القرآن الكريم

وترجمة معانيه إلى

اللغة الإنكليزية

সূচী পত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ الرَّحْمٰنِ

الرَّحِيْمِ ۙ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۗ اِيَّاكَ نَعْبُدُ

وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۗ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

সূরা আল-ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত সাত।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (২) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৩) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৪) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, (৬) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। (৭) তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

সূরা আল-ফাতিহা

ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য : সূরা আল-ফাতিহা কোরআনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূরা। প্রথমতঃ এ সূরা দ্বারাই পবিত্র কোরআন আরম্ভ হয়েছে এবং এ সূরা দিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত নামায আরম্ভ হয়। অবতরণের দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এটিই প্রথম নাযিল হয়। সূরা 'ইকরা', 'মুযযাম্মিল' ও সূরা 'মুদ্দাস্‌সিরে'র ক'টি আয়াত অবশ্য সূরা আল-ফাতিহার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এ সূরার অবতরণই সর্বপ্রথম। যে সকল সাহাবী (রাঃ) সূরা আল-ফাতিহা সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সে বক্তব্যের অর্থ বোধহয় এই যে, পরিপূর্ণ সূরারূপে এর আগে আর কোন সূরা নাযিল হয়নি। এ জন্যই এ সূরার নাম 'ফাতিহাতুল-কিতাব' বা কোরআনের উপক্রমণিকা রাখা হয়েছে।

'সূরা-ফাতিহা' এদিক দিয়ে সমগ্র কোরআনের সার-সংক্ষেপ। এ সূরায় সমগ্র কোরআনের সারমর্ম সংক্ষিপ্তাকারে বলে দেয়া হয়েছে। কোরআনের অবশিষ্ট সূরাগুলো প্রকারান্তরে সূরা ফাতিহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা। কারণ, সমগ্র কোরআন প্রধানতঃ ঈমান এবং নেক আমলের আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত। আর এ দু'টি মূলনীতিই এ সূরায় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরে রূহুল মা'আনী ও রূহুল বয়ানে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাই এ সূরাকে সহীহ হাদীসে 'উম্মুল কোরআন', 'উম্মুল কিতাব', 'কোরানে আযীম' বলেও অভিহিত করা হয়েছে।– (কুরতুবী)

অথবা এ জন্য যে, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত বা অধ্যয়ন করবে তার জন্য এ মর্মে বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সে যেন প্রথমে পূর্বঘোষিত যাবতীয় ধ্যান-ধারণা অন্তর থেকে দূরীভূত করে একমাত্র সত্য ও সঠিক পথের সন্ধানের উদ্দেশে এ কিতাব তেলাওয়াত আরম্ভ করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট এ প্রার্থনাও করে যে, তিনি যেন তাকে সিরাতুল মুস্তাকীমের হেদায়েত দান করেন।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে— যার হাতে আমার জীবন-মরণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, সূরা আল-ফাতিহার দৃষ্টান্ত তওরাত, ইনজীল, যাবুর প্রভৃতি অন্য কোন আসমানী কিতাবে তো নেই-ই, এমনকি পবিত্র কোরআনেও এর দ্বিতীয় নেই। ইমাম তিরমিযী আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন যে— সূরায়ে ফাতিহা প্রত্যেক রোগের ঔষধবিশেষ।

হাদীস শরীফে সূরা আল-ফাতিহাকে সূরায়ে শেফাও বলা হয়েছে। —(কুরতুবী)

বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, — সমগ্র কোরআনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সূরা হচ্ছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ — (কুরতুবী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

بِسْمِ اللّٰهِ **কোরআনের একটি আয়াত :**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কোরআন শরীফের সূরা নাম্লের একটি আয়াত বা অংশ। সূরা তওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার প্রথমে بِسْمِ اللّٰهِ লেখা হয়। بِسْمِ اللّٰهِ সূরা আল-ফাতিহার অংশ, না অন্যান্য সকল সূরারই অংশ, এতে ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) বলেছেন بِسْمِ اللّٰهِ সূরা নাম্ল ব্যতীত অন্য কোন সূরার অংশ নয়। তবে এটি এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আয়াত যা প্রত্যেক সূরার প্রথমে লেখা এবং দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

কোরআন তেলাওয়াত ও প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ্সহ আরম্ভ করার আদেশ : জাহেলিয়াত যুগে লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের প্রত্যেক কাজ উপাস্য দেব-দেবীদের নামে শুরু করতো। এ প্রথা রহিত করার জন্য হযরত জিব্রাঈল পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম যে আয়াত নিয়ে এসেছিলেন, তাতে আল্লাহ্র নামে কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। যথা اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ অর্থাৎ, পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে।

কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, স্বয়ং রসূলে করীম (সা:)-ও প্রথমে প্রত্যেক কাজ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ বলে আরম্ভ করতেন এবং কোন কিছু লেখাতে হলেও এ কথা প্রথমে লেখাতেন। কিন্তু بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অবতীর্ণ হওয়ার পর সর্বকালের জন্য বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে সব কাজ শুরু করার নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে।

—(কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)

কোরআন শরীফের স্থানে স্থানে উপদেশ রয়েছে যে, প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ্ বলে আরম্ভ কর। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "যে কাজ বিসমিল্লাহ্ ব্যতীত আরম্ভ করা হয়, তাতে কোন বরকত থাকে না।"

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, ঘরের দরজা বন্ধ করতে বিসমিল্লাহ্ বলবে, বাতি নেভাতেও বিসমিল্লাহ্ বলবে, পাত্র আবৃত করতেও বিসমিল্লাহ্ বলবে। কোন কিছু খেতে, পানি পান করতে, ওযু করতে, সওয়ারীতে আরোহণ করতে এবং তা থেকে অবতরণকালেও বিসমিল্লাহ্ বলার নির্দেশ কোরআন-হাদীসে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। —(কুরতুবী)

বিসমিল্লাহ্র তফসীর : বিসমিল্লাহ্ বাক্যটি তিনটি শব্দ দ্বারা গঠিত। প্রথমতঃ 'বা' বর্ণ, দ্বিতীয়ত: 'ইসম' ও তৃতীয়ত : 'আল্লাহ্'। আরবী ভাষায় 'বা' বর্ণটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে তিনটি অর্থ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এবং এ তিনটির যে কোন একটি অর্থ এ ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক — সংযোজন। অর্থাৎ, এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে মিলানো বা সংযোগ ঘটানো অর্থে। দুই— এস্তেয়ানাত — অর্থাৎ, কোন বস্তুর সাহায্য নেয়া। তিন— কোন বস্তু থেকে বরকত হাসিল করা।

'ইসম' শব্দের ব্যাখ্যা অত্যন্ত ব্যাপক। মোটামুটিভাবে এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, 'ইসম' নামকে বলা হয়। 'আল্লাহ্' শব্দ সৃষ্টিকর্তার নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মহত্তর ও তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর সম্মিলিত রূপ। কোন কোন আলেম একে ইসমে আ'যম বলেও অভিহিত করেছেন।

এ নামটি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। এজন্যই এ শব্দটির দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না। কেননা, আল্লাহ্ এক; তাঁর কোন শরীক নেই। মোটকথা, আল্লাহ্ এমন এক সত্তার নাম, যে সত্তা পালনকর্তার সমস্ত গুণাবলীর এক অসাধারণ প্রকাশবাচক। তিনি অদ্বিতীয় ও নজীরবিহীন। এজন্য বিসমিল্লাহ্ শব্দের মধ্যে 'বা'- এর তিনটি অর্থের সামঞ্জস্য হচ্ছে আল্লাহ্র নামের সাথে, তাঁর নামের সাহায্যে এবং তাঁর নামের বরকতে।

তাআব্বুজ শব্দের অর্থ اعوذ بالله من الشيطٰن الرجيم পাঠ করা।

আল-কোরআনে এরশাদ হয়েছে— যখন কোরআন পাঠ কর, তখন শয়তানের প্রতারণা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাও। দ্বিতীয়তঃ কোরআন পাঠের প্রাক্কালে আ'উযুবিল্লাহ্ পাঠ করা ইজমায়ে-উম্মত দ্বারা সুন্নত বলে স্বীকৃত হয়েছে। এ পাঠ নামাযের মধ্যেই হোক বা নামাযের বাইরেই হোক। কোরআন তেলাওয়াত ব্যতীত অন্যান্য কাজে শুধু বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত, আ'উযুবিল্লাহ নয়। তেলাওয়াত কালে উভয়টি পাঠ করা সুন্নত। তবে একটি সূরা শেষ করে শুধুমাত্র সূরা তওবা ব্যতীত অপর সূরা আরম্ভ করার পূর্বে যখন কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করা হয় তখন আউযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ উভয়টিই পাঠ করতে হয়। তেলাওয়াত করার সময় মধ্যে সূরা-বারাআত আসলে তখন বিসমিল্লাহ পড়া নিষেধ। কিন্তু প্রথম তেলাওয়াতই যদি সূরা বারাআত দ্বারা আরম্ভ হয়, তবে আ'উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ উভয়টিই পাঠ করতে হবে। -(আলমগীরী)

'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম', কোরআনের সূরা নামল-এর একটি আয়াতের অংশ এবং দু'টি সূরার মাঝখানে একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। তাই অন্যান্য আয়াতের ন্যায় এ আয়াতটির সম্মান করাও ওয়াজিব। অযু ছাড়া এটি স্পর্শ করা জায়েয নয়। অপবিত্র অবস্থায় যথা হায়েয-নেফাসের সময়, (পবিত্র হওয়ার পূর্বে) তেলাওয়াতরূপে পাঠ করাও না জায়েয। তবে কোন কাজ কর্ম আরম্ভ করার পূর্বে (যথা—পানাহার) দোয়ারূপে পাঠ করা সব সময়ই জায়েয।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরাতুল-ফাতিহার বিষয়বস্তু : সূরাতুল-ফাতিহার আয়াত সংখ্যা সাত। প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ্র প্রশংসা এবং শেষের তিনটি আয়াতে মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা ও দরখাস্তের বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ। মধ্যের একটি আয়াত প্রশংসা ও দোয়া মিশ্রিত।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ননা করেছেন যে, রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন — নামায (অর্থাৎ, সূরাতুল ফাতিহা) আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত। অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাদের জন্য। আমার বান্দাগণ যা চায়, তা তাদেরকে দেয়া হবে। অতঃপর রসূল (সাঃ) বলেছেন যে, যখন বান্দাগণ বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ তখন আল্লাহ্ বলেন যে, আমার বান্দাগণ আমার প্রশংসা করছে। আর যখন বলে الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন তিনি বলেন যে, তারা আমার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে। আর যখন বলে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন তিনি বলেন, আমার বান্দাগণ আমার গুণগান করছে। আর যখন বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তখন তিনি বলেন,এ আয়াতটি আমার এবং আমার বান্দাগণের মধ্যে সংযুক্ত। কেননা, এর এক অংশে আমার প্রশংসা এবং অপর অংশে বান্দাগণের দোয়া ও আরয রয়েছে। এ সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে, বান্দাগণ যা চাইবে তারা তা পাবে।

অতঃপর বান্দাগণ যখন বলে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (শেষ পর্যন্ত) তখন আল্লাহ্ বলেন, এসবই আমার বান্দাগণের জন্য এবং তারা যা চাইবে তা পাবে। – (মাযহারী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার)। অর্থাৎ, দুনিয়াতে যে কোন স্থানে যে কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, বাস্তবে তা আল্লাহ্রই প্রশংসা। কেননা, এ বিশ্ব চরাচরে অসংখ্য মনোরম দৃশ্যাবলী, অসংখ্য মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিরাজি আর সীমাহীন উপকারী বস্তুসমূহ সর্বদাই মানব মনকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে এবং তাঁর প্রশংসায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, সকল বস্তুর অন্তরালেই এক অদৃশ্য সত্তার নিপুণ হাত সদা সক্রিয়।

যখন পৃথিবীর কোথাও কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে তা উক্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তার প্রতিই বর্তায়। যেমন, কোন চিত্র, কোন ছবি বা নির্মিত বস্তুর প্রশংসা করা হলে প্রকৃতপক্ষে সে প্রশংসা প্রস্তুতকারকেরই করা হয়।

এ ব্যাক্যটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামনে বাস্তবতার একটি নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের সামনে যা কিছু রয়েছে এ সব কিছুই একটি একক সত্তার সাথে জড়িত এবং সকল প্রশংসাই সে অনন্ত অসীম শক্তির। এসব দেখে কারো অন্তরে যদি প্রশংসাবাণীর উদ্রেক হয় এবং মনে করে যে, তা অন্য কারো প্রাপ্য, তবে এ ধারণা জ্ঞান-বুদ্ধির সংকীর্ণতারই পরিচায়ক। সুতরাং নিঃসন্দেহে একথাই বলতে হয় যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ যদিও প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে অতি সূক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্টবস্তুর উপাসনাই নিষিদ্ধ করা হলো। তাছাড়া এ দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে এক-ত্ববাদের শিক্ষাও দেয়া হয়েছে। আল-কোরআনের এ ক্ষুদ্র বাক্যটিতে একদিকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করা হয়েছে এবং অপরদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নিমগ্ন মানব মনকে এক অতিবাস্তবের দিকে আকৃষ্ট করতঃ যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর পূজা-অর্চনাকে চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতদসঙ্গে অতি হেকমতের সাথে বা অকাট্যভাবে ঈমানের সর্বপ্রথম স্তম্ভ 'তওহীদ' বা একত্ববাদের পরিপূর্ণ নকশাও তুলে ধরা হয়েছে। একটু চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, বাক্যটিতে যে দাবী করা হয়েছে, সে দাবীর স্বপক্ষে দলীলও দেয়া হয়েছে।

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এ ক্ষুদ্র বাক্যটির পরেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রথম গুণবাচক নাম 'রাব্বুল আলামীন'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। আরবী ভাষায় رَبّ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পালনকর্তা। লালন-পালন বলতে বুঝায়, কোন বস্তুকে তার সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে সামনে এগিয়ে নিয়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়া ।

এ শব্দটি একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। সম্বন্ধপদ রূপে অন্যের জন্যেও ব্যবহার করা চলে, সাধারণভাবে নয়। কেননা, প্রত্যেকটি প্রাণী বা সৃষ্টিই প্রতিপালিত হওয়ার মুখাপেক্ষী, তাই সে অন্যের প্রকৃত প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে পারে না।

اَلْعٰلَمِيْنَ শব্দটি عَالَم শব্দের বহুবচন। এতে পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত। যথা— আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, তারকা-নক্ষত্ররাজি, বিজলী, বৃষ্টি, ফেরেশতাকুল, জ্বিন, জমীন এবং এতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে। জীবজন্তু, মানুষ, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এর অর্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির পালনকর্তা। তাছাড়া একথাও চিন্তার উর্ধ্বে নয় যে, আমরা যে দুনিয়াতে বসবাস করছি এর মধ্যেও কোটি কোটি সৃষ্টবস্তু রয়েছে। এ সৃষ্টিগুলোর মধ্যে যা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং যা আমরা দেখি না সে সবগুলোই এক একটা আলম বা জগত।

তাছাড়া আরো কোটি কোটি সৃষ্টি রয়েছে, যা সৌরজগতের বাইরে, যা আমরা অবলোকন করতে পারি না। ইমাম রাযী তফসীরে-কবীরে লিখেছেন যে, এ সৌরজগতের বাইরে আরো সীমাহীন জগত রয়েছে। যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত এবং একথা সর্বজনবিদিত যে, সকল বস্তুই আল্লাহ্র ক্ষমতার অধীন। সুতরাং তাঁর জন্য সৌরজগতের অনুরূপ আরো সীমাহীন কতকগুলো জগত সৃষ্টি করে রাখা অসম্ভব মোটেই নয়।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - এর নিখুঁত প্রতিপালন নীতিই পূর্বের বাক্য اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর দলীল বা প্রমাণ। সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালনের দায়িত্ব একই পবিত্র সত্তার ; তাই তারিফ-প্রশংসারও প্রকৃত প্রাপক তিনিই; অন্য কেউ নয়। এজন্য প্রথম আয়াত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -এ তারীফ-প্রশংসার সাথে ঈমানের প্রথম স্তম্ভ আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব বা তওহীদের কথা অতি সূক্ষ্মভাবে এসে গেছে।

দ্বিতীয় আয়াতে তাঁর গুণ, দয়ার প্রসঙ্গ رحمٰن ও رحيم শব্দদ্বয়ের দ্বারা বর্ণনা করেছেন। উভয় শব্দই 'গুণের আধিক্যবোধক বিশেষণ' যাতে আল্লাহ্র দয়ার অসাধারণত্ব ও পূর্ণতার কথা বুঝায়। এ স্থলে এ গুণের উল্লেখ সম্ভবতঃ এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে সমগ্র সৃষ্টিজগতের লালন-পালন ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এতে তাঁর নিজস্ব কোন প্রয়োজন নেই বা অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েও নয়; বরং তাঁর রহ্মত বা দয়ার তাগিদেই করেছেন। যদি

সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্বও না থাকে, তাতেও তাঁর কোন লাভ-ক্ষতি নেই, আর যদি সমগ্র সৃষ্টি অবাধ্যও হয়ে যায় তবে তাতেও তাঁর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ -এর অর্থ কোন বস্তুর উপর এমন অধিকার থাকা, যাকে ব্যবহার, রদবদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সব কিছু করার সকল অধিকার থাকবে। دين অর্থ প্রতিদান দেয়া। مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর শাব্দিক অর্থ প্রতিদান-দিবসের মালিক বা অধিপতি। অর্থাৎ, প্রতিদান - দিবসের অধিকার ও আধিপত্য কোন্ বস্তুর উপরে হবে, তার কোন বর্ণনা দেয়া হয়নি। তফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে যে, এতে 'আম' বা অর্থের ব্যাপকতার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিদান-দিবসে সকল সৃষ্টিরাজি ও সকল বিষয়ই আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারে থাকবে।

প্রতিদান-দিবসের স্বরূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা ঃ প্রথমতঃ প্রতিদান দিবস কাকে বলে এবং এর স্বরূপ কি? দ্বিতীয়তঃ সমগ্র সৃষ্টির উপর প্রতিদান-দিবসে যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার একক অধিকার থাকবে, অনুরূপভাবে আজও সকল কিছুর উপর তাঁরই তো একক অধিকার রয়েছে; সুতরাং প্রতিদান-দিবসের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, প্রতিদান-দিবস সে দিনকেই বলা হয়, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা ভাল-মন্দ সকল কাজ-কর্মের প্রতিদান দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। রোযে-জাযা শব্দ দ্বারা বোঝান হয়েছে যে, দুনিয়া ভাল-মন্দ কাজ-কর্মের প্রকৃত ফলাফল পাওয়ার স্থান নয়; বরং এটি হল কর্মস্থল; কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জায়গা। যথার্থ প্রতিদান বা পুরস্কার গ্রহণেরও স্থান এটা নয়। এতে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে কারও অর্থ-সম্পদের আধিক্য ও সুখ-শান্তির ব্যাপকতা দেখে বলা যাবে না যে, এ লোক আল্লাহ্র দরবারে মকবুল হয়েছেন বা তিনি আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র। অপর পক্ষে কাকেও বিপদাপদে পতিত দেখেও বলা যাবে না যে, তিনি আল্লাহ্র অভিশপ্ত। যেমনি করে কর্মস্থলে বা কারখানার কোন কোন লোককে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যস্ত দেখে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে বিপদগ্রস্ত বলে ভাবে না; বরং সে এ ব্যস্ততাকে জীবনের সাফল্য বলেই গণ্য করে এবং যদি কেহ অনুগ্রহ করে তাকে এ ব্যস্ততা থেকে রেহাই দিতে চায়, তবে তাকে সে সবচেয়ে বড় ক্ষতি বলে মনে করে। সে তার এ ত্রিশ দিনের পরিশ্রমের অন্তরালে এমন এক আরাম দেখতে পায়, যা তার বেতনস্বরূপ সে লাভ করে।

এ জন্যই নবীগণ এ দুনিয়ার জীবনে সর্বপেক্ষা বেশী বিপদাপদে পতিত হয়েছেন এবং তারপর ওলী-আওলিয়াগণ সবচেয়ে অধিক বিপদে পতিত হন। কিন্তু দেখা গেছে, বিপদের তীব্রতা যত কঠিনই হোক না কেন, দৃঢ়পদে তাঁরা তা সহ্য করেছেন। এমনকি আনন্দিত চিত্তেই তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন। মোটকথা, দুনিয়ার আরাম আয়েশকে সত্যবাদিতা ও সঠিকতা এবং বিপদাপদকে খারাপ কাজের নিদর্শন বলা যায় না।

অবশ্য কখনো কোন কোন কর্মের সামান্য ফলাফল দুনিয়াতেও প্রকাশ করা হয় বটে, তবে তা সেকাজের পূর্ণ বদলা হতে পারে না। এগুলো সাময়িকভাবে সতর্ক করার জন্য একটু নিদর্শন মাত্র।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বাক্যটিতে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই একথা জানেন যে, সেই একক সত্তাই প্রকৃত মালিক, যিনি সমগ্র জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং এর লালন-পালন ও বর্ধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং যাঁর মালিকানা পূর্ণরূপে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই সর্বাবস্থায় পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ— প্রকাশ্যে, গোপনে, জীবিতাবস্থায় ও মৃতাবস্থায় এবং যার মালিকানার আরম্ভ নেই, শেষও নেই। এ মালিকানার সাথে মানুষের মালিকানা তুলনাযোগ্য নয়। কেননা, মানুষের মালিকানা আরম্ভ ও শেষের চৌহদ্দীতে সীমাবদ্ধ। এক সময় তা ছিল না; কিছু দিন পরেই তা থাকবে না। অপরদিকে মানুষের মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য। বস্তুর বাহ্যিক দিকের উপরই বর্তায়; গোপনীয় দিকের ওপর নয়। জীবিতের ওপর; মৃতের ওপর নয়। এজন্যই প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানা কেবলমাত্র প্রতিদান দিবসেই নয়, বরং পৃথিবীতেও সমস্ত সৃষ্টজগতের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তাআলা। তবে এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানা বিশেষভাবে প্রতিদান দিবসের এ কথা বলার তাৎপর্য কি? আল-কোরআনের অন্য আয়াতের প্রতি লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে, যদিও দুনিয়াতেও প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্ তাআলারই, কিন্তু তিনি দয়াপরবশ হয়ে আংশিক বা ক্ষণস্থায়ী মালিকানা মানবজাতিকেও দান করেছেন এবং পার্থিব জীবনের আইনে এ মালিকানার প্রতি সম্মানও দেখানো হয়েছে। বিশ্বচরাচরে মানুষ ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি, বাড়ী-ঘর এবং আসবাব-পত্রের ক্ষণস্থায়ী মালিক হয়েও এতে একেবারে ডুবে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ একথা ঘোষণা করে এ অহংকারী ও নির্বোধ মানব-সমাজকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমাদের এ মালিকানা, আধিপত্য ও সম্পর্ক মাত্র কয়েক দিনের এবং ক্ষণিকের। এমন দিন অতি সত্বরই আসছে, যে দিন কেউই জাহেরী মালিকও থাকবে না, কেউ কারো দাস বা কেউ কারো সেবা পাবার উপযোগীও থাকবে না। সমস্ত বস্তুর মালিকানা এক ও একক সত্তার হয়ে যাবে।

সূরা আল-ফাতিহার প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ্র প্রশংসা ও তারীফের বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর তফসীরে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে সাথে ঈমানের মৌলিক নীতি ও আল্লাহ্র একত্ববাদের বর্ণনাও সূক্ষ্মভাবে দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতের তফসীরে আপনি অবগত হলেন যে, এর দু'টি শব্দে তারীফ ও প্রশংসার সাথে সাথে ইসলামের বিপ্লবাত্মক মহোত্তম আকীদা যথা কিয়ামত ও পরকালের বর্ণনা প্রমাণসহ উপস্থিত করা হয়েছে।

এখন চতুর্থ আয়াতের বর্ণনা ঃ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এ আয়াতের এক অংশে তা'রীফ ও প্রশংসা এবং অপর অংশে দোয়া ও প্রর্থনা। نَعْبُدُ — عبادت শব্দ থেকে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে ঃ কারো প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দরুন তাঁর নিকট নিজের আন্তরিক কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা। نَسْتَعِيْنُ — استعانت হতে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে কারো সাহায্য প্রার্থনা করা। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 'আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।' মানবজীবন তিনটি অবস্থায় অতিবাহিত হয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। পূর্বের তিনটি আয়াতের মধ্যে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এবং اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এ দু'টি আয়াতে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অতীতে সে কেবল মাত্র আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী ছিল, বর্তমানেও সে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী। অস্তিত্বহীন এক অবস্থা থেকে

তিনি তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন।

তাকে সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর আকার-আকৃতি এবং বিবেক ও বুদ্ধি দান করেছেন। বর্তমানে তার লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের নিয়মিত সুব্যবস্থাও তিনিই করেছেন। অতঃপর مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ -এর মধ্যে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতেও সে আল্লাহ্ তা'আলারই মুখাপেক্ষী। প্রতিদান দিবসে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য পাওয়া যাবে না।

প্রথম তিনটি আয়াতের দ্বারা যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, মানুষ তার জীবনের তিনটি কালেই একান্তভাবে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী, তাই সাধারণ যুক্তির চাহিদাও এই যে, ইবাদতও তাঁরই করতে হবে। কেননা, ইবাদত যেহেতু অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে নিজের অফুরন্ত কাকুতি-মিনতি নিবেদন করার নাম, সুতরাং তা পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোন সত্তা নেই। ফলকথা এই যে, একজন বুদ্ধিমান ও বিবেকবান ব্যক্তি মনের গভীরতা থেকেই এ স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি উচ্চারণ করছে যে, আমরা তোমাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না। এ মৌলিক চাহিদাই اِيَّاكَ نَعۡبُدُ তে বর্ণনা করা হয়েছে।

যখন স্থির হলো যে, অভাব পূরণকারী একক সত্তা আল্লাহ্ তা'আলা, সুতরাং নিজের যাবতীয় কাজে সাহায্যও তাঁর নিকটই প্রার্থনা করবে। এ মৌলিক চাহিদারই বর্ণনা وَاِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ এ করা হয়েছে। মোটকথা, এ চতুর্থ আয়াতে একদিকে আল্লাহ্র তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে একথারও স্বীকৃতি রয়েছে যে, ইবাদত ও শ্রদ্ধা পাওয়ার একমাত্র তিনিই যোগ্য। অপরদিকে তাঁর নিকট সাহায্য ও সহায়তার প্রার্থনা করা এবং তৃতীয়তঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করার শিক্ষাও দেয়া হয়েছে। এতদসঙ্গে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, কোন বান্দাই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাকেও অভাব পূরণকারী মনে করবে না। অপর কারো নিকট প্রার্থনার হাত প্রসারিত করা যাবে না। অবশ্য কোন নবী বা কোন ওলীর বরাত দিয়ে প্রার্থনা করা এ আয়াতের মর্মবিরোধী নয়।

এ আয়াতে এ বিষয়ও চিন্তা করা কর্তব্য যে, 'আমরা তোমারই নিকট সাহায্য চাই।' কিন্তু কোন্ কাজের সাহায্য চাই, তার কোন উল্লেখ নেই। জমহুর মুফাসসিরীনের অভিমত এই যে, নির্দিষ্ট কোন ব্যাপারে সাহায্যের কথা উল্লেখ না করে আ'ম বা সাধারণ সাহায্যের প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, আমি আমার ইবাদত এবং প্রত্যেক ধর্মীয় ও পার্থিব কাজে এবং অন্তরে পোষিত প্রতিটি আশা-আকাঙ্খায় কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

শুধু নামায রোযারই নাম ইবাদত নয়। ইমাম গায্যালী স্বীয় গ্রন্থ আরবাঈন-এ দশ প্রকার ইবাদতের কথা লিখেছেন। যথা - নামায, যাকাত, রোযা, কোরআন তিলাওয়াত, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র স্মরণ, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা, প্রতিবেশী এবং সাথীদের প্রাপ্য পরিশোধ করা, মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার উপদেশ দেয়া, রসূলের সুন্নত পালন করা।

একই কারণে ইবাদতে আল্লাহ্র সাথে কাকেও অংশীদার করা চলে না। এর অর্থ হচ্ছে, কারো প্রতি ভালবাসা, আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসার সমতুল্য হবে না। কারো প্রতি ভয়, কারো প্রতি আশা-আকাঙ্খা পোষণ আল্লাহ্র ভয় ও তাঁর প্রতি পোষিত আশা-আকাঙ্খার সমতুল্য হবে না। আবার কারো ওপর একান্ত ভরসা করা, কারো আনুগত্য ও খেদমত করা, কারো কাজকে আল্লাহ্র ইবাদতের সমতুল্য আবশ্যকীয় মনে করা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সামনে স্বীয় কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা এবং যে কাজে অন্তরের আবেগ-আকুতি প্রকাশ পায়, এমন কাজ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা- যথা রুকূ বা সেজদা করা ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই বৈধ হবে না।

শেষ তিনটি আয়াতে মানুষের দোয়া ও আবেদনের বিষয়বস্তু এবং এক বিশেষ প্রার্থনাপদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে—

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ

غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ

অর্থাৎ, 'আমাদিগকে সরল পথ দেখাও; সে সমস্ত মানুষের পথ, যারা তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে। যে পথে তোমার অভিশপ্ত বান্দারা চলেছে সে পথ নয় এবং ঐ সমস্ত লোকের রাস্তাও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।'

এ তিনটি আয়াতে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যেমন, সরল পথের হেদায়েতের জন্য যে আবেদন এ আয়াতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, এর আবেদনকারী যেমনিভাবে সাধারণ মানুষ, সাধারণ মুমিনগণ, তেমনি আওলিয়া, গাউস-কুতুব এবং নবী-রসূলগণও বটে। নিঃসন্দেহে যাঁরা হেদায়েত প্রাপ্ত, বরং অন্যের হেদায়েতের উৎসস্বরূপ, তাঁদের পক্ষে পুনরায় সে হেদায়েতের জন্যই বারংবার প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য কি? এ প্রশ্নের উত্তর হেদায়েত শব্দের তাৎপর্য পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করার ওপর নির্ভরশীল।

ইমাম রাগেব ইস্ফাহানী 'মুফরাদাতুল-কোরআনে' হেদায়েত শব্দের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এর সারমর্ম হচ্ছে— 'কাউকে গন্তব্যস্থানের দিকে অনুগ্রহের সাথে পথ প্রদর্শন করা'। তাই হেদায়েত করা প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ এবং এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। হেদায়েতের একটি স্তর হচ্ছে সাধারণ ও ব্যাপক। এতে সমগ্র সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত। জড়পদার্থ, উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগৎ পর্যন্ত এর আওতাধীন। প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রাণহীন জড়পদার্থ বা ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে হেদায়েতের সম্পর্ক কোথায়?

কোরআনের শিক্ষায় স্পষ্টতঃই এ তথ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, এমনকি প্রতিটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী প্রাণ ও অনুভূতির অধিকারী। স্ব-স্ব পরিমণ্ডলে প্রতিটি বস্তুর বুদ্ধি-বিবেচনা রয়েছে। অবশ্য এ বুদ্ধি ও অনুভূতির তারতম্য রয়েছে। কোনটাতে তা স্পষ্ট এবং কোনটাতে নিতান্তই অনুল্লেখ্য। যে সমস্ত বস্তুতে তা অতি অল্পমাত্রায় বিদ্যমান সেগুলোকে প্রাণহীন বা অনুভূতিহীন বলা যায়। বুদ্ধি ও অনুভূতির ক্ষেত্রে এ তারতম্যের জন্যই সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষ ও জিন জাতিকেই শরীয়তের হুকুম-আহকামের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কারণ, সৃষ্টির এ দু'টি স্তরের মধ্যেই বুদ্ধি ও অনুভূতি পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হয়েছে। কিন্তু, তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, একমাত্র মানুষ ও জিন জাতি ছাড়া সৃষ্টির অন্য কোন কিছুর মধ্যে বুদ্ধি

ও অনুভূতির অস্তিত্ব নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেনঃ

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

অর্থাৎ— এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহ্র প্রশংসার তসবীহ্ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ্ বুঝতে পার না। (সূরা বনী-ইসরাঈল)

সূরা নূরে এরশাদ হয়েছে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

অর্থাৎ, — 'তোমরা কি জান না যে, আসমান-জমিনে যা কিছু রয়েছে, সকলেই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা ও গুণগান করে? বিশেষতঃ পাখীকুল যারা দু'পাখা বিস্তার করে শূন্যে উড়ে বেড়ায়, তাদের সকলেই স্ব-স্ব দোয়া তসবীহ্ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং আল্লাহ্ তা'আলাও ওদের তসবীহ্ সম্পর্কে খবর রাখেন।'

একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়ের ওপরই তাঁর তারীফ ও প্রশংসা নির্ভরশীল। আর এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করাই সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞান। এটা বুদ্ধি-বিবেক ও অনুভূতি ব্যতীত সম্ভব নয়। কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুরই প্রাণ ও জীবন আছে এবং বুদ্ধি ও অনুভূতি রয়েছে। তবে কোন কোনটির মধ্যে এর পরিমাণ এত অল্প যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তা অনুভব করা যায় না। তাই পরিভাষাগতভাবে ওগুলোকে প্রাণহীন ও বুদ্ধিহীন জড়পদার্থ বলা হয়। আর এ জন্যেই ওদেরকে শর'য়ী আদেশের আওতাভুক্ত করা হয়নি। গোটা বস্তুজগত সম্পর্কিত এ মীমাংসা আল-কোরআনে সে যুগেই দেয়া হয়েছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথায়ও আধুনিক কালের কোন দার্শনিকও ছিল না, দর্শনবিদ্যার কোন পুস্তকও রচিত হয়নি। পরবর্তী যুগের দার্শনিকগণ এ তথ্যের যথার্থতা স্বীকার করেছেন এবং প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যেও এ মত পোষণ করার মত অনেক লোক ছিল। মোটকথা, আল্লাহ্র হেদায়েতের এ প্রথম স্তরে সমস্ত সৃষ্টিজগত যথা— জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণীজগৎ, মানবমন্ডলী ও জ্বিন প্রভৃতি সকলেই অন্তর্ভুক্ত। এ সাধারণ হেদায়েতের উল্লেখই আল-কোরআনের أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ আয়াতে করা হয়েছে।

অর্থাৎ, যিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য বিশেষ অভ্যাস এবং বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন এবং সে মেযাজ ও দায়িত্বের উপযোগী হেদায়েত দান করেছেন। এ ব্যাপারে হেদায়েতের পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই অতি নিপুণভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে। যে বস্তুকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে সেই কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব ও নৈপুণ্যের সাথে পালন করছে। যথা — মুখ হতে নির্গত শব্দ নাক বা চক্ষু কেউই শ্রবণ করতে পারে না, অথচ এ দু'টি মুখের নিকটতম অঙ্গ। পক্ষান্তরে এ দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু কানকে অর্পণ করেছেন, তাই একমাত্র কানই মুখের শব্দ শ্রবণ করে ও বোঝে। অনুরূপভাবে কান দ্বারা দেখা বা ঘ্রাণ লওয়ার কাজ করা চলে না। নাক দ্বারা শ্রবণ করা বা দেখার কাজও চলে না।

হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তর এর তুলনায় অনেকটা সংকীর্ণ। অর্থাৎ, সে সমস্ত বস্তুর সাথে জড়িত, পরিভাষায় যাদেরকে বিবেকবান বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়। অর্থাৎ — মানুষ এবং জ্বিন জাতি। এ হেদায়েত নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌঁছেছে। কেউ এ হেদায়েতকে গ্রহণ করে মুমিন হয়েছে আবার কেউ একে প্রত্যাখান করে কাফির- বে-দ্বীনে পরিণত হয়েছে।

হেদায়েতের তৃতীয় স্তর আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তা শুধু মু'মিন ও মুত্তাকী বা ধর্মভীরুদের জন্য। এ হেদায়েত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন প্রকাশ মাধ্যম ব্যতীতই মানুষকে প্রদান করা হয়। এরই নাম তওফীক। অর্থাৎ, এমন অবস্থা, পরিবেশ ও মনোভাব সৃষ্টি করে দেয়া যে, তার ফলে কোরআনের হেদায়েতকে গ্রহণ করা এবং এর ওপর আমল করা সহজসাধ্য হয় এবং এর বিরুদ্ধাচরণ কঠিন হয়ে পড়ে। এ তৃতীয় স্তরের পরিসীমা অতি ব্যাপক। এ স্তরই মানবের উন্নতির ক্ষেত্র। নেক কাজের সাথে এ হেদায়েতের বৃদ্ধি হতে থাকে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ বৃদ্ধির উল্লেখ রয়েছেঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থাৎ — 'যারা আমার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে, আমি তাদেরকে আমার পথে আরো অধিকতর অগ্রসর হওয়ার পথ অবশ্যই দেখিয়ে থাকি।' এটি সেই কর্মক্ষেত্র যেখানে নবী-রসূল এবং বড় বড় ওলী-আওলিয়া, কুতুবগণকেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আরো অধিকতর হেদায়েত ও তওফীকের জন্য চেষ্টায় রত থাকতে দেখা গেছে।

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, হেদায়েত এমন এক বস্তু যা সকলেই লাভ করেছে এবং এর আধিক্য লাভ করার জন্য বড় হতে বড় ব্যক্তির পক্ষেও কোন বাধা-নিষেধ নেই। এজন্যই সূরা আল-ফাতেহায় গুরুত্বপূর্ণ দোয়ারূপে হেদায়েত প্রার্থনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যা একজন সাধারণ মুমিনের জন্যও উপযোগী, আবার একজন বড় হতে বড় রসূলের জন্যও উপযোগী। এজন্যই হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর শেষ জীবনে সূরা ফাতাহ্তে মক্কাবিজয়ের ফলাফল বর্ণনা করতে গিয়ে একথাও বলা হয়েছে যে, وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا অর্থাৎ, মক্কা বিজয় এজন্যই আপনার দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে, যাতে সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত লাভ হয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেবল নিজেই হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন না ; বরং অন্যের জন্যও ছিলেন হেদায়েতের উৎস। এমতাবস্থায় তাঁর হেদায়েত লাভের একমাত্র অর্থ হতে পারে, এ সময় হেদায়েতের কোন উচ্চতর অবস্থা তিনি লাভ করেছেন।

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যা পবিত্র কোরআন বুঝবার ক্ষেত্রে যে সব ফায়দা প্রদান করবে সংক্ষেপে তা নিম্নরূপঃ

(এক) পবিত্র কোরআনের কোথাও কোথাও মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবার জন্যই হেদায়েত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোথাও শুধুমাত্র মুত্তাকীদের জন্য বিশেষ অর্থে হেদায়েত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতেকরে অজ্ঞ লোকদের পক্ষে সন্দেহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় কিন্তু হেদায়েতের সাধারণ ও বিশেষ স্তরসমূহ জানার পর এ সন্দেহ

আপনা-আপনিতেই দূরীভূত হয়ে যাবে। বুঝতে হবে যে, কারো বেলায় ব্যাপক অর্থে এবং কারো বেলায় বিশেষ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

(দুই) আল-কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এরশাদ হয়েছে যে, জালেম ও ফাসেকদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়েত দান করেন না। অন্যত্র বারবার এরশাদ হয়েছে যে, তিনি সকলকেই হেদায়েত দান করেন। এর উত্তরও হেদায়েতের স্তরসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে দেয়া হয়েছে যে, হেদায়েতের ব্যাপক অর্থে সকলেই হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং বিশেষ অর্থে জালেম ও ফাসেকরা বাদ পড়েছে।

(তিন) হেদায়েতের তিনটি স্তরের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় স্তর সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ পর্যায়ের হেদায়েত একান্তভাবে একমাত্র তাঁরই কাজ। এতে নবী-রসূলগণেরও কোন অধিকার নেই। নবী-রসূলগণের কাজ শুধু হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরে সীমিত। কোরআনের যেখানে যেখানে নবী-রসূলগণকে হেদায়েতকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে। আর যেখানে এরশাদ হয়েছে ঃ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ অর্থাৎ, আপনি যাকে চাইবেন তাকেই হেদায়েত করতে পারবেন না — এতে হেদায়েতের তৃতীয় স্তরের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, কাউকে তওফীক দান করা আপনার কাজ নয়।

মোটকথা, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ একটি ব্যাপক ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দোয়া, যা মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মানবসমাজের কোন ব্যক্তিই এর আওতার বাইরে নেই। কেননা, সরল-সঠিক পথ ব্যতীত দ্বীন-দুনিয়া কোনটিরই উন্নতি ও সাফল্য সম্ভব নয়। দুনিয়ার আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যেও সিরাতে-মুস্তাকীমের প্রার্থনা পরশপাথরের ন্যায়, কিন্তু মানুষ তা লক্ষ্য করে না। আয়াতের অর্থ হচ্ছে -'আমাদিগকে সরল পথ দেখিয়ে দিন।'

সরল পথ কোনটি? 'সোজা সরল রাস্তা' সে পথকে বলে, যাতে কোন মোড় বা ঘোরপ্যাঁচ নেই। এর অর্থ হচ্ছে, ধর্মের সে রাস্তা যাতে 'ইফরাত বা 'তফরীত এর-অবকাশ নেই। ইফরাতের অর্থ সীমা অতিক্রম করা এবং তফরীত অর্থ মর্জিমত কাট-ছাট করে নেয়া। এরশাদ হয়েছে ঃ

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ, যে সকল লোক আপনার অনুগ্রহ লাভ করেছে তাদের রাস্তা। যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ করেছে, তাদের পরিচয় অন্য একটি আয়াতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ
وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ

অর্থাৎ — যাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন, নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল সালেহীন। আল্লাহ্র দরবারে মকবুল উপরোক্ত লোকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর নবীগণের। অতঃপর নবীগণের উম্মতের মধ্যে যাঁরা সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী, তাঁরা হলেন সিদ্দীক। যাদের মধ্যে রূহানী কামালিয়াত ও পরিপূর্ণতা রয়েছে, সাধারণ ভাষায় তাঁদেরকে 'আওলিয়া' বলা হয়। আর যাঁরা দ্বীনের প্রয়োজনে স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন, তাঁদেরকে বলা হয় শহীদ। আর সালেহীন হচ্ছেন যাঁরা ওয়াজিব-মুস্তাহাব প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ও আমলকারী। সাধারণ পরিভাষায় এঁদেরকে দ্বীনদার বলা হয়।

এ আয়াতের প্রথম অংশে ইতিবাচক বাক্য ব্যবহার করে সরল পথের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরোক্ত চার স্তরের মানুষ যে পথে চলেছেন তাই সরল পথ। পরে শেষ আয়াতে নেতিবাচক বাক্য ব্যবহার করেও এর সমর্থন করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

অর্থাৎ, যারা আপনার অভিসম্পতগ্রস্ত তাদের পথ নয় এবং তাদের পথও নয়, যারা পথহারা হয়েছে।

اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ বলতে ঐ সকল লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা ধর্মের হুকুম-আহ্কামকে বুঝে-জানে, তবে স্বীয় অহমীকা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ মান্য করতে গাফলতি করেছে। যেমন, সাধারণভাবে ইহুদীদের নিয়ম ছিল, সামান্য স্বার্থের জন্য দ্বীনের নিয়ম-নীতি বিসর্জন দিয়ে তারা নবী-রসূলগণের অবমাননা পর্যন্ত করতে দ্বিধাবোধ করত না। ضالين – তাদেরকে বলা হয়, যারা না বুঝে অজ্ঞতার দরুন ধর্মীয় ব্যাপারে ভুল পথের অনুসারী হয়েছে এবং ধর্মের সীমালঙ্ঘন করে অতিরঞ্জনের পথে অগ্রসর হয়েছে। যথা-নাসারাগণ। তারা নবীর শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদানের নামে এমনি বাড়াবাড়ি করেছে যে, নবীদিগকে আল্লাহ্র স্থানে উন্নীত করে দিয়েছে। ইহুদীদের বেলায় এটা অন্যায় এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র নবীদের কথা মানেনি; এমনকি তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে। অপরদিকে নাসারাগণের বেলায় অতিরঞ্জন হচ্ছে এই যে, তারা নবীদিগকে আল্লাহ্র পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে— আমরা সে পথ চাই না, যা নফসানী উদ্দেশের অনুগত হয় এবং মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে ও ধর্মের মধ্যে সীমালঙ্ঘনের প্রতি প্ররোচিত করে। সে পথও চাই না, যে পথ অজ্ঞতা ও মূর্খতার দরুন ধর্মের সীমারেখা অতিক্রম করে এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সোজা-সরল পথ চাই যার মধ্যে না অতিরঞ্জন আছে, আর না কম-কছুরী আছে এবং যা নফসানী প্রভাব ও সংশয়ের উর্ধ্বে।

সূরা আল-ফাতেহার আয়াত সাতটির তফসীর শেষ হয়েছে। এখন সমগ্র সূরার সারমর্ম হচ্ছে এই দোয়া— 'হে আল্লাহ্! আমাদিগকে সরল পথ দান করুন। কেননা, সরল পথের সন্ধান লাভ করাই সবচাইতে বড় জ্ঞান ও সর্বাপেক্ষা বড় কামিয়াবী। বস্তুতঃ সরল পথের সন্ধানে ব্যর্থ হয়েই দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়েছে। অন্যথায় অ-মুসলমানদের মধ্যেও সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করার আগ্রহ-আকূতির অভাব নেই। এজন্যই কোরআন পাকে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় পদ্ধতিতেই সিরাতে-মুস্তাকীমের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

দোয়া করার পদ্ধতি ঃ এ সূরায় একটা বিশেষ ধরনের বর্ণনারীতির মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্র নিকট কোন দোয়া বা কোন আকূতি পেশ করতে হয়, তখন প্রথমে তাঁর তা'রীফ কর, তাঁর দেয়া সীমাহীন নেয়ামতের স্বীকৃতি দাও। অতঃপর একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কাকেও দাতা ও অভাব পূরণকারী মনে করো না কিংবা অন্য কাকেই এবাদতের যোগ্য বলে স্বীকার করো না। অতঃপর স্বীয় উদ্দেশের জন্য আরযি পেশ কর। এ নিয়মে যে দোয়া করা হয়, তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আশা করা যায়। দোয়া করতেও এমন ব্যাপক পদ্ধতি অবলম্বন

কর, যাতে মানুষের সকল মকসুদ তার অন্তর্ভুক্ত থাকে। যথা, সরল পথ লাভ করা এবং দুনিয়ার যাবতীয় কাজে সরল-সঠিক পথ পাওয়া, যাতে কোথাও কোন ক্ষতি বা পদস্খলনের আশংকা না থাকে। মোটকথা, এখানে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর তা'রীফ- প্রশংসা করার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হল মানবকুলকে শিক্ষা দেয়া।

আল্লাহ্র তা'রীফ-প্রশংসা করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব ঃ এ সূরার প্রথম বাক্যে আল্লাহ্র তা'রীফ বা প্রশংসা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তা'রীফ বা প্রশংসা সাধারণতঃ কোন গুণের বা প্রতিদানের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে কোন গুণের বা প্রতিদানের উল্লেখ নেই। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নেয়ামত অগণিত। কোন মানুষ এর পরিমাপ করতে পারে না। কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহ্র নেয়ামতের গণনা করতে চাও, তবে তা পারবে না। মানুষ যদি সারা বিশ্ব হতে মুখ ফিরিয়ে শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্বের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তবে বুঝতে পারবে যে, তার দেহই এমন একটি ক্ষুদ্র জগত যাতে বৃহৎ জগতের সকল নিদর্শন বিদ্যমান। তার দেহ যমীন তুল্য। কেশরাজি উদ্ভিদ তুল্য। তার হাড়গুলো পাহাড়ের মত এবং শিরা-উপশিরা যাতে রক্ত চলাচল করে, সেগুলো নদী-নালা বা সমুদ্রের নমুনা। দু'টি বস্তুর সংমিশ্রণে মানুষের অস্তিত্ব। একটি দেহ ও অপরটি আত্মা। এ কথাও স্বীকৃত যে, মানবদেহে আত্মা সর্বাপেক্ষা উত্তম অংশ আর তার দেহ হচ্ছে আত্মার অনুগত এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের অধিকারী। এ নিকৃষ্ট অংশের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী চিকিৎসকগণ বলেছেন যে, মানবদেহে আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ হাজার প্রকার উপাদান রেখেছেন। এতে তিন শতেরও অধিক জোড়া রয়েছে। প্রত্যেকটি জোড়া আল্লাহ্র কুদরতে এমন সুন্দর ও মজবুতভাবে দেয়া হয়েছে যে, সর্বদা নড়া-চড়া করা সত্ত্বেও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না এবং কোন প্রকার মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ মানুষের বয়স ষাট-সত্তর বছর হয়ে থাকে। এ দীর্ঘ সময় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সর্বদা নড়াচড়া করছে, অথচ এর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন— نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ অর্থাৎ, 'আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমিই তাদের জোড়াগুলোকে মজবুত করেছি।' এ কুদরতী মজবুতির পরিণাম হয়েছে এই যে, সাধারণভাবে তা অত্যন্ত নরম ও নড়বড়ে অথচ এ নড়বড়ে জোড়া সত্তুর বছর বা এর চাইতে অধিক সময় পর্যন্ত কর্মরত থাকে। মানুষের অঙ্গগুলোর মধ্যে শুধু চক্ষুর কথাই চিন্তা করলে দেখা যাবে, এতে আল্লাহ্ তা'আলার অসাধারণ হেকমত প্রকাশিত হয়েছে; সারা জীবন সাধনা করেও এ রহস্যটুকু উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

এ চোখের এক পলকের কার্যক্রম লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে যে, এর এক মিনিটের কার্যক্রমে আল্লাহ্ তা'আলার কত নেয়ামত যে কাজ করছে, তা ভেবে অবাক হতে হয়। কেননা চক্ষু খুলে এ দ্বারা কত বস্তুকে সে দেখছে। এতে যেভাবে চক্ষুর ভেতরের শক্তি কাজ করছে, অনুরূপভাবে বহির্জগতের সৃষ্টিরাজিও এতে বিশেষ অংশ নিচ্ছে। সূর্যের কিরণ না থাকলে চোখের দৃষ্টিশক্তি কোন কাজ করতে পারে না। সূর্যের জন্য আকাশের প্রয়োজন হয়। মানুষের দেখার জন্য এবং চক্ষু দ্বারা কাজ করার জন্য আহার্য ও বায়ুর প্রয়োজন হয়। এতে বুঝা যায়, চোখের এক পলকের দৃষ্টির জন্য বিশ্বের সকল শক্তি ব্যবহৃত হয়। এ তো একবারের দৃষ্টি এখন দিনে কতবার দেখে এবং জীবনে কতবার দেখে তা হিসাব করা মানুষের শক্তির ঊর্ধ্বে। এমনিভাবে কান, জিহ্বা, হাত ও পায়ের যত কাজ এতে সমগ্র জগতের শক্তি যুক্ত হয়ে কার্য সমাধা হয়। এ তো সে মহা দান যা প্রতিটি জীবিত মানুষ ভোগ করে। এতে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্রের কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নেয়ামত এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে যা প্রতিটি প্রাণী ভোগ করেও উপকৃত হয়। আকাশ-জমিন এবং এ দু'টির মধ্যে সৃষ্ট সকল বস্তু চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বায়ু প্রভৃতি প্রতিটি প্রাণীই উপভোগ করে।

এরপর আল্লাহ্র বিশেষ দান যা মানুষকে হেকমতের তাকিদে কম-বেশী দেয়া হয়েছে, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, আরাম-আয়েশ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও একথা অত্যন্ত মৌলিক যে, সাধারণ নেয়ামত যা সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সমভাবে উপভোগ্য; যথা — আকাশ, বাতাস, জমিন এবং বিরাট এ প্রকৃতি, এ সমস্ত নেয়ামত বিশেষ নেয়ামতের (যথা ধন-সম্পদ) তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম। অথচ এসব নেয়ামত সকল মানুষের মধ্যে সমভাবে পরিব্যাপ্ত বলে, এত বড় নেয়ামতের প্রতি মানুষ দৃষ্টিপাত করে না। ভাবে, কি নেয়ামত! বরং আশপাশের সামান্য বস্তু যথা, আহার্য, পানীয়, বসবাসের নির্ধারিত স্থান, বাড়ী-ঘর প্রভৃতির প্রতিই তাদের দৃষ্টি সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকে।

মোটকথা, সৃষ্টিকর্তা মানবজাতির জীবন-ধারণ এবং দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার সুবিধার্থে যে অফুরন্ত নেয়ামত দান করেছেন, তার অতি অল্পই এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পক্ষে দুনিয়ার জীবনে চোখ মেলেই মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই মহান দাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকা ছিল স্বাভাবিক। বলাবাহুল্য যে, মানবজীবনের সে চাহিদার প্রেক্ষিতে কোরআনের সর্ব প্রথম সূরার সর্বপ্রথম বাক্যে اَلْحَمْدُ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই মহান সত্তার তা'রীফ ও প্রশংসাকে এবাদতের শীর্ষস্থানে রাখা হয়েছে।

রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন নেয়ামত কোন বান্দাকে দান করার পর যখন সে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে, তখন বুঝতে হবে, যা সে পেয়েছে, এ শব্দ তা অপেক্ষা অনেক উত্তম।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি বিশ্ব-চরাচরের সকল নেয়ামত লাভ করে এবং সেজন্য সে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে, তবে বুঝতে হবে যে, সারা বিশ্বের নেয়ামতসমূহ অপেক্ষা তার اَلْحَمْدُ বলা অপেক্ষা অতি উত্তম।— (কুরতুবী)

কোন কোন আলেমের মন্তব্য উদ্ধৃত করে কুরতুবী লিখেছেন যে, মুখে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলা একটি নেয়ামত এবং এ নেয়ামত সারা বিশ্বের সকল নেয়ামত অপেক্ষা উত্তম। সহীহ্ হাদীসে আছে যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পরকালের তৌলদণ্ডের অর্ধেক পরিপূর্ণ করবে।

হযরত শফীক ইবনে ইব্রাহীম اَلْحَمْدُ -এর ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে কোন নেয়ামত দান করেন, তখন প্রথমে দাতাকে জানো এবং পরে তিনি যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক। আর তাঁর দেয়া শক্তি ও ক্ষমতা তোমাদের দেহে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর অবাধ্যতার নিকটেও যেও না।

দ্বিতীয় শব্দ الله -এর সাথে لام বর্ণটি যুক্ত। যাকে আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী খাস لام বলা হয়। যা কোন আদেশ বা গুণের বিশেষত্ব বুঝায়। এখানে অর্থ হচ্ছে যে, শুধু তারীফ- প্রশংসাই মানবের কর্তব্য। বরং এ তারীফ- প্রশংসা তাঁর অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত। বাস্তব পক্ষে তিনি ব্যতীত এ জগতে অন্য কেউ তারীফ-প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। এতদসঙ্গে এও তাঁর নেয়ামত যে, মানুষকে চরিত্র গঠন শিক্ষাদানের জন্য এ আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আমার নেয়ামতসমূহ যে সকল মাধ্যম অতিক্রম করে আসে, সেগুলোরও শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর যে ব্যক্তি এহ্‌সানকারীর শুকরিয়া আদায় করে না সে বাস্তবপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলারও শুকরিয়া করে না।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - এর অর্থ মুফাসসিরকুল- শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আমরা তোমারই এবাদত করি, তুমি ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করি না। আর তোমারই সাহায্য চাই, তুমি ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য চাই না।— (ইবনে জরীর, ইবনে আবি হাতেম)

সলফে-সালেহীনদের কেউ কেউ বলেছেন যে, সূরা আল-ফাতেহা কোরআনের সারমর্ম এবং إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ সূরা আল-ফাতেহার সারমর্ম। কেননা, এর প্রথম বাক্যে রয়েছে শিরক থেকে মুক্তির ঘোষণা এবং দ্বিতীয় বাক্যে তার পরিপূর্ণ শক্তি ও কুদরতের স্বীকৃতি। মানুষ দুর্বল, আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত কোন কিছুই সে করতে পারে না। তাই সকল ব্যাপারে আল্লাহ্র উপর একান্তভাবে নির্ভর করা ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই। এ উপদেশ কোরআনের বিভিন্ন স্থানে দেয়া হয়েছে ।

(এক) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এবাদত জায়েয নয় ঃ ইতিপূর্বে এবাদতের পরিচয় দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কোন সত্তার অসীমতা, মহত্ত্ব এবং তাঁর প্রতি ভালবাসার ভিত্তিতে, তাঁর সামনে অশেষ কাকুতি-মিনতি পেশ করার নামই এবাদত। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সাথে অনুরূপ আচরণ করাই শিরক। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, মূর্তিপূজার মত প্রতীকপূজা বা পাথরের মূর্তিকে খোদায়ী শক্তির আধার মনে করা বা কারো প্রতি সম্ভ্রম বা ভালবাসা এ পর্যায়ে পৌছে দেয়া, যা আল্লাহ্র জন্য করা হয়, তাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করা একমাত্র আল্লাহ্রই কাজ। যে ব্যক্তি এ কাজে অন্যকে অংশীদার করে, হালাল ও হারাম জানা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কথাকে অবশ্য করণীয় মনে করে, তবে প্রকারান্তরে সে তার এবাদতই করে এবং শিরকে পতিত হয়। সাধারণ মুসলমান যারা কোরআন-হাদীস সরাসরি বুঝতে পারে না, শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম নির্ধারণের যোগ্যতাও রাখে না; এ জন্য কোন ইমাম, মুজতাহিদ, আলেম বা মুফতীর কথার উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে; তাদের সাথে এ আয়াতের মর্মের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, প্রকৃত পক্ষে তারা কোরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক আমল করে; আল্লাহ্র নিয়ম-বিধানেরই অনুকরণ করে। আলেমগণের নিকট থেকে তারা আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা গ্রহণ করে মাত্র। কোরআনই তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে ঃ

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, 'যদি আল্লাহ্র আদেশ তোমাদের জানা না থাকে, তবে আলেমদের নিকট জেনে নাও।'

হালাল-হারাম নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে কাউকেই অংশীদার করা শিরক। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে মান্নত করাও শিরক। প্রয়োজন মিটানো বা বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট দোয়া করাও শিরক। কেননা, হাদীসে দোয়াকে এবাদতরূপে গণ্য করা হয়েছে। কাজেই যেসব কার্যকলাপে শিরকের নিদর্শন রয়েছে, সেসব কাজ করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আদী ইবনে হাতেম বলেন,— ইসলাম কবুল করার পর আমি আমার গলায় ক্রস পরিহিত অবস্থায় রসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম। এটা দেখে হুযূর আদেশ করলেন, এ মূর্তিটা গলা থেকে ফেলে দাও। আদী ইবনে হাতেম যদিও ক্রস সম্পর্কে তখন নাসারাদের ধারণা পোষণ করতেন না, এতদসত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে শিরকের নিদর্শন থেকে বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যকীয় বলে রসূল (সাঃ) তাঁকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এমনিভাবে কারো প্রতি রুকূ বা সেজদা করা, বাইতুল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর তওয়াফ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এসব থেকে বেঁচে থাকার স্বীকারোক্তি এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারই إِيَّاكَ نَعْبُدُ তে করা হয়েছে।

কারো সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। কেননা, বৈষয়িক সাহায্য তো একজন অপরজনের কাছ থেকে সব সময়ই নিয়ে থাকে। এ ছাড়া দুনিয়ার কাজ-কারবার চলতেই পারে না। যথা— প্রস্তুতকারক, দিন-মজুর, নির্মাতা, কর্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর কারিগরই অন্যের সাহায্যে নিয়োজিত, অন্যের খেদমতে সর্বদা ব্যস্ত এবং প্রত্যেকেই তাদের সাহায্যপ্রার্থী ও সাহায্য গ্রহণে ব্যাধ্য। এরূপ সাহায্য নেয়া কোন ধর্মমতে বা কোন শরীয়তেই নিষেধ নয়। কারণ, এ সাহায্যের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থিত সাহায্য কোন অবস্থাতেই সম্পৃক্ত নয়। অনুরূপভাবে কোন নবী বা ওলীর বরাত দিয়েও আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা কোরআনের নির্দেশ ও হাদীসের বর্ণনায় বৈধ প্রমাণিত হয়েছে। এরূপ সাহায্য প্রার্থনাও আল্লাহ্র সম্পর্কযুক্ত সাহায্য প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত নয়, যা কোরআন ও হাদীসে শিরকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অল্লাহ্র নিকট বিশেষভাবে প্রার্থিত সাহায্য দু'প্রকার। এক— আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ফেরেশতা, কোন নবী, কোন ওলী বা কোন মানুষকে একক ক্ষমতাশালী বা একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে তাদের নিকট কিছু চাওয়া, — এটি প্রকাশ্য কুফরী। একে কাফের-মুশরিকরাও কুফরী বলে মনে করে। তারা নিজেদের দেবীদেরকেও আল্লাহ্র ন্যায় সর্বশক্তিমান একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে না।

দুই — সাহায্য প্রার্থনার যে পন্থা কাফেরগণ গ্রহণ করে থাকে, কোরআন তাকে বাতিল ও শিরক বলে ঘোষণা করেছে। তা হচ্ছে কোন ফেরেশতা, নবী, ওলী বা দেবদেবী সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা যে,

প্রকৃত শক্তি ও ইচ্ছার মালিক তো আল্লাহ্ তা'আলাই, তবে তিনি তাঁর কুদরতে সে ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির কিছু অংশ অমুককে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাকে ক্ষমতা দান করেছেন এবং সে ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোরআনের إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এরূপ সাহায্য আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নিকট চাইতে পারি না।

সাহায্য-সহতায়তা সম্পর্কিত এ ধারণা মুমিন ও কাফের এবং ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। কোরআন একে হারাম ও শিরক ঘোষণা করেছে এবং কাফেরগণ একে সমর্থন করে এ অনুযায়ী আমল করছে। এ ব্যাপারে যেখানে সংশয়ের উদ্ভব হয় তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তার কোন কোন ফেরেশতার উপর পার্থিব ব্যবস্থা পরিচালনার অনেক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন বলে বর্ণনা রয়েছে। এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয় যে, ফেরেশতাগণকে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্ নিজেই তো ক্ষমতা দিয়েছেন, তদনুরূপ নবীগণকেও এমন কিছু কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন যা অন্য মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে; যথা, মু'জেযা। অনুরূপ আওলিয়াগণকেও এমন কিছু কাজের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যা সাধারণ মানুষ করতে পারে না। যেমন, কারামত। সুতরাং স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ধারণায় পতিত হওয়া বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার কিয়দংশ যদি তাদের মধ্যে না-ই দিতেন, তবে তাঁদের দ্বারা এমন সব কাজ কি করে হয়ে থাকে? এতে নবী ও ওলীগণের প্রতি কর্মে স্বাধীন হওয়ার বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। বরং মু'জেযা এবং কারামত একমাত্র আল্লাহ্রই কাজ। এর প্রকাশ নবী ও ওলীগণের মাধ্যমে করে থাকেন শুধু তাঁর হেকমত ও রহস্য বুঝাবার জন্য। নবী ও ওলীগণের পক্ষে সরাসরি এসব কাজ করার ক্ষমতা নেই। এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। যথা,— এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

বদরের যুদ্ধে রসূল (সাঃ) শত্রুসৈন্যদের প্রতি একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং সে কঙ্কর সকল শত্রু, শত্রুসৈন্যের চোখে গিয়ে পড়েছিল। সে মু'জেযা সম্পর্কে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'হে মুহাম্মদ (সাঃ) ! এ কঙ্কর আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহ তা'আলাই নিক্ষেপ করেছেন।' এতে বুঝা যায় যে, নবীগণের মাধ্যমে মু'জেযারূপে যেসব অস্বাভাবিক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল আল্লাহ্রই কাজ। অনুরূপ, হযরত নূহ (আঃ)-কে তাঁর জাতি বলেছিল যে, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে যে শাস্তি সম্পর্কে আমাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করছেন, তা এনে দেখান। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ মু'জেযারূপে আসমানী বালা নিয়ে আসা আমার ক্ষমতার উর্ধ্বে। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তবে আসবে। তখন তোমরা তা থেকে পালাতে পারবে না।

সূরা ইবরাহীমে নবী ও রসূলগণের এক দলের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন ঃ

وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

অর্থাৎ, 'কোন মুজেযা দেখানো আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হতে পারে না।' তাই কোন নবী বা ওলী কোন মু'জেযা বা কারামত যখন ইচ্ছা বা যা ইচ্ছা দেখাবেন, এরূপ ক্ষমতা কাউকেই দেয়া হয়নি।

রসূল ও অন্যান্য নবিগণকে মুশরিকরা কত রকমের মু'জেযা দেখাতে বলেছে, কিন্তু যেগুলোতে আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়েছে সেগুলোই প্রকাশ পেয়েছে। আর যেগুলোতে আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়নি, সেগুলো প্রকাশ পায়নি। কোরআনের সর্বত্র এ সম্পর্কিত তথ্য বিদ্যমান।

তাই এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে এবং এতদসঙ্গে নবী-রসূল ও ওলী-আওলিয়াগণের গুরুত্বের বিশেষভাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। এ বিশ্বাস এবং স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং তাঁর বিধানের অনুসরণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। যেভাবে কোন ব্যক্তি বাল্‌ব ও পাখার গুরুত্ব অনুধাবন না করে একে নষ্ট করে দিয়ে আলো-বাতাস পাওয়ার আশা করতে পারে না, তেমনি নবী-রসূল ও ওলী-আওলিয়াগণের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি আশা করা যায় না।

সাহায্য প্রার্থনা ও ওসীলা তালাশ করা এবং তা গ্রহণ করার প্রশ্নে নানা প্রকার প্রশ্ন ও সংশয়ের উৎপত্তি হতে দেখা যায়। আশা করা যায় যে, উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা সে সংশয় ও সন্দেহের নিরসন হবে।

সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েতেই দ্বীন-দুনিয়ার সাফল্যের চাবিকাঠি ঃ আলোচ্য তফসীরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা যে দোয়াকে সর্বক্ষণ সকল লোকের সকল কাজের জন্য নির্ধারিত করেছেন তা হচ্ছে সিরাতুল-মুস্তাকীমের হেদায়েতপ্রাপ্তির দোয়া। এমনিভাবে আখেরাতের মুক্তি যেমন সে সরল পথে রয়েছে যা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, অনুরূপভাবে দুনিয়ার যাবতীয় কাজের উন্নতি-অগ্রগতিও সিরাতুল-মুস্তাকীম বা সরল পথের মধ্যেই নিহিত। যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করলে উদ্দেশ্য সফল হয়, তাতে পূর্ণ সফলতাও অনিবার্যভাবেই হয়ে থাকে।

যে সব কাজে মানুষ সফলতা লাভ করতে পারে না, তাতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সে কাজের ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে।

সারকথা, সরল পথের হেদায়েত কেবল পরকাল বা দ্বীনী জীবনের সাফল্যের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং দুনিয়ার সকল কাজের সফলতাও এরই উপর নির্ভরশীল। এজন্যই প্রত্যেক মুমিনের এ দোয়া তসবীহ্স্বরূপ সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। তবে মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখতে ও দোয়া করতে হবে; শুধু শব্দের উচ্চারণ যথেষ্ট নয়।

সূরা আল ফাতেহা সমাপ্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۚ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى
لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ
يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ
وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ
اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۗ

সূরা আল্ বাক্বারাহ

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ২৮৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) আলিফ লাম মীম। (২) এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, (৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে (৪) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।

সূরা আল্ বাক্বারাহ

সূরা বাক্বারার ফযীলত ঃ এ সূরা বহু আহ্‌কাম সম্বলিত সবচাইতে বড় সূরা। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, সূরা বাক্বারাহ পাঠ কর। কেননা, এর পাঠে বরকত লাভ হয় এবং পাঠ না করা অনুতাপ ও দুর্ভাগ্যের কারণ। যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে তার উপর কোন আহ্‌লে–বাতিল তথা জাদুকরের জাদু কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

নবী করীম (সাঃ) এ সূরাকে سنام القرآن (সেনামুল – কোরআন) ও ذروة القرآن (যারওয়াতুল–কোরআন) বলে উল্লেখ করেছেন। সেনাম ও যারওয়াহ বস্তুর উৎকৃষ্টতম অংশকে বলা হয়। সূরায়ে বাক্বারায় আয়াতুল কুরসী নামে যে আয়াতখানা রয়েছে তা কোরআন শরীফের অন্যান্য সকল আয়াত থেকে উত্তম। — (ইবনে–কাসীর)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, এ সূরায় এমন দশটি আয়াত রয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি সে আয়াতগুলো রাতে নিয়মিত পাঠ করে, তবে শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং সে রাতের মত সকল বালা–মুসীবত, রোগ–শোক ও দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকে নিরাপদে থাকবে। তিনি আরো বলেছেন, যদি বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের উপর এ দশটি আয়াত পাঠ করে দম করা হয়, তবে সে ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করবে। আয়াত দশটি হচ্ছে ঃ সূরার প্রথম চার আয়াত, মধ্যের তিনটি অর্থাৎ, আয়াতুল–কুরসী ও তার পরের দু'টি আয়াত এবং শেষের তিনটি আয়াত।

আহ্‌কাম ও মাসায়েল ঃ বিষয়বস্তু ও মাসায়েলের দিক দিয়েও সূরা বাক্বারাহ সমগ্র কোরআনে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। এ সূরায় এক হাজার আদেশ, এক হাজার নিষেধ, এক হাজার হেকমত এবং এক হাজার সংবাদ ও কাহিনী রয়েছে।

আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হরূফে মুকাত্তাআত ঃ অনেকগুলো সূরার প্রারম্ভে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন বর্ণ দ্বারা গঠিত এক–একটা বাক্য উল্লেখিত হয়েছে। যথা الٓمّٓصٓ، الٓمّٓ ، حٰمٓ। এগুলোকে কোরআনের পরিভাষায় 'হরূফে মুকাত্তাআত' বলা হয়। এ অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে সাকিন পড়া হয়। যথা– الف – لام – ميم –(আলিফ্–লাম্–মীম্)।

কোন কোন তফসীরকার এ হরফগুলোকে সংশ্লিষ্ট সূরার নাম বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহ্‌র নামের তত্ত্ব বিশেষ।

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী এবং ওলামার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত মত হচ্ছে যে, হরূফে–মুকাত্তাআতগুলো এমনি রহস্যপূর্ণ যার মর্ম ও মাহাত্ম্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। অন্য কাকেও এ বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান গনী (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবিগণ এ সম্বন্ধে অভিমত পোষণ করেন যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার রহস্যজনিত বিষয় এবং তাঁর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ । এ বিশ্বাস রেখে এগুলোর তেলাওয়াত করতে

হবে। কিন্তু এগুলোর রহস্য উদ্ধারের ব্যাপারে এবং তত্ত্ব-সংগ্রহে আমাদের ব্যস্ত হওয়া উচিত হবে না।

ইবনে-কাসীরও কুরতুবীর বরাত দিয়ে এ মন্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কোন কোন আলেম এ শব্দগুলোর যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, সেগুলোকে ভুল প্রতিপন্ন করাও উচিত হবে না। কেননা, তাঁরা উপমাস্থলে এবং এগুলোকে সহজবোধ্য করার উদ্দেশেই এসব অর্থ বর্ণনা করেছেন।

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ সাধারণতঃ ذلك কোন দূরবর্তী বস্তুকে ইশারা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। الكتب দ্বারা কোরআন মজীদকে বোঝানো হয়েছে। ريب অর্থ সন্দেহ-সংশয়। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, এটি এমন এক কিতাব যাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। এটি বাহ্যতঃ দূরবর্তী ইশারার স্থল নয়। কারণ, এ ইশারা কোরআন শরীফের প্রতিই করা হয়েছে, যা মানুষের সামনেই রয়েছে। কিন্তু দূরবর্তী ইশারার শব্দ ব্যবহার করে একথাই বোঝানো হয়েছে যে, সূরাতুল-ফাতেহাতে যে সিরাতুল-মুস্তাকীমের প্রার্থনা করা হয়েছিল, সমগ্র কোরআন শরীফ সে প্রার্থনারই প্রত্যুত্তর। এটি সিরাতুল-মুস্তাকীমের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও বটে। অর্থ হচ্ছে— আমি তোমাদের প্রার্থনা শুনেছি এবং হেদায়েতের উজ্জ্বল সূর্যসদৃশ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছি। যে ব্যক্তি হেদায়েত লাভে ইচ্ছুক সে যেন এ কিতাব অনুধাবন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে।

এতদসঙ্গে এ কথাও বলে দেয়া হচ্ছে যে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কোন কালামে বা বক্তব্যে সন্দেহ ও সংশয় দু'কারণে হতে পারে। কারো বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতার দরুন সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে। যার উল্লেখ কয়েক আয়াত পরেই খোদ কোরআন শরীফে রয়েছে যেমন وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ - যদি তোমরা এতে সন্দেহ পোষণ কর। (অতএব বুদ্ধির স্বল্পতাহেতু কারো মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এরূপ বলা ন্যায়সঙ্গত যে, এ কিতাবে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।)

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে, তাদের জন্য হেদায়েত। অর্থাৎ, যে বিশেষ হেদায়েত পরকালের মুক্তির উপায়, তা কেবল মুত্তাকীদেরই প্রাপ্য। অবশ্য কোরআনের হেদায়েত মানবজাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমস্ত বিশ্বচরাচরের জন্য ব্যাপক। সূরাতুল-ফাতেহার তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হেদায়েতের তিনটি স্তর রয়েছে। (এক)— সমগ্র মানবজাতি, প্রাণীজগত তথা সমগ্র সৃষ্টির জন্যই ব্যাপৃত। (দুই)— মুসলমানদের জন্য খাস। (তিন)— যারা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নৈকট্য লাভ করেছে, তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তথাপি হেদায়েতের স্তরের কোন সীমারেখা নেই।

কোরআনের কোথাও 'আম' বা সাধারণ এবং কোথাও বিশেষ হেদায়েতের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এখানে বিশেষ বা সুনির্দিষ্ট হেদায়েতের কথা বলা হয়েছে। এজন্যই হেদায়েতের সঙ্গে মুত্তাকিগণকে বিশেষভাবে যুক্ত করা হয়েছে বলেই এরূপ সংশয় প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। হেদায়েতের বেশী প্রয়োজন তো সে সমস্ত লোকেরই ছিল, যারা মুত্তাকী নয়। কেননা, ইতিমধ্যে হেদায়েতের স্তর বিন্যাস করে এসব সংশয়ের অবসান করে দেয়া হয়েছে। তাই এখন আর একথা বলা ঠিক নয় যে, কোরআন শুধু মুত্তাকীদের জন্যই হেদায়েত বা পথপ্রদর্শক, — অন্যের জন্য নয়।

মুত্তাকিগণের গুণাবলী ঃ পরবর্তী দু'টি আয়াতে মুত্তাকিগণের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত, তাদের পথই হচ্ছে সিরাতুল-মুস্তাকীম। যারা সরল-সঠিক পুণ্যপন্থা লাভ করতে চায়, তাদের উচিত সে দলে শরীক হয়ে তাদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং সে সকল লোকের স্বভাব-চরিত্র, আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে জীবনের পাথেয়রূপে গ্রহণ করা। আর এজন্যই মুত্তাকিগণের বিশেষ গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গে এরশাদ হচ্ছে ঃ

أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝٥
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ۝٦ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ
أَبْصَٰرِهِمْ غِشَٰوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝٧ وَمِنَ النَّاسِ
مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْءَاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۝٨
يُخَٰدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ ۝٩ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝١٠ وَإِذَا قِيلَ
لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝١١
أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝١٢ وَإِذَا
قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَآ ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوٓا أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ
السُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۝١٣
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ
شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۝١٤
اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝١٥

(৫) তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম। (৬) নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না। (৭) আল্লাহ্ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (৮) আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। (৯) তারা আল্লাহ্ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। (১০) তাদের অন্তকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ্ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন। (১১) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। (১২) মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। (১৩) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলেন, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না। (১৪) আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি— আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। (১৫) বরং আল্লাহ্ই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে।

أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, তারাই আল্লাহ্ প্রদত্ত সৎপথপ্রাপ্ত এবং তারাই পূর্ণ সফলকাম। উপরোক্ত দু'টি আয়াত দ্বারা মুত্তাকীদের গুণাবলীর বর্ণনার মধ্যে ঈমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এর মূলনীতিগুলো এবং তৎসঙ্গে সৎকর্মের মূলনীতিগুলোও স্থান পেয়েছে। তাই ঐ সমস্ত গুণাবলীর বিশ্লেষণ পরবর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছে।

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

অর্থাৎ, আল্লাহ্কে যারা ভয় করে, তারা এমন লোক যে, অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং স্বীয় জীবিকা থেকে সৎপথে ব্যয় করে।

আলোচ্য আয়াতে মুত্তাকীদের তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন, নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং স্বীয় জীবিকা থেকে সৎপথে ব্যয় করা। উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে বেশ কতকগুলো জরুরী বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রথমতঃ ঈমানের সংজ্ঞা ঃ ঈমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পবিত্র কোরআনে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ঈমান এবং গায়ব। শব্দ দু'টির অর্থ যথাযথভাবে অনুধাবন করলেই ঈমানের পুরোপুরি তাৎপর্য ও সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে।

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, কারো কথাকে তার বিশ্বস্ততার নিরিখে মনে-প্রাণে মেনে নেয়া। এজন্যই অনুভূতিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান কোন বস্তুতে কারো কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি এক টুকরো সাদা কাপড়কে সাদা এবং এক টুকরো কালো কাপড়কে কালো বলে এবং আর এক ব্যক্তি তার কথা সত্য বলে মেনে নেয়, তাহলে একে ঈমান বলা যায় না। এতে বক্তার কোন প্রভাব বা দখল নেই। অপরদিকে রসূল (সাঃ)-এর কোন সংবাদ কেবলমাত্র রসূলের উপর বিশ্বাসবতঃ মেনে নেয়াকেই শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলে। غيب - এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এমনসব বস্তু যা বাহ্যিকভাবে মানবকুলের জ্ঞানের উর্ধ্বে এবং যা মানুষ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারে না, চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না, কান দ্বারা শুনতে পায় না, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ নিতে পারে না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না, হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারে না, — ফলে সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভও করতে পারে না।

কোরআনে غيب শব্দ দ্বারা সে সমস্ত বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে যেগুলোর সংবাদ রসূল (সাঃ) দিয়েছেন এবং মানুষ যে সমস্ত বিষয়ে স্বীয় বুদ্ধিবলে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম।

غيب শব্দ দ্বারা ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও সত্তা, সিফাত বা গুণাবলী এবং তকদীর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, বেহেশত-দোযখের অবস্থা, কেয়ামত এবং কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশতাকুল, সমস্ত আসমানী কিতাব, পূর্ববর্তী সকল নবী ও রসূলগণের বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত যা সূরা বাক্বারার اٰمَنَ الرَّسُوْلُ আয়াতে দেয়া হয়েছে। এখানে ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং শেষ আয়াতে ঈমানের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন ঈমান বিল-গায়ব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে হেদায়েত এবং শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, সে সবগুলোকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া। তবে

শর্ত হচ্ছে যে, সেগুলো রসূলের (সাঃ) শিক্ষা হিসেবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে হবে। আহ্‌লে-ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ঈমানের এ সংজ্ঞাই দিয়েছেন। 'আকায়েদে-তাহাবী' ও 'আকায়েদে-নসফী'-তে এ সংজ্ঞা মেনে নেয়াকেই ঈমান বলে অভিহিত করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধু জানার নামই ঈমান নয়। কেননা, খোদ ইবলীস এবং অনেক কাফেরও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত যে সত্য তা আন্তরিকতভাবে জানতো, কিন্তু না মানার কারণে তারা ঈমানদারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

দ্বিতীয়তঃ ইক্বামতে-সালাত ঃ ইক্বামত বা প্রতিষ্ঠা অর্থ শুধু নামায আদায় করা নয়, বরং নামাযকে সকল দিক দিয়ে ঠিক করাকে প্রতিষ্ঠা করা বলা হয়। 'ইক্বামত' অর্থে নামাযে সকল ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, এতে সব সময় সুদৃঢ় থাকা এবং এর ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা সবই বোঝায়। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল প্রভৃতি সকল নামাযের জন্য একই শর্ত। এক কথায় নামাযে অভ্যস্ত হওয়া ও তা শরীয়তের নিয়ম মত আদায় করা এবং এর সকল নিয়ম-পদ্ধতি যথার্থভাবে পালন করাই ইক্বামতে-সালাত।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় ঃ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় অর্থে এখানে ফরয যাকাত, ওয়াজিব সদকা এবং নফল দান-খয়রাত প্রভৃতি যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা হয় সে সবকিছুই বোঝানো হয়েছে। কোরআনে সাধারণত ঃ انفاق শব্দ নফল দান-খয়রাতের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে ফরয যাকাত উদ্দেশ্য সেসব ক্ষেত্রে زَكٰوةَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ – এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় তথা সৎপথে অর্থ ব্যয় করার একটা প্রবল আকাঙ্খা প্রত্যেক সৎ মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে জাগ্রত করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। একজন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তা করবে যে, আমাদের নিকট যা কিছু রয়েছে, তা সবই তো আল্লাহ্‌র দান ও আমানত। যদি আমরা সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করি, তবেই মাত্র এ নেয়ামতের হক আদায় হবে। পরন্তু এটা আমাদের পক্ষ থেকে কারো প্রতি কোন এহ্‌সান বা অনুগ্রহ হবে না। তবে এ আয়াতে مما শব্দ যোগ করে একথা বোঝানো হয়েছে যে, যে ধন-সম্পদ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে তা সবই ব্যয় করতে হবে এমন নয়; বরং কিয়দংশ ব্যয় করার কথাই বলা হয়েছে।

মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে অদৃশ্যে বিশ্বাস, এরপর নামায প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমানের গুরুত্ব সকলেরই জানা যে, ঈমানই প্রকৃত ভিত্তি এবং সকল 'আমল কবুল হওয়া ঈমানের উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু যখনই ঈমানের সাথে 'আমলের কথা বলা হয়, তখন সেগুলোর তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হতে থাকে। কিন্তু এখানে শুধু নামায এবং অর্থ ব্যয় পর্যন্ত 'আমলকে সীমাবদ্ধ রাখার কারণ কি? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, যত রকমের 'আমল রয়েছে তা ফরযই হোক অথবা ওয়াজিব, সবই হয় মানুষের দেহ অথবা ধন-দৌলতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এবাদতে-বদনী তথা দৈহিক এবাদতের মধ্যে নামায সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে নামাযের বর্ণনায় এবং যেহেতু আর্থিক ইবাদত সবই انفاق শব্দের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এ উভয় প্রকার এবাদতের বর্ণনার মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় এবাদতের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। পূর্ণ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ তারাই মুত্তাকী যাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ এবং 'আমলও পূর্ণাঙ্গ। ঈমান এবং 'আমল এ দুয়ের সমন্বয়েই ইসলাম। এ আয়াতে ঈমানের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেয়ার সাথে সাথে ইসলামের বিষয়বস্তুর প্রতিও ইঙ্গীত করা হয়েছে।

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য ঃ অভিধানে কোন বস্তুতে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ঈমান এবং কারো অনুগত হওয়াকে ইসলাম বলে।

ঈমানের আধার হল অন্তর, ইসলামের আধার অন্তরসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিন্তু শরীয়তে ঈমান ব্যতীত ইসলাম এবং ইসলাম ব্যতীত ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌, তা'আলা ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে কর্মের দ্বারা আনুগত্য ও তাবেদারী প্রকাশ করা না হয়।

মোটকথা, আভিধানিক অর্থে ঈমান ও ইসলাম স্বতন্ত্র অর্থবোধক বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। অর্থগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন -হাদীসে ঈমান ও ইসলামের পার্থক্যের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু শরীয়ত ঈমানবিহীন ইসলাম এবং ইসলামবিহীন ঈমান অনুমোদন করে না।

প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি অন্তরের বিশ্বাস না থাকে, তবে কোরআনের ভাষায় একে 'নেফাক্ব' বলে। নেফাক্বকে কুফর হতেও বড় অন্যায় সাব্যস্ত করা হয়েছে।

বলা হয়েছে— 'মুনাফিক্বদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর।' অনুরূপভাবে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে যদি মৌখিক স্বীকৃতি এবং আনুগত্য না থাকে, কোরআনের ভাষায় একেও কুফরী বলা হয়।

বলা হয়েছে "কাফেরগণ রসূল (সাঃ) এবং তাঁর নবুওয়তের যথার্থতা সম্পর্কে এমন সুস্পষ্টভাবে জানে, যেমন জানে তাদের নিজ নিজ সন্তানদেরকে।"

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে—

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

অর্থাৎ, তারা আমার নিদর্শন বা আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, অথচ তাদের অন্তরে এর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তাদের এ আচরণ কেবল অন্যায় ও অহঙ্কারপ্রসূত।

ঈমান ও ইসলামের ক্ষেত্র এক, কিন্তু আরম্ভ ও শেষের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। — অর্থাৎ, ঈমান যেমন অন্তর থেকে আরম্ভ হয় এবং প্রকাশ্য 'আমলে পৌছে পূর্ণতা লাভ করে, তদ্রূপ ইসলামও প্রকাশ্য 'আমল থেকে আরম্ভ হয় এবং অন্তরে পৌছে পূর্ণতা লাভ করে। অন্তরের বিশ্বাস প্রকাশ্য 'আমল পর্যন্ত না পৌছালে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। অনুরূপভাবে প্রকাশ্য আনুগত্য ও তাবেদারী আন্তরিক বিশ্বাসে না পৌছালে গ্রহণযোগ্য হয় না। ইমাম গাযালী এবং ইমাম সুবকীও এ মত পোষণ করেছেন।

অন্য আয়াতে মুত্তাকীদের এমন আরো কতিপয় গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে, যাতে ঈমান বিল্‌গায়ব এবং পরকালের প্রতি বিশ্বসের প্রসঙ্গটা আরো একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, রসূল (সাঃ)-এর যমানায় মুমিন ও মুত্তাকী শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিলেন, একশ্রেণী তাঁরা যাঁরা প্রথমে মুশরিক ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অন্য শ্রেণী হল যাঁরা প্রথমে আহ্‌লে-কিতাব ইহুদী-নাসারা ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এখানে পূর্ববর্তী আয়াতে প্রথম

শ্রেণীর বর্ণনা ছিল। আর অন্য আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাই এ আয়াতে কোরআনের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস করার কথাও বলা হয়েছে। হাদীসের বর্ণনানুযায়ী এ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা যাঁরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোন না কোন আসমানী কিতাবের অনুসারী ছিলেন, তাঁরা দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী ছিলেন। প্রথমতঃ কোরআনের প্রতি ঈমান এবং 'আমলের জন্য, দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার জন্য। তবে পার্থক্য এই যে, সেগুলো সম্পর্কে বিশ্বাসের বিষয় হবে এই যে, কোরআনের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলো সত্য ও হক এবং সে যুগে এর উপর আমল করা ওয়াজিব ছিল। আর এ যুগে কোরআন অবতীর্ণ হবার পর যেহেতু অন্যান্য আসমানী কিতাবের হুকুম-আহ্কাম এবং পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহ মনসূখ হয়ে গেছে, তাই এখন 'আমল একমাত্র কোরআনের আদেশানুযায়ীই করতে হবে।

খতমে নবুওয়ত সম্পর্কিত একটি দলীল ঃ এ আয়াতের বর্ণনা রীতিতে একটা মৌলিক বিষয়ের মীমাংসাও প্রসঙ্গক্রমে বলে দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই শেষনবী এবং তাঁর নিকট প্রেরিত ওহীই শেষ ওহী। কেননা, কোরআনের পরে যদি আরো কোন আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো, তবে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর প্রতি যেভাবে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে, পরবর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার কথাও একইভাবে বলা হতো ; বরং এর প্রয়োজনই ছিল বেশী। কেননা, তাওরাত ও ইনজীলসহ বিভিন্ন আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান তো পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল এবং এগুলো সম্পর্কে কম-বেশী সবাই অবগতও ছিল। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরেও যদি ওহী ও নবুওয়তের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা আল্লাহ্র অভিপ্রায় হতো, তবে অবশ্যই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং নবী-রসূলগণের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টির মত পরবর্তী কিতাব ও নবী-রসূলের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টিরও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন হতো, যাতে পরবর্তী লোকেরা এ সম্পর্কে বিভ্রান্তির কবল থেকে নিরাপদ থাকেত পারে।

কিন্তু কোরআনের যেসব জায়গায় ঈমানের উল্লেখ রয়েছে, সেখানেই পূর্ববর্তী নবিগণের এবং তাঁদের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমূহেরও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কোথাও পরবর্তী কোন কিতাবের উল্লেখ নেই। কোরআন মজীদে এ বিষয়ে অন্যূন পঞ্চাশটি স্থানে উল্লেখ রয়েছে। সর্বত্রই হযরতের (সাঃ) পূর্ববর্তী নবী ও ওহীর কথা বলা হলেও কোন একটি আয়াতেও পরবর্তী কোন ওহীর উল্লেখ তো দূরের কথা, কোন ইশারা-ইঙ্গিতও দেখা যায় না।

আখেরাতের প্রতি ঈমান ঃ এ আয়াতে মুত্তাকিগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে। এখানে আখেরাত বলতে পরকালের সে আবাসস্থলের কথা বোঝানো হয়েছে, যাকে কোরআন পাকে 'দারুল-ক্বারার', 'দারুল-হায়াওয়ান,' এবং 'ওকবা' নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র কোরআন তার আলোচনা ও তার ভায়বহতার বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

আখেরাতের প্রতি ঈমান একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাস ঃ আখেরাতের প্রতি ঈমান প্রসঙ্গটি ঈমান বিল-গায়ব- এর আলোচনায় কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। পুনরায় এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে এ জন্য যে, যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ঈমান অনুযায়ী আমল করার প্রকৃত প্রেরণা ও এখান থেকেই সৃষ্টি হয়।

ইসলামী আকায়েদগুলোর মধ্যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা একটা বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা দুনিয়ার রূপই পাল্টে দিয়েছে। এ বিশ্বাসে, উদ্বুদ্ধ হয়েই ওহীর অনুসারিগণ প্রথমে নৈতিকতা ও কর্মে এবং পরবর্তীতে ব্যক্তিগত, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পর্যন্ত দুনিয়ার অন্যান্য সকল জাতির মোকাবেলায় একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসনে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছে। পরন্তু তওহীদ ও রেসালতের ন্যায় এ আকীদাও সমস্ত নবী-রসূলের শিক্ষা ও সর্বপ্রকার ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই সর্বসম্মত বিশ্বাসরূপে চলে আসছে। যেসব লোক জীবন ও এর ভোগ-বিলাসকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গণ্য করে, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে তিক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সে তিক্ততাকেই সর্বাপেক্ষা কষ্ট বলে মনে করে, আখেরাতের জীবন, সেখানকার হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও পুরস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে যাদের এতটুকুও আস্থা নেই, তারা যখন সত্য-মিথ্যা কিংবা হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করাকে তাদের জীবনের সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে বাধা রূপে দেখতে পায়, তখন সামান্য একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে সকল মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করে না, এমতাবস্থায় এ সমস্ত লোককে যে কোন দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার মত আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যাকিছু অন্যায়, অসুন্দর বা সামাজিক জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর, সেসব অনাচার কার্যকরভাবে উৎখাত করার কোন শক্তি সে আইনেরও নেই, এ কথা পরীক্ষিত সত্য। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কোন দুরাচারের চরিত্রশুদ্ধি ঘটানোও সম্ভব হয় না। অপরাধ যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, আইনের শাস্তি সাধারণতঃ তাদের ধাত-সওয়া হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আর তাদের মধ্যে শাস্তিকে ভয় করার মত অনুভূতিও থাকে না। অপরপক্ষে, আইনের শাস্তিকে যারা ভয় করে, তাদের সে ভয়ের আওতাও শুধুমাত্র ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে, যতটুকুতে ধরা পড়ার ভয় বিদ্যমান। কিন্তু গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে যেখানে ধরা পড়ার সম্ভবনা থাকে না, সেরূপ পরিবেশে এ সমস্ত লোকের পক্ষ্যেও যে কোন গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়ার পথে কোন বাধাই থাকে না।

প্রকারান্তরে আখেরাতের প্রতি ঈমানই এমন এক কার্যকর নিয়ন্ত্রণবিধি, যা মানুষকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বত্রই যে কোন গর্হিত আচরণ থেকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে বিরত রাখে। তার অন্তরে এমন এক প্রত্যয়ের অম্লান শিখা অবিরাম সমুজ্জ্বল করে দেয় যে, আমি প্রকাশ্যেই থাকি আর গভীর নির্জনেই থাকি, রাজপথে থাকি কিংবা কোন বদ্ধঘরে লুকিয়েই থাকি, মুখে বা ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ করি আর নাই করি, আমার সকল আচরণ, আমার সকল অভিব্যক্তি, এমনকি অন্তরে লুক্কায়িত প্রতিটি আকাঙ্খা পর্যন্ত সর্বত্র বিরাজমান এক মহাসত্তার সামনে রয়েছে। তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টির সামনে কোন কিছুই আড়াল করার সাধ্য আমার নেই। আমার সত্তার সঙ্গে মিশে রয়েছে এমনসব প্রহরী, যারা আমার প্রতিটি আচরণ এবং অভিব্যক্তি প্রতিমুহূর্তেই লিপিবদ্ধ করছেন।

উপরোক্ত বিশ্বাসের মধ্যেমেই প্রাথমিক যুগে এমন মহোত্তম চরিত্রের

অগণিত লোক সৃষ্টি হয়েছিলেন, যাদের চাল-চলন এবং আচার-আচরণ দেখেই মানুষ ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়তো।

এখন লক্ষণীয় আর একটি বিষয় হচ্ছে, আয়াতের শেষে يُؤْمِنُونَ শব্দ ব্যবহার না করে يُوقِنُونَ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, বিশ্বাসের বিপরীতে অবিশ্বাস এবং ইয়াক্বীনের বিপরীতে সন্দেহ-সংশয়। এ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হলেই শুধু উদ্দেশ্য সফল হয় না, বরং এমন দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে, যে প্রত্যয় স্বচক্ষে দেখা কোন বস্তু সম্পর্কেই হতে পারে।

মুত্তাক্বীদের এই গুণ পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান এবং সবকিছুরই একটি পরিপূর্ণ নকশা তার সামনে দৃশ্যমান করে রাখবে। যে ব্যক্তি অন্যের হক নষ্ট করার জন্য মিথ্যা মামলা করে বা মিথ্যা সাক্ষী দেয়, আল্লাহ্র আদেশের বিপরীত পথে হারাম ধন-দৌলত উপার্জন করে এবং দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য সফল করার জন্য শরীয়ত বিরোধী কাজ করে, সে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাসী হয়ে, প্রকাশ্যে ঈমানের কথা যদি স্বীকার করে এবং শরীয়তের বিচারে তাকে মুমিনও বলা হয়, কিন্তু কোরআন যে ইয়াক্বীনের কথা ঘোষণা করেছে, এমন লোকের মধ্যে সে ইয়াক্বীন থাকতে পারে না। আর সে কোরআনী ইয়াক্বীনই মানবজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিতে পারে। আর এর পরিণামেই মুত্তাকিগণকে হেদায়েত এবং সফলতার সে পুরস্কার দেয়া হয়েছে, যা পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারাই সরল-সঠিক পথের পথিক, যা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে আর তারাই সম্পূর্ণ সফলকাম হয়েছে।

সূরা বাক্বারার প্রথম পাঁচটি আয়াতে কোরআনকে হেদায়েত বা পথপ্রদর্শনের গ্রন্থরূপে ঘোষণা করে সকল সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়ার পর সে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা এ গ্রন্থের হেদায়েতে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত ও লাভবান হয়েছেন এবং যাঁদেরকে কোরআনের পরিভাষায় মুমিন ও মুত্তাকী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁদের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং পরিচয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পনেরটি আয়াতে সে সমস্ত লোকের বিষয় আলোচিত হয়েছে, যারা এ হেদায়েতকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

এরা দু'টি দলে বিভক্ত। একদল প্রকাশ্যে কোরআনকে অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণের পথ অবলম্বন করেছে। কোরআন তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। অপর দল হচ্ছে, যারা হীন পার্থিব উদ্দেশে অন্তরের ভাব ও বিশ্বাসের কথাটি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে সাহস পায়নি, বরং প্রতারণার পথ অবলম্বন করেছে ; মুসলমানদের নিকট বলে, আমরা মুসলমান ; কোরআনের হেদায়েত মানি এবং আমরা তোমাদের সাথে আছি। অথচ তাদের অন্তরে লুক্কায়িত থাকে কুফর ও অস্বীকৃতি। আবার কাফেরদের নিকট গিয়ে বলে, আমরা তোমাদের দলভুক্ত, তোমাদের সাথেই রয়েছি। মুসলমানদিগকে ধোঁকা দেয়ার জন্য এবং তাদের গোপণ কথা জানার জন্যই তাদের সাথে মেলামেশা করি। কোরআন তাদেরকে 'মুনাফিক' বলে আখ্যায়িত করেছে। এ পনেরটি আয়াত যারা কোরআন অমান্য করে তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে ৬ ও ৭ আয়াতে প্রকাশ্যে যারা অস্বীকার করে তাদের কথা ও স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। আর পরবর্তী তেরটি আয়াতেই মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এতে তাদের স্বরূপ, নিদর্শন, অবস্থা ও পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

এ আয়াতগুলোর বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করলে বোঝা যায় যে, কোরআন সূরা বাক্বারার প্রথম বিশটি আয়াতে একদিকে হেদায়েতের উৎসের সন্ধান দিয়ে বলেছে যে, এ উৎস হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব এই কোরআন ; অপরদিকে বিশ্ববাসীকে এ হেদায়েত গ্রহণ করা ও না করার নিরিখে দুটি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। যারা গ্রহণ করেছে, তাদেরকে মুমিন-মুত্তাকী বলেছে, আর যারা অগ্রাহ্য করেছে তাদেরকে কাফের ও মুনাফিক বলে আখ্যা দিয়েছে।

কোরআনের এ শিক্ষা থেকে একটি মৌলিক জ্ঞাতব্য বিষয় এও প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ববাসীকে এমনভাবে দু'টি ভাগ করা যায়, যা হবে আদর্শভিত্তিক। বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা ও বর্ণ এবং ভৌগোলিক বিভক্তি এমন কোন ভেদরেখা নয়, যার ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভক্ত করা যেতে পারে।

আলোচ্য ৬ ও ৭ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সেসমস্ত কাফের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যারা তাদের কুফরীর দরুন বিরুদ্ধাচারণ ও শত্রুতার পথ বেছে নিয়েছে। আর যারা এ বিরুদ্ধাচরণের বশীভূত তারা কোন সত্য কথা শুনতে এবং কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে প্রস্তুত ছিল না। এ সমস্ত লোকের জন্য আল্লাহ্র বিধান হচ্ছে যে, তাদেরকে দুনিয়াতেই একটি নগদ শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তঃকরণে সীল-মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে। তাদের চোখ-কান থেকে হক বা সত্য গ্রহণের যোগ্যতা রহিত করে দেয়া হয়েছে। তাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, সত্যকে উপলব্ধি করার মত বুদ্ধি, দেখবার মত দৃষ্টিশক্তি এবং শোনার মত শ্রবণশক্তি আর তাদের অবশিষ্ট নেই। আয়াতে এ সমস্ত লোকের জন্য কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

কাফিরের সংজ্ঞা ঃ كفر এর শাব্দিক অর্থ গোপন করা। না-শুকরী বা কৃতঘ্নতাকেও কুফর বলা হয়। কেননা, এতে এহ্সানকারীর এহ্সান গোপন করা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় কুফর বলতে বোঝায়, যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয, এর যে কোনটিকে অস্বীকার করা।

যথা— ঈমানের সারকথা হচ্ছে যে, রসূল (সাঃ) আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যমে উম্মতকে যে শিক্ষাদান করেছেন এবং যেগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলোকে আন্তরিকভাবে স্বীকার করা এবং সত্য বলে জানা। কোন ব্যক্তি যদি এ শিক্ষামালার কোন একটিকে হক বলে না মানে, তাহলে তাকে কাফের বলা যেতে পারে।

'এনযার' শব্দের অর্থ ঃ 'এনযার' শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সংবাদ দেয়া যাতে ভয়ের সঞ্চার হয়। আর ابشار এমন সংবাদকে বলা হয়, যা শুনে আনন্দ লাভ হয়। সাধারণ অর্থে এনযার বলতে ভয় প্রদর্শন করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু ভয় প্রদর্শনকে 'এনযার' বলা হয় না, বরং শব্দটি দ্বারা এমন ভয় প্রদর্শন বোঝায়, যা দয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যেভাবে মা সন্তানকে আগুন, সাপ, বিচ্ছু এবং হিংস্র জীবজন্তু হতে ভয় দেখিয়ে থাকেন! 'নাযির' বা ভয়-প্রদর্শনকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাঁরা অনুগ্রহ করে মানবজাতিকে যথার্থ ভয়ের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। এজন্যই নবী-রসূলগণকে খাসভাবে নাযীর বলা হয়। কেননা, তাঁরা দয়া ও সতর্কতার ভিত্তিতে অবশ্যম্ভাবী বিপদ হতে ভয় প্রদর্শন করার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। নবীগণের জন্য 'নাযীর' শব্দ ব্যবহার করে একদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাঁরা তবলীগের দায়িত্ব পালন করবেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে — সাধারণ মানুষের প্রতি যথার্থ মমতা ও সমবেদনা সহকারে কথা বলা।

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে যে,

এ সমস্ত জেদী-অহংকারী লোক, যারা সত্যকে জেনে-শুনেও কুফরী ও অস্বীকৃতির উপর দৃঢ় অনড় হয়ে আছে, অথবা অহংকারের বশবর্তী হয়ে কোন সত্য কথা শুনতে কিংবা সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দেখতেও প্রস্তুত নয়, তাদের পথে এনে ঈমানের আলোকে আলোকিত করার উদ্দেশে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে বিরামহীন চেষ্টা করছেন তা ফলপ্রসূ হওয়ার নয়। এদের ব্যাপারে চেষ্টা করা না করা একই কথা।

পাপের শাস্তি পার্থিব সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া : এ দু'টি আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল, কুফর ও অন্যান্য সব পাপের আসল শাস্তি তো পরকালে হবেই; তবে কোন কোন পাপের আংশিক শাস্তি দুনিয়াতেও হয়ে থাকে। দুনিয়ার এ শাস্তি ক্ষেত্রবিশেষে নিজের অবস্থা সংশোধন করার সামর্থ্যকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। শুভবুদ্ধি লোপ পায়।

মানুষ আখেরাতের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে গাফেল হয়ে গোমরাহীর পথে এমন দ্রুততার সাথে এগুতে থাকে; যাতে অন্যায়ের অনুভূতি পর্যন্ত তাদের অন্তর থেকে দূরে চলে যায়। এ সম্পর্কে কোন কোন বুযুর্গ মন্তব্য করেছেন যে, পাপের শাস্তি এরূপও হয়ে থাকে যে, একটি পাপ অপর একটি পাপকে আকর্ষণ করে, অনুরূপভাবে একটি নেকীর বদলায় অপর একটি নেকী আকৃষ্ট হয়।

হাদীসে আছে, মানুষ যখন কোন একটি গোনাহর কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে হঠাৎ কালো দাগ লাগার পর যেমন তা খারাপ লাগে, তেমনি প্রথমাবস্থায় অন্তরে পাপের দাগও অস্বস্তির সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি তওবা না করে, আরো পাপ করতে থাকে, তবে পর পর দাগ পড়তে পড়তে অন্তঃকরণ দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার অন্তর থেকে ভাল-মন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়।

উপদেশ দান করা সর্বাবস্থায় উপকারী : এ আয়াতে সনাতন কাফেরদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নসীহত করা না করা সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সাথে عليهم - এর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ সমতা কাফেরদের জন্য, রসূলের জন্য নয়। তবে তাদেরকে জানানোর এবং সংশোধণ করার চেষ্টা করার সওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। তাই সমগ্র কোরআনে কোন আয়াতেই এসব লোককে ঈমান ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া নিষেধ করা হয়নি। এতে বোঝা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কাজে নিয়োজিত, তা ফলপ্রসূ হোক বা না হোক, সে এ কাজের সওয়াব পাবেই।

একটি সন্দেহের নিরসন : এ আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ ভাষা সূরায়ে মুতাফ্‌ফিফীনের এক আয়াতেও উল্লেখিত হয়েছে যথা :

كَلَّا بَلْ سكته رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থাৎ, এমন নয়; বরং তাদের অন্তরে তাদের কর্মের মরিচা গাঢ় হয়ে গেছে। তাতে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের মন্দ কাজ ও অহংকারই তাদের অন্তরে মরিচার আকার ধারণ করেছে। এ মরিচাকে আলোচ্য আয়াতে 'সীলমোহর' বা আবরণ শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এরূপ সংশয় সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, যখন আল্লাহ্ই তাদের অন্তরে সীলমোহর এঁটে দিয়েছেন এবং গ্রহণ-ক্ষমতাকে রহিত করেছেন, তখন তারা কুফরী করতে বাধ্য। কাজেই তাদের শাস্তি হবে কেন? এর জওয়াব হচ্ছে যে, তারা নিজেরাই অহংকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই এজন্য তারাই দায়ী। যেহেতু বান্দাদের সকল কাজের সৃষ্টি আল্লাহ্ই করেছেন, তিনি এস্থলে সীলমোহরের কথা বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই যখন সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে রহিত করতে উদ্যত হয়েছে, তখন আমি আমার কর্ম-পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের এ খারাপ যোগ্যতার পরিবেশ তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে দু'টি আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক আছে, যারা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়, বরং তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও মুমিনদের সাথে প্রতারণা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকেই প্রতারিত করছে না।

এতে তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, তাদের এ দাবীও মূলতঃ প্রতারণামূলক। এটা বাস্তব সত্য যে, আল্লাহ্‌কে কেউ ধোকা দিতে পারে না এবং তারাও একথা হয়তো ভাবে না যে, তারা আল্লাহ্‌কে ধোকা দিতে পারবে, বরং রসূল (সাঃ) এবং মুসলমানদের সাথে ধোকাবাজি করার দরুনই বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে ধোকাবাজি করছে।-(কুরতুবী)।

এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক প্রকৃত প্রস্তাবে আত্ম-প্রবঞ্চনায় লিপ্ত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত ধোকা ও প্রতারণার উর্ধ্বে। অনুরূপ তাঁর রসূল এবং মুমিনগণও ওহীর দৌলতে ছিলেন সমস্ত ধোকা-প্রতারণা থেকে নিরাপদ। কারো পক্ষে তাঁদের কোন ক্ষতি করা ছিল অস্বাভাবিক। পরন্তু তাদের এ ধোকার ক্ষতিকর পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় ক্ষেত্রে তাদেরই উপর পতিত হতো। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

রোগ সে অবস্থাকেই বলা হয়, যে অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে চলে যায় এবং তাদের কাজ-কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। যার শেষ পরিণাম ধ্বংস ও মৃত্যু। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, — যেভাবে অসতর্কতার দরুন মানুষের শরীরে রোগের সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে প্রবৃত্তির প্ররোচনার অনুকরণের দ্বারা মানুষের অন্তরেও রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এ আয়াতে তাদের অন্তর্নিহিত কুফরকে রোগ বলা হয়েছে যা আত্মিক ও দৈহিক উভয় বিবেচনায়ই বড় রোগ। রূহানী ব্যাধি তো প্রকাশ্য; কেননা, প্রথমতঃ এ থেকে স্বীয় পালনকর্তার না-শুকরি ও অবাধ্যতা সৃষ্টি হয়। যাকে কুফর বলা হয়, তা মানবাত্মার জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যধি। এতদসঙ্গে মানবসভ্যতার জন্যও অত্যন্ত ঘৃণ্য দোষ। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সত্যকে গোপন করা এবং স্বীয় অন্তরের কথাকে প্রকাশ করার হিম্মত না করা — এ ব্যাপারটিও অন্তরের বড় রোগ। মুনাফিকদের দৈহিক রোগ এজন্য যে, তারা সর্বদাই এ ভয়ের মধ্যে থাকে যে, না জানি কখন কোথায় তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে! দিবারাত্র এ চিন্তায় ব্যস্ত থাকাও একটা মানসিক তথা শারিরিক ব্যাধিই বটে! তাছাড়া এর পরিণাম অনিবার্যভাবেই ঝগড়া ও শত্রুতা। কেননা, মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে তারা সব সময়ই হিংসার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে, কিন্তু সে হতভাগা নিজের অন্তরের কথাটুকুও প্রকাশ করতে পারে না। ফলে সে শারিরীক ও মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে।

'আল্লাহ্ তাদের রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।' এর অর্থ এই যে, তারা ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি দেখে জ্বলে-পুড়ে দিন দিন ছাই হতে থাকে। আল্লাহ্ তো দিন দিন তার দ্বীনের উন্নতি দিয়েই যাচ্ছেন।

১১ ও ১২ নং আয়াতে মুনাফিকদের সে ভুলের আলোচনা করা হয়েছে

الٓمّٓ ۱ ٥ البقرة ٢

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا
فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي
ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ
كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ
أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم
مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ
بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ
مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

(১৬) তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে। বস্তুতঃ তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি এবং তারা হেদায়েতও লাভ করতে পারেনি। (১৭) তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে লোক কোথাও আগুন জ্বালালো এবং তার চার দিককার সবকিছুকে যখন আগুন স্পষ্ট করে তুললো, ঠিক এমনি সময় আল্লাহ্ তার চারদিকের আলোকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। ফলে, তারা কিছুই দেখতে পায় না। (১৮) তারা বধির মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। (১৯) আর তাদের উদাহরণ সেসব লোকের মত যারা দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ো রাতে পথ চলে, যাতে থাকে আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক। মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। অথচ সমস্ত কাফেরই আল্লাহ্ কর্তৃক পরিবেষ্টিত। (২০) বিদ্যুতালোকে যখন সামান্য আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাশীল। (২১) হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে। (২২) যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুত ঃ এসব তোমরা জান। (২৩) এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সুরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকে।

যে, তারা ফেৎনা-ফাসাদকে মীমাংসা এবং নিজেদেরকে মীমাংসাকারী মনে করে। কোরআন পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, ফাসাদ ও মীমাংসা মৌখিক দাবীর উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যথায় কোন চোর বা ডাকাতও নিজেকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলতে রাজী নয়। এ ব্যাপারটি একান্তভাবে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির আচরণের উপর নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আচরণ যদি ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়, তবে এসব কাজ যারা করে তাদেরকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুফ্‌সিদই বলতে হবে। চাই একাজে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্য হোক বা না'ই হোক।

১৩ নং আয়াতে মুনাফিকদের সামনে সত্যিকার ঈমানের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে – آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ – অর্থাৎ, অন্যান্য লোক যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও অনুরূপভাবে ঈমান আন। এখানে 'নাস' শব্দের দ্বারা সাহাবিগণকে বোঝানো হয়েছে। কেননা কোরআন অবতরণের যুগে তাঁরাই ঈমান এনেছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সাহাবিগণের ঈমানের অনুরূপ ঈমানই গ্রহণযোগ্য। যে বিষয়ে তাঁরা যেভাবে ঈমান এনেছিলেন অনুরূপ ঈমান যদি অন্যেরা আনে তবেই তাকে ঈমান বলা হয় ; অন্যথায় তাকে ঈমান বলা চলে না। এতে বোঝা গেল যে, সাহাবিগণের ঈমানই ঈমানের কষ্টি পাথর। যার নিরিখে অবশিষ্ট সকল উম্মতের ঈমান পরীক্ষা করা হয়। এ কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় যে ঈমান সঠিক প্রমাণিত না হয়, তাকে ঈমান বলা যায় না এবং অনুরূপ ঈমানদারকে মুমিন বলা চলে না। এর বিপরীতে যত ভাল কাজই হোক না কেন, আর তা যত নেক-নিয়্যতেই করা হোক না কেন, আল্লাহ্‌র নিকট তা ঈমানরূপে স্বীকৃতি পায় না। সে যুগের মুনাফিকরা সাহাবিগণকে বোকা বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুতঃ এ ধরনের গোমরাহী সর্বযুগেই চলে আসছে। যারা ভ্রষ্টকে পথ দেখায়, তাদের ভাগ্যে সাধারণতঃ বোকা, অশিক্ষিত, মূর্খ প্রভৃতি আখ্যাই জুটে থাকে। কিন্তু কোরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এসব লোক নিজেরাই বোকা। কেননা, এমন উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী থাকা সত্ত্বেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হয়নি।

১৪ নং আয়াতে মুনাফিকদের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা যখন মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা মুসলমান হয়েছি; ঈমান এনেছি। আর যখন তাদের দলের কাফেরদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি, মুসলমানদের সাথে উপহাস করার উদ্দেশে এবং তাদের বোকা বানাবার জন্য মিশেছি।

১৫ নং আয়াতে তাদের এ বোকামীর উত্তর দেয়া হয়েছে। তারা মনে করে, আমরা মুসলমানদিগকে বোকা বানাচ্ছি। অথচ বাস্তবে তারা নিজেরাই বোকা সাজছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে একটু ঢিল দিয়ে উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছেন। প্রকাশ্যে তাদের কোন শাস্তি না হওয়াতে তারা আরো গাফলতিতে পতিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপহাস ও ঠাট্টার প্রত্যুত্তরে তাদের প্রতি এরূপ আচরণ করেছেন বলেই একে উপহাস বা বিদ্রূপ বলা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৬ নং আয়াতে মুনাফিকদের সে অবস্থার বর্ণনা রয়েছে যে, তারা ইসলামকে কাছে থেকে দেখেছে এবং তার স্বাদও পেয়েছে, আর কুফরীতে তো পূর্ব থেকেই লিপ্ত ছিল। অতঃপর ইসলাম ও কুফর উভয়কে দেখে-বুঝেও তাদের দুনিয়ার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইসলামের

পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করেছে। তাদের এ কাজকে ব্যবসায়ের সাথে তুলনা করে জানানো হয়েছে যে, তাদের ব্যবসায়ের কোন যোগ্যতাই নেই। তারা উত্তম ও মূল্যবান বস্তু ঈমানের পরিবর্তে নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন বস্তু কুফর খরিদ করেছে।

১৭ – ২০ এই চার আয়াতে দু'টি উদাহরণ দিয়ে মুনাফিকদের কার্যকলাপকে ঘৃণ্য আচরণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুনাফিকদের দু'শ্রেণীর লোকের পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে পৃথক দু'টি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

মুনাফিকদের একশ্রেণীর লোক হচ্ছে তারা, যারা কুফরীতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের কাছে থেকে আর্থিক স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করতো। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হচ্ছে তারা, যারা ইসলামের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে কখনো প্রকৃত মুমিন হতে ইচ্ছে করতো, কিন্তু দুনিয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে এ ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতো। এভাবে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দিনাতিপাত করতো।

আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র নাগালের উর্ধ্বে নয়। সব সময়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ পাক তাদের ধ্বংসও করতে পারেন। এমনকি তাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিকে পর্যন্ত রহিত করে দিতে পারেন। এই তেরটি আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থার পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এতে অনেক আহকাম ও মাসআলা এবং গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত বা উপদেশ রয়েছে। যথা—

কুফর ও নেফাক সেযুগেই ছিল, না এখনও আছে ঃ আলোচ্য আয়াতগুলোতে আমরা জানতে পারি যে, মুনাফিকদের কপটতা নির্ধারণ করা এবং তাদেরকে মুনাফিক বলে চিহ্নিত করার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর রসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মুসলমান নয়; বরং মুনাফিক। দ্বিতীয়তঃ এই যে, তাদের কথা-বার্তা ও কার্যকলাপে ইসলাম ও ঈমানবিরোধী কোন কাজ প্রকাশ পাওয়া।

হুযূর (সাঃ)- এর তিরোধানের পর ওহী বন্ধ হওয়ায় প্রথম পদ্ধতিতে মুনাফিকদের সনাক্ত করার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিটি এখনও রয়েছে। যে ব্যক্তি কথা-বার্তায় ঈমান ও ইসলামের দাবীদার, কিন্তু কার্যকালাপে তার বিপরীত, তাকে মুনাফিক বলা হবে।

ঈমান ও কুফরের তাৎপর্য ঃ আলোচ্য আয়াতে চিন্তা করলে ঈমান ও ইসলামের পূর্ণ তাৎপর্যটি পরিষ্কার হয়ে যায়। অপরদিকে কুফরের হাকিকতও প্রকাশ পায়। কেননা, এ আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের ঈমানের দাবী آمَنَّا بِاللَّهِ এবং কোরআনের পক্ষ থেকে এই দাবীর খণ্ডনে ঘোষিত وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে আরো কিছু বিশেষ চিন্তা-ভাবনার অপেক্ষা রাখে ঃ যে সমস্ত মুনাফিকের বর্ণনা কোরআনে দেয়া হয়েছে, সাধারণতঃ তারা ছিল ইহুদী। আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও রোজ কেয়ামতে বিশ্বাস করা তাদের ধর্মমতেও প্রমাণিত ছিল, তাদেরকে রসূল (সাঃ)-এর রিসালত ও নবুওয়তের প্রতি ঈমান আনার কথা এখানে বলা হয়নি। বরং মাত্র দু'টি বিষয়ে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রতি ও শেষবিচার দিনের প্রতি। এতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা চলে না। তা সত্ত্বেও কোরআন কর্তৃক তাদেরকে মিথ্যাবাদী এবং তাদের ঈমানকে অস্বীকার করার কারণ কি? আসল কথা হচ্ছে যে, কোন না কোন প্রকারে নিজ নিজ ধারণা ও ইচ্ছা মাফিক আল্লাহ্ এবং পরকাল স্বীকার করাকে ঈমান বলা যায় না। কেননা, মুশরিকরাও তো কোন না কোন দিক দিয়ে আল্লাহ্‌কে মেনে নেয় এবং কোন একটি নিয়ামক সত্তাকে সবচাইতে বড় একক ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করে। আর ভারতের মুশরিকগণ 'পরলোক' নাম দিয়ে আখেরাতের একটি ধারণাও পোষণ করে থাকে। কিন্তু কোরআনের দৃষ্টিতে একেও ঈমান বলা যায় না। বরং একমাত্র সে ঈমানই গ্রহণযোগ্য, যাতে আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর নিজের বর্ণনাকৃত সকল গুণাগুণসহ যে ঈমান আনা হয় এবং পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ্ ও রসূলের বর্ণনাকৃত অবস্থা ও গুণাগুণের সাথে যে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়।

কুফর ও ঈমানের সংজ্ঞা ঃ কোরআনের ভাষায় ঈমানের তাৎপর্য বলতে গিয়ে সূরা বাক্বারার ত্রয়োদশতম আয়াতে বলা হয়েছে آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ যাতে বোঝা যাচ্ছে যে, ঈমানের যথার্থতা যাচাই করার মাপকাঠি হচ্ছে সাহাবিগণের ঈমান। এ পরীক্ষায় যা সঠিক বলে প্রমাণিত না হবে, তা আল্লাহ্ ও রসূলের নিকট ঈমান বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না।

যদি কোন ব্যক্তি কোরআনের বিষয়কে কোরআনের বর্ণনার বিপরীত পথে অবলম্বন করে বলে যে, আমি তো এ আকীদাকে মানি, তবে তা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। যথা — আজকাল কাদিয়ানীরা বলে বেড়ায় যে, আমরা তো খতমে-নবুওয়তে বিশ্বাস করি। অথচ এ বিশ্বাসে তারা রসূল (সাঃ)-এর বর্ণনা ও সাহাবিগণের ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে। আর এ পর্দার অন্তরালে মির্জা গোলাম আহমদের নবুওয়ত প্রতিষ্ঠার পথ বের করছে। তাই কোরআনের বর্ণনায় এদেরকেও وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ - এর আওতাভুক্ত করা হয়।

শেষকথা, যদি কোন ব্যক্তি সাহাবিগণের ঈমানের পরিপন্থী কোন বিশ্বাসের কোন নতুন পথ ও মত তৈরী করে সে মতের অনুসারী হয় এবং নিজেকে মুমিন বলে দাবী করে, মুসলমানদের নামায-রোযা ইত্যাদিতে শরীকও হয়, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের প্রদর্শিত পথে ঈমান আনয়ন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের ভাষায় তাদেরকে মুমিন বলা হবে না।

একটি সন্দেহের নিরসন ঃ হাদীস ও ফেকাহ্শাস্ত্রের একটা সুপরিচিত সিদ্ধান্ত এই যে, আহলে-কেবলাকে কাফের বলা যাবে না। এর উত্তরও এ আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে যে, আহলে-কেবলা তাদেরকেই বলা হবে যারা দ্বীনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ে স্বীকৃতি জানায় ; কোন একটি বিষয়েও অবিশ্বাস পোষণ করে না বা অস্বীকৃতি জানায় না। পরন্তু শুধু কেবলামুখী হয়ে নামায পড়লেই কেউ ঈমানদার হতে পারে না। কারণ, তারা সাহাবিগণের ন্যায় দ্বীনের যাবতীয় যরুরীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

মিথ্যা একটি জঘন্য অপরাধ ঃ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ আয়াতে মুনাফিকদের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তারা প্রথম স্তরের কাফের হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের জানামতে মিথ্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইত। তাই তারা ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং রোজ কেয়ামতের কথা বলেই ক্ষান্ত হতো, রসূলের প্রতি ঈমানের প্রসঙ্গ দৃঢ়তার সাথে পাশ কাটিয়ে যেতো। কেননা, এতে করে তাদের পক্ষে সরাসরি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার ভয় ছিল। এতে বোঝা যায় যে, মিথ্যা এমন একটি জঘন্য ও নিকৃষ্ট অপরাধ যা কোন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন লোকই পছন্দ করে না — সে কাফের-ফাসিকই হোক না কেন।

নবী এবং ওলীগণের সাথে দুর্ব্যবহার করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র সাথে দুর্ব্যবহারেরই শামিল ঃ উপরোক্ত আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে একথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ অর্থাৎ, এরা আল্লাহ্‌কে ধোকা দেয়। অথচ এ মুনাফিকদের মধ্যে হয়তো একজনও এমন ছিল না, যে আল্লাহ্‌কে ধোকা দেয়ার মনোভাব পোষণ করত। বরং তারা রসূল (সাঃ) এবং মুমিনগণকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশে এ সমস্ত ঘৃণ্য কাজ করেছে।

আলোচ্য আয়াতে তাদের এ আচরণকে আল্লাহ্‌কেই ধোকা দেয়া বলে উল্লেখিত হয়েছে এবং প্রকারান্তরে বলে দেয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌র রসূল বা কোন ওলীর সাথে দুর্ব্যবহার করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা আল্লাহ্‌র সাথেই মন্দ আচরণ করে। প্রসঙ্গতঃ আল্লাহ্‌র রসূলের সাথে বে-আদবী করায় আল্লাহ্‌র সাথেই বে-আদবী করা হয়, একথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌র রসূল এবং তাঁর অনুসারিগণের বিপুল মর্যাদার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে।

মিথ্যা বলার পাপ ঃ আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের কঠোর শাস্তির কারণ – بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ –অর্থাৎ, তাদের মিথ্যাচারকে স্থির করা হয়েছে। অথচ তাদের কুফর ও নিফাক্বের অন্যায়ই ছিল সবচাইতে বড়। দ্বিতীয় বড় অন্যায় হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কঠোর শাস্তির কারণ তাদের মিথ্যাচারকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মিথ্যা বলার অভ্যাসই তাদের প্রকৃত অন্যায়। এ বদ-অভ্যাসই তাদেরকে কুফর ও নিফাক্ব পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে। এ জন্যই অন্যায়ের পর্যায়ে যদিও কুফর ও নিফাক্বই সর্বাপেক্ষা বড়, কিন্তু এসবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ হচ্ছে মিথ্যা। তাই কোরআন মিথ্যা বলাকে মূর্তিপূজার সাথে যুক্ত করে এরশাদ করেছে ঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

অর্থাৎ – মূর্তিপূজার অপবিত্রতা ও মিথ্যা বলা হতে বিরত থাক।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌র হেদায়েতকে মানা না মানার ভিত্তিতে মানবজাতিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে, প্রত্যেকের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে তিনটি দলকেই সমগ্র কোরআনের মৌল শিক্ষার প্রতি আহবান করা হয়েছে। এতে সৃষ্টিজগতের সবকিছুর আরাধনা পরিহার করে এক আল্লাহ্‌র এবাদতের প্রতি এমন পদ্ধতিতে দাওয়াত দেয়া হয়েছে যাতে সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও একটু চিন্তা করলেই তওহীদের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয়।

نَاس (নাস) আরবী ভাষায় সাধারণভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে পূর্বে আলোচিত মানব সমাজের তিন শ্রেণীই এ আহ্বানের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ এবাদত শব্দের অর্থ নিজের অন্তরে মাহাত্ম্য ও ভীতি জাগ্রত রেখে সকল শক্তি আনুগত্য ও তাবেদারীতে নিয়োজিত করা এবং সকল অবাধ্যতা ও নাফরমানী থেকে দূরে থাকা। (রূহুল বয়ান পৃঃ ৭৪) 'রব' শব্দের অর্থ পালনকর্তা। ইতিপূর্বে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তদনুসারে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়,— স্বীয় পালনকর্তার এবাদত কর।

এ ক্ষেত্রে 'রব' শব্দের পরিবর্তে 'আল্লাহ্ বা তাঁর গুণবাচক নামসমূহের মধ্য থেকে অন্য যে কোন একটা ব্যবহার করা যেতে পারতো, কিন্তু তা না করে 'রব' শব্দ ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে, এখানে দাবীর সাথে দলীলও পেশ করা হয়েছে। কেননা, এবাদতের যোগ্য একমাত্র সে সত্তাই হতে পারে, যে সত্তা তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যিনি বিশেষ এক পালননীতির মাধ্যমে সকল গুণে গুণান্বিত করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করেছেন এবং পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকার স্বাভাবিক সকল ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন।

মানুষ যত মূর্খই হোক এবং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি যতই হারিয়ে থাকুক না কেন, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, পালনের সকল দায়িত্ব নেয়া আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর সাথে সাথে একথাও উপলব্ধি করতে পারবে যে মানুষকে এ অগণিত নেয়ামত না পাথর-নির্মিত কোন মূর্তি দান করেছে, না অন্য কোন শক্তি। আর তারা করবেই বা কিরূপে? তারা তো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বা বেঁচে থাকার জন্য নিজেরাই সে মহাশক্তি ও সত্তার মুখাপেক্ষী। যে নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী সে অন্যের অভাব কি করে দূর করবে? যদি কেউ বাহ্যিক অর্থে কারো প্রতিপালন করেও, তবে তাও প্রকৃতপ্রস্তাবে সে সত্তার ব্যবস্থাপনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।

এর সারমর্ম এই যে, যে সত্তার এবাদতের জন্য দাওয়াত দেয়া হয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা আদৌ এবাদতের যোগ্য নয়।

আমল নাজাত ও বেহেশত পাওয়ার নিশ্চিত উপায় নয় ঃ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ বাক্যটিতে لعل শব্দ আশা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি এমন ক্ষেত্রে বলা হয়, যেখানে কোন কাজ হওয়া নিশ্চিত হয়ে থাকে। ঈমান তওহীদের পরিণাম নাজাত সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র ওয়াদা নিশ্চিত, কিন্তু সে বস্তুকে আশারূপে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, মানুষের কোন কাজই মুক্তি ও বেহেশতের মূল্য বা বিনিময় হতে পারে না। বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতেই মুক্তি সম্ভব। ঈমান আনা ও আমল করার তৌফীক হওয়া আল্লাহ্‌র মেহেরবানীর নমুনা, কারণ নয়।

তওহীদের বিশ্বাসই দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার জামিন ঃ ইসলামের মৌলিক আকীদা তওহীদ বিশ্বাস শুধু একটি ধারণা বা মতবাদমাত্রই নয়; বরং মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষরূপে গঠন করার একমাত্র উপায়ও বটে। যা মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়, সকল সংকটে আশ্রয় দান করে এবং সকল দুঃখ-দুর্বিপাকের মর্মসাথী। কেননা, তওহীদ বিশ্বাসের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, সৃষ্ট সকল বস্তুর পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন একমাত্র একক সত্তার ইচ্ছাশক্তির অনুগত এবং তাঁর কুদরতের প্রকাশ।

এ দু'টি আয়াতে এমন এক কালাম পেশ করা হচ্ছে, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারোই হতে পারে না। ব্যক্তিগত মেধা কিংবা দলগত উদ্যোগের দ্বারাও এ কালামের অনুরূপ রচনা করা সম্ভব নয়। সমগ্র মানবজাতির এ অপার গতার আলোকেই এ সত্য প্রমাণিত যে, এ কালাম আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নয়। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে উদ্দেশ করে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা এ কালামকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মানুষের কালাম বলে মনে কর, তবে যেহেতু তোমরাও মানুষ, তোমাদেরও অনুরূপ কালাম রচনা করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকা উচিত। কাজেই সমগ্র কোরআন নয় বরং এর ক্ষুদ্রতম একটি সূরাই রচনা করে দেখাও। এতে তোমদিগকে আরো সুযোগ দেয়া যাবে যে, একা না পারলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ মিলে, যারা তোমাদের সাহায্য-সহায়তা করতে পারে এমন সব লোক নিয়েই ছোট একটি সূরা রচনা করে দেখাও! কিন্তু না, তা পারবে না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের সে যোগ্যতাই নেই। তারপর বলা হয়েছে, কেয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা

করেও যখন পারবে না, তখন দোযখের আগুন ও শাস্তিকে ভয় কর। কেননা, এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা মানব রচিত কালাম নয়, বরং এমন অসীম শক্তিশালী সত্তার কালাম যা মানুষের ধরা-ছোঁয়া ও নাগালের উর্ধ্বে। যাঁর শক্তি সকলের উর্ধ্বে এমন এক মহা সত্তা ও শক্তির কালাম। সুতরাং তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরত থেকে দোযখের কঠোর শাস্তি হতে আত্মরক্ষা কর।

মোটকথা, এ দুটি আয়াতে কোরআনুল-করীমকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সর্বাপেক্ষা বড় মু'জেযা হিসাবে অভিহিত করে তাঁর রিসালত ও সত্যবাদিতার দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। রসূল (সাঃ)-এর মু'জেযার তো কোন শেষ নেই এবং প্রত্যেকটিই অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু তা সত্ত্বেও এস্থলে তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যার মু'জেযা অথাৎ, কোরআনের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রেখে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জেযা হচ্ছে কোরআন এবং এ মু'জেযা অন্যান্য নবী রসূলগণের সাধারণ মু'জেযা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার কুদরতে রসূল প্রেরণের সাথে সাথে কিছু মু'জেযাও প্রকাশ করেন। আর এসব মু'জেয়া যে সমস্ত রসূলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো তাঁদের জীবন কাল পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কোরআনই এমন এক বিচিত্র মু'জেযা যা কেয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ

رَيْب শব্দের অর্থ সন্দেহ, সংশয়। কিন্তু ইমাম রাগিব ইসফাহানীর মতে رَيْب এমন সন্দেহ ও ধারণাকে বলা হয়, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সামান্য একটু চিন্তা করলেই যে সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। এজন্য কোরআনে অমুসলিম জ্ঞানী সমাজের পক্ষেও رَيْب -এ পতিত হওয়া স্বাভাবিক নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআন একটি গতিশীল ও কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী মু'জেযা ঃ

অন্যান্য সমস্ত নবী ও রসূলগণের মু'জেযাসমূহ তাঁদের জীবন পর্যন্তই মু'জেযা ছিল। কিন্তু কোরআনের মু'জেযা হুযূর (সাঃ) -এর তিরোধানের পরও পূর্বের মতই মু'জেযা সুলভ বৈশিষ্ট্যসহই বিদ্যমান রয়েছে। আজ পর্যন্ত একজন সাধারণ মুসলমানও দুনিয়ার যে কোন জ্ঞানী-গুণীকে চ্যালেঞ্জ করে বলেত পারে যে, কোরআনের সমতুল্য কোন আয়াত ইতিপূর্বেও কেউ তৈরী করতে পারেনি, এখনও কেউ পারবে না, আর যদি সাহস থাকে তবে তৈরী করে দেখাও।

সুতরাং কোরআনের রচনাশৈলী, যার নমুনা আর কোনকালেই কোন জাতি পেশ করতে পারেনি, সেটাও একটি গতিশীল দীর্ঘস্থায়ী মু'জেযা। হুযূরের যুগে যেমন এর নযীর পেশ করা যায়নি, অনুরূপভাবে আজও তা কেউ পেশ করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না।

অনন্য কোরআন ঃ উপরোক্ত সাধারণ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়টিও পরিষ্কার হওয়ার প্রয়োজন যে, কিসের ভিত্তিতে কোরআনকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বাপেক্ষা বড় মু'জেযা বলা হয়? আর কি কারণে কোরআন শরীফ সর্বযুগে অনন্য ও অপরাজেয় এবং সারা বিশ্ববাসী কেন এর নযীর পেশ করতে অপরাগ?

দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের এ দাবী যে, চৌদ্দ শত বৎসরের এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোরআনের এ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও কেউ কোরআনের বা এর একটি সূরার অনুরূপ কোন রচনাও পেশ করতে পারিনি, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবীর যথার্থতা কতটুকু এ দুটি বিষয়ই দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ।

কোরআনের মু'জেযা হওয়ার অন্যান্য কারণসমূহ ঃ প্রথম কথা হচ্ছে যে, কোরআনকে মু'জেযা বলে অভিহিত করা হলো কেন, আর কি কি কারণে সারা বিশ্ব এর নযীর পেশ করতে অপারগ হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই আলেমগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর প্রত্যেক মুফাস্সিরই স্ব স্ব বর্ণনা ভঙ্গিতে এর বিবরণ দিয়েছেন। এখানে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করা হল।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ আশ্চর্য এবং সর্ববিধ জ্ঞানের আধার মহান গ্রন্থটি কোন্ পরিবেশে এবং কার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আরো লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, সে যুগের সমাজ পরিবেশে কি এমন কিছু জ্ঞানের উপকরণ বিদ্যমান ছিল, যার দ্বারা এমন পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ রচিত হতে পারে, যাতে সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় উপকরণ সন্নিবেশিত করা স্বাভাবিক হতে পারে? সমগ্র মানব সমাজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সকল দিক সম্বলিত নির্ভুল পথ-নির্দেশ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার মত কোন সূত্রের সন্ধান কি সে যুগের জ্ঞান-ভাণ্ডারে বিদ্যমান ছিল, যদ্দারা মানুষের দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিকেরই সুষ্ঠু বিকাশের বিধানাবলী থেকে শুরু করে পারিবারিক নিয়ম-শৃংখলা, সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তথা দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম ও সর্বযুগে সমভাবে প্রযোন্য আইন-কানুন বিদ্যমান থাকতে পারে?

যে ভূ-খণ্ডে এবং যে মহান ব্যক্তির প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, এর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা জানতে গেলে সাক্ষাৎ ঘটবে এমন একটা উষর শুষ্ক মরুময় এলাকার সাথে যা ছিল বাতহা বা মক্কা নামে পরিচিত। যে এলাকার ভূমি না ছিল কৃষিকাজের উপযোগী, না ছিল এখানে কোন কারিগরি শিল্প। আবহাওয়াও এমন স্বাস্থ্যকর ছিল না, যা কোন বিদেশী পর্যটককে আকৃষ্ট করতে পারে। রাস্তা-ঘাটও এমন ছিল না, যেখানে সহজে যাতায়াত করা যায়। সেটি ছিল অবশিষ্ট দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এমন একটি মরুময় উপদ্বীপ, যেখানে শুষ্ক পাহাড়-পর্বত এবং ধু-ধু বালুকাময় প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়তো না। কোন জনবসতি বা বৃক্ষলতার অস্তিত্বও বড় একটা দেখা যেতো না।

এ বিরাট ভূ-ভাগটির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য শহরেরও অস্তিত্ব ছিল না। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম এবং তার মধ্যে উট-ছাগল প্রতিপালন করে জীবনধারণকারী কিছু মানুষ বসবাস করতো। ছোট ছোট গ্রামগুলো তো দূরের কথা, নামেমাত্র যে কয়টি শহর ছিল, সেগুলোতেও লেখাপড়ার কোন চর্চাই ছিল না। না ছিল কোন স্কুল কলেজ, না ছিল কোন বিশ্ববিদ্যালয়। শুধুমাত্র ঐতিহ্যগতভাবে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে এমন একটা সুসমৃদ্ধ ভাষাসম্পদ দান করেছিলেন, যে ভাষা গদ্য ও পদ্য বাক-রীতিতে ছিল অনন্য। আকাশের মেঘ-গর্জনের মতো সে ভাষার মাধুরী অপূর্ব সাহিত্যরসে সিক্ত হয়ে তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতো। অপূর্ব রসময় কাব্যসম্ভার বৃষ্টিধারার মত আবৃত হতো পথে-প্রান্তরে। এ সম্পদ ছিল এমনি এক বিস্ময় আজ পর্যন্তও যার রসাস্বাদন করতে গিয়ে যে কোন সাহিত্য প্রতিভা হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু এটি ছিল তাদের স্বভাবজাত এক সাধারণ উত্তরাধিকার। কোন মক্তব-মাদরাসার মাধ্যমে এ ভাষাজ্ঞান অর্জন করার রীতি ছিল না। অধিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের কোন আগ্রহও পরিলক্ষিত হতো না। যারা শহরে বাস করতো, তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। পণ্যসামগ্রী একস্থান থেকে অন্যস্থানে আমদানী-রপ্তানীই ছিল তাদের একমাত্র পেশা।

সে দেশেই সর্বপ্রাচীন শহর মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সে মহান

ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব, যাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র পবিত্রতম কিতাব কোরআন নাযিল করা হয়। প্রসঙ্গতঃ সে মহামানবের অবস্থা সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা যাক।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তিনি পিতৃহারা হন, জন্মগ্রহণ করেন অসহায় এতীম হয়ে। মাত্র সাত বছর বয়সেই মাতৃবিয়োগ ঘটে। মাতার স্নেহ-মমতার কোলে লালিত-পালিত হওয়ার সুযোগও তিনি পাননি! পিতৃ-পিতামহগণ ছিলেন এমন দরাজদিল যার ফলে পারিবারিক সূত্র থেকে উত্তরাধিকাররূপে সামান্য সম্পদও তাঁর ভাগ্যে জুটেনি যার দ্বারা এ অসহায় এতীমের যোগ্য লালন-পালন হতে পারতো। পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় নিতান্ত কঠোর দারিদ্র্যের মাঝে লালিত-পালিত হন। যদি তখনকার মক্কায় লেখাপড়ার চর্চা থাকতো তবুও এ কঠোর দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে লেখাপড়া করার কোন সুযোগ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর হতো না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তদানিন্তন আরবে লেখাপড়ার কোন চর্চাই ছিল না, যে জন্য আরব জাতিকে উম্মী তথা নিরক্ষর জাতি বলা হতো। কোরআন পাকেও এ জাতিকে উম্মী জাতি নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সে মহান ব্যক্তি বাল্যকালাবধি যে কোন ধরনের লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন রয়ে যান। সে দেশে তখন এমন কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরও অস্তিত্ব ছিল না, যাঁর সাহচর্যে থেকে এমন কোন জ্ঞান-সূত্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হতো, যে জ্ঞান কোরআন পাকে পরিবেশন করা হয়েছে। যেহেতু একটা অনন্য সাধারণ মু'জেযা প্রদর্শনিই ছিল আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্য, তাই মামুলী একটু অক্ষর জ্ঞান যা দুনিয়ার যে কোন এলাকার লোকই কোন না কোন উপায়ে আয়ত্ত করতে পারে, তাও আয়ত্ত করার কোন সুযোগ তাঁর জীবনে হয়ে উঠেনি। অদৃশ্য শক্তির বিশেষ ব্যবস্থাতেই তিনি এমন নিরক্ষর উম্মী রয়ে গেলেন যে, নিজের নামটুকু পর্যন্ত দস্তখত করতে তিনি শিখেননি।

তদানিন্তন আরবের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় ছিল কাব্য চর্চা। স্থানে স্থানে কবিদের জলসা-মজলিস বসতো। এসব মজলিসে অংশগ্রহণকারী চারণ ও স্বভাব কবিগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা হতো। প্রত্যেকেই উত্তম কাব্য রচনা করে প্রাধান্য অর্জন করার চেষ্টা করতো। কিন্তু তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন রুচি দান করেছিলেন যে, কোনদিন তিনি এধরনের কবি জলসায় শরীক হননি। জীবনেও কখনও একছত্র কবিতা রচনা করারও চেষ্টা করেননি।

উম্মী হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রতা-নম্রতা, চরিত্রমাধুর্য ও অত্যন্ত প্রখর ধীশক্তি এবং সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর অসাধারণ গুণ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো, ফলে আরবের ক্ষমতাদর্পী বড়লোকগুলোও তাঁকেই শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতো সমগ্র মক্কা নগরীতে তাঁকে আল-আমীন বলে অভিহিত করা হতো।

এ নিরক্ষর ব্যক্তি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মক্কা নগরীতে অবস্থান করেছেন। ভিন্ন কোন দেশে ভ্রমণেও যাননি। যদি এমন ভ্রমণও করতেন, তবুও ধরে নেয়া যেত যে, তিনি সেসব সফরে অভিজ্ঞতা ও বিদ্যার্জন করেছেন। মাত্র সিরিয়ায় দুটি বাণিজ্যিক সফর করেছেন, যাতে তাঁর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত মক্কায় এমনভাবে জীবনযাপন করেছেন যে, কোন পুস্তক বা লেখনী স্পর্শ করেছেন বলেও জানা যায় না, কোন মক্তবেও যাননি, কোন কবিতা বা ছড়াও রচনা করেননি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মুখ থেকে সে বাণী নিঃসৃত হতে লাগল, যাকে কোরআন বলা হয়। যা শাব্দিক ও অর্থের গুণগত দিক দিয়ে মানুষকে স্তম্ভিত করতো। সুস্থ বিবেকবান লোকদের জন্য কোরআনের এ গুণগত মান মু'জেযা হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাতেই তো শেষ নয়! বরং এ কোরআন সারা বিশ্ববাসীকে বরাংবার চ্যালেঞ্জ সহকারে আহবান করেছে যে, যদি একে আল্লাহ্‌র কালাম বলে বিশ্বাস করতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে এর নযীর পেশ করে দেখাও।

একদিকে কোরআনের আহবান অপরদিকে সমগ্র বিশ্বের বিরোধী শক্তি যা ইসলাম ও ইসলামের নবীকে ধ্বংস করার জন্য স্বীয় জান-মাল, শক্তি-সামর্থ ও মান-ইয্‌যত তথা সবকিছু নিয়োজিত করে দিন-রাত চেষ্টা করছিল। কিন্তু এ সামান্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে কেউ সাহস করেনি। ধরে নেয়া যাক, এ গ্রন্থ যদি অদ্বিতীয় ও অনন্য সাধারণ নাও হতো, তবু একজন উম্মী লোকের মুখে এর প্রকাশই কোরআনকে অপরাজেয় বলে বিবেচনা করতে যে কোন সুস্থবিবেক সম্পন্ন লোকই বাধ্য হতো। কেননা, একজন উম্মী লোকের পক্ষে এমন একটা গ্রন্থ রচনা করতে পারা কোন সাধারণ ঘটনা বলে চিন্তা করা যায় না।

দ্বিতীয় কারণ ঃ পবিত্র কোরআন ও কোরআনের নির্দেশাবলী সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য অবতীর্ন হয়েছে। কিন্তু এর প্রথম সম্বোধন ছিল প্রত্যক্ষভাবে আরব জনগণের প্রতি। যাদের অন্য কোন জ্ঞান না থাকলেও ভাষা শৈলীর উপর ছিল অসাধারণ বুৎপত্তি। এদিক দিয়ে আরবরা সারাবিশ্বে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। কোরআন তাদেরকে লক্ষ্য করেই চ্যালেঞ্জ করেছে যে, কোরাঅন যে আল্লাহ্‌র কালাম তাতে যদি তোমরা সন্দিহান হয়ে থাক, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সাধারণ সূরা রচনা করে দেখাও। যদি আল-কোরআনের এ চ্যালেঞ্জ শুধু এর অন্তর্গত গুণ, নীতি, শিক্ষাগত তথ্য এবং নিগুঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হতো, তবে হয়তো এ উম্মী জাতির পক্ষে কোন অজুহাত পেশ করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারতো, কিন্তু ব্যাপার তা নয়, বরং রচনা-শৈলীর আঙ্গিক সম্পর্কেও এতে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য অন্যান্য জাতির চাইতে অরববাসীরাই ছিল বেশী উপযুক্ত। যদি এ কালাম মানব ক্ষমতার উর্ধ্বে কোন অলৌকি শক্তির রচনা না হতো, তবে অসাধারণ ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন আরবদের পক্ষে এর মোকাবেলা কোন মতেই অসম্ভব হতো না, বরং এর চাইতেও উন্নতমানের কালাম তৈরী করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল। দু'একজনের পক্ষে তা সম্ভব না হলে, কোরআন তাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমনটি রচনা করারও সুযোগ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সমগ্র আরবাসী একেবারে নিশ্চুপ রয়ে গেল কয়েকটি বাক্যও তৈরী করতে পারলো না!

আরবের নেতৃস্থানীয় লোকগুলো কোরআন ও ইসলামকে সম্পূর্ণ উৎখাত এবং রসূল (সাঃ)-কে পরাজিত করার জন্য যেভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, তা শিক্ষিত লোকমাত্রই অবগত। প্রাথমিক অবস্থায় হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এবং তাঁর স্বল্পসংখ্যক অনুসারীর প্রতি নানা উৎপীড়নের মাধ্যমে ইসলাম থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়ে তারা তোষামোদের পথ ধরলো। আরবের বড় সরদার ওতবা ইবনে রাবীয়া সকলের প্রতিনিধিরূপে
হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন
করলো, আপনি ইসলাম প্রচার থেকে বিরত থাকুন। আপনাকে সমগ্র আরবের ধন-সম্পদ, রাজত্ব এবং সুন্দরী মেয়ে দান করা হবে। তিনি এর উত্তরে কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। এ প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। হিজরতের পূর্বে ও পরে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধে অবতীর্ন হল। কিন্তু কেউই কোরআনের

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অগ্রসর হল না—তারা কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা এমনকি কয়েকটি ছত্রও তৈরী করতে পারল না। ভাষাশৈলী ও পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে কোরআনের মোকাবেলা করার ব্যাপারে আরবদের এহেন নীরবতাই প্রমাণ করে যে, কোরআন মানবরচিত গ্রন্থ নয়, বরং তা আল্লাহ্‌রই কালাম। মানুষ তো দূরের কথা, সমগ্র সৃষ্টিজগত মিলেও এ কালামের মোকাবেলা করতে পারে না।

আরববাসীরা যে এ ব্যাপারে শুধু নির্বাকই রয়েছে তাই নয়, তাদের একান্ত আলোচনায় এরূপ মন্তব্য করতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি যে, এ কিতাব কোন মানুষের রচনা হতে পারে না। আরবদের মধ্যে যাদের কিছুটা সুস্থ্য বিবেক ছিল তারা শুধু মুখেই একথা প্রকাশ করেনি, এরূপ স্বীকৃতির সাথেসাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকেই ইসলাম গ্রহণও করেছে। আবার কেউ কেউ পৈত্রিক ধর্মের প্রতি অন্ধ আবেগের কারণে অথবা বনী-আব্‌দে মনাফের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কোরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম বলে স্বীকার করেও ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে।

কুরায়েশদের ইতিহাসই সে সমস্ত ঘটনার সাক্ষী। তারই মধ্য থেকে এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে অতি সহজে বুঝা যাবে যে, সমগ্র আরববাসী কোরআনকে অদ্বিতীয় ও নযীরবিহীন কালাম বলে স্বীকার করেছে এবং এর নযীর পেশ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়ার ঝুঁকি নিতে সচেতনভাবে বিরত রয়েছে!

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং কোরআন নাযিলের কথা মক্কার গণ্ডী ছাড়িয়ে হেজাযের অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার পর বিরুদ্ধবাদীদের অন্তরে এরূপ সংশয়ের সৃষ্টি হলো যে, আসন্ন হজ্জের মওসুমে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজীগণ যখন মক্কায় আগমন করবে, তখন তারা রসূল (সাঃ)-এর কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারবে না। এমতাবস্থায় এরূপ সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করার পন্থা নিরূপণ করার উদ্দেশে মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরায়েশরা একটি বিশেষ পরামর্শ সভার আয়োজন করলো। এ বৈঠকে আরবের বিশিষ্ট সরদারগণও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ওলীদ ইবনে মুগীরা বয়সে ও বিচক্ষণতায় ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। সবাই তার নিকট এ সমস্যার কথা উত্থাপন করলো। তারা বললো, এখন চারদিকে থেকে মানুষ আসবে এবং মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে। তাদের সেসব প্রশ্নের জবাবে আমরা কি বলবো? আপনি আমাদেরকে এমন একটি উত্তর বলে দিন, যেন আমরা সবাই একই কথা বলতে পারি।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তিনি উত্তর দিলেন, যদি তোমাদের কিছু বলতেই হয়, তবে তাঁকে জাদুকর বলতে পার। লোকদেরকে বলো যে, এ লোক জাদু-বলে পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন। সমবেত লোকেরা তখনকার মত প্রস্তাবে একমত ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। তখন থেকেই তরা আগন্তুকদের নিকট একথা বলতে আরম্ভ করলো, কিন্তু আল্লাহ্‌র জ্বালানো প্রদীপ কারো ফুৎকারে নির্বাপিত হবার নয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থকে সাধারণ লোকদের অনেকেই কোরআনের অমীয় বাণী শুনে মুলমান হয়ে গেল। ফলে মক্কার বাইরেও ইসলামের বিস্তার সূচিত হলো।—(খাসায়েসে-কুব্‌রা)

এমনিভাবে বিশিষ্ট কুরাইশ সরদার নযর ইবনে হারেস তার স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আজ তোমরা এমন এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদেরই মধ্যে যৌবন অতিবাহিত করেছেন, তোমরা তাঁর চরিত্রমাধুর্যে বিমুগ্ধ ছিলে,তাঁকে তোমরা সবার চাইতে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করতে, আমানতদার বলে অভিহিত করতে। কিন্তু যখন তাঁর মাথার চুল সাদা হতে আরম্ভ করেছে, আর তিনি আল্লাহ্‌র কালাম তোমাদেরকে শোনাতে শুরু করেছেন, তখন তোমরা তাঁকে জাদুকর বলে অভিহিত করছ। আল্লাহ্‌র কসম; তিনি জাদুকর নন। আমি বহু জাদুকর দেখেছি, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, তাদের সঙ্গে মেলাশো করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ) কোন অবস্থাতেই তাদের মত নন। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। আরও জেনে রেখো! আমি অনেক জাদুকরের কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা জাদুকরের কথাবার্তার সাথে কোন বিচারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তোমরা তাঁকে কবি বল, অথচ আমি অনেক কবি দেখেছি, এ বিদ্যা আয়ত্ত করেছি, অনেক বড় বড় কবির কবিতা শুনেছি, অনেক কবিতা আমার মুখস্থও আছে, কিন্তু তাঁর কালামের সাথে কবিদের কবিতার কোন সাদৃশ্য আমি খুঁজে পইনি। কখনও কখনও তোমরা তাঁকে পাগল বল, তিনি পাগলও নন। আমি অনেক পাগল দেখেছি, তাদের পাগলামীপূর্ণ কথাবার্তাও শুনেছি, কিন্তু তাঁর মধ্যে তাদের মত কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না। হে আমার জাতি! তোমরা ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এ ব্যাপারে চিন্তা কর, সহজে এড়িয়ে যাওয়ার মত ব্যক্তিত্ব তিনি নন।

হযরত আবু যর (রাঃ) বলেছেন, আমার ভাই আনীস একবার মক্কায় গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন যে, মক্কায় এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র রসূল বলে দাবী করছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেখানকার মানুষ এ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে? তিনি উত্তর দিলেন, তাঁকে কেউ কবি কেউ পাগল, কেউবা জাদুকর বলে। আমার ভাই আনীস একজন বিশিষ্ট কবি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি যতটুকু লক্ষ্য করেছি, মানুষের এসব কথা ভুল ও মিথ্যা। তাঁর কালাম কবিতাও নয়, জাদুও নয়, আমার ধারণায় সে কালাম সত্য।

আবু যর (রাঃ) বলেন যে, ভাইয়ের কথা শুনে আমি মক্কায় চলে এলাম। মসজিদে হারামে অবস্থান করলাম এবং ত্রিশ দিন শুধু অপেক্ষা করেই অতিবাহিত করলাম। এ সময় যমযম কূপের পানি ব্যতীত আমি অন্য কিছুই পানাহার করিনি। কিন্তু এতে আমার ক্ষুধার কষ্ট অনুভব হয়নি! দুর্বলতাও উপলব্ধি করিনি! শেষ পর্যন্ত কাবা প্রাঙ্গন থেকে বের হয়ে লোকের নিকট বললাম, আমি রোম ও পারস্যের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী লোকদের অনেক কথা শুনেছি, অনেক জাদুকর দেখেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাণীর মত কোন বাণী আজও পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। কাজেই সবাই আমার কথা শোন এবং তাঁর অনুসরণ কর। আবু যরের এ প্রচারে উদ্‌বুদ্ধ হয়েই মক্কা বিজয়ের বছর তাঁর কওমের প্রায় এক হাজার লোক মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম ও হযরতের সবচাইতে বড় শত্রু আবু জাহ্‌ল এবং আখ্‌নাস ইবনে শোরাইকও লোকচক্ষুর অগোচরে কোরআন শুনত, কোরআনের অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গি এবং অনন্য রচনারীতির প্রভাবে প্রভান্বিত হতো। কিন্তু গোত্রের লোকেরা যখন তাদেরকে বলতো যে, তোমরা যখন এ কালামের গুণ সম্পর্কে এতই অবগত এবং একে অদ্বিতীয় কালামরূপে বিশ্বাস কর, তখন কেন তা গ্রহণ করছ না? প্রত্যুত্তরে আবু জাহ্‌ল বলতো, তোমরা জান যে, বনি আবদে মনাফ এবং আমাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই বিরামহীন শত্রুতা চলে আসছে; তারা যখন কোন কাজে অগ্রসর হতে চায়, তখন আমরা তার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বাধা দেই। উভয় গোত্রই সমপর্যায়ের। এমবতাবস্থায় তারা যখন বলছে যে, আমাদের মধ্যে এমন এক নবীর আভিবর্ভাব হয়েছে, যাঁর নিকট আল্লাহ্‌র বাণী আসে, তখন আমরা

কিভাবে তাদের মোকাবেলা করব, তাই আমার চিন্তা। আমি কখনও তাদের একথা মেনে নিতে পারি না।

মোটকথা কোরআনের এ দাবী ও চ্যালেঞ্জে সারা আরববাসী যে পরাজয় বরণ করেই ক্ষান্ত হয়েছে তাই নয়, বরং একে অদ্বিতীয় ও অনন্য বলে প্রকাশ্য ভাবে স্বীকারও করেছে। যদি কোরআন মানব রচিত কালাম হতো, তবে সমগ্র আরববাসী তথা সমগ্র বিশ্ববাসী অনুরূপ কোন না কোন একটি ছোট সূরা রচনা করতে অপারগ হতো না এবং এ কিতাবের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকারও করতো না। কোরআন ও কোরআনের বাহক পয়গাম্বরের বিরূদ্ধে জান-মাল, ধন সম্পদ, মান-ইজ্জত সবকিছু ব্যয় করার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কোরাআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দুটি শব্দও রচনা করতে কেউ সাহসী হয়নি।

এর কারণ এই যে, যে সমস্ত মানুষ তাদের মূর্খতাজনিত কার্যকলাপ ও আমল সত্ত্বেও কিছুটা বিবেকসম্পন্ন ছিল মিথ্যার প্রতি তাদের একটা সহজাত ঘৃণাবোধ ছিল। কোরআন শুনে তারা যখন বুঝতে পারলো যে, এমন কালাম রচনা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, তখন তারা কেবল একগুয়েমীর মাধ্যমে কোন বাক্য রচনা করে তা জনসমেক্ষ তুলে ধরা নিজেদের জন্য লজ্জার ব্যাপার বলে মনে করতো। তারা জানতো যে, আমরা যদি কোন বাক্য পেশ করিও, তবে সমগ্র আরবের শুদ্ধভাষী লোকেরা তুলনামূলক পরীক্ষায় আমাদেরকে অকৃতকার্যই ঘোষণা করবে এবং এজন্য অনর্থক লজ্জিত হতে হবে। এজন্য সমগ্র জাতিই চুপ করে ছিল। আর যারা কিছুটা ন্যায়পথে চিন্তা করেছে, তারা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নিতেও কুণ্ঠিত হয়নি যে, এটা আল্লাহ্‌র কালাম।

এসব ঘটনার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, আরবের একজন সরদার আস'আদ ইবনে যেরার হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট স্বীকার করেছেন যে, তোমরা অনর্থক মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধোচারণ করে নিজেদের ক্ষতি করছ এবং পারস্পারিক সম্পর্কচ্ছেদ করছ। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং তিনি যে কালাম পেশ করেছেন তা আল্লাহ্‌র কালাম এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

তৃতীয় কারণ ঃ তৃতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআন কিছু গায়েবী সংবাদ এবং ভবিষ্যতে ঘটবে এমন অনেক ঘটনার সংবাদ দিয়েছে, যা হুবহু সংঘটিত হয়েছে। যথা—কোরআন ঘোষণা করেছে, রোম ও পারস্যের যুদ্ধে প্রথমতঃ পারস্যবাসী জয়লাভ করবে এবং দশ বছর যেতে না যেতেই পুনরায় রোম পারস্যকে পরাজিত করবে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মক্কার সরদারগণ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সাথে এ ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা সম্পর্কে বাজী ধরল। শেষ পর্যন্ত কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযাযায়ী রোম জয়লাভ করলো এবং বাজীর শর্তানুযায়ী যে মাল দেয়ার কথা ছিল, তা তাদের দিতে হলো। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অবশ্য এ মাল গ্রহণ করেননি। কেননা, এরূপ বাজী ধরা শরীয়ত অনুমোদন করে না। এমন আরো অনেক ঘটনা কোরআনে উল্লেখিত রয়েছে, যা গায়েবের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নিকট অতীতে হুবহু ঘটেছেও।

চতুর্থ কারণ ঃ চতুর্থ কারণ এই যে, কোরআন শরীফে পূর্ববর্তী উম্মত, শরীয়ত ও তাদের ইতিহাস এমন পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে যুগের ইহুদী-খৃষ্টানদের পন্ডিতগণ, যাদেরকে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের বিজ্ঞ লোক মনে করা হতো, তারাও এতটা অবগত ছিল না। রসূল (সাঃ)-এর কোন প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা ছিল না। কোন শিক্ষিত লোকের সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেননি। কোন কিতাব কোনদিন স্পর্শও করেননি। এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার প্রথম থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর ঐতিহাসিক অবস্থা এবং তাদের শরীয়ত সমপর্কে অতি নিখুঁতভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা আল্লাহ্‌র কালাম ব্যতীত কিছুতেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই যে তাঁকে এ সংবাদ দিয়েছেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পঞ্চম কারণ ঃ পঞ্চম কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের অন্তর্নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কিত যেসব সংবাদ দেয়া হয়েছে পরে সংশ্লিষ্ট লোকদের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সব কথাই সত্য। একাজও আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ, তা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ষষ্ঠ কারণ ঃ ষষ্ঠ কারণ হচ্ছে যে, কোরআনে এমন সব আয়াত রয়েছে যাতে কোন সম্প্রদায় বা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তাদের দ্বারা অমুক কাজ হবে না; তারা তা করতে পারবে না। ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা বলেই মনে করে, তবে তারা নিশ্চয়ই তাঁর নিকট যেতে পছন্দ করবে। সুতরাং এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে মৃত্যু কামনা করা অপছন্দনীয় হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا – তারা কখনও তা চাইবে না।

মৃত্যু কামনা করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা কোরআনকে মিথ্যা বলে অভিহিত করতো। কোরআনের এরাশাদ মোতাবেক তাদের মৃত্যু কামনা করার ব্যাপারে ভয় পাওয়ার কোন কারণ ছিল না। ইহুদীদের পক্ষে মৃত্যু কামনার (মোবাহালা) এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মুসলমানদেরকে পরাজিত করার অত্যন্ত সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কোরআনের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গেই তাতে সম্মত হওয়া তাদের পক্ষে উচিত ছিল। কিন্তু ইহুদী ও মুশরিকরা মুখে কোরআনকে যতই মিথ্যা বলুক না কেন, তাদের মন জানতো যে, কোরআন সত্য, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মৃত্যু কামনার চ্যালেঞ্জে সাড়া দিলে সত্য-সত্যই তা ঘটবে। এজন্যই তারা কোরআনের এ প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি এবং একটি বারের জন্যও মুখ দিয়ে মৃত্যুর কথা বলেনি।

সপ্তম কারণ ঃ কোরআন শরীফ শ্রবণ করলে মুমিন, কাফির, সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সবার উপর দু'ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন, হযরত জুবাইর ইবনে মোতআম (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন হুযুর (সাঃ)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা তুর পড়তে শুনেন। হুযুর (সাঃ) যখন শেষ আয়াতে পৌছলেন, তখন হযরত জুবাইর (রাঃ) বলেন যে, মনে হলো, যেন আমার অন্তর উড়ে যাচ্ছে। তাঁর কোরআন পাঠ শ্রবণের এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। তিনি বলেন, সেদিনই কোরআন আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ۝ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ۝ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ۔

অর্থাৎ—তারা কি নিজেরাই সৃষ্ট হয়েছে, না তারাই আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? কোন কিছুতেই ওরা ইয়াকীন করছে না। তাদের নিকট কি তোমার পালনকর্তার ভাণ্ডারসমূহ গচ্ছিত রয়েছে, না তারাই রক্ষক?

অষ্টম কারণ ঃ অষ্টম কারণ হচ্ছে, কোরআনকে বারংবার পাঠ করলেও মনে বিরক্তি আসে না। বরং যতই বেশী পাঠ করা যায়, ততই তাতে আগ্রহ বাড়তে থাকে। দুনিয়ার যত ভাল ও আকর্ষণীয় পুস্তকই হোক না কেন, বড়জোড় দু-চারবার পাঠ করার পর তা আর পড়তে মন চায় না, অন্যে পাঠ করলেও তা শুনতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু কোরআনের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, যত বেশী পাঠ করা হয়, ততই মনের আগ্রহ আরো বাড়তে থাকে। অন্যের পাঠ শুনতেও আগ্রহ জন্মে।

নবম কারণ ঃ নবম কারণ হচ্ছে, কোরআন ঘোষণা করেছে যে, কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হয়ে তা সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ ওয়াদা এভাবে পূরণ করছেন যে, প্রত্যেক যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিলেন এবং রয়েছেন, যারা কোরআনকে এমনভাবে স্বীয় স্মৃতিপটে ধারণ করছেন যে, এর প্রতিটি যের-যবর তথা স্বরচিহ্ন পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছে। নাযিলের সময় থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর অতিবাহিত হয়েছে ; এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এ কিতাবে কোন পরিবর্তন-পারিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়নি। প্রতি যুগেই স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কোরআনের হাফেয ছিলেন ও রয়েছেন। বড় বড় আলেম যদি একটি যের-যবর বেশ-কম করেন, তবে ছোট বাচ্চারাও তাঁর ভুল ধরে ফেলে। পৃথিবীর কোন ধর্মীয় কিতাবের এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা সে ধর্মের লোকরা এক দশমাংশও পেশ করতে পারবে না। আর কোরআনের মত নির্ভুল দৃষ্টান্ত বা নযীর স্থাপন করা তো অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে এটা স্থির করাও মুশকিল যে, এ কিতাব কোন ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাতে কয়টি অধ্যায় ছিল।

গ্রন্থাকারে প্রতি যুগে কোরআনের যত প্রচার ও প্রকাশ হয়েছে, অন্য কোন ধর্ম-গ্রন্থের ক্ষেত্রে তা হয়নি। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রতি যুগেই মুসলমানদের সংখ্যা কাফের-মুশরিকদের তুলনায় কম ছিল এবং প্রচার-মাধ্যমও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকেদের তুলনায় কম ছিল। এতদসত্ত্বেও কোরআনের প্রচার ও প্রকাশের তুলানায় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের প্রচার ও প্রকাশনা সম্ভব হয়নি। তারপরেও কোরআনের সংরক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা শুধু গ্রন্থ ও পুস্তকেই সীমাবদ্ধ রাখেননি যা জ্বলে গেলে বা অন্য কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে আর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা থাকে না। তাই স্বীয় বান্দাগণের স্মৃতিপটেও সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। খোদানাখাস্তা সমগ্র বিশ্বের কোরআনও যদি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তবু এ গ্রন্থ পূর্বের ন্যায়ই সংরক্ষিত থাকবে। কয়েকজন হাফেয একত্রে বসে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তা লিখে দিতে পারবেন। এ অদ্ভুত সংরক্ষণও আল্ কোরআনেরই বিশেষত্ব এবং এ যে আল্লাহ্রই কালাম তার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ। যেভাবে আল্লাহ্র সত্তা সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে, তাতে কোন সৃষ্টির হস্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা নেই, অনুরূপভাবে তাঁর কালাম সকল সৃষ্টির রদ-বদলের উর্ধ্বে এবং সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে। কোরআনের এই ভবিষ্যদ্বানীর সত্যতা বিগত চৌদ্দশত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ প্রকাশ্য মু'জেযার পর কোরআন আল্লাহ্র কালাম হওয়াতে কোন প্রকার সন্দেহ – সংশয় থাকতে পারে না।

দশম কারণ ঃ কোরআনে এল্‌ম ও জ্ঞানের যে সাগর পুঞ্জীভূত করা হয়েছে, অন্য কোন কিতাবে আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। ভবিষ্যতেও তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত শব্দসম্ভাবরের মধ্যে এত জ্ঞান ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে যে, তাতে সমগ্র সৃষ্টির সর্বকালের প্রয়োজন এবং মানবজীবনের প্রত্যেক দিক পরিপূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। আর বিশ্বপরিচালনার সুন্দরতম নিয়ম এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নির্ভুল বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া মাথার উপরে ও নীচে যত সম্পদ রয়েছে সে সবের প্রসঙ্গ ছাড়াও জীব-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান এমনকি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সকল দিকের পথনির্দেশ সম্বলিত এমন সমাহার বিশ্বের অন্য কোন আসমানী কিতাবে দেখা যায় না।

শুধু আপাতঃদৃষ্টিতে পথনির্দেশই নয়, এর নমুনা পাওয়া এবং সে সব নির্দেশ একটা জাতির বাস্তব জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়ে তাদের জীবনধারা এমনকি ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস এবং রুচিরও এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন দুনিয়ার অন্য কোন গ্রন্থের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে এমন নযীর আর একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা নিরক্ষর উম্মী জাতিকে জ্ঞানে, রুচিতে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে এত অল্পকালের মধ্যে এমন পরিবর্তিত করে দেয়ার নযীরও আর দ্বিতীয়টি নেই।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে কোরআনের সেই বিস্ময় সৃষ্টিকারী প্রভাব, যাতে কোরআনকে আল্লাহ্র কালাম বলে প্রতিটি মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বিদ্বেষের কালিমায় সম্পূর্ণ কলুষিত হয়ে যায়নি, এমন কোন লোকই কোরআনের এ অনন্যসাধারণ মু'জেযা সম্পর্কে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করতে কার্পণ্য করেনি। যারা কোরআনকে জীবনবিধান হিসাবে গ্রহণ করেনি, এমন অনেক অ-মুসলিম লোকও কোরআনের এ নযীরবিহীন মু'জেযার কথা স্বীকার করেছেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত মণীষী ডঃ মারড্রেসকে ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে কোরআনের বাষট্টিটি সূরা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর স্বীকারোক্তিও এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন,—'নিশ্চয়ই কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি সৃষ্টিকর্তার বর্ণনাভঙ্গিরই স্বাক্ষর। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোরআনে যেসব তথ্যাদি বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্র বাণী ব্যতীত অন্য কোন বাণীতে তা থাকতে পারে না।'

এতে সন্দেহ পোষণকারীরাও যখন এর অনন্যসাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করে, তখন তারাও এ কিতাবের সত্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। বিশ্বের সর্বত্র শতাধিক কোটি মুসলমান ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কোরআনের বিশেষ প্রভাব দেখে খৃষ্টান মিশনগুলোতে কর্মরত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, যেসব মুসলমান কোরআন বুঝে পড়ার সুযোগ লাভ করেছে, তাদের মধ্যে একটি লোকও ধর্মত্যাগী-মুরতাদ হয়নি।

মোট কথা, কোরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথাযোগ্য বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব না হলেও সংক্ষিপ্তভাবে যতটুকু বলা হলো, এতেই সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, কোরআন আল্লাহ্রই কালাম এবং রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জেযা।

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا
رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ
وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا
فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا
الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ
بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾
الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ
مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا
فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى
السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

(২৪) আর যদি তা না পার—অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টার, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য। (২৫) আর হে নবী (সাঃ), যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকুল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (২৬) আল্লাহ্ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। বস্তুতঃ যারা মুমিন তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক। আর যারা কাফির তারা বলে, এরূপ উপমা উপস্থাপনে আল্লাহ্র মতলবই বা কি ছিল। এ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অনেককে বিপথগামী করেন, আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। তিনি অনুরূপ উপমা দ্বারা অসৎ ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন কাকেও বিপথগামী করেন না। (২৭) (বিপথগামী ওরাই) যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত। (২৮) কেমন করে তোমরা আল্লাহ্র ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন আবার মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন। অতঃপর তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে। (২৯) তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ্ সবিষয়ে অবহিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জান্নাতবাসীদেরকে একই আকৃতি বিশিষ্ট বিভিন্ন ফলমূল পরিবেশনের উদ্দেশ্য হবে পরিতৃপ্তি ও আনন্দ সঞ্চার। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে ফলসমূহ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ বেহেশতের ফলাদি আকৃতিগতভাবে ইহজগতে প্রাপ্ত ফলের অনুরূপই হবে। সেগুলো যখন জান্নাতবাসীদের মাঝে পরিবেশন করা হবে, তখন তারা বলে উঠবে, অনুরূপ ফল তো আমরা দুনিয়াতেও পেতাম। কিন্তু স্বাদ ও গন্ধ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। দুনিয়ার ফলের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলবে না, শুধু নামের মিল থাকবে।

জান্নাতে পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্ত্রী লাভের অর্থ, তারা হবে পার্থিব যাবতীয় বাহ্যিক ও গঠনগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও চরিত্রগত কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং প্রস্রাব পায়খানা, রজঃস্রাব, প্রসবোত্তর স্রাব প্রভৃতি যাবতীয় ঘৃণ্য বিষয়ের উর্ধ্বে। অনুরূপভাবে নীতিভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা, অবাধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও কদর্যতার লেশমাত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণসমূহকে যেন দুনিয়ার পতনশীল ও ক্ষীয়মান উপকরণসমূহের ন্যায় মনে না করা হয় যাতে যে কোন মুহূর্তে বিলুপ্তি ও ধ্বংসপ্রাপ্তির আশঙ্কা থাকে। বরং জান্নাতবাসিগণ অনন্তকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এই অফুরন্ত উপকরণসমূহ ভোগ করতঃ বিমল আনন্দস্ফূর্তি ও চরম তৃপ্তি লাভ করতে থাকবেন।

আলোচ্য আয়াতে মুমিনদের জান্নাতের সুসংবাদ লাভের জন্য ঈমানের সাথে সাথে সৎকাজেরও শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাই সৎকর্মহীন ঈমান মানুষকে এ সুসংবাদের অধিকারী করতে পারে না। যদিও কেবলমাত্র ঈমানই স্থায়ী দোযখবাস হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারে। সুতরাং মুমিন যত পাপীই হোক না কেন, এক না এক কালে দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু সৎকাজ ভিন্ন কেউ দোযখের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভের অধিকারী হতে পারবে না। —(রূহুল-বয়ান)

কয়েক আয়াত পূর্বে দাবী করা হয়েছে যে, কোরআন করীমে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। এ যে আল্লাহ্র বাণী এ সম্পর্কে কেউ যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করে, তবে তাকে কোরআনের ক্ষুদ্রতম সূরার অনুরূপ একটি সূরা প্রণয়ন করে পেশ করতে আহবান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে কোরআন অবিশ্বাসীদের এক অমূলক সন্দেহ বর্ণনাপূর্বক তা অপনোদন করা হয়েছে। সন্দেহটি এই যে, কোরআন শরীফে মশা-মাছির ন্যায় তুচ্ছ বস্তুর আলোচনাও স্থান লাভ করেছে। বস্তুতঃ এটা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর পবিত্র কালামের মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ গ্রন্থ প্রকৃতই যদি আল্লাহ্র বাণী হতো, তবে এরূপ নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ বস্তুর আলোচনা স্থান পেত না। কারণ, কোন মহান সত্তা এ ধরনের নগণ্য বস্তুর আলোচনা করতে লজ্জা ও অপমান বোধ করেন।

প্রত্যুত্তরে বলা হয়েছে যে, কোন তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উপমা অনুরূপ নগণ্য বস্তুর মাধ্যমে দেয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও বিবেকসম্মত। এতদুদ্দেশে কোন ঘৃণ্য ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ সম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদাবোধের মোটেও পরিপন্থী নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ পাক এ ধরনের বস্তুসমূহের উল্লেখে মোটেও লজ্জাবোধ করেন না। সাথে সাথে এও ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, এ ধরনের নির্বুদ্ধিতামূলক সন্দেহের উদ্রেক শুধু তাদের মনেই

হতে পারে, যাদের মন-মস্তিষ্ক অবিরাম খোদাদ্রোহিতার ফলে সম্পূর্ণ ভাবে বুদ্ধি-বিবেচনা ও অনুধাবনশক্তি বিবর্জিত হয়ে পড়েছে। মুমিনদের মন-মস্তিষ্কে এ ধরনের অবাস্তব সন্দেহের উদ্রেক কখনো হতে পারে না।

অতঃপর এর অন্য এক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, অনুরূপ উপমার মাধ্যমে মানুষের এক পরীক্ষাও হয়ে যায় — এসব দৃষ্টান্ত দূরদর্শী চিন্তাশীলদের জন্য যোগায় হেদায়েতের উপকরণ। আর চিন্তাশক্তি বিবর্জিত দুর্বিনীতদের পক্ষে অধিকতর পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিশেষে এ কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মহান কোরআনে বর্ণিত এসব উপমার দ্বারা এমন উদ্ধত ও অবাধ্যজনই বিপথগামী হয়, যারা আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভংগ করে এবং যেসব সম্পর্ক আল্লাহ্ পাক অক্ষুণ্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা তা ছিন্ন করে। যার পরিণামস্বরূপ ধরার বুকে অশান্তি বিস্তার লাভ করে।

উপমার ক্ষেত্রে কোন তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ দুষণীয় নয় ঃ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কোন নিকৃষ্ট, নগণ্য ও ঘৃণ্য বস্তুর উল্লেখ কোন ত্রুটি বা অপরাধ নয় কিংবা বক্তার মহানর্যাদার পরিপন্থীও নয়। কোরআন, হাদীস এবং প্রথম যুগের ওলামায়ে কেরাম ও প্রখ্যাত ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের বাণী ও রচনাবলীতে এ ধরনের বহু উপমার সন্ধান মেলে, যা সাধারণভাবে একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে হয়। কোরআন-হাদীস এসব তথাকথিত লজ্জা ও সম্ভ্রমের তোয়াক্কা না করে প্রকৃত উদ্দেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে এরূপ উপমা বর্জন মোটেও বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেনি। يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ (আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে —) এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বা চুক্তি লঙ্ঘন করা জঘন্য অপরাধ। এর পরিণতিতে সে যাবতীয় পূণ্য থেকে বঞ্চিতও হয়ে যেতে পারে। وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (এবং আল্লাহ্ পাক যে সব সম্পর্ক অটুট রাখতে বলেছেন, তারা তা ছিন্ন করে)। এতে বুঝা যায়, যে সব সম্পর্ক শরীয়ত অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছে, তা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক এবং তা ছিন্ন করা সম্পূর্ণ হারাম। গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, একজন মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র এবং অন্যান্য মানুষ তথা সমগ্র সৃষ্টিকূলের অধিকার ও প্রাপ্য আদায় করার নির্ধারিত পদ্ধতি ও তৎসংশ্লিষ্ট সীমা ও বাঁধানের সমষ্টির নামই দ্বীন বা ধর্ম। বিশ্বের শান্তি ও অশান্তি এসব সম্পর্ক যথাযথভাবে বাজায় রাখা বা না রাখার ওপরই নির্ভরশীল। এজন্যই وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ (তারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তির সৃষ্টি করে) বাক্যাংশের মাধ্যমে উল্লেখিত সম্পর্ক ক্ষুণ্ন করাকেই বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার একমাত্র কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এ হল যাবতীয় অশান্তি ও কলহের মূল কারণ। أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (তারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতিগ্রস্ত।) —এ ব্যাক্যের মাধ্যমে যারা উল্লেখিত নির্দেশাবলী অমান্য করবে তাদেরকে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকালের ক্ষতিই প্রকৃত ক্ষতি। সে তুলনায় পার্থিব ক্ষতি উল্লেখযোগ্য কোন বিষয়ই নয়।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহসমূহ বর্ণনার পর বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র অগণিত দয়া ও সুখ-সম্পদে পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও অবধ্যতা প্রদর্শনে কিভাবে লিপ্ত থাকতে পারে। এতে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এসব প্রমাণাদি সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে চিন্তা করার জন্য প্রয়োজনীয় কষ্টটুকু স্বীকার করতে তারা যদি প্রস্তুত না থাকে, তবে অন্ততঃ দাতার দানের স্বীকৃতি এবং তার প্রতি যথাযোগ্য ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা তো প্রত্যেক সভ্য ও রুচিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের স্বাভাবিক ও অবশ্য কর্তব্য।

প্রথম আয়াতে সেসব বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহাদির বর্ণনা রয়েছে, যা মানুষের মূল সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যা প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরে উপস্থিত। যথা—প্রথমাবস্থায় সে ছিল নিষ্প্রাণ অনুকণা, পরে তাতে আল্লাহ্ পাক প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে সেসব সাধারণ অনুগ্রহের বিবরণ রয়েছে, যদ্দ্বারা সমগ্র মানবজাতি ও গোটা সৃষ্টি যথাযথভাবে উপকৃত হয় এবং যা মানুষের টিকে থাকার জন্য একান্ত আবশ্যক। এসবের মধ্যে প্রথমে ভূমি ও তার উৎপন্ন ফসলের আলোচনা রয়েছে, যার সাথে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। অতঃপর যে আসমানসমূহের সাথে ভূমির সঞ্জীবতা ও উৎপাদন ক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সে গুলোর আলোচনা করা হয়েছে।

وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ এখানে তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। এখানে اموات শব্দটি ميت এর বহুবচন। মৃত ও নিষ্প্রাণ বস্তুকে ميت বলা হয়। আয়াতের মর্ম এই যে, মানুষ তার সৃষ্টির মূল উৎস সম্পর্কে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সৃষ্টির সূচনা ঐ নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহ থেকেই হয়েছে, যা আংশিকভাবে জড়বস্তুর আকৃতিতে, আংশিকভাবে প্রবহমান বস্তুর আকৃতিতে এবং আংশিকভাবে খাদ্যের আকৃতিতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। মহান আল্লাহ্ সেসব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহকে বিভিন্ন স্থান থেকে একত্রিত করেছেন। অবশেষে সেগুলোতে প্রাণ সংযোগ করে জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। এহলো মানব সৃষ্টির সূচনাপর্বের কথা।

ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ (অনন্তর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন আবার পুনরুজ্জীবিত করবেন।) অর্থাৎ- যিনি তোমাদের ইতস্তঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য অণুকণা সমন্বয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, তিনিই মরজগতে তোমাদের আয়ুর নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে তোমাদের জীবনশিখা নিভিয়ে দেবেন এবং এক নির্ধারিত সময়ের পর কেয়ামতের দিন তোমাদের দেহের নিষ্প্রাণ বিক্ষিপ্ত কণাগুলোকে আবার সমন্বিত করে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

প্রথম মৃত্যু হল তোমাদের সৃষ্টিধারায় সূচনাপর্বের, নিষ্প্রাণ ও জড় অবস্থা যা থেকে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হল মরজগতে মানুষের আয়ু শেষ হয়ে যাওয়াকালীন মৃত্যু। বস্তুতঃ তৃতীয়বার জীবন লাভ হবে কিয়ামতের দিন।

মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের মধ্যবর্তী সময় ঃ আলোচ্য আয়াতে ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর পরবর্তী এমন এক জীবনের বর্ণনা রয়েছে, যার সূচনা হবে কিয়ামতের দিন থেকে। কিন্তু যে কবরদেশের প্রশ্নোত্তর এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত — এখানে তার কোন উল্লেখ নেই। মানুষ ইহকালে যে জীবন লাভ করে এবং পরকালে যে জীবন লাভ করবে, কবরের জীবন অনুরূপ কোন জীবন নয়, বরং তা কল্পনাময় স্বাপ্নিক জীবনের মতই এক মধ্যবর্তী অবস্থা। একে ইহলৌকিক জীবনের পরিসমাপ্তি এবং পারলৌকিক জীবনের প্রারম্ভও বলা যেতে পারে। সুতরাং এটি এমন স্বতন্ত্র জীবন নয়, পৃথকভাবে যার আলোচনা করার প্রয়োজন

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ
آدَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنْۢبِئُونِي
بِأَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ
إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يٰٓآدَمُ أَنْۢبِئْهُمْ
بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنْۢبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّيٓ أَعْلَمُ
غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۙ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ أَبٰى وَ
اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾ وَقُلْنَا يٰٓآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ
وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا
هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّٰلِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ
عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتٰعٌ إِلٰى حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقّٰىٓ
آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾

(৩০) আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন ঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। (৩১) আর আল্লাহ্ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। তারপর সেমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমারা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। (৩২) তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ (সেগুলো ব্যতীত)। নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। (৩৩) তিনি বললেন, হে আদম, ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তাপর যখন তিনি বলে দিলেন সে সবের নাম, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি? এবং সেসব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর। (৩৪) এবং যখন আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (৩৫) এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েবে। (৩৬) অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে। (৩৭) অতঃপর হযরত আদম (আঃ) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ্য করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।

থাকতে পারের।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا (তিনিই সে মহান আল্লাহ্ যিনি তোমাদের উপাকারার্থ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুসমগ্রী সৃষ্টি করেছেন।) এখানে এমন এক সাধারণ ও ব্যাপক অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র প্রাণীজগত সমভাবে এদ্দ্বারা উপকৃত। এ জগতে মানুষ যত অনুগ্রহই লাভ করেছে বা করতে পারে সংক্ষেপে তা এই একটি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, মানুষের আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ওষুদ-পত্র বসবাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ এ মাটি থেকেই উৎপন্ন ও সংগৃহীত হয়ে থাকে।

জগতের কোন বস্তুই অহেতুক নয় ঃ বিশ্বের সব কিছুই যে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশে সৃষ্ট, আলোচ্য আয়াতে এ তথ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করে না— তা সে উপকার ইহলৌকিক হোক, বা পরকাল সম্পর্কিত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত হোক। অনেক জিনিস সরাসরি মানুষের আহার ও ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে সেগুলোর উপকার সহজেই অনুধাবনযোগ্য। আবার এমনও অগণিত বস্তু রয়েছে, যার আবেদন ও উপকরিতা মানুষ অলক্ষ্যে ভোগ করে যাচ্ছে, অথচ তা অনুভব করতে পারছে না। এমনকি বিষাক্ত দ্রব্যাদি, বিষধর জীবজন্তু প্রভৃতি যেসব বস্তু দৃশ্যতঃ মানুষের পক্ষ্যে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়, গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায়, সেগুলোও কোন না কোন দিক দিয়ে মানুষের জন্য কল্যাণকরও বটে। যেসব জন্তু একদিকে মানুষের জন্য হারাম, অপরদিকে তদ্দ্বারা তারা উপকৃতও হয়ে চলেছে।

প্রখ্যাত সাধক আরিফ বিল্লাহ ইবনে আ'তা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এরশাদ করেন যে, আল্লাহ্ পাক সারা বিশ্বকে এ উদ্দেশেই সৃষ্টি করেছেন যেন জগতের যাবতীয় বস্তু তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে; আর তোমরা যেন সর্বতোভাবে আল্লাহ্র আরাধনায় নিয়োজিত থাক। তবেই যেসব বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা তা নিঃসন্দেহে লাভ করবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হবে সেসব বস্তুর অন্বেষণে ও সাধন চিন্তায় নিয়োজিত থেকে সে মহান সত্তাকে ভুলে না বসা, যিনি এগুলোর একক স্রষ্টা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতের সারসংক্ষেপ এই—মহান পরওয়াদেগার আল্লাহ্ পাক যখন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বে তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করেন, তখন এ সম্পর্ক ফেরেশতাদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য তাঁর এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, তাঁরা যেন এ ব্যাপারে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন। কাজেই ফেরেশতাগণ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, মানব জাতির মাঝে এমনও অনকে লোক হবে, যারা শুধু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে। সুতরাং এদের উপর খেলাফত ও শৃংখলা বিধানের দায়িত্ব অর্পণের হেতু তাঁদের পুরোপুরি বোদগম্য নয়। এ দায়িত্ব পালনের জন্য ফেরেশতাগণই যোগ্যতম বলে মনে হয়। কেননা, পুণ্য ও সততা তাঁদের প্রকৃতিগত গুণ। তাঁদের দ্বারা পাপ ও অকল্যাণ সাধন আদৌ সম্ভব নয়—তাঁরা সদা অনুগত। এ জগতের শাসনকার্য পরিচালনা ও শৃংখলা বিধানের কাজও হয়তো তাঁরাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। তাঁদের এ ধারণা যে ভুল ও অমূলক, তা আল্লাহ্

পাক শাসকোচিত ভংগীতে বর্ণনা করে বলেন যে, বিশ্ব খেলাফতের প্রকৃতি ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনয়িতা সম্পর্কে তোমরা মোটেও ওয়াকেফহাল নও। তা কেবল আমিই পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত।

অতঃপর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম (আঃ)–এর শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অনুপম মর্যাদার বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় উত্তরটি দেয়া হয়েছে যে, বিশ্ব খেলাফতের জন্য ভূ–পৃষ্ঠের অন্তর্গত সৃষ্ট বস্তুসমূহের নাম, গুণাগুণ, বিস্তারিত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষণাদি সম্পর্ক সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। বস্তুতঃ ফেরেশতাগণের এ যোগ্যতা ও গুণাবলী নেই।

আদম সৃষ্টি প্রসংগে ফেরেশতাদের সাথে আলোচনার তাৎপর্য ঃ একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে,ফেরেশতাদের সমাবেশে আল্লাহ্ পাকের এ ঘটনা প্রকাশ করার তাৎপর্য কি এবং এতে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল? তাঁদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ , না তাদেরকে এ সম্পর্কে নিছক অবহিত করা? না ফেরেশতাদের ভাষায় এ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করানো?

একথা সুস্পষ্ট যে, কোন বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শের প্রয়োজনয়িতা তখনই দেখা দেয়, যখন সমস্যার সমস্ত দিক কারো কাছে অস্পষ্ট থাক; নিজস্ব অভিজ্ঞান ও জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা না থাকে। আর তখনই কেবল অন্যান্য জ্ঞানী–গুণীদের সাথে পরামার্শ করা হয়। অথবা পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সেখানেও হতে পারে, যেখানে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকার সমপন্ন হয়। তাই তাদের অভিমত জানার উদ্দেশে পরমার্শ করা হয়। যেমনটি বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সাধারণ পরিষদসমূহে প্রচলিত। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এ দু'টোর কোনটাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মহান আল্লাহ্ গোটা বস্তুজগতের স্রষ্টা এবং প্রতিটি বিন্দুবিসর্গ সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সামনে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সবকিছুই সমান। তাই তাঁর পক্ষে কারো সাথে পরামর্শ করার কি প্রয়োজনয়িতা থাকতে পারে!

অনুরূপভাবে এখানে এমনও নয় যে, সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত – যেখানে প্রত্যেক সদস্য সমঅধিকার সম্পন্ন বলে প্রত্যেকের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ পাকই সবছির স্রষ্টা ও মালিক। ফেরেশতা ও মানব–দানব সবই তাঁর সৃষ্টি এবং সবই তার আয়ত্তাধীন। তাঁর কোন কাজ বা পদক্ষেপ সম্পর্কে কারো কোন প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই যে,এ কাজ কেন করা হলো বা কেন করা হলো না। لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ আল্লাহ্ পাকের কাজ সম্পর্কে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই, কিন্তু অন্যান্য সবাইকে তাদের কৃত কর্ম সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

সারকথা প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে পরামর্শ গ্রহণ উদ্দেশ্যও নয় এবং এর কোন অবাশ্যকতাও ছিল না। কিন্তু রূপ দেয়া হয়েছে পরামর্শ গ্রহণের যাতে মানুষ পরামর্শরীতি এবং তার প্রয়োজনীয়তার শিক্ষা লাভ করতে পারে। যেমন কোরআন পাকে রসূলে করীম (সাঃ)–কে বিভিন্ন কাজে ও ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অথচ তিনি ছিলেন ওহীর বাহক। তাঁর সব কাজকর্ম এবং তাঁর প্রত্যেক অধ্যায় ও দিক ওহীর মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করে দেয়া হতো। কিন্তু তাঁর মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ রীতির প্রচলন করা এবং উম্মতকে তা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশে তাঁকেও পরামর্শ গ্রহণের তাকীদ দেয়া হয়েছে।

যেহেতু হযরত আদম (আঃ)–এর মাঝে ফেরেশতা ও জ্বিন উভয় সম্প্রদায়ের যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে, সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ পদমর্যাদা একেবারে সুস্পষ্ট। এখন আল্লাহ্ পাক এ বিষয়টি কার্যকরভাবে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলেন যে, ফেরেশতা ও জ্বিনদের দ্বারা হযরত আদম (আঃ)–এর প্রতি এমন বিশেষ ধরনের সম্মান প্রদর্শন করানো হোক, যদ্দ্বারা কার্যতঃ স্পষ্ট হয়ে যোয় যে, তিনি তাদের উভয়ের চাইতে উত্তম ও পূর্ণতর। এ জন্য যে সম্মান প্রদর্শনমূলক কাজের প্রস্তাব করা হয়েছে, তারই বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ্ পাক বলেন, "আমি ফেরশতাদেরকে হুকুম করলাম, তোমরা আদমকে সেজদা কর। সমস্ত ফেরেশতা সেজদায় পতিত হল, কিন্তু ইবলীস সেজদা করতে অস্বীকার করলো এবং অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে উঠলো।"

সেজদার নির্দেশ কি জ্বিনদের প্রতিও ছিল? এ আয়াতে বাহ্যতঃ যে কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই যে, আদম (আঃ)–কে সেজদা করার হুকুম ফেরেশতাদেরকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন একথা বলা হলো যে, ইবলীস ব্যতীত সব ফেরেশতাই সেজদা করলেন, তখন তাতে প্রমাণিত হলো যে, সেজদার নির্দেশ সকল বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টির প্রতিই ছিল। ফেরেশতা ও জ্বিন সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নির্দেশ প্রদান করতে গিয়ে শুধু ফেরেশতাগণের উল্লেখ এজন্য করা হলো যে, তারাই ছিল সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন তাদেরকে হযরত আদম (আঃ)–এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হলো, তাতে জ্বিন জাতি অতি উত্তম রূপে এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত বলে জানা গেল।

সম্মানসূচক সেজদা ইসলামে নিষিদ্ধ ঃ এ আয়াতে হযরত আদম (আঃ)–কে সেজদা করতে ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আঃ)–এর পিতা–মাতা ও ভাইগণ মিশর পৌছার পর হযরত ইউসুফকে সেজদা করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। এটা সুস্পষ্ট যে, এ সেজদা এবাদতের উদ্দেশে হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের উপাসনা শিরক ও কুফরী। কোন কালে কোন শরীয়তে এরূপ কাজের বৈধতার কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। সুতরাং এর অর্থ এছাড়া অন্য কোন কিছুই হতে পারে না যে, প্রাচীন কালের সেজদা আমাদের কালের সালাম, মুসাফাহা, মুআনাকা, হাতে চুমো খাওয়া এবং সম্মান প্রদর্শনার্থ দাঁড়িয়ে যাওয়ার সমার্থক ও সমতুল্য ছিল। ইমাম জাসসাস আহ্‌কামুল কোরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী নবিগণের শরীয়তে বড়দের প্রতি সম্মানসূচক সেজদা করা বৈধ ছিল। শরীয়তে মুহাম্মদীতে তা রহিত হয়ে গেছে। বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি হিসাবে এখন শুধু সালাম ও মুসাফাহার অনুমতি রয়েছে। রুকূ–সেজদা এবং নামাযের মত করে হাত বেঁধে দাঁড়ানোকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এর বিশ্লেষণ এই যে, শিরক, কুফর এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করা কোন শরীয়তেই বৈধ ছিল না। কিন্তু কিছু কিছু কাজ এমনও রয়েছে, যা মূলতঃ শিরক বা কুফর নয়। কিন্তু মানুষের অজ্ঞানতা ও অসাবধানতার দরুন সে সমস্ত কার্যাবলী শিরক ও কুফরের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এসব কার্যাবলী পূর্ববর্তী নবিগণের শরীয়তে আদৌ নিষিদ্ধ ছিল না। বরং সেগুলোকে শিরকরূপে প্রতিপন্ন করা থেকে মানুষকে বিরত রাখা হত মাত্র। যেমন, প্রাণীদের ছবি আঁকা ও ব্যবহার করা মূলতঃ কুফর বা শিরক নয়। এজন্য পূর্ববর্তী শরীয়তে তা বৈধ ছিল। যেমন, হযরত সুলায়মান (আঃ)–এর কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا

يَعۡمَلُوۡنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنۡ مَّحَارِيۡبَ وَتَمَاثِيۡلَ (এবং জ্বিনেরা তার জন্য বড় বড় মিহ্‌রাব তৈরী করতো এবং ছবি অঙ্কন করতো)।

অনুরূপভাবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে সেজদা করা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে বৈধ ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে মানুষের অজ্ঞানতার ফলে এ সব বিষয়ই শিরক ও পৌত্তলিকতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পথেই নবিগণের দ্বীন ও শরীয়তে বিকৃতি ও মূলচ্যুতি ঘটেছে। পরবর্তী নবি ও শরীয়ত এসে তা একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। শরীয়তে মুহাম্মদী যেহেতু অবিনশ্বর ও চিরন্তন শরীয়ত—রসূলে করীম (সাঃ)-এর মাধ্যমে যেহেতু নবুওয়ত ও রিসালতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তাঁর শরীয়তই যেহেতু সর্বশেষ শরীয়ত, সেহেতু একে বিকৃতি ও মূলচ্যুতি থেকে বাঁচাবার জন্য এমন প্রতিটি ছিদ্রপথই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে শিরক ও পৌত্তলিকতা প্রবেশ করতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সেসব বিষয়ই এ শরীয়তে হারাম করে দেয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কোন যুগে শিরক ও মূর্তি পূজার উৎস বা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছবি ও চিত্রাঙ্কন এবং তার ব্যবহারও এজন্যই হারাম করা হয়েছে। সম্মানসূচক সেজদা একই কারণে হারাম হয়েছে। আর এমন সব সময়ে নামায পড়াও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, যে সব সময়ে মুশরিক ও কাফিরগণ নিজেদের তথাকথিত উপাস্যদের পূজা ও উপাসনা করত। কারণ, এ বাহ্যিক সাদৃশ্য পরিণামে যেন শিরকের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

কোন কোন আলেম বলেছেন, এবাদতের মূল যে নামায, তাতে চার রকমের কাজ রয়েছে। যথা— দাঁড়ানো, বসা, রুকূ ও সেজদা করা। তন্মধ্যে প্রথম দু'টি মানুষ অভ্যাসগতভাবে নিজস্ব প্রয়োজনেও করে এবং নামাযের মধ্যে এবাদত হিসাবেও করে। কিন্তু রুকূ- সেজদা এমন কাজ, যা মানুষ কখনো অভ্যাসগতভাবে করে না, বরং তা শুধু এবাদতের জন্যই নির্দিষ্ট। এ জন্য এ দু'টোকে শরীয়তে মুহাম্মদীতে এবাদতের পর্যায়ভুক্ত করে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশে তা করা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, সেজদায়ে তা'জিমী বা সম্মানসূচক সেজদার বৈধতার প্রমাণ তো কোরআন পাকের উল্লেখিত আয়াতসমূহে পাওয়া যায়, কিন্তু তা রহিত হওয়ার দলীল কি?

উত্তর এই যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর অনেক 'মোতাওয়াতির' ও মশহুর হাদীস দ্বারা সেজদায়ে-তা'জিমী হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে। হুযুর (সাঃ) এরশাদ করেছেন, ''যদি আমি আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো প্রতি সেজদায়ে-তা'জিমী করা জায়েয মনে করতাম, তবে স্বামীকে সেজদা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম, কিন্তু এই শরীয়তে সেজদায়ে-তা'জিমী সম্পূর্ণ হারাম বলে কাউকে সেজদা করা কারো পক্ষে জায়েয নয়।''

এই হাদীসটি বিশ জন সাহাবীর রেওয়য়েত থেকে প্রমাণিত। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তাদরীবুররাবী' তে বর্ণনা করা হয়েছে, যে রেওয়ায়েত দশ জন সাহাবী নকল করে থাকেন, সেটি হাদীসে মোতাওয়াতরের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় যা (হাদীসে মোতাওয়াতির) কোরআন পাকের ন্যায়ই অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য।

এটা আদম (আঃ)-এর ঘটনার সমাপ্তিপর্ব। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশ্ব খিলাফতের যোগ্যতা যখন স্পষ্ট করে বলে দেয়া হলো এবং ফেরেশতাগণও তা মেনে নিলেন আর ইবলীস যখন অত্যম্ভরিতা ও হঠকারিতার দরুন কাফির হয়ে বেরিয়ে গেল, তখন হযরত আদম (আঃ) এবং তাঁর সহধর্মিনী হাওয়া (আঃ) এ নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন যে, তোমরা জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং সেখানকার নেয়ামত পরিতৃপ্তিসহ ভোগ করতে থাক। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট গাছ সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হলো যে, এর ধারে কাছেও যেও না। অর্থাৎ, সেটির ভোগ পূর্ণভাবে পরিহার করবে। শয়তান আদম (আঃ)- এর কারণে ধিকৃত ও অভিশপ্ত হয়েছিল, সুতরাং সে কোন প্রাকারে সুযোগ পেয়ে এবং এ গাছের উপকারাদি বর্ণনা করে তাদের উভয়কে সে গাছের ফল খেতে প্ররোচিত করল। নিজেদের বিচ্যুতির দরুন তাঁদেরকেও পৃথিবীতে নেমে যেতে নির্দেশ দেয়া হলো। তাঁদেরকে বলে দেয়া হলো যে, পৃথিবীতে বাসবাস জান্নাতের মত নির্ঝঞ্ঝাট ও শান্তিপূর্ণ হবে না, বরং সেখানে মতানৈক্য ও শত্রুতার উন্মেষ ঘটবে। ফলে বেঁচে থাকার স্বাদ পূর্ণভাবে লাভ করতে পারবে না।

وَقُلۡنَا يٰۤاٰدَمُ اسۡكُنۡ اَنۡتَ وَزَوۡجُكَ الۡجَنَّةَ (এবং আমি আদম (আঃ)-কে সস্ত্রীক জান্নাতে অবস্থান করতে নির্দেশ দিলাম)। এটা আদম সৃষ্টি ও ফেরেশতাদের সেজদার পরবর্তী ঘটনা। কোন কোন বিশেষজ্ঞ এ নির্দেশ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আদম সৃষ্টি ও সেজদার ঘটনা জান্নাতের বাইরে অন্য কোথাও ঘটেছিল। এর পরে তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছে। কিন্তু এ অর্থও সুনিশ্চিত নয়। বরং এমনও হতে পারে যে, সৃষ্টি ও সেজদা উভয় ঘটনা বেহেশতেই ঘটেছিল, কিন্তু তাঁদের বাসস্থান কোথায় হবে সে সম্পর্কে তাঁদেরকে কোন সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। তাঁদের বাসস্থান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত এ ঘটনার পর শোনানো হলো।

وَكُلَا مِنۡهَا رَغَدًا حَيۡثُ شِئۡتُمَا - رغدا আরবী অভিধান অনুযায়ী সেসব নেয়ামত ও আহার্যবস্তুকে বলা হয়, যা লাভ করতে কোন শ্রম সাধনার প্রয়োজন হয় না এবং এত পর্যাপ্ত ও ব্যাপক পরিমাণে লাভ হয় যে, তাতে হ্রাসপ্রাপ্তি বা নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার কোন আশঙ্কাই থাকে না। অর্থাৎ - আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে বলা হলো যে, তোমরা জান্নাতের ফল-মূল পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করতে থাক। ওগুলো লাভ করতে হবে না এবং তা হ্রাস পাবে কিংবা শেষ হয়ে যাবে, এমন কোন চিন্তাও করতে হবে না।

فَتَكُوۡنَا مِنَ الظّٰلِمِيۡنَ - কোন বিশেষ গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছিল যে, এর ধারে কাছেও যেও না। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, সে গাছের ফল না খাওয়া। কিন্তু তাকীদের জন্য বলা হয়েছে, কাছেও যেও না। সেটি কি গাছ ছিল, কোরআন করীমে তা উল্লেখ করা হয়নি। কোন নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারাও তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। কোন কোন মুফাস্‌সির সেটিকে গমের গাছ বলেছেন, আবার কেউ কেউ আঙ্গুর গাছ বলেছেন। অনেকে বলেছেন, আঞ্জীরের গাছ। কিন্তু কোরআন ও হাদীসে যা অনির্দিষ্ট রেখে দেয়া হয়েছে, তা নির্দিষ্ট করার কোন প্রয়োজন পড়ে না।

فَتَكُوۡنَا مِنَ الظّٰلِمِيۡنَ অর্থাৎ - যদি এই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাও, তবে তোমরা উভয়েই যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيۡطٰنُ عَنۡهَا - زلة শব্দের অর্থ বিচ্যুতি বা পদস্খলন। অর্থাৎ, শয়তান আদম ও হাওয়াকে পদস্খলিত করেছিল বা তাঁদের বিচ্যুতি ঘটিয়েছিল। কোরআনের এ-সব শব্দে পরিষ্কার এ-কথা বোঝা যায় যে, আদম ও হাওয়া কর্তৃক আল্লাহ্ পাকের হুকুম লঙ্ঘন সাধারণ পাপীদের মত ছিল না, বরং শয়তানের প্রতারণায় প্রতারিত হয়েই তাঁরা এ

ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। পরিণামে যে গাছের ফল নিষিদ্ধ ছিল, তা খেয়ে বসলেন।

মাধ্যমসমূহ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় : وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ অর্থাৎ, – 'এ গাছের ধারে–কাছেও যেও না'। এ নিষেধাজ্ঞার ফলে একথা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে বৃক্ষের ফল না খাওয়া ছিল এই নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু সাবধানতা–সূচক নির্দেশ ছিল এই যে, সে গাছের কাছেও যেও না। এর দ্বারাই ফিকাহ্শাস্ত্রে কারণ-উপকরণের নিষিদ্ধতার মাসআলাটি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, কোন বস্তু নিজস্বভাবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ না হলেও যখন তাতে এমন আশঙ্কা থাকে যে, ঐ বস্তু গ্রহণ করলে অন্য কোন হারাম ও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, তখন ঐ বৈধ বস্তুও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। যেমন, গাছের কাছে যাওয়া তার ফল–ফসল খাওয়ার কারণও হতে পারতো। সেজন্য তাও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। একে ফিকাহ্শাস্ত্রের পরিভাষায় উপকরণের নিষিদ্ধতা বলা হয়।

নবিগণের নিষ্পাপ হওয়া : এ বর্ণনার দ্বারা হযরত আদম (আঃ)–কে বিশেষ গাছ বা তার ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারেও সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই সে যেন তেমাদেরকে পাপে লিপ্ত করে না দেয়! এতদসত্ত্বেও হযরত আদম (আঃ)–এর তা খাওয়া বাহ্যিকভাবে পাপ বলে গণ্য। অথচ নবিগণ পাপ থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র। সঠিক তথ্য এই যে, নবিগণের যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকার কথা যুক্তি–বুদ্ধির দ্বারা এবং লিখিত ও বর্ণনাগতভাবে প্রমাণিত। চার ইমাম ও উম্মতের সম্মিলিত অভিমতেও নবিগণ ছোট–বড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কারণ, নবিগণ (আঃ)–কে গোটা মানব জাতির অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। যদি তাদের দ্বারাও আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার পরিপন্থী ছোট বড় কোন পাপ কাজ সম্পন্ন হত, তবে নবিগণের বাণী ও কার্যাবলীর উপর আস্থা ও বিশ্বাস উঠে যেত। যদি নবিগণের উপর আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে, তবে দ্বীন ও শরীয়তের স্থান কোথায়? অবশ্য কোরআন পাকের বহু আয়াতে অনেক নবি (আঃ) সম্পর্কে এ ধরনের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের দ্বারাও পাপ সংঘটিত হয়েছে এবং আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এজন্য তাঁদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। হযরত আদম (আঃ)–এর ঘটনাও এ শ্রেণীভূক্ত।

এ ধরনের ঘটনাবলী সমপর্কে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, কোন ভুল বুঝাবুঝি বা অনিচ্ছাকৃত কারণে নবিদের দ্বারা এ ধরনের কাজ সংঘটিত হয়ে থাকবে। কোন নবি (আঃ) জেনে শুনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্ পাকের হুকুমের পরিপন্থী কোন কাজ করেননি। এ ত্রুটি ইজতেহাদগত ও অনিচ্ছাকৃত এবং তা ক্ষমার যোগ্য। শরীয়তের পরিভাষায় একে পাপ বলা চলে না এবং এ ধরনের ভ্রান্তিজনক ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সেসব বিষয়ে হতেই পারে না, যার সম্পর্ক শিক্ষা–দীক্ষা এবং শরীয়তের প্রচারের সাথে রয়েছে, বরং তাঁদের ব্যক্তিগত কাজ–কর্মে এ ধরনের ভুলত্রুটি হতে পারে।

কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ পাকের দরবারে নবিগণের স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে এবং যেহেতু মহান ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ক্ষুদ্র ত্রুটি বিচ্যুতি সংঘটিত হলেও তাকে অনেক বড় মনে করা হয়, সেহেতু কোরআন হাকীমে এ ধরনের ঘটনাবলীকে অপরাধ ও পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো আদৌ পাপ নয়।

হযরত আদম (আঃ)–এর এ ঘটনা সম্পর্কে তফসীরবিদগণ বহু কারণ বর্ণনা করেছেন এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

১। হযরত আদম (আঃ)–কে যখন নিষেধ করা হয়েছিল, তখন এক নির্দিষ্ট গাছের প্রতি ইঙ্গিত করেই তা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে শুধুমাত্র সে গাছটিই উদ্দেশ্য ছিল না, বরং সে জাতীয় যাবতীয় গাছই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (আঃ) এক খণ্ড রেশমী কাপড় ও একখণ্ড স্বর্ণ হাতে নিয়ে এরশাদ করলেন, এ বস্তু দু'টি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্যে হারাম। একথা সুস্পষ্ট যে, ঐ বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণখণ্ডের ব্যবহারই শুধু হারাম ছিল না, যে দু'টি হুযুরের (সাঃ) হাতে ছিল বরং যাবতীয় রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ সম্পর্কেই ছিল এ হুকুম। কিন্তু এখানে হয়তো এ ধারণাও হতে পারে যে, এ নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক সেই বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যেগুলো সে সময় তাঁর (সাঃ) হাতে ছিল। অনুরূপভাবে হযরত আদম (আঃ) –এর হয়তো এ ধারণা হয়েছিল যে, যে গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে নিষেধ করা হয়েছিল, এ নিষেধের সম্পর্ক ঐ বিশেষ গাছটিতেই সীমাবদ্ধ। শয়তান এ ধারণা তাঁর অন্তরে সঞ্চার করে বদ্ধমূল করে দিয়েছিল এবং কসম খেয়ে খেয়ে বিশ্বাস জন্মালো যে, 'আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, তোমাদেরকে এমন কোন কাজের পরামর্শ দিচ্ছি না, যা তোমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। যে গাছ সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে, সেটি অন্য গাছ।'

তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, শয়তান এ প্রবঞ্চনা তাঁর অন্তঃকরণে সঞ্চারিত করেছিল যে, এ গাছ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা আপনার সৃষ্টির সূচনা পর্বের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। যেমন, সদ্যজাত শিশুকে জীবনের প্রথম পর্যায়ে শক্ত ও গুরুপাক আহার থেকে বিরত রাখা হয়। কিন্তু সময় ও শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে সব ধরনের আহার্য গ্রহণেরই অনুমতি দিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং আপনি এখন শক্ত–সমর্থ হয়েছেন ; এখন সে বিধি–নেষিধ কার্যকর নয়।

আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, শয়তান যখন হযরত আদম (আঃ)–কে সে গাছের উপকারিতা ও গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছিল, যেমন— সে গাছের ফল খেলে আপনি অনন্তকাল নিশ্চিন্তে জান্নাতের নেয়ামতাদি ও সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারবেন, তখন তাঁর সৃষ্টির প্রথম পর্বে সে গাছ সম্পর্কে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কথা তাঁর মনে ছিল না। কোরআন মজীদের فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا (অর্থাৎ, আদম (আঃ) ভুলে গেলেন এবং আমি তাঁর মধ্যে (সংকল্পের) দৃঢ়তা পাইনি।) আয়াতও এ সম্ভাব্যতা সমর্থন করে।

যাহোক, এ ধরনের বহু সম্ভাবনা থাকতে পারে। তবে সারকথা এই যে, হযরত আদম (আঃ) বুঝে–শুনে, ইচ্ছাকৃতভাবে এ হুকুম অমান্য করেননি, বরং তাঁর দ্বারা ভুল হয়ে গিয়েছিল বা ইজতেহাদগত বিচ্যুতি ঘটেছিল, যা প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ নয়। কিন্তু হযরত আদম (আঃ)–এর শানে–নবুওয়ত এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চ–মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিচ্যুতিকেও যথেষ্ট বড় মনে করা হয়েছিল। আর কোরআন মজীদ সেজন্যই একে পাপ বলে অভিহিত করেছে। অবশ্য আদম (আঃ)–এর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পর তা মাফ করে দেয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এ বিতর্ক অনাবশ্যক যে, শয়তান জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আদম(আঃ)–কে প্রতারিত করার জন্য কিভাবে আবার সেখানে প্রবেশ করল? কারণ, শয়তানের প্রবঞ্চনার জন্যে জান্নাতে প্রবেশের কোন

প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহ্ পাক শয়তান ও জ্বিন জাতিকে দূর থেকেও প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে এ প্রশ্ন যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)–কে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমাদেরকে দিয়ে যেন এমন কোন কাজ করিয়ে না বসে, যে কারণে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হতে হয়। এতদসত্ত্বেও হযরত আদম (আঃ) শয়তান কর্তৃক কেমন করে প্রতারিত হলেন? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ পাক জ্বিন ও শয়তানকে বিভিন্ন আকার অবয়বে আত্মপ্রকাশের শক্তি দিয়েছেন। হতে পারে, সে এমন রূপ ধারণ করে সামনে এসেছিল যে, হযরত আদম (আঃ) বুঝতেই পারেননি যে, সে'ই শয়তান।

হযরত আদম (আঃ) ইতিপূর্বে কখনও এ ধরনের শাসন ও কোপদৃষ্টির সম্মুখীন হননি। তিনি এমন পাষাণচিত্তও ছিলেন না যে, বেমালুম তা সয়ে যেতে পারেন। তাই চরমভাবে বিচলিত হয়ে মনে মনে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে লাগলেন। কিন্তু নবিসুলভ প্রাজ্ঞদৃষ্টি এবং সে কারণে চরমভাবে সঞ্চারিত ভীতির দরুন মুখ থেকে কোন কথাই বের হচ্ছিল না। ক্ষমা–ভিক্ষা মর্যাদার পরিপন্থী বিবেচিত হয়ে অধিক শাস্তি ও কোপানলের কারণ রূপে পরিগণিত হতে পারে এমন আশঙ্কায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতবাক হয়ে বসে থাকেন। মহান আল্লাহ্ অন্তর্যামী এবং অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়। এ করুণ অবস্থা দেখে আল্লাহ্ পাক নিজেই ক্ষমা প্রার্থনারীতি সম্বলিত কয়েকটি বচন তাঁদেরকে শিখিয়ে দিলেন। তারই বর্ণনা এ আয়াতসমূহে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আঃ) স্বীয় প্রভুর কাছ থেকে কয়েকটি শব্দ লাভ করলেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁদের প্রতি করুণাভরে লক্ষ্য করলেন। (অর্থাৎ, তাঁদের তওবা গ্রহণ করে নিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি মহা ক্ষমাশীল এবং অতি মেহেরবান)। কিন্তু যেহেতু পৃথিবীতে আগমনের মধ্যে আরও অনেক তাৎপর্য ও কল্যাণ নিহিত ছিল — যেমন, তাঁদের বংশধরদের মধ্য থেকে ফেরেশতা ও জ্বিন জাতির মাঝে এক নতুন জাতি — 'মানব' জাতির আবির্ভাব ঘটা, তাদেরকে এক ধরনের কর্ম–স্বাধীনতা দিয়ে তাদের প্রতি শরীয়তী বিধান প্রয়োগের যোগ্য করে গড়ে তোলা, বিশ্বে খোদায়ী খেলাফত প্রতিষ্ঠা এবং অপরাধীর শাস্তি বিধান, শরীয়তী আইন ও নির্দেশাবলী প্রবর্তন। এই নতুন জাতি উন্নতি সাধন করে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে এমন এক স্তরে পৌছবে, যা ফেরেশতাদের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। এসব উদ্দেশ্য সম্পর্কে আদম সৃষ্টির পূর্বে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছিল।

এজন্য অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার পরও পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ রহিত করা হয়নি, অবশ্য তার রূপ পাল্টে দেয়া হয়েছে। আর এখানকার এ নির্দেশ মহাজ্ঞানী ও রহস্যবিদসুলভ এবং পৃথিবীতে আগমন খোদায়ী খেলাফতের সম্মানসূচক। পরবর্তী আয়াতসমূহে উক্ত পদ–সংশ্লিষ্ট সেসব দায়িত্ব ও কর্তব্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা আল্লাহ্ পাকের একজন খলীফা হিসাবে তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল। এজন্য পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমি তাদের সবাইকে নীচে নেমে যেতে নির্দেশ দিলাম। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন পথ–নির্দেশ বা হেদায়েত (অর্থাৎ, ওহীর মাধ্যমে শরীয়তী বিধান) আসে, তখন যেসব লোক আমার সে হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের না থাকবে কোন ভয়, না তারা সন্তপ্ত হবে। (অর্থাৎ, কোন অতীত বস্তু হারাবার গ্লানিও থাকবে না এবং ভবিষ্যতে কোন কষ্টেরও আশঙ্কা থাকবে না।)

تلقى শব্দের অর্থ আগ্রহ ও উৎসাহসহ কাউকে সংবর্ধনা জানানো এবং তাকে গ্রহণ করা। এর মর্ম এই যে, আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে যখন তাদেরকে তওবার বাক্যগুলো শিখিয়ে দেয়া হলো, তখন হযরত আদম (আঃ) যথোচিত মর্যাদা ও গুরুত্বসহ তা গ্রহণ করলেন।

كلمات তথা যে সব বাক্য হযরত আদমকে তওবার উদ্দেশে বলে দেয়া হয়েছিল, তা কি ছিল? এ সম্পর্কে মুফাস্সির সাহাবাগণের কয়েক ধরনের রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমতই এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যা কোরআন মজীদের অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

অর্থাৎ, হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমরা আমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যাব।

توبة – تاب (তওবা) এর প্রকৃত অর্থ, ফিরে আসা। যখন তওবার সম্বন্ধ মানুষের সঙ্গে হয়, তখন তার অর্থ হবে তিনটি বস্তুর সমষ্টি ঃ

১। কৃত পাপকে পাপ মনে করে সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। ২। পাপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা। ৩। ভবিষ্যতে আবার এরূপ না করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করা।

এ তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির অভাব থাকলে তওবা হবে না। সুতরাং মৌখিকভাবে 'আল্লাহ্ তওবা' বা অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করা নাজাত লাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। فَتَابَ عَلَيْهِ এর মধ্যে তওবার সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র সাথে। এর অর্থ তওবা গ্রহণ করা।

প্রথম যুগের কোন কোন মনীষীর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কারো দ্বারা পাপ সংঘটিত হলে সে কি করবে? উত্তরে বলা হয়েছিল যে, তাই করবে যা আদি পিতা–মাতা হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আঃ)নিবেদন করেছিলেন – رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي (হে আমার পরওয়ারদেগার, আমি আমার নফসের উপর অত্যাচার করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন) হযরত ইউনুস (আঃ) পদস্খলনের পর নিবেদন করেন لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তুমি অতি পবিত্র। আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি।

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)–এর দ্বারা যে ইজতেহাদগত বিচ্যুতি বা ত্রুটি সাধিত হয়েছিল, প্রথমতঃ কোরআন করীম তার সম্বন্ধ উভয়ের সাথে করেছে। বলা হয়েছে, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا (অতঃপর শয়তান উভয়কে পদস্খলিত করে দেয়)।

পৃথিবীতে অবতরণের হুকুমও হযরত হাওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে, اِهْبِطُوْا (তোমরা নেমে যাও)। কিন্তু পরে তওবা ও তা কবুলের ক্ষেত্রে একবচন ব্যবহার করে শুধু হযরত আদম (আঃ)– এর উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত হাওয়ার উল্লেখ নেই। এছাড়া অন্যত্রও এ পদস্খলন প্রসঙ্গে শুধু হযরত আদম (আঃ)–এর উল্লেখ করা হয়েছে ঃ عَصٰىٓ اٰدَمُ অর্থাৎ, আদম (আঃ) স্বীয় পালনকর্তার হুকুম লঙ্ঘন করলেন।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ
هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾
يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا
بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾ وَاٰمِنُوْا بِمَآ
اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۪ وَلَا تَشْتَرُوْا
بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ
وَالصَّلٰوةِ ۚ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ
اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾
وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ
مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾

(৩৮) আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে। (৩৯) আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অনন্তকাল সেখানে থাকবে। (৪০) হে বনী – ইসরাঈলগণ, তোমরা স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহ যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি এবং তোমরা পূরণ কর আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা, তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। আর ভয় কর আমাকেই। (৪১) আর তোমরা সে গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্যবক্তা হিসেবে তোমাদের কাছে। বস্তুতঃ তোমরা তার প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না আর আমার আয়াতের অল্প মূল্য দিও না। এবং আমার (আযাব) থেকে বাঁচ। (৪২) তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বে সত্যকে তোমরা গোপন করো না। (৪৩) আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়। (৪৪) তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? (৪৫) ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব (৪৬) যারা একথা খেয়াল করে যে, তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় পরওয়ারদেগারের এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। (৪৭) হে বনী–ইসরাঈলগণ! তোমরা স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা, যা আমি তোমাদের উপর করেছি এবং (স্মরণ কর) সে বিষয়টি যে, আমি তোমাদেরকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি সমগ্র বিশ্বের উপর। (৪৮) আর সে দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না; কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যও পাবে না।

এর কারণ হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা নারী জাতির প্রতি বিশেষ রেয়াত প্রদর্শন করে হযরত হাওয়ার বিষয়টি গোপন রেখেছেন এবং পাপ ও ভর্ৎসনার ক্ষেত্রে সরাসরি তাঁর উল্লেখ করেননি। এক জায়গায় উভয়ের তওবারও বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا (হে আমাদের প্রভু, আমরা আমাদের নফসের উপর জুলুম করেছি)। এ ব্যাপারে কারো সংশয় থাকা উচিত নয় যে, হযরত হাওয়ার অপরাধও ক্ষমা হয়েছে। এছাড়া স্ত্রী যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের অধীন সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে তাঁর (হাওয়ার) উল্লেখের প্রয়োজনবোধ করা হয়নি। — (কুরতুবী)

তওবা গ্রহণের অধিকার আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নেই ঃ

এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তওবা গ্রহণের অধিকারী আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কেউ নয়। খ্রীষ্টান ও ইহুদিগণ এক্ষেত্রে মারাত্মক ভুলে পড়ে আছে। তারা পাদ্রী–পুরোহিতদের কাছে কিছু হাদিয়া উপঢৌকনের বিনিময়ে পাপ মোচন করিয়ে নেয় এবং মনে করে যে, তারা মাফ করে দিলেই আল্লাহ্‌র নিকটেও মাফ হয়ে যায়। বর্তমানে বহু মুসলমানও এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে। অথচ কোন পীর বা আলেম কারো পাপ মোচন করিয়ে দিতে পারেন না; তাঁরা বড়জোর দোয়া করতে পারেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আদম (আঃ)-এর পৃথিবীতে অবতরণ শাস্তিস্বরূপ নয় ঃ قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا (তোমরা জান্নাত থেকে নেমে যাও)– এর পূর্ববর্তী আয়াতেও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ ছিল। এখানে পুনরায় এর উল্লেখ করার মাঝে সম্ভবতঃ এ উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে যে, প্রথম আয়াতে পৃথিবীতে অবতরণের হুকুম ছিল শাস্তিমূলক। সেইজন্যই তার সাথে সাথে মানবের পারস্পরিক শত্রুতারও বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশে বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। আর তা হলো বিশ্বে খোদায়ী খেলাফতের পূর্ণতাসাধন। এজন্য এর সাথে হেদায়েত প্রেরণের উল্লেখও রয়েছে, যা খোদায়ী খেলাফতের সম্বন্ধীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এতে বুঝা গেল যে, পৃথিবীতে অবতরণের প্রথম নির্দেশটি যদিও শাস্তিমূলক ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হলো, তখন অন্যান্য মঙ্গল ও হেকমতসমূহের বিবেচনায় পৃথিবীতে প্রেরণের হুকুমের রূপ পরিবর্তন করে মূল হুকুম বহাল রাখা হলো এবং তাদের অবতরণ হলো বিশ্বের শাসক খলীফা হিসেবে।

শোক–সন্তাপ থেকে শুধু তারাই মুক্তি পেতে পারে যারা আল্লাহর বাধ্য ও অনুগত ঃ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (যারা আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে; তাদের আশঙ্কা নেই এবং কোন চিন্তাও করতে হবে না)। এ আয়াতে আসমানী হেদায়েতের অনুসারিগণের জন্য দু'ধরনের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমতঃ তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং দ্বিতীয়তঃ তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

خوف আগত দুঃখ–কষ্টজনিত আশঙ্কার নাম। আর حزن বলা হয়, কোন উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে সৃষ্ট গ্লানি ও দুশ্চিন্তাকে। লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এ দু'টি শব্দে যাবতীয় সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করে দেয়া হয়েছে যে, স্বাচ্ছন্দ্যের একবিন্দুও এর বাইরে নেই।

অতঃপর এ দু'টি শব্দের মধ্যে তত্ত্বগত ব্যবধানও রয়েছে। এখানে فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ এর ন্যায় لاحزن عليهم – না বলে ক্রিয়াবাচক শব্দ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ এর ব্যবহারের মধ্যে এ ইংগিতই রয়েছে যে, কোন উদ্দেশ্য সফল না হওয়া জনিত গ্লানি ও দুশ্চিন্তা থেকে শুধু তাঁরাই মুক্ত থাকতে পারেন, যাঁরা আল্লাহ্র ওলীর স্তরে পৌঁছতে পেরেছেন। যাঁরা আল্লাহ্ প্রদত্ত হেদায়েতসমূহের পূর্ণ অনুসরণকারী, তাঁরা ব্যতীত অন্য কোন মানুষ এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। তা' সে সারা বিশ্বের রাজাধিরাজই হোক, বা সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তিই হোক। কেননা, এদের মধ্যে কেউই এমন নয়, যার স্বভাব এ ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোন অবস্থার সম্মুখীন হবে না এবং সেজন্য দুশ্চিন্তায় লিপ্ত হবে না। অপরপক্ষে আল্লাহ্র ওলিগণ নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্খাকে আল্লাহ্র ইচ্ছার মাঝে বিলীন করে দেন। এজন্য কোন ব্যাপারে তাঁরা সফলকাম না হলে মোটেও বিচলিত হন না। কোরআন মজীদের অন্যত্র একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিশিষ্ট জান্নাতবাসিগণের অবস্থা হবে এই যে, তাঁরা জান্নাতে পৌঁছার পর আল্লাহ্র সেসব নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করবেন, যার দ্বারা তিনি তাঁদের সন্তাপ ও দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন।

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ সূরা বাক্বারাহ্ কোরআন সংক্রান্ত আলোচনা দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে এবং তাতে বলে দেয়া হয়েছে যে, কোরআনের হেদায়েত যদিও গোটা সৃষ্টজগতের জন্য ব্যাপক, কিন্তু এর দ্বারা শুধু মুমিনগণই উপকৃত হবে। এর পরে যারা এর প্রতি ঈমান আনেনি, তাদের জন্য নির্ধারিত কঠিন শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে এক শ্রেণী ছিল সরাসরি কাফের ও অবিশ্বাসীদের। অপর একটা শ্রেণী ছিল মুনাফিক ও কপটদের।

জ্ঞাতব্য ঃ সূরা বাক্বারাহ্ যেহেতু মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, সুতরাং এতে মুশরিক ও মুনাফিকদের বিবরণের পর যে কোন আসমানী গ্রন্থে বিশ্বাসী আহলে-কিতাবদেরকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সূরার চল্লিশতম আয়াত থেকে আরম্ভ করে একশত তেইশতম আয়াত পর্যন্ত শুধু এদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সেখানে তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রথমে তাদের বংশগত কৌলিন্য, বিশ্বের বুকে তাদের যশ-খ্যাতি, মান-মর্যাদা এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের অগণিত অনুকম্পাধারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের পদচ্যুতি ও দুষ্কৃতির জন্য সাবধান করে দেয়া হয়েছে এবং সঠিক পথের দিকে আহবান করা হয়েছে। প্রথম সাত আয়াতে এসব বিষয়েরই আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে প্রথম তিন আয়াতে ঈমানের দাওয়াত এবং চার আয়াতে সৎকাজের শিক্ষা ও প্রেরণা রয়েছে। তৎপর অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। বিস্তারিত সম্বোধনের সূচনা ও সমাপ্তিপর্বে গুরুত্ব সৃষ্টির উদ্দেশে যে يَٰبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ (হে ইসরাঈলের বংশধর) শব্দসমষ্টি দ্বারা সংক্ষিপ্ত সম্বোধনের সূচনা হয়েছিল, সেগুলোই পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

يَٰبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ এখানে ইসরাঈল (إِسْرَٰٓءِيلَ) হিব্রু ভাষার শব্দ। এর অর্থ 'আবদুল্লাহ' (আল্লাহ্র দাস)। ইয়া'কূব (আঃ)-এর অপর নাম। ওলামায়ে কেরামের মতানুসারে হুযূরে পাক (সাঃ) ব্যতীত অন্য কোন নবির একাধিক নাম নেই। কেবল – হযরত ইয়াকুব (আঃ)– এর দু'টি নাম রয়েছে— ইয়া'কূব ও ইসরাঈল। কোরআন পাক এক্ষেত্রে তাদেরকে বনী-ইয়াকুব (بنى يعقوب) বলে সম্বোধন না করে বনী-ইসরাঈল নাম ব্যবহার করেছে। এর তাৎপর্য এই যে, স্বয়ং নিজেদের নাম ও উপাধি থেকেই যেন তারা বুঝতে পারে যে, তারা 'আবদুল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহ্র আরাধনাকারী দাসের বংশধর এবং তাদের তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে হবে। এ আয়াতে বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে ঃ

'এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূরণ কর।' অর্থাৎ, তোমরা আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলে, তা পূরণ কর। হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ)-এর মতে তওরাতে বর্ণিত সে অঙ্গীকারের কথাই কোরআনের এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক বনী-ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মাঝে থেকে ১২ জনকে দলপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলাম – (সূরা মায়েদাহ্ ৩ রুকূ)। সমস্ত রসূলের উপর ঈমান আনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাঁদের মধ্যে আমাদের হুযূরে পাক (সাঃ)-ও বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এছাড়া, নামায, যাকাত এবং অন্যান্য সদ্কা-খয়রাতও এ অঙ্গীকারভুক্ত। যার মূল মর্ম হল রসূলে করীম (সাঃ)-এর উপর ঈমান ও তার পুরোপুরি অনুসরণ। এ জন্যই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, অঙ্গীকারের মূল অর্থ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ।

'আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করব।' অর্থাৎ, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ এ ওয়াদা করেছেন যে, যারা এ অঙ্গীকার পালন করবে, আল্লাহ্ পাক তাদের যাবতীয় পাপ মোচন করে দেবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদেরকে জান্নাতের সুখ-সম্পদের দ্বারা গৌরবান্বিত করা হবে।

মূল ব্যক্তব্য এই যে, হে বনী- ইসরাঈল, তোমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসরণ করার ব্যাপারে আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছ, তা পূরণ কর, তবে আমিও তোমাদের সাথে কৃত ক্ষমা ও জান্নাত বিষয়ক অঙ্গীকার পূরণ করবো। আর শুধু আমাকেই ভয় কর। একথা ভেবে সাধারণ ভক্তদেরকে ভয় করো না যে, সত্য কথা বললে তারা আর বিশ্বাসী থাকবে না, ফলে আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে।

মুহাম্মদ (সাঃ)- এর উম্মতের বিশেষ মর্যাদা ঃ তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক বনী-ইসরাঈলকে প্রদত্ত সুখ-সম্পদ ও অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ কিরিয়ে দিয়ে তাঁর যিক্র ও অনুসরণের আহবান করেছেন এবং উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে তাঁর দয়া ও করুণার উদ্ধৃতি না দিয়েই একই কাজের উদ্দেশে আহবান করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ (তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব।) এখানে উম্মতে-মুহাম্মদীর এক বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, দাতা ও করুণাময়ের সাথে তাদের সম্পর্ক মাধ্যমহীন— একেবারে সরাসরি। এরা দাতাকে চেনে।

অঙ্গীকার পালন করা ওয়াজিব এবং তা লঙ্ঘন করা হারাম ঃ এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, অঙ্গীকার ও চুক্তির শর্তাবলী পালন করা অবশ্য কর্তব্য আর তা লঙ্ঘন করা হারাম। সূরা মায়েদা'-তে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (তোমরা কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি পালন কর)।

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদিগকে নির্ধারিত শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে এই শাস্তি দেয়া হবে যে, হাশরের

ময়দানে যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবজাতি সমবেত হবে, তখন অঙ্গীকার লঙ্ঘনকারীদের মাথার উপর নিদর্শনস্বরূপ একটি পতাকা উত্তোলন করে দেয়া হবে এবং যত বড় অঙ্গীকার করবে, পতাকাও তত উঁচু ও বড় হবে এভাবে তাদেরকে হাশরের ময়দানে লজ্জিত ও অপমানিত করা হবে।

পাপ বা পুণ্যের প্রবর্তকের আমলনামায় তার সম্পাদনকারীর সমান পাপ-পূণ্য লেখা হয় ঃ أَوَّلَ كَافِرٍ – যে কোন পর্যায়ে কাফের হওয়া চরম অপরাধ ও জুলুম। কিন্তু এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রথম কাফেরে পরিণত হয়ো না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি প্রথম কুফরী গ্রহণ করবে, তার অনুসরণে পরবর্তীকালে যত লোক এ পাপে লিপ্ত হবে, তাদের সবার কুফরী ও অবিশ্বাসজনিত পাপের বোঝার সমতুল্য বোঝা তাকে একাই বহন করতে হবে। কারণ, সে-ই কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য এ অবিশ্বাস-প্রসূত পাপের মূল কারণ ও উৎস। সুতরাং তার শাস্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

এতে বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারও পাপের কারণে পরিণত হয়, তবে কেয়ামত পর্যন্ত যত লোক তার কারণে এ পাপে জড়িত হবে, তাদের সবার সমতুল্য পাপ তার একারই হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অন্য কারও পূণ্যের কারণ হয়, তাকে অনুসরণ করে কেয়ামত পর্যন্ত যত লোক সৎকাজ সাধন করে যে পরিমাণ পূণ্য লাভ করবে, তাদের সবার সমতুল্য পূণ্য সে ব্যক্তির আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দেয়া হবে। এ মর্মে কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াত এবং রসূল (সাঃ)-এর অগণিত হাদীস রয়েছে।

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا (এবং তোমরা আমার আয়াতসমূহ কোন নগণ্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করো না।) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার আয়াতসমূহের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো মানুষের মর্জি ও স্বার্থের তাগিদে আয়াতসমূহের মর্ম বিকৃত বা ভুলভাবে প্রকাশ করে কিংবা তা গোপন রেখে টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা। এ কাজটি উম্মতের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

কোরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয ঃ এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, আল্লাহ্ তাআলার আয়াতসমূহ ঠিক ঠিকভাবে শিক্ষা দিয়ে বা ব্যক্ত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সঙ্গত কিনা?এই প্রশ্নটির সম্পর্ক উল্লেখিত আয়াতের সঙ্গে নয়। স্বয়ং এ মাসআলাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও পর্যালোচনা সাপেক্ষ। কোরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কি না, এ সম্পের্কে ফেকাহ্শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা (রা ঃ) প্রমুখ কয়েকজন ইমাম তা নিষেধ করেছেন। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) কোরআনকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে পরিণত করতে বারণ করেছেন।

অবশ্য পরবর্তী হানাফী ইমামগণ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, পূর্বে কোরআনের শিক্ষকমণ্ডলীর জীবনযাপনের ব্যয়ভার ইসলামী বায়তুলমাল (ইসলামী ধনভাণ্ডার) বহন করত, কিন্তু বর্তমানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শিক্ষকমণ্ডলী কিছুই লাভ করেন না। ফলে যদি তাঁরা জীবিকার অন্বেষণে চাকরী-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে ছেলেমেয়েদের কোরআন শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য কোরআন শিক্ষার বিনিময়ে প্রয়োজনানুপাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমামতি, আযান, হাদীস ও ফেকাহ্ শিক্ষাদান প্রভৃতি যে সব কাজের উপর দ্বীন ও শরীয়তের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে সেগুলোকেও কোরআন শিক্ষাদানের সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজনমত এগুলোর বিনিময়েও বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।— (দুররে-মুখতার, শামী)

ঈসালে সওয়াব উপলক্ষে খতমে-কোরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না জায়েয ঃ আল্লামা শামী 'দুররেমুখতারের শরাহ' এবং 'শিফাউল-আলীল' নামক গ্রন্থে বিস্তারিত-ভাবে এবং অকাট্য দলীলাদিসহ একথা প্রমাণ করেছেন যে, কোরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তীকালের ফকীহগণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরীয়তের বিধান ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসবে। সুতরাং এ অনুমতি এ সব বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক। এ জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদের ঈসালে-সওয়াবের উদ্দেশে কোরআন খতম করানো বা অন্য কোন দোয়া-কালাম ও অযিফা পড়ানো হারাম। কারণ, এর উপর কোন ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। এখন যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন পড়া হারাম, সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে, তারা উভয়ই গোনাহ্গার হবে। বস্তুতঃ যে পড়েছে সে-ই যখন কোন সওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌঁছাবে? কবরের পাশে কোরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন খতম করানোর রীতি সাহাবী, তাবেয়ীন এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বেদ'আত।

সত্য গোপন করা এবং তাতে সংযোজন ও সংমিশ্রণ হারাম ঃ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ (সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত করো না।) এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শ্রোতা ও সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। অনুরূপভাবে কোন ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে সত্য গোপন করাও হারাম।

জ্ঞাতব্য ঃ ধৈর্য ধারণ করার জন্য কেবল অপ্রয়োজনীয় কামনা-বাসনাগুলোই পরিহার করতে হয়। কিন্তু নামাযের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কাজও সম্পন্ন করতে হয় এবং বহু বৈধ কামনাও সাময়িক ভাবে বর্জন করতে হয়। যেমন— পানাহার, কথাবার্তা, চলাফেরা এবং অন্যান্য মানবীয় প্রয়োজনাদি, যেগুলো শরীয়তানুসারে বৈধ ও অনুমোদিত, সেগুলোও নামাযের সময় বর্জন করতে হয়। তাও নির্ধারিত সময়ে দিন রাতে পাঁচবার করতে হয়। এজন্য কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট কার্যাবলী সম্পন্ন করা এবং নির্ধারিত সময়ে যাবতীয় বৈধ ও অবৈধ বস্তু থেকে দৈর্য ধারণ করার নাম নামায।

মানুষ অপ্রয়োজনীয় কামনাসমূহ বর্জন করতে সংকল্পবদ্ধ হলে কিছু দিন পর তার স্বাভাবিক চাহিদাও লোপ পেয়ে যায়, কোন প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা থাকে না। কিন্তু নামাযের সময়সূচীর অনুসরণ এবং তৎসম্পর্কিত যাবতীয় শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন এবং এসব সময়ে প্রয়োজনীয় আশা-আকাংখা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি মানব স্বভাবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ও আয়াসসাধ্য। এজন্য এখানে সন্দেহের উদ্ভব হতে পারে যে, ঈমানকে সহজলব্ধ করার জন্য ধৈর্য ও নামাযরূপ ব্যবস্থাপত্রের যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তার অনুশীলনও কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে নামায

সম্পর্কিত শর্তাবলী ও নিয়মাবলী পালন ও অনুসরণ করা নামায সংক্রান্ত এসব জটিলতার প্রতিবিধান প্রসংগে এরশাদ হয়েছে, নিঃসন্দেহে নামায কঠিন ও আয়াসসাধ্য কাজ। কিন্তু যাদের অন্তঃকরণে বিনয় বিদ্যমান, তাদের পক্ষে এটা মোটেও কঠিন কাজ নয়। এতে নামাযকে সহজসাধ্য করার ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে।

নামায কঠিন বোধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মানবমন কল্পনারাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। আর মানুষের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মনেরই অনুসরণ করে। কাজেই যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনেরই অনুসরণে মুক্তভাবে বিচরণ করতে প্রয়াসী। নামায এরূপ স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। না বলা, না হাসা, না খাওয়া, না চলা প্রভৃতি নানাবিধ বাধ্যবাধকতার ফলে মন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং মনের অনুগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এথেকে কষ্ট বোধ করতে থাকে।

সারকথাঃ নামাযের মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তি বোধের একমাত্র কারণ হচ্ছে মনের বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার অবাধ বিচরণ। এর প্রতিবিধান মনের স্থিরতার দ্বারাই হতে পারে। خشوع বা বিনয়ের অর্থ মূলতঃ سكون قلب বা মনের স্থিরতা। কাজেই বিনয়কে নামায সহজসাধ্য হওয়ার কারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠে যে, মনের স্থিরতা অর্থাৎ বিনয় কিভাবে লাভ করা যায়? একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যদি কোন ব্যক্তি তার অন্তরের বিচিত্র চিন্তাধারা ও নানাবিধ কল্পনাকে তার মন থেকে সরাসরি দূরীভূত করতে চায়, তবে এতে সফলতা লাভ করা প্রায় অসম্ভব। বরং এর প্রতিবিধান এই যে, মানবমন যেহেতু একই সময়ে বিভিন্ন দিকে ধাবিত হতে পারে না, সুতরাং যদি তাকে একটি মাত্র চিন্তায় মগ্ন ও নিয়োজিত করে দেয়া যায়, তবে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা আপনা থেকেই বেরিয়ে যাবে। এজন্য خشوع বা বিনয়ের বর্ণনার পর এমন এক চিন্তার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে নিমগ্ন থাকলে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা প্রদমিত ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এগুলো দমে যাওয়ার ফলে হৃদয়ের অস্থিরতা দূর হয়ে স্থিরতা জন্মাবে। স্থিরতার দরুন নামায আনায়াসলব্ধ হবে এবং নামাযের উপর স্থায়িত্ব লাভ হবে। আর নামাযের নিয়মানুবর্তিতার দরুন গর্ব-অহঙ্কার ও যশ-খ্যাতির মোহও হ্রাস পাবে। তাছাড়া ঈমানের পথে যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে তা দূরীভূত হয়ে পূর্ণ ঈমান লাভ সম্ভব হবে।

اقيموا الصلوة - صلوة - এর শাব্দিক অর্থ প্রার্থনা বা দোয়া। শরীয়তের পরিভাষায় সে বিশেষ এবাদত, যাকে নামায বলা হয়। কোরআন করীমে যতবার নামাযের তাকীদ দেয়া হয়েছে— সাধারণতঃ اقامت শব্দের মাধ্যমেই দেয়া হয়েছে। নামায পড়ার কথা শুধু দু'এক জায়গায় বলা হয়েছে। এজন্য اقامت صلوة (নামায প্রতিষ্ঠা)-এর মর্ম অনুধাবন করা উচিত। اقامت - এর শাব্দিক অর্থ সোজা করা, স্থায়ী রাখা। সাধারণতঃ যেসব খুঁটি দেয়াল বা গাছ প্রভৃতির আশ্রয়ে সোজাভাবে দাঁড়ানো থাকে, সেগুলো স্থায়ী থাকে এবং পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। এজন্য اقامت স্থায়ী ও স্থিতিশীলকরণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

কোরআন ও সুন্নাহ্র পরিভাষায় اقامت صلوة অর্থ, নির্ধারিত সময় অনুসারে যাবতীয় শর্তাদি ও নিয়মাবলী রক্ষা করে নামায আদায় করা। শুধু নামায পড়াকে اقامت صلوة বলা হয় না। নামাযের যত গুণাবলী, ফলাফল, লাভ ও বরকতের কথা কোরআন-হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই اقامت صلوة (নামায প্রতিষ্ঠা) - এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, কোরআন করীমে আছে - إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ (নিশ্চয়ই নামায মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে)।

নামাযের এ ফল ও ক্রিয়ার তখনই প্রকাশ ঘটবে, যখন নামায উপরে বর্ণিত অর্থে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এজন্য অনেক নামাযীকে অশ্লীল ও ন্যক্কারজনক কাজে জড়িত দেখে এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক হবে না। কেননা, তারা নামায পড়েছে বটে কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেনি।

وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ আভিধানিকভাবে যাকাতের অর্থ দু'রকম - পবিত্র করা ও বর্ধিত হওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় সম্পদের সে অংশকে যাকাত বলা হয়, যা শরীয়তের নির্দেশানুসারে সম্পদ থেকে বের করা হয় এবং শরীয়ত মোতাবেক খরচ করা হয়।

যদিও এখানে সমসাময়িক বনী-ইস্রাঈলদিগকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, নামায ও যাকাত ইসলাম পূর্ববর্তী বনী-ইস্রাঈলদের উপরই ফরয ছিল। কিন্তু সূরা মায়েদায় বর্ণিত ঃ "নিশ্চই আল্লাহ্ পাক বনী-ইস্রাঈল থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন দলপতি মনোনীত করে প্রেরণ করলাম । আর আল্লাহ্ পাক বললেন, যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর, তবে নিশ্চয়ই আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে।" এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী-ইস্রাঈলের উপর নামায ও যাকাত ফরয ছিল। অবশ্য তার রূপ ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন।

وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ - ركوع রুকূর শাব্দিক অর্থ ঝুঁকা বা প্রণত হওয়া। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এ শব্দ সেজদার স্থলেও ব্যবহৃত হয়। কেননা, সেটাও ঝুঁকারই সর্বশেষ স্তর। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় ঐ বিশেষ ঝোঁকাকে রুকূ বলা হয়, যা নামাযের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত। আয়াতের অর্থ এই যে, রুকূকারীগণের সাথে রুকূ কর।' এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, নমামাযের সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে রুকূকে বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করা হলো? উত্তর এই যে, এখানে নামাযের একটি অংশ উল্লেখ করে গোটা নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন, কোরআন মজীদের এক জায়গায় وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ (ফজর নামাযের কোরআন পাঠ) বলে সম্পূর্ণ ফজরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের কোন কোন রেওয়ায়েতে 'সেজদা' শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ এক রাক'আত বা গোটা নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর মর্ম এই যে, নামাযিগণের সাথে নামায পড়। কিন্তু এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নামাযের অন্যান্য অংশের মধ্যে বিশেষভাবে রুকূর উল্লেখের তাৎপর্য কি?

উত্তর এই যে, ইহুদীদের নামাযে সেজদাসহ অন্যান্য সব অঙ্গই ছিল, কিন্তু রুকূ ছিল না। রুকূ মুসলমানদের নামাযের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। এজন্য راكعين শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর নামাযিগণকে বুঝানো হবে, যাতে রুকূও অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোমরাও উম্মতে মুহাম্মদীর নামাযিগণের সাথে নামায আদায় কর। অর্থাৎ, প্রথম ঈমান গ্রহণ কর, পরে জামাতের সাথে নামায আদায় কর।

নামাযের জামাত সম্পর্কিত নির্দেশাবলী ঃ নামাযের হুকুম এবং তা ফরয হওয়া তো وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ শব্দের দ্বারাই বুঝা গেল। এখানে مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (রুকূকারীদের সাথে) শব্দের দ্বারা নামায জামাতের সাথে

আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ হুকুমটি কোন ধরনের? এ ব্যাপারে ওলামা ও ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাহাবা (রাঃ), তাবেয়ীন এবং ফুকাহাদের মধ্যে একদল জামাতকে ওয়াজেব বলেছেন এবং তা পরিত্যাগ করাকে কঠিন পাপ বলে অভিহিত করেছেন। কোন কোন সাহাবা (রাঃ) তো শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত জামাতহীন নামায জায়েয নয় বলেও মন্তব্য করেছেন। যারা জমাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা এ আয়াতটি তাঁদের দলীল।

অধিকাংশ ওলামা, ফুকাহা, সাহাবা ও তাবেঈনের মতে জামাত হল সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্। কিন্তু ফজরের সুন্নতের ন্যায় সর্বাধিক তাকীদপূর্ণ সুন্নত। ওয়াজিবের একেবারে নিকটবর্তী।

আমলহীন উপদেশ প্রদানকারীর নিন্দা ঃ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (তোমরা অন্যেকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ নিজেদেরকে ভুলে বস।) এ আয়াতে ইহুদী আলেমদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, তারা তো নিজেদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে মুহাম্মদ (সাঃ)- এর অনুসরণ করতে এবং ইসলামের উপর স্থির থাকতে নির্দেশ দেয়। (এ থেকে বুঝা যায়, ইহুদী আলেমগণ দ্বীন ইসলামকে নিশ্চিতভাবে সত্য বলে মনে করত।) নিজেরা প্রবৃত্তির কামনার দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ করতে কখনো প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু যারাই অপরকে পূণ্য ও মঙ্গলের প্রেরণা দেয়, অথচ নিজের ক্ষেত্রে তা কার্যে পরিণত করে না, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা সবাই ভর্ৎসনা ও নিন্দাবাদের অন্তর্ভূক্ত। এ শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে হাদীসে করুণ পরিণতি ও ভয়ঙ্কর শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর (সাঃ) এরশাদ করেন, মে'রাজের রাতে আমি এমন কিছুসংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের জিহ্বা ও ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিবরাঈল বললেন, এরা আপনার উম্মতের পার্থিব স্বার্থপূজারী উপদেশদানকারী— যারা অপরকে তো সৎকাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজের খবর রাখত না।— (কুরতুবী)

নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, কতিপয় জান্নাতবাসী কতক নরকবাসীকে অগ্নিদগ্ধ হতে দেখে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমরা কিভাবে দোযখে প্রবেশ করলে, অথচ আল্লাহ্র কসম, আমরা তো সেসব সৎকাজের দৌলতেই জান্নাত লাভ করেছি, যা তোমাদেরই কাছে শিখেছিলাম? দোযখবাসীরা বলবে, আমরা মুখে অবশ্য বলতাম কিন্তু নিজে তা কাজে পরিণত করতাম না।

পাপী ওয়ায়েজ উপদেশ প্রদান করতে পারে কিনা ঃ উল্লেখিত বর্ণনা থেকে একথা যেন বোঝা না হয় যে, কোন আমলহীন বিরুদ্ধাচারীর পক্ষে অপরকে উপদেশ দান করা জায়েয নয় এবং কোন ব্যক্তি যদি কোন পাপে লিপ্ত থাকে, তবে সে অপরকে উক্ত পাপ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে পারে না। কারণ, সৎকাজের জন্য ভিন্ন নেকী ও সৎকাজের প্রচার-প্রসারের জন্য পৃথক ও স্বতন্ত্র নেকী। আর এটা সুস্পষ্ট যে, এক নেকী পরিহার করলে অপর নেকীও পরিহার করতে হবে এমন কোন কথা নেই। যেমন, কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে অপরকেও নামায পড়তে বলতে পারবে না, এমন কথা নয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে রোযাও রাখতে পারবে না, এমন কোন কথা নেই। তেমনিভাবে কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়া ভিন্ন পাপ এবং নিজের অধীনস্থ লোকদিগকে ঐ অবৈধ কাজ থেকে বারণ না করা পৃথক পাপ। একটি পাপ করেছে বলে অপর পাপও করতে হবে এমন কোন বাধ্য বাধকতা নেই।

যদি প্রত্যেক মানুষ নিজে পাপী বলে সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বাধাদান করা ছেড়ে দেয় এবং বলে যে, যখন সে নিজে নিষ্পাপ হতে পারবে, তখনই অপরকে উপদেশ দেবে, তাহলে ফল দাঁড়াবে এই যে, কোন তবলীগকারীই অবিশিষ্ট থাকবে না। কেননা, এমন কে আছে, যে পরিপূর্ণ নিষ্পাপ? হযরত হাসান (রাঃ) এরশাদ করেছেন— শয়তান তো তাই চায় যে, মানুষ এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তাবলীগের দায়িত্ব পালন না করে বসে থাক।

মূল কথা এই যে, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (তোমরা কি অপরকে সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে ভুলে বস?) আয়াতের অর্থ এই যে, উপদেশদানকারী (ওয়ায়েজকে) আমলহীন থাকা উচিত নয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ওয়ায়েজ কিংবা ওয়ায়েজ নয় এমন কারো পক্ষেই যখন আমলহীন থাকা জায়েয নয়, তাহলে এখানে বিশেষভাবে ওয়ায়েজের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা কি? উত্তর এই যে, বিষয়টি উভয়ের জন্য নাজায়েয, কিন্তু ওয়ায়েজ বহির্ভূতদের তুলনায় ওয়ায়েজের অপরাধ অধিক মারাত্মক। কেননা, ওয়ায়েজ অপরাধকে অপরাধ মনে করে জেনে-শুনে করছে। তার পক্ষে এ ওযর গ্রহণযোগ্য নয় যে, এটা যে অপরাধ তা আমার জানা ছিল না। অপরপক্ষে ওয়ায়েয বহির্ভূত মূর্খদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এছাড়া ওয়ায়েজ ও আলেম যদি কোন অপরাধ করে, তবে তা হয় ধর্মের সাথে এক প্রকারের পরিহাস। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সাঃ) এরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক অশিক্ষিত লোকদেরকে যত ক্ষমা করবেন, শিক্ষিতদেরকে তত ক্ষমা করবেন না।

দু'টি মানসিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার ঃ সম্পদ-প্রীতির ও যশ-খ্যাতির মোহ এমন ধরনের দু'টি মানসিক ব্যাধি যদ্দরুন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনই নিষ্প্রভ ও অসার হয়ে পড়ে। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মানবেতিহাসে এযাবৎ যতগুলো মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং যত বিশৃংখলা ও অশান্তি বিস্তার লাভ করেছে, সেগুলোর উৎপত্তিই হয়েছিল উল্লেখিত এ দু'টি ব্যাধি থেকে।

সম্পদ প্রাপ্তির পরিণতি ও ফলাফল ঃ

(১) অর্থগৃধ্নুতা ও কৃপণতার অন্যতম জাতীয় ক্ষতির দিক হল এই যে, তার সম্পদ জাতির কোন উপকারে আসে না। দ্বিতীয় ক্ষতিটি তার ব্যক্তিগত। এ প্রকৃতির লোককে সমাজে কখনও সু-নজরে দেখা হয় না।

(২) স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা ঃ তার সম্পদলিপ্সা পূরণার্থ জিনিসে ভেজাল মেশানো, মাপে কম দেয়া, মজুদদারী, মুনাফাখোরী, প্রবঞ্চনা-প্রতারণা প্রভৃতি ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন তার মজ্জাগত হয়ে যায়। স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে সে অপরের রক্ত নিংড়ে নিতে চায়। পরিশেষে পুঁজিপতি ও মজুরদের পারস্পারিক বিবাদের উৎপত্তি হয়।

(৩) এমন লোক যত সম্পদই লাভ করুক, কিন্তু আরো অধিক উপার্জনের চিন্তা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে, অবকাশ ও অবসর বিনোদনের সময়েও তার একই ভাবনা থাকে যে, কিভাবে তার পুঁজি আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে যে সম্পদ তার সুখ-সাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে পরিণত হতে পারত, তা পরিণামে তার জীবনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

(৪) সত্য কথা যত উজ্জ্বল হয়েই সামনে উদ্ভাসিত হোক না কেন,

তার এমন কোন কথা মেনে নেয়ার সৎসাহস থাকে না, যাকে সে তার উদ্দেশ্য সাধন ও সম্পাদলাভের পথে প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। এসব বিষয় পরিশেষে গোটা সমাজের শান্তি ও স্বস্তি বিঘ্নিত করে।

গভীরভাবে চিন্তা করলে যশ-খ্যাতির মোহের অবস্থাও প্রায় একই রকম বলে পরিলক্ষিত হবে। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ অহঙ্কার, স্বার্থান্বেষা, অধিকার হরণ, ক্ষমতা লিপ্সা এবং এর পরিণতিতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও অনুরূপ আরো অগণিত অমানবিক সমাজবিরোধী ও নৈতিকতা বিবর্জিত দাঙ্গা-হাঙ্গামার উৎপত্তি ঘটে, যা পরিণামে গোটা বিশ্বকে নরকে পরিণত করে দেয়। এই উভয় ব্যাধির প্রতিকার কোরআন পাক এ ভাবে উপস্থাপন করেছে— বলা হয়েছে وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর)। অর্থাৎ, ধৈর্য ধারণ করে ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে বশীভূত করে ফেলো। তাতে সম্পদপ্রীতি হ্রাস পাবে। কেননা, সম্পদ বিভিন্ন আস্বাদ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যম বলেই ধন-প্রেমের উদ্ভব হয়। যখন এসব আস্বাদ ও কামনা-বাসনার অন্ধ অনুসরণ পরিহার করতে দৃঢ়-সংকল্প হবে, তখন প্রাথমিক অবস্থায় খানিকটা কষ্ট বোধ হলেও ধীরে ধীরে এসব কামনা যথোচিত ও ন্যায়সঙ্গত পর্যায়ে নেমে আসবে এবং ন্যায় ও মধ্যমপন্থা তোমাদের স্বভাব ও অভ্যাসে পরিণত হবে। তখন আর সম্পদের প্রাচুর্যের কোন আবশ্যকতা থাকবে না। সম্পদের মোহও এতে প্রবল হবে না যে, নিজস্ব লাভ-ক্ষতির বিবেচনা ও নেশা তোমাকে অন্ধ করে দেবে।

আর নামায দ্বারা যশ-খ্যাতির আকর্ষণও দমে যাবে। কেননা, নামাযের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সব ধরনের বিনয় ও নম্রতাই বিদ্যমান। যখন যথা নিয়মে ও যথাযথভাবে নামায আদায় করার অভ্যাস গড়ে উঠবে, তখন সর্বক্ষণ আল্লাহ্ পাকের সামনে নিজের অক্ষমতা ও ক্ষুদ্রতার ধারণা বিরাজ করতে থাকবে। ফলে অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা ও মান-মর্যাদার মোহ হ্রাস পাবে।

বিনয়ের নিগুঢ় তত্ত্ব : إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِينَ (কিন্তু বিনয়ীদের পক্ষে মোটেও কঠিন নয়।) কোরআন ও সুন্নাহ্য় যেখানে خشوع বা বিনয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে এর অর্থ অক্ষমতা ও অপারগতাজনিত সেই মানসিক অবস্থাকেই বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ পাকের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয়। এর ফলে এবাদত-উপাসনা সহজতর হয়ে যায়। কখনও এর লক্ষণাদি দেহেও প্রকাশ পেতে থাকে। তখন সে শিষ্টাচারসম্পন্ন বিনম্র ও কোমলমন বলে পরিদৃষ্ট হয়। যদি হৃদয়ে খোদাভীতি ও নম্রতা না থাকে, মানুষ বাহ্যিকভাবে যতই শিষ্টাচারের অধিকারী ও বিনম্র হোক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বিনয়ের অধিকারী হয় না। বিনয়ের লক্ষণাদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করাও বাঞ্ছনীয় নয়।

হযরত ওমর (রাঃ) একবার এক যুবককে নতশিরে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'মাথা উঠাও, বিনয় হৃদয়ে অবস্থান করে।'

হযরত ইব্রাহীম নখয়ী (রাঃ) বলেন যে, মোটা কাপড় পরা, মোটা খাওয়া এবং মাথা নত করে থাকার নামই বিনয় নয়।

خشوع বা বিনয় অর্থ حق বা অধিকারের ক্ষেত্রে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সবার সংগে একই রকম ব্যবহার করা এবং আল্লাহ্ পাক তোমার উপর যা ফরয করে দিয়েছেন তা পালন করতে গিয়ে হৃদয়কে শুধু তারই জন্য নির্দিষ্ট ও কেন্দ্রিভূত করে নেয়া।

সারকথা— ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বিনয়ীদের রূপ ধারণ করা শয়তান ও প্রবৃত্তির প্রতারণা মাত্র। আর তা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তা ক্ষমার্হ।

জ্ঞাতব্য : خشوع এর সাথে সাথে অপর একটি শব্দ خضوع - ও ব্যবহৃত হয়। কোরআন করীমের বিভিন্ন জায়গায় তা রয়েছে। এ শব্দ দু'টি প্রায় সমার্থক। কিন্তু خشوع শব্দ মূলতঃ কণ্ঠ ও দৃষ্টির নিম্নমুখিতা ও বিনয় প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়— যখন তা কৃত্রিম হবে না বরং অন্তরের ভীতি ও নম্রতার ফলশ্রুতিস্বরূপ হবে। কোরআন করীমে আছে وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ (শব্দ নীচু হয়ে গেল)। এবং خضوع শব্দে দৈহিক ও বাহ্যিক বিনয় ও ক্ষুদ্রতাকে বোঝায়। কোরআন করীমে আছে فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِينَ (অতঃপর তাদের কাঁধ তার সামনে ঝুঁকিয়ে দিল।)

নামাযে বিনয়ের ফেকাহ্গত মর্যাদা : নামাযে خشوع বিনয়ের তাকীদ বার বার এসেছে। এরশাদ হয়েছে. وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي (আমার স্মরণে নামায প্রতিষ্ঠা কর)। এবং একথা স্পষ্ট যে, غفلت অমনোযোগিতা স্মরণের পরিপন্থী। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে غافل (অমনোযোগী) সে আল্লাহ্কে স্মরণ করার দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ নয়। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে, وَلَا تَكُن مِّنَ الْغٰفِلِينَ (এবং অমনোযোগীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না)। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন— নামায বিনয় ও ক্ষুদ্রতা প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। অন্য কথায়, অন্তরে বিনয় ও ক্ষুদ্রতাবোধ না থাকলে তা নামাযই নয়। অপর এক হাদীসে আছে— যার নামায তাকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত না রাখে, সে আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। আর গাফেল বা অমনোযোগীর নামায তাকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। এ থেকে বুঝা গেল, যে লোক অন্যমনস্ক হয়ে নামায পড়ে, সে আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ইমাম গাযালী (রাঃ) উল্লেখিত আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহ এবং অন্যান্য প্রমাণাদির উদ্ধৃতি দিয়ে এরশাদ করেছেন, এগুলোর দ্বারা বুঝা যায় যে, خشوع বা বিনয় নামাযের শর্ত এবং নামাযের বিশুদ্ধতা এরই উপর নির্ভরশীল। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ), সুফিয়ান সওরী ও হাসান বসরী (রাঃ) প্রমুখের অভিমত এই যে, খুশু বা বিনয় ব্যতীত নামায আদায় হয় না, বরং তা ভংগ হয়ে যায়।

কিন্তু ইমাম চতুষ্টয় এবং অধিকাংশ ফকীহ্গণের মতে 'খুশু' নামাযের শর্ত না হলেও তাঁরা একে নামাযের রূহ বা আত্মা বলে মন্তব্য করে এ শর্ত আরোপ করেছেন যে, তকবীরে-তাহরীমার সময় বিনয়সহ মনের একাগ্রতা বজায় রেখে আল্লাহ্র উদ্দেশে নামাযের নিয়ত করতে হবে। পরে যদি খুশু বিদ্যমান না থাকে তবে যদিও সে নামাযের অতটুকু অংশের সওয়াব লাভ করবে না যে অংশে খুশু উপস্থিত ছিল না, তবে ফেকাহ্ অনুযায়ী তাকে নামায পরিত্যাগকারীও বলা চলবে না এবং নামায পরিত্যাগকারীর উপর যে শাস্তি প্রযোজ্য, তার জন্য সে শাস্তিবিধানও করা যাবে না।

খুশুহীন নামাযও সম্পূর্ণ নিরর্থক নয় : সবশেষে 'খুশু'র এ অসাধারণ গুরুত্ব সত্ত্বেও মহান পরওয়ারদেরগারের দরবারে আমাদের এই কামনা যেন অন্যমনস্ক ও গাফেল নামাযীও সম্পূর্ণভাবে নামায পরিত্যাগকারীর পর্যায়ভুক্ত না হয়। কেননা, যে অবস্থায়ই হোক সে অন্ততঃ ফরয আদায়ের পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সামান্য সময়ের জন্য হলেও অন্তরকে যাবতীয় আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্র প্রতি নিয়োজিত করেছে। কমপক্ষে নিয়তের সময় শুধু সে আল্লাহ্ পাকেরই

وَإِذْ نَجَّيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِذْ وَٰعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا۟ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

(৪৯) আর (স্মরণ কর) সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদিগকে মুক্তিদান করেছি ফেরআউনের লোকদের কবল থেকে যারা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করত; তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে জবাই করত এবং তোমাদের স্ত্রীদিগকে অব্যাহতি দিত। বস্তুতঃ তাতে পরীক্ষা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে, মাহা পরীক্ষা। (৫০) আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে অথচ তোমরা দেখছিলে। (৫১) আর যখন আমি মুসার সাথে ওয়াদা করেছি চল্লিশ রাত্রির অতঃপর তোমরা গোবৎস বানিয়ে নিয়েছ মূসার অনুপস্থিতিতে। বস্তুতঃ তোমরা ছিলে যালেম। (৫২) তারপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও। (৫৩) আর (স্মরণ কর) যখন আমি মূসাকে কিতাব এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্য বিধানকারী নির্দেশ দান করেছি, যাতে তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হতে পার। (৫৪) আর যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদেরই ক্ষতিসাধন করেছ এই গোবৎস নির্মাণ করে। কাজেই এখন তওবা কর স্বীয় স্রষ্টার প্রতি এবং নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের স্রষ্টার নিকট। তারপর তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করা হল। নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাকারী, অত্যন্ত মেহেরবান। (৫৫) আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা, কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহ্‌কে (প্রকাশ্য) দেখতে পাব। বস্তুতঃ তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ। অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। (৫৬) তারপর মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি তুলে দাঁড় করিয়েছি, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও। (৫৭) আর আমি তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি 'মান্না' ও সালওয়া'। সেসব পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। বস্তুতঃ তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছে।

ধ্যানে নিমগ্ন ছিল। এধরনের নামাযে অন্ততঃ এতটুকু উপকার অবশ্যই হবে যে, তাদের নাম অবাধ্য ও বেনামযীদের তালিকা-বহির্ভূত থাকবে।

জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য আয়াতে যে দিনের কথা বলা হয়েছে, সেটি হল কেয়ামতের দিন। দাবী আদায় করে দেয়ার অর্থ— যেমন, কেউ নামায-রোযা সংক্রান্ত হিসাবের সম্মুখীন হলে, তখন অপর কেউ যদি বলে যে, আমার নামায-রোযার বিনিময়ে তাকে হিসাবমুক্ত করে দেয়া হোক, তবে তা গৃহীত হবে না। বিনিময় অর্থ, টাকা-পয়সা বা ধন-সম্পদের বিনিময়ে দায়মুক্ত করে দেয়া। এ দু'টির কোনটিই গ্রহণ করা হবে না। ঈমান ব্যতীত সুপারিশ গৃহীত না হওয়ার কথা কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও বোঝা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে এদের পক্ষে কোন সুপারিশই হবে না। ফলে তা গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই উঠবে না।

মোটকথা, দুনিয়াতে সাহায্য করার যত পদ্ধতি আছে ঈমান ব্যতীত সেগুলোর কোনটাই আখেরাতে কার্যকর হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জ্ঞাতব্য ঃ কোন ব্যক্তি ফেরআউনের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ইসরাঈল বংশে এমন এক ছেলের জন্ম হবে, যার হাতে তোমার রাজ্যের পতন ঘটবে। এজন্য ফেরআউন নবজাত পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করলো। আর যেহেতু মেয়েদের দিক থেকে কোন রকম আশঙ্কা ছিল না, সুতরাং তাদের সম্পর্কে নিশ্চুপ রইলো। দ্বিতীয়তঃ এতে তার নিজস্ব একটি মতলবও ছিল যে, সে স্ত্রীলোকদেরকে দিয়ে ধাত্রী-পরিচারিকার কাজও করানো যাবে। সুতরাং এ অনুকম্পাও ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

এই ঘটনার দ্বারা হয় উল্লেখিত হত্যাকাণ্ডকে বুঝানো হয়েছে, কিংবা বিপদে ধৈর্যের পরীক্ষা অথবা অব্যাহতি দানের কথা বুঝানো হয়েছে, যা এক অনুগ্রহ ও নেয়ামত। আর নেয়ামতের ক্ষেত্রেই শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা হয়। পরবর্তী আয়াতে অব্যাহতি দানের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ এঘটনা ঐ সময়ের, যখন ফেরআউন সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী-ইসরাঈলরা কারো কারো মতে মিশরে ফিরে এসেছিল- আবার কারো কারো মতে অন্য কোথাও বসবাস করছিল। তখন মূসা (আঃ)-এর খেদমতে বনী-ইসরাইলরা আরয করলো যে, আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিত। যদি আমাদের জন্য কোন শরীয়ত নির্ধারিত হয়, তবে আমাদের জীবন বিধান হিসাবে আমরা তা গ্রহণ ও বরণ করে নেবো। মূসা (আঃ)-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক অঙ্গীকার প্রদান করলেন যে, তুমি তূর-পর্বতে অবস্থান করে এক মাস পর্যন্ত আমার আরাধনা ও অতন্দ্র সাধনায় নিমগ্ন থাকার পর তোমাকে এক কিতাব দান করবো। মূসা (আঃ) তাই করলেন। ফলে তওরাত লাভ করলেন। কিন্তু অতিরিক্ত দশ দিন উপাসনা-আরাধনায় মগ্ন থাকার নির্দেশ দেয়ার কারণ ছিল এই যে, হযরত মূসা (আঃ) একমাস রোযা রাখার পর ইফতার করে ফেলেছিলেন। আল্লাহ্ তাআলার কাছে রোযাদারের মুখের গন্ধ অত্যন্ত পছন্দনীয় বলে মূসা (আঃ)-কে আরো দশ দিন রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন, যাতে পুনরায় সে গন্ধের উৎপত্তি হয়। এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হলো। মূসা (আঃ) তো ওদিকে তূর-পর্বতে রইলেন, এদিকে সামেরী নামক এক ব্যক্তি সোনা-রূপা দিয়ে গোবৎসের একটি প্রতিমূর্তি তৈরী

করলো এবং তার কাছে পূর্ব থেকে সংরক্ষিত জিবরাঈল (আঃ)-এর ঘোড়ার খুরের তলার কিছু মাটি প্রতিমূর্তির ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়ায় সেটি জীবন্ত হয়ে উঠলো এবং অশিক্ষিত বনী-ইসরাঈলরা তারই পূজা করতে আরম্ভ করে দিল।

এ তওবার বর্ণনা পরবর্তী তৃতীয় আয়াতে রয়েছে। আর 'আশার' অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ পাকের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল, বরং এর অর্থ এই যে, মাফ করে দেয়া এমনই এক জিনিস যার প্রতি লক্ষ্য করে বনী-ইসরাঈল আল্লাহ্ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে বলে দর্শকদের মনে আশার সঞ্চার হতে পারে।

জ্ঞাতব্য ঃ মীমাংসার বস্তু দ্বারা হয়ত তওরাতের অন্তর্ভুক্ত শরীয়তী বিধানমালাকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, শরীয়তের মাধ্যমে যাবতীয় বিশ্বাসগত ও কর্মগত মতবিরোধের মীমাংসা হয়ে যায়। অথবা মু'জেযা বা অলৌকিক ঘটনাবলীকে বোঝানো হয়েছে- যদ্দ্বারা সত্য ও মিথ্যা দাবীর ফয়সালা হয়। অথবা স্বয়ং তওরাতই এর অর্থ। কেননা, এর মধ্যেও মীমাংসাকারীর জন্য প্রয়োজনীয় উভয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ রয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ এটা তাদের তওবার জন্যে প্রস্তাবিত পদ্ধতির বর্ণনা— অর্থাৎ, অপরাধিগণকে হত্যা করে দেয়া। আমাদের শরীয়তেও এমন কোন কোন অপরধের জন্য তওবা করা সত্ত্বেও মৃত্যুদণ্ড বা শারীরিক দণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন, ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হত্যা। সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত যিনার (ব্যভিচার) শাস্তি 'রজম' বা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। তওবার দ্বারা এ শাস্তি থেকে অব্যাহতি নেই। বস্তুতঃ তারা এই নির্দেশ কার্যে পরিণত করেছিল বলে পরকালে দয়া ও করুণার অধিকারী হয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ ঘটনা এই — যখন হযরত মূসা (আঃ) তূর-পর্বত থেকে তওরাত নিয়ে এসে বনী-ইসরাঈলের সামনে পেশ করে বললেন যে, এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত কিতাব, তখন কিছুসংখ্যক উদ্ধত লোক বললো, যদি আল্লাহ্ স্বয়ং বলে দেন যে, এ কিতাব তাঁর প্রদত্ত, তবে অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস এসে যাবে। মূসা (আঃ) আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে এতদুদ্দেশে তাদেরকে তূর-পর্বতে যেতে বললেন। বনী-ইসরাঈলরা সত্তর জন লোককে মনোনীত করে হযরত মূসা (আঃ)-এর সংগে তূর-পর্বতে পাঠাল। সেখানে পৌঁছে তারা আল্লাহ্র বাণী স্বয়ং শুনতে পেল। তখন তারা নতুন ভান করে বললো, শুধু কথা শুনে তো আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না— আল্লাহ্ই জানেন এ কথা কে বলছে। যদি আল্লাহ্কে দেখতে পাই, তবে অবশ্যই মেনে নেবো। কিন্তু যেহেতু এ মরজগতে আল্লাহ্কে দেখার ক্ষমতা কারো নেই, কাজেই এ ধৃষ্টতার জন্য তাদের উপর বজ্রপাত হলো এবং সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের এ ধ্বংস-প্রাপ্তির বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ 'মউত' শব্দ দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায় যে, তারা বজ্রপাতের ফলে মৃত্যুবরণ করেছিল। তাদের পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনা এরূপ — মূসা (আঃ) আল্লাহ্র দরবারে নিবেদন করলেন, বনী-ইসরাঈল এমনিতেই আমার প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে থাকে। এখন তারা ভাববে যে, এ লোকগুলোকে কোথাও নিয়ে গিয়ে কোন উপায়ে আমিই স্বয়ং ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং আমাকে মেহেরবানীপূর্বক এ অপবাদ থেকে রক্ষা করুন। তাই আল্লাহ্ পাক দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনর্জীবিত করে দিলেন।

জ্ঞাতব্য ঃ উভয় ঘটনাই ঘটেছিল তীহ্ প্রান্তরে। তার বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, বনী-ইসরাঈলের আদি বাসস্থান ছিল শাম দেশে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সময়ে তারা মিশরে এসে বসবাস করতে থাকে। আর 'আমালেকা' নামক এক জাতি শাম দেশ দখল করে নেয়। ফেরআউনের ডুবে মরার পর যখন এরা শান্তিতে বসবাস করতে থাকে, তখন আল্লাহ্ পাক আমালেকাদের সাথে জেহাদ করে তাদের আদি বাসস্থান পুনর্দখল করতে নির্দেশ দিলেন। বনী-ইসরাঈল এতদুদ্দেশে মিশর থেকে রওয়ানা হল। শামের সীমান্তে পৌঁছার পর আমালেকাদের শৌর্য-বীর্যের কথা জেনে তারা সাহস হারিয়ে হীনবল হয়ে পড়লো এবং জেহাদ করতে পরিস্কার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এ শাস্তি প্রদান করলেন, যাতে তারা একই প্রান্তরে চল্লিশ বছর হতবুদ্ধি হয়ে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্যভাবে বিচরণ করতে থাকে। ঘরে ফেরা আর তাদের ভাগ্যে জোটেনি।

এ প্রান্তর কোন বিশাল ভূ-খণ্ড ছিল না। 'তীহ্' প্রান্তর মিশর ও শাম দেশের মধ্যবর্তী দশ মাইল এলাকা বিশিষ্ট একটি ভূ-ভাগ। বর্ণিত আছে, এরা নিজেদের বাসস্থান মিশরে পৌঁছার জন্য সারাদিন চলার পর রাতে কোন মঞ্জিলে অবস্থান করত, কিন্তু ভোরে ওঠে দেখতে পেত— যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেখানেই রয়ে গেছে। এভাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এ প্রান্তরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শ্রান্ত ও ক্লান্তভাবে বিচরণ করছিল।

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ
خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا
غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا
مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ
عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ
اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ
لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا
تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَ
بَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ
خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

(৫৮) আর যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে এবং এতে যেখানে খুশী খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে থাক এবং দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার সময় সেজদা করে ঢুক, আর বলতে থাক— 'আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও' — তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মশীলদেরকে অতিরিক্ত দানও করব। (৫৯) অতঃপর যালেমরা কথা পাল্টে দিয়েছে যা কিছু তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল তা থেকে। তারপর আমি অবতীর্ণ করেছি যালেমদের উপর আযাব আসমান থেকে নির্দেশ লংঘন করার কারণে। (৬০) আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে। অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবণ। তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক খাও, পান কর আর দুনিয়ার বুকে দাংগা-হাংগামা করে বেড়িও না। (৬১) আর তোমরা যখন বললে, হে মূসা, আমরা একই ধরনের খাদ্য-দ্রব্যে কখনও ধৈর্যধারণ করব না। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্যে এমন বস্তুসামগ্রী দান করেন, যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তরকারী, কাকড়ী, গম, মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি। মূসা (আঃ) বললেন, তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও যা নিকৃষ্ট সে বস্তুর পরিবর্তে যা উত্তম? তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই পাবে যা তোমরা কামনা করছ। আর তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহ্‌র রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। এমন হলো এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মানতো না এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান সীমালংঘনকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

জ্ঞাতব্য ঃ শাহ্ আবদুল কাদের (রহঃ)– এর বক্তব্যানুসারে এ ঘটনা তীহ্ উপত্যকায় বসবাসকালে সংঘটিত হয়েছিল। যখন বনী-ইসরাঈলের একটানা 'মান্না ও সালওয়া' খেতে খেতে বিস্বাদ এসে গেল এবং স্বাভাবিক খাবারের জন্য প্রার্থনা করল (যেমন, পরবর্তী চতুর্থ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে), তখন তাদেরকে এমন এক নগরীতে প্রবেশ করতে হুকুম দেয়া হল, যেখানে পানাহারের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পাওয়া যাবে। সুতরাং এ হুকুমটি সে নগরীতে প্রবেশ করা সম্পর্কিত। এখানে নগরীতে প্রবেশকালে কর্মজনিত ও বাক্যজনিত দু'টি আদবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ('তওবা তওবা' বলে প্রবেশ করার মধ্যে বাক্যজনিত এবং প্রণত মস্তকে প্রবেশ করার মধ্যে কার্যজনিত আদব)। এ প্রসঙ্গে বড় জোর একথা বলা যাবে যে, ঘটনার পরের অংশটি আগে এবং আগের অংশটি পরে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে জটিলতা তখনই হত, যখন কোরআন মজীদের ঘটনাই মূখ্য উদ্দেশ্য হত। কিন্তু যখন ফলাফল বর্ণনাই মূল লক্ষ্য, তখন যদি একটি ঘটনার বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রত্যেক অংশের ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং ফলাফলগুলোর কোন প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের কথা বিবেচনা করে যদি আগের অংশকে পরে এবং পরের অংশকে আগে বর্ণনা করা হয়, তবে এতে কোন দোষের কারণ নেই এবং কোন আপত্তিরও কারণ থাকতে পারে না।

অন্যান্য তফসীরকারদের মতে এ হুকুম ঐ নগরী সংক্রান্ত ছিল, যেখানে তাদেরকে জেহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তীহ্ উপত্যকায় তাদের অবস্থানকাল শেষ হওয়ার পর আবার সেখানে জেহাদ সংঘটিত হয়েছিল এবং সে নগরীর উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় হযরত ইউশা (يوشع) (আঃ) নবী ছিলেন। সে নগরীতে জেহাদের হুকুমটি তাঁরই মাধ্যমে এসেছিল।

প্রথম অভিমত অনুসারে 'মান্না' ও 'সালওয়া' বর্জন করে সাধারণ খাবার সংক্রান্ত বনী-ইসরাঈলের আবেদনকেও পূর্ববর্তী অপরাধগুলোর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া উচিত। তখন মর্ম দাঁড়াবে এই যে, আবেদনটি তো ধৃষ্টতাপূর্ণই ছিল, কিন্তু তবুও তারা যদি এ শিষ্টাচার (আদব) ও নির্দেশ পালন করে, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। এই উভয় অভিমত অনুযায়ী এ ক্ষমা সকল বক্তার জন্য তো সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবে। তদুপরি যারা নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে সৎকার্যাবলী সম্পন্ন করবে, তাদের জন্য এছাড়াও অতিরিক্ত পুরস্কার থাকবে।

বাক্যের শব্দগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান ঃ এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, বনী-ইসরাইলকে উক্ত নগরীতে حِطَّةٌ বলতে বলতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তারা দুষ্টামী করে সে শব্দের পরিবর্তে حنطة বলতে থাকে। ফলে তাদের উপর আসমানী শাস্তি অবতীর্ণ হল। এই শব্দগত পরিবর্তন এমন ছিল— যাতে শুধু শব্দই পরিবতর্তিত হয়ে যায়নি, বরং অর্থও সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গিয়েছিল। حِطَّةٌ অর্থ তওবা ও পাপ বর্জন করা। আর حنطة অর্থ গম। এ ধরনের শব্দগত পরিবর্তন, তা কোরআনেই হোক বা হাদীসে কিংবা অন্য কোন খোদায়ী বিধানে নিঃসন্দেহে এবং সর্ববাদিসম্মতভাবে হারাম। কেননা, এটা এক ধরনের تحريف তথা শব্দগত ও অর্থগত বিকৃতিসাধন।

এখন রইল এই যে, অর্থ ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি রক্ষা করে নিছক শব্দগত পরিবর্তন সম্পর্কে কি হুকুম? ইমাম কুরতুবী এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, কোন কোন বাক্যাংশে বা বক্তব্যে শব্দই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে

এবং মর্ম ও ভাব প্রকাশের জন্য শব্দই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। এ ধরনের উক্তি ও বাণীর ক্ষেত্রে শব্দগত পরিবর্তনও জায়েয নয়। যেমন, আযানের জন্য নির্ধারিত শব্দের স্থলে সমার্থবোধক অন্য কোন শব্দ পাঠ করা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে নামাযের মাঝে নির্দিষ্ট দোয়াসমূহ। যেমন, সানা, আত্তাহিয়্যাতু, দোয়ায়ে-কুনুত ও রুকু-সেজদার তসবীহসমূহ। এগুলোর অর্থ সম্পূর্ণভাবে ঠিক রেখেও কোন রকম শব্দগত পরিবর্তন জায়েয নয়। তেমনিভাবে সমগ্র কোরআন মজিদের শব্দাবলীরও একই হুকুম। অর্থাৎ, কোরআন তেলাওয়াতের সংগে যেসব হুকুম সম্পর্কযুক্ত, তা শুধু ঐ শব্দাবলীতেই তেলাওয়াত করতে হবে, যাতে কোরআন নাযিল হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি এসব শব্দাবলীর অনুবাদ অন্য এমন সব শব্দের দ্বারা করে পাঠ করতে থাকে, যাতে অর্থ পুরোপুরিই ঠিক থাকে, তবে একে শরীয়তের পরিভাষায় কোরআন তেলাওয়াত বলা যাবে না। কোরআন পাঠ করার জন্য যে সওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে, তাও লাভ করতে পারবে না। কারণ, কোরআন শুধু অর্থের নাম নয় বরং অর্থের সাথে সাথে যে শব্দবলীতে তা নাযিল হয়েছে, তার সমষ্টির নামই কোরআন। আলোচ্য আয়াতের ভাষ্যে দৃশ্যতঃ বোঝা যায় যে, তাদেরকে তওবার উদ্দেশে যে শব্দটি বাত্‌লে দেয়া হয়েছিল, তার উচ্চারণও করণীয় ছিল; সেগুলোতে পরিবর্তন সাধন ছিল পাপ। আর তারা যে পরিবর্তন করেছিল তা ছিল শব্দের সাথে সাথে অর্থেরও পরিপন্থী। কাজেই তারা আসমানী আযাবের সম্মুখীন হয়েছিল।

কিন্তু যে উক্তি ও ব্যাক্যাংশে অর্থই মূল উদ্দেশ্য শব্দ নয়, যদি সেগুলোতে শব্দগত এমন পরিবর্তন করা হয় যাতে অর্থের ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দেসীন ও ফুকাহার মতে এ পরিবর্তন জায়েয। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও ইমাম আযম (রাঃ)-থেকে ইমাম কুরতুবী উদ্ধৃত করেন যে, হাদীসের অর্থভিত্তিক বর্ণনা জায়েয, কিন্তু শর্ত হচ্ছে এই যে, বর্ণনাকারীকে আরবী ভাষায় পারদর্শী হতে হবে এবং হাদীস বর্ণনার স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত থাকতে হবে—যাতে তার ভুলের কারণে অর্থের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য সৃষ্টি না হয়।

উল্লেখিত ৬০ তম আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত মুসা (আঃ) নিজ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে পানির জন্য দোয়া করলে আল্লাহ্ পাক পানির ব্যবস্থা করে দিলেন। পাথরের উপর লাঠির আঘাতের সাথে সাথে প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে পড়ল। এতে বোঝা গেল যে, এস্তেস্‌কা (পানির জন্য প্রার্থনা)-এর মূল হল দোয়া। মুসা (আঃ)-এর শরীয়তেও বিষয়টিকে শুধু দোয়াতেই সীমিত রাখা হয়েছে। যেমন, ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, এস্তেস্‌কার মূল হলো পানির জন্য দোয়া করা। এ দোয়া কোন কোন সময়ে এস্তেস্‌কার নামাযের আকোরেও করা হয়েছে। যেমন, এস্তেস্‌কার নামাযের উদ্দেশে হুযুর (সাঃ)-এর ঈদগাহে তশরীফ নেয়া এবং সেখানে নামায, খুৎবা ও দোয়া করার কথা বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। আবার কখনও নামায বাদ দিয়ে শুধু বাহ্যিক অর্থে দোয়া করেই ক্ষান্ত করেছেন। যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্নিত আছে যে, হুযুর (সাঃ) জুমার খুৎবায় পানির জন্য দোয়া করেন— ফলে আল্লাহ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

একথা সর্ববাদিসম্মত যে, এস্তেসকা নামাযের আকারে হোক বা দোয়া রূপে হোক তা ক্রীয়াশীল ও গুরুত্ববহ হওয়ার জন্য পাপ থেকে তওবা, নিজের দীনতা-হীনতা ও দাসত্বসুলভ আচরণের অভিব্যক্তি একান্ত আবশ্যক। পাপে অটল এবং আল্লাহ্র অবাধ্যতায় অনড় থেকে দোয়া করলে তা ক্রিয়াশীল হবে বলে আশা করার অধিকার কারো নেই।

জ্ঞাতব্য ঃ ৬১ তম আয়াতে বর্ণিত ঘটনাও তীহ্ উপত্যকাসংশ্লিষ্ট। মান্না ও সালওয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই তারা ওসব সব্জী ও শস্যের জন্য আবেদন করল। এ প্রান্তরের সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি শহর ছিল। সেখানে গিয়ে চাষাবাদ করে উৎপন্ন ফসলাদি ভোগের নির্দেশ দেয়া হলো।

তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে এটাও একটা যে, কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য ইহুদীদের থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেয়া হলো। অবশ্য কেয়ামতের অব্যবহিত পূর্বে, সর্বমোট চল্লিশ দিনের জন্য নিছক লুটেরা দলের ন্যায় অনিয়মিত ও আইন-শৃংখলা বিবর্জিত, ইহুদীদের কিঞ্চিৎ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। একে কোন বুদ্ধিমান ও বিবেকবানই রাজ্য বলেত পারবে না। আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে পূর্বেই তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যদি নির্দেশ অমান্য কর, তবে চিরকাল তোমরা অন্য জাতির দ্বারা শাসিত হতে থাকবে। যেমন—সূরা আরাফে বলা হয়েছে—

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ

'এবং সে সময়টি স্মরণ করুন, যখন আপনার পালনকর্তা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় তিনি ইহুদীদের উপর কেয়ামত পর্যন্ত এমন শাসক প্রেরণ (নিয়োগ) করতে থাকবেন, যারা তাদের প্রতি কঠিন শাস্তি পৌছাতে থাকবে।' বস্তুতঃ বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের মর্যাদাও আমেরিকা ও বৃটেনের গোলাম বৈ আর কিছু নয়।

তাছাড়াও বহু নবী বিভিন্ন সময়ে ইহুদীদের হাতে নিহত নিগৃহিত হয়েছেন— যা নিতান্ত অন্যায় বলে তারা নিজেরাও উপলব্ধি করত, কিন্তু প্রতিহিংসা ও হঠকারিতা তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছিল।

ইহুদীদের চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার অর্থ, বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের ফলে উদ্ভূত সন্দেহ ও তার উত্তর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে ইহুদীদের শাস্তি, ইহকালে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং ইহকাল ও পরকালে খোদায়ী গযব ও রোষের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট তফসীরকারগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের বর্ণনানুসারে ওদের স্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনার প্রকৃত অর্থ, কোরআনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইবনে কাসীরের ভাষায় ঃ "তারা যত ধন-সম্পদের অধিকারীই হোক না কেন, বিশ্ব-সম্প্রদায়ের মাঝে তুচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। যার সংস্পর্শে আসবে সেই তাদেরকে অপমানিত করবে এবং তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে রাখবে।"

বিশিষ্ট তফসীরকার ইমাম যাহ্হাকের ভাষায় এ লাঞ্ছনা-অবমাননার অর্থ ঃ ইহুদীরা সর্বদা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে।

একই মর্মে সূরা 'আলে-ইমরানের' এক আয়াতে রয়েছে ঃ

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ

"আল্লাহ্ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত, তারা যেখানে যাবে সেখানেই তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে।" আল্লাহ্ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যমের অর্থ এই যে, যাদেরকে আল্লাহ্ পাক নিজের বিধান অনুসারে আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন— অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকগণ বা রমণীকুল বা এমন সাধক ও উপাসক যে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না, তারা নিরাপদে থাকবে। আর মানবপ্রদত্ত

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا
مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَ
اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ
فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ
كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا
وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ
قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا
رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا
فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ
إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾

(৬২) নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী, নাসারা ও সাবেঈন, (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। আর তাদের কোনই ভয়-ভীতি নেই, তারা দুঃখিতও হবে না। (৬৩) আর আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে, তোমাদিগকে যে কিতাব দেয়া হয়েছে তাকে ধর সুদৃঢ়ভাবে এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা মনে রেখো যাতে তোমরা ভয় কর। (৬৪) তারপরেও তোমরা তা থেকে ফিরে গেছ। কাজেই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী যদি তোমাদের উপর না থাকত, তবে অবশ্যই তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে। (৬৫) তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছ, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করেছিল। আমি বলেছিলাম ঃ তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। (৬৬) অতঃপর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপাদান করে দিয়েছি। (৬৭) যখন মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের একটি গরু জবাই করতে বলেছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ? মূসা (আঃ) বললেন, মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (৬৮) তারা বলল, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন সেটির রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। মূসা (আঃ) বললেন, তিনি বলছেন, সেটা হবে একটা গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়— বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের। এখন আদিষ্ট কাজ করে ফেল। (৬৯) তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্যে প্রার্থনা কর যে, তার রং কিরূপ হবে? মূসা (আঃ) বললেন, তিনি বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাভী— যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে।

মাধ্যম অর্থ শান্তিচুক্তি। যার একটি রূপ এও হতে পারে যে, মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে বা অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসাবে জিযিয়া কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে তাদের দেশে বসবাসের সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু কোরআনের আয়াতে مِّنَ النَّاسِ বলা হয়েছে مِنَ الْمُسْلِمِينَ বলা হয়নি। সুতরাং এমন হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, অন্যান্য অমুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে তাদের আশ্রয়াধীন হয়ে সাময়িক শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

সারকথা, ইহুদীরা উপরোক্ত দু'অবস্থা ব্যতীত সর্বত্র ও সর্বদাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। (১) আল্লাহ্ প্রদত্ত ও অনুমোদিত আশ্রয়ের মাধ্যমে, যার ফলে তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি, নারী প্রভৃতি এই লাঞ্ছনা ও অবমাননা থেকে অব্যাহতি পাবে। কিংবা (২) শান্তিচুক্তির মাধ্যমে নিজেদেরকে এ অবমাননা থেকে মুক্ত রাখতে পারবে। এ চুক্তি মুসলমানদের সাথেও হতে পারে। কিংবা অন্যান্য অমুসলিম জাতির সাথেও হতে পারে।

এমনিভাবে সূরা 'আলে-ইমরানের' আয়াত দ্বারা সূরা-বাক্বারার আয়াতের বিশদ বিশ্লেষণ হয়ে যায়। অধুনা ফিলিস্তীনে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে সন্দেহের অবতারণা হয়েছে, এ দ্বারা তাও দূরীভূত হয়ে যায়। তা এই যে, কোরআনের আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইহুদীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হবে না। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, ফিলিস্তীনে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উত্তর সুস্পষ্ট— কেননা, ফিলিস্তীনে ইহুদীদের বর্তমান রাষ্ট্রের গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত, তারা ভালভাবেই জানেন যে, এ রাষ্ট্র প্রকৃত প্রস্তাবে ইসরাঈলের নয়, বরং আমেরিকা ও বৃটেনের একটি ঘাঁটি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ রাষ্ট্র নিজস্ব সম্পদ ও শক্তির উপর নির্ভর করে একমাসও টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান শক্তি ইসলামী বিশ্বকে দুর্বল করার উদ্দেশে তাদের মাঝখানে ইসরাঈল নাম দিয়ে একটি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ রাষ্ট্র আমেরিকা-ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে একটা অনুগত আজ্ঞাবহ ষড়যন্ত্র কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোন গুরুত্ব বহন করে না। এ যেন কোরআনের বাণী وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ —এরই বাস্তব রূপ। পাশ্চাত্য শক্তিবলয়, বিশেষ করে আমেরিকার সাথে নানা ধরনের প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের পক্ষপুষ্ট ও আশ্রিত হয়ে নিছক ক্রীড়নক রূপে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তাও অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও অবমাননার ভেতর দিয়ে। সুতরাং বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দরুন কোরআনের কোন আয়াত সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

জ্ঞাতব্য ঃ নীতি বা আইনের মর্ম সুস্পষ্ট। আল্লাহ্ পাক বলেছেন যে, আমার দরবারে কোন ব্যক্তির বিশেষ মর্যাদা নেই। যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও কর্মে পুরোপুরি আনুগত্য স্বীকার করবে, সে পূর্বে যেমনই থাকুক না কেন, আমার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং তার আমল পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয়। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর 'পূর্ণ আনুগত্য' মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মুসলমান হওয়াতেই সীমাবদ্ধ। যার অর্থ এই যে, যে মুসলমান হবে, সে-ই পরকালে নাজাতের অধিকারী হবে। এখানে পূর্ববর্তী ধারণার উত্তর হয়ে গেল। অর্থাৎ, এতসব অনাচার ও গর্হিত আচরণের পরেও কেউ যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে আমি সব মাফ করে দেব।

জ্ঞাতব্য ঃ যখন হযরত মূসা (আঃ)-কে তূর পর্বতে তওরাত প্রদান করা হল, তখন তিনি ফিরে এসে তা বনী-ইসরাঈলকে দেখাতে ও শোনাতে আরম্ভ করলেন। এতে হুকুমগুলো কিছুটা কঠোর ছিল— কিন্তু তাদের অবস্থানুযায়ীই ছিল। এ সম্পর্কে প্রথম তারা একথাই বলেছিল যে, যখন স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে বলে দেবেন যে, 'এটা আমার কিতাব' তখনই আমরা মেনে নেব। (যে বর্ণনা উপরে চলে গেছে) মোটকথা, যে সত্তর জন লোক মূসা (আঃ)-এর সাথে গিয়েছিল, তারাও ফিরে এসে সাক্ষী দিল। কিন্তু তাদের সাক্ষ্যের সাথে এ এথাটিও নিজেদের পক্ষ হতে সংযুক্ত করে দিল যে, আল্লাহ্ তাআলা সর্বশেষে একথাও বলে দিয়েছেন, 'তোমরা যতটুকু পার আমল কর, আর যা না পার, তা আমি ক্ষমা করে দেব।'

তখন তা কতকটা তাদের স্বভাবগত দুরন্তপনা ও হঠকারিতা, হুকুমগুলোর কিছুটা কঠোরতা এবং কতকটা এ সংযোগের ফলে তাদের এক সুবর্ণ সুযোগ হয়ে গেল। তারা পরিষ্কারভাবে বলে দিল, আমাদের দ্বারা এ গ্রন্থের উপর আমল করা সম্ভব হবে না। ফলে আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদেরকে হুকুম করলেন, 'তূর পর্বতের একটি অংশ তুলে নিয়ে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে দাও এবং বল, হয় কিতাব মেনে নাও, নইলে এক্ষুণি মাথার উপর পড়ল ! অবশেষে নিরুপায় হয়ে মেনে নিতে হল।

জ্ঞাতব্য ঃ আল্লাহ্র সাধারণ রহমত পৃথিবীতে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সবার জন্যই ব্যাপক। তারই প্রভাব হল পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শারীরিক সুস্থতা। তবে বিশেষ রহমতের বিকাশ ঘটবে আখেরাতে, যার ফলে মুক্তি ও আল্লাহ্র নৈকট্যলাভ সম্ভব হবে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে আয়াতের ৬৪ শেষাংশের লক্ষ্য হল সে সমস্ত ইহুদী, যারা মহানবী (সাঃ)-এর সময়ে উপস্থিত ছিল। হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর উপর ঈমান না আনাও যেহেতু উল্লেখিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু তাদেরকে পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীদের আওতাভুক্ত করে উদাহরণসরূপ বলা হয়েছে যে, 'এতদসত্ত্বেও আমি দুনিয়াতে তোমাদের উপর তেমন কোন আযাব অবতীর্ণ করিনি, যেমনটি পূর্বকালে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীদের উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকত। এটা একান্তই আল্লাহ্র রহমত।

আর হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে আযাব অবতীর্ণ না হওয়াটা যেহেতু মহনবী (সাঃ)-এরই বরকত, কাজেই কোন কোন তফসীরকার মহানবী (সাঃ)-এর আবির্ভাবকেই আল্লাহ্র রহমত ও করুণা বলে বিশ্লেষণ করেছেন।

এ বিষয়টির সমর্থনকল্পে বিগত বেঈমানদের একটি ঘটনা পরবর্তী আয়াতে বিবৃত হচ্ছে ঃ

৬৫ আয়াতে বর্নিত এ ঘটনাটিও হযরত দাউদ (আঃ)-এর আমলেই সংঘটিত হয়। বনী- ইসরাঈলের জন্যে শনিবার ছিল পবিত্র এবং সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য নির্ধারিত দিন। এ দিন মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী ছিল বলে মৎস্য শিকার ছিল তাদের প্রিয় কাজ। ফলে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা মৎস্য শিকার করে। এতে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে 'মস্‌খ' তথা বিকৃতি বা রূপান্তরের শাস্তি নেমে আসে। তিন দিন পর এদের সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এ ঘটনার দর্শক ও শ্রোতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অবাধ্য শ্রেণী ও অনুগত শ্রেণী। অবাধ্যদের জন্যে এ ঘটনাটি ছিল অবাধ্যতা থেকে তওবা করার উপকরণ। এ কারণে একে نكال 'শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত' বলা হয়েছে। অপরদিকে অনুগতদের জন্যে এটা ছিল আনুগত্যে অটল থাকার কারণ। এজন্যে একে موعظة 'উপদেশপ্রদ' ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আকৃতি রূপান্তরের ঘটনা ঃ তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, ইহুদীরা প্রথম প্রথম কলা-কৌশলের অন্তরালে এবং পরে সাধারণ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল সৎ ও বিজ্ঞ লোকদের। তারা এ অপকর্মে বাধা দিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ বিরত হল না। অবশেষে তারা এদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি বাসস্থানও দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। একভাগে অবাধ্যরা বসবাস করত আর অপর ভাগে সৎ ও বিজ্ঞ জনেরা বাস করতেন। একদিন তারা অবাধ্যদের বস্তিতে অস্বাভাবিক নীরবতা লক্ষ্য করলেন। অতঃপর সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, সবাই বিকৃত হয়ে বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ) বলেন, তাদের যুবকরা বানরে এবং বৃদ্ধরা শূকরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রূপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনকে চিনত এবং তাদের কাছে এসে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করত।

রূপান্তরিত সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি ঃ সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, কয়েকজন সাহাবী একবার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হুযূর ! আমাদের যুগের বানর ও শূকরগুলো কি সেই রূপান্তরিত ইহুদী সম্প্রদায় ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর আকৃতি রূপান্তরের আযাব নাযিল করেন, তখন তারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তিনি আরও বললেন, বানর ও শূকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, ভবিষতেও থাকবে। এদের সাথে রূপান্তরিত বানর ও শূকরদের কোন সম্পর্ক নেই।

জ্ঞাতব্য ঃ ঘটনার বিবরণ এই যে, বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। মিশকাতের টীকা গ্রন্থ মিরকাতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল বিবাহজনিত। জনৈক ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির কন্যার পাণিগ্রহণ করার প্রস্তাব করে প্রত্যাখাত হয় এবং এই পাণিপ্রার্থী কন্যার পিতাকে হত্যা করে গা ঢাকা দেয়। ফলে হত্যাকারী কে ? তা জানা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

মাআলী (রহঃ) কাল্‌বী (রাঃ)- এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তখন পর্যন্তও তওরাতে হত্যা সম্পর্কে কোন আইন বিদ্যমান ছিল না। এতে বোঝা যায়, ঘটনাটি তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا
وَإِنَّآ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ۝ قَالَ إِنَّهٗ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا
ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا
قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝ وَ
إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ
تَكْتُمُوْنَ ۝ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى
وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ
بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ
لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهٰرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ
الْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝ أَفَتَطْمَعُوْنَ أَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ
فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْ بَعْدِ
مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا
اٰمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا أَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا
فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

(৭০) তারা বলল, আপনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন— তিনি বলে দিন যে, সেটা কিরূপ? কেননা, গরু আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল মনে হয়। ইনশাআল্লাহ্ এবার আমরা অবশ্যই পথপ্রাপ্ত হব। মূসা (আঃ) বললেন, তিনি বলেন যে, এ গাভী ভূকর্ষণ ও জল সেচনের শ্রমে অভ্যস্ত নয়— হবে নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত। (৭১) তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা সেটা জবাই করল, অথচ জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না। (৭২) যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে। যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেয়া ছিল আল্লাহ্র অভিপ্রায়। (৭৩) অতঃপর আমি বললাম ঃ গরুর একটি খণ্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন— যাতে তোমরা চিন্তা কর। (৭৪) অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমনও আছে যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে, যা আল্লাহ্র ভয়ে খসে পড়তে থাকে। আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। (৭৫) হে মুসলমানগণ, তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ করত, অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা অবগত ছিল। (৭৬) যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে ঃ আমরা মুসলমান হয়েছি। আর যখন পরস্পরের সাথে নিভৃতে অবস্থান করে, তখন বলেঃ পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যা প্রকাশ করেছেন, তা কি তাদের কাছে বলে দিচ্ছ? তাহলে যে তারা এ নিয়ে পালনকর্তার সামনে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তোমরা কি তা উপলব্ধি কর না?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

হাদীসে বর্ণিত আছে, বনী-ইসরাঈল কোন বাদানুবাদে প্রবৃত্ত না হলে এতসব শর্তও আরোপিত হত না, বরং যে কোন গরু জবাই করলেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারত। বস্তুতঃ মৃতদেহে গরুর গোশতের টুকরো স্পর্শ করাতেই সে জীববিত হয়ে যায় এবং হত্যাকারীর নাম বলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু বরণ করে।

এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, মূসা (আঃ) ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, নিহত ব্যক্তি সত্য বলবে। নতুবা শরীয়তসম্মত সাক্ষী ছাড়া নিহত ব্যক্তির জবানবন্দীই হত্যা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না।

৭৪ আয়াতে পাথরের তিনটি ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে ঃ (১) পাথর থেকে বেশী পানি প্রসরণ, (২) কম পানির নিঃসরণ। এ দুটি প্রভাব সবারই জানা। (৩) আল্লাহ্র ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়া। এ তৃতীয় ক্রিয়াটি কারও কারও অজানা থাকতে পারে। কারণ, পাথরের কোনরূপ জ্ঞান ও অনুভূতি নেই। কিন্তু জানা উচিত যে, ভয় করার জন্যে জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। জন্তু-জানোয়ারের জ্ঞান নেই, কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি প্রত্যক্ষ করি। তবে চেতনার প্রয়োজন অবশ্য আছে। জড় পদার্থের মধ্যে এতটুক চেতনাও নেই বলে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে ন। কারণ, চেতনা প্রাণের উপর নির্ভরশীল। খুব সম্ভব জড় পদার্থের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম প্রাণ আছে যা আমরা অনুভব করতে পারি না। উদাহরণতঃ বহু পণ্ডিত মস্তিষ্কের চেতনাশক্তি অনুভব করতে পারেন না। তারা একমাত্র যুক্তির ভিত্তিতেই এর প্রবক্তা। সুতরাং ধারণাপ্রসূত প্রমাণাদির চাইতে কোরআনী আয়াতের যৌক্তিকতা কোন অংশেই কম নয়।

এছাড়া আমরা এরূপ দাবীও করি না যে, পাথর সব সময় ভয়ের দরুনই নীচে গড়িয়ে পড়ে। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা 'কতক পাথর' বলেছেন। সুতরাং নীচে গড়িয়ে পড়ার অন্য আরও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তম্মধ্যে একটি হল আল্লাহ্র ভয়।

এখানে তিন রকমের পাথরের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সাবলীল ভঙ্গিতে এদের শ্রেণীবিন্যাস ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। কতক পাথরের প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা এত প্রবল যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তদ্দ্বারা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর এমন নয় যে, সৃষ্ট জীবের দুঃখ-দুর্দশায় অশ্রুসজল হবে। কতক পাথরের মধ্যে প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা কম। ফলে সেগুলোর দ্বারা উপকারও কম হয়। এ ধরনের পাথর প্রথম ধরনের পাথরের তুলনায় কম নরম হয়। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর এ দ্বিতীয় ধরনের পাথর অপেক্ষাও বেশী শক্ত।

কতক পাথরের মধ্যে উপরোক্তরূপ প্রভাব না থাকলেও এতটুকু প্রভাব অবশ্যই আছে যে, খোদার ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে। এ পাথর উপরোক্ত দুই প্রকার পাথরের তুলনায় অধিক দুর্বল। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর এ দুর্বলতম প্রভাব থেকেও মুক্ত।

জ্ঞাতব্য ঃ উদ্দেশ্য এই যে, যারা এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ ও স্বার্থান্বেষী, তারা অন্যের সদুপদেশে কখনও মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে না।

এখানে 'আল্লাহ্র বাণী' অর্থ তওরাত। 'শ্রবণ করা' অর্থ পয়গম্বরদের মাধ্যমে শ্রবণ করা। 'পরিবর্তন করা' অর্থাৎ, কোন কোন বাক্য অথবা ব্যাখ্যা অথবা উভয়টিকে বিকৃত করে ফেলা।

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَ
مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ
يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ
لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُوا
لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ
اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيٓـَٔتُهُ
فَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ
اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ
فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ
لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ ۖ وَبِالْوٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِي
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ
حُسْنًا وَّأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

(৭৭) তারা কি এতটুকুও জানে না যে, আল্লাহ্ সেসব বিষয়ও পরিজ্ঞাত যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে? (৭৮) তোমাদের কিছু লোক নিরক্ষর। তারা মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আল্লাহ্র গ্রন্থের কিছুই জানে না। তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া কিছুই নেই। (৭৯) অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ— যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্যে এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে। (৮০) তারা বলে ঃ আগুন আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করবে না; কিন্তু গণাগনতি কয়েকদিন। বলে দিন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্র কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যে, আল্লাহ্ কখনও তার খেলাফ করবেন না — না তোমরা যা জান না, তা আল্লাহ্র সাথে জুড়ে দিচ্ছ। (৮১) হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে, তারাই দোযখের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। (৮২) পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। (৮৩) যখন আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী।

অথবা 'আল্লাহ্র বাণী' অর্থাৎ, ঐ বাণী, যা মূসা (আঃ)-এর সত্যায়নের উদ্দেশে তাঁর সাথে গমনকারী সত্তর জন ইহুদী তূর পর্বতে শুনেছিল। 'শ্রবণ' অর্থ মাধ্যমবিহীনভাবে সরাসরি শ্রবণ। 'পরিবর্তন' অর্থ স্বগোত্রের কাছে প্রসঙ্গক্রমে এরূপ বর্ণনা করা যে, আল্লাহ্ তাআলা উপসংহারে বলে দিয়েছেন ঃ তোমরা যেসব নির্দেশ পালন করতে না পার, তা মাফ।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আমলে যেসব ইহুদী ছিল, তাদের দ্বারা উল্লেখিত কোন কুকর্ম সংঘটিত হয়নি সত্য, কিন্তু পূর্ববর্তীদের এসব দুষ্কর্মকে তারা অপছন্দ ও ঘৃণা করত না। এ কারণে তারাও কার্যতঃ পূর্ববর্তীদেরই মত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জনগণের সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে ভুল বিষয় পরিবেশন করলে তারা কিছু নগদ অর্থ-কড়িও পেয়ে যেত এবং মান-সম্মানও বজায় থাকত। এ কারণে তারা তওরাতে শাব্দিক ও মর্মগত উভয় প্রকার পরিবর্তন করারই চেষ্টা করত। উল্লেখিত আয়াতে এ বিষয়ের উপরই কঠোর হুসিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ তফসীরবিদগণ ইহুদীদের এ বক্তব্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হল এই যে, ঈমানদার ব্যক্তি গোনাহ্গার হলে গোনাহ্ পরিমাণে দোযখ ভোগ করবে। কিন্তু ঈমানের ফলস্বরূপ চিরকাল দোযখে থাকবে না। কিছুকাল পরই তা থেকে মুক্তি পাবে।

অতএব, ইহুদীদের দাবীর সারমর্ম এই যে, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত মূসা (আঃ) প্রচারিত ধর্ম রহিত হয়নি। কাজেই তারা ঈমানদার; ঈসা (আঃ) ও হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত অস্বীকার করার পরও তারা কাফের নয়। সুতরাং যদি কোন পাপের কারণে তারা দোযখে চলেও যায়, কিন্তু কিছু দিন পরই মুক্তি পাবে। বলাবাহুল্য, এ দাবীটি একটি অসত্যের উপর অসত্যের ভিত্তি বৈ নয়। কেননা, মূসা (আঃ) কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম চিরকালের জন্য— এরূপ দাবীই অসত্য। অতএব ঈসা (আঃ) ও হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবুওয়েত অস্বীকার করার কারণে ইহুদীরা কাফের। কাফেরও কিছুদিন পর দোযখ থেকে মুক্তি পাবে, এমন কথা কোন আসমানী গ্রন্থে নেই— যা আলোচ্য আয়াতে অঙ্গীকার শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, ইহুদীদের দাবীটি যুক্তিহীন, বরং যুক্তিবিরুদ্ধ।

গোনাহ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া শুধু কাফেরদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। কারণ, কুফরের কারণে কোন সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য থাকে না। কুফরের পূর্বে কিছু সৎকর্ম করে থাকলেও তা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই কাফেরদের মধ্যে আপাদমস্তক গোনাহ্ ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করা যায় না। ঈমানদারদের অবস্থা কিন্তু তা নয়। প্রথমতঃ তাদের ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম। দ্বিতীয়তঃ আন্যান্য নেক আমল তাদের আমলনামায় লেখা হয়। সে জন্য ঈমানদার সৎকর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। সুতরাং উল্লেখিত বেষ্টনী তাদের বেলায় অবান্তর।

জ্ঞাতব্য ঃ 'অল্প কয়েকজন' অর্থ, তারাই যারা তওরাতের পুরোপুরি অনুসরণ করত, তওরাত রহিত হওয়ার পূর্বে তারা মূসা (আঃ) প্রবর্তিত শরীয়তের অনুসারী ছিল এবং তওরাত রহিত হওয়ার পর ইসলামী শরীয়তের অনুসারী হয়ে যায়। আয়াত দৃষ্টে বোঝা যায় যে, একত্ববাদে ঈমান এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন এতীম বালক-বালিকা ও দীন-দরিদ্রদের সেবাযত্ন করা, মানুষের সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলা,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۝
ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم
مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن
يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ
مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ وَ
لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ
فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۝ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ
بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۝

(৮৪) যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা পরস্পর খুনাখুনি করবে না এবং নিজদিগকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে না, তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে। (৮৫) অতঃপর তোমরাই পরস্পর খুনাখুনি করছ এবং তোমাদেরই একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিস্কার করছ। তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমন করছ। আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিস্কার করাও তোমাদের জন্যে অবৈধ। তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর! যারা এরূপ করে,পার্থিব জীবনে দূর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। (৮৬) এরাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে। অতএব এদের শাস্তি লঘু হবে না এবং এরা সাহায্যও পাবে না। (৮৭) অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি। এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রসূল পাঠিয়েছি। আমি মরিয়ম তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট মো'জেযা দান করেছি এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে শক্তিদান করেছি। অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনে ভাল লাগেনি, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। শেষ পর্যন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছ এবং একদলকে হত্যা করেছ। (৮৮) তারা বলে, আমাদের হৃদয় অর্ধাবৃত। এবং তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তারা অল্পই ঈমান আনে।

নামায পড়া এবং যাকাত দেয়া ইসলামী শরীয়তসহ পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও ছিল।

শিক্ষা ও প্রচার ক্ষেত্রে কাফেরের সাথেও অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা বৈধ নয় :

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا আয়াতে এমন কথাকে বুঝানো হয়েছে, যা সৌন্দর্যমণ্ডিত। এর অর্থ এই যে, যখন মানুষের সাথে কথা বলবে, নম্রভাবে হাসিমুখে ও খোলা মনে বলবে— যার সাথে কথা বলবে, সে সৎ হউক বা অসৎ, সুন্নী হউক বা বেদাতী। তবে ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অথবা কারও মনোরঞ্জনের জন্য সত্য গোপন করবে না। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা যখন মূসা ও হারুন (আঃ)-কে নবুওয়ত দান করে ফেরাউনের প্রতি পাঠিয়েছিলেন, তখন এ নির্দেশ দিয়েছিলেন فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا অর্থাৎ, তোমারা উভয়েই ফেরাউনকে নরম কথা বলবে। আজ যারা অন্যের সাথে কথা বলে, তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর চাইতে উত্তম নয় এবং যার সাথে কথা বলে, সেও ফেরাউন অপেক্ষা বেশী মন্দ ও পাপিষ্ঠ নয়।

আনুষাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জ্ঞাতব্য : কোন কোন সময় কারও বক্তব্যের ভেতরই কোন কিছুর অঙ্গীকারও বোঝা যায় যদিও তা সুস্পষ্ট নয়। আলোচ্য আয়াতে ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ অনিশ্চয়তা অপনোদন করে বলা হয়েছে যে, তাদের অঙ্গীকার সাক্ষ্যদানের মতই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ছিল।

দেশত্যাগ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই যে, কাউকে এমন উৎপীড়ন করবে না,যাতে সে দেশত্যাগে বাধ্য হয়।

বনী-ইসারাঈলকে তিনটি নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। প্রথমতঃ খুনাখুনী না করা, দ্বিতীয়তঃ বহিস্কার অর্থাৎ, দেশ ত্যাগে বাধ্য না করা এবং তৃতীয়তঃ স্বগোত্রের কেউ কারও হাতে বন্দী হলে অর্থের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করা। কিন্তু তারা প্রথমোক্ত দু'টি নির্দেশ অমান্য করে তৃতীয় নির্দেশ পালনে বিশেষ তৎপর ছিল। ঘটনার বিবরণ এরূপ : মদীনাবাসীদের মধ্যে 'আওস' ও 'খাযরাজ' নামে দু'টি গোত্রের মধ্যে শত্রুতা লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে যুদ্ধও বাধত। মদীনার আশে-পাশে ইহুদীদের দু'টি গোত্র 'বনী কোরায়যা' ও 'বনী-নুযায়ের' বসবাস করত। আওস গোত্র ছিল বনী-কোরায়যার মিত্র এবং খাযরাজ ছিল বনী-নুযায়েরের মিত্র। আওস ও খাযরাজের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে মিত্রতার ভিত্তিতে বনী-কোরায়যা আওসের সাহায্য করত এবং নুযায়ের খাযরাজের পক্ষ অবলম্বন করত। যুদ্ধে আওস ও খাযরাজের যেমন লোকক্ষয় ও ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হত, তাদের মিত্র বনী নুযায়েরেরও তেমনি হত। বনী-কোরায়যাকে হত্যা ও বহিস্কারের ব্যাপারে শত্রুপক্ষের মিত্র-নুযায়েরেরও হাত থাকত। তেমনি নুযায়েরের হত্যা, বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করার কাজে শত্রুপক্ষের মিত্র বনী কুরায়যারও হাত থাকত। তবে তাদের একটি আচরণ ছিল অদ্ভুত। ইহুদীদের দুই দলের কেউ আওস অথবা খাযরাজের হাতে বন্দী হয়ে গেলে প্রতিপক্ষীয় দলের ইহুদী স্বীয় মিত্রদের অর্থে বন্দীকে মুক্ত করে দিত। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতঃ বন্দীকে মুক্ত করা আমাদের উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যুদ্ধে সাহায্য করার ব্যাপারে কেউ আপত্তি করলে তারা বলত : কি করব, মিত্রদের সাহায্যে এগিয়ে না আসা লজ্জার ব্যাপার। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাদের এ আচরণেরই নিন্দা করেছেন এবং তাদের এ অপকৌশলের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন।

اثم ও عدوان (গোনাহ ও অন্যায়) -আয়াতে ব্যবহৃত এ দু'টি শব্দ

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا
جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۫ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾
بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا
اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ
فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ
مُّهِيْنٌ ﴿٩٠﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا
نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَهُوَ
الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ
اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ
مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ
ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا
وَعَصَيْنَا ۗ وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ
قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

(৮৯) যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছাল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে করত। অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। অতএব, অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। (৯০) যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে, তা খুবই মন্দ ; যেহেতু তারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তা অস্বীকার করেছে— এই হঠকারিতার দরুন যে, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ নাযিল করেন। অতএব, তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (৯১) যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা পাঠিয়েছেন তা মেনে নাও, তখন তারা বলে, আমরা মানি যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সেটি ছাড়া সবগুলোকে তারা অস্বীকার করে। অথচ এ গ্রন্থটি সত্য এবং সত্যায়ন করে ঐ গ্রন্থের যা তাদের কাছে রয়েছে। বলে দিন, তবে তোমরা ইতিপূর্বে পয়গম্বরদের হত্যা করতে কেন যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে? (৯২) সুস্পষ্ট মু'জেযাসহ মূসা তোমাদের কাছে এসেছেন। এরপর তার অনুপস্থিতিতে তোমরা গোবৎস বানিয়েছ। বাস্তবিকই তোমরা অত্যাচারী। (৯৩) আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের উপর তুলে ধরলাম যে, শক্ত করে ধর, আমি যা তোমাদের দিয়েছি আর শোন। তারা বলল, আমরা শুনেছি আর অমান্য করেছি। কুফরের কারণে তাদের অন্তরে গোবৎসপ্রীতি পান করানো হয়েছিল। বলে দিন, তোমরা বিশ্বাসী হলে, তোমাদের সে বিশ্বাস মন্দ বিষয়াদি শিক্ষা দেয়।

দ্বারা দু'রকম হক বা অধিকার নষ্ট করার প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে তারা একদিকে আল্লাহ্‌র হক নষ্ট করেছে এবং অপরকে কষ্ট দিয়ে বান্দার হকও নষ্ট করেছে।

ঘটনায় বর্ণিত ইহুদীরা নবী করিম (সাঃ)-এর নবুওয়ত স্বীকার না করায় নিঃসন্দেহে কাফের। কিন্তু এখানে তাদের কুফর উল্লেখ করা হয়নি; বরং কতিপয় নির্দেশ পালন না করাকে কুফর বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথচ যতক্ষণ কেউ হারামকে হারাম মনে করে, ততক্ষণ কাফের হয় না। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, শরীয়তের পরিভাষায় কঠোর গুনাহ্‌কে শুধু কঠোরতার প্রেক্ষিতেই কুফর বলে দেয়া হয়। আমরা নিজেদের পরিভাষায়ও এর দৃষ্টান্ত অহরহ দেখতে পাই। উদাহরণতঃ কাউকে কোন নিকৃষ্ট কাজ করতে দেখলে আমরা বলে দেই ঃ তুই একেবারে চামার। অথচ সে মোটেই চামার নয়। এ ক্ষেত্রে তীব্র ঘৃণা এবং সংশ্লিষ্ট কাজটির নিকৃষ্টতা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। من ترك الصلوٰة متعمدا فقد كفر (যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দেয়, সে কাফের হয়ে যায়।) এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদীসের বেলায়ও এ অর্থই বুঝতে হবে।

আয়াতে উল্লিখিত দু'টি শাস্তির প্রথমটি হল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি। তা এভাবে বাস্তব রূপ লাভ করেছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর আমলেই মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিভঙ্গের অপরাধে বনী-কুরায়যা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও বন্দী হয়েছে এবং বনী-নুযায়রকে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে সিরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছে।

কোরআন-হাদীসের বিভিন্নস্থানে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে 'রূহুল কুদুস' (পবিত্রাত্মা) বলা হয়েছে। কোরআনের আয়াতে قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ এবং হাদীসে হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেতের কবিতা রয়েছে—

জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে ঈসা (আঃ)-কে কয়েক রকম শক্তি দান করা হয়েছে। প্রথমতঃ জন্মগ্রহণের সময় শয়তানের স্পর্শ থেকে রক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া জিবরাঈলের দম করার ফলেই মরিয়মের উদরে হযরত ঈসার গর্ভ সঞ্চারিত হয়। বহু ইহুদী ঈসা (আঃ)-এর শত্রু ছিল। এ কারণে দেহরক্ষী হিসাবে জিবরাঈল তাঁর সাথে থাকতেন। এমনকি, শেষ পর্যন্ত জিবরাঈলের মাধ্যমেই তাঁকে আকাশে তুলে নেয়া হয়। ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-সহ অনেক পয়গাম্বরকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) -কে হত্যা পর্যন্ত করেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

জ্ঞাতব্য : কোরআনকে তওরাতের 'মুসাদ্দিক' (সত্যায়নকারী) বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, তওরাতে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব ও কোরআন অবতরণের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, কোরআনের মাধ্যমেও সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যারা তওরাতকে স্বীকার করে, তারা কিছুতেই কোরাআন ও মুহাম্মদ (সাঃ)-কে অস্বীকার করতে পারে না। তা করতে গেলে প্রকারান্তরে তাওরাতকেই অস্বীকার করা হয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, তারা যখন সত্যকে সত্য বলেই জানত, তখন তাদেরকে ঈমানদার বলাই উচিত, কাফের বলা হল কেন?

এর উত্তর এই যে, শুধু জানাকেই ঈমান বলা যায় না। শয়তানের

সত্যজ্ঞান সবার চাইতে বেশী। তাই বলে সে ঈমানদার হয়ে যাবে কি? জানাসত্ত্বে অস্বীকার করার কারণে কুফরের তীব্রতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের শত্রুতাকে কুফরের কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এখানে এক ক্রোধ কুফরের কারণে এবং অপর ক্রোধ হিংসার কারণে। এ জন্যেই ক্রোধের উপর ক্রোধ বলা হয়েছে। শাস্তির সাথে অপমানজনক শব্দ যোগ করে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি কাফেরদের জন্যেই নির্দিষ্ট। কেননা, পাপী ঈমানদারকে যে শাস্তি দেয়া হবে, তা হবে, তাকে পাপমুক্ত করার উদ্দেশে, অপমান করার উদ্দেশে নয়। পরবর্তী আয়াতে তাদের যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে কুফর প্রমাণিত হয় এবং হিংসাও বুঝা যায়।

'আমরা শুধু তওরাতের প্রতিই ঈমান আনব, অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনব না,' ইহুদীদের এ উক্তি সুস্পষ্ট কুফর। সেই সাথে তাদের উক্তি 'যা (তওরাত) আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে'— এ থেকে প্রতিহিংসা বোঝা যায়। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, অন্যান্য গ্রন্থ যেহেতু আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়নি, কাজেই আমরা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনব না। আল্লাহ্ তাআলা তিন পন্থায় তাদের এ উক্তি খণ্ডন করেছেন।

প্রথমতঃ অন্যান্য গ্রন্থের সত্যতা ও বাস্তবতা যখন অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তখন সেগুলো অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য দলীলের মধ্যে কোন আপত্তি থাকলে তারা তা উপস্থিত করে দূর কের নিতে পারত। অহেতুক অস্বীকারের কোন অর্থ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআন মজীদ, যা তওরাতেরও সত্যায়ন কর। সুতরাং কোরাঅন মজীদকে অস্বীকার করলে তওরাতের অস্বীকৃতিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ সকল খোদায়ী গ্রন্থের মতেই পয়গম্বরদের হত্যা করা কুফর। তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা কয়েকজন পয়গম্বরকে হত্যা করেছে। অথচ তারা বিশেষভাবে তওরাতের শিক্ষাই প্রচার করতেন। তোমরা সেসব হত্যাকারীকেই নেতা ও পুরোহিত মনে করেছ। এভাবে কি তোমরা তওরাতের সাথেই কুফরি করনি? সুতরাং তওরাতের প্রতি তোমাদের ঈমান আনার দাবী অসার প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা, কোন দিক দিয়েই তোমাদের কথা ও কাজ শুদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

পরবর্তী আয়াতে আরও কতিপয় যুক্তি দ্বারা ইহুদীদের দাবী খন্ডন করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটে তওরাত অবতরণের পূর্বে। তখন মূসা (আঃ)-এর নবুওতের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে যেসব যুক্তি প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত ছিল, আয়াতে بينات বলে সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন, লাঠি, জ্যোতির্ময় হাত, সাগর দ্বি-খন্ডিত হওয়া ইত্যাদি।

ইহুদীদের দাবীর খন্ডনে আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা একদিকে ঈমানের দাবী কর, অন্যদিকে প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হও। ফলে শুধু মূসা (আঃ)-কেই নয়, আল্লাহ্কেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলেছ। কোরআন অবতরণের সময় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আমলে যেসব ইহুদী ছিল, তারা গোবৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করেনি সত্য ; কিন্তু তারা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের সমর্থক ছিল। অতএব তারাও মোটামুটিভাবে এ আয়াতের লক্ষ্য।

আয়াতে বর্ণিত কারণ ও ঘটনাসমূহের সারমর্ম এই যে, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার পর তারা একটি কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে। পরে মূসা (আঃ)-এর শাসানোর ফলে যদিও তওবা করে নেয়, কিন্তু তওবারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। উচ্চস্তরের তওবার অভাবে তাদের অন্তরে কুফরের কালিমা থেকেই যায়। পরে সেটাই বেড়ে গিয়ে গোবৎস পূজার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন টীকাকারের বর্ণনা মতে গোবৎস পূজা থেকে তওবা করতে গিয়ে তাদের কিছু লোককে হত্যা বরণ করতে হয় এবং কিছু লোক ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। এদের তওবাও সম্ভবতঃ দুর্বল ছিল। এছাড়া যারা গোবৎস পূজায় জড়িত ছিল না, তারাও অন্তরে গোবৎস পূজারীদের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃণা পোষণ করতে পারেনি। ফলে তাদের অন্তরে শিরকের প্রভাব কিছু না কিছু অবশিষ্ট ছিল। মোটকথা, তওবার দুর্বলতা ও শিরকের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃণার অভাব— এতদুভয়ের প্রতিক্রিয়ায় তাদের অন্তরে ধর্মের প্রতি শৈথিল্য দানা বেঁধে উঠেছিল। এ কারণেই অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য তূর পর্বতকে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়।

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ
دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَ
لَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ
بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَ
مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَ
مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا
يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ
عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى
وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَ
رُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٨﴾
وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا
الْفٰسِقُوْنَ ﴿٩٩﴾ اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ؕ
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ
اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾

(৯৪) বলে দিন, যদি আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহ্র কাছে একমাত্র তোমাদের জন্যই বরাদ্দ হয়ে থাকে— অন্য লোকদের বাদ দিয়ে, তবে মৃত্যু কামনা কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক। (৯৫) কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না ঐসব গোনাহ্র কারণে, যা তাদের হাত পাঠিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্ গোনাহ্গারদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন। (৯৬) আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে এমন কি, মুশরিকদের চাইতেও অধিক লোভী দেখবেন। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বছর আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ুপ্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ্ দেখেন যা কিছু তারা করে। (৯৭) আপনি বলে দিন, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু হয়— যেহেতু তিনি আল্লাহ্র আদেশে এ কালাম আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন, যা সত্যায়নকারী তাদের সম্মুখস্থ কালামের এবং মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা। (৯৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয়, নিশ্চিতই আল্লাহ্ সেসব কাফেরের শত্রু। (৯৯) আমি আপনার প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। অবাধ্যরা ব্যতীত কেউ এগুলো অস্বীকার করে না।(১০০) কি আশ্চর্য, যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তখন তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলে, বরং অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। (১০১) যখন তাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন রসূল আগমন করলেন— যিনি ঐ কিতাবের সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে, তখন আহ্লে কেতাবদের একদল আল্লাহ্র গ্রন্থকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল— যেন তারা জানেই না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম যে সত্যধর্ম , তা প্রমাণ করার জন্যে এ ঘটনাটি যথেষ্ট। এখানে আরও দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য ঃ

প্রথমত ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর আমলে বিদ্যমান ইহুদীদের সঙ্গে উপরোক্ত যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল—যারা তাঁকে নবী হিসাবে চেনার পরেও শত্রুতা ও হঠকারিতাবশতঃ অস্বীকার করেছিল, সকল যুগের ইহুদীদের সঙ্গে নয়।

দ্বিতীয় ঃ এখানে এরূপ সন্দেহ করা ঠিক নয় যে, মন ও জিহ্বা উভয়টি দ্বারাই কামনা হতে পারে। ইহুদীরা সম্ভবতঃ মনে মনে মৃত্যুর কামনা করেছে। উত্তর এই যে, প্রথমতঃ আল্লাহ্র উক্তি وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ (কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না) এ সম্ভাবনাকে নাচক করে দিচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ তারা মনে মনে মৃত্যু কামনা করে থাকলে, তা অবশ্যই মুখেও প্রকাশ কতর। কারণ, এতে তাদেরই জয় হত এবং নবী করীম (সাঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার একটা সুযোগ পেয়ে যেত।

এরূপ সন্দেহও অমূলক যে, বোধ হয় তারা কামনা করেছে ; কিন্তু তার প্রচার হয়নি। কারণ, সর্বযুগেই ইসলামের শত্রু ও সমালোচকদের সংখ্যা ইসলামের মিত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যার চাইতে বেশী ছিল। এরূপ কোন ঘটনা ঘটে থাকলে তারা কি একে ফলাও করে প্রচার করত না যে, দেখ, তোমাদের নির্ধারিত সত্যের মাপকাঠিতেও আমরা পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছি।

আরবের মুশরিকরা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না। তাদের মতে বিলাস-ব্যসন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবই ছিল পার্থিব। এ কারণে তারা দীর্ঘায়ু কামনা করলে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। কিন্তু ইহুদীরা শুধু পরকালে বিশ্বাসীই ছিল না ; বরং তাদের ধারণামতে পরকালের যাবতীয় আরাম-আয়েস ও নেয়ামতরাজি তাদেরই প্রাপ্য ছিল। এরপরও তাদের পৃথিবীতে দীর্ঘায়ু কামনা করা বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কি ?

সুতরাং পরকালে বিশ্বাস সত্ত্বেও তাদের দীর্ঘায়ু কামনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পারলৌকিক নেয়ামত সম্পর্কিত তাদের দাবী সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য। প্রকৃত ব্যাপার তাদেরও ভালভাবে জানা রয়েছে যে, সেখানে পৌছলে জাহান্নামই হবে তাদের আবাসস্থল। তাই যতদিন বেঁচে থাকা যায়, ততদিনই মঙ্গল।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا
كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ
السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ؕ
وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا
تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ
زَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ
وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا
لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ
مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۞ وَلَوْ اَنَّهُمْ
اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَ
قُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞
مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ
اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ
بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۞

(১০২) তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ—যদি তারা জানত! (১০৩) যদি তারা ঈমান আনত এবং খোদাভীরু হত, তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পেত। যদি তারা জানত। (১০৪) হে মুমিনগণ, তোমরা 'রায়িনা' বলো না— 'উনযুরনা' বল এবং শুনতে থাক। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।(১০৫) আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের মনঃপুত নয় যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ্ মহান অনুগ্রহদাতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লেখিত আয়াতসমূহের তফসীর ও শানে-নযূল প্রসঙ্গে অনেক অসমর্থিত ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়। সেসব রেওয়ায়েত পাঠ করে অনেক পাঠকরে মনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। হাকীমুল উম্মত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ) সুস্পষ্ট ও সহজভঙ্গিতে এসব প্রশ্নের উত্তর দান করেছেন। তাঁর বর্ণনাকে যথেষ্ট মনে করে এখানে হুবহু উদ্ধৃত করে দিলাম।

(১) নির্বোধ ইহুদীরাই হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে জাদুকর বলে আখ্যায়িত করত, তাই আল্লাহ্ তাআলা আয়াতের মাঝখানে তাঁর নিস্কলুষতাও প্রকাশ করে দিয়েছেন।

(২) বর্ণিত আয়াতসমূহে ইহুদীদের নিন্দা করাই উদ্দেশ্য। কারণ, তাদের মধ্যে জাদুবিদ্যার চর্চা ছিল। এসব আয়াত সম্পর্কে পরামাসুন্দরী যোহ্‌রার একটি মুখরোচক কাহিনীও সুবিদিত রয়েছে। কাহিনীটি কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত নয়। শরীয়তের নীতি বিরুদ্ধ মনে করে অনেক আলেম কাহিনীটিকে নাকচ করে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ একে সদর্থে ব্যাখ্যা করা শরীয়ত বিরুদ্ধ মনে না করে নাকচ করেননি। বাস্তবে কাহিনীটি সত্য কি মিথ্যা, এখানে তা আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে এটা ঠিক যে, আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা কাহিনীর উপর নির্ভরশীল নয়।

(৩) সবকিছু জানা সত্ত্বেও ইহুদীরা আমল বা কাজ করত, 'এলম' বা জানার বিপরীত এবং এ ব্যাপারে তারা মোটেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিত না। তাই আয়াতে প্রথমে তাদের জানার সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং পরিশেষে 'যদি তরা জানত!' বলে না জানার কথাও বলা হয়েছে। কারণ, যে জানার সাথে তদনুরূপ কাজ ও বিচক্ষণতা যুক্ত হয় না, তা না জানারই শামিল।

(৪) ঠিক কখন, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য জানা না থাকলেও এক সময়ে পৃথিবীতে বিশেষ করে বাবেল শহরে জাদু-বিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। জাদুর অত্যাশ্চর্য ক্রিয়া দেখে মূর্খ লোকদের মধ্যে জাদু ও পয়গম্বরগণের মু'জেযার স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্তি দেখা দিতে থাকে। কেউ কেউ জাদুকরদেরও সজ্জন ও অনুসরণযোগ্য মনে করতে থাকে। এই বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশে আল্লাহ্ তাআলা বাবেল শহরে 'হারূত' ও 'মারূত' নামে দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাদের কাজ ছিল জাদুর স্বরূপ ও ভেল্কিবাজি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা— যাতে বিভ্রান্তি দূর হয় এবং জাদুর আমল ও জাদুকরদের অনুসরণ থেকে তারা বিরত থাকতে পারে। পয়গম্বরগণের নবুওয়তকে যেমন মু'জেযা ও নিদর্শনাদি দ্বারা প্রমাণ করে দেয়া হয়, তেমনি হারূত ও মারূত যে ফেরেশতা, তার উপর যুক্তি-প্রমাণ খাড়া করে দেয়া হল, যাতে তাদের নির্দেশাবলী জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

একাজে পয়গম্বরগণকে নিযুক্ত না করার কারণ এই যে, প্রথমতঃ এতে পয়গম্বর ও জাদুকরদের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল। এদিক দিয়ে তারা যেন ছিলেন একটি পক্ষ। কাজেই উভয়পক্ষকে বাদ দিয়ে তৃতীয় পক্ষকে বিচারক নিযুক্ত করাই বিধেয়।

দ্বিতীয়তঃ জাদুর বাক্যাবলী মুখে উচ্চারণ ও বর্ণনা ব্যতীত এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর ছিল না। যদিও 'কুফরে'র বর্ণনা কুফর নয়, এই স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী পয়গম্বরগণ তা করতে পারতেন, তথাপি হেদায়েতের প্রতীক হওয়ার কারণে একাজে তাঁদের নিযুক্তি সমীচীন মনে

করা হয়নি। এ কাজের জন্য ফেরেশতাই মনোনীত হন। কারণ, সৃষ্টি জগতে ফেরেশতাদের দ্বারা এমন কাজও নেয়া হয়, যা সামগ্রিক উপযোগিতার দিক দিয়ে ভাল, কিন্তু অনিষ্টের কারণে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে মন্দ। যেমন, কোন হিংস্র ও ইতর প্রাণীর লালন-পালন ও দেখাশুনা করা। সৃষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে একাজ সঠিক ও প্রশংসনীয়, কিন্তু জাগতিক কল্যাণ আইনের দৃষ্টিতে অঠিক ও নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে পয়গম্বরগণকে শুধু জাগতিক কল্যাণমূলক আইন তদারকের কাজেই নিযুক্ত করা হয়— যা সাধারণতঃ ভাল কাজেই হয়ে থাকে। উপরোক্ত জাদুর উচ্চারণ ও বর্ণনা উদ্দেশের দিক দিয়ে জাগতিক কল্যাণমূলক কাজ হলেও জাদুর আমলে লিপ্ত হয়ে পড়ার (যেমন, বাস্তবে হয়েছে) ক্ষীণ সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে পয়গম্বরগণকে এ থেকে দূরে রাখাই পছন্দ করা হয়েছে।

জাদু ও মু'জেযার পার্থক্য ঃ পয়গম্বরদের মু'জেযা ও ওলীদের কারামাত দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, জাদুর মাধ্যমেও বাহ্যত তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মূর্খ লোকেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে জাদুকরদেরকেও সম্মানিত ও মাননীয় মনে করতে থাকে। এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করা দরকার।

বলাবাহুল্য, প্রকৃত সত্তার দিক দিয়ে এবং বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সত্তার পার্থক্য এই যে, জাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ঘটনাবলীও কারণের আওতাবহির্ভূত নয়। পার্থক্য শুধু কারণটি দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে। যেখানে কারণ দৃশ্যমান, সেখানে ঘটনাকে কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয় এবং ঘটনাকে মোটেই বিস্ময়কর মনে করা হয় না। কিন্তু যেখানে কারণ অদৃশ্য, সেখানেই ঘটনাকে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক মনে করা হয়। সাধারণ লোক 'কারণ' না জানার দরুন এ ধরনের ঘটনাকে অলৌকিক মনে করতে থাকে। অথচ বাস্তবে তা অন্যান্য অলৌকিক ঘটনারই মত। কোন দূরপ্রাচ্য থেকে আজকের লেখা পত্র হঠাৎ সামনে পড়লে দর্শকমাত্রই সেটাকে অলৌকিক বলে আখ্যায়িত করবে। অথচ জ্বিন ও শয়তানরা এ জাতীয় কাজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। মোটকথা এই যে, জাদুর প্রভাবে দৃষ্ট ঘটনাবলীও প্রাকৃতিক কারণের অধীন। তবে কারণ অদৃশ্য হওয়ার দরুন মানুষ অলৌকিকতার বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।

মু'জেযার অবস্থা এর বিপরীত। মু'জেযা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্ তাআলার কাজ। এতে প্রাকৃতিক কারণের কোন হাত নেই। ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে নমরূদের জ্বালানো আগুনকে আল্লাহ্ তাআলাই আদেশ করেছিলেন, 'ইবরাহীমের জন্য সুশীতল হয়ে যাও।' কিন্তু এতটুকু শীতল নয় যে, ইবরাহীম কষ্ট অনুভব করে।' আল্লাহ্র এই আদেশের ফলে আগুন শীতল হয়ে যায়।

ইদানিং কোন কোন লোক শরীরে ভেষজ প্রয়োগ করে আগুনের ভেতরে চলে যায়। এটা মু'জেযা নয় ; বরং ভেষজের প্রতিক্রিয়া। তবে ভেষজটি অদৃশ্য, তাই মানুষ একে অলৌকিক বলে ধোকা খায়।

স্বয়ং কোরআনের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, মু'জেযা সরাসরি আল্লাহ্র কাজ। বলা হয়েছে –

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

অর্থাৎ— আপনি যে একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছিলেন। অর্থাৎ, এক মুষ্টি কঙ্কর যে সমবেত সবার চোখে পৌঁছে গেল, এতে আপনার কোন হাত ছিল না। এটা ছিল একান্তভাবেই আল্লাহ্র কাজ। এই মু'জেযাটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একমুষ্টি কঙ্কর কাফের বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন যা সবার চোখেই পড়েছিল।

মু'জেযা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ্র কাজ আর জাদু অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। এ প্রার্থক্যটিই মু'জেযা ও জাদুর স্বরূপ বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সাধারণ লোক এই পার্থক্যটি কিভাবে বুঝবে? কারণ, বাহ্যিক রূপ উভয়েরই এক। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সাধারণ লোকদের বোঝার জন্যেও আল্লাহ্ তাআলা কয়েকটি পার্থক্য প্রকাশ করেছেন।

প্রথমতঃ মু'জেযা ও কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাঁদের খোদাভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে থাকে। পক্ষান্তরে জাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহ্র যিক্র থেকে দূরে থাকে। এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মু'জেযা ও জাদুর প্রার্থক্য বুঝতে পারে।

দ্বিতীয়ত ঃ আল্লাহ্র চিরাচরিত রীতি এই যে, যে ব্যক্তি মু'জেযা ও নবুওত দাবী করে জাদু করতে চায়, তার জাদু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। অবশ্য নবুওয়তের দাবী ছাড়া জাদু করলে, তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পয়গম্বরগণের উপর জাদু ক্রিয়া করে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর হবে 'ইতিবাচক। কারণ, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, জাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। পয়গম্বরগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। এটা নবুওয়তের মর্যাদার পরিপন্থী নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পয়গম্বরগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন, রোগাক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভ করেন। তেমনিভাবে জাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হতে পারেন। সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর জাদু করেছিল এবং সে জাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং জাদুর প্রভাব দূরও করা হয়েছিল। মূসা (আঃ)-এর জাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া কোরআনেই উল্লেখিত রয়েছে — يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ এবং فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ

জাদুর কারণেই মূসা (আঃ) – এর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল।

শরীয়তে জাদু সম্পর্কিত বিধি বিধান

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় জাদু এমন অদ্ভুত কর্মকাণ্ড, যাতে কুফর, শিরক এবং পাপাচার অবলম্বন করে জ্বিন ও শয়তানকে সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য নেয়া হয়। কোরআনে বর্ণিত বাবেল শহরের জাদু ছিল তাই। – (জাস্সাস) এ জাদুকেই কোরআন কুফর বলে অভিহিত করেছে। আবু মনসূর (রহঃ) বলেন, বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, জাদুর সকল প্রকারই কুফর নয়; বরং যাতে ঈমানের পরিপন্থী কথাবার্তা এবং কাজকর্ম অবলম্বন করা হয়, তাই কুফর। — (রূহুল আনী)।

আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আপনার কোন জায়েয কাজ থেকে যদি অন্যরা নাজায়েয কাজের আশকারা পায়, তবে সে জায়েয কাজটিও আপনার পক্ষে জায়েয থাকবে না। উদাহরণতঃ কোন আলেমের কোন জায়েয কাজ দেখে যদি সাধারণ লোকেরা বিভ্রান্ত হয় এবং নাজায়েয কাজে লিপ্ত হয়, তবে সে আলেমের জন্য সে জায়েয কাজটিও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। তবে শর্ত এই যে, সংশ্লিষ্ট কাজটি শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী না হওয়া চাই। কোরআন ও হাদীসে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ
تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ
وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝ اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا
سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ
اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا
وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ
قَدِيْرٌ ۝ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا
لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
بَصِيْرٌ ۝ وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا
اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ۝ بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ
اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

(১০৬) আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ সব কিছুর উপর শক্তিমান? (১০৭) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌র জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য? আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। (১০৮) ইতিপূর্বে মূসা (আঃ) যেমন জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, (মুসলমানগণ,) তোমরাও কি তোমাদের রসূলকে তেমনি প্রশ্ন করতে চাও? যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (১০৯) আহ্‌লে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশতঃ চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোন রকমে কাফির বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)। যাক তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (১১০) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্যে পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহ্‌র কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষ করেন। (১১১) ওরা বলে, ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না। এটা ওদের মনের বাসনা। বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর। (১১২) হাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

ইহুদীদের দাবী ছিল দু'টি ঃ (এক) ইহুদীবাদ ইসলামের চাইতে শ্রেষ্ঠ। (দুই) তারা মুসলমানদের শুভাকাঙ্ক্ষী। প্রথম দাবীটি তারা প্রমাণ করতে পারেনি। নিছক দাবীতে কিছু হয় না। এছাড়া দাবীটি নিরর্থকও বটে। কারণ, 'নাসিখ' (যে রহিত করে) আগমন করলে 'মনসূখ' (যাকে রহিত করা হয়) বর্জনীয় হয়ে যায়। তা উত্তম ও অধমের পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল নয়। এই উত্তরটি সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত, এ কারণে আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়নি। আয়াতে শুধু দ্বিতীয় দাবীটি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুকে শক্তিশালী ও জোরদার করার উদ্দেশে আহ্‌লে-কিতাবদের সাথে মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুশরিকরা যেমন নিশ্চিতরূপেই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী নয়, তাদেরকেও তেমনি মনে কারো।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا —এই আয়াতে কোরআনী আয়াত রহিত হওয়ার সম্ভাব্য সকল প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে। অভিধানে 'নস্‌খ' শব্দের অর্থ দূর করা, লিখা। সমস্ত মুসলিম টীকাকার এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে 'নস্‌খ' শব্দ দ্বারা বিধি-বিধান দূর করা —অর্থাৎ, রহিত করাকে বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হাদীস ও কোরআনের পরিভাষায় এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে 'নস্‌খ' বলা হয়। 'অন্য বিধানটি' কোন বিধানের বিলুপ্তি ঘোষণাও হতে পারে, আবার এক বিধানের পরিতর্তে অপর বিধান প্রবর্তনও হতে পারে।

আল্লাহ্‌র বিধানে নস্‌খের স্বরূপ ঃ জগতের রাষ্ট্র ও আইন-আদালতে এক নির্দেশকে রহিত করে অন্য নির্দেশ জারী করার ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত। রচিত আইনে 'নস্‌খ' বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। (১) ভুল ধারণার উপর নির্ভর করে প্রথমে যদি কোন অইন প্রবর্তন করা হয়, তবে পরে বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হলে পূর্বেকার অইন পরিবর্তন করা হয়। (২) ভবিষ্যত অবস্থার গতি-প্রকৃতি জানা না থাকার কারণে কোন কোন সাময়িক আইন জারী করা হয়। পরে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সে আইনও পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু এ ধরনের নস্‌খ আল্লাহ্‌র আইনে হতে পারে বলে ধারণা করা যায় না।

তৃতীয় প্রকার 'নস্‌খ' এরূপ ঃ আইন-রচয়িতা আগেই জানে যে, অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন এই আইন আর উপযোগী থাকবে না, অন্য আইন জারী করতে হবে। এরূপ জানার পর সাময়িকভাবে এই আইন জারী করে দেন, পরে পূর্বজ্ঞান আনুযায়ী যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তখন পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনও পরিবর্তন করেন। উদাহরণতঃ রোগীর বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র দেন। তিনি জানেন, যে, এই ওষুধ দু'দিন সেবন করার পর রোগীর অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন অন্য ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে। অবস্থার এহেন পরিবর্তন জানার ফলেই চিকিৎসক প্রথম দিন এক ওষুধ এবং পরে অন্য ওষুধ দেন।

অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথম দিনেই পরিবর্তনসহ চিকিৎসার পূর্ণ প্রোগ্রাম কাগজে লিখে দিতে পারে যে, দুদিন এই ওষধ, তিন দিন অন্য ওষুধ এবং এক সপ্তাহ পর অমুক ওযুধ সেব্য। কিন্তু এরূপ করা হলে রোগীর পক্ষে জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এতে ভুল বোঝাবুঝির

কারণে ত্রুটিরও আশঙ্কা থাকে। তাই ডাক্তার প্রথম দিনেই পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন না।

আল্লাহ্র আইনে এবং আসমানী গ্রন্থসমূহে শুধুমাত্র তৃতীয় প্রকার নসখই হতে পারে এবং হয়ে থাকে। প্রতিটি নবুওয়ত ও প্রতিটি আসমানী গ্রন্থ পূর্ববর্তী নবুওত ও আসমানী গ্রন্থের বিধান নস্খ তথা রহিত করে নতুন বিধান জারী করেছে। এমনিভাবে একই নবুওয়ত ও শরীয়তে এমন রয়েছে যে, এক বিধান কিছু দিন প্রচলিত থাকার পর খোদায়ী হেকমত অনুযায়ী সেটি পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে আছেঃ لم تكن نبوة قط الا تناسخت – অর্থাৎ, এমন নবুওয়ত কখনও ছিল না, যাতে নস্খ ও পরিবর্তন করা হয়নি। –(কুরতুবী) বিধান পরিবর্তন সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য উসূলে ফেকাহ দ্রষ্টব্য)

এখানে 'অন্যায় আবদার' বলার কারণ এই যে, প্রতিটি কাজেই আল্লাহ্ তাআলার হেকমত ও উপযোগিতা নিহিত থাকে। তাতে পন্থা নির্দেশ করার কোন অধিকার বান্দার নেই যে, সে বলবে, একাজটি এভাবে করা হোক।

জ্ঞাতব্য ঃ তখনকার অবস্থানুযায়ী ক্ষমার নির্দেশই ছিল বিধেয়। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন এবং জেহাদের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর ইহুদীদের প্রতিও আইন বলবৎ করা হয় এবং অপরাধের ক্রমানুপাতে দুষ্টদের হত্যা, নির্বাসন, জিযিয়া আরোপ ইত্যাদি শাস্তি দেয়া হয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের পারস্পরিক মতবিরোধের উল্লেখ করে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও মতবিরোধের কুফল বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আসল সত্য উদঘাটন করেছেন। এসব ঘটনায় মুসলমানদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত (পথনির্দেশ) নিহিত রয়েছে যা পরে বর্ণিত হবে।

খ্রীষ্টান ও ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মের প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করে ধর্মের নাম-ভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে তুলেছিল এবং তারা প্রত্যেকেই স্বজাতিকে জান্নাতি ও আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র বলে দাবী করতো এবং তাদের ছাড়া অন্যান্য সমস্ত জাতিকে জাহান্নামী ও পথভ্রষ্ট বলে বিশ্বাস করত।

এ অযৌক্তিক মতবিরোধের ফলশ্রুতিতেই মুশরিকরা একথা বলার সুযোগ পেল যে, খ্রীষ্টধর্ম ও ইহুদীধর্ম উভয়টিই মিথ্যা ও বানোয়াট এবং ওদের মূর্তি পূজাই একমাত্র সত্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম।

আল্লাহ তাআলা উভয় সম্প্রাদায়ের মূর্খতা সম্পর্কে মন্তব্য করছেন যে, এরা উভয় জাতিই জান্নাতে যাওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে উদাসীন; তারা শুধু ধর্মের নাম ভিত্তিক জাতীয়তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ ইহুদী-খ্রীষ্টান অথবা ইসলাম যে কোন ধর্ম হোক, সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে দু'টি বিষয়ঃ

(এক) বান্দা মনে-প্রাণে নিজেকে আল্লাহ্র কাছে সমর্পন করবে। তাঁর আনুগত্যকেই নিজের মত ও পথ মনে করবে। এ উদ্দেশ্যটি যে ধর্মে অর্জিত হয় তা'ই প্রকৃত ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে পেছনে ফেলে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান জাতীয়তাবাদের ধ্বজা ধরে থাকা ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

(দুই) যদি কেউ মনে-প্রাণে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যের সংকল্প গ্রহণ করে কিন্তু আনুগত্য ও এবাদত নিজ খেয়াল-খুশীমত মনগড়া পন্থায় সম্পাদন করে, তবে তাও জান্নাতে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়, বরং এক্ষেত্রেও আনুগত্য ও এবাদতের সে পন্থাই অবলম্বন করতে হবে, যা আল্লাহ্ তাআলা রসূলের মাধ্যমে বর্ণনা ও নির্ধারণ করেছে।

প্রথম বিষয়টি بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ বাক্যাংশের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি وَهُوَ مُحْسِنٌ বাক্যাংশের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এতে জানা গেল যে, পারলৌকিক মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য আনুগত্যের সংকল্পই যথেষ্ট নয়, বরং সৎকর্মও প্রয়োজন। বস্তুতঃ কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নাহ্র সাথে সামঞ্জস্যশীল শিক্ষা ও পন্থাই সৎকর্ম।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى
لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ
الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ
مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ
اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ لَهُمْ فِي
الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ
عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿١١٦﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَ
اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ
لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ
قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ
قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿١١٨﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ
بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿١١٩﴾

(১১৩) ইহুদীরা বলে, খ্রীস্টানরা কোন ভিত্তির উপরেই নয় এবং খ্রীস্টানরা বলে, ইহুদীরা কোন ভিত্তির উপরেই নয়। অথচ ওরা সবাই কিতাব পাঠ করে। এমনিভাবে যারা মূর্খ, তার ও ওদের মতই উক্তি করে। অতএব, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল। (১১৪) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড় যালেম আর কে? এদের পক্ষে মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধেয় নয়, অবশ্য ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়। ওদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। (১১৫) পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ্ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। (১১৬) তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব কিছু থেকে পবিত্র, বরং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর আজ্ঞাধীন (১১৭) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও', তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। (১১৮) যারা কিছু জানে না, তারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন না। অথবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন কেন আসে না? এমনিভাবে তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও তাদেরই অনুরূপ কথা বলেছে। তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয় আমি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি তাদের জন্যে, যারা প্রত্যয়শীল। (১১৯) নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। আপনি দোযখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্‌র কাছে বংশগত ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানের কোন মূল্য নেই; গ্রহণীয় বিষয় হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম ঃ ইহুদী হউক, অথবা খ্রীষ্টান কিংবা মুসলমান— যে কেউ উপরোক্ত মৌলিক বিষয়াদির মধ্য থেকে কোন একটি ছেড়ে দেয়, অতঃপর শুধু নামভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নিজেদেরকে জান্নাতের একমাত্র উত্তরাধিকারী মনে করে নেয়, সে আত্ম প্রবঞ্চনা বৈ কিছুই করে না; আসল সত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব নামের উপর ভরসা করে কেউ আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী ও মকবুল হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার মধ্যে ঈমান ও সৎকর্ম থাকে।

প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তেই ঈমানের মূলনীতি এক ও অভিন্ন। তবে সৎকর্মের আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। তওরাতের যুগে যেসব কাজকর্ম মূসা (আঃ) ও তওরাতের শিক্ষার অনুরূপ ছিল, তা'ই ছিল সৎকর্ম। তদ্রূপ ইঞ্জীলের যুগে নিশ্চিতরূপে তা'ই ছিল সৎকর্ম, যা হযরত ঈসা (আঃ) ও ইঞ্জীলের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এখন কোরআনের যুগে ঐসব কার্যকলাপই সৎকর্ম রূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, যা সর্বশেষ পয়গম্বর (সাঃ)-এর বাণী ও তৎকর্তৃক আনীত গ্রন্থ কোরআন মজীদের হেদায়েতের অনুরূপ।

মোটকথা, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মতবিরোধ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার ফয়সালা এই যে, উভয় সম্প্রাদায় মূর্খতাসুলভ কথাবার্তা বলেছে, তাদের কেউই জান্নাতের ইজারাদার নয়। তাদের কারও ধর্ম ভিত্তিহীন ও বানোয়াট নয়; বরং উভয় ধর্মের নির্ভুল ভিত্তি রয়েছে। ভুল বোঝাবুঝির প্রকৃত কারণ হচ্ছে এই যে, ওরা ধর্মের আসল প্রাণ অর্থাৎ বিশ্বাস, সৎকর্ম ও সত্য মতবাদকে বাদ দিয়ে বংশ অথবা দেশের ভিত্তিতে কোন সম্প্রদায়কে ইহুদী আর কোন সম্প্রাদায়কে খ্রীষ্টান নামে অভিহিত করেছে।

যারা ইহুদীদের বংশধর অথবা ইহুদী নগরীতে বাস করে অথবা আদমশুমারীতে নিজেকে ইহুদী বলে প্রকাশ করে, তাদেরকেই ইহুদী মনে করে নেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে খ্রীষ্টানদের পরিচিতি ও সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে। অথচ ঈমানের মূলনীতি ভঙ্গ করে এবং সৎকর্ম থেকে বিমুখ হয়ে কোন ইহুদীই ইহুদী এবং কোন খ্রীষ্টানই খ্রীষ্টান থাকতে পারে না।

কোরআন মজীদে আহ্‌লে-কিতাবদের মতবিরোধ ও আল্লাহ্‌র ফয়সালা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের সতর্ক করা, যাতে তারাও ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়ে একথা না বলে যে, আমরা পুরুষানুক্রমে মুসলমান, প্রত্যেক অফিসে ও রেজিষ্টারে আমাদের নাম মুসলমানদের কোটায় লিপিবদ্ধ এবং আমরা মুখেও নিজেদের মুসলমান বলি, সুতরাং জান্নাত এবং নবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে ওয়াদাকৃত সকল পুরস্কারের যোগ্য হকদার আমরাই।

এই ফয়সালা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধু দাবী করলে, মুসলমানরূপে নাম লিপিবদ্ধ করালে অথবা মুসলমানের ঔরসে কিংবা মুসলমানদের আবাসভূমিতে জন্মগ্রহণ করলেই প্রকৃত মুসলমান হয় না, বরং মুসলমান হওয়ার জন্যে পরিপূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ করা অপরিহার্য। ইসলামের অর্থ আত্মসমর্পণ। দ্বিতীয়তঃ সৎকর্ম অর্থাৎ, সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমল করাও জরুরী।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কোরআন মজীদের এই হুশিয়ারী সত্ত্বেও অনেক মুসলমান উপরোক্ত ইহুদী ও খ্রীষ্টানী ভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছে। তারা আল্লাহ্, রসূল, পরকাল ও কেয়ামতের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে বংশগত মুসলমান হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করতে শুরু করেছে। কোরআন

ও হাদীসে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য সম্পর্কে মুসলমানদের সাথে যেসব অঙ্গীকার করা হয়েছে, তারা নিজেকে সেগুলোর যোগ্য হকদার মনে করে সেগুলোর পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করছে। অতঃপর সেগুলো পূর্ণ হওয়ার লক্ষণ দেখতে না পেয়ে কোরআন ও হাদীসের অঙ্গীকার সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। তারা লক্ষ্য করে না যে, কোরআন নিছক বংশগত মুসলমানদের সাথে কোন অঙ্গীকার করেনি— যতক্ষণ না তারা নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর ইচ্ছার অধীন করে দেয়। بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ আয়াতের সারমর্ম তাই।

আজকাল সমগ্র বিশ্বের মুসলমান নানাবিধ বিপদাপদ ও সঙ্কটে নিমজ্জিত। অনেক অর্বাচীনের ধারণা, এ অবস্থার জন্যে সম্ভবতঃ আমাদের ইসলামই দায়ী। কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইসলাম নয় বরং ইসলামকে পরিহার করাই এর জন্য দায়ী। আমরা ইসলামের শুধু নামটুকু রেখেছি; আমাদের মধ্যে ইসলামের বিশ্বাস, চরিত্র, আমল ইত্যাদি কিছুই নেই।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আমরা যাই আছি, ইসলামেরই নাম নেই এবং আল্লাহ্ তাআলা ও রসূল (সাঃ)-কেই স্মরণ করি। পক্ষান্তরে যেসব কাফের খোলাখুলিভাবে আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ইসলামের নাম মুখে উচ্চারণ করাও পছন্দ করে না, তারাই আজ বিশ্বের বুকে সব দিক দিয়ে উন্নত, তারাই বিশাল রাষ্ট্রের অধিকারী এবং তারাই বিশ্বের শিল্প ও ব্যবসায়ের একচ্ছত্র অধিপতি। দুষ্কর্মের শাস্তি হিসেবেই যদি আজ আমরা সর্বত্র লাঞ্ছিত ও পদদলিত, তবে কাফের ও পাপাচারীদের সাজা আরও বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলেই এ প্রশ্নেরও অবসান হয়ে যায়।

প্রথমতঃ এর কারণ এই যে, মিত্র ও শত্রুর সাথে একই রকম ব্যবহার করা হয় না। মিত্রের দোষ পদে পদে ধরা হয়। নিজ সন্তান ও শিষ্যকে সামান্য বিষয়ে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু শত্রুর সাথে তেমনি ব্যবহার করা হয় না। তাকে অবকাশ দেয়া হয় এবং সময় আসলে হঠাৎ পাকড়াও করা হয়।

মুসলমান যতক্ষণ ঈমান ও ইসলামের নাম উচ্চারণ করে, আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও ভালবাসা দাবী করে, ততক্ষণ সে বন্ধুরই তালিকাভুক্ত থাকে। ফলে তার মন্দ আমলের সাজা সাধারণতঃ দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়— যাতে পরকালের বোঝা কিছুটা হলেও হালকা হয়ে যায়। কাফেরের অবস্থা এর বিপরীত। সে বিদ্রোহী ও শত্রুর আইনের অধীন। দুনিয়াতে হালকা শাস্তি দিয়ে তার শাস্তির মাত্রা হ্রাস করা হয় না। তাকে পুরোপুরি শাস্তির মধ্যেই নিক্ষেপ করা হবে। 'দুনিয়া মুমিনের জন্যে বন্দীশালা, আর কাফেরদের জন্যে জান্নাত।'— মহানবী (সাঃ)-এর এ উক্তির তাৎপর্যও তাই।

মুসলমানদের অবনতি ও অস্থিরতা এবং কাফেরদের উন্নতি ও প্রশান্তির মূলে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক কর্মের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এক কর্ম দ্বারা অন্য কর্মের বৈশিষ্ট্য অর্জিত হতে পারে না। উদাহরণতঃ ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আর্থিক উন্নতি আর ওষুধপত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শারীরিক সুস্থতা। এখন যদি কেউ দিবারাত্র ব্যবসায়ে মগ্ন থাকে, অসুস্থতা ও তার চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ না দেয়, তবে শুধু ব্যবসায়ের কারণে সে রোগের কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে না। এমনিভাবে কেউ ওষুধপত্র ব্যবহার করেই ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ, আর্থিক উন্নতি লাভ করতে পারে না। কাফেরদের পার্থিব উন্নতি এবং আর্থিক প্রাচুর্য তাদের কুফরের ফলশ্রুতি নয়, যেমন মুসলমানদের দারিদ্র্য ও অস্থিরতা ইসলামের ফলশ্রুতি নয়। বরং কাফেররা যখন পরকালের চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে পরিপূর্ণভাবে জাগতিক অর্থ-সম্পদ ও আরাম-আয়েশের পেছনে আত্মনিয়োগ করেছে— ব্যবসা শিল্প, কৃষি ও রাজনীতির লাভজনক পন্থা অবলম্বন করছে এবং ক্ষতিকর পন্থা থেকে বিরত থাকছে, তখনই তারা জগতে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে। তারাও যদি আমাদের মত ধর্মের নাম নিয়ে বসে থাকত এবং জাগতিক উন্নতির লক্ষ্যে যথাবিহিত চেষ্টা-সাধণা না করত, তবে তাদের কুফর তাদেরকে অর্থ-সম্পদ ও রাষ্ট্রের মালিক বানাতে পারত না। এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে, আমাদের (তথাকথিত নামের) ইসলাম আমাদের সামনে সকল বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে? ইসলাম ও ঈমাম সঠিক মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তার আসল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পারলৌকিক মুক্তি ও জান্নাতের অফুরন্ত শান্তি। উপযুক্ত চেষ্টা-সাধণা না করা হলে ইসলাম ও ঈমানের ফলশ্রুতিতে জগতে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের প্রাচুর্য লাভ করা অবশ্যম্ভাবী নয়।

একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যে কোন দেশে যে কোন মুসলমান যদি ব্যবসা, শিল্প ও রাজনীতির বিশুদ্ধ মূলনীতি শিক্ষা করে তদনুযায়ী কাজ করে, তবে সেও কাফেরদের অর্জিত জাগতিক ফলাফল লাভে বঞ্চিত হয় না।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপে অবলম্বন না করলে শুধু বংশগতভাবে ইসলামের নাম ব্যবহারের দ্বারা কোন শুভ ফল আশা করা যায় না।

আলোচ্য ১১৪ ও ১১৫ নং আয়াতদ্বয়ে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

ঘটনাটি এই যে, ইসলাম-পূর্বকালে ইহুদীরা হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-কে হত্যা করলে খ্রীষ্টানরা তার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। তারা ইরাকের একজন অগ্নি-উপাসক সম্রাটের সাথে মিলিত হয়ে সম্রাট তায়তাসের নেতৃত্বাধীন সিরিয়ার ইহুদীদের উপর আক্রমণ চালায়— তাদের হত্যা ও লুণ্ঠন করে, তওরাতের কপিসমূহ জ্বালিয়ে ফেলে, বায়তুল মোকাদ্দাসে আবর্জনা ও শূকর নিক্ষেপ করে, মসজিদের প্রাচীর ক্ষত-বিক্ষত করে সমগ্র শহরটিকে জন-মানবহীন বিরানায় পরিণত করে দেয়। এতে ইহুদীদের শক্তি পদদলিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মহানবী (সাঃ)-এর আমল পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাস এমনিভাবে পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল।

ফারূকে আযম হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত আমলে যখন সিরিয়া ও ইরাক বিজিত হয়, তখন তাঁরই নির্দেশক্রমে বায়তুল-মোকাদ্দাস পুনঃনির্মিত হয়। এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমস্ত সিরিয়া ও বায়তুল-মোকাদ্দাস মুসলমানদের অধিকারে ছিল। অতঃপর বায়তুল-মোকাদ্দাস মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয় এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পর্যন্ত ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের অধিকারে থাকে। অবশেষে হিজরী ষষ্ঠ শতকে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়্যূবী বায়তুল-মোকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেন।

এ আয়াত থেকে কতিপয় প্রয়োজনীয় মাসআলা এবং বিধানও প্রমাণিত হয়।

প্রথমতঃ শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। বায়তুল-মোকাদ্দাস, মসজিদে-হারাম ও মসজিদে-নবভীর অবমাননা, যেমনি বড় যুলুম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা

সমভাবে প্রযোজ্য। তবে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত। মসজিদে-হারামে এক রাকাআত নামাযের সওয়াব একলক্ষ রাকাআত নামাযের সমান এবং মসজিদেনবভী ও বায়তুল-মোকাদ্দাসে পঞ্চাশ হাজার রাকাআত নাযের সমান। এই তিন মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে সেখানে পৌছা বিরাট সওয়াব ও বরকতের বিষয়। কিন্তু অন্য কোন মসজিদে নামায পড়া উত্তম মনে করে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসতে বারণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদে যিকর ও নামাযে বাধা দেয়ার যত পন্থা হতে পারে সে সবগুলোই হারাম। তন্মধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা এই যে, মসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে নামায ও তেলাওয়াত করতে পরিস্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মসজিদে হট্টগোল করে অথবা আশে-পাশে গান-বাজনা করে মুসল্লীদের নামায ও যিকরে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

এমনিভাবে নামাযের সময়ে যখন মুসল্লীরা নফল নামায, তসবীহ্, তেলাওয়াত ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকেন, তখন মসজিদে সরবে তেলাওয়াত ও যিকর করা এবং নামাযীদের নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করাও বাধা প্রাদনেরই নামান্তর। এ কারণেই ফিকাহ্‌বিদগণ একে না-জায়েয আখ্যা দিয়েছেন। তবে, মসজিদে যখন মুসল্লী না থাকে, তখন সরবে যিকর অথবা তেলাওয়াত করায় দোষ নেই।

এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, যখন মুসল্লীরা নামায, তসবীহ্ ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে, তখন মসজিদে নিজের জন্যে অথবা কোন ধর্মীয় কাজের জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করাও নিষিদ্ধ।

তৃতীয়তঃ মসজিদ জনশূন্য করার জন্য সম্ভবপর যত পন্থা হতে পারে সবই হারাম। খোলাখুলিভাবে মসজিদকে বিধ্বস্ত করা ও জনশূন্য করা যেমনি এর অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়ে। মসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ এই যে, সেখানে নামায পড়ার জন্যে কেউ আসে না কিংবা নামাজীর সংখ্যা হ্রাস পায়।

মোটকথা, وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ আয়াতটিতে কেবলামুখী হওয়ার পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, এর উদ্দেশ্য (নাউযুবিল্লাহ্) বায়তুল্লাহ্ অথবা বায়তুল-মোকাদ্দাসের পূজা করা নয়, কিংবা এ'দুটি স্থানের সাথে আল্লাহ্র পবিত্র সত্তাকে সীমিত করে নেয়াও নয়। তাঁর সত্তা সমগ্র বিশ্বকে বেষ্টন করে রেখেছে এবং সর্বত্রই তাঁর মনোযোগ সমান। এরপরও বিভিন্ন তাৎপর্যের কারণে বিশেষ স্থান অথবা দিককে কেবলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

আয়াতের এই বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট ও অন্তরে বদ্ধমূল করার উদ্দেশেই সম্ভবতঃ হুযুরে আকরাম (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামকে হিজরতের প্রথম দিকে ষোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার আদেশ দেয়া হয়। এভাবে কার্যতঃ বলে দেয়া হয় যে, আমার মনোযোগ সর্বত্র রয়েছে। নফল নামাযসমূহের এক পর্যায়ে এই নির্দেশ অব্যাহত রাখা হয়েছে। সফরে কোন ব্যক্তি উট, ঘোড়া ইত্যাদি যানবাহনে সওয়ার হয়ে পথ চললে তাকে তদবস্থায় ইশারায় নফল নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার জন্য যানবাহন যেদিকে চলে সেদিকে মুখ করাই যথেষ্ট।

কোন কোন মুফাস্সীর فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ আয়াতকে এই নফল নামাযেরই বিধান বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই বিধান সে সমস্ত যানবাহনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাতে সওয়ার হয়ে চলার সময় কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন। পক্ষান্তরে যেসব যানবাহনে সওয়ার হলে কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন নয়, যেমন রেলগাড়ী, সামুদ্রীক জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে নফল নামাযেও কেবলার দিকেই মুখ করতে হবে। তবে নামাযরত অবস্থায় রেলগাড়ী অথবা জাহাজের দিক পরিবর্তন হয়ে গেলে এবং আরোহীর পক্ষে কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ না থাকলে তদবস্থায়ই নামায পূর্ণ করবে।

এমনিভাবে কেবলার দিক সম্পর্কে নামাযীর জানা না থাকলে, রাত্রির অন্ধকারে দিক নির্ণয় করা কঠিন হলে এবং বলে দেয়ার লোক না থাকলে সেখানেও নামাযী অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকই তার কেবলা বলে গণ্য হবে। নামায আদায় করার পর যদি দিকটি ভ্রান্তও প্রমাণিত হয়, তবুও তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে— পূণর্বার পড়তে হবে না।

জ্ঞাতব্য ঃ (১) বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ফেরেশতা নিযুক্ত করা— যেমন, বৃষ্টিবর্ষণ ও রিযিক পৌছানো ইত্যাদি কোন না কোন রহস্যের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন উপকরণ ও শক্তিকে কাজে লাগানোও তেমনি। এর কোনটিই এজন্যে নয় যে, মানুষ এগুলোকে ক্ষমতাশালী স্বীকার করে তাদের কাছে সাহায্য চাইবে।

(২) ইমাম বায়যাভী বলেন ঃ পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে আদি কারণ হওয়ার দরুন আল্লাহ্‌কে 'পিতা' বলা হত। একেই মূর্খেরা জন্মদাতা অর্থে বুঝে নিয়েছে। ফলে এরূপ বিশ্বাস করা অথবা বলা কুফর সাব্যস্ত হয়েছে। অনিষ্টের ছিদ্রপথ বন্ধ করার লক্ষ্যে বর্তমানেও এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের অনুমতি নেই।

জ্ঞাতব্য ঃ ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা ছিল আসমানী কিতাবের অধিকারী। তাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকও ছিল। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা তাদের মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, প্রচুর অকাট্য ও শক্তিশালী নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করা সত্ত্বেও সেগুলো অস্বীকার মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তাদেরকে মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ
قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ
الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٢٠﴾
اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ
بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٢١﴾ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ
اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾
وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٣﴾ وَاِذِ ابْتَلٰٓى
اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٤﴾ وَاِذْ جَعَلْنَا
الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ
اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُوْدِ ﴿١٢٥﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ
اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ
كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾

(১২০) ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ্ প্রদর্শন করেন, তা'ই হল সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহ্র কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই। (১২১) আমি যাদেরকে গ্রন্থ দান করেছি, তারা তা যথাযথভাবে পাঠ করে। তারাই তৎপ্রতি বিশ্বাস করে। আর যারা তা অবিশ্বাস করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (১২২) হে বনী-ইসরাঈল! আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (১২৩) তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও সুপারিশ ফলপ্রদ হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (১২৪) যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না। (১২৫) যখন আমি কা'বাগৃহকে মানুষের জন্যে সম্মিলন স্থল ও শান্তির আলয় করলাম, আর তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখ। (১২৬) যখন ইবরাহীম বললেন, পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে তুমি শান্তিধাম কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ফলের দ্বারা রিযিক দান কর। বললেন ঃ যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরও কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ দেবো, অতঃপর তাদেরকে বলপ্রয়োগে দোযখের আযাবে ঠেলে দেবো; সেটা নিকৃষ্ট বাসস্থান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক পয়গম্বর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বিভিন্ন পরীক্ষা, তাতে তাঁর সাফল্য এবং পুরস্কার ও প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। হযরত খলীলুল্লাহ্ যখন স্নেহপরবশ হয়ে স্বীয় সন্তান-সন্ততির জন্যেও এ পুরস্কারের প্রার্থনা জানালেন, তখন পুরস্কার লাভের জন্যে একটি নিয়ম-নীতিও বলে দেয়া হল। এতে হযরত খলীলুল্লাহ্র প্রার্থনাকে শর্তসাপেক্ষে মঞ্জুর করে বলা হয়েছে যে, আপনার বংশধরগণও এই পুরস্কার পাবে, তবে তাদের মধ্যে যারা অবাধ্য ও যালেম হবে, তারা এ পুরস্কার পাবে না।

হযরত খলীলুল্লাহ্র পরীক্ষাসমূহ ও পরীক্ষার বিষয়বস্তু ঃ এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমতঃ যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশেই সাধারণতঃ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা সর্বজ্ঞ। কারও কোন অবস্থা অথবা গুণ-বৈশিষ্ট্যই তাঁর অজানা নয়। এমতাবস্থায় এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল?

দ্বিতীয়ত ঃ কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে?

তৃতীয়তঃ কি ধরনের সাফল্য হয়েছে?

চতুর্থতঃ কি পুরস্কার দেয়া হল?

পঞ্চমতঃ পুরস্কারের জন্য নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতির কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। এই পাঁচটি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর লক্ষ্য করুন ঃ

প্রথমতঃ পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল? কোরআনের একটি শব্দ رب (তাঁর পালনকর্তা) এ প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এ পরীক্ষার পরীক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা। আর তাঁর 'আসমায়ে হুসনার' মধ্য থেকে এখানে 'রব' (পালনকর্তা) নামটি ব্যবহার করে রবুবিয়্যাতের (পালনকর্তৃত্বের) দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর অর্থ কোন বস্তুকে ধীরে ধীরে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এই পরীক্ষা কোন অপরাধের সাজা হিসেবে কিংবা অজ্ঞাত যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশে ছিল না; বরং এর উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষার মাধ্যমে স্বীয় বন্ধুর লালন করে তাঁকে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো। অতঃপর আয়াতে কর্মকে পূর্বে এবং কারককে পরে উল্লেখ করে ইবরাহীম (আঃ)-এর মহত্ত্বকে আরও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে? এ সম্পর্কে কোরআনে শুধু كلمات (বাক্যসমূহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীদের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ খোদায়ী বিধানসমূহের মধ্য থেকে দশটি, কেউ ত্রিশটি এবং কেউ কমবেশী অন্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এতে কোন বিরোধ নেই, বরং সবগুলোই ছিল হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্র পরীক্ষার বিষয়বস্তু। প্রখ্যাত তফসীরকার ইবনে-জরীর ও ইবনে কাসীরের অভিমত তাই।

আল্লাহ্র কাছে সূক্ষ্মদর্শিতার চাইতে চারিত্রিক দৃঢ়তার মূল্য বেশীঃ পরীক্ষার এসব বিষয়বস্তু পাঠশালায় অধীত জ্ঞান-অভিজ্ঞতার যাচাই কিংবা তৎসম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ছিল না, বরং তা ছিল চারিত্রিক মূল্যবোধ এবং কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়তা যাচাই করা। এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র দরবারে যে বিষয়ের মূল্য বেশী, তা শিক্ষাবিষয়ক সূক্ষ্মদর্শিতা নয়, বরং কার্যগত ও চরিত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব।

এ ধরনের পরীক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ঃ

আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা ছিল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে স্বীয় বন্ধুত্বের বিশেষ মূল্যবান পোশাক উপহার দেয়া। তাই তাঁকে বিভিন্ন রকম কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। সমগ্র জাতি, এমন কি তাঁর আপন পরিবারের সবাই মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। সবার বিশ্বাস ও রীতিনীতির বিপরীত একটি সনাতন ধর্ম তাঁকে দেয়া হয়। জাতিকে এ ধর্মের দিকে আহবান জানানোর গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে অর্পন করা হয়। তিনি পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মাধ্যমে নির্ভয়ে জাতিকে এক আল্লাহ্র দিকে আহবান জানান। বিভিন্ন পন্থায় তিনি মূর্তি পূজার নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে কার্যক্ষেত্রে তিনি মূর্তিসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। ফলে সমগ্র জাতি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। বাদশাহ্ নমরূদ ও তার পারিষদবর্গ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ্র খলীল প্রভুর সন্তুষ্টির জন্যে এসব বিপদাপদ সত্ত্বেও হাসিমুখে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপের জন্যে পেশ করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বন্ধুকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখে আগুনকে নির্দেশ প্রদান করলেন ঃ

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

অর্থাৎ, আমি হুকুম দিয়ে দিলাম ঃ হে অগ্নি, ইবরাহীমের উপর সুশীতল ও নিরাপত্তার কারণ হয়ে যাও।

নমরূদের আগুন সম্পর্কিত এ নির্দেশের মধ্যে ভাষা ছিল ব্যাপক। বস্তুতঃ কোন বিশেষ স্থানে আগুনকে নির্দিষ্ট করে এ নির্দেশ দেয়া হয়নি। এ কারণে সমগ্র বিশ্বে যেখানেই আগুন ছিল, এ নির্দেশ আসা মাত্রই স্ব স্ব স্থানে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নমরূদের আগুন- এর আওতায় পড়ে শীতল হয়ে গেল।

কোরআনে بَرْدًا (শীতল) শব্দের সাথে سَلَامًا (নিরাপদ) শব্দটি যুক্ত করার কারণ এই যে, কোন বস্তু সীমাতিরিক্ত শীতল হয়ে গেলে তাও বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়ক, বরং মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। سَلَامًا বলা না হলে অগুন বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়কও হয়ে যেতে পারত।

এ পরীক্ষা সমাপ্ত হলে জন্মভূমি ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া হয়। ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় স্বগোত্র ও মাতৃভূমিকেও হাসিমুখে ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনসহ সিরিয়ায় হিজরত করলেন।

মাতৃভূমি ও স্বজাতি ত্যাগ করে সিরিয়ায় অবস্থান শুরু করতেই নির্দেশ এল, বিবি হাজেরা (রাঃ) ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকেও স্থানান্তরে গমন করুন।—(ইবনে-কাসীর)

জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং তাঁদের সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে কোন শস্যশ্যামল বনানী আসলেই হযরত খলীল বলতেন, এখানে অবস্থান করানো হোক। জিবরাঈল (আঃ) বলতেন, এখানে অবস্থানের নির্দেশ নেই— গন্তব্যস্থল সামনে রয়েছে। চলতে চলতে যখন শুষ্ক পাহাড় ও উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তর এসে গেল (যেখানে ভবিষ্যতে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ ও মক্কা নগরী আবাদ করা লক্ষ্য ছিল), তখন সেখানেই তাঁদের থামিয়ে দেয়া হল। আল্লাহ্র বন্ধু স্বীয় পালনকর্তার মহব্বতে মত্ত হয়ে এই জনশূন্য তৃণলতাহীন প্রান্তরেই বসবাস আরম্ভ করলেন। কিন্তু পরীক্ষার এখানেই শেষ হল না। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) নির্দেশ পেলেন যে, বিবি হাজেরা ও শিশুকে এখানে রেখে নিজে সিরিয়ায় ফিরে যাও। আল্লাহ্র বন্ধু নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা পালন করতে তৎপর হলেন এবং সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। 'আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক আমি চলে যাচ্ছি'— বিবিকে এতটুকু কথা বলে যাওয়ার দেরীও তিনি সহ্য করতে পারলেন না। হযরত হাজেরা তাঁকে চলে যেতে দেখে কয়েকবার ডেকে অবশেষে কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ জন-মানবহীন প্রান্তরে আমাদের একা ফেলে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? কিন্তু হযরত ইবরাহীম নির্বিকার— কোন উত্তর নেই। অবশ্য হাজেরাও ছিলেন খলিলুল্লাহরই সহধর্মিনী! ব্যাপার বুঝে ফেললেন। ডেকে বললেন, আপনি কি আল্লাহ্র কোন নির্দেশ পেয়েছেন? হযরত ইবরাহীম বললেন, হাঁ! খোদায়ী নির্দেশের কথা জানতে পেরে হযরত হাজেরা খুশীমনে বললেন,— যান। যে প্রভু আপনাকে চলে যেতে বলেছেন, তিনি আমাদের ধ্বংস হতে দেবেন না।

অতঃপর হযরত হাজেরা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে জন-মানবহীন প্রান্তরে কালাতিপাত করতে থাকেন। এক সময় দারুণ পিপাসা তাঁকে পানির খোঁজে বের হতে বাধ্য করল। তিনি শিশুকে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়ে বার বার ওঠানামা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পানির চিহ্নমাত্র দেখলেন না এবং এমন কোন মানুষ দৃষ্টিগোচর হল না, যার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে পারেন। সাত বার ছোটাছুটি করার পর তিনি নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন। এ ঘটনাকে স্মরণীয় করার উদ্দেশেই 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাত বার দৌড়ানো কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে হজ্বের বিধি-বিধানে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। হযরত হাজেরা যখন দৌড়াদৌড়ি শেষ করে নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন, তখন আল্লাহ্র রহমত নাযিল হল। জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং শুষ্ক মরুভূমিতে পানির একটি ঝর্ণাধারা বইয়ে দিলেন। বর্তমানে এ ধারার নামই যমযম। পানির সন্ধান পেয়ে প্রথমে জীব-জন্তু আগমন করল। জীব-জন্তু দেখে মানুষ এসে সেখানে আস্তানা গাড়ল। এভাবে মক্কায় জনপদের ভিত্তি রচিত হয়ে গেল। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপত্রও সংগৃহীত হল।

হযরত ইসমাঈল (আঃ) নামে খ্যাত এই সদ্যজাত শিশু লালিত-পালিত হয়ে কাজ-কর্মের উপযুক্ত হয়ে গেলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র ইঙ্গিতে মাঝে মাঝে এসে বিবি হাজেরা ও শিশুকে দেখে যেতেন। এ সময় আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বন্ধুর তৃতীয় পরীক্ষা নিতে চাইলেন। বালক ইসমাঈল অসহায় ও দীন-হীন অবস্থায় বড় হয়েছিলেন এবং পিতার স্নেহ-বাৎসল্য থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। এমতাবস্থায় পিতা খোলাখোলি নির্দেশ পেলেন ঃ এ ছেলেকে নিজ হাতে জবাই করে দাও। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ —'বালক যখন পিতার কাজে কিছু সাহায্য করার যোগ্য হয়ে উঠল, তখন ইবরাহীম (আঃ) তাকে বললেন ঃ হে বৎস, আমি স্বপ্নে তোমাকে জবাই করতে দেখেছি। এখন বল, তোমার কি অভিপ্রায়? পিতৃভক্ত বালক আরয করলেন ঃ' পিতঃ, আপনি যে আদেশ পেয়েছেন, তা পালন করুন। আপনি আমাকেও ইনশাআল্লাহ্ এ ব্যাপারে ধৈর্যশীল পাবেন।'

এর পরবর্তী ঘটনা সবাই জ্ঞাত আছেন যে, হযরত খলীল (আঃ) পুত্রকে জবাই করার উদ্দেশে মিনা প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। অতঃপর আল্লাহ্র আদেশ পালনে নিজের পক্ষ থেকে যা করণীয় ছিল, তা পুরোপুরিই সম্পন্ন করলেন। কিন্তু প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে উদ্দেশ্য

পুত্রকে জবাই করানো ছিল না, বরং পুত্রবৎসল পিতার পরীক্ষা নেয়া উদ্দেশ্য ছিল। স্বপ্নের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বপ্নে 'জবাই করে দিয়েছেন' দেখেন নি, বরং জবাই করছেন অর্থাৎ, জবাই করার কাজটি দেখেছেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) তা'ই বাস্তবে পরিণত করেছিলেন। প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে কাজটি দেখানো হয়েছে। এ কারণেই صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا বলা হয়েছে যে, স্বপ্নে যা দেখেছিলেন আপনি তা পূর্ণ করে দিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ্ তাআলা বেহেশত থেকে এর পরিপুরক নাযিল করে তা কোরবানী করার আদেশ দিলেন। এ রীতিটিই পরে ভবিষ্যতের জন্য একটি চিরন্তন রীতিতে পরিণতি লাভ করে।

এগুলো ছিল বড়ই কঠিন পরীক্ষা, যার সম্মুখীন হযরত খলীলুল্লাহ্কে করা হয়। এর সাথে সাথেই আরও অনেকগুলো কাজ এবং বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতাও তাঁর উপর আরোপ করা হল। তন্মধ্যে দশটি কাজ 'খাসায়েলে ফিতরত' (প্রকৃতিসুলভ অনুষ্ঠান) নামে অভিহিত। এগুলো হলো শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত ভবিষ্যত উম্মতের জন্যেও এগুলো স্থায়ী বিধি-বিধানে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-ও তাঁর উম্মতকে এসব বিধি-বিধান পালনের জোর তাকিদ দিয়েছেন।

ইবনে-কাসীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়াতে উদ্ধৃত করেছেন। এতে বলা হয়েছে ঃ সমস্ত ইসলাম ত্রিশটি অংশে সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে দশটি সূরা বারাআতে, দশটি সূরা আহ্যাবে এবং দশটি সূরা মু'মিনূনে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এগুলো পূর্ণরূপে পালন করেছেন এবং সব পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সূরা বারাআতে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসলমানের দশটি বিশেষ লক্ষণ ও গুণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

—"তারা হলেন তওবাকারী, এবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রোযাদার, রুকূ-সেজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজে বাধা-দানকারী, আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমার হেফাযতকারী— এহেন ঈমানদারদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।"

সূরা মু'মিনূনে বর্ণিত দশটি গুণ হল এই ঃ

"নিশ্চিতরূপেই ঐসব মুসলমান কৃতকার্য, যারা নামাযে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, যারা অনর্থক বিষয় থেকে দূরে সরে থাকে, যারা নিয়মিত যাকাত প্রদান করে, যারা স্বীয় লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করে, কিন্তু আপন স্ত্রী ও যাদের উপর বিধিসম্মত অধিকার রয়েছে তাদের ব্যতীত। কারণ, এ ব্যাপারে তাদের অভিযুক্ত করা হবে না। যারা এদের ছাড়া অন্যকে তালাশ করে, তারাই সীমালজ্ঘনকারী। যারা স্বীয় আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে, যারা নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামায পড়ে, এমন লোকেরাই উত্তরাধিকারী হবে। তারা হবে জান্নতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী। সেখানে তারা অনন্তকাল বাস করবে।"

সূরা আহ্যাবে বর্ণিত দশটি গুণ হল ঃ

-"নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, আনুগত্যশীল পুরুষ ও আনুগত্যশীলা নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও দৈর্যশীলা নারী, বিনয় অবলম্বনকারী পুরুষ ও বিনয় অবলম্বনকারিনী নারী, খয়রাতকারী পুরুষ ও খয়রাতকারিনী নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, লজ্জাস্থানের রক্ষণা-বেক্ষণকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের রক্ষণা-বেক্ষণকারিনী নারী, অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারিনী নারী— তাদের সবার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা মাগফেরাত ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

কোরআনের মুফাস্সির হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের উপরোদ্ধৃত উক্তির দ্বারা বোঝা গেল যে, মুসলমানদের জন্যে যেসব জ্ঞান এবং কর্মগত ও নৈতিক গুণ অর্জন করা দরকার, তার সবই এ তিনটি সূরার কয়েকটি আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোই কোরআনোক্ত كلمات যেসব বিষয়ে হযরত খলীলুল্লাহ্র পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ আয়াতের ইঙ্গিতও এসব বিষয়ের দিকেই।

এ পর্যন্ত আয়াত সম্পর্কিত পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যে দু'টির উত্তর সম্পন্ন হল।

তৃতীয় প্রশ্ন ছিল এ পরীক্ষায় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাফল্যের প্রকার ও শ্রেণী সম্পর্কে। এর উত্তর এই যে, স্বয়ং কোরআনই বিশেষ ভঙ্গিতে তাঁকে সাফল্যের স্বীকৃতি ও সনদ প্রদান করেছে ঃ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ আর ইবরাহীম পরীক্ষায় পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। অর্থাৎ, প্রতিটি পরীক্ষায় সম্পূর্ণ ও একশ' ভাগ সাফল্যের ঘোষণা আল্লাহ্ দিয়েছেন।

চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, এই পরীক্ষার পুরস্কার কি পেলেন? এরও বর্ণনা এই আয়াতেই রয়েছে— বলা হয়েছে ঃ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا - পরীক্ষার পর আল্লাহ্ বলেন— "আমি তোমাকে মানব সমাজের নেতৃত্বদান করব।"

এ আয়াত দ্বারা একদিকে বোঝা গেল যে, হযরত খলীল (আঃ)-কে সাফল্যের প্রতিদানে মানবসমাজের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে, অপরদিকে মানবসমাজের নেতা হওয়ার জন্যে যে পরীক্ষা দরকার, তা পার্থিব পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার অনুরূপ নয়। পার্থিব পাঠশালাসমূহের পরীক্ষায় কতিপয় বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণকেই সাফল্যের মাপকাঠি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু নেতৃত্ব লাভের পরীক্ষায় আয়াতে বর্ণিত ত্রিশটি নৈতিক ও কর্মগত গুণে পুরোপুরি গুণান্বিত হওয়া শর্ত। কোরআনের অন্য এক জায়গায় এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

— "যখন তারা শরীয়তবিরুদ্ধ কাজে সংযমী হল এবং আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাসী হল, তখন আমি তাদেরকে নেতা করে দিলাম, যাতে আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করে।"

এই আয়াতে صبر (সংযম) ও يقين (বিশ্বাস) শব্দদ্বয়ের মধ্যে পূর্বোক্ত ত্রিশটি গুণ সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে। صبر হল শিক্ষাগত ও বিশ্বাসগত পূর্ণতা আর يقين কর্মগত ও নৈতিক পূর্ণতা।

পঞ্চম প্রশ্ন ছিল এই যে, পাপাচারী ও যালেমকে নেতৃত্বলাভের সম্মান দেয়া হবে না বলে ভবিষ্যত বংশধরদের নেতৃত্বলাভের জন্যে যে বিধান ব্যক্ত হয়েছে, তার অর্থ কি?

এর ব্যাখ্যা এই যে, নেতৃত্ব এক দিক দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার খেলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব। আল্লাহ্র অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে এ পদ দেয়া যায় না। এ কারণেই আল্লাহ্র অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে স্বেচ্ছায় নেতা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত না করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য।

হযরত খলীলুল্লাহ্‌র মক্কায় হিজরত ও কা'বা নির্মাণের ঘটনা ঃ এই আয়াতে কা'বা গৃহের ইতিহাস, হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) কর্তৃক কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ, কা'বা ও মক্কার কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লেখিত হয়েছে। এ বিষয়টি কোরআনের অনেক সূরায় ছড়িয়ে রয়েছে।

হরম সম্পর্কিত মাসায়েল

(১) مَثَابَةً শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা কা'বা গৃহকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। ফলে তা সর্বদাই মানবজাতির প্রত্যাবর্তনস্থল হয়ে থাকবে এবং মানুষ বরাবর তার দিকে ফিরে যেতে আকাঙ্ক্ষী হবে। মুফাসসির শ্রেষ্ঠ হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ لايقضى احد منها وطرا অর্থাৎ, কোন মানুষ কা'বা গৃহের যেয়ারত করে তৃপ্ত হয় না, বরং প্রতি বারই যেয়ারতের অধিকতর বাসনা নিয়ে ফিরে আসে। কোন কোন আলেমের মতে কা'বা গৃহ থেকে ফিরে আসার পর আবার সেখানে যাওয়ার আগ্রহ হজ্জ কবুল হওয়ার অন্যতম লক্ষণ। সাধারণভাবে দেখা যায়, প্রথমবার কা'বাগৃহ যেয়ারত করার যতটুকু আগ্রহ থাকে, দ্বিতীয়বার তা আরও বৃদ্ধি পায় এবং যতবারই যেয়ারত করতে থাকে, এ আগ্রহ উত্তরোত্তর ততই বেড়ে যেতে থাকে।

এবিস্ময়কর ব্যাপারটি একমাত্র কা'বারই বৈশিষ্ট্য । নতুন জগতের শ্রেষ্ঠতম মনোরম দৃশ্যও এক-দু'বার দেখেই মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। পাঁচ-সাতবার দেখলে আর দেখার ইচ্ছাই থাকে না। অথচ এখানে না আছে কোন মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপট, না এখানে পৌছা সহজ এবং না আছে ব্যবসায়িক সুবিধা, তা সত্ত্বেও এখানে পৌছার আকুল আগ্রহ মানুষের মনে অবিরাম ঢেউ খেলতে থাকে। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এখানে পৌছার জন্যে মানুষ ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

(২) এখানে أَمْنًا শব্দের অর্থ مأمن অর্থাৎ, শান্তির আবাসস্থল بيت শব্দের অর্থ শুধু কা'বা গৃহ নয়, বরং সম্পূর্ণ হরম। অর্থাৎ, কা'বা গৃহের পবিত্র প্রাঙ্গণ। কোরআনে كعبة ও بيت الله শব্দ বলে যে সম্পূর্ণ হরমকে বোঝানো হয়েছে, তার আরও বহু প্রমাণ রয়েছে। যেমন, এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ এখানে كعبة বলে সমগ্র হরমকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, এতে কোরবানীর কথা আছে। কোরবানী কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে হয় না এবং সেখানে কোরবানী করা বৈধও নয়। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে যে, 'আমি কা'বার হরমকে শান্তির আলয় করেছি।' শান্তির আলয় করার অর্থ মানুষকে নির্দেশ দেয়া যে, এ স্থানকে সাধারণ হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অশান্তিজনিত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।— (ইবনে-আরাবী)।

(৩) وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى এখানে মকামে-ইবরাহীমের অর্থ ঐ পাথর, যাতে মু'জেযা হিসাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। কা'বা নির্মাণের সময় এ পাথরটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন।— (সহীহ্ বুখারী)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি এই পাথরে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পদচিহ্ন দেখেছি। যেয়ারতকারীদের উপর্যুপরি স্পর্শের দরুন চিহ্নটি এখন অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে।— (কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে মকামে-ইবরাহীমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে যে, সমগ্র হরমটিই মকামে-ইবরাহীম। এর অর্থ বোধ হয় এই যে, তওয়াফের পর যে দু'রাকআত নামায মকামে-ইবরাহীমে পড়ার নির্দেশ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, তা হরমের যে কোন অংশে পড়লেই চলে। অধিকাংশ ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ এ ব্যাপারে একমত।

(৪) আলোচ্য আয়াতে মকামে-ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নিতে বলা হয়েছে। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিদায় হজ্জের সময় কথা ও কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি তওয়াফের পর কা'বা গৃহের সম্মুখে অনতিদূরে রক্ষিত মকামে-ইবরাহীমের কাছে আগমন করলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى অতঃপর মকামে-ইবরাহীমের পেছনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে দু'রাকআত নামায পড়লেন যে, কা'বা ছিল তাঁর সম্মুখে এবং কা'বা ও তাঁর মাঝখানে ছিল মকামে-ইবরাহীম।— (সহীহ্ মুসলিম)

এ কারণেই ফিকাহ্‌শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন ঃ যদি কেউ মকামে-ইবরাহীমের পেছনে সংলগ্ন স্থানে জায়গা না পায়, তবে মকামে-ইবরাহীম ও কা'বা উভয়টিকে সামনে রেখে যে কোন দূরত্বে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে নির্দেশ পালিত হবে।

(৫) আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তওয়াফ পরবর্তী দুই রাকআত নামায ওয়াজিব।— (জাস্‌সাস, মোল্লা আলী ক্বারী)

তবে এ দু'রাকআত নামায বিশেষভাবে মকামে-ইবরাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত। হরমের অন্যত্র পড়লেও আদায় হবে। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ দু'রাকআত নামায কা'বা গৃহের দরজা সংলগ্ন স্থানে পড়েছেন বলেও প্রমাণিত রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও তাই করেছেন বলে বর্ণিত আছে (জাস্‌সাস)। মোল্লা আলী ক্বারী মানাসেক গ্রন্থে বলেছেন, এ দু'রাকআত মকামে ইবরাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত। যদি কোন কারণে সেখানে পড়তে কেউ অক্ষম হয়, তবে হরম অথবা হরমের বাইরে যে কোনখানে পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

(৬) وَطَهِّرْ بَيْتِيَ এখানে কা'বা গৃহকে পাক-সাফ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যিক অপবিত্রতা ও আবর্জনা এবং আত্মিক অপবিত্রতা উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, কুফর, শিরক, দুশ্চরিত্রতা, হিংসা, লালসা, কুপ্রবৃত্তি, অহঙ্কার, রিয়া, নাম-যশ ইত্যাদির কলুষ থেকেও কা'বা গৃহকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশে بيتى শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ আদেশ যে কোন মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, সব মসজিদই আল্লাহ্‌র ঘর। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ

হযরত ফারূকে আ'যম (রাঃ) মসজিদে এক ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে শুনে বললেন ঃ তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ, জান না? (কুরতুবী) অর্থাৎ, মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, এতে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা উচিত নয়। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে কা'বা গৃহকে যেমন যাবতীয় বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখতে বলা হয়েছে, তেমনি অন্যান্য মসজিদকেও পাক-পবিত্র রাখতে হবে। দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদকে যাবতীয় অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পাক-সাফ করে এবং অন্তরকে কুফর, শিরক, দুশ্চরিত্রতা, অহঙ্কার, হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি থেকে পবিত্র করে মসজিদে প্রবেশ করা কর্তব্য। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। তিনি ছোট শিশু এবং

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ
مِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ
اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا
مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ
يُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٢٩﴾ وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ
اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۚ
وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ
قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾ وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَ
يَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا
وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ
الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ
اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ
وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٤﴾

(১২৭) স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করেছিল ঃ পরওয়ারদেগার ! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই, তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। (১২৮) পরওয়ারদেগার ! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অণুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্বের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু। (১২৯) হে পরওয়ারদেগার ! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন— যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। (১৩০) ইবরাহীমের ধর্ম থেকে কে মুখ ফেরায় ? কিন্তু সে ব্যক্তি, যে নিজেকে বোকা পতিপন্ন করে। নিশ্চয়ই আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং সে পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (১৩১) স্মরণ কর, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন ঃ অনুগত হও। সে বলল ঃ আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম। (১৩২) এরই ওছিয়ত করেছে ইবরাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না। (১৩৩) তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয় ? যখন সে সন্তানদের বলল ঃ আমার পর তোমরা কার এবাদত করবে ? তারা বললো, আমরা তোমার, পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব। তিনি একক উপাস্য। (১৩৪) আমরা সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। তারা ছিল এক সম্প্রদায়— যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদেরই জন্যে। তারা কি করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

পাগলদেরও মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। কারণ, তাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(৭) لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ আয়াতের শব্দগুলো থেকে কতিপয় বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ কা'বা গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য তওয়াফ, এ'তেকাফ ও নামায। দ্বিতীয়তঃ তওয়াফ আগে আর নামায পরে। (হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমত তাই)। তৃতীয়তঃ, বিশ্বের বিভিন্ন কোণ থেকে আগমনকারী হাজীদের পক্ষে নামাযের চাইতে তওয়াফ উত্তম। চতুর্থতঃ ফরয হোক অথবা নফল কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে যে কোন নামায পড়া বৈধ। — (জাস্‌সাস)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত খলীলুল্লাহ্ (আঃ) আল্লাহ্র পথে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজন এবং কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্র আদেশ পালনে তৎপর হওয়ার যেসব অক্ষয় কীর্তি তিনি স্থাপন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ও নজীরবিহীন।

সন্তানের প্রতি স্নেহ ও মমতা শুধু একটি স্বাভাবিক ও সহজাত বৃত্তিই নয়; বরং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলারও নির্দেশ রয়েছে। উল্লেখিত আয়াতসমূহ এর প্রমাণ। তিনি সন্তানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া ঃ رب শব্দ দ্বারা দোয়া আরম্ভ করেছেন। এর অর্থ, 'হে আমার পালনকর্তা।' তিনি এই শব্দের মাধ্যমে দোয়া করার রীতি শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ, এ জাতীয় শব্দ আল্লাহ্র রহমত ও কৃপা আকৃষ্ট করার ব্যাপারে খুবই কার্যকর ও সহায়ক। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রথম দোয়া এই ঃ "তোমার নির্দেশে আমি এই জনমানবহীন প্রান্তরে নিজ পরিবার-পরিজনকে রেখে যাচ্ছি। তুমি একে একটি শান্তিপূর্ণ শহর বানিয়ে দাও— যাতে এখানে বসবাস করা আতঙ্কজনক না হয় এবং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য হয়।"

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বিতীয় দোয়ায় বলা হয়েছে ঃ পরয়ারদেগার ! শহরটিকে শান্তিধাম করে দাও। অর্থাৎ, হত্যা, লুণ্ঠন, কাফেরদের অধিকার স্থাপন, বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখ।

হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া কবুল হয়েছে। মক্কা মুকাররমা শুধু একটি জনবহুল নগরীই নয়, সারা বিশ্বের প্রত্যাবর্তনস্থলও বটে। বিশ্বের চার দিক থেকে মুসলমানগণ এ নগরীতে পৌছাকে সর্ববৃহৎ সৌভাগ্য মনে করে। নিরাপদ ও সুরক্ষিতও এতটুকু হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত কোন শত্রুজাতি অথবা শত্রুসম্রাট এর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। 'আসহাবে-ফীলের' ঘটনা স্বয়ং কোরআনে উল্লেখিত রয়েছে। তারা কা'বা ঘরের উপর আক্রমণের ইচ্ছা করতেই সমগ্র বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিল।

এ শহরটি হত্যা ও লুটতরাজ থেকেও সর্বদা নিরাপদ রয়েছে। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা অগণিত আনাচার, কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কা'বা ঘর ও তার পার্শ্ববর্তী হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত। তারা প্রাণের শত্রুকে হাতে পেয়েও হরমের মধ্যে পাল্টা হত্যা অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ করত না। এমনকি, হরমের অধিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের রীতি সমগ্র আরবে প্রচলিত ছিল। এ

কারণেই মক্কাবাসীরা বাণিজ্যব্যাপদেশে নির্বিঘ্নে সিরিয়া ও ইয়ামানে যাতায়াত করত। কেউ তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করত না।

আল্লাহ্ তাআলা হরমের চতুঃসীমায় জীব-জন্তুকেও নিরাপত্তা দান করেছেন। এই এলাকায় শিকার করা জায়েয নয়। জীব-জন্তুর মধ্যেও স্বাভাবিক নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত করে দেয়া হয়েছে। ফলে তারা সেখানে শিকারী দেখলেও ভয় পায় না।

হযরত ইবরাহীমের তৃতীয় দোয়া এই যে, এ শহরের অধিবাসীদের উপজীবিকা হিসাবে যেন ফল-মূল দান করা হয়। মক্কা-মুকাররমা ও পার্শ্ববর্তী ভূমি কোনরূপ বাগ-বাগিচার উপযোগী ছিল না। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছিল না পানির নাম-নিশানা। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা ইবরাহীমের দোয়া কবুল করে নিয়ে মক্কার অদূরে 'তায়েফ' নামক একটি ভূখণ্ড সৃষ্টি করে দিলেন। তায়েফে যাবতীয় ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যা মক্কার বাজারেই বেচা-কেনা হয়।

হযরত খলীলুল্লাহ্ (আঃ)-এর সাবধানতা ঃ আলোচ্য আয়াতে মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সমগ্র মক্কাবাসীর জন্যে শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এক দোয়ায় যখন হযরত খলীল স্বীয় বংশধরের মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তখন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, মু'মিনদের পক্ষে এ দোয়া কবুল হলো, জালেম ও মুশরিকদের জন্য নয়। সে দোয়াটি ছিল নেতৃত্ব লাভের দোয়া। হযরত খলীল (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্র বন্ধুত্বের মহান মর্যাদায় উন্নীত ও খোদাভীতির প্রতীক। তাই এ ক্ষেত্রে সে কথাটি মনে পড়ে গেল এবং তিনি দোয়ার শর্ত যোগ করলেন যে, আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির এ দোয়া শুধু মুমিনদের জন্য করেছি। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ ভয় ও সাবধানতার মূল্য দিয়ে বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ كَفَرَ অর্থাৎ, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমি সমস্ত মক্কাবাসীকেই দান করব, যদিও তারা কাফের, মুশরিক হয়। তবে মু'মিনদেরকে ইহকাল ও পরকাল সর্বত্রই তা দান করব, কিন্তু কাফেররা পরকালে শাস্তি ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

স্বীয় সৎকর্মের উপর ভরসা না করা ও তুষ্ট না হওয়ার শিক্ষাঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে সিরিয়ার সুজলা-সুফলা সুদর্শন ভূখণ্ড ছেড়ে মক্কার বিশুষ্ক পাহাড়সমূহের মাঝখানে স্বীয় পরিবার-পরিজনকে এনে রাখেন এবং কা'বা গৃহের নির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোন আত্মত্যাগী সাধকের অন্তরে অহংকার দানা বাঁধতে পারত এবং সে তাঁর ক্রিয়াকর্মকে অনেক মূল্যবান মনে করতে পারত। কিন্তু এখানে ছিলেন আল্লাহ্র এমন এক বন্ধু যিনি আল্লাহ্র প্রতাপ ও মহিমা সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত। তিনি জানতেন, আল্লাহ্র উপযুক্ত এবাদত ও আনুগত্য কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে। তাই আমল যত বড়ই হোক সেজন্য অহংকার না করে কেঁদে কেঁদে এমনি দোয়া করা প্রয়োজন যে, হে পরওয়ারদেগার ! আমার এ আমল কবুল হোক। কা'বা গৃহ নির্মাণের আমল প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম তাই বলেছেন, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا হে পরওয়ারদেগার ! আমাদের এ আমল কবুল করুন। কেননা, আপনি শ্রোতা, আপনি সর্বজ্ঞ।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ — এ দোয়াটিও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান ও খোদাভীতিরই ফল, আনুগত্যের অদ্বিতীয় কীর্তি স্থাপন করার পরও তিনি এরূপ দোয়া করেন যে, আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর। কারণ, মা'রেফাত তথা আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান যার যত বৃদ্ধি পেতে থাকে সে ততবেশী অনুভব করতে থাকে যে, যথার্থ আনুগত্য তার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না।

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا —এ দোয়াতেও স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ্র প্রেমিক, আল্লাহ্র পথে নিজের সন্তান-সন্ততিকে বিসর্জন দিতেও এতটুকু কুণ্ঠিত নন। তিনিও সন্তানদের প্রতি কতটুকু মহব্বত ও ভালবাসা রাখেন। কিন্তু এই ভালবাসার দাবীসমূহ কয়জন পূর্ণ করতে পারে? সাধারণ লোক সন্তানদের শুধু শারীরিক সুস্থতা ও আরামের দিকেই খেয়াল রাখে। তাদের যাবতীয় স্নেহ-মমতা এ দিকটিকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা শারীরিকের চাইতে আত্মিক এবং জাগতিকের চাইতে পারলৌকিক আরামের জন্যে চিন্তা করেন অধিক। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করলেন ঃ "আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে একটি দলকে পূর্ণ আনুগত্যশীল কর।" সন্তানদের জন্যে এ দোয়ার মধ্যে আরও একটি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সমাজে যারা গণ্য মান্য, তাদের সন্তানরা পিতার পথ অনুসরণ করলে সমাজে তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তাদের যোগ্যতা জনগণের যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।—(বাহ্রে-মুহীত)

হযরত খলীলুল্লাহ্ (আঃ)-এর এ দোয়াটিও কবুল হয়েছে। তাঁর বংশধরের মধ্যে কখনও সত্যধর্মের অনুসারী ও আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ আদর্শ পুরুষের অভাব হয়নি। জাহেলিয়াত আমলে আরবে যখন সর্বত্র মূর্তিপূজার জয়-জয়কার, তখনও ইবরাহীমের বংশধরের মধ্যে কিছু লোক একত্ববাদ ও পরকালে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ্র আনুগত্যশীল ছিলেন। যেমন যায়েদ ইবনে আমর, ইবনে নওফেল এবং কুস ইবনে সায়েদা প্রমুখ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, মূর্তিপূজার প্রতি তাঁরও অশ্রদ্ধা ছিল।—(বাহ্রে-মুহীত)

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ — তেলাওয়াতের আসল অর্থ অনুসরণ করা। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি কোরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব পাঠ করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ, যে লোক এসব কালাম পাঠ করে, এর অনুসরণ করাও তার অবশ্য কর্তব্য। আসমানী গ্রন্থ ঠিক যেভাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, হুবহু তেমনিভাবে পাঠ করা জরুরী। নিজের পক্ষ থেকে তাতে কোন শব্দ অথবা স্বরচিহ্নটিও পরিবর্তন পরিবর্ধন করার অনুমতি নেই। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল-কোরআন' গ্রন্থে বলেনঃ "আল্লাহ্র কালাম ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ অথবা কালাম পাঠ করাকে সাধারণ পরিভাষায় তেলাওয়াত বলা যায় না।"

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ – এখানে কিতাব বলে আল্লাহ্র কিতাব বোঝানো হয়েছে। 'হেকমত' শব্দটি আরবী অভিধানে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা— সত্যে উপনীত হওয়া, ন্যায় ও সুবিচার, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি।— (কামূস)

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী লেখেন ঃ এ শব্দটি আল্লাহ্র জন্যে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সকল বস্তুর পূর্ণজ্ঞান এবং সুদৃঢ় উদ্ভাবন। অন্যের জন্যে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয়, বিদ্যমান বস্তুসমূহের বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সৎকর্ম। বিশুদ্ধ জ্ঞান, সৎকর্ম, ন্যায়, সুবিচার, সত্য কথা ইত্যাদি। — (কামূস ও রাগেব)

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, আয়াতে হেকমতের কি অর্থ? তাফসীরকার সাহাবীগণ হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর কাছ থেকে শিখে কোরআনের ব্যাখ্যা করতেন। এখানে হেকমত শব্দের অর্থে তাঁদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবগুলোর মর্মই এক। অর্থাৎ , রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাহ। ইবনে কাসীর ও ইবনে জরীর কাতাদাহ্ থেকে এ ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত করেছেন। হেকমতের অর্থ কেউ কোরআনের তফসীর, কেউ ধর্মে গভীর জ্ঞান, কেউ শরীয়তের বিধি-বিধানের জ্ঞান, কেউ এমন বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন বলেছেন, যা শুধু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বর্ণনা থেকেই জানা যায়। নিঃসন্দেহে এসব উক্তির সারমর্ম হল রসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ্।

وَيُزَكِّيهِمْ — زَكٰوة শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পবিত্রতা। বাহ্যিক ও আত্মিক সর্বপ্রকার পবিত্রতার অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

উপরোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ভবিষ্যত বংশধরদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছেন যে, আমার বংশধরের মধ্যে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন— যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের তেলাওয়াত করে শোনাবেন, কোরআন ও সুন্নাহ্র শিক্ষা দেবেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে তাদের পবিত্র করবেন। দোয়ায় নিজের বংশধরের মধ্য থেকেই পয়গম্বর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ প্রথমতঃ এই যে, এটা তাঁর সন্তানদের জন্যে গৌরবের বিষয়। দ্বিতীয়তঃ এতে তাদের কল্যাণও নিহিত রয়েছে। কারণ, স্বগোত্র থেকে পয়গম্বর হলে তাঁর চাল-চলন ও অভ্যাস-আচরণ সম্পর্কে তারা উত্তমরূপে অবগত থাকবে। ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা থাকবে না। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ প্রত্যুত্তরে ইবরাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলে দেয়া হয় যে, আপনার দোয়া কবূল হয়েছে এবং কাঙ্ক্ষিত পয়গম্বরকে শেষ যমানায় প্রেরণ করা হবে।' — (ইবনে-জরীর, ইবনে-কাসীর)

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্মের বৈশিষ্ট্য ঃ মুসনাদে-আহ্মদ গ্রন্থে উদ্ধৃত এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ 'আমি আল্লাহ্র কাছে তখনও পয়গাম্বর ছিলাম, যখন আদম (আঃ)-ও পয়দা হননি ; বরং তাঁর সৃষ্টির জন্য উপাদান তৈরী হচ্ছিল মাত্র। আমি আমার সূচনা বলে দিচ্ছি ঃ আমি পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া, ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ এবং স্বীয় জননীর স্বপ্নের প্রতীক। ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদের অর্থ তাঁর এ উক্তি وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ আমি এমন এক পয়গম্বরের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন। তাঁর নাম আহমদ।) তাঁর জননী গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর পেট থেকে একটি নূর বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছে। কোরআনে হুযুর (সাঃ)-এর আবির্ভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে দু'জায়গায় সূরা আলে-ইমরানের ১৬৪ তম আয়াতে এবং সূরা জুমু'আয় ইবরাহীমের দোয়ায় উল্লেখিত ভাষারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যে পয়গম্বরের জন্যে দোয়া করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)।

পয়গম্বর প্রেরণের অর্থ তিনটি ঃ সূরা বাক্বারার আলোচ্য আয়াতে এবং সূরা আলে-ইমরান ও সূরা জুমু'আর বিভিন্ন আয়াতে হুযুর (সাঃ) সম্পর্কে একই বিষয়বস্তু অভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতে মহানবী (সাঃ)-এর পৃথিবীতে পদার্পণ ও তাঁর রেসালতের তিনটি লক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ কোরআন তেলাওয়াত, দ্বিতীয়তঃ আসমানী গ্রন্থ ও হেকমতের শিক্ষাদান এবং তৃতীয়ত ঃ মানুষের চরিত্রশুদ্ধি।

প্রথম উদ্দেশ্য কোরআন তেলাওয়াত ঃ এখানে সর্বপ্রথম প্রণিধানযোগ্য যে, তেলাওয়াতের সম্পর্ক শব্দের সাথে এবং শিক্ষাদানের সম্পর্ক অর্থের সাথে। তেলাওয়াত ও শিক্ষাদান পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হওয়ার মর্মার্থ এই যে, কোরআনের অর্থসম্ভার যেমন উদ্দেশ্য, শব্দসম্ভারও তেমনি একটি লক্ষ্য। এসব শব্দের তেলাওয়াত ও হেফাযত ফরয ও গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যাঁরা মহানবী (সাঃ)-এর প্রত্যক্ষ শিষ্য ও সম্বোধিত ছিলেন তাঁরা শুধু আরবী ভাষা সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল ছিলেন না, বরং অলংকারপূর্ণ আরবী ভাষার একেকজন বাগ্মী কবিও ছিলেন। তাঁদের সামনে কোরআন পাঠ করাই বাহ্যতঃ তাঁদের শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট ছিল, পৃথকভাবে অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। এমতাবস্থায় কোরআন তেলাওয়াতকে পৃথক উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থ শিক্ষাদানকে পৃথক উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করার কি প্রয়োজন ছিল? অথচ কার্যক্ষেত্রে উভয় উদ্দেশ্যই এক হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ থেকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদ্ভব হয়। প্রথম এই যে, কোরআন অপরাপর গ্রন্থের মত নয়— যাতে শুধু অর্থসম্ভারের উপর আমল করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং শব্দসম্ভার থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে; শব্দে সামান্য পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়ে গেলেও ক্ষতির কারণ মনে করা হয় না। অর্থ না বুঝে এসব গ্রন্থের শব্দ পাঠ করা একেবারেই নিরর্থক, কিন্তু কোরআন এমন নয়। কোরআনের শব্দের সাথে বিশেষ বিশেষ বিধি-বিধান সম্পৃক্ত রয়েছে। ফেকাহ্শাস্ত্রের মূলনীতিসংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে কোরআনের সংজ্ঞা এভাবে هو النظم والمعنى جميعا বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, শব্দসম্ভার ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমন্বিত গ্রন্থের নামই কোরআন। এতে বুঝা যায় যে, কোরআনের অর্থসম্ভারকে অন্য শব্দ অথবা অন্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হলে তাকে কোরআন বলা যাবে না, যদিও বিষয়বস্তু একেবারে নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত হয়। কোরআনের বিষয়বস্তুকে পরিবর্তিত শব্দের মাধ্যমে কেউ নামাযে পাঠ করলে তার নামায হবে না। এমনিভাবে কোরআন সম্পর্কিত অপরাপর বিধি-বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। এ কারণেই ফেকাহ্শাস্ত্রবিদগণ কোরআনের মূল শব্দ বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদ লিখতে ও মুদ্রিত করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ পরিভাষায় এ জাতীয় অনুবাদকে 'উর্দু কোরআন, বাংলা কোরআন অথবা ইংরেজী কোরআন' বলা হয়। কারণ, ভাষান্তরিত কোরআন প্রকৃতপক্ষে কোরআন বলে কথিত হওয়ারই যোগ্য নয়।

অর্থ না বুঝে কোরআনের শব্দ পাঠ করা নিরর্থক নয়-- সওয়াবের কাজ ঃ

একথা বলা কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, অর্থ না বুঝে তোতাপাখীর মত শব্দ পাঠ করা অর্থহীন। বিষয়টির প্রতি বিশেষ জোর দেয়ার কারণ এই যে, আজকাল অনেকেই কোরআনকে অন্যান্য গ্রন্থের সাথে তুলনা করে মনে করে যে, অর্থ না বুঝে কোন গ্রন্থের শব্দাবলী পড়া ও পড়ানো বৃথা কালক্ষেপণ বৈ কিছুই নয়। কোরআন সম্পর্কে তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, শব্দ ও অর্থ উভয়টির সমন্বিত আসমানী গ্রন্থের নামই কোরআন। কোরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং তার বিধি-বিধান পালন করা যেমন ফরয ও উচ্চস্তরের এবাদত, তেমনিভাবে তার শব্দ তেলাওয়াত করাও একটি স্বতন্ত্র এবাদত ও সওয়াবের কাজ।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য গ্রন্থ শিক্ষাদান ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরাম কোরআনের অর্থ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু উপরোক্ত কারণেই তাঁরা শুধু অর্থ বোঝে ও তা বাস্তবায়ন করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি। বোঝা এবং আমল করার জন্যে একবার পড়ে নেয়াই যথেষ্ট

ছিল, কিন্তু তাঁরা সারা জীবন কোরআন তেলাওয়াতকে 'অন্ধের যষ্টি' মনে করেছেন। কতক সাহাবী দৈনিক একবার কোরআন খতম করতেন, কেউ দু'দিনে এবং কেউ তিন দিনে কোরআন খতমে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে কোরআন খতম করার রীতি মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কোরআনের সাত মনযিল এই সাপ্তাহিক তেলাওয়াত রীতিরই চিহ্ন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামের এ কার্যধারাই প্রমাণ করে যে, কোরআনের অর্থ বোঝা এবং সে অনুযায়ী আমল করা যেমন এবাদত, তেমনিভাবে শব্দ তেলাওয়াত করাও স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে একটি উচ্চস্তরের এবাদত এবং বরকত, সৌভাগ্য ও মুক্তির উপায়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)- কর্তব্যসমূহের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াতকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন। উদ্দেশ্য এই যে, যে মুসলমান আপাততঃ কোরআনের অর্থ বোঝে না, শব্দের সওয়াব থেকেও বঞ্চিত হওয়া তার পক্ষে উচিত নয়। বরং অর্থ বোঝার জন্যে চেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরী, যাতে কোরআনের সত্যিকার নূর ও বরকত প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং কোরআন অবতরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। (মা'আযাল্লাহ্,) কোরআনকে তন্ত্র-মন্ত্র মনে করে শুধু ঝাড়-ফুঁকে ব্যবহার করা উচিত নয় এবং আল্লামা ইকবালের ভাষায় 'সূরা ইয়াসীন সম্পর্কে শুধু এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নয় যে, এ সূরা পাঠ করলে মরণোন্মুখ ব্যক্তির আত্মা সহজে নির্গত হয়।'

তৃতীয় উদ্দেশ্য পবিত্রকরণ ঃ মহানবী (সাঃ)-এর তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে পবিত্রকরণ। এর অর্থ বাহ্যিক ও আত্মিক না-পাকী থেকে পবিত্র করা। বাহ্যিক না-পাকী সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানরাও ওয়াকিফহাল। আত্মিক না-পাকী হচ্ছে কুফর, শেরক, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর পুরোপুরি ভরসা করা, অহংকার, হিংসা, শত্রুতা দুনিয়া প্রীতি ইত্যাদি। কোরআন ও সুন্নাহতে এসব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। পবিত্রকরণকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পৃথক কর্তব্য সাব্যস্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন শাস্ত্র পুঁথিগতভাবে শিক্ষা করলেই তার প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জিত হয় না। প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জন করতে হলে গুরুজনের শিক্ষাধীনে থেকে তাঁর অনুশীলনের অভ্যাসও গড়ে তুলতে হয়। সূফীবাদে কামেল পীরের দায়িত্বও তাই। তিনি কোরআন ও সুন্নাহ্ থেকে অর্জিত শিক্ষাকে কার্যক্ষেত্রে অনুশীলন করে অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা করেন।

হেদায়েত ও সংশোধনের দু'টি ধারা ঃ আল্লাহর গ্রন্থ ও রসূল ঃ এ প্রসঙ্গে আরও দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম এই যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির আদিকাল থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত মানুষের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্য দু'টি ধারা অব্যাহত রেখেছেন। একটি খোদায়ী গ্রন্থসমূহের ধারা এবং অপরটি রসূলগণের ধারা। আল্লাহ তাআলা শুধু গ্রন্থ নাযিল করাই যেমন যথেষ্ট মনে করেননি, তেমনি শুধু রসূল প্রেরণ করেও ক্ষান্ত হননি। বরং সর্বদা উভয় ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এতদুভয় ধারা সমভাবে প্রবর্তন করে আল্লাহ তাআলা একটি বিরাট শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তা এই যে, মানুষের নির্ভুল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্যে শুধু গ্রন্থ কিংবা শুধু শিক্ষাই যথেষ্ট নয়; বরং একদিকে খোদায়ী হেদায়েত ও খোদায়ী সংবিধানেরও প্রয়োজন, যাকে কোরআন বলা হয় এবং অপরদিকে একজন শিক্ষাগুরুরও প্রয়োজন যিনি স্বীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে খোদায়ী হেদায়েতে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারণ, মানুষই মানুষের প্রকৃত শিক্ষাগুরু হতে পারে। গ্রন্থ কখনও গুরু বা অভিভাবক হতে পারে না—তবে শিক্ষা-দীক্ষায় সহায়ক অবশ্যই হতে পারে।

ইসলামের সূচনা একটি গ্রন্থ ও একজন রসূলের মাধ্যমে হয়েছে। এ দু'য়ের সম্মিলিত শক্তিই জগতে একটি সুষ্ঠু ও উচ্চস্তরের আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনিভাবে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যেও একদিকে পবিত্র শরীয়ত ও অন্যদিকে কৃতী পুরুষগণ রয়েছেন। কোরআনও নানাস্থানে এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ 'হে মুমিনগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।'

সমগ্র কোরআনের সারমর্ম হল সূরা ফাতেহা। আর সূরা ফাতেহার সারমর্ম হল সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত। এখানে সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান দিতে গিয়ে কোরআনের পথ, রসূলের পথ অথবা সুন্নাহর পথ বলার পরিবর্তে কিছু খোদাভক্তের সন্ধান দেয়া হয়েছে যে, তাদের কাছ থেকে সিরাতে-মুস্তাকীমের সন্ধান জেনে নাও। বলা হয়েছে ঃ

'সিরাতে-মুস্তাকীম হল তাদের পথ, যাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে। তাদের পথ নয়, যারা গযবে পতিত ও গোমরাহ।' অন্য এক জায়গায় নেয়ামত প্রাপ্তদের আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

— এমনিভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)- ও পরবর্তীকালের জন্যে কিছুসংখ্যক লোকের নাম নির্দিষ্ট করে তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ

— 'হে মানবজাতি, আমি তোমাদের জন্যে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। এতদুভয়কে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি আমার সন্তান ও পরিবার-পরিজন। সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ 'আমার পরে তোমারা আবু বকর ও ওমরের অনুসরণ করবে।' অন্য এক হাদীসে আছে, 'আমার সুন্নত ও খোলাফায়ে-রাশেদীনের সুন্নত অবলম্বন করা তোমাদের কর্তব্য।'

মোটকথা, কোরআনের উপরোক্ত নির্দেশ ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শিক্ষা থেকে একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানুষের হেদায়েতের জন্যে সর্বকালেই দু'টি বস্তু অপরিহার্য। (১) কোরআনের হেদায়েত এবং (২) তা হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশে ও আমলের যোগ্যতা অর্জনের জন্যে শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ও আল্লাহ-ভক্তদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এ রীতি শুধু ধর্মীয় শিক্ষার বেলাতেই প্রযোজ্য নয়; বরং যে কোন বিদ্যা ও শাস্ত্র নিখুঁতভাবে অর্জন করতে হলে এ রীতি অপরিহার্য। একদিকে শাস্ত্রসম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি থাকতে হবে এবং অন্যদিকে থাকতে হবে শাস্ত্রবিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। প্রত্যেক শাস্ত্রের উন্নতি ও পূর্ণতার এ দু'টি অবলম্বন থেকে উপকার লাভের ক্ষেত্রে বহু মানুষ ভুল পন্থার আশ্রয় নেয়। ফলে উপকারের পরিবর্তে অপকার এবং মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই ঘটে বেশী।

কেউ কেউ কোরআনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে শুধু ওলামা ও মাশায়েখকেই সবকিছু মনে করে বসে। তারা শরীয়তের অনুসারী কি না, তারও খোঁজ নেয় না। এ রোগটি আসলে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের থেকেই সংক্রামিত হয়েছে। কোরআন বলে ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, 'তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাদের ওলামা ও মাশায়েখকে স্বীয় উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে।' এটা নিঃসন্দেহে শিরক ও কুফরের রাস্তা। লক্ষ

লক্ষ মানুষ এ রাস্তায় বের হয়েছে এবং হচ্ছে। পক্ষান্তরে এমন কিছু লোক রয়েছে; যারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা অর্জনের জন্য কোন ওস্তাদ ও অভিভাবকের প্রয়োজনই মনে করে না। তারা বলে ঃ 'আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' এটাও আরেক পথভ্রষ্টতা। এর ফল হচ্ছে ধর্মচ্যুত হয়ে মানবীয় প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হওয়া। কেননা, বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ব্যতিরেকে শাস্ত্র অর্জন মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। এরূপ ব্যক্তি অবশ্যই ভুল বোঝাবুঝির শিকারে পরিণত হয়। এ ভুল বোঝাবুঝি কোন কোন সময় তাকে ধর্মচ্যুতও করে দেয়।

কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অর্থাৎ, 'আমিই কোরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাযত করব।'

এ ওয়াদার ফলেই কোরআনের প্রতিটি যের ও যবর পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সুন্নাহ্‌র ভাষা যদিও এভাবে সংরক্ষিত নয়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সুন্নাহ্‌এবং হাদীসেরও সংরক্ষিত হওয়া উল্লেখিত আয়াতদৃষ্টে অপরিহার্য। বাস্তবে সুন্নাহ এবং হাদীসও সংরক্ষিত রয়েছে। যখনই কোন পক্ষ থেকে এতে কোন বাধা সৃষ্টি অথবা মিথ্যা রেওয়ায়েত সংমিশ্রিত করা হয়েছে, তখনই হাদীস বিশেষজ্ঞরা এগিয়ে এসেছেন এবং দুধ ও পানিকে পৃথক করে দিয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত এ কর্মধারা অব্যাহত থাকবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমার উম্মতে কেয়ামত পর্যন্ত সত্যপন্থী এমন একদল আলেম থাকবেন, যারা কোরআন ও হাদীসকে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত রাখবেন এবং সকল বাধা-বিপত্তির অবসান ঘটাবেন।

মোটকথা, কোরআন বাস্তবায়নের জন্যে রসূলের শিক্ষা অপরিহার্য। কোরআনের বাস্তবায়ন কেয়ামত পর্যন্ত ফরয। কাজেই রসূলের শিক্ষাও কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকা অবশ্যম্ভাবী। অতএব, উল্লেখিত আয়াতে কেয়ামত পর্যন্ত রসূলের শিক্ষা সংরক্ষিত হওয়ারও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একে হাদীস বিশারদ ওলামা ও বিশুদ্ধ গ্রন্থাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত রেখেছেন। সাম্প্রতিককালে কিছু লোক ইসলামী বিধি-বিধান থেকে গা বাঁচানোর উদ্দেশে একটি অজুহাত আবিস্কার করেছে যে, হাদীসের বর্তমান ভাণ্ডার সংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য নয়। উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের ধর্মদ্রোহিতার স্বরূপই ফুটে উঠেছে। তাদের বোঝা উচিত যে, হাদীসের ভাণ্ডার থেকে আস্থা উঠে গেলে কোরআনের উপরও আস্থা রাখার উপায় থাকে না।

সংশোধনের নিমিত্ত বিশুদ্ধ শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, চারিত্রিক প্রশিক্ষণও আবশ্যক ঃ পবিত্রকরণকে একটি স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত দান করা হয়েছে যে, শিক্ষা যতই বিশুদ্ধ হোক না কেন, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুরুব্বীর অধীন কার্যতঃ প্রশিক্ষণ লাভ না করা পর্যন্ত শুধু শিক্ষা দ্বারাই চরিত্র সংশোধিত হয় না। কারণ, শিক্ষার কাজ হল প্রকৃতপক্ষে সরল ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন। এ কথা সুস্পষ্ট যে, পথ জানা থাকাই গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্যে যথেষ্ট নয়। এ জন্যে সাহস করে পা বাড়াতে হবে এবং চলতেও হবে। সাহসী বুযুর্গদের সংসর্গ ও আনুগত্য ছাড়া সাহস অর্জিত হয় না। যে সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে শিক্ষা অর্জন করেছেন, শিক্ষার সাথে সাথে তাঁদের আত্মিক পরিশুদ্ধিও সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে তাঁর প্রশিক্ষণাধীনে সাহাবিগণের যে একটি দল তৈরী হয়েছিল, একদিকে তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধির গভীরতা ছিল বিস্ময়কর; বিশ্বের দর্শন তাঁদের সামনে হার মেনেছিল এবং অন্যদিকে তাঁদের আত্মিক পবিত্রতা, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসাও ছিল অভাবনীয়। স্বয়ং কোরআন তাদের প্রশংসায় বলে ঃ

'যারা পয়গম্বরের সঙ্গে রয়েছে, তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পর সদয়। তুমি তাদের রুকু-সেজদা করতে দেখবে। তারা আল্লাহ্‌র কৃপা ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে।'

এ কারণেই তাঁরা যে দিকে পা বাড়াতেন, সাফল্য ও কৃতকার্যতা তাঁদের পদচুম্বন করত এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থন তাঁদের সাথে থাকত। তাঁদের বিস্ময়কর কীর্তিসমূহ আজও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার মস্তিস্ককে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। বলাবাহুল্য, এগুলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেরই ফল। বর্তমান পৃথিবীতে শিক্ষার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের চিন্তা সবাই করেন। কিন্তু শিক্ষার প্রাণ সংশোধনের দিক মোটেই মনোযোগ দেয়া হয় না। অর্থাৎ, শিক্ষক ও শিক্ষাগুরুর চারিত্রিক সংশোধন এবং সংস্কারক সুলভ প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া হয় না। ফলে হাজারো চেষ্টাযত্নের পরও এমন কৃতী পুরুষের সৃষ্টি হয় না, যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বলিষ্ঠতা অন্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং অন্যকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষকবর্গ যে ধরনের জ্ঞানগরিমা ও চরিত্রের অধিকারী হবেন, তাদের শিক্ষাধীন ছাত্রসমাজও বেশীর চেয়ে বেশী তাদের মতই হতে পারবে। একারণে শিক্ষাকে কল্যাণকর ও উন্নত করতে হলে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন-পরিবর্ধনের চাইতে শিক্ষকদের শিক্ষাগত, কর্মগত ও চরিত্রগত অবস্থার প্রতি অধিক নজর দেয়া আবশ্যক।

এ পর্যন্ত নবুওয়ত ও রিসালতের তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হল। পরিশেষে সংক্ষেপে আরও জানা প্রয়োজন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর অর্পিত তিনটি কর্তব্য তিনি কতদূর বাস্তবায়িত করেছেন; এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্য কতটুকু হয়েছে? এর জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, তাঁর তিরোধানের সময় সমগ্র আরব উপত্যকার ঘরে ঘরে কোরআন তেলাওয়াত হত। হাজার হাজার হাফেজ ছিলেন। শত শত লোক দৈনিক অথবা প্রতি তৃতীয় দিনে কোরআন খতম করতেন। কোরআন ও হিকমত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

বিশ্বের সমগ্র দর্শন কোরআনের সামনে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। তওরাত ও ইঞ্জীলের বিকৃত সংকলনসমূহ গল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছিল, কিন্তু কোরআনের নীতিমালাকে সম্মান ও শিষ্টাচারের মানদন্ড গণ্য করা হত। অপরদিকে 'তাযকিয়া' তথা পবিত্রকরণও চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এককালের দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরাও চরিত্র-দর্শনের শ্রেষ্ঠ গুরুর আসনে আসীন হয়েছিলেন। চরিত্রহীনতার রোগীরা শুধু রোগমুক্তই হয়নি, সফল চিকিৎসকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। যারা দস্যু ছিল তারা পথপ্রদর্শক হয়ে গেল। মূর্তিপূজারীরা মূর্তমান ত্যাগ ও সহানুভূতি হয়ে গিয়েছিল। কঠোরতা ও যুদ্ধলিপ্সার স্থলে নম্রতা ও পারস্পরিক শান্তি বিরাজমান ছিল। এক সময় ডাকাতিই যাদের পেশা ছিল, তারাই মানুষের ধন-সম্পদের রক্ষকে পরিণত হয়েছিল।

মোটকথা, হযরত খলীলুল্লাহ্ (আঃ)-এর দোয়ার ফলে যে তিনটি কর্তব্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর অর্পিত হয়েছিল, তাতে তিনি স্বীয় জীবদ্দশায়ই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর সহচরগণ এগুলোকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে তথা সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত করে দিয়েছিলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে সন্তানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের

প্রতি পয়গম্বরগণের বিশেষ মনোযোগের কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ আয়াতে ইবরাহিমী দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর দৌলতেই ইহকাল ও পরকালে ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্মান লাভের কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এ ধর্ম থেকে বিমুখ হয়, সে নির্বোধদের স্বর্গে বাস করে।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرٰهٖمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ অর্থাৎ, ইবরাহিমী ধর্ম থেকে সে ব্যক্তিই মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, যার বিন্দুমাত্রও বোধশক্তি নেই। কারণ, এ ধর্মটি হুবহু স্বভাব-ধর্ম। কোন সুস্থস্বভাব ব্যক্তি এ ধর্মকে অস্বীকার করতে পারে না। পরবর্তী আয়াতে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এতেই এ ধর্মের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা এ ধর্মের দৌলতেই হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে ইহকালে সম্মান ও মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং পরকালেও। ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাত্ম্য সারা বিশ্বই প্রত্যক্ষ করেছে। নমরূদের মত পরাক্রমশালী সম্রাট ও তার পারিষদবর্গ একা এই মহাপুরুষের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, ক্ষমতার যাবতীয় কলা-কৌশল তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে এবং সর্বশেষে ভয়াবহ অগ্নিকুন্ডে তাঁকে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু জগতের যাবতীয় উপাদান ও শক্তি যে অসীম ক্ষমতাবানের আজ্ঞাধীন, তিনি নমরূদের সমস্ত পরিকল্পনাকে ধূলিস্মাৎ করে দিলেন। আল্লাহ তাআলা প্রচণ্ড আগুনকেও তাঁর বন্ধুর জন্যে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করে দিলেন। ফলে বিশ্বের সমগ্র জাতি তাঁর অপরিসীম মাহাত্ম্যের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হল। বিশ্বের সমস্ত মুমিন ও কাফির, এমনকি পৌত্তলিকেরাও এ মূর্তিসংহারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে। আরবের মুশরিকরা আর যাই হোক, হযরত ইবরাহীমেরই সন্তান-সন্ততি ছিল। এ কারণে মূর্তিপূজা সত্ত্বেও হযরত ইবরাহিম (আঃ)-এর সম্মান ও মাহাত্ম্য মনে-প্রাণে স্বীকার করত এবং তাঁরই ধর্ম অনুসরণের দাবী করত। ইবরাহীমী ধর্মের কিছু অস্পষ্ট চিহ্ন তাদের কাজে-কর্মেও বিদ্যমান ছিল। হজ্জ, ওমরা, কোরবানী ও অতিথি পরায়ণতা এ ধর্মেরই নিদর্শন। তবে তাদের মূর্খতার কারণে এগুলো বিকৃত হয়ে পড়েছিল। বলাবাহুল্য, এটা ঐ নেয়ামতেরই ফলশ্রুতি— যার দরুন খলীলুল্লাহকে (আঃ) 'মানব নেতা' উপাধি দেয়া হয়েছিলঃ إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর ধর্মের অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য ছাড়াও এ ধর্মের জনপ্রিয়তা ও স্বভাবধর্ম হওয়ার বিষয়টি সারা দুনিয়ার সামনে প্রতিভাত হয়ে গেছে। ফলে যার মধ্যে এতটুকুও বোধশক্তি ছিল, সে এ ধর্মের সামনে মাথা নত করেছিল। এই ছিল ইবরাহীম (আঃ)-এর ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা। পারলৌকিক ব্যাপারটি আমাদের সামনে উপস্থিত নেই, কিন্তু ইবরাহীম (আঃ)-এর মর্যাদা কোরআনের সে আয়াতেই ফুটে উঠেছে, যাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ইহকালে তাঁকে যেমন সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তেমনি পরকালেও তাঁর উচ্চাসন নির্ধারিত রয়েছে।

ইবরাহিমী ধর্মের মৌলনীতি আল্লাহ্র আনুগত্য শুধু মাত্র ইসলামেই সীমাবদ্ধ ঃ অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে ইবরাহিমী ধর্মের ইবরাহিমী মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছেঃ

إِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ, 'ইবরাহীমকে (আঃ) যখন তাঁর পালনকর্তা বললেনঃ আনুগত্য অবলম্বন কর, তখন তিনি বললেন ঃ আমি বিশ্বপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম।' এ বর্ণনা-ভঙ্গিতে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তাআলার (أَسْلِمْ আনুগত্য অবলম্বন কর।) সম্মোধনের উত্তরে সম্মোধনেরই ভঙ্গিতে اسلمت لك (আমি আপনার আনুগত্য অবলম্বন করলাম) বলা যেত, কিন্তু হযরত খলীল (আঃ) এ ভঙ্গি ত্যাগ করে বলেছেন, أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ, আমি বিশ্বপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম। কারণ, প্রথমতঃ এতে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর স্থানোপযোগী গুণকীর্তনও করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়টিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আমি আনুগত্য অবলম্বন করে কারো প্রতি অনুগ্রহ করিনি; বরং এমন করাই ছিল আমার জন্য অপরিহার্য। কারণ, তিনি রাব্বুল আলামীন তথা সারা জাহানের পালনকর্তা। তাঁর আনুগত্য না করে বিশ্ব তথা বিশ্ববাসীর কোনই গত্যন্তর নেই। যে আনুগত্য অবলম্বন করে, সে স্বীয় কর্তব্য পালন করে লাভবান হয়। এতে আরও জানা যায় যে, ইবরাহিমী ধর্মের মৌলনীতির যথার্থ স্বরূপ ও এক 'ইসলাম' শব্দের মধ্যেই নিহিত—যার অর্থ আল্লাহ্র আনুগত্য। ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মের সারমর্মও তাই। ঐসব পরীক্ষার সারমর্মও তাই, যাতে উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর এ দোস্ত মর্যাদার উচ্চস্তর শিখরে পৌছেছেন। ইসলাম তথা আল্লাহর আনুগত্যের খাতিরেই সমগ্র সৃষ্টি। এরই জন্যে পয়গম্বরগণ প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিল করা হয়েছে। এতে আরও বোঝা যায় যে, ইসলামই সমস্ত পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত রসূল ইসলামের দিকেই মানুষকে আহবান করেছেন এবং তাঁরা এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে পরিচালনা করেছেন। কোরআন স্পষ্টভাষায় বলেছেঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ....

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ....

'ইসলামই আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে, তা কখনও কবুল করা হবে না।'

জগতে পয়গম্বরগণ যত ধর্ম এনেছেন, নিজ নিজ সময়ে সে সবই আল্লাহ্র কাছে মকবুল ছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে সেসব ধর্মও ছিল ইসলাম—যদিও সেগুলো বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। যেমন, মূসা (আঃ)-এর ধর্ম, ঈসা (আঃ)-এর ধর্ম, তথা ইহুদী ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু সবগুলোর স্বরূপ ছিল ইসলাম, যার মর্ম আল্লাহর আনুগত্য। তবে এ ব্যাপারে ইবরাহিমী ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি নিজ ধর্মের নাম 'ইসলাম' রেখেছিলেন এবং স্বীয় উম্মতকে 'উম্মতে-মুসলিমাহ্' নামে অভিহিত করেছিলেন। তিনি দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেনঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

অর্থাৎ, 'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উভয়কে (ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে) মুসলিম (অর্থাৎ, আনুগত্যশীল) কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও এক দলকে আনুগত্যকারী কর।' হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তানদের প্রতি ওসীয়ত প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ 'তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া অন্য ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করো না।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পর তাঁরই প্রস্তাবক্রমে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত এ বিশেষ নাম লাভ করেছে। ফলে এ উম্মতের নাম হয়েছে 'মুসলমান'। এ উম্মতের ধর্মও 'মিল্লাতে-ইসলামিয়াহ' নামে

অভিহিত। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا

'— এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। তিনিই ইতিপূর্বে তোমাদের 'মুসলমান' নামকরণ করেছেন এবং এতেও (অর্থাৎ, কোরআনেও) এ নামই রাখা হয়েছে।'

ধর্মের কথা বলতে গিয়ে ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং আরবের মুশরিকরাও বলে যে, তারা ইবরাহিমী ধর্মের অনুসারী, কিন্তু এসব তাদের ভুল ধারণা অথবা মিথ্যা দাবী মাত্র। বাস্তবে মুহাম্মদী ধর্মই শেষ যমানায় ইবরাহিমী ধর্ম তথা স্বভাব-ধর্মের অনুরূপ।

মোটকথা, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যত পয়গম্বর আগমন করেছেন এবং যত আসমানী গ্রন্থ ও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে ইসলাম তথা, আল্লাহ্‌র আনুগত্য। এ আনুগত্যের সারমর্ম হল রিপুর কামনা-বাসনার বিপরীতে আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ ত্যাগ করে হেদায়েতের অনুসরণ।

পরিতাপের বিষয়, আজ ইসলামের নাম উচ্চারণকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমান এ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা ধর্মের নামেও স্বীয় কামনা-বাসনারই অনুসরণ করতে চায়। কোরআন ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যাই তাদের কাছে পছন্দ, যা তাদের কামনা-বাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা শরীয়তের পরিচ্ছদকে টেনে ছিন্ন-বিছিন্ন করে নিজেদের কামনার মূর্তিতে পরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে—যাতে বাহ্যদৃষ্টিতে শরীয়তেরই অনুসরণ করছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কামনারই অনুসরণ।

গাফেলরা জানে না যে, এসব অপকৌশল ও অপব্যাখ্যার দ্বারা সৃষ্টিকে প্রতারিত করা গেলেও স্রষ্টাকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয় ; তাঁর জ্ঞান প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। তিনি মনের গোপন ইচ্ছা ও ভেদকে পর্যন্ত দেখেন ও জানেন। তাঁর কাছে খাঁটি আনুগত্য ছাড়া কোনকিছুই গ্রহণীয় নয়।

এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, ইবরাহীমের ধর্ম বলুন, আর ইসলামই বলুন, তা সমগ্র জাতি বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যেই এক অনন্য নির্দেশনামা। এমতাবস্থায় আয়াতে যে বিশেষভাবে ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আঃ) কর্তৃক সন্তানদের সম্বোধন করার কথা বলা হয়েছে এবং উভয় মহাপুরুষ ওসীয়তের মাধ্যমে স্বীয় সন্তানদেরকে যে ইসলামে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণ কি ?

উত্তর এই যে, এতে বুঝা যায় যে, সন্তানের ভালবাসা ও মঙ্গলচিন্তা রেসালত এমনকি বন্ধুত্বের স্তরেরও পরিপন্থী নয়। আল্লাহ্‌র বন্ধু যিনি এক সময় পালনকর্তার ইঙ্গিতে স্বীয় আদরের দুলালকে কোরবানী করতে কোমর বেঁধেছিলেন, তিনিই অন্য সময় সন্তানের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্যে তাঁর পালনকর্তার দরবারে দোয়াও করেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় সন্তানকে এমন বিষয় দিয়ে যেতে চান, যা তাঁর দৃষ্টিতে সর্ববৃহৎ নেয়ামত অর্থাৎ, ইসলাম। উল্লেখিত আয়াত وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ আর আয়াত إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي এর সারমর্মও তাই। পার্থক্য এতটুকু যে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নেয়ামত ও ধন-সম্পদ হচ্ছে দুনিয়ার ধ্বংসশীল ও নিকৃষ্ট বস্তু নিশ্চয়। অথচ পয়গম্বরগণের দৃষ্টি অনেক উর্ধ্বে। তাঁদের কাছে প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম তথা ইসলাম।

সাধারণ মানুষ মৃত্যুর সময় সন্তানকে বৃহত্তম ধন-সম্পদ দিয়ে যেতে চায়। আজকাল একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী কামনা করে, তার সন্তান মিল-ফ্যাক্টরীর মালিক হোক, আমদানী ও রফতানীর বড় বড় লাইসেন্স লাভ করুক, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স গড়ে তুলুক। একজন চাকুরীজীবী চায়, তার সন্তান উচ্চপদ ও মোটা বেতনে চাকুরী করুক। অপরদিকে একজন শিল্পপতি মনে-প্রাণে কামনা করে, তার সন্তান শিল্পক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করুক। সে সন্তানকে সারা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ কলা-কৌশল বলে দিতে চায়।

এমনিভাবে পয়গম্বর এবং তাঁদের অনুসারী ওলীগণের সর্ববৃহৎ বাসনা থাকে, যে বস্তুকে তাঁরা সত্যিকার চিরস্থায়ী এবং অক্ষয় সম্পদ মনে করেন, তা সন্তানরাও পুরোপুরিভাবে লাভ করুক। এজন্যেই তাঁরা দোয়া করেন এবং চেষ্টাও করেন। অন্তিম সময়ে এরই জন্য ওসীয়ত করেন।

ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা, সন্তানের জন্য বড় সম্পদ ঃ পয়গম্বরগণের এই বিশেষ আচরণের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্যেও একটি নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, তারা যেভাবে সন্তানদের লালন-পালন ও পার্থিব আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে, সেভাবে ; বরং তার চাইতেও বেশী তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা দরকার। মন্দ পথ ও মন্দ কার্যকলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক। এরই মধ্যে সন্তানদের সত্যিকার ভালবাসা ও প্রকৃত শুভেচ্ছা নিহিত। এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে, সন্তানকে রৌদ্রের তাপ থেকে বাঁচাবার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, কিন্তু চিরস্থায়ী অগ্নি ও আযাবের কবল থেকে রক্ষা করার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না। সন্তানের দেহ থেকে কাঁটা বের করার জন্যে সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাকে বন্দুকের গুলি থেকে রক্ষা করবে না।

পয়গম্বরদের কর্মপদ্ধতি থেকে আরও একটি মৌলিক বিষয় জানা যায় যে, সর্বপ্রথম সন্তানদের মঙ্গলচিন্তা করা এবং এর পর অন্য দিকে মনোযোগ দেয়া পিতা-মাতার কর্তব্য। পিতা-মাতার নিকট থেকে এটাই সন্তানদের প্রাপ্য। এতে দু'টি রহস্য নিহিত রয়েছে— প্রথমতঃ প্রাকৃতিক ও দৈহিক সম্পর্কের কারণে তারা পিতা-মাতার উপদেশ সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করবে। অতঃপর সংস্কার প্রচেষ্টায় ও সত্য প্রচারে তারা পিতামাতার সাহায্যকারী হতে পারবে।

দ্বিতীয়ত ঃ এটাই সত্য প্রচারের সব চাইতে সহজ ও উপযোগী পথ যে, প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের সংশোধনের কাজে মনে-প্রাণে আত্মনিয়োগ করবে। এভাবে সত্য প্রচার ও সত্য শিক্ষার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পরিবারের দায়ত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে পরিবারের লোকজনের শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র জাতিরও শিক্ষা হয়ে যায়। এ সংগঠন-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করেই কোরআন বলে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

— 'হে মুমিনগণ, নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর।'

মহানবী (সাঃ) ছিলেন সারা বিশ্বের রসূল। তাঁর হেদায়েত কিয়ামত পর্যন্ত সবার জন্যে ব্যাপক। তাঁকেও সর্বপ্রথম নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ অর্থাৎ, নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। আরও বলা হয়েছে ঃ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا অর্থাৎ, পরিবার-পরিজনকে নামায পড়ার নির্দেশ দিন এবং নিজেও নামায অব্যাহত রাখুন।

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ
الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ
رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِنْ
آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾
صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ
عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا
أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ أَمْ تَقُولُونَ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا
هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ
مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

(১৩৫) তারা বলে, তোমরা ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে। আপনি বলুন, কখনই নয় ; বরং আমরা ইবরাহীমের ধর্মে আছি যাতে বক্রতা নেই। সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১৩৬) তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী। (১৩৭) এতএব তারা যদি ঈমান আনে, তোমাদের ঈমান আনার মত, তবে তারা সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে। সুতরাং এখন তাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী (১৩৮) আমরা আল্লাহ্‌র রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্‌র রং– এর চাইতে উত্তম রং আর কার হ'তে পারে? আমরা তাঁরই এবাদত করি। (১৩৯) আপনি বলে দিন, তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ্ সম্পর্কে তর্ক করছ? অথচ তিনিই আমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। আমাদের জন্যে আমাদের কর্ম, তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্ম। এবং আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ। (১৪০) অথবা তোমরা কি বলছ যে, নিশ্চয়ই ইবরাহীম, ঈসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁদের সন্তানগণ ইহুদী অথবা খ্রীস্টান ছিলেন? আপনি বলে দিন, তোমরা বেশী জান, না আল্লাহ্ বেশী জানেন? (১৪১) তার চাইতে অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্যকে গোপন করে? আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন। সে সম্প্রদায় অতীত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদের জন্যে এবং তোমরা যা করছ, তা তোমাদের জন্যে। তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না।

মহানবী (সাঃ) সর্বদাই এ নির্দেশ পালন করেছেন।

তৃতীয়ত ঃ আরও একটি রহস্য এই যে, কোন মতবাদ ও কর্মসূচীতে পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন সহযোগী ও সমমনা না হলে সে মতবাদ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ কারণেই প্রাথমিক যুগে মহানবী (সাঃ)-এর প্রচারকার্যের জওয়াবে সাধারণ লোকদের উত্তর ছিল যে, প্রথমে আপনি নিজ পরিবার কোরায়েশকে ঠিক করে নিন ; এরপর আমাদের কাছে আসুন। হুযূর (সাঃ)- এর পরিবারে যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করল এবং মক্কা বিজয়ের সময় তা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করল, তখন এর প্রতিক্রিয়া কোরআনের ভাষায় এরূপ প্রকাশ পেল— يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا অর্থাৎ, মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে।

আজকাল ধর্মহীনতার যে সয়লাব শুরু হয়েছে, তার বড় কারণ এই যে, পিতামাতা ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী ও ধার্মিক হলেও সন্তানদের ধার্মিক হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করে না। সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টি সন্তানের পার্থিব ও স্বল্পকালীন আরাম-আয়েশের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং আমরা এর ব্যবস্থাপনায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকি। অক্ষয় ধন-সম্পদের দিকে মনোযোগ দেই না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে তওফীক দিন, যাতে আমরা আখেরাতের চিন্তায় ব্যাপৃত হই এবং নিজের ও সন্তানদের জন্যে ঈমান ও নেক আমলকে সর্ববৃহৎ পুঁজি মনে করে তা অর্জনে সচেষ্ট হই।

বাপ-দাদার কৃতকর্মের ফলাফল সন্তানরা ভোগ করবে না ঃ لَهَا مَا كَسَبَتْ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে,বাপ-দাদার সৎকর্ম সন্তানদের উপকারে আসে না— যতক্ষণ না তারা নিজেরা সৎকর্ম সম্পাদন করবে। এমনিভাবে বাপ-দাদার কুকর্মের শাস্তিও সন্তানরা ভোগ করবে না, যদি তারা সৎকর্মশীল হয়। এতে বোঝা যায় যে, মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি সাবালক হওয়ার পূর্বে মারা গেলে পিতা-মাতার কুফর ও শিরকের কারণে তারা শাস্তি ভোগ করবে না। এতে ইহুদীদের সে দাবীও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় যে, আমরা যা ইচ্ছা তা'ই করব, আমাদের বাপ-দাদার সৎকর্মের দ্বারাই আমাদের মাগ্‌ফেরাত হয়ে যাবে। কিন্তু তা নয়।

কোরআন এ বিষয়টি বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

"প্রত্যেকের আমলের দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।" অন্য এক আয়াতে আছে ঃ "কিয়ামতের দিন একজনের বোঝা অন্যজন বহন করবে না।" রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলছেন ঃ "হে বনী-হাশেম, এমন যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোক নিজ নিজ সৎকর্ম নিয়ে আসবে আর তোমরা আসবে সৎকর্ম থেকে উদাসীন হয়ে শুধু বংশ গৌরব নিয়ে এবং আমি বলব যে, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারব না। অন্য এক হাদীসে আছে ঃ "আমল যাকে পেছনে ফেলে দেয়, বংশ তাকে এগিয়ে নিতে পারে না।"

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআন ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধরকে اسباط শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এটা سبط – এর বহুবচন। এর অর্থ গোত্র ও দল। তাদের سبط বলার কারণ এই যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর ঔরসজাত পুত্রদের সংখ্যা ছিল বার জন। পরে প্রত্যেক পুত্রের সন্তানরা এক-একটি গোত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বংশে বিশেষ বরকত দান করেছিলেন। তিনি যখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে মিসরে যান, তখন সন্তান ছিল বার জন। পরে ফেরাউনের সাথে মোকাবেলার পর মূসা

(আঃ) যখন মিসর থেকে বনী-ইসরাঈলকে নিয়ে বের হলেন, তখন তাঁর সাথে ইয়াকুব (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের সন্তান হাজার হাজার সদস্যের সমন্বয়ে একটি গোত্র ছিল। তাঁর বংশে আল্লাহ্ তা'আলা আরও একটি বরকত দান করেছেন এই যে, দশজন নবী ছাড়া সব নবী ও রসূল ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধরের মধ্যেই পয়দা হয়েছেন। বনী-ইসরাঈল ছাড়া অবশিষ্ট পয়গম্বরগণ হলেন, আদম (আঃ)-এর পর হযরত নূহ্, শোয়াইব, হুদ, সালেহ্, লূত, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, ইসমাঈল ও মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ (যদি তারা তদ্রূপ ঈমান আনে, যেরূপ তোমরা ঈমান এনেছ) – সূরা বাক্বারার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত ঈমানের স্বরূপ কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। কেননা, 'তোমরা ঈমান এনেছ' বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতে তাঁদের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ঈমান হচ্ছে সে রকম ঈমান, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছেন। যে ঈমান ও বিশ্বাস এ থেকে চুল পরিমাণও ভিন্ন, তা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

এর ব্যাখ্যা এই যে, যে সব বিষয়ের উপর তাঁরা ঈমান এনেছেন, তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারবে না। তাঁরা যেরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ঈমান এনেছেন, তাতেও প্রভেদ থাকতে পারবে না। নিষ্ঠায় পার্থক্য হলে তা 'নিফাক' তথা কপট বিশ্বাসে পর্যবসিত হবে। আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী, ফেরেশতা, নবী-রসূল, আল্লাহ্র কিতাব ও এ সবের শিক্ষা সম্বন্ধে যে ঈমান ও বিশ্বাস রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অবলম্বন করেছেন, একমাত্র তাই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য। এ সবের বিপরীত ব্যাখ্যা করা অথবা ভিন্ন অর্থ নেয়া আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ফেরেশতা ও নবী-রসূলগণের যে মর্তবা, মর্যাদা ও স্থান নির্ধারিত হয়েছে, তা হ্রাস করা অথবা বাড়িয়ে দেওয়াও ঈমানের পরিপন্থী।

এ ব্যাখ্যার ফলে কতিপয় ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ঈমানের ত্রুটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা ঈমানের দাবীদার, কিন্তু ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঈমানের মৌখিক দাবী মূর্তিপূজক, মুশরিক, ইহুদী, খ্রীষ্টানরাও করত এবং প্রতিটি যুগে ধর্মভ্রষ্ট বিপথগামীরাও করেছে। যেহেতু আল্লাহ্, রসূল, ফেরেশতা, কিয়ামত-দিবস ইত্যাদির প্রতি তাদের ঈমান তেমন নয়, যেমন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ঈমান, এ কারণে আল্লাহ্র কাছে তা ধিকৃত ও গ্রহণের অযোগ্য সাব্যস্ত হয়ে যায়।

ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের কোন কোন দল পয়গম্বরদের অবাধ্যতা করেছে। এমনকি কোন কোন পয়গম্বরকে হত্যাও করেছে। পক্ষান্তরে কোন কোন দল পয়গম্বরদের সম্মান ও মহত্ব বৃদ্ধি করতে গিয়ে তাঁদেরকে 'খোদা' অথবা 'খোদার পুত্র' অথবা খোদার সমপর্যায়ে নিয়ে স্থাপন করেছে। এ উভয় প্রকার ত্রুটি ও বাড়াবাড়িকেই পথভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। بِمِثْلِ مَا آمَنتُم আয়াতে।

ইসলামী শরীয়তে রসূলের মহত্ব ও ভালবাসা ফরয তথা অপরিহার্য কর্তব্য। এর অবর্তমানে ঈমানই শুদ্ধ হয় না। কিন্তু রসূলকে এলেম, কুদরত ইত্যাদি গুণে আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করা একান্তই পথভ্রষ্টতা ও শিরক। আজকাল কোন কোন মুসলমান রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে 'আলেমুল-গায়েব' 'আল্লাহ্র মতই সর্বত্র বিরাজমান' উপস্থিত ও দর্শক (হাযির ও নাযির) বলেও বিশ্বাস করে। তারা মনে করে যে, এভাবে তারা মহানবী (সাঃ)-এর মহত্ব ও মহব্বত ফুটিয়ে তুলছে। অথচ এটা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশ ও আজীবন সাধনার প্রকাশ্য বিরোধিতা। আলোচ্য আয়াতে এসব মুসলমানের জন্যেও শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ্র কাছে মহানবী (সাঃ)-এর মহত্ব ও মহব্বত এতটুকু কাম্য যতটুকু সাহাবায়ে-কেরামের অন্তরে তাঁর প্রতি ছিল। এতে ত্রুটি করাও অপরাধ এবং একে বাড়িয়ে দেয়াও বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা।

নবী ও রসূলের যেকোন রকম মনগড়া প্রকারভেদই পথভ্রষ্টতা ঃ এমনিভাবে কোন কোন সম্প্রদায় খতমে নবুওয়ত অস্বীকার করে নতুন নবীর আগমনের পথ খুলে দিতে চেয়েছে। তারা কোরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা 'খাতামুন্নাবিয়ীন' (সর্বশেষ নবী)-কে উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিবন্ধক মনে করে নবী ও রসূলের অনেক মনগড়া প্রকার আবিষ্কার করেছে। এসব প্রকারের নাম রেখেছে 'নবী-যিল্লী' (ছায়া-নবী) 'নবী-বুরুযী' (প্রকাশ্য-নবী) ইত্যাদি। আলোচ্য আয়াতটি তাদের অবিমৃশ্যকারিতা ও পথভ্রষ্টতার মুখোশটিকেও উম্মোচিত করে দিয়েছে। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রসূলগণের উপর যে ঈমান এনেছেন, তাতে 'যিল্লী-বুরুযী' বলে কোন নাম-গন্ধও নেই। সুতরাং এটা পরিষ্কার ধর্মদ্রোহিতা।

আখেরাতের উপর ঈমান সম্পর্কে কোন অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় ঃ কিছুসংখ্যক লোকের মস্তিস্ক ও চিন্তা-ভাবনা শুধু বস্তু ও বস্তুবাচক বিষয়াদির মধ্যেই নিমজ্জিত। অদৃশ্যজগত ও পরজগতের বিষয়াদি তাদের মতে অবান্তর ও অযৌক্তিক। তারা এসব ব্যাপারে নিজে থেকে নানাবিধ ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয় এবং একে দ্বীনের খেদমত বলে মনে করে। তারা এসব জটিল বিষয়কে বোধগম্য করে দিয়েছে বলে মনে করে গর্বও করে। কিন্তু এসব ব্যাখ্যা بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ উক্তির পরিপন্থী হওয়ার কারণে বাতিল ও অ-গ্রহণযোগ্য। আখেরাতের অবস্থা ও ঘটনাবলী কোরআন ও হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, বিনা দ্বিধায় ও বিনা ব্যাখ্যায় তা বিশ্বাস করাই প্রকৃতপক্ষে ঈমান। হাশরের পুনরুত্থানের পরিবর্তে আত্মিক পুনরুত্থান স্বীকার করা এবং আযাব, সওয়াব, আমল, ওজন ইত্যাদি বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা বর্ণনা করা সবই গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারণ।

এখলাসের তাৎপর্য ঃ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ বাক্যটিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র ব্যাপারে নিষ্ঠাবান। নিষ্ঠা বা এখলাসের অর্থ হযরত সায়ীদ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে ধর্মে নিষ্ঠাবন হওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার না করা এবং একমাত্র আল্লাহ্র জন্যে সৎকর্ম করা, মানুষকে দেখানোর জন্যে অথবা মানুষের প্রশংসা অর্জনের জন্যে নয়।

سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ
الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٢﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ
عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ
كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۚ
وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ
لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٣﴾ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ
وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا
قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۗ
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ
اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٥﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ
اَبْنَآءَهُمْ ۗ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤٦﴾

(১৪২) এখন নির্বোধেরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের ঐ কেবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল? আপনি বলুন ঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান। (১৪৩) এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি— যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্যে। (১৪৪) আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যেই কেবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিতই এটা কেঠারতর বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ্ পথপ্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্, মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুণাময়। (১৪৫) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর। যারা আহ্লে-কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ্ বেখবর নন, সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে যা তারা করে। (১৪৫) যদি আপনি আহ্লে-কিতাবদের কাছে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কেবলা মেনে নেবে না এবং আপনিও তাদের কেবলা মানেন না। তারাও একে অন্যের কেবলা মানে না। যদি আপনি তাদের বাসনার অনুসরণ করেন, সে জ্ঞানলাভের পর, যা আপনার কাছে পৌছেছে, তবে নিশ্চয় আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(১৪৬) আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য ১৪২ তম আয়াতে কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে বিরোধিতাকারীদের আপত্তি বর্ণনা করে তার জওয়াব দেয়া হয়েছে। আপত্তি ও জওয়াবের পূর্বে কেবলার স্বরূপ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জেনে নেয়া বাঞ্ছনীয়।

কেবলার শাব্দিক অর্থ মুখ করার দিক। প্রত্যেক এবাদতে মুমিনের মুখ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র দিকেই থাকে। আল্লাহ্ পবিত্র সত্তা ; পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বন্ধন থেকে মুক্ত, তিনি কোন বিশেষ দিকে অবস্থান করেন না। ফলে কোন এবাদতকারী ব্যক্তি যদি যে দিকে ইচ্ছা সেদিকেই মুখ করত কিংবা একই ব্যক্তি এক সময় একদিকে অন্য সময় অন্যদিকে মুখ করত, তবে তাও স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী হতো না।

কিন্তু অপর একটি রহস্যের কারণে সমস্ত এবাদতকারীর মুখ একদিকেই হওয়া উচিত। রহস্যটি এই,— এবাদত বিভিন্ন প্রকার। কিছু এবাদত ব্যক্তিগত, আর কিছু এবাদত সমষ্টিগত। আল্লাহ্র যিকির, রোযা প্রভৃতি ব্যক্তিগত এবাদত। এগুলো নির্জনে গোপণভাবে সম্পাদন করতে হয়। নামায ও হজ্ব সমষ্টিগত ইবাদত। এগুলো সংঘবদ্ধভাবে এবং প্রকাশ্যে সম্পাদন করতে হয়। সমষ্টিগত উপাসনার বেলায় উপাসনার সাথে সাথে মুসলমানদের সংঘবদ্ধ জীবনের রীতি-নীতিও শিক্ষা দেয়া লক্ষ্য থাকে। এটা সবারই জানা যে, সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থার প্রধান মৌলনীতি হচ্ছে বহু ব্যক্তি ভিত্তিক ঐক্য ও একাত্মতা। এ ঐক্য যত দৃঢ় ও মজবুত হবে, সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থাও ততই শক্ত ও সুদৃঢ় হবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং বিচ্ছিন্নতা উভয়টিই সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থার পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর। এরপর ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু কি হবে, তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে বিভিন্ন যুগের মানুষ বিভিন্ন মত পোষণ করেছে। কোন কোন সম্প্রদায় বংশকে কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছে, কেউ দেশ ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে এবং কেউ বর্ণ ও ভাষাকে।

কিন্তু আল্লাহ্র ধর্ম এবং পয়গম্বরদের শরীয়ত এ সব এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়কে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু করার যোগ্য মনে করেনি। প্রকৃতপক্ষে এসব বিষয় সমগ্র মানবজাতিকে একই কেন্দ্রে সমবেত করতে সমর্থও নয়। বরং চিন্তা করলে দেখা যায়, এ ধরনের ঐক্য প্রকৃতপক্ষে মানব জাতিকে বহুধা বিভক্ত করে দেয় এবং পারস্পারিক সংঘর্ষ ও মতানৈক্যই সৃষ্টি করে বেশী।

সকল পয়গম্বরের ধর্ম ইসলাম ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের ঐক্যকেই ঐক্যের মানদণ্ড ও কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছে এবং কোটি কোটি উপাস্যের উপসনায় বিভক্ত বিশ্বকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লহ্র এবাদত ও আনুগত্যের প্রতি আহবান জানিয়েছে। বলাবাহুল্য, একমাত্র এ কেন্দ্রবিন্দুতেই পূর্ব ও পশ্চিম, ভূত ও ভবিষ্যতের মানবমণ্ডলী একত্রিত হতে পারে। অতঃপর এ ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের ঐক্যকে বাস্তবে রূপায়ন এবং শক্তিদানের উদ্দেশে তৎসঙ্গে কিছু বাহ্যিক ঐক্যও যোগ করা হয়েছে। কিন্তু এসব বাহ্যিক ঐক্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, ঐক্যের বিষয়বস্তু কার্যগত ও ইচ্ছাধীন হতে হবে— যাতে সমগ্র মানবমণ্ডলী স্বেচ্ছায় তা অবলম্বন করে ঐক্যসূত্রে গ্রহিত হতে পারে। বংশ, দেশ, ভাষা, বর্ণ প্রভৃতি ঐচ্ছিক বিষয় নয়। যে ব্যক্তি এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, সে অন্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে পারে না । যে ব্যক্তি পাকিস্তানে অথবা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছে, সে বিলেতে অথবা অফ্রিকায় জন্মগ্রহণে সক্ষম নয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণকায়, সে যেমন স্বেচ্ছায়

শ্বেতকায় হতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে একজন শ্বেতকায় ব্যক্তিও স্বেচ্ছায় কৃষ্ণকায় হতে পারে না।

এমন বিষয়কে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করা হলে মানবতা শতধা, এমনকি সহস্রধা বিভক্ত হয়ে পড়া অপরিহার্য হয়ে যাবে। এ কারণে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে জড়িত এ সব বিষয়কে ইসলাম পরিপূর্ণ সম্মান দান করলেও, মানব ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হতে দেয়নি। তবে ইসলাম ইচ্ছাধীন বিষয়সমূহে চিন্তাগত ঐক্যের সাথে সাথে কার্যগত ও আকারগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে। এতেও এমন বিষয়কে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা স্বেচ্ছায় অবলম্বন করা প্রত্যেক পুরুষ-স্ত্রী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে-গ্রাম্য, ধনী-দরিদ্রের পক্ষে সমান সহজ। কাজেই ইসলামী শরীয়ত সারা বিশ্বের মানুষকে পোশাক, বাসস্থান ও পানাহারের ব্যাপারে কোন এক নিয়মের অধীন করেনি। কারণ, প্রত্যেক দেশের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে প্রয়োজনাদিও ভিন্ন ভিন্ন। এমতাবস্থায় সবাইকে একই ধরনের পোশাক ও ইউনিফর্মের অধীন করে দিলে নানা অসুবিধা দেখা দেবে। যদি ন্যূনতম কোন ইউনিফর্মেরও অধীন করে দেয়া হয়, তাতেও মানবিক সমতার প্রতি অবিচার করা হবে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত উৎকৃষ্ট পোশাক ও বস্ত্রের অবমাননা হবে। পক্ষান্তরে আরও বেশী দামের ইউনিফর্মের অধীন করে দেয়া হলে দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এ কারণে ইসলামী শরীয়ত মুসলমানদের জন্যে কোন বিশেষ পোশাক বা ইউনিফর্ম নির্দিষ্ট করেনি, বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব পন্থা ও পোশাক প্রচলিত ছিল, সবগুলো যাচাই করে অপব্যয়, অযথা গর্ব ও বিজাতীয় অনুকরণ-ভিত্তিক পন্থা ও পোশাক-পরিচ্ছদকে নিষিদ্ধ করেছে। অবশিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এমনি বিষয়াদিকে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা ইচ্ছাধীন সহজলভ্য ও সস্তা। উদাহরণতঃ জামা'তের নামাযে কাতারবন্দি হওয়া, ইমামের উঠাবসার পূর্ণ অনুকরণ, হজ্বের সময় পোশাক ও অবস্থানের অভিন্নতা ইত্যাদি।

এমনিভাবে কেবলার ঐক্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা যদিও যাবতীয় দিকের বন্ধন থেকে মুক্ত, তাঁর জন্য সবদিকই সমান, তথাপি নামাযে সমষ্টিগত ঐক্য সৃষ্টি করার উদ্দেশে বিশ্ববাসীর মুখমণ্ডল একই দিকে নিবদ্ধ থাকা একটি উত্তম, সহজ ও স্বাভাবিক ঐক্য পদ্ধতি। এতে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণের সমগ্র মানবমণ্ডলী সহজেই একত্রিত হতে পারে। এখন সমগ্র বিশ্বের মুখ করার দিক কোনটি হবে এর মীমাংসা মানুষের হাতে ছেড়ে দিলে তাও বিরাট মতানৈক্য এবং কলহের কারণ হয়ে যাবে। একারণে এর মীমাংসা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হওয়াই বিধেয়। হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেই ফেরেশতাদের দ্বারা কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। আদম ও আদম-সন্তানদের জন্যে সর্বপ্রথম কেবলা কা'বাগৃহকেই সাব্যস্ত করা হয়। বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

অর্থাৎ, মানুষের জন্যে সর্বপ্রথম যে গৃহ নির্মিত হয়, তা মক্কায় অবস্থিত এবং এ গৃহ বিশ্ববাসীর জন্যে হেদায়েত ও বরকতের উৎস।

নামাযে কা'বার দিকে মুখ করাই যথেষ্ট ঃ এখানে একটি ফেকাহ্-বিষয়ক সূক্ষ্ম তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। আয়াতে কা'বা অথবা বায়তুল্লাহ বলার পরিবর্তে 'মসজিদে-হারাম' বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বসবাসকারীদের পক্ষে হুবহু কা'বাগৃহ বরাবর দাঁড়ানো জরুরী নয়, বরং পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের মধ্য থেকে যে দিকটিতে কা'বা অবস্থিত সেদিকে মুখ করলেই যথেষ্ট হবে। তবে যে ব্যক্তি মসজিদে-হারামে উপস্থিত রয়েছে কিংবা নিকটস্থ কোন স্থান বা পাহাড় থেকে কা'বা দেখতে পাচ্ছে, তার পক্ষে এমনভাবে দাঁড়ানো জরুরী যাতে কা'বাগৃহ তার চেহারার বরাবরে থাকে। যদি কা'বাগৃহের কোন অংশ তার চেহারা বরাবরে না পড়ে, তবে তার নামায শুদ্ধ হবে না। কা'বাগৃহ যাদের চোখের সামনে নেই এ বিধান তাদের জন্যে নয়। তারা কা'বাগৃহ কিংবা মসজিদে-হারামের দিকে মুখ করলেই যথেষ্ট।

وسط শব্দের অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়। আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ মহানবী (সাঃ) عدل শব্দ দ্বারা وسط - এর ব্যাখ্যা করেছেন।—এর অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট। (কুরতুবী) আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি শ্রেষ্ঠত্ব ও ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত করা হয়েছে। এর ফলে তারা হাশরের ময়দানে একটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে। সকল পয়গম্বরের উম্মতরা তাঁদের হেদায়েত ও প্রচারকার্য অস্বীকার করে বলতে থাকবে, দুনিয়াতে আমাদের কাছে কোন আসমানী গ্রন্থ পৌঁছেনি এবং কোন পয়গম্বরও আমাদের হেদায়েত করেননি। তখন মুসলিম সম্প্রদায় পয়গম্বরগণের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে উপস্থিত হবে এবং সাক্ষ্য দেবে যে, পয়গম্বরগণ সব যুগেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আনীত হেদায়েত তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্যে তাঁরা সাধ্যমত চেষ্টাও করেছেন। বিবাদী উম্মতরা মুসলিম সম্প্রদায়ের সাক্ষ্যে প্রশ্ন তুলে বলবে ঃ আমাদের আমলে এই সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আমাদের ব্যাপারাদি তাদের জানার কথা নয়, কাজেই আমাদের বিপক্ষে তাদের সাক্ষ্য কেমন করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

মুসলিম সম্প্রদায় এ প্রশ্নের উত্তরে বলবে ঃ নিঃসন্দেহে তখন আমাদের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু আমাদের নিকট তাদের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কিত তথ্যাবলী একজন সত্যবাদী রসূল ও আল্লাহ্র গ্রন্থ কোরআন সরবরাহ করেছে। আমরাও সে গ্রন্থের উপর ঈমান এনেছি এবং তাদের সরবরাহকৃত তথ্যাবলীকে চাক্ষুষ দেখার চাইতেও অধিক সত্য মনে করি ; তাই আমাদের সাক্ষ্য সত্য। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উপস্থাপিত হবেন এবং সাক্ষীদের সমর্থন করে বলবেন ঃ তারা যাকিছু বলছে, সবই সত্য। আল্লাহ্র গ্রন্থ এবং আমার শিক্ষার মাধ্যমে তারা এসব তথ্য জানতে পেরেছে।

হাশরের ময়দানে সংঘটিতব্য এ ঘটনার বিবরণ সহীহ্ বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী ও মুসন'দে-আহ্মদের একাধিক হাদীসে সংক্ষেপে ও সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করা হয়েছে। তাই এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

মধ্যপন্থার রূপরেখা, তার গুরুত্ব ও কিছু বিবরণ ঃ (১) মধ্যপন্থার অর্থ ও তাৎপর্য কি? (২) মধ্যপন্থার এত গুরুত্বই বা কেন যে, এর উপরই শ্রেষ্ঠত্বকে নির্ভরশীল করা হয়েছে? (৩) মুসলিম সম্প্রদায় যে মধ্যপন্থী,

বাস্তবতার নিরীখে এর প্রমাণ কি? ধারাবাহিকভাবে এ তিনটি প্রশ্নের উত্তরঃ

(১) اعتدال (ভারসাম্য)-এর শাব্দিক অর্থ সমান হওয়া। عدل মূল ধাতু থেকে এর উৎপত্তি, আর عدل এর অর্থও সমান হওয়া।

(২) যে গুরুত্বের কারণে ভারসাম্যকে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি সাব্যস্ত করা হয়েছে তা একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। বিষয়টি প্রথমে একটি স্থুল উদাহরণ দ্বারা বুঝুন। ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ইত্যাদি যত নতুন ও পুরাতন চিকিৎসা-পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে, সে সবই এ বিষয়ে একমত যে, 'মেযাজে'র বা স্বভাবের ভারসাম্যের উপরই মানবদেহের সুস্থতা নির্ভরশীল। ভারসাম্যের ত্রুটিই মানবদেহে রোগ-বিকার সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির মূলনীতিই মেজায-পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল। এ শাস্ত্র মতে মানবদেহ চারিটি উপাদান—রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল ও পিত্ত দ্বারা গঠিত। এ চারিটি উপাদান থেকে উৎপন্ন চারিটি অবস্থা শৈত্য, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা মানবদেহে বিদ্যমান থাকা জরুরী। এ চারিটি উপাদানের ভারসাম্যই মানবদেহের প্রকৃত সুস্থতা নিশ্চিত করে। পক্ষান্তরে যে কোন একটি উপাদান মেজাযের চাহিদা থেকে বেড়ে অথবা কমে গেলেই তা হবে রোগ-ব্যাধি। চিকিৎসা দ্বারা এর প্রতিকার না করলে এক পর্যায়ে তাই মৃত্যুর কারণ হবে।

এই স্থুল উদাহরণের পর এখন আধ্যাত্মিকতার দিকে আসুন। আধ্যাত্মিকতায় ভারসাম্যের নাম আত্মিক সুস্থতা এবং ভারসাম্যহীনতার নাম আত্মিক ও চারিত্রিক অসুস্থতা। এ অসুস্থতার চিকিৎসা করে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা না হলে পরিণামে আত্মিক মৃত্যু ঘটে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রই জানে যে, যে উৎকৃষ্টতার কারণে মানুষ সমগ্র সৃষ্টিজীবের সেরা, তা তার দেহ অথবা দেহের উপাদান অথবা সেগুলোর অবস্থা, তাপ-শৈত্য নয়। কারণ, এসব উপাদান ও অবস্থার ক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্যান্য জীব-জন্তুও মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত, বরং তাদের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে এসব উপাদান মানুষের চাইতেও বেশী থাকে।

যে বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ 'আশরাফুল -মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা বলে গণ্য হয়েছে, তা নিশ্চিতই তার রক্ত-মাংস চর্ম এবং তাপ-শৈত্যের উর্ধ্বে অন্য কোন বিষয় যা মানুষের মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান—অন্যান্য সৃষ্টজীবের মধ্যে ততটুকু নেই। এ বস্তুটি নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করাও কোন সূক্ষ্ম ও কঠিন কাজ নয়। বলাবাহুল্য, তা হচ্ছে মানুষেরর আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠা বা পরিপূর্ণতা।

আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠাই যখন মানুষের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি, মানবদেহের মত মানবাত্মাও যখন ভারসাম্য ও ভারসাম্যহীনতার শিকার হয় এবং মানবদেহের সুস্থতা যখন মেযাজ ও উপাদানের ভারসাম্য আর মানবাত্মার সুস্থতা যখন আত্মা ও চরিত্রের ভারসাম্য, তখন কামেল মানব একমাত্র তিনিই হতে পারেন, যিনি দৈহিক ভারসাম্যের সাথে সাথে আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্যেরও অধিকারী হবেন। এ উভয়বিধ ভারসাম্য সমস্ত পয়গম্বরকে বিশেষভাবে দান করা হয়েছিল এবং আমাদের রসূল (সাঃ) তা সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ কারণে তিনি সর্বপ্রধান কামেল মানব।

আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর প্রেরণ ও গ্রন্থ অবতরণের রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এগুলোর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে চারিত্রিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা হবে এবং লেন-দেন ও পারস্পারিক আদান-প্রদানে বৈষয়িক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মানদণ্ড নাযিল করা হয়েছে। মানদণ্ড অর্থ প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়ত হতে পারে। শরীয়ত দ্বারা সত্যিকার ভারসাম্য জানা যায় এবং ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, মানবমণ্ডলীকে আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্যের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করাই পয়গম্বর ও আসমানী গ্রন্থ প্রেরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য, এটাই মানব মণ্ডীলর সুস্থতা।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্বপ্রকার ভারসাম্য নিহিত ঃ মুলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

অর্থাৎ— আমি তোমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় করেছি। উপরোক্ত বর্ণনা থেকেই অনুমান করা যায় যে, وَّسَطًا শব্দটি উচ্চারণ ও লেখায় একটি সাধারণ শব্দ হলেও তাৎপর্যের দিকে দিয়ে কোন সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তির মধ্যে যত পরাকাষ্ঠা থাকা সম্ভব, সে সবগুলোকে পরিব্যপ্ত করেছে।

আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী, ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান। যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে এবং পয়গম্বর ও আসমানী গ্রন্থসমূহ প্রেরিত হয়েছে, তাতে এ সম্প্রদায় অপরাপর সম্প্রদায় থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ।

কোরআন বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করেছে। সূরা আ'রাফের শেষভাগে এ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ

অর্থাৎ, আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা সৎপথ প্রদর্শন করে এবং তদনুযায়ী ন্যায়বিচার করে।

এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্য বিধৃত হয়েছে যে, তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আসমানী গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেরাও চলে এবং অন্যদেরকেও চালাবার চেষ্টা করে। কোন ব্যাপারে কলহবিবাদ সৃষ্টি হলে তার মীমাংসাও তারা গ্রন্থের সাহায্যেই করে, যাতে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার কোন আশঙ্কা নেই।

সূরা আলে-ইমরানে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ভারসাম্য এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

অর্থাৎ, তোমরাই সে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখবে।

অর্থাৎ, মুসলমানরা যেমন সব পয়গম্বরের শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর প্রাপ্ত হয়েছে, সব গ্রন্থের সর্বাধিক পরিব্যপ্ত ও পূর্ণতর গ্রন্থ লাভ করেছে, তেমনি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ মেজায এবং ভারসাম্যও সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে তারাই সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের সামনে জ্ঞানবিজ্ঞান ও তত্ত্ব-রহস্যের দ্বার উম্মুক্ত করা

হয়েছে। ঈমান, আমল ও খোদাভীতির সমস্ত শাখা-প্রশাখা তাদের ত্যাগের দৌলতে সজীব ও সতেজ হয়ে উঠবে। তারা কোন বিশেষ দেশ ও ভৌগলিক সীমার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে না। তাদের কর্মক্ষেত্র হবে সমগ্র বিশ্ব এবং জীবনের সকল শাখায় পরিব্যপ্ত। তাদের অস্তিত্বই অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষা ও তাদের বেহেশতের দ্বারে উপনীত করার কাজে নিবেদিত।

أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ বাক্যাংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়টি গণ মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষা ও উপকারের নিমিত্তই সৃষ্ট। তাদের অভীষ্ট কর্তব্য ও জাতীয় পরিচয় এই যে, তারা মানুষকে সৎকাজের দিকে পথ দেখাবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে।

বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় হওয়ার প্রমাণ কি? এখন এ প্রশ্নটি আলোচনাসাপেক্ষ। এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে হলে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র ও কীর্তিসমূহ যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে নমুনাস্বরূপ কতিপয় বিষয় উলেখ করা হচ্ছেঃ

বিশ্বাসের ভারসাম্য ঃ সর্বপ্রথম বিশ্বাসগত ভারসাম্য নিয়েই আলোচনা করা যাক। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্র পুত্র মনে করে তাদের উপাসনা ও আরাধনা করতে শুরু করেছে। যেমন, এক আয়াতে রয়েছে ঃ ''ইহুদীরা বলেছে, ওযায়ের আল্লাহ্র পুত্র এবং খ্রীষ্টানরা বলেছে, মসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র''। অপরদিকে এসব সম্প্রদায়েরই অনেকে পয়গম্বরের উপর্যুপরি মো'জেযা দেখা সত্ত্বেও তাদের পয়গম্বর যখন তাদেরকে কোন ন্যায়যুদ্ধে আহবান করেছেন, তখন পরিষ্কার বলে দিয়েছে ঃ ''আপনি এবং আপনার পালনকর্তাই যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব।'' আবার কোথাও পয়গম্বরগণকে স্বয়ং তাদের অনুসারীদের হাতেই নির্যাতিতও হতে দেখা গেছে।

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা তা নয়। তারা একদিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি এমন আনুগত্য ও মহব্বত পোষণ করে যে, এর সামনে জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, ইজ্জত-আবরু সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপরদিকে রসূলকে রসূল এবং আল্লাহ্কে আল্লাহ্ই মনে করে। এতসব পরাকাষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তারা আল্লাহ্র দাস ও রসূল বলেই বিশ্বাস করে এবং মুখে প্রকাশ করে। তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে গিয়েও তারা একটা সীমার ভেতরে থাকে।

কর্ম ও এবাদতের ভারসাম্য ঃ বিশ্বাসের পরই শুরু হয় আমল ও এবাদতের পালা। এক্ষেত্রেও পূর্ববতর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা শরীয়তের বিধি-বিধানকে কানাকড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, ঘুষ-উৎকোচ নিয়ে আসমানী গ্রন্থকে পরিবর্তন করে অথবা মিথ্যা ফতোয়া দেয়, বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান পরিবর্তন করে এবং এবাদত থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। অপরদিকে তাদের উপাসনালয়সমূহে এমন লোকও দেখা যায়, সংসারধর্ম ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছে। তারা খোদাপ্রদত্ত হালাল নেয়ামত থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখে এবং কষ্ট সহ্য করাকেই সওয়াব ও এবাদত বলে মনে করে।

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায় একদিকে বৈরাগ্যকে মানবতার প্রতি জুলুম বলে মনে করে এবং অপরদিকে আল্লাহ্ ও রসূলের বিধি-বিধানের জন্যে জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা রোম ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসনের অধিপতি ও মালিক হয়েও বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ধর্মনীতি ও রাজনীতির মধ্যে কোন বৈরিতা নেই এবং ধর্ম মসজিদ ও খানকায় আবদ্ধ থাকার জন্যে আসেনি ; বরং হাট-ঘাট, মাঠ-ময়দান, অফিস-আদালত এবং মন্ত্রণালয়সমূহে এর সাম্রাজ্য অপ্রতিহত। তাঁরা বাদশাহীর মাঝে ফকিরী এবং ফকিরীর মাঝে বাদশাহী শিক্ষা দিয়েছে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য ঃ এরপর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য করুন। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা মানবাধিকারের প্রতি পরওয়াও করেনি ; ন্যায়-অন্যায়ের তো কোন কথাই নেই। নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাউকে যেতে দেখলে তাকে নিপীড়ণ, হত্যা ও লুণ্ঠন করাকেই বড় কৃতিত্ব মনে করেছে। জনৈক বিত্তশালীর চারণভূমিতে অপরের উট প্রবেশ করে কিছু ক্ষতিসাধন করায় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যায়। এতে কত মানুষ যে নিহত হয়, তার কোন ইয়ত্তা নেই। মহিলাদের মানবাধিকার দান করা তো দূরের কথা, তাদের জীবিত থাকার অনুমতি পর্যন্ত দেয়া হত না। কোথাও প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের জীবন্ত সমাহিত করার প্রথা এবং কোথাও মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে দাহ করার প্রথা। অপরদিকে এমন নির্বোধ দয়ার্দ্রতারও প্রচলন ছিল যে, পোকা-মাকড় হত্যা করাকেও অবৈধ জ্ঞান করা হত। জীব-হত্যাকে তো দস্তুরমত মহাপাপ বলে সাব্যস্ত করা হত। আল্লাহ্র হালাল করা প্রাণীর গোশত ভক্ষণকে মনে করা হত অন্যায়।

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরীয়ত এসব ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটিয়েছে। তারা একদিকে মানুষের সামনে মানবাধিকারকে তুলে ধরেছে। শুধু শান্তি ও সন্ধির সময়ই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রেও শত্রুর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেক কাজের একটা সীমা নির্ধারণ করেছে, যা লঙ্ঘণ করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। নিজ অধিকারের ব্যাপারে ক্ষমা, মার্জনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং অপরের অধিকার প্রদানে যত্নবান হওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য ঃ এরপর অর্থনীতি বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রেও অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা। এতে হালাল-হারাম এবং অপরের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুরবস্থা থেকে চক্ষু বন্ধ করে অধিকতর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকেই সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য গণ্য করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি মালিকানাকেই অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, উভয় অর্থব্যবস্থার সারমর্মই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপাসনা, ধন-সম্পদকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান করা এবং এরই জন্যে যাবতীয় চেষ্ট-সাধনা নিয়োজিত করা।

মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরীয়ত এক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব

অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামী শরীয়ত একদিকে ধন-সম্পদকে জীবনের লক্ষ্য মনে করতে বারণ করেছে এবং সম্মান, ইজ্জত ও কোন পদমর্যাদা লাভকে এর উপর নির্ভরশীল রাখেনি ; অপরদিকে সম্পদ বন্টনের নিষ্কলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে যাতে কোন মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না বসে। এছাড়া সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ ও সাধারণ ওয়াক্‌ফের আওতায় রেখেছে। বিশেষ বস্তুর মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। হালাল মালের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

সাক্ষ্যদানের জন্যে ন্যায়ানুগ হওয়া শর্ত ঃ لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ মুসলিম সম্প্রদায়কে ভারসাম্যপূর্ণ তথা ন্যায়ানুগ করা হয়েছে যাতে তারা সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়। এতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি আদেল বা ন্যায়নুগ নয়, সে সাক্ষ্যদানেরও যোগ্য নয়। আদেলের অর্থ সাধারণতঃ 'নির্ভরযোগ্য' করা হয়। এর সম্পূর্ণ শর্ত ফেকাহ্ গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত রয়েছে।

ইজ্‌মা শরীয়তের দলীল ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন, ইজ্‌মা (মুসলিম ঐকমত্য) যে শরীয়তের একটি দলীল, আলোচ্য আয়াতটি তার প্রমাণ। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্প্রদায়কে সাক্ষ্যদাতা সাব্যস্ত করে আপরাপর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে তাদের বক্তব্যকে দলীল করে দিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের ইজমা বা ঐকমত্যও একটি দলীল এবং তা পালন করা ওয়াজিব। সাহাবীগণের ইজমা তাবেয়িগণের জন্যে এবং তাবেয়িগণের ইজমা তাঁদের পরবর্তীদের জন্যে দলীল স্বরূপ।

তফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে ঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের যেসব ক্রিয়াকর্ম সর্বসম্মত, তা আল্লাহ্‌র কাছে প্রশংসনীয় ও গ্রহণীয়। কারণ, যদি মনে করা হয় যে, তারা ভ্রান্ত বিষয়ে একমত হয়েছে, তবে তাদের নির্ভরযোগ্য সম্প্রদায় বলার কোন অর্থ থাকে না।

ইমাম জাস্‌সাস বলেন ঃ এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক যুগের মুসলমানদের ইজমাই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয়। 'ইজমা শরীয়তের দলীল' — এ কথাটি প্রথম শতাব্দী অথবা বিশেষ কোন যুগের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। কারণ, আয়াতে সমগ্র সম্প্রদায়কেই সম্বোধন করা হয়েছে। যারা আয়াত নাযিলের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁরাই শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নন ; বরং কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান আসবে, তারা সবাই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং প্রতি যুগের মুসলমানই 'আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যদাতা'। তাদের উক্তি দলীল। তারা কোন ভুল বিষয়ে একমত হতে পারে না।

কা'বা শরীফ সর্বপ্রথম কখন নামাযের কেবলা হয় ঃ হিজরতের পূর্বে মক্কা মোকাররমায় যখন নামায ফরয হয়, তখন কা'বা গৃহই নামাযের জন্যে কেবলা ছিল, না বায়তুল-মোকাদ্দস ছিল— এ প্রশ্নে সাহাবী ও তাবেয়িগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ইসলামের শুরু থেকেই কেবলা ছিল বায়তুল-মোকাদ্দাস। হিজরতের পরও ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসই কেবলা ছিল। এরপর কা'বাকে কেবলা করার নির্দেশ আসে। তবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কায় অবস্থানকালে হাজরে-আসওয়াদ ও রোকনে-ইয়ামানীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যাতে কা'বা ও বায়তুল-মোকাদ্দাস উভয়টিই সামনে থাকে। মদীনায় পৌছার পর এরূপ করা সম্ভবপর ছিল না। তাই তাঁর মনে কেবলা পরিবর্তনের বাসনা দানা বাঁধতে থাকে।— (ইবনে-কাসীর)

অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়িগণ বলেন ঃ মক্কায় নামায ফরয হওয়ার সময় কা'বা গৃহই ছিল মুসলমানদের প্রাথমিক কেবলা। কেননা, হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)- এর কেবলাও তাই ছিল। মহানবী (সাঃ) মক্কায় অবস্থানকালে কা'বাগৃহের দিকে মুখ করেই নামায পড়তেন। মদীনায় হিজরতের পর তাঁর কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাস সাব্যস্ত হয়। তিনি মদীনায় ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। এরপর প্রথম কেবলা অর্থাৎ, কা'বাগৃহের দিকে মুখ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়।

বনু-সালমার মুসলমানরা যোহর অথবা আসরের নামায থেকেই কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ কার্যকর করে নেন। কিন্তু কেবার মসজিদে এ সংবাদ পরদিন ফজরের নামাযে পৌছালে তারাও নামাযের মধ্যেই বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিক থেকে কা'বার দিকে মুখ করে নেন।— (ইবনে-কাসীর, জাস্‌সাস)।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ - এখানে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা ঈমানের প্রচলিত অর্থ নেয়া হলে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, কেবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধেরা মনে করতে থাকে যে, এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না। কাজেই তোমরা নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত করো না।

কোন কোন হাদীসে এবং মনীষীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে নামায। মর্মার্থ এই যে, সাবেক কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে যেসব নামায পড়া হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো নষ্ট করবেন না ; বরং তা শুদ্ধ ও মকবুল হয়েছে।

সহীহ্ বোখারীতে ইবনে-আ'যেব (রাঃ) এবং তিরমিযীতে ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কা'বাকে কেবলা করার পর অনেকেই প্রশ্ন করে যে, যেসব মুসলমান ইতিমধ্যেই ইন্তেকাল করেছেন, তাঁরা বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে নামায পড়ে গেছেন— কা'বার দিকে নামায পড়ার সুযোগ পাননি, তাঁদের কি হবে? এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই অলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এতে নামাযকে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সব নামাযই শুদ্ধ ও গ্রহণীয়। তাদের ব্যাপারে কেবলা পরিবর্তনের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না।

আলোচ্য ১৪৪ তম আয়াতের প্রথম বাক্যে কা'বার প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর আকর্ষণ এবং এর বিভিন্ন কারণ বর্ণিত হয়েছে। এসব কারণের মধ্যে কোন বিরোধ নেই — সবই সম্ভবপর। উদাহরণত ঃ মহানবী (সাঃ) ওহী অবতরণ ও নবুওয়ত-প্রাপ্তির পূর্বে স্বীয় স্বভাবগত ঝোঁকে দ্বীনে-ইবরাহিমীর অনুসরণ করতেন। ওহী অবতরণের পর কোরআনও তাঁর শরীয়তকে দ্বীনে-ইবরাহিমীর অনুরূপ বলেই আখ্যা দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর কেবলাও কা'বাই ছিল।

আরও কারণ ছিল এই যে, আরব গোত্রগুলো মৌখিকভাবে হলেও দ্বীনে-ইবরাহীমী স্বীকার করত এবং নিজেদেরকে তার অনুসারী বলে দাবী করত। ফলে কা'বা মুসলমানদের কেবলা হয়ে গেলে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারত। সাবেক কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাস দ্বারা

আহ্‌লে-কিতাবদের আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ষোল/সতের মাসের অভিজ্ঞতার পর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ, মদীনার ঈহুদীরা এর কারণে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে দূরেই সরে যাচ্ছিল।

মোটকথা, কা'বা মুসলমানদের কেবলা সাব্যস্ত হোক— এটাই ছিল মহানবী (সাঃ)-এর আন্তরিক বাসনা। তবে আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীল পয়গম্বরগণ কোন দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করার অনুমতি আছে বলে, না জানা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দরবারে কোন দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করেন না। এতে বুঝা যায়, যে, মহানবী (সাঃ) এ দোয়া করার অনুমতি পূর্বাহ্নেই পেয়েছিলেন। এজন্য তিনি কেবলা পরিবর্তনের দোয়া করেছিলেন এবং তা কবুল হবে বলে আশাবাদীও ছিলেন। একারণেই তিনি বারবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখতেন যে, ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছে কিনা। আলোচ্য আয়াতে এ দৃশ্যটি বর্ণনা করার পর প্রথমে দেয়া কবুল করার ওয়াদা করা হয়— فَلَنُوَلِّيَنَّكَ অর্থাৎ – আমি আপনার চেহ্‌রা-মোবারক সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে আপনি পছন্দ করেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ সে দিকে মুখ করার আদেশ নাযিল করা হয়, যথা, فَوَلِّ وَجْهَكَ এর বর্ণনা পদ্ধতিটি বিশেষ আনন্দদায়ক। এতে প্রথমে ওয়াদার আনন্দ ও পরে ওয়াদা পূরণের আনন্দ একই সাথে উপভোগ করা যায়।

নামাযে কেবলামুখী হওয়ার মাসআলা : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে সবদিকিই সমান قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহ্‌রই মালিকানাধীন। কিন্তু উম্মতের স্বার্থে সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যে একটি দিককে কেবলা হিসাবে নির্দিষ্ট করে সবার মাঝে ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তবে এ দিকটি বায়তুল-মোকাদ্দাসও হতে পারত। কিন্তু মহানবী (সাঃ)-এর আন্তরিক বাসনার কারণে কা'বাকে কেবলা সাব্যস্ত করে আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে فول وجهك الى الكعبة অর্থাৎ, 'কা'বার দিকে অথবা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ কর' বলার পরিবর্তে شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (অর্থাৎ মসজিদে হারামের দিকে) বলা হয়েছে। এতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

প্রথমতঃ যদিও আসল কেবলা বায়তুল্লাহ্ তথা কা'বা ; কিন্তু কা'বার দিকে মুখ করা সেখান পর্যন্তই সম্ভব, যেখান থেকে তা দৃষ্টিগোচর হয়। যারা সেখান থেকে দূরে এবং কা'বা তাদের দৃষ্টির আগোচরে থাকে, তাঁদের উপরও হুবহু কা'বার দিকে মুখ করার কড়াকড়ি আরোপ করা হলে, তা পালন করা খুবই কঠিন হতো। বিশেষ যন্ত্রপাতি ও অঙ্কের মাধ্যমেও নির্ভুল দিক নির্ণয় করা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে অনিশ্চিত হয়ে পড়তো। অথচ শরীয়ত সহজ-সরল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে বায়তুল্লাহ্ অথবা কা'বা শব্দের পরিবর্তে মসজিদুল-হারাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বায়তুল্লাহ্ অপেক্ষা মসজিদুল হারাম অনেক বেশী স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এ বিস্তৃত স্থানের দিকে মুখ করা দূর-দূরান্তের মানুষের জন্যেও সহজ।

সংক্ষিপ্ত শব্দ الى – এর পরিবর্তে شطر শব্দটি ব্যবহার করায় কেবলার দিকে মুখ করার ব্যাপারটি আরও সহজ হয়ে গেছে। شطر দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়— বস্তুর অর্ধাংশ ও বস্তুর দিক। আলোচ্য আয়াতে এর অর্থ হচ্ছে বস্তুর দিক। এতে বুঝা যায় যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বা অঞ্চলে বিশেষভাবে মসজিদে-হারামের দিকে মুখ করাও জরুরী নয় ; বরং মসজিদে-হারাম যেদিকে অবস্থিত সে দিকের প্রতি মুখ করাই যথেষ্ট। — (বাহ্‌রে-মুহীত)

وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ – আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, খানায়ে-কা'বা কিয়ামত পর্যন্ত আপনার কেলা থাকবে। এতে ইহুদী-নাসারাদের সে মতবাদের খণ্ডন করাই ছিল উদ্দেশ্য যে, মুসলমানদের কেবলার কোন স্থিতি নেই ; ইতিপূর্বে তাদের কেবলা ছিল খানায়ে-কা'বা, পরিবর্তিত হয়ে বায়তুল-মোকাদ্দাস হল,

আবার তাও বদলে গিয়ে পুনরায় খানায়ে-কা'বা হলো। আবারও হয়তো বায়তুল-মোকাদ্দাসকেই কেবলা বানিয়ে নেবে।- (বাহ্‌রে-মুহীত)

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ – এখানে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নিয়ে হুযূর (সাঃ)- কে সম্বোধন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টির দ্বারা উম্মতে-মুহাম্মদীকে অবহিত করাই উদ্দেশ্য যে, উল্লেখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ এতই কঠিন ব্যাপার যে, স্বয়ং রসূলে-করীম (সাঃ)-ও যদি এমনটি করেন, (অবশ্য তা অসম্ভব), তবে তিনিও সীমা লঙ্ঘনকারী বলে সাব্যস্ত হবেন।

১৪৬ নং আয়াতে রসূলে-করীম (সাঃ)-কে রসূল হিসাবে চেনার উদাহরণ সন্তানদের চেনার সাথে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, এরা যেমন কোনরকম সন্দেহ-সংশয়হীনভাবে নিজেদের সন্তানদেরকে জানে, তেমনিভাবে তওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত রসূলে করীম (সাঃ)-এর সুসংবাদ, প্রকৃষ্ট লক্ষণ ও নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাঁকেও সন্দেহাতীতভাবেই চেনে। কিন্তু তাদের যে অস্বীকৃতি তা একান্তভাবেই হঠকারিতা ও বিদ্বেষপ্রসূত।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পরিপূর্ণভাবে চেনার উদাহরণ পিতা-মাতাকে চেনার সাথে না দিয়ে সন্তান-সন্ততিকে চেনার সাথে দেয়া হয়েছে। অথচ মানুষ স্বভাবতঃ পিতা-মাতাকেও অত্যন্ত ভাল করেই জানে। এহেন উদাহরণ দেয়ার কারণ হল এই যে, পিতা-মাতার নিকট সন্তানাদির পরিচয় সন্তানের নিকট পিতা-মাতার পরিচয় অপেক্ষা বহুগুণ বেশী হয়ে থাকে। কারণ, পিতা-মাতা জন্মলগ্ন থেকে সন্তান-সন্ততিকে স্বহস্তে লালন-পালন করে। তাদের শরীরের এমন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই, যা পিতা-মাতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে পিতা-মাতার গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সন্তানরা কখনও দেখে না।

الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ
مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ
حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ
نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ
يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا
لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَّا
تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ
الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا
أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

(১৪৭) বাস্তব সত্য সেটাই যা তোমার পালনকর্তা বলেন। কাজেই তুমি সন্দিহান হয়ো না। (১৪৮) আর সবার জন্যই রয়েছে কেবলা একেক দিকে, যে দিকে সে মুখ করে (এবাদত করবে)। কাজেই সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাকবে, আল্লাহ্‌ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। (১৪৯) আর যে স্থান থেকে তুমি বের হও, নিজের মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও—নিঃসন্দেহে এটাই হলো তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত বাস্তব সত্য। বস্তুতঃ তোমার পালনকর্তা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবহিত নন। (১৫০) আর তোমরা যেখান থেকেই বেরিয়ে আস এবং যেখানেই অবস্থান কর সেদিকেই মুখ ফেরাও, যাতেকরে মানুষের জন্য তোমাদের সাথে ঝগড়া করার অবকাশ না থাকে। অবশ্য যারা অবিবেচক, তাদের কথা আলাদা। কাজেই তাদের আপত্তিতে ভীত হয়ো না। আমাকেই ভয় কর। যাতে আমি তোমাদের জন্যে আমার অনুগ্রহসমূহ পূর্ণ করে দেই এবং তাতে যেন তোমরা সরলপথ প্রাপ্ত হও। (১৫১) যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন ; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না। (১৫২) সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ; অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (১৫৩) হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (১৫৪) আর যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। (১৫৫) এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের— (১৫৬) যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ বর্ণনার দ্বারা এ কথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, এখানে সন্তানকে শুধু সন্তান হিসাবে চেনাই উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তার পৈতৃক সম্পর্ক ক্ষেত্রবিশেষে সন্দেহজনকও হতে পারে। স্ত্রীর খেয়ানতের দরুন সন্তান তার নিজের নাও হতে পারে। বরং এখানে আকার-অবয়বের পরিচয় জানা হলো উদ্দেশ্য। পুত্র-কন্যা প্রকৃতপক্ষে নিজের হোক বা নাই হোক, কিন্তু মানুষ সন্তান হিসাবে যাকে প্রতিপালন করে, তার আকার-অবয়ব চেনার ব্যাপারে কখনও সন্দেহ হয় না।

আলোচ্য আয়াতে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বলতে গিয়ে فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ বাক্যটি তিনবার এবং وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ বাক্যটি দু'বার করে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর একটা সাধারণ কারণ এই যে, কেবলা পরির্তনের নির্দেশটি বিরোধীদের জন্য তো এক হৈ-চৈয়ের ব্যাপার ছিলই, স্বয়ং মুসলমানদের জন্যও তাদের এবাদতের ক্ষেত্রে ছিল একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। কাজেই এই নির্দেশটি যদি যথার্থ তাকীদ ও গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করা না হতো, তাহলে মনের প্রশান্তি অর্জন হয়ত যথেষ্ট সহজ হতো না। আর সেজন্যই নির্দেশটিকে বার বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তদুপরি এতে এরূপ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, কেবলার এই যে পরিবর্তন, এটাই সর্বশেষ পরিবর্তন। এরপর পুনঃপরিবর্তনের আর কোন সম্ভাবনাই নেই। প্রথমবারের নির্দেশঃ

"অতঃপর তুমি তোমার মুখমণ্ডল মসজিদুল-হারামের দিকে ফেরাও এবং যেখানেই তুমি থাক না কেন, এরপর থেকে তুমি তোমার চেহারা সেদিকেই ফেরাবে",- এ নির্দেশটি মুকীম অবস্থায় থাকার সময়ের। অর্থাৎ, যখন আপনি আপনার স্থায়ী বাসস্থানে অবস্থান করেন, তখন নামাযে মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন। এরপর সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে— وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ নিজের দেশে বা সফরে যেখানেই থাক না কেন, নামাযে বায়তুল্লাহর দিকেই মুখ ফেরাবে, এ নির্দেশ শুধু মসজিদে-নববীতে নামায পড়ার বেলাতেই নয়; বরং যেকোন স্থানের লোকেরা নিজ নিজ শহরে যখন নামায পড়বে, তখন তারা মসজিদুল-হারামকেই কেবলা বানিয়ে নামায পড়বে।

এ নির্দেশ দ্বিতীয়বার পুনরুল্লেখ করার পূর্বে وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ অর্থাৎ, "যেখানেই তুমি বের হয়ে যাও না কেন" কথাটা যোগ করে বুঝানো হয়েছে যে, নিজ নিজ বাসস্থানে মুকীম থাকা অবস্থায় যেমন তোমরা মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করে নামায পড়বে, তেমনি কোথাও সফরে বের হলেও নামাযের সময় মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করেই দাঁড়াবে।

তৃতীয়বারের পুনরুল্লেখের যৌক্তিকতা বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, বিরোধীরা যাতে কথা বলতে না পারে যে, তওরাত এবং ইঞ্জীলে তো বলা হয়েছিল যে, তওরাত এবং ইঞ্জীলে উল্লেখিত নির্দেশসমূহের মধ্যে আখেরী যমানার প্রতিশ্রুত নবীর কেবলা মসজিদুল-হারাম হওয়ার কথা, কিন্তু এ রসূল (সাঃ) কা'বার পরিবর্তে বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেবলা করে নামায পড়ছেন কেন?

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا শব্দটিতে وِجْهَةٌ শব্দটির আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু, যার দিকে মুখ করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ কেবলা। এক্ষেত্রে হযরত উবাই ইবনে কা'ব—

وَجْهَهُ –এর স্থলে قِبْلَةٌ ও পড়েছেন বলে বর্ণিত রয়েছে।

তফসীরের ইমামগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই,—প্রত্যেক জাতিরই এবাদতের সময় মুখ করার জন্য একটা নির্ধারিত কেবলা চলে আসছে। সে কেবলা আল্লাহ্‌র তরফ হতে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, অথবা তারা নিজেরাই তা নির্ধারণ করে নিয়েছে। মোটকথা, এবাদতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিই কোন না কোন দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় আখেরী নবীর উম্মতগণের জন্য যদি কোন একটা বিশেষ দিককে কেবলা নির্ধারণ করে দেয়া হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কি আছে?

এ পর্যন্ত কেবলা পরিবর্তনসংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়টির ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা হযরত ইবরাহীমের দোয়ার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী (সাঃ)–এর আর্বিভাব। এতে এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ)–এর আর্বিভাবে কা'বা নির্মাতার দোয়ারও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তাঁর কেবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের কিছুই নেই।

كَمَآ أَرْسَلْنَا —বাক্যে উদাহরণসূচক যে, 'কাফ' (ك) বর্ণটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটি ব্যাখ্যা তো উল্লেখিত তফসীরের মাধ্যমেই বুঝা গেছে। এছাড়াও আরেকটি বিশ্লেষণ রয়েছে, যা কুরতুবী গ্রহণ করেছেন। তা হল এই যে, 'কাফ'–এর সম্পর্ক হল পরবর্তী আয়াত فَاذْكُرُونِىٓ – এর সাথে। অর্থাৎ, আমি যেমন তোমাদের প্রতি কেবলাকে একটি নেয়ামত হিসাবে দান করেছি এবং অতঃপর দ্বিতীয় নেয়ামত দিয়েছি রসূলের আবির্ভাবের মাধ্যমে, তেমনি আল্লাহ্‌র যিকিরও আরেকটি নেয়ামত। এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যাতে এসব নেয়ামতের অধিকতর প্রবৃদ্ধি হতে পারে। কুরতুবী বলেন, এখানে كَمَآ أَرْسَلْنَا —এর 'কাফ'টির ব্যবহার ঠিক তেমনি, যেমনটি সূরা আনফালের كما اخرجنا এবং সূরা হেজরের كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ —এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

فَاذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ —এতে 'যিকির'– এর অর্থ হল স্মরণ করা, যার সম্পর্ক হল অন্তরের সাথে। তবে জিহ্বা যেহেতু অন্তরের মুখপাত্র, কাজেই মুখে স্মরণ করাকেও 'যিকির' বলা যায়। এতে বুঝা যায় যে, সে মৌখিক যিকিরই গ্রহণযোগ্য, যার সাথে মনেও আল্লাহ্‌র স্মরণ বিদ্যমান থাকবে।

তবে এতদসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন লোক যদি মুখে তসবীহ্ জপে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার মন যদি অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ, যিকিরে না লাগে, তবুও তা একেবারে ফায়দাহীন নয়। হযরত আবু ওসমান (রাহঃ)–এর কাছে জনৈক ভক্ত এমনি অবস্থায় অভিযোগ করেছিল যে, মুখে মুখে যিকির করি বটে, কিন্তু অন্তরে তার কোনই মাধুর্য অনুভব করতে পারি না। তখন তিনি বললেন, —তবুও আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় কর যে, তিনি তোমার একটি অঙ্গ জিহবাকে তো অন্ততঃ তাঁর যিকিরে নিয়োজিত করেছেন।— (কুরতুবী)

যিকিরের ফযীলত ঃ যিকিরের ফযীলত অসংখ্য। তন্মধ্যে এটাও কম ফযীলত নয় যে, বান্দা যদি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তাহলে আল্লাহ্ তাকে স্মরণ করেন। আবু ওসমান মাহ্‌দী (রহঃ) বলেছেন যে, আমি সে সময়টির কথা জানি, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে স্মরণ করেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি তা কেমন করে জানতে পারেন? বললেন, তা এজন্যে যে, কোরআন করীমের ওয়াদা অনুসারে যখন কোন মুমিন বান্দা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ্ নিজেও তাকে স্মরণ করেন। কাজেই বিষয়টি জানা সবার জন্যই সহজ যে, আমরা যখন আল্লাহ্‌র স্মরণে আত্মনিয়োগ করব, আল্লাহ্ তা'আলাও আমাদের স্মরণ করবেন।

আর আয়াতের অর্থ হল এই যে, তোমরা যদি আমাকে আমার হুকুমের আনুগত্যের মাধ্যমে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে সওয়াব ও মাগফেরাত দানের মাধ্যমে স্মরণ করব।

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রঃ) 'যিকরুল্লাহ্'র তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যিকিরের অর্থই হচ্ছে আনুগত্য এবং নির্দেশ মান্য করা। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য করে না, সে আল্লাহ্‌র যিকিরই করে না; প্রকাশ্যে যত বেশী নামায এবং তসবীহ্ই সে পাঠ করুক না কেন।"

যিকিরের তাৎপর্য ঃ মুফাস্‌সের কুরতুবী ইবনে–খোয়াইয–এর আহ্‌কামুল কোরআনের বরাত দিয়ে এ সম্পর্কিত একখানা হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটির মর্মার্থ হচ্ছে যে, রসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে অর্থাৎ, তাঁর হালাল ও হারাম সম্পর্কিত নির্দেশগুলোর অনুসরণ করে, যদি তার নফল নামায–রোযা কিছু কমও হয়, সেই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে, সে নামায–রোয, তসবীহ্–তাহলীল প্রভৃতি বেশী করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না।

হযরত যুন্নুন মিসরী বলেন ঃ "যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে সে অন্যান্য সব কিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই সবদিক দিয়ে তাকে হেফাযত করেন এবং সব কিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন।"

হযরত মু'আয (রাঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র আযাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মানুষের কোন আমলই যিকরুল্লাহ্‌র সমান নয়।" হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে–কুদ্‌সীতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,— "বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোঁট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি।

ধৈর্য ও নামায যাবতীয় সংকটের প্রতিকার ঃ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ "ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর," — এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের দুঃখ–কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকটের নিশ্চিত প্রতিকার দু'টি বিষয়ের মধ্যেই নিহিত। একটি 'সবর' বা ধৈর্য এবং অন্যটি "নামায"। বর্ণনারীতির মধ্যে اسْتَعِينُوا শব্দটিকে বিশেষ কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার ফলে এখানে যে মর্মার্থ দাঁড়ায় তা এই যে, মানব জাতির যে কোন সংকট বা সমস্যার নিশ্চিত প্রতিকারই ধৈর্য ও নামায। যে কোন প্রয়োজনেই এ দু'টি বিষয়ের দ্বারা মানুষ সাহায্য লাভ করতে পারে। তফসীরে মাযহারীতে শব্দ দু'টির ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের তাৎপর্য এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ স্বতন্ত্রভাবে দু'টি বিষয়েরই তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে।

সবর–এর তাৎপর্য ঃ 'সবর' শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযম অবলম্বন ও

নফস্-এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ।

কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'সবর'-এর তিনটি শাখা রয়েছে। (এক) নফসকে হারাম এবং না-জায়েয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা (দুই) এবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং (তিন) যে কোন বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ, যে সব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহ্‌র বিধান বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কোন কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায়, কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করা হয়, তবে, তা 'সবর'-এর পরিপন্থী নয়। -(ইবনে কাসীর, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে)।

'সবর'-এর উপরোক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সাধারণ মানুষের ধারণায় সাধারণতঃ তৃতীয় শাখাকেই সবর হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রথম দু'টি শাখা যে এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। এমনকি এ দু'টি বিষয়ও যে 'সবর'- এর অন্তর্ভুক্ত এ ধারণাও যেন অনেকের নেই। কোরআন-হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী বা 'সাবের' সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরোক্ত তিন প্রকারেই 'সবর' অবলম্বন করে। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, ''ধৈর্যধারণকারীরা কোথায়?'' একথা শোনার সংগে সংগে সেসব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা তিন প্রকারেই সবর করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। এসব লোককে প্রথমেই বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে। 'ইবনে-কাসীর' এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন যে, কোরআনের অন্যত্র —

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, সবরকারী বান্দাগণকে তাদের পুরস্কার বিনা হিসাবে প্রদান করা হবে— এ আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

নামায ঃ মানুষের যাবতীয় সমস্যা ও সংকট দূর করা এবং যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পন্থাটি হচ্ছে নামায।

'সবর'-এর তফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার এবাদতই সবরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এরপরেও নামাযকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যে, নামায এমনই একটি এবাদত, যাতে 'সবর' তথা ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা বিদ্যমান। কেননা, নামাযের মধ্যে একাধারে যেমন নফস তথা রিপুকে আনুগত্যে বাধ্য রাখা হয়, তেমনি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ, নিষিদ্ধ চিন্তা এমনকি অনেক হালাল ও মোবাহ বিষয় থেকেও সরিয়ে রাখা হয়। সেমতে নিজের 'নফস'-এর উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে সর্বপ্রকার গোনাহ্ ও অশোভন আচার-আচরণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নিজেকে আল্লাহ্‌র এবাদতে নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে 'সবর'-এর যে অনুশীলন করতে হয়, নামাযের মধ্যেই তার একটা পরিপূর্ণ নমুনা ফুটে উঠে।

যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে মুক্তিলাভ করার ব্যাপারে নামাযের একটা বিশেষ 'তাছীর' বা প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ বিশেষ রোগে কোন কোন অষুধী গুল্ম-লতা ও ডাল-শিকড় গলায় ধারণ করায় বা মুখে রাখায় যেমন বিশেষ ফল লক্ষ্য করা যায়, লোহার প্রতি চুম্বকের বিশেষ আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক, কিন্তু কেন এরূপ হয়, তা যেমন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না, তেমনি বিপদ মুক্তি এবং যাবতীয় প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে নামাযের তাছীরও ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যথাযথ আন্তরিকতা ও মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করলে যেমন বিপদমুক্তি অবধারিত, তেমনি যেকোন প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারেও এতে সুনিশ্চিত ফল লাভ হয়।

হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, যখনই তিনি কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখনই নামায আরম্ভ করতেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা সে নামাযের বরকতেই তাঁর যাবতীয় বিপদাপদ দূর করে দিতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে—

اذا حزبه امر فزع الى الصلوٰة

অর্থাৎ, মহানবী (সাঃ)-কে যখনই কোন বিষয় চিন্তিত করে তুলত, তখনই তিনি নামায পড়তে শুরু করতেন।

আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ঃ নামায এবং 'সবরে'র মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের প্রতিকার হওয়ার কারণ এই যে, এ দু'পন্থায়ই আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভ হয়। إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ বাক্যের দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, নামাযী এবং সবরকারিগণের সাথে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য তথা খোদায়ী শক্তির সমাবেশ ঘটে। যেখানে বা যে অবস্থায় বান্দার সাথে আল্লাহ্‌র শক্তির সমাবেশ ঘটে, সেখানে দুনিয়ার কোন শক্তি কিংবা কোন সংকটই যে টিকতে পারে না, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না। বান্দা যখন আল্লাহ্‌র শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার অগ্রগমন ব্যাহত করার মত শক্তি কারও থাকে না। বলাবাহুল্য, মকসুদ হাসিল করা এবং সংকট উত্তরণের নিশ্চিত উপায় একমাত্র আল্লাহ্‌র শক্তিতে শক্তিমান হওয়াই হতে পারে।

আলমে-বরযখে নবী এবং শহীদগণের হায়াত ঃ ইসলামী রেওয়ায়েত মোতাবেক প্রত্যেক মৃতব্যক্তি আলমে-বরযখে বিশেষ ধরনের এক হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের আযাব বা সওয়াব অনুভব করে থাকে। এই জীবন-প্রাপ্তির ব্যাপারে মুমিন-কাফের এবং পুণ্যবান ও গোনাহগারের কোন পার্থক্য নেই। তবে বরযখের এ জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক স্তরে সর্বশ্রেণীর লোকই সমানভাবে শরীক। কিন্তু বিশেষ এক স্তর নবী-রসূল এবং বিশেষ নেক্কার বান্দাদের জন্য নির্ধারিত। এ স্তরেও অবশ্য বিশেষ পার্থক্য এবং পরস্পরের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

যেসব লোক আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হন তাঁদেরকে শহীদ বলা হয়। সাধারণভাবে অবশ্য তাঁদের মৃত বলাও জায়েয। তবে তাঁদের মৃত্যুকে অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীবন লাভ করে থাকে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনে অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়। তাহল অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য মৃতের তুলনায় তাঁদের বেশী অনুভূতি দেয়া হয়। যেমন, মানুষের পায়ের গোঁড়ালী ও হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ, উভয় স্থানেই অনুভূতি থাকে, কিন্তু গোঁড়ালীর তুলনায় আঙ্গুলের অনভূতি অনেক বেশী তীক্ষ্ণ। তেমনি, সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদগণ বরযখের জীবনে বহুগুণ বেশী অনুভূতি প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এমনকি শহীদের এ জীবনানুভূতি অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জড়দেহেও এসে পৌছে

থাকে। অনেক সময় তাঁদের হাড়-মাংসের দেহ পর্যন্ত মাটিতে বিনষ্ট হয় না, জীবিত মানুষের দেহের মতই অবিকৃত থাকতে দেখা যায়। হাদীসের বর্ণনা এবং বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হয়েছে। তবে সাধারণ নিয়মে তাঁদেরকেও মৃতই ধরা হয় এবং তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিসগণের মধ্যে বন্টিত হয়, তাঁদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুনর্বিবাহ করতে পারে।

এ আয়াতের ক্ষেত্রে নবী-রসূলগণ শহীদগণের চাইতেও অনেক বেশী মর্তবার অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁদের পবিত্র দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকার পরও বাহ্যিক হুকুম, আহ্কামে তার কিছু প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। যথা, তাঁদের পরিত্যক্ত কোন সম্পদ বন্টন করার রীতি নেই। তাঁদের স্ত্রিগণ দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারেন না।

মোটকথা, বরযখের এ জীবনে সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হচ্ছেন নবী-রসূলগণ, অতঃপর শহীদগণ এবং তারপর অন্যান্য সাধারণ মৃত ব্যক্তিবর্গ। অবশ্য কোন কোন হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, ওলী-আওলিয়া এবং নেক্কার বান্দাগণের অনেকেই বরযখের হায়াতের ক্ষেত্রে শহীদগণের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। কেননা, আত্মশুদ্ধির সাধনায় রত অবস্থায় যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের মৃত্যুকেও শহীদের মৃত্যু বলা যায়। ফলে তাঁরাও শহীদগণেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যান। আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী নিঃসন্দেহে অন্যান্য নেক্কার সালেহগণের তুলনায় শহীদগণের মর্যাদা বেশী।

যদি কোন শহীদের লাশ মাটিতে বিনষ্ট হতে দেখা যায়, তাহলে এমন ধারণা করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্র পথে সে নিহত হয়েছে সত্য, তবে হয় তো নিয়ত বিশুদ্ধ না থাকায় তার সে মৃত্যু যথার্থ শহীদের মৃত্যু হয়নি। কিন্তু এমন কোন শহীদের লাশ যদি মাটির নীচে বিনষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, আল্লাহ্র পথে শহীদ হওয়ার ব্যাপারে যার নিষ্ঠায় কোন সন্দেহ নেই, তবে সেক্ষেত্রে অবশ্য এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, তিনি শহীদ নন অথবা কোরআনের আয়াতের মর্মার্থ এখানে টিকছে না। কেননা, মানুষের লাশ যে কেবলমাত্র মাটিতেই বিনষ্ট হয় তাই নয়। অনেক সময় ভূমিস্থ অন্যান্য ধাতু কিংবা অন্য কোন কিছুর প্রভাবেও জড়দেহ বিনষ্ট হওয়া সম্ভব। নবী-রসুল ও শহীদগণের লাশ মাটিতে ভক্ষণ করে না বলে হাদীসে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে একথা বুঝা যায় না যে, মাটি ছাড়া তাদের লাশ অন্য কোন ধাতু কিংবা রাসায়নিক প্রভাবেও বিনষ্ট হতে পারে না।

নবী-রসূলগণের পবিত্র দেহও যে সাধারণ মানব-দেহের মত বিভিন্ন উপকরণের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁদের দেহও অস্ত্রের আঘাত কিংবা ওষুধের প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবান্বিত হয়েছে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, নবী-রসূলগণের মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবনের তুলনায় শহীদগণের মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবন বেশী শক্তিসম্পন্ন হতে পারে না। নবী-রসূলগণের জীবিত দেহে অস্ত্র এবং অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং মাটির সাথে মিশ্রিত অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ কিংবা অন্য কোন উপাদানের প্রভাবে যদি শহীদের লাশে কোন প্রকার বিকৃতি ঘটে যায়, তবে এর দ্বারা 'মাটি শহীদের লাশে বিকৃতি ঘটাতে পারে না'— এ হাদীসের যথার্থতা বিঘ্নিত হয় না।

সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদের লাশ অধিককাল পর্যন্ত মাটির দ্বারা প্রভাবান্বিত না হওয়াকে তাদের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দু'অবস্থাতেই হতে পারে। প্রথমতঃ চিরকাল জড়দেহ অবিকৃত থাকার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়তঃ অন্যান্যের তুলনায় অনেক বেশীদিন অবিকৃত থাকার মাধ্যমে। যদি বলা হয় যে, তাঁদের দেহও সাধারণ লোকের দেহের তুলনায় আশ্চর্যজনকভাবে বেশীদিন অবিকৃত থাকে এবং হাদীসের দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে; তবে তাও অবাস্তব হবে না। যেহেতু বরযখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না, সেহেতু কোরআনে শহীদের সে জীবন সম্পর্কে لَّا تَشْعُرُونَ (তোমরা বুঝতে পার না,) বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হল এই যে, সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মত অনুভূতি তোমাদের দেয়া হয়নি।

বিপদে ধৈর্যধারণ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে বান্দাদের যে পরীক্ষা নেয়া হয়, তার তাৎপয وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ আয়াতের তফসীরে বর্ণিত হয়েছে। কোন বিপদে পতিত হওয়ার আগেই যদি সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়, তবে সে বিপদে ধৈর্যধারণ সহজতর হয়ে যায়। কেননা, হঠাৎ করে বিপদ এসে পড়লে পেরেশানী অনেক বেশী হয়। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করেই পরীক্ষার কথা বলেছেন, সেহেতু সবার পক্ষেই অনুধাবন করা উচিত যে, এ দুনিয়া দুঃখ-কষ্ট সহ্য করারই স্থান। সুতরাং এখানে যেসব সম্ভাব্য বিপদ-আপদের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে না করলেই ধৈর্যধারণ করা সহজ হতে পারে। পরীক্ষায় সমগ্র উম্মত সমষ্টিগতভাবে উত্তীর্ণ হলে পর সমষ্টিগতভাবেই তার পুরস্কার দেয়া হবে; এছাড়াও সবরের পরীক্ষায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা যতটুকু উত্তীর্ণ হবেন, তাদের ততটুকু বিশেষ মর্যাদাও প্রদান করা হবে।

বিপদে 'ইন্নালিল্লাহ্' পাঠ করা ঃ আয়াতে সবরকারিগণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা বিপদের সম্মুখীন হলে— 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, কেউ বিপদে পড়লে যেন এ দোয়াটি পাঠ করে। কেননা, এরূপ বলাতে একাধারে যেমন অসীম সওয়াব পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি যদি অর্থের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে পাঠ করা হয়, তবে বিপদে আন্তরিক শান্তিলাভ এবং তা থেকে উত্তরণও সহজতর হয়ে যায়।

البقرة ٢ ২৫ سيقول ٢

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ
شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ
مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ
يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا
فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٦٢﴾ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ
الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ
الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

(১৫৭) তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত। (১৫৮) নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্ব বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দু'টিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সে আমলের সঠিক মূল্য দেবেন। (১৫৯) নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও ; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহ্র অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও। (১৬০) তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধণ করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু। (১৬১) নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ্র ফেরেশতাগণের এবং সমগ্র মানুষের লা'নত। (১৬২) এরা চিরকাল এ লা'নতের মাঝেই থাকবে। তাদের উপর থেকে আযাব কখনও হালকা করা হবে না এবং এরা বিরামও পাবে না। (১৬৩) আর তোমাদের উপাস্য, একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই (১৬৪) নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালায় যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে— নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।

সাফা মারওয়া দৌড়ানো ঃ

'সাফা' এবং 'মারওয়া' বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী দু'টি পাহাড়ের নাম। হজ্ব কিংবা ওমরার সময় কা'বা ঘর তওয়াফ করার পর এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে দৌড়াতে হয়। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় 'সায়ী'। জাহেলিয়াত যুগেও যেহেতু এ সায়ীর রীতি প্রচলিত ছিল এবং তখন এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে কয়েকটি মূর্তি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, এজন্য মুসলমানদের কারো কারো মনে একটা দ্বিধার ভাব জাগ্রত হয়েছিলো যে, বোধহয় এ 'সায়ী' জাহেলিয়াত যুগের কোন অনুষ্ঠান এবং ইসলাম যুগে এর অনুসরণ করা হয় তো গোনাহ্র কাজ।

কোন কোন লোক যেহেতু জাহেলিয়াত যুগে একে একটা অর্থহীন কুসংস্কার বলে মনে করতেন, সেজন্য ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁরা একে জাহেলিয়াত যুগের কুসংস্কার হিসেবেই গণ্য করতে থাকেন। এরূপ সন্দেহের নিরসনকল্পে আল্লাহ্ পাক যেভাবে বায়তুল্লাহ্ শরীফের কেবলা হওয়া সম্পর্কিত সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছেন, তেমনিভাবে পরবর্তী আয়াতে বায়তুল্লাহ্ সংশ্লিষ্ট আরো একটি সংশয়ের অপনোদন করে দিয়েছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ شَعَائِرِ اللّٰهِ —এখানে شَعَائِر শব্দটি شعيرة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন বা নিদর্শন। شَعَائِرِ اللّٰهِ - বলতে সেসব আমলকে বুঝায়, যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনের নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

حج - এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য স্থির করা। কোরআন-সুন্নাহর পরিভাষায় বায়তুল্লাহ্ শরীফের উদ্দেশে গমন এবং সেখানে বিশেষ সময়ে বিশেষ ধরনের কিছু কর্ম সম্পাদন করাকে বলা হয় হজ্ব।

عمرة শব্দের আভিধানিক অর্থ দর্শন করা। শরীয়তের পরিভাষায়, বায়তুল্লাহ্ শরীফে হাযির হয়ে তওয়াফ-সায়ী প্রভৃতি বিশেষ ধরনের কয়েকটি এবাদত সম্পাদন করার নামই ওমরা।

'সায়ী' ওয়াজিব ঃ হজ্ব, ওমরা এবং সায়ীর বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহ্র কিতাবসমূহে আলোচিত হয়েছে।

সায়ী' করা ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে সুন্নত, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মতে ফরয, ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতে ওয়াজিব। যদি কোন কারণে তা ছুটে যায়, তবে একটা ছাগল জবাই করে কাফ্ফারা দিতে হবে।

উপরোক্ত আয়াতের শব্দবিন্যাস থেকে এরূপ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, আয়াতে তো 'সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে সায়ী করাতে গোনাহ্ হবে না' বলা হয়েছে। এর দ্বারা বড়জোর এটা একটা মোস্তাহাব কাজ বলে সাব্যস্ত হতে পারে, ওয়াজিব হওয়ার কারণ কি?

এখানে বুঝা দরকার যে, فَلَا جُنَاحَ (অর্থাৎ, গোনাহ হবে না) কথাটা প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বলা হয়েছে। কেননা, প্রশ্ন ছিল, যেহেতু সাফা ও মারওয়াতে মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল এবং জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা সায়ীর মাধ্যমে সে মূর্তিরই পূজা-অর্চনা করতো, সেহেতু এ কাজটি হারাম হওয়া উচিত। এরূপ প্রশ্নের জবাবেই বলা হয়েছে যে, এতে কোন গোনাহ নেই। আর যেহেতু এটা হযরত ইবরাহীমের প্রবর্তিত সুন্নত, কাজেই কারো কোন বর্বরসুলভ আমল দ্বারা এটা গোনাহ্র কাজ বলে

সাব্যস্ত হতে পারে না। প্রশ্নের জবাবে এরূপ বলাতে এ আমলটি ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী বুঝা যায় না।

এলমে-দ্বীনের প্রকাশ ও প্রচার করা ওয়াজিব এবং গোপন করা হারাম ঃ উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র যে সমস্ত প্রকৃষ্ট হেদায়েত অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে গোপন করা এত কঠিন হারাম ও মহাপাপ, যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও লা'নত বা অভিসম্পাত করে থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও অভিসম্পাত করে। এতে কয়েকটি বিষয় জানা যায় ঃ

প্রথমতঃ যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বিশেষ জরুরী, তা গোপন করা হারাম। রসূলে-করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন— 'যে লোক দ্বীনের কোন বিধানের বিষয় জানা সত্ত্বেও তা জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।' – হাদীসটি হযরত আবু-হোরায়রা ও আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে ইবনে মাজা রেওয়ায়েত করেছেন।

ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, এ অভিসম্পাত আরোপিত হবে তখনই, যখন অন্য কোন লোক সেখানে উপস্থিত থাকবে না। যদি অন্যান্য আলেম লোকও সেখানে উপস্থিত থাকেন, তবে একথা বলে দেয়া যেতে পারে যে, অন্য কোন আলেমকে জিজ্ঞেস করে নাও।—(কুরতুবী, জাস্‌সাস)

দ্বিতীয়তঃ জানা যায় যে, 'জ্ঞানকে গোপন করার' অভিসম্পাত সে সমস্ত জ্ঞান ও মাসআলা গোপন করার ব্যাপারেই প্রযোজ্য, যা কোরআন ও সুন্নাহ্‌তে পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা কর্তব্য। পক্ষান্তরে এমন সূক্ষ্ম ও জটিল মাসআলা সাধারণ্যে প্রকাশ না করাই উত্তম, যদ্দ্বারা সাধারণ লোকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তখন তা كتمان علم বা জ্ঞানকে গোপন করার হুকুমের আওতায় পড়বে না। উল্লেখিত আয়াতে مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى বাক্যের দ্বারাও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তেমনিভাবে মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যদি সাধারণ মানুষকে এমনসব হাদীস শোনাও যা তারা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবে তাদেরকে ফেতনা-ফাসাদেরই সম্মুখীন করবে।—(কুরতুবী)

সহীহ্ বোখারীতে হযরত আলী (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত রয়েছে, তিনি বলেছেন যে,— 'সাধারণ মানুষের সামনে এলেমের শুধুমাত্র ততটুকু প্রকাশ করবে, যতটুকু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ধারণ করতে পারে। মানুষ আল্লাহ্ ও রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক, তোমরা কি এমন কামনা কর? কারণ, যেকথা তাদের বোধগম্য নয়, তাতে তাদের মনে নানারকম সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবে এবং তাতে করে তারা আল্লাহ্ ও রসূলকে অস্বীকারও করে বসতে পারে।

কোন্ কোন্ পাপের জন্য সমগ্র সৃষ্টি লা'নত করে ঃ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ —আয়াতে কোরআনে-করীম লা'নত বা অভিসম্পাতকারীদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেনি। তফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ ও ইকরিমা (রাঃ) বলেছেন, এভাবে বিষয়টি অনির্ধারিত রাখাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের উপর অভিসম্পাত করে থাকে। এমনকি জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। কারণ, তাদের অপকর্মের দরুন সেসব সৃষ্টিরও ক্ষতিসাধিত হয়। হযরত বারা' ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, اللّٰعِنُوْنَ —এর অর্থ হল সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণশীল সমস্ত জীব।—(কুরতুবী)

কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি লা'নত করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয় যতক্ষণ না তার কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণের বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায় ঃ وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ —বাক্যাংশের দ্বারা জাস্‌সাস ও কুরতুবী প্রমুখ উদ্ভাবন করেছেন যে, যে কাফের কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে বলে নিশ্চিত নয়, তার প্রতি লা'নত করা বৈধ নয়। আর আমাদের পক্ষে যেহেতু কারও শেষ পরিণতির (মৃত্যুর) নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোন উপায় নেই, সেহেতু কোন কাফেরের নাম নিয়ে তার প্রতি লা'নত বা অভিসম্পাত করাও জায়েয নয়। বস্তুতঃ রসূলে করীম (সাঃ) যে সমস্ত কাফেরের নামোল্লেখ করে লা'নত করেছেন, কুফর অবস্থায় তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি অবহিত হয়েছিলেন। অবশ্য সাধারণ কাফের ও জালেমদের প্রতি অনির্দিষ্টভাবে লা'নত করা জায়েয।

এতে একথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, লা'নতের ব্যাপারটি যখন এতই কঠিন ও নাযুক যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোন কাফেরের প্রতিও লা'নত করা বৈধ নয়, তখন কোন মুসলমান কিংবা কোন জীব-জন্তুর উপর কেমন করে লা'নত করা যেতে পারে? পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ আমাদের নারী সম্প্রদায় একান্ত গাফলতিতে পড়ে আছে। তারা কথায় কথায় নিজেদের আপনজনদের প্রতিও অভিসম্পাত বা লা'নত বাক্য ব্যবহার করতে থাকে এবং শুধু লা'নত বাক্য ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট হয় না; বরং তার সমার্থক যে সমস্ত শব্দ জানা থাকে সেগুলোও ব্যবহার করতে কসুর করে না। লা'নতের প্রকৃত অর্থ হল, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। কাজেই কাউকে 'মরদূদ', 'আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত' প্রভৃতি শব্দে গালি দেয়াও লা'নতেরই সমপর্যায়ভুক্ত।

আরবের মুশরিকরা যখন নিজেদের বিশ্বাসের পরিপন্থী আয়াত وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ শুনল, তখন বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, সারা বিশ্বেরই কি একজন মাত্র উপাস্য হতে পারে? যদি এ দাবী যথার্থ হয়ে থাকে, তবে তার কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তারই প্রমাণ পেশ করেছেন আলোচ্য আয়াতে।

তওহীদের মর্মার্থ ঃ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ বিভিন্নভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদ বা একত্ববাদ সপ্রমাণিত রয়েছে। উদাহরণতঃ তিনি একক, সমগ্র বিশ্বে না আছে তাঁর তুলনা, না আছে কোন সমকক্ষ। সুতরাং একক উপাস্য হওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।

দ্বিতীয়তঃ উপাস্য হওয়ার অধিকারেও তিনি একক। অর্থাৎ, তাঁকে ছাড়া অন্য আর কেউই এবাদতের যোগ্য নয়।

তৃতীয়তঃ সত্তার দিক দিয়েও তিনি একক। অর্থাৎ অংশী-বিশিষ্ট নন। তিনি অংশী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র। তাঁর বিভক্তি কিংবা ব্যবচ্ছেদ হতে পারে না।

চতুর্থতঃ তিনি তাঁর আদি ও অনন্ত সত্তার দিক দিয়েও একক। তিনি তখনও বিদ্যমান ছিলেন, যখন অন্য কোন কিছুই ছিল না এবং তখনও বিদ্যমান থাকবেন যখন কোন কিছুই থাকবে না। অতএব, তিনিই একমাত্র

সত্তা যাকে وَّاحِدٌ বা 'এক' বলা যেতে পারে। وَّاحِدٌ শব্দটিতে উল্লেখিত যাবতীয় দিকের একত্বই বিদ্যমান রয়েছে।— (জাস্সাস)

তারপর আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা জ্ঞানী-নির্জ্ঞান নির্বিশেষে যে কেউই বুঝতে পারে। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের চিরাচরিত বিবর্তন তাঁরই ক্ষমতার পরিপূর্ণতা ও একত্ববাদের প্রকৃত প্রমাণ।

তেমনিভাবে পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ। পানিকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক তরল পদার্থ করে সৃষ্টি করেছেন যে, একান্ত তরল ও প্রবাহমান হওয়া সত্ত্বেও তার পিঠের উপর লক্ষ লক্ষ মণ ওজনবিশিষ্ট বিশালকায় জাহাজ বিরাট ওজনের চাপ নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করে। তদুপরি এগুলোকে গতিশীল করে তোলার জন্য বাতাসের গতি ও নিতান্ত রহস্যপূর্ণভাবে সে গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভৃতি বিষয়ও এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পেছনে এক মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ সত্তা বিদ্যমান। পানীয় পদার্থগুলো তরল না হলে যেমন এ কাজটি সম্ভব হতো না, তেমনি বাতাসের মাঝে গতি সৃষ্টি না হলেও জাহাজ চলতে পারতো না; এগুলোর পক্ষে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করাও সম্ভব হতো না। এ বিষয়টিই কোরআনে-হাকীম এভাবে উল্লেখ করেছে ঃ

إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে বাতাসের গতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন এবং তখন এ সমস্ত জাহাজ সাগর পৃষ্ঠে ঠায় দাঁড়িয়ে যাবে।"

بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এক দেশের মালামাল অন্য দেশে আমদানী-রফতানী করার মাঝেও মানুষের এত বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা গণনাও করা যায় না। আর এ উপকারিতার ভিত্তিতেই যুগে যুগে, দেশে দেশে নতুন নতুন বাণিজ্যপন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে।

এমনিভাবে আকাশ থেকে এভাবে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা, যাতে কোনকিছুর ক্ষতিসাধিত না হয়। যদি এ পানি প্লাবনের আকারে আসত, তাহলে কোন মানুষ, জীব-জন্তু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই থাকত না। অতঃপর পানি বর্ষণের পর ভূ-পৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার ছিল না। যদি তাদেরকে বলা হতো, তোমাদের সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমত ছ'মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে রাখ, তাহলে তারা পৃথক পৃথকভাবে কি সে ব্যবস্থা করতে পারত? আর কোনক্রমে রেখে দিলেও সেগুলোকে পচন কিংবা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে কেমন করে রক্ষা করত? কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন নিজেই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ

অর্থাৎ, "আমি পানিকে ভূমিতে ধারণ করিয়েছি, যদিও বৃষ্টির পানি পড়ার পর তাকে প্রবাহিত করেই নিঃশেষ করে দেয়ার ক্ষমতা আমার ছিল।"

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পানিকে বিশ্ববাসী মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য কোথাও উন্মুক্ত খাদ-খন্দে সংরক্ষিত করেছেন, আবার কোথাও ভূমিতে বিস্তৃত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির অভ্যন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। তারপর এমন এক ফল্গুধারা সমগ্র যমীনে বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ যে কোনখানে খনন করে পানি বের করে নিতে পারে। আবার এই পানিরই একটা অংশকে জমাট বাঁধা সাগর বানিয়ে তুষার আকারে পাহাড়ের চূড়ায় চাপিয়ে দিয়েছেন যা পতিত কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একান্ত সংরক্ষিত; অথচ ধীরে ধীরে গলে প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সারকথা, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার কয়েকটি বিকাশস্থলের বর্ণনার মাধ্যমে তওহীদ বা একত্ববাদই প্রমাণ করা হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ
اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ
يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾
اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَ
تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً
فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ۗ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ
حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا
مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ
تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ
اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۗ اَوَلَوْ كَانَ
اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ۗ صُمٌّ ۢ بُكْمٌ
عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٧١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ
مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

(১৬৫) আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হ'ত যদি এ জালেমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর। (১৬৬) অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক (১৬৭) এবং অনুসারীরা বলবে, কতইনা ভাল হত, যদি আমাদিগকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হত! তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি। এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে। অথচ, তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না। (১৬৮) হে মানবমণ্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৬৯) সে তো এ নির্দেশই তোমাদিগকে দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক এবং আল্লাহর প্রতি এমনসব বিষয়ে মিথ্যারোপ কর যা তোমরা জান না। (১৭০) আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও। (১৭১) বস্তুতঃ এহেন কাফেরদের উদাহরণ এমন, যেন কেউ এমন কোন জীবকে আহবান করছে যা কোন কিছুই শোনে না, হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া—বধির মূক, এবং অন্ধ। সুতরাং তারা কিছুই বোঝে না। (১৭২) হে ঈমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহর, যদি তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ حَلٰلًا طَيِّبًا –حل- শব্দের প্রকৃত অর্থ হল গিঠ খোলা। যেসব বস্তু-সামগ্রীকে মানুষের জন্য হালাল বা বৈধ করে দেয়া হয়েছে, তাতে যেন একটা গিঠই খুলে দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোর উপর থেকে বাধ্যবাধকতা সরিয়ে নেয়া হয়েছে। হযরত সাহ্‌ল ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল– (১) হালাল খাওয়া, (২) ফরয আদায় করা এবং (৩) রসূলে করীম (সাঃ)-এর সুন্নতসমূহের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। طيب শব্দের অর্থ পবিত্র। শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল এবং মানসিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় সমস্ত বস্তু-সামগ্রীও এরই অন্তর্ভুক্ত।

خطوات (খুতুওয়াত) خطوة (খুতওয়াতুন) -এর বহুবচন। খطوة বলা হয় পায়ের দুই ধাপের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে। সুতরাং خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ -এর অর্থ হচ্ছে শয়তানী কাজকর্ম।

بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ – سوء বলা হয় এমন বস্তু বা বিষয়কে যা দেখে রুচিজ্ঞানসম্পন্ন যে কোন বুদ্ধিমান লোক দুঃখবোধ করে। فحشاء অর্থ অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ। আবার অনেকে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে سوء এবং فحشاء —এর মর্ম যথাক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাপ। অর্থাৎ, সাধারণ গোনাহ এবং কবীরা গোনাহ। اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ – এখানে শয়তানের নির্দেশদান অর্থ হচ্ছে মনের মাঝে ওসওয়াসা বা সন্দেহের উদ্ভব করা। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন— আদম-সন্তানদের অন্তরে একাধারে শয়তানী প্রভাব এবং ফেরেশতার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। শয়তানী ওসওয়াসার প্রভাবে অসৎ কাজের কল্যাণ এবং উপকারিতাগুলো সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং তাতে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথগুলো উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের এলহামের প্রভাবে সৎ ও নেক কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে কল্যাণ ও পুরস্কার দানের ওয়াদা করেছেন, সেগুলোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সত্য ও সঠিক পথে চলতে গিয়ে অন্তরে শান্তি লাভ হয়।

এ আয়াতের দ্বারা বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের যেমন নিন্দা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি বৈধ অনুসরণের জন্যে কতিপয় শর্ত এবং একটা নীতিও জানা যাচ্ছে। যেমন, দু'টি শব্দে বলা হয়েছে لَا يَعْقِلُوْنَ এবং لَا يَهْتَدُوْنَ এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাপ-দাদা পূর্ব-পুরুষদের আনুগত্য ও অনুসরণ এ জন্য নিষিদ্ধ যে, তাদের মধ্যে না ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি, না ছিল কোন খোদায়ী হেদায়েত। হেদায়েত বলতে সে সমস্ত বিধি-বিধানকে বোঝায়, যা পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে। আর জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে সে সমস্ত বিষয়কে বোঝানো হয়েছে, যা শরীয়তের প্রকৃষ্ট 'নছ' বা নির্দেশ থেকে গবেষণা করে বের করা হয়।

অতএব, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণটি সাব্যস্ত হল এই যে, তাদের কাছে না আছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কোন বিধি বিধান, না আছে তাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর পর্যালোচনা-গবেষণা করে তা থেকে বিধি-বিধান বের করে নেয়ার মত কোন যোগ্যতা। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কোন আলেমের

ব্যাপারে এমন নিশ্চিত বিশ্বাস হলে যে, কোরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের সাথে সাথে তাঁর মধ্যে এজতেহাদ (উদ্ভাবন)–এর যোগ্যতাও রয়েছে, তবে এমন মুজতাহেদ আলেমের আনুগত্য–অনুসরণ করা জায়েয। অবশ্য এ আনুগত্য তাঁর ব্যক্তিগত হুকুম মানার জন্যে নয়, বরং আল্লাহ্র এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মানার জন্যেই হতে হবে। যেহেতু আমরা সরাসরি আল্লাহ্র সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে পারি না, সেহেতু কোন মুজতাহেদ আলেমের অনুসরণ করি, যাতেকরে আল্লাহ্র বিধি–বিধান অনুযায়ী আমল করা যায়।

অন্ধ অনুসরণ এবং মুজতাহেদ ইমামগণের অনুসরণের মধ্যে পার্থক্য ঃ উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা সাধারণভাবে মুজতাহেদ ইমামদের অনুসরণের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি উদ্ধৃত করেন, তারা নিজেরাই এ আয়াতের আসল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নন।

এ আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, এ আয়াতে যে পূর্ব-পুরুষের আনুগত্য ও অনুসরণের কথা নিষেধ করা হয়েছে, তার প্রকৃত মর্ম হল ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিশ্বাস ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাপ–দাদা ও পূর্ব–পুরুষের অনুসরণ। যথার্থ ও সঠিক বিশ্বাস এবং সৎকর্মে তাদের অনুসরণ করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, সূরা ইউসুফে হযরত ইউনুস (আঃ)–এর সংলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ দু'টি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে ঃ

—'আমি সে জাতির ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করেছি, যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করে না এবং যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে আমি অনুসরণ করেছি আমাদের পিতা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আঃ)–এরধর্মবিশ্বাসের।'

এ আয়াতের দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয়ে বাপ-দাদাদের অনুসরণ করা হারাম, কিন্তু বৈধ ও সৎকর্মের বেলায় তা জায়েয ; বরং প্রশংসনীয়।

ইমাম কুরতুবী এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজতাহেদ ইমামগণের আনুগত্য ও অনুসরণ সম্পর্কিত মাসআলা–মাসায়েল এবং অন্যান্য বিধি–বিধানেরও উল্লেখ করেছেন।

হালাল খাওয়ার বরকত ও হারাম খাদ্যের অকল্যাণ ঃ আলোচ্য আয়াতে যেমন হারাম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কারণ, হারাম খেলে যেমন মন্দ অভ্যাস ও অসচ্চরিত্রতা সৃষ্টি হয়, এবাদতের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে এবং দোয়া কবুল হয় না, তেমনিভাবে হালাল খানায় অন্তরে এক প্রকার নূর সৃষ্টি হয়। তদ্দ্বারা অন্যায়–অসচ্চরিত্রতার প্রতি ঘৃণাবোধ এবং সততা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়; এবাদত–বন্দেগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ আসে, পাপের কাজে মনে ভয় আসে এবং দোয়া কবুল হয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী–রসূলগণের প্রতি হেদায়েত করেছেন যে –

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

'হে আমার রসূলগণ ! তোমরা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর।'

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দোয়া কবুল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবুল না হওয়ার আশঙ্কাই থাকে বেশী। রসূল (সাঃ)–এরশাদ করেছেন,— বহু লোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে দু'হাত তুলে আল্লাহ্র দরবারে বলতে থাকে, ইয়া পরওয়ারদেগার ! ইয়া রব !' কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক–পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় তার দোয়া কি করে কবুল হতে পারে? –(মুসলিম, তিরমিযী, – ইবনে–কাসীর–এর বরাতে)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ
لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ
يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا
النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيْمٌ ﴿١٧٤﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ
بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ
الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍ
بَعِيْدٍ ﴿١٧٦﴾ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ
الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ
وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي
الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ
الْبَأْسِ ۗ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۖ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

(১৭৩) তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শূকর মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং না-ফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল ,অত্যন্ত দয়ালু। (১৭৪) নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ্ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে। বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (১৭৫) এরাই হল সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং (খরিদ করেছে) ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে আযাব। অতএব, তারা দোযখের উপর কেমন ধৈর্যধারণকারী। (১৭৬) আর এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ নাযিল করেছেন সত্যপূর্ণ কিতাব। আর যারা কেতাবের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে নিশ্চয়ই তারা জেদের বশবর্তী হয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। (১৭৭) সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ্র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী, তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য

আলোচ্য আয়াতে যে বস্তু-সামগ্রীকে হারাম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলোর সংখ্যা চার। যেমন, মৃত পশু, রক্ত, শূকর মাংস এবং যেসব জানোয়ার আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয়। উপরোক্ত চিহ্নিত চারটি বস্তুর সাথে স্বয়ং কোরআনেরই অন্য আয়াতে এবং হাদীস শরীফে আরো কতিপয় বস্তুর উল্লেখ এসেছে। সুতরাং সেসব নির্দেশ একত্রিত করে চিহ্নিত হারাম বস্তুগুলো সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

মৃত ঃ এর অর্থ যেসব প্রাণী হালাল করার জন্য শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যবেহ্ করা জরুরী, সেসব প্রাণী যদি যবেহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যেমন, আঘাত প্রাপ্ত হয়ে, অসুস্থ হয়ে, কিংবা দম বন্ধ হয়ে মারা যায়, তবে সেগুলোকে মৃত বলে গণ্য করা হবে এবং সেগুলোর গোশত খাওয়া হারাম হবে।

তবে কোরআন শরীফের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ 'তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হলো।'

এ আয়াতের মর্মানুযায়ী সামুদ্রিক জীব-জন্তুর বেলায় যবেহ্ করার শর্ত আরোপিত হয়নি। ফলে এগুলো যবেহ্ ছাড়াই খাওয়া হালাল। অনুরূপ এক হাদীসে মাছ এবং টিড্ডি নামক পতঙ্গকে মৃত প্রাণীর তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এ দু'টির মৃতকেও হালাল করা হয়েছে। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন— আমাদের জন্য দু'টি মৃত হালাল— মাছ এবং টিড্ডি। সুতরাং বোঝা গেল যে, জীব-জন্তুর মধ্যে মাছ এবং টিড্ডি নামক পতঙ্গ মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে না, এ দু'টি যবেহ্ না করেও খাওয়া যাবে। তবে মাছ পানিতে মরে যদি পচে যায় এবং পানির উপরে ভেসে উঠে, তবে তা খাওয়া যাবে না।— (জাস্সাস)। অনুরূপ যেসব বন্য জীব-জন্তু ধরে যবেহ্ করা সম্ভব নয়, সেগুলোকে বিসমিল্লাহ্ বলে তীর কিংবা অন্য কোন ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে যদি মারা হয়, তবে সেগুলোও হালাল হবে, এমতাবস্থায়ও শুধু আঘাত দিয়ে মারলে চলবে না, কোন ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা শর্ত।

মাসআলা ঃ ইদানীং এক রকম চোখা গুলী ব্যবহৃত হয়, এ ধরনের গুলী সম্পর্কে কোন কোন আলেম মনে করেন যে, এসব ধারালো গুলীর আঘাতে মৃত জন্তুর হুকুম তীরের আঘাতে মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে। কিন্তু আলেমগণের সম্মিলিত অভিমত অনুযায়ী বন্দুকের গুলী চোখা এবং ধারালো হলেও তা তীরের পর্যায়ভুক্ত হয় না। কেননা, তীরের আঘাত ছুরির আঘাতের ন্যায়, অপরপক্ষে বন্দুকের গুলী চোখা হলেও গায়ে বিদ্ধ হয়ে বারুদের বিস্ফোরণ ও দাহিকা শক্তির প্রভাবে জন্তুর মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং এরূপ গুলীর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত জানোয়ারও যবেহ্ করার আগে মারা গেলে তা খাওয়া হালাল হবে না।

মাসআলাঃ আলোচ্য আয়াতে 'তোমাদের জন্য মৃত হারাম' বলাতে মৃত জানোয়ারের গোশ্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম হিসাবে বিবেচিত হবে। যাবতীয় অপবিত্র বস্তু সম্পর্কে সে একই বিধান প্রয়োজ্য।

অর্থাৎ, এগুলোর ব্যবহার যেমন হারাম, তেমনি এগুলো ক্রয়-বিক্রয় কিংবা অন্য কোন উপায়ে এগুলো থেকে যে কোনভাবে লাভবান হওয়াও হারাম। এমনকি মৃত জীব-জন্তুর গোশ্ত নিজ হাতে কোন গৃহপালিত

জন্তুকে খাওয়ানোও জায়েয নয়। বরং সেগুলো এমন কোন স্থানে ফেলে দিতে হবে, যেন কুকুর-বিড়ালে খেয়ে ফেলে। নিজ হাতে উঠিয়ে কুকুর-বিড়ালকে খাওয়ানোও জায়েয হবে না।— (জাস্‌সাস, কুরতুবী)

মাসআলাঃ 'মৃত' শব্দটির অন্য কোন বিশেষণ ছাড়া সাধারণভাবে ব্যবহার করাতে প্রতীয়মান হয় যে, হারামের হুকুমও ব্যাপক এবং তন্মধ্যে মৃত জন্তুর সমুদয় অংশই শামিল। কিন্তু অন্য এক আয়াতে عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ শব্দ দ্বারা এ বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে। তাতে বুঝা যায় যে, মৃত জন্তুর শুধু সে অংশই হারাম যেটুকু খাওয়ার যোগ্য। সুতরাং মৃত জন্তুর হাড়, পশম প্রভৃতি যেসব অংশ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলো ব্যবহার করা হারাম নয়; সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা, কোরআনের অন্য এক আয়াতে আছেঃ

وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ

এতে হালাল জানোয়ারসমূহের পশম প্রভৃতির দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে যবেহ করার শর্ত আরোপ করা হয়নি।— (জাস্‌সাস)

চামড়ার মধ্যে যেহেতু রক্ত প্রভৃতি নাপাকীর সংমিশ্রণ থাকে, সেজন্য মৃত জানোয়ারের চামড়া শুকিয়ে পাকা না করা পর্যন্ত নাপাক এবং ব্যবহার হারাম। কিন্তু পাকা করে নেয়ার পর ব্যবহার করা সম্পূর্ণ জায়েয। সহীহ্ হাদীসে এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।— (জাস্‌সাস)

মাসআলাঃ মৃত জানোয়ারের চর্বি এবং তদ্দ্বারা তৈরী যাবতীয় সামগ্রীই হারাম। এসবের ব্যবহার কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। এমনকি এসবের ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম।

রক্ত ঃ আলোচ্য আয়াতে যেসব বস্তু-সামগ্রীকে হারাম করা হয়েছে, তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে রক্ত। এ আয়াতে শুধু রক্ত উল্লেখিত হলেও সূরা আন'আমের এক আয়াতে اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا অর্থাৎ 'প্রবাহমান রক্ত' উল্লেখিত রয়েছে। রক্তের সাথে 'প্রবাহমান' শব্দ সংযুক্ত করার ফলে শুধু সে রক্তকেই হারাম করা হয়েছে, যা যবেহ্ করলে বা কেটে গেলে প্রবাহিত হয়। এ কারণেই কলিজা-যকৃৎ প্রভৃতি জমাট বাঁধা রক্তে গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফেকাহ্‌বিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী পাক ও হালাল।

মাসআলা ঃ যেহেতু শুধুমাত্র প্রবাহমান রক্তই হারাম ও নাপাক, কাজেই যবেহ্ করা জন্তুর গোশতের সাথে রক্তের যে অংশ জমাট বেঁধে থেকে যায়, সেটুকু হালাল ও পাক। ফেকাহ্‌বিদ সাহাবী ও তাবেয়ীসহ সমগ্র আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একমত। একই কারণে মশা-মাছি ও ছারপোকার রক্ত নাপাক নয়। তবে যদি রক্ত বেশী হয় এবং ছড়িয়ে যায়, তবে তা ধুয়ে ফেলা উচিত।— (জাস্‌সাস)

মাসআলা ঃ রক্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করাও হারাম। অন্যান্য নাপাক রক্তের ন্যায় রক্তের ক্রয়-বিক্রয় এবং তদ্দ্বারা অর্জিত লাভালাভ ও হারাম। কেননা, কোরআনের আয়াতে 'রক্ত' শব্দটি অন্য কোন বিশেষণ ব্যতীতই ব্যবহৃত হওয়ার কারণে রক্ত বলতে যা বুঝায়, তার সম্পূর্ণটাই হারাম প্রতিপন্ন হয়ে গেছে।

রুগীর গায়ে অন্যের রক্ত দেয়ার মাসআলা ঃ এই মাসআলার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ রক্ত মানুষের শরীরের অংশ। শরীর থেকে বের করে নেওয়ার পর তা নাপাক। তদনুসারে প্রকৃত প্রস্তাবে একজনের রক্ত অন্যজনের শরীরে প্রবেশ করানো দু'কারণে হারাম হওয়া উচিত, প্রথমতঃ মানুষের যেকোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্মানিত এবং আল্লাহ্ কর্তৃক সংরক্ষিত। শরীর থেকে পৃথক করে নিয়ে তা অন্যত্র সংযোজন করা সে সম্মান ও সংরক্ষণ বিধানের পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ এ কারণে যে, রক্ত 'নাজাসাতে-গলীযা' বা জঘন্য ধরনের নাপাকী। আর নাপাক বস্তুর ব্যবহার জায়েয নয়।

তবে নিরুপায় অবস্থায় এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ রক্ত যদিও মানুষের শরীরেরই অংশ, তথাপি এটা অন্য মানুষের শরীরে স্থানান্তরিত করার জন্য যার রক্ত, তার শরীরে কোন প্রকার কাটা-ছেঁড়ার প্রয়োজন হয় না,— কোন অঙ্গ কেটে পৃথক করতে হয় না। সূঁই-এর মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে রক্ত বের করে অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। তদনুসারে রক্তকে দুধের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যা অঙ্গ কর্তন ব্যতিরেকেই একজনের শরীর থেকে বের হয়ে অন্যের শরীরের অংশে পরিণত হতে থাকে। শিশুর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করেই ইসলামী শরীয়ত মানুষের দুধকে শিশু খাদ্য হিসাবে নির্ধারিত করেছে এবং স্বীয় সন্তানকে দুধ-পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত করে দিয়েছে।

"অষুধ হিসাবে স্ত্রীলোকের দুধ পুরুষের পক্ষে নাকে প্রবেশ করানো কিংবা পান করায় দোষ নেই।" —আলমগীরি

ইবনে কুদামাহ্ রচিত 'মুগনী' গ্রন্থে এ মাসআলা সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।— (মুগনী, - কিতাবুস সাইদ, ৮ম খঃ, ২০৬ পৃষ্ঠা)

রক্তকে যদি দুধের সাথে তুলনা করা হয়, তবে তা সামঞ্জস্যহীন হবে না। কেননা, দুধ রক্তেরই পরিবর্তিত রূপ এবং মানব-দেহের অংশ হওয়ার ব্যাপারেও একই পর্যায়ভুক্ত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, দুধ পাক এবং রক্ত নাপাক। সুতরাং হারাম হওয়ার প্রথম কারণ অর্থাৎ, মানবদেহের অংশ হওয়ার ক্ষেত্রে তো নিষিদ্ধ হওয়ার ধারণা যুক্তিতে টেকে না। অবশিষ্ট থাকে দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ, নাপাক হওয়া। এক্ষেত্রেও চিকিৎসার বেলায় অনেক ফেকাহ্‌বিদ রক্ত ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় মানুষের রক্ত অন্যের দেহে স্থানান্তর করার প্রশ্নে শরীয়তের নির্দেশ দাঁড়ায় এই যে, সাধারণ অবস্থায় এটা জায়েয নয়। তবে চিকিৎসার্থ, নিরুপায় অবস্থায় অষুধ হিসাবে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে জায়েয। 'নিরুপায় অবস্থায়' অর্থ হচ্ছে রোগীর যদি জীবন-সংশয় দেখা দেয় এবং অন্য কোন অষুধ যদি তার জীবন রক্ষার জন্য কার্যকর বলে বিবেচিত না হয়, আর রক্ত দেয়ার ফলে তার জীবন-রক্ষার সম্ভাবনা যদি প্রবল থাকে, তবে সে অবস্থায় তার দেহে অন্যের রক্ত দেয়া কোরআন শরীফের সে আয়াতের মর্মানুযায়ীও জায়েয হবে, যে আয়াতে অনন্যোপায় অবস্থায় মৃত জন্তুর গোশত খেয়ে জীবন বাঁচানোর সরাসরি অনুমতি দেয়া হয়েছে।

আর যদি অনন্যোপায় না হয় এবং অন্য অষুধ ব্যবহারে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়, তবে সে অবস্থায় রক্ত ব্যবহারের প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফেকাহ্‌বিদ একে জায়েয বলেছেন এবং কেউ কেউ না-জায়েয বলেছেন। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহ্‌র কিতাবসমূহে 'হারাম

বস্তুর দ্বারা চিকিৎসা' শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে।

শূকর হারাম হওয়ার বিবরণ ঃ আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় যে বস্তুটি হারাম করা হয়েছে, সেটি হল শূকরের গোশত। এখানে শূকরের সাথে 'লাহ্‌ম' বা গোশত শব্দ সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এর দ্বারা শুধু গোশত হারাম একথা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং শূকরের সমগ্র অংশ অর্থাৎ, হাড়, গোশত, চামড়া, চর্বি, রগ, পশম প্রভৃতি সবকিছুই সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে 'লাহ্‌ম' তথা গোশত যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শূকর অন্যান্য হারাম জন্তুর ন্যায় নয়, তাই এটি যবেহ করলেও পাক হয় না। কেননা, গোশত খাওয়া হারাম এমন অনেক জন্তু রয়েছে যাদের যবেহ্ করার পর সেগুলোর হাড়, চামড়া প্রভৃতি পাক হতে পারে। কিন্তু যবেহ করার পরও শূকরের গোশত হারাম তো বটেই, নাপাকও থেকে যায়। কেননা, এটি একাধারে যেমনি হারাম তেমনি 'নাজাসে-আইন' বা সম্পূর্ণ নাপাক। শুধুমাত্র চামড়া সেলাই করার কাজে শূকরের পশম দ্বারা তৈরী সূতা ব্যবহার করা জায়েয বলে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।— (জাস্‌সাস, কুরতুবী)

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে যা যবেহ করা হয় ঃ আয়াতে উল্লেখিত চতুর্থ হারাম বস্তু হচ্ছে সেসব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ অথবা উৎসর্গ করা হয়। সাধারণতঃ এর তিনটি উপায় প্রচলিত রয়েছে।

প্রথমতঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভের উদ্দেশে যা উৎসর্গ করা হয় এবং যবেহ করার সময়ও সে নাম নিয়েই যবেহ করা হয়, যে নামে তা উৎসর্গিত। এমতাবস্থায় যবেহকৃত জন্তু সমস্ত মত-পথের আলেম ও ফেকাহবিদগণের দৃষ্টিতেই হারাম ও নাপাক। এর কোন অংশের দ্বারাই ফায়দা গ্রহণ জায়েয হবে না। কেননা, وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াতে যে অবস্থার কথা বুঝানো হয়েছে এ অবস্থা এর সরাসরি নমুনা, যে ব্যাপারে কারো কোন মতভেদ নেই।

দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশে যা যবেহ করা হয়, তবে যবেহ করার সময় তা আল্লাহ্র নাম নিয়েই যবেহ করা হয়। যেমন, অনেক অজ্ঞ মুসলমান পীর-বুযুর্গগণের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি মান্নত করে তা যবেহ করে থাকে। কিন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম নিয়েই তা যবেহ করা হয়। এ সুরতটিও ফকীহ্গণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী হারাম এবং যবেহকৃত জন্তু মৃতের শামিল।

তবে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে এ সুরতটি সম্পর্কে কিছুটা মত-পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন মুফাস্‌সের এবং ফেকাহ্‌বিদ এ সুরতটিকেও আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে যবেহকৃত জীবের বিধানের অনুরূপ বিবেচনা করেছেন। যেমন, তফসীরে বায়যাবীর টীকায় বলা হয়েছে ঃ

'সে সমস্ত জন্তুই হারাম, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয়। যবেহ করার সময় তা'আল্লাহ্র নামেই যবেহ করা হোক না কেন। কেননা, আলেম ও ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোন জন্তুকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নৈকট্য হাসিল করার উদ্দেশে কোন মুসলমানও যবেহ করে, তবে সে ব্যক্তি 'মুরতাদ' বা ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে এবং তার যবেহকৃত পশুটি মুরতাদের যবেহকৃত পশু বলে বিবেচিত হবে।'

দুররে মুখতার কিতাবুয-যাবায়েহ্ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

"— যদি কোন আমীরের আগমন উপলক্ষে তাঁরই সম্মানার্থ কোন পশু যবেহ করা হয়, তবে যবেহকৃত সে পশুটি হারাম হয়ে যাবে। কেননা, এটাও তেমনি, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে যা যবেহ করা হয়"— এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত ; যদিও যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম নিয়েই তা যবেহ্ করা হয়। শামীও এ অভিমত সমর্থন করেছেন।— (দুররে-মুখতার, ৫ম খঃ, ২১৪ পৃঃ)

কেউ কেউ অবশ্য উপরোক্ত সুরতটিকে وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াতের সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন না। কেননা, আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি অনুসারে একেবারে সরাসরি তা বুঝায় না। তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নৈকট্য বা সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত দ্বারা 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উদ্দেশে যা উৎসর্গ করা হয়' সে আয়াতের প্রতি যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় এ সুরতটিকেও হারাম করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এ যুক্তিই সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ ও সাবধানতাপ্রসূত।

উপরোক্ত সুরতটি হারাম হওয়ার সমর্থনে কোরআনের অন্য আর একটি আয়াতও দলীল হিসেবে পেশ করা যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ বাতেলপন্থীরা যেসব বস্তুর পূজা করে থাকে, সেই সবকিছুকে نُصُب বলা হয়। সেমতে আয়াতের অর্থ হয় ঃ সে সমস্ত পশু, যেগুলোকে বাতেল উপাস্যের উদ্দেশে যবেহ্ করা হয়েছে।

'আরবদের স্বভাব ছিল যে, যার উদ্দেশ্যে যবেহ করা হতো, যবেহ করার সময় তারস্বরে সে নামই উচ্চারণ করতে থাকতো। ব্যাপকভাবে তাদের মধ্যে এ রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য প্রত্যাশা— যা সংশ্লিষ্ট পশু হারাম হওয়ার মূল কারণ, সেটাকে 'এহ্‌লাল' অর্থাৎ, 'তারস্বরে নামোচ্চারণ' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

ইমাম মুসলিম তাঁর ওস্তাদ ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়াহ্‌ইয়ার সনদে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসের শেষভাগে রয়েছে যে, একজন স্ত্রীলোক হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আজমী লোকদের মধ্যে আমাদের কিছুসংখ্যক দুর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে! তাদের মধ্যে সব সময় কোন না কোন উৎসব লেগেই থাকে। উৎসবের দিনে কিছু হাদিয়া-তোহফা তারা আমাদের কাছেও পাঠিয়ে থাকে। আমরা তাদের পাঠানো সেসব সামগ্রী খাবো কিনা? জবাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন—

'সে উৎসব দিবসের জন্যেই যেসব পশু যবেহ করা হয়, সেগুলো খেয়ো না, তবে তাদের ফলমূল খেতে পার।'— (তফসীরে-কুরতুবী, ২য় খঃ, ২০৭ পৃঃ)।

মোটকথা, দ্বিতীয় সুরতটি, যাতে নিয়ত থাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভ, কিন্তু যবেহ করা হয় আল্লাহ্র নামেই, সেটিও হারাম হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য অর্জন, এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার দরুন وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াতের হুকুম দ্বিতীয় আয়াত وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ -এরও প্রতিপাদ্য সাব্যস্ত হওয়ায় এ শ্রেণীর পশুর গোশতও হারাম।

তৃতীয় সুরত হচ্ছে পশুর কান কেটে অথবা শরীরের অন্য কোথাও কোন চিহ্ন অঙ্কিত করে কোন দেব-দেবী বা পীর-ফকীরের নামে ছেড়ে

দেয়া হয়। সেগুলো দ্বারা কোন কাজ নেয়া হয় না, যবেহ্ করাও উদ্দেশ্য থাকে না। বরং যবেহ্ করাকে হারাম মনে করে। এ শ্রেণীর পশু আলোচ্য দু'আয়াতের কোনটিরই আওতায় পড়ে না। এ শ্রেণীর পশুকে কোরআনের ভাষায় 'বহীরা' বা 'সায়েবা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের পশু সম্পর্কে হুকুম হচ্ছে যে, এ ধরনের কাজ অর্থাৎ, কারো নামে কোন পশু প্রভৃতি জীবন্ত উৎসর্গ করে ছেড়ে দেয়া কোরআনের সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী হারাম। যেমন বলা হয়েছে ঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ

"আল্লাহ্ তাআলা বাহীরা বা 'সায়েবা' সম্পর্কে কোন বিধান দেননি। তবে এ ধরনের হারাম আমল কিংবা সংশ্লিষ্ট পশুটিকে হারাম মনে করার ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই সেটি হারাম হয়ে যাবে না। বরং হারাম মনে করাতেই তাদের একটা বাতিল মতবাদকে সমর্থন এবং শক্তি প্রদান করা হয়। তাই এরূপ উৎসর্গকৃত পশু অন্যান্য সাধারণ পশুর মতই হালাল।"

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পশুর উপর তার মালিকের মালিকানা বিনষ্ট হয় না, যদিও সে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে এরূপ মনে করে যে, এটি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে যে নামে উৎসর্গ করা হয়েছে তারই মালিকানায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু শরীয়তের বিধানমতে যেহেতু তার সে উৎসর্গীকরণই বাতিল, সুতরাং সে পশুর উপর তারই পরিপূর্ণ মালিকানা কায়েম থাকে। সে মতে উৎসর্গকারী যদি সে পশু কারো নিকট বিক্রয় করে কিংবা অন্য কাউকে দান করে, তবে তা ক্রেতা ও দানগ্রহীতার জন্য হালাল। পৌত্তলিক সমাজের অনেকেই মন্দির বা দেব-দেবীর নামে পশু-পাখী উৎসর্গ করে সেগুলো পূজারী বা সেবায়েতদের হাতে তুলে দেয়। সেবায়েতরা সেসব পশু বিক্রয় করে থাকে। এরূপ পশু ক্রয় করা সম্পূর্ণ হালাল।

এক শ্রেণীর কুসংস্কারগ্রস্ত মুসলমানকেও পীর-বুযুর্গের মাজারে ছাগল-মুরগী ইত্যাদি ছেড়ে আসতে দেখা যায়। মাযারের খাদেমরাই সাধারণতঃ উৎসর্গীকৃত সেসব জন্তু ভোগ-দখল করে। যেহেতু মূল মালিক খাদেমদের হাতে এগুলো ছেড়ে যায় এবং এগুলোর ব্যাপারে খাদেমদের পূর্ণ এখতিয়ার থাকে, সেহেতু এ শ্রেণীর জীব-জন্তু ক্রয় করা, যবেহ্ করে খাওয়া, বিক্রয় করে লাভবান হওয়া সম্পূর্ণ হালাল।

গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ এ ক্ষেত্রে কোরআন করীম মরণাপন্ন অবস্থায়ও হারাম বস্তু খাওয়াকে হালাল বা বৈধ বলেনি; বলেছে فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ "তাতে তার কোন পাপ নেই"। এর মর্ম এই যে, এসব বস্তু তখনও যথারীতি হারামই রয়ে গেছে, কিন্তু যে লোক খাচ্ছে তার অনন্যোপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে হারাম খাদ্য গ্রহণের পাপ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের লোভে শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম পরিবর্তিত করে এবং তার বিনিময়ে যে হারাম ধন-সম্পদ গ্রহণ করে, তা যেন সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরে। কারণ, এ কাজের পরিণতি তাই। কোন কোন বিজ্ঞ আলেমের মতে প্রকৃতপক্ষে হারাম মাল বা ধন-সম্পদ সবই দোযখের আগুন। অবশ্য তা যে আগুন, সে-কথা পার্থিব জীবনে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু মৃত্যুর পর তার সে কর্মই আগুনের রূপ ধরে উপস্থিত হবে।

মুসলমানদের কেবলা যখন বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিক থেকে পরিবর্তিত করে বায়তুল্লাহ্র দিকে নির্ধারণ করা হলো, তখন ইহুদী, খ্রীষ্টান, পৌত্তলিক প্রভৃতি যারা সর্বদা মুসলমানদের মধ্যে ত্রুটি তালাশ করার ফিকিরে থাকতো, তারা তৎপর হয়ে উঠলো এবং নানাভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও ইসলামের প্রতি অবিরাম নানা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতে শুরু করল। এসব প্রশ্নের জবাব পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য একটি আয়াতে বিশেষ বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে এ বিতর্কের যতি টেনে দেয়া হয়েছে। যার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, নামাযে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে কি পশ্চিমদিকে, এ বিষয় নির্ধারণকেই যেন তোমরা দ্বীনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছ এবং এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই তোমাদের যাবতীয় আলোচনা-সমালোচনা আবর্তিত হতে শুরু করেছে। মনে হয়, তোমাদের ধারণায় শরীয়তের অন্য কোন হুকুম-আহ্কামই যেন আর নেই!

অন্য অর্থে এ আয়াতের লক্ষ্য মুসলমান, ইহুদী, নাসারা নির্বিশেষে সবাই হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই যে, প্রকৃত পুণ্য বা নেকী আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যের ভেতরেই নিহিত। যেদিকে মুখ করে তিনি নামাযে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন, সেটাই শুদ্ধ ও পুণ্যের কাজে পরিণত হয়ে যায়। অন্যথায়, দিক হিসাবে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের কোনই বৈশিষ্ট্য নেই। দিকবিশেষের সাথে কোন পুণ্যও সংশ্লিষ্ট নয়। পুণ্য-একান্তভাবেই আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের সাথে সম্পৃক্ত। তাই আল্লাহ্ তাআলা যতদিন বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রতি মুখ করে নামায পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন, ততদিন সেদিকে মুখ করাই ছিল পুণ্য। আবার যখন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর হুকুম হয়েছে, এখন এ হুকুমের আনুগত্য করাই পুণ্যে পরিণত হয়েছে।

আলোচ্য ১৭৭ তম আয়াত থেকে সূরা-বাক্বারার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এ অধ্যায়ে মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে তা'লীম ও হেদায়েত প্রদানই মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গতঃ এতে বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবও দেয়া হয়েছে। সে হিসেবে আলোচ্য এ আয়াতটিকে ইসলামের বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবহ আয়াত বলে অভিহিত করা যায়।

অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আলোচ্য এ আয়াতে এ'তেকাদ বা বিশ্বাস, এবাদত, মোআমালাত বা লেনদেন এবং নৈতিকতা ও আখলাক সম্পর্কিত বিধি-বিধানের মূলনীতিসমূহের আলোচনা মোটামুটিভাবে এসে গেছে। প্রথম বিষয় — ই'তেকাদ বা মৌলবিশ্বাস সম্পর্কিত আলোচনা مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ শীর্ষক আয়াতে বিস্তারিতভাবে অলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবাদত এবং মোআমালাত সম্পর্কিত। তার মধ্যে এবাদত সম্পর্কিত আলোচনা وَاٰتَى الزَّكٰوةَ পর্যন্ত উল্লেখিত হয়েছে। অতঃপর মোআমালাতের আলোচনা وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ শীর্ষক আয়াতে করা হয়েছে। এরপর আখলাক সম্পর্কিত আলোচনা وَالصّٰبِرِيْنَ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

সবশেষে বলা হয়েছে যে, সে সমস্ত লোকই সত্যিকার মুমিন, যারা এসব নির্দেশাবলীর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে এবং এসব লোককেই প্রকৃত মোত্তাকী বলা যেতে পারে।

অতঃপর আলোচ্য আয়াতে প্রথমে ধন-সম্পদ ব্যয় করার দুটি গুরু

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ
رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَ
لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ
بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ
مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

(১৭৮) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (১৭৯) হে বুদ্ধিমানগণ! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার। (১৮০) তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য ওসীয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে। পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা সবকিছু শোনেন ও জানেন। (১৮১) যদি কেউ ওসীয়ত শোনার পর তাতে কোন রকম পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করে তাদের উপর এর পাপ পতিত হবে। (১৮২) যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে আশংকা করে পক্ষপাতিত্বের অথবা কোন অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন গোনাহ্ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (১৮৩) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার— (১৮৪) গণনার কয়েকটি দিনের জন্য। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোযা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিস্কীনকে খাদ্যদান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি রোযা রাখ, তবে তা তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার।

ত্বপূর্ণ খাত বর্ণনা করে পরে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, এ দুটি খাত যাকাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথমেই এ দু'টি খাতের কথা বর্ণনা করার পরে যাকাতের কথা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, সাধারণতঃ মানুষ আলোচ্য দু'টি খাতে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কুণ্ঠাবোধ করে, কিন্তু তা উচিত নয়।

মাসআলা ঃ এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির দ্বারাই এ তথ্যও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, ধন-সম্পদের ফরয শুধুমাত্র যাকাত প্রদানের মাধ্যমেই পূর্ণ হয় না, যাকাত ছাড়া আরোও বহু ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা ফরয ও ওয়াজিব হয়ে থাকে।— (জাস্সাস, কুরতুবী)।

যেমন, রুযী-রোযগারে অক্ষম আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কারো সামনে যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়, তবে যাকাত প্রদান কারার পরেও সে দরিদ্রের জীবন রক্ষার্থ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ফরয হয়ে পড়ে।

অনুরূপ, যেসব স্থানে প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মসজিদ তৈরী করা এবং দ্বিনী-শিক্ষার জন্য মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করাও আর্থিক ফরযের অন্তর্গত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যাকাতের একটা বিশেষ বিধান রয়েছে, সে বিধান অনুযায়ী যে কোন অবস্থায় যাকাত প্রদান করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য খরচের বেলায় প্রয়োজন দেখা দেয়া শর্ত।

অতঃপর পূর্ববর্তী বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে অতীতকাল বাচক শব্দের স্থলে وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ বাক্যটিতে কারক পদ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুমিন ব্যক্তির মধ্যে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার অভ্যাস সব সময়ের জন্য থাকতে হবে, ঘটনাচক্রে কখনো কখনো অঙ্গীকার পূরণ করলে চলবে না। কেননা, এরূপ মাঝে-মধ্যে কাফের-গোনাহগাররাও ওয়াদা- অঙ্গীকার পূরণ করে থাকে। সুতরাং এটা ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না।

তেমনিভাবে মোআমালাতের বর্ণনায় শুধুমাত্র অঙ্গীকার পূরণ করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়, অংশীদারিত্ব, ভাড়া-ইজারা প্রভৃতি বৈষয়িক দিকসমূহের সুষ্ঠুতা ও পবিত্রতাই অঙ্গীকার পূরণের উপর নির্ভরশীল।

এরপরই আখলাক বা মন-মানসিকতার সুস্থতা বিধান সম্পর্কিত বিধি-বিধানের আলোচনায় একমাত্র 'সবর'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, সবর-এর অর্থ হচ্ছে মন-মানসিকতা তথা নফসকে বশীভূত করে অন্যায়-অনাচার থেকে সর্বতোভাবে সুরক্ষিত রাখা। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, মানুষের হৃদয়-বৃত্তিসহ আভ্যন্তরীণ যত আমল রয়েছে, সবরই সেসবের প্রাণস্বরূপ। এরই মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায় ও কদাচার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَلْقِصَاص 'কেসাসুন'-এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ, অন্যের প্রতি যতটুকু জুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ তার পক্ষে জায়েয। এর চাইতে বেশীকিছু করা জায়েয নয়। এ সূরারই পরবর্তী এক আয়াতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

অনুরূপ সূরা নহলের শেষ আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

এতে আলোচ্য বিষয়ই আরো বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। সেমতে শরীয়তের পরিভাষায় 'কেসাস' বলা হয় হত্যা এবং আঘাতের সে শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান করা হয়।

মাসআলা ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয় কোন অস্ত্র কিংবা এমন কোন কিছুর দ্বারা হত্যার উদ্দেশে আঘাত করা, যার দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা হত্যা সংঘটিত হয়— 'কেসাস' অর্থাৎ, 'জানের বদলায় জান' এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মাসআলা ঃ এ ধরনের হত্যার অপরাধে যেমন স্বাধীন ব্যক্তির হত্যাকারী অন্য স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, তেমনি কোন ক্রীতদাসের বদলায়ও স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। অনুরূপ স্ত্রীলোক হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ হত্যার অপরাধে স্ত্রীলোককেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

এ আয়াতে স্বাধীন ব্যক্তির বদলায় স্বাধীন ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকের বদলায় স্ত্রী লোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার যে কথা উল্লেখিত হয়েছে, তা সেই একটা বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, যে ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

মাসআলা ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেয়া হয়, — যেমন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস মাত্র দুই পুত্র, সে দুজনেই যদি মাফ করে দেয়, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পূর্ণ মাফ না হয়, অর্থাৎ, উপরোক্ত ক্ষেত্রে এক পুত্র মাফ করে, কিন্তু অপর পুত্র তা না করে, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারী কেসাস- এর দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবে সত্য, কিন্তু এক পুত্রের দাবীর বদলায় অর্ধেক দিয়্যত প্রদান করতে হবে।

শরীয়তের বিধানে হত্যার বদলায় যে দিয়্যত বা অর্থদণ্ড প্রদান করতে হয়, তার পরিমাণ হচ্ছে মধ্যম আকৃতির একশ' উট, অথবা একহাজার দীনার কিংবা দশ হাজার দেরহাম। বর্তমানকালের প্রচলিত ওজন অনুপাতে এক দেরহাম—সাড়ে তিন মাসা রৌপ্যের সমপরিমাণ। সেমতে পূর্ণ দিয়্যত–এর পরিমাণ হবে দু'হাজার নয়শ' তোলা আট মাসা রৌপ্য।

মাসআলা ঃ কেসাস–এর আংশিক দাবী মাফ হয়ে গেলে যেমন মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হয়ে দিয়্যত ওয়াজিব হয়, তেমনি উভয়পক্ষ যদি কোন নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে আপোষ-নিষ্পত্তি করে ফেলে, তবে সে অবস্থাতেও, 'কেসাস' মওকুফ হয়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে, যা ফেকাহ্‌র কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

মাসআলা ঃ নিহত ব্যক্তির যে ক'জন ওয়ারিস্ থাকবে, তাদের প্রত্যেকেই 'মীরাস'–এর অংশ অনুপাতে 'কেসাস' ও দিয়্যত–এর মালিক হবে এবং দিয়্যত হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ 'মীরাস'–এর অংশ অনুপাতে বন্টিত হবে। তবে কেসাস যেহেতু বন্টনযোগ্য নয়, সেহেতু ওয়ারিসগণের মধ্য থেকে যে কোন একজনও যদি কেসাস–এর দাবী ত্যাগ করে, তবে তার উপর কেসাস ওয়াজিব হবে না; বরং দিয়্যত ওয়াজিব হবে এবং প্রত্যেকেই অংশ অনুযায়ী দিয়্যতের ভাগ পাবে।

মাসআলা ঃ 'কেসাস' গ্রহণ করার অধিকার যদিও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণের, তথাপি নিজেরা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। অর্থাৎ, নিহত ব্যক্তির বদলায় হত্যাকারীকে তারা নিজেরা হত্যা করতে পারবে না। এ অধিকার আদায় করার জন্য আইন কর্তৃপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা, কোন্ অবস্থায় কেসাস ওয়াজিব হয় এবং কোন্ অবস্থায় হয় না, এ সম্পর্কিত অনেক সূক্ষ্ম দিকও রয়েছে, যা সবার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রাগের মাথায় বাড়াবাড়িও করে ফেলতে পারে, এজন্য আলেম ও ফেকাহ্‌বিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী 'কেসাস'–এর হক আদায় করার জন্য ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে।— (কুরতুবী)

১৮০ নং আয়াতে মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি (যদি সে কিছু ধন–সম্পদ রেখে যায়,) যে ওসীয়ত ফরয করা হয়েছে, সে নির্দেশের তিনটি অংশ বর্ণিত হয়েছে

(এক) মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সন্তান–সন্ততি ছাড়া অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের কোন অংশ যেহেতু নির্ধারিত নেই, সুতরাং তাদের হক মৃত ব্যক্তির ওসীয়তের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

(দুই) এ ধরনের নিকাটাত্মীয়দের জন্য ওসীয়ত করা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির উপর ফরয।

(তিন) এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির বেশী ওসীয়ত করা জায়েয নয়।

উপরোক্ত তিনটি নির্দেশের মধ্যে প্রথম নির্দেশটি অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়িগণের মতে 'মীরাস'–এর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর 'মনসূখ' বা রহিত হয়ে গেছে। ইবনে–কাসীর ও হাকেম প্রমুখ সহীহ্ সনদের সাথে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর মতে ওসীয়ত–সম্পর্কিত এ নির্দেশটি মীরাস–এর আয়াত দ্বারা রহিত করে দেয়া হয়েছে। মীরাস–সম্পর্কিত আয়াতটি হচ্ছে ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মীরাসের আয়াত সে সমস্ত আত্মীয়দের জন্য ওসীয়ত করা রহিত করে দিয়েছে, যাদের মীরাস নির্ধারিত ছিল। এছাড়া অন্যান্য যেসব আত্মীয়ের অংশ মীরাসের আয়াতে নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য ওসীয়ত করার হুকুম এখনো অবশিষ্ট রয়েছে।— (জাসসাস, কুরতুবী)

তবে আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, যেসব আত্মীয়ের জন্য মীরাসের আয়াতে কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য ওসীয়ত করা মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে ফরয বা জরুরী নয়। সে ফরয রহিত হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজনবিশেষে এটা মুস্তাহাবে পরিণত হয়েছে। –(জাস্সাস, কুরতুবী)

ওসীয়ত ফরয হওয়া প্রসঙ্গে ঃ ওসীয়ত সম্পর্কিত এ আয়াতের নির্দেশ একাধারে যেমন কোরআনের মীরাস–সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে, তেমনি বিদায় হজ্বের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশের মাধ্যমেও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর বর্ণিত হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। বিদায় হজ্বের বিখ্যাত খোতবায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছিলেন ঃ

ان الله اعطى لكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث

اخرجه الترمذی وقال هذا حديث حسن

"আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক হকদারের হক নির্ধারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে কোন ওয়ারিসের পক্ষে ওসীয়ত করা জায়েয নয়।— (তিরমিযী)

একই হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় একথাও যুক্ত হয়েছে ঃ

لاوصية لوارث الا ان تجيزه الورثة

"কোন ওয়ারিসের জন্য সে পর্যন্ত ওসীয়ত জায়েয হবে না, যে পর্যন্ত অন্যান্য ওয়ারিসগণ অনুমতি না দেয়।" – (জাস্সাস)

হাদীসের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তাআলাই যেহেতু প্রত্যেক ওয়ারিসের হিস্সা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সুতরাং এখন আর ওসীয়ত করার অনুমতি নেই। তবে যদি অন্যান্য ওয়ারিসগণ ওসীয়ত করার অনুমতি দেন, তবে যে কোন ওয়ারিসের জন্য বিশেষভাবে কোন ওসীয়ত করা জায়েয হবে।

তৃতীয় নির্দেশ ঃ এক- তৃতীয়াংশ সম্পদের ওসীয়ত সম্পর্কে ঃ আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিগণের পক্ষে এখনো তাদের মোট সম্পদের এক- তৃতীয়াংশ পরিমাণ ওসীয়ত করা জায়েয। এমনকি উত্তরাধীকারীগণের অনুমতিক্রমে সমগ্র সম্পত্তিও ওসীয়ত করা জায়েয এবং গ্রহণযোগ্য।

মাসআলা ঃ উপরোক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হচ্ছে যে, যেসব আত্মীয়ের হিস্সা কোরআন করীম নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের জন্যে ওসীয়ত করা ওয়াজিব নয়। এমনকি ওয়ারিসগণের অনুমতি ব্যতীত এক- তৃতীয়াংশ সম্পদের অতিরিক্ত ওসীয়ত করা জায়েযই নয়। তবে যেসব আত্মীয়ের হিস্সা কোরআন নির্ধারণ করেনি, তাদের জন্য মোট সম্পত্তির এক- তৃতীয়াংশ পরিমাণের মধ্যে ওসীয়ত করার অনুমতি রয়েছে।

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তির উপর অন্যের ঋণ বা আমানত থাকে এবং তা পরিশোধ করার জন্যে তার সমগ্র সম্পত্তির ওসীয়ত করতে হয়, তবুও তার পক্ষে তা করতে হবে এবং সমস্ত সম্পত্তির ওসীয়তই বৈধ হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, — কারো উপর অন্যের হক থাকলে তার পক্ষে সে সম্পর্কে লিখিত ওসীয়ত করা ব্যতীত তিনটি রাতও কাটানো উচিত নয়।

মাসআলা ঃ এক- তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসীয়ত করার যে অধিকার দেয়া হয়েছে, সেরূপ ওসীয়ত করার পর জীবিতাবস্থায় তা পরিবর্তন কিংবা বাতিল করে দেয়ারও অধিকার রয়েছে।— (জাস্সাস)

صوم -এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম 'সওম'। তবে সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে একাধারে এ ভাবে বিরত থাকলেই তা রোযা বলে গণ্য হবে। সূর্যাস্তের এক মিনিট আগেও যদি কোন কিছু খেয়ে ফেলে, পান করে, কিংবা সহবাস করে, তবে রোযা হবে না। অনুরূপ উপায়ে সবকিছু থেকে পূর্ণ দিবস বিরত থাকার পরও যদি রোযার নিয়ত না থাকে, তবে তাও রোযা হবে না।

সওম বা রোযা ইসলামের মূলভিত্তি বা আরকানের অন্যতম। রোযার অপরিসীম ফযীলত রয়েছে।

পূর্ববর্তী উম্মতের উপর রোযার হুকুম ঃ মুসলমানদের প্রতি রোযা ফরয হওয়ার নির্দেশটি একটি বিশেষ নযীর উল্লেখসহ দেয়া হয়েছে। নির্দেশের সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোযা শুধুমাত্র তোমাদের প্রতিই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল। এর দ্বারা যেমন রোযার বিশেষ গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে, তেমনি মুসলমানদের এ মর্মে একটা সান্ত্বনাও দেয়া হয়েছে যে, রোযা একটা কষ্টকর এবাদত সত্য, তবে তা শুধুমাত্র তোমাদের উপরই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপরও ফরয করা হয়েছিল। কেননা, সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন একটা ক্লেশকর কাজে অনেক লোক একই সাথে জড়িত হয়ে পড়লে তা অনেকটা স্বাভাবিক এবং সাধারণ বলে মনে হয়।— (রুহুল-মা'আনী)

কোরআনের বাক্য وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ অর্থাৎ, যারা তোমাদের পূর্বে ছিল, — ব্যাপক অর্থবোধক। এর দ্বারা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকল উম্মত এবং শরীয়তকেই বোঝায়। এতে বোঝা যায় যে, নামাযের এবাদত থেকে যেমন কোন উম্মত বা শরীয়তই বাদ ছিল না, তেমনি রোযাও সবার জন্যই ফরয ছিল।

যাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, مِنْ قَبْلِكُمْ বাক্য দ্বারা পূর্ববর্তী উম্মত 'নাসারা'দের বুঝানো হয়েছে, তাঁরা বলেন — এটা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যান্য উম্মতের উপর রোযা ফরয ছিল না, তাঁদের কথায় এ তথ্য বোঝায় না।— (রুহুল-মা'আনী)

আয়াতের মধ্যে শুধু বলা হয়েছে যে, — 'রোযা যেমন মুসলমানদের উপর ফরয করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল'; একথা দ্বারা এ তথ্য বুঝায় না যে, আগেকার উম্মতগণের রোযা সমগ্র শর্ত ও প্রকৃতির দিক দিয়ে মুসলমানদের উপর ফরযকৃত রোযারই অনুরূপ ছিল। যেমন, রোযার সময়সীমা, সংখ্যা এবং কখন তা রাখা হবে, এসব ব্যাপারে আগেকার উম্মতদের রোযার সাথে মুসলমানদের রোযার পার্থক্য হতে পারে, বাস্তব ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। বিভিন্ন সময়ে রোযার সময়সীমা এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়েছে।— (রূহুল- মা'আনী)

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ বাক্যে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, 'তাকওয়া' বা পরহেযগারীর শক্তি অর্জন করার ব্যাপারে রোযার একটা বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। কেননা, রোযার মাধ্যমে প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে বিশেষ শক্তি অর্জিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সেটাই 'তাকওয়া' বা পরহেযগারীর ভিত্তি।

রুগ্ন ব্যক্তির রোযা ঃ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا বাক্যে উল্লেখিত 'রুগ্ন' সে ব্যক্তিকে বোঝায়, রোযা রাখতে যার কঠিন কষ্ট হয় অথবা রোগ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। পরবর্তী আয়াত وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -এর মধ্যে সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে। ফেকাহ্‌বিদ আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত তাই।

মুসাফেরের রোযাঃ আয়াতের অংশ أَوْ عَلٰى سَفَرٍ -এর মধ্যে مسافر না বলে عَلٰى سَفَرٍ শব্দ ব্যবহার করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রথমতঃ শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থের সফর যথা, বাড়ীঘর থেকে বের হয়ে কোথাও গেলেই রোযার ব্যাপারে সফর-জনিত 'রুখসত' তথা অব্যাহতি পাওয়া যাবে না; সফর দীর্ঘ হতে হবে। কেননা, عَلٰى سَفَرٍ

শব্দের মর্মার্থ হচ্ছে, যে সফরের অবস্থায় থাকে। এতে বোঝা যায় যে, বাড়ীঘর থেকে পাঁচ–দশ মাইল দূরে গেলেই তা সফর বলে গণ্য হবে না। তবে সফর কতটুকু দীর্ঘ হতে হবে, সে সীমারেখা কোরআনে উল্লেখিত হয়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর হাদীস এবং সাহাবিগণের আমলের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এবং অন্যান্য কিছুসংখ্যক ফেকাহ্‌বিদের মতে এ সফর কমপক্ষে তিন মন্‌যিল দূরত্বের হতে হবে। অর্থাৎ, একজন লোক স্বাভাবিকভাবে পায়ে হেঁটে তিন দিনে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, ততটুকু দূরত্বের সফরকে সফর বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগের আলেমগণ 'মাইল'–এর হিসাবে এ দূরত্ব আটচল্লিশ মাইল নির্ধারণ করেছেন।

দ্বিতীয় মাসআলা ঃ عَلٰى سَفَرٍ শব্দ দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, মুসাফির, এর প্রতি রোযার ব্যাপারে সফরজনিত 'রুখসত' ততক্ষণই প্রযোজ্য হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সফর অবস্থায় থাকে। তবে স্বভাবতঃই সফর চলা অবস্থায় কোথাও সাময়িক যাত্রাবিরতি সফরের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটায় না। নবী করীম (সাঃ)–এর হাদীস মতে এ যাত্রাবিরতির মেয়াদ উর্ধ্বপক্ষে পনের দিনের কম সময় হতে হবে। কেউ যদি সফরের মধ্যেই কোথাও পনের দিন অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে সে আর 'সফরের মধ্যে' থাকে না। ফলে সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে সফরজনিত 'রুখসত' ও প্রযোজ্য হবে না।

মাসআলা ঃ উল্লেখিত বাক্যাংশ দ্বারা একথাও বোঝায় যে, কেউ যদি সফরের মধ্যে কোন এক জায়গায় নয়; বরং বিভিন্ন জায়গায় মোট পনের দিনের যাত্রাবিরতি করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তার সফরের ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে না। সে সফর–জনিত রুখসত পাওয়ার অধিকারী হবে।

রোযার কাযা ঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ অর্থাৎ, রুগ্ন বা মুসাফির ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় কিংবা সফরে যে কয়টি রোযা রাখতে পারবে না, সেগুলো অন্য সময় হিসাব করে কাযা করা ওয়াজিব। এতে বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের অসুবিধায় পতিত হয়ে যে ক'টি রোযা ছাড়তে হয়েছে, সে ক'টি রোযা অন্য সময় পূরণ করে নেয়া তাদের উপর ওয়াজিব। এ কথাটি বোঝানোর জন্যে فعليه القضاء "তার উপর কাযা ওয়াজিব," এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তা না বলে فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রুগ্ন এবং মুসাফিরদের অপরিহার্য রোযার মধ্যে শুধু সে পরিমাণ রোযার কাযা করাই ওয়াজিব, রুগী সুস্থ হওয়ার পর এবং মুসাফির বাড়ী ফেরার পর যে কয় দিনের সুযোগ পাবে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি এতটুকু সময় না পায় এবং এর আগেই মৃত্যুবরণ করে, তবে তার উপর কাযা কিংবা 'ফিদ্‌ইয়া'র জন্য ওসীয়ত করা জরুরী নয়।

মাসআলা ঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ বাক্যে যেহেতু এমন কোন শর্তের উল্লেখ নেই, যদ্বারা বোঝা যেতে পারে যে, এ রোযা একই সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে, না মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে রাখলেও চলবে, সুতরাং যার রমযানের প্রথম দশ দিনের রোযা ফওত হয়েছে সে যদি প্রথমে দশ তারিখের কাযা করে, পরে নয় তারিখের, তারপর আট তারিখের কাযা হিসাবে করতে থাকে, তবে তাতে কোন অসুবিধা হবে না। অনুরূপভাবে দশটি রোযার মধ্যে দু'চারটি করার পর বিরতি দিয়ে দিয়ে অবশিষ্টগুলো কাযা করলেও কোন অসুবিধা হবে না। কেননা, আয়াতের মধ্যে এরূপভাবে কাযা করার ব্যাপারেও কোন নিষেধাজ্ঞা উল্লেখিত হয়নি।

রোযার ফিদ্‌ইয়া ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ আয়াতের স্বাভাবিক অর্থ দাঁড়ায়, যেসব লোক রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের দরুন নয়; বরং রোযা রাখার পূর্ণ সামর্থ, থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না, তাদের জন্যেও রোযা না রেখে রোযার বদলায় 'ফিদ্‌ইয়া' দেয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই এতটুকু বলে দেয়া হয়েছে যে, وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ, রোযা রাখাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

উপরোক্ত নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের, যখন লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে লোকজনকে রোযায় অভ্যস্ত করে তোলা। এরপর অবতীর্ণ আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ —এর দ্বারা প্রাথমিক এ নির্দেশ সুস্থ –সবল লোকদের ক্ষেত্রে রহিত করা হয়েছে। তবে যেসব লোক অতিরিক্ত বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অপারক কিংবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছে, অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সেসব লোকের বেলায় উপরোক্ত নির্দেশটি এখনো প্রযোজ্য রয়েছে। সাহাবী ও তাবেয়িগণের সর্বসম্মত অভিমত তাই।— (জাসসাস, মাযহারী)

বোখারী মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী প্রমুখ হাদীসের সমস্ত ইমামগণই সাহাবী হযরত সালামা – ইবনুল আকওয়া (রাঃ)–এর সে বিখ্যাত হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে , যখন وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ শীর্ষক আয়াতটি নাযিল হয়, তখন আমাদেরকে এ মর্মে এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল যে, যার ইচ্ছা হয় সে রোযা রাখতে পারে এবং যে রোযা রাখতে না চায়, সে 'ফিদইয়া' দিয়ে দেবে। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ নাযিল হলো, তখন 'ফিদইয়া' দেয়ার এখতিয়ার রহিত হয়ে সুস্থ–সমর্থ লোকদের উপর শুধুমাত্র রোযা রাখাই জরুরী সাব্যস্ত হয়ে গেল।

ফিদইয়ার পরিমাণ এবং আনুষঙ্গিক মাসআলা ঃ একটি রোযার ফিদইয়া অর্ধ সা' গম অথবা তার মূল্য। আমাদের দেশে প্রচলিত আশি তোলার সের হিসাবে অর্ধ সা' একসের সাড়ে বার ছটাক হয়। এই পরিমাণ গম অথবা নিকটবর্তী প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী তার মূল্য কোন মিসকীনকে দান করে দিলেই একটি রোযার 'ফিদইয়া' আদায় হয়ে যায়। ফিদইয়া কোন মসজিদ বা মাদ্রাসায় কার্যরত কোন লোকের খেদমতের পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়া জায়েয নয়।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ
بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ
يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ وَاِذَا
سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ۗ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا
دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝
اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ۗ هُنَّ
لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ
بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪
ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ
عٰكِفُوْنَ فِي الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

(১৮৫) রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না— যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ্ তাআলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (১৮৬) আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে— বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে। (১৮৭) রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যাকিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ্ দান করেছেন, তা আহরণ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা এ'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না। এই হলো আল্লাহ্ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ্ নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ বাক্যটি ছিল সংক্ষিপ্ত। তারই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ আয়াতে যে, সে কতিপয় দিন হল রমযান মাসের দিনগুলো। আর এর ফযীলত হলো এই যে, আল্লাহ্ তাআলা এ মাসটিকে স্বীয় ওহী এবং আসমানী কিতাব নাযিল করার জন্য নির্বাচিত করেছেন। কোরআনও (প্রথম) এ মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর সহীফা রমযান মাসের ১লা তারিখে নাযিল হয়েছিল। আর রমযানের ৬ তারিখে তওরাত, ১৩ তারিখে ইঞ্জীল এবং ২৪ তারিখে কোরআন নাযিল হয়েছে। হযরত জাবের (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, 'যবুর' রমযানের ১২ তারিখে এবং ইঞ্জীল ১৮ তারিখে নযিল হয়েছে।– (ইবনে–কাসীর)

উল্লেখিত হাদীসে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অবতরণ সম্পর্কিত যেসব তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব তারিখে সেসব কিতাব গোটাই নাযিল করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কোরআনের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা সম্পূর্ণভাবে রমযানের কোন এক রাতে লওহে মাহ্ফূয থেকে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ করে দেয়া হলেও হুযুর আকরাম (সাঃ)–এর উপর ধীরে ধীরে তেইশ বছরে তা অতীর্ণ হয়।

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ – এই একটি মাত্র বাক্যে রোযা সম্পর্কিত বহু হুকুম–আহকান ও মাসআলা–মাসায়েলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। شهد শব্দটি شهود থেকে গঠিত। এর অর্থ উপস্থিতি ও বর্তমান থাকা। আরবী অভিধানে الشهر অর্থ মাস। এখানে অর্থ হল রমযান মাস। কাজেই বাক্যটির অর্থ দাঁড়াল এই যে, 'তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি রমযান মাসে উপস্থিত থাকবে, অর্থাৎ, বর্তমান থাকবে, তার উপর গোটা রমযান মাসের রোযা রাখা কর্তব্য। ইতিপূর্বে রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া দেয়ার যে সাধারণ অনুমতি ছিল এ বাক্যের দ্বারা তা মনসুখ বা রহিত করে দিয়ে রোযা রাখাকেই ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে।

রমযান মাসে উপস্থিত বা বর্তমান থাকার মর্ম হল রমযান মাসটিকে এমন অবস্থায় পাওয়া, যাতে রোযা রাখার সামর্থ্য থাকে। অর্থাৎ, মুসলমান, বুদ্ধিমান, সাবালক, মুকীম এবং হায়েয–নেফাস থেকে পবিত্র অবস্থায় রমযান মাসে বর্তমান থাকা।

মাসআলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার জন্য রোযার যোগ্য অবস্থায় রমযান মাসের উপস্থিতি একটি শর্ত। এমতাবস্থায় যে লোক পূর্ণ রমযান মাসকে পাবে, তার উপর গোটা রমযান মাসের রোযা ফরয হয়ে যাবে। যে লোক এ অবস্থায় কিছু কম সময় পাবে, তার উপর ততদিনই ফরয হবে। কাজেই রমযান মাসের মাঝে যদি কোন কাফের ব্যক্তি মুসলমান হয়, কিংবা কোন নাবালেগ যদি বালেগ হয়, তবে তার উপর পরবর্তী রোযাগুলোই ফরয হবে; বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা করার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য উন্মাদ ব্যক্তি মুসলমান ও বালেগ হওয়ার প্রেক্ষিতে যেহেতু ব্যক্তিগত যোগ্যতার অধিকারী হয়, সেহেতু সে যদি রমযানের কোন অংশে সুস্থ হয়ে উঠে, তবে এ রমযানের বিগত দিনগুলোর কাযা করাও তার উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়বে। তেমনিভাবে হায়েয– নেফাসগ্রস্ত স্ত্রীলোক যদি রমযানের মাঝে পাক হয়ে যায় অথবা কোন অসুস্থ লোক যদি সুস্থ হয়ে উঠে কিংবা কোন মুসাফির যদি মুকীম হয়ে যায়, তবে বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা

করা তার পক্ষে জরুরী হবে।

মাসআলা : যেসব দেশে রাত ও দিন কয়েক মাস দীর্ঘ হয়ে থাকে সেসব দেশে বাহ্যতঃ মাসের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় না। অর্থাৎ, রমযান মাসের প্রকাশ্য আগমন ঘটে না। কাজেই সেদেশের অধিবাসীদের উপর রোযা ফরয না হওয়াই উচিত। হানাফী মাযহাব অবলম্বী ফেকাহ্‌বিদগণের মধ্যে হালওয়ানী, কেবালী প্রমুখ নামাযের ব্যাপারেও এমনি ফতোয়া দিয়েছেন যে, তাদের উপর নিজেদের দিন-রাত অনুযায়ী নামাযের হুকুম বর্তাবে। অর্থাৎ, যে দেশে মাগরিবের সাথে সাথেই সুবহে-সাদেক হয়ে যায়, সেদেশে এশার নামায ফরয হয় না।-(শামী)

এর তাকাদা হল এই যে, যে দেশে ছয় মাসের দিন হয় সেখানে শুধু পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয হবে। রমযান আদৌ আসবে না। হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-ও 'এমদাদুল-ফাতাওয়া' গ্রন্থে রোযা সম্পর্কে এ মতই গ্রহণ করেছেম।

আয়াতে - وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ রুগ্ন কিংবা মুসাফিরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে যে, সে তখন রোযা না রেখে বরং সুস্থ হওয়ার পর অথবা সফর শেষ হওয়ার পর ততদিনের রোযা কাযা করে নিবে, এ হুকুমটি যদিও পূর্ববর্তী আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া দেয়ার ঐচ্ছিকতাকে রহিত করে দেয়া হয়েছে, কাজেই সন্দেহ হতে পারে যে, হয় তো রুগ্ন কিংবা মুসাফিরের বেলায়ও হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে রমযানের হুকুম-আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর একটি সুদীর্ঘ আয়াতে রোযা ও এ'তেকাফর বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। এখানে মাঝখানে বর্তমান সংক্ষিপ্ত আয়াতটিকে বান্দাদের অবস্থার প্রতি মহান পরওয়ারদেগারের অনুগ্রহ এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ ও কবুল করার বিষয় আলোচনা করে নির্দেশ পালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কারণ, রোযা-সংক্রান্ত এবাদতে অবস্থাবিশেষে অব্যাহতি দান এবং বিভিন্ন সহজতা সত্ত্বেও কিছু কষ্ট বিদ্যমান রয়েছে। এ কষ্টকে সহজ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি আমার বান্দাদের সন্নিকটে রয়েছি, যখনই তারা আমার কাছে কোন বিষয় প্রার্থনা বা দোয়া করে, আমি তাদের সে দোয়া কবুল করে নেই এবং তাদের বাসনা পুরণ করে দেই।

এমতাবস্থায় আমার হুকুম-আহ্‌কাম মেনে চলা বান্দাদেরও একান্ত কর্তব্য। তাতে কিছুটা কষ্ট হলেও তা'সহ্য করা উচিত। ইমাম ইবনে-কাসীর দোয়ার প্রতি উৎসাহদান সংক্রান্ত এই মধ্যবর্তী বাক্যটির তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতের দ্বারা রোযা রাখার পর দোয়া কবুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে জন্যই রোযার ইফতারের পর দোয়ার ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা উচিত। মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন -

للصائم عند فطره دعوة مستجابة

অর্থাৎ, রোযার ইফতার করার সময় রোযাদারের দোয়া -কবুল হয়ে থাকে।-(আবু দাউদ)

সে জন্যই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ইফতারের সময় বাড়ীর সবাইকে সমবেত করে দোয়া করতেন।

মাসআলা : এ আয়াতে فَإِنِّي قَرِيبٌ (আমি নিকটেই রয়েছি) বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ধীরে-সুস্থে ও নীরবে দোয়া করাই উত্তম, উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করা পছন্দনীয় নয়। ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) এ আয়াতের শানে-নুযুল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, কোন গ্রামের কিছু অধিবাসী রসূলে-করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিল যে, 'যদি আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের নিকটেই থেকে থাকেন, তবে আমরা আস্তে আস্তে দোয়া করব। আর যদি দূরে থেকে থাকেন তবে উচ্চৈঃস্বরে ডাকব।' এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

أُحِلَّ لَكُمْ বাক্যাংশটি দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, যে বিষয়টিকে এ আয়াত দ্বারা হালাল করা হয়েছে, তা ইতিপূর্বে হারাম ছিল। বোখারী এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাবে সাহাবী হযরত বারা ইবনে আ'যেবের বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রথম যখন রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছিল, তখন ইফতারের পর থেকে শয্যাগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা ও স্ত্রী-সহবাসের অনুমতি ছিল। একবার শয্যাগ্রহণ করে ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথেই এ সবকিছু হারাম হয়ে যেতো। কোন কোন সাহাবী এ ব্যাপারে অসুবিধায় পড়েন। কায়স ইবনে-সারমাহ্ আনসারী নামক জনৈক সাহাবী একবার সমগ্র দিন কঠোর পরিশ্রম করে ইফতারের সময় ঘরে এসে দেখেন, ঘরে খাওয়ার মত কোন কিছুই নেই। স্ত্রী বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি কোনখান থেকে কিছু সংগ্রহ করে আনার চেষ্টা করি। স্ত্রী যখন কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে ফিরে এলেন ততক্ষণে সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়ার দরুন খানা-পিনা তাঁর জন্য হারাম হয়ে যায়। ফলে পরদিন তিনি এ অবস্থাতেই রোযা রাখেন। কিন্তু দুপুর বেলায় শরীর দুর্বল হয়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান।-(ইবনে-কাসীর)

অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবী গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গার পর স্ত্রীদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে মানসিক কষ্টে পতিত হন। এসব ঘটনার পর এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে পূর্ববর্তী হুকুম রহিত করে সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে সুবহে - সাদেক উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র রাতেই খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। ঘুমাবার পূর্বে কিংবা ঘুম থেকে উঠার পর সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতাই এতে আর অবশিষ্ট রাখা হয়নি। এমনকি হাদীস অনুযায়ী শেষরাত্রে সেহরী খাওয়া সুন্নত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কিত নির্দেশই প্রদান করা হয়েছে।

সেহরী খাওয়ার শেষ সময়সীমা : حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ আয়াতে রাতের অন্ধকারকে কালো রেখা এবং ভোরের আলো ফোটাকে সাদা রেখার সাথে তুলনা করে রোযার শুরু এবং খানা-পিনা হারাম হওয়ার সঠিক সময়টি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু এ সময়সীমার মধ্যে বেশ-কম হওয়ার সম্ভাবনা যাতে না থাকে সেজন্য حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ শব্দটিও যোগ করে দেয়া হয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সন্দেহপ্রবণ লোকদের ন্যায় সুবহে-সাদেক দেখা দেয়ার আগেই খানা-পিনা হারাম মনে করো না অথবা এমন অসাবধানতাও অবলম্বন করো না যে, সুবহে-সাদেকের আলো ফুটে উঠার পরও খানা-পিনা করতে থাকবে। বরং খানা-পিনা এবং রোযার মধ্যে সুবহে-সাদেকের উদয় সঠিকভাবে নির্ণয়ই হচ্ছে সীমারেখা। এ সীমারেখা উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা বন্ধ করা জরুরী মনে করা যেমন জায়েয নয়, তেমনি সুবহে-সাদেক উদয় হওয়ার ব্যাপারে একীন হয়ে

যাওয়ার পর খানা-পিনা করাও হারাম এবং রোযা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ, তা এক মিনিটের জন্য হলেও। সুব্‌হে-সাদেক উদয় সম্পর্কে একীন হওয়া পর্যন্তই সেহ্‌রীর শেষ সময়।

মাসআলা ঃ উপরোক্ত আলোচনাগুলো শুধুমাত্র সেসব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের নিজের চোখে 'সুবহে-সাদেক' দেখে সময় নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে। যেমন, আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে এবং সময় সম্পর্কেও যদি তাদের সঠিক জ্ঞান থাকে। কিন্তু যাদের তেমন সুযোগ নেই, অর্থাৎ, আকাশ ঠিকমত দেখবার সুযোগ নেই, সুব্‌হে-সাদেকের উদয় সম্পর্কে সঠিক ধারণাও নেই, কিংবা আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে সেসব লোকের পক্ষে অন্যান্য লক্ষণ কিংবা জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য নিয়ে সেহ্‌রী-ইফতারের সময় নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্য এসব হিসাবের মধ্যেও এমন সময় আসতে পারে, যে সময়সীমার মধ্যে সুব্‌হে-সাদেকের উদয় হওয়ার ব্যাপারে একীন বা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। এমতাবস্থায় সন্দেহযুক্ত সময়ে কি করা উচিত, এ সম্পর্কে ইমাম জাসসাস 'আহকামুল-কোরআন' গ্রন্থে বলেন— এরূপ ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে খানা-পিনা না করাই কর্তব্য। তবে এরূপ সন্দেহপূর্ণ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ, সুব্‌হে-সাদেক উদয় হওয়ার পূর্বক্ষণে যদি কেউ প্রয়োজনবশতঃ খানা-পিনা করে ফেলে, তবে সে গোনাহ্‌গার হবে না। কিন্তু পরে তাহ্‌কীক বা যাচাই করে যদি দেখা যায়, যে সময় সে খানা-পিনা করেছে সে সময় সুব্‌হে-সাদেক হয়ে গিয়েছিল, তবে তার পক্ষে সেদিনের রোযার কাযা করা ওয়াজিব হবে। যেমন, রমযানের এক তারিখে চাঁদ না দেখার কারণে লোকেরা রোযা রাখল না, কিন্তু পরে জানা গেল যে, ২৯শে শাবানেই রমযানের চাঁদ উদিত হয়েছিল। তবে এমতাবস্থায় যারা সে দিনটিকে ৩০শে শাবান মনে করে রোযা রাখেনি, তারা গোনাহগার হবে না, তবে তাদের এ দিনের রোযা সকল ইমামের মতেই কাযা করতে হবে। অনুরূপভাবে মেঘলা দিনে কেউ সূর্য অস্ত গেছে মনে করে ইফতার করে ফেললো, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল এমতাবস্থায় এ ব্যক্তি গোনাহগার হবে না সত্য, তবে তার উপর ঐ রোযা কাযা করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম জাস্‌সাসের উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা বোঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি ঘুম ভাঙ্গার পর শুনতে পায় যে, ফজরের আযান হচ্ছে, তখন তার পক্ষে সুব্‌হে-সাদেক উদয় হওয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহে একীন হয়ে যায়। এরপরও যদি সে জেনে শুনে কিছু খেয়ে নেয়, তবে সে গোনাহ্‌গারও হবে এবং তার উপর সে রোযা কাযা করাও ওয়াজিব হবে। অপরপক্ষে যদি সে সন্দেহযুক্ত সময়ে খায় এবং পরে সুব্‌হে-সাদেক এ সময়েই উদিত হয়েছিল বলে জানতে পারে, তবে তার উপর থেকে গোনাহ্ রহিত হয়ে যাবে বটে, কিন্তু রোযার কাযা করতে হবে।

এ'তেকাফ ঃ এ'তেকাফ-এর শাব্দিক অর্থ কোন একস্থানে অবস্থান করা। কোরআন-সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় কতকগুলো বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট মসজিদে অবস্থান করাকে এ'তেকাফ বলা হয়। فِى الْمَسٰجِدِ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, এ'তেকাফ যে কোন মসজিদেই হতে পারে। কেননা, এখানে মসজিদ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শুধুমাত্র যেসব মসজিদে নিয়মিত জামাত হয়, সেসব মসজিদেই এ'তেকাফ করা বৈধ। অন্যান্য মসজিদ যেখানে নিয়মিত জামাত হয় না, সেগুলোতে এ'তেকাফ না হওয়ার ব্যাপারে ফেকাহ্‌বিদগণ যে শর্ত আরোপ করে থাকেন, তা 'মসজিদ' শব্দের সংজ্ঞা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা, যেখানে নিয়মিত জামাতে নামায হয়, তাকেই কেবল মসজিদ বলা যেতে পারে। বাসস্থান বা দোকান-পাট সর্বত্রই বিচ্ছিন্নভাবে নামায পড়া জায়েয এবং তা হয়েও থাকে, কিন্তু তাই বলে সেগুলোকে মসজিদ বলা হয় না।

মাসআলা ঃ এ'তেকাফের অবস্থায় খানা-পিনার হুকুম সাধারণ রোযাদারদের প্রতি প্রযোজ্য নির্দেশেরই অনুরূপ। তবে স্ত্রী-সহবাসের ব্যাপারে এ অবস্থায় পৃথক নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ'তেকাফ অবস্থায় এটা রাতের বেলায়ও জায়েয নয়। এ আয়াতে সে নির্দেশই ব্যক্ত হয়েছে।

রোযার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশ ঃ সর্বশেষ আয়াত تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا বলে ইশারা করা হয়েছে যে, রোযার মধ্যে খানা-পিনা এবং স্ত্রী-সহবাস সম্পর্কিত যেসব নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এগুলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, এর ধারে- কাছেও যেয়ো না। কেননা, কাছে গেলেই সীমালঙ্ঘনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। একই কারণে রোযা অবস্থায় কুলি করতে বাড়াবাড়ি করা, যদ্দরুন গলার ভেতরে পানি প্রবেশ করতে পারে; মুখের ভিতর কোন অষুধ ব্যবহার করা, স্ত্রীর অতিরিক্ত নিকটবর্তী হওয়া প্রভৃতি মকরূহ। তেমনিভাবে সময় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য সময়ের কিছুটা আগেই সেহ্‌রী খাওয়া শেষ করে দেয়া এবং ইফতার গ্রহণে দু'চার মিনিট দেরী করা উত্তম। এসব ব্যাপারে অসাবধানতা এবং শৈথিল্য প্রদর্শন আল্লাহ্‌র এই নির্দেশের পরিপন্থী।

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ
قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ۝ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ۝ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم
مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا
تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ
فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ
الْكَافِرِينَ ۝ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ
لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

(১৮৮) তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না। (১৮৯) তোমার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদের বিষয়ে। বলে দাও যে, এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্বের সময় ঠিক করার মাধ্যম। আর পেছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোন নেকী বা কল্যাণ নেই। অবশ্য নেকী হল আল্লাহকে ভয় করার মধ্যে। আর তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা নিজেদের বাসনায় কৃতকার্য হতে পার। (১৯০) আর লড়াই কর আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (১৯১) আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শাস্তি। (১৯২) আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়ালু। (১৯৩) আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপার আলাদা)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইতিপূর্বে সূরা বাক্বারারই ১৬৮-তম আয়াতে হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। পূর্ববর্তী সে আয়াতে বলা হয়েছিল ঃ

"হে মানবমণ্ডলী ! জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুসমূহ খাও, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"

অনুরূপ সূরা-নাহলে এরশাদ হয়েছে-

"তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা যে পবিত্র ও হালাল রুযী দান করেছেন, তা থেকে খাও এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই উপাসক হয়ে থাক।"

প্রথম আয়াতে সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ)-এর একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে তার জওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসেরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সাহাবায়ে-কেরামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি সম্ভ্রম ও সমীহ বোধের কারণে খুব কমই প্রশ্ন করতেন। তাঁরা এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যমানার উম্মতদের ব্যতিক্রম ছিলেন। পূর্ববর্তী উম্মতগণ এ আদবের প্রতি সচেতন ছিল না। তারা সব সময় নানা অবান্তর প্রশ্ন করতো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সাহাবীগণের যেসব প্রশ্নের উল্লেখ কোরআন মজীদে বিদ্যমান রয়েছে, তা সংখ্যায় মাত্র চৌদ্দটি। এ চৌদ্দটি প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي (যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমার কাছে প্রশ্ন করে।) দ্বিতীয় প্রশ্নটি আলোচ্য চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত। এই দু'টি প্রশ্ন ছাড়াও সূরা বাক্বারায় আরও ছয়টি প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে। বাকী ছয়টি প্রশ্ন পরবর্তী বিভিন্ন সূরায় বিদ্যমান।

উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 'আহিল্লা' বা নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ, চাঁদের আকৃতি-প্রকৃতি সূর্য থেকে ভিন্নতর। সেটা এক সময় সরু বাঁকা রেখার আকৃতি ধারণ করে অতঃপর ক্রমানুয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে; অবশেষে সম্পূর্ণ গোলকের মত হয়ে যায়। এরপর পুনরায় ক্রমানুয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে। এই হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ অথবা এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন। এই দুই প্রকার প্রশ্নেরই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যে উত্তর প্রদান করা হয়েছে, তাতে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে। যদি প্রশ্নই এই হয়ে থাকে যে, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? তবে তো প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর হয়েই গেছে। আর যদি প্রশ্নে এই হ্রাস-বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত রহস্য জানবার উদ্দেশ্য থেকে থাকে, যা ছিল সাহাবায়ে-কেরামের স্বভাববিরুদ্ধ, তবে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মৌল- তত্ত্ব বর্ণনার পরিবর্তে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনার দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আকাশের গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর মৌলিক উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে। আর মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন বিষয়ই এই জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য ও জবাব এই যে, চন্দ্রের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি এবং উদয়াস্তের মধ্যে আমাদের কোন কোন মঙ্গল নিহিত? সেজন্য আল্লাহ্

তাআলা প্রশ্নের উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, চাঁদের সঙ্গে তোমাদের যেসব মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পৃক্ত তা এই যে, এতে তোমাদের কাজ-কর্ম ও চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ এবং হজ্বের দিনগুলোর হিসাব জেনে রাখা সহজতর হবে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে চান্দ্র ও সৌর-হিসাবের গুরুত্ব ঃ এ আয়াতে এতটুকু বোঝা গেল যে, চন্দ্রের দ্বারা তোমরা তারিখ ও মাসের হিসাব জানতে পারবে, যার উপর তোমাদের লেন দেন আদান-প্রদান এবং হজ্ব প্রভৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গটিই সূরা ইউনুসে বিবৃত হয়েছে ঃ

وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, বিভিন্ন পর্যায় ও বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে চন্দ্রের পরিক্রমণের উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা বর্ষ, মাস ও তারিখের হিসাব জানা যায়, কিন্তু সূরা বনী-ইসরায়ঈলের আয়াতে বর্ষ, মাস ও দিন-ক্ষণের হিসাব যে সূর্যের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত তাও বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا
فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

অর্থাৎ, "অতঃপর আমি রাতের চিহ্ন তিরোহিত করে দিনের চিহ্নকে দর্শনযোগ্য করলাম, যাতে তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহের দান রুযী-রোযগারের অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষপঞ্জী ও দিন-ক্ষণের হিসাব অবগত হতে পার।"-(বনী-ইসরায়ঈল)

এই তৃতীয় আয়াত দ্বারা যদিও প্রমাণিত হলো যে, বর্ষ, মাস ইত্যাদির হিসাব সূর্যের আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি দ্বারাও নির্ণয় করা যায়। কিন্তু চন্দ্রের ক্ষেত্রে কোরআন যে ভাষা প্রয়োগ করেছে, তাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরীয়তে চান্দ্রমাসের হিসাবই নির্ধারিত। রমযানের রোযা, হজ্বের মাস ও দিনসমূহ, মহররম, ঈদ, শবে-বরাত ইত্যাদির সঙ্গে যেসব বিধি-নিষেধ সম্পৃক্ত, সেগুলো সবই 'রুইয়াতে-হেলাল' বা নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। কেননা, এই আয়াতে هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ - 'এটি মানুষের হজ্ব ও সময় নির্ধারণের উপায়' বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যদিও এই হিসাব সূর্যের দ্বারাও অবগত হওয়া যায়, তবুও আল্লাহ্র নিকট চন্দ্রমাসের হিসাবই নির্ভরযোগ্য।

ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক চান্দ্রমাসের হিসাব গ্রহণ করার কারণ এই যে, প্রত্যেক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই আকাশে চাঁদ দেখে চান্দ্রমাসের হিসাব অবগত হতে পারে। পণ্ডিত, মূর্খ, গ্রামবাসী, মরুবাসী, পার্বত্য উপজাতি ও সভ্য-অসভ্য নির্বিশেষে সবার জন্যই চান্দ্রমাসের হিসাব সহজতর। কিন্তু সৌরমাস ও সৌরবৎসর এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এর হিসাব জ্যোতির্বিদদের ব্যবহার্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং ভৌগোলিক, জ্যামিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যার সূত্র ও নিয়ম-কানুনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এই হিসাব প্রত্যেকের পক্ষে সহজে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসের হিসাব বাধ্যতামূলক করা হলেও সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এ হিসাবেরই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। চাঁদ ইসলামী এবাদতের অবলম্বন। চাঁদ এক হিসেবে ইসলামের প্রতীক বা শে'আরে ইসলাম। ইসলাম যদিও সৌরপঞ্জী ও সৌর-হিসাবকে এই শর্তে নাজায়েয বলেনি, তবুও এতটুকু সাবধান অবশ্যই করেছে, যেন সৌর হিসাব এত প্রাধান্য লাভ না করে, যাতে লোকেরা চান্দ্রপঞ্জী ও চান্দ্রমাসের হিসাব ভুলেই যায়। কারণ, এরূপ করাতে রোযা, হজ্ব ইত্যাদি এবাদতে ত্রুটি হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

মাসআলা ঃ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ('ঘরের পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করাতে তোমাদের জন্য কোন পুণ্য নেই') এই আয়াত দ্বারা এই মাসআলা জানা গেল যে, যে বিষয়কে ইসলামী শরীয়ত প্রয়োজনীয় বা এবাদত বলে মনে করে না, তাকে নিজের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় বা এবাদত মনে করা জায়েয নয়। এমনিভাবে যে বিষয় শরীয়তে জায়েয রয়েছে, তাকে পাপ মনে করাও গোনাহ্। মক্কার কাফেররা তাই করছিল। তারা ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা শরীয়তসম্মতভাবে জায়েয থাকা সত্ত্বেও না-জায়েয মনে করতো এবং পাপ বলে গণ্য করতো, ঘরের পিছন দিক দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে বা বেড়া কেটে বা সিঁধ কেটে ঘরে প্রবেশ করাকে (শরীয়তে যার কোন আবশ্যকতাই ছিল না) নিজেদের জন্য অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করেছিল। এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

'বেদআত'-এর না-জায়েয হওয়ার বড় কারণই তাই যে, এতে অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে ফরয- ওয়াজিবের মতই অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয় অথবা কোন কোন জায়েয বস্তুকে না-জায়েয ও হারাম বলে গণ্য করা হয়। আলোচ্য আয়াতে এরূপ শরীয়ত-বহির্ভূত নিয়মে জায়েযকে না-জায়েয মনে করা অথবা হারামকে হালাল মনে করা বা 'বেদআত'-এর প্রচলন করার নিষেধাজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

জেহাদ বা ন্যায়ের সংগ্রাম ঃ গোটা মুসলিম উম্মাহ্ এ ব্যাপারে একমত যে, মদীনায় হিজরতের পূর্বে কাফেরদের সঙ্গে 'জেহাদ' ও কেতাল' তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে অবতীর্ণ কোরআন মজীদের সব আয়াতেই কাফেরদের অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়। রবী' ইবনে-আনাস (রাঃ)-এর উক্তি অনুসারে মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

এই আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ কেবলমাত্র সে সব কাফেরদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ-সমরে উপস্থিত হবে। এর অর্থ এই যে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মীয় কাজে সংসারত্যাগী, উপাসনারত সন্ন্যাসী-পাদরী প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, অসমর্থ অথবা যারা কাফেরদের অধীনে মেহনত মজদুরী করে, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হয় না —সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়েয নয়। কেননা, আয়াতের নির্দেশে কেবলমাত্র তাদেরই সঙ্গে যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু উল্লিখিত শ্রেণীর লোকদের কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয়। এজন্য ফেকাহশাস্ত্রবিদ ইমামগণ বলেন, যদি কোন নারী, বৃদ্ধ অথবা ধর্মপ্রচারক বা ধর্মীয় মিশনারীর লোক কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অথবা কোন প্রকারে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা

জায়েয। কারণ, তারা الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ 'যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে' – এই আয়াতের আওতাভুক্ত। (মাযহারী, কুরতুবী ও জাস্‌সাস) যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর তরফ থেকে মুজাহিদদেরকে যেসব উপদেশ দেয়া হতো, সেগুলোর মধ্যে এ নির্দেশের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে وَلَا تَعْتَدُوْا (এবং সীমা অতিক্রম করো না)–বাক্যটির অর্থ অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই যে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করে সীমা অতিক্রম করো না।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ

– (আর তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর এবং যেখান থেকে তারা তোমাদেকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও।) হুদায়বিয়ার সন্ধি–চুক্তির শর্ত মোতাবেক হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে–কেরাম (রাঃ)–সহ সে ওমরার কাযা আদায়ের উদ্দেশে যাত্রার নিয়ত করেন, আগের বছর মক্কার কাফেররা যে ওমরা উদযাপনে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু সাহাবায়ে–কেরামের মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, কাফেররা হয় তো তাদের সন্ধি ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে না। যদি তারা এ বছরও তাঁদেরকে বাধা দেয়, তবে তাঁরা কি করবেন? এ প্রসঙ্গেই উল্লেখিত আয়াতে অনুমতি প্রদান করা হলো যে, যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তোমাদেরও তার সমুচিত জবাব দেয়ার অনুমতি থাকলো।

পুরো মক্কী যিন্দেগীতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বাধা দান করা হয়েছিল এবং সর্বদা ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। কাজেই এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবিগণের ধারণা হয়েছিল যে, হয় তো কোন কোন ক্ষেত্রে কাফেরদিগকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ও দোষণীয় হয়ে থাকবে। এ ধারণার অপনোদনকল্পে এরশাদ হলো ঃ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ –(এবং ফেতনা বা দাঙ্গা–হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও কঠিন অপরাধ)। অর্থাৎ, একথা তো অবশ্যই সত্য ও সর্বজনবিদিত যে, নরহত্যা নিকৃষ্ট কর্ম, কিন্তু মক্কার কাফেরদের কুফরী ও শিরকের উপর অটল থাকা এবং মুসলমানদিগকে ওমরা ও হজ্জের মত এবাদতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ। এরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করা হলো। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত فتنة (ফেতনাহ্) শব্দটির দ্বারা কুফর, শিরক এবং মুসলমানদের এবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই বোঝানো হয়েছে।– (জাস্‌সাস, কুরতুবী প্রমুখ)

অবশ্য এ আয়াতের ব্যাপকতার দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেররা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে হত্যা করা শরীয়তসিদ্ধ। আয়াতের এই ব্যাপকতাকে পরবর্তী বাক্যে এই বলে সীমিত করা হয়েছে–

وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ

অর্থাৎ,'মসজিদুল–হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকা তথা পুরো হরমে মক্কায় তোমরা তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হয়।

মাসআলা ঃ হরমে–মক্কার বা মক্কার সম্মানিত এলাকায় মানুষ তো দূরের কথা, কোন হিংস্র পশু হত্যা করাও জায়েয নয়। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, যদি কেউ অপরকে হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তাখন তার প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা জায়েয। এই মর্মে সমস্ত ফেকাহ্‌বিদগণ একমত।

মাসআলা ঃ এ আয়াত দ্বারা আরও বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথম অভিযান আক্রমণ বা আগ্রাসন কেবলমাত্র মসজিদুল–হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা 'হরমে মক্কায়'–ই নিষিদ্ধ। অপরাপর এলাকায় যেমন প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ অপরিহার্য, তেমনি প্রথম আক্রমণ বা অভিযানও জায়েয।

সপ্তম হিজরী সনে যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধি–চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিগত বছরের ওমরার কাযা আদায় করার নিয়তে সাহাবিগণ (রাঃ)–সহ মক্কা অভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন হযরত (সাঃ)–এর সাহাবিগণ জানতেন যে, কাফেরদের কাছে চুক্তি ও সন্ধির কোনই মর্যাদা নেই। এমনও হতে পারে, তারা সন্ধির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। তখন সে ক্ষেত্রে সাহাবিগণের মনে এই আশঙ্কার উদ্ভব হয় যে, এতে করে হরম–শরীফেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। উপরের আয়াতে সাহাবিগণের এ আশঙ্কার জবাব দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ মক্কার হরম–শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মুসলমানদের অবশ্যই অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু যদি কাফেররা হরম–শরীফের এলাকায় মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার মোকাবেলায় মুসলমানদের পক্ষেও যুদ্ধ করা জায়েয।

সাহাবিগণের মনে দ্বিতীয় সন্দেহ এই ছিল যে, এটা যিলকদ মাস এবং সে চার মাসেরই অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোকে 'আশহুরে–হুরাম' বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এই মাসসমূহে কোথাও কারও সংগে যুদ্ধ করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তবে আমরা এই মাসে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করবো। তাঁদের এই দ্বিধা দূর করার জন্যই আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে। অর্থাৎ, মক্কার হরম–শরীফের সম্মানার্থ শত্রুর হামলা প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা যেমন শরীয়তসিদ্ধ, তেমনিভাবে হারাম মাসের (সম্মানিত মাসেও) যদি কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার প্রতিরোধকল্পে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জায়েয।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ
اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۞ وَاَنْفِقُوْا فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَاَحْسِنُوْا ۚ اِنَّ
اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۗ فَاِنْ
اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى
يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ
رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ
لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ۭ تِلْكَ
عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۭ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞ اَلْحَجُّ
اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ
وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۭ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۭ وَتَزَوَّدُوْا
فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۡ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ۞

(১৯৪) সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুতঃ যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেযগার, আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন। (১৯৫) আর ব্যয় কর আল্লাহ্‌র পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন। (১৯৬) আর তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে হজ্জ ও ওমরাহ্ পরিপূর্ণভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যাকিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না কোরবানী যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোযা করবে কিংবা খয়রাত দেবে অথবা কুরবানী করবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা হজ্জ ও ওমরাহ্ একত্রে একই সাথে পালন করতে চাও, তবে যাকিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কুরবানী করাই তার উপর কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা কোরবানীর পশু পাবে না, তারা হজ্জের দিনগুলোর মধ্যে রোযা রাখবে তিনটি আর সাতটি রোযা রাখবে ফিরে যাবার পর। এভাবে দশটি রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ নির্দেশটি তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদুল-হারামের আশে-পাশে বসবাস করে না। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। সন্দেহাতীতভাবে জেনো যে, আল্লাহ্‌র আযাব বড়ই কঠিন। (১৯৭) হজ্জের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীও সাথে নিরাভরণ হওয়া জায়েজ নয়। না অশোভন কোন কাজ করা, না ঝাপড়া-বিবাদ করা হজ্জের সেই সময় জায়েজ নয়। আর তোমরা যাকিছু সৎকাজ কর, আল্লাহ্ তা জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাক, হে বুদ্ধিমানগণ! তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন পাপ নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য

জেহাদে অর্থ ব্যয় ঃ وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর)- এই আয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে প্রয়োজনমত ব্যয় করা মুসলমানদের প্রতি ফরয হয়েছে। এই আয়াত থেকে ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদ আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুসলমানদের উপর ফরয যাকাত ব্যতীত আরও এমন কিছু দায়-দায়িত্ব ও ব্যয় খাত রয়েছে, যেগুলো ফরয। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোন খাত নয় বা সেগুলোর জন্যে কোন নির্ধারিত নেসাব বা পরিমাণ নেই। বরং যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকুই খরচ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। আর যদি প্রয়োজন না হয়, তবে কিছুই ফরয নয়। জেহাদে অর্থ ব্যয়ও এই পর্যায়ভুক্ত।

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ -(এবং স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।) আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট। এতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে। এখন কথা হলো যে, 'ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা' বলতে এক্ষেত্রে কি বোঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের ব্যাখ্যাতাগণের অভিমত বিভিন্ন প্রকার। ইমাম জাস্‌সাস ও ইমাম রাযী (রাহঃ) বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিভিন্ন উক্তির মাঝে কোন বিরোধ নেই। প্রত্যেকটি উক্তিই গৃহীত হতে পারে। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপেই জানি। কথা হলো এই যে, আল্লাহ্ তাআলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখা-শোনা করি। এ প্রসঙ্গেই এই আয়াতটি নাযিল হলো। এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, 'ধ্বংসে'র দ্বারা এখানে জেহাদ পরিত্যাগ করাকেই বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জেহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসেরই কারণ। সেজন্যই হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) সারা জীবনই জেহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হুযায়ফা (রাঃ), কাতাদা (রাঃ) এবং মুজাহিদ ও যাহ্‌হাক (রঃ) প্রমুখ তফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের কাছ থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত বারা' ইবনে আ'যেব (রাঃ) বলেছেন — পাপের কারণে আল্লাহ্‌র রহমত ও মাগফেরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর। এজন্যই মাগফেরাত সম্পর্কে নিরাশ হওয়া হারাম।

ইমাম জাস্‌সাস্ (রঃ)-এর ভাষ্য অনুযায়ী উপরোক্ত সমস্ত নির্দেশই এ আয়াত থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

وَاَحْسِنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ - এই বাক্যে প্রত্যেক কাজই সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে। সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করাকে কোরআন 'ইহ্‌সান' احسان শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছে। ইহ্‌সান দু'রকম ঃ (১) এবাদতে ইহ্‌সান ও (২) দৈনন্দিন কাজ কর্ম, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহ্‌সান। এবাদতের ইহ্‌সান সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'হাদীসে-জিবরাঈল'- এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে,

এমনভাবে এবাদত কর, যেন তুমি আল্লাহ্‌কে স্বচক্ষে দেখছ। আর যদি সে পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে না পার, তবে এ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন।

এছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে (মু'আমালাত ও মু'আশারাতে) ইহ্সানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত মা'আয ইবনে জাবাল বর্ণিত মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে হযরত রসূলে-করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ 'তোমরা নিজেদের জন্যে যাকিছু পছন্দ কর, অন্যান্য লোকদের জন্যেও তাই পছন্দ কর। আর যা তোমরা নিজেদের জন্যে না-পছন্দ কর, অন্যের জন্যেও তা না-পছন্দ করবে।'-(মাযহারী)

হজ্ব সর্বসম্মতভাবে ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে একটি রুক্‌ন এবং ইসলামের ফরায়েয বা অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কোরআনের বহু আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে এর প্রতি তাকীদ ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অধিকাংশ ওলামায়ে-কেরামের মতে হিজরী তৃতীয় বছর, যে বছর ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সে বছরই সূরা আলে ইমরানের একটি আয়াতের মাধ্যমে হজ্ব ফরয করা হয়েছে।- (ইবনে কাসীর)

এ আয়াতেই হজ্ব ফরয হওয়ার শর্তসমূহ এবং মর্মার্থ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্ব না করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য আটটি আয়াতের প্রথম আয়াত وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ মুফাস্‌সেরীনের ঐকমত্য অনুযায়ী হোদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যা ৬ষ্ঠ হিজরী সালে সংঘটিত হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হজ্ব ফরয হওয়ার বিষয় বাতলানো নয়, তা পূর্বেই বাতলে দেয়া হয়েছে, বরং এখানে উদ্দেশ্য হল হজ্ব ও ওমরার কিছু বিশেষ নির্দেশ বর্ণনা করা।

ওমরার আহ্‌কাম ঃ সূরা আলে-ইমরানের যে আয়াতের মাধ্যমে হজ্ব ফরয করা হয়েছে তাতে যেহেতু শুধুমাত্র হজ্বের কথাই বলা হয়েছে, ওমরার কোন আলোচনাই করা হয়নি, আর এই আয়াতে যাতে শুধু ওমরার কথাই আলোচনা করা হয়েছে, এর ফরয কিংবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন কথাই বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে যে, কোন লোক যদি এহ্‌রামের মাধ্যমে হজ্ব অথবা ওমরা আরম্ভ করে, তাহলে তার পক্ষে তা সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন, সাধারণ নফল নামায-রোযার ব্যাপারে এই হুকুম যে, তা আরম্ভ করলে সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। কাজেই এই আয়াতের দ্বারা ওমরা ওয়াজিব কিনা তা বুঝায় না। বরং আরম্ভ করলে শেষ করতে হবে, তাই বুঝায়।

ইবনে-কাসীর হযরত জাবেরের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ তিনি রসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হুযুর! ওমরা কি ওয়াজিব? তিনি বলেছিলেন ঃ ওয়াজিব নয়, তবে যদি কর, খুবই ভাল। তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি সহীহ ও হাসান। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক প্রমুখ ওমরাকে ওয়াজিব বলেননি, সুন্নত বলে গণ্য করেছেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্ব অথবা ওমরা শুরু করলে তা আদায় করা ওয়াজিব। তবে প্রশ্ন উঠে, যদি কোন ব্যক্তি ওমরা শুরু করার পর কোন অসুবিধায় পড়ে তা আদায় করতে না পারে, তাহলে কি হবে? এর উত্তর পরবর্তী فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ - বাক্যে দেওয়া হয়েছে।

এ আয়াতটি হোদায়বিয়ার ঘটনা প্রসংগে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন রসূল (সাঃ) এবং সাহাবিগণ এহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু মক্কার কাফেররা তাঁদেরকে হরমের সীমায় প্রবেশ করতে দেয়নি। ফলে তাঁরা ওমরা আদায় করতে পারেননি। তখন আদেশ হলো, এহ্‌রামের ফিদইয়াস্বরূপ একটি করে কুরবানী কর। কুরবানী করে এহ্‌রাম ভেংগে ফেল। কিন্তু সাথে সাথে পরবর্তী আয়াত وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ - এ বলে দেয়া হয়েছে যে, এহ্‌রাম খোলার শরীয়তসম্মত ব্যবস্থা মাথা মুড়ানো ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয়, যতক্ষণ না এহ্‌রামকারীর কুরবানী নির্ধারিত স্থানে পৌছবে।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতে নির্ধারিত স্থানের সীমানা হচ্ছে হরমের এলাকায় পৌছে কুরবানীর পশু যবেহ করা। তা নিজে না পারলে, অন্যের দ্বারা জবাই করাতে হবে। এ আয়াতে অপারকতা অর্থ হচ্ছে, রাস্তায় কোন শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া বা প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকা। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্য কোন কোন ইমাম অসুস্থতাকেও অপারকতার আওতাভুক্ত করেছেন। তবে রসূল (সাঃ)-এর আমল দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরবানী করেই এহ্‌রাম ছাড়তে হবে। কিন্তু বাতিলকৃত হজ্ব বা ওমরা কাযা করা ওয়াজিব। যেমন, হুযূর (সাঃ) এবং সাহাবায়ে-কেরাম হোদায়বিয়া সন্ধির পরবর্তী বছর উল্লেখিত ওমরার কাযা আদায় করেছিলেন।

এ আয়াতে মাথা মুণ্ডনকে এহ্‌রাম ভঙ্গ করার নিদর্শন বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এহ্‌রাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাঁটা অথবা কাটা নিষিদ্ধ। এ হিসাবে পরবর্তী নির্দেশে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি হজ্ব ও ওমরা আদায় করতে গিয়ে কোন অসুবিধার সম্মুখীন নাও হয়, কিন্তু অন্য কোন অসুবিধার দরুন মাথা মুণ্ডন করতে বা মাথার চুল কাটাতে বাধ্য হয়, তবে তাকে কি করতে হবে?

এহ্‌রাম অবস্থায় কোন কারণে মাথা মুণ্ডন করলে কি করতে হবে? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ — এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি কোন অসুস্থতার দরুন মাথা বা শরীরের অন্য কোন স্থানের চুল কাটতে হয়, অথবা মাথায় উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট পায়, তবে এমতাবস্থায় মাথার চুল বা শরীরের অন্য কোন স্থানের লোম কাটা জায়েয। কিন্তু এর ফিদইয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর তা হচ্ছে রোযা রাখা বা সদকা দেয়া বা কুরবানী করা। কুরবানীর জন্যে হরমের সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু রোযা রাখা বা সদকা দেয়ার জন্যে কোন বিশেষ স্থান নির্ধারিত নেই। তা যে কোন স্থানে আদায় করা চলে। কোরআনের শব্দের মধ্যে রোযার কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকারও কোন পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবী কা'ব ইবনে ওজরার এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে এরশাদ করেছেন, — তিনটি রোযা এবং ছয় জন মিসকীনকে মাথাপিছু অর্ধসা'গম দিতে হবে।— (বোখারী)

হজ্ব মৌসুমে হজ্ব ওমরা একত্রে আদায় করার নিয়ম ঃ ইসলাম পূর্ব যুগে আরববাসীদের ধারণা ছিল, হজ্বের মাস আরম্ভ হয়ে গেলে অর্থাৎ, শাওয়াল মাস এসে গেলে হজ্ব ও ওমরা একত্রে আদায় করা অত্যন্ত পাপ।

এ আয়াতে তাদের এ ধারণার নিরসন করে বলা হয়েছে যে, মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্যে এ সময়ের মধ্যে হজ্ব ও ওমরা একত্রে সমাধা করা নিষেধ। কারণ, তাদের পক্ষে হজ্বের মাস অতিক্রান্ত হওয়ার

পরও ওমরার জন্যে দ্বিতীয়বার মীকাতে গমন করা তেমন অসুবিধার ব্যাপার-নয়। কিন্তু এ সীমারেখার বাইরে থেকে যারা হজ্ব করতে আসে, তাদের জন্যে দু'টিকেই একত্রে আদায় করা জায়েয করে দেয়া হয়েছে। কেননা, এত দূর-দূরান্ত থেকে ওমরার জন্যে পৃথকভাবে ভ্রমণ করা খুবই কঠিন ও অসুবিধাজনক। সে সমস্ত নির্ধারিত স্থানসমূহকে মীকাত বলা হয়, যা সারা বিশ্বের হজ্বযাত্রিগণ যিনি যে দিক থেকে আগমন করেন, সেসব রাস্তার প্রত্যেকটিতে একটি স্থান আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। যখনই মক্কায় আগমনকারীরা এ স্থানে আসবে, তখন হজ্ব অথবা ওমরার নিয়তে এহ্রাম করা আবশ্যক। এহ্রাম ব্যতীত নির্ধারিত এ স্থান অতিক্রম করা গোনাহ্র কাজ। যেমন, বলা হয়েছে لَمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ – এর অর্থ তাই। অর্থাৎ, যাদের পরিবার-পরিজন মীকাতের সীমারেখার অভ্যন্তরে বসবাস করে না, তাদের জন্যে হজ্ব ও ওমরা হজ্বের মাসে একত্রে করা জায়েয।

অবশ্য যারা হজ্বের মৌসুমে হজ্ব ও ওমরাকে একত্রে আদায় করে, তাদের উপর এ দু'টি এবাদতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। তা হচ্ছে, কুরবানী করার সামর্থ্য যাদের রয়েছে তারা বকরী, গাভী, উট প্রভৃতি যা তাদের জন্য সহজলভ্য হয় তা থেকে কোন একটি পশু কুরবানী করবে। কিন্তু যাদের কুরবানী করার মত আর্থিক সংগতি নেই তারা দশটি রোযা রাখবে। হজ্বের ৯ তারিখ পর্যন্ত তিনটি আর হজ্ব সমাপনের পর সাতটি রোযা রাখতে হবে। এ সাতটি রোযা যেখানে এবং যখন সুবিধা, তখনই আদায় করতে পারে। হজ্বের মধ্যে যে ব্যক্তি তিনটি রোযা পালন করতে না পারে, ইমাম আবু-হানীফা এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীর মতে তাদের জন্যে কুরবানী করাই ওয়াজিব। যখন সামর্থ্য হয়, তখন কারো মাধ্যমে হরম শরীফে কুরবানী আদায় করবে।

তামাত্তু ও কেরান ঃ হজ্বের মাসে হজ্বের সাথে ওমরাকে একত্রিতকরণের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে, মীকাত হতে হজ্ব ও ওমরাহর জন্যে একত্রে এহ্রাম করা। শরীয়তের পরিভাষায় একে 'হজ্বে-কেরান' বলা হয়। এর এহ্রাম হজ্বের এহ্রামের সাথেই ছাড়তে হয়, হজ্বের শেষদিন পর্যন্ত তাকে এহ্রাম অবস্থায়ই কাটাতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, মীকাত হতে শুধু ওমরার এহ্রাম করবে। মক্কা আগমনের পর ওমরার কাজ-কর্ম শেষ করে এহ্রাম খুলবে এবং ৮ই যিলহজ্ব তারিখে মিনা যাবার প্রাক্কালে হরম শরীফের মধ্যেই এহ্রাম বেঁধে নেবে। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় 'তামাত্তু' কিন্তু فَمَنْ تَمَتَّعَ এ সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

হজ্ব ও ওমরার আহ্কামের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাতে গাফলতি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঃ শেষ আয়াতটিতে প্রথমে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যার অর্থ এসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত ,সতর্ক ও ভীত থাকা বুঝায়। অতঃপর বলা হয়েছে وَاعْلَمُوٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জেনে শোনে আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আজকাল হজ্ব ও ওমরাকারিগণের অধিকাংশই এ সম্পর্কে অসতর্ক। তারা প্রথমতঃ হজ্ব ও ওমরার নিয়মাবলী জানতেই চেষ্টা করে না। আর যদিও বা জেনে নেয়, অনেকেই তা যথাযথভাবে পালন করে না। অনেকেই দায়িত্ব-জ্ঞানহীন মোয়াল্লেম ও সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে অনেক ওয়াজিবও পরিত্যাগ করে। আর সুন্নত ও মুস্তাহাবের তো কথাই নেই। আল্লাহ্ সবাইকে নিজ নিজ আমল যথাযথভাবে পালন করার তওফীক দান করুন।

হজ্বসংক্রান্ত ৮ টি আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় আয়াত ও তার মাসআলাসমূহ ঃ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ –'আশহুরুন' শব্দটি শাহ্রুন শব্দের বহুবচন। এর অর্থ, মাস। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, যারা হজ্ব অথবা ওমরা করার নিয়তে এহ্রাম বাঁধে, তাদের উপর এর সকল অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এ দু'টির মধ্যে, ওমরার জন্যে কোন সময় নির্ধারিত নেই। বছরের যে কোন সময় তা আদায় করা যায়। কিন্তু হজ্বের মাস এবং এর অনুষ্ঠানাদি আদায়ের জন্যে সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই এ আয়াতের শুরুতেই বলে দেয়া হয়েছে যে, হজ্বের ব্যাপারটি ওমরার মত নয়। এর জন্যে কয়েকটি মাস রয়েছে, সেগুলি প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। জাহেলিয়াতের যুগ থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত এ মাসগুলোই হজ্বের মাসরূপে গণ্য হয়ে আসছে। আর তা হচ্ছে শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্বের দশ দিন। আবু উমামাহ্ ও ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে তা'ই বর্ণিত হয়েছে।– (মাযহারী)

হজ্বের মাস শাওয়াল হতে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে হজ্বের এহ্রাম বাঁধা জায়েয নয়। কোন কোন ইমামের মতে শাওয়ালের পূর্বে হজ্বের এহ্রাম করলে হজ্ব আদায়ই হবে না। ইমাম আবু হানীফার মতে হজ্ব অবশ্য আদায় হবে, কিন্তু মাকরূহ হবে।– (মাযহারী)

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ

– এ আয়াতে হজ্বের এহ্রামকারীদের জন্য নিষিদ্ধ কাজ-কর্মের কিছুটা বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এহ্রাম অবস্থায় যেসব বিষয় থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য ও ওয়াজিব তা হচ্ছে 'রাফাস' 'ফুসুক' ও 'জিদাল'। رَفَثَ 'রাফাস' একটি ব্যাপক শব্দ, যাতে স্ত্রী-সহবাস ও তার আনুষঙ্গিক কর্ম, স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাও এর অন্তর্ভুক্ত। এহ্রাম অবস্থায় এ সবই হারাম। অবশ্য আকার-ইঙ্গিত দূষণীয় নয়।

فُسُوْقَ 'ফুসুক' –এর শাব্দিক অর্থ বের হওয়া। কোরআনের ভাষায় নির্দেশ লংঘন বা নাফরমানী করাকে 'ফুসুক' বলা হয়। সাধারণ অর্থে যাবতীয় পাপকেই 'ফুসুক' বলে। তাই অনেকে এস্থলে সাধারণ অর্থই নিয়েছেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) 'ফুসুক' শব্দের অর্থ করেছেন — সে সকল কাজ-কর্ম যা এহ্রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। স্থান অনুসারে এই ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, সাধারণ পাপ এহ্রামের অবস্থাতেই শুধু নয়; বরং সব সময়ই নিষিদ্ধ।

যে সমস্ত বিষয় প্রকৃতপক্ষে না-জায়েয ও নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু এহ্রামের জন্য নিষেধ ও না-জায়েয –তা হচ্ছে ছয়টিঃ

(১) স্ত্রী-সহবাস ও এর আনুষঙ্গিক যাবতীয় আচরণ; এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস-সংক্রান্ত আলাপ –আলোচনা। (২) স্থলভাগের জীবজন্তু শিকার করা বা শিকারীকে বলে দেয়া। (৩) নখ বা চুল কাটা। (৪) সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার। এ চারটি বিষয় স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যেই এহ্রাম অবস্থায় হারাম বা নিষিদ্ধ।

অবশিষ্ট দু'টি বিষয় পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত। (৫) সেলাই করা কাপড় পরিধান করা। (৬) মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা। অবশ্য মুখমণ্ডল আবৃত করা স্ত্রীলোকদের জন্যেও না-জায়েয।

আলোচ্য ছ'টি বিষয়ের মধ্যে স্ত্রী–সহবাস যদিও 'ফুসুক' শব্দের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি একে 'রাফাস' শব্দের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে এজন্যে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এহ্‌রাম অবস্থায় এ কাজ হতে বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এর কোন ক্ষতিপূরণ বা বদলা দেয়ার ব্যবস্থা নেই। কোন কোন অবস্থায় এটা এত মারাত্মক যে, এতে হজ্বই বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য অন্যান্য কাজগুলোর কাফ্‌ফারা বা ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আরাফাতে অবস্থান শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রী–সহবাস করলে হজ্ব ফাসেদ হয়ে যাবে। গাভী বা উট দ্বারা এর কাফ্‌ফারা দিয়েও পর বছর পুনরায় হজ্ব করতেই হবে। এজন্যেই فَلَا رَفَثَ শব্দ ব্যবহার করে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

جِدَالَ শব্দের অর্থ একে অপরকে পরাস্ত করার চেষ্টা করা। এজন্যেই বড় রকমের বিবাদকে جِدَالَ বলা হয়। এ শব্দটিও অতি ব্যাপক। কোন কোন মুফাসসের এ শব্দের ব্যাপক অর্থই গ্রহণ করেছেন। আবার অনেকে হজ্ব ও এহ্‌রামের সম্পর্ক হেতু এখানে 'জিদাল'–এর অর্থ করেছেন যে, জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা অবস্থানের স্থান নিয়ে মতানৈক্য করতো; কেউ কেউ আরাফাতে অবস্থান করাকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করতো, আবার কেউ কেউ মুযদালে ফাতে অবস্থানকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করতো। তারা আরাফাতে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করতো না। পথিমধ্যে অবস্থিত একটি স্থানকেই ইবরাহীম (আঃ)–এর নির্ধারিত অবস্থানস্থল বলে মনে করতো। এমনিভাবে হজ্বের সময় সম্পর্কেও তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতো। কেউ কেউ যিলহজ্ব মাসে হজ্ব করতো, আবার কেউ কেউ যিলকদ মাসে। এসব ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঝগড়া–বিবাদ হতে থাকতো এবং এ জন্যে একে অপরকে পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত করতো। তাই কোরআনে করীম وَلَا جِدَالَ বলে এসব বিবাদের মূলোৎপাটন করেছে। আর আরাফাতে অবস্থানকে ফরয এবং মুযদালিফাতে অবস্থানকে ওয়াজিব করা হয়েছে। এটাই হক ও সঠিক। উপরন্তু যিলহজ্ব মাসের নির্ধারিত দিনগুলোতেই হজ্ব আদায় করতে হবে, এ ঘোষণা করে এর বিরুদ্ধে ঝগড়া করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ এ স্থলে 'ফুসুক ও জিদাল' শব্দদ্বয়কে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করে এ অর্থ নিয়েছেন যে, 'ফুসুক' ও 'জিদাল' সর্বক্ষেত্রেই পাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু এহ্‌রামের অবস্থায় এর পাপ গুরুতর। পবিত্র দিনসমূহে এবং পবিত্র স্থানে, যেখানে কেবল আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্যে আগমন করা হয়েছে এবং 'লাব্বাইকা লাব্বাইকা' বলা হচ্ছে, এহ্‌রামের পোশাক তাদেরকে সব সময় একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা এখন এবাদতে ব্যস্ত, এমতাবস্থায় ঝগড়া–বিবাদ ইত্যাদি অত্যন্ত অন্যায় ও চরমতম নাফরমানীর কাজ।

কোরআনের ভাষালঙ্কার ঃ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ আয়াতের শব্দগুলো নেতিবাচক। হজ্বের মধ্যে এসব বিষয় নেই, অথচ উদ্দেশ্য হচ্ছে এ সকল বিষয়ের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করা; যার জন্যে لا ترفثوا ولاتفسقوا ولاتجادلوا শব্দ ব্যবহার করার কথা ছিল। কিন্তু এখানে নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হজ্বের মধ্যে এসব বিষয়ের কোন অবকাশ নাই। এমননকি এ সবের কল্পনাও হতে পারে না। وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ —এহ্‌রামকালে নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্ণনা করার পর উল্লেখিত বাক্যে হেদায়েত করা হচ্ছে যে, হজ্বের পবিত্র সময়ে ও পূতঃ স্থানগুলোতে শুধু নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আল্লাহ্‌র যিকির ও এবাদত এবং সৎকাজে সদা আত্মনিয়োগ কর। তুমি যে কাজই কর না কেন, তা আল্লাহ্ তাআলা জানেন; আর এতে তোমাদেরকে অতি উত্তম বখশিশও দেয়া হবে।

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ – এ আয়াতে ঐ সমস্ত ব্যক্তির সংশোধনী পেশ করা হয়েছে যারা হজ্ব ও ওমরা করার জন্য নিঃস্ব অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে। অথচ দাবী করে যে, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করছি। পক্ষান্তরে পথে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। নিজেও কষ্ট করে এবং অন্যকেও পেরেশান করে। তাদেরই উদ্দেশে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হজ্বের উদ্দেশে সফর করার আগে প্রয়োজনীয় পাথেয় সাথে নেয়া বাঞ্ছনীয়, এটা তাওয়াক্কুলের অন্তরায় নয়। বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার প্রকৃত অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত আসবাবপত্র নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ ও জমা করে নিয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। হুযূর (সাঃ) থেকে তাওয়াক্কুলের এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। নিঃস্বতার নাম তাওয়াক্কুল বলা মূর্খতারই নামান্তর।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ
فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن
كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ
حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ
النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا
لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ
قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي
أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ
اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

(১৯৮) তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন পাপ নেই। অতঃপর যখন তওয়াফের জন্য ফিরে আসবে আরাফাত থেকে, তখন মাশ'আরে-হারামের নিকটে আল্লাহ্কে স্মরণ কর। আর তাঁকে স্মরণ কর তেমনি করে, যেমন তোমাদিগকে হেদায়েত করা হয়েছে— আর নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে অজ্ঞ। (১৯৯) অতঃপর তওয়াফের জন্যে দ্রুতগতিতে সেখান থেকে ফিরে আস, যেখান থেকে সবাই ফিরে। আর আল্লাহ্র কাছেই মাগফেরাত কামনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, করুণাময়। (২০০) আর অতঃপর যখন হজ্বের যাবতীয় অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সমাপ্ত করে সারবে, তখন স্মরণ করবে আল্লাহ্কে, যেমন করে তোমরা স্মরণ করতে নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে; বরং তার চেয়েও বেশী স্মরণ করবে। তারপর অনেকে তো বলে যে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে দুনিয়াতে দান কর। অথচ তার জন্যে পরকালে কোন অংশ নেই। (২০১) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে— হে পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (২০২) এদেরই জন্য অংশ রয়েছে নিজেদের উপার্জিত সম্পদের। আর আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (২০৩) আর স্মরণ কর আল্লাহ্কে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিনে। অতঃপর যে লোক তাড়াহুড়া করে চলে যাবে শুধু দু' দিনের মধ্যে, তার জন্যে কোন পাপ নেই। আর যে লোক থেকে যাবে তার উপর কোন পাপ নেই, অবশ্য যারা ভয় করে। আর তোমরা আল্লাকে ভয় করতে থাক এবং নিশ্চিত জেনে রাখ, তোমরা সবাই তাঁর সামনে সমবেত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতগুলোতে হজ্ব সংক্রান্ত অন্যান্য বহু বিষয়েরই আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে প্রার্থনাকারীদিগকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এক শ্রেণী হচ্ছে কাফের ও পরকালে অবিশ্বাসী। এদের প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হচ্ছে দুনিয়া। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে মুমিন ; পরকালের প্রতি বিশ্বাসে অটল। এরা পার্থিব কল্যাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের কল্যাণও সমভাবে কামনা করে। পরবর্তী আয়াতসমূহে 'নেফাক' বা কপটতা ও 'এখলাছ' বা আন্তরিকতার ভিত্তিতে বিভক্ত মানব শ্রেণী সম্পর্কে বলা হচ্ছে, কেউ মুনাফেক বা কপট আর কেউ মুখলেছ বা আন্তরিকতাপূর্ণ।

আয়াতের শেষাংশে, যাতে নিষ্ঠাবান মুমিনগণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আত্মবিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না, তা সে সমস্ত নিষ্ঠাবান সাহাবায়ে কেরামের শানে নাযিল হয়েছে, যাঁরা আল্লাহ্র রাস্তায় অনুক্ষণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। মুস্তাদরাকে হাকেম, ইবনে-জরীর, মুসনাদে ইবনে আবী-হাতেম প্রভৃতি গ্রন্থে সহী, সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ আয়াতটি হযরত সোহাইব রুমী (রাঃ)-এর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল কোরাইশ তাঁকে বাধা দিতে উদ্যত হলে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং তাঁর তুনীরে রক্ষিত সবগুলো তীর বের করে দেখালেন এবং কোরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, —হে কোরাইশগণ! তোমরা জান, আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তুনীরে একটি তীরও থাকবে, ততক্ষণ তোমরা আমার ধারে-কাছেও পৌছতে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার চালাব। যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি তলোয়ার চালিয়ে যাব। তারপর তোমরা যা চাও করতে পারবে। আর যদি তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ কামনা কর, তাহলে শোন, আমি তোমাদিগকে মক্কায় রক্ষিত আমার ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা তা নিয়ে নাও এবং আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। তাতে কোরাইশদল রাযী হয়ে গেল এবং হযরত সোহাইব রুমী নিরাপদে রসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রসূল (সাঃ) দু'বার এরশাদ করলেনঃ—

ربح البيع ابا يحيى - ربح البيع ابا يحيى

'হে আবু ইয়াহ্ইয়া, তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।'

কোন কোন তফসীরকার অন্যান্য কতিপয় সাহাবীর বেলায় সংঘটিত একই ধরনের কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন।— (মাযহারী)

পূর্ববর্তী আয়াতে নিষ্ঠাবানদের প্রশংসা করা হয়েছিল। অনেক সময় এই নিষ্ঠার মধ্যেও ভুলবশতঃ বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। যদিও উদ্দেশ্য থাকে অধিক আনুগত্য, কিন্তু সে আনুগত্য শরীয়ত ও সুন্নতের সীমারেখা অতিক্রম করে বেদ'আতে পরিণত হয়। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ প্রথমে ইহুদী আলেম ছিলেন এবং সে ধর্মমত অনুযায়ী শনিবার ছিল সপ্তাহের পবিত্র দিন, আর উটের মাংস ছিল হারাম। ইসলাম গ্রহণের পর সে সাহাবীর ধারণা হয় যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর ধর্মে শনিবারকে পবিত্র দিন হিসাবে সম্মান করা ছিল ওয়াজিব। কিন্তু মুহাম্মদী

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ
اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿۲۰۴﴾ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى
فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللّٰهُ
لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿۲۰۵﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ
الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ۗ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۲۰۶﴾ وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۗ وَ
اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰۷﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ
الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۲۰۸﴾ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ
بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ ﴿۲۰۹﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ
ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ۗ
وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۲۱۰﴾ سَلْ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ
اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ
مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱۱﴾

(২০৪) আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহ্‌কে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক। (২০৫) যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ্ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না। (২০৬) আর যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহঙ্কারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্যে দোযখই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা। (২০৭) আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে—যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ্ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (২০৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না—নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২০৯) অতঃপর তোমাদের মাঝে পরিষ্কার নির্দেশ এসে গেছে বলে জানার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হও, তাহলে নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (২১০) তারা কি সে দিকেই তাকিয়ে রয়েছে যে, মেঘের আড়ালে তাদের সামনে আসবেন আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণ? আর তাতেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে। বস্তুতঃ সব কার্য-কলাপই আল্লাহ্‌র নিকট গিয়ে পৌছবে। (২১১) বনী-ইসরাঈলদিগকে জিজ্ঞেস কর, তাদেরকে আমি কত স্পষ্ট নির্দশনাবলী দান করেছি। আর আল্লাহ্‌র নেয়ামত পৌছে যাওয়ার পর যদি কেউ সে নেয়ামতকে পরিবর্তিত করে দেয়, তবে আল্লাহ্‌র আযাব অতি কঠিন।

শরীয়তে তার অসম্মান করা ওয়াজিব নয়। তেমনিভাবে মূসা (আঃ)-এর শরীয়তে উটের মাংস ছিল হারাম, কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শরীয়তে তা ভক্ষণ করা ফরয নয়। সুতরাং আমরা যদি যথারীতি শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে থাকি এবং উটের মাংসকে হালাল জেনেও কার্যতঃ তা বর্জন করি, তা'হলে তো দু'কূলই রক্ষা পায় —মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের প্রতিও আস্থা রইলো, অথচ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শরীয়তেরও কোন বিরোধিতা হলো না। পক্ষান্তরে এতে আল্লাহ্‌র অধিকতর আনুগত্য এবং ধর্মের ব্যাপারে বেশী বিনয় প্রকাশ পাবে বলে মনে হয়। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই এ ধারণার সংশোধন উচ্চারণ করেছেন। তারই সার-সংক্ষেপ হচ্ছে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। আর ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা তখনই সাধিত হবে, যখন এমন কোন বিষয়কে ধর্ম হিসাবে পালন করা না হবে; যা ইসলামে পালনযোগ্য নয়। বস্তুতঃ এমনসব বিষয়কে ধর্ম গণ্য করা হোল একটি শয়তানী প্রতারণাজনিত পদস্খলন। আর পাপ হিসাবে তার শাস্তি কঠোরতর হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً - سلم শব্দটি যের ও যবরসহযোগে (সিল্‌ম ও সাল্‌ম) দুটি পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটির অর্থ হচ্ছে শান্তি' অপরটি ইসলাম'। এখানে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতে ইসলাম অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। -(ইবনে কাসীর) كَآفَّةً শব্দটি 'পরিপূর্ণভাবে' এবং সাধারণভাবে এই দু'ই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী এখানে বাক্যটির গঠন হচ্ছে অবস্থাজ্ঞাপক। এতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে, একটি হচ্ছে اُدْخُلُوْا (তোমরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও) শব্দে যে সর্বনাম রয়েছে, তার অবস্থা জ্ঞাপন করছে। অথবা ইসলাম অর্থে سلم শব্দটির অবস্থা জ্ঞাপন করছে। প্রথম ক্ষেত্রে অনুবাদ দাঁড়াবে এই যে,— তোমরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ, তোমাদের হাত-পা, চোখ-কান, মন-মস্তিস্ক সবকিছুই যেন ইসলামের আওতায় এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়, এমন যেন না হয় যে, হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইসলামের বিধানসমূহ পালন করে যাচ্ছ অথচ তোমাদের মন-মস্তিস্ক তাতে সন্তুষ্ট নয়। কিংবা মন-মস্তিস্ক ইসলামের অনুশাসনে সন্তুষ্ট বটে, কিন্তু হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ তার বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আয়াতটির অনুবাদ এই যে,— তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ, এমন যাতে না হয় যে, ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে গড়িমসি করতে থাকলে। তাছাড়া কোরআন ও সুন্নাহ্‌তে বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও এবাদতের সাথেই হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের সাথেই হোক অথবা রাজনীতির সাথে হোক, এর সম্পর্ক বাণিজ্যের সাথেই হোক কিংবা শিল্পের সাথে,— ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দিয়েছে তোমরা তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

এতদুভয় দিকের মূল প্রতিপাদ্যই মোটামুটিভাবে এই যে, ইসলামের বিধানসমূহ-তা মানবজীবনের যে কোন বিভাগের সাথেই সম্পৃক্ত হোক না কেন, যে পর্যন্ত তার সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রতি সত্যিকারভাবে স্বীকৃতি না দেবে, সে পর্যন্ত মুসলমান যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না।

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ
اٰمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ
مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾ كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً
فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا
فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا
جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا
لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ
لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ
الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا حَتّٰى يَقُولَ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ
قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾ يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ
خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

(২১২) পার্থিব জীবনের উপর কাফেরদিগকে উন্মত্ত করে দেয়া হয়েছে। আর তারা ঈমানদারদের প্রতি লক্ষ্য করে হাসাহাসি করে। পক্ষান্তরে যারা পরহেযগার তারা সেই কাফেরদের তুলনায় কেয়ামতের দিন অত্যন্ত উচ্চমর্যাদায় থাকবে। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সীমাহীন রুযী দান করেন। (২১৩) সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশতঃ তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে হেদায়েত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন। (২১৪) তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহ্‌র সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী। (২১৫) তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও—যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্যে, আত্মীয়-আপনজনের জন্যে, এতীম-অনাথদের জন্যে, অসহায়দের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহ্‌র জানা রয়েছে।

এ আয়াতের যে শানে-নুযুল উপরে বলা হয়েছে। মূলতঃ তার মূল বক্তব্য এই যে, শুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষাই তোমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে। একে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিলে সে তোমাদেরকে অন্যান্য সমস্ত ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেবে।

সতর্কতা ঃ যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং এবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামী সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না, তাদের জন্যে এ আয়াতে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তথাকথিত দ্বীনদারদের মধ্যেই ত্রুটি বেশীরভাগ দেখা যায়। এরা দৈনন্দিন আচার-আচরণ, বিশেষতঃ সামাজিকতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক যে অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে হয়, এরা যেন এসব রীতি নীতিকে ইসলামের নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করে না। তাই এগুলো জানতে শিখতেও যেমন এদের কোন আগ্রহ নেই, তেমনিভাবে এর অনুশীলনেও তাদের কোন আগ্রহ নেই। নাউযুবিল্লাহ্! অন্ততঃপক্ষে হাকীমুল-উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রাঃ) রচিত 'আদাবে মো'আশারাত' পুস্তিকাটি পড়ে নেয়া প্রতিটি মুসলমানের উচিত।

আল্লাহ্ ও ফেরেশতা মেঘের আড়ালে করে তাদের নিকট আগমন করবেন, এমন ঘটনা কেয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র আগমন দ্ব্যর্থবোধক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী এবং বুযুর্গানে দ্বীনের রীতি হচ্ছে, বিষয়টিকে সঠিক ও সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়া, কিন্তু কিভাবে তা সংঘটিত হবে, তা জানার প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তাঁর সমস্ত গুণাবলী ও অবস্থা জানা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের উপর নির্ভর করে অহংকার করা এবং দরিদ্র লোকের প্রতি উপহাস করার পরিণতি কেয়ামতের দিন চোখের সামনে ভেসে উঠবে। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, —যে ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষকে তার দারিদ্র্যের জন্যে উপহাস করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে কেয়ামতের দিন সমগ্র উম্মতের সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষের উপর এমন অপবাদ আরোপ করবে, যে দোষে সে দোষী নয়, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে একটি উঁচু অগ্নিকুণ্ডের উপর দাঁড় করাবেন; যতক্ষণ না সে তার মিথ্যার স্বীকারোক্তি করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে রাখা হবে।—(যিকরুল-হাদীস, কুরতুবী)

এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন এককালে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই মতাদর্শ ও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবাই একই ধরনের বিশ্বাস ও আকীদা পোষণ করত। তা ছিল প্রকৃতির ধর্ম। অতঃপর তাদের মধ্যে আকীদা, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা বা পরিচয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ্ তাআলা সত্য ও সঠিক মতবাদকে প্রকাশ করার জন্যে এবং সঠিক পথ দেখাবার লক্ষ্যে নবী ও রসূলগণকে প্রেরণ করেন, তাঁদের প্রতি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেন। নবীগণের চেষ্টা, পরিশ্রম ও তবলীগের ফলে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল এবং তাঁদের প্রদর্শিত সত্য-সঠিক পথ ও মতকে গ্রহণ করে নেয়। আর একদল তা প্রত্যাখ্যান করে নবীগণকে মিথ্যা বলে। প্রথমোক্ত দল নবীগণের অনুসারী এবং মুমিন বলে পরিচিত, আর শেষোক্ত দলটি নবীগণের অবাধ্য ও অবিশ্বাসী এবং কাফের বলে পরিচিত। এ আয়াতের

প্রথম বাক্যে এরশাদ হয়েছে –

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল কোরআনে' বলেছেন, আরবী অভিধান অনুযায়ী এমন মানবগোষ্ঠীকে উম্মত বলা হয়, যাদের মধ্যে কোন বিশেষ কারণে সংযোগ, ঐক্য ও একতা বিদ্যমান থাকবে। সে ঐক্য মতাদর্শ ও বিশ্বাসজনিতই হোক অথবা একই যুগে একই এলাকা বা দেশের অধিবাসী হওয়ার দরুনই হোক অথবা অন্য কোন অঞ্চলের বংশ, বর্ণ ও ভাষার সমতার কারণেই হোক।

'কোন এককালে সকল মানুষ পরস্পর একতাবদ্ধ ছিল' —এতে দু'টি কথা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ 'একতা' বলতে কোন্ ধরনের একতাকে বোঝানো হয়েছে? দ্বিতীয়তঃ এই একতা কখন ছিল? প্রথম বিষয়ের মীমাংসা এ আয়াতের শেষ বাক্যটির দ্বারা হয়ে যায়। এতে একতার মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার এবং বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে হক ও সত্য মতবাদ নির্ধারণের ব্যাপারে নবী ও রসূল প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এ মতাদর্শের মধ্যে মীমাংসা করার জন্যে নবী ও রসূলগণের প্রেরণ এবং আসমানী কিতাব অবতরণ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, সে মতবিরোধ বংশ, ভাষা বর্ণ বা অঞ্চল অথবা যুগের মতানৈক্য ছিল না, বরং মতাদর্শ, আকায়েদ ও ধ্যান-ধারণার পার্থক্য ছিল। এতেই বোঝা যায় যে, এ আয়াতে একত্ব বলতে ধ্যান-ধারণা, চিন্তা এবং আকীদার একত্বকেই বোঝানো হয়েছে।

সুতরাং এ আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এমন এক সময় ছিল, যখন প্রতিটি মানুষ একই মত ও আদর্শ এবং একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রশ্ন উঠে, সে মত ও বিশ্বাসটি কি ছিল? এতে দু'টি সম্ভাবনা বিদ্যমান। (১) হয় তখনকার সব মানুষ তওহীদ ও ঈমানের বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ ছিল। নতুবা (২) সবাই মিথ্যা ও কুফরীতে ঐক্যবদ্ধ ছিল। অধিকাংশ তফসীরকারের সমর্থিত মত হচ্ছে যে, সে আকীদাটি ছিল সঠিক ও যথার্থতা ভিত্তিক। অর্থাৎ, তওহীদ ও ঈমানের ঐকমত্য।

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, 'এক' বলতে আকীদা ও তরীকার একত্ব এবং সত্য-ধর্ম বলে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও ঈমানের ব্যাপারে ঐকমত্যের কথাই বলা হয়েছে।

এখন দেখতে হবে, এ সত্য দ্বীন ও ঈমানের উপর সমস্ত মানুষের ঐকমত্য কোন্ যুগে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তা কোন্ যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল? তফসীরকার সাহাবিগণের মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব এবং ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেছেন যে, এ ঘটনাটি 'আলমে-আযল' বা আত্মার জগতের ব্যাপার। অর্থাৎ, সমস্ত মানুষের আত্মাকে সৃষ্টি করে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?) তখন একবাক্যে সকল মানুষ একই আকীদাতে বিশ্বাসী ছিল, যাকে ঈমান ও ইসলাম বলা হয়।— (কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এই একত্বের বিশ্বাস তখনকার, যখন হযরত আদম (আঃ) সস্ত্রীক দুনিয়াতে আগমন করলেন এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি জন্মাতে আরম্ভ করল আর মানবগোষ্ঠী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে শুরু করলো। তাঁরা সবাই হযরত আদম (আঃ)-এর ধর্ম, তাঁর শিক্ষা ও শরীয়তের অনুগত ছিল। একমাত্র কাবীল ছাড়া সবাই তওহীদের সমর্থক ছিলেন।

'মুসনাদে বায্যার' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতির সাথে সাথে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, একত্বের ধারণা হযরত আদম (আঃ) থেকে আরম্ভ হয়ে হযরত ইদ্রিস (আঃ) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সে সময় সবাই মুসলমান এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এতদুভয় নবীর মধ্যবর্তী সময় হল দশ 'করন'। বাহ্যতঃ এক 'করন' দ্বারা এক শতাব্দী বোঝা যায়। সুতরাং মোট সময় ছিল এক হাজার বছর।

কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, এই একক বিশ্বাসের যুগ ছিল হযরত নূহ (আঃ)-এর তুফান পর্যন্ত। নূহ (আঃ)-এর সাথে যারা নৌকায় আরোহণ করেছিলেন, তারা ব্যতীত সমগ্র বিশ্ববাসী এতে ডুবে মরেছিল। তুফান বন্ধ হওয়ার পর যারা জীবিত ছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান; সত্য ধর্ম ও একত্ববাদে বিশ্বাসী।

বাস্তবপক্ষে এ তিনটি মতামতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তিনটি যুগই এমন ছিল, যেগুলোতে সমস্ত মানুষ একই মতবাদ ও একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সত্য ধর্মের উপর কায়েম ছিল। পরবর্তী আয়াতে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী বাক্যটিতে সমস্ত মানব জাতিকে একই মত ও ধর্মের অনুসারী বলে উল্লেখ করার পর মতবিরোধের কোন কারণ বর্ণনা না করেই বলা হয়েছে—'আমি নবী-রসূলগণ ও কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে মতবিরোধের মীমাংসা করা যায়।'

এ দু'টি বাক্যে আপাত দৃষ্টিতে গরমিল মনে হয়। কারণ, নবীগণ এবং কিতাবসমূহ প্রেরণের কারণ ছিল মানুষের মতানৈক্য। পক্ষান্তরে সে সময় কোন মত-পার্থক্য ছিল বলেই উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য এর অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। যারা কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে একটু চিন্তা করেন, তাদের জন্যে এর মর্ম উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয়। কোরআন কখনও অতীতের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্প, কাহিনী কিংবা ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখিত যাবতীয় কাহিনীরই অবতারণা করেনি; বরং মধ্য থেকে সেসব অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছে, যা এই কালামের প্রেক্ষাপটের দ্বারা বোঝা যায়। ফলে তা'ই বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে তা বিশ্ববাসী স্বচক্ষে দেখেছে। তাই এর পুনরালোচনা ছিল নিষ্প্রয়োজন। তবে এতটুকু বলা হয়েছে যে, এসব মতানৈক্যের মীমাংসা করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা কি ব্যবস্থা করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ 'অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা নবীগণকে প্রেরণ করলেন।' তাঁরা সত্য ধর্মের অনুসারীদেরকে স্থায়ী আরাম ও সুখ-শান্তির সুসংবাদ দিতেন, আর তা থেকে যারা বিমুখ হয়েছিল, তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখাতেন। আর তাদের নিকট ওহী ও আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন যা বিভিন্ন মতাদর্শের নিরসন করে সত্য ও সঠিক মতাদর্শ জানিয়ে দেয়। অতঃপর এরশাদ হয়েছে, নবী-রসূল এবং আসমানী গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ্য ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করার পরেও বিশ্ববাসী দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। কিছু লোক এ হেদায়েতকে গ্রহণ করেনি। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, যাদের কাছে নবীগণ ও দলীলসমূহ এসেছে, তাদেরই একদল তা অগ্রাহ্য করেছে। অর্থাৎ, ইহুদী ও নাসারাগণ। আরো বিস্ময়কর বিষয়, আসমানী কিতাবে কোন সন্দেহ-সংশয়ের সম্ভাবনা ছিল না যে, তা বোঝা যায় না বা বোঝতে ভুল হয়। বরং প্রকৃতপক্ষে জেনে-বোঝেও শুধুমাত্র গোঁড়ামী ও জেদবশতঃ তারা এসবের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

দ্বিতীয় দল হচ্ছে তাদের, যারা আল্লাহ্‌র দেয়া হেদায়েতকে গ্রহণ

করেছে এবং নবী–রসূল ও আসমানী কিতাবসমূহের মীমাংসাকে সর্বান্তকরণে মেনে নিয়েছে। كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً –এর সারমর্ম হচ্ছে এই যে, প্রথমে বিশ্বের সমস্ত মানুষ সত্য ও সঠিক ধর্মের মধ্যে ছিল। অতঃপর মতের পার্থক্য ও উদ্দেশের বিভিন্নতার দরুন মতানৈক্য আরম্ভ হয়। দীর্ঘদিন পর আমল ও বিশ্বাসের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হতে থাকে, এমনকি সত্য–মিথ্যার মধ্যেও সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। সবাইকে সঠিক ধর্মের উপর পূনর্বহাল করার জন্য প্রকাশ্য প্রমাণের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ তা মেনে নিয়েছে, আবার কেউ কেউ জেদবশতঃ অস্বীকার করেছে এবং বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে।

এ আয়াতের দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা যায়। প্রথমতঃ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যে অসংখ্য নবী–রসূল ও আসমানী কিতাব প্রেরণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল 'মিল্লাতে–ওয়াহেদা' ত্যাগ করে যে মানব সমাজ বিভিন্ন দল ও ফেরকাতে বিভক্ত হয়েছে, তাদেরকে পুনরায় পূর্ববর্তী ধর্মের আওতায় ফিরিয়ে আনা। নবীগণের আগমনের ধারাটিও এভাবেই চলেছে। যখনই মানুষ সৎপথ থেকে দূরে সরে গেছে, তখনই হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্ তাআলা কোন না কোন নবী প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন, যেন তাঁর অনুসরণ করা হয়। আবার যখন তারা পথ হারিয়েছে, তখন অন্য আর একজন নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

আর যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে পরিবর্তন–পরিবর্ধনের মাধ্যমে সেসব নবী– রসূলের শিক্ষাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল বলেই আরো নবী –রসূল এবং কিতাব প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সেহেতু কোরআনকে পরিবর্তন হতে হেফাজতে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং কোরআনের শিক্ষাকে কেয়ামত পর্যন্ত এর প্রকৃত রূপে বহাল রাখার জন্য উম্মতে–মুহাম্মদীর মধ্য হতে এমন এক দলকে সঠিক পথে কায়েম রাখার ওয়াদা করেছেন, যে দল সব সময় সত্য ধর্মে অটল থেকে মুসলমানদের মধ্যে কোরআন ও সুন্নাহ্র সঠিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসার করতে থাকবে। কারো শত্রুতা বা বিরোধিতা তাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এ জন্যেই তাঁর পরে নবুওয়ত ও ওহীর দ্বার বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী বিষয়। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই সর্বোপরি খত্মে–নবুওয়ত ঘোষণা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ বোঝা গেল যে, ধর্মের ভিত্তিতেই জাতীয়তা নির্ধারিত হয়। মুসলমান ও অমুসলমানকে দু'টি জাতি হিসাবে চিহ্নিত করাই এর উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ আয়াতটিও একটি প্রমাণ। এতদসঙ্গে একথাও পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে, ইসলামের মধ্যে এ দু'টি জাতীয়তা সৃষ্টির ব্যবস্থাও একটি একক জাতীয়তা সৃষ্টি করার জন্যই, যা সৃষ্টির আদিতে ছিল। যার বুনিয়াদ দেশ ও ভৌগোলিক সীমার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না, বরং একক বিশ্বাস ও একক ধর্মের অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরশাদ হয়েছেঃ যে كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً সৃষ্টির আদিতে সঠিক বিশ্বাস এবং সত্যধর্মের অনুসারীরূপে একক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরে মানুষ বিভেদ সৃষ্টি করেছে। নবীগণ মানুষকে এ প্রকৃত একক জাতীয়তার দিকে আহবান করেছেন। যারা তাঁদের এ আহবানে সাড়া দেয়নি, তারা এক জাতীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্বতন্ত্র জাতি গঠন করেছে।

এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, মন্দ লোকেরা প্রেরিত নবীগণের এবং আল্লাহ্র কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং ঈমানদারদের পক্ষে তাদের এহেন দুরাচারের জন্য মনোকষ্ট নেয়া উচিত নয়। যেভাবে কাফেররা তাদের পূর্বপুরুষদের পথ অবলম্বন করে নবীগণের বিরুদ্ধাচরণের পথ ধরেছে, তেমনিভাবে মুমিন ও সালেহগণের উচিত নবীগণের শিক্ষা অনুসরণ করা, তাঁদের অনুসরণে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা এবং যুক্তিগ্রাহ্য মনোমুগ্ধকর ওয়াজ এবং নম্রতার মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদেরকে সত্য ধর্মের প্রতি আহবান করতে থাকা।

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং বিপদ–আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই বেহেশ্ত লাভ করতে পারবে না। অথচ কোরআন ও হাদীসের বর্ণনায় প্রমাণ রয়েছে যে, অনেক পাপী ব্যক্তিও আল্লাহ্র দয়া ও ক্ষমার দৌলতে জান্নাত লাভ করবে; এতে কোন কষ্ট সহ্যের প্রয়োজনই হবে না। কারণ, কষ্ট ও পরিশ্রমের স্তর বিভিন্ন। নিম্নস্তরের পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছে স্বীয় জৈবিক কামনা–বাসনা ও শয়তানের তাড়না থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিংবা সত্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের বিশ্বাস ও আকীদাকে ঠিক করা। এ স্তর প্রত্যেক মুমিনেরই অর্জন করতে হয়। অতঃপর মধ্যম ও উচ্চ স্তরের বর্ণনা—যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম হবে, সে স্তরেরই জান্নাত লাভ হবে। এভাবে কষ্ট ও পরিশ্রম হতে কেউই রেহাই পায়নি। এক হাদীসে রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন—

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل

"সবচাইতে অধিক বালা–মুসীবতে পতিত হয়েছেন নবী–রসূলগণ। তারপর তাঁদের নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ।"

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, নবীগণ ও তাঁদের সাথীদের প্রার্থনা যে, 'আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে' তা কোন সন্দেহের কারণে নয় যা তাঁদের শানের বিরুদ্ধে। বরং এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদিও আল্লাহ্ তাআলা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, এর সময় ও স্থান নির্ধারণ করেননি। অতএব, এ অশান্ত অবস্থায় এ ধরনের প্রার্থনার অর্থ ছিল এই যে, সাহায্য তাড়াতাড়ি অবতীর্ণ হোক। এমন প্রার্থনা আল্লাহ্র প্রতি ভরসা ও শানে নবুওয়তের খেলাফ নয়, বরং আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বান্দাদের সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। বস্তুতঃ নবী এবং সালেহীনগণই এরূপ প্রার্থনার অধিক উপযুক্ত।

প্রথমোক্ত আয়াতগুলোতে স্বাভাবিকভাবে বিষয়টি একান্ত গুরুত্ব ও তাকীদের সাথে বলা হয়েছে যে, কুফরী ও মোনাফেকী ত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আল্লাহ্র আদেশের পরিপন্থী হলে কারো কথাই মানবে না। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য জান–মাল কোরবান করে দাও এবং যাবতীয় দুঃখ–কষ্টে ধৈর্যধারণ কর। এখান থেকে সে নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জান–মাল কোরবান করার ছোট–খাটো বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে, যা জান–মাল এবং বিয়ে–তালাক প্রভৃতিসহ জীবনের অন্যান্য আচার–অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পূর্ব থেকে যে বর্ণনাপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে এখানেও সে রীতিই রক্ষা করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক এ বিষয়গুলোর আলোচনাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং এরও একটা বিশেষ রীতি রয়েছে। এসব বিষয়ের অধিকাংশই হচ্ছে এমন– যার সম্পর্কে সাহাবীগণ রসূল করীম (সাঃ)–কে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং

সেগুলোর উত্তর রসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে সরাসরি আরশে মোয়াল্লা থেকে আল্লাহ্ তাআলাই দিয়েছেন। সেমতে এসব ফতোয়া বা প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাই দিয়েছেন বলেও যদি মনে করা হয়, তাও ভুল হবে না। কোরআন শরীফে রয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ — এতে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্ তাআলা ফতোয়া দেয়ার কাজটিকে নিজেরই সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কাজেই এতে কোন প্রকার রূপক বিশ্লেষণ চলে না। তাছাড়া বলা যেতে পারে যে, এ ফতোয়া রসূল (সাঃ) দিয়েছেন, যা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে শেখানো হয়েছে। এ রুকূতে শরীয়তের যেসব হুকুম-আহকাম সাহাবীগণের প্রশ্নের উত্তরে বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র কোরআনে এমনিভাবে প্রশ্নোত্তরের আকারে বিশেষ বিধানের বর্ণনা প্রায় সতেরটি জায়গায় রয়েছে। তন্মধ্যে সাতটি সূরা বাক্বারায়, একটি সূরা মায়েদায়, একটি সূরা আনফালে। এ নয়টি স্থানে প্রশ্ন করা হয়েছে সাহাবায়ে-কেরামের পক্ষ থেকে। এছাড়া সূরা আ'রাফে দু'টি এবং সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা কাহ্‌ফ, সূরা তা-হা ও সূরা নাযেআতে একটি করে ছয়টি স্থানে কাফেরদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল—যার উত্তর কোরআনে করীমে উত্তরের আকারেই দেয়া হয়েছে। মুফাসসের হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবীগণের চাইতে কোন উত্তম দল আমি দেখিনি; ধর্মের প্রতি তাঁদের অনুরাগ ছিল অত্যন্ত গভীর আর হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর প্রতি তাঁদের এহেন ভালবাসা ও সম্পর্ক সত্ত্বেও তাঁরা প্রশ্ন করতেন খুব অল্প। তাঁরা সর্বমোট তেরটি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করেছিলেন। সেগুলোর উত্তর কোরআন করীমে দেয়া হয়েছে। তবে তাঁরা প্রয়োজন ছাড়া কোন প্রশ্ন করতেন না। — (কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথমটিতে সাহাবিগণের প্রশ্নের বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ অর্থাৎ, মানুষ কি ব্যয় করবে এ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে। এ প্রশ্নই দু'টি আয়াতের পর পুনরায় একই বাক্যের মাধ্যমে করা হয়েছে।

وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ কিন্তু প্রথমবার এই প্রশ্নের যে উত্তর উল্লেখিত আয়াতে দেয়া হয়েছে, দু'আয়াতের পর এর উত্তর অন্যভাবে দেয়া হয়েছে। এজন্য বোঝতে হবে যে, একই রকম প্রশ্নের দু'টি উত্তরের একটি তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে। আর সে তাৎপর্যটি সে সমস্ত অবস্থা ও ঘটনার বিষয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, যেগুলোর প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল। যেমন, আলোচ্য আয়াতের শানে—নুযুল হচ্ছে এই যে, আমর ইবনে নূহ রসূল (সাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, যে ما ننفق من اموالنا واين نضعها অর্থাৎ, আমাদের সম্পদ হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোথায় ব্যয় করব? ইবনে জরীরের বর্ণনামতে এ প্রশ্নটির দু'টি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে অর্থ-সম্পদের মধ্য থেকে কি বস্তু এবং কত পরিমাণ খরচ করা হবে? দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই দানের পাত্র কারা?

দু'আয়াত পরে যে একই প্রশ্ন করা হয়েছে, তার শানে-নুযুল ইবনে হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এই যে, মুসলমানগণকে যখন বলা হলো যে, তোমরা স্বীয় সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর, তখন কয়েকজন সাহাবী রসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার যে আদেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা শোনতে চাই, কি বস্তু কি পরিমাণে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করব? এখানে এ প্রশ্নের একটি মাত্র অংশ বিদ্যমান। অর্থাৎ, কি ব্যয় করা হবে। এভাবে এ দু'টি প্রশ্নের ধারা ও রূপের কিছুটা বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। প্রথম প্রশ্নে কি ব্যয় করবে এবং কোথায় ব্যয় করবে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে কি ব্যয় করব। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কোরআন মজীদ যা বলেছে, তাতে বোঝা যায় যে, প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ, 'কোথায় ব্যয় করবে' একে অধিক গুরুত্ব দিয়ে পরিষ্কারভাবে এর উত্তর দেয়া হয়েছে এবং প্রথম অংশ 'কি খরচ করব'—এর উত্তর দ্বিতীয় উত্তরের আওতায় বর্ণনা করা যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। এখন কোরআন মজীদে বর্ণিত দু'টি অংশের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রথম অংশে অর্থাৎ, কোথায় ব্যয় করবে সে সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে ঃ 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় তোমরা যা-ই ব্যয় কর তার হকদার হচ্ছে— তোমাদের পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন ও মুসাফিরগণ।' আর দ্বিতীয় অংশের জবাব অর্থাৎ, কি ব্যয় করবে? এ প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে এরশাদ করা হয়েছে' তোমরা যেসব কাজ করবে তা আল্লাহ্ তাআলা জানেন।' বাক্যটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি যে, এতটুকু বাধ্যতামূলকভাবেই তোমাদের ব্যয় করতে হবে এবং স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী যাকিছু তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ্‌র নিকট এর প্রতিদান পাবে।

মোটকথা, প্রথম আয়াতে হয় তো প্রশ্নকারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই প্রশ্নের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, আমরা যা ব্যয় করবো তা কাকে দেব? কাজেই উত্তর দিতে গিয়ে দানের 'মাসরাফ' বা পাত্র সম্পর্কে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া দানের বস্তু ও পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যাপারটিকে প্রাসঙ্গিক বলে ধরে নেয়া হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্নে শুধু জিজ্ঞাসা ছিল যে, কি খরচ করবো? এর উত্তরে বলা হয়েছে قُلِ الْعَفْوَ 'আপনি বলে দিন যে, যা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই খরচ কর।' এতে বোঝা গেল যে, নফল সদকার বেলায় নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই ব্যয় করতে হবে। নিজের সন্তানাদিকে কষ্টে ফেলে, তাদেরকে অধিকার হতে বঞ্চিত করে সদকা করার কোন বিধান নেই। এতে সওয়াব পাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, ঋণ পরিশোধ না করে তার পক্ষে নফল সদকা করাও আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ
قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَ
كُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ
اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ
حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ
مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ
قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

(২১৬) তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয় তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আর হয় তো বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। (২১৭) সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহ্র নিকট তার চেয়েও বড় পাপ! আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতেকরে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তা সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। (২১৮) আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহ্র পথে লড়াই (জেহাদ) করেছে, তারা আল্লাহ্র রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়। (২১৯) তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে এ- গুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে তাই খরচ করবে। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জেহাদের কয়েকটি বিধান ঃ উল্লেখিত আয়াতের প্রথমটিতে জেহাদ ফরয হওয়ার আদেশ নিম্নলিখিত শব্দগুলো দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ 'তোমাদের উপর জেহাদ ফরয করা হোল।' এ শব্দগুলোর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর সব সময়ই জেহাদ করা ফরয। তবে কোরআনের কোন কোন আয়াত ও রসূল (সাঃ)-এর হাদীসের বর্ণনাতে বোঝা যায় যে, জেহাদের এ ফরয, ফরযে-আইনরূপে প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাব্যস্ত হয় না, বরং এটা ফরযে কেফায়া। যদি মুসলমানদের কোন দল তা আদায় করে, তবে সমস্ত মুসলমানই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পায়। তবে যদি কোন দেশে বা কোন যুগে কোন দলই জেহাদের ফরয আদায় না করে, তবে ঐ দেশের বা ঐ যুগের সমস্ত মুসলমানকেই ফরয থেকে বিমুখতার দায়ে পাপী হতে হবে। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ.

الجهاد ماض الى يوم القيامة —এর মর্ম হচ্ছে এই যে, কেয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকা আবশ্যক, যারা জেহাদের দায়িত্ব পালন করবে। কোরআনের অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ্ তাআলা জান এবং মালের দ্বারা জেহাদকারিগণকে জিহাদ বর্জনকারীদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং উভয়কে পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।'

এতে যেসব ব্যক্তি কোন অসুবিধার জন্যে বা অন্য কোন ধর্মীয় খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে জেহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদেরকেও আল্লাহ্ তাআলা সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, জেহাদ যদি ফরযে-আইন হতো তবে তা বর্জনকারীদেরকে সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হতো না।'

এমনিভাবে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

অর্থাৎ, 'কেন তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি ছোট দল ধর্মীয় ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে বেরিয়ে গেলো না।' এ আয়াতে কোরআন নিজেই ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব বন্টন করে দিয়ে বলছে যে, কিছুসংখ্যক মুসলমান জেহাদের ফরয আদায় করবে, আর কিছুসংখ্যক মুসলমান মানুষকে ধর্মীয় তা'লীমদানে নিয়োজিত থাকবে। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন জেহাদ ফরযে আইন না হয়ে ফরযে-কেফায়া হবে।

তাছাড়া বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট জেহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার পিতা-মাতা কি বেঁচে আছেন? উত্তরে সে বললো, জি, বেঁচে আছেন। তখন রসূল (সাঃ) তাকে উপদেশ দিলেন, তুমি পিতা-মাতার খেদমত করেই জেহাদের সওয়াব হাসিল কর। এতেও বোঝা যায় যে, জেহাদ ফরযে কেফায়া। যখন মুসলমানদের একটি

দল জেহাদের ফরয আদায় করে, তখন অন্যান্য মুসলমানগণ অন্য খেদমতে নিয়োজিত হতে পারে। তবে যদি মুসলমানদের নেতা প্রয়োজনে সবাইকে জেহাদে অংশগ্রহণ করার আহবান করেন, তখন জেহাদ ফরযে আইনে পরিণত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কোরআন-হাকীমের সূরা তওবায় এরশাদ হয়েছেঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ

— অর্থাৎ, "হে মুসলমানগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে বেরিয়ে যাও, তখনই তোমরা মনমরা হয়ে পড়।"

এ আয়াতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হওয়ার সার্বজনীন নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ্ না করুন, যদি কোন ইসলামী দেশ অমুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সে দেশের লোকের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশবাসীর উপরেও সে ফরয আপতিত হয়। তারাও যদি প্রতিহত করতে না পারে, তবে এর নিকটবর্তী মুসলিম দেশের উপর, এমনি সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের উপর এ ফরয পরিব্যাপ্ত হয় এবং ফরযে আইন হয়ে যায়। কোরআনের আলোচ্য আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহ্ ও মোহাদ্দেসগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জেহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে ফরযে- কেফায়া।

যতক্ষণ পর্যন্ত জেহাদ ফরযে কেফায়া পর্যায়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তানদের পক্ষে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জেহাদে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়।, কিংবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঋণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত এ ফরযে কেফায়াতে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়। আর যখন এ জেহাদ প্রয়োজনের তাকীদে ফরযে-আইনে পরিণত হয়, তখন পিতা-মাতা, স্বামী বা স্ত্রী অথবা ঋণদাতা কারোই অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে জেহাদের প্রতি উৎসাহ দানের লক্ষ্যে এরশাদ হয়েছে যে, – 'যদিও জেহাদ স্বাভাবিকভাবে বোঝা বলে মনে হয়, কিন্তু স্মরণ রেখো, মানুষের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেষ্টা পরিণামে অনেক সময় অকৃতকার্য হয়। ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করা বিজ্ঞ ও বড় বুদ্ধিমানের পক্ষেও আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রতিটি মানুষই তার জীবনের যাবতীয় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, তার জীবনেই অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে সে কোন কাজকে অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী মনে করেছিল, কিন্তু পরিণামে তা অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়েছে। অথবা কোন বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেছিল এবং তা থেকে দূরে সরেছিল, কিন্তু পরিণামে দেখা গেল, তা অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী ছিল। মানুষের বুদ্ধি ও চেষ্টার অশুভ পরিণাম অনেক ব্যাপারেই ধরা পড়ে। তাই বলা হয়েছে ঃ "জেহাদ ও ধর্মযুদ্ধে যদিও আপাতদৃষ্টিতে জান ও মালের ক্ষতির আশংকা মনে হয়, কিন্তু যখন পরিণাম সামনে আসবে, তখন বোঝা যাবে যে, এ ক্ষতি বাস্তবে মোটেও ক্ষতি ছিল না; বরং সোজাসুজি লাভ, উপকার এবং চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা ছিল।"

নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধসংক্রান্ত নির্দেশাবলী ঃ আলোচ্য আয়াতের দ্বারা দ্বিতীয় যে বিষয়টি প্রমাণিত হচ্ছে, তা হলো নিষিদ্ধ মাস অর্থাৎ, রজব, যিলকদ, যিলহজ্ব এবং মহাররম মাসে যুদ্ধ – বিগ্রহ করা হারাম। এমনিভাবে কোরআনের অনেকগুলো আয়াতেই এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষেধ করা হয়েছে। যথা ঃ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ اربعة حرم ثلاث متواليات ورجب বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে হুযুর (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, এসব আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, উল্লেখিত চারটি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের এ নিষেধাজ্ঞা সর্বকালের জন্যই প্রযোজ্য।

ইমামে-তফসীর আতা ইবনে আবী-রাবাহ্ কসম খেয়ে বলেছেন যে, এ আদেশ সর্বযুগের জন্য। তাবেয়ীগণের অনেকেও এ আদেশকে স্থায়ী আদেশ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ্ এবং ইমাম জাস্‌সাসের মতে এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে। ফলে এখন কোন মাসেই প্রয়োজনীয় যুদ্ধ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ আয়াত দ্বারা এ আদেশ রহিত করা হয়েছে? এ সম্পর্কে ফকীহ্‌গণের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً আয়াতটি উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ রহিতকারী। আবার অধিকাংশের মতে রহিতকারী সেই আয়াত হচ্ছেঃ

فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

حيث শব্দটি এ স্থলে কাল বাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, মুশরিকদের যে মাসে এবং যে কালেই (মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত) পাও, হত্যা কর। কারো কারো মতে এ আদেশ রসূল (সাঃ)-এর কর্ম দ্বারা রহিত হয়েছে। তিনি নিষিদ্ধ মাসেই তায়েফ অবরোধ করেছিলেন এবং নিষিদ্ধ মাসেই হযরত 'আমের আশআরীকে' আওতাসের যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ্‌গণ এ আদেশকে রহিত বলে উল্লেখ করেছেন।

রূহুল-মা'আনী এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এবং বায়যাবী সূরা বরা'আতের প্রথম রুকূর তফসীর প্রসঙ্গে এ আদেশ রহিত হওয়ার ব্যাপারে 'এজমায়ে উম্মতের' কথা উল্লেখ করেছেন।— (বয়ানুল-কোরআন)

কিন্তু তফসীরে মাযহারী এসব দলীলের জবাবে বলেছেন যে, নিষিদ্ধ মাসের বিস্তারিত আলোচনা এ আয়াতে রয়েছে। একে বলা হয়, 'আয়াতুস সাইফ'। অর্থাৎ,

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

পরন্তু এ আয়াতটি জেহাদ বা যুদ্ধ-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর মধ্যে সর্বশেষে অবতীর্ণ হয়েছে। হুযুর (সাঃ)-এর ওফাতের মাত্র আশি দিন পূর্বে প্রদত্ত বিদায় হজ্বের ভাষণেও নিষিদ্ধ মাসের বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিদ্যমান। কাজেই এর দ্বারা আলোচ্য আয়াতকে রহিত বলা চলে না। তাছাড়া রসূল (সাঃ)-এর তায়েফ অবরোধ যিলকদ মাসে নয়, বরং শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এ অভিযানের দ্বারাও উল্লেখিত আয়াতকে মনসুখ বলা যায় না। অবশ্য একথা বলা যায় যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের নিষেধাজ্ঞা থেকে এ এব্যাপারটি স্বতন্ত্র যে, যদি কাফেররা এসব মাসেই আক্রমণ করে, তবে প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণ মুসলমানদের

জন্যেও বৈধ্য হবে। কাজেই আয়াতের শুধুমাত্র এ অংশটুকুকেই রহিত বলা যেতে পারে, যার ব্যাখ্যা রয়েছে— اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ আয়াতটিতে।

মোটকথা, এসব মাসে নিজে থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করা সর্বকালের জন্যেই নিষিদ্ধ। তবে কাফেররা যদি এসব মাসে আক্রমণ করে, প্রতিরক্ষামূলক প্রতি–আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্যেও জায়েয। যেমন, ইমাম জাস্‌সাস হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)–এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, রসূল (সাঃ) নিষিদ্ধ মাসে যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেরদের দ্বারা আক্রান্ত না হতেন, ততক্ষণ আক্রমণ করতেন না।

মুরতাদের পরিণাম ঃ উল্লেখিত আয়াত يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ এর শেষে মুসলমান হওয়ার পর তা ত্যাগ করা বা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হুকুম বলা হয়েছে। حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ, 'তাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাতে তথা ইহ ও পরকালের জন্যে বরবাদ হয়ে গেছে।' এ বরবাদ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, পার্থিব জীবনে তাদের স্ত্রী তাদের বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যদি তার কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তাহলে সে ব্যক্তির উত্তরাধিকার বা মীরাসের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, ইসলামে থাকাকালীন নামায– রোযা যত কিছু করেছে সব বাতিল হয়ে যায়, মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া হয় না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফনও করা হবে না।

আর পরকালে বরবাদ হওয়ার অর্থ হচ্ছে এবাদতের সওয়াব না পাওয়া এবং চিরকালের জন্যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

মাসআলা ঃ যদি এমন ব্যক্তি পুনরায় মুসলমান হয় তাহলে পরকালে দোযখ থেকে রেহাই পাওয়া এবং দুনিয়াতে তার উপর পুনরায় শরীয়তের হুকুম জারি হওয়া নিশ্চিত। তবে যদি সে প্রথম মুসলমান থাকা অবস্থায় হজ্ব করে থাকে, তবে সামর্থ্যবান হয়ে থাকলে দ্বিতীয়বার তা ফরয হওয়া না হওয়া, পূর্বের নামায–রোযার পরকালে প্রত্যাবর্তন হওয়া না হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে ইমামগণ মতানৈক্য পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা দ্বিতীয়বার হজ্বকে ফরয বলেন এবং পূর্বের নামায–রোযার সওয়াব পাবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী দু'টি বিষয়েই মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন।

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রথম থেকেই কাফের হয়ে থাকে এবং সে অবস্থায় কোন কাজ করে থাকে, কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বকৃত যাবতীয় সৎকর্মের সওয়াবই সে পাবে। আর যদি সে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সবই বরবাদ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ মোটকথা, মুরতাদের অবস্থা কাফেরদের অবস্থা অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। এজন্যে কাফেরদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করা যায়, কিন্তু পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করলে মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আর যদি মুরতাদ স্ত্রীলোক হয়, তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। কেননা, মুরতাদের কার্যকলাপের দরুন সরাসরিভাবে ইসলামের অবমাননা করা হবে। কাজেই তারা সরকার অবমাননার শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

সাহাবিগণের প্রশ্নসমূহ এবং সেসব প্রশ্নের উত্তর যে পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে এ আয়াতও অন্তর্ভুক্ত। এতে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে সাহাবিগণের প্রশ্ন এবং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তার উত্তর দেয়া হয়েছে। এ দু'টি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, বিস্তারিতভাবে এ দু'টির তাৎপর্য ও বিধানগুলো লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

শরাব হারাম হওয়া এবং এতদসংক্রান্ত বিধান ঃ ইসলামের প্রথম যুগে জাহেলিয়াত আমলের সাধারণ রীতি–নীতির মত মদ্যপানও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অতঃপর রসূলে করীম (সাঃ)–এর হিজরতের পরেও মদীনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ এ দু'টি বস্তুর শুধু বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করেই এতে মত্ত ছিল। কিন্তু এগুলোর অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তবে আল্লাহ্‌র নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রতেক জাতি ও প্রত্যেক অঞ্চলে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও থাকেন যারা বিবেক–বুদ্ধিকে অভ্যাসের উর্ধ্বে স্থান দেন। যদি কোন অভ্যাস বুদ্ধি বা যুক্তির পরিপন্থী হয়, তবে সে অভ্যাসের ধারে–কাছেও তাঁরা যান না। এ ব্যাপারে নবী–করীম (সাঃ)–এর স্থান ছিল সবচেয়ে উর্ধ্বে। কেননা, যেসব বস্তু কোন কালে হারাম হবে, এমন সব বস্তুর প্রতিও তাঁর অন্তরে একটা সহজাত ঘৃণা ছিল। সাহাবিগণের মধ্যেও এমন কিছুসংখ্যক লোক ছিলেন, যাঁরা হালাল থাকা কালেও মদ্য পান তো দূরের কথা, তা স্পর্শও করেননি।

মদীনায় পৌছার পর কতিপয় সাহাবী এসব বিষয়ের অকল্যাণগুলো অনুভব করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ফারূকে–আযম, হযরত মা'আয ইবনে জাবাল এবং কিছুসংখ্যক আনসার রসূলে–করীম (সাঃ)–এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ ''মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি–বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন–সম্পদও ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?'' এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ হচ্ছে প্রথম আয়াত যা মুসলমানদেরকে মদ ও জুয়া থেকে দূরে রাখার পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, মদ ও জুয়াতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দু'টির মাধ্যমেই অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত হয়; যা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বড় ও ক্ষতিকর। পাপ অর্থে এখানে সেসব বিষয়ও বোঝানো হয়েছে, যা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, মদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দোষ হচ্ছে এই যে, এতে মানুষের সবচাইতে বড় গুণ, বুদ্ধি–বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ, বুদ্ধি এমন একটি গুণ যা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে যখন তা থাকে না, তখন প্রতিটি মন্দ কাজের পথই সুগম হয়ে যায়।

এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় মদকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু এর অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকগুলোকে তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, মদ্যপানের দরুন মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। বলতে গেলে আয়াতটিতে মদ্যপান ত্যাগ করার জন্যে এক প্রকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কোন সাহাবী এ পরামর্শ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন, এ আয়াতে মদকে তো হারাম করা হয়নি, বরং এটা দ্বীনের পক্ষে ক্ষতির কাজে ধাবিত করে বিধায় একে পাপের কারণ বলে স্থির করা হয়েছে, যাতে ফেতনায় পড়তে না হয়, সেজন্যে পূর্ব থেকেই সতকর্তা অবলম্বন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

মদের ব্যাপারে পরবর্তী আয়াতটি নাযিল হওয়ার ঘটনা নিম্নরূপঃ একদিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) সাহাবিগণের মধ্যে হতে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন। আহারাদির পর যথারীতি

মদ্যপানের ব্যবস্থা করা হলো এবং সবাই মদ্যপান করলেন। এমতাবস্থায় মাগরিবেরে নামাযের সময় হলে সবাই নামাযে দাঁড়ালেন এবং একজনকে ইমামতি করতে এগিয়ে দিলেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন তিনি قُلْ يَاأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ সূরাটি ভুল পড়তে লাগলেন, তখনই মদ্যপান থেকে পুরোপুরী বিরত রাখার জন্যে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল। এরশাদ হলঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের-কাছেও যেও না।' এতে নামাযের সময় মদ্যপানকে হারাম করা হয়েছে। তবে অন্যান্য সময় তা পান করার অনুমতি তখনও পর্যন্ত বহাল রয়ে গেল। পরবর্তীতে বহুসংখ্যক সাহাবী এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরই মদ্যপান সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। ভেবেছিলেন, যে বস্তু মানুষকে নামায থেকে বিরত রাখে, তাতে কোন কল্যাণই থাকতে পারে না। যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, তখন এমন বস্তুর ধারে-কাছে যাওয়া উচিত নয়, যা মানুষকে নামায থেকে বিরত করে। যেহেতু নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ের জন্যে মদ্যপানকে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়নি, সেহেতু কেউ কেউ নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে মদ্যপান করতে থাকেন। ইতিমধ্যে আরো একটি ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। হযরত আতবান ইবনে মালেক কয়েকজন সাহাবীকে নিমন্ত্রণ করেন, যাদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবী ওক্কাসও উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর মদ্যপান করার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। আরবদের প্রথা অনুযায়ী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কবিতা প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের বংশ ও পূর্ব-পুরুষদের অহংকারমূলক বর্ণনা আরম্ভ হয়। সা'দ ইবনে আবী ওক্কাস একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন যাতে আনসারদের দোষারোপ করে নিজেদের প্রশংসাকীর্তন করা হয়। ফলে একজন আনসার যুবক রাগান্বিত হয়ে উটের গণ্ডদেশের একটি হাড় সা'দ এর মাথায় ছুঁড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে সা'দ রসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে উক্ত আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন হুযুর (সাঃ) দোয়া করলেনঃ

اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ্! শরাব সম্পর্কে আমাদেরকে একটি পরিষ্কার বর্ণনা ও বিধান দান কর।' তখনই সূরা মায়েদার উদ্ধৃত মদ ও মদ্যপানের বিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়েছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনো, মদ, জুয়া, মূর্তি এবং তীর নিক্ষেপ এসবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে থাক, যাতে তোমরা মুক্তিলাভ ও কল্যাণ পেতে পার। মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে; আর আল্লাহ্র যিকর ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখাই হল শয়তানের একান্ত কাম্য, তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না?

মদের অবৈধতা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক নির্দেশ ঃ আল্লাহ্ নির্দেশাবলীর তাৎপর্য তিনিই জানেন। তবে শরীয়তের নির্দেশসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, ইসলামী শরীয়ত কোন বিষয়ে কোন হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ-অনুভূতিসমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে, যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ কষ্টের সম্মুখীন না হয়। যেমন, কোরআন নিজেই ঘোষণা করেছে— لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا 'আল্লাহ্ তাআলা কোন মানুষকেই এমন আদেশ দেন না, যা তার শক্তি ও ক্ষমতার উর্ধ্বে।' এই দয়া ও রহস্যের চাহিদা ছিল ইসলামী শরীয়তেও মদ্যপানকে হারাম করার ব্যাপারে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

মদ্যপানকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কোরআনের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম হচ্ছে এই যে, মদপান সম্পর্কে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে আলোচ্য এ আয়াতটিই সর্বপ্রথম নির্দেশ। এতে মদ্যপানের দরুন যেসব পাপ ও ফাসাদ সৃষ্টি হয়, তার বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়েছে; মদ্যপান হারাম করা হয়নি। বরং এ আয়াতটিকে এই মর্মে একটা পরামর্শ বলা যেতে পারে যে, এটা বর্জনীয় বস্তু। কিন্তু বর্জন করার কোন নির্দেশ এতে দেয়া হয়নি।

দ্বিতীয় আয়াত সূরা নেসায় বলা হয়েছেঃ

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى -এতে বিশেষভাবে নামাযের সময় মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য সময়ের জন্যে অনুমতি রয়ে যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াত রয়েছে সূরা মায়েদায়। এতে পরিষ্কার ও কঠোরভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ ও হারাম করে দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে শরীয়তের এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ছিল এই যে, আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা বিশেষতঃ নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হতো।

আলেমগণ বলেছেন, 'যেভাবে শিশুদেরকে মায়ের বুকের দুধ ছাড়ানো কঠিন ও কষ্টকর, তেমনি মানুষের কোন অভ্যাসগত কাজ ছাড়ানো এর চাইতেও কষ্টকর।' এজন্যে ইসলাম একান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথমে শরাবের মন্দ দিকগুলো মানবমনে বদ্ধমূল করেছে। অতঃপর নামাযের সময়ে একে নিষিদ্ধ করেছে এবং সব শেষে বিশেষ বিশেষ সময়ের পরিবর্তে কঠোরভাবে সর্বকালের জন্যেই নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে।

তবে শরাব হারাম করার ব্যাপারে প্রথমতঃ ধীরমন্থর গতিতে এগিয়ে যাওয়াটাই ছিল বৈজ্ঞানিক পন্থা। তেমনিভাবে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করার পর এর নিষিদ্ধতার আইন-কানুনও শক্তভাবে জারি করাও বিজ্ঞতারই পরিচায়ক। এজন্যে রসূল (সাঃ) শরাব সম্পর্কে কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। এরশাদ হয়েছে-'সর্বপ্রকার অপকর্ম এবং অশ্লীলতার জন্মদাতা হচ্ছে শরাব। এটি পান করে মানুষ নিকৃষ্টতর পাপে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে।'

নাসায়ী শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে,— 'শরাব এবং

ঈমান একত্রিত হতে পারে না।' তিরমিযীতে হযরত আনাস (রাঃ) হুযুর (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর (সাঃ) মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণীর ব্যক্তির উপর লা'নত করেছেন।

(১) যে লোক নির্যাস বের করে, (২) প্রস্তুতকারক, (৩) পানকারী, (৪) যে পান করায়, (৫) আমদানীকারক, (৬) যার জন্যে আমদানী করা হয়, (৭) বিক্রেতা, (৮) ক্রেতা, (৯) সরবরাহকারী, এবং (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী।

অতঃপর শুধু মৌখিক শিক্ষা ও প্রচারের উপরই ক্ষান্ত হননি, বরং যথাযথ আইনের মাধ্যমেও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যার নিকট কোন প্রকার মদ থেকে থাকে, তা অমুক স্থানে উপস্থিত কর।

সাহাবিগণের মধ্যে আদেশ পালনের অনুপম আগ্রহ ঃ আদেশ পাওয়া মাত্র অনুগত সাহাবিগণ নিজ নিজ ঘরে ব্যবহারের জন্যে রক্ষিত মদ তৎক্ষণাৎ ফেলে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন রসূলে-করীম (সাঃ)-এর প্রেরিত এক ব্যক্তি মদীনার অলি-গলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, মদ্য পান হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তখন যার হাতে শরাবের যে পাত্র ছিল, তা তিনি সেখানেই ফেলে দিয়েছিলেন। যার কাছে মদের কলস বা মটকা ছিল, তা ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বের করে ভেঙ্গে ফেলেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) তখন এক মজলিসে মদ্যপানে সাকীর কাজ সম্পাদন করছিলেন। আবু তালহা, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ, উবাই ইবনে কা'ব, সোহাইল (রাঃ) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সাহাবিগণ সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকের ঘোষণা কানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন—এবার সমস্ত শরাব ফেলে দাও। এর পেয়ালা, মটকা, হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেল। অন্য বর্ণনায় আছে—হারাম ঘোষণার সময় যার হাতে শরাবের পেয়ালা ছিল এবং তা ঠোঁট স্পর্শ করছিল, তাও তৎক্ষণাৎ সে অবস্থাতেই দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সেদিন মদীনায় এ পরিমাণ শরাব নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, বৃষ্টির পানির মত শরাব প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদীনার অলি-গলির অবস্থা এমন ছিল যে, যখনই বৃষ্টি হতো তখন শরাবের গন্ধ ও রং মাটির উপর ফুটে উঠত।

যখন আদেশ হল যে, যার কাছে যে রকম মদ রয়েছে, তা অমুক স্থানে একত্রিত কর। তখন মাত্র সেসব মদই বাজারে ছিল যা ব্যবসার জন্যে রাখা হয়েছিল। এ আদেশ পালনকল্পে সাহাবিগণ বিনা দ্বিধায় নির্ধারিত স্থানে সব মদ একত্রিত করেছিলেন।

হুযুর (সাঃ) স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে শরাবের অনেক পাত্র ভেঙ্গে ফেললেন এবং অবশিষ্টগুলো সাহাবিগণের দ্বারা ভাঙ্গিয়ে দিলেন। জনৈক সাহাবী মদের ব্যবসা করতেন এবং সিরিয়া থেকে মদ আমদানী করতেন। ঘটনাচক্রে তখন তিনি মদ আনার উদ্দেশে সিরিয়া গিয়েছিলেন। যখন তিনি ব্যবসায়ের এ পণ্য নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মদীনায় প্রবেশ করার পূর্বেই মদ হারাম হওয়ার সংবাদ তাঁর কানে পৌঁছল, তখন সে সাহাবীও তাঁর সমুদয় মাল- যা অনেক মুনাফার আশায় আনা হয়েছিল, এক পাহাড়ের পাদদেশে রেখে এসে হুযুরে-আকরাম (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এসব সম্পদের ব্যাপারে কি করতে হবে তৎসম্পর্কে নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। মহানবী (সাঃ) হুকুম করলেন—মটকাগুলো ভেঙ্গে সমস্ত শরাব ভাসিয়ে দাও। অতঃপর বিনা আপত্তিতে তিনি তাঁর সমস্ত পুঁজির বিনিময়ে সংগৃহীত এ পণ্য স্বহস্তে মাটিতে ঢেলে দিলেন। এটাও ইসলামের মু'জেযা এবং সাহাবিগণের বিস্ময়কর আনুগত্যের নিদর্শন, যা এ ঘটনায় প্রমাণ হল। যে জিনিসের অভ্যাস হয়ে যায়, সবাই জানে যে, তা ত্যাগ করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। মদ্যপানে তাঁরা এমন অভ্যস্ত ছিলেন যে, অল্পদিন তা থেকে বিরত থাকাও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। কিন্তু নবী করীমের (সাঃ) একটিমাত্র নির্দেশই তাঁদের অভ্যাসে এমন অপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করল যে, তারপর থেকে তাঁরা শরাবের প্রতি তেমনি ঘৃণা পোষণ করতে লাগলেন, যেমন পূর্বে তাঁরা এর প্রতি আসক্ত ছিলেন।

ইসলামী রাজনীতি এবং সাধারণ রাজনীতির পার্থক্য ঃ আলোচ্য আয়াতে ও ঘটনাসমূহে শরাব হারাম হওয়ার আদেশের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্যের একটা নমুনা দেখা গেল। একে ইসলামের মু'জেযা বা নবী করীম (সাঃ)-এর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অথবা ইসলামী রাজনীতির অপরিহার্য ফলশ্রুতিও বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ নেশার অভ্যাস ত্যাগ করা যে অত্যন্ত কঠিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তদুপরি আরবদেশের কথা তো স্বতন্ত্র, সেখানে এর প্রচলন এত বেশী ছিল যে, মদ ছাড়া কয়েক ঘন্টা কাটানোও তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় তা কি পরশপাথর ছিল যে, মাত্র একটি ঘোষণার শব্দ কানে পৌঁছামাত্র তাঁদের স্বভাবে এ আমূল পরিবর্তন সাধিত হল। সে একটি মাত্র ঘোষণাই তাঁদের অভ্যাসে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল যে, কয়েক মিনিট পূর্বে যে জিনিস এত প্রিয় এবং এত লোভনীয় ছিল, অল্প কয়েক মিনিট পরে তাই অত্যন্ত ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য পরিগণিত হয়ে গেল।

অপরদিকে বর্তমান যুগের তথাকথিত উন্নত মানের রাজনীতির একটি উদাহরণ সামনে রেখে দেখা যাক। আজ থেকে কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং সমাজসংস্কারকগণ মদ্যপানের মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলো অনুধাবন করে দেশে মদ্যপানকে আইন করে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আর এজন্যে জনমত গঠনের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসাবে অভিহিত প্রচারের আধুনিকতম যন্ত্রগুলোও ব্যবহার করা হয়েছিল। সবগুলো প্রচার-মাধ্যমই মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। শত শত সংবাদপত্রে নিবন্ধ প্রকাশিত হলো, পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হল, লক্ষ লক্ষ পুস্তক ছেপে প্রচার ও বিতরণ করা হল। তাছাড়া আমেরিকার সংসদেও এজন্য আইন পাশ করা হল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমেরিকার যে অবস্থা মানুষের সামনে এবং সেখানকার সরকারী প্রতিবেদনের মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে এসেছে, তা হল এই যে, এই আধুনিক উন্নত ও শিক্ষিত জাতি সেই আইনগত নিষেধাজ্ঞার সময়টিতে সাধারণ সময়ের চাইতেও অধিক মাত্রায় মদ্যপান করেছে। এমনকি অবশেষে সরকার এ আইন বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়।

তদানীন্তন আরবের মুসলমান এবং আধুনিক আমেরিকার উন্নত জাতির মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই বিরাট পার্থক্যের প্রকৃত কারণ ও রহস্য কি?

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, ইসলামী শরীয়ত মানুষের সংশোধনের জন্য শুধু আইনকেই পর্যাপ্ত মনে করেনি। বরং আইনের পূর্বে তাদের মন-মস্তিষ্ককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, এবাদত-আরাধনা এবং পরকালের চিন্তা নামক পরশমনির পরশে মনোজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। যার ফলে রসূল (সাঃ)-এর একটিমাত্র আহবানেই তারা স্বীয় জান-মাল, শান-শওকত সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। মক্কী জীবনে এই মানুষ তৈরীর কাজই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলতে থাকে। এভাবে আত্মত্যাগীদের একটা বিরাট দল তৈরী হয়ে গেল।

তারপর প্রণয়ন করা হলো আইন। পক্ষান্তরে মানুষের মনের পরিবর্তনের জন্য আমেরিকার সরকার অসংখ্য উপায় অবলম্বন করেছে। তাদের নিকট সবকিছুই ছিল, কিন্তু ছিল না পরকালের চিন্তা। অপরদিকে মুসলমানদের প্রতিটি শিরা-উপশিরাও ছিল পরকালের চিন্তায় পরিপূর্ণ।

আজও যদি সমস্যাকাতর দুনিয়ার মানুষ সে পরশমণি ব্যবহার করে দেখেন, তবে অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, অতি সহজেই সারা বিশ্বে শান্তি-শৃংখলা ফিরে এসেছে।

মদ্যপানের অপকারিতা ও উপকারিতার তুলনা ঃ এ আয়াতে মদ ও জুয়া উভয় বস্তু সম্পর্কেই কোরআন বলেছে যে, এতে কিছু উপকারিতাও রয়েছে, তবে বেশ কিছু অপকারিতাও বর্তমান—কিন্তু এর উপকারিতার তুলনায় অপকারিতার মাত্রা অনেক বেশী। তাই একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, এর উপকারিতা এবং অপকারিতাগুলো কি কি? অতঃপর দেখতে হবে, উপকারিতার তুলনায় অপকারিতা বেশী হওয়ার কারণ কি? সবশেষে ফেকাহ্‌র কয়েকটি মূলনীতি বর্ণণা করা হবে, যেগুলো এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়।

প্রথমে শরাব সম্পর্কে আলোচনা করা যাক ঃ এর উপকারিতার কথা বলতে গেলে-শরাব পানে আনন্দ লাভ হয়, সাময়িকভাবে শক্তিও কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে কিছুটা লাবণ্যও সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ নগণ্য উপকারিতার তুলনায় এর ক্ষতির দিকটা এত বিস্তৃত ও গভীর যে, অন্য কোন বস্তুতেই সচরাচর এতটা ক্ষতি দেখা যায় না। শরাবের প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মানুষের হজমশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, খাদ্যস্পৃহা কমে যায়, চেহারা বিকৃত হয়ে পড়ে, স্নায়ু দুর্বল হয়ে আসে। সামগ্রিকভাবে শারীরিক সক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একজন জার্মান ডাক্তার বলেছেন,—যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত তারা চল্লিশ বছর বয়সে ষাট বছরের বৃদ্ধের মত অকর্মণ্য হয়ে পড়ে এবং তাদের শরীরের গঠন এত হাল্কা হয়ে যায় যে, ষাট বছরের বৃদ্ধেরও তেমনটি হয় না। শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে অল্প বয়সে বৃদ্ধের মত বেকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া শরাব লিভার এবং কিডনীকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে ফেলে। যক্ষ্মা রোগ মদ্যপানেরই একটা বিশেষ পরিণতি। ইউরোপের শহরাঞ্চলে যক্ষ্মার আধিক্যের কারণও অতিমাত্রায় মদ্যপান। সেখানকার কোন কোন ডাক্তার বলেছেন, ইউরোপে অধিক মৃত্যুর কারণই হচ্ছে যক্ষ্মা। যখন থেকে ইউরোপে মদপানের আধিক্য দেখা দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাবও দেখা দিয়েছে।

এগুলো হচ্ছে মানবদেহে মদের সাধারণ প্রতিক্রিয়া। বস্তুতঃ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবাই অবগত। সবাই জানেন যে, মানুষ যতক্ষণ নেশাগ্রস্ত থাকে, ততক্ষণ তার জ্ঞান-বুদ্ধি কোন কাজই করতে পারে না। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানিগণের অভিমত হচ্ছে এই যে, নেশার অভ্যাস মানুষের বোধশক্তিকেও দুর্বল করে দেয়। যার প্রভাব চৈতন্য ফিরে পাবার পরেও ক্রিয়াশীল থাকে। অনেক সময় এতে মানুষ পাগলও হয়ে যায়। চিকিৎসাবিদগণের সবাই এতে একমত যে, শরাব কখনও শরীরের অংশে পরিণত হয় না, এতে শরীরে রক্তও সৃষ্টি হয় না; রক্তের মধ্যে একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মাত্র। ফলে সাময়িকভাবে শক্তির সামান্য আধিক্য অনুভূত হয়। কিন্তু হঠাৎ রক্তের এ উত্তেজনা অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যেসব শিরা ও ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে, মদ্যপানের দরুন সেগুলো শক্ত ও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে দ্রুতগতিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসতে থাকে। শরাবের দ্বারা মানুষের গলদেশ এবং শ্বাসনালীরও প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে স্বর মোটা হয়ে যায় এবং স্থায়ী কফ হয়ে থাকে, তারই ফলে শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি হয়। শরাবের প্রতিক্রিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানদের উপরও পড়ে। মদ্যপায়ীদের সন্তান দুর্বল হয় এবং অনেকে তাতে বংশহীনও হয়ে পড়ে।

একথাও স্মরণযোগ্য যে, মদ্যপানের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ নিজের মধ্যে চঞ্চলতা ও স্ফূর্তি এবং কিছুটা শক্তি অনুভব করে। ফলে তারা ডাক্তার-হাকীমদের মতামতকে পাত্তা দিতে চায় না। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, শরাব এমন একটি বিষাক্ত দ্রব্য, যার বিষক্রিয়া পর্যায়ক্রমিকভাবে দৃশ্যমান হতে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলো প্রকাশ পায়।

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এটা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে এবং এ শত্রুতা ও বিরোধ মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এই অনিষ্টকারিতাই সবচাইতে গুরুতর। সুতরাং কোরআন সূরা মায়েদার এক আয়াতে বলছে ঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

অর্থাৎ, 'শয়তান শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায়।'

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, মদ্যপান করে যখন মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন সে নিজের গোপন কথাও প্রকাশ করে দেয়। যার পরিণাম অনেক সময় অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়। বিশেষ করে সে ব্যক্তি যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে, তবে তার দ্বারা বেফাঁসভাবে কোন গোপন তথ্য প্রকাশিত হওয়ার ফলে সারা দেশেই পরিবর্তন ও বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। দেশের রাজনীতি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের কৌশলগত গোপন তথ্য শত্রুর হাতে চলে যেতে পারে। বিচক্ষণ গুপ্তচরেরা এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে।

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, সে মানুষকে পুতুলে পরিণত করে দেয়; যাকে দেখলে বাচ্চারা পর্যন্ত উপহাস করতে থাকে। কেননা, তার কাজ ও চাল-চলন সবই তখন অস্বাভাবিক হয়ে যায়। শরাবের আরও একটি মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে এই যে, এটি খেয়ানতের মতো।

শরাব মানুষকে সকল মন্দ থেকে মন্দতর কাজে চালিত করে। ব্যভিচার ও নরহত্যার অধিকাংশই এর পরিণাম। আর এ জন্য অধিকাংশ শরাবখানাই ব্যভিচার, যেনা ও হত্যাকাণ্ডের আখড়ায় পরিণত হয়। এসব হচ্ছে মানুষের শারীরিক ক্ষতি, আর রূহানী ক্ষতি তো সুপরিজ্ঞাত যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া চলে না। অন্য কোন এবাদত অথবা আল্লাহ্‌র কোন যিকির করাও সম্ভব হয় না। সে জন্যই কোরআন করীমে এরশাদ হয়েছে— শরাব তোমাদিগকে আল্লাহ্ স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখে।

এখন রইল আর্থিক ক্ষতির দিকটি। যদি কোন এলাকায় একটি শরাবখানা খোলা হয়, তবে তা সমস্ত এলাকার টাকা-পয়সা লুটে নেয়, একথা সর্বজনবিদিত। এ ব্যয়ের পরিমাণ ও পর্যায় বহু রকমের। একজন বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদের সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী শুধু একটি শহরে শরাবের মোট ব্যয় সামগ্রিক জীবনযাত্রার অন্যান্য সকল ব্যয়ের সমান।

এই হলো শরাবের ধর্মীয়, পার্থিব, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা, যা রসূল (সাঃ) একটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন — ام الفواحش وام الخبائث অর্থাৎ, 'শরাব সকল মন্দ ও অশ্লীলতার জননী।' এ প্রসঙ্গে জনৈক জার্মান ডাক্তারের মন্তব্য প্রবাদ বাক্যের মতই প্রসিদ্ধ। তিনি বলেছেন, যদি অর্ধেক শরাবখানা বন্ধ করে দেয়া হয়, তবে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, অর্ধেক হাসপাতাল ও অর্ধেক জেলখানা আপনা থেকেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।— (তফসীরে আল-মানার ঃ মুফতী আবদুহু-পৃঃ ২২৬, জিলদ ২)

আল্লামা তানতাবী (রাহঃ) আল-জাওহারে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—ফ্রান্সের জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত হেনরী তাঁর গ্রন্থ 'খাওয়াতির ও সাওয়ানিহ ফিল ইসলাম'-এ লিখেছেন,—'প্রাচ্যবাসীকে সমূলে উৎখাত করার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এবং মুসলমানদেরকে খতম করার জন্য নির্মিত দু'ধারী তলোয়ার ছিল এই 'শরাব'। আমরা আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত আমাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের ব্যবহৃত অস্ত্রে মুসলমানরা ব্যাপকভবে প্রভাবিত হয়নি'; ফলে তাদের বংশ বেড়েই চলেছে। এরাও যদি আমাদের সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিত, যেভাবে তাদের একটি বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী তা গ্রহণ করে নিয়েছে, তাহলে তারাও আমাদের কাছে পদানত ও অপদস্থ হয়ে পড়ত। আজ যাদের ঘরে আমাদের সরবরাহকৃত শরাবের প্রবাহ বইছে, তারা আমাদের কাছে এতই নিকৃষ্ট ও পদদলিত হয়ে গেছে যে, তারা মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারছে না।'

জনৈক বৃটিশ আইনজ্ঞ ব্যান্টাম লেখেন,—'ইসলামী শরীয়তের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এও একটি বৈশিষ্ট যে, এতে মদ্যপান নিষিদ্ধ। আমরা দেখেছি, আফ্রিকার লোকেরা যখন এর ব্যবহার শুরু করে, তখন থেকেই তাদের বংশে 'উন্মাদনা' সংক্রমিত হতে শুরু করেছে। আর ইউরোপের যেসব লোক এই পদার্থটিতে চুমুক দিতে শুরু করেছে, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিরও বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। কাজেই আফ্রিার লোকদের জন্যে যেমন এর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন, তেমনি ইউরোপের লোকদের জন্যও এ কারণে কঠিন শাস্তি বিধান করা দরকার।

সারকথা, যে কোন সৎলোক যখনই শীতল মস্তিষ্কে এ ব্যাপারে চিন্তা করেছেন, তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে উঠেছেন যে, 'এটি অপবিত্র বস্তু, এ যে শয়তানী কাজ, এ যে হলাহল—ধ্বংসের উপকরণ। এই 'উম্মুল-খাবায়েস' বা সকল অকল্যাণের মাতার ধারে-কাছেও যেয়ো না; ফিরে এসো فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত কোরআনের চারটি আয়ত উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা নাহ্‌লের আরো এক জায়গায় নেশাকর দ্রব্যাদির আলোচনা অন্য ভঙ্গিতে করা হয়েছে। সে বিষয়টিও এখানেই আলোচনা করে ফেলা বাঞ্ছনীয় হবে বলে মনে হয়। যাতে শরাব ও অন্যান্য যাবতীয় নেশাকর দ্রব্যাদি সম্পর্কে কোরআনী বর্ণনাগুলো মোটামুটিভাবে সামনে এসে যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে এই ঃ

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

অর্থাৎ, আর খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা তোমরা নেশাকর দ্রব্য এবং উত্তম আহার্য প্রস্তুত করে থাক; নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য বড় প্রমাণ রয়েছে।

তফসীর ও ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার ঐ সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষের খাদ্যরূপে দান করে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি মহিমার পরিচয় দিয়েছেন। এতে প্রথমে দুধের কথা বলা হয়েছে। যাকে আল্লাহ্ তাআলা জন্তুর পেটের মধ্যে রক্ত ও মলমূত্রের সংমিশ্রণ থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন খাদ্য হিসাবে দান করেছেন। ফলে মানুষকে কোন কিছুই করতে হয় না। এজন্য এখানে نُّسْقِيكُم শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমি তোমাদিগকে দুধ পান করিয়ে থাকি। অতঃপর বলা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের দ্বারাও মানুষ কিছু খাদ্যবস্তু তৈরী করে থাকে, যাতে তাদের উপকার হয়। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা নিজেদের জন্য লাভজনক খাদ্য প্রস্তুতে মানুষের শিল্পজ্ঞানের কিছুটা হাত রয়েছে। আর এই দক্ষতার ফলে দুরকমের খাদ্য তৈরী হয়েছে। একটি হল নেশাজাত দ্রব্য, যাকে মদ বা শরাব বলা হয়। দ্বিতীয়টি হলো উৎকৃষ্ট খাদ্য। অর্থাৎ, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা অবস্থায় আহার করা অথবা শুকিয়ে ব্যবহার করা। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পূর্ণ কুদরতের মাধ্যমে মানুষকে খেজুর ও আঙ্গুর দান করেছেন এবং তার দ্বারা নিজেদের খাদ্যদ্রব্য তৈরীর কিছুটা অধিকারও তিনি মানুষকে প্রদান করেছেন। এখন তাদের অভিপ্রায় ও ইচ্ছা, তারা কি প্রস্তুত করবে। নেশাজাত দ্রব্য তৈরী করে নিজেদের বুদ্ধিকে বিকল করবে, না উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে শক্তি অর্জন করবে?

এ তফসীরের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত দ্বারা নেশাজাত দ্রব্যকে হালাল বলার দলীল দেয়া যাবে না। এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ তাআলার দানসমূহ এবং তার ব্যবহারের বিভিন্ন দিক ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা, যা যে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র নেয়ামত। যথা, সমস্ত আহার্য এবং মানুষের জন্য উপকারী বস্তুকে অনেকে না-জায়েয পথে ব্যবহার করে। কিন্তু কারো ভুলের জন্য আল্লাহ্‌র নেয়ামত তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে পারে না। অতঃপর এখানে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন,—কোন্ পথে ব্যবহার হালাল এবং কোন্ পথে ব্যবহার হারাম। তবু আল্লাহ্ তাআলা এভাবে সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, নেশার বিপরীতে 'উৎকৃষ্ট খাদ্য' বলা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় যে, নেশা ভাল বিষয় নয়। অধিকাংশ মুফাসসের নেশাযুক্ত বস্তুকেও 'সুকর' (سكر) বলেছেন।— (রূহুল মা'আনী, কুরতুবী, জাস্‌সাস)

গোটা মুসলিম উম্মতের মতে এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মদ্যপান হারাম হওয়ার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত পরবর্তী সময়ে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যদিও শরাব হালাল ছিল এবং মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই তা পান করতেন, কিন্তু তখনও এ আয়াতে এদিকে ইশারা করা হয়েছিল যে, এটি পান করা ভাল নয়। তারপর অত্যন্ত কঠোরতার সাথে শরাবকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।— (জাস্‌সসা ও কুরতুবী)

জুয়ার অবৈধতা ঃ ميسر একটি ধাতু। এর অভিধানিক অর্থ বণ্টন করা। ياسر বলা হয় বন্টনকারীকে। জাহেলিয়াত আমলে নানা রকম জুয়ার প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে এক প্রকার জুয়া ছিল এই যে, উট জবাই করে তার অংশ বন্ট করতে গিয়ে জুয়ার আশ্রয় নেয়া হতো। কেউ একাধিক অংশ পেতো আবার কেউ বঞ্চিত হতো। বঞ্চিত ব্যক্তিকে উটের পূর্ণ মূল্য দিতে হতো, আর গোশত দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হতো; নিজেরা ব্যবহার করতো না।

এ বিশেষ ধরনের জুয়ায় যেহেতু দরিদ্রের উপকার ছিল এবং খেলোয়াড়দের দানশীলতা প্রকাশ পেত, তাই এ খেলাতে গর্ববোধ করা হতো। আর যারা এ খেলায় অংশগ্রহণ না করতো, তাদেরকে কৃপণ ও হতভাগ্য বলে মনে করা হতো। বণ্টনের সাথে সম্পর্কের কারণেই এরূপ জুয়াকে 'মাইসির' বলা হতো। সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়িগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সব রকমের জুয়াই 'মাইসির' শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরে এবং জাস্সাস 'আহকামুল-কোরআনে' লিখেছেন যে, মুফাস্সেরে কোরআন হযরত ইবনে-আব্বাস, ইবনে ওমর, কাতাদা, মোআবিয়া ইবনে সালেহ, আতা ও তাউস (রাঃ) বলেছেন ঃ

'সব রকমের জুয়াই 'মাইসির' এমনকি কাঠের গুটি এবং আখরোট দ্বারা বাচ্চাদের এ ধরনের খেলাও।' ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ من القمار المخاطرة লটারীও জুয়ারই অর্ন্তভুক্ত।' জাস্সাস ও ইবনে-সিরীন বলেছেন ঃ 'যে কাজে লটারীর ব্যবস্থা রয়েছে, তাও মাইসির এর অন্তর্ভুক্ত।'—(রূহুল-বয়ান)

مخاطرة 'মুখাতিরা' বলা হয় এমন লেনদেনকে, যার মাধ্যমে কেউ কেউ প্রচুর সম্পদ পেয়ে যায় এবং অনেকে কিছুই পায় না। আজকাল প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লটারীর সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে।

আজকাল নানা প্রকারের লটারী দেখা যায়। এসবই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত ও হারাম। মোটকথা, মাইসির ও কেমারের সঠিক সংজ্ঞা এই যে, যে ব্যাপারে কোন মালের মালিকানায় এমন সব শর্ত আরোপিত হয়, যাতে মালিক হওয়া না হওয়া উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে। আর এরই ফলে পূর্ণ লাভ কিংবা পূর্ণ লোকসান উভয় দিকই বজায় থাকবে।— (শামী পৃঃ ৩৫৫, ৫ম খণ্ড)

উদাহরণতঃ এতে যায়েদ অথবা ওমরের যে কোন একজনকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। এ সবের যত প্রকার ও শ্রেণী অতীতে ছিল, বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টি হতে পারে, তার সবগুলোকে মাইসির, কেমার এবং জুয়া বলা যেতে পারে। বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের শব্দ-প্রতিযোগিতা এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে লটারীর যতগুলো পদ্ধতি রয়েছে, এ সবই কেমার ও মাইসির-এর অন্তর্ভুক্ত।

তবে যদি শুধু একদিক থেকে পুরস্কার নির্ধারণ করা হয়— যেমন, যে ব্যক্তি অমুক কাজ করবে, তাকে পুরস্কার দেয়া হবে। আর এতে যদি কোন চাঁদা নেয়া না হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। কেননা, এটা লাভ ও লোকসানের মাঝে পরিক্রমণশীল নয়, বরং লাভ হওয়া ও লাভ না হওয়ার মধ্যেই সীমিত।

এ জন্য সহীহ্ হাদীসে দাবা ও ছক্কা-পাঞ্জা জাতীয় খেলাকেও হারাম বলা হয়েছে। কেননা, এসবেও অনেক ক্ষেত্রেই টাকা-পয়সার বাজি ধরা হয়ে থাকে। তাস খেলায় যদি টাকা-পয়সার হার-জিত শর্ত থাকে, তবে তাও হারাম।

মুসলিম শরীফে বারীদা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে-আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছক্কা-পাঞ্জা খেলে সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তে স্বীয় হস্ত রঞ্জিত করে। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, ছক্কা-পাঞ্জাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন যে,— দাবা ছক্কা-পাঞ্জা খেলা অপেক্ষাও খারাপ।— (ইবনে-কাসীর)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে শরাবের ন্যায় জুয়াও হালাল ছিল। মক্কায় যখন সূরা রূমের غُلِبَتِ الرُّوْمُ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং কোরআন ঘোষণা করে যে, এখন রোম যদিও তাদের প্রতিপক্ষ কেসরার কাছে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তারা কয়েক বছরের মধ্যেই জয়লাভ করবে। তখন মক্কার মুশরিকরা তা অবিশ্বাস করে। সে সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) মুশরিকদের সাথে বাজি ধরলেন যে, যদি কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসীরা জয়লাভ করে, তবে তোমাদেরকে এ পরিমাণ মাল পরিশোধ করতে হবে। এ বাজি মুশরিকরা গ্রহণ করল। ঠিক কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসীরা জয়লাভ করল। শর্তানুযায়ী হযত আবু বকর (রাঃ) তাদের নিকট থেকে মাল আদায় করে রসূল (রাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। হুযূর (সাঃ) ঘটনা শুনে খুশী হলেন, কিন্তু মালগুলো সদকা করে দিতে আদেশ দিলেন।

কেননা, যে বস্তু আগত দিনে হারাম হবে, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো হালাল থাকাকালেও স্বীয় রসূল (সাঃ)-কে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এজন্যই তিনি শরাব ও জুয়া থেকে সর্বদা বেঁচে রয়েছেন এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীও তা থেকে সর্বদা নিরাপদে রয়েছেন। এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূল (সাঃ)-কে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, হযরত জাফর (রাঃ)-এর চারটি অভ্যাস আল্লাহ্র নিকট অতি প্রিয়। হুযূর (সাঃ) জাফর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন,—তোমার চারটি অভ্যাস কি কি? তিনি উত্তর দিলেন, আজ পর্যন্ত আমার এ চারটি অভ্যাস কাউকেই বলিনি। আল্লাহ্ যখন আপনাকে জানিয়েই দিলেন তখন বলতে হয়। তা হচ্ছে এই, আমি দেখেছি যে, শরাব মানুষের বুদ্ধি বিলুপ্ত করে দেয়, তাই আমি কোন দিনও শরাব পান করিনি। মূর্তির মধ্যে মানুষের ভাল-মন্দ কোনটাই করার ক্ষমতা নেই বলে জাহেলিয়াত আমলেও আমি কোন দিন মূর্তিপূজা করিনি। আমার স্ত্রী ও মেয়েদের ব্যাপারে আমার মধ্যে সম্ভ্রমবোধ অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে, তাই আমি কোন দিনও যেনা করিনি। আমি দেখেছি যে, মিথ্যা বলা অত্যন্ত মন্দ কাজ, তাই আমি কোন দিনও মিথ্যা কথা বলিনি।— (রূহুল-বয়ান)

জুয়ার সামাজিক ও সামগ্রিক ক্ষতি ঃ জুয়া সম্পর্কে কোরআন মজীদ শরাব বিষয়ে প্রদত্ত আদেশেরই অনুরূপ বিধান প্রদান করেছে যে, এতে কিছুটা উপকারও রয়েছে, কিন্তু ক্ষতি অনেক বেশী। এর লাভ সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। যদি খেলায় জয়লাভ করে, তবে একজন দরিদ্র লোক একদিনেই ধনী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এর আর্থিক, সামাজিক এবং আত্মিক ক্ষতি সম্পর্কে অনেক কম লোকই অবগত। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেয়া হচ্ছে। জুয়া খেলা একজনের লাভ এবং

অপরজনের ক্ষতির উপর পরিক্রমণশীল। জয়লাভকারীর কেবল লাভই লাভ; আর পরাজিত ব্যক্তির ক্ষতিই ক্ষতি। কেননা, এ খেলায় একজনের মাল অন্যজনের হাতে চলে যায়। এজন্য জুয়া সামগ্রিকভাবে জাতির ধ্বংস এবং মানব চরিত্রের অধঃপতন ঘটায়। যে ব্যক্তি এতে লাভবান হয়, সে পরোপকারের ব্রত থেকে দূরে সরে রক্ত-পিপাসুতে পরিণত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তির মৃত্যু এগিয়ে আসে, অথচ প্রথম ব্যক্তি আয়েশ বোধ করতে থাকে এবং নিজের পূর্ণ সামর্থ্য এতে ব্যয় করে। ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য এর বিপরীত। কেননা, এতে উভয়পক্ষের লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা থাকে। ব্যবসা দ্বারা মাল হস্তান্তরে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং উভয় পক্ষই এতে লাভবান হয়ে থাকে।

জুয়ার একটি বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, জুয়াড়ী প্রকৃত উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকে। কেননা, তার একমাত্র চিন্তা থাকে যে, বসে বসে একটি বাজির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যেই অন্যের মাল হস্তগত করবে, যাতে কোন পরিশ্রমের প্রয়োজনই নেই। কোন কোন মনীষী সর্বপ্রকার জুয়াকেই 'মাইসির' বলেছেন। কারণস্বরূপ বলেছেন যে, এতে অতি সহজে অন্যের মাল হস্তগত হয়। জুয়া খেলা যদি দু'চার জনের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাতেও আলোচ্য ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বর্তমান যুগ, যাকে অনভিজ্ঞ, দূরদর্শিতাবিহীন মানুষ উন্নতির যুগ বলে অভিহিত করে থাকে, নতুন নতুন ও রকমারি শরাব বের করে নতুন নতুন নাম দিচ্ছে, স্বাদেরও নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে নানা পদ্ধতিতে তার প্রচলন ঘটাচ্ছে, অনুরূপভাবে জুয়ারও নানা প্রকার পন্থা বের করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেক দিক রয়েছে যা সামগ্রিক। এসব নতুন পদ্ধতিতে সম্মিলিতভাবে গোটা জাতির কাছ থেকে কিছু কিছু করে টাকা নেয়া হয় এবং ক্ষতিটা সকলের মধ্যে বন্টন করা হয়। ফলে তা দেখার মত কিছু হয় না। আর যে ব্যক্তি এ অর্থ পায়, তা সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ফলে অনেকেই তার ব্যক্তিগত লাভ লক্ষ্য করে জাতির সমষ্টিগত ক্ষতির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। এ জন্য অনেকেই এ নতুন প্রকারের জুয়া জায়েয বলে মনে করে। অথচ এতেও সেসব ক্ষতিই নিহিত, যা সীমিত জুয়ায় বিদ্যমান। একদিক দিয়ে জুয়ার এই নতুন পদ্ধতি প্রাচীন পদ্ধতির জুয়া অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর এবং এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী ও সমগ্র জাতির পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এর ফলে জাতির সাধারণ মানুষের সম্পদ দিন দিন কমতে থাকে; আর কয়েকজন পুঁজিপতির মাল বাড়তে থাকে। এতে সমগ্র জাতির সম্পদ কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পথ খুলে যায়।

পক্ষান্তরে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার বিধান হচ্ছে এই যে, যেসব ব্যবস্থায় সমগ্র জাতির সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির হাতে জমা হওয়ার পথ খোলে, সে সবগুলো পন্থাই হারাম। এ প্রসঙ্গে কোরআন ঘোষণা করেছেঃ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

অর্থাৎ, সম্পদ বন্টন করার যে নিয়ম কোরআন নির্ধারণ করেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, ধন-দৌলত যেন কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে।

তাছাড়া জুয়ার আরো একটা ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, জুয়াও শরাবের মত পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। পরাজিত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই জয়ী ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং জুয়া সমাজ ও সভ্যতার জন্য অত্যন্ত মারাত্মক বিষয়। কাজেই, কোরআন শরীফ বিশেষভাবে এ ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছে।

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

অর্থাৎ, শয়তান শরাব ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়।

ফিকাহ্ শাস্ত্রের কয়েকটি নিয়ম ঃ এ আয়াতে শরাব ও জুয়ার কিছু আপাত উপকারের কথা স্বীকার করেও তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যার ফলে বোঝা গেল যে, কোন বস্তু কিংবা কোন কাজে দুনিয়ার সাময়িক উপকার বা লাভ থাকলেই শরীয়ত একে হারাম করতে পারে না, এমন কথা নয়। কেননা, যে খাদ্য বা অষুধে উপকারের চাইতে ক্ষতি বেশী, তাকে কোন অবস্থাতেই প্রকৃত উপকারী বলে স্বীকার করা যায় না। অন্যথায় পৃথিবীর সবচাইতে খারাপ বস্তুতেও কিছু না কিছু উপকার নিহিত থাকা মোটেও বিচিত্র নয়। প্রাণসংহারক বিষ, সাপ-বিচ্ছু বা হিংস্র জন্তুর মধ্যেও কিছু না কিছু উপকারিতার দিক অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে যেসব বস্তুতে উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশী, শরীয়ত সেগুলোকেও হারাম সাব্যস্ত করেছে। চুরি-ডাকাতি, যেনা-প্রতারণা এমন কি আছে, যাতে উপকার কিছুই নেই? কেননা, কিছু না কিছু উপকার না থাকলে কোন বুদ্ধিমান মানুষ এর ধারে-কাছেও যেতো না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এসব কাজে তারাই বেশী লিপ্ত, যারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলে বিবেচিত। তাতেই বুঝা যায় যে, প্রতিটি অন্যায় কাজেও কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই আছে। তবে যেহেতু এ সবের উপকারের চাইতে ক্ষতি মারাত্মক, এজন্য কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক এগুলোকে উপকারী বা হালাল বলবে না। ইসলামী শরীয়ত শরাব ও জুয়াকে এই ভিত্তিতেই হারাম বলে ঘোষণা করেছে।

ফিকাহ্র আর একটি আইন ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হয় যে, উপকার হাসিল করার চাইতে ক্ষতি রোধ করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া বিধেয়। অর্থাৎ, কোন একটি কাজে কিছু উপকারও হয়, আবার ক্ষতিও হয়, এক্ষেত্রে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লাভ ত্যাগ করতে হবে। এমন উপকার সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য যা ক্ষতি বহন করে।

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ
لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ
مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾
وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ وَ
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ
وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَ
بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن
تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

(২২০) দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়ে। আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, এতীম সংক্রান্ত হুকুম। বলে দাও, তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেয়া উত্তম আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। বস্তুতঃ অমঙ্গলকামী ও মঙ্গলকামীদেরকে আল্লাহ্ জানেন। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের উপর জটিলতা আরোপ করতে পারতেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞ। (২২১) আর তোমরা মুশরেক নারীদেরকে বিয়ে করোনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরেক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে। এবং তোমরা (নারীরা) কোন মুশরেকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরেকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা দোযখের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ্ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (২২২) আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন। (২২৩) তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্র সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাত করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও। (২২৪) আর নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহ্র নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিও না মানুষের সাথে কোন আচার-আচরণ থেকে, পরহেযগারী থেকে এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ সবকিছুই শুনেন, জানেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যে জাতিকে তাদের প্রথা-পদ্ধতিতে আসমানী কিতাবের অনুসারী মনে হয়, কিন্তু বিশ্বাস ও আকীদার দিক দিয়ে খুঁজে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, তারা আহলে-কিতাব নয়, সে জাতির স্ত্রীলোক বিয়ে করা জায়েয নয়। যেমন, আজকাল ইংরেজদেরকে সাধারণ মানুষ খ্রীস্টান বা নাসারা মনে করে ; অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের কোন কোন আকীদা সম্পূর্ণ মুশরেকদের অনুরূপ। তাদের অনেকেই আল্লাহ্র অস্তিত্বও স্বীকার করে না,ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়ত কিংবা আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জীলকেও আসমানী গ্রন্থ বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এমন ব্যক্তিগণ আহলে-কিতাব ঈসায়ী নয়। এসব দলে যে সমস্ত স্ত্রীলোক রয়েছে, তাদের বিয়ে করা বৈধ নয়। মানুষ অত্যন্ত ভুল করে যে, খোঁজ-খবর না নিয়েই পাশ্চাত্যের মেয়েদেরকে বিয়ে করে বসে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে প্রকাশ্যভাবে মুসলমান মনে করা হয়, কিন্তু তার আকীদা কুফর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, তার সাথে মুসলমান নারীর বিয়ে জায়েয নয়। আর যদি হয়ে যাওয়ার পর তার আকীদা এমনি বিকৃত হয়ে পড়ে তবে তাদের বিয়ে ছিন্ন হয়ে যাবে। আজকাল অনেকেই নিজের ধর্ম সম্পর্কে অন্ধ ও অজ্ঞ এবং সামান্য কিছুটা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেই স্বীয় ধর্মীয় আকীদা নষ্ট করে বসে। কাজেই প্রথমে ছেলের আকীদা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর বিয়ে সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা দেয়া মেয়েদের অভিভাবকদের উপর ওয়াজিব।

মুসলমান ও কাফেরের পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ ঃ আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুসলমান পুরুষের বিয়ে কাফির নারীর সাথে এবং কাফের পুরুষের বিয়ে মুসলমান নারীর সাথে হতে পারে না। কারণ, কাফের স্ত্রী-পুরুষ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কেননা, বৈবাহিক সম্পর্ক পরস্পরের ভালবাসা, নির্ভরশীলতা এবং একাত্মতায় পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তা ব্যতীত এ সম্পর্কে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। আর মুশরেকদের সাথে এ জাতীয় সম্পর্কের ফলে ভালবাসা ও নির্ভরশীলতার অপরিহার্য পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, তাদের অন্তরে কুফর ও শেরেকের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় অথবা কমপক্ষে কুফর ও শেরেকের প্রতি ঘৃণা তাদের অন্তর থেকে উঠে যায়। এর পরিণামে শেষ পর্যন্ত সেও কুফর ও শেরেকে জড়িয়ে পড়ে যার পরিণতি জাহান্নাম ! এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক জাহান্নামের দিকে আহবান করে। আল্লাহ্ তাআলা জান্নাত ও মাগফেরাতের দিকে আহবান করেন এবং পরিষ্কারভাবে নিজের আদেশ বর্ণনা করেন, যাতে মানুষ উপদেশ মত চলে। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন ঃ

প্রথমতঃ মুশরেক শব্দ দ্বারা সাধারণ অমুসলমানকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত কিতাবে বিশ্বাসী নারীরা এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ

তাই এখানে মুশরেক বলতে ঐসব বিশেষ অমুসলমানকেই বুঝানো হয়েছে, যারা কোন নবী কিংবা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, তাদের সাথে এরূপ সম্পর্কের ফলে কুফর ও শেরেকের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা

রয়েছে। কারণটি তো আপাতঃ দৃষ্টিতে সমস্ত অমুসলমানের বেলায়ই খাটে, এতদসত্ত্বেও কিতাবীদেরকে এ আদেশের আওতামুক্ত রাখার কারণ কি? উত্তর অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কিতাবীদের সাথে মুসলমানদের মতপার্থক্য অন্যান্য অমুসলমানদের তুলনায় ভিন্ন ধরনের। কেননা, ইসলামের আকীদার তিনটি দিক রয়েছেঃ তওহীদ, পরকাল ও রিসালত। তন্মধ্যে পরকালের আকীদার বেলায় কিতাবী নাসারা ও ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে একমত। তাছাড়া আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করাও তাদের প্রকৃত ধর্মমতে কুফর। অবশ্য তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি মহব্বত ও মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে যে শেরেক পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা ভিন্ন কথা।

এখন মৌলিক মতপার্থক্য শুধু এই যে, তারা হুযূর (সাঃ)-কে রসূল বলে স্বীকার করে না। অথচ ইসলাম ধর্মে এটি একটি মৌলিক আকীদা। এ আকীদা ব্যতীত কোন মানুষ মুসলমান হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও অন্যান্য অমুসলমানদের তুলনায় কিতাবীদের মতপার্থক্য মুসলমানদের সাথে অনেকটা কম। কাজেই তাদের সংস্পর্শে পথভ্রষ্টতার ভয়ও তুলনামূলকভাবে কম।

তৃতীয়তঃ কিতাবীদের সাথে মতপার্থক্য তুলনামূলকভাবে কম বলে তাদের মেয়েদের সাথে মুসলমান পুরুষের বিয়েকে জায়েয করা হলেও তার বিপরীত দিকে মুসলিম নারীদের সাথে কিতাবী অমুসলমানদের বিয়ের ব্যাপারটিও জায়েয হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একটু চিন্তা করলে পার্থক্যটা বোঝা যাবে। মেয়েরা প্রকৃতিগতভাবে কিছুটা দুর্বল। তাছাড়া স্বামীকে তার হাকেম বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে। তার আকীদা ও পরিকল্পনা দ্বারা মেয়েদের আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কাজেই মুসলমান নারী যদি অমুসলমান কিতাবীদের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে এতে তার বিশ্বাস ও আকীদা নষ্ট হয়ে যাওয়া খুবই সহজ। অপরদিকে অমুসলমান কিতাবী মেয়ের মুসলমান পুরুষের সাথে বিয়ে হলে তার প্রভাবে স্বামী প্রভাবিত না হয়ে বরং স্বামীর প্রভাবে স্ত্রীর প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে কোন অনিয়ম বা আতিশয্যে যদি লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তা তার নিজস্ব ত্রুটি।

চতুর্থতঃ বৈবাহিক সম্পর্ক যে প্রভাব বিস্তার করে তা উভয় পক্ষে একই রকম হয়ে থাকে। সুতরাং এতে যদি এরূপ আশা পোষণ করা হয় যে, মুসলমানদের আকীদায় অমুসলমানদের আকীদা প্রভাবিত হয়ে সে-ই মুসলমান হয়ে যাবে, তবে এর চাহিদা হচ্ছে এই যে, মুসলমান এবং অন্যান্য অমুসলমানদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক জায়েয হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, যখন কোন কিছুতে লাভের একটি দিকের পাশাপাশি ক্ষতিরও কারণ থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সুস্থবুদ্ধির চাহিদা অনুযায়ী ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা এবং সফলতা লাভের কাল্পনিক সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলাই উত্তম। হয়তো সে অমুসলমান প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, তবে সতর্কতার বিষয় হলো, মুসলমান প্রভাবিত হয়ে যেন কাফের না হয়ে যায়।

পঞ্চমতঃ কিতাবী ইহুদী ও নাসারা নারীদের সাথে মুসলমান পুরুষদের বিবাহের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি তাদেরকে বিবাহ করা হয়, তবে বিবাহ ঠিক হবে এবং স্বামীর পরিচয়েই সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু হাদীসে রয়েছে, এ বিবাহও পছন্দনীয় নয়। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করেছেন,-মুসলমান বিবাহের জন্য দ্বীনদার ও সৎ স্ত্রীর অনুসন্ধান করবে, যাতে করে সে তার ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্যকারিনীর ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে করে তাদের সন্তানদেরও দ্বীনদার হওয়ার সুযোগ মিলবে। যখন কোন অধার্মিক মুসলমান মেয়ের সাথে বিবাহ পছন্দ করা হয়নি, সেক্ষেত্রে অমুসলমান মেয়ের সাথে কিভাবে বিবাহ পছন্দ করা হবে? এ কারণেই হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) যখন সংবাদ পেলেন যে, ইরাক ও শাম দেশের মুসলমানদের এমন কিছু স্ত্রী রয়েছে এবং দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তখন তিনি ফরমান জারি করলেন যে, তা হতে পারে না। তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হলো যে, এটা বৈবাহিক জীবন তথা ধর্মীয় জীবনের জন্য যেমন অকল্যাণকর, তেমনি রাজনৈতিক দিক দিয়েও ক্ষতির কারণ।-(কিতাবুল-আসার, ইমাম মুহাম্মদ)

বর্তমান যুগের অমুসলমান কিতাবী, ইহুদী ও নাসারা এবং তাদের রাজনৈতিক ধোঁকা-প্রতারণা, বিশেষতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবাহ এবং মুসলমান সংসারে প্রবেশ করে তাদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করা এবং মুসলমানদের গোপন তথ্য জানার প্রচেষ্টা আজ স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে। তাদের রচিত অনেক গ্রন্থেও যার স্বীকারোক্তির উল্লেখ রয়েছে। মেজর জেনারেল আকবরের লেখা 'হাদীসে-দেফা' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা উদ্ধৃতিসহ করা হয়েছে। মনে হয় হযরত ওমর ফারূকের সুদূর প্রসারী দৃষ্টিশক্তি বৈবাহিক ব্যাপার সংক্রান্ত এ বিষয়টির সর্বনাশা দিক উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। বিশেষতঃ বর্তমানে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে যারা ইহুদী ও নাসারা নামে পরিচিত এবং আদম-শুমারীর খাতায় যাদেরকে ধর্মীয় দিক দিয়ে ইহুদী কিংবা নাসারা বলে লেখা হয়, যদি তাদের প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, খ্রীস্টান ও ইহুদীমতের সাথে তাদের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। তারা সম্পূর্ণতঃই ধর্ম বিবর্জিত। তারা ঈসা (আঃ)-কেও মানে না, তওরাতকেও মানে না, এমনকি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বও মানে না, পরকালকেও মানে না। বলাবাহুল্য, বিবাহ হালাল হওয়ার কোরআনী আদেশ এমন সব ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে না। তাদের মেয়েদের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে হারাম। বিশেষত ঃ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

আয়াতে যাদের বুঝানো হয়েছে আজকালকার ইহুদী-নাসারারা তার আওতায় পড়ে না। সে হিসেবে সাধারণ অমুসলমানদের মত তাদের মেয়েদের সাথেও বিবাহ করা হারাম।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ
بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ
مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ
عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾ وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ۗ وَلَا
يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ
تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ
اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ
فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ
وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

(২২৫) তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধরবেন না, কিন্তু সেসব কসমের ব্যাপারে ধরবেন, তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করেছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, ধৈর্যশীল। (২২৬) যারা নিজেদের শ্ত্রীদের নিকট গমন করবে না বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর যদি পারস্পরিক মিল-মিশ্ করে নেয়, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাকারী দয়ালু। (২২৭) আর যদি বর্জন করার সংকল্প করে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী। (২২৮) আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহ্র প্রতি এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েয নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন শ্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে শ্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীরদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (২২৯) তালাকে-'রাজঈ' হ' ল দুবার পর্যন্ত— তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয় তাদের কাছ থেকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও শ্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহ্র নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহ্র নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে শ্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই হলো জালেম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য

আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মাসআলা ঃ (১) চরম যৌন উত্তেজনা বশতঃ ঋতুকালীন অবস্থায় সহবাস অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে খুব ভাল করে তওবা করে নেয়া ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে সাথে কিছু দান খয়রাত করে দিলে তা উত্তম।

(২) পশ্চাদ পথে (অর্থাৎ—যোনিপথ ছাড়া গুহ্যদ্বার দিয়ে) নিজের শ্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হারাম।

(৩) 'লাগভ্-কসম'-এর দু'টি অর্থ—একটি হচ্ছে এই যে, কোন অতীত বিষয়ে মিথ্যা শপথ অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা বিষয়টিকে নিজের ধারণা মত সঠিক বলেই মনে করে না। উদাহরণতঃ— নিজের জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী কসম করে বসল যে,— 'যায়েদ এসেছে'। কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি। অথবা কোন ভবিষ্যত বিষয়ে এভাবে কসম করে বসলো যে, উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু অথচ অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'কসম' বেরিয়ে গেছে এ রকম,— এতে কোন পাপ হবে না। আর সে জন্যই একে 'লাগভ্' বা 'অহেতুক' বলা হয়েছে। আখেরাতে এজন্যে কোন জবাবদিহী করতে হবে না। যেসব কসমের জন্য জবাবদিহীর কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সে সব কসম যা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা জেনেই করা হয়। একে বলা হয় 'গমুস' এতে পাপ হয়। তবে ইমাম আজম আবু হানিফার (রহঃ) মতের প্রেক্ষিতে কোন কাফ্ফারা দিতে হয় না। আর উল্লিখিত অর্থে 'লাগভ' কসমের জন্যও কোন কাফ্ফারা নাই। এ আয়াতে এ দু রকমের কসম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

'লাগভ'এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যাতে কাফ্ফারা দিতে হয় না। আর একে 'লাগভ্ (অহেতুক) এজন্যে বলা হয় যে, এতে পার্থিব কোন কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্য করতে হয় না। এ অর্থে 'গমুস' কসমও এরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তাতে পাপ হলেও কোন রকম কাফ্ফারা দিতে হয় না। এতদুভয়ের তুলনায় যে কসমের প্রেক্ষিতে কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্য করতে হয়, তাকে বলা হয় 'মুনআকেদাহ্'। এর তাৎপর্য হলো যে, কেউ যদি— 'আমি অমুক কাজটি করব' কিংবা অমুক বিষয়টি সম্পাদন করব' বলে কসম খেয়ে তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে তাতে তাকে কাফ্ফারা দিতেই হবে।

(৪) যদি কসম খেয়ে বলে যে, আমি আমার শ্ত্রীর সাথে সহবাস করব না, তবে তার চারটি দিক রয়েছে ঃ

প্রথমতঃ কোন সময় নির্ধারণ করলো না।

দ্বিতীয়তঃ চার মাস সময়ের শর্ত রাখলো।

তৃতীয়ত ঃ চার মাসের বেশী সময়ের শর্ত আরোপ করলো। অথবা চতুর্থত ঃ চার মাসের কম সময়ের শর্ত রাখলো। বস্তুতঃ ১ম, ২য়, ও ৩য় দিকগুলোকে 'শরীয়তে' ঈলা বলা হয়। আর তার বিধান হচ্ছে, যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙ্গে শ্ত্রীর কাছে চলে আসে, তাহলে তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে, কিন্তু বিয়ে যথাস্থানে বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও কসম না ভাঙ্গে, তাহলে সে শ্ত্রীর উপর 'তালাকে-কাতয়ী' বা নিশ্চিত তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ, পুনঃর্বার বিয়ে ছাড়া শ্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া জায়েয থাকবে না। অবশ্য স্বামী-শ্ত্রী উভয়ের ঐকমত্যে পুনরায় বিয়ে করে নিলেই জায়েয হয়ে যাবে। আর চতুর্থ অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে এই যে, যদি কসম ভঙ্গ করে, তাহলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে কসম পূর্ণ করলেও বিয়ে যথাযথ অটুট

থাকবে।— (বয়ানুল-কোরআন)

স্ত্রী ও পুরুষের পার্থক্য এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও মর্যাদা ঃ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ আয়াতটি নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং সেগুলোর স্তর নির্ণয় সম্পর্কে একটি শরীয়তী মূলনীতি হিসেবে গণ্য। এ আয়াতের পূর্বাপর কয়েকটি রুকূতে এ মূলনীতিই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা ঃ ইসলাম নারী জাতিকে যে মর্যাদা প্রদান করেছে এখানে প্রথমেই তার যৎসামান্য বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। যা অনুধাবন করে নেয়ার পর নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি ন্যায়ানুগ ও মধ্যমপন্থী জীবন ব্যবস্থার চাহিদাও ছিল তাই এবং এটাই হচ্ছে সে স্থান বা মর্যাদা,যার কম-বেশী করা কিংবা যাকে অস্বীকার করা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির জন্যেই বিরাট আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দু'টি বস্তু রয়েছে যা গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব, সংগঠন এবং উন্নয়নের স্তম্ভস্বরূপ। তার একটি হচ্ছে নারী, অপরটি সম্পদ। কিন্তু চিত্রের অপর দিকটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ দুটো বস্তুই পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত এবং নানা রকম অনিষ্ট ও অকল্যাণেরও কারণ। আরও একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও কঠিন নয় যে, এ দুটো বস্তুই আপন প্রকৃতিতে পৃথিবীর গঠন, নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং উৎকর্ষের অবলম্বন। কিন্তু যখন এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, স্থান ও উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেয়া হয়, তখন এগুলোই দুনিয়ার সবচাইতে ভয়াবহ ধ্বংসকারিতার রূপ পরিগ্রহ করে।

কোরআন মানুষকে একটা জীবন-বিধান দিয়েছে। তাতে উল্লেখিত দুটো বস্তুকেই নিজ নিজ স্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাদের দ্বারা সর্বাধিক উপকারিতা ও ফলাফল হতে পারে এবং যাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিহ্নটিও না থাকে। সম্পদের যথার্থ স্থান, তা অর্জনের পন্থা, ব্যয় করার নিয়ম-পদ্ধতি এবং সম্পদ বন্টনের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা এসব একটা পৃথক বিষয় যাকে 'ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা বলা যেতে পারে।

এখন নারী সমাজ এবং তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে,— নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে, এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরী, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা অপরিহার্য। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশী।

প্রায় একই রকম বক্তব্য সূরা নিসার এক আয়াতে এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ঃ "যেহেতু আল্লাহ্ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কাজেই পুরুষেরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। আর এজন্য যে,তারা তাদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে থাকে।"

ইসলামপূর্ব সমাজে নারীর স্থান ঃ ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশী ছিল না। তখন চতুষ্পদ জীব-জন্তুর মত তাদেরও বেচা-কেনা চলত। নিজের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোন রকম মূল্য ছিল না; অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হতো। নারী তার আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ বা মীরাসের অধিকারিণী হতো না, বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হতো। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধীন; কোন জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোন স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হোত, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখল করার এতটুকু অধিকার তাদের ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীরূপী নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে খুশী, যেভাবে খুশী ব্যবহার করতে পারবে; তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিল না। এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়, সেগুলোতেও কোন কোন লোক এমনও ছিল, যারা নারীর মানব-সত্ত্বাকেই স্বীকার করতো না।

ধর্ম-কর্মেও নারীদের জন্য কোন অংশ ছিল না, তাদেরকে এবাদত-উপাসনা কিংবা বেহেশতের যোগ্যও মনে করা হতো না। এমনকি রোমের কোন কোন সংসদে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, এরা হল অপবিত্র এক জানোয়ার, যাতে আত্মার অস্তিত্ব নেই। সাধারণভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর দিয়ে দেয়াকে কৌলিণ্যের নিরিখ বলে মনে করা হতো। অনেকের ধারণা ছিল, নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুক না কেন, তাতে হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যুদন্ড কিংবা খুনের বদলা কোনটাই আরোপ করা ওয়াজিব হবে না। কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেই তার চিতায় আরোহণ করে জ্বলে মরতে হবে। মহানবী (সাঃ)-এর নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে ৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে ফরাসীরা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছিল যে, বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা এ প্রস্তাব পাশ করে যে, নারী প্রাণী হিসাবে মানুষই বটে, কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের সেবার উদ্দেশেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোটকথা, সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে আচরণ করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ অংশ ছিল অত্যন্ত অসহায়। তাদের ব্যাপারে বুদ্ধি ও যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যবস্থাই নেয়া হতো না।

'হযরত রাহ্মাতুল্লিল্ আলামীন' ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছেন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছে। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছেন এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরয করেছে। বিয়ে-শাদী ও ধন-সম্পদে তাদেরকে স্বত্বাধিকার দেয়া হয়েছে, কোন ব্যক্তি তিনি পিতা হলেও কোন প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না, এমনকি স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোন পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষেরা। তাদের সন্তুষ্টিবিধানকেও শরীয়তে মোহাম্মদী এবাদতের মর্যাদা দান করেছে। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে।

বর্তমান ফেৎনা-ফাসাদের মূল কারণঃ স্ত্রীলোককে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জঘন্য অন্যায়। ইসলাম এ অন্যায় প্রতিরোধ করেছে। আবার তাদেরকে বলগাহীনভাবে ছেড়ে দেয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেওয়াও নিরাপদ নয়। সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও ঘরের কাজ কর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়াও নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এজন্য কোরআনে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর উর্ধ্বে। অন্যকথায় বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। যেভাবে ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতের যুগে দুনিয়ার মানুষ স্ত্রীলোককে ঘরের আসবাবপত্র ও চতুষ্পদ জন্তুতুল্য বলে গণ্য করার ভুলে নিমগ্ন ছিল, অনুরূপভাবে মুসলমানদের বর্তমান পতনের পর জাহেলিয়াতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। এতে প্রথম ভুলের সংশোধন আর একটি ভুলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র বিশ্ব ঝগড়া-বিবাদ ও ফেৎনা-ফাসাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন এত বেড়ে গেছে যে, তা আজ সেই বর্বর যুগকেও হার মানিয়েছে। আরবদের মধ্যে একটা প্রবাদ রয়েছে—

الجاهل اما مفرط اومفرّط অর্থাৎ, "মূর্খ লোক কখনও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে না। যদি সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকে, তবে হীনমন্যতা ও সংকীর্ণতার পর্যায়ে চলে আসে।" বর্তমানে এমনি অবস্থা চলছে। যে নারীকে সব জাতি এক সময় মানুষ বলে গণ্য করতেও রাজী ছিল না, সে জাতিগুলোই এখন এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, পুরুষদের যে কর্তৃত্ব নারী সমাজ তথা গোটা দুনিয়ার জন্যেই একান্ত কল্যাণকর ছিল, সে কর্তৃত্ব বা তত্ত্বাবধায়কের ধারণাটুকুও একেবারে ঝেড়ে-মুছে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যার অশুভ পরিণতি প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, যতদিন পর্যন্ত আল-কোরআনের এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ফেৎনা দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। বর্তমান বিশ্বের মানুষ শান্তির অন্বেষায় নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন করে চলছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, অগণিত অর্থ ব্যয় করছে,কিন্তু যে উৎস থেকে ফৎনা-ফাসাদ ছড়াচ্ছে সেদিকে কারো লক্ষ্যই নেই।

যদি আজ ফেৎনা-ফাসাদের কারণ উদঘাটনের জন্য কোন নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করা হয়, তবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী সামাজিক অশান্তির কারণই দাঁড়াবে স্ত্রীলোকের বেপরোয়া চাল-চলন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে অহংপূজার প্রভাব বড় বড় বুদ্ধিমান দার্শনিকের চক্ষুকেও ধাঁধিয়ে দিয়েছে। অঙ্গ-অভিলাষের বিরুদ্ধে যে কোন কল্যাণকর চিন্তা বা পন্থাকেও সহ্য করা হয় না। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের অন্তরকে ঈমানের আলোতে আলোকিত করে রসূল (সাঃ)-এর উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

মাসআলা ঃ এ আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করার পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অপরদিকে নিজের অধিকার আদায় করার চাইতে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্নবান হবারও উপদেশ দেয়া হয়েছে। তা যদি হয়, তবে বিনা তাকিদেই প্রত্যেকের অধিকার রক্ষিত হবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেকেই স্বীয় অধিকার আদায় করতে তৎপর, অথচ নিজের দায়িত্বের প্রতি আদৌ সচেতন নয়। ফলে ঝগড়া-বিবাদই শুধু সৃষ্টি হতে থাকে।

যদি কোরআনের এ শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তবে ঘরে বাইরে অর্থাৎ, সারা বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করবে এবং ঝগড়া-বিবাদ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

নারী ও পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য ঃ সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা মানবচরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, সর্বোপরি স্ত্রীলোকদের সুবিধার্থেই পুরুষকে স্ত্রীলোকদের উপর শুধু কিছুটা প্রাধান্যই দেয়া হয়নি বরং তা পালন করাও ফরয করে দেয়া হয়েছে। এরই বর্ণনা اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ আয়াতে দেয়া হয়েছে। তাই বলে সকল পুরুষই সকল স্ত্রীলোকের উপর মর্যাদার অধিকারী নয়। কেননা, আল্লাহ্র নিকট মর্যাদার নিরিখ হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। সেখানে মর্যাদার তারতম্য ঈমান ও নেক আমলের তারতম্যের উপর হয়ে থাকে। তাই, পরকালের ব্যাপারে দুনিয়ার মত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। এক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, কোন কোন স্ত্রীলোক অনেক পুরুষের চাইতেও অধিক মর্যাদার যোগ্য।

উল্লেখিত ভূমিকার পরে আয়াতের শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা করা যাক। এরশাদ হয়েছে ঃ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ "তাদের অধিকার পুরুষের দায়িত্বে, যেভাবে পুরুষের অধিকার তাদের দায়িত্বে।" এতে স্ত্রীলোকের অধিকারের কথা পুরুষের অধিকারের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, পুরুষ তো নিজের ক্ষমতায় এবং খোদা প্রদত্ত মর্যাদার বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করেই নেয়, কিন্তু নারীদের অধিকারের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা, তারা শক্তি দ্বারা তা আদায় করতে পারে না।

এতে আরো একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পুরুষের পক্ষে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নারীদের অধিকার প্রদান করা উচিত। তাই مِثْلُ শব্দ ব্যবহার করে উভয়ের অধিকার ও কর্তব্যের সমতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক হতে হবে। কেননা, প্রকৃতিগতভাবেই তা ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে যে, উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য পালন সমভাবে ওয়াজিব। এ কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে অবহেলা করলে সমভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

লক্ষ্যণীয় যে, কোরআনের ছোট একটি বাক্যে দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের মত বিরাট বিষয়কে সন্নিবেশ করা হয়েছে। কেননা, এ আয়াতেই নারীর সমস্ত অধিকার পুরুষের উপর এবং পুরুষের সমস্ত অধিকার নারীর উপর অর্পণ করা হয়েছে। - (বাহরে-মুহীত) এ বাক্য শেষে بِالْمَعْرُوْفِ শব্দ ব্যবহার করে পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে এমন সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। বলা হচ্ছে যে, অধিকার আদায় প্রচলিত ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে হতে হবে। কারণ, 'মারুফ' শব্দের অর্থ এমন বিষয় যা শরীয়ত অনুযায়ী নাজায়েয নয় এবং সাধারণ নিয়ম ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী যাতে কোন রকম জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই। সারকথা, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য নিয়ম জারি করাই যথেষ্ট নয়,বরং প্রচলিত সাধারণ প্রথা-প্রচলনের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথা অনুযায়ী কারো আচরণ

অন্যের পক্ষে কষ্টের কারণ হলে তা জায়েয হবে না। যথা বদমেজাজী, অনুকম্পাহীনতা ইত্যাদি। এসব ব্যাপার আইনের আওতায় আসতে পারে না। কিন্তু بِالْمَعْرُوْفِ শব্দটি দ্বারা এসব ব্যাপারই বুঝানো হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে— وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, উভয় পক্ষের অধিকার ও কর্তব্য সমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের উপর এক স্তর বেশী মর্যাদা দান করেছেন। এতে একটি বিরাট দর্শন রয়েছে, যার প্রতি আয়াতের শেষ বাক্য وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এ আয়াতের উদ্দেশে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের তুলনায় কিছুটা উচ্চমর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই তাদের অতি সতর্কভাবে ধৈর্যের সাথে কাজ করা আবশ্যক। যদি স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনের ব্যাপারে কিছুটা গাফেলতীও হয়ে যায়, তবে তারা তা সহ্য করে নেবে এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে মোটেই অবহেলা করবে না। (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত আদেশ বা হুকুম কোরআনের অনেক আয়াতেই এসেছে। তবে এ কয়টি আয়াতে তালাক সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর তা বোঝবার জন্য প্রথমে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের তাৎপর্য বোঝতে হবে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে ও তালাক ঃ বিয়ের একটি দিক হচ্ছে এই যে, এটি পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত একটি চুক্তি। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে, অনেকটা তেমনি। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, এটি একটি সুন্নত বা প্রথা ও এবাদত। তবে সমগ্র উম্মত এতে একমত যে, বিয়ে সাধারণ লেন-দেন ও চুক্তির উর্ধ্বে একটা পবিত্র বন্ধনও বটে। যেহেতু এতে একটি সুন্নত ও এবাদতের গুরুত্ব রয়েছে, সেহেতু বিয়ের ব্যাপারে এমন কতিপয় শর্ত রাখা হয়, যা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রাখা হয় না।

প্রথমতঃ —যে কোন স্ত্রীলোকের সাথে যে কোন পুরুষের বিয়ে হতে পারে না। এক্ষেত্রে শরীয়তের একটি বিধান রয়েছে। সে বিধানের ভিত্তিতে কোন কোন স্ত্রীলোকের বিয়ে কোন কোন পুরুষের সাথে হওয়া নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ — বিয়ে ব্যতীত অন্যসব ব্যাপার সমাধা করার জন্য সাক্ষী শর্ত নয়। একমাত্র মতবিরোধের সময়েই সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে এর সম্পাদনকালেই সাক্ষীর প্রয়োজন। যদি দু'জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক সাক্ষী ব্যতীত কোন নারী এবং পুরুষ পরস্পর বিয়ের কাজ সম্পাদন করে এবং উভয়পক্ষের কেউ তা অস্বীকারও না করে, তবুও শরীয়তের বিধানমতে এ বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে— যতক্ষণ পর্যন্ত অন্ততঃ দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে 'এজাব কবূল' না হয়। বিয়ের সুন্নত নিয়ম হল, সাধারণ প্রচারের মাধ্যমে সম্বন্ধ স্থির করা। এমনিভাবে এতে আরো অনেক শর্তাবলী ও নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহ অন্যান্য ইমামগণের মতে, বিয়ের ক্ষেত্রে লেন-দেন চুক্তির গুরুত্ব অপেক্ষা এবাদত ও সুন্নতের গুরুত্ব অনেক বেশী। এ মতের সমর্থনে তাঁরা কোরআন ও হাদীসের অনেক দলীল উদ্ধৃত করেছেন।

বিয়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তালাক সম্পর্কে কিছু জ্ঞানলাভ করা দরকার। তালাক বিয়ের চুক্তি ও লেন-দেন বাতিল করাকে বোঝায়। ইসলামী শরীয়ত বিয়ের বেলায় চুক্তির চাইতে এবাদতের গুরুত্ব বেশী দিয়ে একে সাধারণ বৈষয়িক চুক্তি অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। তাই এ চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারটিও সাধারণ ব্যাপারের চাইতে কিছুটা জটিল। যখন খুশী, যেভাবে খুশী তা বাতিল করে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না, বরং এর জন্য একটি সুষ্ঠু আইন রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

ইসলামের শিক্ষা এই যে, বিয়ের চুক্তি সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়, তা ভঙ্গ করার মত কোন অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা, এ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এতে বংশ ও সন্তানদের জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এজন্যই এ সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে যেসব কারণের উদ্ভব হয়, কোরআন ও হাদীসের শিক্ষায় সে সমস্ত কারণ নিরসনের জন্য পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকটি বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে যে উপদেশ রয়েছে, সেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে, যাতে এ সম্পর্ক দিন দিন প্রগাঢ় হতে থাকে এবং কখনো ছিন্ন হতে পারে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। অসহযোগিতার অবস্থায় প্রথমে বুঝাবার চেষ্টা, অতঃপর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের উপদেশ দেয়া হয়েছে। যদি এতেও সমস্যার সমাধান না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে সালিস সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোরআনুল করীমে এরশাদ হয়েছে ঃ

حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا আয়াতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পরিবার থেকে সালিস সাব্যস্ত করার নির্দেশটিও একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বিষয়টিকে যদি পরিবারের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তিক্ততা এবং মনের দূরত্ব আরো বেশী বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু অনেক সময় ব্যাপার এমন রূপ ধারণ করে যে, সংশোধনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কাংখিত ফল লাভের স্থলে উভয়ের একত্রে মিলেমিশে থাকাও মস্ত আযাবে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়াই উভয় পক্ষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। আর এ জন্যই ইসলামে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত অন্যান্য ধর্মের মত বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করার পথ বন্ধ করে দেয়নি। যেহেতু চিন্তাশক্তি ও ধৈর্যের সামর্থ্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অনেক বেশী, তাই তালাকের অধিকারও পুরুষকেই দেয়া হয়েছে; এ স্বাধীন ক্ষমতা স্ত্রীলোককে দেয়া হয়নি। যাতে করে সাময়িক, বিরক্তির প্রভাবে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক বেশী তালাকের কারণ হতে না পারে।

তবে স্ত্রীজাতিকেও এ অধিকার থেকে একেবারে বঞ্চিত করা হয়নি। স্বামীর জুলুম-অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাদের জন্যেও রয়েছে। তারা কাজীর দরবারে নিজেদের অসুবিধার বিষয় উপস্থাপন করে স্বামীর দোষ প্রমাণ করে বিবাহবিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে। যদিও পুরুষকে তালাক দেয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, কিন্তু এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, এ ক্ষমতার ব্যবহার আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার। একমাত্র অপারক অবস্থাতেই এ ক্ষমতার প্রয়োগ করা যায়। হাদীসে এরশাদ হয়েছে — ابغض الحلال الى الله الطلاق অর্থাৎ,

"আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বিষয় হচ্ছে তালাক।"

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে এই যে, রাগান্বিত অবস্থায় কিংবা সাময়িক বিরক্তি ও গরমিলের সময় এ ক্ষমতার প্রয়োগ করবে না। এ হেকমতের পরিপ্রেক্ষিতেই ঋতু অবস্থায় তালাক দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র অবস্থায়ও যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়ে থাকে, তবে এমতাবস্থায় এজন্য তালাক দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, এতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ হবে এবং তাতে তার কষ্ট হবে। কাজেই কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ, যদি তালাক দিতেই হয়, তবে এমন সময় তালাক দাও, যাতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ না হয়। ঋতু অবস্থায়ও তালাক দিলে চলতি ঋতু ইদ্দতে গণ্য হবে না। চলতি ঋতুর অন্তে পবিত্রতা লাভের পর পুনরায় যে ঋতু শুরু হয়, সে ঋতু থেকে ইদ্দত গণনা করা হবে। আর যে তহুর বা শুচিতায় সহবাস করা হয়েছে, যেহেতু সে তহুরে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, তাই তাতে ইদ্দত আরো দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। তালাক দেয়ার জন্য এ নির্ধারিত তহুর ঠিক করার আরো একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এ সময়ের মধ্যে রাগ কমেও যেতে পারে এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ফিরে আসলে তালাক দেয়ার ইচ্ছাও শেষ হয়ে যেতে পারে। তৃতীয় শর্ত রাখা হয়েছে যে, বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার বিষয়টি সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় ও চুক্তি ছিন্ন করার মত নয়। বৈষয়িক চুক্তির মত বিয়ের চুক্তি একবার ছিন্ন করাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। উভয়পক্ষ অন্যত্র দ্বিতীয় চুক্তি করার ব্যাপারে স্বাধীনও নয়। বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তালাকের তিনটি স্তর ও পর্যায় রাখা হয়েছে এবং এতে ইদ্দতের শর্ত রাখা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের অনেক সম্পর্কই বাকী থাকে। যেমন, স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করতে পারে না। তবে পুরুষের জন্য অবশ্য বাধা-নিষেধ থাকে না।

চতুর্থ শর্ত এই যে, যদি পরিষ্কার কথায় এক বা দুই তালাক দেয়া হয়, তবে তালাক প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয় না। বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে পূর্বের বিয়েই অক্ষুণ্ন থাকে।

তবে এ প্রত্যাহারের অধিকার শুধু এক অথবা দুই তালাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, যাতে কোন অত্যাচারী স্বামী এমন করতে না পারে যে, কথায় কথায় তালাক দেবে এবং তা প্রত্যাহার করে পুনরায় স্বীয় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। এজন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, যদি কেউ তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার আর প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে না। এমনকি যদি উভয়ে রাজী হয়েও নিজেরা পুনরায় বিয়ে করতে চায় ,তবুও বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতীত তা করতে পারবে না।

আলোচ্য আয়াতে তালাক - ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আলোচ্য আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রথমে এরশাদ হয়েছে - اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ অর্থাৎ, তালাক হয় দু'বার। অতঃপর এ দু'তালাকের মধ্যে শর্ত রাখা হয়েছে যে, এতে বিবাহবন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায় না, বরং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহবন্ধনে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা স্বামীর থাকে। বস্তুতঃ ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যদি তালাক প্রত্যাহার করা না হয়, তবেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়। এ বিষয়কে — فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ, হয় শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তালাক প্রত্যাহার করা হবে অথবা সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে তার ইদ্দত শেষ হতে দেয়া হবে, যাতে সে (স্ত্রী) মুক্তি পেতে পারে।

এখনও তৃতীয় তালাকের আলোচনা আসেনি। মধ্যখানে একটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে, যা এ অবস্থায় আলোচনায় আসতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, কোন কোন অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীকে রাখতেও চায় না, আবার তার অধিকার আদায় করারও কোন চিন্তা করে না, আবার তালাকও দেয় না। এতে স্ত্রী যখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেই সুযোগ নিয়ে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু অর্থকড়ি আদায় করার বা মোহর মাফ করিয়ে নেয়ার বা ফেরত নেয়ার দাবী করে বসে। কোরআন-মজীদ এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا

অর্থাৎ, "তালাকের পরিবর্তে তোমাদের দেয়া অর্থ-সম্পদ বা মোহর ফেরত লওয়া হালাল নয়।'

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ ؕ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۪ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ؕ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۫ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ
يَعِظُكُمْ بِهِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ؕ ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ أَزْكٰى
لَكُمْ وَأَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

(২৩০) তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করতে কোন পাপ নেই, যদি আল্লাহ্‌র হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। আর এই হলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়। (২৩১) আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, অতঃপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও, অথবা সহানুভূতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশে আটকে রেখো না। আর যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করো না। আল্লাহ্‌র সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের উপর রয়েছে এবং তাও স্মরণ কর, যে কিতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে যার দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়েই জ্ঞানময়। (২৩২) আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্বস্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান করো না। এ উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ্ ও কেয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। আর আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে মোহর ফেরৎ নেয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রী এমন অনুভব করে যে, মনের গরমিলের দরুন আমি স্বামীর হক আদায় করতে পারিনি, এবং স্বামী যদি তাই বুঝে,তবে এমতাবস্থায় মোহর ফেরৎ নেয়া বা তা ক্ষমা করিয়ে নেয়া এবং এর পরিবর্তে তালাক নেওয়া জায়েয হবে। এই মাসআলা বর্ণনা করার পর এরশাদ হয়েছে ঃ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ অর্থাৎ, এ ব্যক্তি যদি তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তবে তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোন অধিকার থাকবে না। কেননা, এমতাবস্থায় এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সব দিক বুঝে-শুনেই সে স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে এই যে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়েও পুনর্বিবাহ করতে চায়, তবে তাও তারা করতে পারে না। তাদের পুনর্বিবাহের জন্য শর্ত হচ্ছে যে, স্ত্রী ইদ্দতের পরে অন্য কাউকে বিয়ে করবে এবং সে স্বামীর সাথে সহবাসের পর কোন কারণে যদি এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, অথবা মৃত্যুবরণ করে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

তিন তালাক ও তার বিধান ঃ এ ক্ষেত্রে কোরআন মজীদের বর্ণনাভঙ্গি লক্ষ্য করলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তালাক দেয়ার শরীয়তসম্মত বিধান হচ্ছে বড় জোর দুই তালাক পর্যন্ত দেয়া যাবে। তৃতীয় তালাক দেয়া উচিত হবে না। আয়াতের শব্দ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ এরপর তৃতীয় তালাককে (যদি) শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে— এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। নতুবা বলা উচিত ছিল যে, অর্থাৎ, তালাক তিনটি। তাই এর অর্থ হচ্ছে যে, তৃতীয় তালাক পর্যন্ত পৌঁছা উচিত নয়। আর এ জন্যই ইমাম মালেক এবং অনেক ফকীহ্ তৃতীয় তালাক দেয়ার অনুমতি দেননি। তাঁরা একে তালাকে-বেদ'য়াত বলেন। আর অন্যান্য ফকীহ্‌গণ তিন তুহুরে আলাদা আলাদাভাবে তিন তালাক দেয়াও জায়েয বলেন। এসব ফকীহ্ একেই সুন্নত তালাক বলেছেন। কিন্তু কেউই একথা বলেননি যে, এটাই তালাকের সুন্নত বা উত্তম পন্থা, বরং বেদ'য়াত তালাক এর স্থলে সুন্নত তালাক শুধু এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটা বেদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কোরআন ও হাদীসের এরশাদসমূহ এবং সাহাবী ও তাবেয়িগণের কার্যপদ্ধতিতে প্রমাণিত হয় যে, যখন তালাক দেয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না, তখন তালাক দেয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, এমন এক তুহুরে এক তালাক দেবে, যাতে সহবাস করা হয়নি। এ এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে। ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহসম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। ফকীহ্‌গণ একে আহ্‌সান বা উত্তম তালাক পদ্ধতি বলেছেন। সাহাবিগণও একেই তালাকের সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করেছেন।

ইবনে আবি-শাইবা তাঁর গ্রন্থে হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রাহঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাবিগণ তালাকের ব্যাপারে এ পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন যে,মাত্র এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দিবে এবং এতেই ইদ্দত শেষ হলে বিবাহবন্ধন স্বাভাবিকভাবে ছিন্ন হয়ে যাবে।

কোরআনের শব্দের দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, দুই তালাক পর্যন্ত দেয়া যায়। তবে مَرَّتٰنِ শব্দ দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, এক শব্দে দুই

তালাক দেয়া উচিত নয়;বরং দুই তুহরে পৃথক পৃথকভাবে দুই তালাক দিতে হবে। الطلاق طلاقان এর দ্বারাই দুই তালাক প্রমাণিত হয়, কিন্তু مَرَّتٰنِ শব্দটি এ নিয়মের দিকে ইঙ্গিত করে যে, দুই তালাক পৃথক পৃথক শব্দে হওয়াই উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে একেবারে দু'টি টাকা দেয়, তবে তাকে দু'বার দিয়েছে বলা যায় না। তেমনি কোরআনের শব্দে দুই বারের অর্থই হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে দেয়া।—(রুহুল-মা'আনী)

যাহোক, কোরআন মজীদের শব্দের দ্বারা যেহেতু দুই তালাক পর্যন্ত প্রমাণিত হয়, এজন্য ইমাম ও ফকীহ্গণ একে সুন্নত তরিকা বলে অভিহিত করেছেন। তৃতীয় তালাক উত্তম না হওয়াও কোরআনের বর্ণনাভঙ্গিতেই বুঝা যায় এবং এতে কোন মতানৈক্য নেই। রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারাও তৃতীয় তালাক নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বলে প্রমাণিত হয়। ইমাম নাসায়ী মুহাম্মদ ইবনে লাবিদের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ- 'এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক এক সাথে দিয়েছে— এ সংবাদ রসূল (সাঃ)-এর নিকট পৌছলে তিনি রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি উপহাস করছ? অথচ আমি এখনও তোমাদের মধ্যেই রয়েছি। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো— হে আল্লাহর রসূল! আমি তাকে হত্যা করব?

ইবনে কাইয়্যেম এ হাদীসের সনদকে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে সঠিক বলেছেন— (যাদুল-মা'আদ) আল্লামা মা-ওয়ারদী, ইবনে-কাসীর, ইবনে হাজার প্রমুখ সবাই এ হাদীসের সনদকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য ইমাম মালেক এবং অন্যান্য ফকীহ্বৃন্দ তৃতীয় তালাককে নাজায়েয ও বেদ'আত বলেন। অন্যান্য ইমামগণ তিন তুহরে তিন তালাক দেয়াকে সুন্নত তরিকা বলে যদিও একে বেদ'য়াত থেকে দূরে রেখেছেন, কিন্তু এটা যে তালাকের উত্তম পন্থা নয়, তাতে কারো দ্বিমত নেই।

মোটকথা, ইসলামী শরীয়ত তালাকের তিনটি পর্যায়কে তিন তালাকের আকারে স্থির করেছে। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, তালাকের ব্যাপারে এ তিনটি পর্যায়ই পূর্ণ করতে হবে। বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে,— প্রথমতঃ তালাকের দিকে অগ্রসর হওয়াই অপছন্দনীয় কাজ। কিন্তু অপারকতাবশতঃ যদি এদিকে অগ্রসর হতেই হয়, তবে এর নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ, এক তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ করার সুযোগ দেয়াই উত্তম, যাতে ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ বন্ধন আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যায়। একেই তালাকের উত্তম পদ্ধতি বলা হয়।

এতে আরো সুবিধা হচ্ছে এই যে, পরিষ্কার শব্দে এক তালাক দিলে পক্ষদ্বয় ইদ্দতের মধ্যে ভাল-মন্দ বিবেচনা করার সুযোগ পায়। যদি তারা ভাল মনে করে, তবে তালাক প্রত্যাহার করলেই চলবে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে যদিও বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং স্ত্রী বিবাহমুক্ত হয়ে যায়, তবুও সুযোগ থাকে যে, উভয়েই যদি ভাল মনে করে, তবে বিয়ের নবায়নই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি তালাকের উত্তম পন্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এবং ইদ্দতের মধ্যেই আরো এক তালাক দিয়ে বসে, তবে সে বিবাহ ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে গেল, যদিও এর প্রয়োজন ছিল না। আর এ পদক্ষেপ শরীয়তও পছন্দ করে না। তবে এ দু'টি স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিষয়টি পূর্বের মতই রয়ে যায়। অর্থাৎ, ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে। আর ইদ্দত শেষ হলে উভয় পক্ষের ঐকমত্যে বিয়ের নবায়ন হতে পারে। পার্থক্য শুধু এই যে, দুই তালাক দেয়াতে স্বামী তার অধিকারের একাংশ হাত ছাড়া করে ফেলে এবং এমন সীমারেখায় পদার্পণ করে যে, যদি আর এক তালাক দেয়, তবে চিরতরে নবায়নের এ পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি তালাকের দু'টি পর্যায় অতিক্রম করে ফেলে তার জন্য পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেয়া হচ্ছে— فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ এতে দু'টি আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে এই যে, ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে বিয়ে নবায়নের প্রয়োজন নেই, বরং তালাক প্রত্যাহার করে নেয়াই যথেষ্ট। এতে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিয়ের নবায়নের প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, স্বামী যদি মিল-মহব্বতের সাথে সংসার জীবনযাপন করতে চায়, তবে তালাক প্রত্যাহার করবে। অন্যথায় স্ত্রীকে ইদ্দত অতিক্রম করে বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ দেবে, যাতে বিবাহ বন্ধন এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যায়। আর তা যদি না হয়, তবে স্ত্রীকে অযথা কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে যেন তালাক প্রত্যাহার না করে। সেজন্যই বলা تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ হয়েছে। تَسْرِيحٌ অর্থ খুলে দেয়া বা ছেড়ে দেয়া। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দ্বিতীয় তালাক দেয়া বা অন্য কোন কাজ করার প্রয়োজন নেই। তালাক প্রত্যাহার ব্যতীত ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়াই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

হাদীস শাস্ত্রের ইমাম আবু দাউদ (রাহ্ঃ) আবু রজিন আসাদী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, কোরআন مَرَّتٰنِ বলেছে, তারপর তৃতীয় তালাকের কথা বলেনি কেন? তিনি উত্তর দিলেন যে, পরে যে تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ বলা হয়েছে সেটিই তৃতীয় তালাক। —(রুহুল-মা'আনী) অধিকাংশ আলেমের মতে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তৃতীয় তালাক যে কাজ করে, এ কর্ম পদ্ধতিও তাই করে যা ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার না করলেই হয়। আর যেভাবে امساك এর সাথে بِمَعْرُوفٍ শব্দের শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে ফিরিয়েই রাখতে হয়, তবে উত্তম পন্থায়ই ফিরিয়ে রাখা হোক। তেমনিভাবে تَسْرِيحٌ এর সাথে احسان শব্দের শর্ত আরোপের মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তালাক হচ্ছে একটি বন্ধনকে ছিন্ন করা। আর সংলোকের কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, কোন কাজ বা চুক্তি করতে হলে তারা তা উত্তম পন্থায়ই করে থাকেন। এমনিভাবে যদি বিবাহ বন্ধনও ছিন্ন করার পর্যায়ে এসে যায়, তবে তা রাগান্বিত হয়ে বা ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে করা উচিত নয়; এহ্সান ও ভদ্রতার সাথেই তা সম্পন্ন করা উচিত। বিদায়ের সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে উপহার-উপঢৌকন হিসাবে কিছু কাপড়-চোপড়,কিছু টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিয়ে বিদায় করবে।

এ ব্যাপারে কোরআনে এরশাদ হচ্ছে–

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে আর্থিক ক্ষমতানুযায়ী কিছু উপঢৌকন ও পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়ে বিদায় করা উচিত।

আর যদি সে এরূপ না করেই তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে সে শরীয়ত প্রদত্ত তার সমস্ত ক্ষমতা বিনা প্রয়োজনে হাত ছাড়া করে দিল। ফলে তার শাস্তি হচ্ছে এই যে, এখন আর সে তালাকও প্রত্যাহার করতে পারবে না এবং স্ত্রীর অন্যত্র বিয়ে হওয়া ব্যতীত উভয়ের মধ্যে আর

কখনো বিয়ে হতে পারবে না।

একত্রে তিন তালাকের প্রশ্ন : এ প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক উত্তর এই যে, কোন কাজের পাপ কাজ হওয়া তার প্রতিক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে না। অন্যায়ভাবে হত্যা করা পাপ হলেও যাকে গুলী করে বা কোন অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়, সে নিহত হয়েই যায়। এই গুলী বৈধভাবে করা হলো, কি অবৈধভাবে করা হয়েছে, সে জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে না। চুরি সব ধর্মমতেই পাপ, কিন্তু যে অর্থ- সম্পদ চোরাই পথে পাচার করা হয়, তা তো হাতছাড়া হয়েই গিয়েছে। এমনিভাবে যাবতীয় অন্যায় ও পাপের একই অবস্থা যে, এর অন্যায় ও পাপ হওয়া এর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করে না।

এই মূলনীতির ভিত্তিতে শরীয়ত-প্রদত্ত উত্তম নীতি-নিয়মের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে প্রয়োজন ব্যতীত স্বীয় সমস্ত ক্ষমতাকে শেষ করে দেয়া এবং একই সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যদিও রসূল (সাঃ)-এর অসন্তুষ্টির কারণ, যা পূর্ববর্তী বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে,এজন্য সমগ্র উম্মত এক বাক্যে একে নিকৃষ্ট পন্থা বলে উল্লেখ করেছে এবং কেউ কেউ নাজায়েযও বলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ এ পদক্ষেপ নেয়, তবে এর ফলাফলও তাই হবে, বৈধ পথে অগ্রসর হলে যা হয়। অর্থাৎ, তিন তালাক হয়ে যাবে এবং শুধু প্রত্যাহার নয়, বিবাহ বন্ধন নবায়নের সুযোগও আর থাকবে না।

হুযূর (সাঃ)-এর মীমাংসাই এ ব্যাপারে বড় প্রমাণ যে, তিনি অসন্তুষ্ট হয়েও তিন তালাক কার্যকরী করেছেন। হাদীস গ্রন্থে অনুরূপ বহু ঘটনা বর্ণনা রয়েছে। আর যারা এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতেও তাঁরা হাদীসের সেসব ঘটনা সংগ্রহ করেই একত্রিত করেছেন। সম্প্রতি, জনাব মাওলানা আবু যাহেদ সরফরাজ তাঁর 'উমদাতুল-আসার' গ্রন্থে এ মাসআলা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন।এখানে এ সম্পর্কিত মাত্র দু' তিনটি হাদীস উদ্ধৃত হলো।

ইতিপূর্বেও দু'তালাক সংক্রান্ত আইন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ইসলামে তালাকের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থাসমূহ কোরআনের দার্শনিক বর্ণনাসহকারে বিবৃত হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে আরো কিছু বিষয় এবং তার আহ্কাম বর্ণিত হয়েছে।

তালাকের পর তা প্রত্যাহার ও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা : প্রথম আয়াতের বর্ণিত প্রথম মাসআলাটি হচ্ছে এই যে, যখন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক তার ইদ্দত অতিক্রম করার কাছাকাছি গিয়ে পৌছে, তখন স্বামীর দু'টি অধিকার থাকে। একটি হচ্ছে তালাক প্রত্যাহার করে তাকে স্বীয় বিবাহেই রেখে দেয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তালাক প্রত্যাহার না করে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা।

এ দু'টি অধিকার সম্পর্কে কোরআন শর্ত আরোপ করেছে যে, রাখতে হলে কিংবা ছিন্ন করতে হলে নিয়মানুযায়ী করতে হবে। এতে بِالْمَعْرُوفِ শব্দটি দু'জায়গায়ই পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রত্যাহারের জন্যও কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন রয়েছে এবং ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারেও কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন বর্তমান। উভয় অবস্থায় যেটাই গ্রহণ করা হোক, শরীয়তের নিয়মানুযায়ী করতে হবে। শুধু সাময়িক খেয়াল-খুশী বা আবেগের তাগিদে কোন কিছু করা চলবে না। উভয় দিক সম্পর্কেই শরীয়তের কিছু বিধান কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। আর তারই বিশ্লেষণ করেছেন মহানবী (সাঃ)- তাঁর হাদীসে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তালাক দেয়ার পর এই বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহ অবস্থা ও পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিয়েতে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তবে এ জন্য শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে মনোমালিন্যকে অন্তর থেকে দূর করে সুন্দর ও সুখী জীবনযাপন এবং পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে আদায় করার মানসে করতে হবে, স্ত্রীকে যন্ত্রণা দেয়ার উদ্দেশ্যে তা করা চলবে না। এ জন্য আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে—

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

অর্থাৎ, স্ত্রীকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়ার উদ্দেশ্যে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আটকে রেখো না।

এ পৃথিবীতেও চিন্তা করলে দেখা যায়, কোন অত্যাচারী ব্যক্তি কারো প্রতি অত্যাচার করে সাময়িকভাবে আত্মতুষ্টি লাভ করে বটে, কিন্তু তার অশুভ পরিণতিতে তাকে অধিকাংশ সময় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়। সে অনুধাবন করুক বা নাই করুক, অনেক সময় এমন বিপদে পতিত হয় যে, অত্যাচারের ফলাফল দুনিয়াতেই তাকে কিছু না কিছু ভোগ করতে হয়।

কোরআনে -হাকীমের নিজস্ব একটা দার্শনিক বর্ণনাভঙ্গি রয়েছে। দুনিয়ার আইন-কানুন ও শাস্তির বর্ণনার ন্যায় কোরআন শুধুমাত্র আইন-কানুন ও শাস্তির কথাই বর্ণনা করে না; বরং একান্ত গুরুগম্ভীরভাবে তার বিধি-বিধানের দার্শনিক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং তার বিরোধিতার দরুন মানুষের যে অকল্যাণ হতে পারে, তার এমন ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়, যা দেখে যে লোক মানবতার আবরণ সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলেনি, সে কখনো এসবের দিকে অগ্রসরই হতে পারে না। কেননা, প্রত্যেকটি আইন-কানুনের সঙ্গে আল্লাহ্র ভয় ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

বিয়ে ও তালাককে খেলায় পরিণত করো না : দ্বিতীয় মাসআলা হচ্ছে এই, এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্র আয়াতকে খেলায় পরিণত করো না।

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا - খেলায় পরিণত করার একটি তফসীর হচ্ছে এই যে, বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা যে সীমারেখা ও শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করা। আর দ্বিতীয় তফসীর হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহেলিয়াত যুগে কোন কোন লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বা বাঁদীকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বলতো যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দেয়া বা মুক্তি দিয়ে দেয়ার কোন উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়। এতে ফয়সালা দেয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাককে যদি কেউ খেলা বা তামাশা হিসাবেও সম্পাদন করে, তবুও তা কার্যকরী হয়ে যাবে। এতে নিয়তের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,— তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যে, হাসি-তামাশার মাধ্যমে করা এবং বাস্তবে করা দুই-ই সমান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তালাক, দ্বিতীয়টি দাস মুক্তি এবং তৃতীয়টি বিয়ে। হাদীসটি ইবনে-মাদুবিয়্যাহ্ উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে, আর ইবনুল-মুনযির বর্ণনা করেছেন ওবাদাহ্ ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

"তিনটি বিষয় রয়েছে, যেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে বলা আর হাসি-তামাশাচ্ছলে বলা একই সমান। (এক) বিবাহ, (দুই) তালাক (তিন) রাজ'য়াত বা তালাক প্রত্যাহার।"

এ তিনটি বিষয়ে শরীয়তের আদেশ হচ্ছে এই যে, যদি দু'জন স্ত্রী ও পুরুষ বিয়ের ইচ্ছা ব্যতীতও সাক্ষীর সামনে হাসতে হাসতে বিয়ের এজাব ও কবুল করে নেয়, তবুও বিয়ে হয়ে যাবে। তেমনি তালাক প্রত্যাহার এবং দাসকে মুক্তিদানের ব্যাপারেও শরীয়তের এই বিধান। এসব ক্ষেত্রে হাসি-তামাশা কোন ওজররূপে গণ্য হবে না।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্য বিয়েতে বাধা দেওয়া হারাম ঃ দ্বিতীয় আয়াতে সে সমস্ত উৎপীড়নমূলক ব্যবহারের প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা সাধারণতঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের সাথে করা হয়। তাদেরকে অন্য লোকের সাথে বিয়ে করতে বাধা দেয়া হয়। প্রথম স্বামীও তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেয়াতে নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা মনে করে। আবার কোন কোন পরিবারে মেয়ের অভিভাবকগণও দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখে। আবার কেউ কেউ এসব মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে কিছু মালামাল হাসিল করার উদ্দেশে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু স্ত্রীর অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজন তালাক দেয়ার ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতাবশতঃ উভয়ের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাধার সৃষ্টি করে। স্বাধীন স্ত্রীলোককে তার মর্জিমত শরীয়ত বিরোধী কার্য ব্যতীত বিয়ে হতে বাধা দেয়া একান্তই অন্যায়, তা তার প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকেই হোক, অথবা তার অভিভাবকদের পক্ষ থেকেই হোক। কিন্তু শর্ত হচ্ছে- إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ তবে এ হুকুম তখন বর্তাবে, যখন উভয়ে শরীয়তের নিয়মানুযায়ী রাজী হবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি উভয়ে রাজী না হয়, তবে কোন এক পক্ষের উপর জোর বা চাপ সৃষ্টি করা বৈধ হবে না। যদি উভয়ে রাজীও হয় আর তা শরীয়তের আইন মোতাবেক না হয়, যথা, বিয়ে না করেই পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করতে আরম্ভ করে, অথবা তিন তালাকের পর অন্যত্র বিয়ে না করেই যদি পুনর্বিবাহ করতে চায়, অথবা ইদ্দতের মধ্যেই অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন সকল মুসলমানের এবং বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকের যারা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে সম্মিলিতভাবে বাধা দিতে হবে, এমনকি শক্তি প্রয়োগ করতে হলেও তা করতে হবে।

এমনিভাবে কোন মেয়ে যদি স্বীয় অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত পারিবারিক 'কুফূ' বা সামঞ্জস্যহীন স্থানে বা বংশের প্রচলিত মোহরের কম মোহরে বিয়ে করতে চায়, যার পরিণাম বা কু-প্রভাব বংশের উপর পতিত হতে পারে, তবে এমন ক্ষেত্রে তারা তাকে বাধা দিতে পারেন। তবে إِذَا تَرَاضَوْا বলে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যায় না।

আয়াতের শেষে তিনটি বাক্যের প্রথমটিতে এরশাদ হয়েছে—

ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

অর্থাৎ, "এ আদেশ সেসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ তাআলা ও কেয়ামতের উপর বিশ্বাস করে।" এতেই ইশারা করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ তাআলা ও পরকালের বিশ্বাস করে তাদের জন্যে এসব আহকাম যথাযথভাবে পালন করা অবশ্য কর্তব্য। আর যারা এ আদেশ পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করে তাদের বোঝা উচিত যে, তাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে।

ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ এসব হুকুমের আনুগত্য তোমাদের জন্য পবিত্রতার কারণ'— এতে ইশারা করা হয়েছে যে, এর ব্যতিক্রম করা পাপ-মগ্নতা এবং ফেৎনা-ফাসাদের কারণ। কেননা, বয়ঃপ্রাপ্তা বুদ্ধিমতী যুবতী মেয়েকে সাধারণভাবে বিয়ে থেকে বিরত রাখা একদিকে তার প্রতি অত্যাচার, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং অপরদিকে তার সতিত্ব, পবিত্রতা ও মান-ইজ্জতকে আশঙ্কায় ফেলারই নামান্তর। তৃতীয়তঃ সে যদি এই বাধার ফলে কোন পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার সে পাপের অংশীদার তারাও হবে যারা তাকে বিয়ে থেকে বিরত রেখেছে।

আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে কোরআনের অনুপম দার্শনিক নীতি ঃ কোরআন করীম এখানে একটি বিধান উপস্থাপন করেছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছামত বিয়ে করতে বাধা দেয়া অন্যায়। এ বিধান স্থির করার পর তার বাস্তবায়নকে সহজ করার জন্য এর প্রতি সাধারণ মানুষের মন-মস্তিষ্ককে তৈরী করার উদ্দেশে তিনটি বাক্য উল্লেখ করেছে। প্রথম বাক্যে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং পরকালে শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষকে সে বিধান বাস্তবায়নের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে এ আইন অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে এ আইনের আনুগত্যের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তৃতীয় বাক্যে বলে দিয়েছে যে, এই আনুগত্যের মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। এর বিরুদ্ধাচরণের মাঝে কোন কল্যাণ আছে বলে যদিও তোমরা কখনও ধারণা কর, কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং পরিণতি সম্পর্কে তোমাদের অজ্ঞতারই ফল।

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ
يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ
لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ
تَسْتَرْضِعُوْۤا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّاۤ اٰتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۳۳﴾
وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ
اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۲۳۴﴾
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ
فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ
سِرًّا اِلَّاۤ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ؕ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ
حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْۤ
اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۳۵﴾

(২৩৩) আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ, পিতার উপর হলো সে সমস্ত নারীর খোর-পোষের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী। কাউকে তার সামর্থ্যাতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না। আর মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং যার সন্তান তাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না। আর ওয়ারিসদের উপরও দায়িত্ব এই। তারপর যদি পিতা-মাতা ইচ্ছা করে, তাহলে দু' বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই, আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ অত্যন্ত ভাল করেই দেখেন। (২৩৪) আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহ্‌র অবগতি রয়েছে। (২৩৫) আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে সে নারীর বিয়ের পয়গাম দাও, কিংবা নিজেদের মনে গোপন রাখ, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই, আল্লাহ জানেন যে, তোমার অবশ্যই সে নারীদের কথা উল্লেখ করবে। কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না। অবশ্য শরীয়তের নির্ধারিত প্রথা অনুযায়ী কোন কথা সাব্যস্ত করে নেবে। আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোন ইচ্ছা করো না। আর একথা জেনে রেখো যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহ্‌র তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাক। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে স্তন্যদান সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতে তালাকসংক্রান্ত আদেশাবলীর আলোচনা হয়েছে। এরই মধ্যে শিশুকে স্তন্যদানসংক্রান্ত আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যে, সাধারণতঃ তালাকের পরে শিশুর লালন-পালন ও স্তন্যদান নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। কাজেই এ আয়াতে এমন ন্যায় সঙ্গত নিয়ম বাতলে দেয়া হয়েছে যা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। বিয়ে বহাল থাকাকালে স্তন্যদান বা দুধ ছাড়ানোর বিষয় উপস্থিত হোক অথবা তালাক দেয়ার পর, উভয় অবস্থাতেই এমন এক ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হয়েছে, যাতে কোন ঝগড়া-বিবাদ বা কোন পক্ষের উপরই অন্যায় ও জুলুম হওয়ার পথ না থাকে। আয়াতের প্রথম বাক্যে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ

يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ

— অর্থাৎ, মাতাগণ নিজেদের বাচ্চাদেরকে পূর্ণ দু' বছর স্তন্যদান করাবে যদি কোন বিশেষ অসুবিধা এ সময়ের পূর্বে স্তন্যদানে বিরত থাকতে বাধ্য না করে।

এ আয়াত দ্বারা স্তন্যদানের সব কয়টি মাসআলা বোঝা গেল।

শিশুদের স্তন্যদান মায়ের উপর ওয়াজিব ঃ প্রথমত ঃ এই যে, শিশুকে স্তন্যদান মাতার উপর ওয়াজিব। কোন অসুবিধা ব্যতীত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা অসন্তুষ্টির দরুন স্তনদান বন্ধ করলে পাপ হবে এবং স্তন্যদানের জন্য স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে কোন প্রকার বেতন বা বিনিময় নিতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহবন্ধন বিদ্যমান থাকে। কেননা, এটা স্ত্রীরই দায়িত্ব।

দ্বিতীয়তঃ পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, স্তন্যদানের পূর্ণ সময় দু' বছর। যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয়, তবে তা বাচ্চার অধিকার।

এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, স্তন্যদানের সময়সীমা দু' বছর ঠিক করা হয়েছে। এরপর মাতৃস্তনের দুধ পান করানো চলবে না। তবে কোরআনের কোন কোন আয়াত এবং হাদীসের আলোকে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ত্রিশ মাস বা আড়াই বছর পর্যন্ত এ সময়সীমাকে বর্ধিত করেছেন। আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিশুকে মাতৃস্তনের দুধপান করানো সকলের ঐকমত্যে হারাম।

এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে এরশাদ হয়েছে—

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا

অর্থাৎ— "নিয়মানুযায়ী মাতার খাওয়া-পরা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সন্তানের পিতার দায়িত্ব। কাকেও সামর্থ্যের উর্ধ্বে কোন আদেশ দেয়া হয় না।"

এতে প্রথমতঃ লক্ষ্যণীয় এই যে, মাতাগণের উদ্দেশে কোরআন-মজীদে والدات শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, পিতার জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ وَالِدٌ কে বাদ দিয়ে اَلْمَوْلُوْدِ لَهٗ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ কোরআনের অন্যত্র وَالِدٌ শব্দের ব্যবহারও রয়েছে। যেমন لَا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ অবশ্য এক্ষেত্রে وَالِدٌ এর পরিবর্তে مَوْلُوْدٌ لَّهٗ ব্যবহার করার

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ
عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَ
لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ
قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

(২৩৬) স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী। যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব। (২৩৭) আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে সে (অর্থাৎ, স্বামী) যদি ক্ষমা করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্র সেসবই অত্যন্ত ভাল করে দেখেন। (২৩৮) সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহ্র সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও। (২৩৯) অতঃপর যদি তোমাদের কারো ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই পড়ে নাও অথবা সওয়ারীর উপরে। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহ্কে স্মরণ কর, যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না। (২৪০) আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে। অতঃপর যদি সে স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞতাসম্পন্ন। (২৪১) আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য। (২৪২) এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তা বুঝতে পার।

একটি বিশেষ তাৎপর্য এই যে, সমগ্র কোরআনেরই এক বিশেষ বর্ণনাভঙ্গি রয়েছে যে, —কোরআন কোন বিধানকে দুনিয়ার আইনের বর্ণনা-পদ্ধতি অনুযায়ী বিবৃত করে না; বরং অভিভাবক সুলভ সহানুভূতির ভঙ্গিতে এমনভাবে বর্ণনা করে, যাকে গ্রহণ করা এবং সেমতে কাজ করা মানুষের পক্ষে সহজ হবে।

শিশুকে স্তন্যদান মাতার দায়িত্ব আর মাতার ভরণ-পোষণ পিতার দায়িত্ব ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, শিশুকে স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্ব, আর মাতার ভরণ-পোষণ ও জীবনধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর মাতা স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা তালাক-পরবর্তী ইদ্দতের মধ্যে থাকে। তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসাবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু শিশুকে স্তন্য দানের পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে।—(মাযহারী)

স্ত্রীর খরচ স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী হবে, না স্ত্রীর মর্যাদা অনুসারে ঃ শিশুর পিতা-মাতা উভয়ই যদি ধনী হয়, তবে ভরণ-পোষণও ধনী ব্যক্তিদের মত হওয়া ওয়াজিব। আর দু'জনই গরীব হলে গরীবের মতই ভরণ-পোষণ দিতে হবে। দু'জনের আর্থিক অবস্থা যদি ভিন্ন ধরনের হয়, তবে এক্ষেত্রে ফকীহ্গণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। হেদায়া প্রণেতা বলেছেন, — যদি পুরুষ ধনী হয় এবং স্ত্রী দরিদ্র হয়, তবে এমন মানের খোরপোষ দিতে হবে, যা দরিদ্রদের চাইতে বেশী এবং ধনীদের চাইতে কম।

ইমাম কারখী বলেছেন যে, স্বামীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোরপোষ নির্ধারণ করতে হবে।

ফতহুল-কাদীরে এ মতের সমর্থনে বহু ফকীহ্র ফতোয়া উদ্ধৃত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে স্তন্যদান সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনার পর এরশাদ হয়েছে ঃ

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

অর্থাৎ, কোন মাতাকে তার শিশুর জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না। আর কোন পিতাকেও এর জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না।" অর্থাৎ, শিশুর পিতা-মাতা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করবে না। যেমন, মাতা যদি স্তন্যদান করতে অপারক হয় আর যদি পিতা মনে করে, যেহেতু শিশু তারও বটে, কাজেই তার উপর চাপ সৃষ্টি করা চলে। কিন্তু না, অপারক অবস্থায় মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা যাবে না। অথবা পিতা দরিদ্র এবং মাতার কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্তন্যদানে অস্বীকার করে যে, শিশু যেহেতু পিতার, কাজেই অন্য কারো দ্বারা দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করা হোক, এমন মানসিকতা প্রদর্শন করাও সঙ্গত হবে না।

মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা না করার বিবরণ ঃ পঞ্চম মাসআলা لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا এতে বোঝা যায় যে, মা যদি কোন অসুবিধার কারণে শিশুকে স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে শিশুর পিতা তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য শিশু যদি অন্য কোন স্ত্রীলোকের বা কোন জীবের দুধ পান না করে, তবে মাতাকে বাধ্য করা চলে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ...... إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

মোহর ও স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাসের প্রেক্ষিতে তালাকের

বারটি অবস্থা নির্ধারিত হয়েছে। তন্মধ্যে এ আয়াতে দু'টি অবস্থার হুকুম বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে এই, যদি মোহর ধার্য করা না হয়। দ্বিতীয়টি, মোহর ধার্য করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস বা সহবাস হয়নি। তৃতীয়তঃ মোহর ধার্য হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে। এক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহর সম্পূর্ণই পরিশোধ করতে হবে। কোরআন করীমে অন্য জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণিত। চতুর্থতঃ মোহর ধার্য করা হয়নি, অথচ সহবাসের পর তালাক দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারে প্রচলিত মোহর পরিশোধ করতে হবে। এর বর্ণনাও অন্য এক আয়াতে এসেছে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথম দুই অবস্থার আলোচনা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থার নির্দেশ হচ্ছে, মোহর কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। ন্যূনপক্ষে তাকে এক জোড়া কাপড় দিয়ে দেবে। কোরআন-মজীদ প্রকৃতপক্ষে এর কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। অবশ্য একথা বলেছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের মর্যাদানুযায়ী দেয়া উচিত, যাতে অন্যেরাও অনুপ্রাণিত হয় যে, সামর্থ্যবান লোক এহেন ব্যাপারে কার্পণ্য করে না। হযরত হাসান (রাঃ) এমনি এক ব্যাপারে বিশ হাজারের উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আর কাযী শোরাইহ্ পাঁচশ দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়েছেন। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেছেন, নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে এক জোড়া কাপড়।-(কুরতবী)

দ্বিতীয় অবস্থায় হুকুম হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রীর মোহর বিয়ের সময় ধার্য করা হয়ে থাকে এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়, তবে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী তা ক্ষমা করে দেয় কিংবা স্বামী পুরো মোহরই দিয়ে দেয়, তবে তা হচ্ছে তাদের ঐচ্ছিক ব্যাপার। যেমন, আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ পুরুষের পূর্ণ মোহর দিয়ে দেওয়াকেও হয়তো এজন্য মাফ করা বলা হয়েছে যে, আরবের সাধারণ প্রথা অনুযায়ী বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মোহরের অর্ধ দিয়ে দেয়া হতো। সুতরাং সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক স্বামীর প্রাপ্য হয়ে যেতো। যদি সে বদান্যতার প্রেক্ষিতে অর্ধেক না নেয়, তবে তাও ক্ষমার পর্যায়ে পড়ে এবং ক্ষমা করাকে উত্তম ও তাকওয়ার পক্ষে অনুকূল বলা হয়েছে। কেননা, তালাকটি যে ভদ্রোচিত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ক্ষমা তারই নিদর্শন — যা শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম এবং সওয়াবের কাজ। তাই ক্ষমা স্ত্রীর পক্ষ থেকেও হতে পারে, স্বামীর পক্ষ হতেও হতে পারে।

ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ - এর তফসীর রসূল (সাঃ) নিজে বর্ণনা করেছেন। বিবাহ বন্ধনের মালিক হচ্ছে স্বামী। এ হাদীসটি দারুকুতনী গ্রন্থে আমর ইবনে শো'আইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আলী (রাঃ) এবং ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকেও উদ্ধৃত করেছেন।-(কুরতুবী)

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে সমাধা হওয়ার পর তা বহাল রাখা বা ভঙ্গ করার মালিক স্বামী। সে-ই তালাক দিতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে তালাক দেয়ার সুযোগ সীমিত।

কতিপয় হাদীসের প্রমাণ অনুসারে অধিকাংশ আলেমের মতে মধ্যবর্তী নামায অর্থ হচ্ছে আসরের নামায। কেননা, এর একদিকে দিনের দু'টি নামায— ফজর ও যোহর এবং অপরদিকে রাতের দু'টি নামায — মাগরিব ও এশা রয়েছে। এ নামাযের প্রতি তাগিদ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, অনেক লোকেরই এ সময় কাজকর্মে ব্যস্ততা থাকে। আর হাদীসে 'কানেতীন বা আনুগত্যের' সাথে বাক্যটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'নীরবতার সাথে'।

এ আয়াতের দ্বারা নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে জায়েয ছিল। আর এ নামায দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইশারার দ্বারা পড়া তখনই শুদ্ধ হবে যখন একই স্থানে দাঁড়িয়ে পড়া সম্ভব। ইশারার ক্ষেত্রে সেজদার ইশারা রুকূর ইশারার চেয়ে একটু বেশী নীচু করবে। চলতে চলতে নামায হবে না। যখন এমনভাবে পড়াও সম্ভব হবে না। (যেমন যুদ্ধ চলাকালে) তখন নামায কাযা করতে হবে এবং অন্য সময় আদায় করবে।-(বয়ানুল-কোরআন)

(১) وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ .... وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ জাহেলিয়াত আমলে স্বামীর মৃত্যুর দরুন ইদ্দত ছিল এক বৎসর। কিন্তু ইসলামে এক বৎসরের স্থলে চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন—পূর্ববর্তী আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে ঃ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

-কিন্তু এতে স্ত্রীকে এতটুকু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যে, যেহেতু তখনও পর্যন্ত মিরাসের বিধান নাযিল হয়নি এবং মিরাসে কোন অংশ স্ত্রীলোকের জন্য নির্ধারণ করা হয়নি, বরং তাদের ভাগ্য পুরুষের ওসিয়্যতের উপর নির্ভরশীল ছিল যা পূর্ববর্তী আয়াত كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ এর তফসীরে বোঝা গেছে। কাজেই নির্দেশ হয়েছিল যে, যদি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজের সুবিধার জন্য স্বামীর পরিত্যক্ত বাড়ীতে থাকতে চায়, তবে এক বৎসর পর্যন্ত থাকার অধিকার রয়েছে এবং তারই পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ইদ্দতের সময় পর্যন্ত দিতে হবে।

এ আয়াতে সেই নির্দেশটিই বর্ণনা করা হয়েছে আর স্বামীদেরকে সেভাবেই ওসিয়ত করতে বলা হয়েছে। আর যেহেতু এ অধিকারটি ছিল স্ত্রীর তাই তা আদায় করা না করার অধিকারও ছিল তারই। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়া জায়েয ছিল না। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে তার অংশ ছেড়েও দিতে পারতো। আর অন্যত্র বিয়ে করাও জায়েয ছিল। এখানে 'নিয়মানুযায়ী' শব্দের অর্থ তাই। কিন্তু ইদ্দতের মধ্যে ঘর থেকে বের হওয়া বা বিয়ে করা ইত্যাদি ছিল পাপের কাজ। স্ত্রীলোকের জন্যও এবং বাধা দিতে পারা সত্ত্বেও যারা বাধা না দেয় তাদের জন্যও। পরে যখন মিরাসের আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন বাড়ী-ঘর এবং অন্যান্য সব কিছুর মধ্যেই যেহেতু স্ত্রীকেও অংশ দেয়া হয়েছে, কাজেই সে তার নিজের অংশে থাকার এবং নিজের অংশ থেকে ব্যয় করার পূর্ণ অধিকারী রয়ে গেছে। ফলে এ আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে।

(২) وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের উপকার করার কথা এর পূর্ববর্তী আয়াতেও এসেছে। তবে তা ছিল শুধু দু'রকম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য। সহবাস কিংবা নির্জনবাসের পূর্বে যাদেরকে তালাক দেয়া হয়েছে, তাদের একটি উপকার ছিল কমপক্ষে একজোড়া কাপড় দেয়া। আর দ্বিতীয় উপকার হচ্ছে অর্ধেক মোহর দেয়া। বাকী রইল সে সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যাদের সাথে স্বামী নির্জনবাস কিংবা সহবাস করেছে। তাদের মধ্যে যাদের মোহর ধার্য করা হয়েছে, তাদের উপকার করা অর্থ, তার ধার্যকৃত পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়া। আর যার মোহর ধার্য করা হয়নি তার জন্য মোহরে-মিসাল দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর যদি مَتَٰعٌ শব্দের দ্বারা 'বিশেষ ফায়দা' বলতে একজোড়া কাপড় বোঝানো হয়, তবে একজনকে তা দেয়া ওয়াজিব, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর অন্যান্যদের বেলায় তা মোস্তাহাব। আর যদি مَتَٰعٌ শব্দের দ্বারা খোর-পোষ বোঝানো হয়ে থাকে, তবে যে তালাকের পর ইদ্দত অতিক্রান্ত করতে হয়, তাতে ইদ্দত পর্যন্ত তা দেয়া ওয়াজিব তালাকে-রাজয়ীই হোক আর তালাকে-বায়েনই হোক ব্যাপক অর্থে সব ধরনের তালাকই এর অন্তর্ভুক্ত।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ
فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٢٤٣ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٤٤ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ
قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ
مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ
قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن
دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا
مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ٢٤٦ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ
قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ
عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ
الْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٤٧

(২৪৩) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে বললেন, মরে যাও। তারপর তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া প্রকাশ করে না। (২৪৪) আল্লাহ্‌র পথে লড়াই কর এবং জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সবকিছু শুনেন। (২৪৫) এমন কে আছে যে আল্লাহ্‌কে করজ দেবে উত্তম করজ; অতঃপর আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহ্ই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে। (২৪৬) মূসার পরে তুমি কি বনী-ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ্ নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইর হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করব না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। আর আল্লাহ্ তাআলা জালেমদের ভাল করেই জানেন। (২৪৭) আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন,— নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ্ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন,— নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ্ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লেখিত তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গিতে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি হেদায়েত করেছেন। জেহাদের বিধান বর্ণনার পূর্বে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যাতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হায়াত-মওত বা জীবন-মরণ একান্তভাবেই আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তির অধীন। যুদ্ধ বা জেহাদে অংশ নেয়াই মৃত্যুর কারণ নয়। তেমনি ভীরুতার সাথে আত্মগোপন করা মৃত্যু থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নয়। তফসীরে ইবনে-কাসীরে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর উদ্ধৃতিসহ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত ঐতিহাসিক ঘটনাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,—কোন এক শহরে বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাস করতো। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগলো। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে একথা অবগত করাবার জন্য যে,—মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না—তাদের কাছে দু'জন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা দু'জন সে ময়দানের দু'ধারে দাঁড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই একসাথে মরে গেল, একটি লোকও জীবিত রইল না; পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন এ সংবাদ জানতে পারলো, তখন সেখানে গিয়ে দশ হাজার মানুষের দাফন-কাফন করার ব্যবস্থা করা যেহেতু খুব সহজ ব্যাপার ছিল না তাই তাদেরকে চারিদিকে দেয়াল দিয়ে একটি বন্ধন কূপের মত করে দিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মৃতদেহগুলো পচে-গলে গেল এবং হাড়-গোড় তেমনি পড়ে রইল। দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলের হিযকীল (আঃ) নামক একজন নবী সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে সেই বদ্ধ জায়গায় বিক্ষিপ্তাবস্থায় হাড়-গোড় পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাঁকে মৃত লোকদের সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হলো। তিনি দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদেগার, তাদের সবাইকে পুনর্জীবিত করে দাও। আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং বিক্ষিপ্ত সেই হাড়গুলোকে আদেশ দিলেন ঃ

অর্থাৎ, ওহে পুরাতন হাড়সমূহ। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে নিজ নিজ স্থানে সমবেত হতে আদেশ করছেন। আল্লাহ্‌র নবীর যবানীতে এসব হাড় আল্লাহ্‌র আদেশ শ্রবণ করলো। অনেক জড়বস্তুকে হয়ত মানুষ অনুভূতিহীন মনে করে, কিন্তু দুনিয়ার প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুও আল্লাহ্‌র অনুগত ও ফরমাঁবরদার এবং নিজ নিজ অস্তিত্ব অনুযায়ী বুদ্ধি ও অনুভূতির অধিকারী। কোরআন করীম أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ - বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে তার উপযুক্ত হেদায়েত দান করেছেন।

মোটকথা, একটি মাত্র শব্দে প্রত্যেকটি হাড় নিজ নিজ স্থানে পুনঃস্থাপিত হলো। অতঃপর সে নবীর প্রতি নির্দেশ হলো, সেগুলোকে বল ঃ 'ওহে হাড়সমূহ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা মাংস পরিধান কর এবং রগ ও চামড়া দ্বারা সজ্জিত হও।'

সাথে সাথে হাড়ের প্রতিটি কঙ্কাল একেকটি পরিপূর্ণ লাশ হয়ে গেল। অতঃপর রূহকে আদেশ দেয়া হলো ঃ হে আত্মাসমূহ! আল্লাহ্ তাআলা তোমাদিগকে যার যার শরীরে ফিরে আসতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ শব্দ উচ্চারিত হতেই সে নবীর সামনে সমস্ত লাশ জীবিত হয়ে দাঁড়ালো এবং

বিস্মিত হয়ে চারদিকে তাকাতে আরম্ভ করলো। আর সবাই বলতে লাগলো سبحانك لااله الا انت "তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই"।

এ ঘটনাটি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীকে সৃষ্টিবলয় সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তদুপরি এটা কেয়ামত ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য একটা অকাট্য প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে থাকা তা জেহাদ হোক কিংবা প্লেগ মহামারীই হোক, আল্লাহ্ এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়তির প্রতি যারা বিশ্বাসী তাদের পক্ষে সমীচীন নয়। যার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে, নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্ত পূর্বেও তা হবে না এবং এক মুহূর্ত পরেও তা আসবে না, তাদের পক্ষে এরূপ পলায়ন অর্থহীন এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ।

এখন ঘটনাটি কোরআনের ভাষায় লক্ষ্য করুন! কোরআন-মজীদ এরশাদ করেছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ —অর্থাৎ, আপনি কি সেসব লোকের ঘটনা লক্ষ্য করেননি, যারা মৃত্যুর ভয়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল?

লক্ষণীয় যে, এ ঘটনা হুযুর (সাঃ)- এর যুগের হাজার হাজার বছর পূর্বেকার। হুযুর (সাঃ) – এর পক্ষে এ ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। তাই এখানে أَلَمْ تَرَ বলার উদ্দেশ্য কি? মুফাসসেরগণ বলেছেন, এমনিভাবে যেসব ঘটনা সম্পর্কে أَلَمْ تَرَ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে অথচ ঘটনা হুযুর (সাঃ)-এর যুগের বহু পূর্বেকার, যা হুযুর (সাঃ)-এর দেখার কথা কল্পনাও করা যায় না, সেসব ক্ষেত্রে দেখা দ্বারা উদ্দেশ্য আত্মার দর্শন। এসব ক্ষেত্রে أَلَمْ تَرَ দ্বারা أَلَمْ تَعْلَمْ (আপনি কি জানেন না?) বোঝানো হয়। তবুও أَلَمْ تَرَ শব্দে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ ঘটনা যে সবারই জানা, সুপ্রসিদ্ধ একটি ব্যাপার, এদিকে ইঙ্গিত করা। বোঝানো হচ্ছে যে, ঘটনাটি এমনি সুপ্রসিদ্ধ এবং বহুল আলোচিত যেন এখনও ইচ্ছা করলে তা দেখা যেতে পারে কিংবা দেখার যোগ্য। أَلَمْ تَرَ -র পরে إِلَى শব্দ যোগ করায় ভাষাগত দিক দিয়ে এদিকেই ইঙ্গিত বোঝায়। অতঃপর কোরআন করীম তারা সংখ্যায় অনেক ছিল বলে উল্লেখ করেছে। وَهُمْ أُلُوفٌ অর্থাৎ, সংখ্যায় ছিল তারা হাজার হাজার। এ সংখ্যা নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী এ শব্দটি অধিকতা বাচক বহুবচন। এতে বোঝা যায় যে, তাদের সংখ্যা দশ হাজারের কম ছিল না।

অতঃপর এরশাদ হয়েছে ঃ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বললেন,— "তোমরা মরে যাও!" আল্লাহ্র এ আদেশ প্রত্যক্ষও হতে পারে, কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে।

অতঃপর বলেছেন ঃ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ – অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা মানুষের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়। এতে সে করুণাও অন্তর্ভুক্ত যা বনী-ইসরাঈলদের উল্লেখিত দলটির প্রতি পুনর্জীবন দানের মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল এবং সে দয়াও শামিল যাতে উম্মতে-মুহাম্মদীকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন।

অতঃপর পথভোলা মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশে এরশাদ হয়েছে – وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ – অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার শত সহস্র দয়া ও করুণার নিদর্শন মানুষের সামনে অহর্নিশ উপস্থিত হতে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

প্রাসঙ্গিকভাবে এ আয়াত অন্য কয়েকটি বিষয়ের সমাধান করে দিয়েছে। প্রথমত ঃ আল্লাহ্র নির্ধারিত তকদীরের উপর কোন তদবীর কার্যকর হতে পারে না। জেহাদ অথবা মহামারীর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচানো যায় না, আর মহামারীগ্রস্ত স্থানে অবস্থান করাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। মৃত্যুর একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যার কোন ব্যতিক্রম হওয়ার নয়।

দ্বিতীয়তঃ কোনখানে কোন মহামারী কিংবা কোন মারাত্মক রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে সেখান থেকে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়া বৈধও নয়। রসূল (সাঃ)-এর এরশাদ মোতাবেক অন্য এলাকার লোকের পক্ষেও মহামারীগ্রস্ত এলাকায় যাওয়া বৈধ নয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'সে রোগের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতের উপর আযাব নাযিল করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, কোন শহরে প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা দিয়েছে, তখন সেখানে যেও না। আর যদি কোন এলাকাতে এ রোগ দেখা দেয় এবং তুমি সেখানেই থাক, তবে সেখান থেকে পলায়ন করবে না।'

প্লেগ সম্পর্কে মহানবীর উক্তির দর্শন ঃ এ সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, 'কোথাও যাওয়া মৃত্যুর কারণ হতে পারে না, আবার কোনখান থেকে পালিয়ে যাওয়াও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নয়।' এ মৌলিক বিশ্বাসের পাশাপাশি আলোচ্য নির্দেশটি নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমতঃ মহামারীগ্রস্ত এলাকার বাইরের লোককে আসতে নিষেধ করার একটি তাৎপর্য এই যে, এমনও হতে পারে যে, সেখানে গমন করার পর তার হায়াত শেষ হওয়ার দরুনই এ রোগে আক্রান্ত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করলো; এতদসত্ত্বেও আক্রান্ত ব্যক্তির মনে এমন ধারণা হতে পারে যে, সেখানে না গেলে হয়তো সে মারা যেতো না। তাছাড়া অন্যান্য লোকেরও হয়তো এ ধারণাই হবে যে, এখানে না এলে মৃত্যু হতো না। অথচ যা ঘটেছে তা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল। যেখানেই থাকতো তার মৃত্যু এ সময়েই হতো। এ আদেশের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা হয়েছে, যাতে করে তারা কোন ভুল বোঝাবুঝির শিকার না হয়।

দ্বিতীয় তাৎপর্য হল এই যে, এতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন যে, যেখানে কষ্ট হওয়ার বা মৃত্যুর আশংকা থাকে, সেখানে যাওয়া উচিত নয়; বরং সাধ্যমত ঐসব বস্তু থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করা কর্তব্য, যা তার জন্য ধ্বংস বা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া নিজের জানের হেফাযত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব ঘোষণা করা হয়েছে।

এ নিয়মের চাহিদাও তাই যে, আল্লাহ্র দেয়া তকদীরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যথাসাধ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যেসব স্থানে প্রাণ নাশের আশংকা থাকে, সেসব স্থানে না যাওয়াও এক প্রকার সতর্কতামূলক তদবীর।

এমনিভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদেরকে সে স্থান থেকে পলায়ন

করতে নিষেধ করার মাঝেও বহু তাৎপর্য নিহিত। একটি হচ্ছে এই যে, যদি এ পলায়নের প্রথা চলতে থাকে, তবে সাধারণভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা সক্ষম ও সবল তারা তো সহজেই পালাতে পারে, কিন্তু যারা দুর্বল তাদের অবস্থা কি হবে? আর যারা রোগাক্রান্ত তাদের সেবা-শুশ্রূষা কিংবা মারা গেলে দাফন-কাফনেরই বা কি ব্যবস্থা হবে?

দ্বিতীয়তঃ যারা সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে হয়তো রোগের জীবাণু প্রবেশ করে থাকবে। এমতাবস্থায় তারা যদি বাড়ী-ঘর ছেড়ে বের হয়ে থাকে, তবে তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরো বেড়ে যাবে। কারণ, প্রবাসজীবনে রোগাক্রান্ত হলে যে কি অবস্থা হয় তা সবারই জানা।

তৃতীয়তঃ যদি তাদের মধ্যে রোগের জীবাণু ক্রিয়া করে থাকে, তবে তা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। আর যদি নিজের জায়গায় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে পড়ে থাকে, তবে হয়তো নাজাত পেতে পারে। আর যদি এ রোগে মারা যাওয়াই তার ভাগ্যে থাকে, তবে ধৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করার বদলায় শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।

ইমাম বোখারী (রহঃ) ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়া'মার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে জানিছেন যে, তিনি রসূল (সাঃ)-কে প্লেগ-মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রসূল (সাঃ) তাঁকে বলেছেন, এ রোগটি আসলে শাস্তিরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যে জাতিকে শাস্তি দেয়া উদ্দেশ্য হতো তাদের ভেতরে পাঠানো হতো। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা একে মুমিনদের জন্য রহমতে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র যেসব বান্দা এরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়া সত্ত্বেও নিজ এলাকায়ই দৈর্যসহকারে বসবাস করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তার শুধু সে বিপদই হতে পারে, যা আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য লিখে রেখেছেন, তবে এমন ব্যক্তি শহীদের মত সওয়াব পাবে। হুযুর (সাঃ)-এর বাণী- 'প্লেগ শাহাদত এবং প্লেগে আক্রান্ত ব্যক্তি শহীদ'— এর ব্যাখ্যাও তাই।

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, মৃত্যুর ভয়ে জেহাদ থেকে পলায়ন করা হারাম। এ বিষয়টি কোরআনের অন্যত্র অত্যন্ত বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য কোন কোন বিশেষ অবস্থাকে নির্দেশের আওতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

এটা একান্তই আল্লাহ্‌র কুদরত যে, সাহাবিগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় সিপাহসালার আল্লাহ্‌র অসি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) যার সমগ্র ইসলামী জীবনই জেহাদে অতিবাহিত হয়েছে, তিনি কোন জেহাদে শহীদ হননি; বরং রোগাক্রান্ত হয়ে বাড়ীতে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করার আক্ষেপে তিনি অনুতাপ করেছিলেন এবং পরিবারের লোকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ 'আমি অমুক অমুক বিরাট বিরাট জেহাদে অংশগ্রহণ করেছি। আমার শরীরের এমন কোন জায়গা নেই যা তীর-বল্লম অথবা অন্য কোন মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে যখম হয়নি। কিন্তু অনুতাপের বিষয় এই যে, আজ আমি গাধার মত বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করছি। আল্লাহ্ যেন আমাকে ভীরু-কাপুরুষের প্রাপ্য শাস্তি না দেন। মৃত্যু ভয়ে যারা জেহাদ থেকে সরে থাকতে চায়, তাদেরকে আমার জীবনের এ উপদেশমূলক ঘটনাটি শুনিয়ে দিও।'

يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا - করজ বা ঋণ অর্থ নেক আমল ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা। এখানে করজ বা ঋণ শব্দটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। অন্যথায় সবকিছুরই তো একমাত্র মালিক তিনিই। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব, এমনিভাবে তোমাদের সদ্ব্যয়ের প্রতিদান অবশ্যই দেয়া হবে।

বৃদ্ধি করার কথা এক হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ্‌র পথে একটি খেজুর দানা ব্যয় করলে, আল্লাহ্ তাআলা একে এমনভাবে বৃদ্ধি করে দেবেন যে, তা পরিমাণে ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশী হবে।

আল্লাহ্‌কে ঋণ দেয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে ঋণ দেয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। তাই হাদীসে অভাবীদেরকে ঋণ দেয়ারও অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

(১) "কোন একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে একবার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহ্‌র পথে সে পরিমাণ সম্পদ দু'বার সদ্‌কা করার সমতুল্য।"

(২) ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন, এ আয়াত শুনে মানুষের মধ্যে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে একদল দুর্ভাগা বলাবলি করতো যে, মুহাম্মদের রব্ অভাবী এবং আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে; আর আমরা অভাবমুক্ত। এর উত্তরে এরশাদ হয়েছে ঃ

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ

দ্বিতীয় দল হচ্ছে সে সমস্ত লোকের, যারা এ আয়াত শুনে এর বিরুদ্ধাচরণ এবং কার্পণ্য অবলম্বন করেছে। ধন-সম্পদের লোভ তাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার তৌফিক তাদের হয়নি।

তৃতীয় দল হচ্ছে সেসব নিষ্ঠাবান মুসলমানদের, যাঁরা এ ঘোষণা শোনার সাথে সাথেই সাড়া দিয়েছিলেন এবং নিজেদের পছন্দ করা সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে দিয়েছিলেন। যেমন— আবুদ দারদাহ্ (রাঃ) প্রমুখ। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবুদ দারদাহ্ রসূল (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন,— হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আল্লাহ্ তাআলা কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন? তাঁর তো ঋণের প্রয়োজন নেই! আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) উত্তর দিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা এর বদলে তোমাদিগকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাতে চাচ্ছেন। আবুদ দারদাহ্ একথা শুনে বললেন,— হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ), হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়লেন। আবুদ দারদাহ্ বলতে লাগলেন— 'আমি আমার দু'টি বাগানই আল্লাহ্‌কে ঋণ দিলাম। রাসূল (সাঃ) বললেন, একটি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দাও এবং অন্যটি নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে দাও। আবুদ দারদাহ্ বললেন যে, আপনি সাক্ষী থাকুন, এ দু'টি বাগানের মধ্যে যেটি উত্তম— যাতে খেজুরের ছয় শ' ফলন্ত বৃক্ষ রয়েছে, সেটা আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করলাম। আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) বললেন, এর বদলে আল্লাহ্ তোমাকে বেহেশ্‌ত দান করবেন।

আবুদদারদাহ্ (রাঃ) বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বিষয়টি জানালেন। স্ত্রীও তাঁর এ সৎকর্মের কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ 'খেজুরে পরিপূর্ণ অসংখ্য বৃক্ষ এবং প্রশস্ত অট্টালিকা আবুদদারদাহ্‌র জন্য তৈরী হয়েছে।'

(৩) ঋণ দেয়ার বেলায় তা ফেরত দেয়ার সময় যদি কিছু অতিরিক্ত দেয়ার কোন শর্ত করা না থাকে এবং নিজের পক্ষ থেকে যদি কিছু বেশী দিয়ে দেয়া হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তার (ঋণের) হককে উত্তমরূপে পরিশোধ করে।'

তবে, যদি অতিরিক্ত দেয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম বলে গণ্য হবে।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ
سَكِينَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ
تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾
فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۚ
فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ
اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ
هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ
قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ
غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَمَّا
بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ
أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ
وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا
يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ
الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ
آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

(২৪৮) বনী-ইসরাঈলীদেরকে তাদের নবী আরো বললেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্ত। আর তাতে থাকবে মূসা, হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। (২৪৯) অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বার বার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহ্র হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন। (২৫০) আর যখন তালুত ও তার সেনাবাহিনী শত্রুর সম্মুখীন হল, তখন বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ— আর আমাদের সাহায্য কর সে কাফের জাতির বিরুদ্ধে। (২৫১) তারপর ঈমানদাররা আল্লাহ্র হুকুমে জালুতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ্ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। আর তাকে যা চাইলেন শেখালেন। আল্লাহ্ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ্ একান্তই দয়ালু, করুণাময়। (২৫২) এগুলো হলো আল্লাহর নিদর্শন, যা আমরা তোমাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে থাকি। আর আপনি নিশ্চতই আমার রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

সে বনী-ইসরাঈলরা আল্লাহ্র বিধান লংঘন করেছিল বলে আমালেকার কাফিরদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তখন তাদের সংশোধনের চিন্তা হলো। এখানে যে নবীর কথা বলা হয়েছে, তিনি 'শামঈল' নামে পরিচিত। أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ – বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে একটি সিন্দুক পূর্ব থেকেই ছিল, তা বংশানুক্রমে চলে আসছিল। তাতে হযরত মূসা (আঃ) ও অন্যান্য নবীগণের পরিত্যক্ত কিছু বরকতপূর্ণ বস্তুসামগ্রী রক্ষিত ছিল। বনী-ইসরাঈলরা যুদ্ধের সময় এ সিন্দুকটিকে সামনে রাখতো, আল্লাহ্ তাআলা এর দৌলতে তাদেরকে বিজয়ী করতেন। জালুত বনী-ইসরাঈলদেরকে পরাজিত করে এ সিন্দুকটি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ যখন এ সিন্দুক ফিরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, কাফেররা যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারী ও অন্যান্য বিপদাপদ। এমনিভাবে পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে দু'টি গরুর উপর সেটি উঠিয়ে হাঁকিয়ে দিল। ফেরেশতাগণ গরুগুলোকে তাড়া করে এনে তালুতের দরজায় পৌঁছে দিলেন। বনী-ইসরাঈলরা এ নিদর্শন দেখে তালুতের রাজত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করলো এবং তালুত জালুতের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন। তখন মৌসুম ছিল অত্যন্ত গরম।

قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ – এ পরীক্ষার কারণ আমার মতে এই যে, অনুরূপভাবে মানুষের জোশ ও উত্তেজনা অনেক গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু প্রয়োজনের সময় খুব নগণ্যসংখ্যক লোকই এগিয়ে আসে। উপরন্তু তখন কিছু লোকের অসহযোগ অন্যান্য লোকদেরকেও বিচলিত করে। এসব লোকদেরকে দূরে সরানোই ছিল আল্লাহ্র ইচ্ছা। তাই তাদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন যা অত্যন্ত উপযোগী ছিল। কেননা, যুদ্ধের সময় দৃঢ়তা ও কষ্টসহিষ্ণুতারই বেশী প্রয়োজন। অতএব, পিপাসার তীব্রতার সময় পানি পাওয়া সত্ত্বেও পান করা থেকে বিরত থাকা দৃঢ়তার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে এ অবস্থায় অন্ধের মত ঝাঁপিয়ে পড়া অস্থিরতার লক্ষণ।

পরবর্তীতে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বর্ণনা করা হয়েছে যে, অতিমাত্রায় পানি পানকারীগণ শারীরিক দিক দিয়ে বেকার হয়ে পড়লো এবং তারা দ্রুত চলাফেরা করতে অপারক হয়ে গেলো। রূহুল-মা'আনীতে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে-আব্বাসের রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতিতে ঘটনার যে পরিণতি বর্ণিত হয়েছে তাতে বোঝা যায়, এতে তিন ধরনের লোক ছিল।

একদল অসম্পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। দ্বিতীয় দল পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের সংখ্যা কম বলে চিন্তা করেছে এবং তৃতীয় দল ছিল পরিপূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং নিজেদের সংখ্যালঘিষ্টতার কথাও চিন্তা করেননি।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

(২৫৩) এই রসূলগণ— আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ তো হলো তারা যার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন, আর কারও মর্যাদা উচ্চতর করেছেন এবং আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে প্রকৃষ্ট মু'জেযা দান করেছি এবং তাকে শক্তিদান করেছি 'রূহুল-কুদ্দুস' অর্থাৎ জিবরাঈলের মাধ্যমে। আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর পয়গম্বরদের পেছনে যারা ছিল তারা লড়াই করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফের। আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো, কিন্তু আল্লাহ্ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন। (২৫৪) হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম। (২৫৫) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যাকিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যাকিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (২৫৬) দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত' দেরকে মানবে না এবং আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংগবার নয়। আর আল্লাহ্ সবই শুনেন এবং জানেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

(১) আয়াত تِلْكَ الرُّسُلُ - এর বক্তব্যে নবী করীম (সাঃ)-কে এক প্রকার সান্ত্বনা দান করা উদ্দেশ্য। কেননা, তাঁর নবুওয়ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরও অর্থাৎ, যা وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও কাফেররা তা মেনে নিচ্ছিল না। ফলে এটি তাঁর পক্ষে দুঃখ ও অনুতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা একথা শুনিয়ে দিয়েছেন যে, ইতিপূর্বেও বিভিন্ন পদমর্যাদা সম্পন্ন বহু নবী অতিক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু কারোই সমগ্র উম্মত ঈমানদার হয়নি। কিছুসংখ্যক লোক আনুগত্য প্রদর্শন করেছে, আবার অনেকে বিরুদ্ধাচারণও করেছে। অবশ্য এতেও আল্লাহ্র বহু তাৎপর্য রয়েছে, যদিও তা সবার বুঝে আসে না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এতটুকু বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, এর মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন বিশেষ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

(২) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আয়াতটিতে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবিগণের মধ্যে কেউ কেউ অন্য নবী অপেক্ষা মর্যাদায় বড় ছিলেন, অথচ হাদীসে রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্র নবিগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করো না।' তিনি আরো বলেছেন— 'আমাকে মূসা (আঃ)-এর চাইতে বড় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করো না।' আরো উক্ত হয়েছে, 'আমি বলতে পারি না যে, কেউ ইউনুস ইবনে মাতা অপেক্ষা উত্তম।'

(৩) مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ - হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথেই আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যম ব্যতীত কথা বলেছেন। কিন্তু তাও অন্তরালমুক্ত ছিল না। কেননা, সূরা শুরার مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ - (কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহ্র সাথে কথা বলা বাস্তবসম্মত নয়)-আয়াতে অন্তরালমুক্তভাবে আল্লাহ্ তাআলার সাথে কথা বলার বিষয়টিকে নাকচ করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, হযরত মূসা (আঃ)- এর সাথে আল্লাহ্র কথা বলা অন্তরাল থেকেই হয়েছে। অবশ্য মৃত্যুর পরে কোন রকম অন্তরাল বা যবনিকা ছাড়াই কথাবার্তা হওয়া সম্ভব। তাই শুরার সে আয়াতটি পার্থিব জীবন সম্পর্কে প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়।

এ সূরায় এবাদত এবং বৈষয়িক আচার-আচরণের বেশ কিছু বিধান এবং রীতি-নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোর বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মনের উপর চাপ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। যাবতীয় সৎকাজের মধ্যে জান-মাল ব্যয় করাটাই মানুষের কাছে সবচাইতে কঠিন মনে হয়। অথচ আল্লাহ্র বিধানসমূহের অধিকাংশই জান অথবা মাল সম্পর্কিত। তা'ছাড়া অধিকাংশ মানুষই পাপে লিপ্ত হয়, এই জানের মহব্বত অথবা মালের প্রতি আসক্তির কারণেই। সুতরাং বলতে গেলে এ দু'টিই সমস্ত পাপের মূল উৎস। আর তা থেকে মুক্তিলাভই হল যাবতীয় এবাদত-বন্দেগীর লক্ষ্য। কাজেই এসব বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর যুদ্ধ-বিগ্রহের আলোচনা একান্তই যুক্তিযুক্ত।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ —শীর্ষক আয়াতে জানের মহব্বত ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরবর্তী আয়াত – مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ —এর মধ্যে সম্পদের মোহ ত্যাগ করে তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে বিলিয়ে দেয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এরপরে বর্ণিত তালুতের কাহিনী দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, মর্যাদা ও কর্তৃত্বপ্রাপ্তি ধন-সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়। এটা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। পরন্তু যারা জানের পরোয়া না করেই আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করে, তাদের নজীর এবং প্রতিফলও তালুতের ঘটনাতে বিধৃত হয়েছে। অতঃপর সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দিয়ে জীবনের প্রকৃত সাফল্য লাভ করার উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে .... أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ – অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর।

যেহেতু সম্পদ ব্যয় করার উপর অনেক এবাদত ও মোমালাত নির্ভরশীল, তাই এ বিষয়টি সমধিক বিস্তারিতভাবে এবং গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী রুকূতেও বেশীর ভাগ আলোচনা সম্পদ ব্যয় প্রসঙ্গেই করা হয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এখনই কাজ করার সময়। পরকালে কোন কাজ বা ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, আর বন্ধুত্বের খাতিরেও কেউ দেবে না। পক্ষান্তরে কেউ এসে সুপারিশ করে মুক্ত করবে, তাও সম্ভব হবে না; যতক্ষণ আল্লাহ্ নিজে না ছাড়বেন।

আয়াতুল কুরসীর বিশেষ ফযীলত ঃ এ আয়াতটি কোরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত। হাদীসে এ আয়াতের অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহ্‌মদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সাঃ) এটিকে সবচাইতে উত্তম আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, রসূল (সাঃ) উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোরআনের মধ্যে কোন্ আয়াতটি সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইবনে কা'ব আরয করলেন, তা হচ্ছে আয়াতুল-কুরসী। রসূল (সাঃ) তা সমর্থন করে বললেন— হে আবুল মানযার ! তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।

নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনাতে রয়েছে যে, হুযূরে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন,— 'যে লোক প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল-কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না।' অর্থাৎ, মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের ফলাফল এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে।

এ আয়াতে মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ্ জাল্লা- শানুহুর একক অস্তিত্ব, তওহীদ ও গুণাবলীর বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ববান হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাক্‌শক্তিসম্পন্ন হওয়া, তাঁর সত্তার অপরিহার্যতা, তাঁর অসীম-অনন্তকাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী হওয়া যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে কেউ কোন কথা বলতে না পারে, এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তার যাবতীয় বস্তুনিচয়কে সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে কোন ক্লান্তি বা পরিশ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয় না এবং এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, কোন প্রকাশ্য কিংবা গোপন বস্তু কিংবা কোন অণু-পরমাণুর বিন্দু-বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে না পারে। এই হচ্ছে আয়াতটির মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এ আয়াতটিতে দশটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য—

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ এতে 'আল্লাহ্' শব্দটি অস্তিত্ববাচক নাম। অর্থ, সে সত্তা যা সকল পরাকাষ্ঠার অধিকারী ও সব কিছু থেকে মুক্ত। لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ সে সত্তারই বর্ণনা, যে সত্তা এবাদতের যোগ্য। 'ইলাহ্' সে সত্তা ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

দ্বিতীয় বাক্য اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ আরবী ভাষায় حى অর্থ হচ্ছে জীবিত। আল্লাহ্‌র নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দিয়েছে যে, তিনি সর্বদা জীবিত ও বিদ্যমান থাকবেন; মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। قيوم শব্দ কেয়াম শব্দ হতে উৎপন্ন, ইহা ব্যুৎপত্তিগত আধিক্যের অর্থ ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে অন্যকেও বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। 'কাইয়ুম' আল্লাহ্‌র এমন এক বিশেষ গুণ যাতে কোন সৃষ্টি অংশীদার হতে পারে না। তাঁর সত্তা স্থায়িত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেননা, যে নিজের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী, সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কি করে করবে? সে জন্যই কোন মানুষকে 'কাইয়ুম' বলা জায়েয নয়। যারা 'আবদুল কাইয়ুম' নামকে বিকৃত করে শুধু 'কাইয়ুম' বলে তারা গোনাহগার হবে।

আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামের মধ্যে حى وقيوم অনেকের মতে 'ইসমে-আযম।' হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, বদরের যুদ্ধে আমি একবার চেয়েছিলাম যে, রসূল (সাঃ)-কে দেখবো তিনি কি করছেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, তিনি সেজদায় পড়ে يا حى يا قيوم বলছেন।

তৃতীয় বাক্য لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ - سِنَةٌ সীন-এর যের দ্বারা উচ্চারণ করলে এর অর্থ হয় তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব। نَوْمٌ পূর্ণ নিদ্রাকে বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পূর্ববর্তী বাক্যে 'কাইয়ুম' শব্দে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আসমান ও যমিনের যাবতীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আল্লাহ্ তাআলা। সমস্ত সৃষ্টিরাজি তাঁর আশ্রয়েই বিদ্যমান। এতে করে হয়তো ধারণা হতে পারে যে, যে সত্তা এত বড় কার্য পরিচালনা করছেন, তাঁর কোন সময় ক্লান্তি আসতে পারে এবং কিছু সময় বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য থাকা দরকার। দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌কে নিজের বা অন্য কোন সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করবে না, নিজের মতো মনে করবে না। তিনি সমকক্ষতা ও সকল তুলনার উর্ধ্বে। তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে এসব কাজ করা কঠিন নয়। আবার তাঁর ক্লান্তিরও কোন কারণ নেই। আর তাঁর সত্তা যাবতীয় ক্লান্তি, তন্দ্রা ও নিদ্রার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

চতুর্থ বাক্য لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত لا م অক্ষর মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ এবং যমিনে যা কিছু রয়েছে সে সবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির মালিক। যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

পঞ্চম বাক্য— مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ অর্থ হচ্ছে, এমন কে আছে, যে তাঁর সামনে কারো সুপারিশ করতে পারে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত? এতে কয়েকটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম হচ্ছে এই যে, যখন আল্লাহ্ তাআলা যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর মালিক এবং কোন বস্তু তাঁর চাইতে বড় নয়, তাই কেউ তাঁর কোন কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকারী নয়। তিনি যা কিছু করেন, তাতে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। তবে এমন হতে পারতো যে, কেউ কারো জন্য

সুপারিশ করে, তাই এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ক্ষমতাও কারো নেই। তবে আল্লাহ্র কিছু খাস বান্দা আছেন, যাঁরা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে পারবেন, অন্যথায় নয়। হাদীসে এরশাদ হয়েছে, রসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সমস্ত উম্মতের জন্য সুপারিশ করবো। একে 'মাকামে-মাহমুদ' বলা হয়, যা হুযূর (সাঃ)-এর জন্য খাস। অন্যের জন্য নয়।

ষষ্ঠ বাক্য– يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা অগ্রপশ্চাত যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত। অগ্রপশ্চাত বলতে এ অর্থও হতে পারে যে, তাদের জন্মের পূর্বে ও জন্মের পরের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী আল্লাহ্র জানা রয়েছে। আর এ অর্থও হতে পারে যে, অগ্র বলতে সে অবস্থা বোঝানো হয়েছে যা মানুষের জন্য প্রকাশ্য, আর পশ্চাত বলতে বোঝানো হয়েছে যা অদৃশ্য। তাতে অর্থ হবে এই যে, কোন কোন বিষয় মানুষের জ্ঞানের আওতায় রয়েছে কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহ্র ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। তাঁর জ্ঞান সে সমস্ত বিষয়ের উপরই পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এ দুটিতে কোন বিরোধ নেই। আয়াতের ব্যাপকতায় উভয় দিকই বোঝানো হয়।

সপ্তম বাক্য وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ অর্থাৎ, মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানের কোন একটি অংশবিশেষকেও পরিবেষ্টিত করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেন শুধু ততটুকুই সে পেতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টির অণু-পরমাণুর ব্যাপক জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানের আওতাভুক্ত, এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। মানুষ অথবা অন্য কোন সৃষ্টি এতে অংশীদার নয়।

অষ্টম বাক্য — وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ অর্থাৎ, তাঁর কুরসী এত বড়, যার মধ্যে সাত আকাশ ও যমিন পরিবেষ্টিত রয়েছে। আল্লাহ্ উঠা-বসা আর স্থান-কাল থেকে মুক্ত। এ ধরনের আয়াতকে মানুষের কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের সাথে তুলনা করা উচিত নয়। এর অবস্থা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা মানবজ্ঞানের উর্ধ্বে। তবে হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এতটুকু বোঝা যায় যে, আরশ ও কুরসী এত বড় যে, তা সমগ্র আকাশ ও যমিনকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। ইবনে কাসীর হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হুযূর (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কুরসী কি এবং কেমন? তিনি বলেছেন, যার এখতিয়ারে আমার প্রাণ তাঁর কসম, কুরসীর সাথে সাত আকাশ ও সাত যমিনের তুলনা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেয়া একটি আংটির মত। অন্য এক বর্ণনাতে আছে যে, আরশের তুলনায় কুরসীও অনুরূপ।

নবম বাক্য وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষে এ দু'টি বৃহৎ সৃষ্টি, আসমান ও যমিনের হেফাযত করা কোন কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। কারণ, এই অসাধারণ ও একক পরিপূর্ণ সত্তার পক্ষে এ কাজটি একান্তই সহজ ও অনায়াসসাধ্য।

দশম বাক্য وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ তিনি অতি উচ্চ ও অতি মহান। পূর্বের নয়টি বাক্যে আল্লাহ্র সত্তা ও গুণের পূর্ণতা বর্ণনা করা হয়েছে। তা দেখার এবং বোঝার পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে যে, সকল শান-শওকত, বড়ত্ব ও মহত্ব এবং শক্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তাআলা। এ দশটি বাক্যে আল্লাহ্র 'যাত' ও সিফাতের পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

ইসলামকে যারা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সেজন্য তাদেরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, কোন শক্ত দড়ির বেষ্টনকে সুদৃঢ়ভাবে ধরে পতন থেকে মুক্তি পায়। আর এমন দড়ি ছিঁড়ে পড়ার যেমন ভয় থাকে না, তেমনিভাবে ইসলামেও কোন রকম ধ্বংস কিংবা ক্ষতি নেই। তবে দড়িটি যদি কেউ ছিঁড়ে দেয় তা যেমন স্বতন্ত্র কথা, তেমনিভাবে কেউ যদি ইসলামকে বর্জন করে, তবে তাও স্বতন্ত্র ব্যাপার।– (বয়ানুল-কোরআন)

এ আয়াত দেখে কোন কোন লোক প্রশ্ন করে যে, আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। অথচ ইসলাম ধর্মে জেহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা দেয়া হয়েছে?

একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এমন প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ, ইসলামে জেহাদ ও কেতালের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য দেয়া হয়নি। যদি তাই হতো, তবে জিযিয়া করের বিনিময়ে কাফেরদেরকে নিজ দায়িত্বে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইসলামের জেহাদ ও কেতাল ফেৎনা-ফাসাদ বন্ধ করার লক্ষ্যে করা হয়। কেননা, ফাসাদ আল্লাহ্র পছন্দনীয় নয়, অথচ কাফেররা ফাসাদের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহ্ এরশাদ করেছেনঃ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ "তারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা ফাসাদকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

এজন্য আল্লাহ্ তাআলা জেহাদ এবং কেতালের মাধ্যমে এসব লোকের সৃষ্ট যাবতীয় অনাচার দূর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেমতে জেহাদের মাধ্যমে অনাচারী জালেমদের হত্যা করা সাপ-বিচ্ছু ও অন্যান্য কষ্টদায়ক জীবজন্তু হত্যা করারই সমতুল্য।

ইসলাম জেহাদের ময়দানে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং অচল ব্যক্তিদের হত্যা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছে। আর এমনিভাবে সে সমস্ত মানুষকেও হত্যা করা থেকে বিরত করেছে, যারা জিযিয়া কর দিয়ে আইন মান্য করতে আরম্ভ করেছে।

ইসলামের এ কার্য-পদ্ধতিতে বোঝা যায় যে, সে জেহাদ ও কেতালের দ্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না, বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অন্যায়-অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দিয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) একজন বৃদ্ধা নাসারা স্ত্রীলোককে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তখন সে স্ত্রীলোক উত্তর দিল আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা। শেষ জীবনে নিজের ধর্ম কেন ত্যাগ করবো? হযরত ওমর (রাঃ) একথা শুনেও তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি বরং এ আয়াত পাঠ করলেন لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ অর্থাৎ, ধর্মে কোন বল প্রয়োগের নিয়ম নেই। বাস্তব পক্ষে ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ সম্ভবও নয়। কারণ ঈমানের সম্পর্ক বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে নয়। আর জেহাদ ও কেতাল দ্বারা শুধু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রভাবিত হয়। সুতরাং এর দ্বারা ঈমান গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভবই নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জেহাদ কেতালের নির্দেশ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ আয়াতের পরিপন্থী নয়।— (মাযহারী)

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ
اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ
الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا
اُحْيٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ
الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّ
هِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ
قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ
عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ
اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى
الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ
لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(২৫৭) যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। (২৫৮) তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ্ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন? ইবরাহীম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন সে কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ্ সীমালংঘণকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না। (২৫৯) তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ্ মরণের পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ্ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ' বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল, আমি ছিলাম, একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ' বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে—সেগুলো পচে যায়নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল—আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ ২৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইসলাম সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত এবং কুফর সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য। এতদসঙ্গে কাফের বা বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব করার বিপদ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, এরা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নেয়।

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, যখন আল্লাহ্ তাআলা কোন কাফের ব্যক্তিকে দুনিয়াতে মান-সম্মান এবং রাজত্ব দান করেন, তখন তাকে সে নামে অভিহিত করা জায়েয। এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রয়োজনবোধে তার সাথে তর্ক-বিতর্ক করাও জায়েয, যাতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।

কেউ কেউ এরূপ সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, সে হয়তো বলতে পারতো যে, যদি আল্লাহ্ বলতে কেউ থাকেন, তবে তিনিই পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত করুন! এর উত্তর হচ্ছে এই যে, তার অন্তরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একথা জেগে উঠলো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আছেন এবং পূর্ব দিক হতে সূর্য উদয় করা তাঁর কাজ এবং তিনি পশ্চিম দিক হতেও উদয় করতে পারেন। আর এ ব্যক্তি নবী হয়ে থাকলে অবশ্যই এমন হবে। আর এমন হলে বিস্ময় এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাতে না আবার লাভের পরিবর্তে ক্ষতি বেড়ে যায়! যেমন, মানুষ এ মু'জেযা দেখে যদি আমার দিক থেকে ফিরে তার দিকে ঝুঁকে যায়! সামান্য বাড়াবাড়িতে না আবার রাজত্বই চলে যায়। কাজেই সে উত্তরও দেয় নাই। তার কাছে এ প্রশ্নের কোন উত্তরও ছিল না। এ জন্য হতভম্ব হয়ে পড়ে।—(বয়ানুল-কোরআন)

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ۖ قَالَ أَوَلَمْ
تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً
مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ
جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ۝ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ
وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ وٰسِعٌ عَلِيمٌ ۝ الَّذِينَ
يُنْفِقُونَ أَمْوٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا
مَنًّا وَّلَا أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ
يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝ يٰأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا
تُبْطِلُوا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ
رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ
عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ ۝

(২৬০) আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন; তুমি কি বিশ্বাস কর না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্যে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও! পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন। (২৬১) যারা আল্লাহ্র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ্ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। (২৬২) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। (২৬৩) নম্র কথা বলে দেয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা ঐ দান-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলা সম্পদশালী, সহিষ্ণু। (২৬৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিবেদন ও পুনর্জীবনদান প্রত্যক্ষীকরণ ঃ এটি হলো তৃতীয় কাহিনী যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আরয করলেন, আপনি কিভাবে মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন, তা আমাকে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করলেন, এরূপ আকাঙ্খা ব্যক্ত করার কারণ কি? আমার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি কি তোমার আস্থা নেই? ইবরাহীম (আঃ) নিজের আস্থা বিবৃত করে নিবেদন করলেন, আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই আছে। কেননা, আপনার সর্বময় ক্ষমতার নিদর্শন সর্বদা, প্রতি মুহূর্তেই দেখতে পাচ্ছি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তার নিজের সত্তা থেকে শুরু করে এ বিশ্ব জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এর প্রমাণ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মানব-প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে; এটা কি করে হবে, না জানি এর প্রক্রিয়াটা কেমন? মনের মাঝে এ ধরনের প্রশ্ন উদয় হওয়ার ফলে পূর্ণ প্রশান্তি লাভ হতে চায় না। নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) এরূপ নিবেদন করেছিলেন, যাতে মৃতব্যক্তিকে জীবিতকরণ সংক্রান্ত চিন্তা দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। অধিকন্তু মনে যাতে স্থিরতা আসে; নানা প্রশ্নের জাল যেন অন্তরে বাসা বাঁধতে না পারে এবং মনের দৃঢ়তা যাতে বজায় থাকে।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষ করাবার জন্য এক অভিনব ব্যবস্থা করলেন, যাতে মুশরেকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ও দূর হয়ে যায়। প্রক্রিয়াটি ছিল এই যে, ইবরাহীমকে চারটি পাখী ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে লালন-পালন করতে নির্দেশ দেয়া হলো, যাতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে যায় এবং ডাকামাত্র হাতের কাছে চলে আসে। তদুপরি তিনি যেন সেগুলোকে ভালভাবে চিনতেও পারেন। পরে নির্দেশ হল, পাখীগুলোকে জবাই করে এর হাড়-মাংস, পাখা ইত্যাদি সবগুলোকেই কিমায় পরিণত কর, তারপর সেগুলোকে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজে পছন্দমত কয়েকটি পাহাড়ে এক একটি ভাগ রেখে দাও। তারপর এদেরকে ডাক। তখন এগুলো আল্লাহ্র কুদরতে জীবিত হয়ে দৌড়ে তোমার কাছে চলে আসবে।

তফসীরে রূহুল-মা'আনীতে ইবনুল-মান্যারের উদ্ধৃতিতে হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাই করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সাথে হাড়, পাখার সাথে পাখা, গোশতের সাথে গোশত রক্তের সাথে রক্ত মিলে পূর্বের রূপ ধারণ করল এবং তাঁর কাছে দৌড়ে এসে উপস্থিত হলো। তখন আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করলেন-হে ইবরাহীম। কেয়ামতের দিন এমনিভাবে সবাইকে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একত্রিত করে এক মুহূর্তে সেগুলোতে প্রাণ সঞ্চারিত করে দেব। কোরআনের ভাষায় يَأْتِينَكَ سَعْيًا বলা হয়েছে যে, এসব পাখী দৌড়ে আসবে, যাতে বোঝা যায়, সেগুলো উড়ে আসবে না। কেননা, আকাশে উড়ে আসলে দৃষ্টির অগোচরে যেতে পারে এবং তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। পক্ষান্তরে মাটির উপরে দৌড়ে আসলে তা দৃষ্টির মধ্যে থাকবে। এ ঘটনাতে আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের পরে পুনর্জীবনের এমন এক নিদর্শন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দেখালেন, যাতে মুশরেকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়েরও

অবসান হতে পারে। পুনর্জীবন এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে মুশরেকদের এটাই ছিল বড় প্রশ্ন। মানুষ মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যায়, আর এ মাটি বাতাসের সাথে কোথায় কোথায় উড়ে যায়! আবার কখনো পানির স্রোতের সাথে গড়িয়ে যায়, কখনো বা বৃক্ষ ও শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে আবার এর রেণু-কণা, দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিক্ষিপ্ত রেণু-কণা একত্রিত করে তাতে প্রাণসঞ্চার করার বিষয়টি সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। সব বিষয়কেই তারা নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওজন করতে চায়। তারা তাদের বোধশক্তির বাইরের কোন ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তাও করতে পারে না। অথচ তারা যদি নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই একটু চিন্তা করে, তবেই বুঝতে পারবে যে, তাদের অস্তিত্বও সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুর একটা সমষ্টি।

আলোচ্য ঘটনার উপর কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর ঃ আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমতঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মনে এ প্রশ্নই বা কেন জেগেছিল? অথচ তিনি আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতার উপর বিশ্বাসীরূপে তৎকালীন বিশ্বে সর্বাধিক দৃঢ় ছিলেন।

এর উত্তর এই যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশ্ন কোন সন্দেহ-সংশয়ের কারণে ছিল না। বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতে মৃতদেহকে জীবিত করবেন, তা তাঁর সর্বময় ক্ষমতার জন্য কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু মৃতকে জীবিত করা মানুষের শক্তির উর্ধ্বে, তারা কখনো কোন মৃতকে জীবিত হতে দেখেনি। পরন্তু মৃতকে জীবিত করার পদ্ধতি ও রূপ বিভিন্ন রকম হতে পারে। মানুষের স্বভাব হচ্ছে এই যে, যে বস্তু সে দেখেনি তার অনুসন্ধান করার জন্য তার মনে একটা সহজাত কৌতূহল জন্ম নেয়। এতে তার ধারণা, বিভিন্ন পথে এগিয়ে যেতে থাকে। তাতে চিন্তাজনিত কষ্টও সহ্য করতে হয়। এ চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে রেহাই পেয়ে অন্তরে স্থিরতা লাভ করাকেই 'এতমিনান' বা প্রশান্তি বলা হয়। এই এতমিনান লাভের উদ্দেশেই ছিল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ প্রার্থনা।

এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, ঈমান ও এতমিনান-এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঈমান সে ইচ্ছাধীন দৃঢ়বিশ্বাসকে বলে, যা মানুষ রসূল (সাঃ)-এর কথায় কোন অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অর্জন করে। আর 'এতমিনান' অন্তরের সে দৃঢ়তাকে বলা হয় যা প্রত্যক্ষ কোন ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। অনেক সময় কোন দৃশ্যমান বিষয়েও দৃঢ়বিশ্বাস জন্মায়, কিন্তু অন্তরের এতমিনান বা প্রশান্তি লাভ হয় না এজন্য যে, এর স্বরূপ জানা থাকে না। এতমিনান শুধু চাক্ষুষ দর্শনে লাভ হয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী অবশ্যই ছিলেন; তবে প্রশ্নটি ছিল শুধু তার স্বরূপটি জানার জন্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) মৃতকে জীবিত করার স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন বটে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে তাঁর মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে أَوَلَمْ تُؤْمِنْ অর্থাৎ, তুমি কি বিশ্বাস কর না, বলার হেতু কি?

উত্তর এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক উত্থাপিত এ প্রশ্নটি দু'ধরনের অর্থ হতে পারে।

(এক) তিনি জীবিত করার স্বরূপ জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন। তবে মূল প্রশ্ন অর্থাৎ, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন না।

(দুই) পুনর্জীবিত করার ক্ষমতায় সন্দেহ কিংবা অস্বীকৃতি থেকেও এ প্রশ্ন জন্ম নিতে পারে। প্রশ্নের ভাষা এ সম্ভাবনার প্রতিকূল নয়। উদাহরণতঃ কোন বোঝা সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস এই যে, অমুক ব্যক্তি এটি বহন করতে পারবে না। তখন আপনি তার অপারকতা প্রকাশ করার জন্যে বললেন ঃ দেখি, তুমি কেমন করে বোঝাটি বহন কর! ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশ্নের এ ভুল অর্থও কেউ কেউ গ্রহণ করতে পারতো। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এ ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত প্রমাণিত করার উদ্দেশে বললেন أَوَلَمْ تُؤْمِنْ যাতে ইবরাহীম (আঃ) উত্তরে بَلَىٰ হাঁ, বিশ্বাস করি' বলে ভুল বোঝার অবকাশ থেকে মুক্ত হয়ে যান।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। পরাক্রমশালী হওয়ার মধ্যে সর্বশক্তিমানতা বিধৃত হয়েছে; আর প্রজ্ঞাময় বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন বিশেষ হেকমতের কারণেই প্রত্যেককে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রত্যক্ষ করানো হয় না। নতুবা প্রত্যেককে এটা প্রত্যক্ষ করানো আল্লাহ্ তাআলার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু এতে 'ঈমান-বিল-গায়েব' তা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ হয়।

এটি সূরা বাক্বারার ৩৬ তম রুকু, যা ২৬২ নম্বর আয়াত থেকে শুরু হয়। এখনও এ সূরার পাঁচটি রুকূ বাকী রয়েছে। তন্মধ্যে শেষ রুকূতে সামগ্রিক ও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী চার রুকূতে ২৬২ তম আয়াত থেকে ২৮৩ তম আয়াত পর্যন্ত মোট ২১টি আয়াত। এগুলোতে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশ ও বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। এসব নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে বর্তমান বিশ্ব যেসব অর্থনৈতিক সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে সেগুলোর সমাধান আপনা-আপনিই বের হয়ে আসবে। আজ কোথাও পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং কোথাও এর জবাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তিত রয়েছে। এসব নীতির পারস্পরিক সংঘাতের ফলে গোটা বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তপ্ত লাভায় পরিপূর্ণ হয়ে আগ্নেয়গিরির রূপ ধারণ করেছে। এসব আয়াতে ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্ণিত হয়েছে। এটি দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

(১) প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে অভাবগ্রস্ত, দীন-দুঃখীদের জন্যে ব্যয় করার শিক্ষা,— একে সদকা ও খয়রাত বলা হয়।

(২) সুদের লেন-দেনকে হারাম করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ।

প্রথম দু'রুকূতে দান-খয়রাতের ফযীলত, তৎপ্রতি উৎসাহদান এবং তৎসম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ দু'রুকূতে সুদভিত্তিক কারবারের অবৈধতা, নিষেধাজ্ঞা এবং ঋণদানের বৈধ পন্থার বর্ণনা রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর দান-খয়রাত আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এমন কতিপয় বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা দান-খয়রাতকে বরবাদ ও নিস্ফল প্রয়াসে পরিণত করে।

এরপর বর্ণনা করা হয়েছে দু'টি উদাহরণ। একটি আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় দান খয়রাতের এবং অপরটি অগ্রহণীয় ও ফাসেদ দান-খয়রাতের।

এ রুকূতে এ পাঁচটি বিষয়বস্তু উল্লেখিত হয়েছে।

এসব বিষয়বস্তুর পূর্বে জানা দরকার যে, আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয়

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ
تَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ
فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن
نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ
الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا
إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا
أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾
الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ
يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ
أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

(২৬৫) যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়; অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন। (২৬৬) তোমাদের কেউ পছন্দ করে যে, তার একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হবে, এর তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে, আর এতে সর্বপ্রকার ফল-ফসল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌছবে, তার দুর্বল সন্তান-সন্ততিও থাকবে, এমতাবস্থায় এ বাগানে একটি ঘূর্ণিবায়ু আসবে, যাতে আগুন রয়েছে, অনন্তর বাগানটি ভস্মীভূত হয়ে যাবে? এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন—যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর। (২৬৭) হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ। (২৬৯) তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশে তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান।

করাকে কোরআন পাক কোথাও **انفاق** শব্দে, কোথাও **اطعام** শব্দে, কোথা **صدقه** শব্দে এবং কোথাও **إِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ** শব্দে ব্যক্ত করেছে। কোরআনের এসব শব্দ এবং বিভিন্ন স্থানে এগুলোর ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, **صدقه** – **انفاق** – **اطعام** প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যাপক অর্থবোধক এবং সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সর্বপ্রকার দান-খয়রাত ও ব্যয়কেই বোঝায়; তা ফরয, ওয়াজিব, কিংবা নফল, মুস্তাহাব যাই হোক। ফরয যাকাত বোঝাবার জন্যে কোরআন একটি স্বতন্ত্র শব্দ **إِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ** ব্যবহার করেছে এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ বিশেষ সদকাটি আদায় করা ও ব্যয় করার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এ রুকূতে বেশীর ভাগ **انفاق** শব্দ এবং কোথাও **صدقه** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এখানে সাধারণ দান-খয়রাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার একটি দৃষ্টান্ত ঃ প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, —অর্থাৎ, হজ্ব, জিহাদ কিংবা ফকীর, মিসকীন, বিধবা ও এতীমদের জন্যে কিংবা সাহায্যের নিয়তে আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন, কেউ গমের একটি দানা সরস জমিতে বপন করল। এ দানা থেকে একটি চারা গাছ উৎপন্ন হল, যাতে গমের সাতটি শীষ এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। অতএব, এর ফল দাঁড়ালো এই যে, একটি দানা থেকে সাতশ' দানা অর্জিত হয়ে গেল।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার সওয়াব এক থেকে শুরু করে সাতশ' পর্যন্ত পৌছে। এক পয়সা ব্যয় করলে সাতশ' পয়সার সওয়াব অর্জিত হতে পারে।

সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, একটি সৎকর্মের সওয়াব দশগুণ পাওয়া যায় এবং তা সাতশ' গুণে পৌছে।

দান গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলী ঃ কিন্তু কোরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করার পরিবর্তে গম-বীজের দৃষ্টান্তের আকারে বর্ণনা করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কৃষক গমের এক দানা থেকে সাতশ' দানা তখনই পেতে পারে, যখন দানাটি হবে উৎকৃষ্ট। কৃষকও কৃষি বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল হবে এবং জমিও হবে সরস। কেননা, এ তিনটির যেকোন একটি বিষয়ে অভাব হলেও হয় দানা বেকার হয়ে যাবে অর্থাৎ, একটি দানাও উৎপন্ন হবে না, কিংবা এক দানা থেকে সাতশ' দানার মত ফলনশীল হবে না।

এমনিভাবে সাধারণ সৎকর্ম এবং বিশেষ করে আল্লাহ্‌র পথে কৃত ব্যয় গ্রহণীয় ও অধিক সওয়াব পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। (১) পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা। হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেন না।

(২) যে ব্যয় করবে তাকেও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সৎ হতে হবে। কোন খারাপ নিয়তে কিংবা নাম-যশ অর্জনের উদ্দেশে যে ব্যয় করে, সে ঐ অজ্ঞ কৃষক সদৃশ, যে বীজকে অনুর্বর মাটিতে বপন করে, ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়।

(৩) যার জন্য ব্যয় করবে, তাকেও সদকার যোগ্য হতে হবে। অযোগ্য ব্যক্তির জন্যে ব্যয় করলে সদকা ব্যর্থ হবে। এভাবে বর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযীলতও জানা গেল এবং সাথে সাথে তিনটি শর্তও জানা গেল যে, হালাল ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে, ব্যয়

করার রীতিও সুন্নত অনুযায়ী হতে হবে এবং যোগ্য ব্যক্তির প্রতি ব্যয় করতে হবে। শুধু পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিলেই এ ফজীলত অর্জিত হবে না।

দ্বিতীয় আয়াতে দান-খয়রাতের নির্ভুল ও সুন্নত তরীকা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং যাকে দান করে, তাকে কষ্ট দেয় না, তাদের সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য তাদের কোন বিপদাশঙ্কা নেই এবং অতীতের ব্যাপারেও তাদের কোন চিন্তা নেই।

সদকা গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলী ঃ এ আয়াতে সদকা কবূল হওয়ার জন্যে দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। (১) দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং (২) গ্রহীতাকে ঘৃণিত মনে করা যাবে না। অর্থাৎ, তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করতে পারবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

তৃতীয় আয়াতে قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ অর্থাৎ, সদকা-খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত দু'টি শর্তের আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে কারও প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং দ্বিতীয়তঃ যাকে দান করা হবে তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে যে, আর্থিক অক্ষমতা কিংবা ওযরের সময় যাঞ্চাকারীর জওয়াবে কোন যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত অজুহাত বলে দেয়া এবং যাঞ্চকারী অশোভন আচরণ করে রাগান্বিত করলে তাকে ক্ষমা করা বহুগুণে শ্রেয়ঃ সে দান খয়রাতের চাইতে যার পর দান গ্রহীতাকে কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং সম্পদশালী ও সহিষ্ণু। তিনি কারও অর্থের মুখাপেক্ষী নন। যে ব্যক্তি ব্যয় করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই করে। অতএব, ব্যয় করার সময় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষ্য রাখা উচিত যে, কারও প্রতি তার অনুগ্রহ নেই, নিজের উপকারের জন্যেই সে ব্যয় করছে। দান গ্রহীতার পক্ষ থেকে কোনরূপ অকৃতজ্ঞতা অনুভব করলেও তাকে খোদায়ী রীতির অনুসারী হয়ে ক্ষমা করা দরকার।

চতুর্থ আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই অন্যভাবে আরও তাকীদসহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে, মুখে অনুগ্রহ প্রকাশ করে কিংবা আচার-আচরণের মাধ্যমে গ্রহীতাকে কষ্ট দিয়ে নিজের দান-খয়রাতকে বরবাদ করো না।

এতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যে দান-খয়রাতের পর অনুগ্রহ প্রকাশ কিংবা গ্রহীতাকে কষ্ট দেয়ার মত কোন কাজ করা হয়, তা বাতিল এবং না করার শামিল। এরূপ দান-খয়রাতে কোন সওয়াব নেই। এ আয়াতে দান কবুল হওয়ার আরও একটি শর্ত বর্ণনা করে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন মসৃণ পাথরের উপর মাটি জমে যায় এবং তাতে কেউ বীজ বপন করে। অতঃপর এর উপর মুষলধারে বারিপাত হয়। ফলে মাটি কেটে গিয়ে পাথরটি সম্পূর্ণ মসৃণ হয়ে যায়। এরূপ লোক স্বীয় উপার্জন হস্তগত করতে সক্ষম হবে না এবং আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না। এতে সদকা-খয়রাত কবুল হওয়ার এ শর্ত জানা গেল যে, নির্ভেজালভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পরকালের সওয়াবের নিয়তে ব্যয় করতে হবে—লোকদেখানো কিংবা নাম-যশের নিয়ত করা যাবে না। নাম-যশের নিয়তে ব্যয় করা ধন-সম্পদ জলাঞ্জলি দেয়ারই নামান্তর। যদি পরকালে বিশ্বাসী মুমিনও নাম-যশের উদ্দেশে কোন দান-খয়রাত করে, তবে তার অবস্থাও তদ্রূপ হবে এবং বিনিময়ে কোন সওয়াবই সে পাবে না। এমতাবস্থায় এখানে لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ যোগ করে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশে কাজ করা আল্লাহ্ তাআলা ও কেয়ামতে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয়। লোকদেখানো কাজ করা বিশ্বাসে ত্রুটিরই লক্ষণ।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কৃতঘ্ন-কাফেরদেকে পথ প্রদর্শন করবেন না। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার হেদায়েত ও আয়াত সব মানুষের জন্যেই প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু কাফেররা এ সবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এর পরিণতিতে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে তওফীক তথা সৎকাজের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে দেন। ফলে তারা কোন হেদায়েত কবুল করতে পারে না।

পঞ্চম আয়াতে গ্রহণযোগ্য দান-খয়রাতের একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। যারা স্বীয় ধন-সম্পদকে মনে দৃঢ়তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ কোন টিলায় অবস্থিত বাগানের মত। প্রবল বৃষ্টিপাত না হলেও হাল্কা বারিবর্ষণই যার জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে খুব পরিজ্ঞাত।

এ উদাহরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, খাঁটি নিয়ত ও উপরোক্ত শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযীলত অনেক। সৎনিয়ত ও আন্তরিকতার সাথে অল্প ব্যয় করলেও তা যথেষ্ট এবং পারলৌকিক সাফল্যের কারণ।

ষষ্ঠ আয়াতে উপরোক্ত শর্তাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে দান-খয়রাত বাতিল ও প্রত্যাখাত হওয়ার বিষয়টিও একটি উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ তোমাদের কেউ পছন্দ করবে কি যে, তার একটি আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান হবে, বাগানের নীচ দিয়ে পানির নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, বাগানে সব রকম ফল থাকবে, সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার দুর্বল ও শক্তিহীন ছেলে সন্তানও বর্তমান থাকবে, এমতাবস্থায় বাগানে দাবানল আঘাত হানবে এবং বাগানটি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? আল্লাহ্ তাআলা এমনিভাবে তোমাদের জন্যে নজীর বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

এ উদাহরণে কয়েকটি অতিরিক্ত শর্ত যোগ করা হয়েছে; অর্থাৎ, সে বৃদ্ধ হয়ে গেল, তার সন্তান-সন্ততিও আছে এবং সন্তানগুলো অল্পবয়স্ক; ফলে দুর্বল ও শক্তিহীন। এসব শর্তের উদ্দেশ্য এই যে, যৌবনে কারও বাগান ও শস্যক্ষেত্র জ্বলে গেলে সে পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশা করতে পারে, কিংবা যার সন্তান-সন্ততি নেই এবং পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশাও নেই, বাগান জ্বলে যাওয়ার পরও তার পক্ষে জীবিকার ব্যাপারে তেমন চিন্তিত হওয়ার কথা নয়। একটিমাত্র লোকের ভরণ-পোষণ, কষ্টে-সৃষ্টে হলেও চলে যায়। পক্ষান্তরে যদি সন্তান-সন্ততিও থাকে এবং পিতার কাছে সহযোগিতা ও সাহায্য করার মত বলিষ্ঠ যুবক ও সৎসন্তান-সন্ততি থাকে, তবুও বাগান ধ্বংস হওয়ার দরুন তেমন বেশী চিন্তা ও ব্যথার কারণ নেই। কেননা, সে সন্তান-সন্ততির চিন্তা থেকে মুক্ত। বরং সন্তানেরা তার বোঝাও বহন করতে সক্ষম। মোটকথা এ তিনটি শর্তই মুখাপেক্ষিতার তীব্রতা বর্ণনা করার জন্যে যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ, সে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে বাগান করলো, বাগান তৈরী হয়ে ফলও দিতে লাগলো, এমতাবস্থায় সে বৃদ্ধ হয়ে পড়লো। তার সন্তান-সন্ততিও বর্তমান এবং সন্তানগুলো অল্প বয়স্ক ও দুর্বল। এহেন মুহূর্তে যদি তৈরী-বাগান জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তীব্র আঘাত ও অপরিসীম কষ্টেরই কথা।

পূর্ণ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সদ্কা ও খয়রাত আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে এখলাস। অর্থাৎ, খাঁটি নিয়তে ও অন্তরে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যেই ব্যয় করতে হবে ; নাম-যশের উদ্দেশে নয়।

এখন সমগ্র রুকুর সবগুলো আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় ও সদকা খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত জানা যাবে।

প্রথমত ঃ যে ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হয়, তা হালাল হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। তৃতীয়তঃ বিশুদ্ধ খাতে ব্যয় করতে হবে। চতুর্থতঃ খয়রাত দিয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবে না। পঞ্চমতঃ যাকে দান করা হবে, তার সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। ষষ্ঠতঃ যা কিছু ব্যয় করা হবে, খাঁটি নিয়তের সাথে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে— নাম-যশের জন্যে নয়।

দ্বিতীয় শর্ত, অর্থাৎ, সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার সময় কোন হকদারের হক যাতে নষ্ট না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বীয় পোষ্যদের প্রয়োজনীয় খরচাদি তাদের অনুমতি ছাড়া বন্ধ অথবা হ্রাস করে দান-খয়রাত করা কোন সওয়াবের কাজ নয়। অভাবগ্রস্ত ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করে সব ধন-সম্পদ খয়রাত করা কিংবা ওয়াক্ফ করে দেয়া সুন্নাহর শিক্ষার পরিপন্থী। এ ছাড়া আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার হাজারো পন্থা রয়েছে।

সুন্নত দান এই যে, গুরুত্ব ও প্রয়োজনের তীব্রতার দিকে লক্ষ্য রেখে খাত নির্বাচন করতে হবে। ব্যয়কারীরা সাধারণতঃ এ দিকে লক্ষ্য রাখে না।

তৃতীয় শর্তের সারমর্ম এই যে, নিজ ধারণা মতে কোন কাজকে সৎকাজ মনে করে সেই খাতে ব্যয় করাই সওয়াব হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়; বরং খাতটি শরীয়তের বিচারে বৈধ ও পছন্দনীয় কিনা, তা দেখাও জরুরী। যদি কেউ অবৈধ খেলাধুলার জন্যে স্বীয় সহায় সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে দেয়, তবে সে সওয়াবের পরিবর্তে আযাবের যোগ্য হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়— এমন সব কাজের বেলায় এ কথাই প্রযোজ্য।

পূর্ববর্তী রুকূতে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার বর্ণনা ছিল। এখন এর সাথেই সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচ্য রুকুর সাতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, এর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ .... غَنِىٌّ حَمِيدٌ শানে-নুযূল দৃষ্টে طيب শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'উৎকৃষ্ট'। কেউ কেউ দান করার জন্যে নিকৃষ্ট বস্তু নিয়ে আসত। এর পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কোন কোন তফসীরকার শব্দের ব্যাপকতা দৃষ্টে এর অর্থ করেছেন 'হালাল'। কেননা, মাল পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট তখনই হয়, যখন তা হালালও হয়। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতে হালালেরও তাকীদ হবে। তবে প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ী অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, খয়রাতের মাল হালাল এবং উৎকৃষ্ট দু'টোই হওয়া শর্ত। মনে রাখা দরকার যে, আয়াতে উৎকৃষ্ট মাল দেয়ার নির্দেশ ঐ ব্যক্তির জন্যে, যার কাছে উৎকৃষ্ট বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্দ ও নিকৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে। مَا كَسَبْتُمْ এবং أَخْرَجْنَا শব্দ, দ্বারা বোঝা যায় যে, উৎকৃষ্ট বস্তু বিদ্যমান রয়েছে। আর وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ বাক্য দ্বারা বোঝা যায় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে অকেজো জিনিষ ব্যয় করে। পক্ষান্তরে যার কাছে মুলতঃই উৎকৃষ্ট বস্তু নেই, সে এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। সে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করলেও গ্রহণীয় হবে।

مَا كَسَبْتُمْ শব্দ থেকে কোন কোন আলেম মাসআলা চয়ন করেছেন যে, পিতা পুত্রের উপার্জন ভোগ করতে পারে, এটা জায়েয। কেননা, মহানবী (সাঃ) বলেন,— তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপার্জনের একটি পূতঃপবিত্র অংশ। অতএব, তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে সন্তান-সন্ততির উপার্জন ভক্ষণ কর।— (কুরতুবী)

শষ্য ক্ষেত্রের ওশর-বিধি ঃ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ বাক্যে أَخْرَجْنَا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওশরী জমিতে (যে যমীনের উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ ইসলামী বিধান অনুযায়ী সরকারী তহবিলে জমা দিতে হয়) যে ফসল উৎপন্ন হয়, তার এক-দশমাংশ দান করা ওয়াজিব। আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) বলেন যে, ওশরী জমীতে ফসল অল্প হোক বা বেশী হোক ওশর দেয়া ওয়াজিব। সূরা আন'আমের وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ আয়াতটি ওশর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশসূচক।

'ওশর' ও 'খেরাজ' ইসলামী শরীয়তের দু'টি পারিভাষিক শব্দ। এ দু'য়ের মধ্যে একটি বিষয় অভিন্ন। উভয়টিই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত কর। পার্থক্য এই যে, 'ওশর' শুধু কর নয়, এতে আর্থিক এবাদতের দিকটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; যেমন—যাকাত। একারণেই ওশরকে 'যাকাতুল –'আরদ' বা ভূমির যাকাতও বলা হয়। পক্ষান্তরে খেরাজ শুধু করকে বোঝায়। এতে এবাদতের কোন দিক নেই। মুসলমানরা এবাদতের যোগ্য ও অনুসারী। তাই তাদের কাছ থেকে ভূমির উৎপন্ন ফসলের যে অংশ নেয়া হয়, তাকে 'ওশর' বলা হয়। অ-মুসলিমরা এবাদতের যোগ্য নয়। তাই তাদের ভূমির উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে 'খেরাজ' বলা হয়। যাকাত ও ওশরের মধ্যে কার্যতঃ আরও পার্থক্য এই যে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পণ্য সামগ্রির উপর বছরান্তে যাকাত ওয়াজিব হয়,কিন্তু ওশরী জমিনে উৎপাদনের সাথে সাথেই ওশর ওয়াজিব হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, জমিনে ফসল উৎপন্ন না হলে ওশর দিতে হয় না। কিন্তু পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ-রৌপ্যে মুনাফা না হলেও বছরান্তে যাকাত ফরয হবে। ওশর ও খেরাজের বিস্তারিত ফেকাহ্ গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য।

ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ .... وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

যখন কারও মনে এ ধারণা জন্মে যে, দান-খয়রাত করলে ফকীর হয়ে যাবে, বিশেষতঃ আল্লাহ্ তাআলার তাকীদ শুনেও স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করার সাহস না হয় এবং খোদায়ী ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানী ওয়াদার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন বুঝে নেয়া উচিত যে, এ প্ররোচনা শয়তানের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। এখানে এরূপ বলা ঠিক নয় যে, আমরা তো শয়তানের চেহারাও দেখিনি— প্ররোচনা ও নির্দেশ নেয়া দূরের কথা। পক্ষান্তরে যদি মনে ধারণা জন্মে যে, সদ্কা-খয়রাত করলে গোনাহ্ মাফ হবে এবং ধন-সম্পত্তিও বৃদ্ধি পাবে ও বরকত হবে, তখন মনে করতে হবে, এ বিষয়টি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি সবার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং নিয়ত ও কর্ম সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ۚ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

(২৭০) তোমরা যে খয়রাত বা সদ্ব্যয় কর কিংবা কোন মানত কর, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সেসব কিছু জানেন। অন্যায়কারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২৭১) যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপন কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কিছু গোনাহ দূর করে দিবেন। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন। (২৭২) তাদেরকে সৎপথে আনার দায় তোমার নয়। বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপকারার্থেই কর। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। (২৭৩) খয়রাত ঐ সকল গরীব লোকের জন্যে, যারা আল্লাহ্র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে – জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাচ্ঞা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত। (২৭৪) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্যে তাদের সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন আশংকা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

হেকমতের অর্থ ও ব্যাখ্যা : يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ 'হেকমত' শব্দটি কোরআন পাকে বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতে তফসীরকারগণের এ সম্পর্কিত প্রায় ত্রিশটি উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে : প্রকৃতপক্ষে এগুলো প্রায় কাছাকাছি উক্তি। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই, অভিব্যক্তির পার্থক্য মাত্র। حكمة শব্দটি احكام এর ধাতু। এর অর্থ কোন কর্ম অথবা উক্তিকে তার গুণাবলীসহ পূর্ণ করা।

এ কারণেই বাহ্‌রে-মুহীতে হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কিত সূরা বাক্বারার وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ – হেকমতের আসল অর্থ প্রত্যেক বস্তুকে যথাস্থানে স্থাপন করা। এর পূর্ণত্ব শুধুমাত্র নবুওয়তের মাধ্যমেই সাধিত হতে পারে। তাই এখানে হেকমত বলতে নবুওয়তকে বোঝান হয়েছে।

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে বলনে : হেকমত শব্দটি আল্লাহ্র জন্যে ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হবে সমগ্র বিষয়াদির পূর্ণ জ্ঞান এবং নিখুঁত আবিষ্কার। অন্যের জন্যে এ শব্দটি ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হয় সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তদনুযায়ী কর্ম।

এ অর্থটিই বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোথাও এর অর্থ নেয়া হয়েছে কোরআন, কোথাও হাদীস, কোথাও বিশুদ্ধ জ্ঞান, কোথাও সৎকর্ম, কোথাও সত্যকথা, কোথাও সুস্থ বুদ্ধি, কোথাও ধর্মের বোধ, কোথাও মতামতের নির্ভুলতা এবং কোথাও আল্লাহ্র ভয়। শেষোক্ত অর্থটি স্বয়ং হাদীসে উল্লিখিত আছে। বলা হয়েছে رأس الحكمة خشية الله অর্থাৎ, আল্লাহ্র ভয়ই প্রকৃত হেকমত। وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ আয়াতে হেকমতের ব্যাখ্যা সাহাবী ও তাবে— তাবেয়ীগণ কর্তৃক হাদীস ও সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, আলোচ্য يُّؤْتِ الْحِكْمَةَ উআয়াতে পূর্ববর্ণিত সবগুলো অর্থই বোঝানো হয়েছে।— (বাহ্‌রে-মুহীত, ৩২০ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খন্ড)

এ উক্তিই শব্দটির সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট অর্থবোধক। وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا বাক্য থেকেও এ দিকেই ইশারা বোঝা যায়। কারণ, এর অর্থ হচ্ছে, যাকে হেকমত দেয়া হয়েছে, তাকে প্রভূত মঙ্গল ও কল্যাণ দেয়া হয়েছে।

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ ...... وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

কোন প্রকার ব্যয় বলতে সর্বপ্রকার ব্যয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যে ব্যয়ে সব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং যে ব্যয়ে সবগুলোর কিংবা কতকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। উদাহরণতঃ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা হয়নি বরং গোনাহ্র কাজে ব্যয় করা হয়েছে, কিংবা লোক দেখানো ব্যয় করা হয়েছে, অথবা ব্যয় করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে কিংবা হালাল ও উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করা হয়নি ইত্যাদি, সর্বপ্রকার ব্যয়ই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে 'মানত' শব্দের ব্যাপকতায় সর্বপ্রকার মানতই এসে গেছে। উদাহরণতঃ আর্থিক এবাদতের মানত। এ সাদৃশ্যের কারণেই ব্যয়ের সাথে মানতের উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দৈহিক এবাদতের মানত; তা আবার শর্তহীন হোক কিংবা শর্তযুক্ত হোক, তা পূর্ণ করা হোক বা না হোক, ইত্যাদি সর্বপ্রকার মানতই আয়াতে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রকার ব্যয় ও সর্বপ্রকার

মানত সম্পর্কেই পরিজ্ঞাত। তিনি এগুলোর প্রতিদানও দেবেন। সীমা ও শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে উৎসাহিত করা এবং লক্ষ্য না রাখার জন্য ভীতি-প্রদর্শন করার লক্ষ্যেই একথা শোনান হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাদেরকে স্পষ্টভাবে শাস্তিবাণী শুনিয়ে দেয়া হয়েছে।

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ..... وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

বাহ্যতঃ এ আয়াতে ফরয ও নফল সব রকম দান-খয়রাতকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রকার দানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই উত্তম। এতে ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় প্রকার উপকারিতাই বর্তমান। ধর্মীয় উপকারিতা এই যে, এতে রিয়া তথা লোক দেখানোর সম্ভাবনা নেই এবং দান গ্রহণকারীও লজ্জিত হয় না। বৈষয়িক উপকারিতা এই যে, স্বীয় অর্থের পরিমাণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। গোপনীয়তা উত্তম হওয়ার মানে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম হওয়া। সুতরাং অপবাদ খণ্ডন করা, অন্যে তা অনুসরণ করবে এরূপ আশা করা ইত্যাদি কারণে যদি কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম বিবেচিত হয়, তবে তা এর পরিপন্থী নয়।

وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ গোপনে দান করার সাথেই গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারাও সম্পর্কযুক্ত নয়— শুধু এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্যে গোপনীয়তার পার্শ্বে একে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, গোপন দান করার মধ্যে যদি তুমি কোন বাহ্যিক উপকার না দেখ, তবে বিষণ্ণ হওয়া উচিত নয়। কেননা, তোমার গোনাহ্‌ আল্লাহ্‌ মাফ করবেন। এটা তোমার বিরাট উপকার।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ .... وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দান-খয়রাতে আসলে তোমাদের নিয়তও থাকে নিজেদেরই উপকার লাভ করা এবং বাস্তবেও এর দ্বারা বিশেষভাবে তোমাদেরই উপকার হবে। এমতাবস্থায় দান-খয়রাত করলে তা শুধুমাত্র মুসলমানকেই দেবে— কাফেরকে দেবে না, এ বিশেষ পথে এ উপকার লাভ করতে চাও কেন? এটি অতিরিক্ত বিষয়। এর প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়।

এখানে আরও বুঝে নেয়া দরকার যে, এ সদ্‌কা অর্থ নফল সদ্‌কা, যা যিম্মী কাফেরকেও দেয়া জায়েয। এখানে সদকা বলতে ফরয সদকা বোঝান হয়নি। ফরয সদকা মুসলমান ছাড়া কাউকে দেয়া জায়েয নয়।— (মাযহারী)

মাসআলা ঃ দারুল-হরবের কাফেরদেরকে কোন প্রকার দান-খয়রাত দেয়া জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ যিম্মী কাফের অর্থাৎ, যে দারুল-হরবের নয়, তাকে শুধু যাকাত ও ওশর দান করা জায়েয নয়, অন্যান্য সব ওয়াজিব ও নফল সদ্‌কা দান করা জায়েয। আলোচ্য আয়াতে যাকাত অন্তর্ভুক্ত নয়।

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ...... فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

এখানে ফকীর বলতে ঐ সকল লোককে বোঝান হয়েছে, যারা ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশে অন্য কোন কাজ করতে পারে না।

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন ফকীরকে যদি মূল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়, তবে এ কারণে তাকে ধনী মনে করা হবে না; বরং ফকীরই বলা হবে। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাত দান করাও দুরস্ত হবে।— (কুরতুবী)

تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ এতে বোঝা যায় যে, লক্ষণাদি দেখে বিচার করা অশুদ্ধ নয়। কাজেই যদি এমন কোন বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া যায়, যার দেহে পৈতা আছে এবং সে খতনাকৃতও নয়, তবে তাকে মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা যাবে না।—(কুরতুবী)

لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, তারা পথ আগলিয়ে সওয়াল করে না। কিন্তু পথ না আগলিয়েও সওয়াল করে না— এরূপ বোঝা যায় না। কোন কোন তফসীরকার তাই বলেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরকারদের মতে এর অর্থ এই যে, তারা মোটেই সওয়াল করে না। لانهم متعففون عن المسألة عفة تامة কারণ, তারা সওয়াল করা থেকে নিজেদেরকে পুরোপুরি নিরাপদ দুরত্বে রাখে।— (কুরতুবী)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ এ সপ্তম আয়াতে ঐ সকল লোকের বিরাট প্রতিদান ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা রাত্রে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, দান-খয়রাতের জন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, দিবারাত্রিরও কোন প্রভেদ নেই। এমনিভাবে গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, খাঁটি নিয়তে দান করতে হবে। নাম-যশের নিয়ত থাকলে চলবে না। প্রকাশ্যে ব্যয় করার কোন প্রয়োজন দেখা না দেয়া পর্যন্তই গোপনে দান করার শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ। যেখানে এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে প্রকাশ্যে দান করাই শ্রেয়।

ইবনে-আসাকের-এর বরাত দিয়ে রূহুল-মা'আনীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার দশ হাজার দেরহাম দিনে, দশ হাজার দেরহাম রাত্রে, দশ হাজার দেরহাম গোপনে ও দশ হাজার দেরহাম প্রকাশ্যে, এভাবে মোট চল্লিশ হাজার দেরহাম আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেন। কোন কোন তফসীরকার হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর এ ঘটনাকে আয়াতের শানে-নুযুল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ আয়াতের শানে-নুযুল সম্পর্কে আরও বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَآءَهٗ
مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ
وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾
يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٧﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا
اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ
لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾ وَاِنْ
كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ
لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ
اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٨١﴾

(২৭৫) যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছেঃ ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মত! অথচ আল্লাহ্ তাআলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (২৭৬) আল্লাহ্ তাআলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে। (২৭৭) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্যে তাদের পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (২৭৮) হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। (২৭৯) অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না। (২৮০) যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (২৮১) ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে 'রিবা' অর্থাৎ সুদের অবৈধতা ও তার বিধি-বিধান সম্পর্কিত বর্ণনা শুরু হয়েছে। এ প্রশ্নটি কয়েকদিক দিয়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে সুদের কারণে কোরআন ও সুন্নায় কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে সুদ বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। সুদের কবল থেকে মুক্তি লাভ করার পথে যেসব অসুবিধা ও জটিলতা বিদ্যমান, সেগুলোর তালিকা সুদীর্ঘ। তাই বিষয়টি কয়েক দিক দিয়েই আলোচনা সাপেক্ষ।

প্রথমে এ ব্যাপারে কোরআনী আয়াতের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ও সহীহ হাদীসসমূহের বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সুদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে এবং দেখতে হবে সুদ কোন্ কোন্ ব্যবসা-বাণিজ্যে পরিব্যাপ্ত, এর অবৈধতা কোন্ রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল এবং এতে কি ধরনের অনিষ্ট বিদ্যমান?

সুদের দ্বিতীয় দিক হচ্ছে যৌক্তিক ও অর্থনৈতিক। অর্থাৎ, বাস্তবিকই কি সুদ বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতির নিশ্চয়তা দিতে পেরেছে? একে উপেক্ষা করলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাধারণ অর্থনীতির প্রাচীর কি ধসে যাবে, না গোটা ব্যাপারটাই শুধু আল্লাহ্ ও পরকালে অবিশ্বাসী মস্তিষ্কসমূহের উদ্ভট ফসল? নতুবা সুদ ছাড়াও সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে—শুধু সমস্যার সমাধানই নয়; বরং বিশ্বের অর্থনৈতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুদ বর্জনের উপরই নির্ভরশীল, সুদই বিশ্বের অর্থনৈতিক অশান্তি ও অস্থিরতার মূল ও প্রধান কারণ?

এই আলোচনাটি একটি অর্থনৈতিক বিষয়। এর আওতায় অনেকগুলো মৌলিক ও আনুষঙ্গিক সুদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। কোরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এসব আলোচনাও কম দীর্ঘ নয়।

আলোচ্য ছয়টি আয়াতে সুদের অবৈধতা ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যে সুদখোরদের মন্দ পরিণতি এবং হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্ছনা ও ভ্রষ্টতার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা সুদ খায়, তারা দণ্ডায়মান হয় না; কিন্তু সে ব্যক্তির মত, যাকে কোন শয়তান জিন আসর করে দিশেহারা করে দেয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হাশরের ময়দানে কবর থেকে উঠা। সুদখোর যখন কবর থেকে উঠবে, তখন ঐ পাগল বা উন্মাদের মত উঠবে, যাকে কোন শয়তান-জিন দিশেহারা করে দেয়।

এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, জিন ও শয়তানের আসরের ফলে মানুষ অজ্ঞান কিংবা উন্মাদ হতে পারে। অভিজ্ঞ লোকদের উপর্যুপরি অভিজ্ঞতাও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। হাকীম ইবনে কাইয়্যেম জওযী (রহঃ) লিখেছেন ঃ চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকগণও স্বীকার করেন যে, মৃগীরোগ, মূর্ছারোগ, কিংবা পাগলামী বিভিন্ন কারণে হতে পারে। মাঝে মাঝে জিন ও শয়তানের আসরও এর কারণ হয়ে থাকে। যারা বিষয়টি অস্বীকার করে, তাদের কাছে বাহ্যিক অসম্ভাব্যতা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ বর্তমান নেই।

আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সুদখোরেরা হাশরে উন্মাদ অবস্থায় উত্থিত হবে— কোরআন পাক সোজাসুজি একথা বলেনি, বরং পাগলামী ও অজ্ঞানতার বিশেষ একটি প্রকার উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ, শয়তান আসর করে দিশেহারা করে দিলে যেভাবে উঠে, সেভাবে উঠবে। এতে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, অজ্ঞান ও পাগল ব্যক্তি মাঝে মাঝে যেমন চুপচাপ পড়ে থাকে তাদের অবস্থা তেমন হবে না; তারা শয়তান

কর্তৃক মাতাল করা লোকদের মত প্রলাপোক্তি ও অন্যান্য পাগলসুলভ কাণ্ড-কীর্তি দ্বারা পরিচিত হবে।

সম্ভবতঃ এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, রোগবশতঃ অজ্ঞান কিংবা পাগল হওয়ার পর চেতনাশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। এরূপ ব্যক্তিই কষ্ট কিংবা শাস্তি অনুভব করতে পারে না। এমনি হবে সুদখোরদের অবস্থা।

এখন দেখতে হবে যে, অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে যে মিল থাকা দরকার, তা এখানে আছে কি না? আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যে শাস্তি কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে কোন অপরাধের কারণে দেয়া হয়, তার সাথে অপরাধের অবশ্যই মিল থাকে। হাশরে সুদখোরদেরকে মাতাল অবস্থায় উত্থিত করার মধ্যে সম্ভবতঃ এ বিষয়ের অভিব্যক্তি রয়েছে যে, সুদখোর টাকা-পয়সার লালসায় এমন বিভোর হয়ে পড়ে যে, কোন দরিদ্রের প্রতি তার মনে সামান্য দয়ারও উদ্রেক হয় না এবং লজ্জা-শরম তাকে বাধা দিতে পারে না। সে প্রকৃতপক্ষে জীবদ্দশায়ও অজ্ঞানই ছিল। তাই হাশরেও তাকে এ অবস্থায়ই উঠানো হবে। অথবা এ শাস্তি দেয়ার কারণ এই যে, সে যেহেতু দুনিয়াতে স্বীয় নির্বুদ্ধিতাকে বুদ্ধির আবরণে প্রকাশ করেছে এবং ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ আখ্যা দিয়েছে, তাই তাকে নির্বোধ করে উঠানো হবে।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ এর অর্থ হচ্ছে সুদ-গ্রহণ করা ও সুদ ব্যবহার করা, খাওয়ার জন্য ব্যবহার করুক, কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী অথবা আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করুক। কিন্তু বিষয়টি 'খাওয়া' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই যে, যে বস্তু খেয়ে ফেলা হয়, তা আর ফেরৎ দেয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অন্য রকম ব্যবহারে ফেরৎ দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পুরোপুরি আত্মসাৎ করার কথা বোঝাতে গিয়ে 'খেয়ে ফেলা' শব্দ দ্বারা বোঝান হয়। শুধু আরবী ভাষা নয়, অধিকাংশ ভাষার সাধারণ বাকপদ্ধতিও তাই।

এরপর দ্বিতীয় বাক্যে সুদখোরদের এ শাস্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে, তারা দু'টি অপরাধ করেছে ঃ (এক) সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে। (দুই) সুদকে হালাল মনে করেছে এবং যারা একে হারাম বলেছে, তাদের উত্তরে বলেছে ঃ "ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদেরই অনুরূপ। সুদের মাধ্যমে যেমন মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও মুনাফাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব, সুদ হারাম হলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো হারাম হওয়া উচিত।" অথচ কেউ বলে না যে, ক্রয়-বিক্রয় হারাম। এ ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ তাদের বলা উচিত ছিল যে, সুদও তো ক্রয়-বিক্রয়ের মতই। ক্রয়-বিক্রয় যখন হালাল তখন সুদও হালাল হওয়া উচিত। কিন্তু তারা বর্ণনাভঙ্গি পাল্‌টিয়ে যারা সুদকে হারাম বলতো, তাদের প্রতি এক প্রকার উপহাস করেছে যে, তোমরা সুদকে হারাম বললে ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম বল।

তৃতীয় বাক্যে আল্লাহ্ তাআলা তাদের এ উক্তির জওয়াবে বলেছেন যে, এরা ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ ও সমতুল্য বলেছে, অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশের ফলে এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা একটিকে হালাল এবং অপরটিকে হারাম করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় উভয়টি কেমন করে সমতুল্য হতে পারে?

এ জওয়াবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সুদখোরদের আপত্তি ছিল যুক্তিগত। অর্থাৎ, মুনাফা উপার্জনই যখন উভয় লেন-দেনের লক্ষ্য, তখন হারাম-হালালের ব্যাপারে উভয়টি একই রকম হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তাআলা তাদের যুক্তিনির্ভর আপত্তির জওয়াব যুক্তিগতভাবে পার্থক্য বর্ণনার মাধ্যমে দেননি ; বরং বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তাআলাই সব কিছুর একমাত্র অধিপতি এবং বস্তুর লাভ-ক্ষতি ও ভালমন্দ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি যখন একটিকে হালাল ও অপরটিকে হারাম করেছেন, তখন এতেই বুঝে নেয়া যায় যে, তিনি যে বস্তুকে হারাম করেছেন, তার মধ্যে অবশ্যই কোন অনিষ্ট, ক্ষতি বা অপবিত্রতা রয়েছে— সাধারণ মানুষ তা অনুভব করুক বা নাই করুক। কেননা, সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার পূর্ণ স্বরূপ ও লাভ-ক্ষতি পুরোপুরিভাবে একমাত্র ঐ মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞই জানতে পারেন যার জ্ঞান থেকে পৃথিবীর কণা পরিমাণ বস্তুও লুক্কায়িত নয়। বিশ্বের ব্যক্তিবর্গ ও সম্প্রদায়সমূহ নিজ নিজ লাভ-ক্ষতি জানতে পারলেও সমগ্র বিশ্বের লাভ-লোকসান পুরোপুরিভাবে জানতে পারে না। কোন কোন বস্তু কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের পক্ষে লাভজনক হয়, কিন্তু গোটা জাতি কিংবা গোটা দেশের জন্যে তাতে ক্ষতি নিহিত থাকে।

এরপর তৃতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি সুদের অর্থ অর্জন করেছিল, সুদ হারাম হওয়ার পর সে যদি ভবিষ্যতের জন্যে তওবা করে নেয় এবং সুদ থেকে বিরত থাকে, তবে পূর্বেকার সঞ্চিত অর্থ শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী তারই অধিকারভুক্ত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, সে সর্বান্তকরণেই বিরত রয়েছে কি কপটতা সহকারে তওবা করেছে— তার এ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল থাকবে।

মনে প্রাণে তওবা করে থাকলে আল্লাহ্‌র কাছে তা উপকারী হবে, অন্যথায় তা তওবা না করারই মত। তার প্রতি সাধারণ লোকদের খারাপ ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। যে উপদেশ শুনেও উপরোক্ত উক্তি ও কার্যে পুনরায় লিপ্ত হয়, তার এ কার্যে (সুদ গ্রহণ করা) গোনাহ্ হওয়ার কারণে সে দোযখে যাবে এবং তার এ উক্তিতে (অর্থাৎ, সুদ ক্রয়-বিক্রয়েরই মত হালাল) কুফর হওয়ার কারণে সে চিরকাল দোযখে অবস্থান করবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। এখানে একটি বিশেষ সামঞ্জস্যের কারণে সুদের সাথে দান-খয়রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, সুদ ও খয়রাত উভয়ের স্বরূপ যেমন পরস্পর বিরোধী, উভয়ের পরিণামও তেমনি পরস্পর বিরোধী। আর সাধারণতঃ যারা এসব কাজ করে, তাদের উদ্দেশ্য এবং নিয়তও পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে।

স্বরূপের বিরোধ এই যে, সদকা ও খয়রাতে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই নিজ অর্থ-সম্পদ অপরকে দেয়া হয় এবং সুদে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই অপরের অর্থ-সম্পদ নিয়ে নেয়া হয়। এ দু'টি কাজ যারা করে, তাদের নিয়ত ও উদ্দেশ্য পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণ এই যে, খয়রাতকারী ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ও পরকালীন সওয়াবের জন্যে স্বীয় অর্থ-সম্পদ হ্রাস কিংবা নিঃশেষ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পক্ষান্তরে সুদ গ্রহণকারী ব্যক্তি তার বর্তমান অর্থ-সম্পদকে অবৈধভাবে বৃদ্ধি করার উদগ্র বাসনা পোষণ করে থাকে। পরিণতির পরস্পর বিরোধিতা কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তাআলা সুদ দ্বারা অর্জিত ধন-সম্পদ কিংবা তার বরকত মিটিয়ে দেন এবং খয়রাতকারীর ধন-সম্পদ কিংবা তার বরকত বাড়িয়ে দেন। সারকথা এই যে, যারা ধন-সম্পদের লোভ করে না, সম্পদ হ্রাসে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও তাদের ধন-সম্পদ কিংবা ধন-সম্পদের ফলাফল, বরকত ও

উপকারিতা বেড়ে যায়।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদকে মেটানো আর দান-খয়রাতকে বর্ধিত করার উদ্দেশ্য কি? কোন কোন তফসীরকার বলেন ঃ এ মেটানো ও বাড়ানো পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুদখোরের ধন-সম্পদ পরকালে তার কোনই কাজে আসবে না;বরং তা তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে দান-খয়রাতকারীদের ধন-সম্পদ পরকালে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী নেয়ামত ও শান্তিলাভের উপায় হবে। এ ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট। এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সাধারণ তফসীরকারগণ বলেন ঃ সুদকে মেটানো এবং দান-খয়রাতকে বাড়ানো পরকালে তো হবেই, কিন্তু এর কিছু কিছু লক্ষণ দুনিয়াতেও প্রত্যক্ষ করা যায়।

যে সম্পদের সাথে সুদ মিশ্রিত হয়ে যায়, অধিকাংশ সময় সেগুলো তো ধ্বংস হয়ই, অধিকন্তু আগে যা ছিল, তাও সাথে নিয়ে যায়। সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা যায়। অজস্র পুঁজির মালিক কোটিপতি দেখতে দেখতে দেউলিয়া ও ফকীরে পরিণত হয়। সুদবিহীন ব্যবসা-বাণিজ্যেও লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্তও হয়; কিন্তু গতকাল যে কোটিপতি ছিল, আজ সে পথের ভিখারী, এমন ক্ষতি শুধু সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। লোক সমাজে অসংখ্য বর্ণনা-বিবৃতি এ ব্যাপারে সুবিদিত যে, সুদের মাল তাৎক্ষণিকভাবে যতই প্রবৃদ্ধি লাভ করুক না কেন, তা সাধারণতঃ স্থায়ী হয় না। সন্তান-সন্ততি ও বংশধররা তা ভোগ করতে পারে না। প্রায়ই কোন না কোন বিপর্যের মুখে তা ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত মা'মার (রহঃ) বলেন ঃ আমি বুযুর্গদের মুখে শুনেছি, চল্লিশ বছর যেতে না যেতেই সুদখোরের ধন-সম্পদে ভাটা আরম্ভ হয়ে যায়।

যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধন-সম্পদের ধ্বংস দেখা নাও যায়, তবুও তার উপকারিতা, বরকত ও ফলাফল থেকে বঞ্চনা নিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী। কেননা, এটা সুস্পষ্ট যে, স্বর্ণ-রৌপ্য স্বয়ং উদ্দেশ্যও নয় এবং উপকারীও নয়। স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা কারও ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটে না, কিংবা শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তা গায়ে জড়ানো কিংবা বিছানোও যায় না। তদুপরি এর উপার্জন ও সংরক্ষণে হাজারো কষ্ট স্বীকার করতে হয়। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতে এত সব কষ্ট স্বীকার করার কারণ এছাড়া অন্য কিছু নয় যে, স্বর্ণ-রৌপ্য এমন কতগুলো বস্তু অর্জন করার উপায়, যার সাহায্যে মানুষের জীবন সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয় এবং সে আরাম ও সম্মানজনক জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। মানুষ নিজে যে আরাম ও সম্মান অর্জন করেছে, তার সন্তান সন্ততিও তা ভোগ করুক, এ বাসনা মানুষের স্বভাবজাত।

এগুলোই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপকারিতা ও ফলাফল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা ভুল হবে না যে, যে ব্যক্তি এসব উপকারিতা ও ফলাফল লাভ করতে সক্ষম হয়, তার ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে বেড়ে যায়; যদিও চর্মচক্ষে তা কম বলে মনে হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপকারিতা ও ফলাফল কম অর্জন করে, তার ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে হ্রাস পায়; যদিও চর্মচক্ষে তা অধিক মনে হয়ে থাকে।

একথা উপলব্ধি করে নেয়ার পর এবার সুদের কারবারে দান-খয়রাতের ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। আপনি প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারবেন যে, সুদখোরের ধন-সম্পদ যদিও ক্রমবর্ধিষ্ণু দেখা যায়, কিন্তু এ বর্ধিষ্ণুতা পাণ্ডুরোগীর দেহ ফুলে মোটা হয়ে যাওয়ারই মত। ফুলে যাওয়ার ফলে যে বর্ধিষ্ণুতা আসে তাও দেহেরই বৃদ্ধি, কিন্তু কোন সমঝদার মানুষই এ বর্ধিষ্ণুতাকে পছন্দ করতে পারে না। কেননা, সে জানে যে, এ বর্ধিষ্ণুতা মৃত্যুর বার্তাবহ। এমনিভাবে সুদখোরের ধন-সম্পদ যতই ক্রমবর্ধমান দেখা যাক না কেন, সে এর উপকারিতা ও ফলাফল অর্থাৎ, আরাম ও সম্মান থেকে সর্বদাই বঞ্চিত থাকে।

এখানে হয়ত কারও মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, আজকাল তো সুদখোরদেরই আধিপত্য বেশী। আরাম ও সম্মান তো দেখা যায় তাদেরই করায়ত্ত। দেখা যায়, তারাই প্রাসাদোপম বাড়ী-ঘরের মালিক। আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের যাবতীয় সামগ্রীও তাদেরই হাতের মুঠোয়। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বসবাসের প্রয়োজনীয় এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত আসবাব-পত্রেরও তাদের অভাব নেই। নফর, চাকর এবং শান-শওকতের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম তাদেরই কাছে বিদ্যমান। কিন্তু চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে, আরামের সাজ-সরঞ্জাম তো কারখানায় নির্মিত এবং তা বাজারেও বিক্রি হয়। স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে তা অর্জনও করা যায়। কিন্তু যার নাম আরাম ও শান্তি, তা কোন কারখানায় নির্মিত হয় না বরং বাজারেও বিক্রয় হয় না। তা এমন একটি রহমত, যা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই আসে। অনেক সময় বিস্তর সরঞ্জাম সত্ত্বেও তা অর্জিত হয় না। একটি নিদ্রা-সুখের কথাই ধরুন। এর জন্যে মনোরম বাসগৃহ নির্মাণ করা যায়, সুষম আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা যায়, আসবাব-পত্র সুদৃশ্য ও মনোরম করা যায় এবং ইচ্ছামত নরম বিছানা ও খাট যোগাড় করা যায়, কিন্তু এতসব সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় হলেই কি সুখ নিদ্রা অবশ্যম্ভাবী? আপনার হয়তো এ অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু হাজারো মানুষ এ প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলবে,— যাদের কোন বিপত্তির কারণে নিদ্রা আসে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সম্পদশালী দেশ সম্পর্কিত কোন কোন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সেখানে শতকরা পঁচাত্তর জন মানুষ ঘুমের বড়ি ব্যবহার না করে ঘুমোতেই পারে না এবং মাঝে মাঝে বড়িও তাদের ঘুম আনতে ব্যর্থ হয়। ঘুমের সাজ-সরঞ্জাম আপনি বাজার থেকে কিনে আনতে পারেন, কিন্তু ঘুম কোন মূল্যেই কিনে আনতে পারেন না। অন্যান্য আরাম এবং সুখের অবস্থাও তাই।

বিষয়টি বুঝে নেয়ার পর সুদ-খোরদের অবস্থা পর্যালোচনা করুন। আপনি তাদের কাছে সবকিছু পাবেন,কিন্তু আরাম ও সুখ পাবেন না। এক কোটিকে দেড় কোটি এবং দেড় কোটিকে দু'কোটি করার চিন্তায় তাদেরকে এমন বিভোর দেখা যাবে যে, খাওয়া-পরা এবং বিবি-বাচ্চাদের প্রতি লক্ষ্য করারও সময় নেই। কয়েকটি মিল-কারখানা চলছে, ভিনদেশ থেকে জাহাজ আসে— এসব নানাবিধ চিন্তার জাল বোনার মধ্যেই তাদের সকাল থেকে বিকাল এবং বিকাল থেকে সকাল হয়ে যায়।

এ হচ্ছে তাদের আরাম ও সুখের অবস্থা। এখন তাদের সম্মানের অবস্থাটিও দেখে নিন। বলাবাহুল্য, সুদখোরেরা কঠোরপ্রাণ ও নির্দয়। দরিদ্রদের দারিদ্র্য এবং স্বল্প পুঁজিওয়ালাদের পুঁজির স্বল্পতার সুযোগ গ্রহণ করাই তাদের পেশা। দরিদ্রদের রক্ত চুষে তারা তাদের নিজেদের উদর স্ফীত করে তোলে। তাই জনগণের অন্তরে তাদের প্রতি ইযযত ও সম্ভ্রম থাকা অসম্ভব। নিজ দেশের মহাজন-ব্যবসায়ী এবং দুনিয়াজোড়া ছড়িয়ে থাকা ইহুদীদের ইতিহাস পাঠ করুন। তাদের সিন্দুক স্বর্ণ-রৌপ্যে যতই পরিপূর্ণ হোক না কেন, জগতের কোন কোণে এবং মানবগোষ্ঠীর কোন স্তরেই তাদের সম্মান নেই। বরং তাদের এ কর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের অন্তরে তাদের সম্পর্কে প্রতিহিংসা ও যুগপৎ ঘৃণারই সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিশ্বের সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ

এ হিংসা ও ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ। শ্রম ও পুঁজির মধ্যকার সংগ্রামই বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে। কম্যুনিজমের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা এ হিংসা ও ঘৃণারই ফলশ্রুতি। ফলে সমগ্র বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। এ হচ্ছে তাদের সুখ ও সম্মানের অবস্থা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সুদের ধন-সম্পদ সুদখোরের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনকেও কখনও সুখময় করে না। হয় তারা ধ্বংস হয়ে যায়, না হয় এর অমঙ্গলে তারাও ধন-সম্পদের সত্যিকার ফলাফল ভোগে বঞ্চিত হয়।

ইউরোপীয় সুদখোরদের দৃষ্টান্ত থেকে সম্ভবতঃ কেউ ধোঁকা খেতে পারে যে, তারা তো সবাই সুখী ও সমৃদ্ধিশালী। তাদের বংশধররাও সমৃদ্ধশালী হচ্ছে। কিন্তু প্রথমতঃ তাদের সমৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত চিত্র এইমাত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তাদের অবস্থা হচ্ছে এরূপ ঃ মনে করুন, কোন আদমখোর অন্যান্য মানুষের রক্ত চুষে নিজে দেহের লালন-পালন করে এবং এ জাতীয় কতিপয় আদমখোর কোন এক মহল্লায় বসতি স্থাপন করেছে। আপনি কাউকে এ মহল্লায় নিয়ে গিয়ে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করান। দেখা যাবে, তারা সবাই সুস্থ, সবল ও প্রফুল্ল। কিন্তু একজন মানবতার মঙ্গলকামী জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু এ মহল্লায়ই দেখবে না। সে এদের বিপরীতে ঐসব বস্তিও দেখবে, যাদের রক্ত চুষে তাদেরকে অর্ধমৃত করে দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি আদম খোরদের মহল্লা এবং এসব বস্তির প্রতি লক্ষ্য করবে, সে কখনও মহল্লাবাসীদেরকে মোটা-তাজা দেখে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে না এবং সামগ্রিক দিক দিয়ে এদের কর্মকে মানব জাতির উন্নতির উপায়ও বলতে পারবে না; বরং একে মানবতার বিপর্যয় ও ধ্বংস বলে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হবে।

এর বিপরীতে দান-খয়রাতকারীদেরকে দেখুন। তাদেরকে কখনও ধন-সম্পদের পেছনে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে দেখবেন না। সুখের সাজ-সরঞ্জাম যদিও তাদের কম, কিন্তু সাজ-সরঞ্জামওয়ালাদের চাইতে শান্তি, স্বস্তি এবং মানবিক স্থৈর্য তারা অনেকগুণ বেশী ভোগ করে থাকেন। বলাবাহুল্য, এটাই প্রকৃত সুখ। দুনিয়াতে প্রত্যেকেই তাদেরকে সম্মান ও ভক্তির চোখে দেখে থাকে।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ -মোটকথা, এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। এ উক্তি পরকালের দিক দিয়ে তো সম্পূর্ণ পরিষ্কার ; সত্যোপলব্ধির সামান্য চেষ্টা করলে দুনিয়ার দিক দিয়েও সুস্পষ্ট। হুযূর (সাঃ)-এর এ উক্তির উদ্দেশ্যও তাই ঃ "সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর শেষ পরিণতি হচ্ছে স্বল্পতা।"— (মুসনদে-আহমদ, ইবনে-মাজাহ্)

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তাআলা কোন কাফের গোনাহ্গারকে পছন্দ করেন না।" এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা সুদকে হারামই মনে করে না, তারা কুফরে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্ত্বেও কার্যতঃ সুদ খায়, তারা গোনাহ্গার, পাপাচারী।

তৃতীয় আয়াতে নামায ও যাকাতের নির্দেশের প্রতি অনুগত সৎকর্মশীল মুমিনদের বিরাট পুরস্কার ও পরকালীন সুখ-শান্তি বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ আয়াতের সারমর্ম হলো, সুদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পর সুদের যেসব বকেয়া অর্থ কারও কাছে প্রাপ্য ছিল, সেগুলোর লেনদেনও হারাম।

এর ব্যাখ্যা এই যে, সুদের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবে ব্যাপকভাবে সুদী কারবারের প্রচলন ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এর নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হলে মুসলমানরা যথারীতি সুদের কাজ-কারবার পরিত্যাগ করেন। কিন্তু বনীছকীফ ও বনী-মখযুমের মধ্যে পরস্পর সুদের কারবার বহাল ছিল এবং বনী মখযুম মুসলমান হওয়ার পর সুদের টাকা পরিশোধ করাকে অবৈধ মনে করতে থাকে। আর এদিকে বনী-ছকীফ তাদের প্রাপ্য সুদ দাবী করতে থাকে। কারণ, তারা মুসলমান ছিল না, কিন্তু মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। বনী-মখযুমের বক্তব্য ছিল এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমরা যে হালাল উপার্জন করছি, তা সুদ পরিশোধে ব্যয় করবো না।

এ মতবিরোধের ঘটনাস্থল ছিল মক্কা মুকার্‌রমা। তখন মক্কা বিজিত হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর পক্ষ থেকে মক্কার শাসক ছিলেন হযরত মুআয (রাঃ)। অন্য রেওয়ায়েত মতে ইতাব ইবনে-উসায়েদ (রাঃ)। তিনি নির্দেশ লাভের উদ্দেশে ঘটনার বিবরণ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট লিখে পাঠালেন। এরই প্রেক্ষিতে কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর সারমর্ম এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর সুদের পূর্ববর্তী সব কাজ-কারবার অবিলম্বে মওকুফ করে দিতে হবে। অতীত সুদও গ্রহণ না করে শুধু মূলধন আদায় করতে হবে।

এই ইসলামী আইন কার্যকর হলে মুসলমানরা তো তা মানতে বাধ্য ছিলই, যেসব অমুসলিম গোত্র মুসলমানদের সাথে শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ইসলামী আইন কবুল করে নিয়েছিল, তারাও এই আইন মেনে নিতে বাধ্য হল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন বিদায়-হজ্বের ভাষণে এ আইন ঘোষণা করলেন, তখন একথাও প্রকাশ করলেন যে, এ আইন ব্যক্তিবিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ কিংবা মুসলমানদের আর্থিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে নয়; বরং সমগ্র মানব সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রবর্তন করা হয়েছে। তাই আমি সর্বপ্রথম অ-মুসলমানদের কাছে মুসলমানদের প্রাপ্য বকেয়া সুদের বিরাট অঙ্ক মওকুফ করে দিচ্ছি। এখন তাদেরও নিজ নিজ বকেয়া সুদের অঙ্ক ছেড়ে দিতে আপত্তি থাকা উচিত নয়।

নির্দেশটি পালন কষ্টসাধ্য ছিল বলেই নির্দেশের পূর্বে اتَّقُوا اللّٰهَ এবং নির্দেশের পরে إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যুক্ত করা হয়েছে।

এরপর পঞ্চম আয়াতে এ নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে কঠোর শাস্তির কথা শুনানো হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা যদি সুদ পরিহার না কর, তবে আল্লাহ্ তাআলাও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কুফর ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তম গোনাহের কারণে কোরআন পাকে এত বড় শাস্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে—

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

অর্থাৎ, যদি তোমরা তওবা করে ভবিষ্যতের জন্যে বকেয়া সুদ ছেড়ে দিতে কৃতসংকল্প হও, তবে তোমরা আসল মূলধন ফেরত পেয়ে যাবে। মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা কারও উপর যুলুম করতে পার না এবং কেউ মূলধন হ্রাস করে কিংবা পরিশোধে বিলম্ব করে তোমাদের উপরও যুলুম করতে পারবে না। আয়াতে মূলধন দেয়াকে তওবার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যদি তোমরা তওবা কর এবং ভবিষ্যতে সুদ ছেড়ে দিতে কৃতসংকল্প হও, তবেই তোমরা মূলধন ফেরত পাবে।

এ থেকে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, সুদ ছেড়ে দেয়ার সংকল্প করে তওবা না করলে মূলধনও পাবে না।

এরপর ষষ্ঠ আয়াতে সুদখোরীর মানবতা বিরোধী কাণ্ডকীর্তির বিপরীতে পূতঃপবিত্র চরিত্র এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি কৃপামূলক ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ

– অর্থাৎ, তোমার খাতক যদি রিক্ত হস্ত হয়— ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হয়, তবে শরীয়তের নির্দেশ এই যে, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া বিধেয়। যদি তাকে ঋণ থেকেই রেহাই দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্যে আরও উত্তম।

সুদখোরদের অভ্যাস এই যে, খাতক নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হলে সুদের অঙ্ক আসলের সাথে যোগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার চালায় এবং সুদের হারও আগের চাইতে বাড়িয়ে দেয়।

এখানে শ্রেষ্ঠতম বিচারক আল্লাহ্ তাআলা আইন প্রণয়ন করে দিয়েছেন যে, কোন খাতক বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে এবং ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাকে অতিষ্ঠ করা জায়েয নয়; বরং তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। সাথে সাথে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত করেছেন যে, যদি এ গরীবকে ক্ষমা করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে অধিক উত্তম।

এখানে ক্ষমা করাকে কোরআন পাক সদ্কা শব্দে ব্যক্ত করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের জন্যে সদ্কা হয়ে যাবে এবং বিরাট সওয়াবের কারণ হবে। এছাড়াও আরও বলেছেন ঃ ক্ষমা করা তোমাদের জন্য উত্তম।

সূরা আলে-এমরানের ১৩শ রুকূর ১৩০ তম আয়াতটি এই ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوا أَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা সুদ খেয়ো না দ্বিগুণ চতুর্গুণ এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আশা করা যায়, তোমরা সফল হবে।"

এ আয়াত অবতরণের একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে। জাহেলিয়াত আমলের আরবে সুদ গ্রহণের সাধারণ রীতি ছিল এই যে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে সুদের উপর বাকী দেয়া হতো। মেয়াদ এসে গেলে দেনাদার যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে তাকে আরও সময় দেয়া হতো। এমনিভাবে দ্বিতীয় মেয়াদেও যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেয়া হতো। সাধারণ তফসীর গ্রন্থসমূহে এবং বিশেষভাবে 'লুবাবুন্নুকূল' গ্রন্থে মুজাহিদের রেওয়ায়েতক্রমে এ বিবরণ উল্লেখিত আছে।

জাহেলিয়াত যুগের সে সর্বনাশা প্রথা বিলোপ করার জন্যেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ কারণেই আয়াতে أَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً (অর্থাৎ, কয়েকগুণ অতিরিক্ত) বলে তাদের প্রচলিত পদ্ধতির নিন্দা এবং অপরের চরম সর্বনাশ সাধন করে স্বার্থ উদ্ধার করার ঘৃণ্য মানসিকতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে একে হারাম করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, কয়েকগুণ অতিরিক্ত না হলে সুদ হারাম হবে না। কেননা, সূরা বাক্বারা ও নিসায় যে কোন ধরনের সুদের অবৈধতা পরিষ্কার বর্ণিত হয়েছে; কয়েকগুণ বেশী হোক বা না হোক। এর দৃষ্টান্ত যেমন কোরআনের স্থানে স্থানে বলা হয়েছেঃ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآيَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا অর্থাৎ, আমার আয়াতের বিনিময়ে অল্পমূল্য গ্রহণ করো না। এতে 'অল্পমূল্য' বলার কারণ এই যে, খোদায়ী আয়াতের বিনিময়ে যদি সপ্তরাজ্যও গ্রহণ করা হয়, তবে অল্পমূল্যই হবে। এর অর্থ এই নয় যে, কোরআনের আয়াতের বিনিময়ে অল্পমূল্য গ্রহণ করা তো হারাম, বেশী মূল্য হারাম নয়। এমনিভাবে এ আয়াতে أَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً শব্দটি তাদের লজ্জাকর পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি অবৈধতার শর্ত নয়।

'রিবার' আরও কিছু ব্যাখ্যা

আজকাল সুদ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে কোরআন ও সুন্নায় যখন এর অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা দৃষ্টিগোচর হয় এবং এর স্বরূপ বোঝা ও বোঝানো হয়, তখন সাধারণ মন-মানস এর অবৈধতা মেনে নিতে ইতস্ততঃ করে এবং নানা রকম বাহানা সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই আলোচনাটিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে এর প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই এখানে এ সম্পর্কিত একটা ধারাবাহিক আলোচনার সূত্রপাত করা হচ্ছে।

প্রথমত ঃ কোরআন ও সুন্নায় 'রিবার' স্বরূপ কি এবং এর প্রকার কি কি?

দ্বিতীয়ত ঃ রিবার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য ও উপযোগিতা কি?

তৃতীয়ত ঃ সুদ বা 'রিবা' যতই মন্দ হোক না কেন, এটি বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি ও বাণিজ্য নীতির প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। যদি কোরআনী নির্দেশ অনুযায়ী একে পরিত্যাগ করা হয়, তবে ব্যাংক ও বাণিজ্যনীতি কিভাবে চালু থাকবে?

রিবা শব্দের ব্যাখ্যাঃ **একটি বিভ্রান্তিকর ঘটনা ও উত্তর ঃ** 'রিবা' আরবী ভাষার একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়তপ্রাপ্তি এবং কোরআন অবতরণের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগের আরবেও এ শব্দটি প্রচলিত ছিল। শুধু প্রচলিতই নয়, বরং রিবার লেন-দেনও তখনকার সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। সুতরাং সূরা নিসার আয়াত থেকে জানা যায় যে, 'রিবা' শব্দ এবং এর লেন-দেন তওরাতের আমলেও সুবিদিত ছিল এবং তওরাতেও একে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

যে শব্দ প্রাচীনকাল থেকেই আরবে ও নিকটবর্তী দেশসমূহে সুবিদিত রয়েছে, যার লেন-দেনেরও প্রচলন রয়েছে এবং যার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করার সাথে কোরআন পাক বলে যে, মূসা (আঃ)-এর উম্মতের জন্যেও সুদ বা 'রিবা' হারাম করা হয়েছিল, তখন এটা জানা কথা যে, সেই শব্দের স্বরূপ এমন ধরনের কোন অস্পষ্ট বিষয় হতে পারে না যে, তাকে বুঝতে গিয়ে অহেতুক জটিলতা দেখা দেবে।

এ কারণেই অষ্টম হিজরীতে যখন সুদ বা 'রিবার' অবৈধতা সম্পর্কে সূরা বাক্বারার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়, তখন কোথাও বর্ণিত হয়নি যে, সাহাবায়ে-কেরাম 'রিবা' শব্দের স্বরূপ বোঝার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দিগ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং মহানবী (সাঃ)-এর কাছ থেকে অন্যান্য ব্যাপারের মত রিবার স্বরূপ সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, বরং দেখা গেছে যে, মদ্যপানের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে যেমন তাঁরা তা বাস্তবায়নে তৎপর হয়েছিলেন, তেমনি রিবার অবৈধতা

বিধান নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই তাঁরা রিবার যাবতীয় লেন-দেনও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আরবরা যাকে রিবা বলতো এবং যার লেন-দেন করতো, কোরআন তাকেই হারাম করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এ বিধানকে শুধু নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই নয়, দেশের আইন হিসেবেও জারি করেন। তবে এমন কতকগুলো প্রকারকেও তিনি রিবার অন্তর্ভুক্ত করে দেন যেগুলোকে সাধারণভাবে রিবা মনে করা হতো না। এসব প্রকার নির্ধারণের ব্যাপারেই হযরত ফারূকে আযমের (রাঃ) মনে খটকা দেখা দিয়েছিল এবং এগুলোর ব্যাপারেই মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেছেন; প্রচলিত রিবা সম্পর্কে কারও কোন সন্দেহ ছিল না এবং কেউ এ নিয়ে কোন মতভেদও করেননি।

তফসীরবিদ ইবনে-জরীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন ঃ ''জাহেলিয়াত আমলে প্রচলিত ও কোরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা' হল কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে ঋণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা।'' আরবরা তাই করতো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সুদ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হতো।— (তফসীরে ইবনে-জরীর, ৩য় খণ্ড, ৬২ পৃঃ।)

স্পেনের খ্যাতনামা তফসীরবিদ আবু হাইয়্যান গারনাতী রচিত 'তফসীরে-বাহরে মুহীতে' ও জাহেলিয়াত আমলে প্রচলিত রিবার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি এ রূপই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তারা অর্থ লগ্নি করে মুনাফা গ্রহণ করতো এবং ঋণের মেয়াদ যতই বেড়ে যেতো, ততই চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ বাড়িয়ে দেয়া হতো। এরাই বলতো যে, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মুনাফা নেয়া যেমন জায়েয, তেমনি অর্থ ঋণ দিয়ে মুনাফা নেয়াও তদ্রূপ জায়েয হওয়া উচিত। কোরআন পাক একে হারাম করেছে এবং ক্রয়-বিক্রয় ও রিবার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ كل قرض جر نفعا فهو ربا অর্থাৎ, যে ঋণ কোন মুনাফা টানে, তা'ই রিবা।— (জামে'-সগীর)

তবে নবী করীম (সাঃ) কয়েক রকম ক্রয়-বিক্রয়কেও রিবার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আরবরা এগুলোকে রিবা মনে করতো না। উদাহরণতঃ তিনি ছয়টি বস্তু সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এগুলো অদল-বদল করতে হলে সমান সমান এবং নগদে হওয়া দরকার। কম-বেশী কিংবা বাকী হলে তাও রিবা হবে। এ ছয়টি বস্তু হচ্ছে সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর ও আঙ্গুর।

আরবে 'মুযাবানা' ও 'মুহাকালা' নামে কাজ-কারবারের কয়েকটি প্রকার প্রচলিত ছিল। বৃক্ষস্থিত ফলকে বৃক্ষ থেকে আহরিত ফলের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাকে 'মুযাবানা' বলা হয় এবং ক্ষেতে অকর্তিত খাদ্যশস্য যথা— গম, বুট ইত্যাদিকে শুকনা পরিষ্কার করা খাদ্য যথা - গম, বুট ইত্যাদির বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাকে 'মুহাকালা' বলা হয়।

সুদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এগুলোকেও সুদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন।— (ইবনে-কাসীর)

এতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, বিশেষ করে উপরোক্ত ছয়টি বস্তুর মধ্যেই সুদ সীমাবদ্ধ, না এগুলো ছাড়া আরও কিছু বস্তু এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে? হযরত ফারূকে-আযম (রাঃ) এ সব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েই নিম্নোক্ত উক্তি করেছিলেন যে,

'সুদের আয়াত হচ্ছে কোরআন পাকের সর্বশেষ আয়াতসমূহের অন্যতম। এর পূর্ণ বিবরণ দান করার পূর্বেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাই এখন সতর্ক পদক্ষেপ জরুরী। সুদ তো অবশ্যই বর্জন করতে হবে, তদুপরি যেসব ব্যাপারে সুদের সন্দেহও হয়, সেগুলোও পরিহার করা উচিত।— (আহকামুল-কোরআন-জাস্সাস, ইবনে-কাসীর)

ফারূকে-আযম (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য ক্রয়-বিক্রয়ে ঐসব প্রকারকেও রিবার অন্তর্ভুক্তিকরণ ছিল, যেগুলোকে জাহেলিয়াত যুগের আরবে সুদ মনে করা হতো না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এগুলোকে সুদের অন্তর্ভুক্ত করে হারাম করেছিলেন। আসল 'রিবা' বা সুদ যা সমগ্র আরবে সুবিদিত ছিল, সাহাবায়ে কেরাম যা ত্যাগ করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে সম্পর্কে আইন জারি করে বিদায় হজ্বের ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন, সে সুদ সম্পর্কে ফারূক আযমের মনে কোনরূপ খটকা বা সন্দেহ দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে এরূপ চিন্তাও করা যায় না। কিন্তু সুদের যেসব প্রকার সম্পর্কে তিনি সন্দিগ্ধ ছিলেন, সেগুলোর ব্যাপারে তিনি সমাধান প্রদান করেন যে, যেসব ব্যাপারে সুদের সন্দেহ হয়, সেগুলোকেও পরিত্যাগ করতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজকাল কিছু সংখ্যক লোক, যারা পাশ্চাত্যের বাহ্যিক জাঁকজমক, ধনাঢ্যতা এবং বর্তমান বাণিজ্যনীতি ইত্যাদিতে সুদের প্রধান্য বিস্তারের মোহে মোহগ্রস্ত, তারা ফারূকে-আযমের উপরোক্ত উক্তির ব্যাখ্যা এই বের করেছে যে, 'রিবা'র অর্থই অস্পষ্ট ও অব্যক্ত ছিল। কাজেই এতে গবেষণার অবকাশ রয়েছে। তাদের এ অভিমত যে ভ্রান্ত, তার যথেষ্ট প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। 'আহকামুল কোরআনে ইবনে আরাবী এ শ্রেণীর লোকের কঠোর সমালোচনা করেছেন, যারা ফারূকের-আযমের উপরোক্ত উক্তির ভিত্তিতে সুদের আয়াতকে অস্পষ্ট বলে অভিহিত করতে চেয়েছে। তিনি বলেন ঃ 'যারা রিবার আয়াতকে অস্পষ্ট বলেছেন, তারা শরীয়তের অকাট্য বিষয়সমূহ বোঝাতে সক্ষম হয়নি। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় রসূলকে একটি মানবগোষ্ঠীর নিকট প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরই ভাষায় প্রেরণ করেছেন। স্বীয় গ্রন্থ সহজ করার জন্যে তাদেরই ভাষায় তা অবতীর্ণ করেছেন। তাদের ভাষায় 'রিবা' শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। আয়াতে ঐ অতিরিক্তটুকুকে বোঝানো হয়েছে, যার বিপরীতে কোন সম্পদ নেই বরং মেয়াদ আছে।

ইমাম রাযী তফসীর-কবীরে বলেন ঃ রিবা দু'রকম ঃ (এক) বাকী বিক্রয়ের রিবা এবং (দুই) নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে বেশী নেয়ার রিবা। প্রথম প্রকার জাহেলিয়াত যুগে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। সে যুগের লোকেরা এরূপ লেন-দেন করতো। দ্বিতীয় প্রকার রিবা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অমুক অমুক বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশী করা রিবার অন্তর্ভুক্ত।

জাসসাসের আহকামুল-কোরআনে বলা হয়েছেঃ রিবা দু'রকমঃ একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে এবং অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া। দ্বিতীয় প্রকারই ছিল জাহেলিয়াত যুগের রিবা। এর সংজ্ঞা এই যে, যে ঋণে মেয়াদের হিসাবে কোন মুনাফা নেয়া হয়, তা-ই রিবা। ইবনে-রুশদ 'বেদায়াতুল-মুজতাহিদ' গ্রন্থে তা-ই লিখেছেন। তিনি এ রিবার অবৈধতা কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

ইমাম তোয়াহাবী 'শরহে মা'আনিউল-আসার' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ কোরআনে উল্লিখিত 'রিবা' দ্বারা পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে সে রিবাকেই বোঝান হয়েছে, যা ঋণের উপর নেয়া হতো। জাহেলিয়াত যুগেও একেই রিবা বলা হতো। এরপর রসূল (সাঃ)-এর বর্ণনা ও তাঁর সুন্নত থেকে অন্য প্রকার রিবার বিষয় জানা

যায়, যা বিশেষ প্রকারে ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশী করা কিংবা বাকী দেয়ার পরিবর্তে নেয়া হয়। এ রিবা হারাম হওয়া সম্পর্কেও অনেক সুপ্রসিদ্ধ হাদীসে বর্নিত আছে। কিন্তু এ প্রকার রিবার বিস্তারিত বিবরণ না থাকার কারণে এতে কোন কোন সাহাবীর মনে খটকা দেখা দেয় এবং ফিকাহ্‌বিদরা পরস্পর মতভেদ করেন।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহঃ) 'হুজ্জাতুল্লাহিল-বালেগাহ' গ্রন্থে বলেন ঃ এক প্রকার হচ্ছে সরাসরি ও প্রকৃত সুদ এবং অন্য এক প্রকার প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ ও নির্দেশগত। সত্যিকার সুদ ঋণ দিয়ে বেশী নেয়াকে বলা হয় এবং নির্দেশগত সুদ বলতে হাদীসে বর্ণিত সুদকে বোঝান হয়। অর্থাৎ, কিছু সংখ্যক বিশেষ বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে বেশী নেয়া। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لاربا إلا فى النسيئة অর্থাৎ, রিবা বা সুদ শুধু বাকী দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর অর্থও তা-ই যে সত্যিকার ও আসল সুদ, যাকে সাধারণভাবে সুদ মনে করা ও বলা হয়, তা বাকী দিয়ে মুনাফা নেয়াকেই বলা হয়। এ ছাড়া যত প্রকার সুদ এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, সবগুলো নির্দেশগত সুদের অন্তর্ভুক্ত।

আজকাল যে সদুকে প্রচলিত অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ মনে করা হয় এবং যে সুদের প্রশ্নটি এখানে আলোচনাধীন, সে সুদের অবৈধতা কোরআনের সাতটি আয়াত, চল্লিশটিরও বেশী হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

দ্বিতয়ি প্রকার সুদ, যা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হয়, আজকাল এর ব্যাপক প্রচল নেই। কাজেই এ নিয়ে আলোচনা করারও তেমন প্রয়োজন নেই।

এ পর্যন্ত কোরআন ও সুন্নাহ্য় সুদের স্বরূপ কি, তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সুদ সংক্রান্ত আলোচনায় এটিই ছিল প্রধান বিষয়বস্তু।

সুদ নিষিদ্ধকরণের তাৎপর্য ও উপযোগিতা ঃ এরপর দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, সুদের অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা কোন রহস্য ও উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল, এতে কি আত্নিক অথবা অর্থনৈতিক অপকারিতা রয়েছে, যে কারণে ইসলাম একে এত বড় গোনাহ্ সাব্যস্ত করেছে?

এ প্রসঙ্গে প্রথমে বোঝা দরকার যে, জগতের কোন সৃষ্টবস্তু ও তার কাজ-কারবারই এমন নেই যাতে কোন না কোন বৈশিষ্ট্য বা উপকারিতা নেই। সাপ-বিচ্ছু, বাঘ-সিংহ এমনকি সংখিয়ার মত মারাত্মক বিষের মধ্যেও মানুষের হাজারো উপকারিতা নিহিত রয়েছে। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ঘুষ ইত্যাদির মধ্যেও কোন না কোন উপকার খুঁজে বের করা কঠিন নয়। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যেই দেখা যায়, যে জিনিসের মধ্যে উপকার বেশী এবং ক্ষতি কম, তাকে উপকারী ও উত্তম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে যেসব জিনিসের অনিষ্ট ও অপকারিতা বেশী এবং উপকারিতা কম, সেগুলোকে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়। কোরআন পাকও সুদ ও জুয়াকে হারাম করার সময় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এগুলোর মধ্যে গোনাহ ও মানুষের উপকার দুই-ই রয়েছে, কিন্তু গোনাহ্‌র পরিমাণ উপকারের তুলনায় অনেক বেশী। তাই এগুলোকে উত্তম ও উপকারী বলা যায় না, বরং ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক মনে করে এগুলো থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

'রিবা' অর্থাৎ, সুদের অবস্থাও তদ্রূপ। এতে সুদখোরের সাময়িক উপকার অবশ্যই দেখা যায়। কিন্তু এর জাগতিক ও পারলৌকিক মন্দ পরিণাম এ উপকারের তুলনায় অত্যন্ত জঘন্য।

প্রত্যেক বস্তুর উপকার-অপরকার ও লাভ-ক্ষতি তুলনা করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাছে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় হয়ে থাকে যে, যদি কোন বস্তুর উপকার অস্থায়ী ও সাময়িক হয় এবং অপকার দীর্ঘস্থায়ী কিংবা চিরস্থায়ী হয়, তবে একে কোন বুদ্ধিমান উপকারী বস্তুসমূহের তালিকায় গণ্য করতে পারে না। এমনিভাবে যদি কোন বস্তুর উপকার ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয় এবং ক্ষতি সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপে, তবে একেও কোন সচেতন মানুষ উপকারী বলতে পারে না। চুরি ও ডাকাতিতে চোর ও ডাকাতের উপকার অনস্বীকার্য। কিন্তু তা সমগ্র জাতির জন্যে ক্ষতিকর এবং তাদের শান্তি ও স্বস্তি বিনষ্টকারী। তাই কোন মানুষই চুরি-ডাকাতিকে ভাল বলে না।

এ ভূমিকার পর সুদের প্রতি লক্ষ্য করুন। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, এতে সুদখোরের সাময়িক ও অস্থায়ী উপকারের তুলনায় তার আত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি এত তীব্র যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি মানবতার গণ্ডির ভেতরেই থাকতে পারে না। তার সাময়িক উপকারটিও শুধুমাত্র তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত উপকার। কিন্তু এর ফলে গোটা জাতিকে বিরাট ক্ষতি ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার শিকার হতে হয়। কিন্তু জগতের অবস্থা বিচিত্র বটে! এখানে কোন বস্তু একবার প্রচলিত হয়ে গেলে তার যাবতীয় অনিষ্টকারিতা যেন দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যায় এবং শুধু তার উপকারিতাই লক্ষ্যপথে থেকে যায়—তা যতই নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন। এর ক্ষতি ও অনিষ্টের প্রতি অধিকাংশ লোকই লক্ষ্য করে না—যদিও তা অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক।

প্রথা ও প্রচলন মানব মনের জন্যে একটি সূক্ষ্ম বিষক্রিয়া যা মানুষকে অচেতন করে দেয়। অনেক কম ব্যক্তিই প্রথা ও প্রচলন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে একথা বুঝতে চেষ্টা করে যে, এতে উপকার কতটুকু আর ক্ষতিই বা কতটুক? বরং কারও সতর্ক করার দরুন যদি ক্ষতিগুলো কারও দৃষ্টিতে ধরাও পড়ে, তবুও প্রথা ও প্রচলনের অনুবর্তিতা তাকে সঠিক পথে আসতে দেয় না।

বর্তমান যুগে সুদ মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সমগ্র বিশ্ব এর রাহুগ্রাসে পতিত। এটি মানব রুচিকে বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে মানুষ যে বিষয়টি সমগ্র মানবতার জন্যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ, তাকেই তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ভাবতে শুরু করেছে। আজ কোন চিন্তাবিদ এর বিপক্ষে আওয়াজ তুললে তাকে অপরিণামদর্শী, অবাস্তব চিন্তা-ধারার সেকেলে লোক বলেই অভিহিত করা হয়।

কিন্তু যে চিকিৎসক কোন দেশে ব্যাপকাকারে মহামারী ছড়িয়ে পড়তে এবং চিকিৎসা ব্যর্থ হতে দেখে মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, এ রোগ রোগই নয়, বরং সুস্থতা ও সাক্ষাৎ আরাম, সে প্রকৃত অর্থে চিকিৎসকই নয়, বরং মানবতার সাক্ষাৎ শত্রু। পারদর্শী চিকিৎসকের কাজ এ সময়েও এ ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না যে, সে মানুষকে এ রোগ ও তার ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং প্রতিকারের পন্থা বলতে থাকবে।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম মানব চরিত্র সংশোধনের দায়িত্ব নিয়ে আগমন করেছেন। তাঁদের কথা কেউ শুনবে কি না, তাঁরা এর পরওয়া করেননি। তাঁরা যদি মানুষের শোনার ও মান্য করার অপেক্ষা করতেন, তবে সারা বিশ্ব কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ থাকতো। শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রচারকার্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন, তখন কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র মান্যকারী কে ছিল? সুদকে যদিও বর্তমান অর্থনীতির মেরুদণ্ড মনে করা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব সত্য আজ কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও স্বীকার করছেন। তাঁদের মতে

সুদ অর্থনীতির মেরুদণ্ড নয় বরং মেরুদণ্ডে সৃষ্ট এমন একটা দুষ্টক্ষত, যা অহরহ তাকে খেয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজকালকার অনেক বিচক্ষণ লোকও কোন সময় প্রথা ও প্রচলনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে এদিকে লক্ষ্য করেন না যে, সুদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কি? দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাও এসব বিচক্ষণদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করে না যে, সুদের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষ এবং গোটা জাতি দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার শিকার হয়ে যায়। দরিদ্র আরও দরিদ্র হতে থাকে এবং গুটি কতক পুঁজিপতি সমগ্র জাতির অর্থ দ্বারা উপকৃত হয়ে বরং বলা উচিত যে, জাতির রক্ত শোষণ করে স্ফীত হতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, যখন এসব বুদ্ধিজীবীর সামনে এ সত্যটি তুলে ধরা হয়, তখন তারা একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যে আমাদেরকে পাশ্চাত্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুদের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করতে উপদেশ দেন এবং দেখাতে চান যে, তারা সুদভিত্তিক অর্থনীতির কল্যাণেই এমন সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। কিন্তু এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন নরখাদক সম্প্রদায় তাদের এ অভ্যাসের উপকারিতা দেখানোর জন্যে আপনাকে নরখাদকদের মহল্লায় নিয়ে গেলো এবং দেখালো যে, এরা কেমন মোটা-তাজা, সবল ও সুস্থ। এরপর সে প্রমাণ করে যে, এদের অভ্যাস-আচরণই অনুসরণীয় ও উত্তম আচরণ।

কিন্তু কোন সমঝদার লোকের সাথে এ ব্যক্তির মোকাবিলা হলে সে বলবে ঃ তুমি এ নরখাদকদের ক্রিয়াকর্মের কল্যাণ এদের মহল্লায় নয়— অন্য মহল্লায় গিয়ে দেখ। দেখবে, শত শত, হাজার হাজার নরকংকাল পড়ে রয়েছে। এদের রক্ত, গোশত খেয়ে এ হিংস্ররা তাজা হয়েছে। ইসলাম ও ইসলামী শরীয়ত কখনও এরূপ কার্যকে উপকারী বলে মেনে নিতে পারে না, যার ফলশ্রুতিতে সমগ্র মানব সমাজ বিপর্যয়ের শিকার হবে আর কিছুসংখ্যক লোক ও তাদের তল্পীবাহকরা সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকবে।

সুদের অর্থনৈতিক অনিষ্ট ঃ সুদের ফলে গুটিকতক লোকের উপকার এবং সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয়— এ ছাড়া সুদের মধ্যে যদি অন্য কোন দোষ নাও থাকতো তবুও এ দোষটিই সুদ নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল। অথচ এতে এ ছাড়া আরও অর্থনৈতিক অনিষ্ট এবং আত্মিক বিপর্যয় বিদ্যমান রয়েছে।

সুদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির বিপর্যয় ঘটিয়ে বিশেষ একটি শ্রেণীর উপকার কিভাবে হয়, প্রথমে তাই দেখা যাক। সুদের মহাজনী ও আধুনিক পদ্ধতি এমন বিশ্রী যে, বৃহত্তম মানব সমাজের ক্ষতি ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের উপকারের বিষয়টি যে কোন স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু আজকালকার নতুন প্রেক্ষাপটে যেভাবে মদকে মেশিনে পরিশোধিত করে, ডাকাতির নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে এবং ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার নতুন নতুন কৌশল বের করে এ সবগুলোকেই সভ্যতার খোলস পরিয়ে দিয়েছে—যাতে এদের আভ্যন্তরীণ অনিষ্ট বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিগোচর না হয়, তেমনিভাবে সুদের জন্যে ব্যক্তিগত গদির পরিবর্তে যৌথ কোম্পানী গঠন করেছে— যাকে ব্যাঙ্ক বলা হয়। এখন জগদ্বাসীর চোখে ধূলি দেয়ার জন্যে বলা হয় যে, সুদের এ আধুনিক পদ্ধতি দ্বারা সমগ্র জাতিরই উপকার হয়। কেননা, যে জনগণ নিজের টাকা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে জানে না, কিংবা স্বল্প পুঁজির কারণে করতে পারে না, তাদের সবার টাকা-পয়সা ব্যাঙ্কে জমা হয়ে প্রত্যেকেই অল্প হলেও কিছু না কিছু মুনাফা পেয়ে যায়। বড় বড় ব্যবসায়ীরাও ব্যাঙ্ক থেকে সুদের উপর ঋণ নিয়ে বড় ব্যবসা করে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। এভাবে সুদ বর্তমানে একটি কল্যাণকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং গোটা জাতি এর দ্বারা উপকার পাচ্ছে।

কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে এটি একটি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। মদের দুর্গন্ধময় দোকানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেলে এবং পতিতালয়গুলোকে সিনেমা ও নৈশ ক্লাবে রূপান্তরিত করে,বিষকে প্রতিষেধক এবং ক্ষতিকরকে উপকারীরূপে দেখাবার প্রয়াসে এ প্রতারণাকে কাজে লাগানো হয়েছে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের সামনে যেমন একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, চরিত্রবিধ্বংসী অপরাধসমূহকে আধুনিক পোশাক পরিয়ে দেয়ার ফলে যেমন এসব অপরাধের ব্যাপকতা পূর্বের চাইতে বেড়েই গেছে, তেমনি সুদখোরীর এ নতুন পদ্ধতিতে-শতকরা কয়েক টাকা সুদ জনগণের পকেটে পুরে দিয়ে একদিকে তাদেরকে এ জঘন্য অপরাধে শরীক করেছে এবং অপরদিকে নিজেদের জন্যে এ অপরাধের অসীম ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিয়েছে।

কে না জানে যে, জনগণ সেভিংস ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিস থেকে যে শতকরা কয়েক টাকা সুদ পায়, তদ্দ্বারা কিছুতেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না। তাই তারা ভরণ-পোষণের জন্যে কোন মজুরী কিংবা চাকুরী খুঁজতে বাধ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে প্রথমতঃ তাদের দৃষ্টি যায় না। যদি কেউ এদিকে মনোনিবেশও করে তবে গোটা জাতির পুঁজি ব্যাঙ্কে জমা হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য যে আকার ধারণ করেছে, তাতে কোন স্বল্প পুঁজির অধিকারীর পক্ষে ব্যবসায়ে প্রবেশ করা স্বপ্ন-বিলাসের পর্যায়েই থেকে যায়। কেননা, যে ব্যবসায়ীর বাজারে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে এবং বড় কারবার আছে, ব্যাঙ্ক তাকেই বড় পুঁজি ঋণ দিতে পারে। দশ লক্ষের মালিক এক কোটি ঋণ পেতে পারে। সে তার ব্যক্তিগত টাকার তুলনায় দশ গুণ বেশী টাকার ব্যবসা চালাতে পারে। পক্ষান্তরে স্বল্প পুঁজির অধিকারী ব্যক্তির কোন প্রভাব-প্রতিপত্তিই থাকে না এবং ব্যাংকও তাকে বিশ্বাস করে না যে, পুঁজির দশ গুণ বেশী দিয়ে দেবে। এক লক্ষ দূরের কথা, তার এক হাজার পাওয়াই কঠিন। মনে করুন, কেউ এক লাখ টাকা ব্যাংকের পুঁজি খাটিয়ে দশ লাখ টাকার ব্যবসা করে যদি তার শতকরা এক টাকা মুনাফা হয়, তবে তার নিজস্ব এক লাখ টাকায় যেন শতকরা দশ টাকা মুনাফা হলো। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি শুধু ব্যক্তিগত টাকা দ্বারা এক লাখ টাকার ব্যবসা করে, তবে এক লাখের মুনাফা শতকরা এক টাকাই হবে। এ মুনাফা তার প্রয়োজনীয় খরচাদির জন্যেও হয়ত যথেষ্ট নয়। এদিকে বাজারে বড় পুঁজিপতি যে দর ও রেয়াতসহ কাঁচামাল পায়, ছোট পুঁজিপতি তা পায় না। ফলে স্বল্প পুঁজিওয়ালা পঙ্গু ও মুখাপেক্ষী হয়েই থাকে। যদি তার কপাল মন্দ হয় এবং সেও কোন বড় ব্যবসায়ে প্রবেশ করে, তবে বৃহৎ পুঁজিপতিরা তাকে অনধিকার প্রবেশকারী মনে করে নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও বাজার এমন পর্যায়ে নিয়ে আসে যে, ক্ষুদ্র পু'জিপতিরা আসল ও মুনাফা উভয়ই খুইয়ে বসে। ফলে বৃহৎ পুঁজিপতিদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

জাতির প্রতি এটা কতবড় অবিচার যে, গোটা জাতি প্রকৃত ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধু বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তারা বখশিস হিসেবে যতটুকু ইচ্ছা তাদেরকে মুনাফা দেবে।

এর চাইতেও বড় আর একটি ক্ষতির কবলে সারাদেশ পড়ে আছে। তা এই যে, উপরোক্ত অবস্থায় বৃহৎ পুঁজিপতিরাই দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের একচেটিয়া অধিকারী হয়ে যায়। তারা উচ্চতর মূল্যে বিক্রয় করে স্বীয় গাঁট মজবুত করে নেয় এবং জাতির গাঁট খালি করে দেয়। তারা মূল্য বৃদ্ধি করার জন্যে যখন ইচ্ছা মাল বিক্রি বন্ধ করে দেয়। যদি গোটা জাতির

পুঁজি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টেনে এসব স্বার্থপরদের লালন-পালন না করা হতো এবং সবাই বক্তিগত পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করতে বাধ্য হতো, তবে ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা এ বিপদের সম্মুখীন হতো না এবং এসব স্বার্থপর হিংস্ররাও গোটা ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্ণধার হয়ে বসতে পারতো না। ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের ব্যবসায়ের মুনাফা জমকালো হলে অন্যরাও সাহস করতো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপক হয়ে যেতো। এতে করে প্রত্যেকের পক্ষেই কিছু কিছু লোক নিয়োগ করার সুযোগ হতো। এতে অনেক বেকার সমস্যারও সমাধান হতো এবং বাণিজ্যিক মুনাফাও ব্যাপক হয়ে পড়তো। এছাড়া দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতেও এর নিশ্চিত প্রভাব পড়ত। কেননা, পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই ব্যবসায়ীরা কম মুনাফা অর্জনে সম্মত হয়। অথচ বর্তমান এ প্রতারণামূলক কর্মপদ্ধতি গোটা জাতিকে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত করে তাদের চিন্তাধারাকেও বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে তারা এ রোগকেই সুস্থতা মনে করে বসেছে।

ব্যাংকের সুদ দ্বারা জাতির তৃতীয় অর্থনৈতিক ক্ষতিও লক্ষণীয়। যার পুঁজি দশ হাজার এবং সে ব্যাংক থেকে সুদের উপর কর্জ নিয়ে এক লাখের ব্যবসা করে, যদি কোথাও তার পুঁজি ডুবে যায় এবং ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সে দেউলিয়া হয়ে যায়, তবে চিন্তা করুন, ক্ষতির শতকরা দশ ভাগ তার নিজস্ব এবং অবশিষ্ট শতকরা নব্বই ভাগই গোটা জাতির হয়েছে, যাদের পুঁজি ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে সে ব্যবসা করেছিল। যদি ব্যাঙ্ক নিজেই দেউলিয়ার ক্ষতি বহন করে, তবে ব্যাঙ্ক তো জাতিরই পকেট। পরিণামে এ ক্ষতি জাতিরই হবে। এর সারমর্ম হলো এই যে, যতক্ষণ মুনাফা হচ্ছিল, ততক্ষণ সে একা ছিল মুনাফার মালিক, তাতে জাতির কোন অংশ ছিল না এবং যখনই ক্ষতি হলো, তখন শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষতিই জাতির ঘাড়ে চেপে বসলো।

সুদের আরো একটি অর্থনৈতিক ক্ষতি এই যে, সুদখোর যখন অবক্ষয়ে পড়ে, তখন সে পুনরায় মাথা তোলার যোগ্য থাকে না। কেননা, ক্ষতি বরদাস্ত করার মত পুঁজি যে তার ছিলই না। ক্ষতির সময় তার উপর দ্বিগুণ বিপদ চাপে। একে তো নিজের মুনাফা ও পুঁজি গেল, তদুপরি ব্যাঙ্কের ঋণও চেপে বসল। এ ঋণ পরিশোধের কোন উপায় তার কাছে নেই। সুদহীন ব্যবসায়ে যদি কোন সময় সমগ্র পুঁজিও বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে এর দ্বারা মানুষ ফকীর হয় না— ঋণী হয়।

আত্মসেবা ও জাতি হত্যার আরও একটি অপকৌশল :

সুদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির সর্বনাশ সাধন করে কতিপয় ব্যক্তির আত্মসেবার সংক্ষিপ্ত চিত্র পেশ করা হলো। এর সাথে আরও একটি প্রতারণা লক্ষণীয়।

সুদখোররা যখন অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝতে পারল যে, কোরআনের উক্তি يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا অক্ষরে অক্ষরে সত্য; অর্থাৎ, মালের অবক্ষয় আসা অবশ্যম্ভাবী, যার ফলে দেউলিয়া হতে হয়, তখন এসব অবক্ষয়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তারা দু'টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললো। একটি বীমা, অপরটি 'স্টক-এক্সচেঞ্জ'। কেননা, ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ার দু'টি কারণ হতে পারে। একটি দৈব-দুর্বিপাক, যথা, জাহাজ ডুবি, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি এবং অপরটি পণ্যদ্রব্যের দাম ক্রয়-মূল্যের নীচে নেমে আসা। বিনিয়োগকৃত পুঁজি যেহেতু নিজস্ব নয়— জাতির যৌথ সম্পদ, তাই উভয় অবস্থাতে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি কম এবং জাতির বেশী হয়। কিন্তু তারা এ অল্প ক্ষতির বোঝাও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার জন্যে একদিকে বীমা কোম্পানী খুলেছে যাতে ব্যাঙ্কের মত সমগ্র জাতির পুঁজি নিয়োজিত থাকে। দৈব-দুর্বিপাকে সুদখোরদের ক্ষতি হয়ে গেলে, বীমার মাধ্যমে সমগ্র জাতির যৌথ পুঁজি থেকে তা উদ্ধার করে নেয়া হয়।

জনগণ মনে করে, বীমা কোম্পানীগুলো আল্লাহ্‌র রহমত; ডুবন্ত ব্যক্তির আশ্রয়স্থল। কিন্তু এদের স্বরূপ দেখলে ও বুঝলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এখানেও প্রতারণা ছাড়া কিছুই নেই। আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় সাহায্যের লোভ দেখিয়ে জাতির পুঁজি সঞ্চয় করা হয়, কিন্তু এর মোটা অংকের টাকা দ্বারা বৃহৎ ব্যবসায়ীরাই উপকৃত হয়। তারা মাঝে মাঝে নিজেই স্বীয় ক্ষয়প্রাপ্ত মোটরে অগ্নিসংযোগ করে কিংবা কোন কিছুর সাথে ধাক্কা লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয় এবং বীমা কোম্পানী থেকে টাকা আদায় করে নতুন মোটর ক্রয় করে। শতকরা দু'একজন গরীব হয়তো আকস্মিক মৃত্যুর কারণে কিছু টাকা পেয়ে যায়। অপরদিকে দর কমে যাওয়ার বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তারা স্টক-এক্সচেঞ্জের বাজার গরম করেছে। এ বিশেষ প্রকার জুয়া দ্বারা গোটা জাতিকে প্রভাবান্বিত করা হয়েছে, যাতে মূল্য হ্রাসের কারণে যে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, তাও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া যায়।

এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংকের সুদ ও বাণিজ্যই গোটা মানব সমাজের দারিদ্র্য ও আর্থিক দুরবস্থার কারণ। হাঁ, গুটিকতক ধনীর ধন-সম্পদ এর দৌলতে আরও বেড়ে যায়। জাতির ধ্বংস এবং গুটিকতক লোকের উন্নতিই এর ফলশ্রুতি। এ বিরাট অনিষ্ট সাধারণ সরকারসমূহের দৃষ্টি এড়ায়নি। এর প্রতিকারার্থে তারা বৃহৎ পুঁজিপতিদের আয়করের হার বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এমনকি, সর্বশেষ হার টাকায় সাড়ে পনর আনা করা হয়েছে – যাতে পুঁজি তাদের হাত থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আবার জাতীয় তহবিলে পৌঁছে যায়।

কিন্তু সবাই জানেন যে, এ আইনের ফলেই সাধারণভাবে মিল-কারখানার হিসাবে জালিয়াতি হচ্ছে এবং সরকারের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য ও হিসাবাদি গোপন করার উদ্দেশে অনেক পুঁজি গুপ্তধনের আকারে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

মোটকথা, ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে কয়েক ব্যক্তির হাতে আবদ্ধ হওয়া যে দেশের অর্থনীতির জন্যে সমূহ ক্ষতির কারণ, এ সম্পর্কে সবাই পরিজ্ঞাত। এ কারণেই আয়করের হার বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এ কর্মপন্থাও রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। রোগের আসল কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থতাই এর বড় কারণ। কাজেই এ প্রতিকার যেন শত্রুকে ভিতরে রেখেই দরজা এঁটে দেয়ার মত হয়ে গেছে।

যতদিন পর্যন্ত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সুদের কারবার বন্ধ করা না হয় এবং নিজ নিজ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করার নীতি প্রচলিত না হয়, ততদিন এ রোগের প্রতিকার অসম্ভব।

একটি সন্দেহ ও তার উত্তর : এস্থানে প্রশ্ন উঠতে হতে পারে যে, ব্যাংকের মাধ্যমে গোটা জাতির পুঁজি সঞ্চিত হয়ে কিছু না কিছু উপকার তো জনগণেরও হয়েছে যদিও তা খুব কম। অবশ্য এটা সত্য যে বৃহৎ পুঁজিপতিরা এরদ্বারা বেশী উপকৃত হয়েছে তবে হাঁ, যদি ব্যাংকে সম্পদ সঞ্চিত করার রীতি বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে এর ফল আগেকার যুগের মতই হবে, অর্থাৎ, জনগণের সম্পদ গুপ্তধন ও গুপ্তভাণ্ডারের আকারে ভূগর্ভে চলে যাবে। এতে না জনগণের উপকার হবে, না অন্য কারো।

এর উত্তর এই যে, ইসলাম সুদ হারাম করে যেমন সমগ্র জাতির সম্পদ বিশেষ বিশেষ পুঁজিপতির হাতে আবদ্ধ হওয়ার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, তেমনি পুঁজিকরের আকারে যাকাত আরোপ করে প্রত্যেক

ধনীকে সম্পদ স্থবির অবস্থায় না রেখে ব্যবসা–বাণিজ্যে নিয়োজিত রাখতে বাধ্য করেছে। কেননা, পুঁজিকরের আকারে যাকাত আরোপিত হওয়ার কারণে যদি কোন ব্যক্তি টাকা–পয়সা অথবা সোনা–রূপা মাটির নীচে পুঁতে রাখে, তবে প্রতি বছর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত যেতে যেতে তার মূল নিঃশেষ হয়ে যাবে। কাজেই প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই পুঁজিকে ব্যবসা–বাণিজ্যে নিয়োজিত করে তদ্দ্বারা নিজে উপকৃত হতে, অপরের উপকার করতে এবং মুনাফা থেকেই যাকাত আদায় করতে বাধ্য হবে।

যাকাত একদিক দিয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির নিশ্চয়তা দেয় : এ থেকে আরও জানা গেল যে, যাকাত প্রদানের মধ্যে যেমন জাতির অক্ষম শ্রেণীর সাহায্য করার মত বিরাট উপকার নিহিত, তেমনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যেও ব্যবসা–বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি চমৎকার প্রক্রিয়া। কেননা, প্রত্যেকেই যখন দেখবে, নগদ পুঁজি আবদ্ধ রাখার ফলে মুনাফা তো দূরের কথা, বছরান্তে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ক্রমানুয়ে হ্রাসই পেয়ে যাচ্ছে, তখন অবশ্যই সে এ পুঁজি কোন ব্যবসায়ে নিয়োজিত করার জন্যে সচেষ্ট হবে। হারাম সুদ থেকে বাঁচার জন্য ব্যবসায়ের আকার– প্রকৃতি এরূপ হবে না যে, লাখো মানুষের পুঁজি দ্বারা শুধু এক ব্যক্তিই ব্যবসা করবে; বরং প্রত্যেকেই নিজে বিনিয়োগের চিন্তা করবে। বৃহৎ পুঁজিপতিরাও যখন নিজ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করবে, তখন ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা ব্যবসা ক্ষেত্রে ঐসব অসুবিধার সম্মুখীন হবে না যা ব্যাংক থেকে সুদের টাকা নিয়ে ব্যবসা করলে দেখা দেয়। এভাবে দেশের আনাচে–কানাচে প্রত্যন্ত এলাকাতেও ব্যবসা এবং বিভিন্ন–মুখী বিনিয়োগ প্রচেষ্টা ছড়িয়ে পড়বে যাতে সর্বশ্রেণীর মানুষই উপকৃত হবে।

(১) মানবচরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ হচ্ছে আত্মত্যাগ ও দানশীলতা। অর্থাৎ, নিজে কষ্ট করে হলেও অপরকে সুখী করার প্রেরণা। সুদের ব্যবসায়ের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে এ প্রেরণা লোপ পায়। সুদখোর ব্যক্তি অপরের উপকার করা তো দূরের কথা অপরকে নিজ চেষ্টায় ও নিজ পুঁজি দ্বারা তার সমতুল্য হতে দেখলে তাও সহ্য করতে পারে না।

(২) সুদখোরেরা কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার পরিবর্তে তার বিপদের সুযোগে অবৈধ মুনাফা লাভের চেষ্টায় মত্ত থাকে।

(৩) সুদ খাওয়ার ফলশ্রুতিতে অর্থলালসা সীমাহীনভাবে বেড়ে যায়। সে এতে এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, ভালমন্দেরও পরিচয় থাকে না এবং সুদের অশুভ পরিণামের প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে।

সুদ ছাড়া কি কোন ব্যবসা চলতে পারে না? : সুদের স্বরূপ এর বৈষয়িক, পার্থিব ও ধর্মীয় অনিষ্টকারিতা বিস্তারিতভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এখন তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হলো অর্থনৈতিক ও আত্মিক অনিষ্টকারিতা। বর্তমান যুগে সুদই হচ্ছে কাজ–কারবারের প্রধান অবলম্বন। সারা বিশ্বের ব্যবসা–বাণিজ্য সুদের উপরই চলছে। এ থেকে মুক্তিলাভের উপায় কি? বর্তমান যুগে ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক বর্জন করার অর্থ ব্যবসায়ের তল্পীতল্পা গুটানো।

এর জওয়াব এই যে, কোন রোগ যখন ব্যাপক হয়ে মহামারীর আকার ধারণ করে, তখন তার চিকিৎসা কঠিন অবশ্যই হয়; কিন্তু নিষ্ফল কখনো হয় না। নিস্তার সাথে যে কোন সংশোধন প্রচেষ্টাই পরিণামে সফল হয়। তবে এজন্যে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং সাহসিকতা একান্ত প্রয়োজন। কোরআন পাকেই আল্লাহ্ তাআলা বলেন : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের কোনরূপ সংকীর্ণতায় ফেলে নি। তাই সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্যে এমন কোন কার্যকর ও ফলপ্রসূ পথ অবশ্যই রয়েছে, যাতে অর্থনৈতিক ক্ষতিও নেই, আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের দ্বারও রুদ্ধ হয় না এবং সুদ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা এই যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বর্তমান পদ্ধতি দেখে বাহ্যদৃষ্টিতে মনে করা হয় যে, সুদের উপরই ব্যাংক নির্ভরশীল; সুদ ছাড়া ব্যাংক চলতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা নিশ্চিতরূপে নির্ভুল নয়। সুদ ছাড়াও ব্যাংক ব্যবস্থা এমনিভাবে ফলপ্রসূ ও কার্যকরী ভূমিকা সহকারেই কায়েম থাকতে পারে; শুধু তাই নয় বরং আরও উত্তম, ও উপকারী ভূমিকা নিয়েই তা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। তবে এর জন্যে কিছুসংখ্যক শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ও কিছু সংখ্যক ব্যাংক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাঁরা নতুনভাবে এর পদ্ধতি নির্ধারণ করলে সাফল্য দূরে নয়। শরীয়তের নিয়মানুয়ায়ী ব্যাংক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ইনশাল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করবে যে, এতে জাতির কিরূপ মঙ্গল সাধিত হয়। ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করার পদ্ধতি ও নীতি ব্যাখ্যা করার স্থান এটা নয়, তাই এ সম্পর্কে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে।

কিছু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সুদের প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্যাংকের বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন করে এর ব্যবস্থা করা যায়। সুদের দ্বিতীয় প্রয়োজন অসহায় দরিদ্র লোকদের সাময়িক অভাব পূরণ করা। এর চমৎকার প্রতিকার ইসলামে পূর্ব থেকেই যাকাতও ওয়াজিব সদকার আকারে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ধর্ম ও ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা আজকাল যাকাত ব্যবস্থাকেও পঙ্গু করে দিয়েছে। অসংখ্য মুসলমান নামাযের মত যাকাতেরও ধারে কাছে যায় না। যারা যাকাত দেয়, তাদের মধ্যে অনেক বৃহৎ পুঁজিপতি হিসাব করে পূর্ণ যাকাতও প্রদান করে না। যারা সম্পূর্ণ যাকাত প্রদান করে, তারা শুধু যাকাত পকেট থেকে বের করতেই জানে। অথচ আল্লাহ্ তাআলা শুধুমাত্র যাকাত পকেট থেকে বের করারই নির্দেশ দেননি – তা আদায় করারও নির্দেশ দিয়েছেন। প্রদত্ত যাকাত যথার্থ হকদারকে পৌছে দিয়ে তার অধিকারভুক্ত করে দিলেই যাকাত আদায় করা শুদ্ধ হতে পারে। সুতরাং চিন্তা করার বিষয় হলো, এমন মুসলমান কয়জন আছে, যারা যথার্থ হকদার খুঁজে তাদের কাছে যাকাত পৌছে দিতে যত্নবান। মুসলমান জাতি যতই গরীব হোক, যাদের উপর যাকাত ফরয, তারা প্রত্যেকেই যদি পুরোপুরি যাকাত প্রদান করে এবং বিশুদ্ধ পন্থায় স্বীয় অর্থ–সম্পদ ব্যয় করে,তবে কর্জের তাগিদে সুদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন কোন মুসলমানেরই থাকতে পারে না। যদি শরীয়তের বিধি অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়, এর অধীনে বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানদের ধন–সম্পদের যাকাত এতে জমা হয়, তবে বায়তুল-মাল থেকে প্রত্যেক অভাব গ্রস্তেরই অভাব পূরণ করা সম্ভব। বেশী টাকার প্রয়োজন হলে সুদবিহীন কর্জও প্রদান করা যেতে পারে। এভাবে বেকার ও কর্মহীনদের ছোট ছোট দোকান করে দিয়ে কিংবা কোন শিল্পকর্মে নিয়োগ করেও কাজে লাগানো যায়। জনৈক ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ঠিকই বলেছেন যে, মুসলমানরা যাকাত–ব্যবস্থার অনুবর্তী হয়ে গেলে তাদের মধ্যে কোন নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত লোক দেখা যাবে না।

মোটকথা, বর্তমান যুগে সুদকে মহামারী আকারে প্রসার লাভ করতে দেখে এরূপ মনে করা ঠিক নয় যে, সুদের ব্যবসা বর্জন করা অর্থনৈতিক আত্মহত্যার নামান্তর এবং এ যুগের লোক সুদের ব্যবসায়ের ব্যাপারে ক্ষমার্হ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ
يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ
لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَ
لَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ
صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا
تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ
وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَ
اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۲﴾

(২৮২) হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ্ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া। এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। দু' জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু' জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু' জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর—যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা এটা লিখতে অলসতা করো না, তা ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধ করণ আল্লাহ্‌র কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।

এটা অবশ্য ঠিক যে, যতদিন সমগ্র জাতি কিংবা উল্লেখযোগ্য দল কিংবা কোন ইসলামী সরকার পূর্ণ মনোযোগ সহকারে একাজে সংকল্পবদ্ধ না হয়, ততদিন দু'চার, দশ জনের পক্ষে সুদ বর্জন করা কঠিন, কিন্তু ক্ষমার্হ তবুও বলা যায় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধার-কর্জের ক্ষেত্রে দলীল লেখার নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি : আলোচ্য আয়াতসমূহে লেন-দেন সম্পর্কিত আইনের জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। যাকে চুক্তিনামাও বলা যেতে পারে। এরপর সাক্ষ্য-বিধির বিশেষ ধারা উল্লেখিত হয়েছে।

আজকাল লেখালেখির যুগ। লেখাই মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি চৌদ্দ শ' বছর পূর্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তখন দুনিয়ার সব কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য মুখে মুখেই চলতো। লেখালেখি এবং দলীল-দস্তাবেজের প্রথা প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম কোরআন পাক এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলা হয়েছে ঃ

اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

অর্থাৎ, 'তোমরা যখন পরস্পর নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে ধার-কর্জের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও'।

এতে প্রথম নীতি এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ধার-কর্জের লেন-দেনে দলীল-দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করা উচিত—যাতে ভুল-ভ্রান্তি অথবা কোন পক্ষ থেকে অস্বীকৃতির কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তখন কাজে লাগে।

দ্বিতীয়তঃ ধার-কর্জের ব্যাপারে মেয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার-কর্জের লেন-দেন জায়েয নয়। এতে কলহ-বিবাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়! এ কারণেই ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ মেয়াদও এমন নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে কোনরূপ অস্পষ্টতা না থাকে। মাস এবং দিন তারিখসহ নির্দিষ্ট করতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্ট মেয়াদ, যেমন 'ধানকাটার সময়' নির্ধারিত করা যাবে না। কেননা, আবহাওয়ার পরিবর্তনে ধানকাটার সময় আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে। যেহেতু সে যুগে লেখার ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং আজও ব্যাপক প্রচলনের পর পৃথিবীর অধিকাংশ লোক লেখা জানে না,তাই সম্ভাবনা ছিল যে, লেখক কিসের স্থলে কি লিখে ফেলবে। ফলে কারও ক্ষতি এবং কারও লাভ হয়ে যাবে। এ সম্ভাবনার কারণেই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ অর্থাৎ, এটা জরুরী যে, তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে।

এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, লেখক কোন একপক্ষের লোক হতে পারবে না; বরং নিরপেক্ষ হতে হবে— যাতে কারও মনে সন্দেহ বা খট্‌কা না থাকে।

অপরদিকে লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যের ক্ষণস্থায়ী উপকার করে নিজের চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে উচিত হবে না। এরপর লেখককে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে অস্বীকার করবে না।

এরপর দলীল কোন্ পক্ষ থেকে লিখতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ অর্থাৎ, যার দায়িত্বে দেনা, সে লেখাবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি সওদা কিনে মূল্য বাকী রাখলো। এখানে যার দায়িত্বে দেনা হচ্ছে, সে দলীলের বিষয়বস্তু লেখাবে। কেননা, এটা হবে তার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি বা অঙ্গীকারপত্র। লেখানোর মধ্যেও কমবেশীর সম্ভাবনা থাকতে পারে, তাই বলা হয়েছে ঃ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا অর্থাৎ, সে তার পালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করবে এবং দেনা বিন্দুমাত্রও কম লেখাবে না। লেন-দেনের ব্যাপারে দেনাদার ব্যক্তি কখনও নির্বোধ অথবা অক্ষম, বৃদ্ধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, মূক অথবা অন্য ভাষাভাষী হতে পারে। এ কারণে দলীলের বিষয়বস্তু বলে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তাই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার পক্ষ থেকে তার কোন অভিভাবক লেখাবে। পাগল ও নাবালেগের তো অভিভাবক থাকেই। তাদের সব কাজ-কারবার অভিভাবক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মূক এবং অন্য ভাষাভাষীর অভিভাবকও এ কাজ করতে পারে। যদি তারা কাউকে উকীল নিযুক্ত করে, তাতেও চলবে। এখানে কোরআন পাকের 'ওলী' শব্দটি উভয় অর্থই বুঝায়।

সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী মূলনীতি ঃ এ পর্যন্ত লেন-দেনে দলীল লেখা ও লেখানোর জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, দলীলের লেখাকেই যথেষ্ট মনে করবে না; বরং এতে সাক্ষ্যও রাখবে— যাতে কোন সময় পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে আদালতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফয়সালা হতে পারে। এ কারণেই ফেকাহ্বিদগণ বলেছেন যে, লেখা শরীয়তসম্মত প্রমাণ নয়, তাই লেখার সমর্থনে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকলে শুধু লেখার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা যায় না। আজকালকার সাধারণ আদালতসমূহেও এ রীতিই প্রচলিত রয়েছে। লেখার মৌখিক সত্যায়ন ও তৎসমর্থনে সাক্ষ্য ব্যতীত কোন ফয়সালা করা হয় না।

সাক্ষীর সংখ্যা ঃ এরপর সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণতঃ (১) সাক্ষী দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হওয়া জরুরী। একা একজন পুরুষ অথবা শুধু দু'জন মহিলা সাধারণ লেন-দেনের সাক্ষ্যের জন্যে যথেষ্ট নয়।

সাক্ষীদের শর্তাবলী ঃ (২) সাক্ষী মুসলমান হতে হবে। مِنْ رِجَالِكُمْ শব্দে এদিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। (৩) সাক্ষীকে নির্ভরযোগ্য 'আদিল' (বিশ্বস্ত) হতে হবে, যার কথার উপর আস্থা রাখা যায়। ফাসেক ও ফাজের (অর্থাৎ, পাপাচারী) হলে চলবে না। مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে।

শরীয়ত সম্মত ওযর ব্যতীত সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা গোনাহ্ ঃ

নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন কোন ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী করার জন্যে ডাকা হয়, তখন সে যেন আসতে অস্বীকার না করে। কেননা, সাক্ষ্যই হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং বিবাদ মেটানোর উপায় ও পন্থা। কাজেই একে জরুরী জাতীয় কাজ মনে করে কষ্ট স্বীকার করবে। এরপর আবার লেন-দেনের দলীল লিপিবদ্ধ করার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে ঃ লেন-দেন ছোট কিংবা বড় হোক—সবই লিপিবদ্ধ করা দরকার। এ ব্যাপারে বিরক্তিবোধ করা উচিত নয়। কেননা, লেন-দেন লিপিবদ্ধ করা সত্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে, নির্ভুল সাক্ষ্য দিতে এবং সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকতে চমৎকাররূপে সহায়তা করে। যদি নগদ লেন-দেন হয়—বাকী না হয়, তবে তা লিপিবদ্ধ না করলেও ক্ষতি নেই। তবে এ ব্যাপারেও কমপক্ষে সাক্ষী রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা, উভয়পক্ষের মধ্যে কোন সময় মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। উদাহরণতঃ বিক্রেতা মূল্যপ্রাপ্তি অস্বীকার করতে পারে কিংবা ক্রেতা বলতে পারে যে, সে ক্রীতবস্তু বুঝে পায়নি। এ মতবিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য কাজে লাগবে।

সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করার মূলনীতি ঃ আয়াতের শুরুতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন লিখতে ও সাক্ষী হতে অস্বীকার না করে। এমতাবস্থায় তাদেরকে হয়তো মানুষ বিরক্ত করে তুলতে পারতো। তাই আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ অর্থাৎ, কোন লেখক বা সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। অর্থাৎ, নিজের উপকারের জন্যে যেন তাদের বিব্রত না করা হয়। এরপর বলা হয়েছেঃ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ অর্থাৎ, তোমরা যদি লেখক বা সাক্ষীকে বিব্রত কর, তবে এতে তোমাদের গোনাহ্ হবে।

এতে বুঝা গেল যে, লেখক কিংবা সাক্ষীকে বিব্রত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হারাম। এ কারণেই ফকীহ্গণ বলেন ঃ যদি লেখক লেখার পারিশ্রমিক দাবী করে কিংবা সাক্ষী যাতায়াত খরচ চায়, তবে এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। তা না দেয়াও তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত করার শামিল এবং অবৈধ। ইসলাম বিচার ব্যবস্থায় যেমন সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছে এবং সাক্ষ্য গোপন করাকে কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, তেমনি এ ব্যবস্থাও করেছে, যাতে কেউ সাক্ষ্য দেয়া থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য না হয়। এ দ্বিবিধ সতর্কতার ফলেই প্রত্যেক মামলায় সত্যবাদী ও নিঃস্বার্থ সাক্ষী পেতো এবং নিষ্পত্তি দ্রুত, সহজ ও ন্যায়ানুগ হতো। বর্তমান বিশ্ব এ কোরআনী নীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। ফলে সমগ্র বিচার ব্যবস্থা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। ঘটনার আসল ও সত্য সাক্ষী পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকেই সাক্ষ্য দান থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ এই যে, যার নাম সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়, পুলিশী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা হলে রোজই সময়ে-অসময়ে থানা পুলিশ তাদের ডেকে পাঠায়। মাঝে মাঝে কয়েক ঘন্টা বসিয়ে রাখে। দেওয়ানী আদালতসমূহেও সাক্ষীর সাথে অপরাধীরমত ব্যবহার করা হয়। এরপর রোজ রোজ মোকদ্দমার হাযিরা পরিবর্তিত হয়। তারিখের পর তারিখ পড়ে। বেচারা সাক্ষী নিজ কাজ-কারবার, মজুরী কিংবা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। অন্যথা হলে পরোয়ানা জারি করে গ্রেফতার করা হয়। তাই কোন ভদ্র ও ব্যস্ত মানুষ কোন মামলার সাক্ষী হওয়াকে আযাব বলে মনে করে এবং যথাসাধ্য এ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। তবে শুধু পেশাদার সাক্ষীই এসব ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যাদের কাছে সত্য-মিথ্যার কোন পার্থক্য নেই। কোরআন পাক এ সম্পর্কিত মৌলিক প্রয়োজনাদি গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করে এসব অনিষ্টের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে। আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ অর্থাৎ, আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে নির্ভুল নীতি শিক্ষা দেন। এটা তাঁর অনুগ্রহ। আল্লাহ্ তাআলা সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত। এ আয়াতে অনেক বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন ফেকাহ্বিদ এ আয়াত

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَ
اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ
وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ
اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ
الْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

(২৮৩) আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করা। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। (২৮৪) যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে, সব আল্লাহ্রই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (২৮৫) রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (২৮৬) আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

থেকে বিশটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ বাকীর ব্যাপারে যদি কেউ বিশ্বস্ততার জন্যে কোন বস্তু বন্ধক নিতে চায়, তাও করতে পারে। কিন্তু এতে مَقْبُوضَةٌ শব্দ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বন্ধকী বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া তার জন্যে জায়েয নয়। সে শুধু ঋণ পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত একে নিজের অধিকারে রাখবে। এর যাবতীয় মুনাফা আসল মালিকের প্রাপ্য।

দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি কোন বিরোধ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান রাখে, সে সাক্ষ্য গোপন করতে পারবে না। যদি সে গোপন করে, তবে তার অন্তর গোনাহ্গার হবে। 'অন্তর গোনাহ্গার' বলার কারণ এই যে, কেউ যেন একে শুধু মুখের গোনাহ্ মনে না করে। কেননা, অন্তর থেকেই প্রথমে ইচ্ছা সৃষ্টি হয়। তাই অন্তরের গোনাহ্ প্রথম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

আলোচ্য আয়াত উপরোক্ত বিষয়বস্তুরই পরিশিষ্ট। এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, সাক্ষ্য গোপন করা হারাম। তোমরা যদি ঘটনা জেনেও তা গোপন কর, তবে সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ এর হিসাব গ্রহণ করবেন। এ ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইকরিমা (রাঃ), শা'বী (রাহঃ) ও মুজাহিদ (রাহঃ) থেকে বর্ণিত আছে।— (কুরতুবী)

শাব্দিক ব্যাপকতার দিক দিয়ে আয়াতটি ব্যাপক এবং যাবতীয় বিশ্বাস,এবাদত ও লেন-দেন এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের প্রসিদ্ধ উক্তি তাই। আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টির যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব গ্রহণ করবেন। যে কাজ করা হয়েছে এবং যে কাজের শুধু মনে মনে সংকল্প করা হয়েছে, সে সবগুলোরই হিসাব গ্রহণ করবেন। বোখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর ভাষ্যে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মুমিনকে আল্লাহ্ তাআলার নিকটবর্তী করা হবে এবং আল্লাহ্ তাকে এক এক করে সব গোনাহ্ স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করবেন ঃ এ গোনাহ্টি কি তোমার জানা আছে? মুমিন স্বীকার করবে। আল্লাহ্ তাআলা বলবেন ঃ আমি দুনিয়াতেও তোমার গোনাহ্ জনসমক্ষে প্রকাশ করিনি, আজও তা ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর নেক কাজের আমলনামা তার হাতে অর্পণ করা হবে। পক্ষান্তরে কাফের ও মুনাফিকদের পাপকাজসমূহ প্রকাশ্যে বর্ণনা করা হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বর্ণিত শেষ আয়াতদ্বয়ের বিশেষ ফযীলতঃ আলোচ্য আয়াত দু'টি সূরা বাক্বারার শেষ আয়াত। সীহহ্ হাদীসসমূহে এ আয়াত দু'টির বিশেষ ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেউ রাতের বেলায় এ আয়াত দু'টি পাঠ করলে তা তার জন্যে যথেষ্ট।

হযরত ইবনে – আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা এ দু'টি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ করেছেন। জগৎ সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ্ তাআলা স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এশার নামাযের পর এ দু'টি আয়াত পাঠ করলে তা তাহাজ্জুদ নামাযের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। মুস্তাদ্‌রাক হাকেম ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা এ দু'টি আয়াত দ্বারা সূরা বাক্বারা সমাপ্ত করেছেন। আরশের নিম্নস্থিত বিশেষ

ভাণ্ডার থেকে এ দু'টি আয়াত আমাকে দান করা হয়েছে। তোমরা বিশেষভাবে এ দু'টি আয়াত শিক্ষা কর এবং নিজেদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দাও।

এ কারণেই হযরত ফারূকে আযম ও আলী (রাঃ) বলেন, আমাদের মতে যার সামান্যও বুদ্ধিজ্ঞান আছে, সে এ দু'টি আয়াত পাঠ করা ব্যতীত নিদ্রা যাবে না। এ আয়াতদ্বয়ের অর্থগত বৈশিষ্ট্য অনেক। তন্মধ্যে একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এই যে, সূরা বাক্বারার অধিকাংশ বিধি-বিধান সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যথা বিশ্বাস, এবাদত, লেন-দেন, চরিত্র-সামাজিকতা ইত্যাদি। সর্বশেষ এ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে অনুগত মুমিনদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তাআলার যাবতীয় বিধান শিরোধার্য করে নিয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্যে উদ্যোগী হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্নের জওয়াব দেয়া হয়েছে, যা এ আয়াতদ্বয়ের পূর্ববর্তী আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের মনে দেখা দিয়েছিল। প্রশ্নটি ছিল এই— যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِىٓ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّٰهُ

অর্থাৎ, 'তোমাদের অন্তরে যা আছে, প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় যেসব কাজ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার হিসাব নেবেন। অনিচ্ছাকৃত কু-চিন্তা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এর অন্তর্ভুক্তই ছিল না। কিন্তু আয়াতের ভাষা বাহ্যতঃ ব্যাপক ছিল। এতে বুঝা যেতো যে, অনিচ্ছাকৃত ধারণারও হিসাব নেয়া হবে। এ আয়াত শুনে সাহাবায়ে কেরাম অস্থির হয়ে গেলেন এবং রসূল (সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! এতদিন আমরা মনে করতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব হবে। মনে যেসব অনিচ্ছাকৃত কল্পনা আসে, সেগুলোর হিসাব হবে না। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, প্রতিটি কল্পনারও হিসাব হবে। এতে তো শাস্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয়। মহানবী (সাঃ) আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানতেন, কিন্তু উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না, বরং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সাহাবায়ে-কেরামকে আপাততঃ আদেশ দিলেন যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, তা সহজ হোক কিংবা কঠিন— মুমিনের কাজ হল তা মেনে নেয়া। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তাআলার প্রত্যেক আদেশ শুনে তোমাদের একথা বলা উচিতঃ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ অর্থাৎ, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার নির্দেশ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রভু! যদি নির্দেশ পালনে আমাদের কোন ত্রুটি বা ভুল হয়ে থাকে, তবে তা ক্ষমা করুন। কেননা, আমাদের সবাইকে আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'

সাহাবায়ে-কেরাম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশ মত কাজ করলেন; যদিও তাঁদের মনে এ শঙ্কা ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কু-চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলা এ দু'টি আয়াত নাযিল করেন। প্রথম আয়াতে মুসলমানদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, যে আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে-কেরামের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। প্রথম আয়াতটি হচ্ছে ঃ

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ
بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

অর্থাৎ, রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ বিষয়ের প্রতি, যা তাঁর কাছে তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মহানবী (সাঃ)-এর প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে 'রসূল' শব্দ ব্যবহার করে তাঁর সম্মান ও মহাত্ম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরপর বলেছেন ঃ রসূল (সাঃ)-এর যেমন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর প্রতি বিশ্বাস রয়েছে, তেমনি সাধারণ মুমিনদেরও রয়েছে। এতে প্রথমে পূর্ণ বাক্যে রসূল (সাঃ)-এর বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে, এরপর মুমিনদের বিশ্বাস পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।. এ বর্ণনা-ভঙ্গিতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও আসল বিশ্বাসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সকল মুসলমান অভিন্ন, কিন্তু বিশ্বাসের স্তরে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিশ্বাস প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শ্রবণের ভিত্তিতে এবং অন্য মুসলমানগণের বিশ্বাস 'অদৃশ্য বিশ্বাস' এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেখার ভিত্তিতে।

এরপর মহানবী (সাঃ) ও অন্য মুমিনদের অভিন্ন ও সংক্ষিপ্ত ঈমানের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের প্রতি, পূর্ণতার যাবতীয় গুণে তাঁর গুণান্বিত হওয়ার প্রতি, ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি এবং আল্লাহ্ তাআলার গ্রন্থাবলী ও সমস্ত পয়গম্বরগণের সকলেরই সত্য হওয়ার প্রতি।

এরপর বলা হয়েছে যে, এ উম্মতের মুমিনগণ পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মত আল্লাহ্ তাআলার পয়গম্বরগণের মধ্যে প্রভেদ করবে না যে, কাউকে পয়গম্বর মানবে এবং কাউকে মানবে না। যেমন, ইহুদীরা হযরত মূসা (আঃ)-কে এবং খ্রীস্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে পয়গম্বর মানে, কিন্তু শেষ নবী (সাঃ)-কে পয়গম্বর মানে না। এ উম্মতের প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তাআলার কোন পয়গম্বরকে অস্বীকার করে না। এরপর সাহাবায়ে-কেরামের প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুখে বলেছিলেন ঃ

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ঐ সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াত থেকে দেখা দেয়ার সম্ভাবনা ছিল যে, অন্তরের গোপন ধারণার জন্যে দায়ী করা হলে আযাব থেকে কিরূপে বাঁচা যাবে। বলা হয়েছে — لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কাউকে তার সাধ্যের বহির্ভূত কোন কাজের নির্দেশ দেন না। কাজেই অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব কল্পনা ও কু-চিন্তা অন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, এরপর সেগুলো কার্যে পরিণত করা না হয়, সেসব আল্লাহ্ তাআলার কাছে মাফ। যেসব কাজ ইচ্ছা করে করা হয়, শুধু সেগুলোরই হিসাব হবে।

এর বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, মানুষের যেসব কাজকর্ম হাত, পা, চক্ষু, মুখ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোকে 'বাহ্যিক কাজকর্ম' বলা হয়। এগুলো দু'প্রকার ঃ এক ইচ্ছাধীন— যা ইচ্ছা করে করা হয়; যেমন ইচ্ছা করে কথা বলা, ইচ্ছা করে কাউকে প্রহার করা ইত্যাদি। দুই, অনিচ্ছাধীন, যা ইচ্ছা ছাড়াই ঘটে যায়। যেমন, এক কথা বলতে গিয়ে অন্য কথা বলে ফেলা অথবা কাঁপুনি রোগে অনিচ্ছাকৃতভাবে হাত নড়ে যাওয়ার কারণে

কারও ক্ষতি হয়ে যাওয়া। এখানে লক্ষণীয় যে, বিশেষভাবে ইচ্ছাধীন কাজ-কর্মেরই হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তি হবে — অনিচ্ছাকৃত কাজের আদেশ মানুষকে দেয়া হয়নি এবং সেজন্যে সওয়াব বা আযাব হবে না।

এমনিভাবে যেসব কাজকর্ম মানুষের অন্তরে সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোও দু'প্রকার। এক, ইচ্ছাধীন। যেমন, ইচ্ছা করে অন্তরের কুফর ও শিরকের বিশ্বাস পোষণ করা কিংবা জেনে বুঝে ইচ্ছা সহকারে নিজেকে বড় মনে করা। অর্থাৎ, অহংকার করা কিংবা মদ্য পানে কৃতসংকল্প হওয়া প্রভৃতি। দুই, অনিচ্ছাধীন। যেমন, ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মনে কু-ধারণা আসা। এ ক্ষেত্রেও হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তি শুধু ইচ্ছাধীন কাজের জন্যেই হবে— অনিচ্ছাধীন কাজের জন্যে নয়।

কোরআনে বর্ণিত এ ব্যাখ্যার ফলে সাহাবায়ে-কেরামের মানসিক উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। আয়াতের শেষে এই বিষয়বস্তুটি আরও ফুটিয়ে তোলার জন্যে বলা হয়েছে ঃ

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

অর্থাৎ, মানুষ সওয়াবও সেকাজের জন্যেই পাবে, যা স্বেচ্ছায় করে এবং শাস্তিও সে- কাজের জন্যেই পাবে যা স্বেচ্ছায় করে।

এখানে সন্দেহ দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের সওয়াব অথবা আযাব হয়। যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করে— যা দেখে অন্যরাও এ সৎকাজে উদ্বুদ্ধ হয়, যতদিন পর্যন্ত অন্যেরা এ সৎকাজ করতে থাকবে, ততদিন এর সওয়াব প্রথম ব্যক্তিও পেতে থাকবে। এমনিভাবে, যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ প্রবর্তন করে, ভবিষ্যতে যত লোক এ পাপকাজে লিপ্ত হবে, তাদের সমান পাপ প্রথম প্রচলনকারী ব্যক্তিরও হতে থাকবে। হাদীস দ্বারা আরও প্রমাণিত আছে যে, কেউ যদি নিজের সওয়াব অন্যকে দিতে চায়, তবে অন্য ব্যক্তি এ সওয়াব পায়। অতএব, বোঝা গেল যে, ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের সওয়াব কিংবা আযাব হয়।

এ সন্দেহ নিরসনকল্পে বলা যায় যে, প্রথমাবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে ঐ কাজের সওয়াব কিংবা আযাব হবে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করে। অতএব, পরোক্ষভাবে এমন কোন কাজের সওয়াব কিংবা আযাব হওয়া এর পরিপন্থী নয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করেনি। উপরোক্ত দৃষ্টান্তসমূহে একথা সুস্পষ্ট যে, প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সওয়াব কিংবা আযাব হয়নি, বরং অন্যের মধ্যস্থতায় হয়েছে। এছাড়া মধ্যস্থতার মধ্যে তার কার্য ও ইচ্ছার প্রভাব অবশ্যই রয়েছে। কেননা, যে ব্যক্তি কারও উদ্ভাবিত ভাল কিংবা মন্দ পথ অবলম্বন করে, তার মধ্যে প্রথম ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত কাজের প্রভাব থাকে, যদিও প্রথম ব্যক্তি এ প্রভাবের ইচ্ছা করেনি। এমনিভাবে কেউ কোন ব্যক্তিকে সওয়াব তখনই পৌঁছায়, যখন সে তার প্রতি কোন অনুগ্রহ করে থাকে। এ হিসেবে অপরের কাজের সওয়াব এবং আযাবও প্রকৃতপক্ষে নিজের কাজেরই সওয়াব ও আযাব।

উপসংহারে কোরআন পাক মুসলমানদেরকে একটি বিশেষ দোয়া শিক্ষা দিয়েছে। এতে ভুল-ভ্রান্তিবশতঃ কোন কাজ হয়ে যাওয়ার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলা হয় ঃ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا

'হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে দায়ী করো না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি।' এরপর বলা হয়েছে ঃ

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ

অর্থাৎ, 'হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের উপর ভারী ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের (বনী-ইসরাঈলদের) উপর অর্পণ করেছিলে এবং আমাদের উপর এমন ফরয কাজ আরোপ করো না, যা সম্পাদনের শক্তি আমাদের নেই।'

এর অর্থ সেসব কঠিন কাজকর্ম, যা বনী-ইসরাঈলের উপর আরোপিত ছিল। যেমন, না-পাক বস্ত্র ধৌত করলে পাক হতো না, বরং না-পাক অংশ কেটে ফেলতে হতো কিংবা পুড়িয়ে ফেলতে হতো এবং নিজেকে হত্যা করা ব্যতীত তাদের তওবা কবুল হতো না। কিংবা অর্থ এই যে, দুনিয়াতে আমাদের উপর আযাব নাযিল করো না; যেমন বনী-ইসরাঈলের কু-কর্মের জন্যে নাযিল করেছে। এসব দোয়া যে আল্লাহ্ তাআলা কবুল করেছেন, তা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাধ্যমে প্রকাশও করেছেন।

সূরা বাক্বারাহ সমাপ্ত

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ مِائَتَا اٰيَةٍ وَّعِشْرُوْنَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴿٢﴾ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٣﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦﴾ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ؕ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

সূরা আলে-ইমরান

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ঃ ২০০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। (৩) তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন সত্যতার সাথে; যা সত্যায়ন করে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের। (৪) নাযিল করেছেন তওরাত ও ইঞ্জীল, এ কিতাবের পূর্বে, মানুষের হেদায়েতের জন্যে এবং অবতীর্ণ করেছেন মীমাংসা। নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশীল, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৫) আল্লাহ্‌র নিকট আসমান ও যমীনের কোন বিষয়ই গোপন নেই। (৬) তিনিই সেই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। (৭) তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেন ঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তিসম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। (৮) হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সর্বকালে সব পয়গম্বরই তওহীদের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন ঃ দ্বিতীয় আয়াতে তওহীদের ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। যেমন, মনে করুন, কোন একটি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের অধিবাসী ও বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একমত। পূর্বাপর এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে শত শত, এমন কি হাজার হাজার বছরের ব্যবধান। একজনের উক্তি অন্য জনের কাছে পৌঁছারও কোন উপায় নেই। তা সত্ত্বেও যে-ই আসেন তিনিই যদি পূর্ববর্তীদের মত একই কথা বলেন এবং সবাই একই কর্ম ও একই বিশ্বাসের অনুসারী হন, তবে এমন বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করে নিতে মানব-স্বভাব বাধ্য। উদাহরণতঃ আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও তাঁর তওহীদের পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ সর্বপ্রথম হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম দুনিয়াতে পদার্পণ করেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর বংশধরদের মধ্যেও এই তথ্যের চর্চা প্রচলিত ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আদম সন্তানদের প্রাথমিক কালের আচার-অভ্যাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হওয়ার পর হযরত নূহ (আঃ) আগমন করেন। তিনিও মানুষকে আল্লাহ্ সম্পর্কিত ঐসব তত্ত্বের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকেন, যেসব বিষয়ের প্রতি আদম আলাইহিস সালাম দাওয়াত দিতেন। অতঃপর সুদীর্ঘকাল অতীতের গর্ভে বিলীন হওয়ার পর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস্ সালাম ইরাক ও সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরাও হুবহু একই দাওয়াত নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। এরপর মূসা ও হারুন আলাইহিমাস্ সালাম এবং তাঁদের বংশের পয়গম্বরগণ আগমন করেন। তাঁরা সবাই সে একই কলেমায়ে তওহীদের বাণী প্রচার করেন এবং এ কলেমার প্রতি মানুষজনকে দাওয়াত দিতে থাকেন। এর পরও দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে হযরত ঈসা (আঃ) সেই একই আহবান নিয়ে আগমন করেন। সবার শেষে খাতামুল-আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) একই তওহীদের দাওয়াত নিয়ে দুনিয়াতে আবির্ভূত হন।

মোটকথা, হযরত আদম থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং সবাই একই বাণী উচ্চারণ করেন। তাঁদের অধিকাংশেরই পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয়নি। তাঁদের আবির্ভাবকালে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার আমলও ছিল না যে, এক পয়গম্বর অন্য পয়গম্বরের গ্রন্থাদি ও রচনাবলী পাঠ করে তাঁর দাওয়াতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবেন। বরং সচরাচর তাঁদের একজন অন্যজন থেকে বহু শতাব্দী পরে জন্ম গ্রহণ করেছেন। জাগতিক উপকরণাদির মাধ্যমে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কোন অবস্থা তাঁদের জানা থাকারও কথা নয়। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী লাভ করেই তাঁরা পূর্বসূরীদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই তাঁদেরকে এ দাওয়াত প্রচার করার জন্যে নিযুক্ত করা হয়।

এখন যে ব্যক্তি ইসলাম ও তওহীদের দাওয়াতের প্রতি মনে মনে কোনরূপ বৈরীভাব পোষণ করে না, সে যদি খোলা মনে, সরলভাবে চিন্তা করে যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মানুষ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে একই সত্যের কথা বর্ণনা করলে তা মিথ্যা হতে পারে কি? তবে এতটুকু চিন্তাই তার পক্ষে তওহীদের সত্যতা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট। এক্ষেত্রে বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য কি না, তা যাচাই করারও প্রয়োজন থাকে না। বরং বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণকারী এত বিপুল

সংখ্যক লোকের এক বিষয়ে একমত হওয়াই বিষয়টির সত্যতা নিরূপণের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু পয়গম্বরগণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, তাঁদের সততা ও সাধুতার উচ্চতম মাপকাঠির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কারও পক্ষে এরূপ বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, তাঁদের বাণী ষোল আনাই সত্য এবং তাঁদের দাওয়াতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জগতেরই মঙ্গল নিহিত।

প্রথমদিকের দুই আয়াতে বর্ণিত তওহীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে যে,— কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টান একবার হুযুর (সাঃ)— এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ধর্মীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাদের সামনে তওহীদের দু'একটি প্রমাণ উপস্থিত করলে খ্রীষ্টানরা নিরুত্তর হয়ে যায়।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতেও তওহীদের বিষয়বস্তু বিধৃত হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে যে, এ জ্ঞান থেকে কোন জাহানের কোন কিছু গোপন নয়।

চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তি এবং সর্ববিষয়ে সার্বিক সামর্থ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি মানুষকে জননীর উদরে তিনটি অন্ধকার পর্যায়ে কিরূপ নিপুণভাবে গঠন করেছেন। তাদের আকার-আকৃতি ও বর্ণ বিন্যাসে এমন শিল্পীসুলভ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে, আকৃতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে একজনের আকার-আকৃতি অন্যজনের সাথে এমন মিল খায় না যে, স্বতন্ত্র পরিচয় দুরূহ হয়ে পড়ে। এহেন সর্বব্যাপী জ্ঞান ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের যুক্তিসঙ্গত দাবী এই যে, উপাসনা একমাত্র তাঁরই করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কারো জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য এরূপ নয়। কাজেই অন্য কেউ উপাসনার যোগ্যও নয়।

এভাবে তওহীদ সপ্রমাণ করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলার প্রধান চারটি 'সিফাত' চারটি আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে চিরঞ্জীব ও সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী হওয়ার সিফাত এবং তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ আয়াত পর্যন্ত সর্বব্যাপী জ্ঞান ও সার্বিক শক্তি-সামর্থ্যের সিফাত বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ চারটি গুণেই যে সত্তা গুণান্বিত, তিনিই একমাত্র উপাসনার যোগ্য।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা খ্রীষ্টানদের বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের মূলোৎপাটন করেছেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআনের এসব বাক্য 'মুতাশাবিহাত' অর্থাৎ, রূপক। এসব বাক্যের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এগুলো আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলের (সাঃ) মধ্যকার একটা গোপন রহস্য। এগুলোর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সর্ব সাধারণ অবগত হতে পারে না, বরং এসব শব্দের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া সাধারণ মানুষের জন্যে বৈধ নয়। এগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী যে, এসব বাক্য দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার যা উদ্দেশ্য, তা সত্য। এর অতিরিক্ত ঘাঁটা-ঘাঁটি করার অনুমতি নেই।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কোরআনের সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট বা রূপক আয়াতের কথা উল্লেখ করে একটি সাধারণ মূলনীতি ও নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ মূলনীতিটি বুঝে নেয়ার পর অনেক আপত্তি ও বাদানুবাদের অবসান ঘটে। এর ব্যাখ্যা এরূপ ঃ কোরআন মজিদে দুই প্রকার আয়াত রয়েছে। এক প্রকারকে 'মুহ্‌কামাত' তথা সুস্পষ্ট আয়াত এবং অপর প্রকারকে 'মুতাশাবিহাত' তথা অস্পষ্ট ও রূপক আয়াত বলা হয়।

আরবী ভাষার নিয়মাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ব্যক্তি যে সব আয়াতের অর্থ সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারে, সে সব আয়াতকে মুহ্‌কামাত বলে এবং এরূপ ব্যক্তি যেসব আয়াতের অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝতে সক্ষম না হয়, সেসব আয়াতকে মুতাশাবিহাত বলে। (মাযহারী, ২য় খণ্ড)

প্রথম প্রকার আয়াতকে আল্লাহ্ তাআলা 'উম্মুল কিতাব' আখ্যা দিয়েছেন। এর অর্থ এই যে, এসব আয়াতই সমগ্র শিক্ষার মূল ভিত্তি। এসব আয়াতের অর্থ যাবতীয় অস্পষ্টতা ও জটিলতা মুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার আয়াতে বক্তার উদ্দেশ্য; অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এগুলো সম্পর্কে বিশুদ্ধ পন্থা এই যে, এসব আয়াতকে প্রথম প্রকার আয়াতের আলোকে দেখতে হবে। যে অর্থ প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে যায়, তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে বক্তার এমন উদ্দেশ্য বুঝতে হবে, যা প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে নয়। এ ব্যাপারে স্বীকৃত মূলনীতি কিংবা কোন ব্যাখ্যা অথবা, কদর্থ করা বৈধ নয়। উদাহরণতঃ হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কোরআনের সুস্পষ্ট উক্তি এরূপ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ (সে আমার নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা ছাড়া অন্য কেউ নয়)। অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ

অর্থাৎ, - আল্লাহ্‌র কাছে ঈসার উদাহরণ হচ্ছে আদমের অনুরূপ। আল্লাহ্ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে।

এসব আয়াত এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত বান্দা এবং তাঁর সৃষ্ট। অতএব 'তিনি উপাস্য, তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র'— খ্রীষ্টানদের এসব দাবী সম্পূর্ণ বানোয়াট।

এখন যদি কেউ এসব সুস্পষ্ট প্রমাণ থেকে চোখ বন্ধ করে শুধু 'আল্লাহ্‌র বাক্য' এবং 'আল্লাহ্‌র আত্মা' ইত্যাদি অস্পষ্ট আয়াত সম্বল করে হঠকারিতা শুরু করে দেয় এবং এগুলোর এমন অর্থ নেয়, যা সুস্পষ্ট আয়াত ও পরম্পরাগত বর্ণনার বিপরীত, তবে একে তার বক্রতা ও হঠকারিতা ছাড়া আর কি বলা যায়?

কারণ, অস্পষ্ট আয়াতসমূহের নির্ভুল উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। তিনিই কৃপা ও অনুগ্রহপূর্বক যাকে যতটুকু ইচ্ছা জানিয়ে দেন। সুতরাং এমন অস্পষ্ট আয়াত থেকে কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিয়ে স্বমতের অনুকূলে কোন অর্থ বের করা শুদ্ধ হবে না।

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ – এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বর্ণনা করেন যে, যারা সুস্থ স্বভাব-সম্পন্ন তারা অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে বেশী তথ্যানুসন্ধান ও ঘাঁটাঘাটি করে না; বরং তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস করে যে, এ আয়াতটিও আল্লাহ্‌র সত্য কালাম। তবে তিনি কোন বিশেষ হেকমতের কারণে এর অর্থ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেননি প্রকৃতপক্ষে এ পন্থাই বিপদমুক্ত ও সতর্কতাযুক্ত। এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক এমনও আছে, যাদের অন্তর বক্রতাসম্পন্ন। তারা সুস্পষ্ট আয়াত থেকে চক্ষু বন্ধ করে অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে লিপ্ত থাকে এবং তা থেকে নিজ মতলবের অনুকূলে অর্থ বের করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। এরূপ লোকদের সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ
الْمِيْعَادَ ٩ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ
اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ١٠ كَدَاْبِ
اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ
اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ١١ قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ۭ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ١٢ قَدْ كَانَ
لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۭ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى
كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ ۭ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ
مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ١٣ زُيِّنَ
لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاۗءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۭ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ
الْمَاٰبِ ١٤ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۭ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ
رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ١٥

(৯) হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবে; এতে কোনই সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদার অন্যথা করেন না। (১০) যারা কুফুরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র সামনে কখনও কাজে আসবে না। আর তারাই হচ্ছে দোযখের ইন্ধন। (১১) ফেরআউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ধারা অনুযায়ীই তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে তাদের পাপের কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন আর আল্লাহ্র আযাব অতি কঠিন। (১২) কাফেরদিগকে বলে দিন, খুব শিগ্গীরই তোমরা পরাভূত হয়ে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নীত হবে— সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান (১৩) নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের, এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য। (১৪) মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহ্র নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়। (১৫) বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলবো?— যারা পরহেযগার, আল্লাহ্র নিকট তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশ্ত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত— তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনিগণ এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন।

وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ – 'জ্ঞানে গভীরতার অধিকারী' কারা? এ সম্পর্কে আলেমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। অধিকতর গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, এঁরা হলেন আহ্লুস সুন্নাত-ওয়াল-জমাআত। তাঁরা কোরআন ও সুন্নাহ্র সে ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধ মনে করেন, যা সাহাবায়ে কেরাম, পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমায় বর্ণিত রয়েছে। তাঁরা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে কোরআনী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু মনে করেন এবং অস্পষ্ট আয়াতসমূহের যেসব অর্থ তাঁদের বোধগম্য নয়, নিজেদের জ্ঞানের দৈন্য স্বীকার করে সেগুলোকে তাঁরা আল্লাহ্র নিকটই সোপর্দ করেন। তাঁরা স্বীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ঈমানী শক্তির জন্য গর্বিত নন; বরং সর্বদা আল্লাহ্র কাছে দৃঢ়তা ও অধিকতর জ্ঞান-গরিমা ও অন্তর-দৃষ্টি কামনা করতে থাকেন। তাঁদের মন-মস্তিষ্ক অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে উৎসাহী নয়। তাঁরা সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট উভয় প্রকার আয়াতকে সত্য মনে করেন। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস এই যে, উভয় প্রকার আয়াত একই উৎস থেকে আগত। তবে এক প্রকার, অর্থাৎ, সুস্পষ্ট আয়াতের অর্থ জানা আমাদের জন্যে উপকারী ও জরুরী ছিল, এজন্যে আল্লাহ্ তাআলা তা গোপন রাখেন নি; বরং খোলাখুলি বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং অন্য প্রকার অর্থাৎ, অস্পষ্ট আয়াতের অর্থ আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ হেকমতের কারণে বর্ণনা করেননি। কাজেই তা জানা আমাদের জন্যে জরুরী নয়। সংক্ষেপে এরূপ আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট। – (মাযহারী)

প্রথম আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, পথ-প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টতা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ্ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার অন্তরকে সৎকাজের দিকে আকৃষ্ট করে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার অন্তরকে সোজাপথ থেকে বিচ্যুত করে দেন।

রসূল (সাঃ) বলেন ঃ এমন কোন অন্তর নেই যা আল্লাহ্ তাআলার দুই অঙ্গুলীর মাঝখানে নয়! তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা করেন, তাকে সৎপথে কায়েম রাখেন এবং যখন ইচ্ছা করেন, সৎপথ থেকে বিচ্যুত করে দেন।

তিনি যথেচ্ছ ক্ষমতাশীল। যা ইচ্ছা, তাই করেন। কাজেই, যারা ধর্মের পথে কায়েম থাকতে চায়, তারা সর্বদাই আল্লাহ্র নিকট অধিকতর দৃঢ়চিত্ততা প্রদানের জন্যে দোয়া করে। হুযূর (সাঃ) সর্বদাই অনুরূপ দোয়া করতেন। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)– এর নিম্নরূপ একটি দোয়া বর্ণিত হয়েছে, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك অর্থাৎ, হে অন্তর আবর্তনকারী, আমাদের অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখ। – (মাযহারী, ২য় খণ্ড)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ –এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফেররা পরাজিত ও পরাভূত হবে। এতে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আমরা জগতের সব কাফেরকে পরাভূত দেখি না, এর কারণ কি? উত্তর এই যে, আয়াতে সারা জগতের কাফের বোঝানো হয়নি; বরং তখনকার মুশরিক ও ইহুদী জাতিকে বোঝানো হয়েছে। সেমতে মুশরিকদেরকে হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে এবং ইহুদীদেরকে হত্যা, বন্দী, জিযিয়া কর আরোপ এবং নির্বাসনের মাধ্যমে পরাজিত করা হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতে বদর যুদ্ধের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধে

কাফেরদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাযার। তাদের কাছে সাত শত উট ও একশত অশ্ব ছিল। অপরপক্ষে মুসলমান যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিন শতের কিছু বেশী। তাদের কাছে সর্বমোট সত্তুরটি উট, দুইটি অশ্ব, ছয়টি লৌহবর্ম এবং আটটি তরবারী ছিল। মজার ব্যাপার ছিল এই যে, প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতেই প্রতিপক্ষ দলের সংখ্যা নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ প্রতিভাত হচ্ছিল। এর ফলে মুসলমানদের আধিক্য কল্পনা করে কাফেরদের অন্তর উপর্যুপরি শঙ্কিত হচ্ছিল এবং মুসলমানগণও নিজেদের অপেক্ষা প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখে আল্লাহ্ তাআলার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করছিলেন। তাঁরা পূর্ণ ভরসা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র ওয়াদা فَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ (যদি তোমাদের মধ্যে একশত ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকে, তবে তারা দুইশতের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে)— এর ওপর আস্থা রেখে আল্লাহ্র সাহায্যের আশা করছিলেন। কাফেরদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল তিনগুণ। তা যদি মুসলমানদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে যেতো, তবে তাঁদের মনে ভয়-ভীতি সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। উভয়পক্ষের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ মনে হওয়ায় অবস্থাটা ছিল সাধারণ। আবার কোন কোন অবস্থায় উভয় দলই প্রতিপক্ষকে কম দেখেছিল। সূরা আনফালে এ সম্পর্কে বর্ণনা আসবে।

মোট কথা, মক্কায় প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একটি স্বল্প সংখ্যক নিরস্ত্র দলকে বিরাট বাহিনীর বিপক্ষে জয়ী করা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্যে বিরাট শিক্ষণীয় ঘটনা। - (ফাওয়ায়েদে- আল্লামা ওসমানী)

দুনিয়ার মহব্বত ঃ হাদীসে বলা হয়েছে حب الدنيا رأس كل خطيئة (দুনিয়ার মহব্বত সব অনিষ্টের মূল।) প্রথম আয়াতে দুনিয়ার কয়েকটি প্রধান কাম্যবস্তুর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে,— মানুষের দৃষ্টিতে এ সবের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক করে দেয়া হয়েছে। তাই অনেক মানুষ এদের বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পরকালকে ভুলে যায়। আয়াতে যেসব বস্তুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সাধারণভাবে মানুষের স্বাভাবিক কামনা-বাসনার লক্ষ্য। তন্মধ্যে সর্বপ্রথমে রমণী ও পরে সন্তান-সন্ততির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছুই অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, সবগুলোর মূল কারণ থাকে নারী অথবা সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন। এর পর উল্লেখ করা হয়েছে সোনা, রূপা, পালিত পশু ও শস্যক্ষেতের কথা। কারণ, এগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষের কাঙ্ক্ষিত ও প্রিয়বস্তু।

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষের মনে এসব বস্তুর প্রতি স্বভাবগতভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এতে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। একটি এই যে, এসব বস্তুর প্রতি মানুষের স্বভাবগত আকর্ষণ বা মোহ না থাকলে জগতের সমুদয় শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠতো না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শস্যক্ষেতে কাজ করতে অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিশ্রম করতে অথবা ব্যবসায়ে অর্থ ও কায়িক শ্রম ব্যয় করতে কেউ প্রস্তুত হতো না। মানব স্বভাবে এসব বস্তুর প্রতি প্রকৃতিগত আকর্ষণ সৃষ্টি করার মধ্যেই জগতের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল করে দেয়া হয়েছে। ফলে মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই এসব বস্তুর উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠার পর শ্রমিক কিছু পয়সা উপার্জনের চিন্তায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। ধনী ব্যক্তি কিছু পয়সা খরচ করে শ্রমিক যোগাড় করার চিন্তায় বের হয়। ব্যবসায়ী উৎকৃষ্টতর পণ্যদ্রব্য সুন্দরভাবে সাজিয়ে গ্রাহকের অপেক্ষায় বসে থাকে— যাতে কিছু পয়সা উপার্জন করা যায়। এদিগকে গ্রাহক অনেক কষ্টার্জিত পয়সা নিয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কেনাকাটার উদ্দেশে বাজারে পৌছে। চিন্তা করলে দেখা যায়; এসব প্রিয়বস্তুর ভালবাসাই সবাইকে নিজ নিজ গৃহ থেকে বের করে আনে এবং এ ভালবাসাই দুনিয়া জোড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি ও পরিচালন-ব্যবস্থাকে মজবুত ও দৃঢ় একটা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় রহস্য এই যে, জাগতিক নেয়ামতের প্রতি মানুষের মনে আকর্ষণ ও ভালবাসা না থাকলে পারলৌকিক নেয়ামতের স্বাদ জানা যেতো না এবং তৎপ্রতি আকর্ষণও হতো না। এমতাবস্থায় সৎকর্ম করে জান্নাত অর্জন করার এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত হয়ে দোযখ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনও কেউ অনুভব করতো না।

এখানে অধিকতর প্রণিধানযোগ্য হলো তৃতীয় রহস্যটি। অর্থাৎ, এসব বস্তুর ভালবাসা স্বাভাবগতভাবে মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে যে, কে এগুলোর আকর্ষণে মত্ত হয়ে পরকালকে ভুলে যায় এবং কে এসবের আসল স্বরূপ ও ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয় অবগত হয়ে শুধু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অর্জনে সচেষ্ট হয় ও পরকালীন কল্যাণ আহরণের লক্ষ্যে তার সুচারু ব্যবহার করে।

মোটকথা এই যে, জগতের সুস্বাদু ও মোহনীয় বস্তুগুলোকে আল্লাহ্ তাআলা কৃপাবশতঃ মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে তৎপ্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর অনেকগুলো রহস্যের মধ্যে অন্যতম রহস্য, মানুষের পরীক্ষা নেয়া। বাহ্যিক কাম্যবস্তু ও তার ক্ষণস্থায়ী স্বাদে মত্ত হওয়ার পর মানুষ কিরূপ কাজ করে আল্লাহ্ তাআলা তা দেখতে চান। এসব বস্তু লাভ করার পর যদি মানুষ স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং এগুলোকে তাঁর মা'রেফত ও মহব্বত লাভের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে, তবে বলা যায় যে, সে দুনিয়াতেও লাভবান হয়েছে এবং পরকালেও সফলকাম হবে। জগতের লোভনীয় বস্তু তার পথের প্রতিবন্ধক হওয়ার পরিবর্তে তার পথ প্রদর্শক এবং সহায়ক হয়েছে। পক্ষান্তরে এসব বস্তু লাভ করার পর যদি মানুষ এগুলোর মধ্যেই আপাদমস্তক নিমজ্জিত হয়ে স্রষ্টাকে, পরকাল এবং হিসাব-নিকাশকে ভুলে যায়, তবে বলতে হবে যে, এসব বস্তুই তার পারলৌকিক জীবনের ধ্বংস ও অনন্তকাল শাস্তিভোগের কারণ হয়েছে। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে জগতেও এসব বস্তু তার শাস্তির কারণ ছিল।

আল্লাহ্ তাআলা যেসব বস্তুকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছেন, শরীয়ত অনুযায়ী সেগুলো পরিমিত উপার্জন করলে এবং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সঞ্চয় করলে ইহকাল ও পরকালের কামিয়াবী হাসিল হবে। পক্ষান্তরে অবৈধ পন্থায় সেগুলো ব্যবহার করলে অথবা বৈধ পন্থায় হলেও এগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত নিমজ্জিত হয়ে পরকাল বিস্মৃত হয়ে গেলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে।

এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি বিশেষ লোভনীয় বস্তুর কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ

ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

অর্থাৎ, এসব বস্তু হচ্ছে পার্থিব জীবনে ব্যবহার করার জন্যে; মন বসাবার জন্যে নয়। আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে উত্তম ঠিকানা। অর্থাৎ, সেখানে চিরকাল থাকতে হবে এবং যার নেয়ামত ধ্বংস হবে না, হ্রাসও পাবে না।

১৫ নং আয়াতে এ সম্পর্কিত আরও ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ যারা দুনিয়ার অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নেয়ামতে মত্ত হয়ে পড়েছে, আপনি তাদের বলে দিন যে, আমি তোমাদের আরও উৎকৃষ্টতর নেয়ামতের সন্ধান বলে দিচ্ছি। যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং যারা আল্লাহ্‌র অনুগত, তারাই এ নেয়ামত পাবে। সে নেয়ামত হচ্ছে সবুজ বৃক্ষলতাপূর্ণ বেহেশত— যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাতে থাকবে সকল প্রকার আবিলতামুক্ত পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনিগণ এবং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি।

পূর্ববর্তী আয়াতে দুনিয়ার ছয়টি প্রধান নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্থাৎ, রমণীকুল, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রূপার ভাণ্ডার, উৎকৃষ্ট অশ্ব, পালিত জন্তু ও শস্যক্ষেত। এদের বিপরীতে পরকালের নেয়ামতরাজির মধ্যে বহ্যতঃ তিনটি বর্ণিত হয়েছে। প্রথম— জান্নাতের সবুজ কানন; দ্বিতীয়— পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনিগণ এবং তৃতীয়— আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। অবশিষ্টগুলোর মধ্যে সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ এই যে, দুনিয়াতে দুই কারণে মানুষ সন্তান-সন্ততিকে ভালবাসে। প্রথমতঃ সন্তান-সন্ততি পিতার কাজকর্মে সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর পর সন্তান-সন্ততি দ্বারা পিতার নামটুকু থেকে যায়। কিন্তু পরকালে কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই এবং সেখানে মৃত্যুও নেই যে, কোন অভিভাবক অথবা উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন হবে। এছাড়া দুনিয়াতে যার যত সন্তান-সন্ততি আছে, সে জান্নাতে তাদেরকে পাবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ায় যার সন্তান নেই, প্রথমতঃ জান্নাতে তার মনে সন্তানের বাসনাই হবে না। আর কারও মনে বাসনা জাগ্রত হলে আল্লাহ্ তাকে তাও দান করবেন। তিরমিযীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কোন জান্নাতীর মনে সন্তানের বাসনা জাগ্রত হলে সন্তানের গর্ভাবস্থা, জন্মগ্রহণ ও বয়োপ্রাপ্তি মুহূর্তের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং তার মনের বাসনা পূর্ণ করা হবে।

এমনিভাবে জান্নাতে সোনা-রূপার উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এই যে, দুনিয়াতে সোনা-রূপার বিনিময়ে দুনিয়ার আসবাবপত্র এবং প্রয়োজনীয় সবকিছুই যোগাড় করা যায়। কিন্তু পরকালে ক্রয়-বিক্রয়েরও প্রয়োজন হবে না এবং কোন কিছুর বিনিময়ও দিতে হবে না। বরং জান্নাতীর মন যখন যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা সরবরাহ করা হবে। এছাড়া জান্নাতে সোনা-রূপার কোন অভাব নেই। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে কোন কোন প্রাসাদের একটি ইঁট সোনার ও একটি ইঁট রূপার হবে। মোটকথা, পরকালের হিসাবে সোনা-রূপাকে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই মনে করা হয়নি।

এমনিভাবে দুনিয়াতে ঘোড়ার কাজ হলো বাহন হয়ে পথের দূরত্ব অতিক্রম করা। জান্নাতে সফর ও যানবাহন প্রভৃতি কোন কিছুই প্রয়োজন হবে না। সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, শুক্রবার দিন জান্নাতীদের আরোহণের জন্যে উৎকৃষ্ট ঘোড়া সরবরাহ করা হবে। এগুলোতে আরোহণ করে জান্নাতীরা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা করতে যাবে।

মোট কথা, জান্নাতে ঘোড়ারও কোন উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব নেই। এমনিভাবে পালিত পশু কৃষিক্ষেত্রে কাজে আসে অথবা তা দুগ্ধ দান করে। জান্নাতে দুগ্ধ ইত্যাদি পশুর মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ্ তাআলা দান করবেন।

কৃষিকাজের অবস্থাও তদ্রূপ। দুনিয়াতে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের উদ্দেশে শস্যক্ষেত্রে পরিশ্রম করা হয়। জান্নাতে যাবতীয় শস্যই আপনা-আপনি সরবরাহ হবে। কাজেই সেখানে কৃষিকাজের প্রয়োজনই হবে না। তবুও যদি কেউ কৃষি কাজকে ভালবাসে, তবে তার জন্য সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। তিবরানীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে একব্যক্তি কৃষিকাজের বাসনা প্রকাশ করবে। তাকে তৎক্ষণাৎ যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে। অতঃপর শস্যের বপন, রোপন, পাকা ও কর্তন কয়েক মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে। এসব কারণেই জান্নাতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে শুধু জান্নাত ও জান্নাতের হুরদের বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, জান্নাতীদের জন্যে কোরআনের ওয়াদাও রয়েছে যে, وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ অর্থাৎ, তারা যে বাসনাই প্রকাশ করবে, তাই পাবে। এহেন ব্যাপক ঘোষণার পর বিশেষ নেয়ামতের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে কি? তা সত্ত্বেও কয়েকটি বিশেষ নেয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো প্রত্যেক জান্নাতী চাওয়া ছাড়াই পাবে। এগুলোর পর আরও একটি সর্ববৃহৎ নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সাধারণভাবে মানুষ যার কল্পনাও করে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার অশেষ সন্তুষ্টি। হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন জান্নাতিগণ জান্নাতে পৌছে আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে এবং তাদের কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকবে না, তখন আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তাদের সম্বোধন করে বলবেন ঃ এখন তোমরা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়েছ। আর কোন বস্তুর প্রয়োজন নেই তো? জান্নাতিগণ বলবেন ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এত নেয়ামত দান করেছেন যে, এরপর আর কোন নেয়ামতের প্রয়োজনই থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা বলবেন ঃ এখন আমি তোমাদের সব নেয়ামত থেকে উৎকৃষ্ট একটি নেয়ামত দিচ্ছি। তা এই যে, তোমরা সবাই আমার অশেষ সন্তুষ্টিলাভ করেছ। এখন অসন্তুষ্টির আর কোন আশঙ্কা নেই। কাজেই জান্নাতের নেয়ামতরাজি ছিনিয়ে নেয়ার অথবা হ্রাস করে দেয়ারও কোন আশঙ্কা নেই।

এ দু'টি আয়াতের সারমর্মই হুযুর (সাঃ) বলেছেন ঃ "দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু এতে আছে তাও অভিশপ্ত; তবে ঐসব বস্তু নয়, যদ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা হয়।"

اَلَّذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اِنَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۶﴾ اَلصّٰبِرِیْنَ وَالصّٰدِقِیْنَ وَالْقٰنِتِیْنَ
وَالْمُنْفِقِیْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِیْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿۱۷﴾ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ
لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ
لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۱۸﴾ اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ
الْاِسْلَامُ ۟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ
مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًۢا بَیْنَهُمْ ؕ وَمَنْ یَّكْفُرْ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ
فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹﴾ فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ
وَجْهِیَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ لِّلَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
وَالْاُمِّیّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ
تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِیْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰﴾ اِنَّ
الَّذِیْنَ یَكْفُرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ وَیَقْتُلُوْنَ النَّبِیّٖنَ بِغَیْرِ
حَقٍّ ۙ وَّیَقْتُلُوْنَ الَّذِیْنَ یَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ﴿۲۱﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ حَبِطَتْ
اَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِیْنَ ﴿۲۲﴾

(১৬) যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ্ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (১৭) তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (১৮) আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত। (২০) যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও, "আমি এবং আমার অনুসরণকারীগণ আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি।" আর আহ্‌লে কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌঁছে দেয়া। আর আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা। (২১) যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং পয়গাম্বরগণকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে, আর সেসব লোককে হত্যা করে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। (২২) এরাই হলো সে লোক যাদের সমগ্র আমল দুনিয়া ও আখেরাত উভয়লোকেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

شَهِدَ اللّٰهُ .... **আয়াতের ফযীলত ঃ** এই আয়াতের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। ইমাম বগভী বলেন, সিরিয়া থেকে দু'জন বিশিষ্ট ইহুদী পণ্ডিত একবার মদীনায় আগমন করেন। মদীনার আবাসিক এলাকা দেখে তারা মন্তব্য করেন যে, শেষ যমানার নবী যে রকম লোকালয়ে বসবাস করবেন বলে তওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এটা ঠিক সে রকম বলেই মনে হচ্ছে। এরপর তারা জানতে পারেন যে, এখানে একজন মহান ব্যক্তি আছেন, যাঁকে সবাই নবী বলে আখ্যায়িত করে। তারা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তওরাতে বর্ণিত আখেরী নবীর গুণাবলী তাঁদের সামনে ভেসে উঠে। তারা বললেন ঃ আপনি কি মুহাম্মদ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আমি মুহাম্মদ এবং আমি আহমদ। তারা আরও বললেন ঃ আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করবো। যদি আপনি সঠিক উত্তর দেন, তবে আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো। হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ প্রশ্ন করুন। তারা বললেন, আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কিত সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য কোন্‌টি? এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত নবী করীম (সাঃ) আয়াতটি তেলাওয়াত করে তাদের শুনিয়ে দিলে তারা তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যান।

মুসনাদে আহমদে উদ্ধৃত হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরাফাতের ময়দানে এ আয়াত পাঠ করার পর বললেন ঃ "হে পরওয়ারদেগার আমিও এর সাক্ষ্যদাতা।"

'**দ্বীন ও ইসলাম শব্দের ব্যাখ্যা ঃ** আরবী ভাষায় دين শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে এক অর্থ রীতি ও পদ্ধতি। কোরআনের পরিভাষায় دين সেসব মূলনীতি ও বিবিধ-বিধানকে বলা হয় যা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সব পয়গম্বরের মধ্যে সমভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। 'শরীয়ত' অথবা 'মিনহাজ' শব্দটি পরবর্তী পরিভাষা। 'মাযহাব' শব্দটি দ্বীনের বিভিন্ন শাখার বিধি-বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কোরআন বলে ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّیْنِ مَا وَصّٰی بِهٖ نُوْحًا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্যে সে দ্বীনই প্রবর্তন করেছেন, যার নির্দেশ ইতিপূর্বে নূহ্ ও অন্যান্য পয়গম্বরকে দেয়া হয়েছিল।

এতে বোঝা যায়, সব পয়গম্বরের দ্বীনই এক ও অভিন্ন ছিল। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সত্তার যাবতীয় পরাকাষ্ঠার অধিকারী হওয়া এবং সমুদয় দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র হওয়া এবং তাঁকে ছাড়া কেউ উপাসনার যোগ্য না হওয়ার প্রতি মনে প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকার করা, কেয়ামত দিবস, হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও শাস্তিদান এবং জান্নাত ও দোযখের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকার করা, আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রসূল ও তাঁদের বিধানের প্রতিও তেমনিভাবে ঈমান আনা। 'ইসলাম' শব্দের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর অনুগত হওয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁদের আনীত বিধি-বিধানের আনুগত্য

করেছে, তারা সবাই মুসলমান ও মুসলিম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিল এবং তাদের ধর্মও ছিল ইসলাম। এ অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই হযরত নূহ্ (আঃ) বলেন ঃ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ অর্থাৎ, আমি 'মুসলিম' হওয়ার জন্যে আদিষ্ট হয়েছি। - (সূরা ইউনুস) এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিজেকে ও নিজ উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমা' বলেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ

হযরত ঈসা (আঃ)-এর সহচরগণ এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিল ঃ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 'সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম।'

মোটকথা এই যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে তাঁর আনীত দ্বীনই ছিল দ্বীনে ইসলাম এবং আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য। পরে এগুলো একের পর এক রহিত হয়েছে এবং পরিশেষে দ্বীনে-মুহাম্মদীই 'ইসলাম' নামে অভিহিত হয়েছে— যা কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। যদি ইসলামের দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয় অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনীত ধর্ম, তবে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এ যুগে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। পূর্ববর্তী দ্বীনগুলোকেও তাদের সময়ে ইসলাম বলা হলেও এখন তা রহিত হয়ে গেছে। অতএব উভয় অবস্থাতে আয়াতের প্রকৃত অর্থ একই দাঁড়ায়।

তাই কোরআনের সম্বোধিত উম্মতের সামনে ইসলামের যে কোন অর্থই নেয়া হোক না কেন, সারমর্ম হবে এই যে, রসূলের (সাঃ) আবির্ভাবের পর কোরআন ও তাঁর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মই ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এবং এধর্মই আল্লাহ্ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য-অন্য কোন ধর্ম নয়। এ বিষয়বস্তুটি কোরআনের অসংখ্য আয়াতে বিভিন্ন শিরোনামে বিধৃত হয়েছে।

ইসলামেই মুক্তি নিহত ঃ আজকাল ইসলামের উদারতার নামে কুফর ও ইসলামকে এক করার চেষ্টা করা হয় এবং বলা হয় যে, সৎকর্ম সম্পাদন করলে ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে যে কোন ধর্মাবলম্বীই মুক্তি পাবে— সে ইহুদী, খৃষ্টান, অথবা মূর্তিপূজারী যাই হোক। আলোচ্য আয়াত এ উদ্ভট মতবাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এভাবে ইসলামের মূলনীতি বিধ্বস্ত করা হয়। কারণ, এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, ইসলামের বাস্তব কোন ভিত্তি নেই। এটা একটা কাল্পনিক বিষয়, যা কুফরের পোশাকেও সুন্দর মানায়। কোরআন মজীদের অসংখ্য আয়াত পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, আলো ও অন্ধকার যেরূপ এক হতে পারে না, তদ্রূপ অবাধ্যতা ও আনুগত্য উভয়টি আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয় হতে পারে না। যে ব্যক্তি ইসলামের কোন একটি মূলনীতি অস্বীকার করে, সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বিদ্রোহী ও পয়গম্বরগণের শত্রু; প্রচলিত অর্থে সৎকর্ম বা নেক আমল ও প্রথাগত চরিত্রে সে যতই সুন্দর হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের উপরই পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত, তার কোন কর্ম ধর্তব্য নয়। কোরআনে এমন লোকদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন আমি তাদের কোন আমল ওজন করব না।

পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

-অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে, আল্লাহ্ দ্রুত তার হিসাব গ্রহণ করবেন। মৃত্যুর পর প্রথমতঃ কবর তথা বরযখ-জগতে পরকালের পথে প্রথম পরীক্ষা নেয়া হবে। এরপর বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ হবে কেয়ামতে। এ হিসাব-নিকাশের সময়ই সব বিরোধের স্বরূপ ফুটে উঠবে। মিথ্যাপন্থীরা তাদের স্বরূপ জানতে পারবে এবং শাস্তিও আরম্ভ হয়ে যাবে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ
اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ
فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا
رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ
مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ
إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ
فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ
وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ إِن
تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

(২৩) আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে—আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি তাদের আহবান করা হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়। অতঃপর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (২৪) তা এজন্য যে, তারা বলে থাকে যে, দোযখের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না; তবে সামান্য হাতে গোনা কয়েকদিনের জন্য স্পর্শ করতে পারে। নিজেদের উদ্ভাবিত ভিত্তিহীন কথায় তারা ধোঁকা খেয়েছে। (২৫) কিন্তু তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে যখন আমি তাদেরকে একদিন সমবেত করবো–যে দিনের আগমনে কোন সন্দেহ নেই। আর নিজেদের কৃতকর্ম তাদের প্রত্যেকেই পাবে—তাদের প্রাপ্য প্রদানে মোটেই অন্যায় করা হবে না। (২৬) বলুন ইয়া আল্লাহ্‌! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। (২৭) তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর। (২৮) মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (২৯) বলে দিন, তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ্‌ সে সবই জানতে পারেন। আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সেসবও তিনি জানেন। আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের শানে-নুযূল ঃ মুসলমানদের অব্যাহত উন্নতি ও ইসলামের ক্রমবর্দ্ধমান প্রসার দেখে বদর যুদ্ধে পরাজিত এবং ওহুদ যুদ্ধে বিপর্যস্ত মুশরেক ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তাই সবাই মিলে ইসলাম ও মুলমানদের বিরুদ্ধে যথাসর্বস্ব কোরবান করতে প্রস্তুত হচ্ছিল। অবশেষে দেশময় গভীর ষড়যন্ত্রের ফল স্বরূপ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরেক, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের একটি সম্মিলিত ঐক্য গড়ে উঠলো। ওরা সবাই মিলে মদীনার উপর ব্যাপক আক্রমণ ও চূড়ান্ত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলো। সাথে সাথে তাদের অগণিত সৈন্য দুনিয়ার বুক থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার সংকল্প নিয়ে মদীনা অবরোধ করে বসলো। কোরআনে এ যুদ্ধ 'গযওয়ায়ে-আহ্‌যাব' অর্থাৎ, সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ এবং ইতিহাসে 'গযওয়ায়ে-খন্দক' নামে উল্লেখিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীগণের সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করেছিলেন যে, শত্রু সৈন্যের আগমন পথে মদীনার বাইরে পরিখা খনন করা হবে।

বায়হাকী, আবুনায়ীম ও ইবনে খুযায়মার রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, প্রতি চল্লিশ হাত পরিখা খননের দায়িত্ব প্রতি দশজন মুজাহিদ সাহাবীর উপর অর্পন করা হয়। পরিকল্পনা ছিল কয়েক মাইল লম্বা যথেষ্ট গভীর ও প্রশস্ত পরিখা খনন করা হবে, যাতে শত্রু সৈন্যরা সহজে অতিক্রম করতে না পারে। খনন কাজ দ্রুত সমাপ্ত করাও দরকার ছিল। তাই নিবেদিতপ্রাণ সাহাবিগণ কঠোর পরিশ্রম সহকারে খননকার্যে মশগুল ছিলেন। পেশাব-পায়খানা, পানাহার ইত্যাদি প্রয়োজনে কাজ বন্ধ রাখা দুরূহ ছিল। তাই একটানা ক্ষুধার্ত থেকেও কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছিল। বাস্তবেও কাজটি এমন ছিল যে, আজকালকার আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত বাহিনীর পক্ষেও এত অল্প সময়ে এ কাজ সমাধা করা সহজ হতো না। কিন্তু এখানে ঈমানী শক্তি কার্যকর ছিল। তাই অতি সহজেই কাজ সমাধা হয়ে গেলো।

হযরত নবী করীম (সাঃ)ও একজন সৈনিক হিসেবে খননকার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাক্রমে পরিখার এক অংশে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড বের হলো। এ অংশে নিয়োজিত সাহাবিগণ সর্বশক্তি ব্যয় করেও প্রস্তরখণ্ডটি ভেঙ্গে অপসারণ করতে ব্যর্থ হলেন। তাঁরা মূল পরিকল্পনাকারী হযরত সালমান ফারসীর মাধ্যমে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে সংবাদ পাঠালেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন এবং কোদাল দিয়ে প্রস্তরখণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত করতেই তা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেলো এবং একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হলো। এ স্ফুলিঙ্গের আলোকচ্ছটা বেশ দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ এ আলোকচ্ছটায় আমাকে হীরা ও পারস্য সাম্রাজ্যের রাজপ্রাসাদ দেখানো হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় বার আঘাত করতেই আরেকটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হলো। তিনি বললেন ঃ এ আলোকচ্ছটায় আমাকে রোম সাম্রাজ্যের লাল বর্ণের রাজপ্রাসাদ ও দালান-কোঠা দেখানো হয়েছে। অতঃপর তৃতীয়বার আঘাত করতেই আবার আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন ঃ এতে আমাকে সান্‌আ ইয়ামনের সুউচ্চ রাজ-প্রাসাদ দেখানো হয়েছে। তিনি আরও বললেন ঃ আমি তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, জিবরাঈল (আঃ) আমাকে

বলেছেন যে, আমার উম্মত অদূর ভবিষ্যতে এসব দেশ জয় করবে।

এ সংবাদে মদীনার মুনাফেকরা ঠাট্টা-বিদ্রেপের একটা সুযোগ পেয়ে বসলো। তারা বলতে লাগলো ঃ দেখ, প্রাণ বাঁচানোই যাদের পক্ষে দায়; যারা শত্রুর ভয়ে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে দিবারাত্র পরিখা খননে ব্যস্ত, তারাই কিনা পারস্য, রোম ও ইয়ামন জয় করার দিবা-স্বপ্ন দেখছে! আল্লাহ্ তাআলা এসব নির্বোধ জালেমদের উত্তরেই আলোচ্য قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ আয়াতটি নাযিল করেন।

এতে মুনাজাত ও দোয়ার ভাষায় অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে জাতিসমূহের উত্থান-পতন ও সাম্রাজ্যের পট পরিবর্তনে আল্লাহ্ তাআলার অপ্রতিহত শক্তি সামর্থের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য বিজয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে জগতের বৈপ্লবিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ, জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং কওমে নূহ, আদ, সামূদ প্রভৃতি অবাধ্য জাতিগুলোর ধ্বংসকাহিনী সম্পর্কে উদাসীন ও মূর্খ শত্রুদের হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এরা বাহ্যিক শান-শওকতের পূজা করে। এরা জানে না, জগতের সমস্ত শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার করায়ত্ত। সম্মান ও অপমান তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি দরিদ্র ও পথের ভিখারীকে রাজ সিংহাসন ও মুকুটের অধিকারী করতে পারেন এবং প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটদের হাত থেকে রাষ্ট্র ও ঐশ্বর্য্য ছিনিয়ে নিতে পারেন। আজ পরিখা খননকারী ক্ষুধার্ত ও নিঃস্বদের আগামীকাল সিরিয়া, ইরাক ও ইয়ামন সাম্রাজ্যের অধিকারী করে দেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

ভাল ও মন্দের নিরিখ ঃ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে بِيَدِكَ الْخَيْرُ অর্থ্যাৎ, তোমার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। আয়াতের প্রথমাংশে রাজত্ব দান করা ও ছিনিয়ে নেয়া এবং সম্মান ও অপমান উভয়দিক উল্লেখ করা হয়েছিল। এ কারণে এখানেও بيدك الخير والشر (তোমার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণ) কিন্তু আয়াতে শুধু خير (কল্যাণ) শব্দ ব্যবহার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে বিষয়কে কোন ব্যক্তি অথবা জাতি অকল্যাণকর বা বিপজ্জনক মনে করে, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা জাতির জন্যে আপাতদৃষ্টিতে অকল্যাণকর ও বিপজ্জনক মনে হলেও পরিণামের সামগ্রিক ফলশ্রুতির দিক দিয়ে তা অকল্যাণকর নাও হতে পারে।

মোটকথা, আমরা যেসব বিষয়কে মন্দ বলি, সেগুলো পুরোপুরি মন্দ নয়— আংশিক মন্দ মাত্র। বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্ব-পালকের দিকে সম্বন্ধ এবং সামগ্রিক উপযোগিতার দিক দিয়ে কোন বস্তুই মন্দ নয়।

২৭ নং আয়াতে নভোমণ্ডলেও আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমতার ব্যাপ্তি বর্ণনা করা হয়েছে—

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ অর্থাৎ, আপনি ইচ্ছা করলেই রাত্রির অংশ দিনে প্রবিষ্ট করে দিনকে বর্ধিত করে দেন এবং দিনের অংশ রাত্রিতে প্রবিষ্ট করে রাত্রিকে বর্ধিত করে দেন।

সবাই জানেন যে, দিবারাত্রির ছোট বা বড় হওয়া সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই আয়াতের সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, নভোমণ্ডল, তৎসংশ্লিষ্ট সর্ববৃহৎ গ্রহ সূর্য এবং সর্বক্ষুদ্র উপগ্রহ চন্দ্র-সবই আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমতাধীন। অতএব উপাদান-জগত ও অন্যান্য শক্তি যে, আল্লাহ্ তাআলারই ক্ষমতাধীন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ আপনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন। যেমন, ডিম থেকে বাচ্চা অথবা বীর্য থেকে সন্তান অথবা বীজ থেকে বৃক্ষ বের করেন। পক্ষান্তরে আপনি মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। যেমন, পাখি থেকে ডিম, জীব থেক বীর্য অথবা বৃক্ষ থেকে ফল ও শুষ্ক বীজ।

জীবিত ও মৃতের ব্যাপক অর্থ নেয়া হলে জ্ঞানী-মূর্খ পূর্ণ-অপূর্ণ এবং মুমিন ও কাফের সবাই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ্ তাআলার সর্বব্যাপী ক্ষমতা সমগ্র আত্মা-জগত ও আধ্যাত্মিক জগতের উপর সুস্পষ্টরূপে পরিব্যাপ্ত হয়। অর্থাৎ, তিনি ইচ্ছা করলেই কাফেরের ঔরসে মুমিন অথবা মূর্খের ঔরসে জ্ঞানী পয়দা করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলেই মুমিনের ঔরসে কাফের এবং জ্ঞানীর ঔরসে মূর্খ পয়দা করতে পারেন। তাঁরই ইচ্ছায় আযরের গৃহে খলীলুল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন এবং নূহ (আঃ)-এর গৃহে তাঁর ঔরসজাত পুত্র কাফের থেকে যায়, আলেমের সন্তান জাহেল থেকে যায় এবং জাহেলের-সন্তান আলেম হয়ে যায়।

আয়াতে সমগ্র সৃষ্টজগতের উপর আল্লাহ্ তাআলার একচ্ছত্র ক্ষমতা কিরূপ প্রাঞ্জল ও মনোরম ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণিত হয়েছে, উপরোক্ত বিবরণ থেকে সহজেই তা বোঝা যায়। প্রথমেই উপাদান জগত এবং তার শক্তি ও রাজত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর নভোমণ্ডল ও তার শক্তিসমূহ উল্লেখিত হয়েছে। সবশেষে আত্মা ও আধাত্মিকতার বর্ণনা এসেছে। প্রকৃতপক্ষে এটাই সমগ্র বিশ্বশক্তির সর্বোচ্চ শক্তি।

সবশেষে বলা হয়েছে ঃ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ, আপনি যাকেই ইচ্ছা অপরিমিত রিযক দান করেন। কোন সৃষ্টজীব জানতে পারে না— যদিও স্রষ্টার খাতায় তা কড়ায়-গণ্ডায় লিখিত থাকে।

আলোচ্য আয়াতের বিশেষ ফযীলত ঃ ইমাম বগভীর নিজস্ব সনদে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফাতেহা, আয়াতুল-কুরসী, সূরা আলে-ইমরানের شَهِدَ اللّٰهُ আয়াত শেষ পর্যন্ত এবং قُلِ اللّٰهُمَّ আয়াত بِغَيْرِ حِسَابٍ পর্যন্ত পাঠ করে, আমি তার ঠিকানা জান্নাতে করে দেব, আমার সকাশে স্থান দেব, দৈনিক সত্তর বার তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেব, তার সত্তরটি প্রয়োজন মিটাব, শত্রুর কবল থেকে আশ্রয় দেব এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাকে জয়ী করব।

অমুসলমানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কি রূপ হওয়া উচিত কোরআনে এ সম্পর্কিত অনেক আয়াত রয়েছে। সূরা মুমতাহিনায় বলা হয়েছেঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ

"হে মুমিনগণ! আমার ও তোমাদের শত্রু অর্থাৎ, কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে, তাদের কাছে তোমার বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাবে।"

পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত ঃ এ বিষয়বস্তুটি কোরআনের বহু আয়াতে সংক্ষেপে এবং কোন কোন স্থানে বিস্তারিতভাবে

উল্লেখ করা হয়েছে। এসব আয়াতে অ-মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। এসব দেখে শুনে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ অমুসলিমদের মনে সন্দেহ জাগে যে, মুসলমানদের ধর্মে কি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সদাচার প্রদর্শনেরও কোন অবকাশ নেই? পক্ষান্তরে এর বিপরীতে কোরআনের অনেক আয়াত, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনেক বাণী এবং খোলাফায়ে-রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবিগণের আচরণ থেকে অমুসলিমদের সাথে দয়া, সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি এবং সমবেদনার নির্দেশও পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এমনসব ঘটনাবলীও প্রমাণিত দেখা যায়, যা অন্যান্য জাতির ইতিহাসে একান্তই বিরল। এসব দেখে একজন স্থূলবুদ্ধি মুসলমানও এক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলীতে পরস্পর বিরোধীতা ও সংঘর্ষ অনুভব করতে পারে। কিন্তু উপরোক্ত উভয় প্রকার ধারণা সত্যিকার কোরআনী শিক্ষার প্রতি অগভীর মনোযোগ ও অসম্পূর্ণ তথ্যানুসন্ধানের ফল। কোরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে এতদসম্পর্কিত আয়াতগুলো একত্রিত করে গভীরভাবে চিন্তা করলে অ-মুসলিমদের অভিযোগও দূর হয়ে যায় এবং আয়াত ও হাদীসসমূহের মধ্যে কোন প্রকার পরস্পর বিরোধিতাও অবশিষ্ট থাকে না। এ উদ্দেশে বিষয়টির পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে। এতে বন্ধুত্ব, অনুগ্রহ, সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি ও সমবেদনার পারস্পরিক পার্থক্য এবং প্রত্যেকটির স্বরূপ জানা যাবে। আরো জানা যাবে তার কারণ কি কি?

দুই ব্যক্তি অথবা দুই দলের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। একটি স্তর হলো আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার। এই স্তরের সম্পর্ক একমাত্র মুসলমানদের সাথেই হতে পারে, অ-মুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করা কিছুতেই জায়েয নয়।

দ্বিতীয়তঃ সমবেদনার স্তর। এর অর্থ সহানুভূতি, শুভাকাঙ্ক্ষা ও উপকার করা। এই স্তরের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে এবং যুদ্ধরত অ-মুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া সব অ-মুসলমানদের সাথেও স্থাপন করা জায়েয।

সূরা মুমতাহিনায় বলা হয়েছেঃ "যারা তোমাদের সাথে ধর্মের ব্যাপারে যুদ্ধরত নয় এবং মাতৃভূমি থেকে তোমাদের বহিষ্কার করেনি, তাদের সাথে দয়া ও ন্যায়বিচারের ব্যবহার করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেন না।"

তৃতীয়তঃ সৌজন্য ও আতিথেয়তার স্তর। এর অর্থ বাহ্যিক সদাচার ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার। এই সম্পর্কের উদ্দেশ্য যদি ধর্মীয় উপকার সাধিত করা অথবা আতিথেয়তা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা হয়ে থাকে, তবে সব অ-মুসলমানের সাথেই এটা জায়েয। সূরা আলে-ইমরানের আলোচ্য আয়াতে إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً বলে এ স্তরের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা জায়েয নয়। তবে যদি তুমি তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করার লক্ষ্যে বন্ধুত্ব করতে চাও, তাহলে জায়েয। সৌজন্যভাবও বন্ধুত্বের হয়ে থাকে। এজন্য একে বন্ধুত্ব থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে।— (বয়ানুল-কোরআন)

চতুর্থতঃ লেন-দেনের স্তর। অর্থাৎ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকুরী, শিল্প ও কারিগরী ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করা। এ স্তরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও সব অ-মুসলমানের সাথে জায়েয। তবে এতে যদি মুসলমানদের ক্ষতি হয়, তবে জায়েয নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ), খোলাফায়ে-রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ফিকাহ্‌বিদগণ এ কারণেই যুদ্ধরত কাফেরদের হাতে সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং শুধুমাত্র স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছেন। তাদের চাকুরী প্রদান করা অথবা তাদের কল-কারখানা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাকুরী করা সবই জায়েয।

এ আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কোন কাফেরের সাথে কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। তবে অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও উপকার সাধন যুদ্ধরত কাফের ছাড়া সবার বেলায়ই জায়েয। এমনিভাবে বাহ্যিক সচ্চরিত্রতা ও সৌহার্দমূলক ব্যবহার সবার সাথেই জায়েয রয়েছে ; তবে এর উদ্দেশ্য অতিথির আতিথেয়তা অথবা অ-মুসলমানকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা হতে হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) 'রাহ্‌মাতুল্লিল-আলামীন' হয়ে জগতে আগমন করেন তিনি অ-মুলমানদের সাথে যেরূপ অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছেন, তার নযীর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে যে শত্রুরা তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিল, তিনি স্বয়ং তাদের সাহায্য করেন। এরপর মক্কা বিজিত হয়ে গেলে সব শত্রু তাঁর করতলগত হয়ে যায়। কিন্তু তিনি একথা বলে সবাইকে মুক্ত করে দেন যে, لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ অর্থাৎ, আজ তোমাদের শুধু ক্ষমাই করা হচ্ছে না, বরং অতীত উৎপীড়নের কারণে তোমাদের কোনরূপ ভর্ৎসনাও করা হবে না। অ-মুসলিম যুদ্ধবন্দী হাতে আসার পর তিনি তাদের সাথে এমন ব্যবহার করতেন, যা অনেক পিতাও পুত্রের সাথে করেন না। কাফেররা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর হাত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে কখনও উত্থিত হয়নি। মুখে বদদোয়াও তিনি করেন নি। অ-মুসলিম বনু-সাকীফের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি মসজিদে-নব বীতে তাদের অবস্থান করতে দেন-যা ছিল মুসলমানের দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ সম্মানের স্থান।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের মত অ-মুসলমান দরিদ্র যিম্মীদেরও সরকারী ধনাগার থেকে ভাতা প্রদান করতেন। খোলাফায়ে-রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের কাজ-কর্মের মধ্যে এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো ছিল সহানুভূতি, সৌজন্য ও লেন-দেনমূলক ব্যবহার—নিষিদ্ধ বন্ধুত্ব নয়।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, ইসলামে অ-মুসলিমদের জন্যে কতটুকু উদারতা ও সদ্ব্যবহারের শিক্ষা বর্তমান রয়েছে। অপরদিকে বন্ধুত্ব বর্জনের আয়াত থেকে সৃষ্ট বাহ্যিক পরস্পর বিরোধিতাও দূর হয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কোরআন কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন এত কঠোরভাবে নিষেধ করে কেন? কোন অবস্থাতেই এরূপ সম্পর্ক জায়েয না রাখার রহস্য কি? এর একটি বিশেষ কারণ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জগতের বুকে মানুষের অস্তিত্ব সাধারণ জিন-জানোয়ার অথবা জঙ্গলের বৃক্ষ ও লতা-পাতার মত নয় যে, জন্মলাভ করবে, বড় হবে, এরপর মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে! বরং ইসলাম মনে করে যে, মানুষের জীবন একটি উদ্দেশমূলক জীবন। মানুষের খাওয়া-পরা, উঠা-বসা, নিদ্রা-জাগরণ এমন কি, জন্ম-মৃত্যু সবই একটি উদ্দেশের চারপাশে অবিরত ঘুরছে। এসব কাজকর্ম যতক্ষণ সে উদ্দেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, ততক্ষণই তা নির্ভুল ও শুদ্ধ। পক্ষান্তরে উদ্দেশের

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ
سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًۢا بَعِيْدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ
نَفْسَهٗ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ
يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ
اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾
اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾
اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ
مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا
قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۗ وَ
لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا
بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ
حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا
زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۗ
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

(৩০) সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও, ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান দূরের হতো। আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। (৩১) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (৩২) বলুন, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুতঃ যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ্ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না। (৩৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আদম (আঃ), নূহ্ (আঃ) ও ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর এবং এমরানের খান্দানকে নির্বাচিত করেছেন। (৩৪) যারা বংশধর ছিলেন পরস্পরের। আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী। (৩৫) এমরানের স্ত্রী যখন বললো— হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত। (৩৬) অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো— বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি একে কন্যা প্রসব করেছি। বস্তুতঃ কি সে প্রসব করেছে আল্লাহ্ তা ভালই জানেন! সেই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি—অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে। (৩৭) অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন—অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তাঁর কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন—'মারইয়াম'! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো? তিনি বলতেন, 'এসব আল্লাহ্র নিকট থেকে আসে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।

বিপরীত হয়ে গেলেই তা অশুদ্ধ।

আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের আনুগত্য ও এবাদতই যখন মানব-জীবনের লক্ষ্য, তখন জগতের কাজ-কারবার, রাজ্যশাসন, রাজনীতি ও পারিবারিক সম্পর্ক সবই এ লক্ষ্যের অধীন। অতএব যে মানব এ লক্ষ্যের বিরোধী, সে মানবতার প্রধান শত্রু।

বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে এ বিষয়বস্তুটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ من احب لله وابغض لله فقد استكمل ايمانه অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুত্ব ও শত্রুতাকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীন করে দেয়, সে স্বীয় ঈমানকে পূর্ণতা দান করে।" এতে বোঝা গেল যে, স্বীয় ভালবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা ও বিদ্বেষকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীন করে দিলেই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। অতএব মুমিনের আন্তরিক বন্ধুত্ব এমন ব্যক্তির সাথেই হতে পারে, যে এ উদ্দেশ্য হাসিলে তার সঙ্গী এবং আল্লাহ্র অনুগত। এ কারণে কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপনকারীদের সম্পর্কে কোরআনের উল্লেখিত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, ওরা কাফেরদেরই অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ স্বীয় মহান সত্তার প্রতি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের খাতিরে কাফেরদের আন্তরিক বন্ধুত্বে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করবে না। বন্ধুত্বের সম্পর্ক অন্তরের সাথে। অন্তরের অবস্থা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং বাস্তবে কেউ কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব রেখে মুখে তা অস্বীকার করতে পারে। এ কারণে দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "তোমাদের অন্তরের গোপন ভেদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা ওয়াকিফহাল। অস্বীকৃতি ও অপকৌশল তাঁর সামনেঅচল।"

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ভালবাসা একটি গোপন বিষয়। কারও প্রতি কারও ভালবাসা আছে কি না, অল্প আছে কি বেশী আছে, তা জানার একমাত্র মাপকাঠি হলো, অবস্থা ও পারস্পরিক ব্যবহার দেখে অনুমান করা অথবা ভালবাসার চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখে জেনে নেয়া। যারা আল্লাহ্কে ভালবাসার দাবীদার এবং আল্লাহ্র ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষী, আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় ভালবাসার মাপকাঠি তাদের বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ, জগতে যদি কেউ পরম প্রভুর ভালবাসার দাবী করে, তবে মুহাম্মদ সালাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণের কষ্টিপাথরে তা যাচাই করে দেখা অত্যাবশ্যকীয়। এতে আসল ও মেকী ধরা পড়বে। যার দাবী যতটুকু সত্য হবে, সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণে ততটুকু যত্নবান হবে এবং তাঁর শিক্ষার আলোকে পথের মশালরূপে গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে যার দাবী দুর্বল হবে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণে তার অলসতা ও দুর্বলতা সেই পারিমাণে পরিলক্ষিত হবে।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের আলোচনা ঃ হযরত নবী করীম (সাঃ-এর রেসালাতে সন্দেহ পোষণ করার কারণে যেসব লোক তাঁর আনুগত্য করতো না, আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের পথ প্রদর্শনের জন্যে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কিছু নযীর বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তাদের সন্দেহ দূর হয়ে যায়। পূর্ববর্তী পয়মগ্বরগণের আলোচনায় হযরত আদম, নূহ, আলে-ইবরাহীম ও আলে-ইমরানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখিত হয়েছে।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٤١﴾ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾

(৩৮) সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে, আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পূত–পবিত্র সন্তান দান কর—নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (৩৯) যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ্ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহ্র নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি নেতা হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না, তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল নবী হবেন। (৪০) তিনি বললেন, 'হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র–সন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে, আমার স্ত্রীও যে বন্ধ্যা!' বললেন, আল্লাহ্ এমনিভাবেই যা ইচ্ছা করে থাকেন। (৪১) তিনি বললেন, হে পালনকর্তা! আমার জন্য কিছু নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার জন্য নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলবে না। তবে ইশারা ইঙ্গিতে করতে পারবে এবং তোমার পালনকর্তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে আর সকাল—সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে। (৪২) আর যখন ফেরেশতারা বলল,—হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব–নারী সমাজের উর্ধ্বে মনোনীত করেছেন। (৪৩) হে মারইয়াম! তোমার পালনকর্তার উপাসনা কর এবং রুকূকারীদের সাথে সেজদা ও রুকূ কর। (৪৪) এ হলো গায়েবী সংবাদ, যা আমি আপনাকে পাঠিয়ে থাকি। আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন প্রতিযোগিতা করছিল যে, কে প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে এবং আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিলো। (৪৫) যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ—মারইয়াম–তনয় ঈসা; দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহ্র ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত।

এখানে হযরত ঈসা (আঃ)–এর আলোচনাই আসল উদ্দেশ্য। এর আগে তাঁর মাতা ও মাতামহীর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর রহস্য ও উপযোগিতা পরে বর্ণিত হবে। মোটকথা এই যে, শেষ জমানায় মুসলিম সম্প্রদায়কে হযরত ঈসা (আঃ)–এর সাথে একযোগে কাজ করতে হবে। এ কারণে তাঁর পরিচয় ও লক্ষণাদির বর্ণনায় কোরআন অন্যান্য পয়গম্বরের তুলনায় অধিক যত্নবান।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তে প্রচলিত এবাদত–পদ্ধতির মধ্যে আল্লাহ্র নামে সন্তান উৎসর্গ করার রেওয়াজও ছিল। এসব উৎসর্গীকৃত সন্তানদের পার্থিব কোন কাজকর্মে নিযুক্ত করা হতো না। এ পদ্ধতি অনুযায়ী মরিয়মের জননী নিজের গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে মান্নত করলেন যে, তাকে বিশেষভাবে বায়তুল–মুকাদ্দাসের খেদমতে নিয়োজিত করা হবে এবং অন্য কোন পার্থিব কাজে নিয়োগ করা হবে না। কিন্তু যখন তিনি কন্যা প্রসব করলেন, তখন এই ভেবে অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, কন্যা দ্বারা তো এ কাজ সম্ভবপর নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাঁর আন্তরিকতার বরকতে কন্যাকেই কবুল করে নিলেন এবং সারা বিশ্বের কন্যাদের মধ্যে তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করলেন।

এতে বোঝা যায় যে, সন্তানের শিক্ষা–দীক্ষা ও লালন–পালনের ব্যাপারে জননীর বিশেষ অধিকার রয়েছে। এরূপ না হলে মরিয়মের জননী মান্নত করতেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا হযরত যাকারিয়া (আঃ) তখনও পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন।

সময়ও ছিল বার্ধক্যের— যে বয়সে স্বাভাবিকভাবে সন্তান হয় না। তবে খোদায়ী শক্তি–সামর্থ্যের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, অলৌকিকভাবে এহেন বার্ধক্যের মধ্যেও তিনি সন্তান দিতে পারেন। তবে অসময়ে ও অস্থানে দান করার খোদায়ী মহিমা ইতঃপূর্বে তিনি কখনও প্রত্যক্ষ করেন নি। তাই এযাবৎ সাহস করে দোয়া করেননি। কিন্তু এসময় যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা ফলের মওসুম ছাড়াই মরিয়মকে ফল দান করেছেন, তখনই তাঁর মনের সুপ্ত আকাঙ্খা জেগে উঠলো এবং তিনি দোয়া করার সাহস পেলেন; যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মওসুম ছাড়াই ফল দিতে পারেন, তিনি বৃদ্ধ দম্পতিকে হয়ত সন্তানও দেবেন। বললেন–

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً এতে বোঝা যায় যে, সন্তান হওয়ার জন্যে দোয়া করা পয়গম্বর ও সজ্জনদের সুন্নত।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

অর্থাৎ, হযরত নবী করীম (সাঃ)–কে যেরূপ স্ত্রী ও সন্তান দান করা হয়েছে, তদ্রূপ এই নেয়ামত পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকেও দেয়া হয়েছিল। এখন কেউ যদি কোন পন্থায় সন্তান জন্মগ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করে,তবে সে শুধু স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে না; বরং পয়গম্বরের একটি সার্বজনীন ও সর্বসম্মত সুন্নত থেকেও বঞ্চিত হয়।

হযরত নবী করীম (সাঃ) বিবাহ ও সন্তানের প্রশ্নটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করেছেন। তাই যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিবাহ কিংবা সন্তান গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে, তাকে তিনি স্বীয় দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুমতি দেননি। তিনি বলেনঃ

"বিবাহ আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি এ সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিবাহ কর। কেননা, তোমাদের আধিক্যের কারণে আমি অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করবো।"

كلمة الله (আল্লাহ্‌র বাণী) – হযরত ঈসা (আঃ)-কে 'কলেমাতুল্লাহ' বলার কারণ এই যে, তিনি শুধু আল্লাহ্‌র নির্দেশে চিরাচরিত প্রথার বিপরীতে পিতার মাধ্যম ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

وَحَصُوْرًا এটা হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ)-এর তৃতীয় গুণ। এর অর্থ যাবতীয় কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা। উদাহরণতঃ উত্তম পানাহার, উত্তম পোষাক পরিধান এবং বিবাহ ইত্যাদি। এ গুণটি প্রশংসার ক্ষেত্রে উল্লেখ করায় বাহ্যতঃ মনে হয় যে, এটাই উত্তম পন্থা। অথচ বিভিন্ন হাদীসে বিবাহিত জীবন-যাপন করাই যে উত্তম একথা প্রমাণিত আছে। এ সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কারও অবস্থা হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ)-এর মত হয়- অর্থাৎ, অন্তরে পরকালের চিন্তা প্রবল হওয়ার কারণে স্ত্রীর প্রয়োজন অনুভূত না হয় এবং স্ত্রী ও সন্তানদের হক আদায় করার মত অবকাশ না থাকে, তবে তার পক্ষে বিবাহ না করাই উত্তম। এ কারণেই যেসব হাদীসে বিবাহের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তাতে এ কথাও বলা হয়েছে, من استطاع منكم الباءة অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ্য রাখে এবং স্ত্রীর হক আদায় করতে পারে, তার পক্ষেই বিবাহ করা উত্তম— অন্যথায় নয়।— (বয়ানুল -কোরআন)

হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর দোয়ার তাৎপর্য ঃ

اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ

– হযরত যাকারিয়া (আঃ) খোদায়ী শক্তি-সামর্থ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। ইতিপূর্বে এর নমুনা প্রত্যক্ষ করে নিজে দোয়াও করেছিলেন। এছাড়া দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়ও তিনি অবগত ছিলেন। এতসবের পরেও 'কিভাবে আমার পুত্র হবে' বলার মানে কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, এ জিজ্ঞাসা আল্লাহ্‌র শক্তি-সামর্থ্যে সন্দেহের কারণে ছিল না। বরং তিনি পুত্র হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী বর্তমানে বার্ধক্যের যে পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি, তা বহাল রেখেই পুত্র দান করা হবে, না এতে কোনরূপ পরিবর্তন করা হবে? আল্লাহ্ তাআলা উত্তরে বলেছিলেন যে, না তোমরা বার্ধক্যাবস্থায়ই থাকবে এবং এ অবস্থাতেই তোমাদের সন্তান হবে। সুতরাং আয়াতের অর্থে কোনরূপ জটিলতা নেই।

قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا

প্রতিশ্রুত সেই সুসংবাদটি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতি এবং পুত্র জন্মগ্রহণের পূর্বেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মশগুল হওয়ার উদ্দেশে হযরত যাকারিয়া (আঃ) নিদর্শন জানতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এ নিদর্শন দিলেন যে, তিন দিন পর্যন্ত তুমি মানুষের সাথে ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলতে সমর্থ হবে না।

এ নিদর্শনের মধ্যে সূক্ষ্মতা এই যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশে নিদর্শন চাওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা এমন নিদর্শন দিলেন যে,তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া হযরত যাকারিয়া অন্য কোন কাজের যোগ্যই থাকবেন না। সুতরাং কাঙ্খিত নিদর্শনও পাওয়া গেলো এবং উদ্দেশ্যও পুরোপুরি অর্জিত হলো।

اِلَّا رَمْزًا এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কথা বলতে অক্ষম হলে ইশারা-ইঙ্গিত কথার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম (সাঃ) এক বাঁদীকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্ কোথায়? উত্তরে সে আকাশের দিকে ইশারা করলে হযরত (সাঃ) বললেনঃ এ বাঁদী মুসলমান।— (কুরতুবী)

ইসলামী শরীয়তে লটারী সম্পর্কিত বিধান এই যে, হানাফী মযহাব মতে যেসব হকের কারণ শরীয়তানুযায়ী নির্দিষ্ট ও জানা আছে, সেসব হকের মীমাংসা লটারীযোগে করা নাজায়েয এবং তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণতঃ শরীকানাধীন বস্তুর মীমাংসা লটারীযোগে করা এবং লটারীতে যার নাম বের হয় তাকে সম্পূর্ণ বস্তুটি দিয়ে দেয়া অথবা কোন শিশুর পিতৃত্বে মতবিরোধ দেখা দিলে লটারীযোগে একজনকে পিতা মনে করে নেয়া। পক্ষান্তরে যেসব হকের কারণ জনগণের রায়ের ওপর ন্যস্ত, সেসব হকের মীমাংসা লটারীযোগে করা জায়েয। যথা—কোন্ শরীককে কোন্ অংশ দেয়া হবে, সে ব্যাপারে লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা করা। এক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে একজনকে পূর্বের অংশ ও অন্যজনকে পশ্চিমের অংশ দেয়া জায়েয। এর কারণ এই যে, লটারী ছাড়াই উভয়পক্ষ একমত হয়ে যদি এভাবে অংশ নিতো অথবা বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে এভাবে নিতো, তবুও তা জায়েয হতো।— (বয়ানুল-কোরআন) অর্থাৎ, যেক্ষেত্রে সব শরীকের অংশ সমান হয়, সেখানে কোন এক দিককে এক শরীকের জন্যে নির্দিষ্ট করার উদ্দেশে লটারী জায়েয।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের একটি প্রমাণ ঃ আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর একটি অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি শৈশবে যে বয়সে কোন শিশু কথা বলতে সক্ষম হয় না, তখনই কথা বলবেন। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, জন্মের পর যখন ইহুদীরা মরিয়মের প্রতি অপবাদ আরোপ করতঃ ভর্ৎসনা করতে থাকে, তখন সদ্যজাত শিশু ঈসা (আঃ) বলে ওঠেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র বন্দা। এতদসত্ত্বেও আলোচ্য আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, যখন তিনি প্রৌঢ় বয়সের হবেন, তখনও মানুষের সাথে কথা বলবেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শৈশবাবস্থায় কথা বলা নিঃসন্দেহে একটি অলৌকিক ব্যাপার—যার উল্লেখ এক্ষেত্রে সমীচীন হয়েছে। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে কথা বলা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়। মুমিন, কাফের, পণ্ডিত, মূর্খ সবাই এ বয়সে কথা বলে। কাজেই এক্ষেত্রে বিশেষ গুণ হিসাবে এটা উল্লেখ করার অর্থ কি?

এ প্রশ্নের এক উত্তর বয়ানুল-কোরআনে দেয়া হয়েছে যে, 'শৈশবাবস্থায় কথা বলা' বর্ণনা করাই আসল উদ্দেশ্য। তৎসঙ্গে 'প্রৌঢ় বয়সের কথা' উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর শৈশবাবস্থার কথাবার্তাও শিশুসুলভ হবে না; বরং প্রৌঢ় লোকদের মত জ্ঞানীসুলভ, মেধা সম্পন্ন প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হবে।

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ قَالَتْ
رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝ وَرَسُوْلًا اِلٰى
بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيْٓ اَخْلُقُ
لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِ
اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ
اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ
بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝ فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ
الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ
اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝ رَبَّنَآ اٰمَنَّا
بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

(৪৬) যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং পূর্ণ বয়স্ক হবেন তখন তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (৪৭) তিনি বললেন, 'পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি!' বললেন, এ ভাবেই। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়। (৪৮) আর তাকে তিনি শিখিয়ে দেবেন কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জীল। (৪৯) আর বনী-ইসরাঈলদের জন্যে রসূল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় – আল্লাহ্র হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত-কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহ্র হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই – যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৫০) আর এটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে, যেমন তওরাত। আর তা এজন্য যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বস্তু যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। কাজেই আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। (৫১) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা-তাঁর এবাদত কর, এটাই হলো সরল পথ। (৫২) অতঃপর ঈসা (আঃ) যখন বনী-ইসরায়ীলের কুফরী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেনঃ কারা আছে আল্লাহ্র পথে আমাকে সাহায্য করবে? সঙ্গী-সাথীরা বললো, আমরা রয়েছি আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা হুকুম কবুল করে নিয়েছি। (৫৩) হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যা তুমি নাযিল করেছ, আমরা রসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদিগকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, এখানে প্রৌঢ় বয়সের কথাবার্তার উল্লেখ একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতস্বরূপ করা হয়েছে। তা এই যে, ইসলামী ও কোরআনী বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আঃ)-কে জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, আকাশে তুলে নেয়ার সময় তাঁর বয়স প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মাঝামাঝি ছিল। অর্থাৎ, তিনি যৌবনের প্রারম্ভিক কালে উত্তোলিত হয়েছেন। অতএব প্রৌঢ় বয়স— যাকে আরবীতে 'কুহুল' বলা হয়—তিনি এ জগতে সে বয়স পাননি। কাজেই প্রৌঢ় বয়সে মানুষের সাথে কথা বলা তখনই সম্ভব, যখন তিনি আবার এ জগতে প্রত্যাবর্তন করবেন। এ কারণেই তাঁর শৈশবাবস্থায় কথাবার্তা বলা যেমন একটি অলৌকিক ব্যাপার, তেমনি প্রৌঢ় বয়সে দুনিয়ায় ফিরে এসে কথাবার্তা বলাও হবে একটা অলৌকিক ব্যাপার।

পাখীর আকৃতি গঠন করা তথা চিত্রাঙ্কন করা হযরত ঈসা (আঃ)-এর শরীয়তে বৈধ ছিল। আমাদের শরীয়তে এর বৈধতা রহিত হয়ে গেছে।

قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ - حوارى শব্দটি حور ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন। অভিধানে এর অর্থ দেয়ালে চুনকাম করার চুন। পরিভাষায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর খাঁটি ভক্তদের উপাধি ছিল হাওয়ারী-তাঁদের আন্তরিকতা ও মনের স্বচ্ছতার কারণে অথবা যেহেতু তাঁরা সাদা পোশাক পরিধান করতেন এ জন্য তাঁদেরকে হাওয়ারী নামে অভিহিত করা হতো। যেমন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ভক্ত ও সহচরগণের উপাধি ছিল সাহাবী।

কোন কোন তফসীরবিদ হাওয়ারীদের সংখ্যা দ্বাদশ উল্লেখ করেছেন। 'হাওয়ারী' শব্দটি কোন সময় শুধু সাহায্যকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেই এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ প্রত্যেক পয়গম্বরের একজন হাওয়ারী অর্থাৎ, খাঁটি সহচর থাকে আমার হাওয়ারী হলেন যুবায়ের।— (কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ) যখন মানুষের অবিশ্বাস ও বিরোধিতা লক্ষ্য করলেন, তখন সাহায্যকারীদের খোঁজ নিলেন এবং مَنْ اَنْصَارِيْٓ বললেন। এর আগে তিনি একা একাই নবুওয়তের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সূচনা থেকেই কোন সাহায্যকারী দল গঠন করার চিন্তা করেননি। প্রয়োজন দেখা দিতেই দল গঠিত হয়ে যায়। বস্তুতঃ জগতের সব কাজই এমনি দৃঢ়তা ও সাহসিকতা চায়।

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۖ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٥٤﴾ إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰىٓ إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ أُجُوْرَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٧﴾ ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿٥٨﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۖ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٥٩﴾ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٢﴾

(৫৪) এবং কাফেররা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহ্ও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী। (৫৫) আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিবো– কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো। বস্তুতঃ তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো। (৫৬) অতএব যারা কাফের হয়েছে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দেবো দুনিয়াতে এবং আখেরাতে– তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৫৭) পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। আর আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। (৫৮) আমি তোমাদেরকে পড়ে শুনাই এ সমস্ত আয়াত এবং নিশ্চিত বর্ণনা। (৫৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন এবং তারপর তাঁকে বলেছিলেন–হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন। (৬০) যা তোমার পালনকর্তা বলেন তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। কাজেই তোমরা সংশয়বাদী হয়ো না। (৬১) অতঃপর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই কাহিনী সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বল ঃ 'এসো, আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী।' (৬২) নিঃসন্দেহে এটাই হলো সত্যভাষণ। আর এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আর আল্লাহ্; তিনিই হলেন পরাক্রমশালী মহাপ্রাজ্ঞ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোর ব্যাখ্যাঃ কোন কোন ফেরকার লোকেরা আলোচ্য আয়াতের বিভিন্ন শব্দ ও অর্থে বিকৃতি সাধন করে হযরত ঈসা (আঃ)–এর হায়াত এবং আখেরী যমানায় তাঁর পুনরাগমন সম্পর্কিত মুসলমানদের সর্ববাদিসম্মত আকীদাকে ভুল প্রমাণ করতে সচেষ্ট রয়েছে। এ কারণে আয়াতের শব্দাবলীর পূর্ণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ আরবী ভাষায় 'মকর' শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশল। উত্তম লক্ষ্য অর্জনের জন্যে মকর ভাল এবং মন্দ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে হলে তা মন্দও হতে পারে। এ কারণেই وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ আয়াতে مكر শব্দের সাথে سيئ (মন্দ) যোগ করা হয়েছে। বাংলা ভাষার বাচনভঙ্গিতে মকর শব্দটি শুধু ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এ নিয়ে আরবী বাচনভঙ্গিতে সন্দেহ করা উচিত নয়। আরবী অর্থের দিক দিয়েই এখানে আল্লাহ্‌কে 'শ্রেষ্ঠতম কুশলী' خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)–এর বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও গোপন কৌশল অবলম্বন করতে আরম্ভ করে। তারা অনবরত বাদশাহ্‌র কাছে বলতে থাকে যে, লোকটি আল্লাহ্‌দ্রোহী। সে তাওরাত পরিবর্তন করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট। এসব অভিযোগ শুনে বাদশাহ্ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। ইহুদীদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলার সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশলও স্বীয় পথে অগ্রসর হচ্ছিল। পরবর্তী আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে।— (তফসীরে–ওসমানী)

إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ – متوفى শব্দের ধাতু توفى এবং মূলধাতু وفى অভিধানে এর অর্থ পুরোপুরি লওয়া। وفاء . ايفاء ও استيفاء এসব শব্দেরও প্রকৃত অর্থ পুরোপুরি লওয়া। আরবী ভাষার সব অভিধান-গ্রন্থই এর প্রমাণ। মৃত্যুর সময় মানুষ নির্ধারিত আয়ু পূর্ণ করে ফেলে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত আত্মা পুরোপুরি নিয়ে নেয়া হয়। এ কারণে রূপক অর্থে শব্দটি মৃত্যু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মানুষের দৈনন্দিন নিদ্রা মৃত্যুর একটি হাল্কা নমুনা। কোরআনে এ অর্থেও توفى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে–

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا

আল্লাহ্ মৃত্যুর সময় প্রাণ নিয়ে নেন। আর যাদের মৃত্যু আসে না, তাদের নিদ্রার সময় প্রাণ নিয়ে নেন।

দুররে–মনসূর গ্রন্থে হযরত ইবনে–আব্বাসের রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত ইবনে আব্বাস বলেন مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ অর্থাৎ, আমি আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেব এবং শেষ যমানায় স্বাভাবিক মৃত্যুদান করব।

এ তফসীরের সারমর্ম এই যে, توفى শব্দের অর্থ মৃত্যু ; কিন্তু আয়াতের শব্দে رَافِعُكَ প্রথমে ও مُتَوَفِّيْكَ পরে হবে। এখানে مُتَوَفِّيْكَ –কে পূর্বে উল্লেখ করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, নিজের কাছে উঠিয়ে নেয়া চিরতরে নয় ; বরং এ ব্যবস্থা কিছুদিনের জন্যে হবে। এরপর তিনি আবার দুনিয়াতে আসবেন, শত্রুদের পরাজিত করবেন এবং অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। এভাবে আকাশ থেকে পুনর্বার

অবতরণ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের পর মৃত্যুবরণের ঘটনাটি একাধারে একটি মু'জেযা। এতদসঙ্গে ঈসা (আঃ)-এর সম্মান ও মর্যাদার পূর্ণত্বলাভ এবং খ্রীষ্টানদের এ বিশ্বাসের খণ্ডন যে, ঈসা (আঃ) অন্যতম উপাস্য। নতুবা জীবিত অবস্থায় আকাশে উত্থিত হওয়ার ঘটনা থেকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস আরও জোরদার হয়ে যেতো যে, তিনিও আল্লাহ্ তাআলার মতই চিরঞ্জীব এবং ভালমন্দের নিয়ামক। এ কারণে প্রথমে مُتَوَفِّيكَ বলে এসব ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এরপর নিজের দিকে উঠিয়ে নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্যি কথা এই যে, কাফের ও মুশরেকরা চিরকালই পয়গম্বরগণের বিরোধিতা ও তাঁদের সাথে শত্রুতা করে এসেছে। অপরদিকে আল্লাহ্ তাআলারও চিরাচরিত রীতি ছিল এই যে, যখনই কোন জাতি পয়গম্বরের বিরোধিতায় অনমনীয় হয়েছে এবং মু'জেযা দেখার পরও অস্বীকার ও অবিশ্বাস অব্যাহত রেখেছে, তখনই আল্লাহ্ তাআলা আসমানী আযাব পাঠিয়ে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। যেমন, 'আদ সামুদ এবং সালেহ্ ও লূত পয়গম্বরের কওমের বেলায় করা হয়েছে। অথবা পয়গম্বরকেই কাফেরদের দেশ থেকে হিজরত করিয়ে অন্যদিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে তাঁকে শক্তি ও সৈন্যবল দান করে অবাধ্য কওমের বিরুদ্ধে জয়ী করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইরাক থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হযরত মূসা (আঃ) মিসর থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় আগমন করেন এবং সবশেষে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন। অতঃপর সেখান থেকে অভিযান পরিচালনা করে মক্কা জয় করেন। ইহুদীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে তুলে নেয়াও প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার হিজরতই ছিল— তারপর তিনি আবার দুনিয়াতে পদার্পণ করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে পুরোপুরি জয়লাভ করবেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এ হিজরত সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে আকাশের দিকেই করানো হলো কেন? এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং বলেন যে, ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতই। অর্থাৎ, আদম (আঃ) যেমন সাধারণ সৃষ্টজীব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় পিতা-মাতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, তেমনি ঈসা (আঃ)-এর জন্মও সাধারণ মানুষের জন্ম থেকে পৃথক পন্থায় হয়েছে এবং মৃত্যুও অভিনব পন্থায় শত শত বৎসর পর জগতে পুনরাগমনের পরেই হবে। সুতরাং তাঁর হিজরতও যদি ভিন্ন প্রকৃতিতে ও বিস্ময়কর পন্থায় হয়; তবে তাতে আশ্চর্য কি?

এসব বিস্ময়কর ঘটনার কারণেই মূর্খ খ্রীষ্টানরা ভ্রান্তবিশ্বাসে পতিত হয়ে তাঁকে খোদা বলতে শুরু করেছে। অথচ চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এসব ঘটনার মধ্যেই তাঁর বন্দেগী, খোদায়ী নির্দেশের প্রতি আনুগত্য এবং মানবিক গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রমাণাদি রয়েছে। এ কারণেই কোরআন প্রতিটি ক্ষেত্রে ওদের উপরোক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস খন্ডনের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। আকাশে উত্থিত করার ফলে ওদের বিশ্বাস খুব জোরদার হয়ে যেতো। তাই مُتَوَفِّيكَ শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে এ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের প্রধান উদ্দেশ্য ইহুদীদের খন্ডন। কারণ, ওরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করতে ও শূলীতে চড়াতে চেয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা ওদের সব পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দেন।

কিন্তু শব্দ আগে-পিছে করার ফলে আলোচ্য আয়াতে খ্রীষ্টানদের বিশ্বাসও খন্ডন হয়ে গেছে যে, ঈসা (আঃ) খোদা নন যে, তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবেন। এক সময় তাঁরও মৃত্যু হবে।

ইমাম রাযী তফসীরে-কবীরে বলেন ঃ কোরআন মজীদে এমনি ধরনের বিশেষ বিশেষ রহস্যের কারণে শব্দ আগে-পিছে করার ভূরি ভূরি নজির রয়েছে। পরবর্তী ঘটনাকে অগ্রে ও অগ্রবর্তী ঘটনাকে পরে বর্ণনা করা হয়েছে।— (তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা)

وَرَافِعُكَ إِلَيَّ এতে বাহ্যতঃ ঈসা (আঃ)-কেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনাকে উপরে উঠিয়ে নেব। সবাই জানেন যে, ঈসা শুধু আত্মার নাম নয়; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের নাম। কাজেই আয়াতে দৈহিক উত্তোলন বাদ দিয়ে শুধু আত্মিক উত্তোলন বোঝা সম্পূর্ণ ভুল। তবে একথা ঠিক যে, আরবী শব্দটি উচ্চ মর্তবার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন — وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ এবং يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ইত্যাদি আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু এটা জানা কথা যে, উচ্চ মর্তবার অর্থে رفع শব্দটির ব্যবহার রূপক। উল্লেখিত আয়াতসমূহে পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার ভিত্তিতে এ ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে আসল অর্থ ছেড়ে রূপক অর্থ বোঝার কোন কারণ নেই। এ ছাড়া আয়াতে رفع শব্দের সাথে الى ব্যবহার করার কারণে রূপক অর্থের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে গেছে। এ আয়াতে وَرَافِعُكَ إِلَيَّ এবং সূরা নিসার আয়াতেও ইহুদীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন প্রসঙ্গে وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, ইহুদীরা নিশ্চিতই হযরত ঈসাকে হত্যা করেনি, বরং আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। "নিজের কাছে তুলে নেয়া" সশরীরে তুলে নেয়াকেই বলা হয়।

ঈসা (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ্‌র পাঁচটি অঙ্গীকার ঃ আলোচ্য ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইহুদীদের বিপক্ষে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে পাঁচটি অঙ্গীকার করেছেন।

সর্বপ্রথম অঙ্গীকার এই যে, তাঁর মৃত্যু ইহুদীদের হাতে হত্যার মাধ্যমে হবে না, বরং প্রতিশ্রুত সময়ে স্বাভাবিক পন্থায় হবে। প্রতিশ্রুত সময়টি কেয়ামতের নিকটতম যমানায় আসবে। তখন ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। বিভিন্ন সহীহ্ ও মুতাওয়াতির হাদীসে এর বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্গীকার ছিল যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে আপাততঃ উর্ধ্ব জগতে তুলে নেয়া হবে। সাথে সাথে এ অঙ্গীকার পূর্ণ করা হয়।

তৃতীয় অঙ্গীকার ছিল শত্রুদের অপবাদ থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে। এ অঙ্গীকার এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, শেষ নবী (সাঃ) আগমন করে ইহুদীদের যাবতীয় অপবাদ দূর করে দেন। উদাহরণতঃ পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করার কারণে ইহুদীরা ঈসার (আঃ) জন্মবিষয়ে অপবাদ আরোপ করতো। কোরআন এ অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র কুদরত ও নির্দেশে পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। হযরত আদমের জন্মগ্রহণ ছিল আরো বেশী বিস্ময়কর

ব্যাপার। কারণ, তিনি পিতা ও মাতা উভয় ব্যাতিরেকেই জন্মগ্রমণ করেন।

ইহুদীরা ঈসার (আঃ) বিরুদ্ধে খোদায়ী দাবী করার অভিযোগও এনেছিল। কোরআনের অনেক আয়াতে এর বিপরীতে ঈসা (আঃ)-এর বন্দেগী ও মানবত্বের স্বীকারোক্তি বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ অঙ্গীকার وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, অবিশ্বাসীর বিপক্ষে আপনার অনুসারীদের কেয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখা হবে। আয়াতে অনুসরণের অর্থ হযরত ঈসার (আঃ) নবুওয়তে বিশ্বাস করা ও স্বীকারোক্তি করা। এর জন্য যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করা শর্ত নয়। এভাবে খ্রীষ্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তাঁর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মুসলমানরাও ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়তে বিশ্বাসী। এটা ভিন্ন কথা যে, এতটুকু বিশ্বাসই পরকালের মুক্তির জন্যে যথেষ্ট নয়; বরং ঈসা (আঃ)-এর যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করার উপর পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। হযরত ঈসা (আঃ)-এর অকাট্য বিধানাবলীর মধ্যে একটি ছিল এই যে, পরবর্তীকালে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতিও ঈমান আনতে হবে। খ্রীষ্টানরা এটি পালন করেনি। ফলে তারা আখেরাতের মুক্তি থেকে বঞ্চিত। মুসলমানরা এটিও পালন করেছে। ফলে তারা পরকালের মুক্তির অধিকারী হয়েছে। কিন্তু জগতে ইহুদীদের বিপক্ষে বিজয়ী রাখার অঙ্গীকার শুধু হযরত ঈসার (আঃ) নবুওয়তের উপর নির্ভরশীল ছিল। এ অঙ্গীকার অনুযায়ী ইহুদীদের বিপক্ষে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের বিজয় সব সময় অর্জিত হয়েছে এবং নিশ্চিতরূপেই কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এ অঙ্গীকারের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, ইহুদী জাতির বিপক্ষে খ্রীষ্টান ও মুসলমান জাতি সর্বদাই বিজয়ী রয়েছে। তাদের রাষ্ট্রই দুনিয়ার যত্রতত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র ঃ ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র দেখে এ ব্যাপারে সন্দেহ করা যায় না। কারণ, প্রথমতঃ এ রাষ্ট্রটি রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টানদের একটি সামরিক ছাউনী ছাড়া কিছুই নয়। ওরা এটিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। যদি একদিনের জন্যও এর মাথার উপর থেকে রাশিয়া, আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য রাষ্ট্র হাত গুটিয়ে নেয়, তবে বিশ্বের মানচিত্র থেকে এর অস্তিত্ব মুছে যাওয়া সুনিশ্চিত। একারণে বাস্তবধর্মী লোকদের দৃষ্টিতে ইসরাঈলের এ ইহুদী রাষ্ট্রটি একটি আশ্রিত রাষ্ট্রের অতিরিক্ত কিছু নয়। যদি একে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রও ধরেও নেয়া হয়, তবুও খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের সমষ্টির বিপরীতে এ যে নেহাতই একটি আপাংক্তেয় রাষ্ট্র, তা কোন সুস্থবুদ্ধি ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে বলা যায় যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে কিছুদিনের জন্যে ইহুদীদের প্রাধান্য বিস্তারের সংবাদ স্বয়ং ইসলামী রেয়ওয়ায়েতসমূহেই দেয়া হয়েছে। যদি দুনিয়ার আয়ু ফুরিয়ে এসে থাকে এবং কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে থাকে, তবে এ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ইসলামী রেওয়ায়েতের পরিপন্থী নয়। এহেন ক্ষণস্থায়ী আলোড়নকে সাম্রাজ্য অথবা রাষ্ট্র বলা যায় না।

পঞ্চম অঙ্গীকার এই যে, কেয়ামতের দিন সব ধর্মীয় মতবিরোধের মীমাংসা করা হবে। সময় এলে এ অঙ্গীকারও পূর্ণ হবে যে, ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

হযরত ঈসা (আঃ)-এর হায়াত ও অবতরণের প্রশ্ন ঃ জগতে একমাত্র ইহুদীরাই একথা বলে যে, ঈসা (আঃ) নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়ে সমাহিত হয়ে গেছেন এবং পরে জীবিত হননি। কোরআনে সূরা নিসার আয়াতে ওদের এ ধারণার স্বরূপ উদঘাটিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ বাক্যাংশে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা ঈসার (আঃ) শত্রুদের চক্রান্ত স্বয়ং তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ, যেসব ইহুদী তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশে ঘরে প্রবেশ করেছিল, আল্লাহ্ তাআলা তাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তির আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে হুবহু ঈসার (আঃ) ন্যায় করে দেন। অতঃপর হযরত ঈসাকে (আঃ) জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নেন। আয়াতের ভাষা এরূপ ঃ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ "তারা ঈসাকে হত্যা করেনি, শূলীতেও চড়ায়নি। কিন্তু আল্লাহ্‌র কৌশলে তারা সাদৃশ্যের ধাঁধায় পতিত হয় এবং নিজের লোককেই হত্যা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।"

এ দুই দলের বিপরীতে ইসলামের বিশ্বাস আলোচ্য আয়াত ও অন্যান্য কতিপয় আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ইহুদীদের কবল থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নিয়েছেন। তাঁকে হত্যা করা হয়নি এবং শূলীতেও চড়ানো হয়নি। তিনি জীবিতাবস্থায় আকাশে বিদ্যমান রয়েছেন এবং কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আকাশ থেকে অবতরণ করে ইহুদীদের বিপক্ষে জয়লাভ করবেন, অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন।

এ বিশ্বাসের উপর সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হাফেয ইবনে হজর 'তালখীস' গ্রন্থের ৩১৯ পৃষ্ঠায় এ ইজমা উদ্ধৃত করেছেন।

এখানে আমরা একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়টি চিন্তা করলে আলোচ্য প্রশ্নে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। তা এই যে, সূরা আলে-ইমরানের একাদশতম রুকূতে আল্লাহ্ তাআলা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উল্লেখ প্রসঙ্গে হযরত আদম, নূহ, ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধরের উল্লেখ একটিমাত্র আয়াতে সংক্ষেপে করেছেন। এরপর প্রায় তিন রুকূর বাইশটি আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উল্লেখ এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে যে, কোরআন যাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর উল্লেখও এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়নি। হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতামহীর উল্লেখ, তাঁর মানতের বর্ণনা, জননীর জন্ম, তাঁর নাম, তাঁর লালন-পালনের বিস্তারিত বিবরণ, ঈসা (আঃ)-এর জননীর গর্ভে আগমন, অতঃপর জন্মের বিস্তারিত অবস্থা, জন্মের পর জননী কি পানাহার করলেন, শিশু সন্তানকে নিয়ে গৃহে আগমন, পরিবারের লোকদের ভর্ৎসনা, জন্মের পরপরই ঈসা (আঃ)-এর বাকশক্তি প্রাপ্তি, যৌবনে পদার্পণ, স্বজাতিকে ধর্মের প্রতি আহ্বান, তাদের বিরোধিতা, সহচরদের সাহায্য, ইহুদীদের ষড়যন্ত্র, জীবিতাবস্থায় আকাশে উত্থিত হওয়া প্রভৃতি। এরপর মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে তাঁর আরও গুণাবলী,আকার আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণও এমনিভাবে দেয়া হয়েছে যে, সমগ্র কোরআন ও হাদীসে কোন পয়গম্বরের জীবনালেখ্য এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়টিই সকলের পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এরূপ কেন করা হয়েছে এবং এর তাৎপর্য কি?

সামান্য চিন্তা করলেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায় যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) হলেন সর্বশেষ নবী, তাঁরপর আর কোন নবী আসবেন না। এ কারণে, তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভাব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই একদিকে তিনি পরবর্তীকালে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং সাধারণ গুণাবলীর মাধ্যমে ও অনেকের বেলায় নাম উল্লেখ করে তাঁদের অনুসরণ করতে জোর তাকিদ করেছেন। অপরদিকে উম্মতের ক্ষতিসাধনকারী পথভ্রষ্ট লোকদের পরিচয়ও বলেছেন।

পরবর্তীকালে আগমনকারী পথভ্রষ্টদের মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক হবে দাজ্জাল। তার ফেতনাই হবে সর্বাধিক বিভ্রান্তিকর। হযরত নবী করীম (সাঃ) তার এত বেশী হাল-হাকীকত বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তার আগমনের সময় সে যে পথভ্রষ্ট, এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ থাকবে না। এমনিভাবে পরবর্তীকালে আগমনকারী সংস্কারক ও অনুসরণযোগ্য মনীষিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন হযরত ঈসা (আঃ)। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নবুওয়ত ও রিসালতের সম্মানে ভূষিত করেছেন; দাজ্জালের ফিৎনার সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাহায্যের জন্যে আকাশে জীবিত রেখেছেন এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জাল হত্যার জন্যে নিয়োজিত হবেন। এ কারণে তাঁর জীবনালেখ্য ও গুণাবলী মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন ছিল, যাতে তাঁর অবতরণের সময় তাঁকে চেনার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ ও বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে।

এর রহস্য ও উপযোগিতা অনেক। প্রথম, তাঁর পরিচয়ে জটিলতা থাকলে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে। মুসলিম সম্প্রদায় তাঁর সাথে সহযোগিতা করবে না। ফলে তিনি কিভাবে তাদের সাহায্য করবেন?

দ্বিতীয়, হযরত ঈসা (আঃ) সে সময় নবুওয়ত ও রিসালতের দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট হয়ে জগতে আসবেন না; বরং মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদানের উদ্দেশে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করবেন, কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি স্বীয় নবুওয়তের পদ থেকে অপসারিতও হবেন না। তখন তিনি হবেন প্রাদেশিক শাসকের মত, যিনি নিজ প্রদেশের শাসক পদে অধিষ্ঠিত থেকেও প্রয়োজন বশতঃ অন্য প্রদেশে চলে যান। তিনি এ প্রদেশে শাসক হিসেবে না এলেও নিজ প্রদেশের শাসক পদ থেকে অপসারিতও নন। মোটকথা এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) তখনও নবুওয়ত ও রিসালতের গুণে গুণান্বিত হবেন। তাঁকে অস্বীকার করা পূর্বে যেরূপ কুফর ছিল, তখনও কুফর হবে। এমতাবস্থায় মুসলিম সম্প্রদায় যারা কোরআনী নির্দেশের ভিত্তিতে পূর্ব থেকেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী—যদি অবতরণের সময় তাঁকে চিনতে না পারে, তবে অবিশ্বাসে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

তৃতীয়,ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের ঘটনা দুনিয়ার অন্তিম পর্যায়ে সংঘটিত হবে। এমতাবস্থায় তাঁর অবস্থা ও লক্ষণাদি অস্পষ্ট হলে অন্য কোন প্রতারকের পক্ষ থেকে এরূপও দাবী করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যে, আমিই মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম। এখন কেউ এরূপ করলে লক্ষণাদির সাহায্যে তাকে প্রত্যাখান করা যাবে। উদাহরণতঃ হিন্দুস্থানে এক সময় মির্যা কাদিয়ানী দাবী করে বসে যে, সে-ই প্রতিশ্রুত মসীহ্। মুসলমান ওলামাগণ এসব লক্ষণের সাহায্যেই তার এ ভ্রান্ত দাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বিপদাপদ মুমিনদের জন্যে প্রায়শ্চিত্য স্বরূপ : فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ এ আয়াতের বিষয়বস্তুতে সামান্য একটা প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কিয়ামতের মীমাংসার বর্ণনায় একথা বলার মানে কি যে, ইহকাল ও পরকালে শাস্তি দেব? কারণ, তখন তো ইহকালের শাস্তি হবেই না।

এর সমাধান এই যে, এ কথাটি অপরাধীকে লক্ষ্য করে বিচারকের এরূপ উক্তির মতই যে, এখন তোমাকে এক বছর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমতাবস্থায় পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হলে নিশ্চিতরূপেই দুই বছরের সাজা হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে এক বছরের সাথে অতিরিক্ত এক বছর যুক্ত হয়ে মোট দুই বৎসর সাজা হবে।

আলোচ্য আয়াতেও তদ্রূপ বোঝা দরকার। ইহকালের সাজা তো হয়েই গেছে। এর সাথে পরকালের সাজা যুক্ত হয়ে কিয়ামতের দিন মোট সাজা পূর্ণ করা হবে। অর্থাৎ, ইহকালের সাজা পরকালের সাজার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। কিন্তু মুমিনদের অবস্থা এর বিপরীত। ইহকালে তাদের উপর কোন বিপদাপদ এলে গোনাহ্ মাফ হয়। এবং পরকালের দণ্ড লঘু অথবা রহিত হয়। সে কারণেই لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুমিনগণ ঈমানের কারণে আল্লাহ্‌র প্রিয়। প্রিয়জনের সাথে এমনি ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে কাফেররা কুফরের কারণে আল্লাহ্‌র ঘৃণার পাত্র। ঘৃণিতদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা হয় না।—(বয়ানুল কোরআন)

কিয়াসের প্রামাণ্যতা : اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ
এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কিয়াসও শরীয়তসম্মত প্রমাণ। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন : ঈসা (আঃ)-এর জন্ম আদমের জন্মের অনুরূপ। অর্থাৎ, আদম (আঃ)-কে যেমন জনক (ও জননী) ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈসা (আঃ)-কেও তদ্রূপ জনক ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব এখানে আল্লাহ্ তাআলা ঈসা (আঃ)-এর সৃষ্টিকে আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির উপর কিয়াস করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।—(মাযহারী)

মুবাহালার সংজ্ঞা :......... فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সাঃ)-কে মুবাহালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুবাহালার সংজ্ঞা এই : যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তিতর্কে মীমাংসা না হয়, তবে তারা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। লা'নতের অর্থ আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া। আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া মানেই খোদায়ী ক্রোধের নিকটবর্তী হওয়া। এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত হোক। এরূপ করার পর যে পক্ষ মিথ্যাবাদী, সে তার প্রতিফল ভোগ করবে। সেসময় সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পরিচয় অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতেও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এভাবে প্রার্থনা করাকে 'মুবাহালা' বলা হয়। এতে বিতর্ককারীরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করলেই চলে। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে একত্রিত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একত্রিত করলে এর গুরুত্ব বেড়ে যায়।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌۢ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾ قُلْ يَا أَهْلَ
الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
مِّنْ دُونِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾
يَا أَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرٰهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ
وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ هٰٓأَنْتُمْ
هٰٓؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ
تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ إِبْرٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّ
لٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرٰهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا
النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾
وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ۚ
وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾ يَا أَهْلَ
الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾

(৬৩) তারপর যদি তারা গ্রহণ না করে, তাহলে প্রমাদ সৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ্ জানেন। (৬৪) বলুন ঃ 'হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও, ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না।' তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, 'সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।' (৬৫) হে আহ্‌লে কিতাবগণ! কেন তোমরা ইবরাহীমের বিষয়ে বাদানুবাদ কর? অথচ তওরাত ও ইঞ্জীল তাঁর পরেই নাযিল হয়েছে। তোমরা কি বোঝ না? (৬৬) শোন! ইতিপূর্বে তোমরা যে বিষয়ে কিছু জানতে, তাই নিয়ে বিবাদ করতে। এখন আবার যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না, সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছ? (৬৭) ইবরাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন 'হানীফ' অর্থাৎ, সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আত্মসমর্পণকারী, এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না। (৬৮) মানুষদের মধ্যে যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম-আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু। (৬৯) কোন কোন আহ্‌লে-কিতাবের আকাঙ্খা, যাতে তোমাদের গোমরাহ করতে পারে, কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই গোমরাহ করে না। অথচ তারা বুঝতে পারে না। (৭০) হে আহ্‌লে-কিতাবগণ, কেন তোমরা আল্লাহ্‌র কালামকে অস্বীকার কর, অথচ তোমরাই তাঁর প্রবক্তা?

মুবাহালার ঘটনা ঃ এর পটভূমি এই যে, মহানবী (সাঃ) নাজরানের খ্রীষ্টানদের কাছে একটি ফরমান প্রেরণ করেন। এতে ধারাবাহিকভাবে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয় ঃ (১) ইসলাম কবুল কর, (২) অথবা জিযিয়া কর দাও, (৩) অথবা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। খ্রীষ্টানরা পরস্পর পরামর্শ করে শোরাহ্‌বীল, আবদুল্লাহ্ ইবনে শোরাহ্‌বিল ও জিবার ইবনে ফয়েজকে হুযূর (সাঃ)-এর কাছে পাঠায়। তারা এসে ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা শুরু করে। একপর্যায়ে তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে উপাস্য প্রতিপন্ন করার জন্যে প্রবল বাদানুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে মুবাহালার উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে রসূলে খোদা (সাঃ) প্রতিনিধিদলকে মুবাহালার আহবান জানান এবং নিজেও হযরত ফাতিমা, হযরত আলী এবং ইমাম হাসান-হোসাইনকে সঙ্গে নিয়ে মুবাহালার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসেন। এ আত্মবিশ্বাস দেখে শোরাহবীল ভীত হয়ে যায় এবং সাথীদ্বয়কে বলতে থাকে ঃ তোমরা জান যে, ইনি আল্লাহর নবী। আল্লাহ্‌র নবীর সাথে মুবাহালা করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই মুক্তির অন্য কোন পথ খোঁজ। সঙ্গীদ্বয় বললো ঃ তোমার মতে মুক্তির উপায় কি? সে বলল ঃ আমার মতে নবীর শর্তানুযায়ী সন্ধি করাই উত্তম উপায়। অতঃপর এতেই প্রতিনিধিদল সম্মত হয় এবং মহানবী (সাঃ) তাদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করে মীমাংসায় উপনীত হন।— (ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড)

তবলীগের মূলনীতি ঃ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ এ আয়াত থেকে তবলীগ তথা দ্বীনের প্রতি আমন্ত্রণ জানানোর একটি মূলনীতি জানা যায়। তা এই যে, ভিন্ন মতাবলম্বী কোন দলকে দ্বীনের প্রতি আমন্ত্রণ জানাতে হলে প্রথমে তাকে শুধু এমন বিষয়ের প্রতিই আহবান জানানো উচিত, যে বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হতে পারে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন রোম সম্রাটকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন এমন বিষয়ের প্রতি আহবান জানান, যাতে উভয়েই একমত ছিলেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার এক-ত্ববাদ। আমন্ত্রণলিপিটি নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ

"আমি আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি—যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। এ পত্র আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। যে হেদায়েতের পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাই। মুসলমান হয়ে যান ; শান্তি লাভ করবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর যদি বিমুখ হন, তবে আপনার প্রজা সাধারণের গোনাহ্ আপনার উপর পতিত হবে। হে আহ্‌লে কিতাবগণ! এমন এক বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। তা এই যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও ইবাদত করবো না। তাঁর সাথে অংশীদার করবো না এবং আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করবো না।"

فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ এ আয়াতে 'সাক্ষী থাক' বলে আমাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যুক্তিপ্রমাণ সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হওয়ার পরেও সত্যকে স্বীকার না করলে স্বীয় মতাদর্শ প্রকাশ করে বিতর্কে ইতি টানা উচিত—অধিক আলোচনা ও কথা কাটাকাটি সমীচীন নয়।

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧١﴾ وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٧﴾

(৭১) হে আহলে-কিতাবগণ, কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রিত করছ এবং সত্যকে গোপন করছ, অথচ তোমরা তা জান। (৭২) আর আহলে-কিতাবগণের একদল বললো, মুসলমানগণের উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে দিনের প্রথম ভাগে মেনে নাও, আর দিনের শেষ ভাগে অস্বীকার কর, হয়তো তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। (৭৩) যারা তোমাদের ধর্মমতে চলবে, তাদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করবে না। বলে দিন, নিঃসন্দেহে হেদায়েত সেটাই, যে হেদায়েত আল্লাহ্ করেন। আর এসব কিছু এ জন্যে যে, তোমরা যা লাভ করেছিলে তা অন্য কেউ কেন প্রাপ্ত হবে, কিংবা তোমাদের পালনকর্তার সামনে তোমাদের উপর তারা কেন প্রবল হয়ে যাবে। বলে দিন, মর্যাদা আল্লাহ্রই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ। (৭৪) তিনি যাকে ইচ্ছা নিজের বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন। আর আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল। (৭৫) কোন কোন আহলে-কিতাব এমনও রয়েছে, তোমরা যদি তাদের কাছে বহু ধন-সম্পদ আমানত রাখ, তাহলেও তা তোমাদের যথারীতি পরিশোধ করবে। আর তাদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছে যারা একটি দীনার গচ্ছিত রাখলেও ফেরত দেবে না— যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়াতে পারবে। এটা এজন্য যে, তারা বলে রেখেছে যে, উম্মীদের অধিকার বিনষ্ট করাতে আমাদের কোন পাপ নেই। আর তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে জেনে শুনেই মিথ্যা বলে। (৭৬) যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং পরহেজগার হবে, অবশ্যই আল্লাহ্ পরহেজগারদেরকে ভালবাসেন। (৭৭) যারা আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দেবেন না। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ও اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, তারা সত্যের স্বীকারোক্তি না করলে অথবা তাদের জানা না থাকলে অবিশ্বাস করা বৈধ হবে। কারণ, কুফরী তথা অবিশ্বাস এমনিতেই একটি মন্দ কাজ। এটা সর্বাবস্থায়ই অবৈধ। তবে স্বীকারোক্তির পর কুফর করলে তা অধিকতর তিরস্কার ও ধিক্কারের যোগ্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অমুসলানের উত্তম গুণাবলীর প্রশংসা ঃ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ এ আয়াতে কিছুসংখ্যক লোকের আমানতে বিশ্বস্ত হওয়ার কারণে প্রশংসা করা হয়েছে। আয়াতে 'কিছু সংখ্যক লোক' বলে যদি ঐসব আহ্লে-কিতাবকে বোঝানো হয়ে থাকে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তবে এ প্রশংসায় কোনরূপ জটিলতা নেই। কিন্তু যদি সাধারণ আহ্লে-কিতাব বোঝানো হয়ে থাকে, যারা অ-মুসলিম, তবে প্রশ্ন হয় যে, কাফেরের কোন আমলই গ্রহণযোগ্য নয়; এমতাবস্থায় তার প্রশংসার অর্থ কি?

উত্তর এই যে, প্রশংসা করলেই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া বোঝায় না। এখানে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, ভাল কাজ কাফেরের হলেও তা এক পর্যায়ে ভালই। সে এর উপকার দুনিয়াতে সুখ্যাতির আকারে এবং আখেরাতে শাস্তি হ্রাসের আকারে পাবে।

এ বর্ণনায় একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা নেই, বরং সে খোলা মনে প্রতিপক্ষের সদগুণাবলীরও প্রশংসা করে।

اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا – এ আয়াত দ্বারা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) প্রমাণ করেছেন যে, ঋণদাতা ব্যক্তির প্রাপ্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণগ্রহীতাকে তাগাদা করতে থাকার অধিকার তার রয়েছে। – (কুরতুবী, ৪র্থ খণ্ড)

অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে সতর্কবাণী ঃ উভয় পক্ষে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যা সাব্যস্ত হয় এবং যা পূর্ণ করা উভয় পক্ষের জন্যে জরুরী, এমন বিষয়কে অঙ্গীকার বলা হয়। ওয়াদা শুধু এক পক্ষ থেকে হয়। অতএব, অঙ্গীকার ব্যাপক এবং ওয়াদা সীমিত।

কোরআন ও সুন্নাহ্য় অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপরোল্লেখিত ৭৭ তম আয়াতেও অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে পাঁচটি সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছে ঃ

(১) জান্নাতের নেয়ামতসমূহে তার কোন অংশ নেই। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ দ্বারা কোন মুসলমানের অধিকার নষ্ট করে, সে নিজের জন্যে দোযখের শাস্তিকে অপরিহার্য করে নেয়। বর্ণনাকারী আরয করলেন ঃ যদি বিষয়টি সামান্য হয় তবুও কি দোযখ অপরিহার্য হবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তা গাছের একটা তাজা ডালই হোক না কেন? – (মুসলিম)

(২) আল্লাহ্ তাআলা তার সাথে অনুকম্পাসূচক কথা বলবেন না।

(৩) কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তাকে রহ্মতের দৃষ্টিতে দেখবেন না।

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ
مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ
اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ
هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا
الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ
اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ
اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ
لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ
عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ
مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

(৭৮) আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহ্‌র কথা অথচ এসব আল্লাহ্‌র কথা নয়। আর তারা জেনে-শুনে আল্লাহ্‌রই প্রতি মিথ্যারোপ করে। (৭৯) কোন মানুষকে আল্লাহ্ কিতাব, হেকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে বলবে যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌কে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও' -- এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহ্ ওয়ালা হয়ে যাও, যেমন, তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।' (৮০) তাছাড়া তোমাদেরকে একথা বলাও সম্ভব নয় যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীগণকে নিজেদের পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও। তোমাদের মুসলমান হবার পর তারা কি তোমাদেরকে কুফরী শেখাবে? (৮১) আর আল্লাহ্ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, 'আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন সে রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমারা কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ?' তারা বললো, 'আমরা অঙ্গীকার করছি।' তিনি বললেন, 'তাহলে এবার সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।' (৮২) অতঃপর যে লোক এই ওয়াদা থেকে ফিরে দাঁড়াবে, সেই হলো নাফরমান। (৮৩) তারা কি আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।

(৪) আল্লাহ্ তাআলা তার পাপ মার্জনা করবেন না। কেননা, অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে বান্দার হক নষ্ট হয়েছে। বান্দার হক নষ্ট করলে আল্লাহ্ মার্জনা করেন না।

(৫) তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পয়গম্বরগণের নিষ্পাপ হওয়ার একটি যুক্তি ঃ مَا كَانَ لِبَشَرٍ নাজরানের প্রতিনিধিদলের উপস্থিতিতে কোন কোন ইহুদী ও খ্রীষ্টান বলেছিল ঃ হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনি কি চান যে, আমরা আপনার তেমনি উপাসনা করি, যেমনি খ্রীষ্টানরা ঈসা ইবনে মরিয়মের উপাসনা করে? হযরত (সাঃ) বলেছিলেন ঃ (মা'আযাল্লাহ্) এটা কিরূপে সম্ভব যে, আমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যের এবাদত করি অথবা অপরকে এর প্রতি আহবান জানাই? আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এ উদ্দেশে প্রেরণ করেননি। এ কথোপকথনের পরই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, মানুষকে আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশেই আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে কিতাব, হেক্‌মত ও পয়গম্বরের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেন। মানুষকে আল্লাহ্‌র এবাদত থেকে সরিয়ে স্বয়ং নিজের অথবা অন্য কোন সৃষ্টজীবের দাসে পরিণত করার চেষ্টা পয়গম্বরের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ, এর অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্ যাকে যে পদের যোগ্য মনে করে প্রেরণ করেন, সে বাস্তবে সে কাজের যোগ্য নয়। জগতের কোন সরকার কোন ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করার পূর্বে দু'টি বিষয় চিন্তা করে নেয়:

(১) লোকটি সরকারের নীতি বোঝার ও স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের যোগ্যতা রাখে কি না?

(২) সরকারী আদেশ পালন ও জনগণকে সরকারের আনুগত্যের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখার ব্যাপারে তার কাছ থেকে কতটুকু দায়িত্ববোধ আশা করা যায়? যার সম্পর্কে বিদ্রোহ অথবা সরকারী নীতি লংঘনের সামান্যতম সন্দেহ থাকে, তাকে কোন সরকারই প্রতিনিধি বা দূত নিযুক্ত করতে পারে না। তবে কোন ব্যক্তির যোগ্যতা ও আনুগত্যের সঠিক পরিমাপ করা জাগতিক সরকারের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার বেলায় এরূপ সম্ভাবনা নেই। যদি কোন মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ্ জানে যে, সে খোদায়ী আনুগত্যের সীমা চুল পরিমাণও লঙ্ঘন করবে না, তবে পরে এর ব্যতিক্রম হওয়া একেবারেই অসম্ভব। নতুবা আল্লাহ্‌র জ্ঞান ভ্রান্ত হয়ে যাবে। (নাউযুবিল্লাহ্)। এখান থেকেই পয়গম্বরগণের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব, পয়গম্বরগণ যখন সামান্যতম অবাধ্যতা থেকেও পবিত্র, তখন শিরক তথা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা কোথায় অবশিষ্ট থাকে?

আল্লাহ্ তাআলার তিনটি অঙ্গীকার ঃ আল্লাহ্ তাআলা বান্দার কাছ থেকে তিনটি অঙ্গীকার নিয়েছেন। একটি সূরা আ'রাফের اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র মানবজাতি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও রবুবিয়াতে বিশ্বাসী হবে। কেননা, ধর্মের গোটা প্রাচীর এ ভিত্তির উপরই নির্মিত। এ বিশ্বাস না থাকলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিবেক ও চিন্তার পথ প্রদর্শন কোন উপকারেই আসে না। এ সম্পর্কে যথাস্থানে

আরও আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় অঙ্গীকার وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। অঙ্গীকার শুধু আহ্‌লে-কিতাব পণ্ডিতদের কাছ থেকেই নেয়া হয়েছে, যাতে তারা সত্য গোপন না করে।

তৃতীয় অঙ্গীকার আলোচ্য আয়াত وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ এ উল্লেখিত হয়েছে। এর বিবরণ পরে আসবে। – (তফসীরে-আহমদী)

مِيْثَاقَ এর অর্থ কি এবং তা কোথায় নেয়া হয়েছে ঃ এ অঙ্গীকার আত্মার জগতে অথবা পৃথিবীতে ওহীর মাধ্যমে নেয়া হয়েছে। – (বয়ানুল-কোরআন)।

কি অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল, তা কোরআনেই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কি সম্পর্কে নেয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে বিভিন্নজনের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত আলী ও হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা সব পয়গম্বরের কাছ থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে অঙ্গীকার নেন যে, তাঁরা স্বয়ং যদি তাঁর আমলে জীবিত থাকেন, তবে যেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন। স্বীয় উম্মতকেও যেন এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে যান।

হযরত তাউস, হাসান বসরী, কাতাদাহ্ প্রমুখ তফসীরবিদগণ বলেন ঃ পয়গম্বরগণের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল— যাতে তাঁরা পরস্পরকে সাহায্য ও সমর্থন দান করেন। – (তফসীরে ইবনে কাসীর)

নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা শেষোক্ত উক্তির সমর্থন হতে পারে–

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ
وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

কেননা, এ অঙ্গীকার একে অন্যের সাহায্য ও সমর্থনের জন্যে নেয়া হয়েছিল। – (তফসীরে – আহ্‌মদী)

উভয় তফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ কারণে আয়াতের অর্থ উভয়টিই হতে পারে। – (ইবনে-কাসীর)

মহানবী (সাঃ)-এর বিশ্বজনীন নবুওয়ত ঃ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা সব পয়গম্বরের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেন যে, আপনাদের মধ্য থেকে কোন পয়গম্বরের পর যখন অন্য পয়গম্বর আগমন করেন— যিনি অবশ্যই পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও খোদায়ী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী হবেন, তখন পূর্ববর্তী নবীর জন্যে জরুরী হবে নতুন নবীর সত্যতা ও নবুওয়তের প্রতি নিজে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অন্যকেও বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ দিয়ে যাওয়া। কোরআনের এ সামগ্রিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কেও এমনি ধরনের অঙ্গীকার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কাছ থেকে নিয়ে থাকবেন। আল্লামা সুবকী বলেন ঃ এ আয়াতে রসূল বলে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বোঝানো হয়েছে এবং এমন কোন পয়গম্বর অতিবাহিত হননি, যাঁর কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে অঙ্গীকার নেয়া হয়নি। এমনিভাবে এমন কোন পয়গম্বর অতিবাহিত হননি, যিনি স্বীয় উম্মতকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে ও সাহায্য সমর্থন করতে নির্দেশ দেননি। যদি মহানবী (সাঃ) সেসব পয়গম্বরের আমলেই আবির্ভূত হতেন, তবে তিনিই সবার নবী হতেন এবং তারা সবাই তাঁর উম্মত হতেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি শুধু নিজের উম্মতেরই নবী নন, নবীগণেরও নবী। এক হাদীসে এরশাদ করেছেন ঃ "আজ যদি মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁরও গত্যন্তর ছিল না।"

অন্য এক হাদীসে বলেন ঃ যখন ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন তিনিও কোরআন এবং তোমাদের নবীর বিধি-বিধানই পালন করবেন।— (তফসীরে ইবনে-কাসীর)

এতে বোঝা যায় যে, মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত বিশ্বজনীন। তাঁর শরীয়তের মধ্যে পূর্ববর্তী সব শরীয়ত পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এ বর্ণনা থেকে بعثت الى الناس كافة (আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি।) হাদীসের বিশুদ্ধ অর্থও স্পষ্ট হয়ে গেছে। মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত শুধু তাঁর আমল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে—হাদীসের এরূপ অর্থ করা ঠিক নয়। বরং তাঁর নবুওয়তের যমানা এত বিস্তৃত যে, হযরত আদমের নবুওয়তেরও পূর্ব থেকে এর আরম্ভ। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ আদমের দেহে আত্মা সঞ্চারের পূর্বেই আমি নবী ছিলাম। হাশরের ময়দানে শাফাআতের জন্যে অগ্রসর হওয়া, তাঁর পতাকাতলে সমগ্র মানবজাতির একত্রিত হওয়া এবং মি'রাজ-রজনীতে বায়তুল-মুকাদ্দাসে সব পয়গম্বরের ইমামতি করা তাঁর বিশ্বজনীন নেতৃত্বের অন্যতম লক্ষণ।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَ
اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَ
عِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ
لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا
كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ
الْبَيِّنٰتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ
اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٧﴾
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٨﴾
اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٨٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ
ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ﴿٩٠﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ
مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٩١﴾

(৮৪) বলুন, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানবর্গের উপর আর যা কিছু পেয়েছেন মূসা ও ঈসা এবং অন্যান্য নবী রসূলগণ তাঁদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আমরা তাঁদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত। (৮৫) যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (৮৬) কেমন করে আল্লাহ্ এমন জাতিকে হেদায়েত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর এবং রসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফের হয়েছে। আর আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। (৮৭) এমন লোকের শাস্তি হলো আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত (৮৮) সর্বক্ষণই তারা তাতে থাকবে। তাদের আযাব হাল্‌কাও হবে না এবং তারা এতে অবকাশও পাবে না। (৮৯) কিন্তু যারা অতঃপর তওবা করে নেবে এবং সৎকাজ করবে তারা ব্যতীত, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৯০) যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকৃতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে, কস্মিনকালেও তাদের তওবা কবূল করা হবে না— আর তারা হলো গোমরাহ্। (৯১) যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে দেয়া হয়, তবুও যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তওবা কবূল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব! পক্ষান্তরে তাদের কোনই সাহায্যকারী নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামই মুক্তির পথ ঃ ইসলামের শাব্দিক অর্থ আনুগত্য করা। পরিভাষায় একটি বিশেষ ধর্মের আনুগত্য করার নাম ইসলাম, যা আল্লাহ্ তাআলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে মানবজাতির হেদায়তের জন্যে প্রেরণ করেছেন। কেননা, সব পয়গম্বরের শরীয়তে ধর্মের মূলনীতি এক ও অভিন্ন।

অতঃপর ইসলাম শব্দটি কখনও উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কখনও শুধু সর্বশেষ শরীয়তের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা শেষ নবী (সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনে উভয় প্রকার ব্যবহারই বিদ্যমান। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ নিজেকে 'মুসলিম' এবং নিজ নিজ উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমাহ্' বলেছেন—একথাও কোরআন থেকেই প্রমাণিত। শেষ নবী (সাঃ)-এর উম্মতকে বিশেষভাবে 'মুসলিম' বলাও কোরআনেই উল্লেখিত রয়েছে। هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا

মোটকথা, যে কোন পয়গম্বর যে কোন খোদায়ী ধর্ম নিয়ে জগতে আগমন করেছেন, তাকেই ইসলাম বলা হয় এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের বিশেষ উপাধি হিসেবেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখন প্রশ্ন হয় যে, আলোচ্য আয়াতে ইসলাম শব্দ দ্বারা কোন্ অর্থ বোঝানো হয়েছে।

বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, যে কোন অর্থই বোঝানো হোক, পরিণামের দিক দিয়ে তাতে কোন পার্থক্য হয় না। কেননা, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের ইসলাম একটি সীমিত শ্রেণীর জন্য এবং বিশেষ যমানার জন্যে ছিল। ঐ শ্রেণীর উম্মত ছাড়া অন্যদের জন্যে তখনও সেই ইসলাম গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেই নবীর পর যখন অন্য নবী প্রেরিত হন, তখন সে ইসলামও বিদায় নেয়। নতুন নবী যা নিয়ে আগমন করতেন, তাই হতো তখনকার ইসলাম। এতে অবশ্য মৌলিক কোন পরিবর্তন হতো না, শুধু শাখাগত বিধি-বিধান ভিন্ন হতো। শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে যে ইসলাম দেয়া হয়েছে, তা অপরিবর্তনীয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। উল্লেখিত নীতি অনুযায়ী তাঁর আবির্ভাবের পর পূর্ববর্তী সব ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। এখন পূর্বেকার ইসলাম আর ইসলাম নয়। বরং হুযূর (সাঃ)-এর মাধ্যমে যা পৃথিবীতে পৌছেছে, তাই হলো ইসলাম। এ কারণেই বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ আজ যদি হযরত মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অন্য এক হাদীসে বলেন ঃ কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা (আঃ) যখন অবতরণ করবেন, তখন নবুওয়তের পদে সমাসীন থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার শরীয়তেরই অনুসরণ করবেন।

অতএব এ আয়াতে ইসলামের যে কোন অর্থই নেয়া হোক, পরিণাম উভয়েরই এক। অর্থাৎ, শেষ নবীর অবির্ভাবের পর একমাত্র তাঁর আনীত ধর্মকেই ইসলাম বলা হবে। এ ধর্মই বিশ্বাবাসীর মুক্তির উপায়। আলোচ্য আয়াতে এ ধর্ম সর্ম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ্‌র কাছে তা গ্রহণীয় নয়।

একটি সন্দেহের অপনোদন ঃ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ সন্দেহ হয় যে, ধর্মত্যাগী হওয়ার পর কেউ হেদায়েত পায় না। অথচ বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত। কেননা, অনেক লোক ধর্মত্যাগী হওয়ার পরেও ঈমান এনে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে যায়।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا
مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ ﴿۹۲﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِیْلُ عَلٰی نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ
تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِیْنَ ﴿۹۳﴾ فَمَنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ
فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۹۴﴾ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۫ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِیْمَ
حَنِیْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۹۵﴾ اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِیْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًی لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴿۹۶﴾ فِیْهِ اٰیٰتٌۢ بَیِّنٰتٌ مَّقَامُ
اِبْرٰهِیْمَ ۚ۬ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ
الْعٰلَمِیْنَ ﴿۹۷﴾ قُلْ یٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ ۖۗ وَاللّٰهُ
شَهِیْدٌ عَلٰی مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۸﴾ قُلْ یٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ
سَبِیْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۹﴾ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِیْعُوْا فَرِیْقًا
مِّنَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ یَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِیْمَانِكُمْ كٰفِرِیْنَ ﴿۱۰۰﴾

(৯২) কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ্ তা জানেন। (৯৩) তওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইয়াকুব যেগুলো নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন, সেগুলো ব্যতীত সমস্ত আহার্য বস্তুই বনী-ইসরায়ীলদের জন্য হালাল ছিল। তুমি বলে দাও, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ কর।' (৯৪) অতঃপর আল্লাহ্র প্রতি যারা মিথ্যা আরোপ করেছে, তারাই যালেম – সীমালংঘনকারী। (৯৫) বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলেছেন। এখন সবাই ইবরাহীমের ধর্মের অনুগত হয়ে যাও, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠভাবে সত্যধর্মের অনুসারী। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (৯৬) নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। (৯৭) এতে রয়েছে 'মকামে-ইবরাহীমের' মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ ঘরের হজ্ব করা হলো মানুষের উপর আল্লাহ্র প্রাপ্য ; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না— আল্লাহ্ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না। (৯৮) বলুন, হে আহলে-কিতাবগণ, কেন তোমরা আল্লাহ্র কিতাব অমান্য করছো, অথচ তোমরা যা কিছু কর, তা আল্লাহ্র সামনেই রয়েছে (৯৯)। বলুন, হে আহলে-কিতাবগণ! কেন তোমরা আল্লাহ্র পথে ঈমানদারদিগকে বাধা দান কর— তোমরা তাদের দ্বীনের মধ্যে বক্রতা অনুপ্রবেশ করানোর পন্থা অনুসন্ধান কর, অথচ তোমরা এ পথের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবগত নন। (১০০) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে-কিতাবদের কোন ফেরকার কথা মান, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদিগকে কাফেরে পরিণত করে দেবে।

উত্তর এই যে, আয়াতে হেদায়েতের সম্ভাবনা নাকচ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের বাচনভঙ্গিতে এর উদাহরণ, যেন কোন বিচারক নিজ হাতে কোন দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দিলেন। দুষ্কৃতকারী বলতে লাগলো ঃ বিচারক নিজ হাতে আমাকে মর্যাদা দান করেছেন। এর উত্তরে বিচারক বললেন ঃ এমন দুরাচারকে আমি কেন মর্যাদা দান করতে যাবো? অর্থাৎ, এটা মর্যাদা দানের ব্যাপারই নয়। অর্থ এই নয় যে, এ ব্যক্তি শিষ্টতা অবলম্বন করার পরেও মর্যাদাপ্রাপ্তির যোগ্য হতে পারে না। – (বয়ানুল-কোরাআন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াত ও সাহাবায়ে কেরামের কর্ম প্রেরণা ঃ সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন কোরআনী নির্দেশের প্রথম সম্বোধিত এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রত্যক্ষ সঙ্গী। কোরআনী নির্দেশ পালনের জন্যে তাঁরা ছিলেন উন্মুখ। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সহায় সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করলেন যে, কোনটি তাঁদের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এরপর আল্লাহ্র পথে তা ব্যয় করার জন্যে তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আবেদন করতে লাগলেন। মদীনার আনসারগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন হযরত আবু তাল্হা (রাঃ)। মসজিদে নবভী সংলগ্ন বিপরীত দিকে তাঁর একটি বাগানে 'বীরহা' নামে একটি কূপ ছিল। বর্তমানে বাগানের স্থলে বাবে-মজীদীর সামনে 'আস্তফা-মনযিল' নামে একটি দালান অবস্থিত রয়েছে। এতে মদীনা যিয়ারতকারী হাজিগণ অবস্থান করেন। এর উত্তর পূর্ব কোণে 'বীরহা' কূপটি অদ্যাবধি স্বনামে বিদ্যমান রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাঝে মাঝে এ বাগানে পদার্পণ করতেন এবং বীরহা কূপের পানি পান করতেন। এ কূপের পানি তিনি পছন্দও করতেন। আবু তালহার এ বাগান অত্যন্ত মূল্যবান, উর্বর এবং তাঁর বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন ঃ আমার সব বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে বীরহা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আমি এটি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে চাই। আপনি যে কাজে পছন্দ করেন, এটি তাতেই খরচ করুন। হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ বিরাট মুনাফার এ বাগানটি আমার মতে আপনি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দিন। হযরত আবু তালহা এ পরামর্শ শিরোধার্য করে বাগানটি স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেন। – (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, শুধু ফকীর-মিসকীনকে দিলেই পুণ্য হয় না— পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করাও বিরাট পুণ্য ও সওয়াবের কাজ।

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ) তাঁর আরোহণের প্রিয় ঘোড়াটি নিয়ে উপস্থিত হন এবং আরয করেন ঃ আমার সম্পত্তির মধ্যে এটি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। একে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করতে চাই। মহানবী (সাঃ)-তাঁর ঘোড়াটি গ্রহণ করে তাঁরই পুত্র ওসমানকে দান করলেন। দান করা বস্তু স্বগৃহে ফিরে যেতে দেখে যায়েদ ইবনে-হারিসা কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন হলেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ তোমার দান গৃহীত হয়েছে। – (তফসীরে-মাযহারী, ইবনে জারীর, তিবরানী)

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদের সাথে বিতর্কের বিষয় বর্ণিত হয়েছে— কোথাও ইহুদীদের সাথে এবং কোথাও খ্রীষ্টানদের সাথে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও একটি বিতর্কের বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে কলবী থেকে বর্ণিত ঘটনায় বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন যে, আমরা যাবতীয় মূলনীতিতে এবং অধিকাংশ শাখাগত বিধি-বিধানে ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী। একথা শুনে ইহুদীরা আপত্তি উত্থাপন করে বললোঃ আপনারা উটের গোশত খান, দুধ পান করেন। অথচ এগুলো হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি হারাম ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উত্তরে বললেন ঃ ভুল কথা, এগুলো তাঁর প্রতি হালাল ছিল। ইহুদীরা বলল ঃ আমরা যেসব বস্তু হারাম মনে করি, সবই হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীমের আমল থেকেই হারাম হিসাবে চলে এসেছে এবং আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ কথোপকথনের পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে ইহুদীদের মিথ্যাবাদিতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বলা হচ্ছে ঃ তওরাত অবতরণের পূর্বে উটের গোশত ব্যতীত সব খাদ্যদ্রব্য স্বয়ং বনী-ইসরাঈলের জন্যেও হালাল ছিল। তবে উটের গোশত বিশেষ কারণবশতঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ) নিজেই নিজের জন্যে হারাম করে নিয়েছিলেন। পরে তাঁর বংশধরের জন্যেও তা হারাম ছিল।

বিশেষ কারণটি ছিল এই যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) 'ইরকুন্নিসা' (সাইটিকা বাত) রোগে আক্রান্ত হয়ে মানত করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা এ রোগ থেকে মুক্তি দিলে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্য বস্তু পরিত্যাগ করবেন। এরপর তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্যবস্তু উটের গোশত পরিত্যাগ করেন। (হাকেম, তিরমিযী, রূহুল-মা'আনী) মানতের কারণে যে উটের গোশত হারাম হয়েছিল, তা ওহীর নির্দেশে বনী-ইসরাঈলের জন্যে পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল। এতে বোঝা গেল যে, তাদের শরীয়তে মানতের কারণে হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যেতো। আমাদের শরীয়তেও মানতের কারণে জায়েয কাজ ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু মানত করে হালালকে হারাম করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে মানত কসমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দেয়া ওয়াজিব হবে। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ (তফসীরে-কবীর)

আলোচ্য ৯৬ নং আয়াতে সারা বিশ্বের সকল গৃহ এমন কি, মসজিদ ও উপাসনালয়সমূহের মোকাবিলায়ও কা'বা গৃহের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ একাধিক ঃ

কাবাগৃহের শ্রেষ্ঠত্ব ও নির্মাণ ইতিহাসঃ প্রথমতঃ এটি সারা বিশ্বে সর্বপ্রথম উপাসনালয়।

দ্বিতীয়তঃ এ গৃহ বরকতময় ও কল্যাণের আধার।

তৃতীয়তঃ এ গৃহ সারা বিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শক।

আয়াতের সারমর্ম এই যে, মানবজাতির জন্যে সর্বপ্রথম যে গৃহ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করা হয়, তা ঐ গৃহ, যা বাক্কায় (মক্কার অপর নাম ছিল বাক্কা) অবস্থিত। অতএব কা'বা গৃহই বিশ্বের সর্ব প্রথম উপাসনালয়। এর অর্থ এও হতে পারে যে, বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ এবাদতের জন্যেই নির্মিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে কোন উপাসনালয়ও ছিল না এবং বাস গৃহও ছিল না। হযরত আদম (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্র নবী। তাঁর পক্ষে এমনটি অকল্পনীয় নয় যে, পৃথিবীতে আগমনের পর তিনি নিজের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের আগেই আল্লাহ্র ঘর অর্থাৎ, ইবাদতের গৃহ নির্মাণ করেন। এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, মুজাহিদ, কাতাদাহ্, সুদ্দী প্রমুখ সাবাহী ও তাবেয়িগণের মতে কা'বাই বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ। পক্ষান্তরে এটাও সম্ভব যে, মানুষের বসবাসের গৃহ পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল; কিন্তু এবাদতের জন্যে কা'বা গৃহই সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল। এ মতটি হযরত আলী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত রয়েছে।

বায়হাকী বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়ার পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলের মাধ্যমে তাঁদের কা'বা গৃহ নির্মাণের আদেশ দেন। এ গৃহ নির্মিত হয়ে গেলে তাঁদেরকে তা তওয়াফ করার আদেশ দেয়া হয় এবং বলা হয়, আপনি সর্বপ্রথম মানব এবং এ গৃহ সর্বপ্রথম গৃহ— যা মানবমণ্ডলীর জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। – (ইবনে কাসীর)

কোন কোন হাদীসে আছে, হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত এ কা'বা গৃহ নূহের মহাপ্লাবন পর্যন্ত অক্ষত ছিল। মহাপ্লাবনে এ গৃহ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রাচীন ভিত্তির উপর এ গৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এক দুর্ঘটনায় প্রাচীর ধ্বসে গেলে জুরহাম গোত্রের লোকেরা একে পুনঃনির্মাণ করেন। এভাবে কয়েক বার বিধ্বস্ত হওয়ার পর একবার আমালেকা সম্প্রদায় ও একবার কোরাইশরা এ গৃহ নির্মাণ করে। সর্বশেষ এ নির্মাণে মহানবী (সাঃ)-ও শরীক ছিলেন এবং তিনিই 'হাজরে-আসওয়াদ' স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কোরাইশদের এ নির্মাণের ফলে ইবরাহীমী ভিত্তি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রথমতঃ কা'বার একটি অংশ 'হাতীম' কা'বা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। – দ্বিতীয়তঃ ইবরাহীম (আঃ)-এর নির্মাণে কা'বা গৃহের দরজা ছিল দু'টি-একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি পশ্চাৎমুখী হয়ে বের হওয়ার জন্যে। কিন্তু কোরাইশরা শুধু পূর্বদিকে একটি দরজা রাখে। তৃতীয়তঃ তারা সমতল ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে— যাতে সবাই সহজে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। বরং তারা যাকে অনুমতি দেয় সে'ই যেন প্রবেশ করতে পারে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন ঃ আমার ইচ্ছা হয়, কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে ইবরাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কা'বা গৃহ ভেঙ্গে দিলে নও-মুসলিম অজ্ঞ লোকদের মনে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দেয়ার আশঙ্কার কথা চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি। এ কথাবার্তার কিছুদিন পরেই মহানবী (সাঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

কিন্তু হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভাগ্নেয় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর উপরোক্ত ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর যখন মক্কার উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি উপরোক্ত ইচ্ছাটি কার্যে পরিণত করেন এবং কা'বা গৃহের নির্মাণ ইবরাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেন। কিন্তু মক্কার উপর তাঁর কর্তৃত্ব বেশী দিন টেকেনি। অত্যাচারী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ মক্কায় সৈন্যাভিযান করে তাঁকে শহীদ করে দেয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেই সে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়রের এ চিরস্মরণীয় কীর্তিটিও মুছে ফেলতে মনস্থ করে! সেমতে সে জনগণের মধ্যে প্রচার করতে থাকে যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়রের এ কাজ ঠিক হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কা'বা

গৃহকে যে অবস্থায় রেখে গেছেন, সে অবস্থায় রাখাই আমাদের কর্তব্য। এ অজুহাতে কা'বা গৃহকে আবার ভেঙ্গে জাহেলিয়াত আমলের কোরাইশরা যেভাবে নির্মাণ করেছিল, সেভাবেই নির্মাণ করা হলো। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পর কোন কোন বাদশাহ্ উল্লেখিত হাদীস দৃষ্টে কা'বা গৃহকে ভেঙ্গে হাদীস অনুযায়ী নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ইমাম হযরত মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) ফতোয়া দেন যে, এভাবে কা'বা গৃহের ভাঙ্গাগড়া অব্যাহত থাকলে পরবর্তী বাদশাহ্দের জন্যে একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যাবে এবং কা'বা গৃহ তাদের হাতে একটি খেলনায় পরিণত হবে। কাজেই বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে, সে অবস্থায়ই থাকতে দেয়া উচিত। সমগ্র মুসলিম সমাজ তাঁর এ ফতোয়া গ্রহণ করে নেয়। ফলে আজ পর্যন্ত হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্মাণই অবশিষ্ট রয়েছে। তবে মেরামতের প্রয়োজনে ছোটখাট কাজ সব সময়ই অব্যাহত থাকে।

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, খানায়ে কা'বা জগতের সর্বপ্রথম গৃহ এবং কমপক্ষে সর্বপ্রথম উপাসনালয়। কোরআনে যেখানে আল্লাহ্র আদেশে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল কর্তৃক কা'বা গৃহ নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, তাঁরা কা'বা গৃহের প্রাথমিক ভিত নির্মাণ করেননি, বরং সাবেক ভিত্তির উপরই নির্মাণ করেন। আয়াত وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ থেকেও বোঝা যায় যে, কা'বা গৃহের ভিত্তি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। সূরা হজ্বের এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ অর্থাৎ, যখন আমি ইবরাহীমের জন্যে এ গৃহের স্থান ঠিক করে দিলাম। এতেও বোঝা যায় যে, কা'বা গৃহের স্থান পূর্ব থেকে নির্ধারিত ছিল।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে কা'বা গৃহ নির্মাণের আদেশ দেয়া হলে ফেরেশতার মাধ্যমে বালুর স্তূপের নীচে লুক্কায়িত সাবেক ভিত্তি চিহ্নিত করে দেয়া হয়।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কা'বা গৃহের একটি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো যে, এ হচ্ছে জগতের সর্ব প্রথম গৃহ অথবা সর্বপ্রথম উপাসনালয়। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, হযরত আবু যর (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-কে একবার জিজ্ঞেস করেন যে, জগতের সর্বপ্রথম মসজিদ কোন্‌টি? উত্তর হলো ঃ মসজিদে হারাম। আবার প্রশ্ন করা হলো ঃ এরপর কোন্‌টি? উত্তর হলো মসজিদে বায়তুল-মুকাদ্দাস। আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই দু'টি মসজিদ নির্মাণের মাঝখানে কতদিনের ব্যবধান ছিল? উত্তর হলো ঃ চল্লিশ বৎসর।

এ হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর হাতে কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণের দিক দিয়ে বায়তুল-মুকাদ্দাস নির্মাণের ব্যবধান বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রামাণিত রয়েছে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রথম নির্মাণও হযরত ইবরাহীমের হাতে কা'বা গৃহ নির্মাণের চল্লিশ বৎসর পর সম্পন্ন হয়। এরপর হযরত সুলায়মান (আঃ) বায়তুল-মুকাদ্দাসের পুনঃনির্মাণ করেন। এভাবে বিভিন্ন হাদীসের পরস্পর বিরোধিতা দূর হয়ে যায়।

আদিকাল থেকেই কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে। আয়াতে وُضِعَ لِلنَّاسِ শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানবগোষ্ঠী এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। আল্লাহ্ তাআলা এর প্রকৃতিতে এমন মাহাত্ম্য নিহিত রেখেছেন যে, মানুষের অন্তর আপনা-আপনিই এর দিকে আকৃষ্ট হয়। আয়াতে উল্লেখিত 'বাক্কা' শব্দের অর্থ মক্কা। এখানে 'মীম' অক্ষরকে 'বা' অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। অথবা উচ্চারণ ভেদে অপর নাম 'বাক্কা'।

কা'বা গৃহের বরকত ঃ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে কা'বা গৃহকে 'মোবারক' (বরকতময়) বলা হয়েছে। 'মোবারক' শব্দটি বরকত থেকে উদ্ভূত। বরকত শব্দের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। কোন বস্তু দু'ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। (এক) প্রকাশ্যতঃ বস্তুর পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। (দুই) তদ্বারা এত বেশী কাজ হওয়া, যা তদপেক্ষা বেশী বস্তু দ্বারা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। একেও অর্থগত দিক দিয়ে 'বৃদ্ধি পাওয়া' বলা যেতে পারে।

কা'বা গৃহের বরকতময় হওয়া বাহ্যিক এবং অর্থগত উভয় দিক দিয়েই রয়েছে। বাহ্যিক বরকত এই যে, মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা শুষ্ক বালুকাময় অনুর্বর মরুভূমি হওয়া সত্ত্বেও এতে সব সময়, সব ঋতুতে, সব রকম ফল-মূল, তরি-তরকারী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এত বিপুল পরিমাণে মজুদ থাকে, যা শুধু মক্কাবাসীর জন্যেই নয়— বহিরাগতদের জন্যেও যথেষ্ট। বহিরাগতদের অবস্থা সবাই জানে। বিশেষতঃ হজ্বের মওসুমে লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে সমবেত হয়। তাদের সংখ্যা মক্কার অধিবাসী অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী হয়ে থাকে। এ বিরাট জনসমাবেশ সেখানে দু'চার দিন নয়— কয়েক মাস অবস্থান করে। হজ্বের মওসুম ছাড়াও এমন কোন দিন যায় না, যখন সেখানে হাজার হাজার বহিরাগত মানুষের ভীড় না থাকে। বিশেষতঃ হজ্বের মওসুমে যখন সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয়, তখনও এমন কথা শোনা যায়নি যে, বাজারে জরুরী পণ্য সামগ্রীর অভাব দেখা দিয়েছে। মক্কায় পৌছে কোন কোন হাজী শত শত ভেড়া-দুম্বাও কোরবানী করেন। গড়ে জনপ্রতি একটি কোরবানী তো অবশ্যই হয়। এ লক্ষ লক্ষ ভেড়া-দুম্বা সেখানে সব সময়ই পাওয়া যায়। এগুলো বড় একটা বাইরে থেকে আমদানী করার ব্যবস্থা করতে হয় না।

এ হচ্ছে বাহ্যিক বরকতের অবস্থা— যা উদ্দিষ্ট নয়। অর্থগত ও আধ্যাত্মিক বরকত যে কি পরিমাণ, তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কতিপয় প্রধান এবাদত, বিশেষ করে কা'বা গৃহেই করা যায়। এসব এবাদতে যে বিরাট সওয়াব ও কল্যাণ রয়েছে, তা কা'বা গৃহের কারণেই হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ হজ্ব ও ওমরা। আরও কিছু এবাদত আছে, যা মসজিদে-হারামে করলে সওয়াব বহুগুণে বেড়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, বাস গৃহে নামায পড়লে এক নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু মহল্লার মসজিদে পড়লে পঁচিশ নামাযের, জামে মসজিদে পড়লে পাঁচশ' নামাযের, মসজিদে আকসায় পড়লে এক হাজার নামাযের, আমার মসজিদে পড়লে পঞ্চাশ হাজার নামাযের এবং মসজিদে-হারামে পড়লে এক লক্ষ নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়।— (ইবনে মাজাহ্, তাহাভী)

হজ্বের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসে বলা হয়েছে, বিশুদ্ধভাবে হজ্বব্রত পালনকারী মুসলমান বিগত গোনাহ্ থেকে এমনভাবে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে

যায়, যেন সদ্য মায়ের গর্ভ থেকে নিষ্পাপ অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছে। এগুলো কা'বা গৃহেরই অর্ন্তগত ও আধ্যাত্মিক বরকত। আয়াতের শেষাংশে هدى বলে এসব বরকতই ব্যক্ত করা হয়েছে।

কাবা গৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য ঃ আলোচ্য ৯৭ নং আয়াতে কা'বা গৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ এতে আল্লাহ্র কুদরতের অনেক নিদর্শন রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে মকামে-ইবরাহীম। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত হয়ে যায়; কেউ তাকে হত্যা করতে পারে না। তৃতীয়তঃ সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য এতে হজ্বব্রত পালন করা ফরয; যদি এ গৃহ পর্যন্ত পৌছার শক্তি ও সামর্থ্য থাকে।

কা'বা গৃহ নির্মিত হওয়ার দিন থেকে অদ্যাবধি আল্লাহ্ তাআলা এর বরকতে শত্রুর আক্রমণ থেকে মক্কাবাসীদের নিরাপদে রেখেছেন। বাদশাহ্ আবরাহা বিরাট হস্তীবাহিনীসহ কা'বা গৃহের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। আল্লাহ্ স্বীয় কুদরতে পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেন। মক্কার হরমে প্রবেশকারী মানুষ, এমনকি জীবজন্তু পর্যন্ত বিপদমুক্ত হয়ে যায়। জন্তু-জানোয়াররাও এ বিষয়ে সচেতন। এ সীমানায় প্রবেশ করে তারাও নিজেদের নিরাপদ মনে করে। সেখানে বন্য ও হিংস্র জন্তু মানুষ দেখে পালায় না। সাধারণভাবে দেখা যায়, কা'বা গৃহের যে পার্শ্বে বৃষ্টি হয়, সে পার্শ্বস্থিত দেশগুলোতে প্রচুর বারিপাত হয়। আরেকটি বিস্ময়কর নিদর্শন এই যে, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ হাজী সেখানে একত্রিত হয়। তারা জামরাত নামক স্থানে প্রত্যেকেই একেকটি প্রতীক লক্ষ্য করে দৈনিক সাতটি করে কঙ্কর তিন দিন পর্যন্ত নিক্ষেপ করে। যদি এসব কঙ্কর সেখানেই জমা থাকতো, তবে এক বৎসরেই কঙ্করের স্তূপের নীচে জামরাত অদৃশ্য হয়ে যেতো এবং কয়েক বৎসরে সেখানে কঙ্করের বিরাট পাহাড় গড়ে উঠত। অথচ হজ্বের তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সেখানে কঙ্করের খুব একটা স্তূপ দেখা যায় না। ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কঙ্কর দেখা যায় মাত্র। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে হুযূর (সাঃ)-বলেন ঃ ফেরেশতারা এসব কঙ্কর তুলে নেয়। যাদের হজ্ব কোন কারণে কবুল হয় না, শুধু তাদের কঙ্করই এখানে থেকে যায়। এ কারণেই জামরাত থেকে কঙ্কর তুলে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এগুলো কবুল করা হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এ উক্তির সত্যতা প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখেন। জামরাতের আশেপাশে সামান্য কঙ্করই দৃষ্টিগোচর হয়। অথচ সেগুলো সেখান থেকে সরানোর বা পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকেও নেই ; জনগণের পক্ষ থেকেও নেই।

এ কারণেই শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) খাসায়েসে কুবরা নামক গ্রন্থে বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কতক মু'জেযা তাঁর ওফাতের পরও দেদীপ্যমান রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। প্রত্যেকেই তা অবলোকন করতে পারে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে পবিত্র কোরআন। সমগ্র বিশ্ব এ অনন্য কিতাবটির সমতুল্য গ্রন্থ রচনা করতে অক্ষম। এ অক্ষমতা যেমন তাঁর জীবদ্দশায় ছিল, তেমনি আজও রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। প্রতি যুগের মুসলমান বিশ্বকে একথা বলে চ্যালেঞ্জ করতে পারে যে, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ কোরআনের সূরার মত একটি সূরা তৈরী কর দেখি। এমনিভাবে জামরাত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ এসব জামরাতে নিক্ষিপ্ত কঙ্কর অদৃশ্যভাবে ফেরেশতারা তুলে নেয়। যাদের হজ্ব কবুল হয় না, শুধু সেসব হতভাগ্যদের কঙ্করই থেকে যায়। তাঁর এ উক্তির সত্যতা প্রতি যুগেই প্রমাণিত হচ্ছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত হবে। নিঃসন্দেহে এটা তাঁর অক্ষয় মু'জেযা এবং কা'বা গৃহ সম্পর্কিত একটি বিরাট নিদর্শন।

মকামে-ইবরাহীম ঃ মকামে-ইবরাহীম কা'বা গৃহের একটি বড় নিদর্শন। এ কারণেই কোরআনে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মকামে-ইবরাহীম একটি পাথরের নাম। এর উপর দাঁড়িয়েই হযরত ইবরাহীম (আঃ) কা'বা গৃহ নির্মাণ করতেন। এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ নির্মাণের উচ্চতার সাথে সাথে পাথরটিও আপনা-আপনি উচু হয়ে যেতো এবং নীচে অবতরণের সময় নীচু হয়ে যেতো। এ পাথরের গায়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর গভীর পদচিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান। একটি অচেতন ও জড় পাথরের পক্ষে প্রয়োজনানুসারে উচু ও নীচু হওয়া এবং মোমের মত নরম হয়ে নিজের মধ্যে পদচিহ্ন গ্রহণ করা- এসবই আল্লাহ্র অপার কুদরতের নিদর্শন এবং এতে কা'বা গৃহের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়। এ পাথরটি কা'বা গৃহের নীচে দরজার নিকটে অবস্থিত ছিল। যখন কোরআনে মকামে-ইবরাহীমে নামায পড়ার আদেশ অবতীর্ণ হয় وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى তখন তওয়াফকারীদের সুবিধার্থে পাথরটি সেখান থেকে অপসারিত করে কা'বা গৃহের সামনে সামান্য দূরে যমযম কূপের নিকট স্থাপন করা হয়। একে এ স্থানেই একটি নিরাপদ কক্ষে তালাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। কা'বা প্রদক্ষিণের পর দুই রাকআত নামায এর পেছনে দাঁড়িয়ে পড়া হয়। অধুনা কক্ষটি সরিয়ে নিয়ে মকামে-ইবরাহীমকে একটি কাঁচ-পাত্রে সংরক্ষিত করে দেয়া হয়েছে। আসলে এ বিশেষ পাথরটিকেই মকামে-ইবরাহীম বলা হয়। তওয়াফ-পরবর্তী নামায এর উপরে অথবা আশেপাশে পড়া উত্তম। কিন্তু শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে মকামে-ইবরাহীম সমগ্র মসজিদে-হারামকেও বোঝায়। এ কারণেই ফেকাহ্‌বিদগণ বলেন ঃ মসজিদে-হারামের যে কোন স্থানে তওয়াফ পরবর্তী নামায পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

কা'বা গৃহে প্রবেশকারীর নিরাপত্তা ঃ কা'বা গৃহের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায়। এ নিরাপত্তা একেত শরীয়তের আইন হিসেবে— অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, তাকে কষ্ট দেবে না বা হত্যা করবে না। যদি কেউ হত্যাকাণ্ড করে অথবা অন্য কোন অপরাধ করে এতে প্রবেশ করে, তবুও তাকে সেখানে শাস্তি দেবে না, বরং তাকে হরম থেকে বের হতে বাধ্য করবে। বের হওয়ার পর তাকে শাস্তি দেবে। এভাবে হরমে প্রবেশকারী ব্যক্তি শরীয়তের আইন অনুযায়ী নিরাপদ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ এ নিরাপত্তা সৃষ্টিগতভাবে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টিগতভাবেই প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তরে কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নিহিত রেখেছেন। ফলে বিস্তর মতবিরোধ সত্ত্বেও তারা সবাই এ বিশ্বাসে একমত যে, কা'বা গৃহে প্রবেশকারী ব্যক্তি যতবড় অপরাধী ও শত্রুই হোক না কেন, কা'বা গৃহের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে তাকে কিছুই বলা যাবে না ; হরম শরীফকে সাধারণ কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। জাহেলিয়াত যুগের আরব ও তাদের বিভিন্ন গোত্র অসংখ্য পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কা'বা গৃহের সম্মান রক্ষার জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত ছিল না। তাদের যুদ্ধপ্রিয়তা ও নিষ্ঠুরতা সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা পিতার হত্যাকারীকে দেখেও মাথা হেট করে চলে যেতো ; কিছুই বলতো না।

মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হরমের অভ্যন্তরে কিছুক্ষণ যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কা'বা গৃহকে পবিত্র করা। বিজয়ের পর হুযূর (সাঃ) ঘোষণা করেন যে, এ অনুমতি কা'বা

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ
وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ يٰۤاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ
مُّسْلِمُوْنَ ۝ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا
نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ
مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ وَلْتَكُنْ
مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ
تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ فَاَمَّا
الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ
فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ
نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

(১০১) আর তোমরা কেমন করে কাফের হতে পার, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহ্‌র রসূল। আর যারা আল্লাহ্‌র কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে, তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে সরল পথের। (১০২) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্‌কে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (১০৩) আর তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ্ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার। (১০৪) আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম। (১০৫) আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে—তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব। (১০৬) সেদিন কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো। বস্তুতঃ যাদের মুখ কালো হবে, তাদের বলা হবে, 'তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে কুফরীর বিনিময়ে আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর। (১০৭) আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে রহ্‌মতের মাঝে। তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (১০৮) এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ, যা তোমাদিগকে যথাযথ পাঠ করে শুনানো হচ্ছে। আর আল্লাহ্ বিশ্ব-জাহানের প্রতি উৎপীড়ন করতে চান না।

গৃহকে পবিত্রকরণের উদ্দেশে কয়েক ঘন্টার জন্যেই ছিল। এরপর পূর্বের ন্যায় চিরকালের জন্যে হরমে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন ঃ আমার পূর্বে কারো জন্যে হরমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা হালাল ছিল না, আমার পরেও কারো জন্যে হালাল নয়। আমাকেও মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়েছিল, পরে আবার হারাম করে দেয়া হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে মক্কায় সৈন্যাভিযান এবং হত্যা ও লুটতরাজ করেছিল। এতে কা'বা গৃহের সাধারণ নিরাপত্তা আইন এতটুকুও ক্ষুন্ন হয়নি। কেননা মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা সর্ব সম্মতিক্রমে হাজ্জাজের একাজ হারাম ও মহাপাপ ছিল। সমগ্র মুসলিম জাতি এজন্যে তাকে ধিক্কার দিয়েছে। এ ঘটনাকে কা'বা গৃহের সৃষ্টিগত সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থীও বলা যায় না। কারণ, হাজ্জাজ স্বয়ং এ কাজের বৈধতায় বিশ্বাসী ছিল না। সে একে একটি জঘন্য অপরাধ মনে করতো। কিন্তু রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল।

একথা অনস্বীকার্য যে, সর্বশ্রেণীর মানবমণ্ডলীই কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধকে অত্যন্ত জরুরী মনে করে। তারা হরমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুনখারাবীকে জঘন্যতম পাপ বলে গণ্য করে। এটা সারা বিশ্বে একমাত্র কা'বা গৃহেরই বৈশিষ্ট্য।

কা'বা গৃহের হজ্ব ফরয হওয়া ঃ ৯৭ নং আয়াতে কা'বা গৃহের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তাআলা মানব জাতির প্রতি শর্তাধীনে কা'বা গৃহের হজ্ব ফরয করেছেন। শর্ত এই যে, সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য থাকতে হবে। সামর্থ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ থাকতে হবে, যদ্দ্বারা সে কা'বা গৃহ পর্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে। দৈহিক দিক দিয়ে হাত পা ও চক্ষু কর্মক্ষম হতে হবে। কারণ, যাদের এসব অঙ্গ বিকল, তাদের পক্ষে স্বীয় বাড়ী-ঘরে চলাফেরাই দুষ্কর। এমতাবস্থায় সেখানে যাওয়া ও হজ্বের অনুষ্ঠানাদি পালন করা তার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হবে?

মহিলাদের পক্ষে মাহ্‌রাম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা শরীয়ত মতে নাজায়েয। কাজেই মহিলাদের সামর্থ্য তখনই হবে, যখন তার সাথে কোন মাহ্‌রাম পুরুষ হজ্বে থাকবে; নিজ খরচে করুক অথবা মহিলাই তার খরচ বহন করুক। এমনিভাবে কা'বা গৃহে পৌঁছার জন্যে রাস্তা নিরাপদ হওয়ায়ও সামর্থ্যের একটি অংশ। যদি রাস্তা বিপজ্জনক হয় এবং জান-মালের ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা থাকে, তবে হজ্বের সামর্থ্য নাই বলে মনে করা হবে।

হজ্ব শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। শরীয়তের পরিভাষায় কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ, আরাফাত ও মুযদালেফায় অবস্থান ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মকে হজ্ব বলা হয়। এ ব্যাখ্যা কোরআন প্রদত্ত। হজ্বের অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মৌখিক উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমানদের শক্তির ভিত্তি ঃ আলোচ্য ১০২ ও ৩ নং আয়াতের প্রথমটিতে প্রথম মূলনীতি এবং দ্বিতীয়টিতে দ্বিতীয় মূলনীতি ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথম মূলনীতিটি তাকওয়া বা আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করা। অর্থাৎ, তার অপছন্দনীয় কাজ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা।

'তাকওয়া' শব্দটি আরবী ভাষায় বেঁচে থাকা ও বিরত থাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ 'ভয় করা'ও করা হয়। কারণ, যেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়, সেগুলো ভয় করারই বিষয়। তাতে খোদায়ী শাস্তির ভয় থাকে। এ তাকওয়া তথা বেঁচে থাকার কয়েকটি স্তর রয়েছে। তম্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হলো কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। এ অর্থে প্রত্যেক মুসলমানকেই 'মুত্তাকী' (আল্লাহ্‌ভীরু) বলা যায়—যদিও সে গোনাহে লিপ্ত থাকে। এ অর্থ বোঝানোর জন্যেও কোরআনে অনেক জায়গায় 'মুত্তাকীন' ও 'তাকওয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তর যা আসলে কাম্য— তা হলো এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, যা আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলের পছন্দনীয় নয়। কোরআন ও হাদীসে তাকওয়ার যে সব ফযীলত ও কল্যাণ প্রতিশ্রুত হয়েছে, তা এ স্তরের 'তাকওয়ার' উপর ভিত্তি করেই হয়েছে।

তৃতীয় স্তরটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও তাঁদের বিশেষ উত্তরাধিকারী ওলীগণ এ স্তরের তাকওয়া অর্জন করে থাকেন। অর্থাৎ, অন্তরকে আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনার দ্বারা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখা। আলোচ্য আয়াতে اتَّقُوا اللَّهَ বলার পর حَقَّ تُقَاتِهِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তাকওয়ার ঐ স্তর অর্জন কর, যা তাকওয়ার হক।

তাকওয়ার হক কি ঃ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, রবী, কাতাদাহ্ ও হাসান বসরী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকেও এমনি বর্ণিত হয়েছে যে, তাকওয়ার হক হল, প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা, আল্লাহ্‌কে সর্বদা স্মরণে রাখা— কখনও বিস্মৃত না হওয়া এবং সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা— অকৃতজ্ঞ না হওয়া।— (বাহ্‌রে মুহীত)

কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে— 'সাধ্যমত আল্লাহ্‌কে ভয় কর। হযরত ইবনে আব্বাস ও তাউস বলেন ঃ এ আয়াতটি বাস্তবে তাকওয়ার হকেরই ব্যাখ্যা। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাক। এভাবেই তাকওয়ার হক আদায় হবে। অতএব, কোন ব্যক্তি অবৈধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকার জন্যে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা সত্ত্বেও কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে, তা তাকওয়ার হকের পরিপন্থী হবে না।

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ এতে বোঝা যায় যে, পূর্ণ ইসলামই প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূল (সাঃ) এর পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা।

মুসলমানদের জাতীয় শক্তির দ্বিতীয় ভিত্তি ঃ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا আয়াতে পারস্পরিক ঐক্যের বিষয়টি অত্যন্ত সাবলীল ও বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, এতে সর্বপ্রথম মানুষকে পরস্পর ঐকবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, ঐক্য ও মৈত্রী যে প্রশংসনীয় ও কাম্য, তাতে জগতের জাতি, ধর্ম ও দেশ-কাল নির্বিশেষে সব মানুষই একমত। এতে দ্বিমতের কোনই অবকাশ নেই। সম্ভবতঃ জগতের কোথাও এমন কোন ব্যক্তি নেই যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিবাদ-বিসংবাদকে উপকারী ও উত্তম মনে করে। এ কারণে বিশ্বের সব দল ও গোত্রই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানায়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, ঐক্য উপকারী ও অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত হওয়া সত্ত্বেও মানব জাতি বিভিন্ন দল-উপদল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এরপর দলের ভেতরে উপদল এবং সংগঠনের ভেতরে উপসংগঠন সৃষ্টি করার এমন এক কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে, যাতে সঠিক অর্থে দুই ব্যক্তির ঐক্য কল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হতে চলেছে। সাময়িক স্বার্থের অধীনে কয়েক ব্যক্তি কোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে কিংবা স্বার্থোদ্ধারে অকৃতকার্য হলে শুধু তাদের ঐক্যই বিনষ্ট হয় না ; বরং পরস্পর শত্রুতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

এ কারণে কোরআন পাক শুধু মৈত্রী, একতা, শৃঙ্খলা ও দলবদ্ধ হওয়ার উপদেশই দান করেনি ; বরং তা অর্জন করা ও অটুট রাখার জন্যে একটি ন্যায়ানুগ মূলনীতিও নির্দেশ করেছে— যা স্বীকার করে নিতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। মূলনীতিটি এই যে, কোন মানুষের মস্তিস্কপ্রসূত অথবা কিছুসংখ্যক লোকের রচিত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে এমন আশা করা যে, তারা এতে একতাবদ্ধ হয়ে যাবে— বিবেক ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী ও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। তবে বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনায় অবশ্যই সব মানুষের একতাবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক ; একথা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই নীতিগতভাবে অস্বীকার করতে পারে না। এখন মতভেদের একটি মাত্র ছিদ্রপথ খোলা থাকতে পারে যে, বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা কি এবং কোনটি? ইহুদীরা তওরাতের ব্যবস্থাকে এবং খ্রীষ্টানরা ইঞ্জীলের ব্যবস্থাকে আল্লাহ্ প্রদত্ত অবশ্যপালনীয় ব্যবস্থা বলে দাবী করে। এমনকি, মুশরিকদের বিভিন্ন দলও স্ব স্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান বলেই দাবী করে থাকে। এ ধরনের মতানৈক্য ও বিভেদকেই কোরআন পাক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বর্তমানে এ কোরআনী মূলনীতিকে পরিত্যাগ করার কারণেই সমগ্র মুসলিম সমাজ শতধাবিভক্ত হয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ বিভেদ মেটানোর অমোঘ ব্যবস্থাই وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا (আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সবাই মিলে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর।) আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। এখানে 'আল্লাহ্‌র রজ্জু' বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের রেওয়ায়েতে হুযুর (সাঃ) বলেন ঃ

كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض

অর্থাৎ, কোরআন হল আল্লাহ্ তাআলার রজ্জু যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত প্রলম্বিত।— (ইবনে কাসীর)

যায়েদ ইবনে আরকামের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে حبل الله هو القران অর্থাৎ, 'আল্লাহ্‌র রজ্জু হচ্ছে কোরআন।'— (ইবনে কাসীর)

আরবী বাচন পদ্ধতিতে 'হাবল' এর অর্থ অঙ্গীকারও হয় এবং এমন যে কোন বস্তুকেই বলা হয় যা উপায় বা মাধ্যম হতে পারে। কোরআন অথবা দ্বীনকে 'রজ্জু' বলার কারণ এই যে, এটা একদিকে আল্লাহ্ তাআলার সাথে বিশ্ববাসী মানুষের সম্পর্ক কায়েম করে এবং অন্যদিকে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করে একদলে পরিণত করে।

মোটকথা, কোরআনের এ বাক্যে বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতিই বিধৃত হয়েছে। কেননা, প্রথমতঃ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত জীবন-ব্যবস্থা কোরআনকে কাজে-কর্মে বাস্তবায়িত করা প্রত্যেক মানুষের জন্যে অবশ্য

কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ সব মুসলমান সম্মিলিতভাবে একে বাস্তবায়িত করবে। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃংখল জাতিতে পরিণত হবে। উদাহরণতঃ একদল লোক একটি রজ্জুকে ধরে থাকলে তারা সবাই এক দেহে পরিণত হয়ে যাবে।

এছাড়া আয়াতে একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টান্তও বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমানরা যখন আল্লাহ্‌র গ্রন্থকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে, তখন তাদের অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তিদের অনুরূপ, যারা কোন উচ্চ স্থানে আরোহণ করার সময় শক্ত রজ্জু ধারণ করে নিশ্চিত পতনের সম্ভাবনা থেকে নিরাপদ থাকে। সুতরাং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সবাই মিলে কোরআনকে শক্তরূপে ধারণ করে থাকলে শয়তান তার কোন অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হবে না এবং ব্যক্তিগত জীবনের মত মুসলিম জাতির শক্তিও সুদৃঢ় ও অজেয় হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, কোরআনকে আঁকড়ে থাকলেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তি একত্রিত হয় এবং মরণোন্মুখ জাতি নবজীবন লাভ করে। পক্ষান্তরে কোরআন থেকে সরে থাকলে জাতীয় ও দলগত জীবনে যেমন বিপর্যয় নেমে আসে, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনও সুখকর হয় না।

ঐক্য একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই সম্ভব ঃ ঐক্যের বিশেষ একটি কেন্দ্র বা ভিত্তি থাকা অত্যাবশ্যক। এ সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মত ও পথ রয়েছে। কোথাও বংশগত সম্পর্ককে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণতঃ আরব গোত্রসমূহের মধ্যে কোরায়শকে এক জাতি ও বনু-তামীমকে অন্য জাতি মনে করা হতো। কোথাও বর্ণগত পার্থক্যই ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের এক জাতি এবং শ্বেতাঙ্গদের অন্য জাতি মনে করা হয়েছে। কোথাও দেশগত ও ভাষাগত একত্বকে কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হয়েছে। ফলে হিন্দীরা একজাতি ও আরবীরা অন্য জাতি হয়ে গেছে। আবার কোথাও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কিছু নিয়ম—প্রথাকে ঐক্যের কেন্দ্র বানানো হয়েছে। যারা এসব নিয়ম-প্রথা পালন করে না, তারা ভিন্নজাতি। উদাহরণতঃ ভারতের হিন্দু ও আর্যসমাজের কথা বলা যায়।

কোরআন পাক এগুলোকে বাদ দিয়ে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু 'হাবলুল্লাহ্' অর্থাৎ, আল্লাহ্ প্রেরিত মজবুত জীবন-ব্যবস্থাকে সাব্যস্ত করেছে এবং দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসীরা সবাই মিলে এক জাতি— যারা আল্লাহ্‌র রজ্জুর সাথে জড়িত এবং কাফেররা ভিন্ন জাতি- যারা এ শক্ত রজ্জুর সাথে জড়িত নয়।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদিগকে দু'টি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত জীবন-ব্যবস্থার অনুসারী হয়ে যাও। দ্বিতীয়তঃ একে সবাই মিলে শক্তভাবে ধারণ কর,যাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের সুশৃঙ্খল ঐক্যবন্ধন স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে একবার তা প্রত্যক্ষ করা গেছে।

মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্যের ধনাত্মক দিক ফুটিয়ে তোলার পর বলা হয়েছেঃ وَلَا تَفَرَّقُوْا পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করো না। কোরআন পাকের বিজ্ঞজনোচিত বর্ণনাভঙ্গি এই যে, যেখানে ধনাত্মক দিক ফুটিয়ে তোলা হয়, সেখানেই ঋণাত্মক দিক উল্লেখ করে বিপরীত রাস্তায় অগ্রসর হওয়া থেকে বারণ করা হয়।

এছাড়া কোরআন বিভিন্ন পয়গম্বরের উম্মতদের ঘটনাবলী বর্ণনা করে দেখিয়েছে যে, তারা কিভাবে পারস্পরিক মতবিরোধ ও অনৈক্যের কারণে জীবনের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক লাঞ্ছনায় পতিত হয়েছে।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্যে তিনটি বিষয় পছন্দ করেছেন এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ করেছেন। পছন্দনীয় জিনিসগুলো এই ঃ (এক)— তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। (দুই)— আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকবে। (তিন)— শাসনকর্তাদের প্রতি শুভেচ্ছার মনোভাব পোষণ করবে।

অপছন্দনীয় বিষয়গুলো এই ঃ (এক)— অনাবশ্যক কথাবার্তা ও বিতর্ক অনুষ্ঠান। (দুই)— বিনা প্রয়োজনে কারও কাছে ভিক্ষা চাওয়া এবং (তিন)— সম্পদ বিনষ্ট করা।— (ইবনে কাসীর)

এখন প্রশ্ন এই যে, প্রত্যেক মতভেদই কি নিন্দনীয় এবং মতভেদের কোন দিকই কি অনিন্দনীয় নেই? উত্তর এই যে, প্রত্যেক মতভেদই নিন্দনীয় নয়। বরং যে মতভেদে প্রবৃত্তির তাড়নার ভিত্তিতে কোরআন থেকে দূরে সরে চিন্তা করা হয়, তাই নিন্দনীয়। কিন্তু যদি কোরআনের নির্ধারিত সীমার ভেতরে থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ব্যাখ্যা স্বীকার করে নিজের যোগ্যতা ও মেধার আলোকে শাখা-প্রশাখায় মতভেদ করা হয়, তবে সে মতভেদ অস্বাভাবিক নয়, ইসলাম তা নিষেধও করে না। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং ফেকাহ্‌বিদ আলেমগণের মধ্যকার মতভেদ ছিল এমনি ধরনের। এমন মতভেদকে রহমত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অবশ্য যদি এসব শাখা বিষয়কেই দ্বীনের মূল সাব্যস্ত করা হয়, তবে তাও নিন্দনীয়.।

পারস্পরিক ঐক্যের উভয় দিক ব্যাখ্যা করার পর আয়াতে ঐ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে ইসলাম পূর্বকালে আরবরা লিপ্ত ছিল। গোত্রসমূহের পারস্পরিক শত্রুতা, কথায় কথায় অহরহ খুনখারাবী ইত্যাদির কারণে গোটা আরব জাতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। একমাত্র ইসলামরূপ আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতই তাদেরকে এহেন অশান্তির আগুন থেকে উদ্ধার করেছে।

মুসলমানদের ঐক্য আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল ঃ কোরআন পাকের এ উক্তি থেকে আরও একটি সত্য প্রতিভাত হয়েছে যে, অন্তরের মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলা। সম্প্রীতি বা ঘৃণা সৃষ্টি করা তাঁরই কাজ। কোন দলের অন্তরে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা আল্লাহ্ তাআলারই অনুগ্রহের দান। আর একথা সবারই জানা যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ একমাত্র তাঁর আনুগত্যের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। অবাধ্যতা ও গোনাহ্ দ্বারা এ অনুগ্রহ অর্জিত হওয়া সুদূর পরাহত।

এর ফলশ্রুতি এই যে, মুসলমানরা যদি শক্তিশালী সংগঠন ও ঐক্য কামনা করে, তবে এর একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যকে অঙ্গের ভূষণ করে নেয়া। এদিকে ইশারা করার জন্যেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ অর্থাৎ, এমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্যে সত্যাসত্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন - যাতে তোমরা বিশুদ্ধ পথে থাক।

মুসলমানদের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণ দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ঃ

প্রথমে খোদাভীতি ও আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার মাধ্যমে আত্মসংশোধন এবং দ্বিতীয়তঃ প্রচার বা তবলীগের মাধ্যমে অপরের সংশোধন। আলোচ্য আয়াতে ১০৪ নং দ্বিতীয় নির্দেশটি বর্ণিত হয়েছে। এ

দু'টি আয়াতের সারমর্ম এই যে, নিজেও স্বীয় কাজকর্ম ও চরিত্র আল্লাহ্ প্রেরিত আইন অনুযায়ী সংশোধন কর এবং অন্যান্য ভাইয়ের কাজকর্ম সংশোধন করারও চিন্তা কর। এ বিষয়বস্তুটিই সূরা 'ওয়াল আসরে' বর্ণনা করা হয়েছেঃ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

অর্থাৎ, পরকালের ক্ষতি থেকে তারা মুক্ত, যারা নিজেরাও ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরকেও বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎকর্মের নির্দেশ দেয়।

জাতীয় ও সমষ্টিগত জীবনের জন্যে একটি শক্তিশালী ঐক্য-সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য। পূর্ববর্তী আয়াতে 'আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর' বলে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এমনিভাবে এ ঐক্য সম্পর্ককে স্থিতিশীল রাখার জন্য দ্বিতীয় কাজটিও অপরিহার্য। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ, অপরারপর ভাইদেরকেও কোরআন ও সুন্নাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করাকে প্রত্যেকেই আপন কর্তব্য মনে করবে যাতে আল্লাহ্র রজ্জু তার হাত থেকে ফসকে না যায়। ওস্তাদ মরহুম শায়খুল - ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী বলতেন ঃ আল্লাহ্র এ রজ্জু ছিঁড়ে যেতে পারে না। অবশ্য হাত থেকে ফসকে যেতে পারে। তাই এ রজ্জুটি ফসকে যাবার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন পাক নির্দেশ জারি করেছে যে, প্রত্যেক মুসলমান যেমন নিজে সৎকর্ম করা ও গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকাকে জরুরী মনে করবে, তেমনি অপরকেও সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করাকে একটি কর্তব্য বলে মনে করবে।

'সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ' করণের কর্তব্য প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তখনই আরোপিত হবে, যখন চোখের সামনে কাউকে অসৎকাজ করতে দেখবে। উদাহরণতঃ কোন মুসলমানকে মদ্যপান করতে অথবা চুরি করতে কিংবা ভিন্ন নারীর সাথে অশালীন মেলামেশা করতে দেখলে সাধ্যানুযায়ী তা প্রতিরোধ করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু চোখের সামনে এসব কাজ না পড়লে,তা ওয়াজিব নয় ; বরং এরূপ কাজ বন্ধ করার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের। সরকার অপরাধীর অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করে তাকে শাস্তি দেবে।

'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' বাক্যের দ্বারা এরূপ বুঝার সম্ভাবনা ছিল যে,এ প্রয়োজন হয়তো বিশেষ বিশেষ স্থানেই হবে। অর্থাৎ, যখন চোখের সামনে অসৎকাজ হতে দেখা যায়। কিন্তু يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ বলে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়ের কাজ হবে কল্যাণের প্রতি আহবান করা; তখন অসৎকাজ হতে দেখা যাক, বা না যাক অথবা কোন ফরয আদায় করার সময় হোক বা না হোক। উদাহরণতঃ সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত নামাযের সময় নয়। কিন্তু এ সম্প্রদায় এ সময়ও এই বলে নামায পড়ার উপদেশ দেবে যে, সময় হলে নামায আদায় করা জরুরী। অথবা রোযার সময় আসেনি। রমযান মাস এখনও দূরে। কিন্তু এ সম্প্রদায় স্বীয় কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন হবে না; বরং পূর্ব থেকেই মানুষকে বলতে থাকবে যে, রমযান মাস এলে রোযা রাখা ফরয। মোটকথা, এ সম্প্রদায়ের কাজ হবে কল্যাণের প্রতি আহবান করতে থাকা।

কল্যাণের প্রতি আহবানেরও দু'টি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় অমুসলমানদেরকে 'খায়র' তথা ইসলামের প্রতি আহবান করা। প্রত্যেক মুসলমান সাধারণভাবে এবং উল্লেখিত সম্প্রদায়টি বিশেষভাবে জগতের সব জাতিকে ইসলামের প্রতি আহবান করবে মুখেও এবং কর্মের মাধ্যমেও। সেমতে জেহাদের আয়াতে সাচ্চা মুসলমানের সংজ্ঞা এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ

অর্থাৎ, তারা সাচ্চা মুসলমান ,যাদের আমি পৃথিবীতে শক্তি তথা রাজত্ব দান করলে তারা প্রথমেই পৃথিবীতে আনুগত্যের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে— যার একটি প্রতীক হচ্ছে নামায। তারা নিজেদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তথা যাকাতের মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে এবং 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আজকাল মুসলিম সম্প্রদায় যদি কল্যাণের প্রতি আহবান করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে,তবে বিজাতির অনুকরণের ফলে আমাদের মধ্যে যেসব ব্যাধি সংক্রমিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে যাবে। কারণ, মুসলিম জাতি এ মহান লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে গেলে তাদের অনৈক্য দূর হবে। তারা যখন বুঝতে পারবে যে, জ্ঞান-গরিমা ও কর্মের দিক দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য জাতির উপর আমাদের প্রাধান্য অর্জন করতে হবে এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং আল্লাহ্র আনুগত্যমুখী সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষা দানের দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে, তখন সমগ্র জাতি একটি মহান লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামের সাফল্যের চাবিকাঠি এর মধ্যেই নিহিত ছিল। হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) وَلْتَكُن مِّنكُمْ আয়াত তিলাওয়াত করে বলেছিলেন ঃ এ সম্প্রদায়টি হচ্ছে বিশেষভাবে সাহাবায়ে-কেরামের দল।—(ইবনে-জারীর) কেননা, তাঁদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে এ কাজের জন্য দায়ী মনে করতেন।

দ্বিতীয় পর্যায়টি হলো কল্যাণের প্রতি স্বয়ং মুসলমানদেরকে আহবান করা। অর্থাৎ, সব মুসলমান (সাধারণভাবে) এবং উল্লেখিত সম্প্রদায় (বিশেষভাবে) মুসলমানদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাবে। এ আহবানও দু'প্রকার। একটি ব্যাপক আহবান, অর্থাৎ, সব মুসলমানদেরকে শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও ইসলামী চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা এবং দ্বিতীয়টি বিশেষ আহবান। অর্থাৎ, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোরআন ও সুন্নাহ্র শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ তৈরী করা।

পরবর্তী আয়াতে এ আহবানকারী সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এরূপ বলা হয়েছে ঃ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ অর্থাৎ, তারা সৎকাজে আদেশ করে ও অসৎকাজে নিষেধ করে।

ইসলাম যেসব সৎকর্ম ও পুণ্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে যেসব সৎকর্মের প্রচলন করেছেন, তা সবই আয়াতের উল্লেখিত 'মারূফ' তথা সৎ কর্মের অন্তর্ভুক্ত। 'মারূফ' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিচিত। এসব সৎকর্মও সাধারণ্যে পরিচিত। তাই এগুলোকে 'মারূফ' বলা হয়।

এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেসব সৎকর্মরূপী কাজকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন বলে খ্যাত, তা সবই আয়াতে উল্লেখিত 'মুনকার'-এর

অন্তর্ভুক্ত। এ স্থলে 'ওয়াজেবাত' (জরুরী করণীয় কাজ) ও 'মাআসী' (গোনাহ্র কাজ)-এর পরিবর্তে 'মারূফ' ও 'মুনকার' বলার রহস্য সম্ভবতঃ এই যে, নিষেধ ও বাধাদানের নির্দেশটি শুধু সবার কাছে পরিচিত ও সর্বসম্মত মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে। ইজতেহাদী মাসআলায় শরীয়তের নীতি অনুসারেই বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত থাকতে পারে। এসব মাসআলায় নিষেধ ও বাধাদান সঙ্গত নয়। পরিতাপের বিষয়, এহেন বিজ্ঞজনোচিত শিক্ষার প্রতি ইদানিং উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। আজকাল ইজতেহাদী মাসআলাকে বিতর্কের ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করা হয় এবং একেই সর্ববৃহৎ পুণ্যের কাজ বলে সাব্যস্ত করা হয়। অথচ এর বিপরীতে সর্বসম্মত গোনাহ্র কাজে বাধা দানের প্রতি তেমন মনোনিবেশ করা হয় না। আয়াতের শেষাংশে এ আহবানকারী দলের প্রশংসনীয় পরিণামের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে তারাই হলো সফলকাম। ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সৌভাগ্য তাদেরই প্রাপ্য।

আয়াতে বর্ণিত সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম প্রতীক ছিলেন সাহাবায়ে-কেরামের দল। তাঁরা কল্যাণের প্রতি আহবান এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ এর মহান লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে অল্পদিনের মধ্যে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। রোম ও পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্য পদানত করেন। বিশ্বকে নৈতিকতা ও পবিত্রতার শিক্ষা দেন এবং পূণ্য ও খোদাভীতির প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন।

কল্যাণের প্রতি আহবানকারী সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা ও তাদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানদের পারস্পরিক মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

অর্থাৎ— তাদের মত হয়ো না, যারা প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি আসার পর পরস্পর মতবিরোধ করেছে।

উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মত হয়ো না। তারা আল্লাহ্ তাআলার পরিস্কার নির্দেশ পাওয়ার পর শুধু কুসংস্কার ও কামনা-বাসনার অনুসরণ করে ধর্মের মূলনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের মাধ্যমে আযাবে পতিত হয়েছে। এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا আয়াতের পরিশিষ্ট। প্রথম আয়াতে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্তহাতে ধারণ করার প্রতি আহবান করা হয়েছে এবং ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, ঐক্যবদ্ধতা সমগ্র জাতিকে একক সত্তায় পরিণত করে দেয়। এরপর কল্যাণের প্রতি আহবান এবং 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' দ্বারা এ ঐক্যবদ্ধতাকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এরপর وَلَا تَفَرَّقُوا এবং وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের কারণে পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং নিজেদের মধ্যে এ ব্যাধি অনুপ্রবেশ করতে দিও না।

আয়াতে যে বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা সে সমস্ত মতবিরোধ যা দ্বীনের মূলনীতিতে করা হয় অথবা স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে শাখা-প্রশাখায় করা হয়। আয়াতে 'উজ্জ্বল নির্দেশাবলী আসার পর' বাক্যটিই এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেননা, দ্বীনের মূলনীতি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। কিছু শাখা প্রশাখাও এমন সুস্পষ্ট হয়ে থাকে, যাতে স্বার্থপরতা না থাকলে মতবিরোধের অবকাশ নাই। কিন্তু যেসব শাখা-প্রশাখা অস্পষ্ট, সে সম্পর্কে কোন আয়াত ও হাদীস না থাকার কারণে অথবা আয়াতে ও হাদীসে বাহ্যিক বৈপরীত্য থাকার কারণে যদি ইজতেহাদে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আয়াতে উল্লেখিত নিন্দার আওতায় পড়বে না। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি সহীহ্ হাদীসে এ ধরনের মতবিরোধের সমর্থন এবং অনুমতি পাওয়া যায়। হাদীসটি এই ঃ যদি কেউ ইজতেহাদ করে এবং সঠিক নির্দেশ প্রকাশ করে, তবে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। আর যদি ইজতেহাদে ভুল করে তবুও একটি সওয়াব পাবে।

এতে বুঝা যায় যে, ইজতেহাদ সম্পর্কিত মতবিরোধ ভুল হলেও যখন এক সওয়াব পাওয়া যায়, তখন তা নিন্দনীয় হতে পারে না। সুতরাং সাহাবায়ে-কেরাম ও মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে যেসব ইজতেহাদী মতবিরোধ হয়েছে, সে সবগুলোই কোনো না কোনো পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতের সাথে সম্পর্কহীন। হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ও হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয বলেন ঃ সাহাবায়ে-কেরামের মতবিরোধ মুসলমানদের জন্যে রহমত ও মুক্তির কারণ স্বরূপ।— (রুহুল-মা'আনী)

ইজতেহাদী মতবিরোধে কোন পক্ষের নিন্দাবাদ জায়েয নয় ঃ এখান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ফুটে উঠেছে। তা এই যে, শরীয়ত সম্মত ইজতেহাদী মতবিরোধে যে ইমাম যে পক্ষ অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে এক পক্ষ ভুল ও অপরপক্ষ সঠিক হলেও তা মীমাংসা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার। তিনি হাশরের ময়দানে সঠিক ইজতেহাদকারী আলেমকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন এবং যার ইজতেহাদ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে, তাকে একটি সওয়াব দান করবেন। ইজতেহাদী মতবিরোধে কারণ একথা বলার অধিকার নাই যে, নিশ্চিতরূপে এ পক্ষ সঠিক এবং ও পক্ষ ভ্রান্ত। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধির আলোতে এক পক্ষকে কোরআন ও সুন্নাহ্র অধিক নিকটবর্তী মনে করে, তবে সে এরূপ বলতে পারে যে, আমার মতে এ পক্ষটি সঠিক; কিন্তু ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে এবং এ পক্ষটি ভ্রান্ত; কিন্তু সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। এ নীতিকথাটি ইমাম ও ফেকাহ্‌বিদগণের কাছে স্বীকৃত। এতে আরও বুঝা যায় যে, ইজতেহাদী মতবিরোধে কোন পক্ষ এরূপ অসৎ হয় না যে, 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ'-এর নীতি অনুযায়ী তাকে নিন্দা করা যেতে পারে। সুতরাং যা অসৎ নয়,তাকে নিন্দা করা থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক। আজকাল অনেক আলেমকেও এ ব্যাপারে গাফেল দেখা যায়। তাঁরা বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণকারীদের গালি-গালাজ করতেও কুণ্ঠিত হন না। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে যত্রতত্র দ্বন্দ্ব-কলহ,বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

ইজতেহাদের নীতিমালা যথাযথভাবে পালন করার পরও যদি ইজতেহাদী মতবিরোধ দেখা দেয়,তবে তা আলোচ্য وَلَا تَفَرَّقُوا আয়াতের পরিপন্থী ও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু আজকাল মুসলমানদের মধ্যে কি হচ্ছে? আজকাল এতদসম্পর্কিত আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ককেই দ্বীনের ভিত্তি মনে করা হচ্ছে এবং এ নিয়ে পারস্পরিক গালি-গালাজ, লড়াই-ঝগড়া,

এমনকি মারামারি পর্যন্ত সংঘটিত হচ্ছে। এ সমস্ত আচরণ অবশ্যই আলোচ্য আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী, নিন্দনীয় এবং সাহাবায়ে-কেরাম ও তাবেয়ীগণের রীতির পরিপন্থী। পূর্ববর্তী মনীষীগণের মধ্যে ইজতেহাদী মতবিরোধ নিয়ে বিপক্ষ দলের সাথে এরূপ ব্যবহারের কথা কখনও শোনা যায়নি।

মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার অর্থ ঃ মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার কথা কোরআন মজীদের অনেক জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে।

এসব আয়াতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। বিশিষ্ট তফসীরবিদগণের মতে শুভ্রতা দ্বারা ঈমানের নূরের শুভ্রতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মু'মিনদের মুখমণ্ডল ঈমানের নূরে উদ্ভাসিত,আনন্দাতিশয্যে উৎফুল্ল ও হাস্যোজ্জ্বল হবে। পক্ষান্তরে কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা কুফরের কালোবর্ণ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কাফেরদের মুখমণ্ডল কুফরের পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন হবে। তদুপরি পাপাচারের অন্ধকারে আরও অন্ধকারময় হয়ে যাবে।

উজ্জ্বল মুখ ও কাল মুখ কারা ঃ এরা কারা— এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন ঃ আহ্‌লে সুন্নত সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল শুভ্র হবে এবং বিদআতীদের মুখমণ্ডল কালো হবে। হযরত আতা বলেন ঃ মুহাজির ও আনসারগণের মুখমণ্ডল সাদা হবে এবং বনী-কুরায়যা ও বনী নুযায়রের মুখমণ্ডল কালো হবে।—(কুরতুবী)

তিরমিযী শরীফে হযরত আবু উমামাহ্ বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ খারেজী সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল কালো হবে। আর তারা যাদের হত্যা করবে, তাদের মুখমণ্ডল সাদা হবে।

আবু উমামাকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনি এ হাদীস রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি অঙ্গুলি গুণে উত্তর দিলেন ঃ হাদীসটি যদি অন্ততঃ সাত বার তাঁর কাছ থেকে না শুনতাম, তবে বর্ণনাই করতামনা।—(তিরমিযী)

হযরত ইকরিমাহ্ বলেন ঃ আহ্‌লে কিতাবগণের এক অংশের মুখমণ্ডল কালো হবে অর্থাৎ, যারা হুযুর (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পূর্বে তিনি নবী হবেন বলে বিশ্বাস করতো কিন্তু নবুওয়ত -প্রাপ্তির পর তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করার পরিবর্তে তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করে। -(কুরতুবী)

কতিপয় প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। (এক)— আল্লাহ্ তাআলা يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ বাক্যের প্রথমে উজ্জ্বলতার উল্লেখ করে পরে মলিন হওয়ার কথা বলেছেন কিন্তু فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ বাক্যের বর্ণনাভঙ্গি পাল্টে দিয়েছেন। অথচ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যে এখানেও শুভ্রতাকে আগে উল্লেখ করাই উচিত ছিল। আয়াতের ধারাবাহিকতা পাল্টে দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা সম্ভবতঃ সৃষ্টির লক্ষ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সৃষ্টির লক্ষ্য হচ্ছে সৃষ্ট জীবের প্রতি অনুকম্পা করা, শাস্তি দেয়া নয়। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম শুভ্র মুখমণ্ডলের কথা বর্ণনা করেছেন; কারণ এরাই আল্লাহ্‌র অনুকম্পা ও সওয়াব লাভের যোগ্য। অতঃপর মলিন মুখমণ্ডল উল্লেখ করেছেন। কারণ, এরা আল্লাহ্‌র শাস্তির যোগ্য। এরপর আয়াতের শেষাংশে فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ বলে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অনুকম্পাও প্রকাশ করেছেন। এভাবে আয়াতের শুরুতে ও শেষাংশে উভয় স্থানেই অনুকম্পা বর্ণনা করেছেন এবং মাঝখানে মলিন মুখমণ্ডলের কথা উল্লেখ করেছেন। এভাবে অসীম অনুকম্পার প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে যে, মানবজাতিকে শাস্তিদানের উদ্দেশে সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আল্লাহ্ তাআলার অনুকম্পা লাভে ধন্য হওয়ার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(দুই)— শুভ্র মুখমণ্ডলবিশিষ্টদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র অনুকম্পার মধ্যে অবস্থান করবে। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এখানে আল্লাহ্‌র অনুকম্পা বলে জান্নাত বোঝানো হয়েছে। তবে জান্নাতকে অনুকম্পা বলার রহস্য এই যে, মানুষ যত এবাদতই করুক না কেন, আল্লাহ্‌র অনুকম্পা ব্যতীত জান্নাতে যেতে পারবে না। কারণ, এবাদত করা মানুষের নিজস্ব পরাকাষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত সামর্থ্যের বলেই মানুষ এবাদত করতে পারে। সুতরাং ইবাদত করলেই জান্নাতে প্রবেশ অপরিহার্য হয়ে যায় না। বরং আল্লাহ্‌র অনুকম্পার দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব।— (তফসীরে-কবীর)

(তিন) — আল্লাহ তাআলা فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ বাক্যাংশের পর পর هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ বলে একথা ব্যক্ত করেছেন যে, বিশ্বাসীরা আল্লাহ তাআলার যে অনুকম্পায় অবস্থান করবে, তা তাদের জন্যে সাময়িক হবে না বরং সর্বকালীন হবে। এ নেয়ামত কখনও বিলুপ্ত অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত করা হবে না। এর বিপরীতে মলিন মুখমণ্ডল বিশিষ্টদের জন্যে একথা বলা হয়নি যে, তারা তাদের সে অবস্থায় চিরকালই থাকবে।

মানুষ নিজের গোনাহর শাস্তিই লাভ করে ঃ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অদ্যকার শাস্তি আমার পক্ষ থেকে নয়; বরং তোমাদের উপার্জিত। তোমরা পৃথিবীতে অবস্থানকালে এসব উপার্জন করেছিলে। কেননা জান্নাত ও দোযখের বিপদ ও নেয়ামত প্রকৃতপক্ষে তোমাদের কর্মেরই পরিবর্তিত চিত্র। এ বিষয়টি বোঝানোর জন্যেই আয়াতের শেষাংশে বলেছেন ঃ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ অর্থাৎ,— আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করার কোন ইচ্ছা করেন না। শাস্তি ও পুরস্কার যা কিছু দেয়া হয়, সুবিচার ও অনুকম্পার দাবী হিসেবেই দেয়া হয়।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ
الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ
اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ
الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾ لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ۗ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ
الْاَدْبَارَ ۟ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١١﴾ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا
ثُقِفُوْۤا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ
مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا
يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۗ ذٰلِكَ
بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾ لَيْسُوْا سَوَآءً ۗ مِنْ اَهْلِ
الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَ
هُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ
يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ
فِي الْخَيْرٰتِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَمَا يَفْعَلُوْا
مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾

(১০৯) আর যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে সে সবই আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র প্রতিই সবকিছু প্রত্যাবর্তনশীল। (১১০) তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী। (১১১) যৎসামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে,তাহলে তারা পশ্চাদপসরণ করবে। অতঃপর তাদের সাহায্য করা হবে না। (১১২) আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত ওরা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ওরা উপার্জন করেছে আল্লাহ্‌র গযব। ওদের উপর চাপানো হয়েছে গলগ্রহতা। তা এজন্যে যে, ওরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তার কারণ, ওরা নাফরমানী করেছে এবং সীমা লঙ্ঘন করেছে। (১১৩) তারা সবাই সমান নয়। আহলে -কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা অবিচলভাবে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তারা সেজদা করে। (১১৪) তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়; অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং সৎকাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে। আর এরাই হল সৎকর্মশীল। (১১৫) তারা যেসব সৎকাজ করবে, কোন অবস্থাতেই সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে না। আর আল্লাহ্‌ পরহেযগারদের বিষয়ে অবগত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার কয়েকটি কারণ ঃ মুসলিম সম্প্রদায়কে 'শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়' বলে ঘোষণা করার কারণসমূহ কোরআন পাক একাধিক আয়াতে বর্ণনা করেছে। এতদসম্পর্কিত প্রধান আয়াত সূরা বাকারায় উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ, وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا আয়াতটি। সেখানেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ মধ্যপন্থী হওয়া এবং জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যপন্থার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। —(মা'আরেফুল কোরআন, ১ম খণ্ড)

আলোচ্য ১১০ নং আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা মানব জাতির উপকারার্থ সমুত্থিত হয়েছে। আর তাদের প্রধান উপকার এই যে, মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের চেষ্টাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে 'সৎকাজে আদেশ দান এবং অসৎকাজে নিষেধ' করার দায়িত্ব অধিকতর পূর্ণত্বলাভ করেছে। সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, এ কর্তব্যটি পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের দায়িত্বেও ন্যস্ত ছিল, কিন্তু বিগত অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে জিহাদের নির্দেশ ছিল না। তাই তারা শুধু অন্তর ও মুখের দ্বারাই 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের কর্তব্য পালন করতে পারতো। মুসলিম সম্প্রদায় বাহুবলেও এ কর্তব্য পালন করতে পারে। সব রকমের জেহাদের এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমে ইসলামী আইন কার্যকরী করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ব্যাপক ঔদাসীন্যের দরুন ধর্মের অন্যান্য বিশেষ কার্যাবলীর ন্যায় সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করার কর্তব্যটিও পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকবে—যারা 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ'—এর কর্তব্য পুরোপুরি পালন করে যাবে।

وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ বাক্যাংশে মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস পূর্ববর্তী সব পয়গাম্বর ও উম্মতেরও অভিন্ন গুণ। একে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে কিরূপে আখ্যা দেয়া হলো? উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায় যে স্তরে উন্নীত হয়েছে, তা পূর্ববর্তী উম্মতগণের তুলনায় বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী।

আয়াতের শেষাংশে আহলে -কিতাবগণের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁদের কেউ কেউ মুমিন। বলা বাহুল্য, এরা হলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ। এরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

কোরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। আয়াতের লক্ষ্য সাহাবায়ে-কেরামের সাথে নবুওয়তের যমানায় কোন ক্ষেত্রেই মোকাবিলায় বিরুদ্ধবাদিরা জয়লাভ করতে পারেনি। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদী গোত্রগুলো সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিল। বিশেষ করে তারা পরিণামে মুসলমানদের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। কতক নিহত হয়েছে, কতক নির্বাসিত হয়েছে এবং কিছু সংখ্যকের উপর জিযিয়া কর ধার্য করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়েরই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم
مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾
مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا
صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا
ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا
عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ
أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَا أَنتُمْ أُولَاءِ
تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ
قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ
قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِن
تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا
بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ
تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

(১১৬) নিশ্চয় যারা কাফের হয়, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র সামনে কখনও কোন কাজে আসবে না। আর তারাই হলো দোযখের আগুনের অধিবাসী– তারা সে আগুনে চিরকাল থাকবে। (১১৭) এ দুনিয়ার জীবনে যাকিছু ব্যয় করা হয়, তার তুলনা হলো ঝড়ো হাওয়ার মতো, যাতে রয়েছে তুষারের শৈত্য, যা সে জাতির শস্যক্ষেত্রে গিয়ে লেগেছে যারা নিজের জন্য মন্দ করেছে। অতঃপর সেগুলোকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তাদের উপর কোন অন্যায় করেননি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করছিল। (১১৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না– তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। (১১৯) দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে– 'আমরা ঈমান এনেছি।' পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক। আল্লাহ্‌ মনের কথা ভালই জানেন। (১২০) তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়; তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তাহলে তাতে তারা আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই – তারা যা কিছু করে, সে সমস্তই আল্লাহ্‌র আয়ত্তে রয়েছে। (১২১) আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করলেন, আর আল্লাহ্‌ সব বিষয়েই শোনেন এবং জানেন।

ইহুদীদের প্রতি গযব ও লাঞ্ছনার অর্থ ঃ সূরা বাক্বারার ৬১তম আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে কোন ব্যতিক্রম নেই। সূরা আলে-ইমরানের আলোচ্য আয়াতের إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ - এর ব্যতিক্রম সম্পর্কেও সেখানে পূর্ণ তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে। — (মা'আরেফুল কোরআন ১ম খণ্ড) এখানে পুনর্বার উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, কাশ্‌শাফ গ্রন্থের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হচ্ছে ইহুদীদের সাথে লাঞ্ছনা ও অপমান লেগেই থাকবে। তবে তারা দুই উপায়ে এ লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে পারবে। (এক) – আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার । উদাহরণত ঃ নাবালেগ বালক অথবা মহিলা হলে আল্লাহ্‌র নির্দেশে সে হত্যা থেকে নিরাপদে থাকবে। (দুই) وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ অর্থাৎ, —অন্যের সাথে সন্ধিচুক্তির কারণে তাদের লাঞ্ছনা ও অপমান প্রকাশ পাবে না وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ শব্দের মধ্যে মুসলমান ও কাফের উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আয়াতের অর্থ মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে বিপদমুক্ত হওয়াও হতে পারে এবং কোন অমুসলিম শক্তির সাথে চুক্তি করে নিরাপদ হওয়াও হতে পারে, বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের অবস্থা যে হুবহু তাই, তা জ্ঞানী মাত্রেরই অজানা নয়। ইসরাঈল রাষ্ট্রটি প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টান পাশ্চাত্যের একটি সামরিক ছাউনি। এর যাকিছু শক্তিমদমত্ততা দেখা যায়, সবই অপরের কৃপায়। আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিবর্গ এর উপর থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিলে এটি একদিনও স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ – অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ মিত্ররূপে গ্রহণ করো না। بِطَانَةً শব্দের অর্থ অভিভাবক, বন্ধু, বিশ্বস্ত, রহস্যবিদ। কাপড়ের অভ্যন্তর ভাগকেও بِطَانَةً বলা হয়, যা শরীরের সাথে মিশে থাকে। এ শব্দটি بطن শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর বিপরীত শব্দ ظهر। কোন বস্তুর বাহ্যিক দিককে ظهر এবং আভ্যন্তরীণ দিককে بطن বলা হয়। এমনিভাবে কাপড়ের উপরের অংশকে ظهارة এবং ভেতরের যে অংশ শরীরের সাথে মিশে থাকে, তাকে بِطَانَةً বলা হয়। আমরা নিজ ভাষায় বলি ঃ সে তার জামা-চাদর। অর্থাৎ, সে তার খুব প্রিয়। এমনিভাবে بِطَانَةً বলে রূপক অর্থে বন্ধু, বিশ্বস্ত, গোপন তথ্যের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য লোককে বোঝানো হয়। প্রসিদ্ধ অভিধানগ্রন্থ লিসানুল-আরবে بِطَانَةً শব্দের অর্থ এরূপ লিখিত আছে ঃ 'কোন ব্যক্তির অভিভাবক, বিশ্বস্ত বন্ধু এবং যার সাথে পরামর্শ করে কাজ করা হয়, এরূপ ব্যক্তিকে তার بِطَانَةً বলা হয়।'

অতএব, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, স্বধর্মাবলম্বীদের ছাড়া অন্য কাউকে এমন মুরুব্বী ও উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করো না, যার কাছে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে না।

ইসলাম স্বীয় বিশ্বব্যাপী করুণার ছায়াতলে মুসলিমগণকে অমুসলিমদের সাথে সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, মানবতা ও উদারতার অসাধারণ নির্দেশ দিয়েছে। এটা শুধু মৌখিক নির্দেশই নয়; বরং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) —এর আচরণ একে কার্যে পরিণত করেও দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু

মুসলমানদের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যাবলী সংরক্ষণের স্বার্থে ইসলাম এ নির্দেশও দিয়েছে যে, ইসলামী আইনে অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক একটি বিশেষ সীমার বাইরে এগিয়ে নেয়ার অনুমতি মুসলমানদের দেয়া যায় না। কারণ, এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুক্তিপূর্ণ, সঙ্গত ও জরুরী ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই হেফাজত হয়। যেসব অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রের বাসিন্দা কিংবা মুসলমানদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে জোরদার নির্দেশাবলী ইসলামী আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি কোন যিম্মী অর্থাৎ, মুসলিম রাষ্ট্রের অ-মুসলিম বাসিন্দাকে কষ্ট দেয়, কেয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হবো। আর আমি যে মোকদ্দমায় বাদী হবো, তাতে জয়লাভ অবধারিত।" অন্য এক হাদীসে বলেনঃ "চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম বাসিন্দা অথবা অন্য কারও প্রতি অত্যাচার করতে আমার পালনকর্তা আমাকে নিষেধ করেছেন।" আর এক হাদীসে বলেনঃ "সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অ-মুসলিমের প্রতি অত্যাচার করে কিংবা তার প্রাপ্য হ্রাস করে কিংবা তার উপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করে, তবে কেয়ামতের দিন আমি তার পক্ষ থেকে উকিল হবো।"

কিন্তু এসব উদারতার সাথে সাথে মুসলমানদের নিজস্ব জামাত ও জাতিসত্তার হেফাযতের স্বার্থে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা বিশ্বস্ত মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করো না।

ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-কে বলা হলো যে, এখানে একজন হস্তলিপিতে সুদক্ষ অমুসলিম বালক রয়েছে। আপনি তাকে ব্যক্তিগত মুনশী হিসাবে গ্রহণ করে নিলে ভালই হবে! হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "এরূপ করলে মুসলমানদের ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে বিশ্বস্তরূপে গ্রহণ করা হবে, যা কোরআনের নির্দেশের পরিপন্থী।"

ইমাম কুরতুবী হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম ও তফসীরবিদ। তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে মুসলমানদের মধ্যে এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ ও তার অশুভ পরিণাম এভাবে বর্ণনা করেনঃ "আজকাল অবস্থা এমন পাল্টে গেছে যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্যরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এভাবে ওরা মূর্খ বিত্তশালী ও শাসকদের ঘাড়ে চেপে বসেছে।"

অধুনা আধুনিক সভ্যতার যুগেও বিশেষ মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী নয় — এমন কোন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা ও মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করা হয় না।

আলোচ্য ১১৮ নং আয়াতে উপরোক্ত নির্দেশের কারণ হিসেবে বলা হয়েছেঃ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا অর্থাৎ, তারা তোমাদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে কসুর করবে না। তারা তোমাদের বিপদ কামনা করে। এ ধরনের কিছু বিষয় স্বয়ং তাদের মুখেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যে শত্রুতা গোপন রাখে, তা আরও মারাত্মক। আমি তোমাদের সামনে সব আলামত প্রকাশ করে দিয়েছি ; এখন তোমরা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পার তবে তা থেকে উপকার পেতে পার।

উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদী হোক কিংবা খ্রীষ্টান, কপট বিশ্বাসী মুনাফেক হোক কিংবা মুশরেক — কেউ তোমাদের সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। তারা সর্বদাই তোমাদের বোকা বানিয়ে তোমাদের ক্ষতি সাধনে ব্যাপৃত এবং ধর্মীয় ও পার্থিব অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট থাকে। তোমরা কষ্টে থাক এবং কোন না কোন উপায়ে তোমাদের ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষতি হোক, এটাই হলো তাদের কাম্য। তাদের অন্তরে যে শত্রুতা লুক্কায়িত রয়েছে, তা খুবই মারাত্মক। কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্দমনীয় জিঘাংসায় উত্তেজিত হয়ে এমন সব কথাবার্তা বলে ফেলে, যা তাদের গভীর শত্রুতার পরিচায়ক। শত্রুতা ও প্রতিহিংসায় তাদের মুখ থেকে অসংলগ্ন কথা বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এহেন শত্রুদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল্লাহ্ তাআলা শত্রু-মিত্রের পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপনের বিধান বলে দিয়েছেন, সুতরাং মুসলমানদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া খবুই সমীচীন।

وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ বাক্যটি কাফেরসুলভ মনোভাবের পূর্ণ পরিচায়ক। এর মধ্যে এ বিষয়ের গভীর শিক্ষা নিহিত আছে যে, কোন অমুসলিম কোন অবস্থাতেই মুসলমানদের সত্যিকার বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে هٰٓاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ অর্থাৎ — তোমরা তো তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তো তোমাদের মোটেই ভালবাসে না। এছাড়া তোমরা সব ঐশী গ্রন্থেই বিশ্বাস কর। তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলেঃ আমরা মুসলমান। কিন্তু যখন একান্তে গমন করে, তখন তোমাদের প্রতি ক্রোধের আতিশয্যে আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলে দিন, তোমরা ক্রোধে নিপাত যাও! নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরের কথাবার্তা সম্পর্কে সম্যক অবগত। অর্থাৎ— এটা কেমন বেখাপ্পা বিষয় যে, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবে, অথচ তারা তোমাদের বন্ধু নয়; বরং মূলোৎপাটনকারী শত্রু! আশ্চর্যের বিষয় তোমরা সব খোদায়ী গ্রন্থে বিশ্বাসী ; তা যে কোন জাতি, যে কোন যুগে, যে কোন পয়গম্বরের প্রতি অবতীর্ণ হোক না কেন ; কিন্তু এর বিপরীতে তারা তোমাদের পয়গম্বর ও গ্রন্থ কোরআনকে বিশ্বাস করে না। এমন কি তাদের নিজ গ্রন্থের প্রতিও তাদের শুদ্ধ বিশ্বাস নাই। এদিক দিয়ে তোমাদের সাথে ওদের অল্পবিস্তর বন্ধুত্ব এবং তাদের প্রতি তোমাদের বিদ্বেষভাব থাকা উচিত ছিল, কিন্তু এখানে ব্যাপার হচ্ছে উল্টো।

এ কাফেরসুলভ মনোভাবের আরও ব্যাখ্যা এই যে, اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ অর্থাৎ — তাদের অবস্থা এই যে, তোমরা কোন সুখকর অবস্থার সম্মুখীন হলে তারা দুঃখিত হয়, আর তোমরা কোন বিপদে পতিত হলে তারা আনন্দে গদগদ হয়ে ওঠে।

অতঃপর কপট বিশ্বাসীদের চক্রান্ত এবং ঘোর শত্রুদের শত্রুতার অশুভ পরিণাম থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে একটি সহজ সুন্দর ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হচ্ছেঃ "তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে এবং পরহেযগারী অবলম্বন করলে ওদের চক্রান্ত তোমাদের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট করতে পারবে না।"

ধৈর্য ও পরহেযগারীর মধ্যেই মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য ঃ যাবতীয় বিপদাপদ ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকার জন্যে কোরআন ধৈর্য ও তাকওয়া-পরহেযগারীকে শুধু এ আয়াতেই নয়, অন্যান্য আয়াতেও একটি কার্যকরী প্রতিষেধক হিসেবে বর্ণনা করেছে।

إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى
الله فليتوكل المؤمنون ﴿١٢٢﴾ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم
أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ﴿١٢٣﴾ إذ تقول للمؤمنين
ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة
منزلين ﴿١٢٤﴾ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم
هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ﴿١٢٥﴾
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ﴿١٢٦﴾ ليقطع طرفا من
الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ﴿١٢٧﴾ ليس لك
من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴿١٢٨﴾
ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء و
يعذب من يشاء والله غفور رحيم ﴿١٢٩﴾ يا أيها الذين
آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا
الله لعلكم تفلحون ﴿١٣٠﴾ واتقوا النار التي أعدت
للكافرين ﴿١٣١﴾ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ﴿١٣٢﴾

১২২) যখন তোমাদের দু' টি দল সাহস হারাবার উপক্রম করলো, অথচ আল্লাহ্ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা মুমিনদের উচিত। (১২৩) বস্তুত ঃ আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক,. যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। (১২৪) আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগণকে —তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন। (১২৫) অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন। (১২৬) বস্তুতঃ এটা তো আল্লাহ্ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে, (১২৭) যাতে ধ্বংস করে দেন কোন কোন কাফেরকে অথবা লাঞ্ছিত করে দেন— যেন ওরা বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায়। (১২৮) হয় আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে আযাব দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নাই। কারণ তারা রয়েছে অন্যায়ের উপর। (১২৯) আর যাকিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে, সেসবই আল্লাহ্র। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা আযাব দান করবেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়। (১৩০) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো। (১৩১) এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (১৩২) আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও রসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ওহুদ যুদ্ধের পটভূমি ঃ আলোচ্য আয়াতের তফসীরের পূর্বে ওহুদ যুদ্ধের পটভূমি হৃদয়ঙ্গম করে নেয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদর নামক স্থানে কোরাইশ বাহিনী ও মুসলিম মুজাহিদগণের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে কোরাইশদের সত্তর জন খ্যাতনামা ব্যক্তি নিহত হয়। এবং এ পরিমাণই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। এ মারাত্মক ও অবমাননাকর পরাজয়টি ছিল প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী আযাবের প্রথম কিস্তি। এতে কোরাইশদের প্রতিশোধস্পৃহা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। নিহত সরদারদের আত্মীয়-স্বজনরা সমগ্র আরবকে ক্ষেপিয়ে তোলে। তারা প্রতিজ্ঞা করে ঃ আমরা যতদিন এ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করব, ততদিন স্বস্তির নিশ্বাস নেব না। তারা মক্কাবাসীদের কাছে আবেদন জানালো, তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া থেকে যে অর্থ-সম্পদ নিয়ে এসেছে, তা সবই যেন এ অভিযানে ব্যয় করা হয়— যাতে মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে নিহত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ আবেদনে সবাই যোগও দিল। সেমতে তৃতীয় হিজরীতে কোরাইশদের সাথে অন্যান্য কয়েকটি গোত্রও মদীনা আক্রমণের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো। এমনকি, স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের সাথে যোগদান করলো— যাতে প্রয়োজনবোধে পুরুষদের উৎসাহিত করে পশ্চাদপসরণে বাধা দিতে পারে। তিন হাজার যোদ্ধার বিরাট বাহিনী অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যখন মদীনা থেকে তিন চার মাইল দূরে ওহুদ পাহাড়ের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করলো, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁর ব্যক্তিগত মত ছিল মদীনার ভেতরে থেকেই সহজে ও সাফল্যের সাথে শত্রু শক্তিকে প্রতিহত করা। তখন মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বাহ্যতঃ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে প্রথমবারের মত তার কাছেও পরামর্শ চাওয়া হলো। তার অভিমতও হুযূর (সাঃ)-এর অভিমতের অনুরূপ ছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক উৎসাহী তরুণ সাহাবী যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি এবং শাহাদতের আগ্রহে পাগলপারা ছিলেন, জেদ ধরলেন যে, শহরের বাইরে গিয়েই শত্রু সৈন্যের মোকাবেলা করা উচিত। নতুবা শত্রুরা আমাদের দুর্বল ও কাপুরুষ বলে মনে করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতে এ প্রস্তাবটিই গৃহীত হলো।

ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গৃহের অভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং লৌহবর্ম পরিধান করে বের হয়ে এলেন। এতে কেউ কেউ মনে করলেন যে, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছি। এটা ঠিক হয়নি। তাঁরা নিবেদন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আপনার ইচ্ছা না হলে এখানেই অবস্থান করুন। তিনি বললেন ঃ একবার লৌহবর্ম পরিধান করে এবং অস্ত্রধারণ করার পর যুদ্ধ ব্যতিরেকেই তা আবার খুলে ফেলা পয়গাম্বরের জন্য শোভন নয়। এ বাক্যে পয়গম্বর ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ, পয়গম্বর কখনও দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারেন না। এতে উম্মতের জন্যেও বিরাট শিক্ষা রয়েছে।

মহানবী (সাঃ) যখন মদীনা থেকে বের হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রায় এক হাজার সাহাবী। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রায় তিনশত লোকের একটি দল নিয়ে রাস্তা থেকে এই বলে ফিরে গেল যে, অন্যদের পরামর্শ

মত যখন কাজ করা হয়েছে, তখন আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। আমরা অনর্থক নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে চাই না। তার সঙ্গীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুনাফিক। তবে কিছুসংখ্যক মুসলমানও তাদের প্রতারণায় পড়ে তাদের সঙ্গে ফিরে গেল।

অবশেষে হুযুর-আকরাম (সাঃ) সর্বমোট সাতশত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছলেন। তিনি স্বয়ং সামরিক কায়দায় এমনভাবে সৈন্য সমাবেশ করলেন, যাতে ওহুদ পাহাড়টি থাকলো পিছনের দিকে। তিনি হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরের হাতে পতাকা দান করলেন। হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়ামকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। হযরত হামযার হাতে বর্মহীন সৈন্যদের পরিচালনভার অর্পন করলেন। পশ্চাৎদিক থেকে আক্রমণের ভয় থাকায় পঞ্চাশ জন তীরন্দাজের একটি বাহিনীকে সেদিকে নিযুক্ত করলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন পশ্চাৎদিকে টিলার উপর থেকে হেফাজতের দায়িত্ব পালন করেন। সৈন্যদের জয়-পরাজয়ের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং কোন অবস্থাতেই তারা স্থানচ্যুত হবে না। আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের এ তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। কোরাইশরা বদরযুদ্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। তাই তারাও শ্রেণীবদ্ধভাবে সৈন্য সমাবেশ করলো।

বিজাতির দৃষ্টিতে মহানবীর (সাঃ) সামরিক প্রজ্ঞা ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেরূপ সামরিক কায়দায় সৈন্যদের সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ করেন, তা দেখে স্পষ্টতঃই মনে হয় যে, একজন কামেল পথপ্রদর্শক ও পূত-পবিত্র পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে নিপুণ সেনাধ্যক্ষ হিসেবেও তাঁর তুলনা নাই। তিনি যেভাবে ব্যূহ রচনা করে সৈন্য সংস্থাপন করেছিলেন, তখনকার জগৎ সে সম্পর্কে মোটেই জ্ঞাত ছিল না। বর্তমান যুগে সমরবিদ্যা একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। এ যুগের সমর-কুশলীরাও মহানবী (সাঃ) প্রদর্শিত রণনৈপুণ্যকে প্রশংসার চোখে দেখে থাকে। জনৈক খ্রীষ্টান ঐতিহাসিকের ভাষায় ঃ 'একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত যে, অপরিসীম সাহস ও বীরত্বের অধিকারী মুহাম্মদ (সাঃ) শত্রুপক্ষের মোকাবেলায় সমরবিদ্যার ক্ষেত্রেও নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন। তিনি মক্কাবাসীদের বিশৃঙ্খল ও এলোপাথাড়ি যুদ্ধের মোকাবেলায় চমৎকার দূরদর্শিতা ও কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।' এ কথাটি বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসবিদ টম এ্যাণ্ডারসনের। লেখকের 'লাইফ অব মোহাম্মদ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

যুদ্ধের সূচনা ঃ অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হলো। প্রথম দিকে মুসলমানদের পাল্লাই ভারী ছিল। শত্রুসৈন্য ইতস্ততঃ পলায়ন করতে লাগলো। বিজয় সমাপ্ত হয়েছে মনে করে মুসলমান সৈন্যরা গনীমতের মালামাল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন। শত্রুদের পলায়ন করতে দেখে ওহুদ পাহাড়ের পেছন দিকে হুযুর কর্তৃক নিযুক্ত তীরন্দাজ সৈন্যরাও স্থান ত্যাগ করে পাহাড়ের পাদদেশের দিকে আসতে লাগলেন। অধিনায়ক আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কঠোর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের স্থান ত্যাগ করতে বারণ করলেন। কিন্তু কয়েকজন ছাড়া সবাই বলল ঃ হুযুরের নির্দেশটি ছিল সাময়িক। এখন আমাদের সবার সাথে মিলিত হওয়া উচিত। এ সুযোগে কাফের বাহিনীর অধিনায়ক খালেদ ইবনে ওলীদ যিনি তখনও মুসলমান হননি, পাহাড়ের পেছন দিক থেকে ঘুরে এসে গিরিপথে আক্রমণ করে বসলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এ আক্রমণ প্রতিহত করতে চাইলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। খালেদের সৈন্যবাহিনী ঝড়ের বেগে হঠাৎ মুসলমানদের উপর পতিত হলো। অপরদিকে পলায়নপর শত্রুসৈন্যও ফিরে এসে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাপিয়ে পড়ল। এভাবে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। এ আকস্মিক বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুসলিম বাহিনীর একটি বৃহৎ অংশ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল। এতদসত্ত্বেও কিছুসংখ্যক সাহাবী অমিততেজে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শাহাদত বরণ করেছেন। এ সংবাদে মুসলমানদের অবশিষ্ট চেতনাও বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হলো এবং তাঁরা সাহস হারিয়ে ফেললেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) —এর চারপাশে তখন মাত্র দশ-বারো জন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী বিদ্যমান। হুযুর স্বয়ং আহত। পরাজয়- পর্ব সম্পন্ন হওয়ার তেমন কিছুই আর বাকী ছিল না। এমনি সময়ে সাহাবীগণ জানতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জীবিতই রয়েছেন। তখন তাঁরা চতুর্দিক থেকে এসে তাঁর চারপাশে সমবেত হলেন এবং তাঁকে নির্বিঘ্নে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু এ পরাজয়ের দরুন মুসলমানরা অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লেন। মুসলমানদের এ সাময়িক পরাজয় ছিল কয়েকটি কারণের ফলশ্রুতি। কোরআন পাক প্রত্যেকটি কারণ সম্পর্কে একান্ত মাপা শব্দে পর্যালোচনা করেছে এবং ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক থাকতে আদেশ দিয়েছে।

এ যুদ্ধের বিশ্লেষণে অনেক অসাধারণ শিক্ষাপ্রদ ঘটনা রয়েছে —যা মুসলমানদের জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান।

ওহুদের ঘটনার কয়েকটি শিক্ষা ঃ

(১) পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কোরাইশরা এ যুদ্ধে পুরুষদের পশ্চাদপসরণ রোধ করার জন্যে নারীদেরকে সঙ্গে এনেছিল। নবী করীম (সাঃ) দেখলেন, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার নেতৃত্বে মহিলারা কবিতা আবৃত্তি করে পুরুষদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। এ সময় নবী করীম (সাঃ) -এর পবিত্র মুখে এ দোয়া উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ ''হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার কাছ থেকেই শক্তি সঞ্চয় করি, তোমার নামেই আক্রমণ পরিচালনা করি এবং তোমার দ্বীনের জন্যেই লড়াই করি। আমার জন্যে আল্লাহ্ তাআলাই যথেষ্ট —তিনি উত্তম অভিভাবক।'' এ দোয়ার প্রত্যেকটি শব্দ আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক নিবিড় করে এবং মুসলমানদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহকেও অন্যান্য জাতির যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে স্বতন্ত্র রূপ দান করে।

(২) দ্বিতীয় লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এ যুদ্ধে কতিপয় সাহাবী বীরত্ব ও আত্মনিবেদনের জ্বলন্ত স্বাক্ষর স্থাপন করেন, যার নজীর ইতিহাসে দুর্লভ। হযরত আবু দাজানা নিজ দেহ দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ঢালের ন্যায় আড়াল করে রেখেছিলেন। শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর তাঁর দেহে বিদ্ধ হয়েছিল। হযরত তালহাও এমনিভাবে নিজ দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছিলেন ; কিন্তু প্রিয়তম নবীর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। হযরত আনাসের চাচা আনাস ইবনে নসর বদর যুদ্ধে অনুপস্থিতির কারণে অনুতপ্ত ছিলেন। তাঁর অভিলাষ ছিল, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত কোন যুদ্ধে সুযোগ পেলে মনের অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করবেন। ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হলে তিনি তাতে অংশ গ্রহণ করলেন। মুসলিম বাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো এবং কাফের বাহিনী অমিত বিক্রমে অগ্রসর হলো, তখন তিনি তরবারী নিয়ে অগ্রসর হলেন। ঘটনাক্রমে হযরত সা'দ (রাঃ)-কে পলায়নপর মুসলমানদের মধ্যে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে বললেন ঃ

সা'দ কোথায় যাচ্ছ? আমি ওহুদের পাদদেশে বেহেশতের সুগন্ধ অনুভব করছি, একথা বলে এগিয়ে গেলেন এবং তুমুল যুদ্ধের পর শাহাদত বরণ করলেন। —(ইবনে-কাসীর)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ মুসলমানদের ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর কাছে মাত্র এগার জন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। হযরত তালহা (রাঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কোরাইশ সৈন্যরা তখন ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ কে এদের প্রতিরোধ করবে? হযরত তালহা (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ আমি, ইয়া রসূলাল্লাহ। অন্য একজন আনসার সাহাবী বলেন ঃ আমি হাজির আছি, মহানবী (সাঃ) আনসারকে অগ্রসর হতে আদেশ দিলেন। তিনি যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন। শত্রুপক্ষের আরেকটি দলকে অগ্রসর হতে দেখে তিনি আবার উপরোক্ত প্রশ্ন উচ্চারণ করলেন। এবারও হযরত তালহা (রাঃ) পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন। তিনি নির্দেশ পেলেই সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলেন ; কিন্তু মহানবী (সাঃ) এবারও অন্য একজন আনসারকে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে হযরত তালহার বাসনা পূর্ণ হলো না। এভাবে সাত বার প্রশ্ন হলো এবং হযরত তালহা প্রত্যেকবার নির্দেশ লাভে ব্যর্থ হলেন। অন্যান্য সাহাবীকে পাঠিয়ে দেয়া হতো এবং তাঁরা শহীদ হয়ে যেতেন।

বদরযুদ্ধে সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও মুসলমানরা জয়লাভ করেন। ওহুদ যুদ্ধে বদরের তুলনায় সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশী ছিল। তবুও পরাজয় বরণ করতে হলো। এতে মুসলমানদের জন্যে শিক্ষা এই যে, সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্যের উপরই ভরসা করা উচিত নয়, বরং এরূপ মনে করা দরকার যে, বিজয় আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আসে। ফলে তাঁর সাথেই সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হবে।

ইয়ারমুক যুদ্ধের সময় রণাঙ্গণ থেকে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের প্রার্থনা ও মুসলমানদের সংখ্যাল্পতার কথা ব্যক্ত করে লেখা একটি পত্র খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) – এর হস্তগত হয়েছিল। তিনি এর উত্তরে লিখেছিলেন ঃ

قد جاءنى كتابكم تستمدوننى وانى ادلكم على من هو اعز نصرا واحصن جندا اللهُ عزوجل فاستنصروه . فان محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر فى يوم بدر فى اقل من عدتكم فاذا جاء كم كتابى هذا فقاتلوهم ولاترجعونى

—'তোমাদের পত্র হস্তগত হয়েছে। তোমরা অতিরিক্ত সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আমি তোমাদের এমন এক সত্তার ঠিকানা দিচ্ছি —যাঁর সাহায্য অধিকতর কার্যকরী এবং যাঁর সৈন্যবল অজেয়। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। তোমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। মুহাম্মদ (সাঃ) বদরযুদ্ধে তোমাদের চাইতেও কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য লাভ করেছিলেন। আমার এ পত্র পৌঁছা মাত্রই তোমরা শত্রু সৈন্যে উপর ঝাঁপিয়ে পড় এবং আমার কাছে এ ব্যাপারে অধিক কিছু লেখার প্রয়োজন নেই।''

এ ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন ঃ এ পত্র পেয়ে আমরা আল্লাহ্ নাম উচ্চারণ করে অগণিত কাফের বাহিনীর উপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং শত্রুরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করল। হযরত ফারূকে আযম জানতেন, মুসলমানের জয়-পরাজয় সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাল্পতার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং আল্লাহ্র প্রতি ভরসা ও তাঁর সাহায্যের দ্বারাই এর মীমাংসা হয়। হুনায়ন যুদ্ধ প্রসঙ্গে কোরআন পাক এ সত্যটিই ফুটিয়ে তুলেছে ঃ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا

অর্থাৎ, "হুনায়ন যুদ্ধের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা স্বীয় সংখ্যাধিক্যে গর্বিত হয়ে পড়েছিলে। কিন্তু এ সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন উপকারেই আসেনি।" এবার আলোচ্য আয়াতসমূহের তফসীরের প্রতি লক্ষ্য করুনঃ

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ – অর্থাৎ, "আপনি যখন সকাল বেলায় বের হয়ে যুদ্ধার্থ মুসলমানদের বিভিন্ন ব্যূহে সংস্থাপিত করেছিলেন।"

ঘটনা বর্ণনায় কোরআন পাকের একটি বিশেষ অলৌকিক পদ্ধতি এই যে, এতে কোন ঘটনা খুঁটিনাটিসহ সবিস্তারে বর্ণনা করা হয় না। তবে ঘটনায় যেসব বিশেষ নির্দেশ নিহিত থাকে, সেগুলো বর্ণনা করা হয়। আলোচ্য আয়াতে যেসব খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে, উদাহরণত ঃ কখন গৃহ থেকে বের হয়েছিলেন, তা غَدَوْتَ শব্দে ব্যক্ত হয়েছে। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, এটা ছিল তৃতীয় হিজরীর ৭ই শাওয়ালের সকাল বেলা।

এরপর বলা হয়েছে, এ সফর কোথা থেকে আরম্ভ হয়েছিল। مِنْ أَهْلِكَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সে সময় তিনি পরিবার-পরিজনের মধ্যে ছিলেন এবং তাঁদের সেখানে রেখেই তিনি বের হয়ে পড়েছিলেন। অথচ আক্রমণটি মদীনার উপরই হওয়ার ছিল। এসব খুঁটিনাটি ঘটনায় এ নির্দেশ রয়েছে যে, আল্লাহ্র নির্দেশ এসে গেলে তা পালন করতে পরিবার-পরিজনের মায়া-মমতা অন্তরায় না হওয়াই উচিৎ। এর পর গৃহ থেকে বের হয়ে রণাঙ্গন পর্যন্ত পৌঁছার খুঁটিনাটি ঘটনা বাদ দিয়ে রণাঙ্গণের প্রথম কাজ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ

অর্থাৎ, আপনি যুদ্ধার্থ মুসলমানদের উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপিত করেছিলেন। অতঃপর আয়াতটি এভাবে শেষ করা হয়েছে ঃ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ – অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী, এই দুইটি গুণবাচক শব্দ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তখন শত্রু ও মিত্র উভয় পক্ষ নিজ নিজ অবস্থানে যা বলাবলি করছিল, তা সবই আল্লাহ্ তাআলার জানা হয়ে গেছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যা কিছু ঘটেছে তার কোনটিই তাঁর অজানা নয়। এমনিভাবে এ যুদ্ধের পরিণামও তাঁর অজ্ঞাত নয়।

দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে– إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا অর্থাৎ, তোমাদের দুটি দল ভীরুতা প্রকাশের সংকল্প করেছিল, অথচ আল্লাহ্ তাদের সহায় ছিলেন। এ দুই দল হলো আউস গোত্রের বনী হারেসা এবং খাযরাজ গোত্রের বনী সালমা। এরা উভয়েই আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের দেখাদেখি দুর্বলতা প্রদর্শন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের মধ্যে দুর্বলতা ছিল না, বরং স্বদলের সংখ্যাল্পতা ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই তারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক ইবনে হেশাম এ বিষয়টি যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন। وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا বাক্যটি তাদের ঈমানের

পূর্ণাঙ্গতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ গোত্রদ্বয়ের কোন কোন বুযুর্গ বলতেন ঃ আয়াতে আমাদের প্রতি কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ব্যাক্যাংশের সুসংবাদও আমাদের লক্ষ্য করেই উক্ত হয়েছে।

এ আয়াতের শেষভাবে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করাই মুসলমানদের কর্তব্য। এতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সংখ্যাধিক ও সাজ-সরঞ্জামের উপর ভরসা করা মুসলমানদের উচিত নয়। বরং সামর্থ্য অনুযায়ী সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রাম করার পর ভরসা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের উপরই করা দরকার। সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই বনী-হারেসা ও বনী সালমার মনে দুর্বলতা ও ভীরুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা দ্বারা এর প্রতিকার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতি যথার্থ ভরসা ও আস্থাই এ জাতীয় কুমন্ত্রণার অমোঘ প্রতিকার।

'**তাওয়াক্কুল**' (আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ভরসা) মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। সুফী বুযুর্গগণ এর স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে এতটুকু বোঝা দরকার যে, বাহ্যিক উপায়-উপকরণ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়। বরং তাওয়াক্কুল হলো সামর্থ্য অনুযায়ী যাবতীয় বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করার পর ফলাফলের ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করা এবং বাহ্যিক উপায়াদির জন্যে গর্ব না করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। এ ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ)-এর উত্তম নমুনা আমাদের সামনে রয়েছে। স্বয়ং মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করা, সামর্থ্য অনুযায়ী অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য সমরোপকরণ সংগ্রহ করা, রণাঙ্গণে পৌঁছে স্থানোপযোগী যুদ্ধের মানচিত্র তৈরী করা, বিভিন্ন ব্যূহ রচনা করে সাহাবায়ে কেরামকে তথায় সংস্থাপিত করা ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠ ব্যবস্থা বৈ তো নয়। মহানবী (সাঃ) স্বহস্তে এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে প্রকারান্তরে এ কথাই বলে দিয়েছেন যে, বাহ্যিক উপায়াদিও আল্লাহ্ তাআলার অবদান। এগুলো থেকে সম্পর্কেচ্ছেদ করা তাওয়াক্কুল নয়। এক্ষেত্রে মুসলিম ও অ-মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, মুসলমানরা সব সাজ-সরঞ্জাম বৈষয়িক শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ করার পরও ভরসা একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই করে। পক্ষান্তরে অ-মুসলিমরা এ আধ্যাত্মিকতা থেকে বঞ্চিত। তারা বৈষয়িক শক্তির উপরই ভরসা করে। সবগুলো ইসলামী যুদ্ধে এ পার্থক্যটি প্রকাশ পেতে দেখা গেছে।

অতঃপর ঐ যুদ্ধের দিকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে - যাতে মুসলমানরা পুরাপুরি তাওয়াক্কুলের পরিচয় দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদের সাফল্য দান করেছিলেন। وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তাআলা বদরে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন; অথচ তোমরা সংখ্যায় ছিলে অতি নগণ্য।

বদরের গুরুত্ব ও অবস্থান ঃ মদীনা থেকে প্রায় ষাট মাইল পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত একটি বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম বদর।

তখনকার দিনে এখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটির গুরুত্ব ছিল অত্যাধিক। এখানেই তওহীদ ও শেরেকের মধ্যে সর্বপ্রথম সংঘর্ষ ঘটে দ্বিতীয় হিজরী, ১৭ই রমযান মোতাবেক ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে, ১১ই মার্চ শুক্রবার দিন। এটি বাহ্যতঃ একটি স্থানীয় যুদ্ধ মনে হলেও বাস্তবে পৃথিবীর ইতিহাসে এর ফলে একটি সুমহান বিপ্লব সূচিত হয়েছিল। এ কারণেই কোরআনের ভাষায় একে 'ইয়াওমুল-ফোরকান' বলা হয়েছে। পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদরাও এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।

আমেরিকার প্রফেসর হিট্টি 'আরব জাতির ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন —এটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম প্রকাশ্য বিজয়।

وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ - অর্থাৎ, তোমরা সংখ্যায় অল্প ও সাজ-সরঞ্জামে নগণ্য ছিলে। সহীহ্ রেওয়ায়েত অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। তাদের সঙ্গে অশ্ব ছিল মাত্র ২টি এবং উট ৭০টি। সৈন্যরা পালাক্রমে এগুলোর উপর সওয়ার হয়ে যুদ্ধ করতেন।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর —যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

কোরআন পাক স্থানে স্থানে মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র ও শত্রুদের শত্রুতার অশুভ পরিণাম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ধৈর্য ও খোদাভীতিকে প্রতিকার হিসেবে বর্ণনা করেছে। বলাবাহুল্য, এ দুইটি বিষয়ের মধ্যেই সমগ্র সাংগঠনিক তৎপরতা ও প্রকাশ্য বিজয়ের রহস্য নিহিত। পূর্বেও একথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ধৈর্য ও আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় এ উভয়টিকে উল্লেখ না করে শুধু তাকওয়া বা আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ, তাকওয়া প্রকৃতপক্ষে একটি ব্যাপক গুণ। ধৈর্যও এর অন্তর্ভুক্ত।

ফেরেশতা প্রেরণের রহস্য ঃ এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে, আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদের প্রভূত শক্তি দান করেছেন। একজন ফেরেশতা একাই গোটা জনপদ উল্টে দিতে পারেন। উদাহরণত ঃ কওমে-লূতের বস্তি একা জিবরাঈলই (আঃ) উল্টে দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় এখানে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করার কি প্রয়োজন ছিল?

এছাড়া ফেরেশতারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণই করেছিল, তখন একটি কাফেরেরও প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এসব প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং কোরআন পাক وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى আয়াতে দিয়েছে। অর্থাৎ, ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য তাঁদের দ্বারা যুদ্ধ জয় করানো ছিল না; বরং উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীকে সান্ত্বনা প্রদান করা, তাদের মনোবল দৃঢ় করা এবং বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া। আয়াতের শব্দ اِلَّا بُشْرٰى এবং وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ থেকে এ কথাই ফুটে উঠেছে। এ ঘটনা সম্পর্কেই সূরা আনফালে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমরা মুসলমানদের অন্তর স্থির রাখ —অস্থির হতে দিয়ো না। অন্তর স্থির রাখার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সুফীবাদী সাধকগণের নিয়ম মাফিক 'তাসাররুফ' তথা অবস্থান্তরকরণের মাধ্যমে অন্তরকে সুদৃঢ় করে দেয়া।

আরেকটি পন্থা, কোন না কোন উপায়ে মুসলমানদের সামনে একথা ফুটিয়ে তোলা যে, আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা তাদের সাহায্যার্থে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যেমন কখনও দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে, কখনও আওয়াজ দিয়ে এবং কখনও অন্য কোন উপায়ে। বদরের রণক্ষেত্রে এসব উপায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ —আয়াতের এক তফসীর অনুযায়ী এতে ফেরেশতাদের সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন

হাদীসে আছে, ফেরেশতারা কোন মুশরিকের উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা করতেই আপনা-আপনি তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।—(হাকেম)

কোন কোন সাহাবী জিবরাঈলের আওয়াজ শুনেছেন যে, তিনি اقدم حيزوم বলেছেন। কেউ কেউ কতক ফেরেস্তাকে দেখেছেনও।—(মুসলিম)

উপরোক্ত ঘটনাবলী এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে ফেরেশতাগণ মুসলমানদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, তারাও যেন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের কাজ ছিল মুসলমানদের মনোবল অটুট রাখা এবং সান্ত্বনা দেয়া। ফেরেশতাদের দ্বারা যুদ্ধ করানো কখনও উদ্দেশ্য ছিল না। এর আরও একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, এ জগতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জেহাদের দায়িত্ব মানুষের স্কন্ধে অর্পন করা হয়েছে। সে কারণেই তারা সওয়াব, ফযীলত ও উচ্চমর্যাদা লাভ করে। ফেরেশতা-বাহিনী দ্বারা দেশ জয় করা যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতো, তাহলে পৃথিবীতে কাফেরদের রাষ্ট্র দূরের কথা, তাদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেতো না। এ বিশ্ব চরাচরে আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা তা নয়। এখানে কুফর, ঈমান, ইবাদত ও গোনাহ্ মিশ্রিতভাবেই চলতে থাকবে। এদের পরিষ্কার পৃথকীকরণের জন্যে হাশরের দিন নির্ধারিত রয়েছে।

বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সংখ্যা বিভিন্ন সূরায় বিভিন্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আনফালের আয়াতে এক হাজার, সূরা আলে-ইমরানের আয়াতে প্রথমে তিন হাজার এবং পরে পাঁচ হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা করা হয়েছে। এর রহস্য কি? উত্তর এই যে সূরা আন্‌ফালে বলা হয়েছে, বদর যুদ্ধে মুসলমানগণ (যাদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের) শত্রু সংখ্যা এক হাজার দেখে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এতে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করার ওয়াদা করা হয়। অর্থাৎ, শত্রু সংখ্যা যত, ততসংখ্যক ফেরেশতা প্রেরণ করা হবে। আয়াতের ভাষা এরূপ ঃ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

—যখন তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের জবাব দেন যে, আমি এক হাজার অনুসরণকারী ফেরেশতার দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবো। এ আয়াতের পরও ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে —মুসলমানদের মনোবল অটুট রাখা এবং বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা। পরবর্তী আয়াতটি এই ঃ

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ

সূরা আলে-ইমরানের আলোচ্য আয়াতে তিন হাজার ফেরেশতার ওয়াদা করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বদরের মুসলমানদের কাছে সংবাদ পৌছে যে, কুরয ইবনে জাবের মুহারেবী স্বীয় গোত্রের বাহিনী নিয়ে কোরাইশদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসছে। —(রূহুল-মা'আনী) পূর্বেই শত্রুদের সংখ্যা মুসলমানদের তিনগুণ বেশী ছিল। এ সংবাদে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিলে তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা করা হয় —যাতে শত্রুদের চাইতে মুসলমানদের সংখ্যা তিন গুণ বেশী হয়ে যায়।

অতঃপর এ আয়াতের শেষ ভাগে কয়েকটি শর্ত যোগ করে এ সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে পাঁচ হাজার করে দেয়া হয়। শর্ত ছিল দু'টি ঃ (এক) মুসলমানগণ ধৈর্য ও আল্লাহ্‌ভীতির উচ্চস্তরে পৌছলে, (দুই) শত্রুরা আকস্মিক আক্রমণ চালালে। দ্বিতীয় শর্তটি অর্থাৎ, আকস্মিক আক্রমণ বাস্তবে ঘটেনি, তাই পাঁচ হাজারের ওয়াদা পূরণেরও প্রয়োজন হয়নি। আকস্মিক আক্রমণ না হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র ওয়াদা পাঁচ হাজারের আকারে পূর্ণ করা হয়েছে, না তিন হাজারের আকারে সে সম্পর্কে তফসীর ও ইতিহাসবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ – এখান থেকে আবারো ওহুদের ঘটনায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। মাঝখানে সংক্ষেপে বদর যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এ আয়াত অবতরণের হেতু এই যে, ওহুদ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মুখস্থ উপর ও নীচের চারটি দাঁতের মধ্য থেকে নীচের পাটির ডান দিকের একটি দাঁত শহীদ এবং মুখমণ্ডল আহত হয়ে পড়েছিল। এতে দুঃখিত হয়ে তিনি এ বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন ঃ "যারা নিজেদের পয়গম্বরের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে, তারা কেমন করে সাফল্য অর্জন করবে? অথচ পয়গম্বর তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করেন।" এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি কোন কোন কাফেরের জন্যে বদদোয়াও করেছিলেন। এতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً কয়েকগুণ বেশী, অর্থাৎ, চক্রবৃদ্ধি হারকে সুদ হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে অত্যন্ত কঠোরভাবে সর্বাবস্থায় সুদ হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। সূরা বাক্বারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً কে উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি চক্রবৃদ্ধি সুদ থেকে বেঁচেও থাকে, তবে সুদের উপার্জনকে যখন পুনরায় সুদে খাটাবে, তখন অবশ্যই দ্বিগুণের দ্বিগুণ হতে থাকবে —যদিও সুদখোরদের পরিভাষায় একে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হবে না। সারকথা, সব সুদই পরিণামে দ্বিগুণের ওপর দ্বিগুণ সুদ হয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতে সবরকম সুদকেই নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে।

আলোচ্য ১৩২ নং আয়াতে দুইটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (এক) প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যের সাথে রসূলের আনুগত্যেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, রসূলের আনুগত্য যদি হুবহু আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআনর আনুগত্য হয়ে থাকে, তবে একে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে যদি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে, তবে তা কি?

(দুই) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মকবুল ও নিষ্ঠাবান পরহেযগার বান্দার গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য শুধু মৌখিক দাবীকে বলা হয় না, বরং গুণাবলী ও লক্ষণাদির দ্বারাই আনুগত্যকারীর পরিচয় হয়।

রসূলের আনুগত্যকে পৃথক করে বর্ণনা করার তাৎপর্য ঃ প্রথমোক্ত বিষয়টি প্রথম আয়াত وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ এ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর,

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ
وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ
وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا
اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَمَنْ يَّغْفِرُ
الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۚ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ
يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ
جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَنِعْمَ اَجْرُ
الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِي
الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾ هٰذَا
بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾ وَلَا تَهِنُوْا وَ
لَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾ اِنْ
يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ۚ وَتِلْكَ
الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٠﴾

(১৩৩) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য। (১৩৪) যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন। (১৩৫) তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না। (১৩৬) তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ—যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান! (১৩৭) তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ—যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (১৩৮) এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশবাণী। (১৩৯) আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে। (১৪০) তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ্ জানতে চান—কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না।

যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয়। এতে আল্লাহ্র করুণালাভের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যকে যেমন অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য করা হয়েছে, তেমনি রসূল (সাঃ) —এর আনুগত্যকেও জরুরী ও অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু এ আয়াতেই নয়, বরং সমগ্র কোরআনে বার বার এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং যেখানেই আল্লাহ্র আনুগত্যের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই রসূলের আনুগত্যকেও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন পাকের এই উপর্যুপরি ও অব্যাহত বাণী ইসলাম ও ঈমানের এ মূলনীতির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, ঈমানের প্রথম অংশ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব, একত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে রসূল (সাঃ) –এর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য করা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৩৩ নং আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের পর এটি দ্বিতীয় নির্দেশ। এখানে ক্ষমার অর্থ এমন সৎকর্ম, যা আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমা লাভ করার কারণ হয়। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু সারমর্ম সবগুলোরই এক। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, 'কর্তব্য পালন', হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'ইসলাম', আবুল আলিয়া 'হিজরত', আনাস ইবনে-মালেক 'নামাযের প্রথম তাকবীর', সায়ীদ ইবনে-জুবায়ের 'এবাদত পালন', যাহ্হাক 'জেহাদ' এবং ইকরিমা 'তওবা' বলেছেন। এসব উক্তির সারকথা এই যে, ক্ষমা বলে এমন সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্র ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে।

এখানে দুইটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। (এক) এ আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ অন্য এক আয়াতে وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ – যে কাজের দৌলতে একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বাসনা করতে নিষেধও করা হয়েছে।

উত্তর এই যে, শ্রেষ্ঠত্ব দু'প্রকার (এক) ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা অর্জন করা মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির বাইরে। এগুলোকে অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। উদাহরণতঃ শ্বেতাঙ্গ হওয়া, সুশ্রী হওয়া, বুযুর্গ পরিবারভুক্ত হওয়া ইত্যাদি। (দুই) ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা মানুষ অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে পারে। এগুলোকে ইচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। অনিচ্ছাধীন শেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা এবং বাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্ স্বীয় হেকমত অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বণ্টন করেছেন। এতে কারও চেষ্টার কোন দখল নাই। সুতরাং যত চেষ্টা ও বাসনাই করা হোক না কেন এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে না। চেষ্টাকারীর মনে হিংসা ও শত্রুতার আগুন জ্বলা ছাড়া আর কোন ফায়দা হবে না। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি কৃষ্ণাঙ্গ। সে যদি শ্বেতাঙ্গ হওয়ার বাসনা করতে থাকে, এতে লাভ কি? তবে যেসব শ্রেষ্ঠত্ব ইচ্ছাধীন সেগুলোকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অর্জন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা শুধু এক আয়াতে নয়— বহু আয়াতে এ নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ পুণ্যার্জনে একে অন্যকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাও। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنٰفِسُوْنَ। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যদি কারও মধ্যে এমন কোন সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত ত্রুটি থাকে, যা দূর করা তার সাধ্যাতীত, তবে এ ত্রুটি স্বীকার

করে নিয়ে অন্যের গুণের দিকে না তাকিয়ে স্বীয় কাজ করে যাওয়াই তার উচিত। কেননা, সে যদি নিজ ত্রুটির জন্যে অনুতাপ ও অন্যের গুণের জন্যে হিংসা করতে থাকে, তবে যতটুকু কাজ করা সম্ভব ততটুকুও করতে পারবে না এবং একেবারে অথর্ব হয়ে পড়বে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আয়াতে ক্ষমাকে জান্নাতের পূর্বে উল্লেখ করে সম্ভবতঃ এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, জান্নাত লাভ করা আল্লাহ্র ক্ষমা ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা, মানুষ যদি জীবনভর পুণ্য অর্জন করে এবং গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে, তবুও তার সমগ্র পুণ্যকর্ম জান্নাতের মূল্য হতে পারে না। জান্নাত লাভের পন্থা মাত্র একটি। তা'হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমা ও অনুগ্রহ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

—'সততা ও সত্য অবলম্বন কর মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ কর এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের সুসংবাদ লাভ কর। কারও কর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। শ্রোতারা বললো ঃ আপনাকেও নয়কি—ইয়া রসূলাল্লাহ্। উত্তর হলো ঃ আমার কর্ম আমাকেও জান্নাতে নেবে না। তবে আল্লাহ্ যদি স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন।'

মোটকথা এই যে, আমাদের কর্ম জান্নাতের মূল্য নয়। তবে আল্লাহ্ তাআলার রীতি এই যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ঐ বান্দাকেই দান করেন, যে সৎকর্ম করে। বরং সৎকর্মের সামর্থ্য লাভ হওয়াই আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষণ। অতএব সৎকর্ম সম্পাদনে ত্রুটি করা উচিত নয়। আল্লাহ্র ক্ষমাই জান্নাতে প্রবেশের আসল কারণহেতু এর প্রতি গুরুত্বদানের উদ্দেশে একে এককভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশে مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ বলা হয়েছে। 'পালনকর্তা' বিশেষণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য আরও কৃপা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করা।

আয়াতে জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমান। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের চাইতে অধিক বিস্তৃত কোন বস্তু মানুষ কল্পনা করতে পারে না। এ কারণে বোঝাবার জন্যে জান্নাতের প্রশস্ততাকে এ দু'টির সাথে তুলনা করে বোঝানো হয়েছে যে, জান্নাত খুবই বিস্তৃত। প্রশস্ততায় তা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে নিজের মধ্যে ধরে নিতে পারে। এর প্রশস্ততাই যখন এমন, তখন দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে, তা আল্লাহ্ মালুম। আয়াতের এ ব্যাখ্যা তখন হবে, যখন عرض শব্দের অর্থ طول তথা দৈর্ঘ্যের বিপরীত নেয়া হয়। কিন্তু যদি এর অর্থ হয় 'মূল্য' তবে আয়াতের অর্থ হবে যে, জান্নাত কোন সাধারণ বস্তু নয়— এর মূল্য সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল। সুতরাং এহেন মূল্যবান বস্তুর প্রতি ধাবিত হও।

তফসীর-কবীরে বলা হয়েছে ঃ

– "আবু মুসলিম বলেন ঃ আয়াতে উল্লেখিত عرض শব্দের অর্থ ঐ বস্তু যা বিক্রিত বস্তুর মোকবেলায় মূল্য হিসেবে পেশ করা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যদি জান্নাতের মূল্য ধরা হয়, তবে সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের সবকিছু হবে এর মূল্য। এতে করে জান্নাত যে বিশাল ও অমূল্য বিষয় তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য।"

জান্নাতের দ্বিতীয় বিশেষণে বলা হয়েছে ঃ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ অর্থাৎ, জান্নাত মোত্তাকীগণের জন্যে নির্মিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, জান্নাত সৃষ্ট হয়ে গেছে। কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপরে অবস্থিত এবং সপ্তম আকাশই তার যমীন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বাসী মোত্তাকীদের বিশেষ গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা করেছেন। এসব গুণ ও লক্ষণের সাথে অনেক তাৎপর্য নিহিত। উদাহরণতঃ কোরআন পাক স্থানে স্থানে সৎলোকদের সংসর্গ ও তাদের শিক্ষা থেকে উপকৃত হওয়ার প্রতি জোর দিয়েছে। কোথাও صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ বলে দ্বীনের সরল ও বিশুদ্ধ পথ তাদের কাছ থেকে শিক্ষা করার প্রতি ইশারা করেছে এবং কোথাও وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ বলে তাদের সংসর্গের বিশেষ কার্যকারিতা নির্দেশ করেছে। জগতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার লোকই রয়েছে। ভাল লোকদের পোশাকে মন্দরাও অনেক সময় তাদের স্থান দখল করে বসে। এ কারণে সৎ ও মোত্তাকীদের বিশেষ লক্ষণ ও গুণাবলী বর্ণনা করে একথা বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজন ছিল যে, মানুষ যেন ভ্রান্ত পথপ্রদর্শক ও নেতাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে এবং সাচ্চা লোকদের লক্ষণ চিনে নিয়ে তাদের অনুসরণ করে। বিশ্বাসী মোত্তাকীদের গুণাবলী ও লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও জান্নাতের উচ্চস্তর বিবৃত করে সৎলোকদের সুসংবাদ এবং অসৎ লোকদের জন্যে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদানের পথ খোলা হয়েছে। উপসংহারে هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ বলে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের যেসব গুণ ও লক্ষণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে প্রাথমিক আয়াতসমূহে মানবীয় অধিকার ও পারস্পরিক জীবন-যাপন সম্পর্কিত গুণাবলী ব্যক্ত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার এবাদত ও আনুগত্য সম্পর্কিত গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে। শব্দান্তরে প্রথমোক্ত গুণাবলীকে 'হুকূল-ইবাদ' (বান্দার হক) এবং শেষোক্ত গুণাবলীকে 'হুকূকুল্লাহ্' (আল্লাহ্র হক) বলা যেতে পারে।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলী আগে এবং আল্লাহ্র অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলীকে পরে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আসলের দিক দিয়ে যদিও আল্লাহ্র অধিকার সব অধিকারের চাইতে অগ্রগণ্য, তবুও এতদুভয়ের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা বান্দার উপর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন সত্য, কিন্তু এতে আল্লাহ্ তাআলার নিজস্ব কোন লাভ বা স্বার্থ নাই এবং এসব অধিকারের প্রয়োজনও তাঁর নাই। বান্দা এসব হক আদায় না করলে আল্লাহ্ তাআলার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। তাঁর সত্তা সব কিছুর উর্ধ্বে। তাঁর এবাদত দ্বারা স্বয়ং এবাদতকারীই উপকৃত। তদুপরি তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দাতাও বটেন। তাঁর অধিকারে সর্বাধিক ত্রুটিকারী ব্যক্তি যখনই স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর দিকে ধাবিত হয় এবং তওবা করে,তখনই তাঁর দয়ার দরবার থেকে এক নিমিষের মধ্যে তওবাকারীর সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যেতে পারে। হুকূকুল-ইবাদ কিন্তু এমন নয়। কেননা, বান্দা স্বীয় অধিকারের প্রতি মুখাপেক্ষী। তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করা না হলে তার ভয়ানক ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি মাফ করে দেয়াও বান্দার পক্ষে সহজ নয়। এ কারণেই বান্দার অধিকার বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

এতদ্ব্যতীত পারস্পরিক অধিকার আদায়ের উপরই বিশ্বজগতের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মানব সমাজের সংশোধন সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। এর সামান্য ত্রুটিই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও গোলযোগের পথ খুলে দেয়। পক্ষান্তরে পারস্পরিক অধিকার আদায়ের মাধ্যমে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতে পারলে শত্রু ও মিত্রে পরিণত হয়ে পড়ে এবং শতাব্দীকালের যুদ্ধ ও শান্তি

সভ্যতায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। এসব কারণেও মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলীকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঃ

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ অর্থাৎ, মোত্তাকী তারাই, যারা আল্লাহ্ তাআলার পথে স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত। স্বচ্ছলতা হোক কিংবা অভাব-অনটন হোক, সর্বাবস্থায় তারা সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত রাখে। বেশী হলে বেশী এবং কম হলে কমই ব্যয় করে। এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে নিজেকে মুক্ত মনে করবে না এবং এ সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে না। কেননা, হাজার টাকা থেকে এক টাকা ব্যয় করার যে মর্তবা আল্লাহ্‌র কাছে হাজার পয়সার এক পয়সা ব্যয় করারও একই মর্তবা। কার্যক্ষেত্রে হাজার টাকার মালিকের পক্ষে এক টাকা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা যেমন কঠিন নয়, তেমনি হাজার পয়সার মালিকের পক্ষে এক পয়সা ব্যয় করতেও কোন কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

অপরদিকে আয়াতে এ নির্দেশও রয়েছে যে, অভাব-অনটনেও সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত রাখলে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার কল্যাণকর অভ্যাসটি বিনষ্ট হবে না। সম্ভবতঃ এর বরকতে আল্লাহ্ তাআলা আর্থিক স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন।

আয়াতে তৃতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। তা এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে অন্যের উপকার ও দরিদ্রদের সাহায্য করার অভ্যাস গড়ে তোলে, সে কখনও অপরের অধিকার খর্ব করতে প্রবৃত্ত হবে না এবং অপরের সম্পদ সম্মতি ব্যতিরেকে হজম করে ফেলার ইচ্ছা করবে না। অতএব প্রথমোক্ত এ গুণটির সারমর্ম হল এই যে, বিশ্বাসী, আল্লাহ্‌ভীরু এবং আল্লাহ্‌র প্রিয়বান্দারা অপরের উপকার সাধনের চিন্তায় সদা ব্যাপৃত থাকেন; তারা স্বচ্ছলই হোক কিংবা অভাবগ্রস্ত। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একবার মাত্র একটি আঙ্গুরের দানা খয়রাত করেছিলেন। তখন তাঁর কাছে এ ছাড়া কিছুই ছিল না।

আল্লাহ্‌র পথে শুধু অর্থ ব্যয় করাই জরুরী নয় ঃ আয়াতে আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন يُنْفِقُوْنَ বলে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করেছে, কিন্তু কি ব্যয় করবে, তার কোন উল্লেখ নেই। এ ব্যাপকতা থেকে বোঝা যায় যে, শুধু অর্থ সম্পদই নয় বরং ব্যয় করার মত প্রত্যেক বস্তুই এর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণতঃ কেউ যদি তার সময়, কিংবা শ্রম আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তাহলে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

স্বচ্ছলতা ও অভাব-অনটন উল্লেখ করার আরও একটি রহস্য ঃ এ দু'অবস্থায়ই মানুষ আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য হলে আরাম-আয়েশে ডুবে মানুষ আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়। অপরদিকে অভাব-অনটন থাকলে প্রায়ই সে চিন্তায় মগ্ন হয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা আরাম-আয়েশেও আল্লাহ্‌কে ভুলে না কিংবা বিপদাপদেও আল্লাহ্‌র প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে না।

আলোচ্য সূরায় ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে জানা গেছে যে, কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এ যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে জয়লাভ করার পর অবশেষে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করে। সত্তরজন সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আহত হন। কিন্তু এ সবের পর আল্লাহ্ তাআলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়।

এ সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ ছিল তিনটি। (এক) —রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মতভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত পালিত হয়নি। কেউ বলতো ঃ আমাদের এখানেই অটল থাকা দরকার। অধিকাংশের মত ছিল এখন এ জায়গায় অবস্থান করার কোন প্রয়োজন নেই। সবার সাথে মিলিত হয়ে শত্রুদের পরিত্যক্ত সামগ্রী আহরণ করা উচিত। (দুই) —খোদ নবী করীম (সাঃ)-এর নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই ভীত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ে। (তিন) —মদীনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুদের মোকাবেলা করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আদেশ পালনে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, সেটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমানদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তারা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ সাময়িক পরাজয় অবশেষে বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিল সত্য ; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। মুসলিম বীরদের মৃতদেহ ছিল চোখের সামনে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কেও হতভাগারা আহত করে দিয়েছিল। সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নৈরাশ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। মুসলিম মুজাহিদগণ স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যেও বেদনায় মুষড়ে পড়েছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে দু'টি বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। (এক) অতীত ঘটনার জন্যে দুঃখ ও বিষাদ। (দুই) আশঙ্কা যে, ভবিষ্যতের জন্যে মুসলমানগণ যেন দুর্বল ও হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এ জাতি অঙ্কুরেই না মনোবল হারিয়ে ফেলে। এ দুইটি ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্যে কোরআন পাকের এ বাণী অবতীর্ণ হয়—

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ, 'ভবিষ্যতের জন্যে তোমরা দৌর্বল্য ও শৈথিল্যকে কাছে আসতে দিয়ো না এবং অতীতের জন্যেও বিমর্ষ বিষণ্ণ হয়ো না। যদি তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাক এবং আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদার উপর ভরসা রেখে রসূলের (সাঃ) আনুগত্য ও আল্লাহ্‌র পথে জেহাদে অনড় থাক, তবে পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।'

উদ্দেশ্য এই যে, অতীতে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ সংশোধনের চিন্তা করা দরকার। ঈমান, বিশ্বাস ও রসূলের আনুগত্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশারী। এগুলো হাতছাড়া হতে দিয়ো না। পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।

কোরআন পাকের এ বাণী ভগ্ন হৃদয়কে জুড়ে দিল এবং মৃতপ্রায় দেহে সঞ্জীবনীর কাজ করল। চিন্তা করুন, আল্লাহ্ তাআলা কিভাবে সাহাবায়ে-কেরামের আত্মিক চেতনাকে সঞ্জীবিত করেছেন। তিনি চিরদিনের জন্যে তাদের একটি মূলনীতি দিয়ে দিলেন যে, অতীত বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় সময় নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ শক্তি ও প্রভাব সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। সাথে সাথে একথাও বলে দিলেন যে, বিজয় ও প্রাধান্য অর্জনের মূল সহায়ক একটিই। অর্থাৎ, ঈমান ও তার দাবীসমূহ পূরণ করা। যুদ্ধের জন্যে যেসব প্রস্তুতি নেয়া হয়, সেগুলোও ঈমানের দাবীর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, সামরিক শক্তির দৃঢ়তা, সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং বাহ্যিক উপায়াদি দ্বারা সামর্থ্য অনুযায়ী সুসজ্জিত হওয়া। ওহুদ যুদ্ধের সমগ্র ঘটনাবলী এসব বিষয়েরই সাক্ষ্য বহন করে।

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤١﴾ اَمْ
حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا
مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٢﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ
قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾ وَمَا
مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَا۟ئِنْ
مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى
عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَ
مَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ
الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾ وَكَاَيِّنْ
مِّنْ نَّبِىٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا
لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ؕ
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ
قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا
وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

(১৪১) আর এ কারণে আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে পাক–সাফ করতে চান এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করে দিতে চান। (১৪২) তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল? (১৪৩) আর তোমরা তো মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখন তো তোমরা তা চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছ। (১৪৪) আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহ্র কিছুই ক্ষতি–বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্ তাদের সওয়াব দান করবেন। (১৪৫) আর আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না—সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান করব। পক্ষান্তরে—যে লোক আখেরাতে বিনিময় কামনা করবে, তা থেকে—আমি তাকে তাই দেবো। আর যারা কৃতজ্ঞ তাদেরকে আমি প্রতিদান দেবো। (১৪৬) আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী–সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জেহাদ করেছে; আল্লাহ্র পথে–তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহ্র রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন। (১৪৭) তারা আর কিছুই বলেনি—শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদিগকে সাহায্য কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য

এ আয়াতে ভিন্ন ভঙ্গিতে মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছেঃ এ যুদ্ধে তোমরা আহত ও নিহত হয়েছ ঠিকই, কিন্তু তোমাদের প্রতিপক্ষও তো ইতিপূর্বে এ ধরনের দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে। ওহুদে তোমাদের সত্তর জন শহীদ ও অনেক আহত হয়েছে। এক বৎসর পূর্বে তাদেরও সত্তর জন লোক জাহান্নামবাসী ও অনেক আহত হয়েছিল। স্বয়ং এ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েও তাদের অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। তাই কোরআন বলেঃ

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ
نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

অর্থাৎ, "তোমাদের গায়ে ক্ষত লেগে থাকলে তাদের গায়েও ইতিপূর্বে এমনি ক্ষত লেগেছে। আমি এ দিনগুলোকে পালাক্রমে পরিক্রমণ করাই। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে।"

আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলার চিরাচরিত রীতি হচ্ছে যে, তিনি কঠোরতা, নম্রতা, সুখ–দুঃখ, কষ্ট ও আরামের দিনগুলোকে মানুষের মধ্যে চক্রবৎ ঘুরিয়ে আনেন। যদি কোন কারণে কোন মিথ্যা শক্তি সাময়িকভাবে বিজয় ও সাফল্য অর্জন করে ফেলে, তবে তাতে সত্যপন্থীদের হতোদ্যম হয়ে পড়া সঙ্গত নয় এবং এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, এখন থেকে পরাজয়ই তাদের ভাগ্যলিপি হয়ে গেছে। বরং এ পরাজয়ের সঠিক কারণ খোঁজ করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিণামে সত্যপন্থীরাই জয়যুক্ত হবে।

আলোচ্য আয়াতগুলোও ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব ঘটনা অনেক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই কোরআন পাক সূরা আলে–ইমরানের চার পাঁচ রুকূ পর্যন্ত ওহুদ যুদ্ধের জয়–পরাজয় ও এতদুভয়ের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক নির্দেশাবলী অব্যাহতভাবে বর্ণনা করেছে।

উল্লেখিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে কতিপয় সাহাবীর একটি বিচ্যুতির জন্যে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে মৌলিক বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ বিষয়টিতে মুসলমানদের কার্যতঃ পাকাপোক্ত করার জন্যেও ওহুদ যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়, হুযুর (সাঃ)–এর আহত হওয়া, তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়া, তজ্জন্যে কতিপয় সাহাবীর হতোদ্যম হয়ে পড়া প্রভৃতি ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে। বিষয়টি এইঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর প্রতি ভালবাসা রাখা ও তাঁর মাহাত্ম্য স্বীকার করা মুসলমানের ঈমানের অংশবিশেষ। ইসলামী মূলনীতিতে এ বিষয়টির গুরুত্ব অত্যধিক। এ ব্যাপারে সামান্য দুর্বলতাকেও কুফরের নামান্তর বলা হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এর সাথে সাথে এ বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, মুসলমানরাও যেন ঐ রোগে আক্রান্ত না হয়ে পড়ে, যাতে খ্রীষ্টান ও ইহুদীরা আক্রান্ত হয়েছিল। খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)–এর ভালবাসা ও মাহাত্ম্যকে এবাদত ও আরাধনার সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে এবং তাঁকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে নিয়েছে।

ওহুদ যুদ্ধের সাময়িক পরাজয়ের সময় কেউ একথা রটিয়ে দিয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর ওফাত হয়ে গেছে। তখন সাহাবায়ে–কেরামের যে কি অবস্থা হয়েছিল এবং হওয়া উচিত ছিল, তা সামান্য অনুমান করাও

সবার পক্ষে সহজ নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মহব্বতে যে সাহাবায়ে কেরাম স্বীয় ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করাকে জগতের সবচাইতে বড় সৌভাগ্য মনে করেছেন এবং কার্যক্ষেত্রে তার পরিচয়ও দিয়েছেন, তাঁদের আত্মনিবেদন ও এশকে-রসূলের খবর যারা কিছুটা রাখেন, একমাত্র তারাই তাঁদের সে সময়কার মর্মন্তুদ অবস্থা কিছুটা অনুমান করতে পারেন।

এসব আশেকানে রসূলের (সাঃ) কানে যখন এ সংবাদ প্রবেশ করেছিল, তখন তাঁদের অনুভূতি কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। বিশেষ করে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তেজনা বিরাজ করছে, বিজয়ের পর পরাজয়ের দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে, মুসলমান যোদ্ধাদের পা উপড়ে যাচ্ছে; এমনি সংকট মুহূর্তে যিনি ছিলেন সব প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের মূল কেন্দ্র, সকল আশা-আকাঙ্খার প্রতীক, তিনিও তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন! এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতি ছিল এই যে, সাহাবায়ে কেরামের একটি বিরাট দল ভয়ার্ত হয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করতে লাগলেন। এ পলায়ন জরুরী অবস্থা ও সাময়িক ভয় ভীতির পরিণতি ছিল। খোদা না-খাস্তা, এতে ইসলাম পরিত্যাগ করার কোন ইচ্ছা বা প্ররোচনা কার্যকর ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ স্বীয় রসূলের সাহাবীদের এমন পবিত্র ফেরেশতা-তুল্য দল করতে চান, যারা হবে বিশ্বের জন্যে আদর্শ। এ কারণে তাদের সামান্য বিচ্যুতিকেও বিরাট আকারে দেখা হয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার কারণে সাহাবীগণের এমন কঠোর ভাষায় সম্বোধন করা হয়েছে, যেমন ইসলাম ত্যাগ করার কারণে করা যেতে পারে। তীব্র অসন্তোষ প্রকাশের সাথেই এ মৌলিক বিষয়টির প্রতি হুশিয়ার করা হয়েছে যে, ধর্ম, এবাদত ও জেহাদ আল্লাহ্ তাআলার নিমিত্ত—যিনি চিরজীবি ও সদাপ্রতিষ্ঠিত। মহানবী (সাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ সত্য হলেও তাতে অসাধারণ কি? তাঁর মৃত্যু তো একদিন হবেই। এতে মনোবল হারিয়ে ফেলা এবং দ্বীনের কাজ ত্যাগ করা সাহাবায়ে-কেরামের পক্ষে শোভা পায় না। এ কারণেই বলা হয়েছেঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদিন না একদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন। তাঁর পরও মুসলমানদের ধর্মের উপর অটল থাকতে হবে। এতে আরও বোঝা যায় যে, সাময়িক বিপর্যয়ের সময় হুযুর (সাঃ)-এর আহত হওয়া এবং তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পেছনে যে রহস্য ছিল, তা হলো তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী সাহাবায়ে-কেরামের সম্ভাব্য অবস্থার একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা—যাতে তাদের মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে হুযুর (সাঃ) স্বয়ং তা সংশোধন করে দেন এবং পরে সত্যসত্যই যখন তাঁর ওফাৎ হবে, তখন আশেকানে-রসূল যেন সম্বিত হারিয়ে না ফেলেন। বাস্তবে তাই হয়েছে। হুযুর (সাঃ)-এর ওফাতের সময় যখন প্রধান প্রধান সাহাবীগণও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াত তেলাওয়াত করেই তাদের সান্ত্বনা দেন।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতেও বিপদাপদের সময় অটল থাকার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু আল্লাহ্ তাআলার কাছে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মৃত্যুর দিন, তারিখ, সময় সবই নির্ধারিত, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কারও মৃত্যু হবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরও কেউ জীবিত থাকবে না। এমতাবস্থায় কারও মৃত্যুতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার কোন অর্থ নেই।

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, গনীমতের মাল আহরণের চিন্তায় হুযুর (সাঃ)-এর অর্পিত কাজ ছেড়ে তারা ভুল করেছিল। স্মর্তব্য যে, গনীমতের মাল আহরণ করাও প্রকৃতপক্ষে নির্ভেজাল দুনিয়া কামনা নয়—যা শরীয়তে নিন্দনীয়, বরং যুদ্ধক্ষেত্রে গনীমতের মাল আহরণ করে সংরক্ষিত করা এবং নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাও জেহাদের অংশবিশেষ এবং এবাদত। উপরোক্ত সাহাবীগণ শুধু জাগতিক লালসার বশবর্তী হয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন নি। কেননা, তাঁরা যদি এ মাল আহরণে অংশগ্রহণ নাও করতেন, তবুও শরীয়তের আইন অনুযায়ী তাঁরা ঐ অংশই পেতেন, যা অংশ গ্রহণের পর পেয়েছেন। কাজেই তাঁরা জাগতিক লোভ-লালসার কারণে স্থান ত্যাগ করেছিলেন একথা বলা যায় না। কিন্তু পূর্বোক্ত আয়াতের তফসীরেও বলা হয়েছে যে, বড়দের সামান্য বিচ্যুতিকেই অনেক বড় মনে করা হয়। মামুলী অপরাধকে কঠোর অপরাধ গণ্য করে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। গনীমতের মাল আরহণ করার সাথে কিছু না কিছু জাগতিক ফায়দার সম্পর্ক অবশ্য ছিল। এ সম্পর্কের মন্দ প্রভাব অন্তরে প্রতিফলিত হওয়াও অসম্ভব ছিল না। কাজেই সাহাবায়ে-কেরামের চারিত্রিক মানকে সমুন্নত রাখার জন্যে তাদের এ কার্যকে 'দুনিয়া কামনা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে— যাতে জাগতিক লালসার সামান্য ধূলিকণাও তাঁদের অন্তরে স্থান লাভ করতে না পারে।

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾ سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَاۤ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥١﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٢﴾ اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْۤ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّاۢ بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥٣﴾

(১৪৮) অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখেরাতের সওয়াব। আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন। (১৪৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফেরদের কথা শোন, তাহলে ওরা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে, তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। (১৫০) বরং আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্যকারী, আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য। (১৫১) খুব শীঘ্রই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবো। কারণ, ওরা আল্লাহ্র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে যে সম্পর্কে কোন সনদ অবতীর্ণ করা হয়নি। আর ওদের ঠিকানা হলো দোযখের আগুন। বস্তুতঃ জালেমদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট! (১৫২) আর আল্লাহ্র সে ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে। এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছ ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছ, আর যা তোমরা চাইতে তা দেখার পর কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করেছ, তাতে তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারো বা কাম্য ছিল আখেরাত। অতঃপর তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন ওদের উপর থেকে যাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। বস্তুতঃ তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ্র মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। (১৫৩) আর তোমরা উপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না কারো প্রতি, অথচ রসূল ডাকছিলেন তোমাদিগকে তোমাদের পেছন দিক থেকে। অতঃপর তোমাদের উপর এলো শোকের ওপরে শোক, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর এবং যার সম্মুখীন হচ্ছ সেজন্য বিমর্ষ না হও। আর আল্লাহ্ তোমাদের কাজের ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লেখিত আয়াতসমূহে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথে জেহাদে অংশগ্রহণকারী আল্লাহ্ ভক্তদের দৃঢ়তা, বিপদাপদে অস্থির ও দুর্বল না হওয়ার কথা বর্ণনা করার পর তাদের একটি বিরাট গুণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা এ অপূর্ব আত্মত্যাগের মধ্যেও আল্লাহ্ তাআলার দরবারে কয়েকটি দোয়া করতেন ঃ

এক— আমাদের বিগত অপরাধমূহ ক্ষমা করুন। দুই—বর্তমান জেহাদকালে আমারা যেসব ত্রুটি করেছি, তা মার্জনা করুন। তিন — আমাদের দৃঢ়তা বহাল রাখুন। চার — শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী করুন।

এসব দোয়ায় মুসলমানদের জন্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ রয়েছে।

নিজেদের সৎকাজের জন্য গর্ব করা উচিত নয় ঃ প্রথম এই যে, সত্যধর্মী মুমিন ব্যক্তি যত বড় সৎকর্মই করুক এবং আল্লাহ্র পথে যত কর্মতৎপরতাই প্রদর্শন করুক, সৎকর্মের জন্যে গর্ব করার অধিকার তার নেই। কারণ, তার সৎকর্মও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপারই ফলশ্রুতি। এ কৃপা ব্যতীত কোন সৎকর্ম হওয়াই সম্ভব নয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

فو الله لولا الله ما اهتدينا و لا تصدقنا ولا صلينا আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপা না হলে আমরা সরল পথ প্রাপ্ত হতাম না এবং আমরা যাকাত ও নামায আদায় করতে পারতাম না।

এতদ্ব্যতীত মানুষ যে সৎকর্ম করে, তা যতই সঠিকভাবে করুক না কেন, আল্লাহ্র শানের উপযুক্ত করে সম্পাদন করা মানুষের সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র প্রাপ্য আদায়ে ত্রুটি–বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। তাই কর্ম সম্পাদনের সময়ও মাগফেরাতের দোয়া করা প্রয়োজন।

এছাড়া উপস্থিত ক্ষেত্রে মানুষ যে সৎকর্ম করছে ভবিষ্যতেও তা করার সামর্থ্য হবে এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কাজেই বর্তমান কর্মে ত্রুটি–বিচ্যুতির জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতেও এর উপর কায়েম থাকার দোয়া মুসলমানদের দৈনিক প্রার্থনা হওয়া দরকার।

আল্লাহ্র কাছে সাহাবায়ে–কেরামের উচ্চ মর্তবাঃ এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, ওহুদ যুদ্ধে কতিপয় ছাহাবীর মতামত ভ্রান্ত ছিল! একারণে পূর্ববর্তী অনেক আয়াতে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্যে অব্যাহতভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এতসব অসন্তোষ প্রকাশ ও হুশিয়ারীর মধ্যেও সাহাবায়ে–কেরামের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ দর্শনীয়। প্রথমতঃ لِيَبْتَلِيَكُمْ বলে প্রকাশ করেছেন যে, সাময়িক পরাজয়টি সাজা হিসেবে নয়; বরং পরীক্ষার জন্যে। অতঃপর وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ বলে পরিষ্কার ভাষায় ত্রুটি মার্জনার কথা ঘোষণা করেছেন।

কতিপয় সাহাবীর ইহকাল কামনার অর্থ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে–কেরাম তখন দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদল ইহকাল কামনা করছিলেন এবং একদল শুধু পরকালের আকাঙ্খী ছিলেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কোন কর্মের ভিত্তিতে একদল সাহাবীকে ইহকালের প্রত্যাশী বলা হয়েছে? এটা জানা কথা যে,

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً
مِّنكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ
الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ
لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ
لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِيَ
اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ
إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ
عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ
أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ
اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَ
اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

(১৫৪) অতঃপর তোমাদের উপর শোকের পর শান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা ছিল তন্দ্রার মত। সে তন্দ্রায় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঝিমোচ্ছিল আর কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ভাবছিল। আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মূর্খদের মত। তারা বলছিল আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই? তুমি বল, সবকিছুই আল্লাহ্র হাতে। তারা যা কিছু মনে লুকিয়ে রাখে—তোমার নিকট প্রকাশ করে না সে সবও। তারা বলে আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। তুমি বল, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে তবুও তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসতে নিজেদের অবস্থান থেকে যাদের মৃত্যু লিখে দেয়া হয়েছে। তোমাদের বুকে যা রয়েছে তার পরীক্ষা করা ছিল আল্লাহ্র ইচ্ছা, আর তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে তা পরিষ্কার করা ছিল তাঁর কাম্য। আল্লাহ্ মনের গোপন বিষয় জানেন। (১৫৫) তোমাদের যে দুটি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদেরই পাপের দরুন। (১৫৬) হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফের হয়েছে এবং নিজেদের ভাই-বন্ধুরা যখন কোন অভিযানে বের হয় কিংবা জেহাদে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো, তাহলে মরতোও না আহতও হতো না! যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আল্লাহ্ই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমাদের সমস্ত কাজই, তোমরা যা কিছুই কর না কেন, আল্লাহ সবকিছুই দেখেন। (১৫৭) আর তোমরা যদি আল্লাহ্র পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা যাকিছু সংগ্রহ করে থাক আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম।

গনীমতের মাল আহরণের ইচ্ছাকেই 'ইহকাল কামনা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন চিন্তা করা দরকার যে, যদি তাঁরা স্বীয় রক্ষাব্যূহেই থেকে যেতেন এবং গনীমতের মাল আহরণে অংশগ্রহণ না করতেন, তবে কি তাঁদের প্রাপ্য অংশ হ্রাস পেত? কিংবা অংশগ্রহণের ফলে কি তাঁদের প্রাপ্য অংশ বেড়ে গেছে? কোরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, গনীমতের আইন যাদের জানা আছে, তারা এব্যাপারে নিশ্চিত যে, মাল আহরণে শরীক হওয়া ও রক্ষাব্যূহে অবস্থান করা উভয় অবস্থাতেই তারা সমান অংশ পেতেন।

এতে বোঝা যায় যে, তাদের এ কর্ম নির্ভেজাল ইহকাল কামনা হতে পারে না; বরং একে জেহাদের কাজেই অংশগ্রহণ বলা যায়। তবে স্বাভাবিকভাবে তখন গনীমতের মালের কল্পনা অন্তরে জাগ্রত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ্ স্বীয় পয়গম্বরের সহচরদের অন্তর এ থেকেও মুক্ত ও পবিত্র দেখতে চান। এ কারণেই একে 'ইহকাল কামনা' রূপে ব্যক্ত করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে।

উল্লেখিত ১৫৩ তম আয়াত থেকে কিছু সংখ্যক সাহাবীর যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়া এবং স্বয়ং হুযূরে আকরাম (সাঃ) কর্তৃক আহ্বান করার পরও ফিরে না আসা আর সেজন্য হুযূরের দুঃখিত হওয়া এবং সে কারণে শেষ পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামের দুঃখিত হওয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে। হাদীসের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রাঃ)-এর ডাকে সাহাবিগণ পুনরায় সমবেত হয়েছিলেন।

তফসীরে রূহুল-মা'আনী প্রণেতা এই ঘটনার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, প্রথমে রসূলে করীম (সাঃ) আহ্বান করেন যা সাহাবায়ে কেরাম শুনতে পাননি এবং তাঁরা বহুদূরে চলে যান। শেষ পর্যন্ত হযরত কা'আব ইবনে-মালেক (রাঃ)-এর ডাক সবাই এসে সমবেত হয়েছিলেন।

তফসীরে বয়ানুল-কোরআনে হযরত হাকীমুল-উম্মত বলেন, (সাহাবিগণের যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সরে পড়া) মূল কারণ ছিল হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর শাহাদতের সংবাদ। পক্ষান্তরে হুযূর যখন ডাকলেন, তখন তাতে একে তো এ দুঃসংবাদের কোন খণ্ডন ছিল না, তদুপরি আওয়াজ যদি পৌঁছেও থাকে, তাঁরা তা চিনতে পারেননি। তারপর যখন হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রাঃ) ডাকেন, তখন তাতে সে সংবাদের খন্ডন এবং সাথে সাথে হুযূর (সাঃ)-এর বেঁচে থাকার কথাও বলা হয়েছিল। কাজেই একথা শুনে সবাই শান্ত হলেন এবং ফিরে এসে একত্রে সমবেত হলেন। তবে প্রশ্ন থাকে যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ভৎর্সনা এবং রসূলে করীম (সাঃ) দুঃখিত হলেন কেন? তার কারণ এই হতে পারে যে, সাহাবায়ে কেরাম যদি সে সময়টায় মনের দিক দিয়ে দৃঢ় থাকতেন, তাহলে হুযূরের ডাকের শব্দ চিনতে পারতেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ওহুদের মহাপরীক্ষার তাৎপর্য ঃ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ —আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল যে, ওহুদের যুদ্ধে যে বিপদ এসেছিল এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর যে মুসীবত এসে পতিত হয়েছিল তা শাস্তি হিসাবে নয়, বরং পরীক্ষাস্বরূপ ছিল। এই পরীক্ষার মাধ্যমে নিষ্ঠাবান মুমিন এবং মুনাফেকদের মাঝে পার্থক্য প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল। আর فَأَثَابَكُمْ غَمًّا বাক্যের দ্বারা যে শাস্তির কথা বোঝা যায়,তার ব্যাখ্যা এই যে,এর প্রকৃত রূপটি ছিল শাস্তির মতই, কিন্তু এই শাস্তিটি যে অভিভাবকসুলভ

এবং সংশোধনের জন্য ছিল, তা সুস্পষ্ট। যে কোন পিতা তার পুত্রকে এবং ওস্তাদ তাঁর শাগরেদকে যে যৎসামান্য শাসন করে থাকেন, তাকেও প্রচলিত পরিভাষায় শাস্তি বলেই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা প্রশিক্ষণ ও সংশোধনেরই একটা রূপ এবং শাসকসুলভ শাস্তি থেকে ভিন্নতর।

ওহুদের ঘটনায় মুসলমানদের উপর বিপদ আসার কারণ : উল্লেখিত বাক্য لِيَبْتَلِيَكُمْ থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তাতে তো একথাই বোঝা যায় যে, এসব বিপদের কারণ ছিল একান্তই আল্লাহ্র ইচ্ছা, কিন্তু পরবর্তী আয়াতে إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, সেই সাহাবিগণের পূর্ববর্তী কোন কোন পদস্খলনই এই প্রতিক্রিয়ার কারণ।

এর উত্তর এই যে, বাহ্যিক কারণ অবশ্য সে পদস্খলনই ছিল, যার ভিত্তিতে তাদের দ্বারা আরো কিছু পাপ করিয়ে নেয়ার জন্য শয়তান প্রলুব্ধ হয় এবং ঘটনাচক্রে তার সে লোভ চরিতার্থও হয়ে যায়। কিন্তু এই পদস্খলন এবং তার পশ্চাদবর্তী ফলাফলের মাঝে নিহিত ছিল এই মৌলিক তাৎপর্য لِيَبْتَلِيَكُمْ বাক্যে যা বর্ণনা করা হয়েছে। রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে যুজাজ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, — শয়তান তাঁদেরকে এমন কতিপয় পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেগুলো নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়া সমীচীন মনে হয়নি। সে কারণেই তারা জেহাদ থেকে সরে পড়েন, যাতে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করে পছন্দনীয় অবস্থায় জেহাদ করতে পারেন এবং শহীদ হয়ে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে পারেন।

এক পাপও অপর পাপের কারণ হতে পারে : উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল যে, একটি পাপ অপর একটি পাপকে টেনে আনে। যেমন একটি পুণ্য আরেকটি পুণ্যকে টেনে আনে। অর্থাৎ, পাপকর্ম ও পুণ্যকর্মের মধ্যে একটা আকর্ষণীশক্তি বিদ্যমান রয়েছে। মানুষ যখন কোন একটা পুণ্য বা নেকী সম্পাদন করে, অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, তখন তার পক্ষে অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পদান করা সহজ হয়ে যায়। তার মনে নেক কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তেমনিভাবে মানুষ যখন কোন পাপ কার্য সম্পাদন করে ফেলে তখন তা অন্যান্য পাপের পথও সুগম করে দেয়; মনের মধ্যে পাপের আগ্রহ বেড়ে যায়।

আল্লাহর নিকট সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদা : ওহুদের ঘটনায় কোন কোন সাহাবীর দ্বারা যেসব পদস্খলন ও অপরাধ সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত কঠিন। পঞ্চাশ জন সাহাবীকে যে অবস্থানে সেখান থেকে না সরার নির্দেশ দিয়ে বসানো হয়েছিল, তাঁদের অধিকাংশই সেখান থেকে সরে গিয়েছিলেন। এই সরে পড়ার পেছনে যদিও তাঁদের এই ধারণা কার্যকর ছিল যে, এখন বিজয় অর্জিত হয়ে গেছে এবং এই নির্দেশ পালন করার প্রয়োজনীয়তা আর অবশিষ্ট নাই। কাজেই এখন নীচে নেমে গিয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মহানবী (সাঃ)-এর পরিষ্কার হেদায়েতের বিরুদ্ধাচরণই ছিল। এই অন্যায় ও ত্রুটির ফলেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের ভুলটি সংঘটিত হয়; যদিও এ ব্যাপারেও কোন কোন বিশ্লেষণের সাহায্য নেয়া হয়ে থাকে। যেমন যুজাজ থেকে উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারপর এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এমন এক অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়, যখন রসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং তাদের সাথে রয়েছেন এবং পেছন থেকে তাদেরকে ডাকছেন। এসব বিষয়কে যদি ব্যক্তিত্ব এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে পৃথক করে দেখা যায়, তবে নিঃসন্দেহে এটা এত কঠিন ও ভয়ানক অপরাধ ছিল যে, সাহাবিগণ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীরা যেসব অপবাদ আরোপ করে থাকে, এটা সেসব অপবাদগুলোর মধ্যকার কঠিন অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পদস্খলন সত্ত্বেও এদের সাথে কি আচরণ করেছেন? উল্লেখিত আয়াতে সে প্রসঙ্গটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ বাহ্যিক নেয়ামত তন্দ্রা অবতরণ করে তাদের ক্লান্তি শ্রান্তি ও হতাশা দূর করে দেয়া। তারপর বলে দেয়া হয় যে, তখন মুসলমানদের উপর যে বিপদ এসেছিল, তা শাস্তি কিংবা আযাব ছিল না; বরং তাতে কিছুটা অভিভাবকসুলভ শাসনের লক্ষ্যও নিহিত ছিল। অতঃপর পরিষ্কার ভাষায় তাঁদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে একটি শিক্ষা : এখান থেকেই আহ্লে সুন্নত ওয়াল জমাআতের সেই আকীদা ও বিশ্বাসের সমর্থন হয় যে, যদিও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সম্পূর্ণভাবে নিষ্পাপ নন, তাঁদের দ্বারা বড় কোন পাপ সংঘটিত হয়ে যাওয়া সম্ভব এবং হয়েছেও; কিন্তু তা সত্ত্বেও উম্মতের জন্যে তাঁদের কোন দোষচর্চা কিংবা দোষ আরোপ করা জায়েয নয়। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই (সাঃ) যখন তাঁদের এত বড় পদস্খলন ও অপরাধ মার্জনা করে তাঁদের প্রতি দয়া ও করুণাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং তাঁদেরকে 'রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া রাযু আনহু '- এর মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, তখন তাঁদেরকে কোন প্রকার অশালীন উক্তিতে স্মরণ করার কোন অধিকার অপর কারো পক্ষে কেমন করে থাকতে পারে?

সে জন্যই এক সময় কোন এক সাহাবী যখন হযরত ওসমান ও অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী সম্পর্কে ওহুদ যুদ্ধের এই ঘটনার আলোচনায় বলেছেন যে, এরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন; তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন, — আল্লাহ্ নিজে যে বিষয়ের ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন, সে বিষয়ে সমালোচনা করার কোন অধিকার কারো নেই।— (সহীহ্ বুখারী)

হাফেজ ইবনে-তাইমিয়াহ (রাঃ) আকীদায়ে-ওয়াস্তিয়া-গ্রন্থে বলেছেন :

—'আহলে-সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যেসব মতবিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে, সে সম্পর্কে কারো প্রতি কোন আপত্তি উত্থাপন কিংবা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা। কারণ, ইতিহাসে যেসব রেওয়ায়েতে তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহকে তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যা ও ভ্রান্ত যা শত্রুরা রটিয়েছে। আর কোন কোন ব্যাপার রয়েছে যেগুলোতে কম-বেশী করে মূল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা সংযুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো প্রকৃতই শুদ্ধ সেগুলোও একান্তই সাহাবীগণের স্ব স্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে বিধায় তাঁদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়। বস্তুতঃ ঘটনা বিশেষের মধ্যে যদি তারা সীমালঙ্ঘন করেও থাকেন, তবুও আল্লাহ্ তা'আলার রীতি হলো إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّـَٔاتِ অর্থাৎ— সৎকাজের মাধ্যমে অসৎ কর্মের কাফ্ফারা হয়ে যায়। বলাবাহুল্য সাহাবায়ে কেরামের সৎকর্মের সমান অন্য কারো কর্মই হতে পারে না। কাজেই তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমার যতটুকু যোগ্য, তেমন অন্য কেউ নয়। সে জন্যই তাদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার অন্য কারো নেই। তাদের ব্যাপারে কটূক্তি বা অশালীন মন্তব্য করার অধিকারও অন্য কারো নেই।—(আকীদায়ে-ওয়াস্তিয়া)।

وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ
اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾
إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي
يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾ وَمَا
كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ
ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ أَفَمَنِ اتَّبَعَ
رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ وَ
بِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا
يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾ أَوَلَمَّا
أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ
هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

(১৫৮) আর তোমরা মৃত্যুই বরণ কর অথবা নিহতই হও, অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলার সামনেই সমবেত হবে। (১৫৯) আল্লাহ্র রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন-হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করুন— আল্লাহ্র তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন। (১৬০) যদি আল্লাহ্ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহ্র ওপরই মুসলমানগণের ভরসা করা উচিত। (১৬১) আর কোন বিষয় গোপন করে রাখা নবীর কাজ নয়। আর যে লোক গোপন করবে সে কিয়ামতের দিন সেই গোপন বস্তু নিয়ে আসবে। অতঃপর পরিপূর্ণভাবে পাবে প্রত্যেকে, যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না। (১৬২) যে লোক আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুগত, সেকি ঐ লোকের সমান হতে পারে, যে আল্লাহ্র রোষ অর্জন করেছে? বস্তুতঃ তার ঠিকানা হল দোযখ। আর তা কতইনা নিকৃষ্ট অবস্থান। (১৬৩) আল্লাহ্র নিকট মানুষের মর্যাদা বিভিন্ন স্তরের আর আল্লাহ্ দেখেন যা কিছু তারা করে। (১৬৪) আল্লাহ্ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট। (১৬৫) যখন তোমাদের উপর একটি মুসীবত এসে পৌঁছাল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌঁছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা বলবে, এটা কোথা থেকে এল? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌঁছেছে তোমারই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ওহুদ যুদ্ধে কোন কোন সাহাবীর যে পদস্খলন এবং তাঁদের যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়ার দরুন হুযূরে আকরাম (সাঃ) অন্তরে যে আঘাত পেয়েছিলেন যদিও স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমা, করুণা ও চারিত্রিক কোমলতার দরুন তিনি সেজন্য সাহাবিগণের প্রতি কোন প্রকার ভর্ৎসনা করেননি এবং কোন রকম কঠোরতাও অবলম্বন করেননি। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূলের (সাঃ) সঙ্গী-সাথীগণের মনস্তুষ্টির উদ্দেশে এবং এই ভুলের দরুন তাঁদের মনে যে দুঃখ ও অনুতাপ হয়েছিল, সে সমস্ত বিষয় ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয়ার লক্ষ্যেই আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে অধিকতর কোমলতা ও করুণা প্রদর্শনের হেদায়েত করা হয়েছে এবং কাজে-কর্মে সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মুর্শিদ ও অভিভাবকদের কয়েকটি গুণ : যে সাহাবায়ে (রাঃ) হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন এবং যারা তাঁকে নিজেদের জান-মাল অপেক্ষা অধিক প্রিয়জ্ঞান করতেন, তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে যখন তাঁদের দ্বারা একটি পদস্খলন ঘটে যায়, তখন একদিকে নিজেদের পদস্খলন ও বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে অবহিত হওয়ার পর তাঁদের অনুতাপ সীমাহীনভাবে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, যা তাঁদের মন-মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণভাবে অকেজো করে দিতে পারতো কিংবা তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ করে তুলতে পারতো। এরই প্রতিকারে পূববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ এই পদস্খলনের শাস্তি দুনিয়াতেই দেওয়া হয়ে গেছে ; আখেরাতের পাতা পরিষ্কার।

অপরদিকে এই ত্রুটি ও পদস্খলনের ফলে রসূল-করীম (সাঃ) আহত হয়ে পড়েন এবং দৈহিক কষ্টও হয়। আত্মিক কষ্ট তো পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিল। কাজেই দৈহিক ও আত্মিক কষ্টের কারণে সাহাবিগণের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল, যা তাঁদের হেদায়েত ও দীক্ষার পথে অন্তরায় হতে পারতো। সেজন্যে মহানবী (সাঃ) -কে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আপনি তাঁদের পদস্খলন ও ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং ভবিষ্যতের জন্যও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে থাকুন।

এ বিষয়টিকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এক বিস্ময়কর বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে বিবৃত করেছেন যাতে প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

(এক) – হুযূরে আকরাম (সাঃ)-কে এসব বিষয়ের নির্দেশ এমন ভঙ্গিতে দেয়া—হয়েছে যাতে তাঁর প্রশংসা ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিকাশও ঘটে যে, এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য পূর্ব থেকেই আপনার মাঝে বিদ্যমান ছিল।

(দুই) –এর আগে فَبِمَا رَحْمَةٍ শব্দটি বাড়িয়ে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, এসব গুণ-বৈশিষ্ট পরিপূর্ণভাবে আপনার মধ্যে থাকা আমারই রহমতের ফলশ্রুতি, কারো ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয়। তদুপরি রহমত শব্দটিকে সাধারণভাবে ব্যবহার করে রহমতের মহত্ব ও ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে একথাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ রহমত শুধু সাহাবায়ে কেরামের জন্যই নয়, বরং স্বয়ং রসূলে-করীম (সাঃ)-এর জন্যও রয়েছে। সে কারণেই আপনাকে গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে।

অতঃপর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পরবর্তী বাক্যগুলোর দ্বারা প্রকাশ

করা হয়েছে যে, এই কোমলতা, সদ্ব্যবহার, ক্ষমা প্রদর্শন এবং দয়া ও করুণা করার সে গুণ যদি আপনার মধ্যে না থাকত, তবে মানুষের সংশোধনের যে দায়িত্ব আপনার উপর সমর্পণ করা হয়েছে তা যথা উদ্দেশ্য সম্পাদিত হতো না। মানুষ আপনার মাধ্যমে আত্ম-সংশোধন ও চারিত্রিক সংস্কার সাধনের উপকারিতা লাভ করার পরিবর্তে আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতো।

এ সমস্ত বিষয়ের দ্বারা দীক্ষাদান, সংস্কার সাধন এবং ধর্ম প্রচারের রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল। যে ব্যক্তি দীক্ষাদান, সমাজ-সংস্কার এবং ধর্ম প্রচারের কাজে আত্ম-নিয়োগ করার সংকল্প করবে, তার পক্ষে উল্লেখিত গুণ-বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে যখন আল্লাহ্ তাআলার প্রিয়তম রসূলের কঠোরতাই সহ্য করা হয়নি, তখন কোন প্রকার কঠোরতা বা চারিত্রিক অনমনীয়তার মাধ্যমে মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং তাদের সংস্কার ও দীক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতে পারবে এমন সাধ্য কার হতে পারে !

সবশেষে বলা হয়েছে وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ অর্থাৎ, ইতিপূর্বে যেমন কাজে-কর্মে এবং কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন, তেমনিভাবে এখনও তাদের সাথে পরামর্শ করুন, যাতে তাঁদের মনে প্রশান্তি আসতে পারে। এতে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, কল্যাণ কামনার যে অনুরাগ তাঁদের অন্তরে বিদ্যমান, তা তাদেরকে পরামর্শের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে প্রকাশ করবেন।

এই সমুদয় আয়াতে সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম প্রচারকদের জন্য কয়েকটি বিষয়কে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ আচার-ব্যবহার ও কথা-বার্তায় রূঢ়তা ও কর্কশতা পরিহার করা। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোকদের দ্বারা কোন ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলে কিংবা কষ্টদায়ক কোন বিষয় সংঘটিত হলে সেজন্য প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে বরং ক্ষমা প্রদর্শন করা এবং সদয় ব্যবহার করা। তৃতীয়তঃ তাদের পদস্খলন ও ভুলভ্রান্তির কারণে তাদের কল্যাণ কামনা থেকে বিরত না থাকা। তাদের জন্যে দোয়া-প্রার্থনা করতে থাকা এবং বাহ্যিক আচার-আচরণে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার পরিহার না করা। উল্লেখিত আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে প্রথমে তো সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং অতঃপর আচরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে হেদায়েত দেয়া হয়েছে। পরামর্শ গ্রহণ সম্পর্কে কোরআন-করীম দু'জায়গায় সরাসরি নির্দেশ দান করেছে। একটি হলো এই আয়াতে এবং দ্বিতীয়টি হলো সূরা-শূরার সে আয়াতে যাতে সত্যিকার মুসলমানদের গুণবৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি গুণ এই বলা হয়েছে যে, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ, (যারা সত্যিকার মুসলমান) তাঁদের প্রতিটি কাজ হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।

এতদুভয় আয়াতে যেভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শের অপরিহার্যতা প্রতীয়মান হয়, তেমনিভাবে এতে ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিধান সংক্রান্ত কয়েকটি মূলনীতিও সামনে এসে যায়। তা হলো এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র হলো একক পরামর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্র যাতে পরামর্শের ভিত্তিতে নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে থাকে; বংশগত উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নয়। অধুনা ইসলামী শিক্ষারই দৌলতে সমগ্র বিশ্বে এই মূলনীতি সর্বজনস্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়ে গেছে। তদুপরি ব্যক্তি-শাসিত রাজতন্ত্রী সাম্রাজ্যসমূহও জোরে হোক জবরদস্তিতে হোক এ দিকেই চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু আজ থেকে চৌদ্দ শ বছর আগেকার যুগের প্রতি লক্ষ্য করুন, যখন সমগ্র বিশ্বের উপর বর্তমান তিন বৃহতের স্থলে দুই বৃহতের শাসন বিদ্যমান ছিল। তার একটি হলো কিসরার শাসন আর অপরটি হলো কায়সারের শাসন। এতদুভয়ের বিধি-বিধানই ব্যক্তি রাষ্ট্র ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্য হিসাবে একই পর্যায়ভুক্ত ছিল। এতে এক ব্যক্তি লক্ষ-কোটি বনী-আদমের উপর শাসন করতো নিজের মেধা ও যোগ্যতার বলে নয়, বরং উত্তরাধিকারের নৃশংস ও উৎপীড়নমূলক নীতির ভিত্তিতে। আর মানুষকে গৃহপালিত জানোয়ারের মর্যাদা দেয়াকেও মনে করা হতো একান্ত রাষ্ট্রীয় সম্মান ও এনাম। রাষ্ট্রীয় এই মতবাদই দুনিয়ার অধিকাংশ এলাকার উপর চাপিয়ে রাখা হয়েছিল। শুধুমাত্র গ্রীসে গণতন্ত্রের কিছু নমুনার একটা অসম্পূর্ণ রেখা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাও ছিল এতই অস্পষ্ট ও ক্ষীণ যে, তার উপর কোন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা ছিল একান্তই দুরূহ ব্যাপার। সে কারণেই গ্রীক রাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে কোন স্থিতিশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়নি, বরং সে সমস্ত মূলনীতি এরিষ্টটলের দর্শনের একটি শাখা হিসেবে বিদ্যমান রয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের অপ্রাকৃতিক নীতি-পদ্ধতিসমূহকে বাতিল করে দিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়োগ ও অপসারণের বিষয়টি একান্তভাবে জন-সাধারণের অধিকারে তুলে দিয়েছে। যে অধিকারকে তারা নিজেদের প্রতিনিধি এবং বিচক্ষণ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের পথে আটকে পড়া পৃথিবী ইসলামের শিক্ষারই দৌলতে এই ন্যায়সঙ্গত ও প্রকৃতিগ্রাহ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। আজকের পৃথিবী যাকে গণতন্ত্র নামে অভিহিত করছে, সে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃত প্রাণই হলো এটি।

কিন্তু বর্তমান ধাচের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ যেহেতু রাজতান্ত্রিক উৎপীড়ন-নিপীড়নেরই প্রতিক্রিয়ায় অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং তাও এত অসমঞ্জস্যভাবে বিকাশ লাভ করেছে যে, জনসারণকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সাব্যস্ত করে দিয়ে রাষ্ট্রীয় আইন ও শাসন-বিধানের মুক্ত মালিকানা দান করেছে। ফলে তাদের মন-মস্তিষ্ক, আসমান, যমীন ও মানবজাতির স্রষ্টা আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রকৃত মালিকানা ও রাষ্ট্রাধিকারের কল্পনা থেকেও বিমুক্ত হয়ে পড়েছে। এখন তাদের গণতন্ত্র আল্লাহ্ তাআলারই দেয়া গণ অধিকারের উপর আল্লাহ্ কর্তৃক আরোপিত বাধ্যবাধকতাসমূহকে পর্যন্ত মনের উপর কঠিন চাপ এবং ন্যায়ের পরিপন্থী বলে ধারণা করতে শুরু করেছে।

ইসলামী সংবিধান যেভাবে বনী-আদমকে 'কাইসার' ও 'কিসরার' এবং ব্যক্তি শাসনের নিপীড়ন-নির্যাতনের নিগড় থেকে মুক্ত করেছে, তেমনিভাবে আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকেও দেখিয়েছে আল্লাহ্র আনুগত্যের পথ। কোন দেশের বিধিব্যবস্থা হোক কিংবা জনসাধারণ—সবাইকে একথা বাতলে দেয়া হয়েছে যে, তারা সবাই আল্লাহ্ তাআলার আইনেরই অনুগত। জনসাধারণ এবং গণসংসদের অধিকার, আইন প্রণয়ন, মনোনয়ন-অপসারণ সবই আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার ভিতরে হতে হবে। শাসক বা নেতার নির্বাচনে, পদ ও দফতর বন্টনের ব্যাপারে একদিকে তাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতার প্রতি যেমন পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, তেমনিভাবে তাদের আমানতদারী এবং বিশ্বস্ততারও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হবে। এমন লোককেই নিজেদের শাসক বা নেতা নির্বাচন করতে হবে, যিনি এলেম ও পরহেযগারী, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে হবেন সর্বোত্তম। তদুপরি এ নেতা

নির্বাচন স্বেচ্ছাচারমূলক হবে না, বরং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সৎলোকদের পরামর্শের উপর নির্ভরশীল হবে। কোরআনে-করীমের উল্লেখিত আয়াত এবং রসূলে করীম (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নীতিই তার প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ) এরশাদ করেছেন, لاخلافة الا عن مشورة অর্থাৎ— পরামর্শকরণ ব্যতীত খেলাফত হতে পারে না।— (কান্‌যুল-উম্মাল)

আলোচনা ও পরামর্শ করাকে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি মৌলিক বিষয় হিসাবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান যদি কোন সময় পরামর্শের ঊর্ধ্বে চলে যায় কিংবা এমন ধরনের লোকের সাথে পরামর্শে প্রবৃত্ত হয়, যারা শরীয়তের দৃষ্টিতে পরামর্শের যোগ্য নয়, তবে তাকে অপসারিত করা অপরিহার্য।

পরামর্শ অপরিহার্য হওয়ার কারণে ইসলামী রাষ্ট্র এবং তার অধিবাসীবৃন্দের যে সুফল লাভ হবে, তার অনুমান এভাবে করা যায় যে, রসূল করীম (সাঃ) পরামর্শকে 'রহমত' বলে অভিহিত করেছেন। ইবনে 'আদী ও বায়হাকী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, উল্লেখিত আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেন, — আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের জন্য এ পরামর্শের কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু আল্লাহ্ এই পরামর্শকে আমার উম্মতের জন্য রহমত সাব্যস্ত করেছেন।—(বয়ানুল-কোরআন)

সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ যদি চাইতেন, তাহলে তাঁর রসূলকে প্রতিটি কাজের ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে বলে দিতেন, পরামর্শের কোন প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট রাখতেন না। কিন্তু হুযুরের মাধ্যমে পরামর্শ রীতির প্রচলন করার মাঝেই নিহিত ছিল উম্মতের কল্যাণ ও মঙ্গল। কাজেই আল্লাহ্ বহু বিষয় এমন রেখে দিলেন, যাতে সরাসরি কোন পরিষ্কার ওহী নাযিল হয়নি। বরং সেগুলোর ব্যাপারে হুযুর-আকরাম (সাঃ)-কে পরামর্শ করে নেয়ার নির্দেশ দান করা হয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতে লক্ষ্যণীয় যে, এতে রসূলে করীম (সাঃ)-কে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়ার পর বলা হয়েছে فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ অর্থাৎ, পরামর্শ করার পর আপনি যখন কোন একটি দিক সাব্যস্ত করে নিয়ে সেমতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। এতে عَزَمْتَ শব্দে عزم অর্থাৎ, নির্দেশ বাস্তবায়নে দৃঢ়সংকল্প হওয়াকে শুধুমাত্র মহানবী (সাঃ) -এর প্রতিই সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। عزمتم (আযাম্‌তুম) বলা হয়নি, যাতে সংকল্প ও তা বাস্তবায়নে সাহাবায়ে কেরামের সংযুক্ততাও বোঝা যেতে পারতো। এই ইঙ্গিতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরামর্শ করে নেয়ার পর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমীর যা করবেন তাই হবে গ্রহণযোগ্য। কোন কোন সময় হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে যদি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-আব্বাসের অভিমত বেশী শক্তিশালী হতো, তখন সেমতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতেন। অথচ পরামর্শ সভায় অধিকাংশ সময় এমনসব মনীষী উপস্থিত থাকতেন, যাঁরা ইবনে-আব্বাসের তুলনায় বয়স, জ্ঞান ও সংখ্যার দিক দিয়ে ছিলেন গরিষ্ঠ। হুযুরে আকরাম (সাঃ) ও অনেক সময় 'শায়খাইন' অর্থাৎ, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর মতকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীদের মতের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। এমন কি এমন ধারণাও করা হতে লাগলো যে, উল্লেখিত আয়াতটি এতদুভয়ের সাথে পরামর্শ করার জন্যই নাযিল হয়ে থাকবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, এটা তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিপন্থী এবং ব্যক্তিশাসনের রীতি। তাছাড়া এতে সংখ্যা গরিষ্ঠের ক্ষতির আশঙ্কাও বিদ্যমান।

উত্তর এই যে, ইসলামী আইন পূর্বাহ্নেই এর প্রতি লক্ষ্য করেছে। কারণ, যাকে ইচ্ছা রাষ্ট্রপ্রধান বা আমীর বানিয়ে দেয়ার অধিকারই জনসাধারণকে সে দেয়নি, বরং জ্ঞান-গরিমা, যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা, আল্লাহ্‌ভীতি ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে যাকে সবচেয়ে ভাল মনে করা হবে, শুধুমাত্র তাকেই তো নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করা জনগণের জন্যে অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছে। তবে যে ব্যক্তিকে এ সমস্ত উচ্চতর গুণ-বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে, তার উপর যদি এমন সব দায়িত্ব আরোপ করা হয় যা অবিশ্বাসী, ফাসেক ও ফাজের ব্যক্তির উপর আরোপ করা হয়, তবে তা বুদ্ধি-বিবেচনা ও ন্যায়নীতিকে হত্যা করারই নামান্তর এবং যারা কাজের লোক তাদের উৎসাহ ভঙ্গ করা ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অন্তরায় সৃষ্টি করার শামিল হবে।

গনীমতের মাল চুরি করা মহাপাপ ঃ কোন নবীর পক্ষে এমন পাপের সম্ভাব্যতা নেই ঃ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গনীমতের মাল চুরি করার বিষয়টিও এসে গেছে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ঘটনাটি ছিল এই যে, বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মালের মধ্য থেকে একটি চাদর খোয়া যায়। কোন কোন লোক বলল, হয়তো সেটি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিয়ে থাকবেন! এসব কথা যারা বলত, তারা যদি মুনাফেক হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। আর তা কোন অবুঝ মুসলমানের পক্ষে বলাও অসম্ভব নয়। তবে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, সে হয়তো মনে করে থাকবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর তা করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে غلول বা গনীমতের মালের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা মহাপাপ হওয়া এবং কেয়ামতের দিন সেজন্য কঠিন শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, কোন নবী সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে, তিনিই এহেন পাপ কাজ করে থাকবেন, একান্তই অনর্থক ধৃষ্টতা। কারণ, নবীগণ হলেন যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত।

غلول শব্দটি সাধারণভাবে খেয়ানত অর্থে এবং বিশেষ করে গনীমতের মালে খেয়ানত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর গনীমতের মাল চুরি করা কিংবা তাতে খেয়ানত করা সাধারণ চুরি অথবা খেয়ানত অপেক্ষা বেশী পাপের কাজ। তার কারণ, গনীমতের মালের সাথে গোটা ইসলামী সেনাবাহিনীর অধিকার সংযুক্ত থাকে। কাজেই যে লোক এতে চুরি করবে, সে চুরি করবে শত-সহস্র লোকের সম্পদ। যদি কখনও কোন সময় তার মনে তা সংশোধন করার খেয়াল হয়, তখন সবাইকে তাদের অধিকার প্রত্যার্পণ করা কিংবা সবার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়া একান্তই দুরূহ ব্যাপার। পক্ষান্তরে অন্যান্য চুরির মালের মালিক (সাধারণতঃ) পরিচিত ও নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। কখনও কোন সময় আল্লাহ্ যদি তওবা করার তওফীক দান করেন, তবে তার হক আদায় করে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিয়ে মুক্ত হতে পারে। সে কারণেই কোন এক যুদ্ধে এক লোক যখন কিছু পশম নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, গনীমতের মাল বন্টন করার কাজ শেষ হয়ে গেলে যখন তার মনে হল, 'তখন সেগুলো নিয়ে গিয়ে হুযুর (সাঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হল। তিনি রহমতুললিল আলামীন এবং উম্মতের জন্য পিতা-মাতা অপেক্ষা সদয় হওয়া সত্ত্বেও তাকে এই বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, এখন এগুলো কেমন করে আমি সমগ্র

সেনাবাহিনীর মাঝে বন্টন করব? কাজেই কেয়ামতের দিনই তুমি এগুলো নিয়ে উপস্থিত হইও।

'গলুল' তথা গনীমতের মাল চুরি করার ব্যাপারটি অন্যান্য চুরি অপেক্ষা কঠিন পাপ এজন্যই যে, হাশরের ময়দানে যেখানে সমগ্র সৃষ্টি সমবেত হবে, সবার সামনে তাকে সেখানে এমনভাবে লাঞ্ছিত করা হবে যে, চুরি কার বস্তু-সামগ্রী তার কাঁধে চাপানো থাকবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ দেখ, কেয়ামতের দিন কারো কাঁধে একটি উট চাপানো অবস্থায় থাকবে (এবং ঘোষণা করা হবে যে, এ লোক গনীমতের মালের উট চুরি করেছিল) এমন যেন না হয়। যদি সে লোক আমার শা'ফাআত কামনা করে, তবে আমি তাকে পরিষ্কার ভাষায় জবাব দিয়ে দেব যে, আমি আল্লাহ্‌র যা কিছু নির্দেশ পেয়েছিলাম, তা সবই পৌঁছে দিয়েছিলাম, এখন আমি কিছুই করতে পারব না।

আল্লাহ্ রক্ষা করুন। হাশর মাঠের এই লাঞ্ছনা এমনই কঠিন হবে যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, যাদের সাথে এসব ঘটনা ঘটবে, তারা কামনা করবে যে, আমাদিগকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হোক, তবু যেন এহেন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা থেকে বেঁচে যাই।

ওয়াক্‌ফ ও সরকারী ভাণ্ডারে চুরি করা 'গুলুলেরই পর্যায়ভুক্ত ঃ মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্ এবং ওয়াক্‌ফের মালের অবস্থাও একই রকম, যাতে হাজার-হাজার মুসলমানের চাঁদা বা দান অন্তর্ভুক্ত। ক্ষমাও যদি করাতে হয়, তবে কার কাছ থেকে ক্ষমা করাবে? এমনিভাবে রাষ্ট্রের সরকারী কোষাগার (বায়তুল-মাল) —এর হুকুমও তাই। কারণ, এতে সমগ্র দেশবাসীর অধিকার অন্তর্ভুক্ত। যে লোক এতে চুরি করে, সে সবারই অধিকার চুরি করে থাকে। কিন্তু যেহেতু এ সমস্ত মালেরই কোন একক বা ব্যক্তি-মালিকানা থাকে না, বরং যারা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত, তারা শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং চুরির সুযোগ-সুবিধাও অধিক থাকে, কাজেই ইদানিংকালে সমগ্র বিশ্বে সবচাইতে বেশী চুরি ও খেয়ানত এ সমস্ত মালেই হচ্ছে। পক্ষান্তরে মানুষ এর কঠিন পরিণতি ও ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে একান্ত নিস্পৃহ। তারা যেন এতটুকুও বুঝতে চায় না যে, এতে জাহান্নাম ছাড়াও হাশরের ময়দানে রয়েছে চরম লাঞ্ছনা। তদুপরি হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর শাফাআত থেকে বঞ্চিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।—(নাউযুবিল্লাহ।)

মহানবী (সাঃ)-এর আগমন সমগ্র মানবতার জন্য সর্ববৃহৎ অনুগ্রহ ঃ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ বিষয়েরই একটি আয়াত সূরা বাক্বারায় উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ আয়াতে একটি শব্দ অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে—

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

এ প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কোরআন করীমের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মহানবী (সাঃ) হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বের জন্য সবচাইতে বড় নেয়ামত ও মহা অনুগ্রহ। কিন্তু এখানে এই আয়াতে শুধুমাত্র মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট করাটা কোরআনের অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে কোরআন সমগ্র বিশ্বের জন্য হেদায়েত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত থাকা সত্ত্বেও هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ বলারই অনুরূপ যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে মুত্তাকীনদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তার কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই এক। তা হল এই যে, যদিও রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর অস্তিত্ব মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের জন্যই মহা নেয়ামত এবং বিরাট অনুগ্রহ, তেমনিভাবে কোরআন করীমও সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য হেদায়েত, কিন্তু যেহেতু এই হেদায়েত ও নেয়ামতের ফল শুধু মুমিন-মুত্তাকীরাই উপভোগ করছে, সেহেতু কোন কোন স্থানে একে তাঁদেরই সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল রসূলে করীম (সাঃ)-কে মুমিনদের জন্য কিংবা সমগ্র বিশ্বের জন্য মহা নেয়ামত ও বিরাট অনুগ্রহ হিসাবে বিশ্লেষণ করা।

আধুনিককালের মানুষ যদি আধ্যাত্মিকতাবিমুখ এবং বস্তুবাদের দাসে পরিণত না হত, তবে এ বিষয়টি কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখত না; যে কোন বুদ্ধিমান মানুষই এই মহা অনুগ্রহের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারত। কিন্তু আধুনিককালের মানুষ যেহেতু পৃথিবীর জীব-জন্তুসমূহের মধ্যে একটি অতি বিচক্ষণ জীব অপেক্ষা অধিক কিছু রয়নি, কাজেই তাদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ ও ইনআম বলতেও সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকেই মনে করা হয়, যাতে তাদের পেট ও জৈবিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উপকরণ মজুদ থাকে। তারা সেগুলোর অস্তিত্বের মূল তাৎপর্য বা তার প্রাণ ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। সে কারণেই এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মানুষকে প্রথম একথা বাতলে দেয়া দরকার হয়ে পড়েছে যে, তাদের মূল সত্তা শুধু কয়েকটি হাড় গোড় ও চর্ম-মাংশের সমষ্টি নয়, বরং মানুষের প্রকৃত তাৎপর্য হল সে আত্মা, যা তার দেহের সাথে যুক্ত। যতক্ষণ এ আত্মা তার দেহে বর্তমান রয়েছে, ততক্ষণই সে মানুষ এবং ততক্ষণই তার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে। সে যতই দুর্বল, সামর্থ্যহীন ও মুমূর্ষ হোক না কেন, দেহে আত্মা থাকা পর্যন্ত তার সম্পত্তি করায়ত্ত করে নেয়ার কিংবা তার অধিকার ছিনিয়ে নেবার ক্ষমতা কারোরই নেই। পক্ষান্তরে যখনই তার দেহ থেকে এই আত্মা পৃথক হয়ে যায়, তখন সে যত বড় বীর-পাহ্‌লোয়ানই হোক না কেন, তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতই সুগঠিত ও সুসংহত থাক না কেন, সে আর মানুষ থাকে না —নিজের বিষয়-সম্পত্তিতেও আর তার কোন অধিকার অবশিষ্ট থাকে না।

আম্বিয়া (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করেছেন, মানবাত্মার যথার্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করার জন্যে, যাতে তাদের দেহের দ্বারা সম্পাদিত প্রতিটি কাজ-কর্ম মানবতার পক্ষে কল্যাণকর প্রতিপন্ন হতে পারে। তারা যেন বিষাক্ত হিংস্র জীব-জানোয়ারের মত অন্যান্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে না বেড়ায় এবং নিজের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে আখেরাতের অনন্ত জীবনের জন্য নিজেই যেন উপাদান সংগ্রহ করে নিতে পারে। আর মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কাজেও মহানবী হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর মর্যাদা অন্যান্য নবী-রসূলগণ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। তিনি তাঁর মক্কী জীবনে শুধু মানব সমাজের জন্যে ক্যাডার গঠনের কাজই সম্পাদান করেছেন এবং মানব সম্প্রদায়কে এমন এক সমাজ গঠন করে দিয়েছেন, যার মর্যাদা ফেরেশতাদের চাইতেও উর্ধ্বে। সারা দুনিয়া এর পূর্বে আর কখনও এমন ধরনের মানুষ প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁদের একেকজন রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রত্যক্ষ মু'জেযার ফসল প্রতীয়মান হয়েছেন। তাঁদের পরবর্তীদের জন্যও তিনি যে শিক্ষা এবং শিক্ষাদানপদ্ধতি রেখে গেছেন,তার পূর্ণ-বাস্তবায়ন করা হলে সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ স্থান লাভ করা যেতে পারে। আর যেহেতু এই শিক্ষা সারা বিশ্বেরই জন্য, সেহেতু তার অস্তিত্ব সমগ্র বিশ্বমানবের জন্যই অনুগ্রহ স্বরূপ। অবশ্য এর দ্বারা প্রকৃত মুমিনগণই পরিপূর্ণ উপকার লাভ করেছে।

وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦٦﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ۖ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا تَّبَعْنٰكُمْ ۗ
هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ
مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿١٦٧﴾ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا
لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ۗ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ
اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٦٨﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۗ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾
فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ
يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٧٠﴾
يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧١﴾ اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ
اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٢﴾
اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾

(১৬৬) আর যেদিন দু' দল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছে; সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহ্‌র হুকুমেই হয়েছে এবং তা এজন্য যে, তাতে ঈমানদারদিগকে জানা যায় (১৬৭) এবং তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায় যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে বলা হল এসো, আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই কর কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত কর। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে, লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে বস্তুতঃ আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে। (১৬৮) ওরা হলো যে সব লোক, যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হত না। তাদেরকে বলে দিন, এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (১৬৯) আর যারা আল্লাহ্‌র রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। (১৭০) আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয়-ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। (১৭১) আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ্ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না। (১৭২) যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার, তাদের জন্য রয়েছে মহান সওয়াব। (১৭৩) যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, 'তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর।' তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী!

দ্বিতীয় ও প্রকৃত উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করা হয়েছে আয়াতের শেষ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ বাক্যে। এতে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, বিপদাপদ যাই এসেছে আসলে তা শত্রুর শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের কারণে আসেনি, বরং তোমাদের নিজেদেরই কোন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুন এসেছে। যেমন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশ পালনে তোমাদের শৈথিল্য হয়ে যাওয়া।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অতঃপর فَبِاِذْنِ اللّٰهِ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব যা কিছু হয়েছে, সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সমর্থনে হয়েছে যাতে নিহিত রয়েছে বহু হেকমত ও রহস্য। সেসব রহস্যের কিছু কিছু ইতিপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। তবে একটি রহস্য হচ্ছে এই যে, এভাবে আল্লাহ্ নিঃস্বার্থ মুমিনগণকেও দেখে নেবেন। অর্থাৎ, যাতে মুমিনদের নিঃস্বার্থতা এবং মুনাফেকদের প্রতারণা এমনভাবে প্রকৃষ্ট হয়ে যায় যাতে যে কোন লোক তা দেখে নিতে পারে। এখানে আল্লাহ্‌র দেখে নেয়ার অর্থ হল এই যে, পৃথিবীতে দেখার যেসব উপায় প্রচলিত রয়েছে, সে অনুযায়ী দেখে নেয়া। অন্যথায় আল্লাহ্ তো সর্বক্ষণই প্রত্যেক বস্তু ও বিষয় দেখছেন। বস্তুতঃ এই রহস্যটি এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, কঠিন বিপদের সময় মুনাফেকরা সরে দাঁড়িয়েছে, আর নিঃস্বার্থ মুমিনরা যুদ্ধে অনড়-অটল রয়েছেন।

এভাবে সান্ত্বনা দেয়ার আরো একটি কারণ এই যে, এ যুদ্ধে যেসব মুসলমান শহীদ হয়েছেন, তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমনসব প্রতিদান দিয়েছেন, অন্যান্যদেরও তার প্রতি ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়া উচিত। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তী وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا আয়াতে শহীদদের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহর রাহে শাহাদত বরণকারীদের বিশেষ মর্যাদা : এ আয়াতে শহীদানের বিশেষ মর্যাদার বিবরণ বিধৃত হয়েছে। এছাড়া বিশুদ্ধ হাদীসেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেছেন, শহীদদের অবস্থা ও মর্যাদার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। কাজেই হাদীসের রেওয়ায়েতে যেসব দিক বর্ণিত হয়েছে, তাও বিভিন্ন অবস্থারই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।

এ আয়াতে শহীদদের প্রথম বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে, তাঁদের অনন্ত জীবনলাভকে। অতঃপর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁদের রিযিকপ্রাপ্তি।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ আয়াতে যে, তারা সদা-সর্বক্ষণ আনন্দমুখর থাকবেন। যে সমস্ত নেয়ামত আল্লাহ্ তাঁদেরকে দান করবেন সেগুলোর মধ্যে চতুর্থটি হল وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ অর্থাৎ, তাঁর নিজেদের যেসব উত্তরসূরিকে পৃথিবীতে রেখে গিয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারেও তাদের এ আনন্দ অনুভূত হয় যে, তাঁরাও পৃথিবীতে থেকে সৎকাজ ও জেহাদে নিয়োজিত রয়েছেন। ফলে তাঁরাও এখানে এসে এমনি সব নেয়ামত এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন।

আর সান্দী (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, শহীদের যেসব আত্মীয়-বন্ধুর মৃত্যু সম্পর্কে তাদের পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেয়া হয় যে, অমুক ব্যক্তি এখন

তোমার নিকট আসছেন। তখন তিনি তেমনি আনন্দিত হন, যেমন পৃথিবীতে বহু দূরের কোন বন্ধুর সাথে সুদীর্ঘ সময়ের পর সাক্ষাৎ হলে যা হয়ে থাকে।

এ আয়াতের যে শানে নুযুল হযরত আবু দাউদ (রহঃ) বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, তা হল এই-রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে বললেন যে, ওহুদের ঘটনায় যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হন তখন আল্লাহ্ তাঁদের আত্মাগুলোকে সবুজ পাখীর পালকের ভেতরে স্থাপন করে মুক্ত করে দেন। তাঁরা জান্নাতের ঝর্ণা ও উদ্যানসমূহ থেকে নিজেদের রিযিক আহরণ করেন এবং অতঃপর তারা সেই আলোক ধারায় ফিরে আসেন, যা তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র আরশের নীচে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন তারা নিজেদের জন্য আনন্দ ও শান্তিময় এ জীবন প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন, আমাদের আত্মীয়-আপনজনরা পৃথিবীতে আমাদের মৃত্যুতে শোকার্ত ; আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কি কেউ তাদের জানিয়ে দিতে পারে, "যাতে তারা আমাদের জন্য দুঃখ না করে এবং তারাও যাতে জেহাদে (অংশগ্রহণের) চেষ্টা করে।" তখন আল্লাহ্ বললেন, 'তোমাদের এ সংবাদ তাদেরকে পৌছে দিচ্ছি।' এরই প্রেক্ষিতে وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(কুরতুবী)

এ যুদ্ধের ঘটনাটি এই, মক্কার কাফেররা যখন ওহুদের ময়দান থেকে ফিরে এল, তখন পথে এসে তাদের আফসোস হলো যে, আমরা বিজয় অর্জন করার পরিবর্তে অনর্থকই ফিরে এলাম। সবাই মিলে একটা কঠিন আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত মুসলমানকে খতম করে দেয়াই উচিত ছিল। আর এই কল্পনা তাদের মনে এমনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল যে, পুনরায় মদীনায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করতে লাগল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মনে গভীর ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তাতে তারা সোজা মক্কার পথ ধরল। কিন্তু যেতে যেতে মদীনাযাত্রী কোন কোন পথিকের কাছে বলে দিয়ে গেল যে, তোমরা সেখানে গিয়ে কোন প্রকারে মুসলমানদের মনে আমাদের ভয় বিস্তার করবে যে, তারা আবার এদিকে ফিরে আসছে। এ ব্যাপারটি ওহীর মাধ্যমে হুযূর (সাঃ) জানতে পারলেন। কাজেই তিনি 'হামরাউল-আসাদ' পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন।– (ইবনে জরীর, রূহুল-বয়ান)

আর সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঘোষণা করলেন, কে আছে, যারা মুশরেকীনের পশ্চাদ্ধাবন করবে? তখন সত্তর জন সাহাবী প্রস্তুত হলেন যাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যারা গত কালকের যুদ্ধে কঠিনভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন এবং অন্যের সাহায্যে চলাফেরা করছিলেন। এরাই রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর সাথে মুশরেকদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হলেন। যখন তাঁরা 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে গিয়ে পৌছালেন, তখন সেখানে নোআইম ইবনে মাসউদের সাথে সাক্ষাত হল। সে সংবাদ দিল যে, আবু সুফিয়ান নিজের সাথে আরও সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় মদীনা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আহত-দুর্বল সাহাবায়ে কেরাম এই ভীতিজনক সংবাদ শুনে সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরা তা জানি না حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।

এদিকে মুসলমানদেরকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশে এ সংবাদ দেয়া হলো, কিন্তু মুসলমানগণ তাতে কোনরূপ প্রভাবান্বিত হলেন না; অপরদিকে বনী খোযাআহ্ গোত্রের মা'বাদ ইবনে খোযাআহ্ নামক এক ব্যক্তি মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছিল। যদিও সে লোকটি মুসলমান ছিল না কিন্তু মুসলমানদের হিতার্থী ছিল এবং তার গোত্র ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ। কাজেই রাস্তায় মদীনা প্রত্যাগত আবু সুফিয়ানকে যখন দেখতে পেল যে, সে নিজেদের প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা করছে এবং পুনরায় মদীনা আক্রমণের চিন্তা-ভাবনা করছে। তখন সে আবু সুফিয়ানকে বলল, তোমরা ধোকায় পড়ে আছ যে, মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি তাদের বিরাট বাহিনীকে হামরাউল আসাদে দেখে এসেছি, যারা কিনা পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন উদ্দেশে বেরিয়েছে। এ সংবাদ আবু সুফিয়ানের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিল।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে এ ঘটনারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্‌র উপর রসূলে করীম (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের চাইতে অধিক তাওয়াক্কুল তো দুনিয়ার অন্য কারো মধ্যে থাকতেই পারে না, কিন্তু তাঁদের তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা এমন ছিল না যে, বাহ্যিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি পরিহার করে বসে থাকতেন এবং বলতেন যে, আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট; তিনি বসিয়ে বসিয়েই আমাদিগকে বিজয় দান করবেন। কিন্তু তা নয়। বরং তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সমবেত করলেন, আহত মানুষের মনে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করলেন, জেহাদের জন্য তাদেরকে তৈরী করলেন এবং রওয়ানা হয়ে গেলেন। বস্তুতঃ নিজের আয়ত্তে যত রকম ব্যবস্থা ছিল সে সবই তিনি করলেন এবং তারপরে বললেন, 'আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। এটাই হল সেই সঠিক ও যথার্থ তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা, যার শিক্ষা কোরআনে দেওয়া হয়েছে। আর রসূলে করীম (সাঃ) ও এরই উপর আমল করেছেন এবং করিয়েছেন। তাছাড়া বাহ্যিক ও পার্থিব উপকরণসমূহও আল্লাহ্ তাআলারই অনুগ্রহের দান। এগুলোকে বর্জন করা তাঁর অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর। তদুপরি স্বাভাবিক উপকরণাদি বর্জন করে তাওয়াক্কুল করা রসূলে করীম (সাঃ) – এর সুন্নত নয়।

রসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং কোন এক ঘটনার প্রেক্ষিতে حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ এ আয়াত সম্পর্কেই পরিস্কার ভাষায় এরশাদ করেছেন—

হযরত আউফ ইবনে মালেক বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর নিকট দু'ব্যক্তির মোকদ্দমা উপস্থিত হলে তিনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিলেন। এই মীমাংসাটি যে লোকের বিরুদ্ধে গেল তিনি গভীর মনোযোগের সাথে তা শোনলেন এবং এ কথা বলতে বলতে চলে যেতে লাগলেন حسبى الله ونعم الوكيل হুযূর (সাঃ) বললেন, তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আস। তারপর বললেন— "আল্লাহ্ হাত-পা ভেঙ্গে বসে থাকা পছন্দ করেন না। বরং তোমাদের উচিত সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর নরম হয়ে যাওয়া এবং 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কারক' বলে ঘোষণা করা।"

লن تنالوا ۴ ٨٣ ال عمرٰن ۳

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ وَّاتَّبَعُوْا
رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿١٧٤﴾ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ
يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٥﴾
وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا
يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٦﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا وَلَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٧﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ
لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٧٨﴾
مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ
الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ
لٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ
وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٩﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ
الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا
لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ
لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨٠﴾

(১৭৪) অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অতি বিরাট। (১৭৫) এরা যে রয়েছে, এরাই হলে শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর। (১৭৬) আর যারা কুফরের দিকে ধাবিত হচ্ছে তারা যেন তোমাদিগকে চিন্তান্বিত করে না তোলে। তারা আল্লাহ্ তাআলার কোন কিছুই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। আখেরাতে তাদেরকে কোন কল্যাণ দান না করাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে মহা শাস্তি। (১৭৭) যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফর ক্রয় করে নিয়েছে, তারা আল্লাহ্ তাআলার কিছুই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (১৭৮) কাফেররা যেন মনে না করে যে, আমি যে অবকাশ দান করি, তা তাদের পক্ষে কল্যাণকর। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে করে তারা পাপে উন্নতি লাভ করতে পারে। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি। (১৭৯) নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ এমন নন যে, ঈমানদারগণকে সে অবস্থাতেই রাখবেন যাতে তোমরা রয়েছ, আর আল্লাহ্ এমন নন যে, তোমাদিগকে গায়বের সংবাদ দেবেন। কিন্তু আল্লাহ্ স্বীয় রসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র ওপর এবং তাঁর রসূলগণের ওপর তোমরা প্রত্যয় স্থাপন কর। বস্তুতঃ তোমরা যদি বিশ্বাস ও পরহেযগারীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাক, তবে তোমাদের জন্যে রয়েছে বিরাট প্রতিদান। (১৮০) আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের পরম সত্ত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর; আল্লাহ্ সে সম্পর্কে জানেন।

তৃতীয় আয়াতে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জেহাদের জন্য রওয়ানা হওয়া এবং 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াকীল' বলার উপকারিতা, ফলশ্রুতি ও বরকত বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে— "এরা আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এল। তাতে তাদের কোন রকম অসন্তোষ হলো না আর তারা হল আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুগত।"

আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে তিনটি নেয়ামত দান করেছেন। প্রথম নেয়ামত হল এই যে, কাফেরদের মনে তাঁদের ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, এতে তারা পালিয়ে গেল। ফলে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে নিরাপদ রইলেন। এ নেয়ামতকে আল্লাহ্ তাআলা 'নেয়ামত' শব্দেই উল্লেখ করলেন। দ্বিতীয় নেয়ামত এই যে, হামরাউল আসাদের বাজারে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে সুযোগ হয়েছিল এবং তাতে তাঁরা যে লাভবান হয়েছিলেন, তাকেই বলা হয়েছে 'ফযল'।

তৃতীয় নেয়ামতটি হলো আল্লাহ্‌র রেযামন্দী বা সন্তুষ্টি লাভ যা সমস্ত নেয়ামতের উর্ধ্বে এবং যা এই জেহাদে তাঁদেরকে বিশেষ ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে।

কোরআনে করীম حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ আয়াতে যেসব লাভ ও উপকারিতার কথা বর্ণনা করেছে, তা শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না বরং যে কেউ পূর্ণ ঈমানী উদ্দীপনা সহকারে এর জপ করবে, সেই এ সমস্ত বরকত লাভে সমর্থ হবে।

'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াকীল' পাঠের উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে ওলামা ও মাশায়েখগণ লিখেছেন যে, এ আয়াতটি পূর্ণ ঈমানী উদ্দীপনা ও স্থির বিশ্বাসের সাথে এক হাজার বার পাঠ করে কোন দোয়া করা হলে আল্লাহ্ তা প্রত্যাখ্যান করেন না। দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদের সময় 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াকীল' পাঠ করা পরীক্ষিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফেরদের পার্থিব ভোগ-বিলাসও প্রকৃতপক্ষে আযাবেরই পরিপূর্ণতা ঃ এক্ষেত্রে কেউ যেন এমন কোন সন্দেহ না করে যে, আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদিগকে অবকাশ, দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য-সামর্থ্য ও আরাম-আয়েশের উপকরণ এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে তারা নিজেদের অপরাধ প্রবণতায় অধিকতর এগিয়ে যায়, তাহলে তো কাফেররা নির্দোষ। কারণ, আয়াতের উদ্দেশ্য হল এই যে, কাফেরদের সামান্য কয়েক দিনের এ অবকাশ ও ভোগ-বিলাসে যেন মুসলমানরা পেরেশান না হয়। কেননা, কুফর ও পাপ সত্ত্বেও তাদেরকে পার্থিব শক্তি-সামর্থ্য ও বৈভব দান করাটাও তাদের শাস্তিরই একটি পন্থা, যার অনুভূতি আজকে নয় এই পৃথিবী থেকে যাবার পরই হবে যে, তাদেরকে দেওয়া পার্থিব ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ তারা পাপকর্মে ব্যয় করেছে প্রকৃত পক্ষে সেসবই ছিল নরকঙ্গার। এ বিষয়টিই কতিপয় আয়াতে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا অর্থাৎ, কাফেরদের ধন-সম্পদ এবং ভোগ-বিলাস তাদের জন্য গৌরবের বস্তু নয়; এগুলো আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আযাবেরই একটা কিস্তি যা আখেরাতে তাদের আযাব বৃদ্ধির কারণ হবে।

ওহীর পরিবর্তে কার্যকর পদ্ধতিতে মুমিন ও মুনাফেকের পার্থক্য বিধানের তাৎপর্য ঃ এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিঃস্বার্থ মুমিন ও মুনাফেকের মধ্যে পার্থক্য বিধানের উদ্দেশে আল্লাহ্ তাআলা এমন জটিলতা ও দুর্ঘটনার অবতারণা করেন, যাতে বাস্তব ও কার্যকরভাবে মুনাফেকের প্রতারণা প্রকৃষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এ পার্থক্য বিধান যদিও ওহীর মাধ্যমে মুনাফেকদের নামোল্লেখ করেও করা যেতে পারত, কিন্তু হেকমতের তাকাদা তা নয়। আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণ হেকমত তিনিই জানেন। তবে এখানে একটি হেকমত এটাও হতে পারে যে, মুসলমানদিগকে যদি ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হত যে, অমুক ব্যক্তি মুনাফেক, তাহলে তার সাথে মুসলমানদের সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তার সাথে আচার–আচরণে সতর্কতার ব্যাপারে এমন কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ থাকত না, যা মুনাফেকরাও সমর্থন করতে পারত। তখন তারা বলত যে, তোমরা ভুল বলছ। আমরা প্রকৃতই মুসলমান।

পক্ষান্তরে বিপদাপদ ও জটিলতা আরোপের মাধ্যমে যে বাস্তব ও কার্যকর পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে; তাতে মুনাফেকরা সরে পড়তে বাধ্য হয়েছে; তাদের প্রতারণা স্পষ্ট হয়ে গেছে! এখন আর তাদের এ দাবী করার সুযোগ থাকেনি যে, তারাও নিঃস্বার্থ মুমিন।

এভাবে মুনাফেকী প্রকাশিত হয়ে পড়ায় একটি ফায়দা এও হয়েছে যে, তাদের সাথে মুসলমানদের বাহ্যিক মেলামেশাও বন্ধ হয়ে যায়। অন্যথায় মানসিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বাহ্যিক মেলামেশা যদি বিদ্যমান থাকত, তবুও তা ক্ষতিকর হত।

গায়েবী ব্যাপারে কাউকে অবহিত করে দেওয়া হলে তা গায়েব থাকে না ঃ এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তাআলা গায়েবী ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে যে কাউকে অবহিত করেন না। অবশ্য নিজের নবী–রসূল নির্বাচিত করে তাদেরকেই গায়েবী ব্যাপারে অবহিত করেছেন। এতে এমন সন্দেহ করা উচিত নয় যে, তাই যদি হয়, তবে নবীগণও তো এলমে গায়েবের অংশীদার এবং আলেমে-গায়ব। কারণ, এলমে-গায়েব আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সত্তার সাথে সংযুক্ত, কোনও সৃষ্টিকে তার অংশীদার সাব্যস্ত করা শিরক। আর তা হল দু'টি শর্তসাপেক্ষে। (এক) সে এলমকে হতে হবে 'এলমে যাতী' যা অপর কারো মাধ্যমে আগত বা শেখানো নয়। (দুই) সে এলমকে সমগ্র বিশ্বজগৎ ও ভূত-ভবিষ্যতের উপর পরিব্যপ্ত হতে হবে, যাতে কোন একটি অণু–পরমাণু পর্যন্ত গোপন থাকবে না। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং ওহীর মাধ্যমে তাঁর নবী–রসূলগণকে যে সমস্ত গায়েবী বিষয় অবহিত করেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে এলমে গায়েব নয় বরং গায়েবী বিষয়ের সংবাদ যা নবী–রসূলগণকে দেওয়া হয়েছে। কোরআনে করীমও একে কয়েক স্থানে اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ (তথা গায়েবের সংবাদ বা অবগতি) শব্দে বিশ্লেষণ করেছে। বলা হয়েছে— مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ (অর্থাৎ,— সেগুলো ছিল গায়েবী সংবাদের অন্তর্ভুক্ত যা ওহীর মাধ্যমে আপনাকে অবহিত করা হয়েছে)।

উল্লেখিত সাতটি আয়াতের প্রথম আয়াতে কার্পণ্যের নিন্দাবাদ এবং তার উপর অভিসম্পাতের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

কার্পণ্যের সংজ্ঞা এবং সে জন্য শাস্তি বিধানের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ঃ 'বোখল' বা কার্পণ্যের শরীয়ত নির্ধারিত অর্থ হল— 'যা আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করা কারো উপর ওয়াজিব, তা ব্যয় না করা।' এ কারণেই কার্পণ্য বা বোখল হারাম এবং এজন্য জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব ক্ষেত্রে ব্যয় করা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব, তাতে ব্যয় না করা হারাম-কার্পণ্যের আওতাভুক্ত নয়। অবশ্য সাধারণ অর্থে তাকেও কার্পণ্যই বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের কার্পণ্য বা বোখল হারাম নয়। তবুও অনুত্তম।

'বোখল' বা কার্পণ্য অর্থেই আরও একটি শব্দ হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হল شُحٌّ —এর সংজ্ঞা হলো এই যে, যে ব্যয় নিজের দায়িত্বে ওয়াজিব ছিল, তা ব্যয় না করা। তদুপরি সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে লোভের বশবর্তী হওয়া। এটি কার্পণ্য অপেক্ষাও অধিক অপরাধ। সে কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন—

لا يجتمع شح وايمان فى قلب رجل مسلم ابدا

অর্থাৎ— 'শুহ্' বা কৃপণতা এবং 'ঈমান' কোন মুসলমানের অন্তরে একত্রে অবস্থান করতে পারে না। – (কুরতুবী)

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ
اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ
وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٨١﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ
اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٨٢﴾ اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا
اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا
بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ
وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾
فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ
بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿١٨٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ
الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ
زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا
الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾ لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ
اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ
وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٨٦﴾

(১৮১) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাদের কথা শোনেছেন, যারা বলেছে যে আল্লাহ্ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান! এখন আমি তাদের কথা এবং যেসব নবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তা লিখে রাখব, অতঃপর বলব, 'আস্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব!' (১৮২) এ হল তারই প্রতিফল যা তোমরা ইতিপূর্বে নিজের হাতে পাঠিয়েছ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না। (১৮৩) সে সমস্ত লোক যারা বলে যে, আল্লাহ্ আমাদিগকে এমন কোন রসূলের ওপর বিশ্বাস না করতে বলে রেখেছেন যতক্ষণ না তারা আমাদের নিকট এমন কোরবানী নিয়ে আসবেন যাকে আগুন গ্রাস করে নেবে।' তুমি তাদের বলে দাও, 'তোমাদের মাঝে আমার পূর্বে বহু রসূল নিদর্শনসমূহ এবং তোমরা যা আব্দার করেছ তা নিয়ে এসেছিলেন, তখন তোমরা কেন তাদেরকে হত্যা করলে যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক।' (১৮৪) তাছাড়া এরা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে তোমার পূর্বেও এরা এমন বহু নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে যারা নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলেন এবং এনেছিলেন সহীফা ও প্রদীপ্ত গ্রন্থ। (১৮৫) প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়। (১৮৬) অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরেকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং পরহেযগারী অবলম্বন কর, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৮১ নং আয়াতে ইহুদীদের একটি কঠিন ঔদ্ধত্যের ব্যাপারে সতর্কীকরণ ও শাস্তির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তা এরূপ যে, মহানবী (সাঃ) যখন কোরআনে হাকীম থেকে যাকাত ও সদকার বিধি-বিধান বর্ণনা করেন, তখন উদ্ধত ইহুদীরা বলতে আরম্ভ করে যে, আল্লাহ্ তাআলা ফকীর ও গরীব হয়ে গেছেন, আর আমরা হচ্ছি ধনী ও আমীর। সে জন্যেই তো তিনি আমাদের কাছে চাইছেন। বলাবাহুল্য, তাদের বিশ্বাস তাদের এ উক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মোটেই নয়। কিন্তু হুযুরে আকরাম (সাঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশেই হয়ত বলেছিল যে, কোরআনের এ আয়াত যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তার মর্ম এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ ফকীর ও পরমুখাপেক্ষী। তাদের এই অহেতুক প্রমাণটি সতস্ফূর্তভাবে বাতিল বলে সাব্যস্ত হওয়ার দরুন তার কোন উত্তরের প্রয়োজন ছিল না। কারণ, যাকাত ও সদকা সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র নির্দেশ তাঁর নিজের কোন লাভের জন্য নয়, বরং যারা মালদার তাদেরই পার্থিব ও আখেরাতের ফায়দার জন্য ছিল। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এ বিষয়টি 'আল্লাহ্‌কে ঋণদান' শিরোনামে এ জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে একথা বুঝা যায় যে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য অপরিহার্য ও সন্দেহাতীত হয়ে থাকে, তেমনিভাবে যে সদকা মানুষ দিয়ে থাকে তার প্রতিদানও আল্লাহ্ নিজ দায়িত্বে পরিশোধ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক বলে জানে, তার মনে এ শব্দের ব্যবহারে কস্মিনকালেও এমন কোন সন্দেহ উদয় হতে পারে না, যেমনটি উদ্ধত ইহুদীদের উক্তিতে বিদ্যমান। কাজেই কোরআনে করীম এই সন্দেহের উত্তর দান করেছে। শুধুমাত্র তাদের ঔদ্ধত ও হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ এবং তাঁর প্রতি উপহাস করার একাধিক অপরাধের শাস্তি হিসাবে বলা হয়েছে, আমি তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তসমূহ লিখে রাখব যাতে কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন করে আযাবের ব্যবস্থা করা যায়। অন্যথায় আল্লাহ্‌র জন্য লেখার কোনই প্রয়োজন নেই।

অতঃপর ইহুদীদের এ সমস্ত ঔদ্ধত্যের আলোচনার সাথে সাথে তাদের আরও একটি অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরা হলো এমন লোক, যারা নবী-রসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কিংবা তাদের উপহাস করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এরা তাদেরকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। কাজেই এমন লোকদের দ্বারা কোন নবীর প্রতি মিথ্যারোপ ও উপহাস করা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়।

কুফরী ও পাপের ব্যাপারে মনে-প্রাণে সম্মত থাকাও মহাপাপ ঃ এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআনের লক্ষ্য হলেন মহানবী (সাঃ) ও মদীনাবাসী ইহুদীবর্গ। আর নবীদের হত্যার ঘটনাটি হল হযরত ইয়াহ্ইয়া ও যাকারিয়া (আঃ)- এর সময়ের। সুতরাং এ আয়াতে নবী হত্যার অপরাধ এ সময়ের ইহুদীদের উপর আরোপ করা হল কেমন করে? তার কারণ এই যে, মদীনার ইহুদীরাও তাদের পূর্ববর্তী ইহুদীদের সে কাজের ব্যাপারে সম্মত এবং আনন্দিত ছিল বলে তারাও সেই হত্যাকারীদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী তাঁর তফসীরে বলেছেন, এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, কুফরের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপনও কুফরী ও মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত। রসূলে করীম (সাঃ)-এর এক বাণীতে এ বিষয়ের অধিকতর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, যমীনের উপর যখন কোন পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, যে লোক সেখানে উপস্থিত থাকে এবং সে পাপের প্রতিবাদ করে আর

সে কাজকে মন্দ জ্ঞান করে, তখন সে যেন সেখানে উপস্থিত থাকে না। অর্থাৎ, সে ব্যক্তি তাদের পাপের অংশীদার হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঘটনাস্থলে না থেকেও তাদের কৃত পাপের প্রতি সমর্থন দান করে, তাকে অংশীদার বলেই গণ্য করা হবে।

এ আয়াতের শেষাংশে এবং তৃতীয় আয়াতে সে উদ্ধতদের শাস্তিস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তাদের দোযখে নিক্ষেপ করে বলা হবে, এবার আগুনে জ্বলার স্বাদ আস্বাদন কর, যা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল; আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এটা কোন অন্যায় আচরণ নয়।

চতুর্থ আয়াতে সে ইহুদীদের অপবাদ ও মিথ্যারোপের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আর তাহল এই যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপকল্পে এই ছল উদ্ভাবন করে যে, পূর্ববর্তী নবীদের সদকার বস্তু -সামগ্রী কোন মাঠে কিংবা পাহাড়ে রেখে দেয়ার নিয়ম ছিল, তখন আকাশ থেকে একটা আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। এটাই সদকা কবুল হওয়ার লক্ষণ। রসূলে করীম (সাঃ) এবং তাঁর উম্মতকে আল্লাহ্ তাআলা এ বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যে, সদকার দ্রব্যসামগ্রীকে আগুনের গ্রাসে পরিণত করার পরিবর্তে তা মুসলমান গরীব-দুঃখীদিগকে দিয়ে দেয়া হয়। যেহেতু পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণের রীতির সাথে এ রীতিটির কোন মিল ছিল না, সেহেতু একে মুশরেকীনরা বাহনা বানিয়ে নিল যে, যদি আপনি নবীই হতেন, তাহলে আপনিও এমন মু'জেযা প্রাপ্ত হতেন, যাতে আকাশ থেকে আগুন এসে সদকার বস্তু-সামগ্রীকে গ্রাস করে ফেলত। অধিকন্তু তারা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতিও অপবাদ আরোপ করেছে যে, তিনি আমাদের নিকট থেকে এমন প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়েছেন যে, আমরা যেন এমন কোন লোকের প্রতি ঈমান না আনি, যার দ্বারা আকাশ থেকে আগুন এসে সদকার দ্রব্য-সামগ্রীকে জ্বালিয়ে দেয়ার মু'জেযা অনুষ্ঠিত হবে না।

ইহুদীদের এ দাবী যেহেতু আদৌ প্রমাণভিত্তিক ছিল না যে, আল্লাহ্ তাদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, কাজেই তার কোন উত্তর দেয়াও নিষ্প্রয়োজন। তাদের নিজেদের বক্তব্যের দ্বারাই তাদেরকে পরাজিত করার উদ্দেশে এরশাদ করা হয়েছে, তোমরা যদি এ দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাক যে, আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তবে পূর্ববর্তী যেসব নবী-রসূল তোমাদের কথা মত এই মু'জেযাও দেখিয়েছিলেন, তখন তোমাদের কর্তব্য ছিল তাদের প্রতি ঈমান আনা, কিন্তু তোমরা তাদেরকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ, বরং তাদেরকে হত্যা পর্যন্ত করে দিয়েছ। তা কেমন করে করলে?

এখানে এমন সন্দেহ করা যায় না যে, ইহুদীদের এ দাবী যদিও সর্বৈভ ভ্রান্ত ছিল, কিন্তু যদি মহানবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে এ মু'জেযা প্রকাশিত ও হত, তবে হয়তো তারা ঈমান এনে নিত! কারণ, আল্লাহ্ তাআলা জানতেন যে, তারা শুধুমাত্র বিদ্বেষ ও হঠকারিতাবশতঃই এসব কথা বলছে। কথামত মু'জেযা প্রকাশিত হলেও এরা ঈমান গ্রহণ করত না। পঞ্চম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, তাদের মিথ্যাবাদের দরুন আপনি দুঃখিত হবেন না। তার কারণ, এমনি ধরনের আচরণ সব নবী-রসূলের সাথেই হয়ে এসেছে।

আখেরাতের চিন্তা যাবতীয় দুঃখ-বেদনার প্রতিকার এবং সমস্ত সংশয়ের উত্তর ঃ ষষ্ঠ আয়াতে এই বাস্তবতাকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, যদি কখনও কোথাও কাফেররা বিজয়ীও হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ পার্থিব আরাম-আয়েশ লাভ করে আর তারই বিপরীতে মুসলমানগণ যদি বিপদাপদ, জটিলতা ও পার্থিব উপকরণের সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়, তাহলে তা তেমন বিস্ময়কর কিছু নয়। তাতে দুঃখিত হওয়ারও কিছু নেই। কারণ, এ বাস্তবতা সম্পর্কে কোন ধর্ম, কোন মতাবলম্বী কিংবা কোন দার্শনিকই অস্বীকার করতে পারে না যে, পার্থিব দুঃখ-কষ্ট বা আরাম-আয়েশ উভয়টিই কয়েকদিনের জন্য মাত্র। কোন জানদার বা প্রাণীই মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে না। তাছাড়া পার্থিব দুঃখ-কষ্ট কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পৃথিবীতেই আবর্তিত হয়ে শেষ হয়ে যায়। আর পৃথিবীতে যদি শেষ নাও হয়, মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। কাজেই কয়েকদিনের সুখ-দুঃখ নিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে থাকা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং মৃত্যুর পরবর্তী চিন্তা করাই উচিত যে, সেখানে কি হবে?

এজন্যই এ আয়াতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করবে। আর আখেরাতে নিজের কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি প্রাপ্ত হবে, যা কঠিনও হবে আবার দীর্ঘও হবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের পক্ষে সে চিন্তা করাই উচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে সে লোকই সত্যিকার কৃতকার্য, যে দোযখ থেকে অব্যাহতি লাভ করবে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে। তা প্রাথমিক পর্যায়ে হোক— যেমন, সৎকর্মশীল আবেদগণের সাথে যেরূপ আচরণ করা হবে— অথবা কিছু শাস্তি ভোগের পরেই হোক— যেমন, পাপী মুসলমানদের অবস্থা। কিন্তু সমস্ত মুসলমানই শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি লাভ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাতের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে কাফেরদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কাজেই তারা যদি সামান্য কয়েকদিনের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে গর্বিত হয়ে ওঠে, তবে সেটা একান্তই ধোঁকা। সেজন্যই আয়াতে বলা হয়েছে "দুনিয়ার জীবন তো হলো ধোঁকার উপকরণ।" তার কারণ এই যে, সাধারণতঃ এখানকার ভোগ-বিলাসই হবে আখেরাতের কঠিন যন্ত্রণার কারণ। পক্ষান্তরে এখানকার দুঃখ-কষ্ট হবে আখেরাতের সঞ্চয়।

সবর দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার ঃ সপ্তম আয়াতটি নাযিল হয়েছে একটি বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে, যার মোটামুটি আলোচনা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কোরআন করীমে যখন مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا আয়াতটি নাযিল হয় এবং যাতে অত্যন্ত সালঙ্কার বর্ণনাভঙ্গিতে সদকা ও খয়রাতকে আল্লাহ্‌কে করয দেওয়া বলে অভিহিত করা হয় আর সে বর্ণনায় ইঙ্গিত করা হয় যে, যাই কিছু এখানে দান করবে, আখেরাতে তার প্রতিদান তেমনি নিশ্চিত— যেন অন্যের ঋণ পরিশোধ করা হয়।

একথা শুনে কোন মূর্খ বিদ্বেষপরায়ণ ইহুদী বলল— "আল্লাহ্ ফকীর আর আমরা হলাম আমীর।" এতে হযরত আবু বকর (রাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং সে ইহুদীকে এক চড় বসিয়ে দিলেন। ইহুদী এসে রসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে অভিযোগ পেশ করল। তারই প্রেক্ষিতে নাযিল হল। .... لَتُبْلَوُنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ....

এতে মুসলমানদিগকে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনের জন্য জান-মালের কোরবানী দিতে হবে এবং কাফের, মুশরেক ও আহ্‌লে

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ
لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَ
اشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ۝ لَا تَحْسَبَنَّ
الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ
يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۝
الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝
رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ
مِنْ اَنْصَارٍ ۝ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ
لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۝

(১৮৭) আর আল্লাহ্ যখন আহ্‌লে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা সে প্রতিজ্ঞাকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল আর তার কেনা-বেচা করল সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। সুতরাং কতই না মন্দ তাদের এ বেচা-কেনা! (১৮৮) তুমি মনে করো না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা আমার নিকট থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (১৮৯) আর আল্লাহ্‌র জন্যই হল আসমান ও যমিনের বাদশাহী। আল্লাহ্ই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী। (১৯০) নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে। (১৯১) যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে), পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (১৯২) হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করলে তাকে সবসময়ে অপমানিত করলে ; আর জালেমদের জন্যে তো কোন সাহায্যকারী নেই। (১৯৩) হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ্ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষক্রটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে।

কিতাবদের কটূক্তি এবং কষ্ট দানের কারণে ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। এ সমস্তই হলো তাদের জন্য পরীক্ষা। এতে ধৈর্য ধারণ করা এবং নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাকওয়ার পরাকাষ্ঠা সাধনে নিয়োজিত থাকাই হল তাদের পক্ষে উত্তম। তাদের সাথে বাদানুবাদ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধর্মীয় জ্ঞান গোপন করা হারাম এবং কোন কাজ না করেই তার জন্য প্রশংসার অপেক্ষা করা দূষণীয় ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আহ্‌লে কিতাবদের দু'টি অপরাধ এবং তার শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর তা হল এই যে, তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল কিতাবের বিধি-বিধানসমূহকে কোন রকম হেরফের বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন না করে জনসমক্ষে বিবৃত করে দেবে এবং কোন নির্দেশই গোপন করবে না। কিন্তু তারা নিজেদের পার্থিব স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে সে প্রতিজ্ঞার কোন পরোয়াই করেনি; বহু বিধি-নিষেধ তারা গোপন করেছে।

দ্বিতীয়ত ঃ তারা সৎকর্ম তো করেই না তদুপরি কামনা করে যে, সৎকাজ না করা সত্ত্বেও তাদের প্রশংসা করা হোক।

তওরাতের বিধি-বিধান গোপন করার ঘটনা সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত অনুসারে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ইহুদীদের কাছে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করলেন যে, এটা কি তওরাতে আছে? তারা তা গোপন করল এবং যা তওরাতে ছিল, তার বিপরীত বলে দিল। আর তাদের এ অসৎকর্মের জন্য আনন্দিত হয়ে ফিরে এল যে, আমরা চমৎকার ধোঁকা দিয়ে দিয়েছি। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হল, যাতে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় ব্যাপার, না-করা কাজের জন্য প্রশংসার আগ্রহী হওয়া। তা হল মুনাফেক ইহুদীদের একটি কর্মপন্থা যে, কোন জেহাদ সমাগত হলে তারা কোন ছলছুতারভিত্তিতে ঘরে বসে থাকত এবং এভাবে জেহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য আনন্দ উপযাপন করত। আর রসূলে-করীম (সাঃ) যখন ফিরে আসতেন, তখন তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে মিথ্যা কসম খেয়ে নানা অজুহাত বর্ণনা করত এবং আশা করত যে, তাদের এহেন কাজের জন্য প্রশংসা করা হোক।— (বুখারী)

কোরআনে করীমে এতদুভয় বিষয়ে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। তাতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ধর্মীয় জ্ঞান ও আল্লাহ্-রসূলের বিধি-বিধান গোপন করা হারাম। তবে এ গোপন করার ব্যাপারটি হল তেমনিভাবে গোপন করা যা ইহুদীদের কাজ ছিল। অর্থাৎ, —পার্থিব স্বার্থে আল্লাহ্‌র আহ্‌কাম গোপন করা। তারা তা করে মানুষের নিকট থেকে অর্থ-কড়ি গ্রহণ করত। অবশ্য কোন ধর্মীয় কল্যাণ বিবেচনায় যদি কোন বিশেষ হুকুম জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ করা না হয়, তবে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) স্বতন্ত্র এক পরিচ্ছেদ এ ব্যাপারে হাদীসের উদ্ধৃতি সহকারে বিবৃত করেছেন যে, অনেক সময় কোন কোন হুকুম প্রকাশ করতে গেলে সাধারণ জনগণের মাঝে ভুল-বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে এবং এতে তাদের নানা ফিৎনা-ফাসাদে পতিত হয়ে পড়ারও আশংকা দেখা দিতে পারে। এমন আশংকায় কোন হুকুম গোপন করা হলে, তাতে কোন দোষ নেই।

কোন সৎকাজ করে সেজন্য প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনের অপেক্ষা করা

হলে সৎকাজ করা সত্ত্বেও শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তা দূষণীয় এবং কাজ না করা সত্ত্বে এরূপ আচরণ তো আরও বেশী দূষণীয়। আর মনের দিক দিয়ে এমন বাসনা সৃষ্টি হওয়া যে, আমিও অমুক কাজটি করব এবং তাতে সুনাম হবে, তাহলে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য যদি সুনামের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবস্থা করা না হয়।— (বয়ানুল-কোরআন)

এ আয়াতগুলোতে চিন্তা-ভাবনার প্রসঙ্গেই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে ভাবতে হয়।

(এক) **'আসমান-যমিন সৃষ্টি বলতে কি বোঝায় :** خَلْق শব্দের অর্থে নতুন আবিষ্কার ও সৃষ্টি। অর্থ হচ্ছে,— আসমান এবং যমীন সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার এক বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান। এ দুয়ের মধ্যে অবস্থিত আল্লাহ্ তাআলার অসংখ্য সৃষ্টিরাজিকেও এ আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এ বিরাট সৃষ্টজগতের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই স্ব স্ব সৃষ্টিকর্তার নিদর্শনরূপে দাঁড়িয়ে আছে।

আরো একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে السَّمٰوٰتِ শব্দ দ্বারা যেমন উর্ধ্বজগত তথা সকল উন্নতি বোঝায়, তেমনি ارض বলতে নিম্নজগত তথা নিম্নমুখী সব কিছুকেই বোঝায়। সেমতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ পাক যেমন সকল উচ্চতা ও উন্নতির সৃষ্টিকর্তা, তেমনি নিম্নজগৎ তথা সকল নিম্নমুখিতারও সৃষ্টিকর্তা।

(দুই) **দিন-রাত্রির আবর্তন :** চিন্তা-ভাবনার দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, দিন- রাত্রির আবর্তন অর্থে কি বোঝানো হয়েছে! এখানে اخْتِلَافِ শব্দটি আরবী পরিভাষায় اختلف فلان فلانا (অর্থাৎ, অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির পরে এসেছে,) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সেমতে وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ বাক্যের অর্থ হবে, রাত্রির গমন এবং দিবসের আগমন।'

وَاخْتِلَافِ শব্দ দ্বারা কম-বেশীও বোঝায়। যেমন, শীতকালে রাত্রি হয় দীর্ঘ এবং দিন হয় খাটো, গরমকালে দিন বড় এবং রাত্রি হয় ছোট। অনুরূপ এক দেশ থেকে অন্য দেশে দিবস এবং রাত্রির দৈর্ঘ্যে তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন, উত্তর মেরুর সন্নিকটবর্তী দেশগুলোতে দিবাভাগ উত্তর মেরু থেকে দূরবর্তী দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশী দীর্ঘ হয়। এসবগুলো বিষয়ই আল্লাহ্ তাআলার অপার কুদরতের একেকটি অতি উজ্জ্বল নিদর্শন।

(তিন) **'আয়াত' শব্দের অর্থ :** তৃতীয় ভাবনার বিষয় হচ্ছে 'আয়াত' বা নিদর্শন বলতে কি বোঝায়? اٰيٰت -اٰيَة - এর বহুবচন। শব্দটি কয়েকটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যথা, মু'জেযাকে যেমন 'আয়াত' বলা হয়, তেমনি কোরআন শরীফের বাক্যকেও 'আয়াত' বলা হয়। তৃতীয় অর্থে দলীল-প্রমাণও বোঝানো হয়ে থাকে। এখানে তৃতীয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, এসব বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে।

(চার) اُولُوا الْاَلْبَابِ —চতুর্থ বিবেচ্য বিষয়। اُولُوا الْاَلْبَابِ শব্দের অর্থ সম্পর্কে ভাবনার বিষয় হচ্ছে, এর দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে?

اَلْبَاب শব্দটি لب শব্দের বহুবচন। অর্থ মগজ। প্রত্যেক বস্তুরই মগজ অর্থে তার সারবস্তুকে বোঝায় এবং সে সারটুকু দ্বারা সংশ্লিষ্ট বস্তুর বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়। এ কারণেই মানুষের বুদ্ধি ও মেধাকে لب বলা হয়। কেননা; বুদ্ধিই মানুষের প্রধান সারবস্তু। সেমতে اُولُوا الْاَلْبَابِ শব্দের অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিসম্পন্ন লোকজন।

বুদ্ধিমান শুধুমাত্র তারাই যারা ঈমান গ্রহণ করে এবং সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করে : এ বিষয়টি ছিল লক্ষ্যণীয় যে, বুদ্ধিমান বলতে কাদেরকে বোঝায়? কারণ, সমগ্র বিশ্বে প্রতিটি মানুষই বুদ্ধিমান হওয়ার দাবীদার। কোন একজন একান্ত নির্বোধ ব্যক্তিও নিজেকে নির্বোধ বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। সেজন্যই কোরআনে করীম বুদ্ধিমানের এমন কয়েকটি লক্ষণ বাতলে দিয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষেই বুদ্ধির মাপকাটি হিসাবে গণ্য হতে পারে।

প্রথম লক্ষণটি হলো আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অনুভূত বিষয়ের জ্ঞান কান, নাক, চোখ, জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও লাভ করা যায়। নির্বোধ জীব-জন্তুর মধ্যেও তা রয়েছে। পক্ষান্তরে বুদ্ধির কাজ হলো, লক্ষ্যণীয় নিদর্শনাদির মধ্য থেকে গৃহীত দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে এমন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যা অনুভবযোগ্য নয় এবং যার দ্বারা বাস্তবতার সর্বশেষ উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।

এই মূলনীতির প্রেক্ষিতে সৃষ্ট-জগতের প্রতি লক্ষ্য করলে আসমান, যমীন এবং এর অন্তর্গত যাবতীয় সৃষ্টি ও সেগুলোর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সামগ্রীর সুদৃঢ় ও বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা বুদ্ধিকে এমন এক সত্তার সন্ধান দেয়, যা জ্ঞান-অভিজ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত এবং যিনি যাবতীয় বস্তু সামগ্রীকে বিশেষ হেকমতের দ্বারা তৈরী করেছেন। তাঁরই ইচ্ছায় এই সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুতঃ সে সত্তা একমাত্র আল্লাহ্ জাল্লাহ্- শানুহুরই হতে পারে।

মানুষের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ব্যর্থতা সর্বদা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কাজেই তাকে এই ব্যবস্থার পরিচালক বলা চলে না। সেজন্যই আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তাতে উৎপন্ন বস্তুনিচয়ের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুদ্ধির সামনে একটিমাত্র পরিণতি সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর তাহল আল্লাহ্র পরিচয় লাভ, তাঁর আনুগত্য এবং তাঁরই যিকর করা। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে সে বুদ্ধিমান বলে কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কাজেই কোরআন মজীদ বুদ্ধিমানদের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে—

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

অর্থাৎ, বুদ্ধিমান হলো সে সমস্ত লোক যারা আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণ করে বসে, শুনে, ডানে ও বায়ে। অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তাআলার স্মরণে নিয়োজিত থাকে।

এতে বোঝা গেল যে, বর্তমান পৃথিবী যে বিষয়টিকে বুদ্ধি এবং বুদ্ধিমানের মাপকাঠি বলে গণ্য করে নিয়েছে, তা শুধুমাত্র একটা ধোঁকা। কেউ ধন-সম্পদ গুটিয়ে নেওয়াকে বুদ্ধিমত্তা সাব্যস্ত করেছে, কেউ বিভিন্ন ধরনের কল-কব্জা তৈরী করা কিংবা বাষ্প-বিদ্যুৎকে প্রকৃত শক্তি মনে করার নামই রেখেছে বুদ্ধিমত্তা। কিন্তু সুস্থ বিবেক ও সুষ্ঠু বুদ্ধির কথা হলো তাই, যা আল্লাহ্ তাআলার নবী-রসূলগণ নিয়ে এসেছেন। যাতে করে এলম ও হেকমতের আলোকে পার্থিব ব্যবস্থা পরম্পরা নিম্ন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়ে গিয়ে মধ্যবর্তী পর্যায়গুলোকে উপেক্ষা করেছে। বিজ্ঞান তোমাদিগকে কাঁচা মাল থেকে কল-কারখানা পর্যন্ত এবং কল-কারখানা থেকে বাষ্প-বিদ্যুতের শক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু

বুদ্ধির কাজ হলো আরও একটু এগিয়ে দেওয়া যাতে তোমরা বুঝতে পার, উপলব্ধি করতে পার যে, আসল কাজটি কি মাটি, পানি বা লোহা-তামার, না মেশিনের; আর নাইবা সেগুলোর মাধ্যমে তৈরী বাষ্পের। বরং কাজটি তাঁরই যিনি আগুন, পানি ও বায়ুকে সৃষ্টি করেছেন— যার ফলে এই বিদ্যুৎ, এই বাষ্প তোমরা পেতে পারছ।

এ ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, সেসব লোকই শুধু বুদ্ধিমান বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য, যারা আল্লাহ্‌কে চেনবেন এবং সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ তাঁকে স্মরণ করবেন।

সারকথা, আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টি ও সৃষ্টজগতের উপর চিন্তা-গবেষণা করে তার মাহাত্ম্য ও কুদরত সম্পর্কে অবগত হওয়া একটি মহৎ ও উচ্চ পর্যায়ের এবাদত। সেগুলোর মধ্যে গভীর মনোনিবেশ করে তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ না করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। উল্লেখিত আয়াতের শেষ বাক্যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহে চিন্তা গবেষণা করার ফলাফল বাতলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার সীমাহীন সৃষ্টির উপর যে লোক চিন্তা-ভাবনা করে সে লোক এই অবস্থায় না পৌঁছে পারে না যে, এসব বস্তু-সামগ্রীকে আল্লাহ্ নিরর্থক সৃষ্টি করেননি বরং এসবের সৃষ্টির পেছনে হাজারো তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। সে সমস্তকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়ে মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, সমগ্র পৃথিবী তাদের কল্যাণের জন্য তৈরী করা হয়েছে এবং তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার এবাদত-আরাধনার উদ্দেশে। এটাই হলো তাদের জীবনের লক্ষ্য। তারপর চিন্তা-গবেষণা করে এই তাৎপর্য আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছে যে, গোটা এই বিশ্ব-সৃষ্টি নিরর্থক নয় বরং এগুলো সবই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অসীম কুদরত ও হেকমতেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পরবর্তীতে সে সমস্ত লোকের কয়েকটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনা উল্লেখ করা হয়েছে যা তারা নিজেদের পালনকর্তাকে চিনে নিয়ে তাঁর মহান দরবারে পেশ করেছিলেন।

প্রথম আবেদনটি ছিল এই যে, فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ, আমাদিগকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।

দ্বিতীয় আবেদনে আমাদিগকে আখেরাতের লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি দান কর। কারণ, যাদেরকে তুমি জাহান্নামে প্রবিষ্ট করবে, তাদেরকে সমগ্র বিশ্বের সামনে লাঞ্ছিত করা হবে। কোন কোন ওলামা লিখেছেন, হাশরের মাঠের লাঞ্ছনা এমন এক আযাব হবে যার ফলে মানুষ কামনা করবে যে, হায়, যদি তাকে জাহান্নামেই দিয়ে দেয়া হতো; তবুও যদি তার অপকর্মের প্রচার গোটা হাশরের সামনে করা না হতো।

তৃতীয় আবেদন ঃ আমরা তোমার পক্ষ থেকে আগত আহবানকারী রসূলে মকবুল (সাঃ) – এর আহবান শুনেছি এবং তাতে ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদের বড় গোনাহ্‌গুলো ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের অন্যায় ও দোষ-ত্রুটির কাফ্‌ফারা করে দাও আর আমাদিগকে নেককার ও সৎকর্মশীলদের সাথে মৃত্যু দান কর। অর্থাৎ, তাঁদের শ্রেণীভুক্ত করে দাও।

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ
اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ
عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ
فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ
وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَ
اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۗ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَ
بِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَمَا
عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ
يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ
لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٠﴾

(১৯৪) হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না। (১৯৫) অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। তারপর সেসমস্ত লোক যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করব জান্নাতে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়। (১৯৬) নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন তোমাদিগকে ধোঁকা না দেয়। (১৯৭) এটা হলো সামান্য ফায়দা— এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোযখ। আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান। (১৯৮) কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্যে একান্তই উত্তম। (১৯৯) আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয়, আর যা কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর উপর, আল্লাহ্‌র সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে সওদা করে না, তারাই হলো সে লোক যাদের জন্য পারিশ্রমিক রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ যথাশীঘ্র হিসাব চুকিয়ে দেন। (২০০) হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরোক্ত তিনটি আবেদন ছিল আযাব, কষ্ট এবং অনিষ্ট থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য। পরবর্তীতে চতুর্থ আবেদনটি করা হয়েছে কল্যাণ লাভ সম্পর্কে যে, নবী-রসূলগণের মাধ্যমে জান্নাতের নেয়ামতসমূহের যে প্রতিশ্রুতি তুমি দান করেছ তা আমাদিগকে দান কর। কেয়ামতের দিন যেন লাঞ্ছনাও না হয়। অর্থাৎ, — প্রাথমিক জবাবদিহী ও বদনামীর পর মাফ করার পরিবর্তে প্রথম পর্যায়েই আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও। তুমি তো ওয়াদা ভঙ্গ কর না, কিন্তু এই আবেদন-নিবেদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আমাদিগকে এমন যোগ্যতা দান কর যাতে আমরা তোমার সে ওয়াদা লাভের অধিকারী হতে পারি এবং শেষ পর্যন্ত যেন তাতে স্থির থাকতে পারি। আমাদের মৃত্যু যেন ঈমান ও আ'মালে ছালেহার সাথে হয়।

হিজরত ও শাহাদতের দ্বারা হক্কুল এবাদ ব্যতীত অন্যান্য সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায় :........ لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ আয়াতের আওতায় তফসীরের সার- সংক্ষেপে এই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র হকের বেলায় যে সমস্ত ত্রুটি গাফলতী ও পাপ-তাপ হয়ে থাকবে তা হিজরত ও শাহাদতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। তার কারণ, স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ) হাদীসে ঋণ-ধারকে এ থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। বরং তাঁর ক্ষমার নিয়ম হলো স্বয়ং পাওনাদার কিংবা তার ওয়ারিসানকে প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবে অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেবে। অবশ্য যদি কারো প্রতি আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ করে পাওনাদারকে রাজী করিয়ে দেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। কারো কারো ব্যাপারে এমন হবেও বটে।

এ আয়াতটিতে মুসলমানগণকে তিনটি বিষয়ে নছিহত করা হয়েছে। (১) সবর, (২) মুসাবারাহ্ (৩) মুরাবাতা ও (৪) তাকওয়া, যা এ তিনের সাথে অপরিহার্যভাবে যুক্ত।

'সবর' এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা ও বাধা। আর কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় এর অর্থ নফসকে তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের উপর জমিয়ে রাখা। এর তিনটি প্রকার রয়েছে।

(এক) 'সবর আলাত্তাআত'। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূল যে সমস্ত কাজের হুকুম করেছেন, সেগুলোর অনুবর্তিতা মনের উপর যত কঠিনই হোক না কেন তাতে মনকে স্থির রাখা।

(দুই) 'সবর 'আনিল মা'আসী' অর্থাৎ, যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল নিষেধ করেছেন, সেগুলো মনের জন্য যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, যত স্বাদেরই হোক না কেন, তা থেকে মনকে বিরত রাখা।

(তিন) 'সবর আলাল-মাসায়েব' অর্থাৎ, বিপদাপদ ও কষ্টের বেলায় সবর করা, ধৈর্য ধারণ করা, অধৈর্য না হওয়া এবং দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে আগত মনে করে মন-মস্তিস্ককে সেজন্য অধৈর্য করে না তোলা।

'মোসাবারাহ' শব্দটি সবর থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ, শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করা। আর 'মোরাবাতা' অর্থ হলো, ঘোড়াকে বাঁধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এ অর্থেই কোরআনে করীমে বলা হয়েছে وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) ইসলামী সীমান্তের হেফাযতে সুসজ্জিত হয়ে থাকা অপরিহার্য, যাতে ইসলামী সীমান্তের প্রতি শত্রুরা রক্তচক্ষু তুলে তাকাতেও সাহস না পায়।

(২) জামাতের নামাযের এমন নিয়মানুবর্তিতা করা যে, এক নামাযান্তেই দ্বিতীয় নামাযের জন্য অপেক্ষামান থাকা। এ দু'টি বিষয়ই ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মকবুল ইবাদত। এর মাহাত্ম্য অসংখ্য অগণিত। এখানে কয়েকটি মাত্র লিখে দেয়া হলো।

রেবাত বা ইসলামী সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা : ইসলামী সীমান্তের হেফাযত করার লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষারত থাকাকেই 'রেবাত' ও মোরাবাতাহ বলা হয়। এর দু'টি রূপ হতে পারে। প্রথমতঃ যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নেই,. সীমান্ত সম্পূর্ণ শান্ত, এমতাবস্থায় শুধুমাত্র অগ্রিম হেফাযত হিসাবে তার দেখা-শোনা করতে থাকা। এক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনসহ সেখানে (সীমান্তে) বসবাস করতে থাকা কিংবা চাষ-বাস করে রুযী-রোযগার করাও জায়েয। এমতাবস্থায় যদি সীমান্ত রক্ষাই নিয়্যত হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থায় রুযী-রোযগার করা যদি তারই আনুষঙ্গিক বিষয় হয়, তবে এমন ব্যক্তিরও 'রেবাত ফী সাবীলিল্লাহ'র সওয়াব হতে থাকবে। তাকে যদি কখনও যুদ্ধ করতে না হয়, তবুও। কিন্তু প্রকৃত নিয়্যত যদি সীমান্তের হেফাযত না হয়, বরং রুযী- রোজগারই হয় মুখ্য, তবে দৃশ্যতঃ সীমান্ত রক্ষার কাজ করে থাকলেও এমন ব্যক্তি 'মোরাবেত ফী-সাবিলিল্লাহ' হবে না। অর্থাৎ, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সীমান্ত রক্ষাকারী বলে গণ্য হবে না.।

দ্বিতীয়তঃ সীমান্তে যদি শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, তবে এমতাবস্থায় নারী ও শিশুদিগকে সেখানে রাখা জায়েয নয়। তখন সেখানে তারাই থাকবে, যারা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে।-(কুরতুবী)

এতদুভয় অবস্থাতে 'রেবাত' বা সীমান্তরক্ষার অসংখ্য ফযীলত রয়েছে। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, - 'আল্লাহ্‌র পথে একদিনের 'রেবাত' (সীমান্ত প্রহরা) সমগ্র দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে সে সমুদয় থেকেও উত্তম।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে হযরত সালমান কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন- 'একদিন ও একরাতের 'রেবাত (সীমান্ত প্রহরা) ক্রমাগত এক মাসের রোযা এবং সমগ্র রাত এবাদতে কাটিয়ে দেয়া অপেক্ষাও উত্তম। যদি এমতাবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার সীমান্ত প্রহরার পর্যায়ক্রমিক সওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার রিযিক জারী থাকবে এবং সে শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে।

আবু দাউদ (রহঃ) ফুযালাহ্ ইবনে ওবায়েদ-এর রেওয়ায়েতক্রমে এ মর্মে এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূল করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন- প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় শুধুমাত্র মোরাবেত (ইসলামী সীমান্তরক্ষী) ছাড়া। অর্থাৎ, তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে। এবং সে কবরে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী থেকে নিরাপদ থাকবে।

এসব রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'রেবাত' বা সীমান্ত রক্ষার কাজটি সমস্ত সদকায়ে জারিয়া অপেক্ষাও উত্তম। কারণ, সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সদকাকৃত বাড়ী-ঘর,জমি-জমা, রচিত গ্রন্থরাজি কিংবা ওয়াক্ফকৃত জিনিসের দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে। যখন উপকারিতা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার সওয়াব বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে সীমান্ত প্রহরার সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। কারণ, সমস্ত মুসলমানের সৎকর্মে নিয়োজিত থাকা তখনই সম্ভব, যখন তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকবে। ফলে একজন সীমান্তরক্ষীর এ কাজ সমস্ত মুসলমানের সৎকাজের কারণ হয়। সে কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত তার 'রেবাত' কর্মের সওয়াব অব্যাহত থাকবে। তাছাড়াও সে যত নেক কাজ দুনিয়ায় করতো, সেগুলোর সওয়াবও আমল করা ছাড়াই সর্বদা জারী থাকবে।

সূরা আল -ইমরান সমাপ্ত

سُوْرَةُ النِّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَّسِتٌّ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعٌ وَّعِشْرُوْنَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ① وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ② وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا ③ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ④ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ⑤

সূরা আন-নিসা
মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ঃ ১৭৬
পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(১) হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্নীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (২) এতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালামালের সাথে ভালো মালামালের অদল-বদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয় এটা বড়ই মন্দ কাজ। (৩) আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। (৪) আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর। (৫) আর যে সম্পদকে আল্লাহ্‌ তোমাদের জীবন-যাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিও না। বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও, পরাও এবং তাদেরকে সান্ত্বনার বাণী শোনাও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথমোক্ত সূরায় বিভিন্ন যুদ্ধ-জেহাদ, শত্রুপক্ষের সাথে আচার-আচরণ, যুদ্ধলব্ধ বস্তু সামগ্রীর (গণিমতের মাল) অপচয় ও আত্মসাতের ভয়াবহ পরিণাম প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। আর আলোচ্য সূরার শুরুতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যের অধিকার সংক্রান্ত বিধান জারি করা হয়েছে। যেমন — অনাথ-এতীমের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও স্ত্রীদের অধিকার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, হক্কুল-এবাদ বা অন্যের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কতকগুলো অধিকার রয়েছে, যেগুলো সাধারণতঃ দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় পড়ে এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তা কার্যকর করা যেতে পারে।

সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও শ্রমের মজুরী প্রভৃতি এ জাতীয় অধিকার যা মূলতঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে থাকে। এসব অধিকার যদি কোন এক পক্ষ আদায় করতে ব্যর্থ হয় অথবা সেক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তাহলে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার সুরাহা করা যেতে পারে।

কিন্তু সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, কারো নিজ বংশের এতীম ছেলে মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক অধিকার আদায় হওয়া নির্ভর করে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার উপর। এসব অধিকারকে তোলাদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। কোন চুক্তির মাধ্যমেও তা নির্ধারণ করা দুষ্কর। সুতরাং এসব অধিকার আদায়ের জন্য আল্লাহ্‌-ভীতি এবং পরকালের ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উত্তম উপায় নেই। আর একেই বলা হয়েছে 'তাকওয়া'। বস্তুতঃ এই তাকওয়া দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক শক্তির চেয়ে অনেক বড়। তাই আলোচ্য সূরাটিও তাকওয়ার বিধান দিয়ে শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ .... অর্থাৎ, হে মানবমণ্ডলী। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার বিরুদ্ধাচরণকে ভয় কর। সম্ভবতঃ এ কারণেই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বিয়ের খোতবায় এ আয়াতটি পাঠ করতেন। বিয়ের খোতবায় এই আয়াতটি পাঠ করা সুন্নত।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এখানে 'হে মানবমণ্ডলী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে যাতে সমগ্র মানুষই-পুরুষ হোক অথবা মহিলা, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের হোক অথবা দুনিয়ার প্রলয় দিবস পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী – প্রতিটি মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

তাকওয়ার হুকুমের সাথে সাথে আল্লাহ্‌র অসংখ্য নামের মধ্যে এখানে 'রব' শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যেও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। অর্থাৎ, এমন এক সত্তার বিরুদ্ধাচরণ করা কি করে সম্ভব হতে পারে, যিনি সমগ্র সৃষ্টিলোকের লালন-পালনের যিম্মাদার এবং যার রবুবিয়াত বা পালন-নীতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে স্তরে দেদীপ্যমান।

এরপরই আল্লাহ্‌ তাআলা মানব সৃষ্টির একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, তিনি বিশেষ কৌশল ও দয়ার মাধ্যমে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানব সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়া হতে পারতো, কিন্তু আল্লাহ্‌ একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে,

দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একটি মাত্র মানুষ তথা হযরত আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার সুদৃঢ় বন্ধন তৈরী করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ ভীতি এবং পরকালের ভয় ছাড়াও এই ভ্রাতৃ বন্ধনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই যেন একে অন্যের অধিকারের প্রতি পুরোপুরি সম্মান প্রদর্শন করে এবং উঁচু-নিচু, আশরাফ-আতরাফ তথা ইতর-ভদ্রের ব্যবধান ভুলে গিয়ে যেন সবাই একই মানদণ্ডে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী করে নেয়।

الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً

অর্থাৎ, — সে মহাসত্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদের সকলকে একটি মানুষ তথা আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। আদম থেকে সৃষ্টি করার অর্থ এই যে, প্রথমতঃ হযরত আদমের (আঃ) স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই যুগল থেকেই পৃথিবীর সকল মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

অতএব, বলা যেতে পারে যে, এই আয়াতটি মূলতঃ পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত আয়াতসমূহের ভূমিকা হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই ভূমিকায় একদিকে আল্লাহ্র অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে একই পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য করে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

অতঃপর আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্কে ভয় করো, যাঁর নাম উচ্চারণ করে তোমরা অন্যের থেকে অধিকার দাবী কর এবং যাঁর নামে শপথ করে অন্যের কাছ থেকে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে থাক। এ পর্যায়ে আরো বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্কে তা পিতার দিক থেকেই হোক, অথবা মায়ের দিক থেকেই হোক, তাদের অধিকার সম্পর্ক সচেতন থাক, তা আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন কর।

দ্বিতীয় আয়াতে এতীম শিশুদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তাকিদ করা হয়েছে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের বিধানও জারি করা হয়েছে।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ঃ আলোচ্য সূরার সূচনাতেই আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। 'আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর দ্বারা সব রকম আত্মীয়ই বোঝানো হয়েছে। কালামে-পাকে 'আরহাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলতঃ একটি বহুবচনবোধক শব্দ। এর একবচন হচ্ছে 'রেহম'। আর 'রেহম' অর্থ জরায়ু বা গর্ভাশয়। অর্থাৎ, জন্মের প্রাক্কালে মায়ের উদরে যে স্থানে সন্তান অবস্থান করে। জন্মসূত্রেই মূলতঃ মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদকে ইসলামী পরিভাষায় 'সেলায়ে-রেহ্মী' বলা হয়। আর এতে কোন রকম ব্যত্যয় সৃষ্টি হলে তাকে বলা হয় 'কেত্বয়ে-রেহ্মী।'

হাদীস শরীফে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করে, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা। – (মেশকাত – ৪১৯ পৃঃ)

এ হাদীসে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখার দুটি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক রাখলে পরকালে তো কল্যাণ লাভ হবেই, ইহকালেও সম্পদের প্রাচুর্য এবং আল্লাহ্র রসূলের (সাঃ) পক্ষ থেকে দীর্ঘ জীবন লাভের আশ্বাস সম্পর্কিত সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন ঃ মহানবী (সাঃ)-এর মদীনায় আগমনের প্রায় সাথে সাথেই আমিও তাঁর দরবারে গিয়ে হাজির হলাম। সর্বপ্রথম আমার কানে তাঁর যে কথাটি প্রবেশ করল, তা হলো এই ঃ

– "হে লোক সকল ! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বেশী বেশী সালাম দাও। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষকে খাদ্য দান কর। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোল এবং এমন সময়ে নামাযে মনোনিবেশ কর, যখন সাধারণ লোকেরা নিদ্রামগ্ন থাকে। স্মরণ রেখো, এ কথাগুলো পালন করলে তোমরা পরম সুখ ও শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" – (মেশকাত পৃঃ ১০৮)

অন্য এক হাদীসে আছে ঃ উম্মুল-মু'মিনীন হযরত মায়মুনাহ্ (রাঃ) তাঁর এক বাঁদীকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর মহানবী (সাঃ)-এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছালেন, তখন তিনি বললেন, তুমি যদি বাঁদীটি তোমার মামাকে দিয়ে দিতে, তাহলে অধিক পুণ্য লাভ করতে পারতে। – (মেশকাত – পৃঃ ১৭১)

ইসলাম দাস-দাসীদের আযাদ করে দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছে এবং একে অতীব পুণ্যের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখাকে তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন ঃ

– "কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করলে সদ্কার সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু কোন নিকটাত্মীয়কে সাহায্য করলে একই সংগে সদ্কা এবং আত্মীয়তার হক আদায়ের দ্বৈত পুণ্য লাভ করা যায়। – (মেশ্কাত – পৃঃ ১৭১)

আয়াতের শেষাংশে মানুষের অন্তরকে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে খুবই সচেতন ও পর্যবেক্ষণকারী'। আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের ইচ্ছার কথাও ভালোভাবে অবগত রয়েছেন। কিন্তু যদি লোকলজ্জার ভয়ে অথবা সমাজ ও পরিবেশের চাপে পড়ে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সুব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্র কাছে এর কোন মূল্য নেই। এ প্রসংগে আল্লাহ্কে ভয় করার কি তাৎপর্য রয়েছে, তাও অনুধাবন করতে কোন বেগ পেতে হয় না। কারণ, তাঁকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তিনি সর্বক্ষণই মানুষের আচার-আচরণ ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

কোরআনে-করীমের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে যে সব বিধি-নিষেধ বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোকে দুনিয়ার সাধারণ

আইন-কানুনের মতো বর্ণনা করা হয়নি।

কোরআনে বর্ণিত আইন-কানুনগুলোকে জনগণের হৃদয়গ্রাহী করার জন্য বিশেষ আন্তরিকতার সাথে এবং প্রশিক্ষণমূলক পন্থায় বর্ণনা করা হয়েছে। আইনগুলো বর্ণনা করার সাথে সাথে মানুষের মন-মানসিকতারও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে, যাতে তাদের মধ্যে সেগুলোর গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

এতীমের অধিকার ঃ আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে ঃ وَاٰتُوا الْيَتٰمٰىٓ اَمْوَالَهُمْ এতীমের সম্পদ তাদেরকে যথাযথভাবে বুঝিয়ে দাও। আরবী 'এতীম' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, নিঃসঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটি মাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে 'দুররে-এতীম' বা নিঃসঙ্গ মুক্তা বলা হয়ে থাকে।

ইসলামী পরিভাষায় যে শিশু-সন্তানের পিতা ইন্তেকাল করে, তাকে এতীম বলা হয়ে থাকে। অবশ্য জীব-জন্তুর ব্যাপারে এর বিপরীতভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, যে সব জীব-জন্তুর মা মরে যায়, সেগুলোকে এতীম বলা হয়।

ছেলে-মেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় এতীম বলা হয় না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ বালেগ হবার পর আর কেউ এতীম থাকে না। - (মেশকাত- পৃঃ ২৮৪)

এতীম যদি পারিতোষিক অথবা উপঢৌকন হিসেবে কিছু সম্পদপ্রাপ্ত হয়, তাহলে এতীমের অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে সেসব মালেরও হেফাজত করা। এতীমের মৃত পিতা অথবা দেশের সরকার যে-ই উক্ত অভিভাবককে মনোনীত করুক না কেন ; তার উপরই এতীমের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়। উক্ত অভিভাবকের উচিত, এতীমের যাবতীয় প্রয়োজন তার গচ্ছিত ধন-সম্পদ থেকে নির্বাহ করা। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এতীম বালেগ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট তার সম্পত্তি অর্পণ না করা। কারণ, বালেগ হওয়ার পূর্বে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনা সম্পত্তি সংরক্ষণের মতো না হওয়াই স্বাভাবিক।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, এতীমের ধন-সম্পদ তার নিকট পৌছে দাও। আর এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বালেগ হলেই কেবল তার নিকট তার গচ্ছিত মালামাল পৌছে দেওয়া যেতে পারে।

অতএব, এতীমের মালামাল তার নিকট পৌছে দেয়ার পন্থা হল এতীমের মালামাল পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা এবং সে বালেগ হলে যথাসময় তার নিকট তার সম্পত্তি হস্তান্তর করা।

কোরআনের এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন অভিভাবক ব্যক্তিগতভাবে এতীমের মাল অপচয় ও আত্মসাৎ করবে না, এটাই যথেষ্ট নয়; বরং তার নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে তার ধন-সম্পদের সার্বিক তত্ত্বাবধান করা এবং এতীম বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তার নিজস্ব দায়িত্বে তা সংরক্ষণ করা।

মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণ ঃ জাহেলিয়াত যুগে এতীম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ন করা হত। যদি কোন অভিভাবকের অধীনে কোন এতীম মেয়ে থাকতো আর তারা যদি সুন্দরী হতো এবং তাদের কিছু সম্পদ -সম্পত্তিও থাকতো, তাহলে তাদের অভিভাবকরা নামমাত্র মোহর দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে নিতো অথবা তাদের সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার ফিকির করতো। এসব অসহায় মেয়েদের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা তারা চিন্তাও করতো না।

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সাঃ)-এর যুগে ঠিক এ ধরনের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি এতীম মেয়ে ছিল। সে ব্যক্তির একটি বাগান ছিল, যার মধ্যে উক্ত এতীম বালিকাটিরও অংশ ছিল। সে ব্যক্তি উক্ত মেয়েটিকে বিয়ে করে নিলো এবং নিজের পক্ষ থেকে 'দেন-মোহর' আদায় তো করলোই না, বরং বাগানে মেয়েটির যে অংশ ছিল তাও সে আত্মসাৎ করে নিলো। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

وَاِنْ خِفْتُمْ .... مِّنَ النِّسَآءِ

অর্থাৎ, মেয়ের তো অভাব নেই; বিয়ে যদি করতেই হয়,তবে অন্য স্ত্রীলোকদের মধ্য থেকে একাধিক বিয়ে করতে পার।

নাবালেগের বিয়ে প্রসংগে ঃ আলোচ্য আয়াতে যে 'ইয়াতামা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে এতীম মেয়ে। আর শরীয়তের পরিভাষায় সে বালক অথবা বালিকাকেই এতীম বলা হয়ে থাকে, যে এখনো বালেগ হয়নি। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এতীমের অভিভাবকের এখতিয়ার রয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে বালেগ হওয়ার আগেই তাদের বিয়ে-শাদী দিতে পারে। তবে তাদের ভবিষ্যত মঙ্গল ও কল্যাণকে সামনে রেখেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বয়সের সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। এমনকি অনেক বড় বড় মেয়েকেও ছোট ছোট ছেলেদের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। ছেলের স্বভাব-চরিত্র যাচাই-বাছাই না করেই কোন একটি মেয়েকে তার নিকট সোপর্দ করা হয়- এটা কোন ক্রমেই ঠিক হবে না।

এ ছাড়া এমন অনেক বালেগ অবিবাহিতা মেয়েও পাওয়া যায়, বিয়ের পূর্বেই যাদের বাপ মারা গেছে। এসব মেয়ে বালেগ হলেও মেয়ে-সুলভ লজ্জা-শরমের কারণে তাদের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের সামনে কোন প্রকার উচ্চ-বাচ্য করতে পারে না এবং অভিভাবক যা কিছু করে সেটাই তারা নতশিরে গ্রহণ করে নেয়। এমতাবস্থায় অভিভাবকদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে তাদের অধিকার কোনক্রমেই ক্ষুণ্ন না হয়।

এ আয়াতে এতীম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ আইন-কানুনের মতো তা শুধু প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করার পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ্ -ভীতির অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে যে, যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে মনে কর, তা হলে এতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করবে না; বরং সে ক্ষেত্রে অন্য মেয়েকেই বিয়ে করে নেবে। এ কথা বলার সাথে সাথে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে এতীম ছেলে-মেয়েদের কোন প্রকার অধিকার ক্ষুণ্ন না হয় সে ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বহু-বিবাহ ঃ বহু-বিবাহের প্রথাটি ইসলামপূর্ব যুগেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্ম মতেই বৈধ বলে বিবেচিত হতো। আরব, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরান, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি সব দেশেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। বহু বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্তমান যুগেও স্বীকৃত।

বর্তমানকালে ইউরোপের এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ বহু বিবাহ রহিত করার জন্য তাদের অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আসছেন বটে, কিন্তু তাতে কোন সুফল হয়নি। বরং তাতে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফল রক্ষিতার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অবশেষে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ব্যবস্থারই বিজয় হয়েছে। তাই আজকে ইউরোপের দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বহু-বিবাহ পুনঃপ্রচলন করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করছেন।

ইসলাম পূর্ব যুগে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বহু-বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধর্ম এবং দেশের ইতিহাস থেকে এটা জানা যায় যে, এর প্রতি কোন প্রকার বাধা-নিষেধও ছিল না। ইহুদী, খ্রীষ্টান,আর্য, হিন্দু এবং পারসিকদের মধ্যে বহু -বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও কোন সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। তবে তৎকালে সীমা-সংখ্যাহীন বহু-বিবাহের জন্য অনেকের লোভ-লালসার অন্ত ছিল না। অন্য দিকে এ থেকে উদ্ভূত দায়িত্বের ব্যাপারেও তারা সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারত না; বরং এসব স্ত্রীকে তারা রাখত দাসী-বাঁদীর মত এবং তাদের সাথে যথেচ্ছা ব্যবহার করত। তাদের প্রতি কোন প্রকার ইনসাফ করা হত না। চরম বৈষম্য বিরাজ করত পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

অনেক সময়, পছন্দসই দু'একজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে অবশিষ্টদের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হত।

ইসলামের বিধান ঃ কোরআন এই সামাজিক অনাচার এবং জুলুমের প্রতিরোধ করেছে। বহু-বিবাহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধও জারি করেছে। ইসলাম একই সময় চার এর অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্য বিশেষ তাকিদ দিয়েছে এবং ইনসাফের পরিবর্তে জুলুম করা হলে তার জন্য শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, – তোমাদের পছন্দমত দুই,তিন,অথবা চারজন স্ত্রীও গ্রহণ করতে পার।

আলোচ্য আয়াতে مَا طَابَ (যা তোমাদের ভাল লাগে) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত হাসান বসরী, ইবনে জুবায়ের এবং ইবনে-মালেক (রাহঃ) শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন ما حل শব্দ দ্বারা ; যার অর্থ হচ্ছে, যে সব মেয়ে তোমাদের জন্য বৈধ। আর অনেক তফসীরকার উপরোক্ত শব্দটির শাব্দিক অর্থ 'পছন্দ' দ্বারাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। তবে উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে কোন প্রকার বৈপরীত্য নেই। অর্থাৎ, এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, যেসব মেয়ে প্রকৃতিগতভাবে তোমাদের মনঃপূত এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হয় কেবল তাদেরকেই বিয়ে করতে পার।

আলোচ্য আয়াতে একাধিক অর্থাৎ, চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার সুযোগ অবশ্য দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে এই চার পর্যন্ত কথাটি আরোপ করে তার উর্ধ্ব সংখ্যক কোন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না বরং তা হবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ- তাও ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে।

যদি সমতা রক্ষা করা সম্ভব না হয় ঃ চারটি পর্যন্ত বিয়ের অনুমতি দেয়ার পর বলা হয়েছে ঃ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً – অর্থাৎ, যদি আশঙ্কা কর যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাক।

পবিত্র কোরআনে চার জন স্ত্রীর কথা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বিধান তথা ন্যায় বিচার করতে না পার, তাহলে এক স্ত্রীর উপরেই নির্ভর কর। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ হতে পারে, যখন শরীয়ত মোতাবেক সবার সাথে সমান আচরণ করা হবে ; তাদের সবার অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে অপারক হলে এক স্ত্রীর ওপরই নির্ভর করতে হবে এবং এটাই ইসলামের নির্দেশ।

রসূলে করীম (সাঃ) একাধিক স্ত্রীর বেলায় সবার সাথে পরিপূর্ণ সমতার ব্যবহার করার ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকিদ করেছেন এবং যারা এর খেলাফ করবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির খবর দিয়েছেন। নিজের ব্যবহারিক জীবনেও তিনি এ ব্যাপারে সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করে দেখিয়েছেন। এমনকি তিনি এমন বিষয়েও সমতাপূর্ণ ব্যবহারের আদর্শ স্থাপন করেছেন যে ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ছিল না।

এক হাদীসে হুযুর (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে, সে যদি এদের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ করতে না পারে, তবে কিয়ামতের ময়দানে সে এমনভাবে উঠবে যে, তার শরীরের এক পার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে। (মেশকাত শরীফ, ২৭৮ পৃঃ)

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভালবাসা ও অন্তরের আকর্ষণ মানুষের সাধ্যায়ত্ব ব্যাপার নয়। তাই অসাধ্য বিষয়টিতেও সমতা রাখার উদ্দেশে অতঃপর বলা হয়েছে ঃ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ অর্থাৎ, কোন এক স্ত্রীর প্রতি যদি তোমার আন্তরিক আকর্ষণ বেশী হয়ে যায়, তবে সেটা তোমার সাধ্যায়ত্ব ব্যাপার নয় বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অন্যজনের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করা জায়েয হবে না। আলোচ্য আয়াতে فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً অর্থাৎ, যদি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখতে পারবে না বলে ভয় কর, তবে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাক, বলে সে সমস্ত ব্যাপারেই ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ব। এসব ব্যাপারে বেইনসাফী মহাপাপ। আর যাদের এরূপ পাপে জড়িত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাদের পক্ষে একাধিক বিয়ে না করাই কর্তব্য।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব ঃ সূরা নিসার এ আয়াতে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে না পারার আশঙ্কার ক্ষেত্রে এক বিয়েতেই তৃপ্ত থাকার নির্দেশ এবং পরবর্তী আয়াতে 'তোমরা কোন অবস্থাতেই একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না' এ দু'আয়াতের মূল তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পেরে অনেকেই এমন একটা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কার ক্ষেত্রে যেহেতু এক বিয়েরই নির্দেশ এবং খোদ কোরআনই যখন বলে যে, তোমরা কোন অবস্থাতেই

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমান ব্যবহার বজায় রাখতে সমর্থ হবে না, সুতরাং পরোক্ষভাবে কোরআন এক বিয়েরই অনুমোদন দেয় এবং বহু বিবাহ রহিত করে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যে ভুল তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। কেননা, একাধিক বিয়ে বন্ধ করাই যদি আল্লাহ্ তাআলার অভিপ্রায় হত, তবে "নারীদের মধ্যে যাদের ভাল লাগে তাদের মধ্য থেকে তোমরা দুই, তিন, চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পার" — এরূপ বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا বলে ইনসাফ কায়েম না করার সম্ভাবনা ব্যক্ত করারও কোন অর্থ হয় না।

এছাড়া খোদ রসূল (সাঃ) সাহাবীগণের কর্মধারা ও মৌখিক বর্ণনা এবং পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে মুসলিম সমাজে বিনা দ্বিধায় একাধিক বিয়ের রীতি প্রচলিত থাকাই প্রমাণ করে যে, বহু বিবাহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন না।

প্রকৃত প্রস্তাবে সূরা নিসার এ আয়াত দ্বারা মানুষের সাধ্যায়ত্ব ব্যাপারে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে যা মানুষের সাধ্যের বাইরে অর্থাৎ, আন্তরিক আকর্ষণের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। সুতরাং দু'টি আয়াতের মর্মে যেমন কোন বৈপরীত্য নেই, তেমনি এ আয়াতের দ্বারা একাধিক বিবাহের অবৈধতাও প্রমাণিত হয় না।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ..... ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا এতে দু'টি শব্দ রয়েছে। একটি أَدْنَىٰ এটি دنو ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ হয় নিকটতর। দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছেঃ لاتعولوا = عال- يعيل ঝুঁকে পড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে শব্দটি অসঙ্গতভাবে ঝুঁকে পড়া এবং দাম্পত্য জীবনে নির্যাতনের পথ অবলম্বন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ হচ্ছে এই যে, এ আয়াতে তোমাদের যা বলা হলো যে, সমতা বজায় রাখতে না পারার আশঙ্কা থাকলে এক স্ত্রী নিয়েই সংসারযাত্রা নির্বাহ কর কিংবা শরীয়ত সম্মত ক্রীতদাসী নিয়ে সংসার কর; - এটা এমন এক পথ যা অবলম্বন করলে তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। বাড়াবাড়ি বা সীমা লঙ্ঘনের সম্ভাবনাও দূর হবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, এক স্ত্রী হলে তো আর অবিচার কিংবা জুলুমের কোন অবকাশই থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'তোমরা জুলুম না করার নিকটে থাকবে' এরূপ বলার অর্থ কি? বরং এখানে বলা উচিত ছিল যে, এক বিবাহের ক্ষেত্রে তোমরা অবিচারের পথ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যাবে।

জবাব হচ্ছে এই যে, যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে লোকেরা এক স্ত্রীকেও নানাভাবে জ্বালা-যন্ত্রণার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে রাখে সুতরাং এক স্ত্রীর সংসার করলে তোমরা জুলুম বা সীমালংঘন থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে যাবে এরূপ না বলে أَدْنَىٰ (আদ্না) শব্দটি বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, এটা অবিচারের পথ পরিহার করার নিকটবর্তী পন্থা। এ পথ অবলম্বন করলে তোমরা ইনসাফের কাছাকাছি পৌছতে পারবে। আর পরিপূর্ণ ইনসাফ তখনই হবে, যখন তোমরা স্ত্রীর বদ-মেজাজী, উদ্ধত আচরণ প্রভৃতি সবকিছু ধৈর্য সহকারে বরদাশ্ত করতে পারবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

স্ত্রীদের মোহরের ব্যাপারে তখনকার দিনে অনেক ধরনের অবিচার ও জুলুমের পন্থা প্রচলিত ছিল।

(এক) স্ত্রীর প্রাপ্য মোহর তার হাতে পৌছাতো না; মেয়ের অভিভাবকগণই তা আদায় করে আত্মসাৎ করতো। যা ছিল নিতান্তই একটা নির্যাতনমূলক রেওয়াজ। এ প্রথা উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে কোরআন নির্দেশ দিয়েছেঃ

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ

এতে স্বামীর প্রতি নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, স্ত্রীর মোহর তাকেই পরিশোধ কর; অন্যকে নয়। অন্যদিকে অভিভাবকগণকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মোহর আদায় হলে তা যার প্রাপ্য তার হাতেই অর্পণ করে। তাদের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে।

(দুই) স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করার ক্ষেত্রে নানা রকম তিক্ততার সৃষ্টি হতো। প্রথমতঃ মোহর পরিশোধ করতে হলে মনে করা হতো যেন জরিমানার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। এ অনাচার রোধ করার লক্ষ্যেই نِحْلَةً আয়াতে শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত হৃষ্টমনে তা পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, অভিধানে نِحْلَةً বলা হয় সে দানকে যা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রদান করা হয়।

মোটকথা, আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, স্ত্রীদের মোহর অবশ্য পরিশোধ্য একটা ঋণ বিশেষ। এটা পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরী। পরন্তু অন্যান্য ওয়াজেব ঋণ যেমন সন্তুষ্ট চিত্তে পরিশোধ করা হয়, স্ত্রীর মোহরের ঋণও তেমনি হৃষ্টচিত্তে, উদার মনে পরিশোধ করা কর্তব্য।

(তিন) অনেক স্বামীই তার বিবাহিত স্ত্রীকে অসহায় মনে করে নানাভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মোহর মাফ করিয়ে নিতো। এভাবে মাফ করিয়ে নিলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মাফ হতো না। অথচ স্বামী মনে করতো যে, মৌখিকভাবে যখন স্বীকার করিয়ে নেয়া গেছে, সুতরাং মোহরের ঋণ মাফ হয়ে গেছে। এ ধরনের জুলুম প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছেঃ

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

- অর্থাৎ, যদি স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মোহরের কোন অংশ ক্ষমা করে দেয়, তবেই তোমরা তা হৃষ্টমনে ভোগ করতে পার।

অর্থ হচ্ছে, চাপ প্রয়োগ কিংবা কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি করে ক্ষমা করিয়ে নেয়ার অর্থ কোন অবস্থাতেই ক্ষমা নয়। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায়, খুশী মনে মোহরের অংশবিশেষ মাফ করে দেয় কিংবা পুরোপুরিভাবে বুঝে নিয়ে কোন অংশ তোমাদের ফিরিয়ে দেয়, তবেই কেবল তা তোমাদের পক্ষে ভোগ করা জায়েয হবে।

এ ধরনের বহু নির্যাতনমূলক প্রথা জাহেলিয়াত যুগে প্রচলিত ছিল। কোরআন এসব জুলুমের উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজও মুসলিম সমাজে মোহর সম্পর্কিত এ ধরনের নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায়। কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এরূপ নির্যাতনমূলক পথ পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য।

আয়াতে 'হৃষ্টচিত্তে' প্রদানের শর্ত আরোপ করার পেছনে গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কেননা, মোহর স্ত্রীর অধিকার এবং তার নিজস্ব সম্পদ। হৃষ্টচিত্তে যদি সে তা কাউকে না দেয় বা দাবী ত্যাগ না করে, তবে স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষে সে সম্পদ কোন অবস্থাতেই হালাল হবে না। হুযুর (সাঃ) এ হাদীসে শরীয়তের মূল নীতিরূপে এরশাদ করেছেন।

الا لاتظلموا الا لايحل مال امرئ الابطيب نفس منه

– অর্থাৎ, 'সাবধান'! জুলুম করো না। মনে রেখো, কারো পক্ষে অন্যের সম্পদ তার আন্তরিক তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল হবে না।' – (মেশ্‌কাতঃ ২৫৫ পৃঃ)

এ হাদীসটি এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির নির্দেশ দেয় যা সর্বপ্রকার প্রাপ্য ও লেন-দেনের ব্যাপারে হালাল এবং হারামের সীমারেখা নির্দেশ করে।

সম্পদের হেফাজত জরুরী : এ আয়াতে ধন-সম্পদের গুরুত্ব এবং মানুষের জীবন ধারণ ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তদসঙ্গে সম্পদের হেফাজতের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ ত্রুটির সংশোধন নির্দেশ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, অনেকেই স্নেহান্ধ হয়ে অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ ছেলে-মেয়ে অথবা স্ত্রীলোকদের হাতে ধন-সম্পদের দায়-দায়িত্ব তুলে দেয়। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পদের অপচয় এবং যা দারিদ্র্য ঘনিয়ে আসার আকারে দেখা দেয়।

অর্বাচীন ও অনভিজ্ঞদের হাতে সম্পদ তুলে দেয়া নিষিদ্ধ : মুফাসসিরে কোরআন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কোরআনে পাকের এ আয়াতে নির্দেশ করা হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান-সন্ততি কিংবা অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকো না, বরং আল্লাহ্ তাআলা যেহেতু তোমাকে অভিভাবক এবং দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেজন্য তুমি সম্পদ তোমার নিজের হাতে রেখে তাদের খাওয়া-পরার দায়-দায়িত্ব পালন করতে থাক। যদি তারা অর্থ সম্পদের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেয়ার আব্দার করে, তবে তাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দাও যে, এসব তোমাদের জন্যই সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যাতে তাদের মনোকষ্টের কারণ না হয়, আবার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা না দেয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-আব্বাসের এ ব্যাখ্যা মতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা এবং অনভিজ্ঞ যে কোন স্ত্রীলোকের হাতেই ধন-সম্পদ তুলে না দেয়ার নির্দেশ প্রমাণ হয়- যাদের হাতে পড়ে সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে এতীম শিশু বা নিজের সন্তানের কোন পার্থক্য নেই। হযরত আবু মূসা আশআরীও এ আয়াতের এরূপ তফসীরই বর্ণনা করেছেন। ইমামে-তফসীর হাফেজ তাবারীও এ মতই গ্রহণ করেছেন।

অবশ্য প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্যে এ আয়াতের নির্দেশ এতীমদের বেলাতেই প্রযোজ্য বলে মনে হয়। কিন্তু আয়াতে যে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং 'তোমাদের সম্পদ' বলে যে ইশারা করা হয়েছে, তাতেও এতীম এবং সাধারণ বালক-বালিকা নির্বিশেষে সবার বেলাতেই এ নির্দেশ প্রযোজ্য বলে মনে হয়। মোট কথা, মালের হেফাজত অত্যন্ত জরুরী এবং অপচয় করা গোনাহের কাজ।

নিজের সম্পদের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। যেমন, জীবন রক্ষা করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সেও শহীদের মর্যাদা পাবে বলে হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে। হুযুর (সাঃ) এরশাদ করেন : من قتل دون ماله فهو شهيد "নিজের মালের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদ।" অর্থাৎ, সওয়াবের দিক দিয়ে শহীদের মর্যাদা পাবে। – (বুখারী ও মুসলিম)

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ
مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ
اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ
فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۠ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗ
نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ
وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝ وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ
لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا
عَلَيْهِمْ ۠ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝
اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا
يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝

(৬) আর এতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করতে পার, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করতে পার। এতীমের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করো না বা তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যারা স্বচ্ছল তারা অবশ্যই এতীমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ খেতে পারে। যখন তাদের হাতে তাদের সম্পদ প্রত্যার্পণ কর, তখন সাক্ষী রাখবে। অবশ্য আল্লাহ্‌ই হিসাব নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট। (৭) পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশী। এ অংশ নির্ধারিত। (৮) সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিছু সদালাপ করো। (৯) তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল-অক্ষম সন্তান-সন্ততি ছেড়ে গেলে তাদের জন্যে তারাও আশঙ্কা করে; সুতরাং তারা যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে। (১০) যারা এতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথমতঃ আয়াত দ্বারা যখন বোঝা গেল যে, যে পর্যন্ত সাংসারিক ব্যাপারে নাবালেগদের বুদ্ধিমত্তা প্রমাণিত না হবে, সে পর্যন্ত তাদের হাতে ধন-সম্পদের দায়িত্ব অর্পণ করা সমীচীন নয়। সেজন্য দ্বিতীয় আয়াতে শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা ও যোগ্যতা যাচাই করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ঃ বলা হয়েছেঃ

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

অর্থাৎ, বালেগ হওয়ার আগেই ছোট ছোট দায়িত্ব দিয়ে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছে অর্থাৎ, বালেগ হয়। মোটকথা, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক এবং যখন দেখ যে, তারা দায়িত্ব বহন করার যোগ্য হয়ে উঠেছে, তখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে বুঝিয়ে দাও। সারকথা হচ্ছে, শিশুদের বিশেষ প্রকৃতি ও জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের মাপকাঠিতে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (এক) বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়, (দুই) বালেগ হওয়ার পরবর্তী সময়, (তিন) বালেগ হওয়ার আগেই জ্ঞান-বুদ্ধির যথেষ্ট বিকাশ।

এতীম শিশুর অভিভাবকগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তাঁরা শিশুর লেখাপড়া ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে ছোট ছোট কাজ কারবার এবং লেন-দেনের দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের পরীক্ষা করতে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে .... وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى বাক্যের অর্থ এটাই। এ থেকে হযরত ইমাম আবু হানিফা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু যদি তার অভিভাবকের অনুমতিক্রমে লেন-দেন বা ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে তা বৈধ ও কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে ঃ শিশু যখন বালেগ এবং বিয়ের যোগ্য হয়ে যায়, তখন তার অভিজ্ঞতা ও বিষয়-বুদ্ধি পরিমাপ করতে হবে। যদি দেখা যায়, সে তার ভালমন্দ বুঝবার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, তখন তার বিষয়-সম্পত্তি তার হাতে তুলে দাও।

বুদ্ধি-বিবেচনার সংজ্ঞা ঃ আয়াতে উল্লেখিত اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا বাক্য দ্বারা কোরআনের এ নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে, এতীম শিশুর মধ্যে যে পর্যন্ত বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ লক্ষ্য না কর, সে পর্যন্ত তাদের বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিও না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ 'বুদ্ধি-বিবেচনার' সময়সীমা কি? কোরআনের অন্য কোন আয়াতেও এর কোন শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এ জন্য কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি কোন এতীমের মধ্যে যথেষ্ট বয়স হওয়ার পরও বুদ্ধি বিবেচনার লক্ষণাদি দেখা না যায়, তবে অভিভাবক তার হাতে বিষয় সম্পত্তি তুলে দিতে পারবে না। সমগ্র জীবন এ সম্পত্তি তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখতে হলেও না।

এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, এখানে বুদ্ধি-বিবেচনা না থাকার অর্থ হচ্ছে শিশুসুলভ চপলতা। বালেগ হওয়ার পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে এ চপলতা স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়ে যায়। সেমতে বালেগ হওয়ার বয়স পনের বছর এবং তারপর দশ বছর, এভাবে

পঁচিশ বছর বয়স হওয়ার পর অভিভাবককে ধরে নিতে হবে যে, এতদিনে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ অবশ্যই ঘটেছে, সুতরাং তার বিষয় সম্পত্তি তখন তার হাতেই তুলে দিতে হবে। কেননা, অনেকের মধ্যে জীবনের শেষ সীমা পর্যন্তও বুদ্ধি-বিবেচনার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়নি। তাই বলে তাকে সারাজীবন তার বিষয়-সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত রাখা যাবে না। আর যদি সে লোক বদ্ধ পাগল কিংবা একেবারেই নির্বোধ হয়,তবে তার হুকুম স্বতন্ত্র। এ ধরনের লোকের ব্যাপারে নাবালেগ শিশুদের হুকুমই কার্যকর হবে। পাগলামীর এ অবস্থায় সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়ে গেলেও অভিভাবককে সারা জীবনই তার সহায় সম্পত্তির দেখা-শোনা করতে হবে।

ওলী কতটুকু গ্রহণ করতে পারে ঃ শেষ আয়াত এতীমের বিষয়-সম্পত্তি হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি এ সম্পদ থেকে তার পারিশ্রমিক বাবদ কিছু গ্রহণ করতে পারে, এ সম্পর্কিত নির্দেশ বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অভাবী নয় কিংবা তার প্রয়োজনীয় খরচ-পত্রের ব্যবস্থা অন্যত্র থেকে সংস্থান করতে পারে, তার উচিত এতীমের মাল থেকে তার পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা। কেননা, ওলী হিসেবে এতীমের বিষয়-সম্পত্তি দেখা শোনা করার দায়িত্ব তার উপর 'ফরয' কর্তব্য। সুতরাং এ দায়িত্ব পালন করার বিনিময়ে তার পক্ষে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার স্বত্ব ঃ ইসলাম-পূর্বকালে আরব ও অনারব জাতিসমূহের মধ্যে দুর্বল শ্রেণী, এতীম বালক-বালিকা ও অবলা নারী চিরকালই জুলুম নির্যাতনের শিকার ছিল। প্রথমতঃ তাদের কোন অধিকারই স্বীকার করা হতো না। কোন অধিকার স্বীকার করা হলেও পুরুষদের কাছ থেকে তা আদায় করে নেয়ার সাধ্য কারো ছিল না।

ইসলাম সর্বপ্রথম তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে। এরপর এসব অধিকার সংরক্ষণেরও চমৎকার ব্যবস্থা করে। উত্তরাধিকার আইনেও জগতের সাধারণ জাতিসমূহ সমাজের উভয় প্রকার দুর্বল অঙ্গকে তাদের স্বাভাবিক ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। আরবদের নিয়মই ছিল এই যে, যারা অশ্বারোহণ করে এবং শত্রুদের মোকাবিলা করে তাদের অর্থ-সম্পদ লুট করার যোগ্যতা রাখে, তারাই শুধু মাত্র উত্তরাধিকারের যোগ্য হতে পারে।- (রূহুল-মা'আনী ২১০ পৃঃ ৪র্থ খণ্ড)

বলাবাহুল্য, বালক-বালিকা ও নারী উভয় প্রকার দুর্বল শ্রেণী এ নিয়মের আওতায় পড়ে না। তাই তাদের নিয়ম অনুযায়ী শুধুমাত্র যুবক ও বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রই ওয়ারিস হতে পারতো। কন্যা কোন অবস্থাতেই ওয়ারিস বলে গণ্য হতো না, প্রাপ্তবয়স্কা হোক অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা। পুত্র সন্তানও অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে সে উত্তরাধিকারের যোগ্য বলে বিবেচিত হতো না।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে একটি ঘটনা সংঘটিত হলো এই, আউস ইবনে সাবেত (রাঃ) স্ত্রী, দুই কন্যা ও একটি নাবালেগ পুত্র রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রাচীন আরবীয় পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁর দুই চাচাতো ভাই এসে তাঁর সম্পত্তি দখল করে নিল এবং সন্তান ও স্ত্রীকে কিছুই দিল না। কেননা, তাদের মতে প্রাপ্ত বয়স্কা হোক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা, নারী সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারের যোগ্য গণ্য হতো না, ফলে স্ত্রী ও দুই কন্যা এমনিতেই বঞ্চিতা হয়ে গেল। প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়ার কারণে পুত্রকেও বাদ দেয়া হলো এবং দুই চাচাতো ভাই সমগ্র বিষয় -সম্পত্তির ওয়ারিস হয়ে গেলো।

আউস ইবনে সাবেতের স্ত্রী এ প্রস্তাবও দিল যে, যে চাচাতো ভাই তাদের বিষয়সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে, তারা তার কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করে নিক, যাতে সে তাদের চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু তারা এ প্রস্তাবেও স্বীকৃত হলো না। তখন আউস ইবনে সাবেতের স্ত্রী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এ অবস্থা বর্ণনা করলো এবং সন্তানদের অসহায়ত্ব ও বঞ্চনার অভিযোগ করলো। তখন পর্যন্ত উত্তরাধিকার সম্পর্কিত কোরআন পাকের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উত্তর দিতে বিলম্ব করলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ওহীর মাধ্যমে এই নিপীড়নমূলক আইনের অবশ্যই পরিবর্তন সাধন করা হবে। সেমতে তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এরপর উত্তরাধিকারের অন্যান্য আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে অংশসমূহের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এ সূরার দ্বিতীয় রুকূতে এসব বিবরণ রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোরআনী বিধান অনুযায়ী মোট ত্যাজ্য সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ স্ত্রীকে দিয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে এভাবে বন্টন করলেন যে, অর্ধেক পুত্রকে এবং কন্যাদ্বয়কে সমান হারে দিলেন। চাচাতো ভাই সন্তানদের তুলনায় নিকটবর্তী ছিল না। তাই তাদের বঞ্চিত করা হলো।- (রূহুল-মা'আনী)

উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভের বিধি ঃ আলোচ্য আয়াত উত্তরাধিকারের কতিপয় বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে উত্তরাধিকারের আইন ব্যক্ত করে দিয়েছে।

مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ এর শব্দদ্বয় উত্তরাধিকারের দু'টি মৌলিক নীতি ব্যক্ত করেছে। (এক) - জন্মের সম্পর্ক, যা পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে রয়েছে এবং যা والدان শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। (দুই) সাধারণ আত্মীয়তা, যা اقربون শব্দের মর্ম। বিশুদ্ধ মত অনুসারে اقربون শব্দটি সর্ব প্রকার আত্মীয়তায় পরিব্যপ্ত; পারস্পরিক জন্মের সম্পর্ক হোক, যেমন পিতা-মাতা সন্তানদের মধ্যে কিংবা অন্য প্রকার সম্পর্ক হোক, যেমন, সাধারণ পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক হোক— সবগুলোই اقربون শব্দের আওতাভুক্ত। কিন্তু পিতা-মাতার গুরুত্ব অধিক। তাই তাদের কথা বিশেষভাবে পৃথকভাবে উল্লেখিত হয়েছে। অতঃপর এ শব্দটি আরো ব্যক্ত করেছে যে, কোন আত্মীয়তার যে কোন সম্পর্কই ওয়ারিস হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়, বরং নিকটতম আত্মীয় হওয়া শর্ত। কেননা, নিকটতম হওয়াকে যদি মাপকাঠি করা না হয়, তবে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিই সমগ্র ভূপৃষ্ঠের মানুষের মধ্যে বন্টন করা জরুরী হয়ে পড়বে। কেননা, সব মানুষই এক পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার সন্তান। মূল রক্তের দিক দিয়ে কিছু না কিছু সম্পর্ক সবার মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। এর বাস্তবায়ন প্রথমতঃ সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি কোনরূপে চেষ্টা করে এর ব্যবস্থা করেও নেয়া যায়, তবে ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করতে করতে অবিভাজ্য অংশ পর্যন্ত পৌছাবে, যা কারো কাজে আসবে না। তাই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যখন আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, তখন এরূপ নীতি নির্ধারণ করে দেওয়া

জরুরী ছিল, যার ফলে নিকট ও দূরের বিভিন্ন সম্পর্ক একত্রিত হলে নিকটের আত্মীয়কে দূরের আত্মীয়ের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আত্মীয় বিদ্যমান থাকলে দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করতে হবে। অবশ্য যদি কিছু আত্মীয় এমন থেকে থাকে যে, একই সময়ে সবাই নিকটবর্তী সাব্যস্ত হয়, যদিও নিকটতম হওয়ার কারণ বিভিন্ন,তবে সবাই ওয়ারিস হবে। যেমন, সন্তানদের সাথে পিতা-মাতা কিংবা স্ত্রী থাকা; এরা সবাই নিকটতম ওয়ারিস,যদিও ঐ নৈকট্যের কারণ বিভিন্ন।

اقربون শব্দটি আরো একটি বিষয় ব্যক্ত করেছে যে, পুরুষদেরকে যেমন উত্তরাধিকারের হকদার মনে করা হয়, তেমনি নারী ও শিশুদেরকেও এ হক থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কেননা, সন্তানের সম্পর্ক হোক কিংবা পিতা-মাতার সম্পর্ক হোক অথবা অন্য কোন সম্পর্ক হোক, প্রত্যেকটিতেই সম্পৃক্ততার মর্যাদা ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সমান। ছেলে যেমন পিতা-মাতা থেকে জন্মগ্রহণ করে, তেমনি মেয়েও পিতা-মাতারই সন্তান। উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্পর্কের উপর ভিত্তিশীল। কাজেই ছোট ছেলে কিংবা মেয়েকে বঞ্চিত করার কোন কারণই থাকতে পারে না।

اقربون শব্দ থেকে আরো একটি বিষয় জানা গেল যে, ত্যাজ্য সম্পত্তির বন্টন প্রয়োজনের মাপকাঠিতে নয়; বরং আত্মীয়তার মাপকাঠিতে হবে। তাই আত্মীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত, তাকে বেশী হকদার মনে করা জরুরী নয়। বরং সম্পর্কে যে ব্যক্তি মৃতের অধিক নিকটবর্তী হবে, সে দূরবর্তীর তুলনায় অধিক হকদার হবে, যদিও প্রয়োজন ও অভাব দূরবর্তীর বেশী হয়। আর যদি নিকটতম আত্মীয়তার মাপকাঠির পরিবর্তে কোন কোন আত্মীয় অভাবগ্রস্ত ও উপকারী হওয়াকে মাপকাঠি করে নেয়া হয়, তবে তা কোন বিধানই হতে পারে না কিংবা একটি সুনির্দিষ্ট অটল আইনের আকার ধারণ করতে পারে না। কেননা, নিকটতম আত্মীয়তা ছাড়া অন্য যে কোন মাপকাঠি সাময়িক চিন্তাপ্রসূত হবে। কারণ, দারিদ্র্য ও অভাব চিরস্থায়ী নয়। অবস্থা ও স্তর সব সময় পরিবর্তিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় হকের দাবীদার অনেক বের হয়ে আসবে এবং ফয়সালাকারীদের পক্ষে এর ফয়সালা করা কঠিন হবে।

এতীম পৌত্রের উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্ন ঃ আজকাল এতীম পৌত্রের উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নটিকে অহেতুক একটি বিতর্কিত প্রশ্নে পরিণত করা হয়েছে। অথচ কোরআনে উল্লেখিত মূলনীতির ভিত্তিতে এ প্রশ্নটির অকাট্য সমাধান আপনা-আপনি বের হয়ে আসে। পুত্রের তুলনায় পৌত্র অধিক অভাবগ্রস্ত হলেও اقربون এর আইনের দৃষ্টিতে সে ওয়ারিস হতে পারে না। কেননা, পুত্রের উপস্থিতিতে সে নিকটতম আত্মীয় নয়। তবে তার অভাব দূর করার জন্যে অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এমনি এক ব্যবস্থা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে।

এ প্রশ্নে বর্তমান যুগের পাশ্চাত্যভক্ত নব্যশিক্ষিতদের ছাড়া কেউ দ্বিমত করেনি। সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় আজ পর্যন্ত কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে একথাই বুঝে এসেছে যে, পুত্র বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পৌত্র উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না,তার পিতা বিদ্যমান থাকুক অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হোক।

উত্তরাধিকারের নির্ধারিত অংশ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মীমাংসিতঃ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا এতে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বিভিন্ন ওয়ারিসের জন্যে যে বিভিন্ন অংশ কোরআন নির্দিষ্ট করেছে, এগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত অংশ। এতে কারো নিজস্ব অভিমত ও অনুমানের ভিত্তিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার কোন অধিকার নেই।

উত্তরাধিকারিত্ব একটি বাধ্যতামূলক মালিকানা ঃ مَّفْرُوضًا শব্দ থেকে আরো একটি মাসআলা জানা যায় যে, উত্তরাধিকারের মাধ্যমে ওয়ারিসরা সে মালিকানা লাভ করে, তা বাধ্যতামূলক। এতে ওয়ারিসের কবুল করা এবং সম্মত হওয়া জরুরী ও শর্ত নয়, বরং সে যদি মুখে স্পষ্টতঃ বলে যে, সে তার অংশ নেবে না, তবুও আইনতঃ সে নিজের অংশের মালিক হয়ে যায়। এটা ভিন্ন কথা যে, মালিক হওয়ার পর শরীয়তের বিধি অনুযায়ী অন্য কাউকে দান, বিক্রি, অথবা বিলি-বন্টন করে দিতে পারবে.।

বঞ্চিত আত্মীয়দের মনস্তুষ্টি বিধান করা জরুরী ঃ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্যে এমন কিছু লোকও থাকবে, যারা শরীয়তের বিধি অনুযায়ী তার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অংশ পাবে না। বলাবাহুল্য, ফারায়েযের বিস্তারিত আইন-কানুন সম্পর্কে প্রত্যেকেই জ্ঞাত নয়। সাধারণভাবে প্রত্যেক আত্মীয়ই অংশ পাওয়ার আশা পোষণ করতে পারে। তাই যেসব আত্মীয় নিয়মানুযায়ী বঞ্চিত সাব্যস্ত হয়, বন্টনের সময় তারা বিষন্ন ও দুঃখিত হতে পারে; যদি তারা বন্টনের সময় মজলিসে উপস্থিত থাকে এবং বিশেষতঃ যখন তাদের মধ্যে কিছু এতীম,মিসকীন ও অভাবগ্রস্তও থাকে। এমতাবস্থায় যখন অন্যান্য আত্মীয় নিজ নিজ অংশ নিয়ে যায় আর তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখে তখন তাদের বেদনা, নৈরাশ্য ও মনোকষ্ট ভুক্তভোগী মাত্রই অনুমান করতে পারে।

এখন কোরআনী ব্যবস্থার সৌন্দর্যও লক্ষ্য করুন। একদিকে স্বয়ং কোরআনেরই বর্ণিত সুবিচারভিত্তিক বিধান এই যে, নিকটবর্তী আত্মীয় বর্তমান থাকলে দূরবর্তী আত্মীয় বঞ্চিত হবে, অপরদিকে বঞ্চিত দূরবর্তী আত্মীয়ে মনোবেদনা ও নৈরাশ্যকেও উপেক্ষা করা হয়নি। এর জন্য একটি স্বতন্ত্র আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ

"যেসব দূরবর্তী, এতীম, মিসকীন ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যদি তারা বন্টনের সময় উপস্থিত থাকে, তবে অংশীদারদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এ মাল থেকে স্বেচ্ছায় তাদেরকে কিছু দিয়ে দেওয়া। এটা তাদের জন্যে এক প্রকার সদকা ও সওয়াবের কাজ।"

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ
مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

(১১) আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন ঃ একজন পুরুষের অংশ দু' জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু-এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ। (১২) আর, তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়; ওছিয়্যতের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্যে এক -চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওছিয়্যতের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের, ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয়-ভাগের এক পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে ওছিয়্যতের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহ্র। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সম্পদ বন্টনের পূর্বে করণীয় ঃ শরীয়তের নীতি এই যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রথমে শরীয়তানুযায়ী তার কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এতে অপব্যয় ও কৃপণতা উভয়টি নিষিদ্ধ। এরপর তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। যদি ঋণ সম্পত্তির সম পরিমাণ কিংবা তারও বেশী হয়, তবে কেউ ওয়ারিসী স্বত্ব পাবে না এবং কোন ওছিয়্যত কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে কিংবা ঋণ একেবারেই না থাকে, তবে সে কোন ওছিয়্যত করে থাকলে এবং তা গোনাহ্র ওছিয়্যত না হলে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক -তৃতীয়াংশ থেকে তা কার্যকর হবে। যদি সে তার সমস্ত সম্পত্তি ওছিয়্যত করে যায় তবুও এক তৃতীয়াংশের অধিক ওছিয়্যত কার্যকর হবে না। এমনটি করা সমীচীন নয় এবং ওয়ারীসদেরকে বঞ্চিত করার নিয়তে ওছিয়্যত করা পাপ কাজও বটে।

ঋণ পরিশোধের পর এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওছিয়্যত কার্যকর করে অবশিষ্ট সম্পত্তি শরীয়তসম্মত ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ ফারায়েয গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য। ওছিয়্যত না থাকলে ঋণ পরিশোধের পর সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করতেহবে।

কন্যাদেরকে অংশ দেয়ার গুরুত্ব ঃ কোরআন পাক কন্যাদেরকে অংশ দেয়ার প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, কন্যাদের অংশকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করে এর অনুপাতে পুত্রদের অংশ ব্যক্ত করেছে এবং للانثيين مثل حظ الذكر (দুই কন্যার অংশ এক পুত্রের অংশের সমপরিমাণ) বলার পরিবর্তে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ (এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমপরিমাণ) বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অনেকেই বোনদেরকে অংশ দেয় না এবং বোনরা একথা চিন্তা করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে ক্ষমা করে দেয় যে, পাওয়া যখন যাবেই না, তখন ভাইদের সাথে মন কষাকষির দরকার কি ! এরূপ ক্ষমা শরীয়তের আইনে ক্ষমাই নয়; ভাইদের জিম্মায় তাদের হক পাওনা থেকে যায়। যারা এভাবে ওয়ারিসী স্বত্ব আত্মসাৎ করে, তারা কঠোর গোনাহ্গার। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নাবালেগা কন্যাও থাকে। তাদেরকে অংশ না দেয়া দ্বিগুণ গোনাহ্। এক গোনাহ্ শরীয়তসম্মত ওয়ারিসের অংশ আত্মসাৎ করার এবং দ্বিতীয় গোনাহ্ এতীমের সম্পত্তি হজম করে ফেলার।

এরপর আরও ব্যাখ্যা সহকারে কন্যাদের অংশ বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ অর্থাৎ, যদি পুত্র সন্তান না থাকে, শুধু একাধিক কন্যাই থাকে, তবে তারা ত্যাজ্য সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। এতে সব কন্যাই সমান অংশীদার হবে। অবশিষ্ট তিন ভাগের এক অন্যান্য ওয়ারিস যেমন মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা, স্ত্রী অথবা স্বামী প্রমুখ পাবে। কন্যাদের সংখ্যা দুই বা তার বেশী হলে দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে তারা সমান অংশীদার হবে।

স্বামী ও স্ত্রীর অংশ ঃ উপরোক্ত বর্ণনায়ও স্ত্রীর অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমে স্বামীর অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। একে প্রথমে বর্ণনা করার

উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এর গুরুত্ব প্রকাশ করা। কেননা, স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী ভিন্ন পরিবারের লোক হয়ে যায়। যদি পিত্রালয়ে স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং তার সম্পত্তি সেখানেই থাকে, তবে স্বামীর অংশ দেয়া থেকে গা বাঁচানোর চেষ্টা হতে পারে। এ অন্যায়ের অবসান ঘটানোর জন্যেই বোধ হয় স্বামীর অংশ প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে। মৃতা স্ত্রীর যদি কোন সন্তান না থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও ওছিয়্যত কার্যকর করার পর স্বামী তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। অবশিষ্ট অর্ধেক থেকে অন্যান্য ওয়ারিস যেমন মৃতার পিতা-মাতা, ভাই-বোন যথারীতি অংশ পাবে।

মৃতার যদি সন্তান থাকে, এক বা একাধিক—পুত্র বা কন্যা, এ স্বামীর ঔরসজাত হোক বা পূর্ববর্তী কোন স্বামীর ঔরসজাত, তবে বর্তমান স্বামী ঋণ পরিশোধ ও ওছিয়্যত কার্যকর করার পর মৃতার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ অন্য ওয়ারিসরা পাবে।

পক্ষান্তরে যদি স্বামী মারা যায় এবং তার কোন সন্তান না থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও ওছিয়্যত কার্যকর করার পর স্ত্রী মোট সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি মৃত স্বামীর সন্তান থাকে, এ স্ত্রীর গর্ভজাত হোক কিংবা অন্য স্ত্রীর, তবে ঋণ পরিশোধ ও ওছিয়্যত কার্যকর করার পর স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ পাবে। স্ত্রী একাধিক হলেও উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী এক অংশ সকল স্ত্রীর মধ্যে সমহারে বন্টন করা হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক স্ত্রীই এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশ পাবে না, বরং সবাই মিলে এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশে অংশীদার হবে। উভয় অবস্থাতে স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা তাদের অন্যান্য ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

মাসআলা : প্রথমে দেখা উচিত যে, যদি স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করা না হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মতই প্রথমে মোট ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে মোহরানা পরিশোধ করার পর ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। মোহরানা দেয়ার পর স্ত্রী ওয়ারিসী স্বত্বে অংশীদার হবার দরুন এ অংশও নেবে। মোহরানা পরিশোধ করার পর যদি মৃত স্বামীর সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মত সম্পূর্ণ সম্পত্তি মোহরানা বাবদ স্ত্রীকে সমর্পণ করা হবে এবং কোন ওয়ারিসই অংশ পাবে না।

'কালালা'র ওয়ারিসী স্বত্ব : আলোচ্য আয়াতে 'কালালা'র পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। 'কালালার' অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। আল্লামা কুরতুবী এগুলো স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে,— অর্থাৎ, যে মৃত ব্যক্তির ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন কেউ নেই, সে-ই 'কালালা'।

রুহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার লিখেন : 'কালালা' শব্দটি আসলে ধাতু। এর অর্থ পরিশ্রান্ত হওয়া, যা দুর্বলতার পরিচায়ক। পিতা-পুত্রের আত্মীয়তা ব্যতীত অন্য আত্মীয়তাকে 'কালালা' বলা হয়েছে। কেননা, এ আত্মীয়তা পিতা-পুত্রের আত্মীয়তার তুলনায় দুর্বল।

غَيْرَ مُضَآرٍّ এর তফসীর : 'কালালা'র ওয়ারিসী স্বত্বের উপসংহারে এই ওয়ারিসী স্বত্ব ওছিয়্যত ও ঋণ পরিশোধের পর কার্যকর হবে বলে উল্লেখ করার পর غَيْرَ مُضَآرٍّ বলা হয়েছে। এ শর্তটি যদিও শুধু এখানেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এর পূর্বে অন্য যে দু'জায়গায় ওছিয়্যত ও ঋণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও এ হুকুমই গ্রহণীয় ও কার্যকর হবে। এর উদ্দেশ্য এই যে, মৃত ব্যক্তির জন্যে ওছিয়্যত কিংবা ঋণের মাধ্যমে ওয়ারিসদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বৈধ নয়। ওছিয়্যত করা কিংবা নিজের যিম্মায় ভিত্তিহীন ঋণ স্বীকার করার মধ্যে ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা লুক্কায়িত থাকা এবং সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও কবিরা গোনাহ্।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ ﴿۱۳﴾ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ
يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۠ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۴﴾ وَالّٰتِيْ
يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا
عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي
الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ
سَبِيْلًا ﴿۱۵﴾ وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا
وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۱۶﴾
اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْۗءَ بِجَهَالَةٍ
ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰۗىِٕكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ
عَلَيْهِمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۷﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ
لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ
وَهُمْ كُفَّارٌ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۸﴾

(১৩) এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য। (১৪) যে কেউ আল্লাহ্ ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (১৫) আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চার জন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন। (১৬) তোমাদের মধ্য থেকে যে দু' জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী, দয়ালু। (১৭) অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ। (১৮) আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে : আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআন পাকের বর্ণনা-পদ্ধতি এই যে, বিধানাবলী বর্ণনা করার পর পরিশিষ্ট হিসেবে মান্যকারীদের জন্যে উৎসাহবাণী এবং তাদের ফযিলত উল্লেখ করা হয় আর অমান্যকারীদের জন্যে ভীতি প্রদর্শন, শাস্তি ও তাদের নিন্দা উল্লেখ করা হয়।

এখানেও বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। তাই আলোচ্য ১৩ নং আয়াতে আনুগত্যকারী ও অবাধ্যতাকারীদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

ওয়ারিসী স্বত্বের বিধানাবলীর পরিশিষ্ট

মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হতে পারে না : ওয়ারিসী স্বত্ব বন্টনের ভিত্তি বংশগত আত্মীয়তার উপর রচিত। কিন্তু কোন কোন বিষয়ের ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রথম, যার ওয়ারিস এবং যে ওয়ারিস তারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হতে পারবে না। কাজেই মুসলমান কোন কাফেরের এবং কাফের কোন মুসলমানের ওয়ারিস হবে না, তাদের পরস্পরের মধ্যে যে কোন ধরনের বংশগত সম্পর্কই থাক না কেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم অর্থাৎ, মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারবে না।–(মেশকাত)

এ বিধান তখনকার জন্য যখন জন্মের পর থেকেই একজন ব্যক্তি মুসলমান অথবা কাফের হয়। কিন্তু কেউ যদি পূর্বে মুসলমান থাকে, এরপর নাউযুবিল্লাহ্ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে এরূপ ব্যক্তি মারা গেলে কিংবা নিহত হলে তার মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত ধন-সম্পদ মুসলমান ওয়ারিসরা পাবে। আর ধর্মত্যাগী অবস্থায় উপার্জিত মাল বায়তুল মালে জমা হবে।

কিন্তু কোন স্ত্রী লোক ধর্মত্যাগ করলে তার উভয় অবস্থার উপার্জিত ধন-সম্পদ মুসলমান ওয়ারিসরা পাবে। কিন্তু স্বয়ং ধর্মত্যাগী ব্যক্তি পুরুষ কিংবা স্ত্রী কোন মুসলমানের কাছ থেকে অথবা ধর্মত্যাগীর কাছ থেকে ওয়ারিসী স্বত্ব পাবে না।

হত্যাকারীর স্বত্ব : যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, যার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে সে স্বত্বাধিকারী ছিল, তবে এ হত্যাকারী তার ওয়ারিসী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন **القاتل لا يرث** অর্থাৎ, হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না।–(মেশকাত) তবে ভুলবশতঃ হত্যার কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে। বিস্তারিত তথ্য ফিকাহ্ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

গর্ভস্থ সন্তানের স্বত্ব : যদি কোন ব্যক্তি কয়েকজন সন্তান রেখে যায় এবং স্ত্রীর গর্ভেও সন্তান থাকে, তবে এই গর্ভস্থ সন্তানও ওয়ারিসদের তালিকাভুক্ত হবে। কিন্তু সন্তানটি পুত্র না কন্যা, একজন না বেশী, তা জানা যেহেতু দুষ্কর, তই গর্ভের এ সন্তান জন্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত বন্টন মূলতবী রাখা উচিত। কোন কারণে যদি তাৎক্ষণিকভাবেই বন্টন জরুরী হয়, তবে গর্ভস্থ সন্তানকে এক পুত্র অথবা এক কন্যা উভয়ের মধ্য থেকে যা ধরে বন্টন করলে ওয়ারিসরা কম পায়, সেই প্রকার স্বত্ব তাদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি গর্ভস্থ সন্তানের জন্যে রেখে দিতে হবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পুরুষ ও নারীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা নির্লজ্জ কাজ অর্থাৎ, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যেসব নারী দ্বারা এমন কুকর্ম সংঘটিত হয়, তাদের এ কাজ প্রমাণ করার জন্যে চার জন পুরুষ সাক্ষী তলব করতে হবে। অর্থাৎ, যেসব বিচারকের কাছে এই মামলা পেশ করা হয়, তারা প্রমাণের জন্যে চার জন যোগ্য সাক্ষী তলব করবেন এবং এই সাক্ষীদের পুরুষ শ্রেণীভুক্ত হওয়াও জরুরী। এ ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যভিচারের সাক্ষীদের ব্যাপারে শরীয়ত দু'রকম কঠোরতা করেছে যেহেতু ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এতে ইজ্জত ও আবরু আহত হয় এবং পারিবারিক মানসম্ভ্রমের প্রশ্ন দেখা দেয়, তাই প্রথমে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এমন ক্ষেত্রে শুধু পুরুষই সাক্ষী হতে হবে– নারীদের সাক্ষ্য ধর্তব্য নয়। দ্বিতীয়তঃ চার জন পুরুষ হওয়া জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ শর্তটি খুবই কঠোর। দৈবাৎ ও কদাচিৎ তা পাওয়া যেতে পারে। এ শর্ত আরোপের কারণ, যাতে স্ত্রীর স্বামী, তার জননী অথবা অন্য স্ত্রী অথবা ভাই-বোন ব্যক্তিগত জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে অহেতুক অপবাদ আরোপ করার সুযোগ না পায় অথবা অন্য অমঙ্গলকারী লোকেরা শত্রুতা– বশতঃ অপবাদ আরোপ করতে সাহসী না হয়। কেননা, চার জন পুরুষ সাক্ষীর কমে ব্যভিচারের সাক্ষ্য দিলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। এমতাবস্থায় বাদী ও সাক্ষীরা সবে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয় এবং একজন মুসলমানের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করার দায়ে তাদেরকে 'হদ্দে-কযফ' বা অপবাদের শাস্তি ভোগ করতে হয়।

ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত গোনাহ্ মাফ হয় কি না ঃ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কোরআন পাকে بِجَهَالَةٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায়, অজ্ঞাতসারে এবং না জেনে-শুনে গোনাহ্ করলে তওবা কবুল হবে এবং জ্ঞাতসারে জেনে-শুনে গোনাহ্ করলে তওবা কবুল হবে না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম এ আয়াতের যে তফসীর করেছেন তা এই যে, এখানে এর جهالة অর্থ এই নয় যে, সে গোনাহ্র কাজটি যে গোনাহ্ তা জানে না কিংবা গোনাহ্র ইচ্ছা নেই; বরং অর্থ এই যে, গোনাহ্র অশুভ পরিণাম ও পারলৌকিক আযাবের প্রতি তার সাময়িক অনীহাই তার গোনাহ্র কাজ করার কারণ; যদিও গোনাহ্টি যে গোনাহ্, তা সে জানে এবং তার ইচ্ছাও করে।

পক্ষান্তরে جهالة শব্দটি এখানে নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, তফসীরের সারসংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ইউসুফ-এর নযীর বিদ্যমান রয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) ভাইদেরকে বলেছিলেন ঃ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ এতে ভাইদেরকে জাহেল বলা হয়েছে, অথচ তারা যে কাজ করেছিল, তা কোন ভুল অথবা ভুলে যাওয়াবশতঃ ছিল না; বরং ইচ্ছাকৃতভাবে, জেনে-শুনেই করেছিল। কিন্তু এ কাজের পরিণতি সম্পর্কে গাফেল হওয়ার কারণে তাদেরকে জাহেল বলা হয়েছে।

আবুল-আলিয়া ও কাতাদাহ্র বর্ণনা মতে সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, كل ذنب اصابه عبد فهو جهالة عمدا كان اوغيره অর্থাৎ, বান্দা যে গোনাহ্ করে-অনিচ্ছাকৃত করুক কিংবা ইচ্ছাকৃত, সর্বাবস্থায়ই তা মূর্খতা।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন কাজে আল্লাহ্র নাফরমানী করছে, সে দৃশ্যতঃ বড় আলেম ও বিশেষ জানা-শোনা বিচক্ষণ হলেও সে কাজ করার সময় মূর্খই হয়ে যায়। – (ইবনে-কাসীর)

আবু হাইয়্যান তফসীরে বাহ্রে-মুহীতে বলেন ঃ এটা এমনই, যেমন হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لا يزنى الزانى অর্থাৎ, ব্যভিচারী ঈমানদার অবস্থায় ব্যভিচার করে না। উদ্দেশ্য এই যে, যখন সে এই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তখন সে ঈমানের তাগিদ থেকে দূরে সরে পড়ে।

তাই হযরত ইকরিমা বলেন ঃ

দুনিয়ার যেসব কাজ আল্লাহ্র আনুগত্যের বাইরে, সেগুলো সবই মূর্খতা। কারণ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র না-ফরমানী করে, সে ক্ষণস্থায়ী সুখকে চিরস্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। যে ব্যক্তি এই ক্ষণস্থায়ী সুখের বিনিময়ে চিরস্থায়ী কঠোর আযাব ক্রয় করে, তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না। তাকে সবাই মূর্খ বলবে, যদিও সে ভালভাবে জানা ও বোঝার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে সে কুকর্ম সম্পাদন করে।

মোটকথা, গোনাহ্র কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা হোক, কিংবা ভুলক্রমে, উভয় অবস্থাতেই তা মূর্খতাবশতঃ সম্পন্ন হয়। এ কারণেই সাহাবা, তাবেয়ীন ও সমগ্র উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন গোনাহ্ করে, তার তওবাও কবুল হতে পারে। –(বাহ্রে-মুহীত)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾ وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢١﴾ وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْۤ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ؗ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ؗ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٣﴾

(১৯) হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে! নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ রেখেছেন। (২০) যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গোনাহ্র মাধ্যমে গ্রহণ করবে? (২১) তোমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ তোমাদের একজন অন্য জনের কাছে গমন এবং নারীরা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে। (২২) যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না, কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে। এটা অশ্লীল, গযবের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ। (২৩) তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা; ভগিনীকন্যা, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা-যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, দয়ালু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলাম পূর্বযুগের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ : আলোচ্য আয়াত তিনটিতে সেসব নির্যাতন প্রতিরোধ করা হয়েছে, যেগুলো ইসলাম-পূর্বকালে অবলাদের প্রতি নিতান্ত সাধারণ আচরণ বলে মনে করা হতো। তন্মধ্যে একটি সর্ববৃহৎ নির্যাতন ছিল এই যে, পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর জান ও মালের মালিক মনে করতো। স্ত্রী যার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতো, সে তার প্রাণকে নিজের মালিকানাধীন মনে করতো। স্বামীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসরা যেমন তার ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিস ও মালিক হতো, তেমনি তার স্ত্রীর ওয়ারিস ও মালিক বলে গণ্য হতো। ইচ্ছা করলে নিজেই তাকে বিয়ে করতো কিংবা অন্যের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তাকে বিয়ে দিয়ে দিতো। স্বামীর (অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত) পুত্র নিজেও পিতার মৃত্যুর পর তাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারতো। স্ত্রীর প্রাণেরই যখন এই অবস্থা, তখন তার ধন-সম্পদের ব্যাপারটি তো বলাই বাহুল্য। এই একটিমাত্র মৌলিক ভ্রান্তির ফলশ্রুতিতে নারীদের উপর নানা ধরনের অগণিত নির্যাতন চলতো। উদাহরণতঃ-

(এক) যেসব অর্থ-সম্পদ স্ত্রী উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা পিত্রালয় থেকে উপঢৌকন হিসেবে লাভ করতো, সেগুলো হজম করে ফেলা হতো।

(দুই) যদি কোন নারী তার নিজের অংশের ধন-সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই নিতো, তবে পুরুষরা তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দিত, যাতে ধন-সম্পদ বাইরে নিয়ে যেতে না পারে; বরং এখানেই মারা যায় এবং ধন-সম্পদ তাদের অধিকারভুক্ত থেকে যায়।

(তিন) মাঝে মাঝে স্ত্রীর কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও শুধু স্বভাবগতভাবে স্বামী তাকে অপছন্দ করতো এবং স্ত্রীর প্রাপ্য প্রদান করতো না। অপরপক্ষে তালাক দিয়ে তাকে মুক্তও করতো না, যাতে সে অতিষ্ঠ হয়ে অলংকার ও মোহরানা বাবদ প্রদত্ত টাকা ফেরত দেয় কিংবা অপ্রদত্ত মোহরানা ক্ষমা করে দেয়। মাঝে মাঝে স্বামী তালাক দিয়েও তালাকপ্রাপ্তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিতো না, যাতে সে বাধ্য হয়ে প্রদত্ত মোহরানা ফেরত দেয় কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা ক্ষমা করে দেয়।

(চার) কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর ওয়ারিসরা বিধবাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিতো না—মূর্খতাপ্রসূত লজ্জার কারণে কিংবা কিছু অর্থ আদায় করার লোভে।

এসব নির্যাতনের ভিত্তি ছিল এই যে, তারা নিজেদেরকে স্ত্রীর সম্পত্তি এমন কি, তার প্রাণেরও মালিক মনে করতো। কোরআন পাক এসব অনর্থের সে মূলটি উৎপাটন করে দিয়েছে এবং এর আওতায় সংঘটিত নির্যাতনসমূহের প্রতিকারকল্পে ঘোষণা করেছে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ। তোমাদের জন্যে হালাল নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের মালিক হয়ে বস।"

'বলপূর্বক' কথাটি এখানে শর্ত হিসেবে বলা হয়নি, যাতে এমন মনে করে নেয়া যাবে যে, নারীদের সম্মতিক্রমে তাদের মালিক হওয়া হয়ত শুদ্ধ হবে, বরং বাস্তব ঘটনা বর্ণনার জন্যে সংযুক্ত হয়েছে। শরীয়ত-সম্মত ও যুক্তিগত কারণ ছাড়াই নারীদের মালিক হয়ে যাওয়া বলপূর্বকই হতে

পারে। কোন বুদ্ধিমতি ও জ্ঞানী নারী এতে সম্মত হতে পারে না।– (বাহ্‌রে-মুহীত)

এ কারণেই শরীয়ত এ ব্যাপারে তার সম্মতিকে গুরুত্ব দেয়নি। কোন নারী নির্বুদ্ধিতাবশতঃ কারো মালিকানাধীন হতে রাযী হলেও ইসলামী আইন এতে রাযী নয় যে, কোন স্বাধীন মানুষ কারো মালিকানাধীন চলে যাবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে যাদের সাথে বিয়ে হারাম, এমন নারীদের বিবরণ দেয়া হয়েছে। কোন কোন হারাম নারী কোন অবস্থাতেই হালাল হয় না, তাদেরকে "মোহাররামাতে-আবাদীয়্যা" (চিরতরে হারাম) বলা হয়। কোন কোন নারী চিরতরে হারাম নয়, কোন কোন অবস্থায় তারা হালালও হয়ে যায়।

প্রথমোক্ত তিন প্রকার ঃ (১) বংশগত হারাম নারী, (২) দুধের কারণে হারাম নারী এবং (৩) শ্বশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী চিরতরে হারাম। শেষোক্ত এক প্রকার অর্থাৎ, পর-স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত পরের স্ত্রী থাকে তখন পর্যন্ত হারাম।

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ – জাহেলিয়াত যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পুত্রেরা বিনাদ্বিধায় বিয়ে করে নিতো। এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা এই নির্লজ্জ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং 'একে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ' বলে অভিহিত করেছেন। বলাবাহুল্য, যাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মা বলা হয়, পিতার মৃত্যুর পর তাকে স্ত্রী করে রাখা মানব-চরিত্রের জঘন্য অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

মাসআলা ঃ আয়াতে পিতার বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম বলা হয়েছে। এতে এরূপ কোন কথা নেই যে, পিতা যদি তার সাথে সহবাসও করে। কাজেই যে কোন স্ত্রীলোকের সাথে পিতার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলে পুত্রের পক্ষে তাকে বিয়ে করা কখনও হালাল নয়।

এমনিভাবে পুত্রের স্ত্রীকে পিতার পক্ষে বিয়ে করা হালাল নয়; যদিও পুত্র শুধু বিবাহই করে – সহবাস না করে। আল্লামা শামী বলেন ঃ

وتحرم زوجة الاصل للفرع بمجرد العقد دخل بها اولا

মাসআলা ঃ যদি পিতা কোন স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচার করে, তবুও তাকে বিয়ে করা পুত্রের পক্ষে হালাল নয়।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ অর্থাৎ, আপন জননীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে। امهات শব্দের ব্যাপকতায় দাদী, নানী সবই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

وَبَنَاتُكُمْ – স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা হারাম। কন্যার কন্যাকে এবং পুত্রের কন্যাকেও বিয়ে করা হারাম।

মোটকথা, কন্যা, পৌত্রী, প্রপৌত্রী, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী এদের সবাইকে বিয়ে করা হারাম এবং বিয়ে করা স্ত্রীর অন্য স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা জায়েয কিনা ; সে সম্পর্কে পরে বর্ণনা করা হবে। যে পুত্র-কন্যা ঔরসজাত নয়; বরং পালিত, তাদের এবং তাদের সন্তানকে বিয়ে করা জায়েয— যদি অন্য কোন পথে অবৈধতা না থাকে। এমনিভাবে ব্যভিচারের মাধ্যমে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সেও কন্যারই পর্যায়ভুক্ত। তাদের বিয়ে করাও দুরস্ত নয়।

وَأَخَوَاتُكُمْ – সহোদরা ভগিনীকে বিয়ে করা হারাম। এমনিভাবে বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া ভগিনীকেও বিয়ে করা হারাম।

وَعَمَّاتُكُمْ – পিতার সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোনকে বিয়ে করা হারাম। তিন প্রকার ফুফুকেই বিয়ে করা যায় না।

وَخَالَاتُكُمْ – আপন জননীর তিন প্রকার বোন, প্রত্যেকের সাথেই বিয়ে করা হারাম।

وَبَنَاتُ الْأَخِ – ভ্রাতুষ্পুত্রীর সাথেও বিয়ে হারাম; আপন হোক, বৈমাত্রেয় হোক— বিয়ে হালাল নয়।

وَبَنَاتُ الْأُخْتِ – বোনের কন্যা অর্থাৎ, ভাগ্নেয়ীর সাথেও বিয়ে হারাম। এখানেও বোনকে ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে।

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ – যেসব নারীর স্তন্য পান করা হয়, তারা জননী না হলেও বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে জননীর পর্যায়ভুক্ত এবং তাদের সাথে বিয়ে হারাম। অল্প দুধ পান করুক কিংবা বেশী, একবার পান করুক কিংবা একাধিকবার— সর্বাবস্থায় তারা হারাম হয়ে যায়। ফিকাহ্‌বিদগণের পরিভাষায় একে "হুরমতে-রেযাআত" বলা হয়।

তবে এতটুকু স্মরণ রাখা জরুরী যে, শিশু অবস্থায় দুধ পানের সময়ে দুধ পান করলেই এই 'হুরমতে-রেযাআত' কার্যকরী হয়। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন ঃ إنما الرضاعة من المجاعة অর্থাৎ, দুধ পানের কারণে যে অবৈধতা প্রমাণিত হয়, তা সে সময়ে দুধ পান করলে হবে, যে সময় দুধ পান করে শিশু শারীরিক দিক দিয়ে বর্ধিত হয়। – (বোখারী, মুসলিম)

ইমাম আবু হানীফার মতে এই সময়কাল হচ্ছে শিশুর জন্মের পর থেকে আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত। ইমাম আবু হানীফার বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদসহ অন্যান্য ফেকাহ্‌বিদগণের মতে মাত্র দুই বছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করলে অবৈধতা প্রমাণিত হয়। ইমাম মুহাম্মদের ফতোয়াও তাই। কোন বালক-বালিকা যদি এ বয়সের পর কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করে, তবে এতে দুধ পানজনিত অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ – অর্থাৎ, দুধ পানের সাথে সম্পর্কিত যেসব বোন আছে, তাদেরকে বিয়ে করা হারাম। এর বিশদ বিবরণ এই যে, দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়কালে কোন বালক অথবা বালিকা কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে সে তাদের মা এবং তার স্বামী তাদের পিতা হয়ে যায়। এছাড়া সে স্ত্রীলোকের আপন পুত্র-কন্যা তাদেরই ভাই-বোন হয়ে যায়। অনুরূপ সে স্ত্রীলোকের বোন তাদের খালা হয় এবং সে স্ত্রীলোকের জেষ্ঠ-দেবররা তাদের চাচা হয়ে যায়। তার স্বামীর বোনেরা শিশুদের ফুফু হয়ে যায়। দুধ পানের কারণে তাদের সবার পরস্পর বৈবাহিক অবৈধতা স্থাপিত হয়ে যায়। বংশগত সম্পর্কের কারণে পরস্পর যেসব বিয়ে হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণে সেসব সম্পর্কীয়দের সাথে বিয়ে হারাম হয়ে যায়। মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে ঃ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন ঃ

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ
مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ
الْفَرِيْضَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ
طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ
فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ
فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ
غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ
بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذٰلِكَ
لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ۝ يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ
عَلَيْكُمْ ۫ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ۝
يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ۝

(২৪) এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়— এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্র হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য—ব্যভিচারের জন্যে নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ্ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ। (২৫) আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে। আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত রয়েছেন। তোমরা পরস্পর এক ; অতএব, তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে— ব্যভিচারিণী কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবে না। অতঃপর যখন তারা বিবাহ বন্ধনে এসে যায়, তখন যদি কোন অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদেরকে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ব্যবস্থা তাদের জন্যে, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে। আর যদি সবর কর, তবে তা তোমাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (২৬) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে সব কিছু পরিষ্কার বর্ণনা করে দিতে চান, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ প্রদর্শন করতে চান। এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান, আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী রহস্যবিদ। (২৭) আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান। এবং যারা কামনা-বাসনার অনুসারী, তারা চায় যে, তোমরা পথ থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত হয়ে পড়। (২৮) আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে।

يحرم من الرضاعة مايحرم من الولادة ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب

মাসআলা ঃ একটি বালক ও একটি বালিকা কোন মহিলার দুধ পান করলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। এমনিভাবে দুধ ভাই ও বোনের কন্যার সাথেও বিয়ে হতে পারে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

طول -এর অর্থ শক্তি-সামর্থ্য। আয়াতের অর্থ এই যে, যার স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি-সামর্থ্য নেই কিংবা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই, সে ঈমানদার দাসীদেরকে বিয়ে করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, যতটা সম্ভব স্বাধীন নারীকেই বিয়ে করা উচিত— দাসীকে বিয়ে না করাই বাঞ্ছনীয়। অগত্যা যদি দাসীকে বিয়ে করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসী খোঁজ করতে হবে।

হযরত ইমাম আবু হানীফার মাযহাব তাই। তিনি বলেন ঃ স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দাসীকে অথবা ইহুদী-খ্রীষ্টান দাসীকে বিয়ে করা মকরূহ।

হযরত ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য ইমামের মতে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও দাসীকে বিয়ে করা হারাম এবং ইহুদী বা খ্রীষ্টান দাসী বিয়ে করা সর্বাবস্থায় অবৈধ।

মোটকথা, দাসীকে বিয়ে করা থেকে বেঁচে থাকা স্বাধীন পুরুষের জন্যে সর্বাবস্থায় উত্তম। যদি অগত্যা করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসীকে করবে। কারণ, দাসীর গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে ঐ ব্যক্তির গোলাম হয়, যে দাসীর মালিক। অমুসলমান দাসীর গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে জননীর চাল-চলন অনুযায়ী ভিন্ন ধর্মের অনুসারী হয়ে যেতে পারে। অতএব, সন্তানকে গোলামীর কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে এবং ঈমানদার বানানোর জন্যে সন্তানের মাতার স্বাধীন হওয়া জরুরী। দাসী হলে কমপক্ষে ঈমানদার হওয়া দরকার, যাতে সন্তানের ঈমান সংরক্ষিত থাকে। এ কারণেই ওলামায়ে-কেরাম বলেন ঃ স্বাধীন ইহুদী-খ্রীষ্টান নারীকে বিয়ে করা যদিও বৈধ, কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। বর্তমান যুগে এর গুরুত্ব অত্যধিক। কেননা, ইহুদী ও খ্রীষ্টান রমণীরা আজকাল সাধারণতঃ স্বয়ং স্বামীকে ও স্বামীর সন্তানদেরকে স্বধর্মে আনার উদ্দেশ্যেই মুসলমানদেরকে বিয়ে করে।

বিয়ের অনেকগুলো বিধান বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে তোমাদের বিধানাবলী বলে দেন এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও পুণ্যবানগণের অনুসৃত পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা মনে করবে না যে, হারাম ও হালালের এই বিবরণ শুধু তোমাদের জন্যই; বরং তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদেরকেও এ ধরনের বিধান বলা হয়েছিল। তারা এসব বিধান পালন করে আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্ত হয়েছে।

কামপ্রবৃত্তির অনুসারী যেনাকার এবং মিথ্যা ধর্মাবলম্বীদের কাছে হারাম-হালাল বলে কোন কিছুই নেই। তারা তোমাদেরকেও সৎপথ থেকে বিচ্যুত করে নিজেদের মিথ্যা পরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট করতে চায়। তোমরা তাদের গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক থাকবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۟ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا
فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾ اِنْ
تَجْتَنِبُوْا كَبَاۗىِٕرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ
مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰي بَعْضٍ ۭ
لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۭ وَلِلنِّسَاۗءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۭ
وَسْـَٔـلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾ وَلِكُلٍّ
جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۭ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ
اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْھُمْ نَصِيْبَھُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٣٣﴾
اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَي النِّسَاۗءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَھُمْ عَلٰي
بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۭ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۭ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَھُنَّ فَعِظُوْھُنَّ
وَاهْجُرُوْھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْھُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

(২৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। (৩০) আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজসাধ্য। (৩১) যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সেসব বড় গোনাহ্গুলো থেকে বেঁচে থাকতে পার, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব। (৩২) আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমনসব বিষয়ে যাতে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। আর আল্লাহ্র কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলা সর্ব-বিষয়ে জ্ঞাত। (৩৩) পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ যা ত্যাগ করে যান সেসবের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও। আল্লাহ্ তাআলা নিঃসন্দেহে সব কিছুই প্রত্যক্ষ করেন। (৩৪) পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ্ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ্ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।

এরপর বলা হয়েছে ঃ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ – অর্থাৎ, **আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে হাল্কা ও সহজ বিধান দিতে চান। তোমাদের অসুবিধা দূর করার জন্যে বিয়ের ব্যাপারে এমন সরল বিধান তিনি দিয়েছেন, যা সবাই পালন করতে পার। স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি না থাকার ক্ষেত্রে বাঁদীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দান করেছেন। উভয়পক্ষকে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে মোহর নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সুবিচারের শর্তে একাধিক বিয়ে করার অনুমতিও দিয়েছেন।**

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا – অর্থাৎ, মানুষ **সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। তার মাঝে কাম-বাসনার উপাদানও নিহিত রয়েছে। যদি তাকে নারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার আদেশ দেয়া হতো, তবে সে আনুগত্য করতে অক্ষম হয়ে পড়তো। তার অক্ষমতা ও দুর্বলতার** পরিপ্রেক্ষিতে **নারীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি ; বরং** উৎসাহিত করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নিজের সম্পদও অন্যায় পন্থায় ব্যয় করা বৈধ নয় ঃ আলোচ্য আয়াতের মধ্যে اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ – **শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ** ''তোমাদের সম্পদ পরস্পরের মধ্যে''— এর **দ্বারা তফসীরকারগণ** সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পরস্পরের মধ্যে অন্যায় পন্থায় একের সম্পদ অন্যের পক্ষে ভোগ করা **সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।**

আবূ হাইয়্যান 'তফসীরে-বাহ্‌রে মুহীত'- এ বলেন, আয়াতে এ **শব্দগুলো দ্বারা নিজস্ব সম্পদও অন্যায় পথে ব্যয় করা কিংবা অপব্যয় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।**

আয়াতে لَا تَاْكُلُوْٓا **বলা হয়েছে। যার অর্থ 'খেয়ো না'। পরিভাষার** বিচারে 'খেয়ো না' বলতে যে **কোনভাবে ভোগদখল বা হস্তক্ষেপ করো না** বোঝানো হয়েছে। সেটা খেয়ে, পরিধান করে কিংবা অন্য যে কোন পন্থায় ব্যবহার করেই হোক না কেন! কেননা, সাধারণ পরিভাষায় সম্পদে যে কোন হস্তক্ষেপকেই 'খেয়ে ফেলা' বলা হয়, যদি সংশ্লিষ্ট বস্তুটি আদৌ খাদ্যবস্তু নাও হয়।

باطل – শব্দটির তরজমা করা হয়েছে 'অন্যায় পন্থায়'। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-মাসউদ (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীগণের মতে শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং না-জায়েয সবগুলো পন্থাকেই বাতেল বলা হয়। যেমন, চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশ্বাসভংগ, ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত।— (বাহ্‌রে – মুহীত)

'বাতেল' পন্থায় খাওয়া ঃ কোরআন পাক একটিমাত্র **শব্দ** بِالْبَاطِلِ **বলে অন্যায় পন্থায় অর্জিত সকল প্রকার সম্পদকে হারাম করে দিয়েছে।** লেনদেন এর ব্যাপারে অন্যায় পন্থা কি কি হতে পারে **রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর** বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। **এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে,** লেনদেন এর ব্যাপারে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) যেসব **বিষয়কে হারাম বলে** উল্লেখ করেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে **কোরআনে উল্লেখিত 'বাতেল'** শব্দের ব্যাখ্যা মাত্র। ফলে হাদীসে উল্লেখিত **অর্থনৈতিক লেনদেন বিষয়ক**

বিধি-নিষেধগুলোও প্রকৃতপক্ষে কোরআনেরই নির্দেশ।

সৎ-রোযগারের শর্তাবলী ঃ হযরত মুআয-ইবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন,— সর্বাপেক্ষা পবিত্র রোযগার হচ্ছে ব্যবসায়ীদের রোযগার। তবে শর্ত হচ্ছে, তারা যখন কথা বলবে তখন মিথ্যা বলবে না। কোন আমানতের খেয়ানত করবে না। কোন পণ্য ক্রয় করার সময় সেটাকে মন্দ সাব্যস্ত করে মূল্য কম দেয়ার চেষ্টা করবে না। নিজের মাল বিক্রয় করার সময় সে মালের অযথা তারিফ করে ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করবে না। তার নিজের নিকট অন্যের ধার থাকলে পাওনাদারকে অযথা ঘুরাবে না। অপরপক্ষে, সে কারো কাছে কিছু পাওনা হলে তাকে উত্যক্ত করবে না— (ইসফাহানী, তফসীরে – মাযহারী)

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ

ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الامن اتقى الله وبـر وصدق - اخرجه الحاكم عن رفاعة بن رافع

অর্থাৎ— যারা আল্লাহ্কে ভয় করে, সৎভাবে লেন-দেন করে এবং সত্য বলে—সেসব লোক ছাড়া কেয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা গোনাহ্গারদের কাতারে উত্থিত হবে।"

অন্যের সম্পদ হালাল হওয়ার দু'টি শর্ত ঃ আলোচ্য আয়াতে عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ বাক্যটি সংযুক্ত করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল এবং হারাম।

পাপের প্রকারভেদ ঃ উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, পাপের প্রকারভেদ দু'রকম। কিছু কবীরা অর্থাৎ কঠিন ও বড় রকমের পাপ, আর কিছু সগীরা অর্থাৎ হালকা ও ছোট পাপ। এ কথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যদি কেউ সাহস করে কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদের সগীরা গোনাহ্গুলো নিজেই ক্ষমা করে দেবেন।

যাবতীয় ফরয-ওয়াজিবসমূহ সম্পাদন করাও কবীরা গোনাহ্ থেকে বাঁচার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ফরয-ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করাও কবীরা গোনাহ্। বস্তুতঃ যে লোক ফরয-ওয়াজিবসমূহ পালনের ব্যাপারে যথাযথ অনুবর্তিতা অবলম্বন করে এবং যাবতীয় কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহ্ স্বয়ং তার সগীরা গোনাহ্সমূহের কাফ্ফারা করে দেবেন।

সৎকর্মসমূহ সগীরা গোনাহ্র প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ঃ প্রায়শ্চিত্ত অর্থ এই যে, কর্তার সৎ-কর্মসমূহকে সগীরা গোনাহের ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেখিয়ে তার হিসাব সমান সমান করে দেয়া হবে। জাহান্নামের পরিবর্তে সে জান্নাত প্রাপ্ত হবে। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, কোন লোক যখন নামায পড়ার জন্য অযু করে, তখন প্রতিটি অঙ্গ ধৌত হওয়ার সাথে সাথে তার গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। মুখমণ্ডল ধুয়ে নিলে চোখ, কান ও নাক প্রভৃতি অঙ্গের পাপসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। কুলি করার সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বার পাপের কাফ্ফারা হয়ে যায়; আর পা ধোয়ার সাথে সাথে ধুয়ে যায় পায়ের পাপসমূহ। তারপর যখন সে মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়, তখন প্রতিটি পদক্ষেপে পাপের কাফ্ফারা হতে থাকে।

কবীরা গোনাহ্ শুধু তওবা দ্বারাই মাফ হয় ঃ আলোচ্য আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, অযু, নামায প্রভৃতি সৎকর্মের মাধ্যমে গোনাহ্র কাফ্ফারা হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ হলো সগীরা গোনাহ্। কবীরা গোনাহ্ একমাত্র তওবা ছাড়া মাফ হয় না। বস্তুতঃ সগীরা গোনাহ্ মাফের শর্ত হল, সাহস ও চেষ্টার মাধ্যমে কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, যদি কোন লোক কবীরা গোনাহে লিপ্ত থেকেও অযু-নামায আদায় করতে থাকে, তবে শুধু মাত্র অযু-নামায কিংবা অন্যান্য সৎকর্মের দ্বারা তার সগীরা গোনাহের কাফ্ফারাও হবে না—কবীরা গোনাহ্ তো থাকলই।— কাজেই কবীরা গোনাহের একটা বিরাট অনিষ্ট স্বয়ং সে সমস্ত পাপের অস্তিত্ব, যার প্রতি কোরআন ও হাদীসে কঠোর সাবধানবাণী বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো সত্যিকার তওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না।

মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয় এমন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করাঃ এ আয়াতে অন্যের এমনসব বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে যা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। কারণ, মানুষ যখন নিজেকে অন্যের চাইতে ধন-দৌলত, আরাম-আয়েশ, বিদ্যা-বুদ্ধি শারীরিক সৌন্দর্য-সৌষ্ঠবে খাটো অনুভব করে, তখন স্বভাবগতভাবেই তার অন্তরে হিংসার বীজ উপ্ত হতে শুরু করে। এতে কম করে হলেও তার মনে সেসব বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত লোকের সমপর্যায়ে উন্নীত হওয়া কিংবা তার চাইতেও কিছুটা উপরে উঠবার একটা বাসনা সৃষ্টি হতে থাকে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার মত নয়। কেননা, তা অর্জন করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। যেমন, কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা বা কোন সাধারণ ঘরের সন্তানের পক্ষে দেশের সেরা কোন পরিবারের সন্তান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কিংবা কারো পক্ষে অত্যন্ত সুশ্রী হওয়ার বাসনা ইত্যাদি। যদি কেউ আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে জন্মগতভাবে এসব বৈশিষ্ট্য লাভ করতে না পারে, তবে সারা জীবন সাধ্য-সাধনা করেও তার পক্ষে সেটা লাভ করা সম্ভব হবে না। উদাহরণতঃ কোন বেঁটে কদাকার লোক সুন্দর-সুঠাম হওয়ার জন্য কিংবা কোন সাধারণ ঘরের সন্তান মহান সৈয়দ বংশের সন্তান হওয়ার জন্য যদি আজীবন সাধনা করে, তবে তার সে সাধনা সফল হওয়ার নয়। এটা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়, কোন দাওয়া-তদবীরও এ ব্যাপারে ফলপ্রসূ হওয়ার নয়। এমতাবস্থায় যদি তার অন্তরে এরূপ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় যে, আমার পক্ষে যখন এরূপটি হওয়া সম্ভব নয়, তখন অন্য আর একজন কেন এরূপ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে? এরূপ মনোভাবকে 'হাসাদ' বা হিংসা বলা হয়। এটা মানব-চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও লজ্জাজনক রোগবিশেষ। দুনিয়ার অধিকাংশ ঝগড়া-ফ্যাসাদ এবং হত্যা-লুণ্ঠনের উদগাতাই হচ্ছে মানব-চরিত্রের এ কুৎসিৎ ব্যাধি।

কোরআন-করীম সে অশান্তি অনাচারের পথ রুদ্ধ করার উদ্দেশেই এরশাদ করেছে ঃ

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ কোন হেকমতের কারণেই মানুষের

মধ্য এ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিভিন্ন জনের মধ্যে বন্টন করেছেন। তার কল্যাণহস্তই এক একজনের মধ্যে এক এক ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্য বিতরণ করেছে। সুতরাং প্রত্যেককেই তার নিজের ভাগ্যের প্রতি তুষ্ট এবং রাজী থাকা উচিত। অন্যের গুণ-বৈশিষ্ট্যের আকাঙ্ক্ষায় অন্তর বিষিয়ে তোলা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নয়। কেননা, এতে নিজেকে অর্থহীন মানসিক পীড়া এবং হিংসারূপী কঠিন গোনাহে লিপ্ত করা ছাড়া আর কোন ফল লাভ হয় না।

আল্লাহ্ তাআলা যাকে নররূপে সৃষ্টি করেছেন তাতেই তার শোকরগুযারী করা কর্তব্য। অপরপক্ষে যাকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন তারও কর্তব্য এতে রাজী থাকা এবং চিন্তা করা যে, যদি তাকে পুরুষরূপে সৃষ্টি করা হতো তবে হয় তো সে পুরুষের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হতো না, বরং উল্টা গোনাহ্‌গার হতে হতো। যাকে আল্লাহ্ তাআলা সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার পক্ষে এ নেয়ামতের শুকরিয়া করা উচিত। অপরপক্ষে যে কদাকার তার পক্ষেও অনর্থক দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয়ে বরং চিন্তা করা উচিত যে, হয় তো কোন মঙ্গলের জন্যই আল্লাহ্ পাক আমাকে এই চেহারা অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এরূপ না হয়ে যদি আমি সুশ্রী হতাম, তবে হয় তো কোন ফেৎনার সম্মুখীন হতে হতো। অনুরূপ সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করে যেমন কারো পক্ষে অহঙ্কারী হওয়া উচিত নয়, তেমনি সাধারণ বংশে জন্মগ্রহণকারী কোন লোকের পক্ষেও রক্ত-ধারার দিক দিয়ে সৈয়দ হওয়ার দুরাশা পোষণ করা উচিত নয়। কেননা, হাজার চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারাও তা অর্জিত হওয়ার নয়। সুতরাং এরূপ অর্থহীন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে মানসিক যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। তাই বংশ মর্যাদা লাভের দুরাশার চাইতে নেক আমল ও সদগুণের মাধ্যমে যদি কেউ প্রাধান্য অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, তবেই তার সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। এটা মানুষের সাধ্যায়ত্ত। এ চেষ্টার মাধ্যমে মানুষ শুধু সাফল্যই লাভ করতে পারে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার স্তরকে ছাড়িয়ে আরো অনেক উর্ধ্বে উঠতে পারে।

কোরআনের কোন কোন আয়াত এবং একাধিক সহীহ্ হাদীসের বর্ণনায় সৎকর্মে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ, অন্যের চাইতে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হওয়ার নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপ অন্যের মধ্যে যে গুণ-গরিমা রয়েছে, তা অর্জন করার জন্যে সচেষ্ট হওয়ার প্রতিও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সাঃ) শুধু ঐ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই অন্যের সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত, যেগুলো চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে। যেমন, কারো গভীর জ্ঞান কিংবা চারিত্রিক মহত্ত্ব দেখে তাঁর কাছ থেকে তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা প্রশংসনীয় কাজ। আলোচ্য এ আয়াতে সেরূপ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

অর্থাৎ, পুরুষরা যাকিছু সাধনার মাধ্যমে অর্জন করবে তারা তার অংশ পাবে এবং নারীরা যাকিছু অর্জন করবে তার অংশও তারা পাবে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং কর্মে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য লাভ করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। প্রত্যেকেই তার প্রচেষ্টার ফল অবশ্যই লাভ করবে।

সূরা-নিসার শুরু থেকে এ পর্যন্ত অধিকাংশ হুকুম ও হেদায়েত ছিল নারী শ্রেণীর অধিকার সম্পর্কিত। ইসলাম-পূর্ব যুগে দুনিয়ার সর্বত্র অবলা নারীদের প্রতি ব্যাপকভাবে যেসব নির্যাতনমূলক অন্যায় আচরণ প্রচলিত ছিল, এসব নির্দেশের মাধ্যমে কোরআন সেগুলোর উচ্ছেদ সাধন করেছে। বস্তুতঃ পুরুষেরা যেসব অধিকার ভোগ করে, ইসলাম নারীদেরকেও সেরূপ সমান অধিকার দিয়েছে। নারীদের যিম্মায় যেমন পুরুষের প্রতি কিছু বিশেষ ধরনের কর্তব্য আরোপ করেছে, তেমনি পুরুষদের উপরও নারীদের প্রতি কিছু বিশেষ দায়িত্ব পালন ফরয করেছে।

নাফরমান স্ত্রী ও তার সংশোধনের উপায় ঃ অতঃপর সেসব স্ত্রীলোকের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যারা স্বামীদের আনুগত্য করে না কিংবা যারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। কোরআনে করীম তাদের সংশোধনের জন্যে পুরুষদের যথাক্রমে তিনটি উপায় বাতলে দিয়েছে। বলা হয়েছে—

وَالّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

অর্থাৎ, স্ত্রীদের পক্ষ থেকে যদি নাফরমানী সংঘটিত হয় কিংবা এমন আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধন হলো যে, নরমভাবে তাদের বোঝাবে। যদি তাতেও বিরত না হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বিছানা নিজের থেকে পৃথক করে দেবে। যাতে এই পৃথকতার দরুন সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে। কোরআন-করীমে এ প্রসঙ্গে فِي الْمَضَاجِعِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদগণ এই মর্মোদ্ধার করেছেন যে, পৃথকতা শুধু বিছানাতেই হবে, বাড়ী বা থাকার ঘর পৃথক করবে না— যাতে স্ত্রীকে সে ঘরে একা থাকতে হয়। কারণ, তাতে তার দুঃখও বেশী হবে এবং এতে কোন রকম অঘটন ঘটে যাওয়ারও সম্ভাবনা অধিক।

আয়াতের শেষাংশে এরশাদ হয়েছে যে, এই তিনটি পন্থা প্রয়োগে যদি স্ত্রী অনুগত হয়ে যায়, তবে তোমরাও সহনশীলতার আশ্রয় নাও; সাধারণ কথায় কথায় দোষারোপের পন্থা খুঁজে বেড়িয়ো না। আর জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র কুদরত ও ক্ষমতা সবার উপরেই পরিব্যাপ্ত।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ এই আয়াতের দ্বারা মূলনীতিস্বরূপ যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের বক্তব্য অনুসারে পুরুষ ও নারীদের অধিকার পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, বরং পুরুষের তুলনায় নারীদের দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ নারীরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে পারে না। কিন্তু তথাপি এই সমতার অর্থ এই নয় যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে মর্যাদার কোন পার্থক্যও থাকবে না; বরং দু'টি ন্যায়সঙ্গত ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই পুরুষদেরকে নারীদের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে।

প্রথমতঃ পুরুষকে তার জ্ঞানৈশ্বর্য ও পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতার কারণে নারী জাতির উপরে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, যা অর্জন করা নারী জাতির পক্ষে

আদৌ সম্ভব নয়। দৈবাৎ কিংবা ব্যক্তিবিশেষের কথা স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়তঃ নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষরা নিজের উপার্জন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকে।

প্রথম কারণটি হল, আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ও মানুষের নিজস্ব ক্ষমতা বহির্ভূত। আর দ্বিতীয় কারণটি নিজের উপার্জিত ও ক্ষমতাভিত্তিক। তাছাড়া একথাও বলা যেতে পারে যে, একই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যে কাউকে শাসক, কাউকে শাসিত বানানোর জন্য বুদ্ধি ও ন্যায়ের আলোকে দু'টি বিষয় অপরিহার্য ছিল ঃ (১) যাকে শাসক বানানো হবে, তার মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের নিরিখে শাসনকার্যের যোগ্যতা; (২) তার অভিভাবকত্বে শাসিতের সম্মতি। প্রথম কারণটি পুরুষের শাসকোচিত যোগ্যতার পরিচায়ক। আর দ্বিতীয় কারণ শাসিত হওয়ার ব্যাপারে নারীদের স্বীকারোক্তি। কারণ, নারীরা যখন বিয়ের সময় নিজের খোরপোষ ও মোহরের শর্তে বিয়ের অনুমতি দান করে, তখনই সে তাদের অভিভাবকত্ব মেনে নেয়।

সারকথা, এ আয়াতের প্রথম বাক্যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-ব্যবস্থার একটি মূলনীতি বাতলে দেয়া হয়েছে। তাহল এই যে, অধিকাংশ বিষয়ে অধিকারের সমতাবিধান সত্ত্বেও নারীর উপর পুরুষের একটি শাসকোচিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নারীরা হল পুরুষের শাসিত ও অধীন।

এই মূলনীতির ভিত্তিতে পৃথিবীতে নারীদের দু'টি শ্রেণী রয়েছে। একটি হল তাদের শ্রেণী যারা আলোচ্য মূলনীতি এবং স্থিরীকৃত চুক্তির অনুবর্তী রয়েছে এবং পুরুষের অভিভাবকত্ব স্বীকার করে নিয়ে তার আনুগত্য অবলম্বন করেছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হল সে সমস্ত নারীরা, যারা যথার্থভাবে এ মূলনীতির অনুবর্তী থাকেনি। প্রথম শ্রেণীর নারীরা পারিবারিক ও বৈষয়িক শান্তি ও স্বস্তির জন্য নিজেরাই যিম্মাদার। তাদের কোন সংশোধনের প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নারীদের সংশোধনকল্পে এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে এমন এক সুষ্ঠু ব্যবস্থা বাতলানো হয়েছে, যার মাধ্যমে ঘরের বিষয় ঘরের ভেতরেই সংশোধিত হয়ে যেতে পারে। এবং স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-বিসংবাদ তাদের দু'জনের মধ্যেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে; তৃতীয় কোন লোকের যেন প্রয়োজনই না হয়। এতে পুরুষদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি নারীদের অবাধ্যতা কিংবা অনুগত্যের কিছু অভাব অনুভব কর, তবে সর্বাগ্রে বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাদের মানসিক সংশোধন কর। এতেই যদি ফলোদয় হয়ে যায়, তবে বিষয়টি এখানেই মিটে গেল। এতে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকটি সব সময়ের জন্য পাপ থেকে বেঁচে গেল। আর পুরুষও মানসিক যাতনা থেকে রেহাই পেল। এভাবে উভয়ে দুঃখ-বেদনার কবল থেকে মুক্তি পেল। পক্ষান্তরে যদি বুঝিয়ে-শুনিয়ে কাজ না হয়, তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এবং নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার উদ্দেশে নিজে পৃথক বিছানায় শোবে। এটা একটা মামুলি শাস্তি এবং উত্তম সতর্কীকরণ। এতে যদি স্ত্রী সতর্ক হয়ে যায়, তবে বিবাদটিও এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারে। আর যদি সে এ ভদ্রজনোচিত শাস্তির পরেও স্বীয় অবাধ্যতা ও দুষ্কর্ম থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে সাধারণভাবে মারধোর করারও অনুমতি রয়েছে। আর তার সীমা হল এই যে, শরীরে যেন সে মারধোরের প্রতিক্রিয়া কিংবা জখম না হয়। কিন্তু এই পর্যায়ের শাস্তি দানকেও রসূলে করীম (সাঃ) পছন্দ করেননি, বরং তিনি বলেছেন, 'ভাল লোক এমন করে না'।

যাহোক, এ সাধারণ মারধোরের মাধ্যমেই যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তবুও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল। এতে যেমন স্ত্রীদের সংশোধনকল্পে পুরুষদেরকে তিনটি অধিকার দান করা হয়েছে, তেমনিভাবে আয়াতের শেষাংশে একথাও বলা হয়েছে فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا অর্থাৎ, যদি এ তিনটি ব্যবস্থার ফলে তারা তোমাদের কথা মানতে আরম্ভ করে, তবে তোমরাও আর বাড়াবাড়ি করো না এবং দোষানুষ্ধান করতে যেও না, বরং কিছু সহনশীলতা অবলম্বন কর। আর একথা খুব ভাল করে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে নারীদের উপর তেমন কোন উচ্চ মর্যাদা দান করেননি। আল্লাহ্ তাআলার মহত্ত্ব তোমাদের উপরও বিদ্যমান রয়েছে, তোমরা কোন রকম বাড়াবাড়ি করলে তার শাস্তি তোমাদেরকেও ভোগ করতে হবে।

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ
وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿۳۵﴾ وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا
بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَ
الْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ﴿۳۶﴾ ۙالَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ
النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ
اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۳۷﴾ ۚ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ
اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ
وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿۳۸﴾ وَمَاذَا
عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿۳۹﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ
حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۴۰﴾ فَكَيْفَ
اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰۤؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿۴۱﴾

(৩৫) যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত। (৩৬) আর উপাসনা কর আল্লাহ্‌র, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে।- (৩৭) যারা নিজেরাও কার্পণ্য করে এবং অন্যকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয় আর গোপন করে সেসব বিষয় যা আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে দান করেছেন স্বীয় অনুগ্রহে-বস্তুতঃ তৈরী করে রেখেছি কাফেরদের জন্য অপমানজনক আযাব। (৩৮) আর সে সমস্ত লোক যারা ব্যয় করে স্বীয় ধন-সম্পদ লোক-দেখানোর উদ্দেশে এবং যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে না, ঈমান আনে না কেয়ামত দিবসের প্রতি এবং শয়তান যার সাথী হয় সে হল নিকৃষ্টতর সাথী। (৩৯) আর কি-ই বা ক্ষতি হত তাদের যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহ্‌র উপর, কেয়ামত দিবসের উপর এবং যদি ব্যয় করত আল্লাহ্-প্রদত্ত রিযিক থেকে। অথচ আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে যথার্থভাবেই অবগত। (৪০) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কারো প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও রাখেন না; আর যদি তা সৎকর্ম হয়, তবে তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল সওয়াব দান করেন। (৪১) আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকব তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিবাদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উভয় পরিবারের সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা করার বিধান ঃ উল্লেখিত ব্যবস্থাটি ছিল- এ কারণে যাতে ঘরের ব্যাপার ঘরেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময় মনোমালিন্য বা বিবাদ দীর্ঘায়িতও হয়ে যায়। তা স্ত্রীর স্বভাবের তিক্ততা ও অবাধ্যতা কিংবা পুরুষের পক্ষ থেকে অহেতুক কড়াকড়ি প্রভৃতি যে কোন কারণেই হোক এমতাবস্থায় ঘরের বিষয় আর ঘরে সীমিত থাকে না; বাইরে নিয়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সমর্থকরা একে অপরকে মন্দ বলে এবং পারস্পরিক অপবাদারোপ করে বেড়ায়। যার ফলে উভয় পক্ষের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত দু'জনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিবাদই পারিবারিক বিসংবাদের রূপ পরিগ্রহ করে।

আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে কোরআনে-করীম এ ধরনের বিবাদ-বিসংবাদের দরজা বন্ধ করার উদ্দেশে সমসাময়িক শাসকবর্গ, উভয়পক্ষের সমর্থক ও পক্ষাবলম্বী এবং মুসলমান দলকে সম্বোধন করে এমন এক পূত-পবিত্র পন্থা বাতলে দিয়েছে, যাতে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে পরস্পর অপবাদারোপের পথও বন্ধ হয়ে গিয়ে আপোষ-মীমাংসার পথ বেরিয়ে আসতে পারে। আর ঘরের বিবাদ ঘরে মীমাংসা না হতে পারলেও অন্ততঃ পরিবারের মধ্যেই যেন তা হয়ে যায়; আদালতে মামলা-মোকদ্দমা রুজু করার ফলে যেন বিষয়টি হাটে-ঘাটে বিস্তার লাভ না করে।

আর তা হল এই যে, সরকার, উভয়পক্ষের মুরব্বী-অভিভাবক অথবা মুসলমানদের কোন শক্তিশালী সংস্থা তাদের (অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে আপোষ করিয়ে দেয়ার জন্য দু'জন সালিস নির্ধারণ করে দেবেন। একজন পুরুষের পরিবার থেকে এবং একজন স্ত্রীর পরিবার থেকে। এতদুভয় ক্ষেত্রে সালিস অর্থে حكم (হাকাম) শব্দ প্রয়োগ করে কোরআন নির্বাচিত সালিসদ্বয়ের প্রয়োজনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিষয়টিও নির্ধারণ করে দিয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, এতদুভয়ের মধ্যেই বিবাদ মীমাংসা করার গুণ থাকতে হবে। বলাবাহুল্য, এ গুণটি সে ব্যক্তির মধ্যেই থাকতে পারে, যিনি বিজ্ঞও হবেন এবং তৎসঙ্গে বিশ্বস্ত, দ্বীনদারও হবেন।

সারকথা, একজন সালিস পুরুষের (স্বামীর) পরিবার থেকে এবং একজন মহিলার (স্ত্রীর) পরিবার থেকে নির্বাচিত করে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছে পাঠানো হবে। যেখানে গিয়ে এতদুভয় কি কি কাজ করবেন এবং এদের দায়িত্বই বা কি হবে কোরআনে-করীম তা স্থির করে দেয়নি। অবশ্য বর্ণনাশেষে একটি বাক্য اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا অর্থাৎ, যদি এতদুভয় সালিস সমস্যার সমাধান এবং পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের কাজে সহায়তা দান করবেন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করে দেবেন।

এ বাক্যটির দ্বারা দু'টি বিষয় বোঝা যায় ঃ

(এক) আপোষ-মীমাংসাকারী সালিসদ্বয়ের নিয়ত যদি সৎ হয় এবং সত্যিকারভাবেই যদি তারা স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা কামনা করেন, তাহলে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের গায়বী সাহায্য হবে। ফলে তারা

নিজেদের উদ্দেশে কৃতকার্য হবেন। আর তাতেকরে তাদের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মনেও আল্লাহ্ তাআলা সম্প্রীতি ও মহব্বত সৃষ্টি করে দেবেন। এতে আরো একটি কথা প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোথাও পারস্পরিক মীমাংসা না হয়, তবে বুঝতে হবে, সালিসদ্বয়ের যে কোন একজনের মনে হয়তো নিঃস্বার্থতার অভাব ছিল।

(দুই) এ বাক্যের দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, দু'পক্ষের সালিসকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হল স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মীমাংসা করা, এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। অবশ্য একথা স্বতন্ত্র যে, উভয়পক্ষ সম্মত হয়ে এতদুভয় ব্যক্তিকে নিজেদের উকীল, প্রতিনিধি অথবা সালিস নির্ধারণ করবে এবং একথা স্বীকার করে নেবে যে, তোমরা মিলেমিশে যে সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা তাই মেনে নেব। এক্ষেত্রে এই সালিসদ্বয় সম্পূর্ণভাবে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারী হয়ে যাবে। তারা দু'জনে তালাকের ব্যাপারে একমত হয়ে গেলে তালাকই হয়ে যাবে। আবার তারা 'খোলা' প্রভৃতি যে কোন সিদ্ধান্তে একমত হবে, তাই হবে এবং পুরুষের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অধিকার অনুসারে যদি তারা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তাই মেনে নিতে হবে। পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের মধ্যে হযরত হাসান বসরী ও হযরত আবু হানীফা (রহঃ) প্রমুখেরও এমনি মত।-(রূহুল মা'আনী)

হযরত আলী (রাঃ)-এর সামনে একবার এমনি এক ঘটনা উপস্থিত হয়। তাতেও প্রমাণ হয় যে, একমাত্র আপোষ-মীমাংসা ছাড়া উল্লেখিত সালিসদ্বয়ের অন্য কোন অধিকার থাকে না, যতক্ষণ না উভয়পক্ষ তাদেরকে পূর্ণ অধিকার দান করে। ঘটনাটি সুনানে বায়হাকী গ্রন্থে হযরত ওবায়দা সালমানীর রেওয়ায়েতক্রমে নিম্নরূপ বর্ণিত রয়েছে ঃ

একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হযরত আলী (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হল। তাদের উভয়ের সাথেই ছিল বহু লোকের এক এক দল। হযরত আলী (রাঃ) নির্দেশ দিলেন যে, পুরুষের পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন 'হাকাম' বা সালিস নির্ধারণ করা হোক। অতঃপর সালিস নির্ধারিত হয়ে গেলে তাদের সম্বোধন করে হযরত আলী (রাঃ) বললেন, তোমরা কি তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জান? আর তোমাদেরকে কি করতে হবে সে ব্যাপারে কি তোমরা অবগত? শোন, তোমরা যদি এই স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে রাখার ব্যাপারে এবং তাদের পারস্পরিক আপোষ মীমাংসা করে দেয়ার ব্যাপারে একমত হতে পার, তবে তাই করো। পক্ষান্তরে তোমরা যদি মনে কর যে, তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করা সম্ভব নয়, কিংবা তা করে দিলে টিকতে পারবে না এবং তোমরা উভয়েই তাদের পৃথক করে দেয়ার ব্যাপারে একমত হয়ে এতেই মঙ্গল বিবেচনা কর, তবে তাই করবে। একথা শুনে মহিলাটি বলল, আমি এটা স্বীকার করি— এতদুভয় সালিস আল্লাহ্র আইন অনুসারে যে ফয়সালা করবে, তা আমার মতের পক্ষে হোক অথবা বিরোধী হোক, আমি তাই মানি।

কিন্তু পুরুষটি বলল, পৃথক হয়ে যাওয়া কিংবা তালাক হয়ে যাওয়া তো আমি কোনক্রমেই সহ্য করবো না। অবশ্য সালিসদের এ অধিকার দিচ্ছি যে, তারা আমার উপর যে কোন রকম আর্থিক জরিমানা আরোপ করে তাকে (স্ত্রীকে) সম্মত করিয়ে দিতে পারেন।

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, না তা হয় না। তোমারও সালিসদেরকে তেমনি অধিকার দেয়া উচিত যেমন স্ত্রী দিয়েছে।

এ ঘটনার দ্বারা কোন কোন মুজতাহিদ ইমাম উদ্ভাবন করেছেন যে, সালিসদের অধিকারসম্পন্ন হওয়া কর্তব্য। যেমন, হযরত আলী উভয়পক্ষকে বলে তাদেরকে অধিকারসম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু ইমাম আযম হযরত আবু হানীফা ও হযরত হাসান বসরী (রহঃ) সাব্যস্ত করেছেন যে, উল্লেখিত সালিসদ্বয়ের অধিকারসম্পন্ন হওয়াই যদি অপরিহার্য হতো, তবে হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক উভয়পক্ষের সম্মতি লাভের চেষ্টা করার কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। সুতরাং উভয়পক্ষকে সম্মত করার চেষ্টাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এই সালিসদ্বয় অধিকারসম্পন্ন নয়। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী যদি অধিকার দান করে, তবে অধিকারসম্পন্ন হয়ে যায়।

কোরআনে-করীমের এ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার ক্ষেত্রে অতি চমৎকার এক নতুন পথের উন্মোচন হয়ে যায়।

হক বা অধিকার সংক্রান্ত বর্ণনার পূর্বে তওহীদের আলোচনার কারণ ঃ হক বা অধিকার সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে আল্লাহ্র আনুগত্য, এবাদত-বন্দেগী ও তওহীদের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে—

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا অর্থাৎ, আল্লাহ্র এবাদত কর এবং এবাদতের বেলায় তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না।

হক বা অধিকার সংক্রান্ত বর্ণনার পূর্বে এবাদত-বন্দেগী ও তওহীদ সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করার বেশ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। তার একটি হচ্ছে এই যে,আল্লাহ্ তাআলার ভয় এবং তাঁর হুকুম-আহ্কামের প্রতি যাদের মধ্যে নিষ্ঠা না থাকে, তাদের দ্বারা দুনিয়ার অন্য অধিকার রক্ষা নিষ্ঠাও আশা করা যায় না। মানবগোষ্ঠী, সমাজের রীতি-নীতি কিংবা রাষ্ট্রের আইন-কানুন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশে হাজারো পন্থা আবিষ্কার করে নেয়। কিন্তু যে বিষয়টি মানুষকে মানুষের অধিকারের প্রতি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাধ্য করতে পারে, তাহল আল্লাহ্র ভয় ও পরহেযগারী। আর এই খোদাভীতি ও পরহেযগারী শুধুমাত্র তওহীদের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। কাজেই বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক ও আত্মীয়-স্বজনের হক বা অধিকারসমূহের বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে তওহীদ ও এবাদত-বন্দেগী সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা একান্তই সঙ্গত।

তওহীদের পর পিতা-মাতার অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা ঃ অতঃপর সমস্ত আত্মীয়-আপনজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রে পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় এবাদত-বন্দেগী ও হকসমূহের পর-পরই পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত বিবরণ দানের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহ একান্তই আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে, কিন্তু বাহ্যিক উপকরণের দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহ্র পরে মানুষের প্রতি সর্বাধিক এহসান বা অনুগ্রহ থাকে পিতা-মাতার। সাধারণ উপকরণসমূহের মাঝে মানুষের অস্তিত্বের পেছনে পিতা-মাতাই বাহ্যিক কারণ। তাছাড়া জন্ম থেকে যৌবন প্রাপ্তি পর্যন্ত যে সমস্ত কঠিন বন্ধুর পথ ও স্তর রয়েছে, তাতে বাহ্যতঃ পিতা-মাতাই তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখেন, তার প্রতিপালন ও পরিবর্ধনের জামানতদার হয়ে থাকেন। সে জন্যই কোরআন-করীমের অন্যান্য জায়গায়ও পিতা-মাতার হকসমূহকে আল্লাহ্ তাআলার এবাদত ও

আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

অর্থাৎ, আমার এবং তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর।

হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম (সাঃ) দশটি অসিয়্যত করেছিলেন। তন্মধ্যে-(১) আল্লাহ্ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদি তোমাদেরকে সেজন্য হত্যা কিংবা অগ্নিদগ্ধও করা হয়। (২) নিজের পিতা-মাতার নাফরমানী কিংবা তাদের মনে কষ্ট দেবে না, যদি তারা এমন নির্দেশও দিয়ে দেন যে, তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ ত্যাগ কর।- (মুসনাদে আহমদ)

রসূলে করীম (সাঃ)-এর বাণীসমূহে যেমন পিতা-মাতার আনুগত্য ও তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকিদ রয়েছে, তেমনিভাবে তার সীমাহীন ফযীলত, মর্তবা ও সওয়াবের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ যে লোক নিজের রিযিক ও আয়ুতে বরকত কামনা করবে, তার পক্ষে সেলায়ে-রেহ্মী অর্থাৎ নিজের আত্মীয়-স্বজনের হকসমূহ আদায় করাউচিত।

তিরমিযী শরীফের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

শোআবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত বায়হাকী (রহঃ) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে পুত্র স্বীয় পিতা-মাতার অনুগত, সে যখনই নিজের পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায়, তখন প্রতিটি দৃষ্টিতে সে একটি করে মকবুল হজ্বের সওয়াব প্রাপ্ত হয়।

বায়হাকীর অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, সমস্ত গোনাহ্ আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করে দেন, কিন্তু যে লোক পিতা-মাতার নাফরমানী এবং তাঁদের মনে কষ্টদায়ক কাজ করে, তাকে আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই বিভিন্ন বিপদাপদে লিপ্ত করে দেয়া হয়।

নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকীদ ঃ উল্লেখিত আয়াতে পিতা-মাতার পরে পরেই সাধারণ ذِي الْقُرْبٰى অর্থাৎ,— সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার তাকীদ দেয়া হয়েছে। কোরআন-করীমের প্রসিদ্ধ এক আয়াতে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা হুযুর (সাঃ) প্রায়শঃই বিভিন্ন ভাষণের পর তেলাওয়াত করতেন। বলা হয়েছে—

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبٰى

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ সবার সাথে ন্যায় ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং নির্দেশ দিচ্ছেন আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করার জন্য।" এতে সামর্থ্যানুযায়ী আত্মীয়-আপনজনদের কায়িক ও আর্থিক সেবা-যত্ন করা, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং তাঁদের খবরা-খবর নেয়াও অন্তর্ভুক্ত।

হযরত সালমান ইবনে 'আমের (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, সদকার মাল সাধারণ গরীব-মিসকীনকে দান করলে তাতে তো শুধু সদকার সওয়াবই পাওয়া যায়, অথচ তা যদি নিজের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-আপনজনকে দান করা হয়, তাহলে তাতে দু'টি সওয়াব পাওয়া যায়। একটি হল সদকার সওয়াব এবং আরেকটি হল সেলায়ে-রেহ্মীর সওয়াব। অর্থাৎ, আত্মীয়তার হক আদায় করার সওয়াব।-(মুসনাদে আহমদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

উল্লেখিত আয়াতে প্রথমে পিতা-মাতার হকের ব্যাপারে তাকীদ দেয়া হয়েছে এবং তারপরেই আত্মীয়-স্বজনের হকের কথা বলা হয়েছে।

এতীম-মিসকীনের হক ঃ তৃতীয় পর্যায়ে এরশাদ হয়েছে - وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ এতীম ও মিসকীনদের হক সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ যদিও সূরার প্রথমভাগে এসে গেছে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের হক বর্ণনা প্রসঙ্গে এখানে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লা-ওয়ারিস তথা অনাথ শিশু এবং অসহায় মানুষের সাহায্য-সহায়তাকেও এমনি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিবেচনা করবে, যেমন আত্মীয়-আপনজনদের বেলায় করে থাক।

প্রতিবেশীর হক ঃ চতুর্থ পর্যায়ে বলা হয়েছে وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى (এবং নিকট প্রতিবেশীর)- পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে - وَالْجَارِ - جار الجنب শব্দের অর্থ প্রতিবেশী। এ আয়াতে দু'রকম প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে।

(১) جارذى القربى (২) جار الجنب এতদুভয় প্রকার প্রতিবেশীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, جارذى القربى বলতে সেসব প্রতিবেশীকে বোঝায়, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়ও বটে। এভাবে এতে দু'টি হক সমন্বিত হয়ে যায়। আর جارجنب বলতে শুধুমাত্র সে প্রতিবেশীকে বোঝায় যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। আর সেই জন্যই তার উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে।

কোন কোন তফসীরকার মনীষী বলেছেন, 'জারে-যিলকোরবা' এমন প্রতিবেশীকে বলা হয়, যে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং মুসলমান। আর 'জারে-জুনুব' বলা হয় অমুসলমান প্রতিবেশীকে।

কোরআনে ব্যবহৃত শব্দে অবশ্য এসমুদয় সম্ভাব্যতাই বিদ্যমান। তাছাড়া বাস্তবতার দিক দিয়েও প্রতিবেশীদের মাঝে স্তরভেদ থাকাটা একান্তই যুক্তিসঙ্গত এবং নির্ভরযোগ্যও বটে। আর প্রতিবেশীদের আত্মীয় অথবা অনাত্মীয় হওয়ার দিক দিয়েও। প্রতিবেশী চাই নিকটবর্তী হোক অথবা দূরবর্তী, আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়, মুসলমান হোক অথবা অমুসলমান, যে কোন অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা ও তাদের খবরা-খবর নেয়া কর্তব্য।

অবশ্য প্রতিবেশী হওয়া ছাড়াও যার অন্যান্য হক রয়েছে, অন্যান্য প্রতিবেশীদের তুলনায় তাকে মর্যাদাগত অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, স্বয়ং হুযুরে আকরাম (সাঃ) এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে, "কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে, যাদের হক মাত্র একটি, কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক দু'টি এবং কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক তিনটি। এক হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হল এমন অমুসলমান যাদের সাথে কোন আত্মীয়তা নেই। দুই হকবিশিষ্ট

প্রতিবেশী হল তারা, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানও বটে। আর তিন হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হল তারা, যারা প্রতিবেশী ও মুসলমান এবং সেই সঙ্গে আত্মীয়ও বটে।'– (ইবনে-কাসীর)

সহকর্মীদের হক ঃ ষষ্ঠ পর্যায়ে বলা হয়েছে وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ -এর শাব্দিক অর্থ হল সহকর্মী। এতে সেসব সফর সঙ্গীরাও অন্তর্ভুক্ত যারা রেল, জাহাজ, বাস, মোটর প্রভৃতিতে পাশাপাশি বসে ভ্রমণ করে এবং সে সমস্ত লোকও অন্তর্ভুক্ত যারা কোন সাধারণ বা বিশেষ বৈঠক বা অধিবেশনে আপনার সাথে উপবেশন করে থাকে।

ইসলামী শরীয়ত নিকটবর্তী ও দূরবর্তী স্থায়ী প্রতিবেশীদের অধিকার সংরক্ষণকে যেমন ওয়াজিব করে দিয়েছে, তেমনিভাবে সে ব্যক্তির সাহচর্যের অধিকার বা হককেও অপরিহার্য করে দিয়েছে, যে সামান্য সময়ের জন্য হলেও কোন মজলিস, বৈঠক অথবা সফরের সময় আপনার সমপর্যায়ে উপবেশন করে। তাদের মধ্যে মুসলমান, অমুসলমান, আত্মীয়, অনাত্মীয় সবাই সমান— সবার সাথেই সদ্ব্যবহার করার হেদায়েত করা হয়েছে। এর সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে এই যে, আপনার কোন কথায় বা কাজে যেন সে কোন রকম কষ্ট না পায়। এমন কোন কথা বলবেন না, যাতে সে মর্মাহত হতে পারে। এমন কোন আচরণ করবেন না, যাতে তার কষ্ট হতে পারে। যেমন, সিগারেট পান করে তার দিকে ধোঁয়া ছাড়া, পান খেয়ে তার দিকে পিক ফেলা এবং এমনভাবে বসা যাতে তার বসার জায়গা সংকুচিত হয়ে যায় প্রভৃতি।

কোরআন-করীমের এ হেদায়েত অনুযায়ী যদি সবাই আমল করতে শুরু করে, তাহলে রেল, জাহাজ, বাস প্রভৃতির সফরক্ষেত্রে সংঘটিত সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, আমার শুধুমাত্র একজনের জায়গারই অধিকার রয়েছে; তার বেশী জায়গা দখল করে রাখার কোন অধিকার নেই। রেলে বা অন্যান্য যানবাহনে অন্য কোন যাত্রী পাশে বসতে গেলে একথা ভাবা উচিত যে, এখানে তারও ততটুকুই অধিকার রয়েছে যতটা রয়েছে আমার।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এমন প্রতিটি লোকই সাহেবে-বিল-জাম্ব-এর অন্তর্ভুক্ত যে কোন কাজে, কোন পেশায় বা কোন বিষয়ে আপনার সাথে জড়িত বা আপনার অংশীদার; তা শিল্পশ্রমেই হোক অথবা অফিস-আদালতের চাকরিতেই হোক কিংবা কোন সফরে বা স্থায়ী বসবাসেই হোক।– (রূহুল-মা'আনী)

পথিকের হক ঃ সপ্তম পর্যায়ে এরশাদ হয়েছে وَابْنِ السَّبِيْلِ -অর্থাৎ, পথিক। এতে এমন লোককে বোঝানো হয়েছে যে সফরের অবস্থায় আপনার নিকট এসে উপস্থিত হয় কিংবা আপনার মেহমান হয়ে যায়। যেহেতু এই অজানা-অচেনা লোকটির কোন আত্মীয় বা সম্পর্কীয় লোক এখানে উপস্থিত থাকে না, সেহেতু কোরআন ইসলামী তথা মানবীয় সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তার হকও আপনার উপর অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছে। তাহল, সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী তার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

গোলাম-বাঁদী ও কর্মচারীর হক ঃ অষ্টম পর্যায়ে বলা হয়েছে وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এতে অধিকারভুক্ত গোলাম-বাঁদীকে বোঝানো হয়েছে। তাদের ব্যাপারেও এ হক সাব্যস্ত ও অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। সাধ্যানুযায়ী তাদের খাওয়া-পরার ব্যাপারে কার্পণ্য করবে না। তাছাড়া তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ তাদের দ্বারা করাবে না।

এখানে আয়াতের বাক্যগুলো যদিও সরাসরিভাবে অধিকারভুক্ত গোলাম-বাঁদীকেই বোঝাচ্ছে, কিন্তু কারণ-উপকরণের সামঞ্জস্য এবং রসূল করীম (সাঃ)-এর বিভিন্ন বক্তব্যের ভিত্তিতে আলোচ্য নির্দেশ ও বিধি-বিধান দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী ও অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। তাদের হকও একই রকম। নির্ধারিত বেতন-ভাতা, খানাপিনা প্রভৃতির ব্যাপারে বিলম্ব বা কার্পণ্য করা যাবে না এবং তাদের উপর সাধ্যাতীত কোন কাজও চাপানো যাবে না।

অধিকার প্রদানে তারাই শৈথিল্য প্রদর্শন করে যাদের মনে দাম্ভিকতা বিদ্যমান ঃ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا -অর্থাৎ, আল্লাহ্ এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে দাম্ভিক এবং নিজেকে অন্যের চাইতে বড় প্রতিপন্ন করে।

আয়াতের এই শেষ বাক্যটি পূর্ববর্তী সমস্ত বক্তব্যের উপসংহার। কারণ, পূর্ববর্তী আটটি পর্যায়ে যে সমস্ত লোকের হক সম্পর্কে তাকীদ করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে সেসব লোকই শৈথিল্য প্রদর্শন করে যাদের মন-মানসিকতায় আত্মগর্ব, অহমিকা, তাকাব্বুর ও দাম্ভিকতা বিদ্যমান। আল্লাহ্ সমস্ত মুসলমানকে এর অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখুন!

অতঃপর الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ বাক্যে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত লোক দাম্ভিক তারা ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রেও কার্পণ্য অবলম্বন করে। নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করে না এবং অন্যান্য লোককেও নিজের অশোভন কথা এবং কার্যকলাপের মাধ্যমে এহেন মন্দ অভ্যাস অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহিত করে।

আয়াতে যে بخل শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, প্রচলিত অর্থে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে সাধারণতঃ অর্থ-সম্পদ সংক্রান্ত অধিকার বা হক আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে। কিন্তু আয়াতের শানে-নুযূল পর্যালোচনা করতে গেলে বোঝা যায়, এখানে بخل বা কার্পণ্য শব্দটি সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান ও অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্পণ্যই অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতটি মদীনায় বসবাসরত ইহুদীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। এরা ভীষণ দাম্ভিক ও অসম্ভব রকম কৃপণ ছিল। অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের বেলায় যেমন কৃপণতা করত, তেমনি সে সমস্ত জ্ঞানের বিষয়ও গোপন করত, যা তারা নিজেদের এলহামী গ্রন্থের মাধ্যমে অর্জন করেছিল এবং সে সমস্ত জ্ঞানও গোপন করত যাতে মহানবী (সাঃ)-এর আগমন সংক্রান্ত সুসংবাদ ও লক্ষণসমূহের উল্লেখ ছিল। কিন্তু ইহুদীরা এসব বিষয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নেয়ার পরেও কার্পণ্যের আশ্রয় নিত— না তারা নিজেরা সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করত, আর না অন্যকে সে অনুযায়ী আমল করতে বলত।

পরবর্তীতে বলা হয়েছে, যে সমস্ত লোক আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পদের

বেলায়ও কার্পণ্য করে এবং এলেম ও ঈমানের ব্যাপারেও কার্পণ্য করে, তারা আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ ; তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে অপমানজনক আযাব।

দান-খয়রাতের ফযীলত এবং কার্পণ্যের ক্ষতি সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন–

"প্রতিদিন ভোর বেলায় দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্, সৎপথে ব্যয়কারীকে শুভ প্রতিদান দান কর। আর অন্যজন বলেন, হে আল্লাহ্, কৃপণকে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দাও।"– (বোখারী, মুসলিম)

অতঃপর وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ বাক্যের দ্বারা দাম্ভিকের আরেকটি দোষের কথা বলা হয়েছে। তা হল এই যে, এসব লোক আল্লাহ্‌র পথে নিজেরাও ব্যয় করে না এবং অন্যকেও ব্যয় না করার অনুপ্রেরণা যোগায়। অবশ্য তারা ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশে। আর যেহেতু এরা আল্লাহ্ এবং আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে না, সেহেতু তাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের সওয়াবের নিয়তে ব্যয় করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ ধরনের লোক শয়তানের দোসর। অতএব, তাদের পরিণতিও তাই হবে, যা হবে তাদের দোসর শয়তানের পরিণতি।

এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও কার্পণ্য প্রদর্শন করা যেমন দূষণীয়, তেমনিভাবে লোক দেখানোর জন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ব্যয় করাও নিতান্ত মন্দ কাজ। যারা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ব্যয় না করে লোক দেখানোর উদ্দেশে ব্যয় করে, তাদের আমল আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয় না। হাদীসে এমন কাজকে শেরক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। যথা ঃ

শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশে নামায পড়ল সে শেরেকী করল। যে লোক দেখানোর উদ্দেশে রোযা রাখল সে শেরেকী করল এবং যে লোক দেখানোর উদ্দেশে সদকা-খয়রাত করল সে শেরেকী করল।"– (মুসনাদে-আহমদ)

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ অর্থাৎ, তাদের ক্ষতিটা কি হবে এবং তাদের এমন কি বিপদই বা হবে, যদি তারা আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নেয় এবং আল্লাহ্-প্রদত্ত ধন-সম্পদের মধ্য থেকে ব্যয় করে? এগুলো সবই যে একান্ত সহজ কাজ। এগুলো গ্রহণ করা বা বাস্তবায়ন করা কোনই কষ্টের বিষয় নয়, তবুও কেন নাফরমান ও অকৃতজ্ঞ থেকে আখেরাতে ধ্বংসের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিচ্ছে।

অতঃপর বলা হয়েছে اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কারো সৎকর্মের সওয়াব এবং অশুভ প্রতিদানের বেলায় বিন্দু-বিসর্গও অন্যায় করেন না। বরং নিজের পক্ষ থেকে এতে অধিকতর বৃদ্ধি করে দেন এবং আখেরাতে এগুলোকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে তার সওয়াব দান করবেন এবং নিজের পক্ষ থেকেও দেবেন মহান দান।

আল্লাহ্ তাআলার নিকট নিম্নতম সওয়াবের পরিমাণ হচ্ছে এই যে, সেখানে একটি সৎ কাজের জন্য দশ-দশটি সওয়াব লেখা হয়, তদুপরি নানা বাহানায় বৃদ্ধির পরেও বৃদ্ধি হতে থাকে। কোন কোন রেওয়ায়েতে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু সৎকাজ এমনও রয়েছে, যেগুলোর সওয়াব বিশ লক্ষ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে যায়। তাছাড়া আল্লাহ্ হলেন মহাদাতা। তিনি তাঁর অসীম রহমতে (সৎ কাজের বিনিময়) এমনভাবে বাড়িয়ে দেন, যা কোন হিসাব বা সীমা-পরিসীমায় আসে না। বলা হয়েছে— وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ কাজেই আল্লাহ্ তাআলার দরবার থেকে যে কি মহাদান হতে পারে, তার কি কল্পনা করা যেতে পারে?

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ذَرَّةٍ শব্দের একটি অর্থ তো সুবিদিত, যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এছাড়া কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, লাল রঙের সর্বাধিক ক্ষুদ্র পিঁপড়াকে ذَرَّةٍ (যাররাতুন) বলা হয়। আরবরা নিকৃষ্টতা ও ওজনহীনতা বোঝানোর জন্য শব্দটি উদাহরণস্বরূপ বলে থাকে।

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ বলে আখেরাতের ময়দানের দৃশ্যকে সামনে উপস্থিত করার প্রতি লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে। এতে মক্কাবাসী কাফেরদের ভীতি প্রদর্শনও উদ্দেশ্য বটে।

তাদের কি অবস্থা হবে, যখন হাশরের ময়দানে প্রত্যেক উম্মতের নবীগণকে নিজ নিজ উম্মতের নেক-বদ ও সৎ-অসৎ আমলের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করা হবে এবং যখন আপনিও নিজের উম্মতের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। আর বিশেষ করে সেই কাফের-মুশরিকদের সম্পর্কে খোদায়ী আদালতে সাক্ষ্য দান করবেন যে, তারা প্রকাশ্য সব মু'জেযা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও মিথ্যারোপ করেছে এবং আল্লাহ্‌র তওহীদ ও আমার রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন করেনি।

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আমাকে কোরআন শোনাও। হযরত আবদুল্লাহ্ নিবেদন করলেন, আপনি কি আমার কাছ থেকে শুনতে চান, অথচ কোরআন আপনারই উপর অবতীর্ণ হয়েছে! হুযুর বললেন, হাঁ পড়। হযরত আবদুল্লাহ্ বলেন, অতঃপর আমি সূরা আন-নিসা পড়তে আরম্ভ করলাম। فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ পর্যন্ত পৌঁছার পর তিনি বললেন, এবার থাম। তারপর যখন আমি তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকালাম, দেখলাম, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

আল্লামা কুস্তলানী (রহঃ) লিখেছেন, এ আয়াত পাঠে, হুযুর (সাঃ)-এর সামনে আখেরাতের দৃশ্যাবলী উদ্ভাসিত হয়ে যায় এবং স্বীয় উম্মতের শৈথিল্যপরায়ণ ব্যক্তিদের কথা স্মরণ হয়। আর সে জন্যই তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে।

জ্ঞাতব্য ঃ কোন কোন মনীষী বলেছেন, هٰٓؤُلَآءِ -এর দ্বারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সময়ে উপস্থিত কাফের-মুনাফেকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার অনেকের মতে কেয়ামত পর্যন্ত আগত গোটা উম্মতের প্রতিই এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায় যে, হুযুরের উম্মতের যাবতীয় আমল হুযুরের সামনে উপস্থাপিত করা হতে থাকে।

যাহোক, এতে বোঝা গেল যে, বিগত উম্মতসমূহের নবী-রসূলগণ

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿٤٢﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿٤٤﴾ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿٤٥﴾ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّۢا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٤٦﴾

(৪২) সেদিন কামনা করবে সে সমস্ত লোক, যারা কাফের হয়েছিল এবং রসূলের নাফরমানী করেছিল, যেন যমীনের সাথে মিশে যায়। কিন্তু গোপন করতে পারবে না আল্লাহ্‌র নিকট কোন বিষয়। (৪৩) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর (নামাযের কাছে যেও না) ফরয গোসলের অবস্থায়ও, যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু, মুসাফীর অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও— তাতে মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমাশীল। (৪৪) তুমি কি ওদের দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, (অথচ) তারা পথভ্রষ্টতা খরিদ করে এবং কামনা করে, যাতে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাও। (৪৫) অথচ আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদেরকে যথার্থই জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (৪৬) কোন কোন ইহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুরিয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করছি। তারা আরো বলে, শোন, না শোনার মত। মুখ বাঁকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশে বলে, 'রায়েনা' (আমাদের রাখাল)। অথচ যদি তারা বলত যে, আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি এবং (যদি বলত,) শোন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে তাই ছিল তাদের জন্য উত্তম। আর সেটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন তাদের কুফরীর দরুন। অতএব, তারা ঈমান আনছে না, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক।

নিজ নিজ উম্মতের সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপিত হবেন এবং স্বয়ং মহানবী (সাঃ)-ও স্বীয় উম্মতের কৃতকর্মের সাক্ষ্যদান করবেন। কোরআন করীমের এই বর্ণনারীতির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হুযুর (সাঃ)-এর পর আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না, যিনি স্বীয় উম্মতের উপর সাক্ষ্যদান করতে পারেন। অন্যথায় কোরআন করীমে তাঁর (অর্থাৎ, সে নবীর এবং তাঁর সাক্ষ্যদানের) বিষয়ও উল্লেখ থাকত। এ হিসেবে উক্ত আয়াতটি খতমে নবুওয়তেরও একটি প্রমাণ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আয়াতে ময়দানে-আখেরাতে কাফেরদের দুরবস্থার বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এরা কেয়ামতের দিন কামনা করবে যে, হায়! আমরা যদি ভূমির সাথে মিশে যেতাম, ভূমি যদি দ্বিধা হয়ে যেত আর আমরা তাতে ঢুকে গিয়ে মাটি হয়ে যেতাম এবং এখনকার জিজ্ঞাসাবাদ ও হিসাব-নিকাশ থেকে যদি অব্যাহতি লাভ করতে পারতাম!

হাশরের ময়দানে কাফেররা যখন দেখবে, সমস্ত জীব-জন্তু একে অপরের কাছ থেকে কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়ার পর মাটিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের আক্ষেপ হবে এবং কামনা করবে—হায়। আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম! যেমন সূরা 'নাবা'তে বলা হয়েছে وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا (আর কাফেররা বলবে, কতই না উত্তম হত যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম।)

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا অর্থাৎ, এই কাফেররা নিজেদের বিশ্বাস ও কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছুই গোপন রাখতে পারবে না। তাদের হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে, নবী-রসূলগণ সাক্ষ্য দান করবেন এবং আমলনামাসমূহেও সবকিছু বিধৃত থাকবে।

হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'কাফেররা কোন কিছুই গোপন করতে পারবে না। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তারা কসম খেয়ে খেয়ে বলবে وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ (আল্লাহ্‌র কসম আমরা শিরক করিনি।) বাহ্যতঃ এ দু'টি আয়াতের মাঝে যে বৈপরীত্য দেখা যায় তার কারণ কি? তখন হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ)-উত্তরে বললেন, ব্যাপারটি হবে এমন যে, যখন প্রথমে কাফেররা লক্ষ্য করবে শুধুমাত্র মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে যাচ্ছে না, তখন তারা একথা স্থির করে নেবে যে, আমাদেরকেও নিজেদের শেরক ও অসৎকর্মের বিষয় অস্বীকার করা উচিত। হয় তো আমরা এভাবে মুক্তি পেয়েও যেতে পারি। কিন্তু এ অস্বীকৃতির পর স্বয়ং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করবে এবং গোপন করার যে মতলব তারা স্থির করেছিল, তাতে সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্য হয়ে পড়বে এবং তখন সবই স্বীকার করে নেবে। এজন্যই বলা হয়েছে وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا কোন কিছুই গোপন করতে পারবে না।

শরাব হারাম হওয়ার ধারাবাহিক নির্দেশাবলী ঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইসলামী শরীয়তকে একটি বৈশিষ্ট্য এই দান করেছেন যে, এর প্রতিটি বিধি-বিধানকে তিনি সরল ও সহজ করেছেন। তারই এক বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যাঁদের মন-মানসকে একান্ত নিষ্পাপ করে তৈরী করেছিলেন এমন বিশেষ বিশেষ কিছু লোক ছাড়া মদ্যপান ছিল সমগ্র আরববাসীর পুরাতন অভ্যাস। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লোকেরা কখনও এ দুষ্ট বস্তুর ধারে কাছেও যেতেন না। যেমন, মহানবী (সাঃ) নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও কখনও মদ্য স্পর্শ করেননি। এছাড়া বলতে গেলে সমগ্র জাতিই ছিল এ বদভ্যাসে লিপ্ত। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, কোন বস্তু একবার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে মানুষের পক্ষে তা পরিহার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে মদ্যপান কিংবা অন্যান্য নেশাজনিত অভ্যাস মানুষকে এমনভাবে কাবু করে বসে যে, তা থেকে বেরিয়ে আসাকে মৃত্যুর শামিল মনে করতে থাকে।

আল্লাহ্ তাআলার নিকট মদ্যপান ও নেশা করা ছিল হারাম। বিশেষতঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলমানদেরকে এর অভিশাপ থেকে রক্ষা ছিল আল্লাহ্ তাআলার অভিপ্রায়। কিন্তু সহসা একে হারাম করে দেয়া হলে, মানুষের পক্ষে এ নির্দেশ পালন করা একান্তই কঠিন হত। কাজেই প্রথমে এর উপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হোল এবং এর অশুভ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কীকরণের মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিষ্ককে একে পরিহার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হল। সুতরাং আলোচ্য এ আয়াতে শুধুমাত্র এ হুকুমই দেয়া হয়েছে যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারে-কাছেও যেও না। যার মর্ম ছিল এই যে, নামাযের সময়ে নামাযের প্রতি মনোনিবেশ করা ফরয। এ সময় মদ্যপান করা যাবে না। এতে মুসলমানগণ উপলব্ধি করলেন যে, এটা এমন এক মন্দ বস্তু যা মানুষকে নামাযে বাধা দান করে। (কাজেই দেখা গেল) অনেকে তখন থেকেই অর্থাৎ, এ নির্দেশ আসার সাথে সাথেই মদ্যপান পরিহার করলেন এবং অনেকে এর মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত সূরা মায়েদার আয়াতে শরাবের অপবিত্রতা ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ অবতীর্ণ হল এবং যে কোন অবস্থায় মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে গেল।

মাসআলা ঃ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া যেমন হারাম, তেমনি কোন কোন মুফাসসির মনীষী এমনও বলেছেন যে, নিদ্রার এমন প্রবল চাপ হলেও নামায পড়া জায়েয নয়, যাতে মানুষ নিজের মুখের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

তায়াম্মুমের হুকুম একটি পুরস্কার--যা এ উম্মতেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ আল্লাহ্ তাআলার কতই না অনুগ্রহ যে, তিনি অযু-গোসল প্রভৃতি পবিত্রতার নিমিত্ত এমন এক বস্তুকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন, যার প্রাপ্তি পানি অপেক্ষাও সহজ। বলাবাহুল্য, ভূমি ও মাটি সর্বত্রই বিদ্যমান। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ সহজ ব্যবস্থাটি একমাত্র-উম্মতে মুহাম্মদীকেই দান করা হয়েছে। তায়াম্মুম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল ফেকাহ্র কিতাব ছাড়াও সাধারণ বাংলা-উর্দু পুস্তিকায় বর্ণিত রয়েছে। প্রয়োজনে সেগুলো পাঠ করা যেতে পারে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাকওয়া ও পরহেযগারীর বিষয় আলোচনা করা হয় এবং তাতে অধিকাংশই ছিল পারস্পরিক লেন-দেন সংক্রান্ত। এরই মাঝে প্রসঙ্গক্রমে নামায তার সাথে সম্পৃক্ত কিছু হুকুম-আহকামও বলে দেয়া হয়েছে, যা মানুষের মনে আল্লাহ্র ভয় ও আখেরাতের চিন্তা সৃষ্টি করে এবং তাতেকরে পারস্পরিক লেনদেনের সুষ্ঠুতা সূচিত হয়। উল্লেখিত আয়াতে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে পালনীয় কর্তব্য ও আচার-আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে ইহুদীদের দুষ্কর্মের প্রতিকার এবং বাক্য প্রয়োগের রীতি-নীতি সম্পর্কেও মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

يَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا
مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا
أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَٰبَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن
يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن
يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾ انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّٰغُوتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ
ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ
اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ
فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ
عَلَىٰ مَا ءَاتَىٰهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ
إِبْرَٰهِيمَ الْكِتَٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

(৪৭) হে আসমানী গ্রন্থের অধিকারীবৃন্দ! যাকিছু আমি অবতীর্ণ করেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, যা সে গ্রন্থের সত্যায়ন করে এবং যা তোমাদের নিকট রয়েছে পূর্ব থেকে। (বিশ্বাস স্থাপন কর) এমন হওয়ার আগেই যে, আমি মুছে দেব অনেক চেহারাকে এবং অতঃপর সেগুলোকে ঘুরিয়ে দেব পশ্চাৎ দিকে কিংবা অভিসম্পাত করব তাদের প্রতি যেমন করে অভিসম্পাত করেছি আছহাবে-সাব্তের উপর। আর আল্লাহ্র নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হবে। (৪৮) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহ্র সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। (৪৯) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে থাকে, অথচ পবিত্র করেন আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকেই? বস্তুতঃ তাদের উপর সূতা পরিমাণ অন্যায়ও হবে না। (৫০) লক্ষ্য কর, কেমন করে তারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অথচ এই প্রকাশ্য পাপই যথেষ্ট। (৫১) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে। (৫২) এরা হল সে সমস্ত লোক, যাদের উপর লা'নত করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যার উপর লা'নত করেন, তুমি তার কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না। (৫৩) তাদের কাছে কি রাজ্যের কোন অংশ আছে? তাহলে যে এরা কাউকেও একটি তিল পরিমাণও দেবে না। (৫৪) নাকি যাকিছু আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে। অবশ্যই আমি ইবরাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হেকমত দান করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্র বাণী فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا (অর্থাৎ, তাদের ঘুরিয়ে দেব পশ্চাদ্দিকে) ঘুরিয়ে দেয়া বা উল্টে দেয়ার মধ্যে দু'টি সম্ভাবনাই থাকতে পারে। মুখমণ্ডলের আকার-অবয়ব মুছে দিয়ে গোটা চেহারাকে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়ে দেয়াও হতে পারে, আবার মুখমণ্ডলকে গর্দানের মত সমান্তরাল করে দেয়াও হতে পারে।

অর্থাৎ, মুখমণ্ডলকে গর্দানের দিকে উল্টে না দিয়ে বরং গর্দানের মত পরিষ্কার ও সমান্তরাল করে দেয়া।— (মাযহারী, রূহুল মা'আনী)

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এমন ধরনের বিকৃতি সাধানের ব্যাপারটি কবে সংঘটিত হবে? কারো কারো মতে এ আযাব কেয়ামতের প্রাক্কালে ইহুদীদের উপর অবতীর্ণ হবে। আবার কারো কারো মতে এ আযাব সংঘটিত হবার নয়। কারণ, তাদের কেউ কেউ ঈমান নিয়ে এসেছিল।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহঃ) বলেন, আমার মতে এ প্রশ্নই আসতে পারে না। কারণ, কোরআনে এমন কোন শব্দের উল্লেখ নেই, যাতে বোঝা যায় যে, ঈমান যদি না আন তবে অবশ্যই এ আযাব আসবে, বরং সম্ভাবনার উল্লেখ রয়েছে মাত্র। অর্থাৎ, যদি তাদের অপরাধের প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে মনে হয় তারা এমনি আযাবের যোগ্য। যদি আযাব দেয়া না হয়, তবে সেটা তাঁর একান্ত অনুগ্রহের ব্যাপার।

শেরকের সংজ্ঞা ও তার কয়েকটি দিক ঃ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যেসব বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, তেমন কোন বিশ্বাস সৃষ্ট বস্তুর ব্যাপারে পোষণ করাই হল শের্ক। এরই কিছু বিশ্লেষণ নিম্নরূপঃ

জ্ঞানের ক্ষেত্রে শরীক সাব্যস্ত করা ঃ অর্থাৎ, (১) কোন বুযুর্গ বা পীরের ব্যাপারে এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, আমাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি সর্বদা অবহিত। (২) কোন জ্যোতিষ-পণ্ডিতের কাছে গায়বের সংবাদ জিজ্ঞেস করা কিংবা (৩) কোন বুযুর্গের বাক্যে মঙ্গল দেখে তাকে অনিবার্য মনে করে নেয়া অথবা (৪) কাউকে দূর থেকে ডাকা এবং সাথে সাথে এ কথা বিশ্বাস করা যে, সে আমার ডাক শুনে নিয়েছে অথবা (৫) কারো নামে রোযা রাখা।

ক্ষমতার ক্ষেত্রে শরীক করা ঃ অর্থাৎ, কাউকে হিত কিংবা অহিত তথা ক্ষতি-বৃদ্ধি সাধনের অধিকারী মনে করা। কারো কাছে উদ্দেশ্য যাঞ্চা করা। কারো কাছে রুযী-রোযগার বা সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করা।

এবাদতে শরীক সাব্যস্ত করা ঃ কাউকে সেজদা করা, কারো নামে কোন পশু মুক্ত করা, কারো নামে মানত করা, কারো কবর কিংবা বাড়ী-ঘরের তওয়াফ করা, আল্লাহ্ তাআলার কোন হুকুমের তুলনায় অপর কারো কথা কিংবা কোন প্রথাকে প্রাধান্য দেয়া, কারো সামনে রুকূ করার মত অবনত হওয়া, কারো নামে জীব কোরবানী করা, পার্থিব কাজ-কারবার কিংবা বিবর্তনকে নক্ষত্রের প্রভাব বলে বিশ্বাস করা এবং কোন কোন মাসকে অশুভ মনে করা প্রভৃতি।

আত্মপ্রশংসা করা এবং নিজেকে ত্রুটিমুক্ত মনে করা বৈধ নয় ঃ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم — ইহুদীরা নিজেদেরকে

পূত-পবিত্র বলে বর্ণনা করত। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলেছেন, তাদের দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখ, যারা নিজেরাই নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করে; তাদের ব্যাপারে বিস্মিত হওয়াই উচিত।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কারো পক্ষে নিজের কিংবা অন্য কারো পবিত্রতা বর্ণনা করা জায়েয নয়। এই নিষিদ্ধতার তিনটি কারণ রয়েছে—

(১) অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপ্রশংসার কারণ হয়ে থাকে কেবর তথা অহমিকা বা আত্মগর্ব। কাজেই মূলতঃ এই নিষিদ্ধতাও কেবরেরই জন্য হয়ে থাকে।

(২) দ্বিতীয়তঃ শেষ পরিণতি সম্পর্কে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই অবগত যে, তা পবিত্রতা কিংবা পরহেযগারীর মধ্যেই হবে কিনা। কাজেই নিজে নিজেকে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করা খোদাভীতির পরিপন্থী। এক রেওয়ায়েতে হযরত সালমা বিনতে যয়নব (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? তখন যেহেতু আমার নাম ছিল برة (বাররাহ্ অর্থাৎ, পাপমুক্ত), কাজেই আমি তাই বললাম। তাতে হুযুর (সাঃ) বললেন— لاتزكوا انفسكم الله اعلم البر منكم অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা নিজেকে পাপ-মুক্ত বলে বর্ণনা করো না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন, তোমাদের মধ্যে কে পবিত্র। অতঃপর বাররাহ্ নামটি পাল্টিয়ে তিনি যয়নব রেখে দিলেন।— (মাযহারী)

(৩) নিষিদ্ধতার তৃতীয় কারণটি হল এই যে, অধিকাংশ সময় এ ধরনের দাবী করতে গিয়ে মানুষের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে যে, সেলোক আল্লাহ্ তাআলার দরবারে এজন্য প্রিয় যে, সে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। অথচ কথাটি সর্বৈব মিথ্যা। কারণ, মানুষের মধ্যে অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান থাকে।— (বয়ানুল-কোরআন)

মাসআলা ঃ যদি উল্লেখিত কারণগুলো না থাকে, তাহলে নেয়ামতের প্রকাশকল্পে নিজের গুণ বর্ণনা করার অনুমতি রয়েছে।— (বয়ানুল-কোরআন)

'জ্বিবত' ও 'তাগূত'-এর মর্ম ঃ উল্লেখিত একান্নতম আয়াতে 'জ্বিবত' ও 'তাগূত' শীর্ষক দু'টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। শব্দ দু'টির মর্ম সম্পর্কে তফসীরকার মনীষীবৃন্দের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবিসিনীয় ভাষায় 'জ্বিবত' বলা হয় জাদুকরকে। আর 'তাগূত' বলা হয় গণক বা জ্যোতিষীকে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন যে, 'জ্বিবত' অর্থ জাদু এবং 'তাগূত' অর্থ শয়তান। হযরত মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত যে সমস্ত জিনিসের উপাসনা করা হয়, সে সবই 'তাগূত' বলে অভিহিত হয়।

ইমাম কুরতুবী বলেন যে, মালেক ইবনে আনাস (রাঃ)-এর উক্তিটিই অধিক পছন্দনীয়। তার কারণ, কোরআন থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এরশাদ হয়েছে ঃ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (আল্লাহ্র এবাদত কর এবং 'তাগূত' থেকে বেঁচে থাক।) কিন্তু উল্লেখিত বিভিন্ন মতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কাজেই এর যে কোনটিই অর্থ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে 'জ্বিবত' প্রতিমাকেই বোঝাত, পরে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য পূজ্য বস্তুতে এর প্রয়োগ হতে আরম্ভ করে।— (রূহুল-মা'আনী)

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ইহুদীদের সরদার হুইয়াই ইবনে আখতাব ও কা'ব ইবনে আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর নিজেদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে কোরাইশদের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশে মক্কায় এসে উপস্থিত হয়। ইহুদী সরদার কা'ব ইবনে আশরাফ আবু সুফিয়ানের কাছে এসে হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে তাদের সাথে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন মক্কাবাসীরা কা'ব ইবনে আশরাফকে বলল, তোমরা হলে একটি প্রতারক সম্প্রদায়। সত্য সত্যই যদি তোমরা তোমাদের এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সত্য হয়ে থাক, তবে আমাদের এ দু'টি মূর্তির (জ্বিবত ও তাগূতের) সামনে সেজদা কর।

সুতরাং সে কোরাইশদিগকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে তাই করল। তারপর কা'ব কোরাইশদিগকে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন এবং আমাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন লোক এগিয়ে আস, যাতে আমরা সবাই মিলে কা'বার প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে এ ওয়াদা করে নিতে পারি যে, আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

কা'বের এ প্রস্তাব কোরাইশরাও পছন্দ করল এবং সেভাবে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধ একটি ঐক্যজোট গঠন করল। অতঃপর আবু সুফিয়ান কা'বকে বলল, তোমরা হলে শিক্ষিত লোক; তোমাদের নিকট আল্লাহ্র কিতাব রয়েছে, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ মূর্খ। সুতরাং তুমিই আমাদেরকে বল, প্রকৃতপক্ষে আমরা ন্যায়ের উপর রয়েছি, নাকি মুহাম্মদ (সাঃ) ন্যায়ের উপর রয়েছেন?

তখন কা'ব জিজ্ঞেস করল, তোমাদের দ্বীন কি? আবু সুফিয়ান উত্তরে বলল, আমরা হজ্বের জন্য নিজেদের উট জবাই করি এবং সেগুলোর দুধ খাওয়াই, মেহমানদিগকে দাওয়াত করি, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখি এবং বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্র ঘর)-এর তওয়াফ করি, ওমরা আদায় করি। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর পৈত্রিক ধর্ম পরিহার করেছেন, নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হয়ে গেছেন এবং সর্বোপরি তিনি আমাদের সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে নিজের এক নতুন ধর্ম উপস্থাপন করেছেন। এসব কথা শোনার পর কা'ব ইবনে আশরাফ বলল, তোমরাই ন্যায়ের উপর রয়েছ। মুহাম্মদ (সাঃ) গোমরাহ হয়ে গেছেন।—(নাউযুবিল্লাহ্)

এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করে ওদের মিথ্যা ও প্রতারণার নিন্দা করেন।— (রূহুল-মা'আনী)

রিপুর কামনা-বাসনা অনেক সময় মানুষকে দ্বীন ও ঈমান থেকে বঞ্চিত করে দেয় ঃ কা'ব ইবনে আশরাফ ছিল বিশিষ্ট ইহুদী পন্ডিত। সে আল্লাহ্তে বিশ্বাস পোষণ করত এবং তাঁরই এবাদত-বন্দেগী করত। কিন্তু তার মন-মস্তিষ্কে যখন রৈপিক কামনা-বাসনার পিশাচ চেপে বসল, তখন সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোরাইশদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে প্ররোচিত হয়। কোরাইশরা তার সাথে ঐক্যজোট করার জন্য শর্ত আরোপ করল যে, তাদেরকে আমাদের দেব-দেবীর সামনে সেজদা করতে হবে। সে তা মেনে নিল, যা আগেই বলা হয়েছে। সে নিজের ধর্মের বিরুদ্ধে কোরাইশদের শর্ত বাস্তবায়িত করলো বটে, কিন্তু স্বীয় ধর্ম-বিশ্বাসকে ঠিক রাখার জন্য তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া পছন্দ করলো না। কোরআনে-করীম অন্য

জায়গায় বাল্'আম বাঊরার ব্যাপারেও এমন ধরনের ঘটনা বিবৃত করেছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ

এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শুধু কিতাব সম্পর্কিত এলেম বা জ্ঞান থাকাটাই কল্যাণ ও মঙ্গলকর হতে পারে না, যে পর্যন্ত না যথার্থভাবে তার অনুসরণ করা হবে এবং যে পর্যন্ত না হীন পার্থিব লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করতে পারবে। তা না হলে মানুষ তার ধর্ম হেন প্রিয় বস্তুকেও স্বীয় রৈপিক কামনা-বাসনার বলীতে পরিণত করা থেকে বাঁচতে পারে না। ইদানীংকালেও কোন কোন লোক এমন রয়েছে, যারা জৈবিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বীয় সত্য মতকে অতি সহজে বর্জন করে বসে এবং ধর্ম বিবর্জিত বিশ্বাস ও মতবাদকে ইসলামের ছদ্মাবরণে উপস্থিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। না তাদের মনে আল্লাহ্র সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কোন পরোয়া থাকে, আর না থাকে আখেরাতের কোন রকম ভয়-ভীতি। বস্তুতঃ এ সমস্ত কিছুই সত্য সঠিক মতবাদকে বর্জন করে শয়তানের ইঙ্গিতে চলার পরিণতি।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, বাল্আম-বাউরা একজন বিশিষ্ট ইহুদী আলেম ও উচ্চস্তরের দরবেশ ছিল। কিন্তু যখন সে নিজের রৈপিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে অশুভ চক্রান্ত করতে আরম্ভ করল, তখন মূসা (আঃ)-এর কোনই ক্ষতি হলো না। কিন্তু সে নিজে গোমরাহ্ হয়ে চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হল।

আল্লাহ্র অভিসম্পাত ইহ ও পরকালীন অপমানের কারণ ঃ লা'নত বা অভিসম্পাত অর্থ হলো আল্লাহ্র রহমত ও করুণা থেকে দূরে সরে পড়া—চরম অপমান-অপদস্থতা। যার উপর আল্লাহ্র লা'নত পতিত হয় সে কখনও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে পারে না। তাদের সম্পর্কে অতি কঠিন ভর্ৎসনার কথা বলা হয়েছে। কোরআনে আছে—

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا

অর্থাৎ, "যাদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত হয়েছে, তারা যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই নিহত অথবা ধৃত হবে।" এই তো গেল তাদের পার্থিব অপমান। আখেরাতে তাদের অপমান এর চেয়েও কঠিন হবে।

আল্লাহ্র লা'নতের অধিকারী কারা ঃ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, যার উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হয়, তার কোন সাহায্যকারী থাকে না। এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, আল্লাহ্র লা'নতের যোগ্য কারা?

এক হাদীসে আছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) সুদগ্রহীতা এবং সুদ দাতা, সুদ সংক্রান্ত দলীল সম্পাদনকারী এবং সুদের লেনদেনের সাক্ষী সবার প্রতিই অভিসম্পাত করেছেন। এদের সবাই পাপের ক্ষেত্রে সমান।—(মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "যে লোক লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত হবে সে অভিশপ্ত হবে।" অতঃপর তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা চোরদের প্রতিও অভিসম্পাত করেন। যে ডিম কিংবা রশির মত সাধারণ বস্তুও চুরি থেকে বিরত থাকে না, তারও হস্তকর্তন করা হয়।— (মেশকাত)

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে 'সুদগ্রহীতা ও দাতার উপর আল্লাহ্ তাআলার লা'নত এবং সে সমস্ত নারীর উপর যারা নিজের শরীর গোদায়, যে অন্যের শরীরও গুদিয়ে দেয়, তেমনিভাবে চিত্রকরের উপরও আল্লাহ্র লা'নত।'

অপর এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্ তাআলা লা'নত করেন মদ্যপায়ীর প্রতি, মদ যে ব্যক্তি পান করায় তার প্রতি, তার বিক্রেতা ও ক্রেতার প্রতি, যে মদের জন্য নির্যাস বের করে তার প্রতি এবং যারা মদ্য বহন করে তাদের সবার প্রতি।— (মেশকাত)

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন,— ছয় প্রকার লোক রয়েছে যাদের প্রতি আমি অভিসম্পাত করেছি এবং আল্লাহ্ তাআলাও লা'নত করেছেন। আর প্রত্যেক নবীই মুস্তাজাবুদ্দাওয়াত হয়ে থাকেন। সে ছয় প্রকার লোক নিম্নরূপ ঃ

(১) আল্লাহ্র কিতাবে যারা কাট্-ছাঁট করে, (২) যারা বলপূর্বক ক্ষমতা লাভ করে এবং এমনসব লোককে সম্মানে ভূষিত করে, যাদেরকে আল্লাহ্ অপদস্থ করেছেন আর এমন সব লোককে অপমানিত করে যাদেরকে আল্লাহ্ সম্মান দান করেছেন (৩) যারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীর বা নিয়তিকে অবিশ্বাস করে। (৪) যারা আল্লাহ্ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুসামগ্রীকে হালাল মনে করে। (৫) বিশেষতঃ আমার বংশধরগণের মধ্যে সে সমস্ত লোক যারা হারামকে হালাল করে নেয় এবং (৬) যে লোক আমার সুন্নতকে বর্জন করে।— (বায়হাকী)

মাসআলা ঃ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি সম্পর্কে-যদি সে ফাসেকও হয়ে থাকে, যে পর্যন্ত একথা নিশ্চিতভাবে জানা না যায় যে, তার মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হয়েছে, সে পর্যন্ত তার উপর লা'নত করা জায়েয নয়। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই আল্লামা শামী এযীদের উপর লা'নত করতে বারণ করেছেন। তবে কুফরী অবস্থায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত জানা থাকলে তার উপর লা'নত করা জায়েয। যেমন, আবু জাহ্ল, আবু লাহাব প্রভৃতি।—(শামী, ২য় খণ্ড, ৮৩৬ পৃঃ)

মাসআলা ঃ কারও নাম না করে এভাবে লা'নত করা জায়েয যে, জালেমদের উপর কিংবা মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক।

মাসআলাঃ লা'নতের আভিধানিক অর্থ আল্লাহ্র রহমত হতে দূর হয়ে যাওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ কাফেরদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে, রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর মুমিনদের ক্ষেত্রে হলে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভকারী (সৎকর্মশীলদের) মর্যাদা থেকে নীচে পড়ে যাওয়া। সে জন্যই কোন মুসলমানের জন্য তার নেক আমল কমে যাওয়ার দোয়া করা জায়েয নয়।— (কাহ্তানী থেকে শামী কতৃক উদ্ধৃত ঃ ২য় খণ্ড, ৮৩৬ পৃঃ)

ইহুদীদের হিংসা ও তার কঠোর নিন্দা ঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সাঃ)-কে যে জ্ঞানৈশ্বর্য ও শান-শওকত দান করেছিলেন, তা দেখে ইহুদীরা হিংসার অনলে জ্বলে মরতো। আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য ৫৩ ও ৫৪তম আয়াতে ওদের সে হিংসা-বিদ্বেষের কঠোর নিন্দা করেছেন এবং তাদের বিদ্বেষকে একান্ত অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করে তার দু'টি

والمحصنٰت ٥ ٨٨ النسآء ٤

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ
سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ۚ كُلَّمَا
نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٥٦﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ
لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۫ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿٥٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ
يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا
الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ
اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ
اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ
اَنْ يَّتَحَاكَمُوْۤا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْۤا اَنْ يَّكْفُرُوْا
بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿٦٠﴾

(৫৫) অতঃপর তাদের কেউ তাকে মান্য করেছে আবার কেউ তার কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে। বস্তুতঃ (তাদের জন্য) দোযখের শিখায়িত আগুনই যথেষ্ট। (৫৬) এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী। (৫৭) আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, অবশ্যই আমি প্রবিষ্ট করাব তাদেরকে জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ। তাদেরকে আমি প্রবিষ্ট করব ঘন ছায়ানীড়ে। (৫৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ্ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। (৫৯) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর—যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (৬০) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।

কারণ বর্ণনা করেছেন। একটি কারণ ব্যক্ত হয়েছে ৫৩তম আয়াতে এবং দ্বিতীয় কারণটি ৫৪তম আয়াতে। কিন্তু এ দু'টির মর্ম মূলতঃ একই। তা হল এই যে, আল্লাহ্ বলেছেন যে, তোমাদের এই হিংসা, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ-এর কারণটা কি? যদি এ কারণে হয়ে থাকে যে, তোমরাই প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী অথচ তা তোমাদের হাতে না এসে তিনি পেয়ে গেছেন, তাহলে তোমাদের এ ধারণা যে একান্তই ভ্রান্ত তা সুস্পষ্ট। কারণ, এখন তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তোমরা যদি তা থেকে কোন অংশ প্রাপ্ত হতে, তাহলে তোমরা তো জন্য কাউকে একটি কড়িও দিতে না। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের এ বিদ্বেষ এ কারণে হয়ে থাকে যে, রাজক্ষমতা না হয় আমরা না-ই পেলাম, কিন্তু তাঁর হাতে কেন যাবে? রাষ্ট্রের সাথে তাঁর কি সম্পর্ক। তাহলে তার উত্তর হল এই যে, ইনিও নবীগণেরই বংশধর, যাঁদের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পূর্ব থেকেই ছিল। কাজেই রাষ্ট্র কোন অপাত্রে অর্পিত হয়নি। অতএব, তোমাদের ঈর্ষা একান্তভাবেই অযৌক্তিক।

ঈর্ষার সংজ্ঞা তার বিধান এবং অপকারিতাসমূহ ঃ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাতা আল্লামা নবভী (রহঃ) হাসাদ বা ঈর্ষার সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে বলেছেন—

"অন্যের প্রাপ্ত নেয়ামতের অপসারণ কামনা করার নামই হলো হাসাদ বা ঈর্ষা।" আর এটি হারাম।

মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

"তোমরা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে রেখো না: বরং আল্লাহ্র বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি তিন দিনের বেশী সময় পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা জায়েয নয়।"—(মুসলিম, ২য় খণ্ড)

– "তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাক। কারণ, হিংসা মানুষের সৎকর্মসমূহকে তেমনিভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন করে আগুন খেয়ে ফেলে কাঠকে।"—(আবু-দাউদ)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ আয়াতে তফসীর প্রসঙ্গে হযরত মু'আয (রাঃ) বলেছেন যে, তাদের শরীরের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন সেগুলো পাল্টিয়ে দেয়া হবে এবং এ কাজটি এত দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হবে যে, এক মুহূর্তে শতবার চামড়া পাল্টানো যাবে। আর হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন,

— "আগুন তাদের চামড়াকে একদিনে সত্তর হাজারবার খাবে। যখন তাদের চামড়া খেয়ে ফেলবে, অমনি সেসব লোককে বলা হবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাও। সাথে সাথে সেগুলো পূর্বের মত হয়ে যাবে।—(মাযহারী, ২য় খণ্ড)

আয়াতের শানে-নুযূলঃ আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতটি নাযিল হওয়ার একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। তাহল এই যে, ইসলাম-পূর্বকালেও কা'বা ঘরের সেবাকে এক বিশেষ মর্যাদার কাজ মনে

করা হত। খানায়ে-কা'বার কোন বিশেষ খেদমতের জন্য যারা নির্বাচিত হত, তারা গোটা সমাজ তথা জাতির মাঝে সম্মানিত ও বিশিষ্ট বলে পরিগণিত হত। সে জন্যই বায়তুল্লাহ্র বিশেষ খেদমত বিভিন্ন লোকের মাঝে ভাগ করে দেয়া হত। জাহেলিয়াত আমল থেকেই হজ্বের মওসুমে হাজীদিগকে 'যমযম' কূপের পানি পান করানোর সেবা মহানবী (সাঃ)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাসের (রাঃ) উপর ন্যস্ত ছিল। একে বলা হত 'সেকায়া।' এমনি করে অন্যান্য আরো কিছু কিছু সেবার দায়িত্ব হুযুর (সাঃ)-এর অন্য পিতৃব্য আবু তালেবের উপর এবং কা'বা ঘরের চাবি নিজের কাছে রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে তা খুলে দেয়া ও বন্ধ করার ভার ছিল ওসমান ইবনে তালহার উপর।

এ ব্যাপারে স্বয়ং ওসমান ইবনে তালহার ভাষ্য হল এই যে, জাহেলিয়াত আমলে আমরা সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন বায়তুল্লাহ্র দরজা খুলে দিতাম এবং মানুষ তাতে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করত। হিজরতের পূর্বে একবার মহানবী (সাঃ) কতিপয় সাহাবীসহ বায়তুল্লা হতে প্রবেশের উদ্দেশে তশরীফ নিয়ে গেলে ওসমান (যিনি তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি) তাঁকে ভেতরে প্রবেশে বাধা দিলেন এবং অত্যন্ত বিরক্তি প্রদর্শন করলেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) অত্যন্ত ধৈর্য ও গাম্ভীর্য সহকারে ওসমানের কটূক্তিসমূহ সহ্য করে নিলেন। অতঃপর বললেন, হে ওসমান! হয়তো তুমি এক সময় বায়তুল্লাহ্র এই চাবি আমার হাতেই দেখতে পাবে। তখন যাকে ইচ্ছা এই চাবি অর্পণ করার অধিকার আমারই থাকবে। ওসমান ইবনে তালহা বলল, তাই যদি হয়, তবে সেদিন কোরাইশরা অপমানিত অপদস্থ হয়ে পড়বে। হুযুর বললেন, না, তা নয়। তখন কোরাইশরা আযাদ হবে, তারা হবে যথার্থ সম্মানে সম্মানিত। এ কথা বলতে বলতে তিনি বায়তুল্লাহ্র ভেতরে তশরীফ নিয়ে গেলেন। (ওসমান বলেন), তারপর আমি যখন আমার মনের ভেতর অনুসন্ধান করলাম, তখন আমার যেন নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তিনি যাকিছু বললেন, তা অবশ্যই ঘটবে। সে মুহূর্তেই আমি মুসলমান হয়ে যাবার সংকল্প নিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি আমার সম্প্রদায়ের মতিগতি পরিবর্তিত দেখতে পেলাম। তারা আমাকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করতে লাগল। কাজেই আমি আর আমার (মুসলমান হওয়ার) সংকল্প বাস্তবায়িত করতে পারলাম না। অতঃপর মক্কা বিজিত হয়ে গেলে পর রসূলে করীম (সাঃ) আমাকে ডেকে বায়তুল্লাহ্র চাবি চাইলেন। আমি তা পেশ করে দিলাম।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, ওসমান ইবনে তালহা চাবি নিয়ে বায়তুল্লাহ্র উপরে উঠে গেলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) মহানবীর নির্দেশ পালনকল্পে তার নিকট থেকে বলপূর্বক চাবি ছিনিয়ে নিয়ে হুযুরের হাতে অর্পণ করলেন। যাহোক, বায়তুল্লায় প্রবেশ এবং সেখানে নামায আদায় করার পর মহানবী (সাঃ) যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন, তখন পুনরায় আমার হাতেই সে চাবি ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ এই নাও, এখন থেকে এ চাবি কেয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরদের হাতেই থাকবে। অন্য যে কেউ তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নিতে চাইবে, সে হবে যালেম, অত্যাচারী। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নেবার কোন অধিকার কারোরই থাকবে না। এতদসঙ্গে তিনি এই হেদায়েত করলেন যে, বায়তুল্লাহ্র এই খেদমত তথা সেবার বিনিময়ে তোমরা যে সম্পদ প্রাপ্ত হবে, তা শরীয়তের রীতি মোতাবেক ব্যবহার করবে।

ওসমান ইবনে তালহা বলেন, যখন আমি চাবি নিয়ে হৃষ্টচিত্তে চলে আসছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। বললেন, ওসমান, আমি যা বলেছিলাম তাই হল নাকি? তৎক্ষণাৎ আমার সে কথাটি মনে হয়ে গেল, হিজরতের পূর্বে যা তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, "একদিন এ চাবি আমার হাতে দেখতে পারে।" তখন আমি নিবেদন করলাম, নিঃসন্দেহে আপনার কথা বাস্তবায়িত হয়েছে—আর এক্ষণে আমিও কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম।— (মাযহারী)

হযরত ফারূকে আ'যম ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে, সেদিন যখন মহানবী (সাঃ) বায়তুল্লাহ্ থেকে বেরিয়ে আসেন তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি আবৃত হচ্ছিল।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তাআলা তোমাদিগকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার অধিকারীর নিকট অর্পণ করে দাও।" এ হুকুমের লক্ষ্য সাধারণ মুসলমানরাও হতে পারে কিংবা বিশেষভাবে ক্ষমতাসীন শাসকবর্গও হতে পারেন। তবে সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয় হল এই যে, এমন সবাই এর লক্ষ্য যারা আমানতের রক্ষক বা আমানতদার। এতে সাধারণ জনগণ ও শাসকবর্গ সবাই অন্তর্ভুক্ত।

আমানত পরিশোধের তাকীদ ঃ বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, যার দায়িত্বে কোন আমানত থাকবে, সে আমানত প্রাপককে পৌঁছে দেয়া তার একান্ত কর্তব্য। রসূলে করীম (সাঃ) আমানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ প্রদান করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এমন খুব কম হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) কোন ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে একথা বলেননি—

"যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। "আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিয়মানুবর্তিতা নেই, তার ধর্ম নেই।"— (শোআবুল ঈমান)

খেয়ানত মুনাফেকীর লক্ষণ ঃ বোখারী ও মুসলিমের হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদিন মুনাফেকীর লক্ষণসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি লক্ষণ এটাও বলেছিলেন যে, যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে তাতে খেয়ানত করে।

আমানতের প্রকারভেদ ঃ এখানে লক্ষণীয় যে, কোরআন করীম আমানতের বিষয়টিকে امانات বহুবচনে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, কারো নিকট অপর কারো কোন বস্তু বা সম্পদ গচ্ছিত রাখাটাই শুধুমাত্র 'আমানত' নয়, যাকে সাধারণতঃ আমানত বলে অভিহিত করা হয় এবং মনে করা হয়; বরং আমানতের আরও কিছু প্রকারভেদ রয়েছে। আয়াতের শানে-নুযূল প্রসঙ্গে এখনই যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তাও কোন বস্তুগত আমানত ছিল না। কারণ, বায়তুল্লাহ্র চাবি বিশেষ কোন বস্তু নয়, বরং তা ছিল বায়তুল্লাহ্র খেদমতের একটা পদের নিদর্শন।

রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার আমানতঃ এতে প্রতীয়মান হয়, রাষ্ট্রীয় যত পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে, সেসবই আল্লাহ্ তাআলার আমানত। যাদের হাতে নিয়োগ-বরখাস্তের অধিকার রয়েছে সে

সমস্ত কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দ হলেন সে পদের আমানতদার। কাজেই তাদের পক্ষে কোন পদ এমন কাউকে অর্পণ করা জায়েয নয়, যে লোক তার যোগ্য নয়, বরং প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

কোন পদে অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগকর্তা অভিসম্পাতযোগ্যঃ যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ শর্ত মোতাবেক কোন লোক পাওয়া না গেলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যোগ্যতা ও আমানতদারী তথা সততার দিক দিয়ে যে সবচেয়ে অগ্রবর্তী হবে, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যাকে সাধারণ মুসলমানদের কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তারপর যদি কাউকে তার যোগ্যতা যাচাই ছাড়াই একান্ত বন্ধুত্ব কিংবা সম্পর্কের কারণে কোন পদে নিয়োগ প্রদান করে, তবে তার উপর আল্লাহ্র লা'নত হবে। না তার ফরয (এবাদত) কবুল হবে, না নফল। এমন কি সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে।— (জমউল-ফাওয়ায়েদ, ৩২৫ পৃঃ)

ন্যায়বিচার বিশ্ব-শান্তির জামিনঃ আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে আমানত পরিশোধের এবং দ্বিতীয় বাক্যে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে আমানত পরিশোধ বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এর অবর্তমানে কোথাও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না। কাজেই যাদের হাতে দেশের শাসনক্ষমতা থাকবে, তাদেরকে প্রথমে গচ্ছিত এই আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। অর্থাৎ, সরকারী পদসমূহে সেসব লোককেই নিয়োগ করতে হবে যাদেরকে সর্বাধিক যোগ্য বলে মনে করবে। কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা কোন সুপারিশ অথবা ঘুষ-উৎকোচ যেন কোনক্রমেই প্রশ্রয় পেতে না পারে। অন্যথায় এর ফলে অযোগ্য, অথর্ব, আত্মসাৎকারী ও অত্যাচারী লোক সরকারী পদের অধিকারী হয়ে আসবে। অতঃপর শাসকবর্গ যদি একান্তভাবেও দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কামনা করেন, তবুও তাদের পক্ষে সে লক্ষ্য অর্জন কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর হবে না। কারণ, এসব সরকারী কর্মচারীই হলো সমগ্র রাষ্ট্রের হাত-পা। এরাই যখন অন্যায় ও আত্মসাৎকারী হবে, তখন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার আর কি উপায় থাকবে।

এ আয়াতে বিশেষভাবে একটি কথা স্মরণযোগ্য যে, এতে মহান পরওয়ারদেগার সরকারী পদসমূহকেও আমানত বলে সাব্যস্ত করে প্রথমেই একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমানত যেমন শুধুমাত্র তাদেরকে প্রত্যর্পণ করতে হয় যারা তার প্রকৃত মালিক; কোন ফকীর-মিসকীনকে কারো আমানত দয়াপরবশ হয়ে দিয়ে দেয়া কিংবা কোন আত্মীয়-স্বজন অথবা বন্ধু-বান্ধবের প্রাপ্য হক আদায় করতে গিয়ে অন্য কারো আমানত তাদেরকে দিয়ে দেয়া জায়েয নয়। তেমনিভাবে সরকারী পদ-যার সাথে সর্বসাধারণের অধিকার জড়িত, তাও আমানতেরই অন্তর্ভুক্ত এবং একমাত্র সে সমস্ত লোকই এসব আমানতের অধিকারী, যারা নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে এসব পদের জন্য উপযোগী এবং উপস্থিত লোকদের মধ্যে উত্তম। আর বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর দিক দিয়েও যারা অন্যান্যদের তুলনায় অগ্রগণ্য। এদের ছাড়া অন্য কাউকে এসব পদ অর্পণ করা হলে আমানতের মর্যাদা রক্ষিত হবে না।

এলাকার ভিত্তিতে সরকারী পদ বন্টন ঃ এতদসঙ্গে কোরআনে হাকীম উল্লেখিত বাক্যের দ্বারা সেই সাধারণ ভুলেরও অপনোদন করে দিয়েছে, যা অধিকাংশ দেশের সংবিধানে প্রচলিত রয়েছে যে, সরকারী পদসমূহকে দেশের অধিবাসীবৃন্দের হক বা অধিকার বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

বস্তুতঃ এই মূলনীতিগত ভুলের ভিত্তিতে আইন রচনা করতে হয়েছে যে, সরকারী পদসমূহ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বন্টন করা হবে। দেশের প্রত্যেক প্রদেশ বা জেলার জন্য পৃথক পৃথক কোটা নির্ধারিত থাকবে। এক এলাকার কোটায় অপর এলাকার লোক নিয়োগ করা যাবে না, তা প্রার্থী যতই যোগ্য হোক না কেন। পক্ষান্তরে নির্ধারিত এলাকার প্রার্থী যতই অযোগ্য ও অকর্মণ্য হোক না কেন, তাকেই নিয়োগ করতে হবে। কোরআনে হাকীম পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছে যে, এসব পদ কারোই ব্যক্তিগত বা এলাকাগত অধিকার নয়, বরং এগুলো হলো রাষ্ট্রীয় আমানত, যা শুধুমাত্র এর যোগ্য প্রাপককেই অর্পণ করা যেতে পারে, তা সে যে কোন এলাকারই হোক। অবশ্য কোন বিশেষ এলাকা বা প্রদেশের শাসনকল্পে সে এলাকার মানুষকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে, যাতে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত থাকবে। কিন্তু তাতে শর্ত হলো এই যে, কাজের যোগ্যতা এবং আমানতদারীর ব্যাপারে তার উপর পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে।

সংবিধান সম্পর্কিত কয়েকটি মূলনীতিঃ এভাবে এই সংক্ষিপ্ত আয়াতে সংবিধান সম্পর্কিত কয়েকটি মৌলিক নীতির আলোচনাও এসে গেছে। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রথমতঃ আয়াতের প্রথম বাক্য إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ -এর দ্বারা আরম্ভ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃত হুকুম ও নির্দেশ দানের মালিক আল্লাহ্ তাআলা। পৃথিবীর শাসকবর্গ তাঁর আজ্ঞাবহ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শাসনক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের মালিকও একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই।

(২) দ্বিতীয়তঃ সরকারী পদসমূহ দেশের অধিবাসীদের অধিকার নয়, যা জনসংখার হারে বন্টন করা যেতে পারে ; বরং এগুলো হল আল্লাহ্ প্রদত্ত আমানত, যা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের পক্ষে যোগ্য ও যথার্থ লোককেই দেওয়া যেতে পারে।

(৩) তৃতীয়তঃ পৃথিবীতে মানুষের যে শাসন, তা শুধুমাত্র একজন প্রতিনিধি ও আমানতদার হিসেবেই হতে পারে। তারা দেশের আইন প্রণয়নে সে সমস্ত নীতিমালার অনুসরণে বাধ্য থাকবে যা একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বাতলে দেয়া হয়েছে।

(৪) চতুর্থতঃ তাদের নিকট যখন কোন মোকদ্দমা আসবে, তখন বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা এমন কি ধর্ম ও মতবাদের পার্থক্য না করে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করে দেয়া শাসন কর্তৃপক্ষের উপর ফরয।

এ আয়াতে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের এসব মূলনীতি বর্ণনার পর এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা খুবই উত্তম। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা সবার ফরিয়াদই শোনেন এবং যে লোক বলার কিংবা ফরিয়াদ করার সামর্থ্য রাখে না, তিনি তার অবস্থাও উত্তমভাবে দেখেন। অতএব, তাঁর রচিত নীতিমালাই সর্বদা সকল রাষ্ট্রের জন্য সর্বযুগে উপযোগী হতে পারে। পক্ষান্তরে মানবরচিত নীতিমালা ও সংবিধান

শুধুমাত্র নিজেদের পরিবেশেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেগুলোরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রথম আয়াতের লক্ষ্য যেমন শাসনকর্তৃপক্ষ ছিল, তেমনি দ্বিতীয় আয়াতে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্, রসূল এবং তোমাদের সচেতন নেতৃবর্গের অনুসরণ কর।

'উলিল আমর' কাকে বলা হয় : 'উলিল-আমর' আভিধানিক অর্থে সে সমস্ত লোককে বলা হয়, যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। সে কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও হাসান বসরী (রঃ) প্রমুখ মুফাসসেরগণ ওলামা ও ফোকাহা সম্প্রদায়কে 'উলিল-আমর' সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরাই হচ্ছেন মহানবী (সাঃ)-এর নায়েব বা প্রতিনিধি। তাঁদের হাতেই দ্বীনী ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব অর্পিত।

মুফাসসেরীনের অপর এক জামাআত—যাদের মধ্যে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামও রয়েছেন—বলেছেন যে, 'উলিল-আমর'-এর অর্থ হচ্ছে সে সমস্ত লোক যাদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত।

এছাড়া তফসীরে-ইবনে-কাসীর এবং তফসীরে-মাযহারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ শব্দটির দ্বারা (ওলামা ও শাসক) উভয় শ্রেণীকেই বোঝায়। কারণ, নির্দেশ দানের বিষয়টি তাঁদের উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত।

এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। তা এই যে, বিশ্‌র নামক এক মুনাফেক ছিল। কোন এক ইহুদীর সাথে তার বিবাদ বেধে যায়। ইহুদী লোকটি বলল, চল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে এর মীমাংসা করিয়ে নেই। কিন্তু মুনাফেক বিশ্‌র এ প্রস্তাবে সম্মত হল না। বরং সে কা'ব ইবনে আশরাফ নামক ইহুদীর কাছে গিয়ে মীমাংসা করাবার প্রস্তাব করল। কা'ব ইবনে আশরাফ ছিল ইহুদীদের একজন সর্দার এবং রসূলে করীম (সাঃ) ও মুসলমানদের কঠিন শত্রু। কাজেই বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিষয়টি ছিল একান্তই বিস্ময়কর যে, ইহুদী নিজেদের সর্দারকে বাদ দিয়ে মহানবী (সাঃ)-এর মীমাংসাকে পছন্দ করছিল, অথচ নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয়দানকারী বিশ্‌র হুযূরের স্থলে ইহুদী সর্দারের মীমাংসা গ্রহণ করছিল! কিন্তু এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, তাদের উভয়ের মনেই এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, রসূলে করীম (সাঃ) যে মীমাংসা করবেন তা একান্তই ন্যায়সঙ্গত করবেন। আর তাতে কারোই পক্ষপাতিত্বের কোন সন্দেহ-সংশয় ছিল না। কিন্তু যেহেতু বিরোধীয় বিষয়ে ইহুদী লোকটি ছিল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তার নিজেদের সর্দার অপেক্ষাও বেশী বিশ্বাস ছিল মহানবী (সাঃ)-এর উপর। পক্ষান্তরে মুনাফেক বিশর ছিল অন্যায়ের উপর। সে জন্য সে জানত যে, মহানবীর মীমাংসা তার বিরুদ্ধেই যাবে, যদিও আমি মুসলমান বলে পরিচিত।

যাহোক, এতদুভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির পর মহানবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের বিষয় তাঁরই মাধ্যমে মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত হল। অতঃপর মহানবী (সাঃ) মোকদ্দমার বিষয় অনুসন্ধান করলেন। তাতে ইহুদীর অধিকার প্রমাণিত হয় এবং তিনি তারই পক্ষে ফয়সালা করে দিলেন। আর বাহ্যিকভাবে মুসলমান বিশ্‌রকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এতে সে এ মীমাংসা মেনে নিতে অসম্মত হল এবং নতুন এক পন্থা উদ্ভাবন করল যে, কোনক্রমে ইহুদীকে রাযী করিয়ে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকট মীমাংসা করাতে নিয়ে যাবে। ইহুদীও তাতে সম্মত হয়। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, বিশ্‌র মনে করেছিল, যেহেতু হযরত ওমর কাফেরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন, কাজেই তিনি ইহুদীর পক্ষে রায় দেয়ার পরিবর্তে আমারই পক্ষে রায় দেবেন।

তাদের দু'জনই হযরত ওমর ফারূকের নিকট হাযির হল। ইহুদী লোকটি ফারূকে আযমের নিকট সমগ্র ঘটনা বিবৃত করে জানাল যে, এ মোকদ্দমার ফয়সালা হুযূর (সাঃ)-ও করেছেন, কিন্তু তাতে এ লোকটি সম্মত নয়। ফলে আপনার নিকট এসেছি।

হযরত ওমর বিশ্‌রকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি তাই? সে স্বীকার করল। তখন হযরত ফারূকে আযম বললেন, তাহলে একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসছি। একথা বলে তিনি ঘরের ভেতর থেকে একটি তলোয়ার নিয়ে এলেন এবং মুনাফেক লোকটিকে সাবাড় করে দিলেন। তিনি বললেন, যে লোক রসূলের (সাঃ) ফয়সালা মানতে রাযী নয়, এই হল তার মীমাংসা। (ঘটনাটি ছা'লাবী, ইবনে আবী হাতেম ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতক্রমে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত রয়েছে।)

সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরকারগণ এতদসঙ্গে একথাও লিখেছেন যে, এরপর নিহত মুনাফেকের ওয়ারিসানরা হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেছিল যে, তিনি শরীয়তসিদ্ধ কোন দলীল ছাড়াই একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন। তদুপরি নিহত লোকটিকে মুসলমান বলে প্রমাণ করার জন্য তার কথা ও কার্যগত কুফরীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য এবং নিহত ব্যক্তির মুনাফেক হওয়ার কথা প্রকাশ করে হযরত ওমরকে মুক্ত করে দিয়েছেন।

طاغوت শব্দের অর্থ ঔদ্ধত্য প্রকাশকারী। আর প্রচলিত অর্থে 'তাগূত' বলা হয় শয়তানকে। এ আয়াতে বিরোধীয় বিষয়টিকে কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট নিয়ে যাওয়াকে শয়তানের নিকট নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। তা এ কারণে যে, কা'ব নিজেই ছিল এক শয়তান। কিংবা এ কারণে যে, শরীয়তের ফয়সালা বর্জন করে শরীয়ত বিরোধী মীমাংসার দিকে ধাবিত হওয়া শয়তানেরই শিক্ষা হতে পারে। বস্তুতঃ যে লোক সে শিক্ষার অনুসরণ করেছে সে শয়তানেরই নিকট যেন নিজের মোকদ্দমা নিয়ে গেছে। সেজন্য আয়াতের শেষাংশে হেদায়েত দান করা হয়েছে যে, যে লোক শয়তানের অনুসরণ করবে, শয়তান তাকে পথভ্রষ্টতার সুদূর প্রান্তে নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদের সময় রসূলে করীম (সাঃ) কৃত মীমাংসাকে অমান্য করা কোন মুসলমানের কাজ হতে পারে না। যে কেউ এমন কাজ করবে, সে মুনাফেক ছাড়া আর কিছু নয়। আর যখন সে মুনাফেকের কাফের হওয়া কার্যতঃ এভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, সে মহানবী (সাঃ)-এর মীমাংসায় সম্মত হয়নি, তখন হযরত ফারূকে আযম কর্তৃক তাকে হত্যা করাও বৈধ হয়ে যায়। কারণ, তখন আর সে মুনাফেক থাকেনি, বরং প্রকাশ্য মুর্তাদ হয়ে যায়। কাজেই বলা হয়েছে— এরা এমন লোক, যখন

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا
أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ
وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن
رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا
عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا
فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ
بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن
لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

(৬১) আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে এসো—যা তিনি রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফেকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে। (৬২) এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন বিপদ আরোপিত হয়, তবে তাতে কি হল! অতঃপর তারা আপনার কাছে আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে যে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। (৬৩) এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহ্‌ তা'আলা অবগত। অতএব, আপনি ওদেরকে উপেক্ষা করুন এবং ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোন কথা বলুন যা তাদের জন্য কল্যাণকর। (৬৪) বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রসূলও যদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দিতেন, অবশ্যই তারা আল্লাহ্‌কে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত। (৬৫) অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। (৬৬) আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা নিজেদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তবে তারা তা করত না; অবশ্য তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন। যদি তারা তাই করে যা তাদের উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এবং তাদেরকে নিজের ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে। (৬৭) আর তখন অবশ্যই আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে মহান সওয়াব দেব। (৬৮) আর তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করব।

তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা সে নির্দেশের প্রতি চলে এসো, যা আল্লাহ্‌ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন এবং চলে এসো তাঁর রসূলের দিকে, তখন এসব মুনাফেক আপনার দিকে আসতে অনীহা প্রকাশ করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রসূল করীম (সাঃ)-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা কুফর ঃ এ আয়াতে রসূল করীম (সাঃ)-এর মহত্ত্ব ও সুউচ্চ মর্যাদার বিষয় প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের অসংখ্য আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত মহানবী (সাঃ)-এর আনুগত্যের অপরিহার্যতার বিষয়টি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা কসম খেয়ে বলেছেন যে, কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন কিংবা মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে ধীরস্থির মস্তিষ্কে মহানবী (সাঃ)-কে এভাবে স্বীকার করে নেবে যাতে তাঁর কোন সিদ্ধান্তেই মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না থাকে।

মহানবী (সাঃ) রসূল হিসাবে গোটা উম্মতের শাসক এবং যে কোন বিবাদের মীমাংসার যিম্মাদার। তাঁর শাসন ও সিদ্ধান্ত অপর কাউকে বিচারক সাব্যস্ত করার উপর নির্ভরশীল নয়। তার পরেও এ আয়াতে মুসলমানগণকে বিচারক সাব্যস্ত করে নিতে বলা হয়েছে। তার কারণ, সরকারীভাবে সাব্যস্তকৃত বিচারক এবং তার মীমাংসার উপর অনেকেরই সন্তুষ্টি আসে না, যেমনটি আসে নিজের মনোনীত বা সাব্যস্তকৃত সালিস বা বিচারকের উপর। কিন্তু মহানবী (সাঃ) শুধুমাত্র একজন শাসকই নন, বরং তিনি একজন নিষ্পাপ রসূল, রাহমাতুল লিল-আলামীন এবং উম্মতের জন্য একান্ত দয়ালু পিতাও বটেন। কাজেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যখনই কোন বিষয়ে, কোন সমস্যার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখনই রসূলে মকবুল (সাঃ)-কে বিচারক সাব্যস্ত করে তার মীমাংসা করিয়ে নেয়া এবং অতঃপর তাঁর মীমাংসাকে স্বীকার করে নিয়ে সেমতে কাজ করা উভয় পক্ষের উপর ফরয।

মতবিরোধের ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ)-কে বিচারক সাব্যস্ত করা ঃ কোরআনের তফসীরকারগণ বলেছেন যে, কোরআনের বাণীসমূহের উপর আমল করা মহানবী (সাঃ)-এর যুগের সাথেই সীমিত নয়। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পবিত্র শরীয়তের মীমাংসাই হল তাঁর মীমাংসা। কাজেই এ নির্দেশটি কেয়ামত পর্যন্ত তেমনিভাবে বলবৎ থাকবে, যেমন ছিল তাঁর যুগে। তখন যেমন সরাসরি (কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তকল্পে) তাঁর কাছে উপস্থিত করা হত, তেমনি তাঁর পরে তাঁর শরীয়তের মীমাংসা নিতে হবে। আর এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অনুসরণ।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল ঃ প্রথমতঃ সে ব্যক্তি আদৌ মুসলমান নয়, যে নিজের যাবতীয় বিবাদ ও মোকদ্দমায় রসূলে করীম (সাঃ)-এর মীমাংসায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে কারণেই হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) সে লোকটিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন, যে মহানবী (সাঃ)-এর মীমাংসায় রাযী হয়নি এবং পুনরায় বিষয়টি ফারূকে আযমের দরবারে নিয়ে গিয়েছিল। এই নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসবর্গ রসূলে করীম (সাঃ)-এর আদালতে হযরত ওমর ফারূকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যে, তিনি একজন মুসলমানকে অকারণে হত্যা করেছেন। এই মামলা হুযূরের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ما كنت اظن ان عمر يجترئ على قتل رجل مؤمن (অর্থাৎ, আমার ধারণা ছিল না যে, ওমর কোন মুমিনকে হত্যার সাহস করতে পারবে।) এতে প্রমাণিত হয় যে, উচ্চতর বিচারকের নিকট যদি কোন অধঃস্তন বিচারকের মীমাংসার ব্যাপারে আপীল করা হয়, তবে

তাঁকে স্বীয় অধঃস্তন বিচারকের পক্ষপাতিত্ব করার পরিবর্তে ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করা কর্তব্য। যেমন, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহানবী (সাঃ) হযরত ওমরের মীমাংসার বিরুদ্ধে অসন্তষ্টি প্রকাশ করেন। অতঃপর যখন এ আয়াত নাযিল হয়, তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আয়াতের ভিত্তিতে সে লোক মুমিনই ছিল না।

দ্বিতীয় মাসআলাঃ এ আয়াতের দ্বারা এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, فِيمَا شَجَرَ বাক্যটি শুধু আচার-অনুষ্ঠান কিংবা অধিকারের সাথেই সম্পৃক্ত নয় ; আকীদা, মতবাদ এবং অপরাপর বৈষয়িক বিষয়েও ব্যাপক।—(বাহ্‌রে মুহীত) অতএব, কোন সময় কোন বিষয়ে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিলে বিবাদ পরিহার করে উভয়পক্ষকে রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট এবং তাঁর অবর্তমানে তৎপ্রবর্তিত শরীয়তের আশ্রয়ে গিয়ে মীমাংসা অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয।

তৃতীয় মাসআলা ঃ এতে একথাও জানা গেল যে, যে কাজ বা বিষয় মহানবী (সাঃ) কর্তৃক কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত, তা সম্পাদন করতে গিয়ে মনে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব করাও ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। উদাহরণতঃ যেক্ষেত্রে শরীয়ত তায়াম্মুম করে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তায়াম্মুম করতে কেউ যদি সম্মত না হয়, তবে একে পরহেযগারী বলে মনে করা যাবে না, বরং এটা একান্তই মানসিক ব্যাধি। রসূলে করীম (সাঃ) অপেক্ষা কেউ বেশী পরহেযগার হতে পারে না। যে অবস্থায় মহানবী (সাঃ) বসে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন *এবং নিজেও বসে নামায আদায় করেছেন, কারো মন যদি এতে সম্মত না* হয় এবং অসহনীয় পরিশ্রম ও কষ্ট সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তবে তার জেনে রাখা উচিত যে, তার মন ব্যাধিগ্রস্ত। অবশ্য সাধারণ প্রয়োজন কিংবা কষ্টের সময় যদি প্রদত্ত অব্যাহতিকে পরিহার করে কষ্টের উপর আমল করে, তবে তা মহানবীর শিক্ষা অনুসারেই বৈধ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই শরীয়ত প্রদত্ত অব্যাহতির প্রতি সংকীর্ণতা অনুভব করা তাকওয়া নয়।

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ বিগত বিশ্লেষণের দ্বারা এ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর উম্মতের জন্য শুধুমাত্র একজন সংস্কারক এবং নৈতিক পথপ্রদর্শকই ছিলেন না, বরং তিনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকও ছিলেন। তদুপরি এমন শাসকও ছিলেন যাঁর সিদ্ধান্তকে ঈমান ও কুফরের মানদন্ড সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, মুনাফেক বিশ্‌রের ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হয়। আর এ বিষয়টি বিশ্লেষণের উদ্দেশেই আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় পবিত্র গ্রন্থের একাধিক জায়গায় স্বীয় আনুগত্যের সাথে সাথে রসূলে করীম (সাঃ)-এর আনুগত্যকেও অপরিহার্য বলে অভিহিত করেছেন।

কা'আব ইবনে আশরাফ ইহুদীকে প্রস্তাব করে এবং পরে বাধ্য হয়ে মহানবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়। আর হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর মীমাংসা যেহেতু তার বিরুদ্ধে হয়েছিল, সেহেতু সে তাতে আশ্বস্ত না হয়ে বরং পুনর্বার মীমাংসা করার জন্য হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হল। এ ঘটনা মদীনায় জানাজানি হয়ে গেলে ইহুদীরা মুসলমানগণকে ধিক্কার দিতে লাগল। পূর্ব কারণে আলোচিত বিশ্‌র ইবনে আহবারের ঘটনা মদীনায় জানাজানি হয়ে গেলে ইহুদীরা মুসলমানদেরকে এই বলে ভর্ৎসনা করত যে, তোমরা কেমন মানুষ! যাকে তোমরা রসুল বলে মান্য কর এবং তার অনুসরণ কর বলেও দাবী কর, তাঁর মীমাংসাসমূহকে স্বীকার কর না! ইহুদীদের প্রতি লক্ষ্য কর, তাদের গোনাহের তওবাকল্পে তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছিল যে, তোমাদের মধ্য থেকে একে অপরকে হত্যা কর, আমরা এহেন কঠিন নির্দেশ পর্যন্ত পালন করেছি। এমন কি এভাবে আমাদের সত্তর ব্যক্তি নিহত হয়। তোমাদেরকে যদি এমন কোন হুকুম দেয়া হত, তবে তোমরা কি করতে? আয়াতটিতে তারও উত্তর দেয়া হয়েছে যে, এই অবস্থা মুনাফেকদেরই হতে পারে, পাকা মুসলমানদের নয়। তার প্রমাণ হলো, এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন সাহাবায়ে-কেরামের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) মধ্য থেকে একজন বললেন, আল্লাহ্ আমাদিগকে এহেন (কঠিন) পরীক্ষার সম্মুখীন করেননি। সাহাবীর এ বাক্যটি রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যাদের অন্তরে পাহাড়ের মত সুদৃঢ় মজবুত ঈমান রয়েছে।" ইবনে ওহাব বলেন যে, এ বাক্য হল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এ আয়াত শুনে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র কসম, এ হুকুম নাযিল হলে আমি নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে এর জন্য কোরবান করে দিতাম। অবশ্য সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দেশত্যাগের নির্দেশ আমল করে দেখিয়েও দিয়েছেন। তাঁরা স্বীয় জন্মভূমি মক্কা, নিজেদের সমস্ত সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করে মদীনা অভিমুখে হিজরত করেছিলেন।

وَمَن يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
اللّٰهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِينَ
وَحَسُنَ أُولٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى
بِاللّٰهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا
ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَإِنْ
أَصٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ
شَهِيدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ أَصٰبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ
تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌ يٰلَيْتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ
فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾ فَلْيُقٰتِلْ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَن يُقٰتِلْ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ
فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾ وَمَا لَكُمْ
لَا تُقٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدٰنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا
مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن
لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

(৬৯) আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। (৭০) এটা হল আল্লাহ্-প্রদত্ত মহত্ব। আর আল্লাহ্ যথেষ্ট পরিজ্ঞাত। (৭১) হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়। (৭২) আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি। (৭৩) পক্ষান্তরে তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ আসলে তারা এমনভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কোন মিত্রতাই ছিল না। (বলবে) হায়, আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমিও যে সফলতা লাভ করতাম। (৭৪) কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জেহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব। (৭৫) আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জান্নাতের পদমর্যাদাসমূহ আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে : যে সমস্ত লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশিত বিষয়ের উপর আমল করবেন এবং আল্লাহ্ ও রসূলের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকবেন, তাঁদের পদমর্যাদা তাঁদেরই আমল তথা কৃতকর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ্ তাআলা নবী-রসূলগণের সাথে জান্নাতের উচ্চতর স্থানে জায়গা দেবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে নবীগণের পরবর্তী মর্যাদার লোকদের সাথে স্থান দেবেন। তাঁদেরকেই বলা হয় ছিদ্দীকীন। অর্থাৎ, তাঁরা হলেন সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ ও বিরোধিতা না করে প্রাথমিক পর্যায়েই ঈমান এনেছেন। যেমন, হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রমুখ। অতঃপর তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা থাকবেন শহীদগণের সাথে। শহীদ সে সমস্ত লোককে বলা হয়, যাঁরা আল্লাহর রাহে নিজেদের জান-মাল কোরবান করে দিয়েছেন। আর চতুর্থ শ্রেণীর লোকগণ থাকবেন সালেহীনদের সাথে। বস্তুতঃ সালেহীন হলেন সেসব লোক, যাঁরা জাহের ও বাতেন, প্রকাশ্য ও গোপন সব ক্ষেত্রেই সৎকর্মসমূহের যথাযথ অনুবর্তী।

সারকথা, আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যশীল বান্দাগণ সে সমস্ত মহান ব্যক্তিদের সাথে থাকবেন, যাঁরা আল্লাহ্ তাআলার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও মকবুল।

জান্নাতে দেখা সাক্ষাতের কয়েকটি দিক : (১) নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই একে অন্যকে দেখবেন। যেমন, মুয়াত্তা ইমাম মালেক গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন : জান্নাতবাসীরা নিজেদের জানালা দিয়ে উপরের শ্রেণীর লোকদেরকে তেমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমন পৃথিবীতে তোমরা তাদেরকে দেখ।

(২) উপরের শ্রেণীর লোকেরা নীচের শ্রেণীতে নেমে এসেও সাক্ষাৎ করবেন। যেমন, হযরত ইবনে জরীর (রহঃ) হযরত রবী' (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন যে, উপরের শ্রেণীর লোকেরা নীচের শ্রেণীতে নেমে আসবেন এবং তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও উঠা-বসা হবে।

তাছাড়া নীচের শ্রেণীর অধীবাসীদের জন্য উপরের শ্রেণীতে যাওয়ার অনুমতি লাভও হতে পারে। আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে রসূলে করীম (সাঃ) বহু লোককে জান্নাতে নিজের সাথে অবস্থানের সুসংবাদ দিয়েছেন।

প্রেম নৈকট্যের শর্ত : হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর সান্নিধ্য ও নৈকট্য তাঁর সাথে প্রেম ও মহব্বতের মাধ্যমেই লাভ হবে। সহীহ্ বোখারীতে হাদীসে মুতাওয়াতেরায় সাহাবায়ে কেরামের এক বিপুল জামাআত কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে : রসূলে করীম (সাঃ)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হল যে, "সে লোকটির মর্যাদা কেমন হবে, যে লোক কোন জামাত বা দলের সাথে ভালবাসা পোষণ করে, কিন্তু আমলের বেলায় এদলের নির্ধারিত মান পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি?" হুযূর (সাঃ) বললেন, المرء مع من احب অর্থাৎ, হাশরের মাঠে প্রতিটি লোকই যার সাথে তার ভালবাসা, তার সাথে থাকবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, পৃথিবীতে কোন কিছুতেই আমি এতটা আনন্দিত হইনি যতটা এ হাদীসের কারণে আনন্দিত হয়েছি। কারণ, এ হাদীসে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে যাঁদের

গভীর ভালবাসা রয়েছে তাঁরা হাশরের মাঠেও হুযূরের সাথেই থাকবেন।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর সান্নিধ্য লাভ কোন বর্ণ-গোত্রের উপর নির্ভরশীল নয় ঃ তিবরানী (রহঃ) জামে কবীর গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক হাবশী ব্যক্তি মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে এসে নিবেদন করলেন,— "ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের চাইতে আকার-আকৃতি, রং উভয় দিক দিয়েই সুন্দর ও অনন্য এবং নবুওয়তের দিক দিয়েও। এখন যদি আমি এ ব্যাপারেও ঈমান নিয়ে আসি, যাতে আপনার ঈমান রয়েছে এবং সেরূপ আমলও করি, যা আপনি করে থাকেন, তাহলে কি আমিও জান্নাতের মাঝে আপনার সাথে থাকতে পারব"।

মহানবী (সাঃ) বললেন, "হাঁ, অবশ্যই। তুমি তোমার হাবশীসুলভ কদাকৃতির জন্য চিন্তিত হয়ো না। সে সত্তার কসম, যাঁর মুঠোয় আমার প্রাণ, জান্নাতের মাঝে কাল রংয়ের হাবশীও সাদা ও সুন্দর হয়ে যাবে এবং এক হাজার বছরের দূরত্বে থেকেও চমকাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (কলেমায়) বিশ্বাসী হবে, তার মুক্তি ও কল্যাণ আল্লাহ্র দায়িত্বে এসে যায়। আর যে লোক 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' পড়ে, তার আমলনামায় একলক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হয়"।

সিদ্দীক-এর সংজ্ঞা ঃ দ্বিতীয় স্তর হল সিদ্দিকীনের। আর সিদ্দীক হলেন সে সমস্ত লোক যাঁরা মা'রেফত বা আল্লাহ্ তাআলার পরিচয় ল্যাভের ক্ষেত্রে নবীগণের কাছাকাছি। এর উদাহরণ এই যে, কোন লোক যেন কোন বস্তুকে দূর থেকে অবলোকন করছে। হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট কোন এক লোক জিজ্ঞেস করলেন যে, "আপনি কি আল্লাহ্ তাআলাকে দেখেছেন?" তিনি বলেছিলেন, "আমি এমন কোন কিছুর এবাদত করতে পারি না, যা আমি দেখিনি।" অতঃপর আরো বললেন,— "আল্লাহ্কে মানুষ স্বচক্ষে দেখেনি সত্য, কিন্তু মানুষের অন্তর ঈমানের আলোকে তাঁকে উপলব্ধি করে নেয়।" এখানে 'দেখা' বলতে হযরত আলী (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য হল স্বীয় জ্ঞানের গভীরতা সূক্ষ্মতার মাধ্যমে দেখার মতই উপলব্ধি করে নেয়া।

শহীদের সংজ্ঞা ঃ তৃতীয় স্তর হল শহীদগণের। আর শহীদ হলেন সে সমস্ত লোক, যাঁরা বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হন; তাঁরা তা প্রত্যক্ষ করেন না। তাঁদের উদাহরণ হল এমন, যেন কোন লোক কোন বস্তুকে আয়নার কাছে থেকে অবলোকন করছে। যেমন, হযরত হারেসা (রাঃ) বলেছেন, "আমার মনে হয় আমি যেন আমার মহান পরওয়ারদেগারের আরশ প্রত্যক্ষ করছি।"

তাছাড়া ان تعبد الله كانك تراه হাদীসটিতেও এমন ধরনের দেখার কথা বলা হয়েছে।

সালেহীনের সংজ্ঞা ঃ চতুর্থ স্তর হল সালেহীনের। যাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্যকে অনুসরণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিশ্চিত জেনে নেন। তাদের উদাহরণ হলো, কোন বস্তুকে দূরে থেকে আয়নার মধ্যে দেখা। আর হাদীসে فان لم تكن تراه فانه يراك যে বলা হয়েছে, তাতেও দেখা বা প্রত্যক্ষ করার এই স্তরের কথাই বোঝানো হয়েছে। ইমাম রাগেব ইস্পাহানীর এই পর্যালোচনার সার-নির্যাস হচ্ছে, এগুলোই হল 'মা' রেফতে-রব' বা আল্লাহ্ তাআলার পরিচয় লাভের স্তর। বস্তুতঃ এই মা'রেফতের স্তরের পার্থক্যহেতু মর্যাদাও বিভিন্ন। যাহোক, আয়াতের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। এতে মুসলমানদিগকে এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যশীল অনুসারীগণ তাঁদেরই সাথে থাকবে যাঁরা অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদের সবাইকে তোমার এমনি ভালবাসা লাভের তওফীক দান কর। আমীন।

কতিপয় অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا

حِذْرَكُمْ আয়াতের প্রথমাংশে জেহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের এবং অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে জেহাদে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে একটি বিষয় বোঝা যাচ্ছে এই যে, কোন ব্যাপারে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। এ বিষয়টি আরও কয়েক জায়গায় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বোঝা যাচ্ছে, এখানে অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হলেও এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু দেয়া হয়নি যে, এ অস্ত্রের কারণে তোমরা নিশ্চিতভাবেই নিরাপদ হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করাটা মূলতঃ মানসিক স্বস্তিলাভের জন্যই হয়ে থাকে। বাস্তবে এগুলো লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এরশাদ হয়েছে—

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا

অর্থাৎ, "হে নবী! আপনি বলে দিন, আমাদের উপর এমন কোন বিপদাপদই আসে না, যা আল্লাহ্ আমাদের তকদীর বা নিয়তিতে নির্ধারিত করে দেননি।"

১। এ আয়াতে প্রথমে জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ অতঃপর জেহাদের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার সুশৃংখল নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দু'টি বাক্য فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ব্যবহার করা হয়েছে। ثبة শব্দটি ثُبَاتٍ এর বহুবচন। এর অর্থ ক্ষুদ্র দল। অর্থাৎ, তোমরা যখন জেহাদের উদ্দেশে রওয়ানা হবে, তখন একা একা বেরোবে না, বরং ছোট ছোট দলে বেরোবে কিংবা (সম্মিলিত) বড় সৈন্যদল নিয়ে বেরোবে। তার কারণ, একা একা যুদ্ধ করতে গেলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। শত্রুরা এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেই শৈথিল্য করে না।

উৎপীড়িতের সাহায্য করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ঃ মক্কা নগরীতে এমন কিছু দুর্বল মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন, যারা দৈহিক দুর্বলতা এবং আর্থিক দৈন্যের কারণে হিজরত করতে পারছিলেন না। পরে কাফেররাও তাদেরকে হিজরত করতে বাধাদান করছিল এবং বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে আরম্ভ করেছিল, যাতে তারা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এদের কারো কারো নামও তফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস ও তাঁর মাতা, সালামা ইবনে হেশাম, ওলীদ ইবনে ওলীদ, আবু জান্দাল ইবনে সাহ্ল প্রমুখ।—(কুরতুবী) এসব সাহাবী নিজেদের ঈমানী বলিষ্ঠতার দরুন কাফেরদের অসহনীয়-উৎপীড়ন সহ্য করেও ঈমানের উপর স্থির থাকেন। অবশ্য তাঁরা এসব অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বরাবরই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মোনাজাত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করে নেন এবং মুসলমানদিগকে নির্দেশ দেন, যাতে তাঁরা জেহাদের মাধ্যমে সেই নিপীড়িতদেরকে কাফেরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন।

এ আয়াতে বোঝা যায়, মুমিনরা আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দু'টি বিষয়ের দোয়া করেছিলেন। একটি হলো এই যে, আমাদিগকে এই (মক্কা)

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ
إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ
لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ
عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ
اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا
أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ
خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾ أَيْنَمَا تَكُونُوا
يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ
حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ
هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ مَّا أَصَابَكَ مِنْ
حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ
لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ
فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

(৭৬) যারা ঈমানদার তারা যে জেহাদ করে আল্লাহ্‌র রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে— (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। (৭৭) তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জেহাদের নির্দেশ দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহ্‌কে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না। (হে রসূল,) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমাণও খর্ব করা হবে না। (৭৮) তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই— যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও। বস্তুতঃ তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও, এসবই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে, যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না। (৭৯) আপনার যে কল্যাণ হয়, তা হয় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে। আর আমি আপনাকে পাঠিয়েছি মানুষের প্রতি আমার পয়গামের বাহক হিসাবে। আর আল্লাহ্ সব বিষয়েই যথেষ্ট— সব বিষয়ই তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। (৮০) যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহ্‌রই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।

নগরী থেকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা কর এবং দ্বিতীয়টি হলো যে, আমাদের জন্য কোন সহায় বা সাহায্যকারী পাঠাও। আল্লাহ্ তাঁদের দু'টি প্রার্থনাই কবুল করে নিয়েছিলেন। তা এভাবে যে, কিছু লোককে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যাতে তাদের প্রথম প্রার্থনাটি পূরণ হয়েছিল। অবশ্য কোন কোন লোক সেখানেই রয়ে যান এবং বিজয়ের পর রসূলে মকবুল (সাঃ) ইতাব ইবনে উসায়দ (রাঃ)-কে সেসব লোকের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি এসব উৎপীড়িতদেরকে অত্যাচারীদের উৎপীড়ন-অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। আর এভাবেই পূর্ণ হয় তাদের দ্বিতীয় প্রার্থনাটি।

এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় জেহাদ করার নির্দেশ দানের পরিবর্তে وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ বাক্য ব্যবহার করার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন পরিস্থিতিতে জেহাদ করাটাই স্বাভাবিক দায়িত্ব, যা না করা কোন ভালো মানুষের পক্ষে একান্তই অসম্ভব।

আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করা সর্ববিপদের অমোঘ প্রতিকার ঃ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا আয়াতে বলা হয়েছে যে, জেহাদের নির্দেশ দানের পেছনে একটি কারণ ছিল সে সমস্ত অসহায় দুর্বল নারী-পুরুষের প্রার্থনা। মুসলমানগণকে জেহাদ করার নির্দেশ দানের মাধ্যমে সে প্রার্থনা মঞ্জুরীর কথাই ঘোষণা হয়েছে। আর তাতে যথাশীঘ্র তাদের বিপদাপদ শেষ হয়ে যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

যুদ্ধক্ষেত্রে মুমিন ও কাফেরের উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা ঃ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা মুমিন বা ঈমানদার তারা জেহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে। আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। এতে পরিষ্কারভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্যতঃ মুমিনদের যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্রের লক্ষ্য। কারণ, আল্লাহ্‌ই সমগ্র সৃষ্টির মালিক এবং তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান নির্ভেজাল ও ন্যায়ভিত্তিক। তাছাড়া ন্যায় ও কল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেই যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিশ্বশান্তির জন্যও সমগ্র বিশ্বে এমন সংবিধানের প্রচলন অপরিহার্য, যাকে আল্লাহ্‌র কানুন বা সংবিধান বলা হয়। সুতরাং পরিপূর্ণ কোন মুমিন ব্যক্তি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তার সামনেই এ উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে।

কিন্তু এর বিপরীতে যারা কাফের তাদের বাসনা থাকে কুফরের প্রচলন, কুফরের বিজয় এবং পৈশাচিক শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যাতে করে বিশ্বময় কুফরী ও শেরেকী বিস্তার লাভ করতে পারে। আর কুফরী ও শেরেকী যেহেতু শয়তানের পথ, সুতরাং কাফেররা শয়তানের কাজেই সাহায্য করে থাকে।

শয়তানের চক্রান্তের দুর্বলতা ঃ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا আয়াতে বলা হয়েছে যে, শয়তানের চক্রান্ত ও কলাকৌশল হয় দুর্বল। ফলে তা মুমিনের সামান্যতমও ক্ষতি করতে পারে না। অতএব, মুসলমানগণকে শয়তানের বন্ধুবর্গ অর্থাৎ, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোন রকম দ্বিধা করা উচিত নয়। তার কারণ, তাদের সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং। পক্ষান্তরে শয়তানের কলাকৌশল কাফেরদের কিছুই মঙ্গল সাধন করবে না।

এ আয়াতে শয়তানের কলাকৌশলকে যে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেজন্য আয়াতের মাধ্যমেই দু'টি শর্তের বিষয়ও প্রতীয়মান হয়। (এক) যে লোকের বিরুদ্ধে শয়তান কলাকৌশল অবলম্বন করবে, তাকে মুসলমান হতে হবে এবং (দুই) সে যে কাজে নিয়োজিত থাকবে, তা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র জন্য হতে হবে ; কোন পার্থিব বস্তুর আকাঙ্ক্ষা কিংবা আত্মস্বার্থ প্রণোদিত হবে না। প্রথম শর্ত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বাক্যের দ্বারা এবং দ্বিতীয় শর্ত يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায়। এ দু'টি শর্তের যে কোন একটির অবর্তমানে শয়তানের কলাকৌশল দুর্বল হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী নয়।

জেহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানগণ কর্তৃক তা মুলতবীর আকাঙ্ক্ষার কারণ ঃ জেহাদের হুকুম অবতীর্ণ হবার পর মুসলমানদের পক্ষ থেকে তা স্থগিত থাকার বাসনা কোন আপত্তির কারণে ছিল না, বরং এটা ছিল একটি আনন্দমিশ্রিত অভিযোগ। তার কারণ, স্বভাবতঃ মানুষ যখন ব্যক্তিগতভাবে একা একা কোন চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তখন তার উত্তেজনা হঠাৎ উথলে উঠে এবং তখন কোন বিষয়ের প্রতিশোধ নেয়া তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। কিন্তু আরাম-আয়েশের সময়ে তাদের মন-মানস কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে উদ্বুদ্ধ হতে চায় না। এটা হল মানুষের একটা সহজাত বৃত্তি। সুতরাং এসব মুসলমান যখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তখন কাফেরদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অসহ্য হয়ে তারা জেহাদের নির্দেশ কামনা করতেন। কিন্তু মদীনায় হিজরত করে চলে আসার পর যখন তারা শান্তি ও আরাম-আয়েশ লাভে সমর্থ হন, আর এমনি অবস্থায় যখন জেহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের পুরাতন সে প্রতিশোধ স্পৃহা অনেকটা প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মন-মস্তিষ্কে সেই উন্মাদনা ও উত্তেজনা বিদ্যমান ছিল না। সেজন্য তারা শুধু বাসনা করল যে, এক্ষণই যদি জেহাদের নির্দেশটি না আসত, তবেই ভাল হত। এই বাসনাকে আপত্তি হিসাবে দাঁড় করিয়ে সে সমস্ত মুসলমানকে পাপী সাব্যস্ত করা আদৌ সমীচীন নয়। মুসলমানগণ যদি উল্লেখিত অভিযোগটি মুখেই প্রকাশ করে থাকেন, তবে উল্লেখিত বক্তব্যটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু যদি অভিযোগটি মুখে প্রকাশ না করে থাকেন এবং তা শুধু মনে মনেই কল্পনাস্বরূপ এসে থাকে তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা অপরাধ বা পাপ বলে গণ্যই হয় না। এক্ষেত্রে উভয় অবস্থারই সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া আয়াতে উল্লেখিত قالوا শব্দের দ্বারা এমন কোন সন্দেহ করা উচিত হবে না যে, তাঁরা মনের কল্পনাকে মুখেও প্রকাশ করেছিলেন। কারণ, এর অর্থ এমনও হতে পারে যে, তাঁরা হয়ত মনে মনেই বলে থাকবেন।-(বয়ানুল-কোরআন) কোন কোন তফসীরকারের মতে এ আয়াতের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে নয়, বরং মুনাফেকদের সাথে। সেক্ষেত্রে কোন প্রশ্নই থাকে না।— (তফসীরে - কবীর)

রাষ্ট্রশুদ্ধি অপেক্ষা আত্মশুদ্ধি অগ্রবর্তী ঃ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল্ আলামীন প্রথমে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রশুদ্ধির উপকরণ। অর্থাৎ, এতে অত্যাচার—উৎপীড়নের প্রশমন করা যায়। এতেই প্রতিষ্ঠিত হয় সমগ্র দেশময় শান্তি ও শৃংখলা। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষকে অপরের সংশোধন করার পূর্বে নিজের সংশোধন করা কর্তব্য। বস্তুতঃ মর্যাদার দিক দিয়েও প্রথম পর্যায়ের হুকুমটি হল ফরযে- আইন, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের হুকুম হচ্ছে ফরযে-কেফায়াহ্। এতে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও অগ্রবর্তিতাই প্রতীয়মান হয়।— (মাযহারী)

দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামতের পার্থক্য ঃ আয়াতে দুনিয়ার নেয়ামতের তুলনায় আখেরাতের নেয়ামতসমূহকে উত্তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। তা হল এই—

(১) দুনিয়ার নেয়ামত অল্প এবং আখেরাতের নেয়ামত অধিক।

(২) দুনিয়ার নেয়ামত অনিত্য এবং আখেরাতের নেয়ামত নিত্য-অফুরন্ত।

(৩) দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের সাথে নানা রকম অস্থিরতাও রয়েছে, কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত এ সমস্ত জঞ্জালমুক্ত।

(৪) দুনিয়ার নেয়ামত লাভ অনিশ্চিত, কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত প্রত্যেক মুত্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তির জন্য একান্ত নিশ্চিত।— (তফসীরে- কবীর)

পাকা ও সুদৃঢ় বাসস্থান নির্মাণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় ঃ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা সুদৃঢ় প্রাসাদে হলেও মৃত্যু তোমাদেরকে বরণ করতেই হবে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, বসবাস করার জন্য কিংবা ধন-সম্পদের হেফাযতের উদ্দেশে সুদৃঢ় ও উত্তম গৃহ নির্মাণ করা তাওয়াক্কুল বা ভরসার পরিপন্থী কিংবা শরীয়তবিরুদ্ধ নয়।— (কুরতুবী)

মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই নেয়ামত লাভ করে ঃ مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ এখানে حَسَنَةٍ (হাসানাতিন) -এর দ্বারা নেয়ামতকে বোঝানো হয়েছে।

এ আয়াতের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যে সমস্ত নেয়ামত লাভ করে তা তাদের প্রাপ্য নয়, বরং একান্ত আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহেই প্রাপ্ত হয়। মানুষ যত এবাদত-বন্দেগীই করুক না কেন, তাতে সে কোন নেয়ামত লাভের অধিকারী হতে পারে না। কারণ, এবাদত করার যে সামর্থ্য, তাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই লাভ হয়। তদুপরি আল্লাহ্ তাআলার অসংখ্য নেয়ামত তো রয়েছেই। এ সমস্ত নেয়ামত সীমিত এবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে কেমন করে লাভ করা সম্ভব? বিশেষ করে আমাদের এবাদত-বন্দেগী যদি আল্লাহ্ তাআলার শান মোতাবেক না হয়?

অতএব, মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন—

"আল্লাহ্ তাআলার রহমত ব্যতীত কোন একটি লোকও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' বলা হল, "আপনিও কি যেতে পারবেন না"? তিনি বললেন, "না আমিও না।" - (মাযহারী)

বিপদাপদ মানুষের কৃতকর্মের ফল ঃ এখানে وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ -অর্থ হল বিপদাপদ। -(মাযহারী)

বিপদাপদ যদিও আল্লাহ্ তাআলাই সৃষ্টি করেন, কিন্তু তার কারণ হয় মানুষের কৃত অসৎকর্ম। মানুষটি যদি কাফের হয়ে থাকে, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ তার জন্য সে সমস্ত আযাবের একটা সামান্য নমুনা হয়ে থাকে যা আখেরাতে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ আখেরাতের আযাব এর চাইতে বহুগুণ বেশী। আর যদি লোকটি ঈমানদার হয়, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ হয় তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যা আখেরাতে

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ
مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ
الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا
كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ
الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا
نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً
حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ
لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴿٨٥﴾ وَإِذَا حُيِّيتُمْ
بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾

(৮১) আর তারা বলে, আপনার আনুগত্য করি। অতঃপর আপনার নিকট থেকে বেরিয়ে গেলেই তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পরামর্শ করে রাতের বেলায় সে কথার পরিপন্থী যা তারা আপনার সাথে বলেছিল। আর আল্লাহ্ লিখে নেন, সে সব পরামর্শ যা তারা করে থাকে। সুতরাং আপনি তাদের ব্যাপারে নিস্পৃহতা অবলম্বন করুন এবং ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর, আল্লাহ্ হলেন যথেষ্ট ও কার্যসম্পাদনকারী। (৮২) এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত। (৮৩) আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুতঃ আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত! (৮৪) আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন। আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ্ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ্ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা। (৮৫) যে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্যে সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। (৮৬) আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর; তারচেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী। (৮৭) আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনোই উপাস্য নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন কেয়ামতের দিন— এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়া আল্লাহ্র চাইতে বেশী সত্য কথা আর কার হবে!

তার মুক্তির কারণ। অতএব, এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ "কোন বিপদ এমন নেই, যা কোন মুসলমানের উপর পতিত হয়, অথচ তাতে আল্লাহ্ সে লোকের প্রায়শ্চিত্ত করে দেন না। এমন কি যে কাঁটাটি পায়ে ফোটে তাও।" — (মাযহারী)

"অপর এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে-হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বান্দার উপর যে সমস্ত লঘু বা গুরু বিপদ আসে, সে সবই হয় তাদের পাপের ফলে। অথচ তাদের বহু পাপ ক্ষমাও করে দেয়া হয়। – (মাযহারী)

মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপকঃ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সাঃ)-কে সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। তিনি শুধু আরবদের জন্যই রসূল ছিলেন না, বরং তাঁর রেসালত ছিল সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য ব্যাপক। তা তারা তখন উপস্থিত থাক অথবা না-ই থাক। কেয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষই এর আওতাভুক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নেতৃত্বদানকারীদের প্রতি বিশেষ হেদায়েত ঃ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا মুনাফেকরা যখন আপনার নিকট আসে, তখন বলে যে, আমরা আপনার নির্দেশ কবুল করে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা নাফরমানী করার উদ্দেশে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, তখন রসূলে করীম (সাঃ) এর-বড় কষ্ট হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সাঃ)-কে হেদায়েত দান করেছেন যে, এসব বিষয়ে আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আপনি আপনার যাবতীয় কাজ আল্লাহ্র উপর ভরসা করে চালিয়ে যেতে থাকুন। কারণ, আপনার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, যারা মানুষের নেতৃত্ব দান করতে যাবে, তাদেরকে নানা রকম জটিলতা অতিক্রম করতেই হবে। মানুষ তাদের প্রতি নানারকম উল্টা-সিধা অপবাদ আরোপ করবে। বন্ধুরূপী বহু শত্রুও থাকবে। এসব সত্ত্বেও সে নেতার পক্ষে সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে নিজের কাজে নিয়োজিত থাকা উচিত। যদি তার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সঠিক হয়, তবে ইনশাআল্লাহ কৃতকার্যতা অবশ্যই তার পদচুম্বন করবে।

কোরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা ঃ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মানবকূলকে আহ্বান জানিয়েছেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা افلا يقرءون না বলে বলেছেন أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ এতে বাহ্যতঃ একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলেই বোঝা যায়। তা'হল এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তারা যদি গভীর মনোযোগের সাথে কোরআনের প্রতি লক্ষ্য করে, তাহলে তারা এর অর্থ ও বিষয়বস্তুর মাঝে কোন পার্থক্য খুঁজে পাবে না। আর এ বিষয়টি একমাত্র চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। শুধুমাত্র তেলাওয়াত বা আবৃত্তির দ্বারা—যাতে তাদাব্বুর বা চিন্তা-গবেষণা অনুপস্থিত থাকবে- বহুবিধ বৈপরীত্য দেখা যাবে, যা বাস্তবের পরিপন্থী।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রতিটি মানুষ

কোরআনের উপর গভীর চিন্তা-গবেষণা করুক, এটাই হল কোরআনের চাহিদা। কাজেই কোরআন সম্পর্কিত চিন্তা-গবেষণা কিংবা তার পর্যালোচনা করা শুধুমাত্র ইমাম-মুজতাহিদগণেরই একক দায়িত্ব— এমন মনে করা যথার্থ নয়। জ্ঞান-বুদ্ধির পর্যায়ের মতই অবশ্য চিন্তা-গবেষণা এবং পর্যালোচনারও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। ইমাম-মুজতাহিদগণের গবেষণা-পর্যালোচনা একটি আয়াত থেকে বহু বিষয় উদ্ভাবন করবে। ওলামা সম্প্রদায়ের চিন্তা-ভাবনা এসব বিষয় উপলব্ধি করবে। আর সাধারণ মানুষ যখন নিজের ভাষায় কোরআনের তরজমা-অনুবাদ পড়ে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন তাতে তাদের মনে সৃষ্টি হবে আল্লাহ্ তাআলার মহত্বের ধারণা ও ভালবাসা। এটাই হল কৃতকার্যতার মূল চাবিকাঠি। অবশ্য জনসাধারণের জন্য ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করার জন্য পর্যায়ক্রমিকভাবে কোন বিজ্ঞ আলেমের নিকট কোরআন পাঠ করা উত্তম। আর তা সম্ভব না হলে কোন নির্ভরযোগ্য তফসীর অধ্যয়ন করবে এবং কোন জটিলতা বা সন্দেহ-সংশয় দেখা দিলে নিজের মনমতো তার কোন সমাধান করবে না, বরং বিজ্ঞ কোন আলেমের সাহায্য নেবে।

কোরআন ও সুন্নাহর তফসীরের কয়েকটি শর্ত : উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-পর্যালোচনা করার অধিকার প্রতিটি লোকেরই রয়েছে। কিন্তু আমরা বলেছি যে, চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-পর্যালোচনার স্তরভেদ রয়েছে, সেমতে প্রত্যেক স্তরের হুকুমও পৃথক পৃথক। যে মুজতাহিদসুলভ গবেষণার দ্বারা কোরআনে হাকীমের ভেতর থেকে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের মীমাংসাজনিত সিদ্ধান্ত বের করা হয়, তার জন্য তার লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করে নেয়া অপরিহার্য, যাতে নির্ভুল মর্ম নির্ণয় করা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে যদি তার পটভূমিকা সংক্রান্ত জ্ঞান মোটেই না থাকে, কিংবা স্বল্প পরিমাণ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, একজন মুজতাহিদের যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা তার মধ্যে নেই। বলাবাহুল্য, তাহলে সে আয়াতের দ্বারা যেসব মর্ম উদ্ভাবন করবে, তাও হবে ভ্রান্ত। এমতাবস্থায় আলেম সম্প্রদায় যদি সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তা হবে একান্তই ন্যায়সঙ্গত।

যে লোক কোন দিন কোন মেডিক্যাল কলেজের ছায়াও মাড়ায়নি, সে যদি আপত্তি তুলে বসে যে, দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসা শাস্ত্রে সনদপ্রাপ্ত ডাক্তারদের একক আধিপত্য কেন দেয়া হল? একজন মানুষ হিসাবে আমারও সে অধিকার রয়েছে। কিংবা কোন নির্বোধ যদি বলতে শুরু করে যে, দেশে নদীনালা, পুল-নর্দমা প্রভৃতি সংস্কার ও নির্মাণের ঠিকাদার শুধুমাত্র বিজ্ঞ প্রকৌশলীদেরকেই কেন দেয়া হবে? আমিও তো একজন নাগরিক হিসাবে এ দায়িত্ব পালনের অধিকারী। অথবা বিকৃত-বুদ্ধি কোন লোক যদি এমন আপত্তি তুলতে আরম্ভ করে যে, দেশের সংবিধান বা আইন-কানুনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শুধু আইনবিদদের একচ্ছত্র অধিকার হবে কেন? আমিও একজন বুদ্ধিমান নাগরিক হিসাবে একাজ সম্পাদন করতে পারি। তখন নিঃসন্দেহে এসব লোককে বলা হবে যে, দেশের নাগরিক হিসাবে অবশ্যই এসব কাজ সমাধা করার অধিকার তোমারও রয়েছে, কিন্তু এ সমস্ত কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা অর্জন করতে গিয়ে যে বছরের পর বছর মাথা ঘামাতে হয়, সুবিজ্ঞ শিক্ষকদের নিকট এসব শাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় এবং সে জন্য যেসব সনদ হাসিল করতে হয়, তোমরাও প্রথমে সে কষ্টটুকু স্বীকার করে আস। তাহলে সন্দেহাতীতভাবে তোমরাও এ সমস্ত কার্য সম্পাদনে সমর্থ হবে।

কিন্তু এ কথাগুলোই যদি কোরআন ও সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মত সুক্ষ্ম ও জটিল কাজের বেলায় বলা হয়, তাহলে তখন আলেম সমাজের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে শ্লোগান উত্থিত হয়। তাহলে কি সমগ্র বিশ্বে শুধুমাত্র কোরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞানটিই এমন লা-ওয়ারিস রয়ে গেছে যে, এ ব্যাপারে যে কোন লোক নিজ নিজ ভঙ্গিতে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অধিকার সংরক্ষণ করবে। যদি সে লোক কোরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞানার্জনে কয়েকটি মাসও ব্যয় না করে থাকে, তবুও কি?

কেয়াস একটি দলীল : এ আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা যাচ্ছে যে, কোন মাসআলার বিশ্লেষণ যদি কোরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যে সরাসরি না পাওয়া যায়, তাহলে তাতেই চিন্তা-ভাবনা করে তার সমাধান বের করার চেষ্টা করা কর্তব্য। আর একেই শরীয়তের পরিভাষায় 'কেয়াস' বলা হয়।

বহু মতবিরোধ ও তার ব্যাখ্যা : وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا এ আয়াতে উল্লেখিত اختلاف كثير (বা বহু মতবিরোধ) এর মর্ম এই যে, যদি কোন একটি বিষয়ে মতবিরোধ একটি হয়, তবে বহু বিষয়ে মতবিরোধও বহু হয়ে থাকে। – (বয়ানুল-কোরআন) কিন্তু এখানে (অর্থাৎ, কোরআনে) কোন একটি বিষয়েও কোন মতবিরোধ বা মতপার্থক্য নেই। অতএব, এটা একান্তভাবেই আল্লাহ্র কালাম। মানুষের কালামে এমন অপূর্ব সামঞ্জস্য হতেই পারে না। এর কোথাও না আছে ভাষালঙ্কারের কোন ত্রুটি, না আছে তওহীদ, কুফর, কিংবা হারাম-হালালের বিবরণে কোন স্ববিরোধিতা ও পার্থক্য। তাছাড়া গায়বী বিষয়সমূহের মাঝেও এমন কোন সংবাদ নেই, যা প্রকৃত বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তদুপরি না আছে কোরআনের ধারাবাহিকতার কোন পার্থক্য যে, একটি হবে অলঙ্কারপূর্ণ আরেকটি হবে অলঙ্কারহীন। প্রত্যেক মানুষের ভাষ্য-বিবৃতি ও রচনা-সঙ্কলনে পরিবেশের কম-বেশী প্রভাব অবশ্যই থাকে— আনন্দের সময় তা এক ধরনের হয়, আবার বিষাদে হয় অন্য রকম। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হয় এক রকম, আবার অশান্তিপূর্ণ পরিবেশে অন্য রকম। কিন্তু কোরআন এ ধরনের যাবতীয় ত্রুটি, পার্থক্য ও স্ববিরোধিতা থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। আর এটাই হল কালামে-এলাহী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

যাচাই না করে কোন কথা রটনা করা মহাপাপ : এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কোন শোনা কথা যাচাই, অনুসন্ধান ব্যতিরেকে বর্ণনা করা উচিত নয়। রসূলে করীম (সাঃ)-এর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "কোন লোকের পক্ষে মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোন রকম যাচাই না করেই সমস্ত শোনা কথা প্রচার করে।"

অপর এক হাদীসে তিনি বলেছেন : "যে লোক এমন কোন কথা বর্ণনা করে, যার ব্যাপারে সে জানে যে, সেটি মিথ্যা, তাহলে সে দু'জন মিথ্যাবাদীর একজন মিথ্যাবাদী – (ইবনে – কাসীর)

উলুল-আমর কারা : وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلٰى أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ -আয়াতে উল্লেখিত استنباط শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কূপের গভীরতা থেকে পানি তোলা। সে জন্যই কূপ খননকালে প্রথম যে পানি বেরোয় তাকে আরবীতে ماء مستنبط বলা হয়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হল কোন বিষয়ের গভীরে গিয়ে তার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। – (কুরতুবী)

'উলুল-আমর' বা দায়িত্বশীল লোক নির্ণয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

হযরত হাসান, কাতাদা ও ইবনে আবী লায়লা (রহঃ) প্রমুখের মতে দায়িত্বশীল লোক বলতে ওলামা ও ফকীহগণকে বোঝায়। হযরত সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা শাসনকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে বোঝায়। আল্লামা আবু বকর জাসসাস এতদুভয় মত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, সঠিক ব্যাপার হলো এই যে, এতদুভয় অর্থই ঠিক। কারণ, 'উলুল-আমর' শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য। অবশ্য এতে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন যে, 'উলুল-আমর' বলতে ফকীহগণকে বোঝানো যেতে পারে না। তার কারণ, اولوا الامر (উলুল-আমর) শব্দটি তার শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে সে সমস্ত লোককে বোঝায়, যাদের হুকুম বা নির্দেশ চলতে পারে। বলাবাহুল্য, এ কাজটি ফকীহ্গণের নয়। প্রকৃত বিষয় হল এই যে, হুকুম চলার দু'টি প্রেক্ষিত রয়েছে। (এক) জবরদস্তিমূলক। এটা শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠী বা সরকার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। (দুই) বিশ্বাস ও আস্থার দরুন হুকুম মান্য করা। আর সেটা ফকীহ্গণই অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং যা সর্বযুগের মুসলমানদের অবস্থার দ্বারা প্রতিভাত হয়। ধর্মীয় ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানগণ নিজের ইচ্ছা ও মতামতের তুলনায় আলেম সম্প্রদায়ের নির্দেশকে অবশ্য পালনীয় বলে সাব্যস্ত করে থাকে। তাছাড়া শরীয়তের দৃষ্টিতেও সাধারণ মানুষের জন্য আলেমদের হুকুম মান্য করা ওয়াজেবও বটে। সুতরাং তাঁদের ক্ষেত্রেও 'উলুল আমর'-এর প্রয়োগ যথার্থ হবে। - (আহকামুল কোরআন, জাসসাস)।

আধুনিক সমস্যাবলী সম্পর্কিত বিষয়ে কেয়াস ও ইজ্‌তেহাদ ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, যেসব বিষয়ে কোন 'নস' তথা কোরআন-হাদীসের সরাসরি কোন বিধান নেই, সেগুলোর হুকুম 'ইজতেহাদ' ও কেয়াসের রীতি অনুযায়ী কোরআনের আয়াত থেকে উদ্ভাবন করতে হবে। তার কারণ, এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আধুনিক কোন বিষয়ের সমাধানকল্পে রসূলে করীম (সাঃ)-এর বর্তমানে তাঁর নিকট যাও। আর যদি তিনি বর্তমান না থাকেন, তাহলে ফকীহ্গণের নিকট যাও। কারণ, তাঁদেরই মধ্যে বিধান উদ্ভাবন করার মত পরিপূর্ণ যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে।

এই বর্ণনার দ্বারা কতিপয় বিষয় প্রতীয়মান হয়। যথা, 'নস' বা কোরআন-হাদীসের সরাসরি নির্দেশের অবর্তমানে ওলামাদের কাছে যেতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশ দু'রকম। কিছু হল সরাসরি 'নস' বা কোরআন-সুন্নাহ্‌ভিত্তিক এবং কিছু হল পরোক্ষ ও অস্পষ্ট, যা আল্লাহ্ তাআলা আয়াতসমূহের গভীরে নিহিত রেখেছেন।

তৃতীয়তঃ এ ধরনের অন্তর্নিহিত মর্মগুলো কেয়াস ও ইজতেহাদের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা আলেম সম্প্রদায়ের একান্ত দায়িত্ব।

চতুর্থতঃ এসব বিধানের ক্ষেত্রে আলেম সম্প্রদায়ের অনুসরণ করা সাধারণ মানুষের অবশ্য কর্তব্য। - (আহ্‌কামুল-কোরআন, জাসসাস)

রসূলে করীম (সাঃ)-ও প্রমাণ উদ্ভাবন সংক্রান্ত নির্দেশের আওতাভুক্তঃ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রসূলে করীম (সাঃ)-ও দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে হুকুম-আহকাম উদ্ভাবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তার কারণ, আয়াতে দু'রকম লোকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের একজন হলেন রসূলে-আকরাম (সাঃ) এবং অপরজন হচ্ছেন 'উলুম-আমর'। অতঃপর বলা হয়েছে لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ —আর এই নির্দেশটি হল ব্যাপক। এতে উল্লেখিত দু'রকম লোকের মধ্যে কাকেও নির্দিষ্ট করা হয়নি। অতএব, এতে প্রমাণিত হয় যে, হুযুর (সাঃ) নিজেও আহ্‌কাম উদ্ভাবন-সংক্রান্ত নির্দেশের আওতাভুক্ত।- (আহ্‌কামুল -কোরআন, জাসসাস)

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ (১) কারো মনে যদি এমন কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এ আয়াতের দ্বারা শুধুমাত্র এতটুকুই বোঝা যায় যে, শত্রুর ভয়-শঙ্কা সম্পর্কে তোমরা নিজে নিজে কোন রটনা করো না, বরং যারা জ্ঞানী ব্যক্তি এবং যারা সমাজের নেতৃস্থানীয় তাদের সাথে যোগাযোগ কর। তারা চিন্তা-ভাবনা করে যা করতে বলবেন তোমরা সে মতই কাজ করবে। বলাবাহুল্য, দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই।

তাহলে তার উত্তর এই যে, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ বাক্যে শত্রুর কোন উল্লেখ নেই। কাজেই এ নির্দেশ ভয় ও শান্তি উভয় অবস্থাতেই ব্যাপক। এ নির্দেশের সম্পর্ক যেমন শত্রুর সাথে, তেমনিভাবে দুর্যোগ সংক্রান্ত সমস্যার সাথেও বটে। কারণ, যখন কোন নতুন বিষয় বা মাসআলা সাধারণ মানুষের সামনে উদ্ভব হয়, যার হালাল হওয়া কিংবা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সরাসরি কোরআন বা হাদীসের কোন নির্দেশ নেই, তখন তারা বিরাট দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তারা বুঝে উঠতে পারে না, কোন দিকটি তারা গ্রহণ করবে। অথচ উভয় দিকেই লাভ-ক্ষতি উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। এমন অবস্থায় শরীয়ত সবচেয়ে উত্তম পথ বাতলে দিয়েছে। তাহল উদ্ভাবন (استنباط) কর। উদ্ভাবনের মাধ্যমে যা পাওয়া যায়, তারই উপর আমল করবে। - (আহকামুল-কোরআন, জাসসাস)

ইজতেহাদ ও এস্তেম্বাত বলিষ্ঠ ধারণা সৃষ্টি করে, নিশ্চিত বিশ্বাস নয় ঃ (২) এস্তেম্বাত এর মাধ্যমে আলেমগণ যে নির্দেশ উদ্ভাবন করবেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে একথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ্ তাআলার নিকটও এটাই নিশ্চিতভাবে সত্য ও সঠিক। বরং এই নির্দেশ বা বিধানটি সম্পূর্ণভাবে অভ্রান্ত নাও হতে পারে। তবে তা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে থাকে, যা আমল করার জন্য যথেষ্ট।- (আহ্‌কামুল - কোরআন, জাসসাস)

কোরআনী বিধানের বর্ণনাশৈলী ঃ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ — এ আয়াতের প্রথম বাক্যে রসূলে করীম (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, "আপনি একাই যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয়ে পড়ুন; কেউ আপনার সাথে থাক বা নাই থাক।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যে একথাও বলা হয়েছে যে, অন্যান্য মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহদানের কাজটিও পরিহার করবেন না। এভাবে উৎসাহদানের পরেও যদি তারা যুদ্ধের জন্য উদ্‌বুদ্ধ না হয়, তবে আপনার দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল; তাদের কর্মের জন্য আপনাকে জবাবদেহী করতে হবে না।

এতদসঙ্গে একা যুদ্ধ করতে গিয়ে যেসব বিপদাশঙ্কা দেখা দিতে পারে, তার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে— "আশা করা যায় আল্লাহ্ কাফেরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন এবং তাদেরকে ভীত ও পরাজিত করে দেবেন। আর আপনাকে একাই জয়ী করবেন।" অতঃপর এই বিজয় প্রসঙ্গে প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনার প্রতি যখন আল্লাহ্ তাআলার সমর্থন রয়েছে, যার সমরশক্তি কাফেরদের শক্তি অপেক্ষা অসংখ্যগুণ বেশী, তখন আপনার বিজয়ই অবশ্যম্ভাবী ও নিশ্চিত। তারপর এই সুদৃঢ় প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় শাস্তির কঠোরতা বর্ণনা করা হয়েছে। এ

শাস্তি কেয়ামতের দিনেই হোক, কিংবা পার্থিব জীবনেই হোক, যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেমন আমার শক্তি অপরাজেয়, তেমনি শাস্তি দানের ক্ষেত্রেও আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

সুপারিশের স্বরূপ , বিধি ও প্রকারভেদ ঃ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً —এ আয়াতে শাফাআত অর্থাৎ, সুপারিশকে ভাল ও মন্দ দু'ভাগে বিভক্ত করার পর এর স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক সুপারিশ যেমন মন্দ নয়, তেমনি প্রত্যেক সুপারিশ ভালও নয়। আরও বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করবে, সে সওয়াবের অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে। আয়াতে ভাল সুপারিশের সাথে نصيب শব্দ এবং মন্দ সুপারিশের সাথে كفل শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধানে উভয় শব্দের অর্থই এক। অর্থাৎ, কোন কিছুর অংশবিশেষ। কিন্তু সাধারণ পরিভাষায় نصيب শব্দটি ভাল অংশ এবং كفل শব্দটি মন্দ অংশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যদিও কখনও ভাল অংশেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোরআন পাকে كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ (তাঁর রহমতের দু'টি অংশ) ব্যবহার করা হয়েছে।

شفاعة -এর শাব্দিক অর্থ মিলিত হওয়া বা মিলিত করা। এ কারণেই আরবী ভাষায় شفعة শব্দ জোড় অর্থে এবং বিপরীতে وتر শব্দ বিজোড় অর্থে ব্যবহার করা হয়। অতএব, شفاعة -এর শাব্দিক অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কোন দুর্বল অধিকার প্রার্থীর সাথে স্বীয় শক্তি যুক্ত করে তাকে দেয়া কিংবা অসহায় একা ব্যক্তির সাথে নিজে মিলিত হয়ে তাকে জোড় করে দেয়া।

এতে জানা গেল যে, বৈধ শাফাআত ও সুপারিশের একটি শর্ত এই যে, যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে, তার দাবী সত্য ও বৈধ হতে হবে এবং অপর শর্ত এই যে, দুর্বলতার কারণে সে স্বীয় দাবী প্রবলদের কাছে স্বয়ং উত্থাপন করতে পারবে না। এতে বোঝা গেল যে, অসত্য সুপারিশ করা অথবা অপরকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে মন্দ সুপারিশ। নিজ সম্পর্কে ব্যবহার করলে কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তিজনিত চাপ ও জবরদস্তি প্রয়োগ করা হলে জুলুম হওয়ার কারণে তাও অবৈধ। কাজেই এরূপ সুপারিশও মন্দ সুপারিশেরই অন্তর্ভুক্ত।

এখন আলোচ্য আয়াতের সারবস্তু এই যে, যে ব্যক্তি কারো বৈধ অধিকার ও বৈধ কাজের জন্যে বৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সেও সওয়াবের অংশ পাবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন অবৈধ কাজের জন্যে অথবা অবৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে।

অংশ পাওয়ার অর্থ এই যে, যার কাছে সুপারিশ করা হয়, সে যখন এ উৎপীড়িতের কিংবা বঞ্চিতের কার্যোদ্ধার করে দেবে, তখন কার্যোদ্ধারকারী ব্যক্তি যেমন সওয়াব পাবে, তেমনি সুপারিশকারীও সওয়াব পাবে।

এমনিভাবে কোন অবৈধ কাজের সুপারিশকারীও গোনাহ্‌গার হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সুপারিশকারীর সওয়াব কিংবা আযাব তার সুপারিশ কার্যকরী ও সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সর্বাবস্থায় সে নিজ অংশ পাবে।

রসূলে-করীম (সাঃ) বলেন ঃ "যে, ব্যক্তি কোন সৎকাজে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে, সেও ততটুকু সওয়াব পায়, যতটুকু সৎকর্মী পায়।" -(মাযহারী)

ইবনে মাজায় হযরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যার কাজে একটি বাক্য দ্বারাও সাহায্য করে, তাকে কেয়ামতে আল্লাহ্ তাআলার সামনে উপস্থিত করা হবে এবং তার কপালে লিখিত থাকবে ঃ "এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত ও নিরাশ।" (মাযহারী)

এতে জানা গেল যে, সৎকাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা যেমন একটি সৎকাজ তেমনি অসৎ ও পাপ কাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা কিংবা সহযোগিতা প্রদান করা সমান গোনাহ্।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছেঃ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا

আভিধানিক দিক দিয়ে مقيت শব্দের অর্থ তিনটি ঃ (এক) শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান, (দুই) উপস্থিত ও দর্শক এবং (তিন) রুযী বন্টনকারী। উল্লেখিত বাক্যে তিনটি অর্থই প্রযোজ্য। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের অর্থ হবে— আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। যে কাজ করে এবং যে সুপারিশ করে তাদেরকে প্রতিদান কিংবা শাস্তিদান তাঁর পক্ষে কঠিন নয়।

দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের উদ্দেশ্য হবে— আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর পরিদর্শক ও প্রত্যেক বস্তুর সামনে উপস্থিত। কে কোন্ নিয়তে সুপারিশ করে; আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যার্থে করে, না ঘুষ হিসেবে তার কাছ থেকে কোন মতলব হাসিলের উদ্দেশে করে, তিনি সে সবই জানেন।

তৃতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের মর্ম হবে রিযিক ও রুযী বন্টনের কাজে আল্লাহ্ স্বয়ং যিম্মাদার। যার জন্যে যতটুকু লিখে দিয়েছেন, সে ততটুকু অবশ্যই পাবে। কারো সুপারিশে তিনি প্রভাবিত হবেন না; বরং যাকে যতটুকু ইচ্ছা দেবেন। তবে সুপারিশকারী ব্যক্তি মাঝখান থেকে সওয়াব পেয়ে যাবে। কেননা, এটা হচ্ছে দুর্বলের সাহায্য।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ্ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য অব্যাহত রাখেন, যতক্ষণ সে কোন মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে ব্যাপৃত থাকে। তোমরা সুপারিশ কর, সওয়াব পাবে। অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় পয়গম্বরের মাধ্যমে যে ফয়সালা করেন তাতে সন্তুষ্ট থাক।'

এ কারণেই কোরআন পাকের ভাষায় ইঙ্গিত রয়েছে যে, সুপারিশের সওয়াব ও আযাব সুপারিশ সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং সুপারিশ করলেই সর্বাবস্থায় সওয়াব অথবা আযাব হবে। আপনি ভাল সুপারিশ করলেই সওয়াবের অধিকারী হয়ে যাবেন এবং মন্দ সুপারিশ করলেই আযাবের যোগ্য হয়ে পড়বেন— আপনার সুপারিশ কার্যকরী হোক বা না হোক।

তফসীর বাহ্‌রে মুহীত, বয়ানুল-কোরআন প্রভৃতি গ্রন্থে من يشفع বাক্যে منها শব্দটিকে سبب সাব্যস্ত করে এদিকে ইঙ্গিত করে বলে বলা হয়েছে। তফসীরে মাযহারীতে তফসীরবিদ মুজাহিদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুপারিশকারী সুপারিশের সওয়াব পাবে, যদি তার সুপারিশ গ্রহণ করা নাও হয়। এ বিষয়টি শুধু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং অন্যের কাছে সুপারিশ করেই সুপারিশকারী যেন ক্ষান্ত হয়ে যায়, তা গ্রহণ করতে বাধ্য করবে না। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মুক্ত করা বাঁদী বরীরা স্বীয় স্বামী মুগীছের কাছ থেকে তালাক নিয়েছিলেন। তালাক দেয়ার পর মুগীছ

বরীরার ভালবাসায় পাগলপারা হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুগীছকে পুনরায় বিবাহ করার জন্য বরীরার কাছে সুপারিশ করেন। বরীরা আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! এটি আপনার নির্দেশ হলে শিরোধার্য, পক্ষান্তরে সুপারিশ হলে আমার মন তাতে সম্মত নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ নির্দেশ নয়, সুপারিশই। বরীরা জানতেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নীতির বাইরে অসন্তুষ্ট হবেন না। তাই পরিষ্কার ভাষায় আরয করলেন ঃ তাহলে আমি এ সুপারিশ গ্রহণ করব না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হৃষ্টচিত্তে তাকে তদবস্থায়ই থাকতে দিলেন।

এ ছিল সুপারিশের স্বরূপ। শরীয়তের দৃষ্টিকোণে এ জাতীয় সুপারিশ দ্বারাই সওয়াব পাওয়া যায়। আজকাল বিকৃত আকারের যে সুপারিশ মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে, তা প্রকৃতপক্ষে সুপারিশ নয়; বরং এ হচ্ছে সম্পর্ক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করা। এ কারণেই আজকাল সুপারিশ গ্রহণ করা না হলে সুপারিশকারী অসন্তুষ্ট হয়ে যায়; বরং শত্রুতা সাধনে উদ্যত হয়। অথচ বিবেক ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাপ সৃষ্টি করা জবরদস্তির অন্তর্ভুক্ত এবং কঠোর গোনাহ্। এটি কারও অর্থ সম্পদ কিংবা কারও অধিকার জবরদস্তি করায়ত্ত করে নেয়ার মতই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শরীয়ত ও আইনের দৃষ্টিতে স্বাধীন ছিল। আপনি জোর-জবরদস্তি করে তার স্বাধীনতা হরণ করেন। সুতরাং এ হচ্ছে একজনের অভাব দূর করার জন্যে অন্যের ধন-সম্পদ চুরি করে বিলিয়ে দেয়ার অনুরূপ। সুপারিশের বিনিময় গ্রহণ করা ঘুষ। হাদীসে একে سحت বা হারাম বলা হয়েছে। আর্থিক ঘুষ হোক কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শ্রমের বিনিময়ে নিজের কোন কাজ হাসিল করা হোক— সর্বপ্রকার ঘুষই এর অন্তর্ভুক্ত।

কাশ্শাফ প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ ঐ সুপারিশ ভাল, যার উদ্দেশ্য কোন মুসলমানের অধিকার পূর্ণ করা অথবা তার কোন বৈধ উপকার করা অথবা ক্ষতির কবল থেকে তাকে রক্ষা করা হয়ে থাকে। এছাড়া এ সুপারিশটিও কোন জাগতিক লাভালাভ অর্জনের জন্যে না হওয়া চাই; বরং আল্লাহ্র ওয়াস্তে দুর্বলের সমর্থনের লক্ষ্যে হওয়া উচিত এবং সুপারিশ করে কোন আর্থিক অথবা কায়িক ঘুষ না নেয়া চাই। এ সুপারিশ কোন অবৈধ কাজে না হওয়া চাই এবং যে অপরাধের শাস্তি কোরআনে নির্ধারিত রয়েছে, এরূপ কোন অপরাধ মাফ করাবার জন্যেও না হওয়া চাই।

বাহরে মুহীত, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ কোন মুসলমানের অভাব-অনটন দূর করার জন্যে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করাও ভাল সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত। এতে দোয়াকারীও সওয়াব পায়। এক হাদীসে আছে, যখন কেউ মুসলমান ভাইয়ের জন্যে নেক দোয়া করে, তখন ফেরেশতা বলেন ঃ ولك بمثل অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমারও অভাব দূর করুন।

সালাম ও ইসলাম ঃ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا – এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সালাম ও তার জওয়াবের আদব বর্ণনা করেছেন।

تحية – এর تحية শব্দের ব্যাখ্যা ও এর ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ تحية শাব্দিক অর্থ حياك الله (আল্লাহ্ তোমাকে জীবিত রাখুন) বলা। ইসলামপূর্ব কালে আরবরা পরস্পরের সাক্ষাৎকালে একে অন্যকে حياك الله কিংবা انعم صباحا কিংবা انعم الله بك عينا ইত্যাদি সম্ভাষণে সালাম করত। ইসলাম এ সালাম পদ্ধতি পরিবর্তন করে السلام عليكم বলার রীতি প্রচলিত করেছে। এর অর্থ, তুমি সর্বপ্রকার কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাক।

ইবনে-আরাবী আহ্কামুল-কোরআন গ্রন্থে বলেন ঃ 'সালাম' শব্দটি আল্লাহ্ তাআলার উত্তম নামসমূহের অন্যতম। السلام عليكم – এর অর্থ এই যে, رقيب عليكم অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সংরক্ষক।

ইসলামী সালাম অন্যান্য জাতির সালাম থেকে উত্তম ঃ জগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের সময় ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশার্থে কোন না কোন বাক্য আদান-প্রদান করার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামী সালাম যতটুকু ব্যাপক অর্থবোধক, অন্য কোন সালাম ততটুকু নয়। কেননা, এতে শুধু ভালবাসাই প্রকাশ করা হয় না, বরং সাথে সাথে ভালবাসার যথার্থ হকও আদায় করা হয়। অর্থাৎ, আল্লাহ্র কাছে দোয়া করা হয় যে, আল্লাহ্ আপনাকে সর্ববিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদে রাখুন। এ দোয়াটি আরবদের প্রথা অনুযায়ী শুধু জীবিত থাকার দোয়া নয়; বরং পবিত্র জীবনের দোয়া। অর্থাৎ, সর্ববিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া। এতে এ বিষয়েরও অভিব্যক্তি রয়েছে যে, আমরা ও তোমরা- সবাই আল্লাহ্ তাআলার মুখাপেক্ষী। তাঁর অনুমতি ছাড়া আমরা একে অপরের উপকার করতে পারি না। এ অর্থের দিক দিয়ে বাক্যটি একাধারে একটি এবাদত এবং মুসলমান ভাইকে আল্লাহ্র কথা মনে করিয়ে দেয়ার উপায়ও বটে।

ইবনে আরাবী আহ্কামুল-কোরআন গ্রন্থে ইমাম ইবনে উয়াইনার এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

اتدرى ما السلام يقول انت آمن منى – অর্থাৎ, সালাম কি বস্তু, তুমি জান? সালামকারী ব্যক্তি বলে যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে বিপদমুক্ত।

মোটকথা এই যে, ইসলামী সালামে বিরাট অর্থগত ব্যাপ্তি রয়েছে। যথা,

(১) এতে রয়েছে আল্লাহ্ তাআলার যিক্র, (২) আল্লাহ্র কথা মনে করিয়ে দেয়া, (৩) মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশ, (৪) মুসলমান ভাইয়ের জন্য সর্বোত্তম দোয়া এবং (৫) মুসলমান ভাইয়ের সাথে এ চুক্তি যে, আমার হাত ও মুখ দ্বারা আপনার কোন কষ্ট হবে না। সহীহ্ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেন ঃ "যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ সে-ই প্রকৃত মুসলমান।"

আয়াতে বিষয়বস্তুর উপসংহারে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

"আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর হিসাব নিবেন।" মানুষ এবং ইসলামী অধিকার; যথা সালাম ও সালামের জওয়াব ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা এগুলোরও হিসাব নিবেন। এরপর বলা হয়েছে ঃ

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ –অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাকেই উপাস্য মনে কর এবং যে কাজই কর, তাঁর এবাদতের নিয়তে কর। তিনি কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। ঐ দিন সবাইকে প্রতিদান দেবেন। কেয়ামতের ওয়াদা, প্রতিদান ও শাস্তির সংবাদ সব সত্য। وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا – কেননা, এ সংবাদ আল্লাহ্র দেয়া। আল্লাহ্র চাইতে অধিক কার কথা সত্য হতে পারে?

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ؕ
اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ
فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا
فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ
وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ اِلَّا
الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ
جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا
قَوْمَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ
اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا
جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۝ سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ
يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْۤا اِلَى
الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْۤا اِلَيْكُمُ
السَّلَمَ وَيَكُفُّوْۤا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ
ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

(৮৮) অতঃপর তোমাদের কি হল যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু' দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারণে। তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ্ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোন পথ পাবে না। (৮৯) তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না। (৯০) কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে চুক্তি আছে অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছে করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে; তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ দেননি। (৯১) এখন তুমি আরও এক সম্প্রদায়কে পাবে। তারা তোমাদের কাছেও এবং স্বজাতির কাছেও নির্বিঘ্ন হয়ে থাকতে চায়। যখন তাদেরকে ফ্যাসাদের প্রতি মনোনিবেশ করানো হয়, তখন তারা তাতে নিপতিত হয়, অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়, তোমাদের সাথে সন্ধি না রাখে এবং স্বীয় হস্তসমূহকে বিরত না রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে প্রকাশ্য যুক্তি-প্রমাণ দান করেছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে তিনটি দলের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে দু'টি বিধান উল্লেখিত হয়েছে। এসব দলের ঘটনাবলী নিম্নোদ্ধৃত রেওয়ায়েতগুলো থেকে জানা যাবে।

প্রথম রেওয়ায়েত ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে হুমাইদ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার কতিপয় মুশরেক মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করে এবং প্রকাশ করে যে, তারা মুসলমান; হিজরত করে মদীনায় এসেছে। কিছুদিন পর তারা ধর্মত্যাগী হয়ে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে পণ্যদ্রব্য আনার অজুহাত পেশ করে পুনরায় মক্কা চলে যায়। এরপর তারা আর ফিরে আসেনি। এদের সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। কেউ কেউ বলল এরা কাফের, আর কেউ কেউ বলল এরা মু'মিন। আল্লাহ্ তাআলা فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ —আয়াতে এদের কাফের হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং এদেরকে হত্যা করার বিধান দিয়েছেন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত ঃ ইবনে আবী শায়বা হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেন যে, বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পর সুরাকা ইবনে মালেক মুদলাজী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জানাল, আমাদের গোত্র বনী-মুদলাজের সাথে সন্ধি স্থাপন করুন। তিনি হযরত খালেদকে সন্ধি সম্পন্ন করার জন্যে সেখানে প্রেরণ করলেন। সন্ধির বিষয়বস্তু ছিল এই ঃ

আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করব না। কোরায়েশরা মুসলমান হয়ে গেলে আমরাও মুসলমান হয়ে যাব। যেসব গোত্র আমাদের সাথে একতাবদ্ধ হবে, তারাও এ চুক্তিতে আমাদের অংশীদার।

এর পরিপ্রেক্ষিতে وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ থেকে اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তৃতীয় রেওয়ায়েত ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ... سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ – আয়াতে আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা মদীনায় এসে বাহ্যতঃ নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করত এবং স্বগোত্রের কাছে বলতঃ আমরা তো বানর ও বিচ্ছুদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তারাই আবার মুসলমানদের কাছে বলত, আমরা তোমাদের ধর্মে আছি!

যাহ্হাক, হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বনী আবদুদ্দারেরও একই অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েত রূহুল-মা'আনীতে এবং তৃতীয় রেওয়ায়েত মাআলেমে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত থানভী (রঃ) বলেন ঃ তৃতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের অবস্থা প্রথম রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের অবস্থার মতই হয়ে গেছে। অর্থাৎ, তারা যে পূর্ব থেকেই মুসলমান নয়, একথা রেওয়ায়েত থেকেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। এ কারণেই তারা সাধারণ কাফেরদের অনুরূপ। অর্থাৎ, সন্ধিচুক্তি থাকাকালে তাদের সাথে যুদ্ধ করা চলবে না। কিন্তু সন্ধিচুক্তি না থাকা অবস্থায় যুদ্ধ করা চলবে। সেমতে প্রথম রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ, فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ – গ্রেফতার করা ও হত্যা করার নির্দেশ এবং তৃতীয় আয়াত

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ – শান্তি চুক্তির সময় তাদের ব্যতিক্রম বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে তাদের শান্তিচুক্তি উল্লেখিত হয়েছে। ব্যতিক্রমকে জোরদার করার জন্য পুনরায় فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ বলে দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের সম্পর্কে চতুর্থ আয়াত অর্থাৎ, سَتَجِدُونَ آخَرِينَ .... – এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়; বরং লড়াই করে, তবে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর। এ থেকে বোঝা যায় যে, তারা সন্ধিচুক্তি করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না।– (বয়ানুল-কোরআন)

মোটকথা, এখানে তিন দল লোকের কথা উল্লেখিত হয়েছে ঃ

(১) মুসলমান হওয়ার জন্যে যে সময় হিজরত করা শর্ত সাব্যস্ত হয়, সে সময় সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হিজরত না করে কিংবা হিজরত করার পর দারুল ইসলাম ত্যাগ করে দারুল হরবে চলে যায়।

(২) যারা স্বয়ং মুসলমানদের সাথে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি করে কিংবা এরূপ চুক্তিকারীদের সাথে চুক্তি করে।

(৩) যারা সাময়িকভাবে বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশে শান্তিচুক্তি করে অতঃপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হলে তাতে অংশগ্রহণ করে এবং চুক্তিতে কায়েম না থাকে।

প্রথম দল সাধারণ কাফেরদের মত। দ্বিতীয় দল হত্যা ও ধরপাকড়ের আওতা বহির্ভূত এবং তৃতীয় দল প্রথম দলের অনুরূপ শাস্তির যোগ্য। এসব আয়াতে মোট দু'টি বিধান উল্লেখিত হয়েছে: অর্থাৎ, সন্ধিচুক্তি না থাকা কালে যুদ্ধ এবং সন্ধিচুক্তি থাকাকালে যুদ্ধ নয়।

হিজরতের বিভিন্ন প্রকার ও বিধান ঃ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ –ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফেরদের দেশ থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলমানদের উপর ফরয ছিল। (১) এ কারণে যারা এ ফরয পরিত্যাগ করত, তাদের সাথে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের মত ব্যবহার করতে নিষেধ করে দেন। মক্কা বিজিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঘোষণা করেন ঃ لاهجرة بعد الفتح অর্থাৎ, মক্কা বিজিত হয়ে যখন দারুল ইসলাম হয়ে গেল, তখন সেখান থেকে হিজরত করা ফরয নয়।– (বোখারী) এটা ছিল তখনকার কথা, যখন হিজরত ঈমানের শর্ত ছিল। তখন সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হিজরত করত না, তাকে মুসলমান মনে করা হত না। কিন্তু পরে এ বিধান রহিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার হিজরত কেয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لاتنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة অর্থাৎ, যতদিন তওবা কবুল হওয়ার সময় থাকবে, ততদিন হিজরত বাকী থাকবে।– (বোখারী)

এ হিজরত সম্পর্কে বোখারীর টীকাকার আল্লামা আইনী লিখেন ঃ "স্থায়ী হিজরতের অর্থ হচ্ছে পাপকর্ম পরিত্যাগ করা।" যেমন, এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ المهاجر من هجر مانهى الله عنه – অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি মুহাজির, যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করে।– (মেরকাত, প্রথম খণ্ড)

এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, পরিভাষায় হিজরত দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়– (১) ধর্মের খাতিরে দেশ ত্যাগ করা; যেমন সাহাবায়ে কেরাম স্বদেশ মক্কা ছেড়ে মদীনা ও আবিসিনিয়ায় চলে যান। (২) পাপ কাজ বর্জন করা।

وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا – এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হারাম। বর্ণিত আছে যে, আনসাররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর কাছে কাফেরদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ

, এরা দুরাচারী জাতি। তাদের প্রয়োজন আমাদের নেই।–(মাযহারী, ২য় খণ্ড)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا
فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰۤى اَهْلِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۚ فَاِنْ
كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ وَاِنْ
كَانَ مِنْ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰۤى اَهْلِهٖ وَ
تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۫
تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا
فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ
عَذَابًا عَظِيْمًا ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ
عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ؕ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝
لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ
بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ
الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

(৯২) মুসলমানের কাজ নয় যে, মুসলমানকে হত্যা করে; কিন্তু ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি না পায়, সে আল্লাহ্র কাছ থেকে গোনাহ্ মাফ করানোর জন্যে উপর্যুপরি দুই মাস রোযা রাখবে। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৯৩) যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (৯৪) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও। তোমারা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তুতঃ আল্লাহ্র কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো এমনি ছিলে ইতিপূর্বে; অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্মের খবর রাখেন। (৯৫) গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান— যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করে— সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জেহাদ করে, আল্লাহ্ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ্ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ্ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যোগসূত্র ঃ পূর্ব থেকে হত্যা ও যুদ্ধের আলোচনা চলে এসেছে। হত্যা সর্বমোট আট প্রকার। কেননা, নিহত ব্যক্তি হয় মুসলমান, না হয় যিম্মী, না হয় চুক্তিবদ্ধ ও অভয়প্রাপ্ত এবং না হয় দারুল হরবের কাফের হবে। এ চার অবস্থার কোন না কোন একটি হবেই। হত্যাকারী দুই প্রকার ঃ হয় ইচ্ছাকৃত, না হয় ভ্রমবশতঃ। অতএব, মোট প্রকার হল আটটি ঃ (এক) মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (দুই) মুসলমানকে ভ্রমবশতঃ হত্যা, (তিন) যিম্মীকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (চার) যিম্মীকে ভ্রমবশতঃ হত্যা, (পাঁচ) চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (ছয়) চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভ্রমবশতঃ হত্যা, (সাত) হরবী কাফেরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং (আট) হরবী কাফেরকে ভ্রমবশতঃ হত্যা।

এসব প্রকারের মধ্যে কিছু সংখ্যকের বিধান পূর্বে বলা হয়েছে, আর কিছু পরে বর্ণিত হবে এবং কিছু সংখ্যকের বিধান হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে। প্রথম প্রকারের পার্থিব বিধান অর্থাৎ, কেসাস ওয়াজেব হওয়া সূরা বাক্বারায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং পারলৌকিক বিধান পরবর্তী আয়াত وَمَنْ يَّقْتُلْ —এ বর্ণিত হবে। দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা وَهُوَ مُؤْمِنٌ থেকে وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ আয়াতে আসবে। তৃতীয় প্রকারের বিধান দার-কুত্নীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যিম্মী হত্যার বিনিময়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলমানের কাছ থেকে কেসাস নিয়েছেন।— (তাখরীজে-হেদায়া)

চতুর্থ প্রকার وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ আয়াতে উল্লেখিত হবে। পঞ্চম প্রকার পূর্ববর্তী রুকূর فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ প্রকারের বিধান চতুর্থ প্রকারের সাথেই উল্লেখিত হয়েছে। কেননা, مِّيْثَاقٌ তথা চুক্তি অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় প্রকারই হতে পারে। অতএব, যিম্মীও অভয়প্রাপ্ত কাফেরের অন্তর্ভুক্ত। দুররে-মোখতার গ্রন্থের 'দিয়্যৎত' অধ্যায়ের শুরুতে অভয়প্রাপ্ত উভয়ই এর রক্ত-বিনিময় ওয়াজিব হওয়ার মাসআলা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণ করা হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম প্রকারের বিধান স্বয়ং জেহাদ আইনসিদ্ধ হওয়ার মাসআলা থেকে পূর্বেই জানা গেছে। কেননা, জেহাদে দারুল-হরবের কাফেরদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিহত করা হয়। অতএব, ভ্রমবশতঃ হত্যার বৈধতা আরও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হবে।— (বয়ানুল-কোরআন)

তিন প্রকার হত্যা ও তার বিধান ঃ عمد প্রথম প্রকার অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃত হত্যা। এর সংজ্ঞা এই বাহ্যতঃ ইচ্ছা করে এমন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা, যা লৌহনির্মিত অথবা অঙ্গচ্ছেদনের ব্যাপারে লৌহনির্মিত অস্ত্রের মত। যথা– ধারাল বাঁশ, ধারাল পাথর ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার شبه عمد অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে যা সাদৃশ্যপূর্ণ। এর সংজ্ঞা এই ঃ ইচ্ছা করেই হত্যা করা, কিন্তু এমন অস্ত্র দ্বারা নয়, যদ্দ্বারা অঙ্গচ্ছেদ হতে পারে।

তৃতীয় প্রকার خطأ অর্থাৎ, ভ্রমবশতঃ হত্যা। ইচ্ছা ও ধারণায় ভ্রম হওয়া। যেমন, দূর থেকে মানুষকে শিকারী জন্তু কিংবা দারুল-হরবের কাফের মনে করে লক্ষ্য স্থির করতঃ গুলী করে ফেলা কিংবা লক্ষ্যচ্যুতি ঘটা। যেমন, জন্তুকে লক্ষ্য করেই তীর অথবা গুলী ছোঁড়া; কিন্তু তা কোন মানুষের গায়ে লেগে যাওয়া। এগুলো সব ভ্রমবশতঃ হত্যার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে ভ্রম বলে 'ইচ্ছা নয়' বোঝানো হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় প্রকার হত্যাই এর অন্তর্ভুক্ত। উভয় প্রকারের মধ্যে গোনাহ্ ও রক্ত-বিনিময়ের বিধান রয়েছে। তবে উভয় প্রকারের গোনাহ্ ও রক্ত-বিনিময় বিভিন্ন রকম। দ্বিতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময় হচ্ছে একশ উট। উটগুলো চার প্রকারের হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রকারে পাঁচটি করে উট থাকবে। তৃতীয় প্রকারের রক্ত বিনিময়ও একশ উট। কিন্তু উটগুলো হবে পাঁচ প্রকারের। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রকারে বিশটি করে উট থাকবে। তবে রক্ত-বিনিময় মুদ্রার মাধ্যমে দিলে উভয় প্রকারে দশ হাজার দেরহাম অথবা এক হাজার দীনার দিতে হবে। ইচ্ছার কারণে দ্বিতীয় প্রকারের গোনাহ্ বেশী এবং তৃতীয় প্রকারের গোনাহ্ কম। অর্থাৎ, শুধু অসাবধানতার গোনাহ্ হবে।— (হেদায়া) ক্রীতদাস মুক্তকরণ ওয়াজেব হওয়া এবং তওবা শব্দ দ্বারা একথা বোঝা যায়। উপরোক্ত তিন প্রকারের হত্যার যে স্বরূপ বর্ণিত হল, তা পার্থিব বিধানের দিক দিয়ে। গোনাহ্র দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত হওয়া আন্তরিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। শাস্তিবাণীও এরই উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তাআলা জানেন, এদিক দিয়ে প্রথম প্রকার অনিচ্ছাকৃত এবং দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছাকৃত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

০ রক্ত বিনিময়ের উপরোক্ত পরিমাণ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন নিহত ব্যক্তি পুরুষ হবে। পক্ষান্তরে মহিলা হলে এর পরিমাণ হবে অর্ধেক।— (হেদায়া)

০ মুসলমান ও যিম্মীর রক্ত-বিনিময় সমান। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ دية كل ذى عهد فى عهده الف دينار (হেদায়া, আবু-দাউদ)

০ কাফ্ফারা অর্থাৎ, ক্রীতদাস মুক্ত করা কিংবা রোযা রাখা স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয় এবং রক্ত-বিনিময় হত্যাকারীর স্বজনদের যিম্মায় ওয়াজেব। শরীয়তের পরিভাষায় তাদেরকে 'আকেলা' বলা হয়।— (বয়ানুল-কোরআন)

এখানে প্রশ্ন করা উচিত হবে না যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা তার স্বজনদের উপর কেন চাপানো হয়? তারা তো নিরপরাধ! এর কারণ এই যে, হত্যাকারীর স্বজনরাও দোষী। তারা তাকে এ ধরনের উচ্ছৃংখল কাজ-কর্মে বাধা দেয়নি। রক্ত-বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা তার দেখাশোনা করতে ত্রুটি করবে না।

০ কাফ্ফারায় বাঁদী ও ক্রীতদাস সমান। رَقَبَةٍ শব্দে উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। তবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হতে হবে।

০ নিহত ব্যক্তির রক্ত-বিনিময় তার ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। কোন ওয়ারিস স্বীয় অংশ মাফ করে দিলে সে পরিমাণ মাফ হয়ে যাবে। সবাই মাফ করে দিলে সম্পূর্ণ মাফ হয়ে যাবে।

০ যে নিহত ব্যক্তির কোন ওয়ারিস নেই; তার রক্ত-বিনিময় বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগারে জমা হবে। কেননা, রক্ত-বিনিময় ত্যাজ্য সম্পত্তি। ত্যাজ্য সম্পত্তির বিধান তাই।— (বয়ানুল-কোরআন)

চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় (যিম্মী অথবা অভয়প্রাপ্ত)-এর ক্ষেত্রে যে রক্ত-বিনিময় ওয়াজেব হয়, বাহ্যতঃ তা তখনই হয়, যখন যিম্মী কিংবা অভয়প্রাপ্তের পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে যদি তার পরিবার-পরিজন বিদ্যমান না থাকে কিংবা তারা অমুসলমান হয়; মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হতে পারে না বলে এরূপ পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকা না থাকারই শামিল— এমত ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি যিম্মী হলে তার রক্ত-বিনিময় বায়তুল মালে জমা হবে। কেননা, যিম্মী বে-ওয়ারিসের ত্যাজ্য সম্পত্তি রক্ত-বিনিময়সহ বায়তুল মালে যায়। (দুররে মোখতার) নিহত ব্যক্তি যিম্মী না হলে রক্ত-বিনিময় ওয়াজেব হবে না।— (বয়ানুল -কোরআন)

০ কাফ্ফারার রোযায় যদি রোগ-ব্যাধির কারণে উপর্যুপরিতা ক্ষুণ্ন হয়, তবে প্রথম থেকে রোযা রাখতে হবে। অবশ্য মহিলাদের ঋতুস্রাবের কারণে যে রোযা ভাংতে হয় তাতে উপর্যুপরিতা ক্ষুণ্ন হবে না।

০ ওযরবশতঃ রোযা রাখতে সক্ষম না হলে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তওবা করবে।

০ ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় কাফ্ফারা নেই— তওবা করা উচিত।— (বয়ানুল-কোরআন)

মুসলমান মনে করার জন্যে ইসলামী লক্ষাণাদিই যথেষ্ট ঃ উল্লেখিত তিনটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কেউ মুসলমান বলে নিজেকে পরিচয় দিলে অনুসন্ধান ব্যতিরেকে তার উক্তিকে কপটতা মনে করা কোন মুসলমানের জন্যেই বৈধ নয়। এ ব্যাপারে কোন কোন সাহাবী থেকে ভুল সংঘটিত হওয়ার কারণে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

তিরমিযী ও মুসনাদে-আহমদ গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী-সুলায়মের এক ব্যক্তি একদিন ছাগলের পাল চরানো অবস্থায় একদল মুজাহিদ সাহাবীর সম্মুখে পতিত হয়। সে মুজাহিদ দলকে সালাম করল। তার পক্ষ থেকে এ বিষয়ের কার্যতঃ অভিব্যক্তি ছিল যে, সে একজন মুসলমান। কিন্তু মুজাহিদরা মনে করলেন যে, সে শুধু জীবন ও ছাগলের পাল রক্ষা করার জন্যেই এ প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। এ সন্দেহে তাঁরা লোকটিকে হত্যা করে তার ছাগলের পাল অধিকার করে নিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত করলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইসলামী পদ্ধতিতে তোমাকে সালাম করে, তার সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ করো না যে, সে প্রতারণাপূর্বক নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে। তার অর্থ-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ মাল মনে করে অধিকারে নিও না।— (ইবনে-কাসীর)

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এ দুটি ঘটনা ছাড়া আরও ঘটনাবলী বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সুবিজ্ঞ তফসীরবিদগণ বলেছেন, এসব রেওয়ায়েতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। সমষ্টিগতভাবে কয়েকটি ঘটনাও আয়াতটি অবতরণের হেতু হতে পারে।

ঘটনার তদন্ত না করে সিদ্ধান্ত নেয়া বৈধ নয় ঃ আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে একটি সাধারণ নির্দেশ রয়েছে যে, মুসলমানরা কোন কাজ সত্যাসত্য যাচাই না করে শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে করবে না। বলা হয়েছে ঃ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا অর্থাৎ, তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে সফর কর, তখন সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে সব কাজ করো। শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করলে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সফরে সংঘটিত হয়েছিল বলে আয়াতে সফর উল্লেখ করা হয়েছে। কিংবা এর কারণ এও হতে পারে যে, সাধারণতঃ সফরে থাকা অবস্থায় অন্যের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়। নিজ শহরে অন্যের অবস্থা সাধারণতঃ জানা থাকে। তাই আসল নির্দেশটি ব্যাপক। অর্থাৎ, সফরে হোক কিংবা বাসস্থানে হোক, সর্বত্রই খোঁজ-খবর না নিয়ে কোন

পদক্ষেপ গ্রহণ করা বৈধ নয়। এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ ভেবে-চিন্তে কাজ করা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং তড়িঘড়ি কাজ করা শয়তানের পক্ষ থেকে।—(বাহ্‌রে-মুহীত)

কেবলার অনুসারীকে কাফের না বলার তাৎপর্য ঃ এ আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জানা গেল যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমানরূপে পরিচয় দেয়, কলেমা পাঠ করে কিংবা অন্য কোন ইসলামী বৈশিষ্ট্য যথা নামায, আযান ইত্যাদিতে যোগদান করে, তাকে মুসলমান মনে করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে মুসলমানদের মতই ব্যবহার করতে হবে এবং সে আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়েছে না কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, একথা প্রমাণ করার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

এছাড়া এ ব্যাপারে তার কাজকর্মের উপরও উপরোক্ত নির্দেশ নির্ভরশীল হবে না। মনে করুন, সে নামায পড়ে না, রোযা রাখে না এবং সর্বপ্রকার গোনাহে জড়িত, তবুও তাকে ইসলাম বহির্ভূত বলার কিংবা তার সাথে কাফেরের মত ব্যবহার করার অধিকার কারও নেই। এ কারণেই ইমাম আযম আবু-হানীফা (রহঃ) বলেনঃ "আমরা কেবলার অনুসারীকে কোন পাপ কার্যের কারণে কাফের সাব্যস্ত করি না।" কোন কোন হাদীসে এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত আছে যে, যত গোনাহ্‌গার দুষ্কর্মীই হোক, কেবলার অনুসারীকে কাফের বলো না।

কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও স্মরণযোগ্য যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে, কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী তাকে কাফের বলা বা মনে করা বৈধ নয়। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কুফরের নিশ্চিত লক্ষণ, এরূপ কোন কথা বা কাজ যতক্ষণ তার দ্বারা সংঘটিত না হবে, ততক্ষণ তার ইসলামের স্বীকারোক্তিকে বিশুদ্ধ মনে করা হবে এবং তাকে মুসলমানই বলা হবে। তার সাথে মুসলমানের মতই ব্যবহার করা হবে এবং তার আন্তরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার অধিকার কারও থাকবে না।

কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করার সাথে সাথে কিছু কুফরী কলেমাও বকাবকি করে, অথবা প্রতিমাকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে কিংবা ইসলামের কোন অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশ অস্বীকার করে কিংবা কাফেরদের কোন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে; যেমন, গলায় পৈতা পরা ইত্যাদি, তবে তাকে সন্দেহাতীতভাবে কুফরী কাজকর্মের কারণে কাফের আখ্যা দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতের শব্দে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। নতুবা ইহুদী ও খৃষ্টান সবাই নিজেকে মুমিন-মুসলমান বলত। মুসায়লামা কায্‌যাব শুধু কলেমার স্বীকারোক্তিই নয়, ইসলামী বৈশিষ্ট্য, যথা নামায, আযান ইত্যাদিরও অনুগামী ছিল। আযানে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর সাথে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'ও উচ্চারণ করত। কিন্তু সাথে সাথে সে নিজেকেও নবী-রাসূল ও ওহীর অধিকারী বলে দাবী করত, যা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ। এ কারণেই তাকে ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত করা হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের এজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে জেহাদ করে তাকে হত্যা করা হয়।

মোটামুটি মাসআলা হল এই যে, প্রত্যেক কলেমা উচ্চারণকারী কেবলার অনুসারীকে মুসলমান মনে কর। তার অন্তরে কি আছে, তা খোঁজাখুঁজি করার প্রয়োজন নেই, অন্তরের বিষয় আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ কর। তবে ঈমান প্রকাশের সাথে সাথে ঈমান বিরোধী কোন কাজ সংঘটিত হলে তাকে মুর্তাদ অর্থাৎ, ধর্মত্যাগী মনে কর। এর জন্যে শর্ত এই যে, কাজটি যে ঈমান বিরোধী, তা অকাট্য ও নিশ্চিত হতে হবে। এতে কোনরূপ দ্ব্যর্থতার অবকাশ না থাকা চাই।

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰۗىِٕكَةُ ظَالِمِيْٓ
اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ۭ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ
فِي الْاَرْضِ ۭ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا
فِيْهَا ۭ فَاُولٰۗىِٕكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَسَاۗءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾
اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۗءِ وَالْوِلْدَانِ
لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾
فَاُولٰۗىِٕكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ
عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾ وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ
فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ۭ وَمَنْ يَّخْرُجْ
مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ
الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَي اللّٰهِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾ وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ڰ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿١٠١﴾

(৯৬) এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (৯৭) যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে ঃ এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে ঃ আল্লাহ্র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। (৯৮) কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না। (৯৯) অতএব, আশা করা যায়, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (১০০) যে কেউ আল্লাহ্র পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহ্র কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১০১) যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হিজরতের সংজ্ঞা ঃ আলোচ্য চারটি আয়াতে হিজরতের ফযীলত, বরকত ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। অভিধানে হিজরত শব্দটি 'হিজরান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, অসন্তুষ্টিচিত্তে কোন কিছুকে ত্যাগ করা। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় দেশত্যাগ করাকে হিজরত বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় দারুল-কুফর তথা কাফেরদের দেশ ত্যাগ করে দারুল-ইসলাম তথা মুসলমানদের দেশে গমন করার নাম হিজরত।—(রূহুল-মা'আনী)

মোল্লা আলী ক্বারী মেশকাতের শরাহ্য় বলেন ঃ ধর্মীয় কারণে কোন দেশ ত্যাগ করাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত।— (মেরকাত, ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃঃ)

মুহাজির সাহাবীগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ সূরা হাশরের الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন দেশের কাফেররা যদি মুসলমানকে মুসলমান হওয়ার কারণে দেশ থেকে জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে বহিষ্কার করে তবে তাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত।

হিজরতের ফযীলতঃ জেহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ যেমন সমগ্র কোরআন পাকে ছড়িয়ে রয়েছে, তেমনি হিজরতের বর্ণনাও কোরআন পাকের অধিকাংশ সূরায় একাধিকবার বিবৃত হয়েছে। সবগুলো আয়াত একত্রিত করলে জানা যায় যে, হিজরত সম্পর্কিত আয়াতসমূহে তিন রকমের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। (এক) হিজরতের ফযীলত, (দুই) হিজরতের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বরকত এবং (তিন) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দারুল-কুফর থেকে হিজরত না করার কারণে শাস্তিবাণী।

হিজরতের ফযীলত সম্পর্কিত প্রথম বিষয়বস্তু সূরা বাক্বারার এক আয়াতে রয়েছে—

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اُولٰۗىِٕكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র পথে জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ-প্রার্থী। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়।

দ্বিতীয় আয়াত – সূরা তওবায় আছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ
وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র পথে জান ও মাল দ্বারা জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্র কাছে বিরাট পদমর্যাদার অধিকারী এবং তারাই সফলকাম।

তৃতীয় আয়াত— আলোচ্য সূরা নিসার ঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ
الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَي اللّٰهِ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের নিয়তে নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে

পথেই মৃত্যুবরণ করে তার সওয়াব আল্লাহ্র যিম্মায় সাব্যস্ত হয়ে যায়।

কোন কোন রেওয়ায়েতমতে এ আয়াতটি হযরত খালেদ ইবনে হেযাম সম্পর্কে আবিসিনিয়ায় হিজরতের সময় অবতীর্ণ হয়। তিনি মক্কা থেকে হিজরতের নিয়তে আবিসিনিয়ার পথে রওয়ানা হয়ে যান। পথিমধ্যে সর্প-দংশনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মোটকথা, উপরোক্ত তিনটি আয়াতে দারুল-কুফর থেকে হিজরতে উৎসাহদান এবং এর বিরাট ফযীলত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ 'হিজরত পূর্বকৃত সব গোনাহ্কে নিঃশেষ করে দেয়।

হিজরতের বরকতঃ হিজরত বরকত সম্পর্কে সূরা নাহ্লের এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

"যারা আল্লাহ্র জন্যে হিজরত করে নির্যাতিত হওয়ার পর, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা দান করব এবং পরকালের বিরাট সওয়াব তো রয়েছেই, যদি তারা বুঝে।"

সূরা নিসার উল্লেখিত চার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে অনেক জায়গা ও সুযোগ-সুবিধা পাবে।"

আয়াতে বর্ণিত مراغم শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া। স্থানান্তরিত হওয়ার জায়গাকেও অনেক সময় مُرٰغَمًا বলে দেয়া হয়।

এ আয়াতদ্বয়ে হিজরতের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বরকত বর্ণিত হয়েছে। এতে আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের জন্যে হিজরত করে, আল্লাহ্ তার জন্যে দুনিয়াতে অনেক পথ খুলে দেন। সে দুনিয়াতেও উত্তম অবস্থান লাভ করে এবং পরকালের সওয়াব ও পদমর্যাদা তো কল্পনাতীত।

মোটকথা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা কোরআন পাকে মুহাজিরদের জন্যে যে ওয়াদা করেছেন, জগদ্বাসী তা স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। তবে আলোচ্য আয়াতেই এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে যে, هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্র পথে হিজরত হওয়া চাই। পার্থিব ধন-সম্পদ, রাজত্ব,সম্মান অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্বেষায় হিজরত না হওয়া চাই। বোখারীর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও রসূলের জন্যেই হয়। অর্থাৎ, এটিই বিশুদ্ধ হিজরত। এর ফযীলত ও বরকত কোরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে "যে ব্যক্তি অর্থের অন্বেষণে কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরতের বিনিময়ে ঐ বস্তুই পাবে, যার জন্য সে হিজরত করে।"

আজকাল কিছুসংখ্যক মুহাজিরকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখা যায়। হয় তারা এখনও অন্তর্বর্তীকালে অবস্থান করছে, অর্থাৎ, হিজরতের প্রাথমিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, না হয় তারা সঠিক অর্থে মুহাজির নয়। স্বীয় নিয়ত ও অবস্থা সংশোধনের প্রতি তাদের মনোনিবেশ করা উচিত। নিয়ত ও আমল সংশোধন করার পর তারা আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদার সত্যতা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ
مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوْٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا
مِنْ وَّرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا
مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ
عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ
أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى أَنْ تَضَعُوْٓا أَسْلِحَتَكُمْ وَ
خُذُوْا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٠٢﴾
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا
وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ إِنَّ
الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٣﴾ وَلَا
تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ
يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَ
كَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٠٤﴾ إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرٰىكَ اللهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ﴿١٠٥﴾

(১০২) যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান, তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অতঃপর যখন তারা সেজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা নামায পড়েনি। অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে নামায পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। কাফেররা চায় যে, তোমরা কোনরূপে অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই এবং সাথে নিয়ে নাও তোমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদের জন্যে অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (১০৩) অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (১০৪) তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত, তবে তারাও তো তোমাদের মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত এবং তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (১০৫) নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ্ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যোগসূত্র ঃ পূর্বে জেহাদ ও হিজরতের আলোচনা ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেহাদ ও হিজরতের জন্যে সফর করতে হয় এবং এ জাতীয় সফরে শত্রুদের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কাও থাকে। তাই সফর ও আতঙ্কাবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধা ও সংক্ষিপ্ততা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হচ্ছে।

সফর ও কসরের বিধান ঃ তিন মনযিল থেকে কম দূরত্বের সফরে পূর্ণ নামায পড়া হয়।

০ সফর শেষ করে গন্তব্যস্থলে পৌছার পর যদি সেখানে পনর দিনের কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে সে অবস্থানও সফরের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় চার রাকআতবিশিষ্ট ফরয নামায অর্ধেক পড়তে হবে। একে শরীয়তের পরিভাষায় 'কসর' বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি একই জনপদে পনের দিন অথবা তদূর্ধ্ব সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে তা সাময়িক বাসস্থান হিসেবে গণ্য হবে। এমন জায়গায় অস্থায়ী বাসস্থানের মত কসর পড়তে হবে না— পূর্ণ নামায পড়তে হবে।

০ কসর শুধু তিন ওয়াক্তের ফরয নামাযে হবে। মাগরিব, ফজর, এবং সুন্নত ও বেতরের নামাযে কসর নেই।

০ পূর্ণ নামাযের স্থলে অর্ধেক পড়ার মধ্যে কারও মনে এরূপ ধারণা আনাগোনা করে যে, বোধহয় এতে নামায পূর্ণ হলো না, এটা ঠিক নয়। কারণ, কসরও শরীয়তেরই নির্দেশ। এ নির্দেশ পালনে গোনাহ্ হয় না; বরং সওয়াব পাওয়া যায়।

০ আয়াতে وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ বলা হয়েছে (অর্থাৎ, আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন), এতে এরূপ মনে করার অবকাশ নেই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর তিরোধানের পর এখন 'সালাতুল-খওফ'-এর বিধান নেই। কেননা, তখনকার অবস্থা অনুযায়ী আয়াতে এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে। নবী বিদ্যমান থাকলে ওযর ব্যতীত অন্য কেউ নামাযে ইমাম হতে পারে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পর এখন যে ইমাম হবেন, তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং 'সালাতুল-খওফ' পড়াবেন। সব ফেকাহ্‌বিদের মতে সালাতুল-খওফের বিধান এখনও অব্যাহত রয়েছে— রহিত হয়নি।

০ মানুষের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কার কারণে 'সালাতুল-খওফ' পড়া যেমন জায়েয, তেমনিভাবে যদি বাঘ-ভালুক কিংবা অজগর ইত্যাদির ভয় থাকে এবং নামাযের সময়ও সংকীর্ণ হয়, তাহলে তখনও 'সালাতুল খওফ' পড়া জায়েয।

০ আয়াতে উভয় দলের এক এক রাকআত পড়ার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় রাকআতের নিয়ম হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দু'রাকআতের পর সালাম ফিরিয়েছেন।—(বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে দ্রষ্টব্য)

আয়াতের শানে নুযূল ঃ সূরা নিসার ১০৫ থেকে সাতটি আয়াত এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু কোরআনের সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী এ ব্যাপারে প্রদত্ত নির্দেশাবলী এ ঘটনার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতে আগমনকারী মুসলমানদের জন্যে ব্যাপক। এছাড়া এসব নির্দেশের মধ্যে অনেক মৌলিক ও শাখাগত মাসআলাও রয়েছে।

وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَادِلْ
عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ
كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ﴿١٠٧﴾ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا
يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى
مِنَ الْقَوْلِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٨﴾ هٰٓاَنْتُمْ
هٰٓؤُلَاۗءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۣ فَمَنْ يُّجَادِلُ
اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١٠٩﴾ وَ
مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۗءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ
اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى
نَفْسِهٖ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْۗـــَٔـةً
اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْۗـــًٔـا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾
وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّاۗىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ
اَنْ يُّضِلُّوْكَ ۭ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ
شَيْءٍ ۭ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ
مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۭ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾

(১০৬) এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১০৭) যারা মনে বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করে তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবেন না। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না তাকে, যে বিশ্বাসঘাতক পাপী হয়। (১০৮) তারা মানুষের কাছে লজ্জিত হয় এবং আল্লাহ্‌র কাছে লজ্জিত হয় না। তিনি তাদের সাথে রয়েছেন, যখন তারা রাত্রে এমন বিষয়ে পরামর্শ করে, যাতে আল্লাহ্ সম্মত নন। তারা যাকিছু করে, সবই আল্লাহ্‌র আয়ত্তাধীন। (১০৯) শুনছ? তোমরা তাদের পক্ষ থেকে পার্থিব জীবনে বিবাদ করছ, অতঃপর কেয়ামতের দিনে তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে কে বিবাদ করবে অথবা কে তাদের কার্যনির্বাহী হবে। (১১০) যে গোনাহ্ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ্‌কে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়। (১১১) যে কেউ পাপ করে, সে নিজের পক্ষেই করে। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (১১২) যে ব্যক্তি ভুল কিংবা গোনাহ করে, অতঃপর কোন নিরপরাধের উপর অপবাদ আরোপ করে সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গোনাহ্। (১১৩) যদি আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা না হত, তবে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল। তারা পথভ্রান্ত করতে পারে না কিন্তু নিজেদেরকেই এবং আপনার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি ঐশীগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র করুণা অসীম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, হিজরতের প্রাথমিক যুগে সাধারণ মুসলমানরা দারিদ্র্য ও অনাহারে দিনাতিপাত করতেন। তাঁদের সাধারণ খাদ্য ছিল যবের আটা কিংবা খেজুর অথবা গমের আটা। এগুলো খুব দুর্লভ ছিল এবং মদীনায় প্রায় পাওয়াই যেত না। সিরিয়া থেকে চালান এলে কেউ কেউ মেহমানদের জন্যে কিংবা বিশেষ প্রয়োজনের জন্য ক্রয় করে রাখত। হযরত রেফাআহ্ এমনিভাবে কিছু গমের আটা কিনে একটি বস্তায় রেখে দিয়েছিলেন। এ বস্তার মধ্যেই কিছু অস্ত্রশস্ত্রও রেখে একটি ছোট কক্ষে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। বশীর কিংবা তো'মা সিঁধ কেটে বস্তা বের করে নেয়। সকালে হযরত রেফাআহ্ ব্যাপার দেখে ভ্রাতুষ্পুত্র কাতাদার কাছে ঘটনা বিবৃত করলেন। সবাই মিলে মহল্লায় খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। কেউ কেউ বলল, আজ রাত্রে আমরা বনী-উবায়রাকের ঘরে আগুন জ্বলতে দেখেছি। মনে হয় সে খাদ্যই পাকানো হয়েছে। রহস্য ফাঁস হয়ে পড়ার সংবাদ পেয়ে বনী-উবায়রাক নিজেরাই এসে হাযির হল এবং বলল এটা লবীদ ইবনে সাহ্‌লের কাজ। আমরা তো তাকে খাঁটি মুসলমান বলেই জানতাম। খবর পেয়ে লবীদ তরবারী কোষমুক্ত করে এলেন এবং বললেন ঃ তোমরা আমাকে চোর বলছ? শুনে নাও, চুরির রহস্য উদঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ তরবারি কোষবদ্ধ করব না।

বনী-উবায়রাক আস্তে বলল ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার নাম কেউ নেয় না। আপনার দ্বারা একাজ হতেও পারে না। বগভী ও ইবনে-জরীরের রেওয়ায়েতে এস্থলে বলা হয়েছে যে, বনী-উবায়রাক জনৈক ইহুদীর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। ধূর্ততাবশতঃ তারা আটার বস্তা সামান্য ছিঁড়ে ফেলেছিল। ফলে রেফাআহ্‌র গৃহ থেকে উপরোক্ত ইহুদীর গৃহ পর্যন্ত আটার লক্ষণ পাওয়া গেল। জানাজানির পর চোরাই অস্ত্রশস্ত্র এবং লৌহ-বর্মও ইহুদীর কাছাকাছি রেখে দিল। তদন্তের সময় তার গৃহ থেকেই এগুলো বের হল। ইহুদী কসম খেয়ে বলল, ইবনে-উবায়রাক আমাকে লৌহ-বর্মটি দিয়েছে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েত ও বগভীর রেওয়ায়েতে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, বনী-উবায়রাক প্রথমে দেখল যে, এটা ধোপে টিকবে না, তখন ইহুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। যাহোক, এখন বিষয়টি বনী-উবায়রাক ও ইহুদীর মধ্যে গিয়ে গড়ায়।

এদিকে বিভিন্ন পন্থায় হজরত কাতাদা ও রেফাআহ্‌র প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এটি বনী-উবায়রাকেরই কীর্তি। হযরত কাতাদা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে চুরির ঘটনা এবং তদন্তক্রমে বনী-উবায়রাকের প্রতি প্রবল ধারণার কথা আলোচনা করলেন। বনী-উবায়রাক সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এসে রেফাআহ্ ও কাতাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই তারা আমাদের নামে চুরির অপবাদ আরোপ করছে। অথচ চোরাই মাল ইহুদীর ঘর থেকে বের হয়েছে। আপনি তাদেরকে বারণ করুন, তারা যেন আমাদেরকে দোষারোপ না করে এবং ইহুদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরও প্রবল ধারণা জন্মে যে, এ কাজটি ইহুদীর। বনী-উবায়রাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক নয়। বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, এমন কি, তিনি ইহুদীর উপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ করার এবং হস্ত কর্তন করার বিষয়ও স্থির করে ফেলেন।

এদিকে কাতাদা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ আপনি বিনা প্রমাণে একটি মুসলমান পরিবারকে চুরির জন্য দোষারোপ করছেন। এতে হযরত কাতাদা খুব দুঃখিত হলেন এবং আফসোস করে বললেন, আমার মাল গেলেও এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে কোন কিছু না বলাই ভাল ছিল। এমনিভাবে হযরত রেফাআহ্কেও তিনি এ ধরনের কথা বললেন। রেফাআহ্ও ধৈর্যধারণ করলেন এবং বললেন ঃ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ (আল্লাহ্ সহায়)।

বেশীদিন অতিবাহিত না হতেই এ ব্যাপারে কোরআন পাকের পূর্ণ একটি রুকূ অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে ঘটনার বাস্তবরূপ তুলে ধরা হয় এবং এ জাতীয় ব্যাপারাদি সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ দান করা হয়।

কোরআন পাক বনী উবায়রাকের চুরি ফাঁস করে ইহুদীকে দোষমুক্ত করে দিল। এতে বনী-উবায়রাক বাধ্য হয়ে চোরাই মাল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে সমর্পণ করল। তিনি রেফাআহ্কে তা প্রত্যর্পণ করলেন। রেফাআহ্ সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র জেহাদের জন্যে ওয়াকফ করে দিলেন। এদিকে বনী-উবায়রাকের চুরি প্রকাশ হয়ে পড়লে বশীর ইবনে-উবায়রাক মদীনা থেকে পলায়ন করল এবং মক্কার কাফেরদের সাথে একাত্ম হয়ে গেল। সে পূর্বে মুনাফেক থাকলে এবার প্রকাশ্য কাফের এবং পূর্বে মুসলমান থাকলে এবার ধর্মত্যাগী হয়ে গেল।

তফসীর বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের পাপ বশীরকে মক্কায়ও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। যে মহিলার গৃহে সে আশ্রয় নিয়েছিল, সে ঘটনা জানতে পেয়ে তাকে বহিষ্কার করে দিল। এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে এক ব্যক্তির গৃহে সিঁধ কাটে এবং প্রাচীর চাপা পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এ পর্যন্ত ছিল ঘটনার বিবরণ; এবার এ সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য শুনুন। প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে চুরির ঘটনার আসল স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ আমি আপনার প্রতি কোরআন ও ওহী এজন্যে অবতারণ করেছি, যাতে আপনি আল্লাহ্-প্রদত্ত জ্ঞান ও তত্ত্ব অনুযায়ী ফয়সালা করেন এবং বিশ্বাসঘাতকদের অর্থাৎ, বনী-উবায়রাকের পক্ষপাতিত্ব না করেন। যদিও বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে চুরির ব্যাপারে ইহুদীর প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রবল ধারণা হওয়া কোন গোনাহ্ ছিল না; কিন্তু ছিল বাস্তব ঘটনার পরিপন্থী। তাই দ্বিতীয় আয়াতে তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, পয়গম্বরগণের স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। এতটুকু ব্যাপারও তাঁর পক্ষে শোভা পায় না।

তৃতীয় (অর্থাৎ, ১০৭) আয়াতে পুনরায় তাকিদ করা হয়েছে যে, আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে পক্ষে কোন বিতর্ক করবেন না। কেননা, আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করে না।

চতুর্থ (অর্থাৎ, ১০৮) আয়াতে বিশ্বাসঘাতকদের জঘন্য অবস্থা ও নির্বুদ্ধিতা ব্যক্ত হয়েছে যে, তারা নিজেদের মত মানুষের কাছে তো লজ্জাবোধ করে এবং চুরি গোপন করে; কিন্তু আল্লাহ্র কাছে লজ্জিত হয় না, যিনি সর্বদা তাদের সাথে রয়েছেন এবং তাদের প্রত্যেক কাজ নিরীক্ষণ করছেন; বিশেষ করে এ ঘটনাটি দেখেছেন যে, তারা পরস্পর পরামর্শ করে স্থির করে যে, ইহুদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কর, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে রেফাআহ্ ও কাতাদার বিরুদ্ধে নালিশ কর এবং তাঁকে অনুরোধ কর তিনি যেন ইহুদীর বিরুদ্ধে আমাদিগকে সমর্থন করেন।

পঞ্চম (অর্থাৎ, ১০৯) আয়াতে বনী-উবায়রাকের সমর্থকদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে তো তোমরা তাদের সমর্থন করলে; কিন্তু ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। কেয়ামতে যখন আল্লাহ্র আদালতে মোকদ্দমার শুনানী হবে, তখন কে সমর্থন করবে? এ আয়াতে তাদেরকে একাধারে তিরস্কার করা হয়েছে এবং পরকালের ভীতি প্রদর্শন করে স্বীয় দুষ্কর্মের জন্যে তওবা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ (অর্থাৎ, ১১০) আয়াতে কোরআন পাকের সাধারণ বিজ্ঞোচিত পদ্ধতি অনুযায়ী অপরাধী-পাপীদেরকে নৈরাশ্য থেকে উদ্ধার করার জন্যে বলা হয়েছে যে, ছোট গোনাহ্ হোক বা বড় গোনাহ্, গোনাহগার ব্যক্তি যখন আল্লাহ্র কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল করুণাময় পায়। এতেকরে উপরোক্ত গোনাহে যারা জড়িত ছিল, তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, এখনও সময় আছে ফিরে এস। খাঁটি মনে তওবা করলে কিছুই নষ্ট হয়নি, আল্লাহ্ তাআলা মাফ করবেন।

সপ্তম (অর্থাৎ, ১১১) আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা এখনও যদি তওবা না করে, তাহলে তাতে আল্লাহ্র রসূল কিংবা মুসলমানদের কোন ক্ষতি হবে না; বরং এ পাপের বোঝা তাদেরকেই বহন করতে হবে।

অষ্টম (অর্থাৎ, ১১২) আয়াতে একটি সাধারণ বিধির আকারে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজে কোন অপরাধ করে তা অন্য নিরপরাধ ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, (যেমন বর্ণিত ঘটনায় বনী-উবায়রাক নিজে চুরি করে হযরত লবীদ অথবা ইহুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল) সে জঘন্য অপবাদ এবং প্রকাশ্য গোনাহর বোঝা নিজে বহন করে।

নবম (অর্থাৎ, ১১৩) আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী না হলে তাঁরা আপনাকে বিভ্রান্ত করে দিত। তিনি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে সত্য ঘটনা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী। তাই কখনও তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না; বরং নিজেরাই পথভ্রষ্ট হবে। আপনার বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি করতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা আপনার প্রতি ঐশীগ্রন্থ এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদি অবতারণ করেছেন, যা আপনি ইতিপূর্বে জানতেন না।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইজতিহাদ করার অধিকার ঃ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ আয়াত থেকে পাঁচটি বিষয় প্রমাণিত হয়। (এক) যেসব বিষয় সম্পর্কে কোরআন পাকে কোন স্পষ্ট উক্তি বর্ণিত নেই সেগুলোতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিজ মতামত দ্বারা ইজতিহাদ করার অধিকার ছিল। জরুরী বিষয়াদিতে তিনি অনেক ফয়সালা স্বীয় ইজতিহাদ দ্বারাও করতেন।

(দুই) আল্লাহ্ তাআলার কাছে সে ইজতিহাদই গ্রহণযোগ্য, যা কোরআন ও সুন্নাহ্র মূলনীতি থেকে গৃহীত। এব্যাপারে নিছক ব্যক্তিগত মতামত ও ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়, শরীয়তের পরিভাষায় একে ইজতিহাদ বলা যায় না।

(তিন) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইজতিহাদ অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামের ইজতিহাদের মত ছিল না, যাতে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। তিনি যখন ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন ফায়সালা করতেন, তাতে কোন ভুল হয়ে গেলে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সতর্ক করে ফয়সালাকে নির্ভুল ও সঠিক করিয়ে দিতেন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কোন ইজতিহাদী ফয়সালার পর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যদি এ সম্পর্কে কোন হুঁশিয়ারী অবতীর্ণ না হত, তবে তাতে

প্রতিভাত হত যে, ফয়সালাটি আল্লাহ্র পছন্দনীয় ও নির্ভুল হয়েছে।

(চার) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোরআন থেকে যাকিছু বুঝতেন, তা ছিল আল্লাহ্ তাআলারই বোঝানো বিষয়। এতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ ছিল না। অন্যান্য আলেম ও মুজতাহিদের অবস্থা তেমন নয়। তাঁরা যা বোঝেন সে সম্পর্কে একথা বলা যায় না যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে বলে দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন। এ কারণেই فاحكم بما اراك الله (অর্থাৎ, আল্লাহ্ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন)। তখন তিনি শাসিয়ে দিয়ে বললেন ঃ এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর, অন্য কারও নয়।

(পাঁচ) মিথ্যা মোকদ্দমা ও মিথ্যা দাবীর তদবীর করা, ওকালতি করা, সমর্থন করা ইত্যাদি সবই হারাম।

তওবার তাৎপর্য ঃ ১১০ তম আয়াত অর্থাৎ وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ থেকে জানা যায় যে, সংক্রামক গোনাহ্ ও অসংক্রামক গোনাহ্, অর্থাৎ বান্দার হকের সাথে কিংবা আল্লাহ্র হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব গোনাহ্ই তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা মাফ হতে পারে। তবে তওবা ও এস্তেগফারের স্বরূপ জানা জরুরী। শুধু মুখে 'আস্তাগফেরুল্লাহ্ ওয়া আতুবু ইলাইহি' বলার নাম তওবা ও এস্তেগফার নয়। তাই আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি সেজন্য অনুতপ্ত না হয় এবং তা পরিত্যাগ না করে কিংবা ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করতে কৃতসংকল্প না হয়, তবে মুখে মুখে 'আস্তাগফেরুল্লাহ্' বলা তওবার সাথে উপহাস করা বৈ কিছু নয়।

তওবার জন্যে মোটামুটি তিনটি বিষয় জরুরী ঃ (এক) অতীত গোনাহ্র জন্যে অনুতপ্ত হওয়া, (দুই) উপস্থিত গোনাহ্ অবিলম্বে ত্যাগ করা এবং (তিন) ভবিষ্যতে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। বান্দার হকের সাথে যেসব গোনাহ্র সম্পর্ক, সেগুলো বান্দার কাছ থেকেই মাফ করিয়ে নেয়া কিংবা হক পরিশোধ করে দেয়া তওবার অন্যতম শর্ত।

নিজের গোনাহ্র দোষ অন্যের উপর চাপানো দ্বিগুণ শাস্তির কারণ ঃ ১১২ তম আয়াতে অর্থাৎ, وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ .... يَرْمِ بِهٖ থেকে জানা যায় যে, যে লোক নিজে পাপ করে এবং অপর নিরপরাধ ব্যক্তিকে সেজন্য অভিযুক্ত করে, সে নিজ গোনাহ্কে দ্বিগুণ ও অত্যন্ত কঠোর করে দেয় এবং নির্মম শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। একে তো নিজের আসল গোনাহ্র শাস্তি, দ্বিতীয়তঃ অপবাদের কঠোর শাস্তি।

কোরআন ও সুন্নাহর তাৎপর্য ঃ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ .... বাক্যে 'কিতাব'–এর সাথে 'হেকমত' শব্দটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সুন্নাহ ও শিক্ষার নাম যে 'হেকমত' তাও আল্লাহ্ তাআলারই অবতারিত। পার্থক্য এই যে, সুন্নাহর শব্দাবলী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়। এ কারণেই কোরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য কোরআন ও সুন্নাহ উভয়টিরই তথ্যসমূহ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত। তাই উভয়ের বাস্তবায়নই ওয়াজেব।

এ থেকে কোন কোন ফেকাহ্বিদের এ উক্তির স্বরূপও জানা গেল যে, ওহী দুই প্রকার ঃ (এক) متلو যা তেলাওয়াত করা হয় এবং (দুই) غير متلو যা তেলাওয়াত করা হয় না। প্রথম প্রকার ওহী কোরআনকে বলা হয়, যার অর্থ ও শব্দাবলী উভয়ই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। দ্বিতীয় প্রকার ওহী হাদীস তথা সুন্নাহ। এর শব্দাবলী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর এবং মর্ম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টজীবের চাইতে বেশী ঃ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানের মত সর্বব্যাপী ছিল না; যেমন কতক মূর্খ বলে থাকে। বরং আল্লাহ্ যতটুকু দান করতেন, তিনি তাই পেতেন। তবে এতে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা সমগ্র সৃষ্টজীবের জ্ঞানের চাইতে অনেক বেশী।

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ
مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ وَمَن
يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَ
يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ
جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ
بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا
إِنَاثًا ۖ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ
وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ
الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ
الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾
يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾
أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

(১১৪) তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করতো তা স্বতন্ত্র। যে একাজ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে আমি তাকে বিরাট ছওয়াব দান করব। (১১৫) যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। (১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে! এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন। যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। (১১৭) তারা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে (১১৮) যার প্রতি আল্লাহ্‌ অভিসম্পাত করেছেন। শয়তান বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব, (১১৯) তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। (১২০) সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা বৈ নয়। (১২১) তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। তারা সেখান থেকে কোথাও পালাবার জায়গা পাবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পারস্পরিক সলা-পরামর্শ ও মজলিসের উত্তম পন্থা ঃ বলা হয়েছে ঃ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ অর্থাৎ, মানুষের যেসব পারস্পরিক সলা-পরামর্শ পরকালের ভাবনা ও পরিণতির চিন্তা বিবর্জিত শুধু ক্ষণস্থায়ী পার্থিব ও সাময়িক উপকার লাভের জন্য হয়ে থাকে, সেগুলোতে কোন মঙ্গল নেই।

এরপর বলা হয়েছে ঃ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ অর্থাৎ, এসব সলা-পরামর্শ ও কানাকানিতে মঙ্গলের কোন কিছু থাকলে তা হচ্ছে একে অপরকে দান-খয়রাতে উৎসাহিত করা কিংবা সৎকাজের আদেশ দেওয়া অথবা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি স্থাপনের পরামর্শ দান করা। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মানুষের যেসব কথাবার্তায় আল্লাহ্‌র যিকির কিংবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ থাকে, সেগুলো ছাড়া সবই তাদের জন্য ক্ষতিকর।

مَعْرُوفٍ এমন কাজকে বলা হয়, যা শরীয়তে প্রশংসিত এবং যা শরীয়তপন্থীদের কাছে পরিচিত। এর বিপরীতে **منكر ঐ কাজ, যা শরীয়তে অপছন্দনীয় এবং শরীয়তপন্থীদের কাছে অপরিচিত।**

যে কোন সৎকাজের আদেশ এবং উৎসাহদান 'আমর বিল-মারূফে'র অন্তর্ভুক্ত। উৎপীড়িতকে সাহায্য করা, অভাবীদের ঋণ দেয়া, পথভ্রান্তকে পথ বলে দেয়া ইত্যাদি সৎকাজও 'আমর বিল মারূফে'র অন্তর্ভুক্ত। সদকা এবং মানুষের পরস্পরিক শান্তিস্থাপন যদিও এর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এতদুভয়ের উপকারিতা বহুলোকের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং জাতীয় জীবন সংশোধিত হয়।

এ ছাড়া দুটি কাজ জনসেবার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহকে পরিব্যপ্ত করে। (এক) সৃষ্ট জীবের উপকার করা, (দুই) মানুষকে দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করা। সদকা উপকার সাধনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা, সৃষ্টজীবকে ক্ষতির কবল থেকে রক্ষা করার সর্বপ্রধান মাধ্যম। তাই তফসীরবিদগণ বলেন ঃ এখানে সদকার অর্থ ব্যাপক। ওয়াজেব সদকা, জাকাত, নফল সদকা এবং যে কোন উপকার এর অন্তর্ভুক্ত।

শিরক ও কুফরের শাস্তি চিরস্থায়ী হওয়া ঃ এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন করে যে, কর্ম পরিমাণে শাস্তি হওয়া উচিত। মুশরেক ও কাফেররা যে শিরক ও কুফরের অপরাধ করে, তা সীমাবদ্ধ আয়ুষ্কালের মধ্যে করে। অতএব, এর শাস্তি অনন্তকাল স্থায়ী হবে কেন? উত্তর এই যে, কাফের ও মুশরেকরা কুফর ও শিরককে অপরাধই মনে করে না; বরং পুণ্যের কাজ বলে মনে করে। তাই তাদের ইচ্ছা ও সংকল্প এটাই থাকে যে, চিরকাল এ অবস্থার উপরই কায়েম থাকবে। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত যখন সে এঅবস্থার উপরই কায়েম থাকে, তখন সে নিজ সাধ্যের সীমা পর্যন্ত চিরস্থায়ী অপরাধ করে নেয়। তাই শাস্তিও চিরস্থায়ী হবে।

জুলুম ও অবিচার তিন প্রকার ঃ এক প্রকার জুলুম আল্লাহ্‌ তাআলা কখনও ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার জুলুম মাফ হতে পারে। তৃতীয় প্রকার জুলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ্‌ তাআলা না নিয়ে ছাড়বেন না।

প্রথম প্রকার জুলুম হচ্ছে শিরক, দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহ্‌র হকে ত্রুটি করা এবং তৃতীয় প্রকার বান্দার হক বিনষ্ট করা। — (ইবনে-কাসীর)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللّٰهِ
حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ
وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتٰبِ ۗ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ۙ وَ
لَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ
مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ
دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ
إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرٰهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿١٢٦﴾
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۙ وَمَا
يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِي يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِي لَا
تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتٰمٰى
بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

(১২২) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাব, যেগুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। তারা চিরকাল তথায় অবস্থান করবে। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সত্য সত্য। আল্লাহ্র চাইতে অধিক সত্যবাদী কে? (১২৩) তোমাদের আশার উপরও ভিত্তি নয় এবং আহলে-কিতাবদের আশার উপরও না। যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের কোন সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না। (১২৪) যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না। (১২৫) যে আল্লাহ্র নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে— যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার? আল্লাহ্ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (১২৬) যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে, সব আল্লাহ্রই। সব বস্তু আল্লাহ্র মুষ্টি-বলয়ে। (১২৭) তারা আপনার কাছে নারীদের বিবাহের অনুমতি চায়। বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে অনুমতি দেন এবং কোরআনে তোমাদেরকে যা যা পাঠ করে শুনানো হয়, তা ঐ সব পিতৃহীনা নারীদের বিধান, যাদেরকে তোমরা নির্ধারিত অধিকার প্রদান কর না অথচ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখ। আর অক্ষম শিশুদের বিধান এই যে, এতীমদের জন্যে ইনসাফের উপর কায়েম থাক। তোমরা যা ভাল কাজ করবে, তা আল্লাহ্ জানেন।

শিরকের তাৎপর্য ঃ শিরকের তাৎপর্য হচ্ছে— আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সৃষ্টবস্তুকে এবাদত কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করা। জাহান্নামে পৌঁছে মুশরেকরা যে উক্তি করবে, কোরআন পাক তা উদ্ধৃত করেছে ঃ تَاللّٰهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِينَ — অর্থাৎ, আল্লাহ্র কসম, আমরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলাম যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য স্থির করেছিলাম।

জানা কথা যে, মুশরেকদেরও এরূপ বিশ্বাস ছিল না যে, তাদের স্বনির্মিত প্রস্তরমূর্তি বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও মালিক। তারা অন্যান্য ভুল-বোঝাবোঝির কারণে এদেরকে এবাদতে কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহ্ তাআলার সমতুল্য স্থির করে নিয়েছিল। এ শিরকই তাদেরকে জাহান্নামে পৌঁছে দিয়েছে। —(ফাতহুল মুলহিম) জানা গেল যে, স্রষ্টা রিযিকদাতা, সর্বশক্তিমান, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ্ তাআলার ইত্যকার বিশেষ গুণে কোন সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করাই শিরক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড ঃ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتٰبِ – আয়াতে মুসলমান ও আহ্লে-কিতাবদের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি কথোপকথন উল্লেখিত হয়েছে। এরপর এ কথোপকথন বিচার করে উভয় পক্ষকে বিশুদ্ধ হেদায়েতের পর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অবশেষে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার একটি মানদণ্ড ব্যক্ত করা হয়েছে, যা সামনে রাখলে মানুষ কখনও ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার শিকার হবে না।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ একবার কিছু সংখ্যক মুসলমান ও আহ্লে-কিতাবের মধ্যে গর্বসূচক কথাবার্তা শুরু হলে আহ্লে-কিতাবরা বলল ঃ আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত। কারণ, আমাদের নবী ও আমাদের গ্রন্থ তোমাদের নবী ও তোমাদের গ্রন্থের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানরা বলল ঃ আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা, আমাদের নবী সর্বশেষ নবী এবং আমাদের গ্রন্থ সর্বশেষ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ পূর্ববর্তী সব গ্রন্থকে রহিত করে দিয়েছে। এ কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

এতে বলা হয়েছে যে, এ গর্ব ও অহংকার কারও জন্য শোভা পায় না। শুধু কল্পনা, বাসনা ও দাবী দ্বারা কেউ কারও চাইতে শ্রেষ্ট হয় না, বরং প্রত্যেকের কাজ-কর্মই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। কারও নবী ও গ্রন্থ যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন, যদি সে ভ্রান্ত কাজ করে, তবে সেই কাজের শাস্তি পাবে। এ শাস্তির কবল থেকে রেহাই দিতে পারে— এরূপ কাউকে সে খুঁজে পাবে না।

এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। ইমাম মুসলিম তিরমিযী, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ (রাহঃ) হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ – অর্থাৎ, যে কেউ কোন অসৎকাজ করবে, সেজন্যে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হল, তখন আমরা খুব দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) – এর কাছে আরয করলাম যে, এ

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ
وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا
بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ﴿١٢٩﴾ وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ
اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿١٣٠﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ
اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى
الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٢﴾ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ
اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ
قَدِيْرًا ﴿١٣٣﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ
ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٤﴾

(১২৮) যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন গোনাহ্ নাই। মীমাংসা উত্তম। মনের সামনে লোভ বিদ্যমান আছে। যদি তোমরা উত্তম কাজ কর এবং খোদাভীরু হও, তবে, আল্লাহ্ তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন। (১২৯) তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব, সম্পূর্ণ ঝুঁকেও পড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং খোদাভীরু হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১৩০) যদি উভয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ স্বীয় প্রশস্ততা দ্বারা প্রত্যেককে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। আল্লাহ্ সুপ্রশস্ত, প্রজ্ঞাময়। (১৩১) আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে সবই আল্লাহ্‌র। বস্তুতঃ আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা সবাই ভয় করতে থাক আল্লাহ্‌কে। যদি তোমরা তা না মান, তবে জেনো, সে সব কিছুই আল্লাহ্ তাআলার যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন অভাবহীন, প্রসংশিত। (১৩২) আর আল্লাহ্‌রই জন্যে সে সবকিছু যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। আল্লাহ্ই যথেষ্ট কর্মবিধায়ক। (১৩৩) হে মানবকূল, যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে সরিয়ে তোমাদের জায়গায় অন্য কাউকে প্রতিষ্ঠিত করেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র সে ক্ষমতা রয়েছে। (১৩৪) যে কেউ দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করবে, তার জেনে রাখা প্রয়োজন যে, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ আল্লাহ্‌রই নিকট রয়েছে। আর আল্লাহ্ সব কিছু শোনেন, দেখেন।

আয়াতটি তো কোন কিছুই ছাড়েনি। সামান্য মন্দ কাজ হলেও তার সাজা দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ চিন্তা করো না, সাধ্যমত কাজ করে যাও। কেননা, (উল্লেখিত শাস্তি যে জাহান্নামই হবে, তা জরুরী নয়) তোমরা দুনিয়াতে যে কোন কষ্ট অথবা বিপদাপদে পড়, তাতে তোমাদের গোনাহ্‌র কাফফারা এবং মন্দ কাজের শাস্তি হয়ে থাকে। এমন কি যদি কারও পায়ে কাঁটা ফুটে, তাও গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা বৈ নয়।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, মুসলমান দুনিয়াতে যে কোন দুঃখ-কষ্ট, অসুখ-বিসুখ অথবা ভাবনা-চিন্তার সম্মুখীন হয়, তা তার গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হয়ে যায়।

তিরমিযী ও তফসীরে ইবনে-জরীর হযরত আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন তাঁদেরকে مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ আয়াতটি শুনালেন, তখন তাঁদের যেন কোমর ভেঙ্গে গেল। এ প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি বললেন ঃ ব্যাপার কি? হযরত সিদ্দীক (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কোন মন্দ কাজ করেনি? প্রত্যেক কাজেরই যদি প্রতিফল ভোগ করতে হয়, তবে কে রক্ষা পাবে? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ হে আবুবকর! আপনারা মোটেই চিন্তিত হবেন না। কেননা, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে আপনাদের গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি বললেন ঃ আপনি কি অসুস্থ হন না? আপনি কি কোন দুঃখ ও বিপদে পতিত হন না? হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) আরয করলেন ঃ নিশ্চয় এসব বিষয়ের সম্মুখীন হই। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ ব্যাস, এটাই আপনাদের প্রতিফল।

আবু দাউদ প্রমুখের বর্ণিত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর হাদীসে বলা হয়েছে, বান্দা জ্বরে কষ্ট পেলে কিংবা পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে তা তাঁর গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। এমনকি, যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্তু এক পকেটে তালাশ করে অন্য পকেটে পায়, তবে এতটুকু কষ্টও তার গোনাহ্‌র কাফফারা হয়ে যায়।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, শুধু দাবী ও বাসনায় লিপ্ত হয়ো না; বরং কাজের চিন্তা কর। কেননা, তোমরা অমুক নবী কিংবা গ্রন্থের অনুসারী—শুধু এ বিষয় দ্বারাই তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। বরং এ গ্রন্থের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান এবং তদনুযায়ী সৎকার্য সম্পাদনের মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কতিপয় পথনির্দেশ ঃ ..... وَاِنِ امْرَاَةٌ وَاسِعًا حَكِيْمًا অত্র তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের দাম্পত্য জীবনের এমন একটি জটিল দিক সম্পর্কে পথনির্দেশ করেছেন, সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকটি দম্পতিকেই যার সম্মুখীন হতে হয়। তা হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক মনোমালিন্য ও মন কষাকষি। আর এটি এমন একটি জটিল সমস্যা, যার সুষ্ঠু সমাধান যথাসময়ে না হলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনই দুর্বিসহ হয় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে এহেন পারিবারিক মনোমালিন্যই গোত্র ও বংশগত কলহ-বিবাদ তথা হানাহানি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কোরআন পাক নর ও নারীর যাবতীয় অনুভূতি ও প্রেরণার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয় শ্রেণীকে এমন এক সার্থক জীবন ব্যবস্থা বাতলে দেয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যার ফলে মানুষের পারিবারিক

জীবন সুখময় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর অনুসরণে পারস্পরিক তিক্ততা ও মর্ম-পীড়া, ভালবাসা ও প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর যদি অনিবার্য কারণে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়, তবে তা করা হবে সম্মানজনক ও সৌজন্যমূলক পন্থায় যেন, তার পেছনে শত্রুতা, বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের মনোভাব না থাকে।

১২৮ তম আয়াতটি এমনি সমস্যা সম্পর্কিত, যাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয়। নিজ নিজ হিসাবে উভয়ে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক মনের মিল না হওয়ার কারণে উভয়ে নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা করে। যেমন, একজন সুদর্শন সুঠামদেহী স্বামীর স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা, অধিক বয়স্কা অথবা সুশ্রী না হওয়ার কারণে তার প্রতি স্বামীর মন আকৃষ্ট হচ্ছে না। আর এর প্রতিকার করাও স্ত্রীর সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় স্ত্রীকেও দোষারোপ করা যায় না, অন্যদিকে স্বামীকেও নিরপরাধ সাব্যস্ত করা যায়।

অত্র আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে এ ধরনের কতিপয় ঘটনা তফসীরে-মাযহারী প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে কোরআন পাকের সাধারণ নীতি فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ – অর্থাৎ, উক্ত স্ত্রীকে বহাল রাখতে চাইলে তার যাবতীয় ন্যায্য অধিকার ও চাহিদা পূরণ করে রাখতে হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে কল্যাণকর ও সৌজন্যমূলক পন্থায় তাকে বিদায় করবে। এমতাবস্থায় স্ত্রীও যদি বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত হয়, তবে ভদ্রতা ও শালীনতার সাথেই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি তার সন্তানের খাতিরে অথবা নিজের অন্য কোন আশ্রয় না থাকার কারণে, বিবাহ বিচ্ছেদে অসম্মত হয়, তবে তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, নিজের প্রাপ্য মোহর বা খোর-পোষের ন্যায্য দাবী আংশিক বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে স্বামীকে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখার জন্য সম্মত করাবে। দায়দায়িত্ব ও ব্যয় ভার লাঘব হওয়ার কারণে স্বামীও হয়ত এ সমস্ত অধিকার থেকে মুক্ত হতে পেরে এ প্রস্তাব অনুমোদন করবে। এভাবে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে।

কোরআন করীমের অত্র আয়াতে এ ধরনের সমঝোতার সম্ভাব্যতার প্রতি পথ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ অর্থাৎ, "প্রত্যেক অন্তরেই লোভ বিদ্যমান রয়েছে।" কাজেই স্ত্রী হয়ত মনে করবে যে, আমাকে বিদায় করে দিলে সন্তানাদির জীবন বরবাদ হবে, অথবা অন্যত্র আমার জীবন আরো দুর্বিসহ হতে পারে। তার চেয়ে বরং এখানে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে পড়ে থাকাই লাভজনক। স্বামী হয়ত মনে করবে যে, দায়-দায়িত্ব হতে যখন অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল, তখন তাকে বিবাহ বন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি? অতএব, এভাবে অনায়াসে সমঝোতা হতে পারে। সাথে সাথে এরশাদ করা হয়েছে ঃ-

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

'যদি কোন নারী স্বামীর পক্ষ থেকে কলহ-বিবাদ বা বিমুখ হওয়ার আশঙ্কা বোধ করে, তবে উভয়ের কারোই কোন গোনাহ্ হবে না, যদি তারা নিজেদের মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে পারস্পরিক সমোঝতায় উপনীত হয়। এখানে গোনাহ্ না হওয়ার কথা বলার কারণ এই যে, ব্যাপারটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঘুষের আদান-প্রদানের মত মনে হয়। কারণ, স্বামীকে মোহরানা ইত্যাদি ন্যায্য দাবী হতে অব্যাহতির প্রলোভন দিয়ে দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখা হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাকের এ ভাষ্যের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বস্তুতঃ এটা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং উভয় পক্ষ কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সমঝোতার ব্যাপার। অতএব, এটা সম্পূর্ণ জায়েয।

দাম্পত্য কলহের মধ্যে অযথা অন্যের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় ঃ তফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে, أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কোন সমঝোতা করে নেবে। এখানে بَيْنَهُمَا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-কলহ বা সন্ধি -সমঝোতার মধ্যে অহেতুক কোন তৃতীয় ব্যক্তি নাক গলাবে না। বরং তাদের নিজেদেরকে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। কারণ, তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির ফলে স্বামী-স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি অন্য লোকের গোচরীভূত হয়, যা তাদের উভয়ের জন্যই লজ্জাস্কর ও স্বার্থের পরিপন্থী। তদুপরি তৃতীয় পক্ষের কারণে সন্ধি-সমঝোতা দুষ্কর হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। অত্র আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন— وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

অর্থাৎ "আর যদি তোমরা কল্যাণ সাধন কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।" এখানে বুঝানো হয়েছে যে, অনিবার্য কারণ বশতঃ স্বামীর অন্তরে যদি স্ত্রীর প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকে এবং তার ন্যায্য অধিকার পূরণ করা অসম্ভব মনে করে তাকে বিদায় করতে চায়, তবে আইনের দৃষ্টিতে স্বামীকে সে অধিকার দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছুটা স্বার্থ পরিত্যাগ করে সমঝোতা করাও জায়েয। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বামী যদি সংযম ও খোদাভীতির পরিচয় দেয়, স্ত্রীর সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করে, মনের মিল না হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করে বরং তার যাবতীয় অধিকার ও প্রয়োজন পূরণ করে, তবে তার এই ত্যাগ ও উদারতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা ওয়াকিফহাল রয়েছেন। অতএব, তিনি এহেন ধৈর্য, উদারতা, সহনশীলতা ও মহানুভবতার এমন প্রতিদান দেবেন, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এখানে "আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন" বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিদান কি দেবেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, এর প্রতিদান হবে কল্পনার উর্ধ্বে, ধারণার অতীত।

মোটকথা, কোরআন পাক উভয় পক্ষকে একদিকে স্বীয় অভাব-অভিযোগ দূর করা ও ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনতঃ অধিকার দিয়েছে। অপর দিকে ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম ও উন্নত চরিত্র আয়ত্ব করার উপদেশ দিয়েছে। এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিবাহবিচ্ছেদ হতে যথাসাধ্য বিরত থাকা কর্তব্য। বরং উভয়ের পক্ষেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে সমঝোতায় আসা বাঞ্ছনীয়।

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তাআলার। এখানে এই উক্তিটির তিন বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথমবার বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্র সচ্ছলতা, প্রাচুর্য ও তাঁর দরবারে অভাবহীনতা। দ্বিতীয়বার বোঝানো হয়েছে যে, কারো অবাধ্যতায় আল্লাহ্ তাআলার কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। তৃতীয়বার আল্লাহ্ পাকের অপার রহমত ও সহায়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি খোদাভীতি ও আনুগত্য করো, তবে তিনি তোমাদের সর্ব কাজে সহায়তা করবেন, রহমত বর্ষণ করবেন, এবং অনায়াসে তা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ
وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا
اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ
وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ
عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ
وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ
بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ
ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿١٣٧﴾
بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ۙ ﴿١٣٨﴾ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ
الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ
الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ
اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا
مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَا ۙ ﴿١٤٠﴾

(১৩৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা- মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কেই অবগত। (১৩৬) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রসূলের উপর এবং সেসমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর ও কিয়ামতদিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে (১৩৭) যারা একবার মুসলমান হয়ে পরে পুনরায় কাফের হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে এবং আবারো কাফের হয়েছে এবং কুফরীতেই উন্নতি লাভ করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে না কখনও ক্ষমা করবেন, না পথ দেখাবেন। (১৩৮) সেসব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব— (১৩৯) যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য। (১৪০) আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।

সু-সম্পন্ন করে দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা অপরিসীম ক্ষমতাবান। তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে সব কিছু পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তোমাদের সবাইকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে তোমাদের স্থলে অন্যদেরকে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম। অবাধ্যদের পরিবর্তে তিনি অনুগত ও বাধ্য লোক অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারেন। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অনির্ভরতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং অবাধ্যদেরকে ভীত প্রদর্শন করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুনিয়ার বুকে নবী প্রেরণ ও কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা এবং এটাই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার চাবিকাঠি।

সূরা-নিসার এই আয়াতে সব মুসলমানকে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার উপর অটল থাকতে এবং সত্য সাক্ষ্যদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাসমূহও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই বিষয় প্রসঙ্গে সূরা মায়েদা ও সূরা হাদীদে দু'খানি আয়াত রয়েছে। সূরা মায়েদার আয়াতের বিষয়বস্তু এমনকি শব্দাবলীও প্রায় অভিন্ন। সূরা হাদীদের আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত আদম (আঃ)-কে প্রতিনিধিরূপে দুনিয়ায় পাঠানো, অতঃপর একের পর এক নবী প্রেরণ এবং শতাধিক ছহীফা ও আসমানী কিতাব নাযিল করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার বুকে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং ইনসাফ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ-নছিহত, তালিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে যেসব অবাধ্য লোককে সত্য ও ন্যায়ের পথে আনা যাবে না, তাদেরকে প্রশাসনিক আইন অনুসারে উপযুক্ত শাস্তি দান করে সৎপথে আসতে বাধ্য করা হবে।

কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও তার উপর অবিচল থাকা শুধু সরকার ও বিচার বিভাগেরই বিশেষ দায়িত্ব নয়, বরং প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন সে নিজে ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকে এবং অন্যেকেও ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। অবশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতির একটি পর্যায় সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষের বিশেষ দায়িত্ব। তা হচ্ছে দুষ্ট ও অবাধ্য লোকেরা যখন ন্যায়নীতিকে পদদলিত করবে নিজেরা তো ন্যায়-নীতির ধার ধারবেই না, বরং অন্যকেও ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকতে দেবে না; তখন তাদেরকে দমন করার জন্য আইনের শাসন ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এমতাবস্থায় একমাত্র ক্ষমতাসীন সরকার ও কর্তৃপক্ষই ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

বর্তমান বিশ্বের মূর্খ জনগণ তো দূরের কথা, শিক্ষিত সুধীরাও মনে করেন যে, ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করা শুধু সরকার ও আদালতেরই দায়িত্ব, এ ব্যাপারে জনগণের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। এহেন ভ্রান্ত ধারণার কারণেই বিশ্বের সব দেশে সব রাজ্যে সরকার ও জনগণ দু'টি পরস্পর বিরোধী শক্তিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। সব দেশের জনগণ সরকারের কাছে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি দাবী করে, কিন্তু নিজেরা কখনো ন্যায়-নীতি পালন করতে প্রস্তুত নয়। এরই কুফল আজ সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছে। আইন

-কানুন নিষ্ক্রিয় ও অপরাধ প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। আজকাল সব দেশেই আইন প্রণয়নের জন্য সংসদ রয়েছে। এখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। আর তার সদস্য মনোনয়নের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সারা দুনিয়ায় হৈ চৈ পড়ে যাচ্ছে। অতঃপর নির্বাচিত সদস্যগণ দেশবাসীর মন-মানসিকতা, আবেগ-অনুভূতি ও দেশের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আইন প্রণয়ন করছেন। তারপর জনমত যাচাই করার জন্য তার প্রকাশ ও প্রচার করা হয় এবং জনসমর্থন লাভের পর তা প্রবর্তন করা হয়। আর সেটা কার্যকরী করার জন্য সরকারের প্রশাসনযন্ত্র সচল হয়ে উঠে যার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেক শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন দেশের সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। দেশের শান্তিশৃঙ্খলা, কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য তার সক্রিয় কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করছেন। কিন্তু এত বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও প্রচলিত তন্ত্র-মন্ত্রের মোহমুক্ত হয়ে, তথাকথিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঠিকাদারদের অন্ধ অনুকরণের উর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে প্রত্যেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, ফলাফল অত্যন্ত নৈরাস্যজনক।

খোদাভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্ব শান্তির চাবিকাঠি : সুস্থ বিবেকসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি চলমান সমাজের প্রথা ও রীতিনীতির বন্ধন ছিন্ন করে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রসূলে আরাবী (সাঃ)-এর আনীত পয়গাম সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, শুধু আইন ও দণ্ডদান করেই পৃথিবীতে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়নি বরং ভবিষ্যতেও অর্জিত হবে না। একমাত্র খোদাভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। যার ফলে রাজা-প্রজা, শাসক ও শাসিত সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব উপলব্ধি করতে, তা যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জনসাধারণ একথা বলে দায়িত্ব এড়াতে পারে না যে, এটা সরকারের কাজ। কোরআন-মজীদের পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এক বৈপ্লবিক বিশ্বাসের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতত্রয়ের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অটল-অনড় থাকা এবং অন্যকেও অটল রাখার চেষ্টা করার জন্য শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আয়াতসমূহের শেষ দিকে এমন এক তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা মানুষের ধ্যান-ধারণা ও প্রেরণার জগতে মহা-বিপ্লবের সূচনা করতে পারে। তা হলো, আল্লাহ্ তাআলার অপরিসীম ক্ষমতা ও পরাক্রম, তার সম্মুখে উপস্থিতি ও জাবাবদিহী এবং প্রতিদান ও প্রতিফল লাভের বিশ্বাস। এটা এমন এক সম্পদ যার দৌলতে আজ থেকে সাতশত বছর পূর্ববর্তি অশিক্ষিত বিশ্বাসী লোকেরাও বিপুল শান্তি ও নিরপত্তা ভোগ করতো এবং যার অভাবের কারণেই আজকের মহাশূন্যের অভিযাত্রী, কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী উন্নত বিশ্ববাসীরা শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূজারী ও তন্ত্র-মন্ত্রের অন্ধ অনুসারীদের উপলব্ধি করা উচিত যে, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে তারা হয়তো মহাশূন্যে আরোহণ করতে, গ্রহ হতে গ্রহান্তরে ভেসে বেড়াতে এবং মহাসাগর পাড়ি দিতে পারবে, কিন্তু সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কারখানা, উপাদান-উপকরণ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ, সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কোথাও পাবে না। কোন অত্যাধুনিক আবিষ্কারের মাঝে কিংবা কোন গ্রহ-উপগ্রহেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং পাওয়া যাবে একমাত্র রসূলে আরাবী (সাঃ)-এর পয়গাম ও শিক্ষার মধ্যে, খোদাভীতি ও আখেরাতের বিশ্বাসের মধ্যে। এরশাদ হয়েছে— أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ অর্থাৎ, মনে রেখো, একমাত্র আল্লাহ্র স্মরণের মধ্যেই অন্তরসমূহের প্রশান্তি নিহিত। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহ বস্তুতঃপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার অফুরন্ত কুদরত ও কল্পনাতীত সৃষ্টি বৈচিত্র্যকে ভাস্বর করে চলেছে, যার সামনে মানুষ তার অক্ষমতা ও অযোগ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু অনুভূতিশীল অন্তর ও অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন চোখ না হলে তাতেই বা কি লাভ।

কোরআন হাকীম একদিকে পৃথিবীতে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করেছে, অপরদিকে এমন এক অপূর্ব নীতিমালা ঘোষণা করেছে- যাকে পুরোপুরি গ্রহণ ও নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়ন করা হলে, যুলুম ও অনাচারে জর্জরিত দুনিয়া সুখ-শান্তির আধারে পরিণত হবে। আখেরাতে বেহেশত লাভের পূর্বে দুনিয়াতেই জান্নাতী সুখের নমুনা উপভোগ করা যাবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ..... - কারো মতে অত্র আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আর অনেকের মতে আয়াতটিতে ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা, প্রথমে তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল তারপর গো-বৎসের পূজা করে কাফের হয়েছিল, অতঃপর তওবা করে আবার ঈমান এনেছিল, পুনরায় হযরত ঈসা (আঃ)- কে অস্বীকার করে কুফরীর চরমে উপনীত হয়েছে। - (তফসীরে রূহুল মা'আনী)

لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا এ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, বার বার কুফরীর মধ্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে সত্যকে উপলব্ধি করার এবং গ্রহণ করার যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। ভবিষ্যতে তওবা করা ও ঈমান আনার সৌভাগ্য হয় না। তবে কোরআন-হাদীসের অকাট্য দলীলাদির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যত বড় কট্টর কাফের বা মোরতাদই হোক না কেন, যদি সত্যিকারভাবে তওবা করে, তবে পূর্ববর্তী সমুদয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়। অতএব, বার বার কুফরী করার পরও যদি তারা সত্যিকারভাবে তওবা করে, তবে তাদের জন্য এখনো ক্ষমার আইন উন্মুক্ত রয়েছে।

এখানে প্রথম আয়াতে মুনাফেকদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছে। তবে এহেন দুঃসংবাদকে بشارت অর্থাৎ, 'সু-সংবাদ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন সু-সংবাদ শুনার জন্য প্রত্যেকেই উদ্‌গ্রীব থাকে। কিন্তু মুনাফেকদের জন্য এছাড়া আর কোন সংবাদ নেই। বরং তাদের জন্য সু-সংবাদের পরিবর্তে এটাই একমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী।

মানমর্যাদা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সমীপে কামনা করা বাঞ্ছনীয় : দ্বিতীয় আয়াতে কাফের ও মুশরেকদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ করে এধরনের আচরণে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সাথে সাথে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার উৎস ও মূল কারণ বর্ণনা করতঃ একেও অযথা-অবান্তর প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন - أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا অর্থাৎ, "তারা কি ওদের কাছে গিয়ে ইজ্জত-সম্মান লাভ করতে চায়? তবে ইজ্জত-সম্মান তো সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তাআলার এখতিয়ারাধীন।"

কাফের ও মুশরেকদের সাথে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা এবং অন্তরঙ্গ মেলা-মেশার প্রধান কারণ এই যে, ওদের বাহ্যিক মান-মর্যাদা, শক্তি-সামর্থ্য, ধনবলে-প্রভাবিত হয়ে হীনমন্যতার শিকার হয় এবং মনে করে যে, ওদের সাহায্য-সহযোগিতায় আমাদেরও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেন যে, তারা এমন লোকদের সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার আকাঙ্খা করছে, যাদের নিজেদেরই সত্যিকার কোন মর্যাদা নেই। তাছাড়া যে শক্তি ও বিজয়ের মধ্যে সত্যিকার ইজ্জত ও সম্মান নিহিত, তাতো একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার এখতিয়ারভুক্ত। অন্য কারো মধ্যে যখন কোন ক্ষমতা বা সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়, তা সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত। অতএব, মান-মর্যাদা দানকারী মালিককে অসন্তুষ্ট করে তাঁর শত্রুদের থেকে ইজ্জত হাসিল করার অপচেষ্টা কত বড় বোকামী!

এ সম্পর্কে 'সূরায়ে-মুনাফেকূন' - এ এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, ইজ্জত-সম্মান একমাত্র আল্লাহ্, রসূল এবং ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মুনাফেকরা তা অবগত নয়।

এখানে আল্লাহ্ তাআলার সাথে হযরত রসূল (সাঃ) ও মুমিনদের উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। তিনি যাকে ইচ্ছা আংশিক মার্যাদা দান করেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার একান্ত অনুগত, পছন্দনীয় ও প্রিয়পাত্র, তাই তিনি তাঁদেরকে সম্মান দান করেন। পক্ষান্তরে কাফের ও মুশরেকদের ভাগ্যে সত্যিকার কোন ইজ্জত নেই। অতএব, তাদের সাথে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করে সম্মান অর্জন করা সুদূর পরাহত। ফারূকে-আযম হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বান্দাদের (মখলুকের) সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার বাসনা করে আল্লাহ্ তাআলা তাকে লাঞ্ছিত করেন।

হযরত আবুবকর জাস্সাস (রাহঃ) 'অহ্কামুল - কোরআনে' লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম এই যে, কাফের, মুশরেক পাপিষ্ঠ ও পথভ্রষ্টদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টা করা অন্যায় ও অপরাধ। তবে এই উদ্দেশে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন নিষেধ করা হয় নাই। কেননা, সূরা মুনাফেকূনের পূর্বোক্ত আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় রসূলকে (সাঃ) ও মমিনদেরকে ইজ্জত দান করেছেন।

এখানে মর্যাদার অর্থ যদি আখেরাতের চিরস্থায়ী ইজ্জত-সম্মান হয়, তবে তা আল্লাহ্ তাআলা শুধুমাত্র তাঁর রসূল (সাঃ) ও মুমিনদের জন্য সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। কারণ, আখেরাতের আরাম-আয়েশ, ইজ্জত-সম্মান কোন কাফের বা মুশরেক কস্মিনকালেও লাভ করবে না। আর যদি এখানে পার্থিব মান-মর্যাদা ধরা হয়, তবে মুসলমানরা যতদিন সত্যিকার মুমিন থাকবে, ততদিন সম্মান ও প্রতিপত্তি তাদেরই করায়ত্ব থাকবে। অবশ্য তাদের ঈমানের দুর্বলতা, আমলের গাফলতি বা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের সাময়িক ভাগ্যবিপর্যয় হলে বা ঘটনাচক্রে অসহায় হতমান হলেও পরিশেষে তারাই আবার মর্যাদা ও বিজয়ের গৌরব লাভ করবে। দুনিয়ার ইতিহাসে এর বহু নজীর রয়েছে। শেষ যুগে হযরত ঈসা (আঃ) ও ইমাম মাহ্দীর নেতৃত্বে মুসলমানরা আবার যখন সত্যিকার ইসলামের অনুসারী হবে, তখন তারাই দুনিয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ — অত্র আয়াতে ইতিপূর্বে মক্কা মোকাররমায় অবতীর্ণ সূরা আন্আমের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে,— আমি তো মানুষের সংশোধনের নিমিত্ত আগেই হুকুম নাযিল করেছিলাম যে, কাফের ও বদকারের ধারে কাছেও বসবে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কপটাচারী মুনাফেকরা আদেশ লঙ্ঘন করে ওদের সাথে সৌহার্দ্য স্থাপন করতে শুরু করেছে এবং তাদেরকে ইজ্জত-সম্মানের মালিক মোখতার মনে করেছে।

সূরায়ে-নেসার আলোচ্য আয়াত এবং সূরায়ে আন্আমের যে আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এতদুভয়ের সমন্বিত মর্ম এই যে, যদি কোন প্রভাবে কতিপয় লোক একত্রিত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কোন আয়াত বা হুকুমকে অস্বীকার বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে, তবে যতক্ষণ তারা এহেন গর্হিত ও অবাঞ্ছিত কার্যে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ তাদের মজলিসে বসা বা যোগদান করা মুসলমানদের জন্যে হারাম।

মোটকথা, বাতিল পন্থীদের মজলিসে উপস্থিতি ও তার হুকুম কয়েক প্রকার। প্রথমতঃ তাদের কুফরী চিন্তাধারার প্রতি সম্মতি ও সন্তুষ্টি সহকারে যোগদান করা। এটা মারাত্মক অপরাধ ও কুফরী। দ্বিতীয়তঃ গর্হিত আলোচনা চলাকালে বিনা প্রয়োজনে অপছন্দ সহকারে উপবেশন করা। এটা অত্যন্ত অন্যায় ও ফাসেকী। তৃতীয়তঃ পার্থিব প্রয়োজনবশতঃ বিরক্তি সহকারে বসা জায়েয। চতুর্থতঃ জোর-জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বসা ক্ষমার্হ। পঞ্চমতঃ তাদেরকে সৎপথে আনয়নের উদ্দেশে উপস্থিত হওয়া সওয়াবের কাজ।

কুফরীর প্রতি মৌন সম্মতিও কুফরী ঃ আলোচ্য আয়াতের শেষে এরশাদ হয়েছে— إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ অর্থাৎ, এমন মজলিস যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত ও আহ্কামকে অস্বীকার, বিদ্রূপ বা বিকৃত করা হয়, সেখানে হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করলে তোমরাও তাদের সমতুল্য ও তাদের গোনাহ্র অংশীদার হবে। অর্থাৎ, খোদা না করুন, তোমরা যদি তাদের সমতুল্য ও তাদের গোনাহ্র অংশীদার হবে। অর্থাৎ, খোদা না করুন, তোমরা যদি তাদের কুফরী কথাবার্তা মনে-প্রাণে পছন্দ কর, তাহলে বস্তুতঃ তোমরাও কাফের হয়ে যাবে। কেননা, কুফরীকে পছন্দ করাও কুফরী। আর যদি তাদের কথাবার্তা পছন্দ না করা সত্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে তাদের সাথে উঠা বসা কর এমতাবস্থায়ে তাদের সমতুল্য হওয়ার অর্থ হবে তারা যেভাবে শরীয়তকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করার অপ্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, তোমরা তাদের আসরে যোগদান করে সহযোগিতা করায় তাদের মতই ইসলামের ক্ষতি সাধন করছ! নাউজু বিল্লাহে মিন যালেকা।

والمحصنٰت ٥ ١٠٢ النسآء ٤

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا
أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ
نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا
إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ
اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا
إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ
لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ
وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ
اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾ مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ
إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

(১৪১) এরা এমনি মুনাফেক যারা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতীক্ষায় ওঁৎপেতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোন বিজয় অর্জিত হয়, তবে তারা বলে, আমরাও কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? পক্ষান্তরে কাফেরদের যদি আংশিক বিজয় হয়, তবে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের কবল থেকে রক্ষা করিনি? সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কেয়ামতের দিন মীমাংসা করবেন এবং কিছুতেই আল্লাহ্ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।

(১৪২) অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহ্র সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহ্কে অল্পই স্মরণ করে। (১৪৩) এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। বস্তুতঃ যাকে আল্লাহ্ গোমরাহ্ করে দেন, তুমি তাদের জন্য কোন পথই পাবে না কোথাও। (১৪৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহ্র প্রাকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে?(১৪৫) নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না। (১৪৬) অবশ্য যারা তওবা করে নিয়েছে, নিজেদের অবস্থার সংস্কার করেছে এবং আল্লাহ্র পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর ফরমাবরদার হয়েছে, তারা থাকবে মুসলমানদেরই সাথে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ শীঘ্রই ঈমানদারগণকে মহাপুণ্য দান করবেন। (১৪৭) তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ্ কি করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক! আর আল্লাহ হচ্ছেন সমুচিত মূল্যদানকারী, সর্বজ্ঞ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَامُوا كُسَالَىٰ – আল্লাহ্র বাণীতে যে শিথিলতার নিন্দা করা হয়েছে তা হচ্ছে বিশ্বাসের শিথিলতা। বিশ্বাস সুদৃঢ় থাকা সত্ত্বেও আমলের মধ্যে যদি কোন শৈথিল্য থাকে, তবে তা অত্র আয়াতের আওতাভুক্ত নয়। কিন্তু তখনও বিনা ওযরে শিথিলতা করা নিন্দনীয়। আর রোগকষ্ট, নিদ্রালুতা প্রভৃতি কোন অনিবার্য কারণবশতঃ হলে ক্ষমার্হ।

وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ — অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার দরবারে একমাত্র ঐ সব আমলই গৃহীত ও কবুল হয় যা শুধু তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে করা হয়েছে এবং কোনরূপ রিয়াকারী বা স্বার্থের লেশমাত্র যার মধ্যে নেই। মুখলেস শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরে-মাযহারীতে লিখিত আছে الذى يعمل لله لايحب ان يحمده الناس عليه অর্থাৎ, মুখলেস সে ব্যক্তিকে বলে যে শুধু আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সর্বপ্রকার আমল করে এবং ঐ কাজের জন্য লোকের প্রশংসা কামনা করে না।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ
وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا
عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ
بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ
وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ
يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١٥٠﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَ
اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٥١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ
رُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٥٢﴾ يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ
عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ
فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ
اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ
ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ
الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا
لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٤﴾

(১৪৮) আল্লাহ্ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ্ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ। (১৪৯) তোমরা যদি কল্যাণ কর প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে অথবা যদি তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনো, আল্লাহ্ নিজেও ক্ষমাকারী, মহাশক্তিশালী। (১৫০) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। (১৫১) প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব। (১৫২) আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর রসূলের উপর এবং তাঁদের কারও প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি, শীঘ্রই তাদেরকে প্রাপ্য সওয়াব দান করা হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৫৩) আপনার নিকট আহলে-কিতাবরা আবেদন জানায় যে, আপনি তাদের উপর আসমান থেকে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে নিয়ে আসুন। বস্তুতঃ এরা মূসার কাছে এর চেয়েও বড় জিনিস চেয়েছে। বলেছে, একেবারে সামনাসামনিভাবে আমাদের আল্লাহ্‌কে দেখিয়ে দাও। অতএব, তাদের উপর বজ্রপাত হয়েছে তাদের পাপের দরুন; অতঃপর তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ-নিদর্শন প্রকাশিত হবার পরেও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল; তাও আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং আমি মূসাকে প্রকৃষ্ট প্রভাব দান করেছিলাম। (১৫৪) আর তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেবার উদ্দেশে আমি তাদের উপর তূর পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, অবনত মস্তকে দরজায় ঢোক। আরো বলেছিলাম, শনিবার দিন সীমালঙ্ঘন করো না। এভাবে তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে দুনিয়া হতে জোর-জুলমের অবসান ঘটানোর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তা মানব-রচিত শাসক-সুলভ আইনের মত নয়, বরং ভীতিপ্রদর্শন ও আশ্বাসদানের মাধ্যমে এক অপূর্ব কানুন পেশ করা হয়েছে। যার মধ্যে একদিকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমনের জন্য মজলুমকে অধিকার দেয়া হয়েছে যে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে, তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে। অপরদিকে সূরায়ে নহল-এর আয়াতে একটি শর্ত আরোপ করে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۖ وَلَئِنْ
صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ

অর্থাৎ, আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে তোমাদের উপর যে পরিমাণ জুলুম করা হয়েছে, তোমরা ঠিক ততটুকুই প্রতিশোধ নিতে পার। তবে শর্ত হলো এই যে, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তোমরা আবার জুলুম ও বাড়াবাড়ি করো না, বরং ইনসাফের গণ্ডীর মধ্যে থাকবে, অন্যথায় তোমরাও অত্যাচারী ও অপরাধী সাব্যস্ত হবে। সাথে সাথে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ক্ষমা করে দাও, তবে নিঃসন্দেহে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম।

এ আয়াতে করীমার দ্বারা আরো বোঝা যায় যে, মজলুম ব্যক্তি যদি অত্যাচারীর অন্যায়-অত্যাচারের কাহিনী লোকের কাছে প্রকাশ করে বা আদালতে অভিযোগের ফরিয়াদ জানায়, তবে তা শেকায়েত ও হারাম গীবতের আওতায় পড়বে না। কারণ, জালেম নিজেই মজলুমকে অভিযোগ উত্থাপন করতে সুযোগ দিয়েছে ও বাধ্য করেছেন।

সারকথা, কোরআন পাক একদিকে মজলুমকে তার প্রতি জুলুমের সমতুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন। অপরদিকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে উন্নত চরিত্রের শিক্ষা ও ক্ষমার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য পরকালের উত্তম প্রতিদানের আশ্বাস শুনিয়ে ক্ষমা ও ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করার জন্য উদ্‌বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَفُوًّا قَدِيْرًا

অর্থাৎ, "যদি তোমরা কোন উত্তম কাজ প্রকাশ্যে কর, বা উহা গোপনে কর, অথবা কারো কোন অন্যায়কে ক্ষমা করে দাও, তবে তা অতি উত্তম। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা অতিশয় ক্ষমা পরায়ণ, ক্ষমতাবান।"

অত্র আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য কারো অন্যায়কে ক্ষমা করার আদর্শ শিক্ষা দেওয়া। প্রকাশ্যে বা গোপনে নেক কাজ করার উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ক্ষমা করাও একটি বিশিষ্ট সৎকার্য। যে ব্যক্তি অন্যের অপরাধ মার্জনা করবে, সে আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমা ও করুণার যোগ্য হবে।

আয়াতের শেষে فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا বলে জানিয়ে

দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা সর্বশক্তিমান, যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিতে পারেন এবং যখন ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। তথাপি তিনি অতি ক্ষমাশীল। আর মানুষের শক্তি ও ক্ষমতা যখন সামান্য ও সীমাবদ্ধ, তাই ক্ষমা ও মার্জনার পথ অবলম্বন করা তার জন্য অধিক বাঞ্ছনীয়।

এ হচ্ছে অন্যায়-অনাচার প্রতিরোধ ও সামাজিক সংস্কার সাধনের ইসলামী মূলনীতি এবং অভিভাবক সুলভ সিদ্ধান্ত। এক দিকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার প্রদান করে ইনসাফ ও ন্যায়নীতিকে সমুন্নত রাখা হয়েছে, অপরদিকে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে ক্ষমা ও মার্জনা করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি সম্পর্কে কোরআন করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

অর্থাৎ, "তোমার ও অন্য যে ব্যক্তির মধ্যে দুশমনী ছিল, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি আন্তরিক বন্ধু হয়ে যাবে।"

আইন-আদালত বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে যদিও অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করা যায়, কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকে। যার ফলে পারস্পরিক বিবাদের সূত্রপাত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কোরআন করীম যে অপূর্ব নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষা দিয়েছে, তার ফলে দীর্ঘকালের শত্রুতাও গভীর বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

এখানে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে কোরআন পাক স্পষ্ট ফয়সালা দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলাকে মান্য করে কিন্তু তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, অথবা কোন পয়গম্বরকে মান্য করে, আর কোন পয়গম্বরকে অমান্য করে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে সে ঈমানদার নয়, বরং প্রকাশ্য কাফের, পরকালে তার পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় নেই।

একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে মুক্তি নেই ঃ কোরআন হাকীমের উপরোক্ত স্পষ্ট ঘোষণা ঐ সব বিভ্রান্ত লোকদের হীনমন্যতা ও গোঁজামিলকেও ফাঁস করে দিয়েছে, যারা অন্যান্য ধর্মানুসারীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজেদের ধর্মমত ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিজাতির পদমূলে উৎসর্গ করতে ব্যগ্র। যারা কোরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ফয়সালাকে উপেক্ষা করে অন্যান্য ধর্মানুসারীদেরকে বুঝাতে চায় যে, "মুসলমানদের মতেও শুধু ইসলামই একমাত্র মুক্তিসনদ নয়, বরং ইহুদী ও খৃস্টানরাও তাদের নিজ নিজ ধর্মে-কর্মে স্থির থেকে পরকালে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। অথচ তারা অধিকাংশ রসূলকে অথবা অন্ততঃ কোন কোন পয়গম্বরকে অমান্য করে। যার ফলে তাদের কাফের ও জাহান্নামী হওয়ার কথা অত্র আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে।"

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অমুসলমানদের প্রতি ইনসাফ, ন্যায়নীতি, সমবেদনা, সহানুভূতি, উদারতা ও এহসান বা হিতকামনার দিক দিয়ে ইসলাম নজীর বিহীন। কিন্তু উদারতা বা সহানুভূতি ব্যক্তিগত অধিকারের আওতায় হয়ে থাকে যা আমরা যে কোন ব্যক্তিকে উৎসর্গ করতে পারি। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ বা অনধিকার চর্চা করা যাবে না। ইসলাম একদিকে অমুসলমানদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও পরমসহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে যেমন উদার ও অবারিত দ্বার, অপরদিকে স্বীয় সীমারেখা সংরক্ষণের ব্যাপারে অতি সতর্ক, সজাগ ও কঠোর। ইসলাম অমুসলমানদের প্রতি উদারতার সাথে সাথে কুফরী ও কু-প্রথার প্রতি পূর্ণ ঘৃণা প্রকাশ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমান ও অমুসলমানরা দু'টি পৃথক জাতি এবং মুসলমানদের জাতীয় প্রতীক ও স্বাতন্ত্র্য সযত্নে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলে চলবে না, বরং সামাজিকতার ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। একথা কোরআন ও হাদীসে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআন পাক ও ইসলামের অভিমত যদি এই হতো যে, যে কোন ধর্মমতের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা সম্ভব, তাহলে ইসলাম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ও খোলাফায়ে-রাশেদীনের জেহাদ পরিচালনা করা এমন কি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) - এর নবুওয়ত ও কোরআন নাযিল করা নিরর্থক হতো। - (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা)।

সূরা বাকারার ৬২ তম আয়াত দ্বারা কেউ কেউ হয়ত সন্দেহে পতিত হতে পারেন যে, এতে এরশাদ করা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থাৎ - নিশ্চয় যারা সত্যিকারভাবে ঈমান এনেছে (মুসলমান হয়েছে) এবং যারা ইহুদী হয়েছে এবং নাসারা (খৃস্টান) ও সাবেয়ীনদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ও কেয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছে আর সৎকাজ করেছে, তাদের পালনকর্তার সমীপে তাদের জন্য পূর্ণ প্রতিদান সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের কোন শংকা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

অত্র আয়াতে ঈমানদারীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার পরিবর্তে শুধু আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ও কেয়ামতের প্রতি ঈমান আনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই যারা সামান্য পড়াশোনা করে কোরআন উপলব্ধি করতে চায়, তারা অত্র আয়াত দ্বারা ধারণা করে বসেছে যে, শুধু আল্লাহ্ তাআলা ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করাই পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট; নবী-রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা মুক্তির পূর্বশর্ত নয়। কিন্তু তারা একথা জানে না যে, কোরআনের পরিভাষায় আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ঈমান তখনই শুধু গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য হয় যখন তার সাথে পয়গম্বর, ফেরেশতা ও আসমানী কিতাবের প্রতিও ঈমান আনা হয়। অন্যথায় শুধু আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও একত্ববাদ তো স্বয়ং শয়তানও স্বীকার করে। কোরআন করীমের ভাষায় শুনুনঃ

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا
فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থাৎ - তাদের ঈমান ঐ সময় গ্রহণযোগ্য ও তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে, যখন তারা তোমাদের সাধারণ মুসলমানদের মত পুরোপুরি ঈমান আনবে। যার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে নবিগণের প্রতিও ঈমান আনয়ন করা অপরিহার্য। আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে চিনে রাখো যে, তারা আল্লাহ্ ও রসূলের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। অতএব, আপনার পক্ষে আল্লাহ্ তাআলাই তাদের মোকাবেলায় যথেষ্ট এবং তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।

সূরা নিসার আলোচ্য আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত কোন একজন নবীকেও যেব্যক্তি অস্বীকার

করবে সে প্রকাশ্য কাফের, তার জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব অবধারিত। রসূলের প্রতি ঈমান ছাড়া আল্লাহ্ তাআলার প্রতি সত্যিকার ঈমান সাব্যস্ত হয় না।

শেষ আয়াতে পুনরায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আখেরাতের মুক্তি ও কামিয়াবী শুধু ঐ সব লোকের জন্যেই সংরক্ষিত যারা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে তাঁর নবী ও রসূলগণের প্রতিও যথার্থ ঈমান ও আস্থা রাখে।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন—

ان القرءان يفسر بعضه بعضا

অর্থাৎ – "নিশ্চয় কোরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা ও তফসীর করে।" অতএব, কোরআনী তফসীরের পরিপন্থী কোন তফসীর বর্ণনা কারো জন্য জায়েয নয়।

কতিপয় ইহুদী দলপতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে হযরত মূসা (আঃ)–এর প্রতি যেমন লিপিবদ্ধ আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল, আপনিও তদ্রূপ একখানি লিপিবদ্ধ কিতাব আসমান থেকে নিয়ে আসুন। তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করবো। তারা আন্তরিকভাবে ঈমানের আগ্রহ কিংবা সত্যানুসন্ধিৎসার কারণে এহেন আবদার করে নাই। বরং জিদ ও হঠকারিতার কারণে একের পর এক বাহানার আশ্রয় নিতে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াত দ্বারা ইহুদীদের স্বরূপ উদঘাটন করে তাদের হঠকারী মনোভাব সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)–কে ওয়াকিফহাল করেন এবং সান্ত্বনা দান করেন যে, এরা এমন এক জাতি–গোষ্ঠীর সদস্য যারা পূর্ববর্তী রসূলগণকেও উত্যক্ত–বিরক্ত করতো, খোদাদ্রোহিতামূলক বড় বড় অপরাধও নির্দ্বিধায় করে বসতো। এদের পূর্বসূরিরা হযরত মূসা (আঃ)–এর কাছে আবদার করেছিল যে, সরাসরি ও প্রকাশ্যেভাবে আমাদেরকে আল্লাহ্ দেখাতে হবে। এহেন চরম স্পর্ধার কারণে তাদের উপর অকস্মাৎ বজ্রপাত হয়েছিল এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তী ইহুদীরা অদ্বিতীয় মাবুদ আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন সত্তা ও একত্ববাদের অকাট্য প্রমাণাদি অর্থাৎ, হযরত মূসা (আঃ)–এর প্রকাশ্য মোজেযাসমূহ ও ফেরাউনের শোচনীয় সলিল সমাধির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার পরও আল্লাহ্ তাআলাকে ত্যাগ করে গো–বৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। এসব অপকর্মের কারণে তারা সমূলে উৎখাতযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি এবং হযরত মূসা (সাঃ)–কে কামিয়াব ও বিজয়ী করেছি। তারা তাওরাতের অনুশাসন মানতে স্পষ্ট অস্বীকার করায় আমি তূর পাহাড়কে তাদের উপর তুলে এনে ঝুলিয়ে দিয়েছি, যাতে হয়ত তারা শরীয়তের বিধান মানতে বাধ্য হবে, অথবা তাদেরকে পাহাড়ের নীচে পিষে মারা হবে। আমি তাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তারা যখন 'ইলইয়া' শহরের দ্বারদেশে উপনীত হবে, তখন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত অন্তরে অবনত মস্তকে শহরে প্রবেশ করবে। আমি আরো জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, শনিবার দিন মৎস্য শিকার করবে না। এসব তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ। অতএব, এগুলো লংঘন করো না। এভাবে আমি তাদের থেকে দৃঢ় শপথ গ্রহণ নিয়েছিলাম কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তারা একে একে প্রত্যেকটি নির্দেশ অমান্য করেছে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। অতএব, আমি দুনিয়াতেও তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছি এবং আখেরাতেও তাদের নিকৃষ্টতর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥٥﴾ وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا
عَظِيْمًا ﴿١٥٦﴾ وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ
اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ
اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ
الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا
حَكِيْمًا ﴿١٥٨﴾ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿١٥٩﴾ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾ لٰكِنِ
الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ
وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ
الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

(১৫৫) অতএব, তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল তাদেরই অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য এবং অন্যায়ভাবে রসূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং তাদের এই উক্তির দরুন যে, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন'। অবশ্য তা নয়, বরং কুফরীর কারণে স্বয়ং আল্লাহ্ তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন। ফলে এরা ঈমান আনে না কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক। (১৫৬) আর তাদের কুফরী এবং মরিয়মের প্রতি মহা-অপবাদ আরোপ করার কারণে। (১৫৭) আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহ্র রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শূলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। (১৫৮) বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১৫৯) আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে। (১৬০) বস্তুতঃ ইহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পূত-পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল—তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহ্র পথে অধিক পরিমাণে বাধা দানের দরুন। (১৬১) আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায়ভাবে। বস্তুতঃ আমি কাফেরদের জন্য তৈরী করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব। (১৬২) কিন্তু যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানপক্ক ও ঈমানদার, তারা তাও মান্য করে যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে। আর যারা নামাযে অনুবর্তিতা পালনকারী, যারা যাকাত দানকারী এবং যারা আল্লাহ্ ও কেয়ামতে আস্থাশীল। বস্তুতঃ এমন লোকদেরকে আমি দান করবো মহাপূণ্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আলে-ইমরানের — يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা দুশমন ইহুদীদের দুরভিসন্ধি বানচাল করে তাদের কবল থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-কে হেফাযত করা প্রসঙ্গে পাঁচটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা আলে-ইমরানের তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম ওয়াদা ছিল তাঁকে হত্যা করার কোন সুযোগ ইহুদীদেরকে দেয়া হবে না, বরং আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নিজের কাছে তুলে নেবেন। সূরায়ে নিসার আলোচ্য আয়াতে ইহুদীদের দুষ্কর্মের বর্ণনার সাথে সাথে খোদায়ী ওয়াদা বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে হযরত ঈসা (আঃ)- এর হত্যা সংক্রান্ত ইহুদীদের মিথ্যা দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ - অর্থাৎ - ওরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যাও করতে পারেনি, শূলেও চড়াতে পারেনি, বরং আসলে ওরা সন্দেহে পতিত হয়েছিল।

সন্দেহ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল ঃ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ - এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামে-তফসীর হযরত যাহ্হাক (রাহ্ঃ) বলেন— ইহুদীরা যখন হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হলো, তখন তাঁর ভক্ত সহচরবৃন্দ এক স্থানে সমবেত হলেন। হযরত ঈসা (আঃ)ও সেখানে উপস্থিত হলেন। শয়তান ইবলীস তখন রক্তপিপাসু ইহুদী ঘাতকদেরকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবস্থানের ঠিকানা জানিয়ে দিল। চার হাজার ইহুদী দুরাচার একযোগে গৃহ অবরোধ করলো। তখন হযরত ঈসা (আঃ) স্বীয় ভক্ত অনুচরগণকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ অত্র গৃহ হতে বহির্গত ও নিহত হতে এবং পরকালে বেহেশতে আমার সাথী হতে প্রস্তুত আছো কি? জনৈক ভক্ত আত্মোৎসর্গের জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। হযরত ঈসা (আঃ) নিজের জামা ও পাগড়ী তাঁকে পরিধান করালেন। অতঃপর তাঁকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাদৃশ করে দেয়া হলো। যখন তিনি গৃহ থেকে বহির্গত হলেন, তখন ইহুদীরা ঈসা (আঃ) মনে করে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং শূলে চড়িয়ে হত্যা করলো। অপরদিকে হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা আসমানে তুলে নিলেন।-(তফসীরে-কুরতুবী)।

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইহুদীরা 'তায়তালানুস' নামক জনৈক নরাধমকে সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আঃ) -কে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু ইতিপুর্বে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে আসমানে তুলে নেওয়ায় সে তাঁর নাগাল পেল না। বরং ইতিমধ্যে তার নিজের চেহারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত হয়ে গেল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে যখন গৃহ থেকে বেরিয়ে এল তখন অন্যান্য ইহুদীরা তাকেই ঈসা (আঃ) মনে করে পাকড়াও করলো, এবং শূলেতে বিদ্ধ করে হত্যা করলো। -(তফসীরে-মাযহারী)

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে যে কোনটিই সত্য হতে পারে। কোরআন করীম এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু ব্যক্ত করেনি। অতএব, প্রকৃত ঘটনার সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। অবশ্য কোরআন পাকের আয়াত ও তার তফসীর সংক্রান্ত রেওয়াতে সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রকৃত ঘটনা ইহুদী-খৃস্টানদেরও অজ্ঞাত ছিল। তারা চরম বিভ্রান্তির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে শুধু অনুমান করে বিভিন্ন উক্তি ও দাবী করছিল। ফলে উপস্থিত লোকদের মধ্যেই চরম মতভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۔

অর্থাৎ, যারা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে নানা মতভেদ করে নিশ্চয় এ ব্যাপারে তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে। তাদের কাছে এ সম্পর্কে কোন সত্যনির্ভর জ্ঞান নেই। তারা শুধু অনুমান করে কথা বলে। আর তারা যে হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেনি, এ কথা সুনিশ্চিত। বরং আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নিরাপদে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।'

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর কিছু লোক বললো, আমরা তো নিজেদের লোককেই হত্যা করে ফেলেছি। কেননা, নিহত ব্যক্তির মুখমণ্ডল হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত হলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য রকম। তদুপরি এ ব্যক্তি যদি ঈসা (আঃ) হয়, তবে আমাদের প্রেরিত লোকটি গেল কোথায়? আর এ ব্যক্তি আমাদের হলে হযরত ঈসা (আঃ)-ই বা কোথায় গেলেন?

وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا অর্থাৎ- আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু পরাক্রমশালী, রহস্যজ্ঞানী।' ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে কতল করার যত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তই করুক না কেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা যখন তাঁর হেফাযতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন তখন তাঁর অসীম কুদরত ও অপার হেকমতের সামনে ওদের অপচেষ্টার কি মূল্য আছে? আল্লাহ্ তাআলা প্রজ্ঞাময়, তাঁর প্রতিটি কাজের নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। জড়পূজারী বস্তুবাদীরা যদি হযরত ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আসমানে উত্তোলনের সত্যটুকু উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তা তাদেরই দুর্বলতার প্রমাণ।

পরিশেষে এ প্রসঙ্গটির উপসংহার টেনে বলা হয়েছে—

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ

- অর্থাৎ, ইহুদীরা ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে যদিও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করে না, এবং হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, এমনকি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকে অস্বীকার করে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পূর্বে এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের দৃষ্টির সম্মুখে সত্য উন্মোচিত হবে, তখন তারা যথার্থই বুঝতে পারবে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে তাদের ধারণা একান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল!

অত্র আয়াতের مَوْتِهٖ অর্থাৎ, 'তার মৃত্যুর পূর্বে' শব্দে ইহুদীদের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তফসীর এই যে, প্রত্যেক ইহুদীই তার অন্তিম মুহূর্তে যখন পরকালের দৃশ্যাবলী অবলোকন করবে, তখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়তের সত্যতা ও নিজেদের বাতুলতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তখনকার ঈমান তাদের আদৌ কোন উপকারে আসবে না; যেমন লোহিত সাগরে ডুবে মরার সময় ফেরাউনের ঈমান ফলপ্রসূ হয়নি।

দ্বিতীয় তফসীর যা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িগণের বিপুল জামাত কর্তৃক গৃহীত এবং সহীহ্ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, তা হলো موتہ 'তার মৃত্যু' শব্দের সর্বনামে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তফসীর হলো ঃ আহলে-কিতাবরা এখন যদিও হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনে না, ইহুদীরা তো তাঁকে নবী বলে স্বীকারই করতো না, বরং ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ইত্যাকার আপত্তিকর বিশেষণে ভূষিত করতো। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালেকা)। অপর দিকে খৃস্টানরা যদিও ঈসা মসীহ্ (আঃ)-কে ভক্তি ও মান্য করার দাবীদার; কিন্তু তাদের মধ্যে একদল ইহুদীদের মতই হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার এবং মৃত্যুবরণ করার কথায় স্বীকৃতি প্রদান করে চরম মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে। তাদের আরেক দল অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে হযরত ঈসা (আঃ)-কে স্বয়ং খোদা বা খোদার পুত্র বলে ধারণা করে বসেছে। কোরআন পাকের এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃস্টানরা বর্তমানে যদিও হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি যথাযথ ঈমান রাখে না, বরং শৈথিল্য বা বাড়াবাড়ি করে, কিন্তু কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে তিনি যখন পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন এরাও তাঁর প্রতি পুরোপুরি ঈমান আনয়ন করবে। খৃস্টানরা মুসলমানদের মত সহীহ্ আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে ঈমানদার হবে। ইহুদীদের মধ্যে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করা হবে, অবশিষ্টরা ইসলাম গ্রহণ করবে। তখন সমগ্র দুনিয়া থেকে সর্বপ্রকার কুফরী ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাবে; সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র প্রাধান্য কায়েম হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ 'হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক রূপে অবশ্যই অবতরণ করবেন। তিনি দাজ্জালকে কতল করবেন, শুকর নিধন করবেন এবং ক্রুশকে চূরমার করবেন। তখন একমাত্র পরোয়ারদেগার আল্লাহ্ তাআলার এবাদত করা হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) আরো বলেন— তোমরা ইচ্ছা করলে এখানে কোরআন পাকের এ আয়াত পাঠ করতে পার যাতে বলা হয়েছে— ''আহলে-কিতাবদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, বরং ওরা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।'' হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ এর অর্থ 'হযরত ঈসা (আঃ)- এর মৃত্যুর পূর্বে।' এ বাক্যটি তিনি তিন বার উচ্চারণ করেন। - (তফসীরে-কুরতুবী)

ইসলামী শরীয়তেও কোন কোন দ্রব্য পানাহার করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। তবে তা শারীরিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতিকর হওয়ার কারণে। পক্ষান্তরে ইহুদীদের জন্য কোন দৈহিক বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর হওয়ার কারণে পবিত্র দ্রব্য হারাম করা হয়নি, বরং তাদের অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ সেগুলো হারাম করা হয়েছিল।

এই আয়াতে কতিপয় মহান ব্যক্তির জন্য যে বিপুল প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে তা তাঁদের ঈমান ও সৎকর্মের কারণে। অন্যথায় শুধু জরুরী আকীদা-বিশ্বাসকে সংশোধনের উপরই আখেরাতের মুক্তি নির্ভরশীল। তবে অবশ্যই ঈমানের সাথে মৃত্যুর সৌভাগ্য হতে হবে।

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ
وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ
وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ
وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن
قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ
تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾
لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ
يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَ
صَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا۟ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾ إِنَّ
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَظَلَمُوا۟ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ
طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ
عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ
مِن رَّبِّكُمْ فَـَٔامِنُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

(১৬৩) আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী–রসূলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি, ইসমাঈল, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনূস, হারূন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ। (১৬৪) এছাড়া এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি ইতিপূর্বে এবং এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাইনি। আর আল্লাহ্ মূসার সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি। (১৬৫) সুসংবাদদাতা ও ভীতি–প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞ। (১৬৬) আল্লাহ্ আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তিনি যে তা সজ্ঞানেই করেছেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ্ নিজেও সাক্ষী এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষী। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (১৬৭) যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহ্র পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, তারা বিভ্রান্তিতে সুদূরে পতিত হয়েছে। (১৬৮) যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং সত্য চাপা দিয়ে রেখেছে, আল্লাহ কখনও তাদের ক্ষমা করবেন না এবং সরল পথ দেখাবেন না। (১৬৯) তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের পথ। সেখানে তারা বাস করবে অনন্তকাল। আর এমন করাটা আল্লাহ্র পক্ষ্যে সহজ। (১৭০) হে মানবজাতি! তোমাদের পালনকর্তার যথার্থ বাণী নিয়ে তোমাদের নিকট রসূল এসেছেন, তোমরা তা মেনে নাও যাতে তোমাদের কল্যাণ হতে পারে। আর যদি তোমরা তা না মান, জেনে রাখ, আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবকিছুই আল্লাহর। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ

– এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, নবিগণের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নির্দেশ ও বাণীকে ওহী বলা হয়। পূর্ববর্তী নবিগণের প্রতি যেমন খোদায়ী ওহী নাযিল হয়েছিল, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)–এর প্রতিও তেমনি আল্লাহ্ তাআলা ওহী নাযিল করেছেন। অতএব, পূর্ববর্তী নবিগণকে যারা মান্য করে, তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)–কেও মান্য করতে বাধ্য। আর যারা তাকে অস্বীকার করে, তারা যেন অন্যসব নবীকে এবং তাদের প্রতি প্রেরিত ওহীকেও অস্বীকার করলো।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে হযরত নূহ (আঃ) ও তৎপরবর্তী নবিগণের ওহীর সাথে তুলনা করার কারণ হয়ত এই যে, হযরত আদম (আঃ)–এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের। হযরত নূহ (আঃ)–এর যুগেই তা পূর্ণতা লাভ করেছিল। হযরত আদম (আঃ)–এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল প্রাথমিক শিক্ষাস্বরূপ, ক্রমে তা উন্নত হতে থাকে এবং পরীক্ষার স্তরে পৌছায়। যারা উত্তীর্ণ হলো, তাদের জন্য পুরস্কার, আর যারা অবাধ্যতা করলো তাদের জন্য আযাবের ব্যবস্থা করা হলো। অতএব, শরীয়তের আদেশ–নিষেধ সম্বলিত ওহীপ্রাপ্ত নবিগণের আগমন হযরত নূহ (আঃ) থেকেই শুরু হয়েছিল। অপর দিকে ওহী অস্বীকারকারী বিরুদ্ধাচারীদের উপর সর্বপ্রথম আযাবও হযরত নূহ (আঃ)–এর কালেই আরম্ভ হয়।

সারকথা এই যে, হযরত নূহ (আঃ)–এর পূর্বে আল্লাহ্র ওহীর অবাধ্য ও নবিগণের বিরুদ্ধাচরণকারীদের উপর কোন ব্যাপক আযাব বা গযব আপতিত হতো না। বরং তাদেরকে মাযুর সাব্যস্ত করে অব্যাহতি ও অবকাশ দেয়া হতো, বোঝাবার চেষ্টা করা হতো। হযরত নূহ (আঃ)–এর আমলে যখন ধর্মীয় শিক্ষার অধিকতর প্রচার–প্রসার হয়েছিল এবং আল্লাহ্র হুকুম সম্পর্কে মানুষের কাছে কোন অস্পষ্টতা ছিল না, তখন থেকেই অবাধ্যদের উপর আল্লাহ্র আযাব নাযিল হতে থাকে। হযরত নূহ (আঃ)–এর যমানার সর্বনাশা মহাপ্লাবনই সর্বপ্রথম ব্যাপক ঐতিহাসিক আযাব। পরবর্তী কালে হযরত হুদ (আঃ), হযরত ছালেহ (আঃ), হযরত শোয়ায়েব (আঃ), প্রমুখ পয়গম্বগণের আমলেও অমান্যকারী নাফরমান কাফেরদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার আযাব ও গযব আপতিত হয়েছে। অতএব, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে হযরত নূহ (আঃ) ও তৎপরবর্তিগণের ওহীর সাথে তুলনা করে মক্কার মুশরেক ও আহ্‌লে–কিতাব ইহুদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, উল্লিখিত চিরাচরিত নিয়মানুসারে তারা যদি রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর প্রতি অবতীর্ণ ওহী অর্থাৎ, কোরআনকে অস্বীকার বা অমান্য করে, তবে তারাও ভয়াবহ শাস্তির আওতায় পড়বে।—(ফাওয়ায়েদে–ওসমানী)

হযরত নূহ (আঃ)–এর অস্তিত্বই ছিল এক অনন্য মো'জেযা। তিনি সুদীর্ঘ সাড়ে নয় শত বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তার দৈহিক শক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি, একটি দাঁতও পড়েনি, একগাছি চুলও পাকেনি। তিনি সারা জীবন দেশবাসীর নির্যাতন–নিপীড়ন অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সহ্য করেছেন।— (তফসীরে–মাযহারী)

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ – ''এবং আরো বহু রসূল যাঁদের ইতিবৃত্তান্ত আপনাকে শুনিয়েছি।'' এ আয়াতে হযরত নূহ (আঃ)–এর পরে

যেসব পয়গম্বর আগমন করেছেন, তাদের সম্পর্কে প্রথমে সাধারণভাবে বলার পর তন্মধ্যে বিশিষ্ট ও মর্যাদাসম্পন্ন কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝানো হয়েছে যে, এঁরা সবাই আল্লাহ্‌র পয়গম্বর এবং নবিগণের নিকটে বিভিন্ন পন্থায় ওহী প্রেরিত হয়েছে। কখনো ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী পৌছেছে, কখনো লিপিবদ্ধ কিতাব আকারে এসেছে, আবার কখনো আল্লাহ্ তাআলা রসূলের সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন। সারকথা যে কোন পন্থায় ওহী পৌছুক না কেন, তদনুযায়ী আমল করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। অতএব, ইহুদীদের এরূপ আবদার করা যে, তওরাতের মত লিখিত কিতাব নাযিল হলে আমরা মান্য করবো, অন্যথায় নয়—সম্পূর্ণ আহম্মকী ও স্পষ্ট কুফরী।

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন— আল্লাহ্ তাআলা একলাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন, যাঁদের মধ্যে স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী রসূলের সংখ্যা ছিল তিন 'শ তের জন।— (তফসীরে-কুরতুবী)

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ — "পয়গম্বরগণ সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী।" আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারদের ঈমান ও সৎকর্মশীলতার পুরস্কারস্বরূপ বেহেশতের সুসংবাদ দান করার জন্য এবং কাফের, বেঈমান ও দুরাচারদের কুফরী ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে, দেশে দেশে অব্যাহতভাবে নবী প্রেরণ করেছেন যেন কেয়ামতের শেষ বিচারের দিনে অবাধ্য ব্যক্তিরা অজুহাত উত্থাপন করতে না পারে যে, ইয়া আল্লাহ্, কোন্ কাজে আপনি সন্তুষ্ট আর কোন্ কাজে বিরাগ হন, তা আমরা উপলব্ধি করতে পারিনি। জানতে পারলে অবশ্যই আমরা আপনার স ন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করতাম। অতএব, আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয় এবং আমরা নিরপরাধ। পথভ্রষ্ট লোকেরা যাতে এহেন অজুহাত পেশ করতে বা বাহানার আশ্রয় নিতে না পারে, তজ্জন্য আল্লাহ্ তাআলা অলৌকিক মোজেযাসহ নবিগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তারা সর্বস্ব উৎসর্গ করে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব, এখন আর সত্য দ্বীন ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, কোন বাহানারও অবকাশ নেই। আল্লাহ্‌র ওহী এমন এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ যার মোকাবিলায় অন্য কোন প্রমাণই কার্যকর হতে পারে না। কোরআন পাক এমন এক অকাট্য দলীল যার সামনে কোন অযুক্তি টিকেত পারে না। আল্লাহ্ তাআলা হেকমত ও তদবীরের এটা এক কল্পনাতীত নিদর্শন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন— একদা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সমীপে একদল ইহুদী উপস্থিত হলো। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, - আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা সন্দেহাতীতভাবে জান যে, আমি আল্লাহ্ তাআলার সত্য রসূল। তারা অস্বীকার করলো। তখনই ওহী নাযিল হল ঃ لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ঐ কিতাবের (আল-কোরআনের) মাধ্যমে যা তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞানের নিদর্শন, আপনার নবুওতের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। তিনি আপনাকে ঐ কিতাবেরযোগ্য জেনেই কিতাব নাযিল করেছেন। আর ফেরেশেতাগণও এর সাক্ষী। অধিকন্তু সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষ্যদানের পর আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

মহানবী (সাঃ) ও কোরআন পাকের সত্যতা প্রমাণের পর আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ এখনও যারা কোরআন মজীদ ও রসূলে করীম (সাঃ)-কে অস্বীকার করে এবং তওরাতে রসূল (সাঃ)-এর যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে তা গোপন করে এবং এক কথায় অন্য কথা লোকের কাছে প্রকাশ করে এবং তাদেরকে সত্য দ্বীন হতে বিরত ও বঞ্চিত করে, এহেন চরম অপরাধীদের কস্মিনকালেও ক্ষমা ও হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য হবে না। এতদ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, একমাত্র হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আনুগত্যের মধ্যেই হেদায়েত সীমাবদ্ধ ; তাঁর অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচারণ করা চরম গোমরাহী। অতএব, ইহুদীদের-ধ্যান-ধারণা, ধর্ম-কর্ম ভ্রান্ত ও বাতিল।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ
اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ
اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ؗ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا
تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ
سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى
الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٧١﴾ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ
يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ
عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿١٧٢﴾ فَاَمَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَ
يَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا
فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧٣﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِىْ رَحْمَةٍ
مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾

(১৭১) হে আহলে-কিতাবগণ ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ—তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে এবং তার রসূলগণকে মান্য কর। আর একথা বলো না যে, আল্লাহ্ তিনের এক, একথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তার। আর কর্মবিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট (১৭২) মসীহ্ আল্লাহর বান্দা হবেন, তাতে তার কোন লজ্জাবোধ নেই এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর দাসত্বে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে সমবেত করবেন। (১৭৩) অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন, বরং স্বীয় অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। পক্ষান্তরে যারা লজ্জাবোধ করেছে এবং অহঙ্কার করেছে তিনি তাদেরকে দেবেন বেদনাদায়ক আযাব। আল্লাহ্কে ছাড়া তারা কোন সাহায্যকারী ও সমর্থক পাবে না। (১৭৪) হে মানবকুল ! তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সনদ পৌছে গেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি প্রকৃষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছি। (১৭৫) অতএব, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে তিনি তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের আওতায় স্থান দেবেন এবং নিজের দিকে আসার মত সরল পথে তুলে দেবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَكَلِمَتُهٗ শব্দে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র কালেমা। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরকারগণ বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন।

(এক) হযরত ইমাম গাযযালী (রাহঃ) বলেন ঃ কোন শিশুর জন্ম লাভের জন্য দু'টি শক্তির যৌথ ভূমিকা থাকে। তন্মধ্যে একটি হলো নারী-পুরুষের বীর্যের সম্মেলন। দ্বিতীয় শক্তি আল্লাহ্ তাআলার كن (হও) নির্দেশ দান; যার ফলে উক্ত শিশুর অস্তিত্বের সঞ্চার হয়ে থাকে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম লাভের ক্ষেত্রে প্রথম শক্তি বর্তমান ছিল না। তাই দ্বিতীয় শক্তির সাথে সম্পর্কিত করে তাঁকে কালেমাতুল্লাহ্ বলা হয়েছে। যার তাৎপর্য এই যে, তিনি বস্তুগত কার্যকারণ ছাড়া শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার كن (হয়ে যাও) নির্দেশের প্রভাবে জন্মলাভ করেছেন। এমতাবস্থায় اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ বাক্যের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্ তাআলা এ কালেমাটি হযরত জিবারঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে হযরত মরিয়মের কাছে পৌছে দিলেন, আর হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মগ্রহণের মাধ্যমে তা কার্যকর ও বাস্তবায়িত হলো।

(দুই) কারো মতে 'কালেমাতুল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র সুসংবাদ। এর দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যক্তি-সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত মরিয়ম (আঃ)-কে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যে সুসংবাদ দান করেছিলেন সেখানে 'কালেমা' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যথা ঃ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ এবং ফেরেশতারা বললো-যে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে সু-সংবাদ দিচ্ছেন 'কালেমা' সম্পর্কে।

(তিন) কারো মতে এখানে 'কালেমা' অর্থ নিদর্শন। যেমন, অন্য এক আয়াতে শব্দটি নিদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا

وَرُوْحٌ مِّنْهُ — এ শব্দে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ হযরত ঈসা (আঃ)-কে 'রূহ' বলার তাৎপর্য কি? দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ তাআলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার কারণ কি?

এ সম্পর্কে তফসীরকারগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে—(এক) কারো মতে 'রূহ' অতিশয় পবিত্র বস্তু হওয়ার কারণে এরূপ বলা হয়েছে। কেননা, প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, কোন বস্তুর অধিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বোঝাবার জন্য তাকে সরাসরি ' রূহ' বলা হয়। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মলাভের মধ্যে যেহেতু বীর্যের কোন দখল ছিল না, বরং তিনি শুধু আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা এবং كن নির্দেশের ভিত্তিতে জন্মলাভ করেছিলেন, কাজেই দৈহিক পবিত্রতার দিক দিয়ে তিনি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। অতএব, প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁকে 'রূহ' বলা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তাআলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার উদ্দেশ্য সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা। যেমন, মসজিদের সম্মানার্থ সেটিকে 'আল্লাহ্র মসজিদ' বলা হয়, কাবা শরীফকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহ্র ঘর বলা হয়; অথবা কোন একান্ত আনুগত বান্দাকে আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত করে আবদুল্লাহ বা আল্লাহ্র বান্দা বলা হয়। যেমন, সূরা বনী-ইসরাঈলের اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ আয়াতে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 'আল্লাহ্র বান্দা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(দুই) কারো মতে আধ্যাত্মিক জীবন দান করে মানুষের মৃতপ্রায় অন্তরকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য হযরত ঈসা (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন। দৈহিক জীবনের মূল যেমন রূহ বা প্রাণ, তদ্রূপ হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণ স্বরূপ। অতএব, তাঁকে 'রূহ' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। যেমন وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا আয়াতে পবিত্র কোরআনকেও 'রূহ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা, কোরআনপাক আধ্যাত্মিক জীবনের উৎসমূল।

(তিন) কেউ বলেন—'রূহ' শব্দটি রহস্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থই অধিক সমীচীন। কারণ, হযরত ঈসা (আঃ)–এর নজীরহীন ও বিস্ময়কর জন্ম আল্লাহ্ তাআলার অসীম কুদরতের নিদর্শন ও রহস্য। এজন্যই তাঁকে 'রূহুল্লাহ' বলা হয়।

(চার) আরেকটি অভিমত এই যে, روح (রূহ) শব্দ ফুঁক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্ পাকের নির্দেশক্রমে হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত মরিয়ম (আঃ)–এর গলবন্দে ফুঁক দিয়েছিলেন। আর তার ফলেই তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন। যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ) শুধু ফুৎকারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁকে রূহুল্লাহ্ খেতাব দেয়া হয়েছে। কোরআন পাকে এদিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে। فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا

এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। তবে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র সত্তার অংশ ছিলেন বা আল্লাহ্‌ই ঈসা (আঃ)–এর মানবীয় দেহে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন–এমন অর্থ করা বা ধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল।

একটি ঘটনা ঃ আল্লামা আলূসী (রাহঃ) লিখেছেন যে, একদিন খলিফা হারুনুর রশীদের দরবারে জনৈক খৃস্টান চিকিৎসক হযরত আলী ইবনে হোসাইন ওয়াকেদীর সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হয়। সে বলল,—তোমাদের কোরআনে এমন একটি শব্দ রয়েছে যার দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র অংশ ছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ সে কোরআনের رُوْحٌ مِّنْهُ শব্দটি পেশ করল। তদুত্তরে আল্লামা ওয়াকেদী কোরআন পাকের আয়াত وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ পাঠ করলেন। এখানে جَمِيْعًا مِّنْهُ শব্দ দ্বারা সব কিছুকে আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যার অর্থ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে। অতএব, رُوْحٌ مِّنْهُ শব্দের অর্থ যদি করা হয় যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র অংশ, তবে جَمِيْعًا مِّنْهُ শব্দের অর্থ করতে হবে আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ্‌র অংশ। (নাযুবিল্লাহি মিন যালিক)। অতএব, হযরত ঈসা (আঃ)–এর বিশেষ কোন মর্যাদা সাব্যস্ত হয় না। এ উত্তর শুনে খৃস্টান চিকিৎসক নিরুত্তর হয়ে গেল এবং ইসলাম গ্রহণ করলো।

وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ কোরআন নাযিলের সমসাময়িক কালে খৃস্টানরা যেসব উপদলে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদল মনে করতো—মসীহই খোদা। স্বয়ং খোদাই মসীহরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। দ্বিতীয় দল বলতো—মসীহ্ পুত্র। তৃতীয় দলের বিশ্বাস ছিল, তিন সদস্য সমন্বয়ে খোদার একক পরিবার। এ দলটি আবার দু'টি উপদলে বিভক্ত ছিল। এক দলের মতে পিতা, পুত্র ও মরিয়ম এ তিনের সমন্বয়ে এক খোদা। অন্য এক দলের মতে হযরত মরিয়ম (আঃ)–এর পরিবর্তে রূহুল কুদুস পবিত্রাত্মা হযরত জিবরাঈল (আঃ) ছিলেন তিন খোদার একজন।

মোটকথা, খৃস্টানরা হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ)–কে তিনের এক খোদা মনে করতো। তাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য কোরআন করীমে প্রত্যেকটি উপদলকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সম্মিলিতভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সামনে স্পষ্ট ও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, সত্য একটিই। আর তা হল হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) তাঁর মাতা হযরত মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী একজন মানুষ ও আল্লাহ্ তাআলার সত্য রসূল। এর অতিরিক্ত তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলা বা ধারণা করা হয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল। তাঁর প্রতি ইহুদীদের মত অবজ্ঞা বা ঈর্ষা পোষণ করা অথবা খৃস্টানদের মত অতি ভক্তি প্রদর্শন করা সমভাবে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কোরআন মজীদের অসংখ্য আয়াতে একদিকে ইহুদী–খৃস্টানদের পথভ্রষ্টতা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে হযরত ঈসা (আঃ)–এর উচ্চ মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের অধিকারী হওয়ার কথাও জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে অবজ্ঞা ও অতিভক্তি দু'টি পরস্পর বিরোধী ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যবর্তী সত্য ও ন্যায়ে সঠিক পথ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

অর্থাৎ, আসমান ও যমীনে উপর হতে নীচে পর্যন্ত যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা। অতএব, তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র–পরিজন হতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা একাই সর্বকার্য সম্পাদনকারী এবং সকলের কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট; অন্য কারো সাহায্য–সহায়তার প্রয়োজন নেই। তিনি একক; তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র–পরিজন থাকতে পারে না।

সারকথা, কোন সৃষ্ট ব্যক্তিরই স্রষ্টার অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা নেই। আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সত্তার জন্য এর অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই। অতএব, একমাত্র বিবেকবর্জিত, ঈমান হতে বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট কোন জীবকে তাঁর অংশীদার বা পুত্র বলা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হারাম ঃ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ আয়াতে ইহুদী–নাসারাগণকে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। غلو শব্দের অর্থ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। ইমাম জাস্‌সাস 'আহ্‌কামুল–কোরআনে' লিখেছেন ঃ

الغلوفى الدين هو مجاوزة حد الحق فيه

অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার অর্থ তার ন্যায়সঙ্গত সীমা রেখা অতিক্রম করা।

আহলে–কিতাব অর্থাৎ ইহুদী–খৃস্টান উভয় জাতিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ বাড়াবাড়ি করো না। কারণ, এ বাড়াবাড়ির রোগে উভয় জাতিই আক্রান্ত হয়েছে। খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)–কে ভক্তি–শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। তাঁকে স্বয়ং খোদা, খোদার পুত্র অথবা তিনের এক খোদা বানিয়ে দিয়েছে। অপর দিকে ইহুদীরা তাঁকে অমান্য ও প্রত্যাখ্যান করার দিক দিয়ে বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছে। তারা হযরত ঈসা (আঃ)–কে আল্লাহ্‌র নবী হিসেবে স্বীকার করেনি। বরং তাঁর মাতা হযরত মরিয়ম (আঃ)–এর উপর মারাত্মক অপবাদ আরোপ করেছে এবং তাঁর নিন্দাবাদ করেছে।

ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘনের কারণে ইহুদী ও খৃষ্টানদের গোমরাহী ও ধ্বংস হওয়ার শোচনীয় পরিণতি বার বার প্রত্যক্ষ হয়েছে। তাই হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর প্রিয় উম্মতকে এব্যাপারে সংযত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন। মুসনাদে আহমদে হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

لاتطرونى كما اطرت النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله

অর্থাৎ, 'তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এমন অতিরঞ্জিত করোনা, যেমন খৃস্টানরা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর ব্যাপারে করেছে। স্মরণ রাখবে যে, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। অতএব, আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল বলবে।' বোখারী এবং ইবনে-মাদয়িনী এ হাদীস উল্লেখ করে এর সনদকে সহীহ্ বলেছেন।

সারকথা, আল্লাহ্‌র বান্দা ও মানুষ হিসেবে আমিও অন্য লোকদের সমপর্যায়ের। তবে আমার সবচেয়ে বড় মর্যাদা এই যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূল। এরচেয়ে অগ্রসর করে আমাকে আল্লাহ্ তাআলার কোন বিশেষণে বিশেষিত করা বাড়াবাড়ি বৈ নয়। তোমরা ইহুদী-নাসারাদের মত বাড়াবাড়ি করো না। বস্তুতঃ ইহুদী-খৃস্টানরা শুধু নবিগণের ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করে ক্ষান্ত হয়নি, বরং এটা যখন তাদের স্বভাবে পরিণত হলো, তখন তারা নবিগণের সহচর ও অনুগামীদের ব্যাপারেও অতিরঞ্জিত সব গুণ আরোপ করেছিল। পাদ্রী-পুরোহিতগণকেও তারা নিষ্পাপ মনে করতো। অতঃপর এতটুকু যাচাই করারও প্রয়োজন মনে করতো না যে, তারা সত্যিকারভাবে নবিগণের অনুগত এবং তাঁদের শিক্ষার অনুসারী না শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে পণ্ডিত-পুরোহিত রূপে পরিগণিত হন? ফলে পরবর্তীকালে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এমন পাদ্রী-পুরোহিতদের কুক্ষিগত হয়েছে যারা নিজেরা স্বার্থপর ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং অনুসারীদেরকে চরম বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর আবর্তে নিক্ষেপ করেছে। ধর্ম-কর্মের নামে তারা অধর্ম-অনাচারে লিপ্ত হয়েছে। কোরআন পাক ঘোষণা করছে ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

'তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ ও সন্যাসিগণকে মাবুদের আসনে বসিয়েছিল।' রসূলকে তো খোদা বানিয়েছিলই, রসূলের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার নামে পূর্ববর্তী নবিগণকেও পূজা করা শুরু করেছিল।

এতদ্বারা বোঝা গেল যে, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি যা ধর্মের নামেই পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের সত্যিকার রূপরেখাকে বিলীন করেছে। তাই আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) স্বীয় উম্মতকে এহেন ভয়াবহ মহামারীর কবল হতে রক্ষা করার জন্য পূর্ণ সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হজ্বের সময় 'রমীয়ে-জামারাহ্' অর্থাৎ, কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য রসূলুল্লাহ্ হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ)-কে কঙ্কর আনতে আদেশ করলেন। তিনি মাঝারী আকারের পাথরকুচি নিয়ে এলে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং বললেন— بِمِثْلِهِنَّ অর্থাৎ, এ ধরনের মাঝারী আকারের কঙ্কর নিক্ষেপ করাই পছন্দনীয়। বাক্যটি তিনি দুবার বললেন। অতঃপর আরো বললেন ঃ

اياكم والغلوفى الدين فانما هلك من قبلكم بالغلو فى دينهم

অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থেকো। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ তাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল জানা গেল।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল ঃ প্রথমতঃ হজ্বের সময় যে কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয় তা মাঝারী আকারের হওয়াই সুন্নত। অতি ক্ষুদ্র বা বড় পাথর নিক্ষেপ করা সুন্নতের পরিপন্থী। বড় বড় প্রস্তর নিক্ষেপ করা ধর্মের কাজে বাড়াবাড়ির শামিল।

দ্বিতীয়ত ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে যে কাজের যে সীমারেখা শিক্ষা দিয়েছেন, সেটিই শরীয়তের নির্ধারিত সীমা। তা অতিক্রম করাই বাড়াবাড়ি রূপে পরিগণিত হবে।

তৃতীয়ত ঃ - যে কোন কাজে সুন্নাহ সম্মত সীমারেখা অতিক্রম করাই বাড়াবাড়ি রূপে বিবেচনা করতে হবে।

দুনিয়ার মহব্বতের রূপরেখা ঃ পার্থিব ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত আকাংখা ও লোভ-লালসা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। এটা পরিত্যাগ করার জন্য কোরআন পাকে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বত বা পার্থিব মোহ সম্পর্কে সতর্ক করার সাথে সাথে রসূলে করীম (সাঃ) স্বীয় কথা ও কার্য দ্বারা তার সীমারেখাও নির্ধারণ করেছেন। যেমন, বিবাহ করাকে তিনি নিজের সুন্নত বলে ঘোষণা করেছেন, বিবাহ করার জন্য উৎসাহিত করেছে, সন্তান জন্মদানের উপকারিতা বুঝিয়েছেন, পরিবার-পরিজনের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের ন্যায্য অধিকার পূরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, নিজের ও পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন করাকে 'ফরিযাতুন বা'দাল ফরিযা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যবসায়, কৃষিকার্য, শিল্প-কর্ম, হস্তশিল্প ও মজদুরীর জন্য প্রেরণা যুগিয়েছেন। অতএব, এর কোনটাই দুনিয়ার মহব্বতের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না। ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাকে নবুওয়তের দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় প্রচেষ্টায় সমগ্র আরব উপ-দ্বীপে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পত্তন করেন। অতঃপর খোলাফায়ে-রাশেদীনের সুবর্ণ যুগে সে রাষ্ট্রের এলাকা বহু দূর-দূরান্তে বিস্তৃত হয়েছিল, অথচ তাঁদের অন্তরে দুনিয়ার কোন মোহই ছিল না। এতদ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, প্রয়োজন অনুসারে এসব করা নিন্দনীয় নয়।

ইহুদী ও খৃস্টানরা এ তত্ত্বটি অনুবাধন করতে অপারক হওয়ায় সন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছে। তাদের এ ভ্রান্তি খণ্ডন করে আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

وَرَهْبَانِيَّةَ ۨابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

অর্থাৎ, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে সন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছে। যা আমি তাদের প্রতি আরোপ করিনি। অতঃপর তারা তা যথাযথভাবে বজায় রাখেনি।

সুন্নত ও বেদাতের সীমারেখা ঃ এবাদত, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রসূলে পাক (সাঃ) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে মধ্যপন্থা নির্দেশ করেছেন। তার চেয়ে পেছনে অবস্থান যেমন, অবাঞ্ছনীয়, তেমনি অগ্রসর হওয়াও অমার্জনীয়। এ জন্য রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বপ্রকার বেদাতকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار অর্থাৎ, প্রত্যেকটি বেদাতই

গোমরাহী আর প্রত্যেকটি গোমরাহীর পরিণামই জাহান্নাম। রসূলে মকবূল (সাঃ)-এর কথা বা কার্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় না, এরূপ কোন বিষয়কে সওয়াবের কাজ মনে করাই বেদাত।

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মোহাদ্দেস দেহলবী (রাহঃ) লিখছেন ঃ "ইসলামের দৃষ্টিতে বেদাতকে চরম অপরাধ এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটাই দ্বীন ও শরীয়তকে বিকৃত করার প্রধান হাতিয়ার ও চিরাচরিত পন্থা। পূর্ববর্তী উম্মতগণেরও প্রধান ব্যাধি ছিল যে, তারা নিজেদের নবী ও রসূলগণের মৌলিক শিক্ষার উপর নিজেদের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করেছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা কিকি বর্ধিত করেছে আর আসল বিষয়টা কি ছিল, তা জানারও কোন উপায় ছিল না।

দ্বীনকে বিকৃত করার কারণ ও পন্থাসমূহ কি কি, কোনও গুপ্তপথে যাতে এ মহামারী উম্মতে-মোহাম্মদীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, তজ্জন্য ইসলামী শরীয়তে কিভাবে প্রতিটি পথে সতর্ক ও শক্তিশালী প্রহরা মোতায়েন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মোহাদ্দেস দেহলবী (রাহঃ) তদীয় 'হুজ্জাতুল্লাহ্ হিলবালেগাহ' কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মানের মধ্যপন্থা ঃ উক্ত কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, নবী-করীম (সাঃ)-এর কঠোর হুঁশিয়ারী এবং শরীয়তের কঠিন বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও বর্তমান মুসলিম সমাজ ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ির শিকারে পরিণত হয়েছে। দ্বীনের প্রতিটি শাখায় এই লক্ষণ সুস্পষ্ট ও উদ্বেগজনক। দ্বীন ও ঈমানের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও মারাত্মক হচ্ছে ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার আতিশয্য অথবা অবহেলা ও অবজ্ঞার মনোবৃত্তি। একদল মনে করছে যে, ধর্মীয় আলেম-ওলামা, পীর-বুযুর্গাণের কোন প্রয়োজনই নেই; আল্লাহ্র কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ, তারাও মানুষ আমরাও মানুষ। এমনোভাবাপন্ন কোন কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি আরবী ভাষায়ও অনভিজ্ঞ, কোরআনের হাকীকত ও নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও সাহাবায়ে-কেরামের বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তফসীর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়া সত্ত্বেও, কয়েকখানি অনুবাদ পুস্তক পাঠ করেই নিজেকে কোরআনের সমঝদার মনে করে বসেছে। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরেদ অর্থাৎ, সাহাবায়ে-কেরাম কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখা ও তফসীরের তোয়াক্কা না করে নিজেদের কল্পনা-প্রসূত মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে। অথচ তারা চিন্তা করে না যে, ওস্তাদ ছাড়া শুধু কিতাবই যদি যথেষ্ট হতো, তবে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কোরআনের লিখিত কপি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌছে দিতে সক্ষম ছিলেন—রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ওস্তাদরূপে প্রেরণের আবশ্যক হতো না। একথা শুধু আল্লাহ্র কিতাবের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং দুনিয়ার যে কোন বিষয় বা শাস্ত্রের বই পুস্তক বা অনুবাদ পাঠ করেই কেউ উক্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হতে পারে না। শুধু ডাক্তারী বই পড়েই আজ পর্যন্ত কেউ বড় ডাক্তার হতে পারে নাই। প্রকৌশল বিদ্যার বই অধ্যয়ন করেই কোন পারদর্শী প্রকৌশলী হয়েছে বলে শুনা যায় না। এমনকি দর্জিবিদ্যা বা পাক প্রণালীর শুধু বই পড়ে কোন সুদক্ষ দর্জী বা বাবুর্চি হতেও দেখা যায় না। বরং এসব ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। অথচ তারা কোরআন-হাদীসকে এত হাল্কা মনে করেছে যে, এগুলো বুঝার জন্য কোন ওস্তাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। এটা সত্যই পরিতাপের বিষয়।

অনুরূপভাবে একদল শিক্ষিত লোক গড্ডালিকা প্রবাহে মেতে উঠেছে যে, কোরআন পাক বুঝার জন্য তর্জমা অধ্যয়নই যথেষ্ট। পূর্ববর্তী মনীষিগণের তফসীর ও ব্যাখ্যার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা বা তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ করার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। আদতে এটাও এক প্রকার বাড়াবাড়ি বা অনধিকার চর্চা।

অপরদিকে বহু মুসলমান অন্ধ ভক্তিজনিত রোগে আক্রান্ত। যাকে তাদের পছন্দ হয়েছে, তাকেই নেতা সাব্যস্ত করে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছে। তারা কখনো এতটুকু যাচাই করে দেখে না যে, আমরা যাকে নেতারূপে অনুসরণ করছি তিনি এলেম-আমল, এছলাহ ও পরহেযগারীর মাপকাঠিতে টিকেন কিনা? তারা যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা কোরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক কিনা? প্রকৃতপক্ষে এহেন অন্ধভক্তিও বাড়াবাড়িরই নামান্তর।

বাড়াবাড়ির উভয় পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইসলামী শরীয়তের পথ-নির্দেশ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্র কিতাব আল্লাহ্ ওয়ালা লোকদের কাছে বুঝতে হবে এবং আল্লাহ্র কিতাব দ্বারা আল্লাহ্ ওয়ালা লোকদের চিনতে হবে। অর্থাৎ, প্রথমে কোরআন ও হাদীসের নির্ধারিত নিরিখের আলোকে খাঁটি আল্লাহ্ ওয়ালাগণকে চিনে নাও। অতঃপর দেখ তাঁরা কোরআন ও হাদীসের চর্চায় সদা নিমগ্ন এবং তাদের জীবনধারাও কোরআন-হাদীসের রংয়ে রঞ্জিত কিনা। অতঃপর কোরআন ও হাদীসের সব জটিল প্রশ্নের সমাধানে তাঁদের অভিমত ও সিদ্ধান্তকে নিজের বুঝ-ব্যবস্থার উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়ে তার অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহ্র বান্দা হওয়াই সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয় ঃ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ - অর্থাৎ, হযরত ঈসা (আঃ) স্বয়ং এবং আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ কখনো আল্লাহ্র বান্দারূপে পরিচিত হতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন না। কারণ, আল্লাহ্র দাসত্ব ও গোলামি করা, তার এবাদত-বন্দেগী করা, আদেশ-নিষেধ পালন করা অতি মর্যাদা, গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়। হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) ও হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট ফেরেশতাগণ এ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত রয়েছেন। তাই এতে তাঁদের কোন লজ্জা নেই। আসলে আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা গোলামি করাই লজ্জা ও অমর্যাদার কাজ। যেমন, খৃষ্টানরা হযরত ঈসা মসীহ (আঃ)-কে আল্লাহ্র পুত্র ও অন্যতম উপাস্য সাব্যস্ত করেছে এবং মুশরেকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা ও দেবী সাব্যস্ত করে তাদের মূর্তি তৈরী করে পূজা-অর্চনা শুরু করেছে। অতএব, তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি ও অপমান অবধারিত রয়েছে।— (ফাওয়ায়েদে-উসমানী)

قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ 'বুরহান' শব্দের আভিধানিক অর্থ অকাট্য দলীল-প্রমাণ। এ আয়াতে এর দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র সত্তা ও মহান ব্যক্তিত্বকে বোঝানো হয়েছে।— (তফসীরে রূহুল-মা'আনী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মহান ব্যক্তিত্বের জন্য 'বুরহান' শব্দ প্রয়োগ করার তাৎপর্য এই যে, তাঁর বরকতময় সত্তা, অনুপম চরিত্র মাধুর্য, অপূর্ব মো'জেযাসমূহ, তাঁর প্রতি বিস্ময়কর কিতাব আল-কোরআন অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি তাঁর রেসালতের অকাট্য দলীল ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যার পরে আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের আবশ্যক হয় না। অতএব, তাঁর মহান ব্যক্তিত্বই তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ
لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ
إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا
تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوٓا إِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

سُورَةُ الْمَآئِدَةِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّعِشْرُونَ اٰيَةً وَّسِتَّةَ عَشَرَ رُكُوعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللّٰهَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

(১৭৬) মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায়—অতএব, আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তোমাদিগকে 'কালালাহ্' –এর মীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন; যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং এক বোন থাকে, তবে সে পাবে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয়, তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। তা দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হবে বলে আল্লাহ্ তোমদিগকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।

সূরাতুল – মায়েদাহ
মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত, ১২০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(১) মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে; যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে তা ব্যতীত। কিন্তু এহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না! নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন। (২) হে মুমিনগণ! হালাল মনে করো না আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ এবং সম্মানিত মাসসমূহকে এবং হরমে কুরবানীর জন্যে নির্দিষ্ট জন্তুকে এবং ঐসব জন্তুকে, যাদের গলায় কন্ঠাভরণ রয়েছে এবং ঐসব লোককে, যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে, যারা স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। যখন তোমরা এহ্‌রাম থেকে বের হয়ে আস, তখন শিকার কর। যারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল, সেই সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও খোদভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা।

আলোচ্য আয়াতে نور (নূর) শব্দ দ্বারা কোরআন মজীদকে বোঝানো হয়েছে।—(রূহুল-মা'আনী) যেমন, সূরায়ে মায়েদার আয়াত قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِينٌ অর্থাৎ, তোমাদের কাছে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এক উজ্জ্বল আলো তথা এক প্রকৃষ্ট কিতাব অর্থাৎ, কোরআন এসেছে।—(বয়ানুল কোরআন)

আবার নূর অর্থ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং কিতাব অর্থ আল-কোরআনও হতে পারে।—(রূহুল মা'আনী) তবে তার অর্থ এই নয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মানবীয় দৈহিকতা থেকে পবিত্র শুধু নূর ছিলেন।

সূরা আন-নিসা সমাপ্ত

সূরাতুল মায়েদাহ

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ এখানে আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ এবং 'কালালাহ্‌র' হুকুম বর্ণনার মাধ্যমে কয়েকটি বিষয় জানা গেল।

প্রথমত ঃ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ বলার পর দৃষ্টান্ত স্বরূপ আহলে-কিতাবদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তদ্রূপ فَأَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)–এর সাহাবায়ে-কেরামের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে যাতে করে ওহী হতে যারা পরান্মুখ তাদের পথভ্রষ্টতা ও সর্বনাশ এবং ওহীর আনুগত্য ও অনুসরণকারীদের সাফল্য ও সৌভাগ্য সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়।

দ্বিতীয়ত ঃ জানা গেল যে, আহলে-কিতাবরা আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সত্তার জন্য অংশীদার ও পুত্র সাব্যস্ত করার মত হীন মানসিকতাকে নিজেদের ঈমানের অঙ্গ বানিয়েছে। হঠকারিতার সাথে আল্লাহ্‌র ওহীর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। অপর দিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর সাহাবায়ে-কেরাম ধর্মীয় মূলনীতি ও এবাদত তো দূরের কথা লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, বিবাহ-শাদী এমনকি মীরাস বন্টনের মত ব্যাপারেও নিজেদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে যথেষ্ট মনে করতেন না, বরং সর্ব ব্যাপারেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর দিকে তাকিয়ে থাকতেন, ওহীর প্রতীক্ষা করতেন। যদি একবারে সান্ত্বনা না পেতেন, তবে আবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর সমীপে হাযির হয়ে জানতে চাইতেন।

তৃতীয়ত ঃ আরো বোঝা গেল যে, হযরত সাইয়্যেদুল-মুরসালীন (সাঃ) ওহীর হুকুম ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে কোন আদেশ জারি করতেন না। যদি কোন ব্যাপারে পূর্ববর্তী কোন ওহী না থাকতো, তবে তিনি ওহীর প্রতীক্ষা করতেন। এখানে আরো ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আহ্‌লে-কিতাবদের আবদার অনুসারে ওহী এক সাথে নাযিল না হয়ে যথাসময়ে অল্প-অল্প নাযিল হওয়া অতি উত্তম ছিল। কারণ, এমতাবস্থায় যে কোন ব্যক্তি নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে প্রশ্ন করার সুযোগ পায় এবং ওহীর মাধ্যমে জবাব জানতে পারে। যেমন, অত্র আয়াতে এবং কোরআন মজীদের আরো বহু আয়াতে তার নজীর দেখতে পাওয়া যায়।

এ ব্যবস্থাটি অধিক উপকারী ও কার্যকরী। তাছাড়া স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক বান্দাকে স্মরণ ও সম্বোধন করা বন্দার জন্য অতি সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় যা পূর্ববর্তী উম্মতগণ হাসিল করতে পারেনি।

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

যে কোন সাহাবীর কল্যাণার্থ বা যার প্রশ্নের উত্তরে কোন আয়াত নাযিল হয়েছে, উক্ত আয়াত তাঁকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করেছে। আর মতভেদ হলে যার বক্তব্য অনুসারে ওহী নাযিল হয়েছে, কেয়ামত পর্যন্ত চিরদিন তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি বজায় থাকবে। যাহোক, 'কালালাহ' সম্পর্কে প্রশ্ন ও উত্তর উল্লেখ করে উপরোক্ত সমাধানসমূহের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।— (ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

শানে নুযুল ঃ এটি সূরা মায়েদার প্রথম আয়াত। সূরা মায়েদা সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় অবতীর্ণ। মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যেও এটি শেষ দিককার সূরা। এমনকি, কেউ কেউ একে কোরআন মজীদের সর্বশেষ সূরাও বলেছেন। মুসনাদে-আহ্‌মদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আসমা বিনতে এয়াযীদের (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত আছে, সূরা মায়েদা যে সময় অবতীর্ণ হয়, সে সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফরে 'আযবা' নামীয় উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার ছিলেন। সাধারণতঃ ওহী অবতরণের সময় যেরূপ অসাধারণ ওজন ও বোঝা অনুভূত হতো, তখনও যথারীতি তা অনুভূত হয়েছিল। এমনকি ওজনের চাপে উষ্ট্রী অক্ষম হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নীচে নেমে আসেন। কোন কোন রেওয়ায়েত দৃষ্টে বোঝা যায় যে, এটি ছিল বিদায় হজ্জের সফর। বিদায় হজ্জ নবম হিজরীর ঘটনা। এ হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর হুযুর (সাঃ) প্রায় আশি দিন জীবিত ছিলেন। ইবনে হাব্বান 'বাহরে-মুহীত' গ্রন্থে বলেন ঃ সূরা মায়েদার কিয়দংশ হোদায়বিয়ার সফরে, কিয়দংশ মক্কা বিজয়ের সফরে এবং কিয়দংশ বিদায় হজ্জের সফরে অবতীর্ণ হয়। এতে বোঝা যায় যে, এ সূরাটি সর্বশেষ সূরা না হলেও শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

রুহুল-মা'আনী গ্রন্থে আবু ওবায়দাহ্ হযরত হামযা ইবনে হাবীব এবং আতিয়্যা ইবনে কায়স বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

المائدة من آخر القرآن تنزيلا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها

অর্থাৎ, 'সূরা মায়েদাহ্ কোরআন অবতরণের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে যা হালাল করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্যে হালাল এবং যা হারাম করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্যে হারাম মনে করো।'

ইবনে-কাসীরে এমনি ধরনের একটি রেওয়ায়েত হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি একবার হজ্জের পর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ জুবায়ের, তুমি কি সূরা মায়েদাহ্ পাঠ কর? তিনি আরয করলেন, জী-হাঁ, পাঠ করি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ এটি কোরআন পাকের সর্বশেষ সূরা। এতে হালাল ও হারামের যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত আছে, তা অটল। এগুলো রহিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কাজেই এগুলোর প্রতি বিশেষ যত্নবান থেকো।

সূরা মায়েদায়ও সূরা নেসার মত বিভিন্ন বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল, লেন-দেন, পারস্পরিক চুক্তি-অঙ্গীকার ইত্যাদির বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই রুহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন ঃ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সূরা বাক্কারা ও সূরা আলে-ইমরান অভিন্ন। কেননা, এ দু'টি সূরায় প্রধানতঃ মৌলিক বিধি-বিধান ও আকায়েদ, যথা, তওহীদ, রেসালত, কিয়ামত ইত্যাদির বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নিসা ও সূরা মায়েদাহ্ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অভিন্ন। কেননা, এ দু'টি সূরায় প্রধানতঃ বিভিন্ন বিধি-বিধানের বিস্তারিত আলোচনা স্থান লাভ করেছে এবং মৌলিক বিধি-বিধান প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নিসায় পারস্পরিক লেন-দেন ও বন্দার হকের উপর জোর দেয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর হক, এতীমের হক, পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতেও এসব লেন-দেন ও চুক্তি -অঙ্গীকার মেনে চলা ও পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমনঃ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ হে মুমিনগণ, তোমরা ওয়াদা —অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এ কারণেই সূরা মায়েদার অপর নাম সূরা ওকূদ। অর্থাৎ, ওয়াদা-অঙ্গীকারের সূরা।- (বাহরে-মুহীত)

চুক্তি-অঙ্গীকার ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে এ সূরাটি বিশেষ করে এর প্রথম আয়াতটি সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমর ইবনে হাযম (রাঃ)-কে ঐ আমলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং একটি ফরমান লিখে তাঁর হাতে অর্পণ করেন, তখন এ ফরমানের শিরোনামে উল্লেখিত আয়াতটিও লিপিবদ্ধ করে দেন।

এ সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যটি এত ব্যাপক অর্থবোধক যে, এর ব্যাখ্যায় হাজারো পৃষ্ঠা লেখা যায় এবং লেখা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ ! স্বীয় চুক্তি-অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এতে প্রথমে يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا বলে সম্বোধন করে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এতে যে নির্দেশ রয়েছে, তা সাক্ষাৎ ঈমানের দাবী। এরপর বলা হয়েছেঃ اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ عقود – عقد – শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ বাঁধা, আবদ্ধ করা। চুক্তিতে যেহেতু দুই ব্যক্তি অথবা দুই দল আবদ্ধ হয়, এজন্য এটাকেও عقد বলা হয়। এভাবে عقود এর অর্থ হয় عهود অর্থাৎ, চুক্তি ও অঙ্গীকার।

খ্যাতনামা তফসীরবিদ ইবনে-জরীর উপরোক্ত অর্থে তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের 'ইজমা' (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন। ইমাম জাস্‌সাস বলেনঃ দুই পক্ষ যদি ভবিষ্যতে কোন কাজ করা অথবা না করার বাধ্য-বাধকতায় একমত হয়ে যায়, তবে তাকেই عهد , عقد ও معاهد বলা হয়। আমাদের পরিভাষায় একেই চুক্তি বলা হয়। অতএব, উপরোক্ত বাক্যের সারমর্ম এই যে, পারস্পরিক চুক্তি পূর্ণ করাকে জরুরী ও অপরিহার্য মনে কর।

এখন দেখতে হবে আয়াতে চুক্তি বলে কোন্ ধরনের চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণের বাহ্যতঃ বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও এবাদত সম্পর্কিত যে সব অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের কাছ থেকে স্বীয় নাযিলকৃত বিধি-বিধান হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন, আয়াতে সেগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। এ উক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।

তফসীরবিদ ইবনে সাআদ ও যায়দ ইবনে আসলাম বলেন ঃ এখানে ঐসব চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ পরস্পরে একে অন্যের সাথে সম্পাদন করে। যেমন, বিবাহ-শাদী ও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ইত্যাদি।

কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে ঐসব শপথ ও অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যা জাহেলিয়াত যুগে একজন অন্যজনের কাছ থেকে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পাদন করতো। মুজাহিদ,রবী,কাতাদাহ্

প্রমুখ তফসীরবিদগণও একথাই বলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সব উক্তির মধ্যে কোন পরস্পরবিরোধিতা নাই। অতএব, উপরোক্ত সব চুক্তি ও অঙ্গীকারই عقود শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং কোরআন সবগুলোই পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

এ কারণেই ইমাম রাগেব বলেন ঃ চুক্তির যত প্রকার রয়েছে, সবই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এর প্রাথমিক প্রকার তিনটি। (এক)–পালনকর্তার সাথে মানুষের অঙ্গীকার। উদাহরণতঃ ঈমান ও এবাদতের অঙ্গীকার অথবা হারাম ও হালাল মেনে চলার অঙ্গীকার। (দুই)– নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার। যেমন, নিজ যিম্মায় কোন বস্তুর মান্নত মানা অথবা শপথ করে কোন কাজ নিজের উপর জরুরী করে নেওয়া। (তিন) – মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত চুক্তি। এছাড়া সে সব চুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যা দুই ব্যক্তি, দুই দল বা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়।

বিভিন্ন সরকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা পারস্পরিক সমঝোতা, বিভিন্ন দলের পারস্পরিক অঙ্গীকার এবং দুই ব্যক্তির মধ্যকার সর্বপ্রকার লেন-দেন, বিবাহ, ব্যবসা, শেয়ার, ইজারা ইত্যাদিতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে সব বৈধ শর্ত স্থির করা হয়, আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তা মেনে চলা প্রত্যেক পক্ষের অবশ্য কর্তব্য। 'বৈধ' শব্দটি প্রয়োগ করার কারণ এই যে, শরীয়ত বিরোধী শর্ত আরোপ করা এবং তা গ্রহণ করা কারও জন্যে বৈধ নয়।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ যেসব জীব-জন্তুকে সাধারণভাবে নির্বোধ মনে করা হয়, সেগুলোকে بهيمة (অস্পষ্ট প্রাণী) বলা হয়। কেননা, মানুষ অভ্যাসগতভাবে তাদের ভাষা বুঝে না। ফলে তাদের বক্তব্য مبهم তথা অস্পষ্ট থেকে যায়। ইমাম শা'রানী বলেন ঃ সাধারণ লোকের ধারণা অনুযায়ী এসব জন্তুকে بهيمة বলার কারণ এটা নয় যে, তাদের বুদ্ধি নাই এবং বুদ্ধির বিষয়বস্তু তাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়; বরং প্রকৃত সত্য হল এই যে, কোন প্রাণীই বুদ্ধি ও অনুভূতিহীন নয়, এমনকি কোন বৃক্ষ এবং প্রস্তরও নয়। তবে এদের ততটুকু বুদ্ধি নাই, যতটুকু মানুষের রয়েছে।

انعام — শব্দটি نعم এর বহুবচন। এর অর্থ পালিত পশু। যেমন, উট, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি। সূরা আনআমে এদের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এদের সবাইকে انعام বলা হয়। بهيمة শব্দের ব্যাপকতাকে انعام শব্দ এসে সংকুচিত করে দিয়েছে! এখন আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে, গৃহপালিত পশু আট প্রকার তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, عقود শব্দ বলে যাবতীয় চুক্তি-অঙ্গীকার বুঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল ঐ অঙ্গীকার, যা আল্লাহ্ তাআলা হালাল ও হারাম মেনে চলার বাপারে বান্দার কাছ থেকে নিয়েছেন। আলোচ্য বাক্যে এই বিশেষ অঙ্গীকারটিই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্যে উট, ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদিকে হালাল করে দিয়েছেন। শরীয়তের নিয়ম অনুয়ায়ী তোমরা এগুলোকে যবেহ্ করে খেতে পার।

আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ — অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অবমাননা করোনা। এখানে شعائر শব্দটি شعيرة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন। যেসব অনুভূত ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্মকে সাধারণের পরিভাষায় মুসলমান হওয়ার চিহ্নরূপে গণ্য করা হয়, সেগুলোকে شعائر اسلام তথা 'ইসলামের নিদর্শনাবলী' বলা হয়। যেমন, নামায, আযান, হজ্ব, সুন্নতী দাঁড়ি ইত্যাদি। আয়াতে উল্লেখিত 'আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী'র ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। কিন্তু হযরত হাসান বছরী ও আতা (রাঃ) থেকে বর্ণিত বাহ্‌রে-মুহীত ও রূহুল-মাআনী গ্রন্থে উল্লেখিত ব্যাখ্যাটিই পরিস্কার ও সহজবোধ্য। ইমাম জাসসাস এ ব্যাখ্যাটিকে এ সম্পর্কিত সব উক্তির নির্যাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যাখ্যাটি এই ঃ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অর্থ সব শরীয়ত এবং ধর্মের নির্ধারিত ওয়াজেব, ফরয ও এদের সীমা।

আলোচ্য আয়াতে لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ বলার সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অবমাননা করো না। আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর এক অবমাননা এই যে, মূলতঃই এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। প্রথমতঃ এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। দ্বিতীয়তঃ এসব বিধি-বিধানকে অসম্পূর্ণভাবে পালন করা এবং তৃতীয়তঃ নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। আয়াতে এ তিন প্রকার অবমাননাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কোরআন পাক এ নির্দেশটিই শব্দান্তরে এভাবে বর্ণনা করেছে ঃ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা অন্তরের খোদা-ভীতিরই লক্ষণ। আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে কিছু বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

বলা হয়েছে ঃ

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

অর্থাৎ, পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে এগুলোর অবমাননা করো না। পবিত্র মাস হচ্ছে শাওয়াল, জিলহজ্ব ও রজব। এসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা শরীয়তের আইনে অবৈধ ছিল। সাধারণ আলেমগণের মতে পরবর্তী কালে এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। এছাড়া হরমে কুরবানী করার জন্তু বিশেষতঃ যেসব জন্তুকে গলায় কুরবানীর চিহ্নস্বরূপ কন্ঠাভরণ পরানো হয়েছে, সেগুলোর অবমাননা করো না। এসব জন্তুর অবমাননার এক পন্থা হচ্ছে এদের হরম পর্যন্ত পৌছতে না দেয়া অথবা ছিনিয়ে নেয়া। দ্বিতীয় এই যে, এগুলো কুরবানীর পরিবর্তে অন্য কোন কাজে নিয়োজিত করা। যেমন, আরোহন করা অথবা দুগ্ধ লাভ করা ইত্যাদি। আয়াত এসব পন্থাকেই অবৈধ করে দিয়েছে।

এছাড়া ঐসব লোকেরও অবমাননা করোনা, যারা হজ্বের জন্যে পবিত্র মসজিদের উদ্দেশে গৃহত্যাগ করেছে। এ সফরে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় পালনকর্তার কৃপা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। অর্থাৎ, পথিমধ্যে তাদের গতিরোধ করো না এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট দিয়ো না।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا অর্থাৎ, প্রথম আয়াতে এহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করতে যে নিষেধ করা হয়েছিল, এখানে সে নিষেধাজ্ঞার সীমা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তোমরা এহ্‌রাম থেকে মুক্ত হয়ে যাও, তখন শিকার করার নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। অতএব, তখন শিকারও করতে পারবে।

উল্লেখিত আয়াতে প্রত্যেক মানব ও পালনকর্তার মধ্যকার চুক্তির কয়েকটি অংশ এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে এতে প্রথমে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর

প্রতি সর্বাবস্থায় সম্মান প্রদর্শন করতে এবং এগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর বিশেষভাবে হজ্জ সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর কিছু বিবরণ রয়েছে। তন্মধ্যে হজ্জের উদ্দেশে আগমনকারী যাত্রীসাধারণ ও তাদের সাথে আনীত কুরবানীর জন্তুদের গতিরোধ ও সেগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অতঃপর চুক্তির দ্বিতীয় অংশ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

أَنْ تَعْتَدُوا

অর্থাৎ, যে সম্প্রদায় হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় তোমাদের মক্কায় প্রবেশ করতে এবং ওমরা পালন করতে বাধা প্রদান করেছিল এবং তোমরা তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখ নিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিলে, এখন শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয়ে তোমরা তাদের কাছ থেকে এভাবে প্রতিশোধ নিও না যে, তোমরা তাদের কাবাগৃহে ও পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং হজ্জ করতে বাধা দিতে শুরু করবে। এটাই হবে জুলুম। আর ইসলাম জুলুমের উত্তরে জুলুম করতে চায় না। বরং ইসলাম জুলুমের প্রতিদানে ইনসাফ এবং ইনসাফে কায়েম থাকার শিক্ষা দেয়। তারা শক্তি ও ক্ষমতা হাতে পেয়ে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং ওমরা পালন করতে অন্যায়ভাবে বাধা দিয়েছিল। এখন এর প্রত্যুত্তরে এরূপ হওয়া সমীচীন নয় যে, মুসলমানরা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে তাদের হজ্জের ক্রিয়াকর্ম থেকে বাধা প্রদান করবে।

কোরআন পাকের শিক্ষা এই যে, ইনসাফ ও ন্যায়বিচারে শত্রু-মিত্র সব সমান। তোমাদের শত্রু যতই কঠোর হোক সে তোমাদের যতই কষ্ট দিয়ে থাকুক, তার ব্যাপারেও ন্যায়বিচার করা তোমাদের কর্তব্য।

এটা ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য যে, সে শত্রুদের অধিকারও সংরক্ষণ করে এবং তাদের অন্যায়ের প্রত্যুত্তরে অন্যায় দ্বারা নয়; বরং ন্যায় বিচার দ্বারা দিতে শিক্ষা দেয়।

পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কোরআনী মূলনীতি ঃ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্য। এতে কোরআন পাক এমন একটি মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা দিয়েছে, যা সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। এর উপরই মানুষের সর্ব প্রকার মঙ্গল ও সাফল্য বরং তার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এ প্রশ্নটি হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা। জ্ঞানী মাত্রই জানে যে, এ বিশ্বের গোটা রক্ষা ব্যবস্থা মানুষের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি একজন অন্যজনের সাহায্য না করে, তবে একাকী মানুষ হিসেবে সে যতই বুদ্ধিমান, শক্তিধর অথবা বিত্তশালী হোক, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারবে না। একাকী মানুষ স্বীয় খাদ্যের জন্যে শস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে আহারোপযোগী করা পর্যন্ত সব স্তর অতিক্রম করতে পারে না। এমনিভাবে পোশাক-পরিচ্ছদের জন্যে তুলা চাষ থেকে শুরু করে স্বীয় দেহের মানানসই পোশাক তৈরী করা পর্যন্ত অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে একাকী কোন মানুষ কিছুতেই সক্ষম নয়। মোটকথা, প্রত্যেকটি মানুষই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অন্য হাজারো লাখো মানুষের মুখাপেক্ষী। তাদের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারাই সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এ সাহায্য ও সহযোগিতা পার্থিব জীবনের জন্যেই জরুরী নয়— মৃত্যু থেকে নিয়ে কবরে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরও এ সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। বরং এর পরও মানুষ জীবিতদের দোয়ায়ে-মাগফেরাত ও ইছালে-ছওয়াবের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অসীম জ্ঞান ও পরিপূর্ণ ক্ষমতায় বিশ্বচরাচরের জন্যে এমন অটুট ব্যবস্থা রচনা করেছেন, যাতে একজন অন্যজনের মুখাপেক্ষী। দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার জন্যে যেমন ধনীর মুখাপেক্ষী, তেমনি শ্রেষ্ঠতম ধনী ব্যক্তিও পরিশ্রম ও মেহনতের জন্যে দিনমজুরের মুখাপেক্ষী। ব্যবসায়ী গ্রাহকের মুখাপেক্ষী এবং গ্রাহক ব্যবসায়ীর মুখাপেক্ষী। গৃহ নির্মাতা রাজমিস্ত্রী, কর্মকার, ছুতারের মুখাপেক্ষী এবং এরা সবাই গৃহনির্মাতার মুখাপেক্ষী। যদি এহেন সর্বব্যাপী মুখাপেক্ষিতা না থাকতো এবং সাহায্য-সহযোগিতা কেবল নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপরই নির্ভরশীল হতো, তবে কে কার কাজ করতে এগিয়ে আসতো! এমতাবস্থায় সাহায্য-সহযোগিতার দশাও তাই হতো, যা এ জগতে সাধারণ নৈতিক মূল্যবোধের হচ্ছে। যদি এ কর্মবন্টন কোন সরকার অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আইন আকারে করে দেওয়া হতো, তবে এর পরিণামও তাই হতো, যা আজকাল সারা বিশ্বে জাগতিক আইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে। অর্থাৎ, আইন খাতাপত্রে সংরক্ষিত আছে এবং বাজারে ও অফিস আদালতে ঘুষ, অন্যায় সুবিধাদান, কর্তব্যবিমুখতা ও কর্মহীনতার আইন চালু রয়েছে। একমাত্র সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার ব্যবস্থাপনাই বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন কারবারের স্পৃহা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে।

মোটকথা, সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনাও পারস্পরিক সম্পর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ চিত্রের একটা ভিন্ন পিঠও আছে। তা এই যে, যদি অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুন্ঠন ইত্যাদির জন্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা হতে থাকে, চোর ও ডাকাতদের বড় বড় সুশৃঙ্খল দল গঠিত হয়ে যায়, তবে এ সাহায্য ও সহযোগিতাই বিশ্বব্যবস্থাকে তছনছও করে দিতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, পারস্পরিক সহযোগিতা একটি দুধারী তরবারি— যা নিজের উপরও চালিত হতে পারে এবং বিশ্বব্যবস্থাকেও বানচাল করতে পারে। এ বিশ্ব মঙ্গলামঙ্গল, ভালমন্দ এবং সৎ-অসতের আবাসভূমি। এ কারণে এতে এরূপ হওয়া অসম্ভব ছিল না। এখানে অপরাধ, হত্যা, লুন্ঠন ও কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও শক্তি ব্যবহৃত হতে পারত। এটা শুধু সম্ভাবনাই নয়; বরং বাস্তব আকারে বিশ্ববাসীর সামনে ফুটে উঠেছে। তাই এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্বের জ্ঞানীগুণীরা স্বীয় হেফাযতের জন্যে বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ দল অথবা জাতির ভিত্তি স্থাপন করেছে— যাতে একদল অথবা একজাতির বিরুদ্ধে অন্য দল অথবা অন্য জাতি আক্রমনোদ্যত হলে সবাই মিলে পারস্পরিক সহযোগিতার শক্তি ব্যবহার করে তা প্রতিহত করতে পারে।

জাতীয়তা বন্টন ঃ আবদুল করিম শাহরেস্তানী প্রণীত 'মিলাল ওয়ানিহাল' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ প্রথম দিকে যখন পৃথিবীর জনসংখ্যা বেশী ছিল না, তখন বিশ্বের চার দিকের ভিত্তিতে চারটি জাতীয়তা জন্মলাভ করে ঃ প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, দক্ষিণ, উত্তর প্রত্যেক দিকে বসবাসকারীরা নিজেদেরকে এক জাতি এবং অন্যকে ভিন্ন জাতি মনে

করতে থাকে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি রচিত হতে থাকে। এরপর যখন জনসংখ্যা বেড়ে যায়, তখন প্রত্যেক দিকের লোকদের মধ্যে বংশ ও গোত্রের ভিত্তিতে জাতীয়তার ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে। আরবের সমগ্র ব্যবস্থা এ বংশ ও গোত্রগত ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর ভিত্তিতেই যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হতো। বনূ হাশেম এক জাতি, বনূ তামীম অন্য জাতি এবং বনূ খোযায়াহ্ স্বতন্ত্র একটি জাতি বলে বিবেচিত হতো। হিন্দুদের মধ্যে আজ পর্যন্ত উচ্চজাত ও নীচ জাতের ব্যবধান অব্যাহত রয়েছে।

আধুনিক ইউরোপীয়রা নিজেদের বংশ তো বিসর্জন দিয়েছেই, অন্যান্যদের রক্ত-ধারাকেও তারা মূল্যহীন প্রতিপন্ন করেছে। দুনিয়ায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই তারা বংশগত ও গোত্রগত জাতীয়তা ও বিভাগকে নিশ্চিহ্ন করে আবার আঞ্চলিক, প্রাদেশিক, দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে মানবজাতিকে খন্ড-বিখন্ড করে পৃথক পৃথক জাতি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আজ প্রায় সারা বিশ্বেই ভাষা এবং অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তার ধারণা চালু হয়ে গেছে। এমনকি, মুসলমানরাও এ জাদুর পরশ থেকে মুক্ত নয়। আরবী, তুর্কী, ইরাকী, সিন্ধীর বিভাগই নয়; বরং তাদের মধ্যেই ভাগফলকে ভাগ করে মিসরী, সিরীয়, হেজাযী, নজদী এবং পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, সিন্ধী, হিন্দী ইত্যাদি পৃথক পৃথক জাতি জন্মলাভ করেছে। ইউরোপীয়রা এসবের ভিত্তিতেই সরকারী কাজ-কারবার পরিচালনা করেছে। ফলে আঞ্চলিকতা ভিত্তিক বিদ্বেষ জনগণের শিরা-উপশিরায় ঢুকে পড়েছে এবং প্রত্যেক প্রদেশের জনগণ এর ভিত্তিতেই সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে।

জাতীয়তা ও কোরআনী শিক্ষা ঃ কোরআন পাক মানুষকে আবার ভুলে যাওয়া সবক স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সূরা নেসার প্রথম আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা সব মানুষ এক পিতা-মাতার সন্তান। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদায় হজ্বের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, কোন আরবের অনারবের উপর অথবা কোন শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। খোদাভীতি ও খোদার আনুগত্যই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি। কোরআনের এ শিক্ষা إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই) ঘোষণা করে আবিসিনিয়ার কৃষ্ণাঙ্গকে লাল তুর্কী ও রোমীর ভাই এবং অনারব নীচ জাতের মানুষকে কোরায়শী ও হাশেমী আরবের ভাই করে দিয়েছে। জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি এভাবে রচনা করেছে যে, যারা আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলকে মেনে চলে, তারা এক জাতি এবং যারা মানে না, তারা ভিন্ন জাতি। জাতীয়তার এ ভিত্তিই আবু জেহেল ও আবু লাহাবের পারিবারিক সম্পর্ক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে ছিন্ন করে দিয়েছে এবং বেলাল হাবশী ও ছুহায়েব রোমীর সম্পর্ককে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছে।

হাসান বসরা থেকে, বেলাল হাবাশা থেকে এবং ছুহাইব রোম থেকে এলেন অথচ মক্কার পবিত্র মাটি থেকে উঠলো আবু জেহেল. 'এটা কেমন আশ্চর্যজনক ব্যাপার' এমনকি, কোরআন পাক ঘোষণা করেছে ঃ

خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছ— কিছু কাফের হয়ে গেছ এবং কিছু মুমিন। বদর, ওহুদ, আহযাব ও হোনায়নের যুদ্ধে কোরআনের এ বিভক্তি কার্যক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করেছিল। বংশগত ভাই আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে মুসলমান ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক তার সাথে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং সে তার তরবারির নীচে এসে গিয়েছিল। বদর ওহুদ ও খন্দকের ঘটনাবলী এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়।

এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যদি মুসলমান ভাইও ন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং অন্যায় ও উৎপীড়নের পথে চলে, তবে অন্যায় কার্যে তারও সাহায্য করো না। বরং অন্যায় ও অত্যাচার থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এটাই তাকে বিশুদ্ধ সাহায্য—যাতে অন্যায় ও অত্যাচারের পাপে তার ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট না হয়।

কোরআন পাকের এ শিক্ষা সৎকর্ম ও খোদাভীতিকে আসল মাপকাঠি করেছে, তার উপরই মুসলিম জাতি জাতীয়তাবাদের প্রাচীর খাড়া করেছে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার আহবান জানিয়েছে। এর বিপরীতে পাপ ও অত্যাচার উৎপীড়নকে কঠোর অপরাধ গণ্য করেছে এবং এতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছে। এক্ষেত্রে بر ও تقوى দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। بر শব্দের অর্থ সাধারণ তফসীরকারগণের মতে সৎকর্ম এবং تقوى শব্দের অর্থ মন্দ কাজ বর্জন। اثم শব্দের অর্থ যে কোন পাপকর্ম-অধিকার সম্পর্কিত হোক অথবা এবাদত সম্পর্কিত। عدوان শব্দের অর্থ সীমা লঙ্ঘন করা। এখানে অর্থ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা।

সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে সাহায্য করার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ الدال على الخير كفاعله – অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন সৎকর্মের পথ বলে দেয়, সে ততটুকু ছওয়াব পাবে, যতটুকু নিজে সৎকর্মটি করলে পেত। –(ইবনে-কাসীর)

সহীহ্ বুখারীর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হেদায়েত ও সৎকর্মের প্রতি আহবান জানায়, তার আহবানে যতলোক সৎকর্ম করবে, সে তাদের সবার সমান ছওয়াব পাবে। এতে তাদের ছওয়াব হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসৎকর্ম অথবা পাপের প্রতি আহবান করে, তার আহবানে যতলোক পাপকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সবার সমান গোনাহ তারও হবে। এতে তাদের গোনাহ হ্রাস করা হবে না।

ইবনে-কাসীর বর্ণিত তিবরানীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর সাথে তার সাহায্যার্থ বের হয়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। এর ভিত্তিতেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ অত্যাচারী বাদশাহর চাকুরী ও পদ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে বিরত রয়েছেন। কারণ, এতে অত্যাচারে সহায়তা করা হয়। রুহুল-মাআনীতে فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এ হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন ডাক দেয়া হবে—অত্যাচারী ও তাদের সাহায্যকারীরা কোথায় আছ? অতঃপর যারা অত্যাচারীদের দোয়াত-কলমও ঠিক করে দিয়েছে, তাদেরকেও একটি লৌহ শবাধারে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

কোরআন ও সুন্নার এ শিক্ষাই জগতে সততা, ইনসাফ, সহানুভূতি ও সচ্চরিত্রতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিকে কর্মীরূপে প্রস্তুত করেছে এবং অপরাধ ও উৎপীড়ন দমনের জন্যে প্রতিটি ব্যক্তিকে এমন সিপাহীরূপে গড়ে তুলেছিল, যারা খোদাভীতির কারণে প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে। এ বিজ্ঞজনোচিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুফল সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগে জগদ্বাসী প্রত্যক্ষ করেছে। আজকালও কোন দেশে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে নাগরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেককেই কিছু কিছু আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অপরাধবৃত্তি নিবারণের জন্যে জনগণেকে সৎকাজের প্রতি আহবান প্রচেষ্টা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا
أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾ يَسْأَلُونَكَ
مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

(৩) তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ্ করেছ। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ্ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। এসব গোনাহ্র কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহ্র প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমাশীল। (৪) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি বস্তু তাদের জন্যে হালাল? বলে দিন ঃ তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে এবং ওদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর। আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। (৫) আজ তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল। আহ্লে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। তোমাদের জন্যে হালাল সতী–সাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতী–সাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী করার জন্যে, কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্যে নয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এটা জানা কথা যে, সামরিক কুচকাওয়াজ ও নাগরিক প্রতিরক্ষার নিয়ম অনুযায়ী এ কাজের অনুশীলনী হয় না; বরং এ কাজ শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিতই নয়। আজকালকার সাধারণ শিক্ষাঙ্গন গুলোতে بر ও تقوى তথা সৎকর্ম ও খোদাভীতির প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং اثم ও عدوان তথা পাপ ও অত্যাচারের সকল পথ উন্মুক্ত। গোটা জাতিই যেখানে হালাল ও হারাম, ন্যায় ও অন্যায় ভুলে গিয়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে যায়, সেখানে বেচারা পুলিশ কতদূর অপরাধ দমন করতে পারে? আজ সর্বত্র ও সবদেশে অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, অশ্লীলতা, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি রোগ রোজ রোজ বেড়েই চলেছে এবং আইন–শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তা দমন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। বলাবাহুল্য, এর কারণ দু'টি ঃ এক, প্রচলিত সরকারগুলো কোরআনী ব্যবস্থা থেকে দূরে রয়েছে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা স্বীয় জীবনে بر ও تقوى সৎকর্ম ও খোদাভীতির মূলনীতি অনুসরণ করতে দ্বিধা বোধ করে – যদিও এর ফলশ্রুতিতে তাদের অসংখ্য দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। আক্ষেপ, তারা যদি একবার পরীক্ষার জন্যেই এ তিক্ত ঢোক গিলে ফেলতো এবং খোদায়ী কুদরতের তামাশা দেখতো যে, কিভাবে তাদের এবং জনগণের জীবনে সুখ, শান্তি আরাম ও আনন্দের স্রোতধারা নেমে আসে!

দুই, জনগণ মনে করে নিয়েছে যে, অপরাধ প্রবণতা দমন করা একমাত্র সরকারের দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, তারা পেশাদার অপরাধীদের অপরাধ গোপন করতেও সচেষ্ট থাকে। শুধু সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও অপরাধ দমন করার উদ্দেশে সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার রীতিই দেশ থেকে উঠে গেছে। জনগণের বোঝা দরকার যে, অপরাধীর অপরাধ গোপন করা এবং সত্য সাক্ষ্যদানে বিরত থাকা অপরাধে সহায়তা করার নামান্তর। এটা কোরআনের আইনে হারাম ও কঠোর পাপ এবং আলোচ্য আয়াত وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ – এ বর্ণিত নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াত। এতে অনেক মূলনীতি এবং শাখাগত বিধি–বিধান ও মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মাসআলাটি হচ্ছে হালাল ও হারাম জন্তু সম্পর্কিত। যেসব জন্তুর মাংসে মানুষের জন্যে শারীরিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন দেহে রোগসৃষ্টি হতে পারে; অথবা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন চরিত্র ও অন্তরগত অবস্থা বিনষ্ট হতে পারে, কোরআন পাক সেগুলোকে অশুচি আখ্যা দিয়ে হারাম করেছে। পক্ষান্তরে যেসব জন্তুর মাংসে কোন শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি নাই, সেগুলোকে পবিত্র ও হালাল ঘোষণা করেছে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের জন্যে মৃত জন্তু হারাম করা হয়েছে। 'মৃত' বলে ঐ জন্তু বুঝানো হয়েছে, যা যবেহ্ ব্যতীত কোন রোগে অথবা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়। এধরনের মৃত জন্তুর মাংস চিকিৎসা–বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মানুষের জন্যে ক্ষতিকর এবং আধ্যাতিক দিক দিয়েও।

তবে হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই প্রকার মৃতকে বিধানের বাইরে রেখেছেন; একটি মৃত মাছ ও অপরটি মৃত টিড্ডী। (মুসনাদে আহমদ,

ইবনে মাজাহ, দারেকুতনী, বায়হাকী)

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় হারাম বস্তু হচ্ছে রক্ত। কোরআনের অন্য আয়াতে أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا বলায় বুঝা যায় যে, যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাই হারাম। সুতরাং কলিজা ও প্লীহা রক্ত হওয়া সত্ত্বেও হারাম নয়। পূর্বোক্ত যে হাদীসে মাছ ও টিড্ডীর কথা বলা হয়েছে, তাতেই কলিজা ও প্লীহা হালাল হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

তৃতীয় বস্তু শূকরের মাংস। একেও হারাম করা হয়েছে। মাংস বলে তার সম্পূর্ণ দেহ বুঝানো হয়েছে। চর্বি ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।।

চতুর্থ ঐ জন্তু যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। যদি যবেহ্ করার সময়ও অন্যের নাম নেয়া হয়, তবে তা খোলাখুলি শিরক। এরূপ জন্তু সর্বসম্মতভাবে মৃতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আরবের মুশরেকরা মূর্তিদের নামে যবেহ্ করতো। অধুনা কোন কোন মূর্খ লোক পীর-ফকীরের নামে যবেহ্ করে। যদিও যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে; কিন্তু জন্তুটি যেহেতু অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে কুরবানী করে, তাই সাধারণ ফেকাহ্‌বিদগণ একেও وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ আয়াত দৃষ্টে হারাম বলেছেন।

পঞ্চম منخنقة অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে অথবা নিজেই কোন জাল ইত্যাদিতে আবদ্ধ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গেছে।

ষষ্ঠ موقوذة অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা লাঠি অথবা পাথর ইত্যাদির প্রচন্ড আঘাতে নিহত হয়। যদি নিক্ষিপ্ত তীরের ধারাল অংশ শিকারের গায়ে না লাগে এবং তীরের আঘাতে শিকার নিহত হয়, তবে সে শিকারও موقوذة এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। منخنقة এবং ميتة উভয়টি موقوذة তথা মৃতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জাহেলিয়াত যুগে এগুলোকে জায়েয মনে করা হতো। এ কারণে আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আদী ইবনে হাতেম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ আমি মাঝে মাঝে চওড়া তীর দ্বারা শিকার করি। যদি এতে শিকার মরে যায়,তবে খেতে পারি কি না ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তীরের যে অংশ ধারাল নয়, যদি সে অংশের আঘাতে শিকার মরে যায়, তবে তা موقوذة এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তুমি খেতে পারবে না। আর যদি ধারাল অংশ শিকারের গায়ে লাগে এবং শিকারকে আহত করে, তবে তা খেতে পার। ইমাম জাসসাস 'আহ্‌কামুল-কোরআন' গ্রন্থে এ হাদীসটি নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। এরূপ শিকার হালাল হওয়ার জন্যে শর্ত এই যে, বিসমিল্লাহ্ বলে তীর নিক্ষেপ করতে হবে।

যে শিকার বন্দুকের গুলিতে মরে যায়, ফেকাহ্‌বিদগণ সেটাকেও موقوذة এর অন্তর্ভুক্ত করে হারাম বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলতেন ঃ المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة – অর্থাৎ বন্দুক দ্বারা যে জন্তুকে হত্যা করা হয়, তাই .... অতএব হারাম। (জাসসাস)। ইমাম আযম আবু হানীফা (রাহঃ) শাফেয়ী, মালেক প্রমুখ সবাই এ ব্যাপারে একমত। – (কুরতুবী)

সপ্তম متردية অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা কোন পাহাড়, টিলা, উঁচু দালানের উপর থেকে অথবা কূপে পড়ে মরে যায়। এ কারণেই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ যদি তুমি পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান কোন শিকারের প্রতি বিসমিল্লাহ্ বলে তীর নিক্ষেপ কর এবং তীরের আঘাতে সে নীচে পড়ে মরে যায়, তবে তা খেয়ো না। কারণ, এতে সম্ভাবনা আছে যে, শিকারটি তীরের আঘাতে না মরে নীচে পড়ে যাওয়ার কারণে মরে গেছে। এমতাবস্থায় তা الْمُتَرَدِّيَةُ -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে কোন পাখিকে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি সেটি পানীতে পড়ে যায়, তবে উহা খাওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ, এখানেও পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। – (জাসসাস)

অষ্টম نطيحة অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা কোন সংঘর্ষে নিহত হয়। যেমন রেলগাড়ী, মোটর ইত্যাদির নীচে এসে মরে যায় অথবা কোন জন্তুর শিং-এর আঘাতে মরে যায়।

নবম ঐ জন্তু হারাম, যেটি কোন হিংস্র জন্তুর কামড়ে মরে যায়। উপরোক্ত নয় প্রকার হারাম জন্তুর বর্ণনা করার পর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ – অর্থাৎ, এসব জন্তুর মধ্যে কোনটিকে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর যবেহ্ করতে পারলে হালাল হয়ে যাবে।

এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চার প্রকার জন্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না। কেননা, মৃত ও রক্তকে যবেহ্ করার সম্ভাবনা নাই এবং শূকর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত জন্তু সত্তার দিক দিয়েই হারাম। এ দুটোকে যবেহ্ করা না করা উভয়ই সমান। এ কারণে হযরত আলী (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান বসরী, কাতাদাহ প্রমুখ পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চারটি পরবর্তী পাঁচটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। অতএব আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ পাঁচ প্রকার জন্তুর মধ্যে যদি জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায় এবং তদবস্থায়ই বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করে দেয়া হয়, তবে এগুলো খাওয়া হালাল হবে।

দশম, ঐ জন্তু হারাম, যাকে নুছুবের উপর যবেহ্ করা হয়। নুছুব ঐ প্রস্তরকে বলা হয়, যা কাবা গৃহের আশেপাশে স্থাপিত ছিল। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা এদের উপাসনা করত এবং এদের কাছে এদের উদ্দেশে জন্তু কোরবানী করত ! একে তারা এবাদত বলে গণ্য করত।

জাহেলিয়াত যুগের আরবরা উপরোক্ত সব প্রকার জন্তুর মাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত ছিল। কোরআন পাক এগুলোকে হারাম করেছে।

একাদশ استقسام الأزلام হারাম। ازلام শব্দটি زلم এর বহুবচন। এর অর্থ ঐ তীর, যা জাহেলিয়াত যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে নির্ধারিত ছিল। এ কাজের জন্যে সাতটি তীর ছিল। তন্মধ্যে একটিতে نعم (হাঁ), একটিতে لا (না) এবং অন্যগুলোতে অন্য শব্দ লিখিত ছিল। এ তীরগুলো কাবাগৃহের খাদেমের কাছে থাকত। কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা কোন কাজ করার পূর্বে তা উপকারী হবে না অপকারী, তা জানতে চাইলে সে কা'বার খাদেমের কাছে পৌঁছে একশত মুদ্রা উপঢৌকন দিত। খাদেম তূন থেকে একটি একটি করে তীর বের করত। 'হাঁ' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হয়ে আসলে মনে করা হত যে, কাজটি উপকারী। পক্ষান্তরে 'না' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হলে তারা বুঝে নিত যে, কাজটি করা ঠিক হবে না। হারাম জন্তুসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা এ তীরগুলো জন্তুসমূহের মাংস বন্টনেও ব্যবহার করত। কয়েকজন শরীক হয়ে উট ইত্যাদি যবেহ করে তা মাংস প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী বন্টন না করে এসব জুয়ার তীরের সাহায্যে বন্টন করত। ফলে কেউ সম্পূর্ণ বঞ্চিত, কেউ প্রাপ্য অংশের চাইতে কম এবং কেউ অনেক বেশী মাংস পেয়ে যেত। এ কারণে হারাম জন্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গে এ হারাম বন্টন পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

আলেমগণ বলেন ঃ ভবিষ্যৎ অবস্থা এবং অদৃশ্য বিষয় জানার যেসব পন্থা প্রচলিত আছে; যেমন ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা, হস্তরেখা বিদ্যা, শকুন বিদ্যা ইত্যাদি সব استقسام بالازلام এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম।

استقسام بالازلام শব্দটি কখনও জুয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যাতে গুটিকা নিক্ষেপ অথবা লটারীর নিয়মে অধিকার নির্ধারণ করা হয়। কোরআন পাক একে ميسر নাম দিয়ে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে। এ কারণেই হযরত ছায়ীদ ইবনে জুবায়র, মুজাহিদ ও শা'বী (রাঃ) বলেনঃ আরবে যেমন ভাগ্য নির্ধারক তীরের সাহায্যে অংশ বের করা হত পারস্য ও রোমেও তেমনি আবার ছক, চওসর ইত্যাদির গুটি দ্বারা অংশ বের করা হত। সুতরাং তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে নির্দ্ধারণের ন্যায় এগুলোও হারাম। – (মাযহারী)

ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা বন্টন হারাম করার সাথে সাথে বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ –অর্থাৎ, এ বন্টন পদ্ধতি পাপাচার ও পথভ্রষ্টতা। এরপর বলা হয়েছেঃ

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ

অর্থাৎ, অদ্য কাফেররা তোমাদের দ্বীনকে পরাভূত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে আর ভয় করো না। তবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

এ আয়াতটি হিজরতের দশম বৎসরে বিদায় হজ্বের আরাফার দিনে অবতীর্ণ হয়। তখন মক্কা এবং প্রায় সমগ্র আরব মুসলমানদের করতলগত ছিল। সমগ্র আরব উপত্যকায় ইসলামী আইন প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। তাই বলা হয়েছে ঃ ইতিপূর্বে কাফেররা মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি অপেক্ষকৃত কম দেখে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পরিকল্পনা করতো। কিন্তু এখন তাদের মধ্যে এরূপ দুঃসাহস ও বল–ভরসা নাই। এ কারণে মুসলমানরা তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত হয়ে স্বীয় প্রতিপালকের আনুগত্য ও এবাদতে মানোনিবেশ করুক।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

এ আয়াতটি অবতরণের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। আরাফার দিন। এ দিনটি পূর্ণ বৎসরের মধ্যে সর্বোত্তম দিন। ঘটনাক্রমে এ দিনটি পড়েছিল শুক্রবারে। এর শ্রেষ্ঠত্বও সর্বজনবিদিত। স্থানটি হচ্ছে ময়দানে–আরাফাতের 'জবলে–রহমত, (রহমতের পাহাড়) এর সন্নিকট। এ স্থানটিই আরাফার দিনে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত অবতরণের বিশেষ স্থান। সময় আছরের পর—যা সাধারণ দিনগুলোতেও বরকতময় সময়। বিশেষতঃ শুক্রবার দিনে। অনেক রেওয়ায়েত দৃষ্টে এ দিনের এ সময়েই দোয়া কবুলের মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসে। আরাফার দিনে আরও বেশী বৈশিষ্ট্য সহকারে দোয়া কবুলের সময়।

হজ্বের জন্যে মুসলমানদের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক সমাবেশ। প্রায় দেড় লক্ষ সাহাবায়ে–কেরাম উপস্থিত। রাহমাতুল্লিল–আলামীন সাহাবায়ে–কেরামের সাথে জবলে–রহমতের নীচে স্বীয় উষ্ট্রী আযবার পিঠে সওয়ার। সবাই হজ্বের প্রধান রোকন অর্থাৎ, আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত।

এসব শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও রহমতের ছত্রছায়ায় উল্লেখিত পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সাহাবায়ে–কেরাম বর্ণনা করেন ঃ যখন হযরত রসূলে করীম (সাঃ) – এর উপর ওহীর মাধ্যমে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন নিয়মানুযায়ী ওহীর গুরুভার সহ্য করতে না পেরে উষ্ট্রি ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এ আয়াত কোরআনের শেষ দিককার আয়াত। এরপর বিধি–বিধান সম্পর্কিত আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। বলা হয় যে, শুধু উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনমূলক কয়েকখানি আয়াত–এর পর নাযিল হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাত্র একাশি দিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। কেননা, দশম হিজরীর ৯ই যিলহজ্ব তারিখে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ওফাত পান।

এ আয়াত যেমন বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনি এর বিষয়বস্তুও ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের জন্যে বিরাট সুসংবাদ, অনন্য পুরস্কার ও স্বাতন্ত্রের স্বাক্ষর বহন করে। এ বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, পৃথিবীতে মানব জাতিকে সত্য দ্বীন ও খোদায়ী নেয়ামতের চূড়ান্ত মাপকাঠি প্রদানের যে ওয়াদা ছিল, আজ তা ষোলকলায় পূর্ণ করে দেয়া হলো। হযরত আদম (আঃ) – এর আমল থেকে যে সত্যধর্ম ও খোদায়ী নেয়ামতের অবতরণ ও প্রচলন আরম্ভ করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের অবস্থানুযায়ী এ নেয়ামত থেকে আদম সন্তানদের অংশ দেয়া হচ্ছিল, আজ যেন সেই ধর্ম ও নেয়ামত পরিপূর্ণ আকারে শেষনবী মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতকে প্রদান করা হল।

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরে শিকারী কুকুর, বাজ ইত্যাদি দ্বারা শিকার করা জন্তু হালাল হওয়ার জন্যে চারটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম, কুকুর অথবা বাজ শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে। শিকার পদ্ধতি এই যে, আপনি যখন কুকুরকে শিকারের দিকে প্রেরণ করবেন, তখন সে শিকার ধরে আপনার কাছে নিয়ে আসবে— নিজে খাওয়া শুরু করবে না। বাজপক্ষীর বেলায় পদ্ধতি এই যে, আপনি ফেরৎ আসার জন্যে ডাক দেয়া মাত্রই সে কাল বিলম্ব না করে ফিরে আসবে— যদিও তখন কোন শিকারের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে। শিকারী জন্তু এমনভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে গেলে বোঝা যাবে যে, সে আপনার জন্যে শিকার করে নিজের জন্যে নয়। এমতাবস্থায় এগুলোর ধরে আনা শিকার স্বয়ং আপনারই শিকার বলে গণ্য হবে। যদি শিকারী জন্তু কোন সময় এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে যেমন, কুকুর নিজেই খাওয়া আরম্ভ করে কিংবা বাজপাখী আপনার ডাকে ফেরৎ না আসে, তবে এ শিকার আপনার শিকার নয়। কাজেই তা খাওয়াও বৈধ নয়।

দ্বিতীয়, আপনি নিজ ইচ্ছায় কুকুরকে অথবা বাজকে শিকারের পেছনে প্রেরণ করবেন। কুকুর অথবা বাজ যেন স্বেচ্ছায় শিকারের পেছনে দৌড়ে শিকার না করে। আলোচ্য আয়াতে এ শর্তটি مُكَلِّبِيْنَ শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এটি تكليب ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ কুকুরকে শিক্ষা দেয়া। এরপর সাধারণ শিকারী জন্তুকে শিক্ষা দেয়ার পর শিকারের দিকে প্রেরণ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। জালালাইন– এর গ্রন্থকার مُكَلِّبِيْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় ارسال শব্দ উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ শিকারের দিকে প্রেরণ করা। তফসীরে কুরতুবীতেও এ উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় শর্ত এই যে, শিকারী জন্তু নিজে শিকারকে খাবে না; বরং আপনার কাছে নিয়ে আসবে। এ শর্তটি مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ বাক্যাংশে

বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ শর্ত এই যে, শিকারী কুকুর অথবা বাজকে শিকারের দিকে প্রেরণ করার সময় 'বিসমিল্লাহ্' বলতে হবে। বর্ণিত চারটি শর্ত পূর্ণ হলে শিকার আপনার হাতে পৌঁছার পূর্বেই যদি মরে যায়, তবুও তা হালাল হবে; যবেহ্ করার প্রয়োজন হবে না। আর যদি জীবিত অবস্থায় হাতে আসে, তবে যবেহ্ ব্যতীত হালাল হবে না।

ইমাম আযম আবু হানীফা (রাঃ)—এর মতে একটি পঞ্চম শর্তও আছে। তা এই যে, শিকারী জন্তু শিকারকে আহতও করতে হবে। جوارح শব্দে এ শর্তের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে।

যেসব বন্য জন্তু কারও করতলগত নয়, উপরোক্ত মাছআলা তাদের বেলায় প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে কোন বন্য জন্তু কারও করতলগত হয়ে গেলে, তা নিয়মিত যবেহ্ করা ব্যতীত হালাল হবে না।

উপসংহারে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা শিকার করা জন্তু হালাল করেছেন ঠিক, কিন্তু শিকারের পেছনে লেগে নামায ও শরীয়তের অন্যান্য জরুরী নির্দেশের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়া কিছুতেই বৈধ নয়।

সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতে গৃহপালিত পশু ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদির হালাল হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তৃতীয় আয়াতে নয় প্রকার হারাম জন্তুর বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের বিবরণে প্রথম বাক্যেই গোটা অধ্যায়ের সারমর্ম এমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে, যাতে বিভিন্ন জন্তুর মধ্যে হালাল ও হারাম হওয়ার বৈশিষ্ট্যসহ এর একটি মাপকাঠি ও মূলনীতি সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়।

এরশাদ হচ্ছে اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ – অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্যে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল করা হল। 'আজ' বলে এ দিনকে বোঝানো হয়েছে, যেদিন এ আয়াত ও এর পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, দশম হিজরীর বিদায় হজ্বের আরাফার দিন। উদ্দেশ্য এই যে, আজ যেমন তোমাদের জন্যে তামাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নেয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বস্তুসমূহ, যা পূর্বেও তোমাদের জন্যে হালাল ছিল, চিরস্থায়ীভাবে হালাল রাখা হল। এ নির্দেশ রহিত হওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। কেননা, অচিরেই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এ আয়াতে طيبات অর্থাৎ, পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ হালাল করেন তাদের জন্যে طيبات এবং হারাম করেন خبائث এখানে طيبات – এর বিপরীতে خبائث ব্যবহার করে উভয় শব্দের মর্মার্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

অভিধানে طيبات পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাম্য বস্তুসমূহকে এবং এর বিপরীতে خبائث নোংরা ও ঘৃণার্হ বস্তুসমূহকে বলা হয়। কাজেই আয়াতের এ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, যেসব বস্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও পবিত্র, সেগুলো মানুষের জন্যে হালাল করা হয়েছে এবং যেসব বস্তু নোংরা,ঘৃণার্হ ও অপকারী, সেগুলো হারাম করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, জগতে মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের ন্যায় খাওয়া-পরা, নিদ্রা-জাগরণ ও জীবন-মরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্যেই মানুষকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। সে লক্ষ্যটি উত্তম ও পবিত্র চরিত্র ব্যতিত অর্জিত হতে পারে না। এ কারণেই অসচ্চরিত্র ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষ আখ্যা লাভেরই যোগ্য নয়।

কোরআন পাক এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলে ঃ بَلْ هُمْ اَضَلُّ – অর্থাৎ, এরা চতুষ্পদ জন্তুর চাইতেও অধিকতর পথভ্রষ্ট। যখন চরিত্র সংশোধনের উপর মানবের মানবতা নির্ভরশীল, তখন যেসব বস্তু মানব চরিত্রকে কলুষিত ও বিনষ্ট করে, সেগুলো থেকে মানুষকে পুরোপুরিভাবে বাঁচিয়ে রাখা অত্যাবশ্যক। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানব চরিত্রের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমাজের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অতএব, একথা সুস্পষ্ট যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা যখন মানব চরিত্র প্রভাবান্বিত হয়, তখন যে বস্তু মানুষের শরীরের অংশে পরিণত হয়, তার দ্বারা মানব চরিত্র অবশ্যই প্রভাবান্বিত হবে। এ কারণে পানাহারের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরী। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, সুদ, জুয়া ইত্যাদির আমদানী যে ব্যক্তির শরীরের অংশ হবে, সে নিশ্চিত রূপেই মানবতা থেকে দূরে সরে পড়বে এবং শয়তানের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।

এ কারণেই কোরআন পাক বলে ঃ يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا – এখানে সৎকর্মের জন্যে হালাল ভক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, হালাল ভক্ষণ ব্যতীত সৎকর্ম কল্পনাতীত।

বিশেষ করে মাংস মানব দেহের প্রধান অংশে পরিণত হয়। সুতরাং যে মাংস চরিত্র বিনষ্ট করে, তা যাতে মানুষের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টিরাখা অধিকতর জরুরী। এমনিভাবে সে মাংস থেকেও বিরত থাকতে হবে, যা দৈহিক দিক দিয়ে মানুষের জন্যে ক্ষতিকর। কেননা, এতে রোগ-ব্যাধির জীবাণু থাকে। শরীয়ত যেসব বস্তুকে নোংরা ও ঘৃণার্হ সাব্যস্ত করেছে, সেগুলো নিশ্চিতরূপেই মানুষের দেহ কিংবা আত্মা অথবা উভয়কে বিনষ্ট করে এবং মানুষের প্রাণ অথবা চরিত্রকে ধ্বংস করে। এ কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র বস্তু দ্বারা মানুষের দেহ ও আত্মা লালিত হয় এবং উৎকৃষ্ট চরিত্র গঠিত হয়। এ কারণে এগুলো হালাল করা হয়েছে। মোটকথা اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ বাক্যটি হালাল ও হারাম হওয়ার দর্শন এবং মূলনীতিও ব্যক্ত করেছে।

এখন কোন্ কোন্ বস্তু طيبات অর্থাৎ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও কাম্য এবং কোন্ কোন্ বস্তু خبائث অর্থাৎ, নোংরা ক্ষতিকর ও ঘৃণার্হ, তা সুস্থ রুচিজ্ঞানের আগ্রহ ও অনীহার উপরই নির্ভরশীল। এ কারণেই যেসব জন্তুকে ইসলাম হারাম সাব্যস্ত করেছে, প্রতিযুগের সুস্থ স্বভাব মানুষই সেগুলোকে নোংরা ও ঘৃণার্হ মনে করে এসেছে। যেমন, মৃতজন্তু, রক্ত ইত্যাদি। তবে মাঝে মাঝে মূর্খতাসুলভ রীতিনীতি সুস্থ স্বভাবের উপর প্রবল হয়ে যায়। ফলে ভাল ও মন্দের পার্থক্য লোপ পায় অথবা কোন কোন বস্তুর নোংরামিও অস্পষ্ট হয়ে থাকে। এ ধরনের ব্যাপারে পয়গম্বরদের সিদ্ধান্ত সবার জন্যে অকাট্য দলীলস্বরূপ। কেননা, মানুষের মধ্যে পয়গম্বরগণই সর্বাধিক সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন। আল্লাহ্ তাআলা বিশেষভাবে তাঁদেরকে সুস্থ স্বভাব দ্বারা ভূষিত করেছেন। স্বয়ং তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছেন। তাদের চার দিকে ফেরেশতাদের পাহারা বসিয়েছেন। ফলে তাদের মন-মস্তিষ্ক ও চরিত্র কোন ভ্রান্ত পরিবেশ দ্বারা দূষিত হতে পারে না। তাঁরা যেসব বস্তুকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন আখ্যা

দিয়েছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

অতএব, নূহ্ (আঃ) – এর আমল থেকে শেষনবী (সাঃ) – এর আমল পর্যন্ত প্রত্যেক পয়গম্বর মৃত জন্তু ও শূকর ইত্যাদিকে নিজেদের সময়ে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রতি যুগের সুস্থ-স্বভাব মনীষীরা এদের নোংরা ও ক্ষতিকর বলেই মনে করেছেন।

হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী (রাঃ) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' গ্রন্থে বলেন, ইসলামী শরীয়তে হারামকৃত জন্তুদের সম্পর্কে চিন্তা করলে সেগুলো দুটি মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এক প্রকার জন্তু সৃষ্টিগত ও স্বভাবগতভাবে নোংরা ও অপবিত্র এবং দ্বিতীয় প্রকার জন্তুর যবেহ পদ্ধতি ভ্রান্ত, ফলে যবেহ্-করা জন্তুর পরিবর্তে মৃত বলেই সাব্যস্ত করা হবে।

সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াতে নয়টি বস্তুকে হারাম বলা হয়েছে। তন্মধ্যে শূকর প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং অবশিষ্ট আটটি দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

কোরআন পাক وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ বলে সংক্ষেপে সব নোংরা ও অপবিত্র জন্তু হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। অতঃপর শূকরের মাংস, প্রবাহিত রক্ত ইত্যাদি কয়েকটি বস্তুর নাম পরিষ্কার উল্লেখ করেছে। অবশিষ্ট নোংরা ও অপবিত্র বস্তুসমূহের বর্ণনা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি কোন জন্তুর خَبِيث তথা নোংরা হওয়ার আলামত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ কোন জাতিকে শাস্তি হিসেবে কোন জন্তুর আকৃতিতে বিকৃত ও রূপান্তরিত করা হলে বোঝা যায় যে, জন্তুটি স্বভাবগতভাবে নোংরা। ফলে যারা আল্লাহ্র গযবে পতিত, তাকে সেসব জীবের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়েছে। উদাহরণতঃ কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

অর্থাৎ, কোন কোন জাতিকে শাস্তি হিসেবে শূকর ও বানরের আকৃতিতে বিকৃত করা হয়েছে। অতএব, বোঝা যায় যে, এই দুই প্রকার জন্তু স্বভাবগতভাবেই নোংরা শ্রেণীভুক্ত। নিয়মিত যবেহ্ করলেও এগুলো হালাল হবে না। এছাড়া অনেক জন্তু এমনও আছে, ক্রিয়াকর্ম ও লক্ষণাদি দ্বারা সেগুলো নোংরা হওয়ার বিষয় প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারে। উদাহরণতঃ হিংস্র জন্তু। অন্যান্য জন্তুকে ক্ষত-বিক্ষত করা, ছিঁড়ে-খামচে ভক্ষণ করা এবং নির্মমতাই এদের কাজ।

এজন্যেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি সাধারণ নীতি হিসেবে বর্ণনা করেন যে, দাঁত দ্বারা ছিঁড়ে খায় এমন যাবতীয় হিংস্র জন্তু যেমন, সিংহ, বাঘ ইত্যাদি এবং থাবা দ্বারা শিকার করে এমন প্রত্যেক পাখী যেমন বাজ, চিল প্রভৃতি সবই হারাম। এছাড়া ইঁদুর, মৃতভোজী জন্তু, গাধা ইত্যাদির স্বভাব হচ্ছে হীনতা, নিকৃষ্টতা ও অপবিত্রতার সাথে জড়িত হওয়া। এসব জন্তুর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষতিকর হওয়া প্রত্যেক সাধারণ সুস্থ-স্বভাব ব্যক্তিই অনুভব করতে সক্ষম।

মোটকথা এই যে, ইসলামী শরীয়ত যেসব জন্তুকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, তন্মধ্যে এক প্রকার জন্তুর মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই নোংরামি পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার জন্তুর মাঝে প্রকৃতিগতভাবে কোন নোংরামি নাই; কিন্তু জন্তু যবেহ্ করার যে পদ্ধতি আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন তাকে সে পদ্ধতিতে যবেহ্ করা হয়নি। এখন এর ধরন বিভিন্ন হতে পারে ঃ (এক) মূলতঃ যবেহ্ই করা হয়নি। যেমন, হেঁচকা টান মেরে ফেলা, আঘাত করে মারা ইত্যাদি। (দুই) যবেহ্ করা হয়েছে ; কিন্তু আল্লাহ্র নামের পরিবর্তে অন্যের নাম নিয়ে। (তিন) কারও নাম নেয়া হয়নি এবং যবেহ্ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়নি। এরূপ যবেহ্ শরীয়তে ধর্তব্য নয়; বরং যবেহ ব্যতীত মেরে ফেলারই শামিল।

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

অর্থাৎ, আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য আহলে কিতাবদের জন্যে হালাল।

এক্ষেত্রে সাধারণ সাহাবী ও তাবেয়িগণের মতে 'খাদ্য' বলতে যবেহ্ করা জন্তুকে বোঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আবুদ্দারদা, ইবরাহীম, কাতাদাহ্, সুদ্দী, যাহ্হাক, মুজাহিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে এ কথাই বর্ণিত আছে।— (রুহুল মা'আলী, জাস্সাস) কেননা, অন্য প্রকার খাদ্যবস্তুতে আহ্লে-কিতাব, পৌত্তলিক, মুশরেক সবাই সমান। রুটি, আটা, চাল, ডাল ইত্যাদিতে যবেহ্ করার প্রয়োজন নেই। এগুলো যে কোন লোকের কাছ থেকে যে কোন বৈধ পন্থায় অর্জিত হলে মুসলমানের জন্যে খাওয়া হালাল। অতএব, আলোচ্য বাক্যের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আহ্লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তু মুসলামনদের জন্যে এবং মুসলমানদের যবেহ্ করা জন্তু আহ্লে-কিতাবদের জন্যে হালাল।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, কোরআন ও সুন্নাহ্র পরিভাষায় আহ্লে কিতাব কারা? কিতাব বলে কোন্ কিতাবকে বোঝানো হয়েছে? আহ্লে-কিতাব হওয়ার জন্যে স্বীয় কিতাবের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান থাকা এবং আমল করাও জরুরী কি না? এটা জানা কথা যে, এ স্থলে কিতাবের আভিধানিক অর্থে যে কোন লিখিতপাতাকে বোঝানো হয়নি, বরং যে কিতাব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগমন করেছে , তাই বোঝানো হয়েছে। তাই এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই যে, এখানে ঐ ঐশী কিতাবকেই বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্র কিতাব হওয়া কোরআনের সমর্থন দ্বারা নিশ্চিত। যেমন, তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর, মূসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর ছহীফা ইত্যাদি। সুতরাং যেসব জাতি এমন কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তাকে খোদায়ী প্রত্যাদেশ বলে মনে করে তারাই আহ্লে কিতাব। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র কিতাব বলে কোরআন ও সুন্নাহ্র নিশ্চিত পন্থায় প্রমাণিত নয়, তারা আহ্লে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন মক্কার মুশরেক, অগ্নিউপাসক, মূর্তিপূজারী হিন্দু, বৌদ্ধ, আর্য, শিখ ইত্যাদি। এতে বোঝা গেল যে, কোরআনের পরিভাষায় ইহুদী ও খ্রীস্টান জাতিই আহ্লে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। তারা তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি বিশ্বাসী।

তৃতীয় একটি জাতি হচ্ছে 'ছাবেয়ীন'। তাদের অবস্থা সন্দেহযুক্ত।

যেসব আলেমের মতে তারা দাউদ (আঃ)-এর কিতাব যবুরের প্রতি ঈমান রাখে, তাঁরা তাদেরও আহ্লে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আর যারা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, যবুর কিতাবের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই; এরা তারকা উপাসক জাতি, তারা এদের মূর্তি ও অগ্নিউপাসকদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। মোটকথা, নিশ্চিতরূপে যাদের আহ্লে-কিতাব বলা যায় তারা হল ইহুদী ও খ্রীস্টান জাতি। তাদের যবেহ করা জন্তু মুসলমানদের জন্যে এবং মুসলমানদের যবেহ্ করা জন্তু তাদের জন্যে হালাল।

ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে যারা নাস্তিক, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয় : আজকাল ইউরোপে বিরাট সংখ্যক ইহুদী ও খ্রীষ্টান রয়েছে, যারা শুধু আদম শুমারীর দিক দিয়েই ইহুদী ও খ্রীষ্টান বলে কথিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না, তওরাত ও ইঞ্জিলকে আল্লাহ্র গ্রন্থ মনে করে না এবং মূসা ও ইসা (আঃ)-কে আল্লাহর নবী ও পয়গম্বর বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এটা জানা কথা যে, এরূপ ব্যক্তি আদম শুমারীর নামের কারণে আহ্লে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

'আহলে কিতাবের খাদ্য' বলে কি বোঝানো হয়েছে : طعام শব্দের আভিধানিক অর্থ, খাদ্য দ্রব্য। শাব্দিক অর্থে সর্বপ্রকার খাদ্যই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সাধারণ আলেমদের মতে এ স্থলে طعام বলে শুধু আহ্লে কিতাবদের যবেহ করা গোশত বোঝানো হয়েছে। কেননা, গোশত ছাড়া অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে আহ্লে কিতাব ও অপরাপর কাফেরদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কাফেরদের হাতের আহার্য বস্তু গম, বুট, চাউল, ফল ইত্যাদি খাওয়া হালাল। এতে কারও দ্বিমত নেই। তবে যেসব খাদ্য মানুষের হাতে প্রস্তুত হয়, সেগুলোর ব্যাপারে যেহেতু কাফেরদের বাসন-কোসন ও হাতের পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না, সেহেতু তা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। কিন্তু এতে মুশরেক মূর্তিপূজারীর যে অবস্থা, আহ্লে কিতাবদেরও একই অবস্থা। কারণ, অপবিত্রতার সম্ভাবনা উভয় ক্ষেত্রেই সমান।

আহলে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তু হালাল হওয়ার কারণ : এটি আলোচ্য বিষয়বস্তুর তৃতীয় প্রশ্ন। এর উত্তর অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের পক্ষ থেকে এই দেয়া হয় যে, কাফেরদের মধ্য থেকে আহলে কিতাব ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের যবেহ করা জন্তু হালাল হওয়া এবং তাদের মহিলাকে বিবাহ করা হালাল হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ দুটি বিষয়ে তাদের ধর্মমতও ইসলামের হুবহু অনুরূপ। অর্থাৎ, আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে জন্তু যবেহ্ করাকে তারাও বিশ্বাসগতভাবে জরুরী মনে করে। এ ছাড়া মৃত জন্তুকেও তারা হারাম মনে করে।

এমনিভাবে ইসলামে যেসব মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, তাদের ধর্মেও তাদের বিবাহ করা হরাম। ইসলামে যেমন বিবাহ প্রচার করা ও সাক্ষীদের উপস্থিতিতে হওয়া জরুরী, তেমনি তাদের ধর্মেও এসব বিধি বিধান জরুরী।

আহলে-কিতাবদের যবেহ করা জন্তু হালাল হওয়ার কারণ এই যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মে অনেক পরিবর্তন সত্ত্বেও যবেহ করার মাসআলাটি ইসলামী শরীয়তের অনুরূপ রয়েছে। আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা জন্তুকে তারাও হারাম মনে করে এবং যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা জরুরী মনে করে।

মোটকথা, পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে যারা আহলে-কিতাবদের আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করা জন্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, তাদের মতেও আহলে-কিতাবদের আসল মাযহাবে এরূপ জন্তু হারাম। কিন্তু তাঁরা বিভ্রান্ত লোকদেরকেও আসল আহলে-কিতাবদের সাথে এক করে তাদের যবেহ করা জন্তুকেও হালাল বলেছেন। পক্ষান্তরে সাধারণ সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ দিকটি লক্ষ্য করেছেন যে, আহলে কিতাবদের মূর্খ জনগণ যে আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্যের নামে অথবা আল্লাহ্র নাম ব্যতীতই যবেহ্ করে, তা যেমন ইসলামী বিধানের পরিপন্থী, তেমনি স্বয়ং খ্রীষ্টানদের বর্তমান ধর্মমতেরও বিরোধী। এ কারণে ধর্মীয় বিধানের উপর তাদের কর্মের কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়া উচিত। তাঁরা ফায়সালা দিয়েছেন যে, তাদের যবেহ্ করা জন্তু আয়াতে বর্ণিত আহলে-কিতাবদের যবেহ করা জন্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তা হালাল হওয়ার কোন কারণ নাই। তাদের ভ্রান্ত কর্মের কারণে কোরআনের আয়াতে নসখ তথা রহিতকরণের পথ বেছে নেয়া কিছুতেই সমীচীন নয়।

এ কারণেই ইবনে জরীর, ইবনে কাছীর, আবু হাইয়্যান প্রমুখ তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, সূরা বাক্বারা ও সূরা আনআমের আয়াতসমূহে কোন নস্খ হয়নি। এটাই সাধারণ সাহাবী ও তাবেয়ীদের মত। ইবনে কাছীরের বরাত দিয়ে পূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ মতই বাহরে-মুহীত গ্রন্থে নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লেখিত হয়েছে :

ذهب الى ان الكتابى اذا لم يذكر الله على الذبيحة وذكر غير الله لم تؤكل وبه قال ابوالدرداء وعبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة- وبه قال ابو حنيفة وابويوسف ومحمد وزفر ومالك وكره النخعى والثورى اكل ماذبح واهل به لغير الله-

- "তাঁর মাযহাব এই যে, আহলে-কিতাব যদি যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ না করে, অথবা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করে, তবে তা খাওয়া জায়েয নয়। আবুদ্দারদা, ওবাদা ইবনে ছামেত এবং একদল ছাহাবী এ কথাই বলেন এবং ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মোহাম্মদ, যুফার ও ইমাম মালেকের মতও তাই। নাখায়ী ও সওরী এরূপ জন্তুকে খাওয়া মকরূহ মনে করেন।" - (বাহ্রে মুহীত, ৪৩১ পৃঃ, ৪র্থ খণ্ড)

বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত আজকালকার তওরাত ও ইঞ্জীল থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিসমূহ দেখুন। বর্তমান যুগের ইহুদী ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে স্বীকৃত বাইবেলের প্রাচীন আহাদনামায় যবেহ্ সম্পর্কে এসব বিধি-বিধান রয়েছে :

(১) যে জন্তু আপনা আপনি মরে যায় এবং যেসব জন্তুকে অন্য কোন হিংস্র প্রাণী ছিঁড়ে ফেলে, তার চর্বি অন্য কাজে লাগালে লাগাতে পারে; কিন্তু কোন অবস্থাতেই তা খেতে পারবে না। (আহবারে - ২৪)

(২) যে কোন পন্থা-প্রক্রিয়ায় মনের আগ্রহে এবং খোদাওয়ান্দ প্রদত্ত বরকত অনুযায়ী যবেহ্ করে মাংস খেতে পারবে; কিন্তু তোমরা রক্ত কখনও খেয়ো না। (এস্তেস্না, ১২-১৫)

(৩) তোমরা দেবদেবীর নামে কোরবানীর মাংস, রক্ত, কণ্ঠরোধে নিহত জন্তু এবং হারাম কর্ম থেকে বিরত থাক। - (আহ্দ নামা জাদীদ কিতাব আ'মাল ১-২৯)

(৪) খ্রীষ্টানদের প্রধান পোপ পলিস ক্রিস্থিউনের নামে প্রথম পত্রে লিখেন : বিধর্মীরা যেসব কোরবানী করে তা শয়তানের জন্যে করে; খোদার জন্যে নয়। আমি চাই না যে, তুমি শয়তানের অংশীদারও হও। তুমি খোদাওয়ান্দের পিয়ালা ও শয়তানের পেয়ালা উভয়টি থেকে পান করতে পার না। (ক্রিস্থিউন ১০-২০-৩০)

(৫) 'আ'মালে হাওয়ারিয়্যীন' গ্রন্থে আছে, আমি এ মীমাংসা লিখেছিলাম যে, তারা শুধু দেবদেবীর কোরবানীর মাংস থেকে এবং কণ্ঠরোধে নিহত জন্তু ও হারাম কর্ম থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখবে। (আ'মাল ২১-২৫)

এগুলো হচ্ছে আজকালকার বাইবেল সোসাইটিসমূহের মুদ্রিত

المائدة ٥ ١٠٩ لا يحب الله ٦

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

(৬) হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং পদযুগল গিটসহ। যদি তোমরা অবপবিত্র হও, তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও- অর্থাৎ, স্বীয় মুখ-মণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ্ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান -যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৭) তোমরা আল্লাহ্র নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐ অঙ্গীকারকেও যা তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা বলেছিলে ঃ আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অন্তরের বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন। (৮) হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর। এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত। (৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহানপ্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তওরাত ও ইঞ্জীলের উদ্ধৃতি। এতে বিস্তর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পরও হুবহু কোরআনের বিধি-বিধানের অনুরূপ এ বিষয়বস্তুগুলো অবশিষ্ট রয়েছে।

কোরআনের বক্তব্যও এমনি ঃ "তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, যে জীব আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয়, কণ্ঠরোধে নিহত জন্তু,আঘাতজনিত কারণে মৃত জন্তু, উচ্চস্থান থেকে পতনে মৃত জন্তু, শিং এর আঘাতে মৃত জন্তু, হিংস্র জন্তুর ভক্ষণ করা মৃত জন্তু —তবে যদি তোমরা যবেহ করে পাক করে নিতে পার এবং ঐ জন্তু, যা দেবদেবীর যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয়।"

দেখুন আহবার ৬-১৮-১৯ পর্যন্ত। এখানে হারাম মহিলাদের একটি দীর্ঘ তালিকা দেয়া হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ঐসব মহিলা, যাদের কোরআন হারাম করেছে। এমন কি, جمع بين الاختين অর্থাৎ, দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করাও হারাম এবং হায়েয অবস্থায় সহবাস হারাম হওয়াও বর্ণিত রয়েছে। এছাড়া বাইবেলে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূর্তিপূজারী ও মুশরিকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা অবৈধ। প্রচলিত তওরাতের ভাষা এরূপ ঃ

"তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করবে না। তাদের পুত্রদের স্বীয় কন্যা দান করবে না এবং স্বীয় পুত্রদের জন্যে তাদের কন্যা গ্রহণ করবে না। কারণ, তারা আমার অনুসরণ থেকে আমার পুত্রদের বিমুখ করে দিবে —যাতে তারা অন্য উপাস্যের উপাসনা করে। (এস্তেস্না ৭-৩-৪)

তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, যবেহ করার ব্যাপারে ও বিবাহের ব্যাপারে পার্থক্য এই যে, যবেহ করা জন্তু উভয় পক্ষ থেকেই হালাল। আহলে কিতাবদের যবেহ করা জন্তু মুসলমানদের জন্যে হালাল এবং মুসলমানদের যবেহ করা জন্তু আহলে-কিতাবদের জন্যে হালাল কিন্তু মহিলাদের বিবাহের ব্যাপারটি এরূপ নয়। আহলে-কিতাবদের মহিলাকে বিবাহ করা মুসলমানদের জন্যে হালাল বটে, কিন্তু আহলে-কিতাবদের সাথে মুসলমান মহিলাদের বিবাহ হালাল নয়।

আরেকটি বিষয় এই যে, যদি কোন মুসলমান কখনও ধর্মত্যাগী হয়ে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যায়, তবে সে আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না; বরং সে হবে ধর্মত্যাগী। তার যবেহ করা জন্তু সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এমনিভাবে যে মুসলমান ইসলামের কোন একটি জরুরী ও অকাট্য বিষয় অস্বীকার করার কারণে ধর্মত্যাগী বলে সাব্যস্ত হয়, সে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) —এর প্রতি বিশ্বাসের দাবী করলেও ধর্মত্যাগী এবং তার যবেহ করা জন্তু হালাল নয়। অবশ্য অন্য কোন ধর্মাবলম্বী যদি স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যায়, তবে সে আহলে-কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার যবেহ করা জন্তু হালাল বলে গণ্য হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৮ নং আয়াতের বিষয়বস্তু প্রায় এসব শব্দেই সূরা নেসায়ও বর্ণিত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, সেখানে كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ – বলা হয়েছিল এবং এখানে كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ – বলা হয়েছে। এ দুটি আয়াতে শব্দ আগে পিছে করার একটি সূক্ষ্ম কারণ 'বাহ্রে-মুহীত' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই ঃ

স্বভাবতঃ দুটি কারণই মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারে বাধা-প্রদান এবং অন্যায় ও অবিচারে প্ররোচিত করে। (এক) নিজের অথবা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। (দুই) কোন ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা ও মনোমালিন্য। সূরা নেসার আয়াতে প্রথমোক্ত কারণের উপর ভিত্তি করে সুবিচারের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে শেষোক্ত কারণ হিসেবে বক্তব্য রাখা হয়েছে।

এ কারণেই সূরা-নেসার পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে - وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ -অর্থাৎ, ন্যায়বিচারে অধিষ্ঠিত থাক, যদিও তা স্বয়ং তোমাদের অথবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বাক্যের পর বলা হয়েছে وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا - অর্থাৎ, কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেমন তোমাদেরকে ন্যায়বিচারে পশ্চাদপদ হতে উদ্বুদ্ধ না করে।

অতএব, সূরা নেসার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে নিজের এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনেরও পরওয়া কারো না। যদি ন্যায় বিচার তাদের বিরুদ্ধে যায়, তবে তাতেই কায়েম থাক। সূরা মায়েদার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে কোন শত্রুর শত্রুতার কারণে পশ্চাদপদ হওয়া উচিত নয় যে, শত্রুর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশে সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার শুরু করবে।

এ কারণেই সূরা নেসার আয়াতে قسط অর্থাৎ, 'ইনসাফ'কে অগ্রে উল্লেখ করে বলা হয়েছে - كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ

এবং সূরা মায়েদার আয়াতে لله - কে অগ্রে উল্লেখ করে বলা হয়েছে كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ অবশ্য উভয় আয়াত পরিণামের দিক দিয়ে একই উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। কেননা, যে ব্যক্তি সুবিচারের জন্যে দণ্ডায়মান হবে, সে আল্লাহ্‌র জন্যেই দণ্ডায়মান হবে এবং সে সুবিচারই করবে। কিন্তু নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ক্ষেত্রে এরূপ ধারণা হতে পারে যে, এসব সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রাখাও তো আল্লাহ্‌র জন্যই। তাই এখানে قسط শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সুবিচারের বিপক্ষে কারও প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহ্‌র জন্যে হতে পারে না। সূরা মায়েদায় শত্রুদের সাথে ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে لله শব্দটি অগ্রে এনে মানব স্বভাবকে ভাবাবেগের কবল থেকে দূরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে দণ্ডায়মান হয়েছ। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে শত্রুদের সাথেও ন্যায় বিচার কর।

মোটকথা এই যে, সূরা নেসা ও সূরা মায়েদার উভয় আয়াতে দুটি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (এক) শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারে অটল থাক। আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে অথবা কারও শত্রুতা পরবশ হয়ে এতে দুর্বলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। (দুই) সত্য সাক্ষ্য এবং সত্য কথা প্রকাশ করতে পিছপা হবে না - যাতে বিচারকবর্গ সত্য ও বিশুদ্ধ রায় দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

সত্য সাক্ষ্য দিতে ত্রুটি না করার প্রতি কোরআন পাক অনেক আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জোর দিয়েছে। এক আয়াতে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ অর্থাৎ, সাক্ষ্য গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার অন্তর পাপী। এতে প্রমাণিত হয় যে, সত্য সাক্ষ্য দেয়া অপরিহার্য কর্তব্য এবং সাক্ষ্য গোপন করা কঠোর গোনাহ্।

কিন্তু যে বিষয়টি মানুষকে সত্য সাক্ষ্য দিতে বাধাদান করে, কোরআন পাক তার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছে। বিষয়টি এই যে, সাক্ষীকে বার বার আদালতে হাজিরা দিতে হয় এবং অনর্থক নানা ধরনের হয়রানীরও সম্মুখীন হতে হয়। ফলে সাধারণ লোক সাক্ষীর তালিকাভুক্ত হওয়াকে সাক্ষাৎ বিপদ বলে মনে করে। নিজের কাজ কারবার তো নষ্ট হয়ই ; তদুপরি অর্থহীন যাতনাও ভোগ করতে হয়।

এ কারনেই কোরআন পাক সত্য সাক্ষ্য দেয়াকে অপরিহার্য কর্তব্য সাব্যস্ত করার সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করেছে যে, وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ অর্থাৎ, মোকদ্দমার বিবরণ লিপিবদ্ধকারী ও সাক্ষ্যদাতার কোন ক্ষতি করা যাবে না।

আজ-কালকার আদালত ও মোকদ্দমাসমূহের খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, অকুস্থলের সত্য সাক্ষী খুব কমই পাওয়া যায়। সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হওয়ার ভয়ে জ্ঞানী ও ভদ্র ব্যক্তিরা কোথাও দুর্ঘটনার আঁচ পেলে দ্রুত সেখান থেকে পলায়ন করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বানোয়াট সাক্ষীর দ্বারা মামলা দাঁড় করানো হয়। এর ফল তাই দাঁড়াতে পারে, যা আজকাল আমরা দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে থাকি। শতকরা-দশ পাঁচটি মোকদ্দমারও ন্যায় ও সুবিচারভিত্তিক রায় হতে পারে না। এ ব্যাপারে আদালতকে দোষ দেয়া যায় না। কারণ, তারা প্রাপ্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই রায় দিতে বাধ্য।

সাধারণতঃ এ মারাত্মক ভুলটির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। যদি সাক্ষীদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করা হতো এবং তাদেরকে বার বার পেরেশান করা না হতো, তবে কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী কোন সত্যবাদী লোক সাক্ষ্যদান থেকে বিরত থাকতো না। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে এই যে, যে পুলিশ মোকদ্দমার প্রাথমিক তদন্ত করে, সে-ই বার বার ডেকে সাক্ষীকে এমনভাবে পেরেশান করে দেয় যে, সে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কোন মোকদ্দমার সাক্ষী না হওয়ার জন্যে ছেলেদেরকেও ওছিয়ত করে যেতে বাধ্য হয়। এরপর যদি মোকদ্দমা আদালতে পৌঁছে, তবে তারিখের পর তারিখ পড়তে থাকে। প্রতি তারিখেই নিরপরাধ সাক্ষীকে হাজিরা দেয়ার সাজা ভোগ করতে হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকাররূপে আইনের এ দীর্ঘসূত্রিতা আমাদের আদালতসমূহকে নোংরা করে রেখেছে। হেজায ও অন্যান্য কতিপয় দেশে প্রচলিত প্রাচীন সাদা-সিধা বিচার পদ্ধতিতে একদিকে যেমন মোকদ্দমার প্রাচুর্য নাই, অন্যদিকে তেমনি সাক্ষীদের পক্ষে সাক্ষদানও কষ্টকর নয়।

মোটকথা এই যে, সাক্ষ্যদান পদ্ধতি ও বিচার পদ্ধতিকে কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে তোলা হলে এর বরকত আজও দেখা যেতে পারে। কোরআন একদিকে ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত লোকদের উপর সত্য সাক্ষ্যদান অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছে এবং অপরদিকে সাক্ষীদেরকে অকারণে উত্যক্ত না করতে এবং যথাসম্ভব কম সময়ে বয়ান নিয়ে ছেড়ে দিতে নির্দেশ জারি করেছে।

পরীক্ষার নম্বর, সনদ-সার্টিফিকেট ও নির্বাচনের ভোট দান সবই সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ঃ পরিশেষে এখানে আরও একটি বিষয় জানা জরুরী। তা এই যে, আজকাল শাহাদত তথা সাক্ষ্যদানের যে অর্থ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা শুধু মামলা-মোকদ্দমায় কোন বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর

পরিভাষায় 'শাহাদত' শব্দটি আরও ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণতঃ যদি ডাক্তার কোন রোগীকে সার্টিফিকেট দেয় যে, সে কর্তব্য পালনের যোগ্য নয় কিংবা চাকুরী করার যোগ্য নয়, তবে এটিও একটি শাহাদত। এতে বাস্তব অবস্থার খেলাফ যদি কিছু লেখা হয়, তবে তা মিথ্যা সাক্ষ্য হয়ে কবিরা গোনাহ্ হবে।

এমনিভাবে পরীক্ষার্থীদের লিখিত খাতায় নম্বর দেয়াও একটি শাহাদত। যদি ইচ্ছাপূর্বক কিংবা শৈথিল্যভরে কম বা বেশী নম্বর দেয়া হয়, তবে তাও মিথ্যা সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হারাম ও কঠোর পাপ বলে গণ্য হবে।

উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে সনদ ও সার্টিফিকেট বিতরণের অর্থ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া যে, তারা সংশ্লিষ্ট কাজের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। যদি সনদধারী ব্যক্তি বাস্তবে এরূপ না হয়, তবে সার্টিফিকেট ও সনদে স্বাক্ষরদাতা সবাই মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অপরাধে অপরাধী হয়ে যাবে।

এমনিভাবে আইন সভা, কাউন্সিল ইত্যাদির নির্বাচনে ভোট দেয়াও এক প্রকার সাক্ষ্যদান। এতে ভোটদাতার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দেয়া হয় যে, আমার মতে এ ব্যক্তি ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সততা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে জাতির প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য।

এখন চিন্তা করুন, আমাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কয়জন এমন আছেন, যাদের বেলায় এ সাক্ষ্য সত্য ও বিশুদ্ধ হতে পারে? দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের জনগণ নির্বাচনকে একটি হার-জিতের খেলা মনে করে রেখেছে। এ কারণে কখনও পয়সার বিনিময়ে ভোটাধিকার বিক্রয় করা হয়, আবার কখনও চাপের মুখে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়। আবার কখনও সাময়িক বন্ধুত্ব এবং সস্তা অঙ্গীকারের ভরসায় একে ব্যবহার করা হয়।

অন্যের কথা কি বলব, লেখাপড়া জানা ধার্মিক মুসলমানও আযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে গিয়ে কখনও চিন্তা করেন না যে, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে খোদায়ী অভিশাপ ও শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে ভোট দেয়ার দ্বিতীয় একটি দিক রয়েছে —যাকে শাফায়াত বা সুপারিশ বলা হয়। ভোটদাতা ব্যক্তি যেন সুপারিশ করে যে, অমুক প্রার্থীকে প্রতিনিধিত্ব দান করা হোক। কোরআনের ভাষায় এ সম্পর্কিত নির্দেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ

شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি উত্তম ও সত্য সুপারিশ করবে, যার জন্যে সুপারিশ করে, তাকে তার পুণ্য থেকে অংশ দেয়া হবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ ও মিথ্যা সুপারিশ করবে, সে তার মন্দ কর্মের অংশ পাবে।

এর ফলশ্রুতি এই যে, এ প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে তার কর্মজীবনে যেসব ভ্রান্ত ও অবৈধ কাজ করবে, তার পাপ ভোটদাতাও বহন করবে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে ভোটের তৃতীয় দিক হচ্ছে ওকালতির দিক। অর্থাৎ, ভোটদাতা প্রার্থীকে নিজ প্রতিনিধিত্বের জন্যে উকিল নিযুক্ত করে। কিন্তু এ ওকালতি যদি ভোট দাতার ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে হতো এবং এর লাভ-লোকসান কেবল মাত্র সে-ই পেত, তবে এর জন্যে সে নিজেই দায়ী হতো, কিন্তু এখানে ব্যাপারটি তেমন নয়। কেননা, এ ওকালতি এমনসব অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত যাতে তার সাথে সমগ্র জাতিও শরীক। কাজেই কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে স্বীয় প্রতিনিধিত্বের জন্যে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে গোটা জাতির অধিকার খর্ব করার পাপও ভোটদাতার কাঁধে চেপে বসবে।

মোটকথা, আমাদের ভোটের তিনটি দিক রয়েছে। (এক) সাক্ষ্যদান, (দুই) সুপারিশ করা এবং (তিন) সম্মিলিত অধিকার সম্পর্কে ওকালতি করা। এ তিনটি ক্ষেত্রে সৎ, ধর্মভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দান করা যেমন বিরাট ছোয়াবের কাজ এবং এর সুফল যেমন ভোটদাতাও প্রাপ্ত হয়, তেমনি আযোগ্য ও অধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে ভোট দেয়া, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, মন্দ সুপারিশ এবং অবৈধ ওকালতির অন্তর্ভুক্ত এবং এর মারাত্মক ফলাফলও ভোটদাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে।

তাই ভোটদানের পূর্বে প্রার্থী সংশ্লিষ্ট কাজের যোগ্যতা রাখে কিনা এবং সে সৎ ও ধর্মভীরু কিনা, তা যাচাই করে দেখা প্রত্যেকটি মুসলমান ভোটারের অবশ্য কর্তব্য। শৈথিল্য ও ঔদাসীন্যবশতঃ অকারণে বিরাট পাপের ভাগী হওয়া উচিত নয়।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَحِيمِ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ
فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ
لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ
بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ
لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ
عَنْ مَوَاضِعِهِ ۙ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ
تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۖ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

(১০) যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তারা দোযখী। (১১) হে মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের দিকে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল, তখন তিনি তাদের হস্ত তোমাদের থেকে প্রতিহত করে দিলেন। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং মুমিনদের আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত। (১২) আল্লাহ্ বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ্ বলে দিলেন ঃ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দিতে থাক, আমার পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁদের সাহায্য কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম পন্থায় ঋণ দিতে থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গোনাহ্ দূর করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করব, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নিঝরিনীসমূহ প্রবাহিত হয়। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কাফের হয়, সে নিশ্চিতই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। (১৩) অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের কোন না কোন প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন, তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া। অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন। আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মায়েদার পূর্বোল্লেখিত সপ্তম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নেয়ার এবং তাদের তা মেনে নেয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন ঃ

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ
إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ

এ অঙ্গীকারটি হচ্ছে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য ও শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার। এর পারিভাষিক শিরোনাম কলেমা ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'' উচ্চারণকারী প্রতিটি মুসলমান এ অঙ্গীকারের অধীন। এর পরবর্তী আয়াতে অঙ্গীকারের কয়েকটি প্রধান দফা অর্থাৎ, শরীয়তের বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। তাতে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার জন্যে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং ক্ষমতারোহণের পর শত্রুদের প্রতি প্রতিশোধের পরিবর্তে সুবিচার ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ অঙ্গীকারটিও আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় নেয়ামত। এ কারণেই اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ বলে তার বর্ণনা শুরু করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটিকেও আবার اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ বাক্য দ্বারা শুরু করে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা উপরোক্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে শক্তি, উন্নতি ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের কলা কৌশলকে সফল হতে দেননি।

এ আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শত্রুরা বার বার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুসলমানদেরকে হত্যা, লুণ্ঠন ও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার যেসব পরিকল্পনা করে, সেগুলো আল্লাহ্ ব্যর্থ করে দেন। বলা হয়েছে ঃ একটি সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার চিন্তায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হস্তকে প্রতিহত করে দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে কাফেরদের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। কিন্তু তফসীরবিদগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। উদাহরণতঃ মুসনাদে-আবদুর রাজ্জাকে হযরত জাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে ঃ

কোন এক জেহাদে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম এক জায়গায় অবস্থান করছিলেন। বিস্তৃত ময়দানের বিভিন্ন অংশে সাহাবীগণ বিশ্রাম গ্রহণ করতে লাগলেন। এদিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি গাছের ডালে তরবারি ঝুলিয়ে তার নীচে শুয়ে পড়লেন। শত্রুদের মধ্য থেকে জনৈক বেদুঈন সুযোগ বুঝে তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে প্রথমেই তরবারিটি হস্তগত করে ফেলল। অতঃপর তাঁর দিকে তরবারী উঁচিয়ে বলল ঃ আমার কবল থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে?

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) চকিতে উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা। আগন্তুক আবার তার বাক্য পুনরাবৃত্তি করল। তিনিও নিশ্চিন্তে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা। কয়েকবার এরূপ কথাবার্তা হওয়ার পর অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে আগন্তুক তরবারী কোষবদ্ধ করতে বাধ্য হল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীগণকে ডেকে ঘটনা শুনালেন। আগন্তুক বেদুঈন তখনও তাঁর

পাশেই উপবিষ্ট ছিল। তিনি তাকে কিছুই বললেন না। – (ইবনে–কাসীর)

কোন কোন সাহাবী থেকে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, ইহুদী কা'ব ইবনে আশরাফ একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে স্বগৃহে দাওয়াত করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রসূলকে যথাসময়ে এ সংবাদ দিয়ে শত্রুর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। – (ইবনে কাসীর)

হযরত মুজাহিদ, ইকরিমা (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার এক মোকদ্দমার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বনী–নুযায়রের ইহুদীদের বস্তিতে গমন করেন। তারা তাঁকে একটি প্রাচীরের নীচে বসতে দিয়ে কথাবার্তায় ব্যাপৃত রাখে। অপর দিকে আমর ইবনে জাহ্‌শ নামক এক দুরাত্মাকে নিয়োগ করা হয় প্রাচীরের পিছন দিক থেকে উপরে উঠে একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড তাঁর উপর গড়িয়ে দেয়ার জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরকে তাদের সংকল্পের কথা জানিয়ে দেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে প্রস্থান করেন। – (ইবনে–কাসীর)

এসব ঘটনায় কোন বৈপরীত্য নাই —সবগুলোই আলোচ্য আয়াতের সাক্ষী হতে পারে। আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুসলমানদের অদৃশ্য হেফাযতের কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ এতে প্রথমতঃ বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নেয়ামত লাভ করা একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) –এর বৈশিষ্ট্য নয়, বরং এ সাহায্য ও অদৃশ্য হেফাযতের আসল কারণ হচ্ছে তাকওয়া তথা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা। যে কোন জাতি অথবা ব্যক্তি যে কোন সময় যে কোন স্থানে এ দু'টি গুণ অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তারই এভাবে হেফাযত ও সংরক্ষণ করা হবে।

আলোচ্য বাক্যটিতে পূর্ববর্তী আয়াত সমষ্টির সাথেও সংযুক্ত করা যায়, যাতে চরম শত্রুদের সাথেও সদ্ব্যবহার ও সুবিচার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তখন এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, এহেন ঘোর শত্রুদের সাথে সদ্ব্যবহার ও উদারতার শিক্ষা বাহ্যতঃ একটি রাজনৈতিক ভ্রান্তি এবং শত্রুদেরকে দুঃসাহসী করে তোলার নামান্তর। তাই এ বাক্যে মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা যদি খোদাভীরু ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী হও, তবে এ উদারতা ও সদ্ব্যবহার তোমাদের জন্যে মোটেই ক্ষতিকর হবে না, বরং তা শত্রুদেরকে বিরুদ্ধাচরণে দুঃসাহসী করার পরিবর্তে তোমাদের প্রভাবাধীন ও ইসলামের নিকটবর্তী করার কারণ হবে। এছাড়া খোদাভীতিই মানুষকে অঙ্গীকার মেনে চলতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক থেকে বাধ্য করতে পারে। যেখানে খোদাভীতি নাই, সেখানে অঙ্গীকারের দশা তাই হয়, যা আজকাল সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এ কারণে পূর্ববর্তী যে আয়াতে অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছিল, সেখানে আয়াতের শেষাংশে وَاتَّقُوا اللّٰهَ (আল্লাহ্‌কে ভয় কর) বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এ বাক্যটি আবার উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সম্পূর্ণ আয়াতে এদিকেও ইশারা করা হয়েছে যে, মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য শুধু বাহ্যিক সমরোপকরণের উপর মোটেও নির্ভরশীল নয়, বরং তাদের আসল শক্তি তাকওয়া ও আল্লাহ্‌র মধ্যেই নিহিত।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, বনী–ইসরাঈল দুর্ভাগ্যবশতঃ এসব সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করেনি এবং অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিভিন্ন আযাবে নিক্ষেপ করেন।

বনী–ইসরাঈলের প্রতি কুকর্ম ও অবাধ্যতার ফলে দুই প্রকার আযাব নেমে আসে। (এক) বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আযাব। যেমন রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদির বৃষ্টি বর্ষণ, প্রস্তর বর্ষণ, ভূমি উলটিয়ে দেয়া ইত্যাদি। এগুলো কোরআন পাকের অনেক আয়াতে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

(দুই) আত্মিক আযাব। অর্থাৎ, অবাধ্যতার ফলে তাদের অন্তর ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়। তাতে চিন্তা–ভাবনা ও বুঝার ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ফলে তারা পাপের পরিণামে আরও পাপে লিপ্ত হতে থাকে।

এরশাদ হচ্ছে "আমি বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাজা হিসেবে তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিলাম।" ফলে এখন এতে কোন কিছুর সংকুলান রইল না। রহমত থেকে দূরে পড়া এবং অন্তরের কঠোরতাকেই সূরা মুতাফ্‌ফিফীনে 'মরিচা' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে— "কোরআনী আয়াত ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার কারণ এই যে, তাদের অন্তরে পাপের কারণে 'মরিচা' পড়ে গেছে।"

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক হাদীসে বলেন ঃ

মানুষ প্রথমে যখন কোন পাপ কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। এর অনিষ্ট সর্বদাই সে অনুভব করে, যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়ে কাল দাগ লেগে গেলে তা দৃষ্টিকে সব সময়ই কষ্ট দেয়। এরপর যদি সে সতর্ক হয়ে তওবা করে এবং ভবিষ্যতে পাপ না করে, তবে এ দাগ মিটিয়ে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যদি সে সতর্ক না হয় এবং উপর্যুপরি পাপ কাজ করেই চলে, তবে প্রত্যেক গোনাহ্‌র কারণে একটি করে কাল দাগ বেড়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার অন্তর কাল দাগে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন তার অন্তরের অবস্থা ঐ পাত্রের মত হয়ে যায়, যা উপুড় করে রাখা হয় এবং কোন জিনিস রাখলে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে আসে। – পরে পাত্রে কিছু থাকে না। ফলে কোন সৎ ও পুণ্যের বিষয় তার অন্তরে স্থান পায় না। তখন তার অন্তর لايعرف معروفا ولاينكر منكرا কোন পুণ্য কাজকে পুণ্য এবং মন্দ কাজকে মন্দ মনে করে না। বরং ব্যাপার উল্টো হয়ে যায়। অর্থাৎ, দোষকে গুণ, পুণ্যকে পাপ এবং পাপকে ছোয়াব মনে করতে থাকে এবং অবাধ্যতায় বেড়েই চলে। এটা হচ্ছে তার পাপের নগদ সাজা– যা সে ইহকালেই লাভ করে।

বনী–ইরাঈলরা অঙ্গীকার ভঙ্গের নগদ সাজা এই লাভ করে যে, মুক্তির সর্ববৃহৎ উপায় আল্লাহ্‌র রহমত থেকে তারা দূরে পড়ে যায় এবং অন্তর এমন পাষাণ হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌র কালামকে তারা স্বস্থান থেকে ঘুরিয়ে দেয় অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কালামে পরিবর্তন করে। কখনও শব্দে, কখনও অর্থে এবং কখনও তেলাওয়াতে পরিবর্তন করে। পরিবর্তনের এ প্রকারগুলো কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টানও একথা কিছু কিছু স্বীকার করে। – (তফসীরে ওসমানী)

খ্রীষ্টান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা খ্রীষ্টানদের অঙ্গীকার ভঙ্গের সাজা বর্ণনা করে বলেছেন যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সঞ্চারিত করে দেয়া হয়েছে—যা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আজকালকার খ্রীষ্টানদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ দেখে আয়াতের সত্যতায় সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। উত্তর এই যে, আয়াতে প্রকৃত খ্রীষ্টানদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যারা ধর্মকর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে গেছে, তারা প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টানদের তালিকাভুক্ত নয় – যদিও জাতিগতভাবে তারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান নামেই অভিহিত করে। এমন

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصٰرٰىٓ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ
فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهٖ ۖ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ وَسَوْفَ
يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾ يٰٓأَهْلَ
الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا
مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوا عَنْ
كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ وَّكِتٰبٌ
مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ يَّهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ
سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ
بِإِذْنِهٖ وَيَهْدِيهِمْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ لَقَدْ
كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ
قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُّهْلِكَ
الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ
وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ
مَا يَشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

(১৪) যারা বলে : আমরা নাছারা, আমি তাদের কাছ থেকেও তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। অতঃপর তারাও যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল, তা থেকে উপকার লাভ করা ভুলে গেল। অতঃপর আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। (১৫) হে আহলে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন। কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ। (১৬) এর দ্বারা আল্লাহ্ যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন। (১৭) নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে, মসীহ্ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ্। আপনি জিজ্ঞেস করুন, যদি তাই হয়, তবে বল – যদি আল্লাহ্ মসীহ্ ইবনে মরিয়ম, তাঁর জননী এবং ভূমণ্ডলে যারা আছে, তাদের সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তবে এমন কারও সাধ্য আছে কি যে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাদেরকে বিন্দুমাত্রও বাঁচাতে পারে? নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, সবকিছুর উপর আল্লাহ্ তা'আলারই আধিপত্য। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান।

খ্রীষ্টানদের মধ্যে যদি ধর্মীয় বিদ্বেষ ও পারস্পরিক শত্রুতা না থাকে, তবে তা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, ধর্মের ভিত্তিতেই বিভেদ ও বিদ্বেষ হতে পারত। যখন তাদের ধর্মই নাই, তখন বিভেদ কিসের। যারা ধর্মগত দিক দিয়ে খ্রীষ্টান, আয়াতে তাদের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ খ্রীষ্টানদের মতভেদ সর্বজনবিদিত।

বায়যাভীর টীকায় তাইসীর গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে আসলে তিনটি সম্প্রদায় রয়েছে। (এক) নিস্তরিয়া। এরা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে। (দুই) ইয়াকুবিয়া। এরা ইসাকে খোদার সাথে এক মনে করে। (তিন) মালকাইয়া। এরা ঈসা (আঃ)-কে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে।

যেখানে মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এত বড় মতানৈক্য, সেখানে পারস্পরিক শত্রুতা অপরিহার্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে খ্রীষ্টানদের একটি উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে— যা তাদের একদলের ধর্ম বিশ্বাসও ছিল। অর্থাৎ, হযরত মসীহ (আঃ) (মা'আযাল্লাহ) হুবহু আল্লাহ্ তাআলা। কিন্তু যে যুক্তি দ্বারা বিষয়টির খণ্ডন করা হয়েছে, তাতে খ্রীষ্টানদের সব দলের একত্ববাদ বিরোধী ভ্রান্ত বিশ্বাসেরই খণ্ডন হয়ে যায়, তা মসীহ্ (আঃ)-এর খোদার সন্তান হওয়া সংক্রান্ত বিশ্বাসই হোক অথবা তিন খোদার অন্যতম খোদা হওয়ার বিশ্বাসই হোক।

এস্থলে হযরত মসীহ্ ও তাঁর জননীকে উল্লেখ করার মধ্যে দু'টি রহস্য থাকতে পারে। (এক) আল্লাহ্ তাআলার সামনে মসীহ (আঃ)-এর এ অক্ষমতা যে, তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না এবং যে জননীর খেদমত ও হেফাযত তাঁর কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়, সে জননীকেও রক্ষা করতে পারেন না। (দুই) এতে ঐ সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসও খণ্ডন করা হয়েছে, যারা মরিয়মকে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে।

এস্থলে হযরত মসীহ ও মরিয়মের মৃত্যুকে ধরে নেয়ার পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ কোরআন অবতরণের সময় হযরত মরিয়মের মৃত্যু ধরে নেয়ার পর্যায়ে ছিল না ; বরং বাস্তবেই মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। এর এক কারণ تنليب অর্থাৎ, আসলে হযরত মসীহ (আঃ)-এর মৃত্যুকে ধরে নেয়ার পর্যায়ে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর জননীর মৃত্যুকেও একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে—যদিও তাঁর মৃত্যু আগেই হয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একথাও বলা যায় যে, আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আমি মরিয়মকে যেমন মৃত্যুদান করেছি, তেমনি হযরত মসীহ্ ও অন্যান্য সৃষ্টজীবের মৃত্যুও আমারই হাতে। يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ বাক্যে খ্রীষ্টানদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণকেও খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা, হযরত মসীহ্‌কে খোদা মনে করার আসল কারণ তাদের মতে এই ছিল যে, তিনি জগতের সাধারণ নিয়মের বিপরীতে পিতা ছাড়া শুধুমাত্র গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি মানুষ হলে নিয়মানুযায়ী পিতা-মাতা উভয়ের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করতেন।

আলোচ্য বাক্যে এর উত্তর দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা যাকে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। যেমন, مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ আয়াতে এ সন্দেহই নিরসন করা হয়েছে। অর্থাৎ, খোদার সাধারণ নিয়মের বাইরে মসীহ্ (আঃ)-কে সৃষ্টি করা তার খোদা হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ۚ قُلْ فَلِمَ
يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا ۫ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ
وَّلَا نَذِيْرٍ ۫ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ﴿١٩﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا
لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٠﴾ يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ
الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِكُمْ
فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ
وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا
فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ
اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ
غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾

(১৮) ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। আপনি বলুন, তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে কেন শাস্তি দান করবেন? বরং তোমারও অন্যান্য সৃষ্ট মানবের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তাতে আল্লাহ্‌রই আধিপত্য রয়েছে এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (১৯) হে আহলে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রসূল আগমণ করেছেন, যিনি পয়গম্বরদের বিরতির পর তোমাদের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন—যাতে তোমরা একথা বলতে না পার যে, আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আগমন করেননি। অতএব, তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক এসে গেছেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান। (২০) যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামত স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে পয়গম্বর সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দেননি। (২১) হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (২২) তারা বলল ঃ হে মূসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব। (২৩) খোদাভীরুদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি বলল, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন ঃ তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

লক্ষ্যণীয় যে, হযরত আদমকে আল্লাহ্ তাআলা পিতা ও মাতা উভয়ের মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সবকিছুই করতে পারেন। তিনিই স্রষ্টা, প্রভু ও উপাসনার যোগ্য। অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ — فترت এর শাব্দিক অর্থ মন্থর হওয়া, অনড় হওয়া, এবং কোন কাজকে বন্ধ করে দেয়া। আলোচ্য আয়াতে তফসীরবিদগণ فترت এর শেষোক্ত অর্থই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, পয়গম্বরগণের আগমন-পরম্পরা কিছুদিনের জন্যে বন্ধ থাকা। হযরত ঈসার পর শেষনবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের সময় পর্যন্ত যে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, তাই فترت এর যমানা।

فترت এর যমানা কতটুকু ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাঝখানে এক হাজার সাতশ, বছরের ব্যবধান ছিল। এ সময়ের মধ্যে পয়গম্বরগণের আগমন একাদিক্রমে অব্যাহত ছিল। এতে কখনও বিরতি ঘটেনি। শুধু বনী-ইসরাঈলের মধ্য থেকেই এক হাজার পয়গম্বর এ সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। বনী-ইসরাঈল ছাড়া অন্য গোত্র থেকেও অনেক পয়গম্বর আগমন করেছিলেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের মাঝখানে মাত্র পাঁচ'শ বছরকাল পয়গম্বরগণের আগমন বন্ধ ছিল। এ সময়টিকেই فترت তথা বিরতির সময় বলা হয়। এর আগে কখনও এত দীর্ঘ সময় পয়গম্বরগণের আগমন বন্ধ ছিল না।—(কুরতুবী)

হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল এবং হযরত ঈসা ও শেষ নবী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল, সে সম্পর্কে আরও বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, যাতে সময়ের পরিমাণ কম-বেশী বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু এতে আসল উদ্দেশে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না।

ইমাম বোখারী হযরত সালমান ফারসীর রেওয়ায়েত ক্রমে বর্ণনা করেন ঃ হযরত ঈসা ও শেষনবী (সাঃ)-এর মাঝখানে সময় ছিল ছয়শ' বছর। এ সময়ের মধ্যে কোন পয়গাম্বর প্রেরিত হননি। বোখারী ও মুসলিমের বরাত দিয়ে মেশকাতে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, انا اولى الناس بعيسى অর্থাৎ, আমি ঈসা (আঃ)-এর সবচাইতে নিকটবর্তী। এর মর্ম হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে ليس بيننا نبى অর্থাৎ, আমাদের মাঝখানে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হননি।

সূরা ইয়াসীনে যে তিন জন 'রসূলের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক প্রেরিত দূত ছিলেন। আভিধানিক অর্থেই তাদেরকে 'রসূল' বলা হয়েছে।

বিরতির সময়ে খালেদ ইবনে সিনান নবী ছিলেন বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে তফসীরে রূহুল মা'আনীতে শিহাবের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি নবী ছিলেন ঠিক; কিন্তু তাঁর নবুওয়তকাল ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের পূর্বে—পরে নয়।

অন্তবর্তীকালের বিধান ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, যদি কোন সম্প্রদায়ের কাছে কোন রসূল, পয়গম্বর অথবা তাদের কোন প্রতিনিধি আগমন না করে এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তও তাদের কাছে সংরক্ষিত না থাকে, তবে তারা শেরক ছাড়া অন্য কোন

কুকর্ম ও গোমরাহীতে লিপ্ত হলে তা ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তারা আযাবের যোগ্য হবে না। এ কারণেই অন্তর্বর্তীকালের লোকদের সম্পর্কে ফেকাহ্‌বিদগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে কি না।

সাধারণ ফেকাহ্‌বিদগণ বলেন ঃ তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে বলেই আশা করা যায়, যদি তারা নিজেদের ঐ ধর্ম অনুসরণ করে, যা ভুলভ্রান্ত অবস্থায় হযরত ঈসা অথবা মূসা (আঃ)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে তাদের কাছে এসেছিল। তারা একত্ববাদের বিরুদ্ধাচরণ ও শেরেকে লিপ্ত হলে একথা প্রযোজ্য হবে না। কেননা, একত্ববাদ কোন পয়গম্বরের পথ প্রদর্শনের অপেক্ষা রাখে না। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করে নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ তা জেনে নিতে পারে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে যেসব ইহুদী ও খ্রীষ্টানকে সম্বোধন করা হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালে তাদের কাছে কোন রসূল আগমন না করলেও তৌরাত ও ইঞ্জীল তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাদের আলেম সম্প্রদায়ও ছিল। এমতাবস্থায় ''আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক পৌছে নি'' বলে তাদের ওজর পেশ করার কোন যুক্তি ছিল কি? উত্তর এই যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর আমল পর্যন্ত তৌরাত ও ইঞ্জীল অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে তাতে মিথ্যা ও বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনী অনুপ্রবেশ করেছিল। কাজেই তা থাকা না থাকা সমান ছিল। ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ আলেমের বর্ণনা অনুযায়ী তৌরাতের আসল লিপি কারও কাছে কোন অজ্ঞাত স্থানে বিদ্যমান থাকলেও তা এর পরিপন্থী নয়।

শেষ নবীর বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত ঃ ''আমার রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) দীর্ঘ বিরতির পর আগমন করেছেন'— আলোচ্য আয়াতে আহলে-কিতাবদের সম্বোধন করে একথা বলার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের উচিত তাঁর আগমনকে খোদাপ্রদত্ত বিরাট দান ও বড় নেয়ামত মনে করা। কেননা, পয়গম্বরের আগমন সুদীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। এখন তোমাদের জন্যে তা আবার খোলা হয়েছে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এদিকেও রয়েছে যে,তাঁর আগমন এমন এক যুগে ও এমন স্থানে হয়েছে, যেখানে জ্ঞান ও ধর্মের কোন আলো ছিল না। খোদার সৃষ্ট মানব খোদার সাথে পরিচয় হারিয়ে মূর্তিপূজায় মনোনিবেশ করেছিল। এমন জাহেলিয়াতের যুগে এহেন পথভ্রান্ত জাতির সংশোধন করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তাঁর সংসর্গের কল্যাণ ও নবুওয়তের জ্যোতির পরশে অল্প দিনের মধ্যেই এ জাতি সমগ্র বিশ্বের জন্যে জ্ঞান-গরিমা, কর্মপ্রেরণা, সচ্চরিত্রতা, লেন-দেন, সামাজিকতা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য হয়ে পড়ে। এতে করে রসূলুল্লাহ্ এর নবুওয়ত ও তাঁর পয়গম্বরসুলভ শিক্ষা যে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের চাইতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। যে ডাক্তার কোন চিকিৎসা থেকে নিরাশ রোগীর চিকিৎসা এমন জায়গায় করে, যেখানে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্রও দুর্লভ, অতঃপর তাঁর সফল চিকিৎসায় মরণোম্মুখ রোগী শুধু আরোগ্যই লাভ করে না; বরং একজন বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকও হয়ে যায়, এমন ডাক্তারের উৎকৃষ্টতায় কারও মনে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

সুদীর্ঘ বিরতির পর যখন চারদিকে অন্ধকারই অন্ধকার বিরাজ করছিল, তখন তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চতুর্দিককে এমন আলোকোদ্ভাসিত করে তুলে যে, অতীত যুগে এর দৃষ্টান্ত কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব, সব মো'জেযা একদিকে রেখে একা এ মো'জেযাটিই মানুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করতে পারে।

পূর্ববর্তী এক আয়াতে সে অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের আনুগত্যের ব্যাপারে বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে নেয়া হয়েছিল। এর সাথে সাথে তাদের সাধারণ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকরণ, অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ এবং তার শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে।

ঘটনাটি এই যে, ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত হল এবং মূসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায় বনী-ইসরাঈল ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে মিসরের আধিপত্য লাভ করল, তখন আল্লাহ্ তাআলা সেই সঙ্গে তাদেরকে আরো কিছু নেয়ামত এবং তাদের পৈতৃক দেশ সিরিয়াকেও তাদের অধিকারে প্রত্যার্পণ করতে চাইলেন। সেমতে মূসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাদেরকে জেহাদের উদ্দেশে পবিত্র ভূমি সিরিয়ায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দেয়া হল। সাথে সাথে তাদেরকে আগাম সুসংবাদও দেয়া হল যে, এ জেহাদে তারাই বিজয়ী হবে। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা এ পবিত্র ভূমির আধিপত্য তাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন যা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু বনী-ইসরাঈল প্রকৃতিগত হীনতার কারণে আল্লাহ্‌র বহু নেয়ামত তথা ফেরাউনের সাগরডুবি ও তাদের মিসর অধিকার ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখেও এক্ষেত্রে অঙ্গীকার পালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে সক্ষম হল না। তারা সিরিয়ার জেহাদ সম্পর্কিত আল্লাহ্ তাআলার এ নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্যায় জেদ ধরে বসে রইল। ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর কঠোর শাস্তি নাযিল করলেন। পরিণতিতে তারা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় অবরুদ্ধ ও বন্দী হয়ে রইল। বাহ্যতঃ তাদের চারপাশে কোন বাধার প্রাচীর ছিল না এবং তাদের হাত, পা ও শেকল বাঁধা ছিল না; বরং তারা ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে। তারা স্বদেশে অর্থাৎ, মিসর ফিরে যাবার জন্যে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথও চলত; কিন্তু তারা নিজেদেরকে সেখানেই দেখতে পেত, যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিল। ইত্যবসরে হযরত মূসা ও হারুন (আঃ)-এর ওফাত হয়ে যায় এবং বনী-ইসরাঈল তীহ্ প্রান্তরেই উদভ্রান্তের মত ঘুরাফেরা করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাদের হেদায়েতের জন্য অন্য একজন পয়গম্বর প্রেরণ করলেন।

এমনিভাবে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বনী-ইসরাঈলের অবশিষ্ট বংশধর তৎকালীন পয়গম্বরের নেতৃত্বে সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাসের জন্যে জেহাদের সংকল্প গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা ও পূর্ণতা লাভ করে। এ হচ্ছে আয়াতে বর্ণিত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এবার কোরআনের ভাষায় বিস্তারিত ঘটনা শুনুন ঃ

হযরত মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বায়তুল মুকাদ্দাস ও সিরিয়া অভিযানের খোদায়ী নির্দেশ শোনাবার পূর্বে পয়গম্বরসুলভ বিচক্ষণতা ও উপদেশের মাধ্যমে বনী-ইসরাঈলকে প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন ঃ

اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا

وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ

''তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ কর। তিনি তোমাদের

মধ্যে অনেক পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, তোমাদেরকে রাজ্যের অধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন নেয়ামত দিয়েছেন,যা বিশ্বজগতের কেউ পায়নি।

এতে তিনটি নেয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি আধ্যাত্মিক নেয়ামত; অর্থাৎ, তাঁর সম্প্রদায়ে অব্যাহতভাবে বহু পয়গম্বর প্রেরণ। এর চাইতে বড় পারলৌকিক সম্মান আর কিছু হতে পারে না। তফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে, বনী-ইসরাঈলের মত এত অধিক সংখ্যক পয়গম্বর অপর কোন উম্মতে হয়নি।

হাদীসবিদ ইবনে আবী হাতেম আ'মাশের রেওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণনা করেন যে, বনী-ইসরাঈলের শেষ পর্বে যা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়, তাতেই এ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক হাজার পয়গম্বর প্রেরিত হন। আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় নেয়ামতটি হচ্ছে পার্থিব ও বাহ্যিক। অর্থাৎ, তাদেরকে রাজ্য দান। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বনী-ইসরাঈল সুদীর্ঘ কাল ফেরাউন ও ফেরাউন বংশীয়দের ক্রীতদাসরূপে দিনরাত অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। আজ আল্লাহ্ তাআলা ফেরাউন ও তার বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে বনী-ইসরাঈলকে তার রাজ্যের অধিপতি করে দিয়েছেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, পয়গম্বরগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ অর্থাৎ, তোমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককে পয়গম্বর করেছেন। এর অর্থ এই যে, সমগ্র জাতি পয়গম্বর ছিল না। বাস্তব সত্যও তাই। পয়গম্বর কয়েকজনই হন। অবশিষ্ট গোটা জাতি তাদের উম্মত ও অনুসারী হয়। কিন্তু এখানে জাগতিক রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا অর্থাৎ, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করে দিয়েছেন। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমাদের সবাইকে রাজা করে দিয়েছেন। ملوك শব্দটি ملك এর বহুবচন। সাধারণ পরিভাষায় এর অর্থ অধিপতি, বাদশাহ্, রাজা। একথা সবাই জানে যে, গোটা জাতি যেমন নবী ও পয়গম্বর হয় না, তেমনি কোনদেশে গোটা জাতি বাদশাহ্ বা রাজাও হয় না। বরং জাতির এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তি শাসন কার্য পরিচালনা করে। অবশিষ্ট জাতি তাদের অধীনস্থ হয়ে থাকে। কিন্তু কোরআনের ভাষায় তাদের সবাইকে বাদশাহ্ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর একটি কারণ বয়ানুল —কোরআনে এক বুযুর্গের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, কোন জাতির মধ্য থেকে কেউ বাদশাহ্ হলে সাধারণ পরিভাষায় তার রাজত্ব ও সাম্রাজ্যকে গোটা জাতির দিকে সম্বন্ধ করা হয়। উদাহরণতঃ ইসলামের মধ্য যুগের বাদশাহ্দের রাজত্বকে বনী-উমাইয়া ও বনী আব্বাসের রাজত্ব বলা হয়। এমনিভাবে ভারতবর্ষে গযনবী বংশের রাজত্ব, ঘৌরী বংশের রাজত্ব, মোঘল বংশের রাজত্ব অতঃপর ইংরেজদের রাজত্বকে সমগ্র জাতির দিকে সনূন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই যে জাতির একজন বাদশাহ্ হয়, সে জাতির সবাইকে বাদশাহ্ বলে দেয়া হয়।

এই বিশেষ বাচনভঙ্গি অনুযায়ী কোরআন পাক সমগ্র বনী-ইসরাঈলকে রাজ্যাধিপতি বলে দিয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে জনগণের রাষ্ট্র। জনগণই স্বীয় রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করার অধিকারী এবং জনগণই সম্মিলিত মত দ্বারা তাঁকে অপসারণও করতে পারে। তাই দেখার ক্ষেত্রে যদিও একজন রাষ্ট্রপ্রধান হন, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক জনগণই।

তৃতীয় নেয়ামত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার নেয়ামতের সমষ্টি। বলা হয়েছে ঃ وَاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ, তোমাদেরকে এমনসব নেয়ামত দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের আর কাউকে দেননি। আভ্যন্তরীণ সম্মান, নবুওয়ত এবং রেসালতও এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া বাহ্যিক রাজত্ব এবং অর্থ-সম্পদও এরই মধ্যে পরিগণিত। প্রশ্ন হতে পারে, কোরআনের উক্তি অনুযায়ী মুসলিম সম্প্রদায় অন্য সব উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কোরআনের উক্তি كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ প্রভৃতি বাক্য এবং وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا অসংখ্য হাদীসও এ বক্তব্য সমর্থন করে। উত্তর এই যে, আয়াতে বিশ্ব জগতের ঐসব লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা মূসা (আঃ)-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তখন সমগ্র বিশ্বের কেউ ঐসব নেয়ামত পায়নি, যা বনী-ইসরাঈল পেয়েছিল। পরবর্তী যুগের কোন উম্মত যদি আরও বেশী নেয়ামত লাভ করে, তবে তা আয়াতের পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বর্ণিত মূসার উক্তিটি ছিল ঐ নির্দেশ বর্ণনার ভূমিকা, যা পরবর্তী আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা সে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছেন।

পবিত্র ভূমি বলে কোন্ ভূমি বোঝানো হয়েছে ঃ এ প্রশ্নে তফসীরবিদগণের মত বাহ্যতঃ ভিন্ন ভিন্ন। কারও মতে বায়তুল-মুকাদ্দাস, কারও মতে কুদস শহর ও ইলিয়া এবং কেউ কেউ বলেন ঃ আরিহা শহর—যা জর্দান নদী ও বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যস্থলে বিশ্বের একটি প্রাচীনতম শহর যা পূর্বেও ছিল এবং এখনও আছে। হযরত মূসা (আঃ)-এর আমলে এ শহরের অত্যাশ্চর্য জাঁক-জমক ও বিস্তৃতি ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, এ শহরের এক হাজার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছিল। প্রতি অংশে এক হাজার করে বাগান ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, পবিত্র ভূমি বলে দামেস্ক ও ফিলিস্তিনকে এবং কারও মতে জর্দানকে বোঝানো হয়েছে। হযরত কাতাদাহ্ বলেন ঃ সমগ্র সিরিয়াই পবিত্র ভূমি। কা'ব আহবার বলেন ঃ আমি আল্লাহ্র কিতাবে (সম্ভবতঃ তৌরাতে) দেখেছি যে, সমগ্র সিরিয়ায় আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ ধন-ভাণ্ডার রয়েছে এবং এতে আল্লাহ্র অনেক প্রিয় বান্দা রয়েছেন। পয়গম্বরগণের জন্মস্থান ও বাসস্থান হওয়ার কারণে একে পবিত্র ভূমি বলা হয়।

এক রেওয়ায়েতে আছে, একদিন হযরত ইবরাহীম (আঃ) লেবাননের পাহাড়ে আরোহণ করলে আল্লাহ্ তাআলা বললেন ঃ ইবরাহীম, এখান থেকে দৃষ্টিপাত কর। যে পর্যন্ত তোমার দৃষ্টি পৌঁছাবে, আমি তার সবটুকুকে পবিত্র ভূমি করে দিলাম। ইবনে-কাছীর ও মাযহারী তফসীর গ্রন্থ থেকে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। সর্বশেষ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সমগ্র সিরিয়াই পবিত্র ভূমি। তবে বর্ণনায় কেউ সিরিয়ার অংশবিশেষকে এবং কেউ সমগ্র সিরিয়াকে বর্ণনা করেছেন।

قَالُوْا يٰمُوْسٰى এর আগে আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে বনী-ইসরাঈলকে আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করে সিরিয়া

দখল করতে বলেছিলেন। সাথে সাথে এ সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, সিরিয়ার ভূখণ্ড তাদের ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে। কাজেই তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।

উল্লেখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সত্ত্বেও বনী-ইসরাঈল চিরাচরিত ঔদ্ধত্য ও বক্র স্বভাবের কারণে এ নির্দেশ পালনে স্বীকৃত হল না; বরং মূসা (আঃ)-কে বলল ঃ হে মূসা, এ দেশে প্রবল পরাক্রান্ত জাতি বাস করে। যতদিন এ দেশ তাদের দখলে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। যদি তারা অন্য কোথাও চলে যায়, তবে আমরা সেখানে যেতে পারি।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, ইকরিমা, আলী ইবনে আবী তালহা প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তখন সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাস আমালেকা সম্প্রদায়ের দখলে ছিল। তারা ছিল আদ সম্প্রদায়ের একটি শাখা। দৈহিক দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত সুঠাম, বলিষ্ঠ ও ভয়াবহ আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। তাদেরই সাথে জেহাদ করে বায়তুল-মুকাদ্দাস অধিকার করার নির্দেশ মূসা আলাইহিসসালাম ও তাঁর সম্প্রদায়কে দেয়া হয়েছিল।

মূসা আলাইহিসসালাম আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের জন্যে বনী-ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হলেন। উদ্দেশ্য ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছা। জর্দান নদী পার হয়ে বিশ্বের প্রাচীনতম শহর আরিহায় পৌঁছে শিবির স্থাপন করলেন। বনী-ইসরাঈলের দেখা-শোনার জন্যে বার জন সর্দার নির্বাচন করার কথা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। মূসা (আঃ) এই বার জন সর্দারকে শত্রুদের অবস্থা ও রণাঙ্গণের হাল-হকিকত জেনে আসার জন্যে পাঠান। বায়তুল মুকাদ্দাসের অদূরে শহরের বাইরে আমালেকা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির সাথে তাদের দেখা হয়। সে একাই বার জনকে গ্রেফতার করে বাদশাহ্র সামনে উপস্থিত করে বলল ঃ এরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশে এসেছে। শাহী দরবারে নানাহ পরামর্শের পর তাদেরকে মুক্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল—যাতে তারা স্বজাতির কাছে পৌছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমালেকা জাতির শৌর্য-বীর্যের কাহিনী বর্ণনা করে। ফলে আক্রমণ তো দূরের কথা, ভীত হয়ে এদিকে মুখ করার সাহসও তারা হারিয়ে ফেলে।

এস্থলে অধিকাংশ তফসীর গ্রন্থে উল্লেখিত ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহে নাতিদীর্ঘ কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং আমালেকা সম্প্রদায়ের উল্লেখিত ব্যক্তির নাম বলা হয়েছে আউজ ইবনে ওনুক। এসব রেওয়ায়েতে তার অদ্ভুত আকার-আকৃতি ও শক্তি-সাহসকে এমন অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে উদ্ধৃত করাও কঠিন।

ইবনে-কাছীর বলেন ঃ আউজ ইবনে ওনুকের যেসব কিচ্ছা এসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতে স্থান পেয়েছে, সেগুলো কোন বুদ্ধিমানের কাছে গ্রহণীয় নয় এবং শরীয়তেও এগুলোর কোন বৈধতা নেই—এ সবই মিথ্যা ও বানোয়াট। আসল ব্যাপার এতটুকু যে, আমালেকা সম্প্রদায় ছিল আদ সম্প্রদায়ের উত্তর পুরুষদের একটি অংশ। আদ সম্প্রদায়ের ভয়াবহ আকার-আকৃতির কথা স্বয়ং কোরআন পাক বর্ণনা করেছে। তাদের বিশালাকৃতি ও শক্তি-সাহস প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের এক ব্যক্তি বনী-ইসরাঈলের বার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

মোটকথা, বনী-ইসরাঈলের বার জন সর্দার আমালেকাদের কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়ে আরিহায় স্বজাতির কাছে ফিরে এল। তারা মূসা (আঃ)-এর কাছে এ বিস্ময়কর জাতি ও তাদের অবিশ্বাস্য শৌর্যবীর্যের কাহিনী বর্ণনা করল। হযরত মূসা (আঃ) এসব কাহিনী শুনে এতটুকুও ভীত হলেন না। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে বিজয় ও সাফল্যের বাণী শুনিয়ে রেখেছিলেন।

হযরত মূসা তো তাদের শৌর্যবীর্যের অবস্থা শুনে স্বস্থানে পাহাড়ের মত দৃঢ়তা সহকারে জেহাদের প্রস্তুতিতে লেগে রইলেন। কিন্তু বনী-ইসরাঈলকে নিয়েই সমস্যা। তারা যদি প্রতিপক্ষের অসাধারণ শক্তি-সাহসের কথা জেনে ফেলে, তবে নিশ্চিতই ভরাডুবি। তাই তিনি বার জন সর্দারকে আমালেকা সম্প্রদায়ের অবস্থা বনী-ইসরাঈলের কাছে ব্যক্ত করতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু তা হল না। তারা প্রত্যেকেই গোপনে গোপনে বন্ধু-বান্ধবের কাছে তা ব্যক্ত করে দিল। শুধু ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকেন্না নামক দুব্যক্তি মূসা (আঃ)-এর নির্দেশ পালন করে তা কারও কাছে প্রকাশ করল না।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِيْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ﴿٣١﴾

(২৪) তারা বলল ঃ হে মূসা, আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম। (২৫) মূসা বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। (২৬) বললেন ঃ এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে হারাম করা হল। তারা ভূপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না। (২৭) আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শুনান। যখন তারা উভয়েই কিছু উৎসর্গ নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের উৎসর্গ গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের গৃহীত হয়নি। সে বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। সে বলল ঃ আল্লাহ্ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন। (২৮) যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর,তবে আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি। (২৯) আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও। অতঃপর তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই অত্যাচারীদের শাস্তি। (৩০) অতঃপর তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করল। অনন্তর সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (৩১) আল্লাহ্ এক কাক প্রেরণ করলেন। সে মাটি খনন করছিল-যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে। সে বললঃ আফসোস, আমি কি এ কাকের সমতুল্যও হতে পারলাম না যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ আবৃত করি। অতঃপর সে অনুতাপ করতে লাগল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কিন্তু বনী-ইসরাঈল যেখানে পয়গম্বরের কথার প্রতিই কর্ণপাত করল না, সেখানে তাদের উপদেশের আর মূল্য কি? তারা পূর্বের জওয়াবই আরও বিশ্রী ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করলঃ فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ অর্থাৎ, আপনি ও আপনার আল্লাহ্ উভয়ে গিয়েই যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব। বনী-ইসরাঈল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে একথা বললে, তা পরিষ্কার কুফর হতো এবং অতঃপর তাদের সাথে মূসা (আঃ)-এর অবস্থান করা, তীহ্ প্রান্তরে দোয়া করা ইত্যাদি সম্ভবপর হতো না যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

এ কারণে তফসীরবিদগণ উপরোক্ত বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন—আপনি যান এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। আপনার আল্লাহ্ই আপনার সাহায্য করবেন, আমরা সাহায্য করতে অক্ষম। এ অর্থের দিক দিয়ে বনী-ইসরাঈলের জওয়াবটি কুফরের পরিধি অতিক্রম করে যায়—যদিও কথাটি অত্যন্ত বিশ্রী ও পীড়াদায়ক। এ কারণেই তাদের এ বাক্যটি প্রবাদ বাক্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বদরযুদ্ধে নিরস্ত্র ও ক্ষুধার্ত মুসলমানদের মোকাবেলায় এক হাজার সশস্ত্র জওয়ানের বাহিনী প্রস্তুত হয়ে ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ দৃশ্য দেখে আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করতে লাগলেন। এতে ছাহাবী হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! খোদার কসম, আমরা কস্মিন কালেও ঐকথা বলব না, যা মূসা (আঃ)-কে তাঁর স্বজাতি বলেছিল فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করব। আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

হাবিল ও কাবীলের কাহিনী ঃ আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন-আপনি আহ্লে-কিতাবদেরকে অথবা সমগ্র উম্মতকে আদম আলাইহিস সালামের পুত্রদ্বয়ের কাহিনী সত্য সত্য বর্ণনা করে শুনিয়ে দিন।

কোরআন মজীদে অভিনিবেশকারী মাত্রই জানে যে, কোরআন পাক কোন কিচ্ছা-কাহিনী অথবা ইতিহাস গ্রন্থ নয় যে, তাতে কোন ঘটনাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করা হবে। এতদসত্বেও অতীত ঘটনাবলী এবং বিগত জাতিসমূহের ইতিবৃত্তের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে। এগুলোই ইতিহাসের আসল প্রাণ। তন্মধ্যে অনেক অবস্থা ও ঘটনা এমনও রয়েছে, যেগুলোর ওপর শরীয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান ভিত্তিশীল। এসব উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন পাকের সামগ্রিক রীতি এই যে, স্থানে স্থানে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে অধিকাংশ স্থানে পূর্ণ ঘটনা এক জায়গায় বর্ণনা করে না; বরং ঘটনার যে অংশের সাথে আলোচ্য বিষয়বস্তুর সম্পর্ক থাকে সে অংশটুকুই বর্ণনা করা হয়।

হযরত আদম আলাইহিস সালামের পুত্রদ্বয়ের কাহিনীটিও এই বিজ্ঞ রীতির ভিত্তিতে বর্ণনা করা হচ্ছে। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে শরীয়তের অনেক বিধি-বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এখন প্রথমে আয়াতের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা এবং তৎপ্রসঙ্গে আসল কাহিনী শুনুন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বর্ণনা করা হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে বনী-ইসরাইলের প্রতি জেহাদের নির্দেশ এবং তাতে

তাদের কাপুরুষতা ও ভীরুতা বর্ণনা করা হয়েছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য কাহিনীতে অন্যায় হত্যার অনিষ্ট ও ধ্বংসকারিতা বর্ণনা করে জাতিকে মিতাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সত্যের সমর্থনে এবং মিতাচার থেকে পেছনে হটা যেমন ভুল, তেমনি অন্যায় হত্যাকাণ্ডে এগিয়ে যাওয়া ইহকাল ও পরকালকে বরবাদ করার শামিল।

প্রথম আয়াতে ابْنَيْ اٰدَمَ শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। সেমতে প্রত্যেককেই ابن ادم বা আদম সন্তান বলা যায়। কিন্তু সাধারণ তফসীরবিদগণের মতে এখানে ابْنَيْ اٰدَمَ বলে হযরত আদমের ঔরসজাত পুত্রদ্বয় হাবিল ও কাবিলকে বোঝানো হয়েছে।

ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাবধানতা ও সততা অপরিহার্য ঃ তাদের কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশে বলা হয়েছে ঃ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ, তাদেরকে পুত্রদ্বয়ের কাহিনী বিশুদ্ধ ও বাস্তব ঘটনা অনুযায়ী শুনিয়ে দিন। এতে بِالْحَقِّ শব্দ দ্বারা ঐতিহাসিক ঘঠনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনায় খুবই সাবধানতা প্রয়োজন এবং এতে কোনরূপ মিথ্যা জালিয়াতি ও প্রতারণার মিশ্রণ না থাকা চাই এবং প্রকৃত ঘটনা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত না হওয়া চাই।—(ইবনে কাসীর) কোরআন পাক শুধু এখানেই নয়, বরং অন্যান্য জায়গায়ও এ মূলনীতি অনুসরণ-অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

এছাড়া এ শব্দ দ্বারা কোরআন পাকের সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাহ্যতঃ নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও হাজারো বছর পূর্বেকার ঘটনাবলী যেভাবে বিশুদ্ধ ও সত্য সত্য বর্ণনা করেছেন, তার কারণ খোদায়ী ওহী ও নবুওয়ত ছাড়া আর কি হতে পারে?

এ ভূমিকার পর কোরআন পাক পুত্রদ্বয়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেঃ

اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ

আভিধানিক দিক দিয়ে যে বস্তু কারও নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে 'কোরবান' বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় কোরবান ঐ জন্তুকে বলে যাকে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশে যবেহ করা হয়।

হযরত আদম আলাইহিস সালামের পুত্রদ্বয়ের কোরবানীর ঘটনাটি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর একে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সর্বস্তরের আলেমদের সর্বসম্মত উক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন। ঘটনাটি এই ঃ যখন আদম ও হাওয়া (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন প্রতি গর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা—এরূপ যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করত। তখন ভ্রাতা-ভগিনী ছাড়া হযরত আদমের আর কোন সন্তান ছিল না। অথচ ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তাআলা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে আদম (আঃ)-এর শরীয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা-ভগিনী গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্যে প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারিনী কন্যা সহোদরা ভগিনী গণ্য হবে না। তাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে।

কিন্তু ঘটনাচক্রে কাবিলের সহজাত সহোদরা ভগিনীটি ছিল পরমাসুন্দরী এবং হাবিলের সহজাত কন্যাটি ছিল কুশ্রী ও কদাকার। বিবাহের সময় হলে নিয়মানুযায়ী হাবিলের সহজাত কুশ্রী কন্যা কাবিলের ভাগে পড়ল। এতে কাবিল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবিলের শত্রু হয়ে গেল। সে জেদ ধরল যে, আমার সহজাত ভগিনীকেই আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। হযরত আদম (আঃ) তাঁর শরীয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের আব্দার প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তিনি হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশে বললেন ঃ তোমরা উভয়েই আল্লাহ্র জন্যে নিজ নিজ কোরবানী পেশ কর। যার কোরবানী পরিগৃহিত হবে, সেই কন্যার পানিগ্রহণ করবে। হযরত আদম আলাইহিস সালামের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যে সত্য পথে আছে, তার কোরবানীই গৃহীত হবে।

তৎকালে কোরবানী গৃহিত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে কোরবানীকে ভস্মিভূত করে আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কোরবানী অগ্নি ভস্মিভূত করত না, তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হত।

হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশু পালন করত। সে একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা কোরবানী করল। কাবিল কৃষিকাজ করত। সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি কোরবানীর জন্যে পেশ করল। অতঃপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কোরবানীটি ভস্মীভূত করে দিল এবং কাবিলের কোরবানী যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারল না এবং প্রকাশ্যে ভাইকে বলে দিল ঃ لَاَقْتُلَنَّكَ অর্থাৎ, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব।

হাবিল তখন ক্রোধের জওয়াবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত বাক্য উচ্চারণ করল। এতে কাবিলের প্রতি তার সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে উঠেছিল। সে বলল ঃ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার নিয়ম এই যে, তিনি খোদাভীরু পরহেজগারের কর্মই গ্রহণ করেন। তুমি খোদাভীতি অবলম্বন করলে তোমার কোরবানীও গৃহীত হত। তুমি তা করনি, তাই কোরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমার দোষ কি?

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ
قَتَلَ نَفْسًا ۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ
وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ
ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ۝٣٢ اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ
يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ
يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَ
لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝٣٣ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا
مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ۝٣٤ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا
اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ۝٣٥ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى
الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٣٦

(৩২) এ কারণেই আমি বনী-ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে। (৩৩) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্যে পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। (৩৪) কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, দয়ালু। (৩৫) হে মুমিনগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। (৩৬) যারা কাফের, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আরও তদনুরূপ সম্পদ থাকে আর এগুলো বিনিময়ে দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবুও তাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না। তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআনী আইনের অভিনব ও বৈপ্লবিক পদ্ধতি : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হত্যাকাণ্ড এবং তার গুরুতর অপরাধের কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে হত্যা, লুন্ঠন, ডাকাতি ও চুরির শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। ডাকাতি ও চুরির শাস্তির মাঝখানে খোদাভীতি ও এবাদতের মাধ্যমে খোদার নৈকট্য লাভের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কোরআন পাকের এ পদ্ধতি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি করে। মানব রচিত দণ্ডবিধির মত কোরআন পাক শুধু অপরাধ ও শাস্তি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির সাথে খোদাভীতি ও পরকাল কল্পনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও গোনাহ্ থেকে পবিত্র করে দেয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, জনমনে আল্লাহ্ তাআলা ও আখেরাতের ভয় সৃষ্টি করা ছাড়া জগতের কোন আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কোরআন পাকের এই বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতিই জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে এবং এমন লোকদের একটি সমাজ গঠন করেছে, যারা পবিত্রতায় ফেরেশতাদের চাইতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

শরীয়তের শাস্তি তিন প্রকার : চুরি ও ডাকাতির শাস্তি এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতের তফসীর বর্ণনা করার পূর্বে এসব শাস্তি সম্পর্কে শরীয়তের পরিভাষার কিছুটা ব্যাখ্যা আবশ্যক। কেননা, এসব পরিভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক শিক্ষিত লোকের মনেও নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দেয়। জগতের সাধারণ আইনে অপরাধ সম্পর্কিত সব শাস্তিকেই 'দণ্ডবিধি' নামে অভিহিত করা হয়। 'ভারতীয় দণ্ডবিধি', 'বাংলাদেশ দণ্ডবিধি' ইত্যাদি নামে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সর্বপ্রকার অপরাধ ও সব ধরনের শাস্তিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত এরূপ নয়। ইসলামী শরীয়তে অপরাধের শাস্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে : হুদুদ, কেছাছ ও তা'যীরাত। অর্থাৎ, দণ্ডবিধি। এগুলোর সংজ্ঞা ও অর্থ জানার পূর্বে প্রথমতঃ একথা জেনে নেয়া জরুরী যে, যেসব অপরাধের দরুন অন্য মানুষের কষ্ট অথবা ক্ষতি হয়, তাতে সৃষ্টজীবের প্রতিও অন্যায় করা হয় এবং স্রষ্টারও নাফরমানী করা হয়। তাই এ জাতীয় অপরাধে 'হক্কুল্লাহ্' (আল্লাহ্র হক) এবং 'হক্কুল আবদ' (বান্দার হক) উভয়টিই বিদ্যমান থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের কাছেই অপরাধী বলে বিবেচিত হয়।

কিন্তু কোন কোন অপরাধে বান্দার হক এবং কোন কোন অপরাধে আল্লাহ্র হক প্রবল থাকে এবং এ প্রাবল্যের উপর ভিত্তি করেই বিধি-বিধান রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : একথা জানা জরুরী যে, ইসলামী শরীয়ত বিশেষ বিশেষ অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি; বরং বিচারকের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্যে যেরূপ ও যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করবেন, ততটুকুই দেবেন। প্রত্যেক স্থান ও কালের ইসলামী সরকার যদি শরীয়তের রীতিনীতি বিবেচনা করে বিচারকদের ক্ষমতার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করে, তবে তাও জায়েয। বর্তমান শতাব্দীতে তাই হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় সব ইসলামী দেশে এ ব্যবস্থাই প্রচলিত রয়েছে।

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, যেসব অপরাধের কোন শাস্তি কোরআন ও সুন্নাহ্ নির্ধারণ করেনি, বরং বিচারকদের অভিমতের উপর ন্যস্ত করেছে, সেসব শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'তাযিরাত' তথা দণ্ড বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি কোরআন ও সুন্নাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেগুলো দু'রকম ঃ (এক) যেসব অপরাধে আল্লাহ্র হকের পরিমাণ প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে 'হদ' বলা হয়। আর 'হদ'-এরই বহুবচন 'হুদুদ'। (দুই) যেসব অপরাধে বান্দার হককে শরীয়তের বিচারে প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে বলা হয় 'কেছাছ'। কোরআন পাক হুদুদ ও কেছাছ পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছে। আর দণ্ডনীয় অপরাধের বিবরণকে রসূলের বর্ণনা ও সমকালীন বিচারকদের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে।

সারকথা, কোরআন পাক যেসব অপরাধের শাস্তিকে আল্লাহ্র হক হিসেবে নির্ধারণ করে জারি করেছে, সেসব শাস্তিকে 'হুদুদ' বলা হয় এবং যেসব শাস্তিকে বান্দার হক হিসেবে জারি করেছে, সেগুলোকে 'কেছাছ' বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেনি, সে জাতীয় শাস্তিকে বলা হয় 'তা'যীর' তথা 'দণ্ড'। শাস্তির এ প্রকার তিনটির বিধান অনেক বিষয়েই বিভিন্ন। যারা নিজেদের পরিভাষার ভিত্তিতে প্রত্যেক অপরাধের শাস্তিকে দণ্ড বলে এবং শরীয়তের পরিভাষাগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা শরীয়তের বিধি-বিধানে অনেক বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়।

দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘু থেকে লঘুতর, কঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। এব্যাপারে বিচারকদের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু হুদুদের বেলায় কোন সরকার, শাসনকর্তা অথবা বিচারকই সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর করার অধিকারী নয়। স্থান ও কাল ভেদেও এতে কোন পার্থক্য হয় না এবং কোন শাসক ও বিচারক তা ক্ষমাও করতে পারে না। শরীয়তে হুদূদ মাত্র পাঁচটি ঃ ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ- এ চারটির শাস্তি কোরআনে বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চমটি মদ্যপানের হদ। এটি সাহাবায়ে-কেরামের এজমা তথা ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। এভাবে মোট পাঁচটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত ও হুদূদরূপে চিহ্নিত হয়েছে। এসব শাস্তি যেমন কোন শাসক ও বিচারক ক্ষমা করতে পারে না, তেমনি তওবা করলেও ক্ষমা হয়ে যায় না। তবে খাঁটি তওবা দ্বারা আখেরাতের গোনাহ্ মাফ হয়ে সেখানকার হিসাব-কিতাব থেকে অব্যাহতি লাভ হতে পারে। তন্মধ্যে শুধু ডাকাতির শাস্তির বেলায় একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি গ্রেফতারীর পূর্বে তওবা করে এবং তার আচার-আচরণের দ্বারাও তওবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে সে হদ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতারীর পরবর্তী তওবা ধর্তব্য নয়। অন্যান্য হুদূদ তওবা দ্বারাও মাফ হয় না। এ তওবা গ্রেফতারীর পূর্বে হোক অথবা পরে। সব দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ শ্রবণ করা যায়; কিন্তু হুদুদের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা শ্রবণ করা দুই-ই নাজায়েয। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হুদুদের শাস্তি সাধারণতঃ কঠোর। এগুলো প্রয়োগ করার আইনও নির্মম। অর্থাৎ, কোন অবস্থাতেই তা পরিবর্তন ও লঘু করা যায় না এবং কেউ ক্ষমা করারও অধিকারী নয়। কিন্তু সাথে সাথে সামগ্রিক ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশে অপরাধ এবং অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলীও অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তাবলীর মধ্য থেকে যদি কোন একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ, অপরাধ প্রমাণে সামান্যতম সন্দেহ্ পাওয়া গেলেও হদ প্রয়োগ করা যায় না। এ ব্যাপারে শরীয়তের স্বীকৃত আইন হচ্ছে الحدود تندرئ بالشبهات অর্থাৎ, হুদূদ সামান্যতম সন্দেহের কারণেই অকেজো হয়ে পড়ে।

এ ক্ষেত্রে বুঝে নেয়া উচিত যে, কোন সন্দেহ্ অথবা কোন শর্তের অনুপস্থিতির কারণে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছাড়পত্র পেয়ে যাবে যার ফলে তার অপরাধ প্রবণতা আরও বেড়ে যাবে; বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে দণ্ডগত শাস্তি দেবেন। শরীয়তের দণ্ডগত শাস্তিসমূহ সাধারণতঃ দৈহিক ও আর্থিক। এগুলো দৃষ্টান্তমূলক হওয়ার কারণে অপরাধ দমনে খুবই কার্যকর। ধরুন, ব্যভিচার প্রমাণে মাত্র তিন জন সাক্ষী পাওয়া গেল এবং তারা সবাই নির্ভরযোগ্য ও মিথ্যার সন্দেহ থেকে মুক্ত। কিন্তু আইনানুযায়ী চতুর্থ সাক্ষী না থাকার কারণে হদ জারি করা যাবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি অথবা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, বরং বিচারক তাকে অন্য কোন উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করবেন, যা বেত্রাঘাতের আকারে হতে পারে।

তেমনিভাবে চুরি প্রমাণের জন্যে নির্ধারিত শর্তসমূহে কোন ত্রুটি অথবা সন্দেহ দেখা দেয়ার কারণে চোরের হাত কেটে দেয়া যাবে না বটে, কিন্তু এমতাবস্থায় সে সম্পূর্ণ মুক্তও হয়ে যাবে না; বরং তাকে অবস্থানুযায়ী অন্য দণ্ড দেয়া হবে।

কেছাছের শাস্তিও হুদূদের মত কোরআন পাকে নির্ধারিত। অর্থাৎ, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ সংহার করা হবে এবং জখমের বিনিময়ে সমান জখম করা হবে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, হুদূদকে আল্লাহ্র হক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও তা ক্ষমা হবে না এবং হদ অব্যবহার্য হবে না। উদাহরণতঃ যার অর্থ চুরি যায়, সে ক্ষমা করলেও চোরের নির্ধারিত শাস্তি অপ্রযোজ্য হবে না। কিন্তু কেছাছ এর বিপরীত। কেছাছে বান্দার হক প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে কেছাছ হিসেবে তাকে মৃত্যুদণ্ডও করাতে পারে। জখমের কেছাছও তদ্রূপ। পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, হুদূদ ও কেছাছ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি পেয়ে যাবে; বরং বিচারক দণ্ডমূলক শাস্তি যতটুকু উপযুক্ত মনে করবেন, দিতে পারবেন। কাজেই নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলে হত্যাকারীদের সাহস বেড়ে যাবে কিংবা ব্যাপক হারে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে—এরূপ আশঙ্কা করা ঠিক নয়। কেননা, হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করা ছিল নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য। সে তা ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু অপরাপর লোকদের প্রাণরক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার এ দায়িত্ব পালনের জন্য হত্যাকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অন্য কোন শাস্তি দিয়ে এ বিপদাশঙ্কা রোধ করতে পারে।

وَابْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ অর্থাৎ, আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণ কর। وسيلة শব্দটি وسل ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংযোগ স্থাপন করা। এ শব্দটি س،ص উভয় বর্ণে প্রায় একই অর্থে আসে। পার্থক্য এতটুকু যে, وصل এর অর্থ যে কোনরূপে সাক্ষাৎ করা ও সংযোগ করা এবং وسل এর অর্থ আগ্রহও সম্প্রীতি সহকারে সাক্ষাৎ করা।—(ছেহাহ্, জওহরী, মুফরাদাতুল-কোরআন) তাই وصلة ও وصيلة ঐ বস্তুকে বলে, যা দুই বস্তুর মধ্যে মিলন ও সংযোগ স্থাপন করে—তা আগ্রহ ও সম্প্রীতির মাধ্যমেই হোক অথবা অন্য কোন উপায়ে। পক্ষান্তরে وسيلة ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা

একজনকে অপরজনের সাথে আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সংযুক্ত করে দেয়।—(লিসানুল আরব, মুফরাদাতুল-কোরআন) وسيلة শব্দটির সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে হলে ঐ বস্তুকে বলা হবে, যা বান্দাকে আগ্রহ ও মহব্বত সহকারে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষী, ছাহাবী ও তাবেয়ীগণ এবাদত, নৈকট্য, ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা আয়াতে উল্লেখিত وسيلة শব্দের তফসীর করেছেন। হাকেমের বর্ণনা মতে হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বলেন, 'ওসীলা' শব্দ দ্বারা নৈকট্য ও আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। ইবনে জরীর হযরত আ'তা (রাহঃ), মুজাহিদ (রাহঃ) ও হাসান বসরী (রাহঃ) থেকে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত কাতাদাহ্ (রাহঃ) বলেন ঃ تقربوا اليه بطاعته والعمل بمايرضيه অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজ করে। অতএব, আয়াতের সারব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অন্বেষণ কর।

মুসনাদে-আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত এক ছহীহ্ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ জান্নাতের একটি উচ্চ স্তরের নাম 'ওসিলা'। এর উর্ধ্বে কোন স্তর নেই। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কর যেন তিনি এ স্তরটি আমাকে দান করেন।

মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যখন মুয়াযযিন আযান দেয়, তখন মুয়াযযিন যা বলে, তোমরাও তাই বল। এরপর দরূদ পাঠ কর এবং আমার জন্যে ওসীলার দোয়া কর।

এসব হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, ওসীলা জান্নাতের একটি স্তর, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট। আলোচ্য আয়াতে প্রত্যেক ঈমানদারকে ওসীলা অন্বেষণের নির্দেশ বাহ্যতঃ এর পরিপন্থী। উত্তর এই যে, হেদায়াতের সর্বোচ্চ স্থান যেমন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরগুলো সব মুমিনই প্রাপ্ত হবে, তেমনি ওসীলার সর্বোচ্চ স্তর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লাভ করবেন এবং এর নিম্নের স্তরগুলো মুমিনরা প্রাপ্ত হবে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী তাঁর 'মকতুবাত' গ্রন্থে এবং কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী তফসীরে মাযহারীতে বর্ণনা করেন যে, ওসীলা শব্দটিতে প্রেম ও আগ্রহের অর্থ সংযুক্ত থাকায় বোঝা যায় যে, ওসীলার স্তরসমূহের উন্নতি আল্লাহ্ ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহব্বতের উপর নির্ভরশীল। মহব্বত সৃষ্টি হয় সুন্নতের অনুসরণের দ্বারা।

কেননা, কোরআন বলে ঃ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (আমার অনুসরণ কর,তবেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন।) তাই এবাদত, লেন-দেন, চরিত্র, সামাজিকতা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে সুন্নতের যত বেশী অনুসরণ করবে, আল্লাহ্‌র মহব্বত সে ততবেশী অর্জন করতে পারবে এবং আল্লাহ্‌র প্রিয়জনে পরিণত হবে। মহব্বত যতবেশী বৃদ্ধি পাবে, নৈকট্যও ততবেশী অর্জিত হবে।

ওসীলা শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা এবং ছাহাবী ও তাবেয়ীগণের তফসীর থেকে জানা গেল যে, যে বস্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়, তাই মানুষের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়ার ওসীলা। ঈমান ও সৎকর্ম যেমন এর অন্তর্ভুক্ত তেমনি পয়গম্বর ও সৎকর্মীদের সংসর্গ এবং মহব্বতও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এগুলোও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভেরই উপায়। এ কারণেই তাঁদেরকে ওসীলা করে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করা জায়েয। দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্বাসকে ওসীলা করে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করেছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা সে দোয়া কবুল করেছিলেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং জনৈক অন্ধ ছাহাবীকে এভাবে দোয়া করতে বলেছিলেন ঃ

(আল্লাহ্, আমি রহমতের নবী মুহাম্মদের ওসীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি)।— (মানার)

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ
مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ
يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن
يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا
يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا
آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ
هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ
يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۖ يَقُولُونَ
إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ
وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ
فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

(৩৭) তারা দোযখের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না। তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। (৩৮) যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। (৩৯) অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৪০) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্র নিমিত্তেই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য! তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (৪১) হে রসূল, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়; যারা মুখে বলেঃ আমরা মুসলমান, অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং যারা ইহুদী; মিথ্যা বলার জন্যে তারা গুপ্তচর বৃত্তি করে। তারা অন্যদলের গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলেঃ যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবে কবুল করে নিও এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকো। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্যে আল্লাহ্র কাছে আপনি কিছু করতে পারবেন না। এরা এমনিই যে, আল্লাহ্ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সম্পর্কে প্রথমে দেখা দরকার যে, কোরআন পাক মাত্র চারটি অপরাধের শাস্তি স্বয়ং নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করেছে। শরীয়তের পরিভাষায় এগুলোকে 'হদ' বলা হয়। ডাকাতির শাস্তি ডান হাত বা বাম পা কর্তন করা, চুরির শাস্তি ডান হাত গিঁঠ থেকে কর্তন করা, ব্যভিচারের শাস্তি কোন কোন অবস্থায় একশ' বেত্রাঘাত এবং কোন কোন অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা এবং ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত। পঞ্চম 'হদ' মদ্যপানের শাস্তি ছাহাবীদের ঐকমত্যে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত হয়েছে। এ পাঁচটি ছাড়া সব অপরাধের সাজা বিচারকের বিবেচনাধীন; তিনি অপরাধ, অপরাধী এবং পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে যেরূপ ও যতটুকু শাস্তি উপযুক্ত মনে করবেন, দেবেন। এ ব্যাপারে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শক্রমে শাস্তির সীমা নির্ধারণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করাও জায়েয। যেমন, আজকাল এসেম্বলীর মাধ্যমে দণ্ডবিধি নির্ধারণ করা হয় এবং বিচারক ও জজগণ নির্ধারিত দণ্ডবিধির অধীনে মামলা-মোকদ্দমায় রায় দেন। তবে কোরআন ও ইজমা দ্বারা নির্ধারিত উপরোক্ত পাঁচটি অপরাধের শাস্তি পরিবর্তন করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা এসেম্বলীর নেই। কিন্তু এ পাঁচটির ক্ষেত্রেও যদি শরীয়তের নির্ধারিত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা অপরাধ প্রমাণিত না হয় কিংবা অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর যেসব শর্তের অধীনে 'হদ' জারি করা হয়, সেগুলো পূরণ না হয়, তবে হদ জারি করা হবে না,বরং অন্য কোন দণ্ড দেয়া হবে। এতদসঙ্গে এ নীতিটিও স্বীকৃত যে, সন্দেহের সুযোগ অপরাধীরা ভোগ করতে পারবে। অপরাধ প্রমাণে কিংবা অপরাধের শর্তাবলীর মধ্য থেকে কোন একটিতে সন্দেহ দেখা দিলে হদ অব্যবহার্য হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শুধু অপরাধ প্রমাণিত হলেই সাধারণ দণ্ড দেয়া হবে।

এতে বোঝা গেল যে, উপরোক্ত পাঁচটি অপরাধের মধ্যে অনেক অবস্থায় হদ প্রয়োগ করা যাবে না, বরং বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী সাধারণ দণ্ডই দেয়া হবে। সাধারণ দণ্ড শরীয়ত নির্ধারণ করেনি। কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সাধারণ আইনের অনুরূপ এগুলো পরিবর্তন ও কমবেশী করা যায়। কাজেই এগুলোর ব্যাপারে কারও আপত্তি করার অবকাশ নেই। এখন আলোচ্য বিষয় থেকে যাবে শুধু এ পাঁচটি অপরাধের শাস্তি এবং এগুলোর বিশেষ বিশেষ অবস্থা। উদাহরণতঃ চুরিই ধরুন এবং দেখুন যে, ইসলামে হস্ত কর্তনের শাস্তি সব চুরির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং যে চুরির কারণে চোরের হাত কাটা হয়, তার একটা বিশেষ সংজ্ঞা আছে। এর ব্যাখ্যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, অন্যের মাল হেফাযতের জায়গা থেকে বিনানুমতিতে গোপনে নিয়ে যাওয়াকেই সংজ্ঞাদৃষ্টে ও সাধারণ পরিভাষায় চুরি বলা হয়—এরূপ।

আলোচ্য তিনখানি আয়াত এবং তৎপরবর্তী কতিপয় আয়াত যেসব কারণ ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় তার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই ইহুদীরা কখনও স্বজন-প্রীতির বশবর্তী হয়ে এবং কখনও নাম-যশ ও অর্থের লোভে ফতোয়া প্রার্থীদের মনমত ফতোয়া তৈরী করে দিত। বিশেষতঃ অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে এটিই ছিল তাদের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি। কোন বড়লোক অপরাধ করলে তারা তওরাতের গুরুতর শাস্তিকে লঘু শাস্তিতে পরিবর্তন করে দিত। তাদের এ অবস্থাটিই আয়াতের এ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে— يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মদীনায় হিজরত

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ
شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا
حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ
بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ
يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَ
الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ
اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ
وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ
اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ
فِيْهَاۤ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ
بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ
قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ
لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

(৪২) এরা মিথ্যা বলার জন্যে গুপ্তচরবৃত্তি করে, হারাম ভক্ষণ করে। অতএব, তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে লির্লিপ্ত থাকুন। যদি তাদের থেকে লির্লিপ্ত থাকেন, তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে। যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। (৪৩) তারা আপনাকে কেমন করে বিচারক নিয়োগ করবে অথচ তাদের কাছে তওরাত রয়েছে। তাতে আল্লাহ্র নির্দেশ আছে। অতঃপর এরা পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা কখনও বিশ্বাসী নয়। (৪৪) আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ খোদায়ী গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করো না। যেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের। (৪৫) আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময় সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ্ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালেম।

করলেন এবং ইসলামের অভূতপূর্ব জীবন ব্যবস্থা ইহুদীদের সামনে এল, তখন তারা একে একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইল। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় একদিকে যেমন অনেক নমনীয়তা ছিল, অন্যদিকে তেমনি অপরাধ-দমনের জন্যে একটি যুক্তিযুক্ত বিধি-ব্যবস্থাও ছিল। যেসব ইহুদী তওরাতের কঠোর শাস্তিসমূহকে পরিবর্তন করে সহজ করে নিত, তারা এ জাতীয় মোকদ্দমায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বিচারক নিযুক্ত করতে প্রয়াস পেত—যাতে একদিকে ইসলামের সহজ ও নরম বিধি-বিধান দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং অন্যদিকে তওরাত পরিবর্তন করার অপরাধ থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেও তারা একটি দুষ্কৃতির আশ্রয় নিত। তা এই যে, নিয়মিত বিচারক নিযুক্ত করার পূর্বে কোন না কোন পন্থায় মোকদ্দমার রায় ফতোয়া হিসাবে জেনে নিতে। চাইত উদ্দেশ্য, এ রায় তাদের আকাঙ্ক্ষিত রায়ের অনুরূপ হলে বিচারক নিযুক্ত করবে, অন্যথায় নয়। এ সম্পর্কে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যথেষ্ট মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন। তাই আয়াতের প্রারম্ভেই তাঁকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। এর পরিণাম আপনার জন্যে শুভই হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

অতঃপর আয়াতে অবহিত করে দেয়া হয়েছে যে, তারা আন্তরিকতার সাথে আপনাকে বিচারক নিযুক্ত করছে না। তাদের নিয়তে গোলমাল রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ক্ষমতা দিয়ে বলা হয়েছে যে, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের মোকদ্দমায় ফয়সালা করুন, নতুবা লির্লিপ্ত থাকুন। আরও বলা হয়েছে যে, আপনি যদি লির্লিপ্ত থাকতে চান, তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ আয়াতের বিষয়বস্তু তাই। পরের আয়াতে বলা হয়েছে যদি আপনি ফয়সালাই করতে চান, তবে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ফয়সালা করুন। অর্থাৎ, নিজ শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করুন। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবী হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে। কোরআনে যেসব আইন বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলো অবশ্য রহিত হয়নি। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্র আইনের বিরুদ্ধে অন্য কোন আইন, প্রথা ও প্রচলনের অধীনে মোকাদ্দমার রায় প্রদান করাকে অন্যায়, পাপাচার ও কুফর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদের মোকদ্দমা বিধি ঃ এখানে স্মর্তব্য যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) - এর আদালতে মোকদ্দমা দায়েরকারী ইহুদীরা, ইসলামে বিশ্বাসী ছিল না এবং মুসলমানদের অধীনস্ত যিম্মীও ছিল না। তবে তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -কে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন এবং ইচ্ছা করলে তাদের মোকদ্দমার শরীয়তানুযায়ী ফয়সালা করুন। কেননা, তাদের ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব ছিল না। তারা যিম্মী হলে এবং ইসলামী আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করলে তার ফয়সালা করা মুসলিম বিচারকের দায়িত্বে ফরয হত; লির্লিপ্ত থাকা জায়েয হত না ! কেননা, তাদের অধিকারের দেখাশোনা করা এবং অত্যাচার থেকে রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে মুসলমান ও যিম্মীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই; তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ অর্থাৎ, তারা আপনার কাছে মোকদ্দমা নিয়ে আসলে আপনি তার ফয়সালা শরীয়ত

অনুযায়ী করে দিন।

এ আয়াতে ক্ষমতা দেয়ার পরিবর্তে নির্দিষ্ট করে ফয়সালা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু বকর জাসসাস আহকামুল কোরআন গ্রন্থে উভয় আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন যে, যে আয়াতে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তা ঐসব অমুসলিমের সম্পর্কে, যারা আমাদের রাষ্ট্রের বাসিন্দা অথবা যিম্মী নয়, বরং নিজ দেশে বাস করে আমাদের সাথে কোন চুক্তি করেছে মাত্র। যেমন, বনী-কুরায়যা ও বনী-নুযায়ের। আর দ্বিতীয় আয়াত ঐসব অমুসলিমদের সম্পর্কে, যারা যিম্মী এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক।

এখন প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, উভয় আয়াতে অমুসলিমদের মোকদ্দমায় নিজ শরীয়তানুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাদের মনোবাঞ্ছার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, এ নির্দেশ ঐসব মোকদ্দমা সম্পর্কেই দেয়া হয়েছে, যা আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে-নুযুলে বর্ণিত হয়েছে। তম্মধ্যে একটি হচ্ছে হত্যার শাস্তি ও রক্ত-বিনিময়ের মোকদ্দমা ও অপরটি হচ্ছে ব্যভিচার সংক্রান্ত মোকদ্দমা। এ জাতীয় মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে একই নিয়ম। অর্থাৎ, সমগ্র দেশে একই আইন বলবৎ থাকে। একে সাধারণ আইন বলা হয়। সাধারণ আইনে শ্রেণী অথবা ধর্মের কারণে কোনরূপ পার্থক্য হয় না। উদাহরণতঃ চুরির শাস্তি হস্ত কর্তন শুধু মুসলমানদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, বরং দেশের যে কোন বাসিন্দার বেলায় এ শাস্তিই প্রযোজ্য। এমনিভাবে হত্যা ও ব্যভিচারের শাস্তিও সবার বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু অমুসলমানদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় ব্যাপারাদির ফয়সালাও যে ইসলামী আইন অনুযায়ী করতে হবে এমনটি জরুরী নয়।

স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদ্যপান ও শূকরের মাংস মুসলমানদের জন্যে হারাম করে তার শাস্তিও নির্ধারিত করেছিলেন, কিন্তু অমুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি অমুসলমানদের বিবাহ-শাদী ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করেননি। তাদের ধর্ম অনুযায়ী যে বিবাহ শুদ্ধ ছিল, তিনি তাই বহাল রেখেছিলেন।

হিজরের অগ্নি পূজারী এবং নাজরান ও ওয়াদিয়ে কুরার ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী ছিল। মহানবী (সাঃ) জানতেন যে, অগ্নি-উপাসকদের ধর্মে মা ও ভগিনীকেও বিয়ে করা হালাল। এমনিভাবে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মমতে ইদ্দত অতিবাহিত না করে এবং সাক্ষী ব্যতিরেকেও বিবাহ শুদ্ধ। কিন্তু তিনি কখনও তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করেননি, বরং তাদের বিবাহ-শাদীর বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছে।

মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী অমুসলিমদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় বিষয়াদির মীমাংসা তাদেরই ধর্মমতের উপর ছেড়ে দেয়া হবে। যদি এ সব ব্যাপারে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তবে তাদের ধর্মাবলম্বী বিচারক নিযুক্ত করে ফয়সালা করাতে হবে।

তবে যদি তারা মুসলমান বিচারকের নিকট উপস্থিত হয়ে উভয় পক্ষ তাঁর রায় মেনে নিতে সম্মত হয়, তবে মুসলমান বিচারক ইসলামী আইন অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। কেননা, তখন তিনিই উভয় পক্ষে নিযুক্ত বিচারকরূপে গণ্য হবেন। وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-কে ইসলামী আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে দেয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার এক কারণ হয় এই যে, মোকদ্দমাটিই সাধারণ আইনের—যাতে কোন সম্প্রদায়ই আওতা বহির্ভূত নয়, অথবা এর কারণ এই যে, উভয় পক্ষ স্বয়ং রসূলুল্লাহ্কে বিচারক স্বীকার করে ফয়সালার জন্যে আসে, এমতাবস্থায় তাঁর ফয়সালা তাই হবে, যার প্রতি তাঁর ঈমান রয়েছে এবং যা তাঁর শরীয়তের নির্দেশ। মোটকথা, আলোচ্য প্রথম আয়াতে প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে অতঃপর ইহুদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়েছে। يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ বাক্য থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে।

এতে এ রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) – এর কাছে যে প্রতিনিধি দলটি আগমন করেছিল, তারা সবাই ছিল মুনাফেক। ইহুদীদের সাথে এদের গোপন যোগ-সাজশ রয়েছে এবং এরা তাদেরই প্রেরিত। এরপর প্রতিনিধিদলের কতিপয় বদভ্যাস বর্ণনা করে মুসলমানদের হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এগুলো কাফেরসুলভ অভ্যাস। এগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত।

ইহুদীদের একটি বদভ্যাস ঃ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ অর্থাৎ, তারা মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনাতে অভ্যস্ত। তারা আলেম বলে কথিত বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদেরই অন্ধ অনুসারী। তওরাতের নির্দেশাবলীর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ দেখা সত্ত্বেও তারা তাদেরই অনুসরণ করে এবং তাদের বর্ণিত মিথ্যা ও অমূলক কেচ্ছা-কাহিনীই শুনতে থাকে।

আলেমদের অনুসরণ করার বিধি ঃ যারা তওরাত পরিবর্তন করে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশাবলীতে মিথ্যা বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করে, আয়াতে তাদেরকে লক্ষ্য করে যেমন শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, তেমনি ঐসব লোককেও অপরাধী বলা হয়েছে যারা তাদেরকে অনুসরণযোগ্য সাব্যস্ত করে মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এতে মুসলমানদের জন্যেও একটি মৌলিক নির্দেশ রয়েছে যে, আলেমদের কাছ থেকে ফাতোয়া নেয়ার পূর্বে তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া দরকার। অজ্ঞ জনগণের ধর্ম-কর্ম করার একমাত্র পথ হচ্ছে আলেমদের ফতোয়া ও শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করা। রুগ্ন ব্যক্তি কোন ডাক্তার অথবা হাকীমের কাছে যাওয়ার পূর্বে পরিচিতদের কাছে খোঁজ নেয় যে, এ রোগের জন্যে কোন্ ডাক্তার পারদর্শী, কোন্ হাকীম বেশী ভাল, তার কি কি ডিগ্রী আছে, তার চিকিৎসাধীন রোগীদের পরিণাম কি, যথাসম্ভব খোঁজ-খবর নেয়ার পরও যদি সে কোন ভ্রান্ত ডাক্তার অথবা হাকীমের ফাঁদে পড়ে যায়, তবে বিজ্ঞজনদের দৃষ্টিতে সে নিন্দার পাত্র নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনরূপ খোঁজ-খবর না নিয়েই কোন হাতুড়ে ডাক্তারের ফাঁদে পড়ে এবং পরিণামে অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয়ই নষ্ট করে, বিজ্ঞজনদের মতে তার আত্মহত্যার জন্যে সে নিজেই দায়ী হয়।

জনগণের ধর্মকর্মের অবস্থাও তাই। যদি তারা এলাকার বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে কোন আলেমের অনুসরণ করে এবং তার ফতোয়া অনুযায়ী আমল করে, তবে তারা মানুষের কাছেও ক্ষমাযোগ্য হবে এবং আল্লাহ্র কাছেও। এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, فان اثمه على من افتى – অর্থাৎ, এমতাবস্থায় আলেম ও মুফতী ভুল করলে এবং কোন মুসলমান তার ভুল ফতোয়া অনুযায়ী কাজ করলে, তার গোনাহ্ তার উপর নয়— বরং আলেম ও মুফতীর উপরই বর্তাবে, যদি সে জেনেশুনে ভুল করে কিংবা সম্ভাব্য চিন্তা-ভাবনায় ত্রুটি করে অথবা প্রকৃতপক্ষে সে আলেম না হয়েও যদি জনগণকে ধোঁকা দিয়ে আলেমের পদ দখল করে বসে থাকে।

কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর না নিয়ে শুধু নিজ মতে কোন আলেমের অনুসরণ করে এবং তার উক্তি অনুযায়ী কাজ করে

অথচ সংশ্লিষ্ট আলেম অনুসরণের যোগ্য না হয়, তবে এর গোনাহ্ একা তথাকথিত আলেম ব্যক্তিই বহন করবে না, বরং অনুসরণকারীও সমান অপরাধী হবে। এমন লোকদের সম্পর্কেই কোরআন বলেছে سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ -অর্থাৎ, তারা মিথ্যা কথা শোনায় অত্যন্ত অভ্যস্ত এবং স্বীয় অনুসৃতদের এল্‌ম, আমল ও ধার্মিকতার খোঁজ-খবর না নিয়েই তাদের অনুসরণে লিপ্ত।

কোরআন পাক ইহুদীদের এ অবস্থা বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে শুনিয়েছে যেন তারা এ দোষ থেকে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মুসলমানরা এ ব্যাপারে উদাসীন। এ উদাসীনতাই আজকাল মুসলমানদের চরম দুরবস্থার অন্যতম কারণ। অথচ তারা বৈষয়িক ব্যাপারাদিতে খুবই হুশিয়ার, কর্মচঞ্চল ও সুচতুর। অসুস্থ হলে অধিকতর যোগ্য ডাক্তার-বৈদ্য খোঁজ করে, মোকদ্দমা হলে নামীদামী উকিল-ব্যারিষ্টার নিয়োগ করে এবং গৃহ নির্মাণ করতে হলে উৎকৃষ্টতর স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ারের শরণাপন্ন হয়, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে এতই উদার যে, কারও দাড়ি-কোর্তা দেখে এবং কিছু কথাবার্তা শুনেই তাকে অনুসরণযোগ্য আলেম, মুফতী ও পথপ্রদর্শক বলে নির্বাচন করে নেয়। সে নিয়মিত কোন মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছে কি না, বিশেষজ্ঞদের সংসর্গে থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছে কি না, শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে কি না, সাচ্চা বুযুর্গ ও আল্লাহ্ ভক্তদের সংসর্গে থেকে কিছু আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করেছে কি না ইত্যাদি বিষয়ের খবর নেয়ারও প্রয়োজন মনে করে না।

এর ফলশ্রুতি এই যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্ম-কর্মে মনোযোগী, তাদের একটি বিরাট অংশ মুর্খ ওয়ায়েজ ও ব্যবসায়ী পীরের ফাঁদে পড়ে বিশুদ্ধ ধর্মপথ থেকে দূরে পড়ে যায়। তাদের ধর্মীয় জ্ঞান এমন কতিপয় কেচ্ছা-কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা রৈপিক কামনা-বাসনার পরিপন্থী নয়। তারা ধর্মপথে চলছে এবং বিরাট এবাদত করছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, কিন্তু কোরআনের ভাষায় তাদের স্বরূপ হচ্ছে এই ঃ

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا

অর্থাৎ, তারা এমন, যাদের চেষ্টা-চরিত্র ও কাজ-কর্ম পার্থিব জীবনেই লুপ্ত প্রায়, অথচ তারা মনে করছে যে, চমৎকার ধর্ম-কর্ম করে যাচ্ছে।

মোটকথা এই যে, কোরআন পাক سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ বাক্যে মুনাফেক ইহুদীদের অবস্থা বর্ণনা করে একটি বিরাট মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ, মূর্খ জনগণের পক্ষে আলেমদের অনুসরণ করা অপরিহার্য বটে, কিন্তু যথার্থ খোঁজ-খবর না নিয়ে কোন আলেমের অনুসরণ করা ঠিক নয় এবং অজ্ঞ লোকদের মুখে মিছামিছি কথাবার্তা শোনায় অভ্যস্ত হওয়া উচিত নয়।

ইহুদীদের দ্বিতীয় বদভ্যাস ঃ উপরোক্ত মুনাফেকদের দ্বিতীয় বদভ্যাস হচ্ছে سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَاْتُوْكَ – অর্থাৎ, এরা বাহ্যত ঃ আপনার কাছে একটি ধর্মীয় বিষয় জিজ্ঞেস করতে এসেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং ধর্মীয় বিষয় জানার জন্যও আসেনি। বরং তারা এমন একটি ইহুদী সম্প্রদায়ের গুপ্তচর, যারা অহংকারবশতঃ নিজে আপনার কাছে আসেনি। তাদের বাসনা অনুযায়ী এরা শুধু ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে আপনার মতবাদ জেনে তাদেরকে বলে দিতে চায়। এরপর মানা না মানা সম্পর্কে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে। এতে মুসলমানদের জন্যে হুশিয়ারী রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ জানা ও তা অনুসরণ করার নিয়তেই আলেমদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা কর্তব্য। নিজ প্রবৃত্তির অনুকূলে নির্দেশ অনুসন্ধান করার নিয়তে মুফতীদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা রিপু ও শয়তানের অনুসরণ বৈ কিছু নয়। এ থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

ইহুদীদের তৃতীয় বদভ্যাস ঐশী গ্রন্থের বিকৃতিসাধন ঃ ইহুদীরা আল্লাহ্‌র কালামকে যথার্থ পরিবেশ থেকে সরিয়ে তার ভুল অর্থ করত এবং খোদায়ী নির্দেশকে বিকৃত করত। এ বিকৃতি ছিল দ্বিবিধ ঃ তওরাতের ভাষায় কিছু হেরফের করা এবং ভাষা ঠিক রেখে তদস্থলে অযৌক্তিক ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন করা। ইহুদীরা উভয় প্রকার বিকৃতিতেই অভ্যস্ত ছিল।

এতে মুসলমানদের জন্যেও একটি হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। কোরআন পাকের হেফাযতের দায়ীত্ব আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং হাতে রেখেছেন। এতে শাব্দিক পরিবর্তনের দুঃসাহস কেউ করতে পারবে না। কেননা, লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও লাখো মানুষের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত কালামে কেউ যের-যবরের পরিবর্তন করতেই ধরা পড়ে যায়। অর্থগত পরিবর্তন বাহ্যতঃ করা যায় এবং কেউ করেছেও। কিন্তু এর হেফাযতের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার গৃহীত ব্যবস্থা এই যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের কিয়ামত পর্যন্ত একটি সত্যপন্থী দল থাকবে, যারা হবে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বিশুদ্ধ অর্থের বাহক। তারা পরিবর্তনকারীদের রহস্য ফাঁস করে দেবে।

চতুর্থ বদভ্যাস উৎকোচ গ্রহণ ঃ দ্বিতীয় আয়াতে তাদের আরও একটি বদভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ – অর্থাৎ, তারা سحت (সুহ্‌ত) খাওয়ায় অভ্যস্ত। সুহ্‌তের শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুকে মূলোৎপাটিত করে ধ্বংস করে দেয়া। এ অর্থেই কোরআনে বলা হয়েছে ঃ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ অর্থাৎ, তোমরা কুকর্ম থেকে বিরত না হলে আল্লাহ্ তাআলা আযাব দ্বারা তোমাদের মূলোৎপাটন করে দিবেন। অর্থাৎ, তোমাদের মূল শিকড় ধ্বংস করে দেয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে 'সুহ্‌ত' বলে উৎকোচকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ), ইবরাহীম নখয়ী (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ), মুজাহিদ (রাঃ), কাতাদাহ্ (রাঃ) ও যাহ্‌হাক (রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

উৎকোচ বা ঘুষকে সুহ্‌ত বলার কারণ এই যে, এটি শুধু গ্রহিতাকেই ধ্বংস করে না, সমগ্র দেশ ও জাতিরও মূলোৎপাটন করে এবং জননিরাপত্তা ধ্বংস করে। যে দেশে অথবা যে বিভাগে ঘুষ চালু হয়ে পড়ে, সেখানে আইনও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অথচ আইনের উপরই দেশ ও জাতির শান্তি নির্ভরশীল। আইন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে কারও জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষিত থাকে না। তাই ইসলামে একে 'সুহ্‌ত' আখ্যা দিয়ে কঠোরতর হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঘুষের উৎসমুখ বন্ধ করার উদ্দেশে পদস্থ কর্মচারী ও শাসকদেরকে প্রদত্ত উপঢৌকনকেও ছহীহ্ হাদীসে ঘুষ বলে আখ্যায়িত করে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাত করেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রতিও, যে উভয়ের মধ্যে দালালী বা মধ্যস্থতা করে। – (জাস্‌সাস)

শরীয়তের পরিভাষায় ঘুষের সংজ্ঞা এই যে, যে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা আইনতঃ জায়েয নয় সে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা। উদাহরণতঃ যে কাজ করা কোন ব্যক্তির কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত, সে

কাজের জন্যে কোন পক্ষ থেকে বিনিময় গ্রহণ করাই ঘুষ। সরকারী অফিসার ও ক্লার্ক চাকরীর অধীনে স্বীয় কর্তব্য -কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য ; সে যদি সংশ্লিষ্ট কোন লোকের কাছ থেকে সে কাজের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করে, তবে তা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত। কন্যাকে পাত্রস্থ করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। তারা কারও কাছ থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করতে পারে না। এখন কোন পাত্রকে কন্যাদান করে তারা যদি কিছু গ্রহণ করে, তবে তাও ঘুষ। রোযা, নামায, হজ্ব, তেলাওয়াতে-কোরআন ইত্যাদি এবাদতও মুসলমানদের দায়িত্ব। এ জন্যে কারও কাছ থেকে বিনিময় নিলে তা ঘুষ হবে। অবশ্য পরবর্তী ফেকাহ্‌বিদদের ফতোয়া অনুযায়ী কোরআন শিক্ষা দান করা ও নামাযে ইমামতি করা এ থেকে আলাদা।

কেউ যদি ঘুষের বিনিময়ে ন্যায়সংগত কাজও করে দেয়, তবে সে গোনাহ্‌গার হবে এবং ঘুষের অর্থও তার পক্ষে হারাম হবে। পক্ষান্তরে যদি ঘুষ গ্রহণ করে কারও অন্যায় কাজ করে দেয়, সে উপরোক্ত গোনাহ্ ছাড়াও অধিকার হরণ এবং খোদায়ী নির্দেশে বিকৃতি সাধনের কঠোর অপরাধে অপরাধী হয়ে যায়। আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ অর্থাৎ, আমি তওরাত গ্রন্থ অবতারণ করেছি, যাতে সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন এবং একটি বিশেষ জ্যোতি ছিল। এ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আজ যে তওরাতের শরীয়তকে রহিত করা হচ্ছে, এতে করে তওরাতের কোনরূপ মর্যাদাহানি করা হচ্ছে না, বরং সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধি-বিধান পরিবর্তন করার তাগিদেই তা করা হচ্ছে। নতুবা তওরাতও আমারই প্রেরিত গ্রন্থ। এতে বনী-ইসরাঈলের জন্যে পথপ্রদর্শনের মূলনীতি রয়েছে এবং একটি বিশেষ জ্যোতিও রয়েছে, যা আধ্যাত্মিক পন্থায় তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ

অর্থাৎ, তওরাত অবতারণের কারণ ছিল এই যে, যত দিন তার শরীয়তকে রহিত করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত ভবিষ্যতে আগমনকারী পয়গম্বর, তাঁদের প্রতিনিধি আল্লাহ্ ওয়ালা ও আলেমগণ সবাই এ তওরাত অনুযায়ী ফয়সালা করবেন এবং এ আইনকেই জগতে প্রবর্তন করবেন। এ বাক্যে পয়গম্বরদের প্রতিনিধিবর্গকে দুই ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমভাগ ربانيون এবং দ্বিতীয়ভাগ احبار - ربانى শব্দটি رب এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ্ ওয়ালা (আল্লাহ্‌ভক্ত)। احبار শব্দটি حبر এর বহুবচন। ইহুদীদের বাকপদ্ধতিতে আলেমকে حبر বলা হত। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌ভক্ত ব্যক্তিমাত্রই আল্লাহ্‌র জরুরী বিধি-বিধান সম্পর্কে অবশ্যই আলেমও হবে। নতুবা এল্‌ম ব্যতীত আমল হতে পারে না এবং আমল ব্যতীত কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌ভক্ত হতে পারে না। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র কাছে সে ব্যক্তিই আলেম, যে এল্‌ম অনুযায়ী আমলও করে। পক্ষান্তরে যে আলেম খোদায়ী বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও জরুরী ফরয ও ওয়াজেবের আমল করে না, তার প্রতি কেউ চোখ তুলেও তাকায় না। সে আল্লাহ্ ও রসূলের দৃষ্টিতে মূর্খের চাইতেও অধম। অতএব, প্রত্যেক আল্লাহ্‌ভক্তই আলেম এবং প্রত্যেক আলেমই আল্লাহ্‌ভক্ত। কিন্তু আলোচ্য বাক্যে আল্লাহ্‌ভক্ত ও আলেমকে পৃথকভাবে উল্লেখ করে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, একটির জন্যে অপরটি জরুরী হলেও যার মধ্যে যে দিক প্রবল, সে অনুযায়ীই তার নাম রাখা হয়। যে ব্যক্তির মনোযোগ বেশীর ভাগ এবাদত, আমল ও যিকিরে নিবদ্ধ থাকে এবং যতটুকু দরকার ততটুকু এল্‌ম হাসিল করে ক্ষান্ত হয় তাকে 'রাব্বানী' অর্থাৎ, আল্লাহ্ ভক্ত বলা হয়। আধুনিক পরিভাষায় তাকে শায়খ, মুরশেদ, পীর ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করে জনগণকে শরীয়তের নির্দেশাবলী বর্ণনা করা ও শিক্ষা দেয়ার কাজে বেশীর ভাগ নিয়োজিত থাকে এবং ফরয, ওয়াজেব ও সুন্নতে-মুয়াক্কাদাহ ছাড়া অন্যান্য নফল এবাদতে বেশী সময় ব্যয় করে না তাকে حبر অথবা আলেম বলা হয়।

মোটকথা, এ বাক্যে শরীয়ত ও তরীকত এবং আলেম ও মাশায়েখের আসল একত্বও ব্যক্ত হয়েছে এবং কর্মপন্থা ও প্রধান বৃত্তির দিক দিয়ে তাদের পার্থক্যও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, আলেম ও ছুফী দু'টি সম্প্রদায় বা দু'টি দল নয়, বরং উভয়ের জীবনের লক্ষ্যই আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য। তবে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের কর্মপন্থা বাহ্যতঃ পৃথক বলে মনে হয়।

এরপর এরশাদ হয়েছে ঃ

بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ অর্থাৎ, এসব পয়গম্বর ও তাঁদের উভয় শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ আলেম ও মাশায়েখ তওরাতের নির্দেশাবলী প্রয়োগ করতে এ কারণে বাধ্য ছিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা তওরাতের হেফাযত তাঁদের দায়িত্বেই ন্যস্ত করেছিলেন এবং তাঁরা এ দায়িত্ব পালনের ওয়াদা-অঙ্গীকারও করেছিলেন।

এ পর্যন্ত বর্ণিত হল যে, তওরাত একটি ঐশী গ্রন্থ, পথ প্রদর্শক, জ্যোতি আর আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালাম ও তাদের সাচ্চা প্রতিনিধিবর্গ হচ্ছেন মাশায়েখ ও ওলামা এর হেফাযত করেছেন। অতঃপর বর্তমান যুগের ইহুদীদেরকে তাদের বক্রতা ও বক্রতার আসল কারণ সম্পর্কে অবহিত করে বলা হয়েছে ঃ তোমরা পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তওরাতের হেফাযত করার পরিবর্তে এর বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিয়েছ। তওরাতে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে শেষ নবী (সাঃ) - এর আগমনের সংবাদ এবং ইহুদীদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছিল, কিন্তু তারা এ নির্দেশের বিরোধিতা করে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে দেয়। আয়াতে তাদের এ মারাত্মক ভ্রান্তির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ পার্থিব নাম-যশ ও অর্থ লিপ্সাই তোমাদের এ বিরোধিতার কারণ। তোমরা রসূলে করীম (সাঃ)-কে সত্য নবী জেনেও তাঁর অনুসরণ করতে বিব্রত বোধ করছ। কারণ, এখন তোমরা স্বীয় সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় বলে গণ্য হও এবং ইহুদী জনগণ তোমাদের পিছনেই চলে। এমতাবস্থায় ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলে তোমাদের সর্দারী নষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়া বড়লোকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ঘুষ নিয়ে তওরাতের নির্দেশ সহজ করে দেয়াকে তারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এ সম্পর্কে হুশিয়ার করার জন্যে বর্তমান যুগের ইহুদীদেরকে বলা হয়েছে ঃ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا অর্থাৎ, তোমরা লোকদেরকে ভয় করো না যে, তারা তোমাদের অনুসরণ ত্যাগ করবে

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً
لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن
لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾ وَأَنزَلْنَا
إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا
أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

(৪৬) আমি তাদের পেছনে মরিয়ম তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাঁকে ইঞ্জীল প্রদান করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের, সত্যায়ন করে, পথ প্রদর্শন করে এবং এটি খোদাভীরুদের জন্যে হেদায়েত ও উপদেশবাণী। (৪৭) ইঞ্জীলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ্ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সলালা করা। যারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী। (৪৮) আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু এরূপ করেননি— যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব, দৌড়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে। (৪৯) আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন— যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ্ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের গোনাহ্র কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান। (৫০) তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ্ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?

অথবা শত্রু হয়ে যাবে। তাছাড়া দুনিয়ার নিকৃষ্ট অর্থকড়ি গ্রহণ করে তাদের জন্যে আল্লাহ্র নির্দেশও পরিবর্তন করো না। এতে করে তোমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়টিই বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ প্রেরিত বিধানকে জরুরী মনে করে না এবং তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, বরং এর বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা কাফের ও অবিশ্বাসী। এর শাস্তি জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব।

এরপর দ্বিতীয় আয়াতে তওরাতের বরাত দিয়ে কেছাছের বিধান বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ
بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

অর্থাৎ, আমি ইহুদীদের জন্যে তওরাতে এ বিধান অবতারণ করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং বিশেষ জখমেরও বিনিময় আছে।

বনী–কোরায়যা ও বনী–নুযায়রের একটি মোকদ্দমা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর এজলাসে উত্থাপিত হয়েছিল। বনী–নুযায়র গায়ের জোরে বনী – কোরায়যাকে বাধ্য করে রেখেছিল যে, বনী–নুযায়রের কোন ব্যক্তি যদি তাদের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নেয়া হবে এবং রক্ত–বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বনী–নুযায়রের কোন ব্যক্তি বনী–কোরায়যার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে শুধু কেছাছ নয়, রক্ত–বিনিময় দেয়া হবে তাও বনী–নুযায়রের রক্ত–বিনিময়ের অর্ধেক।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদের এ জাহেলিয়াতের মুখোস উম্মোচন করে দিয়েছেন যে, স্বয়ং তওরাতের কেছাছ ও রক্ত–বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমতার বিধান রয়েছে। তারা জেনেশুনে তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং শুধু বাহানাবাজির জন্যে নিজেদের মোকদ্দমা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর এজলাসে উপস্থিত করে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ – অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ প্রেরিত বিধান আনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালেম, খোদায়ী বিধানে অবিশ্বাসী এবং বিদ্রোহী। তৃতীয় আয়াতে প্রথমে হযরত ঈসা (সাঃ)–এর নবুওয়তপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে বার্ণিত হয়েছে যে, তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। এরপর ইঞ্জীল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটিও তওরাতের মতই হেদায়েত ও জ্যোতি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইঞ্জীলের অধিকারীদের ইঞ্জীলে অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা উচিত। যারা এ আইনের বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা অবাধ্য ও উদ্ধত।

কোরআন তওরাত ও ইঞ্জীলের সংরক্ষকঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে নবী করীম (সাঃ)–কে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ ''আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতারণ করেছি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জীলের সত্যায়ন

করে এবং এদের সংরক্ষকও বটে"। কারণ, যখন তওরাতের অধিকারীরা তওরাতে এবং ইঞ্জীলের অধিকারীরা ইঞ্জীলে পরিবর্তন সাধন করে, তখন কোরআনই তাদের পরিবর্তনের মুখোস উম্মোচন করে সংরক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রকৃত শিক্ষা আজও কোরআনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। অথচ এসব গ্রন্থের উত্তরাধিকারী এবং অনুসরণের দাবীদাররা এদের রূপ এমনভাবে বিগড়িয়ে দিয়েছে যে, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শেষাংশে মহানবী (সাঃ)-কে তওরাত ও ইঞ্জীলধারীদের অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ আপনার যাবতীয় নির্দেশ ও ফয়সালা আল্লাহ্ প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে। যারা আপনার দ্বারা স্বীয় বৈষয়িক কামনা-বাসনা অনুযায়ী ফয়সালা করাতে চায়, তাদের ষড়যন্ত্র থেকে হুশিয়ার থাকবেন। এরূপ বলার একটি বিশেষ কারণ ছিল এই যে, ইহুদীদের কতিপয় আলেম মহানবী (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, আপনি জানতেন, আমরা ইহুদীদের আলেম ও ধর্মীয় নেতা। আমরা মুসলমান হয়ে গেলে তারাও সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। তবে আমাদের একটি শর্ত আছে। তা হল এই যে, আপনার কওমের সাথে আমাদের একটি মোকদ্দমা রয়েছে আমরা মোকদ্দমাটি আপনার কাছে উত্থাপন করব। আপনি এর ফয়সালা আমাদের পক্ষে করে দিলে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। আল্লাহ্ তাআলা হুযুর (সাঃ)-কে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলছেন ঃ আপনি এদের মুসলমান হওয়ার প্রেক্ষিতে ন্যায়, সুবিচার ও আল্লাহ্ প্রেরিত আইনের বিপক্ষে কোন ফয়সালা দিবেন না এবং এরা মুসলমান হবে কি হবে না এ বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না।

পয়গম্বরদের বিভিন্ন শরীয়তের আংশিক প্রভেদ ও তার তাৎপর্য ঃ আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, সব আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই প্রেরিত এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ, ছহীফা ও শরীয়তসমূহও যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আগত, তখন এসব গ্রন্থ ও শরীয়তের মধ্যে প্রভেদ কেন এবং পরবর্তী গ্রন্থ ও শরীয়ত পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়তকে রহিত করে দেয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ও তাৎপর্য এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً

وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

অর্থাৎ, আমি তোমাদের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে একটি বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছি। এতে মূলনীতি অভিন্ন ও সর্বসম্মত হওয়া সত্ত্বেও শাখাগত নির্দেশসমূহে কিছু প্রভেদ আছে। যদি আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে একই উম্মত, একই জাতি এবং সবার জন্যে একই গ্রন্থ ও একই শরীয়ত নির্ধারণ করতে চাইতেন, তবে এরূপ করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা পছন্দ করেননি। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পরীক্ষা করা। তিনি যাচাই করতে চান যে, কারা এবাদতের স্বরূপ অবগত হয়ে নির্দেশ এলেই তা পালন করার জন্যে সর্বদা কান পেতে রাখে, নতুন গ্রন্থ ও নতুন শরীয়ত এলে তার অনুসরণে লেগে যায়, পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়ত প্রিয় হলেও এবং পৈতৃক ধর্ম হয়ে যাওয়ার কারণে তা বর্জন করা কঠিন হলেও কারা সর্বদা উন্মুখভাবে আনুগত্যের জন্যে প্রস্তুত থাকে। পক্ষান্তরে কারা এ সত্য বিস্মৃত হয়ে বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ গ্রন্থকেই সম্বল করে নেয় এবং পৈতৃক ধর্ম হিসেবে আঁকড়ে থাকে— এর বিপক্ষে খোদায়ী নির্দেশের প্রতিও কর্ণপাত করে না।

শরীয়তসমূহের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট রহস্য। এর মাধ্যমে প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক স্তরের মানুষকে এবাদত ও দাসত্বের এ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করা হয় যে, প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব, আনুগত্য ও অনুসরণকেই এবাদত বলা হয়। এ দাসত্ব ও আনুগত্য নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, যিকর ও তেলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে এগুলো উদ্দেশ্যও নয়, বরং এগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে খোদায়ী নির্দেশের আনুগত্য। একারণেই যে সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে সে সময়ে নামায পড়লে ছোয়াব তো দূরের কথা, উল্টো পাপের বোঝাই ভারী হয়। দুই ঈদসহ বছরে পাঁচদিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ। এসময়ে রোযা রাখা নিশ্চিত গোনাহ্। ৯ই যিলহজ্জ ছাড়া অন্য কোনদিন কোন মাসে আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হয়ে দোয়া ও এবাদত করা বিশেষভাবে কোন ছোয়াবের কাজ নয়। অথচ ৯ই যিলহজ্জ তারিখে এটি সর্ববৃহৎ এবাদত। অন্যান্য এবাদতের অবস্থাও তাই। যতক্ষণ তা করার নির্দেশ, ততক্ষণই তা এবাদত এবং যখন যেখানে নিষেধ করা হয়, তখন সেখানে তা হারাম ও না জায়েয হয়ে যায়। অজ্ঞ জনসাধারণ এ সত্য সম্পর্কে অবহিত নয়। যেসব এবাদত তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়, বরং যেসব জাতীয় প্রথাকে তারা এবাদত মনে করে পালন করতে থাকে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রকাশ্য নির্দেশের প্রতিও তারা কর্ণপাত করে না। এ ছিদ্রপথেই বেদআত ও মনগড়া আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়তে পরিবর্তন হওয়ার কারণও ছিল তাই। আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন পয়গম্বরের প্রতি বিভিন্ন গ্রন্থ ও শরীয়ত অবতারণ করে মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন একটি কাজ অথবা এক প্রকার এবাদতকে উদ্দেশ্য করে নেয়া ঠিক নয়, বরং বিশুদ্ধ অর্থে আল্লাহ্র অনুগত বান্দা হওয়া উচিত। আল্লাহ্ যখনই আগের কাজ বর্জন করার আদেশ দেন, তখনই তা বর্জন করা দরকার এবং যে কাজের নির্দেশ দেন, বিনা দ্বিধায় তা পালন করা কর্তব্য।

এ ছাড়া শরীয়তসমূহের বিভিন্নতার আর একটি বড় রহস্য এই যে, জগতের প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক স্তরের মানুষের মনমেজাজ ও স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন। কালের পরিবর্তন মানবস্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি সবার জন্যে শাখাগত বিধান এক করে দেয়া হয়, তবে মানুষ গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তাই খোদায়ী রহস্যের তাগিদে প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক মানুষের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাখাগত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। এখানে 'নাসিখ' (রদকারী আদেশ) ও 'মনসূখ' (রদকৃত আদেশ)-এর অর্থ এরূপ নয় যে, আদেশদাতা পূর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না বলে একটি আদেশ জারি করার ফলে যখন নতুন পরিস্থিতি সামনে এল, তখন অপর একটি আদেশ জারি করে একে রহিত করে দিলেন, অথবা পূর্বে অসাবধানতা ও ভ্রান্তিবশতঃ কোন নির্দেশ জারি করেছিলেন, পরে হুশিয়ার হয়ে তা পরিবর্তন করে দিলেন। বরং শরীয়তসমূহে নাসিখ ও মনসূখের অবস্থা একজন বিজ্ঞ হাকীম ও ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মত। ডাক্তার ব্যবস্থাপত্রে পর্যায়ক্রমে ঔষধ পরিবর্তন করে। তিনি পূর্ব থেকেই জানেন যে, তিন দিন এ ওষুধ প্রয়োগ করার পর রোগীর মধ্যে এরূপ অবস্থা দেখা দেবে, তখন অমুক ওষুধ সেবন করানো হবে। সুতরাং ডাক্তার যখন পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপত্র রহিত করে নতুন ব্যবস্থাপত্র দেন তখন এরূপ বলা ঠিক নয় যে, পূর্বের ব্যবস্থাপত্রটি ভুল ছিল বলেই রহিত করা হয়েছে। বরং আসল সত্য হচ্ছে এই যে, বিগত দিনগুলোতে সে ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরী ছিল এবং পরবর্তী পরিবর্তিত অবস্থায় পরবর্তী পরিবর্তিত এ ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরী।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى
قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن
تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ
فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ
لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٥٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ
يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ
فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ
ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ
وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَ
رَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾

(৫১) হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (৫২) বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে ঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন— ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে। (৫৩) মুসলমানরা বলবে ঃ এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহ্র নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি? তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে। (৫৪) হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহ্র অনুগ্রহ— তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। (৫৫) তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং মুমিনবৃন্দ— যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। (৫৬) আর যারা আল্লাহ্ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহ্র দল এবং তারাই বিজয়ী।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত স্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহের সারসংক্ষেপ ঃ (১) প্রাথমিক আয়াতসমূহের দ্বারা জানা যায় যে, ইহুদীদের দায়েরকৃত মোকদ্দমায় মহানবী (সাঃ) যে ফয়সালা দিয়েছিলেন, তা তওরাতের শরীয়তানুযায়ী ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিগত শরীয়তসমূহের বিধি-বিধানকে যদি কোরআন অথবা ওহী রহিত না করে, তবে তা যথারীতি বহাল থাকে। যেমন ইহুদীদের মোকদ্দমায় কেছাছের সমতা এবং ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তর বর্ষণে হত্যার নির্দেশ তওরাতে ছিল এবং অতঃপর কোরআনও তা হুবহু বহাল রেখেছে।

(২) দ্বিতীয় আয়াতে জখমের কেছাছ সম্পর্কিত বিধান তওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামেও এ বিধান রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জারি করেছেন। এ কারণেই আলেমদের মতে বিগত শরিয়তসমূহের যেসব বিধান কোরআন রহিত করেনি, সেগুলো আমাদের শরীয়তেও প্রযোজ্য এবং অনুসরণীয়। এর ভিত্তিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহে তওরাতের অনুসারীদেরকে তওরাত অনুযায়ী এবং ইঞ্জীলের অনুসারীদেরকে ইঞ্জীল অনুযায়ী ফয়সালা দেয়ার ও আমল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অথচ এ গ্রন্থদ্বয় ও তার শরীয়ত মহানবী (সাঃ)-এর আগমনের সাথে সাথেই রহিত হয়ে গেছে। উদ্দেশ এই যে, তওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব বিধান কোরআন রহিত করেনি, সেগুলোর আজও অনুসরণ করা জরুরী।

(৩) আল্লাহ্ প্রেরিত বিধি-বিধান সত্য নয়— এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এসব বিধানের বিরুদ্ধে ফয়সালা করা কুফর, কিন্তু সত্য বিশ্বাস করার পর যদি কার্যতঃ বিপরীত করা হয়, তবে তা অন্যায় ও পাপ।

(৪) ঘুষ গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় হারাম— বিশেষতঃ আইন বিভাগে ঘুষ গ্রহণ করা অধিকতর হারাম।

(৫) আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সব পয়গম্বর ও তাঁদের শরীয়ত মূলনীতির ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন, কিন্তু তাদের আংশিক ও শাখাগত বিধি-বিধান বিভিন্ন এবং এ বিভিন্নতা বিরাট রহস্যের উপর নির্ভরশীল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে সামঞ্জস্য ও গভীর বন্ধুত্ব না করে। সাধারণ অমুসলিম এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের রীতিও তাই। তারা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শুধু স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে; মুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে না।

এরপর যদি কোন মুসলমান এ নির্দেশ অমান্য করে কোন ইহুদী অথবা খ্রীষ্টানের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে সে ইসলামের দৃষ্টিতে সে সম্প্রদায়েরই লোক বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

তফসীরবিদ ইবনে জরীর ইকরিমা (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণনা করেন ঃ এ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় আগমনের পর পার্শ্ববর্তী ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেরা যুদ্ধ করবে না, বরং মুসলমানদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। এমনিভাবে মুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং কোন বহিরাক্রমণকারীর সাহায্য করবে না, বরং আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। কিছুদিন পর্যন্ত এ চুক্তি উভয় পক্ষেই বলবৎ থাকে, কিন্তু ইহুদীরা স্বভাবগত কুটিলতা ও ইসলাম

বিদ্বেষের কারণে বেশীদিন এ চুক্তি মেনে চলতে পারল না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরেকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে স্বীয় দুর্গে আহবান জানিয়ে পত্র লিখল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন। বনী-কুরায়যার এসব ইহুদী একদিকে মুশরকেদের সাথে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং অপরদিকে মুসলমানদের দলে অনুপ্রবেশ করে অনেক মুসলমানের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিল। এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরেকদের জন্যে গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। এ কারণে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদেরকে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করে দেয়া হয়, যাতে শত্রুরা মুসলমানদের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারে। তখন ওবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে চুক্তি বিলোপ ও অসহযোগের কথা ঘোষণা করেন। অপর পক্ষে কিছুসংখ্যক লোক, যারা কপট বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিংবা যারা তখনও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তারা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার মধ্যে সমূহ বিপদাশঙ্কা অনুভব করত। তারা চিন্তা করত, যদি মুশরেক ও ইহুদীদের চক্রান্ত সফল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়, তবে আমাদের প্রাণ রক্ষার একটা উপায় থাকা দরকার। কাজেই এদের সাথেও সম্পর্ক রাখা উচিত, যাতে তখন আমরা বিপদে না পড়ি। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলূল একারণেই বলল ঃ এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা আমার মতে বিপজ্জনক। তাই আমি তা করতে পারি না। এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ হল ঃ

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ
نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ

অর্থাৎ, অসহযোগের নির্দেশ শুনে যাদের অন্তরে কপটতাজনিত রোগ ছিল, তারা কাফের বন্ধুদের পানে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল এবং বলতে লাগল ঃ এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মধ্যে আমাদের জন্য বিপদাশঙ্কা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা এর উত্তরে বলেন ঃ

فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى
مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ

অর্থাৎ, এরা তো এ কল্পনাবিলাসে মত্ত যে, মুশরেক ও ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার সিদ্ধান্ত এই যে, এরূপ হবে না, বরং মক্কা বিজয় অতি সন্নিকটে অথবা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আল্লাহ তাআলা মুনাফেকদের মুখোস উন্মোচন করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। তখন তারা মনের লুক্কায়িত চিন্তাধারার জন্যে অনুতপ্ত হবে।

তৃতীয় আয়াতে এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, যখন মুনাফেকদের মুখোস উন্মোচিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বের দাবী ও শপথের স্বরূপ ফুটে উঠবে, তখন মুসলমানরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলবে ঃ এরাই কি আমাদের সাথে আল্লাহ্র নামে কঠোর শপথ করে বন্ধুত্বের দাবী করত ? আজ এদের সব লোক দেখানো ধর্মীয় কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে! আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা মক্কা বিজয় ও মুনাফেকদের লাঞ্ছনার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার বাস্তব চিত্র কিছুদিন পর সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের স্বার্থেই তাদেরকে অমুসলিমদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। নতুবা সত্যধর্ম ইসলামের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজেই গ্রহণ করেছেন। কোন ব্যক্তি কিংবা দলের বক্রতা ও অবাধ্যতা দূরের কথা, স্বয়ং মুসলমানদের কোন ব্যক্তি কিংবা দল যদি সত্যি সত্যি ইসলাম ত্যাগ করে বসে এবং সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগী হয়ে অমুসলিমদের সাথে হাত মিলায়, তবে এতেও ইসলামের কোনই ক্ষতি হবে না— হতে পারে না। কারণ, এর হেফাযতের দায়িত্ব সর্বশক্তিমানের। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য কোন জাতিকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন, যারা ইসলামের হেফাযত ও প্রচারের কর্তব্য সম্পাদন করবে। আল্লাহ্ তাআলার কাজ কোন ব্যক্তি, বিরাট দল অথবা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি যখন চান খড়-কুটাকেও কড়িকাঠের কাজে লাগাতে পারেন। অন্যথায় কড়ি-কাঠও পচে-গলে মাটি হতে থাকে।

এ আয়াতে যেখানে একথা বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা ধর্মত্যাগী হয়ে গেলে আল্লাহ্ তাআলা কোন জাতির অভ্যুত্থান ঘটাবেন, সেখানে সেই পুণ্যাত্মা জাতির কিছু গুণাবলীও বর্ণনা করেছেন। যারা ধর্মের কাজ করে, এ গুণগুলোর প্রতি তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, এসব গুণের অধিকারীরা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে প্রিয় ও মকবুল।

তাদের প্রথম গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ভালবাসবেন এবং তারা নিজেরাও আল্লাহ্ তাআলাকে ভালবাসবে। এ গুণটি দুই অংশে বিভক্ত ঃ (এক) আল্লাহ্র সাথে তাদের ভালবাসা। একে কোন না কোন স্তরে মানুষের ইচ্ছাধীন মনে করা যায়। কারও সাথে কারও স্বভাবজাত ভালবাসা না হলেও কমপক্ষে যৌক্তিক ভালবাসাকে স্বীয় ইচ্ছাধীন রাখতে পারে। এছাড়া স্বভাবজাত ভালবাসা যদিও ইচ্ছাধীন নয়, কিন্তু এর উপায়-উপকরণগুলো ইচ্ছাধীন। উদাহরণতঃ আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য, প্রতাপ, শক্তি-সামর্থ্য এবং মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অগণিত নেয়ামতরাজির ধ্যান ও কল্পনা অবশ্যম্ভাবীরূপে মানুষের মনে আল্লাহ্র প্রতি স্বভাবজাত ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়।

কিন্তু দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ, তাদের সাথে আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসার ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোন ভূমিকা নেই। যে বিষয়টি মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের বাইরে, তা মানুষকে শুনানোরও কোন বাহ্যিক সার্থকতা নেই।

কিন্তু কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াতের পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, এ ভালবাসার উপায়-উপকরণগুলোও মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ যদি এসব উপায়কে কাজে লাগায়, তবে তাদের সাথে আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা অবশ্যম্ভাবী। এসব উপায় নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ, হে রসূল, আপনি বলে দিন ঃ যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে ভালবাসতে থাকবেন।

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা লাভ করতে চায়, তার উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সুন্নত অনুসরণে অবিচল থাকা।

এমন করলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে ভালবাসবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, যে দল সুন্নতের অনুসরণ করে, শরীয়তের নির্দেশ পালনে ত্রুটি করে না এবং নিজেরা সুন্নত বিরোধী কাজ-কর্ম ও বেদআত প্রচার করে না, একমাত্র তারাই কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করতে সক্ষম।

'তারা মুসলমানদের সামনে নম্র হবে এবং কোন ব্যাপারে মতবিরোধ হলে সত্যপন্থী হওয়া সত্ত্বেও সহজে বশ হয়ে তারা ঝগড়া ত্যাগ করবে। এ অর্থেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

انا زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق

অর্থাৎ, আমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যস্থলে বাসস্থান দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করছি, যে সত্যপন্থী হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করে।

মোটকথা, তারা মুসলমানদের সাথে স্বীয় অধিকার ও কাজ-কারবারের ব্যাপারে কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদ রাখবে না। বাক্যের দ্বিতীয় অংশে اعزة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি عزيز এর বহুবচন। এর অর্থ প্রবল, শক্তিশালী ও কঠোর। উদ্দেশ্য এই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর ধর্মের শত্রুদের মোকাবিলায় কঠোর ও পরাক্রান্ত। শত্রুরা তাদেরকে সহজে কাবু করতে পারে না।

উভয় বাক্য একত্রিত করলে সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, তারা হবে এমন একটি জাতি, যাদের ভালবাসা ও শত্রুতা নিজ সত্তা ও সত্ত্বাগত অধিকারের পরিবর্তে শুধু আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও ধর্মের খাতিরে নিবেদিত প্রাণ হবে। এ কারণেই তাদের বন্দুকের নল আল্লাহ্ ও রসূলের অনুগতদের দিকে নয়; বরং তাঁর শত্রু ও অবাধ্যদের দিকে নিবদ্ধ থাকবে। সূরা ফাত্হে উল্লেখিত أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ আয়াতের বিষয়বস্তুও তাই।

প্রথম গুণের সারমর্ম ছিল অধিকারসমূহে পূর্ণতা এবং দ্বিতীয় গুণের সারমর্ম ছিল বান্দার অধিকার ও কাজ-কারবারের সমতা। তাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - অর্থাৎ, তারা সত্যধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জেহাদে প্রবৃত্ত হবে। এর সারমর্ম এই যে, কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করার জন্যে শুধু কতিপয় প্রচলিত এবাদত এবং নম্র ও কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দীপনাও থাকতে হবে। এ উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানের জন্যে চতুর্থ গুণ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করার চেষ্টায় তারা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনারই পরওয়া করবে না।

চিন্তা করলে বুঝা যাবে, যে কোন আন্দোলন পরিচালনার পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হয়ে থাকে। প্রথমতঃ বিরোধী শক্তির প্রবলতা এবং দ্বিতীয়তঃ আপন লোকদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা আন্দোলন পরিচালনায় দৃঢ়সংকল্প হয়ে অগ্রসর হয়, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না- জেল-জুলুম, জখম, হত্যা ইত্যাদি সবকিছুই অম্লানবদনে সহ্য করে নেয়। কিন্তু আপন লোকদের ভর্ৎসনা-বিদ্রূপ ও নিন্দাবাদের মুখে বড় বড় কর্মবীরদেরও পদস্খলন ঘটে। সম্ভবত ঃ একারণেই আল্লাহ্ তাআলা এখানে এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশে বলেছেন যে, তারা কারও ভর্ৎসনার পরওয়া'না করে স্বীয় জেহাদ অব্যহত রাখবে।

আয়াতের শেষাংশে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এসব গুণ ও উত্তম অভ্যাসসমূহ আল্লাহ্ তাআলারই দান। তিনিই যাকে ইচ্ছা এসব গুণ দ্বারা ভূষিত করেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ছাড়া মানুষ শুধু চেষ্টাচরিত্রের মাধ্যমে এগুলো অর্জন করতে পারে না।

আয়াতের শব্দসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু লোক ধর্মত্যাগী হয়ে গেলেও ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না, বরং ইসলামের হেফাযত ও সমর্থনের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা একটি উচ্চস্তরের চরিত্র ও আমলের অধিকারী দলকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন।

তফসীরবিদগণ বলেছেন ঃ এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে অনাগত গোলযোগকে প্রতিহতকারী দলের জন্যে একটি সুসংবাদ। অনাগত গোলযোগ হচ্ছে ধর্মত্যাগের সে হিড়িক, যার কিছু কিছু জীবাণু নবুওতের সর্বশেষ দিনগুলোতে পাখা বিস্তার করতে শুরু করেছিল এবং অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ওফাতের পর তা ঘূর্ণির আকারে সমগ্র আরব উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে সুসংবাদ লাভের অধিকারী হচ্ছে ছাহাবায়ে কেরামের সে দল, যারা প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ) - এর ডাকে বজ্রকঠোর দৃঢ়তার সাথে ধর্মত্যাগের এ হিড়িককে স্তব্ধ করে দেন।

ঘটনাগুলো ছিল এই ঃ সর্বপ্রথম মুসায়লামা কাযযাব মহানবী (সাঃ) - এর সাথে নবুওয়তে অংশিদারিত্বের দাবী করে। তার ধৃষ্টতা এত চরমে পৌছে যে, সে মহানবী (সাঃ) - এর দূতকে অপমান করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। সে দূতদেরকে হুমকি দিয়ে বলে ঃ যদি দূতদেরকে হত্যা করা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী না হত, তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। মুসায়লামা স্বীয় দাবীতে মিথ্যাবাদী ছিল। হুযুর (সাঃ) তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।

এমনিভাবে এয়ামনে মুযজাজ্ গোত্রের সর্দার আসওয়াদ আ'নাসী নবুওয়তের দাবী করে বসে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে দমন করার জন্যে এয়ামনে নিযুক্ত গভর্নরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু যে রাত্রে তাকে হত্যা করা হয়, তার আগের দিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওফাত পান। রবিউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে ছাহাবায়ে কেরামের কাছে এ সংবাদ পৌছে। বনী-আসাদ গোত্রেও এমনি ধরনের আরেক ঘটনা ঘটে। তাদের সর্দার তোলায়হা ইবনে খুওয়াইলেদ নবুওয়ত দাবী করে বসে।

উপরোক্ত তিনটি গোত্র হুযুরে আকরম (সাঃ) - এর রোগ শয্যায় থাকা অবস্থায়ই ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর তাঁর ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে সর্বত্র ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। আরবের সাতটি গোত্র বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে। তারা প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দীককে ইসলামী আইন অনুযায়ী যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে।

হুযুর (সাঃ)-এর ওফাতের পর দেশ ও জাতির দায়িত্ব প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ) এর কাঁধে অর্পিত হয়। একদিকে তাঁরা ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বিয়োগ ব্যথায় মুহ্যমান; অপরদিকে ছিল গোলযোগ ও বিদ্রোহের হিড়িক। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্র ওফাতের পর আমার পিতা হযরত আবুবকরের উপর যে বিপদের বোঝা পতিত হয়, তা কোন পাহাড়ের উপর পতিত হলে পাহাড়ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এমন দুর্জয় শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দান করেন যে, তিনি অমিত বিক্রমে সমস্ত আপদ-বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যান এবং সর্বশেষে সফলকাম হন।

এটা জানা কথা যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও বিদ্রোহের মোকাবিলা করা যায়, কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি এতই নাজুক ছিল যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) ছাহাবায়ে-কেরামের কাছে পরামর্শ চাইলে কেউ সে পরিস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মত দিলেন না। ছাহাবায়ে-কেরাম অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়লে বহিঃশক্তি এ নবীন ইসলামী দেশটির উপর চড়াও হয়ে পড়তে পারে এমন আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বীয় সিদ্দীকের অন্তরকে এ জেহাদের জন্যে পাথরের মত মজবুত করে দিলেন। তিনি ছাহাবায়ে-কেরামের সামনে এমন এক মর্মভেদী ভাষণ দিলেন, যার ফলে এ জেহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কারও মনে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট রইল না। তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় স্বীয় দৃঢ়তা ও অসম সাহসিকতা সবার সামনে তুলে ধরেন ঃ

"যারা মুসলমান হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদত্ত নির্দেশ ও ইসলামী আইনকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা আমার কর্তব্য। যদি আমার বিপক্ষে সব জিন-মানব ও বিশ্বের যাবতীয় বৃক্ষ-প্রস্তর একত্রিত করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেউ না থাকে, তবুও আমি একা এ জেহাদ চালিয়ে যাব।"

একথা বলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন ছাহাবায়ে কেরাম সামনে এগিয়ে এলেন এবং তাঁকে এক জায়গায় বসিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণের জন্য মানচিত্র তৈরী করে ফেললেন।

একারণেই হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) ও তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে যে জাতিকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে আনার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাঁরাই হলেন সর্বপ্রথম সে জাতি।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্য কোন দল আয়াতে কথিত জাতি হবে না; বরং অন্যদের বেলায়ও এ আয়াতটি প্রযোজ্য হতে পারে। যারা হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবায়ে-কেরামকে আয়াতের প্রতীক বলে আখ্যা দিয়েছেন, তাঁরাও এর বিরোধী নন। বরং নির্ভুল বক্তব্য এই যে, তাঁরা সবাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী যেসব মুসলমান কোরআনী নির্দেশ অনুযায়ী কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করবে, তাঁরাও এ আয়াতের লক্ষণভুক্ত। মোটকথা, ছাহাবায়ে-কেরামের একটি দল খলিফার নির্দেশে এ গোলযোগ দমনে তৈরী হয়ে গেলেন। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) – কে একটি বিরাট বাহিনীসহ মুসায়লামাকে দমন করার উদ্দেশে এয়ামামার দিকে প্রেরণ করা হল। সেখানে মুসায়লামার দল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছিল। তুমুল যুদ্ধের পর মুসায়লামা হযরত ওয়াহ্শী (রাঃ) – এর হাতে নিহত হল এবং তার দল তওবা করে পুনরায় মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে তোলায়হা ইবনে খুওয়াইলেদের মুকাবিলায়ও হযরত খালেদই (রাঃ) গমন করলেন। তোলায়হা পলায়ন করে দেশের বাইরে চলে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন এবং সে মুসলমান হয়ে ফিরে আসে।

সিদ্দীকী খেলাফতের প্রথম মাসে রবিউল আউয়ালের শেষ দিকে আসওয়াদ আনাছীর হত্যা ও তার গোত্রের বশ্যতা স্বীকারের সংবাদ মদীনায় পৌছে। এটিই ছিল সর্বপ্রথম বিজয়বার্তা, যা চরম সঙ্কট মুহূর্তে খলিফা লাভ করেছিলেন। এমনিভাবে অন্যান্য যাকাত অস্বীকারকারীদের মুকাবিলায় আল্লাহ তাআলা প্রতিটি রণাঙ্গনে ছাহাবায়ে-কেরামকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেন।

এভাবে তৃতীয় আয়াতের শেষভাগে উল্লেখিত فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (নিশ্চয় আল্লাহভক্তদের দলই বিজয়ী)। আল্লাহ তাআলার এ উক্তির বাস্তব ব্যাখ্যা পৃথিবীবাসী স্বচক্ষে দেখতে পায়। ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে যখন একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, মহানবী (সাঃ)– এর ওফাতের পর আরবে ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায় এবং এর মুকাবিলার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা যে জাতিকে কর্মক্ষেত্রে আনয়ন করেন, তাঁরা হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) ও তাঁর সহকর্মী সাহাবায়ে কেরাম, তখন এ আয়াত থেকেই একথাও প্রমাণিত হয় যে, এ দলের যেসব গুণ কোরআন পাক বর্ণনা করেছে, তা সবই হযরত আবুবকর (রাঃ) ও তাঁর সহকর্মী ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ, –

প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ভালবাসেন।

দ্বিতীয়তঃ তাঁরা আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসেন।

তৃতীয়তঃ তাঁরা সবাই মুসলমানদের ব্যাপারে নম্র এবং কাফেরদের বেলায় কঠোর।

চতুর্থতঃ তাঁদের জেহাদ নিশ্চিত রূপেই আল্লাহ্র পথে ছিল এবং এতে তাঁরা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করেননি।

আয়াতের শেষভাগে এ পরম সত্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এসব গুণ, এগুলোর যথাসময়ে প্রয়োগ, এগুলোর মাধ্যমে ইসলামী জেহাদে সাফল্য অর্জন প্রভৃতি বিষয় শুধুমাত্র চেষ্টা-তদবীর, শক্তি অথবা দলের জোরে অর্জিত হয় না, বরং এ সবই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তিনিই যাকে ইচ্ছা এ অনুগ্রহ দান করেন।

উপরোক্ত চার আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে ধনাত্মকভাবে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্ব ও বিশেষ বন্ধুত্ব যাদের সাথে স্থাপিত হতে পারে, তারা কারা? এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা ও অতঃপর তাঁর রসূলের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বন্ধু ও সাথী সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাই আছেন এবং তিনিই হতে পারেন। তাঁর সম্পর্ক ছাড়া যত সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আছে, সবই ধ্বংসশীল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর সম্পর্কও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলারই সম্পর্ক; পৃথক নয়। তৃতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সাথী ও আন্তরিক বন্ধু ঐসব মুসলমানকে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা শুধু নামে নয়– সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

প্রথমত ঃ – الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

তাঁরা পূর্ণ আদব ও শর্তাদিসহ নিয়মিত নামায পড়ে। দ্বিতীয়তঃ স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান করে। তৃতীয়তঃ তারা বিনম্র ও বিনয়ী; স্বীয় সৎকর্মের জন্যে গর্বিত নয়।

তৃতীয় বাক্য وَهُمْ رَاكِعُونَ এ ركوع শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে রুকূর অর্থ পারিভাষিক রুকূ, যা নামাযের একটি রোকন। يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ – এর পর وَهُمْ رَاكِعُونَ বাক্যটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য মুসলমানদের নামাযকে অপরাপর সম্প্রদায়ের নামায থেকে ভিন্নরূপে প্রকাশ করা। কারণ, ইহুদী

ও খ্রীষ্টানরাও নামায পড়ে, কিন্তু তাদের নামাযে রুকূ নেই। রুকূ একমাত্র ইসলামী নামাযেরই স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য। – (মাযহারী)

কিন্তু অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে রুকূ শব্দ দ্বারা আভিধানিক অর্থই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, নত হওয়া, বিনয়, নম্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা। বাহরেমুহীত গ্রন্থে আবু হাইয়্যান এবং কাশশাফ গ্রন্থে যমখশরী এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তফসীরে মাযহারী এবং বয়ানুল-কোরআনেও এ অর্থই নেওয়া হয়েছে। অতএব, বাক্যটির অর্থ হবে এই যে, তারা স্বীয় সৎকর্মের জন্যে গর্ব করে না, বরং বিনয় ও নম্রতা তাদের স্বভাব।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এবাক্যটি হযরত আলী (রাঃ)-এর বিশেষ একটি ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন হযরত আলী (রাঃ) নামায পড়ছিলেন। যখন তিনি রুকূতে গেলেন, তখন জনৈক ভিক্ষুক কিছু ভিক্ষা চাইল। তিনি রুকূ অবস্থায়ই অঙ্গুলি থেকে আংটি বের করে ভিক্ষুকের দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন। নামায শেষে ভিক্ষুকের প্রয়োজন মিটাবেন, এতটুকু দেরী করাও তিনি পছন্দ করেননি। তিনি সৎকাজে যে দ্রুততা প্রদর্শন করলেন, তা আল্লাহ্ তাআলার খুব পছন্দ হয় এবং আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে তার মূল্য দেওয়া হয়।

এ রেওয়ায়েতের সনদ আলেম ও হাদীছবিদদের মতে সর্বসম্মত নয়। তবে রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে এর সারমর্ম হবে এই যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্বের যোগ্য তারাই হবে, যারা নামায ও যাকাতের পাবন্দি করে। বস্তুতঃ তাদের মধ্যে বিশেভাবে হযরত আলী (রাঃ) এ বন্ধুত্বের অধিক যোগ্য।

হযরত আলী (রাঃ)-কে এ বিশেষ সম্মানে ভূষিত করার কারণ সম্ভবত ঃ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর অর্ন্তদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ গোলযোগের ঘটনাবলী ফুটে উঠেছিল যে, কিছু লোক হযরত আলী (রাঃ) – এর শত্রুতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করবে। খারেজী সম্প্রদায়ের গোলযোগের দরুন পরবর্তী কালে তাই প্রকাশ পেয়েছে।

মোটকথা, আয়াতটি এ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক; ছাহাবায়ে কেরাম ও সব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত। বক্তব্যের দিক দিয়ে কোন এক ব্যক্তির সাথে আয়াতের বিশেষত্ব নেই। এ কারণেই হযরত ইমাম বাকের (রাঃ)-কে যখন কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াতে কি হযরত আলী (রহঃ)-কে বুঝানো হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে তিনি আয়াতের লক্ষণভুক্ত।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে যারা কোরআনের নির্দেশ পালন করে বিজাতির সাথে গভীর বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকে এবং শুধু আল্লাহ্, রসূল ও মুসলমানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে বিজয় ও বিশ্বজয়ী হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ

এতে বলা হয়েছে যে, যেসব মুসলমান আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ পালন করে, তারা আল্লাহ্র দল। এরপর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে আল্লাহ্র দলই সবার উপর জয়ী হবে।

পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে সবাই প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে যে, ছাহাবায়ে -কেরাম (রাঃ) সবার উপর জয়ী হয়েছেন। যে শক্তিই এ পাহাড়ে মাথা ঠুকেছে, সে-ই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম খলিফার বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সবার বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) – এর মোকাবিলায় বিশ্বের বৃহৎ শক্তিদ্বয় কায়সার ও কেসরা অবতীর্ণ হলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দেন। তাঁদের পর খলিফা ও মুসলমানদের মধ্যে যতদিন আল্লাহ্র এসব নির্দেশ পালন অব্যাহত রয়েছে এবং মুসলমানরা বিজাতির সাথে মেলামেশা ও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বিরত রয়েছে, ততদিন তাদেরকে বিজয়ী বেশেই দেখা গেছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ
هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَ
إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ
مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ
قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكَ
مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ
مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ
مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا
آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ
فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ
قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

(৫৭) হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। (৫৮) আর যখন তোমরা নামাযের জন্যে আহবান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ। (৫৯) বলুন ঃ হে আহলে-কিতাবগণ, আমাদের সাথে তোমাদের এছাড়া কি শত্রুতা যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহ্‌র প্রতি, আমাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি। আর তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান। (৬০) বলুন ঃ আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে। (৬১) যখন তারা তোমাদের কাছে আসে, তখন বলে দাও ঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অথচ তারা কুফর নিয়ে এসেছিল এবং কুফর নিয়েই প্রস্থান করেছে। তারা যা গোপন করত, আল্লাহ্ তা খুব জানেন। (৬২) আর আপনি তাদের অনেককে দেখবেন যে, দৌড়ে দৌড়ে পাপে, সীমালঙ্ঘনে এবং হারাম ভক্ষণে পতিত হয়। তারা অত্যন্ত মন্দ কাজ করছে। (৬৩) দরবেশ ও আলেমরা কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না? তারা খুবই মন্দ কাজ করছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

৫৭ আয়াতে তাকীদের জন্যে রুকূর শুরুভাগে বর্ণিত নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ, হে বিশ্ববাসী, তোমরা তাদেরকে সাথী অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে। এরা দুই দলে বিভক্ত ঃ (এক) আহলে-কিতাব সম্প্রদায়, (দুই) সাধারণ কাফের ও মুশরিক সম্প্রদায়।

আবু হাইয়্যান বাহরে-মুহীত গ্রন্থে বলেন ঃ كفار শব্দে আহলে-কিতাব সম্প্রদায়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবুও এখানে স্বতন্ত্রভাবে আহলে-কিতাবদের উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, আহলে-কিতাবরা অন্যান্য কাফেরদের তুলনায় যদিও বাহ্যতঃ ইসলামের নিকটবর্তী, কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, তাদের কমসংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) –এর আমল ও তৎপরবর্তী আমলে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের সংখ্যা পর্যালোচনা করলে সাধারণ কাফেরদের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। আহলে-কিতাবদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছে, তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

এর কারণ এই যে, আহলে-কিতাবদের গর্ব ছিল যে, তারা খোদায়ী ধর্ম ও ঐশীগ্রন্থের অনুসারী। এ গর্ব ও অহঙ্কারই তাদেরকে সত্যধর্ম গ্রহণে বিরত রেখেছে। মুসলমানদের সাথে তারাই বেশীর ভাগ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। এ দুষ্টামির একটি ঘটনা সপ্তম আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا – অর্থাৎ,

মুসলমানরা যখন নামাযের আযান দেয়, তখন তারা হাসি-তামাশা করে। তফসীরে-মাযহারীতে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ মদীনায় জনৈক খ্রীষ্টান বসবাস করত। সে আযানে যখন اشهد ان محمدا رسول الله বাক্যটি শুনত, তখন বলত অর্থাৎ, আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করুক।

পরিণামে তার এ বাক্যটিই তার গোটা পরিবার পুড়ে ভস্মীভূত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। এক রাত্রে সে যখন ঘুমিয়েছিল, তার চাকর প্রয়োজন বশতঃ আগুন নিতে ঘরে প্রবেশ করল। আগুনের স্ফুলিঙ্গ উড়ে সবার অজ্ঞাতে কোন একটি কাপড়ে গিয়ে পড়ল। এরপর সবাই যখন নিদ্রায় বিভোর, তখন আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এবং সবাই পুড়ে কাবাব হয়ে গেল।

এ আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে ঃ

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ – অর্থাৎ, সত্যধর্মের সাথে ঠাট্টা-মস্কারা করার কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা নির্বোধ।

তফসীরে-মাযহারীতে কাযী ছানাউল্লাহ্ (রঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে নির্বোধ বলেছেন, অথচ সাংসারিক ব্যাপারে তাদের বুদ্ধিমত্তার জুড়ি নেই। এতে বোঝা যায় যে, একজন লোক এক ধরনের কাজে চতুর ও বুদ্ধিমান এবং অন্য ধরনের কাজে নির্বোধ ও বোকা হতে পারে। এ বোকা হওয়ার কারণ দ্বিবিধ – হয় সে বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, না হয় তার বুদ্ধি এ ব্যাপারে অচল। কোরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি অন্য এক আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেছে ঃ

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

অর্থাৎ, তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক বিষয়গুলো খুব বোঝ, কিন্তু পরিণাম ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীন।

أَكْثَرُكُمْ فَٰسِقُونَ – বাক্যে আল্লাহ্ তাআলা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে সম্বোধন করে সবার পরিবর্তে অধিকাংশকে ঈমান থেকে বিচ্যুত বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, তাদের কিছুসংখ্যক লোক এমনও ছিল, যারা সর্বাবস্থায় ঈমানদার ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল তওরাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলীর অনুসারী এবং এতদুভয়ে বিশ্বাসী। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তি ও কোরআন অবতরণের পর তারা তাঁর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কোরআন অনুসারে কাজকর্ম সম্পাদন করতে থাকে।

প্রচারকার্যে সম্বোধিত ব্যক্তির রেয়াত করা ঃ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم বাক্যে উদাহরণের ভঙ্গিতে আল্লাহ্‌র অভিশাপ ও ক্রোধপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে সম্বোধিত ব্যক্তিদেরই অবস্থা ছিল। কাজেই এ দোষ সরাসরি তাদের উপর আরোপ করে 'তোমরা এরূপ' বললেও চলত। কিন্তু কোরআন এ বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে বিষয়টিকে একটি উদাহরণের রূপ দিয়েছে। এতে পয়গম্বরসুলভ একটি প্রচারকার্যের বিশেষ পদ্ধতি ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, বর্ণনাভঙ্গি এরূপ হওয়া চাই, যদ্দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির মনে উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়।

ইহুদীদের চারিত্রিক বিপর্যয় ঃ প্রথম আয়াতে অধিকাংশ ইহুদীর চারিত্রিক বিপর্যয় ও কর্মগত ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে – যাতে শ্রোতারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং এসব কার্যকলাপ ও তার কারণ থেকে আত্মরক্ষা করে।

যদিও সাধারণভাবে ইহুদীদের অবস্থা তাই ছিল, তথাপি তাদের মধ্যে কিছু ভাল লোকও ছিল। কোরআন পাক তাদের ব্যক্তিক্রম প্রকাশ করার জন্যে كثيرا (অনেকে) শব্দটি ব্যবহার করেছে। সীমালঙ্ঘন এবং হারাম ভক্ষণ اثم (পাপ) শব্দের অর্থেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উভয় প্রকার পাপের ধ্বংসকারিতা এবং সে কারণে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্যে বিশেষভাবে এগুলোকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।—(বাহরে-মুহীত)

তফসীরে রূহুল মা'আনী প্রভৃতিতে বলা হয়েছে যে, তাদের সম্পর্কে 'দৌড়ে দৌড়ে পাপে পতিত হওয়ার' শিরোনাম ব্যবহার করে কোরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, তারা এসব কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত অপরাধী এবং এসব কুকর্ম মজ্জাগত হয়ে তাদের শিরা-উপশিরায় জড়িত হয়ে গেছে। এখন তারা ইচ্ছা না করলেও সেদিকেই চলে।

এতে বোঝা যায় যে, মানুষ সৎ কিংবা অসৎ যে কোন কাজ উপর্যুপরি করতে থাকলে আস্তে আস্তে তা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এরপর তা করতে তার কোনরূপ কষ্ট ও দ্বিধা হয় না। ইহুদীরা কু-অভ্যাসে এ সীমায়ই পৌঁছে গিয়েছিল। এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্যে বলা হয়েছেঃ

يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ (তারা দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে পাপে পতিত হয়।) সৎকর্মে পয়গম্বর ও ওলীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁদের সম্পর্কেও কোরআন বলেছে ঃ يُسَٰرِعُونَ فِي الْخَيْرَٰتِ অর্থাৎ, তাঁরা দৌড়ে দৌড়ে পুণ্য কাজে আত্মনিয়োগ করে।

কর্ম সংশোধনের পদ্ধতি ঃ সূফী-বুযুর্গ ও ওলী-আল্লাহ্গণ কর্ম সংশোধনে সবচাইতে অধিক যত্নবান। তাঁরা কোরআন পাকের এসব বাণী থেকেই এ মূলনীতি বেছে নিয়েছেন যে, মানুষ যেসব ভাল কিংবা মন্দ কাজ করে, আসলে সেগুলোর মূল উৎস হচ্ছে ঐসব গোপন কর্মক্ষমতা ও চরিত্র, যা মানুষের মজ্জায় পরিণত হয়। এ কারণেই মন্দ কর্ম ও অপরাধ দমন করার জন্যে তাঁদের দৃষ্টি এসব সূক্ষ্ম গোপন বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ থাকে এবং তাঁরা এগুলো সংশোধন করে দেন। ফলে সব কাজ-কর্ম আপনা থেকেই সংশোধিত হয়ে যায়। উদাহরণতঃ কারও অন্তরে জাগতিক অর্থলিপ্সা প্রবল হলে সে এর ফলে ঘুষ গ্রহণ করে, সুদ খায় এবং সুযোগ পেলে চুরি, ডাকাতি পর্যন্ত করতে উদ্যত হয়। সূফী বুযুর্গরা এসব অপরাধের পৃথক পৃথক প্রতিকার না করে এমন ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করেন, যদ্দরুন এসব অপরাধের ভিত্তিই উৎপাটিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কল্পনায় একথা বদ্ধমূল করে দেন যে, এ জগৎ ক্ষণস্থায়ী এবং এর আরাম-আয়েশ বিষাক্ত।

এমনিভাবে মনে করুন, কেউ অহঙ্কারী কিংবা ক্রোধের হাতে পরাভূত। সে অন্যকে ঘৃণা ও অপমান করে এবং বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে। সূফী বুযুর্গরা এমন লোকের ক্ষেত্রে পরকালের চিন্তা এবং আল্লাহ্‌র সামনে জবাবদিহির ব্যবস্থাপত্র প্রয়োগ করেন। ফলে উপরোক্ত মন্দ অভ্যাস আপনা থেকেই খতম হয়ে যায়।

মোটকথা, এ কোরআনী ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে এমন কিছু কর্মক্ষমতা রয়েছে, যা মজ্জায় পরিণত হয়ে যায়। এগুলো সৎ কর্মক্ষমতা হলে সৎকাজ আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে এগুলো মন্দ কর্মক্ষমতা হলে মন্দ কাজের দিকে মানুষ আপনা-আপনি ধাবিত হয়। কর্ম সংশোধনের নিমিত্ত এসব কর্মক্ষমতার সংশোধন অত্যাবশ্যক।

আলেমদের কাঁধে সর্বসাধারণের কাজ-কর্মের দায়িত্ব ঃ দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদী পীর-মাশায়েখ ও আলেমদেরকে কঠোরভাবে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা সাধারণ মানুষকে মন্দকাজ থেকে কেন বিরত রাখে না? কোরআন পাকে এক্ষেত্রে দু'টি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি ربانيون – এর অর্থ আল্লাহ্ভক্ত ; অর্থাৎ, আমাদের পরিভাষায় যাকে দরবেশ, পীর কিংবা মাশায়েখ বলা হয়। দ্বিতীয় শব্দ احبار ব্যবহার করা হয়েছে। ইহুদীদের আলেমদেরকে 'আহ্বার' বলা হয়। এতে বোঝা যায় যে, 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' —এর মূল দায়িত্ব এ দু'শ্রেণীর কাঁধেই অর্পিত – (এক) পীর ও মাশায়েখ এবং (দুই) আলেমবর্গ। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ ربانيون বলে ঐসব আলেমকে বুঝানো হয়েছে, যারা সরকারের পক্ষ থেকে আদিষ্ট ও ক্ষমতাসীন এবং احبار বলে সাধারণ আলেমবর্গকে বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় অপরাধ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব শাসককুল ও আলেমকুল উভয়ের কাঁধে ন্যস্ত হয়ে যায়। অন্যান্য কতিপয় আয়াতে এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে বর্ণিতও হয়েছে।

আলেম ও পীর-মাশায়েখের প্রতি হুশিয়ারী ঃ আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ – অর্থাৎ, 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' করার কর্তব্যটি ত্যাগ করে এসব মাশায়েখ ও আলেম অত্যন্ত বদভ্যাসে লিপ্ত হয়েছে ; জাতিকে ধ্বংসের দিকে যেতে দেখেও তারা বাধা দিচ্ছে না।

তফসীরবিদ আলেমগণ বলেন, প্রথম আয়াতে সর্বসাধারণের দুষ্কর্ম বর্ণিত হয়েছিল। এর শেষে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ বলা হয়েছে এবং

দ্বিতীয় আয়াতে মাশায়েখ ও আলেমদের ভ্রান্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এর শেষে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আরবী অভিধানের দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত সব কাজকেই فعل বলা হয়। عمل শব্দটি ঐ কাজকে বোঝাবার জন্যে ব্যবহার করা হয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় এবং صنع ও صنعت শব্দ ঐ কাজের বেলায় প্রয়োগ করা হয়, যা ইচ্ছার সাথে সাথে বারবার অভ্যাস ও লক্ষ্য হিসেবে ঠিক করে করা হয়। তাই সর্বসাধারণের কুকর্মের পরিণতির ক্ষেত্রে শুধু عمل শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ আর বিশিষ্ট মাশায়েখ ও আলেমদের ভ্রান্ত কাজের জন্য صنع শব্দ প্রয়োগে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ বলা হয়েছে। এতে এদিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ইহুদীদের মাশায়েখ ও আলেমরা জানত যে, তারা নিষেধ করলে সর্বসাধারণ শুনবে এবং বিরত থাকবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও উপঢৌকনের লোভে কিংবা মানুষের বদধারণার ভয়ে তাদের মাশায়েখ ও আলেমদের মনে সত্য সমর্থন করার কোন আবেদন জাগ্রত হত না। এ নিস্পৃহতা সেসব দুষ্কর্মীর দুষ্কর্মের চাইতেও গুরুতর অপরাধ।

এর সারমর্ম এই যে, কোন জাতি অপরাধ ও পাপে লিপ্ত হলে তাদের মাশায়েখ ও আলেমরা যদি অবস্থাদৃষ্টে বুঝতে পারে যে, তারা নিষেধ করলে জাতি অপরাধ থেকে বিরত হবে, তবে এমতাবস্থায় কোন লোভ কিংবা ভয়ের কারণে অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত না রাখলে মাশায়েখ ও আলেমদের অপরাধ প্রকৃত অপরাধীদের অপরাধের চাইতেও গুরুতর হবে। তাই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মাশায়েখ ও আলেমদের জন্যে সমগ্র কোরআনে এ আয়াতের চাইতে কঠোর হুশিয়ারী আর কোথাও নাই। তফসীরবিদ যাহ্হাক বলেন ঃ আমার মতে মাশায়েখ ও আলেমদের জন্যে এ আয়াত সর্বাধিক ভয়াবহ। – (ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীর)

কারণ এই যে, এ আয়াতদৃষ্টে তাদের অপরাধ সব চোর, ডাকাত ও দুষ্কর্মীদের অপরাধের চাইতেও কঠোর হয়ে যায় –(নাউযুবিল্লাহ্) । কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, অপরাধের এ তীব্রতা তখনই হবে, যখন মাশায়েখ ও আলেমরা অবস্থাদৃষ্টে অনুমানও করতে পারবেন যে, তাদের নিষেধাজ্ঞা শোনা ও মান্য করা হবে। পক্ষান্তরে যদি অবস্থাদৃষ্টে কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁদের নিষেধাজ্ঞা শুনবে না; বরং উল্টা তাদেরকে নির্যাতন করা হবে, তবে তাঁরা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন। কিন্তু উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তরীকা তখনও এই যে, কেউ মানুক বা না মানুক, তারা স্বীয় কর্তব্য পালন করে যাবেন এবং এ ব্যাপারে কারও নির্যাতন বা তিরস্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। যেমন, কয়েক আয়াত পূর্বে আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় মুজাহিদদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্‌র পথে এবং সত্য প্রকাশে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরওয়া করে না।

মোটকথা, যে ক্ষেত্রে কথা শোনা ও মান্য করার সম্ভাবনা বেশী, সেখানে মাশায়েখ ও আলেম বরং প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সাধ্যানুযায়ী পাপ কাজে বাধা দান করবে; হাতে হোক কিংবা মুখে অথবা কমপক্ষে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে নিবে। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, নিষেধাজ্ঞা শোনা হবে না অথবা নিষেধকারীর বিরুদ্ধে শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, সেখানে নিষেধ করা ও বাধা দান করা ফরয নয়, তবে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ অবশ্যই। 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' সম্পর্কিত এ বিবরণ হাদীস থেকে সংগৃহীত হয়েছে। নিজে সৎকর্ম করা ও অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে অপরকেও সৎকর্মের প্রতি পথ প্রদর্শন করা এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব সাধারণ মুসলমান এবং বিশেষ করে মাশায়েখ ও আলেমদের উপর ন্যস্ত করে ইসলাম জগতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য একটি মূলনীতি স্থাপন করেছে। এটি যথাযথ বাস্তবায়িত হলে সমগ্র জাতি অনায়াসেই যাবতীয় দুর্নীতি থেকে পবিত্র হতে পারে।

উম্মতের সংশোধনের পন্থা ঃ ইসলামের প্রথম ও পরবর্তী সমগ্র শতাব্দীগুলোতে যতদিন এ মূলনীতি বাস্তবায়িত হয়েছে, ততদিন মুসলিম জাতি জ্ঞান-গরিমা, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে সারা বিশ্বে সমুন্নত ও স্বতন্ত্র রয়েছে। পক্ষান্তরে যেদিন থেকে মুসলমানরা এ কর্তব্য পালনে বিমুখ হয়ে পড়েছে এবং অপরাধ দমনকে শুধু সরকার ও পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব মনে করে নিজেরা হাত গুটিয়ে বসেছে, সেদিন থেকেই মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করেছে। আজ পিতা-মাতা ও গোটা পরিবার ধার্মিক ও শরীয়তের অনুসারী; কিন্তু সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মতিগতি, চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত। একারণেই জাতির সামগ্রিক সংশোধনের নিমিত্ত কোরআন ও হাদীসে 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ'-এর প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। কোরআন এ কর্তব্যটিকে উম্মতে-মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য আখ্যা দিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধাচারণ করাকে কঠোর পাপ ও শাস্তির কারণ বলে সাব্যস্ত করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কোন জাতির মধ্যে যখন পাপ কাজ করা হয় অথচ কোন লোক তা নিষেধ করে না, তখন তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আযাব প্রেরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে যায়। – (বাহরে মুহীত)

পাপ কাজে ঘৃণা প্রকাশ না করার কারণে সতর্কবাণী ঃ মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা এক জায়গায় ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক বস্তি ধ্বংস করে দাও। ফেরেশতারা আরয করলেন ঃ এ বস্তিতে আপনার অমুক এবাদতকারী বান্দাও রয়েছে। নির্দেশ এল ঃ তাকেও আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাও – আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখেও তার চেহারা কখনও ক্রোধে বিবর্ণ হয়নি।

হযরত ইউশা' ইবনে নূন (আঃ) —এর প্রতি ওহী আসে যে, আপনার জাতির এক লক্ষ লোককে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে। এদের মধ্যে চল্লিশ হাজার সৎ লোক এবং ষাট হাজার অসৎ লোক। ইউশা (আঃ) নিবেদন করলেন, হে রাব্বুল আলামীন, অসৎ লোকদেরকে ধ্বংস করার কারণ তো জানাই, কিন্তু সৎ লোকদেরকে কেন ধ্বংস করা হচ্ছে? উত্তর এল ঃ এ সৎলোকগুলোও অসৎলোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখত। তাদের সাথে পানাহার ও হাসি-তামাশায় যোগদান করত। আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখে কখনও তাদের চেহারায় বিতৃষ্ণার চিহ্নও ফুটে উঠেনি। – (বাহ্‌রে মুহীত)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا
قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا
مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا
لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا
التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ
فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ
مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ
مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ قُلْ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

(৬৪) আর ইহুদীরা বলেঃ আল্লাহ্‌র হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হোক। একথা বলার জন্যে তাদের প্রতি অভিসম্পাত। বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। আপনার প্রতি পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে কালাম অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর পরিবর্ধিত হবে। আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করে দেন। তারা দেশে অশান্তি উৎপাদন করে বেড়ায়। আল্লাহ্ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৬৫) আর যদি আহলে-কিতাবরা বিশ্বাস স্থাপন করত এবং খোদাভীতি অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নেয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করতাম। (৬৬) যদি তারা তওরাত, ইঞ্জীল এবং যা প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, পুরোপুরি পালন করত, তবে তারা উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে ভক্ষণ করত। তাদের কিছুসংখ্যক লোক সৎপথের অনুগামী এবং অনেকেই মন্দ কাজ করে যাচ্ছে। (৬৭) হে রসূল, পৌছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। আল্লাহ্ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (৬৮) বলে দিনঃ হে আহলে-কিতাবগণ, তোমরা কোন পথেই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তওরাত, ইঞ্জীল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাও পুরোপুরি পালন না কর। আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর বৃদ্ধি পাবে। অতএব, এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইহুদীদের একটি ধৃষ্টতার জওয়াব ঃ وَقَالَتِ الْيَهُودُ আয়াতে ইহুদীদের একটি গুরুতর অপরাধ ও জঘন্য উক্তি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, হতভাগারা বলতে শুরু করেছে যে, (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তাআলা দরিদ্র হয়ে গেছেন।

ঘটনাটি ছিল এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মদীনার ইহুদীদেরকে বিত্তশালী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছিলেন, কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় আগমন করেন এবং তাদের কাছে ইসলামের আহবান পৌছে, তখন পাষণ্ডরা সামাজিক মোড়লি ও কুপ্রথার মাধ্যমে প্রাপ্ত নযর-নিয়াযের খাতিরে এ আহবান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ্ তাআলা শাস্তি হিসেবে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হ্রাস করে দেন। ফলে তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে। তখন মূর্খদের মুখ থেকে এ জাতীয় কথাবার্তা বের হয়ে থাকে যে, (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার ফুরিয়ে গেছে অথবা আল্লাহ্ তাআলা কৃপণ হয়ে গেছেন। এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাত তো তাদেরই বাঁধা হবে এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত হবে, যার ফলে পরকালে আযাব এবং ইহকালে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলার হাত সব সময়ই উন্মুক্ত রয়েছে। তাঁর দান চিরকাল অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। কিন্তু তিনি যেমন ধনবান ও বিত্তশালী, তেমনি সুবিজ্ঞও বটে। তিনি বিজ্ঞতা অনুযায়ী ব্যয় করেন; যাকে উপযুক্ত মনে করেন, বিত্তশালী করে দেন এবং যার ঘাড়ে উপযুক্ত মনে করেন, অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ এরা উদ্ধত জাতি। আপনার প্রতি অবতীর্ণ কোরআনী নির্দেশাবলীর দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তাদের কুফর ও অবিশ্বাস আরও কঠোর হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশে তাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে ঘোর মতানৈক্য সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে সাহসী হয় না এবং তাদের কোন চক্রান্তও সফল হয় না। كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ বাক্যে প্রকাশ্য যুদ্ধে ব্যর্থতা এবং وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا বাক্যে গোপন চক্রান্তে ব্যর্থতার কথাই বর্ণিত হয়েছে।

খোদায়ী নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালনে ইহকালীন কল্যাণ ঃ ৬৪তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা তওরাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলী এবং পয়গম্বরগণের বাণী দ্বারা কোন উপকার লাভ করেনি এবং জাগতিক লোভ-লালসায় লিপ্ত হয়ে সবকিছু বিস্মৃত হয়ে বসেছে। ফলে দুনিয়াতেও এরা কপর্দকহীন হয়ে পড়েছে। যদি এখনও তারা বিশ্বাস ও খোদাভীতি অবলম্বন করে, তবে আমি তাদের বিগত সব গোনাহ্ মাফ করে দেব এবং নেয়ামতপূর্ণ উদ্যান দান করব।

খোদায়ী নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালন করার উপায় ঃ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ আয়াতে ঐ বিশ্বাস ও খোদা ভীতির কিছু বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে, যদ্দ্বারা জাগতিক কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দানের ওয়াদা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছিল। বিবরণ এই যে, ইহুদীরা তওরাত, ইঞ্জীল এবং পরবর্তী সর্বশেষ গ্রন্থ কোরআনকে প্রতিষ্ঠিত করুক। এখানে عمل তথা পালন করার পরিবর্তে اقامت তথা প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, এসব গ্রন্থের আমল পুরোপুরি ও বিশুদ্ধ তখনই হবে, যখন তাতে কোন রকম ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি না থাকবে। যেমন, কোন স্তম্ভকে তখনই প্রতিষ্ঠিত বলা যায়, যখন তা কোনদিকে ঝুঁকে থাকবে না বরং সোজা দাঁড়ানো থাকবে।

এর সারমর্ম এই যে, যদি ইহুদীরা আজও তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআন পাকের নির্দেশাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেগুলো পুরোপুরি পালন করে—ত্রুটি এবং মনগড়া বিষয়াদিকে ধর্ম বলে আখ্যা দিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, তবে তারা পরকালের প্রতিশ্রুত নেয়ামতরাজির যোগ্য হবে এবং ইহকালেও তাদের সামনে রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। ফলে উপর-নীচ সবদিক থেকে তাদের উপর রিযিক বর্ষিত হবে। 'উপর-নীচে'র বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে তারা অনায়াসে ও অব্যাহতভাবে রিযিক প্রাপ্ত হবে।— (তফসীরে-কবীর)

পূর্ববর্তী আয়াতে শুধু পরকালের নেয়ামতের ওয়াদা ছিল। আলোচ্য আয়াতে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওয়াদাও বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ইহুদীদের কুকর্ম এবং তওরাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলী পরিবর্তনের বড় কারণ ছিল তাদের সংসার-প্রীতি ও অর্থলিপ্সা। এ মোহই তাদেরকে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও সেগুলো মেনে নিতে বাধা প্রদান করছিল। তাদের আশঙ্কা ছিল এই যে, তারা মুসলমান হয়ে গেলে তাদের মোড়লি শেষ হয়ে যাবে এবং ধর্মীয় নেতা হওয়ার কারণে যেসব হাদিয়া ও উপঢৌকন পাওয়া যায়, তা বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের এ আশঙ্কা দূর করার জন্যে ওয়াদাও করেছেন যে, তারা সাচ্চা ঈমানদার ও সৎকর্মী হয়ে গেলে তাদের জাগতিক অর্থ-সম্পদ ও আরাম-আয়েশ হ্রাস পাবে না, বরং আরও বেড়ে যাবে।

একটি সন্দেহ নিরসন ঃ এ বিবরণ থেকে একথা জানা গেল যে, এই বিশেষ ওয়াদাটি ঐসব ইহুদীর জন্য করা হয়েছে, যারা মহানবী (সাঃ)-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তারা এসব নির্দেশ মেনে নিলে ইহকালেও তাদেরকে সব রকম নেয়ামত ও শান্তি প্রদান করা হত। সেমতে তখন যারা ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করেছে, তারা এসব নেয়ামত পুরোপুরিভাবেই লাভও করেছে। যেমন, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী ও আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ। এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, সে-ই ইহকালে অবশ্যম্ভাবীরূপে অগাধ ধন-দৌলতের অধিকারী হবে এবং যে এরূপ না করবে, সে অবশ্যই অভাব-অনটনে পতিত হবে। কারণ, এ স্থলে কোন সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং একটি বিশেষ দলের সাথে বিশেষ অবস্থায় ওয়াদা করা হয়েছে।

তবে সাধারণ নীতি হিসেবে ঈমান ও সৎকর্মের ফলস্বরূপ পবিত্র-জীবন প্রাপ্ত হওয়ার ওয়াদা রয়েছে। এটি অগাধ ধন-দৌলতের আকারেও হতে পারে কিংবা বাহ্যিক অভাব-অনটনের আকারেও। পয়গম্বর ও ওলীদের অবস্থাই এর প্রমাণ। তাঁরা সবাই অগাধ-ধন-দৌলত প্রাপ্ত হননি, তবে পবিত্র-জীবন অবশ্যই প্রাপ্ত হয়েছেন।

আয়াতের শেষাংশে ইনসাফ প্রদর্শনার্থ একথাও বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের যেসব বক্রতা ও কুকর্ম বর্ণনা করা হয়েছে, তা সব ইহুদীর অবস্থা নয় বরং مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ অর্থাৎ, তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দল সৎপথের অনুসারীও রয়েছে। তবে তাদের অধিকাংশই কুকর্মী। সৎপথের অনুসারী বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা পূর্বে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান ছিল, এরপর কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

প্রচারকার্যের তাকিদ ও রসূল (সাঃ)-এর প্রতি সান্ত্বনা ঃ এ আয়াতদ্বয়ে এবং এর পূর্ববর্তী উপর্যুপরি দুই রুকূতে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বক্রতা, বিপথগামিতা, হঠকারিতা এবং ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র বর্ণিত হয়েছে। মানুষ হিসেবে এর একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এরূপ হওয়াও সম্ভবপর ছিল যে, এর ফলে মহানবী (সাঃ) নিরাশ হয়ে পড়তেন কিংবা বাধ্য হয়ে প্রচারকার্যে ভাটা দিতে পারতেন। আর এর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া এরূপও হতে পারত যে, তিনি বিরোধিতা, শত্রুতা ও নির্যাতনের পরওয়া না করে প্রচারকার্যে ব্যাপৃত থাকতেন, ফলে তাঁকে শত্রুর পক্ষ থেকে নানা রকম কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হত। তাই তৃতীয় আয়াতে এর দিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জোরালো ভাষায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনার প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যাকিছু অবতরণ করা হয়, তার *সম্পূর্ণটিই বিনা দ্বিধায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিন*; কেউ মন্দ বলুক অথবা ভাল, বিরোধিতা করুক কিংবা গ্রহণ করুক। অপরদিকে তাঁকে এ সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, প্রচারকার্যে কাফেররা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং আপনার দেখাশোনা করবেন।

আয়াতের وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ বাক্যটি প্রণিধানযোগ্য—এর উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি আল্লাহ্ তাআলার একটি নির্দেশও পৌছাতে বাকী রাখেন, তবে আপনি পয়গম্বরীর দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবেন না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আজীবন এ কর্তব্য পালনে পূর্ণ সাহসিকতা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

বিদায় হজ্বের সময় মহানবী (সাঃ)-এর একটি উপদেশ ঃ বিদায় হজ্বের প্রসিদ্ধ ভাষণটি একদিক দিয়ে ছিল ইসলামের আইন এবং অপর দিক দিয়ে দয়ার সাগর, পিতা-মাতার চেয়েও অধিক স্নেহশীল পয়গম্বরের অন্তিম উপদেশ। এ ভাষণে তিনি সাহাবায়ে-কেরামের অভূতপূর্ব সমাবেশকে লক্ষ্য করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করার পর প্রশ্ন করলেন ঃ الا هل بلغت! শোন, আমি কি তোমাদের কাছে দ্বীন পৌছে দিয়েছি? সাহাবীগণ স্বীকার করলেন, জি হাঁ, অবশ্যই পৌছে দিয়েছেন। এরপর বললেন ঃ তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থেকো। তিনি আরও বললেন, فليبلغ الشاهد الغائب অর্থাৎ, এ সমাবেশে যারা উপস্থিত আছ, তারা আমার কথাটি অনুপস্থিতদের কাছেও পৌছে দিবে। অনুপস্থিত বলে দুই শ্রেণীর লোককে বোঝানো হয়েছে। (এক) যারা তখন দুনিয়াতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সমাবেশে উপস্থিত ছিল না এবং (দুই) যারা তখনো পর্যন্ত জন্মগ্রহণই করেনি। তাদের কাছে পয়গাম পৌছানোর পন্থা, ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার। সাহাবী ও তাবেয়িগণ এ কর্তব্য যথাযথ পালন করেছেন।

এর প্রভাবেই সাধারণ অবস্থায় সাহাবায়ে-কেরাম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাণী ও হাদীসকে আল্লাহ্ তাআলার একটি বিরাট আমানতের ন্যায় অনুভব করেছেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত প্রত্যেকটি কথাই উম্মতের কাছে পৌছে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। যদি কোন বিশেষ কারণ অথবা অক্ষমতার দরুন কেউ বিশেষ হাদীস অন্যের কাছে বর্ণনা না করতেন, তবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তা দু'চার জনকে অবশ্যই শুনিয়ে দিয়েছেন যাতে এ আমানতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন। সহীহ্ বোখারীতে হযরত মুয়ায (রাঃ)-এর একটি হাদীস সম্পর্কে এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ اخبر به معاذ عند موته تاثما অর্থাৎ, এ আমানত না পৌছানোর কারণে গোনাহ্গার হওয়ার ভয়ে হযরত মুয়ায হাদীসটি মৃত্যুর সময় বর্ণনা করেছেন।

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ আয়াতের এ দ্বিতীয় বাক্যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, যে যত বিরোধিতাই করুক, শত্রুরা আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কয়েকজন সাহাবী দেহরক্ষী হিসেবে সাধারণভাবে মহানবী (সাঃ)-এর সাথে থাকতেন এবং গৃহে ও প্রবাসে তাঁকে প্রহরা দিতেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি সবাইকে বিদায় করে দেন। কারণ, এ দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

হযরত হাসান (রাঃ)-বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ প্রচারকার্যের নির্দেশ প্রাপ্তির পর আমার মনে বেশ ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। কারণ, চারদিক থেকে হয়ত সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং বিরোধিতা করবে। অতঃপর যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন ভয়-ভীতি দূর হয়ে অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়।— (তফসীরে-কবীর)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রচারকার্যে কেউ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য যুদ্ধ ও জেহাদে সাময়িকভাবে কোনরূপ কষ্ট পাওয়া এর পরিপন্থী নয়।

আহলে-কিতাবদের প্রতি শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশ ঃ প্রথম আয়াতে আহলে-কিতাব ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যদি তোমরা শরীয়তের নির্দেশাবলী পালন না কর, তবে তোমরা কিছুই নও। উদ্দেশ্য এই যে, ইসলামী শরীয়ত অনুসরণ না করলে তোমাদের যাবতীয় সাধুতা ও ক্রিয়াকর্ম পণ্ডশ্রম মাত্র। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে একটি সৃষ্টিগত মর্যাদা দান করেছেন ; অর্থাৎ, তোমরা পয়গম্বরদের বংশধর। দ্বিতীয়তঃ তওরাত ও ইঞ্জীলের শিক্ষাগত মর্যাদাও তোমাদের আয়ত্তাধীন; তোমাদের মধ্যে অনেক সাধু ব্যক্তিও রয়েছে। তারা আধ্যাত্মিক পথে পরিশ্রম ও সাধনা করে। কিন্তু এসব বিষয়ের মূল্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে তখনই হবে, যখন তোমরা ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করবে। এছাড়া কোন সম্পর্কই কাজে আসবে না এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিশ্রম ও সাধ্য-সাধনার কোনটিতেই তোমাদের মুক্তি আসবে না।

এ আয়াত থেকে মুসলমানরাও নির্দেশ লাভ করেছে যে, শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ব্যতীত সাধুতা, আধ্যাত্মিকতা, চেষ্টা-সাধনা, অন্তর্দৃষ্টিলাভ, এল্হাম ইত্যাদি দ্বারা মুক্তিলাভ করা যাবে না।

এ আয়াতে শরীয়ত অনুসরণের জন্যে তিনটি বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ প্রথম—তওরাত। দ্বিতীয়— ইঞ্জীল, যা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের কাছে পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং তৃতীয় وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা প্রেরিত হয়েছে।

সাহাবা ও তাবেয়ী তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, এর মর্ম কোরআন পাক, যা খ্রীষ্টান ও ইহুদী সম্প্রদায়সহ সব উম্মতের জন্যেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে পর্যন্ত তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআনের আনীত বিধি-বিধানগুলো বিশুদ্ধভাবে ও পূর্ণরূপে পালন না করবে, সে পর্যন্ত তোমাদের বংশগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং মর্যাদা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হবে না।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে তওরাত ও ইঞ্জীলের মত কোরআনেরও সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার না করে একটি দীর্ঘ বাক্য وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ব্যবহার করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, এতে কতিপয় হাদীসের বিষয়বস্তুর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এসব হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার কোরআন দেয়া হয়েছে, তেমনি অন্যান্য তত্ত্বকথা সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। এগুলোকে এক দিক দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যাও বলা যেতে পারে। হাদীসের ভাষ্য এরূপ ঃ 'শোন, আমাকে কোরআন দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এমন হবে যে, কোন তৃপ্ত ও আরামপ্রিয় ব্যক্তি বলাবলি করবে যে, তোমাদের জন্যে কোরআনই যথেষ্ট। এতে যা হালাল করা হয়েছে তাকেই হালাল মনে কর এবং এতে যা হারাম করা হয়েছে তাকেই হারাম মনে কর। অথচ বাস্তব সত্য এই যে, আল্লাহ্র রসূল যা হারাম করেছেন, তাও আল্লাহ্র হারাম করা বস্তুর মতই হারাম।' --(আবু-দাউদ, ইবনে-মাজা দারেমী)।

শরীয়তের বিধান তিন প্রকার ঃ স্বয়ং কোরআনও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় ঃ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না। তিনি যাকিছু বলেন, সবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলেন। যেসব ক্ষেত্রে তিনি কোন কথা স্বীয় ইজতেহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে বলেন এবং অতঃপর ওহীর মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে নির্দেশ অবতীর্ণ না হয়, পরিণামে সে ইজতেহাদও ওহীর মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেসব বিধান উম্মতকে দিয়েছেন, সেগুলো তিন প্রকার ঃ (এক) যেসব বিধান কোরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে, (দুই) যেসব বিধান সুস্পষ্টভাবে কোরআনে উল্লেখিত নাই; বরং পৃথক ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্র প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং (তিন) যেসব বিধান তিনি স্বয়ং ইজতেহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে দিয়েছেন এবং এর বিরুদ্ধে ওহীর মাধ্যমে কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি।

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এতে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআন তিনটি গ্রন্থের নির্দেশাবলী পালন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ এগুলোর একটি অপরটিকে রহিত করে দিয়েছে। ইঞ্জীল তওরাতের কতক বিধানকে এবং কোরআন তওরাত ও ইঞ্জীলের অনেক বিধানকে রহিত করেছে। এমতাবস্থায় তিনটির সমষ্টিকে পালন করা কিরূপে সম্ভবপর হবে?

এর জওয়াব সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, পরবর্তীকালে আগমনকারী গ্রন্থ পূর্ববর্তী গ্রন্থের যেসব বিধানকে পরিবর্তন করেছে, সেসব পরিবর্তিত বিধান পালন করাই উভয় গ্রন্থ পালন করার নামান্তর। রহিত বিধান পালন করা উভয় গ্রন্থের উদ্দেশ্যেরই পরিপন্থী।

মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি একটি সান্ত্বনা ঃ উপসংহারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সান্ত্বনার জন্যে বলা হয়েছে ঃ আহ্লে-কিতাবদের অনেকেই আমার দেয়া সুযোগ-সুবিধা ও অনুগ্রহের দ্বারা উপকৃত হবে না, বরং তাদের কুফর ও ঔদ্ধত্য আরও বেড়ে যাবে। অতএব, আপনি এতে দুঃখিত হবেন না এবং তাদের প্রতি অনুকম্পাশীলও হবেন না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

(৬৯) নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, ছাবেয়ী বা খ্রীষ্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্র প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (৭০) আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে অনেক পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। যখনই তাদের কাছে কোন পয়গম্বর এমন নির্দেশ নিয়ে আসত যা তাদের মনে চাইত না, তখন তাদের অনেকের প্রতি তারা মিথ্যারোপ করত এবং অনেককে হত্যা করে ফেলত। (৭১) তারা ধারণা করেছে যে, কোন অনিষ্ট হবে না। ফলে তারা আরও অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করলেন। এরপরও তাদের অধিকাংশই অন্ধ ও বধির হয়ে রইল। আল্লাহ্ দেখেন, তারা যা কিছু করে। (৭২) তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিয়ম-তনয় মসীহ্-ই আল্লাহ্; অথচ মসীহ্ বলেন, হে বনী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহ্র এবাদত কর, যিনি আমার পালন কর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৭৩) নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে ঃ আল্লাহ্ তিনের এক ; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। (৭৪) তারা আল্লাহ্র কাছে তওবা করে না কেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে না কেন? আল্লাহ্ যে ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৭৫) মরিয়ম-তনয় মসীহ্ রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন আর তাঁর জননী একজন ওলী। তাঁরা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্যে কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার দেখুন, তারা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

চারটি সম্প্রদায়ের প্রতি পরকালে মুক্তির ওয়াদা ঃ দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা চারটি সম্প্রদায়কে ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহবান জানিয়ে সেজন্য পরকালে মুক্তির ওয়াদা করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম সম্প্রদায় হচ্ছে الَّذِينَ آمَنُوا অর্থাৎ, মুসলমান। দ্বিতীয়তঃ وَالَّذِينَ هَادُوا অর্থাৎ, ইহুদী, তৃতীয়তঃ صابئون এবং চতুর্থত ঃ نصارى -এদের মধ্যে তিনটি জাতি, মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টান সর্বজনপরিচিত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান। সাবিয়্যিন অথবা ছাবেয়ী নামে আজকাল পৃথিবীতে কোন প্রসিদ্ধ জাতি নাই। এ কারণেই এদের চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

তফসীরবিদ ইবনে-কাসীর হযরত কাতাদার বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সাবিয়্যিন হল তারাই যারা ফেরেশতাদের এবাদত করে, কেবলার উল্টোদিকে নামায পড়ে এবং দাউদ (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ যবূর পাঠ করে।

কোরআন পাকের এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে বাহ্যতঃ এর সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা কোরআন মজীদে চারটি ঐশী গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে ঃ কোরআন, ইঞ্জীল, যবূর ও তওরাত। আয়াতে এ গ্রন্থ চতুষ্টয়ের অনুসারীদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলার কাছে সাফল্য সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল ঃ উভয় আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, আমার দরবারে কারও বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কোন মূল্য নেই। যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্য, বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, সে পূর্বে যাই থাক, আমার কাছে প্রিয় বলে গণ্য হবে এবং তার কাজকর্ম গৃহীত হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, কোরআন অবতরণের পর পূর্ণ আনুগত্য মুসলমান হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কারণ, পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত এবং ইঞ্জীলেও এরই নির্দেশ রয়েছে। কারআন পাক শুধুমাত্র এ উদ্দেশেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণেই কোরআন অবতরণ ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পর কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তওরাত, ইঞ্জীল ও যবূরের অনুসরণ বিশুদ্ধ হতে পারে না। অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা মুসলমান হবে, তারাই পরকালে মুক্তি ও ছোয়াবের অধিকারী হবে। এতে এ ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে যে, এরা কুফর ও পাপের পথে থেকে এযাবৎ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব হীন চক্রান্ত করেছে, মুসলমান হওয়ার পর এদের পরিণাম কি হবে? আয়াতদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে যে, অতীত সব গোনাহ্ ও ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা হবে এবং পরকালে তারা শঙ্কিত ও দুঃখিত হবে না।

বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এখানে মুসলমানদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেননা, আয়াতে যে স্তরের ঈমান ও আনুগত্য কামনা করা হয়েছে, তারা পূর্ব থেকেই সে স্তরে বিরাজমান। এ স্তরের প্রতি যাদেরকে ডাকা উদ্দেশ্য, আয়াতে শুধু তাদের উল্লেখ করাই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাদের সাথে মুসলমানদের যুক্ত করার ফলে একটি বিশেষ ভাষালঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বোঝা যাবে। কোন শাসনকর্তা অথবা বাদশাহ্ এরূপ স্থলে বলে থাকেন ঃ আমাদের আইন সবার বেলায় প্রযোজ্য, অনুগত হোক কিংবা বিরোধী যে-ই আনুগত্য করবে, সেই অনুগ্রহ ও পুরস্কারের যোগ্য হবে। এখন সবারই

জানা যে, অনুগতরা তো আনুগত্য করছেই— যে বিরোধী আসলে তাকে শোনানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে অনুগতকে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, অনুগতদের প্রতি আমাদের যে কৃপাদৃষ্টি, তা কোন বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়, বরং তাদের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। যদি বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিও আনুগত্য অবলম্বন করে, তবে সেও এ কৃপা ও অনুগ্রহের অধিকারী হবে।

উপরোক্ত চার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা তিনটি অংশঃ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস, কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস এবং সৎকর্ম।

রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই ঃ এ আয়াতে ঈমান ও বিশ্বাস সম্বন্ধীয় সব বিষয়ের বিবরণ পেশ করা লক্ষ্য নয়। ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস উল্লেখ করে সব বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা এবং তৎপ্রতি আহবান জানানোই এখানে উদ্দেশ্য। নতুবা যে আয়াতেই ঈমানের উল্লেখ করা হবে, সেখানেই ঈমানের আদ্যোপান্ত বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। অথচ এমনটি অপরিহার্য হতে পারে না। তাই এক্ষেত্রেও রসূল অথবা রেসালতের প্রতি বিশ্বাসের কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত না হওয়ায় কোন সামান্যতম জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও কোনরূপ সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না। বিশেষ করে যখন সমগ্র কোরআন ও তার শত শত আয়াত রেসালতের প্রতি বিশ্বাসের স্পষ্টোক্তিতে পরিপূর্ণ রয়েছে। এসব আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রসূল ও রসূলের বাণীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই এবং এ বিশ্বাস ছাড়া কোন ঈমান ও সৎকর্মই গ্রহণীয় নয়। কিন্তু একটি ধর্মদ্রোহী দল কোন না কোন উপায়ে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ কোরআনের অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে পরিষ্কারভাবে রেসালত উল্লেখিত না হওয়ায় তারা একটি নতুন মতবাদ খাড়া করেছে, যা কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্পষ্টোক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। তা এই যে, প্রত্যেক বিজ্ঞ লোক তা ইহুদী, খ্রীষ্টান এমন কি মূর্তিপূজারী পৌত্তলিক থাকা অবস্থায়ও যদি শুধু আল্লাহ্ ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তবে পরকালে মুক্তির অধিকারী হতে পারে— পারলৌকিক মুক্তির জন্যে ইসলাম গ্রহণ করা কোন জরুরী বিষয় নয়।—(নাউযুবিল্লাহ)

আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে কোরআন পাঠের শক্তি এবং কোরআনের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান দান করেছেন, তাদের পক্ষে কোরআনী স্পষ্টোক্তি দ্বারা এ বিভ্রান্তি দূর করা খুব বেশী বিদ্যা-বুদ্ধির মুখাপেক্ষী নয়। যারা কোরআনের অনুবাদ জানে তারাও এ কাল্পনিক ভ্রান্তি অনায়াসে বুঝতে পারে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ "আজ যদি মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গতি ছিল না।"

অতএব, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালন করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেই এবং মুসলমান না হয়েই পরকালে মুক্তি পাবে-এরূপ বলা কোরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ নয় কি?

বনী-ইসরাঈলের অঙ্গীকার ভঙ্গঃ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ অর্থাৎ, বনী-ইসরাঈলের কাছে তাদের রসূল যখন কোন নির্দেশ নিয়ে আসতেন যা তাদের রুচিবিরুদ্ধ হত, তখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা আল্লাহ্র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করত এবং পয়গম্বরদের মধ্যে কারো প্রতি মিথ্যারোপ করত এবং কাউকে হত্যা করত। এটি ছিল আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা। এখন পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অবস্থা এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, এতসব নির্মম অত্যাচার ও বিদ্রোহীসুলভ অপরাধে লিপ্ত হয়েও তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকত। ভাবখানা এই যে, এসব কুকর্মের কোন সাজাই ভোগ করতে হবে না এবং নির্যাতন ও বিদ্রোহের অশুভ পরিণতি কখনও সামনে আসবে না। এহেন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা খোদায়ী নিদর্শন ও হুশিয়ারী থেকে সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির হয়ে যায় এবং যা গর্হিত তাই করতে থাকে। এমনকি, কতক পয়গম্বরকে তারা হত্যা করে এবং কতককে বন্দী করে। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা বাদশাহ বখতে-নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। অতঃপর দীর্ঘদিন অতীত হলে জনৈক পারস্য সম্রাট তাদেরকে বখতে-নসরের লাঞ্ছনা ও অবমাননার কবল থেকে উদ্ধার করে বাবেল থেকে বায়তুল-মোকাদ্দাসে আনেন। তখন তারা তওবা করে এবং অবস্থা সংশোধনে মনোনিবেশ করে। আল্লাহ্ তাদের সে তওবা কবুল করেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা আবার দুষ্কৃতিতে মেতে উঠে এবং অন্ধ ও বধির হয়ে হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে হত্যা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে। তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কেও হত্যা করতে উদ্যত হয়।—(ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا ...... অর্থাৎ, হযরত মসীহ্, রূহুল কুদুস ও আল্লাহ্ কিংবা মসীহ্, মরিয়ম ও আল্লাহ্ সবাই আল্লাহ্ -(নাউযুবিল্লাহ)। তাদের মধ্যে একজন অংশীদার হলেন আল্লাহ্। এরপর তাঁরা তিন জনই এক এবং একজনই তিন। এ হচ্ছে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সাধারণ ধর্মবিশ্বাস। এ যুক্তিবিরোধী ধর্মবিশ্বাসকে তারা জটিল ও দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় ব্যক্ত করে। অতঃপর বিষয়টি যখন কারও বোধগম্য হয় না, তখন একে 'বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য' বলে আখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হয়।— (ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

মসীহ (আঃ)-এর উপাস্যতা খণ্ডন ঃ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ অর্থাৎ, অন্যান্য পয়গম্বর যেমন পৃথিবীতে আগমন করার পর কিছুদিন অবস্থান করে এখান থেকে লোকান্তরিত হয়ে গেছেন এবং স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেননি যা উপাস্য হওয়ার লক্ষণ, এমনিভাবে হযরত মসীহ্ (আঃ) যিনি তাঁদের মতই একজন মানুষ—স্থায়িত্ব ও অমরত্ব লাভ করতে পারেননি। কাজেই তিনি উপাস্য হতে পারেন না।

চিন্তা করলে বোঝা যাবে, যে ব্যক্তি পানাহারের মুখাপেক্ষী, সে পৃথিবীর সব কিছুরই মুখাপেক্ষী। মাটি বাতাস, পানি, সূর্য এবং জীবজন্তু থেকে সে পরাঙ্মুখ হতে পারে না। খাদ্যশস্য উদরে পৌঁছা এবং হজম হওয়া পর্যন্ত চিন্তা করুন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কতকিছু প্রয়োজন। এরপর খাওয়ার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে। পরমুখাপেক্ষিতার এ দীর্ঘ পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা মসীহ্ ও মরিয়মের উপাস্যতা খণ্ডনকল্পে যুক্তির আকারে এরূপ বলতে পারি ঃ মসীহ্ ও মরিয়ম পানাহারের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র থেকে মুক্ত ছিলেন না। এ বিষয়টি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও লোকপরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি পানাহার থেকে মুক্ত নয়, সে পৃথিবীর কোন বস্তু থেকেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে না। এখন আপনিই বলুন, যে সত্তা মানব-মণ্ডলীর মত স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থ বস্তুজগত থেকে পরাঙ্মুখ নয়, সে কিভাবে আল্লাহ্ হতে পারে? এ শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট যুক্তিটি জ্ঞানী ও মূর্খ সবাই সমভাবে বুঝতে পারে। অর্থাৎ, পানাহার করা উপাস্য হওয়ার পরিপন্থী—যদিও পানাহার না করাও উপাস্য হওয়ার প্রমাণ নয়। নতুবা সব ফেরেশতা আল্লাহ্ হয়ে যাবে।— (ফাওয়ায়েদে ওসমানী)।

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ
وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي
دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ
قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾ لُعِنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا
يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾
تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ
لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ
خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ
فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا
الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً
لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ
مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

(৭৬) বলে দিন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুর এবাদত কর, যে তোমাদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না? অথচ আল্লাহ্ সব শুনেন, জানেন। (৭৭) বলুন ঃ হে আহলে-কিতাবগণ, তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। (৭৮) বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লংঘন করত। (৭৯) তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল। (৮০) আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্যে যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। (৮১) যদি তারা আল্লাহ্র প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার। (৮২) আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরেকদেরকে পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান বলে। এর কারণ এই যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না।

হযরত মরিয়ম পয়গম্বর ছিলেন কি ওলী ঃ হযরত মরিয়মের পয়গম্বর ও ওলী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে প্রশংসার স্থলে صديقة শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, তিনি ওলী ছিলেন— নবী নয়। কারণ, প্রশংসার স্থলে সাধারণতঃ উচ্চপদই উল্লেখ করা হয়। নবুওয়ত প্রাপ্ত হয়ে থাকলে এখানে نبية বলা হত। অথচ বলা হয়েছে صديقة এটি ওলীত্বের একটি স্তর। — (রূহুল মাআনী, সংক্ষেপিত)

আলেমদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, মহিলারা কখনও নবুওয়ত লাভ করেনি। এ পদ সর্বদা পুরুষদের জন্যেই সংরক্ষিত রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বনী-ইসরাঈলের কুটিলতার আরেকটি দিক ঃ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বনী-ইসরাঈলের ঔদ্ধত্য ও তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন বর্ণনা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ প্রেরিত রসূল- যারা তাদের অক্ষয় জীবনের বার্তা ও তাদের ইহকাল ও পরকাল সংশোধনের কার্যবিধি নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ অর্থাৎ, কতক পয়গম্বরকে তারা মিথ্যারোপ করে এবং কতককে হত্যা করে ফেলে

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব বনী-ইসরাঈলেরই কুটিলতার আরেকটি দিক ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মূর্খরা যেমন ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার এক প্রান্তে থেকে আল্লাহ্র পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং কতককে হত্যা করেছে, তেমনি এরাই বক্রতার অপর প্রান্তে পৌঁছে পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহ্তে পরিণত করে দিয়েছে, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ - অর্থাৎ, যে সব বনী-ইসরাঈল বলে যে, আল্লাহ্ তো ঈসা ইবনে মরিয়মেরই নাম, তারা কাফের হয়ে গেছে।

এখানে এ উক্তিটি শুধু খ্রীষ্টানদের বলে বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র একই ধরনের বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা ইহুদীদের ব্যাপারেও বর্ণনা করা হয়েছে وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ

অর্থাৎ, ইহুদীরা বলে যে, হযরত ওযায়র আল্লাহর পুত্র এবং খ্রীষ্টানরা বলে যে, মসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র।

غلو শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রম করা। ধর্মের সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ধর্ম যে সীমা নির্ধারণ করেছে, তা লঙ্ঘন করা।

উদাহরণতঃ পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সীমা এই যে, আল্লাহ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে তাঁদেরকে সর্বোত্তম মনে করতে হবে। এ সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্র পুত্র বলে দেয়া হচ্ছে বিশ্বাসগত সীমা লঙ্ঘন।

বনী-ইসরাঈলের বাড়াবাড়ি ঃ পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করা এবং হত্যা করতেও কুণ্ঠিত না হওয়া, অথবা তাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্র পুত্র বলে দেয়া, বনী-ইসরাঈলের এ পরস্পর বিরোধী দু'টি

কাজই হচ্ছে মূর্খতাপ্রসূত বাড়াবাড়ি। আরবের প্রসিদ্ধ প্রবচন হচ্ছে ঃ الجاهل اما مفرط او مفرّط অর্থাৎ, মূর্খ ব্যক্তি কখনও মিতাচার ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে পারে না। সে হয় বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়, না হয় সীমালঙ্ঘনে। এ বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন বনী-ইসরাঈলের দু'টি ভিন্ন দলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকতে পারে এবং এমনও হতে পারে যে, একদল লোকই দু'টি ভিন্নমুখী কর্ম বিভিন্ন পয়গম্বরদের সাথে করেছে। অর্থাৎ, কারো কারো প্রতি মিথ্যারোপ করে হত্যা করেছে এবং কাউকে আল্লাহ্র সমতুল্য করে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদেরকে সম্বোধন করে যে সব নির্দেশ তাদেরকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরকে দেয়া হয়েছে, তা ধর্ম অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি মূল স্তম্ভ বিশেষ। এ মূলনীতি থেকে সামান্য এ দিক -সেদিক হলেই মানুষ পথভ্রষ্টতার আবর্তে পতিত হয়ে যায়। এ কারণে এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার পথ ঃ এটা বাস্তব সত্য যে, সমগ্র দুনিয়া-জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। সমগ্র বিশ্বে তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই নির্দেশ চালু। তাঁরই আনুগত্য করা প্রতিটি মানবের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু বেচারী মাটির মানুষ মৃত্তিকাজনিত তমসা ও অধোগতির দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। সে আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সত্তা এবং তাঁর বিধান ও নির্দেশাবলী শত চেষ্টা করেও জানতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কৃপায় তার জন্যে দু'টি মাধ্যম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ মাধ্যমদ্বয়ের দ্বারা সে আল্লাহ্ তাআলার পছন্দ-অপছন্দ এবং আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করতে পারে। তন্মধ্যে একটি মাধ্যম হচ্ছে ঐশীগ্রন্থ, যা মানুষের জন্যে আইন ও নির্দেশনামাবিশেষ। দ্বিতীয় মাধ্যম হচ্ছে মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বান্দা। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে স্বীয় পছন্দ ও অপছন্দের বাস্তব নমুনা এবং স্বীয় গ্রন্থের বাস্তব ব্যাখ্যাতা রূপে পাঠিয়েছেন। ধর্মীয় পরিভাষায় তাঁদেরকে রসূল কিংবা নবী বলা হয়। কেননা, অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, কোন গ্রন্থ-তা যতই সর্ব বিষয় সমন্বিত ও বিস্তারিত হোক না কেন, মানুষের সংশোধন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে যথেষ্ট হয় না। বরং স্বভাবগতভাবেই মানুষের প্রশিক্ষক ও সংস্কারক একমাত্র মানুষই হতে পারে। তাই আল্লাহ্ তাআলা মানুষের সংশোধন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে দু'টি উপায় রেখেছেন ঃ আল্লাহ্র গ্রন্থ এবং আল্লাহ্র প্রিয় বান্দার জামাত। পয়গম্বরগণ, তাঁদের উত্তরসূরি আলেম ও মাশায়েখ-এঁরা সবাই এ মানব মন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্র প্রিয় এসব মানুষের সম্মানের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্ববাসী বাড়াবাড়ির ভুলে লিপ্ত রয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে যেসব দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে, সে সবই এ ভুলের ফসল। কোথাও তাদেরকে সীমা ডিঙ্গিয়ে ব্যক্তিপূজার স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে এবং কোথাও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে حسبنا كتاب الله - বাক্যটিকে ভুল অর্থ পরিয়ে দেয়া হয়েছে। একদিকে রসূলকে বরং পীরদেরকেও 'আলেমুল গায়ব' এবং খোদায়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করে নেয়া হয়েছে এবং পীর পূজা বরং কবরপূজা আরম্ভ হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ্র রসূলকে শুধু একজন পত্রবাহকের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পয়গম্বরদের অবমাননাকারীদেরকে যেমন কাফের বলা হয়েছে, তেমনি তাঁদেরকে সীমা ছাড়িয়ে আল্লাহ্র সমতুল্য আখ্যাদানকারীদেরকেও কাফের সাব্যস্ত করা হয়েছে। لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ -আয়াতখানি এ বিষয়বস্তুরই ভূমিকা। এতে ফুটে উঠেছে যে, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কতগুলো সীমা ও প্রতিবন্ধককেই বলা হয়। এ সীমার ভিতরে ত্রুটি করা যেমন অপরাধ, তেমনি এ সীমাকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়াও অন্যায়। রসূল ও তাঁদের উত্তরসূরিদের কথা অমান্য করা এবং তাঁদের অবমাননা করা যেমন মহাপাপ, তেমনি তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী মনে করা আরও গুরুতর অপরাধ।

শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ বাড়াবাড়ি নয় ঃ আলোচ্য আয়াতে لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ - বলার সাথে সাথে غَيْرَ الْحَقِّ বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। সূক্ষ্মদর্শী তফসীরবিদদের মতে এ শব্দটি তাকীদ অর্থাৎ, বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, ধর্মে বাড়াবাড়ি সর্বাবস্থায়ই অন্যায়। এটা ন্যায় হওয়ার কোন সম্ভবনাই নেই। আল্লামা যমখশরী প্রমুখ তফসীরবিদগণ, এ স্থলে বাড়াবাড়িকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি অন্যায় ও অসত্য, যা আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অপরটি ন্যায় ও বৈধ। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁরা শিক্ষাগত তথ্যানুন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণকে উপস্থিত করেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত মাসআলায় মুসলিম দার্শনিকগণ এবং ফেকাহ্ সংক্রান্ত মাসআলায় ফেকাহ্বিদগণ এরূপ তথ্যানুসন্ধান করেছেন। উপরোক্ত তফসীরবিদগণের মতে এগুলোও বাড়াবাড়ি ; তবে ন্যায় ও বৈধ। সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেন ঃ এগুলো আদৌ বাড়াবাড়ি নয়। কোরআন ও সুন্নাহ্র মাসআলায় যতটুকু তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ রসূলে-করীম (সাঃ), সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে প্রমাণিত রয়েছে, ততটুকু বাড়াবাড়ি নয় এবং যা বাড়াবাড়ির সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তা এ ক্ষেত্রেও নিন্দনীয়।

বনী-ইসরাঈলকে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বনের নির্দেশ ঃ আলোচ্য আয়াতের শেষভাগে বর্তমান কালের বনী-ইসরাঈলদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে-

وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا — অর্থাৎ,

ঐ সম্প্রদায়ের অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছিল। অতঃপর তাদের পথভ্রষ্টতার স্বরূপ ও কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ وَضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ —অর্থাৎ, তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, যা ছিল বাড়াবাড়ি ও ত্রুটির মাঝখানে মধ্যবর্তী পথ। এভাবে এ আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ত্রুটি যে, একটি মারাত্মক ভ্রান্তি, তা এবং সরল পথে কায়েম থাকার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

বনী-ইসরাঈলের কু-পরিণাম ঃ দ্বিতীয় আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ত্রুটিজনিত পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত বনী-ইসরাঈলের কুপরিণাম বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে- প্রথমতঃ হযরত দাউদ (আঃ)-এর মুখে, যার ফলে তাদের আকার-আকৃতি বিকৃতি হয়ে শূকরে পরিণত হয়। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর বাচনিক এ অভিসম্পাত তাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়। এর জাগতিক প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, তারা বিকৃত হয়ে বানরে পরিণত হয়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, এস্থলে স্থানোপযোগিতার কারণে মাত্র দু'জন পয়গম্বরের বাচনিক তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাদের উপর অভিসম্পাতের সূচনা হযরত মূসা (আঃ) থেকে হয়েছিল এবং তা সমাপ্ত হয়েছে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাচনিক। এভাবে উপর্যুপরি চারজন পয়গম্বরের বাচনিক তাদের উপর অভিসম্পাত

বর্ণিত হয়েছে, যারা পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল কিংবা তাঁদেরকে সীমা ডিঙ্গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীতে অংশীদার করেছিল।

সর্বশেষ দু'আয়াতে কাফেরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এর মারাত্মক পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, বনী-ইসরাঈলের সব বক্রতা ও পথভ্রষ্টতা তাদের ভ্রান্ত পরিবেশ ও কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্বেরই ফলশ্রুতি ছিল, যা তাদেরকে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল।

কতিপয় আহলে-কিতাবের সত্যানুরাগ ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে মুসলমানদের সাথে শত্রুতা ও বন্ধুত্বের মাপকাঠিতে ঐসব আহলে-কিতাবের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যারা সত্যানুরাগ ও খোদাভিরুতার কারণে মুসলমানদের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করত না। কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে এ জাতীয় লোকের সংখ্যা ছিল নেহায়েতই নগণ্য। উদাহরণতঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ। খ্রীষ্টানদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল বেশী। বিশেষতঃ মহানবী (সাঃ)-এর আমলে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এ কারণেই মক্কার নবদীক্ষিত মুসলমানরা কোরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দেন এবং বলেন ঃ আমি শুনেছি আবিসিনিয়ার সম্রাট কারও প্রতি জুলুম করেন না এবং কাউকে জুলুম করতে দেন না। তাই মুসলমানরা কিছুদিনের জন্যে সেখানে চলে যেতে পারে।

পরামর্শ অনুযায়ী প্রথমবার এগার জনের একটি দল আবিসিনিয়ায় চলে যায়। তাদের মধ্যে হযরত ওসমান গনী (রাঃ) এবং তাঁর স্ত্রী নবী-দুহিতা হযরত রোকাইয়া (রাঃ)-ও ছিলেন। এরপর হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেবের নেতৃত্বে একটি বিরাট কাফেলা আবিসিনিয়ায় গিয়ে পৌঁছে। এ কাফেলায় পুরুষ ছিলেন বিরাশি জন। আবিসিনিয়ার অধিবাসিরা তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানায় এবং তারা তথায় সুখে-শান্তিতে বাস করতে থাকেন।

কিন্তু মুসলমানরা অন্য কোন দেশে গিয়ে শান্তিতে জীবন যাপন করবে, মক্কার ক্রোধান্ধ কাফেরকুলের তাও সহ্য হল না। তারা প্রচুর উপঢৌকনসহ একটি প্রতিনিধিদল আবিসিনিয়ার সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দিল এবং মুসলমানদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করল। কিন্তু সম্রাট প্রকৃত অবস্থা তদন্ত করলেন এবং হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অবগত হলেন। এসব তথ্য ও ইসলামী শিক্ষাকে তিনি হযরত ঈসা (আঃ) ও ইঞ্জীলের ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পূর্ণ অনুরূপ পেলেন। বলাবাহুল্য, ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী (সাঃ)-এর আবির্ভাব, তাঁর শিক্ষার সংক্ষিপ্ত চিত্র, তাঁর ও তাঁর সহচরবর্গের দৈহিক আকার-আকৃতি ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছিল। এতে প্রভাবান্বিত হয়ে সম্রাট কোরাইশী প্রতিনিধি দলের সব উপঢৌকন ফেরৎ দিলেন এবং তাদেরকে পরিষ্কার বলে দিলেন যে, আমি এমন লোকদেরকে কখনও দেশ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারি না।

জা'ফর ইবনে আবু তালেবের বক্তৃতার প্রভাব ঃ হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব নাজ্জাশীর দরবারে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এছাড়া সেখানে তাঁদের বসবাসের ফলেও সম্রাট, রাজকর্মচারী ও জনগণের অন্তরে ইসলামের প্রতি অগাধ ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর যখন সাহাবীদের নিয়ে নিরাপদে কালাতিপাত করতে থাকেন, তখন আবিসিনিয়ার মুহাজিরগণ মদীনা যাওয়ার সঙ্কল্প করেন। এ সময় ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ সম্রাট নাজ্জাশী তাঁদের সাথে প্রধান প্রধান খ্রীস্টান আলেম ও মাশায়েখের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। সত্তর জনের এ প্রতিনিধিদলে বাষট্টি জন আবিসিনিয় ও আট জন সিরীয় আলেম ও মাশায়েখ ছিলেন।

নবীর দরবারে শাহী প্রতিনিধিদলের উপস্থিতি ঃ প্রতিনিধিদলটি সংসারত্যাগী দরবেশসুলভ পোশাক পরিহিত হয়ে দরবারে উপস্থিত হলে মহানবী (সাঃ) তাদেরকে সূরা-ইয়াসীন পাঠ করে শুনালেন। কোরআন পাঠ শুনে তাদের চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু ঝরছিল। তারা শ্রদ্ধাপূত কণ্ঠে বললেন ঃ এ কালাম হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কালামের সাথে কতই না গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতঃপর প্রতিনিধিদলের সবাই মুসলমান হয়ে গেলেন।

তাদের প্রত্যাবর্তনের পর সম্রাট নাজ্জাশীও ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন এবং একখানা চিঠি লিখে স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে অপর একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় পাঠালেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে জাহাজ ডুবির ফলে তারা সবাই প্রাণত্যাগ করল। মোটকথা, আবিসিনিয়ার সম্রাট, রাজ কর্মচারী ও জনগণ ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে শুধু ভদ্র ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং পরিশেষে তারা নিজেরাও মুসলমান হয়ে যান।

তফসীরবিদগণের মতে উল্লেখিত আয়াতসমূহ তাঁদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى – এবং পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌র ভয়ে তাদের ক্রন্দন করা এবং সত্যকে গ্রহণ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। তফসীরবিদগণ এ বিষয়েও একমত যে, যদিও আলোচ্য আয়াতসমূহ সম্রাট নাজ্জাশী ও তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধিদল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্ত্বেও ভাষার ব্যাপকতার দরুন অন্যান্য ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ খ্রীস্টানদের বেলায়ও এ আয়াত প্রযোজ্য। অর্থাৎ, যারা ইসলাম পূর্বকালে ইঞ্জীলের অনুসারী ছিল এবং ইসলামোত্তর কালে ইসলামের অনুসারী হয়ে গেছে।

ইহুদীদের মধ্যেও এ ধরনের কয়েকজন ছিলেন যারা পূর্বে তওরাতের অনুসরণ করতেন এবং ইসলাম আসার পর ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা জাতিসমূহের আলোচনায় অনুল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম ছিল। অবশিষ্ট ইহুদীদের অবস্থা সবারই জ্ঞাত ছিল যে, তারা মুসলমানদের শত্রুতা ও মূলোৎপাটনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। তাই আয়াতের শুরুভাগে ইহুদীদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ —অর্থাৎ, মুসলমানদের প্রতি শত্রুতায় ইহুদীরাই সর্বাধিক কঠোর।

মোটকথা, এ আয়াতে খ্রীস্টানদের একটি বিশেষ দলের গুণকীর্তন করা হয়েছে, যারা ছিল খোদাভীরু ও সত্য প্রিয়। নাজ্জাশী ও তাঁর পারিষদবর্গও এ দলের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য যেসব খ্রীস্টান এসব গুণের বাহক ছিল কিংবা ভবিষ্যতে হবে, তারাও এ দলেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়াতের অর্থ এই নয় এবং হতেও পারে না যে, খ্রীস্টান জাতি যতই পথভ্রষ্ট হোক না কেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যতই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ

وَإِذَا سَمِعُوْا مَآ أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى أَعْيُنَهُمْ
تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ
الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ أَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾
فَأَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَآ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٨٦﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا
تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّ
اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ أَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ
بِاللَّغْوِ فِيْٓ أَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْأَيْمَانَ ۚ
فَكَفَّارَتُهٗٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ
أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوْٓا
أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾

(৮৩) আর তারা রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন শুনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু সজল দেখতে পাবেন; এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরকেও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন। (৮৪) আমাদের কি ওযর থাকতে পারে যে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং এ আশা করবো না যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎ লোকদের সাথে প্রবিষ্ট করবেন? (৮৫) অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ্‌ এ উক্তির প্রতিদানস্বরূপ এমন উদ্যান দিবেন যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তন্মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান। (৮৬) যারা কাফের হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছে, তারাই দোযখী। (৮৭) হে মুমিনগণ, তোমরা ঐসব সুস্বাদু বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৮৮) আল্লাহ্‌ তা'আলা যেসব বস্তু তোমাদেরকে দিয়েছেন, তন্মধ্য থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী। (৮৯) আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে; কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে বাধ। অতএব, এর কাফ্‌ফারা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা, তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা, একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটা কাফ্‌ফারা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

করুক না কেন সর্বাবস্থায়ই তাদেরকে মুসলমানদের বন্ধু ও হিতৈষী বলে মনে করতে হবে এবং মুসলমানরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে। কেননা, এমন অর্থ করাও নির্জলা ভুল এবং ঘটনাবলীর পরিপন্থী। তাই ইমাম আবু বকর জাসসাস আহকামুল কোরআনে বলেন ঃ কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোকের ধারণা এই যে, এসব আয়াতে সর্বাবস্থায় খ্রীস্টানদের প্রশংসা কীর্তন করা হয়েছে এবং তারা সর্বতোভাবে ইহুদীদের চাইতে উত্তম। এটি নিরেট মূর্খতা। কারণ, সাধারণভাবে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস যাচাই করলে দেখা যায়, খ্রীস্টানদের মুশরিক হওয়াই অধিক সুস্পষ্ট। মুসলমানদের সাথে কাজ-কারবার পরীক্ষা করলে দেখা যায়, বর্তমান কালের সাধারণ খ্রীস্টানরাও ইসলাম বিদ্বেষে ইহুদীদের চাইতে পিছিয়ে নেই। তবে এ কথা সত্য যে, এক সময় খ্রীস্টানদের মধ্যে খোদাভীরু ও সত্যপ্রিয় লোকদের প্রাচুর্য ছিল। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। স্বয়ং এ আয়াতের শেষভাগে কোরআন এ সত্য বর্ণনা করে বলেছে ঃ ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ অর্থাৎ, এসব আয়াতে খ্রীস্টানদলের প্রশংসা করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে আলেম, সংসারত্যাগী ও খোদাভীরু ব্যক্তিবর্গ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অহঙ্কার নাই যে, অন্যের কথা শুনতে সম্মত হবে না। এতে বোঝা গেল যে, ইহুদীদের অবস্থা এমন ছিল না। তারা খোদাভীরু ও সত্যপ্রিয় ছিল না। তাদের আলেমরাও সংসারত্যাগের পরিবর্তে স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধিকে শুধু জীবিকা-উপার্জনে নিয়োজিত করেছিল এবং সংসারের প্রতি এমন মোহবিষ্ট ছিল যে, সত্যাসত্য ও হালাল-হারামের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করত না।

সত্যানুরাগী আলেম ও মাশায়েখই জাতির প্রাণকেন্দ্র ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল যে, সত্যানুরাগী খোদাভীরু আলেম ও মাশায়েখই জাতির আসল প্রাণকেন্দ্র। তাদের অস্তিত্বের মধ্যেই সমগ্র জাতির জীবন নিহিত। যতদিন কোন জাতির মধ্যে এমন আলেম ও মাশায়েখ বিদ্যমান থাকেন, যারা পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী নয় এবং যারা খোদাভীরু, ততদিন সে জাতি অব্যাহতভাবে কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে থাকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সংসার ত্যাগ খোদায়ী সীমার ভিতরে হলে বৈধ, নতুবা হারাম ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, সংসার ত্যাগ ও ভোগ-বিলাস ত্যাগ করা যদিও এক পর্যায়ে প্রশংসনীয়, কিন্তু এতেও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা নিন্দনীয় ও হারাম। এর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করার তিনটি স্তর ঃ কোন হালাল বস্তুকে হারাম করে নেয়ার তিনটি স্তর রয়েছে। (এক) বিশ্বাসগতভাবে হারাম মনে করে নেয়া, (দুই) উক্তির মাধ্যমে কোন বস্তুকে নিজের জন্যে হারাম করে নেয়া। উদাহরণতঃ এরূপ প্রতিজ্ঞা করা যে, ঠান্ডা পানি পান করবে না কিংবা অমুক হালাল খাদ্য খাবে না অথবা অমুক জায়েয কাজ করবে না এবং (তিন) বিশ্বাস ও উক্তি কিছুই নয় কিন্তু কার্যতঃ কোন হালাল বস্তুকে চিরতরে বর্জন করার সংকল্প করে নেয়া।

প্রথমাবস্থায় যদি ঐ বস্তু অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে হালাল হয়ে থাকে, তবে তাকে হারাম বলে যে লোক বিশ্বাস করবে সে আল্লাহ্‌র আইনের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণের কারণে কাফের হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়াবস্থায়ে যদি কসমের শব্দ যোগে হালাল বস্তুটিকে নিজের উপর হারাম করে থাকে, তবে কসম শুদ্ধ হবে। কসমের শব্দ অনেক, যা ফেকাহ্ গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখিত রয়েছে। উদাহরণতঃ কেউ এরূপ বলে যে, আমি আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি, অমুক বস্তু খাব না কিংবা অমুক কাজ করব না অথবা এরূপ বলে যে, আমি অমুক বস্তু কিংবা অমুক কাজকে নিজের উপর হারাম করছি। বিনা প্রয়োজনে এরূপ কসম খাওয়া গোনাহ্। কিন্তু এরূপ কসম ভঙ্গ করলে তার কাফফারা দেয়া জরুরী। কাফফারার বিবরণ পরে বর্ণিত হবে।

তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ, বিশ্বাস ও উক্তি দ্বারা কোন হালালকে হারাম না করে কার্যতঃ হারামের মত ব্যবহার করলে যদি এরূপ বর্জনকে ছোয়াবের কাজ মনে করে, তবে তা বেদআত এবং বৈরাগ্য বা সংসারত্যাগ। এরূপ বৈরাগ্য যে মহাপাপ তা কোরআনের স্পষ্ট আয়াতে বর্ণিত আছে। এর বিরুদ্ধাচরণ করা ওয়াজেব এবং এরূপ বিধিনিষেধে অটল থাকা গোনাহ্। তবে এরূপ বিধিনিষেধ ছোয়াবের নিয়তে না হয়ে অন্য কোন কারণে যথা, কোন দৈহিক কিংবা আত্মিক অসুস্থতার কারণে কোন বিশেষ বস্তুকে স্থায়ীভাবে বর্জন করলে তাতে গোনাহ্ নেই। কোন কোন সূফী-বুযুর্গ হালাল বস্তু স্থায়ীভাবে বর্জন করেছেন বলে যেসব ঘটনা বর্ণিত আছে, তা এমনি ধরনের বর্জনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা এসব বস্তুকে স্বীয় নফসের জন্যে ক্ষতিকর মনে করেছেন কিংবা কোন বুযুর্গ ক্ষতিকর বলেছেন। তাই প্রতিকারার্থ তা বর্জন করেছেন। এতে কোন দোষ নেই।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ – অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করো না। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা সীমাতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, কোন হালাল বস্তুকে বিনা ওযরে ছোয়াব মনে করে বর্জন করা। অজ্ঞ ব্যক্তি একে তাকওয়া তথা খোদাভীরুতা মনে করে। অথচ আল্লাহ্র কাছে এটা সীমাতিক্রম ও অবৈধ।

তাই দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ – অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যে পবিত্র ও হালাল বস্তু তোমাদেরকে দিয়েছেন, তা খাও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, যার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস রয়েছে।

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হালাল ও পবিত্র বস্তুকে ছোয়াব মনে করে বর্জন করা তাকওয়া নয়, বরং আল্লাহ্র নেয়ামত মনে করে ব্যবহার করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মধ্যেই তাকওয়া নিহিত। হাঁ, কোন দৈহিক ও আত্মিক রোগের প্রতিকারার্থে কোন বস্তু বর্জন করলে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

শপথের কয়েকটি প্রকার ও তার বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতে শপথের কয়েকটি প্রকার বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সূরা-বাকারায়ও বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোর সারকথা এই যে, যদি অতীত ঘটনা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা হয়, তবে ফেকাহ্বিদদের পরিভাষায় এরূপ শপথকে 'এয়ামীনে গুমূস' বলা হয়। উদাহরণতঃ কেউ একটি কাজ করে ফেলল এবং সে জানে যে, এ কাজটি সে করেছে। এরপর সে জেনেশুনে শপথ করে যে, সে কাজটি করেনি। মিথ্যা শপথ কবীরা গোনাহ্ এবং ইহকাল ও পরকালে শাস্তির কারণ। কিন্তু এর জন্যে কোনরূপ কাফফারা ওয়াজেব হয় না– তওবা ও এস্তেগফার করা জরুরী। এ কারণেই একে পরিভাষায় 'এয়ামীনে গুমূস' বলা হয়। কেননা, গুমূসের অর্থ, যে ডুবিয়ে দেয়। এ শপথ শপথকারীকে গোনাহ্ ও শাস্তিতে ডুবিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, নিজ ধারণায় সত্য মনে করে কোন অতীত ঘটনা সম্পর্কে শপথ করা; কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হওয়া। উদাহরণতঃ কোন সূত্রে জানা গেল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এর উপর নির্ভর করে কেউ শপথ করল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এরপর দেখ গেল যে, এটা বাস্তবের বিপরীত। এরূপ শপথকে 'এয়ামীনে লগ্ভ' বলা হয়। এরূপ শপথে গোনাহ্ নেই এবং কাফ্ফারাও দিতে হয় না।

তৃতীয় প্রকার এই যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার শপথ করা। এরূপ শপথকে 'এয়ামীনে মুনআকেদা' বলা হয়। এ শপথ ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজেব হয়। তবে কোন কোন অবস্থায় গোনাহ্ হয়, কিন্তু কোন কোন অবস্থায় গোনাহ্ হয় না।

এস্থলে কোরআন পাকের উল্লেখিত আয়াতে লগ্ভ বলে বাহ্যতঃ এমন শপথকেই বোঝানো হয়েছে, যাতে কাফ্ফারা নেই; গোনাহ্ হোক বা না হোক। কেননা, এর বিপরীতে عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ – উল্লেখিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখানে পাকড়াও করার অর্থ জাগতিকভাবে পাকড়াও, যা কাফ্ফারার আকারে হয়।

সূরা বাকারার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

এখানে لغو বলে ঐ শপথকে বোঝানো হয়েছে, যা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে কিংবা কেউ নিজ ধারণায় সত্য মনে করে শপথ করে, কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হয়। এর বিপরীতে ঐ শপথ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলা হয়। একে 'এয়ামীনে গুমূস' বলা হয়। অতএব, এ আয়াতের সারমর্ম এই যে, এয়ামীনে লগভে গোনাহ্ নেই– 'এয়ামীনে গুমূসে' গোনাহ্ আছে, যাতে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলা হয়। সূরা-বাকারায় পারলৌকিক গোনাহ্ বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা-মায়েদার আলোচ্য আয়াতে জাগতিক নির্দেশ অর্থাৎ, কাফ্ফারা বর্ণিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, এয়ামীনে লগভের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না– অর্থাৎ, কাফ্ফারা ওয়াজেব করেন না, বরং কাফ্ফারা শুধু ঐ শপথের জন্যেই ওয়াজেব করেন যা ভবিষ্যতে কোন কাজ করা না করা সম্পর্কে করা হয় এবং অতঃপর তা ভঙ্গ করা হয়। এরপর কাফ্ফারার বিস্তারিত বিবরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

অর্থাৎ, তিনটি কাজের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় যে কোন একটি কাজ করতে হবে ঃ (এক) দশ জন দরিদ্রকে মধ্যমশ্রেণীর খাদ্য সকাল-বিকাল দু'বেলা খাওয়াতে হবে কিংবা (দুই) দশ জন দরিদ্রকে 'সতর ঢাকা' পরিমাণ পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে। উদাহরণতঃ একটি পাজামা অথবা একটি লুঙ্গি অথবা একটি লম্বা কোর্তা কিংবা (৩) কোন গোলাম মুক্ত করতে হবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا
يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ
وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾
وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُوا۟ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا
عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٩٢﴾ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟
ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّأَحْسَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ وَ
رِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ
حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ
مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ
عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

(৯০) হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক—যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। (৯১) শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে? (৯২) তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগত হও, রসূলের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা কর। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ, আমার রসূলের দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচার বৈ নয়। (৯৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, সে জন্য তাদের কোন গোনাহ্ নেই যখন ভবিষ্যতের জন্যে সংযত হয়েছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এরপর সংযত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে। এরপর সংযত থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ্ সৎকর্মীদেরকে ভালবাসেন। (৯৪) হে মুমিনগণ, আল্লাহ্ তোমাদেরকে এমন কিছু শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন, যে শিকার পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই পৌঁছতে পারবে– যাতে আল্লাহ্ বুঝতে পারেন যে, কে তাকে অদৃশ্যভাবে ভয় করে। অতএব, যে ব্যক্তি এরপর সীমা অতিক্রম করবে, তার জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (৯৫) মুমিনগণ, তোমরা এহ্‌রাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার বধ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজেব হবে, যা সমান হবে ঐ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে– বিনিময়ের জন্তুটি উৎসর্গ হিসেবে কাবায় পৌঁছাতে হবে। অথবা তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজেব– কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তার সমপরিমাণ রোযা রাখবে যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ্ মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ কান্ড করবে, আল্লাহ্ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।

এরপর বলা হয়েছে ঃ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ – অর্থাৎ, কোন শপথ ভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি এ আর্থিক কাফ্‌ফারা দিতে সমর্থ না হয়, তবে তার জন্যে কাফ্‌ফারা এই যে, সে তিন দিন রোযা রাখবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এখানে উপর্যুপরি তিন রোযা রাখার নির্দেশ রয়েছে। তাই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও অন্যান্য কয়েকজন ইমামের মতে শপথের কাফ্‌ফারা হিসেবে যে রোযা রাখা হবে, তা উপর্যুপরি হওয়া জরুরী।

আলোচ্য আয়াতে শপথের কাফ্‌ফারা প্রসঙ্গে প্রথমে إِطْعَامُ শব্দ বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অর্থ যেমন খাদ্য খাওয়ানো হয়, তেমনি কাউকে খাদ্য দান করাও হয়। তাই ফেকাহ্‌বিদগণ আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, দাতা ইচ্ছা করলে দশ জন দরিদ্রকে ভোজনও করিয়ে দিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে খাদ্য তার মালিকানায় দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ভোজন করালে তা মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য হতে হবে, যা সে নিজগৃহে খেতে অভ্যস্ত। দশজন দরিদ্রকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে। পক্ষান্তরে খাদ্য দান করলে প্রত্যেক দরিদ্রকে একজনের ফেতরা পরিমাণ দিতে হবে। অর্থাৎ, পৌনে দু'সের গম অথবা তার মূল্য। মোটকথা, উপরোক্ত তিনটি কাজের মধ্যে যে কোন একটি করতে হবে। কিন্তু রোযা রাখা তখনই যথেষ্ট হতে পারে, যখন তিনটির মধ্যে যে কোন একটিরও সামর্থ্য না থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মানুষের কল্যাণের জন্যেই বস্তুজগতের সৃষ্টি ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বকে মানুষের উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে মানুষের বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত করেছেন এবং মানুষকে সমগ্র বিশ্বের সেবার যোগ্য করেছেন। তবে তিনি মানুষের প্রতি শুধু একটি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তা এই যে, আমার সৃষ্টবস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার যে সীমা আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি, তা লঙ্ঘন করবে না। যেসব বস্তু তোমাদের জন্যে হালাল ও পবিত্র করেছি, সেগুলো থেকে বিরত থাকা ধৃষ্টতা ও অকৃজ্ঞতা এবং যেসব বস্তুর বিশেষ ব্যবহারকে হারাম করেছি, তার বিরুদ্ধাচরণ করা অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ। দাসের কর্তব্য প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী তার সৃষ্টবস্তুকে ব্যবহার করা? এরই নাম দাসত্ব।

প্রথম আয়াতে মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য পরীক্ষার শর এই চারটি বস্তুকে হারাম বলা হয়েছে। এ বিষয়বস্তুরই একটি আয়াত প্রায় একই ধরনের শব্দ সহযোগে সূরা-বাকারায়ও উল্লেখিত হয়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ

এতে উপরোক্ত চার বস্তুকে رجس বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় رجس এমন নোংরা বস্তুকে বলা হয়, যার প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা জন্মে। এ চারটি বস্তুও এমন যে, সামান্য সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মনেই এগুলোর প্রতি আপনা-আপনিই ঘৃণা জন্মে।

'আযলাম'-এর ব্যাখ্যা ঃ এ চার বস্তুর মধ্যে ازلام অন্যতম। এটি زلم -এর বহুবচন। আযলাম এমন শরকে বলা হয়, যদ্দ্বারা আরবে ভাগ্যনির্ধারণী জুয়া খেলার প্রথা প্রচলিত ছিল। দশ ব্যক্তি শরীক হয়ে

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ
عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ
وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾ مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾ قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ
أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن
تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ
لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ
مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن
بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

(৯৬) তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে এবং তোমাদের এহ্রামকারীদের জন্যে হারাম করা হয়েছে স্থল শিকার যতক্ষণ এহরাম অবস্থায় থাক। আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার কাছে তোমরা একত্রিত হবে। (৯৭) আল্লাহ্ সম্মানিত গৃহ কা'বাকে মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ করেছেন এবং সম্মানিত মাসসমূহকে, হারাম কোরবানীর জন্তুকে ও যাদের গলায় আবরণ রয়েছে। এর কারণ এই যে, যাতে তোমরা জেনে নাও যে, আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছু জানেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (৯৮) জেনে নাও, নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা ও নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল-দয়ালু। (৯৯) রসূলের দায়িত্ব শুধু পৌছিয়ে দেওয়া। আল্লাহ্ জানেন, যা কিছু তোমরা প্রকাশ্যে কর এবং যা কিছু গোপনে কর। (১০০) বলে দিন ঃ অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর-যাতে তোমরা মুক্তি পাও। (১০১) হে মুমিনগণ, এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। যদি কোরআন অবতরণকালে তোমরা এসব বিষয় জিজ্ঞেস কর, তবে তা তোমাদের জন্যে প্রকাশ করা হবে। অতীত বিষয় আল্লাহ্ ক্ষমা করেছেন আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল। (১০২) এরূপ কথাবার্তা তোমাদের পূর্বে এক সম্প্রদায় জিজ্ঞেস করেছিল। এরপর তারা এসব বিষয়ে অবিশ্বাসী হয়ে গেল। (১০৩) আল্লাহ্ 'বহিরা', 'সায়েবা' 'ওসীলা' এবং 'হামী' কে শরীয়তসিদ্ধ করেননি। কিন্তু যারা কাফের, তারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। তাদের অধিকাংশেরই বিবেক বুদ্ধি নেই।

একটি উট যবাই করত। অতঃপর এর মাংস সমান দশ ভাগে ভাগ করার পরিবর্তে তা দ্বারা জুয়া খেলা হত। দশটি শরের সাতটিতে বিভিন্ন অংশের চিহ্ন অবিকৃত থাকত। কোনটিতে এক এবং কোনটিতে দুই বা তিন অংশ অঙ্কিত থাকত। অবশিষ্ট তিনটি শর অংশবিহীন সাদা থাকত। এ শরগুলোকে তূনের মধ্যে রেখে খুব নাড়াচাড়া করে নিয়ে এককে অংশীদারের জন্যে একটি শর বের করা হত। যত অংশবিশিষ্ট শর যার নামে বের হত, সে তত অংশের অধিকারী হত এবং যার নামে অংশবিহীন শর হত, সে বঞ্চিত হত। আজকাল এ ধরনের অনেক লটারী বাজারে প্রচলিত আছে। এগুলোও জুয়া এবং হারাম।

লটারীর জায়েয প্রকার ঃ এক প্রকার লটারী জায়েয এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে। তা এই যে, অধিকার সবার সমান এবং অংশও সমান বন্টন করা হয়েছে। এখন কার অংশ কোনটি, তা লটারীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যায়। উদাহরণতঃ একটি গৃহ চার জন অংশীদারের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এখন মূল্যের দিক দিয়ে গৃহটিকে সমান চার ভাগে ভাগ করতে হবে। অতঃপর কে কোন ভাগ নিবে, তা যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট করা সম্ভব না হয়, তবে লটারীর মাধ্যমে যার নামে যে অংশ আসে, তা তাকে দেয়াও জায়েয। অথবা মনে করুন, কোন একটি বস্তুর প্রার্থী এক হাজার জন এবং সবার অধিকারও সমান। কিন্তু যে বস্তুটি ভাগ করতে হবে, তা সর্বমোট একশটি। এ ক্ষেত্রেও লটারীযোগে মীমাংসা করা যায়।

মাসআলা ঃ হরমের সীমার ভেতরে এহ্রাম অবস্থায় যেসব শিকার হারাম, তা খাদ্য জাতীয় অর্থাৎ, হালাল জন্তু হোক কিংবা অখাদ্য অর্থাৎ হারাম জন্তু হোক সবাই হারাম।

* বন্য জন্তুকে শিকার বলা হয়, যেগুলো প্রকৃতিগতভাবে মানুষের কাছে থাকে না। সুতরাং যেসব জন্তু সৃষ্টিগতভাবে গৃহপালিত; যেমন ভেড়া, ছাগল, গরু, উট এগুলো যবাই করা এবং খাওয়া জায়েয।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

* তবে যেসব জন্তু দলীলের ভিত্তিতে ব্যতিক্রমধর্মী, সেগুলোকে ধরা এবং বদ করা হালাল। যেমন, সামুদ্রিক জন্তু শিকার। দলীল এই ঃ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ (তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে।) কিছুসংখ্যক স্থলভাগের জন্তু, যেমন-কাক, চিল, বাঘ, সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর-প্রভৃতি বধ করা হালাল। এমনিভাবে যে হিংস্র জন্তু নিজে আক্রমণ করে, সেটিকে বধ করাও হালাল। হাদীসে এগুলোর ব্যক্তিক্রম উল্লেখিত হয়েছে।

* যে হালাল জন্তু এহরাম ছাড়া অবস্থায় এবং হরমের বাইরে শিকার করা হয়, এহ্রামওয়ালা ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়া জায়েয। যদি সে জন্তুকে শিকার করা ও বধ করার কাজে সে নিজে সহায়ক কিংবা পরামর্শদাতা কিংবা জন্তুর প্রতি ইঙ্গিতকারী না হয়। হাদীসে তাই বলা হয়েছে এবং আয়াতের لَا تَقْتُلُوا শব্দেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, আয়াতে لَا تَقْتُلُوا (বধ করো না) বলা হয়েছে- لَا تَأْكُلُوا (খেয়ো না) বলা হয়নি।

* হরমের এলাকায় প্রাপ্ত শিকারকে জেনেশুনে বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজেব হয়, তেমনিভাবে ভুলক্রমে বা অজ্ঞান্তে বধ করলেও বিনিময় ওয়াজেব।-(রুহুল-মা'আনী)

* প্রথম বার বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজেব, এমনিভাবে দ্বিতীয়-তৃতীয় বার বধ করলেও বিনিময় ওয়াজেব।

* বিনিময়ের সারমর্ম এই যে, যে সময়ে এবং যে স্থানে জন্তুকে বধ করা হয়, উত্তম এই যে, দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা (একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারাও জায়েয) জন্তুর মূল্য অনুমান করাতে হবে। যদি নিহত জন্তু খাবার অযোগ্য (অর্থাৎ, হারাম) হয়, তবে এর মূল্য একটি ছাগলের মূল্যের চাইতে বেশী ওয়াজেব হবে না। আর যদি জন্তুটি খাবারযোগ্য (অর্থাৎ, হালাল) হয়, তবে যে পরিমাণ মূল্য অনুমান করা হবে, তাই ওয়াজেব হবে। উভয় অবস্থায় পরবর্তীতে তিনটি কাজের মধ্য থেকে সে যেকোন একটি করতে পারে। হয় এ মূল্যের দ্বারা কোরবানীর শর্তানুযায়ী কোন জন্তু ক্রয় করে হেরেমের সীমানার ভিতরে তা জবাই করে মাংস ফকিরদের মধ্যে বন্টন করে দিবে, না হয় এ মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্যশস্য ফেতরার শর্তানুযায়ী প্রতি মিসকীনকে অর্ধ ছা'হিসেবে দান করে দিবে এবং না হয় সে খাদ্যশস্য অর্ধ ছা'হিসেবে যতজনকে দেয়া যেত ততসংখ্যক রোযা রাখবে। খাদ্যশস্য বন্টন এবং রোযা রাখা হেরেমের ভিতরে হওয়া শর্ত নয়। যদি অনুমানকৃত মূল্য অর্ধ ছা'থেকেও কম হয়, তবে ইচ্ছা করলে তা একজন ফকিরকে দিয়ে দিতে পারবে কিংবা ইচ্ছা করলে একটি রোযা রাখতে পারবে। এমনিভাবে প্রতি মিসকীনকে অর্ধ ছা'হিসেবে দেয়ার পর যদি অর্ধ ছা'থেকে কম অবশিষ্ট থাকে, তবুও ইচ্ছা করলে তা এক মিসকীনকে দিয়ে দিবে কিংবা ইচ্ছা করলে একটি রোযা রাখবে। আমাদের দেশে প্রচলিত ওজন অনুযায়ী অর্ধ ছা'পৌণে দুই সেরের সমান।

* উল্লেখিত অনুমানে যতজন মিসকিনের অংশ সাব্যস্ত হয়, যদি তাদেরকে দু'বেলা পেটভরে আহার করিয়ে দেয়, তবে তাও জায়েয।

* যদি এ মূল্য দিয়ে যবেহ্‌ করার জন্যে জন্তু ক্রয় করার পর কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তবে উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে ইচ্ছা করলে অন্য জন্তু ক্রয় করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্য ক্রয় করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্যের হিসেবে রোযা রাখতে পারবে। জন্তু বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজেব হয়, তেমনিভাবে জন্তুকে আহত করলেও অনুমান করাতে হবে যে, এ আঘাতের ফলে জন্তুটির কতটুকু মূল্য হ্রাস পেয়েছে। অতঃপর হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য দিয়ে পূর্বোক্ত তিনটি কাজের যে কোন একটি কাজ করা জায়েয হবে।

* এহ্‌রাম বাঁধা ব্যক্তির পক্ষে যে জন্তু শিকার করা হারাম সেই জন্তুকে যবেহ্‌ করাও হারাম। তার যবেহ্‌কৃত জীবটি মৃত বলে গণ্য হবে। لَا تَقْتُلُوا বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এহ্‌রাম বাধা ব্যক্তির পক্ষে যবেহ্‌ করা বধ করারই অনুরূপ।

* যদি কোন অনাবাদী জায়গায় জন্তু বধ করা হয়, তবে নিকটতম জনবসতির বাজার দর হিসাবে মূল্য অনুমান করতে হবে।

* শিকার কাজের জন্য ইঙ্গিত-ইশারা করা, বলে দেয়া এবং সাহায্য করাও শিকার করার মতই হারাম।

শান্তির চারটি উপায় ঃ প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা চারটি বস্তুকে মানুষের প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও শান্তির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রথমতঃ কা'বা। আরবী ভাষায় কা'বা চতুষ্কোণবিশিষ্ট গৃহকে বলা হয়। আরবে খাছ্‌আম গোত্রের নির্মিত অপর একটি গৃহও এ নামে খ্যাত ছিল। সে গৃহকে 'কা'বা এমানিয়াহ্‌' বলা হত। তাই বায়তুল্লাহ্‌কে সে কা'বা থেকে স্বতন্ত্র করে বোঝাবার জন্যে কা'বা শব্দের সাথে الْبَيْتَ الْحَرَامَ শব্দ যোগ করা হয়েছে।

قيام ও قوام শব্দটি اسم مصدر-এর অর্থ ঐ সব বস্তু, যার উপর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। তাই قِيَامًا لِّلنَّاسِ - এর অর্থ হবে এই যে, কা'বা ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহ মানুষের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের কারণ এবং উপায়।

ناس শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এক্ষেত্রে স্থানের ইঙ্গিতে বিশেষভাবে মক্কার লোকজন কিংবা আরববাসী কিংবা সমগ্র বিশ্বের মানুষকেও বোঝা যেথে পারে। বাহ্যতঃ সমগ্র বিশ্বের মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে মক্কা ও আরববাসীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাজেই আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কা'বা তথা বায়তুল্লাহ্‌কে এবং পরবর্তীতে উল্লেখিত আরও কতিপয় বস্তুকে সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপায় করে দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত জগতের প্রতিটি দেশ ও অঞ্চলের মানুষ বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে থাকবে এবং হজ্জব্রত পালন করতে থাকবে, অর্থাৎ, যাদের উপর হজ্জ ফরয, তারা হজ্জ করতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত থাকেব। পক্ষান্তরে যদি এক বছরকালও কেউ হজ্জব্রত পালন না করে কিংবা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে কেউ নামায আদায় না করে, তবে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক আযাব নেমে আসবে।

কা'বা সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ ঃ এ বিষয়বস্তুটি তফসীরবিদ হযরত আতা (রহঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ
খানায়ে-কা'বা সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ। যতদিন এর দিকে মুখ করা হবে এবং হজ্জ পালিত হতে থাকবে, ততদিনই জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি কোন সময় বায়তুল্লাহ্‌র এ সম্মান বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে বিশ্বকেও বিলীন করে দেয়া হবে। বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও বায়তুল্লাহ্‌র মাঝে যে যোগসূত্র রয়েছে, তার স্বরূপ জানা জরুরী নয়। যেমন, চুম্বক লোহ্য এবং বিশেষ প্রকারের আঠা ও খড়-কুটোর পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ কেউ জানে না। কিন্তু এটি এমন একটি বাস্তব সত্য, যা চোখেই দেখা যায়; কেউ একে অস্বীকার করতে পারে না। বায়তুল্লাহ্‌র ও বিশ্ব-ব্যবস্থাপনার পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা মানুষের সাধ্যাতীত। বিশ্ব-স্রষ্টার বর্ণনার মাধ্যমেই তা জানা যায়। বায়তুল্লাহ্‌র সমগ্র বিশ্বের স্থায়ীত্বের কারণ হওয়া এটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বহ্যিক দৃষ্টি তা অনুভব করতে পারে না, কিন্তু আরব ও মক্কাবাসীদের জন্য এটি যে শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ, তা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুষ জ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত।

বায়তুল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিশ্ব-শান্তির কারণ ঃ সাধারণতঃ বিশ্বে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব কারণে ডাকাত চোর, হত্যা ও লুণ্ঠনকারীরা দুঃসাহস করতে পারে না। কিন্তু জাহেলিয়াত যুগের আরবে কোন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিংবা জন-নিরাপত্তার জন্যে কোন নিয়মিত আইনও প্রচলিত ছিল না। গোত্রীয় কাঠামোতেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক গোত্র অন্য গোত্রের জান-মাল ও মান-সম্ভ্রমের উপর যখন ইচ্ছা আক্রমণ করতে পারত। কাজেই কোন গোত্রের পক্ষে কখনও শান্তি ও নিরাপত্তার সুযোগ ছিল না। আল্লাহ্‌ তাআলার স্বীয় পরিপূর্ণ কুদরতের বলে মক্কার বায়তুল্লাহ্‌কে রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত করে শান্তির উপায় করে দেন। রাষ্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার মত ধৃষ্টতা যেমন, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি করতে পারে না, বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের মর্যাদা ক্ষুন্ন করার সাহসও তেমনিভাবে কেউ করতে পারত না। আল্লাহ্‌ তাআলা জাহেলিয়াত যুগে বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের সম্মান ও মাহাত্ম্য

সাধারণ মানুষের অন্তরে এমনভাবে সংস্থাপিত করে দেন যে, তারা এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে যাবতীয় ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তিকে বর্জন করতেও কুণ্ঠিত হত না।

সে যুগের আরবদের রণোন্মাদনা ও গোত্রগত বিদ্বেষ সারা বিশ্বের প্রবাদবাক্যের মত খ্যাত ছিল। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে বায়তুল্লাহ্ ও তার আনুষঙ্গিক বস্তুসামগ্রীর সম্মান ও মাহাত্ম্য এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন যে, প্রাণের ঘোরতর শত্রু কিংবা কঠোরতম অপরাধীও যদি একবার হারাম শরীফের সীমানায় আশ্রয় নিতে পারত, তবে তার সাত খুন মাফ হয়ে যেত। তারা তীব্র দুঃখ ও ক্রোধ সত্ত্বেও তাকে কিছুই বলত না। হেরেমের অভ্যন্তরে পিতৃহন্তাকে চোখের সামনে দেখেও তারা চক্ষু নত করে চলে যেত।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি হজ্ব ও ওমরার নিয়তে বাড়ী থেকে বের হত কিংবা যে জন্তু হারাম শরীফে কোরবানীর জন্যে আনা হত, তার প্রতিও আরবরা সম্মান প্রদর্শন করত এবং কোন অতি মন্দ ব্যক্তিও এর ক্ষতি করত না। হজ্ব ও ওমরার কোন লক্ষণ কিংবা কণ্ঠাভরণ বাধা অবস্থায় কোন প্রাণের শত্রুকেও তারা কিছুই বলত না।

ষষ্ঠ হিজরীতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদল সাহাবায়ে কেরামকে সাথে করে ওমরার এহ্রাম বেঁধে বায়তুল্লাহ্র উদ্দেশে রওয়ানা হন। হেরেম শরীফের সীমানার সন্নিকটে হোদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি যাত্রাবিরতি করেন এবং হযরত ওছমান (রাঃ)-কে কয়েকজন সঙ্গীসহ মক্কায় পাঠিয়ে দেন, যাতে তাঁরা মক্কার সর্দারদেরকে বলে দেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধের নিয়তে নয়-ওমরা আদায় করার জন্যে এসেছেন। কাজেই তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত হবে না।

মোটকথা, জাহেলিয়াত যুগেও আল্লাহ্ তাআলা আরবদের মনে হারাম শরীফের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত ছিল; এ সম্মানের ফলশ্রুতিতে শুধু হারাম শরীফের ভেতরে যাতায়াতকারী লোকজন এবং বিশেষ চিহ্ন পরিহিত অবস্থায় হজ্ব ও ওমরার জন্যে আগমনকারীরা নিরাপদ হয়ে যেত বটে, কিন্তু বহির্বিশ্বের লোকজন এদ্বারা কোন উপকার, শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারত না। কিন্তু আরবে যেভাবে বায়তুল্লাহ্ ও হারাম শরীফের সম্মান ব্যাপকভাবে প্রতিপালিত হতো, তেমনিভাবে হজ্বের মাসগুলোর প্রতিও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হত। আরবরা এ মাসগুলোকে 'আশহুরে হুরুম' বা সম্মানিত মাস বলত। কেউ কেউ এগুলোর সাথে রজব মাসকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। এসব মাসে হেরেমের বাইরে যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকেও আরবরা হারাম মনে করত এবং এ থেকে সযত্নে বেঁচে থাকত।

এ কারণে কোরআন পাক মানুষের স্থায়িত্বের উপায় হিসেবে কা'বার সাথে আরও তিনটি বস্তুর উল্লেখ করেছে ঃ প্রথমতঃ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ অর্থাৎ, সম্মান ও মহত্ত্বের মাস। এখানে شهر শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেছেন যে, এখানে شهر حرام বলে জিলহজ্ব মাসকে বোঝানো হয়েছে। এমাসেই হজ্বের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, শব্দটি একবচন হলেও অর্থের দিক দিয়ে جنس হওয়ার কারণে অন্যান্য সম্মানিত মাসও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় বস্তু হচ্ছে هدى হারাম শরীফে যে জন্তুকে কোরবানী করা হয়, তাকে هدى বলা হয়। যে ব্যক্তির সাথে এরূপ জন্তু থাকত, সে নির্বিবাদে পথ চলতে পারত; তাকে কেউ কিছু বলত না। এভাবে কোরবানীর জন্তুও ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম উপায়।

তৃতীয় বস্তু قلائد - এটি قلادة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ, গলার হার। জাহেলিয়াত যুগের আরবে প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কেউ হজ্বের উদ্দেশে বের হলে চিহ্নস্বরূপ গলায় একটি হার পরে নিত – যাতে একে দেখে সবাই বুঝতে পারে যে, লোকটি হজ্ব করতে যাচ্ছে, ফলে কেউ যেন তাকে কোন কষ্ট না দেয়। কোরবানীর জন্তুর গলায়ও এধরনের হার পরিয়ে দেয়া হত। এসব হারকেও قلائد বলা হয়। এ কারণে قلائد ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হয়ে যায়।

চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, সম্মানিত মাসসমূহ, কোরবানীর জন্তু এবং গলার হার এ তিনটি বস্তুই-বায়তুল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত। এদের সম্মানও বায়তুল্লাহ্র সম্মানেরই এককেটি অংশ। সারকথা এই যে, বায়তুল্লাহ্ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহকে আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র বিশ্বমানবের জন্যে সাধারণভাবে এবং আরব ও মক্কাবাসীদের জন্যে বিশেষভাবে স্থায়িত্বের উপায় করে দিয়েছেন।

قِيَمًا لِّلنَّاسِ এর ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন, এর অর্থ এই যে, বায়তুল্লাহ্ ও হারামকে সবার জন্যে শান্তির আবাসস্থল করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে মক্কাবাসীদের জন্যে রুযি-রোযগারের সুবিধা দান। কেননা, এখানে কোন কিছু উৎপন্ন হয় না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সারা বিশ্বের জিনিসপত্র এখানে পৌঁছিয়ে দেন।

কেউ বলেন, মক্কাবাসীরা যেহেতু কা'বা গৃহের খাদেম ও সংরক্ষক বলে পরিচিত ছিল, তাই তাদেরকে আল্লাহ্ভক্ত মনে করে সর্বদা মানুষ তাদের সম্মান করত। قِيَمًا لِّلنَّاسِ বাক্যে তাদের এ বিশেষ সম্মানকেই বোঝানো হয়েছে।

ইমাম আবদুল্লাহ্ রাযী (রাহঃ) বলেন, এসব উক্তির মধ্যে কোনরূপ বৈপরীত্য নেই। এসবগুলোই উপরোক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা বায়তুল্লাহ্কে সব মানুষের স্থায়িত্ব, ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সাফল্যের উপায় করেছেন এবং আরব ও মক্কাবাসীদেরকে বিশেষভাবে এর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ মঙ্গল ও বরকত দ্বারা ভূষিত করেছেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ
وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ, আমি বায়তুল্লাহ্ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহকে মানুষের জন্যে স্থায়িত্ব, শান্তি ও নিরাপত্তার উপায় করেছি। আরববাসীরা বিশেষভাবে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে। এটা এজন্যে বলা হয়েছে যাতে সবাই জেনে নেয় যে, আল্লাহ্ তাআলা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের যাবতীয় বিষয় যথাযথভাবে জানেন এবং তিনিই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে পারেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ, জেনো, আল্লাহ্ তাআলা কঠোর শাস্তিদাতা এবং আল্লাহ্ তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। এতে বলা হয়েছে যে, হালাল ও হারামের যেসব বিধান দেয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত উপযোগী। এগুলো পালন করার মধ্যেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত। পক্ষান্তরে এগুলোর বিরুদ্ধাচরণ

করা কঠোর শাস্তির কারণ। সাথে সাথে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, মানবীয় ভুলভ্রান্তি ও ঔদাসীন্যের কারণে কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে আল্লাহ্ তাআলা তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন না, বরং তওবাকারী-অনুতপ্ত লোকদের জন্যে ক্ষমার দ্বারও উন্মুক্ত রাখেন।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلٰغُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ

– অর্থাৎ, আমার রসূলের দায়িত্ব এতটুকুই যে, তিনি আমার নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌঁছে দিবেন। এরপর তা মানা না মানার লাভ ও ক্ষতি তারাই ভোগ করবে; তারা না মানলে আমার রসূলের কোনই ক্ষতি নেই। এ কথাও জেনো যে, আল্লাহ্ তাআলাকে ধোঁকা দেয়া যাবে না। তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ

আরবী ভাষায় طيب ও خبيث দু'টি বিপরীত শব্দ। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বস্তুকে طيب এবং প্রত্যেক নিকৃষ্ট বস্তুকে خبيث বলা হয়। আয়াতে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে خبيث শব্দ দ্বারা হারাম ও অপবিত্র এবং طيب শব্দ দ্বারা হালাল ও পবিত্র বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে বরং প্রত্যেক সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের দৃষ্টিতেও পবিত্র ও অপবিত্র এবং হালাল ও হারাম সমান হতে পারে না।

এক্ষেত্রে خبيث ও طيب শব্দ দু'টি স্বীয় ব্যাপকতার দিক দিয়ে হালাল ও হারাম অর্থ-সম্পদ, উত্তম ও অধম মানুষ এবং ভাল ও মন্দ কাজ-কর্ম ও চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কোন সুস্থ বিবেকবানের দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ এবং ভাল ও মন্দ সমান নয়। এ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলার কাছে হালাল ও হারাম কিংবা পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমান নয়। এমনিভাবে ভাল ও মন্দ কাজ-কর্ম ও চরিত্র এবং সৎ ও অসৎ লোকও সমান নয়।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ অর্থাৎ, যদিও মাঝে মাঝে মন্দ ও অনুৎকৃষ্ট বস্তুর প্রাচুর্য দর্শকদেরকে বিস্মিত করে দেয় এবং আশ-পাশে মন্দ ও অপবিত্র বস্তুর ব্যাপক প্রসারের কারণে সেগুলোকেই ভাল বলে মনে করতে থাকে, কিন্তু আসলে এটি মানুষের অবচেতন মনের একটি রোগ এবং অনুভূতির ত্রুটি বিশেষ।

অনাবশ্যক প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক খোদায়ী বিধি-বিধানে অনাবশ্যক চুলচেরা ঘাঁটাঘাঁটি করতে আগ্রহী হয়ে থাকে এবং যেসব বিধান দেয়া হয়নি, সেগুলো নিয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তুলতে থাকে। আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন এরূপ প্রশ্ন না করে, যার ফলশ্রুতিতে তারা কষ্টে পতিত হবে কিংবা গোপন রহস্য ফাঁস হওয়ার কারণে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

শানে নুযুল ঃ মুসলিমের রেওয়ায়েত অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে-নুযুল এই যে, যখন হজ্ব ফরয হওয়া সম্পর্কিত আদেশ অবতীর্ণ হয়, তখন আ'করা ইবনে হাবেস (রাঃ) প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ আমাদের জন্যে কি প্রতি বছরই হজ্ব করা ফরয? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। প্রশ্নকারী পুনর্বার প্রশ্ন করলেন। তিনি তবুও চুপ। প্রশ্নকারী তৃতীয় বার প্রশ্ন করলে তিনি শাসনের সুরে বললেন ঃ যদি আমি তোমার উত্তরে বলে দিতাম যে, হ্যাঁ, প্রতি বছরই হজ্ব ফরয, তবে তাই হয়ে যেত। কিন্তু তুমি এ আদেশ পালন করতে পারতে না। অতঃপর তিনি বললেন ঃ যেসব বিষয় সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দেই না, সেগুলোকে সেভাবেই থাকতে দিও-ঘাঁটাঘাঁটি করে প্রশ্ন করো না। তোমাদের পূর্বে কোন কোন উম্মত বেশী প্রশ্ন করেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ্ ও রসূল যেসব বিষয় ফরয করেননি, তারা প্রশ্ন করে সেগুলোকে ফরয করিয়ে নিয়েছিল এবং পরে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছিল। আমি যে কাজের আদেশ দেই, সাধ্যানুযায়ী তা পালন করা এবং যে কাজে নিষেধ করি, তা পরিত্যাগ করাই তোমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত। (অর্থাৎ, যেসব বিষয়ে আমি নীরব থাকি, সেগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে না)।

মহানবী (সাঃ)-এর পর নবুওয়ত ও ওহী আগমনের সমাপ্তি ঃ এ আয়াতে একটি প্রাসঙ্গিক বাক্যে বলা হয়েছে ঃ وَإِنْ تَسْأَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ অর্থাৎ, কোরআন অবতরণকালে যদি তোমরা এরূপ প্রশ্ন কর, তবে ওহীর মাধ্যমে উত্তর এসে যাবে। এতে 'কোরআন অবতরণকালে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন অবতরণ সমাপ্ত হলে নবুওয়ত ও ওহীর আগমনও বন্ধ করে দেয়া হবে।

নবুওয়াতের আগমন খতম হয়ে যাওয়া ও ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ ধরনের প্রশ্নের ফলে যদিও নতুন কোন বিধান আসবে না এবং যা ফযর নয়, তা ফযর হবে না কিংবা ওহীর মাধ্যমে কারও গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে না, তথাপি অনাবশ্যক প্রশ্ন তৈরী করে সেগুলোর তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া কিংবা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা নবুওয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধই থাকবে। কেননা, এতে করে নিজের ও অপরের সময় নষ্ট করা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه অর্থাৎ, মুসলমান হওয়ার একটি সৌন্দর্য এই যে, মুসলমান ব্যক্তি অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করে। আজকাল অনেক মুসলমান অনর্থক বিষয়াদির তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। আজকাল মূসা (আঃ)-এর মায়ের নাম কি ছিল, নূহ (আঃ) এর নৌকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কি ছিল, ইত্যাকার প্রশ্নের কোন সম্পর্ক মানুষের কর্মের সাথে নাই। উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে, এ জাতীয় প্রশ্ন করা নিন্দনীয়, বিশেষ করে যখন এ কথাও জানা যায় যে, এরূপ প্রশ্নকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ন ধর্মীয় মাসআলা সম্পর্কেই অজ্ঞ থাকে। অনর্থক কাজে ব্যাপৃত হওয়ার ফলে মানুষ জরুরী কাজ থেকে বঞ্চিত থাকে। অতীতে ফেকাহ্‌বিদ আলেমগণ মাসআলা-মাসায়েলের অনেক কাল্পনিক দিক বের করে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরী করে শরীয়তের বিধান বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে এগুলো জরুরী ছিল। তাই এসব প্রশ্ন অনর্থক ও অনাবশ্যক ছিল না। ইসলামের অন্যতম শিক্ষা এই যে, কোন দ্বীনী কিংবা জাগতিক উপকার লক্ষ্য না হলে যে কোন জ্ঞানানুশীলন, কর্ম অথবা কথায় ব্যাপৃত হওয়া উচিত নয়।

বহিরা, সায়েবা ইত্যাদির সংজ্ঞা ঃ 'বহিরা' 'সায়েবা' 'ওছিলা' 'হামী' প্রভৃতি সবই জাহেলিয়াত যুগের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। এগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরবিদদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। তবে আলোচ্য শব্দগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভবপর। আমরা সহীহ্ বুখারী থেকে সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেবের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করছি।

'বহিরা' এমন জন্তুকে বলা হয় যার দুধ প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা হত এবং কেউ নিজের কাজে ব্যবহার করত না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا
حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا
يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا
حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ
أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم
مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ
شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا
إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَ
مَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا
بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

(১০৪) যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান এবং রসূলের দিকে এস, তখন তারা বলে, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। যদি তাদের বাপ-দাদারা কোন জ্ঞান না রাখে এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত না হয় তবুও কি তারা তাই করবে? (১০৫) হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা করতে। (১০৬) হে, মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওছিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ন দুজনকে সাক্ষী রেখো। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু' ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে নামাযের পর থাকতে বলবে। অতঃপর উভয়েই আল্লাহ্‌র নামে কসম খাবে যে, আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোন উপকার গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোন আত্মীয়ও হয় এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। এমতাবস্থায় কঠোর গোনাহ্‌গার হব। (১০৭) অতঃপর যদি জানা যায় যে, উভয় ওসি কোন গোনাহে জড়িত রয়েছে, তবে যাদের বিরুদ্ধে গোনাহ্ হয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে মৃত ব্যক্তির নিকটতম দু' ব্যক্তি তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র নামে কসম খাবে যে, অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্যের চাইতে অধিক সত্য এবং আমরা সীমা অতিক্রম করিনি। এমতাবস্থায় আমরা অবশ্যই অত্যাচারী হব। (১০৮) এটি এ বিষয়ের নিকটতম উপায় যে, তারা ঘটনাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করবে অথবা আশঙ্কা করবে যে, তাদের কাছ থেকে কসম নেয়ার পর আবার কসম চাওয়া হবে। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং শুন, আল্লাহ্ দুরাচারীদেরকে পথ-প্রদর্শন করবেন না।

'সায়েবা' ঐ জন্তু, যাকে প্রতিমার নামে আমাদের দেশের ষাঁড়ের মত ছেড়ে দেয়া হত।

'হামী' পুরুষ উট, যে বিশেষ সংখ্যক রমন ক্রিয়া সমাপ্ত করে। এরূপ উটকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত।

'ওছিলা' যে উষ্ট্রী উপর্যুপরি মাদী বাচ্চা প্রসব করে। জাহেলিয়াত যুগে এরূপ উষ্ট্রীকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত।

এসব শিরকের নিদর্শনাবলী তো ছিলই; তদুপরি যে জন্তুর মাংস, দুধ ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া আল্লাহ্‌র আইনে বৈধ, নিজেদের পক্ষ থেকে শর্তাদি আরোপ করে সে জন্তুকে হালাল ও হারাম করার অধিকার তারা কোথায় পেল? মনে হয়, তারা শরীয়ত প্রণেতার পদে নিজেরাই আসীন হয়ে গিয়েছিল। আরও অবিচার এই যে, নিজেদের এসব মুশরেক সুলভ কুপ্রথাকে তারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের উপায় বলে মনে করত। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা কখনও এসব প্রথা নির্ধারণ করেননি, বরং তাদের বড়রা আল্লাহ্‌র প্রতি এ অপবাদ আরোপ করেছে এবং অধিকাংশ নির্বোধ জনগণ একে গ্রহণ করে নিয়েছে। মোটকথা, এখানে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, অনর্থক প্রশ্ন করে শরীয়তের বিধানে সংকীর্ণতা ও কঠোরতা সৃষ্টি করা যেমন অপরাধ, তেমনি শরীয়ত প্রণেতার নির্দেশ ছাড়া স্বীয় অভিমত ও প্রবৃত্তি দ্বারা হালাল-হারাম নির্ধারণ করা আরও বড় অপরাধ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا
حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হত যে, তোমরা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ সত্য বিধানাবলী ও রসূলের দিকে এস, যা সর্বদিক দিয়ে উপযোগী এবং তোমাদের মঙ্গল ও সাফল্যের রক্ষাকবচ, তখন তারা এছাড়া কোন উত্তর দিত না যে, আমরা বাপ-দাদাদিগকে যে তরীকায় পেয়েছি, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট।

এ শয়তানী যুক্তিই লক্ষ লক্ষ মানুষকে সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট করেছে। কোরআন পাক এর উত্তরে বলে ঃ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারে যে, কোরআন পাকের এ বাক্যটি কোন ব্যক্তি অথবা দলের অনুসরণ করার ব্যাপারে একটি বিশুদ্ধ মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। ফলে অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে এবং মূর্খ ও গাফেলদের জন্যে সত্য প্রকাশের পথ খুলে গেছে। মূলনীতিটি এই যে, অজ্ঞরা জ্ঞানবানদের, অনভিজ্ঞরা অভিজ্ঞদের এবং মূর্খরা জ্ঞানীদের অনুসরণ করবে—একথা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি ও হেদায়েতের মাপকাঠি পরিত্যাগ করে বাপ-দাদা কিংবা ভাই-বন্ধুদের অনুসরণকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। অনুসৃত ব্যক্তি নিজে কোথায় যাচ্ছে এবং অনুসারীদেরকেই বা কোথা নিয়ে যাবে একথা না জেনে তার পদাঙ্ক অনুসরণে লেগে যাওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এমনিভাবে কিছুসংখ্যক লোক বেশী মানুষের সমাগমকেই অনুসরণের মাপকাঠি মনে করে। যার কাছে মানুষের ভিড় দেখে তারা তারই অনুসরণে

লেগে যায়। এটিও একটি অযৌক্তিক কাজ। কেননা, জগতে সব সময়ই বেওকুফ, নির্বোধ ও কুকর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তাই মানুষের ভিড়ই সত্যাসত্য ও ভাল-মন্দ চিহ্নিত করার মাপকাঠি হতে পারে না।

অযোগ্য ব্যক্তির অনুসরণ করা ধ্বংস ডেকে আনার শামিল ঃ কোরআন পাকের এ বাক্যের সুস্পষ্ট শিক্ষা এই যে, বাপ-দাদা, ভাই-বেরাদর ইত্যাদি কেউ অনুসৃত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়। বরং প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বপ্রথম স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ও জীবনযাত্রার গতিপথ নির্ধারণ করা জরুরী। এরপর তা অর্জনের জন্যে দেখা দরকার যে, এমন ব্যক্তি কে, যার এ লক্ষ্য অর্জনের পথ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রয়েছে এবং এ পথে নিজেও চলছেন। এমন ব্যক্তি পাওয়া গেলে তার অনুসরণ অবশ্যই মনযিলে-মকছুদে পৌঁছাতে পারে। মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণের তাৎপর্যও তাই। তাঁরা দ্বীন সম্পর্কে যেমন সম্যক অবগত, তেমনি নিজেরাও এ পথেই চলেন। তাই অজ্ঞ ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করে ধর্মের লক্ষ্য অর্থাৎ, আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ পালন করতে পারে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেই বিপথগামী, যার মনযিলে-মকছুদ জানা নেই কিংবা জেনেশুনে বিপরীত দিকে ধাবমান, তার পিছনে চলা জ্ঞানী মাত্রের দৃষ্টিতেই নিজ প্রচেষ্টা ও কর্মকে বিনষ্ট করার শামিল বরং ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর। দুঃখের বিষয়, বর্তমান জ্ঞান-গরিমা ও আধুনিকতার যুগেও শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ সত্যের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করছে। বর্তমান ধ্বংস ও বিপর্যয়ের প্রধান কারণই হচ্ছে অযোগ্য ও ভ্রান্ত নেতাদের অনুসরণ।

অনুসরণের মাপকাঠি ঃ কোরআন পাকের এ বাক্য দু'টি বিষয়কে অনুসরণের যুক্তিযুক্ত ও সুস্পষ্ট মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছে ঃ একটি علم ও অপরটি اهتداء এখানে علم - এর অর্থ মনযিলে-মকছুদ ও মনযিলে-মকছুদ পর্যন্ত পৌঁছার পথ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং اهتداء এর অর্থ এ লক্ষ্যের পথে চলা, অর্থাৎ, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সরল কর্ম।

সারকথা এই যে, অনুসরণ করার জন্যে যে ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে প্রথমে দেখে নিবে যে, অভীষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যের পথ সম্পর্কে সে অবগত কি না। এরপর দেখবে, সে নিজেও সে পথেই চলছে কি না এবং তার কর্ম তার জ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি নয়।

মোটকথা, কাউকে অনুসৃতব্য সাব্যস্ত করার জন্যে তাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সরল কর্মের কষ্টিপাথরে যাচাই করা জরুরী। শুধু বাপ-দাদা হওয়া কিংবা অনেক মানুষের নেতা হওয়া অথবা ধনাঢ্য হওয়া কিংবা রাষ্ট্রের অধিপতি হওয়া ইত্যাদি কোনটিই অনুসরণের মাপকাঠি হওয়ার যোগ্য নয়।

কারও সমালোচনা করার কার্যকরী পন্থা ঃ কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে বাপ-দাদার অনুসরণে অভ্যস্ত লোকদের বিভ্রান্তি ব্যক্ত করার সাথে সাথে অন্যের সমালোচনা ও তার বিভ্রান্তি প্রকাশ করার একটি কার্যকরী পন্থাও শিক্ষা দিয়েছে। এ পন্থায় সমালোচনা করলে সমালোচিত ব্যক্তি ব্যথিত কিংবা উত্তেজিত হয় না। কেননা, পৈতৃক ধর্ম অনুসরণকারীদের জওয়াবে কোরআন পাক এ কথা বলেনি যে, তোমাদের বাপ-দাদা মূর্খ ও পথভ্রষ্ট। বরং বিষয়টিকে প্রশ্নের আকারে বলেছে ঃ বাপ-দাদার অনুসরণ তখনও কি যুক্তিযুক্ত হতে পারে, যখন বাপ-দাদার মধ্যে না থাকে জ্ঞান এবং না থাকে সৎকর্ম?

যারা মানুষের সংশোধন চিন্তা করে তাদের জন্যে একটি সান্ত্বনাঃ দ্বিতীয় আয়াতে মানুষের সংশোধন চিন্তায় সবকিছু বিসর্জনকারী মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছেঃ সত্যপ্রচার ও শিক্ষায় তোমাদের সাধ্যমত চেষ্টা এবং যথাযথ হিতকাঙ্ক্ষার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্টতায়ই ডুবে থাকে, তবে এর জন্যে মোটেই চিন্তিত হইও না। এমতাবস্থায় অন্যের পথভ্রষ্টতার কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ, তোমরা নিজেও চিন্তা কর। তোমরা যখন সঠিক পথে চলছ, তখন যে বিপথগামী, তার কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি নেই।

এ আয়াতের বাহ্যিক শব্দের দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রতিটি মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজের কর্ম সংশোধনের চিন্তা করাই যথেষ্ট। অন্যরা যা ইচ্ছা করুক। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। অথচ এ বিষয়টি কোরআন পাকের বহু আয়াতের পরিপন্থী। সেসব আয়াতে 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বারণ' করাকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ কারণেই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে কিছু লোকের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে প্রশ্ন রাখেন এবং তিনি উত্তরে বলেন যে, আয়াতটি 'সৎকাজে আদেশ দান' - এর পরিপন্থী নয়। তোমরা যদি 'সৎকাজে আদেশ দান' পরিত্যাগ কর, তবে অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকেও পাকড়াও করা হবে। এজন্যেই তফসীর বাহরে মুহীতে হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়র থেকে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে, তোমরা স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাক। জেহাদ এবং 'সৎকাজে আদেশ' দানও এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো করার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্ট থেকে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কোরআনের إِذَا اهْتَدَيْتُمْ শব্দে চিন্তা করলে এ তফসীরের যথার্থতা ফুটে উঠে। কেননা, এর অর্থ এই যে, যখন তোমরা সঠিক পথে চলতে থাকবে, তখন অন্যের পথভ্রষ্টতা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর নয়। এখন এ কথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি 'সৎকাজে আদেশ দান'এর কর্তব্যটি বর্জন করে, সে সঠিক পথে চলমান নয়।

তফসীর দুররে মনসুরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের (রাঃ) একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। তাঁকে কোন এক ব্যক্তি বলল যে, অমুক অমুক ব্যক্তির মধ্যে ঘোর বিবাদ-বিসম্বাদ রয়েছে। তারা একে অপরকে মুশরেক বলে অভিহিত করে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তুমি কি মনে কর যে,আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমাকে আদেশ করব? কখনই নয়। যাও, তাদেরকে নম্রতার সাথে বোঝাও। যদি মানে উত্তম; নতুবা তাদের চিন্তা ছেড়ে নিজের চিন্তা কর। অতঃপর এ উক্তির প্রমাণ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।

পাপ দমন সম্পর্কে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর একটি ভাষণঃ আয়াতের বাহ্যিক শব্দাবলী থেকে বাহ্যদৃষ্টিতে যে প্রশ্ন দেখা দেয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এক ভাষণে বললেন ঃ তোমরা আয়াতটি পাঠ করে একে অস্থানে প্রয়োগ করছ এবং বলছ যে, 'সৎকাজে আদেশ দান'-এর প্রয়োজন নেই। জেনে রাখ, আমি নিজে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখে শুনেছি ঃ যারা কোন পাপকাজ হতে দেখেও (সাধ্যানুযায়ী) তা দমন করতে চেষ্টা করে না, আল্লাহ্ তা'আলা সত্বরই হয় তো তাদেরকেও অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত করে আযাবে নিক্ষেপ করবেন।

এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত রয়েছে। আবু দাউদের

ভাষায় হাদীসটি এরূপ ঃ যারা কোন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখেও (সাধ্যানুযায়ী) বাধা দেয় না, আল্লাহ্ তাআলা তাদের সবাইকে একযোগে আযাবে নিক্ষেপ করবেন।

মাসআলা ঃ মরণোন্মুখ ব্যক্তি যার হাতে মাল সোপর্দ করে অন্য কাউকে দিতে বলে যায়, তাকে ওসী বলা হয়। ওসী একজন বা একাধিক ব্যক্তিও হতে পারে।

০ সফরে হোক কিংবা স্বগৃহে অবস্থানকালে মুসলমান ও ধর্মপরায়ণ ওসি নিয়োগ করা উত্তম; জরুরী নয়।

০ মোকদ্দমার যে পক্ষ অতিরিক্ত বিষয় প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়, সে বাদী এবং অপর পক্ষ বিবাদী।

০ প্রথমে বাদীর কাছ থেকে সাক্ষী তলব করা হয়। যদি সে শরীয়তের বিধি মোতাবেক সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে, তবে তার পক্ষেই মোকদ্দমার রায় দেয়া হয়। পক্ষান্তরে সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে বিবাদীর কাছ থেকে কসম নেয়া হয় এবং তার পক্ষে মোকদ্দমার রায় দেয়া হয়। যদি বিবাদী কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে বাদীর পক্ষেই মোকদ্দমার রায় দেয়া হয়।

০ আলোচ্য আয়াতে অনুরূপ কাল কিংবা স্থান দ্বারা কসমকে কঠোর করা বিচারকের অভিমতের উপর নির্ভরশীল— জরুরী নয়। এ আয়াত দ্বারাও জরুরী হওয়া প্রমাণিত হয় না। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস থেকেও জরুরী না হওয়া প্রমাণিত হয়।

০ বিবাদী নিজের কোন কাজ সম্পর্কে কসম খেলে ভাষা এরূপ হয়— 'আমি এ কাজ সম্পর্কে জানি না।'

০ যদি উত্তরাধিকারের মোকদ্দমার ওয়ারিস বিবাদী হয়, তবে শরীয়তের আইনানুযায়ী যারা উত্তরাধিকারী, তাদেরকেই কসম খেতে হবে তা একজন হোক কিংবা একাধিক। যারা উত্তরাধিকারী নয়, তারা কসম খাবে না।— (বয়ানুল-কোরআন)

কাফেরের ব্যাপারে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ঃ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ .... أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এ আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে দু'ব্যক্তিকে ওসি নিযুক্ত কর। তারা তোমাদের মধ্য থেকেই হবে এবং ধর্মপরায়ণ হবে। যদি স্বজাতীয় লোক না থাকে, তবে বিজাতি অর্থাৎ, কাফেরদের মধ্য থেকে নিযুক্ত কর।

এ আয়াত থেকে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে, কাফেরদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্য বৈধ। কেননা, আয়াতে কাফেরদের সাক্ষ্য মুসলমানদের ব্যাপারে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ থেকে তা সুস্পষ্ট। অতএব, কাফেরের ব্যাপারে কাফেরের সাক্ষ্য আরও উত্তম রূপে বৈধ হবে। কিন্তু পরে يَاأَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ — আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্যের বৈধতা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু কাফেরদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্যের বৈধতা পূর্বাবস্থায়ই বহাল রয়েছে।— (কুরতুবী, আহ্কামুল-কোরআন)

ইমাম সাহেবের মতের সমর্থন এ হাদীস দ্বারাও হয়। জনৈক ইহুদী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে জনগণ তার মুখে চুনকালি মাখিয়ে মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত করে। তিনি তার দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল ঃ সে ব্যভিচার করেছে। তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে অপরাধীকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।— (জাসসাস)

প্রাপক খাতককে কয়েদ করাতে পারে ঃ تَحْبِسُونَهُمَا আয়াত থেকে একটি মূলনীতি জানা যায় যে, যার যিম্মায় অপরের কোন প্রাপ্য ওয়াজেব রয়েছে, তাকে পাওনাদার ব্যক্তি পাওনার দায়ে প্রয়োজন বোধে কয়েদ করাতে পারে।— (কুরতুবী)

مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ - এখানে صلوة বলে আছরের নামায বুঝানো হয়েছে। এ সময়টি নির্ধারণ করার কারণ এই যে, আহলে-কিতাব এ সময়ের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করত। এ সময়ে মিথ্যা বলা তাদের মতে নিষিদ্ধ ছিল। এতে বুঝা যায় যে, কোন বিশেষ সময় কিংবা স্থানের শর্ত যোগ করে কসমকে কঠোর করা জায়েয।— (কুরতুবী)

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ۗ قَالُوْا لَا عِلْمَ
لَنَا ۗ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١٠٩﴾ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ
الْقُدُسِ ۗ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ
كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا ۢ بِاِذْنِيْ وَ
تُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ
وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٠﴾ وَ
اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْٓا
اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿١١١﴾ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ
يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ
عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ۗ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا
وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٣﴾

(১০৯) যেদিন আল্লাহ্ সব পয়গম্বরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? তাঁরা বলবেন ঃ আমরা অবগত নই; আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (১১০) যখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে; ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে বের করে দাঁড় করিয়ে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা বলল ঃ এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়।

(১১১) আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি এবং আমার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলতে লাগল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আনুগত্যশীল। (১১২) যখন হাওয়ারীরা বলল ঃ হে মরিয়ম-তনয় ঈসা, আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহ্কে ভয় কর। (১১৩) তারা বলল ঃ আমরা তা থেকে খেতে চাই; আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে, আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন এবং আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কেয়ামতে পয়গম্বরগণকে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে ঃ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ কিয়ামতে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একটি উন্মুক্ত মাঠে উপস্থিত হবে। যে কোন অঞ্চলের, যে কোন দেশের এবং যে কোন সময়ের মানুষই হোক না কেন, সবাই সে সুবিশাল ময়দানে উপস্থিত হবে এবং সবার কাছ থেকে তাদের সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে। কিন্তু আয়াতে বিশেষভাবে নবী-রসূলগণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ অর্থাৎ, ঐ দিনটি বাস্তবিকই স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ্ তাআলা সব পয়গম্বরকে হিসাবের জন্যে একত্রিত করবেন। উদ্দেশ্য এই যে, একত্রিত সবাইকে করা হবে, কিন্তু সর্ব প্রথম প্রশ্ন নবী-রসূলগণকেই করা হবে যাতে সমগ্র সৃষ্টজগত দেখতে পায় যে, আজ হিসাব ও প্রশ্ন থেকে কেউ বাদ পড়বে না। পয়গম্বরগণকে যে প্রশ্ন করা হবে, তা এই ঃ مَاذَآ اُجِبْتُمْ অর্থাৎ, তোমরা যখন নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর সত্য ধর্মের দিকে আহবান করেছিলে, তখন তারা তোমাদেরকে কি উত্তর দিয়েছিল? তারা তোমাদের বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করেছিল, না অস্বীকার ও বিরোধিতা করেছিল?

এ প্রশ্নটি যদিও আম্বিয়া (আঃ)-কে করা হবে, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে তাঁদের উম্মতকে শুনানো। অর্থাৎ, উম্মতরা যেসব সৎকর্ম ও কুকর্ম করেছে, তার সাক্ষ্য সর্ব প্রথম তাদের পয়গম্বরদের কাছ থেকে নেয়া হবে। উম্মতের জন্যেও মুহূর্তটি হবে অত্যন্ত নাজুক। কারণ, তারা এ হৃদয়বিদারক পরিস্থিতিতে যখন নিজেদের নবী-রসূলগণের সুপারিশ আশা করবে, তখনই স্বয়ং নবী-রসূলগণের কাছে তাদের সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, আম্বিয়াগণ কোন ভ্রান্ত ও বাস্তব বিরোধী কথা বলতে পারবেন না। তাই গোনাহ্গার ও অপরাধীরা আশঙ্কা করবে যে, যখন স্বয়ং নবীগণই আমাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্যদাতা তখন আর কে আমাদের সুপারিশ ও সাহায্য করবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলবেন ঃ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ অর্থাৎ, তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আপনিই স্বয়ং যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

একটি সন্দেহের নিরসন ঃ এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের ওফাতের পর তাঁর যে উম্মত জন্মগ্রহণ করে, তাদের সম্পর্কে পয়গম্বরগণের এ উত্তর নির্ভুল ও সুস্পষ্ট। কেননা, অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া কারও জানা নেই। কিন্তু বিরাট সংখ্যক উম্মত এমনও তো রয়েছে, যারা স্বয়ং পয়গম্বরগণের অক্লান্ত চেষ্টায় এ তাঁদের হাতেই মুসলমান হয় এবং তাঁদের সামনেই বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করে। এমনিভাবে যেসব কাফের পয়গম্বরগণের আদেশের বিরোধিতা ও তাঁদের সাথে শত্রুতা করে, তাদের সম্পর্কে একথা বলা কিভাবে নির্ভুল হতে পারে যে, তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই? তফসীর বাহরে-মুহীতে ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ রাযী এর উত্তরে বলেন ঃ এখানে পৃথক পৃথক দু'টি বিষয় রয়েছে ঃ (এক) এলম্, যার অর্থ পূর্ণ বিশ্বাস, (দুই) প্রবল ধারণা। একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সামনে থাকা সত্ত্বেও তার ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দিতে পারে, পূর্ণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। কেননা, অন্তরের ভেদ ও সত্যিকার ঈমান সম্পর্কে কেউ ওহী ব্যতীত নিশ্চিতভাবে জানতে পারে না। কারণ, ঈমানের সম্পর্ক হল অন্তরের সাথে। প্রত্যেক উম্মতেই কপট বিশ্বাসী মুনাফেকদেরও একটি দল ছিল। তারা বাহ্যতঃ ঈমানও আনত এবং নির্দেশাবলীও পালন করত,

কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না এবং নির্দেশাবলী অনুসরণের আন্তরিক কোন প্রেরণাও ছিল না। তাদের মধ্যে যা কিছু ছিল, সবই ছিল লোক দেখানো। তবে বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের উপরই জাগতিক বিচার নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে, খোদায়ী নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এবং ইসলাম ও ঈমান বিরোধী কোন কথা ও কর্মে জড়িত হয় না, নবী-রসূলগণ তাকে 'ঈমানদার ও সৎকর্মী' বলতে বাধ্য ছিলেন; সে অন্তরে খাঁটি ঈমানদার কিংবা মুনাফেক যাই হোক। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

অর্থাৎ, আমরা তো বাহ্যিক কাজকর্ম দেখে বিচার করি। অন্তর্নিহিত গোপনভেদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তাআলা।

এ বিধান অনুযায়ী দুনিয়াতে আম্বিয়া (আঃ) ও তাঁদের উত্তরাধিকারী আলেমসমাজ বাহ্যিক কাজকর্মের ভিত্তিতে কারও ঈমানদার সৎকর্মী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারতেন। কিন্তু আজ সে দুনিয়া ও দুনিয়ার রীতি-নীতি শেষ হয়ে গেছে। আজ হাশরের ময়দান। এখানে চুলচেরা তথ্য উদঘাটিত হবে এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন হবে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রথমে অন্যদের সাক্ষ্য নেয়া হবে। যদি অপরাধী এতে নিশ্চিত না হয় এবং স্বীয় অপরাধ স্বীকার না করে, তবে বিশেষ ধরনের সরকারী সাক্ষী উপস্থিত করা হবে। অপরাধীদের মুখে ও জিহবায় সীল মেরে দেয়া হবে এবং তাদের হস্ত, পদ ও চামড়ার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এরা প্রত্যেক কাজের পূর্ণ স্বরূপ তুলে ধরবে।—

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ

بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ, অদ্য আমি তাদের মুখে সীল মেরে দিব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পদযুগল তাদের ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তখন মানুষ জানতে পারবে যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছিল রাব্বুল-আলামীনের গুপ্ত পুলিশ। এদের বর্ণনার পর অস্বীকার করার কোন উপায়ই থাকবে না।

মোটকথা, পরজগতে শুধু ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কোন কিছুর বিচার করা হবে না বরং অকাট্য জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সবকিছুর বিচার হবে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কারও ঈমান ও কর্মের সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া কারও নেই। তাই হাশরের ময়দানে যখন নবী-রসূলগণকে প্রশ্ন করা হবে مَاذَآ اُجِبْتُمْ তখন তাঁরা এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলবেন যে, এ প্রশ্ন ইহজগতে হচ্ছে না যে, ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে জওয়াব দিলেই চলবে, বরং এ প্রশ্ন হচ্ছে হাশরের ময়দানে, যেখানে দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কোন কিছু বলা যাবে না। তাই তাঁদের এ উত্তর যথার্থ ও সঙ্গত যে, এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর-পয়গম্বরগণের চূড়ান্ত দয়ার্দ্রতা প্রকাশ ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, উম্মতের গ্রহণ করা ও গ্রহণ না করা এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার যেসব ঘটনা তাঁদের সামনে সংঘটিত হয়েছে, এগুলো সম্পর্কে প্রবল ধারণাপ্রসূত যে জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেছিলেন, উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে অন্ততঃ তা বর্ণনা করা উচিত ছিল। এ জ্ঞানটি নিশ্চিত কি না, শুধু এ বিষয়টিই আল্লাহ্র জ্ঞানে সমর্পন করলে চলত। কিন্তু এখানে নবী-রসূলগণ নিজস্ব জ্ঞান ও সংঘটিত ঘটনাবলী একেবারেই উল্লেখ করেননি। সবকিছু আল্লাহ্র জ্ঞানের উপর সমর্পন করে তাঁরা চুপ হয়ে গেলেন।

এর তাৎপর্য এই যে, নবী-রসূলগণ নিজ নিজ উম্মত ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। তাঁদের সম্পর্কে এমন কোন কথাই উচ্চারণ করতে তাঁরা অনিচ্ছুক, যার ফলে তাঁরা বিপদের সম্মুখীন হয়। তবে নিরুপায় হলে অবশ্যই বলতে হত। এখানে অকাট্য জ্ঞান না থাকার অজুহাত ছিল। এ অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে মুখে উম্মতের বিরুদ্ধে কিছু বলা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতেন এবং সেমতে তাঁরা তাই করে আত্মরক্ষা করেছেন।

হাশরে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন ঃ সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের একটি ঝলক সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। হিসাব-নিকাসের কাঠগড়ায় আল্লাহ্ তাআলার সর্বাধিক ঘনিষ্ট ও প্রিয় রসূলগণ কম্পিত বদনে উপস্থিত হবেন। সুতরাং অন্যদের যে কি অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়। তাই এখন থেকেই সে ভয়াবহ দিনের চিন্তা করা উচিত এবং জীবনকে এ হিসাব-নিকাস প্রস্তুতিতে নিয়োজিত করা কর্তব্য।

তিরমিযীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

"হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তির পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর নেয়া হয়। প্রথম এই যে, সে জীবনের সুদীর্ঘ ও প্রচুর সংখ্যক দিবারাত্রকে কি কাজে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় এই যে, বিশেষভাবে কর্মক্ষম যৌবনকালকে সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তৃতীয় এই যে, সে অর্থকড়ি কোন (হালাল কিংবা হারাম) পথে উপার্জন করেছে? চতুর্থ এই যে, অর্থকড়িতে সে কোন (জায়েয কিংবা নাজায়েয) কাজে ব্যয় করেছে? পঞ্চম এই যে, নিজ এলম্ অনুযায়ী সে কি আমল করেছে?

আল্লাহ্ তাআলা চূড়ান্ত অনুগ্রহ ও দয়া বশতঃ এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পূর্বেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাধ্যমে উম্মতের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এখন এসব প্রশ্নের সমাধান শিক্ষা করাই উম্মতের কাজ। পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র প্রকাশ করে দেয়ার পরও যদি কেউ ফেল করে, তবে এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে বিশেষ প্রশ্নোত্তর ঃ প্রথম আয়াতে সমগ্র পয়গম্বরগণের অবস্থা ও তাঁদের সাথে প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে এবং এর পরবর্তী নয় আয়াতে (সূরার শেষ পর্যন্ত) বিশেষভাবে বনী-ইসরাঈলের শেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে আলোচনা ও তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের কিছু বিবরণ দেয়া হয়েছে। হাশরে তাঁকে একটি বিশেষ প্রশ্ন ও তার উত্তর পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত হয়েছে।

এ প্রশ্নোত্তরের সারমর্ম ও বনী-ইসরাঈল তথা সমগ্র মানব জাতির সামনে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরা। এ ময়দানে রূহুল্লাহ্ ও কলেমাতুল্লাহ্ অর্থাৎ, ঈসা (আঃ)-কেও প্রশ্ন করা হবে যে, তোমার উম্মত তোমাকে আল্লাহ্র অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। হযরত ঈসা স্বীয় সম্মান, মাহাত্ম্য, নিষ্পাপতা ও নবুওয়ত সত্ত্বেও অস্থির হয়ে আল্লাহ্র দরবারে সাফাই পেশ করবেন। একবার নয়, বার বার বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশ করবেন যে, তিনি উম্মতকে এ শিক্ষা দেননি। প্রথমে বলবেন ঃ

سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ

অর্থাৎ, আপনি পবিত্র, আমার কি সাধ্য ছিল যে, আমি এমন কথা বলব, যা বলার অধিকার আমার নেই?

স্বীয় সাফাইয়ের দ্বিতীয় ভঙ্গি এই যে, তিনি স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাকে

সাক্ষী করে বলবেন ঃ যদি আমি এরূপ বলতাম, তবে অবশ্যই আপনার তা জানা থাকত। কেননা, আপনি তো আমার অন্তরের গোপন রহস্য সম্পর্কেও অবগত। কথা ও কর্মেরই কেন, আপনি তো 'আল্লামুল-গুয়ূব', যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

এ দীর্ঘ ভূমিকার পর হযরত ঈসা (আঃ) প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

হযরত ঈসার উত্তর ঃ আমি তাদেরকে ঐ শিক্ষাই দিয়েছি, যার নির্দেশ আপনি দিয়েছিলেন, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ্র দাসত্ব অবলম্বন কর, যিনি আমার ও তোমাদের সকলের পালনকর্তা। এ শিক্ষার পর আমি যত দিন তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মের সাক্ষী ছিলাম, (তখন পর্যন্ত তাদের কেউ এরূপ কথা বলত না –) এরপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নেন, তখন তারা আপনার দেখাশোনার মধ্যেই ছিল। আপনিই তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি কতিপয় বিশেষ অনুগ্রহের বর্ণনা ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে যে প্রশ্নোত্তরের কথা বর্ণিত হয়েছে, তার পূর্বে ঐসব অনুগ্রহের বিষয়ও উল্লেখিত হয়েছে, যা বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-কে মো'জেযার আকারে দেয়া হয়। এতে একদিকে বিশেষ অনুগ্রহ ও অপরদিকে জবাবদিহির দৃশ্যের অবতারণা করে বনী-ইসরাঈলের ঐ জাতিদ্বয়কে হুশিয়ার করা হয়েছে, যাদের এক জাতি তাঁকে অপমানিত করে এবং নানা অপবাদ আরোপ করে কষ্ট দেয় এবং অন্য জাতি 'খোদা' কিংবা 'খোদার পুত্র' আখ্যা দেয়। অনুগ্রহ উল্লেখ করে প্রথম জাতিকে এবং প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করে শেষোক্ত জাতিকে হুশিয়ার করা হয়েছে। এখানে যেসব অনুগ্রহ কয়েকটি আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি বাক্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে ঃ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا অর্থাৎ, হযরত ঈসা (আঃ)-কে দেয়া একটি বিশেষ মো'জেযা এই যে,তিনি মানুষের সাথে শিশু অবস্থায়ও কথা বলেন এবং পরিণত বয়সেও কথা বলেন।

এখানে প্রথমোক্ত বিষয়টি যে, মো'জেযা ও বিশেষ অনুগ্রহ, তা বলাই বাহুল্য। জন্মগ্রহণের প্রথম দিকে শিশু কথা বলতে পারে না। কোন শিশু মায়ের কোলে কিংবা দোলনায় কথাবার্তা বললে, তা তার বিশেষ স্বাতন্ত্র্যরূপে গণ্য হবে। পরিণত বয়সে কথা বলা, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। প্রত্যেক মানুষই এ বয়সে কথা বলে থাকে। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এটিও একটি মো'জেযা। কেননা, পরিণত বয়সে পৌছার পূর্বেই ঈসা (আঃ)-কে ইহজগত থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এখন এ জগতের মানুষের সাথে পরিণত বয়সে কথা বলা তখনই হতে পারে, যখন দ্বিতীয় বার তিনি এ জগতে পদার্পণ করবেন। মুসলমানদের সর্বসম্মত বিশ্বাস তাই এবং কোরআন ও সুন্নাহর বর্ণনা থেকেও একথাই প্রমাণিত। অতএব, বোঝা গেল যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর শিশু অবস্থায় কথা বলা যেমন মো'জেযা, তেমনি পরিণত বয়সে কথা বলাও একটি মো'জেযা। কারণ, তিনি পুনর্বার পৃথিবীতে পদার্পন করবেন।

মো'জেযা দাবী করা মুমিনের পক্ষে অনুচিত ঃ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ যখন হাওয়ারীরা ঈসা (আঃ)-এর কাছে আকাশ থেকে খাদ্যাধার অবতারণ দাবী করল, তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহ্কে ভয় কর। এতে বুঝা যায় যে, ঈমানদার বান্দার পক্ষে এ ধরনের ফরমায়েশ করে আল্লাহ্কে পরীক্ষা করা কিংবা তাঁর কাছে অলৌকিক বিষয় দাবী করা একান্ত অনুচিত। বরং ঈমানদার বান্দার পক্ষে আল্লাহ্র নির্ধারিত পথে রুযী ইত্যাদি অন্বেষণ করাই কর্তব্য।

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللّٰهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِينَ ﴿١١٥﴾ وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ۖ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

(১১৪) ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেন ঃ হে আল্লাহ্, আমাদের পালনকর্তা। আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদেরকে রুযী দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রুযীদাতা। (১১৫) আল্লাহ্ বললেন ঃ নিশ্চয় আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতরণ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না। (১১৬) যখন আল্লাহ বললেন ঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম ! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহ্কে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র ! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। (১১৭) আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব অবলম্বন কর— যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। (১১৮) যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ। (১১৯) আল্লাহ্ বললেন ঃ আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্যে উদ্যান রয়েছে, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে; তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহান সফলতা। (১২০) নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহ্রই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নেয়ামত অসাধারণ বড় হলে অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও বড় হয়ঃ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِينَ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, নেয়ামত অসাধারণ ও অনন্য হলে তার কৃতজ্ঞতার তাকিদও অসাধারণ হওয়া দরকার এবং অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও অসাধারণ হওয়াই স্বাভাবিক।

মায়েদা তথা খাদ্যাধার আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল কি না, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেন ঃ অবতীর্ণ হয়েছিল। তিরমিযীর হাদীসে আম্মার ইবনে ইয়াসির থেকে বর্ণিত আছে যে, খাদ্যাধার আকাশ থেকে নাযিল হয়েছিল এবং তাতে রুটি ও গোশ্ত ছিল। এ হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, তারা (অর্থাৎ, তাদের কিছু সংখ্যক) বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত হয়েছিল এবং পরবর্তী দিনের জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছিল। ফলে তারা বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। (نعوذ بالله من غضب الله)

এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, তারা তা ভক্ষণও করেছিল। আয়াতের ناكل শব্দে এ তথ্যও বিবৃত হয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ের জন্যে সঞ্চয় করে রাখা নিষিদ্ধ ছিল।— (বয়ানুল-কোরআন)

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى আল্লাহ্ তাআলা সবকিছু জানেন। সুতরাং অজানাকে জানার জন্যে ঈসা (আঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়নি। বরং এর উদ্দেশ্য খ্রীষ্টান জাতিকে তিরস্কার করা ও ধিক্কার দেয়া যে, যাকে তোমরা উপাস্য মনে করছ সে স্বয়ং তোমাদের বিশ্বাসের বিপরীতে স্বীয় দাসত্ব স্বীকার করছে এবং তোমাদের অপবাদ থেকে সে মুক্ত।- (ইবনে-কাছীর)

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ হযরত ঈসা (আঃ) – এর মৃত্যু অথবা আকাশে উত্থিত করা ইত্যাদি বিষয়ে সূরা-আলে-এমরানের إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي বাক্যটিকে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর দলীল ও আকাশে উত্থিত হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করার প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা ঠিক নয়। কেননা, এ কথোপকথন কিয়ামতের দিন হবে। তখন আকাশ থেকে অবতরণের পর তাঁর সত্যিকার মৃত্যু হবে অতীত বিষয়। ইবনে-কাসীর আবু-মূসা আশআরীর রেওয়ায়েত ক্রমে এক হাদীস বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন নবী-রসূলগণকে ও তাঁদের উম্মতকে ডাকা হবে। অতঃপর ঈসা (আঃ)-কে ডাকা হবে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে স্বীয় নেয়ামতের কথা স্মরণ করাবেন এবং নিকটে এনে বলবেন ঃ হে মরিয়ম তনয় ঈসা, اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমি যে সমস্ত নেয়ামত দান করেছিলাম তা স্মরণ কর। অবশেষে বলবেন ঃ وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ হে ঈসা, তুমি কি লোকদেরকে এমন কথা বলেছ যে, আমাকে ও আমার মাতাকে আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্যরূপে গ্রহণ কর? ঈসা বলবেন ঃ পরওয়ারদেগার, আমি এরূপ বলিনি। এরপর খ্রীষ্টানদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তারা বলবে ঃ হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছিলেন। এরপর খ্রীষ্টানদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে দেয়া হবে।

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ অর্থাৎ, আপনি বান্দাদের প্রতি জুলুম ও

অন্যায় কঠোরতা করতে পারেন না। তাই তাদেরকে শাস্তি দিলে তা ন্যায়বিচার ও বিজ্ঞতা-ভিত্তিকই হবে। অগত্যা যদি ক্ষমা করে দেন, তবে এ ক্ষমাও অক্ষমতাপ্রসূত হবে না। কেননা, আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রবল। তাই কোন অপরাধী আপনার শক্তির নাগালের বাইরে যেতে পারবে না। যেহেতু আপনি সুবিজ্ঞ, তাই এটাও সম্ভব নয় যে, অপরাধীকে বিনা বিচারেই ছেড়ে দেবেন। মোটকথা, অপরাধীদের ব্যাপারে আপনি যে রায়ই দেবেন, তাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞজনোচিত ও সক্ষমতাসুলভ হবে। হযরত ঈসা (আঃ) হাশরের ময়দানে এসব কথা বলবেন। সেখানে কাফেরদের পক্ষে কোনরূপ সুপারিশ, দয়া ভিক্ষা ইত্যাদি চলবে না। তাই তিনি عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ এর পরিবর্তে غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ অবলম্বন করেননি। এর বিপরীতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) দুনিয়াতে পরওয়ারদেগারের দরবারে আরয করেছিলেন ঃ

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

হে পরওয়ারদেগার, এ মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাদের মধ্যে যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার লোক এবং যে আমার অবাধ্যতা করে, তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ, এখনও সময় আছে; তুমি স্বীয় রহমতে ভবিষ্যতে তাদেরকে তওবা ও সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনের শক্তি দান করে অতীত গোনাহ্ ক্ষমা করতে পার।— (ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

ইবনে-কাসীর হযরত আবু যরের (রাঃ) বাচনিক বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সাঃ) একবার সারা রাত্রি اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ আয়াতখানিই পাঠ করতে থাকেন। ভোর হলে আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আপনি এ আয়াতটিই পাঠ করতে করতে ভোর করেছেন। এ আয়াত দ্বারাই রুকূ করেছেন এবং এ আয়াত দ্বারাই সেজদা করেছেন। তিনি বললেন ঃ আমি পরওয়ারদেগারের কাছে নিজের জন্যে শাফায়াতের আবেদন করেছি। আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। অতি সত্বরই আমি তা লাভ করব। আমি এমন ব্যক্তির জন্যে শাফায়াত করতে পারব, যে আল্লাহ্ তাআলার সাথে কোন অংশীদার করেনি।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মহানবী (সাঃ) উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে আকাশের দিকে হস্ত প্রসারিত করেন এবং বলেন ঃ اللهم امتى অর্থাৎ, হে পাক পরওয়ারদেগার, আমার উম্মতের প্রতি করুণার দৃষ্টি দাও। অতঃপর তিনি কাঁদতে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলের মাধ্যমে এভাবে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জিবরাঈলকে উপরোক্ত উক্তি শুনিয়ে দেন। আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলকে বললেন ঃ তা হলে যাও এবং (হযরত) মুহম্মদ (সাঃ)-কে বলে দাও যে, আমি অতিসত্বর আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব— অসন্তুষ্ট করব না।

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ — সাধারণভাবে বাস্তবসম্মত উক্তিকে 'সিদক' তথা সত্য এবং বাস্তব বিরুদ্ধ উক্তিকে 'কিয্ব' তথা মিথ্যা মনে করা হয়। কিন্তু কোরআন-সুন্নাহ্ থেকে জানা যায় যে, সত্য ও মিথ্যা শুধু উক্তিই নয়, কর্মও হতে পারে। নিম্নোক্ত হাদীসে বাস্তব বিরোধী কর্মকে মিথ্যা বলা হয়েছে ঃ

من تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوب زور — 'অর্থাৎ, কেউ যদি এমন অলঙ্কারে সজ্জিত হয়, যা তাকে দেয়া হয়নি, অর্থাৎ, এমন কোন গুণ বা কর্ম দাবী করে, যা তার মধ্যে নেই, তবে সে যেন মিথ্যার বস্ত্র পরিধান করে।'

অন্য এক হাদীসে প্রকাশ্যে ও গোপনে উত্তমরূপে নামায আদায়কারীকে সত্য বান্দা বলা হয়েছে ঃ

যে ব্যক্তি জনসমক্ষে উত্তমরূপে নামায পড়ে এবং নির্জনতায়ও এমনিভাবে নামায পড়ে, তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ সে আমার সত্যিকার বান্দা। - (মেশকাত)

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ জান্নাত পাওয়ার পর আল্লাহ্ তাআলা বলবেন ঃ বড় নেয়ামত এই যে, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট; এখন থেকে কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।

ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ — অর্থাৎ, এটিই মহান সফলতা। স্রষ্টা ও পরম প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়ে গেলে এর চাইতে বৃহত্তর সফলতা আর কি হতে পারে?

।। সূরা মায়েদাহ সমাপ্ত।।

سُورَةُ الْأَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَخَمْسٌ وَسِتُّونَ آيَةً وَعِشْرُونَ رُكُوعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۬ؕ ثُمَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُوْنَ ۝ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِیْنٍ ثُمَّ قَضٰۤی اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّی عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ۝ وَهُوَ اللّٰهُ فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ ؕ یَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَیَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ۝ وَمَا تَاْتِیْهِمْ مِّنْ اٰیَةٍ مِّنْ اٰیٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِیْنَ ۝ فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ یَاْتِیْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ اَلَمْ یَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِی الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَیْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِیْنَ ۝ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ كِتٰبًا فِیْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَیْدِیْهِمْ لَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ۝ وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَیْهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِیَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا یُنْظَرُوْنَ ۝

সূরা আল্-আন-আম

(মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১৬৫)

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি।

(১) সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন। তথাপি কাফেররা স্বীয় পালনকর্তার সাথে অন্যান্যকে সমতুল্য স্থির করে। (২) তিনিই তোমাদেরকে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর নির্দিষ্টকাল নির্ধারণ করেছেন। আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহ্‌র কাছে আছে। তথাপি তোমরা সন্দেহ কর। (৩) তিনিই আল্লাহ্ নভোমণ্ডলে এবং ভূমণ্ডলে। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন এবং তোমরা যা কর তাও অবগত (৪) তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী থেকে কোন নিদর্শন আসেনি; যার প্রতি তারা বিমুখ হয় না। (৫) অতএব, অবশ্য তারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে যখন তা তাদের কাছে এসেছে। বস্তুতঃ অচিরেই তাদের কাছে ঐ বিষয়ের সংবাদ আসবে, যার সাথে তারা উপহাস করত। (৬) তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দেইনি। আমি আকাশকে তাদের উপর অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করতে দিয়েছি এবং তাদের তলদেশে নদী সৃষ্টি করে দিয়েছি, অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। (৭) যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম, অতঃপর তারা তা সহস্তে স্পর্শ করত, তবুও অবিশ্বাসীরা একথাই বলত যে, এটা প্রকাশ্য জাদু বৈ কিছু নয়। (৮) তারা আরও বলে যে, তাঁর কাছে কোন ফেরেশতা কেন প্রেরণ করা হল না? যদি আমি কোন ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, তবে গোটা ব্যাপারটাই শেষ হয়ে যেত। অতঃপর তাদেরকে সামান্যও অবকাশ দেওয়া হতনা।

সূরা আল্-আন-আম

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সূরা আন'আমের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েকখানি আয়াত বাদে গোটা সূরাটিই একযোগে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সত্তর হাজার ফেরেশতা তসবীহ্ পাঠ করতে করতে এ সূরার সাথে অবতরণ করেছিলেন। তফসীরবিদগণের মধ্যে মুজাহিদ, কলবী, কাতাদাহ্ প্রমুখও প্রায় একথাই বলেন।

আবু ইসহাক ইসকেরায়িনী বলেন ঃ এ সূরাটিতে তওহীদের সমস্ত মূলনীতি ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এ সূরাটিকে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বাক্য দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। এতে খবর দেওয়া হয়েছে যে, সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে। এ খবরের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রশংসা শিক্ষা দেওয়া এবং এ বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষাদানের মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি কারও হাম্‌দ বা প্রশংসার মুখাপেক্ষী নন। কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক, তিনি স্বীয় ওজুদ বা সত্তার পরাকাষ্ঠার দিক দিয়ে নিজেই প্রশংসনীয়। এ বাক্যের পর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসনীয় হওয়ার প্রমাণও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে সত্তা এ হেন মহান শক্তি-সামর্থ্য ও বিজ্ঞবান বাহক, তিনিই হাম্‌দ ও প্রশংসার যোগ্য হতে পারেন।

এ আয়াতে سماوات শব্দটিকে বহুবচনে এবং ارض শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও অন্য এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নভোমণ্ডলের ন্যায় ভূমণ্ডলও সাতটি। সম্ভবতঃ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সপ্ত আকাশ আকার-আকৃতি ও অন্যান্য অবস্থার দিক দিয়ে একটি অপরটি থেকে অনেক স্বতন্ত্র, কিন্তু সপ্ত পৃথিবী পরস্পর সমআকৃতি বিশিষ্ট; তাই এগুলোকে এক গণ্য করা হয়েছে।- (মাযহারী)

এমনিভাবে ظلمات শব্দটিকে বহুবচনে এবং نور শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, نور বলে বিশুদ্ধ সরল পথ ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তা মাত্র একটিই। আর ظلمات বলে ভ্রান্ত পথ ব্যক্ত করা হয়েছে, যা অসংখ্য।- (মাযহারী ও বাহ্‌রে-মুহীত)

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল নির্মাণ করাকে خلق শব্দ দ্বারা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করাকে جعل শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অন্ধকার ও আলো নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডের মত স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর বস্তু নয়, বরং পরনির্ভর আনুষঙ্গিক ও গুণবাচক বিষয়। অন্ধকারকে আলোর পূর্বে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এ জগতে অন্ধকার হল আসল এবং আলো বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাথে জড়িত। সেসব বস্তু সামনে থাকলে আলোর উদ্ভব হয়, না থাকলে সবকিছু অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য একত্ববাদের স্বরূপ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা করে জগতের ঐসব জাতিকে হুশিয়ার করা, যারা মূলতঃ একত্ববাদের বিশ্বাসী নয় কিংবা বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও একত্ববাদের তাৎপর্যকে পরিত্যাগ করে বসেছে।

অগ্নি উপাসকদের মতে জগতের স্রষ্টা দু'জন-ইয়াযদান ও আহ্‌রামান। তারা ইয়াযদানকে মঙ্গলের স্রষ্টা এবং আহ্‌রামানকে অমঙ্গলের স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে।এ দুটিকেই তারা অন্ধকার ও আলো বলে ব্যক্ত করে।

ভারতের পৌত্তলিকদের মতে তেত্রিশ কোটি দেবতা খোদার অংশীদার। আর্য সমাজ একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আত্মা ও মূল

পদার্থকে অনাদি এবং খোদার শক্তি-সামর্থ্য ও সৃষ্টি থেকে মুক্ত সাব্যস্ত করে একত্ববাদের মূল স্বরূপ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। এমনিভাবে খ্রীষ্টানরা একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথে হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাতাকে আল্লাহ্ তাআলার অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। এরপর একত্ববাদের বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্যে তারা 'একে তিন' এবং 'তিনে এক' এর অযৌক্তিক মতবাদের আশ্রয় নিয়েছে। আরবের মুশরেকরা তো খোদায়ী বন্টনে চূড়ান্ত বদান্যতার পরিচয় দিয়েছে। প্রতিটি পাহাড়ের প্রতিটি বড় পাথরও তাদের মতে মানবজাতির উপাস্য হতে পারত। মোটকথা, যে মানবকে আল্লাহ্ তাআলা' আশরাফুল-মখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা করেছিলেন, তারা যখন পথভ্রষ্ট হল, তখন চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, আকাশ, পানি, বৃক্ষলতা, এমনকি, পোকা-মাকড়কেও সেজদার যোগ্য উপাস্য রুযীদাতা ও বিপদ বিদূরণকারী সাব্যস্ত করে নিল।

কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলাকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভাবক বলে উপরোক্ত সব ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করেছে। কেননা, অন্ধকার ও আলো, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এতে উৎপন্ন যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্ট। অতএব, এগুলোকে কেমন করে আল্লাহ্ তাআলার অংশীদার করা যায়?

প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তম বস্তুগুলোকে আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট ও মুখাপেক্ষী বলে মানুষকে নির্ভুল একত্ববাদ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমার অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ বিশেষ। যদি এরই সূচনা, পরিণতি ও বাসস্থানের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তবে একত্ববাদ একটা বাস্তব সত্য হয়ে সামনে ফুটে উঠবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا – অর্থাৎ, আল্লাহ্‌-তাআলাই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা আদম (আঃ)-কে একটি বিশেষ পরিমাণ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর অংশ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণেই আদম-সন্তানরা বর্ণ, আকার এবং চরিত্র ও অভ্যাসে বিভিন্ন। কেউ কৃষ্ণবর্ণ, কেউ শ্বেতবর্ণ, কেউ লালবর্ণ, কেউ কঠোর, কেউ নম্র, কেউ পবিত্র-স্বভাব বিশিষ্ট এবং কেউ অপবিত্র-স্বভাবের হয়ে থাকে। - (মাযহারী)

এই হচ্ছে মানব সৃষ্টির সূচনা। এরপর পরিণতির দু'টি মনযিল উল্লেখ করা হয়েছে। একটি মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি, যাকে মৃত্যু বলা হয়। অপরটি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ও তার উপকারে নিয়োজিত সৃষ্টজগত— সবার সমষ্টির পরিণতি, যাকে কেয়ামত বলা হয়। মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি বুঝাবার জন্যে বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا —অর্থাৎ, মানব সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তাআলা তার স্থায়িত্ব ও আয়ুষ্কালের জন্যে একটি মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ মেয়াদের শেষ প্রান্তে পৌঁছার নাম মৃত্যু। এ মেয়াদ মানবের জানা না থাকলেও আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা জানেন, বরং এ দিক দিয়ে মানুষও মৃত্যু সম্পর্কে অবগত। কেননা, সে সর্বদা, সর্বত্র আশ-পাশে আদম-সন্তানদেরকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে।

এরপর সমগ্র বিশ্বের পরিণতি অর্থাৎ, কেয়ামতের উল্লেখ করা বলা হয়েছে ঃ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ —অর্থাৎ, আরও একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। এ মেয়াদের পূর্ণ জ্ঞান ফেরেশতাদের নেই এবং মানুষেরও নেই। সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ, গোটা বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক সৃষ্টি ও নির্মিত। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ, মানুষ যে আল্লাহ্‌র সৃষ্টজীব, তা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মানুষকে শৈথিল্য থেকে জাগ্রত করার জন্যে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের একটি বিশেষ আয়ুষ্কাল রয়েছে, যার পর তার মৃত্যু অবধারিত। প্রতিটি মানুষ এ বিষয়টি সর্বক্ষণ নিজের আশ-পাশে প্রত্যক্ষ করে। وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে যে, মানুষের ব্যক্তিগত। মৃত্যুকে যুক্তি ও প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়ে সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক মৃত্যু অর্থাৎ, কেয়ামতকে সপ্রমাণ করা একটা মনস্তাত্ত্বিক ও স্বাভাবিক বিষয়। তাই কেয়ামতের আগমনে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কারণে আয়াতের শেষভাবে উপযুক্ততা প্রকাশার্থে বলা হয়েছে ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ – অর্থাৎ, এহেন সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও তোমরা কেয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর! এটা অনুচিত।

তৃতীয় আয়াতে প্রথম দু'আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলাই এমন এক সত্তা যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য এবং তিনিই তোমাদের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা এবং প্রতিটি উক্তি ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি পরিজ্ঞাত।

চতুর্থ আয়াতে অমনোযোগী মানুষের হঠকারিতা ও সত্য বিরোধী জেদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা এ কর্মপন্থা অবলম্বন করে রেখেছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের হেদায়েতের জন্যে যে-কোন নিদর্শন প্রেরণ করা হয়, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়— এ সম্পর্কে মোটেই চিন্তা-ভাবনা করে না।

পঞ্চম আয়াতে কতক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে এ অমনোযোগিতার আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ —অর্থাৎ, সত্য যখন তাদের সামনে প্রতিভাত হল, তখন তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। এখানে 'সত্যের' অর্থ কোরআন হতে পারে এবং নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র ব্যক্তিত্বও হতে পারে।

কেননা, মহানবী (সাঃ) আজীবন আরব গোত্রসমূহের মধ্যেই অবস্থান করেন। তাঁর শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্য তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা একথাও পুরোপুরিই জানত যে, মহানবী (সাঃ) কোন মানুষের কাছে এক অক্ষরও শিক্ষালাভ করেননি। এমন কি তিনি নিজ হাতে নিজের নামও লিখতে পারতেন না। সারা আরবে তিনি উম্মি (নিরক্ষর) উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়ে যেতেই অকস্মাৎ তাঁর মুখ দিয়ে নিগূঢ়তত্ত্ব, আধ্যাত্মবিদ্যা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন স্রোতধারা প্রবাহিত হতে লাগল, যা জগতের পারদর্শী দার্শনিকদেরকেও বিস্ময়াভিভূত করে দেয়। তিনি নিজের আনীতকালামের মোকাবেলা করার জন্যে আরবের স্বনামখ্যাত প্রাঞ্জলভাষী কবি-সাহিত্যিক ও অলঙ্কারবিদদেরকে চ্যালেঞ্জ দিলেন। তারা মহানবী (সাঃ)-কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে স্বীয় জান-মাল, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকত, কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কোরআনের একটি আয়াতের অনুরূপ বাক্য রচনা করার সাহস

তাদের কারও হল না।

এভাবে নবীকরীম (সাঃ) এবং কোরআনের অস্তিত্ব ছিল সত্যের এক বিরাট নিদর্শন। এছাড়া মহানবী(সাঃ) – এর মাধ্যমে হাজারো মো'জেযা ও খোলাখুলি নিদর্শন প্রকাশ পায়, যে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ যা অস্বীকার করতে পারত না। কিন্তু কাফেররা এসব নিদর্শনকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ

আয়াতের শেষে তাদের অস্বীকৃতি ও মিথ্যারোপের অশুভ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ –অর্থাৎ, আজ তো এসব অপরিনামদর্শী লোকেরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর মো'জেযা, তাঁর আনীত হেদায়াত, কেয়ামত ও পরকাল সবকিছু নিয়েই হাস্যোপহাস করছে, কিন্তু সে সময় দূরে নয়, যখন এগুলোর স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবে। কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। ঈমান ও আমলের হিসাব দিতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পাবে। তখন এগুলোকে বিশ্বাস ও স্বীকার করলেও কোন উপকার হবে না। কেননা, সেটা কর্ম জগৎ নয়— প্রতিদান দিবস। আল্লাহ্ তাআলা এখনও চিন্তা–ভাবনার সুযোগ দিয়েছেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে খোদায়ী নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করলেই ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যারা খোদায়ী বিধান ও পয়গম্বরগণের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত কিংবা বিরোধিতা করত, তাদের প্রতি কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব অবিশ্বাসীর দৃষ্টি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট করে তাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে বিশ্ব–ইতিহাস একটি শিক্ষাগ্রন্থ। জ্ঞানচক্ষু মেলে নিরীক্ষণ করলে এটি হাজারো উপদেশের চাইতে অধিক কার্যকরী উপদেশ। ''জগৎ একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং কাল উৎকৃষ্ট শিক্ষক'' – জনৈক দার্শনিকের এ উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ কারণেই কোরআন পাকের একটি বিরাট বিষয়বস্তু হচ্ছে কাহিনী ও ইতিহাস। কিন্তু সাধারণভাবে অমনোযোগী মানুষেরা জগতের ইতিহাসকেও একটি চিত্তবিনোদনের সামগ্রীর চাইতে অধিক গুরুত্ব দেয়নি, বরং উপদেশ ও জ্ঞানের এ উৎকৃষ্ট বিষয়টিকেও তারা অমনোযোগিতা ও গোনাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। পূর্ববর্তী কিচ্ছা–কাহিনীকে হয় শুধু ঘুমের পূর্বে ঘুমের ওষুধের স্থলে ব্যবহার করা হয়; না হয় অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

সম্ভবতঃ এ কারণেই কোরআন পাক শিক্ষা ও উপদেশের জন্যে বিশ্ব–ইতিহাসকে বেছে নিয়েছে। তবে কোরআনের বর্ণনাভঙ্গী বিশ্বের সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থের মত নয়, যাতে কাহিনী ও ইতিহাস রচনাই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাই কোরআন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ধারাবাহিক কাহিনীর আকারে বর্ণনা করেনি,বরং কাহিনীর যতটুকু অংশ যে ব্যাপারে ও যে অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত, সে ব্যাপারে ততটুকু অংশই উল্লেখ করেছে। অতঃপর অন্যত্র এ কাহিনীর অন্য অংশ বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বর্ণনা করেছে। এতে এ সত্যের দিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, কোন কাহিনী কখনও স্বয়ং উদ্দেশ্য হয় না, বরং প্রত্যেক ঘটনা বর্ণনা করার লক্ষ্য হচ্ছে তা থেকে কোন কার্যকর ফল বের করা। এ কারণে এ ঘটনার যতটুকু অংশ এ লক্ষ্যের জন্যে জরুরী, ততটুকু পাঠ কর এবং সামনে এগিয়ে যাও। স্বীয় অবস্থা পর্যালোচনা কর এবং অতীত ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা অর্জন করে আত্মসংশোধনে ব্রতী হও।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর প্রত্যক্ষ সম্বোধিত মক্কাবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা দেখেনি? দেখলে তা থেকে তারা শিক্ষা ও উপদেশ অর্জন করতে পারত। এখানে 'দেখা'র অর্থ তাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করা। কেননা, সে জাতিগুলো তখন তাদের সামনে ছিল না। এরপর পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও বিপর্যয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে। كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ — অর্থাৎ , তাদের পূর্বে অনেক 'কারণ'কে (অর্থাৎ, সম্প্রদায়কে) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি।

قرن শব্দের অর্থ সমসাময়িক লোকসমাজ এবং সুদীর্ঘ কাল। দশ বছর থেকে একশ' বছর পর্যন্ত সময়কাল অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু قرن শব্দের অর্থ যে এক শতাব্দী, কোন কোন ঘটনা ও হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এক হাদীসে আছে ঃ মহানবী (সাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে বিশর মায়েনীকে বলেছিলেন ঃ তুমি এক 'কারণ' পর্যন্ত জীবিত থাকবে। পরে দেখা গেল যে, তিনি পূর্ণ একশ' বছর জীবিত ছিলেন। মহানবী (সাঃ) জনৈক বালককে দোয়া দেন যে, তুমি এক 'কারণ' জীবিত থেকো। বালকটি পূর্ণ একশ' বছর জীবিত ছিল। خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم এ হাদীসের অর্থ করতে গিয়ে অধিকাংশ আলেম এক 'কারণ' বলতে এক শতাব্দী স্থির করেছেন।

এ আয়াতে অতীত জাতিসমূহ সম্পর্কে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে পৃথিবীতে এমন বিস্তৃতি, শক্তি ও জীবন ধারণের সাজ–সরঞ্জাম দান করেছিলেন, যা পরবর্তী লোকদের ভাগ্যে জুটেনি। কিন্তু তারাই যখন পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং খোদায়ী নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করল, তখন প্রভূত জাঁকজমক, প্রতাপ–প্রতিপত্তি ও অর্থ–সম্পদ তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারল না। তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজ মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে। আদ ও সামূদ গোত্রের মত শক্তিবল তাদের নেই এবং সিরিয়া ও এয়ামেনবাসীদের অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্যশীলও তারা নয়। এসব অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মের পর্যালোচনা করে দেখা তাদের উচিত। বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের পরিণতি কি হবে, তাও ভেবে দেখা দরকার।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ঃ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার শক্তি–সামর্থ্য শুধু প্রবল প্রতাপান্বিত, অসাধারণ জাঁকজমক ও সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং জনবহুল ও মহাপরাক্রান্ত জাতিসমূহকে চোখের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করে সেখানে বসিয়ে দিয়েছে। ফলে কেউ বুঝতেই পারল না যে, এখান থেকে লোকজন হ্রাস পেয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী উমাইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সামনে একটি হঠকারিতাপূর্ণ দাবী পেশ করে বসল। সে বললো ঃ আমি আপনার প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না, যে পর্যন্ত না আপনাকে আকাশে আরোহণ করে সেখান থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসতে দেখব। গ্রন্থে আমার নাম উল্লেখ করে এ আদেশ লিপিবদ্ধ থাকতে হবে ঃ হে আবদুল্লাহ্, রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। সে আরও বলল ঃ আপনি

এগুলো করে দেখালেও আমার মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতসব কথার পরও লোকটি মুসলমান হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইসলামের গাজী হয়ে তায়েফ যুদ্ধে শাহাদতও বরণ করেছিল।

জাতির এহেন অন্যায়, হঠকারিতাপূর্ণ দাবী-দাওয়া এবং উপহাসের ভঙ্গিতে কথাবার্তা পিতা-মাতার চাইতে অধিক স্নেহশীল রসূলে করীম (সাঃ)-এর অন্তরকে কতটুকু ব্যথিত করেছিল, তার সঠিক অনুমান আমরা করতে পারি না। শুধু ঐ ব্যক্তি হয়ত তা অনুভব করতে পারে, যে জাতির মঙ্গল ও কল্যাণ চিন্তাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মত জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে।

তৃতীয় আয়াত অবতরণেরও একটি ঘটনা রয়েছে। পূর্বোল্লেখিত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী উমাইয়া, নযর ইবনে হারেস এবং নওফেল ইবনে খালেদ একবার একত্রিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে ঃ আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যদি আপনি আকাশ থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসেন। গ্রন্থের সাথে চারজন ফেরেশতা এসে সাক্ষ্য দিবে যে, এ গ্রন্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এসেছে এবং আপনি আল্লাহ্‌র রসূল।

আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এর এক উত্তর এই যে, গাফেলরা এসব দাবী-দাওয়া করে মৃত্যু ও ধ্বংসকেই ডেকে আনছে। কেননা, আল্লাহ্‌র আইন এই যে, কোন জাতি কোন পয়গম্বরের কাছে যখন বিশেষ কোন মো'জেযা দাবী করে এবং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের দাবী পূরণ করে দেওয়া হয়, তখন ইসলাম গ্রহণে সামান্য দেরীও সহ্য করা হয় না। ব্যাপক আযাবের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। মক্কাবাসীরাও এ দাবী সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করছিল না যে, তা মেনে নেয়ার আশা করা যেত। তাই বলা হয়েছে ঃ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ অর্থাৎ, আমি যদি তাদের চাহিদা মত মো'জেযা দেখানোর জন্যে ফেরেশতা পাঠিয়ে দেই তবে মো'জেযা দেখার পরও বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্ পক্ষ থেকে ধ্বংসের নির্দেশ জারি হয়ে যাবে। এরপর তাদেরকে বিন্দুমাত্রও অবকাশ দেওয়া হবে না। কাজেই তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, তাদের চাওয়া মো'জেযা প্রকাশ না করলে তাদেরই মঙ্গল।

এরই দ্বিতীয় উত্তর চতুর্থ আয়াতে অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে এরা ফেরেশতা অবতারণের দাবী করে অদ্ভুত বোকামির পরিচয় দিচ্ছে। কেননা, ফেরেশতা যদি আসল আকার-আকৃতিতে সামনে আসে, তবে ভয়ে মানুষের অন্তরাত্মা কাঠ হয়ে যাবে। এমনকি, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার আশঙ্কাও রয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি মানবাকৃতি ধারণ করে ফেরেশতা সামনে আসে, যেমন জিবরাঈল বহুবার মহানবী (সাঃ)-এর কাছে এসেছেন, তবে তারা তাঁকে একজন মানুষই মনে করবে এবং তাদের আপত্তি পূর্বাবস্থায়ই বহাল থাকবে।

এসব হঠকারিতাপূর্ণ কথাবার্তার উত্তর দেওয়ার পর পঞ্চম আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-এর সান্ত্বনার জন্যে বলা হয়েছে ঃ স্বজাতির পক্ষ থেকে আপনি যে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যাতনা ভোগ করছেন, তা শুধু আপনারই বৈশিষ্ট নয়, আপনার পূর্বেও সব পয়গম্বরকে এমনি হৃদয়বিদারক ও প্রাণঘাতি ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তারা সাহস হারায়নি। পরিণামে বিদ্রূপকারী জাতিকে সে আযাবই পাকড়াও করেছে, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

মোটকথা এই যে, আল্লাহ্‌র বিধানাবলী প্রচার করাই আপনার কাজ। এ দায়িত্ব পালন করে আপনি দায়মুক্ত হয়ে যান। কেউ তা গ্রহণ করল কি না তা দেখাশোনা করা আপনার দায়িত্বে নয়। তাই এতে মশগুল হয়ে আপনি অন্তরকে ব্যথিত করবেন।

الانعام ٦ ۱۳۰ واذا سمعوا ٤

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا
يَلْبِسُوْنَ ﴿٩﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ
بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٠﴾ قُلْ
سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١١﴾
قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ قُلْ لِّلّٰهِ ۭ كَتَبَ عَلٰى
نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۭ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ اَلَّذِيْنَ
خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ
وَالنَّهَارِ ۭ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣﴾ قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا
فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۭ قُلْ
اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٤﴾ قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ۭ وَ
ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۭ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ۭ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿١٨﴾

(৯) যদি আমি কোন ফেরেশতাকে রসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হত। এতেও ঐ সন্দেহই করত, যা এখন করছে। (১০) নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথেও উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাঁদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে ঐ শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত। (১১) বলে দিন ঃ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে? (১২) জিজ্ঞেস করুন, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তার মালিক কে? বলে দিন ঃ মালিক আল্লাহ্। তিনি অনুকম্পা প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন। এর আগমনে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে না। (১৩) যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে, তাঁরই। তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (১৪) আপনি বলে দিন ঃ আমি কি আল্লাহ্ ব্যতীত—যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং যিনি সবাইকে আহার্য দান করেন ও তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না—অপরকে সাহায্যকারী স্থির করব? আপনি বলে দিন ঃ আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, সর্বাগ্রে আমিই আজ্ঞাবহ হব। আপনি কদাচ অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (১৫) আপনি বলুন, আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হতে ভয় পাই কেননা, আমি একটি মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় করি। (১৬) যার কাছ থেকে ঐদিন এ শাস্তি সরিয়ে নেওয়া হবে, তার প্রতি আল্লাহ্র অনুকম্পা হবে। এটাই বিরাট সাফল্য। (১৭) আর যদি আল্লাহ্ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান (১৮) তিনিই পরাক্রান্ত স্বীয় বান্দাদের উপর। তিনিই জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ আয়াতে কাফেরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে যা আছে, তার মালিক কে? অতঃপর আল্লাহ্ নিজেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাচনিক উত্তর দিয়েছেন ঃ সবার মালিক আল্লাহ্। কাফেরদের উত্তরের অপেক্ষা করার পরিবর্তে নিজেই উত্তর দেয়ার কারণ এই যে, এ উত্তর কাফেরদের কাছেও স্বীকৃত। তারা যদিও শিরক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিল, তথাপি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সবকিছুর মালিক আল্লাহ্ তাআলাকেই মানত।

لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ বাক্যে الى শব্দটি فى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে মর্ম দাঁড়িয়েছে এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আদি-অন্ত সব মানুষকে কেয়ামতের দিন সমবেত করবেন কিংবা এখানে কবরে একত্রিত করা বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামত পর্যন্ত সব মানুষকে কবরে একত্রিত করতে থাকবেন এবং কেয়ামতের দিন সবাইকে জীবিত করবেন।-(কুরতুবী)

كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ছহীহ্ মুসলীমে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন আল্লাহ্ তাআলা যাবতীয় বস্তুনিচয় সৃষ্টি করেন, তখন একটি ওয়াদাপত্র লিপিবদ্ধ করেন। এটি আল্লাহ্ তাআলার কাছেই রয়েছে। এতে লিখিত আছে ঃ আমার অনুগ্রহ আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে।- (কুরতুবী)

اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ এতে ইঙ্গিত আছে যে, আয়াতের শুরুতে বর্ণিত আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপক অনুগ্রহ থেকে যদি কাফের ও মুশরেকরা বঞ্চিত হয়, তবে স্বীয় কৃতকর্মের কারণেই হবে। কারণ, তারা অনুগ্রহ লাভের উপায় অর্থাৎ, ঈমান অবলম্বন করেনি। – (কুরতুবী)

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ এখানে سكون অর্থ استقرار অবস্থান করা ; অর্থাৎ, পৃথিবীর দিবারাত্রিতে যা কিছু অবস্থিত আছে, তা সবই আল্লাহর অথবা এর অর্থ سكون وحركت এর সমষ্টি। অর্থাৎ, ما سكن وما تحرك (স্থাবর ও অস্থাবর)। আয়াতে শুধু سكون উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত حركت আপনা-আপনিই বোঝা যায়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে তৎপ্রতি বিশ্বা স্থাপন করার এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত সমূহের প্রথম আয়াতে এ নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি এক বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি বলেদিন ঃ মনে কর, যদি আমিও স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমারও কেয়ামতের শাস্তির ভয় রয়েছে। এটা জানা কথা যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিষ্পাপ। তাঁর দ্বারা অবাধ্যতা হতেই পারে না। কিন্তু তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে উম্মতকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, এ নির্দেশের বিরোধিতা করলে যখন নবীগণের সর্দারকেও ক্ষমা করা যায় না, তখন অন্যরা কোন ছার!

এরপর বলা হয়েছে ঃ مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ —অর্থাৎ, হাশর দিবসের শাস্তি অত্যন্ত লোমহর্ষক ও কঠোর হবে। কারও উপর থেকে এ শাস্তি সরে গেলে মনে করতে হবে যে, তার প্রতি আল্লাহর অশেষ করুণা হয়েছে। وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ অর্থাৎ, এটিই বৃহৎ ও প্রকাশ্য সফলতা। এখানে সফলতার অর্থ জান্নাতে প্রবেশ। এতে বোঝা গেল যে, শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ شَهِيْدٌۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ
وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ؕ اَئِنَّكُمْ
لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ؕ قُلْ لَّآ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا
هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿١٩﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ
الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ
كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢١﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا
ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ
تَزْعُمُوْنَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا
مُشْرِكِيْنَ ﴿٢٣﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ
مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى
قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ
اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ
وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

(১৯) আপনি জিজ্ঞেস করুন ঃ সর্ববৃহৎ সাক্ষ্যদাতা কে? বলে দিন ঃ আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আমার প্রতি এ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে— যাতে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ কোরআন পৌছে-সবাইকে ভীতি-প্রদর্শন করি। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্র সাথে অন্যান্য উপাস্যও রয়েছে? আপনি বলে দিন ঃ আমি এরূপ সাক্ষ্য দেব না। বলে দিন ঃ তিনিই একমাত্র উপাস্য; আমি অবশ্যই তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। (২০) যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চিনে, যেমন তাদের সন্তানদেরকে চিনে। যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (২১) আর যে আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তার চাইতে বড় জালেম কে? নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হবে না। (২২) আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা শিরক করেছিল, তাদেরকে বলব ঃ যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে, তারা কোথায়? (২৩) অতঃপর তাদের কোন অপরিচ্ছন্নতা থাকবে না; তবে এটুকুই যে তারা বলবে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না। (২৪) দেখতো, কিভাবে মিথ্যা বলছে নিজেদের বিপক্ষে? এবং যেসব বিষয় তারা আপনার প্রতি মিছামিছি রচনা করত, তা সবই উধাও হয়ে গেছে। (২৫) তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কান লাগিয়ে থাকে। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যাতে একে না বুঝে এবং তাদের কানে বোঝা ভরে দিয়েছি। যদি তারা সব নিদর্শন অবলোকন করে তবুও সেগুলো বিশ্বাস করবে না। এমনকি, তারা যখন আপনার কাছে ঝগড়া করতে আসে, তখন কাফেররা বলে ঃ এটি পূর্ববর্তীদের কিচ্ছাকাহিনী বৈ তো নয়। (২৬) তারা এ থেকে বাধা প্রদান করে এবং এ থেকে পলায়ন করে। তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে, কিন্তু বুঝছে না।

দ্বিতীয় আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিটি লাভ-ক্ষতির মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলা। সত্যিকারভাবে কোন ব্যক্তি কারও সামান্য উপকারও করতে পারে না ক্ষতিও করতে পারে না। আমরা বাহ্যতঃ একজনকে অপরজন দ্বারা উপকৃত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখি। এটি নিছক একটি বাহ্যিক আকার। সত্যের সামনে একটি পর্দার চাইতে বেশী এর কোন গুরুত্ব নেই।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখা প্রসঙ্গে ইমাম বগভী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উটে সওয়ার হয়ে আমাকে পিছনে বসিয়ে নিলেন। কিছু দূর চলার পর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ হে বৎস! আমি আরয করলাম ঃ আদেশ করুন, আমি হাযির আছি। তিনি বললেন ঃ "তুমি আল্লাহ্কে স্মরণ রাখবে, আল্লাহ্ তোমাকে স্মরণ রাখবেন।" তুমি আল্লাহ্কে স্মরণ রাখলে সর্বাবস্থায় তাঁকে সামনে দেখতে পাবে। তুমি শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহ্কে স্মরণ রাখলে, বিপদের সময় তিনি তোমাকে স্মরণ রাখবেন। কোন কিছু যাঞ্চা করতে হলে তুমি আল্লাহ্র কাছেই যাঞ্চা কর এবং সাহায্য চাইতে হলে আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য চাও। জগতে যা কিছু হবে, ভাগ্যের লেখনী তা লিখে ফেলেছে। তোমার অংশে নেই—তোমার এমন কোন উপকার করতে সমগ্র সৃষ্টজীব সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলে, তারা কখনও তা করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি তারা সবাই মিলে তোমার এমন কোন ক্ষতি করতে চায়, যা তোমার ভাগ্যে নেই, তবে কখনই তারা তা করতে সক্ষম হবে না। যদি তুমি বিশ্বাস সহকারে ধৈর্যধারণ করতে পার তবে অবশ্যই তা করো। সক্ষম না হলে ধৈর্য ধর। কেননা, স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজে ধৈর্য ধরার মধ্যে অনেক মঙ্গল রয়েছে। মনে রাখবে, আল্লাহ্র সাহায্য ধৈর্যের সাথে জড়িত—কষ্টের সাথে সুখ এবং অভাবের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত।' - (তিরমিযী, মুসনাদে-আহমদ)

পরিতাপের বিষয়, কোরআন পাকের এ সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আজীবনের শিক্ষা সত্ত্বেও মুসলমানরা এ ব্যাপারে পথভ্রান্ত। তারা আল্লাহ্ তাআলার সব ক্ষমতা সৃষ্টজীবের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে। আজ এমন মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য নয়, যারা বিপদের সময় আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণ করে না বরং তারা তাঁর কাছে দোয়া করার পরিবর্তে বিভিন্ন নামের দোহাই দেয় এবং তাদেরই সাহায্য কামনা করে। তারা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি লক্ষ্য করে না। পয়গম্বর ও ওলীদের ওসিলায় দোয়া করা ভিন্ন কথা। এটা জায়েয। স্বয়ং নবী করীম (সাঃ)-এর শিক্ষায় এর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সরাসরি কোন সৃষ্টজীবকে অভাব পূরণের জন্যে ডাকা এ কোরআনী নির্দেশের পরিপন্থী ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর। আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে সরল পথে কায়েম রাখুন।

আয়াতের শেষে বলেছেন ঃ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলাই সবার উপর পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সবাই তাঁর ক্ষমতাধীন ও মুখাপেক্ষী। এ কারণেই দুনিয়ার জীবনে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন মহত্তম ব্যক্তিগণও সব কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারে না এবং তার সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না; তিনি নৈকট্যশীল রসূলই হোন কিংবা রাজাধিরাজ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুশরেকদের ব্যর্থতার অবস্থা ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, অত্যাচারী ও কাফেররা সফলতা পাবে না। আলোচ্য আ-য়াতসমূহে এর বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে একটি সর্ববৃহৎ পরীক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে যা হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলামীনের সামনে অনুষ্ঠিত হবে। বলা হয়েছে ঃ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ, ঐ দিনটিও স্মরণযোগ্য, যেদিন আমি সবাইকে অর্থাৎ, মুশরক ও তাদের তৈরী করা উপাস্যসমূহকে একত্রিত করব। ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَاۤؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাদেরকে প্রশ্ন করব যে, তোমরা যেসব উপাস্যকে আমার অংশীদার, স্বীয় অভাব পূরণকারী ও বিপদ বিদূরণকারী মনে করতে, আজ তারা কোথায়? তারা তোমাদের সাহায্য করে না কেন?

এখানে ثم শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিলম্ব ও দেরীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে বুঝা যায় যে, হাশরের মাঠে একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে না, বরং সবাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত হতবাক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। অনেক কাল পর হিসাব-কিতাব ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন আল্লাহ্ তাআলা হাশরের ময়দানে তোমাদেরকে এমনভাবে একত্রিত করবেন, যেমন তীরসমূহকে তূণীরে একত্রিত করা হয়। পঞ্চাশ হাজার বছর তোমরা এমনিভাবে থাকবে। অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন এক হাজার বছর পর্যন্ত সবাই অন্ধকারে থাকবে। পরস্পর কথাবার্তাও বলতে পারবে না।— (মুস্তাদরাক, বায়হাকী)।

উপরোক্ত দুই হাদীসে পঞ্চাশ হাজার ও এক হাজারের যে পার্থক্য, তা কোরআন পাকের দুই আয়াতেও উল্লেখিত আছে। এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ, ঐ দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ অর্থাৎ, একদিন তোমার প্রতিপালকের কাছে এক হাজার বছরের মত হবে। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, এ দিনটি তীব্র কষ্ট ও কঠোর শ্রমের দিক দিয়ে দীর্ঘ হবে। কষ্ট ও শ্রমের স্তর বিভিন্ন রূপ হবে। তাই কারও কাছে এ দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের এবং কারও কাছে এক হাজার বছরের সমান বলে মনে হবে।

সারকথা, এ মহাপরীক্ষা কেন্দ্রে প্রথমতঃ দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরীক্ষা শুরুই হবে না। এমনকি সবাই বাসনা করতে থাকবে যে, কোনরূপে পরীক্ষা ও হিসাব-কিতাব হয়ে যাক- পরিণতি যাই হোক, এ অনিশ্চয়তার কষ্ট তো দূর হবে। এ দীর্ঘ অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যে ثم শব্দ প্রয়োগ করে ثُمَّ نَقُوْلُ বলা হয়েছে। এমনিভাবে পরবর্তী আয়াতে মুশরেকদের পক্ষ থেকে যে উত্তর বর্ণিত হয়ছে, তাতেও ثم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, তারাও দীর্ঘ বিরতির পর যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তর দেবেঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কসম, আমরা মুশরেক ছিলাম না। এ আয়াতে তাদের উত্তরকে فتنة শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি পরীক্ষার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং কারও প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থই সম্ভবপর। প্রথম অর্থে তাদের পরীক্ষার উত্তরকেই পরীক্ষা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, এরা পৃথিবীতে এসব মূর্তি ও স্বহস্ত নির্মিত উপাস্যদের প্রতি আসক্ত ছিল, স্বীয় অর্থ-সম্পদ এদের জন্যেই উৎসর্গ করত। কিন্তু আজ সব ভালবাসা ও আসক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং এ ছাড়া তাদের মুখে কোন উত্তর যোগাচ্ছে না। কাজেই তাদের থেকে নির্লিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ারই দাবী করে বসল।

তাদের উত্তরে একটি বিস্ময়কর বিষয় এই যে, কিয়ামতের ভয়াবহ ও লোমহর্ষক দৃশ্যাবলী এবং রাব্বুল আলামীনের শক্তি-সামর্থের অভাবনীয় ঘটনাবলী দেখার পর তারা কোন সাহসে রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে এমন নির্জলা মিথ্যা বলতে পারল! তাও এমন বলিষ্ঠ চিত্তে যে, আল্লাহর মহান সত্তার কসম খেয়ে বলছে যে, আমরা মুশরেক ছিলাম না।

অধিকাংশ তফসীরবিদ এর উত্তরে বলেনঃ তাদের এ উত্তর বিবেক-বুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতার উপর ভিত্তিশীল নয়, বরং ভয়ের আতিশয্যে হতবুদ্ধিতার আবেশে মুখে যা এসেছে, তাই বলেছে। কিন্তু হাশরের সাধারণ ঘটনাবলী ও অবস্থা চিন্তা করলে এ কথাও বলা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের পূর্ণ অবস্থা দৃষ্টির সামনে আনার জন্যে তাদেরকে এ শক্তিও দিয়েছেন যেন, তারা পৃথিবীর মত অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে যা ইচ্ছা বলুক- যাতে কুফর ও শিরকের সাথে সাথে তাদের এ দোষটিও হাশরবাসীদের জানা হয়ে যায় যে, তারা মিথ্যা ভাষণে অদ্বিতীয় পটু। এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তারা মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। কোরআন পাকের অপর এক আয়াতে فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ বলে এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাক্যটির অর্থ এই যে, এরা মুসলমানদের সামনে যেমন মিথ্যা কসম খায়, তেমনি স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের সামনেও মিথ্যা কসম খেতে দ্বিধা করবে না।

হাশরের ময়দানে যখন তারা কসম খেয়ে নিজ নিজ শেরেকী ও কুফরী অস্বীকার করবে, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা তাদের মুখে মোহর এঁটে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হস্তপদকে নির্দেশ দিবেন যে, তোমরা সাক্ষ্য দাও, তারা কি করতো। তখন প্রমাণিত হবে যে, আমাদের হস্ত-পদ, চক্ষু-কর্ণ – এরা সবাই ছিল আল্লাহ্ তাআলার গুপ্ত পুলিশ। তারা সব কাজকর্ম একটি একটি করে সামনে তুলে ধরবে। এ সম্পর্কেই সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছেঃ

অদ্য আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পদযুগল তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

এহেন ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করার পর আর কেউ কোন তথ্য গোপনে ও মিথ্যা ভাষণে দুঃসাহসী হবে না।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا অর্থাৎ, ঐদিন তারা আল্লাহর কাছ থেকে কোন কথা গোপন করতে পারবে না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে এর অর্থ এই যে, প্রথম প্রথম তারা খুব মিথ্যা বলবে এবং মিথ্যা কসম খাবে, কিন্তু স্বয়ং তাদের হস্তপদ যখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন কেউ ভুল কথা বলতে সাহসী হবে না।

মহাবিচারপতির আদালতে সম্পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। পৃথিবীতে যেভাবে সে মিথ্যা বলত, তখনও তার মিথ্যা বলার এ ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না। কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তার মিথ্যার আবরণ স্বয়ং তার হস্তপদের সাক্ষ্য দ্বারা উন্মোচিত করে দিবেন।

মৃত্যুর পর কবরে মুনকীর-নকীর ফেরেশতাদ্বয়ের সামনে প্রথম পরীক্ষা হবে। একে ভর্তি পরীক্ষা বলা যেতে পারে। এ পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছেঃ মুনকির-নাকীর যখন কাফেরকে জিজ্ঞেস করবে, من ربك وما دينك অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক কে এবং তোমার দ্বীন

কি? কাফের বলবে هاه هاه لا ادرى অর্থাৎ,হায়, হায়। আমি কিছুই জানি না। এর বিপরীতে মুমিন বলবে, ودينى الاسلام আমার প্রতিপালক, আল্লাহ্ এবং আমার দ্বীন, ইসলাম। এতে বুঝা যায় যে, এ পরীক্ষায় কেউ মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না। নতুবা কাফের ও মুমিনের ন্যায় উত্তর দিতে পারতো। কারণ এই যে, এখানে পরীক্ষক হচ্ছেন ফেরেশতা। তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং তারা হস্তপদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করতে অক্ষম। এখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হলে ফেরেশতা তার উত্তর অনুযায়ীই কাজ করতো, ফলে পরীক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। হাশরের পরীক্ষা এরূপ নয়। সেখানে প্রশ্ন ও উত্তর সরাসরি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত ও সর্বশক্তিমানের সাথে হবে। সেখানে কেউ মিথ্যা বললেও তা কার্যকরী হবে না।

তফসীর 'বাহ্‌রে-মুহীত' ও 'মাযহারী'তে কোন কোন তফসীরবিদের এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, যারা মিথ্যা কসম খেয়ে স্বীয় শিরককে অস্বীকার করবে, তারা হলো সেসব লোক, যারা কোন সৃষ্টজীবকে খোলাখুলি আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি না বলেও আল্লাহ্‌র সব ক্ষমতা সৃষ্টজীবে বন্টন করে দিয়েছিল। সৃষ্টজীবের কাছেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাচ্ঞা করত,তাদের নামে নৈবেদ্য প্রদান করত এবং তাদের কাছেই স্বাস্থ্য, রুযী-রোযগার, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য যাবতীয় মনোবাঞ্ছা প্রার্থনা করতো। তারা নিজেদেরকে মুশরেক মনে করত না। তাই হাশরের ময়দানেও কসম খেয়ে বলবে যে, তারা মুশরেক ছিল না। কিন্তু কসম খাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা তাদের লাঞ্ছিত করবেন।

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কোরআনের কোন কোন আয়াতের দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা কাফের ও গোনাহ্‌গারদের সাথে কথা বলবেন না। অথচ আলোচ্য আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি কথা বলবেন।

উত্তর এই যে, এ সম্বোধন ও কথাবার্তা সম্মান প্রদান ও প্রার্থনা শ্রবণ হিসেবে হবে না। হুমকি প্রদর্শন ও শাসানির জন্যেও সম্বোধন হবে না, উক্ত আয়াতের অর্থ তা নয়। এ কথাও বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে যে সম্বোধন রয়েছে, তা হবে ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায়। পক্ষান্তরে যে আয়াতে সম্বোধন ও কথাবার্তা হবে না বলে বলা হয়েছে, সেখানে প্রত্যক্ষ কথাবার্তা বুঝানো হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ

انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

—এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলা হয়েছে যে, দেখুন, তারা নিজেদের বিপক্ষে কেমন মিথ্যা বলেছে; আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যাদেরকে তারা মিছামিছি শরীক তৈরী করেছিল, আজ তারা সবাই উধাও হয়ে গেছে। নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অর্থ এই যে, এ মিথ্যার শাস্তি তাদের উপরই পতিত হবে। মনগড়া তৈরী করার অর্থ এই যে, দুনিয়াতে তাদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করার ব্যাপারটি ছিল মিছামিছি (শরীক) ও মনগড়া। আজ বাস্তব সত্য সামনে এসে যাওয়ায় এ মিথ্যা অকেজো হয়ে গেছে। মনগড়া তৈরীর অর্থ মিথ্যা কসমও হতে পারে, যা হাশরের ময়দানে উচ্চারণ করবে। অতঃপর হস্তপদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দ্বারা সে মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন ঃ মনগড়া তৈরী করা বলে মুশরেকদের ঐসব অপব্যাখ্যা বুঝানো হয়েছে, যা তারা দুনিয়াতে মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে বর্ণনা করত। উদাহরণতঃ তারা বলতঃ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ অর্থাৎ, আমরা উপাস্য মনে করে মূর্তির উপাসনা করি না, বরং উপাসনা করার কারণ এই যে, তারা আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করে আমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে দেবে। হাশরে তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হবে যে, তাদের মহাবিপদের সময় কেউ তাদের সুপারিশ করবে না।

উভয় আয়াতে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, হাশরের ভয়াবহ ময়দানে মুশরিকদেরকে যা ইচ্ছা, বলার স্বাধীনতাদানের মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মিথ্যা বলার অভ্যাস একটি দুষ্ট অভ্যাস যা পরিত্যাগ করা অতি কঠিন। সুতরাং যারা দুনিয়াতে মিথ্যা কসম খেত, তারা এখানেও তা থেকে বিরত থাকতে পারেনি। ফলে সমগ্র সৃষ্টজগতের সামনে তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে মিথ্যা বলার নিন্দা জোরালো ভাষায় করা হয়েছে। কোরআনের স্থানে স্থানে মিথ্যাবাদীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা পাপাচারের দোসর। মিথ্যা ও পাপাচার উভয়ই জাহান্নামে যাবে।– (ইবনে-হাব্বান)

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ যে কাজের দরুন মানুষ দোযখে যাবে, তা কি? তিনি বললেন ঃ সে কাজ হচ্ছে মিথ্যা। – (মুসনাদে-আহমদ)

মে'রাজ রজনীতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, এক ব্যক্তির চোয়াল চিরে দেওয়া হচ্ছে। সে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসছে। অতঃপর আবার চিরে দেওয়া হচ্ছে। তার সাথে এ কার্যধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তিনি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ব্যক্তি কে? জিবরাঈল বললেন ঃ এ হল মিথ্যাবাদী।

মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ মিথ্যা সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করা পর্যন্ত কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারে না। এমনকি, হাসি-ঠাট্টা ছলেও মিথ্যা না বলা উচিত।

বায়হাকীতেও ছহীহ্ সনদ সহকারে বর্ণিত আছে, মুসলমানের মধ্যে অন্য কু-অভ্যাস থাকতে পারে, কিন্তু আত্মসাৎ ও মিথ্যা থাকতে পারে না। অন্য এক হাদীসে আছে, মিথ্যা মানুষের রিযিক কমিয়ে দেয়।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ যাহ্‌হাক, কাতাদাহ্, মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (রাহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণের মতে এ আয়াত মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা কোরআন শুনতে ও অনুসরণ করতে লোকদের বারণ করত এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে থাকত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আরও বর্নিত আছে যে, এ আয়াত মহানবী (সাঃ)-এর চাচা আবু তালেব ও আরও কয়েকজন চাচা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা তাঁকে সমর্থন করতেন এবং কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে তাঁকে রক্ষা করতেন, কিন্তু কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করতেন না। এমতাবস্থায় عَنْهُ শব্দের সর্বনামটির অর্থ কোরআনের পরিবর্তে নবী করীম (সাঃ) হবেন।– (মাযহারী)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾

(২৭) আর আপনি যদি দেখেন, যখন তাদেরকে দোযখের উপর দাঁড় করানো হবে। তারা বলবে ঃ কতই না ভাল হত, যদি আমরা পুনঃ প্রেরিত হতাম; তা হলে আমরা স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। (২৮) এবং তারা ইতিপূর্বে যা গোপন করত, তা তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যদি তারা পুনঃ প্রেরিত হয়, তবুও তাই করবে, যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। (২৯) তারা বলে ঃ আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। (৩০) আর যদি আপনি দেখেন; যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন ঃ এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে ঃ হাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম। তিনি বলবেন ঃ অতএব, স্বীয় কুফরের কারণে শাস্তি আস্বাদন কর। (৩১) নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহ্র সাক্ষাৎকে মিথ্যা মনে করেছে। এমনকি, যখন কিয়ামত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে যাবে, তারা বলবে ঃ হায় আফসোস, এর ব্যাপারে আমরা কতই না ত্রুটি করেছি! তারা স্বীয় বোঝা স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করবে। শুনে রাখ, তারা যে বোঝা বহন করবে, তা নিকৃষ্টতর বোঝা। (৩২) পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের আবাস পরহেযগারদের জন্যে শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি বুঝ না? (৩৩) আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে। অতএব, তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং জালেমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। (৩৪) আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গাম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাঁরা এতে ছবর করেছেন। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহ্র বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামের তিনটি মূলনীতি রয়েছে – (১) একত্ববাদ, (২) রেসালত ও (৩) আখেরাতে বিশ্বাস। অবশিষ্ট সব বিশ্বাস এ তিনটিরই অধীন। এ তিন মূলনীতি মানুষকে স্বীয় স্বরূপ ও জীবনের লক্ষ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে তাকে এক সরল ও স্বচ্ছ পথে দাঁড় করিয়ে দেয়। এগুলোর মধ্যে পরকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির বিশ্বাস কার্যতঃ এমন একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা মানুষের প্রত্যেক কাজের গতি বিশেষ একটি দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এ কারণেই কোরআন পাকের সব বিষয়বস্তু এ তিনটির মধ্যেই চক্রাকারে আবর্তিত হয়। আলোচ্য আ-য়াতসমূহে বিশেষভাবে পরকালের প্রশ্ন ও উত্তর, কঠোর শাস্তি, অশেষ ছওয়াব এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম আয়াতে অবিশ্বাসী, অপরাধীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ পরকালে যখন তাদেরকে দোযখের কিনারায় দাঁড় করানো হবে এবং তারা কল্পনাতীত ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলবে, আফসোস, আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করা হলে আমরা পালনকর্তা প্রেরিত নিদর্শনাবলী ও নির্দেশনাবলীকে মিথ্যারোপ করতাম না, বরং এগুলো বিশ্বাস করে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

দ্বিতীয় আয়াতে সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত, মহাবিচারপতি তাদের বিহবল আকাঙ্ক্ষার রহস্য উন্মোচন করে বলেছেন ঃ এরা চিরকালই মিথ্যায় অভ্যস্ত ছিল। এ আকাঙ্ক্ষায়ও এরা মিথ্যাবাদী। আসল ব্যাপার এই যে, পয়গম্বরদের মাধ্যমে যেসব বাস্তব সত্য তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল এবং তারা তা জানা ও চেনা সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতা কিংবা লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে এসব সত্যকে পর্দায় আবৃত রাখার চেষ্টা করত। আজ সেগুলো একটি একটি করে তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছে, আল্লাহ্ পাকের একচ্ছত্র অধিকার ও শক্তি-সামর্থ্য চোখে দেখেছে, পয়গম্বরদের সত্যতা অবলোকন করেছে, পরকালে পুনর্জীবিত হওয়া যা সব সময়ই তারা অস্বীকার করত, নির্মম সত্য হয়ে সামনে এসেছে, প্রতিদান ও শাস্তি প্রকাশ হতে দেখেছে এবং দোযখও দেখেছে। কাজেই বিরোধিতা করার কোন ছুতা তাদের হাতে অবশিষ্ট রইল না। তাই এমনিতেই বলতে শুরু করেছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনর্বার প্রেরিত হলে ঈমানদার হয়ে ফিরতাম।

তাদের এ উক্তিকে মিথ্যা বলা পরিণতির দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ, তারা যে ওয়াদা করছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মিথ্যারোপ করব না, এর পরিণতি কিন্তু এরূপ হবে না; তারা দুনিয়াতে পৌঁছে আবারও মিথ্যারোপ করবে। এ মিথ্যা বলার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা এখনও যা কিছু বলছে, তা সদিচ্ছায় বলছে না, বরং সাময়িক বিপদ টলানোর উদ্দেশ্যে, শাস্তির কবল থেকে বাঁচার জন্যে বলছে-অন্তরে এখনও তাদের সদিচ্ছা নেই।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا এর عطف হয়েছে عادوا এর উপর। অর্থ এই যে, যদি তারা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হয়, তবে সেখানে পৌঁছে একথাই বলবে যে, আমরা এ পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবন মানি না; এ জীবনই একমাত্র জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠে যে, যখন কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে এবং হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তিকে একবার স্বচক্ষে দেখেছে, তখন

দুনিয়াতে এসে পুনরায় তা অস্বীকার করা কিরূপে সম্ভবপর?

উত্তর এই যে, অস্বীকার করার জন্যে বাস্তবে ঘটনাবলীর বিশ্বাস না থাকা জরুরী নয়। বরং আজকাল যেমন অনেক কাফের ইসলামী সত্যসমূহে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতা বশতঃ ইসলামকে অস্বীকার করে চলছে, এমনিভাবে তারা দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পর কিয়ামত, পুনরুজ্জীবন ও পরকাল সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে এগুলো অস্বীকারে প্রবৃত্ত হবে। কোরআন পাক বর্তমান জীবনে কোন কোন কাফের সম্পর্কে বলে ঃ

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا অর্থাৎ, তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করছে কিন্তু তাদের অন্তরে এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। যেমন, ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা শেষ নবী (সাঃ)- কে এমনভাবে চেনে, যেমন স্বীয় সন্তানদেরকে চেনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে আছে।

মোট কথা, জগৎস্রষ্টা স্বীয় আদি জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন যে, তাদের এ বক্তব্য যে, দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মুমিন হয়ে যাব, - সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণামূলক। তাদের কথা অনুযায়ী পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করে তাদেরকে সেখানে ছেড়ে দিলেও তারা আবার তাই করবে, যা প্রথম জীবনে করত।

তফসীর মাযহারীতে তিবরানীর বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, হিসাব-কিতাবের সময় আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-কে বিচার দণ্ডের কাছে দাঁড় করিয়ে বলবেন ঃ সন্তানদের কাজকর্ম স্বচক্ষে পরিদর্শন কর। যার সৎকর্ম পাপকর্মের চাইতে এক রতি বেশী হয়, তাকে তুমি জান্নাতে পৌঁছাতে পার। আল্লাহ্ তাআলা আরও বলবেন ঃ আমি জাহান্নামের আযাবে ঐ ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট করাব, যার সম্পর্কে জানি যে, দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলেও পূর্বের মতই কাজ করবে।

وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন সৎ লোকদের কাজকর্ম তাদের বাহন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে অসৎ লোকদের কাজকর্ম ভারী বোঝার আকারে তাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কাফের ও পাপীরা হাশরের ময়দানে প্রাণরক্ষার্থে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নানা ধরনের কথা-বার্তা বলবে। কখনও মিথ্যা কসম খাবে, কখনও দুনিয়ায় পুনঃ প্রেরিত হওয়ার আকাঙ্খা করবে। কিন্তু একথা কেউ বলবে না যে, আমরা এখন বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এখন সৎকাজ করব। কেননা, এ সত্য স্বতঃসিদ্ধ হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে যে, এ জগৎ কর্মজগৎ নয় এবং বিশ্বাস স্থাপন ততক্ষণ পর্যন্তই শুদ্ধ, যতক্ষণ তা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন হয়। দেখার পর সত্য জানা, তা দেখারই প্রতিক্রিয়া -আল্লাহ্ ও রসূলকে সত্য জানা নয়। এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, এর ফলাফল -অর্থাৎ, চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ, দুনিয়াতে শান্তিময় পবিত্র জীবন এবং পরকালে জান্নাত লাভ শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এর পূর্বে আত্মাজগতে এগুলো অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এর পরে পরকালেও এগুলো উপার্জন করা সম্ভবপর নয়।

এতে ফুটে উঠল যে, পার্থিব জীবন অনেক বড় নেয়ামত এবং অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়। উপরোক্ত সুমহান সওদা এ জীবনেই ক্রয় করা যায়। তাই ইসলামে আত্মহত্যা হারাম এবং মৃত্যুর জন্য দোয়া ও মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ। কারণ এতে আল্লাহ্ তাআলার একটি বিরাট নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

সারকথা এই যে, দুনিয়াতে যে বস্তুটি প্রত্যেকেই প্রাপ্ত হয়েছে এবং যা সর্বাধিক মূল্যবান ও প্রিয়, তা হচ্ছে মানুষের জীবন। একথাও সবার জানা যে, মানুষের জীবনের একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডি রয়েছে কিন্তু জীবনের সঠিক সীমা কারও জানা নেই যে, তা সত্তর বছর হবে, না সত্তর ঘন্টা, না একটি শ্বাস ছাড়ারও সময় পাওয়া যাবে না।

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ
نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ
الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَ
قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ
يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي
الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا
فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ
يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ
اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ
مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا
وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

(৩৫) আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে আপনি যদি ভূতলে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন, অতঃপর তাদের কাছে কোন একটি মোজেযা আনতে পারেন, তবে নিয়ে আসুন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সবাইকে সরল পথে সমবেত করতে পারতেন। অতএব, আপনি নির্বোধদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (৩৬) তারাই মানে, যারা শ্রবণ করে। আল্লাহ্ মৃতদেরকে জীবিত করে উত্থিত করবেন। অতঃপর তারা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৩৭) তারা বলেঃ তার প্রতি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন? বলে দিন ঃ আল্লাহ্ নিদর্শন অবতারণ করতে পূর্ণ সক্ষম; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৩৮) আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি শ্রেণী। আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি। অতঃপর সবাই স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে। (৩৯) যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে, তারা অন্ধকারের মধ্যে মূক ও বধির। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (৪০) বলুন, বলতো দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি পতিত হয় কিংবা তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায়, তবে তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে ডাকবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৪১) বরং তোমরা তো তাঁকেই ডাকবে। অতঃপর যে বিপদের জন্যে তাঁকে ডাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তা দূরও করে দেন। যাদেরকে অংশীদার করছ, তখন তাদেরকে ভুলে যাবে। (৪২) আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে। (৪৩) অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আযাব আসল, তখন কেন কাকুতি-মিনতি করল না? বস্তুতঃ তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ

অর্থাৎ, কাফেররা প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে না, বরং আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতিই মিথ্যারোপ করে। সুদ্দীর বাচনিক তফসীরে মাযহারীতে এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একবার দু'জন কাফের সর্দার আখনাস ইবনে শরীক ও আবু জাহলের মধ্যে সাক্ষাৎ হলে আখনাস আবু জাহলকে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আবুল হিকাম! (আরবে আবু জাহল 'আবুল হিকাম' (জ্ঞানধর) নামে খ্যাত ছিল। ইসলামযুগে কুফুরী ও হঠকারিতার কারণে তাকে 'আবু জাহল' (মূর্খতাধর) উপাধি দেয়া হয়।) আমরা এখন একান্তে আছি। আমাদের কথাবার্তা কেউ শুনবে না; মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে তোমার সঠিক ধারণা কি' আমাকে সত্য সত্য বল? তাকে সত্যবাদী মনে কর, না মিথ্যাবাদী?

আবু জাহল আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলল ঃ নিঃসন্দেহে মুহম্মদ সত্যবাদী। তিনি সারা জীবন মিথ্যা বলেননি। কিন্তু ব্যাপার এই যে, কোরাইশ গোত্রের একটি শাখা 'বনী-কুসাই' এসব গৌরব ও মহত্ত্বের সমাবেশ ঘটবে, অবশিষ্ট কোরাইশরা রিক্ত হস্ত থেকে যাবে— আমরা তা কিরূপে সহ্য করতে পারি? পতাকা বনী-কুসাই-এর হাতে রয়েছে। হরম শরীফে হাজীদেরকে পানি পান করানোর গৌরবজনক কাজটিও তাদের দখলে। খানায়ে-কা'বার প্রহরা ও চাবি তাদের করায়ত্ত। এখন যদি আমরা নবুওয়তও তাদের ছেড়ে দেই, তবে অবশিষ্ট কোরাইশদের হাতে কি থাকবে?

নাজিয়া ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, একবার আবু জাহল স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলল ঃ আপনি মিথ্যাবাদী- এরূপ কোন ধারণা আমরা পোষণ করি না। তবে আমরা ঐ ধর্ম ও গ্রন্থকে অসত্য মনে করি, যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন।— (মাযহারী)

এসব রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতটিকে তার প্রকৃত অর্থেও নেয়া যেতে পারে, কোন রূপক অর্থ করার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ, কাফেররা আপনাকে নয়—আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে। আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, কাফেররা বাহ্যতঃ যদিও আপনাকে মিথ্যা বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনাকে মিথ্যা বলার পরিণাম স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলা। যেমন, এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেয়, সে যেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কেই কষ্ট দেয়।

ষষ্ঠ আয়াতে وَمَا مِنْ دَابَّةٍ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কেয়ামতের দিন মানুষের সাথে সর্বপ্রকার জানোয়ারকেও জীবিত করা হবে। ইবনে-জরীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন সব প্রাণী, চতুষ্পদ জন্তু এবং পক্ষীকুলকেও পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং আল্লাহ্ তাআলা এমন সুবিচার করবেন যে, কোন শিং বিশিষ্ট জন্তু কোন শিংবিহীন জন্তুকে দুনিয়াতে আঘাত করে থাকলে এর দিনে তার প্রতিশোধ তার কাছ থেকে নেয়া হবে। (এমনিভাবে অন্যান্য জন্তুর পারস্পরিক নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়া হবে।) যখন তাদের পারস্পরিক অধিকার ও নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়া সমাপ্ত হবে, তখন আদেশ হবে ঃ 'তোমরা সব মাটি হয়ে যাও।' সব জন্তু তৎক্ষণাৎ মাটির স্তূপে পরিণত হবে। এ সময়েই কাফেররা আক্ষেপ করে বলবে ঃ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا অর্থাৎ, আফসোস আমিও

যদি মাটি হয়ে যেতাম এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে যেতাম।

ইমাম বগভী হযরত আবু হোরায়রার বাচনিক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন সব পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করা হবে, এমনকি, শিংবিহীন ছাগলের প্রতিশোধ শিংবিশিষ্ট ছাগলের কাছ থেকে নেয়া হবে।

সৃষ্টজীবের পাওনার গুরুত্ব ঃ সবাই জানে যে, জীব-জানোয়ারকে কোন শরীয়ত ও বিধি-বিধান পালন করতে আদেশ দেয়া হয়নি, এ আদেশ শুধু মানুষ ও জিনদের প্রতি। একথাও জানা যে, যারা আদিষ্ট নয়, তাদের সাথে প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবহার হতে পারে না। তাই আলেমগণ বলেন ঃ হাশরে জীব-জানোয়ারের প্রতিশোধ তাদের আদিষ্ট হওয়ার কারণে নয়, বরং রাব্বুল-আলামীনের চূড়ান্ত ইনসাফ ও সুবিচারের কারণে এক জন্তুর নির্যাতনের প্রতিশোধ অন্য জন্তুর কাছ থেকে নেয়া হবে। তাদের অন্য কোন কাজের হিসাব-নিকাশ হবে না। এতে বোঝা যায় যে, সৃষ্টজীবের পারস্পরিক পাওনা বা নির্যাতনের ব্যাপারটি এতই গুরুতর যে, আদিষ্ট নয়— এমন জন্তুদেরকেও তা থেকে মুক্ত রাখা হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক ধার্মিক ও এবাদতকারী ব্যক্তিও এর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে কুফর ও শিরক বাতিল করে একত্ববাদ সপ্রমাণ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে মক্কার মুশরেকদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ যদি আজ তোমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে—উদাহরণতঃ আল্লাহ্‌র আযাব যদি দুনিয়াতেই তোমাদেরকে পাকড়াও করে, কিংবা মৃত্যু অথবা কেয়ামতের ভয়াবহ হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়, তবে চিন্তা করে বল, তোমরা এ বিপদ দূর করার জন্যে কাকে ডাকবে? কার কাছে বিপদমুক্তির আশা করবে? নাকি পাথরের এসব হস্তনির্মিত মূর্তি কিংবা অন্য কোন সৃষ্টজীব, যাদেরকে তোমরা খোদার মর্যাদায় আসীন করে রেখেছ, তারা তখন তোমাদের কাজে আসবে কি? তোমরা তাদের কাছে ফরিয়াদ করবে? না শুধু আল্লাহ্ তাআলাকেই আহ্বান করবে?

এর উত্তর যে কোন সচেতন মানুষের পক্ষ থেকে এছাড়া কিছুই হতে পারে না, যা আল্লাহ্ তাআলা তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, এ ব্যাপক বিপদমুহূর্তে কট্টর মুশরেকই সব মূর্তি ও হস্তনির্মিত উপাস্যদেরকে ভুলে যাবে এবং একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকেই আহ্বান করবে। এখন ফলাফল সুস্পষ্ট যে, তোমাদের মূর্তি এবং ঐ উপাস্য, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র আসনে আসীন করে রেখেছ এবং বিপদ বিদূরণকারী ও অভাব মোচনকারী মনে করছ, তারা যখন এ বিপদ মুহূর্তে তোমাদের কাজে আসবে না এবং তোমরা সাহায্যের জন্যে তাদেরকে আহ্বান করতেও সাহসী হবে না, তখন তাদের এবাদত কোন্ উপকারে আসবে।

এ বিষয়টি পূর্ববর্তী আয়াতের সারমর্ম। এসব আয়াতে কুফর, শিরক ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ পার্থিব জীবনেও আযাব আসার সম্ভাব্যতা বর্ণিত হয়েছে। ধরে নেয়া যাক, যদি এ জীবনে আযাব নাও আসে, তবে কেয়ামতের আগমন তো অবশ্যম্ভাবী। সেখানে মানুষের সব কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে এবং প্রতিদান ও শাস্তির বিধান জারি হবে।

এখানে ساعة শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ কেয়ামতও হতে পারে এবং 'কেয়ামতে ছুগরা' (ছোট কেয়ামত)-ও হতে পারে। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুতেই এ কেয়ামত কায়েম হয়ে যায়। প্রবাদবাক্য আছে ঃ من مات فقد قامت قيامته অর্থাৎ, যার মৃত্যু হয়, তার কেয়ামত সেদিনই হয়ে যায়। কেননা, কেয়ামতের হিসাব-কিতাবের প্রাথমিক নমুনাও কবর ও বরযখে দেখা যাবে এবং প্রতিদান ও শাস্তির নমুনাও এখান থেকেই শুরু হয়ে যাবে।

সারকথা এই যে, অবাধ্যদেরকে এসব আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে না যায়। পার্থিব জীবনেও তারা আযাবে পতিত হতে পারে— যেমন, পূর্ববর্তী উম্মতরা হয়েছে। যদি তা না হয়, তবে মৃত্যু কিংবা কেয়ামত পরবর্তী হিসাব তো অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু যে মানব সীমাবদ্ধ জীবনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার আলোতে সমগ্র বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করে, তারা এ জাতীয় বিষয়বস্তুতে বাহানাবাজির আশ্রয় নেয়। তারা পয়গম্বরদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কবাণীকে কুসংস্কারপূর্ণ ধারণা আখ্যা দিয়ে গা বাঁচিয়ে যায়। বিশেষ করে যখন প্রায় সব যুগেই এমন অবস্থাও সামনে আসে যে, অনেক মানুষ আল্লাহ্ ও রসূলের অবাধ্যতা সত্ত্বেও ধনেজনে সমৃদ্ধ হচ্ছে। অর্থ-সম্পদ, জাঁকজমক ও সম্মান-মর্যাদা সব কিছুই তাদের করায়ত্ত রয়েছে। একদিকে এ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এবং অপরদিকে পয়গম্বরদের ভীতি-প্রদর্শন যখন তারা উভয়টিকে মিলিয়ে দেখে, তখন বাহানাবাজ মন ও শয়তান তাদেরকে এ শিক্ষাই দেয় যে, পয়গম্বরদের উক্তি একটি প্রতারণা ও কুসংস্কার প্রসূত ধারণা বৈ নয়।

এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনাবলী এবং তাদের উপর প্রয়োগকৃত আইন বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

অর্থাৎ, আমি আপনার পূর্বেও অন্যান্য উম্মতের কাছে স্বীয় রসূল প্রেরণ করেছি। দু'ভাবে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। প্রথমে কিছু অভাব-অনটন ও কষ্টে ফেলে দেখা হয়েছে যে, কষ্টে ও বিপদে অস্থির হয়েও তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করে কি না। তারা যখন এ পরীক্ষায় ফেল করল এবং আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা ও অবাধ্যতা ত্যাগ করার পরিবর্তে তাতে আরও বেশী লিপ্ত হয়ে পড়ল, তখন তাদের দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া হল। অর্থাৎ, তাদের জন্যে পার্থিব ভোগ-বিলাসের সব দ্বার খুলে দেয়া হল এবং পার্থিব জীবন সম্পর্কিত সবকিছুই তাদেরকে দান করা হল। আশা ছিল যে, তারা এ সব নেয়ামত দেখে নেয়ামতদাতাকে চিনবে এবং এভাবে তারা খোদাকে স্মরণ করবে। কিন্তু এ পরীক্ষায়ও তারা অকৃতকার্য হল। নেয়ামতদাতাকে চেনা ও তাঁর কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা ভোগ-বিলাসের মোহে এমন মত্ত হয়ে পড়ল যে, আল্লাহ্ ও রসূলের বাণী ও শিক্ষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেল। উভয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর যখন তাদের ওযর-আপত্তির আর কোন ছিদ্র অবশিষ্ট রইল না, তখন আল্লাহ্ তাআলা অকস্মাৎ তাদেরকে আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলেন এবং এমন ভাবে নাস্তানাবুদ করে দিলেন যে, বংশে বাতি জ্বালাবারও কেউ অবশিষ্ট রইল না। পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর এ আযাব জলে-স্থলে— অন্তরীক্ষে বিভিন্ন পন্থায় এসেছে এবং গোটা জাতিকে মিসমার করে দিয়েছে। নূহ (আঃ)-এর গোটা জাতিকে এমন প্লাবন ঘিরে ধরে, যা থেকে তারা পর্বতের শৃঙ্গেও নিরাপদ থাকতে পারেনি। আদ জাতির উপর দিয়ে উপর্যপরি আট দিন প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। ফলে তাদের একটি

প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারেনি। সামূদ জাতিকে একটি হৃদয়বিদারী আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়। লূত (আঃ)-এর কওমের সম্পূর্ণ বস্তি উল্টে দেয়া হয়, যা আজ পর্যন্ত জর্দান এলাকায় একটি অভূতপূর্ব জলাশয়ের আকারে বিদ্যমান। এ জলাশয়ে ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি জীব-জন্তুও জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে 'বাহ্‌রে মাইয়্যেত' তথা 'মৃত সাগর' নামেও অভিহিত করা হয় এবং 'বাহ্‌রে লূত' নামেও।

মোটকথা, পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যতার শাস্তি প্রায়ই বিভিন্ন প্রকার আযাবের আকারে অবতীর্ণ হয়েছে যাতে সমগ্র জাতি বরবাদ হয়ে গেছে। কোন সময় তারা বাহ্যতঃ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং পরবর্তীতে তাদের নাম উচ্চারণকারীও কেউ অবশিষ্ট থাকেনি।

আলোচ্য আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কোন জাতির প্রতি অকস্মাৎ আযাব নাযিল করেন না, বরং প্রথমে হুশিয়ারীর জন্যে অল্প শাস্তির অবতারণা করেন। এতে ভাগ্যবান লোক অসাবধানতা পরিহার করে বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করার সুযোগ পায়। আরও জানা গেল যে, ইহ্‌কালে সাজা হিসেবে যে কষ্ট ও বিপদ আসে, তা সাজার আকারে হলেও প্রকৃত সাজা তা নয়, বরং অসাবধানতা থেকে সজাগ করাই তার উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য, এটি সাক্ষাৎ করুণা।

এসব আয়াত দ্বারাই এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় যে, ইহ্‌কাল প্রতিদান জগৎ নয়, বরং কর্মজগৎ। এখানে সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ একই পাল্লায় ওজন করা হয় বরং অসৎ লোক সৎলোকদের চাইতে অধিক সুখে থাকে। অতএব, এ জগতে শাস্তি কার্যকর করার অর্থ কি? এ সন্দেহের উত্তর সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, আসল প্রতিদান ও শাস্তি কেয়ামতেই হবে। তাই কিয়মতের অপর নাম 'ইয়াওমুদ্দীন'; প্রতিদান দিবস। কিন্তু আযাবের নমুনা কিছু কষ্ট এবং ছোয়াবের নমুনা হিসেবে কিছু সুখ করুণাবশতঃ ইহ্‌জগতে প্রেরণ করা হয়। কোন কোন সাধক বলেছেন যে, এ জগতের সব সুখ ও আরাম জান্নাতের সুখেরই নমুনা, যাতে মানুষ জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যত কষ্ট, বিপদ ও দুঃখ রয়েছে, সব পরকালের শাস্তিরই নমুনা, যাতে মানুষ জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়। বলাবাহুল্য, নমুনা ব্যতীত কোন কিছুর প্রতি আগ্রহও সৃষ্টি করা যায় না এবং কোন কিছু থেকে ভীতি প্রদর্শনও করা যায় না।

আলোচ্য আয়াতের শেষ ভাগেও لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ বাক্যে এ তাৎপর্যটিরই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে যে কষ্ট ও বিপদে জড়িত করেছি, এর উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে শাস্তিদান নয়, বরং এ পরীক্ষায় ফেলে আমার দিকে আকৃষ্ট করাই ছিল উদ্দেশ্য। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই বিপদে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়। এতে বুঝা গেল যে, দুনিয়াতে আযাব হিসেবেও যে কষ্ট ও বিপদ কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের উপর পতিত হয়, তাতেও একদিক দিয়ে আল্লাহ্‌র রহমতই কার্যরত থাকে।

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم
مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ
أَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ
كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ
أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾
وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ
لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

(৪৪) অতঃপর তারা যখন ঐ উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি, যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্যে তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। (৪৫) অতঃপর জালেমদের মূল শিকড় কর্তিত হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্যে, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। (৪৬) আপনি বলুনঃ বল তো দেখি, যদি আল্লাহ্ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে এগুলো এনে দেবে? দেখ, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে। (৪৭) বলে দিনঃ দেখতো, যদি আল্লাহ্‌র শাস্তি, আকস্মিক কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আসে, তবে জালেম, সম্প্রদায় ব্যতীত কে ধ্বংস হবে? (৪৮) আমি পয়গম্বরদেরকে প্রেরণ করি না, কিন্তু সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শকরূপে — অতঃপর যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংশোধিত হয়, তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (৪৯) যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে তাদের নাফরমানীর কারণে আযাব স্পর্শ করবে। (৫০) আপনি বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিনঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না? (৫১) আপনি এ কোরআন দ্বারা তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করুন, যারা আশঙ্কা করে স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থায় একত্রিত হওয়ার যে, তাদের কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না— যাতে তারা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এরপর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ, তাদের অবাধ্যতা যখন সীমাতিক্রম করতে থাকে, তখন তাদেরকে একটি বিপজ্জনক পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। অর্থাৎ, তাদের জন্যে দুনিয়ার নেয়ামত, সুখ ও সাফল্যের দ্বার খুলে দেয়া হয়।

এতে সাধারণ মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখে ধোঁকা খেয়ো না যে, তারাই বুঝি বিশুদ্ধ পথে আছে এবং সফল জীবন যাপন করছে। অনেক সময় আযাবে পতিত অবাধ্য জাতিসমূহেরও এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকে অকস্মাৎ কঠোর আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হবে।

তাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা দেখ যে, কোন ব্যক্তির উপর নেয়ামত ও ধন-দৌলতের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, অথচ সে গোনাহ্ ও অবাধ্যতায় অটল, তখন বুঝে নেবে, তাকে ঢিল দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, তার এ ভোগ-বিলাস কঠোর আযাবে গ্রেফতার হওয়ারই পূর্বাভাস।— (ইবনে কাছীর)

তফসীরবিদ ইবনে জরীর ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন জাতিকে টিকিয়ে রাখতে ও উন্নত করতে চান, তখন তাদের মধ্যে দুটি গুণ সৃষ্টি করে দেন— (এক) প্রত্যেক কাজে সমতা ও মধ্যবর্তিতা, (দুই) সাধুতা ও পবিত্রতা। অর্থাৎ, অসত্য বিষয় ব্যবহারে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন জাতিকে ধ্বংস ও বরবাদ করতে চান, তাদের জন্যে বিশ্বাসভঙ্গ ও আত্মসাতের দ্বার খুলে দেন। অর্থাৎ, বিশ্বাস ভঙ্গ ও কুকর্ম সত্ত্বেও তারা দুনিয়াতে সফল বলে মনে হয়।"

শেষ আয়াতে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্‌র ব্যাপক আযাব আসার ফলে অত্যাচারীদের বংশ নির্মূল হয়ে গেল। এরই পর বলা হয়েছেঃ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অপরাধী ও অত্যাচারীদের উপর আযাব নাযিল হওয়াও সারা বিশ্বের জন্যে একটি নেয়ামত। এ জন্যে আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কোরাইশ কাফেরদেরকে তাদের বাসনা অনুযায়ী অন্য রকম মো'জেযাসমূহের মধ্যে কোন কোনটি আল্লাহ্ তাআলা প্রকাশ্যভাবে কার্যক্ষেত্রে দেখিয়ে দিয়েছেন। তারা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করার দাবী করেছিল। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযাটি শুধু কোরাইশরাই নয়, তৎকালীন বিশ্বের বহু লোক স্বচক্ষে দেখেছিল।

তাদের দাবী অনুযায়ী এমন বিরাট মো'জেযা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তারা কুফর ও পথভ্রষ্টতায় এবং জেদ ও হঠকারিতায় পূর্ববৎ অটল থেকে যায় এবং আল্লাহ্ তাআলার এ নির্দশনকে ان هذا الا سحر مستمر বলে উপেক্ষা করে। এসব বিষয় দেখা ও বোঝা সত্ত্বেও তারা প্রতিদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে নতুন নতুন মো'জেযা দাবী করত।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের প্রশ্ন ও দাবীর উত্তর একটি বিশেষ ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে।

কাফেররা বিভিন্ন সময়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে তিনটি দাবী করেছিল। (এক) যদি আপনি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র রসূল হয়ে থাকেন,

তবে মো'জেযার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর ধনভাণ্ডার আমাদের জন্যে একত্রিত করে দিন। (দুই) যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য রসূল হয়ে থাকেন, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ উপকারী ও ক্ষতিকর অবস্থা ও ঘটনাবলী ব্যক্ত করুন যাতে আমরা উপকারী বিষয়গুলো অর্জন করার এবং ক্ষতিকর বিষয়গুলো বর্জন করার ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে নিতে পারি। (তিন) আমরা বুঝতে অক্ষম যে, আমাদেরই স্বগোত্রের একজন লোক, যিনি আমাদের মতই পিতা-মাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পানাহার ও বাজারে ঘুরাফেরা ইত্যাদি মানবিক গুণে আমাদের সম অংশীদার, তিনি কিরূপে আল্লাহ্‌র রসূল হতে পারেন ! সৃষ্টি ও গুণাবলীতে আমাদের থেকে স্বতন্ত্র কোন ফেরেশতা হলে আমরা তাঁকে আল্লাহ্‌র রসূল ও মানব জাতির নেতারূপে মেনে নিতাম।

উপরোক্ত তিনটি দাবীর উত্তরে বলা হয়েছে ঃ'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের বাজে প্রশ্নাদির উত্তরে আপনি বলে দিন ঃ তোমরা আমার কাছে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারও দাবী করছ, কিন্তু আমি কবে এ দাবী করলাম যে, আল্লাহ্ তাআলার সব ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত? তোমরা দাবী করছ যে, আমি ভবিষ্যতের সব উপকারী ও ক্ষতিকর ঘটনা তোমাদেরকে বলে দেই, আমি এ কথাও কবে বললাম যে, আমি সব অদৃশ্য বিষয় জানি? তোমরা আমার মধ্যে ফেরেশতা সুলভ গুণাবলী দেখতে চাও, আমি কবে এ দাবী করলাম যে, আমি ফেরেশতা?

মোটকথা, আমি যে বিষয় দাবী করি, তার প্রমাণই আমার কাছে চাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্‌র রসূল। তাঁর প্রেরিত নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌঁছাই এবং নিজেও তা অনুসরণ করি, অপরকেও অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করি। এর জন্যে একটি দু'টি নয়— অসংখ্য সুস্পষ্ট প্রমাণও উপস্থিত করা হয়েছে।

রেসালত দাবী করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলার সব ধনভাণ্ডারের মালিক হওয়া, আল্লাহ্ তাআলারই মত প্রত্যেক ছোটবড় অদৃশ্য বিষয়ে অবগত হওয়া এবং মানবিক গুণের উর্ধ্বে কোন ফেরেশতা হওয়া মোটেই জরুরী নয়। রসূলের কর্তব্য এতটুকুই যে, তিনি আল্লাহ্ প্রেরিত ঐশীবাণী অনুসরণ করবেন; নিজেও তদনুযায়ী কাজ করবেন এবং অপরকেও কাজ করতে আহবান করবেন।

এ নির্দেশনামা দ্বারা এক দিকে রেসালতের প্রকৃত দায়িত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং অপরদিকে রসূল সম্পর্কে মানুষের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করছিল, তাও দূর করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুসলমানদেরকেও পথ নির্দেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন খ্রীষ্টানদের মত রসূলকে খোদা না মনে করে বসে। রসূলের মাহাত্ম্য ও ভালবাসার দাবীও তাই। এ ব্যাপারে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মত বাড়াবাড়ি করা যাবে না। ইহুদীরা রসূলদের সম্মান হানিতে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে এবং খ্রীষ্টানরা সম্মানদানে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে আল্লাহ্ বানিয়ে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত নয়। এ ধনভাণ্ডার দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে ঃ সে সম্পর্কে তফসীরবিদগণ অনেক জিনিসের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোরআন স্বয়ং ধনভাণ্ডার প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছে ঃ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهُ অর্থাৎ, দুনিয়াতে এমন কোন বস্তু নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই। এতে বুঝা যায়, ভাণ্ডার বলে দুনিয়ার সব বস্তুকেই বুঝানো হয়েছে, এতে কোন বিশেষ বস্তুকে নির্দিষ্ট করা যায় না। অবশ্য তফসীরবিদগণ যেসব নির্দিষ্ট বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন, তাও দৃষ্টান্ত স্বরূপই উল্লেখ করেছেন। কাজেই এতে কোন মতবিরোধ নেই। এ আয়াতে যখন বলা হয়েছে যে, খোদায়ী ভাণ্ডার পয়গম্বরকুল-শিরোমণি হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সাঃ) - এর হাতেও নেই, তখন উম্মতের কোন ওলী অথবা বুযুর্গ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, যাকে যা ইচ্ছা দিতে পারেন—সুস্পষ্ট মূর্খতা বৈ কিছু নয়।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে ঃ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমি ফেরেশতা, যে কারণে তোমরা আমার মানবিক গুণ দেখে রেসালতে অস্বীকার করবে।

মধ্যবর্তী কথায় বাক্যে ভঙ্গি পরিবর্তন করে لا اقول لكم انى اعلم الغيب বলার পরিবর্তে وَلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, 'আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমি অদৃশ্য বিষয় জানি। একথা না বলে 'আমি অদৃশ্য বিষয় জানি না' বলা হয়েছে।

তফসীর বাহরে-মুহীতে আবু হাইয়্যান এরূপ বলার একটি সূক্ষ্ম কারণ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, খোদায়ী ভাণ্ডারের মালিক হওয়া না হওয়া এবং কোন ব্যক্তির ফেরেশতা হওয়া না হওয়া এগুলো প্রত্যক্ষ বিষয়। কাফেররাও জানত যে, আল্লাহ্ তাআলার সব ভাণ্ডার রসূলের হাতে নেই এবং তিনি ফেরেশতাও নন। তারা শুধু হঠকারিতাবশতঃ এসব দাবী করত। কাজেই কাফেরদের এসব কথার উত্তরে একথা বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল যে, আমি আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারের মালিক হওয়া এবং ফেরেশতা হওয়ার দাবী কখনও করিনি।

দ্বিতীয় আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এ সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি তারা জেদ পরিহার না করে, তবে তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক বন্ধ করে আসল কাজে অর্থাৎ রেসালত প্রচারে আত্মনিয়োগ করুন। যারা কেয়ামতে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিতি ও হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন। যেমন, মুসলমান কিংবা যারা কমপক্ষে এসব বিষয় অস্বীকার করে না, আর কিছু না হোক, কমপক্ষে তারা হিসাবের আশঙ্কা করে।

মোটকথা এই যে, কেয়ামত সম্পর্কে তিন প্রকার লোক রয়েছে (এক) কেয়ামতে নিশ্চিত বিশ্বাসী, (দুই) অনিশ্চিত বিশ্বাসী এবং (তিন) সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী। এ তিন প্রকার লোককেই ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ নবী-রসূলগণকে দেয়া হয়েছে। কোরআনের অনেক আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই প্রকার লোক ভীতি প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হবে বলে বেশী আশা করা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের দিকে মনোযোগ দানের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্‌র কাছে একত্রিত হওয়ার আশঙ্কা করে, তাদেরকে কোরআন দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করুন।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَ
مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ
الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ
مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ
رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ
ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾ وَكَذَٰلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾ قُلْ إِنِّي
نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۚ قُل لَّا
أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾
قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ
خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ
لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

(৫২) আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার এবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। (৫৩) আর এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি— যাতে তারা বলে যে, এদেরকেই কি আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন? (৫৪) আর যখন তারা আপনার কাছে আসবে যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে, তখন আপনি বলে দিন ঃ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পালনকর্তা রহমত করা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে, অনন্তর এরপরে তওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৫৫) আর এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি— যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। (৫৬) আপনি বলে দিন ঃ আমাকে তাদের এবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের এবাদত কর। আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের খুশীমত চলবো না। কেননা, তাহলে আমি পথভ্রান্ত হয়ে যাব এবং সুপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হব না। (৫৭) আপনি বলে দিন ঃ আমার কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ আছে এবং তোমরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছ। তোমরা যে বস্তু শীঘ্র দাবী করছ, তা আমার কাছে নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। (৫৮) আপনি বলে দিন ঃ যদি আমার কাছে তা থাকত, যা তোমরা শীঘ্র দাবী করছ, তবে আমার ও তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ কবেই চুকে যেত। আল্লাহ্ জালেমদের সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মান-অপমানের ইসলামী মাপকাঠি ঃ ইসলামে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য নেই ঃ যারা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মনুষ্যত্ব কাকে বলে তা জানে না, বরং মানুষকে জগতের বিভিন্ন জানোয়ারের মধ্যে এমন একটি সজ্ঞান জানোয়ার মনে করে, যে অন্য জানোয়ারদেরকে অধীনস্ত ও প্রভাবাধীন করে স্বীয় সেবাদাসে পরিণত করেছে, তাদের মতে জীবনের লক্ষ্য পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ ও অন্যান্য জৈবিক অনুভূতিতে ব্যবহার করা ছাড়া আর কিইবা হতে পারে? জীবনের লক্ষ্য যখন শুধু তাই হয়, তখন জগতে ভাল-মন্দ, ছোট-বড়, সম্মানিত ও অপমানিত, ভদ্র ও ইতর পরিচয়ের মাপকাঠি এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, যার কাছে পানাহার ও ভোগ্য বস্তুর প্রাচুর্য রয়েছে, সেই কৃতকর্মা, সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র এবং যার কাছে এসব বস্তু স্বল্পমাত্রায় আছে সে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও অকৃতকর্মা।

সত্য বলতে কি, এ বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত হওয়ার জন্যে সচ্চরিত্র ও সৎকর্মের কোন প্রয়োজনই নেই, বরং যে কর্ম ও চরিত্র এ জৈবিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক, তাই সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রতা।

এ কারণেই নবী-রসূলগণের এবং তাদের আনীত ধর্মের সর্ব প্রথম ও সর্বশেষ শিক্ষা ছিল এই যে, এ জীবনের পর আরেকটি চিরস্থায়ী ও অনন্ত জীবন রয়েছে, সে জীবনের সুখশান্তি যেমন পূর্ণ ও চিরস্থায়ী, তেমনি কষ্ট, শাস্তি ও চিরস্থায়ী। পার্থিব জীবন স্বয়ং লক্ষ্য নয়, বরং পর জীবনে যে যে বিষয় উপকারী, তা সংগ্রহে ব্যস্ত থাকাই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আসল লক্ষ্য।

মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জন্তু-জানোয়ারকে পর জীবনের চিন্তা করতে হয় না, কিন্তু জ্ঞানী ও সচেতন ব্যক্তিদের মতে পরজীবনের সংশোধনই মানুষের সর্ববৃহৎ চিন্তা। এ বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী ভদ্রতা ও নীচতা এবং সম্মান ও অপমানের মাপকাঠি অধিক পানাহার কিংবা অধিক ধন-সম্পদ আহরণ হবে না, বরং সচ্চরিত্রতা ও সৎকর্মই হবে আভিজাত্যের এক মাত্র মাপকাঠি। পরকালের সম্মান এগুলোর উপরই নির্ভরশীল।

জগদ্বাসী যখনই নবী-রসূলগণের নির্দেশাবলী, শিক্ষা এবং পরকাল-বিশ্বাসের প্রতি অমনোযোগী হয়েছে, তখনই তার স্বাভাবিক ফলশ্রুতিও সামনে এসে গেছে— অর্থাৎ, শুধু অন্ন ও উদরই মান-অপমান, ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হয়েছে। যারা এতে সফলকাম তারা ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত হয়েছে এবং যারা এতে ব্যর্থ কিংবা অসম্পূর্ণ, তারা দরিদ্র, সম্মানহীন, নীচ ও লাঞ্ছিত বলে পরিগণিত রয়েছে।

তাই সর্বকালে শুধু পার্থিব জীবনের গোলক ধাঁধায় আবদ্ধ মানুষ বিত্তবানদেরকে সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র এবং দীন-দরিদ্র বিত্তহীনদেরকে সম্মানহীন ও নীচ বলে গণ্য করেছে। এ মাপকাঠির ভিত্তিতেই হযরত নূহ (আঃ)-এর কওম বিশ্বাস স্থাপনকারী দরিদ্রদেরকে নীচ বলে আখ্যা দিয়ে বলেছিল ঃ আমরা এ নীচদের সাথে একত্রে বসতে পারি না। আপনি যদি আমাদেরকে কোন পয়গাম শুনাতে চান, তবে দরিদ্র ও নিঃস্বদেরকে আগে দরবার থেকে বহিষ্কার করুন।

মহানবী (সাঃ)-এর আমলে আবারও এ প্রশ্নই দেখা দেয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এরই উত্তর বিশেষ নির্দেশসহ উল্লেখিত হয়েছে।

ইবনে কাছীর ইমাম ইবনে জরীরের বাচনিক বর্ণনা করেন যে, ওতবা, শায়বা, ইবনে-রবিয়া, মুতএম ইবনে আদী, হারেছ ইবনে নওফেল প্রমুখ

কতিপয় কোরাইশ সর্দার মহানবী (সাঃ)-এর চাচা আবু তালেবের নিকট এসে বলল ঃ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ (সাঃ)-এর কথা মেনে নিতে আমাদের সামনে একটি বাধা এই যে, তার চার পাশে সর্বদা এমন সব লোকের ভিড় লেগে থাকে, যারা হয় আমাদের ক্রীতদাস ছিল, এরপর আমরা মুক্ত করে দিয়েছি, না হয় আমাদেরই দান-দক্ষিণায় যারা লালিত-পালিত হতো। এমন নিকৃষ্ট লোকদের উপস্থিতিতে আমরা তার মজলিসে যোগদান করতে পারি না। আপনি তাকে বলে দিন, যদি সে আমাদের আসার সময় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেয়, তবে আমরা তার কথা নিয়ে বিবেচনা করতে সম্মত রয়েছি।

আবু তালেব মহানবী (সাঃ)-কে তাদের বক্তব্য জানিয়ে দিলে হযরত ওমর (রাঃ) মত প্রকাশ করে বললেন ঃ এতে অসুবিধা কি? আপনি কিছুদিন তাই করে দেখুন। এরা তো অকপট বন্ধুবর্গই। কোরাইশ সর্দাদের আগমনের সময় এরা না হয় সরেই যাবে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে উল্লেখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। আয়াত অবতরণের পর হযরত ফারূকে আজম (রাঃ)-কে 'আমার মত ভ্রান্ত ছিল'— এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

যে দরিদ্রদের সম্পর্কে আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন হযরত বেলাল হাবশী (রাঃ), ছোহায়েব রুমী (রাঃ), আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ), আবু হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম (রাঃ), উসায়েদের মুক্ত ক্রীতদাস ছবীহ্ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ), মেকদাদ ইবনে আমর (রাঃ), মসউদ ইবনুল ক্বারী (রাঃ), যুশ-শিমালাইন (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম। তাঁদের সম্মান ও ভদ্রতার সনদ আল্লাহ্র তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

কতিপয় নির্দেশ ঃ উল্লিখিত আয়াত থেকে কতিপয় নির্দেশ বোঝা যায়— প্রথমতঃ কারও ছিন্নবস্ত্র কিংবা বাহ্যিক দুরবস্থা দেখে তাকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করার অধিকার কারও নেই। প্রায়ই এ ধরনের পোশাকে এমন লোকও থাকেন, যারা আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ অনেক দুর্দশাগ্রস্ত, ধূলি-ধূসরিত লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্র প্রিয় তারা যদি কোন কাজের আবদার করে বলে বসেন, 'এরূপ হবে' তবে আল্লাহ্ তাআলা তাদের সে আবদার অবশ্যই পূর্ণ করেন।'

দ্বিতীয়তঃ শুধু পার্থিব ধন-দৌলতকে ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি মনে করা মানবতার অবমাননা। এর প্রকৃত মাপকাঠি হচ্ছে সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম।

তৃতীয়তঃ কোন জাতির সংস্কারক ও প্রচারকের জন্যে ব্যাপক প্রচারকার্যও জরুরী। অর্থাৎ, পক্ষ-বিপক্ষ, মান্যকারী ও অমান্যকারী সবার কাছেই স্বীয় বক্তব্য প্রচার করতে হবে। কিন্তু যারা তার শিক্ষার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তা পালন করে চলবে, তাদের অধিকার অগ্রগণ্য। অন্যের কারণে তাদেরকে পেছনে ফেলা কিংবা উপেক্ষা করা জায়েয নয়। উদাহরণতঃ অমুসলমানদের মধ্যে প্রচার কার্যের জন্যে অজ্ঞ মুসলমানদের শিক্ষাদান ও সংশোধনকে পিছনে ফেলে দেয়া উচিত নয়।

চতুর্থতঃ, আল্লাহ্র নেয়ামত কৃতজ্ঞতার অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি খোদায়ী নেয়ামতের আধিক্য কামনা করে, কথায় ও কাজে কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করা তার পক্ষে অপরিহার্য।

এবার আয়াতসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা দেখুন। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

অর্থাৎ, আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে, এমন লোক যখন আপনার কাছে আসে (এখানে ايات —এর অর্থ কোরআনের আয়াতও হতে পারে এবং আল্লাহ্ তাআলার শক্তি ও কুদরতের সাধারণ নিদর্শনাবলীও হতে পারে।) তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে سَلَامٌ عَلَيْكُمْ বলে সম্বোধন করুন। এখানে سَلَامٌ عَلَيْكُمْ —এর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে ঃ (এক) তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার সালাম পৌঁছিয়ে দিন, যাতে তাদের প্রতি চূড়ান্ত সম্মান বোঝা যায়। এতে করে ঐসব দরিদ্র মুসলমানের মনোবেদনার চমৎকার প্রতিকার হয়ে গেছে, যাদেরকে মজলিস থেকে হটিয়ে দেয়ার প্রস্তাব কোরাইশ সর্দাররা করেছিল। (দুই) আপনি তাদেরকে নিরাপত্তার সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের ভুলত্রুটি হয়ে থাকলেও তা ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তারা সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ —বাক্যে এ অনুগ্রহের উপর আরও অনুগ্রহ ও নেয়ামত দানের ওয়াদা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মুসলমানদেরকে বলে দিন ঃ তোমাদের প্রতিপালক দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। কাজেই খুব ভীত ও অস্থির হয়ো না। এ বাক্যে প্রথমতঃ رب (প্রতিপালক) শব্দ ব্যবহার করে আয়াতের বিষয়বস্তুকে যুক্তিযুক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের প্রতিপালক। এখন জানা কথা যে, কোন প্রতিপালক স্বীয় পালিতদেরকে বিনষ্ট হতে দেন না। অতঃপর رب শব্দটি যে দয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছিল, তা পরিষ্কারভাবেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাও এমন ভঙ্গিতে যে, তোমাদের প্রতিপালক দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন। কাজেই কোন ভাল ও সৎ লোকের দ্বারাই যখন ওয়াদা খেলাফী হতে পারে না, তখন রাব্বুল আলামীনের দ্বারা তা কেমন করে হতে পারে? বিশেষ করে যখন ওয়াদাটি চুক্তির আকারে লিপিবদ্ধ করে নেয়া হয়।

সহীহ্ বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যখন আল্লাহ্ তাআলা সব কিছু সৃষ্টি করলেন এবং প্রত্যেকের ভাগ্যের ফয়সালা করলেন, তখন একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করে নিজের কাছে আরশে রেখে দিলেন। তাতে লেখা আছে ঃ ان رحمتى غلبت على غضبى —অর্থাৎ, আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রবল হয়ে গেছে।

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন ঃ আমি তওরাতে লিখিত দেখেছি, যখন আল্লাহ্ তাআলা আসমান, যমিন ও এতদুভয়ের সবকিছু সৃষ্টি করলেন, তখন 'রহমত' (দয়া) গুণটিকে একশ' ভাগ করে একভাগ সমগ্র সৃষ্টজীবকে দান করলেন। মানুষ, জীবজন্তু ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে দয়ার যেসব লক্ষণ দেখা যায়, তা ঐ এক ভাগেরই ক্রিয়া। পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে, ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে এবং প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যে পারস্পরিক সহানুভূতি, ভালবাসা ও দয়া পরিলক্ষিত হয়, তা ঐ একভাগ দয়ারই ফলশ্রুতি। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ দয়া আল্লাহ্ তাআলা নিজের জন্যে রেখেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে একে নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসরূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই অনুমান করা যায় যে, সৃষ্টজীবের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার দয়া কিরূপ ও কতটুকু!

আর তিনি অত্যন্ত দয়ালু। অর্থাৎ, ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হবেন না, বরং নেয়ামতও দান করবেন।

আয়াতের 'অজ্ঞতা' শব্দ দ্বারা বাহ্যতঃ কেউ ধারণা করতে পারে যে, গোনাহ্ ক্ষমা করার ওয়াদা একমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন অজ্ঞতাবশতঃ কোন গোনাহ্ হয়ে যায়, জেনেশুনে গোনাহ্ করলে হয়তো এ ওয়াদা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা, এস্থলে 'অজ্ঞতা' বলে অজ্ঞতার কাজ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এমন কাজ করে বসে, যা পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তিই করে। এর জন্যে বাস্তবে অজ্ঞ হওয়া জরুরী নয়। স্বয়ং - جهالت (অজ্ঞতা) শব্দেই এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে جهل শব্দের পরিবর্তে جهالت - এর ব্যবহার সম্ভবতঃ এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যেই করা হয়েছে। কেননা, جهل শব্দটি علم (জ্ঞান) এর বিপরীত এবং جهالت শব্দটি حلم ووقار (সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য)-এর বিপরীত। অর্থাৎ, جهالت শব্দটি বাকপদ্ধতিতে 'কার্যগত অজ্ঞতার' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যখনই কোন গোনাহ্ হয়ে যায়, তা কার্যগত অজ্ঞতার কারণেই হয়। তাই কোন কোন বুযুর্গ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে অজ্ঞ। এখানে কার্যগত অজ্ঞতাই বোঝানো হয়েছে। এর জন্যে অজ্ঞান হওয়া জরুরী নয়। কেননা, কোরআন পাক ও অসংখ্য সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, তওবা দ্বারা প্রত্যেক গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়- অমনোযোগিতা ও অজ্ঞতাবশতঃ হোক কিংবা জেনেশুনে মানসিক দুর্মতি ও প্রবৃত্তির তাড়না বশতঃ হোক।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে দু'টি শর্তাধীনে গোনাহগারদের সম্পর্কে ক্ষমা ও রহমতের ওয়াদা করা হয়েছে (এক) তওবা অর্থাৎ, গোনাহ্র জন্য অনুতপ্ত হওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে انما التوبة الندم —অর্থাৎ, অনুশোচনার নামই হল তওবা।

(দুই) ভবিষ্যতের জন্য আমল সংশোধন করা। কয়েকটি বিষয় এ আমল সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যতে এ পাপ কাজের নিকটবর্তী না হওয়ার সংকল্প করা ও সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া এবং কৃত গোনাহর কারণে কারও অধিকার নষ্ট হয়ে থাকলে যথাসম্ভব তা পরিশোধ করা, তা আল্লাহ্র অধিকার হোক কিংবা বান্দার অধিকার। আল্লাহ্র অধিকার যেমন, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ফরয কর্মে ত্রুটি করা। আর বান্দার অধিকার— যেমন, কারও অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে করায়ত্ত করা ও ভোগ করা, কারও ইজ্জত-আবরু নষ্ট করা, কাউকে গালি-গালাজের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন প্রকারে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি।

তাই তওবার পূর্ণতার জন্যে যেমন অতীত গোনাহ্র জন্যে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, ভবিষ্যতের জন্যে কর্ম-সংশোধন করা এবং গোনাহ্র নিকটবর্তী না হওয়া জরুরী, তেমনিভাবে যেসব নামায ও রোযা অমনোযোগিতাবশতঃ তরক করা হয়েছে, সেগুলোর কাযা করা, যে যাকাত দেয়া হয়নি, তা এখন দিয়ে দেয়া, হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করে থাকলে এখন তা আদায় করে নেয়া, নিজে করতে সক্ষম না হলে বদলী হজ্জ করানো প্রভৃতি বিষয়ও অপরিহার্য। যদি জীবদ্দশায় বদলী হজ্জ ও অন্যান্য কাযার পুরোপুরি সুযোগ না মিলে তবে ওছিয়ত করা, যাতে ওয়ারিশ ব্যক্তিরা তার ফরযসমূহের ফিদিয়া (বিনিময়) ও বদলী হজ্জের ব্যবস্থা করে। মোটকথা, কর্ম-সংশোধনের জন্যে শুধু ভবিষ্যৎ কর্ম-সংশোধন করাই যথেষ্ট নয়, বিগত ফরয ও ওয়াজেবসমূহ আদায় করাও জরুরী।

এমনিভাবে যদি কারও অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে হস্তগত করে থাকে, তবে তা ফেরৎ দিতে হবে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে। কাউকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে তারও ক্ষমা নিতে হবে। যদি ক্ষমা নেয়া সম্ভবপর না হয়— উদাহরণতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি মারা যায়, কিংবা তার ঠিকানা অজ্ঞাত হয়, তবে তার জন্যে নিয়মিতভাবে আল্লাহ্ তাআলার কাছে মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকবে। এতে আশা করা যায়, সে সন্তুষ্ট হবে এবং ঋণী ব্যক্তি ঋণ থেকে অব্যাহতি পাবে।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٩﴾ وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ۭ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۣ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾ قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۭ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۭ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۡ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾

(৫৯) তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে। (৬০) তিনিই রাত্রি বেলায় তোমাদেরকে করায়ত্ত করে নেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলা কর, তা জানেন। অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে সমুত্থিত করেন—যাতে নির্দিষ্ট ওয়াদা পূর্ণ হয়। (৬১) অনন্তর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমাদেরকে বলে দিবেন, যা কিছু তোমরা করছিলে। তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রবল। তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের কাছে রক্ষণাবেক্ষণকারী। এমন কি, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে নেয় (৬২) অতঃপর সবাইকে সত্যিকার প্রভু আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছানো হবে। শুনে রাখ, ফয়সালা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন। (৬৩) আপনি বলুন ঃ কে তোমাদেরকে স্থল ও জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন, যখন তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে ও গোপনে আহবান কর যে, যদি আপনি আমাদেরকে এ থেকে উদ্ধার করে নেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৬৪) আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দেন এবং সব দুঃখ-বিপদ থেকে। তথাপি তোমরা শেরক কর। (৬৫) আপনি বলুন ঃ তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী করে দিবেন এবং একককে অন্যের উপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। দেখ, আমি কেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি—যাতে তারা বুঝে নেয়। (৬৬) আপনার সম্প্রদায় একে মিথ্যা বলছে, অথচ তা সত্য। আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের উপর নিয়োজিত নই। (৬৭) প্রত্যেক খবরের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা তা জেনে নিবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার অমোঘ ব্যবস্থাপত্র ঃ সারা বিশ্বে যত ধর্মমত প্রচলিত রয়েছে, তন্মধ্যে ইসলামের স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য ও প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে একত্ববাদে বিশ্বাস। বলাবাহুল্য, শুধু আল্লাহ্‌র সত্তাকে এক ও অদ্বিতীয় জানার নামই একত্ববাদ নয়, বরং পূর্ণত্বের যত গুণ আছে সবগুলোতেই তাঁকে একক ও অদ্বিতীয় মনে করা এবং তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তুকে এসব গুণে অংশীদার ও সমতুল্য মনে না করাকে একত্ববাদ বলা হয়।

আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী হচ্ছে জীবন, জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য, শ্রবণ, দর্শন, বাসনা, ইচ্ছা, সৃষ্টি, অন্নদান ইত্যাদি। তিনি এসব গুণে এমন পরিপূর্ণ যে, কোন সৃষ্টজীব কোন গুণে তাঁর সমতুল্য হতে পারে না। এসব গুণের মধ্যেও দু'টি গুণ সব চাইতে বিখ্যাত। (এক) জ্ঞান এবং (দুই) শক্তি-সামর্থ্য। তাঁর জ্ঞান বিদ্যমান, অবিদ্যমান, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, ছোট, বড়, অণু-পরমাণু সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত এবং তাঁর শক্তি-সামর্থ্যও সবকিছুতেই পরিবেষ্টিত। উল্লেখিত দু'আয়াতে এ দু'টি গুণই বর্ণিত হয়েছে। এ দু'টি গুণ এমন যে, যে ব্যক্তি এগুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং চিন্তায় উপস্থিত রাখে, তার পক্ষে গোনাহ্ ও অপরাধ করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। বলাবাহুল্য, কথায় , কাজে, উঠায়-বসায় এমনকি প্রতি পদক্ষেপে যদি কারও চিন্তায় একথা উপস্থাপিত থাকে যে, একজন সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান তাকে দেখছেন এবং তার প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য এবং মনের ইচ্ছা ও কল্পনা পর্যন্ত জানেন তবে এ উপস্থিতি কখনও তাকে সর্ব শক্তিমানের অবাধ্যতার দিকে পা বাড়াতে দিবে না। তাই আলোচ্য আয়াত দু'টি মানুষকে পূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তার ক্রিয়াকর্ম ও চরিত্র সংশোধন করা ও সংশোধিত রাখার একটি অমোঘ ব্যবস্থাপত্র বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ — مفاتح শব্দটি বহুবচন। এর একবচন مفتح ও مفتح —উভয়টিই হতে পারে। مفتح —এর অর্থ ভাণ্ডার এবং مفتح অর্থ চাবি ঃ আয়াতে উভয় অর্থ হওয়ার অবকাশ আছে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ ও অনুবাদক مفاتح —এর অনুবাদ করেছেন ভাণ্ডার, আবার কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন চাবি। উভয় অনুবাদের সারকথা এক। কেননা, 'চাবির মালিক' বলেও 'ভাণ্ডারের মালিক' বোঝানো যায়।

কোরআনের পরিভাষায় অদৃশ্যের জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র ঃ غيب শব্দ দ্বারা এমন বস্তু বোঝানো হয়, যা অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা কাউকে সে বিষয়ে অবগত হতে দেননি।—(মাযহারী)

প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত ঐসব অবস্থা ও ঘটনা, যা কেয়ামতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিংবা সৃষ্ট জগতের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণতঃ কে কখনও কোথায় জন্মগ্রহণ করবে, কি কি কাজ করবে, কতটুকু বয়স পাবে, কতবার শ্বাস গ্রহণ করবে, কতবার পা ফেলবে, কোথায় মরবে, কোথায় সমাধিস্থ হবে এবং কে কতটুকু রিযিক পাবে, কখন পাবে, বৃষ্টি কখন, কোথায় কি পরিমাণ হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত ঐ ভ্রূণ, যা স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু কারও জানা নেই যে, পুত্র না কন্যা, সুশ্রী না কুশ্রী, সংস্বভাব না বদস্বভাব। এমনি ধরনের আরও যেসব বস্তু অস্তিত্ব লাভ করা

সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবের জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে উহ্য রয়েছে।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ – এর অর্থ এই দাঁড়াল যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডার আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে। কাছে থাকার অর্থ মালিকানায় ও করায়ত্ত থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডারসমূহের জ্ঞান তাঁর করায়ত্ব এবং সেগুলোকে অস্তিত্ব দান করা অর্থাৎ, কখন কতটুকু অস্তিত্ব লাভ করবে —তাও তাঁর সামর্থ্যের অন্তর্গত। কোরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ

অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার কাছে রয়েছে। কিন্তু আমি প্রত্যেক বস্তু একটি বিশেষ পরিমাণে অবতীর্ণ করি।

মোটকথা এই যে, এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার নজিরবিহীন জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠাও প্রমাণিত হয়েছে এবং সামর্থ্যগত পরাকাষ্ঠাও। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, এ জ্ঞান ও সামর্থ্য একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার বৈশিষ্ট্য। এ গুণ অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী عنده শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী বাক্যে এ ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট উক্তিতে রূপান্তরিত করে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্যে বলা হয়েছে ঃ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ —অর্থাৎ, অদৃশ্য বিষয়ের এসব ভাণ্ডার সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ অবহিত নয়।

তাই এ বাক্য দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে ঃ (এক) আল্লাহ্ তাআলার পরিব্যাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ের উপর সামর্থ্যবান হওয়া এবং (দুই) তাঁকে ছাড়া অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর এরূপ জ্ঞান ও সামর্থ্য অর্জিত না হওয়া।

কোরআনের পরিভাষায় غيب শব্দের অর্থ পূর্বে তফসীরে মাযহারীর বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, যেসব বিষয় এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি কিংবা অস্তিত্ব লাভ করলেও কোন সৃষ্টজীব সে সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারেনি। এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখলে অদৃশ্য বিষয়ের প্রশ্নে জনসাধারণের মনে বাহ্যদৃষ্টিতে যেসব প্রশ্ন দেখা দেয়, তা আপনা-আপনিই দূর হয়ে যাবে।

কিন্তু غيب শব্দ দ্বারা মানুষ সাধারণতঃ আভিধানিক অর্থ বুঝে। ফলে যে বস্তু আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টির অন্তরালে, তাকেও সাধারণ মানুষ غيب বলে দেয়, যদিও অন্যদের কাছে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপকরণাদি বিদ্যমান থাকে। এর ফলে নানাবিধ প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। উদাহরণতঃ জ্যোতি বিদ্যা, ভবিষ্যৎকথন বিদ্যা, গণনবিদ্যা কিংবা হস্ত-রেখা বিদ্যা দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর জ্ঞান অর্জন করা হয় অথবা 'কাশফ ও এলহাম' (আল্লাহ্ প্রকাশিত সত্য স্বর্গীয় প্রেরণা) দ্বারা কেউ কেউ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী জেনে ফেলে অথবা মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি দেখে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কে ভবিষ্যৎদ্বাণী করে এবং তা অনেকাংশে সত্যেও পরিণত হয়— এসব বিষয় জনসাধারণের দৃষ্টিতে 'এলমে গায়ব' তথা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান। তাই আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কোরআন পাক 'এলমে-গায়ব'-কে আল্লাহ্ তাআলার বৈশিষ্ট্য বলেছে, অথচ চাক্ষুষ দেখা যায় যে, অন্যরাও তা অর্জন করতে পারে।

উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তাআলা 'কাশফ্ ও এলহামের' মাধ্যমে যদি কোন বান্দাকে কোন ভবিষ্যৎ ঘটনা বলে দেন, তবে কোরআনের পরিভাষায় তাকে 'এলমে গায়ব' বলা যায় না। এমনিভাবে উপকরণ ও যন্ত্রাদির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, তাও কোরআনী পরিভাষা অনুযায়ী 'এলমে-গায়ব' নয়, যেমন আবহাওয়া বিভাগের খবর কিংবা নাড়ি দেখে রোগীর শারীরিক অবস্থা বলে দেয়া। কারণ, আবহাওয়া বিভাগ কিংবা কোন হাকীম-ডাক্তার এসব খবর দেয়ার সুযোগ তখনই পায়, যখন এসব ঘটনার উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়। তবে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় না। যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় কিন্তু জনসাধারণ অজ্ঞ থাকে। এরপর উপকরণ যখন শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন সবার দৃষ্টিতেই ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। এ কারণেই আবহাওয়া বিভাগ একমাস দু'মাস পর যে বৃষ্টি হবে, তার খবর আজ দিতে পারে না। কেননা, এখনও পর্যন্ত এ বৃষ্টির উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়নি। এমনিভাবে কোন হাকীম -ডাক্তার আজ নাড়ী দেখে বৎসর-দুই বছর পূর্বে কিংবা পরে সেবনকৃত ওষুধ কিংবা পথ্যের সন্ধান দিতে পারে না। কারণ, স্বভাবতঃ এর কোন ক্রিয়া নাড়ীতে থাকে না।

মোটকথা, চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখেই এসব বিষয়ের অস্তিত্বের খবর দেয়া হয়। লক্ষণাদি ও উপকরণ প্রকাশ পাওয়ার পর আর সেগুলো অদৃশ্য বিষয় থাকে না, বরং প্রত্যক্ষ বিষয়ে পরিণত হয়। তবে সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না; শক্তিশালী হয়ে উঠার পরই সবার চোখে ফুটে উঠে।

এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত উপায়ে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা সবকিছু সত্ত্বেও অনুমানের অতিরিক্ত কিছু নয়। এলম বলা হয় নিশ্চিত জ্ঞানকে, তা এগুলোর কোনটির মাধ্যমেই অর্জিত হয় না। তাই এসব খবর ভ্রান্ত হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেসব বিষয় হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানা এলম বটে, কিন্তু 'গায়ব' নয়। যেমন হিসাব করে কেউ বলে দেয় যে, আজ পাঁচটা একচল্লিশ মিনিটে সূর্যোদয় হবে কিংবা অমুক মাসের অমুক তারিখে চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ হবে। বলাবাহুল্য, একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর গতি হিসাব করে সময় নির্দিষ্ট করা এমনই যেমন আমরা কোন রেলগাড়ী কিংবা উড়োজাহাজের স্টেশনে কিংবা বিমান বন্দরে পৌঁছার খবর দিয়ে দেই। এছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে খবর জানার যে দাবী করা হয়, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। একশটি মিথ্যার ভিতর থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসা আদৌ পাণ্ডিত্য নয়।

গর্ভস্থ ভ্রূণ পুত্র না কন্যা, এ সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করতে ছাড়ে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এটিও নিছক অনুমান ছাড়া কিছু নয়। শতকরা দু'চার ক্ষেত্রে নির্ভুল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কোন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

এক্সরে মেশিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিল, এবার এর মাধ্যমে গর্ভস্থ সন্তান পুত্র কি কন্যা জানা যাবে। কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এক্ষেত্রে এক্সরে যন্ত্রপাতিও ব্যর্থ।

মোটকথা, কোরআনের পরিভাষায় যাকে 'গায়ব' বা অদৃশ্য বলা হয়, তা আল্লাহ্ ছাড়া কারও জানা নেই। পক্ষান্তরে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মানুষ স্বভাবতঃ যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তা প্রকৃত পক্ষে 'গায়ব' নয়; যদিও ব্যাপকভাবে প্রকাশ না পাওয়ার দরুন তাকে 'গায়ব' বলেই অভিহিত করা হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

খোদায়ী জ্ঞান ও অপার শক্তির কয়েকটি নমুনা ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা এবং নজিরবিহীন বিস্তৃতি বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এতদুভয়ের কয়েকটি চিহ্ন ও নমুনা বর্নিত হচ্ছে।

প্রথম আয়াতে ظلمات শব্দটি ظلمة এর বহুবচন। অর্থ অন্ধকার। ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ – এর অর্থ স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহ। অন্ধকারের অনেক প্রকার রয়েছে ঃ রাত্রির অন্ধকার, মেঘমালার অন্ধকার, ধূলাবালির অন্ধকার, সমুদ্রের ঢেউ এর অন্ধকার ইত্যাদি সব প্রকার বোঝাবার জন্যে ظلمات শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে অন্ধকারও মানুষের জন্যে একটি নেয়ামত। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় মানুষের কাজকর্ম আলো দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং অন্ধকার সব কাজকর্ম থেকে অকেজো করা ছাড়াও মানুষের অগণিত দুঃখ ও বিপদাপদের কারণ হয়ে যায়। তাই আরবদের বাক-পদ্ধতিতে ظلمة শব্দটি দুঃখ ও বিপদাপদের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতেও সাধারণ তফসীরবিদগণ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মুশরেকদেরকে হুঁশিয়ার ও তাদের ভ্রান্ত কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, স্থল ও সামুদ্রিক ভ্রমণে যখনই তোমরা বিপদের সম্মুখীন হও এবং সব আরাধ্য দেব-দেবীকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহ্কে আহবান কর, কখনও প্রকাশ্যে বিনীতভাবে এবং কখনও মনে মনে স্বীকার কর যে, এ বিপদ থেকে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, এর সাথে সাথে তোমরা এরূপ ওয়াদাও কর যে, আল্লাহ্ তাআলা যদি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তবে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করব, তাঁকেই কার্যনির্বাহী মনে করব, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করব না। কেননা, বিপদেই যখন কাজে আসে না, তখন তাদের পূজাপাট আমরা কেন করব? তাই আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, এমতাবস্থায় কে তোমাদেরকে বিপদ ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে? উত্তর নির্দিষ্ট ও জানা। কেননা, তারা এ স্বতঃসিদ্ধতা অস্বীকার করতে পারে না যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন দেব-দেবী এ অবস্থায় তাদের কাজে আসেনি। তাই দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আদেশ দিয়েছেন যে, আপনিই বলে দিন ঃ একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই তোমাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দিবেন, বরং অন্যান্য সব কষ্ট-বিপদ থেকে তিনি উদ্ধার করবেন। কিন্তু এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও যখন তোমরা বিপদ মুক্ত হয়ে যাও, তখন আবার শেরকে লিপ্ত হয়ে পড় এবং দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ শুরু করে দাও। এটা কেমন বিশ্বাসঘাতকতা ও মারাত্মক মূর্খতা!

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে ঃ (এক) আল্লাহ্ তাআলা অপার শক্তি-সামর্থ্য; অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দিতে তিনি পুরোপুরি সামর্থ্য। (দুই) সর্বপ্রকার বিপদাপদ, কষ্ট ও অস্থিরতা দূর করা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই করায়ত্ত এবং (তিন) একথা বাস্তব সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ যে, আজীবন দেব-দেবীর পূজাকারীরাও যখন বিপদে পতিত হয়,. তখন একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকেই আহবান করে এবং তাঁর প্রতিই মনোনিবেশ করে।

শিক্ষণীয় ঃ মুশরেকদের এ কর্মপন্থা বিশ্বাসঘাতকতার দিক দিয়ে যতবড় অপরাধই হোক, কিন্তু বিপদে পড়ে একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করা ও সত্যকে স্বীকার করা মুসলমানদের জন্যে একটি শিক্ষার চাবুক বিশেষ। আমরা মুসলমান আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বিপদের সময়ও তাঁকে স্মরণ করি না; বরং আমাদের সব ধ্যান বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জামের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আমরা যদিও মূর্তি ও দেব-দেবীকে স্বীয় কার্যনির্বাহী মনে করি না, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম উপকরণ ও যন্ত্রপাতিও আমাদের কাছে দেব-দেবীর চাইতে কম নয়। এদের চিন্তায় আমরা এমনভাবে ডুবে আছি যে, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র অপার মহিমার প্রতি মনোযোগ দেয়ার অবসর আমাদের নেই।

বিপদাপদের আসল প্রতিকার ঃ আমরা প্রত্যেক অসুখে শুধু ডাক্তার ও ওষুধকে এবং প্রত্যেক ঝড়-তুফান-বন্যায় শুধু বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জামকে কার্যনির্বাহী মনে করে এমন মত্ত হয়ে পড়ি যে, স্রষ্টার কথা চিন্তাই করি না। অথচ কোরআন পাক বার বার সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে যে, পার্থিব বিপদাপদ সাধারণতঃ মানুষের কুকর্মের ফল এবং পারলৌকিক শাস্তির একটা অতি সাধারণ নমুনা। এসব বিপদাপদ মুসলমানদের জন্যে এক প্রকার রহমত। কারণ, বিপদাপদ দিয়েই অমনোযোগী মানুষকে সতর্ক করা হয়, যাতে তারা এখনও স্বীয় কুকর্ম থেকে বিরত থাকতে যত্নবান হয় এবং পরকালের কঠোর বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। এ বিষয়বস্তুটি বোঝানোর জন্যেই কোরআন পাক বলে ঃ

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে সামান্য শাস্তি আস্বাদন করাই পরকালের বড় শাস্তির পূর্বে –যাতে তারা অমনোযোগিতা ও মন্দকাজ থেকে ফিরে আসে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

অর্থাৎ, তোমাদেরকে যে বিপদাপদ স্পর্শ করে, তা তোমাদের কুকর্মের প্রতিফল। আল্লাহ্ তাআলা অনেক কুকর্ম ক্ষমা করে দেন।— (শূরা)

এ আয়াতের বর্ণনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ— কারও গায়ে কোন কাষ্ঠখণ্ডের সামান্য আঁচড় লাগলে কিংবা কারও কোথাও পদস্খলন ঘটলে কিংবা কারও রোগ-ব্যথা দেখা দিলে তা সবই কোন না কোন গোনাহের প্রতিফল মনে করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা অনেক গোনাহ্ ক্ষমাও করে দেন।

বায়যাভী (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ এই যে, অপরাধী ও গোনাহ্গাররা যেসব রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তা সবই গোনাহের ফল। কিন্তু নিষ্পাপ ও পাপমুক্তদেরকে রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন করার উদ্দেশ্য তাদের ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরীক্ষা নেয়া এবং জান্নাতে তাদেরকে উচ্চস্তর মর্যাদা দান করা হয়ে থাকে।

এ থেকে আরও জানা যায় যে, সব বিপদাপদ, অস্থিরতা, দুর্ঘটনা ও সঙ্কটের আসল ও সত্যিকার প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, অতীত গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকতে কৃতসংকল্প হওয়া এবং বিপদ মুক্তির জন্যে আল্লাহ্র কাছেই দোয়া করা।

এর অর্থ এই নয় যে, বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম, ওষুধ-পত্র, চিকিৎসা এবং বিপদমুক্তির জন্য বস্তুগত কলা-কৌশল অনর্থক, বরং উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত কার্যনির্বাহী আল্লাহ্ তাআলাকেই মনে করতে হবে এবং বস্তুগত সাজ-সরঞ্জামকেও তাঁরই নেয়ামত মনে করে ব্যবহার করতে হবে। কেননা, সব সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তাঁরই সৃজিত এবং তাঁরই প্রদত্ত নেয়ামত। এগুলো তাঁরই নির্দেশ ও ইচ্ছার অনুগামী হয়ে মানুষের সেবা করে।

মোটকথা এই যে, বিপদ মুহূর্তে মুশরেকরা আল্লাহ্কেই স্মরণ করে— এ ঘটনা থেকে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সব বিপদাপদ ও কষ্ট দূর করার জন্যে বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম ও কলা-কৌশলের চাইতে আল্লাহ্ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করাই মুমিনের কাজ। নতুবা এর পরিণতি যা হচ্ছে তাই হবে। অর্থাৎ, সব কলা-কৌশল সামগ্রিক হিসেবে উল্টো দিকে যাচ্ছে। বন্যা প্রতিরোধ ও তার ক্ষয়ক্ষতির কবল থেকে আত্মরক্ষার সব কৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছে, কিন্তু বন্যা আসে এবং বার বার আসে। রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির করা হচ্ছে, কিন্তু রোগ-ব্যাধি রোজ রোজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করার জন্যে সর্ব প্রকার চেষ্টা চলছে এবং বাহ্যতঃ তা কার্যকরীও মনে হচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিক দিক দিয়ে এ পাগলা ঘোরা ছুটেই চলছে। চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, ঘুষ, চোরা কারবার প্রভৃতি দমন করার জন্যে সব সরকারই বস্তুনিষ্ঠ কলা-কৌশল ব্যবহার করছে, কিন্তু হিসাব করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যহ এসব অপরাধের মাত্রা বেড়েই চলেছে। আফসোস! আজ ব্যক্তিগত ও বাহ্যতঃ লাভ-লোকসানের উর্ধ্বে উঠে অবস্থা পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হবে যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে আমাদের বস্তুগত কলা-কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, বরং এগুলো আমাদের বিপদকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এর পর কোরআন বর্ণিত প্রতিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার যে, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বস্তুগত কলা-কৌশলকেও তাঁর প্রদত্ত নেয়ামত হিসেবে ব্যবহার করা। এছাড়া নিরাপত্তার আর কোন বিকল্প পথ নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার সুবিস্তৃত জ্ঞান ও নজিরবিহীন শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, প্রত্যেক মানুষের বিপদাপদ তিনিই দূর করতে পারেন এবং বিপদ মুহূর্তে যে তাঁকে আহবান করে, সে তাঁর সাহায্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। কেননা, সমগ্র সৃষ্টজগতের উপর তাঁর শক্তি-সামর্থ্য কামেল ও পরিপূর্ণ এবং সৃষ্টজীবের প্রতি তাঁর দয়াও অসাধারণ। তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এরূপ শক্তি-সামর্থ্য নেই এবং সমগ্র সৃষ্টজীবের প্রতিও দয়া-মমতা নেই।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের অপর পিঠ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যে কোন আযাব ও যে কোন বিপদ দূর করতে যেমন সক্ষম, তেমনিভাবে তিনি যখন কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে অবাধ্যতার শাস্তি দিতে চান, তখন যে কোন শাস্তি দেয়া তাঁর পক্ষে সহজ। কোন অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্যে দুনিয়ার শাসনকর্তাদের ন্যায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দরকার হয় না এবং কোন সাহায্যকারীও প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ

أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয়েও শক্তিমান যে, তোমাদের প্রতি উপর দিক থেকে কিংবা পদতল থেকে কোন শাস্তি পাঠিয়ে দেবেন কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরের মুখোমুখি করে দেবেন এবং এককে অপরের হাতে শাস্তি দিয়ে ধ্বংসে করে দেবেন।

খোদায়ী শাস্তির তিনটি প্রকার ঃ এখানে তিন প্রকার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে ঃ (এক) – যা উপর দিক থেকে আসে, (দুই) যা নীচের দিক থেকে আসে এবং (তিন) যা নিজেদের মধ্যে মতানৈক্যের আকারে সৃষ্টি হয়। عذابا শব্দটিকে تنوين সহ نكره উল্লেখ করে ব্যাকরণের দিক দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ তিন প্রকারের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

তফসীরবিদগণ বলেন ঃ উপর দিক থেকে আযাব আসার দৃষ্টান্ত বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে অনেক রয়েছে। যেমন নূহ্ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনাকারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল, আ'দ জাতির উপর ঝড়ঝঞ্ঝা চড়াও হয়েছিল, লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিল এবং বনী-ইসরাঈলের উপর রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদি বর্ষণ করা হয়েছিল। আবরাহার হস্তীবাহিনী যখন মক্কার উপর চড়াও হয়, তখন পক্ষীকুল দ্বারা তাদের উপর কঙ্কর বর্ষণ করা হয়। ফলে সবাই চর্বিত ভূষির ন্যায় হয়ে যায়।

এমনিভাবে বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে নীচের দিক থেকে আযাব আসারও বিভিন্ন প্রকার অতিবাহিত হয়েছে। নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি উপরের আযাব বৃষ্টির আকার এবং নীচের আযাব ভূতল থেকে পানি স্ফীত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তারা একই সময়ে উভয় প্রকার আযাবে পতিত হয়েছিল। ফেরআউনের সম্প্রদায়কে পদতলের আযাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কারূণ, স্বীয় ধন-ভাণ্ডারসহ এ আযাবে পতিত হয়ে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত হয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরবিদগণ বলেন ঃ উপরের আযাবের অর্থ অত্যাচারী বাদশাহ্ ও নির্দয় শাসকবর্গ এবং নীচের আযাবের অর্থ নিজ চাকর, নোকর ও অধীন কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতক, কর্তব্যে অবহেলাকারী ও আত্মসাৎকারী হওয়া।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কতিপয় উক্তি থেকেও উপরোক্ত তফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। মেশকাত শরীফে এ উক্তি বর্ণিত রয়েছে ঃ كما تكونون يؤمر عليكم অর্থাৎ, তোমাদের কাজকর্ম যেমন ভাল কিংবা মন্দ হবে, তেমনি শাসক বর্গ তোমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। তোমরা সৎ ও আল্লাহ্‌র বাধ্য হলে তোমাদের শাসকবর্গও দয়ালু ও সুবিচারক হবে। পক্ষান্তরে তোমরা কুকর্মী হলে তোমাদের শাসকবর্গও নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হবে। প্রসিদ্ধ উক্তি عمالكم এর অর্থ তাই।

মেশকাতে উল্লেখিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

—আল্লাহ্ বলেন, আমি আল্লাহ্। আমাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি সব বাদশাহ্‌রও প্রভু। সব অন্তর আমার করায়ত্ত। আমার বান্দারা যখন আমার আনুগত্য করে, তখন আমি বাদশাহ্ ও শাসকদের অন্তরে তাদের প্রতি স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করেই দেই। পক্ষান্তরে আমার বান্দারা যখন আমার অবাধ্যতা করে, তখন আমি শাসকদের অন্তরকে তাদের প্রতি কঠোর করে দেই। তারা তাদেরকে সব রকম নির্যাতন করে। তাই শাসকবর্গকে মন্দ বলে নিজের সময় নষ্ট করো না, বরং আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন ও স্বীয় কাজ কর্মসংশোধন কর— যাতে আমি তোমাদের

সবকাজ ঠিক করে দেই।

এমনিভাবে আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েয (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

যখন আল্লাহ্ তাআলা কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তার মঙ্গল চান, তখন তাকে উত্তম সহকারী দান করেন, যাতে প্রশাসক কোন ভুল করে ফেললে সে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সঠিক কাজ করলে সে তার সাহায্য করে। পক্ষান্তরে যখন কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তার জন্যে অমঙ্গল অবধারিত হয়, তখন মন্দ লোকদেরকে তার পরামর্শদাতা ও অধীন করে দেয়া হয়।

এসব হাদীস ও আলোচ্য আয়াতের উল্লেখিত তফসীরের সারমর্ম এই যে, জনগণ শাসকবর্গের হাতে যেসব কষ্ট ও বিপদাপদ ভোগ করে, তা উপর দিককার আযাব এবং এসব কষ্ট অধীন কর্মচারীদের দ্বারা ভোগ করতে হয়, সেগুলো নীচের দিককার আযাব ! এগুলো কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, বরং খোদায়ী আইন অনুসারে মানুষের কৃতকর্মের শাস্তি। হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ যখন আমি কোন গোনাহ্ করে ফেলি, তখন এর ক্রিয়া স্বীয় চাকর, আরোহণের ঘোড়া ও বোঝা বহনের গাধার মেজাজেও অনুভব করি। এরা সবাই আমার অবাধ্যতা করতে থাকে।

আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় প্রকার আযাব হচ্ছে ঃ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا —অর্থাৎ, তোমরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখী হয়ে যাবে এবং একদল অন্য দলের জন্যে আযাব হয়ে যাবে। এতে يلبسكم শব্দটি لبس ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ গোপন করা, আবৃত করা। এ অর্থেই لباس ঐ কাপড়কে বলে, যা মানুষের দেহকে আবৃত করে এবং এ কারণেই التباس সন্দেহ ও অস্পষ্টতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, যেখানে কোন বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থ আবৃত ও অস্পষ্ট হয়।

شيع শব্দটি شيعة এর বহুবচন। এর অর্থ অনুসারী ও অনুগামী। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ — অর্থাৎ , নূহ (আঃ)-এর অনুসারী হলেন ইবরাহীম (আঃ)। সাধারণে প্রচলিত ভাষা ও বাক-পদ্ধতিতে شيعة শব্দটি এমন দলকে বলা হয়, যারা কোন বিশেষ উদ্দেশে একত্রিত হয় এবং এ উদ্দেশে একে অন্যের সহায়ক হয়। অধুনা প্রচলিত ভাষায় এর স্বতঃস্ফূর্ত অনুবাদ হচ্ছে দল বা পার্টি।

তাই আয়াতের অনুবাদ এরূপ হবে ঃ এক প্রকার আযাব এই যে, জাতি বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখী হয়ে যাবে। এ কারণেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ

الا لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

—অর্থাৎ, তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফের হয়ে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান মারতে শুরু করবে।— (মাযহারী)।

হযরত সায়ীদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেন ঃ একবার আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে চলতে চলতে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায পড়লাম। অনেকক্ষণ দোয়া করার পর তিনি বললেন ঃ আমি পালনকর্তার কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি ঃ (এক) আমার উম্মতকে যেন নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ্ তাআলা এ দোয়া কবুল করেছেন। (দুই) আমার উম্মতকে যেন দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা দ্বারা ধ্বংস করা না হয় আল্লাহ্ তাআলা এ দোয়াও কবুল করেছেন। (তিন) আমার উম্মত যেন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে ধ্বংস না হয়। আমাকে শেষ পর্যন্ত এরূপ দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে।— (মাযহারী)

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে। এতে তিনটি দোয়ার মধ্যে একটি এই যে, আমার উম্মতের উপর এমন শত্রুকে চাপিয়ে দিবেন না, যে সবাইকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়। এ দোয়া কবুল হয়েছে। অপর দোয়া এই যে, তারা যেন পরস্পরে মারমুখী না হয়ে পড়ে। এরূপ দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মোহাম্মদীর উপর বিগত উম্মতদের ন্যায় আকাশ কিংবা ভূতল থেকে কোন ব্যাপক আযাব আগমন করবে না; কিন্তু একটি আযাব দুনিয়াতে তাদের উপরও আসতে থাকবে। এ আযাব হচ্ছে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং দলীয় সংঘর্ষ। এ জন্যেই হযরত (সাঃ) অত্যন্ত জোর সহকারে উম্মতকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। তিনি প্রতি ক্ষেত্রে হুঁশিয়ার করেছেন যে, দুনিয়াতে যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি নেমে আসে, তবে তা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমেই আসবে।

সূরা হুদের এক আয়াতে এ বিষয় বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ —অর্থাৎ, তারা সর্বদা পরস্পরে মতবিরোধই করতে থাকবে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত রয়েছে, তারা এর ব্যতিক্রম।

এতে বোঝা গেল যে, যারা পরস্পরে (শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া) মতবিরোধ করে, তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত কিংবা দূরবর্তী।

এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে দলবদ্ধভাবে শক্ত করে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ে পড়ো না। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا অর্থাৎ, যারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধ করেছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না।

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ

(৬৮) যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না। (৬৯) এদের যখন বিচার করা হবে তখন পরহেযগারদের উপর এর কোন প্রভাব পড়বে না; কিন্তু তাদের দায়িত্ব উপদেশ দান করা— যাতে ওরা ভীত হয়। (৭০) তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। কোরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ স্বীয় কর্মে এমনভাবে গ্রেফতার না হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই এবং যদি তারা জগতের বিনিময়ও প্রদান করে, তবু তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। একাই স্বীয় কর্মে জড়িত হয়ে পড়েছে। তাদের জন্যে উত্তপ্ত পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে— কুফরের কারণে। (৭১) আপনি বলে দিন ঃ আমরা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন বস্তুকে আহ্বান করব, যে আমাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না এবং আমরা কি পশ্চাৎপদে ফিরে যাব, এরপর যে, আল্লাহ্‌ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন? ঐ ব্যক্তির মত, যাকে শয়তানরা বনভূমিতে বিপথগামী করে দিয়েছে— সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। তার সহচররা তাকে পথের দিকে ডেকে বলছে ঃ আস, আমাদের কাছে। আপনি বলে দিন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পথই সুপথ। আমরা আদিষ্ট হয়েছি যাতে স্বীয় পালনকর্তা আজ্ঞাবহ হয়ে যাই। (৭২) এবং তা এই যে, নামায কায়েম কর এবং তাঁকে ভয় কর। তাঁর সামনেই তোমরা একত্রিত হবে। (৭৩) তিনিই সঠিকভাবে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেনঃ হয়ে যা, অতঃপর হয়ে যাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বাতেল পন্থীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে কাজ নিজে করা গোনাহ্‌, সেই কাজ যারা করে, তাদের মজলিসে যোগদান করাও গোনাহ্‌। এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এর বিবরণ এরূপ ঃ

প্রথম আয়াতে يخوضون শব্দটি خوض থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ পানিতে অবতরণ করা ও পানিতে চলা। বাজে ও অনর্থক কাজে প্রবেশ করাকেও خوض বলা হয়। কোরআন পাকে এ শব্দটি সাধারণতঃ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ এবং وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তাই خوض فى الايات এর অনুবাদ এ স্থলে 'ছিদ্রান্বেষণ' (অর্থাৎ, দোষ খোঁজাখুঁজি করা) কিংবা 'কলহ করা'— করা হয়েছে। অর্থাৎ, আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, যারা আল্লাহ্‌ তাআলার নিদর্শনাবলীতে শুধু ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের জন্যে প্রবেশ করে এবং ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

এ আয়াতে প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) ও এর অন্তর্ভুক্ত আছেন এবং উম্মতের ব্যক্তিবর্গও। প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে সম্বোধন করাও সাধারণ মুসলমানদেরকে শুনানোর জন্যে। নতুবা তিনি এর আগেও কখনও এরূপ মজলিসে যোগদান করেননি। কাজেই কোন নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন ছিল না।

অতঃপর মিথ্যাপন্থীদের মজলিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কয়েক প্রকারে হতে পারে ঃ (এক) - মজলিস ত্যাগ করা, (দুই) - সেখানে থেকেও অন্য কাজে প্রবৃত্ত হওয়া— তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করা। কিন্তু আয়াতের শেষে যা বলা হয়েছে তাতে, প্রথম প্রকারই বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ, মজলিসে বসা যাবে না, সেখান থেকে উঠে যেতে হবে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয় অর্থাৎ, ভুলক্রমে তাদের মজলিসে যোগদান করে ফেল— নিষেধাজ্ঞা স্মরণ না থাকার কারণে হোক কিংবা তারা যে স্বীয় মজলিসে আল্লাহ্‌র আয়াত ও রসূলের বিপক্ষে আলোচনা করে, তা তোমার স্মরণ ছিল না, তাই যোগদান করেছ। উভয় অবস্থাতে যখনই স্মরণ হয় তখনই মজলিস ত্যাগ করা উচিত। স্মরণ হওয়ার পর সেখানে বসে থাকা গোনাহ্‌। অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ ভাগে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি সেখানে বসে থাক, তবে তুমিও তাদের মধ্যে গণ্য হবে।

ইমাম রাযী তফসীর-কবীরে বলেন ঃ এ আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গোনাহের মজলিস ও মজলিসের লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। এর উত্তম পন্থা হচ্ছে মজলিস ত্যাগ করে চলে যাওয়া। কিন্তু মজলিস ত্যাগ করার মধ্যে যদি জান, মাল কিংবা ইজ্জতের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে সর্বসাধারণের পক্ষে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অন্য পন্থা অবলম্বন করাও জায়েয। উদাহরণতঃ অন্য কাজে ব্যাপৃত হওয়া এবং তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। কিন্তু বিশিষ্ট লোক ধর্মীয় ক্ষেত্রে যাদের অনুকরণ করা হয়— তাদের পক্ষে সর্বাবস্থায় সেখান থেকে উঠে যাওয়াই সমীচীন।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ —অর্থাৎ, যদি

শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয়। এখানে সাধারণ মুসলমানের প্রতি সম্বোধন হয়ে থাকলে তাতে কোন আপত্তির বিষয় নেই। কেননা, ভুল করা ও বিস্মৃত হওয়া প্রত্যেক মানুষের অনিচ্ছাকৃতদোষ। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি যদি সম্বোধন হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ্র রসূলও যদি ভুল করেন এবং বিস্মৃত হন, তবে তাঁর শিক্ষার প্রতি আস্থা কিরূপে থাকতে পারে?

উত্তর এই যে, বিশেষ কোন রহস্য ও উপযোগিতার অধীনে নবীগণও (আঃ) ভুল করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে ওহীর মাধ্যমে তাঁদের ভুল সংশোধন করে দেয়া হতো। ফলে তাঁরা ভুলের উপর কায়েম থাকতেন না; তাই পরিণামে তাঁদের শিক্ষা ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

মোটকথা, আয়াতের এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, কেউ ভুলক্রমে কোন ভ্রান্ত কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তা মাফ করা হবে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ رفع عن امتى الخطأ وما استكرهوا عليه অর্থাৎ, আমার উম্মতকে ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির গোনাহ্ এবং যে কাজে অপরে জোরজবরদস্তির সাথে করায়, সেই কাজের গোনাহ্ থেকে অব্যাহতি দান করা হয়েছে।

ইমাম জাস্সাস আহ্কামুল-কোরআনে বলেন ঃ "আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যে মজলিসে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসূল কিংবা শরীয়তের বিপক্ষে কথাবার্তা হয় এবং তা বন্ধ করা, করানো কিংবা কমপক্ষে সত্য কথা প্রকাশ করার সাধ্য না থাকে, তবে এরূপ প্রত্যেকটি মজলিস বর্জন করা মুসলমানদের উচিত। হাঁ, সংশোধনের নিয়তে এরূপ মজলিসে যোগদান করলে এবং হক কথা প্রকাশ করলে তাতে কোন দোষ নাই।" আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ স্মরণ হওয়ার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে উপবেশন করো না। এ থেকে ইমাম জাস্সাস মাসআলা চয়ন করেছেন যে, এরূপ অত্যাচারী, অধার্মিক ও উদ্ধত লোকদের মজলিসে যোগদান করা সর্বাবস্থায় গোনাহ্ ; তারা তখন কোন অবৈধ আলোচনায় লিপ্ত হোক বা না হোক। কারণ, বাজে আলোচনা শুরু করতে তাদের দেরী লাগে না। কেননা, আয়াতে সর্বাবস্থায় জালেমদের সাথে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তখনও জুলুমে ব্যাপৃত থাকবে এরূপ কোন শর্ত আয়াতে নেই।

কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তুটি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ — অর্থাৎ, অত্যাচারীদের সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করো না। নতুবা তোমাদেরকেও জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, যদি সর্বাবস্থায় তাদের মজলিসে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে, তবে আমরা মসজিদে-হারামে নামায ও তওয়াফ থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাব। কেননা, তারা সর্বাদাই সেখানে বসে থাকে (এটি মক্কাবিজয়ের পূর্ববর্তী ঘটনা) এবং ছিদ্রান্বেষণ ও কুভাষণ ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

অর্থাৎ, যারা সংযমী, তারা নিজের কাজে মসজিদে-হারামে গেলে দুষ্ট লোকদের কুকর্মের কোন দায়-দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে না। তবে তাদের কর্তব্য শুধু হক কথা বলে দেয়া। সম্ভবতঃ দুষ্টেরা এতে উপদেশ গ্রহণ করে বিশুদ্ধ পথ অনুসরণ করবে।

তৃতীয় আয়াতেও প্রায় একই বিষয়বস্তুর উপর আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছে ঃ وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا - এখানে ذر শব্দটি ذر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অসন্তুষ্ট হয়ে কোন কিছু পরিত্যাগ করা। আয়াতের অর্থ এই ঃ আপনি তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা স্বীয় ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুক করে রেখেছে। এর দু'টি অর্থ হতে পারে ঃ (এক) তাদের জন্যে সত্য ধর্ম ইসলাম প্রেরিত হয়েছে; কিন্তু একে তারা ক্রীড়া ও কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছে এবং একে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। (দুই) তারা আসল ধর্ম পরিত্যাগ করে ক্রীড়া ও কৌতুককেই ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে। উভয় অর্থেরই সারমর্ম প্রায় এক।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا —অর্থাৎ, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। এটিই তাদের ব্যাধির আসল কারণ। অর্থাৎ, তাদের যাবতীয় লম্ফঝম্ফ ও ঔদ্ধত্যের আসল কারণই হচ্ছে এই যে, তারা ইহকালের ক্ষণস্থায়ী জীবন দ্বারা প্রলোভিত এবং পরকাল বিস্মৃত। পরকাল ও কেয়ামতের বিশ্বাস থাকলে তারা কখনও এসব কান্ড করত না।

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাধারণ মুসলমানদেরকে দু'টি নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ এক, উল্লেখিত বাক্যে বর্ণিত লোকদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধনাত্মকভাবে তাদেরকে কোরআন দ্বারা উপদেশ দান করা এবং আল্লাহ্ তাআলার আযাবের ভয় প্রদর্শন করাও জরুরী।

আয়াতের শেষে আযাবের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে তারা স্বয়ং কুকর্মের জালে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আয়াতে اَنْ تُبْسَلَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ আবদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং জড়িত হয়ে পড়া।

কোন ভুল কিংবা কারও প্রতি অত্যাচার করে বসলে তার সম্ভাব্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মানুষ দুনিয়াতে তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে অভ্যস্ত। স্বীয় দলবল ব্যবহার করে অত্যাচারের প্রতিশোধ থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হলে প্রভাবশালীদের সুপারিশ কাজে লাগায়। এতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার চেষ্টা করে।

আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন যে, আল্লাহ্ অপরাধীকে যখন শাস্তি দেবেন, তখন সে শাস্তির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যে কোন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এগিয়ে আসবে না, আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কারও সুপারিশ কার্যকর হবে না এবং কোন অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা হবে না। যদি কেউ সারা বিশ্বের অর্থ-সম্পদের অধিকারী হয় এবং শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তা বিনিময় স্বরূপ দিতে চায়, তবুও এ বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ

قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ
الشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٧٣﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيْمُ لِأَبِيْهِ آزَرَ
أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ إِنِّيْ أَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٤﴾
وَكَذٰلِكَ نُرِيْ إِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ
مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا
رَبِّيْ ۚ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا
قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَأَكُوْنَنَّ
مِنَ الْقَوْمِ الضَّاۤلِّيْنَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ
هٰذَا أَكْبَرُ ۚ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّيْ بَرِيْۤءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾
إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَحَاۤجَّهٗ قَوْمُهٗ ۚ قَالَ أَتُحَاۤجُّوْۤنِّيْ فِي اللّٰهِ
وَقَدْ هَدٰىنِ ۚ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖۤ إِلَّاۤ أَنْ يَّشَاۤءَ رَبِّيْ شَيْـًٔا ۚ
وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ
أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ
سُلْطٰنًا ۚ فَأَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨١﴾

তাঁর কথা সত্য। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার করা হবে, সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত। তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (৭৪) স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম পিতা আযরকে বললেন ঃ তুমি কি প্রতিমা মসূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট। (৭৫) আমি এরূপভাবেই ইবরাহীমকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তসমূহ দেখাতে লাগলাম– যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়। (৭৬) অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। বলল ঃ এটি আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন বলল ঃ আমি অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না। (৭৭) অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল, বলল ঃ এটি আমার প্রতিপালক। অনন্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন বলল ঃ যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ-প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৭৮) অতঃপর যখন সূর্যকে চকচক্ করতে দেখল, বললঃ এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত। (৭৯) আমি একমুখী হয়ে স্বীয় আনন ঐ সত্তার দিকে করেছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরেক নই। (৮০) তাঁর সাথে তার সম্প্রদায় বিতর্ক করল। সে বলল ঃ তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহ্র একত্ববাদ সম্পর্কে বিতর্ক করছ; অথচ তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন ! তোমরা যাদেরকে শরীক কর, আমি তাদেরকে ভয় করি না— তবে আমার পালনকর্তাই যদি কোন কষ্ট দিতে চান। আমার পালনকর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি চিন্তা কর না ? (৮১) যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র সাথে শরীক করে রেখেছ, তাদেরকে কিরূপে ভয় কর, অথচ তোমরা ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে এমন বস্তুকে শরীক করছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। অতএব, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি লাভের অধিক যোগ্য কে, যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক ।

অর্থাৎ, এরা ঐ সব লোক, যাদেরকে কুকর্মের শাস্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করার জন্যে দেয়া হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ পানি তাদের নাড়ীভুঁড়িকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এ পানি ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে, তাদের কুফর ও অবিশ্বাসের কারণে।

এ শেষ আয়াত দ্বারা আরও জানা গেল যে, যারা পরকালের প্রতি অমনোযোগী হয়ে শুধু পার্থিব জীবন নিয়ে মগ্ন, তাদের সংসর্গও অপরের জন্যে মারাত্মক। তাদের সংসর্গে উঠা-বসাকারীরাও পরিণামে তাদের অনুরূপ আযাবে পতিত হবে।

উল্লেখিত আয়াত তিনটির সারমর্ম মুসলমানদেরকে অশুভ পরিবেশ ও খারাপ সংসর্গ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। এটি যে কোন মানুষের জন্যেই বিষতুল্য। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য উক্তি ছাড়াও চাক্ষুস অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, অসৎ সমাজ ও মন্দ পরিবেশই মানুষকে কুকর্ম ও অপরাধে লিপ্ত করে। এ পরিবেশে জড়িয়ে পড়ার পর মানুষ প্রথমতঃ বিবেক ও মনের বিরুদ্ধে কুকর্মে লিপ্ত হয়। এর পর আস্তে আস্তে কুকর্ম যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মন্দের অনুভূতিও লোপ পায়, বরং মন্দকে ভাল এবং ভালকে মন্দ মনে করতে থাকে। যেমন, এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি প্রথমবার গোনাহ্ করে, তখন তার মানসপটে একটি কাল দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে কাল দাগ যেমন প্রত্যেকের কাছেই অপ্রীতিকর ঠেকে, তেমনি সে-ও গোনাহের কারণে অন্তরে অস্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু যখন অব্যাহতভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোনাহ্ করে চলে এবং অতীত গোনাহ্র জন্যে তওবা না করে, তখন একের পর এক কাল দাগ পড়তে থাকে, এমনকি, নূরোজ্জ্বল মানসপট সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এর ফলশ্রুতিতে ভালমন্দের পার্থক্য থাকে না। কোরআন পাকে رَانَ শব্দ দ্বারা এ অবস্থাকেই ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ, কুকর্মের কারণে তাদের অন্তরে মরচে পড়ে গেছে। ফলে ভালমন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতাই লোপ পেয়েছে।

চিন্তা করলে বুঝা যায়, অধিকাংশ ভ্রান্ত পরিবেশ ও অসৎ সঙ্গই মানুষকে এ অবস্থায় পৌছায়। نعوذ بالله منهم এ কারণেই অভিভাবকদের কর্তব্য ছেলেপেলেদেরকে এ ধরনের পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করা।

পরবর্তী তিন আয়াতেও শিরকের খণ্ডন এবং একত্ববাদ ও পরকাল সপ্রমাণের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, যা অনুবাদ থেকেই বুঝা যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে মুশরেকদেরকে সম্বোধন এবং প্রতিমাপূজা ছেড়ে আল্লাহ্র আরাধনার আহ্বান বর্ণিত হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে এ আহ্বানকেই সমর্থন দান করা হয়েছে। এ ভঙ্গি স্বভাবগতভাবেই আরবদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন সমগ্র আরবের পিতামহ। তাই গোটা আরব তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সর্বদা একমত ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একটি তর্কযুদ্ধ উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি প্রতিমাপূজা ও তারকা-পূজার বিপক্ষে স্বীয়

সম্প্রদায়ের সাথে করেছিলেন এবং সবাইকে একত্ববাদের শিক্ষা দান করেছিলেন।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তদীয় পিতা আযরকে বললেন ঃ তুমি স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছ। আমি তোমাকে এবং তোমার গোটা সম্প্রদায়কে পথ ভ্রষ্টতায় পতিত দেখতে পাচ্ছি।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর পিতার নাম 'আযর'– বলেই প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ তার নাম 'তারেখ' উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে 'আযর' তার উপাধি। ইমাম রাযী এবং কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী আলেম বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর পিতার নাম 'তারেখ' এবং চাচার নাম 'আযর' ছিল। তাঁর চাচা আযর নমরূদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পর মুশরেক হয়ে যায়। চাচাকে পিতা বলা আরবী বাকপদ্ধতিতে সাধারণভাবে প্রচলিত রীতি। এ রীতি অনুযায়ী আয়াতে আযরকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর পিতা বলা হয়েছে। যরকানী 'মাওয়াহেব' গ্রন্থের টীকায় এর পক্ষে কয়েকটি সাক্ষ্য–প্রমাণও বর্ণনা করেছেন।

বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধনের আহ্বান ঃ আযর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–এর পিতা হোক কিংবা চাচা— সর্বাবস্থায় বংশগত দিক দিয়ে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে সত্য প্রচারের কাজ শুরু করেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ঃ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ —অর্থাৎ, নিকট আত্মীয়দেরকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। সেমতে তিনি সর্বপ্রথম সাফা পর্বতে আরোহণপূর্বক সত্য প্রচারের জন্যে পরিবারের সদস্যদেরকে একত্রিত করেন।

তফসীরে বাহ্‌রে–মুহীতে বলা হয়েছে ঃ এতে বুঝা যায় যে, পরিবারের কোন সম্মানিত ব্যক্তি যদি ভ্রান্ত পথে থাকে তবে তাকে বিশুদ্ধ পথে আহ্বান করা সম্মানের পরিপন্থী নয়, বরং সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার দাবী তাই। আরও জানা গেল যে, সত্যপ্রচার ও সংশোধনের কাজ নিকট আত্মীয়দের থেকে শুরু করা পয়গম্বরগণের সুন্নত।

দ্বিজাতি তত্ত্ব ঃ এ ছাড়া আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পরিবার ও সম্প্রদায়কে নিজের দিকে সম্বন্ধ করার পরিবর্তে পিতাকে বললেন ঃ তোমার সম্প্রদায় পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে। মুশরেক স্বজনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র পথে যে মহান ত্যাগ স্বীকার করেন, এ উক্তিতে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি স্বীয় কর্মের মাধ্যমে বলে দিলেন যে, ইসলামের সম্পর্ক দ্বারাই মুসলিম জাতিয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বংশগত ও দেশগত জাতিয়তা যদি মুসলিম জাতিয়তার পরিপন্থী হয়, তবে মুসলিম জাতিয়তার বিপরীতে সব জাতিয়তাই বর্জনীয়।

কোরআন পাক হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর এ ঘটনা উল্লেখ করে ভবিষ্যৎ উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছে, যেন তারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। বলা হয়েছে ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا

لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

অর্থাৎ, ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা যা করেছিলেন, তা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে উত্তম আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য। তাঁরা স্বীয় বংশগত ও দেশগত স্বজনদেরকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে, আমরা তোমাদের ও তোমাদের ভ্রান্ত উপাস্যদের থেকে মুক্ত। আমাদের ও তোমারে মধ্যে পারস্পরিক প্রতিহিংসা ও শত্রুতার প্রাচীর ততদিন অবস্থিত থাকবে, যতদিন তোমরা এক আল্লাহ্‌র আরাধনায় সমবেত না হও।

বলাবাহুল্য এ দ্বিজাতি তত্ত্বই এ যুগের একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম এ মতবাদ ঘোষণা করেন। উম্মতে মুহাম্মদী ও অন্যান্য সব উম্মত নির্দেশানুযায়ী এ পন্থাই অবলম্বন করেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ জাতিয়তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিদায় হজ্বের সফরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি কাফেলার সাক্ষাৎ পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কোন্ জাতীয় লোক? উত্তর হলঃ نحن قوم مسلمون – অর্থাৎ, আমরা মুসলমান জাতি।— (বুখারী)

এতে ঐ সত্যিকার ও কালজয়ী জাতিয়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা দুনিয়া থেকে শুরু করে পরকাল পর্যন্ত চালু থাকবে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এখানে পিতাকে সম্বোধন করার সময় স্বজনদেরকে পিতার যুক্ত করে স্বীয় অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু সেখানে জাতিকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করে বলেছেন ঃ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ – –অর্থাৎ, হে আমার কওম, আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও বংশ ও দেশ হিসেবে তোমরা আমার জাতি, কিন্তু তোমাদের মুশরেকসুলভ ক্রিয়াকর্ম আমাকে তোমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য করছে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর স্বজন ও তদীয় পিতা দ্বিবিধ শিরকে লিপ্ত ছিল। তারা প্রতিমা পূজাও করত এবং নক্ষত্র পূজাও। এ কারণেই ইব্রাহীম (আঃ) এ দু'টি প্রশ্নেই পিতা ও স্বজাতির সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

প্রথম আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রতিমা পূজা পথভ্রষ্টতা পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, তারকাপুঞ্জ আরাধনার যোগ্য নয়। মাঝখানে এক আয়াতে ভূমিকাস্বরূপ আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইবরাহীমের বিশেষ মর্যাদা ও সুউচ্চ জ্ঞান–গরিমা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ

مِنَ الْمُوقِنِينَ

অর্থাৎ, আমি ইবরাহীমকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টবস্তুসমূহ প্রদর্শন করেছি, যাতে সেসব বিষয়ের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে জেনে নেয় এবং তার বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করে। এর ফলশ্রুতিই পরবর্তী আয়াতসমূহে একটি অভিনব বিতর্কের আকারে বর্ণিত হয়েছে।

প্রচারকার্যে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা প্রয়োগ করা পয়গম্বরগণের সুন্নতঃ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي —অর্থাৎ, এক রাত্রিতে যখন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হল এবং একটি নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি পড়ল, তখন স্বজাতিকে শুনিয়ে বললেন ঃ এ নক্ষত্র আমার প্রতিপালক। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এটিই আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। এখন অল্পক্ষণের মধ্যেই এর স্বরূপ দেখে নেবে। কিছুক্ষণ পর নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেলে ইব্রাহীম (আঃ) জাতিকে জব্দ করার চমৎকার সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন— لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ – آفِلِينَ —শব্দটি افول থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ অস্ত যাওয়া।

উদ্দেশ্য এই যে, আমি অস্তগামী বস্তুসমূহকে ভালবাসি না। যে বস্তু খোদা কিংবা উপাস্য হবে, তার সর্বাধিক ভালবাসার পাত্র হওয়া উচিত।

এরপর অন্য কোন রাত্রিতে চাঁদকে ঝলমল করতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করলেন এবং বললেন ঃ (তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) এটি আমার পালনকর্তা। কিন্তু এর স্বরূপও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটে উঠবে। সেমতে চন্দ্র যখন অস্তাচলে ডুবে গেল, তখন বললেন ঃ যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথপ্রদর্শন না করতে থাকতেন, তবে আমিও তোমাদের মত পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম এবং চাঁদকেই স্বীয় পালনকর্তা ও উপাস্য মনে করে বসতাম। কিন্তু এর উদয়াস্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা আমাকে সতর্ক করেছে যে, এ নক্ষত্রটিও আরাধনার যোগ্য নয়।

এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আমার পালনকর্তা অন্য কোন শক্তি, যার পক্ষ থেকে আমাকে সর্বক্ষণ পথপ্রদর্শন করা হয়।

এরপর একদিন সূর্য উদিত হতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে ঐভাবেই বললেন ঃ (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) এটি আমার প্রতিপালক এবং বৃহত্তম। কিন্তু এ বৃহত্তমের স্বরূপও অতি সত্বর দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। সেমতে যথাসময়ে সূর্যও অন্ধকারে মুখ লুকালে জাতির সামনে সর্বশেষ প্রমাণ সম্পন্ন করার পর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং বললেন ঃ

يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ —অর্থাৎ, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের এসব মুশরেকসুলভ ধারণা থেকে মুক্ত। তোমরা আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট বস্তুকেই আল্লাহ্র অংশীদার স্থির করেছ।

অতঃপর এ স্বরূপ উদ্ঘাটন করলেন যে, আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এসব সৃষ্টবস্তুর মধ্যে কোনটিই হতে পারে না। এরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রতি মুহূর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত। বরং সেই সত্তা আমাদের সবার পালনকর্তা, যিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি স্বীয় আনন তোমাদের স্বনির্মিত প্রতিমা এবং পরিবর্তন ও প্রভাবের আবর্তে নিপতিত নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে হটিয়ে 'খোদায়ে ওয়াহদাহু লা-শরীকের' দিকে করে নিয়েছি এবং আমি তোমদের ন্যায় অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

এ বিতর্কে হযরত ইবরাহীম (আঃ) পয়গম্বরসুলভ প্রজ্ঞা ও উপদেশ প্রয়োগ করে প্রথমবারেই তাদের নক্ষত্র পূজাকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টতা বলে আখ্যা দেননি, বরং এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন, যাতে প্রত্যেক সচেতন মানুষের মন ও মস্তিষ্ক প্রভাবান্বিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সত্যকে উপলব্ধি করে ফেলে। তবে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে প্রথমবারেই কঠোর হয়ে যান এবং স্বীয় পিতা ও জাতির পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয়টি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে দেন। কেননা, মূর্তিপূজা যে একটি অযৌক্তিক পথভ্রষ্টতা, তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও সুবিদিত। এর বিপরীতে নক্ষত্র পূজার ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা এতটা সুস্পষ্ট ছিল না।

নক্ষত্র পূজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বর্ণিত যুক্তি প্রমাণের সারমর্ম এই যে, যে বস্তু পরিবর্তনশীল, যার অবস্থা নিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে এবং স্বীয় গতিশীলতায় অন্য শক্তির অধীন, সে কিছুতেই পালনকর্তা হওয়ার যোগ্য নয়। এ যুক্তি-প্রমাণে নক্ষত্রের উদয়, অস্ত এবং মধ্যবর্তী সব অবস্থাও উল্লেখ করে বলা যেত যে, নক্ষত্র স্বীয় গতি-প্রকৃতিতে স্বাধীন নয়— অন্য কারও নির্দেশ অনুসরণ করে একটি বিশেষ পথে বিচরণ করে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) এসব অবস্থার মধ্য থেকে শুধু নক্ষত্র-পুঞ্জের অস্তমিত হওয়াকে প্রমাণে উল্লেখ করেছেন। কেননা; এগুলোর অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি জনসাধারণের দৃষ্টিতে সেগুলির এক প্রকার পতনরূপে গণ্য হয়। যে যুক্তি-প্রমাণ জনগণের মনে সাড়া জাগাতে পারে, পয়গম্বরগণ সাধারণতঃ সে যুক্তি-প্রমাণই অবলম্বন করেন। তাঁরা দার্শনিকসুলভ সত্যাসত্যের পেছনে বেশী পড়েন না; বরং সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির মাপকাঠিতেই সম্বোধন করেন। তাই নক্ষত্রপুঞ্জের অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতা প্রমাণ করার জন্যে অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। নতুবা এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে উদয় এবং তৎপরবর্তী অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব পরিবর্তনকেও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেত।

প্রচারকদের জন্যে কয়েকটি নির্দেশ ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বিতর্ক-পদ্ধতি থেকে ওলামা ও ইসলাম প্রচারকদের জন্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ অর্জিত হয়। প্রথম এই যে, প্রচার ও সংশোধনের কাজে সবক্ষেত্রে কঠোরতা সমীচীন নয় এবং সবক্ষেত্রে নম্রতাও সমীচীন নয়। বরং প্রত্যেকটির একটা বিশেষ ক্ষেত্র ও সীমা রয়েছে। প্রতিমা-পূজার ব্যাপারে ইবরাহীম (আঃ) কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। কেননা, এর ভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ বিষয়। কিন্তু নক্ষত্র পূজার ক্ষেত্রে এরূপ কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেননি, বরং বিশেষ দূরদর্শিতার সাথে আসল স্বরূপ জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। কেননা, নক্ষত্র-পুঞ্জের ক্ষমতাহীনতা স্বহস্ত-নির্মিত প্রতিমাদের ক্ষমতাহীনতার মত সুস্পষ্ট নয়। এতে বোঝা গেল যে, জনসাধারণ যদি এমন কোন ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত হয়, যার ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা সাধারণ দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট নয়, তবে আলেম ও প্রচারকের উচিত, কঠোরতার পরিবর্তে তাদের সন্দেহ ভঞ্জনের পন্থা অবলম্বন করা।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, সত্য প্রকাশের বেলায় এখানে ইবরাহীম (আঃ) জাতিকে একথা বলেননি যে, তোমরা এরূপ কর; বরং নিজের অবস্থা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি এসব উদয় ও অস্তের আবর্তে নিপতিত বস্তুকে উপাস্য স্থির করতে পারি না। তাই আমি স্বীয় আনন এমন সত্তার দিকে করে নিয়েছি, যিনি এসব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। উদ্দেশ্য তাই ছিল যে, তোমাদেরও এরূপ করা দরকার। কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে তিনি স্পষ্ট সম্বোধনে বিরত থাকেন— যাতে তারা জেদের বশবর্তী না হয়ে পড়ে। এতে বোঝা গেল যে, যেভাবে ইচ্ছা সত্যকথা বলে দেয়াই সংস্কারক ও প্রচারকের দায়িত্ব নয়, বরং কার্যকরী ভঙ্গীতে বলা জরুরী।

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ
وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ
نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا
لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ
وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَ
هَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ
وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ
وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾
ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ
أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ
فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُل لَّا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾

(৮২) যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকীর সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী। (৮৩) এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইবরাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (৮৪) আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং এয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ-প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ-প্রদর্শন করেছি— তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (৮৫) আরও যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৮৬) এবং ইসরাঈল, ইয়াসা, ইউনুস, লূতকে— প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি। (৮৭) আরও তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে; আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি। (৮৮) এটি আল্লাহ্‌র হেদায়েত। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, এপথে চালান। যদি তারা শেরেকী করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত। (৮৯) তাদেরকেই আমি গ্রন্থ, শরীয়ত ও নবুওয়ত দান করেছি। অতএব, যদি এরা আপনার নবুওয়ত অস্বীকার করে, তবে এর জন্যে এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না। (৯০) এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ্ পথ-প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা বিশ্বের জন্যে একটি উপদেশমাত্র।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিত তারাই হতে পারে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর বিশ্বাসের সাথে কোনরূপ জুলমকে মিশ্রিত না করে। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম চমকে উঠেন এবং আরয করেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পাপের মাধ্যমে নিজের উপর কোন জুলুম করেনি? এ আয়াতে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ হওয়ার জন্যে বিশ্বাসের সাথে জুলুমকে মিশ্রিত না করার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের মুক্তির উপায় কি? মহানবী (সাঃ) উত্তরে বললেন ঃ তোমরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হওনি। আয়াতে 'জুলুম' বলে শেরককে বোঝানো হয়েছে। দেখ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ – (নিশ্চিত শিরক বিরাট জুলুম) কাজেই আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীতে কাউকে অংশীদার স্থির না করে, সে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও সুপথ প্রাপ্ত।

মোটকথা এই যে, যারা প্রতিমা, প্রস্তর, বৃক্ষ, নক্ষত্র, সমুদ্র ইত্যাদির পূজা করে তারা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ এগুলোকে ক্ষমতাশালী মনে করে এবং ধারণা করে, এরা হয়তো কোন ক্ষতি করে ফেলবে— এ কারণে এদের আরাধনা ত্যাগ করতে ভয় পায়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদের নিগূঢ় কথা বলে দিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের ভালমন্দ সবকিছু করার ব্যাপারে সর্বশক্তিমান। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে বিপদ হবে— অথচ এ ভয় তো তোমরা কর না। পক্ষান্তরে যাদের জ্ঞানও নেই, শক্তিও নেই— তাদের পক্ষ থেকে বিপদের ভয় কর— এটা নির্বুদ্ধিতা নয় তো কি? একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করা উচিত। যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তার কোন বিপদাশঙ্কা নেই।

এ আয়াতে وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ –বলা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী জুলুমের অর্থ শেরক– সাধারণ গোনাহ্ নয়। কিন্তু ظلم শব্দটি نكره ব্যবহার করায় আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এর অর্থ ব্যাপক হয়ে গেছে। অর্থাৎ, যাবতীয় শেরকই এর অন্তর্ভুক্ত। يلبسوا শব্দটি لبس থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরিধান করা কিংবা মিশ্রিত করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাসের সাথে কোন প্রকার শেরক মিশ্রিত করে; অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলাকে তাঁর যাবতীয় গুণসহ স্বীকার করা সত্ত্বে অন্যকেও কোন কোন ঐশী গুণের বাহক মনে করে, সে ঈমান থেকে খারিজ।

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, খোলাখুলিভাবে মুশরেক ও মূর্তিপূজারী হয়ে যাওয়াই শুধু শেরক নয়, বরং সে ব্যক্তিও মুশরেক, যে কোন প্রতিমার পূজা করে না এবং ইসলামের কলেমা উচ্চারণ করে; কিন্তু কোন ফেরেশতা কিংবা রসূল কিংবা ওলীকে খোদার কোন কোন বিশেষ গুণে অংশীদার মনে করে। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে যারা ওলীদেরকে এবং তাদের মাযারকে 'মনোবাঞ্ছা পূরণকারী' বলে বিশ্বাস করে এবং কার্যতঃ মনে করে যে, খোদায়ী ক্ষমতা যেন তাদেরকে হস্তান্তর করা হয়েছে, আয়াতে তাদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে।

আয়াতে উল্লেখিত সতের জন পয়গম্বরের তালিকায় একজন অর্থাৎ,

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ
مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّ
هُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ
وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ
خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩١﴾ وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ
اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ
اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ
الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا
اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ
غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا
فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ
وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ؕ
لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٩٤﴾

(৯১) তারা আল্লাহ্‌কে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি, যখন তারা বলল ঃ আল্লাহ্ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি। আপনি জিজ্ঞেস করুন ঃ ঐ গ্রন্থ কে নাযিল করেছে, যা মূসা নিয়ে এসেছিল? যা জ্যোতিবিশেষ এবং মানবমন্ডলীর জন্যে হেদায়েতস্বরূপ, যা তোমরা বিক্ষিপ্তপত্রে রেখে লোকদের জন্যে প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশকে গোপন করছ। তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানতো না। আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের ক্রীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দিন। (৯২) এ কোরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পার্শ্ববর্তীদেরকে ভয়প্রদর্শন করেন। যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তারা স্বীয় নামায সংরক্ষণ করে। (৯৩) ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে ঃ আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোন ওহী আসেনি এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাজিল করে দেখাচ্ছি, যেমন আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে। (৯৪) তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ, আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম, তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ। আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিল যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবী উধাও হয়েগেছে।

হযরত নূহ (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পূর্বপুরুষ। অবশিষ্ট সবাই তাঁর সন্তান-সন্ততি। বলা হয়েছে এ— وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করার কারণে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কন্যা পক্ষের সন্তান; অর্থাৎ, পৌত্র নয়— দৌহিত্র। অতএব, তাঁকে বংশধর কিরূপে বলা যায়? অধিকাংশ আলেম ও ফেকাহ্‌বিদ এর উত্তরে বলেছেন যে, ذريت শব্দটি পৌত্র ও দৌহিত্র সবাইকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এ প্রমাণের ভিত্তিতেই তারা বলেন যে, হযরত হুসাইন (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বংশধর।

দ্বিতীয় আপত্তি হযরত লূত (আঃ) সম্পর্কে দেখা দেয় যে, তিনি ইব্রাহীম (আঃ)-এর সন্তানভুক্ত নন, বরং তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র। এর উত্তরও সুস্পষ্ট যে, সাধারণ পরিভাষায় পিতৃব্যকে পিতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুত্র বলা সুবিদিত।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি খোদায়ী অবদানসমূহ বর্ণনা করে এ আইন ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে প্রিয় বস্তু বিসর্জন দেয়, আল্লাহ্ তাআলা তাকে দুনিয়াতেও তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করেন। অপরদিকে মক্কার মুশরেকদেরকে এসব অবস্থা শুনিয়ে বলা হয়েছে যে, দেখ, তোমাদের মান্যবর হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর সমগ্র পরিবার এ কথাই বলে এসেছেন যে, আরাধনার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সত্তা। তাঁর সাথে অন্যকে আরাধনায় শরীক করা কিংবা তাঁর বিশেষ গুণে তাঁর সমতুল্য মনে করা কুফর ও পথভ্রষ্টতা। অতএব তোমরা যদি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদেশ অমান্য কর, তবে তোমরা আপন স্বীকৃত বিষয় অনুযায়ীও অভিযুক্ত।

অষ্টম আয়াতে এ বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে মহানবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ, আপনার কিছু সংখ্যক সম্বোধিত ব্যক্তি যদি আপনার কথা অমান্য করে এবং পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের নির্দেশ বর্ণনা করা সত্ত্বেও অস্বীকারই করতে থাকে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, আপনার নবুওয়ত স্বীকার করার জন্যে আমি একটি বিরাট জাতি স্থির করে রেখেছি। তারা অবিশ্বাস করবে না। মহানবী (সাঃ)-এর আমলে বিদ্যমান মুহাজির ও আনসার এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সব মুসলমান এ 'বিরাট জাতির' অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত তাঁদের সবার জন্যে গর্বের সামগ্রী। কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা প্রশংসার স্থলে তাদের উল্লেখ করেছেন। اللهم اجعلنا معهم واحشرنا فى زمرتهم

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র জন্যে স্বজাতি ও স্বগোত্র পরিত্যাগ করার বিনিময়ে আম্বিয়া (আঃ) – এর একটি বিরাট দল লাভ করেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন তাঁর সন্তান-সন্ততি। তিনি ইরাক ও সিরিয়া পরিত্যাগ করার বিনিময়ে আল্লাহ্‌র ঘর, নিরাপদ শহর, উম্মুল কুরা অর্থাৎ, মক্কা লাভ করেন। তাঁর জাতি তাঁকে লাঞ্ছিত করতে চাইলে এর বিনিময়ে তিনি সমগ্র বিশ্ব এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানব জাতির ইমাম ও নেতা রূপে বরিত হন। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী পারস্পরিক মতবিরোধ সত্ত্বেও তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে একমত।

এ ক্ষেত্রে সতের জন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। তাঁদের

অধিকাংশই ইবরাহীম (আঃ) এর সন্তান-সন্ততি ও বংশধর। তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে,আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে ধর্মের খেদমতের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং সৎপথ প্রদর্শন করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে মক্কাবাসীদেরকে শুনানো হয়েছে যে, কোন জাতির পূর্ব-পুরুষরা শুধু পিতৃপুরুষ হওয়ার কারণেই অনুসরণীয় হতে পারে না যে, তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে অনুসরণযোগ্য মনে করতে হবে। আরবদের সাধারণ ধারণা তাই ছিল। অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে যে, যার অনুসরণ করা হবে, সে নিজেও বিশুদ্ধ পথে আছে কি না। তাই আম্বিয়া (আঃ) —এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ - অর্থাৎ, এঁরাই এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। এরপর বলেছেন ঃ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ —অর্থাৎ, আপনিও তাদের হেদায়াত ও কর্মপন্থা অনুসরণ করুন।

এতে দু'টি নির্দেশ রয়েছে ঃ (এক) আরববাসী ও সমগ্র উম্মতকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পৈতৃক অনুসরণের কুসংস্কার পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর।

(দুই) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনিও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের পন্থা অবলম্বন করুন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আম্বিয়া (আঃ)-এর শরীয়তসমূহে শাখাগত ও আংশিক বিভিন্নতা পূর্বেও ছিল এবং ইসলামেও তাঁদের থেকে ভিন্ন অনেক বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে । এমতাবস্থায় মহানবী (সাঃ)-কে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের পথ অনুসরণের নির্দেশ দানের অর্থ কি? দ্বিতীয় আয়াত এবং বিভিন্ন হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে এর উত্তর এই যে, এখানে সব শাখাগত ও আংশিক বিধি-বিধানে পূর্ববর্তী পয়গম্বদের পথ অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি, বরং ধর্মের মূলনীতি একত্ববাদ, রেসালত ও পরকালে তাদের পথ অনুসরণ করা উদ্দেশ্য। এগুলো কোন পয়গম্বরের শরীয়তেই পরিবর্তিত হয়নি। আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সাঃ) পর্যন্ত একই বিশ্বাস এবং একই পথ অব্যাহত রয়েছে। যেসব শাখাগত বিধানে পরিবর্তন করা হয়নি, সেগুলোতেও অভিন্ন কর্মপন্থা রয়েছে এবং যেসব বিধানের ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তনের কারণে ভিন্ন নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা পালিত হয়েছে।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে বিশেষ নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত শাখাগত ব্যাপারেও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কর্মপন্থা অনুসরণ করতেন।— (মাযহারী ইত্যাদি)

এরপর মহানবী (সাঃ)-কে বিশেষভাবে একটি ঘোষণা করতে বলা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বগণও করেছেন। ঘোষণাটি এই

قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ

—অর্থাৎ, আমি তোমাদের জীবনকে পরিপাটী করার জন্যে যেসব নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, তজ্জন্য তোমাদের কাছে কোন ফিস বা পারিশ্রমিক চাই না। তোমরা এসব নির্দেশ মেনে নিলে আমার কোন লাভ নেই এবং না মানলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই। এটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে উপদেশ ও শুভেচ্ছার বার্তা।" শিক্ষা ও প্রচার কার্যের জন্যে কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা সব যুগে সব পয়গম্বরের অভিন্ন রীতি ছিল। প্রচারকার্য কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারে এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় আয়াতে ঐসব লোকের জওয়াব দেয়া হয়েছে, যারা বলেছিল, আল্লাহ্ তাআলা কোন মানুষের প্রতি কখনও কোন গ্রন্থ অবতীর্ণই করেননি; গ্রন্থ ও রসূলদের ব্যাপারটি মূলতঃ ভিত্তিহীন।

ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এটি মূর্তিপূজারীদের উক্তি হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট। কেননা, তারা কোন গ্রন্থ ও নবীর প্রবক্তা কোন কালেই ছিল না। অন্যান্য তফসীরকারের মতে এটি ইহুদীদের উক্তি। আয়াতের বর্ণনা-পরম্পরা বাহ্যতঃ এরই সমর্থন করে। এমতাবস্থায় তাদের এ উক্তি ছিল ক্রোধ ও বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ, যা স্বয়ং তাদেরও ধর্মের পরিপন্থী ছিল। ইমাম বগভী (রহঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ উক্তি করেছিল, ইহুদীরা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়ে তাকে ধর্মীয় পদ থেকে অপসারিত করেছিল।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলেছেন ঃ যারা এমন বাজে কথা বলেছে, তারা যথোপযুক্তভাবে আল্লাহ্ তাআলাকে চিনে নি। নতুবা এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি তাদের মুখ থেকে বেরই হত না। যারা সর্বাবস্থায় ঐশীগ্রন্থকে অস্বীকার করে, আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ -আল্লাহ্ তাআলা কোন মানুষের কাছে যদি গ্রন্থ প্রেরণ না-ই করে থাকেন, তবে যে তওরাত তোমরা স্বীকার কর এবং যার কারণে তোমরা জাতির 'চৌধুরী' হয়ে বসে আছ, সে তওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? আরও বলে দিন ঃ তোমরা এমন বক্রগামী যে, তোমরা যে তওরাতকে ঐশীগ্রন্থ বলে স্বীকার কর, তার সাথেও তোমাদের ব্যবহার সহজ-সরল নয়। তোমরা একে বাঁধাই করা গ্রন্থের আকারে না রেখে বিচ্ছিন্ন পত্রে লিপিবদ্ধ করে রেখেছ, যাতে যখনই মন চায়, তখনই মাঝখান থেকে কোন পাতা উধাও করে দিয়ে তার বিষয়বস্তু অস্বীকার করতে পার। তওরাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কিত কিছু আয়াত ছিল। ইহুদীরা সেগুলো তওরাত থেকে উধাও করে দিয়েছিলে। আয়াতের শেষে تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ বাক্যের উদ্দেশ্য তাই। قَرَاطِيسَ শব্দটি **قرطاس** এর বহুবচন। এর অর্থ কাগজের পাতা।

এরপর তাদেরকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ —অর্থাৎ, কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে তওরাত ও ইঞ্জীলের চাইতেও অধিক জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে তোমরাও জানতে না এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও জানা ছিল না।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ না করে থাকলে তওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর তারা কি দেবে; আপনিই বলেদিন ঃ আল্লাহ্ তাআলাই অবতীর্ণ করেছেন। যখন তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন আপনার কাজও শেষ হয়ে গেছে। এখন তারা যে ক্রীড়া-কৌতুকে ডুবে আছে তাতেই তাদেরকে থাকতে দিন।

তাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ করার পর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ

أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ
الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَ
جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي
ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَ
هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ
وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ
صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

(৯৫) নিশ্চয় আল্লাহ্ই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী; তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনি আল্লাহ্, অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? (৯৬) তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসেবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ। (৯৭) তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন—যাতে তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত হও। নিশ্চয় যারা জ্ঞানী তাদের জন্যে আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি। (৯৮) তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা ও একটি হচ্ছে গচ্ছিত স্থল। নিশ্চয় আমি প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্যে, যারা চিন্তা করে। (৯৯) তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর— যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয় এগুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্যে। (১০০) তারা জিনদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করে; অথচ তাদেরকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তারা অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্‌র জন্যে পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। তিনি পবিত্র ও সমুন্নত, তাদের বর্ণনা থেকে। (১০১) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি স্রষ্টা। কিরূপে আল্লাহ্‌র পুত্র হতে পারে, অথচ তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ।

অর্থাৎ, তওরাত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ— একথা যেমন তারাও স্বীকার করে, তেমনিভাবে এ কোরআনও আমি অবতীর্ণ করেছি। কোরআনের সত্যতার জন্যে তাদের পক্ষে এ সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, কোরআন, তওরাত ও ইঞ্জীলে অবতীর্ণ সব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করে। তওরাত ও ইঞ্জীলের পর এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করার প্রয়োজন এ জন্যে দেখা দেয় যে, এ গ্রন্থদ্বয় বনী-ইসরাঈলের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাদের অপর শাখা বনী-ইসমাঈল যারা আরব নামে খ্যাত এবং উম্মুল কুরা অর্থাৎ, মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাসবাস করে, তাদের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত কোন বিশেষ পয়গম্বর ও গ্রন্থ এ যাবত অবতীর্ণ হয়নি। তাই এ কোরআন বিশেষভাবে তাদের জন্যে এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের জন্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে। মক্কা মোয়াজ্জমাকে কোরআন পাক 'উম্মুল কুরা' বলেছে। অর্থাৎ, বস্তিসমূহের মূল। এর কারণ এই যে, ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এখান থেকেই পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল। এছাড়া এ স্থানটিই সারা বিশ্বের কেবলা এবং মুখ ফেরানোর কেন্দ্রবিন্দু।— (মাযহারী)

উম্মুল কুরার পর وَمَنْ حَوْلَهَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ, মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকা। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের সমগ্র বিশ্ব এর অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُونَ

অর্থাৎ, যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা কোরআনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায সংরক্ষণ করে। এতে ইহুদী ও মুশরিকদের একটি অভিন্ন রোগ সম্পর্কে হুশিয়ার করা হয়েছে। অর্থাৎ, যা ইচ্ছা মেনে নেয়া এবং যা ইচ্ছা প্রত্যাখান করা এর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্র তৈরী করা— এটি পরকালে বিশ্বাসহীনতা রোগেরই প্রতিক্রিয়া। যে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাস করে, খোদভীতি অবশ্যই তাকে যুক্তি-প্রমাণে চিন্তা-ভাবনা করতে এবং পৈতৃক প্রথার পরওয়া না করে সত্যকে গ্রহণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে।

চিন্তা করলে দেখা যায়, পরকালের চিন্তা না থাকাই সর্বরোগের মূল কারণ। কুফর ও শিরকসহ যাবতীয় পাপও এরই ফলশ্রুতি। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা যদি কোন সময় ভুল ও পাপ হয়েও যায়, তাতে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে এবং অবশেষে তওবা করে পাপ থেকে বেঁচে থাকতে কৃতসংকল্প হয়। প্রকৃতপক্ষে খোদাভীতি এবং পরকালভীতিই মানুষকে মানুষ করে এবং অপরাধ থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই কোরআন পাকের কোন সূরা বরং কোন রুকূ এমন নেই, যাতে পরকাল চিন্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৯৫ থেকে ৮৯ এই চার আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের এ রোগের প্রতিকারার্থ স্বীয় বিস্তৃত জ্ঞান ও মহান শক্তির কয়েকটি নমুনা এবং মানুষের প্রতি নেয়ামত ও অনুগ্রহরাজি উল্লেখ করেছেন। এতে সামান্য চিন্তা করলেই প্রত্যেক সুস্থ স্বভাব ব্যক্তি স্রষ্টার মাহাত্ম্য ও তাঁর অপরিসীম শক্তি-সামর্থ্য স্বীকার না করে থাকতে পারবে না। তখন সে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করবে যে, এ বিরাট কীর্তি আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া আর কারও হতে পারে না। বলা হয়েছে ঃ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ অর্থাৎ, আল্লাহ্

তাআলা বীজ ও আঁটি অঙ্কুরণকারী। এতে খোদায়ী শক্তি-সামর্থ্যের এক বিস্ময়কর ঘটনা বিধৃত হয়েছে। শুষ্ক বীজ ও শুষ্ক আঁটি ফাঁক করে তার ভেতর থেকে শ্যামল ও সতেজ বৃক্ষ বের করে দেয়া একমাত্র জগত স্রষ্টারই কাজ— এতে কোন মানুষের চেষ্টা ও কর্মের কোন প্রভাব নেই। খোদায়ী শক্তির বলে বীজ ও আঁটির ভেতর থেকে যে নাজুক অঙ্কুর গজিয়ে উঠে, তার পথ থেকে সকল প্রতিবন্ধকতা ও ক্ষতিকর বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেয়াই কৃষকের সকল চেষ্টার মূল বিষয়। লাঙ্গল চষে মাটি নরম করা, সার দেয়া, পানি দেয়া ইত্যাদি কর্মের ফল এর চাইতে বেশী কিছু নয় যে, অঙ্কুরের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকে। এ ব্যাপারে আসল কাজ হচ্ছে বীজ ও আঁটি ফেটে বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হওয়া, অতঃপর তাতে রং-বেরঙের রকমারি পাতা গজানো এবং এমন ফল-ফুলে সুশোভিত হওয়া যে, মানুষের বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক তার একটি পাতা ও পাপড়ি তৈরী করতেও অক্ষম হয়ে যায়। এটা জানা কথা যে, এতে মানব কর্মের কোন প্রভাব নেই। তাই কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ

অর্থাৎ, তোমরা কি ঐ বীজগুলোকে দেখ না যা তোমরা মাটিতে ফেলে দাও? এগুলো তোমরা বপন ও তৈরী কর না আমি করি?

দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে ঃ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَىِّ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলাই মৃত বস্তু থেকে জীবিত বস্তু সৃষ্টি করেন। মৃত বস্তু যেমন, বীর্য ও ডিম— এগুলো থেকে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের সৃষ্টি হয়, এমনিভাবে তিনি জীবিত বস্তু থেকে মৃত বস্তু বের করে দেন— যেমন, বীর্য ও ডিম জীবিত বস্তু থেকে বের হয়।

এরপর বলেছেন ঃ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ —অর্থাৎ, এগুলো সব এক আল্লাহ্র কাজ। অতঃপর একথা জেনে-শুনে তোমরা কোন দিকে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছ? তোমরা স্বহস্ত নির্মিত প্রতিমাকে বিপদ-বিদূরণকারী ও অভাব পূরণকারী উপাস্য বলতে শুরু করেছ।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ - فَالِقُ শব্দের অর্থ ফাঁককারী এবং اصباح শব্দের অর্থ এখানে প্রভাতকাল। فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ -এর অর্থ প্রভাতের ফাঁককারী; অর্থাৎ, গভীর অন্ধকারের চাদর ফাঁক করে প্রভাতের উন্মেষকারী। এটিও এমন একটি কাজ, যাতে জিন, মানব ও সমগ্র সৃষ্ট জীবের শক্তিই ব্যর্থ। প্রতিটি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি একথা বুঝতে বাধ্য যে, রাত্রির অন্ধকারের পর প্রভাতরশ্মির উদ্ভাবক জিন, মানব, ফেরেশতা অথবা অন্য কোন সৃষ্টজীব হতে পারে না, বরং এটি বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তাআলারই কাজ।

সৌর ও চান্দ্র হিসাব ঃ বলা হয়েছে ঃ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا حسبان একটি ধাতু। এর অর্থ হিসাব করা, গণনা করা। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সূর্য ও চন্দ্রের উদয়, অস্ত এবং এদের গতিকে একটি বিশেষ হিসাবের অধীনে রেখেছেন। এর ফলে মানুষ বৎসর, মাস, দিন, ঘন্টা এমনকি, মিনিট ও সেকেণ্ডের হিসাবও অতি সহজে করতে পারে।

আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল মহাগোলক ও এদের গতি-বিধিকে অটল ও অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে। হাজার হাজার বছরেও এদের গতি-বিধিতে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। এদের কলকব্জা মেরামতের জন্যে কোন ওয়ার্কশপের প্রয়োজন হয় না এবং যন্ত্রাংশের ক্ষয়প্রাপ্তি ও পরিবর্তনের আবশ্যকতাও দেখা দেয় না। এ উজ্জ্বল গোলকদ্বয় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে বিচরণ করছে ঃ

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ

পরিতাপের বিষয়, প্রকৃতির এ অটল ও অপবির্তনীয় ব্যবস্থা থেকেই মানুষ প্রতারিত হয়েছে। তারা এগুলোকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বরং উপাস্য ও উদ্দিষ্ট মনে করে বসেছে। যদি এ ব্যবস্থা মাঝে মাঝে অচল হয়ে যেত এবং কলকব্জা মেরামতের জন্যে কয়েক দিন বা কয়েক ঘন্টার বিরতি দেখা দিত, তবে মানুষ বুঝতে পারত যে, এসব মেশিন আপনা আপনি চলে না, বরং এগুলোর পরিচালক ও নির্মাতা আছে। ঐশীগ্রন্থ, পয়গম্বর ও রসূলগণ এ সত্য উদ্ঘাটন করার জন্যেই প্রেরিত হন।

কোরআন পাকের এ বাক্য আরও ইঙ্গিত করেছে যে, বছর ও মাসের সৌর ও চান্দ্র উভয় প্রকার হিসাবই হতে পারে এবং উভয়টি আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত। এটা ভিন্ন কথা যে, সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের সুবিধার্থ এবং তাদেরকে হিসাব-কিতাবের জটিলতা থেকে দূরে রাখার জন্যে ইসলামী বিধি-বিধানে চান্দ্র বৎসর ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু ইসলামী তারিখ এবং ইসলামী বিধান পুরোপুরিভাবে চান্দ্র হিসাবের উপর নির্ভরশীল, তাই এ হিসাবকে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত রাখা সকল মুসলমানের অবশ্যই কর্তব্য। প্রয়োজনবশতঃ সৌর ও অন্যান্য হিসাবও ব্যবহার করা যেতে পারে, তাতে কোন পাপ হবে না। কিন্তু চান্দ্র হিসাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা এবং বিলোপ করে দেয়া পাপের কারণ। এতে রমযান কিংবা যিলহজ্জ ও মহররম কবে হবে তা অজ্ঞাত হয়ে যাবে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ অর্থাৎ, এ বিস্ময়কর অটল ব্যবস্থা— যাতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হয় না— একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই অপরিসীম শক্তির কারসাজি, যিনি পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সব ব্যাপারে জ্ঞানী।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ

অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া অন্যান্য নক্ষত্রও আল্লাহ্ তাআলার অপরিসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এগুলো সৃষ্টি করার পেছনে যে হাজারো রহস্য রয়েছে তন্মধ্যে একটি এই যে, জল ও স্থলপথে ভ্রমণ করার সময় রাত্রির অন্ধকারে যখন দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন মানুষ এসব নক্ষত্রের সাহায্যে পথ ঠিক করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, আজ বৈজ্ঞানিক কলকব্জার যুগেও মানুষ নক্ষত্রপুঞ্জের পথ প্রদর্শনের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়।

এ আয়াতেও মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এসব নক্ষত্রও কোন একজন নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন বিচরণ করছে। এরা স্বীয় অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও কর্মে স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। যারা শুধু এদের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে এবং নির্মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা এবং আত্মপ্রবঞ্চিত।

এরপর বলেছেন ঃ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ - অর্থাৎ, আমি শক্তির প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি বিজ্ঞজনদের জন্যে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা এসব সুস্পষ্ট নির্দশন দেখেও আল্লাহ্কে

চিনে না, তারা বেখবর ও অচেতন।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَهُوَالَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ – مستقر শব্দটি قرار থেকে উদ্ভূত। কোন বস্তুর অবস্থান স্থলকে مستقر বলা হয়। مستودع শব্দটি وديعت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কারও কাছে কোন বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রেখে দেয়া। অতএব, مستودع ঐ জায়গাকে বলা হবে, যেখানে কোন বস্তু অস্থায়ী-ভাবে কয়েক দিন রাখা হয়।

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলাই সে পবিত্র সত্তা যিনি মানুষকে এক সত্তা থেকে অর্থাৎ, আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তার জন্যে একটি দীর্ঘকালীন এবং একটি স্বল্পকালীন অবস্থান-স্থল নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কোরআন পাকের ভাষা এরূপ হলেও এর ব্যাখ্যায় বহুবিধ সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে তফসীরকারদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ বলেছেন ঃ مستقر ও مستودع যথাক্রমে মাতৃগর্ভ ও দুনিয়া। আবার কেউ বলেছেন ঃ কবর ও পরলোক। এছাড়া আরও বিভিন্ন উক্তি আছে এবং কোরআনের ভাষায় সবগুলোরই অবকাশ রয়েছে। কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রঃ) তফসীরে মাযহারীতে বলেছেন ঃ مستقر হচ্ছে পরলোকের বেহেশত ও দোযখ। আর মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে পরকাল অবধি সবগুলো স্তর। তা মাতৃগর্ভই হোক কিংবা পৃথিবীতে বসবাসের জায়গাই হোক কিংবা কবর ও বরযখই হোক— সবগুলোই হচ্ছে مستودع অর্থাৎ, সাময়িক অবস্থানস্থল। কোরআন পাকের এক আয়াত দ্বারাও এ উক্তির অগ্রগণ্যতা বুঝা যায়। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ

– অর্থাৎ, তোমরা সর্বদা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। এর সারমর্ম এই যে, পরকালের পূর্বে মানুষ সমগ্র জীবনে একজন মুসাফিরসদৃশ। বাহ্যিক স্থিরতা ও অবস্থিতির সময়ও প্রকৃতপক্ষে সে জীবন-সফরের বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করতে থাকে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তুতে অভিনব শ্রেণীবিন্যাস নির্দেশিত হয়েছে। এখানে তিন প্রকার সৃষ্ট জগতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ (এক) উর্ধ্বজগত (দুই) অধঃজগত এবং (তিন) শূন্যজগত। অর্থাৎ, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মধ্যবর্তী শূন্যজগতে সৃষ্ট বস্তুসমূহ। প্রথমে অধঃজগতের বস্তু সমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ এগুলো আমাদের অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর এগুলোর বর্ণনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ (এক) মাটি থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগানের বর্ণনা এবং (দুই) মানব ও জীবজন্তুর বর্ণনা। প্রথমোক্তটি প্রথমে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এটি অপরটির তুলনায় অধিক স্পষ্ট এবং অপরটি যেহেতু আত্মার উপর নির্ভরশীল, তাই কিছুটা সূক্ষ্ম। যেমতে বীর্যের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা চিকিৎসকদের অনুভূতির সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কশীল। এর বিপরীতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ। এরপর শূন্যজগতের উল্লেখ করা হয়েছে ; অর্থাৎ সকাল ও বিকাল। এরপর উর্ধ্বজগতের সৃষ্ট বস্তু বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি। অতঃপর অধঃজগতের বস্তুসমূহ অধিক প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণে এগুলোর পূর্ণ বর্ণনা দ্বারা আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। তবে পূর্বে এগুলো সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখিত হয়েছিল, এবার বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিস্তারিত বর্ণনার শ্রেণীবিন্যাসে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার শ্রেণীবিন্যাসের বিপরীত করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রাণীদের বর্ণনা অগ্রে এবং উদ্ভিদের বর্ণনা পরে। সম্ভবতঃ এর কারণ এই যে, এ বিস্তারিত বর্ণনায় নেয়ামত প্রকাশের ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তাই منعم عليه যাদের-কে নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে, তারা উদ্দিষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। উদ্ভিদের মধ্যে পূর্বোক্ত শ্রেণীবিন্যাস বহাল রয়েছে। অর্থাৎ, শস্যের অবস্থা, বীজ ও আঁটির বর্ণনার আগে এনে এবং একে উদ্ভিদের অনুগামী করে মাঝখানে বৃষ্টির প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। এতে আরও একটি সূক্ষ্ম কারণ থাকতে পারে। তা এই যে, সূচনার দিক থেকে বৃষ্টি উর্ধ্বজগতের, পরিণতির দিক দিয়ে অধঃজগতের এবং দূরত্ব অতিক্রমের দিক দিয়ে শূন্যজগতের বস্তু।

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾ قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

(১০২) তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী। (১০৩) দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ। (১০৪) তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী এসে গেছে। অতএব, যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের পর্যবেক্ষক নই। (১০৫) এমনিভাবে আমি নিদর্শনাবলী ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করি— যাতে তারা না বলে যে, আপনি তো পড়ে নিয়েছেন এবং যাতে আমি একে সুধীবৃন্দের জন্যে খুব পরিব্যক্ত করে দেই। (১০৬) আপনি পথ অনুসরণ করুন, যার আদেশ পালনকর্তার পক্ষ থেকে আসে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুশরিকদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (১০৭) যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে তারা শেরক করত না। আমি আপনাকে তাদের সংরক্ষক করিনি এবং আপনি তাদের কার্যনির্বাহী নন। (১০৮) তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহ্কে ছেড়ে। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্কে মন্দ বলবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যাকিছু তারা করত। (১০৯) তারা জোর দিয়ে আল্লাহ্র কসম খায় যে, যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। আপনি বলে দিন ঃ নিদর্শনাবলী তো আল্লাহ্র কাছেই আছে। হে মুসলমানগণ, তোমাদেরকে কে বলল যে, যখন তাদের কাছে নিদর্শনাবলী আসবে, তখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করবেই? (১১০) আমি ঘুরিয়ে দিব তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে, যেমন— তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত ছেড়ে দিব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম আয়াতে ابصار শব্দটি بصر -এর বহুবচন। এর অর্থ দৃষ্টি এবং দৃষ্টিশক্তি। ادراك শব্দের অর্থ পাওয়া, ধরা, বেষ্টন করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এস্থলে ادراك শব্দের অর্থ বেষ্টন করা বর্ণনা করেছেন।—(বাহরে-মুহীত)

এতে আয়াতের অর্থ হয় এই যে, জিন, মানব, ফেরেশতা ও যাবতীয় জীব-জন্তুর দৃষ্টি একত্রিত হয়েও আল্লাহ্র সত্তাকে বেষ্টন করে দেখতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র সৃষ্টজীবের দৃষ্টিকে পূর্ণরূপে দেখেন এবং সবাইকে বেষ্টন করে দেখেন। এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার দু'টি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে। (এক) সমগ্র সৃষ্ট জগতে কারও দৃষ্টি বরং সবার দৃষ্টি একত্রিত হয়েও তাঁর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারে না।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ এযাবত পৃথিবীতে যত মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও শয়তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে যত জন্মগ্রহণ করবে, তারা সবাই যদি এক কাতারে দাঁড়িয়ে যায়, তবে সবার সম্মিলিত দৃষ্টি দ্বারাও আল্লাহ্ তাআলার সত্তাকে পুরোপুরি বেষ্টন করা সম্ভবপর নয়।—(মাযহারী)

এ বিশেষ গুণটি একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই হতে পারে। নতুবা আল্লাহ্ দৃষ্টিকে এত শক্তি দিয়েছেন যে, ক্ষুদ্রতম জীবের ক্ষুদ্রতম চক্ষু পৃথিবীর বৃহত্তম মণ্ডলকে দেখতে পারে এবং চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে। সূর্য ও চন্দ্র কি বিরাট গ্রহ! এদের বিপরীতে পৃথিবীও কিছুই নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ, বরং ক্ষুদ্রতম জন্তুর চক্ষু এসব গ্রহকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে।

সত্যি বলতে কি, দৃষ্টি মানুষের একটি ইন্দ্রিয়বিশেষ। এর দ্বারা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহেরই জ্ঞান লাভ করা যায়। আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা বুদ্ধি ও ধারণার বেষ্টনীরও ঊর্ধ্বে। দৃষ্টিশক্তি দ্বারা তাঁর জ্ঞান কিরূপে অর্জিত হতে পারে?

স্রষ্টার দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা ঃ মানুষ আল্লাহ্ তাআলাকে দেখতে পারে কিনা, এ সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস এই যে, এ জগতে এটা সম্ভবপর নয়। এ কারণেই হযরত মূসা (আঃ) যখন رَبِّ أَرِنِي (হে পরওয়ারদেগার, আমাকে দেখা দাও) বলে আল্লাহ্কে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন উত্তরে বলা হয়েছিল ঃ لَن تَرَانِي (তুমি কস্মিনকালেও আমাকে দেখতে পারবে না।) হযরত মূসাই যখন এ উত্তর পেয়েছিলেন, তখন অন্য কোন জিন ও মানুষের সাধ্য কি! তবে পরকালে মু'মিনরা আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাৎ লাভ করবে। একথা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। স্বয়ং কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ — কেয়ামতের দিন অনেক মুখমণ্ডল সজীব ও প্রফুল্ল হবে। তারা স্বীয় পালনকর্তাকে দেখতে থাকবে।

তবে কাফের ও অবিশ্বাসীরা সেদিনও সাজা হিসেবে আল্লাহ্কে দেখার গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকবে। কোরআনের এক আয়াতে আছে ঃ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ —অর্থাৎ, কাফেররা সেদিন স্বীয় পালনকর্তার সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

পরকালে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাৎ ঘটবে— হাশরে

অবস্থানকালেও এবং জান্নাতে পৌঁছার পরও। জান্নাতীদের জন্যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতই হবে সর্ববৃহৎ নেয়ামত।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলনেঃ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা যেসব নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছ, এগুলোর চাইতে বৃহৎ আরও কোন নেয়ামতের প্রয়োজন হলে বল, আমি তাও দেব। জান্নাতীরা নিবেদন করবে ঃ ইয়া আল্লাহ্, আপনি আমাদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং জান্নাতে স্থান দিয়েছেন! এর বেশী আমরা আর কি চাইব। তখন মধ্যবর্তী পর্দা সরিয়ে নেয়া হবে এবং সবার সাথে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ হবে। এটিই হবে জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এ হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমে হযরত সোহায়ব থেকে বর্ণিত আছে।

বোখারীর এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে সাহাবীদের সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন ঃ (পরকালে) তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে এ চাঁদের ন্যায় চাক্ষুষ দেখতে পাবে।

তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে ইবনে ওমর (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে জান্নাতে বিশেষ মর্যাদা দান করবেন, তাঁদেরকে প্রতিদিন সকাল–বিকাল সাক্ষাৎ দান করবেন।

মোটকথা, এ জগতে কেউ আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে না এবং পরকালে সব জান্নাতী এ নেয়ামত লাভ করবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মে'রাজের রাত্রে যে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তাও প্রকৃতপক্ষে পরকালেরই সাক্ষাৎ। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী বলেন ঃ আকাশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্থানকেই জগত বা দুনিয়া বলা হয়। আকাশের উপরে পরকালের স্থান। সেখানে পৌঁছে যে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাকে পার্থিব সাক্ষাৎ বলা যায় না।

এখন প্রশ্ন থাকে যে, ঃ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ — আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, মানুষ আল্লাহ্ তাআলাকে দেখতেই পারে না। এমতাবস্থায় কেয়ামতে কিরূপে দেখবে? এর উত্তর এই যে, 'আল্লাহ্‌কে দেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।' আয়াতের অর্থ এটা নয়; বরং অর্থ এই যে, মানুষের দৃষ্টি তাঁর সত্তাকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে না। কারণ, তাঁর সত্তা অসীম এবং মানুষের দৃষ্টি সসীম।

কেয়ামতের দেখাও চতুর্দিক বেষ্টন করে হবে না। দুনিয়াতে এরূপ দর্শন সহ্য করার মত শক্তি মানুষের চোখে নেই। তাই দুনিয়াতে কোন অবস্থাতেই দেখা যেতে পারে না। পরকালে এ শক্তি সৃষ্টি হবে এবং দেখা ও সাক্ষাৎ হতে পারবে। কিন্তু দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র সত্তাকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে দেখা তখনও হতে পারবে না।

আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় গুণ এই যে, তাঁর দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্টজগতকে পরিবেষ্টনকারী। জগতের অণু–কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নয়। সর্বাবস্থায় এ জ্ঞান এবং জ্ঞানগত পরিবেষ্টনও আল্লাহ্ তাআলারই বৈশিষ্ট্য। তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্টবস্তুর পক্ষে সমগ্র সৃষ্টজগত ও –তার অণু–পরমাণুর এরূপ জ্ঞান লাভ কখনও হয়নি এবং হতে পারেও না। কেননা, এটা আল্লাহ্ তাআলারই বিশেষ গুণ।

এরপর এরশাদ হয়েছে ঃ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ — আরবী অভিধানে لطيف শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ (এক) দয়ালু, (দুই) সূক্ষ্ম বস্তু যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা কিংবা জানা যায় না।

خبير শব্দের অর্থ যে খবর রাখে। বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ সূক্ষ্ম তাই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁকে অনুভব করা যায় না এবং তিনি খবর রাখেন। তাই সমগ্র সৃষ্টজগতের কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর জ্ঞান ও খবরের বাইরে নয়। এখানে لطيف শব্দের অর্থ দয়ালু নেয়া হলে আলোচ্য বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, তিনি যদিও আমাদের প্রত্যেক কথা ও কাজের খবর রাখেন এবং এজন্যে আমাদের গোনাহ্‌র কারণে আমাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু তিনি দয়ালুও, তাই সব গোনাহ্‌র কারণেই পাকড়াও করেন না।

দ্বিতীয় আয়াতের بَصَائِرُ শব্দটি بصيرت—এর বহুবচন। এর অর্থ বুদ্ধি ও জ্ঞান। অর্থাৎ, যে শক্তি দ্বারা মানুষ অতিন্দ্রীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। আয়াতে بَصَائِرُ বলে ঐসব যুক্তি–প্রমাণ ও উপায়াদিকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো দ্বারা মানুষ সত্য ও বাস্তব রূপকে জানতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য দর্শনের উপায়–উপকরণ পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ, কোরআন, রসূল (সাঃ) ও বিভিন্ন মো'জেযা আগমন করেছে এবং তোমরা রসূলের চরিত্র, কাজ–কর্ম ও শিক্ষা প্রত্যক্ষ করেছ। এগুলোই হচ্ছে সত্য দর্শনের উপায়।

অতএব, যে ব্যক্তি এসব উপায় ব্যবহার করে চক্ষুষ্মান হয়ে যায়, সে নিজেরই উপকার সাধন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপায় পরিত্যাগ করে সত্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে, সে নিজেরই ক্ষতিসাধন করে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ আমি তোমাদের সংরক্ষক নই। অর্থাৎ, মানুষকে জবরদস্তিমূলকভাবে অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর দায়িত্ব নয়, যেমন সংরক্ষকের দায়িত্ব হয়ে থাকে। রসূলের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পৌঁছে দেয়া ও বুঝিয়ে দেয়া। এরপর স্বেচ্ছায় সেগুলো অনুসরণ করা না করা মানুষের দায়িত্ব।

এরপর বলা হয়েছেঃ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ –এর মর্ম এই যে, হেদায়েতের সব সাজ–সরঞ্জাম, মো'জেযা, অনুপম প্রমাণাদি— যেমন, কোরআন— একজন নিরক্ষরের মুখ দিয়ে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্য প্রকাশ করা, যা ব্যক্ত করতে জগতের সব দার্শনিক পর্যন্ত অক্ষম এবং এমন অলঙ্কারপূর্ণ কালাম উচ্চারিত হওয়া, যার সমতুল্য কালাম রচনা করার জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত জিন ও মানবকে চ্যালেঞ্জ করার পরও সারা বিশ্ব অক্ষমতা প্রকাশ করেছে—সত্য দর্শনের এসব সরঞ্জাম দেখে যে কোন হটকারী অবিশ্বাসীরও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর পদতলে লুটিয়ে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা বিদ্যমান ছিল, তারা বলতে থাকে درست অর্থাৎ, এসব জ্ঞান–বিজ্ঞান আপনি কারও কাছ থেকে অধ্যয়ন করে নিয়েছেন।

সাথে সাথেই বলা হয়েছে ঃ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ –এর সারমর্ম এই যে, সঠিক বুদ্ধিমান ও সুস্থ জ্ঞানীদের জন্যে এ বর্ণনা উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। মোটকথা এই যে, হেদায়েতের সরঞ্জাম সবার সামনেই রাখা হয়েছে। কিন্তু কুটিল ব্যক্তিরা এর দ্বারা উপকৃত হয়নি। পক্ষান্তরে সুস্থ জ্ঞানী মনীষীরা এর মাধ্যমে বিশ্বের পথপ্রদর্শক হয়ে গেছেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)–কে বলা হয়েছে ঃ কে মানে আর কে মানে না— আপনি তা দেখবেন না। আপনি স্বয়ং ঐ পথ অনুসরণ করুন, যা অনুসরণ করার জন্যে পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ আগমন করেছে। এর প্রধান বিষয় হচ্ছে এ বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই। এ প্রত্যাদেশ প্রচারের নির্দেশও রয়েছে। এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মুশরিকদের জন্যে পরিতাপ করবেন না যে, তারা কেন

গ্রহণ করল না।

এর কারণ এই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ যদি সৃষ্টিগতভাবে ইচ্ছা করতেন যে, সবাই মুসলমান হয়ে যাক, তবে কেউ শেরক করতে পারত না। কিন্তু তাদের দুষ্কৃতির কারণে তিনি ইচ্ছা করেননি, বরং তাদেরকে শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। তাই শাস্তির সরঞ্জামও সরবরাহ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনি তাদেরকে কিরূপে মুসলমান করতে পারেন? আপনি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন কেন, আমি আপনাকে তাদের সংরক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং আপনি এসব কাজকর্মের জন্যে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যে আমার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন। কাজেই তাদের কাজ-কর্মের ব্যাপারে আপনার উদ্বিগ্ন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মাসআলা নির্দেশিত হয়েছে যে, যে কাজ করা বৈধ নয়, সে কাজের কারণ ও উপায় হওয়াও বৈধ নয়।

ইবনে জরীরের বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের শানে-নুযূল এই ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পিতৃব্য আবু তালেব যখন অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শত্রুতায়, নির্যাতনে এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মুশরেক সর্দাররা মহাফাঁপরে পড়ে যায়। তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে ঃ আবু তালেবের মৃত্যু আমাদের জন্যে কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তার মৃত্যুর পর আমরা যদি মুহাম্মদকে হত্যা করি, তবে এটা আমাদের আত্মসম্মান ও গৌরবের পরিপন্থী হবে। লোকে বলবে ঃ আবু তালেব জীবিত থাকতে তো তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি, এখন একা পেয়ে তাকে হত্যা করেছে। কাজেই এখনও সময় আছে, চল আমরা সকলে মিলে স্বয়ং আবু তালেবের সাথেই চূড়ান্ত কথাবার্তা বলে নেই।

প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত মুসলমান জানে যে, আবু তালেব মুসলমান না হলেও ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তাঁর অগাধ মহব্বত ছিল। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শত্রুদের মোকাবেলায় সব সময় ঢাল হয়ে থাকতেন।

কতিপয় কোরাইশ সর্দারের পরামর্শক্রমে আবু তালেবের কাছে যাওয়ার জন্যে একটি প্রতিনিধিদল গঠন করা হল। আবু সুফিয়ান, আবু জাহল, আমর ইবনে আছ প্রমুখ সর্দার এ প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাক্ষাতের সময় নির্ধারণের জন্যে মুত্তালিব নামক এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হল। সে আবু তালেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রতিনিধি দলকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিল।

তারা আবু তালেবকে বলল ঃ আপনি আমাদের মান্যবর এবং সর্দার। আপনি জানেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ আমাদেরকে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে ভীষণ কষ্টে ফেলে রেখেছেন। আমাদের অনুরোধ এই যে, তিনি যদি আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ না বলেন, তবে আমরা তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করব। তিনি যেভাবে ইচ্ছা নিজ ধর্ম পালন করবেন, যাকে ইচ্ছা, উপাস্য করবেন। আমরা কিছুই বলব না।

আবু তালেব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কাছে ডেকে বললেন ঃ এরা সমাজের সর্দার, আপনার কাছে এসেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আপনারা কি চান? তারা বলল ঃ আমাদের বাসনা, আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকুন। আমরাও আপনাকে এবং আপনার উপাস্যকে মন্দ বলব না। এভাবে পারস্পরিক বিরোধের অবসান হবে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আচ্ছা, যদি আমি আপনাদের কথা মেনে নেই, তবে আপনারা কি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে সম্মত হবেন, যা উচ্চারণ করলে আপনারা সমগ্র আরবের প্রভু হয়ে যাবেন এবং অনারবরাও আপনাদের অনুগত ও করদাতায় পরিণত হয়ে যাবে?

আবু জাহল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল ঃ এরূপ বাক্য একটি নয়, আমরা দশটি উচ্চারণ করতে সম্মত। বলুন বাক্যটি কি? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। একথা শুনেতই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবু তালেবও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বললেন ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র, এ কলেমা ছাড়া অন্য কোন কথা বলুন। কেননা, আপনার সম্প্রদায় এ কলেমা শুনে ঘাবড়ে গেছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ চাচাজান, আমি এ কলেমা ছাড়া অন্য কোন কলেমা বলতে পারি না। যদি তারা আকাশ থেকে সূর্যকে নিয়ে আসে এবং আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি এ কলেমা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। এভাবে তিনি কোরাইশ সর্দারদেরকে নিরাশ করে দিলেন।

এতে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল ঃ হয় আপনি আমাদের উপাস্য প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত হবেন, না হয় আমরা আপনাকেও গালি দিব এবং ঐ সত্তাকেও, আপনি নিজেকে যার রসূল বলে দাবী করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থাৎ, আপনি ঐ প্রতিমাদেরকে মন্দ বলবেন না, যাদেরকে তারা উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। তাহলে তারা আল্লাহ্কে মন্দ বলা শুরু করবে পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে।

এখানে لَا تَسُبُّوا শব্দটি سب ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ গালি দেওয়া। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বভাবগত চরিত্রের কারণে শৈশবকালেও কোন মানুষকে বরং কোন জন্তুকেও কখনও গালি দেননি। সম্ভবতঃ কোন সাহাবীর মুখ থেকে এমন কোন কঠোর বাক্য বের হয়ে থাকতে পারে, যাকে মুশরিকরা গালি মনে করে নিয়েছে। কোরাইশ সর্দাররা এ ঘটনাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে রেখে ঘোষণা করেছে যে, আপনি আমাদের প্রতিমাদেরকে গালি-গালাজ করা থেকে বিরত না হলে আমরা আপনার আল্লাহ্কেও গালি-গালাজ করব।

এতে কোরআনের এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে কোন কঠোর বাক্য বলতে মুসলমানদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হচ্ছিল; যেমন বলা হয়েছে ঃ

اِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ .... وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ....

وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ

এবং -এসব বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছিল যে, আপনি এমন করুন কিংবা এমন করবেন না। অতঃপর এ আয়াতে সম্বোধনকে রসূলুল্লাহ্ থেকে ঘুরিয়ে সাধারণ মুসলমানদের দিকে করে দিয়ে لَا تَسُبُّوا বলা হয়েছে। এতে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তো কখনও কাউকে গালি দেননি। কাজেই সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। ফলে সব সাহাবায়ে কেরামও এ ব্যাপারে সাবধান হয়ে যান।—(বাহ্‌রে-মুহীত)

এখন প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাকের অনেক আয়াতে কঠোর ভাষায় প্রতিমাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এসব আয়াত রহিত নয়। অদ্যাবধি এগুলো তেলাওয়াত করা হয়।

উত্তর এই যে, কোরআনের আয়াতে যেখানে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে বিতর্ক হিসেবে কোন সত্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে তা

বলা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কারও মনে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য নয় এবং কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না যে, এতে প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা কিংবা মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছে। এ সুস্পষ্ট পার্থক্যটি প্রত্যেক ভাষার বিশেষ বাক-পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারে যে, কখনও কোন বিষয়ের তথ্য উদঘাটনের উদ্দেশে কোন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা হয়; যেমন সাধারণতঃ আদালতসমূহে এরূপ হয়ে থাকে। আদালতের সামনে প্রদত্ত এ ধরনের বিবৃতিকে জগতের কেউ এরূপ বলে না যে, অমুক অমুককে গালি দিয়েছে। এমনিভাবে ডাক্তার ও হাকীমদের সামনে মানুষের অনেক দোষ বর্ণিত হয়। এগুলোই অন্যত্র ও অন্যভাবে বর্ণিত হলে গালি মনে করা হবে। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশে এগুলো বর্ণনা করাকে কেউ গালি মনে করে না।

এমনিভাবে কোরআন পাক স্থানে স্থানে প্রতিমাদের অচেতন, অজ্ঞান, শক্তিহীন ও অসহায় হওয়ার কথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছে, যাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই তাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে নিতে পারে এবং যারা বুঝতে পারে না, তাদের ভ্রান্তি ও অদূরদর্শিতা ফুটে উঠে। বলা হয়েছে ঃ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ অর্থাৎ, প্রতিমা ও প্রতিমার উপাসক উভয়ই দুর্বল। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ, তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য প্রতিমারা— সবাই জাহান্নামের ইন্ধন। এখানেও কাউকে মন্দ বলা উদ্দেশ্য নয়— পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির কুপরিণাম ব্যক্ত করাই লক্ষ্য। ফেকাহ্‌বিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, কেউ এ আয়াতটি মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যে পাঠ করলে এ পাঠও নিষিদ্ধ গালির অন্তর্ভুক্ত এবং না-জায়েয হবে। যেমন, মকরূহ স্থানসমূহে কোরআন তেলাওয়াত যে না-জায়েয, তা সবাই জানে। – (রূহুল-মা'আনী)

মোটকথা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখে এবং কোরআন পাকে পূর্বে এরূপ কোন বাক্য উচ্চারিত হয়নি যাকে গালি বলা যায় এবং ভবিষ্যতেও উচ্চারিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। তবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে তা নিষেধ করা হয়েছে।

এ ঘটনা ও এ সম্পর্কিত কোরআনী নির্দেশ একটি বিরাট জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং কতিপয় মৌলিক বিধান এ থেকে বের হয়ে এসেছে।

কোন পাপের কারণ হওয়াও পাপ ঃ উদাহরণতঃ একটি মূলনীতি এই বের হয়েছে যে, যে কাজ নিজ সত্তার দিক দিয়ে বৈধ; বরং কোন না কোন স্তরে প্রশংসনীয়ও, সে কাজ করলে যদি কোন ফ্যাসাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে কিংবা তার ফলশ্রুতিতে মানুষ গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে সে কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা, মিথ্যা উপাস্য অর্থাৎ, প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা কমপক্ষে বৈধ অবশ্যই এবং ঈমানী মর্যাদাবোধের দিক দিয়ে দেখলে সম্ভবতঃ নিজ সত্তায় ছওয়াব ও প্রশংসনীয়ও বটে, কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে আশঙ্কা দেখা দেয় যে, প্রতিমাপূজারীরা আল্লাহ্ তাআলাকে মন্দ বলবে। অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিমাদেরকে মন্দ বলবে, সে এ মন্দের কারণ হয়ে যাবে। তাই এ বৈধ কাজটিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হাদীসে এর আরও একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত রয়েছে। একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন ঃ জাহেলিয়াত যুগে এক দুর্ঘটনায় কাবাগৃহ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কোরাইশরা তার পুনর্নির্মাণ করে। এ পুনর্নির্মাণে কয়েকটি বিষয় প্রাচীন ইবরাহীম ভিত্তির খেলাফ হয়ে গেছে। প্রথমতঃ কা'বার যে অংশকে 'হাতীম' বলা হয়, তাও কা'বাগৃহের অংশবিশেষ ছিল। কিন্তু পুনর্নির্মাণে অর্থাভাবের কারণে সে অংশ বাদ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কা'বা গৃহের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দু'টি দরজা ছিল। একটি প্রবেশের এবং অপরটি প্রস্থানের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। জাহেলিয়াত যুগের নির্মাতারা পশ্চিম দরজা বন্ধ করে একটি মাত্র দরজা রেখেছে। এটিও ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চে স্থাপন করেছে যাতে কেউ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কা'বা গৃহে প্রবেশ করতে না পারে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বললেন ঃ আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ইবরাহীম (আঃ)-এর নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, তোমার সম্প্রদায় অর্থাৎ, আরব জাতি নতুন নতুন মুসলমান হয়েছে। কা'বা গৃহ বিধ্বস্ত করলে তাদের মনে বিরূপ সন্দেহ দেখা দিতে পারে। তাই আমি আমার বাসনা মুলতবী রেখেছি।

এটা জানা কথা যে, কা'বা গৃহকে ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ নির্মাণ করা একটি এবাদত ও সওয়াবের কাজ ছিল। কিন্তু জনগণের অজ্ঞতার কারণে এতে আশঙ্কা আঁচ করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এ ঘটনা থেকেও এ মূলনীতিই জানা গেল যে, কোন বৈধ বরং সওয়াবের কাজেও যদি কোন অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তবে সে বৈধ কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এতে রূহুল মা'আনী গ্রন্থে আবু মনসুর কর্তৃক একটি আপত্তির বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের উপর জেহাদ ও কাফের নিধন ফরয করেছেন। অথচ কাফের নিধনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল এই যে, কোন মুসলমান কোন কাফেরকে হত্যা করলে কাফেররাও মুসলমানদেরকে হত্যা করবে। অথচ মুসলমানকে হত্যা করা হারাম। এখানে জেহাদ মুসলমান হত্যার কারণ হয়েছে। অতএব, উপরোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী জেহাদও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এমনিভাবে আমাদের প্রচারকার্য, কোরআন তেলওয়াত, আযান ও নামাযের প্রতি অনেক কাফের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। অতএব, আমরা কি তাদের এ ভ্রান্ত কর্মের দরুন নিজ এবাদত থেকেও হাত গুটিয়ে নেব?

এর জওয়াবও স্বয়ং আবু মনসুর থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি জরুরী শর্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে এ প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। শর্তটি এই যে, ফ্যাসাদ অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে যে বৈধ কাজটি নিষিদ্ধ করা হয়, তা ইসলামের উদ্দিষ্ট ও জরুরী কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া চাই। যেমন, মিথ্যা উপাস্যদেরকে মন্দ বলা। এর সাথে ইসলামের কোন উদ্দেশ্য সম্পর্কযুক্ত নয়। এমনিভাবে কা'বা গৃহের নির্মাণকে ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ করার উপরও ইসলামের কোন উদ্দেশ্য নির্ভরশীল নয়। তাই এগুলোর কারণে যখন কোন ধর্মীয় অনিষ্টের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তখন এগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কাজ স্বয়ং ইসলামের উদ্দেশ্য কিংবা কোন ইসলামী উদ্দেশ্য যার উপর নির্ভরশীল, যদি বিধর্মীদের ভ্রান্ত আচরণের কারণে তাতে কোন অনিষ্টও দেখা দেয়, তবুও এ জাতীয় উদ্দেশ্যকে কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা হবে না। বরং এরূপ কাজ স্বস্থানে অব্যাহত রেখে যতদূর সম্ভব অনিষ্টের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা হবে।

এ কারণেই একবার হযরত হাসান বসরী ও মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহঃ) উভয়েই এক জানাযার নামাযে যোগদানের উদ্দেশে রওয়ানা হন। নিকটে পৌঁছে দেখলেন, সেখানে পুরুষদের সাথে সাথে মহিলাদেরও সমাবেশ হয়েছে। এ অবস্থা দেখে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন সেখান থেকেই ফিরে গেলেন। কিন্তু হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বললেন ঃ জনসাধারণের

ভ্রান্ত কর্ম-পন্থার কারণে আমরা জরুরী কাজ কিরূপে ত্যাগ করতে পারি? জানাযার নামায ফরয। উপস্থিত অনিষ্টের কারণে তা ত্যাগ করা যায় না। তবে অনিষ্ট দূরীকরণের জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হবে।

এ ঘটনাটিও রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত রয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে উদ্ভূত মূলনীতির সারমর্ম এই যে, যে কাজ নিজ সত্তায় বৈধ বরং এবাদত, কিন্তু শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়, যদি তা করলে ফ্যাসাদ বা অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তবে তা বর্জন করা ওয়াজেব। পক্ষান্তরে কাজটি শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হলে অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণেও তা বর্জন করা যাবে না।

এ মূলনীতি অনুসরণ করে ফেকাহ্‌বিদগণ হাজারো বিধান ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ পিতা যদি অবাধ্য পুত্র সম্পর্কে একথা জানেন যে, তাকে কোন কাজ করতে বললে অস্বীকার করবে এবং বিরুদ্ধাচরণ করবে যদ্দরুন তার কঠোর গোনাহ্‌গার হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে, তবে পিতার উচিত আদেশের ভঙ্গিতে কাজটি করতে বা না করতে বলার পরিবর্তে উপদেশের ভঙ্গিতে এভাবে বলবেন ঃ অমুক কাজটি করলে খুবই ভাল হত। এভাবে অস্বীকার অথবা বিরুদ্ধাচরণ করলেও একটি নতুন অবাধ্যতার গোনাহ্ পুত্রের উপর বর্তাবে না। —(খোলাছাতুল ফাতাওয়া)

এমনিভাবে কাউকে উপদেশ দানের ক্ষেত্রেও যদি লক্ষণাদি দৃষ্টে জানা যায় যে, সে উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে কোন কুকাণ্ড করে বসবে, যদ্দরুন আরও অধিকতর গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তবে তাকে উপদেশ প্রদান না করাই উত্তম। ইমাম বোখারী স্বীয় হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রেখেছেন ঃ

باب من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فهم بعض الناس فيقعوا فى اشد منه

অর্থাৎ, মাঝে মাঝে বৈধ বরং উত্তম কাজও এজন্যে পরিত্যাগ করা হয় যে, তাতে স্বল্পবুদ্ধি জনগণের কোন ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে শর্ত এই যে, কাজটি ইসলামী উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া চাই।

কিন্তু যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত– ফরয, ওয়াজেব, সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ অথবা অন্য কোন প্রকার ইসলামী বৈশিষ্ট্য হবে তা করলে যদিও কিছু স্বল্পজ্ঞানী লোক ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়, তবু এ কাজ কখনও ত্যাগ করা যাবে না। বরং অন্য পন্থায় তাদের ভুল বোঝাবুঝির ও ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করা হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, নামায, কোরআন তেলাওয়াত ও ইসলাম প্রচারের কারণে কাফেররা উত্তেজিত হয়ে উঠত, কিন্তু এ কারণে এসব ইসলামী বৈশিষ্ট্য কখনও ত্যাগ করা হয়নি। স্বয়ং আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযূলে বর্ণিত আবু জাহল প্রমুখের ঘটনার সারমর্ম তাই ছিল যে, কোরাইশ সর্দাররা তওহীদ প্রচার ত্যাগ করার শর্তে সন্ধি স্থাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন যে, তারা যদি চন্দ্র ও সূর্য এনে আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি তওহীদ প্রচার ত্যাগ করতে পারি না।

তাই এ মাসআলাটি এভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত, যদি তা করলে কিছু লোক ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়, তবুও তা কখনও ত্যাগ করা যাবে না। অবশ্য যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং যা ত্যাগ করলে কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না, এ ধরনের কাজ অপরের ভুল বোঝাবুঝি অথবা ভ্রান্তির আশঙ্কার কারণে পরিত্যাগ করা উচিত।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুস্পষ্ট মো'জেযা ও আল্লাহ্ তাআলার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দেখা সত্ত্বেও হঠকারী লোকেরা সেগুলো দ্বারা উপকৃত হয়নি এবং স্বীয় অস্বীকার ও জেদে অটল রয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, তারা স্বীয় জেদ ও নতুন সংস্করণ রচনা করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে বিশেষ বিশেষ ধরনের মো'জেযা দাবী করেছে। যেমন, ইবনে জরীরের বর্ণনা অনুযায়ী কোরাইশ সর্দাররা দাবী উত্থাপন করেছে যে, আপনি যদি সাফা পাহাড়টি স্বর্ণে পরিণত হওয়ার মো'জেযা আমাদেরকে দেখাতে পারেন, তবে আমরা আপনার নবুওয়ত মেনে নেব এবং মুসলমান হয়ে যাব।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আচ্ছা, শপথ কর, যদি এ মো'জেযা প্রকাশ পায়, তবে তোমরা মুসলমান হয়ে যাবে। তারা শপথ করল। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করার জন্যে দাঁড়ালেন যে, এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল প্রত্যাদেশ নিয়ে এলেন যে, আপনি চাইলে আমি এক্ষুণি এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেব। কিন্তু আল্লাহ্‌র আইনানুযায়ী এর পরিণাম হবে এই যে, এরপরও বিশ্বাস স্থাপন না করলে ব্যাপক আযাব নাযিল করে সবাইকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। বিগত সম্প্রদায়সমূহের বেলায়ও তাই হয়েছে। তারা বিশেষ কোন মো'জেযা দাবী করার পর তা দেখানো হয়েছে। এরপরও যখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব ও আযাব নাযিল হয়েছে। দয়ার সাগর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কাফেরদের অভ্যাস ও হঠকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই দয়াপরবশ হয়ে বললেন ঃ এখন আমি এ মো'জেযার দোয়া করি না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ এতে কাফেরদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা প্রার্থিত মো'জেযা প্রকাশিত হলে মুসলমান হওয়ার জন্যে শপথ করল। এর পরবর্তী إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ আয়াতে তাদের উক্তির জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, মো'জেযা ও নিদর্শন সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। যেসব মো'জেযা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোও তাঁর পক্ষ থেকেই ছিল এবং যেসব মো'জেযা দাবী করা হচ্ছে, এগুলো প্রকাশ করতেও তিনি পূর্ণরূপে সক্ষম। কিন্তু বিবেক ও ইনসাফের দিক দিয়ে তাদের এরূপ দাবী করার কোন অধিকার নেই। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রেসালতের দাবীদার এবং এ দাবীর পক্ষে অনেক যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য মো'জেযা আকারে উপস্থিত করেছেন। এখন এসব যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য খণ্ডন করার এবং ভ্রান্ত প্রমাণিত করার অধিকার প্রতিপক্ষের আছে। কিন্তু এসব সাক্ষ্য খণ্ডন না করে অন্য সাক্ষ্য দাবী করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যেমন, আদালতে কোন বিবাদী বাদীর উপস্থিত করা সাক্ষীদের অযোগ্যতা প্রমাণ না করেই দাবী করে বসে যে, আমি এসব সাক্ষীর সাক্ষ্য মানি না। অমুক নির্দিষ্ট ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলে তা মেনে নেব। বাদীর এ উদ্ভট দাবীর প্রতি কোন আদালতই কর্ণপাত করবে না।

এমনিভাবে নবুওয়ত ও রেসালতের পক্ষে অসংখ্য নিদর্শন ও মো'জেযা প্রকাশিত হওয়ার পর এগুলো খণ্ডন না করা পর্যন্ত তাদের এরূপ বলার অধিকার নেই যে, আমরা তো অমুক ধরনের মো'জেযা দেখেই বিশ্বাস স্থাপন করব।

এরপর শেষ অবধি আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে আদেশ করা হয়েছে যে, নিজে সত্য ধর্মে কায়েম থাকা এবং অপরের কাছে তা শুদ্ধরূপে পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে তোমাদের দায়িত্ব। এরপরও যদি তারা হঠকারিতা করে, তবে তাদের চিন্তায় মাথা ঘামানো উচিত নয়। কেননা, জোর-জবরদস্তি করে কাউকে মুসলমান করা উদ্দেশ্য নয়। যদি তা উদ্দেশ্য হত, তবে তা করিতে আল্লাহ্‌র চাইতে শক্তিশালী কে? তিনি নিজেই সবাইকে মুসলমান করে দিতেন। এসব আয়াতে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দান করার জন্যে আরও বলা হয়েছে যে, আমি যদি তাদের প্রার্থিত

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَ
حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ
اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ
عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ
زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ
وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ اَفَغَيْرَ
اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۚ
وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ
بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾
وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ
اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٦﴾ اِنَّ رَبَّكَ
هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١١٧﴾
فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾

(১১১) আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে অবতারণ করতাম এবং তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে জীবিত করে দিতাম, তথাপি তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী নয় ; কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ। (১১২) এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। (১১৩) অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যাপবাদকে মুক্ত ছেড়ে দিন যাতে কারুকার্যখচিত বাক্যের প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয় যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং তারা একেও পছন্দ করে নেয় এবং যাতে ঐসব কাজ করে, যা তারা করছে। (১১৪) তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন? আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি, তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (১১৫) আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (১১৬) আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে। (১১৭) আপনার প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যারা তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয় এবং তিনি তাদেরকেও খুব ভাল করে জানেন, যারা তাঁর পথে অনুগমন করে। (১১৮) অতঃপর যে জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়, তা থেকে ভক্ষণ কর যদি তোমরা তাঁর বিধানসমূহে বিশ্বাসী হও।

মো'জেযাসমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দেই, তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা, তাদের অস্বীকৃতি কোন ভুল বোঝাবুঝি ও অজ্ঞতার কারণে নয়, বরং জেদ ও হঠকারিতার কারণে। কোন মো'জেযা দ্বারা এর প্রতিকার হবার নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ আয়াতে এ বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে যে, যদি আমি তাদের প্রার্থিত মো'জেযাসমূহ দেখিয়ে দেই ; বরং এর চাইতেও বেশী– ফেরেশতাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ এবং মৃতদের সাথে বাক্যালাপ করিয়ে দেই, তবুও তারা মানবে না। পরবর্তী দু'আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, এরা যদি আপনার সাথে শত্রুতা করে, তবে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরেরও অব্যাহতভাবে শত্রু ছিল। অতএব, আপনি এতে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না।

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا —অর্থাৎ, তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ্ তাআলার এ ফয়সালার পর আমি অন্য কোন ফয়সালাকারী অনুসন্ধান করি? না, তা হতে পারে না। এরপর কোরআন পাকের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো স্বয়ং কোরআনের সত্যতা এবং আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ারই প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে ঃ وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا এ আয়াতে কোরআন পাকের চারটি বিশেষ পূর্ণতার কথা বর্ণিত হয়েছে ঃ (এক) কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (দুই) এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অলৌকিক গ্রন্থ–এর মোকাবেলা করতে সারা বিশ্ব অক্ষম। (তিন) যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়বস্তু এতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। (চার) পূর্ববর্তী আহ্‌লে কিতাব ইহুদী ও খ্রীষ্টানরাও নিশ্চিতভাবে জানে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্য কালাম। এরপর তাদের মধ্যে যারা সত্যভাষী ছিল, তারা একথা প্রকাশও করেছে। পক্ষান্তরে যারা হঠকারী, তারা বিশ্বাস সত্ত্বেও তা প্রকাশ করেনি।

কোরআন পাকের এ চারটি পূর্ণতা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে ঃ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ অর্থাৎ "এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের পর আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।" এটা জানা কথা যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন সময়ই সংশয়কারী ছিলেন না, থাকতে পারেন না; যেমন স্বয়ং তিনি বলেন ঃ আমি কোন সময় সন্দেহ করিনি এবং প্রশ্ন করিনি —(ইবনে-কাসীর)। এতে বোঝা গেল যে, এখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য লোকদের শোনানোই এর উদ্দেশ্য। এছাড়া বিষয়টিকে জোরদার করার উদ্দেশে সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কেই যখন এরূপ বলা হয়েছে, এখন অন্য আর কে সন্দেহ করতে পারে?

দ্বিতীয় আয়াতে কোরআন পাকের আরও দু'টি বৈশিষ্ট্যমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোও কোরআন পাক যে আল্লাহ্‌র কালাম, এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলা হয়েছে ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ

অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তার কালাম সত্যতা, ইনসাফ ও সমতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ। তাঁর কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই।

وَتَمَّتْ শব্দে সম্পূর্ণ হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং كَلِمَتُ رَبِّكَ বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। —(বাহ্‌রে-মুহীত)। কোরআনের গোটা বিষয়বস্তু দু'প্রকার, (এক) যাতে বিশ্ব ইতিহাসের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, অবস্থা, সৎকাজের জন্যে পুরস্কারের ওয়াদা এবং অসৎ কাজের জন্যে শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন বর্ণিত হয়েছে এবং (দুই) যাতে মানব জাতির কল্যাণ ও সাফল্যের বিধান বর্ণিত হয়েছে। কোরআন পাকের এ দুই প্রকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে صِدْقًا وَّعَدْلًا দুই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। صدق -এর সম্পর্ক প্রথম প্রকারের সাথে ; অর্থাৎ, কোরআনে যেসব ঘটনা, অবস্থা, ওয়াদা ও ভীতি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই সত্য ও নির্ভুল। এগুলোতে কোনরূপ ভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই। عدل এর সম্পর্ক দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, বিধানের সাথে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলার সব বিধান عدل তথা ন্যায়বিচার ভিত্তিক। عدل শব্দের দুটি অর্থ ঃ (এক) ইনসাফ, যাতে কারও প্রতি অবিচার ও অধিকার হরণ করা হয় না। (দুই) সমতা ও সুষমতা। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র বিধান সম্পূর্ণরূপে মানবিক প্রবৃত্তির অনুসারীও নয় এবং এমনও নয় যে, মানবিক প্রেরণা ও স্বভাবগত ধারণ ক্ষমতা তা সহ্য করতে পারে না। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, খোদায়ী বিধান সুবিচার ও সমতার উপর ভিত্তিশীল। এতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং এমন কোন কঠোরতাও নেই যা মানুষ সহ্য করতে পারে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বাইরে কারো প্রতি কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেননি। আলোচ্য আয়াতে تمت শব্দ ব্যবহার করে আরও বলা হয়েছে যে, কোরআনে শুধু صدق ও عدل বিদ্যমানই নয়, বরং কোরআন এসব গুণে সব দিক দিয়ে পূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কোরআন পাকের যাবতীয় বিধান বিশ্বের সকল জাতি, কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধর এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্যে সুবিচার ও সমতাভিত্তিক। একথাটি একমাত্র আল্লাহ্ রচিত বিধানের মধ্যেই থাকা সম্ভবপর হতে পারে। জগতের কোন আইনসভা বর্তমান ও ভবিষ্যত সকল অবস্থা পুরোপুরি অনুমান করে তদনুযায়ী কোন আইন রচনা করতে পারে না। প্রত্যেক দেশ ও জাতি নিজ দেশ ও জাতির শুধু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আইন রচনা করে। এসব আইনের মধ্যেও অনেক বিষয় অভিজ্ঞতার পর সুবিচার ও সমতার পরিপন্থী দেখা গেলে সেগুলো পরিবর্তন করতে হয়। ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক অবস্থার জন্যে সুবিচার ও সমতাভিত্তিক আইন রচনা করার বিষয়টি মানুষের চিন্তা-কল্পনারও অনেক উর্ধ্বে। এটা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার কালামেই সম্ভবপর। তাই কোরআন পাকের এ পঞ্চম অবস্থাটি (অর্থাৎ, কোরআনে বর্ণিত অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী, পুরস্কারের ওয়াদা ও শাস্তির ভীতি- প্রদর্শন সবই সত্য; এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কোরআন বর্ণিত যাবতীয় বিধান সমগ্র বিশ্ব ও কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরদের জন্যে সুবিচার ও সমতাভিত্তিক, এগুলোতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং সমতা ও মধ্যবর্তিতার চুল পরিমাণ লঙ্ঘন নেই।) কোরআন যে আল্লাহ্‌র কালাম – তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কোরআনের ষষ্ঠ অবস্থা এই যে, لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই। পরিবর্তনের এক প্রকার হচ্ছে যে, এতে কোন ভুল প্রমাণিত করার কারণে পরিবর্তন করা এবং দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে জবরদস্তিমূলকভাবে পরিবর্তন করা। আল্লাহ্‌র কালাম এ সকল প্রকার পরিবর্তনেরই উর্ধ্বে। আল্লাহ্ স্বয়ং ওয়াদা করেছেনঃ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ অর্থাৎ, আমিই কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক। এমতাবস্থায় কার সাধ্য আছে যে, এ রক্ষাব্যূহ ভেদ করে এতে পরিবর্তন করে? কোরআনের উপর দিয়ে চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রতি শতাব্দী ও প্রতি যুগে এর শত্রুদের সংখ্যাও এর অনুসারীদের তুলনায় বেশী ছিল ; কিন্তু এর একটি যের ও যবর পরিবর্তন করার সাধ্যই কারো হয়নি। অবশ্য একটি তৃতীয় প্রকার পরিবর্তন সম্ভবপর ছিল। তা এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা কোরআনকে রহিত করে পরিবর্তন করতে পারতেন। একারণেই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সর্বশেষ পয়গম্বর এবং কোরআন সর্বশেষ গ্রন্থ। একে রহিতকরণের আর কোন সম্ভাবনা নেই। কোরআনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি আরও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ, তারা যেসব কথাবার্তা বলছে, আল্লাহ্ সব শোনেন এবং সবার অবস্থা জানেন। তিনি প্রত্যেকের কার্যের প্রতিফল দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অবহিত করেছেন যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট। আপনি এতে ভীত হবেন না এবং তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। কোরআন একাধিক জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ উদ্দেশ্য এই যে, সংখ্যাধিক্যের ভীতি স্বভাবতই মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ফলে মানুষ তাদের আনুগত্য করতে থাকে। কাজেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলা হয়েছে ঃ

পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক এমন রয়েছে যে, আপনি যদি তাদের নির্দেশ মান্য করেন, তবে তারা আপনাকে বিপথগামী করে দেবে। কেননা, তারা বিশ্বাস ও মতবাদে শুধুমাত্র কল্পনা ও কুসংস্কারের পেছনে চলে এবং বিধি-বিধানে একমাত্র ভিত্তিহীন অনুমান দ্বারা চালিত হয়।

মোটকথা, আপনি তাদের সংখ্যাধিক্যে ভীত হয়ে তাদের সাথে একাত্মতার কথা চিন্তাও করবেন না। কারণ, এরা সবাই নীতিহীন ও বিপথগামী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্‌র পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়ে যায় এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে চলে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা তাদের সবাইকে জানেন। অতএব, তিনি বিপথগামীদেরকে যেমন শাস্তি দেবেন, তেমনি সরল পথের অনুসারীদেরকেও পুরস্কৃত করবেন।

مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এ বাক্যে ইচ্ছাধীন যবেহ ও নিরুপায় অবস্থার যবেহ্— উভয় প্রকার যবেহকেই বোঝানো হয়েছে। নিরুপায় অবস্থার যবেহ হচ্ছে তীর, বাজপক্ষী ও কুকুরের শিকার করা জন্তু। এগুলো ছাড়ার সময় বিছমিল্লাহ্ পাঠ করলে এদের শিকার করা জন্তু জীবিত না পাওয়া গেলেও তাকে যবেহ করা জন্তু বলেই মনে করতে হবে। অবশ্য জীবিত পাওয়া গেলে ইচ্ছাধীনভাবে যবেহ্ করতে হবে। যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণও দুই প্রকারে হতে পারে— (এক) সত্যিকার উচ্চারণ এবং (দুই)— অসত্যিকার ও নির্দেশগত উচ্চারণ। যেমন, মুসলমান ব্যক্তি কর্তৃক ভুলক্রমে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করে যবেহ করা। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে ভুলক্রমে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করলেও তা উপরোক্ত বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং হালাল হবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে উচ্চারণ না করলে হারাম হবে।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ
لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا
لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا تَأْكُلُوا
مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ
لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ
لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا
يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَٰلِكَ
جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا
يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ
آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ
اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

(১১৯) কোন্ কারণে তোমরা এমন জন্তু থেকে ভক্ষণ করবে না, যার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়, অথচ আল্লাহ্ ঐ সব জন্তুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলোকে তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন; কিন্তু সেগুলোও তোমাদের জন্যে হালাল, যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও। অনেক লোক স্বীয় ভ্রান্ত, প্রবৃত্তি দ্বারা না জেনে বিপথগামী করতে থাকে। আপনার প্রতিপালক সীমাতিক্রমকারীদেরকে যথার্থই জানেন। (১২০) তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গোনাহ্ পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় যারা গোনাহ্ করছে, তারা অতিসত্বর তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে। (১২১) যেসব জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না ; এ ভক্ষণ করা গোনাহ্। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে— যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরেক হয়ে যাবে। (১২২) আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে— সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এমনিভাবে কাফেরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। (১২৩) আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি— যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। (১২৪) যখন তাদের কাছে কোন আয়াত পৌঁছে, তখন বলে ঃ আমরা কখনই মানব না যে পর্যন্ত না আমরাও তা প্রদত্ত হই, যা আল্লাহ্‌র রসূলগণ প্রদত্ত হয়েছেন। আল্লাহ্ এবিষয়ে সুপারিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে। যারা অপরাধ করছে, তারা অতিসত্বর আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি পাবে, তাদের চক্রান্তের কারণে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে উল্লেখিত হয়েছিল যে, ইসলামের শত্রুরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও কোরআন পাকের খোলাখুলি মো'জেযা দেখা সত্ত্বেও জেদ ও হঠকারিতাবশতঃ নতুন নতুন মো'জেযা দাবী করে। অতঃপর কোরআন ব্যক্ত করেছে যে, যদি তারা বাস্তবিকই সত্যান্বেষী হত, তবে এ যাবত যেসব মো'জেযা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্যে পর্যাপ্তের চাইতেও বেশী ছিল। অতঃপর সেসব মো'জেযা বর্ণিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং কোরআনে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদর কিছু অবস্থা, চিন্তাধারা, উভয়ের সু ও কুপরিণামের বর্ণনা, মুমিন ও কাফের এবং ঈমান ও কুফরের স্বরূপ উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। মুমিন ও কাফেরের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত দ্বারা এবং ঈমান ও কুফরের দৃষ্টান্ত আলোক ও অন্ধকার দ্বারা দেয়া হয়েছে। এগুলো কোরআন বর্ণিত দৃষ্টান্ত। এগুলোতে কবিত্ব নেই— আছে সত্যের উদ্‌ঘাটন।

মুমিন জীবিত, আর কাফের মৃত ঃ এ দৃষ্টান্তে মুমিনকে জীবিত এবং কাফেরকে মৃত বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, মানুষ, জীব-জন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদির মধ্যে জীবনের প্রকার ও রূপরেখা যদিও ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু বিষয়টি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না যে, এদের মধ্যে প্রত্যেকের জীবনই কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত। প্রকৃতি প্রত্যেকের মধ্যে সে লক্ষ্য অর্জনের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা নিহিত রেখেছে। أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ —কোরআনের এ বাক্যে এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহ্ তাআলা, বিশ্ব জাহানের প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে অভীষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছার জন্যে পূর্ণরূপে পথ প্রদর্শন করেছেন। এ পথ প্রদর্শন অনুযায়ী প্রত্যেক সৃষ্টজীব নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়ে তা পালন করে যাচ্ছে। কর্তব্য পালনই তাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রমাণ। এদের মধ্যে যে বস্তু যখন যে অবস্থায় স্বীয় কর্তব্য পালন ত্যাগ করে, তখন সে জীবিত নয়– মৃত। পানি যদি স্বীয় কর্তব্য পিপাসা নিবারণ ও ময়লা নিষ্কাশন ইত্যাদি ছেড়ে দেয়, তবে তাকে পানি বলা যায় না। আগুন জ্বালানো-পোড়ানো ছেড়ে দিলে আগুন থাকবে না। বৃক্ষ ও ঘাস উৎপন্ন হওয়া, বেড়ে উঠা অতঃপর ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হওয়া ত্যাগ করলে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ থাকবে না। কেননা, সে স্বীয় জীবনের লক্ষ্যকে ত্যাগ করেছে। ফলে সে নিষ্প্রাণ মৃতের মত হয়ে গেছে।

সমগ্র সৃষ্ট জগতের বিস্তারিত পর্যালোচনা করার পর সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিও এ ব্যাপারে চিন্তা করতে বাধ্য হবে যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? সে যদি স্বীয় জীবনের লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়, তবে সে জীবিত বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। নতুবা তার স্বরূপ একটি মৃতদেহের চাইতে বেশী কিছু নয়।

এখন দেখতে হবে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? উল্লেখিত নীতি অনুযায়ী একথা সুনির্দিষ্ট যে, সে যদি জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য পালন করে যায়, তবে সে জীবত, নতুবা মৃত বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। যেসব জ্ঞানপাপী পন্ডিত মানুষকে জগতের একটি স্বউদ্‌গত ঘাস কিংবা একটি চালাক ধরনের জন্তু বলে সাব্যস্ত করেছে, যাদের মতে মানুষ ও গাধার মধ্যে কোন স্বাতন্ত্র্য নেই এবং যারা মানবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ এবং অবশেষে মরে যাওয়াকেই মানব জীবনের

লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছে, তারা প্রকৃত জ্ঞানীদের কাছে সম্বোধনের যোগ্যও নয়। বিশ্বের প্রত্যেক ধর্ম ও চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কশীল মনীষীবৃন্দ সৃষ্টির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি এ বিষয়ে একমত যে, মানুষ সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মাখলুকাত। এটা জানা কথা যে, যার জীবনের লক্ষ্য সেরা ও উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী, তাকেই সেরা ও উত্তম বলা যেতে পারে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথাও জানে যে, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ, বসবাস ও পরিধানের ব্যাপারে অন্যান্য জীব-জন্তুর চাইতে মানুষের বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। বরং অনেক জীবজন্তু মানুষের চাইতে উত্তম ও বেশী পানাহার করে, মানুষের চাইতে ভাল প্রাকৃতিক পোশাকে পরিবৃত এবং মানুষের চাইতে উৎকৃষ্ট আলো-বাতাসে বসবাস করে। নিজের লাভ-লোকসান চেনার ব্যাপারেও প্রত্যেক জন্তু বরং প্রত্যেক উদ্ভিদ বেশ সচেতন। উপকারী বস্তু অর্জন এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে আত্মরক্ষার যথেষ্ট যোগ্যতা তারা রাখে। এমনিভাবে অপরের উপকার সাধনের ব্যাপারে তো সকল জীবজন্তু ও উদ্ভিদ বাহ্যতঃ মানুষের চাইতেও অগ্রে। তাদের মাংস, চামড়া, অস্থি, রগ এবং বৃক্ষের শিকড় থেকে নিয়ে শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু সৃষ্টজীবের জন্যে উপকারী। পক্ষান্তরে মানুষের মাংস, চামড়া, লোম, অস্থি, রগ ইত্যাদি কোন কাজেই আসে না।

এখন দেখতে হবে, এমতাবস্থায় মানুষ কিসের ভিত্তিতে 'সৃষ্টির সেরা' পদে অভিষিক্ত হয়েছে? সত্যোপলব্ধির মনযিল এবার কাছেই এসে গেছে। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, উপরোক্ত বস্তুসমূহের বুদ্ধি ও চেতনার দৌড় উপস্থিত জীবনের সাময়িক লাভ-লোকসান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এ জীবনেই এগুলো অপরের জন্যে উপকারী বলে দেখা যায়। পার্থিব জীবনের পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি হবে— এ ক্ষেত্রে জড়পদার্থ ও উদ্ভিদের তো কথাই নেই, কোন বৃহত্তম হুশিয়ার জন্তুর জ্ঞান-চেতনাও কাজ করে না এবং এক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে কোন বস্তুই কারও উপকারে আসে না। ব্যস, এক্ষেত্রেই সৃষ্টির সেরা মানুষকে কাজ করতে হবে এবং এর দ্বারাই অন্যান্য সৃষ্টজীব থেকে তার স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হতে পারে।

জানা গেল যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের আদি-অন্তকে সামনে রেখে সবার পরিণাম চিন্তা করে এটা নির্ধারণ করা যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে কোন্ বস্তু উপকারী এবং কোন্ বস্তু ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক। অতঃপর এ জ্ঞানের আলোতে নিজের জন্যে উপকারী বস্তুসমূহ অর্জন করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা। অপরকেও এসব উপকারী বস্তুসমূহের প্রতি আহ্বান করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হওয়া, যাতে চিরস্থায়ী সুখ, আরাম ও শান্তির জীবন অর্জিত হয়। যখন মানব জীবনের লক্ষ্য এবং মানবিক পূর্ণতার এ আদর্শগত উপকার নিজেকে অর্জন করতে হবে এবং অপরকে পৌঁছাতে হবে, তখন কোরআনের এ দৃষ্টান্ত বাস্তব রূপ ধারণ করে ফুটে উঠবে যে, ঐ ব্যক্তিই জীবিত যে, আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বের আদি-অন্ত ও এর সামগ্রিক লাভ-লোকসানকে খোদায়ী প্রত্যাদেশের আলোকে যাচাই করে। কেননা, নিছক মানবিক জ্ঞান-বুদ্ধি কখনও একাজ করেনি এবং করতে পারেও না। বিশ্বের বড় বড় পন্ডিত ও দার্শনিক অবশেষে একথা স্বীকার করেছেন।

ঈমান আলো এবং কুফর অন্ধকার ঃ ঈমানকে আলো এবং কুফরকে অন্ধকার বলা হয়েছে। চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ দৃষ্টান্তটি মোটেই কাল্পনিক নয়— বাস্তব সত্যেরই বর্ণনা। আলো ও অন্ধকারের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে দৃষ্টান্তের স্বরূপ ফুটে উঠবে। আলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিকট ও দূরের বস্তুসমূহ দেখা, যার ফলে ক্ষতিকর বস্তুসমূহ বেঁচে থাকা এবং উপকারী বস্তুসমূহকে অবলম্বন করার সুযোগ পাওয়া যায়।

এখন ঈমানকে দেখুন। সেটি একটি নূর, যার আলো সমগ্র আকাশ, ভূপৃষ্ঠ এবং এগুলোর বাইরের সব বস্তুতে প্রতিফলিত। একমাত্র এ আলোই গোটা বিশ্বের পরিণাম এবং সবকিছুর বিশুদ্ধ ফলাফল দেখাতে পারে। যার কাছে এ নূর থাকে, সে নিজেও সব ক্ষতিকর বস্তু থেকে বাঁচতে পারে এবং অপরকেও বাঁচাতে পারে। পক্ষান্তরে যার কাছে এ আলো নেই, সে নিজে অন্ধকারে নিমজ্জিত। সামগ্রিক বিশ্ব এবং গোটা জীবনের দিক দিয়ে কোন্ বস্তু উপকারী এবং কোন্ বস্তু অপকারী, সে তা বাছাই করতে পারে না। শুধু হাতের কাছের বস্তুসমূহকে অনুমান করে কিছু চিনতে পারে। ইহকালীন জীবনই হচ্ছে হাতের কাছের পরিবেশ। কাফের ব্যক্তি পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী এ জীবন এবং এর লাভ-লোকসান চিনে নেয়। কিন্তু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের কোন খবরই সে রাখে না। এ জীবনের লাভ-লোকসানের কোন অনুভূতিও তার নেই? কোরআন পাক এ বিষয়টি বোঝাবার জন্যেই বলেছে ঃ

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ

অর্থাৎ, তারা বাহ্যিক পার্থিব জীবন এবং এর লাভ-লোকসান যৎসামান্য বোঝে, কিন্তু পরকাল সম্পর্কে এরা একেবারেই গাফেল।

অন্য এক আয়াতে পূর্ববর্তী কাফের সম্প্রদায়সমূহের কথা উল্লেখ করার পর কোরআন বলে ঃ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ অর্থাৎ, পরকালের ব্যাপারে এমন তীব্র গাফেল ব্যক্তিরা এ জগতে বোকা ও নির্বোধ ছিল না; বরং তারা ছিল উর্বর মস্তিষ্ক প্রগতিবাদী। কিন্তু এ বাহ্যিক চিন্তার ঔজ্জ্বল্য শুধু জগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরিপাটিতেই কাজে লাগতে পারত। পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে এর কোন প্রভাব ছিল না।

এ বিবরণ শোনার পর আলোচ্য আয়াতটি পুনরায় পাঠ করুন ঃ

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي

النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি পূর্বে মৃত অর্থাৎ, কাফের ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি অর্থাৎ, মুসলমান করেছি এবং তাকে এমন একটি নূর অর্থাৎ, ঈমান দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে এমন অন্ধকারে নিমজ্জিত, যা থেকে বের হতে পারে না। অর্থাৎ, কুফরের অন্ধকারসমূহে পতিত। সে নিজেই নিজের লাভ-লোকসান চিনে না, অপরকে কি উপকার করবে।

ঈমানের আলোর উপকার অন্যেরাও পায় ঃ এ আয়াতে نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ বলে এ কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ঈমানের আলো শুধু মসজিদ, খানকা, নির্জন প্রকোষ্ঠ কিংবা হুজরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নূর প্রাপ্ত হয়, সে একে নিয়ে জনসমাবেশে চলাফেরা করে এবং সর্বত্র এর দ্বারা নিজেও উপকৃত হয় এবং অপরকেও উপকার পৌঁছায়। আলো কোন অন্ধকারের কাছে পরাভূত হয় না। একটি মিটিমিটি প্রদীপ ও অন্ধকারে নতিস্বীকার করে না, তবে প্রদীপের আলো দূর পর্যন্ত পৌঁছে না। কিরণ প্রখর হলে দূর

পর্যন্ত পৌছে এবং নিস্তেজ হলে অল্প স্থান আলোকিত করে। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই সে অন্ধকার ভেদ করে। অন্ধকার তাকে ভেদ করতে পারে না। অন্ধকার যে আলোকে ভেদ করে, সে আলোই নয়। এমনিভাবে যে ঈমান কুফরের কাছে পরাভূত হয়ে যায়, তা ঈমানই নয়। ঈমানের নূর মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় ও সর্বযুগে মানুষের সাথে থাকে।

এমনিভাবে এ দৃষ্টান্তে আরও একটি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলোর উপকারিতা প্রত্যেক মানুষ ও জীব-জন্তু ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় কিছু না কিছু ভোগ করে। মনে করুন, আলোর মালিক চায় না যে, অন্য কেউ এ আলোর দ্বারা উপকৃত হোক এবং অপর ব্যক্তিও উপকার লাভের ইচ্ছা করেনি; কিন্তু কারো সাথে আলো থাকলে অনিচ্ছায় ও স্বাভাবিকভাবে সবাই তদ্দ্বারা উপকৃত হবে। এমনিভাবে মুমিনের ঈমান দ্বারা অন্যরাও কিছু না কিছু উপকার লাভ করে, সে অনুভব করুক বা না করুক। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ অর্থাৎ, এসব স্পষ্ট ও খোলাখুলি প্রমাণ সত্ত্বেও কাফেরদের কুফরে অটল থাকার কারণ এই যে, প্রত্যেকেই নিজ ধারণায় একটা না একটা বাতিক পোষণ করে। শয়তান ও মানসিক প্রবৃত্তি তাদের মন্দ কাজকেই তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে রেখেছে। এটা মারাত্মক বিভ্রান্তি।-(নাউযুবিল্লাহ মিনহু)

পূর্ববর্তী আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছিল যে, এ জগত একটি পরীক্ষাকেন্দ্র। এখানে সৎকর্মের সাথে যেমন কিছু পরিশ্রম, কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি রয়েছে, তেমনি মন্দ কর্মের সাথে ক্ষণস্থায়ী আনন্দ এবং কামনা-বাসনার ধোঁকা সংযুক্ত রয়েছে। এ ধোঁকা অপরিণামদর্শী মানুষের দৃষ্টিতে তাদের মন্দ কাজকেই সুশোভিত করে রাখে। জগতের অনেক চতুর ব্যক্তিও এ ধোঁকায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথমটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, এটাও এ পরীক্ষারই এক পিঠ যে, পৃথিবীর আদিকাল থেকে প্রত্যেক জনপদের সর্দার ও ধনী ব্যক্তিরাই বাস্তব সত্য ও পরিণাম ফল থেকে উদাসীন হয়ে ক্ষণস্থায়ী আনন্দে বিভোর হয়ে অপরাধ করে থাকে এবং জনসাধারণ বড় লোকদের পিছনে চলা এবং তাদের অনুকরণ করাকেই সৌভাগ্য ও সাফল্য গণ্য করে। আম্বিয়া (আঃ) ও তাঁদের নায়েব আলেম ও মাশায়েখগণ তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে এবং পরিণামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইলে বড় লোকেরা তাঁদের বিরুদ্ধে নানারকম চক্রান্ত করে। এসব চক্রান্ত বাহ্যতঃ পয়গম্বর, আলেম ও মাশায়েখদের বিরুদ্ধে হলেও পরিণামের দিক দিয়ে এগুলোর শাস্তি স্বয়ং তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে এবং প্রায়শঃ দুনিয়াতেও তা প্রকাশ পায়।

এতে মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যাতে তারা বড় লোক ও ধনীদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, যেন তাদের পিছনে চলার অভ্যাস না করে, যেন পরিণামদর্শিতা অবলম্বন করে এবং ভাল-মন্দ যেন নিজেই চিনে নেয়।

এছাড়া আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, কোরাইশ সর্দারদের বিরুদ্ধাচরণে আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। এটা নতুন ঘটনা নয়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদেরকেও এধরনের লোকের সাথে পালা পড়েছে। পরিণামে এরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে।

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন যে, কোরাইশ প্রধান আবু জাহল একবার বলল যে, আবদে মনাফ গোত্রের (অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গোত্রের) সাথে আমরা প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা করেছি এবং কখনও পিছনে পড়িনি। কিন্তু এখন তারা বলে ঃ তোমরা ভদ্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের সমতুল্য হতে পারবে না। আমাদের পরিবারে একজন নবী আগমন করেছেন। তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী আসে। আবু জাহল বললঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমরা কোনদিনই তাদের অনুসরণ করব না, যে পর্যন্ত না আমাদের কাছে তাদের অনুরূপ ওহী আসে। আয়াতের وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ বাক্যের অর্থ তাই।

নবুওয়ত সাধনালব্ধ বিষয় নয়, বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি মহান পদ ঃ কোরআন পাক এ উক্তি বর্ণনা করার পর জওয়াবে বলেছে ঃ

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলাই জানেন, রেসালত কাকে দান করতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ নির্বোধ মনে করে রেখেছে যে, নবুওয়ত বংশগত সম্ভ্রান্ততা কিংবা গোত্রীয় সর্দারী ও ধনাঢ্যতার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। অথচ নবুওয়ত হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের একটি পদ। এটা অর্জন করা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত। হাজারো গুণ অর্জন করার পরও কেউ স্বেচ্ছায় অথবা গুণের জোরে রেসালত অর্জন করতে পারে না। এটা খাঁটি আল্লাহ্‌র দান। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, রেসালত ও নবুওয়ত উপার্জন করার বস্তু নয় যে, জ্ঞানগত ও কর্মগত গুণাবলী অথবা সাধনা ইত্যাদি দ্বারা অর্জন করা যাবে। আল্লাহ্‌র বন্ধুত্বের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেও কেউ নবুওয়ত লাভ করতে পারে না। বরং আল্লাহ্‌র এ খাঁটি অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও রহস্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বন্দাকে দান করা হয়। তবে এটা জরুরী যে, আল্লাহ্ যাকে এ পদমর্যাদা দিতে ইচ্ছা করেন তাকে প্রথম থেকেই এর জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়, তাঁর চরিত্র ও কাজকর্ম বিশেষভাবে গঠন করা হয়।

আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ

এখানে صغار শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ, অপমান ও লাঞ্ছনা। এ বাক্যের অর্থ এই যে, সত্যের যেসব শত্রু আজ স্বগোত্রে সর্দার ও বড় লোক খেতাবে ভূষিত, অতিসত্বর তাদের বড়ত্ব ও সম্মান ধুলায় লুণ্ঠিত হবে। আল্লাহ্‌র কাছে তারা তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে এবং কঠোর শাস্তিতে পতিত হবে।

'আল্লাহ্‌র কাছে' -এর এক অর্থ এই যে, কেয়ামতের দিন যখন তারা আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে, তখন অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। অতঃপর তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। দ্বিতীয় অর্থ এটাও হতে পারে যে, বর্তমানে বাহ্যতঃ তারা সর্দার ও সম্মানিত হলেও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা স্পর্শ করবে। এমনটি দুনিয়াতেও হতে পারে এবং পরকালেও। যেমন, পয়গম্বরদের শত্রুদের ব্যাপারে জগতের ইতিহাসে এরূপ হতে দেখা গেছে। অর্থাৎ, তাঁদের শত্রুরা পরিণামে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বড় বড় শত্রু, যারা নিজেরা সম্মানী বলে খুব আস্ফালন করত, তারা একে একে হয় ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে, না হয়

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢٩﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾

(১২৫) অতঃপর আল্লাহ্ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ— অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন— যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব বর্ষণ করেন। (১২৬) আর এটাই আপনার পালনকর্তার সরল পথ। আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে আয়াতসমূহ পুংখানুপুংখ বর্ণনা করেছি। (১২৭) তাদের জন্যেই তাদের প্রতিপালকের কাছে নিরাপত্তার গৃহ রয়েছে এবং তিনি তাদের বন্ধু তাদের কর্মের কারণে। (১২৮) যেদিন আল্লাহ্ সবাইকে একত্রিত করবেন, হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষদের মধ্যে অনেককে অনুগামী করে নিয়েছ। তাদের মানব বন্ধুরা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা পরস্পরে পরস্পরের মাধ্যমে ফল লাভ করেছি। আপনি আমাদের জন্যে যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। আল্লাহ্ বলবেন ঃ আগুন হল তোমাদের বাসস্থান। তথায় তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে; কিন্তু যখন চাইবেন আল্লাহ্। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (১২৯) এমনিভাবে আমি পাপীদেরকে একে অপরের সাথে যুক্ত করে দেব তাদের কাজকর্মের কারণে। (১৩০) হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বরগণ আগমন করেনি, যাঁরা তোমাদেরকে আমার বিধানাবলী বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা বলবে ঃ আমরা স্বীয় গোনাহ্ স্বীকার করে নিলাম। পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা কাফের ছিল।

অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আবু জাহল, আবু লাহাব প্রমুখ কোরাইশ সর্দারদের শোচনীয় অবস্থা বিশ্ববাসীর চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। মক্কা বিজয়ের ঘটনা তাদের সবার কোমর ভেঙ্গে দেয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

ধর্ম সম্পর্কে বক্ষ উন্মুক্তকরণ এবং এর লক্ষণাদি ঃ বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ

অর্থাৎ, যাকে আল্লাহ্ তাআলা হেদায়েত দিতে চান, তার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন।

হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে এবং বায়হাকী শোআবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের বাচনিক বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে شرح صدر অর্থাৎ, বক্ষ উন্মুক্তকরণের তফসীর জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা মুমিনের অন্তরে একটি আলো সৃষ্টি করে দেন। ফলে তার অন্তর সত্যকে নিরীক্ষণ করা, হৃদয়ঙ্গম করা এবং গ্রহণ করার জন্যে উন্মুক্ত হয়ে যায়। (সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে শুরু করে এবং অসত্যকে ঘৃণা করতে থাকে।) সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেন ঃ এরূপ ব্যক্তিকে চেনার মত কোন লক্ষণ আছে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, লক্ষণ এই যে, এরূপ ব্যক্তির সমগ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা পরকাল ও পরকালের নেয়ামতের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। সে পার্থিব অন্যায় কামনা-বাসনা এবং ধ্বংসশীল আনন্দ-উল্লাস থেকে বিরত থাকে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ

অর্থাৎ, যাকে আল্লাহ্ তাআলা পথভ্রষ্টতায় রাখতে চান, তার অন্তর সংকীর্ণ এবং অত্যাধিক সংকীর্ণ করে দেন। সত্যকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা তার কাছে এমন কঠিন মনে হয়, যেমন কারও আকাশে আরোহণ করা।

তফসীরবিদ কলবী বলেন ঃ তার অন্তর সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ এই যে, তাতে সত্য ও সৎকর্মের জন্যে কোন পথ থাকে না। হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) থেকেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্র যিকির থেকে তার মন বিমুখ থাকে এবং কুফর ও শেরকের কথাবার্তায় নিবিষ্ট হয়।

সাহাবায়ে কেরাম ধর্মের ব্যাপারে উন্মুক্তবক্ষ ছিলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে স্বীয় রসূলের সংসর্গ এবং প্রত্যক্ষ শিষ্যত্বের জন্যে মনোনীত করেছিলেন। ইসলামী বিধি-বিধানে তাঁরা খুব কমই সন্দেহ ও সংশয়ের সম্মুখীন হতেন। তাঁরা সারা জীবনে যেসব প্রশ্ন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উত্থাপন করেন, সেগুলো গুণাগুণতি কয়েকটি মাত্র। কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সংসর্গের কল্যাণে আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও ভালবাসা তাঁদের অন্তরে সুগভীর রেখাপাত করেছিল। ফলে তাঁরা شرح صدر তথা বক্ষ উন্মুক্তকরণের স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁদের অন্তর আপনা থেকেই সত্য ও মিথ্যার মানদন্ডে পরিণত হয়েছিল। তাঁরা সত্যকে অতি সহজে কালবিলম্ব না করে গ্রহণ করে নিতেন এবং অসত্য তাঁদের

অন্তরে পথ খুঁজে পেত না। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর যুগ থেকে যতই দূরত্ব বাড়তে থাকে, সন্দেহ ও সংশয় ততই অন্তরে রাস্তা পেতে থাকে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিতে থাকে।

সন্দেহ দূর করার প্রকৃত পন্থা ঃ আজ সমগ্র বিশ্ব এসব সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্তে নিপতিত। তারা তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে এর মীমাংসা করতে সচেষ্ট। অথচ এটা এর নির্ভুল পথ নয়।

সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ যে পথ ধরেছিলেন, সেটাই ছিল যথার্থ পথ। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তি ও নেয়ামত কল্পনায় উপস্থিত করে অন্তরে তাঁর মাহাত্ম্য ও ভালবাসা সৃষ্টি করলে সন্দেহ-সংশয় আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। এ কারণেই কোরআন পাক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এ দোয়া করার আদেশ দিয়েছে ঃ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দাও।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের প্রতি ধিক্কার দেন। তাদের অন্তরে সত্য আসন পায় না এবং তারা প্রত্যেক মন্দ ও অপকর্মে সোল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে— وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا অর্থাৎ, এটা আপনার পালনকর্তার সরল পথ। এখানে هذا (এটা) শব্দ দ্বারা ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মতে কোরআনের দিকে এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে ইসলামের দিকে ইশারা করা হয়েছে— (রূহুল মা'আনী)। উদ্দেশ্য এই যে, আপনাকে প্রদত্ত কোরআন কিংবা ইসলাম আপনার পালনকর্তার পথ। অর্থাৎ, এমন পথ, যা আপনার পালনকর্তা স্বীয় প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্থির করেছেন এবং মনোনীত করেছেন। এখানে পথকে পালনকর্তার দিকে সম্পৃক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন ও ইসলামের যে কর্মব্যবস্থা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেয়া হয়েছে, তা পালন করা আল্লাহ্ তাআলার উপকারের জন্যে নয়, বরং পালনকারীদের উপকারের জন্যে পালনকর্তার দাবীর ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষকে এমন শিক্ষাই দান করা উদ্দেশ্য যা তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে।

এখানে رب শব্দকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধ করে তাঁর প্রতি এমন এক বিশেষ অনুগ্রহ ও কৃপা প্রকাশ করা হয়েছে, যার রসাস্বাদন বিশেষ ব্যক্তিরাই করতে পারেন। কেননা, পালনকর্তা ও উপাস্যের সাথে কোন বন্দার সামান্যতম সম্বন্ধ জড়িত হয়ে যাওয়াও তার জন্যে পরম গৌরবের বিষয়। তদুপরি যদি পরম পালনকর্তা নিজেকে বান্দার দিকে সম্বন্ধ করে বলেন যে, আমি তোমার, তখন তার সৌভাগ্যের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

এরপর مُسْتَقِيْمًا শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআনের এ পথই হলো সরল পথ। এখানেও مُسْتَقِيْمًا -কে صِرَاطُ -এর বিশেষণ হিসেবে উল্লেখ না করে অবস্থা হিসেবে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশ্ব পালকের স্থিরীকৃত পথ মুস্তাকীম ও সরল হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনাই নাই।-(রূহুল মা'আনী, বাহরে মুহীত)

এরপর قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ —অর্থাৎ, আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে আয়াতসমূহকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি। বলা হয়েছে ঃ এখানে فَصَّلْنَا শব্দটি تفصيل থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে এক এক অধ্যায়কে পৃথক পৃথক করে বিশদভাবে বর্ণনা করা। এভাবে গোটা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। অতএব, تفصيل -এর সারমর্ম হচ্ছে বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণনা করা। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মৌলিক বিষয়গুলোকে পরিষ্কার ও বিশদভাবে বর্ণনা করেছি; এতে কোন সংক্ষিপ্ততা বা অস্পষ্টতা রাখিনি। এতে لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কোরআনের বক্তব্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হলেও, তদ্দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কোরআনের উপর চিন্তা-ভাবনা করে; জেদ, হঠকারিতা এবং পৈতৃক প্রথার নিশ্চল অনুসরণের প্রাচীর যাদের সামনে অন্তরায় সৃষ্টি করে না।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ —অর্থাৎ, উপরোক্ত ব্যক্তি, যারা মুক্ত মনে উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কোরআনের পয়গাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ কোরআনী নির্দেশ মেনে চলে, তাদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে 'দারুস্-সালাম'-এর পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে 'দার' শব্দের অর্থ গৃহ এবং 'সালাম' শব্দের অর্থ যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা। কাজেই 'দারুস-সালাম' এমন গৃহকে বলা যায়, যেখানে কষ্ট-শ্রম, দুঃখ, বিষাদ, বিপদাপদ ইত্যাদির সমাগম নেই। নিঃসন্দেহে এটা জান্নাতই হতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সালাম আল্লাহ্ তাআলার একটি নাম। দারুস-সালামের অর্থ আল্লাহ্র গৃহ। আল্লাহ্র গৃহ বলতে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান বোঝায়। অতএব, সার অর্থ আবারও তাই হয় যে, এমন গৃহ যাতে শান্তি, সুখ, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি বিদ্যমান। জান্নাতকে দারুস-সালাম বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একমাত্র জান্নাতই এমন জায়গা, যেখানে মানুষ সর্বপ্রকার কষ্ট, উৎকণ্ঠা, উপদ্রব ও স্বভাব বিরুদ্ধ বস্তু থেকে পূর্ণরূপে ও স্থায়ীভাবে নিরাপদ থাকে। এরূপ নিরাপত্তা জগতে কোন রাজাধিরাজ এবং নবী-রসূলও কখনও লাভ করেন না। কেননা, ধ্বংসশীল জগত এরূপ পরিপূর্ণ ও স্থায়ী শান্তির জায়গাই নয়।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব সৌভাগ্যশালীর জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে দারুস-সালাম রয়েছে। 'প্রতিপালকের কাছে'-এর এক অর্থ এই যে, এ দারুস-সালাম ইহজগতে নগদ পাওয়া যায় না; কেয়ামতের দিন যখন তারা স্বীয় প্রতিপালকের কাছে যাবে, তখনই তা পাবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দারুস-সালামের ওয়াদা ভ্রান্ত হতে পারে না। প্রতিপালক নিজেই এর জামিন। তাঁর কাছে তা সংরক্ষিত রয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দারুস-সালামের নেয়ামত ও আরাম আজ কেউ কল্পনাও করতে পারে না। যে প্রতিপালকের কাছে এ ভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে, তিনিই তা জানেন।

দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে দারুস-সালাম লাভ করা কেয়ামত ও পরকালের উপর নির্ভরশীল মনে হয় না। বরং পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা, এ জগতেও সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা দিয়ে দারুস-সালাম (শান্তির আবাস) দান করতে পারে। দুনিয়ার কোন বিপদাদই তাকে স্পর্শ করে না। যেমন, পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও ওলীগণের মধ্যে এর নজীর দেখতে পাওয়া যায়। আবার পরকালের নেয়ামত তার সামনে উপস্থিত করে তার দৃষ্টিকে এমন সত্যদর্শী করে দেয়া হয় যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বিপদাপদ তার দৃষ্টিতে নিতান্ত নগণ্য বলে প্রতিভাত হতে থাকে। বিপদের পাহাড়ও তাকে

বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না।

এ আয়াতে সৎলোকের জন্যে যে দারুস-সালামের কথা বলা হয়েছে, তা পরকালে তো নিশ্চিত ও অবধারিত; পরন্তু দুনিয়াতেও তাদেরকে দারুস সালামের সুখ ও আনন্দ দেয়া যেতে পারে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ, তাদের সৎকর্মের কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাদের অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হয়ে যান। তাদের সব মুশকিল আসান হয়ে যায়।

তৃতীয় আয়াতে হাশরের ময়দানে সব জিন ও মানবকে একত্রিত করার পর উভয় দলের সাথে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা শয়তান জিনদেরকে সম্বোধন করে তাদের অপরাধ ব্যক্ত করবেন এবং বললেন ঃ তোমরা মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করার কাজে বিরাট অংশ নিয়েছ। এর উত্তরে জিনরা কি বলবে, কোরআন তা উল্লেখ করেনি। তবে এটা বোঝা যায় যে, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র সামনে স্বীকারোক্তি করা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তাদের স্বীকারোক্তি উল্লেখ না করার মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ প্রশ্ন শোনে তারা এমন হতবাক হয়ে যাবে যে, উত্তর দেয়ার জন্যে মুখই খুলতে পারবে না।- (রূহুল-মা'আনী)

এরপর শয়তান মানব অর্থাৎ, দুনিয়াতে যারা শয়তানদের অনুগামী ছিল, নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র দরবারে একটি উত্তর বর্ণনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রশ্ন যদিও তাদেরকে করা হয়নি ; কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে তাদেরকেও যেন সম্বোধন করা হয়েছিল। কেননা, তারাও শয়তান জিনদের কাজ অর্থাৎ, পথভ্রষ্টতাই প্রচার করেছিল। এ প্রাসঙ্গিক সম্বোধনের কারণে তারা উত্তর দিয়েছে। কিন্তু বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, মানবরূপী শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করা হয়ে থাকবে। তা স্পষ্টতঃ এখানে উল্লেখ করা না হলেও সূরা ইয়াসীনের এক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে ঃ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ অর্থাৎ, হে আদম সন্তানরা, আমি কি তোমাদেরকে পয়গম্বরদের মাধ্যমে বলিনি যে, শয়তানদের অনুসরণ করো না?

এতে বোঝা যায়, এ সময়ে মানুষ শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করা হবে। তারা উত্তরে স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা শয়তানদের কথা মান্য করার অপরাধ করেছি। তারা আরও বলবে ঃ হাঁ, জিন শয়তানরা আমাদের সাথে এবং আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ফল লাভ করেছি। মানুষ শয়তানরা তাদের কাছ থেকে এ ফল লাভ করেছে যে, দুনিয়ার ভোগবিলাস আহরণের উপায়াদি শিক্ষা করেছে এবং কোথাও কোথাও জিন শয়তানদের দোহাই দিয়ে কিংবা অন্য পন্থায় তাদের কাছ থেকে সাহায্যও লাভ করেছে, যেমন মূর্তিপূজারীর মধ্যে বরং ক্ষেত্রবিশেষে অনেক মূর্খ মুসলমানের মধ্যেও এ পন্থা প্রচলিত আছে, যদ্দ্বারা শয়তান ও জিনদের কাছ থেকে কোন কোন কাজে সাহায্য নেয়া যায়। জিন শয়তানরা মানুষদের কাছ থেকে যে ফল লাভ করেছে, তা এই যে, তাদের কথা অনুসরণ করা হয়েছে এবং তারা মানুষকে অনুগামী করতে সক্ষম হয়েছে। এমন কি, তারা মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে গিয়েছে। এই মুহূর্তে তারা স্বীকার করবে যে, শয়তানের বিপথগামী করার কারণে আমরা যে মৃত্যু ও পরাকালকে ভুলে গিয়েছিলাম, এখন তা সামনে এসে গেছে। এ স্বীকারোক্তির পর আল্লাহ্ তাআলা বলবেন ঃ

النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

অর্থাৎ, তোমরা উভয় দলের অপরাধের শাস্তি এই যে, তোমাদের বাসস্থান হবে অগ্নি, যাতে সদা-সর্বদা থাকবে। তবে আল্লাহ্ কাউকে তা থেকে বের করতে চাইলে তা ভিন্ন কথা। কোরআনের অন্যান্য আয়াতে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তাআলাও তা চাইবেন না। তাই অনন্তকালই সেখানে থাকতে হবে।

আয়াতে نُوَلِّي শব্দটির আভিধানিক দিক দিয়ে দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) পরস্পরকে যুক্ত করে দেয়া ও নিকটবর্তী করে দেয়া এবং (দুই) শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেয়া। তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে উভয় প্রকার অর্থই বর্ণিত আছে।

হাশরে কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে দল বিভক্ত হবে-- জাগতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নয় ঃ হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়র, কাতাদা (রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলার কাছে মানুষের দল বিভপ্রি বংশ, দেশ কিংবা বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে হবে না; বরং কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে হবে। আল্লাহ্র আনুগত্যশীল মুসলমান যেখানেই থাকবে, সে মুসলমানদের সাথী হবে এবং অবাধ্য কাফের যেখানেই থাকবে, সে কাফেরদের সাথী হবে, তাদের বংশ, দেশ, ভাষা, বর্ণ ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে যতই দূরত্ব ও পার্থক্যই থেকে থাকুক না কেন।

এরপর মুসলানদের মধ্যেও সৎ ও ধার্মিকেরা ধার্মিকদের সাথে থাকবে এবং পাপী ও কুকর্মীদেরকে কুকর্মীদের সাথে যুক্ত করে দেয়া হবে। সূরা তাকভীরে বলা হয়েছে ঃ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ — অর্থাৎ, মানবকুলের যুগল ও দল তৈরী করে দেয়া হবে। এর উদ্দেশ্যও তাই যে, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে হাশরবাসীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ সৎ কিংবা অসৎ-এক ধরনের আমলকারীদেরকে একত্রিত করে দেয়া হবে। সৎলোকেরা সৎলোকদের সাথে জান্নাত এবং অসৎলোকেরা অসৎদের সাথে জাহান্নামে পৌছবে।

আলোচ্য আয়াতের সার বিষয়বস্তু এই যে, আল্লাহ্ তাআলা কতক জালেমকে অন্য জালেমদের সাথে যুক্ত করে একদলে পরিণত করে দেবেন— বংশগত ও দেশগতভাবে তাদের মধ্যে যতই দূরত্ব থাক না কেন।

অন্য এক আয়াতে একথাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আজ মানুষের মধ্যে বংশ, দেশ, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে যে পার্থিব ও আনুষ্ঠানিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, হাশরের মাঠে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বলা হয়েছে ঃ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ —অর্থাৎ, যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে, সেদিন পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ ও ঐকমত্য পোষণকারী ব্যক্তিরা পৃথক হয়ে যাবে।

দুনিয়ার সঙ্ঘবদ্ধ কাজ-কারবারে কর্ম ও চরিত্রের প্রভাবঃ পার্থিব আত্মীয়তা, সম্পর্ক ও আনুষ্ঠানিক সংগঠনসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কেয়ামতের দিন তো সুস্পষ্টভাবে সবারই দৃষ্টিগোচর হবে, দুনিয়াতেও এর সামান্য নমুনা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এখানে সৎলোকের সম্পর্ক সৎ লোকদের সাথেই স্থাপিত হয় এবং তাদেরই দল ও সমাজের সাথে জড়িত থাকে। ফলে তার সামনে সৎকর্মের বিভিন্ন পথ খুলতে থাকে এবং তার

সংকল্প দৃঢ় হতে থাকে। এমনিভাবে অসৎ ব্যক্তির সম্পর্ক তার মত অসৎ ব্যক্তিদের সাথেই স্থাপিত হয়। সে তাদের মধ্যে উঠাবসা করে। তাদের সংসর্গে তার অসৎকর্ম ও অসচ্চরিত্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার সামনে সৎকর্মের দ্বার রুদ্ধ হতে থাকে। এটা তার মন্দ-কর্মের নগদ সাজা, যা এ দুনিয়াতেই সে পায়।

রসূলুল্লাহ্ বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা কোন বাদশাহ্ ও শাসনকর্তার প্রতি অপ্রসন্ন হলে তাকে সৎ মন্ত্রী ও সৎ কর্মচারী দান করেন, ফলে তার রাজ্যের সব কাজকর্ম ঠিকঠাক ও উন্নত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাআলা কারও প্রতি অপ্রসন্ন হলে সে অসৎ সহকর্মী ও অসৎ কর্মচারী পায়। সে কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করলেও ফুলিয়ে উঠতে পারে না।

এক জালেম অপর জালেমের হাতে শাস্তি ভোগ করেঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা نُوَلِّي শব্দের প্রথমোক্ত অর্থের দিক বর্ণিত হল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়র, ইবনে যায়েদ (রাঃ), মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের তফসীর এরূপ বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা একজন জালেমকে অপর জালেমের উপর শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেন এবং এভাবে এককে অপরের হাতে শাস্তি দেন।

এ বিষয়বস্তুও যথাস্থানে সঠিক ও নির্ভুল এবং কোরআন-হাদীসের অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিশীল। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ كما تكونون كذلك يؤمر عليكم অর্থাৎ, তোমরা যেমন হবে তোমাদের উপর তেমনি শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে। তোমরা জালেম ও পাপাচারী হলে তোমাদের শাসকবর্গ ও জালেম ও পাপাচারীই হবে। পক্ষান্তরে তোমরা সাধু ও সৎকর্মী হলে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের শাসনকর্তারূপে সাধু, দয়ালু ও সুবিচারক লোকদের মনোনীত করবেন।

ইবনে-কাসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বাচনিক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন ঃ من اعان ظالما سلطه الله عليه অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর অত্যাচারে তাকে সাহায্য করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে এ জালেমকেই তার উপর চাপিয়ে দেন। তার হাতেই তাকে শাস্তি দেন।

দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। এ প্রশ্নটি হাশরের ময়দানে জিন ও মানবকে করা হবে। প্রশ্নটি এই ঃ তোমরা কি কারণে কুফর ও আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় লিপ্ত হলে? তোমাদের কাছে কি আমার পয়গম্বর পৌছেনি। সে তো তোমাদের মধ্য থেকেই ছিল এবং আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাত, আজকের দিনের উপস্থিতি এবং হিসাব-কিতাবের ভয় প্রদর্শন করত। এর উত্তরে তাদের সবার পক্ষ থেকে পয়গম্বরদের আগমন, আল্লাহ্‌র বাণী পৌছানো এবং এতদসত্ত্বেও কুফরে লিপ্ত হওয়ার স্বীকারোক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ভ্রান্ত কর্মের কোন কারণ ও হেতু তাদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয়নি ; বরং আল্লাহ্ নিজেই এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا অর্থাৎ, তাদেরকে পার্থিব জীবন ও ভোগ-বিলাস ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। ফলে তারা একেই মুক্ষ মনে করে বসেছে, অথচ এটা প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমতঃ প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, অন্য কতিপয় আয়াতে বলা হয়েছে, হাশরের ময়দানে মুশরিকদেরকে কুফর ও শিরক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা মুখ মুছে অস্বীকার করবে এবং পালনকর্তার দরবারে কসম খেয়ে মিথ্যা বলবে ঃ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ – অর্থাৎ, আমাদের পালনকর্তার কসম, আমরা কখনও মুশরিক ছিলাম না। অথচ এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, তারা অনুতাপ সহকারে স্বীয় কুফর ও শেরক স্বীকার করে নিবে। অতএব, আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধিতা দেখা দেয়। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রথমে যখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তখন তারা অস্বীকার করবে। সেমতে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কুদরত-বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দেবেন। হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নেবেন। আল্লাহ্‌র কুদরতে সেগুলো বাকশক্তি প্রাপ্ত হবে। সেগুলো পরিষ্কারভাবে তাদের কুকর্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে দেবে। তখন জিন ও মানব জানতে পারবে যে, তাদের হাত, পা, কান, জিহ্বা সবই ছিল আল্লাহ্‌র গুপ্ত প্রহরী, যারা সব কাজ-কারবার ও অবস্থার অভ্রান্ত রিপোর্ট প্রদান করেছে। এমতাবস্থায় তাদের আর অস্বীকার করার জো থাকবে না। তখন তারা সবাই পরিষ্কার ভাষায় অপরাধ স্বীকার করে নেবে।

জিনদের মধ্যেও কি পয়গম্বর প্রেরিত হন? দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা জিন ও মানব উভয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছেনঃ তোমাদের মধ্য থেকে আমার পয়গম্বর কি তোমাদের কাছে পৌছেনি? এতে বোঝা যায় যে, মানব জাতির পয়গম্বররূপে যেমন মানব প্রেরিত হয়েছে, তেমনি জিন জাতির পয়গম্বররূপে জিন প্রেরিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে হাদীস ও তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেনঃ রসূল ও নবী একমাত্র মানবই হয়েছে। জিন জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে রসূল হয়নি ; বরং মানব রসূলের বাণী স্বজাতির কাছে পৌছানোর জন্যে জিনদের মধ্য থেকে কিছু লোক নিযুক্ত হয়েছে। তারা প্রকৃতপক্ষে মানব-রসূলগণের দূত ও বার্তাবহ ছিল। অপ্রকৃতভাবে তাদেরকেও রসূল বলে দেয়া হয়। যেসব তফসীরবিদ একথা বলেন, তাদের প্রমাণ ঐসব আয়াত, যেগুলোতে জিনদের এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তারা নবীর বাণী অথবা কোরআন শ্রবণ করে স্বজাতির কাছে পৌছিয়েছে। উদাহরণতঃ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ – এবং সূরা জিনের আয়াত فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ইত্যাদি।

কিন্তু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে একদল আলেম এ বিষয়েরও প্রবক্তা যে, শেষ নবী (সাঃ)-এর পূর্বে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রসূল সে সম্প্রদায় থেকেই প্রেরিত হতেন। মানব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরে মানব রসূল এবং জিন জাতির বিভিন্ন স্তরে জিন রসূলই আগমন করতেন। শেষনবী (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সমগ্র বিশ্বের মানব ও জিনদের একমাত্র রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন; তাও কোন এক বিশেষ কালের জন্যে নয়, বরং কেয়ামত অবধি সমস্ত জিন ও মানব তাঁর উম্মত এবং তিনিই সবার রসূল।

হিন্দুদের অবতারও সাধারণতঃ জিন, তাদের মধ্যে কোন রসূল ও নবী হওয়ার সম্ভাবনা ঃ কলবী, মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ এ উক্তিই গ্রহণ করেছেন। কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী তফসীরে-মাযহারীতে এ উক্তি গ্রহণ করে বলেছেনঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আদম (আঃ)-এর পূর্বে জিনদের রসূল জিনদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হত। যখন একথা প্রমাণিত যে, পৃথিবীতে মানব আগমনের হাজার হাজার বছর

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا
غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ
بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ
اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ
اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿١٣٣﴾ اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ
لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿١٣٤﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى
مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ
عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١٣٥﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ
مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا
هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ
لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ
يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿١٣٦﴾ وَكَذٰلِكَ
زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ
شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ؕ
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٧﴾

(১৩১) এটা এ জন্যে যে, আপনার প্রতিপালক কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে জুলুমের কারণে ধ্বংস করেন না এমতাবস্থায় যে, তথাকার অধিবাসীরা অজ্ঞ থাকে। (১৩২) প্রত্যেকের জন্যে তাদের কর্মের আনুপাতিক মর্যাদা আছে এবং আপনার প্রতিপালক তাদের কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। (১৩৩) আপনার প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী, করুণাময়। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে উচ্ছেদ করে দিবেন এবং তোমাদের পর যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলে অভিষিক্ত করবেন; যেমন তোমাদেরকে অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে সৃষ্টি করেছেন। (১৩৪) যে বিষয়ের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা অক্ষম করতে পারবে না। (১৩৫) আপনি বলে দিন ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা স্বস্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করি। অচিরেই জানতে পারবে যে, পরিণাম গৃহ কে লাভ করে। নিশ্চয় জালেমরা সুফলপ্রাপ্ত হবে না। (১৩৬) আল্লাহ্ যেসব শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে অতঃপর নিজ ধারণা অনুসারে বলে, এটা আল্লাহ্র এবং এটা আমাদের অংশীদারদের। অতঃপর যে অংশ তাদের অংশীদারদের, তা তো আল্লাহ্র দিকে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহ্র তা তাদের উপাস্যদের দিকে পৌঁছে যায়। তাদের বিচার কতই না মন্দ! (১৩৭) এমনিভাবে অনেক মুশরেকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা সন্তান হত্যাকে সুশোভিত করে দিয়েছে যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্মমতকে তাদের কাছে বিভ্রান্ত করে দেয়। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মনগড়া বুলিকে পরিত্যাগ করুন।

পূর্বে জিন জাতি বসবাস করত এবং তারাও মানবজাতির মত বিধি-বিধান পালন করতে আদিষ্ট ছিল, তখন শরীয়ত ও যুক্তির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে আল্লাহ্র বিধান পৌঁছানোর জন্যে পয়গম্বর হওয়া অপরিহার্য।

কাযী ছানাউল্লাহ্ (রঃ) আরও বলেন ঃ ভারতবর্ষের হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থ বেদের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরানো বলে বর্ণনা করে এবং তাদের অনুসৃত অবতারদেরকে সে যুগেরই লোক বলে উল্লেখ করে। এটা অসম্ভব নয় যে, তারা এ জিন জাতিরই পয়গম্বর ছিলেন এবং তাদেরই আনীত নির্দেশাবলী কালে পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অবতারদের যেসব চিত্র ও মূর্তি মন্দিরসমূহে রাখা হয়, সেগুলোর দেহাকৃতিও অনেকটা এমনি ধরনের। কারও অনেকগুলো মুখমণ্ডল, কারও অনেক হাত-পা, কারও হাতীর মত শুঁড়। এগুলো সাধারণ মানবাকৃতি থেকে ভিন্ন। জিনদের পক্ষে এহেন আকৃতি ধারণ করা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই এটা সম্ভব যে, তাদের অবতার জিন জাতির রসূল কিংবা তাদের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাদের ধর্মগ্রন্থও তাদের নির্দেশাবলীর সমষ্টি ছিল। এরপর আস্তে আস্তে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ন্যায় একেও পরিবর্তিত করে তাতে শেরক ও মূর্তিপূজা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

যদি আসল ধর্মগ্রন্থ এবং জিন জাতির বিশুদ্ধ নির্দেশাবলীও বিদ্যমান থাকত, তবুও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাব ও রেসালতের পর তাও রহিত হয়ে যেত, বিকৃত ও পরিবর্তিত ধর্মগ্রন্থের তো কথাই নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানব ও জিনদের মধ্য রসূল প্রেরণ করা আল্লাহ্ তাআলার ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের প্রতীক। তিনি কোন জাতির প্রতি এমনিতেই শাস্তি প্রেরণ করেন না, যে পর্যন্ত না তাদেরকে পূর্বাহ্নে পয়গম্বরদের মাধ্যমে জাগ্রত করা হয় এবং হেদায়েতের আলো প্রেরণ করা হয়।

১৩২ নং আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে মানব ও জিন জাতির প্রত্যেক স্তরের লোকদের পদমর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে। এসব পদমর্যাদা তাদের কাজকর্মের ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের প্রতিদান ও শাস্তি এসব কর্মের মাপ অনুযায়ী হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, জিন ও মানব জাতির প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রসূল ও হেদায়েত প্রেরণ করা আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন রীতি। পয়গম্বরদের মাধ্যমে তাদেরকে পূর্ণভাবে সতর্ক না করা পর্যন্ত কুফর, শেরক ও অবাধ্যতার কারণে কখনও শাস্তি দেয়া হয়নি।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বর ও ঐশীগ্রন্থসমূহের অব্যাহত ধারা এ জন্যে ছিল না যে, বিশ্ব পালনকর্তা আমাদের এবাদত ও আনুগত্যের মুখাপেক্ষী কিংবা তাঁর কোন কাজ আমাদের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল নয়, তিনি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তবে পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষী হওয়ার সাথে সাথে তিনি দয়া গুণেও গুণান্বিত। সমগ্র বিশ্বকে অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দান করা এবং বিশ্ববাসীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব প্রয়োজন অযাচিতভাবে মিটানোর কারণও তাঁর এ দয়াগুণ। নতুবা মানুষ তথা গোটা সৃষ্টি নিজের প্রয়োজনাদি নিজে সমাধা করার যোগ্য হওয়া তো দূরের কথা, সে স্বীয় প্রয়োজনাদি চাওয়ার রীতি-নীতিও জানে না। বিশেষতঃ অস্তিত্বের যে নেয়ামত দান করা হয়েছে, তা যে চাওয়া ছাড়াই পাওয়া গেছে, তা দিবালোকের মত স্পষ্ট। কোন মানুষ কোথাও নিজের সৃষ্টির জন্যে দোয়া করেনি এবং অস্তিত্ব

লাভের পূর্বে দোয়া করা কল্পনাও করা যায় না। এমনিভাবে অন্তর এবং যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি হাত, পা, মন-মস্তিষ্ক প্রভৃতি এগুলো কোন মানব চেয়েছিল কি?

আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন- জগত-সৃষ্টি শুধু তাঁর অনুগ্রহের ফল ঃ মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ শব্দ দ্বারা বিশ্বপালকের অমুখাপেক্ষিতা বর্ণনা করার সাথেই ذُو الرَّحْمَةِ যোগ করে বলা হয়েছে যে, তিনি করুণাময়ও বটে।

আল্লাহ্ যে কোন মানুষকে অমুখাপেক্ষী করেননি তার তাৎপর্য ঃ অমুখাপেক্ষিতা আল্লাহ্ পাকেরই বিশেষ গুণ। নতুবা মানুষ অপরের প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে গেলে সে অপরের লাভ-লোকসান ও সুখ-দুঃখের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করত না বরং অপরের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে উদ্যত হত। কোরআন পাকের এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ অর্থাৎ, মানুষ যখন নিজেকে অমুখাপেক্ষী দেখতে পায়, তখন অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যে মেতে উঠে। তাই আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে এমন প্রয়োজনাদির শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছেন, যেগুলো অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ণ হতে পারে না। প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা-বাদশাও চাকর-চাকরানীর মুখাপেক্ষী। বিত্তশালী ও মিল মালিক শ্রমিকদের মুখাপেক্ষী। প্রত্যুষে একজন শ্রমিক ও রিক্সাচালক কিছু পয়সা উপার্জন করে অভাব-অনটন দূর করার জন্যে যেমন রোযগারের তালাশে বের হয়, ঠিক তেমনিভাবে বিত্তশালী ব্যক্তিও শ্রমিক, রিক্সা ও যান বাহনের খোঁজে বের হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সবাইকে অভাব-অনটনের এক শিকলে বেঁধে রেখেছেন। প্রত্যেকেই মুখাপেক্ষী। কারও প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই। এরূপ না হলে কোন ধনী ব্যক্তি কাউকে এক পয়সাও দিত না এবং কোন শ্রমিক কারও সামান্য বোঝাও বহন করত না। এটা একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই বিশেষ গুণ যে, পুরোপুরি অমুখাপেক্ষিতা সত্ত্বেও তিনি দয়ালু, করুণাময়।

এরপর আরও বলা হয়েছে যে, তাঁর রহমত যেমন ব্যাপক ও পূর্ণ, তেমনি তাঁর শক্তি-সামর্থ্য প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। সমগ্র সৃষ্টজগত নিশ্চিহ্ন করে দিলেও তাঁর কুদরতের কারখানায় বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা দেবে না। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বর্তমান সৃষ্টজগতকে ধ্বংস করে তদস্থলে অন্য সৃষ্টজগত এমনিভাবে এ মুহূর্তে উদ্ভব করে স্থাপন করতে পারেন। এর একটি নজীর প্রতি যুগের মানুষের সামনেই রয়েছে। আজ কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাস করছে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ-কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। যদি আজ থেকে একশ' বছর পূর্বেকার অবস্থার দিকে তাকানো যায়, তবে দেখা যাবে, তখনও এ পৃথিবী এমনিভাবে জমজমাট ছিল এবং সব কাজ-কারবার এভাবেই চলত। কিন্তু তখন বর্তমান অধিবাসী ও কার্য পরিচালনাকারীদের কেউই ছিল না। অন্য এক জাতি ছিল, যারা আজ ভূগর্ভে চলে গেছে এবং যাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বর্তমান দুনিয়া সে জাতির বংশধর থেকেই সৃজিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

"আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে, তোমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে পারেন। 'নিয়ে যাওয়ার' অর্থ এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়া যেন নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট না থাকে। তাই এখানে ধ্বংস করা বা মেরে ফেলার কথা বলা হয়নি ; বরং নিয়ে যাওয়া বলা হয়েছে। এতে পুরোপুরি ধ্বংস ও নাম-নিশানাহীন করে দেয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।"

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার অমুখাপেক্ষী হওয়া, করুণাময় হওয়া এবং সর্বশক্তির অধিকারী হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর অবাধ্য ও নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে,

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ۖ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা সব একত্রিত হয়েও আল্লাহ্র সে আযাব প্রতিরোধ করতে পারবে না।

তৃতীয় আয়াতে পুনরায় তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্যে অন্য এক পন্থা অবলম্বন করে বলা হয়েছে ঃ

"হে রসূল, আপনি মক্কাবাসীদেরকে বলে দিন ঃ হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা আমার কথা না মান, তবে না মানা তোমাদের ইচ্ছা এবং স্বস্থানে স্বীয় বিশ্বাস ও হঠকারিতা অনুযায়ী কাজ করতে থাক। আমিও স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে থাকব। এতে আমার কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কে পরকালের মুক্তি ও সফলতা অর্জন করে। মনে রেখো, জালেম অর্থাৎ, অধিকার আত্মসাৎকারী কখনও সফল হয় না।"

পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের একটি বিশেষ পথভ্রষ্টতা ব্যক্ত করা হয়েছে। আরবদের অভ্যাস ছিল যে, শস্যক্ষেত্র, বাগান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যাকিছু আমদানী হত, তার এক অংশ আল্লাহ্র জন্যে এবং এক অংশ উপাস্য দেব-দেবীর নামে পৃথক করে রাখত। আল্লাহ্র নামের অংশ থেকে গরীব-মিসকীনকে দান করা হত এবং দেব-দেবীর অংশ মন্দিরের পূজারী, সেবায়েত ও রক্ষকদের জন্যে ব্যয় করত।

প্রথমতঃ এটাই কম অবিচার ছিল না যে, যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ এবং সমুদয় উৎপন্ন ফসলও তিনিই দান করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত বস্তুসমূহের মধ্যে প্রতিমাদেরকে অংশীদার করা হত। তদুপরি তারা আরও অবিচার করত এই যে, কখনও উৎপাদন কম হলে তারা কমের ভাগটি আল্লাহ্র অংশ থেকে কেটে নিত, অথচ মুখে বলত ঃ আল্লাহ্ তো সম্পদশালী, অভাবমুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। এরপর প্রতিমাদের অংশ এবং নিজেদের ব্যবহারের অংশ পুরোপুরি নিয়ে নিত। আবার কোন সময় এমনও হত যে, প্রতিমাদের কিংবা নিজেদের অংশ থেকে কোন বস্তু আল্লাহ্র অংশে পড়ে গেলে তা হিসাব ঠিক করার জন্যে সেখান থেকে তুলে নিত। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্র অংশ থেকে কোন বস্তু নিজেদের কিংবা প্রতিমাদের অংশে পড়ে যেত, তবে তা সেখানেই থাকতে দিত এবং বলত ঃ আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, তাঁর অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই। কোরআন পাক তাদের এ পথভ্রষ্টতার উল্লেখ করে বলেছেঃ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ অর্থাৎ, তাদের এ বিচারপদ্ধতি অত্যন্ত বিশ্রী ও একদেশদর্শী। যে আল্লাহ্ তাদেরকে এবং তাদের সমুদয় বস্তু-সামগ্রীকে সৃষ্টি করেছেন, প্রথমতঃ তারা তাঁর সাথে অপরকে অংশীদার করেছে। তদুপরি তাঁর অংশও নানা ছলছুতায় অন্যদিকে পাচার করে দিয়েছে।

কাফেরদের প্রতি হুশিয়ারীতে মুসলমানদের জন্যে শিক্ষাঃ এ হচ্ছে মুশরিকদের একটি পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির জন্যে হুশিয়ারী। এতে ঐসব মুসলমানের জন্যেও শিক্ষার চাবুক রয়েছে, যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণ কার্যক্ষমতাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে বয়স ও

وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ
نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ
لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيْهِمْ
بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ
خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا وَاِنْ يَّكُنْ
مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ
عَلِيْمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ
قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٤٠﴾ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ
جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ
حَصَادِهٖ وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤١﴾ وَ
مِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَ
لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٤٢﴾

(১৩৮) তারা বলে ঃ এসব চতুষ্পদ জন্তু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। আমরা যাকে ইচ্ছা করি, সে ছাড়া এগুলো কেউ খেতে পারবে না, তাদের ধারণা অনুসারে। আর কিছুসংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে আরোহণ হারাম করা হয়েছে এবং কিছুসংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর উপর তারা ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে না, তাদের মনগড়া বুলির কারণে; অচিরেই তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন। (১৩৯) তারা বলে ঃ এসব চতুষ্পদ জন্তুর পেটে যা আছে, তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্যে এবং আমাদের মহিলাদের জন্যে তা হারাম। যদি তা মৃত হয়, তবে তার প্রাপক হিসাবে সবাই সমান। অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের বর্ণনার শাস্তি দিবেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (১৪০) নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজ সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতাবশতঃ কোন প্রমাণ ছাড়াই হত্যা করেছে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যেসব দিয়েছিলেন, সেগুলোকে আল্লাহ্র প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে হারাম করে নিয়েছে। নিশ্চিতই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সুপথগামী হয়নি। (১৪১) তিনিই উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছে—তাও, যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয় এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না, এবং খর্জুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র—যেসবের স্বাদবিশিষ্ট এবং যয়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন—একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং হক দান কর কর্তনের সময়ে এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। (১৪২) তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বোঝা বহনকারীকে এবং খর্বাকৃতিকে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

সময়ের এক অংশ তারা আল্লাহ্র এবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করে; অথচ জীবনের সমস্ত সময় ও মুহূর্তকে তাঁরই এবাদত ও আনুগত্যের জন্যে ওয়াক্‌ফ করে মানবিক প্রয়োজনাদি মিটানোর জন্যে তা থেকে কিছু সময় নিজের জন্যে বের করে নেয়াই সঙ্গত ছিল। সত্য বলতে কি, এরপরও আল্লাহ্র যথার্থ কৃতজ্ঞতা আদায় হত না। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, দিবা-রাত্রির চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি কিছু সময় আমরা আল্লাহ্র এবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করি, তবে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে কাজ-কারবার ও আরাম-আয়েশের সময় পুরোপুরি ঠিক রেখে তার সমস্ত জের নামায, তেলাওয়াত ও এবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের উপর ফেলে দেই। কোন অতিরিক্ত কাজের সম্মুখীন হলে কিংবা অসুখ-বিসুখ হলে সর্বপ্রথম এর প্রভাব এবাদতের নির্দিষ্ট সময়ের উপর পড়ে। এটা নিঃসন্দেহে অবিচার, অকৃতজ্ঞতা এবং অধিকা রহরণ। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং সব মুসলমানকে এহেন গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের এ পথভ্রষ্টতা বর্ণিত হয়েছিল যে, জালেমরা আল্লাহ্ সৃজিত জন্তু-জানোয়ার এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহে স্বহস্তনির্মিত নিষ্প্রাণ অচেতন প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্র অংশীদার স্থির করেছিল এবং যেসব বস্তু তারা সদকা-খয়রাতের জন্যে পৃথক করত, যেগুলোতে এক অংশ আল্লাহ্র এবং এক অংশ প্রতিমাদের জন্যে রাখত। অতঃপর আল্লাহ্র অংশকেও বিভিন্ন ছলছুতায় প্রতিমাদের অংশের মধ্যে পাচার করে দিত। এমনি ধরনের আরও অনেক মূর্খতাসুলভ কুপ্রথাকে তারা ধর্মীয় আইনের মর্যাদা দান করেছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা উদ্ভিদ ও বৃক্ষের বিভিন্ন প্রকার এবং তাদের উপকারিতা ও ফল সৃজনে স্বীয় শক্তি-সামর্থ্যের বিস্ময়কর পরাকাষ্ঠা বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের বিভিন্ন প্রকার সৃজনের কথা উল্লেখ করে মুশরিকদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে হুশিয়ার করেছেন যে, এ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকেরা কেমন সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র সাথে কেমন অজ্ঞ, অচেতন, নিষ্প্রাণ ও অসহায় বস্তুসমূহকে শরীক ও অংশীদার করে ফেলেছে।

অতঃপর তাদেরকে সরল পথ ও বিশুদ্ধ কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন যে, যখন এসব বস্তু সৃষ্টি করা ও তোমাদেরকে দান করার কাজে কোন অংশীদার নেই, তখন এবাদতে তাদেরকে অংশীদার করা একান্তই অকৃতজ্ঞতা ও জুলুম। যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করে তোমাদেরকে দান করেছেন এবং এমন অনুগত করে দিয়েছেন যে, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহার করতে পার, এরপর সবগুলোকে তোমাদের জন্যে হালাল করে দিয়েছেন, তোমাদের কর্তব্য এসব নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সময় তাঁর কৃতজ্ঞতা স্মরণে রাখা এবং প্রকাশ করা—শয়তানী ধ্যান-ধারণা এবং মূর্খতাসুলভ প্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

প্রথম আয়াতে اَنْشَاَ শব্দের অর্থ সৃষ্টি করেছেন এবং مَّعْرُوْشٰتٍ শব্দটি عرش থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ উঠানো এবং উচ্চ করা। مَّعْرُوْشٰتٍ উদ্ভিদের ঐসব লতা বোঝানো হয়েছে, যেগুলোকে মাচার উপর চড়ানো হয়। যেমন, আঙ্গুর ও কোন কোন শাকসব্জি। এর বিপরীতে وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ বলে ঐ সমস্ত বৃক্ষ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর লতা উপরে চড়ানো হয় না; কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ হোক, যাদের লতাই হয় না, কিংবা লতাবিশিষ্ট হোক;

কিন্তু সেগুলো মাটিতেই বিস্তৃত হয় এবং উপরে চড়ানো হয় না; যেমন তরমুজ, খরবুযা ইত্যাদি।

نخل শব্দের অর্থ খর্জুর বৃক্ষ, زرع সর্বপ্রকার শস্য, زيتون যয়তুন বৃক্ষকে বলা হয় এবং এর ফলকেও এবং رمان ডালিমকে বলা হয়।

এসব আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে বাগানে উৎপন্ন বৃক্ষসমূহের দুই প্রকার বর্ণনা করেছেন। এক, যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো নয় এবং দুই, যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো হয় না। এতে আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত রহস্য ও কুদরতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, একই মাটি, একই পানি এবং একই পরিবেশে কেমন বিভিন্ন প্রকার চারাগাছ সৃষ্টি করেছেন। এরপর এদের ফল তৈরী, সজীবতা এবং এদের মধ্যে নিহিত হাজারো বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোন বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, যতদিন লতা উপরে না চড়ানো হয়, ততদিন প্রথমতঃ ফলই ধরে না–যদি ধরেও, তবে তা বাড়ে না এবং বাকী থাকে না; যেমন আঙ্গুর ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কোন বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, লতা উপরে চড়াতে চাইলেও চড়ে না—চড়ালেও ফল দুর্বল হয়ে যায়; যেমন খরবুযা, তরমুজ ইত্যাদি। কোন কোন বৃক্ষকে মজবুত কাণ্ডের উপর দাঁড় করিয়ে এত উচ্চে নিয়ে গেছেন যে, মানুষের চেষ্টায় এত উচ্চে নিয়ে যাওয়া স্বভাবতঃ সম্ভবপর ছিল না। বিরাট রহস্যের অধীনে ফলের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে বৃক্ষসমূহ বিভিন্নরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন কোন ফলে মাটিতেই বাড়ে এবং পরিপক্ব হয় এবং কোন কোন ফল মাটির সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। কতক ফলের জন্যে উচ্চ শাখায় ঝুলে অবিরাম তাজা বাতাস, সূর্যকিরণ এবং তারকার রশ্মি থেকে রং গ্রহণ করা জরুরী। সর্বশক্তিমান প্রত্যেকের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

এরপর বিশেষভাবে খর্জুর বৃক্ষ এবং শস্যের কথা উল্লেখ করেছেন। খর্জুর ফল সাধারণভাবে চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে খাওয়া হয়। প্রয়োজন হলে এ দ্বারা পূর্ণ খাদ্যের কাজও নেয়া যায়। শস্যক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য থেকে সাধারণতঃ মানুষের খোরাক এবং জন্তু–জানোয়ারের খাদ্য সংগ্রহ করা হয়। এ দু'টি বস্তু উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ এখানে اكله। -এর সর্বনাম زرع এবং نخل উভয়ের দিকে যেতে পারে। অর্থ এই যে, খেজুরের বিভিন্ন প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ আছে। শস্যের তো শত শত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ ও উপকারিতা আছেই। একই পানি, বাতাস এবং একই মাটি থেকে উৎপন্ন ফলের মধ্যে এত বিরাট ব্যবধান এবং প্রত্যেক প্রকারের উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্যের এমন বিস্ময়কর বিভিন্নতা স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেও একথা স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, এদের সৃষ্টিকর্তা এমন এক অচিন্তনীয় সত্তা, যার জ্ঞান ও রহস্য মানুষ অনুমান করতেও সক্ষম নয়।

এরপর আরও দু'টি বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে ঃ যয়তুন ও ডালিম। যয়তুন একাধারে ফল ও তরকারি হয়ে থাকে। এর তৈল সর্বাধিক পরিষ্কার, স্বচ্ছ এবং অসংখ্য গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে। এটি হাজারো রোগের উত্তম প্রতিষেধক। এমনিভাবে ডালিমেরও অনেক গুণাগুণ সবার জানা আছে। এ দুই প্রকার ফল উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ অর্থাৎ, এদের প্রত্যেকটির কিছু ফল রং ও স্বাদের দিক দিয়ে সাদৃশ্যশীল হয় এবং কিছু ফলের রং, স্বাদ ও পরিমাণ একই রূপ হয় এবং ভিন্ন ভিন্নও হয়। যয়তুনের অবস্থাও তদ্রূপ।

এসব বৃক্ষ ও ফল সম্পর্কে উল্লেখ করার পর মানুষের প্রতি দু'টি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ মানুষের বাসনা ও প্রবৃত্তির দাবীর পরিপূরক। বলা হয়েছে ঃ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ অর্থাৎ, এসব বৃক্ষের ও শস্যক্ষেত্রের ফল ভক্ষণ কর, যখন এগুলো ফলন্ত হয়। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এসব বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ সৃষ্টি করে সৃষ্টিকর্তা নিজের কোন প্রয়োজন মেটাতে চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্যে এগুলো সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তোমরা খাও এবং উপকৃত হও। إِذَا أَثْمَرَ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, বৃক্ষের ডাল থেকে ফল বের করা তোমাদের সাধ্যাতীত কাজ। কাজেই আল্লাহ্‌র নির্দেশে যখন ফল বের হয়ে আসে, তখনই তোমরা তা খেতে পার–পরিপক্ব হোক বা না হোক।

ক্ষেতের ওশর ঃ দ্বিতীয় নির্দেশ এই দেয়া হয়েছে ঃ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ শব্দের অর্থ আন অথবা আদায় কর। ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময়কে حصاد বলা হয়। শব্দের সর্বনাম পূর্বোল্লেখিত প্রত্যেকটি খাদ্য বস্তুর দিকে যেতে পারে। বাক্যের অর্থ এই যে, এমন বস্তু খাও, পান কর এবং ব্যবহার কর; কিন্তু মনে রাখবে যে, ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময় এদের হকও আদায় করতে হবে। 'হক' বলে ফকীর–মিসকীনকে দান করা বুঝানো হয়েছে ঃ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ অর্থাৎ, সৎ লোকদের ধন–সম্পদে নির্দিষ্ট হক রয়েছে ফকীর–মিসকীনদের।

এখানে সাধারণ সদকা–খয়রাত বোঝানো হয়েছে না ক্ষেতের যাকাত ও ওশর বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের দু'রকম উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ প্রথমোক্ত মত প্রকাশ করে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং যাকাত মদীনায় হিজরত করার দুই বছর পর ফরয হয়েছে। তাই এখানে 'হক' -এর অর্থ ক্ষেতের যাকাত হতে পারে না। পক্ষান্তরে কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন এবং حق -এর অর্থ যাকাত ও ওশর নিয়েছেন।

তফসীরবিদ ইবনে–কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে আরাবী উন্দুলুসী 'আহকামুল–কারআনে'-এর সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেছেন যে, আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হোক অথবা মদীনায়, উভয় অবস্থাতেই এ আয়াত থেকে শস্যক্ষেত্রের যাকাত অর্থাৎ, ওশর অর্থ নেয়া যেতে পারে। কেননা, তাঁদের মতে যাকাতের নির্দেশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা মুযযাম্মেলের আয়াতে যাকাতের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। তবে যাকাতের পরিমাণ ও নেসার নির্ধারণের নির্দেশ হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের উপর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে একটি হক আরোপ করা হয়েছে। এর পরিমাণ আয়াতে উল্লেখিত হয়নি। কাজেই পরিমাণের ব্যাপারে আয়াতটি সংক্ষিপ্ত। মক্কায় পরিমাণ নির্ধারণের প্রয়োজনও ছিল না। কেননা, ক্ষেত ও বাগানের ফসল অনায়াসে লাভ করার ব্যাপারে তখন মুসলমানরা নিশ্চিত ছিলেন না। তাই পূর্ব থেকে সৎলোকদের মধ্যে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাই অনুসৃত হত। অর্থাৎ, ফসল কাটা ও ফল নামানোর সময় যেসব গরীব–মিসকীন সেখানে উপস্থিত থাকত, তাদেরকে কিছু দান করা হত। কোন বিশেষ পরিমাণ নির্ধারিত ছিল না। ইসলামপূর্ব কালে অন্যান্য উম্মতের মধ্যেও ফল ও

ফসল এভাবে দান করার প্রথা إِنَّا بَلَوْنَٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ কোরআন পাকের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হিজরতের দু'বছর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেমন অন্যান্য ধন-সম্পদের যাকাত ও নেসাবের পরিমাণ ওহীর নির্দেশক্রমে বর্ণনা করেন, তেমনিভাবে ফসলের যাকাতও বর্ণনা করেন। মুয়ায ইবনে জাবাল, ইবনে ওমর ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ(রাঃ) প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে বিষয়টি সব হাদীসগ্রন্থে এভাবে বর্ণিত রয়েছেঃ ما سقت السماء ففيه العشر وما سقى بالسانية فنصف العشر অর্থাৎ, যেসব ক্ষেতে জল সেচনের ব্যবস্থা নেই শুধু বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করতে হয়, সেসব ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজেব এবং যেসব ক্ষেত কূপের পানি দ্বারা সেচ করা হয়, সেগুলোর উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজেব।

ইসলামী শরীয়ত যাকাত আইনে সর্বত্র এ বিষয়টিকে মূলনীতি হিসাবে ব্যবহার করেছে। যে ফসলে পরিশ্রম ও ব্যয় কম, তার যাকাতের পরিমাণ বেশী এবং পরিশ্রম ও ব্যয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, যাকাতের পরিমাণও সে পরিমাণে হ্রাস পায়। উদাহরণতঃ যদি কেউ কোন লুক্কায়িত ধনভাণ্ডার পেয়ে বসে কিংবা সোনা-রূপা ইত্যাদির খনি আবিষ্কৃত হয়, তবে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজেব। কেননা, এখানে পরিশ্রম ও ব্যয় কম এবং উৎপাদন বেশী। এরপর বৃষ্টি বিধৌত ক্ষেতের নম্বর আসে। এতে পরিশ্রম ও ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। তাই এর যাকাত পাঁচ ভাগের একের অর্ধেক—অর্থাৎ, দশ ভাগের এক ধার্য করা হয়েছে। এরপর রয়েছে ঐ ক্ষেত, যা কূপ থেকে সেচের মাধ্যমে কিংবা খালের পানি ক্রয় করে সিক্ত করা হয়। এতে পরিশ্রম ও খরচ বেড়ে যায়। ফলে এর যাকাত তারও অর্ধেক। অর্থাৎ, বিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এরপর আসে সাধারণ সোনা-রূপা ও পণ্যসামগ্রীর পালা। এগুলো অর্জন করতে পরিশ্রম ও ব্যয় অত্যধিক। এ জন্যে এগুলোর যাকাত তারও অর্ধেক অর্থাৎ, চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসে ক্ষেতের ফসলের জন্যে কোন নেসাব নির্ধারিত হয়নি। তাই ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মাযহাব এই যে, ক্ষেতের ফসল কম হোক কিংবা বেশী, সর্বাবস্থায় তার যাকাত বের করা জরুরী। সূরা বাকারার যে আয়াতে ক্ষেতের যাকাত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও এর কোন নেসাব বর্ণিত হয়নি। বলা হয়েছে ঃ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ – অর্থাৎ, স্বীয় হালাল উপার্জন থেকে ব্যয় কর এবং ঐ ফসল থেকে, যা আমি তোমাদের জন্যে ক্ষেত-খামার থেকে উৎপন্ন করেছি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) পণ্য-সামগ্রী ও চতুষ্পদ জন্তুর নেসাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, রূপা সাড়ে বায়ান্ন তোলার কম হলে যাকাত নেই। ছাগল ১০০ এবং উট ৫-এর কম হলে যাকাত নেই। কিন্তু ক্ষেতের ফসল সম্পর্কে পূর্বোল্লেখিত হাদীসে কোন নেসাব ব্যক্ত করা হয়নি। তাই প্রত্যেক ক্ষেতের ফসলের উপরই উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে দশ ভাগের এক ভাগ কিংবা বিশ ভাগের এক যাকাত দেয়া ওয়াজেব।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ অর্থাৎ, সীমাতিরিক্ত ব্যয় করো না। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্র পথে যদি কেউ সমস্ত ধন-সম্পদ বরং জীবনও ব্যয় করে দেয়, তবে একে অপব্যয় বলা যায় না; বরং যথার্থ প্রাপ্য পরিশোধ হয়েছে এরূপ বলাও কঠিন। এমতাবস্থায় এখানে অপব্যয় করতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য কি? উত্তর এই যে, বিশেষ কোন ক্ষেত্রে অপব্যয়ের ফল স্বভাবতঃ অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রটিরূপে দেখা দেয় যে ব্যক্তি স্বীয় কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে মুক্তহস্তে সীমাতিরিক্ত ব্যয় করে, সে সাধারণতঃ অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করতে ক্রটি করে। এখানে এরূপ ক্রটি করতেই বারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যদি কেউ একই ক্ষেত্রে স্বীয় যথাসর্বস্ব লুটিয়ে দিয়ে রিক্তহস্ত হয়ে বসে, তবে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন বরং নিজের প্রাপ্য কিরূপে পরিশোধ করবে? তাই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র পথে ব্যয়ও সুষম হওয়া চাই, যাতে সবার প্রাপ্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়।

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ
قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۙ ﴿١٤٣﴾
وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ
حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ
اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ
افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٤﴾ قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ
مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗۤ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ
دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا
اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ
رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ
ذِىْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ
اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ
بِعَظْمٍ ؕ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿١٤٦﴾

(১৪৩) সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার ও ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার। জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে? না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৪৪) সৃষ্টি করেছেন উটের মধ্যে দুই প্রকার এবং গরুর মধ্যে দুই প্রকার। আপনি জিজ্ঞেস করুন ঃ তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে, না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন আল্লাহ্ এ নির্দেশ দিয়েছিলেন? অতএব সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পোষণ করে যাতে করে মানুষকে বিনা প্রমাণে পথভ্রষ্ট করতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

(১৪৫) আপনি বলে দিন ঃ যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্যে, যা সে ভক্ষণ করে; কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস-এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ; যবেহ করা জন্তু, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অতঃপর যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় যে অবাধ্যতা করে না এবং সীমালঙ্ঘন করে না, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল দয়ালু। (১৪৬) ইহুদীদের জন্যে আমি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম, কিন্তু ঐ চর্বি, যা পৃষ্ঠে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ
بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٤٧﴾ سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا
لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَىْءٍ ؕ
كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ؕ
قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ؕ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ
اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ
فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ
الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا
فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ
يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٠﴾ قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا
تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا
اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ
حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٥١﴾

(১৪৭) যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে বলে দিন ঃ তোমার প্রতিপালক সুপ্রশস্ত করুণার মালিক। তাঁর শাস্তি অপরাধীদের উপর থেকে টলবে না। (১৪৮) এখন মুশরেকরা বলবে ঃ যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম। এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, এমন কি তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। আপনি বলুন ঃ তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে, যা আমাদেরকে দেখাতে পার? তোমরা শুধুমাত্র আন্দাজের অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বল। (১৪৯) আপনি বলে দিন ঃ অতএব, পরিপূর্ণ যুক্তি আল্লাহ্‌রই। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে পথ প্রদর্শন করতেন। (১৫০) আপনি বলুন ঃ তোমাদের সাক্ষীদেরকে আন, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তাআলা এগুলো হারাম করেছেন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে আপনি এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, যারা আমার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যারা স্বীয় প্রতিপালকের সমতুল্য অংশীদার করে। (১৫১) আপনি বলুন ঃ এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না-আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই-নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾
وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾
ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا
لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾
وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ
مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا
لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ
جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ
يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

(১৫২) এতীমদের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায়-যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহ্র অঙ্গীকার পূর্ণ কর। (১৫৩) তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও। (১৫৪) অতঃপর আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছি, সৎকর্মীদের প্রতি নেয়ামতপূর্ণ করার জন্যে, প্রত্যেক বস্তুর বিশদ বিবরণের জন্যে, হেদায়াতের জন্যে এবং করুণার জন্যে— যাতে তারা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী হয়। (১৫৫) এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময়, অতএব, এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর— যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও। (১৫৬) এ জন্যে যে, কখনও তোমরা বলতে শুরু কর ঃ গ্রন্থ তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দু' সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমরা সেগুলোর পাঠ ও পঠন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। (১৫৭) কিংবা বলতে শুরু কর ঃ যদি আমাদের প্রতি কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হত, আমরা এদের চাইতে অধিক পথপ্রাপ্ত হতাম। অতএব, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়েত ও রহমত এসে গেছে। অতঃপর সে ব্যক্তির চাইতে অধিক অনাচারী কে হবে, যে আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে এবং গা বাঁচিয়ে চলে। অতি সত্বর আমি তাদেরকে শাস্তি দেব, যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে গা বাঁচিয়ে চলে— জঘন্য শাস্তি তাদের গা বাঁচানোর কারণে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে প্রায় দু' তিন রুকূতে অব্যাহতভাবে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, গাফেল ও মূর্খ মানুষ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্-প্রেরিত আইন পরিত্যাগ করে পৈতৃক ও মনগড়া কুপ্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ তাআলা যেসব বস্তু অবৈধ করেছিলেন, সেগুলোকে তারা বৈধ মনে করে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ কর্তৃক হালালকৃত অনেক বস্তুকে তারা নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়েছে এবং কোন কোন বস্তুকে শুধু পুরুষদের জন্যে হালাল, স্ত্রীদের জন্যে হারাম করেছে। আবার কোন কোন বস্তুকে স্ত্রীদের জন্যে হালাল, পুরুষদের জন্যে হারাম করেছে।

আলোচ্য তিন আয়াতে সেসব বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ্ তাআলা হারাম করেছেন। বিশদ বর্ণনায় নয়টি বস্তুর উল্লেখ হয়েছে। এরপর দশম নির্দেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ অর্থাৎ, এ ধর্মই হচ্ছে আমার সরল পথ। এ পথের অনুসরণ কর। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর আনীত ও বর্ণিত ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে সমস্ত হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, মকরূহ ও মোস্তাহাব বিষয়কে এ ধর্মে ন্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্ম যে বিষয়কে হালাল বলেছে, তাকে হালাল এবং যে বিষয়কে হারাম বলেছে, তাকে হারাম মনে করবে— নিজের পক্ষ থেকে হালাল-হারামের ফতোয়া জারি করবে না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে যে দশটি বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর আসল লক্ষ্য হচ্ছে হারাম বিষয়সমূহ বর্ণনা করা। কাজেই সবগুলোকে নিষেধাজ্ঞার ভঙ্গিতে বর্ণনা করাই ছিল সঙ্গত, কিন্তু কোরআন পাক স্বীয় বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতি অনুসারে তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয়কে ধনাত্মকভাবে আদেশের ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। তার উদ্দেশ্য এই যে, এর বিপরীত করা হারাম। (কাশ্শাফ) এর তাৎপর্য পরে জানা যাবে। আয়াতে বর্ণিত দশটি হারাম বিষয় হচ্ছে এই ঃ

(১) আল্লাহ্ তাআলার সাথে এবাদত ও আনুগত্যে কাউকে অংশীদার স্থির করা, (২) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার না করা, (৩) দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা, (৪) অশ্লীল কাজ করা, (৫) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, (৬) এতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা, (৭) ওজন ও মাপে কম দেয়া, (৮) সাক্ষ্য, ফয়সালা অথবা অন্যান্য কথাবার্তায় অবিচার করা (৯) আল্লাহ্র অঙ্গীকার পূর্ণ না করা এবং (১০) আল্লাহ্ তাআলার সোজা-সরল পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করা।

আলোচ্য আয়াতসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ঃ তওরাত বিশেষজ্ঞ কা'বে আহবার পূর্বে ইহুদী ছিলেন, অতঃপর মুসলমান হয়ে যান। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র কিতাব তওরাত বিস্‌মিল্লাহ্র পর কোরআন পাকের এসব আয়াত দ্বারাই শুরু হয়, যেগুলোতে দশটি হারাম বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আরও বর্ণিত আছে যে, এ দশটি বাক্যই হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতিও অবতীর্ণ হয়েছিল।

তফসীরবিদ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সূরা আলে এমরানে মুহ্‌কাম আয়াতের বর্ণনায় এ আয়াতগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সাঃ) পর্যন্ত সব পয়গম্বরের শরীয়তই এসব আয়াত সম্পর্কে একমত। কোন ধর্ম ও শরীয়তে এগুলোর কোনটিই মনসুখ বা রহিত হয়নি।— (তফসীর

বাহ্‌রে-মুহীত)

এসব আয়াত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওছীয়তনামা ঃ তফসীর ইবনে কাছীরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মোহরাঙ্কিত ওছিয়তনামা দেখতে চায়, সে যেন এ আয়াতগুলো পাঠ করে। এসব আয়াতে ঐ ওছিয়ত বিদ্যমান, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে উম্মতকে দিয়েছেন।

হাকেম হযরত ওবাদা ইবনে ছামেতের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ কে আছে যে আমার হাতে তিনটি আয়াতের আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ করবে? অতঃপর তিনি আলোচ্য তিনটি আয়াত তেলওয়াত করে বললেন ঃ যে ব্যক্তি এ শপথ পূর্ণ করবে, তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহ্‌র দায়িত্ব।

এবার দশটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এবং আয়াতত্রয়ের তফসীর লক্ষ্য করুন। আয়াতগুলোর সূচনা এভাবে করা হয়েছে ঃ قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ শব্দের অর্থ 'এস'। আসলে উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হয়ে নিম্নের লোকদেরকে নিজের কাছে ডাকা অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দাওয়াত কবুল করার মধ্যেই তাদের জন্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বিদ্যমান। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে বলুন ঃ এস, যাতে আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাতে পারি যেগুলো আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। এটা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত বার্তা। এতে কারও কল্পনা, আন্দাজ ও অনুমানের কোন প্রভাব নেই; যাতে তোমরা এসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করতে যত্নবান হও এবং অনর্থক নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র হালালকৃত বিষয়সমূহকে হারাম না কর।

এ আয়াতে যদিও সরাসরি মক্কার মুশরেকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি ব্যাপক হওয়ার কারণে সমগ্র মানবজাতিই এর আওতাধীন— মুমিন হোক কিংবা কাফের, আরব হোক কিংবা অনারব, উপস্থিত লোকজন হোক কিংবা অনাগত বংশধর।— (বাহ্‌রে-মুহীত)

সর্বপ্রথম মহাপাপ শিরক, যা হারাম করা হয়েছে ঃ এরূপ সযত্ন সম্বোধনের পর হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের তালিকায় সর্বপ্রথম বলা হয়েছে ঃ অর্থাৎ, اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا সর্বপ্রথম কাজ এই যে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক ও অংশীদার করো না। আরবের মুশরেকদের মত দেব-দেবীদেরকে বা মূর্তিকে খোদা মনে করো না। ইহুদী ও খ্রীস্টানদের মত পয়গম্বরগণকে খোদা কিংবা খোদার পুত্র বলো না। অন্যদের মত ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে আখ্যা দিয়ো না। মূর্খ জনগণের মত পয়গম্বর ও ওলীগণকে জ্ঞান ও শক্তি সামর্থ্যে আল্লাহ্‌র সমতুল্য সাব্যস্ত করো না।

শিরকের সংজ্ঞা ও প্রকার ভেদ ঃ তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছেঃ এখানে شَيْـًٔا এর অর্থ এরূপ হতে পারে যে, 'জলী' অর্থাৎ, প্রকাশ্য শিরক ও প্রচ্ছন্ন শিরক— এ প্রকারদ্বয়ের মধ্য থেকে কোনটিতেই লিপ্ত হয়ো না। প্রকাশ্য শিরকের অর্থ সবাই জানে যে, এবাদত আনুগত্য অথবা অন্য কোন বিশেষ গুণে অন্যকে আল্লাহ্ তাআলার সমতুল্য অথবা তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা। প্রচ্ছন্ন শিরক এই যে, নিজ কাজ-কর্মে ধর্মীয় ও পার্থিব উদ্দেশ্যসমূহে এবং লাভ-লোকসানে আল্লাহ্ তাআলাকে কার্যনির্বাহী বলে বিশ্বাস করেও কার্যতঃ অন্যান্যকে কার্যনির্বাহী মনে করা এবং যাবতীয় প্রচেষ্টা অন্যদের সাথেই জড়িত রাখা। এছাড়া লোক দেখানো এবাদত করা, অন্যদেরকে দেখানোর জন্যে নামায ইত্যাদি ঠিকমত পড়া, নাম-যশ লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা অথবা কার্যতঃ লাভ-লোকসানের মালিক আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সাব্যস্ত করা ইত্যাদিও প্রচ্ছন্ন শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, প্রকাশ্য প্রচ্ছন্ন উভয় প্রকার শিরক থেকেই বেঁচে থাকা দরকার। প্রতিমা ইত্যাদির পূজাপাট যেমন শিরকের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি পয়গম্বর ও ওলীদেরকে জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি গুণে আল্লাহ্ তাআলার সমতুল্য মনে করাও অন্যতম শিরক। আল্লাহ্ না করুন, যদি কারও বিশ্বাস এরূপ হয়, তবে তা প্রকাশ্য শিরক। আর বিশ্বাস এরূপ না হয়ে কাজ এরূপ করলে তা হবে প্রচ্ছন্ন শিরক। এ স্থলে সর্বপ্রথম শিরক থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, শিরকের অপরাধ সম্পর্কে কোরআন পাকের সিদ্ধান্ত এই যে, এর ক্ষমা নাই।

দ্বিতীয় গোনাহ্ পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার ঃ বর্ননা করা হয়েছে ঃ وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অর্থাৎ, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। উদ্দেশ্য এই যে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করো না। তাদেরকে কষ্ট দিও না; কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যহার কর। এতে এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা না করা এবং কষ্ট না দেয়াই যথেষ্ট নয়; বরং সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা ফরয। কোরআন পাকের অন্যত্র এ কথাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ

এ আয়াতে পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া শিরকের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে তাদের আনুগত্য ও সুখবিধানকে আল্লাহ্ তাআলার এবাদতের সাথে সংযুক্ত করে বলা হয়েছে ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অর্থাৎ, তোমার পালনকর্তা ফয়সালা করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ, আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং পিতা-মাতার। অতঃপর আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ, বিপরীত করলে শাস্তি পাবে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ নামায মুস্তাহাব সময়ে পড়া। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ এরপর কোন্‌টি উত্তম? উত্তর হল ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার। আবার প্রশ্ন হল ঃ এরপর কোন্‌টি? উত্তর হল ঃ আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ।

ছহীহ্ মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণিত আছেঃ একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তিনবার বললেনঃ رغم انفه ، رغم انفه ، رغم انفه অর্থাৎ, লাঞ্ছিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! কে লাঞ্ছিত হয়েছে? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।

তৃতীয় হারাম ঃ সন্তান হত্যা ঃ আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় হারাম বিষয় হচ্ছে সন্তান হত্যা। এখানে পূর্বাপর সম্পর্ক এই যে, ইতিপূর্বে

পিতা-মাতার হক বর্ণিত হয়েছে, যা সন্তানের কর্তব্য। এখন সন্তানের হক বর্ণিত হচ্ছে, যা পিতা-মাতার কর্তব্য। জাহেলিয়াত যুগে সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা কিংবা হত্যা করার ব্যাপারটি ছিল সন্তানের সাথে অসদ্ব্যবহারের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ অর্থাৎ, দারিদ্র্যের কারণে স্বীয় সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকে — উভয়কেই জীবিকা দান করব।

জাহেলিয়াত যুগে এ নিকৃষ্টতম নির্দয়-পাষণ্ড প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে কাউকে জামাতা করার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশে তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। মাঝে মাঝে জীবিকা নির্বাহ কঠিন হবে মনে করে পাষণ্ডরা নিজ হাতে সন্তানদেরকে হত্যা করত। কোরআন পাক এ কু-প্রথা রহিত করে দিয়েছে। উল্লেখিত আয়াতে তাদের সেই মানসিক ব্যাধিরও প্রতিকার বর্ণিত হয়েছে, যে কারণে তারা এ ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত হত। সন্তানের পানাহারের সংস্থান কোথা থেকে হবে, এ ভাবনাই ছিল তাদের মানসিক রোগ। আল্লাহ্ তাআলা আয়াতে ব্যক্ত করেছেন যে, পানাহার করানো এবং জীবিকা প্রদানের আসল দায়িত্ব তোমাদের নয়, এ কাজ সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার। তোমরা স্বয়ং জীবিকা ও পানাহারে তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি দিলে তোমরা সন্তানদেরকেও দিয়ে থাক। তিনি না দিলে তোমাদের কি সাধ্য যে, একটি গম অথবা চালের দানা নিজে সৃষ্টি করবে। শক্ত মাটির বুক চিরে বীজকে অঙ্কুরিত করা, অতঃপর তাকে বৃক্ষের আকার দান করা, অতঃপর ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ করা কার কাজ? পিতা-মাতা এ কাজ করতে পারে কি? এগুলো সব সর্বশক্তিমানের কুদরতের কারসাজি। একাজে মানুষের কোন হাত নেই। সে শুধু মাটিকে নরম করতে এবং চারা গজালে পানি দিতে পারে। কিন্তু ফুল-ফল সৃষ্টিতে তার বিন্দুমাত্রও হাত নেই। অতএব, পিতা-মাতার এ ধারণা অমূলক যে, তারা সন্তানদেরকে রিযিক দান করে। বরং আল্লাহ্ তাআলার অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে পিতা-মাতাও পায় এবং সন্তানরাও। তাই এখানে প্রথমে পিতা-মাতার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে,আমি তোমাদেরকেও রিযিক দেব এবং তাদেরকেও। এতে আরও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তোমাদেরকে রিযিক এজন্যে দেয়া হয়, যাতে তোমরা সন্তানদেরকে পৌছে দাও। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন **انما تنصرون وترزقون بضعفائكم** অর্থাৎ, তোমাদের দুর্বল ও অক্ষম লোকদের কারণে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সাহায্য করেন ও রিযিক দান করেন।

সূরা ইসরায়ও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে রিযিকের ব্যাপারে প্রথম সন্তানের উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ অর্থাৎ, আমি তাদেরকেও রিযিক দেব এবং তোমাদেরকেও। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমার কাছে রিযিকের প্রথম হকদার দুর্বল ও অক্ষম সন্তানরা। তাদের খাতিরেই তোমাদেরকেও দেয়া হয়।

সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন না করা এবং ধর্মবিমুখতার জন্যে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া ও এক প্রকার সন্তান হত্যা ঃ আয়াতে বর্ণিত সন্তান হত্যা যে অপরাধ ও কঠোর গোনাহ্ তা বাহ্যিক হত্যা ও মেরে ফেলার অর্থে তো সুস্পষ্টই। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা না দেয়া এবং তার চরিত্র গঠন না করা, যদ্দরুন সে আল্লাহ্-রসূল ও পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে এবং চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে, এটাও সন্তান হত্যার চাইতে কম মারাত্মক নয়। কোরআন পাকের ভাষায় সে ব্যক্তি মৃত, যে আল্লাহ্‌কে চিনে না এবং তাঁর আনুগত্য করে না। أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। যারা সন্তানদের কাজ-কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় কিংবা এমন ভ্রান্ত শিক্ষা দেয়, যার ফলে ইসলামী চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়, তারাও একদিক দিয়ে সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী। বাহ্যিক হত্যার প্রভাবে তো শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু এ হত্যা মানুষের পারলৌকিক ও চিরস্থায়ী জীবনের মূলেও কুঠারাঘাত করে।

চতুর্থ হারাম নির্লজ্জ কাজ ঃ আয়াতে বর্ণিত চতুর্থ হারাম বিষয় হচ্ছে নির্লজ্জ কাজ। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ অর্থাৎ, প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন, যে কোন রকম অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না।

فاحشة শব্দটি **فاحشة** এর বহুবচন। **فحش ، فحشاء ও فاحشة** সবগুলো ধাতু। এগুলোর অর্থ সাধারণতঃ অশ্লীলতা ও নির্লজ্জ হয়। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এসব শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সব কাজ, যার অনিষ্টতা ও খারাবী সুদূর প্রসারী। ইমাম রাগেব 'মুফরাদাতুল'-কোরআন' গ্রন্থে এবং ইবনে আসীর নেহায়াহ্ গ্রন্থে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। কোরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এসব কাজের নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَٰحِشَ

যাবতীয় বড় গোনাহ্ **فحش ও فحشاء** এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত, তা উক্তি সম্পর্কিত হোক কিংবা কর্ম সম্পর্কিত, বাহ্যিক হোক কিংবা আভ্যন্তরীণ। এছাড়া আত্মিক ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার যাবতীয় কাজও এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই সাধারণ ভাষায় এ শব্দটি ব্যভিচারের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোরআনের আলোচ্য আয়াতে নির্লজ্জ কাজসমূহের কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। ব্যাপক অর্থ নেয়া হলে যাবতীয় বদঅভ্যাস, মুখ, হাত, পা ও অন্তরের যাবতীয় গোনাহ্ই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থ ব্যভিচার নেয়া হলে আয়াতে ব্যভিচার ও তার ভূমিকা এবং কারণসমূহ বুঝানো হয়েছে।

এ আয়াতেই **فواحش** এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ঃ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক **فواحش** এর অর্থ হবে হাত, পা ইত্যাদি দ্বারা সম্পন্ন গোনাহ্ এবং আভ্যন্তরীণ **فواحش** এর অর্থ হবে অন্তর সম্পর্কিত গোনাহ্। যেমন -হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, অকৃতজ্ঞতা, অধৈর্য ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক **فواحش** এর অর্থ এমন ব্যভিচার যা প্রকাশ্যে করা হয়। আর আভ্যন্তরীণের অর্থ যে ব্যভিচার গোপনে করা হয়। ব্যভিচারের ভূমিকাও প্রকাশ্য ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত। কু-নিয়তে পর নারীকে দেখা, হাতে স্পর্শ করা এবং তার সাথে প্রেমালাপ করা এরই অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ব্যভিচার সম্পর্কিত যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, সংকল্প এবং গোপন কৌশল অবলম্বন আভ্যন্তরীণ ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ বাহ্যিক নির্লজ্জতার অর্থ সাধারণভাবে প্রচলিত অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজকর্ম এবং আভ্যন্তরীণ নির্লজ্জতার অর্থ আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে নির্লজ্জ কাজ-কর্ম, যদিও

সাধারণভাবে মানুষ সেগুলোকে খারাপ মনে করে না কিংবা সেগুলো যে হারাম, তা সাধারণ মানুষ জানে না। উদাহরণতঃ স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পরও তাকে স্ত্রী হিসেবে রেখে দেয়া কিংবা হালাল নয় এরূপ মহিলাকে বিয়ে করা।

মোটকথা, এ আয়াত নির্লজ্জতার প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত গোনাহ্‌কে এবং সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়ে ব্যভিচারের প্রকাশ্য ও গোপন সকল পন্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এ সম্পর্কে নির্দেশ এই যে, এগুলোর কাছেও যেয়ো না। কাছে না যাওয়ার অর্থ এরূপ মজলিস ও স্থান থেকে বেঁচে থাকা যেখানে গেলে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং এরূপ কাজ থেকেও বেঁচে থাক, যদ্দ্বারা এসব গোনাহ্‌র পথ খুলে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه অর্থাৎ, যে লোক নিষিদ্ধ জায়গার আশপাশে ঘুরাফেরা করে, সে তাতে প্রবেশ করার কাছাকাছি হয়ে যায়।

পঞ্চম হারাম বিষয় অন্যায় হত্যা ঃ এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না, তবে ন্যায়ভাবে। এ 'ন্যায়ভাবে' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তিনটি কারণ ছাড়া কোন মুসলমানের খুন হালাল নয়। (এক) বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, (দুই) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার কেছাছ হিসেবে তাকে হত্যা করা যাবে এবং (তিন) সত্যধর্ম ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেলে।

খলিফা হযরত ওসমান গনী (রাঃ) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন এবং বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখনও তিনি তাদেরকে এ হাদীস শুনিয়ে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্‌র রহমতে আমি এ তিনটি কারণ থেকেই মুক্ত। মুসলমান হয়ে তো দূরের কথা, জাহেলিয়াত যুগেও আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি, আমি কোন খুন করিনি, স্বীয় ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করব— এরূপ কল্পনাও আমার মনে কখনও জাগেনি। এমতাবস্থায় তোমরা আমাকে কি কারণে হত্যা করতে চাও?

বিনা কারণে মুসলমানকে হত্যা করা যেমন হারাম, তেমনিভাবে এমন কোন অমুসলমানকে হত্যা করাও হারাম, যে কোন ইসলামী দেশের প্রচলিত আইন মান্য করে বসবাস করে কিংবা যার সাথে মুসলমানের চুক্তি থাকে।

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা রাঃ বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন যিম্মী অমুসলিমকে হত্যা করে, সে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। যে আল্লাহ্ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি সত্তর বছরের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছে। এই একটি আয়াতে দশটির মধ্যে পাঁচটি হারাম বিষয়ের বর্ণনা দেয়ার পর বলা হয়েছে ঃ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ অর্থাৎ, এসব বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ।

ষষ্ঠ হারাম এতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা ঃ দ্বিতীয় আয়াতে এতীমদের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা যে হারাম, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ অর্থাৎ, এতীমের মালের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায়, যে পর্যন্ত না সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে যায়। এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এতীম শিশুদের অভিভাবককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তারা যেন এতীমদের মালকে আগুন মনে করে এবং অবৈধভাবে তা খাওয়া ও নেয়ার কাছেও না যায়। অন্য এক আয়াতে অনুরূপ ভাষায়ই বলা হয়েছে যে, যারা এতীমদের মাল অন্যায় ও অবৈধভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে।

তবে এতীমের মাল সংরক্ষণ করা এবং স্বভাবতঃ লোকসানের আশঙ্কা নেই— এরূপ কারবারে নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করা উত্তম ও জরুরী পন্থা। এতীমদের অভিভাবকের এ পন্থা অবলম্বন করাই উচিত।

এরপর এতীমের মাল সংরক্ষণের সীমা বর্ণনা করা হয়েছে, حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ অর্থাৎ, সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে গেলে অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তার মাল তার কাছে সমর্পন করতে হবে।

اشد শব্দের প্রকৃত অর্থ শক্তি। আলেমগণের মতে বয়োঃপ্রাপ্ত হলেই এর সূচনা হয়। বালক-বালিকার মধ্যে বয়োঃপ্রাপ্তির লক্ষণ দেখা দিলে কিংবা বয়স পনের-ষোল বছর পূর্ণ হয়ে গেলে শরীয়ত মতে তাদেরকে বয়ঃপ্রাপ্ত বলা হবে।

তবে বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর দেখতে হবে, তার মধ্যে নিজের মালের রক্ষণা-বেক্ষণ এবং শুদ্ধ খাতে ব্যয় করার যোগ্যতা হয়েছে কিনা। যোগ্যতা দেখলে বয়োঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে তার ধন-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করা হবে। অন্যথায় পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ধন-সম্পদ হেফাযত করার দায়িত্ব অভিভাবকদের। ইতিমধ্যে যখনই ধন-সম্পদ সংরক্ষণ এবং কারবারের যোগ্যতা তার মধ্যে দেখা যাবে, তখনই তার ধন-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করতে হবে। যদি পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্তও তার মধ্যে এ যোগ্যতা সৃষ্টি না হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে তার মাল তাকেই সমর্পণ করতে হবে যদি সে উন্মাদ না হয়। কোন কোন ইমামের মতে তখনও তার মাল তাকে দেয়া যাবে না, বরং শরীয়তের কাযী (বিচারক) তার মাল সংরক্ষণের জন্যে কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করবেন।

সপ্তম হারাম ওজন ও মাপে ত্রুটি করা ঃ এ আয়াতে সপ্তম নির্দেশ ওজন ও মাপ ন্যায়ভাবে পূর্ণ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। 'ন্যায়ভাবে' বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে ওজন করে দেবে, সে প্রতিপক্ষকে কম দেবে না এবং প্রতিপক্ষ নিজ প্রাপ্যের চাইতে বেশী নেবে না। – (রুহুল-মা'আনী)

দ্রব্য আদান-প্রদানে ওজন ও মাপে কম-বেশী করাকে কোরআন কঠোর হারাম সাব্যস্ত করেছে। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের জন্য সূরা মুতাফফিফীনে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে।

তফসীরবিদ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে ওজন ও মাপের কাজ করে, তাদেরকে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ ওজন ও মাপ এমন একটি কাজ যে, এতে অন্যায় আচরণ করে তোমাদের পূর্বে অনেক উম্মত আল্লাহ্‌র আযাবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন কর। – (ইবনে-কাছীর)

কর্মচারী ও শ্রমিকদের নির্ধারিত কর্তব্য কর্মে ত্রুটি করাও ওজন ও মাপে ত্রুটি করার অনুরূপ ঃ ওজন ও মাপে ত্রুটি করাকে কোরআন পাকে تطفيف বলা হয়েছে। এটা শুধু ওজন করার সময় কমবেশী করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্যের প্রাপ্যে ত্রুটি করাও تطفيف এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালেক (রহঃ) স্বীয় মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত ওমর (রাঃ)

থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তিকে নামাযের আরকানে ত্রুটি করতে দেখে তিনি বলেছিলেন ঃ তুমি **تطفيف** করেছ, অর্থাৎ, যথার্থ প্রাপ্য শোধ করনি। এ ঘটনা বর্ণনা করে ইমাম মালেক বলেন ঃ **لكل شئ وفاء وتطفيف** অর্থাৎ, প্রাপ্য পুরোপুরি দেয়া ও ত্রুটি করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হয় – শুধু ওজন ও মাপের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়।

এতে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি কর্তব্য কর্ম পূর্ণ করে না, সময় চুরি করে কিংবা কাজে ত্রুটি করে, সে-ও উপরোক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, সে কোন মন্ত্রী হোক প্রশাসক হোক কিংবা সাধারণ কর্মচারী হোক অথবা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিয়োজিত হোক না কেন।

এরপর বলা হয়েছে ঃ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ, আমি কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতিরিক্ত কাজের নির্দেশ দেই না। কোন কোন হাদীসে এর অর্থ এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সাধ্যমত পুরোপুরি ওজন করে, এতদসত্ত্বেও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ওজনে কমবেশী হয়ে যায়, তবে তা মাফ। কেননা, এটা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে।

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ এ বাক্য যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রাপ্য পরিশোধের সময় কিছু বেশী দেয়াই সতর্কতা– যাতে কর্মের সন্দেহ না থাকে, যেমন এরূপ স্থলেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওজনকারীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ زن وارجح অর্থাৎ, ওজন কর এবং কিছু ঝুঁকিয়ে ওজন কর। – (আহ্‌মদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সাধারণ অভ্যাস তাই ছিল। তিনি কারও প্রাপ্য পরিশোধ করার সময় প্রাপ্যের চাইতে বেশী দেয়া পছন্দ করতেন।

অষ্টম নির্দেশ ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীত করা হারাম ঃ বলা হয়েছে ঃ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى অর্থাৎ, তোমরা যখন কথা বলবে, তখন ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে, যদি সে আত্মীয়ও হয়।' এখানে বিশেষ কোন কথার উল্লেখ নাই। তাই সাধারণ তফসীরবিদগণের মতে সব রকম কথাই এর অন্তর্ভুক্ত। কোন ব্যাপারের সাক্ষ্য হোক কিংবা বিচারকের ফয়সালা হোক অথবা পারস্পরিক বিভিন্ন প্রকার কথাবার্তাই হোক– সব ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় ন্যায় ও সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মোকদ্দমার সাক্ষ্যে কিংবা ফয়সালার ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য কায়েম রাখার অর্থ এই যে, ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে যা জানা আছে, নিজের পক্ষ থেকে কমবেশী না করে তা পরিষ্কার বলে দেয়া– অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোন কথা না বলা এবং এতে কারও উপকার কিংবা কারও অপকারের ভ্রূক্ষেপ না করা। মোকদ্দমার ফয়সালার সাক্ষীদেরকে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী যাচাই করার পর তাদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য সূত্র দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তাই ফয়সালা করা। সাক্ষ্য ও ফয়সালায় কারও বন্ধুত্বও ভালবাসা এবং কারও শত্রুতা ও বিরোধিতা সত্য বলার পথে অন্তরায় না হওয়া উচিত। এ কারণেই আয়াতে وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى বাক্যটি যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যার মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিবে কিংবা ফয়সালা করবে, সে তোমার নিকটাত্মীয়ের হলেও ন্যায় ও সত্যকে কোন অবস্থাতেই হাতছাড়া করবে না।

মিথ্যা সাক্ষ্য ও অসত্য ফয়সালা প্রতিরোধ করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পর্কে আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত রয়েছে ঃ – মিথ্যা সাক্ষ্য শেরেকীর সমতুল্য।'

নবম নির্দেশ ঃ আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা ঃ বলা হয়েছে ঃ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এর অর্থ ঐ অঙ্গীকারও হতে পারে, যা রূহের জগতে অবস্থান করার সময় প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে। তখন সব মানুষকে বলা হয়েছিল اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?) তখন সবাই সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল ঃ بَلٰى (অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের পালনকর্তা)। এ অঙ্গীকারের দাবী হল এই যে, পালনকর্তার কোন নির্দেশ অমান্য করা যাবে না। তিনি যে কাজের আদেশ দেন, তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি যে কাজে নিষেধ করেন, তার কাছেও যাওয়া যাবে না এবং সন্দেহযুক্ত কাজ থেকেও বাঁচতে হবে। অঙ্গীকারের সারকথা এই যে, আল্লাহ্ তাআলার পুরোপুরি আনুগত্য করতে হবে।

এছাড়া এর অর্থ কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ অঙ্গীকারও হতে পারে। বর্ণিত তিনটি আয়াত এদের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর তফসীর করা হচ্ছে এবং যেগুলোতে দশটি নির্দেশ তাকীদ সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলেমগণ বলেন ঃ নযর, মান্নত ইত্যাদি পূর্ণ করাও এ অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত। এতে অমুক কাজ করব কিংবা করব না বলে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার সাথে অঙ্গীকার করে। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একথা পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সৎ বান্দারা স্বীয় মান্নত পূর্ণ করে।

মোটকথা, এ নবম নির্দেশটি গণনার দিক দিয়ে নবম হলেও স্বরূপের দিক দিয়ে শরীয়তের যাবতীয় আদেশ–নিষেধের মধ্যে পরিব্যপ্ত।

এ আয়াতের শেষভাগে বলা রয়েছে ঃ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে এসব কাজের জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।

দশম নির্দেশ ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ

অর্থাৎ, এ শরীয়তে মুহাম্মদী হল আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এ পথে চল এবং অন্য কোন পথে চলো না। কেননা, সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

এখানে هٰذَا শব্দ দ্বারা দ্বীনে ইসলাম অথবা কোরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সূরা আনআমের প্রতিও ইশারা হতে পারে। কেননা, তাতেও ইসলামের যাবতীয় মূলনীতি, তৌহীদ, রেসালত এবং মূল বিধি–বিধান ব্যক্ত হয়েছে। مُسْتَقِيْمًا শব্দটি صِرَاطِیْ এর বিশেষণ। কিন্তু ব্যাকরণিক দিক দিয়ে একে বর্তমান কাল বাচক উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সরল হওয়া ইসলামের একটি অপরিহার্য বিশেষণ। এরপর বলা হয়েছে ঃ فَاتَّبِعُوْهُ অর্থাৎ, ইসলামই যখন আমার পথ এবং এটাই যখন সরল পথ, তখন মনযিলে–মকছুদের (অভিষ্ট লক্ষ্যের) সোজা পথ হাতে এসে গেছে। তাই এ পথেই চল।

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ
بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا
إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ
انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا
لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ
بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ قُلْ إِنَّنِي
هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَ
مَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ
وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ
رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾ وَهُوَ الَّذِي
جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

(১৫৮) তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নির্দেশ আসবে। যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি। আপনি বলে দিন ঃ তোমরা পথের দিকে চেয়ে থাক, আমরাও পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। (১৫৯) নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে। (১৬০) যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুতঃ তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (১৬১) আপনি বলে দিন ঃ আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন— একাগ্রচিত্ত ইবরাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম। সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১৬২) আপনি বলুন ঃ আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। (১৬৩) তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল। (১৬৪) আপনি বলুন ঃ আমি কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য প্রতিপালক খোঁজব, অথচ তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক ? যে ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদেরকে সবাইকে প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা বিরোধ করতে। (১৬৫) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।

— وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ এরপর বলা হয়েছে **سبل** শব্দটি **سبيل** এর বহুবচন। এর অর্থও পথ। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ পর্যন্ত পোঁছা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আসল পথ তো একটিই, জগতে যদিও মানুষ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী অনেক পথ করে রেখেছে। তোমরা সেসব পথে চলো না। কেননা, সেগুলো বাস্তবে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে না। কাজেই যে এসব পথে চলবে সে আল্লাহ্ থেকে দূরেই সরে পড়বে।

তফসীর-মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ কোরআন পাক ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রেরণ করার আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা, ইচ্ছা ও পছন্দকে কোরআন ও সুন্নাহর ছাঁচে ঢেলে নিক এবং স্বীয় জীবনকে এরই অনুসারী করে নিক। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই যে, মানুষ কোরআন ও সুন্নাহকে নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও পছন্দের ছাঁচে ঢেলে নিতে চাচ্ছে। কোন আয়াত কিংবা হাদীসকে নিজের মতলব বা ধারণার বিপরীতে দেখলে তারা তার মনগড়া ব্যাখ্যা করে স্বীয় প্রবৃত্তির পক্ষে নিয়ে যায়। এখান থেকেই অন্যান্য বেদাত ও পথভ্রষ্টতার জন্ম। আয়াতে এসব পথ থেকে বেঁচে থাকতেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গাফেল থাকার কারণ এটা নয় যে, তওরাত ও ইঞ্জীল আরবী ভাষায় ছিল না, অনুবাদের মাধ্যমে বিষয়বস্তু জানা সম্ভবপর ও বাস্তবসম্মত। বরং কারণ এই যে, আহ্‌লে-কিতাবরা আরবদের শিক্ষা ও একত্ববাদের ব্যাপারে কখনও যত্নবান হয়নি। ঘটনাচক্রে কোন বিষয়বস্তু পাঠ করাই হুঁশিয়ার হওয়ার ব্যাপারে ততটুকু কার্যকর নয়। তবে এতটুকু হুঁশিয়ারীর কারণে একত্ববাদের জ্ঞান অনুসন্ধান ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ওয়াজেব হয়ে যায় এবং এ কারণেই একত্ববাদ বর্জন করার জন্য আরবদেরকে শাস্তি দেয়া সম্ভবপর ছিল। এতে একথা জরুরী হয় না যে, তাহলে হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়ত ব্যাপক ও সবার জন্য ছিল। এরূপ নয়, বরং এ ধরনের ব্যাপকতা আমাদের পয়গম্বর মুহম্মদ (সাঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য এবং তা মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা উভয়ের সমষ্টির দিক দিয়ে। নতুবা মূলনীতিতে সকল পয়গম্বরের অনুসরণই সব মানুষের জন্যে জরুরী। সুতরাং এ দিক দিয়ে আরবদেরকে শাস্তি দেয়া অশুদ্ধ হত না; কিন্তু আয়াতে বর্ণিত অজুহাতটি বাহ্যদৃষ্টিতে পেশ করা সম্ভবপর ছিল। এখন তারও অবকাশ রইল না এবং আল্লাহ্‌র যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় উক্তি أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও উত্তর নবুওয়তের বিরতিকালে অবস্থান করার কারণে যারা মুক্তি পাবে, তাদের সম্পর্কে সূরা মায়েদার তৃতীয় রুকুর শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আনআমের অধিকাংশই মক্কাবাসী ও আরব-মুশরেকদের বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সংস্কার এবং তাদের সন্দেহ ও প্রশ্নের জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে।

গোটা সূরায় এবং বিশেষভাবে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মক্কা ও আরবের অধিবাসীদের সামনে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মো'জেযা ও প্রমাণাদি দেখে নিয়েছ, তাঁর সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও পয়গম্বরগণের ভবিষ্যদ্বাণীও শুনে নিয়েছ এবং একজন নিরক্ষরের মুখ থেকে কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত শোনার মো'জেযাটিও লক্ষ্য করেছ। এখন ন্যায় ও সত্যের সমুদয় পথ তোমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

অতএব, বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে আর কিসের অপেক্ষা?

এ বিষয়টি আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বলা হয়েছে ঃ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَٰئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ

অর্থাৎ, তারা কি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে এ জন্যে অপেক্ষা করছে যে, মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের কাছে পৌঁছবে! না কি হাশরের ময়দানের জন্যে অপেক্ষা করছে, যেখানে প্রতিদান ও শাস্তির ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং আগমন করবেন অথবা কিয়ামতের কোন একটি সর্বশেষ নিদর্শন দেখে নেয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে? ফয়সালার জন্যে কিয়ামতের ময়দানে পালনকর্তার উপস্থিতি কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ তাআলা কিভাবে এবং কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন, তা মানবজ্ঞান পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। তাই এ ধরনের আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের অভিমত এই যে, কোরআনে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই বিশ্বাস করতে হবে। উদাহরণতঃ এ আয়াতে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে প্রতিদান ও শাস্তির মীমাংসা করার জন্যে উপস্থিত হবেন। তবে কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন এবং কোন দিকে অবস্থান করবেন এ আলোচনা অর্থহীন।

অতঃপর "যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন কোন নিদর্শন এসে যাবে........।"

এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার কোন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন বিশ্বাস স্থাপন করলে তা কবুল করা হবে না এবং যে ব্যক্তি পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে; কিন্তু কোন সৎকর্ম করেনি, সে তখন তওবা করে ভবিষ্যতে সৎকর্ম করার ইচ্ছা করলে তার তওবাও কবুল করা হবে না। মোটকথা, কাফের স্বীয় কুফর থেকে এবং পাপাচারী স্বীয় পাপাচার থেকে যদি তখন তওবা করতে চায়, তবে তা কবুল হবে না।

কারণ, বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা যতক্ষণ মানুষের ইচ্ছাধীন থাকে, ততক্ষণই তা কবুল হতে পারে। আল্লাহ্র শাস্তি ও পরকালের স্বরূপ ফুটে উঠার পর প্রত্যেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা করতে আপনা থেকেই বাধ্য হবে। বলাবাহুল্য, এরূপ ঈমান ও তওবা গ্রহণযোগ্য নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যখন কেয়ামতের সর্ব শেষ নির্দশনটি প্রকাশিত হবে অর্থাৎ, সূর্য পূর্বদিকের পরিবর্তে পশ্চিমদিক থেকে উদিত হবে, তখন এ নির্দশনটি দেখা মাত্রই সারা বিশ্বের মানুষ ঈমানের কালেমা পাঠ করতে শুরু করবে এবং সব অবাধ্য লোকও অনুগত হয়ে যাবে। কিন্তু তখনকার ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় হবে না।— (বগভী)

এ আয়াত থেকে একথা জানা গেল যে, কেয়ামতের কোন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর কোন কাফের কিংবা ফাসেকের তওবা কবুল হবে না। কিন্তু এ নিদর্শন কোন্‌টি, কোরআন পাক তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেনি।

ছহীহ্ মুসলিমে এর বিস্তারিত বিবরণে হুযায়ফা ইবনে ওসায়দ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর কেয়ামতের লক্ষণাদি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ দশটি নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত কেয়ামত হবে না। (এক) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়। (দুই) বিশেষ এক প্রকার ধোঁয়া, (তিন) দাব্বাতুল-আরদ, (চার) ইয়াজুয-মাজুযের আবির্ভাব (পাঁচ) ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, (ছয়) দাজ্জালের *অভ্যুদয়, (সাত,আট,নয়) প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও আরব উপদ্বীপ-এ তিন* জায়গায় মাটি ধসে যাওয়া এবং (দশ) আদন থেকে একটি আগুন বেরিয়ে মানুষকে সামনের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া। মসনদ-আহমদে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ এসব নিদর্শনের মধ্যে সর্বপ্রথম নিদর্শনটি হল পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ও দাব্বাতুল-আরদের আবির্ভাব।

ইমাম কুরতুবী তাযকেরা গ্রন্থে এবং হাফেয ইবনে হাজার বুখারীর টীকায় হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ এ ঘটনার অর্থাৎ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পর একশ বিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে।— (রুহুল-মা'আনী)

এ বিবরণ দৃষ্টে প্রশ্ন হয় যে, ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের পর ছহীহ্ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি মানব জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দেবেন এবং মানুষ ঈমান কবুল করবে। ফলে সমগ্র বিশ্বে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি তখনকার ঈমান গ্রহণীয় না হয়, তবে এ দাওয়াত এবং মানুষের ইসলাম গ্রহণ অর্থহীন হয়ে যায় না কি?

তফসীর রুহুল-মা'আনীতে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের ঘটনাটি ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের অনেক পরে হবে। তওবার দরজা তখন থেকেই বন্ধ হবে; ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে নয়।

সূরা আল্-আনআমের অধিকাংশই মক্কার মুশরেকদেরকে সম্বোধন এবং তাদের প্রশ্ন ও উত্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এখন আল্লাহ্ তাআলার সোজাপথ একমাত্র কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পূববর্তী পয়গম্বরগণের যুগে যেমন তাঁদের ও তাঁদের গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসরণের উপর মুক্তি নির্ভরশীল ছিল, তেমনি আজ শুধু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর শরীয়তের নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই মুক্তি সীমাবদ্ধ। কাজেই তোমরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও এবং সোজা-সরল পথ ছেড়ে এদিক-ওদিক ভ্রান্তপথ অবলম্বন করো না। এসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে মুশরেক, ইহুদী, খ্রস্টান ও মুসলমান সবাইকে ব্যাপকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহ্র সরল পথ পরিহার করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলা হয়েছে যে, এসব ভ্রান্ত পথের মধ্যে কিছু সরল পথের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখীও রয়েছে ; যেমন, মুরেক ও আহলে-কিতাবদের অনুসৃত পথ এবং কিছু বিপরীতমুখী নয়, কিন্তু সরল পথ থেক বিচ্যুত করে ডানে-বামে নিয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে সন্দেহযুক্ত ও বেদআতের পথ। এগুলোও মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেয়।

"যারা ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের কাজ আল্লাহ্ তাআলার নিকট সম্পর্কিত। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাদের কাছে তাদের কৃতকর্মসমূহ বিবৃত করবেন।

আয়াতে উল্লেখিত 'ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করা' এবং 'বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার' অর্থ ধর্মের মূলনীতিসমূহের অনুসরণ ছেড়ে স্বীয় ধ্যান-ধারণাও প্রবৃত্তি অনুযায়ী কিংবা শয়তানের ধোঁকা ও সন্দেহে লিপ্ত হয়ে ধর্মে কিছু নতুন বিষয় ঢুকিয়ে দেয়া অথবা কিছু বিষয় তা থেকে বাদ দেয়া।

ধর্মে বেদআত আবিস্কার করার কারণে কঠোর শাস্তিবাণী ঃ তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে— কিছু লোক ধর্মের মূলনীতি বর্জন করে সে জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এ উম্মতের বেদআতীরাও নতুন ও ভিত্তিহীন বিষয়কে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তারা সবাই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ বিয়টি বর্ণনা করে বলেন ঃ বনী-ইসরাঈলরা যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, আমার উম্মতও সেগুলোর সম্মুখীন হবে। তারা যেমন কর্মে লিপ্ত হয়েছিল, আমার উম্মতও তেমনি হবে। বনী-ইসরাঈলরা ৭২টি দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মতে ৭৩টি দল সৃষ্টি হবে। তন্মধ্যে একদল ছাড়া সবাই দোযখে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোন্‌টি ? উত্তর হল ঃ যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণ করবে, তারাই মুক্তি পাবে।- (তিরমিযী, আবু দাউদ)

তিবরানী নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ এ আয়াতে বেদআতী, প্রবৃত্তির অনুসারী এবং নতুন পথের উদ্ভাবকদের কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত আছে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ধর্মে নিজের পক্ষ থেকে নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন।

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ ''তোমাদের মধ্যে যারা আমার পর জীবিত থাকবে, তারা বিস্তর মতানৈক্য দেখতে পাবে। তাই (আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে,) তোমরা আমার ও খোলাফায়ে-রাশেদীনের সুন্নতকে শক্তভাবে আঁকড়ে থেকো এবং তদনুযায়ী কাজ করে যেও। নতুন নতুন পথ থেকে সযত্নে গা বাঁচিয়ে চলো। কেননা, ধর্মে নতুন সৃষ্ট প্রত্যেক বিষয়ই বেদআত এবং প্রত্যেক বেদআতই পথভ্রষ্টতা।''

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ ছয় ব্যক্তির প্রতি আমি অভিসম্পাত করি, এবং আল্লাহ্ তাআলাও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করুন। (এক) যে ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র গ্রন্থে কোন কিছু যোগ করে (তা শব্দই যোগ করুক কিংবা এমন কোন অর্থ যোগ করুক যা সাহাবায়ে কেরামের তফসীরের বিপরীত)। (দুই) যে ব্যক্তি তকদীরকে অস্বীকার করে। (তিন) যে ব্যক্তি জবরদস্তীমূলকভাবে মুসলানদের নেতা হয়ে যায়— যাতে ঐ ব্যক্তিকে সম্মানিত করে, যাকে আল্লাহ্ লাঞ্ছিত করেছেন এবং ঐ ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করে, যাকে আল্লাহ্ সম্মান দান করেছেন। (চার) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুকে হালাল মনে করে; অর্থাৎ, মক্কার হেরেমে খুন-খারাবি করে কিংবা শিকার করে। (পাঁচ) যে ব্যক্তি আমার বংশধর ও সন্তান-সন্ততির সম্মান হানি করে। (ছয়) যে ব্যক্তি আমার সুন্নত ত্যাগ করে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا

يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, সরল পথ থেকে বিমুখ ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্ তাআলাই কেয়ামতের দিন শাস্তি দিবেন।

এ আয়াতে পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির একটি সহৃদয় বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করবে, তাকে দশগুণ প্রতিদান দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গোনাহ্ করবে, তাকে শুধু এক গোনাহ্‌র সমান বদলা দেয়া হবে।

বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও মুসনাদে-আহমদে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। যে ব্যক্তি কোন সৎকাজের শুধু ইচ্ছা করে, তার জন্যে একটি নেকী লেখা হয়— ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করুক বা না করুক। অতঃপর যখন সে সৎকাজটি সম্পাদন করে, তখন তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর তা কার্যে পরিণত না করে, তার আমলনামায়ও একটি নেকী লেখা হয়। অতঃপর যদি সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করে, তবে একটি গোনাহ্ লেখা হয়। কিংবা একেও মিটিয়ে দেয়া হয়। এহেন দয়া ও অনুকম্পা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র দরবারে ঐ ব্যক্তিই ধ্বংস হতে পারে, যে ধ্বংসে হতেই দৃঢ়সংকল্প।- (ইবনে-কাছীর)

এক হাদীসে কুদসীতে হযরত আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে— যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করে, সে দশটি সৎকাজের ছওয়াব পায় বরং আরও বেশী পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গোনাহ্ করে সে তার শাস্তি এক গোনাহ্‌র সম-পরিমাণ পায় কিংবা তাও আমি মাফ করে দিব। যে ব্যক্তি পৃথিবী ভর্তি গোনাহ্ করার পর আমার কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি তার সাথে ততটুকুই ক্ষমার ব্যবহার করব। ''যে ব্যক্তি আমার দিকে অর্ধহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে বা' (অর্থাৎ, দুই বাহু প্রসারিত) পরিমাণ অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে লাফিয়ে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।''

এসব হাদীস থেকে জানা যায়, আয়াতে যে সৎকাজের প্রতিদান দশগুণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে, তা সর্বনিম্ন পরিমাণ। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কৃপায় আরও বেশী দিতে পারেন এবং দিবেন। অন্যান্য হাদীস দ্বারা সত্তর গুণ বা সাতশ' গুণ পর্যন্ত প্রমাণিত রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতগুলো হচ্ছে সূরা আনআমের সর্বশেষ ছয় আয়াত। যারা সত্যধর্মে বাড়াবাড়ি ও কম-বেশী করে একে ভিন্ন ধর্মে রূপান্তরিত করেছিল এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তাদের মোকাবেলায় প্রথম তিন আয়াতে সত্যধর্মের বিশুদ্ধ চিত্র, মৌলিক নীতি এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শাখাগত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম দু'আয়াতে মূলনীতি এবং তৃতীয় আয়াতে শাখাগত বিধান উল্লেখিত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে একথা বলে দিন যে, আমাকে আমার পালনকর্তা একটি সরল পথ বাতলে দিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমি তোমাদের মত নিজ ধ্যান-ধারণা বা পৈতৃক কুপ্রথার অনুসারী হয়ে এ পথ অবলম্বন করিনি, বরং আমার পালনকর্তাই আমাকে এ পথ বাতলে দিয়েছেন। (পালনকর্তা) শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ পথ বলে দেয়া তাঁর পালনকর্তার একটি দাবী। তোমরাও ইচ্ছা কর তবে হেদায়েতের আয়োজন তোমাদের জন্যেও বিদ্যমান রয়েছে।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

এখানে دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
قيام শব্দটি قيم ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ, সুদৃঢ় অর্থাৎ, এ দ্বীন সুদৃঢ় যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত মজবুত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত; কারও ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা নয় এবং যাতে সন্দেহ হতে পারে–এমন কোন নতুন ধর্মও নয়, বরং এটিই ছিল পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের ধর্ম। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করার কারণ এই যে, জগতের প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই তাঁর মাহাত্ম্যে ও নেতৃত্বে বিশ্বাসী। বর্তমান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ইহুদী, খ্রীস্টান ও আরবের মুশরেকরা পরস্পর যতই ভিন্ন মতাবলম্বী হোক না কেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর মাহাত্ম্যে ও নেতৃত্বে সবাই একমত। নেতৃত্বের এ মহান পদমর্যাদা আল্লাহ্ তাআলা বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দান করেছেন। বলা হয়েছে ঃ ''আমি তোমাকে মানবজাতির নেতারূপে বরণ করব।''

তাদের মধ্যে প্রতিটি সম্প্রদায়ই একথা প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকত যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মেই অটল রয়েছে এবং তাদের ধর্মই মিল্লাতে ইবরাহীম। তাদের এ বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশে বলা হয়েছে ঃ ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যের উপাসনা থেকে বেঁচে থাকতেন এবং শিরকের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন। এটাই তাঁর সর্ববৃহৎ ও অক্ষয় কীর্তি। তোমাদের মধ্যে যখন ইহুদীরা ওযায়ের (আঃ)-কে খ্রীস্টানরা ঈসা (আঃ)-কে এবং আরবের মুশরেকরা হাজারো পাথরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করে নিয়েছে, তখন কারও একথা বলার অধিকার নেই যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী। অবশ্য বুক ফুলিয়ে একথা বলার অধিকার একমাত্র মুসলমানদেরই আছে। কারণ, তারা যাবতীয় শিরক ও কুফরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

এখানে قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
نسك শব্দের অর্থ কোরবানী। হজ্বের ক্রিয়াকর্মকেও نسك বলা হয়। এ শব্দটি সাধারণ এবাদত-উপাসনার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই ناسك শব্দটি عابد (এবাদতকারী) অর্থেও বলা হয়। আয়াতে এসব ক'টি অর্থই নেয়া যেতে পারে। তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকেও এসব তফসীর বর্ণিত রয়েছে। তবে এখানে সাধারণ এবাদত অর্থ নেয়াই অধিক সঙ্গত মনে হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার নামায, আমার সমগ্র এবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ— সবই বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যে নিবেদিত।

এখানে ধর্মের শাখাগত কাজকর্মের মধ্যে সর্ব প্রথম নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এটি যাবতীয় সৎকর্মের প্রাণ ও ধর্মের স্তম্ভ। এরপর অন্যান্য সব কাজ ও এবাদত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর সমগ্র জীবনের কাজকর্ম ও অবস্থা এবং সবশেষে মরণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমার এসব কিছুই একমাত্র বিশ্ব পালক আল্লাহ্‌র জন্যে নিবেদিত যার কোন শরীক নেই। এটিই হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ আন্তরিকতার ফল। মানুষ জীবনের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি অবস্থায় একথা মনে রাখবে যে, আমার এবং সমগ্র বিশ্বের একজন পালনকর্তা আছেন, আমি তাঁর দাস এবং সর্বদা তাঁর দৃষ্টিতে রয়েছি। আমার অন্তর, মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, কলম ও পদক্ষেপ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। মানুষ যদি অন্তরে ও মস্তিষ্কে এ মোরাকাবা ও ধ্যানকে সদাসর্বদা উপস্থিত রাখে, তবে সে বিশুদ্ধ অর্থে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারে এবং যাবতীয় পাপ ও অপরাধ থেকে নির্মল ও পূতঃপবিত্র জীবন যাপন করতে পারে।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ ''আমাকে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এরূপ ঘোষণা করার এবং আন্তরিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'' আর আমি সর্ব প্রথম অনুগত মুসলমান। উদ্দেশ্য এই যে, এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান আমি। কেননা, প্রত্যেক উম্মতের প্রথম মুসলমান স্বয়ং ঐ পয়গম্বরই হন যার প্রতি ওহী অবতরণ করা হয়। প্রথম মুসলমান হওয়া দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সৃষ্ট জগতের মাঝে সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নূর সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর সমস্ত নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও অন্যান্য সৃষ্টজগত অস্তিত্ব লাভ করেছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ
আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।- (রূহুল-মা'আনী)

একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করতে পারে না ঃ চতুর্থ আয়াতে মক্কার মুশরেক ওলীদ ইবনে মুগীরা প্রমুখের উত্তর দেয়া হয়েছে। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলত ঃ তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে এলে আমরা তোমাদের যাবতীয় পাপের বোঝা বহন করব। বলা হয়েছে ঃ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ
অর্থাৎ, আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ তোমরা কি আমার কাছ থেকে এমন আশা কর যে, তোমাদের মত আমিও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন পালনকর্তা অনুসন্ধান করব? অথচ তিনিই সারা জাহান ও সমগ্র সৃষ্ট জগতের পালনকর্তা। আমার কাছ থেকে এরূপ পথ-ভ্রষ্টতার আশা করা বৃথা। আমাদের পাপের বোঝা বহন করার যে কথা তোমরা বলছ, তা একান্তই একটি নির্বুদ্ধিতা। যে ব্যক্তি পাপ করবে, তারই আমলনামায় তা লেখা হবে এবং সে-ই এর শাস্তি ভোগ করবে। তোমাদের এ কথার কারণে পাপ তোমাদের দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে না। যদি মনে করা হয় যে, হিসাব ও আমলনামায় তো তাদেরই থাকবে; কিন্তু হাশরের ময়দানে এর যে শাস্তি নির্ধারিত হবে, তা আমরা ভোগ করে নেব, তবে এ ধারণাকেও পরবর্তী আয়াত নাকচ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না।

এ আয়াত মুশরেকদের অর্থহীন উক্তির জওয়াব তো দিয়েছেই; সাথে সাথে সাধারণ মুসলমানদেরকেও এ নীতি বলে দিয়েছে যে, কেয়ামতের আইন-কানুন দুনিয়ার মত নয়। দুনিয়াতে কেউ অপরাধ করে তার দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপাতে পারে; যখন অপর পক্ষ তাতে সম্মত হয়। কিন্তু খোদায়ী আদালতে এর কোন অবকাশ নেই। সেখানে একজনের পাপের জন্য অন্য জনকে কিছুতেই পাকড়াও করা হবে না। এ আয়াতদৃষ্টেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ ব্যভিচারের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তার উপর পিতা-মাতার অপরাধের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। এ হাদীসটি হাকেম হযরত আয়েশার (রাঃ) রেওয়ায়েতক্রমে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

সূরা আল-আনআম সমাপ্ত

سُورَةُ الْأَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَتَانِ وَسِتُّ آيَاتٍ وَأَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ رُكُوعًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

المص ﴿١﴾ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ
مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ
إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا
تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا
أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴿٤﴾ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن
قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٥﴾ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ ۖ وَمَا كُنَّا
غَائِبِينَ ﴿٧﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ
مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾

সূরা আল আ'রাফ
মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ২০৬
আল্লাহ্‌র নামে শুরু, যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।।

(১) আলিফ, লাম, মীম, ছোয়াদ। (২) এটি একটি গ্রন্থ, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে করে আপনি এর মাধ্যমে ভীতি-প্রদর্শন করেন। অতএব, এটি পৌছে দিতে আপনার মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। আর এটি বিশ্বাসীদের জন্যে উপদেশ। (৩) তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না। (৪) আর তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের কাছে আমার আযাব রাত্রি বেলায় পৌছেছে অথবা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরত অবস্থায়। (৫) অনন্তর যখন তাদের কাছে আমার আযাব উপস্থিত হয়, তখন তাদের কথা এই ছিল যে, তারা বলল ঃ নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী ছিলাম। (৬) অতএব, আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রসূলগণকে। (৭) অতঃপর আমি স্বজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা করব বস্তুতঃ আমি অনুপস্থিত তো ছিলাম না। (৮) আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। (৯) এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো। (১০) আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাঁই দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (১১) আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব, তৈরী করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি— আদমকে সেজদা কর তখন সবাই সেজদা করেছে, কিন্তু ইবলীস সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

সূরা আল আ'রাফ

সূরার বিষয়-সংক্ষেপ

সমগ্র সূরা আ'রাফের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, এ সূরার অধিকাংশ বিষয়বস্তুই পরকাল ও রেসালতের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম আয়াত كِتَٰبٌ أُنزِلَ নবুওয়তের এবং ষষ্ঠ আয়াতে فَلَنَسْـَٔلَنَّ পরকালের সত্যতা সম্পর্কিত। চতুর্থ রুকূর অর্ধেক থেকে ষষ্ঠ রুকূর শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরকালের আলোচনা রয়েছে। অতঃপর অষ্টম রুকূ থেকে ২১ তম রুকূ পর্যন্ত আম্বিয়া (আঃ) ও তাঁদের উম্মতের ব্যাপারাদি বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সবই রেসালতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব কাহিনীতে রেসালতে অবিশ্বাসীদের শাস্তির কথাও বর্ণনা করা হয়েছে— যাতে বর্তমান অবিশ্বাসীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ২২ তম রুকূর অর্ধেক থেকে ২৩ রুকূর শেষ পর্যন্ত পরকাল সম্পর্কিত বিষয়ের পুনরালোচনা করা হয়েছে। শুধু সপ্তম ও ২২ তম রুকূর শুরুতে এবং সর্ব শেষ ২৪ তম রুকূর বেশীর ভাগ অংশে তওহীদ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা। এ সূরার খুব কম অংশেই এমন আছে যাতে স্থানোপযোগী শাখাগত বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। — (বয়ানুল — কোরআন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ — প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ এ কোরআন আল্লাহ্‌র গ্রন্থ, যা আপনার কাছে প্রেরিত হয়েছে। এর কারণে আপনার অন্তরে কোন সংকোচ থাকা উচিত নয়। অন্তরের সংকোচন অর্থ হল কোরআন পাক ও এর নির্দেশাবলী প্রচারের ক্ষেত্রে কারও ভয়ভীতি অন্তরায় না হওয়া উচিত যে, মানুষ এর প্রতি মিথ্যারোপ করবে এবং আপনাকে কষ্ট দেবে। — (মাযহারী)

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যিনি আপনার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন, তিনি আপনার সাহায্য এবং হেফাযতেরও ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই আপনি মনকে সংকোচিত করবেন কেন? কারো কারো মতে এখানে অন্তরের সংকোচনের অর্থ এই যে, কোরআন ও ইসলামী বিধি-বিধান শুনেও যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দয়ার কারণে মর্মাহত হতেন। একেই মানসিক সংকোচ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ আপনার কর্তব্য শুধু দ্বীনের প্রচার করা। এটা করার পর কে মুসলমান হলো আর কে হলো না— এ দায়িত্ব আপনার নয়।

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِينَ — অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন সর্বসাধারণকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি তোমাদের কাছে রসূল ও গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলে? পয়গম্বরগণকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ যেসব বার্তা ও বিধান দিয়ে আমি আপনাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, সেগুলো আপনারা নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌছিয়েছেন কি না? — (মাযহারী)

ছহীহ্ মুসলিমে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিদায় হজ্বের ভাষণে উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌছিয়েছি কি না। তখন তোমরা উত্তরে কি বলবে? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আমরা বলব, আপনি আল্লাহ্‌র

পয়গাম আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং খোদা প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, اللهم اشهد অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, আপনি সাক্ষী থাকুন।

মুসনাদ আহমদে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তাঁর পয়গাম বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়েছি কি না। আমি উত্তরে বলব, পৌঁছিয়েছি। কাজেই এখানে তোমরা এ বিষয়ে সচেষ্ট হও যে, যারা এখন উপস্থিত রয়েছে, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়।— (মাযহারী)

অনুপস্থিতদের অর্থ যারা সেযুগে বর্তমান ছিল; কিন্তু মজলিসে উপস্থিত ছিল না এবং সেসব বংশধর যারা পরবর্তী কালে জন্মগ্রহণ করবে। তাদের কাছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)– এর পৌঁছানোর অর্থ এই যে, প্রতি যুগের মানুষ তাদের পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌঁছানোর ধারা অব্যাহত রাখবে– যাতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষের কাছে এ পয়গাম পৌঁছে যায়।

এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ (সেদিন যে ভাল–মন্দ কাজকর্মের ওজন হবে তা সত্য–সঠিকভাবেই হবে)। এতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে মানুষ ধোঁকায় পড়তে পারে যে, যেসব বস্তু ভারী, সেগুলোর ওজন ও পরিমাপ হতে পারে। মানুষের ভাল–মন্দ কাজকর্ম কোন জড় পদার্থ নয় যে, এগুলোকে ওজন করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় কাজকর্মের ওজন কিরূপে করা হবে? উত্তর এই যে, প্রথমতঃ পরমপ্রভু আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। তিনি সব কিছুই করতে পারেন। অতএব, আমরা যা ওজন করতে পারি না আল্লাহ্ তাআলাও তা ওজন করতে পারবেন না, এটা জরুরী নয়। দ্বিতীয়তঃ আজকাল জগতে ওজন করার নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে যাতে দাঁড়িপাল্লা, স্কেলকাঁটা ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই। এসব নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল এমন বস্তু ও ওজন করা যায়, যা ইতিপূর্বে ওজন করার কল্পনাও করা যেত না। আজকাল বাতাসের চাপ এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহও ওজন করা যায়, এমনকি শীত–গ্রীষ্ম পর্যন্ত ওজন করা হয়। এগুলোর মিটারই এদের দাঁড়িপাল্লা। যদি আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে মানুষের কাজকর্ম ওজন করে নেন, তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

আমলের ওজন সম্পর্কে একটি সন্দেহ ও তার উত্তর ঃ আমলের ওজন সম্পর্কে হাদীসসমূহের বিশদ বর্ণনায় একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, একাধিক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হাশরের দাঁড়িপাল্লায় কলেমা লা–ইলাহা–ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌র ওজন হবে সবচাইতে বেশী। এ কলেমা যে পাল্লায় থাকবে, তা সর্বাধিক ভারী হবে।

তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, ইবনে–হাব্বান, বায়হাকী ও হাকেম প্রমুখ আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ হাশরের ময়দানে আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে তার নিরানব্বইটি আমলনামাসহ সকলের সামনে উপস্থিত করা হবে। প্রত্যেকটি আমলনামা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। আর সবগুলো আমলনামাই অসৎকাজ এবং গোনাহে পরিপূর্ণ হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ এসব আমলনামায় যা কিছু লেখা রয়েছে, তার সবই ঠিক, না কি আমলনামা লেখক ফেরেশতা তোমার প্রতি কোন অবিচার করেছে এবং অবাস্তব কোন কথাও লিখে দিয়েছে? সে স্বীকার করে বলবে ঃ আয় পরওয়ারদেগার, এতে যা কিছু লেখা আছে, সবই ঠিক। সে মনে মনে অস্থির হবে যে, এখন মুক্তির উপায় কি? তখন আল্লাহ্ তাআলা বলবেন ঃ আজ কারও প্রতি অবিচার হবে না। এসব পাপের মোকাবিলায় তোমার একটি নেকীর পাতাও আমার কাছে আছে। তাতে তোমার কলেমা 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু' লেখা রয়েছে। লোকটি বলবে ঃ ইয়া রব, এত বিরাট পাপপূর্ণ আমলনামার মোকাবেলায় এ ছোট পাতাটির কি মূল্য? তখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না। অতঃপর এক পাল্লায় পাপে পরিপূর্ণ আমলনামাগুলো রাখা হবে এবং অপর পাল্লায় ঈমানের কলেমা সম্বলিত পাতাটি রাখা হবে এতে কলেমার পাল্লা ভারী হবে এবং পাপের পাল্লা হালকা হবে। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র নামের তুলনায় কোন বস্তুই ভারী হতে পারে না। – (মাযহারী) মুসনাদ, বাযযার ও মুস্তাদরাক হাকেমে উদ্ধৃত হযরত ইবনে ওমরের এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ নূহ (আঃ) – এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর পুত্রদেরকে সমবেত করে বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে কলেমা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র ওছিয়ত করছি। কেননা, যদি সাত আসমান ও যমিন এক পাল্লায় এবং কলেমা 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে কলেমার পাল্লাই ভারী হবে। এ সম্পর্কিত অনেক হাদীস হযরত আবু সায়ীদ খুদরী, ইবনে আব্বাস ও আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে নির্বরযোগ্য সনদসহ হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে। – (মাযহারী)

এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, মুমিনের পাল্লা সব সময়ই ভারী হবে, সে যত পাপই করুক। কিন্তু কোরআনের অন্যান্য আয়াত এবং অনেক হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মুসলমানের নেকী ও পাপকর্মসমূহেরও ওজন করা হবে। কারও নেকীর পাল্লা ভারী হবে এবং কারও পাপের পাল্লা ভারী হবে। যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে মুক্তি পাবে এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে শাস্তি ভোগ করবে।

উদাহরণতঃ কোরআন পাকের এক আয়াতে আছে ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِنْ
كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

অর্থাৎ, আমি কিয়ামতের দিন ইনছাফের পাল্লা স্থাপন করব। কাজেই কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার হবে না। যদি একটি রাঈদানা পরিমাণও ভালমন্দ কাজ কেউ করে, তবে সবই সে পাল্লায় রাখা হবে। আমিই হিসাবের জন্যে যথেষ্ট। সূরা কারেয়ায় বলা হয়েছে ঃ

فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا
مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ

অর্থাৎ, যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে এবং যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে দোযখে।

এসব আয়াতের তফসীরে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যে মুমিনের নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে স্বীয় আমলসহ জান্নাতে এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে স্বীয় পাপকর্মসহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (মাযহারী)

আবু দাউদে আবু হোরায়রা (রাঃ) – এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত

রয়েছে যে, যদি কোন বান্দার ফরয কাজসমূহে কোন ত্রুটি পাওয়া যায়, তবে রাব্বুল আলামীন বলবেন ঃ দেখ, তার নফল কাজও আছে কি না। নফল কাজ থাকলে ফরযের ত্রুটি নফল দ্বারা পূরণ করা হবে।

আমলের ওজন কিভাবে হবে ঃ আবু হোরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতক্রমে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন কিছু মোটা লোক আসবে। তাদের মূল্য আল্লাহ্‌র কাছে মশার পাখার সমানও হবে না। এ কথার সমর্থনে তিনি কোরআন পাকের এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ وَزْنًا — অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোন ওজন স্থির করবো না। – (মাযহার)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) – এর প্রশংসায় বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তাঁর পা দু'টি বাহ্যতঃ যতই সরু হোক, কিন্তু যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, কিয়ামতের দাঁড়ি–পাল্লায় তাঁর ওজন ওহুদ পর্বতের চাইতেও বেশী হবে।

হযরত আবু হোরায়রার যে হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থের সমাপ্তি টেনেছেন, তাতে বলা হয়েছে ঃ দু'টি বাক্য উচ্চারণের দিক দিয়ে খুবই হালকা; কিন্তু দাঁড়ি পাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং আল্লাহ্‌র কাছে অতি প্রিয়। বাক্য দু'টি এই ঃ

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলতেন ঃ 'সোবহাল্লাহ' ! বললে আমলের দাঁড়ি –পাল্লার অর্ধেক ভরে যায় আর আলহামদু লিল্লাহ্ বললে বাকী অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যায়।

আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান বিশুদ্ধ সনদে আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমলের ওজনের বেলায় কোন আমলই সচ্চরিত্রতার সমান ভারী হবে না।

হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ)–কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ তোমাকে দু'টি কাজের কথা বলছি– এগুলো করা মানুষের জন্যে মোটেই কঠিন নয়; কিন্তু ওজনের দিক দিয়ে এগুলো খুবই ভারী হবে। (এক) সচ্চরিত্রতা এবং (দুই) অধিক মৌনতা, অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা।

ইমাম আহ্‌মদ কিতাবুয যুহ্‌দে হযরত হাযেম (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর কাছে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন। তখন একব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদছিলেন। জিবরাঈল বললেন ঃ মানুষের সব আমলেরই ওজন হবে; কিন্তু আল্লাহ্ ও পরকালের ভয়ে কাঁদা এমন একটি আমল, যার কোন ওজন হবে না। বরং এর এক ফোঁটা অশ্রুও জাহান্নামের বৃহত্তম আগুন নির্বাপিত করে দিবে। – (মাযহারী)

এক হাদীসে আছে, হাশরের ময়দানে একটি লোক উপস্থিত হয়ে যখন আমল–নামায় সৎকর্ম কম দেখবে, তখন খুবই অস্থির হয়ে পড়বে। তখন হঠাৎ একটি বস্তু মেঘের মত উঠে আসবে এবং তার আমলনামার পাল্লায় এসে পড়বে। তাকে বলা হবে ঃ দুনিয়াতে তুমি মানুষকে মাসআলা বলতে এবং শিক্ষা দিতে। এ হচ্ছে তোমার সেই আমলের ফল। তোমার এ শিক্ষা এগিয়ে এসেছে এবং যারা এ শিক্ষা অনুযায়ী আমল করেছে, তাদের সবার আমলেও তোমার অংশ রাখা হয়েছে। – (মাযহারী)

তিবরানী ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যায়, তার আমলের ওজনে দু'টি কিরাত রেখে দেয়া হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এই কিরাতের ওজন হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান।

তিবরানী জাবের (রাঃ)–এর বাচনিক বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ মানুষের আমলের দাঁড়ি–পাল্লায় সর্বপ্রথম যে আমল রাখা হবে, তা হবে তার পরিবার–পরিজনের ভরণ–পোষণের ব্যয়রূপী সৎকর্ম।

ইমাম যাহাবী (রহঃ) হযরত এমরান ইবনে হাছীন (রাঃ)–এর বাচনিক বর্ণনা করেছেন, যে কালি দ্বারা দ্বীনী এলেম ও বিধান সংক্রান্ত বিষয় লেখা হয় তা এবং শহীদদের রক্ত কিয়ামতের দিন ওজন করা হবে। তখন ওজনের ক্ষেত্রে আলেমদের কালি শহীদদের রক্তের চাইতেও ভারী হবে।

কিয়ামতে আমলের ওজন সম্পর্কে এ ধরনের বহু হাদীস রয়েছে। এখানে কয়েকটি এজন্যে উল্লেখ করা হলো যে, এগুলো দ্বারা বিশেষ আমলের শ্রেষ্ঠত্ব ও মূল্য অনুমান করা যায়।

মোটকথা, মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র আল্লাহ্ তাআলা ভূ–পৃষ্ঠে সঞ্চিত রেখেছেন। কাজেই সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই মানুষের কর্তব্য। কিন্তু মানুষ গাফেল হয়ে স্রষ্টার অনুগ্রহরাজি বিস্মৃত হয়ে যায় এবং পার্থিব দ্রব্য–সামগ্রীর মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাই আয়াতের শেষে অভিযোগের সুরে বলা হয়েছে ঃ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ অর্থাৎ, তোমরা খুব কম লোকই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي
مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ
أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ أَنظِرْنِي
إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ
شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ
عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ
إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي
لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ
أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾

(১২) আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে বারণ করল? সে বলল ঃ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। (১৩) বললেন তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নাই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। (১৪) সে বলল ঃ আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (১৫) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোকে সময় দেয়া হল। (১৬) সে বলল ঃ আপনি আমাকে যেমন উদ্‌ভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। (১৭) এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বামদিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (১৮) আল্লাহ্ বললেন ঃ বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। (১৯) হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও, তবে এ বৃক্ষের কাছে যেয়ো না। তাহলে তোমরা গোনাহ্‌গার হয়ে যাবে। (২০) অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বললঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও– কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী। (২১) সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। (২২) অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে উল্লেখিত হযরত আদম (আঃ) ও শয়তানের এ ঘটনা সূরা বাকারার চতুর্থ রুকুতেও বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা সেখানে করা হয়েছে। এখানে আরও কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকা সম্পর্কে ইবলীসের দোয়া কবূল হয়েছে কি না? কবূল হয়ে থাকলে দু'টি পরস্পর বিরোধী আয়াতের ভাষায় সামঞ্জস্য বিধান ঃ ইবলীস ঠিক ক্রোধ ও গযবের মুহূর্তে আল্লাহ্ তাআলার কাছে একটি অভিনব প্রার্থনা করে বলেছিল ঃ আমাকে হাশরের দিন পর্যন্ত জীবন দান করুন। আলোচ্য আয়াতে এর উত্তরে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে ঃ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ – অর্থাৎ, তোকে অবকাশ দেয়া হল। দোয়া ও প্রশ্নের ইঙ্গিতে এ থেকে বুঝে নেয়া যায় যে, এ অবকাশ হাশর পর্যন্ত সময়ের জন্যই দেয়া হয়েছে। কারণ, সে এ প্রার্থনাই করেছিল। কিন্তু এ আয়াতে স্পষ্টভাবে একথা বলা হয়নি যে, এখানে উল্লেখিত অবকাশ ইবলীসের আবদার অনুযায়ী হাশর পর্যন্ত দেয়া হয়েছে, না কি অন্য কোন মেয়াদ পর্যন্ত। কিন্তু অন্য আয়াতে এ স্থলে إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ শব্দাবলীও ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে ব্যাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, ইবলীসের প্রার্থিত অবকাশ কিয়ামত পর্যন্ত দেয়া হয়নি, বরং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র জ্ঞানে সংরক্ষিত। অতএব সারকথা এই যে, ইবলীসের এ দোয়া কবূল হলেও আংশিক কবূল হয়ে থাকবে। অর্থাৎ, কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দানের পরিবর্তে একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছে।

মোটকথা, শয়তান ঐ সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করেছিল যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গা ফুঁক দেয়া পর্যন্ত সব মৃতকে জীবিত করা হবে। একেই পুনরুত্থান দিবস বলা হয়। এ দোয়া হুবহু কবূল হলে যে সময় একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্য কেউ জীবিত থাকবে না এবং كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ এর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, এ দোয়ার কারণে ইবলীস তখনও জীবিত থাকতো। এ কারণেই তার পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দানের একই দোয়াকে পরিবর্তন করে প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া পর্যন্ত কবূল করা হয়েছে। এর ফলে যেসময় সমগ্র বিশ্ব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, তখন ইবলীসও মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর সবাই যখন পুনরায় জীবিত হবে, তখন সে-ও জীবিত হবে।

কাফেরের দোয়াও কবূল হতে পারে কি ঃ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, কাফেরের দোয়া কবূল হয় না; কিন্তু ইবলীসের এ ঘটনাও আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে উপরোক্ত প্রশ্ন দেখা দেয়। উত্তর এই যে, দুনিয়াতে কাফেরের দোয়াও কবূল হতে পারে। ফলে ইবলীসের মত মহা কাফেরের দোয়াও কবূল হয়ে গেছে। কিন্তু পরকালে কাফেরের দোয়া কবূল হবে না। উল্লিখিত আয়াত وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দুনিয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই।

আল্লাহ্‌র সামনে এমন নির্ভীকভাবে কথা বলার দুঃসাহস ইবলীসের কিরূপে হল ঃ রাব্বুল ইযযত আল্লাহ্‌র মহান দরবারে তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রতাপের কারণে রসূল কিংবা ফেরেশতাদেরও নিঃশ্বাস ফেলার

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي
الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا
تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا
يُوَٰرِي سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ
ءَايَٰتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَٰنُ
كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَآ ۗ
إِنَّهُ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَٰطِينَ
أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾ وَإِذَا فَعَلُوا فَٰحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا
عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ۖ
أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ
وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَ
فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَٰلَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَٰطِينَ
أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾

(২৩) তারা উভয়ে বলল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। (২৪) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফল ভোগ আছে। (২৫) বললেন ঃ তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে। (২৬) হে বনী-আদম! আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্র কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (২৭) হে বনী-আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছে- যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না। (২৮) তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন বলে ঃ আমরা বাপ-দাদাকে এমনি করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ও আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। আল্লাহ্ মন্দকাজের আদেশ দেন না। এমন কথা আল্লাহ্র প্রতি কেন আরোপ কর, যা তোমরা জান না। (২৯) আপনি বলে দিন ঃ আমার প্রতিপালক সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক সেজদার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখ এবং তাঁকে খাঁটি আনুগত্যশীল হয়ে ডাক। তোমাদেরকে প্রথমে যেমন সৃষ্টি করেছেন, পুনর্বারও সৃজিত হবে। (৩০) একদলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্যে পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।

সাধ্য ছিল না। ইবলীসের এরূপ দুঃসাহস কিরূপে হল? আলেমগণ বলেন ঃ এটাও আল্লাহ্ তাআলার চূড়ান্ত গযবের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ্র রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণে ইবলীসের সামনে একটি পর্দা অন্তরায় হয়ে যায়। এ পর্দা তার সামনে আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও প্রতাপকে ঢেকে দেয় এবং তার মধ্যে নির্লজ্জতা প্রবল করে দেয়। - (বয়ানুল-কোরআন ঃ সংক্ষেপিত)

মানুষের উপর শয়তানের হামলা চতুর্দিকে সীমাবদ্ধ নয়- আরও ব্যাপক ঃ আলোচ্য আয়াতে ইবলীস আদম সন্তানদের উপর আক্রমণ করার জন্যে চারটি দিক বর্ণনা করেছে- অগ্র, পশ্চাৎ, ডান ও বাম। এখানে প্রকৃতপক্ষে কোন সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হল প্রত্যেক দিক ও প্রত্যেক কোণ থেকে। তাই উপর কিংবা নিচের দিক থেকে পথভ্রষ্ট করার সম্ভাবনা এর পরিপন্থী নয়। এভাবে হাদীসের এ বর্ণনাও এর পরিপন্থী নয় যে, শয়তান মানবদেহে প্রবেশ করে রক্তবাহী রগের মাধ্যমে সমগ্র দেহে হস্তক্ষেপ করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আদম (আঃ) ও ইবলীসের যে ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, হুবহু এ ঘটনাই সূরা বাকারার চতুর্থ রুকূতে বিশদ বর্ণনাসহ উল্লেখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে সম্ভাব্য সব প্রশ্ন ও সন্দেহের বিস্তারিত উত্তর পূর্ণ ব্যাখ্যা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদিসহ সূরা বাকারার তফসীরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে।

ইতিপূর্বে পূর্ণ এক রুকূতে আদম (আঃ) ও অভিশপ্ত শয়তানের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছিল। এতে শয়তানী প্ররোচনার প্রথম পরিণতিতে আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর জান্নাতী পোশাক খুলে গিয়েছিল এবং তাঁরা উলঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁরা বৃক্ষপত্র দ্বারা গুপ্তাঙ্গ ঢাকতে শুরু করেছিলেন।

আলোচ্য ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ তোমাদের পোশাক আল্লাহ্ তাআলার একটি মহান নেয়ামত। একে যথার্থ মূল্য দাও। এখানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়নি-সমগ্র বনী-আদমকে করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন ও পোশাক মানব জাতির একটি সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এ নিয়ম পালন করে। অতঃপর এর বিশদ বিবরণে তিন প্রকার পোশাকের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম, لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ -এখানে يُوَارِي শব্দটি موارة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আবৃত করা سوات শব্দটি سوءة এর বহুবচন। এর অর্থ মানুষের ঐসব অঙ্গ, যেগুলো খোলা রাখাকে মানুষ স্বভাবতই খারাপ ও লজ্জাকর মনে করে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে এমন একটি পোশাক সৃষ্টি করেছি, যদ্দ্বারা তোমরা গুপ্তাঙ্গ আবৃত করতে পার।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَرِيشًا সাজ-সজ্জার জন্যে মানুষ যে পোশাক পরিধান করে, তাকে ريش বলা হয়। অর্থ এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার জন্যে তো সংক্ষিপ্ত পোশাকই যথেষ্ট হয়; কিন্তু আমি তোমাদেরকে আরও পোশাক দিয়েছি, যাতে তোমরা তদ্দ্বারা সাজ-সজ্জা করে বাহ্যিক দেহাবয়বকে সুশোভিত করতে পার।

পোশাকের দ্বিবিধ উপকারিতা ঃ আয়াতে পোশাকের দু'টি উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। (এক) - গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদিত করা এবং (দুই)

শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা এবং অঙ্গ-সজ্জা। প্রথম উপকারিতাটি অগ্রে বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা পোশাকের আসল লক্ষ্য। এটাই সাধারণ জন্তু-জানোয়ার থেকে মানুষের স্বাতন্ত্র্য। জন্তু-জানোয়ারের পোশাক সৃষ্টিগতভাবে তাদের দেহের অঙ্গ। এ পোশাকের কাজ শুধু শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা নয় অঙ্গ-সজ্জাও বটে। গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনেও এর তেমন কোন ভূমিকা নেই। তবে তাদের দেহে গুপ্তাঙ্গ এমনভাবে স্থাপিত হয়েছে,যাতে সম্পূর্ণ খোলা না থাকে। কোথাও লেজ দ্বারা আবৃত করা হয়েছে এবং কোথাও অন্যভাবে।

আদম, হাওয়া এবং তাঁদের সাথে শয়তানী প্ররোচনার ঘটনা বর্ণনা করার পর পোশাকের কথা উল্লেখ করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উলঙ্গ হওয়া এবং গুপ্তাঙ্গ অপরের সামনে খোলা চূড়ান্ত হীনতা ও নির্লজ্জতার লক্ষণ এবং নানা প্রকার অনিষ্টের ভূমিকা বিশেষ।

মানুষের উপর শয়তানের প্রথম হামলা ঃ মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রমণের ফলে তার পোশাক খসে পড়েছিল। আজও শয়তান তার শিষ্যবর্গের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ করে পথে নামিয়ে দেয়। শয়তানের তথাকথিত প্রগতি নারীকে লজ্জা-শরম থেকে বঞ্চিত করে সাধারণ্যে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অর্জিতই হয় না।

ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা ঃ শয়তান মানুষের এ দুর্বলতা আঁচ করে সর্বপ্রথম হামলা গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের উপর করেছে। তাই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধানকারী শরীয়ত গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাকেই স্থির করেছে। নামায, রোযা ইত্যাদি সবই এরপর।

হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ নতুন পোশাক পরিধান করার সময় এ দোয়া পাঠ করা উচিত ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে পোশাক দিয়েছেন। এ পোশাক দ্বারা আমি গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করি এবং সাজ-সজ্জা করি।"

নতুন পোশাক তৈরীর সময় পুরাতন পোশাক দান করে দেয়ার ছওয়াব ঃ তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি নতুন পোশাক পরার পর পুরাতন পোশাক ফকীর-মিসকীনকে দান করে দেয়, সে জীবনে ও মরণে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে চলে আসে। - (ইবনে-কাসীর)

এ হাদীসেও মানুষকে পোশাক পরিধানের সময় ঐ দু'টি উপকারিতাই স্মরণ করানো হয়েছে, যার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা পোশাক সৃষ্টি করেছেন।

পোশাকের তৃতীয় প্রকার ঃ গুপ্ত-অঙ্গ আবৃতকরণ এবং আরাম ও সাজ-সজ্জার জন্যে দু'প্রকার পোশাক বর্ণনা করার পর কোরআন পাক তৃতীয় এক প্রকার পোশাকের কথা উল্লেখ করে বলেছে ঃ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ কোন কোন কেরাআতে যবর দিয়ে لِبَاسَ التَّقْوٰى পড়া হয়েছে। এমতাবস্থায় انزلنا এর مفعول হয়ে অর্থ হবে এই যে, আমি একটি তৃতীয় পোশাক অর্থাৎ, তাকওয়ার পোশাক অবতীর্ণ করেছি। প্রসিদ্ধ কেরাআত অনুযায়ী অর্থ এই যে, এ দু'প্রকার পোশাক তো সবাই জানে। তৃতীয় একটি পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক। এটি সর্বোত্তম পোশাক। হযরত ইবনে আব্বাস ও ওরওয়া ইবনে যুবায়র (রাঃ)-এর তফসীর অনুযায়ী তাকওয়ার পোশাক বলে সৎকর্ম ও খোদাভীতিকে বোঝানো হয়েছে। - (রুহুল-মা'আনী)

উদ্দেশ্য এই যে, বাহ্যিক পোশাক যেমন মানুষের গুপ্ত অঙ্গের জন্যে আবরণ এবং শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা ও সাজ-সজ্জার উপায় হয়, তেমনি সৎকর্ম ও খোদাভীতিও একটি আধ্যাত্মিক পোশাক। এটি মানুষের চারিত্রিক দোষ ও দুর্বলতার আবরণ এবং স্থায়ী কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে মুক্তিলাভের উপায়। এ কারণেই এটি সর্বোত্তম পোশাক।

বাহ্যিক পোশাকের আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা ঃ لِبَاسُ التَّقْوٰى শব্দ থেকে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাহ্যিক পোশাক দ্বারা গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করা ও সাজ-সজ্জা করার আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া ও খোদাভীতি। এ খোদাভীতি পোশাকের মধ্যেও এভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত যেন গুপ্তাঙ্গসমূহ পুরোপুরি আবৃত হয়। পোশাক শরীরে এমন আঁটসাটও না হওয়া চাই, যাতে এসব অঙ্গ উলঙ্গের মত দৃষ্টিগোচর হয়। পোশাকে অহঙ্কার ও গর্বের ভঙ্গিও না থাকা চাই; বরং নম্রতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হওয়া চাই। প্রয়োজনাতিরিক্ত অপব্যয় না হওয়া চাই, মহিলাদের জন্যে পুরুষদের এবং পুরুষদের জন্যে মহিলাদের পোশাক না হওয়া চাই, যা আল্লাহ্ তাআলার অপছন্দনীয়। অধিকন্তু পোশাকে বিজাতির অনুকরণও না হওয়া চাই, যা স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক।

এতদসঙ্গে পোশাকের আসল উদ্দেশ্য চরিত্র ও কর্মের সংশোধনও হওয়া চাই। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ অর্থাৎ, মানুষকে এ তিন প্রকার পোশাক দান করা আল্লাহ্ তাআলার শক্তির নিদর্শনসমূহের অন্যতম— যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় আয়াতে পুনরায় সব মানব সন্তানকে সম্বোধন করে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রত্যেক কাজে শয়তান থেকে বেঁচে থাক। সে যেন আবার তোমাদেরকে ফাসাদে ফেলে না দেয়; যেমন তোমাদের পিতা-মাতা আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করিয়েছে এবং তাদের পোশাক খুলে উলঙ্গ করার কারণ হয়েছে। সে তোমাদের পুরাতন শত্রু। সর্বদা তার শত্রুতার প্রতি লক্ষ্য রাখ।

ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগে শয়তান মানুষকে যেসব লজ্জাজনক ও অর্থহীন কুপ্রথায় লিপ্ত করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, কোরাইশদের ছাড়া কোন ব্যক্তি নিজ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কা'বা গৃহের তওয়াফ করতে পারত না। তাকে হয় কোন কোরাইশীর কাছ থেকে বস্ত্র ধার করতে হতো, না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করতে হতো।

এটা জানা কথা যে, আরবের সব মানুষকে বস্ত্র দেয়া কোরাইশদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই পুরুষ মহিলা অধিকাংশ লোক উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করত। মহিলারা সাধারণতঃ রাতের অন্ধকারে তওয়াফ করত। তারা এ শয়তানী কাজের কারণ এই বর্ণনা করত যে, যেসব পোশাক পরে আমরা পাপকাজ করি, সেগুলো পরিধান করে আল্লাহ্‌র ঘর প্রদক্ষিণ করা বেআদবী। এ জ্ঞানপাপীরা এ বিষয়টি বুঝত না যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা আরও বেশী বেআদবীর কাজ। হরমের সেবক হওয়ার সুবাদে শুধু কোরাইশ গোত্র এ উলঙ্গতা আইনের ব্যতিক্রম ছিল।

আলোচ্য প্রথম আয়াত এ নির্লজ্জ প্রথা ও তার অনিষ্ট বর্ণনা করার জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে ঃ তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করত, তখন কেউ নিষেধ করলে তারা উত্তরে বলত ঃ আমাদের বাপ-দাদা

ও মুরুব্বিরা তাই করে এসেছেন। তাদের তরিকা ত্যাগ করা লজ্জার কথা। তারা আরও বলত আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন।

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে অশ্লীল কাজ বলে উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফকেই বোঝানো হয়েছে। فاحشة ও فحشاء، فحش এমন প্রত্যেক মন্দ কাজকে বলা হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ এবং যুক্তি, বুদ্ধি ও সুস্থ বিবেকের কাছে পূর্ণমাত্রায় সুস্পষ্ট। – (মাযহারী)

এস্তরে ভাল ও মন্দের যুক্তিগত ব্যাপার হওয়া সবার কাছে স্বীকৃত। – (রুহুল-মা'আনী)

তারা এ বাজে প্রথার বৈধতা প্রতিপন্ন করার জন্যে দু'টি প্রমাণ উপস্থিত করেছে। (এক) বাপ-দাদার অনুসরণ; অর্থাৎ, বাপ-দাদার তরিকা কায়েম রাখার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত। এর উত্তর দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। মূর্খ বাপ-দাদার অনুসরণ করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই। সামান্য জ্ঞান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারে যে, কোন তরিকার বৈধতার পক্ষে এটা কোন প্রমাণ হতে পারে না যে, বাপ-দাদা এরূপ করত। কেননা, বাপ-দাদার তরিকা হওয়া যদি কোন তরিকার বিশুদ্ধতার জন্যে যথেষ্ট হয়, তবে দুনিয়াতে বিভিন্ন লোকের বাপ-দাদার বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী তরিকা ছিল। এ যুক্তির ফলে জগতের সব ভ্রান্ত তরিকাও বৈধ ও বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা, মূর্খদের এ প্রমাণ ভ্রুক্ষেপযোগ্য ছিল না বলেই কোরআন পাক এখানে এর উত্তর দেয়া জরুরী মনে করেনি। তবে অন্যান্য আয়াতে এরও উত্তর দিয়ে বলা হয়েছে যে, বাপ-দাদারা কোন মূর্খতাসুলভ কাজ করলেও কি তা অনুসরণযোগ্য হতে পারে?

উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করার বৈধতার প্রশ্নে তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্ তাআলাই আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা সর্বৈব মিথ্যা এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ভ্রান্তি আরোপ। এর উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ অর্থাৎ, আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তাআলা কখনও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। কেননা, এরূপ নির্দেশ দেয়া খোদায়ী প্রজ্ঞা ও শানের পরিপন্থী। অতঃপর তাদের এ মিথ্যা অপবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্যে তাদেরকে হুশিয়ার করে বলা হয়েছে ঃ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ অর্থাৎ, তোমরা কি আল্লাহ্র প্রতি এমন বিষয় আরোপ কর, যার জ্ঞান তোমাদের কাছে নেই? জানা কথা যে, না জেনে না শুনে কোন ব্যক্তির প্রতি কারো সম্বন্ধ করে দেয়া চরম ধৃষ্টতা ও অন্যায়। অতএব, আল্লাহ্র প্রতি এমন ভ্রান্ত সম্বন্ধ করা কত বড় অপরাধ ও অন্যায় হবে! মুজতাহিদগণ কোরআনের আয়াত থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান উদ্ভাবন করেন, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, তাঁরা প্রমাণের ভিত্তিতে এসব বিধান উদ্ভাবন করেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ অর্থাৎ, যেসব মূর্খ উলঙ্গ তওয়াফ বৈধ করার ভ্রান্ত সম্বন্ধ আল্লাহ্র দিকে করে, আপনি তাদের বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তাআলা সর্বদা قسط এর নির্দেশ দেন। قسط এর আসল অর্থ ন্যায়বিচার ও সমতা। এখানে ঐ কাজকে বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ ত্রুটিও নেই এবং নির্দিষ্ট সীমার লঙ্ঘনও নেই। অর্থাৎ, স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে মুক্ত। শরীয়তের সব বিধি-বিধানের অবস্থা তাই। এজন্যে قسط শব্দের অর্থে যাবতীয় এবাদত, আনুগত্য ও শরীয়তের সাধারণ বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। – (রুহুল-মা'আনী)

এ আয়াতে ন্যায়বিচার ও সমতার নির্দেশ বর্ণনা করার পর তাদের পথভ্রষ্টতার উপযোগী দু'টি বিধান বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এক, وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ এবং দুই, وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ প্রথম বিধানটি মানুষের বাহ্যিক কাজকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে প্রথম বিধানে শব্দটি সেজদা ও এবাদতের অর্থে বর্ণিত হয়েছে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক এবাদত ও নামাযের সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখা। এর এক উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, নামাযের সময় মুখমণ্ডল সোজা কেবলার দিকে রাখতে যত্নবান হও এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এ-ও হতে পারে যে, প্রত্যেক কথায়, কাজে এবং কর্মে স্বীয় আননকে প্রতিপালকের নির্দেশের অনুসারী রাখ এবং সতর্ক থাক যে, এদিক-সেদিক যেন না হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে এ বিধানটি বিশেষভাবে নামাযের জন্যে হবে না; বরং যাবতীয় এবাদত ও লেন-দেনকেও পরিব্যাপ্ত করবে।

দ্বিতীয় বিধানের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলাকে এমনভাবে ডাক, যেন এবাদত খাঁটিভাবে তাঁরই হয়; এতে যেন অন্য কারও অংশীদারিত্ব না থাকে; এমন কি, গোপন শিরক অর্থাৎ, লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্য থেকেও পবিত্র হওয়া চাই।

এ বিধান দু'টি পাশাপাশি উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থাকে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সংশোধন করা অবশ্য কর্তব্য। আন্তরিকতা ব্যতীত শুধু বাহ্যিক আনুগত্য যথেষ্ট নয়। এমনিভাবে শুধু আন্তরিকতা বাহ্যিক শরীয়তের অনুসরণ ব্যতীত যথেষ্ট হতে পারে না। বরং বাহ্যিক অবস্থাকেও শরীয়ত অনুযায়ী সংশোধন করা এবং অন্তরকেও আল্লাহ্র জন্যে খাঁটি রাখা একান্ত জরুরী। এতে তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে, যারা শরীয়ত ও তরীকতকে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মনে করে। তাদের ধারণা এই যে, তরীকত অনুযায়ী অন্তর সংশোধন করে দেয়াই যথেষ্ট, তাতে শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ হলেও কোন দোষ নেই। বলাবাহুল্য এটা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনিভাবে কেয়ামতের দিন পুনর্বার তোমাদেরকে সৃষ্টি করে দণ্ডায়মান করবেন। তাঁর অসীম শক্তির পক্ষে এটা কোন কঠিন কাজ নয়; বরং খুব সহজ। সম্ভবতঃ এ সহজ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে يعيدكم এর পরিবর্তে تَعُودُونَ বলেছেন। অর্থাৎ, পুনর্বার সৃষ্টি করার জন্যে বিশেষ কোন কর্মতৎপরতা ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। – (রুহুল-মা'আনী)

এ বাক্যটি এখানে আনার আরও একটি উপকারিতা এই যে, এর ফলে শরীয়তের বিধানাবলীতে পূর্ণরূপে কায়েম থাকা মানুষের জন্যে সহজ হয়ে যাবে। কেননা, পরকাল ও কেয়ামত এবং তথায় ভালমন্দ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির কল্পনাই মানুষের জন্যে প্রত্যেক কঠিনকে সহজ এবং কষ্টকে সুখে রূপান্তরিত করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষের মধ্যে এ ভীতি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কোন ওয়াজ ও উপদেশ তাকে সোজা করতে পারে না এবং কোন আইনই তাকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ একদল লোককে তো আল্লাহ্ তাআলা হেদায়েত দান করেছেন এবং একদলের জন্যে পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। কেননা, তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে শয়তানদেরকে সহচর করেছে

অথচ তাদের ধারণা এই যে, তারা সঠিক পথে রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র হেদায়েত যদিও সবার জন্যে ছিল কিন্তু তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানদের অনুসরণ করেছে এবং জুলুমের উপর জুলুম এই হয়েছে যে, তারা স্বীয় অসুস্থাবস্থাকেই সুস্থতা এবং পথভ্রষ্টতাকেই হেদায়েত মনে করে নিয়েছে।

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে মূর্খতা ও অজ্ঞতা কোন ওযর নয়। যদি কেউ ভ্রান্ত পথকে বিশুদ্ধ মনে করে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা অবলম্বন করে, তবে সে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেককে চেতনা, ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান ও বুদ্ধি এ জন্যেই দিয়েছেন, যাতে সে তদ্দ্বারা আসল ও মেকী এবং অশুদ্ধ ও শুদ্ধকে চিনে নেয়। অতঃপর তাকে এ জ্ঞানবুদ্ধির উপরই ছেড়ে দেননি, পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন এবং গ্রন্থ নাযিল করেছেন। এসবের মাধ্যমে শুদ্ধ ও ভ্রান্ত এবং সত্য ও মিথ্যাকে পুরোপুরিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

যদি কারও মনে সন্দেহ জাগে যে, যে ব্যক্তি বাস্তবে নিজেকে সত্য মনে করে যদিও সে ভ্রান্ত হয়, তাতে তার দোষ কি? সে ক্ষমার্হ হওয়া উচিত। কারণ, সে নিজের ভ্রান্তি সম্পর্কে জ্ঞাতই ছিল না। উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান, বিবেচনা অতঃপর পয়গম্বরদের শিক্ষা দান করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে কমপক্ষে তার অবলম্বিত পথের বিপরীতটির সম্ভাবনা ও সন্দেহ অবশ্যই হওয়া উচিত। এখন তার দোষ এই যে, সে এসব সম্ভাবনা ও সন্দেহের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করেনি এবং যে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছে তাতেই অটল রয়েছে।

অবশ্য যে ব্যক্তি সত্যান্বেষণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ পথ ও সত্যের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়, আল্লাহ্ তাআলার কাছে তার ক্ষমার্হ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইমাম গাযালী (রহঃ) 'আত্তাফরেকাতু বাইনাল ইসলামে ওয়াযযিনদিকাহ্' গ্রন্থ একথা বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ হে আদম সন্তানেরা! তোমরা মসজিদে প্রত্যেক উপস্থিতির সময় স্বীয় পোশাক পরিধান করে নাও এবং তৃপ্তির সাথে খাও ও পান কর-সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা গৃহের তওয়াফকে যেমন বিশুদ্ধ এবাদত এবং কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মনে করত, তেমনি তারা হজ্জের দিনগুলোতে পানাহার ত্যাগ করত। এতটুকু পানাহার করত, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু থাকতে পারে। বিশেষতঃ ঘি, দুধ ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করত।- (ইবনে-জরীর)

তাদের এ অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা নির্লজ্জতা ও বে-আদবী বিধায় বর্জনীয়। এমনিভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত সুস্বাদু খাদ্য অহেতুক বর্জন করাও কোন ধর্মকাজ নয়; বরং তাঁর হালালকৃত বস্তুসমূহকে হারাম করে নেয়া ধৃষ্টতা এবং এবাদতে সীমালঙ্ঘন। আল্লাহ্ তাআলা একে পছন্দ করেন না। তাই হজ্জের দিনগুলোতে তৃপ্তির সাথে খাও, পান কর; তবে অপব্যয় করো না। হালাল খাদ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, হজ্জের আসল লক্ষ্য এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে পানাহারে মশগুল থাকাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াতটি যদিও জাহেলিয়াত যুগের আরবদের একটি বিশেষ কুপ্রথা উলঙ্গতাকে মিটানোর জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে, যা তারা তওয়াফের সময় আল্লাহর গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামে করত, কিন্তু তফসীরবিদ ও ফেকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন বিশেষ ঘটনায় কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ এরূপ নয় যে, নির্দেশটি এ ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। বরং ভাষার ব্যাপকতা দেখতে হবে। যে যে বিষয় ভাষার ব্যাপকতার আওতায় পড়ে, সবগুলোর ক্ষেত্রে সে নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।

নামাযে গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ফরয ঃ তাই ছাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ আয়াত থেকে বেশ কয়েকটি বিধান উদ্ভাবন করেছেন। প্রথম— উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা যেমন নিষিদ্ধ হয়েছে, তেমনি উলঙ্গ অবস্থায় নামায পড়াও হারাম ও বাতিল। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ الطواف بالبيت صلوٰة (বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফও এক প্রকার নামায) এছাড়া স্বয়ং এ আয়াতেই তফসীর বিদগণের মতে যখন مسجد বলে সেজদা বোঝানো হয়েছে, তখন সেজদা অবস্থায় উলঙ্গতার নিষেধাজ্ঞা আয়াতে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়ে যায়। সেজদায় যখন নিষিদ্ধ হল, তখন নামাযের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মেও অপরিহার্যরূপে নিষিদ্ধ হবে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বিষয়টিকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ চাদর পরিধান ব্যতীত কোন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার নামায জায়েয নয়।- (তিরমিযী)

নামায ছাড়া অন্যান্য অবস্থায়ও গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা যে ফরয, তা অন্যান্য আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে। তন্মধ্যে এ সূরারই একটি আয়াত পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

يٰبَنِىٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ

মোটকথা, এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা মানুষের জন্যে প্রথম মানবিক ও ইসলামী ফরয। এটা সর্বাবস্থায় অপরিহার্য। নামায ও তওয়াফে আরও উত্তমরূপে ফরয।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا
تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ
اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ
الْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا
وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ
اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٤﴾ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا
يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٦﴾ فَمَنْ
اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ
يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ۗ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا
يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ
قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

(৩১) হে বনী–আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও– খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। (৩২) আপনি বলুনঃ আল্লাহ্‌র সাজ–সজ্জাকে– যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন ঃ এসব নেয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্যে। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্যে, যারা বুঝে। (৩৩) আপনি বলে দিন ঃ আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন– যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়–অত্যাচার, আল্লাহ্‌র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন, সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না। (৩৪) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে। (৩৫) হে বনী–আদম, যদি তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে পয়গম্বর আগমন করে – তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শুনায়, তবে যে ব্যক্তি সংযত হয় এবং সৎকাজ অবলম্বন করে, তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (৩৬) যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে এবং তা থেকে অহংকার করবে, তারাই দোযখী এবং তথায় চিরকাল থাকবে। (৩৭) অতঃপর ঐ ব্যক্তির চাইতে অধিক জালেম কে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে? তারা তাদের গ্রন্থে লিখিত অংশ পেয়ে যাবে। এমন কি, যখন তাদের কাছে আমার প্রেরিত ফেরেশতারা প্রাণ নেওয়ার জন্যে পৌছে, তখন তারা বলে ঃ তারা কোথায় গেল, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আহবান করতে? তারা উত্তর দেবে ঃ আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে, তারা নিজেদের সম্পর্কে স্বীকার করবে যে, তারা অবশ্যই কাফের ছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নামাযের জন্যে উত্তম পোশাক ঃ আয়াতের দ্বিতীয় মাসআলা, পোশাককে زينت (সাজ–সজ্জা) শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাযে শুধু গুপ্ত–অঙ্গ আবৃত করা ছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী সাজ–সজ্জার পোশাক পরিধান করা শ্রেয়ঃ। হযরত হাসান (রাঃ) নামাযের সময় উত্তম পোশাকে পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা সৌন্দর্য পছন্দ করেন, তাই আমি প্রতিপালকের সামনে সুন্দর পোশাক পরে হাজির হই। তিনি বলেছেন ঃ

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

বোঝা গেল, এ আয়াত দ্বারা যেমন নামাযে গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ফরয বলে প্রমাণিত হয়, তেমনি সামর্থ্য অনুযায়ী পরিস্কার–পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করার ফযীলতও প্রমাণিত হয়।

নামাযে পোশাক সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা ঃ আয়াতের তৃতীয় মাসআলা, যে গুপ্ত–অঙ্গ সর্বাবস্থায় বিশেষতঃ নামায ও তওয়াফে আবৃত করা ফরয, তার সীমা কি? কোরআন পাক সংক্ষেপে গুপ্ত–অঙ্গ আবৃত করার নির্দেশ দিয়ে এর বিবরণ দানের দায়িত্ব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর উপর ন্যস্ত করেছে। তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পুরুষের গুপ্তাঙ্গ নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের গুপ্তাঙ্গ মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল বাদে সমস্ত দেহ।

হাদীসসমূহে এসব বিবরণ বর্ণিত রয়েছে। নাভীর নীচের অংশ অথবা হাঁটু খোলা থাকলে পুরুষের জন্যে এরূপ পোশাক এমনিতেও গর্হিত এবং এতে নামাযও আদায় হয় না। এমনিভাবে নারীর মস্তক, ঘাড় অথবা বাহু অথবা পায়ের গোছা খোলা থাকলে এরূপ পোশাক এমনিতে নাজায়েয এবং এতে নামাযও আদায় হয় না। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে গৃহে নারী খোলা মাথায় থাকে, সে গৃহে নেকীর ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

নারীর মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল গুপ্তাঙ্গের বাইরে রাখা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, নামাযে এসব অঙ্গ খোলা থাকলে নামাযে কোন ত্রুটি হবে না। এর অর্থ এরূপ কখনও নয় যে, মাহ্‌রাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সে শরীয়ত সম্মত ওযর ব্যতীত মুখমণ্ডল খুলে ঘুরাফেরা করবে।

এ হচ্ছে গুপ্তাঙ্গের ফরয সম্পর্কিত বিধান। এটি ছাড়া নামাযই হয় না। নামাযে শুধু গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাই কাম্য নয়; বরং সাজ–সজ্জার পোশাক পরিধান করতেও বলা হয়েছে। তাই পুরুষের উলঙ্গ মাথায় নামায পড়া কিংবা কনুই খুলে নামায পড়া মাকরূহ। হাফশার্ট পরিহিত অবস্থায় হোক কিংবা আস্তিন গুটানো হোক— সর্বাবস্থায় মাকরূহ। এমনিভাবে এমন পোশাক পরে নামায পড়া মাকরূহ, যা পরিধান করে বন্ধু–বান্ধব কিংবা সাধারণ লোকের সামনে যাওয়া লজ্জাজনক মনে করা হয়; যেমন কোর্তা ছাড়া শুধু গেঞ্জি গায়ে নামায পড়া যদিও আস্তিন পূর্ণ হয় কিংবা টুপির পরিবর্তে মাথায় কোন কাপড় অথবা ছোট হাত–রুমাল বেঁধে নামায পড়া। কারণ, রুচি সম্মত ব্যক্তি মাত্রই এ অবস্থায় বন্ধু–বান্ধব অথবা অপরের সামনে যাওয়া পছন্দ করে না। এমতাবস্থায় বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহর দরবারে যাওয়া কিরূপে পছন্দনীয় হতে পারে? মাথা, কাঁধ, কনুই ইত্যাদি খুলে নামায পড়া যে মাকরূহ তা আয়াতে ব্যবহৃত زينت (সাজ–সজ্জা) শব্দ থেকে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর বক্তব্য থেকেও বোঝা যায়।

আয়াতের প্রথম বাক্য যেমন মূর্খতা যুগের আরবদের উলঙ্গতা মিটানোর জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু ভাষার ব্যাপকতাদৃষ্টে তা থেকে

অনেক বিধান ও মাসআলাও জানা গেছে। এমনিভাবে দ্বিতীয় وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا বাক্যটিও আরবদের হজ্বের দিনগুলোতে উৎকৃষ্ট পানাহারকে গোনাহ্ মনে করার কুপ্রথা মিটানোর জন্যে অবতীর্ণ হলেও ভাষার ব্যাপকতাদৃষ্টে এখানেও অনেক বিধান ও মাসআলা প্রমাণিত হয়।

যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার ফরয ঃ প্রথম, শরীয়তের দিক দিয়েও পানাহার করা মানুষের জন্য ফরয ও জরুরী। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ পানাহার বর্জন করে, ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিংবা এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যে, ফরয কর্মও সম্পাদন করতে অক্ষম হয়, তবে সে আল্লাহ্‌র কাছে অপরাধী ও পাপী হবে।

নিষিদ্ধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছু অবৈধ হয় না ঃ আহকামুল কোরআন জাস্‌সাসের বর্ণনামতে এ আয়াত থেকে একটি মাসআলা এরূপ বোঝা যায় যে, জগতে পানাহারের যত বস্তু রয়েছে আসলের দিক দিয়ে সেগুলো সব হালাল ও বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিশেষ বস্তুর অবৈধতা ও নিষিদ্ধতা শরীয়তের কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ প্রত্যেক বস্তুকে হালাল ও বৈধ মনে করা হবে। وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا বাক্যে **مفعول** অর্থাৎ, কি বস্তু পানাহার করবে, তা উল্লেখ না করায় এ মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরবী ভাষায় বিশেষজ্ঞগণ বলেন ঃ এরূপ স্থলে مفعول উল্লেখ না করে **مفعول** এর ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তু পানাহার করতে পার – ঐ সব দ্রব্য–সামগ্রী বাদে, যেগুলো স্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে।

পানাহারে সীমালংঘন বৈধ নয় ঃ আয়াতের শেষ বাক্য وَلَا تُسْرِفُوْا দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পানাহারের অনুমতি বরং নির্দেশ থাকার সাথে সাথে অপব্যয় করার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। আয়াতে ব্যবহৃত **اسراف** শব্দের অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। সীমালঙ্ঘন কয়েক প্রকারের হতে পারে। এক, হালালকে অতিক্রম করে হারাম পর্যন্ত পৌঁছা এবং হারাম বস্তু পানাহার করতে থাকা। এ সীমালঙ্ঘন যে হারাম তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

দুই, আল্লাহ্‌র হালালকৃত বস্তুসমূহকে শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়াই হারাম মনে করে বর্জন করা। হারাম বস্তু ব্যবহার করা যেমন অপরাধ ও গোনাহ্ তেমনি হালালকে হারাম মনে করাও খোদায়ী আইনের বিরোধিতা ও কঠোর গোনাহ্– (ইবনে–কাসীর, মাযহারী, রুহুল–মাআনী)

ক্ষুধা ও প্রয়োজনের চাইতে অধিক পানাহার করাও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। তাই ফেকাহ্‌বিদগণ উদর পূর্তির অধিক ভক্ষণ করাকে না–জায়েয লিখেছেন। (আহকামুল–কোরআন) এমনিভাবে শক্তি–সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কম খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়া, ফলে ফরয কর্ম সম্পাদনের শক্তি না থাকা– এটাও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। উল্লেখিত উভয় প্রকার অপব্যয় নিষিদ্ধ করার জন্যে কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا إِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ

অর্থাৎ, অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বণ করে– প্রয়োজনের চাইতে বেশী ব্যয় করে না এবং কমও করে না।

পানাহারে মধ্য পন্থাই দ্বীন ও দুনিয়ার জন্যে উপকারী ঃ হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ বেশী পানাহার থেকে বেঁচে থাক। কারণ, অধিক পানাহার দেহকে নষ্ট করে, রোগের জন্ম দেয় এবং কর্মে অলসতা সৃষ্টি করে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্য পন্থা অবলম্বন কর। এটা দৈহিক সুস্থতার পক্ষে উপকারী এবং অপব্যয় থেকে দূরবর্তী। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা স্থূলদেহী আলেমকে পছন্দ করেন না। (অর্থাৎ, যে বেশী পানাহার করে সে নিজের প্রচেষ্টায়ই স্থূলদেহী হয়।) আরও বলেন ঃ মানুষ ততক্ষণ ধ্বংস হয় না, যতক্ষণ না সে মানসিক প্রবৃত্তিকে ধর্মের উপর অগ্রাধিকার দান করে।– (রুহুল–মা'আনী)

বায়হাকী বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আয়েশাকে দিনে দু'বার খেতে দেখে বললেন ঃ হে আয়েশা, তুমি কি পছন্দ কর যে, আহার করাই তোমার একমাত্র কাজ হোক?

এ আয়াতে পানাহার সম্পর্কে যে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু পানাহারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পরিধান ও বসবাসের প্রত্যেক কাজেই মধ্য পন্থা পছন্দনীয় ও কাম্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যা ইচ্ছা পানাহার কর এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর, তবে শুধু দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাক। (এক) তাতে অপব্যয় অর্থাৎ, প্রয়োজনের চাইতে বেশী না হওয়া চাই এবং (দুই) গর্ব ও অহঙ্কার না থাকা চাই।

এক আয়াত থেকে আটটি মাসআলা ঃ মোট কথা এই যে, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا বাক্য থেকে আটটি মাসআলার উদ্ভব হয়। (এক) যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার করা ফরয। (দুই) শরীয়তের কোন প্রমাণ দ্বারা কোন বস্তুর অবৈধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সব বস্তুই হালাল। (তিন) আল্লাহ্ তাআলা ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ ব্যবহার করা অপব্যয় ও অবৈধ। (চার) যেসব বস্তু আল্লাহ্ তাআলা হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম মনে করাও অপব্যয় এবং মহাপাপ। (পাঁচ) পেট ভরে খাওয়ার পরও আহার করা নাজায়েয। (ছয়) এতটুকু কম খাওয়াও অবৈধ, যদ্দরুন দুর্বল হয়ে ফরয কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। (সাত) সর্বদা পানাহারের চিন্তায় মগ্ন থাকাও অপব্যয়। (আট) মনে কিছু চাইলেই তা অবশ্যই খাওয়া অপব্যয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে সেসব লোককে হুশিয়ার করা হয়েছে, যারা এবাদতে বাড়াবাড়ি করে এবং স্বকল্পিত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক হালালকৃত বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা এবং হারাম মনে করাকে এবাদত জ্ঞান করে। যেমন, মক্কার মুশরেকরা হজ্বের দিনগুলোতে তওয়াফ করার সময় পোশাক পরিধানকেই বৈধ মনে করত না এবং আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক হালালকৃত ও উপাদেয় খাদ্যসমূহ বর্জন করাকে এবাদত মনে করত।

এহেন লোকদেরকে শাসানোর ভঙ্গিতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, বান্দাদের জন্য সৃজিত আল্লাহ্‌র زِيْنَةٌ অর্থাৎ, উত্তম পোশাক এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্যকে হারাম করেছে ?

উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য বর্জন করা ইসলামের শিক্ষা নয় ঃ উদ্দেশ্য এই যে, কোন বস্তু হালাল অথবা হারাম করা একমাত্র সে সত্তারই কাজ যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। কাজেই সেসব লোক দণ্ডনীয়, যারা আল্লাহ্‌র হালালকৃত উৎকৃষ্ট পোশাক অথবা পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্যকে হারাম মনে করে। সংগতি থাকা সত্ত্বেও জীর্ণাবস্থায় থাকা ইসলামের শিক্ষা নয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়ও

নয়; যেমন অনেক অজ্ঞ লোক মনে করে।

পূর্ববর্তী মনীষীদের অনেককেই আল্লাহ্ তাআলা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন। তাঁরা প্রায়ই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। দু'জাহানের সর্দার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও যখন সঙ্গতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন উৎকৃষ্টতর পোশাকও অঙ্গে ধারণ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, একবার যখন তিনি বাড়ীর বাইরে আসেন, তখন তাঁর গায়ে এমন চাদর শোভা পাচ্ছিল, যার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম। বর্ণিত আছে, ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) চারশ 'গিনি মূল্যের চাদর ব্যবহার করেছেন। এমনিভাবে হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) সব সময় উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর জন্যে জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি সারা বছরের জন্যে ৩৬০ জোড়া পোশাক নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছিল। যে বস্ত্রজোড়া তিনি একবার পরিধান করতেন, দ্বিতীয়বার ব্যবহার করতেন না। মাত্র একদিন ব্যবহার করেই কোন দরিদ্র ছাত্রকে দিয়ে দিতেন।

কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন বান্দাকে নেয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তখন আল্লাহ্ তাআলা এ নেয়ামতের চিহ্ন তার পোশাক-পরিচ্ছদে ফুটে উঠাকে পছন্দ করেন। কেননা, নেয়ামতকে ফুটিয়ে তোলাও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা। এর বিপরীতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ছিন্নবস্ত্র অথবা মলিন পোশাক পরিধান করা অকৃতজ্ঞতা।

অবশ্য, দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী ঃ (এক) রিয়া ও নাম-যশ এবং (দুই) গর্ব ও অহঙ্কার। অর্থাৎ, শুধু লোক দেখানো এবং নিজের বড় মানুষী প্রকাশ করার জন্যে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করা যাবে না। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ দু'টি বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও বূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন ছাহাবী থেকে মামুলী পোশাক কিংবা তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করার কথা বর্ণিত আছে। এর কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথম এই যে, তাঁদের হাতে যে ধনসম্পদ আসত, তা প্রায়ই ফকীর-মিসকীন ও ধর্মীয় কাজে ব্যয় করে ফেলতেন। নিজের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকত না, যদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট পোশাক নিতে পারতেন। দ্বিতীয় এই যে, তিনি ছিলেন সবার অনুসৃত। সাদাসিধা ও সস্তা পোশাক পরে অন্যান্য শাসনকর্তাকে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য ছিল – যাতে সাধারণ দরিদ্র ও ফকীরদের উপর তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রভাব না পড়ে।

এমনিভাবে সূফী বুযুর্গগণ শিষ্যদেরকে প্রথম পর্যায়ে সাজ-সজ্জার পোশাক পরিধান করতে এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এসব বস্তু স্থায়ীভাবে বর্জন করা ছওয়াবের কাজ, বরং প্রবৃত্তিকে বশে আনার জন্যে প্রথম পর্যায়ে চিকিৎসা ও প্রতিকারার্থে এধরনের সাধনার ব্যবস্থা করা হয়। যখন সে প্রবৃত্তিকে বশীভূত করে ফেলে এবং এমন স্তরে পৌছে যায় যে, প্রবৃত্তি তাকে হারাম ও নাজায়েযের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না, তখন সব সূফী বুযুর্গই পূর্ববর্তী সাধক মনীষীদের ন্যায় উত্তম পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য ব্যবহার করেন। তখন এসব উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পোশাক তাঁদের জন্যে আধ্যাত্ম পথে বিঘ্ন সৃষ্টির পরিবর্তে অধিক নৈকট্য লাভের উপায় হয়ে যায়।

খোরাক ও পোশাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সুন্নত ঃ খোরাক ও পোশাক সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ছাহাবী ও তাবেয়ীগণের সুন্নতের সারকথা এই যে, এসব ব্যাপারে লৌকিকতা পরিহার করতে হবে। যেরূপ পোশাক ও খোরাক সহজলভ্য তাই কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে হবে। মোটা ভাত ও মোটা কাপড় জুটলে যে কোন উপায়ে এমনকি, কর্জ করে হলেও উৎকৃষ্টটি অর্জনের জন্যে চেষ্টিত হবে না।

এমনিভাবে উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য জুটলে তাকে জেনে শুনে খারাপ মনে করবে না অথবা তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে না। উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্যের পিছনে লাগা যেমন লৌকিকতা, তেমনি উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট করা কিংবা তা বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করাও নিন্দনীয় লৌকিকতা।

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব নেয়ামত; উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যশীল মুমিনদের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের কল্যাণেই অন্যেরা ভোগ করতে পারছে। কেননা, এ দুনিয়া হচ্ছে কর্মক্ষেত্র—প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। এখানে পার্থিব নেয়ামতের মধ্যে আসল-নকল ও ভালমন্দের পার্থক্য করা যায় না। করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার দস্তরখান সবার জন্যে সমভাবে বিছানো রয়েছে বরং এখানে আল্লাহ্‌র রীতি এই যে, মুমিন ও অনুগত বান্দাদের আনুগত্যে কিছু ত্রুটি হয়ে গেলে অন্যেরা তাদের উপর প্রবল হয়ে পার্থিব নেয়ামতের ভাণ্ডার অধিকার করে বসে এবং তারা দারিদ্র্য ও উপবাসের করাল গ্রাসে পতিত হয়।

কিন্তু এ আইন শুধু এ দুনিয়ারূপী কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরকালে সমস্ত নেয়ামত ও সুখ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাদের জন্যে নির্দিষ্ট থাকবে। আয়াতের এ বাক্যে তাই বলা হয়েছে ঃ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ —অর্থাৎ, আপনি বলে দিন ঃ সব পার্থিব নেয়ামত প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনেও মুমিনদেরই প্রাপ্য এবং কিয়ামতের দিন তো এককভাবে তাদের জন্যেই নির্দিষ্ট হবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) মতে এ বাক্যটির অর্থ এই যে, পার্থিব সব নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরকালে শাস্তির কারণ হবে না– এ বিশেষ অবস্থাসহ তা একমাত্র অনুগত মুমিন বান্দাদেরই প্রাপ্য। কাফের ও পাপাচারীর অবস্থা এরূপ নয়। পার্থিব নেয়ামত তারাও পায় বরং আরও বেশী পায়; কিন্তু এসব নেয়ামত পরকালে তাদের জন্যে শাস্তি ও স্থায়ী আযাবের কারণ হবে। কাজেই পরিণামের দিক দিয়ে এসব নেয়ামত তাদের জন্যে সম্মান ও সুখের বস্তু নয়।

কোন কোন তফসীরবিদের মতে এর অর্থ এই যে, পার্থিব সব নেয়ামতের সাথে পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা ও নানারকম দুঃখ-কষ্ট লেগে থাকে, নির্ভেজাল নেয়ামত ও অনাবিল সুখের অস্তিত্ব এখানে নেই। তবে কিয়ামতে যারা এসব নেয়ামত লাভ করবে, তারা নির্ভেজাল অবস্থায় লাভ করবে। এগুলোর সাথে কোনরূপ পরিশ্রম, কষ্ট হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা এবং কোন চিন্তা-ভাবনা থাকবে না। উপরোক্ত তিন প্রকার অর্থই আয়াতের এ বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই ছাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদগণ এসব অর্থই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, "আমি স্বীয় অসীম শক্তির নিদর্শনাবলী জ্ঞানবানদের জন্যে এমনিভাবে খুলে খুলে বর্ণনা করি, যাতে পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে সবাই বুঝে নেয়।" ভাল পোশাক ও ভাল খাদ্য বর্জন করলে আল্লাহ্ তাআলা সন্তুষ্ট হন – এ আয়াতে মানুষের এ বাড়াবাড়ি ও মূর্খতাসুলভ ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে।

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا
جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ
عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾
وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ
فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ
نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن
تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ
وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

(৩৮) আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমাদের পূর্বে জিন ও মানবের যেসব সম্প্রদায় চলে গেছে, তাদের সাথে তোমরাও দোযখে যাও। যখন এক সম্প্রদায় প্রবেশ করবে; তখন অন্য সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করবে। এমনকি, যখন তাতে সবাই পতিত হবে, তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক ! এরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল। অতএব, আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। আল্লাহ্ বলবেন ঃ প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ; তোমরা জান না। (৩৯) পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবে ঃ তাহলে আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব, শাস্তি আস্বাদন কর স্বীয় কর্মের কারণে। (৪০) নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্যে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করি (৪১) তাদের জন্যে নরকাগ্নির শয্যা রয়েছে এবং উপর থেকে চাদর। আমি এমনিভাবে জালেমদেরকে শাস্তি প্রদান করি। (৪২) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে আমি কাউকে তার সামর্থ্যের চাইতে বেশী বোঝা দেই না, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। (৪৩) তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তা বের করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবেঃ আল্লাহ্ শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের রসূল আমাদের কাছে সত্যকথা নিয়ে এসেছিলেন। আওয়াজ আসবে ঃ এটি জান্নাত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মেরপ্রতিদানে।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে কতিপয় এমন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্ তাআলা হারাম করেছেন। সত্য এই যে, এগুলো বর্জন করলেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা দ্বিবিধ মূর্খতায় লিপ্ত। একদিকে আল্লাহ্ তাআলার হালালকৃত উত্তম ও মনোরম বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্যে অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করে এসব নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং অপরদিকে যেসব বস্তু প্রকৃতপক্ষে হারাম ছিল এবং যেগুলো ব্যবহারের পরিণতিতে আল্লাহ্র গযব ও পরকালের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেগুলোর ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পরকালের শাস্তি ক্রয় করেছে। এভাবে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে দু'কূলই হারিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

"যেসব বস্তুকে তোমরা অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করেছ, সেগুলো তো হারাম নয়, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা সব নির্লজ্জ কাজ হারাম করেছেন, তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক। আরও হারাম করেছেন প্রত্যেক পাপকাজ, অন্যায়-উৎপীড়ন, বিনা প্রমাণে আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার করা এবং আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যার কোন সনদ তোমাদের কাছে নেই।"

এখানে اثم (পাপকাজ) শব্দের আওতায় সেসব গোনাহ্ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেগুলো মানুষের নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং بغى (উৎপীড়ন) শব্দের আওতায় অপরের সাথে লেনদেন ও অপরের অধিকার সম্পর্কিত গোনাহ্ এসে গেছে। অতঃপর শিরক ও আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ এগুলো সুস্পষ্টভাবেই বিশ্বাসগত মহাপাপ।

প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় আয়াতে মুশরেকদের দুটি ভ্রান্ত কাজ বর্ণিত হয়েছিল। (এক) হালালকে হারাম করা এবং (দুই) হারামকে হালাল করা। তৃতীয় আয়াতে তাদের ভয়াবহ পরিণাম এবং পরকালীন শাস্তি ও আযাব বর্ণনা করা হয়েছঃ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ অর্থাৎ, যেসব অপরাধী সর্ব প্রকার অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের মধ্যে লালিত-পালিত হচ্ছে এবং বাহ্যতঃ তাদের উপর কোন আযাব আসতে দেখা যায় না, তারা যেন আল্লাহ্ তাআলার এ চিরাচরিত রীতি সম্পর্কে উদাসীন না থাকে যে, তিনি অপরাধীদেরকে কৃপাবশতঃ ঢিল দিতে থাকেন, যাতে কোনরকমে তারা স্বীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়; কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানে এ ঢিল ও অবকাশের একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে। যখন এ মেয়াদ এসে যায়, তখন এক মুহূর্তও আগেপিছে হয় না এবং তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করা হয়। কখনও দুনিয়াতেই আযাব এসে যায়, এবং যদি দুনিয়াতে না আসে, তবে মৃত্যুর সাথে সাথেই আযাবে প্রবিষ্ট হয়ে যায়।

এ আয়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগেপিছে না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি এমন একটি বাকপদ্ধতি, যেমন আমাদের পরিভাষায় ক্রেতা দোকানদারকে বলে ঃ মূল্য কিছু কম-বেশী হতে পারবে কি না? এখানে জানা কথা যে, বেশী মূল্য তার কাম্য নয়– কম হবে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কমের অনুগামী করে বেশীও উল্লেখ করা হয়। এমনিভাবে এখানে আসল উদ্দেশ্য এই যে, নির্দিষ্ট মেয়াদের পর বিলম্ব হবে না। কিন্তু সাধারণের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী বিলম্বের সাথে আগে হওয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বে কতিপয় আয়াতে একটি অঙ্গীকার বর্ণিত হয়েছে। এটি প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে তার দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে আত্মা জগতে নেয়া হয়েছিল। অঙ্গীকারটি ছিল এই ঃ যখন আমার পয়গম্বর তোমাদের কাছে

আমার নির্দেশাবলী নিয়ে আসবেন, তখন মনে-প্রাণে সেগুলো মেনে নেবে এবং তদনুযায়ী কাজ করবে। এ কথাও বলে দেয়া হয়েছিল যে, দুনিয়াতে আগমনের পর যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকারে অটল থেকে তা পূর্ণ করবে, সে যাবতীয় দুঃখ ও চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে যে পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলবে এবং তাদের নির্দেশাবলী অমান্য করবে, তাদের জন্যে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষমান রয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সে পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে, যা দুনিয়াতে আগমনের পর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করেছে। কেউ অঙ্গীকার ভুলে গিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে আবার কেউ তাতে অটল রয়েছে এবং তদনুযায়ী সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এ উভয় দলের পরিণতি এবং আযাব ও ছওয়াব আলোচ্য চার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী অবিশ্বাসীদের কথা এবং শেষ দু'আয়াতে অঙ্গীকার পূর্ণকারী মুমিনদের কথা আলোচিত হয়েছে।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলেছে এবং আমার নির্দেশাবলীর প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে, তাদের জন্যে আকাশের দরজা খোলা হবে না।

তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের বর্ণিত এক তফসীরে উল্লেখ রয়েছে যে, তাদের আমল ও তাদের দোয়ার জন্যে আকাশের দরজা খোলা হবে না। অর্থাৎ, তাদের দোয়া কবুল করা হবে না এবং তাদের আমলকে ঐ স্থানে যেতে দেয়া হবে না, যেখানে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের আমলসমূহ সংরক্ষিত রাখা হয়। কোরআনের সূরা মুতাফফিফীনে এ স্থানটির নাম ইল্লিয়্যীন বলা হয়েছে। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও উল্লিখিত বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

অর্থাৎ, মানুষের পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ্ তাআলার দিকে উর্ধ্বগামী হয় এবং সৎকর্ম সেগুলোকে উত্থিত করে। অর্থাৎ, মানুষের সৎকর্মসমূহ পবিত্র ও বাক্যাবলী আল্লাহ্‌র বিশেষ দরবারে পৌছানোর কারণ হয়।

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে অপর এক রেওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবী থেকে এমনও বর্ণিত আছে যে, কাফেরদের আত্মার জন্যে আকাশের দরজা খোলা হবে না। এসব আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে। এ বিষয়বস্তুর সমর্থন হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ)-এর ঐ হাদীস থেকে পাওয়া যায়, যা আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে-মাজা ও ইমাম আহাম্মদ বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সংক্ষেপে এই ঃ

'রসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক আনসারী সাহাবীর জানাযায় গমন করেন। কবর প্রস্তুতে কিছু বিলম্ব দেখে তিনি এক জায়গায় বসে যান। সাহাবায়ে কেরামও তাঁর চারদিকে চুপচাপ বসে যান। তিনি মাথা উঁচু করে বললেন ঃ মুমিন বান্দার মৃত্যুর সময় হলে আকাশ থেকে সাদা ধবধবে চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতারা আগমন করে। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে। তারা মরণোন্মুখ ব্যক্তির সামনে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত আযরাঈল আসেন এবং তার আত্মাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নিশ্চিন্ত আত্মা, পালনকর্তা মাগফেরাত ও সন্তুষ্টির জন্যে বের হয়ে আস। তখন তার আত্মা এমন অনায়াসে বের হয়ে আসে, যেমন মশকের মুখ খুলে দিলে তার পানি বের হয়ে আসে। মৃত্যুদূত তার আত্মাকে হাতে নিয়ে উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে সমর্পন করেন। ফেরেশতারা তা নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে ঃ এ পাক আত্মা কার? ফেরেশতারা তার ঐ নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দুনিয়াতে তার সম্মানার্থ ব্যবহার হত এবং বলে ঃ ইনি হচ্ছেন অমুকের পুত্র অমুক। ফেরেশতারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌছে দরজা খোলতে বলে। দরজা খোলা হয়। এখান থেকে আরও ফেরেশতা তাদের সঙ্গী হয়। এভাবে তারা সপ্তম আকাশে পৌছে। তখন আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আমার এ বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে লিখ এবং তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। এ আত্মা আবার কবরে ফিরে আসে। কবরে হিসাব গ্রহণকারী ফেরেশতা এসে তাকে উপবেশন করায় এবং প্রশ্ন করে ঃ তোমার পালনকর্তা কে? তোমার ধর্ম কি? সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ্ তাআলা এবং ধর্ম ইসলাম। এর পর প্রশ্ন হয় ঃ এই যে ব্যক্তি, যিনি তোমাদের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন,তিনি কে? সে বলে ঃ ইনি আল্লাহ্‌র রসূল। তখন একটি গায়েবী আওয়াজ হয় যে, আমার বান্দা সত্যবাধী। তার জন্যে জান্নাতের শয্যা পেতে দাও, জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে তার দরজা খুলে দাও। এ দরজা দিয়ে জান্নাতের সুগন্ধি ও বাতাস আসতে থাকে। তার সৎকর্ম একটি সুশ্রী আকৃতি ধারণ করে তাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে তার কাছে এসে যায়।

'এর বিপরীতে কাফেরের মৃত্যু সময় উপস্থিত হলে আকাশ থেকে কাল রঙের ভয়ঙ্কর মূর্তি ফেরেশতা নিকৃষ্ট চট নিয়ে আগমন করে এবং তার বিপরীত দিকে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদুত তার আত্মা এমনভাবে বের করে, যেমন কোন কাঁটা-বিশিষ্ট শাখা ভিজা পশমে জড়িয়ে থাকলে তাকে সেখান থেকে টেনে বের করা হয়। আত্মা বের হলে তার দুর্গন্ধ মৃত জন্তুর দুর্গন্ধের চাইতেও প্রকট হয়। ফেরেশতারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেশেতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে ঃ এ দুরাত্মাটি কার? ফেরেশতারা তখন তার ঐ হীনতম নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যদ্দ্বারা সে দুনিয়াতে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ, সে অমুকের পুত্র অমুক। অতঃপর প্রথম আকাশে পৌছে দরজা খুলতে বললে তার জন্যে দরজা খোলা হয় না বরং নির্দেশ আসে যে, এ বান্দার আমলনামা সিজ্জীনে রেখে দাও। সেখানে অবাধ্য বান্দাদের আমলনামা রাখা হয়। এ আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা পুনরায় দেহে প্রবেশ করে। ফেরেশতারা তাকে কবরে বসিয়ে মুমিন বান্দার অনুরূপ প্রশ্ন করে। সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে কেবল هاه هاه لا ادرى (হায় হায় আমি জানি না) বলে। তাকে জাহান্নামের শয্যা ও জাহান্নামের পোষাক দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেয়া হয়। ফলে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ পৌছতে থাকে এবং কবরকে তার জন্যে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়।

আয়াতের শেষে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ

يلج শব্দটি ولوج থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় প্রবেশ করা। جمل এর অর্থ উট এবং سم এর অর্থ সূচের ছিদ্র। অর্থ এই যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না উটের মত বিরাট বপু জন্তু সূচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, সূচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা যেমন স্বভাবতঃ অসম্ভব, তেমনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব। এতে তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতঃপর তাদের আযাবের অধিকতর তীব্রতা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ — مِهَادٌ শব্দের অর্থ বিছানা এবং غَوَاشٍ শব্দটি غَاشِيَةٌ এর বহুবচন। এর অর্থ আবৃতকারী বস্তু। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের চাদর ও শয্যা সবই জাহান্নামের

হবে। প্রথম আয়াতে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তার শেষে وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ বলা হয়েছিল। দ্বিতীয় আয়াতে জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করার পর وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ বলা হয়েছে। কেননা, এটি আগেরটির চাইতে গুরুতর।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী যারা পালন করে, তাদের কথা বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতের অধিবাসী এবং জান্নাতেই অনন্তকাল বসবাস করবে।

শরীয়তের নির্দেশাবলী সহজ করা হয়েছে ঃ কিন্তু তাদের জন্যে সেখানে বিশ্বাস স্থাপন করা ও সৎকর্ম সম্পাদন করার শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, কৃপাবশত ঃ এ কথাও বলা হয়েছে ঃ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কোন বান্দার উপর এমন বোঝা চাপান না, যা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্যে যেসব সৎকর্ম শর্ত করা হয়েছে, সেগুলো মানুষের সাধ্যাতীত কঠিন কাজ নয়। বরং আল্লাহ্ তাআলা প্রতি ক্ষেত্রেই শরীয়তের নির্দেশাবলী নরম ও সহজ করেছেন। প্রত্যেক নির্দেশে অসুস্থতা, দুর্বলতা, সফর ও অন্যান্য মানবিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে বলা হয়েছে ঃ মানুষকে সৎকর্মের আদেশ দেয়ার সময় এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, সব সৎকর্ম সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় পালন করা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়ার কারণে আদেশটি তাদের জন্যে কঠিন হতে পারে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণার্থে বলা হয়েছে ঃ আমি মানব জীবনের সকল কাল ও অবস্থা যাচাই করে সর্বাবস্থায় সব সময় ও সব জায়গার জন্যে উপযুক্ত নির্দেশাবলী প্রদান করি। এগুলোর বাস্তবায়ন মোটেই কঠিন কাজ নয়।

জান্নাতীদের মন থেকে পারস্পরিক মালিন্য অপসারণ করা হবে ঃ চতুর্থ আয়াতে জান্নাতীদের দু'টি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। (এক) ঃ وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ অর্থাৎ, জান্নাতীদের অন্তরে পরস্পরের পক্ষ থেকে যদি কোন মালিন্য থাকে, তবে আমি তা তাদের অন্তর থেকে অপসারণ করে দেব। তারা একে অপরের প্রতি সন্তুষ্টি ও ভাই ভাই হয়ে জান্নাতে যাবে এবং বসবাস করবে।

ছহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, মুমিনরা যখন পুলসিরাত অতিক্রম করে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে, তখন জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কারও প্রতি কারও কোন কষ্ট থাকে কিংবা কারও কাছে কারও পাওনা থাকে, তবে এখানে পৌছে পরস্পরে প্রতিদান নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কার করে নেবে। এভাবে হিংসা দ্বেষ, শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পূতপবিত্র হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তফসীর মাযহারীতে আছে, এ পুল বাহ্যতঃ পুলসিরাতের শেষ প্রান্ত এবং জান্নাত সংলগ্ন। আল্লামা সুয়ূতী প্রমুখ এ মতই গ্রহণ করেছেন।

এ স্থলে যেসব পাওনা দাবী করা হবে সেগুলো টাকা পয়সা দ্বারা পরিশোধ করা যাবে না। কারণ, সেখানে কারও কাছে টাকা-পয়সা থাকবে না। মুসলিমের এক হাদীস অনুযায়ী সৎকর্ম দ্বারা এ সব পাওনা পরিশোধ করা হবে। যদি কারও সৎকর্ম এভাবে নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং তার পরেও পাওনা বাকী থাকে, তবে প্রাপকের গোনাহ্ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরূপ ব্যক্তিকে সর্বাধিক নিঃস্ব বলে আখ্যা দিয়েছেন, যে দুনিয়াতে সৎকর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু অপরের পাওনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, ফলে পরকালে সে যাবতীয় সৎকর্ম থেকে রিক্তহস্ত হয়ে পড়ে।

এ হাদীসে পাওনা পরিশোধের সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে এরূপ করা জরুরী নয়। ইবনে কাছীর ও তফসীরে মাযহারীর বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতিরেকে পারস্পরিক হিংসা ও মালিন্য দূর হয়ে যাওয়াও সম্ভব।

যেমন, কোন কোন হাদীসে আছে, তারা পুলসিরাত অতিক্রম করে একটি ঝর্ণার কাছে পৌছবে এবং পানি পান করবে। এ পানির বৈশিষ্ট্য এই যে, সবার মন থেকে পারস্পরিক হিংসা ও মালিন্য ধোয়ে-মুছে যাবে। ইমাম কুরতবী (রহঃ) কোরআন পাকের وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا আয়াতের তফসীরও তাই বর্ণনা করেছেন যে, এ পানি দ্বারা সবার মনের কলহ ও মালিন্য ধোয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) একবার এ আয়াতে পাঠ করে বললেন ঃ আমি আশা করি আমি, ওসমান, তালহা ও যুবায়ের ঐ সব লোকের অন্তর্ভুক্ত হব, যাদের বক্ষ জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে মনোমালিন্য থেকে পরিষ্কার করে দেয়া হবে। (ইবনে কাসীর) বলাবাহুল্য, দুনিয়াতে তাঁদের পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দেয়ার ফলে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত জান্নাতীদের দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, জান্নাতে পৌছে তারা আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, তিনি তাদেরকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং জান্নাতের পথ সহজ করে দিয়েছেন। তারা বলবে ঃ যদি আল্লাহ্ তাআলা কৃপা না করতেন, তবে এখানে পৌছার সাধ্য আমাদের ছিল না।

এতে বোঝা যায় যে, কোন মানুষ কেবল স্বীয় প্রচেষ্টায় জান্নাতে যেতে পারে না, যে পর্যন্ত না তার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার কৃপা হয়। কেননা, স্বয়ং প্রচেষ্টা তার ইচ্ছাধীন নয়। এটাও শুধু আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহেই অর্জিত হয়ে থাকে।

হেদায়তের বিভিন্ন স্তর ঃ ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'হেদায়েত' শব্দের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তা এই যে, 'হেদায়েত' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সত্য এই যে, আল্লাহ্‌র দিকে যাওয়ার পথ প্রাপ্তির নামই হেদায়েত। তাই আল্লাহ্‌র নৈকট্যের স্তর যেমন বিভিন্ন ও অনন্ত, তেমনি হেদায়াতের স্তরও অত্যধিক বিভিন্ন। কুফর ও শিরক থেকে মুক্তি ও ঈমান এর সর্বনিম্ন স্তর। এরই মাধ্যমে মানুষের গতিধারা ভ্রান্ত পথ থেকে সরে আল্লাহ্ মুখী হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ও বান্দার মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা অতিক্রম করার প্রত্যেক স্তরই হেদায়েত। তাই হেদায়াত অন্বেষণ থেকে কখনও কোন মানব এমনকি, নবী-রসূল পর্যন্ত নির্লিপ্ত হতে পারেন না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জীবনের শেষ পর্যন্ত اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ দোয়াটি যেমন উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনি নিজেও যত্নসহকারে অব্যাহত রেখেছেন। কেননা, আল্লাহ্‌র নৈকট্যের স্তরের কোন শেষ নেই। এমন কি, আলোচ্য আয়াতে জান্নাতে প্রবেশকেও হেদায়েত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, এটি হচ্ছে হেদায়েতর সর্বশেষ স্তর।

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا
رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ
مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾
وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ
وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾
وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا
تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا
يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ
تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ
ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾ وَنَادَىٰ
أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ الَّذِينَ
اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ
نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

(৪৪) জান্নাতীরা দোযখীদেরকে ডেকে বলবে ঃ আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি। অতএব, তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তারা বলবে ঃ হাঁ। অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবে ঃ আল্লাহর অভিসম্পাত জালেমদের উপর, (৪৫) যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত। তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী ছিল। (৪৬) উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর থাকবে এবং আরাফের উপরে অনেক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনে নেবে। তারা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে ঃ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না, কিন্তু প্রবেশ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে। (৪৭) যখন তাদের দৃষ্টি দোযখীদের উপর পড়বে, তখন বলবে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এ জালেমদের সাথী করো না। (৪৮) আরাফবাসীরা যাদেরকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে, তাদেরকে ডেকে বলবে তোমাদের দলবল ও ঔদ্ধত্য তোমাদের কোন কাজে আসেনি। (৪৯) এরা কি তারাই; যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন না। প্রবেশ কর জান্নাতে। তোমাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তোমরা দুঃখিত হবে না। (৫০) দোযখীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে ঃ আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা বলবে ঃ আল্লাহ্ এই উভয় বস্তু কাফেরদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন, (৫১) তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজকে তাদেরকে ভুলে যাব; যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জান্নাতীরা জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে গেলে বাহ্যতঃই উভয় স্থানের মধ্যে সব দিক দিয়ে বিরাট ব্যবধান হবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, উভয় স্থানের মাঝখানে এমন কিছু রাস্তা থাকবে, যার ফলে একে অপরকে দেখতে পারবে এবং পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর হবে।

সূরা ছাফফাতে দু'ব্যক্তির কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা দুনিয়াতে একে অপরের সঙ্গী ছিল ; কিন্তু একজন ছিল মুমিন আর অপর জন ছিল কাফের। পরকালে যখন মুমিন জান্নাতে এবং কাফের দোযখে চলে যাবে, তখন তারা একে অপরকে দেখবে এবং কথাবার্তা বলবে। বলা হয়েছে ঃ "জান্নাতী সাথী উঁকি দিয়ে দোযখী সাথীকে দেখবে এবং তাকে দোযখের মধ্যস্থলে পতিত পাবে। সে বলবে ঃ হতভাগা, তোর ইচ্ছা ছিল আমিও তোর মত বরবাদ হয়ে যাই। যদি আল্লাহ্র কৃপা না হত, তবে আজ আমিও তোর সাথে জাহান্নামে পড়ে থাকতাম। তুই আমাকে বলতে যে, এ দুনিয়ার মৃত্যুর পর কোন জীবন, কোন হিসাব-কিতাব বা সওয়াব-আযাব হবে না।" এখন দেখ্লি এসব কি হচ্ছে?

আলোচ্য আয়াতসমূহ ও পরবর্তী প্রায় এক রুকু পর্যন্ত এধরনেরই কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে, যা জান্নাতী ও দোযখীদের মধ্যে হবে।

জান্নাত ও দোযখের মাঝখানে একে অপরকে দেখা ও কথাবার্তা বলার পথও প্রকৃতপক্ষে দোযখীদের জন্যে এক প্রকার আযাব হবে। চারদিক থেকে তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষিত হবে। জান্নাতীদের নেয়ামত ও সুখ দেখে দোযখের আগুনের সাথে সাথে অনুতাপের আগুনেও তারা দগ্ধ হবে। অপরপক্ষে জান্নাতীদের নেয়ামত ও সুখে এক নতুন সংযোজন হবে। কেননা, প্রতিপক্ষের বিপদ দেখে নিজ সুখ ও নেয়ামতের মূল্য বেড়ে যাবে। যারা দুনিয়াতে ধার্মিকদের প্রতি বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করত এবং তারা কোনরূপ প্রতিশোধ নিত না, আজ তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় আযাবে পতিত দেখে তারা হাসবে যে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল তারা পেয়ে গেছে। কোরআন পাকে এ বিষয়টি সূরা 'মুতাফফেফীনে' এভাবে বিধৃত হয়েছে ঃ

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ
يَنظُرُونَ ـ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

দোযখীদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার জন্যে হুশিয়ারী এবং বোকাসুলভ কথাবার্তার জন্যে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকও তিরস্কার করা হবে। তারা তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে ঃ – هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ এ হচ্ছে ঐ আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। এখন দেখ এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখ না।

এমনিভাবে আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতীরা দোযখীদেরকে প্রশ্ন করবে ঃ আমাদের পালনকর্তা আমাদের সাথে যেসব নেয়ামত ও সুখের ওয়াদা করেছিলেন, আমরা সেগুলো সম্পূর্ণ সঠিক পেয়েছি। তোমরা বল, তোমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল, তা তোমাদের সামনে এসেছে কিনা? তারা স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি।

তাদের এ প্রশ্নোত্তরের সমর্থনে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন ফেরেশতা ঘোষণা করবে যে, জালেমদের উপর আল্লাহ্ তাআলার অভিসম্পাত হোক। তারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আসতে বাধা দিত এবং পরকালে অবিশ্বাস করত।

আ'রাফবাসী কারা ঃ জান্নাতী ও দোযখীদের পারস্পরিক কথাবার্তা প্রসঙ্গে তৃতীয় আয়াতে আরও একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু লোক এমনও থাকবে, যারা দোযখ থেকে তো মুক্তি পাবে, কিন্তু তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার আশা পোষণ করবে। তাদেরকেই আ'রাফবাসী বলা হয়।

আ'রাফ কি? সূরা হাদীদের আয়াত থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এতে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে তিনটি দল হবে। (এক) সুস্পষ্ট কাফের ও মুশরিক। এদের পুলসেরাতে চলার প্রশ্নই উঠবে না। এর আগেই জাহান্নামের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। (দুই) মুমিনের দল। তাদের সাথে ঈমানরে আলো থাকবে। (তিন) মুনাফেকের দল। এরা দুনিয়াতে মুসলমানদের সাথে লাগা থাকত। সেখানেও প্রথম দিকে সাথে লাগা থাকবে এবং পুলসেরাতে চলতে শুরু করবে। তখন একটি ভীষণ অন্ধকার সবাইকে ঘিরে ফেলবে। মুমিনরা ঈমানের আলোর সাহায্যে সামনে এগিয়ে যাবে। মুনাফেকরা ডেকে ডেকে তাদেরকে বলবে ঃ একটু আস। আমরাও তোমাদের আলো দ্বারা উপকৃত হই। এতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন ফেরেশতা বলবে ঃ পেছনে ফিরে যাও এবং সেখানেই আলো তালাশ কর। উদ্দেশ্য এই যে, এ আলো হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্মের। এ আলো হাসিল করার স্থান পেছনে চলে গেছে। যারা সেখানে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে এ আলো অর্জন করেনি, তারা আজ আলো দ্বারা উপকৃত হবে না। এমতাবস্থায় মুমিন ও মুনাফেকদের মধ্যে একটি প্রাচীর বেষ্টনী দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। এতে একটি দরজা থাকবে। দরজার বাইরে কেবলই আযাব দৃষ্টিগোচর হবে এবং ভেতরে মুমিনরা থাকবে। তাদের সামনে আল্লাহ্‌র রহমত এবং জান্নাতের মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

ইবনে জরীর ও অন্যান্য তফসীরের মতে এ আয়াতে حِجَابٌ বলে ঐ প্রাচীর বেষ্টনীকেই বোঝানো হয়েছে। এ প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগের নামই আ'রাফ। কেননা, আ'রাফ'ওরফে'র বহুবচন। এর অর্থ প্রতেক বস্তুর উপরিভাগ। কারণ, দূর থেকে এ ভাগই 'মারূফ' তথা খ্যাত হয়ে থাকে। এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী প্রাচীর-বেষ্টনীর উপরিভাগকে আ'রাফ বলা হয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে এ স্থানে কিছুসংখ্যক লোক থাকবে। তারা জান্নাত ও দোযখ উভয় দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে এবং উভয়পক্ষের লোকদের সাথে প্রশ্নোত্তর ও কথাবার্তা বলবে।

সালামের মসনুন শব্দ ঃ আ'রাফবাসীদের ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা জ্ঞাত হওয়ার পর এখন আয়াতের বিষয়বস্তু দেখুন। বলা হয়েছে ঃ আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবে ঃ সালামুন আলাইকুম। এ বাক্যটি দুনিয়াতেও পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় সম্মান প্রদর্শনার্থ বলা হয় এবং বলা সুন্নত। মৃত্যুর পর কবর যিয়ারতের সময় এবং হাশর ও কেয়ামতেও বলা হবে। কিন্তু আয়াত ও হাদীসদৃষ্টে জানা যায় যে, দুনিয়াতে আসসালামু আলাইকুম বলা সুন্নত। কবর যিয়ারতের জন্যে কোরআন পাকে سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ উল্লেখিত হয়েছে। ফেরেশতাগণ যখন জান্নাতীদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে, তখনও বলা হবে – سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ আলোচ্য আয়াতেও আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদেরকে এ বাক্য দ্বারা সালাম করবে।

অতঃপর আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা এখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু এ ব্যাপারে আগ্রহী। অতঃপর বলা হয়েছে "আরাফবাসীদের দৃষ্টি যখন দোযখীদের উপর পড়বে এবং তাদের শাস্তি ও বিপদ প্রত্যক্ষ করবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে যে, আমাদেরকে এসব জালেমের সাথী করবেন না।"

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۵۲﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ
تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ
رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ
غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا
كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۵۳﴾ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۟ يُغْشِي الَّيْلَ
النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ
بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۵۴﴾ اُدْعُوْا
رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۵۵﴾ وَلَا تُفْسِدُوْا
فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ
اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۶﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ
بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا
سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ
كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۷﴾

(৫২) আমি তাদের কাছে গ্রন্থ পৌছিয়েছি, যা আমি স্বীয় জ্ঞানে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, যা পথপ্রদর্শক এবং মুমিনদের জন্যে রহমত। (৫৩) তারা কি এখন এ অপেক্ষায়ই আছে যে, এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হোক? যেদিন এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হবে, সেদিন পূর্বে যারা একে ভুলে গিয়েছিল, তারা বলবে ঃ বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের পয়গম্বরগণ সত্যসহ আগমন করেছিলেন। অতএব, আমাদের জন্যে কোন সুপারিশকারী আছে কি যে, সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে পুনঃ প্রেরণ করা হলে আমরা পূর্বে যা করতাম তার বিপরীত কাজ করে আসতাম। নিশ্চয় তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা মনগড়া যা বলত, তা উধাও হয়ে যাবে। (৫৪) নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ্, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (৫৫) তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৫৬) পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। তাঁকে আহবান কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। (৫৭) তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনিভাবে মৃতদেরকে বের করব— যাতে তোমরা চিন্তা কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও গ্রহ–নক্ষত্র সৃষ্টি করা এবং একটি *বিশেষ অটল ব্যবস্থার অনুগামী হয়ে তাদের নিজ নিজ কাজে* নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শক্তির কথা বর্ণনা করে প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষকে চিন্তার আহবান জানানো হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা এ বিশাল বিশ্ব সৃষ্টি করতে এবং বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাধীনে পরিচালনা করতে সক্ষম, তাঁর জন্য এসব বস্তুকে ধ্বংস করে কেয়ামতের দিন পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ? তাই কেয়ামতকে অস্বীকার না করে একমাত্র তাঁকেই স্বীয় পালনকর্তা মনে কর, তার কাছেই প্রয়োজনাদি প্রার্থনা কর, তাঁরই এবাদত কর এবং সৃষ্ট বস্তুকে পূজা করার পঙ্কিলতা থেকে বের হয়ে সত্যকে চিন। এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের পালনকর্তা। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করার কারণ ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বকে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। স্বয়ং কোরআন পাকেও বিভিন্ন ভঙ্গিতে একথা বার বার বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে ঃ "এক নিমেষের মধ্যে আমার আদেশ কার্যকরী হয়ে যায়।" কোথাও বলা হয়েছে ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে দেন ঃ হয়ে যাও। আর সঙ্গে সঙ্গে তা সৃষ্টি হয়ে যায়"। এমতাবস্থায় বিশ্ব সৃষ্টিতে ছয় দিন লাগার কারণ কি?

তফসীরবিদ হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়র (রঃ) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমেষে সব কিছু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষকে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্মপক্বতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশেই এতে ছয় দিন ব্যয় করা হয়েছে।

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও গ্রহ–উপগ্রহ সৃষ্টির পূর্বে দিবা–রাত্রির পরিচয় কি ছিল?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, সূর্যের পরিক্রমণের ফলে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বে যখন চন্দ্র–সূর্যই ছিল না, তখন ছয় দিনের সংখ্যা কি হিসাবে নিরূপিত হল?

কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন ঃ ছয় দিন বলে এতটুকু সময় বোঝানো হয়েছে, যা এ জগতের হিসাবে ছয় দিন হয়। কিন্তু পরিষ্কার ও নির্মল উত্তর এই যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে দিন এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে রাত এটা এ জগতের পরিভাষা। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দিবা–রাত্রির পরিচয়ের অন্য কোন লক্ষণ নির্দিষ্ট থাকতে পারে; যেমন জান্নাতের দিবা–রাত্রি সূর্যের পরিক্রমণের অনুগামী হবে না।

সহীহ্ রেওয়ায়েত অনুযায়ী যে ছয় দিনে জগত সৃষ্টি হয়েছে তা রবিবার থেকে শুরু করে শুক্রবারে শেষ হয়। শনিবারে জগত সৃষ্টির কাজ হয়নি। কোন কোন আলেম বলেন سبت –এর অর্থ কর্তন করা। এদিনে কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে এদিনকে يوم السبت (শনিবার) বলা হয়। – (ইবনে কাসীর)

আলোচ্য আয়াতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি ছয় দিনে সমাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সূরা হা–মীম সেজদার নবম ও দশম আয়াতে এর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, দু'দিনে ভূমণ্ডল, দু'দিনে ভূমণ্ডলের

পাহাড়, সমুদ্র, খনি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ এবং মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের পানাহারের বস্তু – সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট চার দিন হল। বলা হয়েছে ঃ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ

আবার বলা হয়েছে ঃ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ

যে দু'দিনে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ছিল রবিবার ও সোমবার। দ্বিতীয় দু'দিন ছিল মঙ্গল ও বুধ, যাতে ভূমণ্ডলের সাজ-সরঞ্জাম পাহাড়, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এরপর বলা হয়েছে ঃ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ অর্থাৎ, অতঃপর সাত আকাশ সৃষ্টি করেন দুদিনে। বাহ্যত ঃ এ দুদিন হবে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। এভাবে শুক্রবার পর্যন্ত ছয় দিন হল।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনের কথা বর্ণনার পর বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ, অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। اسْتَوَىٰ – এর শাব্দিক অর্থ অধিষ্ঠিত হওয়া। 'আরশ' রাজসিংহাসনকে বলা হয়। এখন আল্লাহ্‌র 'আরশ' কিরূপ এবং কি— এর উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থই বা কি? এ সম্পর্কে নির্মল, পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ মাযহাব সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকে এবং পরবর্তীকালে সূফী বুযুর্গদের কাছ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, মানব জ্ঞান আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ পূর্ণরূপে বুঝতে অক্ষম। এর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া অর্থহীন; বরং ক্ষতিকরও বটে। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত যে, এসব বাক্যের যে অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দিষ্ট, তাই শুদ্ধ ও সত্য। এরপর নিজে কোন অর্থ উদ্ভাবন করার চিন্তা করাও অনুচিত।

হযরত ইমাম মালেক (রহঃ)-কে কেউ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ – এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন ঃ استواء শব্দের অর্থ তো জানাই আছে; কিন্তু এর স্বরূপ ও অবস্থা মানব বুদ্ধি সম্যক বুঝতে অক্ষম। এতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজেব। এর অবস্থা ও স্বরূপ জিজ্ঞেস করা বেদআত। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এ ধরনের প্রশ্ন করেননি। সুফিয়ান সওরী, ইমাম আওযায়ী, লায়স ইবনে সা'দ, সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা, আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (রহঃ) প্রমুখ বলেছেন ঃ যেসব আয়াত আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর প্রতি যেভাবে আছে সেভাবে রেখেই কোনরূপ ব্যাখ্যা ও সদর্থ ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। – (মাযহারী)

এরপর বলা হয়েছে ঃ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রি দ্বারা দিনকে সমাচ্ছন্ন করেন এভাবে যে, রাত্রি দ্রুত দিনকে ধরে ফেলে। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র বিশ্বকে আলো থেকে অন্ধকারে অথবা অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। দিবা-রাত্রির এ বিরাট পরিবর্তন আল্লাহ্‌র কুদরতে অতি দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়ে যায়— মোটেই দেরী হয় না।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে, সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের অনুগামী।

এতে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের জন্যে চিন্তার খোরাক রয়েছে। বড় বড় বিশেষজ্ঞদের তৈরী মেশিনসমূহে প্রথমতঃ কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটি থাকে। যদি দোষ-ত্রুটি নাও থাকে, তবুও যত কঠিন ইস্পাতের মেশিন ও কল-কব্জাই হোক না কেন, চলতে চলতে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এক সময় ঢিলে হয়ে পড়ে। ফলে মেরামত গ্রেসিং দরকার হয়। এজন্যে কয়েকদিন বরং অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ ও কয়েক মাস তা অকেজো পড়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নির্মিত মেশিনের প্রতি লক্ষ্য করুন, প্রথম দিন যেভাবে এগুলো চালু করা হয়েছিল, আজো তেমনি চালু রয়েছে। এগুলোর গতিতে কখনও এক মিনিট কিংবা এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। কখনও এগুলোর কোন কলকব্জা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং কখনও ওয়ার্কশপে পাঠাতে হয় না। কারণ, এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশে চলছে। অর্থাৎ, এগুলো চালানোর জন্য না বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হয়, না কোন ইঞ্জিনের সাহায্য নিতে হয়, বরং শুধু আল্লাহ্‌র আদেশের শক্তিবলেই চলছে। এ চলার গতিতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য আসাও অসম্ভব। তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ নিজেই যখন নির্দিষ্ট সময়ে এগুলোকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করবেন, তখন গোটা ব্যবস্থাই তছনছ হয়ে যাবে। আর এরই নাম হল কেয়ামত।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতা একটি সামগ্রিক বিধির আকারে বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ – خلق শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা এবং امر শব্দের অর্থ আদেশ করা। বাক্যের অর্থ এই যে, সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া আল্লাহ্‌র জন্যেই নির্দিষ্ট। অন্য কেউ না সামান্যতম বস্তু সৃষ্টি করতে পারে, আর না কাউকে আদেশ করার অধিকার রাখে। তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কাউকে কোন বিশেষ বিভাগ বা কার্যভার সমর্পণ করা হলে তাও বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলারই আদেশ। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব বস্তু সৃষ্টি করাও তাঁরই কাজ এবং সৃষ্টির পর এগুলোকে কর্মে নিয়োগ করাও অন্য কারও সাধ্যের বিষয় নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলারই অসীম শক্তির কারসাজি।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, একমাত্র বিশ্বপালকই যখন অসীম শক্তির অধিকারী এবং যাবতীয় অনুকম্পা ও নেয়ামত প্রদানকারী, তখন বিপদাপদ ও অভাব-অনটনে তাঁকেই ডাকা এবং তাঁর কাছেই দোয়া-প্রার্থনা করা উচিত। তাঁকে ছেড়ে অন্যদিকে মনোনিবেশ করা মূর্খতা এবং বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর।

এতদসহ আলোচ্য আয়াতসমূহে দোয়ার কতিপয় আদবও ব্যক্ত করা হয়েছে। এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখলে দোয়া কবুল হওয়ার আশা বেড়ে যায়।

আরবী ভাষায় دُعَاءٌ (দোয়া) শব্দটির অর্থ দ্বিবিধ – (এক) বিপদাপদ দূরীকরণ ও অভাব পূরণের জন্যে কাউকে ডাকা এবং (দুই) যে কোন অবস্থায় কাউকে স্মরণ করা। এ আয়াতে উভয় অর্থই হতে পারে। বলা হয়েছেঃ اُدْعُوا رَبَّكُمْ অর্থাৎ, অভাব পূরণের জন্যে স্বীয় পালনকর্তাকে ডাক অথবা স্মরণ কর এবং পালনকর্তার এবাদত কর।

প্রথমাবস্থায় অর্থ হবে, স্বীয় অভাব-অনটনের সমাধান একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই প্রার্থনা কর। আর দ্বিতীয়াবস্থায় অর্থ হবে, স্মরণ ও এবাদত একমাত্র তাঁরই কর। উভয় তফসীরই পূর্ববর্তী মনীষী ও তফসীরবিদগণের কাছ থেকে বর্ণিত রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً - تضرع শব্দের অর্থ অক্ষমতা, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা এবং خفية শব্দের অর্থ গোপন।

এ শব্দদ্বয়ে দোয়া ও স্মরণের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আদব বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ অপারকতা ও অক্ষমতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে দোয়া করা, তা কবুল হওয়ার জন্য জরুরী শর্ত। দোয়ার ভাষাও অক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বলার ভঙ্গি এবং দোয়ার আকার-আকৃতিও বিনয় এবং নম্রতাসূচক হওয়া চাই। এতে বোঝা যায় যে, আজকাল জনসাধারণ যে ভঙ্গিতে দোয়া প্রার্থনা করে প্রথমতঃ একে দোয়া-প্রার্থনা বলাই যায় না; বরং দোয়া পড়া বলা উচিত। কেননা, প্রায়ই জানা থাকে না যে, মুখে যেসব শব্দ উচ্চারণ করা হচ্ছে, তার অর্থ কি? আজকাল সাধারণ মসজিদসমূহে এটি ইমামদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাদের কতিপয় আরবী বাক্য মুখস্থ থাকে এবং নামায শেষে সেগুলোই আবৃত্তি করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ং ইমামদেরও এসব শব্দের অর্থ জানা থাকে না। তাদের জানা থাকলেও মুক্তাদীরা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। তারা অর্থ না বুঝেই ইমামের আবৃত্তি করা বাক্যবলীর সাথে সাথে 'আমীন' 'আমীন' বলতে থাকে। এই আগাগোড়া প্রহসনের সারমর্ম কতিপয় বাক্যের আবৃত্তি ছাড়া কিছুই নয়। দোয়া প্রার্থনার যে স্বরূপ, তা এ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এটা ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কৃপায় এসব নিষ্প্রাণ বাক্যগুলোও কবুল করে নিতে পারেন। কিন্তু একথা বোঝা দরকার যে, দোয়া প্রার্থনা পাঠ করার বিষয় নয়। কাজেই চাওয়ার যথার্থ রীতি অনুযায়ীই চাইতে হবে।

এছাড়া যদি কারও নিজ বাক্যাবলীর অর্থও জানা থাকে এবং তা বুঝেসুঝে বলে, তবে বলার ভঙ্গি এবং বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে বিনয় ও নম্রতা ফুটে না উঠলে এ দোয়াও দাবীতে পরিণত হয়, যা করার অধিকার কোন বান্দারই নেই।

মোটকথা, প্রথম শব্দে দোয়ার প্রাণ ব্যক্ত হয়েছে যে, স্বীয় অক্ষমতা, দীনতা, হীনতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহ্র কাছে অভাব-অনটন ব্যক্ত করা। দ্বিতীয় শব্দে আরও একটি নির্দেশ রয়েছে যে, চুপিচুপি ও সংগোপনে দোয়া করা উত্তম এবং কবুলের নিকটবর্তী। কারণ, উচ্চৈঃস্বরে দোয়া চাওয়ার মধ্যে প্রথমতঃ বিনয় ও নম্রতা বিদ্যমান থাকা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ এতে রিয়া এবং সুখ্যাতিরও আশঙ্কা রয়েছে। তৃতীয়তঃ এতে প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা শ্রোতা ও মহাজ্ঞানী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই তিনি জানেন এবং সরব ও নীরব সব কথাই তিনি শোনেন। এ কারণেই খয়বর যুদ্ধের সময় দোয়া করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা কোন বধিরকে অথবা অনুপস্থিতকে ডাকাডাকি করছ না যে, এত জোরে বলতে হবে; বরং একজন শ্রোতা ও নিকটবর্তীকে সম্বোধন করছ— অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলাকে, তাই সজোরে বলা অর্থহীন। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা জনৈক সৎকর্মীর দোয়া উল্লেখ করে বলেন ঃ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا

অর্থাৎ, যখন সে তার পালনকর্তাকে অনুচ্চস্বরে ডাকল। এতে বোঝা যায় যে, অনুচ্চস্বরে দোয়া করা আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয়।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ প্রকাশ্যে ও সজোরে দোয়া করা এবং নীরবে ও অনুচ্চস্বরে দোয়া করা এতদুভয়ের ফযীলত ৭০ ডিগ্রী তফাৎ রয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ অধিকাংশ সময় আল্লাহ্র স্মরণে ও দোয়ায় মশগুল থাকতেন, কিন্তু কেউ তাদের আওয়ায শুনতে পেত না। বরং তাদের দোয়া তাদের ও আল্লাহ্র মধ্যে সীমিত থাকত। তাদের অনেকেই সমগ্র কোরআন মুখস্থ তেলাওয়াত করতেন, কিন্তু অন্য কেউ টেরও পেত না। অনেকেই প্রভূত ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতেন; কিন্তু মানুষের কাছে তা প্রকাশ করে বেড়াতেন না। অনেকেই রাতের বেলায় স্বগৃহে দীর্ঘ সময় নামায পড়তেন; কিন্তু আগন্তুকরা তা বুঝতেই পারত না। হযরত হাসান বসরী আরও বলেন ঃ আমি এমন অনেককে দেখেছি, যারা গোপনে সম্পাদন করার মত কোন এবাদত কখনও প্রকাশ্যে করেননি। দোয়ায় তাঁদের আওয়ায অত্যন্ত অনুচ্চ হত।- (ইবনে কাসীর, মাযহারী)

ইবনে জুরাইজ বলেন ঃ দোয়ায় আওয়াযকে উচ্চ করা এবং শোরগোল করা মকরূহ। আবু বকর জাস্সাস হানাফী আহ্কামুল কোরআন গ্রন্থে বলেন ঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, নীরবে দোয়া করা জোরে দোয়া করার চাইতে উত্তম। হাসান বসরী ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও একথাই বর্ণিত রয়েছে। এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, নামাযে সূরা ফাতেহার শেষে 'আমীনও' আস্তে বলা উত্তম। কারণ, এটিও একটি দোয়া।

অভাব-অনটনের ব্যাপারে দোয়া করা সম্পর্কে এ পর্যন্ত বর্ণনা করা হল। আয়াতে যদি দোয়ার অর্থ যিকর ও এবাদত নেয়া হয়, তবে এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী মনীষীদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, নীরবে যিকর সরব যিকর অপেক্ষা উত্তম। সুফীগণের মধ্যে চিশতিয়া তরীকার বুযুর্গগণ মুরীদকে প্রথম পর্যায়ে সরব যিকর শিক্ষা দেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থার প্রতিকার হিসেবে এরূপ করেন, যাতে শব্দের মাধ্যমে অলসতা দূর হয়ে যায় এবং যিকরের সাথে আত্মার সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। নতুবা সরব যিকর জায়েয হলেও তা তাঁদের কাম্য নয়। অবশ্য এর বৈধতাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, এ বৈধতার জন্যে রিয়া ও সুখ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্য না হওয়া শর্ত।

ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত সা'দ ইবনে আবী-ওক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ خير الذكر الخفى وخير الرزق ما يكفى অর্থাৎ, নীরব যিকর উত্তম এবং ঐ রিযিক উত্তম, যা যথেষ্ট হয়ে যায়।

তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এ সময়ে সরব যিকরই কাম্য ও উত্তম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বীয় উক্তি ও কর্ম দ্বারা এসব অবস্থা ও সময় বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। উদাহরণতঃ আযান ও একামত উচ্চৈঃস্বরে বলা, সরব নামাযসমূহে উচ্চৈঃস্বরে কোরআন তেলাওয়াত করা, নামাজের তকবীর, তশরীকের তকবীর এবং হজ্বে লাব্বাইকা উচ্চৈঃস্বরে বলা ইত্যাদি। এ কারণেই এ সম্পর্কে ফেকাহ্বিদগণের সিদ্ধান্ত এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেসব বিশেষ অবস্থা ও স্থানে কথা ও কর্মের মাধ্যমে সরব যিকর করার শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে সজোরেই করা উচিত। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও স্থানে নীরব যিকরই উত্তম ও অধিক উপকারী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - معتدين শব্দটি اعتداء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমাঅতিক্রম করা। উদ্দেশ্য এই যে,আল্লাহ্ তাআলা সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। তা দোয়ায় সীমা অতিক্রম করাই হোক কিংবা অন্য কোন কাজে—কোনটিই আল্লাহ্র পছন্দনীয় নয়। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সীমা ও শর্তাবলী পালন ও আনুগত্যের নামই ইসলাম। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ও অন্যান্য লেনদেনে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করলে সেগুলো এবাদতের

পরিবর্তে গোনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

দোয়ায় সীমা অতিক্রম করা কয়েক প্রকারে হতে পারে। (এক) দোয়ায় শাব্দিক লৌকিকতা, ছন্দ ইত্যাদি অবলম্বন করা। এতে বিনয় ও নম্রতা ব্যাহত হয়। (দুই) দোয়ায় অনাবশ্যক শর্ত সংযুক্ত করা। যেমন, বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) স্বীয় পুত্রকে এভাবে দোয়া করতে দেখলেন ঃ হে আল্লাহ্, আমি আপনার কাছে জান্নাতে শুভ্র রঙের ডান দিকস্থ প্রাসাদ প্রার্থনা করি। তিনি পুত্রকে বারণ করে বললেন ঃ দোয়ায় এ ধরনের শর্তযুক্ত করা সীমা অতিক্রম। কোরআন ও হাদীসে তা নিষিদ্ধ।— (মাযহারী)

(তিন) সাধারণ মুসলমানদের জন্যে বদ দোয়া করা কিংবা এমন কোন বিষয় কামনা করা যা সাধারণ লোকের জন্যে ক্ষতিকর এবং এমনিভাবে এখানে উল্লেখিত দোয়ায় বিনা প্রয়োজনে আওয়ায উচ্চ করাও এক প্রকার সীমা অতিক্রম।— (তফসীরে মাযহারী, আহকামুল কোরআন)

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا এখানে فساد ও صلاح দুটি পরস্পর বিরোধী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। صلاح শব্দের অর্থ সংস্কার এবং فساد শব্দের অর্থ অনর্থ ও গোলযোগ। ইমাম রাগেব 'মুফরাদাতুল কোরআন' গ্রন্থে বলেন ঃ সমতা থেকে বের হয়ে যাওয়াকেই فساد বলা হয়; তা সামান্য হোক কিংবা বেশী। কম বের হলে কম ফাসাদ এবং বেশী বের হলে বেশী ফাসাদ হবে। افساد শব্দের অর্থ অনর্থ সৃষ্টি করা এবং اصلاح শব্দের অর্থ সংস্কার করা। কাজেই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না, আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক সংস্কার করার পর।

ইমাম রাগেব বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সংস্কার কয়েক প্রকার হতে পারে। (এক) প্রথমেই জিনিসটি সঠিকভাবে সৃষ্টি করা। যেমন, বলা হয়েছে ঃ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (দুই) অনর্থ আসার পর তা দূর করা। যেমন, يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (তিন) সংস্কারের নির্দেশ দান করা। আয়াতে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন, তখন তোমরা তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এখানে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করার দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) বাহ্যিক সংস্কার; অর্থাৎ, পৃথিবীকে চাষাবাদ ও বৃক্ষ রোপণের উপযোগী করেছেন, তাতে মেঘের সাহায্যে পানি বর্ষণ করে মাটি থেকে ফল-ফুল উৎপন্ন করেছেন এবং মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর জন্যে মাটির থেকে জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন।

(দুই) পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ ও অর্থগত সংস্কার করেছেন। পয়গম্বর, গ্রন্থ, ও হেদায়েত প্রেরণ করে পৃথিবীকে কুফর, শেরক ও পাপাচার থেকে পবিত্র করেছেন। আয়াতে উভয় অর্থ, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কারও উদ্দিষ্ট হতে পারে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন। এখন তোমরা এতে গোনাহ্ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি করো না।

ভূপৃষ্ঠের সংস্কার ও অনর্থের মর্ম ঃ সংস্কার যেমন দু'রকম ঃ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, তেমনি অনর্থও দু'রকম। ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা একে এমন এক পদার্থরূপে সৃষ্টি করেছেন, যা পানির মত নরমও নয় যে, তাতে কোন কিছু স্থিতাবস্থা লাভ করতে পারে না এবং পাথরের মত শক্তও নয় যে, খনন করা যাবে না। বরং এক মধ্যবর্তী অবস্থায় রেখেছেন যাতে মানুষ একে চাষাবাদের মাধ্যমে নরম করে নিয়ে বৃক্ষ ও ফল-ফুল উৎপন্ন করতে পারে এবং খনন করে কূপ, পরিখা ও নদীনালা তৈরী করতে পারে ও গৃহের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। এরপর মাটির ভেতরে ও বাইরে আবাদ করার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, যাতে তরিতরকারী, উদ্ভিদ ও ফলমূল উৎপন্ন হয়। বাইরে বাতাস, আলো, ঠাণ্ডা ও উত্তাপ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মেঘমালার মাধ্যমে তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, যার ফলে বৃক্ষ উৎপন্ন হতে পারে। বিভিন্ন নক্ষত্র ও গ্রহপুঞ্জের শীতল ও উত্তপ্ত কিরণ নিক্ষেপ করে ফুল ও ফলে রঙ ও রস ভরে দেয়া হয়েছে। মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করা হয়েছে, যদ্দ্বারা সে মৃত্তিকাজাত কাঁচামাল কাঠ, লোহা, তামা, পিতল, এলোমোনিয়াম ইত্যাদিকে জোড়া দিয়ে শিল্পদ্রব্যের এক নতুন জগত সৃষ্টি করেছে। এগুলো ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এবং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে তা সাধন করেছেন।

আভ্যন্তরীণ ও আত্মিক সংস্কার হল আল্লাহ্র স্মরণ, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। এর জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে প্রতিটি মানুষের অন্তরে আনুগত্য ও স্মরণের একটি প্রেরণা নিহিত রেখেছেন ঃ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (আল্লাহ্ মানুষকে পাপাচার ও খোদাভীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত করেছেন।) মানুষের চার পাশের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অসীম শক্তি ও বিস্ময়কর কারিগরির এমন বহিঃপ্রকাশ রেখেছেন, যেগুলো দেখে সামান্য বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও বলে উঠে ঃ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (সমুচ্চ হোন সুন্দরতম স্রষ্টা।) এছাড়া রসূল প্রেরণ করেছেন এবং ধর্মগ্রন্থ নাযিল করেছেন। এভাবে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপনের পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এভাবে যেন ভূপৃষ্ঠের পরিপূর্ণ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কার হয়ে গেছে। এখন নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ঃ আমি এ ভূপৃষ্ঠকে ঠিকঠাক করে দিয়েছি। তোমরা একে নষ্ট করো না।

সংস্কারের যেমন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দু'টি রূপ বর্ণিত হয়েছে, তেমনি এর বিপরীতে ফাসাদ ও অনর্থ সৃষ্টিরও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দু'টি প্রকার রয়েছে। আলোচ্য আয়াত দ্বারা ফাসাদের উভয় প্রকারই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আসল ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন এবং আভ্যন্তরীণ অনর্থ সৃষ্টিকে প্রতিরোধ করা। কিন্তু এ জগতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও ফাসাদের মধ্যে এমন নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যে, একটির ফাসাদ অন্যটির ফাসাদের কারণ হয়ে যায়। তাই শরীয়ত আভ্যন্তরীণ ফাসাদের দ্বার যেমন রুদ্ধ করেছে, তেমনি বাহ্যিক ফাসাদকেও প্রতিরোধ করেছে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা এবং যাবতীয় অশ্লীল কার্যকলাপও জগতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ফাসাদ সৃষ্টি করে। তাই এসব বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর শাস্তি আরোপ করা হয়েছে এবং সাধারণ অপরাধকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, প্রত্যেকটি অপরাধ ও পাপ কাজই কোথাও বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং কোথাও আভ্যন্তরীণ অনর্থের কারণ হয়। চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রতিটি বাহ্যিক ফাসাদ আভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয় এবং প্রতিটি আভ্যন্তরীণ ফাসাদ বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে।

বাহ্যিক ফাসাদ যে আভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয় তা বলাই বাহুল্য। কারণ, বাহ্যিক ফাসাদ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ।

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নাফরমানীরই অপর নাম আভ্যন্তরীণ ফাসাদ। তবে আভ্যন্তরীণ ফাসাদ যে বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে, তা বোঝা কিছুটা চিন্তাসাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ এ বিশ্বচরাচর ও এর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট এবং তাঁর আজ্ঞাধীন। মানুষ যতদিন আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাধীন থাকে, ততদিন এসব বস্তুও মানুষের খাদেম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা করতে শুরু করে, তখন জগতের প্রত্যেকটি বস্তু অজান্তে ও পরোক্ষভাবে মানুষের অবাধ্য হয়ে উঠে, যা মানুষ বাহ্যতঃ চর্মচক্ষে দেখে না; কিন্তু এসব বস্তুর প্রভাব, বৈশিষ্ট্য, পরিণাম ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এর জাজ্জ্বল্যমাণ প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাহ্যতঃ জগতের সব বস্তুই মানুষের ব্যবহারে এসে থাকে। পানি কন্ঠনালীতে পৌঁছে পিপাসা নিবৃত্ত করতে অস্বীকার করে না। খাদ্য ক্ষুধা দূর করতে বিরত হয় না। পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ শীত-গ্রীষ্মে সুখ সরবরাহ করতে অস্বীকৃত হয় না।

কিন্তু পরিণাম চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এসবের কোন একটি বস্তুও স্বীয় কর্তব্য পুরোপুরি পালন করছে না। কেননা, এসব বস্তু ও এসবের ব্যবহারের আসল উদ্দেশ্য আরাম ও সুখ লাভ করা, অস্থিরতা ও কষ্ট দূর হওয়া এবং অসুখে-বিসুখে রোগমুক্তি অর্জিত হওয়া। অথচ তা হচ্ছে না।

এখন জগতের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে, আজকাল আরাম-আয়েশ ও রোগমুক্তি, সাজ-সরঞ্জামের ধারণাতীত প্রাচুর্য সত্ত্বেও মানবগোষ্ঠী অস্থিরতা ও রোগ-ব্যাধির শিকার হচ্ছে। নতুন নতুন রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ ভিড় জমাচ্ছে। কোন ধনকুবেরই স্বস্থানে নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত নয়। বরং এসব সাজ-সরঞ্জাম যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে হারেই বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি এবং অস্থিরতাও বেড়ে চলছে।

আজ বিদ্যুৎ, বাষ্প ও অন্যান্য বস্তুনিষ্ঠ চাকচিক্যে বিমোহিত মানুষ যদি এসব বস্তুর উর্ধ্বে উঠে চিন্তা করে, তবে বোঝা যাবে যে, আমাদের সব প্রচেষ্টা, সব শিল্প ও আবিষ্কারই আমাদের আসল লক্ষ্য অর্থাৎ, সুখ-শান্তি দানে ব্যর্থ হয়েছে। এই আভ্যন্তরীণ কারণ ছাড়া এর অন্য কোন কারণ নেই যে, আমরা স্বীয় প্রতিপালক ও প্রভুর অবাধ্যতার পথ বেছে নিয়েছি। ফলে তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহও অর্থগতভাবে আমাদের অবাধ্যতা শুরু করেছে।

অর্থাৎ, জগতের এসব বস্তুকে বাহ্যতঃ প্রাণহীন ও চেতনাহীন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রভুর আজ্ঞাধীন হয়ে কাজ করার উপলব্ধি তাদেরও রয়েছে।

সারকথা, চিন্তা করলে বোঝা যায়, প্রতিটি গোনাহ্ ও আল্লাহ্‌র প্রত্যেকটি অবাধ্যতা দুনিয়াতে শুধু আভ্যন্তরীণ অনর্থই সৃষ্টি করে না, বরং বাহ্যিক অনর্থও এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়ে থাকে।

এটা কোন কবির কল্পনা নয়, বরং এমন একটি বাস্তব সত্য, কোরআন ও হাদীস যার সাক্ষ্য। শাস্তির হালকা নমুনা এ জগতে রোগ-ব্যাধি, মহামারী, ঝড় ও বন্যার আকারে দেখা দেয়।

তাই وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا বাক্যের অর্থে যেমন জগতে বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টিকারী গোনাহ্ ও অপরাধসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় অবাধ্যতাই এর অন্তর্ভুক্ত। তাই আলোচ্য আয়াতে অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌কে ভয় ও আশা সহকারে ডাক। অর্থাৎ, একদিকে দোয়া অগ্রাহ্য হওয়ার ভয় থাকবে এবং অপরদিকে তাঁর করুণা লাভের পূর্ণ আশাও থাকবে। এ আশা ও ভয়ই দৃঢ়তার পথে মানবাত্মার দু'টি বাহু। এ বাহুদ্বয়ের সাহায্যে সে উর্ধ্বলোকে আরোহণ করে এবং সুউচ্চ পদ মর্যাদা অর্জন করে।

এ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ প্রতীয়মান হয় যে, আশা ও ভয় সমান সমান হওয়া উচিত। কোন কোন আলেম বলেন, জীবিতাবস্থায় ও সুস্থতার সময় ভয়কে প্রবল রাখা প্রয়োজন, যাতে আনুগত্যে ত্রুটি না হয়, আর যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন আশাকে প্রবল রাখবে। কেননা, এখন কাজ করার শক্তি বিদায় নিয়েছে। করুণা লাভের আশা করাই এখন তার একমাত্র কাজ।- (বাহ্‌রে-মুহীত)

কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী আলেম বলেন ঃ ধর্মের বিশুদ্ধ পথে অটল থাকা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র আনুগত্য করাই প্রকৃত লক্ষ্য। মানুষের মেজাজ ও স্বভাব বিভিন্নরূপ। কেউ ভয়ের প্রবলতার দ্বারা এ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, আবার কেউ মহব্বত ও আশার প্রবলতার দ্বারা। যার জন্যে যে অবস্থা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়, সে তাই হাসিল করতে চেষ্টিত হবে।

মোটকথা, পরবর্তী আয়াতে দোয়ার দু'টি আদব বর্ণিত হয়েছে। (এক) *বিনয় ও নম্রতা সহকারে দোয়া করা এবং (দুই) আস্তে ও সংগোপনে দোয়া* করা। এ দু'টি গুণই মানুষের বাহ্যিক দেহের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, বিনয়ের অর্থ হল দোয়ার সময় দৈহিক আকার-আকৃতিকে অপারক ও ফকীরের মত করে নেয়া, অহংকারী ও বেপরওয়ার মত না হওয়া। দোয়া সংগোপনে করার সম্পর্কও মুখ ও জিহবার সাথে যুক্ত।

এ আয়াতে দোয়ার আরও দু'টি আভ্যন্তরীণ আদব বর্ণিত হয়েছে। এ গুলোর সম্পর্ক মানুষের মনের সাথে। আর তা হল এই যে, দোয়াকারীর মনে এ আশঙ্কা থাকা উচিত যে, সম্ভবতঃ দোয়াটি গ্রাহ্য হবে না এবং এ আশাও থাকা উচিত যে, দোয়া কবুল হতে পারে। কেননা, পাপ ও গোনাহ্ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়াও ঈমানের পরিপন্থী। অপরদিকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়াও কুফর। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকলেই দোয়া কবুল হবে বলে আশা করা যায়।

অতঃপর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার করুণা সৎকর্মীদের নিকটবর্তী। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও দোয়ার সময় ভয় ও আশা উভয় অবস্থাই থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আশার দিকটিই থাকবে প্রবল। কেননা, বিশ্ব প্রতিপালক পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহে কোন ত্রুটি ও কৃপণতা নেই। তিনি মন্দের চেয়ে মন্দ লোক, এমনকি শয়তানের দোয়াও কবুল করতে পারেন। কবুল না হওয়ার আশঙ্কা একমাত্র স্বীয় কুকর্ম ও গোনাহ্‌র অকল্যাণেই থাকতে পারে। কারণ, আল্লাহ্‌র রহমতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্যে সৎকর্মী হওয়া প্রয়োজন।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে, স্বীয় বেশভূষা ফকীরের মত করে এবং আল্লাহ্‌র সামনে দোয়ার হস্ত প্রসারিত করে; কিন্তু তাদের খাদ্য, পানীয় ও পোশাক সবই হারাম- এরূপ লোকের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে? - (মুসলিম, তিরমিযী)

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ বান্দা যতক্ষণ কোন গোনাহ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না করে এবং তড়িঘড়ি না করে, ততক্ষণ তার দোয়া কবুল হতে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبُثَ
لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾
لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾
قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ
يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾
أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾
أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ
لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ
وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ
يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾
قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي
سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَا قَوْمِ
لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾

(৫৮) যে শহর উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্যে। (৫৯) নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। (৬০) তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল ঃ আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। (৬১) সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি কখনও ভ্রান্ত নই; কিন্তু আমি বিশ্বপ্রতিপালকের রসূল। (৬২) তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমনসব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না। (৬৩) তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে— যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যেন তোমরা সংযত হও এবং যেন তোমরা অনুগৃহীত হও। (৬৪) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। আমি তাকে এবং নৌকাস্থিত লোকদেরকে উদ্ধার করলাম এবং যারা মিথ্যারোপ করত, তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ। (৬৫) আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। (৬৬) তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল ঃ আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (৬৭) সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি মোটেই নির্বোধ নই, বরং আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত পয়গম্বর।

তড়িঘড়ি দোয়া করার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ এর অর্থ হল এরূপ ধারণা করে বসা যে, আমি এত দীর্ঘ দিন থেকে দোয়া করছি, অথচ এখনো পর্যন্ত কবুল হল না। অতঃপর নিরাশ হয়ে দোয়া ত্যাগ করা। – (মুসলিম, তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যখনই আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবে, তখনই কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে দোয়া করবে।

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র রহমতের বিস্তৃতিকে সামনে রেখে দোয়া করলে অবশ্যই দোয়া কবুল হবে বলে মনকে মজবুত কর। এমন মনে কর, গোনাহ্‌র কারণে দোয়া কবুল না হওয়ার আশঙ্কা অনুভব করা এর পরিপন্থী নয়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ ও বড় নেয়ামতসমূহ উল্লেখ করেছিলেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, দিবারাত্র, চন্দ্র-সূর্য সাধারণ নক্ষত্রমণ্ডলীর সৃষ্টি ও মানুষের প্রয়োজনাদি সরবরাহে এবং সেবায় এগুলোর নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে হুশিয়ার করেছিলেন যে, যখন এক পবিত্র সত্তাই যাবতীয় প্রয়োজন ও সুখ-শান্তির উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তখন যে কোন অভাব-অনটন ও প্রয়োজনে তাঁর কাছেই দোয়া প্রার্থনা করা উচিত এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকেই সাফল্যের চাবিকাঠি বলে মনে করা কর্তব্য।

আলোচ্য প্রথম আয়াতেও এমনি ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় নেয়ামত উল্লেখিত হয়েছে। এসব নেয়ামতের উপরই মানুষ ও পৃথিবীর সব সৃষ্টজীবের জীবন ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। উদাহরণতঃ বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা উৎপন্ন বৃক্ষ, ফসলাদি তরিতরকারী ইত্যাদি। পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ঊর্ধ্বজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত নেয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছিল এবং আলোচ্য আয়াতে নিম্নজগতের সাথে সম্পর্কশীল নেয়ামতসমূহ বর্ণিত হচ্ছে।– (বাহ্‌রে-মুহীত)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

৫৮ নং আয়াতে বিশেষভাবে একথা বলা হয়েছে যে, আমার এসব বিরাট নেয়ামত যদিও ভূখণ্ডের সর্বত্র ব্যাপক; বৃষ্টি বর্ষিত হলে যদিও পাহাড়, সমুদ্র, উর্বর, অনুর্বর এবং উত্তম ও অনুত্তম সব রকম ভূখণ্ডেই সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফসল, বৃক্ষ ও তরিতরকারী একমাত্র এমন ভূখণ্ডেই উৎপন্ন হয়, যাতে উর্বরতা রয়েছে— কঙ্কর ও বালুকাময় ভূখণ্ড এ বৃষ্টির দ্বারা উপকৃত হয় না।

প্রথম আয়াতের ফলাফল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা মৃত ভূখণ্ডে ফসল উৎপাদনের মত জীবনীশক্তি দান করেন, তাঁর পক্ষে যে মানুষ পূর্বে জীবিত ছিল অতঃপর মারা যায়, তার মধ্যে পুনরায় জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করে দেয়া মোটেই কঠিন নয়। এ ফলাফলটি আয়াতে স্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত থেকে এরূপ ফলাফল বের করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র হেদায়েত, ঐশী গ্রন্থসমূহ, আম্বিয়া (আঃ), তাঁদের প্রতিনিধি আলেম ও মাশায়েখের শিক্ষাও বৃষ্টির মত সবার জন্যেই ব্যাপক; কিন্তু বৃষ্টি দ্বারা যেমন সব ভূখণ্ডই উপকৃত হয় না তেমনি এ আধ্যাত্মিক বৃষ্টির উপকারও তারাই লাভ করে, যাদের মধ্যে যোগ্যতা রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তর কঙ্করময় কিংবা বালুকাময় ভূখন্ডের মত উৎপাদনের যোগ্যতা বিবর্জিত, তারা যাবতীয় সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও স্বীয় পথভ্রষ্টতায় অটল থাকে। এ ফলাফলের দিকেই দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে। كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ অর্থাৎ,

আমি এমনিভাবে স্বীয় প্রমাণাদি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করি তাদের জন্যে যারা এর মূল্য দেয়। উদ্দেশ্য এই যে, বাস্তবে যদিও এ বর্ণনা সবার জন্যেই ব্যাপক; কিন্তু পরিণতির দিক দিয়ে তাদের জন্যেই উপকারী প্রমাণিত হয়েছে যারা যোগ্যতাসম্পন্ন এবং যারা এর মূল্য ও মর্যাদা বোঝে। এভাবে উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে ইহকাল ও পরকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এবার উভয় আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা শুনুন। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ – এতে رياح শব্দটি ريح – এর বহুবচন। এর অর্থ বায়ু, بُشْرًا শব্দের অর্থ সুসংবাদ। এবং রহমত বলে বৃষ্টির রহমত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলাই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদ দেয়ার জন্যে বায়ু প্রেরণ করেন।

উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির পূর্বে ঠাণ্ডা বায়ু প্রেরণ করা আল্লাহ্র চিরন্তন রীতি। এ বাতাস দ্বারা স্বয়ং মানুষ আরাম ও প্রফুল্লতা অর্জন করে এবং তা যেন ভাবী বৃষ্টির সংবাদও পূর্বাহ্নে প্রদান করে। অতএব, এ বায়ু দু'টি নেয়ামতের সমষ্টি। (এক) স্বয়ং মানুষ ও সাধারণ সৃষ্টজীবের জন্যে উপকারী এবং (দুই) বৃষ্টির পূর্বে বৃষ্টির আগমনবার্তা বহনকারী। কেননা, মানুষ একটি নরম ও নাজুক সৃষ্টি; তার অনেক প্রয়োজনীয় কাজ বৃষ্টির কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টির সংবাদ পূর্বে পেয়ে সে নিজের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে নেয়। এছাড়া স্বয়ং তার অস্তিত্ব এবং তার আসবাবপত্র ও নিজের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে নেয়।

এরপর বলা হয়েছে ঃ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا – سحاب শব্দের অর্থ মেঘ এবং ثقال শব্দটি ثقيل – এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী। অর্থাৎ, বায়ু যখন ভারী মেঘমালাকে উপরে উঠিয়ে নেয়। ভারী মেঘমালার অর্থ পানিতে ভরপুর মেঘমালা — যা বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে উপরে উঠে যায়। এভাবে হাজারো মণ ভারী পানি বাতাসে ভর করে উপরে পৌছে যায়। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এতে কোন মেশিন কাজ করে না এবং কোন মানুষও শ্রম নিয়োগ করে না। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম হওয়া মাত্র আপনা-আপনি সমুদ্র থেকে বাষ্প (মৌসুমী বায়ু) উত্থিত হতে থাকে এবং উপরে উঠে মেঘমালার আকার ধারণ করে। অতঃপর হাজারো বরং লাখো গ্যালন পানিভর্তি এ জাহাজ বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে আকাশ পানে ধাবিত হয়।

এরপর বলা হয়েছে ঃ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ – سوق – এর অর্থ কোন জন্তুকে হাঁকানো ও চালানো, بلد এর অর্থ শহর, বস্তি ও জনপদ। আর ميت – এর অর্থ মৃত।

অর্থাৎ, বাতাস যখন ভারী মেঘমালাকে তুলে নেয়, তখন আমি মেঘমালাকে কোন মৃত শহরের দিকে পরিচালিত করি। মৃত শহর বলে এমন জনপদকে বোঝানো হয়েছে, যা পানির অভাবে উজাড়প্রায়। এখানে সাধারণ ভূখণ্ডের পরিবর্তে বিশেষভাবে শহর উল্লেখ করা এ জন্যে সমীচীন হয়েছে যে, বৃষ্টি-বাদল প্রেরণ ও মাটিকে সিক্ত করার প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের প্রয়োজন মেটানো। মানুষের বাসস্থান হচ্ছে শহর। নতুবা বন-জঙ্গলের সজীবতা স্বয়ং কোন লক্ষ্য নয়।

এ পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের বিষয়-বস্তুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রমাণিত হল। প্রথমতঃ বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়। এতে বোঝা গেল যে, যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও 'সামা' (আকাশ) শব্দ দ্বারা মেঘমালাকেই বোঝানো হয়েছে। কোন সময় সামুদ্রিক মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তে সরাসরি আকাশ থেকে মেঘমালা সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ কোন বিশেষ দিক কিংবা বিশেষ ভূখণ্ডের দিকে মেঘমালা ধাবিত হওয়া সরাসরি আল্লাহ্র নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি যখন যেখানে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দান করেন। মেঘমালা আল্লাহ্র সে নির্দেশই পালন করে মাত্র।

এ বিষয়টি সর্বত্রই এভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, মাঝে মাঝে কোন শহর অথবা জনপদের উপর মেঘমালা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে এবং সেখানে বৃষ্টির প্রয়োজনও থাকে, কিন্তু মেঘমালা সেখানে এক ফোঁটা পানিও দেয় না; বরং আল্লাহ্র নির্দেশে যে শহর বা জনপদের প্রাপ্য নির্ধারিত থাকে, সেখানে পৌছেই বর্ষিত হয়। নির্দিষ্ট শহর ছাড়া অন্যত্র মেঘের পানি লাভ করার সাধ্য কারো নেই।

প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকগণ মৌসুমী বায়ুর গতিপথ নির্ণয়ের জন্যে কিছু কিছু বিধি ও মূলনীতি আবিষ্কার করে রেখেছেন। এসবের মাধ্যমে তারা বলে দেন যে, অমুক সাগর থেকে যে মৌসুমী বায়ু উত্থিত হয়েছে, তা কোন্ দিকে প্রবাহিত হবে, কোথায় বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং কতটুকু বৃষ্টিপাত হবে। বিভিন্ন দেশে এ ধরনের তথ্য পরিবেশন করার জন্যে আবহাওয়া বিভাগ কায়েম করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, আবহাওয়া বিভাগ প্রদত্ত খবরাদি প্রচুর পরিমাণে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। খোদায়ী নির্দেশ তাদের বিপরীতে বলে তাদের সব নিয়ম-কানুনই অকেজো হয়ে যায় এবং মৌসুমী বায়ু তাদের প্রদত্ত খবরের বিপরীতে অন্য কোন দিকে গতি পরিবর্তন করে চলে যায়। ফলে আবহাওয়া বিভাগের নিষ্ফল তাকিয়ে থাকাই সার হয়।

এছাড়া বায়ুর গতিপ্রবাহ নির্ণয়ের জন্যে বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবিত নীতিমালাও মেঘমালা যে আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাধীন— এ বিষয়ের পরিপন্থী নয়। কেননা, বিশ্ব চরাচরের সব কাজ-কারবারে আল্লাহ্র চিরন্তন রীতি এই যে, আল্লাহ্র নির্দেশ স্বাভাবিক কারণসমূহের আবরণ ভেদ করে প্রকাশ পায়। এসব স্বাভাবিক কারণদৃষ্টেই মানুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ অর্থাৎ, আমি মৃত শহরে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর পানি দ্বারা সব রকম ফল-মূল উৎপন্ন করি।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

অর্থাৎ, এভাবেই আমি মৃতদেরকে কেয়ামতের দিন উত্থিত করব যাতে তোমরা বোঝ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেভাবে মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত করি এবং তা থেকে বৃক্ষ ও ফল-মূল নির্গত করি, তেমনিভাবে কেয়ামতের দিন মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করে তুলব। আমি এসব দৃষ্টান্ত এজন্যে বর্ণনা করি, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাও।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ কেয়ামতে দু'বার শিঙ্গা ফুঁকা হবে। প্রথম ফুৎকারের পর সারা বিশ্ব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, কোনকিছুই জীবিত থাকবে না। দ্বিতীয় ফুৎকারের পর নতুনভাবে সারা বিশ্ব সৃজিত হবে এবং সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, উভয়বার শিঙ্গা ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। এ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টিপাত হতে থাকবে। এ সময়ের মধ্যেই প্রতিটি মৃত মানুষ ও জন্তুর দেহের অংশ একত্রিত করে পূর্ণ কাঠামো তৈরী করা হবে। অতঃপর শিঙ্গা ফুঁকার সাথে সাথে এসব মৃতদেহে আত্মা এসে যাবে এবং জীবিত হয়ে দণ্ডায়মান হবে। এ রেওয়ায়েতের বেশীর ভাগ বোখারী ও মুসলিম থেকে

এবং কিছু অংশ আবু দাউদের কিতাবুল বা'ছ থেকে গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا – نكد শব্দের অর্থ ঐ বস্তু, যা অনর্থক এবং সামান্য। অর্থাৎ, বৃষ্টির কল্যাণধারা যদিও প্রত্যেক শহর ও ভূখণ্ডে সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়ে ভূখণ্ড দু'প্রকার হয়ে থাকে। (এক) উর্বর ও ভাল— যাতে উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। এ ধরনের ভূখণ্ড থেকে সর্বপ্রকার ফল-মূল উৎপন্ন হয়। (দুই) শক্ত ও লবণাক্ত ভূখণ্ড। এতে উৎপাদনের যোগ্যতা নেই। এরূপ ভূখণ্ডে একে তো কিছু উৎপন্নই হয় না, আর কিছু হলেও খুব অল্প পরিমাণে হয়। যা উৎপন্ন হয় তাও অকেজো ও নষ্ট হয়ে থাকে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
অর্থাৎ, আমি স্বীয় শক্তির প্রমাণাদি নানাভাবে বর্ণনা করি তাদের জন্যে, যারা এগুলোর মর্যাদা দেয়।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বৃষ্টির কল্যাণধারার মত খোদায়ী হেদায়েত ও নিদর্শনাবলীর কল্যাণও সব মানুষের জন্যে ব্যাপক; কিন্তু প্রতিটি ভূখন্ডই যেমন বৃষ্টি থেকে উপকার লাভ করে না, তেমনি প্রতিটি মানুষই এ হেদায়েত থেকে ফায়দা হাসিল করে না; বরং একমাত্র তারাই ফায়দা হাসিল করে, যারা কৃতজ্ঞ ও এর মর্যাদাদা করে থাকে।

আলোচ্য আয়াতসমূহ সূরা আরাফের পূর্ণ অষ্টম রুকু। এতে হযরত নূহ (আঃ) এর উম্মতের অবস্থা ও তাদের সংলাপের বিবরণ রয়েছে। নবীদের পরম্পরায় হযরত আদম (আঃ) যদিও সর্বপ্রথম নবী, কিন্তু তাঁর আমলে ঈমানের সাথে কুফর ও গোমরাহীর মোকাবেলা ছিল না। তাঁর শরীয়তের অধিকাংশ বিধানই পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কুফর ও কাফেরদের কোথাও অস্তিত্ব ছিল না। কুফর ও শেরকের সাথে ঈমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হযরত নূহ (আঃ)-এর আমল থেকেই শুরু হয়। রেসালত ও শরীয়তের দিক দিয়ে তিনিই জগতের প্রথম রসূল। এছাড়া তুফানে সমগ্র বিশ্ব নিমজ্জিত হওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচে ছিল, তারা ছিল হযরত নূহ (আঃ) ও তাঁর নৌকাস্থিত সঙ্গী-সাথী। তাদের দ্বারাই পৃথিবী নতুনভাবে আবাদ হয়। একারণেই তাঁকে 'ছোট আদম' বলা হয়। বলাবাহুল্য, একারণেই পয়গম্বরদের কাহিনীর সূচনা তাঁর দ্বারাই করা হয়েছে। এই কাহিনীতে সাড়ে নয় শ' বছরের সুদীর্ঘ আয়ুকালে তাঁর পয়গম্বরসুলভ চেষ্টা-চরিত্র, অধিকাংশ উম্মতের বিরুদ্ধাচরণ এবং এর পরিণতিতে গুটিকতক ঈমানদার ছাড়া অবশিষ্ট সবার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ

নূহ (আঃ) হযরত আদমের অষ্টম পুরুষ। মুস্তাদরাকে হাকেমে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আদম (আঃ) ও নূহ (আঃ)-এর মাঝখানে দশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। এ বিষয়বস্তুই তিবরানী আবু যর (রাঃ)- এর বাচনিক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। – (তফসীরে মাযহারী) একশ' বছরে এক শতাব্দী হয়। তাই এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁদের উভয়ের মাঝে এক হাজার বছরের ব্যবধান হয়ে যায়। ইবনে জরীর বর্ণনা করেন যে, নূহ (আঃ)-এর জন্ম হযরত আদম (আঃ)-এর জন্মের আটশ' ছাব্বিশ বছর পর হয়েছিল। আর কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স হয়েছিল নয়শ' পঞ্চাশ বছর। আদম (আঃ)-এর বয়স সম্পর্কে এক হাদীসে চল্লিশ কম এক হাজার বছর বলা হয়েছে। এভাবে আদম (আঃ)-এর জন্ম থেকে নূহ (আঃ)-এর ওফাত পর্যন্ত মোট দু'হাজার আটশ' ছাপ্পান্ন বছর হয়। – (মাযহারী) নূহ (আঃ)-এর আসল নাম 'শাকের'। কোন কোন রেওয়ায়েতে 'সাকান' এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আব্দুল গাফ্ফার বর্ণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, তাঁর যুগটি হযরত ইদরীস (আঃ)-এর পূর্বে ছিল, না পরে? অধিকাংশ সাহাবীর মতে তিনি পূর্বে ছিলেন।— (বাহ্‌রে-মুহীত)

মুস্তাদরাকে হাকেমে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ নূহ্ (আঃ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন এবং প্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত থাকেন।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নূহ্ (আঃ) শুধু স্বজাতিরই জন্যে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের নবী ছিলেন না। তাঁর সম্প্রদায় ইরাকে বসবাসকারী ছিল এবং বাহ্যতঃ সভ্য হলেও শেরকে লিপ্ত ছিল। তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে একথা বলেন ঃ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। এর প্রথম বাক্যে আল্লাহ্‌র এবাদতের প্রতি দাওয়াত রয়েছে। এটাই সব নীতির মূলনীতি। দ্বিতীয় বাক্যে শেরক ও কুফর থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এটি এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। তৃতীয় বাক্যে ঐ মহাশাস্তির আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যা বিরুদ্ধাচরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এর অর্থ পরকালের মহাশাস্তিও হতে পারে এবং জগতে প্লাবনের শাস্তিও হতে পারে। (কবীর) তাঁর সম্প্রদায় উত্তরে বলল ঃ

قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ – ملأ – শব্দের অর্থ সম্প্রদায়ের সর্দার ও সমাজের মোড়ল। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত নূহ্ (আঃ)-এর দাওয়াতের জওয়াবে সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল ঃ আমরা মনে করি যে, আপনি প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পতিত রয়েছেন। কারণ, আপনি আমাদেরকে বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলছেন। কেয়ামতে পুনরায় জীবিত হওয়া, প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদি কুসংস্কার বৈ নয়।

এহেন পীড়াদায়ক ও মর্মন্তুদ কথাবার্তার জওয়াবে নূহ্ (সাঃ) পয়গম্বরসুলভ ভাষায় যা বললেন, তা প্রচারক ও সংস্কারকদের জন্যে একটি উজ্জ্বল শিক্ষা ও হেদায়েত। উত্তেজনার স্থলে উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হওয়ার পরিবর্তে তিনি সাদাসিধা ভাষায় তাদের সন্দেহ নিরসনে প্রবৃত্ত হলেন। বললেন ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ - أُبَلِّغُكُمْ
رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোন পথভ্রষ্টতা নেই। তবে আমি তোমাদের ন্যায় পৈতৃক ধর্মের অনুসারী নই, বরং বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে পয়গম্বর। আমি যাকিছু বলি, পালনকর্তার নির্দেশেই বলি এবং আল্লাহ্ তাআলার পয়গামই তোমাদের কাছে পৌঁছাই। এতে তোমাদেরই মঙ্গল। এতে না আল্লাহ্‌র কোন লাভ আছে এবং না আমার

কোন স্বার্থ আছে। এখানে رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'বিশ্ব পালনকর্তা' শব্দটি শেরকের মূলে কুঠারাঘাতস্বরূপ।

এ সম্পর্কে চিন্তা করলে কোন দেব-দেবী-ইয়াযদাঁ ও আহরেমানই টিকতে পারে না। এরপর বলেছেনঃ কেয়ামতের শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের যে সন্দেহ -এর কারণ তোমাদের অজ্ঞতা। আমাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান দান করা হয়েছে।

এরপর তাদের দ্বিতীয় সন্দেহের উত্তর দেয়া হয়েছে, যা সূরা মুমিনূনে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছেঃ

مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ

لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً

অর্থাৎ, নূহ্ (আঃ)-এর দাওয়াত শোনে তাঁর কওম এমনও সন্দেহ করল যে, সে তো আমাদেরই মত একজন মানুষ, আমাদেরই মত পানাহার করে এবং নিদ্রিত ও জাগ্রত হয়, তাঁকে আমরা কিরূপে অনুসৃত মেনে নিতে পারি? আল্লাহ্ তাআলা যদি আমাদের কাছে কোন পয়গাম পাঠাতে চাইতেন, তবে ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করতেন। তাদের স্বাতন্ত্র্য ও মাহাত্ম্য আমাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হত। এবং এছাড়া আর কোন কিছু নয় যে, আমাদের গোত্রেরই এক ব্যক্তি আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

এর উত্তরে তিনি বললেনঃ

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ

وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ অর্থাৎ, তোমরা কি এ ব্যাপারে বিস্মিত যে, তোমাদের পালনকর্তার পয়গাম তোমাদেরই মধ্যে থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে তোমরা ভীত হও এবং যাতে তোমরা অনুগৃহীত হও। অর্থাৎ, তাঁর ভয় প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ কর, যার ফলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ নাযিল হয়।

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষকে রসূল করা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তাআলা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা রেসালত দান করবেন। এতে কারও টু শব্দটি করার অধিকার নেই। এছাড়া আসল ব্যাপারে চিন্তা করলেও বোঝা যায় যে, সাধারণ মানুষের প্রতি রেসালতের উদ্দেশ্য মানুষের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। ফেরেশতাদের দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না।

কারণ, রেসালতের আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও এবাদতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁর নির্দেশাবলীর বিরোধিতা থেকে রক্ষা করা। এটা তখনই সম্ভব, যখন মানুষের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি আদর্শ হয়ে তাদেরকে দেখিয়ে দেয় যে, মানবিক কামনা-বাসনার সাথেও আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও এবাদত একত্রিত হতে পারে। ফেরেশতা এ দাওয়াত নিয়ে আসলে এবং নিজের দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে তুলে ধরলে মানুষের প্রকাশ্য আপত্তি থেকে যেত যে, ফেরেশতারা মানবিক প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত—তাদের ক্ষুধা - তৃষ্ণা এবং নিদ্রা ও শ্রান্তি কিছুই নেই- আমরা তাদের মত হব কেমন করে? কিন্তু নিজেদেরই এক ব্যক্তি যখন সব মানবিক প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও খোদায়ী নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে, তখন তাদের কোন অজুহাত থাকতে পারবে না।

এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যেই বলা হয়েছেঃ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا অর্থাৎ, মানুষ ও মানবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির ভয় প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হয়েই মানুষ ভীত হতে পারে- কারো ভয় প্রদর্শনে নয়। অধিকাংশ উম্মতের কাফেররা এ সন্দেহ উত্থাপন করেছে যে, কোন মানুষের নবী ও রসূল হওয়া উচিৎ নয়। কোরআন পাক সবাইকে এ উত্তরই দিয়েছে। পরিতাপের বিষয় যে, কোরআনের এতসব বর্ণনা সত্ত্বেও আজও কিছু লোক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মানবত্ব অস্বীকার করার দুঃসাহস করে। কিন্তু মূর্খরা এ সত্যটি বোঝে না। তারা কোন স্বজাতীয় ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। এ কারণেই মূর্খরা সব সময়ই সমসাময়িক ওলী ও আলেমদের প্রতি সমসাময়িকতার কারণে ঘৃণা ও বিমুখতা পোষণ করে এসেছে।

স্বজাতির মর্মন্তুদ কথাবার্তার জওয়াবে নূহ্ (আঃ)-এর দয়ার্দ্র এবং শুভেচ্ছামূলক আচরণও চেতনাহীন জাতির মধ্যে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। তারা অন্ধভাবে মিথ্যারোপেই ব্যাপৃত রইল। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রতি প্লাবনের শাস্তি প্রেরণ করলেন। বলা হয়েছেঃ

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

بِاٰيٰتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ — অর্থাৎ, নূহ্ (আঃ)-এর জালেম সম্প্রদায় তাঁর উপদেশ ও শুভেচ্ছার পরোয়া করল না এবং যথারীতি মিথ্যারোপে অটল রইল। এর পরিণতিতে আমি নূহ্ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে একটি নৌকায় উঠিয়ে মুক্তি দিয়েছি এবং যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছিল, তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছি। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ।

হযরত নূহ্ (আঃ)-এর কাহিনী, তাঁর সম্প্রদায়ের সলিল সমাধি লাভ এবং নৌকারোহীদের মুক্তির পূর্ণ বিবরণ সূরা নূহ্ ও সূরা হুদে বর্ণিত হবে। এস্থলে আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোটামুটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম বলেনঃ যে সময় নূহ্ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনের আযাব নেমে এসেছিল, তখন তারা জনসংখ্যা ও শক্তির দিক দিয়ে ভরপুর ছিল। সংখ্যাধিক্যের কারণে ইরাকের ভূখণ্ড এবং পাহাড়েও তাদের সংকুলান হচ্ছিল না। আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন নীতি এই যে, তিনি অবাধ্য জাতিদেরকে ঢিল দেন। তারা যখন সংখ্যাধিক্য, শক্তি ও ধনাঢ্যতার চরম সীমায় উপনীত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তখনই তাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব নেমে আসে।—(ইবনে কাসীর)

নূহ্ (আঃ)-এর সাথে নৌকায় কতজন লোক ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতক্রমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আশি জন লোক ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল জুরহাম। সে আরবী ভাষায় কথা বলত।—(ইবনে-কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, আশি জনের মধ্যে চল্লিশ জন পুরুষ ও চল্লিশ জন মহিলা ছিল। প্লাবনের পর তারা মোসেলের যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা 'ছামানুন' (অর্থাৎ, আশি) নামে খ্যাত হয়ে যায়।

মোটকথা, এখানে নূহ্ (আঃ)-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করে কয়েকটি বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে। (এক) পূর্বতন সব পয়গম্বরের দাওয়াত ও বিশ্বাসের মূলনীতি ছিল অভিন্ন। (দুই) আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় পয়গম্বরদের সাহায্য ও সমর্থন কিরূপ বিস্ময়কর পন্থায় করেন যে পাহাড়ের সুউচ্চ শৃঙ্গে পর্যন্ত প্লাবনের মধ্যেও তাঁদের নিরাপত্তা ব্যাহত

হয়নি। (তিন) পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করা আল্লাহ্‌র আযাব ডেকে আনারই নামান্তর। পূর্ববর্তী উম্মতরা যেমন পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করার কারণে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে, একালের লোকদেরও এ থেকে ভয়মুক্ত হওয়া উচিত নয়।

আদ ও সামূদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ 'আদ' প্রকৃতপক্ষে নূহ (আঃ)-এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং তাঁর পুত্র সামের বংশধরেরই এক ব্যক্তির নাম। অতঃপর তার বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় 'আদ' নামে খ্যাত হয়ে গেছে। কোরআন পাকে আদের সাথে কোথাও 'আদে উলা' (প্রথম আদ) এবং কোথাও إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, আদ সম্প্রদাকে 'ইরাম'ও বলা হয় এবং প্রথম আদের বিপরীতে কোন দ্বিতীয় আদও রয়েছে। এ সম্পর্কে তফসীরবিদ ও ইতিহাসবিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। অধিক প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, আদের দাদার নাম ইরাম। তাঁর এক পুত্র আওসের বংশধররাই আদ। তাদেরকে প্রথম আদ বলা হয়। অপর পুত্র জাসুর পুত্র হচ্ছে সামূদ। তার বংশধরকে দ্বিতীয় আদ বলা হয়। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আদ ও সামূদ উভয়ই ইরামের দু'শাখা। এক শাখাকে প্রথম আদ এবং অপর শাখাকে সামূদ অথবা দ্বিতীয় আদ বলা হয়। ইরাম শব্দটি আদ ও সামূদ উভয়ের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য।

আদ সম্প্রদায়ের তেরটি পরিবার ছিল। আম্মান থেকে শুরু করে হাযরামাওত ও ইয়ামন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল। তাদের খেত-খামারগুলো অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামল ছিল। সব রকম বাগান ছিল। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপুসম্পন্ন। আয়াতে وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً বাক্যের উদ্দেশ্য তাই। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের সামনে দুনিয়ার যাবতীয় নেয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বক্রবুদ্ধির কারণেই এসব নেয়ামতই তাদের জন্যে কাল হয়ে দাঁড়াল। তারা শক্তিমদমত্ত হয়ে مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (আমাদের চাইতে শক্তিশালী কে?) -এর ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে থাকে।

যে বিশ্ব প্রতিপালকের নেয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল, তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করে।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আদ সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব আসে, তখন তাদের একটি প্রতিনিধিদল মক্কা গমন করেছিল। ফলে তারা আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যায়—তাদেরকে দ্বিতীয় আদ বলা হয়। -(বয়ানুল কোরআন)

'হূদ' একজন পয়গম্বরের নাম। তিনি নূহ্‌ (আঃ)-এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং সামের বংশধরের এক ব্যক্তি। আদ সম্প্রদায় এবং হূদ (আঃ)-এর বংশতালিকা চতুর্থ পুরুষে সাম পর্যন্ত পৌঁছে এক হয়ে যায়।— তাই হূদ (আঃ) আদের বংশগত ভাই। এ কারণেই আয়াতে أَخَاهُمْ هُودًا (তাদের ভাই হূদ) বলা হয়েছে।

হযরত হূদ (আঃ)-এর বংশতালিকা ও কিছু জীবন-চরিত্র ঃ আল্লাহ্‌ তাআলাই তাদের হেদায়েতের জন্যে হূদ (আঃ)-কে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন তাদেরই পরিবারের একজন। আরব বংশ বিশেষজ্ঞ আবুল বারাকাত জওফী লিখেন ঃ হূদ (আঃ)-এর পুত্র ইয়ারাব ইবনে কাহতান ইয়ামনে পৌঁছে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামনের সব সম্প্রদায় তাঁরই বংশধর। আরবী ভাষার সূচনা তাঁর থেকেই হয়েছে এবং তাঁর নামানুসারে ভাষার নাম আরবী এবং এ ভাষাভাষীদের নাম হয়েছে আরব।—(বাহ্‌রে-মুহীত)

কিন্তু বিশুদ্ধ তথ্য এই যে, আরবী ভাষা নূহ্‌ (আঃ)-এর আমল থেকেই প্রচলিত ছিল। নূহ্‌ (আঃ)-এর নৌকার একজন আরোহী জুরহাম আরবী ভাষায় কথা বলতেন। _ (বাহ্‌রে-মুহীত)। জুরহাম থেকেই মক্কা শহর আবাদ হয়েছে। এটা সম্ভব যে, ইয়ামনে আরবী ভাষার সূচনা ইয়ারাব ইবনে কাহ্‌তান থেকে হয়েছিল। আবুল বারাকাতের বক্তব্যের উদ্দেশ্যও তাই।

হযরত হূদ (আঃ) আদ জাতিকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে একত্ববাদের অনুসরণ করতে এবং অত্যাচার-উৎপীড়ন ত্যাগ করে ন্যায় ও সুবিচারের পথ ধরতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা স্বীয় ধনৈশ্বর্যের মোহে মত্ত হয়ে তাঁর আদেশ অমান্য করে। এর পরিণতিতে তাদের উপর প্রথম আযাব নাযিল হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত্র শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা শেরেক ও মূর্তি পূজা ত্যাগ করে না। অতঃপর আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আযাব সওয়ার হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগবাগিচা ও দালান-কোঠা ভূমিসাৎ হয়ে যায়। মানুষ ও জীবজন্তু শূন্যে উড়তে থাকে। অতঃপর উপুড় হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে ঃ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا অর্থাৎ, আমি মিথ্যারোপকারীদের বংশ কেটে দিয়েছি। এর মর্ম কোন কোন তফসীরকার এটাই স্থির করেছেন যে, তখন তাদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ এর অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ভবিষ্যতের জন্যেও আদ জাতিকে নির্বংশ করে দেয়া হয়েছে।

হযরত হূদ (আঃ)-এর আদেশ অমান্য করা এবং কুফর ও শেরেকে লিপ্ত থাকার কারণে যখন আদ জাতির উপর আযাব নাযিল হয়, তখন হূদ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা একটি কুঁড়ে ঘরে আশ্রয়গ্রহণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বিরাট বিরাট অট্টালিকা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও এ কুঁড়ে ঘরটিতে বাতাস খুব সুষম পরিমাণে প্রবেশ করত। হযরত হূদ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা ঠিক আযাবের মুহূর্তেও এখানে নিশ্চিন্তে বসে রইলেন। তাঁদের কোন কষ্টই হয়নি। সবাই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তিনি মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই ওফাত পান।—(বাহ্‌রে মুহীত)

আদ জাতির উপর ঘূর্ণিঝড়ের আকারে আযাব আসা কোরআন পাকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে। সূরা মুমিনূনে নূহ্‌ (আঃ)-এর কাহিনী উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাদের পরে আরও একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। বাহ্যতঃ এরাই হচ্ছে 'আদ' জাতি। পরে এ সম্প্রদায়ের কাজ-কর্ম ও কথা বার্তা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে - فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ অর্থাৎ, একটি বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল। এ আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আদ জাতির উপর বিকট ধরনের শব্দের আযাব সওয়ার হয়েছিল। কিন্তু উভয় মতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এটা সম্ভব যে, বিকট শব্দ ও ঘূর্ণিঝড় উভয়টিই হয়েছিল।

এ হচ্ছে আদ জাতি ও হযরত হূদ (আঃ)-এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা। কোরআন পাকের ভাষায় এর বিবরণ এরূপ ঃ

৬৫ নং আয়াত وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ অর্থাৎ, আমি আদ জাতির প্রতি তাদের

ভাই হুদ (আঃ) – কে হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছি। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা শুধু আল্লাহ্ তাআলারই এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমরা কি ভয় কর না?

আদ জাতির পূর্বে নূহ্ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত মহাশাস্তির স্মৃতি তখনও মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। তাই হুদ (আঃ) আযাবের কঠোরতা বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করেননি। বরং এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, তোমরা কি ভয় কর না?

৬৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ অর্থাৎ, সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলেন ঃ আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ধারণা, তুমি একজন মিথ্যাবাদী।

এটা প্রায় নূহ্ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের প্রত্যুত্তরের মতই—শুধু কয়েকটি শব্দের পার্থক্য মাত্র। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে এর উত্তর প্রায় তেমনি দেয়া হয়েছে, যেমন নূহ্ (আঃ) দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই। ব্যাপার শুধু এতটুকু যে, আমি বিশ্ব পালনকর্তার কাছ থেকে রাসূল হয়ে এসেছি। তাঁর বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছাই। আমি সুস্পষ্টভাবে তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই তোমাদের পৈতৃক মূর্খতায় তোমাদের সঙ্গী হওয়ার পরিবর্তে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য কথা তোমাদের কাছে পৌঁছে দেই। কিন্তু তা তোমাদের মনঃপূত নয়।

পঞ্চম আয়াতে আদ জাতির সে আপত্তির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের পূর্বে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় উত্থাপন করেছিল। অর্থাৎ, আমরা নিজেদেরই মত কোন মানুষকে নেতারূপে কিভাবে মেনে নিতে পারি? কোন ফেরেশতা হলে মেনে নেয়া সম্ভবপর ছিল। এর উত্তরেও কোরআন পাক তাই উল্লেখ করেছে, যা নূহ্ (আঃ) দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, কোন মানুষ আল্লাহ্র রসূল হয়ে মানুষকে ভয় প্রদর্শনের জন্যে আসবেন। কেননা, মানুষকে বোঝানোর জন্যে মানুষের পয়গম্বর হওয়াই কার্যকরী হতে পারে।

এরপর আদ জাতিকে আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, স্মরণ কর যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে কওমে নূহের পর ভূপৃষ্ঠের মালিক করে দিয়েছেন এবং দেহাবয়বে বিশালতা সম্পদ জনসংখ্যায় আধিক্য দিয়েছেন। আল্লাহ্র এসব নেয়ামত স্মরণ করলে তোমাদের মঙ্গল হবে।

কিন্তু এ অবাধ্য জাতি এসব উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করল না। তারা পথভ্রষ্টদের চিরাচরিত প্রথায় উত্তর দিল ঃ তুমি কি আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্ম আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাও? দেবতাদেরকে ছেড়ে আমরা এক আল্লাহ্র এবাদত করি—এটাই কি তোমার কাম্য? না, আমরা তা করতে পারব না। তুমি যে শাস্তির হুমকি দিচ্ছ, তা নিয়ে আস যদি সত্যবাদী হও।

৬৭নং আয়াতে হুদ (আঃ) উত্তর দিয়েছেন ঃ তোমরা যখন এমনি অবাধ্য ও অজ্ঞান, তখন তোমাদের উপর আল্লাহ্র গযব ও শাস্তি এল বলে, তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও এখন তারই প্রতীক্ষা করছি। জাতির এ উস্কানিমূলক উত্তর শুনে তিনি আযাব আসার সংবাদ দিয়েছিলেন বটে; কিন্তু পয়গম্বরসুলভ দয়া ও শুভেচ্ছা তাঁকে সাথে সাথে একথা বলতেও বাধ্য করল ঃ পরিতাপের বিষয়, তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা জড় ও অচেতন পদার্থসমূহকে উপাস্য করে নিয়েছে। এদের উপাস্য হওয়ার না কোন যুক্তিগত প্রমাণ আছে, না ইতিহাসগত। এদের এবাদতে তোমরা এতই পাকা হয়ে গেছ যে, এদের সমর্থনে আমার সাথে বিতর্ক করে যাচ্ছ।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে, হুদ (আঃ)-এর সব প্রচেষ্টা এবং আদ জাতির অবাধ্যতার সর্বশেষ পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, আমি হুদ ও তাঁর সাথী মুমিনদেরকে আযাব থেকে নিরাপদে রেখেছি এবং মিথ্যারোপকারীদের মূল কেটে দিয়েছি। তারা বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল না।

এ কাহিনীতে গাফেলদের জন্যে আল্লাহ্র স্মরণ ও আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ, বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্যে শিক্ষাসামগ্রী এবং প্রচারক সংস্কারকদের জন্যে পয়গম্বরসুলভ প্রচার ও সংস্কারপদ্ধতির শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾ اَوَعَجِبْتُمْ
اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ
وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ
فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾
قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ
اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾
قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ۗ
اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا
نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۗ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ
الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٧١﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ
قَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٢﴾
وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا
لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ
هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ
اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

(৬৮) তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বিশ্বস্ত। (৬৯) তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে—যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে। তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে কওমে নূহের পর সর্দার করেছেন এবং তোমাদের দেহের বিস্তৃতি বেশী করেছেন। তোমরা আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর–যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়। (৭০) তারা বললঃ তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে এসেছ যে আমরা এক আল্লাহ্র এবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূজা করত, তাদেরকে ছেড়ে দেই? অতএব নিয়ে আস আমাদের কাছে যদ্দ্বারা আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৭১) সে বললঃ অবধারিত হয়ে গেছে তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ। আমার সাথে ঐসব নাম সম্পর্কে কেন তর্ক করছ, যেগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপ–দাদারা রেখেছে। আল্লাহ্ এদের কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি। অতএব অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। (৭২) অনন্তর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করত তাদের মূল কেটে দিলাম। তারা মান্যকারী ছিল না। (৭৩) সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহ্কে। সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহ্র উষ্ট্রী—তোমাদের জন্যে প্রমাণ। অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহ্র ভূমিতে চড়ে বেড়াবে। একে অসৎভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথায় তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ছালেহ্ (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইতিপূর্বে কওমে নূহ ও কওমে হূদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। সূরা আ'রাফের শেষ পর্যন্ত পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের অবস্থা এবং সত্যের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার কারণে তাদের কুফর ও অশুভ পরিণতির বিষয় বর্ণিত হবে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ইতিপূর্বে আদ জাতির আলোচনায় বলা হয়েছে যে, আদ ও সামূদ একই দাদার বংশধরের দু'ব্যক্তির নাম। তাদের সন্তানরাও তাদের নামে অভিহিত হয়ে দু'সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। একটি আদ সম্প্রদায়, আর একটি সামূদ সম্প্রদায়। তারা আরবের উত্তর পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হজর'। বর্তমানে একে সাধারণতঃ 'মাদায়েনে ছালেহ' বলা হয়। আদ জাতির মত সামূদ জাতিও সম্পন্ন, শক্তিশালী ও বীর জাতি ছিল। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশালকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বত খোদাই করে নানা রকম প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। আরদুল কোরআন গ্রন্থে মাওলানা সাইয়্যেদ সোলায়মান নদভী লিখেছেন ঃ তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলী আজও পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর গায়ে ইরামী ও সামূদী বর্ণমালায় শিলালিপি রয়েছে।

পার্থিব বিত্ত ও ধনৈশ্বর্যের পরিণতি প্রায়ই অশুভ হয়ে থাকে। বিত্তশালীরা আল্লাহ্ ও পরকাল ভুলে গিয়ে ভ্রান্তপথে পা বাড়ায়। সামূদ জাতির বেলায়ও তাই হয়েছে।

অথচ পূর্ববর্তী কওমে নূহের শাস্তির ঘটনাবলী তখনও লোকমুখে আলোচিত হত এবং আদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী যেন সাম্প্রতিক কালের ঘটনা বলে বিবেচিত হত। কিন্তু ঐশ্বর্য ও শক্তির নেশা এমনি জিনিস যে, একজনের ধ্বংসস্তূপের উপর অন্যজন এসে স্বীয় প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং প্রথম জনের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ ভুলে যায়। আদ জাতির ধ্বংসের পর সামূদ জাতি তাদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এবং যে সব জায়গায় নিজেদের বিলাস বহুল প্রাসাদ গড়ে তোলে, সেখানেই তাদের ভাইয়েরা নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। তারা আদ জাতির অনুরূপ কার্যকলাপও শুরু করে দেয়। আল্লাহ্ ও পরকাল বিস্মিত হয়ে শিরক ও মূর্তি পূজায় মনোনিবেশ করে। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় চিরন্তন রীতি অনুযায়ী তাদের হেদায়েতের জন্যে ছালেহ্ (আঃ) কে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেন। তিনি বংশ ও দেশের দিক দিয়ে সামূদ জাতিরই একজন এবং সামেরই বংশধর ছিলেন। একারণেই আয়াতে তাঁকে اَخَاهُمْ صٰلِحًا অর্থাৎ, সামূদ জাতির ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ছালেহ্ (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে সে দাওয়াতই দেন, যা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে তখনও পর্যন্ত সমস্ত পয়গম্বর দিয়ে এসেছিলেন। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছেঃ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক উম্মতে একজন করে রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে তারা মানুষকে আল্লাহ্র এবাদত করার ও মূর্তি পূজা পরিহার করার নির্দেশ দেয়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের ন্যায় ছালেহ্ (আঃ)ও তাঁর জাতিকে একথাই বললেন যে, আল্লাহ্ তাআলাকে প্রতিপালক ও স্রষ্টা মনে কর। তিনি ব্যতীত এবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তাঁর ভাষায় يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

এতদসঙ্গে আরও বললেনঃ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ অর্থাৎ, এখন তো একটি সুস্পষ্ট নিদর্শনও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসে গেছে। এ নিদর্শনের অর্থ একটি আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী। এ আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে। এবং কোরআনের বিভিন্ন সূরায় এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। এ উষ্টির ঘটনা এই যে, হযরত ছালেহ (আঃ) যৌবনকাল থেকেই স্বীয় সম্প্রদায়কে একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং এ কাজেই বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হন। তাঁর বার বার পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করল যে, তাঁর কাছে এমন একটি দাবী করতে হবে যা পূরণ করতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়বেন এবং আমরা তাঁর বিরুদ্ধে জয়লাভ করব। সে মতে তারা দাবী করল যে, আপনি যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্র পয়গম্বর হন, তবে আমাদেরকে 'কাতেবা পাহাড়ের ভিতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী, সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে দেখান।

ছালেহ (আঃ) প্রথমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি আমি তোমাদের দাবী পূরণ করে দেই, তবে তোমরা আমার প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কি না? সবাই যখন এই মর্মে অঙ্গীকার করল, তখন ছালেহ্ (আঃ) দু'রাকআত নামায পড়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলেন, 'ইয়া পরওয়ারদেগার, আপনার জন্যে কোন কাজই কঠিন নয়। তাদের দাবী পূরণ করে দিন।' দোয়ার সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে স্পন্দন দেখা গেল এবং একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে তার ভেতর থেকে দাবীর অনুরূপ একটি উষ্ট্রী বের হয়ে এল।

ছালেহ্ (আঃ)-এর এ বিস্ময়কর মো'জেযা দেখে কিছু লোক তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেল এবং অবশিষ্টরাও মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা করল, কিন্তু দেবদেবীদের বিশেষ পূজারী ও মূর্তিপূজার ঠাকুর ধরনের কিছু সর্দার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল। হযরত ছালেহ্ (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শঙ্কিত হলেন যে, এদের উপর আযাব এসে যেতে পারে। তাই পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেনঃ এ উষ্ট্রীর দেখাশোনা কর। একে কোনরূপ কষ্ট দিও না। এভাবে হয়ত তোমরা আযাব থেকে বেঁচে যেতে পার। এর অন্যথা হলে তোমরা সাথে সাথে আযাবে পতিত হবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এই কথাই ব্যক্ত হয়েছেঃ

هَـٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ অর্থাৎ, এটি আল্লাহ্র উষ্ট্রী —তোমাদের জন্যে নিদর্শন। অতএব একে আল্লাহ্র যমিনে চরে বেড়াতে দাও এবং একে অনিষ্টের অভিপ্রায়ে স্পর্শ করো না। নতুবা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। এ উষ্ট্রীকে 'আল্লাহ্র উষ্ট্রী' বলার কারণ এই যে, এটি আল্লাহ্র অসীম শক্তির নির্দশন এবং ছালেহ্ (আঃ)-এর মো'জেযা হিসেবে বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মও অলৌকিক পন্থায় হয়েছিল বলে তাঁকে রূহুল্লাহ্ (আল্লাহ্র আত্মা) বলা হয়েছে। تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ উষ্ট্রীর পানাহারে তোমাদের মালিকানা ও তোমাদের ঘর থেকে কিছুই ব্যয় হয় না। যমিন আল্লাহ্র এবং এর উৎপন্ন ফসলও আল্লাহ্র সৃজিত। কাজেই তাঁর উষ্ট্রীকে তাঁর যমিনে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও, যাতে সাধারণভাবে চারণ ক্ষেত্রে বিচরণ করে বেড়াতে পারে।

সামূদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করত এবং জন্তুদেরকে পান করাত, এ উষ্ট্রীও সে কূপ থেকেই পানি পান করত। কিন্তু এ আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী যখন পানি পান করত, তখন পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত। হযরত ছালেহ্ (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে ফয়সালা করে দিলেন যে, একদিন এ উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি নিবে। যেদিন উষ্ট্রী পানি পান করত সেদিন অন্যরা উষ্ট্রীর দুধ দ্বারা তাদের সব পাত্র ভর্তি করে নিত। কোরআনের অন্যত্র এভাবে পানি বন্টনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ — অর্থাৎ, হে ছালেহ তুমি স্বজাতিকে বলে দাও যে, কূপের পানি তাদের এবং উষ্ট্রীর মধ্যে বন্টন হবে—একদিন উষ্ট্রীর এবং পরবর্তী দিন তাদের। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফেরেশতারা এ বন্টন ব্যবস্থা দেখাশোনা করবে—যাতে কেউ এর খেলাফ করতে না পারে। অন্য এক আয়াতে আছে هَـٰذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ অর্থাৎ, এটি আল্লাহ্র উষ্ট্রী। একদিন এর পানি এবং অন্য নির্দিষ্ট দিনের পানি তোমাদের।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧٧﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾

(৭৪) তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমাদেরকে আদ জাতির পরে সর্দার করেছেন; তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ কর এবং পর্বত গাত্র খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। অতএব আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (৭৫) তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা ঈমানদার দরিদ্রদেরকে জিজ্ঞেস করল ঃ তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালেহ্কে তার পালনকর্তা প্রেরণ করেছেন? তারা বলল ঃ আমরা তো তার আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী। (৭৬) দাম্ভিকরা বলল ঃ তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তাতে অস্বীকৃত। (৭৭) অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তারা বলল ঃ হে ছালেহ, নিয়ে এস যদ্দ্বারা আমাদেরকে ভয় দেখাতে, যদি তুমি রাসূল হয়ে থাক। (৭৮) অতঃপর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে সকাল বেলায় নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৭৯) ছালেহ তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করলো এবং বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের পয়গাম পৌছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি কিন্তু তোমরা মঙ্গলাকাঙ্খীদেরকে ভালবাস না। (৮০) এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল ঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি? (৮১) তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমণ কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৭৪ নং আয়াতে এ অবাধ্য ও অঙ্গীকারভঙ্গকারী জাতির শুভেচ্ছা ও তাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর জন্যে পুনরায় তাদেরকে আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হয়েছে, যাতে তারা অবাধ্যতা পরিহার করে। বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ ...

..... এতে خُلَفَاءَ শব্দটি خليفة এর বহুবচন। এর অর্থ স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি। قصور শব্দটি قصر এর বহুবচন। এর অর্থ উচ্চ অট্টালিকা ও প্রাসাদ। تنحتون শব্দটি نحت -থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রস্তর খোদাই করা। جبال শব্দটি جبل এর বহুবচন। এর অর্থ পাহাড়। بيوتا শব্দটি بيت - এর বহুবচন। এর অর্থ প্রকোষ্ঠ। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত স্মরণ কর যে, তিনি আদ জাতিকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে তোমাদেরকে অভিষিক্ত করেছেন, তাদের ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তি তোমাদেরকে দান করেছেন এবং তোমাদেরকে এ শিল্প কার্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, উন্মুক্ত জয়গায় তোমরা প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে ফেল এবং পাহাড়ের গাত্র খোদাই করে তাতে প্রকোষ্ঠ তৈরী কর। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর, অনুগ্রহ স্বীকার কর, তাঁর আনুগত্য অবলম্বন কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না।

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় মৌলিক ও শাখাগত মাসআলা জানা যায়।

(এক) ধর্মের মূল বিশ্বাসসমূহে সব পয়গাম্বরই একমত এবং তাঁদের সবার শরীয়তই অভিন্ন। সবারই দাওয়াত ছিল এক আল্লাহ্র এবাদত করা এবং এর বিরুদ্ধাচরণের কারণে ইহকাল ও পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা।

(দুই) পূর্ববর্তী সব উম্মতের মধ্যে এই হয়েছে যে, সম্প্রদায়ের বিত্তশালী ও প্রধানরা পয়গম্বরদের দাওয়াত কবুল করেনি। ফলে তারা ইহকালেও ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও শাস্তির যোগ্য হয়েছে।

(তিন) তফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্র নেয়ামত সমূহ দুনিয়াতে কাফেরদেরকেও দান করাহয় ; যেমন, আদ ও সামূদ জাতির সামনে আল্লাহ্ তাআলা ধন-সম্পদ ও শক্তির দ্বার খুলে দিয়েছেন।

(চার) তফসীর কুরতুবীতে আছে, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুউচ্চ প্রাসাদ ও বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করাও আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত ও বৈধ।

এটা ভিন্ন কথা যে, কোন নবী, রাসূল ও ওলীগণ অট্টালিকা পছন্দ করেননি। কারণ, এগুলো মানুষকে গাফেল করে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে সুউচ্চ প্রসাদ নির্মাণ সম্পর্কে যেসব বক্তব্য বর্ণিত আছে, সেগুলো এধরনেরই।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সামূদ জাতির দু'দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। একদল ছালেহ্ (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় দল ছিল অবিশ্বাসী কাফেরদের। বলা হয়েছে ঃ

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ অর্থাৎ, ছালেহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অহঙ্কারী ছিল, তারা তাদেরকে বলল, যাদেরকে দুর্বল ও হীন মনে করা হত—অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।

ইমাম রাযী তফসীর কবীরে বলেন ঃ এখানে দু'দলের দুটি গুণ ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কাফেরদের গুণটি اسْتَكْبَرُوْا এ صيغة معروف বলা হয়েছে এবং মুমিনদের গুণটি صيغة مجهول এ اسْتُضْعِفُوْا বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কাফেরদের অহঙ্কার গুণটি ছিল তাদের নিজস্ব কাজ যা, দণ্ডনীয়, তিরস্কৃত ও পরিণামে শাস্তির কারণ হয়েছে। পক্ষান্তরে মুমিনদের যে বিশেষণ তারা বর্ণনা করত যে, এরা নিকৃষ্ট, হীন ও দুর্বল, এটা কাফেরদেরই কথা, স্বয়ং মুমিনদের বাস্তব অবস্থা ও বিশেষণ নয়, যা তিরস্কারযোগ্য হতে পারে। বরং তিরস্কার তাদেরই প্রাপ্য, যারা বিনা কারণে তাদেরকে হীন ও দুর্বল বলত ও মনে করত। উভয় দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ ছিল এই যে, কাফেররা মুমিনদেরকে বলল ঃ তোমরা কি বাস্তবিকই জান যে, ছালেহ্ (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরীত রসূল?

উত্তরে মুমিনরা বলল ঃ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে হেদায়েতসহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন আমরা সেগুলোর প্রতি বিশ্বাসী।

তফসীর কাশ্শাফে বলা হয়েছে ঃ সামূদ জাতির মুমিনরা কি চমৎকার অংকারপূর্ণ উত্তরই না দিয়েছে যে, তোমরা এ আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছ যে, তিনি রসূল কি না। আসলে এটা আলোচনার বিষয়ই নয় ; বরং জাজ্বল্যমান ও নিশ্চিত। সাথে সাথে এটাও নিশ্চিত যে, তিনি যা বলেন, তা আল্লাহ্ তাআলার কাছে থেকে আনীত পয়গাম। জিজ্ঞাস্য বিষয় কিছু থাকলে তা এই যে, কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কে করে না? আল্লাহ্র ফযলে আমরা তাঁর আনীত সব নির্দেশের প্রতিই বিশ্বাসী।

কিন্তু তাদের অলংকারপূর্ণ উত্তর শুনেও সামূদ জাতি পূর্ববৎ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বললঃ যে বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা মানি না। দুনিয়ার মহব্বত, ধন-সম্পদ ও শক্তির মত্ততা থেকে আল্লাহ্ তাআলা নিরাপদ রাখুন। এগুলো মানুষের চোখে পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা জাজ্বল্যমান বিষয়কেও অস্বীকার করতে শুরু করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ছালেহ্ (আঃ)-এর দোয়ায় পাহাড়ের একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে আশ্চর্য ধরনের এক উষ্ট্রী বের হয়ে এসেছিল। আল্লাহ্ তাআলা এ উষ্ট্রীকেই এ সম্প্রদায়ের জন্যে সর্বশেষ পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছিলেন। সেমতে সে জনপদের সব মানুষ ও জীব-জন্তু যে কূপ থেকে পানি পান করত, উষ্ট্রী তার সব পানি পান করে ফেলত। তাই ছালেহ্ (আঃ) তাদের জন্যে পানির পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, একদিন উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন জনপদের অধিবাসীরা।

সুতরাং এ উষ্ট্রীর কারণে সামূদ জাতির বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে তারা এর ধ্বংস কামনা করত। কিন্তু আযাবের ভয়ে নিজেরা একে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হত না।

যে সুবৃহৎ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনাকে বিলুপ্ত করে দেয়, তা হচ্ছে নারীর প্রলোভন। সুতরাং সম্প্রদায়ের দু'জন পরমাসুন্দরী নারী বাজী রাখল যে, যে ব্যক্তি এ উষ্ট্রীকে হত্যা করবে, সে আমাদের এবং আমাদের কন্যাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারবে।

সম্প্রদায়ের দু'জন যুবক মিছদা' ও কাসার এ নেশায় মত্ত হয়ে উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। তারা উষ্ট্রীর পথে একটি বড় প্রস্তর খণ্ডের আড়ালে আত্মগোপণ করে বসে রইল। উষ্ট্রী সামনে আসতেই মিছদা' তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল এবং কাসার তরবারির আঘাতে তার পা কেটে হত্যা করল।

কোরআন পাক তাকেই সামূদ জাতির সর্ববৃহৎ হতভাগ্য বলে আখ্যা দিয়ে বলেছে ঃ اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا কেননা, তার কারণেই গোটা সম্প্রদায় আযাবে পতিত হয়।

উষ্ট্রী হত্যার ঘটনা জানার পর ছালেহ্ (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে তোমাদের জীবন কাল মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট রয়েছে। تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ অর্থাৎ, আরও তিন দিন আরাম করে নাও (এরপরই আযাব নেমে আসবে)। এ ওয়াদা সত্য, এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে জাতির দুঃসময় ঘনিয়ে আসে, তার জন্যে কোন উপদেশ ও হুশিয়ারী কার্যকর হয় না। সুতরাং ছালেহ (আঃ)-এর একথা শুনেও তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলল ঃ এ শাস্তি কিভাবে এবং কোথা থেকে আসবে? এর লক্ষণ কি হবে?

ছালেহ (আঃ) বললেন ঃ তাহলে আযাবের লক্ষণও শুনে নাও—আগামী কাল বৃহস্পতিবার তোমাদের নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবার মুখমণ্ডল হলদে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। অতঃপর পরশু শুক্রবার সবার মুখমণ্ডল গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার দিন সবার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন। হতভাগ্য জাতি একথা শুনেও ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে স্বয়ং ছালেহ্ (আঃ)-কেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবল, যদি সে সত্যবাদী হয় এবং আমাদের উপর আযাব আসেই, তবে আমরা নিজেদের পূর্বে তার ভবলীলাই সাঙ্গ করে দেই না কেন? পক্ষান্তরে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে মিথ্যার সাজা ভোগ করুক। সামূদ জাতির এ সংকল্পের বিষয় কোরআন পাকের অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু লোক রাতের বেলা ছালেহ (আঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশে তাঁর গৃহপানে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা পথিমধ্যেই প্রস্তর বর্ষণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ, তারাও গোপন ষড়যন্ত্র করল এবং আমিও প্রত্যুত্তরে এমন কৌশল অবলম্বন করলাম যে, তারা তা জানতেই পারল না। বৃহস্পতিবার ভোরে ছালেহ্ (আঃ)-এর কথা অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল গভীর হলুদ রঙে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। প্রথম লক্ষণ সত্য হওয়ার পরও জালেমরা ঈমানের প্রতি মনোনিবেশ করল না; বরং তারা ছালেহ্ (আঃ)-এর প্রতি আরও চটে গেল এবং সমগ্র জাতি তাকে হত্যা করার জন্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল। আল্লাহ রক্ষা করুন, তাঁর গযবেরও লক্ষণাদি থাকে। মানুষের মন ও মস্তিষ্ক যখন অধোমুখী হয়ে যায়, তখন লাভকে ক্ষতি ও ক্ষতিকে লাভ এবং ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল মনে করতে থাকে।

দ্বিতীয়দিন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয় দিন ঘোর কাল হয়ে গেল। তখন সবাই নিরাশ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যে,

কোন্ দিক থেকে কিভাবে আযাব আসে।

এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হল এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শুনা গেল। ফলে সবাই একযোগে বসা অবস্থায় অধোমুখী হয়ে ভূশায়ী হল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ভূমিকম্পের কথা উল্লেখিত রয়েছে। فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ এখানে رجفة শব্দের অর্থ ভূমিকম্প।

অন্যান্য আয়াতে فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ ও বলা হয়েছে। صَيْحَةٌ শব্দের অর্থ ভীষণ চিৎকার ও বিকট শব্দ। উভয় আয়াতদৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে, তাদের উপর উভয় প্রকার আযাবই এসেছিল ; নীচের দিক থেকে ভূমিকম্প আর উপর দিক থেকে বিকট চিৎকার। ফলে তাদের فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ এ পরিণতি হয়েছিল। جاثم শব্দটি جثوم ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চেতনাহীন হয়ে পড়ে যাওয়া কিংবা বসে থাকা। (কামুস) অর্থাৎ, যে যে অবস্থায় ছিল, সে সেভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হল। نعوذبالله من قهره وعذابه

এ কাহিনীর প্রধান অংশগুলো স্বয়ং কোরআন পাকের বিভিন্ন সূরায় এবং কিছু অংশ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। কিছু অংশ এমনও রয়েছে যা তফসীরবিদগণ ইসরাইলী (অর্থাৎ, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের) বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু এগুলোর উপর কোন ঘটনার প্রমাণ নির্ভরশীল নয়।

ছহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তাবুক যুদ্ধের সফরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হিজর নামক সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে সামূদ জাতির উপর আযাব এসেছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন এ আযাব-বিধ্বস্ত এলাকার ভিতরে প্রবেশ কিংবা এর কূপের পানি ব্যবহার না করে— (মাযহারী)

কোন কোন হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ সামূদ জাতির উপর আপতিত আযাব থেকে আবুরেগাল নামক এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রাণে বাঁচতে পারেনি। এ ব্যক্তি তখন মক্কায় এসেছিল। মক্কার হেরেমের সম্মানার্থে আল্লাহ তাআলা তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। অবশেষে যখন সে হেরেম থেকে বাইরে যায়, তখন সামূদ জাতির আযাব তার উপরও পতিত হয় এবং সেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রসূলুল্লাহ (আঃ) সাহাবায়ে কেরামকে মক্কার বাইরে আবুরেগালের কবরের চিহ্নও দেখান এবং বলেন ঃ তার সাথে স্বর্ণের একটি ছড়িও দাফন হয়ে গিয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম কবর খনন করলে ছড়িটি পাওয়া যায়। এ রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, তায়েফের অধিবাসী ছকীফ গোত্র আবু রেগালেরই বংশধর।— (মাযহারী)

এসব আযাব-বিধ্বস্ত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলোকে আল্লাহ্ তাআলা ভবিষ্যৎ লোকদের জন্যে শিক্ষাস্থল হিসাবে সংরক্ষিত রেখেছেন। কোরআন পাক আরবদেরকে বার বার হুঁশিয়ার করেছে যে, তোমাদের সিরিয়া গমনের পথে এসব স্থান আজও শিক্ষার কাহিনী হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। لَمْ تُسْكَنْ مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا

আযাবের ঘটনা বিবৃত করার পর বলা হয়েছে ঃ

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ অর্থাৎ, স্বজাতির উপর আযাব নাযিল হওয়ার পর ছালেহ্ (আঃ) ও ঈমানদারগণ সে এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তাঁর সাথে চার হাজার মুমিন ছিল। তিনি সবাইকে নিয়ে এয়ামনের 'হাযারা মাওতে' চলে গেলেন। সেখানেই তাঁর ওফাত হয়। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে তাঁর মক্কায় প্রস্থান এবং সেখানে ওফাতের কথাও জানা যায়।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থে জানা যায় যে, ছালেহ্ (আঃ) প্রস্থানকালে জাতিকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি; কিন্তু আফসোস, তোমরা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দই কর না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবাই যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন তাদেরকে সম্বোধন করে লাভ কি? উত্তর এই যে, এক লাভ তো এই যে, এ থেকে অন্যরাও শিক্ষা লাভ করতে পারবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও বদর যুদ্ধে নিহত কোরাইশ সর্দারদেরকে এমনিভাবে সম্বোধন করে কিছু কথা বলেছিলেন। এছাড়া ছালেহ্ (আঃ)-এর এ সম্বোধন আযাব অবতরণের পূর্বেও হতে পারে— যদিও বর্ণনায় তা পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের কাহিনী পর্বের চতুর্থ কাহিনী হচ্ছে হযরত লূত (আঃ)-এর কাহিনী।

লূত (আঃ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। উভয়ের মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম ইরাকে বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল শহর। এখানে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বয়ং হযরত ইরবাহীমের পরিবারও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা ইবরাহীম (আঃ)-কে পয়গম্বর করে পাঠান। কিন্তু সবাই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ব্যাপারটি নমরূদের অগ্নি পর্যন্ত গড়ায়। স্বয়ং পিতা তাঁকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন।

নিজ পরিবারের মধ্যে শুধু সহধর্মিনী হযরত সারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র লূত মুসলমান হন। فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে হযরত ইবরাহীম দেশ ছেড়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন। জর্দান নদীর তীরে পৌঁছার পর আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কেনানে গিয়ে অবস্থান করেন, যা বায়তুল মোকাদ্দাসের অদূরেই অবস্থিত।

লূত (আঃ)-কেও আল্লাহ্ তাআলা নবুওয়ত দান করে জর্দান ও বায়তুল মোকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সাদূমের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্যে প্রেরণ করেন। এ এলাকায় সাদূম, আমূরা, উমা, ছাবুবিম, বালে, অথবা সূগর নামক পাঁচটি বড় বড় শহর ছিল। কোরআন পাক বিভিন্ন স্থানে এদের সমষ্টিকে 'মু'তাফেকা' ও মু'তাফেকাত শব্দে বর্ণনা করেছে। এসব শহরের মধ্যে সাদূমকেই রাজধানী মনে করা হত। হযরত লূত (আঃ) এখানেই অবস্থান করতেন। এ এলাকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্যশ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। (এসব ঐতিহাসিক তথ্য বাহরে মুহীত, মাযহারী, ইবনে কাছীর, আল-মানার প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে)।

কোরআন পাকের ভাষায় মানুষের সাধারণ অভ্যাস হচ্ছে كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ অর্থাৎ, মানুষ যখন দেখে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন অবাধ্যতা শুরু করে। তাদের সামনেও আল্লাহ্ তাআলার স্বীয় নেয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তারা মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী ধনৈশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কাম প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, লজ্জা-শরম ও ভাল-মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্যও বিস্মৃত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকৃতিবিরুদ্ধ নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয়, যা হারাম ও গোনাহ্ তো বটেই, সুস্থ স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য হওয়ার কারণে সাধারণ জন্তু -জানোয়ারও এর

নিকটবর্তী হয় না।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত লূত (আঃ)-কে তাদের হেদায়েতের জন্যে নিযুক্ত করেন। তিনি স্বজাতিকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ, হুশিয়ার করে বললেন ঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ কর, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি।

যিনা তথা ব্যাভিচার সম্পর্কে কোরআন পাক اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً আলিফ ও লাম ব্যতিরেকেই فَاحِشَةً শব্দ ব্যবহার করেছে; কিন্তু এখানে আলিফ লামসহ اَلْفَاحِشَةَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাভিচার যেন একাই সমস্ত অশ্লীলতার সমাহার এবং যিনার চাইতেও কঠোর অপরাধ।

এরপর বলা হয়েছে ঃ এ নির্লজ্জ কাজ তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি। আমর ইবনে দীনার বলেন ঃ এ জাতির পূর্বে পৃথিবীতে কখনও এহেন কুকর্ম দেখা যায়নি।— (মাযহারী) সাদূমবাসীদের পূর্বে কোন ঘোরতর মন্দ ব্যক্তির চিন্তাও এদিকে যায়নি। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক বলেন ঃ কোরআনে লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লেখ না হলে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, কোন মানুষ এরূপ কাজ করতে পারে।— (ইবনে কাছীর)

এতে তাদের নির্লজ্জতার কারণে দু'দিক দিয়ে হুশিয়ার করা হয়েছে। (এক) অনেক গোনাহে মানুষ পরিবেশ অথবা পূর্ববর্তীদের অনুকরণের কারণে লিপ্ত হয়ে যায়—যদিও তা কোন শরীয়ত সম্মত ওযর নয়; কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে তাকে কোন না কোন স্তরে ক্ষমাযোগ্য মনে করা যায়। কিন্তু যে গোনাহ পূর্বে কেউ করেনি এবং তা করার বিশেষ কোন কারণও নেই; তা নিঃসন্দেহে অধিক শাস্তির যোগ্য। (দুই) যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ কিংবা কুপ্রথার উদ্ভাবন ও প্রথম প্রচলন করে, তার উপর তার নিজের কাজের গোনাহ্ ও শাস্তি তো চাপেই সাথে সাথে ঐসব লোকের শাস্তিও তার গর্দানে চেপে বসে, যারা কেয়ামত পর্যন্ত তার সে কাজে প্রভাবিত হয়ে গোনাহে লিপ্ত হয়।

দ্বিতীয় আয়াতে তাদের এ নির্লজ্জতাকে আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলা হয়েছে ঃ তোমরা নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের স্বভাবজাত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা একটি হালাল ও জায়েজ পন্থা নির্ধারণ করেছেন এবং তা হচ্ছে নারীদেরকে বিয়ে করা। এ পন্থা ছেড়ে অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করা একান্ত হীনতা ও বিকৃত চিন্তারই পরিচায়ক।

এ কারণেই সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদগণ এ অপরাধকে সাধারণ ব্যভিচারের চাইতেও অধিক গুরুতর অপরাধ ও গোনাহ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন ঃ যারা একাজ করে, তাদেরকে ঐ রকম শাস্তিই দেয়া উচিত, যেমন লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং মাটি উলটিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই এরূপ ব্যক্তিকে কোন উঁচু পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দিয়ে উপর থেকে প্রস্তর বর্ষণ করা উচিত। মুসনাদে আহ্মদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ অর্থাৎ, একাজে জড়িত উভয় ব্যক্তিকে হত্যা কর।- (ইবনে কাছীর)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ অর্থাৎ, তোমরা মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রমকারী সম্প্রদায়। প্রত্যেক কাজে সীমা অতিক্রম করাই তোমাদের আসল রোগ। যৌন কামনার ক্ষেত্রেও তোমরা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ডিঙ্গিয়ে স্বভাববিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছ।

তৃতীয় আয়াতে, লূত (আঃ)-এর উপদেশের জওয়াবে তাঁর সম্প্রদায়ের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ তাদের দ্বারা যখন কোন যুক্তিসংগত জওয়াব দেয়া সম্ভবপর হল না, তখন জেদের বশবর্তী হয়ে পারস্পরিক বলতে লাগল ঃ এরা বড় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বলে দাবী করে। এদের চিকিৎসা এই যে, এদেরকে বস্তি থেকে বের করে দাও।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সাদুম সম্প্রদায়ের বক্রতা ও বেহায়াপনার আসমানী শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিই আল্লাহ্র আযাবে পতিত হল। শুধু লূত (আঃ) ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী আযাব থেকে বেঁচে রইলেন। কোরআনের ভাষায় فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি লূত ও তাঁর পরিবারকে আযাব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। 'আহ্ল' তথা পরিবারকে বলা হয়, এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ তাঁর পরিবারের মধ্যে দু'টি কন্যা মুসলমান হয়েছিল; কিন্তু তাঁর সহধর্মিনী মুসলমান হয়নি। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ — অর্থাৎ, সমগ্র বস্তির মধ্যে একটি ঘর ছাড়া কোন মুসলমান ছিল না। এতে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, লূত (আঃ)-এর ঘরের লোকই শুধু মুসলমান ছিল। সুতরাং তারাই আযাব থেকে মুক্তি পেল। অবশ্য তাদের মধ্যে তাঁর বিবি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আহ্লের অর্থ ব্যাপক। এতে পরিবারের লোকজন এবং অন্যান্য মুসলমানকেও বোঝানো হয়েছে। সারকথা এই যে, গুণা-গুণতি কয়েকজন মুসলমান ছিল। তাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ তাআলা লূত (আঃ)-কে নির্দেশ দেন যে, বিবি ব্যতীত অন্যান্য পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীল লোককে নিয়ে শেষ রাত্রে বস্তি থেকে বের হয়ে যান এবং পিছনে ফিরে দেখবেন না। কেননা, আপনি যখন বস্তি থেকে বের হয়ে যাবেন, তখনই কালবিলম্ব না করে আযাব এসে যাবে।

হযরত লূত (আঃ) এ নির্দেশ মত স্বীয় পরিবার পরিজন ও সম্পর্কশীলদেরকে নিয়ে শেষ রাত্রে সাদুম ত্যাগ করেন। তাঁর বিবি প্রসঙ্গে দু'রকম রেওয়ায়েতই বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সে সঙ্গে রওয়ানাই হয়নি। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে, কিছু দুর সঙ্গে চলার পর আল্লাহ্র নির্দেশের বিপরীতে পিছনে ফিরে বস্তিবাসীদের অবস্থা দেখতে চেয়েছিল। ফলে সাথে সাথে আযাব এসে তাকেও পাকড়াও করল। কোরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনাটি সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তৃতীয় আয়াতে শুধু বলা হয়েছে যে, আমি লূত (আঃ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু তাঁর সহধর্মিনী আযাবে লিপ্ত রয়ে গেছে। শেষ রাত্রে বস্তি ত্যাগ করা এবং পিছন ফিরে না দেখার নির্দেশ কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াতেও উল্লেখিত রয়েছে।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

(৮২) তাঁর সম্প্রদায় এ ছাড়া কোন উত্তর দিল না যে, বের করে দাও এদেরকে শহর থেকে। এরা খুব সাধু থাকতে চায়। (৮৩) অতঃপর আমি তাকে ও তাঁর পরিবার পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম, কিন্তু তার স্ত্রী। সে তাদের মধ্যেই রয়ে গেল, যারা রয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। (৮৪) অতএব দেখ, গোনাহগারদের পরিণতি কেমন হয়েছে। (৮৫) আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নাই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না এবং ভূপৃষ্ঠের সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এই হল তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৮৬) তোমরা পথে ঘাটে এ কারণে বসে থেকো না যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে হুমকি দিবে, আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করবে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে অধিক করেছেন এবং লক্ষ্য কর কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের। (৮৭) আর যদি তোমাদের একদল ঐ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং একদল বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে ছবর কর যে পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা না করে দেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৮৪ নং আয়াতে আযাব সম্পর্কে সংক্ষেপে এটুকুই বলা হয়েছে যে, তাদের উপর এক অভিনব বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। সূরা হুদে এ আযাবের বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ۙ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۚ وَمَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ

অর্থাৎ, যখন আমার আযাব এসে গেল, তখন আমি বস্তিটিকে উলটে দিলাম এবং তাদের উপর স্তরে স্তরে প্রস্তর বর্ষণ করলাম যা আপনার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নযুক্ত ছিল। সে বস্তিটি এ কাফেরদের থেকে বেশী দূরে নয়।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, উপর থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং নীচে থেকে জিবরাঈল (আঃ) গোটা ভূখণ্ডকে উপরে তুলে উল্টে দিয়েছেন। বর্ষিত প্রস্তরসমূহ স্তরে স্তরে একত্রিত ছিল। অর্থাৎ, এমন অবিরাম ধারায় বর্ষিত হয়েছিল যে, স্তরে স্তরে জমা হয়ে গিয়েছিল। এসব প্রস্তর চিহ্নযুক্ত ছিল। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ প্রত্যেক পাথরে ঐ ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে খতম করার জন্যে পাথরটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সূরা হিজরের আয়াতে এ আযাবের বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছে ঃ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ অর্থাৎ, সূর্যোদয়ের সময় বিকট নাদ তাদেরকে পাকড়াও করল।

এতে জানা যায় যে, প্রথমে আকাশ থেকে একটি বিকট চীৎকার ধ্বনি এবং এরপর অন্যান্য আযাব এসেছে। বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, চীৎকার ধ্বনির পর প্রথমে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে অধিকতর লাঞ্ছিত করার জন্যে উপর থেকে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, প্রথমে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয় এবং পরে ভূখণ্ড উলটিয়ে দেয়া হয়। কারণ, কোরআনের বর্ণনা পদ্ধতিতে যে বিষয়টি আগে উল্লেখ করা হয়, তা বাস্তবেও আগেই সংঘটিত হবে, তা অপরিহার্য নয়।

লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত ভয়াবহ আযাবসমূহের মধ্যে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেয়ার আযাবটি তাদের অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজের সাথে বিশেষ সঙ্গতিও রাখে। কারণ, তারা সিদ্ধ পন্থার বিপরীত কাজ করেছিল।

সূরা হুদে বর্ণিত আয়াতসমূহের শেষে কোরআন পাকে আরবদেরকে হুশিয়ার করে এ কথাও বলেছে যে, وَمَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ অর্থাৎ, উলটে দেয়া বস্তিগুলো জালেমদের কাছ থেকে বেশী দূরে নয়। সিরিয়া গমনের পথে সব সময়ই সেগুলো তাদের চোখের সামনে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

এ দৃশ্য শুধু কোরআন অবতরণের সময়েই নয়, আজও বিদ্যমান রয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাস ও জর্দান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূখণ্ডটি 'লূত সাগর' অথবা 'মৃত সাগর' নামে পরিচিত। এর ভূভাগ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক নীচে অবস্থিত। এর একটি বিশেষ অংশে নদীর আকারে আশ্চর্য ধরনের পানি বিদ্যমান। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে মৃত সাগর বলা হয়। কথিত আছে, এটাই সাদূমের অবস্থান স্থল।

পয়গম্বরদের কাহিনী পরম্পরার পঞ্চম কাহিনী হচ্ছে হযরত শোয়ায়েব

(আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ কাহিনীটিই বিবৃত হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত শোয়ায়েব (আঃ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পুত্র মাদইয়ানের বংশধর। হযরত লূত (আঃ)-এর সাথেও তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাঁর বংশধরও মাদইয়ান নামে খ্যাত হয়েছে। যে বস্তিতে তারা বসবাস করত, তাও মাদইয়ান নামে অভিহিত হয়েছে। অতএব 'মাদইয়ান' একটি জাতির ও একটি শহরের নাম। এ শহর অদ্যাবধি পূর্ব জর্দানের সামুদ্রিক বন্দর 'মায়ানের' অদূরে বিদ্যমান রয়েছে। কোরআন পাকের অন্যত্র মূসা (আঃ) – এর কাহিনীতে বলা হয়েছে وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ এতে এ বস্তিটিকে বোঝানো হয়েছে। (ইবনে কাছীর) হযরত শোয়য়েব (আঃ)-কে চমৎকার বাগ্মিতার কারণে 'খতিবুল আম্বিয়া' বলা হয়।– (ইবনে কাছীর, বাহ্‌রে মুহীত)

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, কোরআন পাকে কোথাও তাদেরকে 'আহলে মাদইয়ান' ও 'আছহাবে মাদইয়ান' নামে উল্লেখ করা হয়েছে আবার কোথাও 'আছহাবে আইকা' নামে। 'আইকা' শব্দের অর্থ জঙ্গল ও বন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ 'আছহাবে মাদইয়ান' ও 'আছহাবে আইকা' পৃথক পৃথক জাতি। তাদের বাসস্থানও ছিল ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) প্রথমে এই জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অপর জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। উভয় জাতির উপর যে আযাব আসে, তার ভাষাও বিভিন্ন রূপ। আছহাবে মাদইয়ানের উপর কোথাও صيحة এবং কোথাও رجفة এবং আছহাবে আইকার উপর কোথাও ظلة এর আযাব উল্লেখ করা হয়েছে। صيحة শব্দের অর্থ বিকট চীৎকার এবং ভীষণ শব্দ। رجفة শব্দের অর্থ ভূমিকম্প এবং ظلة শব্দের অর্থ ছায়াযুক্ত ছাদ, শামিয়ানা। আছহাবে আইকার উপর এভাবে আযাব নাযিল করা হয় যে, প্রথমে কয়েকদিন তাদের বস্তিতে ভীষণ গরম পড়ে। ফলে গোটা জাতি ছটফট করতে থাকে। অতঃপর নিকটস্থ একটি গভীর জঙ্গলের উপর গাঢ় মেঘমালা দেখা দেয়। ফলে জঙ্গলে ছায়া পড়ে এবং শীতল বাতাস বইতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে বস্তির সবাই জঙ্গলে জমায়েত হয়। এভাবে খোদায়ী অপরাধীরা কোনরূপ গ্রেফতারী পরোয়ানা ও সিপাই-সান্ত্রীর প্রহরা ছাড়াই নিজ পায়ে হেঁটে বধ্যভূমিতে গিয়ে পৌঁছে। যখন সবাই সেখানে একত্রিত হয়, তখন মেঘমালা থেকে অগ্নি বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং নীচের দিকে শুরু হয় ভূমিকম্প। ফলে সবাই নিস্তনাবুদ হয়ে যায়।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ 'আছহাবে মাদইয়ান' ও 'আছহাবে আইকা' একই সম্প্রদায়ের দুই নাম। পূর্বোল্লেখিত তিন প্রকার আযাবই তাদের উপর নাযিল হয়েছিল। প্রথমে মেঘমালা থেকে অগ্নি বর্ষিত হয়, অতঃপর বিকট চীৎকার শোনা যায় এবং সবশেষে ভূমিকম্প হয়। ইবনে কাছীর এ তফসীরেরই প্রবক্তা।

মোটকথা, উভয় সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন হোক কিংবা একই সম্প্রদায়ের দু'নাম হোক হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে যে পয়গাম দেন, তা প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। এর ব্যাখার পূর্বে জেনে নিন যে, ইসলামই সব পয়গম্বরের অভিন্ন দাওয়াত। এর সারমর্ম হচ্ছে হক আদায় করা। হক দু'প্রকার ঃ (এক) সরাসরি আল্লাহ্‌র হক, যা করা না করার সাথে অন্য মানুষের কোন উল্লেখযোগ্য লাভ-ক্ষতি সম্পর্কযুক্ত নয়। যেমন— এবাদত, নামায, রোযা ইত্যাদি। (দুই) বান্দার হক। এর সম্পর্ক অন্য মানুষের সাথে। শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় উভয় প্রকার হক সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে উভয়ের বিপক্ষে কাজ করছিল।

তারা আল্লাহ্ তাআলা ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে আল্লাহ্‌র হকের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। এর সাথে ক্রয়-বিক্রয়ে মাপ ও ওজনে কম দিয়ে বান্দাদের হক নষ্ট করছিল। তদুপরি তারা রাস্তা ও সড়কের মুখে বসে থাকত এবং পথিকদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাদের ধন-সম্পদ লুটে নিত এবং শোয়ায়েব (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধা দিত। তারা এভাবে ভূপৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করছিল। এসব অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের হেদায়েতের জন্যে শোয়ায়েব (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম দু'আয়াতে তাদের সংশোধনের জন্যে শোয়ায়েব (আঃ) তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। একত্ববাদের এ দাওয়াতই সব পয়গম্বর দিয়ে এসেছেন। এটিই সব বিশ্বাস ও কর্মের প্রাণ। এ সম্প্রদায়ও সৃষ্টবস্তুর পূজায় লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহ্‌র সত্তা, গুণাবলী ও হক সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়েছিল। তাই তাদেরকে সর্বপ্রথম এ পয়গাম দেয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে ঃ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। এখানে 'সুস্পষ্ট প্রমাণ'-এর অর্থ ঐসব মো'জেযা, যা শোয়ায়েব (আঃ)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর মো'জেযার বিভিন্ন প্রকার তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে উল্লেখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ঃ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ

এতে كيل শব্দের অর্থ মাপ এবং ميزان শব্দের অর্থ ওজন করা। بخس শব্দের অর্থ কারও পাওনা হ্রাস করে ক্ষতি করা। অর্থাৎ তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষের দ্রব্যাদিতে কম দিয়ে তাদের ক্ষতি করো না।

এতে প্রথমে একটি বিশেষ অপরাধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ওজনে কম দিয়ে করা হত। অতঃপর وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ বলে সর্ব প্রকার হকে ক্রটি করাকে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা ধন-সম্পদ, ইযযত-আবরু অথবা অন্য যে কোন বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন।– (বাহ্‌রে মুহীত)

এ থেকে জানা গেল যে, মাপ ও ওজনে পাওনার চাইতে কম দেয়া যেমন – হারাম, তেমনি অন্যান্য হকে ক্রটি করাও হারাম। কারও ইযযত-আবরু নষ্ট করা, কারও পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সম্মান না করা, যাদের আনুগত্য জরুরী তাদের আনুগত্যে ক্রটি করা অথবা যার সম্মান করা ওয়াজেব, তার সম্মানে ক্রটি করা ইত্যাদি সবই এ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত, যা শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় করত। বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মানুষের ইযযত-আবরুকে তাদের রক্তের সমান সম্মানযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন।

কোরআন পাকে تطفيف ও مطففين এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত সব বিষয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি রুকূ-সেজদা করতে দেখে বললেন ঃ قد طففت অর্থাৎ, তুমি মাপ ও ওজনে ক্রটি করেছ। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক) অর্থাৎ, তুমি নামাযের হক পূর্ণ করনি। এখানে নামাযের হক পূর্ণ না করাকে تطفيف শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا

অর্থাৎ পৃথিবীর সংস্কার সাধিত হওয়ার পর তাতে অনর্থ ছড়িও না। এ বাক্যটি সূরা আ'রাফে পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে এর বিস্তারিত অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর বাহ্যিক সংস্কার হল, প্রত্যেকটি বস্তুকে যথার্থ স্থানে ব্যয় করা, এবং নির্ধারিত সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা। বস্তুতঃ তা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। আর আভ্যন্তরীণ সংস্কার হল আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তা তাঁর নির্দেশাবলী পালনের উপর ভিত্তিশীল। এমনিভাবে পৃথিবীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অনর্থ এসব নীতি ত্যাগ করার কারণেই দেখা দেয়। শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় এসব নীতির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিল। ফলে পৃথিবীতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সব রকম অনর্থ বিরাজমান ছিল। তাই তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের এসব কর্মকাণ্ড সমগ্র ভূপৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করবে। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাক।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ অর্থাৎ যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর, তবে এ বিষয়টি তোমাদের জন্যে উত্তম। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা অবৈধ কাজ-কর্ম থেকে বিরত হও, তবে এতেই তোমাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। ধর্ম ও পরকালীন মঙ্গলের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এটি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সাথেই সর্বতোভাবে জড়িত। ইহকালের মঙ্গল এ জন্যে যে, যখন সবাই জানতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তি মাপ ও ওজনে এবং অন্যান্য হকের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ, তখন বাজারে তার প্রভাব বিস্তৃত হবে এবং ব্যবসায়ে উন্নতি সাধিত হবে।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করার জন্যে পথে-ঘাটে ওত পেতে বসে থেকো না। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে উভয় বাক্যের উদ্দেশ্যই এক। অর্থাৎ, তারা রাস্তাঘাটে বসে শোয়ায়েব (আঃ) -এর কাছে আমানতকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করত। তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, তাদের পৃথক পৃথক দু'টি অপরাধ ছিল। পথে বসে লুটপাটও করত এবং শোয়ায়েব (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেও বাধা দিত। প্রথম বাক্যে প্রথম অপরাধ এবং দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে। বাহরে মুহীত প্রভৃতি তফসীর গ্রন্থে এ অর্থই গৃহীত হয়েছে। তারা শরীয়ত বিরোধী অবৈধ ট্যাক্স আদায় করার জন্যে রাস্তার মোড়ে স্থাপিত চৌকিসমূহকেও পথে বসে লুটপাট করার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আল্লামা কুরতবী বলেন ঃ যারা পথে বসে শরীয়ত বিরোধী অবৈধ ট্যাক্সআদায় করে, তারাও শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ন্যায় অপরাধী, বরং তাদের চাইতেও অধিক অত্যাচারী ও দুষ্কৃতিকারী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে বক্রতার অন্বেষণে ব্যাপৃত থাক, যাতে কোথাও অঙ্গুলি রাখার জায়গা পাওয়া গেলে আপত্তি ও সন্দেহের ঝড় সৃষ্টি করে মানুককে সত্য ধর্ম থেকে বিমুখ করার চেষ্টা করা যায়।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ এখানে তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্যে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয় পন্থা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত স্মরণ করানো হয়েছে যে, তোমরা পূর্বে সংখ্যা ও গণনার দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করে তোমাদেরকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করেছেন। অথবা তোমরা ধন-সম্পদের দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্ তাআলা ঐশ্বর্য্য দান করে তোমাদের স্বনির্ভর করে দিয়েছেন। অতঃপর ভীতি প্রদর্শনার্থ বলা হয়েছে ঃ পূর্ববর্তী অনর্থ সৃষ্টিকারী জাতিসমূহের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর—কওমে নূহ্, আদ, সামূদ ও কওমে লূতের উপর কি ভীষণ আযাব এসেছে। তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ করো।

পঞ্চম আয়াতে এ সম্প্রদায়ের একটি সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে। শোয়ায়েব (আঃ)-এর দাওয়াতের পর তাঁর সম্প্রদায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু সংখ্যক মুসলমান হয় এবং কিছু সংখ্যক কাফেরই থেকে যায়। কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয় দল একই রূপ আরাম-আয়েশে দিনাতিপাত করতে থাকে। এতে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে যে, কাফের হওয়া অপরাধ হলে অপরাধীরা অবশ্যই শাস্তি পেত। এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছে ঃ فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا অর্থাৎ, তাড়াহুড়া কিসের? আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় সহনশীলতা ও কৃপাগুণে অপরাধীদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারা যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌছে যায়, তখন সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা করে দেয়া হয়। তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। তোমরা যদি কুফর থেকে বিরত না হও, তবে অতি সত্বর কাফেরদের উপর চূড়ান্ত আযাব নাযিল হয়ে যাবে।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ
يٰشُعَيْبُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا
قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا
فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّٰهِ
تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ
الْفٰتِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ
شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخٰسِرُونَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا
فِي دَارِهِمْ جٰثِمِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا
فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلّٰى
عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ
فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِينَ ﴿٩٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ
إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾
ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ
اٰبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾

(৮৮) তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা বলল ঃ হে শোয়ায়েব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে। শোয়ায়েব বলল ঃ আমরা অপছন্দ করলেও কি? (৮৯) আমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি, অথচ তিনি আমাদেরকে এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের কাজ নয় এ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যদি চান। আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ্র প্রতিই আমরা ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন যথার্থ ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। (৯০) তার সম্প্রদায়ের কাফের সর্দাররা বলল ঃ যদি তোমরা শোয়ায়েবের অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (৯১) অনন্তর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে তারা সকাল বেলায় গৃহ মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৯২) শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপকারীরা যেন কোন দিন সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল। (৯৩) অনন্তর সে তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের হিত কামনা করেছি। এখন আমি কাফেরদের জন্যে কেন দুঃখ করব? (৯৪) আর আমি কোন জনপদে কোন নবী পাঠাইনি, তবে (এমতাবস্থায় যে) পাকড়াও করেছি সে জনপদের অধিবাসীদিগকে কষ্ট ও কঠোরতার মধ্যে, যাতে তারা শিথিল হয়ে পড়ে। (৯৫) অতঃপর অকল্যাণের স্থলে তা কল্যাণে বদলে দিয়েছি। এমনকি তারা অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং বলতে শুরু করেছে, আমাদের বাপ-দাদাদের উপরও এমন আনন্দ-বেদনা এসেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি এমন আকস্মিকভাবে যে তারা টেরও পায়নি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শোয়ায়েব (আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল ঃ আপনি যদি সত্যপন্থী হতেন, তবে আপনার অনুসারীরা সমৃদ্ধ হত এবং অমান্যকারীদের উপর আযাব আসত। কিন্তু হচ্ছে এই যে, উভয় দল সমভাবে আরামে দিন যাপন করছে। এমতাবস্থায় আমরা আপনাকে সত্যপন্থী বলে কিরূপে মেনে নিতে পারি? উত্তরে শোয়ায়েব (আঃ) বললেন ঃ তাড়াহুড়া কিসের? অতি সত্বর আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। এরপর সম্প্রদায়ের অহঙ্কারী সর্দাররা অত্যাচারী ও উদ্ধত লোকদের চিরাচরিত পন্থায় বলে উঠল ঃ হে শোয়ায়েব, হয় তুমি এবং তোমার অনুসারী মুমিনরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে, না হয় আমরা তোমাদেরকে বস্তি থেকে উচ্ছেদ করে দেব।

তাদের ধর্মে 'ফিরে আসা' কথাটা মুমিনদের ক্ষেত্রে যথার্থই প্রযোজ্য। কারণ, তারা পূর্বে তাদের ধর্মেই ছিল এবং পরে শোয়ায়েব (আঃ)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু শোয়ায়েব (আঃ) একদিনও তাদের মিথ্যা ধর্মে ছিলেন না। আল্লাহ্র কোন পয়গম্বর কখনও কোন মুশরিকসুলভ মিথ্যা ধর্মের অনুসারী হতেই পারেন না। এমতাবস্থায় তাঁকে ফিরে আসার কথা বলা সম্ভবতঃ এ কারণে ছিল যে, নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদের বাতিল কথাবার্তা ও কাজকর্ম দেখে চুপ থাকতেন এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। ফলে তাঁর সম্পর্কেও সম্প্রদায়ের লোকদের ধারণা ছিল যে, তিনিও তাদেরই সমধর্মী। ঈমানের দাওয়াত দেয়ার পর তারা জানতে পারল যে, তাঁর ধর্ম তাদের থেকে ভিন্ন অথবা তিনি তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন। শোয়ায়েব (আঃ) উত্তরে বললেনঃ أَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِينَ অর্থাৎ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি এই যে, তোমাদের ধর্মকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাব? অর্থাৎ, এটা হতে পারে না। এ পর্যন্ত প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হল।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, শোয়ায়েব (আঃ) জাতিকে বললেন ঃ তোমাদের মিথ্যা ধর্ম থেকে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এরপর আমরা যদি তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই, তবে এ হবে আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করা।

কেননা, প্রথমতঃ কুফর ও শিরককে ধর্ম বলে স্বীকার করার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলাই যেন এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা অপবাদ। এছাড়া বিশ্বাস স্থাপন করা এবং জ্ঞান ও চক্ষুষ্মানতা অর্জিত হওয়ার পর পুনরায় কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া যেন একথা বলা যে, পূর্বের ধর্ম মিথ্যা ও ভ্রান্ত ছিল। এখন যে ধর্ম গ্রহণ করা হচ্ছে, তাই সত্য ও বিশুদ্ধ। এটা দ্বিমুখী মিথ্যা ও অপবাদ। কারণ, এতে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলা হয়।

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর এ উক্তিতে এক প্রকার দাবী ছিল যে, তোমাদের ধর্মে আমরা কখনও ফিরে যেতে পারি না। এরূপ দাবী করা বাহ্যতঃ দাসত্বের পরিপন্থী এবং নৈকট্যশীল ও আধ্যাত্মবিদদের পক্ষে অসমীচীন; তাই পরে বলেছেন ঃ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ

يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا

অর্থাৎ, আমরা তোমাদের ধর্মে কখনও ফিরে যেতে পারি না। অবশ্য যদি (খোদা না করুন) আমাদের প্রতিপালকই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা

করেন, তবে ভিন্ন কথা। আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞান প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী। আমরা তাঁর উপরই ভরসা করেছি।

এতে স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমরা কোন কাজ করা অথবা না করার কে? কোন সৎকাজ করা অথবা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতেই হয়ে থাকে। যেমন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ فوا لله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولاصلينا
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কৃপা না হলে আমরা সৎপথ পেতাম না ছদকা খয়রাত করতে পারতাম না এবং নামায পড়তে সক্ষম হতাম না।

জাতির অহঙ্কারী সর্দারদের সাথে এ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার পর যখন শোয়ায়েব (আঃ) বুঝতে পারলেন যে, তারা কোন কিছুতেই প্রভাবান্বিত হচ্ছে না, তখন তাদের সাথে কথা-বার্তা ছেড়ে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করলেন ঃ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ফয়সালা করে দিন, সত্যভাবে এবং আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ فتح শব্দের অর্থ এখানে ফয়সালা করা। এ অর্থেই فاتح শব্দটি قاضى অর্থাৎ, বিচারক অর্থে ব্যবহৃত হয়।— (বাহ্‌রে মুহীত)

প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে শোয়ায়েব (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের কাফেরদেরকে ধ্বংস করার দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা এ দোয়া কবুল করে ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।

তৃতীয় আয়াতে অহঙ্কারী সর্দারদের একটি ভ্রান্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তারা পরস্পর অথবা নিজ নিজ অনুসারীদেরকে বলতে লাগল ঃ যদি তোমরা শোয়ায়েবের অনুসরণ কর, তবে অত্যন্ত বেওকুফ ও মূর্খ প্রতিপন্ন হবে।— (বাহ্‌রে মুহীত)

চতুর্থ আয়াতে তাদের আযাবের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ অর্থাৎ, তাদেরকে ভীষণ ভূমিকম্প পাকড়াও করল। ফলে তারা গৃহমধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের আযাবকে এ আয়াতে ভূমিকম্প বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদেরকে ছায়াদিবসের আযাব পাকড়াও করেছে। 'ছায়া দিবসের' অর্থ এই যে, প্রথমে তাদের উপর ঘন কাল মেঘের ছায়া পতিত হয়। তারা এর নীচে একত্রিত হয়ে গেলে এ মেঘ থেকেই তাদের উপর প্রস্তর অথবা অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উভয় আয়াতের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে বলেন ঃ শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রথমে এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেয়া হয়, যেন জাহান্নামের দরজা তাদের দিকে খুলে দেয়া হয়েছিল। ফলে তাদের শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকে। ছায়া এমন কি, পানিতেও তাদের জন্যে শান্তি ছিল না। তারা অসহ্য গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করে দেখল, সেখানে আরও বেশী গরম। অতঃপর অস্থির হয়ে জঙ্গলের দিকে ধাবিত হল। সেখানে আল্লাহ তাআলা একটি ঘন কাল মেঘ পাঠিয়ে দিলেন, যার নীচে শীতল বাতাস বইছিল। তারা সবাই গরমে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে মেঘের নীচে এসে ভিড় করল। তখন মেঘমালা আগুনে রূপান্তরিত হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হল এবং ভূমিকম্পও এল। ফলে তারা সবাই ভস্মস্তূপে পরিণত হল। এভাবে তাদের উপর ভূমিকম্প ও ছায়ার আযাব উভয়টিই আসে।— (বাহ্‌রে মুহীত)

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এটাও সম্ভব যে, তাদের বিভিন্ন অংশের উপর বিভিন্ন আযাব এসেছে। ফলে এক অংশ ভূমিকম্পে এবং এক অংশ ছায়া আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে তাদের ঘটনা থেকে অন্যান্যকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা এ ঘটনা বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا - غنى শব্দের এক অর্থ কোন স্থানে আরাম আয়েশে জীবন-যাপন করা। এখানে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেসব গৃহে আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করত, আযাবের পর এমন অবস্থা হল, যেন এখানে কোনদিন আরাম-আয়েশের নাম নিশানাও ছিল না। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ অর্থাৎ, যারা শোয়ায়েব (আঃ)-কে মিথ্যা বলেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা শোয়ায়েব (আঃ) ও তাঁর মুমিন সঙ্গীদেরকে বস্তি থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দিত, পরিণামে ক্ষতির বোঝা তাদের ঘাড়েই চেপেছে।

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ অর্থাৎ, স্বজাতির উপর আযাব আসতে দেখে শোয়ায়েব (আঃ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। তফসীরবিদগণ বলেন যে, তাঁরা মক্কা মুয়াযযমায় চলে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন।

জাতির চরম অবাধ্যতায় নিরাশ হয়ে শোয়ায়েব (আঃ) বদদোয়া করেছিলেন ঠিকই কিন্তু যখন আযাব এসে গেল, তখন পয়গম্বরসুলভ দয়ার কারণে তাঁর অন্তর ব্যথিত হল। তাই নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে জাতির উদ্দেশে বললেন ঃ আমি তোমাদের কাছে প্রতিপালকের নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় কোন ত্রুটি করিনি; কিন্তু আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কতটুকু কি করতে পারি?

পূর্ববর্তী নবিগণ (আঃ), তাঁদের জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক অবস্থা ও স্মরণীয় ঘটনাবলী যার বর্ণনাধারা কয়েক রুকূ পূর্ব থেকেই চলে আসছে, তাতে এ পর্যন্ত পাঁচ জন নবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ কাহিনীটি হযরত মূসা(আঃ) এবং তাঁর সম্প্রদায় বনী-ইসরাঈলের।

পূর্বেই বলা হয়েছে, কোরআনে করীম বিশ্ব-ইতিহাস এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির অবস্থা বর্ণনা করে। কিন্তু তার বর্ণনারীতি হল এই যে, তাতে সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থ কিংবা গল্প-উপন্যাসের মত আলোচ্য বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা না করে বরং স্থান ও কালের উপযোগিতা অনুসারে ইতিহাস ও গল্প-কাহিনীর অংশবিশেষ তুলে ধরা হয়। সে সঙ্গে আলোচ্য কাহিনীতে প্রাপ্ত নিদর্শনমূলক ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এ নিয়ম অনুযায়ী সে পাঁচটি কাহিনী বর্ণনার পর এখানে কিছু সতর্কতামূলক প্রসঙ্গ অলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় এবং 'আদ' ও 'সামূদ জাতিকে যেসব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা শুধুমাত্র তাদের সাথেই এককভাবে সম্পৃক্ত নয়, বরং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বীয় রীতি অনুযায়ী দুনিয়ার বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট জাতি-সম্প্রদায়ের সংশোধন ও কল্যাণ সাধনকল্পে যেসব নবি-রসূল প্রেরণ করেন তাঁদের আদেশ-উপদেশের প্রতি যারা মনোনিবেশ করে না প্রথমে তাদেরকে পার্থিব বিপদাপদের সম্মুখীন করা হয়, যাতে এই বিপদাপদের চাপে তারা নিজেদের গতি আল্লাহ্ তাআলার প্রতি পরিবর্তিত করে নিতে পারে।

কারণ, প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের মনে বিপদাপদের মুখেই আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয় বেশী। আর এই বাহ্যিক দুঃখকষ্ট প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ রাহ্মানুর-রহীমেরই দান। উল্লেখিত আয়াতে بأساء ও بؤس শব্দ দু'টির অর্থ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা। আর ضراء ও ضر শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো রোগ ও ব্যাধি। কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত অর্থেই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)-ও এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। কোন কোন অভিধানবিদ অবশ্য بأساء ও بؤس শব্দ দু'টির অর্থ আর্থিক ক্ষতি এবং ضراء ও ضر অর্থ শারীরিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি বলে উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ উভয়বিদ অর্থেরই মর্ম এক।

আয়াতটির মর্ম হচ্ছে এই যে, যখনই আমি কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি রসূল প্রেরণ করি এবং সে জাতি তাঁদের কথা অমান্য করে, তখন আমার রীতি হলো, প্রথমে সে অবাধ্য লোকগুলোকে পৃথিবীতেই অর্থনৈতিক ও শারীরিক ক্ষতি আর রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে দেয়া যাতে পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে। পরবর্তি আয়াতে ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا এখানে سَيِّئَةٌ শব্দে পূর্বোল্লেখিত দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির দুরবস্থাই উদ্দেশ করা হয়েছে। আর حَسَنَةٌ শব্দে উদ্দেশ করা হয়েছে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির বিপরীত দিক; ধন-সম্পদের বিস্তৃতি ও স্বচ্ছলতা এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। عفوا শব্দটি عفو থেকে উদ্ভূত। এর একটি অর্থ হয় প্রবৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করা।

সারমর্ম এই যে, প্রথম পরীক্ষাটি নেয়া হয়েছে তাদিগকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে। তারা যখন তাতে অকৃতকার্য হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ফিরে আসেনি, তখন দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেয়া হয় দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির পরিবর্তে তাদের ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে। তাতে তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে এবং অনেক গুণে বেড়ে যায়। এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা দুঃখ-কষ্টের পরে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং এভাবে যেন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ফিরে আসে। কিন্তু কর্মবিমুখ, শৈথিল্যপরায়ণের দল তাতেও সতর্ক হয়নি। বরং বলতে শুরু করে দেয় যে, 'এটা কোন নতুন বিষয় নয়, সৎ কিংবা অসৎ কর্মের পরিণতিও নয়; বরং প্রকৃতির নিয়মই তাই, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ, কখনও রোগ কখনও স্বাস্থ্য, কখনও দারিদ্র্য, কখনও স্বচ্ছলতা— এমনই হয়ে থাকে। আমাদের পিতা-পিতামহ প্রমুখ পূর্ব-পুরুষদেরকেও এমনি সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর তখনই ধরা পড়লো আকস্মিক আযাবের মধ্যে। فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (বাগ্‌তাতান) হঠাৎ, সহসা বা অকস্মাৎ। তার অর্থ, যখন তারা উভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়ে গেল এবং সতর্ক হলো না, তখন আমি তাদেরকে আকস্মিক আযাবের মাধ্যমে ধরে ফেললাম এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন খবরই ছিল না।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ ۖ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾

(৯৬) আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে। (৯৭) এখনও কি এই জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, আমার আযাব তাদের উপর রাতের বেলায় এসে পড়বে অথচ তখন তারা থাকবে ঘুমে অচেতন। (৯৮) আর এই জনপদের অধিবাসীরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর আমার আযাব দিনের বেলাতে এসে পড়বে অথচ তারা তখন থাকবে খেলা-ধুলায় মত্ত। (৯৯) তারা কি আল্লাহ্‌র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে। (১০০) তাদের নিকট কি একথা প্রকাশিত হয়নি, যারা উত্তরাধিকার লাভ করেছে। সেখানকার লোকদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে তাদেরকে তাদের পাপের দরুন পাকড়াও করে ফেলতাম। বস্তুতঃ আমি মোহর এঁটে দিয়েছি তাদের অন্তরসমূহের উপর। কাজেই এরা শুনতে পায় না। (১০১) এগুলো হল সেসব জনপদ যার কিছু বিবরণ আমি আপনাকে অবহিত করছি। আর নিশ্চিতই ওদের কাছে পৌঁছেছিলেন রসূল নিদর্শন সহকারে। অতঃপর কস্মিনকালেও এরা ঈমান আনবার ছিল না, তারপরে যা তারা ইতিপূর্বে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেছে। এভাবেই আল্লাহ্ কাফেরদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন। (১০২) আর তাদের অধিকাংশ লোককেই আমি প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারীরূপে পাইনি; বরং তাদের অধিকাংশকে পেয়েছি হুকুম অমান্যকারী। (১০৩) অতঃপর আমি তাঁদের পরে মূসাকে পাঠিয়েছি নিদর্শনাবলী দিয়ে ফেরাউন ও তার সভাসদদের নিকট। বস্তুতঃ ওরা তাঁর মোকাবেলায় কুফরী করেছে। সুতরাং চেয়ে দেখ, কি পরিণতি হয়েছে অনাচারীদের। (১০৪) আর মূসা বললেন, হে ফেরাউন, আমি বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত রসূল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থাৎ, সে জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং নাফরমানী থেকে বিরত থাকত তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা যখন মিথ্যারোপ করেছে, তখন আমি তাদেরকে তাদেরই কৃতকর্মের দরুন পাকড়াও করেছি।

বরকতের শাব্দিক অর্থ প্রবৃদ্ধি। 'আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকত খুলে দেয়া' বলতে উদ্দেশ্য হল সব রকম কল্যাণ সবদিক থেকে খুলে দেয়া। অর্থাৎ, তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হত আর যমীন থেকে যে কোন বস্তু তাদের মনোমত উৎপাদিত হত এবং অতঃপর সেসব বস্তু দ্বারা তাদের লাভবান হওয়ার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেয়া হত। তাতে তাদেরকে এমন কোন চিন্তা-ভাবনা কিংবা টানাপোড়নের সম্মুখীন হতে হত না যার দরুন বড় বড় নেয়ামতও পঙ্কিলতাপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের প্রতিটি বিষয়ে বরকত বা প্রবৃদ্ধি ঘটত।

পৃথিবীতে বরকতের বিকাশ ঘটে দু'রকমে। কখনও মূল বস্তুটি প্রকৃতভাবেই বেড়ে যায়। যেমন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মো'জেযাসমূহের মধ্যে রয়েছে, একটা সাধারণ পাত্রের পানি দ্বারা গোটা কাফেলার পরিতৃপ্ত হওয়া। কিংবা সামান্য খাদ্য-দ্রব্যে বিরাট সমাবেশের পূর্ণোদর খাওয়া যা সঠিক ও বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে। আবার কোন কোন সময় মূল বস্তুতে বাহ্যতঃ কোন বরকত বা প্রবৃদ্ধি যদিও হয় না, পরিমাণ যা ছিল তাই থেকে যায়, কিন্তু তার দ্বারা এতবেশী কাজ হয় যা এমন দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বস্তুর দ্বারাও সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। তাছাড়া সাধারণভাবেও দেখা যায় যে, কোন একটা পাত্র, কাপড়-চোপড় কিংবা ঘরদোর অথবা ঘরের অন্য কোন আসবাবপত্র এমন বরকতময় হয় যে, মানুষ তাতে আজীবন উপকৃত হওয়ার পরেও তা তেমনি বিদ্যমান থেকে যায়। পক্ষান্তরে অনেক জিনিস তৈরী করার সময়ই ভেঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা অটুট থাকলেও তার দ্বারা উপকার লাভের কোন সুযোগ আসে না। অথবা উপকারে আসলেও তাতে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না।

এই বরকত মানুষের ধন-সম্পদেও হতে পারে, মন মস্তিষ্কেও হতে পারে, আবার কাজ-কর্মেও হতে পারে। কোন কোন সময় মাত্র একগ্রাস খাদ্যও মানুষের জন্য পূর্ণশক্তি-সামর্থ্যের কারণ হয়। আবার কোন কোন সময় অতি উত্তম পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য বা ওষুধও কোন কাজে আসে না। তেমনিভাবে কোন সময়ের মধ্যে বরকত হলে মাত্র এক ঘন্টা সময়ে এত অধিক কাজ করা যায়, যা অন্য সময় চার ঘন্টায়ও করা যায় না। বস্তুতঃ এসব ক্ষেত্রে পরিমাণের দিক দিয়ে সম্পদ বা সময় বাড়ে না সত্য, কিন্তু এমনি বরকত তাতে প্রকাশ পায় যাতে কাজ হয় বহুগুণ বেশী।

এ আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টি ও বস্তু-রাজির বরকত ঈমান ও পরহেযগারীর উপরই নির্ভরশীল। ঈমান ও পরহেযগারীর পথ অবলম্বন করলে আখেরাতের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কল্যাণ এবং বরকতও লাভ হয়। পক্ষান্তরে ঈমান ও পরহেযগারী পরিহার করলে সেগুলোর কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত

হতে হয়। বর্তমান বিশ্বের যে অবস্থা সেদিকে লক্ষ্য করলে বিষয়টি বাস্তব সত্য হয়ে সামনে এসে যায়। এখন বাহ্যিক দিক দিয়ে জমির উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী। তাছাড়া ব্যবহার্য দ্রব্যাদির আধিক্য এবং নতুন নতুন আবিষ্কার এত বেশী যা পূর্ববর্তী বংশধরেরা ধারণা–কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু এ সমুদয় বস্তু উপকরণের প্রাচুর্য্য ও আধিক্য সত্বেও আজকের মানুষকে নিতান্তই হতবুদ্ধি, রুগ্ন ও দারিদ্র্য–প্রপীড়িত দেখা যায়। সুখ ও শান্তি কিংবা মানসিক প্রশান্তির অস্তিত্ব কোথাও নেই। এর কারণ এছাড়া আর কি বলা যায় যে, উপকরণ সবই বর্তমান এবং প্রচুর পরিমাণেই বর্তমান, কিন্তু এ সবের বরকত শেষ হয়ে গেছে।

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ

أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ আয়াতে يهدى، هدى অর্থ চিহ্নিতকরণ এবং বাত্‌লে দেয়া। এখানে এর কর্তা হল সে সমস্ত ঘটনাবলী যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, বর্তমান যুগের লোকেরা যারা অতীত জাতিসমূহের ধ্বংসের পরে তাদের ভূ–সম্পত্তি ও ঘর–বাড়ীর উত্তরাধিকারী হয়েছে, কিংবা পরে হবে, তাদেরকে শিক্ষণীয় সেসব অতীত ঘটনাবলী একথা বাতলে দেয়নি যে, কুফরী ও অস্বীকৃতি এবং আল্লাহ্‌র বিধানের বিরোধিতার পরিণতিতে যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষেরা (অর্থাৎ, বিগত জাতিসমূহ) ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। তেমনিভাবে তারাও যদি অনুরূপ অপরাধে লিপ্ত থাকে, তাহলে তাদের উপরও আল্লাহ্ তাআলার আযাব ও গযব আসতে পারে।

অতঃপর বলা হয়েছে— وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

طبع শব্দের অর্থ ছাপ এবং মোহর লাগানো। তার মানে, এরা অতীত ঘটনাবলী থেকেও কোন রকম শিক্ষা গ্রহণ করে না। ফলে আল্লাহ্‌র গযবের দরুন তাদের অন্তরে মোহর এঁটে যায়; তারা তখন কিছু শুনতে পায় না। হাদীসে মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, কোন লোক যখন প্রথম প্রথম পাপ কাজ করে, তখন তার অন্তরে কালির একটা বিন্দু লেগে যায়। দ্বিতীয়বার পাপ করলে দ্বিতীয় বিন্দু লাগে আর তৃতীয়বার পাপ করলে তৃতীয় বিন্দুটি লেগে যায়। এমনকি সে যদি অনবরত পাপের পথে অগ্রসর হতে থাকে, তওবা না করে, তাহলে এই কালির বিন্দু তার সমগ্র অন্তরকে ঘিরে ফেলে ও মানুষের অন্তরে ভাল–মন্দকে চেনার এবং মন্দ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্ তাআলা যে স্বাভাবিক যোগ্যতাটি দিয়ে রেখেছেন, তা হয় নিঃশেষিত, না হয় পরাভূত হয়ে যায়। আর তখন তার ফল দাঁড়ায় এই যে, সে ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল এবং ইষ্টকে অনিষ্ট, অনিষ্টকে ইষ্ট বলে ধারণা করতে আরম্ভ করে। এ অবস্থানটিকেই কোরআনে ران অর্থাৎ, অন্তরের মরচে বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর এ অবস্থার সর্বশেষ পরিণতিকেই আলোচ্য আয়াতে এবং আরও বহু আয়াতে طبع অর্থাৎ, মোহর এঁটে দেয়া হয় বলা হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, মোহর লেগে যাওয়ার পরিণতি তো জ্ঞান–বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি–কানের দ্বারা শ্রবণের উপর তো তার কোন প্রতিক্রিয়া স্বভাবতঃ হওয়ার কথা নয়। কাজেই উক্ত আয়াতের এ স্থানটিতে فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ অর্থাৎ, 'তারা বোঝে না' বলাই সমীচীন ছিল। কিন্তু কোরআনে–করীমে এ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ অর্থাৎ, তারা শুনে না। এর কারণ হলো এই যে, এখানে শোনা অর্থ মান্য করা এবং অনুসরণ করা, যা বোঝা বা উপলব্ধি করারই ফল। কাজেই প্রকৃত মর্ম দাঁড়ায় এই যে, অন্তরে মোহর এঁটে যাবার দরুন তারা কোন সত্য ও ন্যায় বিষয়কে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ হয় না। তাছাড়া এও বলা যেতে পারে যে, মানুষের অন্তর হল তার সমস্ত অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ ও অনুভূতিসমূহের কেন্দ্র। অন্তরের ক্রিয়ায় যখন কোন রকম গোলযোগ দেখা দেয়, তখন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের যাবতীয় কার্যকলাপও গোলযোগপূর্ণ হয়ে যায়। অন্তরে যখন কোন বিষয়ের ভাল কিংবা মন্দ বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন চোখেও তাই দেখা যায় এবং কানেও তাই শোনা যায়।

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا আয়াতে এখানে انباء শব্দটি نبأ এর বহুবচন। যার অর্থ কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। অর্থাৎ, বিধ্বস্ত জনপদসমূহের কোন কোন ঘটনা আপনাকে বলছি। এখানে من বিশেষণের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের যে ঘটনাবলী আলোচনা করা হলো, এগুলোই শেষ নয়, বরং এমন হাজারো ঘটনার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাত্র।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ, এসব লোকদের প্রতি প্রেরিত নবী ও রসূলগণ তাদের কাছে মু'জেযা (অলৌকিক নিদর্শন)— সমূহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা হয়ে যায়, কিন্তু তাদের একগুঁয়েমী ও হঠকারিতার এমনি অবস্থা ছিল যে, যে বিষয় সম্পর্কে একবার তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়তো যে এটা ভুল এবং মিথ্যা, তখন আর সে বিষয়ের যথার্থতা ও সত্যতার পক্ষে যতই মু'জেযা এবং দলীল–প্রমাণ উপস্থিত হোক না কেন, কিছুতেই তারা আর তাকে বিশ্বাস ও স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ হতো না।

এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় জানা গেল যে, সমস্ত নবী–রসূলকেই মু'জেযা দান করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কোন নবী (আঃ)–এর মু'জেযার আলোচনা কোরআনে এসেছে, অনেকের আসেও নি। এতে এমন কোন ধারণা করা যথার্থ হতে পারে না যে, যাদের মু'জেযার বিষয় কোরআনে আলোচিত হয়নি, আদৌ তাদের কোন মু'জেযাই ছিল না। আর সূরা হুদ–এ হযরত হুদ (আঃ)–এর সম্প্রদায়ের যে উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ অর্থাৎ, আপনি কোন মু'জেযা উপস্থিত করেননি— এই আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, তাদের এ উক্তিটি ছিল শুধুমাত্র হঠকারিতা ও একগুঁয়েমীবশতঃ কিংবা তাঁর মু'জেযাগুলোকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে একথা বলেছিল।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে তাদের যে অবস্থার কথা বলা হয়েছে যে, কোন ভুল কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলে তারা তাই পালন করত; তার বিপরীতে যতই প্রকৃষ্ট দলীল–প্রমাণ আসুক না কেন, নিজের ধ্যান–ধারণা থেকে ফিরতো না। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ও কাফের জাতিসমূহের এমনি অবস্থা। বহু মুসলমান এমনকি আলেম–ওলামা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এ ব্যাধিতে ভুগছেন। প্রথম ধাক্কায় একবার কোন বিষয়কে মিথ্যা বা ভুল বলে উচ্চারণ করে ফেললে পরে বিষয়টির সত্যতার হাজারো প্রমাণ উপস্থাপিত হলেও তাঁরা নিজের সে ধারণাই অনুসরণ করতে থাকেন। সুফীতত্ত্ব মতে এ অবস্থাটি আল্লাহ্‌র গযবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অতঃপর বলা হয়েছে كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ অর্থাৎ, যেভাবে তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে সাধারণ কাফের ও নাস্তিকদের অন্তরেও আল্লাহ্ মোহর এঁটে দিয়ে থাকেন, যাতে সততা বা নেকী অবলম্বনের যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না।

তারপর বলা হয়েছে, وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ অর্থাৎ, আমি

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ
مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ
بِـَٔايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ
فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ
لِلنَّٰظِرِينَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ
عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾
قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿١١١﴾ يَأْتُوكَ
بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا۟ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا
إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾
قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾
قَالَ أَلْقُوا۟ فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ
وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ
فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا
كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا۟ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُوا۟ صَٰغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَ
أُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٢١﴾

(১০৫) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়। আমি তোমাদের পরওয়ারদেগারের নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলদেরকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও। (১০৬) সে বলল, যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থিত কর যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। (১০৭) তখন তিনি নিক্ষেপ করলেন নিজের লাঠিখানা এবং তৎক্ষণাৎ তা জলজ্যান্ত এক অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। (১০৮) আর বের করলেন নিজের হাত এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। (১০৯) ফেরাউনের সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলতে লাগল, নিশ্চয় লোকটি বিজ্ঞ-যাদুকর। (১১০) সে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এ ব্যাপারে তোমাদের কি মত? (১১১) তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দান করুন এবং শহরে বন্দরে লোক পাঠিয়ে দিন লোকদের সমবেত করার জন্য-(১১২) যাতে তারা পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন বিজ্ঞ যাদুকরদের এনে সমবেত করে। (১১৩) বস্তুতঃ যাদুকররা এসে ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হল। তারা বলল, আমাদের জন্য কি কোন পারিশ্রমিক নির্ধারিত আছে, যদি আমরা জয়লাভ করি? (১১৪) সে বলল, হাঁ। এবং অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোক হয়ে যাবে। (১১৫) তারা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা আমরা নিক্ষেপ করছি। (১১৬) তিনি বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন লোকদের চোখগুলোকে ধাঁধিয়ে দিল, ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং মহাযাদু প্রদর্শন করল। (১১৭) তারপর আমি ওহীযোগে মূসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপ কর তোমার লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তারা বানিয়েছিল যাদু বলে। (১১৮) সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য বিষয় এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা করেছিল। (১১৯) সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল। (১২০) এবং যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। (১২১) বলল, আমরা ঈমান আনছি মহা বিশ্বের পরওয়ারদেগারেরপ্রতি।

তাদের অধিকাংশকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য থেকে বিমুখ পেয়েছি।

এ পর্যন্ত বিগত নবী-রসূল (আঃ)-গণ এবং তাঁদের জাতি সম্প্রদায়ের পাঁচটি ঘটনা বিবৃত করার মাধ্যমে বর্তমান উম্মতকে সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ দেয়া হয়েছে।

অতঃপর ষষ্ঠ ঘটনাটিতে হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এতে প্রসঙ্গক্রমে বহু হুকুম-আহকাম, মাসআলা-মাসায়েল এবং শিক্ষা ও উপদেশসংক্রান্ত বিচিত্র বিষয় রয়েছে। সেজন্যই কোরআন করীমে এ ঘটনার অংশবিশেষ বার বার পুনরাবৃত হয়েছে।

এ সূরা নবী-রসূলগণ এবং তাদের জাতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে যত কাহিনী ও ঘটনাবলী আলোচনা করা হয়েছে, এ হল সেগুলার মধ্যে ষষ্ঠ কাহিনী। এখানে এ কাহিনীটি বেশী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কারণ এই যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর মু'জেযাসমূহ বিগত অন্যান্য নবী-রসূলগণের তুলনায় যেমন সংখ্যায় বেশী, তেমনিভাবে প্রকাশের বলিষ্ঠতার দিক দিয়েও অধিক। এমনিভাবে তাঁর সম্প্রদায় বনী-ইসরাঈলের মূর্খতা এবং হঠকারিতাও বিগত উম্মত বা জাতিসমূহের তুলনায় বেশী কঠিন। তদুপরি এই কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও হুকুম-আহকামের কথা এসেছে।

১০৩ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, তাঁদের পরে অর্থাৎ, হযরত নূহ, হুদ সালেহ, লূত ও শোয়াইব (আঃ)-এর বা তাঁদের জাতি ও সম্প্রদায়ের পরে আমি হযরত মূসা (আঃ)-কে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার জাতির প্রতি পাঠিয়েছি। নিদর্শন বা আয়াত' বলতে আসমানী কিতাব তাওরাতের আয়াতও হতে পারে, কিংবা হযরত মূসা (আঃ)-এর মু'জেযাসমূহও হতে পারে। আর সে যুগে 'ফেরাউন' হতো মিসরের সম্রাটের খেতাব। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ে যে ফেরাউন ছিল তার নাম 'কাবুস' বলে উল্লেখ করা হয়।—(কুরতুবী)

فَظَلَمُوا بِهَا - এর যে সর্বনাম তার লক্ষ্য হল নিদর্শন। অর্থাৎ, তারা আয়াত বা নিদর্শনসমূহের প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহ্‌র আয়াত বা নিদর্শনের প্রতি জুলুম করার অর্থ হল এই যে আল্লাহ্ তাআলার আয়াত বা নিদর্শনের কোন মর্যাদা বোঝেনি। সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরী অবলম্বন করেছে। কারণ, জুলুম-এর প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে কোন বস্তু বা বিষয়কে তার সঠিক স্থান কিংবা সঠিক সময়ের বিপরীত ব্যবহার করা।

অতঃপর বলা হয়েছে , فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ অর্থাৎ, চেয়ে দেখ না, সেই দাঙ্গা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কি পরিণতি ঘটেছে। এর মর্মার্থ এই যে, ওদের দুষ্কর্মের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা কর এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১০৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনকে বললেন, আমি বিশ্ব পালক আল্লাহ্ তাআলার রসূল। আর আমার অবস্থা এই যে, আমার যে নবুওয়তী মর্যাদা তার দাবী হলো, যাতে আমি আল্লাহ্‌র প্রতি সত্য ছাড়া কোন বিষয় আরোপ না করি। কারণ, নবীগণকে (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সত্যের যে পয়গাম দান করা হয়, তা হয় তাঁদের নিকট আল্লাহ্‌র আমানত। নিজের পক্ষ থেকে সেগুলোতে কোন

পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা সবই আমানতের খেয়ানত। পক্ষান্তরে নবী-রসূলগণ হলেন খেয়ানত ও যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত-নিষ্পাপ। সারকথা, আমার কথার উপর তোমাদের বিশ্বাস এজন্য স্থাপন করা কর্তব্য যে, আমার সত্যতা তোমাদের সবার সামনে ভাস্বর ; আমি কখনও মিথ্যা বলিওনি, বলতে পারিও না। তাছাড়া قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ অর্থাৎ, শুধু তাই নয় যে, আমি কখনও মিথ্যা বলিনি ; বরং আমার দাবীর স্বপক্ষে আমার মু'জেযাসমূহও প্রমাণ হিসাবে রয়েছে। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রেক্ষিতে তোমরা আমার কথা শুন, আমার কথা মান। বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়কে অন্যায় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আমার সাথে দিয়ে দাও। কিন্তু ফেরাউন অন্য কোন কথাই লক্ষ করল না ; মু'জেযা দেখাবার দাবী করতে লাগল এবং বলল, إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ, বাস্তবিকই যদি তুমি কোন মু'জুযা নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থাপন কর যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।

হযরত মূসা (আঃ) তার দাবী মেনে নিয়ে স্বীয় লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিলেন ; আর অমনি তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়ে গেল فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ 'সু'বান' বলা হয় বিরাটকায় অজগরকে। আর তার গুণবাচক مُّبِيْنٌ (মুবীন) শব্দ উল্লেখ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, সে লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা এমন কোন ঘটনা ছিল না যা অন্ধকারে কিংবা পর্দার আড়ালে ঘটে থাকবে, যা কেউ দেখে থাকবে, কেউ দেখবে না— সাধারণতঃ যা যাদুকর বা ঐন্দ্রজালিকদের বেলায় ঘটে থাকে। বরং এ ঘটনাটি— সংঘটিত হল প্রকাশ্য দরবারে, সবার সামনে।

কোন কোন ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সেই অজগর ফেরাউনের প্রতি যখন হা করে মুখ বাড়াল, তখন সে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর শরণাপন্ন হল; আর দরবারের বহু লোক ভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল। - (তফসীরে - কবীর)

লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়, অবশ্য সাধারণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে এটা যে অত্যন্ত বিস্ময়কর, তাতে সন্দেহ নেই। আর মু'জেযা বা কারামতের উদ্দেশ্যও থাকে তাই। যে কাজ সাধারণ মানুষ করতে পারে না, তা নবী-রসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত করে দেয়া হয় যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, তাঁদের সঙ্গে কোন ঐশীশক্তি সক্রিয় রয়েছে। কাজেই হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা বিস্ময়কর কিংবা অস্বীকার করার মত কোন বিষয় হতে পারে না।

অতঃপর বলা হয়েছে — وَنَزَعَ يَدَهٗ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ — نزع (নাযউন) অর্থ হচ্ছে কোন একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর ভেতর থেকে কিছুটা বল প্রয়োগের মাধমে বের করা। অর্থাৎ, নিজের হাতটিকে টেনে বের করলেন। এখানে কিসের ভেতর থেকে বের করলেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে দু'টি বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। এক স্থানে এসেছে স্বীয় হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নীচে থেকে অর্থাৎ, কখনও গলাবন্ধের ভিতরে ঢুকিয়ে হাত বের করলে আবার কখনও বগল তলে দাবিয়ে সেখান থেকে বের করে আনলে এ মু'জেযা প্রকাশ পেত অর্থাৎ, সে হাতটি দর্শকদের সামনে প্রদীপ্ত হতে থাকতো।

তখন ফেরাউনের দাবীতে হযরত মূসা (আঃ) দু'টি মু'জেযা প্রদর্শন করেছিলেন। একটি হল লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া; আর অপরটি হল হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নীচে দাবিয়ে বের করে আনলে তার প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠা। প্রথম মু'জেযাটি ছিল বিরোধীদিগকে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য; আর দ্বিতীয়টি তাদেরকে আকৃষ্ট করে কাছে আনার উদ্দেশে। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, মূসা (আঃ)-এর শিক্ষায় একটি হেদায়েতের জ্যোতি রয়েছে; আর সেটির অনুসরণ ছিল কল্যাণের কারণ।

قَالَ الْمَلَأُ - ملأ শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোন সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতৃবর্গকে বোঝাবার জন্য। অর্থ হচ্ছে এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এসব মু'জেযা দেখে তাদের সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলল, এ যে বড় পারদর্শী যাদুকর। তার কারণ, প্রত্যেকের চিন্তাই তার নিজ যোগ্যতা অনুসারেই হয়ে থাকে। সে হতভাগারা আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কুদরত ও মহিমা সম্পর্কে কি বুঝবে, যারা জীবনভর ফেরাউনকে খোদা আর যাদুকরদিগকে নিজেদের পথপ্রদর্শক মনে করেছে এবং যাদুকরদের ভোজবাজীই দেখে এসেছে। কাজেই তারা এহেন বিস্ময়কর ঘটনা দেখার পর এছাড়া আর কিইবা বলতে পারত যে, এটা একটা মহাযাদু। কিন্তু তারাও এখানে ساحر এর সাথে عليم শব্দটি যোগ করে একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) - এর মু'জেযা সম্পর্কে তাদের মনেও এ অনুভূতি জন্মেছিল যে, এ কাজটি সাধারণ যাদুকরদের কাজ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির। সেজন্যই স্বীকার করে নিয়েছে যে, তিনি বড়ই বিজ্ঞ যাদুকর।

মু'জেযা ও যাদুর পার্থক্য ঃ বস্তুত ঃ আল্লাহ্ তাআলা সর্বযুগেই নবী রসূলগণের মু'জেযাসমূহকে এমনি ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন যে, দর্শকবৃন্দ যদি সামান্যও চিন্তা করে আর হঠকারিতা অবলম্বন না করে, তাহলে মু'জেযা ও যাদুর মাঝে যে পার্থক্য তা নিজেরাই বুঝতে পারে। যাদুকররা সাধারণতঃ অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে থাকে। পঙ্কিলতা ও অপবিত্রতা যত বেশী হবে, তাদের যাদুও তত বেশী কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হল নবী রসূলগণের সহজাত অভ্যাস। আর এও একটা পরিষ্কার পার্থক্য যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই নবুওয়তের দাবীর পর কারও কোন যাদু কার্যকর হয় না।

তাছাড়া বিজ্ঞজনেরা জানেন যে, যাদুর মাধ্যমে যে বিষয় প্রকাশ করা হয়, সেসব মানসিক বিষয়সমূহের আওতাভুক্তই হয়ে থাকে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, সে বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের মাঝে প্রকাশ পায় না; বরং অন্তর্নিহিত থাকে। কাজেই সে মনে করে, একাজটি বাহ্যিক কোন কারণ ছাড়াই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে মু'জেযাতে বাহ্যিক বা মানসিক কোন বিষয়ের সামান্যতম সংযোগও থাকে না। তা সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের কাজ। তাই কোরআন মজীদে এ বিষয়টিকে আল্লাহ্ তাআলারা সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন, وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى - এবং আল্লাহ্ তাআলাই সে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মু'জেযা এবং যাদুর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী। যারা তত্ত্বজ্ঞ তাদের কাছে এতদুভয়ের মিলে যাওয়ার কোন কারণই নেই। তবে সাধারণ মানুষের কাছে তা মিলে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এই বিভ্রান্তিটি দূর করার উদ্দেশে এমনসব বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে দিয়েছেন যার ফলে মানুষ ধোকা থেকে বেঁচে যেতে পারে।

সারমর্ম এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ও হযরত মূসা (আঃ)-এর মু'জেযাকে নিজেদের যাদুকরদের কার্যকলাপ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্রই মনে করেছিল। সেজন্যই একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, এ যে বড় বিজ্ঞ

যাদুকর, সাধারণ যাদুকররা যে এমন কাজ দেখাতে পারে না।

يُّرِيۡدُ اَنۡ يُّخۡرِجَكُمۡ مِّنۡ اَرۡضِكُمۡ فَمَاذَا تَاۡمُرُوۡنَ অর্থাৎ, এই বিজ্ঞ যাদুকরের ইচ্ছা হলো তোমাদিগকে দেশ থেকে বের করে দেয়া। এবার বল, তোমরা কি পরামর্শ দাও?

এ আয়াতগুলোতে মূসা (আঃ)-এর অবশিষ্ট কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে যে, ফেরআউন যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রকৃষ্ট মু'জেযা দেখল; লাঠি মাটিতে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তা সাপে পরিণত হয়ে গেল এবং আবার যখন সেটাকে হাতে ধরলেন, তখন পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। আর হাতকে যখন গলাবন্ধের ভিতরে দাবিয়ে বের করলেন, তখন তা প্রদীপ্ত হয়ে চকমক করতে লাগল। এ ঐশী নিদর্শনের যৌক্তিক দাবী ছিল মূসা (আঃ)-এর উপর ঈমান নিয়ে আসা, কিন্তু ভ্রান্তবাদীরা যেমন সত্যকে গোপন করার জন্য এবং তা থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশে বাস্তব ও সঠিক বিষয়ের উপর মিথ্যার শিরোনাম লাগিয়ে থাকে, ফেরআউন এবং তার সম্প্রদায়ের নেতারাও তাই করল। বলল যে, তিনি বড় বিজ্ঞ যাদুকর এবং তাঁর উদ্দেশ্য হলো তোমাদের দেশ দখল করে নিয়ে তোমাদিগকে বের করে দেয়া। কাজেই তোমরাই বল এখন কি করা উচিত?

ফেরাউনের সম্প্রদায় একথা শুনে উত্তর দিল, اَرۡجِهۡ وَاَخَاهُ وَاَرۡسِلۡ فِى الۡمَدَآئِنِ حٰشِرِيۡنَ ۙ يَاۡتُوۡكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيۡمٍ এ বাক্যটিতে ارجه শব্দটি ارجاء থেকে উদ্ভূত— যার অর্থ ঢিল দেয়া, শিথিল করা এবং আশা দান করা। আর مدائن শব্দটি مدينة এর বহুবচন, যা যেকোন বড় শহরকে বলা হয়। حشرين শব্দটি حاشر এর বহুবচন যার অর্থ হলো আহবানকারী এবং সংগ্রহকারী । মর্মার্থ হল সৈন্যদল, যারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যাদুকরদিগকে তুলে এনে একত্রিত করবে।

আয়াতের অর্থ দাঁড়াল এই যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ দিল যে, ইনি যদি যাদুকর হয়ে থাকেন এবং যাদুর দ্বারাই আমাদের দেশ দখল করতে চান, তবে তাঁর মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। আমাদের দেশেও বহু বড় বড় অভিজ্ঞ যাদুকর রয়েছে যারা তাকে যাদুর দ্বারা পরাভূত করে দেবে। কাজেই কিছু সৈন্য-সামন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিন। তারা সব শহর থেকে যাদুকরদিগকে ডেকে নিয়ে আসবে।

তার কারণ ছিল এই যে, তখন যাদু-মন্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল এবং সাধারণ লোকদের উপর যাদুকরদের প্রচুর প্রভাব ছিল। আর মূসা (আঃ)-কেও লাঠি এবং উজ্জ্বল হাতের মু'জেযা এজন্যই দেয়া হয়েছিল যাতে যাদুকরদের সাথে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং মু'জেযার মোকাবেলায় যাদুর পরাজয় সবাই দেখে নিতে পারে। আল্লাহ্ তাআলার সনাতন রীতিও ছিল তাই। প্রত্যেক যুগের নবী-রসূলকেই তিনি সে যুগের জনগণের সাধারণ প্রবণতা অনুপাতে মু'জেযা দান করেছেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগে গ্রীক বিজ্ঞান ও গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞান যেহেতু উৎকর্ষের চরম শিখরে ছিল, সেহেতু তাঁকে মু'জেযা দেয়া হয়েছিল জন্মান্ধকে দৃষ্টিসম্পন্ন করে দেয়া এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে সুস্থ করে তোলা। রসূলে করীম (সাঃ)-এর যুগে আরবরা সর্বাধিক পরাকাষ্ঠা অর্জন করেছিল অলংকার শাস্ত্র ও বাগ্মিতায়। তাই হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর সবচেয়ে বড় মু'জেযা হল কোরআন যার মোকাবেলায় গোটা আরব-আজম অসমর্থ হয়ে পড়ে।

মূসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশে সারা দেশ থেকে যেসব যাদুকর এসে সমবেত হয়েছিল তাদের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে। ৯০০ থেকে শুরু করে তিন লক্ষ পর্যন্ত রেওয়ায়েত আছে। তাদের সাথে লাঠি ও দড়ির এক বিরাট স্তূপও ছিল যা ৩০০ উটের পিঠে বোঝাই করে আনা হয়েছিল।— (কুরতুবী)

ফেরাউনের যাদুকররা প্রথমে এসেই দরকষাকষি করতে শুরু করল যে, আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে এবং তাতে জয়ী হলে, আমরা কি পাব? তার কারণ, যারা ভ্রান্তবাদী, পার্থিব লাভই হল তাদের মুখ্য। কাজেই যেকোন কাজ করার পূর্বে তাদের সামনে থাকে বিনিময় কিংবা লাভের প্রশ্ন। অথচ নবী-রসূলগণ এবং তাঁদের যাঁরা নায়েব বা প্রতিনিধি, তাঁরা প্রতি পদক্ষেপে ঘোষণা করেন — وَمَاۤ اَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ اَجۡرٍ ۚ اِنۡ اَجۡرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ অর্থাৎ, আমরা যে সত্যের বাণী তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদেরকে পৌঁছে দেই তার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান কামনা করি না। বরং আমাদের প্রতিদানের দায়িত্ব শুধু আল্লাহ্‌র উপরই রয়েছে। ফেরআউন তাদেরকে বলল, তোমরা পারিশ্রমিক চাইছ? আমি পারিশ্রমিক তো দেবই; আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদিগকে শাহী দরবারের ঘনিষ্ঠদেরও অন্তর্ভুক্ত করে নেব।

ফেরাউনের সাথে এসব কথাবার্তা বলে নেয়ার পর যাদুকররা হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান ও সময় সাব্যস্ত করিয়ে নিল। সেমতে, এক বিস্তৃত ময়দানে এবং এক উৎসবের দিনে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় সাব্যস্ত হল। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে—

قَالَ مَوۡعِدُكُمۡ يَوۡمُ الزِّيۡنَةِ وَاَنۡ يُّحۡشَرَ النَّاسُ ضُحًى

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় যাদুকরদের সর্দারের সাথে হযরত মূসা (আঃ) আলোচনা করলেন যে, আমি যদি তোমাদের উপর জয় লাভ করি, তবে তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে তো? সে বলল, আমাদের কাছে এমন যাদু রয়েছে যে, তার উপর কেউ জয়ী হতে পারে না। কাজেই আমাদের পরাজয়ের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর অগত্যাই যদি তুমি জয়ী হয়ে যাও, তাহলে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে ফেরাউনের চোখের সামনে তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নেব।— (মাযহারী, কুরতুবী)

قَالُوۡا يٰمُوۡسٰۤى اِمَّاۤ اَنۡ تُلۡقِىَ وَاِمَّاۤ اَنۡ نَّكُوۡنَ نَحۡنُ الۡمُلۡقِيۡنَ

এখানে القاء এর অর্থ নিক্ষেপ করা। অর্থাৎ, প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যখন মাঠে গিয়ে সবাই উপস্থিত, তখন যাদুকরেরা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলল, হয় আপনি প্রথমে নিক্ষেপ করুন অথবা আমরা প্রথম নিক্ষেপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। যাদুকরদের এ উক্তিটি ছিল নিজেদের নিশ্চিন্ততা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশে যে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন পরোয়াই নেই যে, প্রথমে আমরা শুরু করি। কারণ, আমরা নিজের শাস্ত্রের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত। তাদের বর্ণনাভঙ্গিতে একথা বোঝা যায় যে, তারা মনে মনে প্রথমে আক্রমণের প্রত্যাশী ছিল, কিন্তু শক্তিমত্তা প্রকাশের উদ্দেশে হযরত মূসা (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করে নিল যে, প্রথমে আপনি আরম্ভ করবেন, না আমরা করব।

হযরত মূসা (আঃ) তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে নিয়ে নিজের মু'জেযা সম্পর্কে পরিপূর্ণ আশ্বস্ততার দরুন প্রথম তাদেরকেই সুযোগ দিলেন। বললেন, اَلۡقُوۡا অর্থাৎ, তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর।

তফসীরে-ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে যে, যাদুকররা হযযরত মূসা

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ
آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا
أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم
مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا
مُنقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا
جَاءَتْنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَقَالَ
الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ
وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾ قَالَ مُوسَىٰ
لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ
يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾
قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ
قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي
الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ
فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾

(১২২) যিনি মূসা ও হারূনের পরওয়ারদেগার। (১২৩) ফেরাউন বলল, তোমরা কি (তাহলে) আমার অনুমতি দেয়ার আগেই ঈমান নিয়ে আসলে— এটা যে প্রতারণা, যা তোমরা এ নগরীতে প্রদর্শন করলে। যাতে করে এ শহরের অধিবাসীদিগকে শহর থেকে বের করে দিতে পার। সুতরাং তোমরা শীঘ্রই বুঝতে পারবে। (১২৪) অবশ্যই আমি কেটে দেব তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে। তারপর তোমাদের সবাইকে শূলীতে চড়িয়ে মারব। (১২৫) তারা বলল, আমাদেরকে তো মৃত্যুর পর নিজেদের পরওয়ারদেগারের নিকট ফিরে যেতেই হবে। (১২৬) বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পরওয়ারদেগারের নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দান কর। (১২৭) ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, তুমি কি এমনি ছেড়ে দেবে মূসা ও তার সম্প্রদায়কে। দেশময় হৈ-চৈ করার জন্য এবং তোমাকে ও তোমার দেব-দেবীকে বাতিল করে দেবার জন্য। সে বলল, আমি এখনি হত্যা করব তাদের পুত্র সন্তানদিগকে; আর জীবিত রাখব মেয়েদেরকে। বস্তুতঃ আমরা তাদের উপর প্রবল। (১২৮) মূসা বললেন তাঁর কওমকে, সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট এবং ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে। (১২৯) তারা বলল, আমাদের কষ্ট ছিল তোমার আসার পূর্বে এবং তোমার আসার পরে। তিনি বললেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর। (১৩০) তারপর আমি পাকড়াও করেছি-ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(আঃ)-এর প্রতি আদব ও সম্মানজনক ব্যবহার করতে গিয়েই প্রথম সুযোগ নেয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাল। তারই প্রতিক্রিয়ায় তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছিল।

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

অর্থাৎ, যাদুকররা যখন তাদের লাঠি ও দড়িগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল, তখন দর্শকদের নজরবন্দী করে দিয়ে তাদের উপর ভীতি সঞ্চারিত করে দিল এবং মহাযাদু দেখাল।

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের যাদু ছিল এক প্রকার নজরবন্দী যাতে দর্শকদের মনে হতে লাগল যে, এই লাঠি আর দড়িগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল তেমনি লাঠি ও দড়ি যা পূর্বে ছিল, সাপ হয়নি। এটা এক রকম সন্মোহনী, যার প্রভাব মানুষের কল্পনা ও দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দেয়।

কিন্তু তাই বলে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, যাদু এ প্রকারেই সীমাবদ্ধ এবং যাদুর মাধ্যমে বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটতে পারে না। কারণ, শরীয়তের বা যুক্তির কোন প্রমাণ এর বিরুদ্ধে স্থাপিত হয়নি। বরং বিভিন্ন প্রকার যাদুর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। কোথাও তা শুধু হাতের চালাকি, যাতে দর্শকরা একটা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। কোথাও শুধু নজরবন্দীর কাজ করে। যেমন, কাজ করে সন্মোহনী। আর কোথাও যদি বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটেও যায়, যেমন মানুষের পাথর হয়ে যাওয়া, তাহলে সেটা শরীয়ত বা বৈজ্ঞানিক যুক্তির বিরুদ্ধে নয়।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

অর্থাৎ, আমি মূসা (আঃ)-কে নির্দেশ দিলাম যে, তোমার লাঠিটি মাটিতে ফেলে দাও। তা মাটিতে পড়তেই সবচেয়ে বড় সাপ হয়ে সমস্ত সাপগুলোকে গিলে খেতে শুরু করল, যেগুলো যাদুকররা যাদুর দ্বারা প্রকাশ করেছিল।

ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে যে, হাজার হাজার যাদুকরের হাজার হাজার লাঠি আর দড়িগুলো যখন সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগল, তখন সমগ্র মাঠ সাপে ভরে গেল এবং সমবেত দর্শকদের মাঝে এক অদ্ভুত ভীতি ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি যখন এক বিরাট আযদাহা বা অজগরের আকার ধরে এল তখন সে সবগুলোকে গিলে খেয়ে শেষ করে ফেলল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে উল্লেখ ছিল যে, ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের সর্দারদের পরামর্শ অনুযায়ী মূসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যেসব যাদুকরকে সমগ্র দেশ থেকে এনে সমবেত করেছিল, তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে পরাজয় বরণ করল তো বটেই, তদুপরি হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমানও নিয়ে এল।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় রয়েছে যে, যাদুকরদের সর্দার মুসলমান হয়ে গেলে তার দেখাদেখি ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ছয় লক্ষ লোক মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান নিয়ে এল এবং তা ঘোষণা করে দিল।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিতর্কের পূর্বে তো হযরত মূসা ও হারূন (আঃ) এ দু'জন ফেরাউনের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এর পরে সবচেয়ে বড় যাদুকর যে স্বীয় সম্প্রদায়ের বিপুল প্রভাবের অধিকারী ছিল এবং তার সাথে ছিল

ছয় লক্ষ জনসাধারণ; তারা সবাই মুসলমান হয়ে যাবার দরুন একটা বিরাট শক্তি ফেরাউনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল।

সে সময় ফেরাউনের ব্যাকুলতা ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়াটা একেবারে নিরর্থক ছিল না। কিন্তু সে তা গোপন করে একজন ধূর্ত ও বিজ্ঞ রাজনীতিকের ভঙ্গিতে প্রথমে যাদুকরদের উপর বিদ্রোহমূলক অপবাদ আরোপ করল যে, তোমরা মূসা (আঃ)-এর সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে এ কাজটি নিজের দেশ ও জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশে করেছ। إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ অর্থাৎ, এটা একটা ষড়যন্ত্র, যা তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঠে আসার পূর্বেই শহরের ভেতরে নিজেদের মধ্যে স্থির করে রেখেছিলে। তারপর যাদুকরদিগকে লক্ষ্য করে বলল, آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ অর্থাৎ, তোমরা কি আমার অনুমতির পূর্বেই ঈমান গ্রহণ করে ফেললে ! অস্বীকৃতিবাচক এই কৈফিয়তটি ছিল হুমকি ও তাম্বীহস্বরূপ। স্বীয় অনুমতির পূর্বে ঈমান আনার কথা বলে লোকেদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল যে, আমারও কাম্য ছিল যে, মূসা (আঃ)-এর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটি যদি প্রতীয়মান হয়ে যায় তাহলে আমিও তাকে মেনে নেব এবং লোকদেরকেও মুসলমান হওয়ার জন্য অনুমতি দান করব। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করলে এবং প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝে-শুনেই একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গেলে।

এই চাতুর্যের মাধ্যমে একদিকে লোকের সামনে মূসা (আঃ)-এর মু'জেযা আর যাদুকরদের স্বীকৃতিকে একটা ষড়যন্ত্র সাব্যস্ত করে তাদেরকে আদি বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখার ব্যবস্থা করল। অপরদিকে রাজনৈতিক চালাকীটি করল এই যে, মূসা (আঃ)-এর কার্যকলাপ এবং যাদুকরদের ইসলাম গ্রহণ একান্তই ফেরাউনের পথভ্রষ্টতাকে পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং জাতি ও জনসাধারণের সাথে যার কোনই সম্পর্ক ছিল না— একটা রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত করার উদ্দেশে বলল, لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا অর্থাৎ, তোমরা এই ষড়যন্ত্র এ জন্য করেছ যে, তোমরা মিসর দেশের উপর জয়লাভ করে এ দেশের অধিবাসীদিগকে এখান থেকে বহিষ্কার করতে চাও। এই চাতুর্য-চালাকীর পর সবার উপর নিজের আতঙ্ক এবং সরকারের প্রভাব ও ভীতি সঞ্চার করার জন্য যাদুকরদের হুমকি দিতে আরম্ভ করল। প্রথমে অস্পষ্ট ভঙ্গিতে বলল, فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ অর্থাৎ, তোমাদের যে কি পরিণতি, তোমরা এখনই দেখতে পাবে। অতঃপর তা পরিষ্কারভাবে বলল لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ অর্থাৎ, আমি তোমাদের সবার বিপরীত দিকের হাত-পা কেটে তোমাদের সবাইকে শূলীতে চড়াব। বিপরীত দিকের কাটা অর্থ হল ডান হাত, বাম পা। যাতে উভয়পার্শ্বে জখমী হয়ে বেকার হয়ে পড়বে।

ফেরআউন এই দুরবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার জন্য এবং স্বীয় পারিষদবর্গ ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছিল। আর তার উৎপীড়নমূলক শাস্তি আগে থেকেই প্রসিদ্ধ এবং অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু ইসলাম ও ঈমান এমন এক প্রবল শক্তি যে, যখন তা কোন আত্মায় বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন মানুষ সমগ্র পৃথিবী ও তার যাবতীয় উপকরণের মোকাবেলা করতে তৈরী হয়ে যায়।

যে যাদুকররা কয়েক ঘন্টা আগেও ফেরআউনকে নিজের খোদা বলে মানত এবং অন্যকেও এই পথভ্রষ্টতার দীক্ষা দিত, কয়েক মুহূর্তে ইসলামের কলেমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে সে কি জিনিস সৃষ্টি হয়েছিল, যাতে তারা ফেরাউনের যাবতীয় হুমকির উত্তরে বলে উঠে ঃ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ অর্থাৎ, তুমি যদি আমাদিগকে হত্যা করে ফেল, তাতে কিছু আসে যায় না, আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছেই চলে যাব, যেখানে আমরা সব রকম শান্তি পাব।

فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا অর্থাৎ, আমাদের ব্যাপারে তোমার যা ইচ্ছা হুকুম দিয়ে দাও। ব্যাস, এতটুকুই তো যে, তোমার হুকুম আমাদের পার্থিবজীবনে চলতে পারে এবং তোমার রোষানলে আমাদের এ জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ঈমান আনার পর আমাদের দৃষ্টিতে এই পার্থিব জীবনের সে গুরুত্বই অবশিষ্ট রয়নি যা ঈমান আনার পূর্বে ছিল। কারণ, আমরা জেনেছি যে, এ জীবন দুঃখে হোক সুখে হোক কেটে যাবেই। চিন্তা সে জীবনের ব্যাপারে করা কর্তব্য যার পরে আর মৃত্যু নেই এবং যার শান্তিও স্থায়ী, অশান্তিও স্থায়ী।

চিন্তা করার বিষয় যে, যারা কিছুক্ষণ আগেও নিকৃষ্টতম কুফরীতে আক্রান্ত ছিল, ফেরাউনের মত একজন বাজে লোককে খোদা হিসাবে মানত, আল্লাহ্র মহিমা-মহত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, তাদের মধ্যে সহসা এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন কেমন করে এল যে, এখন বিগত সমস্ত বিশ্বাস ও কার্যক্রম থেকে একেবারে তওবা করে নিয়ে সত্য দ্বীনের উপর এমন বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত দেখা যায় এবং দুনিয়া থেকে বিগত হয়ে যাওয়াকে এজন্য পছন্দ করে নেয় যে, এতে স্বীয় পালনকর্তার কাছে চলে যেতে পারবে।

শুধু ঈমানের শক্তি এবং আল্লাহ্র রাহে জেহাদের সৎসাহসই যে, তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাই নয়; বরং মনে হয়, তাদের জন্য সত্য ও প্রকৃত মা'রেফত জ্ঞানের দ্বারও যেন উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে কারণেই ফেরাউনের বিরুদ্ধে এহেন সাহসী বিবৃতি দেয়ার সাথে সাথে এ প্রার্থনাও করে যে, رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

অর্থাৎ, — হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদিগকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং মুসলমান অবস্থায় আমাদিগকে মৃত্যু দান কর।

এতে সেই মা'রেফতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ যদি না চান, তাহলে মানুষের সাহস ও দৃঢ়তা কিছু কাজেরই নয়। কাজেই এখানে দৃঢ়তা লাভ করার প্রার্থনা করা হয়েছে। আর এ প্রার্থনা যেমন সত্যকে চিনে নেয়ার ফল, তেমনিভাবে সেই বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যও সর্বোত্তম উপায়, যাতে তারা তখন পড়েছিল। কারণ, ধৈর্য ও দৃঢ়তাই এমন বিষয় যা মানুষকে তার প্রতিপক্ষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয় লাভের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

যাদুকরদের ঈমানী বিপ্লব হযরত মূসা (আঃ)-এর এক বিরাট মু'জেযা ঃ পরিতাপের বিষয়, ইদানীং মুসলমানগণ এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করে চলছে, কিন্তু সে রহস্যটি তারা ভুলে গেছে যা শক্তি ও স্বকীয়তার প্রাণকেন্দ্র। অথচ ফেরাউনের যাদুকরেরাও প্রথম পর্যায়েই তা বুঝে নিয়েছিল। আর তা সারা জীবন আল্লাহ্র পরিচয়বিমুখ নাস্তিক-কাফেরদিগকে মুহূর্তে শুধু যে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছিল তাই নয়; বরং একেকজনকে পরিপূর্ণ আরেফ এবং মুজাহিদে পরিণত করে দিয়েছিল। কাজেই হযরত মূসা (আঃ)-এর এই মু'জেযা লাঠি এবং জ্যোতির্ময় হাতের মু'জেযা অপেক্ষা কম ছিল না।

ফেরাউনের উপর হযরত মূসা ও হারূন (আঃ)-এর ভীতিজনক

প্রতিক্রিয়া ঃ ফেরাউনের ধূর্ততা এবং রাজনৈতিক চাল তার মূর্খজাতিকে তার সাথে পুরাতন পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকার ব্যাপারে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল বটে, কিন্তু এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি তাদের জন্য লক্ষ্য করার মত ছিল যে, ফেরাউনের সমস্ত রোষানল যাদুকরদের উপরেই শেষ হয়ে গেল। মূসা (আঃ) সম্পর্কে ফেরাউনের মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হল না, অথচ তিনিই ছিলেন আসল বিরোধী। কাজেই তাদেরকে বলতে হল ঃ

أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ অর্থাৎ, তাহলে কি তুমি মূসা (আঃ) এবং তাঁর সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দেবে, যাতে তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদিগকে পরিহার করে দেশময় দাঙ্গা-ফাসাদ করতে থাকবে?

এতে বাধ্য হয়ে ফেরআউন বলল ঃ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ অর্থাৎ, তাঁর বিষয়টি আমাদের পক্ষে তেমন চিন্তার বিষয় নয়। আমরা তাদের জন্য এই ব্যবস্থা নেব যে, তাদের মধ্যে কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করব, শুধু কন্যা-সন্তানদের বাঁচতে দেব। যার ফলে কিছুকালের মধ্যেই তাদের জাতি পুরুষশূন্য হয়ে পড়বে ; থাকবে শুধু নারী আর নারী। আর তারা হবে আমাদের সেবাদাসী। তাছাড়া তাদের উপরে তো আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছেই ; যা ইচ্ছা তাই করব। এরা আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

তফসীরকার আলেমগণ বলেছেন যে, সম্প্রদায়ের এহেন জেরার মুখেও ফেরআউন একথাই বলল যে, আমরা বনী-ইসরাঈলের ছেলে-সন্তানদিগকে হত্যা করে দেব, কিন্তু হযরত মূসা ও হারূন (আঃ) সম্পর্কে তখনও তার মুখে কোন কথাই এল না। তার কারণ হযরত মূসা (আঃ)- এর এই মু'জেযা এবং তার পরবর্তী ঘটনা ফেরাউনের মন-মস্তিষ্কে হযরত মূসা (আঃ)-এর ব্যাপারে কঠিন ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছিল।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, ফেরাউনের এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, যখনই সে হযরত মূসা (আঃ)-কে দেখত, তখন অবচেতন অবস্থায়ই তার পেশাব বেরিয়ে যেত।

ফেরআউন মূসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে বনী-ইসলাঈলদের প্রতি তার রাগ ঝাড়ল যে, তাদের ছেলেদিগকে হত্যা করে মেয়েদিগকে জীবিত রাখার আইন তৈরী করে দিল। এতে বনী-ইসরাঈলরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, মূসা (আঃ)-এর জন্মের পূর্বে ফেরআউন তাদের উপর যে আযাব চাপিয়ে দিয়েছিল তা আবার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর মূসা (আঃ)ও যখন তা উপলব্ধি করলেন, তখন একান্তই রসূল জনোচিত সোহাগ ও দর্শনানুযায়ী সে বিপদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তাদেরকে দু'টি বিষয় শিক্ষাদান করলেন। (এক) শত্রুর মোকাবেলায় আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করা এবং (দুই) কার্যসিদ্ধি পর্যন্ত সাহস ও ধৈর্য ধারণ। সেই সঙ্গে একথাও বাতলে দিলেন যে, এই ব্যবস্থা যদি অবলম্বন করতে পার, তাহলে এ দেশ তোমাদের, তোমরাই জয়ী হবে। এই হলো প্রথম আয়াতের বক্তব্য যাতে বলা হয়েছেঃ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا *অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর* এবং ধৈর্য ধারণ কর। তারপর বলা হয়েছে - إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ অর্থাৎ, সমগ্র ভূমি আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে ইচ্ছা এই ভূমির উত্তরাধিকারী ও মালিক করবেন। আর একথা নিশ্চিত যে, শেষ পর্যন্ত মুত্তাকী পরহেযগারগণই কৃতকার্যতা লাভ করে থাকে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি পরহেযগারী অবলম্বন কর যার পদ্ধতি উপরে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা ও ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী হও, তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমরাই হবে মিসর দেশের মালিক ও অধিপতি।

জটিলতা ও বিপদমুক্তির অমোঘ ব্যবস্থা ঃ হযরত মূসা (আঃ) শত্রুর উপর বিজয় লাভের জন্য বনী-ইসরাইলদিগকে যে দার্শনিকসুলভ ব্যবস্থার শিক্ষা দান করেছিলেন, গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এই হচ্ছে সেই অমোঘ ব্যবস্থা, যা কখনও ভুল হয় না এবং যার অবলম্বনে বিজয় সুনিশ্চিত। এই ব্যবস্থার প্রথম অংশটি হলো আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা। এটাই হল এ ব্যবস্থার প্রকৃত প্রাণ। কারণ বিশ্বস্রষ্টা যার সহায় থাকেন, তার দিকে সমগ্র বিশ্বের সহায়তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সমগ্র সৃষ্টি হয় তাঁরই হুকুমের আওতাভুক্ত।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন আপনা থেকেই তার উপকরণাদি সংগৃহীত হতে থাকে। কাজেই শত্রুর মোকাবেলায় বৃহত্তর শক্তিও মানুষের ততটা কাজে আসতে পারে না, যতটা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কাজে লাগতে পারে। অবশ্য তার শর্ত হলো এই যে, এই সাহায্য প্রার্থনা হতে হবে একান্তই সত্যনিষ্ঠার সাথে, শুধু কিছু শব্দের আবৃত্তি নয়।

দ্বিতীয় অংশটি হলো, 'সবর' এর ব্যবস্থা। অভিধান অনুযায়ী সবর-এর প্রকৃত অর্থ হল ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়ে ধীর স্থির থাকা এবং রিপুকে আয়ত্তে রাখা। কোন বিপদে ধৈর্য ধারণকেও সেজন্যই 'সবর' বলা হয় যে, তাতে কান্নাকাটি এবং বিলাপের স্বাভাবিক চেতনাকে দাবিয়ে রাখা হয়।

যে কোন অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন যে, দুনিয়ার যে কোন বৃহদোদ্দেশ্য সাধনের পথে বহু ইচ্ছাবিরুদ্ধ পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতা অপরিহার্য। যে লোক পরিশ্রমের অভ্যাস করে নিতে পারে এবং ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়সমূহকে সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করে নিতে পারে, সে তার অধিকাংশ উদ্দেশ্যে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ)- এর এরশাদ বর্ণিত আছে যে, সবর বা ধৈর্য এমন একটি নেয়ামত, যার চাইতে বিস্তৃত আর কোন নেয়ামত কেউ পায়নি। - (আবু দাউদ)

হযরত মূসা (আঃ)-এর বিজ্ঞজনোচিত উপদেশ এবং তার প্রেক্ষিতে বিজয় ও কৃতকার্যতার সংক্ষিপ্ত ওয়াদা কুটিলমতি বনী-ইসরাঈল কি বুঝবে; এসব শুনে বরং বলে উঠল— أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا অর্থাৎ, আপনার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে কষ্টই দেয়া হয়েছে, আর আপনার আগমনের পরেও তাই হচ্ছে।

উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আপনার আগমনের পূর্বে তো এ আশায় দিন কেটে যেত যে, আমাদের উদ্ধারের জন্য কোন একজন পয়গম্বর আসবেন। অথচ এখন আপনার আগমনের পরেও উৎপীড়নের সে ধারাই যদি বহাল থাকল, আমরা কি করব।

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ
مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ فَأَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ
مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾ وَلَمَّا
وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ
عِندَكَ ۖ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ
مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ
أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿١٣٥﴾ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ
فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا
غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ
مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ
رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا
مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

(১৩১) অতঃপর যখন শুভদিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরম্ভ করে যে, এটাই আমাদের জন্য উপযোগী। আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয় তবে তাতে মূসার এবং তাঁর সঙ্গীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করে। শুনে রাখ তাদের অলক্ষণ যে, আল্লাহ্‌রই এলেমে রয়েছে, অথচ এরা জানে না। (১৩২) তারা আরও বলতে লাগল, আমাদের উপর জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা কিন্তু তোমার উপর ঈমান আনছি না। (১৩৩) সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরেও তারা গর্ব করতে থাকল। বস্তুতঃ তারা ছিল অপরাধপ্রবণ। (১৩৪) আর তাদের উপর যখন কোন আযাব পড়ে তখন বলে, হে মূসা! আমাদের জন্য তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট সে বিষয়ে দোয়া কর যা তিনি তোমার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে এ আযাব সরিয়ে দাও, তবে অবশ্যই আমরা ঈমান আনব তোমার উপর এবং তোমার সাথে বনী-ইসরাঈলদেরকে যেতে দেব। (১৩৫) অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নিতাম নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত—যেখান পর্যন্ত তাদেরকে পৌছানো উদ্দেশ্য ছিল , তখন তড়িঘড়ি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। (১৩৬) সুতরাং আমি তাদের কাছ থেকে বদলা নিয়ে নিলাম—বস্তুতঃ তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার নিদর্শনসমূহকে এবং তৎপ্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছিল। (১৩৭) আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকেও আমি উত্তরাধিকার দান করেছি এ ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের যাতে আমি বরকত সন্নিহিত রেখেছি এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত কল্যাণ বনী-ইসরাঈলদের জন্য তাদের ধৈর্যধারণের দরুন। আর ধ্বংস করে দিয়েছি সে সবকিছু যা তৈরী করেছিল ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা সুউচ্চ নির্মাণ করেছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতগুলোতে ফেরাউনের সম্প্রদায় এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর অবশিষ্ট কাহিনীর আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের জাদুকররা মূসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে ঈমান এনেছে, কিন্তু ফেরাউনের সম্প্রদায় তেমনি ঔদ্ধত ও কুফরীতে আঁকড়ে রয়েছে।

এ ঘটনার পর ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মূসা (আঃ) বিশ বছর যাবৎ মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্‌র বাণী শোনান এবং সত্য ও সরল পথের দিকে আহবান করতে থাকেন। এ সময়ে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-কে নয়টি মু'জেযা দান করেছিলেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে সত্য পথে আনা। وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ আয়াতে এই নয়টি মু'জেযা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

এই নয়টি মু'জেযার মধ্যে প্রথম দু'টি মু'জেযা অর্থাৎ, লাঠির সাপে পরিণত হওয়া এবং হাতের কিরণময় হওয়া ফেরাউনের দরবারে প্রকাশিত হয়। আর এগুলোর মাধ্যমেই জাদুকরদের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আঃ) জয়লাভ করেন। তারপরের একটি মু'জেযা যার আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছে, তা ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়ের হঠকারিতা ও দুরাচরণের ফলে দুর্ভিক্ষের আগমন। যাতে তাদের ক্ষেতের ফসল এবং বাগ-বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ফলে এরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তিলাভের দোয়া করায়। কিন্তু দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেলে পুনরায় নিজেদের ঔদ্ধত্যে লিপ্ত হয় এবং বলতে শুরু করে যে, এই দুর্ভিক্ষ তো মূসা (আঃ)-এর সঙ্গী-সাথীদের অলক্ষণের দরুনই আপতিত হয়েছিল। আর এখন যে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়েছে তা হলে আমাদের সুকৃতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। এমনটিই তো আমাদের প্রাপ্য।

পরবর্তী ছয়টি মু'জেযার বিষয় আলোচিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতগুলোতে। فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাদের উপর পাঠিয়েছি তুফান, পঙ্গপাল, ঘুণ পোকা, ব্যাঙ এবং রক্ত। এতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর আপতিত পাঁচ রকমের আযাবের কথা আলোচিত হয়েছে এবং এগুলোকে উক্ত আয়াতে وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তফসীর অনুযায়ী এর অর্থ হল এই যে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি আযাবই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত থেকে রহিত হয়ে যায় এবং কিছু সময় বিরতির পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আযাব পৃথক পৃথকভাবে আসে।

ইবনে-মুনযির হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, এর প্রতিটি আযাব ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর সাত দিন করে স্থায়ী হয়। শনিবার দিন শুরু হয়ে দ্বিতীয় শনিবারে রহিত হয়ে যেত এবং পরবর্তী আযাব আসা পর্যন্ত তিন সপ্তাহের অবকাশ দেয়া হত।

ইমাম বগভী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, প্রথমবার যখন ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব চেপে বসে এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়ায় তা রহিত হয়ে যায়, কিন্তু তারা নিজেদের ঔদ্ধত্য থেকে বিরত হয় না, তখন হযরত মূসা (আঃ) প্রার্থনা করেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, এরা এতই উদ্ধত যে, দুর্ভিক্ষের আযাবেও প্রভাবিত হয়নি; নিজেদের কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে।

এবার তাদের উপর এমন কোন আযাব চাপিয়ে দাও, যা হবে তাদের জন্য বেদনাদায়ক এবং আমাদের জাতির জন্য উপদেশের কাজ করবে ও পরবর্তীদের জন্য যা হবে ভর্ৎসনামূলক শিক্ষা। তখন আল্লাহ্ প্রথমে তাদের উপর নাযিল করেন তুফানজনিত আযাব। প্রখ্যাত মুফাসসেরগণের মতে তুফান অর্থ পানির তুফান। অর্থাৎ, জলোচ্ছ্বাস। তাতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সমস্ত ঘর-বাড়ী ও জমি-জমা জলোচ্ছ্বাসের আবর্তে এসে যায়। না থাকে কোথাও শোয়া-বসার জায়গা, না থাকে জমিতে চাষ-বাসের কোন ব্যবস্থা। আরো আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ফেরাউন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই ছিল বনী-ইসরাঈলদেরও জমি-জমা ও ঘর-বাড়ী। অথচ বনী-ইসরাঈলদের ঘর-বাড়ী জমি-জমা সবই ছিল শুষ্ক। সেগুলোর কোথাও জলোচ্ছ্বাসের পানি ছিল না, অথচ ফেরাউন সম্প্রদায়ের জমি ছিল অথৈ পানির নীচে।

এই জলোচ্ছ্বাসে ভীত হয়ে ফেরাউন সম্প্রদায় হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট প্রার্থনা করল যে, আপনার পরওয়ারদেগারের দরবারে দোয়া করুন যাতে এ আযাব দূর হয়ে যায়, তাহলে আমরা ঈমান আনব এবং বনী-ইসরাঈলদিগকে মুক্ত করে দেব। মূসা (আঃ)-এর দোয়ায় জলোচ্ছ্বাসের তুফান রহিত হয়ে গেল এবং তারপর তাদের শস্য-ফসল অধিকতর সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠল। তখন তারা বলতে আরম্ভ করল যে, আদতে এই তুফান তথা জলোচ্ছ্বাস কোন আযাব ছিল না; বরং আমাদের ফায়দার জন্যেই তা এসেছিল। যার ফলে আমাদের শস্যভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গেছে। সুতরাং মূসা (আঃ)-এর এতে কোন দখল নেই। এসব কথা বলেই তারা কৃত প্রতিজ্ঞার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে শুরু করে।

এভাবে এরা মাসাধিককাল সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। আল্লাহ্ তাদের চিন্তা-ভাবনার অবকাশ দান করলেন। কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হল না। তখন দ্বিতীয় আযাব পঙ্গপালকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হল। এই পঙ্গপাল তাদের সমস্ত শস্য, ফসল ও বাগানের ফল-ফলারী খেয়ে নিঃশেষিত করে ফেলল। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, কাঠের দরজা-জানালা, ছাদ প্রভৃতিসহ ঘরে ব্যবহার্য সমস্ত আসবাবপত্র পঙ্গপালেরা খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল। আর এ আযাবের ক্ষেত্রেও মূসা (আঃ)-এর মু'জেযা পরিলক্ষিত হয় যে, এই সমস্ত পঙ্গপালই শুধুমাত্র কিবতী বা ফেরাউনের সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত্র ও ঘর-বাড়ীতে ছেয়ে গিয়েছিল। সংলগ্ন ইসরাঈলীদের ঘর-বাড়ী, শস্যভূমি ও বাগ-বাগিচা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে।

এবারও ফেরাউনের সম্প্রদায় চীৎকার করতে লাগল এবং মূসা (আঃ)-এর নিকট আবেদন জানাল যে, এবার আপনি আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দোয়া করে আযাব সরিয়ে দিলে আমরা পাকা ওয়াদা করছি যে, ঈমান আনব এবং বনী-ইসরাঈলদিগকে মুক্তি দিয়ে দেব। তখন মূসা (আঃ) আবার দোয়া করলেন এবং এ আযাবও সরে গেল। আযাব সরে যাওয়ার পর তারা দেখল যে, আমাদের কাছে এখনও এ পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে, যা আমরা আরও বছরকাল খেতে পারব। তখন আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে এবং ঔদ্ধত্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হল। ঈমানও আনল না, বনী-ইসরাঈলদিগকেও মুক্তি দিল না।

আবার আল্লাহ্ তাআলা এক মাসের জন্য অবকাশ দান করলেন। এই অবকাশের পর তাদের উপর চাপালেন তৃতীয় আযাব قمل (কোম্মালা)। قمل সে উকুনকে বলা হয়, যা মানুষের চুলে বা কাপড়ে জন্মে থাকে এবং সেসব পোকা বা কীটকেও বলা হয়, যা কোন কোন সময় খাদ্যশস্যে পড়ে এবং যাকে সাধারণতঃ ঘুণ এবং কেরী পোকাও বলা হয়। কোম্মালের এ আযাবে সম্ভবতঃ উভয় রকমের পোকাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের খাদ্যশস্যেও ঘুণ ধরেছিল এবং শরীরে মাথায়ও উকুন পড়েছিল বিপুল পরিমাণে।

সে ঘুণের ফলে খাদ্যশস্যের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, দশ সের গমে তিন সের আটাও হতো না। আর উকুন তাদের চুল-ভ্রূ পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল।

শেষে আবার ফেরাউনের সম্প্রদায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং মূসা (আঃ)-এর নিকট এসে ফরিয়াদ করল, এবার আর আমরা ওয়াদা ভঙ্গ করব না, আপনি দোয়া করুন। হযরত মূসা (আঃ) -এর দোয়ায় এ আযাবও চলে গেল। কিন্তু যে হতভাগাদের জন্য ধ্বংসই ছিল অনিবার্য এরা প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে কেমন করে ! অব্যাহতি লাভের সাথে সাথে সবই ভুলে গেল এবং অস্বীকার করে বসল।

তারপর আবার একমাসের সময় দেয়া হলো। যাতে প্রচুর আরাম-আয়েশে কাটাল। কিন্তু যখন এই অবকাশেরও কোন সুযোগ নিল না, তখন চতুর্থ আযাব হিসাবে এসে হাযির হল ব্যাঙ। এত অধিক সংখ্যায় ব্যাঙ তাদের ঘরে জন্মাল যে, কোনখানে বসতে গেলে গলা পর্যন্ত উঠত ব্যাঙের স্তূপ। শুতে গেলে ব্যাঙের স্তূপের নীচে তলিয়ে যেতে হতো, পাশ ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ত। রান্নার হাড়ি, আটা-চালের মটকা বা টিন সব কিছুই ব্যাঙে ভরে যেত। এই আযাবে অসহ্য হয়ে সবাই বিলাপ করতে লাগল এবং আগের চাইতেও পাকাপাকি ওয়াদার পর হযরত মূসা (আঃ) এর দোয়ায় এ আযাবও সরলো।

কিন্তু যে জাতির উপর খোদায়ী গযব চেপে থাকে তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান-চেতনা কোন কাজই করে না। কাজেই এ ঘটনার পরেও আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে এরা আবারও নিজেদের হঠকারিতায় আঁকড়ে বসল এবং বলতে আরম্ভ করল যে, এবার তো আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে গেছে যে, মূসা (আঃ) মহাজাদুকর, আর এসবই তাঁর জাদুর কীর্তি-কাণ্ড।

অতঃপর আরেক মাসের জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে অব্যাহতি দান করলেন, কিন্তু তারা এরও কোন সুযোগ নিল না। তখন এল পঞ্চম আযাব 'রক্ত'। তাদের সমস্ত পানাহারের বস্তু রক্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কূপ কিংবা হাউয থেকে পানি তুলে আনলে তা রক্ত হয়ে যায়, খাবার রান্না করার জন্য তৈরী করে নিলে, তাও রক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ সমস্ত আযাবের বেলায়ই হযরত মূসা (আঃ)-এর এ মু'জেযা বরাবর প্রকাশ পেতে থাকে যে, যে কোন আযাব থেকে ইসরাঈলীরা থাকে মুক্ত ও সুরক্ষিত। রক্তের আযাবের সময় ফেরাউনের সম্প্রদায়ের লোকেরা বনী-ইসরাঈলদের বাড়ী থেকে পানি চাইত। কিন্তু তা তাদের হাতে যাওয়া মাত্র রক্তে পরিণত হয়ে যেত। একই দস্তরখানে বসে কিবতী ও বনী-ইসরাঈল খাবার খেতে গেলে যে লোকমাটি বনী-ইসরাঈলেরা তুলত তা যথারূপ থাকত, কিন্তু যে লোকমা বা পানির ঘোট কোন কিবতী মুখে তুলত তাই রক্ত হয়ে যেত। এ আযাবও পূর্বরীতি অনুযায়ী সাত দিন পর্যন্ত স্থায়ী হল এবং আবার এই দুরাচার প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী জাতি চীৎকার করতে লাগল। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট ফরিয়াদ করল এবং অধিকতর দৃঢ়ভাবে ওয়াদা করল। দোয়া করা হলে এ আযাবও সরে গেল, কিন্তু এরা তেমনি গোমরাহীতে স্থির থাকল। এ বিষয়েই কোরআন বলেছে— فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ অর্থাৎ, এরা আত্মগর্ব প্রকাশ করতে থাকল। বস্তুতঃ এরা ছিল অপরাধে অভ্যস্ত জাতি।

অতঃপর ষষ্ঠ আযাবের আলোচনা প্রসঙ্গে আয়াতে رجز এর নাম বলা

হয়েছে। এই শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্লেগ রোগকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশ্য বসন্ত প্রভৃতি মহামারীকেও رجز (রিজ্‌য) বলা হয়। তফসীরসংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, ওদের উপর প্লেগের মহামারী চাপিয়ে দেয়া হয়, যাতে তাদের সত্তর হাজার লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। তখন আবারও তারা নিবেদন করে এবং পুনরায় দোয়া করা হলে প্লেগের আযাবও তাদের উপর থেকে সরে যায়। কিন্তু তারা যথারীতি ওয়াদা ভঙ্গ করে। ক্রমাগত এতবার পরীক্ষা ও অবকাশ দানের পরেও যখন তাদের মধ্যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়নি তখন চলে আসে সর্বশেষ আযাব। তাহল এই যে, তারা নিজেদের ঘর-বাড়ী,জমি-জমা ও আসবাবপত্র ছেড়ে মূসা (আঃ)-এর পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত লোহিত সাগরের গ্রাসে পরিণতি হয়। তাই বলা হয়েছে—

فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا

অর্থাৎ – যে জাতিকে দুর্বল ও হীন বলে মনে করা হতো, তাদেরকে আমি সে ভূমির উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতি বানিয়ে দিয়েছি, যাতে আমি রেখেছি বরকত বা আশীর্বাদ।

কোরআনের শব্দগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এতে 'যে জাতিকে ফেরাউনের সম্প্রদায় দুর্বল ও হীন মনে করেছিল' বলা হয়েছে। এ কথা বলা হয়নি যে, 'যে জাতি দুর্বল ও হীন ছিল।' এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা যে জাতির সহায়তায় থাকেন প্রকৃতপক্ষে তারা কখনও দুর্বল হয় না। যদিও কোন সময় তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে অন্যান্য লোক ধোঁকায় পড়ে যায় এবং তাদেরকে দুর্বল বলে মনে করে বসে! কিন্তু শেষ পরিণতির ক্ষেত্রে সবাই দেখতে পায় যে, তারা মোটেই দুর্বল ও হীন ছিল না। কারণ, প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌রই হাতে।

আর যমিনের মালিক বানিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে وَاَوْرَثْنَا শব্দটি ব্যবহার করে বলেছেন যে, তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'ওয়ারেস' বা উত্তরাধিকারী যেমন করে নিজের পূর্ব পুরুষের সম্পদের অধিকারী হয় এবং পিতার জীবদ্দশায়ই সবাই একথা জেনে নিতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর ধন-সম্পদের মালিক তাঁর সন্তানেরাই হবে, তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র জানা মতে বনী-ইসরাঈলরা পূর্ব থেকেই কওমে-ফেরাউনের ধন-সম্পদের অধিকারী ছিল।

مَشَارِقَ শব্দটি مشرق এর বহুবচন। আর مغارب হচ্ছে مغرب এর বহুবচন। শীত ও গ্রীষ্মের বিভিন্ন ঋতুতে যেহেতু সূর্যের উদয়াস্ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে, সেহেতু এখানে 'মাশারিক' (উদয়াচলসমূহ) এবং 'মাগারিব' (অস্তাচলসমূহ) বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর ভূমি ও যমিন বলতে এক্ষেত্রে অধিকাংশ মুফাস্‌সেরীনের মতে শাম বা সিরিয়া ও মিসর ভূমিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে – যাতে আল্লাহ্ তাআলা কওমে-ফেরাউন ও কওমে-আ'মালেকাহ্‌কে ধ্বংস করার পর বনী-ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন।

হযরত মূসা (আঃ) যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে সাহায্যের ওয়াদা করেছিলেন তখনও তিনি জাতিকে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং একান্ত দৃঢ়তার সাথে বিপদাপদের মোকাবেলা করাই কৃতকার্যতার চাবিকাঠি। হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যদি এমন কোন লোক বা দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়, যাকে প্রতিহত করা তার ক্ষমতার বাইরে, তবে সে ক্ষেত্রে কৃতকার্যতা ও কল্যাণের সঠিক পথ হল তার মোকাবেলা না করে বরং সবর করা। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির উৎপীড়নের মোকাবেলা উৎপীড়নের মাধ্যমে করে অর্থাৎ, নিজেই নিজের প্রতিশোধ নেবার চিন্তা করে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাকে তার শক্তি-সামর্থ্যের উপর ছেড়ে দেন। তাতে সে কৃতকার্য হোক, কি অকৃতকার্য হোক সে ব্যাপারে তাঁর কোন দায়িত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে যখন কোন লোক মানুষের উৎপীড়নের মোকাবেলা ধৈর্য বা সবর এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে করে, তখন আল্লাহ্ স্বয়ং তার জন্য পথ খুলে দেন।

আর যেভাবে আল্লাহ্ বনী-ইসরাঈলের সাথে তাদের সবর ও দৃঢ়তার প্রেক্ষিতে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, তাদিগকে শত্রুর উপর বিজয় এবং যমীনের উপরে শাসনক্ষমতা দান করবেন, তেমনিভাবে মহানবী (সাঃ)-এর উম্মতের প্রতিও ওয়াদা করেছেন।–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ

আর যেভাবে বনী-ইসরাঈলরা আল্লাহ্‌র ওয়াদা প্রত্যক্ষ করেছিল, মহানবী (সাঃ)-এর উম্মতরা তার চেয়েও প্রকৃষ্টভাবে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছে; সমগ্র বিশ্বে তাদের শাসন ও রাষ্ট্রকে ব্যাপক করে দেয়া হয়েছে।– (রূহুল-বয়ান)

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ
عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ
اٰلِهَةٌ ۗ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۝ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ
فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ
اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ
فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ
يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۗ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝
وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ
مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ
هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ
الْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ
رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ۗ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى
الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى
رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ
قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(১৩৮) বস্তুতঃ আমি সাগর পার করে দিয়েছি বনী-ইসরাঈলদিগকে। তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছাল, যারা স্বহস্তনির্মিত মূর্তিপূজায় নিয়োজিত ছিল। তারা বলতে লাগল, হে মূসা! আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে। (১৩৯) এরা যে কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করেছে তা যে ভূল। (১৪০) তিনি বললেন, তাহলে কি আল্লাহকে ছাড়া তোমাদের জন্যে অন্য কোন উপাস্য অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদিগকে সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (১৪১) আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছি তারা তোমাদেরকে দিত নিকৃষ্ট শাস্তি, তোমাদের পুত্র-সন্তানদের মেরে ফেলত এবং মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখত। এতে তোমাদের প্রতি তোমাদের পরওয়ারদেগারের বিরাট পরীক্ষা রয়েছে। (১৪২) আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরো দশ দ্বারা। বস্তুতঃ এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মূসা তাঁর ভাই হারুনকে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাক। তাদের সংশোধন করতে থাক এবং হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে চলো না। (১৪৩) তারপর মূসা যখন আমার প্রতিশ্রুত সময় অনুযায়ী এসে হাযির হলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর পরওয়ারদেগার কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রভু, তোমার দীদার আমাকে দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবে না, তবে তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, সেটি যদি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। তারপর যখন তাঁর পরওয়ারদেগার পাহাড়ের উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল; বললেন, হে প্রভু! তোমার সত্তা পবিত্র, তোমার দরবারে আমি তওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ অর্থাৎ, আমি বনী-ইসরাঈলদিগকে সাগর পার করে দিয়েছি। ফেরাউন সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় বনী-ইসরাঈলদের যে অলৌকিক কৃতকার্যতা ও প্রশান্তি লাভ হয়, তার সে প্রতিক্রিয়াই হয়েছে যা সাধারণতঃ প্রাচুর্য আসার পর বস্তুবাদী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অর্থাৎ, ওরাও ভোগবিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করল।

ঘটনাটি হলো এই যে, এই জাতি মূসা (আঃ)-এর মু'জেযা বলে সদ্য লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছিল এবং গোটা ফেরাউন সম্প্রদায়ের সাগরে ডুবে মরার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটু অগ্রসর হতেই তারা এমন এক মানব গোষ্ঠীর বাসভূমির উপর দিয়ে অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। এই দেখে বনী-ইসরাঈলদেরও তাদের সে রীতি-নীতিই পছন্দ হতে লাগল। তাই মূসা (আঃ)-এর নিকট আবেদন জানাল, এসব লোকের যেমন বহু উপাস্য রয়েছে, আপনি আমাদের জন্যেও এমনি ধরনের কোন একটা উপাস্য নির্ধারণ করে দিন, যাতে আমরা একটা দৃষ্ট বস্তুকে সামনে রেখে এবাদত-উপাসনা করতে পারি; আল্লাহ্‌র সত্তা তো আর সামনে আসে না। মূসা আলাইহিস্ সালাম বললেন, اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ অর্থাৎ - তোমাদের মধ্যে বড়ই মূর্খতা রয়েছে। যাদের রীতি-নীতি তোমরা পছন্দ করছ, তাদের সমস্ত আমল যে বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে গেছে। এরা মিথ্যার অনুগামী। ওদের এসব ভ্রান্ত রীতি-নীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমি কি তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য বানিয়ে দেব? অথচ তিনিই তোমাদিগকে দুনিয়াবাসীর উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন। অর্থাৎ, তৎকালীন বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। কারণ, তখন মূসা (আঃ)-এর উপর যারা ঈমান এনেছিল, তারাই ছিল অন্যান্য লোক অপেক্ষা বেশী মর্যাদাসম্পন্ন ও উত্তম।

অতঃপর বনী-ইসরাঈলদিগকে তাদের বিগত অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ফেরাউনের কওমের হাতে তারা এমনই অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত ছিল যে, তাদের ছেলেদিগকে হত্যা করে নারীদিগকে অব্যাহতি দেয়া হতো সেবাদাসী বানিয়ে রাখার উদ্দেশে। আল্লাহ্ মূসা (আঃ)-এর বদৌলতে এবং তাঁর দোয়ার বরকতে তাদেরকে সে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এই অনুগ্রহের প্রভাব কি এই হওয়া উচিত যে, তোমরা সেই রাব্বুল-আলামীনের সাথে দুনিয়ার নিকৃষ্টতর পাথরকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে। এযে মহা জুলুম। এর থেকে তওবা কর।

এতে وَوٰعَدْنَا শব্দটি وعده (ওয়াদাহ্) থেকে উদ্ভূত। আর ওয়াদার তাৎপর্য হল এই যে, কাউকে লাভজনক কোন কিছু দেয়ার পূর্বে তা প্রকাশ করে দেয়া যে, তোমার জন্য অমুক কাজ করব।

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)-এর প্রতি স্বীয় কিতাব নাযিল করার ওয়াদা করেছেন এবং সেজন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, মূসা (আঃ) ত্রিশ রাত্রি তূর পর্বতে এ'তেকাফ ও আল্লাহ্‌র এবাদত-আরাধনায় অতিবাহিত করবেন। অতঃপর এই ত্রিশ রাত্রির উপর আরও দশ রাত্রি বাড়িয়ে চল্লিশ করে দিয়েছেন।

وٰعَدْنَا শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো দু'পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি দান করা। এখানেও আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহূর পক্ষ থেকে ছিল তওরাত দানের

প্রতিশ্রুতি; আর মূসা (আঃ)–এর পক্ষ থেকে চল্লিশ রাত এবং এ'তেকাফের প্রতিজ্ঞা। কাজেই وَعَدْنَا না বলে وٰعَدْنَا বলা হয়েছে।

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় ও নির্দেশ লক্ষণীয়।

প্রথমতঃ চল্লিশ রাত এ'তেকাফ করানোই যখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল, তখন প্রথমে ত্রিশ এবং পরে দশ বৃদ্ধি করে চল্লিশ করার তাৎপর্য কি? একত্রেই চল্লিশ রাতের এ'তেকাফের হুকুম দিয়ে দিলে কি ক্ষতি ছিল? আল্লাহ্‌র হেকমতের সীমা–পরিসীমা কে জানবে! তবুও আলেম সমাজ এর কিছু কিছু হেকমত বা তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন।

তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে যে, এর একটি তাৎপর্য হল ক্রমধারা সৃষ্টি করা। যাতে কোন কাজ কারো দায়িত্বে অর্পণ করতে হলে, প্রথমেই তার উপর সম্পূর্ণ কাজের চাপ সৃষ্টি করা না হয়; বরং ক্রমানুয়ে বা ধাপে ধাপে যেন বাড়ানো হয়, যাতে সে সহজে তা পালন করতে পারে। তারপর অতিরিক্ত কাজ অর্পণ করা।

তফসীরে কুরতুবীতে আরও বলা হয়েছে যে, এভাবে শাসক ও দায়িত্বশীল লোকদিগকে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য যে, কাউকে যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন কাজের বা বিষয়ের দায়িত্ব দেয়া হয় আর সে যদি উক্ত সময়ের মধ্যে তা সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে আরও সময় দেয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন, মূসা (আঃ)–এর সাথে হয়েছে – ত্রিশ রাত্রিতে যে অবস্থা লাভ উদ্দেশ্য ছিল তা যখন পূর্ণ হয়নি, তখন অতিরিক্ত দশ রাত্রি বাড়িয়ে দেয়া হয়। কারণ, এই দশ রাত্রি বৃদ্ধির ব্যাপারে তফসীরকারগণ যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা হলো এই যে, ত্রিশ রাত্রির এ'তেকাফের সময় হযরত মূসা (আঃ) নিয়মানুযায়ী ত্রিশটি রোযাও রেখেছেন, কিন্তু মাঝে কোন ইফতার করেন নাই। ত্রিশ রোযা শেষ করার পর ইফতার করে তূর পর্বতের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে হাযির হলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হলো যে, রোযাদারের মুখ থেকে যে বিশেষ এক রকম গন্ধ পেটের বাষ্পজনিত কারণে সৃষ্টি হয়, তা আল্লাহ্ তাআলার নিকট অতি পছন্দনীয়, কিন্তু আপনি মেসওয়াক করে সে গন্ধ দূর করে দিয়েছেন! কাজেই আরও দশটি রোযা রাখুন যাতে সে গন্ধ আবার সৃষ্টি হয়।

কোন কোন তফসীর–সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত আছে যে, ত্রিশ রোযার পর হযরত মূসা (আঃ) মেসওয়াক করে ফেলেছিলেন, যার ফলে রোযাজনিত মুখের গন্ধ চলে গিয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় না যে, রোযাদারের জন্য মেসওয়াক করা অনুত্তম বা নিষিদ্ধ। কারণ, প্রথমতঃ এই রেওয়ায়েতের কোন সনদ নেই। দ্বিতীয়তঃ এমনও হতে পারে যে, এ হুকুমটি ব্যক্তিগতভাবে শুধু মূসা (আঃ)–এরই জন্য; সাধারণ নির্দেশ নয়। অথবা মূসা (আঃ)–এর শরীয়তে এ ধরনের হুকুম হয়তো সবারই জন্য ছিল যে, রোযার সময় মেসওয়াক করা যাবে না। কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মদীয়া বা মহানবী (সাঃ)–এর শরীয়তে রোযার অবস্থায় মেসওয়াক করার প্রচলন হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, যা বায়হাকী হযরত আয়েশা (রাঃ) – এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুযুরে আকরাম (সাঃ) বলেছেন ঃ خير خصائل الصيام السواك অর্থাৎ, রোযাদারের সর্বোত্তম কাজ হল মেসওয়াক করা। এই রেওয়ায়েতটি জামেউস্–সগীরে উদ্ধৃত করে, একে 'হাসান' বলা হয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ এ রেওয়ায়েতের প্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন হয় যে, হযরত মূসা (আঃ) হযরত খিযিরের সন্ধানে যখন সফর করছিলেন, তখন যে ক্ষেত্রে অর্ধ দিনের ক্ষুধাতেও ধৈর্যধারণ করতে পারেননি এবং নিজের ভ্রমণসঙ্গীকে বলেছেন যে, آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا অর্থাৎ, – আমাদের নাশতা বের কর। কারণ, এ ভ্রমণ আমাদেরকে পরিশ্রান্তির সম্মুখীন করে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তূর পর্বতে ক্রমাগত এমনভাবে ত্রিশ রোযা করা যাতে রাতের বেলায়ও কোন ইফতার করা যাবে না–বিস্ময়ের ব্যাপার নয় কি?

তফসীরে রূহুল–বয়ানে বর্ণিত আছে যে, এই পার্থক্যটা ছিল এতদুভয় সফরের প্রকৃতির পার্থক্যের দরুন। প্রথমোক্ত সফরের সম্পর্ক ছিল সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির। পক্ষান্তরে তূর পর্বতের এই সফর ছিল সৃষ্টি থেকে আলাদা হয়ে মহান পরওয়ারদেগারের অন্বেষায়। এমন একটি মহৎ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াতেই তাঁর জৈবিক চাহিদা এমন স্তিমিত হয়ে গেছে এবং পানাহারের প্রয়োজনীয়তা এত কমে গেছে যে, ত্রিশ রোযা পর্যন্ত কোন কষ্টই তিনি অনুভব করেন নাই।

এবাদতের বেলায় চান্দ্র হিসাব ও পার্থিব ব্যাপারে সৌর হিসাবের অবকাশ ঃ আয়াতটিতে আরও একটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, নবী–রসূলগণের শরীয়তে তারিখের হিসাব ধরা হতো রাত থেকে। কারণ, এ আয়াতেও ত্রিশ দিনের স্থলে ত্রিশ রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হলো এই যে, নবী–রসূলগণের শরীয়তে চান্দ্রমাস গ্রহণীয়। আর চান্দ্রমাস শুরু হয় রাত এবং তার প্রতিটি তারিখের গণনা শুরু হয় সূর্যাস্তের সাথে সাথে। আসমানী যত গ্রন্থ রয়েছে সে সবগুলোর হিসাবই এভাবে চান্দ্রমাস থেকে এবং তারিখের গণনা সূর্যাস্ত থেকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ইবনে–আরাবীর বরাতে কুরতুবী উদ্ধৃত করেছেন যে, حسابُ الشمس للمنافع وحسابُ القمر للمناسك অর্থাৎ, – সৌর হিসাব হলো পার্থিব লাভের জন্য; আর চান্দ্র হিসাব হলো এবাদত–উপাসনার জন্য।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর তফসীর অনুসারে এই ত্রিশ রাত্রি ছিল যিলক্বদ মাসের রাত্রি; আর এরই উপর যিলহজ্জ মাসের দশ রাত বাড়িয়ে দেয়া হয়। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত মূসা (আঃ) তওরাতের উপঢৌকনটি লাভ করেছিলেন কোরবানীর দিনে। – (কুরতুবী)

আত্মশুদ্ধিতে ৪০ দিনের বিশেষ তাৎপর্য ঃ এ আয়াতের ইঙ্গিতে বুঝা যাচ্ছে যে, আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংশোধনে ৪০ দিনের একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে লোক ৪০ দিন নিঃস্বার্থতার সাথে আল্লাহ্‌র এবাদত করবে, আল্লাহ্ তার অন্তর থেকে জ্ঞান ও হেকমতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দেন। – (রূহুল–বয়ান)

মানুষের প্রতি সকল কাজে ধীর–স্থিরতা ও ক্রমানুয়ের শিক্ষা ঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য একটা বিশেষ সময় নির্ধারিত করে নেয়া এবং তা ধীর–স্থিরতার সাথে পর্যায়ক্রমিকভাবে সমাধা করা আল্লাহ্ তাআলার রীতি। কোন কাজে তাড়াহুড়া করা আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়।

সর্বপ্রথম স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কাজের জন্য অর্থাৎ, বিশ্ব সৃষ্টি উপলক্ষে ছয় দিনের সময় নির্ধারণ করে এ নিয়মটিই বাতলে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ্‌র পক্ষে আসমান–যমীন তথা সমগ্র বিশ্বজাহান সৃষ্টির জন্য এক মিনিট সময়েরও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তিনি যখনই কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। কিন্তু সময় নির্ধারণের এ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্টিকে এ হেদায়েত দানই ছিল উদ্দেশ্য যে, তোমরা প্রতিটি কাজ একান্ত বিচার–বিবেচনার মাধ্যমে ধীরস্থিরভাবে সমাধা করবে। তেমনিভাবে মূসা (আঃ)–কে তওরাত দান করার জন্যেও যে সময় নির্ধারণ করা হয় তাতেও সে ইঙ্গিতই রয়েছে।

আর এই হল সে রীতি, যাকে উপেক্ষা করার দরুন বনী-ইসরাঈলদিগকে গোমরাহীর সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার সাবেক হুকুম অনুসারে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, আমি ত্রিশ দিনের জন্য যাচ্ছি। কিন্তু এদিকে যখন দশ দিনের সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়, তখন এরা নিজেদের তাড়াহুড়ার দরুন বলতে শুরু করে যে, মূসা (আঃ) তো কোথাও হারিয়েই গেছেন। কাজেই আমাদের অপর কোন নেতা নির্ধারণ করে নেয়াই উচিত। তার ফলে তারা সহসাই 'সামেরী'-এর ফাঁদে আটকে গিয়ে 'বাছুর'-এর পূজা করতে শুরু করে দেয়। তারা যদি চিন্তা-ভাবনা এবং নিজেদের কাজে ধীর-স্থিরতা ও পর্যায়ক্রমিকতা অবলম্বন করত, তাহলে এহেন পরিণতি হত না। -(কুরতুবী)

প্রয়োজনবশত : স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ : প্রথমতঃ হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা অনুসারে তূর পর্বতে গিয়ে যখন এ'তেকাফ করার ইচ্ছা করেন, তখন স্বীয় সঙ্গী হযরত হারূন (আঃ) কে বললেন, اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي অর্থাৎ, আমার পেছনে বা অবর্তমানে আপনি আমার সম্প্রদায়ে আমার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে দায়িত্ব পালন করুন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত হন তবে প্রয়োজনবোধে কোথাও যেতে হলে সে কাজের ব্যবস্থাপনার জন্য কোন লোক নিয়োগ করে যাওয়া কর্তব্য।

আরও প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যখন কোথাও সফরে যাবেন, তখন নিজের কোন লোককে স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যাবেন।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাধারণ রীতি এই ছিল যে, কখনও যদি তাঁকে মদীনার বাইরে যেতে হত, তখন তিনি কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যেতেন। একবার তিনি হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ)-কে খলীফা বা প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন এবং একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাক্তুম (রাঃ)-কে খলীফা নিযুক্ত করেন। এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহাবী (রাঃ)-কে মদীনায় খলীফা নিযুক্ত করে তিনি বাইরে যেতেন। - (কুরতুবী)

মূসা (আঃ) হারূন (আঃ)-কে খলীফা নিযুক্ত করার সময় তাঁকে কয়েকটি উপদেশ দান করেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, কাজের সুবিধার জন্য প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা উপদেশ দিয়ে যেতে হয়। এই হেদায়েত বা নির্দেশাবলীর মধ্যে প্রথম নির্দেশ হল وَأَصْلِحْ এখানে أَصْلِحْ এর কোন 'কর্ম' উল্লেখ করা হয়নি যে, কার এসলাহ বা সংশোধন করা হবে। এতে বুঝা যায় যে, নিজেরও এসলাহ করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় সম্প্রদায়েরও এসলাহ করবেন। অর্থাৎ, তাদের মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা জনিত কোন বিষয় আঁচ করতে পারলে তাদেরকে সরল পথে আনয়নের চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয় হেদায়েত দেয়া হলো এই যে, وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ অর্থাৎ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না। বলাবাহুল্য, হারূন (আঃ) হলেন আল্লাহ্র নবী, তাঁর নিজের পক্ষে ফাসাদে পতিত হওয়ার কোন আশঙ্কাই ছিল না। কাজেই এই হেদায়েতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কোন সাহায্য-সহায়তা করবেন না।

সুতরাং হযরত হারূন (আঃ) যখন দেখলেন, তাঁর সম্প্রদায় 'সামেরী' এর অনুগমন করতে শুরু করেছে, এমনকি তার কথা মত 'বাছুরের' পূজা করতে শুরু করে দিয়েছে, তখন তাঁর সম্প্রদায়কে এহেন ভণ্ডামী থেকে বাধা দান করলেন এবং সামেরীকে সে জন্য শাসালেন। অতঃপর ফিরে এসে হযরত মূসা (আঃ) যখন ধারণা করলেন যে, হারূন (আঃ) আমার অবর্তমানে কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছেন, তখন তাঁর প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করলেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর এ ঘটনা থেকে সেসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা অব্যবস্থা এবং নিশ্চিন্ততাকেই সবচেয়ে বড় বুযুর্গী বলে মনে করে থাকেন।

لَنْ تَرَانِي (অর্থাৎ, আপনি আমাকে দেখতে পারবেন না।) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দর্শন যদিও অসম্ভব নয়, কিন্তু যার প্রতি সম্বোধন করা হচ্ছে অর্থাৎ, মূসা (আঃ) বর্তমান অবস্থায় তা সহ্য করতে পারবেন না। পক্ষান্তরে দর্শন যদি আদৌ সম্ভব না হতো, তাহলে لَنْ تَرَانِي না বলে বলা হত, لن ارى 'আমার দর্শন হতে পারে না'।-(মাযহারী)

এতে প্রমাণিত হয় যে, যৌক্তিকতার বিচারে পৃথিবীতে আল্লাহ্র দর্শন লাভ যদিও সম্ভব, কিন্তু তবুও এতে তার সংঘটনের অসম্ভবতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর এটাই হল, অধিকাংশ আহলে সুন্নাহ্র মত যে, এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র দীদার বা দর্শন লাভ যুক্তিগতভাবে সম্ভব হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্ভব নয়। যেমন, সহী মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে— لن يرى احد منكم ربه حتى يموت অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুর পূর্বে তার পরওয়ারদেগারকে দেখতে পারবে না।"

وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ এতে প্রমাণ করা হচ্ছে যে, বর্তমান অবস্থায় শ্রোতা আল্লাহ্র দর্শন সহ্য করতে পারবে না বলেই পাহাড়ের উপর যৎসামান্য ছটা বিকিরণ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাও তোমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভবপর নয়; মানুষ তো একান্ত দুর্বলচিত্ত সৃষ্টি; সে তা কেমন করে সহ্য করবে?

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ আরবী অভিধানে تَجَلّى অর্থ, প্রকাশিত ও বিকশিত হওয়া। সূফী সম্প্রদায়ের পরিভাষায় 'তাজাল্লী' অর্থ হলো কোন বিষয়কে কোন কিছুর মাধ্যমে দেখা। যেমন, কোন বস্তুকে আয়নার মাধ্যমে দেখা হয়। সেজন্যই তাজাল্লীকে দর্শন বলা যায় না। স্বয়ং এ আয়াতেই তার সাক্ষ্য বর্তমান যে, আল্লাহ্ তাআলা দর্শনকে বলেছেন অসম্ভব আর তাজাল্লী বা বিকশিত হওয়াকে তা বলেননি।

ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও হাকেম হযরত আনাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করে হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মাথায় বৃদ্ধাঙ্গুলিটি রেখে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহুর এতটুকু অংশই শুধু প্রকাশ করা হয়েছিল, যাতে পাহাড় পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অবশ্য এতে গোটা পাহাড়ই যে খন্ডবিখণ্ড হয়ে যেতে হবে তা অপরিহার্য নয়, বরং পাহাড়ের যে অংশে আল্লাহ্র তাজাল্লী বিকিরিত হয়েছিল সে অংশটিই হয়তো প্রভাবিত হয়ে থাকবে।

হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ্র কালাম বা বাক্যবিনিময় : এ বিষয়টি তো কোরআনের প্রকৃষ্ট শব্দের দ্বারাই প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আঃ) -এর সাথে সরাসরিই বাক্য বিনিময় করেছেন। এ কালামের মধ্যে রয়েছে প্রথমতঃ সেসব কালাম যা নবুওয়ত দানকালে হয়েছিল। আর দ্বিতীয়তঃ সেসব কালাম, যা তওরাত দানকালে হয়েছে এবং যার আলোচনা এ আয়াতে করা হয়েছে। আয়াতের শব্দের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের কালাম বা বাক্যবিনিময়

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَ
بِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾ وَكَتَبْنَا
لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ
شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ۚ
سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٥﴾ سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ
يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ
لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ
وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ
اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٧﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ
حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ
وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤٨﴾ وَلَمَّا
سُقِطَ فِىْٓ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ
لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾

(১৪৪) (পরওয়ারদেগার) বললেন, হে মূসা, আমি তোমাকে আমার বার্তা পাঠানোর এবং কথা বলার মাধ্যমে লোকদের উপর বিশিষ্টতা দান করেছি। সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করলাম, গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক। (১৪৫) আর আমি তোমাকে পটে লিখে দিয়েছি সর্বপ্রকার উপদেশ ও বিস্তারিত সব বিষয়। অতএব, এগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ দৃঢ়তার সাথে পালনের নির্দেশ দাও। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাব কাফেরদের বাসস্থান। (১৪৬) আমি আমার নিদর্শনসমূহ হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে। যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি হেদায়েতের পথ দেখে, তবে সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহীর পথ দেখলে তাই গ্রহণ করে নেয়। এর কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে মনে করেছে এবং তা থেকে বে-খবর রয়ে গেছে। (১৪৭) বস্তুতঃ যারা মিথ্যা জেনেছে আমার আয়াতসমূহকে এবং আখেরাতের সাক্ষাতকে, তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমন বদলাই সে পাবে যেমন আমল করত। (১৪৮) আর বানিয়ে নিল মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকারাদির দ্বারা একটি বাছুর তা থেকে বেরুচ্ছিল 'হাম্বা হাম্বা' শব্দ। তারা কি একথাও লক্ষ্য করল না যে, সেটি তাদের সাথে কথাও বলছে না এবং তাদেরকে কোন পথও বাতলে দিচ্ছে না! তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল। বস্তুতঃ তারা ছিল জালেম। (১৪৯) অতঃপর যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং বুঝতে পারল যে, আমরা নিশ্চিতই গোমরাহ হয়ে পড়েছি, তখন বলতে লাগল, আমাদের প্রতি যদি আমাদের পরওয়ারদেগার করুণা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।

প্রথম পর্যায়ের কালামের তুলনায় ছিল কিছুটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ কালামের তাৎপর্য এবং তা কেমন করে সংঘটিত হয়েছিল, তা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানতে পারে না। তবে এতে শরীয়তের পরিপন্থী নয়, এমন যত রকম যৌক্তিক সম্ভাব্যতা থাকতে পারে, সেগুলোর কোন একটিকে বিনা প্রমাণে নির্দিষ্ট করা জায়েয হবে না। তাছাড়া এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সাহাবী-তাবেঈগণের মতামতই সব চাইতে উত্তম যে, এ বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেয়া এবং নানা ধরনের সম্ভাব্যতা খুঁজে বেড়ানোর পেছনে না পড়াই বাঞ্ছনীয়।—(বয়ানুল-কোরআন)

سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ এ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ক্ষেত্রের অর্থ কি? এতে দু'টি মত রয়েছে। একটি মিসর, অপরটি শাম বা সিরিয়া। কারণ, হযরত মূসা (আঃ)-এর বিজয়ের পূর্বে মিসরে ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায় ছিল শাসক ও প্রবল। এ হিসাবে মিসরকে 'দারুল ফাসেকীন' বা পাপাচারীদের আবাসস্থল বলা যায়। আর সিরিয়ায় যেহেতু তখন আমালেকা সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যেহেতু ওরাও ছিল ফাসেক বা পাপাচারী, সেহেতু তখন সিরিয়াও ছিল ফাসেকদেরই আবাসভূমি। এতদুভয় অর্থের কোন্‌টি যে এখানে উদ্দেশ্য' সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর তার ভিত্তি হল এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ডুবে মরার পর বনী-ইসরাঈলরা মিসরে ফিরে গিয়েছিল কি না? যদি মিসরে ফিরে গিয়ে থাকে এবং মিসর সাম্রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে থাকে; যেমন আয়াত وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ এর দ্বারা সমর্থন পাওয়া যায়, তবে মিসরে তাদের আধিপত্য আলোচ্য তূর পর্বতে তাজাল্লী বা জ্যোতি বিকিরণের ঘটনার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে এ আয়াতে دَارَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থ শাম দেশ বা সিরিয়াই নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি তখন তারা মিসরে ফিরে না গিয়ে থাকে, তাহলে তাতে উভয় দেশই উদ্দেশ্য হতে পারে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ এতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব থেকে লেখা তওরাতের পাতা বা তখতী হযরত মূসা (আঃ)-কে অর্পণ করা হয়েছিল। আর সে তখতীগুলোর নামই হলো 'তওরাত'।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে সেসব লোককে বিমুখ বা বঞ্চিত করব, যারা পৃথিবীতে অধিকার না থাকা সত্ত্বেও গর্বিত, অহংকারী হয়।"

এখানে "অধিকার না থাকা" শব্দটি প্রয়োগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গর্বিত অহংকারীদের মোকাবিলায় প্রতি-অহংকার করা অন্যায় বা গোনাহ্ নয়। কারণ, এক্ষেত্রে তা শুধু বাহ্যিক রূপের দিক দিয়ে অহংকার, প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়। যেমন, প্রবাদ আছে অর্থাৎ, অহংকারীদের সাথে প্রতি-অহংকারই হলো নম্রতা।— (মাসায়েলে-সুলূক)

অহংকার মানুষকে সুষ্ঠু জ্ঞান ও ঐশী এলম থেকে বঞ্চিত করে দেয় : গর্বিত-অহংকারীদিগকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ থেকে বঞ্চিত করে দেয়ার প্রকৃত মর্ম হচ্ছে এই যে, তাদের থেকে আল্লাহ্র নিদর্শন বা আয়াতসমূহ বোঝা বা উপলব্ধি করার এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সামর্থ্য ও তওফীক তুলে নেয়া হয়। আর এখানে 'আল্লাহ্র নিদর্শন বা

আয়াত' কথাটিও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। যাতে তওরাত, যবুর ও কোরআনে বর্ণিত আয়াত বা নিদর্শনসমূহ যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহ যা আসমান, যমীন ও তাতে অবস্থিত সৃষ্টির মাঝে বিস্তৃত। কাজেই আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য দাঁড়ায় এই যে, 'তাকাব্বুর, অর্থাৎ, নিজকে নিজে অন্যান্যদের চাইতে বড় ও উত্তম মনে করা এমনই দূষণীয় ও জঘন্য অভ্যাস যে, এতে যে পতিত হয়,তার সুষ্ঠু বুদ্ধি-জ্ঞান থাকে না। সেজন্যই সে আল্লাহ্ তাআলার আয়াতের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। না থাকে কোরআনের আয়াত বুঝবার ক্ষমতা ও তওফীক, না আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রাকৃতিক নির্দশনসমূহ সম্পর্কে যথার্থ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্র মা'রেফাত বা পরিচয় লাভে মন চলে।

তফসীরে রূহুল-বয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অহংকার ও গর্ব এমন এক মন্দ অভ্যাস,যা ঐশী জ্ঞান লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, আল্লাহ্র জ্ঞান লাভ হতে পারে একমাত্র আল্লাহ্রই রহমতে। আর আল্লাহ্র রহমত হয় একমাত্র বিনম্রতার মাধ্যমে।

হযরত মূসা (আঃ) যখন তওরাত গ্রহণ করার জন্য তূর পাহাড়ে গিয়ে ধ্যানে বসলেন এবং ইতিপূর্বে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত ধ্যানের যে নির্দেশ হয়েছিল; সে মতে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, ত্রিশ দিন পরে আমি ফিরে আসব, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা যখন আরও দশ দিন ধ্যানের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন, তখন ইসরাঈলী সম্প্রদায় তাদের চিরাচরিত তাড়াহুড়া ও ভ্রষ্টতার দরুন নানা রকম মন্তব্য করতে আরম্ভ করল। তাঁর সম্প্রদায়ে 'সামেরী' নামে একটি লোক ছিল। তাকে সম্প্রদায়ের লোকেরা 'বড় মোড়ল' বলে মানত। কিন্তু সে ছিল একান্তই দুর্বল বিশ্বাসের লোক। কাজেই সে সুযোগ বুঝে বনী-ইসরাঈলের লোকদের বলল, তোমাদের কাছে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের যেসব অলংকারপত্র রয়েছে, সেগুলো তো তোমরা কিবতীদের কাছ থেকে ধার করে এনেছিলে, এখন তারা সবাই ডুবে মরেছে, আর অলংকারগুলো তোমাদের কাছেই রয়ে গেছে, কাজেই এগুলো তোমাদের জন্যে হালাল নয়। কারণ, তখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধে বিজিত সম্পদও হালাল ছিল না। বনী-ইসরাঈলরা তার কথামত সমস্ত অলংকারাদি তার কাছে (সামেরীর কাছে) এনে জমা দিল। সে এই সোনা-রূপা দিয়ে একটি বাছুরের প্রতিমূর্তি তৈরী করল এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর ঘোড়ার খুরের তলার মাটি যা পূর্ব থেকেই তার কাছে রাখা ছিল এবং যাকে আল্লাহ্ তা'আলা জীবন ও জীবনী শক্তিতে সমৃদ্ধ করে দিয়েছিলেন. সোনা-রূপাগুলো আগুনে গলাবার সময় সে তাতে মাটি মিশিয়ে দিল। ফলে বাছুরের প্রতিমূর্তিটিতে জীবনী শক্তির নিদর্শন সৃষ্টি হলো এবং তার ভেতর থেকে গাভীর মত হাম্বা রব বেরোতে লাগল। এ ক্ষেত্রে عِجْلًا শব্দের ব্যাখ্যায় جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সামেরীর এ বিস্ময়কর পৈশাচিক আবিষ্কার যখন সামনে উপস্থিত হলো, তখণ সে বনী-ইসরাঈলদিগকে কুফরীর প্রতি আমন্ত্রণ জানাল যে, ''এটাই হলো খোদা। মূসা (আঃ) তো আল্লাহ্র সাথে কথা বলার জন্যে গেছেন তূর পাহাড়ে, আর এদিকে আল্লাহ্ (নাউযুবিল্লাহ্) সশরীরে এখানে এসে হাজির হয়ে গেছেন। মূসা (আঃ)-এর সত্যি ভুলই হয়ে গেল।'' বনী-ইসরাঈলদের সবাই পূর্ব থেকেই সামেরীর কথা শুনত। আর এখন তার এই অদ্ভুত ম্যাজিক দেখার পর তো আর কথাই নেই; সবাই একেবারে ভক্তে পরিণত হয়ে গেল এবং সে বাছুরকে খোদা মনে করে তারই উপাসনা-এবাদতে প্রবৃত্ত হল।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا
خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ
وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ
اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَ
لَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَ
أَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا
مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾
وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا
هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ
قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ
لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ
مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن
تَشَاءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾

(১৫০) তারপর যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়, তখন বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কি নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বটাই না করেছ! তোমরা নিজ পরওয়ারদেগারের হুকুম থেকে কি তাড়াহুড়া করে ফেললে এবং সে তখতীগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন! ভাই বললেন, হে আমার মায়ের পুত্র, লোকগুলো যে আমাকে দুর্বল মনে করল এবং আমাকে যে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। সুতরাং আমার উপর আর শত্রুদের হাসিও না। আর আমাকে জালিমদের সারিতে গণ্য করো না। (১৫১) মূসা বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, ক্ষমা কর আমাকে আর আমার ভাইকে এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি যে সর্বাধিক করুণাময়। (১৫২) অবশ্য যারা গোবৎসকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তাদের উপর তাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে পার্থিব এ জীবনেই গযব ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে। এমনি আমি অপবাদ আরোপকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (১৫৩) আর যারা মন্দ কাজ করে, তারপরে তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে, তবে নিশ্চয়ই তোমার পরওয়ারদেগার তওবার পর অবশ্য ক্ষমাকারী, করুণাময়। (১৫৪) তারপর যখন মূসার রাগ পড়ে গেল, তখন তিনি তখতীগুলো তুলে নিলেন। আর যা কিছু তাতে লেখা ছিল, তা ছিল সে সমস্ত লোকের জন্য হেদায়েত ও রহমত যারা নিজেদের পরওয়ারদেগারকে ভয় করে। (১৫৫) আর মূসা বেছে নিলেন নিজের সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোক আমার প্রতিশ্রুত সময়ের জন্য। তারপর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তখন বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, তুমি যদি ইচ্ছা করতে, তবে তাদেরকে আগেই ধ্বংস করে দিতে এবং আমাকেও। আমাদেরকে কি সে কর্মের কারণে ধ্বংস করছ, যা আমার সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা করেছে? এসবই তোমার পরীক্ষা; তুমি যাকে ইচ্ছা এতে পথভ্রষ্ট করবে এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথে রাখবে। তুমি যে আমাদের রক্ষক—সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের উপর করুণা কর। তাছাড়া তুমিই তো সর্বাধিক ক্ষমাকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোন কোন পাপের শাস্তি পার্থিব জীবনেই পাওয়া যায় ঃ সামেরী ও তার সঙ্গীদের যেমন হয়েছিল যে, গোবৎস উপাসনা থেকে যখন তারা যথার্থভাবে তওবা করল না, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাকে এ পৃথিবীতে অপদস্থ-অপমানিত করে ছেড়েছেন। তাকে মূসা (আঃ) নির্দেশ দিয়ে দিলেন, সে যেন সকলের কাছ থেকে পৃথক থাকে; সেও যাতে কাউকে না ছোঁয়, তাকেও যেন কেউ না ছোঁয়। সুতরাং সারা জীবন এমনিভাবে জীব-জন্তুর সাথে বসবাস করতে থাকে; কোন মানুষ তার সংস্পর্শে আসতো না।

তফসীরে-কুরতুবীতে হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে যে,আল্লাহ্ তাআলা তার উপর এমন আযাব চাপিয়ে দিয়েছিলেন যে, যখনই সে কাউকে স্পর্শ করত কিংবা তাকে কেউ স্পর্শ করত, তখন সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই গায়ে জ্বর এসে যেত।—(কুরতুবী)

তফসীরে রূহুল-বয়ানে বলা হয়েছে যে, আজও তার বংশধরদের মাঝে এমনি অবস্থা বিদ্যমান। আয়াতের শেষদিকে বলা হয়েছে, وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাদেরকে এমনি শাস্তি দিয়ে থাকি। হযরত সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনাহ্ (রহঃ) বলেন, যারা ধর্মীয় ব্যাপারে বেদআত অবলম্বন করে (অর্থাৎ, ধর্মে কোন রকম কুসংস্কার সৃষ্টি অথবা গ্রহণ করে,) তারাও আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপের অপরাধে অপরাধী হয়ে সে শাস্তিরই যোগ্য হয়ে পড়ে।—(মাযহারী)

ইমাম মালেক (রহঃ) এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, ধর্মীয় ব্যাপারে যারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন বেদআ'ত বা কুসংস্কার আবিষ্কার করে তাদের শাস্তি এই যে, তারা আখেরাতে আল্লাহ্র রোষানলে পতিত হবে এবং পার্থিবজীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে।—(কুরতুবী)

দ্বিতীয় আয়াতে সেসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা হযরত মূসা (আঃ)-এর সতর্কীকরণের পর নিজেদের এই অপরাধের জন্য তওবা করে নিয়েছে এবং তওবার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে কঠোরতর শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, তাদেরই একজন অপরজনকে হত্যা করতে থাকলেই তওবা কবুল হবে—তারা সে শর্তও পালন করল, তখন হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশক্রমে তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমাদের সবার তওবাই কবুল হয়েছে। এই হত্যাযজ্ঞে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তারা শহীদ হয়েছে, আর যারা বেঁচে রয়েছে তারা এখন ক্ষমাপ্রাপ্ত। এ আয়াতে বলা হয়েছে, যেসব লোক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তা সে কাজ যত বড় পাপই হোক, কুফরীও যদি হয়, তবুও পরবর্তীতে তওবা করে নিলে এবং ঈমান ঠিক করে ঈমানের দাবী অনুযায়ী নিজের আমল বা কর্ম সংশোধন করে নিলে, আল্লাহ্ তাকে নিজ রহমতে ক্ষমা করে দেবেন। কাজেই কারো দ্বারা কোন পাপ হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে তওবা করে নেয়া একান্ত কর্তব্য।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর রাগ যখন প্রশমিত হয়, তখন তাড়াতাড়িতে ফেলে রাখা তওরাতের তখতিগুলো আবার তুলে নিলেন। আল্লাহ্ তাআলাকে যারা ভয় করে তাদের জন্য সে 'সংকলনে' হেদায়েত ও রহমত ছিল।

نسخة বা 'সংকলন' বলা হয় সে লেখাকে যা কোন গ্রন্থরাজি থেকে উদ্ধৃত করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) রাগের মাথায় যখন তওরাতের তখতীগুলো তাড়াতাড়িতে নামিয়ে রাখেন, তখন সেগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফলে পরে আল্লাহ্ তাআলা অন্য কোন কিছুতে লেখা তওরাত দান করেছিলেন। তাকেই 'নোসখা' বা সংকলন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্তর জন বনী-ইসরাঈলের নির্বাচন এবং তাদের ধ্বংসের ঘটনা ঃ চতুর্থ আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ্‌র কিতাব তওরাত নিয়ে এসে বনী-ইসরাঈলদিগকে দিলেন, তখন নিজেদের বক্রতা ও ছলছুতার দরুন বলতে লাগল যে, আমরা একথা কেমন করে বিশ্বাস করব যে, এটা আল্লাহ্‌রই কালাম? এমনও তো হতে পারে যে, আপনি নিজেই এগুলো নিয়ে এসে থাকবেন। মূসা (আঃ) তখন এ বিষয়ে তাদের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আল্লাহ্ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করলেন। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বলা হলো যে, আপনি এ সম্প্রদায়ের নির্বাচিত ব্যক্তিদিগকে তূরে নিয়ে আসুন। আমি তাদেরকেও নিজের কালাম শুনিয়ে দেব। তাহলেই বিষয়টি তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে। মূসা (আঃ) তাদের মধ্য থেকে সত্তর জনকে নির্বাচিত করে তূরে নিয়ে গেলেন। ওয়াদা অনুযায়ী তারা নিজ কানে আল্লাহ্‌র কালামও শুনল। এ প্রমাণও যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, তারা পুনরায় বলতে লাগল, কে জানে, এ শব্দ আল্লাহ্‌রই, না অন্য কারও। আমরা তো তখনই বিশ্বাস করব, আল্লাহ্‌কে যখন প্রকাশ্য আমাদের সামনে সরাসরি দেখতে পাব। তাদের এ দাবী যেহেতু একান্তই হঠকারিতা ও মূর্খতার ভিত্তিতে ছিল, তাই তাদের উপর ঐশী রোষানল বর্ষিত হল। ফলে তাদের নীচের দিক থেকে এল ভূকম্পন, আর উপর দিক থেকে শুরু হল বজ্র গর্জন। যার দরুন তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল এবং দৃশ্যতঃ মৃতে পরিণত হল। এ ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা বাক্বারায় এ ক্ষেত্রে صاعقة (সায়ে'কাহ্) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে বলা হয়েছে رجفة (রাজফাহ্)। 'সায়েকা' অর্থ বজ্র গর্জন। আর 'রাজফাহ্' অর্থ ভূকম্পন। কাজেই ভূকম্পন ও বজ্র গর্জন একই সাথে আরম্ভ হয়ে যাওয়াও কিছুই অসম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু হোক আর নাই হোক, তারা মৃতের মত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, যাতে বাহ্যতঃ মৃত বলেই মনে হতে পারে। এঘটনায় হযরত মূসা (আঃ) অত্যন্ত বিচলিত হলেন। কারণ, একে তো এরা ছিল সম্প্রদায়ের বাছা বাছা (বুদ্ধিজীবী) লোক, দ্বিতীয়তঃ জাতির কাছে গিয়ে তিনি কি জবাব দেবেন! তারা অপবাদ আরোপ করবে যে, মূসা (আঃ) তাদেরকে কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেলেছে। তদুপরি এ অপবাদ আরোপের পর এরা আমাকেও রেহাই দেবে না; নির্ঘাত হত্যা করবে। সেজন্যেই তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে নিবেদন করলেন; ইয়া পরওয়ারদেগার,আমি জানি, এ ঘটনায় তাদেরকে হত্যা করা আপনার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তাই যদি হতো, তবে ইতিপূর্বে বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে এরা নিহত হয়ে যেতে পারত; ফেরাউনের সাথে তাদেরও সলিল সমাধি হতে পারত; কিংবা গোবৎস পূজার সময়ও সবার সামনে হত্যা করে দেয়া যেতে পারত। তাছাড়া আপনি ইচ্ছা করলে আমাকেও তাদের সাথেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন, কিন্তু আপনি তা চাননি। তাতে বোঝা যাচ্ছে, এক্ষেত্রেও তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো শাস্তি দেয়া এবং সতর্ক করা। তাছাড়া এটা হয়ইবা কেমন করে যে, আপনি আমাদের কয়েকজন নিরেট মূর্খের কার্যকলাপের দরুন আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন! এক্ষেত্রে 'নিজকে নিজে ধ্বংস করা' এজন্য বলা হয়েছে যে, এই সত্তর জনের এভাবে অদৃশ্য মৃত্যুর পরিণতি সম্প্রদায়ের হাতে মূসা (আঃ)–এর ধ্বংসেরই নামান্তর ছিল।

অতঃপর নিবেদন করলেন যে, আমি জানি, এটা একান্তই পরীক্ষা, যাতে আপনি কোন কোন লোককে পথভ্রষ্ট–গোমরাহ করে দেন, যার ফলে তারা আল্লাহ্ তা'আলার না–শোকর বা কৃতঘ্ন হয়ে উঠে। আবার অনেককে এর দ্বারা সুপথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। ফলে তারা আল্লাহ্ তা'আলার তত্ত্ব ও কল্যাণসমূহ উপলব্ধি করে প্রশান্তি অনুভব করতে থাকে। আমিও আপনার বিজ্ঞতা ও জ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞাত রয়েছি। সুতরাং আপনার এ পরীক্ষায় আমি সন্তুষ্ট। তাছাড়া আপনিই তো আমাদের প্রকৃত অভিভাবক—আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি করুণা ও রহমত দান করুন। আপনিই সমস্ত ক্ষমাকারীদের মধ্যে মহান ক্ষমাকারী। কাজেই তাদের ধৃষ্টতাকেও ক্ষমা করুন। বস্তুতঃ (এ প্রার্থনার পর) তারা যথাপূর্ব জীবিত হয়ে উঠে।

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا
هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ
يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَ
اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي
وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾ وَ
مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

(১৫৬) আর পৃথিবীতে এবং আখেরাতে আমাদের জন্য কল্যাণ লিখে দাও। আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, আমার আযাব তারই উপর পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব যারা ভয় রাখে, যাকাত দান করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। (১৫৭) সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশে সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। (১৫৮) বলে দাও, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ্ প্রেরিত রসূল, সমগ্র আসমান ও যমীনে তার রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর উপর, তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ্র এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার। (১৫৯) বস্তুতঃ মূসার সম্প্রদায়ে একটি দল রয়েছে যারা সত্যপথ নির্দেশ করে এবং সে মতেই বিচার করে থাকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

খাতেমুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ও তাঁর উম্মতের গুণ-বৈশিষ্ট্য ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়ার প্রতিউত্তরে বলা হয়েছিল যে, সাধারণতঃ আল্লাহ্র রহমত তো সমস্ত মানুষ ও বিষয়-সামগ্রীতে ব্যাপক; আপনার বর্তমান উম্মতও তা থেকে বঞ্চিত নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ নেয়ামত ও রহমতের অধিকারী হলো তারাই যারা ঈমান, তাকওয়া-পরহেযগারী ও যাকাত দান প্রভৃতি বিশেষ শর্তসমূহ পূরণ করেন।

এ আয়াতে তাদেরই সন্ধান দেয়া হয়েছে যে, উল্লেখিত শর্তসমূহের যথার্থ পূরণকারী কারা হতে পারে। বলা হয়েছে, এরা হচ্ছে সেসব লোক, যারা উম্মী-নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ করবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সাঃ)-এর কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রতি শুধু ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপনই নয়; বরং সেই সাথে তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্যেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্য ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে শরীয়ত ও সুন্নাহ্র আনুগত্য – অনুসরণও একান্ত আবশ্যক।

الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ এখানে মহানবী (সাঃ)-এর দু'টি পদবী 'রসূল' ও 'নবী' – এর সাথে সাথে তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্য 'উম্মী'-এরও উল্লেখ করা হয়েছে। امى (উম্মী) শব্দের অর্থ হল নিরক্ষর। যে লেখা-পড়া কোনটাই জানে না। সাধারণ আরবদিগকে সে কারণেই কোরআন اميين (উম্মিয়্যীন) বা নিরক্ষর জাতি বলে অভিহিত করেছে যে, তাদের মধ্যে লেখা-পড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল। তবে উম্মী বা নিরক্ষর হওয়াটা কোন মানুষের জন্য প্রসংশনীয় গুণ নয়, বরং ত্রুটি হিসেবেই গণ্য। কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ)-এর জ্ঞান-গরিমা, তত্ত্বও, তথ্য অবগতি এবং অন্যান্য গুণবৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও উম্মী হওয়া তাঁর পক্ষে বিরাট গুণ ও পরিপূর্ণতায় পরিণত হয়েছে। কারণ, শিক্ষাগত, কার্যগত ও নৈতিক পরাকাষ্ঠা যদি কোন লেখাপড়া জানা মানুষের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহলে তা হয়ে থাকে তার সে লেখাপড়ারই ফলশ্রুতি, কিন্তু কোন একান্ত নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারা এমন অসাধারণ, অভূতপূর্ব ও অনন্য তত্ত্ব-তথ্য ও সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশ পেলে, তা তাঁর প্রকৃষ্ট মু'জেযা ছাড়া আর কি হতে পারে—যা কোন প্রথম শ্রেণীর বিদ্বেষীও অস্বীকার করতে পারে না। বিশেষ করে মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের প্রথম চল্লিশটি বছর মক্কা নগরীতে সবার সামনে এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে, যাতে তিনি কারও কাছে এক অক্ষর পড়েনওনি লেখেনওনি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সকালে সহসা তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন বাণীর ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হলো, যার একটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশের মত একটি সূরা রচনায় সমগ্র বিশ্ব অপারক হয়ে পড়ল। কাজেই এমতাবস্থায় তাঁর উম্মী বা নিরক্ষর হওয়া, আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত রসূল হওয়ার এবং কোরআন মজীদ আল্লাহ্র কালাম হওয়ারই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অতএব, উম্মী হওয়া যদিও অন্যদের জন্য কোন প্রশংসনীয় গুণ নয়, কিন্তু মহানবী হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর জন্য একটি প্রশংসনীয় ও মহান গুণ ও পরাকাষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন মানুষের জন্য যেমন 'অহংকারী' শব্দটি কোন প্রশংসাবাচক গুণ নয়; বরং ত্রুটি বলে গণ্য হয়, কিন্তু মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য এটি বিশেষভাবেই প্রশংসাবাচক সিফত।

আলোচ্য আয়াতে মহানবী (সাঃ)-এর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা (অর্থাৎ, ইহুদী-নাসারারা) আপনার সম্পর্কে তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখবে। এখানে লক্ষণীয় যে, কোরআন মজীদ একথা বলেনি

যে, আপনার গুণ-বৈশিষ্ট্য ও অবস্থাসমূহ তাতে লেখা পাবে।' এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তওরাত ও ইঞ্জীলে মহানবী (সাঃ)-এর অবস্থা ও গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহ এমন স্পষ্ট ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যার প্রতি লক্ষ্য করা স্বয়ং হুযূর আকরাম (সাঃ)-কে দেখারই শামিল। আর এখানে তওরাত ও ইঞ্জীলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, বনী-ইসরাঈলরা এ দু'টি গ্রন্থকেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকত। তা না হলে মহানবী (সাঃ)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা 'যবুর' গ্রন্থেও রয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছেন হযরত মূসা (আঃ)। এতে তাঁকে বলা হয়েছে, দুনিয়া ও আখেরাতের পরিপূর্ণ কল্যাণ আপনার উম্মতের মধ্যে তারাই পেতে পারবে, যারা উম্মী-নবী ও খাতেমুল আম্বিয়া আলাইহিস্সালাতু ওয়াস সালামের অনুসরণ করবে। এ বিষয়গুলো তারা তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পাবে।

তওরাত ও ইঞ্জীলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর গুণবৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন ঃ বর্তমান কালের তওরাত ও ইঞ্জীল অসংখ্য রদবদল ও বিকৃতি সাধনের ফলে বিশ্বাসযোগ্য থাকেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তাতে এমনসব বাক্য ও বর্ণনা রয়েছে, যাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ- মোস্তফা (সাঃ) – এর সন্ধান পাওয়া যায়। আর এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কোরআন মজীদ যখন ঘোষণা করেছে যে, শেষ নবীর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনসমূহ তওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে, তখন একথাটি যদি বাস্তবতা বিরোধী হত, তবে সে যুগের ইহুদী ও নাসারাদের হাতে ইসলামের বিরুদ্ধে এমন এক বিরাট হাতিয়ার উপস্থিত হতো যার মাধ্যমে (সহজেই) কোরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারত যে, না, তওরাত ও ইঞ্জীলের কোথাও নবীয়ে -উম্মী (সাঃ) সম্পর্কে আলোচনা নেই। কিন্তু তখনকার ইহুদী বা নাসারারা কোরআনের এ ঘোষণার বিরুদ্ধে কোন পাল্টা ঘোষণা করেনি। এটাই একটা বিরাট প্রমাণ যে, তখনকার তওরাত ও ইঞ্জীলে রসূলে করীম (সাঃ)-এর গুণবৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বিদ্যমান ছিল, ফলে তারাও ছিল সম্পূর্ণ নীরব-নিশ্চুপ।

খাতেমুন্নাবিয়ীন (সমস্ত নবীর শেষ নবী) (সাঃ)-এর যেসব গুণবৈশিষ্ট্য তওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ ছিল সেগুলোর কিছু আলোচনা তওরাত ও ইঞ্জীলের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে কোরআন মজীদেও করা হয়েছে। আর কিছু সে সমস্ত মনীষীবৃন্দের উদ্ধৃতিতে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা তওরাত ও ইঞ্জীলের আসল সংকলন স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাতে হুযূরে আকরাম (সাঃ) – এর আলোচনা নিজে পড়েই মুসলমান হয়েছেন।

হযরত বায়হাকী (রহঃ), দালায়েলুন্নুবুয়্যাত' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, কোন এক ইহুদী বালক নবী করীম (সাঃ)- এর খেদমত করত। হঠাৎ সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে হুযূর (সাঃ) তার অবস্থা জানার জন্য তশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, তার পিতা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তওরাত তেলাওয়াত করছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হে ইহুদী, আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি সে মহান সত্তার যিনি মূসা (আঃ)-এর উপর তওরাত নাযিল করেছেন, তুমি কি তওরাতে আমার অবস্থা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং আবির্ভাব সম্পর্কে কোন বর্ণনা পেয়েছ? সে অস্বীকার করল। তখন তার ছেলে বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ্, তিনি (অর্থাৎ, এই ছেলের পিতা) ভুল বলছেন। তওরাতে আমরা আপনার আলোচনা এবং আপনার গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আপনি তাঁর প্রেরিত রসূল। অতঃপর হুযূরে আকরাম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)- কে নির্দেশ দিলেন যে, এখন এ বালক মুসলমান। তার মৃত্যুর পর তার কাফন-দাফন মুসলমানরা করবে। তার পিতার হাতে দেয়া হবে না।— (মাযহারী)

হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) বলেন যে, হুযূর আকরাম (সাঃ) – এর নিকট জনৈক ইহুদীর কিছু ঋণ প্রাপ্য ছিল। সে এসে তার ঋণ চাইল। হুযূর (সাঃ) বললেন, এমুহূর্তে আমার কাছে কিছুই নেই; আমাকে কিছু সময় দাও। ইহুদী কঠোরভাবে তাগাদা করে বলল, আমি আপনাকে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়ব না। হুযূর (সাঃ) বললেন, তোমার সে অধিকার রয়েছে—আমি তোমার কাছে বসে পড়ব। তারপর হুযূর (সাঃ) সেখানেই বসে পড়লেন এবং যোহর, আসর, মাগরেব ও এশার নামায সেখানেই আদায় করলেন। এমনকি পরের দিন ফজরের নামাযও সেখানই পড়লেন। বিষয়টি দেখে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং ক্রমাগত রাগান্বিত হচ্ছিলেন ; আর ইহুদীকে আস্তে আস্তে ধমকাচ্ছিলেন যাতে সে হুযূর (সাঃ)-কে ছেড়ে দেয়। হুযূর (সাঃ) বিষয়টি বুঝতে পেরে সাহাবীগণকে বললেন, একি করছ? তখন তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, এটা আমরা কেমন করে সহ্য করব যে, একজন ইহুদী আপনাকে বন্দী করে রাখবে? হুযূর (সাঃ) বললেন, 'আমার পরওয়ারদেগার কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির প্রতি জুলুম করতে আমাকে বারণ করেছেন।' এহুদী এসব ঘটনাই লক্ষ্য করছিল।

ভোর হওয়ার সাথে সাথে ইহুদী বলল – اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র রসূল।) এভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়ে সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় দিয়ে দিলাম। আর আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, এতক্ষণ আমি যা কিছু করেছি তার উদ্দেশ্য ছিল শুধু পরীক্ষা করা যে, তওরাতে আপনার যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তা আপনার মধ্যে যথার্থই বিদ্যমান কি নয়। আমি আপনার সম্পর্কে তওরাতে এ কথাগুলো পড়েছি ঃ

''মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্, তাঁর জন্ম হবে মক্কায়, তিনি হিজরত করবেন 'তাইবা'র দিকে; আর তাঁর দেশ হবে সিরিয়া। তিনি কঠোর মেযাজের হবেন না, কঠোর ভাষায় তিনি কথাও বলবেন না, হাটে-বাজারে তিনি হট্টগোলও করবেন না। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে তিনি দূরে থাকবেন।''

পরীক্ষা করে আমি এখন এসব বিষয় সঠিক পেয়েছি। কাজেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্যই নেই; আর আপনি হলেন আল্লাহ্র রসূল। আর এই হল আমার অর্ধেক সম্পদ। আপনি যেভাবে খুশী খরচ করতে পারেন। সে ইহুদী বহু ধন-সম্পত্তির মালিক ছিল। তার অর্ধেক সম্পদও ছিল এক বিরাট সম্পদ।—(বায়হাকী কৃত 'দালায়েলুন্নবুওয়্যাত' গ্রন্থের বরাত দিয়ে 'তফসীরে-মাযহারীতে' ঘটনাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।'

ইমাম বগভী (রহঃ) নিজ সনদে কা'আবে আহবার (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তওরাতে হুযূর আকরাম (সাঃ) সম্পর্কে লেখা রয়েছে ঃ

''মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল ও নির্বাচিত বান্দা। তিনি না কঠোর মেজাজের লোক, না বাজে বক্তা। নাইবা তিনি হাটে-বাজারে হট্টগোল করার লোক। তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না; বরং ক্ষমা করে দেন এবং ছেড়ে দেন। তাঁর জন্ম হবে মক্কায়, আর হিজরত হবে তাইবায়, তাঁর দেশ হবে শাম (সিরিয়া)। আর তাঁর উম্মত হবে 'হাম্মাদীন'। অর্থাৎ, আনন্দ-বেদনা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ্ তাআলার

প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। তারা যে কোন উর্ধ্বারোহণকালে তকবীর বলবে। তারা সূর্যের ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যাতে সময় নির্ণয় করে যথাসময় নামায পড়তে পারে। তিনি তাঁর শরীরের নিম্নাংশে 'তহবন্দ' (লুঙ্গি) পরবেন এবং হস্ত-পদাদি ওযুর মাধ্যমে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখবেন। তাঁদের আযানদাতা আকাশে সুউচ্চ স্বরে আহবান করবেন। জেহাদের ময়দানে তাদের সারিগুলো এমন হবে যেমন নামাযে হয়ে থাকে। রাতের বেলায় তাদের তেলাওয়াত ও যিকিরের শব্দ এমনভাবে উঠতে থাকবে, যেন মধুমক্ষিকার শব্দ।''—(মাযহারী)

ইবনে সা'আদ ও ইবনে আসাকির (রহঃ) হযরত সাহাল মওলা খাইসামা (রাঃ) থেকে সনদ সহকারে উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত সাহাল বলেন, আমি নিজে ইঞ্জীলে মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) – এর গুণ – বৈশিষ্ট্যসমূহ পড়েছি যে, ঃ

''তিনি খুব বেঁটেও হবেন না আবার খুব লম্বাও হবেন না। উজ্জ্বল বর্ণ ও দু'টি কেশ-গুচ্ছধারী হবেন। তাঁর দু'কাঁধের মধ্যস্থলে নবুওয়তের মোহর থাকবে। তিনি সদকা গ্রহণ করবেন না। গাধা ও উটের উপর সওয়ারী করবেন। ছাগলের দুধ নিজে দুইয়ে নেবেন। তালি লাগানো জামা পরবেন। আর যারা এমন করে তারা অহঙ্কার মুক্ত হয়ে থাকেন। তিনি ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর হবেন। তাঁর নাম হবে আহ্‌মদ।''

আর ইবনে সা'আদ, দারেমী ও বায়হাকী যথাক্রমে তাবকাত, মুসনাদ ও 'দালায়েলে নবুওয়ত' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন ; যিনি ছিলেন ইহুদীদের সবচেয়ে বড় আলেম এবং তওরাতের সর্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেছেন যে, তওরাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে ঃ

''হে নবী, আমি আপনাকে সমস্ত উম্মতের জন্য সাক্ষী, সৎকর্মীশীলদের জন্য সুসংবাদদাতা, অসৎকর্মীদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মিয়্যীন অর্থাৎ, আরবদের জন্য রক্ষণা-বেক্ষণকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি। আপনি আমার বান্দা ও রসূল। আমি আপনার নাম 'মুতাওয়াক্কিল' রেখেছি। আপনি কঠোর মেজাজও নন, দাঙ্গাবাজও নন। হাটে-বাজারে হট্টগোলকারীও নন। মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না; বরং ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে মৃত্যু দেবেন না; যতক্ষণ না তাঁর মাধ্যমে বাঁকা জাতিকে সোজা করে নেবেন। এমনকি যতক্ষণ না তারা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই) – এর মন্ত্রে স্বীকৃত হয়ে যাবেন, যতক্ষণ না অন্ধ চোখ খুলে দেবেন, বধির কান যতক্ষণ না শোনার যোগ্য বানাবেন এবং বদ্ধ হৃদয় যতক্ষণ না খুলে দেবেন।''

এমনি ধরনের একটি রেওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস্ (রাঃ) থেকে বোখারী শরীফেও উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আর প্রাচীন গ্রন্থ-বিশারদ আলেম হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ (রাঃ) থেকে ইমাম বায়হাকী তাঁর দালায়েলে-নবুওয়ত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে,

''আল্লাহ্ তাআলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেন যে, হে দাউদ, আপনার পরে একজন নবী আসবেন, যাঁর নাম হবে 'আহ্‌মদ'। আমি তাঁর প্রতি কখনও অসন্তুষ্ট হবো না এবং তিনি কখনোও আমার নাফরমানী করবেন না। আমি তাঁর গত-আগত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছি। তাঁর উম্মত হল দয়াকৃত উম্মত (উম্মতে মরহুমাহ্)। আমি তাদেরকে সে সমস্ত নফল বিষয় দান করছি, যা পূর্ববর্তী নবীগণকে দিয়েছিলাম এবং তাদের উপর সেসব ফরয আরোপ করেছি, যা পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি অপরিহার্য করেছিলাম। এমনকি তারা হাশরের দিন আমার সামনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তাদের নূর আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের নূরের মত হবে। হে দাউদ, আমি মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতকে সমস্ত উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আমি তাদেরকে বিশেষভাবে ছয়টি বিষয় দিয়েছি, যা অন্য কোন উম্মতকে দেইনি। (১) কোন ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাদের কোন শাস্তি হবে না। (২) অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের দ্বারা কোন পাপ কাজ হয়ে গেলে যদি সে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। (৩) যে মাল সে পবিত্র মনে আল্লাহ্‌র রাহে খরচ করবে, আমি দুনিয়াতেই তাকে তা থেকে বহুগুণ বেশী দিয়ে দেব। (৪) তাদের উপর কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে যদি তারা إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পড়ে, তবে আমি তাদের জন্য এ বিপদকে করুণা ও রহমত এবং জান্নাতের দিকে পথনির্দেশে পরিণত করে দেব। (৫-৬) তারা যে দোয়া করবে আমি তা কবুল করব, কখনও যা চেয়েছে তাই দান করে, আর কখনও এই দোয়াকেই তাদের আখেরাতের পাথেয় করে দিয়ে।''—(রূহুল মা'আনী)

শত শত আয়াতের মধ্যে এ ক'টি রেওয়ায়েত তওরাত, ইঞ্জীল ও যবূর-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হলো। সমগ্র রেওয়ায়েতসমূহ মোহাদ্দেসগণ বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

তওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত শেষনবী (সাঃ) ও তাঁর উম্মতের গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং নিদর্শনসমূহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে বহু স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান যমানায় হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ্ কীরানভী মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থ 'এযহারুল-হক' এ বিষয়টিকে অত্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও গবেষণাসহ লিখেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান যুগের তওরাত ও ইঞ্জীল যাতে সীমাহীন বিকৃতি সাধিত হয়েছে, তাতেও মহানবী (সাঃ) -এর বহু গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

উপরে তওরাতের উদ্ধৃতিতে রসূলে করীম (সাঃ) – এর যে সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছিল, তাতে একথাও ছিল যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর মাধ্যমে অন্ধ চোখে আলো এবং বধির কানে শ্রবণশক্তি দান করবেন; আর বদ্ধ অন্তরাত্মাকে খুলে দেবেন। রসূলে করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা امر بالمعروف (সৎ কাজের নির্দেশ দান) এবং نهى عن المنكر (অন্যায় কাজ থেকে বারণ করা)-এর জন্য যে অনন্য স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলেন এসমস্ত গুণাবলীও হয়ত তারই ফলশ্রুতি।

দ্বিতীয় গুণটি এই বলা হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) মানবজাতির জন্য পবিত্র ও পছন্দনীয় বস্তু-সামগ্রী হালাল করবেন; আর পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রীকে হারাম করবেন। অর্থাৎ, অনেক সাধারণ পছন্দনীয় বস্তু সামগ্রী যা শাস্তিস্বরূপ বনী-ইসরাঈলদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছিল, রসূলে করীম (সাঃ) সেগুলোর উপর থেকে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে নেবেন। উদাহরণতঃ পশুর চর্বি বা মেদ প্রভৃতি যা বনী-ইসরাঈলদের অসদাচরণের শাস্তি হিসাবে হারাম করে দেয়া হয়েছিল, মহানবী (সাঃ) সেগুলোকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন। আর নোংরা ও পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রীর মধ্যে রক্ত, মৃত পশু, মদ ও সমস্ত হারাম জন্তু অন্তর্ভুক্ত এবং যাবতীয় হারাম উপায়ের আয় যথা, সুদ, ঘুষ, জুয়া প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত।—(আস্‌সিরাজুল -মুনীর) কোন কোন মনীষী মন্দ চরিত্র ও অভ্যাসকেও পঙ্কিলতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ, মহানবী (সাঃ) মানুষের উপর থেকে সেই বোঝা ও প্রতিবন্ধকতাও সরিয়ে দেবেন, যা তাদের উপর চেপে ছিল।

اصر (ইসর) শব্দের অর্থ এমন ভারী বোঝা যা নিয়ে মানুষ চলাফেরা করতে অক্ষম। আর اغلال (আগলাল) غل এর বহুবচন। 'গাল্লুন' সে হাতকড়াকে বলা হয় যদ্দ্বারা অপরাধীর হাত তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেয়া হয় এবং সে একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়ে।

اصر (ইসর) ও اغلال(আগলাল) অর্থাৎ, অসহনীয় চাপ ও আবদ্ধতা বলতে এ আয়াতে সে সমস্ত কঠিন ও সাধ্যাতীত কর্তব্যের বিধি-বিধানকে বুঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর একান্ত শাস্তি হিসাবে আরোপ করা হয়েছিল। যেমন, কাপড় নাপাক হয়ে গেলে পানিতে ধুয়ে ফেলা বনী-ইসরাঈলদের জন্যে যথেষ্ট ছিল না; বরং যে স্থানটিতে অপবিত্র বস্তু লেগেছে সেটুকু কেটে ফেলা ছিল তাদের জন্য অপরিহার্য। আর বিধর্মী কাফেরদের সাথে জেহাদ করে গনীমতের যে মাল পাওয়া যেত, তা বনী-ইসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল না, বরং আকাশ থেকে একটি আগুন নেমে এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিত। শনিবার দিন শিকার করাও তাদের জন্য বৈধ ছিল না। কোন অঙ্গ দ্বারা কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে, সেই অঙ্গটি কেটে ফেলা ছিল অপরিহার্য, ওয়াজিব। কারো হত্যা, তা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, উভয় অবস্থাতেই হত্যাকারীকে হত্যা করা ছিল ওয়াজিব, খুনের ক্ষতিপূরণের কোন বিধানই ছিল না।

এ সমস্ত কঠিন ও জটিল বিধানসমূহ যা বনী-ইসরাঈলদের উপর আরোপিত ছিল, কোরআনে সেগুলাকে 'ইস্‌র' ও 'আগলাল' বলা হয়েছে এবং সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) এসব কঠিন বিধি-বিধানের পরিবর্তন অর্থাৎ, এগুলোকে রহিত করে তদস্থলে সহজ বিধি-বিধান প্রবর্তন করবেন।

এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) এ বিষয়টিই বলেছেন যে, আমি তোমাদিগকে একটি সহজ ও সাবলীল শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। তাতে না আছে কোন পরিশ্রম, না পথভ্রষ্টতার কোন ভয়-ভীতি।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, الدين يسر অর্থাৎ, ধর্ম সহজ। কোরআন কারীমে বলা হয়েছে وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ধর্মের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।

উম্মী নবী (সাঃ) -এর বিশেষ ও পরিপূর্ণ গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনার পর বলা হয়েছে : فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ অর্থাৎ, তওরাত ও ইঞ্জীলে আখেরী নবী (সাঃ)-এর প্রকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বাতলে দেয়ার পরিণতি এই যে, যারা আপনার প্রতি ঈমান আনবে এবং আপনার সহায়তা করবে আর সেই নূরের অনুসরণ করবে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে—অর্থাৎ, যারা কোরআনের অনুসরণ করবে, তারাই হল কল্যাণপ্রাপ্ত।

এখানে কল্যাণ লাভের জন্য চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। প্রথমতঃ মহানবী (সাঃ) -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমান আনা, দ্বিতীয়তঃ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, তৃতীয়তঃ তাঁর সাহায্য ও সহায়তা করা এবং চতুর্থতঃ কোরআন অনুযায়ী চলা।

শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন বোঝাবার জন্য عَزَّرُوهُ (আযযারূহু) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা تعزير থেকে উদ্ভূত। تعزير (তা'যীর) অর্থ সস্নেহে বারণ করা ও রক্ষা করা। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) عَزَّرُوهُ (আযযারূহু) – এর অর্থ করেছেন শ্রদ্ধা ও সম্মান করা। মুবাররাদ বলেছেন যে, উচ্চতর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে বলা হয় تعزير (তা'যীর)।

তার অর্থ, যারা মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি যথাযথ সম্মান ও মহত্ত্ববোধ সহকারে তাঁর সাহায্য ও সমর্থন করবে এবং বিরোধীদের মোকাবেলায় তাঁর সহায়তা করবে, তারাই হবে পরিপূর্ণ কৃতকার্য ও কল্যাণপ্রাপ্ত। নবী করীম (সাঃ)-এর জীবৎকালে সাহায্য ও সমর্থনের সম্পর্ক ছিল স্বয়ং তাঁর সত্তার সাথে। কিন্তু হুযুর (সাঃ)-এর তিরোধানের পর তাঁর শরীয়ত এবং তাঁর প্রবর্তিত দ্বীনের সাহায্য-সমর্থনই হলো মহানবী সাহায্য-সমর্থনের শামিল।

এ আয়াতে কোরআনে কারীমকে 'নূর' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার কারণ এই যে, 'নূর' বা জ্যোতির পক্ষে জ্যোতি হওয়ার জন্য যেমন কোন দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই; বরং সে নিজেই নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ, তেমনিভাবে কোরআন কারীমও নিজেই আল্লাহ্‌র কালাম ও সত্যবাণী হওয়ার প্রমাণ—যে, একজন একান্ত উম্মী বা নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ দিয়ে এমন উচ্চতর সালঙ্কার বাগ্মিতাপূর্ণ কালাম বেরিয়েছে, যার কোন উপমা উপস্থাপনে সমগ্র বিশ্ব অপারক হয়ে পড়েছে। এটা স্বয়ং কোরআন-কারীমের আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ারই প্রমাণ।

তদুপরি নূর যেমন নিজেই উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং অন্ধকারকে আলোময় করে দেয়, তেমনিভাবে কোরআন কারীমও ঘোর অন্ধকারের আবর্তে আবদ্ধ পৃথিবীকে আলোতে নিয়ে এসেছে।

কোরআনের সাথে সাথে সুন্নাহর অনুসরণও ফরয : এ আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে - يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ - এর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে - وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ - এর প্রথম বাক্যে 'উম্মী নবীর' অনুসরণ এবং পরবর্তী বাক্যে কোরআনের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এতে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আখেরাতের মুক্তি কোরআন ও সুন্নাহ উভয়টি অনুসরণের উপরই নির্ভরশীল। কারণ, উম্মী নবীর অনুসরণ তাঁর সুন্নাহ্‌র অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।

শুধু রসূলের অনুসরণই নয়; বরং মুক্তির জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা এবং মহব্বত থাকাও ফরয : উল্লেখিত বাক্য দু'টির মাঝে وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ শীর্ষক দু'টি শব্দ সংযোজন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বিধি-বিধানের এমন অনুসরণ উদ্দেশ্য নয়, যেমন সাধারণতঃ দুনিয়ার শাসকদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয়। বরং অনুসরণ বলতে এমন অনুসরণই উদ্দেশ্য যা হবে মহত্ত্ব, শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসার ফলশ্রুতি। অর্থাৎ, অন্তরে হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর মহব্বত ও ভালবাসা এত অধিক পরিমাণে থাকতে হবে, যার ফলে তাঁর বিধি-বিধানের অনুসরণে বাধ্য হতে হয়। কারণ, উম্মতের সম্পর্ক থাকে নিজ রসূলের সাথে বিভিন্ন রকম। একে তো তিনি হলেন আজ্ঞাদানকারী মনিব, আর উম্মত হচ্ছে আজ্ঞাবহ প্রজা। দ্বিতীয়তঃ তিনি হলেন প্রেমাস্পদ, আর উম্মত হচ্ছে প্রেমিক।

এদিকে রসূলে করীম (সাঃ) জ্ঞান, কর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তি

স্থাপনকারী একক মহত্ত্বের আধার; আর সে তুলনায় সমগ্র উম্মত হচ্ছে একান্তই হীন ও অক্ষম।

আমাদের পেয়ারা নবী (সাঃ)-এর মাঝে যাবতীয় মহত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, কাজেই তাঁর প্রতিটি মহত্ত্বের দাবী পূরণ করা প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবশ্য কর্তব্য। রসূল হিসাবে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে, মনিব ও হাকেম হিসাবে তাঁর প্রতিটি নির্দেশের অনুসরণ করতে হবে, প্রিয়জন হিসাবে তাঁর সাথে গভীরতম প্রেম ও ভালবাসা রাখতে হবে এবং নবুওয়তের ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি পরিপূর্ণ, তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর আনুগত্য ও অনুসরণ তো উম্মতের উপর ফরয হওয়াই উচিত। কারণ, এছাড়া নবী-রসূলগণকে প্রেরণের উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের রসূলে মকবুল (সাঃ) সম্পর্কে শুধু আনুগত্য অনুসরণের উপর ক্ষান্ত করেননি ; বরং উম্মতের উপর তাঁর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দান করাকেও অবশ্য কর্তব্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। উপরন্তু কোরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে তাঁর রীতি-নীতির শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এ আয়াতে عَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ বাক্যে সেদিকেই হেদায়েত দান করা হয়েছে। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ অর্থাৎ, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং তাঁকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দান কর। এ ছাড়া আরও কয়েকটি আয়াতে এই হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ)-এর উপস্থিতিতে এত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না, যা তাঁর স্বর থেকে বেড়ে যেতে পারে। বলা হয়েছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে - يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল থেকে এগিয়ে যেয়ো না। অর্থাৎ, যদি মজলিসে হুযুর আকরাম (সাঃ) উপস্থিত থাকেন এবং তাতে কোন বিষয় উপস্থিত হয়, তাহলে তোমরা তাঁর আগে কোন কথা বলো না।

হযরত সাহ্ল ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন যে, হুযুর (সাঃ)-এর পূর্বে কেউ কথা বলবে না এবং তিনি যখন কোন কথা বলেন, তখন সবাই তা নিশ্চুপ বসে শুনবে।

কোরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ)-কে ডাকার সময় আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে; এমনভাবে ডাকবে না; নিজেদের মধ্যে একে অপরকে যেভাবে ডেকে থাক। বলা হয়েছে - لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا এ আয়াত শেষে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, এ নির্দেশের খেলাফ কোন অসম্মানজনক কাজ করা হলে সমস্ত সৎকর্ম ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে।

একারণেই সাহাবায়ে কেরাম রেযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম যদিও সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় মহানবী (সাঃ)-এর কর্মসঙ্গী ছিলেন এবং এমতাবস্থায় সম্মান ও আদবের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা বড়ই কঠিন হয়ে থাকে; তবুও তাঁদের অবস্থা এই ছিল যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) যখন মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে কোন বিষয় নিবেদন করতেন, তখন এমনভাবে বলতেন, যেন কোন গোপন বিষয় আস্তে আস্তে বলছেন। এমনি অবস্থা ছিল হযরত ফারূকে আযম (রাঃ)-এর ও।- (শেফা)

হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অপেক্ষা আমার কোন প্রিয় ব্যক্তি সারা বিশ্বে ছিল না। আর আমার এ অবস্থা ছিল যে, আমি তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেও পারতাম না। আমার কাছে যদি হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর আকার-অবয়ব সম্পর্কে কেউ জানতে চায়, তাহলে তা বলতে আমি এ জন্যে অপারক যে, আমি কখনও তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়েও দেখিনি।

ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রেওয়ায়েত করেছেন যে, মজলিসে যখন হুযুর আকরাম (সাঃ) তশরীফ আনতেন তখনই সবাই নিম্নদৃষ্টি হয়ে বসে থাকতেন। শুধু সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযম (রাঃ) তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইতেন; আর তিনি তাঁদের দিকে চেয়ে মুচকি হাসতেন।

ওরওয়া ইবনে মাসউদকে মক্কাবাসীরা গুপ্তচর বানিয়ে মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য মদীনায় পাঠাল। সে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে হুযুর (সাঃ)-এর প্রতি এমন নিবেদিত প্রাণ দেখতে পেল যে, ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিল ; "আমি কিস্‌রা ও কায়সারের দরবারও দেখেছি এবং সম্রাট নাজ্জাশীর সাথেও সাক্ষাত করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবীগণের যে অবস্থা আমি দেখেছি, এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমার ধারণা, তোমরা কস্মিনকালেও তাদের মোকাবেলায় জয়ী হতে পারবে না।"

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, হুযুর আকরাম (সাঃ) যখন ঘরের ভেতর অবস্থান করতেন, তখন তাঁকে বাইরে থেকে সশব্দে ডাকাকে সাহাবায়ে কেরাম বে-আদবী মনে করতেন। দরজায় কড়া নাড়তে হলেও শুধু নখ দিয়ে টোকা দিতেন যাতে বেশী জোরে শব্দ না হয়।

মহানবী (সাঃ)-এর তিরোধানের পরও সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল যে, মসজিদে-নবভীতে কখনও জোরে কথা বলা তো দূরের কথা, কোন ওয়াজ কিংবা বয়ান বিবৃতিও উচ্চৈঃস্বরে করা পছন্দ করতেন না। অধিকাংশ সাহাবী (রাঃ)-এর এমনি অবস্থা ছিল যে, যখনই কেউ হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর পবিত্র নাম উল্লেখ করতেন, তখনই কেঁদে উঠতেন এবং ভীত হয়ে পড়তেন।

এই শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের বরকতেই তাঁরা নবুওয়তী ফয়েয থেকে বিশেষ উত্তরাধিকার লাভ করতে পেরেছিলেন এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলমীনও এ কারণেই তাঁদেরকে আম্বিয়া (আঃ) - এর পর সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

এ আয়াতে ইসলামের মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে রেসালতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচিত হয়েছে যে, আমাদের রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেসালত সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত জিন ও মানবজাতি তথা কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের বংশধরদের জন্য ব্যাপক।

এ আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-কে সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি মানুষকে বলে দিন যে, আমি তোমাদের সবার প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমার নবুওয়ত লাভ ও রেসালতপ্রাপ্তি বিগত নবীগণের মত কোন বিশেষ জাতি কিংবা বিশেষ ভূখণ্ড অথবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়; বরং সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য, বিশ্বের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি দেশ ও রাষ্ট্র এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত বংধরদের জন্য কিয়ামতকাল পর্যন্তের জন্য তা পরিব্যাপ্ত। আর মানব জাতি ছাড়াও এতে জিন জাতিও অন্তর্ভুক্ত।

মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত কিয়ামতকাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তাই তাঁর উপরই -নবুওয়তের ধারাও সমাপ্ত ঃ নবুওয়ত সমাপ্তির এটাই হল প্রকৃত রহস্য। কারণ, মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত যখন কিয়ামত পর্যন্ত আগত বংশধরদের জন্য ব্যাপক, তখন আর অন্য কোন নবী বা রসূলের আবির্ভাবের না কোন প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে, না তার কোন অবকাশ আছে। আর এই হল মহানবীর (সঃ) -এর উম্মতের বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত রহস্য যে, নবী করীম (সাঃ)-এর ভাষায় এতে সর্বদাই এমন একটি দল প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা ধর্মের মাঝে সৃষ্ট *যাবতীয় ফেতনা-ফাসাদের মোকাবেলা করবেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে সৃষ্ট* - সমস্ত প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করতে থাকবেন। কোরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে যেসব বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে, এদল সেগুলোরও অপনোদন করবে এবং আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ সাহায্য ও সহায়তাপ্রাপ্ত হবেন; যার ফলে তারা সবার উপরই বিজয়ী হবেন। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এ দলটি হবে মহানবী (সাঃ)-এর রেসালতের দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত, নায়েব।

ইমাম রাযী (রহঃ) وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতে এই ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে যে, এই উম্মতের মধ্যে 'সাদেকীন' অর্থাৎ, সত্যনিষ্ঠদের একটি দল অবশ্যই অবশিষ্ট থাকবে। তা নাহলে বিশ্ববাসীর প্রতি সত্যনিষ্ঠদের সাথে থাকার নির্দেশই দেয়া হতো না। আর এরই ভিত্তিতে ইমাম রাযী (রহঃ) সর্বযুগে এজমায়ে-উম্মত বা মুসলমান জাতির ঐকমত্যকে শরীয়তের দলীল বলে প্রমাণ করেছেন। তার কারণ, সত্যনিষ্ঠ দলের বর্তমানে কোন ভুল বিষয় কিংবা কোন পথভ্রষ্টতায় সবাই ঐকমত্য বা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না।

ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতে মহানবী (সাঃ)-এর খাতামুন্নাবিয়্যীন বা শেষনবী হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, হুযূর (সাঃ)-এর আবির্ভাব ও রেসালত যখন কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত বংশধরদের জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তখন আর অন্য কোন নতুন রসূলের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেই না। সেজন্যই শেষ যমানায় হযরত ঈসা (আঃ) যখন আসবেন, তখন তিনিও যথাস্থানে নিজের নবুওয়তে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত শরীয়তের উপরই আমল করবেন। (হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর নিজস্ব যে শরীয়ত ছিল, তাকে তখন তিনিও রহিত বলেই গণ্য করবেন।) বিশুদ্ধ রেওয়াত দ্বারা তাই প্রতীয়মান হয়।

মহানবী (সাঃ)-এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ঃ ইবনে কাসীর মুসনাদে আহমদ গ্রন্থের বরাত দিয়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদের সাথে উদ্ধৃত করেছেন যে, গযওয়ায়ে তাবুকের (তাবুক যুদ্ধের) সময় রসূলে করীম (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের ভয় হচ্ছিল যে, শত্রুরা না এ অবস্থায় আক্রমণ করে বসে। তাই তাঁরা হুযূর (সাঃ)-এর চারদিকে সমবেত হয়ে গেলেন। হুযূর নামায শেষ করে এরশাদ করলেন, আজকের রাতে আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কোন নবী-রসূলকে দেয়া হয়নি। তার একটি হল এই যে, আমার রেসালত ও নবুওয়তকে সমগ্র দুনিয়ার জাতিসমূহের জন্য ব্যাপক করা হয়েছে। আর আমার পূর্বে যত নবী-রসূলই এসেছেন, তাঁদের দাওয়াত ও আবির্ভাব নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমাকে আমার শত্রুর মোকাবেলায় এমন প্রভাব দান করা হয়েছে যাতে তারা যদি আমার কাছ থেকে এক মাসের দূরত্বেও থাকে, তবুও তাদের উপর আমার প্রভাব ছেয়ে যাবে। তৃতীয়তঃ কাফেরদের সাথে যুদ্ধেপ্রাপ্ত মালে-গনীমত আমার জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য তা হালাল ছিল না। বরং এসব মালের ব্যবহার মহাপাপ বলে মনে করা হত। তাদের গনীমতের মাল ব্যয়ের একমাত্র স্থান ছিল এই যে, আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে সে সমস্তকে জ্বালিয়ে খাক করে দিয়ে যাবে। চতুর্থতঃ আমার জন্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে মসজিদ করে দেয়া হয়েছে এবং পবিত্র করার উপকরণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে আমাদের নামায যে কোন যমি, যে কোন জায়গায় শুদ্ধ হয়, কোন বিশেষ মসজিদে সীমাবদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী উম্মতদের এবাদত শুধু তাদের *উপসনালয়েই হতো, অন্য কোথাও নয়। নিজেদের ঘরে কিংবা* মাঠে-ময়দানে তাদের নামায বা এবাদত হত না। তাছাড়া পানি ব্যবহারের যখন সামর্থ্যও না থাকে, তা পানি না পাওয়ার জন্য হোক কিংবা কোন রোগ-শোকের কারণে, তখন মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নেয়াই পবিত্রতা ও অযুর পরিবর্তে যথেষ্ট হয়ে যায়। পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য এ সুবিধা ছিল না। অতঃপর বললেন- আর পঞ্চমটির কথা তো বলতেই নেই, তা নিজেই নিজের উদাহরণ, একেবারে অনন্য। তা হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রত্যেক রসূলকে একটি দোয়া কবুল হওয়ার এমন নিশ্চয়তা দান করেছেন, যার কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। আর প্রত্যেক নবী-রসূলই তাঁদের নিজ নিজ দোয়াকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশে ব্যবহার করে নিয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যেও সিদ্ধ হয়েছে। আমাকে তাই বলা হলো যে, আপনি কোন একটা দোয়া করুন। আমি আমার দোয়াকে আখেরাতের জন্য সংরক্ষিত করিয়ে নিয়েছি। সে দোয়া তোমাদের জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ কলেমার সাক্ষ্য দানকারী যেসব লোকের জন্য হবে, তাদের কাজে লাগবে।

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, যে লোক আমার আবির্ভাব সম্পর্কে শুনবে, তা সে আমার উম্মতদের মধ্যে হোক কিংবা ইহুদী-খ্রীষ্টান হোক, যদি সে আমার উপর ঈমান না আনে, তাহলে জাহান্নামে যাবে।

আর সহীহ বোখারী শরীফে এ আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গে আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে কোন এক বিষয়ে মতবিরোধ হয়। তাতে হযরত ওমর (রাঃ) নারায হয়ে চলে যান। তা দেখে হযরত আবু বকর (রাঃ)ও তাকে মানাবার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) কিছুতেই রাযী হলেন না। এমনকি নিজের ঘরে পৌছে দরজা বন্ধ করে দিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে গিয়ে হাযির হন। এদিকে কিছুক্ষণ পরেই হযরত ওমর (রাঃ) নিজের এহেন আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে নিজের ঘটনা বিবৃত করেন। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন যে, এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন লক্ষ্য করলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রতি ভর্ৎসনা করা হচ্ছে, তখন নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, দোষ আমারই বেশী। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, আমার একজন সহচরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকাটাও কি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না! তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে আমি যখন বললাম ঃ "হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের সমস্ত লোকের আল্লাহ্ রসূল।"

তখন তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে। শুধু এই আবু বকর (রাঃ)-ই ছিলেন, যিনি সর্বপ্রথম আমাকে সত্য বলে স্বীকৃতি

দিয়েছেন।

সারমর্ম এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য, প্রত্যেক দেশ ও ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য এবং প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য মহানবী (সাঃ)-এর ব্যাপকভাবে রসূল হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। সাথে সাথে একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর যে লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না, সে লোক কোন সাবেক শরীয়ত ও কিতাবের কিংবা অন্য কোন ধর্ম ও মতের পরিপূর্ণ আনুগত্য একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণভাবে করতে থাকা সত্ত্বেও কস্মিনকালেও মুক্তি পাবে না।

হযরত মূসা (আঃ)- এর সম্প্রদায়ের একটি সত্যনিষ্ঠ দল ঃ দ্বিতীয় আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ وَمِنْ قَوْمِ مُوْسَىٰٓ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ অর্থাৎ, হযরত মূসা (আঃ) -এর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা নিজেরা সত্যের অনুসরণ করে এবং নিজেদের বিতর্কমূলক বিষয়সমূহের মীমাংসার বেলায় সত্য অনুযায়ী মীমাংসা করে থাকে।

বিগত আয়াতসমূহে মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের অসদাচরণ, কূটতর্ক এবং গোমরাহীর বর্ণনা ছিল। কিন্তু এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিটিই এমন নয়; তাদের মধ্যে বরং কিছু লোক ভালও রয়েছে যারা সত্যানুসরণ করে এবং ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করে। এরা হলো সেসব লোক, যারা তওরাত ও ইঞ্জীলের যুগে সেগুলোর হেদায়েত অনুযায়ী আমল করত এবং যখন খাতামুন্নাবিয়্যীন (সাঃ)-এর আবির্ভাব হয়, তখন তওরাত ও ইঞ্জীলের সুসংবাদ অনুসারে তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তাঁর যথাযথ অনুসরণও করে। বনী-ইসরাঈলদের এই সত্যনিষ্ঠ দলটির উল্লেখও কোরআন মজীদে বারংবারই করা হয়েছে।

প্রখ্যাত তফসীরকার ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীর (রহঃ) প্রমুখ এ প্রসঙ্গে এক কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন যে, এ জমাআত বা দল দ্বারা সে দলই উদ্দেশ্য, যারা বনী-ইসরাঈলদের গোমরাহী, অসৎকর্ম, নারী হত্যা প্রভৃতি কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের থেকে সরে পড়েছিল। বনী-ইসরাঈলদের বারটি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্র ছিল, যারা নিজেদের জাতির কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে প্রার্থনা করেছিল যে, হে পরওয়ারদেগারে আলম ! আমাদিগকে এদের থেকে সরিয়ে কোন দূর দেশে পুনর্বাসিত করে দিন, যাতে আমরা আমাদের দ্বীনের উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করতে পারি। আল্লাহ্ তাঁর পরিপূর্ণ কুদরতের দ্বারা তাদেরকে দূর প্রাচ্যের কোন ভূ-খণ্ডে পৌঁছে দেন। সেখানে তারা নির্ভেজাল এবাদতে আত্মনিয়োগ করে। রসূলে করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পরেও আল্লাহ্র মহিমায় তাদের মুসলমান হওয়ার এই ব্যবস্থা হয় যে, মে'রাজের রাতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) হুযূর (সাঃ)-কে সেদিকে নিয়ে যান। তখন তারা মহানবী (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনে। হুযূর আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমাদের কি মাপ-জোখের কোন ব্যবস্থা আছে? আর তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা কি? তারা উত্তর দিল যে, আমরা যমীতে শস্য বপন করি, যখন তা উপযোগী হয়, তখন সেগুলোকে কেটে সেখানেই স্তূপীকৃত করে দেই। সেই স্তূপ থেকে সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমত নিয়ে আসে। কাজেই আমাদের মাপ-জোখের কোন প্রয়োজন পড়ে না। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ মিথ্যা কথা বলে? তারা নিবেদন করল, না। কারণ, কেউ যদি তা করে, তাহলে সাথে সাথে একটি আগুন এসে তাকে পুড়িয়ে দেয়। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সবার ঘর-বাড়ীগুলো একই রকম কেন? নিবেদন করল, যাতে কেউ কারও উপর প্রাধান্য প্রকাশ করতে না পারে। অতঃপর হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের বাড়ীগুলোর সামনে এসব কবর কেন বানিয়ে রেখেছ? নিবেদন করল, যাতে আমাদের সামনে সর্বক্ষণ মৃত্যু উপস্থিত থাকে। অতঃপর হুযূর (সাঃ) যখন মে'রাজ থেকে মক্কায় ফিরে আসলেন, তখন আয়াতটি নাযিল হল وَمِنْ قَوْمِ مُوْسَىٰٓ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ তফসীরে-কুরতুবী এ রেওয়ায়েতটিকে মৌলিক সাব্যস্ত করে অন্যান্য সম্ভাব্যতার কথাও লিখেছেন। ইবনে কাসীর একে বিস্ময়কর কাহিনী বলেছেন, কিন্তু একে খণ্ডন করেননি। অবশ্য কুরতুবী এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, সম্ভবতঃ এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ নয়।

যাহোক, এ আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দল রয়েছে যারা সব সময়ই সত্যে সুদৃঢ় রয়েছে। তা তারা হুযূর (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সংবাদ শুনে যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল তারাই হোক অথবা বনী-ইসরাঈলদের দ্বাদশতম সে গোত্রই হোক, যাকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর কোন বিশেষ স্থানে পুনর্বাসিত করে রেখেছেন যেখানে যাওয়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। (আল্লাহ্‌ই সর্বাধিক জ্ঞানী)।

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى
مُوْسٰۤى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗۤ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ
فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ
مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ
الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَ
مَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾ وَاِذْ قِيْلَ
لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ
شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ
لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا
يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾ وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ
حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ
حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا
تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚۛ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾

(১৬০) আর আমি পৃথক পৃথক করে দিয়েছি তাদের বার জন পিতামহের সন্তানদেরকে বিরাট বিরাট দলে, এবং নির্দেশ দিয়েছি মূসাকে, যখন তার কাছে তার সম্প্রদায় পানি চাইল যে, স্বীয় যষ্টির দ্বারা আঘাত কর এ পাথরের উপর। অতঃপর এর ভেতর থেকে ফুটে বের হল বারটি প্রস্রবণ। প্রতিটি গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ ঘাঁটি। আর আমি ছায়া দান করলাম তাদের উপর মেঘের এবং তাদের জন্য অবতীর্ণ করলাম মান্না ও সালওয়া। যে পরিচ্ছন্ন বস্তু জীবিকারূপে আমি তোমাদের দিয়েছি, তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর। বস্তুতঃ তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি, বরং ক্ষতি করেছে নিজেদেরই। (১৬১) আর যখন তাদের প্রতি নির্দেশ হল যে, তোমরা এ নগরীতে বসবাস কর এবং খাও তা থেকে যেখান থেকে ইচ্ছা এবং বল, আমাদের ক্ষমা করুন। আর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর প্রণত অবস্থায়। তবে আমি ক্ষমা করে দেব তোমাদের পাপসমূহ। অবশ্য আমি সৎকর্মীদিগকে অতিরিক্ত দান করব। (১৬২) অনন্তর জালেমরা এতে অন্য শব্দ বদলে দিল তার পরিবর্তে, যা তাদেরকে বলা হয়েছিল। সুতরাং আমি তাদের উপর আযাব পাঠিয়েছি আসমান থেকে তাদের অপকর্মের কারণে। (১৬৩) আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যা ছিল নদীর তীরে অবস্থিত। যখন শনিবার দিনের নির্দেশ ব্যাপারে সীমাতিক্রম করতে লাগল, যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন পানির উপর, আর যেদিন শনিবার হত না, আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। কারণ, তারা ছিল নাফরমান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)–এর অবশিষ্ট কাহিনী বিবৃত করার পর তাঁর উম্মত (ইহুদী)–এর অসৎকর্মশীল লোকদের প্রতি নিন্দাবাদ এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিণতির বর্ণনা এসেছে। এ আয়াতগুলোতেও তাদের শাস্তি এবং অশুভ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে সে দু'টি শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যা পৃথিবীতে তাদের উপর আরোপিত হয়েছে। আর তা হল প্রথমতঃ কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর এমন কোন ব্যক্তিকে অবশ্য চাপিয়ে রাখতে থাকবেন, যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে এবং অপমান ও লাঞ্ছনায় জড়িয়ে রাখবে। সুতরাং তখন থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইহুদীরা সবসময়ই সর্বত্র ঘৃণিত, পরাজিত ও পরাধীন অবস্থায় রয়েছে। সাম্প্রতিককালের ইসরাঈলী রাষ্ট্রের কারণে এ বিষয়ে এজন্য সন্দেহ হতে পারে না যে, যারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তাদের জানা আছে যে, প্রকৃতপক্ষে আজও ইসরাঈলীদের না আছে নিজস্ব কোন ক্ষমতা, না আছে রাষ্ট্র। প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলামের প্রতি রাশিয়া ও আমেরিকার একান্ত শত্রুতারই ফলশ্রুতি হিসাবে তাদেরই একটা ঘাঁটি মাত্র। এরচেয়ে বেশী কোন গুরুত্বই এর নেই। তাছাড়া আজও ইহুদীরা তাদেরই অধীন ও আজ্ঞাবহ। যখনই এতদুভয় শক্তি তাদের সাহায্য করা বন্ধ করে দেবে, তখনই ইসরাঈলের অস্তিত্ব বিশ্বের পাতা থেকে মুছে যেতে পারে।

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ
مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ
السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا
قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ
الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٧﴾ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ
مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ
وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا
الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا
وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ
الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۗ وَالدَّارُ
الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ
بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾

(১৬৪) আর যখন তাদের মধ্য থেকে এক সম্প্রদায় বলল, কেন সে লোকদের সদুপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা আযাব দিতে চান–কঠিন আযাব? সে বলল, তোমাদের পালনকর্তার সামনে দোষ ফুরাবার জন্য এবং এজন্য যেন তারা ভীত হয়। (১৬৫) অতঃপর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম, গোনাহ্গারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের না-ফরমানীর দরুন। (১৬৬) তারপর যখন তারা এগিয়ে যেতে লাগল সে কর্মে যা থেকে তাদের বারণ করা হয়েছিল, তখন আমি নির্দেশ দিলাম যে, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। (১৬৭) আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার পালনকর্তা সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই কেয়ামত দিবস পর্যন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দান করতে থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার পালনকর্তা শীঘ্র শাস্তিদানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৬৮) আর আমি তাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছি দেশময় বিভিন্ন শ্রেণীতে, তাদের মধ্যে কিছু রয়েছে ভাল, আর কিছু অন্য রকম। তাছাড়া আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি ভাল ও মন্দের মাধ্যমে যাতে তারা ফিরে আসে। (১৬৯) তারপর তাদের পেছনে এসেছে কিছু অপদার্থ, যারা উত্তারিকারী হয়েছে কিতাবের; তারা নিকৃষ্ট পার্থিব উপকরণ আহরণ করছে এবং বলছে, আমাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে। বস্তুতঃ এমনি ধরনের উপকরণ যদি আবারো তাদের সামনে উপস্থিত হয়, তবে তাও তুলে নেবে। তাদের কাছ থেকে কিতাবে কি অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কিছু বলবে না? অথচ তারা সে সবই পাঠ করেছে, যা তাতে লেখা রয়েছে। বস্তুতঃ আখেরাতের আলয় ভীতদের জন্য উত্তম—তোমরা কি তা বোঝ না? (১৭০) আর যেসব লোক সুদৃঢ়ভাবে কিতাবকে আঁকড়ে থাকে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে নিশ্চয়ই আমি বিনষ্ট করব না সৎকর্মীদের সওয়াব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদীদের উপর আরোপিত অন্য আরেক শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যা এই পৃথিবীতেই তাদেরকে দেয়া হয়েছে। তা হল এই যে, তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একান্ত বিক্ষিপ্ত করে দেয়া। কোথাও কোন এক দেশে তাদের সমবেতভাবে বসবাসের সুযোগ হয়নি। وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا এর মর্মও তাই। تقطيع শব্দটি قطعنا থেকে নির্গত। যার অর্থ খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়া। আর اُمَمًا হল اُمَّةٌ এর বহুবচন। যার অর্থ দল বা শ্রেণী। মর্ম হল এই যে, আমি ইহুদী জাতিকে খণ্ড খণ্ড করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছি।

এতে বুঝা গেল যে, কোন জাতিবিশেষের কোন এক স্থানে সমবেত জীবন যাপন ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনও আল্লাহ্ তাআলার একটি নেয়ামত ; পক্ষান্তরে তাদের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া একরকম ঐশী আযাব। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্র এ নেয়ামত সব সময়ই রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ থাকবেও কেয়ামত পর্যন্ত। তারা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের প্রবল একটা সমবেত শক্তি গড়ে উঠেছে। মদীনা থেকে এ ধারা শুরু হয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এভাবেই এক বিস্ময়কর প্রক্রিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। দূরপ্রাচ্যে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থায়ী ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ এর ফলশ্রুতিতে গঠিত। পক্ষান্তরে ইহুদীরা সব সময়ই বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। যতই ধনী ও সম্পদশালী হোক না কেন কখনও শাসনক্ষমতা তাদের হাতে আসেনি।

কয়েক বছর থেকে ফিলিস্তীনের একটি অংশে তাদের সমবেত হওয়া এবং কৃত্রিম ক্ষমতার কারণে ধোঁকায় পড়া উচিত হবে না। শেষ যমানায় এখানে তাদের সমবেত হওয়াটা ছিল অপরিহার্য। কারণ, সদাসত্য রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাদীসে বলা আছে যে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে তাই ঘটবে। শেষ যমানায় ঈসা (আঃ) অবতীর্ণ হবেন, সমস্ত খ্রীষ্টান মুসলমান হয়ে যাবে এবং তিনি ইহুদীদের সাথে জেহাদ করে তাদেরকে হত্যা করবেন। অবশ্য আল্লাহ্র অপরাধীকে সমন জারি করে এবং পুলিশের মাধ্যমে ধরে হাযির করা হবে না। বরং তিনি এমনই প্রাকৃতিক উপকরণ সৃষ্টি করবেন যাতে অপরাধী পায়ে হেঁটে বহু চেষ্টা করে নিজের বধ্যভূমিতে গিয়ে হাযির হবে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ ঘটবে সিরিয়ার দামেশকে। ইহুদীদের সাথে তাঁর যুদ্ধও সেখানে সংঘটিত হবে, যাতে ঈসা (আঃ)-এর পক্ষে তাদেরকে নিধন করা সহজ হয়। আল্লাহ্ তাআলা ইহুদীদিগকে সর্বদাই রাজক্ষমতা থেকে বঞ্চিত অবস্থায় বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত করে রেখে অমর্যাদাজনিত শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিয়েছেন। অতঃপর শেষ যমানায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্য সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে তাদেরকে তাদের বধ্যভূমিতে সমবেত করেছেন। কাজেই তাদের এই সমবেত হওয়া বর্ণিত আযাবের পরিপন্থী নয়।

রইল তাদের বর্তমান রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রশ্ন। বস্তুতঃ এটা এমন একটা ধোঁকা, যার উপরে বর্তমান যুগের সভ্য পৃথিবী যদিও অতি সুন্দর কারুকার্যময় আবরণ জড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে সজাগ কোন ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্যও এতে ধোঁকা খেতে পারে না। কারণ, অধুনা যে এলাকাটিকে ইসরাঈল নামে অভিহিত করা হয়,

প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের একটা যৌথ ছাউনির অতিরিক্ত কোন গুরুত্ব তার নেই। এটি শুধুমাত্র এসব দেশের সাহায্যেই বেঁচে আছে এবং এদের বশংবদ থাকার ভেতরেই নিহিত রয়েছে তার অস্তিত্বের রহস্য। বলাবাহুল্য, নির্ভেজাল দাসত্বকে ভেজাল রাষ্ট্র নামে অভিহিত করে দেয়ায় এ জাতির কোন ক্ষমতালাভ ঘটে না। কোরআনে করীম তাদের সম্পর্কে কেয়ামতকাল পর্যন্ত অপমান ও লাঞ্ছনাজনিত যে শাস্তির কথা বলেছে তা আজও তেমনিভাবে অব্যাহত। প্রথম আয়াতটিতে তারই আলোচনা এভাবে করা হয়েছে وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা যখন সুদৃঢ় ইচ্ছা করে নিয়েছেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর এমন এক শক্তিকে চাপিয়ে দেবেন, যা তাদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাবে। যেমন, প্রথমে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর হাতে, পরে বুখতানাসারের দ্বারা এবং অতঃপর মহানবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে, আর বাদবাকী হযরত ফারূকে আযমের মাধ্যমে সব জায়গা থেকে অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে ইহুদীদের বহিষ্কার করা একান্ত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা।

এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যটি হল এই .... مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ অর্থাৎ, 'এদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সৎ এবং কিছু অন্য রকম।' 'অন্য রকম'-এর মর্ম হল এই যে, কাফের দুষ্কৃতকারী ও অসৎ লোক রয়েছে। অর্থাৎ, ইহুদীদের মধ্যে সবই এক রকম লোক নয়, কিছু সৎও আছে। এর অর্থ, সেসব লোক, যারা তওরাতের যুগে তওরাতের নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য ও অনুশীলন করেছে। না তার হুকুমের প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করেছে, আর না কোন রকম অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে।

এছাড়া এতে তারাও উদ্দেশ্য হতে পারেন, যারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর তার আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর ঈমান এনেছেন। অপরদিকে রয়েছে সে সমস্ত লোক, যারা তওরাতকে আসমানী গ্রন্থ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, কিংবা তার আহ্কাম বা বিধি বিধানের বিকৃতি ঘটিয়ে নিজেদের পরকালকে পৃথিবীতে নিকৃষ্ট বস্তু-সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে এরশাদ হয়েছে ঃ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ অর্থাৎ, আমি ভাল-মন্দ অবস্থার দ্বারা তাদের পরীক্ষা করেছি যেন তারা নিজেদের গর্হিত আচার-আচরণ থেকে ফিরে আসে। 'ভাল অবস্থার দ্বারা' এর অর্থ হলো এই যে, তাদেরকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ দান। আর মন্দ অবস্থা অর্থ হয় লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সে অবস্থা যা যুগে যুগে বিভিন্নভাবে তাদের উপর নেমে এসেছে, অথবা কোন কোন সময়ে তাদের উপর আপতিত দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য। যাহোক, সারমর্ম হল এই যে, মানব জাতির আনুগত্য ও ঔদ্ধত্যের পরীক্ষা করার দু'টিই প্রক্রিয়া। তাদের ব্যাপারে উভয়টিই ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু ইহুদী সম্প্রদায় এতদুভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা যখন তাদের জন্য নেয়ামতের দুয়ার খুলে দিয়েছেন ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছেন, তখন তারা বলতে শুরু করেছে قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ অর্থাৎ, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্ হলেন ফকীর আর আমরা ধনী। আর তাদেরকে যখন দারিদ্র্য ও দুর্দশার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে, তখন বলতে শুরু করেছে ঃ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ অর্থাৎ, আল্লাহ্র হাত সংকুচিত হয়ে গেছে।

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় তো এই জানা গেল যে, কোন জাতির একত্র বাস আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত এবং তার বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততা হল একটা শাস্তি। দ্বিতীয়তঃ পার্থিব আরাম-আয়েশ, আনন্দ-বেদনা এগুলো প্রকৃতপক্ষে ঐশী পরীক্ষারই বিভিন্ন উপকরণ, যার মাধ্যমে তাদের ঈমান ও আল্লাহ্র আনুগত্যের পরীক্ষা নেয়া হয়। এখানকার যে দুঃখ-কষ্ট তা তেমন একটা হা-হুতাশ বা কাঁদাকাটার বিষয় নয়। তেমনিভাবে এখানকার আনন্দ-উচ্ছলতাও অহঙ্কারী হয়ে উঠার মত কোন উপকরণ নয়। দূরদর্শী বুদ্ধিমানের জন্য এতদুভয়টিই লক্ষণীয় বিষয়।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে একটি প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা বিশেষতঃ বনী-ইসরাঈলের আলেম সম্প্রদায়ের নিকট থেকে তওরাত সম্পর্কে নেয়া হয়েছিল যে, এতে কোন রকম পরিবর্তন কিংবা বিকৃতি সাধন করবে না এবং সত্য ও সঠিক বিষয় ছাড়া মহান পরওয়ারদেগারের প্রতি অন্য কোন বিষয় আরোপ করবে না। আর এ বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখিত হয়ে গিয়েছিল যে, বনী-ইসরাঈলের আলেমগণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে স্বার্থান্বেষীদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে তওরাতের বিধি-বিধানের পরিবর্তন করেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বাতলিয়েছে। এখন আলোচ্য এই আয়াতটিতে সে বর্ণনারই উপসংহার হিসাবে বলা হয়েছে যে, বনী-ইসরাঈলের সব আলেমই এমন নয়—কোন কোন আলেম এমনও রয়েছে যারা তওরাতের বিধি-বিধানকে দৃঢ়তার সাথে ধরেছে এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সৎকাজেও নিষ্ঠা অবলম্বন করেছে। আর যথারীতি নামাযও প্রতিষ্ঠা করেছে। এমনি লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করে দেন না, যারা নিজেদের সংশোধন করে। কাজেই যারা ঈমান ও আমলের উভয় ফরয আদায়ের মাধ্যমে নিজের সংশোধন করে নিয়েছে, তাদের প্রতিদান বা প্রাপ্য বিনষ্ট হতে পারে না।

এ আয়াতে কয়েকটি লক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে। প্রথমতঃ এই যে, কিতাব বলতে এতে সে কিতাবই উদ্দেশ্য যার আলোচনা ইতিপূর্বে এসেছে। অর্থাৎ, তওরাত। আর এও হতে পারে যে, এতে সমস্ত আসমানী কিতাবই উদ্দেশ্য। যেমন, তওরাত, যবুর, ইঞ্জীল ও কোরআন।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতের দ্বারা বোঝা গেছে যে, আল্লাহ্র কিতাবকে একান্ত আদব ও সম্মানের সাথে অতি যত্ন সহকারে নিজের কাছে শুধু রেখে দিলেই তার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; বরং তার বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলীর অনুবর্তীও হতে হবে। আর এ কারণেই এখানে বলা হয়েছে, يُمَسِّكُونَ যার অর্থ হয় দৃঢ়তার সাথে পরিপূর্ণভাবে ধরা। অর্থাৎ, তার সমস্ত বিধি-বিধানের অনুশীলন করা।

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ۚ
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾ وَ
إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ
أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن
تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا
أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا
بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ
مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا
لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ
كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ
ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾ مَن يَهْدِ اللَّهُ
فَهُوَ الْمُهْتَدِي ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٧٨﴾

(১৭১) আর যখন আমি তুলে ধরলাম পাহাড়কে তাদের উপরে সামিয়ানার মত এবং তারা ভয় করতে লাগল যে, সেটি তাদের উপর পড়বে, তখন আমি বললাম, ধর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি, দৃঢ়ভাবে এবং স্মরণ রেখো যা তাতে রয়েছে, যেন তোমরা বাঁচতে পার। (১৭২) আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী-আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, 'আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?' তারা বলল, 'অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি।' আবার না কেয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। (১৭৩) অথবা বলতে শুরু কর যে, অংশীদারিত্বর প্রথা তো আমাদের বাপ-দাদারা উদ্ভাবন করেছিল আমাদের পূর্বেই। আর আমরা হলাম তাদের পশ্চাৎবর্তী সন্তান-সন্ততি। তাহলে কি সে কর্মের জন্য আমাদেরকে ধ্বংস করবেন, যা পথভ্রষ্টরা করেছে? (১৭৪) বস্তুতঃ এভাবে আমি বিষয়সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি, যাতে তারা ফিরে আসে। (১৭৫) আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সে লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। (১৭৬) অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমূহের দৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপাতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হল কুকুরের মত; যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হল সেসব লোকের উদাহরণ; যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে। অতএব, আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে। (১৭৭) তাদের উদাহরণ অতি নিকৃষ্ট, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে এবং তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছে। (১৭৮) যাকে আল্লাহ্ পথ দেখাবেন, সে-ই পথপ্রাপ্ত হবে। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করবেন, সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, এখানে তওরাতের বিধি-বিধানের অনুবর্তিতার কথা বলা হয়েছিল আর তওরাতের বিধি-নিষেধ একটি দু'টি নয়, শত শত। সেগুলোর মধ্যে এখানে একটিমাত্র বিধান নামায প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র কিতাবের বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান হল নামায। তদুপরি নামাযের অনুবর্তিতা ঐশী বিধানসমূহের অনুবর্তিতার বিশেষ লক্ষণ। এরই মাধ্যমে চেনা যায়, কে কৃতজ্ঞ আর কে কৃতঘ্ন। আর এর নিয়মানুবর্তিতার একটা বিশেষ কার্যকারিতাও রয়েছে যে, যে লোক নামাযে নিয়মানুবর্তী হয়ে যাবে, তার জন্য অন্যান্য বিধি-বিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে লোক নামাযের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী নয়, তার দ্বারা অন্যান্য বিধি-বিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সম্ভব হয় না। সহীহ্ হাদীসে রসূলে-করীম (সাঃ)-এর এরশাদ রয়েছে—'**নামায হল দ্বীনের স্তম্ভ, যার উপরে তার ইমারত রচিত হয়েছে, যে ব্যক্তি এই স্তম্ভকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, যে এ স্তম্ভকে বিধ্বস্ত করেছে, সে গোটা দ্বীনের ইমারতকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।**

সে কারণেই এ আয়াতে وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ এর পরে وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ বলে এ কথাই বাতলে দেয়া হয়েছে যে, দৃঢ়তার সাথে কিতাব অবলম্বনকারী এবং তার অনুবর্তী তাকেই বলা যাবে যে সমুদয় শর্ত মোতাবেক নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামায আদায় করে। আর যে নামাযের ব্যাপারে গাফেলতি করে, সে যত তসবীহ-ওযীফাই পড়ুক কিংবা যত মুজাহাদা-সাধনাই করুক না কেন আল্লাহ্র নিকট সে কিছুই নয়। এমন কি তার যদি কারামত-কাশফও হয় তবুও তার কোন গুরুত্ব আল্লাহ্র কাছে নেই।

ধর্মের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা না থাকার প্রকৃত মর্ম ও কয়েকটি সন্দেহের উত্তর ঃ এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআন মজীদের পরিষ্কার ঘোষণা রয়েছে যে, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তী বা বাধ্যবাধকতা নেই, যার ভিত্তিতে কাউকে বাধ্যতামূলকভাবে সত্যধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা যেতে পারে। অথচ আলোচ্য এই ঘটনায় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, দ্বীন কবুল করার জন্য বনী-ইসরাঈলদিগকে বাধ্য করা হয়েছে।

কিন্তু সামান্য একটু চিন্তা করলেই পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কোন অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণে কোথাও কখনও বাধ্য করা হয়নি। কিন্তু যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে ইসলামী প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির অনুবর্তী হয়ে যায় এবং তারপরে সে যদি তার বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করে, তাহলে অবশ্যই তার উপর জবরদস্তী করা হবে এবং এই বিরুদ্ধাচরণের দরুন তাকে শাস্তি দেয়া হবে। ইসলামী শাস্তি বিধানে এ ব্যাপারে বহুবিধ শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'আলাস্ত'-সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির বিশ্লেষণ ঃ এ আয়াতগুলোতে মহা প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে যা স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং দাস ও মনিবের মাঝে সেসময় হয়েছিল, যখন এই দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে কোন সৃষ্টি আসেওনি। যাকে বলা হয় عهد ازل বা عهد الست

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও অধিপতি। আকাশ ও ভূমন্ডলের মাঝে অথবা এসবের বাইরে যাকিছুই রয়েছে সবই তাঁর সৃষ্টি ও অধিকারভুক্ত। তিনিই এসবের মালিক। না তাঁর উপর কারো কোন বিধান চলতে পারে, আর নাই বা থাকতে পারে তাঁর কোন কাজের উপর কারও

কোন প্রশ্ন করার অধিকার।

কিন্তু তিনি নিজের একান্ত অনুগ্রহে বিশ্বব্যবস্থাকে এমনভাবে তৈরী করেছেন যে, প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য একটা নিয়ম, একটা বিধিব্যবস্থা রয়েছে। নিয়ম ও বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী যারা চলবে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে স্থায়ী ও সুখ ও শান্তি। আর তার বিপরীতে যারা তার বিরুদ্ধাচারী তাদের জন্যে রয়েছে সব রকমের আযাব ও শাস্তি।

তাছাড়া বিরুদ্ধাচরণকারী অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্য তার নিজস্ব সর্বব্যাপক জ্ঞানই যথেষ্ট ছিল, যা সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরামাণুকে পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং সে জ্ঞানের সামনে গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় কাজ-কর্ম; বরং মনের গোপন ইচ্ছা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিকশিত। কাজেই আমলনামা লিখে রাখার জন্য কোন পরিদর্শক নিয়োগ করা, আমলনামা তৈরী করা, আমলনামাসমূহের ওজন দেয়া এবং সেজন্য সাক্ষী-সাবুদ দাঁড় করানোর কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না।

কিন্তু তিনিই তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের দরুন এ ইচ্ছাও করলেন যে, কোন লোককে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দেবেন না, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে লিখিত- পড়িত প্রমাণ এবং অনস্বীকার্য সাক্ষী-সাবুদের মাধ্যমে সে অপরাধ তার সামনে এমনভাবে এসে যায়, যেন সে নিজেও নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করে এবং নিজেকে যথার্থই শাস্তিযোগ্য মনে করে।

সে জন্যই প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তার প্রতিটি আমল এবং প্রতিটি বাক্য লেখার জন্য ফেরশতা নিয়োগ করে দিয়েছেন। বলা হয়েছে ঃ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ অর্থাৎ, এমন কোন বাক্য মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় না, যার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরিদর্শক ফেরেশতা নিয়োজিত রয়নি। আরো বলা হয়েছে ঃ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ অর্থাৎ, মানুষের প্রতিটি ছোট-বড় কাজ লিখিত রয়েছে।

অতঃপর হাশর ময়দানে ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করে মানুষের সৎ ও অসৎ কর্মের ওজন দেয়া হবে। যদি সৎকর্মের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে সে মুক্তি পাবে। আর যদি পাপের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে আযাবে ধরা পড়বে।

এছাড়া মহা বিচারকের দরবার যখন হাশরের মাঠে স্থাপিত হবে, তখন প্রত্যেকের কাজ-কর্মের উপর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কোন কোন অপরাধী সাক্ষীদেরকে মিথ্যা বলে দাবী করবে, তখন তারই হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে এবং সে ভূমি ও স্থান থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, যার দ্বারা এবং যেখানে সে এ অপরাধমূলক কাজ করেছিল। সেগুলো আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে সত্য-সঠিক ঘটনা বাতলে দেবে। এমনকি তখন অপরাধীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কিংবা অস্বীকার করার কোন সুযোগই থাকবে না। তারা স্বীকার করবে—

فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ

মহান করুণাময় প্রভু ন্যায়বিচার অনুষ্ঠানের এ ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হননি এবং পার্থিব রাষ্ট্রসমূহের মত নিছক একটা পদ্ধতি ও আইনই শুধু তাদেরকে দিয়ে দেননি; বরং আইনের সঙ্গে সঙ্গে একটা ধারাবাহিক বাস্তবায়ন ব্যবস্থাও স্থাপন করেছেন।

একজন অনন্য সাধারণ স্নেহপরায়ণ পিতা যেমন নিজের পারিবারিক ব্যবস্থার সুষ্ঠুতা বিধানের উদ্দেশে এবং পরিবার-পরিজনকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শেখাবার জন্য কিছু পারিবারিক নিয়ম-পদ্ধতি ও রীতি-নীতি তৈরী করেন যে, যে-ই বিরুদ্ধাচরণ করবে সে-ই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু তার (পিতার) স্নেহ ও অনুগ্রহ তাকে এমন ব্যবস্থা স্থাপনেও উদ্বুদ্ধ করে, যাতে কেউ শাস্তিযোগ্য না হয় ; বরং সবাই যেন সেই নিয়ম-পদ্ধতি মোতাবেক চলতে পারে। বাচ্চার জন্য যদি সকাল বেলা স্কুলে যাওয়ার নির্দেশ থাকে এবং তার বিরুদ্ধাচরণের জন্য যদি শাস্তি নির্ধারিত থাকে, তাহলে পিতা ভোর হতেই এ চিন্তাও করেন, যাতে বাচ্চা তার কাজটি করার জন্য সময়ের আগেই তৈরী হয়ে যেতে পারে।

সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের রহমত মাতা-পিতার দয়া ও করুণার চেয়ে বহুগুণ বেশী। কাজেই তিনি তার কিতাবকে শুধু আইন-কানুন ও শাস্তিবিধি হিসাবেই তৈরী করে দেননি; বরং একটি নির্দেশনামাও বানিয়েছেন এবং প্রতিটি আইনের সাথে সাথে এমন সব নিয়ম-পদ্ধতি লিখে দিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে আইনের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়।

ঐশী এ ব্যবস্থার তাগিদেই তিনি নিজে নবী-রসূল পাঠিয়েছেন, তাঁদের সাথে পাঠিয়েছেন আসমানী নির্দেশনামা। এক বিরাট সংখক ফেরেশতাকে সৎকর্মের প্রতি পথ প্রদর্শনের জন্য এবং সৎকর্মে সাহায্য করার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন।

এই ঐশী ব্যবস্থারই একটা তাগিদ ছিল, প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়কে অবহেলা থেকে সজাগ করার এবং নিজের মহান পালনকর্তাকে স্মরণ করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ তৈরী করে দেয়া, আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টি, রাত ও দিনের পরিবর্তন এবং স্বয়ং মানুষের নিজস্ব পরিমন্ডলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার মত এমনসব নির্দশন স্থাপন করে দেয়া যে, যদি সামান্য সচেতনতা অবলম্বন করা যায়, তাহলে কোন সময় স্বীয় মালিককে ভুলবে না। তাই বলা হয়েছে ঃ

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ —অর্থাৎ, যারা দৃষ্টিমান তাদের জন্য পৃথিবীতে আমার নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের সত্তার মাঝেও (নিদর্শন রয়েছে)। তারপরেও কি তোমরা দেখছ না?

তাছাড়া যারা গাফেল, তাদেরকে সজাগ করার জন্য এবং সৎকাজে নিয়োজিত করার জন্য রাব্বুল আলামীন একটি ব্যবস্থা এটাও করেছেন যে, ব্যক্তি, দল ও জাতিসমূহের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় নবী-রসূলগণের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি আদায় করে তাদেরকে আইনের অনুবর্তিতার জন্য প্রস্তুত করেছেন।

কোরআন মজীদের একাধিক আয়াতে বহু প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে, যা বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় আদায় করা হয়েছে। নবী-রসূলগণের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত; রেসালাতের বাণীসমূহ অবশ্যই উম্মতকে পৌছে দেন। এতে যেন কারো ভয়-ভীতি, মানুষের অপমান ও ভর্ৎসনার কোন আশঙ্কাই তাঁদের জন্য অন্তরায় না হয়। আল্লাহ্‌র এই পবিত্র দল নিজেদের এই প্রতিশ্রুতির হক পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করেছেন। রেসালতের বাণী পৌছাতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের সবকিছু কোরবান করে দিয়েছেন।

এমনিভাবে প্রত্যেক রসূল ও নবীর উম্মতের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে যে, তারাও নিজ নিজ নবী-রসূলের যথাযথ অনুসরণ করবে।

তারপর প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এবং বিশেষভাবে সেগুলো সম্পাদন করতে গিয়ে নিজের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্যকে ব্যয় করার জন্য—যা কেউ পূরণ করেছে, কেউ করেনি।

এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি হলো সে প্রতিশ্রুতিটি যা আমাদের রসূল মকবুল (সাঃ) সম্পর্কে সমস্ত নবী-রসূলগণের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে যে, তাঁরা 'নবীয়ে-উম্মী' খাতামুল আম্বিয়া (সাঃ)-এর অনুসরণ করবেন। আর যখনই সুযোগ পাবেন, তাঁকে সাহায্য-সহায়তা করবেন। যার আলোচনা নিম্নের আয়াতে করা হয়েছেঃ

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ

এ সমুদয় প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিই হল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পরিপূর্ণ রহমতের বিকাশ। এগুলোর উদ্দেশ্য হল এই যে, মানুষ যারা অত্যন্ত মনভোলা, প্রায়ই যারা নিজেদের কর্তব্যকর্ম ভুলে যায়, তাদেরকে বার বার এসব প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সতর্ক করে দেয়া, যাতে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন না হয়।

বায়আত গ্রহণের তাৎপর্য ঃ নবী-রসূল এবং তাঁদের প্রতিনিধি ওলামা ও মাশায়েখগণের মাঝে বায়আত গ্রহণের যে রীতি প্রচলিত রয়েছে, তাও এই ঐশী রীতিরই অনুসরণ। স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-ও বিভিন্ন ব্যাপারে সাহাবীগণ (রাঃ)-এর নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করেছেন। সেসব বায়আতের মধ্যে 'বায়আতে-রেদ্ওয়ান-এর কথা কোরআন করীমে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যারা বিশেষ গাছের নীচে আপনার হাতে বায়আত নিয়েছেন।

হিজরতের পূর্বে মদীনার আনসারগণের বায়আতে 'আকাবা' ও এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত।

বহু সাহাবীর নিকট থেকে ঈমান ও সৎকর্মে নিষ্ঠার ব্যাপারে বায়আত নেয়া হয়েছে। মুসলমান সূফী সম্প্রদায়ে যে বায়আত প্রচলিত রয়েছে, তাও ঈমান ও সৎকর্মে নিয়মানুবর্তিতা এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকারই আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ্ ও নবী-রসূলগণের সে রীতিরই অনুসরণ। আর সে কারণেই এতে বিশেষ বরকত রয়েছে। এতে মানুষ পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার এবং শরীয়তের নির্দেশাবলী যথাযথ পালনের সৎসাহস ও সামর্থ্য লাভ করতে পারে। বায়আতের তাৎপর্য জানার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বর্তমানে যে ধরনের বায়আত সাধারণভাবে অজ্ঞ ও মূর্খদের মাঝে প্রচলিত হয়ে গেছে যে, কোন বুযুর্গের হাতে হাত রেখে দেয়াকেই মুক্তির জন্য যথেষ্ট বলে ধারণা করা হয়—তা সম্পূর্ণই মূর্খতা। বায়আত হল একটি চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির নাম। তখনই এর উপকারিতা লাভ হবে, যখন এ চুক্তি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অন্যথায় এতে মহাবিপদের আশঙ্কা।

সূরা আ'রাফের বিগত আয়াতগুলোতে সে প্রতিশ্রুতির বিষয় আলোচিত হয়েছে যা বনী-ইসরাঈলদের কাছ থেকে তওরাতের বিধি-বিধানের অনুবর্তিতার ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে সেই বিশ্বজনীন প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা সমস্ত আদমসন্তানের কাছ থেকে এই দুনিয়ায় আসারও পূর্বে সৃষ্টিলগ্নে নেয়া হয়েছিল। যা সাধারণ ভাষায় عهد الست (আহদে-আলাস্ত) বলে প্রসিদ্ধ।

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ এ আয়াতগুলোতে আদমসন্তানদের বুঝাবার জন্য ذريت শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম রাগেব ইস্ফাহানী বলেন যে, এ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ذرأ (যরউন্) থেকে গঠিত। যার অর্থ সৃষ্টি করা। কোরআন করীমে কয়েক জায়গায় এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا প্রভৃতি। কাজেই 'যুররিয়্যাৎ'-এর শাব্দিক তরজমা হল সৃষ্টি। এ শব্দটি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই প্রতিশ্রুতি সে সমস্ত মানুষেই ব্যাপক ও প্রসারিত যারা আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে ও করবে।

হাদীসের রেওয়ায়েতে এই আদি প্রতিশ্রুতির আরও কিছু বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। যথা ঃ

ইমাম মালেক, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইমাম আহমদ (রহঃ) মুসলিম ইবনে ইয়াসারের বরাতে উদ্ধৃত করেছেন যে, কিছু লোক হযরত ফারূকে আ'যম (রাঃ)-এর নিকট এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাঁর কাছে যে উত্তর আমি শুনেছি তাহল এই—

'আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। তারপর নিজের কুদরতের হাত যখন তাঁর পিঠে বুলিয়ে দিলেন, তখন তাঁর ঔরসে যত সৎমানুষ জন্মাবার ছিল তারা সব বেরিয়ে এল। তখন তিনি বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতেরই কাজ করবে। পুনরায় দ্বিতীয়বার তাঁর পিঠে কুদরতের হাত বুলালেন। তখন যত পাপী-তাপী মানুষ তাঁর ঔরসে জন্মাবার ছিল, তাদেরকে বের করে আনলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা দোযখে যাবার মতই কাজ করবে।' সাহাবীগণের মধ্যে একজন নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্, প্রথমেই যখন জান্নাতী ও দোযখী সাব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে, তখন আর আমল করানো হয় কি উদ্দেশে? হুযুর (সাঃ) বললেন, 'যখন আল্লাহ্ তাআলা কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন সে জান্নাত বাসের কাজই করতে শুরু করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কাজের ভেতরেই হয়, যা জান্নাতবাসীদের কাজ। আর আল্লাহ্ যখন কাউকে দোযখের জন্য তৈরী করেন, তখন সে দোযখের কাজই করতে আরম্ভ করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কোন কাজের মাধ্যমেই হয়, যা জাহান্নামের কাজ।'

অর্থাৎ, মানুষ যখন জানে না যে, সে কোন শ্রেণীভুক্ত, তখন তার পক্ষে নিজের সামর্থ্য, শক্তি ও ইচ্ছাকে এমন কাজেই ব্যয় করা উচিত যা জান্নাতবাসীদের কাজ, আর এমন আশাই পোষণ করা কর্তব্য যে, সেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর রেওয়ায়েতে এ বিষয়টি হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমবারে যারা আদম (আঃ)-এর ঔরস থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা ছিল শ্বেতবর্ণ—যাদেরকে বলা হয়েছে জান্নাতবাসী। আর দ্বিতীয়বার যারা বেরিয়েছিল তারা ছিল কৃষ্ণবর্ণ—যাদেরকে জাহান্নামবাসী বলা হয়েছে।

আর তিরমিযীতেও একই বিষয় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এতে এ কথাও রয়েছে যে, এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জন্মানোর মত যত আদমসন্তান বেরিয়ে এল, তাদের সবার ললাটে একটা বিশেষ ধরনের দীপ্তি ছিল।

এখন লক্ষণীয় এই যে, এসব হাদীসে তো 'যুররিয়াত'-এর আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে নেয়ার এবং বেরিয়ে আসার কথা উল্লেখ রয়েছে, অথচ কোরআনের শব্দে 'বনী-আদম' অর্থাৎ, আদমসন্তানের ঔরসে জন্মগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এতদুভয়ের সামঞ্জস্য এই যে, আদম (আঃ)-এর পিঠ থেকে তাদেরকে বের করা হয়েছে, যারা সরাসরি আদম (আঃ)-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করার ছিল। তারপর তাঁর বংশধরদের পৃষ্ঠদেশ থেকে অন্যান্যদেরকে। এভাবে যে ধারায় এ পৃথিবীতে আদমসন্তানেরা জন্মাবার ছিল, সে ধারায়ই তাদেরকে পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছে।

হাদীসের বর্ণনায় সবাইকে আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করার অর্থও এই যে, আদম থেকে তাঁর সন্তানদিগকে, অতঃপর এই সন্তানদের থেকে তাদের সন্তানদিগকে আনুক্রমিকভাবে সৃষ্টি করা হয়।

কোরআন মজীদে সমস্ত আদমসন্তানের কাছ থেকে যে স্বীকৃতি নেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে, এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, এই আদমসন্তান, যাদেরকে তখন পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, তারা শুধু আত্মাই ছিল না; বরং আত্মা ও শরীরের এমন একটা সমন্বয় ছিল যা শরীরের সুক্ষ্মতর অণু-পরমাণুর দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল। কারণ, পালনকর্তা, বিদ্যমানতা এবং লালন-পালনের প্রয়োজন বেশীর ভাগ সে ক্ষেত্রেই দেখা দেয়, যেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয় ঘটে এবং যাকে এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে উন্নীত হতে হয়। রূহ বা আত্মাসমূহের অবস্থা তা নয়। তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকে। তাছাড়া উল্লেখিত হাদীসসমূহে যে তাদের সাদা ও কাল বর্ণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিংবা তাদের ললাটদেশে দীপ্তির বর্ণনা রয়েছে, তাতেও বুঝা যায় যে, সেগুলো শুধু অশরীরি আত্মাই ছিল না। রূহ বা আত্মার কোন রং বা বর্ণ নেই; শরীরের সাথেই এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক হয়ে থাকে।

এতেও বিস্ময়ের কোন কারণ নেই যে, কেয়ামত পর্যন্ত জন্মাবার যোগ্য সমস্ত মানুষ এক জায়গায় কেমন করে সমবেত হতে পারল? কারণ, হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে এ বিষয়েও বিশ্লেষণ রয়ে গেছে যে, তখন যে আদমসন্তানকে আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, সেগুলো নিজেদের প্রকৃত অবয়বে ছিল না, যা নিয়ে তারা পৃথিবীতে আসবে। বরং তখন তারা ছিল ক্ষুদ্র পিপড়ার মত। তাছাড়া বিজ্ঞানে বর্তমান উন্নতির যুগে তো কোন সমঝদার লোকের মনে এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নেরই উদয় হওয়া উচিত নয় যে, এত বড় আকার-অবয়বসম্পন্ন মানুষ একটা পিপড়ার আকৃতিতে কেমন করে বিকাশ লাভ করল। ইদানীং তো একটি অণুর ভেতরে গোটা সৌরমন্ডলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ফিল্মের মাধ্যমে একটি বড়র চেয়ে বড় বস্তুকেও একটি বিন্দুর আয়তনে দেখানো যেতে পারে। কাজেই আল্লাহ্ তাআলা যদি এই অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির সময় সমস্ত আদমসন্তানকে নিতান্ত ক্ষুদ্র দেহে অস্তিত্ব দান করে থাকেন, তবে তা আর তেমন কঠিন হবে কেন?

আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এই আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আরও কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রথমতঃ এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেয়া হয়েছিল?

দ্বিতীয়তঃ এ অঙ্গীকার যখন এমন অবস্থাতে নেয়া হয় যে, তখন একমাত্র আদম ছাড়া অন্য কোন মানুষের জন্মই হয়নি, তখন তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কেমন করে হল, যাতে তারা আল্লাহ্‌কে চিনতে পারবে এবং তার পালনকর্তা হওয়ার কথা স্বীকার করবে? কারণ, পালনকর্তার কথা সে-ই স্বীকার করতে পারে, যে পালনকর্তা সম্পর্কে জানবে বা প্রত্যক্ষ করবে। পক্ষান্তরে এই প্রত্যক্ষ করাটা এ পৃথিবীতে জন্মানোর পরেই সম্ভব হতে পারে।

প্রথম প্রশ্ন যে, প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেয়া হয়েছিল-এ সম্পর্কে মোফাস্‌সেরে কোরআন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও হাকেম (রহঃ) যে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন তাহল এই যে, এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি তখনই নেয়া হয়, যখন আদম (আঃ)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয়। আর এ প্রতিশ্রুতির স্থানটি হল, 'ওয়াদিয়ে নু'মান'- যা পরবর্তীকালে আরাফাতের ময়দান নামে প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করেছে।—(তফসীরে-মাযহারী)

থাকল দ্বিতীয় প্রশ্ন যে, এই নতুন সৃষ্টি যাকে এখনও উপকরণগত অস্তিত্ব দান করা হয়নি, সে কেমন করে বুঝবে যে, আমাদের কোন স্রষ্টা ও পালনকর্তা রয়েছেন? এমন অবস্থাতে তাদেরকে প্রশ্ন করাই তাদের উপর অসহনীয় চাপ, তা তারা উত্তর কি দেবে! এর উত্তর হল এই যে, যে বিশ্বস্রষ্টা তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবলে সমস্ত মানুষকে একটি অণুর আকারে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে তখন প্রয়োজনানুপাতে তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা-অনুভূতি দেয়া কি তেমন কঠিন ব্যাপার ছিল! আর প্রকৃতপক্ষে হয়েও ছিল তাই। আল্লাহ্-জাল্লা শানুহু সেই ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মাঝে যাবতীয় মানবীয় ক্ষমতার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল জ্ঞানানুভূতি।

স্বয়ং মানুষের অস্তিত্বে আল্লাহ্ তাআলার মহত্ত্ব ও কুদরতের এমনসব অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে যে লোক সামান্যও লক্ষ্য করবে, সে আল্লাহ্‌র পরিচয় সম্পর্কে গাফেল থাকতে পারে না। কোরআনে রয়েছে—

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ অর্থাৎ,

অর্থাৎ, বিজ্ঞজনদের জন্য এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাআলার বহু নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের সত্তার মাঝেও (নিদর্শন রয়েছে), তবুও কি তোমরা দেখছ না?

এখানে তৃতীয় আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে, এই আদি প্রতিশ্রুতি (আহ্‌দে আলাস্ত) যতই নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ হোক না কেন, কিন্তু এ কথাটি তো অন্ততঃ সবাই জানে যে, এ পৃথিবীতে আসার পর এ প্রতিশ্রুতি কারোই স্মরণ থাকেনি। তাহলে প্রতিশ্রুতিতে লাভটা কি হল?

এর উত্তর এই যে, একে তো এই আদমসন্তানদের মধ্যে অনেক এমন ব্যক্তিবর্গও রয়েছে যারা একথা স্বীকার করেছেন যে, আমাদের এই প্রতিশ্রুতির কথা যথার্থই মনে আছে। হযরত যুন্নূন মিসরী (রহঃ) বলেছেন, এই প্রতিশ্রুতির কথা আমার এমনভাবে স্মরণ আছে, যেন এখনও শুনছি। আর অনেকে তো এমনও বলেছেন যে, যখন এই স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হয়, তখন আমার আশেপাশে কারা কারা উপস্থিত ছিল সে কথাও আমার স্মরণ আছে। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, এমন লোকের সংখ্যা একান্তই বিরল। কাজেই সাধারণ লোকের বুঝার বিষয় হল এই যে, বহু কাজ থাকে যেগুলোর বৈশিষ্ট্যগত কিছু প্রভাব থেকে যায়, তা কারো স্মরণ থাক বা নাই থাক। এ বিষয়ে কারও ধারণা-কল্পনা না থাকলেও সে তার প্রভাব বিস্তার করবেই। এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির অবস্থাও তেমনি। প্রকৃতপক্ষে এই স্বীকারোক্তি প্রত্যেকটি মানুষের মনে

খোদা-পরিচিতির একটা বীজ বপন করে দিয়েছে, যা ক্রমানুয়ে লালিত হচ্ছে, সে ব্যাপারে কারও জানা থাক কিংবা না থাক। আর এই বীজেরই ফুল-ফসল এই যে, প্রতিটি মানুষের মনেই ঐশী প্রেম ও মহত্ত্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে—তার বিকাশ যেভাবেই হোক। চাই পৌত্তলিকতা এবং সৃষ্টি-পূজার কোন ভ্রান্ত পদ্ধতির মাধ্যমেই হোক বা অন্য কোনভাবে। সেই কতিপয় হতভাগ্য, যাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গিয়ে তাদের জ্ঞান ও রুচিবোধ বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং তিক্ত-মিষ্টির পার্থক্য করাও যাদের দ্বারা সম্ভব নয়, তাদের ছাড়া সমগ্র দুনিয়ার শত শত কোটি মানুষ আল্লাহ্র ধ্যান, তাঁর কল্পনা ও মহিমান্বিত অস্তিত্বের অনুভূতি থেকে শূন্য নয়। অবশ্য যদি কেউ জৈবিক কামনা-বাসনায় মোহিত হয়ে অথবা কোন গোমরাহ্ ও ভ্রষ্ট সমাজ-পরিবেশের কবলে পড়ে সেই সহজাত বৃত্তিকে ভুলে যায়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন كل مولود يولد على الفطرة কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে على هٰذه الملة (বোখারী, মুসলিম) অর্থাৎ, প্রতিটি সন্তান স্বভাবধর্ম অর্থাৎ, ইসলামের উপরেই জন্মায়। পরে তার পিতা-মাতা তাকে অন্যান্য মত ও পথে প্রবৃত্ত করে দেয়। সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেন যে, আমি আমার বন্দাদিগকে 'হানীফ' অর্থাৎ, এক আল্লাহ্তে বিশ্বাসীরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের পেছনে লেগে গেছে এবং তাদেরকে সেই সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

এমনিভাবে বৈশিষ্ট্যগত প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন বহু আমল ও কথা রয়েছে, যা এ পৃথিবীতে ও নবী-রসূল (আঃ)-এর শিক্ষার মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছে। সেগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষ বুঝুক বা না বুঝুক, স্মরণ রাখুক বা না রাখুক। সেগুলো কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই নিজের কাজ করে যাচ্ছে এবং আপন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিকশিত করছে।

উদাহরণতঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ডান কানে আযান আর বাম কানে একামত ও তকবীর বলার যে সুন্নতটি সব মুসলমানই জানে এবং (আলহামদু লিল্লাহ) সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত রয়েছে—যদিও শিশুরা এসব বাক্যের অর্থ কিছুই বুঝে না এবং বড় হওয়ার পর স্মরণও থাকে না যে, তার কানে কি কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তবুও এর একটা তাৎপর্য রয়েছে। আর তাহল এই যে, এতেকরে সেই আদি প্রতিশ্রুতিতে শক্তি সঞ্চার করে কানের পথে অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করে দেয়া হয়। পরবর্তীকালে এরই প্রতিক্রিয়ায় লক্ষ্য করা যায় যে, বড় হওয়ার পর যদি সে ইসলাম ও ইসলামিয়াত থেকে বহু দূরেও সরে পড়ে, কিন্তু নিজেকে নিজে মুসলমান বলে এবং মুসলমানের তালিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে একান্তই খারাপ মনে কর। এমনিভাবে যারা কোরআনের ভাষা জানে না তাদের প্রতিও কোরআন তেলাওয়াতের যে নির্দেশটি দেয়া হয়েছে, তারও তাৎপর্য হয় তো এই যে, এতেকরে অন্ততঃ এই গোপন উপকারিতা নিশ্চিতই লাভ হয় যে, মানুষের মনে ঈমানের জ্যোতি সজীব হয়।

সেজন্যেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ অর্থাৎ, এ স্বীকারোক্তি আমি এ কারণে গ্রহণ করেছি যাতে তোমরা কেয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই আদি প্রশ্নোত্তরে তোমাদের অন্তরে ঈমানের মূল এমনিভাবে স্থাপিত হয়ে গেছে যে, সামান্য একটু চিন্তা করলেই তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে পালনকর্তা স্বীকার না করে কোন অব্যাহতি থাকবে না।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ অর্থাৎ, এ অঙ্গীকার আমি এ জন্যেও গ্রহণ করেছি, আবার না তোমরা কেয়ামতের দিন এমন কোন ওযর-আপত্তি করতে থাক যে, শিরক ও পৌত্তলিকতা তো আসলে আমাদের বড়রা অবলম্বন করেছিল, আর আমরা তো ছিলাম তাদের পরে তাদের বংশধর। আমরা তো খাঁটি-অখাঁটি, ভুল-শুদ্ধ কোনটাই জানতাম না। কাজেই বড়রা যা কিছু করেছে আমরাও তাই করেছি। অতএব, বড়দের শাস্তি আমাদেরকে দেয়া হবে কেন? আল্লাহ্ তাআলা বাতলে দিয়েছেন যে, অন্যের শাস্তি তোমাদেরকে দেয়া হয়নি; বরং স্বয়ং তোমাদেরই শৈথিল্য ও গাফলতির শাস্তি দেয়া হয়েছে। কারণ, আদি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানবাত্মায় এমন এক জ্ঞান ও দর্শনের বীজ রোপণ করে দেয়া হয়েছিল যাতে সামান্য চিন্তা করলেই এটুকু বিষয় বুঝতে পারা কোন কঠিন ছিল না যে, এসব পাথরের মূর্তি যেগুলোকে আমরা নিজের হাতে গড়ে নিয়েছি কিংবা আগুন, পানি, বৃক্ষ অথবা কোন মানুষ প্রভৃতির কোন একটিও এমন নয়, যাকে কোন মানুষ নিজের স্রষ্টা ও পালনকর্তা বা মোক্ষদাতা কিংবা মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস করতে পারে।

তৃতীয় আয়াতেও একই বিষয়ে বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ, আমি এমনিভাবে আমার নিদর্শনগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি, যাতে মানুষ শৈথিল্য, গাফলতি ও অনাচার থেকে ফিরে আসে। অর্থাৎ, আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ *সম্পর্কে যদি কেউ সামান্য লক্ষ্যও করে, তাহলে সে সেই আদি* প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির দিকে ফিরে আসতে পারে, যা সৃষ্টিলগ্নে করেছিল। অর্থাৎ, একটু লক্ষ্য করলেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পালনকর্তা হওয়ার স্বীকৃতি দিতে শুরু করবে এবং তার ফলে তাঁর আনুগত্যকে নিজের জন্য অবশ্যম্ভাবী মনে করবে।

উল্লেখিত আয়াতে বনী-ইসরাঈলের জনৈক বড় আলেম ও অনুসরণীয় ব্যক্তির জ্ঞান ও দর্শনের সুউচ্চ স্তরে পৌছার পর সহসা গোমরাহ্ ও অভিশপ্ত হয়ে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা এবং তার কারণসমূহ বিবৃত হয়েছে। আর তাতে বহু শিক্ষণীয় বিষয়ও রয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এ ঘটনার যোগসূত্র এই যে, পূর্বের আয়াতগুলোতে সেই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির আলোচনা ছিল যা আল্লাহ্ তাআলা আদিলগ্নে সমস্ত আদমসন্তান থেকে এবং পরবর্তীতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহুদী-নাসারা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতি-সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নিয়েছেন। আর উল্লেখিত আয়াতগুলোতে এ আলোচনাও প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছিল যে, প্রতিশ্রুতিদাতাদের মধ্যে অনেকেই সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। যেমন, ইহুদীরা খাতেমুন্নাবিয়্যীন (সাঃ)-এর এ পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে তাঁর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করত এবং তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও আকার-অবয়ব সম্পর্কে মানুষের কাছে বর্ণনা করত এবং তিনি যে সত্য নবী তাও প্রমাণ করত। কিন্তু যখন মহানবী (সাঃ)-এর আবির্ভাব হয়, তখন তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের লোভে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে এবং তাঁর অনুসরণ করতে বিরত থাকে।

বনী-ইসরাঈলের জনৈক অনুসরণীয় আলেমের পথভ্রষ্টতার দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা ঃ এ আয়াতগুলোতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি স্বীয় জাতিকে সে ঘটনা শুনিয়ে দিন, যাতে বনী-ইসরাঈলের একজন বিরাট আলেম ও আরেফের এমনি উত্থানের পর পতন ও হেদায়েতের পর গোমরাহীর কথা বর্ণিত রয়েছে। সে বিস্তারিত জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ মারেফাত হাসিল করার পর যখন রৈপিক কামনা-বাসনা ও স্বার্থ তার উপর প্রবল হয়ে গেল, তখন তার সমস্ত জ্ঞান-গরিমা, নৈকট্য ও সমস্ত মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তাকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হল।

কোরআন মজীদে সে লোকের নাম বা কোন পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। তফসীরবিদ, সাহাবী ও তাবেঈনের কাছ থেকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ আলেমের নিকট গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে হযরত ইবনে মারদুক্তয়াহ্ (রহঃ) উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, সে লোকটির নাম ছিল বাল্আম ইবনে বাউ'রা। সে সিরিয়ায় বায়তুল মোকাদ্দাসের নিকটবর্তী কেন্আনের অধিবাসী ছিল। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, সে বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোক ছিল। আল্লাহ্র কোন কোন কিতাবের এলেম তার ছিল। তার গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোরআন করীমে যে الَّذِیْٓ اٰتَیْنٰهُ اٰیٰتِنَا বলা হয়েছে, তাতে সে এলেমের প্রতিই ঈঙ্গিত করা হয়েছে।

ফেরাউনের জল-মগ্নতা ও মিসর বিজয়ের পর যখন হযরত মূসা (আঃ) ও বনী-ইসরাঈলদিগকে 'জাব্বারীন' সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করার হুকুম হল এবং 'জাব্বারীন' সম্প্রদায় যখন দেখল যে, মূসা (আঃ) সমগ্র বনী-ইসরাঈল সৈন্যসহ পৌছে গেছেন—পক্ষান্তরে তাদের মোকাবেলায় ফেরাউন সম্প্রদায়ের জল-মগ্ন হয়ে মরার কথা পূর্ব থেকেই তাদের জানা ছিল, তখন তাদের ভয় হল। তারা সবাই মিলে বাল্আম ইবনে বাউ'রার কাছে সমবেত হয়ে বলল, মূসা (আঃ) অতি কঠিন লোক, তদুপরি বিপুল সংখ্যক লোকজনও রয়েছে তাঁর সাথে; তারা এসেছে আমাদিগকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্য। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি তাদেরকে আমাদের মোকাবেলা থেকে ফিরিয়ে দেন। বাল্আম ইবনে বাউ'রা ইস্মে আ'যম জানত এবং সেই ইস্মের মাধ্যমে যে দোয়া করত তাই কবুল হত।

বাল্আ'ম বলল, অতি পরিতাপের বিষয়, তোমরা একি বলছ! তিনি হলেন আল্লাহ্র নবী। তাঁর সাথে রয়েছেন আল্লাহ্র ফেরেশতা। আমি তাঁর বিরুদ্ধে কেমন করে বদদোয়া করতে পারি? অথচ আল্লাহ্র দরবারে তাঁর যে মর্যাদা, তাও আমি জানি। আমি যদি এহেন কাজ করি, তাহলে আমার দুনিয়া-আখেরাত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

সমাজের প্রভাবশালী লোকেরা পীড়াপীড়ি করতে থাকলে বাল্আ'ম বলল, আচ্ছা, তাহলে আমি আমার পালনকর্তার নিকট জেনে নেই; এ ব্যাপারে দোয়া করার অনুমতি আছে কিনা? সে তার নিয়মানুযায়ী বিষয়টি জানার জন্য এস্তেখারা কিংবা অন্য কোন আমল করল। তাতে স্বপ্নযোগে তাকে বলে দেয়া হল, সে যেন এমন কাজ কখনও না করে। সে সম্প্রদায়কে বলল যে, বদদোয়া করতে আমাকে বারণ করা হয়েছে। তখন সমাজপতিরা তাকে একটা লোভনীয় উপঢৌকন দান করল। প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল উৎকোচবিশেষ। সে যখন সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিল, তখন সম্প্রদায়ের লোকজন তার পেছনে লেগে গেল যে, আপনি একাজটি করে দিন। তাদের অনুরোধ-উপরোধ আর পীড়াপীড়ির অন্ত ছিল না। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী তার স্ত্রী উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের কাজটি করে দেয়ার পরামর্শ দেয়। তখন স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনা এবং সম্পদের মোহ তাকে অন্ধ করে দিল। ফলে সে মূসা (আঃ) এবং বনী-ইসরাঈলদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে আরম্ভ করল।

সে মুহূর্তে আল্লাহ্র মহা কুদরতের এক আশ্চর্য বিষয় দেখা দেয়—মূসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে গিয়ে সে যেসব বাক্য বলতে চাইছিল সেসবই নিজ সম্প্রদায়ের প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল। তখন সবাই চীৎকার করে উঠল, তুমি যে আমাদের জন্যই বদদোয়া করছ। বাল্আ'ম বলল, এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়—আমার জিহ্বা এর বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ নয়।

ফল দাঁড়াল এই যে, সে সম্প্রদায়ের উপর ধ্বংস নাযিল হল। আর বালআ'মের শাস্তি হল এই যে, তার জিহ্বা বেরিয়ে এসে বুকের উপর লটকে গেল। এবার সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আমার যে দুনিয়া-আখেরাত সবই শেষ হয়ে গেল। আমার দোয়া যে আর চলছে না। তবে আমি তোমাদিগকে একটা কৌশল বলে দিচ্ছি, যার দ্বারা তোমরা মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে।

তাহল এই যে, তোমরা তোমাদের সুন্দরী নারীদিগকে সাজিয়ে বনী-ইসরাঈল সৈন্যদের মাঝে পাঠিয়ে দাও। তাদেরকে একথা ভাল করে বুঝিয়ে দাও যে, বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাদের সাথে যা-ই কিছু করতে চায়, তারা যেন তা করতে দেয়; কোন রকম বাধ যেন না সাধে। এরা মুসাফির, দীর্ঘদিন ঘর ছাড়া, হয় তো বা এরা এ ব্যবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহ্র নিকট ব্যভিচার অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। যে জাতির মাঝে তা অনুপ্রবেশ করে, তাদের উপর গযব ও অভিসম্পাত নাযিল হয়, সে জাতি কখনও বিজয় কিংবা কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারে না।

বালআ'মের এই পৈশাচিক চালটি তাদের বেশ পছন্দ হল এবং সেমতেই কাজ করা হল। বনী-ইসরাঈলদের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ চালের শিকার হয়ে গেল। হযরত মূসা (আঃ) তাকে এই দুষ্কর্ম থেকে বারণ করলেন। কিন্তু সে বিরত হল না; বরং পৈশাচিক ফাঁদে জড়িয়ে পড়ল।

ফলে বনী-ইসরাঈলের মাঝে কঠিন প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল। তাতে একই দিনে সত্তর হাজার ইসরাঈলী মৃত্যুমুখে পতিত হল। এমনকি যে লোক অসৎকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, তাকে এবং যার সাথে লিপ্ত হয়েছিল তাকে বনী-ইসরাঈলরা হত্যা করে প্রকাশ্যে টাঙ্গিয়ে রাখল, যাতে অন্যান্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তারা সবাই তওবাও করল। তখন সে প্লেগ দমিত হল।

কোরআন মজীদে উল্লেখিত ব্যাপারে বলা হয়েছে, فَانْسَلَخَ مِنْهَا অর্থাৎ, আমি আমার নিদর্শনসমূহ এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞান-পরিচয় সে লোককে দান করেছিলাম, কিন্তু সে তা থেকে বেরিয়ে গেছে। انسلاخ (ইন্সেলাখুন) শব্দটি প্রকৃতপক্ষে পশুদের চামড়ার ভেতর থেকে কিংবা সাপের ছলমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে বলা হয়। এখানেও আয়াতের জ্ঞানকে একটি পোশাক বা লেবাসের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, এ লোকটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে

পড়েছে। فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ (শয়তান তার পেছনে লেগে গেছে।) অর্থাৎ, যে পর্যন্ত আয়াতের জ্ঞান এবং আল্লাহ্র স্মরণ তার সাথে ছিল, সে পর্যন্ত তার উপর শয়তান কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না। কিন্তু যখন তা শেষ হয়ে গেল, তখন শয়তান তাকে কাবু করে ফেলল। فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ (অতঃপর সে হয়ে গেল গোমরাহদের অন্তর্ভুক্ত।) অর্থাৎ, শয়তান কাবু করে ফেলার দরুন সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ অর্থাৎ, আমি ইচ্ছা করলে এসব আয়াতের মাধ্যমে তাকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন করে দিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়ে রৈপিক কামনা-বাসনার দাসত্ব করতে শুরু করেছে। এখানে اَخْلَدَ শব্দটি اخلاد ধাতু থেকে গঠিত হয়েছে। যার অর্থ হল কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কিংবা কোন স্থানকে আঁকড়ে ধরা। আর ارض-এর প্রকৃত অর্থ হল ভূমি। পৃথিবীতে যাবতীয় যাকিছু রয়েছে সেগুলো হয় সরাসরি ভূমি হবে, আর না হয় ভূমিসংক্রান্ত বিষয়সম্পত্তি, বাড়ী-ঘর, ক্ষেত-খামার প্রভৃতি হবে অথবা ভূমি থেকেই উৎপন্ন অন্যান্য লাখো-কোটি বস্তু-সামগ্রী, যার উপর মানুষের জীবন এবং আরাম-আয়েস নির্ভরশীল। সুতরাং ' ارض ' (আরদ) শব্দ বলে এখানে সমগ্র পৃথিবীকেই বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতে ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে যে, ঐ আয়াতসমূহ এবং সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হল প্রকৃত মর্যাদা ও উন্নতির কারণ। কিন্তু যে লোক এ সমস্ত আয়াতের যথার্থ সম্মান না দিয়ে পার্থিব কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অপেক্ষা অগ্রাধিকার দেবে, তার জন্য এই জ্ঞানই মহাবিপদ হয়ে যাবে।

এই বিপদের কথাটিও আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে- فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ - لهث শব্দের প্রকৃত অর্থ হল জিহ্বা বের করে জোরে শ্বাস নেয়া।

প্রত্যেকটি প্রাণীই নিজের জীবন রক্ষার জন্য ভেতরের উষ্ণ বায়ু বাইরে বের করে দিতে এবং বাইরে থেকে নতুন তাজা বায়ু নাক ও গলার মাধ্যমে ভেতরে টেনে নিতে বাধ্য। এরই উপর নির্ভরশীল প্রতিটি প্রাণীর জীবন। আল্লাহ্ তাআলাও প্রত্যেক জীবের জন্য একাজটি এতই সহজ ও সাবলীল করে দিয়েছেন যে, কোন ইচ্ছা বা পরিশ্রম ছাড়াই নাকের রন্ধ্র দিয়ে ভেতরের হাওয়া বাইরে এবং বাইরের হাওয়া ভেতরে আসা-যাওয়া করছে। এতে না কোন শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, না ইচ্ছা করে করার প্রয়োজন পড়ে। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকভাবেই এ কাজটি ক্রমাগত সম্পন্ন হতে থাকে।

জীব-জন্তুর মধ্যে শুধু কুকুরই এমন এক জীব, যাকে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের আসা-যাওয়ার ব্যাপারে জিহ্বা বের করে জোর দিতে হয় এবং পরিশ্রম করতে হয়। অন্যান্য জীবের বেলায় এমন অবস্থা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন তাদের প্রতি কেউ আক্রমণ করে কিংবা সে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে অথবা আকস্মিক কোন বিপদের সম্মুখীন হয়।

কোরআন করীম সে ব্যক্তিকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছে। তার কারণ আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করার দরুনই তাকে এ শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তার জিহ্বা বেরিয়ে গিয়ে বুকের উপর ঝুলে পড়েছিল এবং তাতে সে অনবরত কুকুরের মত হাঁপাচ্ছিল। তাকে কেউ তাড়া করুক আর না-ই করুক, সে যে কোন অবস্থায় শুধু হাঁপাতেই থাকত।

উল্লেখিত আয়াতগুলোর সারমর্ম হচ্ছে—

প্রথমতঃ কারো পক্ষেই নিজের জ্ঞান-গরিমা এবং এবাদত-উপাসনার ব্যাপারে গর্ব করা উচিত নয়। কারণ, সময় বদলাতে এবং বিপরীতগামী হতে দেরী হয় না। যেমন হয়েছিল বাল্‌আ'ম ইবনে বাউরার পরিণতি। এবাদত-উপাসনার সাথে সাথে আল্লাহ্র শোকরগোযারী ও তাতে দৃঢ়তার জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করা এবং তাঁর উপর ভরসা করা কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ এমনসব পরিবেশ ও কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, যাতে স্বীয় ধর্মীয় ব্যাপারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসার ক্ষেত্রে সেই অশুভ পরিণতির কথা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ অসৎ ও পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের নিমন্ত্রণ বা উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকাও কর্তব্য। কারণ, ভ্রান্ত লোকদের উপঢৌকন গ্রহণ করার কারণেই বাল'আম ইবনে বাউরা এই মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছিল।

চতুর্থতঃ অশ্লীলতা ও হারামের অনুসরণ গোটা জাতির জন্য ধ্বংস ও বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে জাতি নিজেদেরকে বিপদাপদ থেকে বিমুক্ত রাখতে চায়, তার কর্তব্য হল নিজ জাতিকে যথাশক্তি অশ্লীলতার প্রকোপ হতে বিরত রাখা। অন্যথায় আল্লাহ্ তাআলার আযাবকেই আমন্ত্রণ জানানো হবে।

পঞ্চমতঃ আল্লাহ্র আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণ নিজেও একটি আযাব এবং এর কারণে শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে গিয়ে আরও হাজার রকমের মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে দেয়। কাজেই যে লোককে আল্লাহ্ তাআলা দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন, সাধ্যমত সে জ্ঞানের সম্মান দান এবং নিজ আমল সংশোধনের চিন্তা থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও বিরত না থাকা তার একান্ত কর্তব্য।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

(১৭৯) আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ। (১৮০) আর আল্লাহ্‌র জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে। (১৮১) আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে এমন এক দল রয়েছে যারা সত্য পথ দেখায় এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে। (১৮২) বস্তুতঃ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে, আমি তাদেরকে ক্রমানুয়ে পাকড়াও করব এমন জায়গা থেকে, যার সম্পর্কে তাদের ধারণাও হবে না। (১৮৩) বস্তুতঃ আমি তাদেরকে ঢিল দিয়ে থাকি। নিঃসন্দেহে আমার কৌশল সুনিপুণ। (১৮৪) তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, তাদের সঙ্গী লোকটির মস্তিষ্কে কোন বিকৃতি নেই? তিনি তো ভীতি প্রদর্শনকারী প্রকৃষ্টভাবে। (১৮৫) তারা কি প্রত্যক্ষ করেনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্য সম্পর্কে এবং যাকিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্‌ তাআলা বস্তু–সামগ্রী থেকে এবং এ ব্যাপারে যে, তাদের সাথে কৃত ওয়াদার সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে? বস্তুতঃ এরপর কিসের উপর ঈমান আনবে? (১৮৬) আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট করেন। তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। আর আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাদের দুষ্টামীতে মত্ত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে রাখেন। (১৮৭) আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিনএর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে অজান্তেই এসে যাবে। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন অপানি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ বিশেষ করে আল্লাহ্‌র নিকটই রয়েছে। কিন্তু তা অধিকাংশ লোকেই উপলব্ধি করে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফেরদের না বোঝা, না দেখা ও না শোনার তাৎপর্য ঃ এ আয়াতে সেসব লোকের বোঝা, দেখা ও শুনাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা কিছুই বোঝে না, কোন কিছু দেখেও না এবং শোনেও না। অথচ বাস্তবে এরা পাগল বা উম্মাদ নয় যে, কিছুই বুঝতে পারে না। অন্ধও নয় যে, কোন কিছু দেখবে না, কিংবা কালাও নয় যে, কোন কিছু শোনবে না। বরং প্রকৃতপক্ষে এরা পার্থিব বিষয়ে অধিকাংশ লোকের তুলনায় অধিক সতর্ক ও চতুর।

কিন্তু কথা হল এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় সৃষ্টিসমূহের মধ্যে প্রত্যেক সৃষ্টির প্রয়োজন অনুপাতে তার জীবনের লক্ষ্য অনুযায়ী বুদ্ধি ও উপলব্ধি ক্ষমতা দান করেছেন। যেসব জিনিসকে আমরা বুদ্ধি বিবর্জিত ও অনুভূতিহীন বলে মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোও জ্ঞান–বুদ্ধি ও চেতনা–অনুভূতি বিবর্জিত নয়। অবশ্য এসব বিষয় সেগুলোর মাঝে সে অনুপাতেই দেয়া হয়েছে যেটুকু তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন। সবচেয়ে কম বুদ্ধি ও চেতনা–উপলব্ধি রয়েছে মাটি, পাথর প্রভৃতি জড় পদার্থের মাঝে। যাদের না আছে প্রবৃদ্ধি, না স্বস্থান থেকে কোথাও যাওয়া কিংবা চলাফেরার প্রয়োজন। কাজেই এতে সে শক্তি–সামর্থ্য এতই ক্ষীণ যে, তাদের জীবনীশক্তির আন্দাজ করাও কঠিন। এগুলোর চাইতে সামান্য বেশী রয়েছে উদ্ভিদদের মধ্যে, যার অস্তিত্বের লক্ষ্যের মাঝে প্রবৃদ্ধি এবং ফল দান প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে বুদ্ধি–উপলব্ধি সে অনুপাতেই দেয়া হয়েছে। তারপর আসে পশুর নম্বর; যাদের জীবনের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রবর্ধন ও চলাফেরা করে খাবার আহরণ, ক্ষতিকর বিষয় থেকে আত্মরক্ষা আর বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়। এ কারণেই তাদেরকে যে বুদ্ধি, চেতনা ও অনুভূতি দেয়া হয়েছে তা অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় বেশী। কিন্তু ততটুকু বেশী যাতে তারা নিজেদের পানাহার, উদরপূর্তি ও নিদ্রা–জাগরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে পারে, শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এসবের পরে আসে মানুষের নম্বর; যার অস্তিত্বের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হল নিজের স্রষ্টা ও পালনকর্তাকে চেনা, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চলা, তাঁর অসন্তুষ্টির বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, সমগ্র সৃষ্টির তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য করা এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়া। সমগ্র বস্তুজগতের পরিণতি ও ফলাফলকে উপলব্ধি করা, আসল ও মেকী যাচাই করে যা ভাল, মঙ্গল ও কল্যাণকর সেগুলোকে গ্রহণ করা, আর যাকিছু মন্দ, অকল্যাণকর সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা। এ কারণেই মানব জাতি এমন বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হয়েছে, জীবনের উন্নতি লাভের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র লাভ করেছে যা অন্য কোন সৃষ্টি পায়নি। মানুষ উন্নতি লাভ করে ফেরেশতাদের কাতার থেকেও এগিয়ে যেতে পারে। একমাত্র মানুষের মাঝেই এমন গুণ–বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে যে, তার কর্মের জন্য ভাল–মন্দ প্রতিদান রয়েছে। যে কারণে তাদেরকে বুদ্ধি, জ্ঞান এবং চেতনা–উপলব্ধিও দেয়া হয়েছে সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় অধিক, যাতেকরে সাধারণ জীবের স্তরের ঊর্ধ্বে উঠে নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য মোতাবেক কাজে আত্মনিয়োগ করে। আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিশেষ বুদ্ধি, চেতনা ও উপলব্ধিকে এবং দর্শন ও শ্রবণশক্তিকে যেন সেমত কাজে নিয়োগ করে।

এই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি সামনে এসে যাবার পর একজন মানুষের বোঝা, তার দর্শন ও শ্রবণ অন্যান্য জীব–জন্তুর বোঝা, শোনা ও দেখা থেকে ভিন্ন রকম হওয়াই উচিত। মানুষও যদি নিজেদের দর্শন, শ্রবণ ও বিবেচনাশক্তিকে তেমনি কাজে নিয়োগ করে, যেমন কাজে অন্যান্য

জীব-জন্তুরা নিয়োগ করে থাকে এবং মানুষের জন্য মন্দ পরিণতি ও ভবিষ্যৎ ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখা, অমঙ্গল থেকে বেঁচে থাকা, কল্যাণ ও মঙ্গলকর বিষয়কে গ্রহণ করা প্রভৃতি যেসব কাজ নির্ধারিত ছিল, সেগুলোর প্রতি যদি লক্ষ্য না রাখে, তবে বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাকে নির্বোধ বলা হবে, চোখ থাকা সত্ত্বেও তাকে অন্ধ এবং কান থাকা সত্ত্বেও তাকে বধির বলেই আখ্যায়িত করা হবে। সেজন্যই কোরআন করীম অন্যত্র এ ধরনের লোকদিগকে صُمٌّ بُكْمٌ ও عُمْيٌ অর্থাৎ, কানা, বোবা ও অন্ধ বলে আখ্যায়িত করেছে।

এতে একথা বিবৃত করা হয়নি যে, তারা নিজেদের পানাহার, থাকা-পরা ও নিদ্রা-জাগরণ প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজন সম্পর্কেও বোঝে না কিংবা জৈবিক প্রয়োজন সম্পর্কিত বিষয়গুলোও দেখতে বা শোনতে পায় না; বরং স্বয়ং কোরআন-করীম তাদের সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছে- يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ অর্থাৎ, 'তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, কিন্তু আখেরাত সম্পর্কে একান্ত গাফেল'। আর ফেরাউন, হামান এবং তাদের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছে— وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ 'তারা একান্তভাবেই বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল'। কিন্তু তাদের বুদ্ধিমত্তা ও দর্শনক্ষমতার ব্যবহার যেহেতু শুধুমাত্র সে পর্যায়েই সীমিত ছিল, যে পর্যায়ে সাধারণ জীব-জন্তুর থাকে—অর্থাৎ, শুধু পেট ও দেহের সেবা করা, আত্মার সেবা কিংবা তার তৃপ্তি সম্পর্কে কোন কিছুই না ভাবা বা না দেখা—সেহেতু তারা এই বৈষয়িকতা ও সামাজিকতায় যত উন্নতি-অগ্রগতিই লাভ করুক না কেন, চন্দ্র ও মঙ্গলের অভিযানে যত বিজয়ই অর্জন করুক না কেন এবং কৃত্রিম উপগ্রহে সমগ্র নভোমণ্ডলকে ভরে দিক না কেন, কিন্তু এসবই পেট ও শরীরের সেবা, তার চেয়ে অধিক কিছু নয়। আত্মার স্থায়ী শান্তি ও তৃপ্তির জন্য এগুলোতে কিছুই নেই। কাজেই কোরআন তাদেরকে অন্ধ-বধির বলেছে। এ আয়াতে তাদের উপলব্ধি, দর্শন ও শ্রবণকে অস্বীকার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের যা বোঝা বা উপলব্ধি করা উচিত ছিল তারা তা করেনি, যা দেখা উচিত ছিল তা তারা দেখেনি, যাকিছু তাদের শোনা উচিত ছিল তা তারা শোনেনি। আর যাকিছু বুঝেছে, দেখেছে এবং শোনেছে, তা সবই ছিল সাধারণ জীব-জন্তুর পর্যায়ের বোঝা, দেখা ও শোনা, যাতে গাধা-ঘোড়া, গরু-ছাগল সবই সমান।

এ জন্যই উল্লেখিত আয়াতের শেষাংশে এসব লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে— أُولٰٓئِكَ كَالْأَنْعَامِ অর্থাৎ, এরা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারেরই মত, শুধুমাত্র শরীরের বর্তমান কাঠামোর সেবায় নিয়োজিত। খাদ্য আর পেটই হলো তাদের চিন্তার সর্বোচ্চ স্তর। অতঃপর বলা হয়েছে بَلْ هُمْ أَضَلُّ অর্থাৎ, এরা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট। তার কারণ চতুষ্পদ জীব-জানোয়ার শরীয়তের বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত নয়—তাদের জন্য কোন সাজা-শাস্তি কিংবা দান-প্রতিদান নেই। তাদের লক্ষ্য যদি শুধুমাত্র জীবন ও শরীর কাঠামোতে সীমিত থাকে তবেই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষকে যে স্বীয় কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। সে জন্য তাদের সুফল কিংবা শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাজেই এসব বিষয়কেই নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে সাব্যস্ত করে বসা জীব-জন্তুর চেয়েও অধিক নিবুর্দ্ধিতা। তাছাড়া জীব-জানোয়ার নিজের প্রভু ও মালিকের সেবা যথার্থই সম্পাদন করে। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞ না-ফরমান মানুষ স্বীয় মালিক, পরওয়ারদেগারের আনুগত্যে ত্রুটি করতে থাকে। সে কারণে তারা চতুষ্পদ জানোয়ার অপেক্ষা বেশী নির্বোধ ও গাফেল প্রতিপন্ন হয়। কাজেই বলা হয়েছে أُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ অর্থাৎ, এরাই হলো প্রকৃত গাফেল।

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থাৎ, সব উত্তম নাম আল্লাহ্রই জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক।

'আসমায়ে-হুসনা' বা উত্তম নামের বিশ্লেষণ ঃ উত্তম নাম বলতে সে সমস্ত নামকে বোঝানো হয়েছে, যা গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরকে চিহ্নিত করে। বলাবাহুল্য, কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সর্বোচ্চ স্তর যার উর্ধ্বে আর কোন স্তর থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র মহান পালনকর্তা আল্লাহ্ জাল্লা শানাহুর জন্যই নির্দিষ্ট। তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্টির পক্ষে এই স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, যে কোন পূর্ণ ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি পূর্ণতর এবং জ্ঞানী অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হতে পারে। وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ-এর মর্মও তাই। প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে।

সে কারণেই আয়াতে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় যে, এসব আসমায়ে-হুসনা বা উত্তম নামসমূহ একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য লাভ করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়; কাজেই فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থাৎ, — এ বিষয়টি যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কিছু আসমায়ে-হুসনা রয়েছে এবং সে সমস্ত আসমা বা নাম একমাত্র আল্লাহ্র সত্তার সাথেই নির্দিষ্ট, তখন আল্লাহকে যখনই ডাকবে এসব নামে ডাকাই কর্তব্য।

ডাকা কিংবা আহবান করা হলো 'দোয়া' শব্দের অর্থ। আর দোয়া শব্দটি কোরআনে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হল আল্লাহ্র যিকির, প্রশংসা ও তসবীহ্-তাহ্লীলের সাথে যুক্ত। আর অপরটি হল নিজের অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা এবং বিপদাপদ থেকে মুক্তি আর সকল জটিলতার নিরসনকল্পে সাহায্যের আবেদন সম্পর্কিত। এ আয়াতে فَادْعُوْهُ بِهَا শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যাপক। অতএব, আয়াতের মর্ম হল এই যে, হামদ, সানা, গুণ ও প্রশংসাকীর্তন, তসবীহ্-তাহ্লীলের যোগ্যও শুধু তিনিই এবং বিপদাপদে মুক্তি দান আর প্রয়োজন মেটানোও শুধু তাঁরই ক্ষমতায়। কাজেই যদি প্রশংসা বা গুণকীর্তন করতে হয়, তবে তাঁরই করবে আর নিজের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা বিপদমুক্তির জন্য ডাকতে হলে, সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে শুধু তাঁকেই ডাকবে, তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে।

আর ডাকার সে পদ্ধতিও বলে দেয়া হয়েছে যে, এসব আসমায়ে-হুসনা বা উত্তম নামে ডাকবে যা, আল্লাহ্র নাম বলে প্রমাণিত।

দোয়া করার কিছু আদব-কায়দা ঃ এ আয়াতের মাধ্যমে গোটা মুসলিম জাতি দোয়া প্রার্থনার বিষয়ে দু'টি হেদায়েত বা দিকনির্দেশ লাভ করেছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্তাই প্রকৃত হামদ-সানা কিংবা বিপদমুক্তি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ডাকার যোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁকে ডাকার জন্য মানুষ এমন মুক্ত নয় যে, যেকোন শব্দে ইচ্ছা ডাকতে থাকবে, বরং আল্লাহ্ বিশেষ অনুগ্রহপরবশ হয়ে আমাদিগকে সেসব শব্দসমষ্টিও শিখিয়ে দিয়েছেন যা তাঁর মহত্ব ও মর্যাদার উপযোগী। সেই সাথে এ সমস্ত শব্দেই তাঁকে ডাকার জন্য আমাদিগকে বাধ্য করে দিয়েছেন যাতে আমরা নিজের মতে শব্দের পরিবর্তন না করি। কারণ, আল্লাহ্র গুণ-বৈশিষ্ট্যের সব দিক লক্ষ্য রেখে তাঁর মহত্ত্বের উপযোগী শব্দ

চয়ন করতে পারা মানুষের সাধ্যের উর্ধ্বে।

ইমাম বোখারী ও মুসলিম, হযরত আবু হুরায়ারা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলে-করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তাআলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে আয়ত্ত করে নেবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই নিরানব্বইটি নাম সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও হাকেম (রহঃ) সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্র নিরানব্বই নাম পাঠান্তে যে উদ্দেশ্যের জন্যই প্রার্থনা করা হয়, তা কবুল হয়। আল্লাহ্ স্বয়ং ওয়াদা করেছেন – ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ, 'তোমরা যদি আমাকে ডাক, তাহলে আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব।' উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা জটিলতা বা বিপদমুক্তির জন্য দোয়া ছাড়া অন্য কোন পন্থা এমন নেই যাতে কোন না কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না এবং ফললাভ নিশ্চিত হবে। নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা করাতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তদুপরি একটা নগদ লাভ হল এই যে, দোয়া যে একটি এবাদত তার সওয়াব দোয়াকারীর আমলনামায় তখনই লেখা হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত আছে– الدعاء مخ العبادة অর্থাৎ, দোয়া হল এবাদতের মগজ। যে উদ্দেশে মানুষ দোয়া করে অধিকাংশ সময় হুবহু সে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, যে বিষয়টিকে প্রার্থনাকারী নিজের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছিল, তা তার পক্ষে কল্যাণকর নয় বলে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে সে দোয়াকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন, যা তার জন্য একান্ত উপকারী ও কল্যাণকর। আর আল্লাহ্র হামদ ও সানার মাধ্যমে যিকর করা হলো ঈমানের খোরাক। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি মানুষের মহব্বত ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তাতে সামান্য পার্থিব দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হলেও শীঘ্রই সহজ হয়ে যায়।

সেজন্যই বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে লোক চিন্তা-ভাবনা, পেরেশানী কিংবা কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তার পক্ষে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়া উচিত। তাতে সমস্ত জটিলতা সহজ হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এরূপ —।

لا اله الا الله العظيم الحليم - لا اله الا الله رب العرش العظيم - لا اله الا الله رب السموات والارض ورب العرش الكريم -

'মুসতাদরাকে হাকেমে' হযরত আনাস (রাঃ)– এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলে-করীম (সাঃ) হযরত ফাতেমা যাহ্রা (রাঃ)-কে বলেন, আমার ওসীয়তগুলো শুনে নিতে (এবং সেমতে আমল করতে) তোমার বাধা কিসে! সে ওসীয়তটি হল এই যে, সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়াটি পড়ে নেবে—

ياحى ياقيوم برحمتك استغيث اصلح لى شانى
كله ولاتكلنى الى نفسى طرفة عين

এ আয়াতটি সমস্ত মকসূদ ও জটিলতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তুলনাহীন। সারকথা হল এই যে, উল্লেখিত আয়াতের এ বাক্যে উম্মতকে দু'টি হেদায়েত দেয়া হয়েছে। একটি হল এই যে, যেকোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য, যে কোন বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহ্কেই ডাকবে; কোন সৃষ্টিকে নয়। অপরটি হলো এই যে, তাঁকে সে নামেই ডাকবে যা আল্লাহ্ তাআলার নাম হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে; তার শব্দের কোন পরিবর্তন করবে না।

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে– وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْٓ اَسْمَآئِهٖ ۭ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ সেসমস্ত লোকের কথা ছাড়ুন, যারা আল্লাহ্ তাআলার আসমায়ে-হুসনার ব্যাপারে বাঁকা চাল অবলম্বন করে। তারা তাদের কৃত বাঁকামীর প্রতিফল পেয়ে যাবে। অভিধান অনুযায়ী الحاد (এলহাদ) অর্থ ঝুঁকে পড়া এবং মধ্যমপন্থা থেকে সরে পড়া। এ কারণেই বগলী কবরকে لحد বলা হয়। কারণ, তাতেও লাশ মাঝ থেকে সরিয়ে রাখা হয়। কোরআনের পরিভাষায় الحاد বলা হয় কোরআনের সঠিক অর্থ ছেড়ে তাতে এদিক সেদিকের ব্যাখ্যা– বিশ্লেষণ জুড়ে দেয়াকে।

এ আয়াতে রসূলে-করীম (সাঃ)-কে হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, আপনি এমন সব লোকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলুন, যারা আল্লাহ্ তাআলার আসমায়ে হুস্‌নার ব্যাপারে বক্রতা অর্থাৎ, অপব্যাখ্যা ও অপবিশ্লেষণ করে।

আল্লাহ্র নামের বিকৃতি সাধনের নিষেধাজ্ঞা এবং তার কয়েকটি দিক ঃ আল্লাহ্র নামের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির কয়েকটি পন্থাই হতে পারে। আর সে সমস্তই এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমতঃ আল্লাহ্ তাআলার জন্য এমন কোন নাম ব্যবহার করা যা কোরআন-হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত নয়। সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে কারোই এমন কোন অধিকার নেই যে, যে যা ইচ্ছা নাম রাখবে কিংবা যে গুণে ইচ্ছা তাঁর গুণকীর্তন করবে। শুধুমাত্র সে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করাই আবশ্যক যা কোরআন ও সুন্নাহ্তে আল্লাহ্ তাআলার নাম কিংবা গুণবাচক হিসাবে উল্লেখিত রয়েছে। যেমন, আল্লাহ্কে 'করীম' বলা যাবে, কিন্তু 'সখী' বা 'দাতা' বলা যাবে না। 'নূর' বলা যাবে, কিন্তু জ্যোতি বলা যাবে না। 'শাফী' বলা যাবে, কিন্তু 'তবীব' বা 'চিকিৎসক' বলা যাবে না। কারণ, এই দ্বিতীয় শব্দগুলো প্রথম শব্দের সমার্থক হলেও কোরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

ইসলামে বিকৃতি সাধনের দ্বিতীয় পন্থাটি হলো আল্লাহ্র যে সমস্ত নাম কোরআন-হাদীসে উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোন নামকে অশোভন মনে করে বর্জন বা পরিহার করা। এতে সে নামের প্রতি বেআদবী বা অবজ্ঞা প্রদর্শন বুঝা যায়।

কোন লোককে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্ধারিত নামে সম্বোধন করা জায়েয নয় ঃ তৃতীয় পন্থা হলো আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত নাম অন্য কোন লোকের জন্য ব্যবহার করা। তবে এতে এই ব্যাখ্যা রয়েছে যে, আসমায়ে-হুস্‌নাসমূহের মধ্যে কিছু নাম এমনও আছে যেগুলো স্বয়ং কোরআন ও হাদীসে অন্যান্য লোকের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। আর কিছু নাম রয়েছে যেগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারোও জন্য ব্যবহার করার কোন প্রমাণ কোরআন-হাদীসে নেই। যেসব নাম আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সেসব নাম অন্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, রাহীম, রাসীদ, আলী, কারীম, আজীজ প্রভৃতি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো

জন্যে যেসব নামের ব্যবহার কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেগুলো একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্যে এগুলোর ব্যবহার করাই উল্লেখিত 'এলহাদ' তথা বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত এবং না-জায়েয ও হারাম। যেমন, রাহ্মান, সুব্হান, রায্যাক, খালেক, গাফ্ফার, কুদ্দুস প্রভৃতি।

তদুপরি এই নির্দিষ্ট নামগুলো যদি আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো ক্ষেত্রে কোন ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয় যে, যাকে এসব শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হচ্ছে তাকেই যদি খালেক কিংবা রায্যাক মনে করা হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণ কুফর। আর বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত না হয়, শুধুমাত্র অমনোযোগিতা কিংবা না বোঝার দরুন কাউকে খালেক, রায্যাক, রাহ্মান কিংবা সুব্হান বলে ডেকে থাকে, তাহলে তা যদিও কুফর নয়, কিন্তু শেরেকী সুলভ শব্দ হওয়ার কারণে কঠিন পাপের কাজ বটে।

উল্লেখিত আয়াত সমূহের সারমর্ম এই যে, তাদের হঠকারিতা এবং সত্য গ্রহণে অনীহার দরুন তিনি যেন মনঃক্ষুণ্ণ না হন। কারণ, সত্য বিষয়টি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে পৌছে দেয়াই ছিল তাঁর নির্ধারিত দায়িত্ব। তা তিনি সম্পাদনও করেছেন। তাঁর উপর অর্পিত দায়-দায়িত্বও শেষ হয়ে গেছে। এখন কারও মানা না মানার ব্যাপারটি হল একান্ত ভাগ্যসংক্রান্ত। এতে তাঁর কোন হাত নেই। সুতরাং তিনি কেন দুঃখিত হবেন!

এ সূরার বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে তিনটি বিষয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (এক) তওহীদ। (দুই) রেসালত। (তিন) আখেরাত। আর এই তিনটি বিষয়ই ঈমান ও ইসলামের মূলভিত্তি। এগুলোর মধ্যে তওহীদ ও রেসালতের বিষয় পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। উল্লেখিত অয়াতগুলোর মধ্যে শেষ দু'টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে আখেরাত ও কেয়ামত সংক্রান্ত বিষয়। এগুলো নাযিলের পেছনে বিশেষ একটি ঘটনা কার্যকর ছিল। তাই তফসীরে ইমাম ইবনে জরীর (রহঃ) এবং আবদ ইবনে হুমাইদ (রহঃ) হযরত কাতাদা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কোরাইশরা হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর নিকট ঠাট্টা ও বিদ্রূপচ্ছলে জিজ্ঞেস করল যে, আপনি কেয়ামত আগমনের সংবাদ দিয়ে মানুষকে এ ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন,—এ ব্যাপারে যদি আপনি সত্য হয়ে থাকেন, তবে নির্দিষ্ট করে বলুন, কেয়ামত কোন সালের কত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে আমরা তা আসার আগেই তৈরী হয়ে যেতে পারি। আপনার এবং আমাদের মাঝে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক বিদ্যমান তার দাবীও তাই। আর যদি সাধারণ লোকদিগকে বিষয়টি আপনি বলতে না চান, তবে অন্ততঃ আমাদেরকে বলে দিন। এ ঘটনার ভিত্তিতেই নাযিল হয় يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ আয়াতটি।

এখানে উল্লেখিত ساعة শব্দটি আরবী ভাষায় সামান্য সময় বা মুহূর্তকে বলা হয়। আভিধানিকভাবে যার কোন বিশেষ পরিসীমা নেই। আর গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদদের পরিভাষায় রাত ও দিনের চব্বিশ অংশের এক অংশকে বলা হয় ساعة (সাআত), যাকে বাংলায় ঘন্টা নামে অভিহিত করা হয়। কোরআনের পরিভাষায় এ শব্দটি সে দিবসকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা হবে সমগ্র সৃষ্টির মৃত্যুদিবস এবং সেদিনকেও বলা হয় যাতে সমগ্র সৃষ্টি পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত হবে। أَيَّانَ (আইয়্যানা) অর্থ কবে। আর مُرْسَاهَا (মুরসা) অর্থ অনুষ্ঠিত কিংবা স্থাপিত হওয়া।

لَا يُجَلِّيهَا শব্দটি تجلية থেকে গঠিত। এর অর্থ প্রকাশিত এবং খোলা। بَغْتَةً (বাগ্তাতান) অর্থ অকস্মাৎ। حَفِيٌّ (হাফিয়্যুন) অর্থ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, জ্ঞানী ও অবহিত ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে এমন লোককে 'হাফী' বলা হয়, যে প্রশ্ন করে বিষয়ের পরিপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করে নিতে পারে।

কাজেই আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, এরা আপনার নিকট কেয়ামত সম্পর্ক প্রশ্ন করে যে, তা কবে আসবে? আপনি তাদেরকে বলে দিন, এর নির্দিষ্টতার জ্ঞান শুধুমাত্র আমার পালনকর্তারই রয়েছে। এ ব্যাপারে পূর্ব থেকে কারও জানা নেই এবং সঠিক সময়ও কেউ জানতে পারবে না। নির্ধারিত সময়টি যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, ঠিক তখনই আল্লাহ্ তাআলা তা প্রকাশ করে দেবেন। এতে কোন মাধ্যম থাকবে না। কেয়ামতের ঘটনাটি আসমান ও যমীনের জন্যও একান্ত ভয়ানক ঘটনা হবে। সেগুলোও টুকরো টুকরো হয়ে উড়তে থাকবে। সুতরাং এহেন ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব থেকে প্রকাশ না করাই বিচক্ষণতার তাকাদা। তা না হলে যারা বিশ্বাসী তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত এবং যারা অবিশ্বাসী মুনকের তারা অধিকতর ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুযোগ পেয়ে যেত। সেজন্যই বলা হয়েছে لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً অর্থাৎ, কেয়ামত তোমাদের নিকট আকস্মিকভাবেই এসে উপস্থিত হবে।

বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) কেয়ামতের আকস্মিক আগমন সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষ নিজ নিজ কাজে পরিব্যস্ত থাকবে। এক লোক খরিদদারকে দেখাবার উদ্দেশে কাপড়ের থান খুলে সামনে ধরে থাকবে, সে (সওদাগর) এ বিষয়টিও সাব্যস্ত করতে পারবে না, এরই মধ্যে কেয়ামত এসে যাবে। এক লোক তার উটনীর দুধ দুইয়ে নিয়ে যেতে থাকবে এবং তখনও তা ব্যবহার করতে পারবে না, এরই মধ্যে কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ নিজের হাউজ মেরামত করতে থাকবে-তা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ হয় তো খাবার লোকমা হাতে তুলে নেবে, তা মুখে দেবার পূর্বেই কেয়ামত হয়ে যাবে।—(রূহুল-মা'আনী)

যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুর তারিখ ও সময়-ক্ষণ অনির্দিষ্ট ও গোপন রাখার মাঝে বিরাট তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, তেমনিভাবে কেয়ামতকেও-যা সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যুরই নামান্তর, তাকে গোপন এবং অনির্দিষ্ট রাখার মধ্যেও বিপুল রহস্য ও তাৎপর্য বিদ্যমান। তা না হলে একে তো এতেই বিশ্বাসীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে এবং পার্থিব যাবতীয় কাজকর্ম অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, তদুপরি অবিশ্বাসীরা সুদীর্ঘ সময়ের কথা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুযোগ পাবে এবং তাদের ঔদ্ধত্য অধিকতর বৃদ্ধি পাবে।

সেজন্যই হেকমত ও বিচক্ষণতার তাগিদে তার তারিখ বা দিন-ক্ষণকে অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে, যাতেকরে মানুষ তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সদা ভীত থাকে। আর এ ভয়ই মানুষকে অপরাধপ্রবণতা থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাধিক কার্যকর পন্থা। সুতরাং উক্ত আয়াতগুলোতে এ জ্ঞানই দেয়া হয়েছে যে, কোন একদিন কেয়ামতের আগমন ঘটবে, আল্লাহ্র সমীপে সবারই উপস্থিত হতে হবে এবং তাদের সারা জীবনের ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সমস্ত কার্যকলাপের নিকাশ নেয়া হবে। যার ফলে হয় জান্নাতের অকল্পনীয় ও অনন্ত নেয়ামতরাজি লাভ হবে অথবা জাহান্নামের সেই কঠিন ও দুর্বিষহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে, যার কল্পনা

করতেও পিত্ত পানি হয়ে যেতে থাকবে। যখন কারও বিশ্বাস ও প্রত্যয় থাকবে, তখন কোন বুদ্ধিমানের কাজ এমন হওয়া উচিত নয় যে, আমলের অবকাশকে এমন বিতর্কের মাঝে নষ্ট করবে যে, এ ঘটনা কবে কখন সংঘটিত হবে। বরং বুদ্ধিমত্তার সঠিক দাবী হল বয়সের অবকাশকে গনীমত মনে করে সে দিবসের জন্য তৈরী হওয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকা এবং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের নির্দেশ লংঘন করতে গিয়ে এমনভাবে ভয় করা, যেমন আগুনকে ভয় করা হয়।

আয়াতের শেষাংশে পুনরায় তাদের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে ঃ يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا প্রথম প্রশ্নটি ছিল এ প্রসঙ্গে যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যখন সংঘটিত হবেই তখন আমাদিগকে তার যথাযথ ও সঠিক তারিখ, দিন-ক্ষণ ও সময় সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। তারই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, এ প্রশ্নটি একান্ত নির্বুদ্ধিতা ও বোকামিপ্রসূত। পক্ষান্তরে বুদ্ধিমত্তার দাবী হল এর নির্দিষ্টতা সম্পর্কে কাউকে অবহিত না করা, যাতে প্রত্যেক আমলকারী প্রতি মুহূর্তে আখেরাতের আযাবের ভয় করে নেক আমল অবলম্বন করার এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়।

আর এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল তাদের একথা বোঝা যে, মহানবী (সাঃ) অবশ্যই কেয়ামতের তারিখ ও সময়-ক্ষণ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে এ বিষয়ে অবশ্যই তিনি জ্ঞান লাভ করে নিয়েছেন, কিন্তু তিনি কোন বিশেষ কারণে সেকথা বলছেন না। সেজন্যই নিজ আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তারা তাঁকে প্রশ্ন করল যে, আমাদিগকে কেয়ামতের পরিপূর্ণ সন্ধান দিয়ে দিন। এ প্রশ্নের উত্তরে এরশাদ হয়েছে قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ অর্থাৎ, আপনি লোকদিগকে বলে দিন যে, প্রকৃতপক্ষে কেয়ামতের সঠিক তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া তাঁর কোন ফেরেশতা কিংবা নবী-রসূলগণেরও জানা নেই। কিন্তু এ বিষয়টি অনেকেই জানে না যে, বহু জ্ঞান আল্লাহ শুধুমাত্র নিজের জন্যই সংরক্ষণ করেন যা কোন ফেরেশতা কিংবা নবী-রসূল পর্যন্ত জানতে পারেন না। মানুষ নিজেদের মূর্খতাবশতঃ মনে করে যে, কেয়ামত অনুষ্ঠানের তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান নবী কিংবা রসূল হওয়ার জন্য অপরিহার্য। এরই ভিত্তিতে তারা এই প্রেক্ষিত আবিষ্কার করে যে, মহানবী (সাঃ)-এর যখন এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ এলেম নেই, কাজেই এটা তাঁর নবী না হওয়ারই লক্ষণ-(নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু উপরোল্লেখিত আলোচনায় জানা গেছে যে, এ ধরনের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

সারকথা হল এই যে, যারা এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে, তারা বড়ই বোকা, নির্বোধ ও অজ্ঞ। না এরা বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত, না জানে তার অন্তর্নিহিত রহস্য ও প্রশ্ন করার পদ্ধতি।

তবে হাঁ, মহানবী (সাঃ)-কে কেয়ামতের কিছু নিদর্শন ও লক্ষণাদি সম্পর্কিত জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর তাহল এই যে, এখন তা নিকটবর্তী। এ বিষয়টি মহানবী (সাঃ) বহু বিশুদ্ধ হাদীসে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে-''আমার আবির্ভাব এবং কেয়ামত এমনভাবে মিশে আছে, যেমন মিশে থাকে হাতের দু'টি আঙ্গুল।—(তিরমিযী)

কোন কোন ইসলামী কিতাবে পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর হয়েছে বলে যে কথা বলা হয়েছে, তা হুযূর আকরাম (সাঃ)-এর কোন হাদীস নয়; বরং তা ইসরাঈলী মিথ্যা রেওয়ায়েত থেকে নেয়া বিষয়।

ভূমণ্ডল বিষয়ক পণ্ডিতগণ আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বছর হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কোরআনের কোন আয়াত কিংবা কোন বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে এ নতুন গবেষণার কোন বিরোধ ঘটে না। ইসলামী রেওয়ায়েতসমূহে এহেন অলীক রেওয়ায়েত ঢুকিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যই হয় তো ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষের মনে কু-ধারণা সৃষ্টি করা, যার খণ্ডন স্বয়ং বিশুদ্ধ হাদীসেও বিদ্যমান রয়েছে। বিশুদ্ধ এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং উম্মতকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন যে, ''পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় তোমাদের উদাহরণ এমন যেন এক কালো বলদের গায়ে একটা সাদা লোম।'' এতে যে কেউ অনুমান করতে পারে যে, হুযূর (সাঃ)-এর দৃষ্টিতেও পৃথিবীর বয়স এত দীর্ঘ, যার অনুমান করাও কঠিন। সে কারণেই হাফেয ইবনে হাযেম উন্দুলুসী বলেছেন যে, আমাদের বিশ্বাস, দুনিয়ার বয়স সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা করা যায় না; তার সঠিক জ্ঞান শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তারই রয়েছে।—(মুরাগী)

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاۤءَ اللّٰهُ ۗوَلَوْ
كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛوَمَا مَسَّنِيَ
السُّوْۤءُ ۛاِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٨﴾ هُوَ الَّذِيْ
خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ
فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚفَلَمَّآ اَثْقَلَتْ
دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَىِٕنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٨٩﴾
فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَاۤءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚفَتَعٰلَى اللّٰهُ
عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩٠﴾ اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿١٩١﴾
وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٢﴾ وَاِنْ
تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ۗسَوَاۤءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ
اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ﴿١٩٣﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿١٩٤﴾ اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ ۖاَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ
بِهَآ ۖاَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ ۖاَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ
بِهَا ۗقُلِ ادْعُوْا شُرَكَاۤءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿١٩٥﴾

(১৮৮) আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ্ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতিপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য। (১৮৯) তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে ; আর তার থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল, তখন, সে গর্ভবতী হল। অতি হালকা গর্ভ। সে তাই নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল। তারপর যখন বোঝা হয়ে গেল, তখন উভয়েই আল্লাহ্কে ডাকল যিনি তাদের পালনকর্তা যে, তুমি যদি আমাদিগকে সুস্থ ও ভাল দান কর তবে আমরা তোমার শুকরিয়া আদায় করব। (১৯০) অতঃপর তাদেরকে যখন সুস্থ ও ভাল দান করা হল, তখন দানকৃত বিষয়ে তাঁর অংশীদার তৈরী করতে লাগল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাদের শরীক সাব্যস্ত করা থেকে বহু উর্ধ্বে। (১৯১) তারা কি এমন কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে যে একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি, বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (১৯২) আর তারা না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজের সাহায্য করতে পারে। (১৯৩) আর তোমরা যদি তাদেরকে আহবান কর সুপথের দিকে, তবে তারা তোমাদের আহবান অনুযায়ী চলবে না। তাদেরকে আহবান জানানো কিংবা নীরব থাকা উভয়টিই তোমাদের জন্য সমান। (১৯৪) আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা সবাই তোমাদের মতই বান্দা। অতএব, তোমরা যখন তাদেরকে ডাক, তখন তাদের পক্ষেও তো তোমাদের সে ডাক কবুল করা উচিত–যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক? (১৯৫) তাদের কি পা আছে, যদ্দ্বারা তারা চলাফেরা করে, কিংবা তাদের কি হাত আছে, যদ্দ্বারা তারা ধরে। অথবা তাদের কি চোখ আছে যদ্দ্বারা তারা দেখতে পায় কিংবা তাদের কি কান আছে যদ্দ্বারা তারা শুনতে পায়? বলে দাও, তোমরা ডাক তোমাদের অংশীদারদিগকে, অতঃপর আমার অমঙ্গল কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে মুশরিক ও সাধারণ মানুষের সেই ভ্রান্ত আকীদার খণ্ডন করা হয়েছে; যা তারা নবী-রসূলগণের ব্যাপারে পোষণ করত যে, তাঁরা গায়েবী বিষয়েও অবগত রয়েছেন। তাঁদের জ্ঞানও আল্লাহ্র মতই সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যপ্ত এবং তাঁরা কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। যাকে ইচ্ছা কল্যাণ দান কিংবা যার জন্য ইচ্ছা অকল্যাণ করার ক্ষমতাও তাদেরই হাতে।

এ আয়াতে তাদের এই শেরেকী আকীদার খণ্ডন উপলক্ষে বলা হয়েছে যে, এলমে-গায়ব এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ব্যাপক এলেম শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই রয়েছে। এটা তাঁরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে কোন সৃষ্টিকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, তা ফেরেশতাই হোক আর নবী ও রসূলগণই হোক, শেরেকী এবং মহাপাপ। তেমনিভাবে প্রত্যেক লাভ-ক্ষতি কিংবা মঙ্গলামঙ্গলের মালিক হওয়াও এককভাবে আল্লাহ তাআলারই গুণ। এতে কাউকে অংশীদার দাঁড় করানোও শেরেকী। বস্তুতঃ এই শেরেকী বা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাথে কোন অংশীদারিত্বের আকীদাকে খণ্ডন করার জন্যই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর আবির্ভাব ঘটেছে।

কোরআনে করীম তার অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়টি একান্ত প্রকৃষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছে। এরশাদ হয়েছে, এলমে-গায়ব এবং ব্যাপক জ্ঞান, যে জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই একক গুণ। তেমনি সাধারণ ক্ষমতা, অর্থাৎ—যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ, লাভ-লোকসান সবই যার অন্তর্ভুক্ত—তাও আল্লাহ্র একক গুণ। এতে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা শেরক।

এ আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে; আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমি নিজের লাভ-ক্ষতিরও মালিক নই—অন্যের লাভ-ক্ষতি তো দূরের কথা!

এভাবে তিনি যেন একথাও ঘোষণা করে দেন যে, আমি আলেমে-গায়ব নই যে, যাবতীয় পূর্ণ জ্ঞান আমার থাকা অনিবার্য হবে। তাছাড়া আমার যদি গায়বী জ্ঞান থাকতই, তবে আমি প্রত্যেকটি লাভজনক বস্তুই হাসিল করে নিতাম, কোন একটি লাভও আমার হাতছাড়া হতে পারত না। আর প্রতিটি ক্ষতিকর বিষয় থেকে সর্বদা রক্ষিত থাকতাম। কখনও কোন ক্ষতি আমার ধারে-কাছে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত না। অথচ এতদুভয় বিষয়ের কোনটিই বাস্তব নয়। বহু বিষয় রয়েছে যা রসূলে করীম (সাঃ) আয়ত্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা করতে পারেননি। তাছাড়া বহু দুঃখ-কষ্ট রয়েছে যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে পতিত হতে হয়েছে। হুদায়রিয়ার সন্ধির সময় হুযুর (সাঃ) এহরাম বেঁধে সাহাবায়ে-কেরামের সাথে ওমরা করার উদ্দেশে হেরেমের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে যান, কিন্তু হেরেম শরীফে প্রবেশ কিংবা ওমরা করা তখনও সম্ভব হতে পারেনি; সবাইকে এহরাম খুলে ফিরে আসতে হয়েছে।

তেমনিভাবে ওহুদ যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) আহত হন এবং মুসলমানদেরকে সাময়িক পরাজয় বরণ করতে হয়। এমনি আরও বহু অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যা মহানবী (সাঃ)-এর জীবনে সংঘটিত হয়েছে।

আর এমনসব ঘটনা প্রকাশের উদ্দেশ্যও হয় তো এই ছিল যাতে

إِنَّ وَلِـِّۧيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا
أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٧﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ
وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ
بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ
الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ
اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم
مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾
وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ
مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَ
رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا
لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ
تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ
وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾

(১৯৬) আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ্, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুতঃ তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের। (১৯৭) আর তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা না তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে, না নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারবে। (১৯৮) আর তুমি যদি তাদেরকে সুপথে আহবান কর, তবে তারা তা কিছুই শুনবে না। আর তুমি তো তাদের দেখছই, তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। (১৯৯) আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে থেকে দূরে সরে থাক।(২০০)আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহ্র শরণাপন্ন হও। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (২০১) যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে।(২০২)পক্ষান্তরে যারা শয়তানের ভাই, তাদেরকে সে ক্রমাগত পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর তাতে কোন কমতি করে না। (২০৩) আর যখন আপনি তাদের নিকট কোন নিদর্শন নিয়ে না যান, তখন তারা বলে, আপনি নিজের পক্ষ থেকে কেন অমুকটি নিয়ে আসলেন না, তখন আপনি বলে দিন, আমি তো সে মতেই চলি যে হুকুম আমার নিকট আসে আমার পরওয়ারদেগারের কাছ থেকে। এটা ভাববার বিষয় তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং হেদায়েত ও রহমত সেসব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে। (২০৪) আর যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়। (২০৫) আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চীৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বে-খবর থেকো না। (২০৬) নিশ্চয়ই যারা তোমার পরওয়ারদেগারের সান্নিধ্যে রয়েছেন, তারা তাঁর বন্দেগীর ব্যাপারে অহঙ্কার করেন না এবং স্মরণ করেন তাঁর পবিত্র সত্তাকে; আর তাঁকেই সেজদা করেন।

মানুষের সামনে কার্যতঃ একথা স্পষ্ট করে দেয়া যায় যে, নবী-রসূলগণ আল্লাহ্ তাআলার নিকট সবচেয়ে বেশী উত্তম ও প্রিয় সৃষ্টি, কিন্তু তবুও তাঁরা খোদায়ী জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী নন। এভাবে সুস্পষ্ট করে দেয়ার উদ্দেশ্যও এই, যাতে মানুষ এমন কোন বিভ্রান্তিতে পতিত না হয় যে, নবী-রসূলগণ খোদায়ী গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী। যেমন, ইহুদী-খ্রীষ্টানরা এমনিভাবে নিজেদের রসূলগণ সম্পর্কে খোদায়ী গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার বিশ্বাস করে শেরক ও কুফরে পতিত হয়েছিল।

এ আয়াত একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নবী-রসূলগণ সর্বশক্তিমানও নন এবং এলমে-গায়বেরও মালিক নন, বরং তাঁরা জ্ঞান ও কুদরতের ততটুকুরই অধিকারী হয়েছিলেন, যতটা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁদেরকে নিজের পক্ষ থেকে দান করেছিলেন।

অবশ্য এতে কোন রকম সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই যে, তাঁদেরকে জ্ঞানের যতটা অংশ দান করা হয়েছে, তা সমগ্র সৃষ্টির সমষ্টিগত জ্ঞানের চাইতেও বহু বেশী। বিশেষ করে আমাদের রসূলে করীম (সাঃ)-কে তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র সৃষ্টির সমপরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে। অর্থাৎ, সমস্ত নবী-রসূলগণকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে সে সমুদয় এবং তার চেয়েও বহুগুণ বেশী জ্ঞান দান করা হয়েছিল। আর এই দানকৃত জ্ঞান অনুযায়ী তিনি শত-সহস্র গোপন বা সাধারণভাবে অজানা বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, যার সত্যতা সম্পর্কে সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে বলা যেতে পারে যে, রসূলে করীম (সাঃ)-কে লক্ষ লক্ষ গায়বী বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। কিন্তু একে কোরআনের পরিভাষায় এলমে গায়ব বলা হয় না। কাজেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জ্ঞানকে 'এলমে-গায়ব' বলা যেতে পারে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ وَلِـِّۧيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ

এখানে 'ওলী' অর্থ রক্ষাকারী; সাহায্যকারী। আর 'কিতাব' অর্থ কোরআন। সালেহীন' অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ভাষায় সে সমস্ত লোক, যাঁরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে সমান করে না। এতে নবী-রসূল থেকে শুরু করে সাধারণ সৎকর্মশীল মুসলমান পর্যন্ত সবাই অন্তর্ভুক্ত।

বস্তুতঃ আয়াতের অর্থ হল এই যে, তোমাদের বিরোধিতার কোন ভয় আমার এ কারণেই নেই যে, আমার রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ্, যিনি আমার উপর কোরআন অবতীর্ণ করেছেন।

এখানে আল্লাহ্ তাআলার সমস্ত গুণাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে কোরআন অবতীর্ণ করার গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, তোমরা যে আমার শত্রুতা ও বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়ে আছ তার কারণ হচ্ছে যে, আমি তোমাদেরকে কোরআনের শিক্ষা দেই এবং কোরআনের প্রতি আহবান করি। কাজেই যিনি আমার উপর কোরআন নাযিল করেছেন তিনিই আমার সাহায্যদাতা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আমার কি চিন্তা?

অতঃপর আয়াতের শেষ বাক্যটিতে একটি সাধারণ নিয়ম বাতলে দেয়া হয়েছে যে, নবী-রসূলগণের মর্যাদা তো বহু ঊর্ধ্বে, সাধারণ সৎ মুসলমানদের জন্যও আল্লাহ্ সহায় ও রক্ষাকারী। তিনি তাদের সাহায্য

করেন বলেই কোন শত্রুর শত্রুতা তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। অধিকাংশ সময় এ পৃথিবীতেই তাদেরকে শত্রুর উপর জয়ী করে দেয়া হয়। আর যদি কখনও কোন বিশেষ তাৎপর্যের কারণে তাৎক্ষণিক বিজয় দান করা নাও হয়, তাতে বিজয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তারা বাহ্যিক অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কৃতকার্য হয়ে থাকেন। কারণ, সৎকর্মশীল মুমিনের প্রতিটি কাজ হয় আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাঁর আনুগত্যের জন্য। কাজেই তারা যদি কোন কারণে পার্থিবজীবনে অকৃতকার্যও হয়, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য লাভে কৃতকার্য হয়ে থাকে। বস্তুতঃ এটাই হল সত্যিকার কৃতকার্যতা।

কোরআনী চরিত্রের একটি ব্যাপক হেদায়েতনামাঃ আলোচ্য আয়াতগুলো কোরআনী চরিত্র দর্শনের এক অনন্য ও ব্যাপক হেদায়েতনামাস্বরূপ। এর মাধ্যমে রসূলে করীম (সাঃ)-কে প্রশিক্ষণ দান করে তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির মাঝে 'মহান চরিত্রবান' খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইসলামের শত্রুদের মন্দ চাল-চালন, হঠকারিতা ও অসচ্চরিত্রতার আলোচনার পর আলোচ্য এই আয়াতগুলোতে তার বিপরীতে মহানবী (সাঃ)-কে সর্বোত্তম চরিত্রের হেদায়েত দেয়া হয়েছে। তাতে তিনটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য خُذِ الْعَفْوَ আরবী অভিধান মোতাবেক عفو (আফবুন)-এর অর্থ একাধিক হতে পারে এবং একত্রে সব ক'টি অর্থই প্রযোজ্য হতে পারে। সে কারণেই তফসীরবিদ আলেমগণের বিভিন্ন দল বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ তফসীরকার যে অর্থ নিয়েছেন তাহল এই যে, عفو বলা হয় এমন প্রত্যেকটি কাজকে, যা সহজে কোন রকম আয়াস ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে। তাহলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপনি এমন বিষয় গ্রহণ করে নিন, যা মানুষ অনায়াসে করতে পারে। অর্থাৎ, শরীয়ত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে আপনি সাধারণ মানুষের কাছে সুউচ্চমান দাবী করবেন না; বরং তারা সহজে যে পরিমাণ আমল করতে পারে আপনি তাই গ্রহণ করে নিন। যেমন, নামাযের প্রকৃত রূপ হচ্ছে এই যে, বান্দা সমগ্র দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ও একাগ্র হয়ে আপন পালনকর্তার সামনে হাত বেঁধে এমনভাবে দাঁড়াবে যেন আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনার মাধ্যমে নিজের আবেদনসমূহ কোন প্রকার মাধ্যম ব্যতীত তাঁর দরবারে সরাসরি পেশ করছে। তখন সে যেন সরাসরি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাথে কথোপকথন করছে। এজন্য যে বিনয়, নম্রতা, রীতি-পদ্ধতি ও সম্মানবোধের প্রয়োজন, তা যে লাখো নামাযীর মধ্যে বিরল বান্দাদের ভাগ্যেই জোটে, তা বলাই বাহুল্য। সাধারণ মানুষ এ স্তর লাভ করতে পারে না। অতএব, এ আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আপনি সেসব লোকদের কাছে এমন সুউচ্চ স্তরের প্রত্যাশাই করবেন না ; বরং যে স্তর তারা সহজে ও অনায়াসে লাভ করতে পারে তাই গ্রহণ করে নিন। তেমনিভাবে অন্যান্য এবাদত-যাকাত, রোযা, হজ্ব এবং সাধারণ আচার-আচরণ ও সামাজিক ব্যাপারে শরীয়ত নির্ধারিত কর্তব্যসমূহ যারা পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারে না, তাদের কাছ থেকে সেটুকুই কবুল করে নেয়া বাঞ্ছনীয়, যা তারা অনায়াসে করতে পারে।

সহীহ্ বোখারী শরীফেও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়র (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে উল্লেখিত আয়াতের এই অর্থই বর্ণনা করা হয়েছে।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াতটি নাযিল হলে হুযুর (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্ আমাকে মানুষের আমল-আখলাকের ব্যাপারে সাধারণ আনুগত্য কবুল করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছি যে, যে পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে থাকব এমনি করব।—(ইবনে-কাসীর)

তফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের এক বিরাট জামাত—হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়র, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং মুজাহিদ প্রমুখও এ বাক্যটির উল্লেখিত অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

عفو এর অপর অর্থ ক্ষমা করা এবং অব্যাহতি দেয়াও হয়ে থাকে। তফসীরকার আলেমগণের এক দল এ ক্ষেত্রে এ অর্থেই বাক্যটির মর্ম সাব্যস্ত করেছেন এই যে, আপনি পাপী-তাপীদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন।

তফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে-জরীর (রহঃ) উদ্ধৃত করেছেন যে, এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন মহানবী (সাঃ) হযরত জিবরাঈল-আমীনকে এর মর্ম জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে জেনে নিয়ে মহানবী (সাঃ)-কে জানান যে, কেউ যদি আপনার প্রতি অন্যায়-অবিচার করে, তবে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। যে আপনাকে কিছুই দেয় না, তাকে আপনি দান করুন এবং যে আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনি তার সাথেও মেলামেশা করুন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে মারদুবিয়া (রহঃ) সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, গযওয়ায়ে-ওহুদের সময় যখন হুযুর (সাঃ)-এর চাচা হযরত হামযা (রাঃ)-কে শহীদ করা হয় এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর শরীরের অংগ-প্রত্যঙ্গ কেটে লাশের প্রতি চরম অসম্মানজনক আচরণ করা হয়, তখন মহানবী (সাঃ) লাশটিকে সে অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, যারা হামযা (রাঃ)-এর সাথে এহেন আচরণ করেছে, আমি তাদের সত্তর জনের সাথে এমনি আচরণ করে ছাড়ব। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এতে হুযুর (সাঃ)-কে বাতলে দেয়া হয় যে, এটা আপনার মর্যাদাসম্পন্ন নয়; বরং আপনার মর্যাদার উপযোগী হলো ক্ষমা ও অব্যাহতি দান করা।

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ – معروف অর্থে عرف বলা হয় যে কোন ভাল ও প্রশংসনীয় কাজকে। অর্থাৎ, যেসব লোক আপনার সাথে মন্দ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে, আপনি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না ; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে সৎকাজেরও উপদেশ দিতে থাকুন। অর্থাৎ, অসদাচরণের বিনিময় সদাচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ন্যায়নীতির মাধ্যমেই নয়; বরং অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করুন।

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ -এর অর্থ হল এই যে, যারা জাহেল বা মূর্খ তাদের কাছ থেকে আপনি দূরে সরে থাকুন। মর্মার্থ এই যে, আপনি অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের সাথে কল্যাণকর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করুন এবং একান্ত কোমলতার সাথে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের বিষয় বাতলে দিন। কিন্তু বহু মূর্খ এমনও থাকে যারা এহেন ভদ্রোচিত আচরণে প্রভাবিত হয় না ; বরং এমতাবস্থায়ও তারা মূর্খজনোচিত রূঢ় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। এমন ধরনের লোকদের সাথে আপনার আচরণ হবে

এই যে, তাদের হৃদয়বিদারক মূর্খ-জনোচিত কথা-বার্তায় দুঃখিত হয়ে তাদেরই মত ব্যবহার আপনিও করবেন না; বরং তাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন।

তফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে-কাসীর (রহঃ) বলেন যে, দূরে সরে থাকার অর্থও মন্দের প্রত্যুত্তরে মন্দ ব্যবহার না করা। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের হেদায়েত করাও বর্জণ করতে হবে। কারণ, এটা রেসালত ও নবুওয়তের দায়িত্ব এবং মর্যাদার যোগ্য নয়।

সহীহ্ বোখারীতে এক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত ফারুকে আ'যম (রাঃ)-এর খেলাফত আমলে উয়াইনাহ্ ইবনে হিসন একবার মদীনায় আসে এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুর-ইবনে কায়সের মেহমান হয়। হুর-ইবনে কায়স ছিলেন সে সমস্ত বিজ্ঞ আলেমদের একজন যাঁরা হযরত ফারুকে আযম (রাঃ)-এর পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করতেন। উয়াইনাহ্ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুরকে বলল, তুমি তো আমীরুল-মু'মিনীনের একজন অতি ঘনিষ্ঠ লোক; আমার জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাতের একটা সময় নিয়ে এসো। হুর ইবনে-কায়স (রাঃ) ফারুকে আযম (রাঃ)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমার চাচা উয়াইনাহ্ আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চান। তখন তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন।

কিন্তু উয়াইনাহ্ ফারুকে আযম (রাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েই একান্ত অমার্জিত ও ভ্রান্ত কথাবার্তা বলতে লাগল যে, "আপনি আমাদেরকে না দেন আমাদের ন্যায্য অধিকার, না করেন আমাদের সাথে ন্যায় ও ইনসাফের আচরণ।" হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) তাঁর এসব কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে হুর ইবনে-কায়স নিবেদন করলেন, ইয়া আমীরাল-মু'মিনীন, "আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন- خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ আর এ লোকটিও জাহেলদের একজন।" এই আয়াতটি শোনার সাথে সাথে হযরত ফারুকে আযম (রাঃ)-এর সমস্ত রাগ শেষ হয়ে গেল এবং তাকে কোন কিছুই বললেন না। হযরত ফারুকে আযম (রাঃ)-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল যে, كان وقافا عند كتاب الله عزوجل অর্থাৎ, আল্লাহ্র কিতাবে বর্ণিত হুকুমের সামনে তিনি ছিলেন উৎসর্গিতপ্রাণ।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ, আপনার মনে যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন ওস্ওসা আসতে আরম্ভ করে, তখন সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। তিনি শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত।

প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের উপসংহার। কারণ, এতে হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, যারা অত্যাচার-উৎপীড়ন করে এবং মূর্খজনোচিত ব্যবহার করে, তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। তাদের মন্দের উত্তর মন্দের দ্বারা দেবেন না। এ বিষয়টি মানব প্রকৃতির পক্ষে একান্তই কঠিন। বিশেষতঃ এমন পরিস্থিতিতে সৎ এবং ভাল মানুষদেরকেও শয়তান রাগান্বিত করে লড়াই-ঝগড়ায় প্রবৃত্ত করেই ছাড়ে। সে জন্যই পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, যদি এহেন মুহূর্তে রোষানল জ্বলে উঠতে দেখা যায়, তবে বোঝবেন শয়তানের পক্ষ থেকেই এমনটি হচ্ছে এবং তার প্রতিকার হল আল্লাহ্র নিকট পানা-চাওয়া, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, দু'জন লোক মহানবী (সাঃ)-এর সামনে ঝগড়া-বিবাদ করছিল। এদের একজন রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলে হুযূর (সাঃ) বললেন, "আমি একটি বাক্য জানি, যদি এ লোকটি সে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহলে তার এই উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে। তারপর বললেন, বাক্যটি হল এই اعوذ بالله من الشيطٰن الرجيم - সে লোক হুযুর (সাঃ)-এর নিকট শোনে সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটি উচ্চারণ করল। তাতে সাথে সাথে তার রোষানল প্রশমিত হয়ে গেল।

هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ, এই কোরআন তোমাদের পরওয়ার-দেগারের পক্ষ থেকে আগত বহুবিধ দলীল-প্রমাণ ও মু'জেযার এক সমাহার। এতে সামান্য লক্ষ্য করলেই একথা বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না যে, এটি যথার্থই আল্লাহ্র কালাম। এতে কোন সৃষ্টিরই কোন হাত নেই। অতঃপর বলা হয়েছে - وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ, এই কোরআন সারা বিশ্বের জন্য সত্য দলীল তো বটেই, তদুপরি যারা ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহ্র রহমত ও হেদায়েত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার অবলম্বনও বটে!

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআন মু'মিনদের জন্যে রহমত। কিন্তু এই রহমতের দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত ও প্রক্রিয়া রয়েছে, যা সাধারণ সম্বোধনের মাধ্যমে এভাবে বলা হয়েছে- وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا অর্থাৎ, যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা সবাই তার প্রতি কান লাগিয়ে চুপচাপ থাকবে।

এ আয়াতের শানে-নুযুল সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এ হুকুমটি কি নামাযের কোরআন পাঠ সংক্রান্ত, না কোন বয়ান-বিবৃতিতে কোরআন পাঠের ব্যাপারে, নাকি সাধারণভাবে কোরআন পাঠের বেলায়; তা নামাযেই হোক অথবা অন্য যে কোন অবস্থায় হোক। অধিকাংশ মুফাস্সেরীনের মতে এটাই যথার্থ যে, আয়াতের শব্দগুলো যেমন ব্যাপক, তেমনি এই হুকুমটিও ব্যাপক। কতিপয় নিষিদ্ধ স্থান বা কাল ব্যতীত যেকোন অবস্থায় কোরআন পাঠের ক্ষেত্রে এ নির্দেশ ব্যাপক।

সে কারণেই হানাফী মাযহাবের ওলামাগণ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ইমামের পেছনে নামায পড়ার সময় মুক্তাদীগণের জন্য কেরাআত পড়া বিধেয় নয়। পক্ষান্তরে যেসব ফোকাহা মুক্তাদীগণকে (ইমামের পেছনে নামায পড়ার ক্ষেত্রেও) সূরা ফাতেহা পাঠ করার কথা বলেছেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে বলেছেন যে, ফাতেহা পড়লেও তা ইমামের কেরাআতের ফাঁকে ফাঁকে পড়বে।

আলোচ্য আয়াতের প্রকৃত বিষয় হল এই যে, কোরআন-করীমকে যাদের জন্য রহমত সাব্যস্ত করা হয়েছে, সে জন্য শর্ত হচ্ছে যে, তাদেরকে কোরআনের আদব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং এর উপর আমল করতে হবে। আর কোরআনের বড় আদব হলো এই যে, যখন তা পাঠ করা হয়, তখন শ্রোতা সেদিকে কান লাগিয়ে নিশ্চুপ থাকবে।

কোরআন পাঠ শ্রবণ করা এবং তার হুকুম-আহ্কামের উপর আমল করার চেষ্টা করা উভয়টিই কান লাগিয়ে রাখার অন্তর্ভুক্ত।—(মাযহারী ও কুরতুবী) আয়াত শেষে لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআনের রহমত হওয়া উল্লেখিত আদবসমূহের অনুবর্তিতার উপর

নির্ভরশীল।

কোরআন তেলাওয়াতের সময় নীরব থেকে তা শ্রবণ করা সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী মাসায়েল ঃ একথা একান্তই সুস্পষ্ট যে, কেউ যদি উল্লেখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে কোরআন-করীমের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে, তবে সে রহ্‌মতের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র গযব ও রোষানলের অধিকারী হবে।

নামাযের মধ্যে কোরআনের দিকে কান লাগানো এবং নিশ্চুপ থাকার বিষয়টি মুসলমান মাত্রেরই জানা রয়েছে। তবে অনেক সময় অমনোযোগিতার কারণে এমনও ঘটে যায় যে, অনেকে একথাও বলতে পারে না যে, ইমাম কোন্ সূরাটি পাঠ করেছেন। তাদের পক্ষে কোরআনের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া এবং শোনার জন্য মনোনিবেশ করা কর্তব্য। জুম'আ কিংবা ঈদের খুতবার হুকুমও তাই। এই আয়াত ছাড়াও রসূলে করীম (সাঃ) বিশেষ করে খুতবার ব্যাপারে এরশাদ করেছেন ঃ اذا خرج الامام للخطبة فلا صلوٰة ولا كلام অর্থাৎ, ইমাম যখন খুত্‌বার জন্য এসে উপস্থিত হন, তখন না নামায পড়বে, না কোন কিছু বলবে।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তখন কোন লোক অপর কাউকে উপদেশ দেয়ার উদ্দেশে একথাও বলবে না যে, 'চুপ কর।' (অগত্যা যদি বলতেই হয়, তবে হাতে ইশারা করে দেবে), যাহোক, খুত্‌বা চলাকালে কোন রকম কথা-বার্তা, তস্‌বীহ্-তাহ্‌লীল, দোয়া-দরূদ কিংবা নামায প্রভৃতি জায়েয নয়।

ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন যে, জুম'আর খুত্‌বার যে হুকুম, ঈদ কিংবা বিয়ে প্রভৃতির খুত্‌বার হুকুমও তাই। অর্থাৎ, তখন মনোনিবেশ সহকারে নীরব থাকা ওয়াজিব।

অবশ্য নামায এবং খুত্‌বা ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় কেউ যখন আপন মনে কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকে, তখন অন্যান্যদের কান লাগিয়ে রাখা এবং নীরব থাকা ওয়াজিব কিনা, এ ব্যাপারে ফকীহ্‌গণের মতপার্থক্য রয়েছে। কোন কোন মনীষী এমতাবস্থায়ও কান লাগানো এবং নীরব থাকাকে ওয়াজিব বলেছেন; আর এর বিরুদ্ধাচরণকে পাপ বলে সাব্যস্ত করেছেন। সেজন্যই যেসব স্থানে মানুষ নিজ নিজ কাজ-কর্মে নিয়োজিত থাকে কিংবা বিশ্রাম করতে থাকে, সেসব জায়গায় কারও পক্ষে সরবে কোরআন পাঠ করাকে তাঁরা অবৈধ বলেছেন এবং যে লোক এমন জায়গায় উচ্চৈঃস্বরে কোরআন পাঠ করবে, তাকে গোনাহ্‌গার বলেছেন। 'খোলাসাতুল-ফাতাওয়া' প্রভৃতি গ্রন্থেও তাই লেখা রয়েছে।

কিন্তু কোন কোন ফকীহ্ বিশ্লেষণ করেছেন যে, কান লাগানো এবং শোনা শুধুমাত্র সে সমস্ত জায়গায়ই ওয়াজিব, যেখানে শোনাবার উদ্দেশেই কোরআন তেলাওয়াত করা হয়। যেমন, নামায ও খুত্‌বা প্রভৃতিতে। আর যদি কোন লোক নিজের ভাবে তেলাওয়াত করতে থাকে, কিংবা কয়েকজন কোন এক স্থানে নিজ নিজ তেলাওয়াতে নিয়োজিত থাকে, তাহলে অন্যের আওয়াযের প্রতি কান লাগিয়ে রাখা এবং নীরব থাকা ওয়াজিব নয়। তার কারণ, সহীহ্ ও বিশুদ্ধ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) রাত্রি বেলায় নামাযে সরবে কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং আয্‌ওয়াজে-মুতাহ্‌হারাত তখন ঘুমোতে থাকতেন। অনেক সময় হুজরার বাইরেও হুযূর (সাঃ)-এর আওয়ায শোনা যেত।

নীরব ও সরব যিকরের বিধি-বিধান ঃ এ আয়াতে কোরআন করীম নিঃশব্দ যিকির কিংবা সশব্দ যিকর দু'রকম যিকিরেরই স্বাধীনতা দিয়েছে। নিঃশব্দ যিকর সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ অর্থাৎ, স্বীয় পরওয়ারদেগারকে স্মরণ কর নিজের মনে। এরও দু'টি উপায় রয়েছে। (এক) জিহ্বা না নেড়ে শুধু মনে মনে আল্লাহ্‌র 'যাত' (সত্তা) ও গুণাবলীর ধ্যান করবে, যাকে "যিকরে ক্বল্‌বী' (আত্মিক যিকর) বা 'তাফাক্কুর' (নিবিষ্ট চিন্তা) বলা হয়। (দুই) তৎসঙ্গে মুখেও ক্ষীণ শব্দে আল্লাহ্ তাআলার নামের অক্ষরগুলো উচ্চারণ করবে। এটাই হল যিকরের সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্টতর উপায় যে, যে বিষয়ের যিকর করা হচ্ছে তার বিষয়বস্তু উপলব্ধি করে অন্তরেও তার প্রতিফলন ঘটিয়ে ধ্যান করবে এবং মুখেও তা উচ্চারণ করবে। কারণ, এভাবে অন্তরের সাথে মুখও যিকরে অংশগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যদি শুধু মনে মনেই ধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন থাকে, মুখে কোন অক্ষর উচ্চারিত না হয়, তবে তাতেও যথেষ্ট সওয়াব রয়েছে, কিন্তু সর্বনিম্ন স্তর হল শুধু মুখে মুখে যিকর করা, অন্তরাত্মার তা থেকে বিমুখ থাকা।

যিকরের দ্বিতীয় পন্থা এ আয়াতেই বলা হয়েছে, وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ অর্থাৎ, সুউচ্চ স্বরের চাইতে কম স্বরে। অর্থাৎ, যে লোক আল্লাহ্ তাআলার যিকর করবে তার সশব্দ যিকর করারও অধিকার রয়েছে, তবে তার আদব হল এই যে, অত্যন্ত জোরে চীৎকার করে যিকর করবে না। মাঝামাঝি আওয়াযে করবে যাতে আদব এবং মর্যাদাবোধের প্রতি লক্ষ্য থাকে। অতি উচ্চৈঃস্বরে যিকর বা তেলাওয়াত করাতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, যার উদ্দেশে যিকর করা হচ্ছে, তাঁর মর্যাদাবোধ অন্তরে নেই। যে সত্তার সম্মান ও মর্যাদা এবং ভয় মানব মনে বিদ্যমান থাকে, তাঁর সামনে স্বভাবগতভাবেই মানুষ অতি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে পারে না। কাজেই আল্লাহ্‌র সাধারণ যিকরই হোক, কিংবা কোরআনের তেলাওয়াতই হোক, যখন আওয়াযের সাথে পড়া হবে, তখন সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যাতে তা প্রয়োজনের চাইতে বেশী উচ্চৈঃস্বরে না হতে পারে।

সারকথা এই যে, এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্‌র যিকর বা কোরআন তেলাওয়াতের তিনটি পদ্ধতি বা নিয়ম জানা গেল। প্রথমতঃ আত্মিক যিকর। অর্থাৎ, কোরআনের মর্ম এবং যিকরের কল্পনা ও চিন্তার মাঝেই যা সীমিত থাকবে; যার সাথে জিহ্বার সামান্যতম স্পন্দনও হবে না। দ্বিতীয়তঃ যে যিকরে আত্মার চিন্তা-কল্পনার সাথে সাথে জিহ্বাও নড়বে। কিন্তু বেশী উচ্চ শব্দ হবে না, যা অন্যান্য লোকেও শোনবে। এ দু'টি পদ্ধতিই আল্লাহ্‌র বাণী وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ -এর অন্তর্ভুক্ত। আর তৃতীয় পদ্ধতিটি হল অন্তরে উদ্দিষ্ট সত্তার উপস্থিতি ও ধ্যান করার সাথে সাথে জিহ্বার স্পন্দনও হবে এবং সেই সঙ্গে শব্দও বেরোবে। কিন্তু এই পদ্ধতির জন্য আদব বা রীতি হল আওয়াযকে অধিক উচ্চ না করা। সীমার বাইরে যাতে না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা। যিকরের এ পদ্ধতিটিই وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ আয়াতে শেখানো হয়েছে। কোরআনের আরও একটি আয়াতে বিষয়টিকে বিশেষ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে- وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا - এতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে, যাতে কেরাআত পড়তে গিয়ে অতি উচ্চৈঃস্বরেও পড়া না হয় এবং একেবারে মনে মনেও নয়। বরং কেরাআতে যেন মাঝামাঝি আওয়ায অবলম্বন করা হয়।

নামাযের মাঝে কোরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ও হযরত ফারূকে আ'যম (রাঃ)-কে এ হেদায়েতই দিয়েছেন।

সহীহ্ ও বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, একবার রসূলে করীম (সাঃ) শেষ রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর বাড়ী গিয়ে দেখলেন, তিনি নামায পড়ছেন। কিন্তু তাতে আস্তে আস্তে অর্থাৎ, শব্দহীনভাবে কোরআন তেলাওয়াত করছেন। তারপর তিনি (হুযুর [সাঃ]) সেখান থেকে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর বাড়ী গিয়ে দেখলেন, তিনি অতি উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করছেন। অতঃপর ভোরে যখন উভয়ে হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি রাতের বেলায় আপনার নিকট গিয়ে দেখলাম, আপনি অতি ক্ষীণ আওয়াযে কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, যে সত্তাকে শোনানো আমার উদ্দেশ্য ছিল তিনি শোনে নিয়েছেন, তাই যথেষ্ট নয় কি? তেমনিভাবে হযরত ফারূকে আযম (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে হুযুর (সাঃ) বললেন, আপনি অতি উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করছিলেন। তিনি নিবেদন করলেন, উচ্চ শব্দে কেরাআত পড়তে গিয়ে আমার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে ঘুম আসতে না পারে এবং শয়তান যেন সে শব্দ শুনে পালিয়ে যায়। অতঃপর হুযুরে আকরাম (সাঃ) মীমাংসা করে দিলেন। তিনি হযরত সিদ্দীকে-আকবর (রাঃ)-কে কিছুটা জোরে এবং হযরত ফারূকে আযম (রাঃ)-কে কিছুটা আস্তে তেলাওয়াত করতে বললেন।—(আবু-দাউদ)

সেজদার কতিপয় ফযীলত ও আহ্কাম ঃ এখানে নামাযসংক্রান্ত এবাদতের মধ্য থেকে শুধু সেজদার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামাযের সমগ্র আরকানের মধ্যে সেজদার একটি বিশেষ ফযীলত রয়েছে।

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যে, কোন এক লোক হযরত সওবান (রাঃ)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমাকে এমন একটা আমল বাতলে দিন যাতে আমি জান্নাতে যেতে পারি। হযরত সওবান (রাঃ) নীরব রইলেন; কিছুই বললেন না। লোকটি আবার নিবেদন করলেন, তখনও তিনি চুপ করে রইলেন। এভাবে তৃতীয়বার যখন বললেন, তখন তিনি বললেন, আমি এ প্রশ্নটিই রসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে করেছিলাম। তিনি আমাকে ওসীয়ত করেছিলেন যে, অধিক পরিমাণে সেজদা করতে থাক। কারণ, তোমরা যখন একটি সেজদা কর তখন তার ফলে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের মর্যাদা এক ডিগ্রী বাড়িয়ে দেন এবং একটি গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন।

লোকটি বললেন, হযরত সওবান (রাঃ)-এর সাথে আলাপ করার পর আমি হযরত আবুদ্দারদ (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছেও একই নিবেদন করলাম এবং তিনিও একই উত্তর দিলেন।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বান্দা স্বীয় পরওয়ারদেগারের সর্বাধিক নিকটবর্তী তখনই হয়, যখন সে বান্দা সেজদায় অবনত থাকে। কাজেই তোমরা সেজদারত অবস্থায় খুব বেশী করে দোয়া-প্রার্থনা করবে। তাতে তা কবুল হওয়ার যথেষ্ট আশা রয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র সেজদা হিসাবে কোন এবাদত নেই। কাজেই ইমাম আ'যম হযরত আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে অধিক পরিমাণে সেজদা করার অর্থ অধিক পরিমাণে নফল নামায পড়া। নফল যতবেশী হবে সেজদাও ততই বেশী হবে।

কিন্তু কোন লোক যদি শুধু সেজদা করেই দোয়া করে নেয়, তাহলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই। আর সেজদারত অবস্থায় দোয়া করার হেদায়েত শুধু নফল নামাযের সাথে সম্পৃক্ত; ফরয নামাযে নয়।

সূরা আ রাফ শেষ হল। এর শেষ আয়াতটি হল আয়াতে সেজদা। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, কোন আদমসন্তান যখন কোন সেজদার আয়াত পাঠ করে অতঃপর সেজদায়ে তেলাওয়াত সম্পন্ন করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায় এবং বলে যে, আফসোস, মানুষের প্রতি সেজদার হুকুম হল আর সে তা আদায়ও করলো, ফলে তার ঠিকানা হল জান্নাত, আর আমার প্রতিও সেজদার হুকুম হয়েছিল, কিন্তু আমি তার না-ফরমানী করেছি বলে আমার ঠিকানা হল জাহান্নাম।

সূরা আ'রাফ সমাপ্ত

سورة الانفال مدنية وهي خمس وسبعون اية وعشر ركوعات

بسم الله الرحمن الرحيم

يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا
الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم
مؤمنين ① انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت
قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى
ربهم يتوكلون ② الذين يقيمون الصلوة ومما
رزقنهم ينفقون ③ اولئك هم المؤمنون حقا لهم
درجت عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ④ كما
اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين
لكرهون ⑤ يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون
الى الموت وهم ينظرون ⑥ واذ يعدكم الله احدى
الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة
تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلمته ويقطع دابر
الكفرين ⑦ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ⑧

সূরা আল-আনফাল

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত, ৭৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম। বলে দিন, গনীমতের মাল হল আল্লাহ্‌র এবং রসূলের। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য কর – যদি ঈমানদার হয়ে থাক। (২) যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে। (৩) সে সমস্ত লোক যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে– (৪) তারাই হল সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুযী। (৫) যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না। (৬) তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হবার পর; তারা যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে। (৭) আর যখন আল্লাহ্ দু' টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোন রকম কন্টক নেই, তাই তোমাদের ভাগে আসুক; অথচ আল্লাহ্ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে, (৮) যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয়।

সূরা আল-আনফাল

সূরার বিষয়বস্তু ঃ

সূরা আনফাল এখন যা আরম্ভ হচ্ছে, এটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরা। এর পূর্ববর্তী সূরা আ'রাফে মুশরেকীন (অংশীবাদী) এবং আহলে-কিতাবের মূর্খতা, বিদ্বেষ, কুফরী ও ফেৎনা-ফাসাদ সংক্রান্ত আলোচনা এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা ছিল।

বর্তমান সূরাটিতে আলোচিত অধিকাংশ বিষয়ই বদরের যুদ্ধকালে সেই কাফের, মুশরিক ও আহলে-কিতাবের অশুভ পরিণতি, তাদের পরাজয় ও অকৃতকার্যতা এবং তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের কৃতকার্যতা সম্পর্কিত, যা মুসলমানদের জন্য ছিল একান্ত কৃপা এবং কাফেরদের জন্য ছিল আযাব ও প্রতিশোধস্বরূপ।

আর যেহেতু এই কৃপা ও দানের সবচাইতে বড় কারণ ছিল মুসলমানদের নিঃস্বার্থতা, পারস্পরিক ঐক্য, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যের ফল, সেহেতু সূরার প্রারম্ভেই তাক্‌ওয়া, পরহেযগারী এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য, যিকির ও ভরসা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। আয়াতের বিস্তারিত তফসীরের পূর্বে সে-ঘটনাটি জানা থাকলে এর তফসীর বুঝতে সহজ হবে বলে আশা করি।

ঘটনাটি হল এই যে, কুফর ও ইসলামের প্রথম সংঘর্ষ বদর যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়ে গেল এবং কিছু গনীমতের মাল-সামান হাতে এল, তখন সেগুলোর বিলি-বন্টন নিয়ে সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটে যা নিঃস্বার্থতা, এখলাস ও ঐক্যের সেই সুউচ্চমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, যার ভিত্তিতে সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ)-এর গোটা জীবন ঢেলে সাজানো ছিল। সেজন্য সর্বাগ্রে এ আয়াতে তার সমাধান দেয়া হয়, যাতে করে এই পূতঃপবিত্র এবং নিষ্কলুষ সম্প্রদায়ের অন্তরে বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থতা এবং ঐক্য ও আত্মত্যাগের প্রেরণা ছাড়া অন্য কোন বিষয় থাকতে না পারে।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হযরত ওবাদা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে-মাজা, মুসতাদরাকে-হাকেম প্রভৃতি গ্রন্থে এভাবে উদ্ধৃত রয়েছে যে, হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)-এর নিকট কোন এক ব্যক্তি আয়াতে উল্লেখিত 'আনফাল' শব্দের মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "এ আয়াতটি তো আমাদের অর্থাৎ, বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। সে ঘটনাটি ছিল এই যে, গনীমতের মালামাল বিলি-বন্টন ব্যাপারে আমাদের মাঝে সামান্য মতবিরোধ হয়ে গিয়েছিল যাতে আমাদের পবিত্র চরিত্রে একটা অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে গনীমতের সমস্ত মালামাল আমাদের হাত থেকে নিয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর দায়িত্বে অর্পণ করেন। আর রসূলে করীম (সাঃ) বদরে অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যে সমানভাবে সেগুলো বন্টন করে দেন।"

ব্যাপার ঘটেছিল এই যে, বদরের যুদ্ধে আমরা সবাই রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে বেরিয়ে যাই এবং উভয়দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তাআলা যখন শত্রুদের পরাজিত করে দেন, তখন আমাদের সেনাবাহিনী তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু লোক শত্রুদের

পশ্চাদ্ধাবন করেন, যাতে তারা পুনরায় ফিরে আসতে না পারে। কিছু লোক কাফেরদের পরিত্যক্ত গনীমতের মালামাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। আর কিছু লোক রসূলে করীম (সাঃ)-এর পাশে এসে সমবেত হন, যাতে গোপনে লুকিয়ে থাকা কোন শত্রু মহানবী (সাঃ)-এর উপর আক্রমণ করতে না পারে। যুদ্ধ শেষে সবাই যখন নিজেদের অবস্থানে এসে উপস্থিত হন, তখন যাঁরা গনীমতের মালামাল সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁরা বলতে লাগলেন যে, এ সমস্ত মালামাল যেহেতু আমরা সংগ্রহ করেছি, কাজেই এতে আমাদের ছাড়া অপর কারও ভাগ নেই। আর যারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়েছিলেন তাঁরা বললেন, এতে তোমরা আমাদের চাইতে বেশী অধিকারী নও। কারণ, আমরাই তো শত্রুকে হটিয়ে দিয়ে তোমাদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছি যাতে তোমরা নিশ্চিন্তে গনীমতের মালামালগুলো সংগ্রহ করে আনতে পার। পক্ষান্তরে যারা মহানবী (সাঃ)-এর হেফাযতকল্পে তাঁর পাশে সমবেত ছিলেন, তাঁরা বললেন, আমরাও ইচ্ছা করলে গনীমতের এই মাল সংগ্রহে তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারতাম, কিন্তু আমরা জেহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর হেফাযতে নিয়োজিত ছিলাম। অতএব আমরাও এর অধিকারী।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর এসব কথাবার্তা হুযুর (সাঃ) পর্যন্ত পৌছলে পর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এসব মালামাল আল্লাহ্ তাআলার; একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত এর অন্য কোন মালিক বা অধিকারী নেই; শুধু তাঁকে ছাড়া যাঁকে রসূলে করীম (সাঃ) দান করেন। সুতরাং মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ অনুযায়ী এসব মালামাল জেহাদে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দেন।—(ইবনে-কাসীর) অতঃপর সবাই আল্লাহ্ ও রসূলের এই সিদ্ধান্তের উপর রাযী হয়ে যান এবং তাঁদের মহান মর্যাদার পরিপন্থী পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেজন্য সবাই লজ্জিত হন।

انفال শব্দটি نفل এর বহুবচন। এর অর্থ অনুগ্রহ, দান ও উপঢৌকন। নফল নামায, রোযা, সদ্কা প্রভৃতিকে এ কারণেই 'নফল' বলা হয় যে, এগুলো কারো উপর অপরিহার্য কর্তব্য ও ওয়াজিব নয়। যারা তা করে, নিজের খুশীতেই করে থাকে। কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় 'নফল ও আন্ফাল' গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ মালামালকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা যুদ্ধকালে কাফেরদের থেকে লাভ করা হয়। তবে কোরআন মজীদে এতদর্থ তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে - (১) আন্ফাল (২) গনীমত এবং (৩) ফায়। انفال শব্দটি তো এ আয়াতেই রয়েছে। আর غنيمة (গনীমত) শব্দ এবং তার বিশ্লেষণ এ সূরার একচল্লিশতম আয়াতে আসবে। আর فيء এবং তার ব্যাখ্যা সূরা হাশরের আয়াত .. وَمَآ أَفَآءَ اللَّهُ প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এ তিনটি শব্দের অর্থ যৎসামান্য পার্থক্যসহ বিভিন্ন রকম। সামান্য ও সাধারণ পার্থক্যের কারণে অনেক সময় একটি শব্দকে অন্যটির জায়গায় শুধু 'গনীমতের মাল' অর্থেও ব্যবহার করা হয়। انفال(গনীমত) সাধারণতঃ সে মালকে বলা হয়, যা যুদ্ধ-জেহাদের মাধ্যমে বিরোধী দলের কাছ থেকে হাসিল করা হয়। আর فيء (ফায়) বলা হয় সে মালকে যা কোন রকম যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই কাফেরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তা সেগুলো ফেলে কাফেররা পালিয়েই যাক, অথবা স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে রাজী হোক। আর انفال ও نفل (নফল ও আন্ফাল) শব্দটি অধিকাংশ সময় এন্আম বা পুরস্কার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জেহাদের নায়ক কোন বিশেষ মুজাহিদকে তার কৃতিত্বের বিনিময় হিসাবে গনীমতের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়ে থাকেন। তফসীরে ইবনে-জরীর গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে।—(ইবনে-কাসীর) আবার কখনও 'নফল' ও 'আন্ফাল' শব্দ দ্বারা সাধারণ গনীমতের মালকেও বোঝানো হয়। এ আয়াতের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ তফসীরকার এই সাধারণ অর্থই গ্রহণ করেছেন। সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটি সাধারণ-অসাধারণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে কোন মতবিরোধ নেই। বস্তুতঃ এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা হল সেটাই; যা ইমাম আবু ওবাইদ (রহঃ) করেছেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল আম্ওয়াল'-এ উল্লেখ করেছেন যে, মূল অভিধান অনুযায়ী 'নফল' বলা হয় দান ও পুরস্কারকে। আর এই উম্মতের প্রতি এটা এক বিশেষ দান যে, জেহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে যেসব মাল-সামান কাফেরদের কাছ থেকে লাভ করা হয়, সেগুলো মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। বিগত উম্মতের মধ্যে এই প্রচলন ছিল না।

উল্লেখিত আয়াতে আন্ফাল-এর বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহ্‌র এবং রসূলের। তার অর্থ এই যে, এগুলোর প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এবং রসূলে করীম (সাঃ) হচ্ছেন সেগুলোর ব্যবস্থাপক। তিনি আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক স্বীয় কল্যাণ বিবেচনায় সেগুলো বিলি-বন্টন করবেন।

সেজন্যই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-আব্বাস, ইকরিমাহ্ (রাঃ) এবং মুজাহিদ ও সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখসহ তফসীরবিদগণের এক বিরাট দল মত প্রকাশ করেছেন যে, এই হুকুমটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক আমলের, যখন গনীমতের মাল-সামান বিলি-বন্টনের ব্যাপারে কোন আইন অবতীর্ণ হয়নি। আলোচ্য সূরার পঞ্চম রুকূতে এ বিষয়টিই আলোচিত হবে। এ আয়াতে গনীমতের যাবতীয় মালামালের বিষয়টি মহানবী (সাঃ)-এর কল্যাণ-বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু পরবর্তীতে যে বিস্তারিত বিধি-বিধান এসেছে, তাতে বলে দেয়া হয়েছে যে, গনীমতের সম্পূর্ণ মালামালকে পাঁচ ভাগ করে তার এক ভাগ বায়তুলমালে সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনের লক্ষ্যে সংরক্ষণ করতে হবে এবং বাকী চার ভাগ বিশেষ নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে জেহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সে সমস্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সূরা আন্ফালের আলোচ্য প্রথম আয়াতটিকে রহিত করে দিয়েছে। আবার কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, এখানে কোন 'নাসেখ-মনসূখ' অর্থাৎ, রহিত কিংবা রহিতকারী নেই, বরং সংক্ষেপন ও বিশ্লেষণের পার্থক্য মাত্র। সূরা আন্ফালের প্রথম আয়াতে যা সংক্ষেপে বলা হয়েছে, একত্রিশতম আয়াতে তারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অবশ্য 'ফায়'-এর মালামাল—যার বিধান সূরা হাশরে বিবৃত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে রসূলে করীম (সাঃ)-এর অধিকারভুক্ত। তিনি নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। সে কারণেই সেখানে তার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -

"আমার রসূল যা কিছু তোমাদের দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক।"

এই বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গনীমতের মাল হলো সেসমস্ত মালামাল যা যুদ্ধ-জেহাদের মাধ্যমে হস্তগত করা হয়। আর 'ফায়' হল সে সমস্ত মালামাল যা কোন রকম লড়াই এবং জেহাদ ছাড়াই হাতে আসে। আর انفال (আন্ফাল) শব্দটি উভয় মালামালের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেই বিশেষ পুরস্কার বা উপঢৌকনের

অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জেহাদের নেতা বা পরিচালক দান করেন।

এ প্রসঙ্গে সাথীদেরকে পুরস্কার দেয়ার চারটি রীতি মহানবী (সাঃ) –এর যুগ থেকে প্রচলিত রয়েছে। (এক) একথা ঘোষণা করে দেয়া যে, যে লোক কোন বিরোধী শত্রুকে হত্যা করতে পারবে— যে সামগ্রী তার সাথে থাকবে সেগুলো তারই হয়ে যাবে, যে হত্যা করেছে। এসব সামগ্রী গনীমতের সাধারণ মালামালের সাথে জমা হবে না। (দুই) বড় কোন সৈন্যদল থেকে কোন দলকে পৃথক করে কোন বিশেষ দিকে জেহাদ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়া এবং এমন নির্দেশ দিয়ে দেয়া যে, এদিক থেকে যেসব গনীমতের মালামাল সংগৃহীত হবে সেগুলো উল্লেখিত বিশেষ দলের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে যারা সে অভিযানে অংশগ্রহণ করবে। তবে এতে শুধু এটুকু করতে হবে যে, সমস্ত মালামাল থেকে এক পঞ্চমাংশ সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনে বায়তুলমালে জমা করতে হবে। (তিন) বায়তুলমালে গনীমতের যে এক পঞ্চমাংশ জমা করা হয়,তা থেকে কোন বিশেষ গাযী (জয়ী)–কে তার কোন বিশেষ কৃতিত্বের প্রতিদান হিসাবে আমীরের কল্যাণ বিবেচনা অনুযায়ী কিছু দান করা। (চার) সমগ্র গনীমতের মালামালের মধ্য থেকে কিছু অংশ পৃথক করে নিয়ে সেবাজীবী লোকদের মধ্যে পুরস্কারস্বরূপ দান করা, যারা মুজাহিদ বা সৈনিকদের ঘোড়া প্রভৃতির দেখাশোনা করে এবং তাদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে। –(ইবনে–কাসীর)

তাহলে আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু দাঁড়াল এই যে, এতে আল্লাহ্ তাআলা রসূলে করীম (সাঃ)–কে উদ্দেশ করে বলেছেন যে, আপনার নিকট লোকেরা 'আনফাল' সম্পর্কে প্রশ্ন করে—আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, 'আন্ফাল' সবই হল আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের। অর্থাৎ, নিজস্বভাবে কেউ এসবের অধিকারী কিংবা মালিক নয়। আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে তাঁর রসূল (সাঃ) এগুলোর ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তাই কার্যকর হবে।

তাকওয়া ও খোদাভীতি সৌহার্দ্য ও ঐক্যের ভিত্তি ঃ এ আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে। فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ এতে সাহাবায়ে–কেরামকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে ভাল রাখ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে সে ঘটনার প্রতি যা বদর যুদ্ধে গনীমতের মালামালের বিলি–বন্টনসংক্রান্ত ব্যাপারে সাহাবায়ে–কেরামের মাঝে ঘটে গিয়েছিল। এতে পারস্পরিক তিক্ততা এবং অসন্তুষ্টি সৃষ্টির আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। কাজেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং গনীমতের মালামালের বিলি–বন্টনের বিষয় এ আয়াতের দ্বারা পরে মীমাংসা করে দিয়েছেন। তারপর তাঁদের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও পারস্পরিক সম্পর্ককে সুন্দর করার উপায় বলা হয়েছে যার কেন্দ্রবিন্দু হল তাকওয়া বা পরহেযগারী এবং খোদাভীতি।

وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ অর্থাৎ,তাকওয়া ও পরহেযগারীর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন কর। এরই কিছুটা বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ, তোমরা যদি মুমিনই হবে, তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পূর্ণ আনুগত্য কর। অর্থাৎ, ঈমানের দাবীই হল আনুগত্য। আর আনুগত্যের ফল হল তাকওয়া। কাজেই মানুষ যখন এ বিষয়গুলো লাভ করতে সমর্থ হয়, তখন তাদের পারস্পরিক বিবাদ–বিসংবাদ, লড়াই–ঝগড়া আপনা থেকেই তিরোহিত হয়ে যায় এবং শত্রুতার স্থলে অন্তরে সৃষ্টি হয় প্রেম ও সৌহার্দ্য।

মুমিনের বিশেষ গুণ–বৈশিষ্ট্য ঃ এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত গুণ–বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যা প্রতিটি মুমিনের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রতিটি মুমিন নিজের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার পর্যালোচনা করে দেখবে, যদি তার মধ্যে এসব গুণ–বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া আদায় করবে যে, তিনি তাকে মুমিনের গুণাবলীতে মণ্ডিত করেছেন। আর যদি এগুলোর মধ্যে কোন একটি গুণ তার মধ্যে না থাকে, কিংবা থাকলেও তা একান্ত দুর্বল বলে মনে হয়, তাহলে তা অর্জন করার কিংবা তাকে সবল করে তোলার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্র ভয় ঃ আয়াতে প্রথম বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ, তাদের সামনে যখন আল্লাহ্র আলোচনা করা হয়, তখন তাদের অন্তর আঁতকে উঠে। অর্থাৎ, তাদের অন্তর আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও প্রেমে ভরপুর, যার দাবী হল ভয় ও ভীতি। কোরআন করীমের অন্য এক আয়াতে তারই আলোচনাক্রমে খোদা– প্রেমিকদিগকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ, (হে নবী), সুসংবাদ দিয়ে দিন সে সমস্ত বিনয়ী, কোমলপ্রাণ লোকদিগকে, যাদের অন্তর তখন ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহ্র আলোচনা করা হয়। এতদুভয় আয়াতে আল্লাহ্র আলোচনা ও স্মরণের একটা বিশেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; তা হল ভয় ও ত্রাস। আর অপর আয়াতটিতে আল্লাহ্র যিকিরের এই বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে অন্তর প্রশান্ত হয়ে উঠে। বলা হয়েছে— اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ অর্থাৎ, আল্লাহ্র যিকিরের দ্বারাই আত্মা শান্তি লাভ করে, প্রশান্ত হয়।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, আয়াতে যে ভয় ও ভীতির কথা বলা হয়েছে, তা মনের প্রশান্তি এবং স্বস্তির পরিপন্থী নয়, যেমন হিংস্র জীব–জন্তু কিংবা শত্রুর ভয় মানুষের মনের শান্তিকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ্র যিকিরের দরুন অন্তরে সৃষ্ট ভয় তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সেজন্য এখানে خَوْفٌ শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। وجل শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ সাধারণ ভয় নয়; বরং এমন ভয়, যা বড়দের মহত্ত্বের কারণে মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, এখানে আল্লাহ্র যিকির বা স্মরণ অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি কোন পাপ কাজে লিপ্ত হতে ইচ্ছা করছিল, তখনই আল্লাহ্র কথা তার স্মরণ হয়ে গেল এবং তাতে সে আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে গেল এবং সে পাপ থেকে বিরত রইল। এ ক্ষেত্রে ভয় অর্থ হবে আযাবের ভয়।— (বাহ্রে–মুহীত)

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঈমানের উন্নতি ঃ মুমিনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তার সামনে যখন আল্লাহ্ তাআলার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। সমস্ত আলেম, তফসীরবিদ ও হাদীসবিদগণের সর্বসম্মত মতে, ঈমান বৃদ্ধির অর্থ হলো ঈমানের শক্তি, অবস্থা এবং ঈমানী জ্যোতির উন্নতি। আর একথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, সৎকাজের দ্বারা ঈমানী শক্তি এবং এমন আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, তাতে সৎকর্ম মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন তা পরিহার করতে গেলে খুবই কষ্ট হয় এবং পাপের প্রতি একটা প্রকৃতিগত ঘৃণার উদ্ভব হয়, যার ফলে সে তার কাছেও যেতে পারে না। ঈমানের এ

অবস্থাকেই হাদীসে 'ঈমানের মাধুর্য' শব্দে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, একজন পরিপূর্ণ মুমিনের এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত যে, তার সামনে যখনই আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করা হবে, তখন তার ঈমানের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি সাধিত হবে এবং সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। এতে বোঝা যাচ্ছে, সাধারণ মুসলমানেরা যেভাবে কোরআন পাঠ করে এবং শুনে, যাতে না থাকে কোরআনের আদব ও মর্যাদাবোধের কোন খেয়াল, না থাকে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর মহত্বের প্রতি লক্ষ্য, সে ধরনের তেলাওয়াত উদ্দেশ্যও নয় এবং এতে উচ্চতর ফলাফলও সৃষ্টি হয় না। অবশ্য সেটাও সম্পূর্ণভাবে পুণ্য বিবর্জিত নয়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা ঃ মুমিনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা করবে। তাওয়াক্কুল অর্থ হল আস্থা ও ভরসা। অর্থাৎ, নিজের যাবতীয় কাজ-কর্ম ও অবস্থায় তার পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকে শুধুমাত্র একক সত্তা আল্লাহ্ তাআলার উপর। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, এর অর্থ এই নয় যে, স্বীয় প্রয়োজনের জন্য জড়-উপকরণ এবং চেষ্টা-চরিত্রকে পরিত্যাগ করে বসে থাকবে। বরং এর অর্থ হলো এই যে, বাহ্যিক জড়-উপকরণকেই প্রকৃত কৃতকার্যতার জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করে বরং নিজের সামর্থ্য ও সাহস অনুযায়ী জড়-উপকরণের আয়োজন ও চেষ্টা-চরিত্রের পর সাফল্য আল্লাহ্ তাআলার উপর ছেড়ে দেবে এবং মনে করবে যে, যাবতীয় উপকরণও তাঁরই সৃষ্টি এবং সে উপকরণসমূহের ফলাফলও তিনিই সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ হবেও তাই, যা তিনি চাইবেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে اجملوا فى الطلب وتوكلوا على الله অর্থাৎ, স্বীয় যিকির এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্যে মাঝামাঝি পর্যায়ের অন্বেষণ এবং জড়-উপকরণের মাধ্যমে চেষ্টা করার পর তা আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দাও। নিজের মন-মস্তিস্ককে শুধুমাত্র স্থূল প্রচেষ্টা ও জড়উপকরণের মাঝেই জড়িয়ে রেখো না।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য নামায প্রতিষ্ঠা করা ঃ মুমিনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে নামায প্রতিষ্ঠা করা। এখানে এ বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য যে, এখানে 'নামায' পড়ার কথা নয়; বরং নামায প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে اقامت শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোন কিছুকে সোজা দাঁড় করানো। কাজেই اقامت صلوٰة এর মর্মার্থ হচ্ছে নামাযের যাবতীয় আদব-কায়দা, রীতি-নীতি ও শর্তাশর্ত এমনভাবে সম্পাদন করা, যেমন করে রসূলে করীম (সাঃ)স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে বাতলে দিয়েছেন। আদব-কায়দা ও শর্তাশর্তের কোন রকম ত্রুটি হলে তাকে নামায পড়া বলা গেলেও নামায প্রতিষ্ঠা করা বলা যেতে পারে না। কোরআন মজীদে নামাযের যেসব উপকারিতা, প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং বরকতের কথা বলা হয়েছে— যেমন, إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (অর্থাৎ, নামায লজ্জাহীনতা ও পাপ থেকে বিরত রাখে।) তা নামায প্রতিষ্ঠা করার উপরই নির্ভরশীল। নামাযের আদবসমূহে যখন কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তখন ফতোয়ার দিক দিয়ে তার সে নামাযকে জায়েয বলা হলেও ত্রুটির পরিমাণ হিসাবে নামাযের বরকত ও কল্যাণে পার্থক্য দেখা দেবে। কোন কোন অবস্থায় তার বরকত বা কল্যাণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হতে হবে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করা ঃ মর্দে-মুমিনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাকে যে রিযিক দান করেছেন, তা থেকে আল্লাহ্‌র রাহে খরচ করবে। আল্লাহ্‌র রাহে এই ব্যয় করার অর্থ ব্যাপক। এতে শরীয়ত নির্ধারিত যাকাত-ফেতরা প্রভৃতি,নফল দান-খয়রাতসহ মেহমানদারী, বড়দের কিংবা বন্ধুবান্ধবদের প্রতি কৃত আর্থিক সাহায্য-সহায়তা প্রভৃতি সব রকমের দান-খয়রাতই অন্তর্ভুক্ত।

মর্দে মুমিনের এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, أُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا অর্থাৎ, এমনসব লোকই হল সত্যিকার মুমিন যাদের ভেতর ও বাহির এক রকম এবং মুখ ও অন্তর ঐক্যবদ্ধ। অন্যথায় যাদের মধ্যে এসমস্ত বৈশিষ্ট্য অবর্তমান, তারা মুখে اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله বললেও তাদের অন্তরে না থাকে তওহীদের রং, আর না থাকে রসূলের আনুগত্য। তাদের কার্যধারা তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে। কাজেই এ আয়াতে এই ইঙ্গিতই দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক সত্যেরই একটা তাৎপর্য থাকে, তা যখন অর্জিত হয় না, তখন সত্যটিও লাভ হয় না।

কোন এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিল যে, হে আবু সাঈদ! আপনি কি মুমিন? তখন তিনি বললেন, ভাই, ঈমান দু'প্রকার। তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ যদি এই হয়ে থাকে যে, আমি আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও রসূলগণের উপর এবং বেহেশত, দোযখ, কেয়ামত ও হিসাব-কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখি কি না? তাহলে তার উত্তর এই যে, নিশ্চয়ই আমি মুমিন। পক্ষান্তরে সূরা আন্‌ফালের আয়াতে যে মুমিনে কামেল বা পরিপূর্ণ মুমিনের কথা বলা হয়েছে তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ যদি এই হয় যে, আমি তেমন মুমিন কি না? তাহলে আমি তা কিছুই জানি না যে, আমি তার অন্তর্ভুক্ত কি না। সূরা আন্‌ফালের আয়াত বলতে সে আয়াতগুলোই উদ্দেশ যা আপনারা এইমাত্র শুনলেন।

আয়াতগুলোতে সত্যিকার মুমিনের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে— لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ এতে মুমিনদের জন্য তিনটি বিষয়ের ওয়াদা করা হয়েছে। (১) সুউচ্চ মর্যাদা, (২) মাগফেরাত বা ক্ষমা এবং (৩) সম্মানজনক রিযিক।

তফসীরে বাহ্‌রে-মুহীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিনদের যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলো তিন রকম। (১) সেসব বৈশিষ্ট্য যার সম্পর্ক অন্তর ও অভ্যন্তরের সাথে। যেমন, ঈমান, খোদাভীতি,আল্লাহ্‌র উপর ভরসা বা নির্ভরশীলতা, (২) যার সম্পর্ক দৈহিক কার্যকলাপের সাথে। যেমন, নামায, রোযা প্রভৃতি (৩) যার সম্পর্ক ধন-সম্পদের সাথে। যেমন, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা।

এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে তিনটি পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। আত্মিক গুণাবলীর জন্য 'সুউচ্চ মর্যাদা'। সে সমস্ত আমল বা কাজ-কর্মের জন্য 'মাগফেরাত' বা ক্ষমা যেগুলোর সম্পর্ক মানুষের দেহের সাথে। যেমন নামায, রোযা প্রভৃতি। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, নামাযে পাপসমূহের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। আর 'সম্মান জনক রিযিক'-এর ওয়াদা দেয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করার জন্য। মুমিন এ পথে যা ব্যয় করবে, আখেরাতে সে তদপেক্ষা বহু উত্তম ও বেশী প্রাপ্ত হবে।

সূরার শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সূরা আন্‌ফালের অধিকাংশ বিষয়ই হলো কাফের-মুশরিকদের আযাব ও প্রতিশোধ এবং মুসলমানদের

প্রতি অনুগ্রহ ও পুরস্কার সম্পর্কিত। এতে উভয়পক্ষের জন্যই শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয় এবং বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। আর এসব বিষয়ের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল বদর যুদ্ধ। এতে বিপুল আয়োজন, সংখ্যাধিক্য ও প্রচুর শক্তি সত্ত্বেও মুশরেকীনরা জান-মালের বিপুল ক্ষতিসহ পরাজয় বরণ করেছে। পক্ষান্তরে মুসলমানরা সর্বপ্রকার স্বল্পতা সত্ত্বেও বিজয়ের গৌরব অর্জন করেছেন।

বদর যুদ্ধের সময় কোন কোন মুসলমান জেহাদের অভিযান পছন্দ করছিলেন না, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ ফরমানের সাহায্যে রসূল করীম (সাঃ)-কে জেহাদাভিযানের নির্দেশ দিলে তারাও তাতে অংশগ্রহণ করেন, যারা ইতিপূর্বে বিষয়টিকে পছন্দ করছিলেন। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে কোরআন করীম এমনসব শব্দ প্রয়োগ করেছে, যেগুলো বিভিন্নভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আয়াতটি আরম্ভ করা হয়েছে كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ বাক্য দিয়ে। এতে كَمَآ এমন একটি বাক্যাংশ যা তুলনা বা উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রয়োগ করা হয়। অতএব, লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে কিসের সাথে কিসের তুলনা করা হচ্ছে। তফসীরকার মনীষীবৃন্দ এর বিভিন্ন বিশ্লেষণ করেছেন। তাতে বহুবিধ সম্ভাব্যতা রয়েছে।

এক ঃ এই তুলনার উদ্দেশ এই যে, যেভাবে বদর যুদ্ধে হস্তগত গনীমতের মালামাল বন্টন করার সময় সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর মাঝে পারস্পরিক কিছুটা মতবিরোধ হয়েছিল এবং পরে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক সবাই মহানবী (সাঃ)-এর হুকুমের প্রতি আনুগত্য করেন এবং তাঁর বরকত ও শুভ পরিণতিসমূহ দেখতে পান, তেমনিভাবে এ জেহাদের প্রারম্ভে কারো পক্ষ থেকে তা অপছন্দ করা হলেও পরে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী সবাই আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তার শুভফল ও উত্তম পরিণতি দেখতে পায়। এ বিশ্লেষণকে ফাররা ও মুবাররাদ এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া বয়ানুল-কোরআনেও এ বিশ্লেষণকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

দুই ঃ এমন সম্ভাবনাও হতে পারে যে, বিগত আয়াতসমূহে সত্যিকার মুমিনগণের জন্য আখেরাতে সুউচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। অতঃপর এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত প্রতিশ্রুতির অবশ্যম্ভাবিতা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আখেরাতের প্রতিশ্রুতি যদিও এখনই চোখে পড়ে না, কিন্তু বদর যুদ্ধে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি প্রত্যক্ষ করা গেছে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস কর যে, এ পৃথিবীতেই যেভাবে ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েছে তেমনিভাবে আখেরাতের ওয়াদাও অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। - (কুরতুবী)

তিন ঃ এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যা আবু-হাইয়্যান (রহঃ) মুফাসসেরীনদের উক্তি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন যে, এ সমস্ত উক্তির কোনটির উপরেই আমার পরিপূর্ণ আস্থা ছিল না। একদিন আমি এ আয়াতটির বিষয় চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে দেখলাম, আমি কোথাও যাচ্ছি এবং আমার সাথে অন্য একটি লোক রয়েছে। আমি সে লোকটির সাথে এ আয়াতের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করতে গিয়ে বললাম, আমি কখনও এমন জটিলতার সম্মুখীন হইনি, যেমনটি এ আয়াতের ব্যাপারে হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, যেন এখানে কোন একটি শব্দ উহ্য রয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ স্বপ্নের মাঝেই আমার মনে পড়ে গেল যে, এখানে نَصَرَكَ (নাছারাকা) শব্দটি উহ্য রয়েছে। বিষয়টি আমারও বেশ মনঃপুত ও পছন্দ হল এবং যার সাথে তর্ক করছিলাম সেও পছন্দ করলো। ঘুম থেকে জাগার পর পুনরায় বিষয়টি নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম। তাতে আমার মনের সন্দেহ বা প্রশ্ন দূর হয়ে গেল। কারণ, এ ক্ষেত্রে كَمَآ শব্দটির ব্যবহার উদাহরণ ব্যক্ত করার জন্য থাকে না, বরং কারণ বিশ্লেষণাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। আর তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বদর যুদ্ধের সময় মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকেই যে বিশেষ সাহায্য-সহায়তা নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি হয়েছিল, তার কারণ ছিল এই যে, এই জেহাদে তিনি যা কিছু করেছিলেন তার কোন কিছুই নিজের মতে করেননি, বরং সেসবই করেছিলেন প্রভুর নির্দেশে এবং খোদায়ী হুকুমের প্রেক্ষিতে। তাঁরই হুকুমে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। আল্লাহ্র আনুগত্যের ফলও তাই হওয়া উচিত এবং তাতেই আল্লাহ্র সাহায্য-সহায়তা পাওয়া যায়।

যাহোক,আয়াতে বর্ণিত এই বাক্যটিতে উল্লেখিত তিনটি অর্থেরই সম্ভাবনা রয়েছে এবং তিনটিই যথার্থ বটে।

বস্তুতঃ اَخْرَجَكَ বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জেহাদের উদ্দেশে মহানবী (সাঃ)-এর যাত্রা প্রকৃত প্রস্তাবে যেন আল্লাহ্ তাআলারই যাত্রা ছিল যা হুযুরের মাধ্যমে বাস্তবতা লাভ করেছে বা প্রকাশ পেয়েছে।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এখানে اَخْرَجَكَ رَبُّكَ বলা হয়েছে, যাতে আল্লাহ্র উল্লেখ এসেছে 'রব' 'গুণবাচক' নামে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর এ জেহাদ যাত্রা ছিল পালনকর্তা ও লালনসুলভ গুণেরই দাবী। কারণ, এতে অত্যাচারিত, উৎপীড়িত মুসলমানদের জন্য বিজয় এবং অত্যাচারী, দাম্ভিক কাফেরদের জন্যে আযাবের বিকাশই ছিল উদ্দেশ।

مِنْۢ بَيْتِكَ এর অর্থ হল আপনার ঘর থেকে। অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা আপনাকে আপনার ঘর থেকে বের করেছেন। অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই 'ঘর' বলতে মদীনা তাইয়্যেবার ঘর কিংবা মদীনাকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে হিজরতের পর তিনি অবস্থান করছিলেন। কারণ, বদরের ঘটনাটি হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে সংঘটিত হয়েছিল। এরই সঙ্গে بِالْحَقِّ শব্দ ব্যবহার করে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, এই সমুদয় বিষয়টিই সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসত্যকে প্রতিহত করার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্র বা সরকারের মত রাজ্য বিস্তারের লোভ কিংবা রাজন্যবর্গের রাগ-রোষের প্রেক্ষিতে ছিল না। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে - وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ অর্থাৎ, মুসলমানদের কোন একটি দল এ জেহাদ কঠিন মনে করছিল এবং পছন্দ করছিল না। সাহাবায়ে কেরামের মনে এই কঠিনতাবোধ কেমন করে এল, সেকথা উপলব্ধি করার জন্য এবং পরবর্তী অন্যান্য আয়াতগুলো যথাযথভাবে বোঝার জন্য প্রথম গযওয়ায়ে বদরের প্রাথমিক অবস্থা ও কারণগুলো জেনে নেয়া প্রয়োজন।

ইবনে-আকাবাহ্ ও ইবনে আমরের বর্ণনা অনুসারে ঘটনাটি ছিল এই যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট মদীনায় এ সংবাদ এসে পৌঁছে যে, আবু সুফিয়ান একটি বাণিজ্যিক কাফেলাসহ বাণিজ্যিক পণ্য-সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর এই বাণিজ্যে মক্কার সমস্ত কোরায়েশ অংশীদার। ইবনে-আকাবার বর্ণনা অনুযায়ী মক্কায় এমন কোন

কোরায়েশ নারী বা পুরুষ ছিল না যার অংশ এ বাণিজ্যে ছিল না। কারো কাছে এক মিস্‌কাল (সাড়ে চার মাশা) পরিমাণ সোনা থাকলে, সেও তা এতে নিজের অংশ হিসাবে লাগিয়েছিল। এই কাফেলার মোট পুঁজি সম্পর্কে ইবনে আকাবার বর্ণনা হচ্ছে এই যে, তা পঞ্চাশ হাজার দীনার ছিল। দীনার হল একটি স্বর্ণমুদ্রা যার ওজন সাড়ে চার মাশা। স্বর্ণের দর অনুয়ায়ী এর মুল্য হয়, বাহান্ন টাকা এবং গোটা পুঁজির মূল্য হয় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা। আর তাও আজকের নয়, বরং চৌদ্দ শ' বছর পূর্বেকার ছাব্বিশ লক্ষ যা বর্তমান ছাব্বিশ কোটি অপেক্ষাও অনেক গুণ বেশী হতে পারে। এই বাণিজ্যিক কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবসায়ের জন্য সত্তর জন কোরায়েশ যুবক ও সর্দার এর সাথে ছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এই বাণিজ্য কাফেলাটি ছিল কোরায়েশদের একটি বাণিজ্য কোম্পানী।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখের রেওয়ায়েত মতে বগভী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, এই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কোরায়েশদের চল্লিশ জন ঘোড়সওয়ার সর্দার যাদের মধ্যে আমর ইবনুল আস, মাখরামাহ ইবনে নাওফেল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া একথাও সবাই জানত যে, কোরায়েশদের এই বাণিজ্য এবং বাণিজ্যিক এই পুঁজিই ছিল সবচেয়ে বড় শক্তি। এরই ভরসায় তারা রসূলে করীম (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীসাথীদিগকে উৎপীড়ন করে মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। সে কারণেই হুযুর (সাঃ) যখন সিরিয়া থেকে এই কাফেলা ফিরে আসার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি স্থির করলেন যে, এখনই কাফেলার মোকাবেলা করে কোরায়েশদের ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দেয়ার উপযুক্ত সময়। তিনি সাহবায়ে কেরামের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তখন ছিল রমযানের মাস। যুদ্ধেরও কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। কাজেই কেউ কেউ সাহস ও শৌর্য প্রদর্শন করলেও অনেকে কিছুটা দোদুল্যমানতা প্রকাশ করলেন। স্বয়ং হুযুর (সাঃ)-ও সবার উপর এ জেহাদে অংশগ্রহণ করাকে অপরিহার্য বা বাধ্যতামূলক হিসেবে সাব্যস্ত করলেন না; বরং তিনি হুকুম করলেন, যাদের কাছে সওয়ারীর ব্যবস্থা রয়েছে,তারা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাতে অনেকে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থেকে যান। আর যাঁরা যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাদের সওয়ারী ছিল গ্রাম এলাকায়, তাঁরা গ্রাম থেকে সওয়ারী আনিয়ে পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু এতটা অপেক্ষা করার মত সময় তখন ছিল না। তাই নির্দেশ হল, যাঁদের নিকট এ মুহূর্তে সওয়ারী উপস্থিত রয়েছে এবং জেহাদে যেতে চান, শুধু তাঁরাই যাবেন। বাইরে থেকে সওয়ারী আনিয়ে নেবার মত সময় এখন নেই। কাজেই হুযুর (সাঃ)-এর সাথে যেতে আগ্রহীদের মধ্যেও অল্পই তৈরী হতে পারলেন। বস্তুতঃ যাঁরা এই জেহাদে অংশগ্রহণের আদৌ ইচ্ছাই করেনি, তার কারণও ছিল, তা এই যে, মহানবী (সাঃ) এতে অংশগ্রহণ করা সবার জন্য ওয়াজিব বা অপরিহার্য সাব্যস্ত করেননি। তাছাড়া তাদের মনে এ বিশ্বাসও ছিল যে, এটা একটা বাণিজ্যিক কাফেলা মাত্র, কোন যুদ্ধবাহিনী নয় যার মোকাবেলা করার জন্য রসূলে করীম (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদিগকে খুব বেশী পরিমাণ সৈন্য কিংবা মুজাহেদীনের প্রয়োজন পড়তে পারে। কাজেই সাহাবায়ে-কেরামের এক বিরাট অংশ এতে অংশগ্রহণ করেননি।

মহানবী (সাঃ) 'বি'রে সুক্‌ইয়া' নামক স্থানে পৌঁছে যখন কায়েস ইবনে সা'দা'আ (রাঃ)-কে সৈন্য গণনা করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি তা গুণে নিয়ে জানান তিন'শ তের জন রয়েছে। মহানবী (সাঃ) এ কথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন, তালুতের সৈন্য সংখ্যাও তাই ছিল। কাজেই লক্ষণ শুভ। বিজয় ও কৃতকার্যতারই লক্ষণ বটে। সাহাবায়ে কেরামের সাথে মোট উট ছিল সত্তরটি। প্রতি তিন জনের জন্য একটি, যাতে তারা পালাক্রমে সওয়ারী করেছিলেন। স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে অপর দু'জন একটি উটের অংশীদার ছিলেন। তাঁরা ছিলেন হযরত আবু লুবাবাহ্ ও হযরত আলী (রাঃ)। যখন হুযুর (সাঃ)-এর পায়ে হেঁটে চলার পালা আসতো, তখন তারা বলতেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, আপনি উটের উপরেই থাকুন, আপনার পরিবর্তে আমরা হেঁটে চলব। তাতে রাহমাতুল্লিল আলামীনের পক্ষ থেকে উত্তর আসত ঃ না, তোমরা আমার চাইতে বেশী বলিষ্ঠ, আর না আখেরাতের সওয়াবে আমার প্রয়োজন নেই যে, আমার সওয়াবের সুযোগটি তোমাদিগকে দিয়ে দেব। সুতরাং নিজের পালা এলে মহানবী (সাঃ)-ও পায়ে হেঁটে চলতেন।

অপরদিকে সিরিয়ার বিখ্যাত স্থান 'আইনে-যোর্‌কায়' পৌঁছে এক ব্যক্তি কোরায়েশ কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ানকে এ সংবাদ দিল যে, রসূলে করীম (সাঃ) তাদের এ কাফেলার অপেক্ষা করেছেন ; তিনি এর পশ্চাদ্ধাবন করবেন। আবু সুফিয়ান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করল। যখন কাফেলাটি হেজাযের সীমানায় পৌঁছাল, তখন বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম জনৈক দমদম্ ইবনে ওমরকে কুড়ি মেসকাল সোনা অর্থাৎ, প্রায় দু'হাজার টাকা মজুরী দিয়ে এ ব্যাপারে রাযী করাল যে, সে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রীতে চড়ে যথাশীঘ্র মক্কা মুকাররমায় গিয়ে এ সংবাদটি পৌঁছে দেবে যে, তাদের কাফেলা সাহাবায়ে-কেরামের আক্রমণ আশঙ্কার সম্মুখীন হয়েছে।

দম্ দম্ ইবনে ওমর সেকালের বিশেষ রীতি অনুয়ায়ী আশঙ্কার ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশে তার উষ্ট্রীর নাক-কান কেটে এবং নিজের পরিধেয় পোশাকের সামনা পেছনে ছিঁড়ে ফেলল এবং হাওদাটি উল্টোভাবে উষ্ট্রীর পিঠে বসিয়ে দিল। এটি ছিল সেকালে ঘোর বিপদের চিহ্ন। যখন সে এভাবে মক্কায় এসে ঢুকল, তখন গোটা মক্কা নগরীতে এক হৈ-চৈ পড়ে গেল, সাজ সাজ রব উঠল। সমস্ত কোরাইশ প্রতিরোধের জন্য তৈরী হয়ে গেল। যারা এ যুদ্ধে যেতে পারল, নিজেই অংশগ্রহণ করল। আর যারা কোন কারণে অপারক ছিল, তারা অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করল। এভাবে মাত্র তিন দিনের মধ্যে সমগ্র কোরাইশ বাহিনী পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

তাদের মধ্যে যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে গড়িমসি করত, তাদেরকে তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং মুসলমানদের সমর্থক বলে মনে করত। কাজেই এ ধরণের লোককে তারা বিশেষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিল। যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলমান ছিলেন এবং কোন অসুবিধার দরুন তখনও হিজরত করতে না পেরে মক্কাতে অবস্থান করছিলেন, তাদেরকে এবং বনু-হাশেম গোত্রের যেসব লোকের প্রতি সন্দেহ হতো যে, এরা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে, তাদেরকেও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। এ সমস্ত অসহায় লোকদের মধ্যে মহানবী (সাঃ)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং আবু তালেবের দুই পুত্র তালেব ও আকীলও ছিলেন।

যাহোক, এভাবে সব মিলিয়ে এই বাহিনীতে এক হাজার জওয়ান, দু'শ' ঘোড়া ছ'শ' বর্মধারী এবং সারী গায়িকা বাঁদীদল তাদের বাদ্যযন্ত্রাদিসহ বদর অভিমুখে রওনা হল। প্রত্যেক মঞ্জিলে তাদের খাবার জন্য দশটি করে উট জবাই করা হত।

অপরদিকে রসূলে করীম (সাঃ) শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক কাফেলার মোকাবেলা করার অনুপাতে প্রস্তুতি নিয়ে ১২ই রমযান শনিবার মদীনা তাইয়্যেবা থেকে রওনা হন এবং কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পর

বদরের নিকট এসে পৌঁছে দু'জন সাহাবীকে আবু সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেন।—(মাযহারী)

সংবাদবাহকরা ফিরে এসে জানালেন যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা মহানবীর পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ জানতে পেরে নদীর তীর ধরে অতিক্রম করে চলে গেছে। আর কোরাইশরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য মক্কা থেকে এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে।—(ইবনে-কাসীর)

বলাবাহুল্য, এ সংবাদে অবস্থার মোড় পাল্টে গেল। তখন রসূলে করীম (সাঃ) সঙ্গী সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আগত এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কি না। হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, তাদের মোকাবেলা করার মত শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা এমন কোন উদ্দেশ্য নিয়েও আসিনি। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং রসূলের নির্দেশ পালনের জন্য নিজেকে নিবেদন করলেন। তারপর হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং তেমনিভাবে নির্দেশ পালন ও জেহাদের জন্য প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করলেন। অতঃপর মেক্‌দাদ (রাঃ) উঠে নিবেদন করলেনঃ

"ইয়া রসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনি যে ফরমান পেয়েছেন, তা জারি করে দিন, আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহ্‌র কসম, আমরা আপনাকে এমন উত্তর দেব না, যা বনী-ইসরাঈলরা দিয়েছিল হযরত মূসা (আঃ)-কে। তারা বলেছিল ঃ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ অর্থাৎ, যান, আপনি ও আপনার রব (পালনকর্তা) গিয়ে লড়াই করুন, আমরা তো এখানেই বসে থাকলাম। সে সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের আবিসিনিয়ার 'বার্কুলগিমাদ' নামক স্থানে নিয়ে যান, তবুও আমরা জেহাদ করার জন্য আপনার সাথে যাব"।

মহানবী (সাঃ) হযরত মেকদাদের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং দোয়া করেন। কিন্তু তখনও আনসারগণের পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। আর এমন একটা সম্ভাবনাও ছিল যে, হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে আনসারগণের যে সহযোগিতা-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল যেহেতু তা ছিল মদীনার অভ্যন্তরের জন্য, সেহেতু তারা মদীনার বাইরে সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে বাধ্যও ছিলেন না। সুতরাং মহানবী (সাঃ) সভাসদকে লক্ষ্য করে বললেন-বন্ধুগণ, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও যে, আমরা এই জেহাদে মদীনার বাইরে এগিয়ে যাব কি না? এই সম্বোধনের মূল লক্ষ্য ছিলেন আনসারগণ। হযরত সা'দ ইবনে মো'আয আনসারী (রাঃ) হুযূর (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, আপনি কি আমাদিগকে জিজ্ঞেস করছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তখন সা'দ ইবনে মো'আয (রাঃ) বললেনঃ

"ইয়া রসূলাল্লাহ্ আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দান করেছি যে, আপনি যা কিছু বলেন তা সত্য। আমরা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, যে কোন অবস্থায় আপনার আনুগত্য করব। অতএব, আপনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে ফরমান লাভ করেছেন, তা জারি করে দিন। সে সত্তার কসম, যিনি আপনাকে দ্বীনে-হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদিগকে সমুদ্রে নিয়ে যান, তবে আমরা আপনার সাথে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্য থেকে কোন একটি লোকও আপনার কাছ থেকে সরে যাবে না। আপনি যদি কালই আমাদিগকে শত্রুর সম্মুখীন করে দেন, তবুও আমাদের মনে এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না। আমরা আশা করি, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের কর্মের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রত্যক্ষ করাবেন, যা দেখে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র নামে আমাদিগকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান।"

এ বক্তব্য শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অত্যন্ত খুশী হলেন এবং স্বীয় কাফেলাকে হুকুম করলেন, আল্লাহ্‌র নামে এগিয়ে যাও। সাথে সাথে এ সুসংবাদও শোনালেন যে, আমাদের আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ওয়াদা করেছেন যে, এ দু'টি দলের মধ্যে একটির উপর আমাদের বিজয় হবে। দু'টি দল বলতে, একটি হল আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা, আর অপরটি হল মক্কা থেকে আগত সৈন্যদল। অতঃপর তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি স্বচক্ষে দেখছি।

(—এ সমুদয় ঘটনা তফসীরে ইবনে-কাসীর এবং মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।)

وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ অর্থাৎ, মুসলমানদের একটি দল এই জেহাদকে কঠিন মনে করছিল বলে যে উক্তি করা হয়েছে, তাতে পরামর্শকালে সাহাবায়ে-কেরামের পক্ষ থেকে জেহাদের ব্যাপারে যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল, সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর এ ঘটনারই বিশ্লেষণ ব্যক্ত হয়েছে পরবর্তী يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ আয়াতে। অর্থাৎ, এরা আপনার সাথে সত্যের ব্যাপারে বিতর্ক ও বিরোধ করেছে যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে।

সাহাবায়ে-কেরাম যদিও কোন রকম নির্দেশ লংঘন করেননি ; বরং পরামর্শের উত্তরে নিজেদের দুর্বলতা ও ভীরুতা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু রসূলের সহচরদের কাছ থেকে এহেন মত প্রকাশও তাদের সুউচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র পছন্দ ছিল না, কাজেই অসন্তোষের ভাষায়ই তা বিবৃত করা হয়েছে।

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ
مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ
بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم
مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ
الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾ إِذْ
يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ
سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ
الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ
عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

(৯) তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে। (১০) আর আল্লাহ্ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাশক্তির অধিকারী, হেকমত ওয়ালা। (১১) যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন, যাতে তোমাদিগকে পবিত্র করে দেন এবং যাতে তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা। আর যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের অন্তরসমূহকে এবং তাতে যেন সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের পা গুলো। (১২) যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়। (১৩) যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের, সেজন্য এই নির্দেশ। বস্তুতঃ যে লোক আল্লাহ্ ও রসূলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। (১৪) আপাততঃ বর্তমান এ শাস্তি তোমরা আস্বাদন করে নাও এবং জেনে রাখ যে, কাফেরদের জন্য রয়েছে দোযখের আযাব। (১৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। (১৬) আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত—অন্যরা আল্লাহ্‌র গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুতঃ সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আনফালের শুরু থেকেই আল্লাহ্ তা'আলার সে সমস্ত নেয়ামতের আলোচনা চলছে যা তাঁর অনুগত বান্দাদের প্রতি প্রদত্ত হয়েছে। গযওয়ায়ে-বদরের ঘটনাগুলোও সে ধারারই কয়েকটি বিষয়। গযওয়ায়ে-বদরে যেসব নেয়ামত আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে দান করা হয়েছে তার প্রথমটি ছিল এ যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের যাত্রা করা যা كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ আয়াতে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় নেয়ামত হল ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করার ওয়াদা, যা وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। আর তৃতীয় নেয়ামত দোয়ার মঞ্জুরী ও সাহায্যের ওয়াদা পূরণ। আর তারই আলোচনা করা হয়েছে إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ আয়াতে। উল্লেখিত আয়াতসমূহের প্রথমটিতে রয়েছে চতুর্থ দানের আলোচনা। তাতে মুসলমানদের জন্য দু'টি নেয়ামতের কথা বলা হয়েছে। একটি হল সবার উপর তন্দ্রা নেমে আসার ফলে ক্লান্তি-শ্রান্তি বিদূরিত হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হল বৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দেয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রটিকে তাদের জন্য সমতল আর শত্রুদের জন্য কাদাপূর্ণ করে দেয়া।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কুফর ও ইসলামের সর্ব প্রথম এই সমর যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তখন মক্কার কাফের বাহিনী প্রথমে সেখানে পৌঁছে গিয়ে এমন জায়গায় অবস্থান নিয়ে নেয় যা উপরের দিকে ছিল। পানি ছিল তাদের নিকটে। পক্ষান্তরে মহানবী (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম সেখানে পৌঁছলে তাদেরকে অবস্থান গ্রহণ করতে হয় নিম্নাঞ্চলে। কোরআনে করীম এই যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা এ সূরার বিয়াল্লিশতম আয়াতে এভাবে বিবৃত করেছে — إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ এর সবিস্তার বিশ্লেষণ পরবর্তীতে করা হবে।

যেখানে পৌঁছার পর রসূলে করীম (সাঃ) প্রথম অবস্থান গ্রহণ করেন, সে স্থানের সাথে পরিচিত হযরত হোবাব ইবনে মুনযির (রাঃ) স্থানটিকে যুদ্ধের জন্য অনুপযোগী বিবেচনা করে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! যে জায়গাটি আপনি গ্রহণ করেছেন,তা কি আপনি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে গ্রহণ করেছেন, যাতে আমাদের কিছু বলার কোন অধিকার নেই, না কি শুধুমাত্র নিজের মত ও অন্যান্য কল্যাণ বিবেচনায় বেছে নিয়েছেন? হুযূর আকরাম (সাঃ) বললেন, না, এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ নয়; এতে পরিবর্তনও করা যেতে পারে। তখন হোবাব ইবনে- মুনযির (রাঃ) নিবেদন করলেন, তাহলে এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে মক্কী সর্দারদের বাহিনীর নিকটবর্তী একটি পানিপূর্ণ স্থান রয়েছে, সেটি অধিকার করাই হবে উত্তম। মহানবী (সাঃ) তাঁর এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেখানে পৌঁছে পানির উপর কব্জা করে নেন। একটি হাউজ বানিয়ে তাতে পানির সঞ্চয় গড়ে তোলেন।

এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর হযরত সা'দ ইবনে মো'আয (রাঃ) নিবেদন করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার জন্য কোন একটি সুরক্ষিত স্থানে একটি সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে দিতে চাই। সেখানে আপনি অবস্থান করবেন এবং আপনার সওয়ারীগুলিও আপনার কাছেই থাকবে।

এর উদ্দেশ্য এই যে, আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ করব। আল্লাহ্ যদি আমাদিগকে বিজয় দান করেন, তবে তো এটাই উদ্দেশ্য। আর যদি

খোদানাখাস্তা অন্য কোন অবস্থার উদ্ভব হয়ে যায়, তাহলে আপনি আপনার সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের সাথে গিয়ে মিশবেন, যাঁরা মদীনা-তাইয়্যেবায় রয়ে গেছেন। কারণ, আমার ধারণা, তাঁরাও একান্ত জীবন উৎসর্গকারী এবং আপনার সাথে মহব্বতের ক্ষেত্রে তাঁরাও আমাদের চাইতে কোন অংশে কম নয়। আপনার মদীনা থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁরা যদি একথা জানতেন যে, আপনাকে এহেন সুসজ্জিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে, তাহলে তাদের একজনও পেছনে থাকতেন না। আপনি মদীনায় গিয়ে পৌঁছলে তাঁরা হবেন আপনার সহকর্মী। মহানবী (সাঃ) তার এই বীরোচিত প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে দোয়া করলেন এবং তাঁর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সামিয়ানার ব্যবস্থা করে দেয়া হল। তাতে মহানবী (সাঃ) এবং সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। হযরত মো'আয (রাঃ) তাঁদের হেফাযতের জন্য তরবারি হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে– ছিলেন।

যুদ্ধের প্রথম রাত। তিনশ' তের জন নিরস্ত্র লোকের মোকাবেলা নিজেদের চাইতে তিন গুণ অর্থাৎ, প্রায় এক হাজার লোকের এক বাহিনীর সাথে। যুদ্ধক্ষেত্রের উপযুক্ত স্থানটিও ওদের দখলে। পক্ষান্তরে নিম্নাঞ্চল, তাও বালুময় এলাকা, যাতে চলাফেরাও কষ্টকর, সেটি পড়ল মুসলমানদের ভাগে। স্বাভাবিকভাবেই পেরেশানী ও চিন্তা-দুর্ভাবনা সবারই মধ্যে ছিল; কারো কারো মনে শয়তান এমন ধারণাও সঞ্চার করেছিল যে, তোমরা নিজেদেরকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী কর এবং এখনও আরাম করার পরিবর্তে তাহাজ্জুদের নামাযে ব্যাপৃত রয়েছে। অথচ সবদিক দিয়েই শত্রুরা তোমাদের উপর বিজয়ী এবং ভাল অবস্থায় রয়েছে। এমনি অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের উপর এক বিশেষ ধরনের তন্দ্রা চাপিয়ে দিলেন। তাতে ঘুমানোর কোন প্রবৃত্তি থাক বা নাই থাক জবরদস্তি সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

হাফেযে হাদীস আবু ইয়া'লা উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আলী মুর্তবা (রাঃ) বলেছেন, বদর যুদ্ধের এই রাতে কেউ ছিল না, যে ঘুমায়নি। শুধু রসূলে করীম (সাঃ) সারা রাত জেগে থেকে ভোর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামাযে নিয়োজিত থাকেন।

ইবনে-কাসীর বিশুদ্ধ সনদসহ উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এ রাতে যখন স্বীয় 'আরীশ' অর্থাৎ, সামিয়ানার নীচে তাহাজ্জুদ নামাযে নিয়োজিত ছিলেন তখন তাঁর চোখেও সামান্য তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসতে হাসতে জেগে ওঠে বলেন, হে আবু বকর ! সুসংবাদ শুন ; এই যে জিবরাঈল (আঃ) টিলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। একথা বলতে বলতে তিনি— سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ আয়াতটি পড়তে পড়তে সামিয়ানার বাইরে বেরিয়ে এলেন। আয়াতের অর্থ এই যে, শীঘ্রই শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়ে যাবে এবং পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে যাবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি সামিয়ানার বাইরে এসে বিভিন্ন জায়গার প্রতি ইশারা করে বললেন, এটা আবু জাহ্লের হত্যা স্থান, এটা অমুকের; সেটা অমুকের। অতঃপর ঘটনা তেমনিভাবে ঘটতে থাকে।— (তফসীরে মাযহারী) আর বদর যুদ্ধে যেমন ক্লান্তি-পরিশ্রান্তি দুর করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের উপর এক বিশেষ ধরনের তন্দ্রালুতা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি ঘটনা ঘটেছিল ওহুদ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও।

সুফিয়ান সওরী (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, যুদ্ধাবস্থায় ঘুম আসাটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শান্তি ও স্বস্তির লক্ষণ, আর নামাযের সময় ঘুম আসাটা শয়তানের পক্ষ থেকে।— (ইবনে-কাসীর)

এ রাতে মুসলমানগণ দ্বিতীয় যে নেয়ামতটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা ছিল বৃষ্টি। এর ফলে গোটা সমরাঙ্গনের চেহারাই পাল্টে যায়। কোরাইশ সৈন্যেরা যে জায়গাটি দখল করেছিল তাতে বৃষ্টি হয় খুবই তীব্র এবং সারা মাঠ জুড়ে কাদা হয়ে গিয়ে চলাচলই দুষ্কর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যেখানে মহানবী (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম অবস্থান করছিলেন, সেখানে বালুর কারণে চলাচল করা ছিল দুষ্কর। বৃষ্টি এখানে অল্প হয়। যাতে সমস্ত বালুকে বসিয়ে দিয়ে মাঠকে অতি সমতল ও আরামদায়ক করে দেয়া হয়।

উল্লেখিত আয়াতে এ দু'টি নেয়ামতের কথাই বলা হয়েছে। (১) নিদ্রা ও (২) বৃষ্টি, যাতে গোটা মাঠের রূপই বদলে যায় এবং দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের মন থেকে সে সমস্ত শয়তানী ওসওসা ধুয়ে- মুছে যায় যে, আমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও পরাজিত ও পতিত বলে মনে হচ্ছে, অথচ শত্রুরা অন্যায়ের উপর থেকেও শক্তি-সামর্থ্য ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা চাপিয়ে দিচ্ছিলেন তোমাদিগকে প্রশান্তি দান করার জন্য; আর তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করছিলেন, যেন তোমাদের পবিত্র করে দেন এবং যেন তোমাদের মন থেকে শয়তানী ওসওসা দূর করে দেন। আর যেন তোমাদের মনকে সুদৃঢ় করেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়পদ করেন।

দ্বিতীয় আয়াতে পঞ্চম নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা বদরের সমরাঙ্গনে মুসলমানদের দেয়া হয়েছে। তাহল এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যেসব ফেরেশতাকে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন তাঁদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, তোমরা ঈমানদারদিগকে সাহস দান করতে থাক। আমি এখনই কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিচ্ছি। বস্তুতঃ তোমরা কাফেরদের গর্দানের উপর অস্ত্রের আঘাত হান; তাদের হত্যা কর দলে দলে।

এভাবে ফেরেশতাদিগকে দু'টি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। প্রথমতঃ মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি করবে। একাজটি ফেরেশতাগণ কর্তৃক মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে দলবৃদ্ধি করে কিংবা তাঁদের সাথে মিলে যুদ্ধ করার মাধ্যমেও হতে পারে এবং নিজেদের দৈবক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরসমূহকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করেও হতে পারে। যাহোক তাঁদের উপর দ্বিতীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যে, ফেরেশতাগণ নিজেরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এবং কাফেরদের উপর আক্রমণও করবেন। সুতরাং এ আয়াতের দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতাগণ উভয় দায়িত্বই যথাযথ সম্পাদন করেছেন। মুসলমানদের মনে দৈবক্ষমতা প্রয়োগক্রমে তাদের সাহস ও বল বৃদ্ধিও করেছেন এবং যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। তদুপরি বিষয়টির সমর্থন কতিপয় হাদীসের বর্ণনার দ্বারাও হয়, যা তফসীরে দুররে-মনসুর ও মাযহারীতে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। তাতে ফেরেশতাদের যুদ্ধ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের চাক্ষুস সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করা হয়েছে।

আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুফর ও ইসলামের এ সম্মুখ সমরে যা কিছু ঘটেছে তার কারণ ছিল কুফ্ফার কর্তৃক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ। আর যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার উপর আরোপিত হয় আল্লাহ্ তাআলার সুকঠিন

আযাব। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, বদর যুদ্ধে একদিকে মুসলমানদের উপর নাযিল হয়েছে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতরাজি,অপরদিকে কাফেরদের উপর মুসলমানদের মাধ্যমে আযাব নাযিল করে তাদেরই অসদাচরণের যৎসামান্য শাস্তি দেয়া হয়েছে। অবশ্য তার চেয়ে কঠিন শাস্তি হবে আখেরাতে। আর তাই বলা হয়েছে চতুর্থ আয়াতে — ذٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكٰفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ, এটা হল আমার যৎসামান্য আযাব; এর আস্বাদ গ্রহণ কর এবং জেনে রাখ যে, এরপরেও কাফেরদের জন্য আরো আযাব আসবে, যা হবে অত্যন্ত কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী ও কল্পনাতীত।

উল্লেখিত ১৫ ও ১৬ আয়াত দু'টিতে ইসলামের একটি সমরনীতি বাতলে দেয়া হয়েছে। ১৫ নং আয়াতে زحف শব্দের মর্মার্থ হল, উভয় বাহিনীর মোকাবেলা ও মুখোমুখি সংঘর্ষ। অর্থাৎ, এমনভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবার পর পশ্চাদপসরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের জন্যে জায়েয নয়।

১৬ নং আয়াতে এই হুকুমের আওতা থেকে একটি অব্যাহতি এবং না–জায়েয পন্থায় পলায়নকারীদের সুকঠিন আযাবের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

দু'টি অবস্থার ক্ষেত্রে অব্যাহতি রয়েছে— إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ অর্থাৎ, যুদ্ধাবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা দুই অবস্থায় জায়েয। প্রথমতঃ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এ পশ্চাদপসরণ হবে শুধুমাত্র যুদ্ধের কৌশলস্বরূপ, শত্রুকে দেখাবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এতে যুদ্ধ ছেড়ে পলায়নের কোন উদ্দেশ্য থাকবে না; বরং প্রতিপক্ষকে অসতর্কবস্থায় ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করাই থাকবে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এটাই হল إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ এর অর্থ। কারণ, تحرف অর্থ হয় কোন একদিকে ঝুঁকে পড়া।— (রূহুল–মা'আনী)

দ্বিতীয়তঃ বিশেষ কোন অবস্থা— যাতে সমরক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণের অনুমতি রয়েছে, তাহল এই যে, নিজেদের উপস্থিত সৈন্যদের দুর্বলতা বোধ করে সেজন্যে পেছনের দিকে সরে আসা যাতে মুজাহিদগণ অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করতে সমর্থ হয়। أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ এর অর্থ তাই। কারণ, تحيز এর আভিধানিক অর্থ হল মিলিত হওয়া এবং فِئَةٍ অর্থ দল। কাজেই এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, নিজেদের দলের সাথে মিলিত হয়ে শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করার উদ্দেশে সমরাঙ্গন থেকে পেছনের দিকে সরে আসলে তা জায়েয।

এই স্বতন্ত্রতার বর্ণনার পর সেসব লোকের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যারা এই স্বতন্ত্রাবস্থা ছাড়াই অবৈধভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছে কিংবা পশ্চাদপসরণ করেছে। এরশাদ হয়েছে —

فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

অর্থাৎ, যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যারা পালিয়ে যায় তারা আল্লাহ্ তাআলার গযব নিয়ে ফিরে যায় এবং তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর সেটি হল নিকৃষ্ট অবস্থান।

এ আয়াত দু'টির দ্বারা এই নির্দেশ বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ সংখ্যা, শক্তি ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে যতবেশীই হোক না কেন, মুসলমানদের জন্য তাদের মোকাবেলা থেকে পশ্চাদপসরণ করা হারাম, দু'টি স্বতন্ত্র অবস্থা ব্যতীত। তা হল এই যে, এই পশ্চাদপসরণ পলায়নের উদ্দেশ হবে না ; বরং তা হবে পাঁয়তারা, পরিবর্তন কিংবা শক্তি অর্জনের মাধ্যমে পুরাক্রমণের উদ্দেশে।

বদর যুদ্ধকালে যখন এ আয়াতগুলো নাযিল হয়,তখন এটাই ছিল সাধারণ হুকুম যে, নিজেদের সৈন্য সংখ্যার সাথে প্রতিপক্ষের কোন তুলনা করা না গেলেও পশ্চাদপসরণ কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়া জায়েয নয়। বদর যুদ্ধের অবস্থাও ছিল তাই। মাত্র তিনশ' তের জনকে মোকাবেলা করতে হচ্ছিল তিন গুণ অর্থাৎ, এক হাজারের অধিক সৈন্যের সাথে। তারপরে অবশ্য এই হুকুমটি শিথিল করার জন্য সূরা আন্‌ফালের ৬৫ ও ৬৬ তম আয়াত নাযিল করা হয়। ৬৫তম আয়াতে বিশ জন মুসলমানকে দু'শ' কাফেরের সাথে এবং একশ' মুসলমানকে এক হাজার কাফেরের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়। তারপর ৬৬ তম আয়াতে তা আরো শিথিল করার জন্য এ বিধান অবতীর্ণ হয়— الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ অর্থাৎ, এখন আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে এই বিধান জারি করেছেন যে, দৃঢ়চিত্ত মুসলমান যদি একশ' হয় তবে তারা দু'শ' কাফেরের উপর জয়ী হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে যে, নিজেদের দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় মুসলমানদেরই জয়ী হওয়ার আশা করা যায়। কাজেই এমন ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ করা জায়েয নয়। তবে প্রতিপক্ষের সংখ্যা যদি দ্বিগুণের চেয়ে বেশী হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা জায়েয রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি একা তিন ব্যক্তির মোকাবেলা থেকে পালিয়ে যায়, তা পলায়ন নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি দু'জনের মোকাবেলা থেকে পালায় সেই পলাতক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ, সে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হবে।— (রূহুল–মা'আনী) এখন এই হুকুমই কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

অধিকাংশ উম্মত এবং চার ইমামের মতেও এটাই শরীয়তের নির্দেশ যে, প্রতিপক্ষের সংখ্যা যতক্ষণ না দ্বিগুণের বেশী হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া হারাম ও গোনাহে–কবীরা।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাতটি বিষয়কে মানুষের জন্য মারাত্মক বলেছেন। সেগুলোর মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত। কাজেই গযওয়ায়ে হুনাইনের ঘটনায় সাহাবায়ে কেরামের প্রাথমিক পশ্চাদপসরণকে কোরআনে করীম একটি শয়তানী পদস্খলন বলে সাব্যস্ত করেছে, যা মহাপাপেরই দলীল। এরশাদ হয়েছে—

إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ

তাছাড়া তিরমিযী ও আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)–এর এক কাহিনী বর্ণিত রয়েছে যে, একবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে মদীনা এসে আশ্রয় নেন এবং মহানবী (সাঃ)–এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই বলে অপরাধ স্বীকার করেন যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক অপরাধীতে পরিণত হয়ে পড়েছি। মহানবী (সাঃ) অসন্তোষ প্রকাশের পরিবর্তে তাঁকে সান্ত্বনা দান করলেন। বললেন : بل انتم العكارون وانا فئتكم *অর্থাৎ, "তোমরা পলাতক নও ; বরং অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে*

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ
لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ۞ اِنْ
تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ
اِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ
وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۞ وَلَا
تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۞ اِنَّ
شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا
يَعْقِلُوْنَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ
اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۞ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ
وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗۤ اِلَيْهِ
تُحْشَرُوْنَ ۞ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
مِنْكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞

(১৭) সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহ্‌ই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ্ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি এহ্‌সান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত। (১৮) এটাতো গেল, আর জেনে রেখো, আল্লাহ্ নস্যাৎ করে দেবেন কাফেরদের সমস্ত কলা-কৌশল। (১৯) তোমরা যদি মীমাংসা কামনা কর, তাহলে তোমাদের নিকট মীমাংসা পৌঁছে গেছে। আর যদি তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যদি তাই কর,তবে আমিও তেমনি করব। বস্তুতঃ তোমাদের কোনই কাজে আসবে না তোমাদের দল-বল, তা যত বেশীই হোক। জেনে রেখ, আল্লাহ্ রয়েছেন ঈমানদারদের সাথে। (২০) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না। (২১) আর তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা বলে যে, আমরা শুনেছি, অথচ তারা শোনে না। (২২) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলার নিকট সমস্ত প্রাণীর তুলনায় তারাই মূক ও বধির, যারা উপলব্ধি করে না। (২৩) বস্তুতঃ আল্লাহ্ যদি তাদের মধ্যে কিছুমাত্র শুভ চিন্তা জানতেন, তবে তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন। আর এখনই যদি তাদের শুনিয়ে দেন, তবে তারা মুখ ঘুরিয়ে পালিয়ে যাবে। (২৪) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ্ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুতঃ তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে। (২৫) আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষতঃ শুধু তাদের উপর পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ্‌র আযাব অত্যন্ত কঠোর।

পুনর্বার আক্রমণকারী, আর আমি হলাম তোমাদের জন্য সে অতিরিক্ত শক্তি।" এতে মহানবী (সাঃ) এ বাস্তবতাকেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে,তাঁদের পালিয়ে এসে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ সেই স্বাতন্ত্র্যের অন্তর্ভুক্ত যাতে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশে সমরাঙ্গন ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-ওমর (রাঃ) আল্লাহ্ তাআলার ভয়-ভীতি ও মহত্ত্ব-জ্ঞানের যে সুউচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারই ভিত্তিতে তিনি এই বাহ্যিক পশ্চাদপসরণেও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং সেজন্যই নিজেকে অপরাধী হিসাবে মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত করছিলেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৭ নং আয়াতে গযওয়ায়ে বদরের অপরাপর ঘটনাবলী বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণকে হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে অধিকের সাথে অল্পের এবং সবলের সাথে দুর্বলের অলৌকিক বিজয়কে তোমরা নিজেদের চেষ্টার ফসল বলে মনে করো না; বরং সে মহান সত্তার প্রতি লক্ষ্য কর; যাঁর সাহায্য-সহায়তা গোটা যুদ্ধেরই চেহারা পাল্টে দিয়েছে।

এ আয়াতে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তারই বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইবনে জরীর ও হযরত বায়হাকী (রহঃ) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, বদর যুদ্ধের দিনে যখন মক্কার এক হাজার জওয়ানের বাহিনী টিলার পেছন দিক থেকে ময়দানে এসে উপস্থিত হয়, তখন মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা একান্ত গর্বিত ও সদম্ভ ভঙ্গীতে উপস্থিত হয়। সে সময় রসূলে করীম (সাঃ) দোয়া করেন, "ইয়া আল্লাহ্, আপনাকে মিথ্যা জ্ঞানকারী এই কোরাইশরা গর্ব ও দম্ভ নিয়ে এগিয়ে আসছে, আপনি বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন, তা যথা শীঘ্র পূরণ করুন।"— (রূহুল-বয়ান) তখন হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) অবতীর্ণ হয়ে নিবেদন করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ আপনি এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে শত্রুবাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করুন। তিনি তাই করলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে-হাতেম হযরত ইবনে-যায়েদের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সাঃ) তিন বার মাটি ও কাঁকরের মুঠো তুলে নেন এবং একটি শত্রুবাহিনীর ডান অংশের উপর, একটি বাম অংশের উপর এবং একটি সামনের দিকে নিক্ষেপ করেন। তার ফল দাঁড়ায় এই যে, সেই এক কিংবা তিন মুষ্ঠি কাঁকরকে আল্লাহ্ একান্ত ঐশীভাবে এমন বিস্তৃত করে দেন যে, প্রতিপক্ষের সৈন্যদের এমন একটি লোকও বাকী ছিল না,যার চোখে অথবা মুখমণ্ডলে এই ধূলি ও কাঁকর পৌঁছেনি। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় গোটা শত্রুবাহিনীর মাঝে এক ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়। আর এই সুযোগে মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করে। ফেরেশতাগণ পৃথকভাবে তাঁদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিলেন।— (মাযহারী, রূহুল-বয়ান)

শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের কিছু লোক নিহত হয়, কিছু হয় বন্দী; আর বাকী সবাই পালিয়ে যায় এবং ময়দান চলে আসে মুসলমানদের হাতে।

সম্পূর্ণ নৈরাশ্য ও হতাশার মধ্যে মুসলমানগণ এই মহান বিজয় লাভে সমর্থ হন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার পর তাদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়। সাহাবায়ে—কেরাম একে অপরের কাছে নিজ নিজ কৃতিত্বের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে নাযিল হয়- فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ আয়াত। এতে তাঁদেরকে হেদায়েত দান

করা হয় যে, কেউ নিজের চেষ্টা-চরিত্রের জন্য গর্ব করো না; যা কিছু ঘটেছে তা শুধুমাত্র তোমাদের পরিশ্রম ও চেষ্টারই ফসল নয়; বরং এটা আল্লাহ্ তাআলার একান্ত সাহায্য ও সহায়তারই ফল। তোমাদের হাতে যেসব শত্রু নিহত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে তোমরা হত্যা করনি ; বরং আল্লাহ্ তাআলাই হত্যা করেছেন।

এমনিভাবে রসূলে করীম (সাঃ)-কে উদ্দেশ করে এরশাদ হয়েছে وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ অর্থাৎ, আপনি যে কাঁকরের মুঠো নিক্ষেপ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং স্বয়ং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছেন। সারমর্ম হচ্ছে, যে, কাঁকর নিক্ষেপের এই ফলাফল যে, তা প্রতিটি শত্রু সৈন্যের চোখে পৌঁছে গিয়ে সবাইকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেয়, এটা আপনার নিক্ষেপের প্রভাবে হয়নি ; বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কুদরতের দ্বারা এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন।

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, মুসলমানদের জন্য জেহাদে বিজয় লাভের চাইতেও অধিক মূল্যবান ছিল এই হেদায়েতটি যা তাদের মনমানসকে উপকরণ থেকে ফিরিয়ে উপকরণের স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং তাতে করে এমন অহংকার ও আত্মগর্বের অভিশাপ থেকে তাঁদেরকে মুক্তি দান করে, যার নেশায় সাধারণতঃ বিজয়ী সম্প্রদায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর বলে দেয়া হয়েছে যে, জয়-পরাজয় আমারই হুকুমের অধীন। আর আমার সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করে যারা অনুগত। وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا অর্থাৎ, আমি মুমিনগণকে এই মহাবিজয় দিয়েছি তাদের পরিশ্রমের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়ার উদ্দেশে। بَلَاءً এর শব্দগত অর্থ হল পরীক্ষা। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাআলার পরীক্ষা কখনো হয় বিপদাপদের সম্মুখীন করে, আবার কখনো হয় ধন-দৌলত ও সাহায্য-বিজয় দানের মাধ্যমে। بلاء حسن বলা হয় এমন পরীক্ষাকে যা আয়েশ-আরাম, ধন-সম্পদ ও সাহায্য দানের মাধ্যমে নেয়া হয়। এতে দেখা হয় যে, এরা একে আমার অনুগ্রহের দান মনে করে শুকরিয়া আদায় করে, নাকি একে নিজেদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার ফল ধারণা করে গর্ব ও অহঙ্কারে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং কৃত আমলকে বরবাদ করে দেয়। কারণ, আল্লাহ্ তাআলার দরবারে কারও গর্বাহঙ্কারের কোন অবকাশ নেই।

পরবর্তী আয়াতে এর পাশাপাশি এই বিজয়ের আরও একটি উপকারিতার কথা বাতলে দেয়া হয়েছে যে, ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ অর্থাৎ, মুসলমানদিগকে এ বিজয় এ কারণেই দেয়া হয়েছে যেন এর মাধ্যমে কাফেরদের পরিকল্পনা ও কলা-কৌশলসমূহকে নস্যাৎ করে দেয়া যায় এবং যাতে কাফেররা একথা উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ্ তাআলার সহায়তা আমাদের প্রতি নেই এবং কোন কলা-কৌশল তথা পরিকল্পনাই আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ছাড়া কৃতকার্য হতে পারে না।

পঞ্চম আয়াতে পরাজিত কোরায়েশী কাফেরদের সম্বোধন করে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা করার উদ্দেশে কোরায়শ বাহিনীর মক্কা থেকে বেরোবার সময় ঘটেছিল।

ঘটনাটি এই যে, কোরায়েশ কাফেরদের বাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশে প্রস্তুতি নেয়ার পর মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে বাহিনী প্রধান আবু জাহ্ল প্রমুখ বায়তুল্লাহ্র পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিল। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই দোয়া করতে গিয়ে তারা নিজেদের বিজয়ের দোয়ার পরিবর্তে সাধারণ বাক্যে এভাবে দোয়া করেছিলঃ

ইয়া আল্লাহ্! উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি উত্তম ও উচ্চতর, উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি বেশী হেদায়েতের উপর রয়েছে এবং উভয় দলের যেটি বেশী ভদ্র ও শালীন এবং উভয়ের মধ্যে যে ধর্ম উত্তম তাকেই বিজয় দান করো।'—(মাযহারী)

এই নির্বোধেরা এ কথাই ভাবছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় আমরাই উত্তম ও উচ্চতর এবং অধিক হেদায়েতের উপর রয়েছি, কাজেই এ দোয়াটি আমাদেরই অনুকূলে হচ্ছে। আর এই দোয়ার মাধ্যমে তারা কামনা করছিল, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যেন হক ও বাতেল তথা সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল, যখন আমরা বিজয় অর্জন করব, তখন এটাই হবে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের সত্যতার ফয়সালা।

কিন্তু তারা একথা জানত না যে, এই দোয়ার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের জন্য বদদোয়া ও মুসলমানদের জন্য নেক-দোয়া করে যাচ্ছে। যুদ্ধের ফলাফল সামনে আসার পর কোরআনে করীম তাদের বাতলে দিল إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ অর্থাৎ, তোমরা যদি ঐশী মীমাংসা কামনা কর, তবে তা সামনে এসে গেছে। সত্যের জয় এবং মিথ্যার পরাজয় সূচিত হয়েছে। وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ অর্থাৎ, আর যদি তোমরা এখনও কুফরীজনিত শত্রুতা পরিহার কর, তাহলে তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ আর তোমরা আবারো যদি নিজেদের দুষ্টামী ও যুদ্ধের দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও মুসলমানদের সাহায্যের দিকে ফিরে যাব। وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ অর্থাৎ, তোমাদের দল ও জোট যতই অধিক হোক না কেন, আল্লাহ্র সাহায্যের মোকাবেলায় তা কোন কাজেই লাগবে না। وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ যখন মুসলমানদের সাথে রয়েছেন, তখন কোন দল তোমাদের কিই বা কাজে লাগতে পারে?

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ অর্থাৎ, সর্বপ্রকার উপকরণ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও মক্কার মুশরিকদের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ ছিল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা। এতে সে সমস্ত লোকের জন্য এক চরম শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে, যারা আসমান-যমীনের স্রষ্টা ও একচ্ছত্র মালিকের পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও গায়েবী শক্তিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র স্থূল ও জড়-উপকরণ এবং শক্তির উপর নির্ভর করে থাকে, কিংবা আল্লাহ্র না-ফরমানী করা সত্ত্বেও তাঁর সাহায্য লাভের ভ্রান্ত আশার মাধ্যমে নিজের সাথে প্রতারণা করে।

উল্লেখিত আয়াতে এরই দ্বিতীয় আরেকটি দিক মুসলমানদের সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা হল এই যে, মুসলমানগণ তাদের সংখ্যাল্পতা ও নিঃসম্বলতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সাহায্যের মাধ্যমেই এহেন বিপুল বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। আর এই যে সাহায্য, এটা হল আল্লাহ্র প্রতি তাঁদের আনুগত্যের ফল। এই আনুগত্যের উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকার জন্য মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য অবলম্বন কর এবং তাতে স্থির থাক। অতঃপর

এ বিষয়টির প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ অর্থাৎ, কোরআন ও সত্যের বাণী শুনে নেবার পরেও তোমরা আনুগত্য-বিমুখ হয়ো না।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ অর্থাৎ, তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা মুখে একথা বলে সত্য যে; আমরা শুনে নিয়েছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই শুনেনি। 'সে সমস্ত লোক' বলতে উদ্দেশ হল সাধারণ কাফেরকুল, যারা শোনার দাবী করে বটে, কিন্তু বিশ্বাস করে বলে দাবী করে না এবং এতে মুনাফেকও উদ্দেশ যারা শোনার সাথে সাথে বিশ্বাসেরও দাবীদার, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা এবং সঠিক উপলব্ধি থেকে এতদুভয় সম্প্রদায়ই বঞ্চিত। কাজেই তাদের এই শ্রবণ না শোনারই শামিল। মুসলমানদিগকে এদের অনুরূপ হতে বারণ করা হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে সে সমস্ত লোকের কঠিন নিন্দা করা হয়েছে, যারা সত্য ও ন্যায়ের বিষয় গভীর মনোযোগ ও নিবিষ্টতার সাথে শ্রবণ করে না এবং তা কবুলও করে না। এহেন লোককে কোরআনে করীম চতুষ্পদ জীব-জন্তু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করেছে। এরশাদ করেছে ঃ

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

الدَّوَابِّ শব্দটি دابة এর বহুবচন। অভিধান অনুযায়ী যমীনের উপর বিচরণকারী প্রতিটি জীবকেই دابة বলা হয়। কিন্তু সাধারণ প্রচলন ও পরিভাষায় دابة বলা হয় শুধুমাত্র চতুষ্পদ জন্তুকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ্র নিকট সে সমস্ত লোকই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও চতুষ্পদ জীবতুল্য যারা সত্য ও ন্যায়ের শ্রবণের ব্যাপারে বধির এবং তা গ্রহণ করার ব্যাপারে মুক। বস্তুতঃ মুক ও বধিরদের মধ্যে, সামান্য বুদ্ধি থাকলেও তারা ইঙ্গিত-ইশারায় নিজেদের মনের কথা ব্যক্ত করে এবং অন্যের কথা উপলব্ধি করে নেয়। অথচ এরা মুক ও বধির হওয়ার সাথে সাথে নির্বোধও বটে। বলাবাহুল্য, যে মুক-বধির বুদ্ধি বিবির্জিতও হবে, তাকে বুঝবার এবং বুঝাবার কোনই পথ থাকে না।

এ আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মানুষকে যে فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (সুগঠিত অঙ্গ সৌষ্ঠব) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সৃষ্টির সেরা ও বিশ্বের বরেণ্য করা হয়েছে এই যাবতীয় এন্আম ও কৃপা শুধু সত্যের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। যখন মানুষ সত্য ও ন্যায়কে শুনতে, উপলব্ধি করতে এবং তা মেনে নিতে অস্বীকার করে, তখন এই সমুদয় পুরস্কার ও কৃপা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তার ফলে সে জানোয়ার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

তফসীরে রূহুল-বয়ান গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, মানুষ প্রকৃত সৃষ্টির দিক দিয়ে সমস্ত জীব-জানোয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ফেরেশতা অপেক্ষা নিম্ন মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু যখন সে তার অধ্যাবসায়, আমল ও সত্যানুগত্যের সাধনায় ব্রতী হয়, তখন ফেরেশতা অপেক্ষাও উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি সত্যানুগত্যে বিমুখ হয়, তখন নিকৃষ্টতার সর্বনিম্ন পর্যায়ে উপনীত হয় এবং জানোয়ার অপেক্ষাও অধম হয়ে যায়।

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যদি তাদের মধ্যে সামান্যতম কল্যাণকর দিক তথা সৎচিন্তা দেখতেন, তবে তাদেরকে বিশ্বাস সহকারে শোনার সামর্থ্য দান করতেন কিন্তু বর্তমান সত্যানুরাগ না থাকা অবস্থায় যদি আল্লাহ্ তাআলা সত্য ও ন্যায় কথা তাদেরকে শুনিয়ে দেন, তাহলে তারা অনীহাভরে তা থেকে বিমুখতা অবলম্বন করবে।

এখানে কল্যাণকর দিক বা সৎচিন্তা বলতে সত্যানুরাগ বুঝানো হয়েছে। কারণ, অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমেই চিন্তা-ভাবনা ও উপলব্ধির দ্বারা উদঘাটিত হয় এবং এতেই বিশ্বাস ও আমলের সামর্থ্য লাভ হয়। পক্ষান্তরে যার মাঝে সত্যানুরাগ বা অনুসন্ধিৎসা নেই, তাতে যেন কোন রকম কল্যাণ নেই। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যদি কোন রকম ভালাই থাকত, তবে তা আল্লাহ্ তাআলার অবশ্যই জানা থাকত। যখন আল্লাহ্ তাআলার জানা মতে তাদের মধ্যে কোন ভালাই তথা সৎচিন্তা নেই, তখন একথাই প্রতীয়মান হল যে, প্রকৃতপক্ষেই তারা যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। আর এই প্রবঞ্চিত অবস্থায় তাদেরকে যদি চিন্তা-ভাবনা ও সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়, তবে তারা কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করবে না, বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়েই নেবে। অর্থাৎ, তাদের এই বিমুখতা এ কারণে হবে না যে, তারা দ্বীনের মধ্যে কোন আপত্তিকর বিষয় দেখতে পেয়েছে, সে জন্যই তা গ্রহণ করেনি; বরং প্রকৃতপক্ষে তারা সত্যের বিষয় কোন লক্ষ্যই করেনি।

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ অর্থাৎ, জেনে রাখ, আল্লাহ্ তাআলা মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন। এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে এবং উভয়টির মধ্যেই বিরাট তাৎপর্য ও শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায়, যা প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা কর্তব্য।

একটি অর্থ এই হতে পারে যে, যখনই কোন সৎকাজ করার কিংবা পাপ থেকে বিরত থাকার সুযোগ আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা করে ফেলো; এতটুকু বিলম্ব করো না এবং অবকাশকে গনীমত জ্ঞান কর। কারণ, কোন কোন সময় মানুষের ইচ্ছার মাঝে আল্লাহ্ নির্ধারিত কাযা বা নিয়তি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং সে তখন আর নিজের ইচ্ছায় সফল হতে পারে না। কোন রোগ-শোক, মৃত্যু কিংবা এমন কোন কাজ উপস্থিত হয়ে যেতে পারে, যাতে সে কাজ করার আর অবকাশ থাকে না। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হল আয়ু এবং সময়ের অবকাশকে গনীমত মনে করা। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে না রাখা। কারণ, একথা কারোই জানা নেই, কাল কি হবে।

তাছাড়া এ বাক্যের দ্বিতীয় মর্ম এও হতে পারে যে, এতে আল্লাহ্ তাআলা যে বন্দার অতি সন্নিকটে তাই বলে দেয়া হয়েছে। যেমন, অন্য আয়াত وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ এতে আল্লাহ্ তাআলা যে মানুষের জীবন শিরার চেয়েও নিকটবর্তী সেকথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, মানবাত্মা সর্বক্ষণ আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যখনই তিনি কোন বন্দাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে চান, তখন তিনি তার অন্তর ও পাপের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেন। আবার যখন কারও ভাগ্যে অমঙ্গল থাকে, তখন তার অন্তর ও সৎকর্মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেয়া হয়। সে কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) অধিকাংশ সময় এই দোয়া করতেন— يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك অর্থাৎ, হে অন্তরসমূহের বিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ
اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ
مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا
تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ
عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ
يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَ
اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾ وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ۗ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۗ
وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٣٠﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا
قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاۤءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ
اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣١﴾ وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا
هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاۤءِ
اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ
فِيْهِمْ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿٣٣﴾

(২৬) আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে অল্প, পরাজিত অবস্থায় পড়েছিলে দেশে; ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলে যে, তোমাদের না অন্যেরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন, স্বীয় সাহায্যের দ্বারা তোমাদিগকে শক্তি দান করেছেন এবং পরিচ্ছন্ন জীবিকা দিয়েছে যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। (২৭) হে ঈমানদারগণ, খেয়ানত করোনা আল্লাহ্‌র সাথে ও রসূলের সাথে এবং খেয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনে। (২৮) আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অকল্যাণের সম্মুখীনকারী। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে মহা সওয়াব। (২৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক, তবে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান। (৩০) আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য, তখন তারা যেমন ছলনা করত তেমনি, আল্লাহ্‌ও ছলনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র ছলনা সবচেয়ে উত্তম। (৩১) আর কেউ যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে তবে বলে, আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এমন বলতে পারি; এ তো পূর্ববর্তী ইতিকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। (৩২) তাছাড়া তারা যখন বলতে আরম্ভ করে যে, ইয়া আল্লাহ্‌, এই যদি তোমার পক্ষ থেকে (আগত) সত্য দ্বীন হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদের উপর বেদনাদায়ক আযাব নাযিল কর। (৩৩) অথচ আল্লাহ্‌ কখনই তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন। তাছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে আল্লাহ্‌ কখনও তাদের উপর আযাব দেবেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআনে করীম পযওয়ায়ে বদরের কিছু বিস্তারিত বিবরণ এবং তাতে মুসলমানদের প্রতি নাযিলকৃত এন্‌আমসমূহের উল্লেখের পর তা থেকে অর্জিত ফলাফল এবং অতঃপর সে প্রসঙ্গে মুসলমানদের প্রতি কিছু উপদেশ দান করেছে يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ আয়াত থেকে তা আরম্ভ হয়। আলোচ্য এ আয়াতগুলো তারই কয়েকটি আয়াত।

এর মধ্যে প্রথম আয়াতটিতে এমন সব পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে হেদায়েত করা হয়েছে, যার জন্য নির্ধারিত সুকঠিন আযাব শুধু পাপীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পাপ করেনি এমন লোকও তাতে জড়িয়ে পড়ে।

সে পাপ যে কি, সে সম্পর্কে তফসীরবিদ ওলামায়ে-কেরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। কোন কোন মনীষী বলেন, 'আম্‌র বিল্‌ মা'রূফ' তথা সৎকাজের নির্দেশ দান এবং 'নাহী আনিল মুনকার' অর্থাৎ, অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত করার চেষ্টা পরিহার করাই হল এই পাপ। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা নিজের এলাকায় কোন অপরাধ ও পাপানুষ্ঠান হতে না দেয়। কারণ, যদি তারা এমন না করে, অর্থাৎ, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপরাধ ও পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখে তা থেকে বারণ না করে, তবে আল্লাহ্‌ স্বীয় আযাব সবার উপরই ব্যাপক করে দেন। তখন তা থেকে না বাঁচতে পারে কোন গোনাহ্‌গার, আর না বাঁচতে পারে নিরপরাধ।

এখানে 'নিরপরাধ' বলতে সেসব লোককেই বুঝানো হচ্ছে যারা মূল পাপে পাপীদের সাথে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তারাও 'আম্‌র বিল মা'রূফ' বর্জন করার পাপে পাপী। কাজেই এ ক্ষেত্রে এমন কোন সন্দেহ করার কারণ নেই যে, একজনের পাপের জন্য অন্যের উপর আযাব করাটা অবিচার এবং কোরআনী সিদ্ধান্ত وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى এর পরিপন্থী। কারণ, এখানে পাপী তার মূল পাপের পরিণতিতে এবং নিরপরাধরা তাদের 'আম্‌র বিল মা'রূফ' থেকে বিরত থাকার পাপের দরুন ধরা পড়েছে, কারো পাপ অন্যের কাঁধে চাপানো হয়নি।

ইমাম বগভী (রহঃ) 'শরহুস্‌সুন্নাহ' ও 'মা'আলিন' নামক গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে-মসউদ (রাঃ) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা কোন নির্দিষ্ট দলের পাপের আযাব সাধারণ মানুষের উপর আরোপ করেন না, যতক্ষণ না এমন কোন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, সে নিজের এলাকায় পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখে তা বাধাদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে বাধা দেয়না, তবেই আল্লাহ্‌র আযাব সবাইকে ঘিরে ফেলে।

তিরমিযী ও আবু-দাউদ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদসহ উদ্ধৃত রয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর এক ভাষণে বলেছেন যে, আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, মানুষ যখন কোন অত্যাচারীকে দেখেও অত্যাচার থেকে তার হাতকে প্রতিরোধ করবে না, শীঘ্রই আল্লাহ্‌ তাদের সবার উপর ব্যাপক আযাব নাযিল করবেন।

সহীহ্‌ বোখারীতে হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, যারা আল্লাহ্‌র কানুনের সীমালঙ্ঘনকারী গোনাহ্‌গার এবং যারা তাদের দেখেও

মৌনতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে সেই পাপানুষ্ঠান থেকে বাধা দান করে না, এতদুভয় শ্রেণীর উদাহরণ এমন একটি সামুদ্রিক জাহাজের মত যাতে দু'টি শ্রেণী রয়েছে এবং নীচের শ্রেণীর লোকেরা উপরে উঠে এসে নিজেদের প্রয়োজনে পানি নিয়ে যায়, যাতে উপরের লোকেরা কষ্ট অনুভব করে। নীচের লোকেরা এমন অবস্থা দেখে জাহাজের তলায় ছিদ্র করে নিজেদের কাজের জন্য পানি সংগ্রহ করতে শুরু করে। কিন্তু উপরের লোকেরা এহেন কাণ্ড দেখেও বারণ করে না। এতে বলাইবাহুল্য যে, গোটা জাহাজেই পানি ঢুকে পড়বে। আর তাতে নীচের লোকেরা যখন ডুবে মরবে, তখন উপরের লোকেরাও বাঁচতে পারবে না।

এসব রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে অনেক তফসীরবিদ মনীষী সাব্যস্ত করেছেন যে, এ আয়াতে فتنة (ফিৎনাহ) বলতে 'এই পাপ' অর্থাৎ, 'সৎকাজে নির্দেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান' বর্জনকেই বুঝানো হয়েছে।

তফসীরে-মাযহারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, 'এই' বলতে উদ্দেশ হল জেহাদ বর্জন করা। বিশেষ করে এমন সময়ে জেহাদ থেকে বিরত থাকা, যখন আমিরুল-মু'মেনীন তথা মুসলমানদের নেতার পক্ষ থেকে জেহাদের জন্য সাধারণ মুসলমানদের প্রতি আহবান জানানো হয় এবং ইসলামী 'শয়ার'সমূহের হেফাযতও তার উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, তখন জেহাদ বর্জনের পরিণতি শুধু জেহাদ বর্জনকারীদের উপরই নয়; বরং সমগ্র মুসলিম জাতির উপর এসে পড়ে। কাফেরদের বিজয়ের ফলে নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং অন্যান্য বহু নিরপরাধ মুসলমান হত্যার শিকারে পরিণত হয়। তাদের জান-মাল বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় 'আযাব' অর্থ হবে পার্থিব বিপদাপদ।

আর যেহেতু আল্লাহ্ ও বান্দার হকসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে গাফেলতী ও শৈথিল্যের কারণ সাধারণতঃ মানুষের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিই হয়ে থাকে, কাজেই সে সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে وَاعْلَمُوٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ, জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফেৎনা।

'ফেৎনা', শব্দের অর্থ পরীক্ষাও হয়; আবার আযাবও হয়। তাছাড়া এমনসব বিষয়কেও ফেৎনা বলা হয় যা আযাবের কারণ হয়ে থাকে। কোরআন করীমের বিভিন্ন আয়াতে এই তিন অর্থেই ফেৎনা শব্দের ব্যবহার হয়েছে। বস্তুতঃ এখানে তিনটি অর্থেরই সুযোগ রয়েছে। কোন কোন সময় সম্পদ ও সন্তান মানুষের জন্য পৃথিবীতেই প্রাণ শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং সেগুলোর জন্য শৈথিল্য ও পাপে লিপ্ত হয়ে আযাবের কারণ হয়ে পড়াটা একান্তই স্বাভাবিক। প্রথমতঃ ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করাই আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ যে, আমার এসব দান গ্রহণ করার পর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, না অকৃতজ্ঞ হও। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মায়ায় জড়িয়ে গিয়ে যদি আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিই তোমাদের জন্য আযাব হয়ে দাঁড়াবে। কোন সময় তো পার্থিব জীবনেই এসব বস্তু মানুষকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করে দেয় এবং দুনিয়াতে সে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিকে আযাব বলে মনে করতে শুরু করে। অন্যথায় একথাটি অপরিহার্য যে, যে ধন-সম্পদ দুনিয়ায় আল্লাহ্ তাআলার হুকুম-আহ্কামের বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে কিংবা ব্যয় করা হয়েছে, সে সম্পদই আখেরাতে তার জন্য সাপ, বিচ্ছু ও আগুনে পোড়ার কারণ হবে। যেমন, কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। আর তৃতীয় অর্থ এই যে, এসব বস্তু-সামগ্রী আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এবিষয়টি তো একান্তই স্পষ্ট যে, এসব বস্তু আল্লাহ্র প্রতি মানুষকে গাফেল করে তোলে এবং তাঁর হুকুম-আহ্কামের প্রতি অমনোযোগী করে দেয়, তখন সেগুলোই আযাবের কারণ হয়। আয়াত শেষে বলা হয়েছে وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ, এ কথাটিও জেনে রেখো যে, যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে গিয়ে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসার সামনে পরাজয় বরণ না করবে তার জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট রয়েছে মহান প্রতিদান।

পূর্ববর্তী আয়াতে এ বিষয়ের আলোচনা হচ্ছিল যে, মানুষের জন্য ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি একটি ফেৎনাবিশেষ। অর্থাৎ, এগুলো সবই পরীক্ষার বিষয়। কারণ, এসব বস্তুর মায়ায় হেরে গিয়েই মানুষ সাধারণতঃ আল্লাহ্ এবং আখেরাতের প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। অথচ এই মহানেয়ামতের যৌক্তিক দাবী ছিল, আল্লাহ্র এহেন মহা অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রতি অধিকতর বিনত হওয়া।

আলোচ্য এ আয়াতসমূহের প্রথমটি সে বিষয়েরই উপসংহার। এতে বলা হয়েছে, যে লোক বিবেককে স্বভাবের উপর প্রবল রেখে এই পরীক্ষায় দৃঢ়তা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহ্র আনুগত্য ও মহব্বতকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থাপন করবে—যাকে কোরআন ও শরীয়তের ভাষায় 'তাক্ওয়া' বলা হয়—তাহলে সে এর বিনিময়ে তিনটি প্রতিদান লাভ করে। (১) ফোরকান, (২) পাপের প্রায়শ্চিত্ত (৩) মাগফেরাত বা পরিত্রাণ।

فرقان শব্দটি فرق ও فرقان দু'টি ধাতুর সমার্থক। পরিভাষাগতভাবে فرقان (ফোরকান) এমন সব বস্তু বা বিষয়কে বলা হয় যা দু'টি বস্তুর মাঝে প্রকৃষ্ট পার্থক্য ও দূরত্ব সূচিত করে দেয়। সেজন্যই কোন বিষয়ের মীমাংসাকে ফোরকান বলা হয়। কারণ, উহা হক ও না-হকের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়। তাছাড়া আল্লাহ্ তাআলার সাহায্যকেও ফোরকান বলা হয়। কারণ, এর দ্বারাও সত্যপন্থীদের বিজয় এবং তাদের প্রতিপক্ষের পরাজয় সূচিত হওয়ার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সে জন্যই কোরআনে করীমে গযওয়ায়ে-বদরকে 'ইয়াওমুল-ফোরকান' তথা পার্থক্যসূচক দিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ আয়াতে বর্ণিত 'তাকওয়া' অবলম্বনকারীদের প্রতি 'ফোরকান' দান করা হবে—কথাটির মর্ম অধিকাংশ মুফাসসেরীনের মতে এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য-সহায়তা থাকে এবং তিনি তাদের হেফাযত করেন। কোন শত্রু তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। যাবতীয় উদ্দেশ্যে তারা সাফল্য লাভে সমর্থ হন।

তফসীরে-মুহায়েমী গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, পূর্ববর্তী ঘটনায় হযরত আবু লুবাব (রাঃ) কর্তৃক স্বীয় পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে যে পদস্খলন ঘটে গিয়েছিল, তা এ কারণেও একটি ত্রুটি ছিল যে, পরিবার-পরিজনের হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি যথাযথ আনুগত্য অবলম্বন করাই ছিল সঠিক পন্থা। তা হলেই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সবই আল্লাহ্ তাআলার হেফাযতে চলে আসত। কোন কোন মুফাসীসের বলেছেন যে, এ আয়াতে ফোরকান বলতে সেসব জ্ঞান-বুদ্ধিকে উদ্দেশ করা হয়েছে যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা ও খাঁটি মেকীর মাঝে পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়। অতএব, মর্ম দাঁড়ায়

এই যে, যারা 'তাকওয়া' অবলম্বন করেন, আল্লাহ্ তাদেরকে এমন জ্ঞান ও অর্ন্তদৃষ্টি দান করেন যাতে তাদের পক্ষে ভাল-মন্দের পার্থক্য করা সহজ *হয়ে যায়।*

দ্বিতীয়তঃ তাকওয়ার বিনিময়ে যা লাভ হয়, তাহল পাপের মোচন। অর্থাৎ, পার্থিবজীবনে মানুষের দ্বারা যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায় দুনিয়াতে সেগুলোর কাফ্ফারা ও বদলার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। অর্থাৎ, এমন সৎকর্ম সম্পাদনের তৌফীক তার হয়, যা তার সমুদয় ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর প্রবল হয়ে পড়ে। তাকওয়ার প্রতিদানে তৃতীয় যে জিনিষটি লাভ হয়, তাহল আখেরাতের মুক্তি ও যাবতীয় পাপের ক্ষমা লাভ।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে— وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা বড়ই অনুগ্রহশীল ও করুণাময়। এতে ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে যে, আমলের যে প্রতিদান তা তো আমলের পরিমাণ অনুযায়ীই হয়ে থাকে। এখানেও তাকওয়ার প্রতিদানে যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তা তারই বদলা বা প্রতিদান। কিন্তু আল্লাহ্ হচ্ছেন বিরাট অনুগ্রহ ও এহসানের অধিকারী। তাঁর দান ও দয়া কোন পরিমাপের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয় এবং তাঁর দান ও এহসানের অনুমান করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য তিনটি নির্ধারিত প্রতিদান ছাড়াও আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে আরও বহু দান ও অনুগ্রহ লাভের আশা রাখা কর্তব্য।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ এক অনুগ্রহ ও দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা রসূলে মকবুল (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম তথা সমগ্র বিশ্বের উপরই হয়েছে। তাহল এই যে, হিজরত-পূর্বকালে মহানবী (সাঃ) যখন কাফের পরিবেষ্ঠিত ছিলেন এবং তারা তাঁকে হত্যা কিংবা বন্দী করার ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করছিল, তখন আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাদের এ অপবিত্র হীনচক্রান্তকে ধূলিস্মাৎ করে দেন এবং মহানবী (সাঃ)-কে নিরাপদে মদীনায় পৌছে দেন।

তফসীরে ইবনে-কাসীর ও মাযহারীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইমাম আহমদ ও ইবনে জরীর (রহঃ) প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে এই ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মদীনা থেকে আগত আনসারদের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি যখন মক্কায় জানাজানি হয়ে যায়, তখন মক্কার কোরাইশরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে যে, এ পর্যন্ত তো তাঁর ব্যাপারটি মক্কার ভেতরেই সীমিত ছিল, যেখানে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই ছিল আমাদের হাতে। কিন্তু এখন যখন মদীনাতেও ইসলাম বিস্তার লাভ করছে এবং বহু সাহাবী হিজরত করে মদীনায় চলে গেছেন, তখন এঁদের একটি কেন্দ্র মদীনাতেও স্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এঁরা যে কোন রকম শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের উপর আক্রমণও করে বসতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথাও উপলব্ধি করতে পারে যে, এ পর্যন্ত সামান্য কিছু সাহাবীই হিজরত করে মদীনায় গিয়েছেন, কিন্তু এখন প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, স্বয়ং মুহাম্মদ (সাঃ) ও সেখানে চলে যেতে পারেন। সে কারণেই মক্কার নেতৃবর্গ এ বিষয়ে সলা-পরামর্শ করার উদ্দেশে ' দারুন্-নদ্ওয়াতে' এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে। 'দারুন্-নদওয়া' ছিল মসজিদে-হারাম সংলগ্ন কোসাই ইবনে কেলাবের বাড়ী। বিশেষ জটিল বিষয় ও সমস্যাদির ব্যাপারে সলা-পরামর্শ ও বৈঠকের জন্য তারা এ বাড়ীটিকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। অবশ্য ইসলামী আমলে এটিকে মসজিদে-হারামের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। কথিত আছে যে, বর্তমান 'বাবুয-যিয়াদাতই' সে স্থান যাকে তৎকালে দারুন্-নদওয়া বলা হতো।

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য কোরাইশ নেতৃবর্গ দারুন্-নদওয়াতেই সমবেত হয়েছিলেন যাতে আবু-জাহ্ল, নযর *ইবনে হারেস, উমাইয়া ইবনে-খলফ, আবু সুফিয়ান প্রমুখসহ সমস্ত* বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির মোকাবেলার উপায় ও ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। এখানে বসেই মহানবী (সাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়।

কিন্তু নবী-রসূলগণের গায়বী শক্তি সম্পর্কে এই মূর্খের দল কেমন করে জানবে। সেদিকে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাদের পরামর্শ কক্ষের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে রসূল করীম (সাঃ)-কে অবহিত করে এই ব্যবস্থা বাতলে দেন যে, আজকের রাতে আপনি নিজের বিছানায় শয়ন করবেন না। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করারও অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে পরামর্শ অনুযায়ী কোরাইশী নওজোয়ানরা সন্ধ্যা থেকেই সরওয়ারে দু'আলম (সাঃ) – এর বাড়ীটি অবরোধ করে ফেলে। রসূলে করীম (সাঃ) বিষয়টি লক্ষ্য করে হযরত আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, আজ রাতে তিনি মহানবীর বিছানায় রাত্রি যাপন করবেন এবং সাথে সাথে এই সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন যে, এতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রাণের ভয় থাকলেও শত্রুরা কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।

হযরত আলী (রাঃ) একাজের জন্য নিজেকে পেশ করলেন এবং মহানবীর (সাঃ)-এর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল যে, হুযূর (সাঃ) এই অবরোধ ভেদ করে বেরোবেন কেমন করে। বস্তুতঃ স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা এক মু'জেযার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করে দেন। তাহল এই যে, আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে মহানবী (সাঃ) একমুঠো মাটি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং অবরোধকারীরা তাঁর ব্যাপারে যে আলাপ-আলোচনা করছিল, তার উত্তর দান করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাদের দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তিকে তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে কেউই তাঁকে দেখতে পায়নি ; অথচ তিনি সবার মাথায় মাটি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। তাঁর চলে যাবার পর কোন এক আগন্তুক এসে অবরোধকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ? তারা জানাল, মুহাম্মদ (সাঃ)- এর অপেক্ষায়। আগন্তুক বলল, কোন স্বপ্নে পড়ে রয়েছ; তিনি এখান থেকে বেরিয়ে চলেও গিয়েছেন এবং যাবার সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি দিয়ে গিয়েছেন। তখন তারা সবাই নিজেদের মাথায় হাত দিয়ে বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণ পেল।

হযরত আলী (রাঃ) মহানবী (সাঃ)- এর বিছানায় শুয়েছিলেন। কিন্তু অবরোধকারীরা তাঁর পাশ ফেরার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল, তিনি মুহাম্মদ (সাঃ) নন। কাজেই তাঁকে তারা হত্যা করতে উদ্যোগী হলো না। ভোর পর্যন্ত অবরোধ করে রাখার পর এরা লজ্জিত-অপদস্থ হয়ে ফিরে গেল। এই রাত এবং এতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্য নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন করার বিষয়টি হযরত আলী (রাঃ)- এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

কোরাইশী সর্দারদের পরামর্শে মহানবী (সাঃ)-এর সম্পর্কে যে তিনটি মত উপস্থাপিত হয়েছিল সে সবকটিই কোরআনের এ আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে — وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ অর্থাৎ, সে সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন কাফেররা আপনার

বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা নেয়ার বিষয় চিন্তা-ভাবনা করছিল যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে না হত্যা করবে, নাকি দেশ থেকে বের করে দেবে।

কিন্তু আল্লাহ্ তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছেন। সুতরাং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থাপক, যা যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে যায়। যেমনটি এ ঘটনার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

আরবী অভিধানে مكر শব্দের অর্থ হল কোন ছল-কৌশলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের লোককে তার উদ্দেশ্য সাধনে বিরত রাখা। বস্তুতঃ একাজ যদি কোন সদুদ্দেশে করা হয় তবে তা উত্তম ও প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু অসৎ মতলবে করা হলে দূষণীয় এবং মন্দকাজ। কাজেই এ শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে এবং আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবশ্য আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এমনসব পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেই এ শব্দের ব্যবহার হতে পারে যেখানে বাক্যের ধারাবাহিকতা কিংবা তুলনার মাধ্যমে দূষণীয় ছলনার কোন অবকাশ থাকতে না পারে। যেমনটি এখানে হয়েছে।—(মাযহারী)

এখানে এ কথাটিও প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতের শেষাংশে যেসব শব্দ বলা হয়েছে তা বর্তমান-ভবিষ্যতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ অর্থাৎ, তারা ঈমানদারদেরকে কষ্টদানের জন্য কলা-কৌশল করতে থাকবে এবং আল্লাহ্ তাদের সে কলা-কৌশলকে ব্যর্থ করে দেয়ার ব্যবস্থা নিতে থাকবেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা তদবীর করাটা কাফেরদের চিরাচরিত বৃত্তি থাকবে। আর তেমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য-সহায়তাও সর্বকালেই সত্যিকার মুসলমানদের উপর থেকে তাদের সেসব ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে দিতে থাকবে।

একত্রিশ ও বত্রিশতম আয়াতে সেই 'দারুন-নদওয়ার' জনৈক সদস্য নযর ইবনে হারেসের এক অহেতুক সংলাপ এবং ত্রিশতম আয়াতে তার জওয়াব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নযর ইবনে হারেস ব্যবসায়ী লোক ছিল এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের ফলে ইহুদী-নাসারাদের গ্রন্থ ও তাদের এবাদত-উপাসনা বার বার দেখার সুযোগ পেয়েছিল। কাজেই সে যখন কোরআনে করীমে বিগত উম্মতসমূহের অবস্থা সংক্রান্ত বিবরণ শুনল তখন বলল— قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاۤءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَاۤ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ, "এসব তো আমাদের শোনা কথাই। আমরা ইচ্ছা করলে এমন কথা বলতে পারি। এগুলো তো বিগত লোকদেরই ইতিকথা"। তারপর কোন কোন সাহাবী যখন তাকে লা-জওয়াব করে দিলেন যে, যদি বলতেই পার, তবে বলছ না কেন? কোরআন যে সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য বিধান করে দিয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জও করে দিয়েছে যে, এর বিরোধীরা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে কোরআনের ছোট একটি সূরার অনুরূপই একটি সূরা উপস্থাপন করে দেখাক। অথচ বিরোধিতায় যারা জানের বাজি লাগিয়েছিল, যারা ধন-দৌলত আর সন্তান-সন্ততিকে পর্যন্ত কোরবান করেছিল তাদের সবাই মিলে কোরআনের মোকাবেলায় ছোট একটি সূরাও পেশ করতে পারেনি। তাহলে একথা বলা যে, আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে আমরাও এমন কালাম বলতে পারি,—এমন একটি কথা যা লাজ-লজ্জার অধিকারী কোন লোকই বলতে পারে না। তারপর নযর ইবনে হারেসের সামনে সাহাবায়ে কেরাম এই কালামের সত্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করলেন, তখন সে স্বীয় ভ্রান্ত মতবাদের উপর তার দৃঢ়তা প্রকাশ করার উদ্দেশে বলতে লাগল ঃ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاۤءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, এই কোরআনই যদি আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা কোন কঠিন আযাব নাযিল করে দিন।

স্বয়ং কোরআন করীম এর উত্তর দিয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ (সাঃ), আপনার মক্কায় থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব করবেন না। কারণ, সমস্ত নবী-রসূলগণের ব্যাপারেই আল্লাহ্র নীতি এই যে, তাঁরা যে জনপদে থাকেন তাতে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আযাব নাযিল করেন না, যতক্ষণ না স্বীয় পয়গম্বরগণকে সেখান থেকে সরিয়ে নেন।

এ উত্তরের সারমর্ম এই যে, তোমরা তো কোরআন ও ইসলামের বিরোধিতার কারণে পাথর বর্ষণেরই যোগ্য, কিন্তু মহানবী (সাঃ)- এর মক্কায় অবস্থান এর অন্তরায়। ইমাম ইবনে জরীর (রহঃ) বলেন, আয়াতের এ অংশটি সে সময় নাযিল হয়েছিল যখন হুযুর (সাঃ) মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তারপর মদীনায় হিজরত করার পর আয়াতের দ্বিতীয় অংশ অবতীর্ণ হয়। وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না, তখন তারা এস্তেগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনা করে। এর মর্ম এই যে, মহানবী (সাঃ)-এর মদীনা চলে যাবার পর যদিও ব্যাপক আযাবের পথে যে অন্তরায় ছিল তা দূর হয়ে গেছে, অর্থাৎ, তাঁর সেখানে বর্তমান থাকা, কিন্তু তারপরেও আযাব আসার পথে আরেকটি বাধা রয়ে গেছে তাহল এই যে, অনেক দুর্বল মুসলমান যারা হিজরত করতে পারছিলেন না, সেখানে রয়ে গিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্র দরবারে এস্তেগফার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন। তাঁদেরই খাতিরে মক্কাবাসীদের উপর আযাব নাযিল করা হয়নি।

অতঃপর এ সমস্ত মুসলমানও হিজরত করে যখন মদীনায় পৌছে যান, তারপরে আয়াতের এই বাক্যটি নাযিল হয় ঃ وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদেরকে আযাব দেবেন না তা কেমন করে হয়, অর্থাৎ, তারা রসূলকে মসজিদে-হারামে গিয়ে এবাদত করতে বাধা দান করে।

অর্থাৎ, আযাব আসার পথের দু'টি অন্তরায়ই এখন দূর হয়ে গেছে। এখন মক্কাতে না আছেন মহানবী (সাঃ), না আছেন ক্ষমা প্রার্থনাকারী মুসলমানগণ। অতএব, আযাব আসতে এখন আর কোন বাধাই অবশিষ্ট নেই। বিশেষতঃ তাদের শাস্তিযোগ্য অপরাধের মধ্যে ইসলাম বিরোধিতা ছাড়াও আরেকটি অপরাধ সংযোজিত হয়েছে যে, তারা নিজেরা তো এবাদত -উপাসনার যোগ্য ছিলই না, তদুপরি যেসব মুসলমান এবাদত, ওমরা ও তওয়াফের উদ্দেশে মসজিদে-হারামে আসতে চায় তাদেরকেও বাধাদান করতে শুরু করেছে। অতএব, এখন তাদের শাস্তিপ্রাপ্তির বিষয়টি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে; সুতরাং মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের উপর সে আযাবই নাযিল করা হয়।

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ۭ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ۭ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٣٩﴾ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۭ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٤٠﴾

(৩৪) আর তাদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে, যার ফলে আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব দান করবেন না ! অথচ তারা মসজিদে-হারামে যেতে বাধাদান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এর অধিকার তো তাদেরই রয়েছে যারা পরহেযগার। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয়। (৩৫) আর কা'বার নিকট তাদের নামায বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোন কিছুই ছিল না। অতএব, এবার নিজেদের কৃত কুফরীর আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর। (৩৬) নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহ্র পথে। বস্তুতঃ এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষপর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফের, তাদেরকে দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (৩৭) যাতে পৃথক করে দেন আল্লাহ্ অপবিত্র ও না-পাককে পবিত্র ও পাক থেকে। আর যাতে একটির পর একটিকে স্থাপন করে সমবেত স্তুপে পরিণত করেন এবং পরে দোযখে নিক্ষেপ করেন। এরাই হল ক্ষতিগ্রস্ত। (৩৮) তুমি বলে দাও, কাফেরদেরকে যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে যা কিছু ঘটে গেছে ক্ষমা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আবারও যদি তাই করে, তবে পূর্ববর্তীদের পথ নির্ধারিত হয়ে গেছে। (৩৯) আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহ্র সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (৪০) আর তারা যদি না মানে, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ তোমাদের সমর্থক; এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছিল যে, মক্কার মুশরিকরা নিজেদের কুফরী ও অস্বীকৃতির দরুন যদিও আসমানী আযাব প্রাপ্তিরই যোগ্য, কিন্তু মক্কায় রসূলে করীম (সাঃ) – এর উপস্থিতি ব্যাপক আযাবের পথে অন্তরায় হয়ে আছে। আর তাঁর হিজরতের পর সে সমস্ত অসহায়-দুর্বল মুসলমানদের কারণে এমন আযাব আসছে না যারা মক্কায় থেকে আল্লাহ্ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে বলা হচ্ছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) কিংবা অসহায় ও দুর্বল মুসলমানদের কারণে যদি দুনিয়াতে তাদের আযাব রহিত হয়েও গিয়ে থাকে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, এরা আযাবের যোগ্যই নয়। বরং তাদের আযাবের যোগ্য হওয়াটা পরিষ্কার। তাছাড়া কুফরী ও অস্বীকৃতি ছাড়াও তাদের এমনসব অপরাধ রয়েছে যার ফলে তাদের উপর আযাব নেমে আসা উচিত। আলোচ্য আয়াত দু'টিতে তাদের তিনটি অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমতঃ এরা নিজেরা তো মসজিদে-হারাম অর্থাৎ, খানায়ে-কা'বায় এবাদত করার যোগ্য নয়, তদুপরি যেসব মুসলমান সেখানে এবাদত-বন্দেগী ও নামায, তওয়াফ প্রভৃতি আদায় করতে চায়, তাদেরকে বাধাদান করে। এতে হোদায়বিয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে যখন রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামসহ ওমরা পালনের উদ্দেশে মক্কায় আগমন করেন, তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁকে বাধাদান করেছিল এবং ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল।

দ্বিতীয় অপরাধ হল এই যে, এই নির্বোধের দল মনে করত এবং বলত যে, আমরা মসজিদে-হারামের মোতাওয়াল্লী, যাকে ইচ্ছা এখানে আসতে অনুমতি দেব, যাকে ইচ্ছা দেব না।

তাদের এই ধারণা ছিল দু'টি ভুল বুঝাবুঝির ফলশ্রুতি। প্রথমতঃ এই যে, তারা নিজেদেরকে মসজিদে-হারামের মোতাওয়াল্লী বলে মনে করেছিল, অথচ কোন কাফের কোন মসজিদের মোতাওয়াল্লী হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তাদের এই ধারণা যে, যাকে ইচ্ছা তারা মসজিদে আসতে বাধাদান করতে পারে। অথচ মসজিদ যেহেতু আল্লাহ্র ঘর, সুতরাং এতে আসতে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই। তবে এমন বিশেষ অবস্থার কথা স্বতন্ত্র, যাতে মসজিদের অবমাননা কিংবা অন্যান্য নামাযীদের কষ্টের আশঙ্কা থাকে। যেমন, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন— "নিজেদের মসজিদসমূহকে রক্ষা কর ছোট শিশুদের থেকে, পাগলদের থেকে এবং নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ থেকে।" ছোট শিশু বলতে সেসব শিশুকে উদ্দেশ করা হয়েছে যাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর পাগলদের দ্বারা অপবিত্রতারও আশঙ্কা থাকে এবং নামাযীদের কষ্টেরও সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের দরুন মসজিদের অসম্মানও হয় এবং নামাযীদের কষ্টও হয়।

এ হাদীসের ভিত্তিতে মসজিদের একজন মোতাওয়াল্লীর এমন শিশু ও পাগলদেরকে মসজিদে আসতে না দেয়ার এবং মসজিদে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ হতে না দেয়ার অধিকার থাকলেও এমন অবস্থা বা পরিস্থিতি ব্যতীত কোন মুসলমানকে মসজিদে আসতে বাধা দেয়ার কোন অধিকার নেই।

কোরআন করীমে আলোচ্য আয়াতটিতে শুধু প্রথম বিষয়টিরই

আলোচনা করা হয়েছে যে, মসজিদে-হারামের মোতাওয়াল্লী যখন শুধুমাত্র মুত্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তিই হতে পারেন, তখন তাদেরকে কেমন করে এর মোতাওয়াল্লী হিসাবে স্বীকার করা যায়! এতে প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদের মোতওয়াল্লী কোন মুসলমান দ্বীনদার ও পরহেযগার ব্যক্তিরই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন কোন মুফাসসেরীন إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ এর সর্বনামটি আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তিত বলে সাব্যস্ত করে এই অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ্র ওলী শুধুমাত্র মুত্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তিরাই হতে পারেন।

এই তফসীর বা ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, যারা শরীয়ত ও সুন্নতের বরখেলাফ আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহ্র ওলী হওয়ার দাবী করে, তারা সর্বৈব মিথ্যাবাদী এবং যারা এহেন লোকদের ওলীআল্লাহ্ বলে মনে করে, তারা (একান্তভাবেই) ধোঁকায় পতিত।

তাদের তৃতীয় অপরাধ এই যে, তাদের মধ্যে কুফর ও শেরেকের পঙ্কিলতা তো ছিলই, তাদের কার্যকলাপও সাধারণ মানবিকতার স্তর থেকেও বহু নিম্নে রয়েছে। কারণ, এরা নিজেদের যে কাজকে 'নামায' নামে অভিহিত করে, তা মুখে কিছু শিস দেয়া এবং হাতে কিছু তালি বাজানো ছাড়া আর কিছু নয়। বলাবাহুল্য, যার সামন্যতম বুদ্ধিও থাকবে সেও এধরনের কার্যকলাপকে এবাদত কিংবা নামায তো দূরের কথা, সঠিক কোন মানবীয় আচরণও বলতে পারে না। কাজেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ অর্থাৎ, তোমাদের কুফরী ও অপরাধের পরিণতি এই যে, এবার আল্লাহ্র আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর। আযাব বলতে এখানে আখেরাতের আযাব হতে পারে এবং পার্থিব আযাবও হতে পারে যা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের মাধ্যমে তাদের উপর নাযিল হয়।

এ ঘটনার বিবরণ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত রয়েছে যে, গযওয়ায়ে-বদরের পরাজয়ের পর অবশিষ্ট আহত মক্কাবাসী কাফেররা যখন মক্কায় গিয়ে পৌঁছল, তখন যাদের পিতা-পুত্র এযুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তারা বাণিজ্যিক কাফেলার আমীর আবু সুফিয়ানের কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে যে, আপনি তো জানেন, এ যুদ্ধটি বাণিজ্যিক কাফেলার হেফাযতকল্পে করা হয়েছে, যার ফলে জান-মালের এহেন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই আমরা চাই, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে আমাদের কিছু সাহায্য করা হোক, যাতে আমরা ভবিষ্যতে মুসলমানদের থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি। তারা এ দাবী মেনে নিয়ে তাদেরকে এক বিরাট অঙ্কের অর্থ দিয়ে দেয় যা তারা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ওহুদ যুদ্ধে ব্যয় করে এবং তাতেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ফলে পরাজয়ের গ্লানির সাথে সাথে অর্থ অপচয়ের অতিরিক্ত অনুতাপ যোগ হয়ে যায়।

কোরআন করীম এ আয়াতে এই ঘটনার পূর্বেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এর পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে দেয়। বলা হয়, যারা কাফের, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র দ্বীন থেকে মানুষকে বাধাদান করার কাজে ব্যয় করতে চাইছে। অতএব, তার পরিণতি হবে এই যে, নিজেদের ধন-সম্পদও ব্যয় করে বসবে এবং পরে এ ব্যয়ের জন্য তাদের অনুতাপ হবে। অথচ শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পরাজয়ই বরণ করতে হবে। বস্তুতঃ গযওয়ায়ে-ওহুদে ঠিক তাই ঘটেছে; সঞ্চিত ধন-সম্পদও ব্যয় করে ফেলেছে এবং পরে যখন পরাজিত হয়েছে, তখন পরাজয়ের গ্লানির সাথে সাথে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার জন্য অতিরিক্ত অনুতাপ ও দুঃখ পোহাতে হয়েছে।

বগভী প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতের বিষয়বস্তুকে বদর যুদ্ধের ব্যয়সংক্রান্ত বলেই অভিহিত করেছেন। বদর যুদ্ধে এক হাজার জোওয়ানের বাহিনী মুসলমানদের মোকাবেলা করতে গিয়েছিল। তাদের খাবার-দাবার এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়ভার মক্কার বার জন সর্দার নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল আবু-জাহ্ল, ওৎবা, শায়বা প্রমুখ। বলাবাহুল্য, এক হাজার লোকের যাতায়াত ও খানা-পিনা প্রভৃতিতে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয়েছিল। কাজেই নিজেদের পরাজয়ের সাথে সাথে অর্থ ব্যয়ের জন্যও বিপুল অনুতাপ ও আফসোস হয়েছিল — (মাযহারী)

আয়াত শেষে আখেরাতের দিক দিয়ে তাদের মন্দ পরিণতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ অর্থাৎ, যারা কাফের, জাহান্নামের দিকেই হবে তাদের হাশর।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে সত্য দ্বীন থেকে বাধা দানকল্পে অর্থ ব্যয়ের যে অশুভ পরিণতির কথা বলা হয়েছে, তাতে বর্তমান কালের সেসব কাফেরও অর্ন্তভুক্ত যারা মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখতে এবং নিজেদের মিথ্যা ও বাতিল মতবাদের প্রতি আহবান করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাসপাতালে, শিক্ষাঙ্গনে এবং দান-খয়রাতের নামে ব্যয় করে থাকে। তেমনিভাবে সেসব পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাও এর অন্তর্ভুক্ত, যারা ইসলামের সর্ববাদীসম্মত আকীদা ও বিশ্বাসসমূহে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি ও সেগুলোর বিরুদ্ধে মানুষকে আহবান করার উদ্দেশে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তাঁর দ্বীনের হেফাযত করেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখাও যায় যে, এরা বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ ব্যয় করা সত্ত্বেও নিজেদের উদ্দেশে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য থেকে যায়।

৩৭তম আয়াতে উল্লেখিত ঘটনাবলীর কিছু ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে যার সার-সংক্ষেপ এই যে, কাফেররা যেসব সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে এবং পরে যার জন্য দুঃখ ও অনুতাপ করেছে আর অপমানিত-অপদস্থ হয়েছে, তাতে ফায়দা হয়েছে এই لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যাতে অপবিত্র পঙ্কিল এবং পবিত্র পূতঃ বস্তুতে পার্থক্য প্রকাশ করে দেন। طيب ও خبيث দু'টি বিপরীতার্থক শব্দ। خبيث শব্দটি অপবিত্র, পঙ্কিল ও হারাম বস্তুকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর طيب তার বিপরীতে পবিত্র, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তুকে বোঝাতে বলা হয়। এখানে এ দু'টি শব্দের দ্বারা যথাক্রমে কাফেরদের অপবিত্র ধন-সম্পদ এবং মুসলমানদের পবিত্র সম্পদ ও অর্থ বোঝা যেতে পারে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে এই যে, কাফেররা যে বিপুল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে তা ছিল অপবিত্র ও হারাম সম্পদ। ফলে তার অশুভ পরিণতি দাঁড়িয়েছে এই যে, তাতে মালও গেছে এবং জানও গেছে। পক্ষান্তরে তার বিপরীতে মুসলমানরা অতি অল্প পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করেছে, কিন্তু সে সম্পদ ছিল পবিত্র ও হালাল। ফলে তা ব্যয়কারীরা বিজয় অর্জন করেছেন এবং সাথে সাথে গনীমতের মালামাল অর্জনেও সমর্থ হয়েছেন। তারপর এরশাদ হয়েছে ঃ

وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা এক 'খবীস' তথা অপবিত্রকে অপর অপবিত্রের সাথে মিলিয়ে দেন এবং তারপর সে সমস্তকে সমবেত করে

দেবেন জাহান্নামে। বস্তুতঃ এরাই হল ক্ষতির সম্মুখীন।

অর্থাৎ, পৃথিবীতে যেমন চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, এবং আধুনিক বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাই পারস্পরিক আকর্ষণের উপর স্থাপিত, তেমনিভাবে কাজ–কর্ম, আচার–আচরণ ও স্বভাব–চরিত্রের মধ্যেও একটা আকর্ষণ রয়েছে। একটি মন্দ কাজ অন্যান্য মন্দ কাজকে এবং একটি ভাল কাজ অন্যান্য ভাল কাজকে আকর্ষণ করে। একটি খারাপ সম্পদ আরেকটি খারাপ সম্পদকে টেনে আনে এবং তারপর এসব খারাপ সম্পদ মিলে অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আর এরই পরিণতি হিসাবে আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত অপবিত্র সম্পদরাজিকে জাহান্নামে সমবেত করবেন এবং এসব সম্পদের অধিকারীরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

এছাড়া এখানে অনেক তফসীরবিদ মনীষী خَبِيثٌ ও طَيِّبٌ এর সাধারণ অর্থ যথাক্রমে অপবিত্র ও পবিত্র বলেই সাব্যস্ত করেছেন এবং 'পাক' বলতে মুমিন আর অপবিত্র বলতে কাফের বুঝিয়েছেন। এমতাবস্থায় মর্ম হবে এই যে, উল্লেখিত অবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র ও অপবিত্র অর্থাৎ, মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য করতে চান; সমস্ত মুমিন জান্নাতে আর সমস্ত কাফের জাহান্নামে সমবেত হোক, এটাই তাঁর ইচ্ছা।

৩৮তম আয়াতে কাফেরদের প্রতি আবারো এক মুরুব্বীসুলভ আহবান জানানো হয়েছে। এতে উৎসাহও রয়েছে এবং ভীতিও রয়েছে। উৎসাহ এ ব্যাপারে যে, যদি তারা এ সমুদয় কুকর্মের পরে এখনও তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে, তাহলে পূর্বকৃত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর ভীতি হলো এই যে, তারা যদি এখনো অপকর্ম থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলাকে নতুন কোন আইন প্রণয়ন কিংবা নতুন করে কোন চিন্তাভাবনা করতে হবে না। বিগত কালের কাফেরদের জন্য যে আইন প্রবর্তিত হয়ে গেছে তাই তাদের উপরও প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ,পৃথিবীতে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে এবং আখেরাতে হয়েছে কঠিন আযাবের যোগ্য।

এটি হলো সূরা আনফালের উনচল্লিশতম আয়াত। এতে দু'টি শব্দ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

(১) ফেৎনা (২) দ্বীন। আরবী অভিধান অনুযায়ী শব্দ দু'টি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তফসীরশাস্ত্রের ইমামগণ সাহাবায়ে–কেরাম ও তাবেঈনদের নিকট থেকে এখানে দু'টি অর্থ উদ্ধৃত করেছেন। (১) ফেৎনা অর্থ কুফর ও শিরক আর (২) দ্বীন অর্থ ইসলাম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এই বিশ্লেষণই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মুসলমানদিগকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে যতক্ষণ না কুফর নিঃশেষিত হয়ে ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে এই নির্দেশ শুধুমাত্র মক্কাবাসী এবং আরববাসীদের জন্যে নির্দিষ্ট হবে। কারণ,আরব হচ্ছে ইসলামের উৎসস্থল। এতে ইসলাম ছাড়া যদি অন্য কোন ধর্ম বিদ্যমান থাকে তাহলে দ্বীনে–ইসলামের জন্য তা হবে আশংকাজনক। তবে পৃথিবীর অন্যত্র অন্যান্য ধর্মমত ও আদর্শকে আশ্রয় দেয়া যেতে পারে। যেমন, কোরআন করীমের অন্যান্য আয়াতে এবং হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে।

আর দ্বিতীয় তফসীর যা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত রয়েছে তাহল এই যে, এতে 'ফেৎনা' অর্থ হচ্ছে সেসব দুঃখ–দুর্দশা ও বিপদাপদের ধারা, যা মক্কার কাফেররা সদাসর্বদা মুসলমানদের উপর অব্যাহত রেখেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মক্কায় অবস্থান করছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তাদের অবরোধে আবদ্ধ থেকে নানা রকম কষ্ট সহ্য করে গেছেন। তারপর যখন তারা মদীনায় হিজরত করেন, তখন তারা মুসলমানের পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁদের হত্যা ও লুণ্ঠন করতে থাকে। এমনকি মদীনায় পৌছার পরও গোটা মদীনা আক্রমণের মাধ্যমে তাদের হিংসা–রোষই প্রকাশ পেতে থাকে।

পক্ষান্তরে 'দ্বীন' শব্দের অর্থ হল প্রভাব ও বিজয়। এ ক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই যে, মুসলমানগণকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকা কর্তব্য, যতক্ষণ না তাঁরা অন্যের অত্যাচার–উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)–এর এক ঘটনার দ্বারাও এ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। তাহল এই যে, মক্কার প্রশাসক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)–এর বিরুদ্ধে যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সৈন্য সমাবেশ করে এবং উভয়পক্ষে মুসলমানদের উপরই যখন মুসলমানদের তলোয়ার চলতে থাকে, তখন দু'জন লোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) – এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, এইক্ষণে মুসলমানগণ যে মহাবিপদের সম্মুখীন, তা আপনি নিজেই দেখছেন। অথচ আপনি সেই ওমর ইবনে খাত্তাবের পুত্র, যিনি কোনক্রমেই এহেন ফেৎনা–ফাসাদকে বরদাশত করতেন না। কাজেই আপনি আজকের ফেৎনার সমাধান করার উদ্দেশে কি কারণে এগিয়ে আসেন না? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা কোন মুসলমানের রক্তপাত করাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আগত দু'জন আরয করলেন, আপনি কি কোরআনের এ আয়াতটি পাঠ করেন না وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ অর্থাৎ, যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফেৎনা–ফাসাদ তথা দাঙ্গা–হাঙ্গামা থাকে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আমি এ আয়াত পাঠ করি এবং এর উপর আমলও করি। আমরা এ আয়াতের ভিত্তিতে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছি যতক্ষণ না ফেৎনা শেষ হয়ে দ্বীন–ইসলামের বিজয় সূচিত হবে। অথচ তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত সত্যধর্মের বিরুদ্ধে অন্য কারো বিজয় সূচিত হোক, তা চাও না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জেহাদ ও যুদ্ধের হুকুম ছিল কুফরীর ফেৎনা এবং কাফেরদের অত্যাচার–উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। তা আমরা করেছি এবং বরাবরই করে যাচ্ছি। আর তাতে করে সে ফেৎনা প্রদমিত হয়ে গেছে। মুসলমানদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধকে তার সাথে তুলনা করা যথার্থ নয়। বরং মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই–বিবাদের ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ)– এর হেদায়েত হচ্ছে এই যে, তাতে বসে থাকা লোকটি দাঁড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম।

এ বিশ্লেষণের সারমর্ম এই যে, মুসলমানদের উপর ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ–জেহাদ অব্যাহত রাখা ওয়াজিব, যতক্ষণ না মুসলমানদের উপর তাদের অত্যাচার–উৎপীড়নের ফেৎনার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং যতক্ষণ না তথাকথিত সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। আর এমন অবস্থাটি কেয়ামতের নিকটবর্তী কালেই বাস্তবায়িত হবে এবং সে কারণে কেয়ামত পর্যন্তই জেহাদের হুকুম অব্যাহত ও বলবৎ থাকবে।

ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ–জেহাদের পরিণতিতে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমতঃ এই যে, তারা মুসলমানদের উপর

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَ
لِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ
السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤١﴾
اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَ
الرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي
الْمِيْعٰدِ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا لِّيَهْلِكَ
مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَاِنَّ
اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾ اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا
وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٤٣﴾ وَ
اِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ
فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا وَاِلَى اللّٰهِ
تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٤٤﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً
فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٤٥﴾

(৪১) আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবেও, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহ্‌র জন্য, রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহ্‌র উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। (৪২) আর যখন তোমরা ছিলে সমরাঙ্গনের এ প্রান্তে আর তারা ছিল সে প্রান্তে অথচ কাফেলা তোমাদের থেকে নীচে নেমে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় যদি তোমরা পারস্পরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে, তবে তোমরা এক সঙ্গে সে ওয়াদা পালন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক কাজ করতে চেয়েছিলেন, যা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল — যাতে সে সব লোক নিহত হওয়ার ছিল, প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর এবং যাদের বাঁচার ছিল, তারা বেঁচে থাকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর। আর নিশ্চিতই আল্লাহ্ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ। (৪৩) আল্লাহ্ যখন তোমাকে স্বপ্নে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন ; বেশী করে দেখালে তোমরা কাপুরুষতা অবলম্বন করতে এবং কাজের বেলায় বিপদ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ্ বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তিনি অতি উত্তমভাবেই জানেন; যা কিছু অন্তরে রয়েছে। (৪৪) আর যখন তোমাদেরকে দেখালেন সে সৈন্য দল মোকাবেলার সময় তোমাদের চোখে অল্প এবং তোমাদেরকে দেখালেন তাদের চোখে অল্প, যাতে আল্লাহ্ সে কাজ করে নিতে পারেন যা ছিল নির্ধারিত। আর সব কাজই আল্লাহ্‌র নিকট গিয়ে পৌঁছায়। (৪৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশে কৃতকার্য হতে পার।

অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে বিরত হয়ে যাবে, তা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেও হতে পারে, কিংবা নিজ নিজ ধর্মমতে থেকেই আনুগত্যের চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমেও হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ এতদুভয় অবস্থার কোনটি গ্রহণ না করে অত্যাচার মোকাবেলায় স্থির থাকবে। আয়াতে এই উভয় অবস্থার হুকুমই বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

অর্থাৎ, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপ যথার্থভাবেই অবলোকন করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে গনীমতের বিধান ও তার বন্টননীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অভিধানে 'গনীমত' বলা হয় সে সমস্ত মাল-সামানকে যা শত্রুর নিকট থেকে লাভ হয়। শরীয়তের পরিভাষা অনুযায়ী অমুসলমানদের নিকট থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহে বিজয়ার্জনের মাধ্যমে যে মালামাল অর্জিত হয়, তাকেই বলা হয় 'গনীমত'। আর যা কিছু আপোষ, সন্ধি-সম্মতির মাধ্যমে অর্জিত হয়, যেমন, জিযিয়া কর, খাজনা-টেক্স প্রভৃতি — তাকে বলা হয় 'ফাই'। কোরআন করীমে এতদুভয় শব্দের মাধ্যমে (অর্থাৎ, 'গনীমত' ও 'ফাই') এতদুভয় প্রকার মালামালের হুকুম-আহ্‌কাম তথা বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা-আনফালে সে গনীমতের মালামালের কথাই আলোচিত হয়েছে যা যুদ্ধকালে অমুসলমানদের কাছ থেকে লাভ হয়েছে।

এখানে সর্বাগ্রে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ইসলামী ও কোরআনী মতাদর্শ অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিকানা শুধুমাত্র সে সত্তার জন্য নির্ধারিত যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের পক্ষে কোন কিছুর মালিকানা লাভ করার একটি মাত্র পন্থা রয়েছে। তা হল এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় আইনের মাধ্যমে কোন বস্তুতে কোন ব্যক্তির মালিকানা সাব্যস্ত করে দেন। যেমন, সূরা ইয়াসীনে চতুষ্পদ জীবের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — 'এরা কি দেখতে পায় না যে, চতুষ্পদ-জন্তুসমূহকে আমি নিজে সৃষ্টি করেছি (এবং) তারপর তারা সেগুলোর মালিক হয়েছে।' অর্থাৎ, এদের মালিকানা নিজস্ব নয়, বরং আমিই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে এগুলোর মালিক বানিয়েছি।

কোন জাতি যখন আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, অর্থাৎ, কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন প্রথম আল্লাহ্ তাআলা তাদের সংশোধনের উদ্দেশে স্বীয় রসূল ও কিতাব পাঠিয়ে থাকেন। যে হতভাগা এ খোদায়ী দানের মাধ্যমেও প্রভাবিত না হয়, তার বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা যে নির্দেশ দিয়েছেন তার মর্ম দাঁড়ায় এই যে, এই বিদ্রোহীদের জান-মাল সবই হালাল করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত মালামালের দ্বারা লাভবান হওয়ার কোন অধিকারই আর তাদেরই নেই। বরং তাদের ধন-সম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হয়েছে। এই বাজেয়াপ্ত করা মালামালেরই অপর নাম, গনীমতের মাল যা কাফেরদের মালিকানা থেকে বেরিয়ে একান্তভাবে আল্লাহ্ তাআলার মালিকানায় রয়ে গেছে।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ
رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا
كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَ
يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٤٧﴾
وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ
الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ
نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ
اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾ اِذْ يَقُوْلُ
الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ
وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٩﴾ وَ
لَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ
وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٥٠﴾ ذٰلِكَ
بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٥١﴾
كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

(৪৬) আর আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে (৪৭) আর তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা বেরিয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশে। আর আল্লাহ্র পথে তারা বাধা দান করত। বস্তুতঃ আল্লাহ্র আয়ত্তে রয়েছে সে সমস্ত বিষয় যা তারা করে। (৪৮) আর যখন সুদৃশ করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে এবং বলল যে, আজকের দিনে কোন মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক, অতঃপর যখন সামনাসামনী হল উভয় বাহিনী তখন সে অতি দ্রুত পায়ে পেছন দিকে পালিয়ে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের সাথে নাই—আমি দেখছি, যা তোমরা দেখছ না ; আমি ভয় করি আল্লাহ্কে। আর আল্লাহ্র আযাব অত্যন্ত কঠিন। (৪৯) যখন মোনাফেকরা বলতে লাগল এবং যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, এরা নিজেদের ধর্মের উপর গর্বিত। বস্তুতঃ যারা ভরসা করে আল্লাহ্র উপর, সে নিশ্চিন্ত, কেননা আল্লাহ্ অতি পরাক্রমশীল, সুবিজ্ঞ। (৫০) আর যদি তুমি দেখ, যখন ফেরেশতারা কাফেরদের জান কবজ করে; প্রহার করে, তাদের মুখে এবং তাদের পশ্চাদদেশে আর বলে, জ্বলন্ত আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর। (৫১) এই হলো সে সবের বিনিময় যা তোমরা তোমাদের পূর্বে পাঠিয়েছ নিজের হাতে। বস্তুতঃ এটি এ জন্য যে, আল্লাহ্ বন্দার উপর যুলুম করেন না। (৫২) যেমন, রীতি রয়েছে ফেরাউনের অনুসারীদের এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের ব্যাপারে যে, এরা আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং সেজন্য আল্লাহ্ তাআলা তাদের পাকড়াও করেছেন তাদেরই পাপের দরুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহা শক্তিশালী, কঠিন শাস্তিদাতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যুদ্ধ-জেহাদে কৃতকার্যতা লাভের জন্য কোরআনের হেদায়েত ঃ প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানগণকে যুদ্ধক্ষেত্র এবং শত্রুর মোকাবেলার জন্য একটি বিশেষ হেদায়েতনামা দান করেছেন, যা তাদের জন্য পার্থিব জীবনে কৃতকার্যতা এবং পরকালীন নাজাতের অমোঘ ব্যবস্থা। প্রাথমিক যুগের যুদ্ধসমূহে মুসলমানদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের রহস্যও এতেই নিহিত ছিল।

প্রথমত দৃঢ়তা ঃ অর্থাৎ, দৃঢ়তা অবলম্বন করা ও স্থির-অটল থাকা। মনের দৃঢ়তা ও সংকল্পের অটলতা উভয়টি এর অন্তর্ভুক্ত। মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই জানে, উপলব্ধি করে এবং পৃথিবীর প্রতিটি জাতি নিজেদের যুদ্ধে এরই উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। কারণ, অভিজ্ঞ লোকদের কাছে এ বিষয়টি গোপন নেই যে, সমরক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং সব চাইতে কার্যকর অস্ত্রই হচ্ছে মন ও পদক্ষেপের দৃঢ়তা। এর অবর্তমানে অন্যান্য সমস্ত উপায়-উপকরণই অকেজো, বেকার।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্র যিকর ঃ এটি সেই বিশেষ ধরনের আধ্যাত্মিক হাতিয়ার যার ব্যাপারে ঈমানদারগণ ব্যতীত সাধারণ পৃথিবী গাফেল। সমগ্র পৃথিবী যুদ্ধের জন্য সর্বোত্তম অস্ত্রশস্ত্র, আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য এবং সেনাবাহিনীকে সুদৃঢ় রাখার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা নেয়। কিন্তু মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব এ হাতিয়ার সম্পর্কে তারা অপরিচিত ও অজ্ঞ। সে কারণেই এই হেদায়েত, এই নির্দেশনামা। এই নির্দেশনামা মোতাবেক যে কোন অঙ্গনে যে কোন জাতির সাথে মোকাবেলা হয়েছে, প্রতিপক্ষের সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা-তদবীর পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্র যিকরে নিজস্বভাবে যে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে তা তো যথাস্থানে আছেই, তদুপরি এটাও একটি বাস্তব সত্য যে, দৃঢ়তার জন্যও এর চেয়ে পরীক্ষিত কোন ব্যবস্থা নেই। আল্লাহ্কে স্মরণ করা এবং তাতে বিশ্বাস রাখা এমন এক বিদ্যুৎ শক্তি যা একজন দুর্বলতর মানুষকেও পাহাড়ের সাথে মোকাবেলা করতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। বিপদ যত কঠিনই হোক না কেন, আল্লাহ্র স্মরণ সে সমস্ত হওয়ায় উড়িয়ে দেয় এবং মানুষের মন-মানসকে বলিষ্ঠ ও পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করে রাখে।

কোরআনে করীম এহেন শঙ্কাপূর্ণ পরিবেশে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্কে স্মরণ করার শিক্ষা দিয়েছে; তাও আবার অধিক পরিমাণে স্মরণ করার তাকীদসহ।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, সমগ্র কোরআনে আল্লাহ্র যিকর ব্যতীত অন্য কোন এবাদতই এত অধিক পরিমাণে করার হুকুম কোথাও উল্লেখ নেই। তার কারণ এই যে, আল্লাহ্র যিকর তথা স্মরণ এমন সহজ একটি এবাদত যে, তাতে না তেমন কোন বিরাট সময় ব্যয় হয়, না পরিশ্রম এবং নাইবা অন্য কোন কাজের কোন রকম ব্যাঘাত ঘটে। তদুপরি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে আল্লাহ্র যিকরের জন্য কোন শর্তাশর্ত, কোন বাধ্যবাধকতা, ওযু কিংবা পবিত্রতা পোশাকাশাক এবং কেবলামুখী হওয়া প্রভৃতি কোন নিয়মই আরোপ করেননি। যে কোন মানুষ যে কোন অবস্থায় ওযুর সাথে, বিনা ওযুতে, দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে যেভাবে ইচ্ছা আল্লাহ্কে স্মরণ করতে পারে। এর পরেও যদি ইমাম জাযারীর গবেষণার বিষয়টি তুলে ধরা যায়, যা তিনি হিসনে হাসীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্র যিকর শুধু মুখে কিংবা মনে মনে যিকর

করাকেই বলা হয় না বরং প্রতিটি জায়েয বা বৈধ কাজ আল্লাহ্-রাসূলের আনুগত্যের আওতায় থেকে করা হলে সে সবই যিকরুল্লাহ্র অন্তর্ভুক্ত, তবে এই পর্যালোচনা অনুযায়ী যিক্রুল্লাহ্র মর্ম এত ব্যাপক ও সহজ হয়ে যায় যে, নিদ্রিত মানুষকেও যাকের বলা যেতে পারে। যেমন কোন কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে— "আলেম ব্যক্তির ঘুমও এবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত"। কারণ, যে আলেম তার এলেমের চাহিদা অনুযায়ী আমল করেন তার জন্য তাঁর নিদ্রা, তাঁর জাগরণ সবাই আল্লাহ্র আনুগত্যের আওতাভুক্ত হওয়া অপরিহার্য।

যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করার নির্দেশটিতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুজাহেদীনের জন্য একটি কাজ বাড়িয়ে দেয়া হল বলে মনে হয় যা স্বভাবতঃই কষ্ট ও পরিশ্রমসাধ্য হবে, কিন্তু আল্লাহ্র যিক্রের এটা এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য যে, তাতে কখনও কোন পরিশ্রম তো হয়ই না, বরং এতে একটা সুখকর অনুভূতি, একটা শক্তি এবং একটা পৃথক স্বাদ অনুভূত হতে থাকে যা মানুষের কাজ-কর্মে অধিকতর সহায়ক হয়। তাছাড়া এমনিতেও কষ্ট-পরিশ্রমের কাজ যারা করে থাকে তাদের অভ্যাস থাকে কোন একটা বাক্য কিংবা কোন গানের কলি কাজের ফাঁকেও গুনগুনিয়ে পড়তে বা গাইতে থাকার। সুতরাং কোরআন করীম মুসলমানগণকে তার একটি উত্তম বিকল্প দিয়েছে যা হাজারো উপকারিতা ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সে কারণেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ, তোমরা যদি দৃঢ়তা এবং আল্লাহ্র যিকরের দু'টি গোপন রহস্য স্মরণ রাখ এবং কর্মক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগ কর, তবে বিজয় ও কৃতকার্যতা তোমাদেরই হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রের একটি যিকর তো হলো তাই, যা সাধারণতঃ 'না'রায়ে তকবীর শ্লোগানের মাধ্যমে করা হয়। এছাড়া আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসার খেয়াল রাখা, তাঁরই উপর নির্ভর করতে থাকা, তাঁর কথা মনে রাখা প্রভৃতি সবই যিক্রুল্লাহ্' – এর অন্তর্ভুক্ত।

৪৬ তম আয়াতে তৃতীয় আরেকটি বিষয়ের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ "আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যকে অপরিহার্যভাবে পালন কর"। কারণ, আল্লাহ্র সাহায্য-সমর্থন শুধুমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে পাপকর্ম ও আনুগত্যহীনতা আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টি ও বঞ্চিতির কারণ হয়ে থাকে। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য কোরআনী হেদায়েতনামার তিনটি ধারা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তা হল দৃঢ়চিত্ততা, আল্লাহ্র যিকর ও আনুগত্য। অতঃপর وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا আয়াতে ক্ষতিকর দিক-গুলোর উপর আলোকপাত করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই বলা হয়েছে وَلَا تَنَازَعُوْا অর্থাৎ, তোমরা পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হয়ো না। তা হলে তোমাদের মাঝে সাহসহীনতা বিস্তার লাভ করবে এবং তোমাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে, তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে।

তারপর وَاصْبِرُوْا (অবশ্য অবশ্যই ধৈর্যধারণ কর।) বাক্যের বিন্যাসধারায় প্রতীয়মান হয় যে, এতে বিবাদ-বিসংবাদ থেকে রক্ষা পাবার একান্ত কার্যকর ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হয়েছে। এর বিশ্লেষণ এই যে, কোন দলের মত ও উদ্দেশে যত ঐক্যই থাক না কেন, কিন্তু ব্যক্তি মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাছাড়া কোন উদ্দেশ্য লাভের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞ, বুদ্ধিজীবীদের মতপার্থক্য থাকা অপরিহার্য। কাজেই অন্যের সাথে চলতে গিয়ে এবং অন্যকে সঙ্গে রাখতে গিয়ে মানুষকে স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়েও ধৈর্যধারণ ও সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং নিজের মতের উপর এত অধিক দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা না থাকা উচিত যা গৃহীত না হলে খেপে যায়। এই গুণের অপর নামই হ'ল 'ছবর'। ইদানীং এ কথাটি সবাই জানে এবং বলেও থাকে যে, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করা অত্যন্ত মন্দ কাজ। কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকার মূল কথা 'ছবর' অবলম্বনে অভ্যস্ত হওয়া এবং নিজের মত মানবার ফিকিরে খেপে না যাওয়ার গুণটি অতি অল্প লোকের মাঝেই পাওয়া যায়। সে কারণেই ঐক্য ও একতার যাবতীয় ওয়াজ-নসীহতই নিষ্ফল হয়ে যায়।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে কোরআন করীম وَلَا تَنَازَعُوْا বলেছে। অর্থাৎ, পারস্পরিক বিবাদ-দ্বন্দ্ব থেকে বিরত করেছে, মতের পার্থক্য কিংবা তা প্রকাশ করতে বাধা দেয়নি। যে ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সাথে সাথে নিজের মত অন্যকে মানাবার প্রেরণা কার্যকর থাকে তাকেই বলা হয় বিবাদ ও বিসংবাদ। আর এটিই হল সে প্রেরণা যাকে কোরআন করীম — وَاصْبِرُوْا শব্দে ব্যক্ত করেছে এবং সবশেষে 'ছবর' অবলম্বনের এক বিরাট উপকারিতার কথা বলে এর তিক্ততা দূর করে দিয়েছে যে,

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (যারা ছবর তথা ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে রয়েছেন।) এটি এমন এক মহাসম্পদ যে, ইহ পর-কালের যাবতীয় সম্পদ এর মোকাবেলায় নগণ্য।

ইমাম ইবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত ক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কোরায়েশ বাহিনী যখন মুসলমানদের সাথে মোকাবেলার উদ্দেশে রওয়ানা হয়, তখন তাদের মনে এমন এক আশঙ্কা চেপে ছিল যে, আমাদের প্রতিবেশী বনূ-বকর গোত্রও আমাদের শত্রু; আমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চলে গেলে সেই সুযোগে এই শত্রু গোত্র না আবার আমাদের বাড়ী-ঘর এবং নারী-শিশুদের উপর হামলা করে বসে! সুতরাং কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ানের ভয়ার্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি থেকে তারা বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু মনের এ আশঙ্কা তাদের পায়ের বেড়ী হয়ে রইল। এমনি সময়ে শয়তান সোরাকা ইবনে মালেকের রূপে এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হল যে, তাঁর হাতে রয়েছে একটি পতাকা আর তাঁর সাথে রয়েছে বীর সৈনিকদের একটি খণ্ড দল। সোরাকা ইবনে মালেক ছিল সে এলাকার এবং গোত্রের বড় সর্দার। কোরায়েশদের মনে তারই আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে কোরায়েশ জোওয়ানদের বাহিনীকে লক্ষ্য করে এক ভাষণ দিয়ে বসল এবং দু'ভাবে তাদেরকে প্রতারিত করল। প্রথমতঃ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ, আজকের দিনে এমন কেউ নেই যারা তোমাদের উপর জয়লাভ করতে পারে। এর উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, আমি তোমাদের প্রতিপক্ষ সম্পর্কেও অবগত রয়েছি এবং তোমাদের শক্তি সামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্য তো চোখেই দেখছি, কাজেই তোমাদের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমরা নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাও, তোমরাই প্রবল থাকবে, তোমাদের মোকাবেলায় বিজয় অর্জন করবে, এমন কেউ নেই।

দ্বিতীয়তঃ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ অর্থাৎ, বনূ-বকর প্রভৃতি গোত্রের ব্যাপারে তোমাদের মনে যে আশঙ্কা চেপে আছে যে, তোমাদের অবর্তমানে তারা মক্কা আক্রমণ করে বসবে, তার দায়-দায়িত্ব আমি নিয়ে নিচ্ছি যে, এমনটি

হবে না ; আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। মক্কার কোরায়েশরা সোরাকা ইবনে মালেক এবং তার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিল। কাজেই তার বক্তব্য শোনামাত্র তা তাদের মনে বসে গেল এবং বনু-বকর গোত্রের আমক্রমণাশঙ্কা মুক্ত হয়ে মুসলমানদের মোকাবেলায় উদ্বুদ্ধ হল।

এই দ্বিবিধ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে নিজেদের বধ্যভূমির দিকে দাবড়ে দিল। কিন্তু— فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ

অর্থাৎ, যখন মক্কার মুশরেক ও মুসলমানদের উভয় দল (বদর প্রাঙ্গণে) সম্মুখ সমরে লিপ্ত হল, তখন শয়তান পেছন ফিরে পালিয়ে গেল।

বদর যুদ্ধে যেহেতু মক্কার মুশরেকদের সহায়তায় একটি শয়তানী বাহিনীও এসে উপস্থিত হয়েছিল, কাজেই আল্লাহ্ তাআলা তাদের মোকাবেলায় হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল (আঃ)-এর নেতৃত্বে ফেরেশতাদের বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, শয়তান যখন সোরাকা ইবনে মালেকের রূপে স্বীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তখন সে জিবরাঈল-আমীন এবং তাঁর সাথী ফেরেশতা বাহিনী দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে সময় তার হাত এক কোরায়শী যুবক হারেছ ইবনে হাশামের হাতে ধরা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চাইল। হারেছ তিরস্কার করে বলল, এ কি করছ! তখন সে বুকের উপর এক প্রবল ঘা মেরে হারেছকে ফেলে দিল এবং নিজের বাহিনী নিয়ে পালিয়ে গেল। হারেছ তাকে সোরাকাহ্ মনে করে বলল, হে আরব সর্দার সোরাকাহ্, তুমি তো বলেছিলে, আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। অথচ ঠিক যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ করছ! তখন শয়তান সোরাকাহ্র বেশেই উত্তর দিল, إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

অর্থাৎ, আমি তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। কারণ, আমি এমন জিনিস দেখছি যা তোমাদের চোখ দেখতে পায় না। অর্থাৎ, ফেরেশতা বাহিনী। তাছাড়া আমি আল্লাহ্কে ভয় করি। কাজেই তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি।

শয়তান যখন ফেরেশতা বাহিনী দেখতে পেল এবং সে যেহেতু তাদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিল, তখন বুঝল যে, এবার আর পরিত্রাণ নেই। তবে তার বাক্য 'আমি আল্লাহ্কে ভয় করি' ! সম্পর্কে তফসীর শাস্ত্রের ইমাম কাতাদাহ বলেন যে, কথাটি সে মিথ্যা বলেছিল। সত্যি সত্যিই যদি সে আল্লাহ্কে ভয় করত, তাহলে নাফরমানী করবে কেন? কিন্তু অধিকাংশ মনীষী বলেছেন যে, ভয় করাও যথাস্থানে ঠিক। কারণ, সে যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণ কুদরত তথা মহা ক্ষমতা এবং কঠিন আযাব সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত, কাজেই ভয় না করায় কোন কারণ থাকতে পারে না। তবে ঈমান ও আনুগত্য ছাড়া শুধু ভয় করা কোন লাভ নেই।

শয়তানের প্রতারণা থেকে বাঁচার উপায় ঃ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যাচ্ছে ঃ

(১) শয়তান মানুষের জাতশত্রু, তাদের ক্ষতি সাধনের জন্য সে নানা রকম কলা-কৌশল ও চাল-ছলনার আশ্রয় নেয় এবং বিভিন্ন রূপ বদলাতে থাকে। কোন কোন সময় শুধু মনে ওসওয়াসা সৃষ্টি করে পেরেশান করে তোলে, আবার কখনো সামনাসামনি এসে ধোঁকা দেয়।

(২) শয়তানকে আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমতা দান করেছেন যে, সে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। জনৈক প্রখ্যাত হানাফী ফেকাহ্বিদের গ্রন্থ 'আকামুল-মার্জান ফী আহ্কামিল্ জানান'-এ বিষয়টি সবিস্তারে প্রমাণ করা হয়েছে। সে কারণেই গবেষক সুফী মনীষীবৃন্দ যারা আধ্যাত্মিক কাশ্ফ ও দর্শনের ক্ষমতা রাখেন তারা মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কোন লোককে দেখেই কিংবা তার কথাবার্তা শুনেই কোন রকম অনুসন্ধান না করে তার পেছনে চলতে আরম্ভ করা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে থাকে—এমন কি কাশ্ফ ও এলহামেও শয়তানের পক্ষ থেকে সংমিশ্রণ হয়ে যেতে পারে।

কৃতকার্যতার জন্য নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, পথের সরলতাও অপরিহার্য ঃ

(৩) যেসব লোক কুফর ও শিরক কিংবা অন্য কোন অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তার কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই হয়ে থাকে যে, শয়তান তাদের দুষ্কর্মকে সুন্দর, প্রশংসনীয় এবং কল্যাণকর হিসাবে প্রকাশ করে তাদের মন-মস্তিষ্ককে ন্যায় ও সত্য এবং প্রকৃত পরিণতি থেকে ফিরিয়ে দেয়। তারা নিজেদের অন্যায়কেই ন্যায় এবং মন্দকেই ভাল মনে করতে শুরু করে। ন্যায়পন্থীদের মত তারাও নিজেদের অন্যায়-অসত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে তৈরী হয়ে যায়। সেজন্য কোরায়েশ বাহিনী এবং তার সর্দার যখন বায়তুল্লাহ থেকে বিদায় নিচ্ছিল তখন বায়তুল্লাহর সামনে এসব শব্দে প্রার্থনা করে বলেছিল – اللهم انصر اهدى الطائفتين – অর্থাৎ, আয় আল্লাহ্, উভয় দলের যেটি অধিকতর সৎপন্থী তারই সাহায্য করো তাকেই বিজয় দান করো। এই অজ্ঞ লোকেরা শয়তানের প্রতারণায় পড়ে নিজেরা নিজেদেরকেই অধিক হেদায়েত-প্রাপ্ত এবং ন্যায়পন্থী বলে মনে করত। আর পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে নিজেদের মিথ্যা ও অন্যায়ের সাহায্য ও সমর্থনে জান-মাল কোরবান করে দিত।

এতেই প্রতীয়মান হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমল তথা কার্যকলাপের গতি-প্রকৃতি সঠিক না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে মদীনার মুনাফেক ও মক্কার মুশরেকদের একটি যৌথ সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে যা তাদের জন্য দুঃখ করেই যেন বলা হয়েছিল। তা হচ্ছে এই غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ

অর্থাৎ, বদরের ময়দানে মুষ্টিমেয় এই মুসলমানরা যে এহেন বিরাট শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে, তা এই বেচারাদেরকে তাদের দ্বীনই প্রতারণায় ফেলে মৃত্যুর মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের উত্তরে বলেছেন وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থাৎ, যে লোক আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করে, জেনে রাখো, সে কখনও আপমানিত ও অপদস্ত হয় না। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা সব কিছুর উপর পরাক্রমশীল। তাঁর কৌশলের সামনে সবার জ্ঞান-বুদ্ধিই বিকল হয়ে যায়। মর্মার্থ এই যে, তোমরা শুধু বস্তু ও বস্তুজগত সম্পর্কেই অবগত এবং তারই উপর নির্ভর কর। কিন্তু সেই গোপন শক্তি সম্পর্কে তোমাদের কোন খবরই নেই, যা বস্তু ও বস্তুজগতের স্রষ্টা আল্লাহ্ তাআলার ভান্ডারে রয়েছে এবং যা তাঁর উপর ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকদের সঙ্গে থাকে।

ইদানিংকালেও সরল সোজা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দেখে তথাকথিত অনেক বিজ্ঞ-বুদ্ধিমান বলে থাকে—এরা সেকেলে, এদের কিছু বলো নাক! কিন্তু এদের মধ্যে যদি আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণ ঈমান ও ভরসা থাকে, তবে

এতে তাদের কিছুই অনিষ্ট হতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্ববর্তী দু'আয়াতে কাফেরদের মৃত্যুকালীন আযাব এবং ফেরেশতাদের সতর্কীকরণের আলোচনা করা হয়েছে। এতে নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ কাফেরদের রূহ কবজ করছিলেন, তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন যে, আগুনে জ্বলার আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর; আপনি যদি সে সময়ে তাদের অবস্থা দেখতেন, তখন আপনি এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেতেন।

তফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের কেউ কেউ এ বিবরণকে সে সমস্ত কোরায়েশ কাফেরের অবস্থা বলে সাব্যস্ত করেছেন, যারা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতা বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে এই যে, বদর যুদ্ধে যে সব কাফের সর্দার নিহত হয় তাদের মৃত্যুতে ফেরেশতাদের হাত ছিল। তাঁরা তাদেরকে সামনের দিক দিয়ে তাদের মুখে এবং পেছন দিক থেকে তাদের পিঠে আঘাত করে তাদের হত্যা করছিলেন আর সেই সঙ্গে আখেরাতে জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে তাদের সংবাদ দিয়ে দিচ্ছিলেন।

আর যারা আয়াতের শব্দের ব্যাপকতারভিত্তিতে এর বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক হিসাবেই গ্রহণ করেছেন তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যখন কোন কাফের মৃত্যুবরণ করে, তখন মওতের ফেরেশতা রূহ কবজ করার সময় তার মুখে ও পিঠে আঘাত করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তাঁদের হাতে আগুনের চাবুক এবং লোহার গদা থাকে যার দ্বারা মরণোম্মুখ কাফেরকে আঘাত করা হয়। কিন্তু যেহেতু এই আযাবের সম্পর্ক জড়জগতের সাথে নয়, বরং কবর জগতের সাথে যাকে বরযখ বলা হয়, কাজেই এই আযাব সাধারণতঃ চোখে দেখা যায় না।

সেইজন্যই রসূলে করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যদি আপনি দেখতেন, তবে বড়ই করুণ দৃশ্য দেখতে পেতেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যুর পর আলমে বরযখেও অর্থাৎ, মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামতের বিচারের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের কাফেরদের উপর আযাব হয়ে থাকে। তাই তা সাধারণভাবে দেখা যায় না। কোরআন মজীদের অন্যান্য আয়াতে এবং হাদীসের বর্ণনাতেও কবর আযাবের ব্যাপারে বিপুল আলোচনা রয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, দুনিয়া ও আখেরাতে এ আযাব তোমাদের নিজের হাতেরই অর্জিত। সাধারণ কাজকর্ম যেহেতু হাতের দ্বারা সম্পাদিত হয়, সেহেতু এখানেও হাতেরই উল্লেখ করা হয়েছে। মর্মার্থ হল এই যে, এসব আযাব তোমাদের নিজেদের আমলেরই ফলাফল। আর একথা সত্য যে, আল্লাহ্ তাঁর বন্দার উপর যুলুমকারী নন যে, অকারণেই কাউকে আযাবে নিপতিত করে দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব অপরাধীর উপর আল্লাহ্ তাআলার এই আযাব নতুন কিছু নয়, বরং এটাই আল্লাহ্ তাআলার সাধারণ রীতি যে, তিনি তাঁর বন্দাদের হেদায়েতের জন্য তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেন, আশে-পাশে তাদের জন্য এমন অসংখ্য বিষয় বিদ্যমান থাকে যেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেই তারা আল্লাহ্ তাআলার অসীম কুদরত ও মহত্ব সম্পর্কে জানতে পারে এবং অসহায় সৃষ্টিকে আর তাঁর সাথে শরীক করে না। তদুপরি অতিরিক্ত সতর্কীকরণের জন্য নবী-রসূল পাঠান। আল্লাহ্র রসূল তাদের বুঝতে ও বোঝাতে সামান্যতম ত্রুটিও রাখেন না। তাঁরা তাদেরকে মু'জেযা আকারে আল্লাহ্ তাআলার ভয়ানক ক্ষমতার দৃশ্যাবলীও দেখান। তারপরেও যখন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় এ সমস্ত বিষয়ে চোখ বন্ধ করে নেয় এবং খোদায়ী সতর্কতার কোনটিতেই কান দেয় না, তখন এহেন লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলার রীতি হল এই যে, পৃথিবীতেও তাদের উপর আযাব নেমে আসে এবং আখেরাতেও অন্তহীন আযাবে বন্দী হয়ে যায়। এরশাদ হয়েছে - كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ - داب - অর্থাৎ, রীতি, অভ্যাস। অর্থাৎ, ফেরাউনের অনুসারী এবং তাদের পূর্ববর্তী কাফের ও উদ্ধত লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলার রীতি সম্পর্কে গোটা বিশ্বই জানতে পেরেছে যে, তিনি ফেরাউনকে তার সমস্ত আড়ম্বর ও প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন এবং তার পূর্ববর্তী আদ ও সামূদ জাতিসমূহকে বিভিন্ন প্রকৃতির আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছেঃ

كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্ তাআলার আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে স্বীয় আযাবে নিপতিত করেছেন। اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ আল্লাহ্ অত্যন্ত শক্তিশালী, কোন ক্ষমতাবানই নিজের শক্তির বলে তাঁর আযাব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। আর আল্লাহ্ তাআলার শাস্তিও অত্যন্ত কঠিন।

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى
يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٣﴾ كَدَأْبِ اٰلِ
فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنٰهُمْ
بِذُنُوْبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٤﴾
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٥﴾
الَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ
مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ
مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ
خِيَانَةً فَانْۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ﴿٥٨﴾
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَ
أَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ
لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَإِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ
فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾

(৫৩) তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ কখনও পরিবর্তন করেন না সে সব নেয়ামত, যা তিনি কোন জাতিকে দান করেছিলেন, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (৫৪) যেমন ছিল রীতি ফেরাউনের বংশধর এবং যারা তাদের পূর্বে ছিল, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহকে। অতঃপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের পাপের দরুন এবং ডুবিয়ে মেরেছি ফেরাউনের বংশধরদেরকে। বস্তুতঃ এরা সবাই ছিল যালেম। (৫৫) সমস্ত জীবের মাঝে আল্লাহ্র নিকট তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যারা অস্বীকারকারী হয়েছে, অতঃপর আর ঈমান আনেনি। (৫৬) যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছ তাদের মধ্য থেকে অতঃপর প্রতিবার তারা নিজেদের কৃত চুক্তি লংঘন করে এবং ভয় করে না। (৫৭) সুতরাং যদি কখনো তুমি তাদেরকে যুদ্ধে পেয়ে যাও, তবে তাদের এমন শাস্তি দাও, যেন তাদের উত্তরসূরিরা তাই দেখে পালিয়ে যায়; তাদেরও যেন শিক্ষা হয়। (৫৮) তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও এমনভাবে যেন হয়ে যাও তোমরা ও তারা সমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধোঁকাবাজ, প্রতারককে পছন্দ করেন না। (৫৯) আর কাফেররা যেন একথা মনে না করে যে, তারা বেঁচে গেছে; কখনও এরা আমাকে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না। (৬০) আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহ্র শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ্ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ্র রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না। (৬১) আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামী তাঁর নেয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। এরশাদ হয়েছে—

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কোন জাতিকে যে নেয়ামত দান করেন তিনি তা ততক্ষণ পর্যন্ত বদলান না, যে পর্যন্ত না সে জাতি নিজেই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপ বদলে দেয়।

এখানে প্রথম লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ নেয়ামত দান করার অন্য কোন মূলনীতি বর্ণনা করেননি। না সে জন্য কোন রকম বাধ্যবাধকতা ও শর্তাশর্ত আরোপ করেছেন, না কারো কোন সৎকর্মের উপর তা নির্ভরশীল রেখেছেন। তার কারণ যদি এমনই হতো, তবে সর্বপ্রথম নেয়ামত আমাদের অস্তিত্ব যাতে আল্লাহ্র আশ্চর্যজনক শিল্পকর্মের হাজারো বিস্ময়কর নেয়ামতের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে—বলাইবাহুল্য, এসব নেয়ামত সে সময় দান করা হয়, যখন না ছিলাম আমরা, না ছিল আমাদের কোন আমল বা কাজকর্ম।

কাজেই যদি আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত ও অনুগ্রহসমূহ বান্দার সৎকর্মের অপেক্ষা থাকত, তবে আমাদের অস্তিত্বই স্থাপিত হতো না।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত ও রহমত তথা তাঁর দান ও করুণা তাঁর রাব্বুল আলামীন ও রাহমানুররাহীম গুণেই প্রকৃতিগত ফসল। অবশ্য এ সমস্ত নেয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য একটা নিয়ম বা মূলনীতি রয়েছে। যা এ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে যে, যে জাতিকে আল্লাহ্ তাআলা কোন নেয়ামত দান করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তা তাদের কাছে থেকে ফিরিয়ে নেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপকে পরিবর্তিত করে আল্লাহ্ তাআলার আযাবকে আমন্ত্রণ জানায়।

অবস্থা পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে ভাল ও সৎ অবস্থা ও কর্মের পরিবর্তে মন্দ অবস্থা ও কার্যকলাপ অবলম্বন করে নেয়া কিংবা আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত আগমনের সময় যে সমস্ত মন্দ ও পাপ কাজে লিপ্ত ছিল নেয়ামত প্রাপ্তির পর তার চেয়ে অধিক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়া।

এই বিশ্লেষণের দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, বিগত আয়াতগুলোতে যে সমস্ত জাতি-সম্প্রদায়ের আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ, কোরায়েশ গোত্রের কাফেররা এবং ফেরাউনের সম্প্রদায়; এ আয়াতের সাথে তাদের সম্পর্ক এ কারণে যে, এরা যদিও আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতপ্রাপ্তির সময়ও তেমন কোন ভাল অবস্থায় ছিল না; সবাই ছিল মুশিরক ও কাফের, কিন্তু নেয়ামতপ্রাপ্তির পর এরা নিজেদের মন্দাচার ও অসৎ কর্মে পূর্বের চাইতে বহুগুণে বেশী তৎপর হয়ে উঠে।

ফেরাউনের বংশধররা বনী-ইসরাঈলদের উপর নানা করম অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ করে এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলা ও বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। যা ছিল তাদের পূর্ববর্তী অপরাধে আরেকটি সংযোজন। এতেকরে তারা নিজেদের অবস্থাকে অধিকতর কল্যাণের

দিকে প্রত্যাবর্তিত করে দেয়। তখন আল্লাহ্ তাআলাও তাঁর নেয়ামতকে বিপদাপদ ও শাস্তি-সাজায় বদলে দেন। তেমনিভাবে মক্কার কোরায়েশরা যদিও মুশরিক ও বদকার ছিল, কিন্তু তার সাথে সাথে তাদের মাঝে কিছু সৎকর্ম, সেলাহ্-রেহমী, তথা স্বজনবাৎসল্য, মেহমান-নাওয়াযী তথা অতিথিপরায়ণতা, হাজীদের সেবা, বায়তুল্লাহ্র প্রতি সম্মানবোধ প্রভৃতি কিছু সদগুণও বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্য দ্বীন-দুনিয়ার নেয়ামতরাজির দরজা খুলে দিয়েছেন; দুনিয়াতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি দান করেছেন। যেসব দেশে কারো বাণিজ্যিক কাফেলা নিরাপদে অতিক্রম করতে পারত না সেসব দেশে—যেমন, সিরিয়া ও ইয়ামেনে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা যেত এবং একান্ত নিরাপদে লাভবান হয়ে ফিরে আসত।

আর দ্বীনের দিক দিয়ে সে মহা-নেয়ামত তাদের দান করা হয়েছে যা বিগত কোন জাতি-সম্প্রদায়ই পায়নি। তাদেরই মাঝে আবির্ভূত হন নবীকুল শিরোমণি সর্বশেষ নবী (সাঃ) এবং তাদেরই মাঝে অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ কোরআন করীম।

কিন্তু এরা আল্লাহ্ তাআলার এসমস্ত দান ও অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করা, এর যথার্থ মর্যাদা দান এবং এগুলোর মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করার পরিবর্তে আগের চেয়েও বেশী পঙ্কিলতায় মজে যায়। সেলাহ্-রেহমী পরিহার করে মুসলমান হয়ে যাওয়ার অপরাধে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর চরম বর্বরতাসুলভ উৎপীড়ন চালাতে আরম্ভ করে, অতিথিপরায়ণতার পরিবর্তে সেই মুসলমানদের জন্য দানা-পানি বন্ধ করার প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করে, হাজীদের সেবা করার পরিবর্তে মুসলমানদের হরমে প্রবেশে পর্যন্ত বাধা দান করতে থাকে। এগুলো ছিল সেসব অবস্থা যাকে কোরায়েশ কাফেররা পরিবর্তিত করে ফেলেছিল। এরই পরিণতিতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নেয়ামতসমূহকে বিপদাপদ ও আযাবে রূপান্তরিত করে দেন। ফলে এরা দুনিয়াতেও অপদস্থ হয় এবং যে সত্তা দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য রাহ্মাতুল্ লিল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন তাঁরই মাধ্যমে এরা নিজেদের মৃত্যু ও ধ্বংসকে আমন্ত্রণ জানায়।

তফসীরে-মাযহারীতে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিলাব ইবনে মুররা যিনি রসূলে করীম (সাঃ)-এর বংশ পরম্পরায় তৃতীয় পুরুষে পরদাদা হিসাবে গণ্য। তিনি প্রথম থেকেই দ্বীনে-ইবরাহীমী ও ইসমাঈলীর অনুগামী ছিলেন এবং বংশানুক্রমিকভাবে এ দ্বীনের নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্য তাদেরই হাতে ন্যস্ত ছিল। কোসাই ইবনে কিলাবের সময়ে তাদের মধ্যে মূর্তি উপাসনার সূচনা হয়। তাঁর পূর্বে তাদের ধর্মীয় নেতা ছিলেন কা'আব ইবনে লুওয়াই। তিনি জুমার দিন যাকে তাদের ভাষায় 'আরোয়িয়া' বলা হয় (সমাজের) সবাইকে সমবেত করে ভাষণ দিতেন এবং বলতেন যে, তার সন্তানবর্গের মাঝে শেষনবী (সাঃ)-এর জন্ম হবে। তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা সবার জন্য অপরিহার্য হবে। যে লোক তাঁর উপর ঈমান আনবে না, তার কোন আমলই কবুল হবে না। মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে তার আরবী কবিতা জাহেলিয়াত আমলের কবিদের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই কোসাই ইবনে কিলাব সমস্ত হাজীর জন্য খানাপিনার ব্যবস্থা করতেন। এমনকি এ দায়িত্বটি মহানবী (সাঃ)-এর বংশে তাঁর আমলেও বলবৎ ছিল। এই ইতিহাসের দ্বারা একথাও বলা যেতে পারে যে, কোরায়েশদের পরিবর্তনের মর্ম হল দ্বীনে-ইবরাহীমী পরিহার করে মূর্তি উপাসনা আরম্ভ করা।

যাহোক, আয়াতের প্রতিপাদ্যে এ কথা বোঝা যাচ্ছে যে, কোন কোন সময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নেয়ামত এমন কোন কোন লোককেও দান করেন, যে তার আমল বা কর্মের দ্বারা তার যোগ্য নয়, কিন্তু প্রদত্ত হওয়ার পর যদি সে নিজের আমল বা কর্মধারা সংশোধন করে কল্যাণের দিকে ফিরানোর পরিবর্তে মন্দ কাজের দিকেই আরো বেশী উৎসাহী হয়ে পড়ে, তখন প্রদত্ত নেয়ামত তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং সে লোক আল্লাহ্র আযাবের যোগ্য হয়ে পড়ে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে— وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদের প্রতিটি কথাবার্তা শুনেন এবং তাদের সমস্ত আমল ও কার্যকলাপ জানেন। এতে কোন রকম ভুল-বিভ্রান্তির কোনই অবকাশ নেই।

উল্লেখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু বরং শব্দাবলীও প্রায় তেমনি, যা এক আয়াত আগেই আলোচিত হয়েছে।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এতে دواب শব্দটি دابة -এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী। মানুষসহ যত প্রাণী ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে সাধারণ প্রচলনে এ শব্দটি বিশেষ করে চতুষ্পদ জীবের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেহেতু নির্বুদ্ধিতা ও অনুভূতিহীনতার দিক দিয়ে তাদের অবস্থা চুতষ্পদ জীব-জানোয়ার অপেক্ষাও নীচে নেমে গিয়েছিল, কাজেই তাদেরকে বোঝাতে গিয়ে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট যে, সমস্ত জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে এরাই সবচেয়ে নিকৃষ্টতর। আয়াতের শেষাংশে রয়েছে— فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ, এরা ঈমান আনবে না। মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে যেসব যোগ্যতা দান করেছিলেন, তারা সে সবই হারিয়ে ফেলেছে এবং চুতষ্পদ জীব-জানোয়ারেরই মত পানাহার ও নিদ্রা-জাগরণকেই জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছে। কাজেই ঈমান পর্যন্ত তাদের পৌঁছা হবে না।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতটি ইহুদী সম্প্রদায়ের ছ'জন লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা পূর্বাহ্নেই সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন যে, এরা শেষ পর্যন্ত ঈমান আনবে না।

اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ – এ আয়াতটি মদীনার ইহুদী এবং বনু-কোরায়যা ও বনু-নাযীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলো মক্কার মুশরিকদের উপর বদর ময়দানে মুসলমানদের মাধ্যমে আল্লাহ্র আযাব অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় আলোচনা এবং পূর্ববর্তী উম্মতের কাফেরদের সাথে তাদের সামঞ্জস্যের বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সে যালেম দলের আলোচনা করা হয়েছে যারা মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানদের জন্য আস্তীনের সাপে পরিণত হয় এবং যারা একদিকে মুসলামানদের বন্ধুত্ব ও সখ্যতার দাবীদার ছিল এবং অপরদিকে মক্কার কাফেরদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। ধর্মমতের দিক দিয়ে এরা ছিল ইহুদী। মক্কার মুশরেকদের মাঝে আবু-জাহ্ল যেমন ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে অগ্রবর্তী ছিল, তেমনি মদীনার ইহুদীদের মধ্যে এ কাজের নেতা ছিল কা'আব ইবনে

আশরাফ।

রসূলে করীম (সাঃ) হিজরত করে মদীনায় চলে আসার পর মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে এরা ভীত হলেও তাদের মনে ইসলামের প্রতি শত্রুতার এক দাবদাহ জ্বলেই যাচ্ছিল।

ইসলামী জাতীয়তা : রসূলে করীম (সাঃ) মদীনায় আগমনের পর ইসলামী রাজনীতির সর্বপ্রথম বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করেন। মুহাজেরীন ও আনসারদের স্বদেশী ও স্বজাতীয় সাম্প্রদায়িকতাকে মিটিয়ে দিয়ে ইসলামের নামে এক নতুন জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাজেরীন ও আনসারদের বিভিন্ন গোত্রকে ভাই-ভাইয়ে পরিণত করে দেন। আর হুযুর (সাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা আনসারদের সে সমস্ত বিরোধও দূর করে দেন যা শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে চলে আসছিল। এবং মুহাজেরীনদের সাথেও তিনি পারস্পরিকভাবে ভাই ভাই সম্পর্ক স্থাপন করেন।

ইহুদীদের সাথে মৈত্রী চুক্তি : হিজরতের পর দেখা যায়, মুসলমানদের প্রতিপক্ষ ছিল দু'টি। (১) মক্কার মুশরেকীন, যাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন মক্কা তাগ করতে বাধ্য করছিল এবং (২) মদীনার ইহুদীবর্গ, যারা এখন মুসলমানদের প্রতিবেশী হয়েছিল। এদের মধ্য থেকে ইহুদীদের সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করা হয়, এবং একটা বিস্তারিত প্রতিজ্ঞা পত্রও লেখা হয়। এই চুক্তির প্রতি আনুগত্য মদীনা এলাকার সমস্ত ইহুদী এবং মুসলমান, আনসার ও মুহাজেরদের উপর আরোপ করা হয়। চুক্তির পূর্ণ ভাষ্য ইবনে-কাসীর 'আল্‌বেদায়াহ্ ওয়ান্নেহায়াহ্' গ্রন্থে এবং সীরাতে ইবনে-হেশাম প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বস্তুতঃ এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে, মদীনার ইহুদিগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুকে প্রকাশ্য কি গোপন সাহায্য করবে না। কিন্তু এরা বদর যুদ্ধের সময় সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করে মক্কার মুশরেকদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে, তবে বদর যুদ্ধের ফলাফল যখন মুসলমানদের সুস্পষ্ট বিজয় এবং কাফেরদে অপমানজনক পরাজয়ের আকারে সামনে এসে যায়, তখন পুনরায় তাদের উপর মুসলমানদের প্রভাব ও ভীতি প্রবল হয়ে উঠে এবং তারা মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে ওযর পেশ করে যে, এবারে আমাদের ভুল হয়ে গেছে, এবার বিষয়টি ক্ষমা করে দিন, ভবিষ্যতে আর এমনভাবে আমরা চুক্তি লংঘন করব না।

মহানবী (সাঃ) ইসলামী গাম্ভীর্য, দয়া ও সহনশীলতার প্রেক্ষিতে যা তাঁর অভ্যাস ছিল আবারও তাদের সাথে চুক্তি নবায়ন করে নিলেন। কিন্তু এরা নিজেদের অসৎ স্বভাব থেকে বিরত ছিল না। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা জানতে পেরে তাদের সাহস বেড়ে যায় এবং তাদের সর্দার কা'আব ইবনে আশরাফ মক্কায় গিয়ে মক্কার মুশরেকদের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আশ্বাস দেয় যে, মদীনার ইহুদীরা তোমাদের সাথে থাকবে।

এটা ছিল তাদের দ্বিতীয়বারে চুক্তি লঙ্ঘন যা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে করেছে। আলোচ্য আয়াতে এভাবে বার বার চুক্তি লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করে তাদের দুষ্কৃতির বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক, যাদের সাথে আপনি চুক্তি সম্পাদন করে নিয়েছেন, কিন্তু এরা প্রতিবারই সে চুক্তি লঙ্ঘন করে চলছে। আয়াতের শেষাংশে এরশাদ হয়েছে : وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ, এরা ভয় করে না। এর মর্মার্থ এও হতে পারে যে, এ হতভাগ্যরা যেহেতু দুনিয়ার লোভে উন্মাদ ও অজ্ঞান হয়ে আছে, তাদের মনে আখেরাতের কোন চিন্তাই নেই। কাজেই এরা আখেরাতের আযাবকে ভয় করে না। এছাড়া এও হতে পারে যে, এহেন দুরাচার ও চুক্তি লঙ্ঘনকারী লোকদের যে অশুভ পরিণতি পৃথিবীতেই হয়ে থাকে এরা নিজেদের গাফলতী ও অজ্ঞানতার দরুন সে ব্যাপারেও ভয় করে না।

অতঃপর সমগ্র বিশ্বই স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে যে, এসব লোক নিজেদের দুষ্কর্মের শাস্তি পৃথিবীতেও ভোগ করেছে। আবু জাহ্লের মত কাআব ইবনে আশরাফ নিহত হয়েছে এবং মদীনার ইহুদীদেরকে দেশছাড়া করা হয়েছে।

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

এতে تَثْقَفَنَّهُمْ শব্দটির অর্থ, তাদের উপর ক্ষমতা লাভ করা। আর شرد মূল ধাতু আর تشريد থেকে গঠিত হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ বিতাড়িত এবং বিক্ষিপ্ত করে দেয়া। অতএব, আয়াতের অর্থ হবে যে, "আপনি যদি কোন যুদ্ধে তাদের উপর ক্ষমতা লাভে সমর্থ হয়ে যান, তবে তাদেরকে এমন কঠোর শাস্তি দিন যা অন্যান্যের জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে যায়।" তাদের পশ্চাতে যারা তাদের সহায়তা ও ইসলামের শত্রুতায় লেগে আছে তারাও যেন একথা উপলব্ধি করে নেয় যে, এখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই কল্যাণ। এর মর্ম হল এই যে, এদেরকে এমন শাস্তিই যেন দেয়া হয়, যা দেখে মক্কার মুশরেকীন ও অন্যান্য শত্রু সম্প্রদায়গুলোও প্রভাবিত হবে এবং ভবিষ্যতে মুসলমানদের মোকাবেলা করার সাহস করবে না।

আয়াতের শেষাংশে لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ বলে রাব্বুল আলামীনের ব্যাপক রহমতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই সুকঠিন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা নয় বরং এতে তাদেরই কল্যাণ যে, হয়তো বা এহেন অবস্থা দেখে এরা কিছুটা চেতনা ফিরে পাবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নিজেদের সংশোধন করে নেবে।

সন্ধি চুক্তি বাতিল করার উপায় : পরবর্তী আয়াতে রসূলে মকবুল (সাঃ)-ক যুদ্ধ ও সন্ধির আইনসংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বলে দেয়া হয়েছে। এতে যদি চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষের দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতা অর্থাৎ, চুক্তি লংঘনের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে চুক্তির বাধ্যবাধকতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা অপরিহার্য নয়। কিন্তু চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়ার পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জায়েয নয়। বরং এর বিশুদ্ধ পন্থা হল এই যে, প্রতিপক্ষকে শান্ত পরিস্থিতিতে এবং অবকাশের অবস্থায় এ ব্যাপারে অবহিত করে দিতে হবে যে, তোমাদের কুটিলতা ও বিরুদ্ধাচারণের বিষয়টি আমাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছে কিংবা তোমাদের আচার-আচরণ আমাদের সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে, তাই আমরা আগামীতে এই চুক্তি পালনে বাধ্য থাকব না; তোমাদেরও সব রকম অধিকার থাকবে যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করতে পার। আয়াতের কথাগুলো হল এই :

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

অর্থাৎ, আপনার যদি কোন চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা হয়, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে এমনভাবে ফিরিয়ে দেবেন যেন আপনারা এবং তারা সমান সমান হয়ে যান। কারণ, আল্লাহ্ খেয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

অর্থাৎ, যে জাতির সাথে কোন সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তার মোকাবেলায় কোন রকম সামরিক পদক্ষেপ খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ্ খেয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না। যদি এ খেয়ানত কাফের শত্রুর সাথেও করা হয়, তবুও তা জায়েয নয়। অবশ্য যদি অপরপক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, তবে এমনটি করা যেতে পারে যে, তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণার মাধ্যমে অবহিত করে দেবেন যে, আগামীতে আমরা এ চুক্তির বাধ্য থাকব না। কিন্তু ঘোষণাটি এমনভাবে হতে হবে যেন মুসলমান ও অপরপক্ষ এতে সমান সমান হয়। অর্থাৎ, এমন অবস্থা যেন সৃষ্টি করা না হয় যে, এই ঘোষণা ও সতর্ককীকরণের পূর্ব থেকেই তদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিয়ে নেবে এবং তারা চিন্তামুক্ত হয়ে থাকার দরুন প্রস্তুতি নিতে পারবে না। বরং যদি কোন প্রস্তুতি নিতে হয়, তা এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পরেই নেবেন।

চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) প্রমুখ সুলায়ম ইবনে 'আমের এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, নির্দিষ্ট এক সময়ের জন্য হযরত মো'আবিয়া (রাঃ) এবং কোন এক সম্প্রদায়ের সাথে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি ছিল। হযরত মো'আবিয়া (রাঃ) ইচ্ছা করলেন যে, এই চুক্তির দিনগুলোতে নিজেদের সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সে সম্প্রদায়ের কাছাকাছি নিয়ে রাখবেন, যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। কিন্তু ঠিক যখন হযরত মো'আবিয়ার সৈন্য দল সেদিকে রওয়ানা হচ্ছিল, দেখা গেল, একজন বুড়ো লোক ঘোড়ায় চড়ে খুব উচ্চৈঃস্বরে না'রা, লাগিয়ে আসছেন যে, الله اكبر الله اكبر وفا ، لا غدرا অর্থাৎ, না'রায়ে তকবীরের সাথে তিনি বললেন, সম্পাদিত চুক্তি পূরণ করা কর্তব্য। এর বিরুদ্ধাচারণ করা উচিৎ নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন যে, কোন জাতি-সম্প্রদায়ের সাথে কোন সন্ধি বা যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেলে, তার বিরুদ্ধে কোন গিঠ খোলা অথবা বাঁধাও উচিত নয়। যাহোক, হযরত মো'আবিয়াকে বিষয়টি জানানো হলো। দেখা গেল কথাগুলো যিনি বলেছেন, তিনি হলেন সাহাবী হযরত আমর ইবনে আম্বাসাহ্ (রাঃ)। হযরত মো'আবিয়া ততক্ষণাৎ স্বীয় বাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যাতে যুদ্ধবিরতির মেয়াদে সৈন্য স্থাপনার পদক্ষেপের দরুন খেয়ানতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়েন।—(ইবনে কাসীর)

উল্লেখিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে সে সমস্ত কাফেরের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বলে বেঁচে গেছে কিংবা অংশ নিয়েও পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা যেন এমন ধারণা না করে যে, বাস্তবিক পক্ষেই আমরা বেঁচে গেছি। কারণ, বদরেরযু দ্ধটি কাফেরদের জন্য এক খোদায়ী আযাব। এই পাকড়াও থেকে বেঁচে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং বলা হয়েছে— اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ অর্থাৎ, এরা নিজেদের চতুরতার দ্বারা আল্লাহ্কে অপারক করতে পারবে না, তিনি যখনই ওদেরকে ধরতে চাইবেন, তখন এরা এক পা'ও সরতে পারবে না। হয়তো বা পৃথিবীতেই এরা ধরা পড়ে যেতে পারে, না হয় আখেরাতে তো তাদের আটকে পড়া অবধারিত।

এ আয়াত ইঙ্গিত করে দিচ্ছে যে, কোন অপরাধী পাপী যদি কোন বিপদ ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যায় এবং তারপরেও যদি তওবা না করে বরং স্বীয় অপরাধে অটল-অবিচল থাকে, তবে তাকে এর লক্ষণ মনে করো না যে, সে কৃতকার্য হয়ে গেছে এবং চিরকালের জন্যেই মুক্তি পেয়ে গেছে, বরং সে সর্বক্ষণই আল্লাহ্র হাতের মুঠোয় রয়েছে এবং এই অব্যাহতি তার বিপদকে আরো বাড়াচ্ছে যদিও সে তা অনুভব করতে পারছে না।

জেহাদের জন্য যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা ফরয ঃ পরবর্তী আয়াতে ইসলামের শত্রুকে প্রতিরোধ ও কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুতির বিধান বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে— وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করে নাও যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব। এক্ষেত্রে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করার সাথে مَّا اسْتَطَعْتُمْ -এর শর্ত আরোপ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমাদের সফলতা লাভের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, তোমাদের প্রতিপক্ষের নিকট যে ধরনের এবং যে পরিমাণ উপকরণ রয়েছে তোমাদেরকেও ততটাই অর্জন করতে হবে বরং সামর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু উপকরণ জোগাড় করতে পার তাই সংগ্রহ করে নাও, তবে সেটুকুই যথেষ্ট—আল্লাহ্র সাহায্য ও সহায়তা তোমদের সঙ্গে থাকবে।

অতঃপর সে উপকরণের কিছুটা বিশ্লেষণ এভাবে করা হয়েছে مِّنْ قُوَّةٍ অর্থাৎ, মোকাবেলা করার শক্তি সঞ্চয় কর। এতে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত এবং শরীরচর্চা ও সমর বিদ্যা শিক্ষা করারও অন্তর্ভুক্ত। কোরআন করীম এখানে তৎকালে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের কোন উল্লেখ করেনি, বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'শক্তি' ব্যবহার করে ইঙ্গিত দিয়েছে, 'শক্তি' প্রত্যেক যুগ, দেশ ও স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে। তৎকালীন সময়ের অস্ত্র ছিল তীর-তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি। তারপরে বন্দুক-তোপের যুগ এসেছে। তারপর এখন চলছে বোমা, রকেটের যুগ। 'শক্তি' শব্দটি এ সবকিছুতেই ব্যাপক। সুতরাং যে কোন বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করার প্রয়োজন হবে সেসবই যদি এই নিয়তে হয় যে, তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুকে প্রতিহত করা এবং কাফেরদের মোকাবেলা করা হবে, তাহলে তাও জেহাদেরই শামিল।

বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা এবং সেগুলো ব্যবহার করার কায়দা-কৌশল অনুশীলন করাকে বিরাট এবাদত ও মহাপুণ্য লাভের উপায় বলে সবাস্ত্য করেছেন।

আর জেহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেহেতু ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষার বিষয়টি সর্বযুগে ও সব জাতিতে আলাদা রকম, সেহেতু রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন— "মুশরেকীনদের বিরুদ্ধে জান-মাল ও মুখে জেহাদ কর।"— (আবু দাউদ, নাসায়ী)

এ হাদীসের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, জেহাদ ও প্রতিরোধ যেমন অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তেমনি কোন কোন সময় মুখেও হয়ে থাকে। তাছাড়া কলমও মুখেরই পর্যায়ভুক্ত। ইসলাম ও কোরআনের বিরুদ্ধে কাফের ও মুলহেদদের আক্রমণ এবং তার বিকৃতি সাধনের প্রতিরোধ মুখে কিংবা কলমের দ্বারা করাও এই সুস্পষ্ট নির্দেশেরভিত্তিতে জেহাদের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখিত আয়াতে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করার নির্দেশ দানের পর সেসব সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করার ফায়দা এবং আসল উদ্দেশ্যও এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ অর্থাৎ, যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নয়, বরং কুফর ও শিরককে পরাভূত ও প্রভাবিত করে দেয়া। তা কখনো মুখ ও কলমের মাধ্যমেও হতে পারে। আবার অনেক সময় যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয়। কাজেই পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিরোধ করা ফরয।

অতঃপর বলা হয়েছে, যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে যাদেরকে প্রভাবিত করা উদ্দেশ্য তাদের অনেককে মুসলমানরা জানে। আর তারা হল সেসব লোক যাদের সাথে মুসলমানদের মোকাবেলা চলছে। এ ছাড়াও কিছু লোক রয়েছে যাদেরকে এখনও মুসলমানরা জানে না। এর মর্ম হল সারা দুনিয়ার কাফের ও মুশরিক, যারা এখনও মুসলমানদের মুকাবেলায় আসেনি কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের সাথেও সংঘর্ষ বাধতে পারে। কোরআন করীমের এ আয়াতটিতে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ যদি নিজেদের উপস্থিত শত্রুর মোকাবেলার প্রস্তুতি নেয়, তবে এর প্রভাব শুধু সে শত্রুর উপরই পড়বে না, বরং দূরদূরান্তের কাফের শক্তির উপরেও পড়বে। বস্তুতঃ হয়েছেও তাই। খোলাফায়ে-রাশেদীনের আমলে এরা সবাই পরাজিত ও প্রভাবিত হয়ে যায়।

যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থেরও প্রয়োজন হয়; বরং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম অর্থ-সম্পদের দ্বারাই তৈরী করা যেতে পারে। সেজন্যই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্‌র রাহে মাল বা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ফযীলত এবং তার মহা-প্রতিদানের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে যে, এ পথে তোমরা যাই কিছু ব্যয় করবে তার বদলা পুরোপুরিভাবে তোমাদেরকে দেয়া হবে। কোন কোন সময় দুনিয়াতেই গনীমতের মালের আকারে এ বদলা মিলে যায়, না হয় আখেরাতের বদলা তো নির্ধারিত রয়েছেই। বলাবাহুল্য, সেটিই অধিকতর মূল্যবান।

তৃতীয় আয়াতে সন্ধির বিধি-বিধান এবং সে সম্পর্কিত বর্ণনা। বলা হয়েছে وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا – سلم সীন বর্ণের উপর যবর (َ) এবং سلم সীন বর্ণের নীচে যের (ِ) উভয় উচ্চারণেই শব্দটি সন্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যদি কাফেরা কোন সময় সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে আপনারও তাই করা উচিত। এখানে নির্দেশবাচক পদ উত্তমতা বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মর্মার্থ এই যে, কাফেরা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে সেক্ষেত্রে আপনার এ অধিকার রয়েছে যে সন্ধি করায় যদি মুসলমানদের কল্যাণ মনে করেন, তাহলে সন্ধিও করতে পারেন।

আর وَاِنْ جَنَحُوْا-এর শর্ত আরোপ করাতে বোঝা যাচ্ছে, সন্ধি তখনই করা যেতে পারে, যখন কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ পাবে। কারণ, তাদের আগ্রহ ব্যতীত যদি স্বয়ং মুসলমানগণ সন্ধির উদ্যোগ করে, তবে এতে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। তবে যদি এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, মুসলমানগণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য একমাত্র সন্ধি ছাড়া অন্য কোন পন্থা দেখা না যায়, তবে সেক্ষেত্রে ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদদের মতে সন্ধির উদ্যোগ করাও জায়েয।

আর যদি শত্রুদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশে এমন কোন সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে যে, তারা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে, শৈথিল্যে ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে, সেজন্য আয়াতের শেষাংশে রসূলে করীম (সাঃ)-কে হেদায়েত দান করা হয়েছে যে, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ, আপনি আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা করুন। কারণ, তিনিই যথার্থ শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। তিনি তাদের কথাবার্তাও শোনেন এবং তাদের মনের গোপন ইচ্ছাও জানেন। তিনি আপনার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। কাজেই আপনি এহেন প্রমাণহীন আশঙ্কা-সম্ভাবনার উপর নিজ কাজের ভিত রাখবেন না। এসব আশঙ্কার বিষয়গুলো আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিন।

পরবর্তী আয়াতে বিষয়টিকে আরো কিছুটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "এ সম্ভাবনাই যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায়, সন্ধি করতে গিয়ে তাদের নিয়ত যদি খারাপ থাকে এবং আপনাকে যদি এভাবে ধোঁকা দিতে চায়, তবুও আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আল্লাহ্ তাআলাই আপনার জন্য যথেষ্ট। পূর্বেও আল্লাহ্‌র সাহায্য-সমর্থনেই আপনার ও মুমিনদের কার্যসিদ্ধি হয়েছে।" তিনি তাঁর বিশেষ সাহায্যে আপনার সহায়তা করেছেন, যা আপনার বিজয় ও কৃতকার্যতার ভিত্তি ও বাস্তব সত্য। আবার বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের জামাতকে আপনার সাহায্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যা ছিল বাহ্যিক উপকরণ। সুতরাং যিনি প্রকৃত মালিক ও মহাশক্তিমান, যিনি বিজয় ও কৃতকার্যতার যাবতীয় উপকরণকে বাস্তবতায় রূপায়িত করেছেন, তিনি আজও শত্রুদের ধোঁকা-প্রতারণার ব্যাপারে আপনার সাহায্য করবেন।

وَإِنْ يُرِيدُوٓا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۚ هُوَ الَّذِيٓ
أَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ
مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ
أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهٗ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾ يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَ
مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾ يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ
عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صٰبِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ
وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَ
اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِينَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهٗٓ أَسْرٰى حَتّٰى
يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيدُ
الْاٰخِرَةَ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ
لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ
حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾

(৬২) পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে প্রতারণা করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে। (৬৩) আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু যমীনের বুকে রয়েছে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। (৬৪) হে নবী, আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট। (৬৫) হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করুন জেহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে এক শ' লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর থেকে তার কারণ, ওরা জ্ঞানহীন। (৬৬) এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশ' লোক বিদ্যমান থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু'হাজারের উপর। আর আল্লাহ্ রয়েছেন দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে। (৬৭) নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ্ চান আখেরাত। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। (৬৮) যদি একটি বিষয় না হত যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ সে জন্য বিরাট আযাব এসে পৌছাত। (৬৯) সুতরাং তোমরা খাও গনীমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমানদের পারস্পরিক স্থায়ী ঐক্য ও সম্প্রীতির প্রকৃত ভিত্তি : এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের অন্তরে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ্ তাআলার দান। তাছাড়া এতে একথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তাআলার না-ফরমানীর মাধ্যমে তাঁর দান অর্জন করা সম্ভব নয়; বরং তাঁর দান লাভের জন্য তার আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা একান্ত শর্ত।

দল বা ব্যক্তিবর্গের মাঝে একতা ও ঐকমত্য এমন একটি বিষয় যার উপকারিতা ও প্রশংসনীয় হওয়ার ব্যাপারে কোন মযহাব ও ধর্ম, কিংবা কোন মতবাদেই কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। সেজন্যই এমন প্রতিটি লোক, যে মানুষের সংশোধন ও সংস্কার কামনা করে সে তাদের পরস্পরের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির উপর জোর দিয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ পৃথিবী এ বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত নয় যে, দীর্ঘস্থায়ী ও আন্তরিক ঐক্য বাহ্যিক প্রচেষ্টার দ্বারা অর্জিত হয় না। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি বিধান ও আনুগত্যের মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে। কোরআন হাকীম এই বাস্তবতার প্রতিই কয়েকটি আয়াতে ইঙ্গিত করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا এই আয়াতে মতবিরোধ ও অনৈক্য থেকে বাঁচার পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে যে, সবাই মিলে আল্লাহ্র রজ্জুকে অর্থাৎ, কোরআন তথা ইসলামী শরীয়তকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। তাহলে সবাই আপনা থেকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে এবং পারস্পরিক যেসব বিরোধ রয়েছে, তা মিটে যাবে। অবশ্য মতের পার্থক্য থাকা পৃথক জিনিস; যতক্ষণ পর্যন্ত এ পার্থক্য তার সীমায় থাকে, ততক্ষণ তা বিবাদ-বিসংবাদ ও বিভেদের কারণ হতে পারে না। ঝগড়া-বিবাদ তখনই হয়, যখন শরীয়ত নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘিত হয়।

আয়াতের শেষভাগে সাধারণ নীতি আকারে বলা হয়েছে : إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِينَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে রয়েছেন। এতে যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বনকারীও অন্তর্ভুক্ত এবং শরীয়তের সাধারণ হুকুম-আহ্কামের অনুবর্তিতায় দৃঢ়তা অবলম্বনকারীরাও শামিল। তাদের সবার জন্যই আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গদানের এ প্রতিশ্রুতি। আর এই খোদায়ী সঙ্গই প্রকৃতপক্ষে তাদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের মূল রহস্য। কারণ, যে ব্যক্তি একক ক্ষমতার অধিকারী পরওয়ারদেগারের সঙ্গলাভে সমর্থ হবে, তাকে সারা বিশ্বের সমবেত শক্তিও নিজের জায়গা থেকে এক বিন্দু নাড়াতে পারে না।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ .... আয়াতটি গয্ওয়ায়ে বদরের বিশেষ এক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এগুলোর তফসীর করার পূর্বে বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য রেওয়ায়েত ও হাদীসের মাধ্যমে ঘটনাটি বিবৃত করা বাঞ্ছনীয়।

ঘটনাটি হল এই যে, বদর যুদ্ধটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম জেহাদ যা একান্তই দৈবাৎ সংঘটিত হয়। তখনও জেহাদ সংক্রান্ত হুকুম-আহ্কামের কোন বিস্তারিত বিবরণ কোরআনে অবতীর্ণ হয়নি। যেমন, জেহাদ করতে গিয়ে গনীমতের মাল হস্তগত হলে তা কি করতে হবে, শত্রু-সৈন্য নিজেদের আয়ত্বে এসে গেলে, তাকে বন্দী করা জায়েয হবে কিনা এবং বন্দী করে ফেললে তাদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে প্রভৃতি।

সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলে

করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। সেগুলোর মাঝে এও একটি যে, কাফেরদের থেকে প্রাপ্ত গনীমতের মালামাল কারো জন্য হালাল ছিল না, কিন্তু আমার উম্মতের জন্য তা হালাল করে দেয়া হয়েছে। গনীমতের মাল বিশেষভাবে এ উম্মতের জন্য হালাল হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্‌র তো জানা ছিল, কিন্তু গযওয়ায়ে বদরের পূর্ব পর্যন্ত এর হালাল হওয়ার ব্যাপারে মহানবী (সাঃ)-এর উপর কোন ওহী নাযিল হয়নি। অথচ গযওয়ায়ে বদরে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানগণকে ধারণা-কল্পনার বাইরে অসাধারণ বিজয় দান করেন। শত্রুরা বহু মালামালও ফেলে যায়, যা গনীমত হিসাবে মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং তাদের বড় বড় সত্তর জন সর্দারও মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসে। কিন্তু এতদুভয় বিষয়ের বৈধতা সম্পর্কে কোন ওহী তখনওআসেনি।

সে কারণেই সাহাবায়ে কেরামের প্রতি এহেন তড়িৎ পদক্ষেপের দরুন ভর্ৎসনা অবতীর্ণ হয়। এই ভর্ৎসনা ও অসন্তুষ্টিই এই ওহীর মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বাহ্যতঃ দুটি অধিকার মুসলমানগণকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এরই মাঝে এই ইঙ্গিতও করা হয়েছিল যে, বিষয়টির দুটি দিকের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার নিকট একটি পছন্দনীয় এবং অপরটি অপছন্দীয়। তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, সহীহ ইবনে হাব্বান প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ সময় হযরত জিব্রাঈলে-আমীন রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট আগমন করে তাঁকে আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ শোনান যে, আপনি সাহাবায়ে কেরামকে দুটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার দান করুন। তার একটি হলো এই যে, এই যুদ্ধবন্দীদিগকে হত্যা করে শত্রুর মনোবলকে চিরতরে ভেঙ্গে দেবে। আর দ্বিতীয়টি হলো এই যে, তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেবে। তবে দ্বিতীয় অবস্থায়, আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশক্রমে একথা অবধারিত হয়ে রয়েছে যে এর বদলা হিসাবে আগামী বছর মুসলমানদের এমনি সংখ্যক লোক শহীদ হবেন, যে সংখ্যক বন্দী আজ মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হবে। এভাবে যদিও ক্ষমতা দেয়া হয় এবং সাহাবায়ে কেরামকে এ দুটি থেকে একটি বেছে নেয়ার অধিকার দেয়া হয় কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় সত্তর জন সাহাবার শাহাদাতের ফয়সালার বিষয় উল্লেখ করার মাঝে অবশ্যই এই ইঙ্গিত বিদ্যমান ছিল যে, এ দিকটি আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয় নয়। কারণ, এটি যদি পছন্দই হত, তবে এর ফলে সত্তর জন মুসলমানের খুন অবধারিত হতো না।

সাহাবায়ে কেরামের সামনে এ দুটি বিষয় যখন ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পেশ করা হল যে, এদেরকে যদি মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে হয়তো এরা সবাই অথবা এদের কেউ কেউ কোন সময় মুসলমান হয়ে যাবে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই হল জেহাদের উদ্দেশ্য ও মূল উপকারিতা। দ্বিতীয়তঃ এমনও ধারণা করা হয়েছিল যে, এ সময় মুসলমানগণ যখন নিদারুণ দৈন্যাবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন সত্তর জনের আর্থিক মুক্তিপণ অর্জিত হলে এ কষ্টও কিছুটা লাঘব হতে পারে এবং তা ভবিষ্যতে জেহাদের প্রস্তুতির জন্যও সহায়ক হতে পারে। রইল সত্তর জন মুসলমানের শাহাদতের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এটাও একটা বিপুল গৌরবের বিষয়। এতে ঘাবড়ানো উচিত নয়। এসব ধারণার প্রেক্ষিতে সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ও অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এ মতই প্রদান করলেন যে, বন্দিগণকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেয়া হোক। শুধুমাত্র হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) প্রমুখ কয়েকজন এ মতের বিরোধিতা করলেন এবং বন্দীদের সবাইকে হত্যা করার পক্ষে মত দান করলেন। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, একান্ত সৌভাগ্যক্রমে ইসলামের মোকাবেলায় শক্তি ও সামর্থ্যের বলে যোগদানকারী সমস্ত কোরায়েশ সর্দার এখন মুসলমানদের হস্তগত হলেও পরে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি একান্তই কল্পনানির্ভর। কিন্তু ফিরে গিয়ে এরা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করবে সে ধারণাই প্রবল।

রসূলে করীম (সাঃ) যিনি রাহমাতুললিল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন এবং আপাদমস্তক করুণার আধার ছিলেন, তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দুটি মত লক্ষ্য করে সে মতটিই গ্রহণ করে নিলেন, যাতে বন্দীদের ব্যাপারে রহ্‌মত ও করুণা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং বন্দীদের জন্যও ছিল সহজ। অর্থাৎ, মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া। তিনি ছিদ্দীকে আকবর ও ফারূককে আযম (রাঃ)-কে উদ্দেশ করে বললেন لواتفقتما ما خالفتكما অর্থাৎ, তোমরা উভয়ে যদি কোন বিষয়ে একমত হয়ে যেতে, তবে আমি তোমাদের বিরোধিতা করতাম না। (মাযহারী) তাঁদের মত-বিরোধের ক্ষেত্রে বন্দীদের প্রতি সহজতা প্রদর্শন করাই ছিল সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও করুণার তাকাদা। অতএব, তাই হল। আর তারই পরিণতিতে পরবর্তী বছর খোদায়ী বাণী মোতাবেক সত্তর জন মুসলমানের শাহাদতের ঘটনা সংঘটিত হল।

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا আয়াতে সে সমস্ত সাহাবাকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার রসূলকে অসংগত পরামর্শ দান করছো। কারণ, শত্রুদেরকে বশে পাওয়ার পরেও তাদের শক্তি ও দম্ভকে চূর্ণ করে না দিয়ে অনিষ্টকর শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের জন্য স্থায়ী বিপদ দাঁড় করিয়ে দেয়া কোন নবীর পক্ষেই শোভন নয়।

এ আয়াতে حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে اثخان এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কারও শক্তি ও দম্ভকে ভেঙ্গে দিতে গিয়ে কঠোরতর ব্যবস্থা নেয়া। এ অর্থের তাকীদ বোঝাবার জন্য فِى الْاَرْضِ বাক্যের প্রয়োগ। এর সারার্থ হল এই যে, শত্রুর দম্ভকে ধূলিস্মাৎ করে দেন।

যেসব সাহাবী মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন, তাঁদের সে মতে যদিও নির্ভেজাল একটি দ্বীনী প্রেরণাও বিদ্যমান ছিল—অর্থাৎ, মুক্তি পাবার পর তাদের মুসলমান হয়ে যাবার আশা, কিন্তু সেই সাথে আত্মস্বার্থজনিত অপর একটি দিকও ছিল যে, এতে করে তাদের হাতে কিছু অর্থ-সম্পদ এসে যাবে। অথচ তখনও পর্যন্ত কোন সরাসরি 'নছ' বা খোদায়ী বাণীর মাধ্যমে সে সমস্ত মালামালের বৈধতা প্রমাণিত ছিল না। কাজেই মানুষের যে সমাজটিকে রসূলে করীম (সাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে এমন মানদন্ডের গঠন করা হচ্ছিল, যাতে তাদের মর্যাদা ফেরেশতাদের চেয়েও বেশী হবে, তাদের পক্ষে গনীমতের সে মাল-সামান বা দ্রব্য সামগ্রীর আগ্রহকেও এক রকম পাপ বলে গণ্য করা হয়। তাছাড়া যে কাজে বৈধাবৈধের সমন্বয় থাকে, তার সমষ্টিকে অবৈধ বলেই বিবেচনা করা হয়। সে জন্যই সাহাবায়ে কেরামের সে কাজটিকে ভর্ৎসনাযোগ্য সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে ঃ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٠﴾ وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٧٢﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴿٧٣﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٤﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٥﴾

(৭০) হে নবী, তাদেরকে বলে দাও, যারা তোমার হাতে বন্দী হয়ে আছে যে, আল্লাহ্ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম মঙ্গলচিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৭১) আর যদি তারা তোমার সাথে প্রতারণা করতে চায়—বস্তুতঃ তারা আল্লাহ্র সাথেও ইতিপূর্বে প্রতারণা করেছে, অতঃপর তিনি তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত, সুকৌশলী। (৭২) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্র রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী-চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ সেসবই দেখেন। (৭৩) আর যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে। (৭৪) আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহ্র রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরাই হলো সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের জন্যে রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী। (৭৫) আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জেহাদ করেছে,. তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ যারা আত্মীয়, আল্লাহ্র বিধান মতে তারা পরস্পর বেশী হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাবতীয় বিষয়ে সক্ষমও অবগত।

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ, তোমরা দুনিয়া কামনা করছ অথচ তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্ চান, তোমরা যেন আখেরাত কামনা কর। এখানে ভর্ৎসনা হিসাবে শুধুমাত্র তাদের সে কাজের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে যা ছিল অসন্তুষ্টির কারণ। বন্দীদের মুসলমান হওয়ার আশা সংক্রান্ত দ্বিতীয় কারণটির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের মত নিঃস্বার্থ, পবিত্রাত্মা দলের পক্ষে এমন দ্ব্যর্থবোধক নিয়ত করা, যাতে কিছু পার্থিব স্বার্থও নিহিত থাকবে গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে ভর্ৎসনা ও সতর্কীকরণের লক্ষ্যস্থল হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। যদিও রসূলে করীম (সাঃ) নিজেও তাঁদের মতামত সমর্থন করে তাদের সাথে আংশিকভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে কাজটি ছিল একান্তভাবেই তাঁর রাহ্মাতুললিল আলামীন বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ। সে কারণেই তিনি মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সে দিকটিই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, যা বন্দীদের পক্ষে সহজ ও দয়াভিত্তিক।

আয়াতের শেষাংশে وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা মহাপরাক্রমশীল, হেকমতওয়ালা; আপনারা যদি তাড়াহুড়া না করতেন, তবে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে পরবর্তী বিজয়ে আপনাদের জন্য ধন-সম্পদের ব্যবস্থাও করে দিতেন।

মাসআলা ঃ উল্লেখিত আয়াতে মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তিদান ও গনীমতে মালামাল সংগ্রহের কারণে ভর্ৎসনা নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ্র আযাবের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং পরে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এতে ভবিষ্যতে এসমস্ত ব্যাপারে মুসলমানদিগকে কোন্ পন্থা অবলম্বন করতে হবে, তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। সে কারণেই পরবর্তী আয়াতে গনীমতের মালামাল সংক্রান্ত মাসআলাটি পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে — فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ অর্থাৎ, গনীমতের যে সব মালামাল তোমাদের হস্তগত হবে, এখন থেকে সেগুলো তোমরা খেতে পারবে এবং ভবিষ্যতের জন্যও তা হালাল করে দেয়া হল। কিন্তু তার পরেও এতে একটি সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে, গনীমতের মাল হালাল হওয়ার নির্দেশটি তো এখন হলো; কিন্তু ইতিপূর্বে যেসব মালামাল সংগ্রহ করে নেয়া হয়েছিল হয়তো সেগুলোতে কোন রকম কারাহাত বা দোষ থাকতে পারে। সেইজন্যই এর পর حَلٰلًا طَيِّبًا বলে সে সন্দেহের অপনোদন করা হয়েছে যে, যদিও বৈধতার হুকুম নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে গনীমতের মাল সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া জায়েয ছিল না, কিন্তু এখন যখন গনীমতের মালের বৈধতা সংক্রান্ত হুকুম এসে গেছে, তখন সংগৃহীত মালামালও নির্দোষভাবেই হালাল।

মাসআলা ঃ এখানে উসূলে ফেকাহ্র একটি বিষয় লক্ষণীয় ও প্রণিধানযোগ্য। তা হল এই যে, যখন কোন অবৈধ পদক্ষেপের পর স্বতন্ত্র কোন আয়াতের মাধ্যমে সে বিষয়টিকে হালাল করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, তখন তাতে পূর্ববর্তী পদক্ষেপের কোনই প্রভাব থাকে না; সে মালামাল যথার্থভাবেই পবিত্র ও হালাল হয়ে যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গযওয়ায়ে বদরের বন্দীদিগকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। ইসলাম ও মুসলমাদের সে শত্রু যারা তাদেরকে কষ্ট দিতে, মারতে এবং হত্যা করতে কখনই কোন ত্রুটি করেনি; যখনই কোন রকম সুযোগ পেয়েছে একান্ত নির্দয়ভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছে, মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসার পর এহেন শত্রুদেরকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেয়াটা সাধারণ ব্যাপার

ছিল না; এটা ছিল তাদের জন্য বিরাট প্রাপ্তি এবং অসাধারণ দয়া ও করুণা। পক্ষান্তরে মুক্তিপণ হিসাবে তাদের কাছ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছিল, তাও ছিল অতি সাধারণ।

এটা আল্লাহ্ তাআলার একান্ত মেহেরবাণী ও দয়া যে, এই সাধারণ অর্থ পরিশোধ করতে গিয়ে যে কষ্ট তাদের করতে হয়, তাও তিনি কি চমৎকারভাবে দূর করে দিয়েছেন। উল্লেখিত আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা যদি তোমাদের মন–মানসিকতায় কোন রকম কল্যাণ দেখতে পান, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু নেয়া হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম বস্তু তোমাদের দিয়ে দেবেন। তদুপরি তোমাদের অতীত পাপও তিনি ক্ষমা করে দেবেন। এখানে خَيْرًا অর্থ ঈমান ও নিষ্ঠা। অর্থাৎ, মুক্তি লাভের পর সেসব বন্দীদের মধ্যে যারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা যে মুক্তিপণ দিয়েছে, তার চাইতে অধিক ও উত্তম বস্তু পেয়ে যাবে। বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়ার সাথে সাথে তাদেরককে এমনভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, তারা যেন মুক্তি লাভের পর নিজেদের লাভ–ক্ষতির প্রতি মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে। সুতরাং বাস্তব ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছিলেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে ক্ষমা এবং জান্নাতে সুউচ্চ স্থান দান ছাড়াও পার্থিব জীবনে এত অধিক পরিমাণ ধন–সম্পদ দান করেছিলেন, যা তাদের দেয়া মুক্তিপণ অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ও অধিক ছিল।

অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন যে, এ আয়াতটি মহানবী (সাঃ)–এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ, তিনিও বদরের যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেও মুক্তিপণ নেয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, মক্কা থেকে তিনি যখন বদর যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন কাফের সৈন্যদের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশে প্রায় সাতশ' স্বর্ণমুদ্রা সাথে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো ব্যয় করার পূর্বেই তিনি গ্রেফতার হয়ে যান।

যখন মুক্তিপণ দেয়ার সময় আসে, তখন তিনি হুযূর আকরাম (সাঃ)–এর নিকট নিবেদন করলেন, আমার কাছে যে স্বর্ণ ছিল সেগুলোকেই আমার মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করা হোক। হুযূর (সাঃ) বললেন, যে সম্পদ আপনি কুফরীর সাহায্যের উদ্দেশে নিয়ে এসেছিলেন, তা তো মুসলমাদের গনীমতের মালে পরিণত হয়ে গেছে, ফিদ্‌ইয়া বা মুক্তিপণ হতে হবে সেগুলো বাদে। সাথে সাথে তিনি একথাও বললেন যে, আপনার দুই ভাতিজা 'আকীল ইবনে–আবী তালেব এবং নওফল ইবনে হারেসের মুক্তিপণও আপনাকেই পরিশোধ করতে হবে। আব্বাস (রাঃ) নিবেদন করলেন, আমার উপর যদি এত অধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়, তবে আমাকে কোরাইশদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে; আমি সম্পূর্ণভাবে ফকীর হয়ে যাব। মহানবী (সাঃ) বললেন, কেন, আপনার নিকট কি সে সম্পদগুলো নেই, যা আপনি মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে আপনার স্ত্রী উম্মুল ফযলের নিকট রেখে এসেছেন? হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, আপনি সে কথা কেমন করে জানলেন? আমি যে রাত্রের অন্ধকারে একান্ত গোপনে সেগুলো আমার স্ত্রীর নিকট অর্পন করেছিলাম এবং এ ব্যাপারে তৃতীয় কোন লোকই অবগত নয়! হুযূর (সাঃ) বললেন, সে ব্যাপারে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে বিস্তারিত অবহিত করেছেন। একথা শুনেই হযরত আব্বাস (রাঃ)–এর মনে হুযূর (সাঃ)–এর নবুওয়তের সত্যতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায়। তাছাড়া এর আগেও তিনি মনে মনে হুযূর (সাঃ)–এর ভক্ত ছিলেন, কিন্তু কিছু সন্দেহও ছিল যা এ সময় আল্লাহ্ তাআলা দূর করে দেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তখনই মুসলমান হয়ে যান। কিন্তু তিনি বহু টাকা–কড়ি মক্কার কোরাইশদের নিকট ঋণ হিসাবে প্রাপ্য ছিল। তিনি যদি তখনই তাঁর মুসলমান হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি প্রাকাশ্যে ঘোষণা করতেন, তবে সে টাকাগুলো মারা যেত। কাজেই তিনি তখনই তা ঘোষণা করলেন না। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)ও এ ব্যাপারে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করলেন না। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি মহানবী (সাঃ)–এর নিকট মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে মহানবী (সাঃ) তাঁকে এ পরামর্শই দিলেন, যাতে তিনি এ মুহূর্তে হিজরত না করেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ)–এর এ সমস্ত কথোপকথনের প্রেক্ষিতে রসূলে করীম (সাঃ) উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত খোদায়ী ওয়াদার বিষয়টিও তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, আপনি যদি মুসলমান হয়ে গিয়ে থাকেন এবং একান্ত নিষ্ঠাসহকারে ঈমান এনে থাকেন, তবে যেসব মালামাল আপনি মুক্তিপণ বাবদ খরচ করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবেন। সুতরাং হযরত আব্বাস (রাঃ) ইসলাম প্রকাশের পর প্রায়ই বলে থাকতেন, আমি তো সে ওয়াদার বিকাশ বাস্তবতা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করছি। কারণ, আমার নিকট থেকে মুক্তিপণ বাবদ বিশ উকিয়া সোনা নেয়া হয়েছিল। অথচ এখন আমার বিশটি গোলাম (ক্রীতদাস) বিভিন্ন স্থানে আমার ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে এবং তাদের কারো ব্যবসায়ই বিশ হাজার দেরহাম থেকে কম নয়। তদুপরি হজ্বের সময় হাজীদের পানি খাওয়ানোর খেদমতটিও আমাকেই অর্পণ করা হয়েছে যা আমার নিকট এমন এক অমূল্য বিষয় যে, সমগ্র মক্কাবাসীর যাবতীয় ধন–সম্পদও এ তুলনায় তুচ্ছ বলে মনে হয়।

গযওয়ায়ে বদরের বন্দীদের মধ্যে কিছু লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের সম্পর্কে লোকদের মনে একটা খট্‌কা ছিল যে, হয়তো এরা মক্কায় ফিরে গিয়ে আবার ইসলাম থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং পরে আমাদের কোন না কোন ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হবে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা এ খট্‌কাটি এভাবে দূর করে দিয়েছেন ঃ

وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থাৎ, যদি আপনার সাথে খেয়ানত করার সংকল্পই তারা করে, তবে তাতে আপনার কোন ক্ষতিই সাধিত হবে না। এরা তো সেসব লোকই, যারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌র সাথেও খেয়ানত করেছে। অর্থাৎ, সৃষ্টিলগ্নে আল্লাহ্ তাআলার রাব্বুল আলামীন তথা বিশ্বপালক হওয়ার ব্যাপারে যে অঙ্গীকার তারা করেছিল, পরবর্তীকালে তার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তাদের এই খেয়ানত তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা অপদস্ত, পদদলিত, লাঞ্ছিত ও বন্দী হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাআলা মনের গোপনতম রহস্য সম্পর্কেও অবহিত রয়েছেন । তিনি বড়ই সুকৌশলী, হেকমতওয়ালা। এখনও যদি তারা আপনার বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহ্‌র হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে যাবেটা কোথায়? তিনি এমনিভাবে তাদেরকে পুনরায় গ্রেফতার করে ফেলবেন। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদেরকে একান্ত উৎসাহব্যাঞ্জক ভঙ্গিতে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল। আর আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সর্তক করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের পার্থিব ও পারত্রিক কল্যাণ শুধুমাত্র ইসলাম ও ঈমানের উপরই নির্ভরশীল।

এ পর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ, তাদের বন্দীদশা ও মুক্তিদান এবং তাদের সাথে সন্ধি-সমঝোতার বিধান সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। পরবর্তী আয়াতসমূহে অর্থাৎ, সূরার শেষ পর্যন্ত এ প্রসঙ্গেই এক বিশেষ অধ্যায়ের আলোচনা ও তার বিধি-বিধান সংক্রান্ত কিছু বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে। আর সেগুলো হচ্ছে হিজরত সংক্রান্ত হুকুম-আহ্কাম। কারণ, কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করতে গিয়ে এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে যে, মুসলমাদের হয়তো তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না এবং তারাও সন্ধি করতে রাজী হবে না। এহেন নাযুক পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পরিত্রাণ লাভের একমাত্র পথ হল হিজরত। অর্থাৎ, এ নগরী বা দেশ অন্য কোন নগরী বা জনপদে গিয়ে বসতি স্থাপন করা, যেখানে স্বাধীনভাবে ইসলামী হুকুম-আহ্কামের উপর আমল করা যাবে।

সূরা আন্ফালের শেষ চারিটি আয়াতে সে সমস্ত আহ্কাম বর্ণনাই প্রকৃত ও মূল উদ্দেশ্য যা মুসলমান মুহাজেরদের উত্তরাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে অমুহাজের মুসলমানও অমুসমানদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আলোচনাও এসে গেছে।

এসব বিধি-বিধান বা হুকুম-আহ্কামের সারমর্ম এই যে, যে সমস্ত লোকের উপর শরীয়তের বিধি-বিধান বর্তায় তারা প্রথমতঃ দু'ভাগে বিভক্ত ; মুসলমান ও কাফের। আবার মুসলমান তখনকার দৃষ্টিতে দু'রকম; (১) মুহাজের ; যারা হিযরত ফরয হওয়ার প্রেক্ষিতে মক্কা থেকে মদীনায় এসে অবস্থান করতে থাকেন। (২) যারা কোন বৈধ অসুবিধার দরুন কিংবা অন্য কোন কারণে মক্কাতেই থেকে যান।

পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক এ সবরকম লোকদের মাঝেই বিদ্যমান ছিল। কারণ, ইসলামের প্রাথমিক পূর্বে এমন হয়েছিল যে, পুত্র হয়তো মুসলমান হয়ে গেলেন কিন্তু পিতা কাফেরই রয়ে গেল, কিংবা পিতা মুসলমান হয়ে গেলেন কিন্তু পুত্র রয়ে গেল কাফের। তেমনিভাবে ভাই ভাতিজা ভাছতে, নানা-মামা প্রভৃতির অবস্থাও ছিল তাই। তদুপরি মুহাজের-অমুহাজের মুসলমানদের মধ্যে আত্মীয়তা থাকা তো বলাইবাহুল্য।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অসীম রহমত ও পরম কুশলতার দরুন মৃত ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত মাল-আসবাব তথা ধন-সম্পদের অধিকারী তারই নিকটবর্তী ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজনকে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ যে যা কিছু এ পৃথিবীতে অর্জন করেছেন, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত কিছুর মালিকানাই আল্লাহ্ তাআলার। তাঁর পক্ষ থেকে এগুলো সারা জীবন ব্যবহার করার জন্য, এগুলোর দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য মানুষকে অস্থায়ী মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং মানুষের মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সব কিছু আল্লাহ্ তাআলার অধিকারে চলিয়া যাওয়াটাই ছিল ন্যায় বিচার ও যুক্তিসম্মত। যার কার্যকররূপ ছিল ইসলামী বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগারে জমা হয়ে যাওয়ার পর তদ্দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালন ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এমনটি করতে গেলে একদিকে মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অনুভূতি আহত হত। তাছাড়া মানুষ যখন একথা জানত যে, মৃত্যুর পর আমার ধন-সম্পদ না পাবে আমার সন্তান-সন্ততি, না পাবে আমার পিতা-মাতা, আর নাইবা পাবে আমার স্ত্রী, তখন তার ফল দাঁড়াত এই যে, স্বভাবসিদ্ধভাবে কোন মানুষই স্বীয় মালামাল ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা করত না। শুধুমাত্র নিজের জীবন পর্যন্তই প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করত। তার বেশী কিছু করার জন্য কেউ এতটুকু যত্নবান হত না। বলাবাহুল্য, এতে সমগ্র মানবজাতি ও সমস্ত শহর-নগরীর উপর ধ্বংস ও বরবাদী নেমে আসত।

সে কারণেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে তার আত্মীয় স্বজনের অধিকার বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। বিশেষ করে এমন আত্মীয়-স্বজনের উপকারিতার লক্ষ্যে সে তার জীবনে ধন-সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করত এবং নানা রকম কষ্ট পরিশ্রমে ব্রতী হত।

এরই সাথে সাথে ইসলাম যে অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটির প্রতিও মীরাসের বন্টন ব্যাপার লক্ষ্য রেখেছে, যার জন্য গোটা মানব জাতির সৃষ্টি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য ও এবাদত। এদিক দিয়ে সমগ্র মানব বিশ্বকে দু'টি পৃথক পৃথক জাতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে; মুমিন ও কাফের। কোরআনে উল্লেখিত এ আয়াত خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ এর মর্মও তাই।

এই দ্বি-বিধ জাতীয়তার দর্শনই বংশ ও গোত্রগত সম্পর্কে মীরাসের পর্যায় পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সুতরাং কোন মুসলমান কোন কাফের আত্মীয়ের মীরাসের কোন অংশ পাবে না এবং কোন কাফেরেরও তার কোন মুসলমান আত্মীয়ের মীরাসে কোন অধিকার থাকবে না। প্রথমোক্ত দু'টি আয়াতে এ বিষয়েরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ এ নির্দেশটি চিরস্থায়ী ও অরহিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামের এ উত্তরাধিকার নীতিই বলবৎ থাকবে।

এর সাথে মুসলমান মুহাজের ও আনসারদের মীরাস সংক্রান্ত অন্য একটি হুকুম রয়েছে, যার সম্পর্কে প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানগণ যতক্ষণ মক্কা থেকে হিজরত না করবে, হিজরতকারী মুসলমানদের সাথে তাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন থাকবে। না কোন মুহাজের মুসলমান তার অমুহাজের মুসলমান আত্মীয়ের উত্তরাধিকারী হবে, না অমুহাজের কোন মুসলমান মুহাজের মুসলমানদের মীরাসের কোন অংশ পাবে। বলাবাহুল্য, এ নির্দেশটি তখন পর্যন্তই কার্যকর ছিল যতক্ষণ না মক্কা বিজয় হয়ে যায়। কারণ, মক্কা বিজয়ের পর স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ) ঘোষণা করে দেন, لا هجرة بعد الفتح অর্থাৎ, মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের হুকুমটিই শেষ হয়ে গেছে। আর হিজরতের হুকুমই যখন শেষ হয়ে গেল, তখন যারা হিজরত করবে না, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের প্রশ্নটিও শেষ হয়ে যায়।

এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন, এ হুকুমটি মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে অনুসন্ধানবিদদের মতে এ হুকুমটিও চিরস্থায়ী ও গায়েব মনসূখ, কিন্তু এটি অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে। যে পরিস্থিতিতে কোরআনের অবতরণকালে এ হুকুমটি নাযিল হয়েছিল, যদি কোন কালে কোন দেশে এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহলে সেখানেও এ হুকমুই প্রবর্তিত হবে।

বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর হিজরত করা 'ফরযে আইন' তথা অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে হাতে গণা কতিপয় মুসলমান ছাড়া বাকী সব মুসলমানই হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছিলেন। তখন মক্কা থেকে হিজরত না করা এরই লক্ষণ হয়ে গিয়েছিল যে, সে মুসলমান নয়। কাজেই অমুহাজেরদের ইসলামও তখন সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেজন্যই মুহাজের-অমুহাজেরদের উত্তরাধিকার স্বত্ব ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল।

এখন যদি কোন দেশে আবারও এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেখানে বসবাস করে যদি ইসলামী ফরায়েয সম্পাদন করা আদৌ সম্ভব না হয়, তবে সে দেশ থেকে হিজরত করা পুনরায় ফরয হয়ে যাবে। আর এমন পরিস্থিতিতে অতি জটিল কোন ওযর ব্যতীত হিজরত না করা নিশ্চিতভাবে যদি কুফরীর লক্ষণ বলে গণ্য হয়, তবে আবারও এ হুকুমই আরোপিত হবে। মুহাজের ও অমুহাজেরের মাঝে পারস্পরিক উত্তরাধিকার স্বত্ব বজায় থাকবে না। এ বর্ণনাতে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুহাজের ও অমুহাজেরদের মাঝে মীরাসী স্বত্ব রহিতকরণের হুকুমটি প্রকৃতপক্ষে পৃথক কোন হুকুম নয়, বরং এটিও সে প্রাথমিক নির্দেশ, যা মুসলমান ও অমুসলমানের মাঝে উত্তরাধিকার স্বত্বকে ছিন্ন করে দেয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এই কুফরীর লক্ষণের প্রেক্ষিতে তাকে কাফের বলে সাব্যস্ত করা হয়নি, যতক্ষণ না তার মধ্যে প্রকৃষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে কুফরীর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

আর হয়তো এ যুক্তিতেই এখানে আরেকটি নির্দেশ অমুহাজের মুসলমানদের কথা উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তারা মুহাজের মুসলমানদের নিকট কোন রকম সাহায্য-সহায়তা কামনা করে, তবে মুহাজের মুসলমানদের জন্য তাদের সাহায্য করা কর্তব্য; যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, অমুহাজের মুসলমানদিগকে সম্পূর্ণভাবে কাফেরদের কাতারে গণ্য করা হয়নি, বরং তাদের এই ইসলামী অধিকার এখনও বলবৎ রয়ে গেছে যে, সাহায্য কামনা করলে তারা সাহায্য পেতে পারে।

আর যেহেতু এ আয়াতের শানে-নুযূল মক্কা থেকে মদীনায় বিশেষ হিজরতের সাথে যুক্ত এবং তারাই অমুহাজের মুসলমান ছিলেন, যারা মক্কায় অবস্থান করেছিলেন এবং কাফেরদের উৎপীড়নের সম্মুখীন হচ্ছিলেন, কাজেই তাঁদের সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি যে একান্তই মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে ছিল, তা বলাইবাহুল্য। আর কোরআন করীম যখন মুহাজের মুসলমানদের প্রতি তাদের (অমুহাজের) মক্কাবাসী মুসলমানদের সাহায্যের নির্দেশ দান করেছে, তাতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে একথাই বোঝা যায় যে, যে কোন অবস্থায়, যে কোন জাতির মোকাবেলায় তাঁদের সাহায্য করা মুসলমানদের উপর অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। এমনকি যে জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা হবে তাদের সাথে যদি মুসলমানদের কোন যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়েও থাকে তবুও তাই করতে হবে, অথচ ইসলামী নীতিতে ন্যায়নীতি ও চুক্তির অনুবর্তিতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। সে কারণেই এ আয়াতে একটি ব্যতিক্রমী নির্দেশেরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অমুহাজের মুসলমান যদি মুহাজের মুসলমানের নিকট এমন কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছে, তবে চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের মোকাবেলায় নিজেদের মুসলমান ভাইদের সাহায্য করাও জায়েয নয়।

এই ছিল প্রথম দু'টি আয়াতের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এবার বাক্যের সাথে তুলনা করে দেখা যাক। এরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا

وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا

অর্থাৎ,— যে সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহ্র ওয়াস্তে নিজেদের প্রিয় জন্মভূমি ও আত্মীয়-আপনজনদের পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্র রাহে নিজেদের জান-মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, সম্পদ ব্যয় করে যুদ্ধের জন্য ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছে এবং যুদ্ধের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে; অর্থাৎ, প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজেরবৃন্দ এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে; অর্থাৎ, মদীনার আনসার মুসলমানগণ—এতদুভয়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পরস্পরের ওলী বা সহায়ক। অতঃপর বলা হয়েছে, সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে বটে কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করবে।

এখানে কোরআন করীম ولى ও ولايت শব্দ ব্যবহার করেছে, যার প্রকৃত অর্থ হল বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত হাসান কাতাদাহ্ ও মুজাহেদ (রাহঃ) প্রমুখ তফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের মতে এখানে ولايت অর্থ উত্তাধিকার এবং অর্থ ولى উত্তরাধিকারী। আর কেউ কেউ এখানে এর আভিধানিক অর্থ বন্ধুত্ব ও সাহায্য সহায়তাও নিয়েছেন।

প্রথম তফসীর অনুসারে আয়াতের মর্ম এই যে, মুসলমান মুহাজের ও আনসার পারস্পরিকভাবে একে অপরের ওয়ারিস হবেন। তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক না থাকবে অমুসলমানদের সাথে আর নাইবা থাকবে সে সমস্ত মুসলমানের সাথে যারা হিজরত করেননি। প্রথম নির্দেশ অর্থাৎ দ্বীনী পার্থক্য তথা ধর্মীয় বৈপরিত্যের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারের ছিন্নতার বিষয়টি তো চিরস্থায়ী আছেই, বাকী থাকল দ্বিতীয় হুকুমটি। মক্কা বিজয়ের পর যখন হিজরতেরই প্রয়োজন থাকেনি। তখন মুহাজের ও অমুহাজেদের উত্তরাধিকারের বিচ্ছিন্নতার হুকুমটিও আর বলবৎ থাকেনি। এর দ্বারা কোন কোন ফেকাহ্‌বিদ প্রমাণ করেছেন যে, দ্বীনের পার্থক্য যেমন উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ তেমনিভাবে দেশের পার্থক্যও উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা ফেকাহ্‌র কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

অতঃপর এরশাদ হয়েছে—

وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ

وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থাৎ, এসব লোক হিজরত করেনি যদিও তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু যে কোন অবস্থায় তারাও মুসলমান। যদি তারা নিজেদের দ্বীনের হেফাযতের জন্য মুসলমানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, তবে তাঁদের সাহায্য করা তাঁদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাই বলে ন্যায় ও ইনসাফের অনুবর্তিতার নীতিকে বিসর্জন দেয়া যাবে না। তারা যদি এমন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তবে সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে সেসব মুসলমানের সাহায্য করা জায়েয নয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে এমনি ঘটনা ঘটেছিল। রসূল করীম (সাঃ) যখন মক্কার কাফেরদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং চুক্তির শর্তে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, এখন মক্কা থেকে যে ব্যক্তি মদীনায় চলে

যাবে হুযুর (সাঃ) তাকে ফিরিয়ে দেবেন। ঠিক এই সন্ধি চুক্তিকালেই আবু-জান্দাল (রাঃ) যাকে কাফেররা মক্কায় বন্দী করে রেখেছিল এবং নানাভাবে নির্যাতন করছিল কোন রকমে মহানবীর খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং নিজের উৎপীড়নের কাহিনী প্রকাশ করে রসূলুল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যে নবী সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হয়ে আগমন করেছিলেন, একজন নিপীড়িত মুসলমানের ফরিয়াদ শুনে তিনি কি পরিমাণ মর্মাহত হয়েছিলেন, তার অনুমান করাও যার তার জন্য সম্ভব নয়, কিন্তু এহেন মর্মপীড়া সত্ত্বেও উল্লেখিত আয়াতে হুকুম অনুসারে তিনি তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে অপারকতা জানিয়ে ফিরিয়ে দেন।

তাঁর এভাবে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি সমস্ত মুসলমানের জন্যই একান্ত পীড়াদায়ক ছিল, কিন্তু সরওয়ারে কায়েনাত (সাঃ) খোদায়ী নির্দেশের আলোকে যেন প্রত্যক্ষ করছিলেন যে, এখন আর এ নির্যাতন-নিপীড়নের আয়ু বেশী দিন নেই। তাছাড়া আর ক'টি দিন ধৈর্যধারণের সওয়াবও আবু-জান্দানের প্রাপ্য রয়েছে। এর পরেই মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এসব কাহিনীর সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। যাহোক, তখন মহানবী (সাঃ) কোরআনী নির্দেশ মোতাবেক চুক্তির অনুবর্তিতাকেই তাঁর ব্যক্তিগত বিপদাপদের উপর গুরুত্বদান করেছিলেন। এটাই হল ইসলামী শরীয়তের সেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, যার ফলে তাঁরা পার্থিব জীবনে বিজয় ও সম্মান এবং আখেরাতের কল্যাণ ও মুক্তির অধিকারী হতে পেরেছেন। অন্যথায় সাধারণভাবে দেখা যায়, পৃথিবীর সরকারসমূহ চুক্তির নামে এক ধরনের প্রহসনের অবতারণা করে থাকে, যাতে দুর্বলকে দাবিয়ে রাখা এবং সবলকে ফাঁকি দেয়াই থাকে উদ্দেশ্য। যখন নিজেদের সামান্যতম স্বার্থ দেখতে পায়, তখনই নানা রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করে দেয়া হয় এবং দোষ অন্যের উপর চাপানোর- ফন্দি-ফিকির করতে থাকে।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে— وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

অর্থাৎ, কাফেররা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। وَلِيٌّ শব্দটি যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, একটি সাধারণ ও ব্যাপকার্থক শব্দ। এতে যেমন ওরাসত বা উত্তরাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে অন্তর্ভুক্ত বৈষয়িক সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়ও। কাজেই এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেরদিগকে পারস্পরিক উত্তরাধিকারী মনে করতে হবে এবং উত্তরাধিকার বন্টনের যে আইন তাদের নিজেদের ধর্মে প্রচলিত রয়েছে, তাদের উত্তরাধিকারের বেলায় সে আইনই প্রয়োগ করা হবে। তদুপরি তাদের এতীম-অনাথ শিশুদের ওলী এবং বিবাহ-শাদীর অভিভাবক তাদেরই মধ্য থেকে নির্ধারিত হবে। সারকথা, সামাজিক বিষয়াদিতে অমুসলমানদের নিজস্ব আইন-কানুন ইসলামী রাষ্ট্রেও সংরক্ষিত রাখা হবে।

আয়াতের শেষভাবে এরশাদ হয়েছে إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ অর্থাৎ, তোমরা যদি এমনটি না কর, তাহলে গোটা পৃথিবীতে ফেৎনা-ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে।

এ বাক্যটি সে সমস্ত হুকুম-আহকামের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, মুহাজেরীন ও আনসারগণকে একে অপরের অভিভাবক হতে হবে—যাতে পারস্পরিক সাহায্য-সহায়তা এবং ওরাসাত তথা উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ এখানকার মুহাজেরীন ও অমুহাজেরীন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক উত্তরাধিকারের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু সাহায্য-সহায়তার সম্পর্ক তার শর্ত মোতাবেক বলবৎ থাকা উচিত। তৃতীয়তঃ কাফেরগণ একে অন্যের ওলী বিধায় পারস্পরিক অভিভাবকত্ব ও তাদের উত্তরাধিকার আইনের ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা মুসলমানদের জন্য সমীচীন নয়। বস্তুতঃ এ সমস্ত নির্দেশের উপর যদি আমল করা না হয়, তাহলে পৃথিবীতে গোলযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে। সম্ভবতঃ এ ধরনের সতর্কতা এ কারণে উচ্চারিত হয়েছে যে, এখানে যেসব হুকুম-আহ্‌কাম বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ন্যায়, সুবিচার ও সাধারণ শান্তি-শৃংখলার মূলনীতি স্বরূপ। কারণ, এসব আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে গেছে যে, পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্ক যেমন আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, তেমনিভাবে এক্ষেত্রে ধর্মীয় ও মতাদর্শগত সম্পর্কও বংশগত সম্পর্কের চেয়ে অগ্রবর্তী। সেজন্যই বংশগত সম্পর্কের দিক দিয়ে পিতা-পুত্র কিংবা ভাই-ভাই হওয়া সত্ত্বেও কোন কাফের কোন মুসলমানের এবং কোন মুসলমান কোন কাফেরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরই সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মূর্খতা জনোচিত বিদ্বেষের প্রতিরোধকল্পে এই হেদায়েতও দেয়া হয়েছে যে, ধর্মীয় সম্পর্ক এহেন সুদৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও চুক্তির অনুবর্তিতা তার চেয়েও বেশী অগ্রাধিকারযোগ্য। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনাবশে সম্পাদিত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েয নয়। এমনিভাবে এই হেদায়েতও দেয়া হয়েছে যে, কাফের একে অপরের উত্তরাধিকারী ও অভিভাবক। তাদের ব্যক্তিগত অধিকার ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যেন কোন রকম হস্তক্ষেপ করা না হয়। দৃশ্যতঃ *এগুলোকে কতিপয় আনুষঙ্গিক ও শাখাগত বিধান বলে মনে হয়*, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বশান্তির জন্য এগুলোই ন্যায় ও সুবিচারের সর্বোত্তম ও ব্যাপক মূলনীতি। আর সে কারণেই এখানে এসব আহ্‌কাম তথা বিধি-বিধান বর্ণনার পর এমন কাঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যা সাধারণতঃ অন্যান্য আহ্‌কামের ক্ষেত্রে করা হয়নি। তা হল এই যে, তোমারা যদি এসব আহ্‌কামের উপর আমল না কর, তবে বিশ্বময় বিশৃংখলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে। বাক্যটিতে এ ইঙ্গিতও বিদ্যমান যে, দাঙ্গা-বিশৃংখলা রোধে এসব বিধি-বিধানের বিশেষ প্রভাব ও অবদান রয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে মক্কা থেকে হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের সাহায্যকারী মদীনাবাসী আনসারদের প্রশংসা, তাঁদের সত্যিকার মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য ও তাঁদের মাগফেরাত ও সম্মানজনক উপার্জন দানের ওয়াদার কথা বলা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا অর্থাৎ, তারাই হচ্ছেন সত্যিকারভাবে মুসলমান। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা হিজরত করতে পারেননি যদিও তাঁরা মুসলমান, কিন্তু তাদের ইসলাম পরিপূর্ণ নয় এবং নিশ্চিতও নয়। কারণ, তাতে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হয়তোবা তারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফেক হয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের দাবী করছে। তারপরেই বলা হয়েছে لَهُمْ مَغْفِرَةٌ অর্থাৎ, তাঁদের জন্য মাগফেরাত নির্ধারিত। যেমন, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, الاسلام يهدم ما كان قبله والهجرة تهدم ما كان قبلها অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ যেমন তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনিভাবে হিজরত তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়।

চতুর্থ আয়াতে মুহাজেরীনদের বিভিন্ন শ্রেণীর নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন প্রাথমিক

পর্যায়ের মুহাজের, যারা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির পূর্বে হিজরত করেছেন এবং কেউ কেউ রয়েছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের মুহাজের, যাঁরা হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে হিজরত করেছেন। এর ফলে তাঁদের পরকালীন মর্যাদায় পার্থক্য হলেও পার্থিব বিধান মতে তাঁদের অবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজেরীনদেরই অনুরূপ। তাঁরা সবাই পরস্পরের ওয়ারেস তথা উত্তরাধিকারী হবেন। সুতরাং মুহাজেরীনগণকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে – فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ অর্থাৎ, দ্বিতীয় পর্যায়ের এই মুহাজেরীনরাও তোমাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত। সে কারণেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিতেও তাদের হুকুম সাধারণ মুহাজেরদেরই মত।

এটি সূরা আনফালের সর্বশেষ আয়াত। এর শেষাংশে উত্তরাধিকার আইনের একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এরই মাধ্যমে সেই সাময়িক বিধানটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে, যেটি হিজরতের প্রথম পর্বের মুহাজের ও আনসারদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃ বন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে একে অপরের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। বলা হয়েছে—

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

আরবী অভিধানে اولوا শব্দটি ''সাথী'' অর্থে ব্যবহৃত হয়। যার বাংলা অর্থ হল 'সম্পন্ন'। যেমন اولوا العقل বুদ্ধিসম্পন্ন। اولوا الامر দায়িত্ব-সম্পন্ন। কাজেই وَأُولُوا الْأَرْحَامِ অর্থ হয় গর্ভ-সাথী, একই গর্ভসম্পন্ন ارحامكم শব্দটি رحم শব্দের বহুবচন। এর প্রকৃত অর্থ হল সে অঙ্গ যাতে সন্তানের জন্মক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আর যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্ক গর্ভের অংশীদায়িত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, কাজেই وَأُولُوا الْأَرْحَامِ আত্মীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বস্তুতঃ আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদিও পারস্পরিকভাবে একে অপরের উপর প্রত্যেক মুসলমানই একটি সাধারণ অধিকার সংরক্ষণ করে এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একের প্রতি অন্যের সাহায্য করা ওয়াজেব হয়ে দাঁড়ায় এবং একে অন্যের উত্তরাধিকারীও হয় কিন্তু যেসব মুসলমানের মাঝে পারস্পরিক আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ক বিদ্যমান, তারা অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অগ্রবর্তী। এখানে فِي كِتَابِ اللَّهِ অর্থ فى حكم الله অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা এক বিশেষ নির্দেশ বলে এ বিধান জারি করেছেন।

এ আয়াত এই মূলনীতি বাতলে দিয়েছে যে, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আত্মীয়তার মান অনুসারে বন্টন করা কর্তব্য। আর وَأُولُوا الْأَرْحَامِ সাধারণভাবে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন অর্থেই বলা হয়। তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের অংশ স্বয়ং কোরআন করীম সূরা নিসায় নির্ধারিত করে দিয়েছে। মীরাস শাস্ত্রের পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় 'আহলে ফারায়েয' বা 'যাবিল ফুরূয'। এদেরকে দেয়ার পর যে সম্পদ উদ্বৃত্ত হবে তা আয়াত দৃষ্টে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করা কর্তব্য। তাছাড়া এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট যে, সমস্ত আত্মীয়ের মধ্যে কোন সম্পত্তি বন্টন করে দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ, দূরবর্তী আত্মীয়তা যে সমগ্র বিশ্বমানুষের মাঝেই বর্তমান, তাতে কোন রকম সন্দেহ-সংশয়েরই অবকাশ নেই। সারা পৃথিবীর মানুষ একই পিতা-মাতা, আদম ও হাওয়ার বংশধর। কাজেই নিকটবর্তী আত্মীয়দিগকে দূরবর্তীর উপর অগ্রাধিকার দেয়া এবং নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করাই আত্মীয়দের মধ্যে মীরাস বন্টনের কার্যকর ও বাস্তবরূপ হতে পারে। এর বিস্তারিত বিবরণ রসূলে করীম (সাঃ)– এর হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'যাবিল ফুরূযে'র অংশ দিয়ে দেয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা মৃত ব্যক্তির 'আসাবাগণ' অর্থাৎ, পিতামহ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে দেয়া হবে। অর্থাৎ, নিকটবর্তী আসাবাকে দূরবর্তী আসাবা অপেক্ষা অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আসাবার বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করা হবে। আর 'আসাবা' এর মধ্যে আর কেউ জীবিত না থাকলে অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করা হবে।

আসাবা ছাড়াও অন্যান্য যেসব লোক আত্মীয় হতে পারে, ফরায়েয শাস্ত্রের পরিভাষায় তাদের বোঝাবার জন্য 'যাবিল আরহাম' শব্দ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই পরিভাষাটি পরবর্তীকালে নির্ধারিত হয়েছে। কোরআনে করীমে বর্ণিত وَأُولُوا الْأَرْحَامِ শব্দটি কিন্তু আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রেই ব্যাপক। এতে যাবিল ফুরূয, আসাবা এবং যাবিল আরহাম সবাই মোটামুটিভাবে অন্তর্ভুক্ত।

তদুপরি এর কিছু বিস্তারিত বিশ্লেষণ সূরা নিসার বিভিন্ন আয়াতে দেয়া হয়েছে। তাতে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের প্রাপ্য অংশ আল্লাহ্ তাআলা নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদেরকে মীরাস শাস্ত্রের পরিভাষায় 'যাবিল ফুরূয' বলা হয়। এছাড়া অন্যান্যদের সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন—

الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فهو لاولى رجل ذكر–

অর্থাৎ, যাদের অংশ স্বয়ং কোরআন নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা তাদেরকেই দিতে হবে যারা মৃতের ঘনিষ্ঠতম পুরুষ।

এদেরকে মীরাসের পরিভাষায় 'আছাবা' (عصبا) বলা হয়। যদি কোন মৃত ব্যক্তির আসাবাদের কেউ বর্তমান না থাকে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর কথা অনুযায়ী তবেই মৃতের সম্পত্তির অংশ তাদেরকে দিতে হবে। এদেরকে বলা হয় 'যাবিল আরহাম।' যেমন, মামা, খালা প্রভৃতি।

সূরা আনফালের শেষ আয়াতের সর্বশেষ বাক্যটির দ্বারা ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের সে ধারাটি বাতিল করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার ভিত্তিতে মুহাজেরীন ও আনসারগণ আত্মীয়তার কোন বন্ধন না থাকলেও পরস্পরের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ হুকুমটি ছিল একটি সাময়িক হুকুম যা হিজরতের প্রাথমিক পর্যায়ে দেয়া ছিল।

সূরা আল-আনফাল সমাপ্ত

سورة التوبة مدنية وهي مائة وتسع وعشرون آية وست عشرة ركوعا

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞١ فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ۞٢ وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۞٣ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۞٤ فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞٥ وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۞٦

সূরা আত্-তাওবাহ
মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১২৯

(১) সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। (২) অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ কর এ দেশে চার মাসকাল। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহ্কে পরাভূত করতে পারবে না, আর নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদিগকে লাঞ্ছিত করে থাকেন। (৩) আর মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ্ মুশরেকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁর রসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তওবা কর, তবে তা, তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্কে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও। (৪) তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। অবশ্যই আল্লাহ্ সাবধানীদের পছন্দ করেন। (৫) অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহ্র কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এজন্যে যে এরা জ্ঞান রাখে না।

সূরা আত্-তাওবাহ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখান থেকে সূরা বরাআতের শুরু। একে সূরা 'তওবাও' বলা হয়। বরাআত বলা হয় এ জন্য যে, এতে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্তির উল্লেখ রয়েছে। আর 'তওবা' বলা হয় এজন্য যে, এতে মুসলমানদের তওবা কবুল হওয়ার বর্ণনা রয়েছে—(মাযহারী)। সূরাটির একটি বৈশিষ্ট্য হল, কোরআন মজীদে এর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' লেখা হয় না, অথচ অন্যান্য সকল সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ লেখা হয়। এই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ লিখিত না হওয়ার কারণ অনুসন্ধানের আগে মনে রাখা আবশ্যক যে, কোরআন মজীদ তেইশ বছরের দীর্ঘ পরিসরে অল্প অল্প করে নাযিল হয়। এমনকি একই সূরার বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়। হযরত জিব্রীলে আমীন 'ওহী নিয়ে আসলে আল্লাহ্র আদেশ মতে কোন্ সূরার কোন আয়াতের পর অত্র আয়াতকে স্থান দিতে হবে তাও বলে যেতেন। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহী লেখকদের দ্বারা তা' লিখিয়ে নিতেন।

একটি সূরা সমাপ্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় সূরা শুরু করার আগে 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' নাযিল হত। এর থেকে বোঝা যেত যে, একটি সূরা শেষ হল, অতঃপর অপর সূরা শুরু হল। কোরআন মজীদের সকল সূরার বেলায় এ নীতি বলবৎ থাকে। সূরা তওবা সর্বশেষে নাযিলকৃত সূরাগুলোর অন্যতম। কিন্তু সাধারণ নিয়ম মতে এর শুরুতে না বিসমিল্লাহ্ নাযিল হয় আর না রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা লিখে নেয়ার জন্য ওহী লেখকদের নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় হযরত (সাঃ)-এর ইন্তেকাল হয়।

কোরআন সংগ্রাহক হযরত ওসমান গনী (রাঃ) স্বীয় শাসনামলে যখন কোরআনকে গ্রন্থের রূপ দেন, তখন দেখা যায়, অপরাপর সূরার বরখেলাফ সূরা তওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' নেই। তাই সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে, হয়তো এটি স্বতন্ত্র কোন সূরা নয় বরং অন্য কোন সূরার অংশ। এতে এ প্রশ্নের উদ্ভবও হয় যে, এমতাবস্থায় তা কোন্ সূরার অংশ হতে পারে? বিষয়-বস্তুর দিক দিয়ে একে সূরা আন্ফালের অংশ বলাই সংগত।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে একথাও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে সূরা আনফাল ও তওবাকে করীনাতাইন বা মিলিত সূরা বলা হত (মাযহারী)। সেজন্য একে সূরা আন্ফালের পর স্থান হয়। এতে এ সতর্কতাও অবলম্বিত হয়েছে যে, বাস্তবে যদি এটি সূরা আন্ফালের অংশ হয়, তবে তারই সাথে যুক্ত থাকাই দরকার। পক্ষান্তরে সূরা তওবার স্বতন্ত্র সূরা হওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়। তাই কোরআন লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় সূরা আন্ফালের শেষে এবং সূরা তওবা শুরু করার আগে কিছু ফাঁক রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়। যেমন, অপরাপর সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্'-এর স্থান হয়।

সূরা বরাআত বা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখিত না হওয়ার এ তত্ত্বটি হাদীসের কিতাব আবু দাউদ, নাসায়ী ও মুসনাদে ইমাম আহমদের স্বয়ং হযরত ওসমান গনী (রাঃ) থেকে এবং তিরমিযী শরীফে মুফাসসেরে কোরআন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-কে প্রশ্নও করেছিলেন যে, যে নিয়মে কোরআনের সূরাগুলোর বিন্যাস করা হয়, অর্থাৎ, প্রথম দিকে শতাধিক আয়াতসমৃলিত বৃহৎ সূরাগুলো রাখা হয়—পরিভাষায় যাদের বলা হয় 'মি-ঈন', অতঃপর রাখা হয় শতের কম

আয়াত সম্বলিত সূরাগুলো—যাদের বলা হয় 'মাসানী'। এর পর স্থান দেয়া হয় ছোট সূরাগুলোকে—যাদের বলা হয় 'মুফাচ্ছালাত'। কোরআন সংকলনের এ নিয়মানুসারে সূরা তওবাকে সূরা আন্‌ফালের আগে স্থান দেয়া কি উচিত ছিল না? কারণ, সূরা তওবার আয়াতসংখ্যা শতের অধিক। আর আন্‌ফালের শতের কম। প্রথম দিকের দীর্ঘ সাতটি সূরাকে আয়াতের সংখ্যানুসারে যে নিয়মে রাখা হয়েছে যাদের سبع طوال বলা হয়; তদনুসারে আন্‌ফালের স্থলে সূরা তওবা থাকাই তো অধিক সঙ্গত। অথচ এখানে এ নিয়মের বরখেলাফ করা হয়। এর রহস্য কি?

হযরত উসমান গনী (রাঃ) বলেন, কথাগুলো সত্য, কিন্তু কোরআনের বেলায় যা করা হল, তা'সাবধানতার খাতিরে। কারণ, বাস্তবে সূরা তওবা যদি স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে আনফালের অংশ হয়, আর একথা প্রকাশ্য যে, আন্‌ফালের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় তওবার আয়াতগুলোর আগে, তাই ওহীর ইঙ্গিত ব্যতীত আন্‌ফালের আগে সূরা তওবাকে স্থান দেয়া আমাদের পক্ষে বৈধ হবে না। আর একথাও সত্য যে, ওহীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন হেদায়েত আসেনি। তাই আন্‌ফালকে আগে এবং তওবাকে পরে রাখা হয়েছে।

এ তত্ত্ব থেকে বোঝা গেল যে, সূরা তওবা স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে সূরা আন্‌ফালের অংশ হওয়ার সম্ভাবনাটি এর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ, এ সম্ভাবনা থাকার ফলে এখানে বিসমিল্লাহ লেখা বৈধ নয়, যেমন বৈধ নয় কোন সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ্ লেখা। এ কারণেই আমাদের মান্য ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ বলেন, যে ব্যক্তি সূরা আন্‌ফালের তেলাওয়াত সমাপ্ত করে সূরা তওবা শুরু করে, সে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথমেই সূরা তওবা থেকে তেলাওয়াত শুরু করে, কিংবা এর মাঝখান থেকে আরম্ভ করে, সে বিসমিল্লাহ্ পড়বে। অনেকে মনে করে যে, সূরা তওবার তেলাওয়াত কালে কোন অবস্থায়ই বিসমিল্লাহ্ পাঠ জায়েয নয়। তাদের এ ধারণা ভুল। অধিকন্তু, এ ভুলও তারা করে বসে যে, এখানে বিসমিল্লাহ্ এর স্থলে اعوذ بالله من النار তারা পাঠ করে.। এর কোন প্রমাণ হুযুর (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক হযরত আলী (রাঃ) থেকে অপর একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এতে সূরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ দর্শানো হয় যে, বিসমিল্লাহ্‌তে আছে শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম, কিন্তু সূরা তওবায় কাফেরদের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তিগুলো নাকচ করে দেয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটিও এক সূক্ষ্ম তত্ত্ব যা মূল কারণের পরিপন্থী নয়। মূল কারণ হল, তওবা ও আন্‌ফাল একটি মাত্র সূরা হওয়ার সম্ভাবনা। হ্যাঁ, উপরোক্ত কারণও যুক্ত হতে পারে এ সূরায় কাফেরদের নিরাপত্তাকে নাকচ করে দেয়া হয় বিধায় 'বিসমিল্লাহ্' সঙ্গত নয়।

সূরা তওবার উপরোক্ত আয়াতগুলোর যথাযথ মর্মোপলব্ধির জন্যে যে ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে, প্রথমে তা জেনে নেয়া আবশ্যক। এখানে সংক্ষেপে ঘটনাগুলোর বিবরণ দেয়া হল।

(১) সূরা তওবার সর্বত্র কতিপয় যুদ্ধ, যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী এবং এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো হুকুম-আহকাম ও মাসায়েলের বর্ণনা রয়েছে। যেমন, আরবের সকল গোত্রের সাথে কৃত সকল চুক্তি বাতিলকরণ, মক্কা বিজয়, হোনাইন ও তাবুক যুদ্ধ প্রভৃতি। এ সকল ঘটনার মধ্যে প্রথম হল অষ্টম হিজরী সালের মক্কা বিজয় অতঃপর এ বছরেই সংগঠিত হয় হোনাইন যুদ্ধ। এরপর তাবুক যুদ্ধ বাধে নবম হিজরীর রজব মাসে। তারপর এ সালের জিলহজ্জ মাসে আরবের সকল গোত্রের সাথে সকল চুক্তি বাতিল করার ঘোষণা দেয়া হয়।

(২) চুক্তি বাতিলের যে কথাগুলোর আয়াতে উল্লেখিত আছে, তার সারমর্ম হল, ষষ্ঠ হিজরী সালে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওমরা পালনের নিয়ত করেন। কিন্তু মক্কার কোরাইশ বংশীয় লোকেরা হযরত (সাঃ)-কে মক্কা প্রবেশে বাধা দেয়। পরে তাদের সাথে হোদায়বিয়ায় সন্ধি হয়। এর মেয়াদকাল ছিল তফসীরে 'রূহুল-মা'আনী'র বর্ণনা মতে, দশ বছর। মক্কার কোরাইশদের সাথে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও বসবাস করত। হোদায়বিয়ায় যে সন্ধি হয়, তার একটি ধারা এও ছিল যে, কোরাইশ বংশীয় লোক ছাড়া অন্যান্য বংশের লোকেরা ইচ্ছা করলে কোরাইশদের মিত্র অথবা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মিত্র হয়ে তাঁর সঙ্গী হতে পারে। এ ধারা মতে 'খোযাআ' গোত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এবং বনু-বকর গোত্র কোরাইশদের মিত্রে পরিণত হয়। এ সন্ধির অপর উল্লেখযোগ্য ধারা হল, এ দশ বছরে না পরস্পরের মধ্যে কোন যুদ্ধ বাধবে, আর না কেউ যুদ্ধকারীদের সাহায্য করবে। যে গোত্র যার সাথে রয়েছে তার বেলায়ও এ নীতি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, এদের কারো প্রতি আক্রমণ বা আক্রমণে সাহায্যদান হবে চুক্তিভঙ্গের নামান্তর।

এ সন্ধি স্থাপিত হয় ষষ্ঠ হিজরীতে। সপ্তম হিজরীতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) গত বছরের ওমরা কাযা করার উদ্দেশে মক্কা শরীফে গমন করেন এবং তিন দিন তথায় অবস্থান করে সন্ধি মোতাবেক মদীনা প্রত্যার্বন করেন। এ সময়ের মধ্যে কোন পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের কিছু পাওয়া যায়নি।

এরপর পাঁচ-ছয় মাস অতিবাহিত হলে এক রাতে বনু-বকর গোত্র বনু খোযা আর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। কোরাইশগণ মনে করে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অবস্থান বহুদূরে, তদুপরি এ'হল নৈশ অভিযান। ফলে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে সহজে পৌছিবে না। তাই তারা এ আক্রমণে লোক ও অস্ত্র দিয়ে বনু-বকরের সাহায্য করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে যা কোরাইয়েশরাও স্বীকার করে নিয়েছিল। অর্থাৎ, হোদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে যায়, যাতে ছিল দশ বছরকাল যুদ্ধ স্থগিত রাখার চুক্তি।

ওদিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মিত্র বনু-খোযাআ গোত্র ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে পৌছে দেয়। তিনি কোরাইশদের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

বদর, ওহোদ ও আহযাব যুদ্ধে মুসলমানদের গায়েবী সাহায্য লাভের বিষয়টি কোরইশরা আঁচ করে হীনবল হয়ে পড়েছিল। তার উপর চুক্তি ভঙ্গের বর্তমান ঘটনায় মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতির আশঙ্কা বেড়ে গেল। চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ হযরতের কাছে পৌছার পর পূর্ণনীরবতা লক্ষ্য করে এ আশঙ্কা আরো ঘনীভূত হল। তাই তারা বাধ্য হয়ে আবু সুফিয়ানকে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে মদীনায় প্রেরণ করে। যাতে তিনি মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি আঁচ করতে পারলে পূর্ববর্তী ঘটনার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে সেই চুক্তিকে নবায়ন করতে পারেন।

আবু সুফিয়ান মদীনায় উপস্থিত হয়ে হযরত (সাঃ) যুদ্ধ প্রস্তুতি অবলোকন করেন, এতে তিনি শঙ্কিত হয়ে গণ্যমান্য সাহাবীদের কাছে যান, যাতে তাঁরা হযরত (সাঃ)-এর কাছে চুক্তিটি বলবৎ রাখার সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁরা সবাই তাদের পূর্ববর্তী ও উপস্থিত ঘটনাবলীর তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুন কথাটি নাকচ করে দেন। ফলে আবু সুফিয়ান বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন, আর এতে মক্কার সর্বত্র যুদ্ধের ভয়-ভীতি

ছড়িয়ে পড়ে।

'বিদায়া' ও 'ইবনে-কাসীর' এর বর্ণনা মতে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) অষ্টম হিজরীর দশই রমযান সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা জয়ের উদ্দেশে মদীনা ত্যাগ করেন, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়।

সূরার তৃতীয় আয়াত يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ বাক্যের অর্থ নিয়ে মুফাস্‌সেরগণের মধ্যে মতবেধ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), হযরত ওমর ফারূক (রাঃ), আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের প্রমুখ সাহাবা বলেন ঃ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ এর অর্থ—আরাফাতের দিন। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীস শরীফে এরশাদ করেছেন। الحج عرفة "হজ্ব হল আরাফাতের দিন"— (আবু দাউদ)। আর কেউ বলেন, এর অর্থ কোরবানীর দিন বা দশই যিলহজ্ব।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) এবং অপরাপর ইমামগণ এ সকল উক্তির সমন্বয় সাধন উদ্দেশে বলেন, হজ্বের পাঁচ দিন হল হজ্বে আকবরের দিন। এতে আরাফাত ও কোরবানীর দিনগুলোও রয়েছে। তবে এখানে يَوْمَ (দিন) শব্দের একবচন আরবী বাকরীতির বিরুদ্ধ নয়। কোরআনের অপর আয়াতে বদর যুদ্ধের দিনগুলোকে يَوْمَ الْفُرْقَانِ রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এখানেও শব্দটি একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়। তেমনি আরবের অপরাপর যুদ্ধ যথা يوم أحد يوم بعاث প্রভৃতিতে একবচন রয়েছে। রয়েছে অনেক দিনব্যাপী এ সকল যুদ্ধ চলতে থাকে।

তা'ছাড়া ওমরার অপর নাম হল হজ্বে-আসগর বা ছোট হজ্ব। এর থেকে হজ্বকে পৃথক করার জন্যে বলা হয় হজ্বে-আকবর অর্থাৎ, বড় হজ্ব। তাই কোরআনের পরিভাষা মতে, প্রতি বছরের হজ্বকে হজ্বে-আকবর বলা যাবে। সাধারণ লোকেরা যে মনে করে, যে বছর আরাফাতের দিন হবে শুক্রবার, সে বছরের হজ্ব হল হজ্বে-আকবর-তাদের এই ধারণা ভুল। তবে এতটুকু কথা বলা আছে যে, হযরত (সাঃ)-এর বিদায় হজ্বে আরাফাতের দিনটি ঘটনাচক্রে শুক্রবার পড়েছিল। সম্ভবতঃ এর থেকে উক্ত ধারণার উৎপত্তি। অবশ্য শুক্রবারের বিশেষ ফযীলতের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। তবে আয়াতের মর্মের সাথে উক্ত ধারণার কোন সম্পর্ক নেই।

ইমাম জাস্‌সাস (রহঃ) 'আহকামুল-কোরআন' গ্রন্থে বলেন, হজ্বের দিনগুলোকে 'হজ্বে-আকবর' নামে অভিহিত করা থেকে এ মাসআলাটি বের হয় যে, হজ্বের দিনগুলোতে ওমরা পালন করা যাবে না। কেননা, কোরআন মজীদ এ দিনগুলোকে হজ্বে-আকবরের জন্যে নির্দিষ্ট রেখেছে।

সূরা তওবার প্রথম পাঁচ আয়াতে মক্কাবিজয়ের পর মক্কা ও তার আশ-পাশের সকল কাফের-মুশরিকের জান-মালের সার্বিক নিরাপত্তা দানের বিষয়টি উল্লেখিত হয়। তবে তাদের চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে তাদের সাথে আর কোন চুক্তি না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সত্ত্বেও ইতিপূর্বে যাদের সাথে চুক্তি করা হয় এবং যারা চুক্তিভঙ্গ করেনি, তাদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া অবধি চুক্তি রক্ষার জন্যে এ আয়াতসমূহে মুসলমানদের আদেশ দেয়া হয়। আর যাদের সাথে কোন চুক্তি হয়নি, কিংবা যাদের সাথে কোন মেয়াদী চুক্তি হয়নি, তাদের প্রতি এই অনুকম্পা করা হয় যে, তড়িৎ মক্কা ত্যাগের আদেশের স্থলে চার মাসের সময় দেয়া হয়। যাতে এ অবসরে যেদিকে সুবিধা চলে যেতে পারে অথবা, এ সময়ে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে মুসলমান হতে পারে। আল্লাহ্‌র এ সকল আদেশের উদ্দেশ হল, আগামী সাল নাগাদ যেন মক্কা শরীফ এ সকল বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের থেকে পবিত্র হয়ে যায়। তবে এ ব্যবস্থা যেহেতু প্রতিশোধমূলক নয়; বরং তাদের একটানা বিশ্বাসঘাতকতার প্রেক্ষিতে নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে নেয়া হয়, সেহেতু তাদের সংশোধন ও মঙ্গল লাভের দরজা খোলা রাখা হয়।

ইসলামের সত্যতার দলীল-প্রমাণ পেশ করা আলেমগণের কর্তব্য ঃ

প্রথমত ঃ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন বিধর্মী যদি ইসলামের সত্যতার দলীল জানতে চায়, তবে প্রমাণপঞ্জী সহকারে তার সামনে ইসলামকে পেশ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত ঃ কোন বিধর্মী ইসলামের সম্যক তথ্য ও তত্ত্বাবলী হাসিলের জন্যে যদি আমাদের কাছে আসে, তবে এর অনুমতি দান ও তার নিরাপত্তা বিধান আমাদের পক্ষে ওয়াজিব। তাকে বিব্রত করা বা তার ক্ষতিসাধন অবৈধ। তফসীরে-কুরতুবীতে আছে ঃ এ হুকুম প্রযোজ্য হয় তখন, যখন আল্লাহ্‌র কালাম শোনা ও ইসলামের গবেষণাই তার উদ্দেশে হয়। ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির জন্যে যদি আসতে চায়, তবে তা' মুসলিম স্বার্থ ও মুসলিম শাসকগণের বিচেনার উপর নির্ভরশীল। সঙ্গত মনে হলে অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিক সময়ের অনুমতি দেয়া যায় না ঃ

তৃতীয়ত ঃ বিদেশী অমুসলমান যাদের সাথে আমাদের কোন চুক্তি নেই, আবশ্যকভাবে অধিক সময় অবস্থানের অনুমতি তাদের দেয়া যাবে না। কারণ, এ আয়াতে তাদের আশ্রয় দান অবস্থানের সীমা নির্ধারণের উদ্দেশে বলা হয়েছে যে, حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ অর্থাৎ, এদের অবস্থানের এতটুকু সময় দাও, যাতে এরা আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে পায়।

চতুর্থত ঃ মুসলিম শাসক ও রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য হবে কোন অমুসলমান প্রয়োজনে আমাদের অনুমতি (ভিসা) নিয়ে আমাদের দেশে আগমন করলে তার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজন শেষে নিরাপদে তাকে প্রত্যর্পণ করা।

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ
إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا
لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ كَيْفَ وَإِنْ
يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ
بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨﴾
اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ
إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا
وَلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ
مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا
أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ
يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ
وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

(৭) মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহ্‌র নিকটও তাঁর রসূলের নিকট কিরূপে বলবৎ থাকবে। তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ মসজিদুল–হারামের নিকট। অতএব, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্যে সরল থাকে, তোমরাও তাদের জন্য সরল থাক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সাবধানীদের পছন্দ করেন। (৮) কিরূপে? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। (৯) তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে, অতঃপর লোকদের নিবৃত রাখে তাঁর পথ থেকে, তারা যা করে চলছে, তা অতি নিকৃষ্ট। (১০) তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার, আর না অঙ্গীকারের। আর তারাই সীমালংঘনকারী। (১১) অবশ্য তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী লোকদের জন্যে সর্বস্তরে বর্ণনা করে থাকি। (১২) আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কোন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে। (১৩) তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রসূলকে বহিষ্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ্—যদি তোমরা মুমিন হও।

আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ন্যায়ের উপর অবিচল এবং বাড়াবাড়ি হতে বিরত থাকার শিক্ষা : কোরআন মজীদ মুসলমানদের তাকিদ করে যে, শত্রুদের বেলায়ও ইনসাফ থেকে কোন অবস্থায় যেন বিচ্যুত না হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন, নগণ্যসংখ্য মুশরিক ছাড়া বাকী সবাই চুক্তিভংগ করেছে। সাধারণতঃ এমতাবস্থায় বাছ–বিচার তেমন থাকে না। নির্দোশ ক্ষুদ্র দলকেও সংখ্যা গুরু অপরাধী দলের একই ভাগ্য বরণ করতে হয়। কিন্তু কোরআন إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল–হারামের পাশে চুক্তি সম্পাদন করেছ" বলে ওদের পৃথক করে দেয়, যারা চুক্তিভংগ করেনি, এবং আদেশ দেয়া হয় যে, সংখ্যাগুরু চুক্তিভংগকারী মুশরিকদের প্রতি রাগ করে এদের সাথে তোমরা চুক্তিভংগ করো না; বরং এরা যতদিন তোমাদের প্রতি সরল ও চুক্তির উপর অবিচল থাকে, তোমরাও তাদের প্রতি সরল থাক। ওদের প্রতি আক্রোশ বশতঃ এদের কষ্ট দেবে না। অষ্টম আয়াতের শেষ বাক্য থেকেও বিষয়টি আঁচ করা যায়। যেখানে বলা হয় : وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ "এদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।" অর্থাৎ, এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ভদ্রচিত্ত লোক চুক্তির উপর অবিচল থাকতে চায়। কিন্তু সংখ্যাগুরুর ভয়ে তারাও জড়সড়। কোরআন মজীদ বিষয়টি অপর এক আয়াতে পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে। বলা হয়েছে : وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا "কোন জাতির শত্রুতা যেন বে–ইনসাফ হতে তাহাদের উদ্বুদ্ধ না করে" ।– (মায়েদাহ)

এরপর নবম আয়াতে বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের বিশ্বাসঘাতকতা ও তাদের মর্মপীড়ার কারণ উল্লেখ করে তাদের উপদেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন বিচার–বিবেচনা করে নিজেদের বিশুদ্ধ করে নেয়। তৎসঙ্গে মুসলমানদেরও হুশিয়ার করা হয় যে, ওরা যে কারণে বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত হয়েছে, সাবধান ! তোমরা তার থেকে পূর্ণ সতর্ক থাকবে। সে কারণটি হল দুনিয়াপ্রীতি। মূলতঃ দুনিয়াবী অর্থ–সম্পদের লালসা এদের অন্ধ করে রেখেছে। তাই এরা আল্লাহর আদেশাবলী ও ঈমানকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে দেয়। তাদের এ স্বভাব বড়ই পূঁতিগন্ধময়।

দশম আয়াতে এদের চরম হঠকারিতার বর্ণনা দেয়া হয়। لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً এরা চুক্তিবদ্ধ মুসলমানদের সাথেই যে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মীয়তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, তা নয়; বরং তারা যে কোন অমুসলমানের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, আত্মীয়তাকেও জলাঞ্জলি দেবে।

মুশরিকদের উপরোক্ত ঘৃণ্য চরিত্রের প্রেক্ষিতে মুসলমানদের জন্যে তাদের সাথে চিরতরে সম্পর্কচ্ছেদ করে নেয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু না। কোরআন যে আদর্শ ও ন্যায়–নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার আলোকে মুসলমানদের হেদায়েত দেয় : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ – "তবে, তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।" এখানে বলা হয় যে, কাফেররা যত শত্রুতা করুক, যত নিপীড়ন চালাক, যখন সে মুসলমান হয়, তখন আল্লাহ্ যেমন তাদের কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করেন, তেমনি সকল তিক্ততা ভুলে তাদের ভ্রাতৃ–বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং ভ্রাতৃত্বের সকল দাবী পূরণ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব লাভের তিনটি শর্ত : এ আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথম, কুফর ও

শিরক থেকে তওবা। দ্বিতীয় নামায, তৃতীয় যাকাত। কারণ, ঈমান ও তওবা হল গোপন বিষয়। এর যথার্থতা সাধারণ মুসলমানের জানার কথা নয়। তাই ঈমান ও তওবার দুই প্রকাশ্য আলামতের উল্লেখ করা হয়; নামায ও যাকাত।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মসউদ (রাঃ) বলেন, এ আয়াত সকল কেবলানুসারী মুসলমানের রক্তকে হারাম করে দিয়েছে। অর্থাৎ, যারা নিয়মিত নামায ও যাকাত আদায় করে এবং ইসলামের বরখেলাফ কথা ও কর্মের প্রমাণ পাওয়া যায় না, সর্বক্ষেত্রে তারা মুসলমানরূপে গণ্য; তাদের অন্তরে সঠিক ঈমান বা মুনাফেকী যাই থাক না কেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এ আয়াত থেকে অস্ত্রধারণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে সাহাবায়ে কেরামের সন্দেহ নিরসন করেছিলেন। – (ইবনে কাসীর)

একাদশ আয়াতের শেষ চুক্তিকারী ও তওবাকারী লোকদের উদ্দেশে সংশ্লিষ্ট আদেশাবলী পালনের তাগিদ দিয়ে বলা হয় ঃ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ "আর আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্যে বিধানসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি।"

ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ায় মক্কার যে কোরাইশদের সাথে যুদ্ধ স্থগিত রাখার সন্ধি হয়েছিল, তাদের ব্যাপারে সূরা তওবার শুরুর আয়াগুলোতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, তারা সন্ধিচুক্তির উপর অবিচল থাকবে না। অতঃপর অষ্টম, নবম ও দশম আয়াতে তাদের চুক্তিভঙ্গের কারণসমূহ বর্ণিত হয়। একাদশ আয়াতে বলা হয় যে, চুক্তিভঙ্গের ভীষণ অপরাধে অপরাধী হলেও তারা যদি মুসলমান হয় এবং ইসলামকে নামায ও যাকাতের মাধ্যমে প্রকাশ করে, তবে অতীতের সকল তিক্ততা ভুলে যাওয়া ও তাদের ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

আলোচ্য দ্বাদশ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক এরা যখন চুক্তিটি ভঙ্গ করে দিল; তখন এদের সাথে মুসলমানদের কি ব্যবহার করা উচিত। এরশাদ হয় ঃ وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ অর্থাৎ, "এরা যদি চুক্তি সম্পাদনের পর শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং ইসলামও গ্রহণ না করে, অধিকন্তু ইসলামকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, তবে সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।"

فقاتلوهم লক্ষ্যণীয় যে, এখানে আপাতঃদৃষ্টিতে বলা সঙ্গত ছিল, 'সেই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর।' কিন্তু তা না বলে বলা হয় فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ "সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।" তার কারণ, এরা চুক্তিভঙ্গের দ্বারা কুফরের ইমাম বা প্রধানে পরিণত হয়ে যুদ্ধের উপযুক্ত হয়। এ বাক্যরীতিতে যুদ্ধাদেশের কারণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

কতিপয় মুফাসসির বলেন, এখানে কুফর-প্রধান বলতে বোঝায় মক্কার ঐ সকল কোরাইশ-প্রধান যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদের উস্কানি দান ও রণ-প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিল। বিশেষতঃ এদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ এজন্যে দেয়া হয় যে, মক্কাবাসীদের শক্তির উৎস হল এরা। তা'ছাড়া, এদের সাথে ছিল অনেক মুসলমানের আত্মীয়তা। যার ফলে এরা হয়ত প্রশ্রয় পেয়ে বসতো।—(মাযহারী)

وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ "এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে" বাক্য থেকে কতিপয় আলেম প্রমাণ করেন যে, মুসলমানদের ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করা চুক্তিভঙ্গের নামান্তর। যে ব্যক্তি ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাকে চুক্তি রক্ষাকারী বলা যাবে না। তবে মাননীয় ফকীহ বৃন্দের ঐকমত্যে আলোচ্য বিদ্রূপ হল তা, যা ইসলাম ও মুসলমানদের হেয় করার উদ্দেশে প্রকাশ্যরূপে করা হয়, ইসলামী আইন-কানুনের গবেষণার উদ্দেশে কৃত সমালোচনা বিদ্রূপের শামিল নয় এবং আভিধানিক অর্থেও তাকে বিদ্রূপ বলা যায় না। মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থানকারী অমুসলিম যিম্মীদের তত্ত্বগত সমালোচনার অনুমতি দেয়া যায়, কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রূপের অনুমতি দেয়া যায় না।

আয়াতের অপর বাক্য হল اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ অর্থাৎ 'এদের কোন শপথ নেই ; কারণ, এরা শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে অভ্যস্ত। তাই এদের শপথের কোন মূল্য-মান নেই।

আয়াতের শেষ বাক্য হল لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ "যাতে তারা ফিরে আসে।" এতে বলা হয় যে, মুসলমানদের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য অপরাপর জাতির মত শত্রু নির্যাতন ও প্রতিশোধ -স্পৃহা নিবারণ, কিংবা সাধারণ রাষ্ট্রনায়কগণের মত নিছক দেশ দখল না হওয়া চাই। বরং তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হওয়া চাই শত্রুদের মঙ্গল কামনা ও সহানুভূতি এবং বিপথ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনা।

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ
وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ وَ
يَتُوْبُ اللهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٥﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ
تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا
مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللهُ خَبِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللهِ
شٰهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَ
فِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللهَ
فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ
الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللهِ وَ
اللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾

(১৪) যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ্ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন (১৫) এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৬) তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ্ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (১৭) মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহ্র মসজিদ আবাদ করার, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে। এদের আমল বরবাদ হবে এবং এরা আগুনে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। (১৮) নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহ্র মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামায ও আদায় করে যাকাত ; আর আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (১৯) তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহ্র রাহে, এরা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ্ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না। (২০) যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্র রাহে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ্র কাছে আর তারাই সফলকাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের হঠকারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিজেদের বাতিল ধর্মকে টিকিয়ে রাখার সকল প্রচেষ্টা এবং তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের জেহাদে অনুপ্রাণিত করার বর্ণনা রয়েছে। আর উপরোক্ত আয়াতসমূহে জেহাদের তাগিদের সাথে রয়েছে এর তাৎপর্য। অর্থাৎ, জেহাদের দ্বারা মুসলমানদের পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষায় নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানসম্পন্নদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। অতএব, এ পরীক্ষা জরুরী।

ষষ্ঠদশ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা কি মনে কর যে, শুধু কলেমার মৌখিক উচ্চারণ ও ইসলামের দাবী শোনে তোমাদের এমনিতে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ্ প্রকাশ্য দেখতে চান কারা আল্লাহ্র রাহে জেহাদকারী এবং কারা আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে না। এ আয়াতে সম্বোধন রয়েছে মুসলমানদের প্রতি। এদের মধ্যে কিছু মুনাফিক প্রকৃতির, আর কিছু দুর্বল ঈমানসম্পন্ন ইতস্ততঃকারী, যারা মুসলমানদের গোপন বিষয়গুলো নিজেদের অ-মুসলিম বন্ধুদের বলে দিত। সেজন্য অত্র আয়াতে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দু'টি আলামতের উল্লেখ করা হয়।

নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দুই আলামত ঃ প্রথম, শুধু আল্লাহ্র জন্যে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে। দ্বিতীয়, কোন অমুসলমানকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করে না। এ আয়াতের শেষে বলা হয়– وَاللهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ "আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত"। তাই তাঁর কাছে কোন হীলা-বাহানা চলবে না।

অমুসলিমদের অন্তরঙ্গ বন্ধু করা জায়েয নয় ঃ ষষ্ঠদশ আয়াতে উল্লেখিত শব্দ وَلِيْجَةً – এর অর্থ, অন্তরঙ্গ বন্ধু, যে গোপন কথা জানে। অন্য এক আয়াতে এ অর্থে بِطَانَةً শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ কাপড়ের ঐ স্তর যা অন্যান্য কাপড়ের ভিতরে পেট বা শরীরের স্পর্শে থাকে। আয়াতটি হল —

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ, মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করো না, তারা তোমাদের ধ্বংসসাধনে কোন ত্রুটি বাকী রাখবে না।"

এ সকল বিষয় আলোচনার পর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ আয়াতে মসজিদুল-হারাম ও অন্যান্য মসজিদগুলোকে বাতিল উপাসনা থেকে পবিত্রকরণ এবং সঠিক ও কবূলযোগ্য তরীকায় এবাদত করার পথনির্দেশ রয়েছে।

কতিপয় মাসায়েল ঃ আয়াতে বলা হয় যে, মসজিদ আবাদ করার উপযুক্ততা কাফেরদের নেই। অর্থ হল, কাফেররা মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক হতে পারবে না। আরও ব্যাপক অর্থে বলা যায়, কোন কাফেরকে কোন ইসলামী ওয়াক্ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ করা জায়েয নয়। তবে নির্মাণকাজে অমুসলিমের সাহায্য নিতে দোষ নেই। – (তফসীরে-মুরাগী)

কোন অ-মুসলিম যদি সওয়াব মনে করে মসজিদ নির্মাণ করে দেয় অথবা মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলমানদের চাঁদা দেয়, তবে কোন প্রকার দ্বীনি বা দুনিয়াবী ক্ষতি সেটার উপর আরোপ করা অথবা খোঁটা দেয়ার আশংকা না থাকলে তা গ্রহণ করা জায়েয রয়েছে। – (শামী)

দ্বিতীয় আয়াতে যা বলা হয়, আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করার যোগ্যতা রয়েছে উপরোক্ত গুণাবলীসম্পন্ন নেককার মুসলমানদের। এর থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি মসজিদের হেফাজত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকে কিংবা যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকর বা দ্বীনি এলমের শিক্ষা দানে, কিংবা শিক্ষা লাভের উদ্দেশে মসজিদে যাতায়াত করে, তা'তার কামেল মুমিন হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। তিরমিযী ও ইবনে-মাজা শরীফে বর্ণিত আছে ঃ রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে তোমরা মসজিদে উপস্থিত হতে দেখ, তোমরা তার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দেবে। কারণ, আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ "আল্লাহ্‌র মসজিদগুলো আবাদ করে তারা, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ....।"

বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে; নবীয়ে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ

"যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে উপস্থিত হয়, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাতে একটি মাকাম প্রস্তুত করেন"। হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন; "মসজিদে আগমনকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যেয়ারতকারী মেহমান, আর মেজবানের কর্তব্য হল মেহমানের সম্মান করা"। —(মাযহারী, তাবরানী, ইবনে-জরীর ও বায়হাকী শরীফ প্রভৃতি)

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) বলেন, মসজিদের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত কার্যকলাপ থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখাও মসজিদ আবাদ করার শামিল। যেমন, মসজিদে ক্রয়-বিক্রয়, দুনিয়াবী কথাবার্তা, হারানো বস্তুর সন্ধান, ভিক্ষাবৃত্তি, বাজে কবিতা পাঠ, ঝগড়া-বিবাদ ও হৈ-হুল্লোড় প্রভৃতি মসজিদের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত কাজ। – (মাযহারী)

১৯ থেকে ২২ পর্যন্ত বর্ণিত চারটি আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। তা হল– মক্কার অনেক মুসরিক মুসলমানদের মোকাবেলায় গর্ব সহকারে বলত, মসজিদুল-হারামের আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আমরাই করে থাকি। এর উপর আর কারো কোন আমল শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত আব্বাস (রাঃ) যখন বদর যুদ্ধে বন্দী হন এবং তাঁর মুসলিম আত্মীয়গণ তাঁকে বাতিল ধর্মের উপর বহাল থাকায় বিদ্রূপের সাথে বলেন, আপনি এখনো ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা ঈমান ও হিজরত (দেশত্যাগ)-কে বড় শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করে আছ, কিন্তু আমরাও তো মসজিদুল-হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকি। তাই আমাদের সমান আর কারো আমল হতে পারে না। তফসীরে ইবনে-কাসীরে আছে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়।

মুস্‌নাদে আবদুর রায্‌যাকের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পর তালহা বিন শায়বা, হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রাঃ)-এর মধ্যে আলোচনা চলছিল। হযরত তালহা বলেন, আমার যে ফযীলত তা তোমাদের নেই। বায়তুল্লাহ্ শরীফের চাবি আমার দখলে। ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরেও রাত্রিযাপন করতে পারি। হযরত আব্বাস বললেন, হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনা আমার হাতে। মসজিদুল-হারামের শাসনক্ষমতা, আমার নিয়ন্ত্রণে। হযরত আলী (রাঃ) অতঃপর বললেন, বুঝতে পারি না এগুলোর উপর তোমাদের এত গর্ব কেন? আমার কৃতিত্ব হল, আমি সবার থেকে ছয় মাস আগে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে করে নামায আদায় করছি এবং রসূলুল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধেও অংশ নিয়েছি। তাঁদের এ আলোচনার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। যাতে স্পষ্ট করে দেয়া হয় যে, ঈমানশূন্য কোন আমল—তা' যতই বড় হোক—আল্লাহ্‌র কাছে কোন মূল্য রাখে না। আর না শিরক অবস্থায় অনুরূপ আমলকারী আল্লাহ্‌র মকবুল বন্দায় পরিণত হতে পারবে।

মুসলিম শরীফে নোমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত হাদীসে ঘটনাটি ভিন্ন-রূপে উদ্ধৃত হয়। এক জুমআর দিন তিনি কতিপয় সাহাবার সাথে মসজিদে নববী (সাঃ)-তে মিম্বরের পাশে বসা ছিলেন। উপস্থিত একজন বললেন, ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজীদের পানি সরবরাহের মত মর্যাদাসম্পন্ন আর কোন আমল নেই এবং এর মোকাবেলায় আর কোন আমলের ধার আমি ধারি না। তাঁর উক্তি খণ্ডন করে অপরজন বললেন, আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদ করার মত উত্তম আমল আর নেই। এভাবে দু'জনের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) তাদের ধমক দিয়ে বললেন, রসূলুল্লাহ্‌র মিম্বরের কাছে শোরগোল বন্ধ কর। জুমআর নামাযের পর স্বয়ং হযরতের কাছে বিষয়টি পেশ কর। কথামত প্রশ্নটি তাঁর কাছে রাখা হয়। এর প্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং এতে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের উপর জেহাদকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

ঘটনা যাই হোক না কেন, আয়াতগুলো অবতরণ হয়েছিল মূলতঃ মুশরিকদের অহঙ্কার নিবারণ উদ্দেশে। অতঃপর মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে, তার সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয় এ সকল আয়াত থেকে। যার ফলে শ্রোতারা ধরে নিয়েছে যে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয়।

সে যাহোক, উপরোক্ত আয়াতে যে সত্যটি তুলে ধরা হয় তা হল, শিরক মিশ্রিত আমল তা যত বড় আমলই হোক কবুলযোগ্য নয় এবং এর কোন মূল্যমানও নেই। সে কারণে কোন মুশরিক মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহ দ্বারা মুসলমানদের মোকাবেলায় ফযীলত ও মর্যাদা লাভ করতে পারবে না.। অন্যদিকে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও জেহাদের মর্যাদা মসজিদুল-হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশী। তাই যে মুসলমান ঈমান ও জেহাদে অগ্রগামী, সে জেহাদে অনুপস্থিত মুসলমানের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী।

আয়াতের শেষ বাক্য হল– وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ "আর আল্লাহ্ যালেম লোকদের হেদায়েত করেন না।" অর্থাৎ,ঈমান যে সকল আমলের মূল ও সকল এবাদত থেকে আফযল এবং জেহাদ যে মসজিদ আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহ থেকে উত্তম, তা'কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা দুর্বোধ্য বিষয় নয়; বরং একান্ত পরিষ্কার কথা। কিন্তু আল্লাহ্ যালেম লোকদের হেদায়েত ও উপলব্ধি শক্তি দান করেন না বিধায় তারা একটি সোজা কথায়ও কু-তর্কে অবতীর্ণ হয়।

বিশেতিতম আয়াতে তার উপরের আয়াতে উল্লেখিত শব্দ لَا يَسْتَوٗنَ 'সমান নয়' এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এরশাদ হয় اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .... "যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্‌র রাহে মাল ও জান দিয়ে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে তাদের বড় মর্যাদা এবং তারাই সফলকাম"। পক্ষান্তরে তাদের প্রতিপক্ষ মুশরিকদের কোন সফলতা আল্লাহ্ দান করেন না। তবে সাধারণ মুসলমানগণ এ সফলতার অংশীদার, কিন্তু দেশত্যাগী মুজাহিদগণের সফলতা সবার উর্ধ্বে। তাই পূর্ণ সফলতার অধিকারী হল তারা।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا
نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ﴿٢١﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ
عَظِيْمٌ ﴿٢٢﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَاۗءَكُمْ وَ
اِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاۗءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَي الْاِيْمَانِ ۭ وَمَنْ
يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾ قُلْ اِنْ كَانَ
اٰبَاۗؤُكُمْ وَاَبْنَاۗؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ
اَمْوَالُ ۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ
مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَ
جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰي يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۭ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٤﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ
مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ
فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـــًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا
رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ
عَلٰي رَسُوْلِهٖ وَعَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا
وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ وَذٰلِكَ جَزَاۗءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦﴾

(২১) তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। (২২) তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কাছে আছে মহা পুরস্কার। (২৩) হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী। (২৪) বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান—যাকে তোমরা পছন্দ কর—আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (২৫) আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হোনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। (২৬) তারপর আল্লাহ্ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা তাঁর রসূল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের এবং এটি হল কাফেরদের কর্মফল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

২১তম ও ২২তম আয়াতে সেই সকল লোকদের পুরস্কার ও পরকালীন মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে। এরশাদ হয় ঃ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ .... "তাদের প্রতিপালক তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী শান্তি, তারা থাকবে সেখানে চিরদিন, আর আল্লাহ্র কাছে রয়েছে মহান পুরস্কার।"

উপরোক্ত আয়াতে হিজরত ও জেহাদের ফযীলত বর্ণিত হয়। সেক্ষেত্রে দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অর্থ-সম্পদকে বিদায় জানাতে হয়। আর এটি হল মনুষ্য স্বভাবের পক্ষে বড় কঠিন কাজ। তাই সামনের আয়াতে এগুলোর সাথে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসার নিন্দা করে হিজরত ও জেহাদের জন্যে মুসলমানদের উৎসাহিত করা হয়। এরশাদ হয়ঃ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَاۗءَكُمْ وَ اِخْوَانَكُمْ ...... "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের বদলে কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা অভিভাবকরূপে তাদের গ্রহণ করে, তারাই হবে সীমালংঘনকারী।"

মাতা-পিতা, ভাই-বোন এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ কোরআনে বহু আয়াত রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয় যে, প্রত্যেক সম্পর্কের একেকটি সীমা আছে এবং এ সকল সম্পর্ক তা মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন যার বেলাতেই হোক, আল্লাহ্ ও রসূলের সম্পর্কের প্রশ্নে বাদ দেয়ার উপযুক্ত। যেখানে এ দুসম্পর্কের সংঘাত দেখা দেবে, সেখানে আল্লাহ্ ও রসূলের সম্পর্ককেই বহাল রাখা আবশ্যক।

আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ উল্লেখিত পাঁচটি আয়াত থেকে আরও কিছু তত্ত্ব পাওয়া যায়। **প্রথমতঃ** ঈমান হল আমলের প্রাণ। ঈমানবিহীন আমল প্রাণশূন্য দেহের মত যা কবুলিয়তের অযোগ্য। আখেরাতের নাজাত ক্ষেত্রে এর কোন দাম নেই। তবে আল্লাহ্ যেহেতু বে-ইনসাফ নন, সেহেতু কাফেরদের নিষ্প্রাণ ভাল আমলগুলোকেও সম্পূর্ণ নষ্ট করেন না'; বরং দুনিয়ায় এর বিনিময়স্বরূপ আরাম-আয়েশ ও অর্থ-সম্পদ দান করে হিসাব পরিষ্কার করে নেন। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয় ঃ গোনাহ ও পাপাচারের ফলে মানুষের বিবেক ও বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। উনবিংশতম আয়াতের শেষ বাক্য وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ "আল্লাহ্ যালেম লোকদের সত্য পথ প্রদর্শন করেন না" থেকে কথাটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন, এর বিপরীতে অপর এক আয়াতে বলা হয়ঃ اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا "তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে তিনি ভাল-মন্দ পার্থক্যের শক্তি দান করবেন।" অর্থাৎ, এবাদত-বন্দেগী ও তাকওয়া-পরহেযগারীর ফলে বিবেক প্রখর হয়, সুষ্ঠু বিচার-বিবেচনার শক্তি আসে। তাই সে ভাল-মন্দের পার্থক্যে ভুল করে না।

তৃতীয় ঃ নেক আমলগুলোর মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে। সেমতে আমলকারীর মর্যাদায়ও তারতম্য হবে। অর্থাৎ, সকল আমলকারীকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যাবে না। আর একটি কথা হল, আমলের আধিক্যের উপর ফযীলত নির্ভরশীল নয়; বরং আমলের সৌন্দর্যের উপর

তা নির্ভরশীল। সূরা মুলকের শুরুতে আছে ঃ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا "যাতে আল্লাহ্ পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের কার আমল কত সৌন্দর্যমণ্ডিত।"

চতুর্থ ঃ আরাম-আয়েশের স্থায়িত্বের জন্যে দু'টি বিষয় আবশ্যক। প্রথম, নেয়ামতের স্থায়িত্ব। দ্বিতীয়, নেয়ামত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়া। তাই আল্লাহ্র মকবুল বান্দাদের জন্যে আয়াতে এ দু'টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। نَعِيمٌ مُّقِيمٌ (স্থায়ী শান্তি) এতে আছে প্রথম বিষয়, আর خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (তথায় চিরদিন বসবাস করবে) বাক্যে আছে দ্বিতীয় বিষয়।

পঞ্চম ঃ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাহল, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সকল সম্পর্কের উপর আল্লাহ্ ও রসূলের সম্পর্ক অগ্রগণ্য। এ দুই সম্পর্কের সাথে সংঘাত দেখা দিলে আত্মীয়তার সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিতে হবে। উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামাতরূপে সাহাবায়ে কেরাম যে অভিহিত, তার মূলে রয়েছে তাঁদের এ ত্যাগ ও কোরবানী। তাঁরা সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও রসূলের সম্পর্কেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

তাই আফ্রিকার হযরত বেলাল (রাঃ), রোমের হযরত সোহাইব (রাঃ),পারস্যের হযরত সালমান (রাঃ), মক্কার কোরাইশ ও মদীনার আনসারগণ গভীর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ওহুদ ও বদর যুদ্ধে পিতা ও পুত্র এবং ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে অস্ত্রের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার এই প্রমাণ বহন করে।

সূরা তওবার ২৪তম আয়াতটি নাযিল হয় মূলতঃ ওদের ব্যাপারে যারা হিজরত ফরয হওয়াকালে মক্কা থেকে হিজরত করেনি। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিবার ও অর্থ-সম্পদের মায়া হিজরতের ফরয আদায়ে এদের বিরত রাখে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা রসূলে করীম (সাঃ)-কে নির্দেশ দেন যে, আপনি তাদিগকে বলে দিন ঃ "যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত, আল্লাহ্ নাফরমানদিগকে কৃতকার্য করেন না।"

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার যে কথা আছে, তৎসম্পর্কে তফসীরশাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এখানে 'বিধান' অর্থে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মক্কা জয়ের আদেশ। বাক্যের মর্ম হল, যারা দুনিয়াবী সম্পর্কের জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, তাদের করুণ পরিণতির দিন সমাগত। মক্কা যখন বিজিত হবে আর এ সকল নাফরমানেরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে, তখন দুনিয়াবী সম্পর্ক তাদের কোন কাজে আসবে না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এখানে বিধান অর্থ আল্লাহ্র আযাবের বিধান। অর্থাৎ, আখেরাতের সম্পর্কের উপর যারা দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে হিজরত থেকে বিরত রয়েছে, আল্লাহ্র আযাব অতি শীঘ্র তাদের গ্রাস করবে। দুনিয়ার মধ্যেই এ আযাব আসতে পারে। অন্যথায় আখেরাতের আযাব তো আছেই। এখানে হুঁশিয়ারী উচ্চারণটি মূলতঃ হিজরত না করার প্রেক্ষিতে। কিন্তু তদস্থলে উল্লেখ করা হয় জেহাদের—যা হল হিজরতের পরবর্তী পদক্ষেপ। এই বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, সবেমাত্র হিজরতের আদেশ দেয়া হল। এতেই অনেকের হাঁপ ছেড়ে বসার অবস্থা। কিন্তু অচিরেই আসবে জেহাদের আদেশ, যে আদেশ পালনে আল্লাহ্ ও রসূলের জন্যে সকল বস্তুর মায়া এমন কি প্রাণের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে।

এও হতে পারে যে, এখানে 'জেহাদ' বলে হিজরতকে উদ্দেশ করা হয়েছে। কারণ, হিজরত মূলতঃ জেহাদেরই অন্যতম অংশ।

আয়াতের শেষ বাক্য হল ঃ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ "আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করবেন না।" "এতে বলা হয় যে, যারা হিজরতের আদেশ আসা সত্ত্বেও দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে আত্মীয়-স্বজন এবং অর্থ-সম্পদকে বুকে জড়িয়ে বসে আছে, তাদের এ আচরণ দুনিয়াতেও কোন কাজ দেবে না এবং তারা আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বগৃহে আরাম-আয়েশ ও ভোগের যে আশা পোষণ করে আছে, তা পূরণ হওয়ার নয়; বরং জেহাদের দামামা বেজে উঠার পর সকল সহায়-সম্পত্তি তাদের জন্যে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, আল্লাহ্র রীতি হল, তিনি নাফরমান লোকদের উদ্দেশ্য পূরণ করেন না।

হিজরতের মাসায়েল ঃ প্রথম, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ফরয হুকুম যখন আসে, তখন এ হুকুম পালন শুধু কর্তব্য আদায় করাই ছিল না; বরং তা ছিল মুসলমান হওয়ার আলামতও। তাই যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত থেকে বিরত ছিল তাদের মুসলমান বলা যেতো না। মক্কা বিজয়ের পর এ আদেশ রহিত হয়। তবে আদেশের মূল বক্তব্য এখনো বলবৎ আছে যে, যে দেশে আল্লাহ্র আদেশ তথা নামায-রোযা প্রভৃতি পালন সম্ভব না হয়, সামর্থ্য থাকলে সে দেশ ত্যাগ করা মুসলমানদের পক্ষে সব সময়ের জন্যে ফরয।

দ্বিতীয় ঃ গোনাহ্ ও পাপাচার যে দেশে প্রবল, সে দেশ ত্যাগ করা মুসলমানদের পক্ষে সব সময়ের জন্যে মুস্তাহাব। – (বিস্তারিত অবগতির জন্যে 'ফাত্হুল বারী দ্রষ্টব্য)

উল্লেখিত আয়াতে সরাসরি সম্বোধন রয়েছে তাদের প্রতি, যারা হিজরত ফরয হওয়াকালে পার্থিব সম্পর্কের মোহে হিজরত করেনি। তবে আয়াতটির সংশ্লিষ্ট শব্দের ব্যাপক অর্থে সকল মুসলমানের প্রতি এ আদেশ রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ভালবাসাকে এমন উন্নত স্তরে রাখা ওয়াজিব, যে স্তর অন্য কারো ভালবাসা অতিক্রম করবে না। ফলে যার ভালবাসা এ স্তরে নয়, সে আযাবের যোগ্য।

পূর্ণতর ঈমানের পরিচয় ঃ এজন্যে বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ 'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সকল লোক থেকে অধিক প্রিয় হই।" আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ 'রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কারো সাথে বন্ধুত্ব রেখেছে শুধু আল্লাহ্র জন্যে, শত্রুতা রেখেছে শুধু আল্লাহ্র জন্যে, অর্থ ব্যয় করে। আল্লাহ্র জন্যে, অর্থ ব্যয় থেকে বিরত রয়েছে আল্লাহ্র জন্যে, সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে।'

হাদীসের এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভালবাসাকে অপরাপর ভালবাসার উর্ধ্বে স্থান দেয়া এবং শত্রুতা ও মিত্রতায় আল্লাহ্-রসূলের হুকুমের অনুগত থাকা পূর্ণতর ঈমান লাভের পূর্বশর্ত।

ইমামে তফসীর কাযী বায়যাবী (রহঃ) বলেন, অল্পসংখ্যক লোকই

আয়াতে উল্লেখিত শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। কারণ, অনেক বড় বড় আলেম ও পরহেযগার লোককেও স্ত্রী-পরিজন এবং অর্থ-সম্পদের মোহে মত্ত দেখা যায়, তবে আল্লাহ্ যাদের হেফাযত করেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু কাযী বায়যাবী প্রসঙ্গতঃ একথাও বলেছেন যে, এখানে ভালবাসা অর্থ অনিচ্ছাকৃত ভালবাসা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আল্লাহ্ কোন মানুষকে তার সামর্থ্যের বাইরে কষ্ট দেন না। তাই কারো অন্তরে যদি পার্থিব সম্পর্কের স্বাভাবিক আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু এ আকর্ষণ আল্লাহ্-রসূলের ভালবাসাকে প্রভাবিত এবং বিরুদ্ধাচরণে প্ররোচিত না করে, তবে তার এ পার্থিব আকর্ষণ উপরোক্ত দণ্ডবিধির আওতায় আসে না। যেমন, কোন অসুস্থ লোক ঔষধের তিক্ততা বা অস্ত্রোপচারকে ভয় করে, কিন্তু তার বিবেক একে শাস্তি এ আরোগ্যের মাধ্যম মনে করে। এখানে যেমন তার অপারেশন-ভীতি স্বাভাবিক এবং এর জন্যে কেউ তাকে তিরস্কারও করে না, তেমনি স্ত্রী-পরিজন ও অর্থ-সম্পদের মোহে কারো অন্তর যদি শরীয়তের কোন কোন হুকুম পালনে অনিচ্ছাকৃতভাবে চাপ বোধ করে এবং এসত্ত্বেও সে শরীয়তের হুকুম পালন করে, তবে তার পক্ষে দুনিয়ার এ আকর্ষণ দূষণীয় নয়; বরং সে প্রশংসার পাত্র এবং তার আল্লাহ্-রসূলের এ ভালবাসাকে এ আয়াত অনুসারে সবার উর্ধ্বে স্থান দাতাগণের কাতারে শামিল রাখা হবে।

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) তফসীরে-মাযহারীতে বলেন, আল্লাহ্ ও রসূলের ভালবাসার এ স্তরে উপনীত হওয়া এক বিরাট নেয়ামত। কিন্তু এ নেয়ামত লাভ করা যায় আল্লাহ্র ওলীগণের সংসর্গে থেকে। এজন্যে সূফিয়ায়ে কেরাম তা' হাসিলের জন্যে মাশায়েখগণের পদসেবাকে আবশ্যকীয় মনে করেন।' তফসীরে 'রুহুল-বয়ান' প্রণেতা বলেন, 'বন্ধুত্বের এই মাকাম হাসিল হয় তাদের, যারা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ (আঃ)-এর মত নিজের জান-মাল ও সন্তানের কোরবানী দিয়েছে আল্লাহ্র পথে, তাঁরই প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে।'

কাযী বায়যাবী (রহঃ) স্বীয় তফসীরে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নত ও শরীয়তের হেফাযত এবং এতে ছিদ্র সৃষ্টিকারী লোকদের প্রতিরোধও আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের ভালবাসার স্পষ্ট প্রমাণ।

২৫ তম আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্র সেই দয়া ও দানের উল্লেখ রয়েছে যা প্রতি ক্ষেত্রে মুসলমানেরা লাভ করে। বলা হয়ঃ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ 'আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। এরপর বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় হোনাইন যুদ্ধের কথা। কারণ, সে যুদ্ধে এমনসব ধারণাতীত অদ্ভুত ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে, যেগুলো নিয়ে চিন্তা করলে মানুষের ঈমানী শক্তি প্রবল ও কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়। সেজন্যে আয়াতের শাব্দিক তফসীরের আগে হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখিত এ যুদ্ধের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দেয়া সমীচীন মনে করি। এতে আয়াতের তফসীর অনুধাবন সহজ হবে এবং যে সকল হিতকর বিষয়ের উদ্দেশে ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়, তা সামনে এসে যাবে। এ বিবরণের অধিকাংশ তথ্য তফসীরে-মাযহারী থেকে নেয়া হয়েছে, যাতে হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি রয়েছে।

'হোনাইন' মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। যা মক্কা শরীফ থেকে প্রায় দশ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে যখন মক্কা বিজিত হয় আর মক্কার কোরাইশগণ অস্ত্র সমর্পণ করে, তখন আরবের বিখ্যাত ধনী ও যুদ্ধবাজ হাওয়াজেন গোত্রে —যার একটি শাখা তায়েফের বনু-সকীফ নামে পরিচিত, তাদের মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে তারা একত্রিত হয়ে আশংকা প্রকাশ করতে থাকে যে, মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানদের বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয়েছে, তখন পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্য হবে তায়েফ। তাই তাদের আগে আমাদের আক্রমণ পরিচালনা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। পরামর্শ মতে এ উদ্দেশে হাওয়াজেন গোত্র মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত শাখা-গোত্রগুলোকে একত্রিত করে। আর বিশাল সে গোত্রের প্রায় সবাই যুদ্ধের জন্যে সমবেত হয়।

এ অভিযানের নেতা ছিলেন মালেক বিন আউফ। অবশ্য পরে তিনি মুসলমান হয়ে ইসলামের অন্যতম ঝাণ্ডাবাহী হন। তবে প্রথম মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তীব্র প্রেরণা ছিল তাঁর মনে। তাই স্বগোত্রের সংখ্যাগুরু অংশ তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ গোত্রের অপর দু'টি ছোট শাখা—বনূকাব ও বনু-কেলাব মতানৈক্য প্রকাশ করে। আল্লাহ্ তাদের কিছু দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন। তারা বলতে থাকে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়াও যদি মুহাম্মদের (সাঃ) বিরুদ্ধে একত্রিত হয়, তথাপি তিনি সকলের উপর জয়ী হবেন, আমরা খোদায়ী শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে পারব না।

যাহোক, এই দুই গোত্র ছাড়া বাকী সবাই যুদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। সেনানায়ক মালেক বিন আউফ পূর্ণ শক্তির সাথে রণাঙ্গনে তাদের সুদৃঢ় রাখার জন্যে এ কৌশল অবলম্বন করেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের পরিবার-পরিজনও উপস্থিত থাকবে এবং প্রত্যেকের জীবিকার প্রধান সহায় পশুপালও সাথে রাখতে হবে। উদ্দেশ্য, কেউ যেন পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের টানে রণক্ষেত্র ত্যাগ না করে। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। হাফেযুল-হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার (রঃ) চব্বিশ বা আটাশ হাজারের সংখ্যাকে সঠিক মনে করেন। আর কেউ কেউ বলেন, এদের সংখ্যা চার হাজার ছিল। তবে এও হতে পারে যে, পরিবার-পরিজনসহ ছিল তারা চব্বিশ বা আটাশ হাজার, আর যোদ্ধা ছিল চার হাজার।

মোটকথা, এদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কা শরীফেই অবহিত হন এবং তিনিও এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প নেন। মক্কায় হযরত আত্তাব ইবনে আসাদ (রাঃ)-কে আমীর নিয়োগ করেন এবং মাআয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে লোকদের ইসলামী তলীম দানের জন্য তাঁর সাথে রাখেন। অতঃপর মক্কার কোরাইশদের থেকে অস্ত্র-শস্ত্র ধারস্বরূপ সংগ্রহ করেন। কোরাইশ সরদার সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এতে ক্ষেপে উঠে বলে, আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র কি আপনি জোর করে নিয়ে যেতে চান? হযরত (সাঃ) বলেন, না, না, বরং ধারস্বরূপ নিচ্ছি। যুদ্ধ শেষে ফিরিয়ে দেব। একথা শোনে সে একশত লৌহবর্ম এবং নওফেল ইবনে হারেস তিন হাজার বর্শা তাঁর হাতে তুলে দেয়। ইমাম যুহরীর (রহঃ) বর্ণনামতে চৌদ্দ হাজার মুসলিম সেনা নিয়ে হযরত (সাঃ) এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এতে ছিলেন মদীনার বার হাজার আনসার যাঁরা মক্কা বিজয়ের জন্য তাঁর সাথে এসেছিলেন। বাকী দু'হাজার ছিলেন আশ পাশের অধিবাসী, যারা মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলেন এবং যাদের বলা হত 'তোলাকা'। অর্থাৎ, সাধারণ ক্ষমায় মুক্তিপ্রাপ্ত। ৮ম হিজরীর ৬ই শাওয়াল শুক্রবার হযরতের নেতৃত্বে মুসলমান সেনাদলের যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়। হযরত (সাঃ) বলেন, ইনশাআল্লাহ্, আগামীকাল আমাদের অবস্থান হবে খায়ফে বনীকেনানা'র সে স্থানে, যেখানে মক্কার কোরাইশগণ ইতিপূর্বে মুসলমানদের সাথে সামাজিক বয়কটের চুক্তিপত্র সই করেছিল।

চৌদ্দ হাজারের এই বিরাট সেনাদল জেহাদ-উদ্দেশে বের হয়ে পড়ে,

তাদের সাথে মক্কার অসংখ্য নারী-পুরুষও যুদ্ধের দৃশ্য উপভোগের জন্যে বের হয়ে আসে। তাদের সাধারণ মনোভাব ছিল, এ যুদ্ধে মুসলিম সেনারা হেরে গেলে আমাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেয়ার একটা ভাল সুযোগ হবে। আর তারা জয়ী হলেও আমাদের অবশ্য ক্ষতি নেই।

এ মনোভাবসম্পন্ন লোকদের মধ্যে শায়বা ইবনে ওসমানও ছিলেন। যিনি পরে মুসলমান হয়ে নিজের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে আমার পিতা হযরত হামযা (রাঃ)-এর হাতে এবং আমার চাচা হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে নিহত হন। ফলে অন্তরে প্রতিশোধের যে আগুন জ্বলছিল, তা' বর্ণনার বাইরে। আমি এটাকে অপূর্ব সুযোগ মনে করে মুসলমানদের সহযাত্রী হলাম। যেন মওকা পেলেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আক্রমণ করতে পারি। তাই আমি তাঁদের সাথে থেকে সদা সুযোগের সন্ধানে রইলাম। এক সময় যখন পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং যুদ্ধের সূচনায় দেখা যায়, মুসলমানরা হতোদ্যম হয়ে পালাতে শুরু করেছে; আমি এ সুযোগে ত্বরিৎবেগে হযরতের (সাঃ) কাছে পৌঁছি। কিন্তু দেখি যে, ডান দিকে হযরত আব্বাস, বাম দিকে আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস হযরতের (সাঃ) দেহরক্ষীরূপে আছেন। এজন্যে পেছন দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর কাছে পৌঁছি এবং সংকল্প নেই যে, তরবারির অতর্কিত আঘাত হেনে তাঁকে হত্যা করব। ঠিক এ সময় আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং আমাকে ডাক দিয়ে বলেন, শায়বা, এদিকে এস। আমি তাঁর পাশে গেলে তাঁর পবিত্র হাত আমার বুকের উপর রাখেন আর দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ্' । এর থেকে শয়তানকে দূর করে দাও।' অতঃপর আমি যখন দৃষ্টি উঠাই, আমার চোখ, কান ও প্রাণ থেকেও হযরত (সাঃ)-কে অধিক প্রিয় মনে হচ্ছিল। তারপর তিনি আদেশ দেন, যাও, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আমার তখন এ অবস্থা যে, হযরতের (সাঃ) জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। তাই কাফেরদের সাথে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করি। যুদ্ধ শেষে হযরত (সাঃ) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর খেদমতে হাযির হই। তিনি আমার মনের গোপন দুরভিসন্ধি প্রকাশ করে বলেন, মক্কা থেকে মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছিলে। আর আমাকে হত্যার জন্যে আশে পাশে ঘুরছিলে। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল তোমার দ্বারা সৎ কাজ করানো। পরিশেষে তাই হ'ল।

এ ধরনের ঘটনা ঘটে নযর ইবনে হারেসের সাথে, তিনিও এ উদ্দেশে হোনাইন গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে আল্লাহ্ তাঁর অন্তরে হযরতের (সাঃ) ভালবাসা প্রবিষ্ট করান। ফলে একজন মুসলিম যোদ্ধারূপে কাফেরদের মোকাবেলা করেন।

তেমনি ঘটনা ঘটে আবু বুরদা ইবনে নায়ার (রাঃ)-এর সাথে। তিনি 'আওতাস' নামক স্থানে পৌঁছে দেখেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট। তাঁর পাশে অন্য একজন লোক। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে হযরত (সাঃ) বলেন, এক সময় আমার তন্দ্রা এসে যায়। এ সুযোগে লোকটি আমার তরবারিটি হাতে নিয়ে আমার শির পাশে এসে বলে, হে মুহাম্মদ! এবার বল, আমার হাত থেকে তোমায় কে রক্ষা করবে? বললাম, আল্লাহ্ আমার হেফাযতকারী। একথা শুনে তরবারিটি তার হাত থেকে খসে পড়ে। আবু বুরদা (রাঃ) বলেন, ইয়া-রসূলাল্লাহ্! অনুমতি দিন, আল্লাহ্র এই শত্রুর গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিই। একে শত্রুদলের গোয়েন্দা মনে হচ্ছে। হযরত (সাঃ) বলেন, তুমি থাম, আল্লাহ্র দ্বীন অপরাপর দ্বীনকে পরাজিত না করা অবধি আল্লাহ্ আমার হেফাযত করে যাবেন। এ বলে লোকটিকে বিনা তিরস্কারে মুক্তি দিলেন। সে যাহোক, মুসলিম সেনাদল হোনাইন নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করে। এ সময় হযরত সুহাইল ইবনে হান্যালা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্কে এসে বলেন, জনৈক অশ্বারোহী এসে শত্রুদলের সংবাদ দিয়েছে যে, তারা পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদসহ রণাঙ্গনে জমায়েত হয়েছে। স্মিতহাস্যে হযরত (সাঃ) বললেন, চিন্তা করো না। ওদের সবকিছু গনীমতের মালামাল হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হবে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হোনাইনে অবস্থান নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হাদ্দাদ (রাঃ)-কে শত্রুদলের অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্যে গোয়েন্দারূপে পাঠান। তিনি দু'দিন তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের সকল যুদ্ধ প্রস্তুতি অবলোকন করেন। এক সময় শত্রু সেনানায়ক মালেক ইবনে আউফকে স্বীয় লোকদের একথা বলতে শোনেন, 'মুহাম্মদ এখনো কোন সাহসী যোদ্ধাবাজদের পাল্লায় পড়েনি। মক্কার নিরীহ কোরাইশদের দমন করে তিনি বেশ দাম্ভিক হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারবেন কার সাথে তাঁর মোকাবেলা। আমরা তাঁর সকল দম্ভ চূর্ণ করে দেব। তোমরা কাল ভোরেই রণাঙ্গনে এরূপ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে যে, প্রত্যেকের পেছনে তার স্ত্রী-পরিজন ও মালামাল উপস্থিত থাকবে। তরবারির কোষ ভেঙ্গে ফেলবে এবং সকলে এক সাথে আক্রমণ করবে' । বস্তুতঃ এদের ছিল প্রচুর যুদ্ধ অভিজ্ঞতা। তাই তারা বিভিন্ন ঘাঁটিতে কয়েকটি সেনাদল লুক্কায়িত রেখে দেয়।

এ হল শত্রুদের রণ প্রস্তুতির একটি চিত্র। কিন্তু অন্যদিকে এক হিসাবে এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ, যাতে অংশ নিয়েছে চৌদ্দ হাজারের এক বিরাট বাহিনী। এছাড়া অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল আগের তুলনায় প্রচুর। ইতিপূর্বের ওহুদ ও বদর যুদ্ধে মুসলমানদের এ অভিজ্ঞতা হয় যে, মাত্র তিনশ' তের জন প্রায় নিরস্ত্র লোকের হাতে পরাজয় বরণ করেছে এক হাজার কাফের সৈন্য। তাই হোনাইনের বিরাট যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রেক্ষিতে হাদীসতত্ত্ববিদ 'হাকেম' ও 'বাজ্জার'-এর বর্ণনামতে কতিপয় মুসলিম সেনা উৎসাহের আতিশয্যে এ দাবী করে বসে যে, আজকের জয় অনিবার্য, পরাজয় অসম্ভব। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায়ই শত্রুদল পলাতে বাধ্য হবে।

কিন্তু মুসলমানরা আল্লাহ্র উপর ভরসা না করে জনবলের উপর তৃপ্ত থাকবে এটা আল্লাহ্র পছন্দ ছিল না। এটাই হুনাইনের যুদ্ধে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

হাওয়াযেন গোত্র পূর্ব পরিকল্পনা মতে মুসলমানদের প্রতি সম্মিলিত আক্রমণ পরিচালনা করে। একই সাথে বিভিন্ন ঘাঁটিতে লুক্কায়িত কাফের সেনারা চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের ঘিরে ফেলে। এ সময় আবার ধূলি-ঝড় উঠে সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে, এতে সাহাবীগণের পক্ষে স্ব স্ব অবস্থানে টিকে থাকা সম্ভব হল না। ফলে তাঁরা পিছু হটতে শুরু করেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অশ্ব চালিয়ে সামনের দিকে বাড়তে থাকেন। আর তাঁর সাথে ছিলেন অল্পসংখ্যক সাহাবী, যাঁদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন শ' । অন্য রেওয়ায়েত মতে এক শ' কিংবা তারও কম, যাঁরা হযরত (সাঃ)-এর সাথে অটল রইলেন। কিন্তু এদেরও মনোবাঞ্ছা ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেন আর অগ্রসর না হন।

এ অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন, উচ্চৈঃস্বরে ডাক দাও, বৃক্ষের নীচে জেহাদের বায়আত গ্রহণকারী সাহাবীগণ কোথায়? সূরা বাক্বারাওয়ালারা কোথায়? জান কোরবানের প্রতিশ্রুতিদানকারী আনসারগণই বা কোথায়? সবাই ফিরে এস, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এখানে আছেন।

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٧﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَ
اِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٨﴾ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ
رَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ
صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ِۨابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ
النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ
يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ
قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٠﴾ اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ
وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ
ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوْۤا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ
لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾

(২৭) এরপর আল্লাহ্ যাদের প্রতি ইচ্ছা তওবার তওফীক দেবেন, আর আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৮) 'হে ঈমানদারগণ মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর, তবে আল্লাহ্ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (২৯) 'তোমরা যুদ্ধ কর আহ্‌লে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ্ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। (৩০) ইহুদীরা বলে 'ওযাইর আল্লাহ্‌র পুত্র এবং নাসারারা বলে 'মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র।' এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন্ উল্টা পথে চলে যাচ্ছে। (৩১) তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র।

হযরত আব্বাসের (রাঃ) এ আওয়ায রণাঙ্গনকে প্রকম্পিত করে তোলে। পলায়নরত সাহাবীগণ ফিরে দাঁড়ান এবং প্রবল সাহসিকতার সাথে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে চলেন। ঠিক এ সময় আল্লাহ্ এঁদের সাহায্যে ফেরেশতাদল পাঠিয়ে দেন। এরপর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়, কাফের সেনানায়ক মালেক ইবনে আউফ পরিবার-পরিজন ও মালামালের মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং তায়েফ দুর্গে আত্মগোপ করে। এরপর গোটা শত্রুদল পালাতে শুরু করে। এ যুদ্ধে সত্তর জন কাফের নেতা নিহত হয়। কতিপয় মুসলমানদের হাতে কিছু শিশু আহত হয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) এটাকে শক্ত ভাষায় নিষেধ করেন। যুদ্ধ শেষে মুসলমানদের হাতে আসে তাদের সকল মালামাল, ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী, চব্বিশ হাজার উষ্ট্র, চব্বিশ হাজার বকরী এবং চার হাজার উকিয়া রৌপ্য।

আলোচ্য ২৫ ও ২৬ নং আয়াতে যুদ্ধের এদিকটি তুলে ধরে বলা হয় যে, তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলে। কিন্তু সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কাজে আসল না। প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্যে সঙ্কুচিত হয়ে গেল, তারপর তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ সান্ত্বনা নাযিল করলেন আপন রসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর এবং ফেরেশতাদের এমন সৈন্যদল প্রেরণ করলেন, যাদের তোমরা দেখনি। তারপর তোমাদের হাতে কাফেরদের শাস্তি দিলেন। 'অতঃপর আল্লাহ্ সান্ত্বনা নাযিল করলেন আপন রসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর'। এ বাক্যের অর্থ হল হোনাইন যুদ্ধের প্রথম আক্রমণে যে সকল সাহাবী আপন স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোবল ফিরে পাবার পর স্ব স্ব অবস্থানে ফিরে আসেন; আর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও আপন অবস্থানে সুদৃঢ় হন। সাহাবীদের প্রতি সান্ত্বনা প্রেরণের অর্থ হল, তাঁরা বিজয় সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন। এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌র সান্ত্বনা ছিল দুই প্রকার। এক প্রকার পলায়নরত সাহাবীদের জন্যে অন্য প্রকার হযরতের (সাঃ) সাথে যাঁরা সুদৃঢ় ছিলেন তাঁদের জন্যে। এ কথার ইঙ্গিত দানের জন্যে 'উপর' শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়। যেমন, 'অতঃপর আল্লাহ্ সান্ত্বনা নাযিল করলেন তাঁর রসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর'।

অতঃপর বলা হয়ঃ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا এবং প্রেরণ করলেন এমন সৈন্যদল যাদের তোমরা দেখনি। এটি হল সাধারণ লোকের ব্যাপারে। তাই কেউ কেউ দেখেছেন বলে কতিপয় রেওয়ায়েতে যে বর্ণিত আছে, তা উপরোক্ত উক্তির বিরোধী নয়। এ আয়াতের শেষ বাক্য হলঃ وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ''আর শাস্তি দিলেন কাফেরদের এবং এটি হল কাফেরদের পরিণাম।'' এ শাস্তি বলতে বোঝায় মুসলমানদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়া, যা স্পষ্ট প্রতিভাত হল। আর এটি ছিল পার্থিব শাস্তি, যা দ্রুত কার্যকর হল। পরবর্তী আয়াতে আখেরাতের

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

''অতঃপর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা তওবা নসীব করবেন। আল্লাহ্ অতীব মার্জনাকারী, পরম দয়ালু।'' এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, যারা মুসলমানদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়ার শাস্তি পেয়েছে এবং এখনো কুফরী আদর্শের উপর অটল রয়েছে, তাদের কিছুসংখ্যক লোককে আল্লাহ্ ঈমানের তওফীক দেবেন। নিম্নে এ ধরনের ঘটনার বিবরণ দেয়া

হল।

হোনাইন যুদ্ধে হাওয়াযেন ও সকীফ গোত্রের কতিপয় সরদার নিহত হয়; কিছু পালিয়ে যায়। তাদের পরিবার-পরিজন বন্দীরূপে এবং মালামাল গনীমতরূপে মুসলমানদের আয়ত্তে আসে।

অতঃপর পরাজিত হাওয়াযেন ও সকীফ গোত্রদ্বয় বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়, কিন্তু প্রত্যেক স্থানে তারা পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত তারা তায়েফের এক মজবুত দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করে। রসূলে করীম (সাঃ) পনের-বিশ দিন পর্যন্ত এই দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। ওরা দুর্গ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস তাদের কারো ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! এদের বদদোয়া দিন। কিন্তু তিনি এদের জন্যে হেদায়েতের দোয়া করেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জি'রানা নামক স্থানে পৌছে প্রথমে মক্কা গিয়ে ওমরা আদায় ও পরে মদীনা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অপর দিকে মক্কাবাসীদের যারা মুসলমানদের শেষ পরিণতি দেখার উদ্দেশে দর্শকরূপে যুদ্ধে এসেছিল, তাদের অনেকে ইসলামের সত্যতা প্রত্যক্ষ করে উক্ত জি'রানা নামক স্থানে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

আত্মপ্রসাদ পরিত্যাজ্য ঃ উল্লেখিত আয়াতগুলোর প্রথম হেদায়েত হল, মুসলমানদের কোন অবস্থায় শক্তি-সামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্যের উপর আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত নয়, সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় যেমন তাদের দৃষ্টি আল্লাহ্র সাহায্যের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে, তেমন সকল শক্তি-সামর্থ্য থাকাবস্থায়ও আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখতে হবে।

হোনাইন যুদ্ধের পর্যাপ্ত পরিমাণ সাজ-সরঞ্জাম ও সংখ্যাধিক্য দেখে কতিপয় সাহাবী যে আত্মগর্বের সাথে বলেছিলেন, আজকের যুদ্ধে কেউ আমাদের পরাস্ত করতে পারবে না, আল্লাহ্র নিকট তাঁর প্রিয় বন্দাদের মুখ থেকে এ ধরনের কথা পছন্দ হচ্ছিল না। যার ফলে রণাঙ্গনে কাফেরদের প্রথম ধাক্কা সামলাতে না পেরে তাঁরা পলায়নপর হয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্র গায়বী সাহায্য পেয়ে তাঁরা এ যুদ্ধে জয়ী হন।

বিজিত শত্রুর মালামাল গ্রহণে ন্যায়নীতি বিসর্জন না দেয়া ঃ দ্বিতীয় হেদায়েত যা এই ঘটনা থেকে হাসিল হয়, তাহল এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হোনাইন যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে মক্কার বিজিত কাফেরদের থেকে যে যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিয়েছিলেন তা ধারস্বরূপ ছিল এবং প্রত্যর্পণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়েছিলেন এবং পরে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করেছিলেন। অথচ, এরা ছিল বিজিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত। তাই জোর করেও সমর্থন আদায় করা যেত। কিন্তু হযরত (সাঃ) তা করেননি। এতে রয়েছে শত্রুর সাথে পূর্ণ সদ্ব্যবহারের হেদায়েত।

তৃতীয় ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হোনাইন গমনকালে 'খাইফে বনী কেনানা' নামক স্থান সম্পর্কে বলেছিলেন, আগামীকালের অবস্থান হবে আমাদের সেখানে, যেখানে মক্কার কোরাইশগণ মুসলমানদের একঘরে করে রাখার প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছিল। এতে মুসলমানদের প্রতি যে হেদায়েত আছে, তাহল,আল্লাহ্ তাদের শক্তি-সামর্থ্য ও বিজয় দান করলে বিগত বিপদের কথা যেন ভুলে না যায় এবং যাতে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। দুর্গে আশ্রয় নেয়া হাওয়াযেন গোত্রের বাণ নিক্ষেপের জবাবে বদ-দোয়ার পরিবর্তে হেদায়েত লাভের যে দোয়া হযরত (সাঃ) করেছেন—তাতে রয়েছে এই শিক্ষা যে, মুসলমানের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য শত্রুকে নিছক পরাভূত করা নয়; বরং উদ্দেশ হল হেদায়েতের পথে তাদের নিয়ে আসা। তাই এ চেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

চতুর্থ ঃ পরাজিত শত্রুদের থেকেও নিরাশ হওয়া উচিত নয়; আল্লাহ্ ইসলাম ও ঈমানের হেদায়েত তাদেরও দিতে পারেন। যেমন হাওয়াযেন গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের তওফীক দিয়েছিলেন।

হাওয়াযেন গোত্রের যুদ্ধবন্দী মুক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীগণের মতামত জানতে চেয়েছিলেন এবং তাঁরা আনন্দের সাথে রাজীও হয়েছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও সকলের ব্যক্তিগত মতামত যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, হকদারের পূর্ণ সন্তুষ্টি ছাড়া কেউ তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। লজ্জা বা জনগণের চাপে কেউ নীরব থাকলে তা' সন্তুষ্টি বলে ধর্তব্য হবে না। আমাদের মাননীয় ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ এ থেকে মাসআলা বের করেন যে, ব্যক্তিগত প্রভাব দেখিয়ে কারো থেকে ধর্মীয় প্রয়োজনে চাঁদা আদায় করাও জায়েয নয়। কারণ, অবস্থার চাপে পড়ে বা লজ্জা রক্ষার খাতিরে অনেক ভদ্রলোকই অনেক সময় কিছু না কিছু দিয়ে থাকে, অথচ অন্তর এতে পূর্ণ সায় দেয় না। এ ধরনের অর্থ-কড়িতে বরকতও পাওয়া যায় না।

فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .... – সুতরাং তারা এ বছরের পর যেন মসজিদুল-হারামের নিকটবর্তী না হয়।

'মসজিদুল-হারাম' বলতে সাধারণতঃ বোঝায় বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিকের আঙ্গিনাকে যা দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। তবে কোরআন ও হাদীসে কোন কোন স্থানে তা মক্কার পূর্ণ হরম শরীফ অর্থেও ব্যবহৃত হয় যা কয়েক বর্গমাইল এলাকাব্যাপী। যার সীমানা চিহ্নিত করেছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। যেমন, মে'রাজের ঘটনায় মসজিদুল-হারাম উল্লেখ রয়েছে। ইমামগণের ঐকমত্যে এখানে মসজিদুল-হারাম অর্থ বায়তুল্লাহ্র আঙ্গিনা নয়। কারণ, মে'রাজের শুরু হয় হযরত উম্মে হানী (রাঃ)-এর গৃহ থেকে, যা ছিল বায়তুল্লাহ্র আঙ্গিনার বাইরে অবস্থিত। অনুরূপ সূরা তওবার শুরুতে যে মসজিদুল হারাম - এর উল্লেখ রয়েছে الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ তার অর্থও পূর্ণ হরম শরীফ। কারণ, এখানে উল্লেখিত সন্ধির স্থান হল 'হোদায়বিয়া' যা হরম শরীফের সীমানার বাইরে তার সন্নিকটে অবস্থিত।— (জাস্‌সাস)। এ বছরের পর মুশরিকদের জন্যে পূর্ণ হারাম-শরীফে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হল।

তবে এ বছর বলতে কোন্‌টি বোঝায় তা নিয়ে মুফাসেরিগণের কিছু মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, দশম হিজরী। তবে অধিকাংশ মুফাসসেরের মতে তাহল নবম হিজরী। কারণ, নবী করীম (সাঃ) নবম হিজরীর হজ্বের মৌসুমে হযরত আলী ও আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর দ্বারা কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করান, তাই নবম হিজরী থেকে দশম হিজরী পর্যন্ত ছিল অবকাশের বছর। দশম হিজরীর পর থেকেই এ নিষেধাজ্ঞা জারী হয়।

কতিপয় প্রশ্ন ঃ উল্লেখিত আয়াত দ্বারা দশম হিজরীর পর মসজিদুল-হারামে মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এতে তিনটি প্রশ্ন আসে। প্রথম, এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মসজিদুল-হারামের জন্যে, না অন্যান্য মসজিদের জন্যেও? দ্বিতীয়, মসজিদুল-হারামের জন্যে হয়ে থাকলে তা কি সর্বাবস্থার জন্যে, না শুধু হজ্ব ও ওমরার জন্যে? তৃতীয়, এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মুশরিকদের জন্যে, না আহলে-কিতাব কাফেরদের জন্যেও?

এ সকল প্রশ্নের উত্তরে কোরআন নীরব। তাই ইজতিহাদকারী ইমামগণ কোরআনের ইশারা-ইঙ্গিত ও হযরত (সাঃ)-এর হাদীস সামনে রেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রথমে আলোচনা করতে হয়, কোরআন মজিদ মুশরিকদের যে অপবিত্র ঘোষণা করেছে, তা কোন্ দৃষ্টিতে? যদি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য জানাবত ইত্যাদি অপবিত্রহেতু বলা হয়ে থাকে, তবে তর্কের কিছুই নেই। কারণ, দৃশ্যমান অপবিত্র বস্তু সাথে রেখে কিংবা গোসল ফরয হয়েছে এরূপ নারী-পুরুষের মসজিদে প্রবেশ জায়েয নয়। পক্ষান্তরে কথাটি যদি কুফর-শেরকের গোপন অপবিত্রতার দৃষ্টিকোণে বলা হয়ে থাকে, তবে সম্ভবতঃ এর হুকুম হবে ভিন্ন।

'তফসীরে-কুরতুবীতে বলা হয়েছে ঃ মদীনার ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ তথা ইমাম মালেক (রহঃ) ও অন্যান্য ইমামগণের মতে মুশরিকরা যে কোন দৃষ্টিকোণে অপবিত্র। কারণ, তারা প্রকাশ্য অপবিত্রতা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে না। তেমনি ফরয গোসলেরও ধার ধারে না। তদুপরি কুফর শিরকের বাতেনী অপবিত্রতা তো তাদের আছেই। সুতরাং সকল মুশরিক এবং সকল মসজিদের জন্যেই হুকুমটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

এ মতের সমর্থনে তাঁরা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের (রহঃ) একটি ফরমানকে দলীলরূপে পেশ করেন, যা তিনি বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসকগণকে লিখেছিলেন। এতে লেখা ছিল, ''মসজিদসমূহে কাফেরদের প্রবেশ করতে দেবে না।'' এ ফরমানে তিনি উপরোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করেছিলেন। তাঁদের দ্বিতীয় দলীল হল নবী করীম (সাঃ)-এর এই হাদীস ঃ 'কোন ঋতুবতী মহিলা বা গোসল ফরয হয়েছে এরূপ ব্যক্তির পক্ষে মসজিদে প্রবেশ করাকে আমি জায়েয মনে করি না।'' আর এ কথা সত্য যে, কাফের-মুশরিকগণ ফরয গোসল সাধারণতঃ করে না। তাই তাদের জন্যে মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, হুকুমটি কাফের মুশরিক এবং আহলে-কিতাব সকলের জন্যে প্রযোজ্য, কিন্তু তা শুধু মসজিদুল - হারামের জন্যে নির্দিষ্ট; অপরাপর মসজিদে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়।— (কুরতুবী) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর দলীল হল ছুমামা ইবনে উছালের ঘটনাটি। তিনি ইসলাম গ্রহণের আগে একস্থানে মুসলমানদের হাতে বন্দী হলে নবী করীম (সাঃ) তাকে মসজিদে নববীর এক খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে উপরোক্ত আয়াতে মসজিদুল-হারামের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্যে মুশরিকদের প্রতি যে আদেশ রয়েছে, তার অর্থ হল, আগামী বছর থেকে মুশরিকদের স্বীয় রীতি অনুযায়ী হজ্ব ও ওমরা আদায়ের অনুমতি দেয়া যাবে না। তাঁর দলীল হল, হজ্বের যে মৌসুমে হযরত আলী (রাঃ)-এর দ্বারা কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়, তাতে একথা ছিল- لا يحجن بعد العام مشرك অর্থাৎ, 'এ বছর পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না।' তাই এ ঘোষণার আলোকে আয়াত فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ... অর্থাৎ, 'মুশরিকগণ মসজিদুল-হারামের নিকটবর্তী হবে না'—এর অর্থ হবে আগামী বছর থেকে মুশরেকদের জন্যে হজ্ব ও ওমরা নিষিদ্ধ করা হল। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অতঃপর বলেন, হজ্ব ও ওমরা ছাড়া মুশরিকগণ অন্য কোন প্রয়োজনে আমীরুল-মু'মিনীনের অনুমতিক্রমে মসজিদুল - হারামে প্রবেশ করতে পারবে।

এ মতের সমর্থনে তাঁর দলীল হলো, মক্কা বিজয়ের পর সকীফ গোত্রের প্রতিনিধিবৃন্দ নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে মসজিদে তাদের অবস্থান করানো হয়। অথচ, এরা তখনও অমুসলমান ছিল এবং সাহাবায়ে কেরামও আপত্তি তুলেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, এরা তো অপবিত্র। হযরত (সাঃ) তখন বলেছিলেন, 'মসজিদের মাটি এদের অপবিত্রতায় প্রভাবিত হবে না।'-(জাসসাস)

এ হাদীস দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোরআন-মজীদে মুশরিকদের যে অপবিত্র বলা হয়েছে, তা তাদের কুফর ও শিরকজনিত বাতেনী অপবিত্রতার কারণে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এ মতেরই অনুসারী। অনুরূপ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, কোন মুশরিক মসজিদের নিকটবর্তী হবে না। তবে সে কোন মুসলমানের দাস বা দাসী হলে প্রয়োজন-বোধে প্রবেশ করতে পারে।—(কুরতুবী)

এ হাদীস থেকেও বোঝা যায় যে, প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণে মসজিদুল-হারাম থেকে মুশরিকদের বারণ করা হয়নি। নতুবা দাস-দাসীকে পৃথক করা যেত না, বরং আসল কারণ হল কুফর ও শিরক এবং এ দুয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির আশংকা। এ আশংকা দাস-দাসীর মধ্যে না থাকায় তাদের অনুমতি দেয়া হল। এছাড়া প্রকাশ্য অপবিত্রতার দৃষ্টিকোণে কাফের-মুশরিক-মুসলমান সমান। অপবিত্র বা গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় তো মুসলমানগণও মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করতে পারবে না।

তদুপরি, অধিকাংশ মুফাসসেরগণের মতে এখানে মসজিদুল-হারাম বলতে যখন পূর্ণ হরম শরীফ উদ্দেশ, তখন এ নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণে না হয়ে কুফর-শিরকজনিত অপবিত্রতার কারণে হওয়া অধিকতর সঙ্গত। এজন্যে শুধু মসজিদুল-হারামের নয়, বরং পূর্ণ হরম শরীফে মুশরেকদের প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ, এটি হল ইসলামের দুর্গ।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর উপরোক্ত তত্ত্বের সার কথা হল, কোরআন ও হাদীসমতে মসজিদসমূহকে অপবিত্রতা থেকে বিশুদ্ধ রাখা আবশ্যক এবং এটি জরুরী বিষয়, কিন্তু আমাদের আলোচ্য আয়াতটি এ বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং তা ইসলামের সেই বুনিয়াদী হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট, যার ঘোষণা রয়েছে সূরা বরাআতের শুরুতে। অর্থাৎ, অচিরেই হরম শরীফকে সকল মুশরিক থেকে পবিত্র করে নিতে হবে। কিন্তু আদর্শ ও ন্যায়নীতি এবং দয়া ও অনুকম্পার প্রেক্ষিতে মক্কা বিজয়ের সাথে সাথেই তাদের হরম শরীফ ত্যাগের আদেশ দেয়া হয়নি; বরং যাদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তের চুক্তি ছিল এবং যারা চুক্তির শর্তসমূহ পালন করে যাচ্ছিল, তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার এবং অন্যান্যদের কিছু দিনের সুযোগ দিয়ে চলতি সালের মধ্যেই এই আদেশ কার্যকরী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়, 'এবছরের পর-পূর্ণ হরম-শরীফে মুশরিকদের প্রবেশাধিকার থাকবে না'। তারা শেরেকী প্রথা মতে হজ্ব ও ওমরা আদায় করতে পারবে না। সূরা তওবার আয়াতে যেমন পরিষ্কার ঘোষণা দেয়া হয় যে, নবম হিজরীর পর কোন মুশরিক হরমের সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে না। রসূলে করীম (সাঃ) এ আদেশকে আরও ব্যাপক করে হুকুম দেন যে, গোটা আরব উপদ্বীপে কোন কাফের-মুশরিক থাকতে পারবে না। কিন্তু হযরত (সাঃ) নিজে এ আদেশ কার্যকর করতে পারেননি। অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর পক্ষেও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সমস্যায় জড়িত থাকার ফলে তা সম্ভব হয়নি। তবে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর শাসনামলে আদেশটি যথাযথভাবে প্রয়োগ

করেন।

ইতিপূর্বে মক্কার মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ ছিল। আর এ আয়াতদ্বয়ে আহ্‌লে-কিতাবের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে। তাবুকে আহ্‌লে কিতাবের সাথে মুসলমানদের যে যুদ্ধ-অভিযান সংঘটিত হয়েছিল, আয়াত দু'টি তারই পটভূমি। 'তফসীরে-দুররে মনসুরে' মুফাসসেরে-কোরআন হযরত মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, উক্ত আয়াত দু'টি তাবুক যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল।

আভিধানিক অর্থে 'আহ্‌লে-কিতাব' বলতে যদিও সেই কাফের দলসমূহকে বোঝায়, যারা কোন না কোন আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী; কিন্তু কোরআনের পরিভাষায় আহ্‌লে-কিতাব বলতে বোঝায় শুধু ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের। কারণ, আরবের আশেপাশে এই দু-সম্প্রদায়ই আহ্‌লে-কিতাব নামে সমধিক পরিচিত ছিল। এজন্যে কোরআনে আরবের মুশরিকদের সম্বোধন করে বলা হয়ঃ أَنْ تَقُولُوٓا إِنَّمَآ أُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۖ وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ অর্থাৎ, তোমরা হয়তো বলতে পার যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দু'সম্প্রদায়ের প্রতিই নাযিল হয়েছিল, আর আমরা তো এর পঠন ও পাঠন থেকে সম্পূর্ণ বেখবর ছিলাম—(আনআম ঃ- ১৫৬)।

আহ্‌লে-কিতাবের উল্লেখ করে অত্র আয়াতদ্বয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করার যে নির্দেশ রয়েছে, তা শুধু আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ আদেশ রয়েছে সকল কাফের সম্প্রদায়ের জন্যেই। কারণ, যুদ্ধ করার যে সকল হেতু সামনে বর্ণিত হয়েছে, তা' সকল কাফেরদের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং এ আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। তবে বিশেষভাবে আহ্‌লে-কিতাবের উল্লেখ করা হয় মুসলমানদের এ দ্বিধা নিবারণ-উদ্দেশে যে, ইহুদী-খ্রীষ্টানেরা অন্ততঃ তাওরাত-ইঞ্জীল এবং হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর প্রতি তো ঈমান রাখে। অতএব, পূর্বের আম্বিয়া (আঃ) ও কিতাবের সাথে তাদের সম্পর্ক থেকে মুসলমানের জেহাদী মনোভাবের জন্য বাধা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাই বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ বিশেষভাবে আহ্‌লে-কিতাবের উল্লেখ করার মাঝে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, তারা এই দৃষ্টিকোণে অধিক শাস্তির যোগ্য। কারণ, এরা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী। এদের কাছে তওরাত ইঞ্জীলের জ্ঞান, যে তাওরাত ও ইঞ্জীলের রয়েছে রসূলে করীম (সাঃ) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী, এমনকি তাঁর দৈহিক আকৃতির বর্ণনা। এ সত্ত্বেও তাদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়।

প্রথম আয়াতে যুদ্ধের চারটি হেতুর বর্ণনা রয়েছে। প্রথমতঃ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ তারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে না। দ্বিতীয়তঃ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ রোজ হাশরের প্রতিও তাদের বিশ্বাস নেই। তৃতীয়তঃ

وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে তারা হারাম মনে করে না। চতুর্থতঃ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ সত্য ধর্ম গ্রহণে তারা অনিচ্ছুক।

এখানে প্রশ্ন জাগে, ইহুদী-খ্রীষ্টানেরা তো বাহ্যতঃ আল্লাহ্‌, পরকাল ও রোজ কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী নয়। যে ঈমান বিশ্বাস আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত, তা না হলে তার কোন মূল্য নেই। ইহুদী-খ্রীষ্টানেরা যদিও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র একত্বকে অস্বীকার করে না, কিন্তু পরবর্তী আয়াতের বর্ণনা মতে ইহুদীদের কর্তৃক হযরত ওযাইর ও খ্রীষ্টানদের কর্তৃক হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র সাব্যস্ত করা প্রকারান্তরে শিরক তথা অংশীবাদকে স্বীকার করে নেয়া। তাই তাদের তাওহীদ ও ঈমানের দাবী অর্থহীন।

অনুরূপ, আখেরাতের প্রতি যে ঈমান-বিশ্বাস রাখা আবশ্যক তা আহ্‌লে-কিতাবের অধিকাংশের মধ্যে নেই। তাদের অনেকের ধারণা হল, রোজ কেয়ামতে মানুষ জড়দেহ নিয়ে উঠবে না; বরং তা হবে মানুষের এক ধরনের রূহানী জিন্দেগী। তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বিশেষ কোন স্থানের নাম নয়; বরং আত্মার শান্তি হল জান্নাত আর অশান্তি হল জাহান্নাম। তাদের এ বিশ্বাস কোরআনের পেশকৃত ধ্যান-ধারণার বরখেলাফ। সুতরাং আখেরাতের প্রতি ঈমানও তাদের যথাযোগ্য নয়।

তৃতীয় হেতুর উল্লেখ করে বলা হয় যে, ইহুদী-খ্রীষ্টানেরা আল্লাহ্‌র হারামকৃত বস্তুকে হারাম মনে করে না। এ কথার অর্থ হল-তওরাত ও ইঞ্জীলে যে সকল বস্তুকে হারাম করে দেয়া হয়েছে, তা তারা হারাম বলে গণ্য করে না। যেমন, সুদ ও কতিপয় খাদ্যদ্রব্য-যা তওরাত ও ইঞ্জীলে হারাম ছিল, তারা সেগুলোকে হারাম মনে করত না।

এ থেকে একটি মাসআলা পরিষ্কার হয় যে, আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল মনে করা যে শুধু পাপ তা' নয়, বরং কুফরীও বটে। অনুরূপ কোন হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করাও কুফরী। তবে হারামকে হারাম মনে করে কেউ যদি ভুলে অসতর্ক পদক্ষেপ নেয়, তবে তা কুফরী নয়, বরং তা গোনাহ্‌ ও ফাসেকী।

আয়াতে উল্লেখিত حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ "যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে" বাক্য দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহের একটি সীমা ঠিক করে দেয়া হয়। অর্থাৎ, তাবেদার প্রজারূপে জিযিয়া প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

'জিযিয়া'র শাব্দিক অর্থ, বিনিময়' পুরস্কার। শরীয়তের পরিভাষায় জিযিয়া বলা হয় কাফেরদের প্রাণের বিনিময়ে গৃহীত অর্থকে।

জিযিয়ার তাৎপর্য ঃ কুফর ও শিরক হল আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের সাথে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু আল্লাহ্‌ নিজের অসীম রহমতগুণে শাস্তির এই কঠোরতা হ্রাস করে ঘোষণা করেন যে, তারা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রজারূপে ইসলামী আইন-কানুনকে মেনে নিয়ে থাকতে চায় তবে তাদের থেকে সামান্য জিযিয়াকর নিয়ে মৃত্যুদণ্ড থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান থাকবে। কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। শরীয়তের পরিভাষায় এ হল জিযিয়া কর।

দু'পক্ষের সম্মতিক্রমে জিযিয়ার যে হার ধার্য হবে তাতে শরীয়তের পক্ষ থেক কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ধার্যকৃত হারে জিযিয়া নেয়া হবে। যেমন, নাজরান গোত্রের সাথে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) -এর চুক্তি হয় যে, তারা সকলের পক্ষ থেকে বার্ষিক দু'হাজার জোড়া বস্ত্র প্রদান করবে। প্রতি জোড়ায় থাকবে একটা লুঙ্গি ও একটা চাদর। প্রতি জোড়ার মূল্যও ধার্য হয়। অর্থাৎ, এক উকিয়া রূপার সমমূল্য। চল্লিশ দিরহামে হয় এক উকিয়া। যা আমাদের দেশের প্রায় সাড়ে এগার তোলা রূপার সমপরিমাণ।

অনুরূপ তাগলিব গোত্রীয় খ্রীষ্টানদের সাথে হযরত ওমর (রাঃ)-এর চুক্তি হয় যে, তারা যাকাতের নেসাবের দ্বিগুণ পরিমাণে জিযিয়াকর প্রদান করবে।

মুসলমানগণ যদি কোন দেশ যুদ্ধ করে জয় করে নেয় এবং সে দেশের অধিবাসিগণকে তাদের সহায়-সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের উপর বহাল রাখে এবং তারাও ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক হিসাবে থাকতে চায়, তবে তাদের জিযিয়ার হার তা হবে যা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) আপন শাসনকালে ধার্য করেছিলের। তাহল, উচ্চবিত্তের জন্যে মাসিক চার দিরহাম, মধ্যবিত্তের জন্যে দু'দিরহাম এবং স্বাস্থ্যবান শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি নিম্নবিত্তের জন্য মাত্র এক দিরহাম। অর্থাৎ, সাড়ে তিন মাশা রূপা অথবা তার সমমূল্যের অর্থ। গরীব-দুঃখী, বিকলাঙ্গ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ এবং সংসারত্যাগী ধর্মযাজকদের এই জিযিয়া কর থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

কিন্তু এই স্বল্প পরিমাণ জিযিয়া আদায়ের বেলায় রসূলে করীম (সাঃ)-এর তাগিদ ছিল যে, কারো সাধ্যের বাইরে কোনরূপ জোর-জবরদস্তি করা না হয়। হযরত (সাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, "যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর যুলুম চালাবে, রোজ হাশরে আমি যালেমের বিরূদ্ধে ঐ অমুসলিমের পক্ষ অবলম্বন করব।" - (মাযহারী)

উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহের প্রেক্ষিতে কতিপয় ইমাম এক মত পোষণ করেন যে, শরীয়ত জিযিয়ার বিশেষ কোন হার নির্দিষ্ট করে দেয়নি, বরং তা ইসলামী শাসকের সুবিবেচনার উপর নির্ভরশীল। তিনি অমুসলিমদের অবস্থা পর্যালোচনা করে যা সঙ্গত মনে হয়, ধার্য করবেন।

আমাদের এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হল যে, জিযিয়া প্রথা 'ইসলামের বিনিময় নয়' বরং তা আদায় করা হয় কাফেরদের মৃত্যুদণ্ড মওকুফের বিনিময়ে। সুতরাং এ সন্দেহ যেন না হয় যে, অল্প মূল্যের বিনিময়ে ওদের কুফরী অবস্থায় বহাল থাকার অনুমতি কেমন করে দেয়া হল? কারণ, এমন অনেক লোক অছে, যাদের স্বধর্মে অবিচল থেকে বিনা জিযিয়ায় ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়। যেমন, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ এবং যাজক সম্প্রদায়। ইসলামের বিনিময়ে জিযিয়া নেয়া হলে এরা কিছুতেই অব্যাহতি পেত না।

আলোচ্য আয়াতে عَنْ يَّدٍ শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে। عَنْ অর্থ এখানে কারণ, يد অর্থ শক্তি ও বিজয়। তাই জিযিয়া যেন খয়রাতি চাঁদা প্রদানের মত না হয়; বরং তা হবে ইসলামের বিজয়কে মেনে নিয়ে একান্ত অনুগত নাগরিক হিসেবে। — রূহুল মা'আনী)। এরপরের বাক্য হল— وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর তফসীর অনুযায়ী এর অর্থ হল— তারা যেন ইসলামের সাধারণ আইন-কানুনের আনুগত্যকে নিজেদের কর্তব্যরূপে গ্রহণ করে নেয়।— (রূহুল-মা'আনী, তফসীরে মাযহারী)।

জিযিয়া প্রদানে স্বীকৃত হলে ওদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করার যে আদেশ আয়াতে হয়েছে তা অধিকাংশ ইমামের মতে সকল অমুসলিমের বেলায়ই প্রযোজ্য। তারা আহলে-কিতাব হোক বা অন্য কেউ। তবে আরবের মুশরিকগণ এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের থেকে জিযিয়া গৃহীত হয়নি।

দ্বিতীয় আয়াত হল প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা। প্রথম আয়াতে মোটামুটিভাবে বলা হয় যে, আহলে-কিতাবগণ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে না। দ্বিতীয় আয়াতে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে, ইহুদীরা হযরত ওযাইর (আঃ) ও খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র সাব্যস্ত করে। তাই তাদের ঈমান ও তওহীদের দাবী নিরর্থক। এরপর বলা হয়— ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ 'এটি তাদের মুখের কথা।' এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) তারা নিজেদের ভ্রান্ত আকীদার কথা নিজ মুখেও স্বীকার করে। এতে গোপনীয়তা কিছুই নেই। (দুই) তারা মুখে যে কুফরী উক্তি করে যাচ্ছে তার পেছনে না কোন দলীল আছে, না কোন যুক্তি। অতঃপর বলা হয় ঃ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ "এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে, আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন। ওরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে"। এতে অর্থ হল ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা নবীগণকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে পূর্ববর্তী কাফের ও মুশরিকদের মতই হয়ে গেল, তারা ফেরেশতা ও লাত-মানাত মূর্তিদ্বয়কে আল্লাহ্‌র কন্যা সাব্যস্ত করেছিল।

উপরোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ে ইহুদী-খ্রীষ্টান পন্ডিত ও পীর-পুরোহিতগণের কুফরী উক্তি ও আমলের বিবরণ রয়েছে। - احبار - حبر - এর এবং رهبان - راهب - এর বহুবচন। حبر ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের আলেমকে এবং راهب তাদের সংসারবিরাগীদেরকে বলা হয়।

প্রথম আয়াতে বলা হয় যে, ইহুদী-খ্রীষ্টানরা তাদের আলেম ও যাজক শ্রেণীকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে প্রতিপালক ও মাবুদ সাব্যস্ত করে রেখেছে। অনুরূপ হযরত ঈসা (আঃ)-কেও মাবুদ মনে করে। তাঁকে আল্লাহ্‌র পুত্র মনে করায় তাঁকে মাবুদ বানানোর বিষয়টি তো পরিষ্কার, তবে আলেম ও যাজক শ্রেণীকে মাবুদ সাব্যস্ত করার দোষে যে দোষী করা হয়, তার কারণ হল, তারা পরিষ্কার ভাষায় ওদের মাবুদ না বললেও পূর্ণ আনুগত্যের যে হক বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র রয়েছে, তাকে তারা যাজক শ্রেণীর জন্যে উৎসর্গ রাখে। অর্থাৎ, তারা সর্বাবস্থায় যাজক শ্রেণীর আনুগত্য করে চলে; তা আল্লাহ্-রসূলের যতই বরখেলাফ হোক না কেন? বলাবাহুল্য, পুরোহিতগণের আল্লাহ্-রসূল বিরোধী উক্তি ও আমলের আনুগত্য করা তাদেরকে মাবুদ সাব্যস্ত করার নামান্তর। আর এটি হল প্রকাশ্য কুফরী।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শরীয়তের মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ জনসাধারণের পক্ষে ওলামায়ে-কেরামের ফতোয়ার অনুসরণ বা ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের মতামতের অনুসরণ-এর সাথে অত্র আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, এঁদের অনুসরণ হল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্-রসূলেরই আনুগত্য। এর তাৎপর্য হল, ইমাম ও আলেমগণ আল্লাহ্-রসূলের আদেশ-নির্দেশকে সরাসরি বিশ্লেষণ করে তার উপর আমল করেন। আর জনসাধারণ আলেমদের জিজ্ঞেস করে— তারপর সেমতে আমল করেন। যে ওলামায়ে-কেরামের ইজতিহাদী ক্ষমতা নেই তারাও ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের পায়রবী করেন। এই পায়রবী হল কোরআনের নির্দেশক্রমে, কাজেই তা মূলতঃ আল্লাহ্‌রই পায়রবী। কোরআনে এরশাদ হয়ঃ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, তোমরা যদি আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম-আহ্‌কাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হও, তবে বিজ্ঞ আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস কর।

পক্ষান্তরে ইহুদী-খ্রীষ্টানরা আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আল্লাহ্‌র রসূলের আদেশ-নিষেধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্বার্থপর আলেম এবং অজ্ঞ পুরোহিতদের কথা ও কর্মকে যে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে, তারই নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় অত্র আয়াতে। অতঃপর বলা হয়, "এই গোমরাহী অবলম্বন করেছে বটে, কিন্তু আল্লাহ্‌র আদেশ হল একমাত্র তাঁর এবাদত করার এবং তিনি তাদের শেরেকী কার্য কলাপ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।"

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى
اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾ هُوَ
الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ
عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ
اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ
وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا
فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ
هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾
اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ
كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ
اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا
فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا
يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٦﴾

(৩২) তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন —যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। (৩৩) তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে। (৩৪) হে ঈমানদারগণ! পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহ্‌র পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। (৩৫) সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে) ,এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার। (৩৬) নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ্ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইহুদী-খ্রীষ্টানদের এহেন বাতিল পথের অনুসরণ এবং গায়রুল্লাহ্‌র অবৈধ আনুগত্যের বিবরণ দিয়ে এ আয়াতটি শেষ করা হয়। পরবর্তী আয়াতে বলা হয় যে, তারা গোমরাহী করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না বরং আল্লাহ্‌র সত্য দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করারও ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। আয়াতে উপমা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এরা মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ এটি তাদের জন্যে অসম্ভব। বরং আল্লাহ্‌র অমোঘ ফয়সালা যে, তিনি নিজের নূর তথা দ্বীন ইসলামকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, তা কাফের ও মুশরিকদের যতই মর্মপীড়ার কারণ হোক না কেন?

এরপর ৩৩ নং আয়াতের সারকথাও এটাই যে, আল্লাহ্ আপন রসূলকে হেদায়েতের উপকরণ কোরআন এবং সত্য দ্বীন-ইসলাম সহকারে এজন্যে প্রেরণ করেছেন, যাতে অপরাপর ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় সূচিত হয়। এ মর্মে আরও কতিপয় আয়াত কোরআনে রয়েছে, যাতে সকল ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

তফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ আছে যে, অন্যান্য দ্বীনের উপর দ্বীনে-ইসলামের বিজয় লাভের সুসংবাদগুলো অধিকাংশ অবস্থা ও কালানুপাতিক যেমন, হযরত মিক্‌দাদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ "এমন কোন কাঁচা ও পাকা ঘর দুনিয়ার বুকে থাকবে না, যেখানে ইসলামের প্রবেশ ঘটবে না। সম্মানীদের সম্মানের সাথে এবং লাঞ্ছিতদের লাঞ্ছনার সাথে, আল্লাহ্ যাদের সম্মানিত করবেন তারা ইসলাম কবুল করবে এবং যাদের লাঞ্ছিত করবেন তারা ইসলাম গ্রহণে বিমুখ থাকবে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রজায় পরিণত হবে।" আল্লাহ্‌র এই প্রতিশ্রুতি অচিরেই পূর্ণ হয়। যার ফলে গোটা দুনিয়ার উপর প্রায় এক হাজার বছর যাবত ইসলামের প্রভুত্ব বিস্তৃত থাকে।

চতুর্থ আয়াতে মুসলমানদের সম্বোধন করে ইহুদী-খ্রীষ্টান পীর-পুরোহিতদের এমন কুকীর্তির বর্ণনা দেয়া হয়, যা লোকসমাজে গোমরাহী প্রসারের অন্যতম কারণ। ইহুদী-খ্রীষ্টানের আলোচনায় মুসলমানদের হয়তো এ উদ্দেশে সম্বোধন করা হয় যে, তাদের অবস্থাও যেন ওদের মত না হয়। আয়াতে ইহুদী খ্রীষ্টান পীর-পুরোহিতগণের অধিকাংশ সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা গর্হিত পন্থায় লোকদের মালামাল গলাধঃকরণ করে চলছে এবং আল্লাহ্‌র সরল পথ থেকে মানুষকে নিবৃত রাখছে।

অধিকাংশ পীর-পুরোহিতগণের যেখানে এ অবস্থা, সেখানে সাধারণতঃ সমকালীন সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু কোরআন মজীদ তা না করে كثيرا (অধিকাংশ) শব্দ প্রয়োগ করেছে। এর দ্বারা মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য যে, তারা যেন শত্রুর বেলায়ও কোনরূপ বাড়াবাড়ির আশ্রয় না নেয়।

গর্হিত পন্থায় মানুষের সম্পদ ভোগের অর্থ হল, অনেক সময় তারা পয়সা নিয়ে তওরাতের শিক্ষাবিরোধী ফতোয়া দান করত। আবার কখনো তওরাতের বিধি-নিষেধকে গোপন রেখে কিংবা তাতে নানা হীলা-বাহানা সৃষ্টি করে জ্ঞানপাপীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। তাদের বড় অপরাধ হল যে, তারা নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট নয়, বরং সত্যপথ অন্বেষণকারীদের বিভ্রান্ত হওয়ারও কারণ হয়ে দাঁড়াতো। কেননা, যেখানে নেতাদের এ অবস্থা, সেখানে অনুসারীদের সত্য সন্ধানের স্পৃহাও আর বাকী থাকে না।

তাছাড়া, পীর-পুরোহিতগণের বাতিল ফতোয়ার দরুন সরল জনগণ মিথ্যাকেও সত্যরূপে বিশ্বাস করে নেয়।

ইহুদী-খ্রীষ্টান আলেম সম্প্রদায়ের মিথ্যা ফতোয়া দানের ব্যাধি সৃষ্টি হয় অর্থের লোভ-লালসা থেকে। এজন্যে আয়াতে বর্ণিত অর্থলিপ্সার করুণ পরিণতি ও কঠোর সাজা এবং এ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বর্ণিত হয়। এরশাদ হয়েছে ঃ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ "অর্থাৎ, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে, তা খরচ করে না আল্লাহ্র পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ দিন।"

"আর তা খরচ করে না আল্লাহ্র পথে" বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যারা বিধানমতে আল্লাহ্র ওয়াস্তে খরচ করে, তাদের পক্ষে তাদের অবশিষ্ট অর্থ সম্পদ ক্ষতিকর নয়। হাদীস শরীফে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ "যে মালামালের যাকাত দেয়া হয়, তা জমা রাখা সঞ্চিত ধন-রত্নের শামিল নয়।" -(আবু দাউদ, আহমদ)। এ থেকে বোঝা যায় যে, যাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা জমা রাখা গোণাহ নয়। অধিকাংশ ফকীহ ও ঈমামগণ এমতের অনুসারী।

وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا "আর তা খরচ করে না" বাক্যের 'তা' সর্বনামের উদ্দিষ্ট বস্তু হল রৌপ্য। অথচ, আয়াতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়েরই উল্লেখ রয়েছে। তফসীরে মাযহারীর মতে এ বর্ণনাভঙ্গিতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, যার অল্প পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য রয়েছে, সে যাকাত প্রদানের বেলায় স্বর্ণকে রূপার মূল্যের সাথে যোগ করে রূপার হিসাবমতে যাকাত প্রদান করবে।

শেষের আয়াতে জমাকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার যে কঠোর সাজার উল্লেখ রয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ংকৃত আমলই সে আমলের সাজা।

অর্থাৎ, যে অর্থ সম্পদ অবৈধ পন্থায় জমা করা হয়, কিংবা বৈধ পন্থায় জমা করলেও তার যাকাত আদায় করা না হয়, সে সম্পদই তার জন্য আযাবের রূপধারণ করে।

এ আয়াতে যে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার উল্লেখ রয়েছে, তার অর্থ সমগ্র শরীরও হতে পারে। কিংবা এই তিন অঙ্গের উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, যে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে খরচ করতে চায় না, তার কাছে যখন কোন ভিক্ষুক কিছু চায়, কিংবা যাকাত তলব করে, তখন সে প্রথমে ভ্রূকুঞ্চন করে, তারপর পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও সে ক্ষান্ত না হলে তাকে পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্যে বিশেষ করে এ তিন অঙ্গে আযাব দানের উল্লেখ করা হয়।

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا "নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট মাস-গণনায় মাস হল বারটি।" এখানে উল্লেখিত عدت অর্থ গণনা। شهور হল شهر -এর বহুবচন। অর্থাৎ, মাস। বাক্যের সারমর্ম হল, আল্লাহ্র কাছে মাসের সংখ্যা বারটি নির্ধারিত; এতে কম বেশী করার কারো ক্ষমতা নেই।

অতঃপর فِيْ كِتٰبِ اللهِ বলে স্পষ্ট করা হয় যে, বিষয়টি রোজে আযল অর্থাৎ, সৃষ্টির প্রথম দিনেই লওহে-মাহফুযে লিখিত রয়েছে। এরপর يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ বলে ইঙ্গিত করা হয় যে, রোজে আযলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও মাসগুলোরও ধারাবাহিকতা নির্ধারিত হয়। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি পরবর্তী মুহূর্তে।

তারপর বলা হয়- مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ অর্থাৎ, তন্মধ্যে চার মাস হল নিষিদ্ধ। সেহেতু এ চার মাস যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত হারাম। অর্থ হল, এই চারটি মাস সম্মানী, যেহেতু মাসগুলো অতীব বরকতময়। এতে এবাদতের সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। প্রথম অর্থ মতে যে হুকুম, তা ইসলামী শরীয়তে রহিত। তবে দ্বিতীয় অর্থ মতে আদব ও সম্মান প্রদর্শন এবং এবাদতে যত্নবান হওয়ার হুকুমটি ইসলামেও বাকী রয়েছে।

বিদায় হজ্বের সময় মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খোতবায় নবী করীম (সাঃ) সম্মানিত মাসগুলোকে চিহ্নিত করে বলেন, 'তিনটি মাস হল ধারাবাহিক— যিলকদ, যিলহজ্ব ও মহররম, অপরটি হল রজব। তবে রজব সম্পর্কে আরববাসীদের দ্বিমত রয়েছে। কতিপয় গোত্রের মতে রজব হল রমযান। আর মুযার গোত্রের ধারণামতে রজব হল জমাদিউস-সানী ও শা'বানের মধ্যবর্তী মাসটি। তাই নবী করীম (সাঃ) খোতবায় মুযার গোত্রের রজব বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেন।

ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ "এটিই হল সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।" অর্থাৎ, মাস-গুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ ও সম্মানিত মাসগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হুকুম-আহ্কামকে সৃষ্টির প্রথম পর্বের এলাহী নিয়মের সাথে সঙ্গতিশীল রাখাই হল দ্বীনে-মুসতাকীম। এতে কোন মানুষের কম-বেশী কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার প্রয়াস অসুস্থ বিবেক ও মন্দ স্বভাবের আলামত।

فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ "সুতরাং তোমরা এ মাসগুলোতে নিজেদের প্রতি অবিচার করো না" অর্থাৎ, এ পবিত্র মাসগুলোর যথাযথ আদব রক্ষা না করে এবং এবাদত বন্দেগীতে অলস থেকে নিজেদের ক্ষতি করো না।

ইমাম জাস্সাস (রহঃ) 'আহ্কামুল - কোরআন' গ্রন্থে বলেন, কোরআনের এ বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ মাসগুলোর এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ফলে এতে এবাদত করা হলে বাকী মাসগুলোতেও এবাদতের তওফীক ও সাহস লাভ করা যায়। অনুরূপ কেউ এ মাসগুলোতে পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারলে বছরের বাকী মাসগুলোতেও পাপাচার থেকে দূরে থাকা সহজ হয়। তাই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার থেকে বিরত থাকা হবে অপূরণীয় ক্ষতি।

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ
إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ
أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ
الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ
لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا
السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾
انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

(৩৭) এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফেরগণ গোমরাহীতে পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় একে এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ মাসগুলোর। অতঃপর হালাল করে নেয় আল্লাহ্‌র হারামকৃত মাসগুলোকে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্যে শোভনীয় করে দেয়া হল। আর আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (৩৮) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহ্‌র পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। (৩৯) যদি বের না হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মন্তদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (৪০) যদি তোমরা তাকে (রসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ্ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ্ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহ্‌র কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪১) তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আহকাম ও মাসায়েল

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাসের যে ধারাবাহিকতা এবং মাসগুলোর যে নাম ইসলামী শরীয়তে প্রচলিত, তা মানবরচিত পরিভাষা নয়; বরং রাব্বুল আলামীন যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিনই মাসের তরতীব, নাম ও বিশেষ মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহ্‌কাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে শরীয়তের আহ্‌কামের ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসই নির্ভরযোগ্য। চান্দ্রমাসের হিসাবমতেই রোযা, হজ্ব ও যাকাত প্রভৃতি আদায় করতে হয়। তবে কোরআন মজীদ চন্দ্রকে যেমন, তেমনি সূর্যকেও সন-তারিখ ঠিক করার মানদন্ডরূপে অভিহিত করেছেন— لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ (যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও কাল নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ কর)। অতএব, চন্দ্র ও সূর্য উভয়টির মাধ্যমেই সন-তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েয। তবে চন্দ্রের হিসাব আল্লাহ্‌র অধিকতর পছন্দ। তাই শরীয়তের আহ্‌কামকে চন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। এজন্যে চান্দ্র বছরের হিসাব সংরক্ষণ করা ফরযে-কেফায়া; সকল উম্মত এ হিসাব ভুলে গেলে সবাই গোনাহ্‌গার হবে। চাঁদের হিসাব ঠিক রেখে অন্যান্য সূত্রের হিসাব ব্যবহার করা জায়েয আছে। তবে তা আল্লাহ্‌র রাসূল ও পরবর্তীগণের তরীকার বরখেলাফ। সুতরাং অনাবশ্যকভাবে অন্য হিসাব নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়।

মাসের হিসাব পূর্ণ করার উদ্দেশে মূল মাস বাড়ানোর যে প্রথা আছে, এই আয়াতের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ তাকেও না-জায়েয মনে করেন। কিন্তু এই মত ঠিক নয়। কেননা, এতে শরীয়তের বিধানের কোন সম্পর্ক নেই। জাহেলী যুগে চান্দ্রমাস পরিবর্তনের ফলে শরীয়তের হুকুম পরিবর্তিত হতো বিধায় তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা যেহেতু পরিবর্তন হয় না, তাই তা উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

দুনিয়ার মোহ ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা সকল অপরাধের মূল ঃ অলসতার যে কারণ ও প্রতিকারের উপায় এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা'এক বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, দ্বীনের ব্যাপারে সকল আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা ও সকল অপরাধ এবং গোনাহের মূলে রয়েছে দুনিয়া প্রীতি ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। হাদীস শরীফে আছে – حب الدنيا رأس كل خطيئة অর্থাৎ, দুনিয়ার মোহ সকল গোনাহের মূল। সেজন্য আয়াতে বলা হয় ঃ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, আল্লাহ্‌র পথে বের হওয়ার জন্য বলা হলে তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর (চলাফেরা করতে চাও না)। আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই কি পরিতুষ্ট হয়ে গেলে।"

রোগ নির্ণয়ের পর পরবর্তী আয়াতে তার প্রতিকার উল্লেখ করা হয়েছে যে, "পার্থিব জিন্দেগীর ভোগের উপকরণ আখেরাতের তুলনায় অতি নগণ্য।"

সারকথা হল, আখেরাতের স্থায়ী জীবনের চিন্তা-ভাবনাই মানুষের করা উচিত। বস্তুতঃ আখেরাতের চিন্তা-ফিকিরই সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের সার্থক উপায়।

ইসলামী আকাদীর মৌলিক বিষয় তিনটি ঃ তওহীদ, রেসালত ও পরকালের বিশ্বাস। তন্মধ্যে পরকালের বিশ্বাস হল বিশুদ্ধ আমলের রূহ

এবং গোনাহ্‌ ও অপরাধের ক্ষেত্রে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। চিন্তা করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, দুনিয়ার শান্তি-শৃংখলা আখেরাতের আকীদা ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বস্তুবাদী উন্নতির এখন যৌবনকাল। অপরাধ দমনে সকল জাতি ও দেশের চেষ্টা-তদবীরের অন্ত নেই। আইন-আদালত ও অপরাধ দমনকারী সংস্থাসমূহের উন্নত ব্যবস্থাপনা সবই আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দৈনন্দিন বেড়েই চলছে। আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক রোগ নির্ণয় ও তার সঠিক প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না বলেই আজকের এ অস্থিরতা। বস্তুতঃ এ সকল রোগের মূলে রয়েছে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা, পার্থিব ব্যস্ততা এবং আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। আমাদের বিশ্বাস, এর একমাত্র প্রতিকার হল, আল্লাহ্‌র যিকর ও স্মরণ এবং আখেরাতের চিন্তা-ভাবনা। যে দেশে যখন এই অমোঘ প্রতিকার প্রয়োগ করা হয়, সে দেশ ও সমাজ মানবতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ফেরেশতাগণেরও ঈর্ষার পাত্র হয়েছিল। নবী ও সাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণ-যুগ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আজকের বিশ্ব অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ চায়, কিন্তু আল্লাহ্‌ ও আখেরাত থেকে উদাসীন হয়ে পদে পদে এমন ব্যবস্থাও করে রাখছে, যার ফলে আল্লাহ্‌র ও আখেরাতের প্রতি মনোযোগ আসে না। তাই এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, অপরাধ দমনের সকল উন্নত ব্যবস্থাপনাই ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। অপরাধ দমন তো দূরের কথা, ঝড়ের বেগে যেন তা' বৃদ্ধি পাচ্ছে। হায়! আজকের চিন্তাশীল মহল যদি উপরোক্ত কোরআনী প্রতিকার প্রয়োগ করে দেখত, তবে বুঝতে পারত, কত সহজে অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ সাধন করা যায়।

৩৯ নং আয়াতে অলস ও নিষ্ক্রিয় লোকদের ব্যাধি ও তার প্রতিকারের উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেয়া হয় যে, "তোমরা জেহাদে বের না হলে আল্লাহ্‌ তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন। আর দ্বীনের আমল থেকে বিরত হয়ে তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৪০ নং আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে দেয়া হয় যে, আল্লাহ্‌র রসূল কোন মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার মোহতাজ নন। আল্লাহ্‌ প্রত্যক্ষভাবে গায়ব থেকে তাঁর সাহায্য করতে সক্ষম। যেমন, হিজরতের সময় করা হয়, যখন তাঁর আপন গোত্র ও দেশবাসী তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সফরসঙ্গী হিসেবে একমাত্র সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ছাড়া আর কেউ ছিল না। পদব্রজী ও অশ্বারোহী শত্রুরা সর্বত্র তাঁর খোঁজ করে ফিরছে। অথচ আশ্রয়স্থল কোন মজবুত দুর্গ ছিল না; বরং তা ছিল এক গিরিগুহা, যার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিল তাঁর শত্রুরা। তখন গুহা-সঙ্গী আবু বকর (রাঃ)-এর চিন্তা নিজের জন্য ছিল না, বরং তিনি এই ভেবে সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন যে, হয়তো শত্রুরা তাঁর বন্ধুর জীবন নাশ করে দেবে, কিন্তু এ সময়েও রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ছিলেন পাহাড়ের মত অনড়, অটল ও নিশ্চিন্ত। শুধু যে নিজে, তা নয়, বরং সফরসঙ্গীকেও অভয় দিয়ে বলছিলেন, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ্‌ আমাদের সাথে আছেন।'' দু'শব্দের এ বাক্যটি বলা মুশকিল কিছু নয়। কিন্তু শ্রোতাবৃন্দ এ নাজুক দৃশ্য সামনে রেখে চিন্তা করলে বুঝতে দেরী হবে না যে, নিছক দুনিয়াবী উপায়-উপকরণের প্রতি ভরসা রেখে মনের এই নিশ্চিন্তভাব সম্ভব নয়। তবুও যে সম্ভব হল, আয়াতের পরবর্তী বাক্যে তার রহস্য বলে দেয়া হল। এরশাদ হয় ঃ 'আল্লাহ্‌ তাঁর কলব মোবারকে সান্ত্বনা নাযিল করেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তাঁর সাহায্য করেন, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।'' অদৃশ্য বাহিনী বলতে ফেরেশতাগণও হতে পারেন এবং জগতের গোপন শক্তিসমূহও হতে পারে। কারণ, এগুলোও আল্লাহ্‌র সৈন্যদল। সার কথা, এর ফলে কুফরীর পতাকা অবনমিত হয় এবং আল্লাহ্‌র ঝাণ্ডা মাথা তুলে দাঁড়ায়।

৪১ নং আয়াতে তাগিদদানের উদ্দেশে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে যে, জেহাদে বের হবার জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন তোমাদের আদেশ করেন, তখন সর্বাবস্থায় তা তোমাদের জন্যে ফরয হয়ে গেল। আর এ আদেশ পালনের মাঝেই নিহিত রয়েছে তোমাদের সমুদয় কল্যাণ।

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ
وَلَٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ
لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ
أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ
الْكَاذِبِينَ ﴿٤٣﴾ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ
فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ
لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ
فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾
لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا
وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ
وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

(৪২) যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হতো, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। আর তারা এমনই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ্ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী। (৪৩) আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের। (৪৪) আল্লাহ্ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ্ সাবধানীদের ভাল জানেন। (৪৫) নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ্ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলছে। (৪৬) আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহ্র পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক। (৪৭) যদি তোমাদের সাথে তারা বের হত, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করতো না, আর অশ্ব ছুটাতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালিমদের ভালভাবেই জানেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৪২ নং আয়াতে অলসতার দরুন জেহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন লোকদের একটি ওযরকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয় যে, এ ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ্ যে শক্তি-সামর্থ্য তাদের দান করেছেন, তা, আল্লাহ্র রাহে সাধ্যমত ব্যয় করেনি। তাই তাদের অসমর্থ থাকার ওযর গ্রহণযোগ্য নয়।

গ্রহণযোগ্য ওযর ও বাহানার পার্থক্য : এ আয়াত থেকে একটি মূলনীতির সন্ধান পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রকৃত ওযর ও বাহানার মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। তাহল, সেই লোকদের ওযর প্রকৃত গ্রহণযোগ্য, যারা আদেশ পালনে প্রস্তুত, কিন্তু কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে পরে অসমর্থ হয়ে পড়ে। মাযুরগণের সকল বিষয় এ নিরিখে যাচাই করা যাবে, কিন্তু আদেশ পালনে যার কোন কোন ইচ্ছা ও প্রস্তুতি নেই, পরে তার যদি কোন ওযরও উপস্থিত হয়, তবে গোনাহের এ ওযর হবে গোনাহের চাইতে নিকৃষ্ট। সুতরাং এ ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ জুমআ'র নামাযে শরীক হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র চলার ইচ্ছা করল, হঠাৎ এক ঘটনায় তার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। এ ধরনের ওযর গ্রহণযোগ্য এবং এতে আল্লাহ্ মা'যুর লোকের পূর্ণ সাওয়াব দান করেন। কিন্তু যে জুমআ'র কোন প্রস্তুতিই নেয়নি, তার কোন ওযর উপস্থিত হলে তা'হবে বাহানার নামান্তর।

উদাহরণতঃ দেখা যায়, ভোরে ফজরের জামাআতে শরীক হওয়ার প্রস্তুতিস্বরূপ ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখে, কিংবা সময়মত জাগাবার জন্য কাউকে নিয়োজিত রাখে, কিন্তু পরে দেখা যায়, ঘটনাচক্রে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ। ফলে নামায কাযা হয়ে যায়। যেমন, রসূলে করীম (সাঃ)-এর লায়লাতুত্ তা'রীসের ঘটনা। সময়মত জেগে উঠার জন্যে তিনি হযরত বেলাল (রাঃ)-কে নিয়োজিত রাখেন যেন প্রত্যুষে সবাইকে জাগিয়ে দেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকেও তন্দ্রায় পেয়ে বসে। ফলে সূর্যোদয়ের পর সকলের চোখ খোলে। এ ওযর প্রকৃত ও গ্রহণযোগ্য। যে কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবা কেরামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, لاتفريط فى النوم انما التفريط فى اليقظة অর্থাৎ, "ঘুমের মধ্যে মানুষ মা'যুর। তাই এটি হল যা মানুষ জাগ্রত অবস্থায় করে।" সান্ত্বনার কারণ হল, সময়মত জেগে উঠার সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। সারকথা এই যে, আদেশ পালনের প্রস্তুতিও ও অপ্রস্তুতির মাধ্যমে কোন ওযর গ্রহণযোগ্য কিনা তা জানা যাবে। নিছক মৌখিক জমা-খরচ দিয়ে কিছু লাভ হবে না।

৪২ নং আয়াতে মিথ্যা ওযর দেখিয়ে অব্যাহতি লাভকারী মুনাফিকদের প্রসঙ্গে বলা হয় যে, জেহাদ থেকে নিবৃত্ত থাকাই উত্তম। কারণ, ওখানে গেলে নানা ষড়যন্ত্র ও গুজবের মাধ্যমে সর্বত্র ফ্যাসাদ সৃষ্টি করত। অতঃপর বলা হয় وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে আছে এমন এক সরল প্রাণ মুসলমান যারা তাদের মিথ্যা গুজবে বিভ্রান্ত হত।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتّٰى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكٰفِرِينَ ﴿٤٩﴾ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلٰوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كٰرِهُونَ ﴿٥٤﴾

(৪৮) তারা পূর্বে থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যসমূহ উলট-পালট করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিশ্রুতি এসে গেল এবং জয়ী হল আল্লাহ্‌র হুকুম, যে অবস্থায় তারা মন্দবোধ করল। (৪৯) আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শোনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে। (৫০) আপনার কোন কল্যাণ হলে তারা মন্দবোধ করে এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, আমরা পূর্ব থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং ফিরে যায় উল্লসিত মনে। (৫১) আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ্‌ আমাদের জন্য রেখেছেন ; তিনি আমাদের কার্যনির্বাহক। আল্লাহ্‌র উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত। (৫২) আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ্‌ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ। (৫৩) 'আপনি বলুন, তোমরা ইচ্ছায় অর্থ ব্যয় কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা' কখনো কবুল হবে না, তোমরা নাফরমানের দল। (৫৪) তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সঙ্কুচিত মনে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ, "ইতিপূর্বেও তারা ফাসাদ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল।" যেমন, ওহুদ যুদ্ধ প্রভৃতিতে। وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُونَ অর্থাৎ, "আল্লাহ্‌র বিজয় হল, যাতে মুনাফিকরা মর্মপীড়া বোধ করছিল।" এর দ্বারা ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, জয়-বিজয় সবই আল্লাহ্‌র আয়ত্তে। যেমন ইতিপূর্বের যুদ্ধসমূহে আপনাকে জয়ী করা হয়েছে, তেমনি এ যুদ্ধেও জয়ী হবেন এবং মুনাফিকদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে পড়বে।

ষষ্ঠ আয়াতে জদ বিন কায়স নামক জনৈক বিশিষ্ট মুনাফিকের এক বিশেষ বাহানার উল্লেখ করে তার গোমরাহীর বর্ণনা দেয়া হয়। সে জেহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে ওযর পেশ করে বলেছিল, আমি এক পৌরুষদীপ্ত যুবক। রোমানদের সাথে যুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাদের সুন্দরী যুবতীদের মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। কোরআন মজীদ তার কথার উত্তরে বলে : أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا "ভাল করে শোন" এই নির্বোধ এক সম্ভাব্য আশংকার বাহানা করে এক নিশ্চিত আশংকা অর্থাৎ, রসূলের অবাধ্যতা ও জেহাদ পরিত্যাগের অপরাধের এখনই দণ্ডযোগ্য হয়ে গেল।

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكٰفِرِينَ "আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে আছে"। তা থেকে নিস্তার লাভের উপায় নেই। এর এক অর্থ এই হতে পারে যে, আখেরাতে জাহান্নাম এদের ঘিরে রাখবে। দ্বিতীয় অর্থ এই হতে পারে যে, জাহান্নামে পৌছার যে সকল কারণ এদেরকে বর্তমানে ঘিরে রেখেছে, সেগুলোই এখানে জাহান্নাম নামে অভিহিত। এ অর্থ হতে বলা যায়, এরা বর্তমানেও জাহান্নামের গণ্ডির মধ্যে রয়েছে।

সপ্তম আয়াতে এদের এক হীন স্বভাবের বর্ণনা দিয়ে বলা হয় যে, এরা যদিও বাহ্যতঃ মুসলমানদের সাথে উঠাবসা রাখে, কিন্তু إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ "আপনার কোন মঙ্গল দেখলে তাদের মুখ কাল হয়ে যায়" وان تصبك مصيبة فرحوا এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে উল্লাস করে বলে যে, আমরা আগেভাগেই তা জানতাম যে, মুসলমানরা বিপদগ্রস্ত হবেই, তাই আমাদের জন্যে যা কল্যাণকর, তাই অবলম্বন করেছি।

অষ্টম আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক মহানবী (সাঃ) ও মুসলমানদেরকে মুনাফিকদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে আসল সত্যকে সদা সামনে রাখার হেদায়েত দান করেছেন। এরশাদ হয়েছে : قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا "আপনি ঐ বস্তু পূজারীদের বলে দিন যে, তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছ। এসব পার্থিব উপকরণ হল এক যবনিকাবিশেষ। এই যবনিকার অন্তরালে যে শক্তি সক্রিয় রয়েছে, তা আল্লাহ্‌রই। আমরা যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হই তা' আগেই আল্লাহ্‌ আমাদের জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহক ও সাহায্যকারী। তাই মুসলমানদের আবশ্যক তাঁর প্রতি ভালবাসা রাখা এবং পার্থিব উপায়-উপকরণকে নিছক মাধ্যম মনে করা, আর মনে করা যে, এগুলোর উপর ভাল-মন্দ নির্ভরশীল নয়।

তদবীর সহকারে তকদীরে বিশ্বাস করা কর্তব্য : বিনা তদবীরে তাওয়াক্কুল করা ভুলঃ আলোচ্য আয়াতটি তকদীর ও তাওয়াক্কুলের

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم
بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾
وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ
يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا
لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ
فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا
مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَ
رَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ
النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا
مِنكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

(৫৫) সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ্র ইচ্ছা হল এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণবিয়োগ হওয়া কুফরী অবস্থায়। (৫৬) তারা আল্লাহ্র নামে হলফ করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে। (৫৭) তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গুহা বা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলে সেদিকে পলায়ন করবে দ্রুতগতিতে। (৫৮) তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সদকা বন্টনে আপনাকে দোষারূপ করে। এর থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়। (৫৯) কতই না ভাল হত, যদি তারা সন্তুষ্ট হত আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর এবং বলত, আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, আল্লাহ্ আমাদের দেবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রসূলও, আমরা শুধু আল্লাহ্কেই কামনা করি। (৬০) "যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহ্র পথে জেহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে– এই হল আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৬১) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ নবীকে ক্লেশ দেয়, এবং বলে, এ লোকটি তো কানসর্বস্ব। আপনি বলে দিন, কান হলেও তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য, আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখে এবং বিশ্বাস রাখে মুসলমানদের কথার উপর। বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের জন্য তিনি রহ্মতবিশেষ। আর যারা আল্লাহ্র রসূলের প্রতি কুৎসা রটনা করে, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

মূল-তত্ত্বকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তকদীর ও তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্র প্রতি ভরসা) এর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে, মানুষ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে এবং বলবে যে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। বরং তার অর্থ হল, *সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বনের পর সাধ্যমত চেষ্টা ও সাহস করে যাবে।* এরপর বিষয়টিকে তকদীর ও তাওয়াক্কুলের উপর অর্পণ করবে; আর দৃষ্টি আল্লাহ্র প্রতি নিবদ্ধ রাখবে। কারণ, চেষ্টা ও তদবীরের ফলাফল দানের মালিক হলেন তিনি।

তকদীর ও তাওয়াক্কুলের বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি বিদ্যমান। ধর্ম বিরোধী কিছু লোক আদতেই তকদীর ও তাওয়াক্কুলে বিশ্বাসী নয়। তারা পার্থিব উপায়-উপকরণকেই আল্লাহ্র স্থলাভিষিক্ত করে রেখেছে। অপর দিকে কিছু মূর্খ লোক আছে, যারা নিজেদের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা চাপা দেয়ার জন্য তকদীর ও তাওয়াক্কুলের আশ্রয় নেয়। জেহাদের জন্য নবী করীম (সাঃ)-এর প্রস্তুতি, অতঃপর অত্র আয়াতের অবতরণ এ সকল বাড়াবাড়ির নিরসন করে সত্য পথ কি,তা' দেখিয়ে দিয়েছে। ফার্সী প্রবাদ আছে, তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে উটের পা বেঁধে নাও।' অর্থাৎ, দুনিয়ার উপায়-উপকরণও আল্লাহ্র নেয়ামত, এ নেয়ামতের সদ্ব্যবহার না করা হল না-শোকরী ও মূর্খতা। তবে উপায়-উপকরণকে ঠিক তাই মনে কর, ফলাফল তার অধীন নয়; বরং আল্লাহ্র হুকুমের অধীন, সে বিশ্বাস রাখবে।

শেষের আয়াতে মু'মিনদের এক বিরল শানের উল্লেখ করে তাদের বিপদে আনন্দ উপভোগকারী কাফেরদের বলা হয় যে, আমাদের যে বিপদ দেখে তোমরা এত উৎফুল্ল, তাকে আমরা বিপদই মনে করি না; বরং তা আমাদের জন্যে শান্তি ও সফলতার অন্যতম মাধ্যম। কারণ, মু'মিন আপন চেষ্টায় বিফল হলেও স্থায়ী সওয়াব ও প্রতিদান লাভের যোগ্য হয়, আর এটিই সকল সফলতার মূলকথা। তাই তারা অকৃতকার্য হলেও কৃতকার্য। তার ভাঙ্গনে রয়েছে গড়ার প্রতিশ্রুতি। এই হল هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ 'তোমরা কি আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষায় আছ?'

অপরদিকে কাফেরদের অবস্থা হল তার বিপরীত। আযাব থেকে কোন অবস্থায়ই তাদের অব্যাহতি নেই। এ জীবনেই তারা মুসলমানগণের মাধ্যমে আল্লাহ্র আযাব ভোগ করবে এবং এভাবে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনা পোহাবে। আর যদি এ দুনিয়ায় কোন প্রকারে নিষ্কৃতি পেয়েও যায়, তবে আখেরাতের আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই; তা অবশ্যই ভোগ করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا (আল্লাহ্র ইচ্ছা হল, এগুলোর দ্বারা তাদের আযাবে রাখা) বাক্যে মুনাফিকদের জন্যে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে যে আযাব বলে অভিহিত করা হয়েছে, তার কারণ হল, দুনিয়ার মোহে উন্মত্ত থাকা মানুষের জন্যে পার্থিব জীবনেও এক বড় আযাব। প্রথমে অর্থ উপার্জনের সুতীব্র কামনা, অতঃপর তা হাসিলের জন্যে নানা চেষ্টা-তদবীর, নিরন্তর দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, না দিনের আরাম, না রাতের ঘুম, না স্বাস্থ্যের হেফাযত আর না পরিবার-পরিজনের সাথে আমোদ-আহলাদের অবকাশ। অতঃপর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম দ্বারা যা কিছু অর্জিত হয়, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তাকে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বৃদ্ধি করার অবিশ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি হল এককেটি স্বতন্ত্র আযাব। এরপর যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে বা রোগ-ব্যাধির কবলে পতিত হয়, তখন যেন আকাশ

ভেঙ্গে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সবই যদি ঠিক থাকে এবং মনের চাহিদামত অর্থ-কড়ি আসতে থাকে, তখন তার নিরাপত্তার প্রয়োজনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং তখন সে চিন্তা-ফিকির তাকে মুহূর্তের জন্যও আরামে বসতে দেয় না।

পরিশেষে এ সকল অর্থ-সম্পদ যখন মৃত্যুকালে বা তার আগে হাত-ছাড়া হতে দেখে, তখন দুঃখ ও অনুশোচনার অন্ত থাকে না। বস্তুতঃ এসবই হল আযাব। অজ্ঞ মানুষ একে শান্তি ও আরামের সম্বল মনে করে। কিন্তু মনের প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি কিসে, তার সন্ধান নেয় না। তাই শান্তির এই উপকরণকেই প্রকৃত শান্তি মনে করে তা' নিয়েই দিবা-নিশি ব্যস্ত থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা দুনিয়ার জীবনে তার আরামের শত্রু এবং আখেরাতের আযাবের পটভূমি।

কাফেরদের সদকা দেয়া যায় কি? শেষের আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুনাফিকরাও সদকার অংশ পেত। কিন্তু তাদের মনমত না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে নানা আপত্তি উত্থাপন করত। এখানে যদি সদকার সাধারণ অর্থ নেয়া যায়, যে অর্থ অনুযায়ী সকল ওয়াজিব ও নফল সদ্‌কা বোঝায়, তবে কোন প্রশ্ন থাকে না। কারণ, অমুসলিমদের নফল সদ্‌কা দান ইমামগণের ঐকমত্যে জায়েয এবং তা হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। আর যদি সদ্‌কা বলতে ফরয সদকা যথা, যাকাত ও ওশর প্রভৃতি বোঝানো হয়, তবে তা থেকে মুনাফিকদেরকেও এজন্যে দেয়া হত যে, তারা নিজেদেরকে মুসলমানরূপেই প্রকাশ করত এবং কুফরীর কোন প্রকাশ্য প্রমাণও তাদের থেকে পাওয়া যায়নি। আল্লাহ্‌ বিশেষ কোন উদ্দেশে আদেশ দান করেন যে, তাদের সাথে মুসলমানদের অনুরূপ আচরণ করা হোক।—(বয়ানুল কোরআন)

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلٰوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ "তারা নামাযে আসে না, কিন্তু আলস্যভরে"— আয়াতে মুনাফিকদের দু'টি আলামত বর্ণিত হয়েছে। নামাযে আলস্য ও দান-খয়রাতে কুন্ঠাবোধ। এতে মুসলমানদের প্রতি হুঁশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে, যেন তারা মুনাফিকদের এই দু'প্রকার অভ্যাস থেকে দূরে থাকে।

সদকার ব্যয় খাতঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে সদকা সম্পর্কে মহানবী (সাঃ)-এর উপর মুনাফিকদের আপত্তির বর্ণনা ও তার জবাব দেয়া হয়েছে। মুনাফিকরা অপবাদ রটাত যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) (নাউযু-বিল্লাহ্‌) সদ্‌কা বন্টনে স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়েছেন এবং যাকে যা ইচ্ছা দিয়ে চলেছেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক সদ্‌কার ব্যয়-খাত ঠিক করে দিয়ে তাদের সন্দেহ নিরসন করেছেন এবং কারা সদ্‌কা পাওয়ার উপযুক্ত তা বাতলে দিয়েছেন। আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আল্লাহ্‌র হুকুমমতেই সদকার বিলি-বন্টন করছেন; নিজের খেয়াল-খুশীমত নয়।

হাদীস গ্রন্থ আবু দাউদ ও দারে কুত্‌নী গ্রন্থে বর্ণিত এবং হযরত যেয়াদ বিন হারেস ছদরী কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত এক হাদীস দ্বারাও এ সত্যটি প্রমাণিত হয়। রেওয়ায়েতকারী বলেন, আমি একদা রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি তাঁর গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে সৈন্যের একটি দল অচিরে প্রেরণ করবেন। আমি আরয করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ্‌! আপনি বিরত হোন, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তারা সবাই আপনার বশ্যতা স্বীকার করে এখানে হাযির হবে। অতঃপর আমি স্বগোত্রের কাছে পত্র প্রেরণ করি। পত্র পেয়ে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এর প্রেক্ষিতে হযরত (সাঃ) আমাকে বলেন, يا اخاصداء المطاع فى قومه অর্থাৎ, 'তুমি তোমার গোত্রের একান্ত প্রিয় নেতা।' আমি আরয করলাম, এতে আমার কৃতিত্বের কিছুই নেই। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তারা হেদায়েত লাভ করে মুসলমান হয়েছে। রেওয়ায়েতকারী বলেন, আমি এই বৈঠকে থাকাবস্থায়ই এক ব্যক্তি এসে হযরত (সাঃ)-এর কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। হুযুর (সাঃ) তাকে জবাব দিলেন ঃ 'সদ্‌কার ভাগ-বাটোয়ারার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ নবী বা অন্য কাউকে দেননি। বরং তিনি নিজেই সদ্‌কার আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই আট শ্রেণীর কোন একটিতে তুমি শামিল থাকলে দিতে পারি।— (কুরতুবী-পৃষ্ঠা ১৬৮, খণ্ড-১)

وَفِيٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ অর্থাৎ, ধনীদের সম্পদে রয়েছে ফকীর-বঞ্চিতদের অধিকার (সূরা যারিয়াত) এতে বলা হয়েছে যে, ধনীদের সম্পদে গরীবদের একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে; আর এ হল তাদের হক।

এ থেকে বোঝা যায় যে, ধনীরা যে দান-খয়রাত করে, তা তাদের এহ্‌সান নয়, বরং এটি গরীবদের হক, যা আদায় করা তাদের কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ এ হক আল্লাহ্‌ নিজেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেউ নিজের খেয়াল-খুশীমত তাতে কম-বেশী করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ নির্দিষ্ট হকের পরিমাণ এবং তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব রসূলের উপর সোপর্দ করেছেন। তিনিও এ কাজটিকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তা সাহাবায়ে কেরামকে মৌখিক বলেই যথেষ্ট মনে করেননি এবং এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত ফরমান লিখে হযরত ওমর ফারূক ও আমর ইবনে হাযম, (রাঃ)-কে সোপর্দ করেছেন। এতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের নেসাব এবং প্রত্যেক নেসাবে যাকাতের যে হার তা চিরদিনের জন্যে আল্লাহ্‌ তাঁর রসূলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতে কোন যুগে বা কোন দেশে কম-বেশী বা রদবদল করার অধিকার কারো নেই।

নির্ভরযোগ্য তথ্যমতে মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যাকাত ফরয হওয়ার আদেশ নাযিল হয়। তফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা মুযযাম্মিলের আয়াত فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ (' সুতরাং নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর'।) — দ্বারা তাই প্রমাণ করা হয়। কারণ, সূরাটি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় নাযিল হয়েছে। তবে বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের শুরুতে যাকাতের বিশেষ নেসাব বা বিশেষ হার নির্ধারণ করা হয়নি, বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকত, তা' মুসলমানগণ মুক্তহস্তে আল্লাহ্‌র রাহে দান করে দিতেন। হিজরতের পরে মদীনা শরীফে যাকাতের নেসাব ও হার নির্ধারণ করা হয় এবং মক্কা বিজয়ের পর সদ্‌কা ও যাকাত আদায়ের সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করা হয়।

সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ঐকমত্যে অত্র আয়াতে সেই ওয়াজিব সদ্‌কার খাতগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা মুসলমানদের জন্যে নামাযের মতই ফরয। কারণ, এ আয়াতে নির্ধারিত খাতগুলো ফরয সদ্‌কারই খাত। হাদীসমতে নফল সদ্‌কা আট খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর পরিসর আরও প্রশস্ত।

যদিও পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সাধারণ অর্থেই সদ্‌কা শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যার মধ্যে ওয়াজিব ও নফল উভয় সদকাই শামিল রয়েছে, তবে অত্র আয়াতে ইমামগণের ঐকমত্যে কেবল ফরয সদ্‌কার খাতসমূহের উল্লেখ রয়েছে। তফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ আছে যে, কোরআনে যেসব স্থানে 'সদ্‌কা' শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে নফল

সদ্‌কার কোন নিদর্শন না থাকলে ফরয সদ্‌কাই উদ্দেশ্য হবে।

আলোচ্য আয়াতের শুরুতে إِنَّمَا (কেবল) শব্দ আনা হয়। তাই শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, সদ্‌কার যে সকল খাতের বর্ণনা সামনে দেয়া হচ্ছে কেবল সে খাতগুলোতেই সকল ওয়াজিব সদ্‌কা ব্যয় করা হবে। এছাড়া অন্য কোন ভাল খাতেও ওয়াজিব সদ্‌কা ব্যয় করা যাবে না। যেমন, জেহাদের প্রস্তুতি, মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ কিংবা জনকল্যাণমূলক সংস্থা প্রভৃতি। এগুলোও যে ভাল ও আবশ্যকীয় এবং তাতে ব্যয় করা যে বড় সওয়াবের কাজ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে সকল সদ্‌কার হার নির্দিষ্ট, তা' এ সকল কাজে ব্যয় করা যাবে না।

আয়াতের দ্বিতীয় শব্দ 'সাদাকাত' হল সদ্‌কার বহুবচন। আরবী অভিধানে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সম্পদের সে অংশ ব্যয় করা হয়, তাকে সদ্‌কা বলা হয়।—(কামুস) ইমাম রাগেব (রাঃ) 'মুফরাদাতুল কোরআন' গ্রন্থে বলেন, দানকে সদ্‌কা বলা হয় এজন্যে যে, দানকারী প্রকারান্তরে দাবী করে যে, কথা ও কাজে সে সত্যবাদী এবং কোন পার্থিব স্বার্থে নয়, বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশেই তার এই দান-খয়রাত। বস্তুতঃ যে দানের সাথে দুনিয়ার স্বার্থ বা রিয়াকারী যুক্ত থাকে, কোরআন সে দানকে ব্যর্থ বলে গণ্য করেছে।

সদ্‌কা শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। নফল ও ফরয উভয় দানই এতে শামিল রয়েছে। নফলের জন্যে শব্দটির প্রচুর ব্যবহার, তেমনি ফরয সদ্‌কার ক্ষেত্রেও কোরআনের বহুস্থানে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً এবং আলোচ্য إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ আয়াত প্রভৃতি। বরং আল্লামা কুরতুবী (রহঃ)-এর তত্ত্ব মতে কোরআনে যেখানে শুধু সদ্‌কা শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে ফরয সদ্‌কা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আবার কতিপয় হাদীসে সদ্‌কা বলতে প্রত্যেক সৎকর্মকেও বোঝানো হয়েছে। যেমন, হাদীস শরীফে আছে, 'কোন মুসলমানের সাথে হৃষ্টচিত্তে সাক্ষাৎ করাও সদ্‌কা, কোন বোঝা বহনকারীর কাঁধে ভার তুলে দেয়াও সদ্‌কা। কূপ থেকে নিজের জন্যে উত্তোলিত পানির কিছু অংশ অন্যকে দান করাও সদ্‌কা।' এ হাদীসে সদ্‌কা শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের তৃতীয় শব্দ হল لِلْفُقَرَاءِ-এর শুরুতে ل('লাম') বর্ণটি উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বাক্যের অর্থ হবে, সকল সদ্‌কা সেই লোকদেরই হক, যাদের উল্লেখ পরে রয়েছে।

আটটি খাতের বিবরণ ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খাত হল যথাক্রমে ফকীর ও মিসকীনের। আসল অর্থে যদিও পার্থক্য রয়েছে। যথা, ফকীর হল যার কিছুই নেই এবং মিসকীন হল যে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। তবে যাকাতের হুকুমে সমান। মোটকথা, যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ অর্থ নেই, তাকে যাকাত দেয়া যাবে এবং সে-ও নিতে পারবে। প্রয়োজনীয় মালামালের মধ্যে থাকার ঘর, ব্যবহৃত বাসন-পেয়ালা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্র প্রভৃতি শামিল রয়েছে।

সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা বা তার মূল্য যার কাছে রয়েছে এবং সে ঋণগ্রস্ত নয়, সে-ই নেসাবের মালিক। তাকে যাকাত দেয়া ও তার পক্ষে যাকাত নেয়া জায়েয নয়। অনুরূপ, যার কাছে কিছু রূপা বা নগদ কিছু টাকা এবং কিছু স্বর্ণ আছে— সব মিলে যদি সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপার সমমূল্য হয়, তবে সেও নেসাবের মালিক ; তাকেও যাকাত দেয়া নেয়া জায়েয নয়। তবে এ হিসাবে যে নেসাবের মালিক নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবান উপার্জনক্ষম এবং একদিনের খাবার সংস্থানও যার রয়েছে, তাকে যাকাত দেয়া অবশ্য জায়েয, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি তার জন্যে জায়েয নয়। এ ধরনের লোকের পক্ষে মানুষের কাছে হাত পাতা হারাম। এব্যাপারে অনেকের অসাবধানতা রয়েছে। এ ধরনের লোকেরা হাত পেতে যা লাভ করে, তাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জাহান্নামের অঙ্গার বলে অভিহিত করেছেন।— (আবু দাউদ (রাঃ) হতে কুরতুবী)

অবশ্য সাধারণ সদ্‌কা অমুসলিমদেরকেও দেয়া যায়। রসূলে করীম (সাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)-কে ইয়ামেন প্রেরণ কালে যাকাত সম্পর্কে হেদায়েত দিয়েছিলেন যে, যাকাতের অর্থ শুধু মুসলিম ধনীদের থেকে নেয়া হবে এবং মুসলিম গরীবদেরকে দেয়া হবে। তাই যাকাতের অর্থ শুধু মুসলমান ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। যাকাত ব্যতীত অন্যান্য সদ্‌কা-খয়রাত এমনিক সদ্‌কায়ে ফিতরও অমুসলিমদের দেয়া জায়েয।—(হেদায়া)

দ্বিতীয় শর্ত নেসাবের মালিক না হওয়া। আর তা ফকীর বা মিসকীন শব্দের অর্থেই প্রকাশ পায়। কেননা, তার নিকট হয় কিছুই থাকবে না, অথবা নেসাবের পরিমাণ থেকে কম থাকবে। সুতরাং ফকীর ও মিসকীনের মধ্যে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক না হওয়ার ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। যাহোক, এই খাতের পর আরো ছয়টি খাতের বর্ণনা রয়েছে যার প্রথমটি হল "আমেলীনে সদ্‌কা" অর্থাৎ, সদ্‌কা আদায়কারী। এরা ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে লোকদের কাছ থেকে যাকাত ও ওশর প্রভৃতি আদায় করে বায়তুলমালে জমা দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে। এরা যেহেতু এ কাজে নিজেদের সময় ব্যয় করে, সেহেতু তাদের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের উপর বর্তায়। কোরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াত যাকাতের একাংশ তাদের জন্য রেখে একথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তাদের পারিশ্রমিক যাকাতের খাত থেকেই আদায় করা হবে।

এর মূল রহস্য হল এই যে, আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের থেকে যাকাত ও অপরাপর সদ্‌কা আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছেন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে। অত্র সূরার শেষের দিকে এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً "হে রসূল, আপনি তাদের মালামাল থেকে সদ্‌কা আদায় করুন।" উক্ত আয়াত মতে রসূলের অবর্তমানে তাঁর উত্তরাধিকারী খলীফা বা আমীরুল মু'মেনীনের উপর যাকাত ও সদ্‌কা আদায়ের দায়িত্ব বর্তায়। বলাবাহুল্য, সহকারী ব্যতীত আমীরের পক্ষে এ দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে ''আমেলীন'' বলতে যাকাত আদায়কারী তথা সেসব সহকারীদের কথাই বলা হয়েছে।

এ আয়াত মতে নবী করীম (সাঃ) অনেক সাহাবাকে বিভিন্ন স্থানে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং আদায়কৃত যাকাত থেকেই তাদের পারিশ্রমিক দিতেন। এ সকল সাহাবীর অনেকে ধনীও ছিলেন। হাদীস শরীফে আছে ঃ ধনীদের জন্য সদ্‌কার অর্থ হালাল নয়, তবে পাঁচ ব্যক্তির জন্য হালাল। প্রথমতঃ যে জেহাদের উদ্দেশে বের হয়েছে, কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থ তার নেই, যদিও সে স্বদেশে ধনী। দ্বিতীয়তঃ সদ্‌কা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। তৃতীয়তঃ সেই অর্থশালী ব্যক্তি, যার মজুদ অর্থের তুলনায় ঋণ অধিক। চতুর্থতঃ যে ব্যক্তি মূল্য আদায় করে গরীব-মিসকীন থেকে সদ্‌কার মালামাল ক্রয় করে। পঞ্চমতঃ যাকে গরীব লোকেরা সদ্‌কার প্রাপ্ত মাল হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করে।

সদ্কা আদায়কারীদের কি পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হবে সে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে হুকুম হল, তাদের কাজ ও পরিশ্রম অনুসারে পারিশ্রমিক দেয়া হবে। —(আহ্কামুল-কোরআনঃ জাস্সাস, কুরতুবী) তবে তাদের পারিশ্রমিক আদায়কৃত যাকাতের অর্ধাংশের বেশী দেয়া যাবে না। যাকাতের আদায়কৃত অর্থ যদি এত অল্প হয় যে, আদায়কারীদের বেতন দিয়ে তার অর্ধেকও বাকী থাকে না, তবে বেতনের হার হ্রাস করতে হবে। অর্ধেকের বেশী বেতন খাতে ব্যয় করা যাবে না।—(তফসীরে মাযহারী, যহীরিয়া)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, যাকাত তহ্বীল থেকে আদায়কারীদের যে বেতন দেয়া হয়, তা সদ্কা হিসেবে নয়, বরং পরিশ্রমের বিনিময় হিসেবেই দেয়া হয়। তাই তারা ধনী হলেও এ অর্থের উপযুক্ত এবং যাকাত থেকে তাদেরকে দেয়া জায়েয। আট প্রকারের ব্যয়খাতের মধ্যে এই একটি খাতই এমন যে, সেখানে স্বয়ং যাকাতের অর্থ পারিশ্রমিকরূপে দেয়া যায়। অথচ, যাকাত সে দানকেই বলা হয়, যা কোন বিনিময় ছাড়াই গরীবদের প্রদান করা হয়। সুতরাং কোন গরীবকে কাজের বিনিময়ে যাকাতের অর্থ দিলে যাকাত আদায় হবে না।

এখানে দু'টি প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমতঃ যাকাত আদায়কারীদেরকে কাজের বিনিময়ে কিরূপে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে? দ্বিতীয়তঃ ধনীর জন্যে যাকাতের অর্থ কিভাবে হালাল হবে? উভয় প্রশ্নের উত্তর একটিই। তা'হল এই যে, সদ্কা আদায়কারীদের আসল পরিচয় জেনে নিতে হবে। তারা আসলে গরীবদেরই উকীলস্বরূপ। বলাবাহুল্য, উকীল কিছু গ্রহণ করলে তা মক্কেলের গ্রহণ বলেই গণ্য হয়। কেউ যদি অন্য লোককে কারো কাছ থেকে কর্জ আদায়ের জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তবে কর্জের টাকা উকীলের হাতে অর্পণ করলেও যেমন ঋণী ব্যক্তি দায়িত্ব মুক্ত হয়, তেমনি গরীবদের উকীল হিসেবে আদায়কারীর মাধ্যমে সদ্কা আদায় করলেও ধনীদের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর উকীল হিসেবে সদ্কার যে অর্থ তারা সংগ্রহ করবে, গরীবরাই তার মালিক হবে। এর পর যাকাতের অর্থ থেকে আদায়কারীর যে বেতন দেয়া হয়, তা আসলে গরীবদের পক্ষ থেকেই, ধনীদের পক্ষ থেকে নয়। গরীবরা যাকাতের অর্থ যে কোন প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে। সুতরাং যাকাতের অর্থ দ্বারা তাদের উকীলদের পারিশ্রমিক দেয়ার অধিকারও তাদের থাকবে।

অতঃপর প্রশ্ন আসে যে, যাকাত আদায়কারীদেরকে তো গরীবরা উকীল নিযুক্ত করেনি, তারা কেমন করে উকীল সেজে বসল? জবাব হল যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সে দেশের সকল গরীব-মিসকীনের উকীল। কারণ, এদের ভরণ-পোষণের সমুদয় দায়িত্ব তাঁর। তিনি যাকাত আদায়ের জন্যে যাদের নিযুক্ত করেন, তারা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে গরীবদেরও উকীল সাব্যস্ত হয়।

এ থেকে বোঝা যায় যে, সদ্কা আদায়কারীদের বেতন হিসেবে যা দেয়া হয় তা' মূলতঃ যাকাতের টাকা নয়; বরং যাকাত যে গরীবদের হক, সে গরীবদের পক্ষ থেকেই তা' কাজের বিনিময় মাত্র।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান যুগে ইসলামী মাদ্রাসা এবং সে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালক বা তাদের প্রতিনিধিগণ সদ্কা ও যাকাত যে ধনীদের থেকে আদায় করেন, তারা উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নন। তাই যাকাত-সদ্কা থেকে তাদের বেতন-ভাতা আদায় করা যাবে না; বরং ভিন্ন খাত থেকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, তারা ধনীদের উকীল, গরীবদের নয়। ধনীদের পক্ষ থেকেই যাকাতের টাকা উপযুক্ত খাতে ব্যয় করার অধিকার তাদের দেয়া হয়। সুতরাং যাকাতের টাকা তাদের হস্তগত হওয়ার পর সঠিক স্থানে ব্যয় না করা পর্যন্ত দাতাদের যাকাতও আদায় হবে না।

তারা যে গরীবদের উকীল নয়, তা সুস্পষ্ট। কারণ, কোন গরীব তাদের উকীল নিযুক্ত করেননি এবং আমীরুল মুমেনীনের প্রতিনিধিত্বও তারা করেন না। তাই তাদের পক্ষে ধনীদের উকীল হওয়া ব্যতীত আর কোন পথ খোলা নেই। সুতরাং যাকাত খাতে ব্যয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যাকাতের টাকা তাদের হাতে থাকা ও মালিকের হাতে থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

এ ব্যাপারে সাধারণতঃ সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না। বহু প্রতিষ্ঠান যাকাতের বিস্তর টাকা সংগ্রহ করে বছরের পর বছর সিন্ধুকে তালাবদ্ধ করে রাখে। আর যাকাতদাতারা মনে করে যে, যাকাত আদায় হয়ে গেল। অথচ তাদের যাকাত আদায় হবে তখনই, যখন তা যাকাতের নির্ধারিত যে কোন একটি খাতে ব্যয়িত হবে।

অনুরূপ অনেকে বর্তমান যুগের যাকাত আদায়কারীদেরকে আমীরুল মুমেনীনের প্রতিনিধিবর্গের সাথে তুলনা করে যাকাতের অর্থ থেকে তাদের বেতন পরিশোধ করে। একান্তভাবেই এটি অজ্ঞতাপ্রসূত। দাতা ও গ্রহীতা কারো পক্ষেই তা জায়েয নয়।

এবাদতের পারিশ্রমিক গ্রহণ ঃ এখানে আরও একটি প্রশ্ন আসে। কোরআনের ইশারা-ইঙ্গিত এবং হাদীসের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, কোন এবাদতের বিনিময় ও মজুরী নেয়া হারাম। মুসনাদে আহ্মদে বর্ণিত এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ اقرءوا القرآن ولا تاكلوا به অর্থাৎ, "কোরআন পাঠ কর, কিন্তু কোরআনকে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে পরিণত করো না।" অপর হাদীসে কোরআন দ্বারা উপার্জিত বস্তুকে জাহান্নামের অংশ বলা হয়েছে। এসব হাদীসের প্রেক্ষিতে ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ একমত যে, এবাদত-বন্দেগীর পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয নয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে সদ্কা-খয়রাত আদায় করাও এবাদত ও দ্বীনের একটি সেবা। রসূলে করীম (সাঃ) একে এক প্রকারের জেহাদ বলে অভিহিত করেছেন। তাই এ এবাদতের মজুরী গ্রহণ করাও হারাম হওয়া সঙ্গত। অথচ কোরআনের আলোচ্য আয়াতটি তা স্পষ্টরূপে জায়েয করে দিয়েছে এবং যাকাতের আট খাতের মধ্যে একেও শামিল করেছে।

ইমাম কুরতুবী (রাঃ) তাঁর তফসীরে বলেন, যে এবাদত ফরযে আইন বা ওয়াজেবে আইন, তার পারিশ্রমিক নেয়া সর্বাবস্থায় হারাম। কিন্তু যে এবাদত ফরযে কেফায়াহ্, তার বিনিময় নেয়া এ আয়াত মতে জায়েয। ফরযে কেফায়াহ্ হল, যা সকল উম্মত বা শহরের সকল বাসিন্দার জন্যে ফরয, কিন্তু সকলের আদায় করা জরুরী নয়, কিছু লোক আদায় করলেই সবাই দায়িত্ব মুক্তি হয়। কিন্তু কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহগার হয়।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, "এ আয়াত মতে ইমামতি ও ওয়ায-নসীহতের পারিশ্রমিক নেয়াও জায়েয রয়েছে। কারণ, এগুলো ওয়াজেবে-আইন নয়; বরং ওয়াজেবে-কেফায়াহ্।" অনুরূপ কোরআন-হাদীস ও অপরাপর দ্বীনী এলমের তালীম ও প্রচার সকল উম্মতের জন্যেই ফরযে-কেফায়াহ্। কতিপয় লোক দায়িত্ব পালন করলে সকলেই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায়। তাই এ সকল এবাদতের বিনিময় নেয়া জায়েয।

যাকাতের চতুর্থ ব্যয়খাত হল 'মুআল্লাফাতুল কুলূব'। সাধারণতঃ তারা

তিন-চার শ্রেণীর বলে উল্লেখ করা হয়। এদের কিছু মুসলমান, কিছু অমুসলমান। মুসলমানদের মধ্যে কেউ ছিল চরম অভাবগ্রস্ত এবং নওমুসলিম, এদের চিত্তাকর্ষণের ব্যবস্থা এজন্যে নেয়া হয়, যেন তাদের ইসলামী বিশ্বাস পরিপক্ক হয়। আর কেউ ছিল ধনী, কিন্তু তাদের অন্তর তখনো ইসলামে রঞ্জিত হয়নি। আর কেউ কেউ ছিল পরিপক্ক মুসলমান, কিন্তু তার গোত্রকে এর দ্বারা হেদায়েতের পথে আনা উদ্দেশ্য ছিল। অমুসলমানদের মধ্যেও এমন অনেকে রয়েছে, যাদের শত্রুতা থেকে বাঁচার জন্যে তাদের পরিতুষ্ট রাখার প্রয়োজন ছিল। আর কেউ ছিল, যারা ওয়ায নসীহত কিংবা যুদ্ধ ও শক্তি প্রয়োগ দ্বারাও ইসলামে প্রভাবিত হচ্ছে না; বরং অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা দয়া, দান ও সদ্ব্যবহারে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। রসূলে করীম (সাঃ)-এর সমগ্র জীবনের ব্রত ছিল কুফরীর অন্ধকার থেকে আল্লাহ্‌র বন্দাদের ঈমানের আলোয় নিয়ে আসা। তাই এ ধরনের লোকদের প্রভাবিত করার জন্য যে কোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করতেন। এরা সবাই মুআল্লাফাতুন কুলূবের অন্তর্ভুক্ত এবং আলোচ্য আয়াতে এদেরকে সদ্‌কার চতুর্থ ব্যয়খাত রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, এদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদ্‌কার অংশ দেয়া হত। সাধারণ ধারণা মতে মুসলিম-অমুসলিম উভয় শ্রেণীই এতে রয়েছে। অমুসলিমদের চিত্তাকর্ষণ করা হয় ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করার জন্যে, আর নওমুসলিমদের পরিতুষ্ট করা হয় ইসলামের উপর অবিচল থাকার জন্য। জনশ্রুতি রয়েছে যে, নবী-যুগে উল্লেখিত বিশেষ কারণে এদের সদ্‌কা দান করা হত। কিন্তু হযরত (সাঃ)-এর ওফাতের পর যখন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কাফেরদের শত্রুতা থেকে বাঁচা ও নওমুসলিমদের আকীদা পোক্ত করার জন্য এ সকল পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন তিরোহিত হয়ে যায়, তখন সেই কারণ ও উদ্দেশ্য আর বাকী থাকেনি। তাই তাদের সদ্‌কা দানও বন্ধ করে দেয়া হয়। কতিপয় ফেকাহবিদ এ অবস্থার প্রেক্ষিতে হুকুমটি রহিত বলে মন্তব্য করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত হাসান বসরী, শা'বী, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহঃ)।

তবে অপরাপর ইমাম ও ফেকাহবিদগণের মতে হুকুমটি রহিত নয়; বরং হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যুগে প্রয়োজন ছিল না বলে তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় প্রয়োজন দেখা দিলে এই শ্রেণীর লোকদিগকে যাকাতের অংশ দেয়া যাবে। এ মতের অনুসারী হলেন ইমাম যুহরী, কাযী আবদুল ওহাব ইবনে আরবী, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)।

প্রকৃত সত্য কথা হল এই যে, কোন যুগেই সদকা প্রভৃতি থেকে অমুসলিমদের অংশ দেয়া হয়নি এবং তারা যাকাতের চতুর্থ ব্যয়খাত— 'মুআল্লাফাতুলকুলূবে' শামিল ছিল না।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) স্বীয় তফসীর গ্রন্থে রসূলে করীম (সাঃ) যাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদ্‌কার খাত থেকে দান করেছিলেন, সবিস্তারে তাদের নামধামসহ উল্লেখ করে বলেছেন, وبالجملة فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر অর্থাৎ, তারা ছিল মুসলমান, তাদের মধ্যে অমুসলমান বলতে কেউ ছিল না।

অনুরূপ তফসীরে মাযহারীতে আছে ঃ

لم يثبت ان النبى صلى الله عليه وسلم اعطى احدا من الكفار للايلاف شيئامن الزكوٰة অর্থাৎ, কোন রেওয়ায়েত থেকে একথা প্রমাণিত নেই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কাফেরদের চিত্তাকর্ষণের জন্য যাকাতের অংশ দিয়েছিলেন। এ কথার সমর্থনে তফসীরে কাশ্শাফের একটি উক্তি পেশ করা যায়। তাতে উল্লেখ আছে যে, "কোরআনে এ স্থানে যাকাতের ব্যয়খাতের বর্ণনার উদ্দেশ্য হল কাফের-মুনাফেকদের অপবাদ খন্ডন করা যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সদকার অংশ থেকে তাদের বঞ্চিত করেছেন। আয়াতে এই ব্যয়-খাতসমূহের বিবরণ দিয়ে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, সদকায় কাফেরদের কোন অধিকার নেই। মুআল্লাফাতুল কুলূবে কাফেরগণ শামিল থাকলে একথা বলার প্রয়োজন ছিল না।"

তফসীরে মাযহারীতে সে ভ্রমটিকেও অত্যন্ত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে; যা কোন কোন হাদীসের রেওয়ায়েতের দরুন মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে। সেসব রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন কোন অমুসলিমদেরকেও কিছু উপঢৌকন দিয়েছেন। সুতরাং সহীহ মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে সে কথা উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ্‌কে তার কাফের থাকাকালে কিছু উপঢৌকন দান করেছেন, সে সম্পর্কে ইমাম নববী (রহঃ)-এর উদ্ধৃতিক্রমে লেখা হয়েছে যে, এসব দান যাকাতের মালের মধ্য থেকে ছিল না; বরং হুনাইন যুদ্ধের গনীমতের মালের যে পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার মধ্য থেকেই দেয়া হয়েছিল। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, বায়তুলমালের এই খাত থেকে মুসলিম-অমুসলিম উভয়ের জন্য ব্যয় করা সমস্ত ফেকাহবিদগণের ঐকমত্যেই জায়েয। অতঃপর বলা হয়েছে, ইমাম বায়হাকী (রহঃ), ইবনে সাইয়্যেদুন্নাস, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ সবাই বলেছেন যে, এ দান যাকাতের মাল থেকে ছিল না, বরং গনীমতের পঞ্চমাংশ থেকে ছিল।

এ পর্যন্ত সদ্‌কার আটটি ব্যয়ক্ষেত্রের চারটির বিবরণ দান করা হল। এ চারটির অধিকার 'লাম' বর্ণের আওতায় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ পরবর্তীতে যে চারটি ব্যয়খাতের আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে শিরোনাম পরিবর্তন করে 'লাম'-এর পরিবর্তে فى (ফী) ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ ইমাম যামাখ্শারী তাঁর কাশ্শাফ গ্রন্থে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, শেষের এ চারটি ব্যয়খাত প্রথম চারটি ব্যয়খাতের তুলনায় বেশী হকদার। কারণ, فى হরফটি পাত্রকে বোঝাবার জন্য বলা হয়। ফলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সদ্‌কাসমূহ সে সমস্ত লোকের মাঝে রেখে দেয়া উচিত। তাদের অধিকতর হকদার হওয়ার কারণ এই যে, প্রয়োজনীয়তা তাদেরই অধিক। কেননা, যে লোক কারো মালিকানাধীন দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ, সে সাধারণ ফকীর-মিসকীনদের তুলনায় অধিক কষ্টে রয়েছে। তেমনিভাবে যে লোক কারো কাছে ঋণী এবং পাওনাদাররা তার উপর তাকাদা করছে, সে সাধারণ গরীব-মিসকীন অপেক্ষা অধিক অভাবে থাকে। কারণ, নিজের দৈনন্দিন ব্যয়ভারের চাইতেও বেশী চিন্তা থাকে তার পাওনাদারদের প্রতি।

আরেকটি ব্যয়খাত হল الْغٰرِمِيْنَ যা غارم এর বহুবচন। এর অর্থ দেনাদার, ঋণী। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্যয়খাত যা فى-এর সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রাপ্যতার অধিকারে প্রথম চারটি ব্যয়খাত অপেক্ষা অগ্রগণ্য। সেজন্য গোলামকে তার মুক্তির জন্য কিংবা ঋণগ্রস্তকে তার ঋণমুক্তির জন্য দান করা সাধারণ ফকীর-মিসকীনকে দান করার চাইতে উত্তম। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, সে ঋণগ্রস্তের কাছে এ পরিমাণ সম্পদ থাকবে না, যাতে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। কারণ, অভিধানে এমন ঋণী ব্যক্তিকেই غارم (গারেম) বলা

হয়। আবার কোন কোন ইমাম এ শর্তও আরোপ করেছেন যে, সে ঋণ যেন কোন অবৈধ কাজের জন্য না করে থাকে। কোন পাপ কাজের জন্য যদি ঋণ করে থাকে—যেমন, মদ কিংবা বিয়ে-শাদীর নাজায়েয প্রথা—অনুষ্ঠান প্রভৃতি, তবে এমন ঋণগ্রস্তকে যাকাতের অর্থ থেকে দান করা যাবে না; যাতে তার পাপ কাজও অপব্যয়ে অনর্থক উৎসাহ দান করা না হয়।

فى سبيل الله এখানে আবারো فى হরফের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তফসীরে-কাশশাফে বর্ণিত রয়েছে যে, এই পুনরাবৃত্তিতে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, এ খাতটি পূর্বোল্লেখিত সব খাত অপেক্ষা উত্তম। তার কারণ এই যে, এতে দু'টি ফায়দা রয়েছে। (১) গরীব-নিঃস্বের সাহায্য এবং (২) একটি ধর্মীয় সেবায় সহায়তা করা। কারণ فى سبيل الله -এর মর্ম সেসব গাযী ও মুজাহিদ, যাদের অস্ত্র ও জেহাদের উপকরণ ক্রয় করার ক্ষমতা নেই অথবা ঐ ব্যক্তি যার উপর হজ্ব ফরয হয়ে গেছে, কিন্তু এখন আর তার কাছে এমন অর্থ নেই যাতে সে ফরয হজ্ব আদায় করতে পারে। এ দু'টি কাজই নির্ভেজাল ধর্মীয় খেদমত ও এবাদত। কাজেই যাকাতের মাল এতে ব্যয় করায় একজন নিঃস্ব লোকের সাহায্য হয় এবং একটি এবাদত আদায়ের সহযোগিতাও হয়। এমনিভাবে ফেকাহবিদগণ ছাত্রদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ, তারাও একটি এবাদত আদায় করার জন্যই এ ব্রত গ্রহণ করে থাকে।— (যাহেরিয়ার হাওয়ালায় রূহুল-মা'আনী)

বাদায়ে, প্রণেতা বলেছেন যে, এমন প্রত্যেক লোকই 'ফী-সাবীলিল্লাহ' খাতের আওতাভুক্ত যে কোন সৎকাজ কিংবা এবাদত করতে চায় যাতে অর্থের প্রয়োজন। অবশ্য এতে শর্ত এই যে, তার কাছে এমন অর্থ-সম্পদ থাকবে না যদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সে কাজটি সম্পাদন করতে পারে। যেমন, ধর্মীয় শিক্ষা ও তবলীগ এবং সে জন্য প্রচার প্রকাশনা প্রভৃতি। কোন যাকাতের হকদার লোক যদি এ কাজ করতে চায়, তবে তাকে যাকাতের মাল দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে, কিন্তু কোন মালদার লোককে তা দেয়া যায় না।

উল্লেখিত বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, এ সমস্ত অবস্থাতেই যা فى سبيل الله -এর তফসীরে বর্ণনা করা হলো দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ততার শর্তটির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কোন ধনী সাহেবে-নেসাবের কোন অংশ এতে নেই। অবশ্য যদি তার বর্তমান মালামাল তার সে প্রয়োজন মেটাতে না পারে, যা জেহাদ কিংবা হজ্বের জন্য প্রয়োজন, তবে যদিও নেসাব পরিমাণ মালামাল বর্তমান থাকার কারণে তাকে ধনী বলা যেতে পারে—যেমন এক হাদীসেও তাকে غنى (ধনী) বলা হয়েছে, কিন্তু সেও এ হিসাবে ফকীর ও অভাবগ্রস্ত বলে গণ্য হবে। যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ জেহাদ অথবা হজ্বের জন্য প্রয়োজন তা তার কাছে বর্তমান নয়। 'ফতহুল-কাদীর' গ্রন্থে শাইখ ইবনে-হুমাম (রহঃ) বলেছেন, সদকা সংক্রান্ত আয়াতসমূহে যেসব ব্যয়খাতের কথা বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটির শব্দ স্বয়ং এর প্রমাণ বহন করে যে, সে তার দৈন্য ও অভাবের ভিত্তিতেই হকদার। ফকীর ও মিসকীন শব্দে তো তা সুস্পষ্ট রয়েছেই ; রেকাব, গারেমীন, ফী-সাবীলিল্লাহ, ইবনুস্সাবীল প্রভৃতি শব্দও এরই ইঙ্গিতবহ যে, তাদের অভাব দূর করার ভিত্তিতেই তাদেরকে দান করা হয়। অবশ্য যারা عاملين (আমেলীন) যাকাত উসুলকারী— তাদেরকে দেয়া হয় তাদের সেবার বিনিময়ে। সুতরাং এতে আমীর-ফকীর সমান। যেমন, غارمين এর খাত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে লোকের উপর দশ হাজার টাকার ঋণ রয়েছে এবং পাঁচ হাজার টাকা তার কাছে রয়েছে, তাকে পাঁচ হাজার টাকার যাকাত দেয়া যেতে পারে। কারণ, যে মাল তার কাছে মওজুদ রয়েছে, তা তার ঋণের দরুন না থাকারই শামিল।

জ্ঞাতব্য : فى سبيل الله শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক। যেসব কাজ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে করা হয়, সে সবই এই ব্যাপক মর্মানুযায়ী فى سبيل الله -এর অন্তর্ভুক্ত। যেসব লোক রসূলে করীম (সাঃ)-এর ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এবং তফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের বক্তব্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থের মাধ্যমে কোরআনকে বুঝতে চায়, এখানে তাদের এ বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, তারা فى سبيل الله শব্দটি দেখেই সে সমস্ত কাজকেও যাকাতের ব্যয়-খাতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, যা কোন কোন দিক দিয়ে সৎকাজ কিংবা এবাদত বলে গণ্য। মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ, কূপ খনন, পুল ও সড়ক তৈরী করা এবং সেসব জনকল্যাণমূলক সংস্থার কর্মচারীদের বেতন ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাকে তাঁরা فى سبيل الله -এর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে যাকাতের ব্যয়খাত সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, যা একান্তই ভুল এবং সমগ্র উম্মতের ইজমার পরিপন্থী। সাহাবায়ে-কেরাম, যাঁরা কোরআনকে সরাসরি রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট অধ্যয়ন করেছেন ও বুঝেছেন, তাঁদের এবং তাবেয়ীন ইমামগণের যত রকম তফসীর এ শব্দটির ব্যাপারে উদ্ধৃত রয়েছে তাতে এ শব্দটিকে হজ্বব্রতী ও মুজাহেদীনের জন্য নির্দিষ্ট বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি তাঁর একটি উট فى سبيل الله (ফী-সাবীলিল্লাহ্) ওয়াকফ করে দিয়েছিল। তখন মহানবী (সাঃ) সে লোকটিকে বলে দেন যে, একে হাজীদের সফরের কাজে ব্যবহার করো।—(মবসূত ৩, পৃঃ - ১০)

ইমাম ইবনে জরীর, ইবনে-কাসীর প্রমুখ হাদীসের রেওয়ায়েতের দ্বারাই কোরআনের তফসীর করেন। তাঁদের সবাই فى سبيل الله শব্দকে এমন মুজাহেদীন ও হজ্বব্রতীদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, যাদের কাছে জেহাদ কিংবা হজ্ব করার উপকরণ নেই। আর যেসব ফেকাহবিদ মনীষীবৃন্দ তালেবে-এলম কিংবা অন্যান্য সৎকর্মীদিগকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁরাও এ শর্তেই তা করেছেন যে, তাদেরকে ফকীর ও অভাবগ্রস্ত হতে হবে। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, ফকীর ও অভাবগ্রস্তরা নিজেই যাকাতের সর্বপ্রথম ব্যয়খাত। এদেরকে ফী-সাবীলিল্লাহ্র অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও এরা যাকাতের হকদার ছিল। কিন্তু চার ইমাম ও উম্মতের ফেকাহ্বিদগণের কেউই একথা বলেননি যে, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণে এবং সে সমস্তের যাবতীয় প্রয়োজন যাকাতের ন্যয়খাতের অন্তর্ভুক্ত। বরং তাঁরা এ বিষয়ে ভিন্নমত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, যাকাতের মালামাল এসব বিষয়ে ব্যয় করা না জায়েয। হানাফী ফেকাহবিদ ইমামগণের মধ্যে শামসুল আয়েম্মা সারাখ্সী মবসূত দ্বিতীয় খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠায় এবং শরহে-সিয়ার চতুর্থ খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠায়, শাফেয়ী ফেকাহবিদগণের মধ্যে আবু ওবায়েদ 'কিতাবুল-আমওয়াল' গ্রন্থে, মালেকী ফেকাহবিদগণের 'দার্দেজ শরহে মুখতাসারুল খলীল' প্রথম খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠায় এবং হাম্বলী ফেকাহবিদগণের মধ্যে মুত্তাফিক মুগনী গ্রন্থে এ বিষয়টি সবিস্তারে লিখেছেন।

ابن السبيل (ইবনুস-সাবীল)। سبيل অর্থ পথ। আর ابن অর্থ মূলতঃ পুত্র হলেও আরবী পরিভাষায় اخ و اب - ابن প্রভৃতি সে সমস্ত বিষয়ের জন্যও বলা হয়, যার গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক কারো সাথে থাকে। এই পরিভাষা অনুযায়ী ابن السبيل বলা হয় পথিক ও মুসাফিরকে। কারণ, পথ অতিক্রম করা এবং গন্তব্য-স্থানের সন্ধান করার সাথে তাদের সম্পর্কও অতি নিবিড়। আর যাকাতের ব্যয়খাতের ক্ষেত্রে এমন মুসাফির বা পথিককে বুঝানোই উদ্দেশ্য; যার কাছে সফরকালে প্রয়োজনীয়

يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهٗٓ
أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا
أَنَّهٗ مَنْ يُحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ فَأَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ
خَالِدًا فِيهَا ۚ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾ يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُونَ
أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ
قُلِ اسْتَهْزِءُوا ۚ إِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَئِنْ
سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللّٰهِ
وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُولِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ
كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِنْكُمْ
نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾ اَلْمُنٰفِقُونَ
وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا
اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَ اللّٰهُ
الْمُنٰفِقِينَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ
فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٦٨﴾

(৬২) তোমাদের সামনে আল্লাহ্‌র কসম খায় যাতে তোমাদের রাযী করতে পারে। অবশ্য তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর রসূলকে রাযী করা অত্যন্ত জরুরী। (৬৩) তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ্‌র সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে যে মোকাবেলা করে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে দোযখ; তাতে সব সময় থাকবে। এটিই হল মহা-অপমান। (৬৪) মুনাফেকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না এমন কোন সূরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে। সুতরাং আপনি বলে দিন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক ; আল্লাহ্ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ। (৬৫) আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্‌র সাথে, তাঁর হুকুম-আহ্‌কামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? (৬৬) ছলনা করো না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহ্‌গার। (৬৭) মুনাফেক নর-নারী সবারই গতিবিধি এক রকম; শিক্ষায় মন্দ কথা, ভাল কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে তারা, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফেকরাই নাফরমান। (৬৮) ওয়াদা করেছেন আল্লাহ্ মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদের এবং কাফেরদের জন্যে দোযখের আগুনের- তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আজাব।

অর্থ-সম্পদ নেই, স্বদেশে তার যত অর্থ-সম্পদই থাক না কেন! এমন মুসাফিরকে যাকাতের মাল দেয়া যেতে পারে, যাতে করে সে তার সফরের প্রয়োজনাদি সমাধা করতে পারবে এবং স্বদেশে ফিরে যেতে সমর্থ হবে।

এ পর্যন্ত যাকাতের সে আটটি খাতের বিবরণ সমাপ্ত হল, যা উল্লেখিত আয়াতে সদ্‌কা ও যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। এবার এমন কিছু মাসআলা বর্ণনা করা যাচ্ছে যেগুলো একইভাবে সে সমস্ত খাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মালিকানা ঃ অধিকাংশ ফেকাহ্‌বিদ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাতের নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় করার ব্যাপারেও যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে যে, এসব খাতে কোন হকদারকে যাকাতের মালের উপর মালিকানা স্বত্ব বা অধিকার দিয়ে দিতে হবে। মালিকানা অধিকার দেয়া ছাড়া যদি কোন মাল তাদেরই উপকার কল্পে ব্যয় করা হয়, তবুও যাকাত আদায় হবে না। সে কারণেই চার ইমামসহ উম্মাহ্‌র অধিকাংশ ফেকাহবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাতের অর্থ মসজিদ-মাদ্রাসা কিংবা হাসপাতাল-এতীমখানা প্রভৃতি নির্মাণ অথবা তাদের অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করা জায়েয নয়। যদিও এসব বিষয়ের উপকারিতা সেই ফকীর-মিসকীন ও প্রাপ্ত হয়, যারা যাকাতের খাত হিসাবে গণ্য, কিন্তু তাদের মালিকানা স্বত্ব এসব বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এতে যাকাত আদায় হবে না।

অবশ্য এতীমখানাগুলোতে যদি মালিকানা স্বত্ব হিসাবে এতীমদের খাওয়া-পরা দেয়া হয়, তবে সে ব্যয়ের অনুপাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। তেমনিভাবে হাসপা তালসমূহে সেযব ওষুধ অভাবী গরীবদিগকে মালিকানা অধিকার মোতাবেক দিয়ে দেয়া হয়, তার মূল্যও যাকাতের অর্থে পরিশোধ করা যেতে পারে। এমনিভাবে উম্মাহ্‌র ফেকাহবিদগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী লা-ওয়ারিস মৃতের কাফন যাকাতের অর্থ থেকে দেয়া যেতে পারে না। কারণ, মৃতের মালিক হওয়ার যোগ্যতা থাকে না। তবে যাকাতের অর্থ যদি কোন গরীব হকদার লোককে দিয়ে দেয়া হয় এবং সে স্বেচ্ছায় সে অর্থ লা-ওয়ারিস মৃতের কাফনে ব্যয় করে, তাহলে তা জায়েয। তেমনিভাবে যদি সে মৃতর উপর ঋণ থাকে, তবে সে ঋণ সরাসরি যাকাতের অর্থের দ্বারা আদায় করা যায় না। তবে তার কোন ওয়ারিস যদি গরীব ও যাকাতের হকদার হয়, তবে তাকে মালিকানার ভিত্তিতে তা দেয়া যেতে পারে। তখন সে অর্থের মালিক হয়ে নিজের ইচ্ছায় তদ্দ্বারা মৃতের ঋণ পরিশোধ করতে পারে। এমনিভাবে জনকল্যাণমূলক যাবতীয় কাজকর্ম—যেমন, কূপ খনন, পুল নির্মাণ কিংবা সড়ক তৈরী প্রভৃতি। যদিও এসবের মাধ্যমে যাকাত পাবার যোগ্য লোকেরাও উপকৃত হয়, কিন্তু এতে তাদের মালিকানা, অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এতে যাকাত আদায় হবে না।

মালিকুল-ওলামা তাঁর 'বেদায়াহ্' গ্রন্থে যাকাত আদায় হওয়ার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার শর্তের পক্ষে দলীল দিয়েছেন যে, কোরআনে সাধারণতঃ যাকাত ও ওয়াজিব সদকার ক্ষেত্রে **ايتاء** শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ — أَقَامُوا الصَّلٰوةَ —

وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ — وَاٰتُوا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ — وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيتَاءِ الزَّكٰوةِ

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ
اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۭ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ
بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ
وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ۭ اُولٰۗىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ اَلَمْ يَاْتِهِمْ
نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ڏ وَقَوْمِ
اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ۭ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُوْنَ ۝ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ
بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰۗىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝
وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

(৬৯) যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তোমাদের চেয়ে বেশী ছিল শক্তিতে এবং ধন-সম্পদের ও সন্তান-সন্ততির অধিকারীও ছিল বেশী ; অতঃপর উপকৃত হয়েছে নিজেদের ভাগের দ্বারা। আবার তোমরা ফায়দা উঠিয়েছ তোমাদের ভাগের দ্বারা- যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীরা ফায়দা উঠিয়েছিল নিজেদের ভাগের দ্বারা। আর তোমরাও চলছ তাদেরই চলন অনুযায়ী। তারা ছিল সে লোক, যাদের আমলসমূহ নিঃশেষিত হয়ে গেছে দুনিয়া ও আখেরাতে। আর তারাই হয়েছে ক্ষতির সম্মুখীন। (৭০) তাদের সংবাদ কি এদের কানে এসে পৌছায়নি, যারা ছিল তাদের পূর্বে; নূহের আ'দের ও সামূদের সম্প্রদায় এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এবং মাদইয়ানবাসীদের? এবং সেসব জনপদের যেগুলোকে উল্টে দেয়া হয়েছিল? তাদের কাছে এসেছিলেন তাদের নবী পরিষ্কার নির্দেশ নিয়ে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তো এমন ছিলেন না যে, তাদের উপর জুলুম করতেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করতো। (৭১) আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ্ তাআলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। (৭২) আল্লাহ্ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুতঃ এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই হল মহান কৃতকার্যতা।

প্রভৃতি আর ايتاء শব্দটি অভিধানে দান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইমাম রাগেব ইসপাহানী (রহঃ) 'মুফরাদাতে-কোরআন' গ্রন্থে বলেছেন— والايتاء الاعطاء وخص وضع الصدقة فى القران بالايتاء অর্থাৎ, ঈতা' অর্থ দান করা। আর কোরআনে ওয়াজিব সদকা আদায় করাকে ঈতা শব্দের সাথে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। 'আর একথা বলাই বাহুল্য যে, কাউকে কোন কিছু দান করার মর্ম এটাই যে, তাকে সে বস্তুর মালিক বানিয়ে দেয়া হবে।

তাছাড়া যাকাত ছাড়াও ايتاء শব্দটি কোরআন করীমে মালিক বানিয়ে দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, وَاٰتُوا النِّسَاۗءَ صَدُقٰتِهِنَّ অর্থাৎ, স্ত্রীদিগকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও। আর একথা সুস্পষ্ট যে, মোহরানা পরিশোধ করা হয়েছে বলে তখনই স্বীকৃত হবে যখন, মোহরের উপর স্ত্রীর মালিকানা স্বত্ব দিয়ে দেয়া হবে।

দ্বিতীয়তঃ কোরআন করীমে যাকাতকে 'সদকা' শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۗءِ আর صدقة (সদকাহ)-এর প্রকৃত অর্থ তাই যে, কোন ফকীর-অভাবগ্রস্তকে তার মালিক বানিয়ে দেয়া হবে।

কাউকে খাবার খাইয়ে দেয়া কিংবা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে দেয়াকে প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে 'সদকা' বলা হয় না। শায়খ-ইবনে হুমাম 'ফাতহুল-কাদীর' গ্রন্থে বলেছেন, সদকার তাৎপর্যও তাই যে, কোন কাফেরকে সে মালের মালিক বানিয়ে দেয়া হবে। এমনিভাবে ইমাম জাসসাস 'আহ্কামুল-কোরআনে' বলেছেন, 'সদকা' শব্দটি হল মালিক করে দেয়ার নাম। -(জাসসাস ২য় খঃ ১৫২ পৃঃ)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ আয়াতে কাফের ও মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়ের সাথে জেহাদ করতে এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে যারা কাফের তাদের সাথে জেহাদ করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট, কিন্তু মুনাফিকদের সাথে জেহাদ করার অর্থ স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কর্মধারায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের সাথে জেহাদ করার মর্ম হল মৌখিক জেহাদ। অর্থাৎ, তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে করে তারা ইসলামের দাবীতে নিষ্ঠাবান হয়ে যেতে পারে। - (কুরতুবী, মাযহারী)

وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ - এতে غلظ এর প্রকৃত অর্থ হল এই যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যে আচরণের যোগ্য হবে তাতে কোন রকম রেয়ায়েত বা কোমলতা যেন না করা হয়। এ শব্দটি رأفت এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হল কোমলতা ও করুণা।

ইমাম কুরতুবী বলেছেন যে, এক্ষেত্রে غلظت শব্দ ব্যবহারে বাস্তব ও কার্যকর কঠোরতাই বোঝানো হয়েছে যে, তাদের উপর শরীয়তের হুকুম জারী করতে গিয়ে কোন রকম দয়া বা কোমলতা করবেন না। মুখে বা কথায় কঠোরতা প্রদর্শন করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তা নবী-রসূলগণের রীতি বিরুদ্ধ। তাঁরা কারো প্রতি কটুবাক্য কিংবা গালাগালি করতেন না। এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— "যদি তোমাদের কোন ক্রীতদাসী যিনায় লিপ্ত হয়, তবে শরীয়ত অনুযায়ী তার

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَ
مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۚ
وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا
بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ
مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا
يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ
فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٧٤﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ
اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾
فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾
فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا
اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ
الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾ اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ
فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۚ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾

(৭৩) হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে; তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল দোযখ এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা।

(৭৪) তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরী বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী হয়েছে। আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। আর এসব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে। বস্তুতঃ এরা যদি তওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্য মঙ্গল। আর যদি তা না মানে, তবে তাদেরকে আযাব দেবেন আল্লাহ্ তাআলা, বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া ও আখেরাতে। অতএব, বিশ্বচরাচরে তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী-সমর্থক নেই। (৭৫) তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যারা আল্লাহ্ তাআলার সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তিনি যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা ব্যয় করব এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব। (৭৬) অতঃপর যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করা হয়, তখন তাতে কার্পণ্য করেছে এবং কৃত ওয়াদা থেকে ফিরে গেছে তা ভেঙ্গে দিয়ে। (৭৭) তারপর এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে কপটতা স্থান করে নিয়েছে সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা লংঘণ করেছিল এবং এজন্যে যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো। (৭৮) তারা কি জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ্ তাদের রহস্য ও সলা-পরামর্শ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ্ খুব ভাল করেই জানেন সমস্ত গোপন বিষয়? (৭৯) সে সমস্ত লোক যারা ভৎর্সনা-বিদ্রূপ করে সেসব মুসলমানদের প্রতি যারা মন খুলে দান-খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া। অতঃপর তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

উপর শাস্তি প্রয়োগ কর, কিন্তু মুখে তাকে ভর্ৎসনা বা গালাগালি করো না।' – (কুরতুবী)

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন –

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ

"আপনি যদি কটুবাক্য ও কঠোরমনা হতেন, তবে আপনার কাছ থেকে মানুষ পালিয়ে যেত।" তাছাড়া স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রীতি-নীতিতেও কোথাও একথার প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, কখনো তিনি কাফের ও মুনাফিকদের সাথে কথা বলতে বা তাদের সম্বোধন করতে গিয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ -তে মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের বৈঠক-সমাবেশে কুফরী কথা বার্তা বলতে থাকে এবং তা যখন মুসলমানরা জেনে ফেলে, তখন মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে নিজেদের সূচিতা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়। ইমাম বগভী (রহঃ) এ আয়াতের শানে-নুযুল বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) গযওয়ায়ে তাবূক প্রসঙ্গে এক ভাষণ দান করেন যাতে মুনাফিকদের অশুভ পরিণতি ও দুরবস্থার কথা বলা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে জুল্লাস নামক এক মুনাফিকও ছিল। সে নিজ বৈঠকে গিয়ে বলল, মুহাম্মদ (সাঃ) যা কিছু বলেন তা যদি সত্যি হয়, তবে আমরা (মুনাফিকরা) গাধার চাইতেও নিকৃষ্ট। তার এ বাক্যটি আমের ইবনে কায়েস (রাঃ) নামক এক সাহাবী শুনে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যা কিছু বলেন নিঃসন্দেহে তা সত্য এবং তোমরা গাধা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন তাবুকের সফর থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন, তখন আমের ইবনে কায়েস (রাঃ) এ ঘটনা মহানবী (সাঃ)-কে বলেন। জুল্লাস নিজের কথা ঘুরিয়ে বলতে শুরু করে যে, আমের ইবনে কায়েস (রাঃ) আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে (আমি এমন কথা বলিনি)। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উভয়কে 'মিম্বরে-নববী'র পাশে দাঁড়িয়ে কসম খাবার নির্দেশ দেন। জুল্লাস অবলীলাক্রমে কসম খেয়ে নেয় যে, আমি এমন কথা বলিনি, আমের মিথ্যা কথা বলছে। হযরত আমের (রাঃ)-এর পালা এলে তিনিও (নিজের বক্তব্য সম্পর্কে) কসম খান এবং পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করেন যে, আয় আল্লাহ্, আপনি ওহীর মাধ্যমে স্বীয় রসূলের উপর এ ঘটনার তাৎপর্য প্রকাশ করে দিন। তাঁর প্রার্থনায় স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং সমস্ত মুসলমান 'আমীন' বললেন। অতঃপর সেখান থেকে তাঁদের সরে আসার পূর্বেই জিবরীলে-আমীন ওহী নিয়ে হাযির হন যাতে উল্লেখিত আয়াতখানি নাযিল হয়।

জুল্লাস আয়াতের পাঠ শুনে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, ইয়া রসূলাল্লাহ্, এখন আমি স্বীকার করছি যে, এ ভুলটি আমার দ্বারা হয়ে গিয়েছিল।

আমের ইবনে কায়েস (রাঃ) যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য। তবে এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তওবা করার অবকাশ দান করেছেন। কাজেই এখনই আমি আল্লাহ্ তাআলার নিকট মাগফেরাত তথা ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং সাথে সাথে তওবা করছি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর তওবা কবুল করে নেন এবং অতঃপর তিনি নিজ তওবায় অটল থাকেন। তাতে তার অবস্থাও শুধরে যায়।—(মাযহারী)

কোন কোন তফসীরবিদ মনীষী এ আয়াতের শানে-নুযূল প্রসঙ্গে এমনি ধরনের অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা করেছেন। বিশেষতঃ এজন্য যে, আয়াতে এ বাক্যটিও রয়েছে যে, وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا অর্থাৎ, তারা এমন এক কাজের চিন্তা করল, যাতে তারা কৃতকার্য হতে পারেনি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতটি এমন কোন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত যাতে মুনাফিকরা মহানবী (সাঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে কৃতকার্য হতে পারেনি। যেমন, উক্ত গযওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের বিখ্যাত ঘটনা যে, মুনাফিকদের বার জন লোক পাহাড়ী এক ঘাঁটিতে এমন উদ্দেশে লুকিয়ে বসেছিল যে, মহানবী (সাঃ) যখন এখানে এসে পৌছবেন, তখন আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এব্যাপারে হযরত জিবরীলে-আমীন তাঁকে খবর দিয়ে দিলে তিনি এ পথ থেকে সরে যান এবং এতে করে তাদের হীনচক্রান্ত ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়।

এছাড়া মুনাফিকদের দ্বারা এ ধরনের অন্যান্য ঘটনাও সংঘটিত হয়। তবে এসবের মধ্যে কোন বৈপরীত্ব কিংবা বিরোধ নেই। এ সমুদয় ঘটনাই উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ এ আয়াতটিও এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। ইবনে জরীর, ইবনে-আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া, তাবারানী ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক সা'লাবাহ্ ইবনে হাতেম আনসারী রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করল যে, হুযূর দোয়া করে দিন যাতে আমি মালদার ধনী হয়ে যাই। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমার কাছে আমার তরীকা পছন্দ নয়? সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে মদীনার পাহাড় সোনা হয়ে গিয়ে আমার সাথে সাথে ঘুরত। কিন্তু এমন ধনী হওয়া পছন্দ নয়। তখন লোকটি ফিরে গেল। কিন্তু আবার ফিরে এল এবং আবারো একই নিবেদন করল এ চুক্তির ভিত্তিতে যে, যদি আমি সম্পদপ্রাপ্ত হয়ে যাই, তবে আমি প্রত্যেক হকদারকে তার হক বা প্রাপ্য পৌছে দেব। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দোয়া করে দিলেন। যার ফল এই দাঁড়ায় যে, তার ছাগল-ভেড়ায় অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এমনকি মদীনায় বসবাসের জায়গাটি যখন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন সে বাইরে চলে যায়। তবে যোহর ও আসরের নামায মদীনায় এসে মহানবী (সাঃ)-এর সঙ্গেই আদায় করতো এবং অন্যান্য নামায সেখানেই পড়ে নিত যেখানে তার মালামাল ছিল।

অতঃপর এ সমস্ত ছাগল-ভেড়ার আরো প্রবৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে সে জায়গাটিতেও তার সংকুলান হয় না। সুতরাং মদীনা শহর থেকে আরো দূরে গিয়ে কোন একটি জায়গা নিয়ে নেয়। সেখান থেকে শুধু জুম'আর নামাযের জন্য সে মদীনায় আসত এবং অন্যান্য পাঞ্জেগানা নামাযগুলো সেখানেই পড়ে নিত। তারপর এসব মালামাল আরো বেড়ে গেলে সে জায়গাও তাকে ছাড়তে হয় এবং মদীনা থেকে বহু দূরে চলে যায়। সেখানে জুম'আ ও জামাআত সব কিছু থেকেই তাকে বঞ্চিত হতে হয়।

কিছুদিন পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লোকদের কাছে সে লোকটির অবস্থা জানতে চাইলে লোকেরা বলল যে, তার মালামাল এত বেশী বেড়ে গেছে যে, শহরের কাছাকাছি কোথাও তার সংকুলান হয় না। ফলে বহু দূরে কোথাও গিয়ে সে বসবাস করছে। এখন আর তাকে এখানে দেখা যায় না। রসূলে করীম (সাঃ) একথা শুনে তিন বার বললেন- يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ অর্থাৎ, সা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস। সা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস। সা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস।

ঘটনাক্রমে সে সময়েই সদ্কার আয়াত নাযিল হয়, যাতে রসূলে করীম (সাঃ)-কে মুসলমানদের কাছ থেকে সদ্কা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়। خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً তিনি পালিত পশুর সদকার যথাযথ আইন প্রণয়ন করিয়ে দুজন লোককে সদকা উসূলকারী বানিয়ে মুসলমানদের পালিত পশুর সদকা আদায় করার জন্য পাঠালেন এবং তাদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যেন তারা সা'লাবাহ্র কাছে যান। এছাড়া বনী সুলাইমের আরো এক লোকের কাছে যাবার হুকুমও করলেন।

এরা উভয়ে যখন সা'লাবাহ্র কাছে গিয়ে পৌছাল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর লিখিত ফরমান দেখাল, তখন সা'লাবাহ্ বলতে লাগল, এ তো 'জিযিয়া' কর হয়ে গেল, যা অ-মুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। তারপর বলল, এখন আপনারা যান, ফেরার পথে এখানে হয়ে যাবেন। এঁরা চলে গেলেন।

আর সুলাইম গোত্রের অপর লোকটি যখন মহানবী (সাঃ)-এর ফরমান শুনল, তখন নিজের পালিত পশু উট-বকরীসমূহের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল তা থেকে সদকার নেসাব অনুযায়ী সে পশু নিয়ে স্বয়ং রসূল (সাঃ)-এর সে দুই কর্মকর্তার কাছে হাযির হলেন। তাঁরা বললেন, আমাদের প্রতি যে নির্দেশ রয়েছে, পশুসমূহের মধ্যে যেটি উৎকৃষ্ট সেটি যেন না নেই। কাজেই আমরা তো এগুলো নিতে পারি না। সুলাইমী লোকটি বার বার বিনয় করে বললেন, আমি নিজের খুশীতে এগুলো দিতে চাই; আপনারা দয়া করে কবুল করে নিন।

অতঃপর এ দুই কর্মকর্তা অন্যান্য মুসলমানদের সদকা আদায় করে সা'লাবাহ্র কাছে এলে সে বলল, দাও দেখি সদকার আইনগুলো আমাকে দেখাও। তারপর তা দেখে সে কথাই বলতে লাগল যে, এ তো এক রকম জিযিয়া করই হয়ে গেল যা মুসলমানদের কাছ থেকে নেয়া উচিত নয়। যাহোক, এখন আপনারা যান,আমি পরে চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত নেব।

যখন এরা মদীনায় ফিরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলেন, তখন তিনি তাদের কুশল জিজ্ঞেস করার পূর্বে আবার সে বাক্যটিই পুনরাবৃত্তি করলেন, যা পূর্বে বলেছিলেন। يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ সা'লাবাহ্র উপর আফসোস!) কথাটি তিন তিন বার বললেন। তারপর সুলাইমীর ব্যাপারে খুশী হয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এ ঘটনারই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ অর্থাৎ, তাদের মধ্যে কোন কোন লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা করেছিল যে, আল্লাহ্ যদি তাদের ধন-সম্পদ দান করেন, তবে তারা দান-খয়রাত করবে এবং উম্মতের সৎকর্মশীলদের মত সমস্ত হকদার, আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-মিসকীনের প্রাপ্য আদায় করবে। অতঃপর যখন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদ দান করলেন, তখন কার্পণ্য করতে আরম্ভ করেছে এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যে বিমুখ হয়ে গেছে।

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তাদের অপকর্ম ও অঙ্গীকার লংঘনের ফলে তাদের অন্তরসমূহে মুনাফেকী বা কুটিলতাকে আরো পাকাপোক্ত করে বসিয়ে দেন, যাতে তাদের তওবা করার ভাগ্যও হবে না।

হযরত আবু উমামাহ্ (রাঃ)-এর বিস্তারিত রেওয়ায়েতের পর— যা এইমাত্র উল্লেখ করা হল, ইবনে জরীর লিখেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন সা'লাবাহ্র জন্য তিন তিন বার আফসোস করেন তখন সে মজলিসে সা'লাবার কতিপয় আত্মীয়-আপনজনও উপস্থিত ছিল। হুযুর (সাঃ)-এর

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۭ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً
فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۭ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ
خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ۭ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ
حَرًّا ۭ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ
جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَاۗىِٕفَةٍ
مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا
وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ۭ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ
فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓي اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ
اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰي قَبْرِهٖ ۭ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا
وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ۭ اِنَّمَا يُرِيْدُ
اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾
وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ
اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

(৮০) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তথাপি কখনোই তাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহকে এবং তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ না-ফরমানদেরকে পথ দেখান না। (৮১) পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহ্র রসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে, আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহ্র রাহে জেহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনাশক্তি থাকত। (৮২) অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশী কাঁদবে। (৮৩) বস্তুতঃ আল্লাহ্ যদি তোমাকে তাদের মধ্য থেকে কোন শ্রেণীবিশেষের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং অতঃপর তারা তোমার কাছে অভিযানে বেরোবার অনুমতি কামনা করে, তবে তুমি বলো যে, তোমরা কখনো আমার সাথে বেরোবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকা পছন্দ করেছ, কাজেই পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাক। (৮৪) আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহ্র প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রসূলের প্রতিও। বস্তুতঃ তারা না-ফরমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে। (৮৫) আর বিস্মিত হয়ো না তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দরুন। আল্লাহ্ তো এই চান যে, এ সবের কারণে তাদেরকে আযাবের ভেতরে রাখবেন দুনিয়ায় এবং তাদের প্রাণ নির্গত হওয়া পর্যন্ত যেন তারা কাফেরই থাকে। (৮৬) আর যখন নাযিল হয় কোন সূরা যে, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র উপর, তাঁর রসূলের সাথে একাত্ম হয়ে; তখন বিদায় কামনা করে তাদের সামর্থ্যবান লোকেরা এবং বলে আমাদের অব্যাহতি দিন, যাতে আমরা (নিষ্ক্রিয়ভাবে) বসে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পারি।

এ বাক্যটি শুনে তাদের মধ্য থেকে একজন সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে সা'লাবার কাছে গিয়ে পৌঁছল এবং তাকে ভৎর্সনা করে বলল, তোমার সম্পর্কে কোরআনে আয়াত নাযিল হয়ে গেছে। এ কথা সা'লাবাহ্ শুনে ঘাবড়ে গেল এবং মদীনায় হাযির হয়ে নিবেদন করল, হুযূর আমার সদ্কা কবূল করে নিন। নবী করীম (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তোমার সদ্কা কবূল করতে বারণ করে দিয়েছেন। একথা শুনে সা'লাবাহ্ নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগল।

হুযূর (সাঃ) বললেন, এটা তো তোমার নিজেরই কৃতকর্ম। আমি তোমাকে হুকুম করেছিলাম, কিন্তু তুমি তা মান্য করনি। এখন আর তোমার সদ্কা কবূল হতে পারে না। তখন সা'লাবাহ্ অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেল এবং এর কিছুদিন পরই মহানবী (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে যায়। অতঃপর হযরত আবুবকর (রাঃ) খলীফা হলে সা'লাবাহ্ সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে তার সদ্কা কবূল করার আবেদন জানাল। তিনি উত্তর দিলেন,যখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ই কবুল করেননি, তখন আমি কেমন করে কবূল করব!

তারপর হযরত সিদ্দীকে-আকবর (রাঃ)-এর ওফাতের পর সা'লাবাহ্ ফারূকে আযম (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয় এবং সে আবেদন জানায় এবং একই উত্তর পায়, যা সিদ্দীকে-আকবর (রাঃ) দিয়েছিলেন। এরপর হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফত আমলেও সে এ নিবেদন করে। কিন্তু তিনিও অস্বীকার করেন। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালেই সা'লাবার মৃত্যু হয়।- (মাযহারী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে উপর থেকেই মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে, যারা সাধারণ নির্দেশ আসার পরেও তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। আলোচ্য আয়াতগুলোতেও তাদেরই এক বিশেষ অবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং এ কারণে তাদের প্রতি আখেরাতের শাস্তি, দুনিয়াতে ভবিষ্যতের জন্য তাদের নাম মুজাহেদীনের তালিকা থেকে কেটে দেয়া এবং পরবর্তী কোন জেহাদে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে না দেয়ার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

مخلفون শব্দটি مخلف এর বহুবচন। অর্থ-'পরিত্যক্ত'। অর্থাৎ, যাকে পরিহার করা বা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরা নিজেরা একথা মনে করে আনন্দিত হচ্ছে যে, আমরা নিজেদেরকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিতে পেরেছি এবং জেহাদে শামিল হতে হয়নি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলা তাদের এহেন সম্মান পাবার যোগ্য মনে করেননি। কাজেই এরা জেহাদ 'বর্জনকারী' নয়; বরং জেহাদ থেকে 'বর্জিত'। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ই তাদেরকে বর্জনযোগ্য মনে করেছেন।

خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ এতে خلاف অর্থাৎ, 'পেছনে' বা 'পরে'। আবু ওবায়দা (রাঃ) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাতে এর মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, এরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জেহাদে চলে যাবার পর তাঁর পেছনে রয়ে যেতে পারল বলে আনন্দিত হচ্ছে যা বাস্তবিকপক্ষে আনন্দের বিষয়ই নয়। بِمَقْعَدِهِمْ শব্দটি এখানে قعود (বসে থাকা) এর ধাতুগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় অর্থে এক্ষেত্রে خلاف অর্থ مخالفت তথা বিরোধিতাও হতে পারে। অর্থাৎ, এরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর নির্দেশের বিরোধিতা করে

ঘরে বসে রইল। আর শুধু নিজেরাই বসে রইল না; বরং অন্যান্য লোকদেরকেও এ কথাই বোঝাল যে, لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ অর্থাৎ, (এমন) গরমের সময়ে জেহাদে বেরিয়ো না।

একথা পূর্বেই জানা গেছে যে, তাবুক যুদ্ধের অভিযান এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, যখন প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাদের এ কথার উত্তর দান প্রসঙ্গে বলেছেন قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا অর্থাৎ, এই হতভাগারা এ সময়ের উত্তাপ তো দেখছে এবং তা থেকে বাঁচার চিন্তা করছে। বস্তুতঃ এর ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের না-ফরমানীর দরুন যে জাহান্নামের আগুনের সম্মুখীন হতে হবে সে কথা ভাবছেই না। তাহলে কি মওসুমের এ উত্তাপ জাহান্নামের উত্তাপ অপেক্ষা বেশী? অতঃপর বলেন –

... فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا এর শাব্দিক অর্থ এই যে, 'হাসো কম, কাঁদো বেশী'। শব্দটি যদিও নির্দেশবাচক পদ আকারে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তফসীরবিদ মনীষীবৃন্দ একে সংবাদবাচক সাব্যস্ত করেছেন এবং নির্দেশবাচক পদ ব্যবহারের এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন যে, এমনি ঘটা অবধারিত ও নিশ্চিত। অর্থাৎ, নিশ্চিতই এমনটি ঘটবে যে, তাদের এ আনন্দ ও হাসি হবে অতি সাময়িক। এরপর আখেরাতে তাদেরকে চিরকাল কাঁদতে হবে। এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আবী হাতেম (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا فاذا انقطعت الدنيا وصاروا الى الله فليستأنفوا البكاء لا ينقطع ابدا "দুনিয়া সামান্য কয়েক-দিনের অবস্থানস্থল, এতে যত ইচ্ছা হেসে নাও। অতঃপর দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে, তখনই কান্নার পালা শুরু হবে যা আর নিবৃত্ত হবে না।" — (মাযহারী)

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে لَنْ تَخْرُجُوا এর মর্মার্থ এই যে, এরা যদি ভবিষ্যতে কোন জেহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান নেই, সেহেতু এদের সে ইচ্ছাও নিষ্ঠাপূর্ণ হবে না; যখন রওয়ানা হবার সময় হবে, পূর্বেকার মতই নানা রকম ছলছুতার আশ্রয় নেবে। সুতরাং মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি নির্দেশ হল যে, তারা নিজেরাও যখন কোন জেহাদে অংশগ্রহণের কথা বলবে, তখন আপনি প্রকৃত বিষয়টি তাদেরকে বাতলে দিন যে, তোমাদের কোন কথা বা কাজে বিশ্বাস নেই। তোমরা না যাবে জেহাদে, না আমার পক্ষ হয়ে ইসলামের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন যে, এ হুকুমটি তাদের জন্য পার্থিব শাস্তি হিসাবে প্রবর্তন করা হয় যে, সত্যিকারভাবে তারা কোন জেহাদে অংশগ্রহণ করতে চাইলেও যেন তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া না হয়।

গোটা উম্মতের ঐকমত্যে আলোচ্য সহীহ হাদীসসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত রয়েছে যে, আলোচ্য ৮৪ তম এ আয়াতটি মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু ও তার জানাযা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সহীহাইন (আর্থাৎ, বোখারী ও মুসলিম)-এর রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তার জানাযায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নামায পড়েন। নামায পড়ার পরই এ আয়াত নাযিল হয় এবং এরপর আর কখনো তিনি কোন মুনাফিকের জানাযার নামায পড়েননি।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এ আয়াত নাযিলের ঘটনাটি সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে। তা'হল এই যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালূল যখন মারা যায়, তখন তার পুত্র আবদুল্লাহ্ যিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ও সাহাবী ছিলেন হুযুর (সাঃ)-এর নিকট এসে নিবেদন করলেন যে, হুযুর, আপনি আপনার জামাটি দান করুন যাতে আমি তা আমার পিতার কাফনে পরাতে পারি। রসূলে করীম (সাঃ) নিজের জামা মোবারক দিয়ে দিলেন। তারপর আবদুল্লাহ্ নিবেদন করেন যে, আপনি তার জানাযার নামাযও পড়াবেন। হুযুর (সাঃ) তাও কবূল করেন। জানাযার নামাযে দাঁড়ালে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর কাপড় আকর্ষণ করে নিবেদন করলেন, আপনি এ মুনাফিকের জানাযা পড়ছেন, অথচ আল্লাহ্ আপনাকে মুসাফিকের নামায পড়তে বারণ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্ আমাকে এ ব্যাপারে এখতিয়ার দিয়েছেন—মাগফেরাতের দোয়া করব অথবা করব না। আর সে আয়াতে যাতে সত্তর বার মাগফেরাতের দোয়া করলেও ক্ষমা হবে না বলে উল্লেখ রয়েছে, তা আমি সত্তর বারের বেশীও ইস্তেগফার করতে পারি। সে আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল সূরা তওবার ঐ আয়াত যা এইমাত্র বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللهُ لَهُمْ

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার জানাযার নামায পড়েন এবং নামাযের পরেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয় وَلَا تُصَلِّ عَلٰى أَحَدٍ .... (সুতরাং এরপর কখনও তিনি কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েননি।)

উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে প্রথমতঃ প্রশ্ন উঠে এই যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এমন এক মুনাফিক ছিল যার মুনাফিকী বিভিন্ন সময়ে প্রকাশও পেয়েছিল এবং সে ছিল সব মুনাফিকের সর্দার। কাজেই এর সাথে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার করলেন কেমন করে যে, তার কাফনের জন্য নিজের পবিত্র জামা মোবারক পর্যন্ত দিয়ে দিলেন।

উত্তর এই যে, এর দু'টি কারণ থাকতে পারে ঃ (এক) তার পুত্র যিনি একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন তাঁর আবেদন। অর্থাৎ, শুধুমাত্র তাঁর মনস্তুষ্টির জন্যই তিনি এমনটি করেছিলেন। (দুই) অপর একটি কারণ এও হতে পারে, যা বুখারীর হাদীসে হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, গযওয়ায়ে বদরের সময় যখন কিছু কোরাইশ সর্দার বন্দী হয়ে আসে, তাদের মধ্যে মহানবী (সাঃ)-এর চাচা আব্বাসও ছিলেন। হুযুর (সাঃ) দেখলেন, তাঁর গায়ে কোর্তা নেই। তখন সাহাবীদিগকে বললেন, তাকে একটি কোর্তা পরিয়ে দেয়া হোক। হযরত আব্বাস ছিলেন দীর্ঘদেহী লোক। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ছাড়া অন্য কারো কোর্তা তাঁর গায়ে ঠিক মত লাগছিল না। ফলে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইর কোর্তা বা কামীস নিয়েই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের চাচা আব্বাসকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তার সে এহ্সানের বদলা হিসাবেই মহানবী (সাঃ) নিজের জামা মোবারকখানা তাকে দিয়ে দেন। (কুরতুবী)

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ এখানে আরো একটি প্রশ্ন এই যে, ফারূকে আযম (রাঃ) যে মহানবী (সাঃ)-কে বললেন যে, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে মুনাফিকদের নামায পড়তে বারণ করেছেন, তা কিসের ভিত্তিতে বলেছিলেন? কারণ, ইতিপূর্বে কোন আয়াতে পরিষ্কারভাবে তাঁকে মুনাফিকের জানাযা পড়তে বারণ করা হয়নি। এতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ওমর বারণের বিষয়টি উক্ত সূরা তওবার সাবেক আয়াত اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ ....। থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে আবারো প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ আয়াতটি যদি জানাযার নামাযের বারণের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে, তবে মহানবী (সাঃ) এতে বারণ হওয়া সাব্যস্ত করলেন না

কেন? বরং তিনি বললেন যে, এ আয়াতে আমাকে অধিকার দেয়া হয়েছে।

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে আয়াতের শব্দাবলীর বাহ্যিক মর্ম হচ্ছে এখতিয়ার দান। তাছাড়া একথাও সুস্পষ্ট যে, সত্তর বারের উল্লেখ নির্দিষ্টতা বোঝাবার জন্য নয়, বরং আধিক্য বোঝাবার জন্য। সুতরাং উক্ত আয়াতের সারমর্ম এর বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী এই হবে যে, মুনাফিকদের মাগফেরাত হবে না, যতবারই তাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন না কেন। কিন্তু এখানে পরিষ্কারভাবে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হুযুরকে বারণ করা হয়নি। কোরআন করীমের অপর এক আয়াতে যা সূরা ইয়াসীনে উক্ত হয়েছে তাতে এর উদাহরণও রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে—

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

এ আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে দ্বীনের তবলীগ ও ভীতি প্রদর্শনে বারণ করা হয়নি, বরং অন্যান্য আয়াতের দ্বারা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ তাদের জন্যও অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয় – بَلِّغْ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ অথবা إِنَّمَآ أَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ প্রভৃতি।

সারকথা এই যে, ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ আয়াতের দ্বারা তো মহানবী (সাঃ)-কে ভীতি প্রদর্শন ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছেই, তদুপরি বর্তমান আলোচ্য আয়াতে নির্দিষ্ট দলীলের মাধ্যমে ভীতি-প্রদর্শনের ধারাকে অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয়ে গেল। মহানবী (সাঃ) উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে একথা বুঝে নিতে পেরেছিলেন যে, তাদের মাগফেরাত হবে না। কিন্তু অপর কোন আয়াতের মাধ্যমে এ পর্যন্ত তাঁকে ভীতি-প্রদর্শনেও বাধা দেয়া হয়নি।

আর মহানবী (সাঃ) জানতেন যে, তার জামার কারণে কিংবা জানাযা পড়ার দরুন তার মাগফেরাত হবে না, কিন্তু এতে অন্যান্য দ্বীনী কল্যাণ সাধিত হওয়ার আশা করা যায়। এতে হয়তো তার পরিবারের লোক ও অন্যান্য কাফেররা যখন হুযুর (সাঃ)-এর এহেন সৌজন্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করবে, তখন তারাও ইসলামের নিকটবর্তী হবে এবং মুসলমান হয়ে যাবে। তাছাড়া তখনো পর্যন্ত যেহেতু (মুনাফেকের) জানাযা পড়ার সরাসরি নিষেধাজ্ঞা ছিল না, সেহেতু তিনি তার জানাযা পড়েছেন।

এ উত্তরের সমর্থন হয়তো সহীহ্ বুখারীর বাক্যেও পাওয়া যাবে, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি যদি জানতে পারতাম, সত্তর বারের বেশী দোয়া ও মাগফেরাত কামনায় তার মাগফেরাত হয়ে যাবে, তাহলে আমি তাও করতাম।— (কুরতুবী)

দ্বিতীয় প্রমাণ হল, সে হাদীস যাতে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, আমার জামা তাকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। তবে আমি এ কাজটি এ জন্য করেছি যে, আমার আশা, এ কাজের ফলে তার সম্প্রদায়ের হাজারো লোক মুসলমান হয়ে যাবে। সুতরাং মাগাযী এবং কোন কোন তফসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে যে, এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে খায্‌রাজ গোত্রের এক হাজার লোক মুসলমান হয়ে যায়।

মোটকথা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মাধ্যমে স্বয়ং হুযুর (সাঃ)- এরও এ বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, তার এ কাজের দরুন এই মুনাফেকের মাগফেরাত তথা পাপ মুক্তি হবে না, কিন্তু যেহেতু আয়াতের শব্দাবলীতে বাহ্যতঃ এই অধিকার দেয়া হয়েছিল; অন্য কোন আয়াতের মাধ্যমে নিষেধও করা হয়নি এবং যেহেতু অপর দিকে একজন কাফেরের প্রতি ইহসান করার মধ্যে পৃথিবীর কল্যাণের আশাও বিদ্যমান ছিল এবং এ ব্যবহারের দ্বারাও অন্যান্য কাফেরদের মুসলমান হওয়ার আশা ছিল, কাজেই তিনি নামায পড়াকেই অগ্রাধিকার দান করেছিলেন। আর ফারূকে আ'যম (রাঃ) বুঝেছিলেন যে, এ আয়াতের দ্বারা যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, মাগফেরাত হবে না, তখন তার জন্য নামাযে জানাযা পড়ে মাগফেরাত প্রার্থনা করাটা একটা অহেতুক কাজ, যা নবুওয়তের শানের খেলাফ। আর একেই তিনি নিষেধাজ্ঞা হিসাবে প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে রসূলে মকবুল (সাঃ) যদিও এ কাজটিকে মূলতঃ কল্যাণকর মনে করতেন না, কিন্তু অন্যান্যদের ইসলাম গ্রহণের পক্ষে সহায়ক হওয়ার প্রেক্ষিতে তা অহেতুক ছিল না। এভাবে না রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাজের উপর কোন আপত্তি থাকে, না ফারূকে আ'যম (রাঃ-এর কথায় কোন প্রশ্ন উঠতে পারে।— (বয়ানুল – কোরআন)

মাসআলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন কাফেরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশে তার সমাধিতে দাঁড়ানো কিংবা তা যেয়ারত করতে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য অথবা কোন বাধ্যবাধকতার কারণে হলে তা এর পরিপন্থী নয়। যেমন হেদায়া গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি কোন মুসলমানের কোন কাফের আত্মীয় মারা যায় এবং তার কোন ওলী-ওয়ারিস না থাকে, তবে মুসলমান আত্মীয় সুন্নত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য না করে তাকে সাধারণভাবে মাটিতে পুঁততে পারে।—(বয়ানুল – কোরআন)

উল্লেখিত আয়াতগুলোতেও সেসব মুনাফেকের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে নানা রকম ছলনার আশ্রয়ে বিরত থেকে ছিল। সেসব মুনাফেকের মাঝে কেউ কেউ সম্পদশালী লোকও ছিল। তাদের অবস্থা থেকে মুসলমানদের ধারণা হতে পারত যে, এরা যখন আল্লাহ্‌র নিকট ধিকৃত, তখন দুনিয়াতে এরা কেন এসব নেয়ামত পাবে?

এর উত্তরে ৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি লক্ষ্য করে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে, তাদের এ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন রহ্‌মত ও নেয়ামত নয়; বরং পার্থিবজীবনেও এগুলো তাদের জন্য আযাববিশেষ। আখেরাতের আযাব তো এর বাইরে আছেই। দুনিয়াতে আযাব হওয়ার ব্যাপারটি এভাবে যে, ধন-সম্পদের মহব্বত, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধির চিন্তা-ভাবনা তাদেরকে এমন কঠিনভাবে পেয়ে বসে যে, কোন সময় কোন অবস্থাতেই স্বস্তি পেতে দেয় না। আরাম-আয়েশের যত উপকরণই তাদের কাছে থাক না কেন, তাদের ভাগ্যে সে আরাম জুটে না যা মনের শান্তি ও স্বস্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে। এছাড়া দুনিয়ার এসব ধন-সম্পদ যেহেতু তাদেরকে আখেরাত সম্পর্কে গাফেল করে দিয়ে কুফর ও পাপে নিমজ্জিত করে রাখার কারণ হয়ে থাকে, সেহেতু আযাবের কারণ হিসাবেও এগুলোকে আযাব বলা যেতে পারে। এ কারণেই কোরআনের ভাষায় لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা এ সমস্ত ধন-সম্পদের মাধ্যমেই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান।

أُولُوا الطَّوْلِ শব্দটি সম্পন্ন লোকদের নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং এর দ্বারা যারা সম্পন্ন নয় অর্থাৎ, যারা অসম্পন্ন এতে তাদের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, তাদের কাছে একটা বাহ্যিক ওযরও ছিল (যার ভিত্তিতে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণে অব্যাহতি কামনা করতে পারত)।

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾ لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ
جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۫
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨٨﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٨٩﴾ وَ
جَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ
كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٠﴾ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا
عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَ
رَسُوْلِهٖ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩١﴾
وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ
مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۪ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ
حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ
يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا
مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٣﴾

(৮৭) তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের উপর। বস্তুতঃ তারা বোঝে না। (৮৮) কিন্তু রসূল এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে, তাঁর সাথে তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জান ও মালের দ্বারা। তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। (৮৯) আল্লাহ্ তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তারা তাতে বাস করবে অনন্তকাল। এটাই হল বিরাট কৃতকার্যতা। (৯০) আর ছলনাকারী বেদুঈন লোকেরা এলো, যাতে তাদের অব্যাহতি লাভ হতে পারে এবং নিবৃত্ত থাকতে পারে তাদেরই যারা আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল। এবার তাদের উপর শীগ্রই আসবে বেদনাদায়ক আযাব যারা কাফের। (৯১) দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের কোন পথ নেই। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (৯২) আর না আছে তাদের উপর যারা এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি তাদের বাহন দান কর এবং তুমি বলেছ, আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করাব তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইতেছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে। (৯৩) অভিযোগের পথ তো তাদের ব্যাপারে রয়েছে, যারা তোমার নিকট অব্যাহতি কামনা করে অথচ তারা সম্পদশালী। যারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। আর আল্লাহ্ মোহর এঁটে দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহে। বস্তুতঃ তারা জানতেও পারেনি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এসব বেদুইন যাযাবরদের মধ্যে দু'রকম লোক ছিল। (এক) যারা ছল-ছুতা পেশ করার জন্য মহানবী (সাঃ)- এর খেদমতে হাযির হয় যাতে তাদেরকে জেহাদে যাওয়ার ব্যাপারে অব্যাহতি দান করা হয়। আর কিছু লোক ছিল এমন উদ্ধত যারা অব্যাহতি লাভের তোয়াক্কা না করেই নিজ নিজ অবস্থানে নিজের মতেই বসে থাকে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন জাদ্দ ইবনে কায়েসকে জেহাদে না যাবার অনুমতি দিয়ে দেন, তখন কতিপয় মুনাফেকও খেদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু কিছু ছল-ছুতা পেশ করে জেহাদ বর্জনের অনুমতি প্রার্থনা করে। এতে তিনি অনুমতি অবশ্য দিয়ে দেন, কিন্তু একথাও বুঝতে পারেন যে, এরা মিথ্যা ওযর পেশ করছে। কাজেই তাদের ব্যাপারে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়। এতে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেয়া হয়। অবশ্য এরই সঙ্গে الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এদের মধ্যে কারো কারো ওযর কুফরী ও মুনাফেকীর কারণে ছিল না; বরং স্বভাবগত আলস্যের কারণে ছিল। এরা এই কাফেরদের আযাবের আওতাভুক্ত নয়।

বিগত আয়াতসমূহে এমনসব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল যারা প্রকৃতপক্ষে জেহাদে অংশগ্রহণে অপারগ ছিল না, কিন্তু শৈথিল্যবশতঃ অজুহাত দর্শিয়ে তা থেকে বিরত রয়েছে কিংবা এমন সব মুনাফেকরা বিরত থেকেছে, যারা নিজেদের কুফরী ও কুটিলতা হেতু নানা রকম ছলছুতার আশ্রয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিয়েছিল। তাছাড়া এতে এমন কিছু উদ্ধত লোকও ছিল যারা অজুহাত দর্শিয়েও অনুমতি গ্রহণের কোন প্রয়োজনবোধ করেনি, এমনিতেই বিরত থেকে গেছে। এদের অপারগ না হওয়া এবং তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে লিপ্ত ছিল, তাদের বেদনাদায়ক আযাব হওয়ার ব্যাপারটি বিগত আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে।

উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহে যে সমস্ত নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কথা আলোচনা করা হচ্ছে, যারা প্রকৃতই অপরাগতার দরুন জেহাদে অংশ গ্রহণে অসমর্থ ছিল। এদের মধ্যে কিছু লোক ছিল অন্ধ বা অসুস্থতার কারণে অপারগ এবং যাদের অপারগতা ছিল একান্ত সুস্পষ্ট। আর কিছু লোক ছিল যারা জেহাদে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল, বরং জেহাদে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, কিন্তু তাদের কাছে সফর করার জন্য সওয়ারীর কোন জীব ছিল না। বস্তুতঃ সফর ছিল সুদীর্ঘ এবং মওসুমটি ছিল গরমের। তারা নিজেদের জেহাদী উদ্দীপনা এবং সওয়ারীর অভাবে তাতে অংশগ্রহণে অপরাগতার কথা জানিয়ে রসূলে করীম (সাঃ) – এর নিকট আবেদন করে যে, আমাদের জন্য সওয়ারীর কোন ব্যবস্থা করা হোক।

তফসীরের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের একাধিক ঘটনার কথা লেখা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, প্রথমে রসূলে করীম (সাঃ) তাদের কাছে নিজের অপারগতা জানিয়ে দেন যে, আমাদের কাছে সওয়ারী বা যানবাহনের কোন ব্যবস্থ নেই। তাতে তারা অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ফিরে যায় এবং কেঁদেই সময় কাটাতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্য এ ব্যবস্থা করেন যে, তখনই হুযুর (সাঃ) – এর নিকট ছয়টি উট এসে যায় এবং তিনি সেগুলো তাদের দিয়ে দেন।—(মাযহারী) তাদের মধ্যে তিন

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ۚ قُلْ لَّا
تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ۚ وَ
سَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ
لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۚ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۚ
اِنَّهُمْ رِجْسٌ ۫ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٥﴾
يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ
لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٩٦﴾ اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ
نِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى
رَسُوْلِهٖ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٩٧﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ
مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ۚ عَلَيْهِمْ
دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ
يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ
عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ۚ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ
سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾

(৯৪) তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের নিকট ছল-ছুতা নিয়ে উপস্থিত হবে; তুমি বলো, ছল কারো না, আমি কখনো তোমাদের কথা শুনব না; আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। আর এখন তোমাদের কর্ম আল্লাহ্ই দেখবেন এবং তাঁর রসূল। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই গোপন ও অগোপন বিষয়ে অবগত সত্তার নিকট। তিনি-ই তোমাদের বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে। (৯৫) এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহ্র কসম খাবে, যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর- নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের ঠিকানা হলো দোযখ। (৯৬) তারা তোমার সামনে কসম খাবে যাতে তুমি তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও। অতএব, তুমি যদি রাযী হয়ে যাও তাদের প্রতি তবু আল্লাহ্ তা'আলা রাযী হবেন না, এ নাফরমান লোকদের প্রতি। (৯৭) বেদুইনরা কুফর ও মুনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা সেসব নীতি-কানুন না শেখারই যোগ্য যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলের উপর নাযিল করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সব কিছুই জানেন এবং তিনি অত্যন্ত কুশলী। (৯৮) আবার কোন কোন বেদুইন এমনও রয়েছে যারা নিজেদের ব্যয় করাকে জরিমানা বলে গণ্য করে এবং তোমার উপর কোন দুর্দিন আসে কিনা সে অপেক্ষায় থাকে। তাদেরই উপর দুর্দিন আসুক ! আর আল্লাহ্ হচ্ছেন শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। (৯৯) আর কোন কোন বেদুইন হল তারা, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্র উপর, কেয়ামত দিনের উপর এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহ্র নৈকট্য এবং রসূলের দোয়া লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনো ! তাই হল তাদের ক্ষেত্রে নৈকট্য। আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

জনের সওয়ারীর ব্যবস্থা করেন হযরত ওসমান গনী (রাঃ)। অথচ ইতিপূর্বে তিনি বিপুল পরিমাণ ব্যবস্থা নিজ খরচে করেছিলেন।

আবার অনেক এমন লোকও থেকে যায়, যাদের জন্য শেষ পর্যন্তও কোন সওয়ারীর ব্যবস্থা হয়নি এবং বাধ্য হয়ে তারা জেহাদে বিরত থাকে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে তাদের কথাই বলা হয়েছে যাদের অপরাগতা আল্লাহ্ কবুল করে নিয়েছেন। আয়াতের শেষাংশে এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, বিপদ শুধু তাদের ক্ষেত্রে যারা সামর্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও জেহাদে অনুপস্থিত থাকাকে নারীদের মত পছন্দ করে নিয়েছে। إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ - এর মর্মও তাই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব মুনাফেকের আলোচনা ছিল যারা গযওয়ায়ে তাবুকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মিথ্যা অজুহাত দর্শিয়ে জেহাদে যাওয়া থেকে অপারগতা প্রকাশ করেছিল। উপরোল্লেখিত আয়াতগুলোতে আলোচনা করা হচ্ছে সেসব লোকদের, যারা জেহাদ থেকে ফিরে আসার পর রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের জেহাদে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে মিথ্যা ওযর-আপত্তি পেশ করছিল। এ আয়াতগুলো মদীনায় তাইয়্যেবায় ফিরে আসার পূর্বেই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে পরবর্তী সময়ে সংঘটিতব্য ঘটনার সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, আপনি যখন মদীনায় ফিরে যাবেন, তখন মুনাফেকরা ওযর-আপত্তি নিয়ে আপনার নিকট আসবে। বস্তুতঃ ঘটনাও তাই ঘটে।

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে তাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তিনটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে—(এক) যখন এরা আপনার কাছে ওযর-আপত্তি পেশ করার জন্য আসে, আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, খামাখা মিথ্যা ওযর পেশ করো না। আমরা তোমাদের কথাকে সত্য বলে স্বীকার করব না। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে তোমাদের দুষ্টামী এবং তোমাদের মনের গোপন ইচ্ছা প্রভৃতি সবই বাতলে দিয়েছেন। ফলে তোমাদের মিথ্যাবাদিতা আমাদের কাছে প্রকৃষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই কোন রকম ওযর-আপত্তি বর্ণনা করা অর্থহীন। তারপর বলা হয়েছে— وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ এতে তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে, এখনও যেন তারা মুনাফেকী পরিহার করে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যায়। কারণ, এতে বলা হয়েছে যে, পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন যে, তা কি এবং কোন্ ধরনের হয়। যদি তোমরা তওবা করে নিয়ে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যাও, তবে সে অনুযায়ীই ব্যবস্থা করা হবে; তোমাদের পাপ মাফ হয়ে যাবে। অন্যথায় তা তোমাদের কোন উপরকারই সাধন করবে না।

(দুই) ৯৫ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, এসব লোক আপনার ফিরে আসার পর মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাইবে এবং তাতে তাদের উদ্দেশ্য হবে, لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ অর্থাৎ, আপনি যেন তাদের জেহাদের অনুপস্থিতির বিষয়টি উপেক্ষা করেন এবং সেজন্য যেন কোন ভর্ৎসনা না করেন। এরই প্রেক্ষিতে এরশাদ হয়েছে যে, আপনি তাদের এই বাসনা পূরণ করে দিন। فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ অর্থাৎ, আপনি তাদের বিষয় উপেক্ষা করুন। তাদের প্রতি ভৎসনাও করবেন না কিংবা তাদের সাথে উৎফুল্ল সম্পর্কও রাখবেন না। কারণ, ভর্ৎসনা করে কোন ফায়দা নেই। তাদের মনে যখন ঈমান নেই এবং তার বাসনাও নেই, তখন ভর্ৎসনা করেই

বা কি হবে। খামাখা কেন নিজের সময় নষ্ট করা।

(তিন) ৯৬ নং আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এরা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে এবং মুসলমানদেরকে রাযী করাতে চাইবে। এ ব্যাপারের আল্লাহ্ তাআলা হেদায়েত দান করেছেন যে, তাদের প্রতি রাযী হবেন না। সাথে সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, আপনি রাযী হয়ে গেলেন বলে যদি ধরেও নেয়া যায়, তবুও তাতে তাদের কোন লাভ হবে না এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি রাযী নন। তাছাড়াও তারা যখন নিজেদের কুফরী ও মুনাফেকীর উপরই অটল থাকল, তখন আল্লাহ্ তাআলা কেমন করে রাযী হবেন।

اعراب শব্দটি عرب শব্দের বহুবচন নয়; বরং এটি একটি পদ বিশেষ যা শহরের বাইরের অধিবাসীদের বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর একক করতে হলে اعرابى বলা হয়। যেমন, انصار – এর এক বচন, انصارى হয়ে থাকে।

তাদের অবস্থা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, এরা কুফরী ও মুনাফেকীর ব্যাপারে শহরবাসী অপেক্ষাও বেশী কঠোর। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এরা এলম ও আলেম তথা জ্ঞান ও জ্ঞানী লোকদের থেকে দূরে থাকার কারণে মূর্খতা, কঠোরতায় ভুগতে থাকার দরুন মনের দিক দিয়েও কঠোর হয়ে পড়ে। وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ অর্থাৎ, এসব লোকের পরিবেশই অনেকটা এমন যে, এরা আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত সীমা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। কারণ, না কোরআন তাদের সামনে আসে, না তার অর্থ-মর্ম ও বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

৯৮ নং আয়াতেও এ সমস্ত বেদুইনেরই একটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা যাকাত প্রভৃতিতে যে অর্থ ব্যয় করে, তাকে এক প্রকার জরিমানা বলে মনে করে। তার কারণ, তাদের অন্তরে তো ঈমান নেই, শুধু নিজেদের কুফরীকে লুকাবার জন্য নামাযও পড়ে নেয় এবং ফরয যাকাতও দিয়ে দেয়। কিন্তু মনে এ কালিমা থেকেই যায় যে, এ অর্থ অনর্থক খরচ হয়ে গেল। আর সেজন্য অপেক্ষায় থাকে যে, কোন রকমে মুসলমানদের উপর কোন বিপদ নেমে আসুক এবং তারা পরাজিত হয়ে যাক; তাহলেই আমাদের এহেন অর্থদণ্ড থেকে মুক্তিলাভ হবে। الدَّوَائِرَ শব্দটি دائرة –এর বহুবচন। আরবী অভিধান অনুযায়ী دائرة (দায়েরাহ্) এমন পরিবর্তনশীল অবস্থাকে বলা হয়, যাতে প্রথম ভাল অবস্থার পর মন্দে পরিণত হয়ে যায়। সেজন্যই কোরআন করীম তাদের উত্তরে বলেছে عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ অর্থাৎ, তাদেরই উপর মন্দ অবস্থা আসবে। আর এরা নিজেদের সেসব কাজ-কর্ম ও কথাবার্তার কারণে অধিকতর অপমানিত।

বেদুইন মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণনার কোরআনী বর্ণনারীতি অনুযায়ী তৃতীয় আয়াতে সেসব বেদুইনের আলোচনা সংগত মনে করা হয়েছে যারা সত্যিকার ও পাকা মুসলমান। আর তা এজন্য যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, সব বেদুইনই এক রকম নয়। তাদের মধ্যেও নিঃস্বার্থ, নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী লোক আছে। তাদের অবস্থা হল এই যে, তারা যে সদকা-যাকাত দেয়, তাকে তারা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর দোয়াপ্রাপ্তির আশায় দিয়ে থাকে।

সদকা যে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায় তা সুস্পষ্ট। তবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর দোয়া লাভের আশা এভাবে যে, কোরআন-করীমে যেখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাতের মালামাল আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, যাকাত দানকারীদের জন্য আপনি দোয়াও করতে থাকুন। যেমন, পরবর্তী এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে – خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে সদকা উসুল করার সাথে সাথে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের জন্য দোয়াও করুন। এ নির্দেশটি এসেছে صلوة শব্দের মাধ্যমে। বলা হয়েছে, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ কারণেই উল্লেখিত আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)–এর দোয়াকে صلوة শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ ﴿١٠٠﴾ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ؕ وَمِنْ
اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ؕ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۟ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ
نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠١﴾
وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ
عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠٢﴾ خُذْ
مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ
اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَ
اَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾ وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ
عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾ وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ
لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

(১০০) আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা। (১০১) আর কিছু কিছু তোমার আশ-পাশের মুনাফেক এবং কিছু লোক মদীনাবাসী কঠোর মুনাফেকীতে অনঢ়। তুমি তাদের জান না; আমি তাদের জানি। আমি তাদেরকে আযাব দান করব দু' বার, তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে মহান আযাবের দিকে। (১০২) আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ্ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১০৩) তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে। আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সবকিছুই শোনেন, জানেন। (১০৪) তারা কি একথা জানতে পারেনি যে, আল্লাহ্ নিজেই স্বীয় বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং যাকাত গ্রহণ করেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্ই তওবা কবুলকারী, করুণাময়। (১০৫) আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ্ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রসূল ও মুসলমানগণ। তাছাড়া তোমরা শীঘ্রই প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর সান্নিধ্যে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। তারপর তিনি জানিয়ে দেবেন তোমাদেরকে যা করতে। (১০৬) আবার অনেক লোক রয়েছে যাদের কাজকর্ম আল্লাহ্র নির্দেশের উপর স্থগিত রয়েছে; তিনি হয় তাদের আযাব দেবেন না হয় তাদের ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সব কিছুই জ্ঞাত, বিজ্ঞতাসম্পন্ন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ বাক্যটিতে ব্যবহৃত من অব্যয়কে অধিকাংশ তফসীরবিদগণ تبعيض - এর জন্য সাব্যস্ত করে মুহাজেরীন ও আনসারদের দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। (১) ঈমান গ্রহণে ও হিজরতে যারা অগ্রবর্তী এবং (২) অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম।

এমন করার ক্ষেত্রেও মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন মনীষী সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে سابقين اولين তাদেরকেই সাব্যস্ত করেছেন, যারা উভয় কেবলা (অর্থাৎ, বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ্) এর দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। অর্থাৎ, যারা কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে মুসলমান হয়েছেন তাঁদেরকে سابقين اولين গণ্য করেছেন। এমনটি হল সাঈদ ইবনে মূসাইয়্যেব ও কাতাদাহ্ (রাঃ)-এর। হযরত আ'তা ইবনে আবী রাবাহ্ বলেছেন যে, 'সাবেকীনে আওয়ালীন' হলেন সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম যাঁরা গযওয়ায়ে বদরে অংশগ্রহণ করেছেন। আর ইমাম শা'বী (রাঃ)-এর মতে যেসব সাহাবী হোদায়বিয়ার বাইআতে-রেদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাই 'সাবেকীনে আওয়ালীন'। বস্তুতঃ প্রতিটি মতানুযায়ী অন্যান্য সাহাবাগণ মুহাজির হোক বা আনসার-সাবেকীনে আওয়ালীনের পর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। (কুরতুবী, মাযহারী)

তফসীরে-মাযহারীতে আরো একটি মত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ আয়াতে من অব্যয়টি আংশিককে বোঝাবার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়নি; বরং বিবরণের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর মর্ম হবে এই যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম অন্যান্য সমস্ত উম্মতের তুলনায় সাবেকীনে আওয়ালীন। আর سابقين اولين হল তার বিবরণ। —'বয়ানুল-কোরআন' থেকে তফসীরের যে সার-সংক্ষেপ উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতেও এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম তফসীর অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের দু'টি শ্রেণী সাব্যস্ত হয়েছে। একটি হল সাবেকীনে আওয়ালীনের, আর দ্বিতীয়টি কেবলা পরিবর্তন কিংবা গযওয়ায়ে বদর অথবা বাইআতে রেদওয়ানের পরে যারা মুসলমান হয়েছেন তাঁদের; আর দ্বিতীয় তফসীরের মর্ম হল এই যে, সাহাবায়ে কেরামই হলেন মুসলমানদের মধ্যে সাবেকীনে আওয়ালীন। কারণ, ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাঁরাই সমগ্র উম্মতের অগ্রবর্তী ও প্রথম।

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ, যারা আমল ও চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুসলমানদের অনুসরণ করেছে পরিপূর্ণভাবে। প্রথম বাক্যের প্রথম তফসীর অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা কেবলা পরিবর্তন কিংবা গযওয়ায়ে বদর অথবা বাইআতে হোদায়বিয়ার পর মুসলমান হয়ে সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় শ্রেণী হল তাঁদের পরবর্তী সে সমস্ত মুসলমানদের, যারা কেয়ামত অবধি ঈমান গ্রহণ, সৎকর্ম ও সচ্চারিত্রিকতার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর চলবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁদের অনুসরণ করবে।

আর দ্বিতীয় তফসীর অনুযায়ী وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ বাক্যে সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলমানগণ অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে পরিভাষাগতভাবে تابعى (তাবেয়ী) বলা হয়। এরপর পরিভাষাগত এই তাবেয়ীগণের পর কেয়ামত অবধি আগত সে সমস্ত মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা ঈমান ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ
وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ
مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ
يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ
عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ
عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا
رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ
يُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ
وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

(১০৭) আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে এবং ঐ লোকের জন্য ঘাঁটিস্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক। (১০৮) তুমি কখনো সেখানে দাঁড়াবে না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ্ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। (১০৯) যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহের ভিত্তি রেখেছে কোন গর্তের কিনারায় যা ধ্বসে পড়ার নিকটবর্তী এবং অতঃপর তা ওকে নিয়ে দোযখের আগুনে পতিত হয়। আর আল্লাহ্ জালেমদের পথ দেখান না। (১১০) তাদের নির্মিত গৃহটি তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করে যাবে যে পর্যন্ত না তাদের অন্তরগুলো চৌচির হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ-প্রজ্ঞাময়।(১১১) আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র রাহে: অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহ্র চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক ? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য

সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতী ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত :

মুহাম্মদ ইবনে কা'আব কুরবী (রাঃ)-কে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ সম্পর্কে আপনি কি বলেন ? তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের সবাই জান্নাতবাসী হবেন— যদি দুনিয়াতে তাঁদের কারো দ্বারা কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েও থাকে তবুও। সে লোকটি জিজ্ঞেস করল, একথা আপনি কোত্থেকে বলছেন (এর প্রমাণ কি)? তিনি বললেন, কোরআন করীমের আয়াত পড়ে দেখ। وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ – এতে শর্তহীনভাবে সমস্ত সাহাবা সম্পর্কেই বলা হয়েছে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ অবশ্য তাবেয়ীনদের ব্যাপারে اتباع باحسان -এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের সবাই কোন রকম শর্তাশর্ত ছাড়াই আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিধন্য হবেন।

তফসীরে-মাযহারীতে এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, আমার মতে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে এর চাইতেও প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى আয়াতটি। এতে বিস্তারিতভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম প্রাথমিক পর্যায়ের হন কি পরবর্তী পর্য্যায়ের, আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের সবার জন্যই জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

তাছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক হাদীসে এরশাদ করেছেন যে, জাহান্নামের আগুন সে মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারে না, যে আমাকে দেখেছে কিংবা আমাকে যারা দেখেছে তাদেরকে দেখেছে।—(তিরমিযী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ যে দশ জন মুমিন বিনা ওজরে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত ছিলেন তাঁদের সাত জন মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নিয়ে মনের অনুতাপ-অনুশোচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এদের উল্লেখ রয়েছে وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا আয়াতে। বাকী তিন জনের হুকুম রয়েছে وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ আয়াতে, যারা প্রকাশ্যে এভাবে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেননি। রসূলে করীম (সাঃ) তাঁদের সমাজচ্যুত করার, এমনকি তাঁদের সাথে সালাম-দোয়ার আদান-প্রদান পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা নেয়ার পর তাদের অবস্থা শোধরে যায় এবং এখলাসের সাথে অপরাধ স্বীকার করে তওবা করে নেন। ফলে তাদের জন্য ক্ষমার আদেশ দেয়া হয়।– (বোখারী, মুসলিম)।

মসজিদে যেরার : মদীনায় আবু আ'মের নামের এক ব্যক্তি জাহেলী যুগে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে আবু আ'মের পাদ্রী নামে খ্যাত হলো। তার পুত্র ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত হানযালা (রাঃ) যাঁর মরদেহকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা নিজের গোমরাহী ও খ্রীষ্টবাদের উপর অবিচল ছিল।

হযরত নবী করীম (সাঃ) হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হলে আবু আ'মের তাঁর সমীপে উপস্থিত হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে। মহানবী (সাঃ) তার অভিযোগের জবাব দান করেন। কিন্তু

তাতে সেই হতভাগার সান্ত্বনা আসলো না। অধিকন্তু সে বলল, "আমরা দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন অভিশপ্ত ও আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে। সে একথাও বলল যে, আপনার যে কোন প্রতিপক্ষের সাহায্য আমি করে যাবো। সে মতে হোনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল রণাঙ্গনে সে মুসলমানদের বিপরীতে অংশ নেয়। হাওয়াযেনের মত সুবৃহৎ শক্তিশালী গোত্রও যখন মুসলমানদের কাছে পরাজিত হলো, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়ায় চলে গেল। কারণ, তখন এটি ছিল খ্রীষ্টানদের কেন্দ্রস্থল। আর সেখানে সে আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। সে যে দোয়া করেছিল, তা সে ভোগ করলো। আসলে লাঞ্ছনা ভোগ কারো অদৃষ্টে থাকলে সে এমনই করে এবং নিজের দোয়ায় নিজেই লাঞ্ছিত হয়।

তবে আজীবন সে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। সে রোম সম্রাটকে মদীনায় অভিযান চালিয়ে মুসলমানদের উৎখাত করার প্ররোচনাও দিয়েছিল।

এ ষড়যন্ত্রের শুরুতে সে মদীনার পরিচিত মুনাফেকদের কাছে চিঠি লিখে যে, "রোম সম্রাট কর্তৃক মদীনা অভিযানের চেষ্টায় আমি আছি। কিন্তু যথা সময় সম্রাটের সাহায্য হয় এমন কোন সম্মিলিত শক্তি তোমাদের থাকা চাই। এর পন্থা হলো এই যে, তোমরা মদীনায় মসজিদের নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যেন মুসলমানদের অন্তরে কোন সন্দেহ না আসে। অতঃপর সে গৃহে নিজেদের সংগঠিত কর এবং যতটুকু সম্ভব যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেখানে রাখ এবং পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণ কর।"

তার এ পত্রের ভিত্তিতে বার জন মুনাফেক মদীনার কোবা মহল্লায়, যেখানে হুযূরে আকরাম (সাঃ) হিজরত করে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন— আরেকটি মসজিদের ভিত্তি রাখল। ইবনে ইস্হাক (রহঃ) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এ বার জনের নাম উল্লেখ করেছেন। সে যাহোক অতঃপর তারা মুসলমানদের প্রতারিত করার উদ্দেশে সিদ্ধান্ত নিল যে, স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-এর দ্বারা এক ওয়াক্ত নামায সেখানে পড়াবে। এতে মুসলমানগণ নিশ্চিত হবে যে, পূর্বনির্মিত মসজিদের মত এটিও একটি মসজিদ।

এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের এক প্রতিনিধিদল মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করে যে, কোবার বর্তমান মসজিদটি অনেক ব্যবধানে রয়েছে। দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের সে পর্যন্ত যাওয়া দুষ্কর। এছাড়া মসজিদটি এত প্রশস্তও নয় যে, এলাকার সকল লোকের সংকুলান হতে পারে। তাই আমরা দুর্বল লোকদের সুবিধার্থে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করেন, তবে আমরা বরকত লাভে ধন্য হব।

রসূলে করীম (সাঃ) তখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এখন সফরের প্রস্তুতিতে আছি। ফিরে এসে নামায আদায় করব। কিন্তু তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন তিনি মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন মসজিদে যেরার সম্পর্কিত এই আয়াতগুলো নাযিল হয়। এতে মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়া হল। আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর রসূলে করীম (সাঃ) কতিপয় সাহাবীকে— যাদের মধ্যে আমের বিন সকস্ এবং হযরত হামযা (রাঃ)-এর হন্তা 'ওয়াহশী'ও উপস্থিত ছিলেন— এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, এক্ষুণি গিয়ে কথিত মসজিদটি ধ্বংস কর এবং আগুন লাগিয়ে এসো। আদেশমতে তাঁরা গিয়ে মসজিদটি সমূলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন। এসব ঘটনা তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।

তফসীরে-মাযহারীতে ইউসুফ বিন সালেহীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) মদীনা পৌঁছে দেখেন যে, সে মসজিদের জায়গাটি ফাঁকা পড়ে আছে। তিনি আসেম বিন আ'দীকে সেখানে গৃহ নির্মাণের অনুমতি দান করেন। তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, যে জায়গা সম্পর্কে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, সেই অভিশপ্ত স্থানে গৃহ নির্মাণ আমার পছন্দ নয়। তবে সাবেত বিন আকরামের ভোগদখলে জায়গাটি দিয়ে দিন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, সে ঘরে তারও কোন সন্তান-সন্ততি হয়নি কিংবা জীবিত থাকেনি।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সে জায়গায় মানুষ তো দূরের কথা, পাখীকুল পর্যন্ত ডিম ও বাচ্চা দেয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাই সেই থেকে আজ পর্যন্ত মসজিদে কোবা থেকে কিছু দূরত্বে অবস্থিত সে জায়গাটি বিরান পড়ে আছে।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا যারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশে মসজিদের নামে গৃহ নির্মাণ করেছে ওরাও মুনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াতে উক্ত মসজিদ নির্মাণের তিনটি উদ্দেশ্য উল্লেখিত হয়েছে। প্রথমতঃ ضِرَارًا অর্থাৎ, মুসলমানদের ক্ষতিসাধন। ضرر ও ضرار শব্দের অর্থ ক্ষতিসাধন। তবে ভাষাবিদগণ এ শব্দ দু'টির মধ্যে কিছু পার্থক্য করেছেন। তারা বলেন, ضرر সেই ক্ষতিকে বলা হয়, যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষে হয় লাভজনক, আর তার প্রতিপক্ষের জন্য হয় ক্ষতিকারক; আর ضرر হলো যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষেও মঙ্গলজনক হয় না। যেহেতু উক্ত মসজিদ নির্মাতাদের মঙ্গলের পরিবর্তে মারাত্মক ضِرَارًا পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে, তাই আয়াতে ضرار শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ, অপর মসজিদ নির্মাণ দ্বারা মুসলমানদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করা। একটি দল সে মসজিদে নামায আদায়ের জন্য পৃথক হয়ে যাবে, যার ফলে কোবার পুরাতন মসজিদের মুসল্লী হ্রাস পাবে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য, وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ অর্থাৎ, সেখানে আল্লাহ্ ও রসূলের শত্রুদের আশ্রয় মিলবে এবং তারা বসে বসে ষড়যন্ত্র পাকাতে পারবে।

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যে মসজিদকে কোরআন মজীদ 'মসজিদে যিরার' নামে অভিহিত করেছে এবং যাকে মহানবী (সাঃ)-এর আদেশে ধ্বংস ও ভস্ম করা হয়েছে তা মূলতঃ মসজিদই ছিল না, তা নামায আদায়ের জন্য নির্মিত হয়নি। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, যা কোরআন চিহ্নিত করে দিয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল যে, বর্তমান যুগে কোন মসজিদের মোকাবেলায় তার কাছাকাছি অন্য মসজিদ নির্মাণ করা হলে এবং এর পেছনে যদি মুসলমানদের বিভক্তিকরণ ও পূর্বতন মসজিদের মুসল্লী হ্রাস প্রভৃতি অসৎ নিয়ত থাকে, তবে এতে মসজিদ নির্মাতার সওয়াব তো হবেই না, বরং বিভেদ সৃষ্টির অপরাধে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও শরীয়ত মতে সে জায়গাটিকে মসজিদই বলা হবে এবং মসজিদের আদব ও হুকুমগুলো এখানেও প্রযোজ্য হবে। একে ধ্বংস করা কিংবা আগুন লাগিয়ে ভস্ম করা জায়েয হবে না। এ ধরনের মসজিদ নির্মাণ মূলতঃ গুনাহের কাজ হলেও যারা এতে নামায আদায় করবে, তাদের নামাযকে অশুদ্ধ বলা যাবে না। এ থেকে অপর একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কেউ যদি জিদের বশে বা লোক দেখানোর উদ্দেশে

কোন মসজিদ নির্মাণ করে, তবে যদিও মসজিদ নির্মাণের সওয়াব সে পাবে না বরং গুনাহ্গার হবে; কিন্তু একে আয়াতে উল্লেখিত 'মসজিদে যিরার' বলা যাবে না। অনেকে এ ধরনের মসজিদকে 'মসজিদে যিরার' নামে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু তা ঠিক নয়। তবে একে 'মসজিদে যিরার এর মত' বলা যায়। তাই এর নির্মাতাকে এ প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত রাখা যেতে পারে। যেমন, হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) এক আদেশ জারী করেছিলেন যে, এক মসজিদের পার্শ্বে অন্য মসজিদ নির্মাণ করবে না, যাতে পূর্বতন মসজিদের জামাআত ও সৌন্দর্য হ্রাস পায়। - (কাশ্‌শাফ)

উপরোক্ত 'মসজিদে যিরার' সম্পর্কে ১০৮ নং আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে হুকুম করা হয় যে, لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا এখানে দাঁড়ানো অর্থ নামাযের উদ্দেশে দাঁড়ানো। অর্থাৎ, আপনি এই তথাকথিত মসজিদে কখনো নামায আদায় করবেন না।

এ আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, আপনার নামায সে মসজিদেই দুরস্ত হবে, যার ভিত্তি রাখা হয় প্রথমদিন থেকে তাকওয়া বা খোদাভীতির উপর। আর সেখানে এমন লোকেরা নামায আদায় করে, যারা পাকপবিত্রতায় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনে উদগ্রীব। বস্তুতঃ আল্লাহ্ নিজেও এমনিতর পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।

আয়াতের বর্ণনাধারা থেকে বোঝা যায় যে, প্রশংসিত সে মসজিদটি হলো মসজিদে কোবা, যেখানে মহানবী (সাঃ) তখন নামায আদায় করতেন। হাদীসের কতিপয় রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। (তফসীরে মাযহারী)

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا এ আয়াতে সেই মসজিদকে মহানবী (সাঃ)-এর নামাযের অধিকতর হকদার বলে অভিহিত করা হয়, যার ভিত্তি শুরু থেকেই তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছে। সে হিসেবে মসজিদে কোবা ও মসজিদে নববী উভয়টিই এ মর্যাদায় অভিষিক্ত। সে মসজিদেরই ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তথাকার মুসল্লীগণ পাক-পবিত্রতা অর্জনে সবিশেষ যত্নবান। পাক-পবিত্রতা বলতে এখানে সাধারণ না-পাকী ও ময়লা থেকে পাক-পরিচ্ছন্ন হওয়া এবং তৎসঙ্গে গুনাহ্ ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র থাকা বোঝায়। আর মসজিদে নববীর মুসল্লীগণ সাধারণতঃ এসব গুণেই গুণান্বিত ছিলেন।

১১১তম আয়াতের শানে নুযূল ঃ অধিকাংশ মুফাসসেরের ভাষ্যমতে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে 'বায়আতে আকাবায়' অংশ গ্রহণকারী লোকদের ব্যাপারে। এ' বায়'আত নেয়া হয়েছিল মক্কায় মদীনার আনসারদের থেকে। তাই সূরাটি মদনী হওয়া সত্ত্বেও এ আয়াতগুলোকে মক্কী বলা হয়েছে।

'আকাবা' বলা হয় পর্বতাংশকে। এখানে আকাবা বলতে বোঝায় মিনার জমরায়ে আকাবার সাথে মিলিত পর্বতাংশকে। বর্তমানে হাজীদের সংখ্যাধিক্যের দরুন পর্বতের এ অংশটিকে শুধু জমরা বাদ দিয়ে মাঠের সমান করে দেয়া হয়েছে। এখানে মদীনা থেকে আগত আনসারগণের তিন দফায় বায়আত নেয়া হয়। প্রথম দফা নেয়া হয় নবুওয়তের একাদশ বর্ষে। তখন মোট ছয় জন লোক ইসলাম গ্রহণ করে বায়'আত নিয়ে মদীনা ফিরে যান। এতে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলাম ও নবী করীম (সাঃ)-এর চর্চা শুরু হয়। পরবর্তী বছর হজ্বের মৌসুমে বার জন লোক সেখানে একত্রিত হন। এদের পাঁচ জন ছিলেন পূর্বের এবং সাত জন ছিলেন নতুন। তাঁরা সবাই মহানবী (সাঃ)-এর হাতে বায়'আত নেন। এর ফলে মদীনায় মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, চল্লিশ জনেরও বেশী। তারা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আবেদন জানান যে, তাঁদেরকে কোরআনের তালীম দানের উদ্দেশে সেখানে কাউকে প্রেরণ করা হোক। তিনি হযরত মোসআব বিন ওমাইর (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন, যিনি তথাকার মুসলমানদের কোরআন পড়ান ও ইসলামের তাবলীগ করেন। ফলে মদীনার বিরাট অংশ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়।

অতঃপর নবুওয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে সত্তর জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সেখানে একত্রিত হন। এ হলো তৃতীয় ও সর্বশেষ বায়'আতে আকাবা। সাধারণতঃ বায়'আতে আকাবা বলতে একেই বোঝানো হয়। এ বায়'আতটি ইসলামের মৌল আকীদা ও আমল, বিশেষতঃ কাফেরদের সাথে জেহাদ এবং মহানবী (সাঃ) হিজরত করে মদীনা গেলে তাঁর হেফাযত ও সাহায্য-সহযোগিতার জন্য নেয়া হয়। বায়'আত গ্রহণকালে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রাঃ) বলেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্। এখন অঙ্গীকার নেয়া হচ্ছে; আপনার রব কিংবা আপনার সম্পর্কে কোন শর্তারোপ করার থাকলে তা পরিষ্কার বলে দেয়া হোক। হুযুর (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্র ব্যাপারে শর্তারোপ করেছি যে, তোমরা সবাই তাঁরই এবাদত করবে; তাঁকে ছাড়া কারো এবাদত করবে না। আর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত হলো যে, তোমরা আমার হেফাযত করবে যেমন নিজের জান-মাল ও সন্তানদের হেফাযত কর। তাঁরা আরয করলেন, এ শর্ত দু'টি পূরণ করলে এর বিনিময়ে আমরা কি পাব? তিনি বললেন, জান্নাত। তাঁরা পুলকিত হয়ে বললেন, আমরা এর জন্য রাযী, এমন রাযী যে, নিজেদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি রহিত করার আবেদন কোন দিনই পেশ করব না এবং রহিতকরণকে পছন্দও করব না।

জেহাদের সর্বপ্রথম আয়াত ঃ মহানবী (সাঃ)-এর মক্কা শরীফে অবস্থানকালে এ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিত কোন হুকুম নাযিল হয়নি। এটিই সর্বপ্রথম জেহাদ সংক্রান্ত আয়াত, যা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। তবে এর উপর আমল শুরু হয় হিজরতের পরে। এরপর দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয় ঃ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ (সুরা হজ্ব ৩৯) মক্কায় কোরাইশ বংশীয় কাফেরদের অগোচরে যখন বায়'আতে আকাবা সম্পাদিত হয় তখনই মহানবী (সাঃ) মক্কার মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের আদেশ দিয়ে দেন। অতঃপর ক্রমশঃ সাহাবায়ে কেরামের হিজরতের ধারা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) নিজে আল্লাহ্র অনুমতির অপেক্ষায় থাকেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হিজরতের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তাঁকে নিজের সহযাত্রী করার মানসে তখনকার মত নিবৃত রাখেন। - (মাযহারী)

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ থেকে فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, জেহাদের হুকুম পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্যও সকল কিতাবে নাযিল হয়েছিল। ইঞ্জিল (বাইবেলে) জেহাদের হুকুম নেই বলে যে কথা প্রচলিত রয়েছে, তা সম্ভবতঃ এজন্য যে, পরবর্তী খ্রীষ্টানরা ইঞ্জিলের যে বিকৃতি ঘটিয়েছে তার ফলে জেহাদের হুকুম সম্বলিত আয়াতগুলো খারিজ হয়ে যায় - 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ'। فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ বায়'আতে আকাবায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে যে অঙ্গীকার করা হয়, তা দৃশ্যতঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মত। তাই আয়াতের শুরুতে ক্রয় শব্দের ব্যবহার করা হয়। উপরোক্ত বাক্যে মুসলমানদের বলা হচ্ছে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের এই সওদা তোমাদের জন্য লাভজনক ও বরকতময়। কেননা, এর দ্বারা অস্থায়ী জান-মালের বিনিময়ে স্থায়ী জান্নাত পাওয়া গেল। চিন্তা করার ব্যাপার যে, এখানে ব্যয় হলো শুধু মাল। কিন্তু আত্মা মৃত্যুর পরও বাকী থাকবে। চিন্তা করলে আরো দেখা যায় যে, মালামাল

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ
السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾ مَا كَانَ
لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَ
لَوْ كَانُوْۤا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ
اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ
اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗۤ اَنَّهٗ عَدُوٌّ
لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿١١٤﴾ وَمَا كَانَ اللّٰهُ
لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا
يَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١١٦﴾ لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى
النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ
مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٧﴾

(১১২) তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকূ ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া সীমাসমূহের হেফাযতকারী। বস্তুতঃ সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে। (১১৩) নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরেকদের মাগফেরাত কামনা করে, যদিও তারা আত্মীয় হোক– একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোযখী। (১১৪) আর ইব্রাহীম কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফেরাত কামনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে একথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম ছিলেন বড় কোমলহৃদয়, সহনশীল। (১১৫) আর আল্লাহ্ কোন জাতিকে হেদায়েত করার পর পথভ্রষ্ট করেন না – যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বলে দেন সেসব বিষয় যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সব বিষয়ে ওয়াকেফহাল। (১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের সাম্রাজ্য। তিনিই জিন্দা করেন ও মৃত্যু ঘটান, আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন সহায়ও নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই। (১১৭) আল্লাহ্ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়।

হলো আল্লাহ্‌রই দান। মানুষ শূন্য হাতেই জন্ম নেয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে অর্থ-সম্পদের মালিক করেন এবং নিজের দেয়া সে অর্থের বিনিময়েই বান্দাকে জান্নাত দান করবেন। তাই হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, 'এ এক অভিনব বেচা-কেনা, মাল ও মূল্য উভয়ই তোমাদিগকে দিয়ে দিলেন আল্লাহ্।' হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, 'লক্ষ্য কর, এ কেমন লাভজনক সওদা, যা আল্লাহ্ সকল মুমিনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন।' তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে কিছু ব্যয় করে জান্নাত ক্রয় করে নাও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ এ গুণাবলী হলো সেসব মুমিনের যাদের সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে – 'আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন।' আয়াতটি নাযিল হয়েছিল বায়'আতে আকাবায় অংশ গ্রহণকারী একটি বিশেষ জামাত সম্পর্কে। তবে আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদকারী সবাই এ আয়াতের মর্মভুক্ত। আর اَلتَّآئِبُوْنَ থেকে শেষ পর্যন্ত যে গুণাবলীর উল্লেখ হয়েছে, তা শর্তরূপে নয়। কারণ,. আল্লাহ্‌র রাহে কেবল জেহাদের বিনিময়েই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তবে এ গুণাবলী উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, যারা জান্নাতের উপযুক্ত, তারা এ সকল গুণের অধিকারী হয়। বিশেষতঃ বায়'আতে আকাবায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবাদের এ সকল গুণ ছিল।

অধিকাংশ মুফাসসেরের মতে السَّآئِحُوْنَ এর অর্থ صائمون অর্থাৎ, রোযাপালনকারী। শব্দটি سياحت (দেশ ভ্রমণ) থেকে উদ্ভূত। ইসলাম-পূর্ব যুগে খ্রীষ্ট ধর্মে দেশ ভ্রমণকে এবাদত মনে করা হতো। অর্থাৎ, মানুষ পরিবার-পরিজন ও ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াত। ইসলাম ধর্মে একে বৈরাগ্যবাদ বলে অভিহিত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর পরিবর্তে রোযা পালনের এবাদতকে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য সংসার ত্যাগ। অথচ রোযা এমন এক এবাদত, যা পালন করতে গিয়ে যাবতীয় পার্থিব বাসনা ত্যাগ করতে হয় এবং এরই ভিত্তিতে কতিপয় রেওয়ায়েতে জেহাদকেও দেশ ভ্রমণের অনুরূপ বলা হয়। এ হাদীসটি ইবনে মাজা, হাকেম ও বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ সহী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হুযূরে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, অর্থাৎ, 'আমার উম্মতের দেশভ্রমণ سياحة امتى الجهاد فى سبيل الله হলো জেহাদ ফীসাবীলিল্লাহ।'

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, কোরআন মজীদে ব্যবহৃত سائحين শব্দের অর্থ রোযাদার। হযরত ইকরিমা (রাঃ) سائحين শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এরা হলো এলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী, যারা এলম হাসিলের জন্য ঘর-বাড়ী ছেড়ে বের হয়ে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতে মুমিন-মুজাহিদের সাতটি গুণ যথা ঃ اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ উল্লেখ করে অষ্টম গুণ হিসেবে বলা হয়েছে وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ এতে রয়েছে উপরোক্ত সাতটি গুণের সমাবেশ। অর্থাৎ, সাতটি গুণের মধ্যে যে তফসীল রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার হলো এই যে, এঁরা নিজেদের প্রতিটি কর্ম ও কথায় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা তথা শরীয়তের হুকুমের অনুগত ও তার হেফাযতকারী।

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۭ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ۭ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١١٨﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾ مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَــُٔـوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢١﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۗفَّةً ۭ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاۗىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

(১১৮) এবং অপর তিন জনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই—অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ দয়াময় করুণাশীল। (১১৯) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। (১২০) মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রসূলুল্লাহ্র সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহ্র পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যাকিছু প্রাপ্ত হয়—তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না। (১২১) আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়, যেন আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন। (১২২) আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে?

فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ কোরআন মজীদ তাবুক যুদ্ধের সময়টিকে 'সঙ্কটকময় মুহূর্ত' বলে অভিহিত করেছে। কারণ, সে সময় মুসলমানগণ বড় অভাব-অনটনে ছিলেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) সে অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, সে সময় দশ জনের জন্য ছিল একটি মাত্র বাহন, যার উপর পালা করে তাঁরা আরোহণ করতেন। তদুপরি সফরের সম্বলও ছিল নিতান্ত অপ্রতুল। অন্যদিকে ছিল গ্রীষ্মকাল, পানিও ছিল পথের মাত্র কয়েকটি স্থানে এবং তাও অতি অল্প পরিমাণে।

مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ আয়াতের এ বাক্যে যে, কিছু লোকের অন্তরের বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ ধর্মান্তর নয়, বরং এর অর্থ হলো, কড়া গ্রীষ্ম ও সম্বলের স্বল্পতা হেতু সাহস হারিয়ে ফেলা এবং জেহাদ থেকে গা বাঁচিয়ে চলা। হাদীসের রেওয়ায়েতগুলোও এ অর্থেরই সমর্থক। এই ছিল তাঁদের অপরাধ। যেজন্য তাঁরা তওবা করেন এবং তা কবূল হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا এখানে خلفوا অর্থ যাদের পেছনে রাখা হয়েছে। তবে মর্মার্থ হলো, যাঁদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হল। এঁরা তিন জন হলেন হযরত কা'আব ইবনে মালেক, শা-এর মুরারা ইবনে রবি এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ) তাঁরা তিন জনই ছিলেন আনসারের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। যাঁরা ইতিপূর্বে বায়'আতে আ'কাবা ও মহানবী (সাঃ)-এর সাথে বিভিন্ন জেহাদে শরীক হয়েছিলেন। কিন্তু এ সময় ঘটনাচক্রে তাঁদের বিচ্যুতি ঘটে যায়। অন্যদিকে যে মুনাফেকরা কপটতার দরুন এ যুদ্ধে শরীক হয়নি, তারা তাঁদের কুপরামর্শ দিয়ে দুর্বল করে তুললো। অতঃপর যখন হুযুরে আকরাম (সাঃ) জেহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন মুনাফেকরা নানা অজুহাত দেখিয়ে ও মিথ্যা শপথ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইল আর মহানবী (সাঃ)-ও তাদের গোপন অবস্থাকে আল্লাহ্র সোপর্দ করে তাদের মিথ্যা শপথেই আশ্বস্ত হলেন, ফলে তারা দিব্যি আরামে সময় অতিবাহিত করে চলে আর ঐ তিন বুযুর্গ সাহাবীকে পরামর্শ দিতে লাগল যে, আপনারাও মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে হুযুর (সাঃ)-কে আশ্বস্ত করুন। কিন্তু তাঁদের বিবেক সায় দিল না। কারণ, প্রথম অপরাধ ছিল জেহাদ থেকে বিরত থাকা, দ্বিতীয় অপরাধ আল্লাহ্র নবীর সামনে মিথ্যা বলা, যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন যে, অপরাধের সাজাস্বরূপ তাদের সমাজচ্যুতির আদেশ দেয়া হয়। আর এদিকে কোরআন মজীদ সকল গোপন রহস্য উদঘাটন এবং মিথ্যা শপথ করে অজুহাত সৃষ্টিকারীদের প্রকৃত অবস্থাও ফাঁস করে দেয়। অত্র সূরার ৯৪ থেকে ৯৮ আয়াত يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ - عَلَيْهِمْ دَاۗىِٕرَةُ السَّوْءِ পর্যন্ত রয়েছে এদের অবস্থা ও নির্মম পরিণতির বর্ণনা। কিন্তু যে তিন জন সাহাবী মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে অপরাধ স্বীকার করেছেন, অত্র আয়াতটি নাযিল হয় তাঁদের তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এহেন দুর্বিসহ অবস্থা ভোগের পর তারা আবার আনন্দিত মনে রসূলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলিত হন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জেহাদ থেকে বিরত থাকার যে ত্রুটি কতিপয় নিষ্ঠবান সাহাবীর দ্বারাও সংঘটিত হয়ে গেল এবং পরে তাঁদের তওবা কবুল হলো,

এ ছিল তাঁদের তাকওয়া ও খোদাভীতিরই ফলশ্রুতি। তাই এ' আয়াতের মাধ্যমে সমস্ত মুসলমানকে তাকওয়ার হেদায়েত দান করা হয়েছে। আর وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (তোমরা সবাই সত্যবাদীদের সাথে থাক।) বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যবাদীদের সাহচর্য এবং তাদের অনুরূপ আমলের মাধ্যমেই তাকওয়া লাভ হয়। এখানে এমনও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ঐ সকল সাহাবীর পদস্খলনের মধ্যে মুনাফেকদের সাথে উঠাবসা ও তাদের পরামর্শেরও একটা দখল ছিল। তাই নাফরমানদের সাহচর্য ত্যাগ করে সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন করা প্রয়োজন। কোরআনের এ আয়াতে আলেম ও সালেহ্গণের পরিবর্তে 'সাদেকীন' শব্দ ব্যবহার করে আলেম ও সালেহ্-এর প্রকৃত পরিচয় দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, সে ব্যক্তিই যথার্থ সালেহ্ বা নেককার যে ভেতরে ও বাহিরে সমান এবং নিয়ত ও ইচ্ছায় এবং কথা ও কর্মে সমান সত্য হয়।

দ্বীনের এলম হাসিল ও সংশ্লিষ্ট নীতি-নিয়ম ঃ

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এ আয়াতটি দ্বীনের এলম হাসিলের মৌলিক দলীল। চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, এতে দ্বীনী এলমের এক সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচী এবং এলম হাসিলের পর আলেমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে। এখানে বিষয়টির কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

দ্বীনী এলমের ফযীলত ঃ দ্বীনী এলমের অগণিত ফযীলত ও সওয়াব সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম ছোট বড় অনেক কিতাব লিখেছেন। এখানে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত হাদীস পেশ করা হলো। তিরমিযী শরীফে আবুদ্দারদা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্ত এলম হাসিল করার উদ্দেশে কোন পথ দিয়ে চলে, আল্লাহ্ এই চলার সওয়াব হিসাবে তার রাস্তাকে জান্নাতমুখী করে দেবেন। আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ দ্বীনী জ্ঞান আহরণকারীর জন্য নিজেদের পালক বিছিয়ে রাখেন। আলেমের জন্য আসমান-যমীনের সমস্ত সৃষ্টি এবং পানির মৎস্যকুল দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করে। অধিকহারে নফল এবাদতকারী লোকের উপর আলেমের ফযীলত অপরাপর তারকারাজির উপর পূর্ণিমা চাঁদেরই অনুরূপ। আলেমসমাজ নবীগণের ওয়ারিস। নবীগণ স্বর্ণ, রূপার মীরাস রেখে যান না। তবে এলমের মীরাস রেখে যান। তাই যে ব্যক্তি এলমের মীরাস পায়, সে যেন মহা-সম্পদ লাভ করলো।—(কুরতুবী)

ইমাম দারেমী (রহঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন যে, জনৈক সাহাবী নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন। বনী-ইসরাঈলের দু'জন লোক ছিলেন, যাদের একজন ছিলেন আলেম। তিনি শুধু নামায ও লোকর দ্বীনী তা'লীম দানে ব্যস্ত থাকতেন। অপরজন সারাদিন রোযা রাখতেন এবং সারা রাত এবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। এ দু'জনের মধ্যে কার ফযীলত বেশী?' হুযূর (সাঃ) বলেন, সেই আলেমের ফযীলত আবেদের উপর এমন, যেমন আমার ফযীলত তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর।— (কুরতুবী)

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন, শয়তানের মোকাবেলায় একজন ফেকাহ্বিদ এক হাজার আবেদের চাইতেও শক্তিশালী ও ভারী।—(তিরমিযী, মাযহারী) তিনি আরো বলেন, মানুষের মৃত্যু হলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। (এক) সদকায়ে জারিয়া—(যেমন, মসজিদ, মাদ্রাসা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান)। (দুই) এলম-যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়। (যেমন, শাগরিদ রেখে গিয়ে এলমে দ্বীনের চর্চা জারী রাখা বা কোন কিতাব লিখে যাওয়া।) (তিন) নেককার সন্তান—যে তার পিতার জন্য দোয়া করে এবং সওয়াব পাঠাতে থাকে।— (কুরতবী)

দ্বীনী এলম ফরযে-আইন অথবা ফরযে-কেফায়া হওয়ার বিবরণ ঃ

ইবনে আ'দী ও বায়হাকী বিশুদ্ধ সনদে হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন- طلب العلم فريضة علىٰ كل مسلم 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর এলম শিক্ষা করা ফরয।' বলাবাহুল্য, এ হাদীসও উপরোক্ত অপরাপর হাদীসে উল্লেখিত 'এলম' শব্দের অর্থ দ্বীনের এলম। তবে অন্যান্য বিষয়ের মত দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞানও মানুষের জন্য জরুরী। কিন্তু হাদীসসমূহে সে সবের ফযীলত বর্ণিত হয়নি। অতঃপর দ্বীনী এলম বলতে একটি মাত্র বিষয়ই বোঝায় না; বরং তা বহু বিষয়েরই উপর পরিব্যাপ্ত এক বিরাট ব্যবস্থা। সুতরাং সমস্ত বিষয়ই একা আয়ত্ত করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই উল্লেখিত হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানদের উপর যে এলম তলব ফরয করা হয়েছে, তার অর্থ হবে এই যে, সমস্ত মুসলমানদের জন্য দ্বীনী এলমের শুধু সে অংশটি আয়ত্ত করাই ফরয করা হয়েছে, যা ঈমান ও ইসলামের জন্য জরুরী এবং যার অবর্তমানে মানুষ না পারে ফরযসমূহ আদায় করতে, আর না পারে হারাম বিষয় থেকে বাঁচতে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়; কোরআন-হাদীসের মাসআলা-মাসায়েল, কোরআন-হাদীস থেকে আহরিত শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম ও তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা আয়ত্তে আনা সকল মুসলমানের পক্ষে সম্ভবও নয় এবং ফরযে-আইনও নয়। তবে গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য তা ফরযে কেফায়াহ্। তাই প্রত্যেকটি শহরেই যদি শরীয়তের উপরোক্ত এলম ও আইন-কানুনের একজন সুদক্ষ আলেম থাকেন, তবে অন্যান্য মুসলমান এ ফরযের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। কিন্তু যদি শহর বা পল্লীতে একজনও অভিজ্ঞ আলেম না থাকেন, তবে তাদের কাউকেই আলেম বানানো বা অন্যখান থেকে কোন আলেমকে ডেকে এনে এখানে রাখার ব্যবস্থা করা স্থানীয় লোকের পক্ষে ফরয। যাতে করে যে কোন প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে তার কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে সেমত আমল করা যায়। দ্বীনী এলম সম্পর্কে ফরযে-আইন ও ফরযে-কেফায়ার তফছীল নিম্নরূপ ঃ

ফরযে-আইন ঃ ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাসমূহের জ্ঞান হাসিল করা, পাকী-নাপাকীর হুকুম-আহকাম জানা, নামায-রোযা ও অন্যান্য এবাদত বা শরীয়ত যেসব বিষয় ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর জ্ঞান রাখা এবং যেসব বিষয় হারাম বা মকরূহ করে দিয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নেসাবের মালিক, তার জন্য যাকাতের মাসআলা-মাসায়েল জানা, যে হজ্ব আদায় করতে সমর্থ তার পক্ষে তার আহ্কাম ও মাসায়েল জেনে নেয়া, যে ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনা-বেচা বা শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত, তার পক্ষে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহকাম জেনে রাখা এবং যে বিয়ের উদ্যোগ নিচ্ছে, তার পক্ষে বিয়ে ও তালাকের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবগত হওয়া ফরয। এক কথায় শরীয়ত মানুষের উপর যেসব কাজ ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম-আহকাম ও মাসআলা- মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয।

এলমে-তাসাউফ ও ফরযে-আইনের অন্তর্ভুক্ত ঃ শরীয়তের যাহেরী হুকুম তথা নামায-রোযা প্রভৃতি যে ফরযে-আইন তা

সর্বজনবিদিত। তাই সেগুলোর এলম রাখাও ফরযে-আইন। হযরত কাযী সানাউল্লাহ্‌ পানিপথী (রহঃ) তফসীরে মাযহারীতে এ আয়াতের টীকায় লিখেছেন যে, যেহেতু বাতেনী আমলও সকলের জন্য ফরযে-আইন, তাই বাতেনী আমল ও বাতেনী হারাম বস্তুর এলম-যাকে পরিভাষায় 'এলমে-তাসাউফ' বলা হয়, তা হাসিল করাও ফরযে-আইন।

অধুনা বিভিন্ন এলম., তত্ত্বজ্ঞান, কাশ্‌ফ ও আত্মোপলব্ধির সম্মিলিত রূপকে এলমে তাসাউফ বলা হয়। তবে এখানে ফরযে-আইন বলতে বাতেনী আমলের শুধু সে অংশকেই বোঝায়, যা ফরয-ওয়াজিবের তফ্‌সীল। যেমন, বিশুদ্ধ আকীদা, যার সম্পর্ক বাতেন তথা অন্তরের সাথে অথবা সবর, শোকর ও তাওয়াক্কুল প্রভৃতি এর বিশেষ স্তর পর্যন্ত ফরয, কিংবা গর্ব-অহংকার, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কৃপণতা ও দুনিয়ার মোহ প্রভৃতি কোরআন ও হাদীস মতে হারাম। এগুলোর গতি-প্রকৃতি, অথবা সেগুলো হাসিল করার কিংবা হারাম থেকে বেঁচে থাকার নিয়ম-নীতি জেনে রাখাও সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয। এ সকল বিষয়ের উপরই হল এলমে তাসাউফের আসল ভিত্তি, যা ফরযে আইন।

ফরযে কেফায়া ঃ পূর্ণ কোরআন মজীদের অর্থ ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবহিত হওয়া, সমুদয় হাদীসের মর্ম বোঝা, বিশুদ্ধ ও দুর্বল হাদীস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থাকা, কোরআন ও হাদীস থেকে নির্গত আহকাম ও মাসায়েলের জ্ঞান অর্জন এবং এ সমস্ত ব্যাপারে সাহাবা, তাবেয়ীন ও মুজতাহেদ ইমামগণের ভাষ্য ও আমল থেকেও এ সম্পর্কিত পূর্ণ জ্ঞান হাসিল করা দুঃসাধ্য। তাই শরীয়ত একে ফরযে-কেফায়া রূপে সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ কিছু লোক যদি প্রয়োজনমত এগুলোর জ্ঞান হাসিল করে নেয়, তবে অন্যান্যরাও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

দ্বীনী এলমের সিলেবাস ঃ কোরআন মজীদ আলোচ্য আয়াতের একটি মাত্র শব্দে দ্বীনী এলমের প্রকৃতি ও তার পাঠ্যক্রম কি হবে তা ব্যক্ত করে দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ অথচ يتعلمون الدين (যেন দ্বীনের জ্ঞান হাসিল করে) ও বলা যেত। কিন্তু কোরআন এখানে تعلم এর স্থলে تفقه শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করেছে যে, নিছক দ্বীনের এলম 'পাঠ' করাই যথেষ্ট নয়। কারণ, ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরাও তা পাঠ করে, আর শয়তান তো এক্ষেত্রে তাদের সকলের আগে; বরং এলমে দ্বীনের উদ্দেশ্য হলো দ্বীনকে অনুধাবন করা কিংবা তাতে বিজ্ঞতা অর্জন করা। تفقه শব্দের অর্থও তাই। এটি فقه থেকে উদ্ভূত। فقه অর্থ বোঝা, অনুধাবন করা। উল্লেখ্য যে, কোরআন মজীদ এ আয়াতে صيغه مجرد ব্যবহার করে لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ (যেন তারা দ্বীনকে বোঝে নেয়) বলেনি; বরং একে باب تفعل এ নিয়ে لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ বলেছে। ফলে এতে পরিশ্রম ও সাধনাও শামিল হয়ে গেছে। সেমতে ব্যক্যের মর্ম হবে "তারা যেন দ্বীন অনুধাবনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাতে দক্ষতা হাসিল করে।" বলাবাহুল্য, পাকী-নাপাকী, নামায-রোযা ও হজ্ব-যাকাতের মাসআলা-মাসায়েল জানাকেই দ্বীনকে অনুধাবন করা বলা যাবে না। বরং দ্বীনের সত্যিকার অনুধাবন হলো, তাকে বোঝে তার প্রতিটি কথা ও কর্ম এবং যাবতীয় গতিবিধির হিসাব দিতে হবে রোজ হাশরে। দুনিয়ার এ জীবন তাকে কিরূপে অতিবাহিত করতে হবে—মূলতঃ এ চিন্তাই হলো দ্বীন অনুধাবন। এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) 'ফেকাহ্‌'-এর যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা'হলো এই যে, "ফেকাহ্‌ সে শাস্ত্রকে বলা হয়, যাতে মানুষ নিজের করণীয় কাজকে বোঝে নেয় এবং সে সকল কাজকেও বোঝে নেয় যা' থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য জরুরী।" অধুনা মাসআলা-মাসায়েলের বিস্তারিত জ্ঞানকেই যে, 'এলমে-ফেকাহ্‌' বলা হয় তা' পরবর্তী যুগের পরিভাষা। কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফেকাহ্‌র তাৎপর্য তাই যা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনের সমস্ত কিতাব পাঠ করে নিল, কিন্তু দ্বীনকে পুরোপুরি বুঝতে পারল না, সে কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় আদৌ আলেম নয়।

এ তত্ত্ব থেকে বোঝা গেল যে, কোরআনের পরিভাষায় দ্বীনের এলম হাসিল করার অর্থ হলো, দ্বীন সম্পর্কে প্রজ্ঞা অর্জন করা। তা কিতাবের মাধ্যমে বা আলেমগণের সাহায্যে যে কোন উপায়েই হোক-সবই একই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত।

ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ঃ দ্বীনের জ্ঞান হাসিলের পর ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব কি হবে তার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ (যেন তারা জাতিকে আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে ভয়প্রদর্শন করে) বাক্যটিতে। উল্লেখ্য যে, এখানে আলেমগণের দায়িত্ব বলা হয়েছে انذار বা ভয়প্রদর্শন। এটি انذار -এর শাব্দিক তরজমা, যথাযথ মর্মার্থ নয়। বস্তুতঃ ভয়প্রদর্শন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের ভীতিপ্রদর্শন হলো, চোর-ডাকাত, শত্রু, হিংস্রজন্তু ও বিষাক্ত প্রাণী থেকে ভয়প্রদর্শন করা। অন্য ধরনের হলো, পিতা স্নেহবশে আপন ছেলেকে আগুন, বিষাক্ত প্রাণী ও অন্যান্য কষ্টদায়ক বস্তু থেকে যে ভয়প্রদর্শন করে। এর মূলে থাকে প্রগাঢ় মমতা, স্নেহবোধ। এ ভয়প্রদর্শনের কলাকৌশলও ভিন্ন। আরবীতে একেই বলা হয় انذار - এজন্য নবী-রসূলগণ نذير উপাধীতে ভূষিত। আলেমগণের উপর জাতিকে ভয়প্রদর্শনের যে দায়িত্ব রয়েছে, তা মূলতঃ নবীগণের আংশিক মীরাস-যা হাদীসমতে ওলামায়ে কেরাম লাভ করেছেন।

তবে এখানে উল্লেখ্য যে, নবীগণ بشير ও نذير উভয় উপাধিতেই ভূষিত। نذير এর অর্থ উপরে জানা গেল। আর بشير অর্থ সুসংবাদ দানকারী। সুতরাং নবীগণের উপর দায়িত্ব হলো সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দান করা। আলোচ্য আয়াতে যদিও শুধু ভয়প্রদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অন্য দলীলের দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, আলেমগণের অন্যতম দায়িত্ব হলো নেক্‌কার বান্দাদিগকে সুসংবাদ দেয়া। তবে এখানে শুধু ভয়প্রদর্শনের উল্লেখ থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষের আসল কাজ দু'টি। (এক) দুনিয়া ও আখেরাতে যা কল্যাণকর, তা অবলম্বন করা এবং (দুই) অকল্যাণ ও অনিষ্টকর কাজ থেকে বেঁচে থাকা। আলেমও দার্শনিকদের ঐকমত্যে শেষোক্ত কাজটিই গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ
ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ
ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ
أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا
ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ
رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿١٢٥﴾ أَوَلَا يَرَوْنَ
أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا
يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ
نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ
ٱنصَرَفُوا۟ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا
يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ
عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

(১২৩) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (১২৪) আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো? অতএব যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে। (১২৫) বস্তুতঃ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের কলুষের সাথে আরো কলুষ বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করলো। (১২৬) তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতিবছর তারা; দু' একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ, তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না। (১২৭) আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় যে, কোন মুসলমান তোমাদের দেখছে কি-না— অতঃপর সরে পড়ে। আল্লাহ্ ওদের অন্তরকে সত্য বিমুখ করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা নির্বোধ সম্প্রদায়। (১২৮) তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। (১২৯) এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও., আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ছিল জেহাদের প্রেরণা। আলোচ্য ১২৩ তম আয়াত থেকে ১২৭ তম আয়াতের প্রথম আয়াতে يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ – এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হচ্ছে যে, কাফেররা দুনিয়ার সর্বত্রই রয়েছে। তবে কোন্ নিয়মে তাদের সাথে জেহাদ করা হবে? এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, প্রথমে তাদের সাথে জেহাদ করবে। নিকটবর্তী দু'রকমের হতে পারে। (এক) অবস্থানের দিক দিয়ে অর্থাৎ, যারা তোমাদের নিকটে অবস্থানকারী, প্রথমে তাদের সাথে জেহাদ কর। (দুই) গোত্র, আত্মীয়তা ও সম্পর্কের দিক দিয়ে যারা নিকটবর্তী অন্যান্যদের আগে তাদের সাথে জেহাদ চালিয়ে যাও। কারণ, ওদের কল্যাণ সাধনই ইসলামী জেহাদের উদ্দেশ্য। আর কল্যাণ সাধনের বেলায় আত্মীয়-স্বজন অগ্রগণ্য। যেমন, কোরআনে রসূলে করীম (সাঃ)-কে আদেশ দেয়া হয়েছে – وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ অর্থাৎ, "হে রসূল, নিজের নিকটাত্মীয়গণকে আল্লাহ্র আযাবের ভয়প্রদর্শন করুন।" তাই তিনি এ আদেশ পালনে সর্বাগ্রে স্বগোত্রীয়দের সমবেত করে আল্লাহ্র বাণী শুনিয়ে দেন। অনুরূপ, তিনি স্থান হিসাবে প্রথমে মদীনার আশ-পাশের কাফের তথা বনু-কোরাইযা, বনু -নযীর ও খায়বরবাসীদের সাথে বোঝা পড়া করেন। তারপর দূরবর্তী লোকদের সাথে জেহাদ করেন এবং সবশেষে রোমানদের সাথে জেহাদের আদেশ আসে, যার ফলে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً – غِلْظَةً অর্থ কঠোরতা, শক্তিমত্তা। বাক্যের মর্ম হলো, কাফেরদের সাথে এমন ব্যবহার কর, যাতে তোমাদের কোন দুর্বলতা তাদের চোখে ধরা না পড়ে। فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا বাক্য থেকে বোঝা যায়, কোরআনের আয়াতের তেলাওয়াত, চিন্তা-ভাবনা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ফলে ঈমানের উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ, ঈমানের নূর ও আস্বাদ বৃদ্ধি পায়। ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ফরমাঁবরদারী সহজ হয়ে উঠে। এবাদতে স্বাদ পায়, গুনাহের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা জন্মে ও কষ্টবোধ হয়।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ঈমান যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন একটি নূরের শ্বেতবিন্দুর মত দেখায়। অতঃপর যতই ঈমানের উন্নতি হয়, সেই শ্বেতবিন্দু সম্প্রসারিত হয়ে উঠে। এমনকি শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে যায়। তেমনি গুনাহ ও মুনাফেকীর ফলে প্রথমে অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। অতঃপর পাপাচার ও কুফরীর তীব্রতার সাথে সাথে সে কাল দাগটিও বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর কাল হয়ে যায়। – (মাযহারী) এজন্য সাহাবায়ে কেরাম একে অন্যকে বলতেন ঃ আস, কিছুক্ষণ একত্রে বসি এবং দ্বীন ও পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করি, যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ বাক্যে মুনাফেকদের সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের কপটতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রভৃতি অপরাধের পরিণতিতে প্রতিবছরই তারা কখনো একবার, কখনো দু'বার নানা ধরনের বিপদে পতিত হয়। যেমন, কখনো তাদের কাফের মিত্ররা পরাজিত হয়, কখনো তাদের গোপন অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে তারা দিবানিশি – মর্মপীড়া ভোগ করে। এখানে এক বা দু'বার বলতে কোন বিশেষ সংখ্যা

سُورَةُ يُونُسَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَتِسْعُ آيَاتٍ وَإِحْدَى عَشَرَ رُكُوعًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ① أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا
إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ
قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ②
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ
بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ③ إِلَيْهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ④
هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑤ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ⑥

সূরাইউনুস

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১০৯

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) الر এগুলো হেকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত। (২) মানুষের কাছে কি আশ্চর্য লাগছে যে, আমি ওহী পাঠিয়েছি তাদেরই মধ্য থেকে একজনের কাছে যেন তিনি মানুষকে সতর্ক করেন এবং সুসংবাদ শুনিয়ে দেন ঈমানদারগণকে যে, তাঁদের জন্য সত্য মর্যাদা রয়েছে তাঁদের পালনকর্তার কাছে। কাফেররা বলতে লাগল, নিঃসন্দেহে এ লোক প্রকাশ্য যাদুকর। (৩) নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ যিনি তৈরী করেছেন আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি কার্য পরিচালনা করেন। কেউ সুপারিশ করতে পারবে না তবে তাঁর অনুমতি ছাড়া ইনিই আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত কর। তোমরা কি কিছুই চিন্তা কর না? (৪) তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, তিনিই সৃষ্টি করেন প্রথমবার আবার পুনর্বার তৈরী করবেন তাদেরকে বদলা দেয়ার জন্য, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে ইনসাফের সাথে। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব এ জন্যে যে, তারা কুফরী করছিল। (৫) তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময়, আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে এবং অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিলসমূহ, যাতে করে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ্ এই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, কিন্তু যথার্থতার সাথে। তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে। (৬) নিশ্চয়ই রাত-দিনের পরিবর্তনের মাঝে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীনে, সবই হল নিদর্শন সেসব লোকের জন্য যারা ভয়করে।

উদ্দেশ্য নয়, বরং বলা হচ্ছে যে, তাদেরই এই দুর্ভোগের পালা শেষ হওয়ার নয়। এ সত্ত্বেও কি তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

এ দু'টি আয়াত সূরা তওবার সর্বশেষ আয়াত, তাতে বলা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) সকল সৃষ্টির উপর, বিশেষতঃ মুসলমানদের উপর বড় দয়াবানও স্নেহশীল। সর্বশেষ আয়াতে তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনার যাবতীয় চেষ্টা-তদবীরের পরও যদি কিছু লোক ঈমান গ্রহণে বিরত থাকে, তবে ধৈর্য ধরুন এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন।

সূরা তওবার শেষে একথা বলার সঙ্গত কারণ হলো এই যে, এর সর্বত্র রয়েছে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও যুদ্ধ-জেহাদের বর্ণনা, যা' আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানের সর্বশেষ পন্থা রূপে বিবেচিত। আর এ পন্থা তখনই অবলম্বন করা হয়, যখন মৌখিক দাওয়াত ও ওয়াজ তবলীগে হেদায়েতের সকল আশা তিরোহিত হয়। তবে নবীগণের সমস্ত কাজ হলো স্নেহ-মমতা ও হামদর্দির সাথে আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে ডাকা, তাদের পক্ষ থেকে অবজ্ঞা ও যাতনার সম্মুখীন হলে, তা আল্লাহ্‌র প্রতি সোপর্দ করা এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখা। এখানে 'আরশে আযীমের অধিপতি' বলার উদ্দেশ্য একথা বোঝানো যে, তাঁর অনন্ত কুদরত সমগ্র জগতের উপর পরিব্যাপ্ত। হযরত উবাই বিন কা'আব (রাঃ)-এর মতে এ দু'টি আয়াত হলো কোরআন মজীদের সর্বশেষ আয়াত। এরপর আর কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এ অবস্থায় নবী করীম (সাঃ)- এর ইন্তেকাল হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-ও এ মতই পোষণ করেন।—(কুরতুবী)

সূরা তওবা সমাপ্ত

সূরা ইউনুস

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ইউনুস মক্কায় অবতীর্ণ কেউ কেউ সূরার মাত্র তিনটি আয়াতকে মদনী বলে উল্লেখ করেছেন, যা মদীনায় হিজরত করার পর নাযিল হয়েছে। এই সূরার মধ্যেও কোরআন পাক এবং ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলী-তওহীদ, রেসালত, আখেরাত ইত্যাদি বিষয়ের যথার্থতা বিশ্বচরাচর এবং তার মধ্যকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনশীল ঘটনাবলীর মাধ্যমে প্রমাণ দেখিয়ে ভালো করে বোদগম্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে সাথে কিছু উপদেশমূলক, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং কাহিনীর অবতারণা করে সে সমস্ত লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যারা আল্লাহ্ তাআলার এ সব প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহের উপর একটুও চিন্তা করে না। এতদসঙ্গে অংশীবাদের খণ্ডন এবং তদসম্পর্কিত কিছু সন্দেহেরও উত্তর দেয়া হয়েছে। এ সূরার বিষয়বস্তুর প্রতি নিবিড়ভাবে চিন্তা করলে পূর্ববর্তী সূরা তওবা আর এ সূরার মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে তাও সহজেই বোঝা যায়। সূরা তওবায় এসব উদ্দেশ্যাবলী (তওহীদ, রেসালত, আখেরাত ইত্যাদি) হাসিল করার জন্যই অবিশ্বাসী কাফেরদের সাথে জেহাদ করা এবং কুফর ও শেরেকের শক্তিকে সাধারণ উপকরণের মাধ্যমে পরাস্থ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সূরা যেহেতু জেহাদের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাই উপরোল্লেখিত উদ্দেশ্যাবলীকে মক্কী যিন্দেগীর রীতি অনুযায়ী শুধু দলীল দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে।

الر এগুলোকে হরফে 'মোকাততাআহ্' বলা হয়, যা কোরআন মজিদের অনেক সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, الم ، عسق ، حم ، ق ইত্যাদি। এ সমস্ত শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তফসীরকারকগণ অনেক কিছু লিখেছেন। এ ধরনের সমস্ত হরুফে

মোকাত্তাআহ্ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং অধিকাংশ বুযুর্গানে কেরামের অভিমত হলো এই যে, এগুলো বিশেষ কিছু গুপ্ত কথা, যার অর্থ হয়তো বা হুযুর (সাঃ)- কে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সাধারণ উম্মতকে শুধু সে সমস্ত জ্ঞান জ্ঞাতব্য সমন্ধেই অবহিত করেছেন, যা তারা বহন করতে পারবে এবং যা না হলে তাদের কাজকর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারত। আর হরুফে মোকাত্তাআহ্র গুঢ় তত্ত্ব এমন কোন জ্ঞাতব্য বিষয় নয় যে, তা না জানলে উম্মতের ঈমান ও আমলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, কিংবা এমনও নয় যে, এগুলোর তত্ত্বকথা না জানলে উম্মতের কোন ক্ষতি হতে পারে। এ জন্যই হুযুর (সাঃ)ও এগুলোর অর্থ উম্মতের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে বর্ণনা করেননি। অতএব আমাদের পক্ষেও এগুলোর অর্থ বের করার পেছনে সময় ব্যয় করা উচিত হবে না। কারণ, এটাতো সত্য কথা যে, এসব শব্দের অর্থ জানার মধ্যে যদি আমাদের কোন রকম মঙ্গল নিহিত থাকত, তাহলে রহমতে-আলম (সাঃ) অন্ততঃ এগুলোর অর্থ বিশ্লেষণে কোন রকম কার্পণ্য করতেন না।

দ্বিতীয় আয়াতে রয়েছে মুশরেকদের একটি সন্দেহ ও প্রশ্নের উত্তর। সন্দেহটি ছিলো এই যে, কাফেররা তাদের মূর্খতার দরুন সাব্যস্ত করে রেখেছিল যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যে নবী বা রসূল আসবেন তিনি মানুষ হবেন না বরং তিনি মানুষ না হয়ে ফেরেশতা হওয়াটাই উচিত। কোরআন পাক বিভিন্ন জায়গায় তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার উত্তর বিভিন্ন প্রকারে দিয়েছে। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ ''যমীনের উপর যদি ফেরেশতারা বাস করতো, তাহলে আমি তাদের জন্য কোন ফেরেশতাকেই রসূল বানিয়ে পাঠাতাম।'' যার মূল কথা হলো এই যে,রেসালতের উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রসূল এবং যাদের মধ্যে রসূল পাঠানো হচ্ছে এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। বস্তুতঃ ফেশেতার সম্পর্ক থাকে ফেরেশতাদের সাথে আর মানুষের সম্পর্ক থাকে মানুষের সাথে। যখন মানুষের জন্য রসূল পাঠানোটাই উদ্দেশ্য, তখন কোন মানুষকেই রসূল বানানো উচিত।

এই আয়াতে এ বিষয়টিই অন্যভাবে বলা হয়েছে যে, এ কারণে এসব লোকের বিস্মিত হওয়া যে, মানুষকে কেন রসূল বানানো হলো এবং সে মানুষকেই বা কেন নাফরমান ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্র আযাবের ভীতি প্রদর্শন করার জন্য এবং যারা আল্লাহ্র ফরমাঁবরদার তাদেরকে সওয়াবের সুসংবাদ শুনিয়ে দেয়ার জন্য দায়িত্ব দেয়া হলো? এই বিস্ময় প্রকাশই একটা বিস্ময়ের বিষয়। কারণ, মানুষের কাছে মানুষকে রসূল করে পাঠোনোই তো বুদ্ধিমত্তার কাজ। আশ্চর্য হওয়ার কারণ তখনই হতো যদি মানুষের কাছে মানুষ না পাঠিয়ে ফেরেশতা বা অন্য কাউকে পাঠানো হতো।

أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ বাক্যের দ্বারা সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এখানে قدم অর্থ পা। যেহেতু পা-ই মানুষের চেষ্টা-তদবীর এবং উন্নতির চাবিকাঠি হয়ে থাকে, সেহেতু ভাবার্থ হিসেবে উচ্চমর্যাদাকে আরবীতে 'কদম' (পদমর্যাদা) বলে দেয়া হয়। আর 'সত্যের পা' বলে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, এই উচ্চমর্দাদা যা তাঁরা পাবে তা সত্য ও সুনিশ্চিত এবং তা চিরকাল থাকার মতো প্রতিষ্ঠিতও বটে। পৃথিবীর পদমর্যাদার মতো নয়। মোটকথা, . শব্দ ব্যবহার করে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, আখেরাতের পদমর্যাদা যেমন সত্য-সঠিক, তেমনি পরিপূর্ণ এবং চিরস্থায়ীও বটে। অতএব, বাক্যের অর্থ দাঁড়ালো এই যে, ঈমানদারদেরকে এ সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাঁদের জন্যে তাঁদের পালনকর্তার কাছে অনেক বড় সম্মানিত মর্যাদা রয়েছে যা তাঁরা নিশ্চিতই পাবে এবং পাওয়ার পর কখনো তা শেষ হয়ে যাবে না। চিরকালই তারা সেই সম্মানিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে। কোন কোন মুফাসসের বলেছেন, এক্ষেত্রে صدق শব্দ প্রয়োগের মাঝে এমন ইশারাও করা উদ্দেশ্য যে, বেহেশতের এসব উচ্চমর্যাদা একমাত্র সত্য নিষ্ঠা ও এখলাসের কারণেই পাওয়া যাবে। শুধু মৌখিকভাবে ঈমানের বাক্য উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মুখ এবং অন্তর উভয়টির মাধ্যমে নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনবে। যার অনিবার্য ফলাফল হলো নেক কাজের উপর পাবন্দী করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা।

তৃতীয় আয়াতে তওহীদকে এমন অনস্বীকার্য বাস্তবতার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করার মধ্যে অতঃপর সমস্ত কাজ-কর্ম পরিচালনার মধ্যে যখন আল্লাহ্ তাআলার কোন শরীক-অংশীদার নেই, তখন এবাদত-বন্দেগী এবং হুকুম পালনের ক্ষেত্রে অন্য কেউ কি করে শরীক হতে পারে? বরং এতে (এবাদতে) অন্য কাউকে শরীক করা একান্তই অবিচার এবং সীমালঙ্ঘনের শামিল। এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আসমান ও যমীনকে (আল্লাহ্ পাক) মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমাদের পরিভাষায় সময়ের সে পরিমাণকেই দিন বলা হয়, যা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সীমিত। আর এটা প্রকাশ্য যে, আসমান-যমীন ও তারকা—নক্ষত্রের সৃষ্টির পূর্বে সূর্যের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তাহলে সূর্য উঠা এবং সূর্য ডুবার হিসাব কি করে হবে? কাজেই (দিন বলতে) এখানে ঐ পরিমাণ সময় উদ্দেশ্য যা এই পৃথিবীতে সূর্য উঠা এবং ডুবার মাঝখানে হয়ে থাকে।

এই ছয় দিনের সামান্য সময়ে এতো বড় বিশ্ব যা আসমান, যমীন, তারকারাজি এবং এই বিশ্বে যত কিছু আছে সমস্তকে তৈরী করে দেয়া একমাত্র সে পবিত্র 'যাতে-খোদা-ওয়ান্দী'র পক্ষেই সম্ভব ছিল যিনি সমস্ত কিছুর উপরে কুদরত রাখেন। তাঁর সৃষ্টিকার্যের জন্য না আগে থেকে কোন উপকরণের প্রয়োজন, না কোন কারিগর বা খাদেমের প্রয়োজন। বরং আল্লাহ্ পাকের পরিপূর্ণ কুদরতের এমনই শান যে, যখনই তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন কোন বস্তু বা কারো সাহায্য ছাড়াই এক মুহূর্তে তৈরী করে ফেলেন। এই ছয় দিনের অবকাশও হয়ত কোন বিশেষ হেকমত এবং মঙ্গলের জন্যই গ্রহণ করা হয়েছিল। না হয় তিনি এই অসামান, যমীন এবং বিশ্বের সমস্ত কিছু এক মুহূর্তে তৈরী করে দিতে পারতেন। তারপর বলেছেন, ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ, আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কোরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ পাকের আরশ এমন এক সৃষ্টি যা সমস্ত আসমান, যমীন এবং সমগ্র বিশ্ব-জাহানকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। গোটা সৃষ্টিজগত তারই বেষ্টনীর মধ্যে আবর্তিত।

এ তিনটি আয়াতে সমগ্র সৃষ্টজগতের বহু নিদর্শন উল্লেখিত হয়েছে, যা আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর পূর্ণ কুদরত ও পরিপূর্ণ হেকমতের স্বাক্ষর বহন করে এবং এ দাবীর প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, আল্লাহ্ পাক বিশ্বকে ধ্বংসে করে গুড়িয়ে দিতে সক্ষম এবং পরে পুনরায় সেই কণাসমূহকে একত্রিত করে একেবারে নতুন অবস্থায় জীবিত করে হিসাব-নিকাশের পর পুরস্কার কিংবা শাস্তির আইন-জারী করবেন (আর এটাই বিবেক ও জ্ঞানের চাহিদা)।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا এখানে ضياء এবং

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُونَ ۝٧ أُولٰٓئِكَ
مَأْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝٨ إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمٰنِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ
الْأَنْهٰرُ فِي جَنّٰتِ النَّعِيمِ ۝٩ دَعْوٰىهُمْ فِيهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ
تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِينَ ۝١٠ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ
لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي
طُغْيٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝١١ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسٰنَ الضُّرُّ دَعَانَا
لِجَنْۢبِهٖٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ
كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَآ إِلٰى ضُرٍّ مَسَّهٗ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٢ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَمَّا ظَلَمُوا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوا
لِيُؤْمِنُوا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۝١٣ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ
خَلٰٓئِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝١٤

(৭) অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নির্দশনসমূহ সম্পর্কে বেখবর (৮) এমন লোকদের ঠিকানা হল আগুন সেসবের বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করছিল। (৯) অবশ্য যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন তাদের পালনকর্তা, তাদের ঈমানের মাধ্যমে। এমন সুসময় কাননকুঞ্জের প্রতি যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ (১০) সেখানে তাদের প্রার্থনা হল 'পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ্' । আর শুভেচ্ছা হল সালাম আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয়, 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্‌রজন্য' বলে।

(১১) আর যদি আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে যথাশীঘ্র অকল্যাণ পৌছে দেন যতশ্রীঘ্র তার কামনা করে, তাহলে তাদের আশাই শেষ করে দিতে হত। সুতরাং যাদের মনে আমার সাক্ষাতের আশা নেই, আমি তাদেরকে তাদের দুষ্টামীতে ব্যতিব্যস্ত ছেড়ে দিয়ে রাখি। (১২) আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়, শুয়ে বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট যখন চলে যায়, তখন মনে হয়, কখনো কোন কষ্টেরই সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। এমনিভাবে মনঃপূত হয়েছে নির্ভয় লোকদের যা তারা করেছে। (১৩) অবশ্য তোমাদের পূর্বে বহু দলকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন তারা জালেম হয়ে গেছে। অথচ রসূল তাদের কাছেও এসব বিষয়ের প্রকৃষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা ঈমান আনল না। এমনিভাবে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি পাপী সম্প্রদায়কে। (১৪) অতঃপর আমি তোমাদেরকে যমীনে তাদের পর প্রতিনিধি বানিয়েছি যাতে দেখতে পারি তোমরা কি কর।

نور উভয়টির অর্থই জ্যোতি ও ঔজ্জ্বল্য।

সে জন্যই বিশিষ্ট অভিধানবিদগণ এ দু'টি শব্দকে একই অর্থবোধক শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লামা যমখ্‌শরী এবং তায়েবী প্রমুখ বলেছেন যে, যদিও উভয় শব্দের মাঝেই জ্যোতি অর্থ বিদ্যমান, তথাপি نور শব্দটি ব্যাপক। দুর্বল সবল, ক্ষীণ-তীক্ষ্ম যে কোন জ্যোতিকেই নূর বলা যায়। কিন্তু ضوء এবং ضياء যে আলোতে তীক্ষ্মতা বিদ্যমান শুধু তাকেই বলা হয়। আর মানুষের উভয় রকমের আলোরই প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণ কাজকর্মের জন্য দিনের প্রখর আলোর প্রয়োজন, আর ছোট ছোট কাজের জন্য রাতের ক্ষীণ আলোই বেশী পছন্দনীয়। যদি দিনের বেলায়ও শুধু চাঁদের অনুজ্জ্বল আলোই থাকতো, তাহলে কাজকর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হতো। পক্ষান্তরে যদি রাতেও সূর্যের তীক্ষ্ম আলো থাকতো, তাহলে ঘুম এবং রাতের উপযুক্ত কাজে অসুবিধা হতো। কাজেই আল্লাহ্ পাক দু'ধরনের আলোর ব্যবস্থাই এমনভাবে করেছেন যে, সূর্যের আলোকে ضوء (যাও) এবং ضِيَآءً (যিয়া)-এর পর্যায়ে রেখেছেন। কাজকর্মের সময়ে তারই বিকাশের ব্যবস্থা করেছেন। আর চাঁদকে হাল্কা এবং মৃদু আলো দিয়ে বানিয়েছেন এবং রাতে তার প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। সূর্য এবং চাঁদের আলোর পার্থক্যের কথা কোরআন একাধিক জায়গায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে।

সূর্য ও চন্দ্রের পরিচালনা ব্যবস্থার মাঝে স্রষ্টার মহান নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে আরেকটি নির্দশন হচ্ছে— وَقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ - قدر শব্দটি تقدير শব্দ থেকে ঘটিত। تقدير অর্থ হল কোন বস্তুকে স্থান কাল অথবা গুণাবলী অনুযায়ী একটা বিশেষ পরিমাণের উপর স্থাপন করা।

مَنَازِلَ শব্দটি منزل এর বহুবচণ। এর প্রকৃত অর্থ নাযিল হওয়ার জায়গা। আল্লাহ্ পাক চন্দ্র-সূর্য উভয়ের চলার জন্য বিশেষ সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার প্রত্যেকটিকেই একেক منزل বলা হয়। চাঁদ যেহেতু প্রতি মাসে তার নিজস্ব পরিক্রমণ সমাপ্ত করে ফেলে, সেহেতু তার মনযিল হল ত্রিশ অথবা উনত্রিশটি। অথবা যেহেতু চাঁদ প্রতিমাসে কমপক্ষে একদিন লুক্কায়িত থাকে সেজন্যে সাধারণতঃ চাঁদের মনযিল আটশটি বলা হয়। আর সূর্যের পরিক্রমণ বছরান্তে পূর্ণ হয় বলে তার মনযিল হল তিনশ' ষাট অথবা পয়ষট্টি। আরবের প্রাচীন জাহেলিয়াত যুগে এবং জ্যোতির্বিদদের মতেও এই মনযিলগুলোর বিশেষ বিশেষ নাম সেসব নক্ষত্রের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছে যেগুলো সেসব মনযিলের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। কোরআন করীম এ সমস্ত প্রচলিত নামের বহু উর্ধ্বে। বস্তুতঃ কোরআনের উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র ঐটুকু দূরত্ব বোঝানো, যা চন্দ্র-সূর্য বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে অতিক্রম করে থাকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তি-নৈপুণ্যের বিশেষ বিশেষ প্রকাশক্ষেত্র আসমান-যমীন ও চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করে তওহীদ ও আখেরাতের আকীদা ও বিশ্বাসকে এক 'সালঙ্কার ভঙ্গিতে প্রমাণ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রথম তিনটিতে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব-জাহানের এমন মুক্ত, পরিচ্ছন্ন, নিদর্শন ও প্রমাণসমূহের পরে মানবকুল দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেছে। (এক) সে শ্রেণী যারা কুদরতের এসব নির্দর্শনের প্রতি আদৌ

মনোনিবেশ করেনি। না চিনেছে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা মালিককে, না এ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করেছে যে, আমরা দুনিয়ার সাধারণ জীব-জন্তুর মতই কোন জীব নই, আল্লাহ্ তাআলা যখন আমাদেরকে পৃথিবীর সমস্ত জীব-জন্তু অপেক্ষা বহুগুণ বেশী চেতনানুভূতি ও জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টিকে যখন আমাদেরই সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন, তখন হয়তোবা আমাদের প্রতিও কিছু দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে থাকবেন এবং সে সবের জন্য হিসাব-নিকাশ দিতে হবে আর সেজন্য একটা হিসাবের দিন বা প্রতিদান দিবসেরও প্রয়োজন। কোরআনের পরিভাষায় যাকে কেয়ামত ও হাশর-নশর বলে অভিহিত করা হয়েছে। বরং তারা নিজেদের জীবনকে সাধারণ জীব-জানোয়ারের পর্যায়েই রেখে দিয়েছে। প্রথম দুই আয়াতে এ শ্রেণীর লোকদের বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের পরকালীন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে—'আমার নিকট আসার ব্যাপারে যেসব লোকের মনে কোন ধারণা-কল্পনাও নেই, তাদের অবস্থা হল এই যে, তারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন ও তার অনন্ত অসীম সুখ-দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে।'

দ্বিতীয়তঃ 'পৃথিবীতে তারা এমন নিশ্চিত হয়ে বসেছে যেন এখান থেকে আর কোথাও যেতেই হবে না; চিরকালই যেন এখানে থাকবে। কখনোও তাদের একথা মনে হয় না যে, এ পৃথিবী থেকে প্রত্যেকটি লোকের বিদায় নেয়া এমন বাস্তব বিষয় যে, এতে কখনো কোন সন্দেহ হতে পারে না। তাছাড়া এখান থেকে নিশ্চিতই যখন যেতে হবে, তখন যেখানে যেতে হবে, সেখানকার জন্যও তো খানিকটা প্রস্তুতি নেয়া কর্তব্য ছিল।'

তৃতীয়তঃ ''এসব লোক আমার নিদর্শনাবলী ও আয়াতসমূহের প্রতি ক্রমাগত গাফেলতী করে চলেছে। এরা যদি আসমান-যমীন কিংবা এ দুয়ের মধ্যবর্তী সাধারণ সৃষ্টি অথবা, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটুও চিন্তা-ভাবনা করত, তাহলে বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া কঠিন হত না এবং তাতে করে তারা এহেন মূর্খজনোচিত গাফেলতীর গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারত।''

এ সমস্ত লোক যাদের এসব লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে আখেরাতে তাদের শাস্তি হল এই যে, এদের ঠিকানা হবে জাহান্নামের আগুন। আর এ শাস্তি স্বয়ং তাদের কৃতকর্মেরই পরিণতি।

পরবর্তী আয়াতে সে সমস্ত ভাগ্যবান লোকদেরও আলোচনা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তাআলার কুদরত তথা মহাশক্তির নির্দেশাবলী সম্পর্কে গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং সেগুলোকে চিনেছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ঈমানের চাহিদা মোতাবেক সৎকর্ম সম্পাদনে নিয়ত নিয়োজিত রয়েছে,

কোরআন করীম সেসব মহান ব্যক্তিদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে যে কল্যাণকর প্রতিদান নির্ধারণ করেছে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছে اولئك يهديهم ربهم অর্থাৎ, তাঁদের পরওয়ারদেগার তাঁদেরকে তাঁদের ঈমানের কারণে মনযিলে-মকসূদ বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন যেখানে সুখ ও শান্তিময় কাননকুঞ্জে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে।

এতে 'হেদায়েত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত অর্থ হল পথপ্রদর্শন এবং রাস্তা দেখানো। আবার কখনো উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দেয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য। আর মনযিলে-মকসূদে বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বলতে জান্নাতকে বোঝানো হয়েছে যার বিশ্লেষণ করা হয়েছে পরবর্তী শব্দে। প্রথম শ্রেণীর লোকদের শাস্তি যেমন তাদের কৃতকর্মের জন্য ছিল, তেমনিভাবে দ্বিতীয় এই মুমিন প্রতিদান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই উত্তম প্রতিদান তাঁরা তাঁদের ঈমানের জন্য পাবেন। আর যেহেতু ঈমানের সাথে সাথে সৎকর্মের কথাও আলোচিত হয়েছে কাজেই এখানে ঈমান বলতে সে ঈমানকেই উদ্দেশ করা হয়েছে, যার সাথে সৎকর্মও বিদ্যমান থাকবে। ঈমান ও সৎকর্মের প্রতিদানই ছিল সুখ-শান্তির আলয় জান্নাত।

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ এখানে دعوى শব্দটি তার নির্ধারিত দাবী অর্থে ব্যবহৃত হয়নি যা কোন বাদী তার প্রতি পক্ষের বিরুদ্ধে করে থাকে, বরং এখানে دعوى অর্থ হল দোয়া। সুতরাং এর মর্মার্থ হল এই যে, জান্নাতে পৌছার পর জান্নাতবাসীদের দোয়া বা প্রার্থনা হবে এই যে, তারা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' অর্থাৎ, তাঁরা আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকবেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সাধারণ পরিভাষায় তো 'দোয়া' বলা হয় কোন বিষয়ের আবেদন এবং কোন উদ্দেশ্য যাত্রা করাকে, কিন্তু سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ সুবহানাকাল্লাহুম্মা-তে কোন আবেদন কিংবা কোন কিছুর প্রার্থনা, নেই একে দোয়া বলা যায় কেমন করে?

এর উত্তর এই যে, এ বাক্যের দ্বারা এ কথাই বোঝানো উদ্দেশ্য যে, জান্নাতাবাসীরা জান্নাতে যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও যাবতীয় চাহিদা সতস্ফূর্তভাবে পেতে থাকবেন; কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করতে কিংবা চাইতে হবে না। কাজেই বাসনা-প্রার্থনা ও প্রচলিত দোয়ার অনুরূপ বাক্য তাদের মুখে আবৃত্ত হতে থাকবে। অবশ্য তাও পার্থিব জীবনের মত অবশ্যকরণীয় কোন এবাদত হিসাবে নয়, বরং তারা এ বাক্যের জপ করে স্বাদানুভব করবেন এবং সানন্দ চিত্তে সুবহানাকাল্লাহুম্মা বলতে থাকবেন। এছাড়া এক হাদীসে কুদ্সীতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'যে বান্দা আমার প্রশংসাকীর্তনে সতত নিয়োজিত থাকে এবং এমনকি নিজের প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করার সময় পর্যন্ত তার থাকে না, আমি তাকে সমস্ত প্রার্থনাকারী অপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করব, বিনা প্রার্থনায় তার যাবতীয় কাজ পূর্ণ করে দেব।' এ হিসাবেও সুবহানাকাল্লাহুম্মা বাক্যটিকে দোয়া বলা যেতে পারে।

এ অর্থেই বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর সামনে যখনই কোন কষ্ট কিংবা পেরেশানী উপস্থিত হত, তখন তিনি এ দোয়া পড়তেন।

لا اله الا الله العظيم الحليم - لا اله الا الله رب العرش العظيم - لا اله الا الله رب السموات والارض ورب العرش الكريم -

আর ইমাম তারাবী বলেছেন যে, পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ একে 'দোয়ায়ে কারব' তথা বিপদের দোয়া বলে অভিহিত করতেন এবং যে কোন বিপদাপদ ও মানসিক পেরেশানীর সময় এ বাক্যগুলো পড়ে দোয়া-প্রার্থনা করতেন।— (তফসীরে কুরতুবী)

ইমাম ইবনে জরীর ও ইবনে মানযার প্রমুখ এমন এক রেওয়ায়েতও উদ্ধৃত করেছেন যে, জান্নাতবাসীদের যখন কোন জিনিসের প্রয়োজন কিংবা বাসনা হবে, তখন তারা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বলবেন এবং এ

বাক্যটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাগণ তাদের আরাধ্য বস্তু এনে উপস্থিত করে দেবেন। 'বস্তুতঃ সুবহানাকাল্লাহুম্মা বাক্যটি যেন জান্নাতবাসীদের একটি পরিভাষা হবে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের বাসনা প্রকাশ করে থাকবেন আর ফেরেশতাগণ প্রতিবারই তা পূরণ করে দেবেন।— (রূহুল মা'আনী, কুরতুবী) সুতরাং এ হিসাবেও 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বাক্যটিকে দোয়া বলা যেতে পারে।

জান্নাতবাসীদের দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ প্রচলিত অর্থে تحية বলা হয় এমন শব্দ বা বাক্যকে যার মাধ্যমে কোন আগন্তুক কিংবা অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। অর্থাৎ, যেমন, সালাম স্বাগতম, খোশ আমদেদ, কিংবা আহ্‌লান ওয়া সাহ্‌লান প্রভৃতি। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা অথবা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে জান্নাতবাসীদেরকে — সলাম -এর মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হবে। অর্থাৎ, এ সুসংবাদ দেয়া হবে যে, তোমরা যে কোন রকম কষ্ট ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে হেফাজতে থাকবে। এ সালাম স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন, সূরা ইয়াসীনে রয়েছে— سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ আবার ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন, অন্যত্র এরশাদ হয়েছে وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُم অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ প্রতিটি দরজা দিয়ে 'সালামুন আলাইকুম' বলতে বলতে জান্নাতাবাসীদের কাছে আসতে থাকবেন। আর এ দু'টি বিষয়ে বিরোধ-বৈপরিত্ব নেই যে, কখনো সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এবং কখনো ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সালাম আসবে। সালাম শব্দটি যদিও পৃথিবীতে দোয়া হিসাবেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু জান্নাতে পৌছে যখন যাবতীয় উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যাবে, তখন এ বাক্যটি দোয়ার পরিবর্তে সুসংবাদের বাক্য হিসেবে ব্যবহার হবে।— (রূহুল মা'আনী)

জান্নাতবাসীদের তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ, জান্নাতবাসীদের সর্বশেষ দোয়া হবে الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে পৌছার পর আল্লাহ্ তাআলার মা'রেফাত বা পরিচয়ের ক্ষেত্রে (বিপুল) উন্নতি লাভ করবে। যেমন, হযরত শিহাব উদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী (রহঃ) তাঁর এক পুস্তিকায় বলেছেন যে, জান্নাতে পৌছে সাধারণ জান্নাতবাসীদের জ্ঞান ও মা'রেফাতের এমন স্তর লাভ হবে, যেমন পার্থিব জীবনে ওলামাদের হয়ে থাকে। আর ওলামাগণ সে স্তরে উন্নীত হবেন, যা এখানে নবী রসূলগণের হত। আর নবী-রসূলগণ সে স্তর প্রাপ্ত হবেন, যা পৃথিবীতে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) পেয়েছিলেন। হয়তো বা এই স্তরের নামই হবে 'মাকামে মাহমুদ' যার জন্য আযানের পর তিনি দোয়া করতে বলেছেন।

সারকথা হল এই যে, জান্নাতবাসীদের প্রাথমিক দোয়া হবে سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ আর সর্বশেষ দোয়া হবে الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ এতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের গুণ-বৈশিষ্ট্যের দু'টি প্রকারভেদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটি 'সিফাতে জালালী' তথা পরাক্রম ও মহত্ত্ব গুণ যাতে যাবতীয় দোষত্রুটি হতে আল্লাহ্ তাআলার পবিত্রতার কথা ব্যক্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি হল 'সিফাতে করম' যাতে তাঁর মহানুভবতা, পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে। কোরআন করীমের تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ আয়াতে এতদুভয় প্রকার বৈশিষ্ট্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, সুবহানত্ব' আল্লাহ্ তাআলার জালালী গুণের অন্তর্ভুক্ত। আর তা'রীফ প্রশংসার অধিকারী হওয়া মহানুভবতা সংক্রান্ত গুণের অন্তর্ভুক্ত। স্বাভাবিক বিন্যাস অনুযায়ী জালালী বৈশিষ্ট্য করুণা ও মহানুভবতা গুণের অগ্রবর্তী। সে কারণেই জান্নাতবাসীরা প্রথমে তাঁর জালালী গুণ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ বাক্যে বর্ণনা করবেন এবং সর্বশেষে মহানুভবতা গুণ প্রকাশ করবেন الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলে। আর এই হবে তাঁদের রাত-দিনের কর্ম।

এ তিনটি আয়াতের স্বাভাবিক ক্রমবিন্যাস হচ্ছে এই যে, জান্নাতবাসীরা যখন سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ বলবেন, তখন এর উত্তরে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম দেয়া হবে এবং এর ফলে তারা الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলবেন।— (রুহুল-মা'আনী)

দোয়া প্রার্থনাকারীর পক্ষে দোয়া শেষে واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين বলা মুস্তাহাব। এতদসঙ্গে সূরা সাফ্‌ফাতের শেষ আয়াতগুলো অর্থাৎ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ - وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ পড়ে নেয়া অধিকতর উত্তম।

উল্লেখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথমটির সম্বন্ধ সেসব লোকের সাথে যারা আখেরাতে অবিশ্বাসী। সে জন্যই যখন তাদেরকে আখেরাতের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়, তখন বিদ্রূপচ্ছলে বলতে থাকে যে, যদি তুমি সত্যবাদীই হয়ে থাক, তবে এখনই এ আযাব ডেকে আন। অথবা বলে, যদি তুমি সত্যবাদীই হয়ে থাক, অথবা বলে, এ আযাব শীঘ্র কেন আসে না? যেমন, নযর ইবনে হারেস বলেছিল ঃ 'আয় আল্লাহ্, একথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আকাশ থেকে অমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন কিংবা এর চেয়েও কোন কঠিন আযাব পাঠিয়ে দিন।'

১১ নং আয়াতে এরই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়েই ক্ষমতাশীল, প্রতিশ্রুত সে আযাব এক্ষণেই নাযিল করতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর মহান হেকমত ও দয়া-করুণার দরুন এ মূর্খরা নিজের জন্য যে বদ্‌দোয়া করে এবং বিপদ ও অকল্যাণ কামনা করে তা নাযিল করেন না। যদি আল্লাহ্ তাআলা তাদের বদদোয়াগুলোও তেমনিভাবে যথাশীঘ্র কবূল করে নিতেন, যেভাবে তাদের ভাল দোয়াগুলো কবূল করেন, তাহলে এরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কল্যাণ ও মঙ্গলের শুভ দোয়া-প্রার্থনার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার রীতি হচ্ছে যে, অধিকাংশ সময় তিনি সেগুলো শীঘ্র কবূল করে নেন। অবশ্য কখনো কোন হেকমত ও কল্যাণের কারণে কবূল না হওয়া এর পরিপন্থী নয়। কিন্তু মানুষ যে কখনো নিজেদের অজান্তে এবং কখনো দুঃখ-কষ্ট ও রাগের বশে নিজের কিংবা নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য বদদোয়া করে বসে, অথবা আখেরাতের প্রতি অস্বীকৃতির দরুন আযাবকে প্রহসন মনে করে নিজের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে সেগুলো তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবূল করেন না; বরং অবকাশ দেন, যাতে অস্বীকারকারীরা বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করে নিজেদের অস্বীকৃতি থেকে ফিরে আসার সুযোগ পায় এবং কোন সাময়িক দুঃখ-কষ্ট, রাগ-রোষ কিংবা যদি মনোবেদনার কারণে বদদোয়া করে বসে, তাহলে সে

যেন নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ লক্ষ্য করে, তার পরিণতি বিবেচনা করে তা থেকে বিরত হবার অবকাশ পেতে পারে।

ইমাম জরীর তাবারী (রহঃ) কাতাদাহ (রাঃ)-এর রেওয়াতেক্রমে এবং বোখারী ও মুসলিম মুজাহিদ (রহঃ)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করছেন যে, এক্ষেত্রে বদদোয়ার মর্ম এই যে, কোন কোন সময় কেউ কেউ রাগতঃ নিজের সন্তান-সন্ততি কিংবা অর্থ-সম্পদ ধ্বংসের বদদোয়া করে বসে কিংবা বস্তু-সামগ্রীর প্রতি অভিসম্পাত করতে আরম্ভ করে—আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় করুণা ও মহানুভবতাবশতঃ সহসাই এসব দোয়া কবুল করেন না। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ 'আমি আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা জানিয়েছি, যেন তিনি কোন বন্ধু-স্বজনের বদদোয়া তার বন্ধু-স্বজনের ব্যাপারে কবুল না করেন।' আর শাহ্‌র ইবনে হাওশাব (রহঃ) বলেছেন, আমি কোন কোন কিতাবে পড়েছি, যেসব ফেরেশতা মানুষের প্রয়োজন সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণায় তাদেরকে এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যে, আমার বন্দা দুঃখ-কষ্টের দরুন কিংবা রাগবশতঃ কোন কথা বলে ফেললে তা লিখবে না।—(কুরতুবী)

তারপরেও কোন কোন সময় এমন কবুলিয়ত বা মঞ্জুরীর সময় আসে, যখন মানুষের মুখ থেকে যে কোন কথা বের হয়, তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে যায়। সেইজন্য রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, নিজের সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-সম্পদের জন্য কখনো বদদোয়া করো না। এমন যেন না হয় যে, সে সময়টি হয় মঞ্জুরীর সময় এবং দোয়া সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়। আর পরে তোমাদেরকে অনুতাপ করতে হয়। সহীহ্ মুসলিমে এ হাদীসটি হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়াতেক্রমে গযওয়ায়ে 'বাওয়াত'-এর ঘটনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে একত্ববাদ ও আখেরাত অস্বীকারকারী লোকদেরকে আরেক অপরূপ সালঙ্কার ভঙ্গিতে স্বীকার করানো হয়েছে। তাহল এই যে, সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় এরা আল্লাহ্ ও আখেরাতের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়, অন্যান্যদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করে এবং তাদেরই কাছে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করে, কিন্তু যখন কোন বিপদে পড়ে তখন এরা নিজেরাও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত লক্ষ্যস্থলের প্রতি নিরাশ হয়ে গিয়ে শুধু আল্লাহ্‌কেই ডাকতে আরম্ভ করে। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় একমাত্র তাঁকেই ডাকতে বাধ্য হয়। অথচ তাঁরই সাথে তাদের অনুগ্রহ বিমুখতার অবস্থা হল এই যে, যখনই আল্লাহ্ তাআলা তাদের বিপদাপদ দূর করে দেন, তখনই আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারে এমন মুক্ত-নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, যেন কখনো তাঁকে ডাকেইনি, তার কাছে যেন কোন বাসনাই প্রার্থনা করেনি। এতে বোঝা যাচ্ছে, মানুষের বাসনা পূরণে আল্লাহ্ তাআলার সাথে যারা অপর কাউকে শরীক করে তারা নিজেও তাদের সে বিশ্বাসের অসারতা, উপলব্ধি করে কিন্তু একান্ত বিদ্বেষ ও জেদের বশেই সে বাতিল বিশ্বাসে অটল থাকে।

তৃতীয় আয়াতে ও দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুরই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কেউ যেন আল্লাহ্ তাআলার অবকাশ দানের কারণে এমন ধারণা করে না বসে যে, পৃথিবীতে আযাব আসতেই পারে না। বিগত জাতি-সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং তাদের ঔদ্ধত্য ও কৃতঘ্নতার সাক্ষিস্বরূপ বিভিন্ন রকম আযাব এ পৃথিবীতেই এসে গেছে। আল্লাহ্ তাআলা নবীকুল শিরমণি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দৌলতে এ ওয়াদা করে নিয়েছেন যে, কোন সাধারণ ব্যাপক আযাব এ উম্মতের উপর আসবে না। ফলে আল্লাহ্ তাআলার এহেন করুণা, অনুগ্রহ এসব লোককে এমন নির্ভয় করে দিয়েছে যে, তারা একান্ত দুঃসাহসের সাথে আল্লাহ্‌র আযাবকে আমন্ত্রণ জানাতে এবং তার দাবী করতে তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ তাআলার আযাব সম্পর্কে এ নিশ্চিন্ততা কোন অবস্থাতেই তাদের জন্য সমীচীন ও কল্যাণকর নয়। কারণ, গোটা উম্মত এবং সমগ্র বিশ্বের উপর ব্যাপক আযাব না পাঠাবার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উপর আযাব নেমে আসা অসম্ভব নয়।

ثُمَّ جَعَلْنَٰكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِى ٱلْأَرْضِ مِنۢ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

অর্থাৎ, অতঃপর পূর্ববর্তী জাতি-সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর আমি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছি এবং পৃথিবীর খেলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব তোমাদের হাতে অর্পণ করে দিয়েছি। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করো না যে, পৃথিবীর খেলাফত (শুধু) তোমাদের ভোগ-বিলাসের জন্যই তোমাদের হাতে অর্পন করা হয়েছে। বরং এই মর্যাদা ও সম্মান দানের পেছনে আসল উদ্দেশ্য হল তোমাদের পরীক্ষা নেয়া যে, তোমরা কেমন কার্যকলাপ অবলম্বন কর—বিগত উম্মতদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থার সংশোধন কর, নাকি রাষ্ট্র ও ধন-দৌলতের নেশায় উন্মত্ত হয়ে পড়।

এতে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, পৃথিবীর সাম্রাজ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কোন গর্ব-অহংকারের বিষয় নয়; বরং একটি ভারী বোঝা, যাতে রয়েছে বহু দায়-দায়িত্ব।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۙ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي
أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ
إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ
فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ
افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ قُلْ
أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ
إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ
رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾ وَيَقُولُونَ
لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا
الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾

(১৫) আর যখন তাদের কাছে আমার প্রকৃষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে সমস্ত লোক বলে, যাদের আশা নেই আমার সাক্ষাতের, নিয়ে এসো কোন কোরআন এটি ছাড়া, অথবা একে পরিবর্তিত করে দাও। তাহলে বলে দাও, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তিত করা আমার কাজ নয়। আমি সে নির্দেশেরই আনুগত্য করি, যা আমার কাছে আসে। আমি যদি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নাফরমানী করি, তবে কঠিন দিবসের আযাবের ভয় করি। (১৬) বলে দাও, যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে আমি এটি তোমাদের সামনে পড়তাম না, আর নাইবা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করতেন এ সম্পর্কে। কারণ, আমি তোমাদের মাঝে ইতিপূর্বেও একটা বয়স অতিবাহিত করেছি। তারপরেও কি তোমরা চিন্তা করবে না? (১৭) অতঃপর তার চেয়ে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে অভিহিত করছে? কস্মিনকালেও পাপীদের কোন কল্যাণ হয় না। (১৮) আর উপাসনা করে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি পূতঃ-পবিত্র ও মহান সে সমস্ত, থেকে যাকে তোমরা শরীক করছ। (১৯) আর সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল, পরে পৃথক হয়ে গেছে। আর একটি কথা যদি তোমার পরওয়ায়রদেগারের পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত না হয়ে যেত; তবে তারা যে বিষয়ে বিরোধ করছে তার মীমাংসা হয়ে যেত। (২০) বস্তুতঃ তারা বলে, তাঁর কাছে তাঁর পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ এল না কেন? বলে দাও, গায়বের কথা আল্লাহ্‌ই জানেন। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৫ থেকে ১৮ এ চার আয়াতে আখেরাতের প্রতি অস্বীকারকারীদের একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং অন্যায় আবদারের খন্ডন করা হয়েছে। এসব লোক না জানত আল্লাহ্ তা'আলার মা'রেফাত, না ওহী ও রেসালত সম্পর্কিত কোন পরিচয়। নবী-রসূলগণকেও সাধারণ মানুষের মত মনে করত। যে কোরআন করীম রসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে পৌছেছে তার সম্পর্কে এদের ধারণা ছিল এই যে, এটি স্বয়ং তাঁরই কালাম, তাঁরই রচনা। এ ধারণার প্রেক্ষিতেই তারা মহানবী (সাঃ)-এর কাছে দাবী জানায় যে, কোরআন এটি তো আমাদের বিশ্বাস ও মতবাদের বিরোধী; যে মূর্তি-বিগ্রহকে আমাদের পিতা-পিতামহ সততঃ সম্মান করে এসেছে এবং এগুলোকে সিদ্ধিদাতা হিসাবে মান্য করে এসেছে, কোরআন সে সমুদয়কে বাতিল ও পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করে। তদুপরি কোরআন আমাদের বলে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে এবং সেখানে হিসাব-নিকাশ হবে। এসব বিষয় আমাদের বুঝে আসে না। আমরা এসব মানতে রাযী নই। সুতরাং হয় আপনি এ কোরআনের পরিবর্তে অন্য কোরআন তৈরী করে দিন যাতে এসব বিষয় থাকবে না, আর না হয় অন্ততঃ এতেই সংশোধন করে সে বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দিন।

কোরআন করীম প্রথমে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার লক্ষ্যে মহানবী (সাঃ)-কে হেদায়েত দান করেছে যে, আপনি তাদের বলে দিন : এটি আমার কালামও নয় এবং নিজের ইচ্ছামত আমি এতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধনও করতে পারি না। আমি তো শুধুমাত্র খোদায়ী ওহীর তাবেদার। আমি আমার ইচ্ছামত এতে যদি সামান্যতম পরিবর্তনও করি, তাহলে অতি কঠিন গোনাহ্গার হয়ে পড়ব এবং নাফরমানদের জন্যে যে আযাব নির্ধারিত রয়েছে, আমি তার ভয় করি। কাজেই আমার পক্ষে এমনটি অসম্ভব।

কাফের ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি-দেশভিত্তিক জাতীয়তা অর্থহীন : وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً অর্থাৎ, সমস্ত আদম সন্তান প্রথমে একত্ববাদে বিশ্বাসী একই উম্মত ও একই জাতি ছিল। শিরক ও কুফরের নামও ছিল না। পরে একত্ববাদে মতবিরোধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়।

একই উম্মত এবং সবার মুসলমান থাকার সময়কাল কত দিন এবং কবে ছিল? হাদীস ও সীরাতের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগ পর্যন্ত এমনি অবস্থা ছিল। নূহ (আঃ)-এর যুগে এসেই কুফর ও শেরক আরম্ভ হয়, যার ফলে হযরত নূহ (আঃ)-কে এর মোকাবেলা করতে হয়।—(তফসীরে মাযহারী)

একথাও সুবিদিত যে, হযরত আদম থেকে হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগ পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ সময়ে পৃথিবীতে মানব বংশ ও জনপদ যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ সমুদয় মানুষের মাঝে বর্ণ ও আকার-অবয়ব এবং জীবন ধারণ পদ্ধতিতে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়ার পর রাষ্ট্রগত পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও নিশ্চিত। আর হয়তো কথাবার্তায় ভাষাগতও কিছু পার্থক্য হয়ে

وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ
فِيْٓ اٰيَاتِنَا ؕ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ؕ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ﴿٢١﴾
هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ وَ
جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ
وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا
اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ
مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؗ
ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾ اِنَّمَا مَثَلُ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ
الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ
زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ
اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ
بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَاللّٰهُ
يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾

(২১) আর যখন আমি আস্বাদন করাই স্বীয় রহমত সে কষ্টের পর, যা তাদের ভোগ করতে হয়েছিল, তখনই তারা আমার শক্তিমত্তার মাঝে নানা রকম ছলনা তৈরী করতে আরম্ভ করবে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ সবচেয়ে দ্রুত কলা-কৌশল তৈরী করতে পারেন। নিশ্চয়ই আমাদের ফেরেশতারা লিখে রাখে তোমাদের ছল-চাতুরী। (২২) তিনিই তোমাদের ভ্রমন করান স্থলে ও সাগরে। এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূহে আরোহণ করলে আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল এবং তাতে তারা আনন্দিত হল, নৌকাগুলোর উপর এল তীব্র বাতাস, আর সর্বদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল এবং তারা জানতে পারল যে, তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল আল্লাহ্কে তাঁর এবাদতে নিঃস্বার্থ হয়ে 'যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোল, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। (২৩) তারপর যখন তাদেরকে আল্লাহ্ বাঁচিয়ে দিলেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অনাচার করতে লাগল অন্যায়ভাবে। হে মানুষ শোন, তোমাদের অনাচার তোমাদেরই উপর পড়বে। পার্থিব জীবনের সুফল ভোগ করে নাও—অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি বাতলে দেব, যাকিছু তোমরা করতে। (২৪) পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম, পরে তা মিলিত-সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে যমীনের শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এল যা মানুষ ও জীব-জন্তুরা খেয়ে থাকে। এমনকি যমীন যখন সৌন্দর্য-সুষমায় ভরে উঠল আর যমীনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল, এগুলো আমাদের হাতে আসবে, হঠাৎ করে তার উপর আমার নির্দেশ এল রাত্রে কিংবা দিনে, তখন সেগুলোকে কেটে স্তুপাকার করে দিল যেন কালও এখানে কোন আবাদ ছিল না। এমনিভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি নিদর্শনসমূহ সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা লক্ষ্য করে। (২৫) আর আল্লাহ্ শান্তি-নিরাপত্তার আলয়ের প্রতি আহ্বান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করেন।

গিয়েছিল। কিন্তু কোরআন করীম এই বংশগত, অঞ্চলগত, বর্ণগত ও রাষ্ট্রগত পার্থক্যকে যা একান্তই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক—উম্মতের ঐক্যের অন্তরায় বলে সাব্যস্ত করেনি এবং এই পার্থক্যের কারণে আদম সন্তানকে বিভিন্ন জাতি কিংবা বিভিন্ন উম্মতও বলেনি, বরং 'উম্মতেওয়াহেদাহ্' তথা একই জাতি বলে অভিহিত করেছে।

অবশ্য যখন ঈমানের বিরুদ্ধে কুফরী ও শেরেকী বিস্তার লাভ করে, তখন কাফের ও মুশরিককে পৃথক জাতি, পৃথক সম্প্রদায় সাব্যস্ত করে বলেছে هُوَالَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ কোরআন করীমের আয়াত এ বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট আদম সন্তানদিগকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করার বিষয় শুধু ঈমান ও ইসলাম বিমুখতা। বংশগত ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের দরুন জাতিসমূহ পৃথক হয় না। ভাষা, দেশ কিংবা গোত্র-বর্ণের ভিত্তিতে মানুষকে বিভিন্ন সম্প্রদায় সাব্যস্ত করা মূর্খতার একটা নয়া দৃষ্টান্ত যা আধুনিক প্রগতির সৃষ্টি। আজকের বহু লেখা-পড়া জানা লোক এই ন্যাশনালিজম তথা জাতীয়তাবাদের পেছনে লেগে আছে। অথচ এরা হাজার রকমের দাঙ্গা বিশৃংখলায় জড়িয়ে রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا আরবী অভিধান অনুসারে مَكْرٌ বলা হয় গোপন পরিকল্পনাকে, যা ভালও হতে পারে এবং মন্দও হতে পারে। উর্দু (কিংবা বাংলা) পরিভাষার দরুন ধোকা খাওয়া উচিত নয় যে, উর্দু (কিংবা বাংলায়) مَكْرٌ বলা হয় ধোকা, প্রতারণা, ফেরেববাজী প্রভৃতি অর্থে, যা থেকে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র।

اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ – অর্থাৎ, তোমাদের অন্যায়-অনাচারের বিপদ তোমাদেরই উপর পড়ছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, জুলুমের কারণে বিপদ অবশ্যম্ভাবী এবং দুনিয়াতেও তা ভোগ করতে হয়।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা আত্মীয়-বাৎসল্য ও অনুগ্রহের বদলাও শীঘ্রই দান করেন। (আখেরাতের পূর্বে পৃথিবীতেই এর বরকত পরিলক্ষিত হতে আরম্ভ করে। তেমনিভাবে) অন্যায় অত্যাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বদলাও শীঘ্রই দান করেন। (দুনিয়াতেই তা ভোগ করতে হয়। এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজা নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।) অন্য এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, তিন প্রকার পাপ এমন রয়েছে, যার অশুভ পরিণতি তার কর্তার উপরই পতিত হয়। তা হল জুলুম, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও ধোঁকা-প্রতারণা।—(আবুশ্শায়খ ইবনে মারদুবিয়াহ্ কর্তৃক তাঁর তফসীরে বর্ণিত ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।)

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে শান্তির আলয়ের দিকে আহবান করেন। অর্থাৎ, এমন গৃহের প্রতি আমন্ত্রণ জানান যাতে রয়েছে সর্ববিধ নিরাপত্তা ও শান্তি। না আছে তাতে কোন রকম দুঃখ-কষ্ট, না আছে ব্যথা-বেদনা, না আছে রোগ-তাপের ভয় আর নাইবা আছে ধ্বংস।

'দারুসসালাম'-এর মর্মার্থ হল জান্নাত। একে 'দারুসসালাম' বলার এক কারণ হল এই যে, প্রত্যেকেই এখানে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও প্রশান্তি

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا
ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا
السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ
جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ۚ
فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾
فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ
لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ
مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾ قُلْ مَنْ
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ
مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ
الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ
فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ
حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

(২৬) যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশী। আর তাদের মুখমন্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। তারাই হল জান্নাতবাসী, এতেই তারা বসবাস করতে থাকবে অনন্তকাল। (২৭) আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ—অসৎ কর্মের বদলায় সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলেব। কেউ নেই তাদেরকে বাঁচাতে পারে আল্লাহ্র হাত থেকে। তাদের মুখমন্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আঁধার রাতের টুকরো দিয়ে। এরা হল দোযখবাসী। এরা এতেই থাকবে অনন্তকাল। (২৮) আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে সমবেত করব; আর যারা শেরক করত তাদেরকে বলব ঃ তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও—অতঃপর তাদেরকে পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন করে দেব, তখন তাদের শরীকরা বলবে, তোমরা তো আমাদের উপাসনা-বন্দেগী করনি। (২৯) বস্তুতঃ আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। আমরা তোমাদের বন্দেগী সম্পর্কে জানতাম না। (৩০) সেখানে প্রত্যেকে যাচাই করে নিতে পারবে যাকিছু সে ইতিপূর্বে করেছিল এবং আল্লাহ্র প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে যিনি তাদের প্রকৃত মালিক, আর তাদের কাছ থেকে দূরে যেতে থাকবে যারা মিথ্যা বলত। (৩১) তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃত্যুকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ্। তখন তুমি বলো, তারপরেও ভয় করছ না? (৩২) অতএব, এ আল্লাহ্ই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। আর সত্য প্রকাশের পরে (উদ্‌ভ্রান্ত ঘুরার মাঝে) কি রয়েছে গোমরাহী ছাড়া—সুতরাং কোথায় ঘুরছ? (৩৩) এমনিভাবে সপ্রমাণিত হয়ে গেছে তোমার পরওয়ারদেগারের বাণী সেসব নাফরমানের ব্যাপারে যে, এরা ঈমান আনবেনা।

লাভ করবে। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, জান্নাতের নাম দারুসসালাম এজন্য রাখা হয়েছে যে, এতে বসবাসকারীদের প্রতি সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও সালাম পৌঁছতে থাকবে। বরং সালাম শব্দই হবে জান্নাতবাসীদের পরিভাষা, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের মনোবাসনা ব্যক্ত করবেন এবং ফেরেশতাগণ তা সরবরাহ করে দেবেন। যেমন, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে।

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'আয (রহঃ) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে নসীহত হিসেবে জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ হে আদম সন্তানগণ, তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা দারুসসালামের দিকে আহবান করেছেন, তোমরা এ খোদায়ী আহবানে কবে এবং কোথা থেকে সাড়া দেবে? ভাল করে জেনে রাখ, এ আহবান গ্রহণ করার জন্য যদি তোমরা পৃথিবী থেকেই চেষ্টা করতে আরম্ভ কর, তাহলে সফলকাম হবে এবং তোমরা দারুসসালামে পৌঁছে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা পার্থিব এ বয়স নষ্ট করার পর মনে কর যে, কবরে পৌঁছে এই আহবানের প্রতি চলতে আরম্ভ করব, তাহলে তোমাদের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হবে। তখন সেখান থেকে আর এক ধাপও আগাতে পারবে না। কারণ, তা কর্মস্থল নয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'দারুসসালাম' হল জান্নাতের সাতটি নামের একটি। – (তফসীরে-কুরতুবী)

এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দুনিয়াতে কোন ঘরের নাম 'দারুসসালাম' রাখা সমীচীন নয়। যেমন, জান্নাত কিংবা ফেরদৌস প্রভৃতি নাম রাখা জায়েয নয়।

অতঃপর উল্লেখিত আয়াতে এরশাদ হয়েছে– وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সরল পথে পৌঁছে দেন।

এর মর্মার্থ হল যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে দারুসসালামের দাওয়াত সমগ্র মানবজাতির জন্যই ব্যাপক। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে হেদায়েতও ব্যাপক। কিন্তু হেদায়েতের বিশেষ প্রকার—সরল-সোজা পথে তুলে দেয়া এবং তাতে চলার তওফীক বিশেষ বিশেষ লোকদের ভাগ্যেই জোটে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ অর্থাৎ, ইনিই হলেন সে মহান সত্তা যাঁর গুণ-পরাকাষ্ঠার বিবরণ এইমাত্র বর্ণিত হল, তারপরে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? অর্থাৎ, যখন আল্লাহ্ তাআলার নিশ্চিত উপাস্য হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন সে নিশ্চিত সত্যকে পরিহার করে অন্যান্যদের প্রতি মনোনিবেশ করা কঠিন নির্বুদ্ধিতার কাজ।

এ আয়াতের জ্ঞাতব্য বিষয় ও মাসায়েলসমূহের মধ্যে স্মরণ রাখার যোগ্য যে, আয়াতে فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সত্য ও মিথ্যার মাঝে কোন সংযোগ নেই। যা সত্য ও ন্যায় হবে না, তাই মিথ্যা ও পথভ্রষ্টতার অন্তর্ভুক্ত হবে। এমন কোন কাজ থাকতে পারে না, যা না হবে সত্য, না হবে পথভ্রষ্টতা। আবার এমনও হতে পারে না যে, দু'টি বিপরীতধর্মী বস্তুই সত্য হবে। আকায়েদের সমস্ত

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ
يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ
مَّنْ يَّهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْۤ
اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ
كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝ وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ
مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝ وَمَا كَانَ هٰذَا
الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ
اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ بَلْ كَذَّبُوْا
بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَ
مِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ
بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ
اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّاۤ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

(৩৪) বল, আছে কি কেউ তোমাদের শরীকদের মাঝে যে সৃষ্টিকে পয়দা করতে পারে এবং আবার জীবিত করতে পারে? বল, আল্লাহ্ই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং অতঃপর তার পুনরুদ্ভব করবেন। অতএব, কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছ? (৩৫) জিজ্ঞেস কর, আছে কি কেউ তোমাদের শরীকদের মধ্যে যে সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করবে? বল, আল্লাহ্ই সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, সুতরাং এমন যে লোক সঠিক পথ দেখাবে তার কথা মান্য করা কিংবা যে লোক নিজে নিজে পথ খুঁজে পায় না, তাকে পথ দেখানো কর্তব্য। অতএব, তোমাদের কি হল, কেমন তোমাদের বিচার? (৩৬) বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর চলে, অথচ আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসে না। আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন, তারা যা কিছু করে। (৩৭) আর কোরআন সে জিনিস নয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তা বানিয়ে নেবে। অবশ্য এটি পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়ন করে এবং সে সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ দান করে যা তোমার প্রতি দেয়া হয়েছে, যাতে কোন সন্দেহ নেই- তোমার বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে। (৩৮) মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছ? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটিই সূরা, আর ডেকে নাও, যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ্ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (৩৯) কিন্তু কথা হল এই যে, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে আরম্ভ করেছে যাকে বুঝতে তারা অক্ষম। অথচ এখনো এর বিশ্লেষণ আসেনি। এমনিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা। অতএব, লক্ষ্য করে দেখ, কেমন হয়েছে পরিণতি। (৪০) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোরআনকে বিশ্বাস করবে এবং কেউ কেউ বিশ্বাস করবে না। বস্তুতঃ তোমার পরওয়ারদেগার যথার্থই জানেন দুরাচারদিগকে। (৪১) আর যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে বল, আমার জন্য আমার কর্ম, আর তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদের দায়-দায়িত্ব নেই আমার কর্মের উপর এবং আমারও দায়-দায়িত্ব নেই তোমরা যা কর সেজন্য।

নীতিশাস্ত্রে একথা সর্বজন স্বীকৃত। **অবশ্য** আনুষঙ্গিক মাসআলা-মাসায়েল ও ফেকাহ্ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন মনীষীর মতে ইজতেহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকেই সত্য ও সঠিক বলা হবে। আর অধিকাংশ ওলামা এ ব্যাপারে একমত যে, ইজতেহাদী মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে প্রতিপক্ষকে পথভ্রষ্ট-গোমরাহ্ বলা যাবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهٗ এখানে تاويل এর মর্মার্থ হল প্রতিফল ও শেষ পরিণতি। অর্থাৎ, এরা নিজেদের গাফলতী ও নির্লিপ্ততার দরুন কোরআন সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করেনি। ফলে এর প্রতি মিথ্যারোপে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পরই সত্য ও বাস্তবতা প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং নিজেদের কৃতকর্মের অশুভ পরিণতি চিরকালের জন্য গলার ফাঁস হয়ে যাবে।

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ ۚ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

(৪২) তাদের কেউ কেউ কান রাখে তোমাদের প্রতি; তুমি বধিরদেরকে কি শোনাবে যদি তাদের বিবেক–বুদ্ধি না থাকে। (৪৩) আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখে; তুমি অন্ধদেরকে কি পথ দেখাবে যদি তারা মোটেও দেখতে না পারে। (৪৪) আল্লাহ্ জুলুম করেন না মানুষের উপর, বরং মানুষ নিজেই নিজের উপর জুলুম করে। (৪৫) আর যেদিন তাদেরকে সমবেত করা হবে, যেন তারা অবস্থান করেনি, তবে দিনের একদণ্ড। একজন অপরজনকে চিনবে। নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতকে এবং সরলপথে আসেনি। (৪৬) আর যদি আমি দেখাই তোমাকে সে ওয়াদাসমূহের মধ্য থেকে কোন কিছু যা আমি তাদের সাথে করেছি, অথবা তোমাকে মৃত্যুদান করি, যাহোক, আমার কাছেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সে সমস্ত কর্মের সাক্ষী যা তারা করে। (৪৭) আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একেকজন রসূল রয়েছে। যখন তাদের কাছে তাদের রসূল ন্যায়দণ্ডসহ উপস্থিত হল, তখন আর তাদের উপর জুলুম হয় না। (৪৮) তারা আরো বলে, এ ওয়াদা কবে আসবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক? (৪৯) তুমি বল, আমি আমার নিজের ক্ষতি কিংবা লাভেরও মালিক নই, কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই একেকটি ওয়াদা রয়েছে, যখন তাদের সে ওয়াদা এসে পৌছে যাবে, তখন না একদণ্ড পেছনে সরতে পারবে, না সামনে ফসকাতে পারবে,। (৫০) তুমি বল, আচ্ছা দেখ তো দেখি, যদি তোমাদের উপর তাঁর আযাব রাতারাতি অথবা দিনের বেলায় এসে পৌছে যায়, তবে এর আগে পাপীরা কি করবে? (৫১) তাহলে কি আযাব সংঘটিত হয়ে যাবার পর এর প্রতি বিশ্বাস করবে? এখন স্বীকার করলে? অথচ তোমরা এরই তাকাদা করতে? (৫২) অতঃপর বলা হবে, গোনাহগারদিগকে, ভোগ করতে থাক অনন্ত আযাব– তোমরা যা কিছু করতে তার তাই প্রতিফল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ, কেয়ামতে যখন মৃতদেহকে কবর থেকে উঠানো হবে, তখন একে অপরকে চিনতে পারবে এবং মনে হবে দেখা–সাক্ষাত হয়নি তা যেন খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়।

ইমাম বগভী (রহঃ) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, এ পরিচয় হবে প্রথমদিকে। পরে কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী সামনে চলে আসলে পর এসব পরিচয় ছিন্ন হয়ে যাবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তখনো পরিচয় থাকবে, কিন্তু ভয়–সন্ত্রাসের দরুন কথা বলতে পারবে না। – (মাযহারী)

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ ۚ آلْآنَ অর্থাৎ, তোমরা কি তখন ঈমান আনবে, যখন তোমাদের উপর আযাব পতিত হয়ে যাবে? চাই তা মৃত্যুর সময়েই হোক কিংবা তার পূর্বে। কিন্তু তখন তোমাদের ঈমানের উত্তরে কি বলা হবে– آلْآنَ এতক্ষণে ঈমান আনলে, যখন ঈমানের সময় চলে গেছে? যেমন, জলমগ্ন হবার সময়ে ফেরাউন যখন বলল, آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ (অর্থাৎ, আমি ঈমান আনছি, নিশ্চয়ই কোন উপাস্য নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈলরা।) উত্তরে বলা হয়েছিল— آلْآنَ (অর্থাৎ, এতক্ষণে ঈমান আনলে?) বস্তুতঃ তার ঈমান কবুল করা হয়নি। এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা বন্দার তওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তার মৃত্যুকালীন উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়। অর্থাৎ, মৃত্যুকালীন গরগরা বা উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যাবার পর ঈমান ও তওবা আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে দুনিয়াতে আযাব সংঘটিত হওয়ার পূর্বাহ্নে তওবা কবুল হতে পারে। কিন্তু আযাব এসে যাবার পর আর তওবা কবুল হয় না। সূরার শেষাংশে ইউনুস (আঃ)–এর কওমের যে ঘটনা আসছে যে, তাদের তওবা কবুল করে নেয়া হয়েছিল,তা এই মূলনীতির ভিত্তিতেই হয়েছিল। কারণ, তারা দূরে থেকে আযাব আসতে দেখেই বিশুদ্ধ–সত্য মনে কেঁদে–কেটে তওবা করে নিয়েছিল। তাই আযাব সরে যায়। যদি আযাব তাদের উপর পতিত হয়ে যেত, তবে আর তওবা কবুল হত না।

وَيَسْتَنْبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۝٥٣
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ
لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝٥٤ أَلَا
إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٥٥ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝٥٦ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝٥٧ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ
فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝٥٨ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ
اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ
لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ۝٥٩ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝٦٠ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن
قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ
فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝٦١

(৫৩) আর তোমার কাছে সংবাদ জিজ্ঞেস করে, এটা কি সত্য? বলে দাও, অবশ্যই আমার পরওয়ারদেগারের কসম এটা সত্য। আর তোমরা পরিশ্রান্ত করে দিতে পারবে না। (৫৪) বস্তুতঃ যদি প্রত্যেক গোনাহগারের কাছে এত পরিমাণ থাকে যা আছে সমগ্র যমীনের মাঝে, আর অবশ্যই যদি সেগুলো নিজের মুক্তির বিনিময়ে দিতে চাইবে আর গোপনে গোপনে অনুতাপ করবে, যখন আযাব দেখবে। বস্তুতঃ তাদের জন্য সিদ্ধান্ত হবে ন্যায়সঙ্গত এবং তাদের উপর জুলুম হবে না। (৫৫) শুনে রাখ, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে সবই আল্লাহ্‌র। শুনে রাখ, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তবে অনেকেই জানে না। (৫৬) তিনিই জীবন ও মরণ দান করেন এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৫৭) হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য। (৫৮) বল, আল্লাহ্‌র দয়া ও মেহেরবাণীতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে যা সঞ্চয় করছ। (৫৯) বল, আচ্ছা নিজেই লক্ষ্য করে দেখ, যা কিছু আল্লাহ্ তোমাদের জন্য রিযিক হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোন্‌টাকে হারাম আর কোন্‌টাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? বল, তোমাদের কি আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি আল্লাহ্‌র উপর অপবাদ আরোপ করছ? (৬০) আর আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের কি ধারণা কেয়ামত সম্পর্কে? আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহই করেন, কিন্তু অনেকেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। (৬১) বস্তুতঃ যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কোরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও যমীনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে কোরআন করীমের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে— (এক) مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ - مَوْعِظَةٌ ও وعظ এর প্রকৃত অর্থ হল এমন বিষয় বর্ণনা করা, যা শুনে মানুষের অন্তর কোমল হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি প্রণত হয়ে পড়ে। পার্থিব গাফলতীর পর্দা ছিন্ন হয়ে মনে আখেরাতের ভাবনা উদয় হয়। কোরআন করীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই 'মাওয়ায়েযে হাসনাহ্'-এর অত্যন্ত সালঙ্কার প্রচারক। এর প্রতিটি জায়গায় ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির সাথে সাথে ভীতি-প্রদর্শন, সওয়াবের সাথে সাথে আযাব, পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও কৃতকার্যতার সাথে সাথে ব্যর্থতা ও পথভ্রষ্টতা প্রভৃতির এমন সংমিশ্রিত আলোচনা করা হয়েছে, যা শোনার পর পাথরও পানি হয়ে যেতে পারে। তদুপরি কোরআন করীমের অন্যান্য বর্ণনা-বিশ্লেষণও এমন যা মনের পটপরিবর্তন করে দিতে অদ্বিতীয়।

مَّوْعِظَةٌ এর সাথে مِّن رَّبِّكُمْ বলে কোরআনী-ওয়াযের মর্যাদাকে অধিকতর উচ্চ করে দিয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, এ ওয়ায নিজেদেরই মত কোন দুর্বল মানুষের পক্ষ থেকে নয় যার হাতে কারো ক্ষতি-বৃদ্ধি, কিংবা পাপ-পুণ্য কিছু নেই; বরং এ হলো মহান পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে, যার কোথাও ভুল-ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই এবং যার প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শনে কোন দুর্বলতা কিংবা আপত্তি ওযরের আশংকা নেই।

কোরআন করীমের দ্বিতীয় গুণ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। وَشِفَاءٌ অর্থ রোগ নিরাময় হওয়া আর صدور হল صدر এর বহুবচন, যার অর্থ বুক। আর এর মর্মার্থ অন্তর।

সারার্থ হচ্ছে যে, কোরআন করীম অন্তরের ব্যাধিসমূহের জন্য একান্ত সফল চিকিৎসা ও সুস্থতা এবং রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন যে, কোরআনের এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, এটি বিশেষতঃ অন্তরের রোগের শেফা; দৈহিক রোগের চিকিৎসা নয়।—(রূহুল-মা'আনী)

কিন্তু অন্যান্য মনীষীবৃন্দ বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে কোরআন সর্ব রোগের নিরাময়, তা অন্তরের রোগই হোক কিংবা দেহেরই হোক। তবে আত্মিক রোগের ধ্বংসকারিতা মানুষের দৈহিক রোগ অপেক্ষা বেশী মারাত্মক এবং এর চিকিৎসাও যে কারো সাধ্যের ব্যাপার নয়। সে কারণেই এখানে শুধু আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক রোগের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, দৈহিক রোগের জন্য এটি চিকিৎসা নয়।

হাদীসের বর্ণনা ও উম্মতের আলেম সম্প্রদায়ের অসংখ্য অভিজ্ঞতাই এর প্রমাণ যে, কোরআন করীম যেমন আন্তরিক ব্যাধির জন্য অব্যর্থ মহৌষধ, তেমনি দৈহিক রোগ-ব্যাধির জন্যও উত্তম চিকিৎসা।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে নিবেদন করল যে, আমার বুকে কষ্ট পাচ্ছি। মহানবী (সাঃ) বললেন, কোরআন পাঠ কর। কারণ আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেছেন— وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ অর্থাৎ, কোরআন সে সমস্ত রোগের জন্য আরোগ্য যা বুকের মাঝে হয়ে থাকে।—(রূহুল মা'আনী-ইবনে মার্দুবিয়াহ থেকে)

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٦٣ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ
ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ
ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٦٤ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ
جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٦٥ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ
وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن
دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
يَخْرُصُونَ ٦٦ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟
فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَسْمَعُونَ ٦٧ قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱلْغَنِىُّ
لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن
سُلْطَـٰنٍۭ بِهَـٰذَآ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٦٨
قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ ٦٩ مَتَـٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ
نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ٧٠

(৬২) মনে রেখো, যারা আল্লাহ্‌র বন্ধু, তাদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। (৬৩) যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে—(৬৪) তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে! আল্লাহ্‌র কথার কখনো হের-ফের হয় না। এটাই হল মহা সফলতা। (৬৫) আর তাদের কথায় দুঃখ নিয়ো না। আসলে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ্‌র। তিনিই শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। (৬৬) শুনছ, আসমানসমূহে ও যমীনে যাকিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্‌র। আর এরা যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে শরীকদের উপাসনার পেছনে পড়ে আছে—তা আসলে কিছুই নয়। এরা নিজেরই কল্পনার পেছনে পড়ে রয়েছে এবং এছাড়া আর কিছু নয় যে, এরা বুদ্ধি খাটাচ্ছে। (৬৭) তিনি তোমাদের জন্য তৈরী করেছেন রাত, যাতে করে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পার, আর দিন দিয়েছেন দর্শন করার জন্য। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে সেসব লোকের জন্য যারা শ্রবণ করে। (৬৮) তারা বলে, আল্লাহ্ পুত্র সাব্যস্ত করে নিয়েছেন—তিনি পবিত্র, তিনি অমুখাপেক্ষী। যাকিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে সবই তাঁর। তোমাদের কাছে তার কোন সনদ নেই। কেন তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ কর—যার কোন সনদই তোমাদের কাছে নেই? (৬৯) বলে দাও, যারা এরূপ করে তারা অব্যাহতি পায় না। (৭০) পার্থিবজীবনে সামান্যই লাভ, অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব কঠিন আযাব—তাদেরই কৃত কুফরীর বদলাতে।

এমনিভাবে হযরত ওয়াসেলাহ্ ইবনে আশকা' (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে জানালো যে, আমার গলায় কষ্ট হচ্ছে। তিনি তাকেও একথাই বললেন যে, কোরআন পড়তে থাক।

قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

অর্থাৎ, মানুষের কর্তব্য হল আল্লাহ্ তাআলার রহমত ও অনুগ্রহকেই প্রকৃত আনন্দের বিষয় মনে করা এবং একমাত্র তাতেই আনন্দিত হওয়া। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ ও মান-সম্ভ্রম কোনটাই প্রকৃতপক্ষে আনন্দের বিষয় নয়। কারণ, একে তো কেউ যত অধিক পরিমাণেই তা অর্জন করুক না কেন, (সবই) অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে; পরিপূর্ণ হয় না। দ্বিতীয়তঃ সততই তার পতনাশঙ্কা লেগে থাকে। তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে – هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ – অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র করুণা-অনুগ্রহ সে সমস্ত ধন-সম্পদও সম্মান-সাম্রাজ্য অপেক্ষা উত্তম, যেগুলোকে মানুষ নিজেদের সমগ্র জীবনের ভরসা বিবেচনা করে সংগ্রহ করে।

এ আয়াতে দু'টি বিষয়কে আনন্দ-হরষের উপকরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি হল فضل 'ফজল', অপরটি رحمة 'রহমত'। এতদুভয়ের মর্ম কি? এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র 'ফজল'-এর মর্ম হল কোরআন, আর রহমত-এর মর্ম হল এই যে, তোমাদেরকে তিনি কোরআন অধ্যয়ন এবং সে অনুযায়ী আমল করার তওফীক দান করেছেন।— (রূহুল-মা'আনী, ইবনে মারদুবিয়াহ থেকে)

এ বিষয়টি হযরত বারা' ইবনে আযেব (রাঃ) এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া অনেক তফসীরকার মনীষী বলেছেন যে, 'ফযল' অর্থ কোরআন; আর রহমত হল ইসলাম। বস্তুতঃ এর মর্মার্থও তাই যা উল্লেখিত হাদীসের দ্বারা বোঝা যায় যে, রহমতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাদিগকে কোরআনের শিক্ষা দান করেছেন এবং এর উপর আমল করার সামর্থ্য দিয়েছেন। কারণ, ইসলামও এ তথ্যেরই শিরোনাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র ওলীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাদের প্রশংসা ও পরিচয় বর্ণনার সাথে সাথে তাদের প্রতি আখেরাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে—যারা আল্লাহ্‌র ওলী তাদের না থাকবে কোন অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোন উদ্দেশে ব্যর্থতার গ্লানি। আর আল্লাহ্‌র ওলী হলেন সে সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া-পরহেযগারী অবলম্বন করেছে। এদের জন্য পার্থিব জীবনেও সুসংবাদ রয়েছে এবং আখেরাতেও।

এতে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। (এক) আল্লাহ্‌র ওলীগণের উপর ভয় ও শঙ্কা না থাকার অর্থ কি? (দুই) ওলীআল্লাহ্‌র সংজ্ঞা ও লক্ষণ কি? (তিন) দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁদের জন্য সুসংবাদের মর্ম কি?

প্রথম বিষয় 'আল্লাহ্‌র ওলীদের কোন ভয়-শঙ্কা থাকে না' অর্থ এও হতে পারে যে, আখেরাতের হিসাব-নিকাশের পর যখন তাঁদেরকে তাঁদের মর্যাদায় জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তখন ভয় ও আশঙ্কা থেকে চিরতরে তাঁদের মুক্ত করে দেয়া হবে। না থাকবে কোন রকম কষ্ট ও অস্থিরতার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোন প্রিয় ও কাঙ্খিত বস্তুর হাতছাড়া হয়ে যাবার দুঃখ। বরং তাদের প্রতি জান্নাতের নেয়ামতরাজি হবে চিরস্থায়ী,

অনন্ত। এ অর্থে আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা আপত্তির কারণই নেই। কিন্তু এ প্রশ্ন অবশ্যই সৃষ্টি হয় যে, এতে শুধু ওলীগণের কোন বিশেষত্ব নেই, সমস্ত জান্নাতবাসী যারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, তাদের সবাই এ অবস্থায়ই থাকবে। তবে একথা বলা যায় যে, যারা শেষ পর্যন্ত জান্নাতে পৌছবে তাদের সবাইকে ওলিআল্লাহ্ বলা হবে। পৃথিবীতে তাদের কার্যকলাপ যেমনই থাকুক না কেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর সবাই ওলীআল্লাহ্র তালিকায় গণ্য হবে।

কিন্তু অনেক তফসীরকার বলেছেন, ওলীআল্লাদের জন্য দুঃখ-ভয় না থাকা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক। আর ওলিআল্লাহ্দের বৈশিষ্ট্যও তাই যে, পৃথিবীতেও তারা দুঃখ ভয় থেকে মুক্ত। এছাড়া আখেরাতে তাদের মনে কোন চিন্তা-ভাবনা না থাকা তো সবারই জানা। এতে সমস্ত জান্নাতবাসীই অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এতে অবস্থা ও বাস্তবতার দিক দিয়ে প্রশ্ন হল এই যে, পৃথিবীতে তো এ বিষয়টি বাস্তবতার পরিপন্থী দেখা যায়। কারণ, ওলীআল্লাহ্র তো কথাই নাই স্বয়ং নবী-রসূলগণও এ পৃথিবীতে ভয় ও আশঙ্কা থেকে মুক্ত নন বা ছিলেন না বরং তাঁদের ভয়-ভীতি অন্যান্যদের তুলনায় বেশীই ছিল। যেমন, কোরআন করীমে এরশাদ হয়েছে إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا অর্থাৎ, ওলামাগণই পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্কে ভয় করেন। অন্যত্র ওলিআল্লাহ্গণের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُوْنٍ অর্থাৎ, এরা সর্বক্ষণ আল্লাহ্র আযাবের ভয় করে। কারণ, তাদের পালনকর্তার আযাব এমন বিষয় যার সম্পর্কে কেউ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না।

আর ঘটনাপ্রবাহও তাই। যেমন, শামায়েলে-তিরমিযী গ্রন্থে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ)-কে অধিকাংশ সময় বিষণ্ন-চিন্তান্বিত দেখা যেত। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি আল্লাহ্কে তোমাদের সবার চেয়ে বেশী ভয় করি।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারূক (রাঃ) সহ অন্যান্য সমস্ত সাহাবী, তাবেয়ীন ও ওলীআল্লাহ্গণের কাঁদা-কাটার ঘটনাবলী ও আখেরাতের ভয়-ভীতি-সন্তস্ত্র থাকার অসংখ্য ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে।

তাই রূহুল মা'আনীতে আল্লামা আলূসী (রহঃ) বলেছেন, পার্থিব জীবনে ওলীআল্লাহ্গণের ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপদ থাকা হল এ হিসেবে যে, পৃথিবীবাসী সাধারণতঃ যেসব ভয় ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন পার্থিব উদ্দেশ ও লক্ষ্য, আরাম-আয়েশ, মান-সম্ভ্রম ও ধন-সম্পদের সামান্য ক্ষতিতেই যে তারা মুচড়ে পড়ে এবং সামান্য কষ্ট ও অস্থিরতার ভয়ে তা থেকে বাঁচার তদবীরে রাত-দিন মজে থাকে। আল্লাহ্র ওলীগণের স্থান হয়ে থাকে এ সবের বহু উর্ধ্বে। তাঁদের দৃষ্টিতে না পার্থিব ক্ষণস্থায়ী মান-সম্ভ্রম ও আরাম-আয়েশের কোন গুরুত্ব আছে যা অর্জন করার জন্য সদা পরিব্যস্ত থাকতে হবে, আর না এখানকার দুঃখ-কষ্ট-পরিশ্রম কোন লক্ষ্য করার মত বিষয় যা প্রতিরোধ করতে গিয়ে অস্থির হয়ে উঠতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি আল্লাহ্র ওলীগণের সংজ্ঞা ও তাঁদের লক্ষণ সংক্রান্ত। 'আওলিয়া' শব্দটি ওলী শব্দের বহুবচন। আরবী ভাষায় 'ওলী' অর্থ নিকটবর্তীও হয় এবং দোস্ত-বন্ধুও হয়। আল্লাহ্ তাআলার প্রেম ও নৈকট্যের একটি সাধারণ স্তর এমন রয়েছে যে, তার আওতা থেকে পৃথিবীর কোন মানুষ, কোন জীবজন্তু এমনকি কোন বস্তু-সামগ্রীই বাদ পড়ে না। যদি এ নৈকট্য না থাকে, তবে সমগ্র বিশ্বের কোন একটি বস্তুও অস্তিত্ব লাভ করতে পারত না। সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্বের প্রকৃত উপকরণ হল সেই সংযোগ যা আল্লাহ্ তাআলার সাথে রয়েছে। যদিও এই সংযোগের তাৎপর্য কেউ বুঝেনি বা বুঝতে পারেও না, তথাপি এই অশরীরী সংযোগ অপরিহার্য ও নিশ্চিত। কিন্তু 'আওলিয়া' শব্দের নৈকট্যের ঐ স্তরের কথা বলা উদ্দেশ নয়। বরং নৈকট্য, প্রেম ও ওলিত্বের দ্বিতীয় আরেকটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে যা আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ বিশেষ বন্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। সে নৈকট্যকে মুহাব্বত বা প্রেম বলা হয়। যারা নৈকট্য লাভ করতে সমর্থ হন, তাদেরকেই বলা হয় ওলীআল্লাহ্ তথা, আল্লাহ্র ওলী। যেমন এক হাদীসে-কুদসীতে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ "আমার বন্দা নফল এবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি আমি নিজেও তাকে ভালবাসতে আরম্ভ করি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, সে যা কিছু শোনে, আমার মাধ্যমেই শোনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা কিছু সে দেখে, আমার মাধ্যমেই দেখে। আমিই তার হাত-পা, হয়ে যাই, যা কিছু সে করে আমার দ্বারাই করে।" এর মর্ম হল এই যে, তার কোন গতি-স্থিতি ও অন্য যে কোন কাজ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ হয় না।

বস্তুতঃ এই বিশেষ ওলীত্ব বা নৈকট্যের স্তর অগণিত ও অশেষ। এর সর্বোচ্চ স্তর নবী-রসূলগণের প্রাপ্য। কারণ, প্রত্যেক নবীরই ওলী হওয়া অপরিহার্য। আর এর সর্বোচ্চ—স্তর হল সায়্যেদুল আম্বিয়া নবী করীম (সাঃ)-এর এবং এ বেলায়েতের সর্বনিম্ন স্তর হল সুফী সাধকগণের পরিভাষায় 'দরজায়ে ফানা' তথা আত্মা বিলুপ্তির স্তর বলা হয়। এর মর্ম হল এই যে, মানুষের অন্তরাত্মা আল্লাহ্র স্মরণে এমনভাবে ডুবে যায় যে, পৃথিবীতে কারো মায়া-ভালবাসাই এর উপর প্রবল হতে পারে না। সে যাকে ভালবাসে, আল্লাহ্র জন্য ভালবাসে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তাও আল্লাহ্র জন্য করে। এক কথায় তার প্রেম ও ঘৃণা, ভালবাসা ও শত্রুতা কোনটাই নিজের ব্যক্তিগত কোন কারণে হয় না। এরই অবশ্যম্ভাবি পরিণতি হল যে তাঁর দেহ মন, ভেতর বাহির সবই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অন্বেষায় নিয়োজিত থাকে। তখন সে প্রত্যেক এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা আল্লাহ্ তাআলার কাছে পছন্দ নয়। এ অবস্থার লক্ষণই হল যিকরের আধিক্য ও আনুগত্যের সার্বক্ষণিকতা। অর্থাৎ, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করা এবং সর্বক্ষণ, সর্বাবস্থায় তাঁর হুকুম আহকামের অনুগত থাকা। এ দু'টি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাঁকেই, ওলী বলা হয়। যার মধ্যে এ দু'টির কোন একটিও না থাকে সে এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এ দু'টিই উপস্থিত থাকে তার স্তরের নিম্নতা উচ্চতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। এ সব স্তরের দিক দিয়েই ওলিআল্লাহ্গণের-মর্যাদার বেশ কম হয়ে থাকে।

এক হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, এ আয়াতে 'আওলিয়াল্লাহ' (আল্লাহ্র ওলীগণ) বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, সে সমস্ত লোককে যারা একান্তভাবে আল্লাহ্র ওয়াস্তে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা পোষণ করে, কোন পার্থিব উদ্দেশ এর মাঝে থাকে না। (ইবনে মারদুবিয়্যাহ থেকে-মাযহারী) আর একথা সুস্পষ্ট যে, এ অবস্থা সে সমস্ত লোকেরই হতে পারে যাদের কথা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, বেলায়েতের এ স্তর লাভের উপায় কি?

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ
مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا
أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَ
لَا تُنْظِرُونِ ﴿٧١﴾ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوهُ
فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى
قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى
فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾
فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧٦﴾
قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ
السَّاحِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾

(৭১) আর তাদেরকে শুনিয়ে দাও নূহের অবস্থা—যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি এবং আল্লাহ্র আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহ্র উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেদের কর্ম সাব্যস্ত কর এবং এতে তোমাদের শরীকদেরকে সমবেত করে নাও, যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে যাকিছু করার করে ফেল এবং আমাকে অব্যাহতি দিও না। (৭২) তারপরও যদি বিমুখতা অবলম্বন কর, তবে আমি তোমাদের কাছে কোন রকম বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় হল আল্লাহ্র দায়িত্বে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আনুগত্য অবলম্বন করি। (৭৩) তারপরও এরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। সুতরাং তাকে এবং তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে বাঁচিয়ে নিয়েছি এবং যথাস্থানে আবাদ করেছি। আর তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি যারা আমার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং লক্ষ্য কর, কেমন পরিণতি ঘটেছে তাদের যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। (৭৪) অনন্তর আমি নূহের পরে বহু নবী—রসূল পাঠিয়েছি তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি। তারপর তাদের কাছে তারা প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছে, কিন্তু তাদের দ্বারা এমনটি হয়নি যে, ঈমান আনবে সে ব্যাপারে, যাকে তারা ইতিপূর্বে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এভাবেই আমি মোহর এঁটে দেই সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তরসমূহের উপর। (৭৫) অতঃপর তাদের পেছনে পাঠিয়েছি আমি মূসা ও হারুনকে ফেরাউন ও তার সর্দারের প্রতি স্বীয় নির্দেশাবলী সহকারে। অথচ তারা অহংকার করতে আরম্ভ করেছে। (৭৬) বস্তুতঃ তারা ছিল গোনাহগার। তারপর আমার পক্ষ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য বিষয় উপস্থিত হল, তখন বলতে লাগলো, এগুলো তো প্রকাশ্য যাদু। (৭৭) মূসা বলল, সত্যের ব্যাপারে একথা বলছ, তা তোমাদের কাছে পৌছার পর? এ কি যাদু? অথচ যারা যাদুকর, তারা সফল হতে পারে না। (৭৮) তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ যাতে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদেরকে? আর যাতে তোমরা দুইজন এদেশের সর্দারী পেয়ে যেতে পার? আমরা তোমাদেরকে কিছুতেই মানব না।

হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ) তফসীরে মাযহারীতে বলেছেন, উম্মতের লোকদের এই স্তর রসূলে করীম (সাঃ)-এরই সংসর্গের মাধ্যমে লাভ হতে পারে। এভাবেই আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্কের সে রূপ যা মহানবী (সাঃ) পেয়েছিলেন, স্বীয় যোগ্যতা অনুপাতে তার অংশবিশেষ উম্মতের ওলীগণ পেয়ে থাকেন। বস্তুতঃ মহানবী (সাঃ)-এর সংসর্গের ফযীলত সাহাবায়ে-কেরাম পেয়েছিলেন সরাসরি। আর সে কারণেই তাদের বেলায়েতের দরজা উম্মতের সমস্ত ওলী-কুতুব অপেক্ষা বহু উর্ধ্বে। পরবর্তী লোকেরা এ ফযীলতই এক বা একাধিক মাধ্যমে অর্জন করেন। মাধ্যম যত বাড়তে থাকে ব্যবধানও সে পরিমাণেই বাড়তে থাকে। এই মাধ্যম শুধুমাত্র সে সমস্ত লোকই হতে পারেন, যারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর রঙে রঞ্জিত হতে পেরেছেন, তাঁর সুন্নতের হুবহু অনুসরণ করেছেন। এ ধরনের লোকদের সান্নিধ্য ও সংসর্গের সাথে সাথে যখন তাদের নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহ্র যিকরেও আধিক্য ঘটে তখনই তা লাভ হয়। বেলায়েতের স্তর প্রাপ্তির এটিই পন্থা যা তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। (১) কোন ওলীর সংসর্গ, (২) তাঁর আনুগত্য ও (৩) আল্লাহ্র অধিক যিকর। কিন্তু শর্ত হল এই যে, এ যিকর সুন্নত তরীকা অনুযায়ী হতে হবে। কারণ, অধিক যিকরের দ্বারা যখন অন্তরের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়, তখন সে নূর বেলায়েতের প্রতিফলনের যোগ্য হয়ে উঠে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতিটি বস্তুর জন্য শিরিশ বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পন্থা রয়েছে, অন্তরের শিরিশ হল আল্লাহ্র যিকর। এ কথাই ইবনে-ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বায়হাকীও উদ্ধৃত করেছেন।

আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, (একবার) এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলনে, যে কোন বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে মুহাব্বত রাখে কিন্তু আমলের দিক দিয়ে তাঁর স্তরে পৌছাতে পারে না। হুযুর বললেন المرء مع من احب অর্থাৎ, প্রতিটি লোক তার সাথেই হবে যাকে সে ভালবাসে।' এতে প্রতীয়মান হয় যে, ওলিআল্লাহ্গণের সংসর্গ ও তাদের প্রতি মহব্বত রাখা মানুষের জন্য বেলায়েত বা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। ইমাম বায়হাকী 'শো'আবুল ঈমান' গ্রন্থে হযরত রাযীন (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) হযরত রাযীন (রাঃ)-কে বললেন যে, তোমাকে দ্বীনের এমন নীতিমালা বলে দিচ্ছি যাতে করে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও কৃতকার্যতা লাভ করতে পারবে—তা হল এই যে, যারা আল্লাহ্র স্মরণ করে তাদের মজলিস ও সংসর্গকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেবে এবং যখন একা থাকবে, তখন যত বেশী সম্ভব আল্লাহ্র যিকরে নিজের জিহবা নাড়তে থাকবে। যার সাথে মহব্বত রাখবে—আল্লাহ্র জন্য রাখবে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে, আল্লাহ্র জন্য করবে।— (মাযহারী)

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষ যে কাশ্ফ-কারামত ও গায়বী বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়াকে ওলীর লক্ষণ ধরে নিয়েছে, তা একান্ত ভুল ও ধোকা। হাজার হাজার ওলীআল্লাহ্ এমন ছিলেন এবং রয়েছেন যাদের দ্বারা এ ধরনের কোন বিষয় সংঘটিত হয়নি। পক্ষান্তরে এমন লোকের দ্বারাও কাশ্ফ ও গায়বী সংবাদ কথিত হয়েছে যার ঈমান পর্যন্ত ঠিক নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে হযরত মূসা ও হারূন (আঃ) এবং বনী-ইসরাঈল ও ফেরাউন সম্প্রদায়ের কিছু অবস্থা এবং সে প্রসঙ্গে কিছু বিধি-বিধান আলোচনা করা

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ
قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ
مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾
فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ
وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ
لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ
فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ
لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ
آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾

(৭৯) আর ফেরাউন বলল, আমার কাছে নিয়ে এস সুদক্ষ যাদুকরদিগকে। (৮০) তারপর যখন যাদুকররা এল, মূসা তাদেরকে বলল, নিক্ষেপ কর, তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করে থাক। (৮১) অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা বলল, যাকিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু—এবার আল্লাহ্ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ দুষ্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না। (৮২) আল্লাহ্ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে যদিও পাপীদের তা মনঃপুত নয়। (৮৩) আর কেউ ঈমান আনল না মূসার প্রতি তাঁর কওমের কতিপয় বালক ছাড়া—ফেরাউন ও তার সর্দারদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোন বিপদে ফেলে দেয়। ফেরাউন দেশময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল। আর সে তার হাত ছেড়ে রেখেছিল। (৮৪) আর মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনে থাক, তবে তারই উপর ভরসা কর যদি তোমরা ফরমাবরদার হয়ে থাক। (৮৫) তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর এ জালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করিও না। (৮৬) আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে ছাড়িয়ে দাও এই কাফেরদের কবল থেকে। (৮৭) আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মূসা এবং তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ কর। আর তোমাদের ঘরগুলো বানাবে কেবলামুখী করে এবং নামায কায়েম কর আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দান কর। (৮৮) মূসা বলল, হে আমার পরওয়ারদেগার, তুমি ফেরাউনকে এবং তার সর্দারদেরকে পার্থিব জীবনের আড়ম্বর দান করেছ, এবং সম্পদ দান করেছ— হে আমার পরওয়ারদেগার, এ জন্যই যে তারা তোমার পথ থেকে বিপথগামী করবে! হে আমার পরওয়ারদেগার, তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংসে করে দাও এবং তাদের অন্তরগুলোকে কঠোর করে দাও যাতে করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে নেয়।

হয়েছে। প্রথম আয়াতে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কিত হুকুম রয়েছে। তা'হল এই যে, বনী-ইসরাঈল যারা মূসা (আঃ)-এর দ্বীনের উপর আমল করত তাদের সবাই নিয়মিত নিজেদের নির্ধারিত উপসনালয়েই নামায আদায় করত। তাছাড়া পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য নির্দেশও ছিল তাই। তাদের নামায ঘরে পড়লে আদায় হতো না। তবে এই বিশেষ সুবিধা মহানবী (সাঃ)-এর উম্মতকেই দান করা হয়েছে যে, তারা যে কোনখানে ইচ্ছা নামায আদায় করে নিতে পারে। সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর ছয়টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটিও উল্লেখ করেছেন যে, আমার জন্য গোটা যমীনকে মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে ; সব জায়গাতেই নামায আদায় হয়ে যায়। তবে এটা আলাদা কথা যে, ফরয নামাযসমূহ মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা সুন্নতে মু'আক্কাদাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। নফল নামায ঘরে আদায় করা উত্তম। স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-এরই উপর আমল করতেন। তিনি শুধু ফরয নামাযই মসজিদে পড়তেন। সুন্নত ও নফলসমূহ ঘরে গিয়ে আদায় করতেন। যাহোক, বনী-ইসরাঈলরা তাদের মাযহাব বা ধর্মমত অনুসারে নিজেদের উপাসনালয়ে গিয়ে নামায আদায়ে বাধ্য ছিল। এদিকে ফেরাউন যে, তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দিত এবং তাদের উপর অত্যাচার করত, সে বিষয়টি লক্ষ্য করে তাদের সমস্ত উপসনালয় ভেঙ্গে চুরমার করে দিল ; যাতে এরা নিজেদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নামায পড়তে না পারে। এরই কারণে আল্লাহ্ তাআলা বনী-ইসরাঈলের উভয় পয়গম্বর হযরত মূসা ও হারূন (আঃ)-কে নির্দেশ দান করলেন যা আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, মিসরে বনী-ইসরাঈলদের জন্য নতুন গৃহ নির্মাণ করা হোক যা কেবলামুখী হবে, যাতে করে তারা এসব আবাসিক ঘরেই নামায আদায় করতে পারে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এতে বোঝা যাচ্ছে, উম্মতের জন্য যদিও এ নির্দেশ ছিল যে, তাদেরকে শুধুমাত্র নির্ধারিত উপসনালয়েই নামায পড়তে হবে, কিন্তু এই বিশেষ বাধার পরিপ্রেক্ষিতে বনী ইসরাঈলদের জন্য নিজেদের ঘরে নামায আদায় করে নেয়ার সাময়িক অনুমতি দেয়া হয় এবং তাদের ঘরের দিকটা কেবলার দিকে সোজা করে নিতে বলা হয়। তাছাড়া এমনও বলা যেতে পারে, এই বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তাদেরকে নির্ধারিত সে ঘরেই নামায পড়ার কথা বলা হয়েছিল, যা কেবলামুখী করে নির্মাণ করা হয়েছিল। সাধারণ ঘরে কিংবা সাধারণ জায়গায় নামায পড়ার অনুমতি তখনও ছিল না, যেমনটি মহানবী (সাঃ)-এর উম্মতের জন্য রয়েছে যে, যে কোন শহরে কিংবা মাঠে যে কোন স্থানে নামায আদায় করার সুযোগ দেয়া হয়েছে।— (রূহুল-মা'আনী)

এখানে এ প্রশ্নটি লক্ষ্য করার মত যে, এ আয়াতে বনী-ইসরাঈলদেরকে যে কেবলার প্রতি মুখ করার হুকুম দেয়া হয়েছে তা কোন কেবলা ছিল—কা'বা ছিল না বায়তুল মুকাদ্দাস? হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এতে কা'বাই উদ্দেশ্য এবং কা'বাই ছিল হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর আস্‌হাবের কেবলা। — (কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী) বরং কোন কোন ওলামা এমনও বলেছেন যে, পূর্ববর্তী সমস্ত নবী রসূলের কেবলাই ছিল কা'বা শরীফ।

আর যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা নিজেদের নামাযে 'সাখরায়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে'র দিকে মুখ করত, তাকে সে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যখন হযরত মূসা (আঃ) মিসর ছেড়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। এটা মিসরে অবস্থানকালে তাঁর কেবলা বায়তুল্লাহ্ হওয়ার পরিপন্থী নয়।

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ وَجَٰوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ
فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ
ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِيٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا إِسْرَٰٓءِيلَ وَ
أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ
ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَٰتِنَا لَغَٰفِلُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَقَدْ
بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ الطَّيِّبَٰتِ
فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَآءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ
مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَٰبَ مِن
قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ
الْخَٰسِرِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾

(৮৯) বললেন, তোমাদের দোয়া মঞ্জুর হয়েছে। অতএব, তোমরা দু' জন অটল থাক এবং তাদের পথে চলো না যারা অজ্ঞ। (৯০) আর বনী-ইসরাঈলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশে। এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল, তখন বলল, এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোন মা' বুদ নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী-ইসরাঈলরা। বস্তুতঃ আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। (৯১) এখন একথা বলছ! অথচ তুমি ইতিপূর্বে না-ফরমানী করছিলে! এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (৯২) অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে। আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না। (৯৩) আর আমি বনী-ইসরাঈলদিগকে দান করেছি উত্তম স্থান এবং তাদেরকে আহার্য দিয়েছি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বস্তু-সামগ্রী। বস্তুতঃ তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়নি যতক্ষণ না তাদের কাছে এসে পৌছেছে সংবাদ। নিঃসন্দেহে তোমার পরওয়ারদেগার তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন কেয়ামতের দিন ; যে ব্যাপারে তাদের মাঝে মতবিরোধ হয়েছিল। (৯৪) সুতরাং তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই তুমি কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না। (৯৫) এবং তাদের অন্তর্ভুক্তও হয়ো না যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহর বাণীকে। তাহলে তুমিও অকল্যাণে পতিত হয়ে যাবে (৯৬) যাদের ব্যাপারে তোমার পরওয়ারদেগারের সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়ে গেছে তারা ঈমান আনবে না। (৯৭) যদি তাদের সামনে সমস্ত নিদর্শনাবলী এসে উপস্থিত হয় তবুও যতক্ষণ না তারা দেখতে পায় বেদনাদায়ক আজাব!

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ ৮৯নং আয়াতের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, নামায পড়ার জন্য কেবলামুখী হওয়ার শর্তটি পূর্ববর্তী নবীগণের সময়েও বিদ্যমান ছিল। তেমনিভাবে পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রসূলের শরীয়তই নামাজের জন্য পবিত্রতা ও আবরু ঢাকা যে শর্ত ছিল, তাও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

এ আয়াতে দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদটি উভয় পয়গম্বরকেই দিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁদেরকে সামান্য পরীক্ষা করা হয়েছে যে, দোয়া কবুল হওয়ার লক্ষণ আল্লামা বগভীর মতে চল্লিশ বছর পর প্রকাশিত হয়। সে কারণেই এ আয়াতে দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করার সাথে সাথে উভয় নবীকে এ হেদায়েতও দেয়া হয়েছে যে, فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ অর্থাৎ, নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব দাওয়াত ও তবলীগের কাজে নিয়োজিত থাকুন, দোয়া কবুল হওয়ার প্রতিক্রিয়া যদি দেরীতেও প্রকাশ পায়, তবুও জাহেলদের মত তাড়াহুড়া করবেন না।

৯০ নং আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-এর বিখ্যাত মু'জেযা সাগর পাড়ি দেয়া এবং ফেরাউনের ডুবে মরার বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে- حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِيٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ অর্থাৎ, যখন তাকে জলডুবিতে পেয়ে বসল তখন বলে উঠল, আমি ঈমান এনেছি যে, যে আল্লাহর উপর বনী-ইসরাঈলরা ঈমান এনেছে তাঁকে ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর আমি তাঁরই আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে তার উত্তর দেয়া হয়েছে ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ অর্থাৎ, কি এতক্ষণে ঈমান এনেছ? অথচ ঈমান আনার এবং ইসলাম গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

এতে প্রমাণিত হয় যে, ঠিক মৃত্যুকালে ঈমান আনা শরীয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টির আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ সে হাদীসের দ্বারাও হয়, যাতে মহানবী (সাঃ) বলেছেন— আল্লাহ্ তাআলা বন্দার তওবা ততক্ষণ পর্যন্তই কবুল করতে থাকেন যতক্ষণ না মৃত্যুর উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়।— (তিরমিযী)

মৃত্যুকালীন উর্ধ্বশ্বাস বলতে সে সময়কে বোঝানো হয়েছে, যখন জান কবজ করার সময় ফেরেশতা সামনে এসে উপস্থিত হন। তখন কর্মজগত পৃথিবীর জীবন সমাপ্ত হয়ে আখেরাতের হুকুম-আহকাম আরম্ভ হয়ে যায়। কাজেই সে সময়কার কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়। ঈমানও নয় এবং কুফরও নয়। এমন সময়ে যে লোক ঈমান গ্রহণ করে, তাকেও মুমিন বলা যাবে না এবং কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন, ফেরাউনের এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের ঐকমত্যে ফেরাউনের মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হয়েছে। তাছাড়া কোরআনের প্রকৃষ্ট নির্দেশেও এটাই সুস্পষ্ট। তাই যারা ফেরাউনের এই ঈমানকে গ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন, হয় তার কোন ব্যাখ্যা করতে হবে, না হয় তাকে ভুল বলতে হবে।— (রূহুল-মা'আনী)

এমনিভাবে খোদানাখাস্তা এমনি মুমূর্ষু অবস্থায় যদি কারো মুখ দিয়ে কুফরী বাক্য বেরিয়ে যায়, তবে তাকে কাফেরও বলা যাবে না। বরং তার জানাযার নামায পড়ে তাকে মুসলমানদের মত দাফন করতে হবে এবং তার সে কুফরী বাক্যের রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন, কোন কোন ওলী আল্লাহ্‌র অবস্থার দ্বারাও তার সমর্থন পাওয়া যায় যে, এমন বাক্য তাঁদের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল মানুষ যাকে কুফরী বাক্য মনে করে ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরে যখন তাঁর কিছুটা সংজ্ঞা ফিরে আসে এবং সে বাক্যে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলে দেন, তখন সবাই নিশ্চিন্ত হয় যে, তা সাক্ষাৎ ঈমানী বাক্যই ছিল।

সারকথা এই যে, যখন রূহ বেরোতে থাকে এবং অন্তিম অবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন সে সময়টি পার্থিবজীবনে গণ্য হয় না। তখনকার কোন আমল বা কার্যকলাপ শরীয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুতঃ এর পূর্বেকার যাবতীয় আমলই ধর্তব্য হয়ে থাকে। কিন্তু উপস্থিত দর্শকদের এ ব্যাপারে প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কারণ, এ বিষয়টির সঠিক অনুমান করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি হতে পারে যে, বাস্তবিকই এ সময়টি রূহ বেরোবার কিংবা উর্ধ্বশ্বাসের সময় কি তার পূর্ব মুহূর্ত।

এখানে ফেরাউনকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, জলমগ্নতার পর আমি তোমার লাশ পানি থেকে বের করে দেব যাতে তোমার এই মৃতদেহটি তোমার পরবর্তী জনগোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ্ তাআলার মহাশক্তির নিদর্শন ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।

ঘটনাটি এই যে, সাগর পাড়ি দেবার পর হযরত মূসা (আঃ) যখন বনী-ইসরাঈলদেরকে ফেরাউনের নিহত হবার সংবাদ দেন, তখন তারা ফেরাউনের ব্যাপারে এতই ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল যে, তা অস্বীকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, ফেরাউন ধ্বংস হয়নি। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সঠিক ব্যাপার প্রদর্শন এবং অন্যান্যদের শিক্ষা লাভের উদ্দেশে একটি ঢেউয়ের মাধ্যমে ফেরাউনের মৃতদেহটি তীরে এনে ফেলে রাখলেন, যা সবাই প্রত্যক্ষ করল। তাতে তার ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এল এবং তার এ লাশ সবার জন্য নিদর্শন হয়ে রইল। তারপর এ লাশের কি পরিণতি হয়েছিল তা জানা যায় না। যেখানে ফেরাউনের লাশটি পাওয়া গিয়েছিল আজও সে স্থানটি 'জাবালে ফেরাউন' নামে পরিচিত।

কিছুকাল পূর্বে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল যে, ফেরাউনের লাশ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে, সাধারণ লোকেরাও তা প্রত্যক্ষ করেছে এবং আজ পর্যন্ত তা কায়রোর যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, এ ফেরাউনই সে ফেরাউন, যার সাথে হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলা হয়েছিল, নাকি অন্য কোনও ফেরাউন। কারণ, ফেরাউন শব্দটি কোন একক ব্যক্তির নাম নয়; সে যুগে মিসরের সব বাদশাহ্কেই ফেরাউন পদবী দেয়া হত।

কিন্তু এটাও কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে জলমগ্ন লাশকে শিক্ষামূলক নিদর্শন হিসাবে সাগর তীরে এনে ফেলেছিলেন, তেমনিভাবে সেটিকে আগত বংশধরদের শিক্ষার জন্য পচাগলা থেকেও রক্ষা করে থাকবেন এবং এখনো তা বিদ্যমান থাকবে।

পরবর্তী আয়াতে ফেরাউনের করুণ পরিণতির মোকাবেলায় সে জাতির ভবিষ্যৎ দেখানো হয়েছে, যাদেরকে ফেরাউন হীন ও পদদলিত করে রেখেছিল। বলা হয়েছে, আমি বনী-ইসরাঈলকে উত্তম আবাস দান করেছি। একদিকে তারা মিসর রাষ্ট্রের আধিপত্য লাভ করেছে এবং অপরদিকে জর্দান ও ফিলিস্তীনের পবিত্র ভূমিও তারা পেয়ে গেছে যাকে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় খলীল ইবরাহীম ও তাঁর সন্তানবর্গের জন্য মীরাস বানিয়ে দিয়েছিলেন। উত্তম আবাসকে কোরআন করীমে مُبَوَّأَ صِدْقٍ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে صِدْقٍ অর্থ কল্যাণজনক ও উপযোগী। অর্থাৎ, এমন আবাসভূমি তাদেরকে দান করা হয়েছে যা তাদের জন্য সর্বদিক দিয়েই কল্যাণকর ও উপযোগী ছিল। অতঃপর বলা হয়েছে— আমি তাদেরকে হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রীর মাধ্যমে আহার্য দান করেছি। অর্থাৎ, দুনিয়ার যাবতীয় সুস্বাদু বস্তু-সামগ্রী ও আরাম-আয়েশ তাদের দিয়ে দিয়েছি।

আয়াতের শেষাংশে আবার তাদের কুটিলতা ও ভ্রান্ত আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যেও বহু লোক ক্ষমতাপ্রাপ্তির পর আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতসমূহের মর্যাদা দেয়নি এবং তাঁর আনুগত্যে বিমুখতা অবলম্বন করেছে। এরা রসূলে করীম (সাঃ) সম্পর্কে তওরাতে যেসব নিদর্শন পাঠ করত, তাতে তাঁর আগমনের সর্বাগ্রে তাদেরই ঈমান আনা উচিত ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, মহানবী (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তো এরা শেষ নবীর উপর বিশ্বাস পোষণ করত, তার নিদর্শনসমূহ ও তাঁর আগমনের সময় নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ লোকদেরকে বলত, নিজেরাও দোয়া করতে গিয়ে শেষ যমানার নবীর ওসীলা দিয়ে দোয়া করত, কিন্তু যখন শেষ যমানার নবী (সাঃ) তাঁর যাবতীয় প্রমাণাদি এবং তওরাতের বাতলানো নিদর্শনসহ আগমন করলেন, তখন এরা পারস্পরিক মতবিরোধ করতে লাগল এবং কিছু লোক ঈমান আনলেও অন্যান্য সবাই অস্বীকার করল। এ আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর আগমনকে جَآءَهُمُ الْعِلْمُ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে علم বলতে 'নিশ্চিত বিশ্বাস'ও উদ্দেশ্য হতে পারে। তাহলে অর্থ হবে এই যে, যখন প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে বিশ্বাসের উপকরণসমূহও সংযোজিত হয়ে গেল, তখন তারা মতবিরোধ করতে লাগল।

কোন কোন তফসীরবিদ একথাও বলেছেন যে, এখানে علم অর্থ معلوم অর্থাৎ, যখন সে সত্তা সামনে এসে উপস্থিত হল, যা তওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই জানা ছিল, তখন তারা মতবিরোধ করতে আরম্ভ করল।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾ قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾

(৯৮) সুতরাং কোন জনপদ কেন এমন হল না যা ঈমান এনেছে অতঃপর তার সে ঈমান গ্রহণ হয়েছে কল্যাণকর? অবশ্য ইউনুসের সম্প্রদায়ের কথা আলাদা। তারা যখন ঈমান আনে, তখন আমি তুলে নেই তাদের উপর থেকে অপমানজনক আযাব–পার্থিব জীবনে এবং তাদেরকে কল্যাণ পৌঁছাই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। (৯৯) আর তোমার পরওয়ারদেগার যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে, তাদের সবাই ঈমান নিয়ে আসতে সমবেতভাবে। তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তী করবে ঈমান আনার জন্য? (১০০) আর কারো ঈমান আনা হতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র হুকুম হয়। পক্ষান্তরে তিনি অপবিত্রতা আরোপ করেন যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে না তাদের উপর। (১০১) তাহলে আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখ তো আসমানসমূহে ও যমীনে কি রয়েছে। আর কোন নিদর্শন এবং কোন ভীতিপ্রদর্শনই কোন কাজে আসে না সেসব লোকের জন্য যারা মান্য করে না। (১০২) সুতরাং এখন আর এমন কিছু নেই, যার অপেক্ষা করবে, কিন্তু সেসব দিনের মতই দিন, যা অতীত হয়ে গেছে এর পূর্বে। আপনি বলুন, এখন পথ দেখ ; আমিও তোমাদের সাথে পথ চেয়ে রইলাম। (১০৩) অতঃপর আমি বাঁচিয়ে নেই নিজের রসূলগণকে এবং তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এমনিভাবে। ঈমানদারদের বাঁচিয়ে নেয়া আমার দায়িত্বও বটে। (১০৪) বলে দাও– হে মানবকুল, তোমরা যদি আমার দ্বীনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে থাক, তবে (জেনো) আমি তাদের এবাদত করি না যাদের এবাদত তোমরা কর আল্লাহ্ ব্যতীত। কিন্তু আমি এবাদত করি আল্লাহ্ তাআলার যিনি তুলে নেন তোমাদেরকে। আর আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে যাতে আমি ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। (১০৫) আর যেন সোজা দ্বীনের প্রতি মুখ করি সরল হয়ে এবং যেন মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত না হই! (১০৬) আর নির্দেশ হয়েছে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার ভাল করবে না মন্দও করবে না। বস্তুতঃ তুমি যদি এমন কাজ কর, তাহলে তখন তুমিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এক্ষেত্রে সমকালীন কোন কোন লোকের কঠিন বিভ্রান্তি ঘটে গেছে। তারা হযরত ইউনুস (আঃ)–এর প্রতি রেসালতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্যকে যুক্ত করে দেন এবং পয়গম্বরের শৈথিল্যতাকেই সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব সরে যাবার কারণ সাব্যস্ত করেন। তদুপরি এই শৈথিল্যতাকেই খোদায়ী রোষের কারণ বলে সাব্যস্ত করেন। সূরা–আম্বিয়া ও সূরা সাফফাতে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। তা এরূপ ঃ "কোরআনের ইঙ্গিত এবং ইউনুস (আঃ)–এর গ্রন্থের বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি পরিষ্কার জানা যায় যে, ইউনুস (আঃ)–এর দ্বারা রেসালতের দায়িত্ব পালনে যৎসামান্য ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল এবং হয়তো তিনি অধৈর্য হয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের অবস্থান ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেজন্য আযাবের লক্ষণাদি দেখেই যখন তাঁর সঙ্গী–সাথীগণ তওবা–এস্তেগফার আরম্ভ করে দেয়, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কোরআনে আল্লাহ্ তাআলার যেসব মূল রীতিনীতির কথা বলা হয়েছে, তাতে একটি নির্দিষ্ট ধারা এও রয়েছে যে, আল্লাহ্ কোন জাতি–সম্প্রদায়কে ততক্ষণ পর্যন্ত আযাবে লিপ্ত করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের উপর স্বীয় প্রমাণাদি পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। সুতরাং নবীর দ্বারা যখন রেসালতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তিনি নিজেই যখন স্থান ত্যাগ করেন, তখন আল্লাহ্‌র ন্যায়নীতি তাঁর সম্প্রদায়কে সেজন্য আযাব দান করতে সম্মত হয়নি। — (তাফহীমুল–কোরআন ঃ মাওলানা মওদুদী পৃষ্ঠা ৩১২, জিলদ—২)

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পাপ থেকে মা'সুম হওয়ার বিষয়টি এমন একটি সর্বসম্মত বিশ্বাস, যার উপর সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য বিদ্যমান। এর বিশ্লেষণে কিছু আংশিক মতবিরোধও রয়েছে যে, এই নিষ্পাপত্ব কি সগীরা–কবীরা সর্বপ্রকার গোনাহ থেকেই, না শুধু কবীরা গোনাহ্ থেকে। তাছাড়া এ নিষ্পাপত্বে নবুওয়তপ্রাপ্তির পূর্বেকার সময়ও অন্তর্ভুক্ত কি না? কিন্তু এতে কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তি কারোই কোন মতবিরোধ নেই যে, নবী–রসূলগণের কেউই রেসালতের দায়িত্ব পালনে কোন রকম শৈথিল্য করতে পারেন না। তার কারণ, নবী–রসূলগণের জন্য এর চাইতে বড় পাপ আর কিছুই হতে পারে না যে, যে দায়িত্বে আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে নির্বাচন করেছেন, তাঁরা নিজেই তাতে শৈথিল্য করে বসবেন। এটা সে মর্যাদাগত দায়িত্বের প্রকাশ্য খেয়ানত, যা সাধারণ শালীনতা–সম্পন্ন মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। এহেন ত্রুটি থেকেও যদি নবীগণ নির্দোষ না হবেন, তবে অন্যান্য পাপের বেলায় নিষ্পাপ হলেই বা কি লাভ!

কোরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত মূলনীতি ও নবীগণের নিষ্পাপত্ব সম্পর্কে সর্বসম্মত বিশ্বাসের পরিপন্থী বাহ্যিক কোন কথা যদি কোরআন–হাদীসের মাঝেও কোনখানে দেখা যায়, তবে সর্বসম্মত মূলনীতির ভিত্তিতে তার এমন ব্যাখ্যা ও অর্থ অনুসন্ধান করা কর্তব্য ছিল, যাতে তা কোরআন–হাদীসের অকাট্য প্রামাণ্য মূলনীতির বিরোধী না হয়।

কিন্তু এখানে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, উল্লেখিত গ্রন্থকার মহোদয় যে বিষয়টি কোরআন করীম ও হযরত ইউনুস (আঃ)–এর সহীফার বিশ্লেষণের উদ্ধৃতিক্রমে উপস্থাপন করেছেন, তা সহীফায়ে–ইউনুসে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের নিকট তার কোন গুরুত্ব বা গ্রাহ্যতা নেই। তবে এ ব্যাপারে কোরআনী ইঙ্গিত একটিও নেই। বরং ব্যাপারটি হলো এই যে, কয়েকটি প্রেক্ষিত জড়ো করে তা থেকে এই

সিদ্ধান্ত বের করা হয়েছে একান্তই জবরদস্তিমূলকভাবে।

প্রথমে তো ধরে নেয়া হয়েছে যে, ইউনুস (আঃ)-এর কওমের উপর থেকে আযাব রদ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্ তাআলার সাধারণ রীতি বিরুদ্ধ হয়েছে। অথচ এমন মনে করা স্বয়ং এ আয়াতের পূর্বাপর ধারাবাহিকতারও সম্পূর্ণ বিরোধী। তদুপরি তফসীরশাস্ত্রের গবেষক ইমানগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরও পরিপন্থী। তারপর এর সাথে একথাও ধরে নেয়া হয়েছে যে, ঐশীরীতি এ ক্ষেত্রে এ কারণে লংঘন করা হয়েছে যে, স্বয়ং নবী দ্বারা রেসালতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছিল, তৎসঙ্গে একথাও ধরে নেয়া হয়েছে যে, পয়গম্বরের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করার জন্য একটা বিশেষ সময় নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি নির্ধারিত সে সময়ের পূর্বেই দ্বীনের প্রতি আহবান করার দায়িত্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

সামান্যতম বিচার-বিবেচনায়ও যদি করা যায়, তবে একথা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, কোরআন ও সুন্নাহ্র কোন ইঙ্গিত এসব মনগড়া প্রতিপাদ্যের পক্ষে খুঁজে পাওয়া যায় না।

স্বয়ং কোরআনের আয়াতে বর্ণনাধারার প্রতি লক্ষ্য করুণ, আয়াতে বলা হয়েছে— فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ এর পরিষ্কার মর্ম এই যে, পৃথিবীর সাধারণ জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে আফসোসের প্রকাশ হিসাবে বলা হয়েছে যে, তারা কেনই বা এমন হল না যে, এমন সময়ে ঈমান নিয়ে আসত যে সময় পর্যন্ত ঈমান আনলে তা লাভজনক হতো! অর্থাৎ, আযাব কিংবা মৃত্যুতে পতিত হওয়ার আগে আগে যদি ঈমান নিয়ে আসত, তবে তাদের ঈমান কবুল হয়ে যেত। কিন্তু ইউনুস (আঃ)-এর সম্প্রদায় তা থেকে স্বতন্ত্র। কারণ তারা আযাবের লক্ষণাদি দেখে আযাবে পতিত হওয়ার পূর্বেই যখন ঈমান নিয়ে আসে, তখন তাদের ঈমান ও তওবা কবুল হয়ে যায়।

আয়াতের এই প্রকৃষ্ট মর্ম প্রতীয়মান করে যে, এখানে কোন ঐশীরীতি লংঘন করা হয়নি ; বরং একান্তভাবে আল্লাহ্ তাআলার নিয়ম অনুযায়ী তাদের ঈমানও তওবা কবুল করে নেয়া হয়েছে।

অধিকাংশ তফসীরকার বাহ্রে-মুহীত, কুরতুবী, যখমশরী, মাযহারী, রূহুল-মা'আনী প্রমুখ এ আয়াতের এ মর্মই লিখেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইউনুস (আঃ)-এর সম্প্রদায়ে তওবা কবুল হওয়ার বিষয়টি সাধারণ খোদায়ী রীতির আওতায়ই হয়েছে।

তাবারী প্রমুখ তফসীরকারও এ ঘটনাকে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের কেউই একথা বলেননি যে, এ বৈশিষ্ট্যের কারণ ছিল ইউনুস (আঃ)-এর ত্রুটিসমূহ। বরং সে সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ মনে তওবা করা ও আল্লাহ্র জ্ঞানে তার নিঃস্বার্থ হওয়া প্রভৃতিকেই কারণ বলে লিখেছেন।

সুতরাং যখন একথা জানা গেল যে, ইউনুস (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের আযাব রহিত হয়ে যাওয়া সাধারণ খোদায়ী রীতির পরিপন্থী নয়, বরং একান্তভাবেই তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তখন এ বিতর্কের ভিত্তিই শেষ হয়ে গেছে।

তেমনিভাবে কোরআনের কোন বক্তব্যে একথা প্রমাণিত নেই যে, আযাবের দুঃসংবাদ শোনানোর পর ইউনুস (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার অনুমতি ছাড়াই তাঁর সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে যান। বরং আয়াতের ধারাবাহিকতা ও তফসীরসংক্রান্ত রেওয়ায়েতের দ্বারা একথাই বোঝা যায় যে, সমস্ত সাবেক উম্মতের সাথে যে ধরণের আচরণ চলে আসছিল অর্থাৎ, তাদের উম্মতের উপর আযাব আসার সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেল। আল্লাহ্ তাআলাও তাঁর পয়গম্বরগণকে এবং তাঁদের সঙ্গীদেরকে সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে দিতেন— যেমন হযরত লূত (আঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কে কোরআনে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে—তেমনিভাবে এখানেও আল্লাহ্ তাআলার সে নির্দেশ যখন ইউনুস (আঃ)-এর মাধ্যমে তাদেরকে পৌঁছে দেয়া হয় যে, তিন দিন পর আযাব আসবে, ইউনুস (আঃ)-এর সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দ্বারা স্পষ্টতঃ এ কথাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ হয়েছে।

অবশ্য পয়গম্বরসুলভ মর্যাদার দিক দিয়ে ইউনুস (আঃ)-এর দ্বারা একটি পদস্খলন হয়ে যায় এবং সে ব্যাপারে সূরা আম্বিয়াও সূরা সাফ্ফাতের আয়াতসমূহে যে ভৎর্সনাসূচক শব্দ এসেছে এবং তারই ফলে যে তার মাছের পেটে অবস্থান করার ঘটনা ঘটেছে ; তা এজন্য নয় যে, তিনি রেসালতের দায়িত্বে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন, বরং ঘটনাটি তাই যা উপরে প্রামাণ্য তফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহকারে লেখা হয়েছে। তা'হল এই যে, হযরত ইউনুস (আঃ) যখন আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক তিন দিন পর আযাব আসার দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেন এবং ঐশীনির্দেশে নিজের অবস্থান ত্যাগ করে বাইরে চলে যান, কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় যে, আযাব আসেনি, তখন ইউনুস (আঃ)-এর মনে এ ভাবনা চেপে বসল যে, আমি সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে গেলে তারা আমাকে মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত করবে। তাছাড়া এ সম্প্রদায়ে নিয়ম প্রচলিত রয়েছে যে, কারো মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। কাজেই এ সময় সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে যাওয়ায় প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে। অতএব, এ সময় এ দেশ থেকে হিজরত করে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথই ছিল না। কিন্তু নবী-রসূলগণের রীতি হল এই যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোনদিকে হিজরত করার নির্দেশ না আসা পর্যন্ত নিজের ইচ্ছামত তাঁরা হিজরত করেন না। সুতরাং এক্ষেত্রে ইউনুস (আঃ)-এর পদস্খলনটি ছিল এই যে, তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনুমোদন আসার পূর্বেই হিজরতের উদ্দেশে নৌকায় আরোহণ করে বসেন। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ না হলেও নবী-রসূলগণের রীতির পরিপন্থী ছিল। কোরআনের আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, ইউনুস (আঃ)-এর পদস্খলন রেসালতের দায়িত্ব সম্পাদনে ছিল না; বরং তিনি যে সম্প্রদায়ের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য অনুমতি আসার পূর্বেই হিজরত করেছেন, এছাড়া আর কোন কিছুই প্রমাণিত হবে না। সূরা-সাফ্ফাতের আয়াতে এ বিষয়বস্তুর ব্যাপারে প্রায় সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ বিদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ এতে হিজরতের উদ্দেশে নৌকায় আরোহণ করাকে أَبَقَ শব্দ ভৎর্সনা আকারে বলা হয়েছে। এর অর্থ হল স্বীয় মনিবের অনুমতি ব্যতীত কোন ক্রীতদাসের পালিয়ে যাওয়া। আর সূরা-আম্বিয়ার আয়াতে রয়েছে —

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ

এতে স্বভাবজাত ভীতির কারণে সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করে হিজরত করাকে কঠিন ভর্ৎসনার সুরে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর এসবই রেসালতের সমস্ত দায়িত্ব পালনের পর, তখন সংঘটিত হয়েছিল, যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে আসায় জীবনাশঙ্কা দেখা যায়। রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে এ বিষয়টি নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ
بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ
إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَعَشْرُ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾ أَلَّا
تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا
رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ
يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾
أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ
ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾

(১০৭) আর আল্লাহ্ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খণ্ডাবার মত তাঁকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন; বস্তুত: তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু। (১০৮) বলে দাও, হে মানবকুল, সত্য তোমাদের কাছে পৌছে গেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে। এমন যে কেউ পথে আসে সে পথ প্রাপ্ত হয় স্বীয় মঙ্গলের জন্য। আর যে বিভ্রান্ত ঘুরতে থাকে, সে স্বীয় অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকবে। অনন্তর আমি তোমাদের উপর অধিকারী নই। (১০৯) আর তুমি চল সে অনুযায়ী যেমন নির্দেশ আসে তোমার প্রতি এবং সবর কর, যতক্ষণ না ফয়সালা করেন আল্লাহ্। বস্তুতঃ তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

সূরাহূদ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াতঃ ১২৩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

(১) আলিফ, লা-ম, রা; এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত এক মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হতে। (২) যেন তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী না কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাঁরই পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। (৩) আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং অধিক আমলকারীকে বেশী করে দেবেন। আর যদি তোমরা বিমুখ হতে থাক, তবে আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের আযাবের আশঙ্কা করছি। (৪) আল্লাহ্র সান্নিধ্যেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (৫) জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তারা নিজেদের বক্ষদেশ ঘুরিয়ে দেয় যেন আল্লাহ্র নিকট হতে লুকাতে পারে। শুন, তারা তখন কাপড়ে নিজেদেরকে আচ্ছাদিত করে, তিনি তখনও জানেন যা কিছু তারা চুপিসারে বলে আর প্রকাশ্যভাবে বলে। নিশ্চয় তিনি জানেন যা কিছু অন্তরসমূহে নিহিত রয়েছে।

–"ইউনুস (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এজন্য চলে যাচ্ছিলেন যে, তিনি সম্প্রদায়ের কঠিন বিরোধিতা এবং কুফরীর উপর হঠকারিতা সত্ত্বেও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত রেসালতের আহবান জানাতে থাকার ফলাফল প্রত্যক্ষ করে নিয়েছিলেন।"

বস্তুতঃ তাঁর এ সফর ছিল হিজরত হিসাবেই। অথচ তখনও তিনি হিজরতের অনুমতি লাভ করেননি।

এতে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর প্রতি ভর্ৎসনা আসার কারণ রেসালত ও দাওয়াতের দায়িত্বে শৈথিল্য প্রদর্শন ছিল না; বরং অনুমতির পূর্বে হিজরত করাই ছিল ভর্ৎসনার কারণ। উল্লেখিত সমকালীন তফসীরকারকে কোন কোন ওলামা তাঁর এই ভুলের ব্যাপারে অবহিত করলে তিনি সূরা-সাফ্ফাতের তফসীরে স্বীয় মতবাদের সমর্থনে অনেক তফসীরবিদের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলোর মধ্যে ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ প্রমুখের ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহ ছাড়া অন্য কোনটির দ্বারাই তাঁর এ মতবাদের সমর্থন প্রমাণিত হয় না যে, হযরত ইউনুস (আঃ)-এর দ্বারা (মা'আযাল্লাহ্) রেসালতের দায়িত্ব সম্পাদনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছিল।

তাছাড়া জ্ঞানবান বিজ্ঞ লোকদের একথা অজানা নেই যে, তফসীরবিদগণ নিজেদের তফসীরে এমনসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহও উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, যেগুলোর ব্যাপারে তাদের সবাই একমত যে, এসব রেওয়ায়েত প্রামাণ্য কিংবা গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তের কোন হুকুমকে এগুলোর উপর নির্ভরশীল করা যায় না। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত মুসলিম তফসীরবিদদের গ্রন্থেই থাক বা ইউনুস (আঃ)-এর সহীফাতেই থাক, শুধু এসবের উপর নির্ভর করেই হযরত ইউনুস (আঃ)-এর উপর এহেন মহা অপবাদ আরোপ করা যেতে পারে না যে, তাঁর দ্বারা রেসালতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য হয়েছে। ইসলামের কোন তফসীরকার এহেন কোন মত গ্রহণও করেননি।

সূরা হূদ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হূদ ঐসব সূরার অন্যতম যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আপতিত খোদায়ী গজব ও বিভিন্ন প্রকার কঠিন আযাবের এবং পরে কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা বিশেষ বর্ণনারীতির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একদিন হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর কিছু দাড়ি-মোবারক পাকা দেখে বিচলিত হয়ে যখন জিজ্ঞেস করলেন–"ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ); আপনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন।" তখন রসূলে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছিলেন, "হাঁ, সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।" তখন কোন কোন রেওয়ায়েতে সূরা হূদের সাথে সূরা ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসা'আলুন এবং সূরা তাকবীরের নামও উল্লেখ করা হয়েছে।–(আল-হাকেম ও তিরমিযী শরীফ) উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত সূরাগুলিতে বর্ণিত বিষয়বস্তু অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ হওয়ার কারণে এসব সূরা নাযিল হওয়ার পর রসূলে পাক (সাঃ)-এর পবিত্র চেহারায় বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা দেয়।

অত্র সূরার প্রথম আয়াত "আলিফ লা'ম রা" বলে শুরু করা হয়েছে। এগুলো সে সমস্ত বর্ণের অন্তর্ভুক্ত যার সঠিক মর্ম একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর

রসূল (সাঃ)-এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য। অন্য কাউকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি, বরং এ ব্যাপারে চিন্তা করতেও বারণ করা হয়েছে।

অতঃপর কোরআন মজীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। محكم শব্দ احكام হতে গৃহীত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে কোন বাক্যকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ করা যার মধ্যে শব্দগত বা ভাবগত কোন বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। সেমতে আয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহকে এমনভাবে তৈরী করেছেন যাতে শাব্দিক অথবা ভাবগত দিক দিয়ে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি, অস্পষ্টতা বা অসারতার সম্ভাবনা নেই।—(তফসীরে-কুরতুবী)।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন এখানে محكم শব্দ منسوخ -এর বিরপীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেমতে আয়াতের মর্ম হবে—আল্লাহ্ তাআলা কোরআন পাকের আয়াতসমূহকে সামগ্রিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, অপরিবর্তিতরূপে তৈরী করেছেন। তওরাত, ইঞ্জীল, ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাসমূহ পবিত্র কোরআন নাযিলের ফলে যেভাবে 'মনসুখ'বা রহিত হয়েছে কোরআন পাক নাযিল হওয়ার পর যেহেতু নবীর আগমন এবং ওহীর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব আর রহিত হবে না।—(কুরতুবী) তবে কোরআনের এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াত রহিত হওয়া এর পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য ১ম আয়াতেই ثُمَّ فُصِّلَتْ অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে বলে কোরআন পাকের আরেকটি মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। تفصيل শব্দের আভিধানিক অর্থ দু'টি বস্তুর মাঝে পার্থক্য ও ব্যবধান করা। সে জন্যেই সাধারণ গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন বিষয়বস্তু فصل، فصل শিরোনামে আলোচনা করা হয়। সে হিসাবে অত্র আয়াতের মর্ম হবে, আকায়েদ, এবাদত, লেন-দেন আচার-ব্যবহার ও নীতি-নৈতিকতার বিষয়বস্তুগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর আরেক অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তো পূর্ণ কোরআন মজীদ একসাথে লওহে মাহফুযে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারপর স্থান-কাল-পাত্র, পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর স্মরণ রাখা, মর্ম অনুধাবন করা এবং ক্রমান্বয়ে তদনুযায়ী আমল করা সহজ হয়।

অতঃপর বলা হয়েছে مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ অর্থাৎ, এসব আয়াত এমন এক মহান সত্তার পক্ষ হতে আগত হয়েছে, যিনি মহা প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ, যার প্রতিটি কাজে বহু তাৎপর্য ও হেকমত বিদ্যমান—যা মানুষ উপলব্ধি করতে অক্ষম। তিনি সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরামাণুর ভূত-ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি যাবতীয় বিধি-নিষেধ নাযিল করেন। মানুষ যতবড় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান ও দূরদর্শী হোক না কেন, তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা এক নির্ধারিত সীমারেখার গন্ডিতে আবদ্ধ। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ভিত্তিতে তাদের অভিজ্ঞতা গড়ে উঠে। ভবিষ্যৎকালে অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক সময়ই তা ব্যর্থ ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার এলম ও হেকমত কখনো ভুল হবার নয়।

দ্বিতীয় আয়াতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ, তওহীদের উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহের বর্ণনা আরম্ভ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ অর্থাৎ, "একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করবে না।" আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ্ তা আলা ব্যতীত অন্য কারও এবাদত-উপাসনা করবে না।

অতঃপর এরশাদ করেছেন إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ 'নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। অত্র আয়াতে বিশ্বনবী (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তিনি সারা বিশ্ববাসীকে যেন জানিয়ে দেন যে, আমি আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী। অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ ও রসূলের অবাধ্য ও বিরুদ্ধাচরণকারী এবং নিজেদের অবৈধ কামনা-বাসনার অনুসারী, তাদেরকে আল্লাহ্‌র ভীতি প্রদর্শন করছি। অপরদিকে অনুগত, বাধ্যগত লোকদের দো-জাহানের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আখেরাতে অফুরন্ত নেয়ামতের সুসংবাদ দিচ্ছি।

نَذِيرٌ শব্দের অর্থ করা হয়, "ভীতি প্রদর্শনকারী।" কিন্তু এ শব্দটি ভীতি প্রদর্শনকারী শত্রু কিংবা হিংস্রজন্তু বা অন্য কোন অনিষ্টকারীর জন্য ব্যবহৃত হয় না, বরং এমন ব্যক্তিকে "নাযীর" বলা হয় যিনি স্বীয় *প্রিয়পাত্রগণকে সস্নেহে এমনসব বস্তু বা কার্য হতে বিরত রাখেন ও ভয়* দেখান, যা তাদের জন্য দুনিয়া, আখেরাত অথবা উভয় কালেই ক্ষতিকারক।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَ
يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾ وَ
هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ
عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِن قُلْتَ
إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ
هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ
مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا
عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَا
الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ﴿٩﴾
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ
السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ
صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ
مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾

(৬) আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিয়েছেন, তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে। (৭) তিনিই আসমান ও যমীন ছয় দিনে তৈরী করেছেন, তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আর যদি আপনি তাদেরকে বলেন যে, "নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত উঠানো হবে, তখন কাফেররা অবশ্য বলে এটা তো স্পষ্ট যাদু। (৮) আর যদি আমি এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তাদের আযাব স্থগিত রাখি, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে কোন জিনিসে আযাব ঠেকিয়ে রাখছে? শুনে রাখ, যেদিন তাদের উপর আযাব এসে পড়বে, সেদিন কিন্তু তা ফিরে যাওয়ার নয়; তারা যে ব্যাপারে উপহাস করত তাই তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। (৯) আর অবশ্যই যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করতে দেই, অতঃপর তা তার থেকে ছিনিয়ে নেই; তাহলে সে হতাশ ও কৃতঘ্ন হয়। (১০) আর যদি তার উপর আপতিত দুঃখ-কষ্টের পরে তাকে সুখভোগ করতে দেই, তবে সে বলতে থাকে যে, আমার অমঙ্গল দূর হয়ে গেছে, আর সে আনন্দে আত্মহারা হয়, অহঙ্কারে উদ্ধত হয়ে পড়ে। (১১) তবে যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং সৎকার্য করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে। (১২) আর সম্ভবতঃ ঐসব আহকাম যা ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট পাঠানো হয়, তার কিছু অংশ বর্জন করবে? এবং এতে মন ছোট করে বসবে? তাদের এ কথায় যে, তাঁর উপর কোন ধন-ভান্ডার কেন অবতীর্ণ হয়নি? অথবা তাঁর সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন? তুমিতো শুধু সতর্ককারী মাত্র; আর সব কিছুরই দায়িত্বভার তো আল্লাহই নিয়েছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

دَآبَّةٍ (দাব্বাতুন) এমনসব প্রাণীকে বলে যা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে। পক্ষীকূলও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, খাদ্য গ্রহণের জন্য তারা ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করে থাকে এবং তাদের বাসস্থান ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন হয়ে থাকে। সামুদ্রিক প্রাণীসমূহও পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল। কেননা, সাগর-মহাসাগরের তলদেশেও মাটির অস্তিত্ব রয়েছে। মোটকথা, সমুদয় প্রাণীকূলের রিযিকের দায়িত্বই তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন এবং একথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যাদ্দ্বারা দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করা যায়। এরশাদ করেছেন عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا 'তাদের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তাআলার উপর এহেন গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার মত কোন ব্যক্তি বা শক্তি নেই, বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে গ্রহণ করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। আর এক পরম সত্য, দাতা ও সর্বশক্তিমান সত্তার ওয়াদা যাতে নড়চড় হওয়ার অবকাশ নেই। সুতরাং নিশ্চয়তা বিধান করণার্থ এখানে على শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা ফরয বা অবশ্যকরণীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অথচ আল্লাহ্‌র উপর কোন কাজ ফরয বা ওয়াজিব হতে পারে না, তিনি কারো হুকুমের তোয়াক্কা করেন না।

رزق রিযিকের আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু যা কোন প্রাণী আহার্যরূপে গ্রহণ করে, যার দ্বারা সে দৈহিক শক্তি সঞ্চয়, প্রবৃদ্ধি সাধন এবং জীবন রক্ষা করে থাকে। রিযিকের জন্য মালিকানা স্বত্ব শর্ত নয়। সকল জীব-জন্তু রিযিক ভোগ করে থাকে কিন্তু তারা তার মালিক হয় না। কারণ, মালিক হওয়ার যোগ্যতাই ওদের নেই। অনুরূপভাবে ছোট শিশুরাও মালিক নয়, কিন্তু ওদের রিযিক অব্যাহতভাবে তাদের কাছে পৌঁছতে থাকে। রিযিকের এহেন ব্যাপক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে ওলামায়ে কেরাম বলেন, রিযিক হালালও হতে পারে, হারামও হতে পারে। যখন কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে অন্যের মাল হস্তগত ও উপভোগ করে, তখন উক্ত বস্তু তার রিযিক হওয়া সাব্যস্ত হয়, তবে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করার কারণে তা তার জন্য হারাম হয়েছে। যদি সে লোভের বশবর্তী হয়ে অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করত, তাহলে তার জন্য নির্ধারিত রিযিক বৈধপন্থায়ই তার নিকট পৌঁছে যেত।

রিযিক সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রতিটি প্রাণীর জিবিকার দায়িত্ব যেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা খোদ গ্রহণ করেছেন, কাজেই অনাহারে কারো মৃত্যুবরণ করার কথাই নয়। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, অনেক প্রাণী ও মানুষ খাদ্যের অভাবে, অনাহারে ক্ষুধা-পিপাসায় মারা যায়, এর রহস্য কি? ওলামায়ে কেরাম এ প্রশ্নের বিভিন্নভাবে জবাব দিয়েছেন।

তন্মধ্যে একটি জবাব হচ্ছে, এখানে রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণের অর্থ হবে আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন। আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া মাত্র তাকে মৃত্যুবরণ করে ধরাপৃষ্ঠ হতে বিদায় নিতে হবে। সাধারণত বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির কারণে মৃত্যু হলেও কখনো কখনো অগ্নিদগ্ধ হওয়া, সলিল সমাধি লাভ করা, আঘাত বা দুর্ঘটনায় পতিত হওয়াও এর কারণ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে রিযিক বন্ধ করে দেয়ার কারণে অনাহারও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কাজেই, আমরা যাদের অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে দেখি, আসলে তাদের রিযিক ও আয়ু শেষ হয়ে গেছে, অতঃ-

রোগ-ব্যাধি বা দুর্ঘটনায় তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি না ঘটিয়ে বরং রিযিক সরবরাহ বন্ধ হওয়ার কারণে অনাহার ও ক্ষুধা-পিপাসায় তারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়।

ইমাম কুরতুবী (রঃ) অত্র আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবু মূসা (রাঃ) ও হযরত আবু মালেক (রাঃ) প্রমুখ আশআরী গোত্রের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন যে, তারা ইয়ামন হতে হিজরত করে মদীনা শরীফ পৌঁছলেন। তাঁদের সাথে পাথেয় স্বরূপ আহার্য পানীয় যা ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে গেলে তাঁরা নিজেদের পক্ষ হতে একজন মুখপাত্র হযরত (সাঃ)-এর সমীপে প্রেরণ করলেন যেন রসূলে করীম (সাঃ) তাদের জন্য কোন আহার্যের সু-ব্যবস্থা করেন। উক্ত প্রতিনিধি যখন রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর গৃহদ্বারে হাযির হলেন, তখন গৃহাভ্যন্তর হতে রসূলে পাক (সাঃ)-এর কোরআন তেলাওয়াতের সুমধুর ধ্বনি ভেসে এল وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্ গ্রহণ করেননি। সাহাবী অত্র আয়াত শ্রবণ করে মনে করলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং যখন যাবতীয় প্রাণীকুলের রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আমরা আশআরী গোত্রের লোকেরা আল্লাহ্ তাআলার নিকট নিশ্চয় অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট নই, অতএব তিনি অবশ্যই আমাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। এ ধারণা করে তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিজেদের অসুবিধার কথা না বলেই সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ফিরে গিয়ে স্বীয় সাথীদের বললেন— "শুভ-সংবাদ, তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য আসছে।" তাঁরা এ কথার অর্থ বুঝলেন যে, তাঁদের মুখপাত্র নিজেদের দুরবস্থার কথা রসূলে পাক (সাঃ)-কে অবহিত করার পর তিনি তাঁদের আহার্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাঁরা নিশ্চিত মনে বসে রইলেন। তাঁরা উপবিষ্টই ছিলেন, এমন সময় দুই ব্যক্তি গোশত-রুটিপূর্ণ একটি قصعة অর্থাৎ, বড় খাঞ্চা বহন করে উপস্থিত হয়ে আশআরীদের দান করল। অতঃপর দেখা গেল আশআরী গোত্রের লোকদের আহার করার পরও প্রচুর রুটি-গোশত রয়ে গেল। তখন তাঁরা পরামর্শ করে অবশিষ্ট খানা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সমীপে প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন, যেন তিনি প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করতে পারেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের দুই ব্যক্তির মাধ্যমে তা রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন।

তারা খাঞ্চা নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন- "ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ), আপনার প্রেরিত রুটি-গোশ্ত অত্যন্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হয়েছে।" তদুত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "আমি তো কোন খাদ্য প্রেরণ করিনি।"

তখন তাঁরা পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, আমাদের অসুবিধার কথা আপনার কাছে ব্যক্ত করার জন্য অমুক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি ফিরে গিয়ে একথা বলেছিলেন। ফলে আমরা মনে করেছি যে, আপনিই খানা প্রেরণ করেছেন। এতদশ্রবণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন— "আমি নই বরং ঐ পবিত্র সত্তা প্রেরণ করেছেন যিনি সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন।"

আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলে করীম (সাঃ)-এর রেসালতের সত্যতা এবং এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীদের জবাব দেয়া হয়েছে। ৯ম থেকে তিন আয়াতে মানুষের একটি স্বভাবজাত বদভ্যাসের বর্ণনা এবং উহা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৯ম ও ১০ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ জন্মগতভাবে চঞ্চল প্রকৃতির ও ক্ষিপ্রতাবাদী। এতদসঙ্গে মানুষের বর্তমান নিয়ে বিভোর হতে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ করেছেন, আমি মানুষকে আমার কোন নেয়ামতের স্বাদ-আস্বাদন করাবার পর যদি তা ছিনিয়ে নেই, তবে তারা একেবারে হিম্মত-হারা, হতাশ ও না-শোকর হয়ে যায়। আর তার উপর দুঃখ-দুর্দশা আপতিত হওয়ার পর, যদি তা দূরীভূত করে সুখ-শান্তি দান করি, তাহলে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলতে থাকে যে, আমার অমঙ্গল চিরতরে দূরীভূত হয়ে গেছে।

সারকথা এই যে, মানুষ স্বভাবতঃ ক্ষিপ্রতাবাদী বর্তমান অবস্থাকেই তারা সর্বস্ব মনে করে থাক। অতীত ও ভবিষ্যতের অবস্থা এবং ইতিহাস স্মরণ রেখে এবং চিন্তা করে শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা অভ্যস্ত নয়। কাজেই, সুখ-সমৃদ্ধির পর দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়া মাত্র অতীত নেয়ামতরাজির প্রতি নিমকহারামী করে এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যে মহান সত্তা প্রথমে সুখ-সচ্ছলতা দান করেছিলেন, তিনি যে আবারও তা দিতে পারেন সে কথা তারা খেয়ালই করে না। অনুরূপভাবে দুঃখ-দৈন্যের পরে যদি সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে, তখন পূর্বাবস্থা স্মরণ করে আল্লাহ্ তাআলার শোকর আদায় করার পরিবর্তে হঠকারিতা ও অহঙ্কার করতে থাকে। অতীতকে বিস্মৃত হয়ে তারা মনে করতে থাকে যে, এসব সুখ-সম্পদ আমারই যোগ্যতার পুরস্কার এবং অবশ্যম্ভাবী প্রাপ্য। এটা কখনো আমার হাতছাড়া হবে না। আত্মভোলা মানুষ এ কথা চিন্তা করে না যে, পূর্ববর্তী দুঃখ-দুর্দশা যেমন স্থায়ী হয়নি, তদ্রূপ বর্তমান সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চিরস্থায়ী নাও হতে পারে।

১১ তম আয়াতে এমনি ইনসানে-কামেল বা সত্যিকার মানুষকে সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা হতে পৃথক করার জন্য এরশাদ করেছেন إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ অর্থাৎ, সাধারণ মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে এসব ব্যক্তি যাদের মধ্যে দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে। একটি হচ্ছে ধৈর্য ও সহনশীলতা, দ্বিতীয়টি সৎকর্মশীলতা।

صبر সবর শব্দটি বাংলা ও উর্দুর চেয়ে আরবী ভাষায় অনেক ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। সবরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাধা দেয়া, বন্ধন করা। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় অন্যান্য কার্য হতে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করাকে 'সবর' বলে। সুতরাং শরীয়তের পরিপন্থী যাবতীয় পাপকার্য হতে প্রবৃত্তিকে দমন করা যেমন সবরের অন্তর্ভুক্ত, তদ্রূপ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব ইত্যাদি নেক কাজের জন্য প্রবৃত্তিকে বাধ্য করাও সবরের শামিল। সারকথা, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও রোজ কেয়ামতের জবাবদিহির ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ্ ও রসূলের অপছন্দনীয় কার্যকলাপ হতে দূরে থাকে এবং সন্তুষ্টিজনক কার্যে মশগুল থাকে, তারাই পূর্ণ ঈমানদার ও সত্যিকার মানুষ নামের যোগ্য। অত্র আয়াতেরই শেষ বাক্যে ধৈর্য ধারণকারী, সৎকর্মশীল, পূর্ণ ঈমানদারগণের প্রতিদান ও পুরস্কারের কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে- أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ অর্থাৎ, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র ওয়াদা রয়েছে যে, তাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে এবং তাদের সৎকার্যসমূহের বিরাট প্রতিদান দেয়া হবে।

এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, পার্থিব সুখ-দুঃখ উভয়কে আল্লাহ্ তাআলা أَذَقْنَا "স্বাদ আস্বাদন করাই" বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, আসল সুখ-দুঃখ পরকালে হবে। পৃথিবীতে পুরোপুরি সুখ বা দুঃখ নেই। বরং

মানুষের পক্ষে স্বাদ গ্রহণের জন্য নমুনাস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ সুখ-দুঃখ দেয়া হয়েছে যেন, আখেরাতের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। সুতরাং পার্থিব সুখ-শান্তিতে আনন্দে আত্মহারা হওয়া যেমন বোকামী, তদ্রূপ পার্থিব দুঃখ-দুর্দশাও অত্যধিক বিমর্ষ হওয়ার বিষয় নয়। বস্তুতঃ দুনিয়াকে আধুনিক পরিভাষা অনুসারে আখেরাতের একটা প্রদর্শনীস্বরূপ বলা যেতে পারে। যেখানে আখেরাতের সুখ-দুঃখের নুমনা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১২তম আয়াত এক বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তা হচ্ছে মক্কার মুশরিকরা মহানবী (সাঃ) সমীপে কতিপয় আবদার পেশ করেছিল। প্রথমতঃ তারা বলল, এতে আমাদের দেব-দেবীকে নিন্দা করা হয়েছে। তাই আমরা এর প্রতি ঈমান আনতে পারছি না। অতএব, আপনি হয়ত অন্য কোরআন নিয়ে আসুন অথবা এর মধ্যে পরিবর্তন ও সংশোধন করুন। ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ "আপনি অন্য কোরআন নিয়ে আসুন অথবা এগুলো পরিবর্তন করুন।"—(তফসীরেবগবী ও তফসীরে মাযহারী)।

দ্বিতীয়তঃ তারা আরো বলেছিল যে, "আমরা আপনার নবুওয়তের প্রতি তখন বিশ্বাস স্থাপন করব, যখন দেখব যে, দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মত আপনার আয়ত্তে কোন ধন-ভান্ডার রয়েছে এবং সেখান থেকে অপনি সবাইকে দান করেছেন। অথবা, আসমান হতে কোন ফেরেশতা অবতরণ করে আপনার সাথে সাথে থাকবেন এবং আপনার কথা সমর্থন করে বলবে যে, ইনি সত্যিই আল্লাহ্র রসূল।"

তাদের এহেন অবাস্তব ও অযৌক্তিক আবদার শুনে রসূলে করীম (সাঃ) মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। কারণ, তাদের অযৌক্তিক আবদার পূরণ করা যেমন তাঁর এখতিয়ার বহির্ভূত ছিল, তদ্রূপ তাদেরকে কুফরী ও শেরকের অবস্থায় ছেড়ে দেয়াও অসহনীয় ছিল, তাদের হেদায়েতের চিন্তা-ফিকির অন্তর হতে দূর করাও সম্ভবপর ছিল না। কেননা, রাহমাতুল-লিল 'আলামীন বা সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমতস্বরূপ তিনি অবতরণ করেছিলেন।'

বস্তুতঃ তাদের আবদার ছিল নিরেট মূর্খতা ও চরম অজ্ঞতা-প্রসূত। কেননা, সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য অসার মূর্তিপূজা ও অন্যান্য নিন্দনীয় কার্য-কলাপের সমালোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়তঃ নবুওয়তকে তারা বাদশাহীর সাথে তুলনা করেছিল। আসলে ধন-ভান্ডারের সাথে নবুওয়তের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। অপরদিকে আল্লাহ্ তাআলারও এমন কোন রীতি নেই যে, তিনি বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে মানুষকে দায়ে ঠেকিয়ে ঈমান আনতে বাধ্য করবেন। তাই যদি হতো, তবে নিখিল সৃষ্টিজগত তাঁর অপার কুদরতের আওতায়ই রয়েছে। কার সাধ্য ছিল যে, তাঁর অপছন্দনীয় কোন কাজ করবে বা চিন্তাধারা পোষণ করবে? কিন্তু তাঁর অফুরন্ত হেকমতের তাগিদে ইহ-জগতকে পরীক্ষাক্ষেত্র সাব্যস্ত করেছেন। এখানে সৎকার্য সম্পাদন অথবা, অন্যায়-অসত্য থেকে বিরত রাখার জন্য বৈষয়িক দিক থেকে কাউকে বাধ্য করা হয় না।

তবে যুগে যুগে পয়গম্বর প্রেরণ ও আসমানী কিতাব নাযিল করে ভাল-মন্দের পার্থক্য এবং তার প্রতিফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। সৎকার্য করা ও অসৎকার্য থেকে দূরে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মু'জেযাস্বরূপ সাথে সাথে যদি কোন ফেরেশতা থাকতেন, তবে যখনই কেউ তাঁকে অমান্য করত, তৎক্ষণাৎ গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হত। ফলে তা দায়ে ঠেকে ঈমান আনার পর্যায়ভুক্ত হত। তাছাড়া ফেরেশতার সাক্ষ্যদানের পর ঈমান আনা হলে তা ঈমান বিল-গায়ব বা গায়বের প্রতি ঈমান হত না। অথচ ঈমান বিল-গায়বই হচ্ছে ঈমানের মূল প্রাণশক্তি। আর ঈমান না আনার এখতিয়ারও থাকত না। অথচ এই এখতিয়ারের উপরই যাবতীয় আমলের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) সমীপে তাদের এহেন অর্থহীন আবদার প্রমাণ করে, তারা নবী ও রসূলের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ ও জাহেল ছিল। তারা আল্লাহ্ তাআলা ও রসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখে না; বরং আল্লাহ্র ন্যায় রসূলকেও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। তাই রসূলের কাছে তারা এমন আবদার করেছে যা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ পূরণ করতে পারে না।

যাহোক, রসূলে করীম (সাঃ) তাদের এহেন অবান্তর আবদারে অত্যন্ত দুঃখিত ও মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তখন তাঁকে সান্ত্বনা দান ও মুশরেকদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য অত্র আয়াত অবতীর্ণ হল।

যাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, আপনি কি তাদের কথায় হতোদ্যম হয়ে আল্লাহ্র প্রেরিত কোরআন পাকের কোন কোন আয়াত প্রচার করা ছেড়ে দেবেন, যার মধ্যে মূর্তির অসারতা ও অক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে বলে মুশরেকরা ঐ সব আয়াত অপছন্দ করছে? এখানে لعلك শব্দ এজন্য প্রয়োগ করা হয়নি যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন কোন আয়াত বাদ দেবেন বলে ধারণা করার অবকাশ ছিল। বরং এখানে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, মুশরেকদের মনোরঞ্জনের খাতিরে রসূলে পাক (সাঃ) কোরআন করীমের কোন আয়াত গোপন রাখতে পারেন না। কারণ, তিনি তো আল্লাহ্র পক্ষ হতে نذير ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরিত হয়েছেন। সর্ব কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই গ্রহণ করেছেন। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখনই নবীর মাধ্যমে মু'জেযা প্রদর্শন করেন। অতএব, তাদের অন্যায় আবদারে আপনার মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

কাফের ও মুশরেকরা শুধু ভীতি প্রদর্শনের যোগ্য হওয়ার কারণে এখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে نذير নাযীর বলা হয়েছে। নতুবা তিনি একদিকে যেমন نذير (ভীতি প্রদর্শক) ছিলেন, অপরদিকে সৎকর্মশীলদের জন্য তদ্রূপ بشير সুসংবাদাতাও ছিলেন। অধিকন্তু 'নাযীর' এমন ব্যক্তিকে বলে যিনি স্নেহ-মমতার ভিত্তিতে স্বীয় প্রিয়জনকে অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু হতে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করেন এবং রক্ষা করার চেষ্টা করেন। অতএব, নাযীর শব্দের মধ্যে 'বশীর'-এর মর্মও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَ
ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾
فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ
إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ
زِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا
صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ
بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ
إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ
الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ
مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَ
يَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾

(১৩) তারা কি বলে? কোরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে। (১৪) অতঃপর তারা যদি তোমাদের কথা পূরণ করতে অপারগ হয়; তবে জেনে রাখ, এটি আল্লাহ্‌র এলম দ্বারা অবতীর্ণ হয়েছে; আরো একীন করে নাও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। অতএব, এখন কি তোমরা আত্মসমর্পণ করবে? (১৫) যে ব্যক্তি পার্থিবজীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। (১৬) এরাই হল সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল। (১৭) আচ্ছা বল তো, যে ব্যক্তি তার প্রভুর সুস্পষ্ট পথে রয়েছে, আর সাথে সাথে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে একটি সাক্ষীও বর্তমান রয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী মূসা (আঃ)–এর কিতাবও সাক্ষী যা ছিল পথনির্দেশক ও রহমত স্বরূপ, (তিনি কি অন্যান্যের সমান)? অতএব তাঁরা কোরআনের প্রতি ঈমান আনেন। আর ঐসব দলগুলির যে কেউ তা অস্বীকার করে, দোযখই হবে তার ঠিকানা। অতএব, আপনি তাতে কোন সন্দেহে থাকবেন না। নিঃসন্দেহে তা আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে ধ্রুব সত্য; তথাপি অনেকেই তা বিশ্বাস করে না। (১৮) আর তাদের চেয়ে বড় যালেম কে হতে পারে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করে। এসব লোককে তাদের পালনকর্তার সাক্ষাত সম্মুখীন করা হবে আর সাক্ষিগণ বলতে থাকবে, এরাই ঐসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। শুনে রাখ, যালেমদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত রয়েছে। (১৯) যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়, আর তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়ায়, এরাই আখেরাতকে অস্বীকার করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে মুশরেকদের পক্ষ হতে বিশেষ ধরনের মু'জেযা দাবী করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, হযরত (সাঃ)–এর মু'জেযা পাক–কোরআন তোমাদের সম্মুখে রয়েছে, যার অলৌকিকত্ব তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমরা যদি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ মু'জেযার দাবী করে থাক, তাহলে কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের দাবী পূরণ করা হয়েছে। সুতরাং নতুন কোন মু'জেযা দাবী করার কোন অধিকার তোমাদের নেই। আর যদি ধৃষ্টতার কারণে তোমরা মু'জেযার দাবী করে থাক, তাহলে তোমাদের মত হঠকারী লোকেরা মু'জেযা দেখার পর ঈমান আনয়ন করবে এমন আশাও করা যায় না। সারকথা, কোরআন করীম যে এক স্পষ্ট ও স্থায়ী মু'জেযা, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ব্যাপারে কাফের ও মুশরেকরা যেসব অমূলক সন্দেহ–সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল পরবর্তী দুই আয়াতে তার জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে যে, তারা কি বলতে চায় যে, কোরআন মজীদ আল্লাহ্‌র কালাম নয়; বরং হযরত (সাঃ) স্বয়ং তা রচনা করেছেন? যদি তোমরা তাই মনে করে থাক যে, এরূপ বিস্ময়কর কালাম নবীয়ে–উম্মী (সাঃ) নিজে রচনা করেছেন, তাহলে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে দেখাও। আর একই ব্যক্তি দশটি সূরা তৈরী করতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। বরং সারা দুনিয়ার পন্ডিত, সাহিত্যিক, মানুষ ও জিন, তথা দেব–দেবী সবাই মিলেই তা রচনা করে আন। কিন্তু তারা যখন দশটি সূরাও তৈরী করতে পারছে না, তাই আপনি বলুন যে, এই কোরআন যদি কোন মানুষের রচিত কালাম হতো, তাহলে অন্য মানুষেরাও অনুরূপ কালাম রচনা করতে সক্ষম হত। সকলের অপারগ হওয়াই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, এই কোরআন আল্লাহ্ পাকের এলম ও কুদরতে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা রচনা করা মানুষের সাধ্যাতীত। এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ হ্রাস–বৃদ্ধি করারও অবকাশ নেই।

অত্র আয়াতে দশটি সূরা তৈরী করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। কিন্তু তা করতে যখন তারা অপারগ হল, তখন তাদের অক্ষমতা আরো প্রকটভাবে প্রমাণ করার জন্য কোরআন করীমের সূরা বাক্বারার আয়াতে মাত্র একটি সূরা তৈরী করার চ্যালেঞ্জ করা অর্থাৎ, তোমরা পবিত্র কোরআনকে যদি মানুষের তৈরী কালাম বলে মনে করে থাক, তাহলে তোমরা বেশী নয় অনুরূপ একটি সূরা তৈরী করে আন। কিন্তু তাদের জন্য এতটা সহজ করে দেয়া সত্ত্বেও কোরআন পাকের এই প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে সক্ষম হল না। অতএব, কোরআন মজীদ আল্লাহ্‌র কালাম ও স্থায়ী মু'জেযা হওয়া সন্দেহাতীত প্রমাণিত হল। তাই পরিশেষে বলা হয়েছে— فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ অর্থাৎ, এখনও কি তোমরা মুসলমান ও আনুগত্যপরায়ণ হবে, নাকি সে গাফলতিতেই মজে থাকবে?

ইসলাম বিরোধীদের যখন আযাবের ভয় দেখানো হতো, তখন তারা নিজেদের দান–খয়রাত, জনসেবা ও জনহিতকর কার্যাবলীকে সাফাইরূপে তুলে ধরত। তারা বলত যে, এতসব সৎকার্য করা সত্ত্বেও আমাদের শাস্তি হবে কেন? আজকাল পান্ডিত্যের দাবীদার অনেক অজ্ঞ মুসলমানকেও এহেন সন্দেহে পতিত দেখা যায়। বাহ্যিকদৃষ্টিতে যেসব অমুসলমান সৎচরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ হয় এবং কোন রাস্তা, পুল, হাসপাতাল, পানি সরবরাহ ইত্যাদি কোন জনকল্যাণকর কাজ করে, তাদেরকে মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। ১৫তম এ আয়াতে সে মনোভাবেরই জবাব দেয়া হয়েছে।

জবাবের সারকথা এই যে, প্রতিটি সৎকার্য গ্রহণযোগ্য ও পারলৌকিক মুক্তির কারণ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে , সেটা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করতে হবে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য তা রসুলে আকরাম (সাঃ)-এর তরীকা মোতাবেক হতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তদীয় রসুলের প্রতি ঈমানই রাখে না, তার যাবতীয় কার্যকলাপ গুণ-গরিমা, নীতি-নৈতিকতা প্রাণহীন দেহের ন্যায়। যার বাহ্যিক আকৃতি অতি সুন্দর হলেও আখেরাতে তার কানাকড়িরও মূল্য নেই। তবে দৃশ্যতঃ সেটা যেহেতু পুণ্যকার্য ছিল এবং তা দ্বারা বহু লোক উপকৃত হয়েছে, তাই আল্লাহ্ জাল্লাশানুহূ এহেন তথাকথিত সৎকার্যকে সম্পূর্ণ বিফল ও বিনষ্ট করেন না' বরং এসব লোকের যা মুখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য ছিল যেমন তার সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি হবে, লোকে তাকে দানশীল, মহান ব্যক্তিরূপে স্মরণ করবে, নেতারূপে তাকে বরণ করবে ইত্যাদি আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে ইহজীবনেই দান করেন। অপরদিকে আখেরাতে মুক্তিলাভ করা যেহেতু তাদের কাম্য ছিল না এবং তাদের প্রাণহীন সৎকার্য আখেরাতের অপূর্ব ও অনন্ত নেয়ামতসমূহের মূল্য হওয়ার যোগ্য ছিল না, কাজেই আখেরাতে তার কোন প্রতিদানও লাভ করবে না। বরং নিজেদের কুফরী, শেরেকী ও গোনাহের কারণে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল তাদের জ্বলতে হবে। এই হল ১৫ তম আয়াতের সংক্ষিপ্ত সার। এবার অত্র আয়াতের শব্দবিন্যাস লক্ষ্য করুন।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে যে, "আখেরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছু নেই।" এতেকরে বোঝা যায় যে, অত্র আয়াত কাফেরদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। কেননা, একজন মুসলমান যত বড় পাপীই হোক না কেন, তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে দোযখ থেকে মুক্তিলাভ করে বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং আরাম-আয়েশ ও নেয়ামত লাভ করবে। এজন্য যাহ্হাক প্রমুখ মুফাসসিরগণের মতে অত্র আয়াত শুধু কাফেরদের উপর প্রযোজ্য।

কোন কোন মুফাসসিরের মতে অত্র আয়াতে ঐসব মুসলমানদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে—যারা সৎকার্যের বিনিময়ে শুধু পার্থিবজীবনে সুখ-শান্তি, যশ-খ্যাতি প্রত্যাশা করে। লোক দেখানো মনোভাব নিয়ে কাজ করে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের মর্ম হবে এই যে, তারা নিজেদের পাপের শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত দোযখের আগুন ছাড়া অন্য কিছু পাবে না। পরিশেষে পাপের শাস্তি ভোগান্তে অবশ্য তারাও সৎকাজের প্রতিদান লাভ করবে।

আয়াতের সবচেয়ে স্পষ্ট তফসীর হচ্ছে এই যে, অত্র আয়াতে ঐসব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা তাদের যাবতীয় সৎকার্য শুধু পার্থিব ফায়দা হাসিলের জন্য করে থাকে, চাই সে আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী কাফের হোক, অথবা নামধারী মুসলমান হোক, যে পরকালকে মৌখিক স্বীকার করেও কার্যতঃ সেদিকে কোন লক্ষ্য রাখে না, বরং পার্থিব লাভের দিকেই সম্পূর্ণ মগ্ন ও বিভোর থাকে। তফসীরকার ইমামগণের মধ্যে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) মায়মুন ইবনে মেহরান ও মুজাহিদ (রহঃ) অত্র ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন।

রসুলে করীম (সাঃ)-এর প্রসিদ্ধ হাদীস انما الاعمال بالنيات দ্বারাও তৃতীয় অভিমতটির সমর্থন পাওয়া যায় যে, নিজের কাজের মধ্যে যে ব্যক্তি যেমন নিয়ত রাখবে, তার কাজটি তদ্রূপ ধর্তব্য হবে এবং তদনুযায়ী প্রতিফল লাভ করবে। যে ব্যক্তি শুধু পার্থিব লাভ পেতে চায়, সে নগদ লাভই পায়, যে ব্যক্তি আখেরাতে পরিত্রাণ লাভ করতে চায়, সে আখেরাতের নেয়ামতই পাবে। আর যে ব্যক্তি উভয় জীবনের কল্যাণ কামনা করে, সে দো-জাহানে কল্যাণ ও কামিয়াবী হাসিল করবে। নিয়তের উপর সর্বকাজের ভিত্তি একথা সর্ব ধর্মে স্বীকৃত এক সনাতন মূলনীতি।—(তফসীরে-কুরতবী)।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) অত্র হাদীস বর্ণনা করে ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন, কোরআনের আয়াত مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا দ্বারা পূর্বোক্ত হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা কারো প্রতি জুলুম করেন না। সৎকর্মশীল মুমিন ব্যক্তিরা দুনিয়াতে আংশিক প্রতিদান লাভ করে থাকে এবং পূর্ণ প্রতিদান আখেরাতে লাভ করবে। আর কাফেররা যেহেতু আখেরাতের কোন ধ্যান-ধারণাই রাখে না, তাই তাদের প্রাপ্য হিস্যা ইহজীবনেই তাদেরকে পুরোপুরি ভোগ করতে দেয়া হয়। তাদের সৎকার্যাবলীর প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ, বস্তুগত উন্নতি ও ভোগ-বিলাসের সামগ্রী দান করা হয়। অবশেষে যখন আখেরাতে উপস্থিত হবে, তখন সেখানে পাওয়ার মত তাদের প্রাপ্তব্য কিছুই থাকবে না।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ

অর্থাৎ, যারা শুধু দুনিয়াতেই নগদ পেতে চায়, আমি তদেরকে নগদই দান করি। তবে সেজন্য দুটি শর্ত রয়েছে। একটি শর্ত হচ্ছে—আমি যতটুকু ইচ্ছা করি, ততটুকুই দান করি, তাদের চেষ্টা বা চাহিদা মোতাবেক দান করা আবশ্যক নয়। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে—আমার হেকমত অনুসারে যাকে সমীচীন মনে করি, শুধু তাকেই নগদ দান করি। সবাইকে দিতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

১৭তম আয়াতে নবী করীম (সাঃ) এবং সত্যিকার মুমিনদের অবস্থা ঐসব লোকের মোকাবেলায় তুলে ধরা হয়েছে—যাদের চরম ও পরম লক্ষ্য হচ্ছে শুধু দুনিয়া হাসিল করা। যেন দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারে যে, এই দুটি শ্রেণী কখনো সমকক্ষ হতে পারে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিশ্বমানবের জন্য রসূল হওয়া এবং যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান না আনে, সে যত ভাল কাজই করুক না কেন, তার গোমরাহ ও জাহান্নামী হওয়া ব্যক্ত করা হয়েছে।

অত্র আয়াতে بَيِّنَةٍ বলে কোরআন পাককে বোঝানো হয়েছে। شَاهِدٌ শব্দের ব্যাখ্যায় তফসীরকার ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। বয়ানুল-কোরআনে হযরত থানবী (রহঃ) লিখেছেন যে, এখানে 'শাহেদ' অর্থ পবিত্র কোরআনের اعجاز এ'জায বা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া যা কোরআনের প্রতিটি আয়াতের সাথে বর্তমান রয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে, কোরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে, যে কোরআনের উপর কায়েম রয়েছে? আর কোরআনের সত্যতার একটি সাক্ষী তো খোদ কোরআনের সাথেই বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ, এর বিস্ময়করতা এবং মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া এবং দ্বিতীয় সাক্ষী ইতিপূর্বে তওরাতরূপে এসেছে, যা হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার রহমতস্বরূপ দুনিয়াবাসীর অনুসরণের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। কেননা, কোরআন যে আল্লাহ্ তাআলার সত্য কিতাব এই সাক্ষ্য তওরাতে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত ছিল।

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۘ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا
يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ
أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ
وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ
اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ
لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ
إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ
فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴿٢٨﴾

(২০) তারা পৃথিবীতেও আল্লাহ্কে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই, তাদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে তারা শুনতে পারত না এবং দেখতেও পেত না। (২১) এরা সে লোক, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আর এরা যা কিছু মিথ্যা মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল, তা সবই তাদের থেকে হারিয়ে গেছে। (২২) আখেরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত, কোন সন্দেহ নেই। (২৩) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং স্বীয় পালনকর্তার সমীপে বিনতি প্রকাশ করেছে তারাই বেহেশতবাসী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। (২৪) উভয়পক্ষের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন অন্ধ ও বধির এবং যে দেখতে পায় ও শুনতে পায় উভয়ের অবস্থা কি এক সমান? তবুও তোমরা কি ভেবে দেখ না? (২৫) আর অবশ্যই আমি নূহ (আঃ)-কে তাঁর জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি, (তিনি বললেন) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। (২৬) তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো এবাদত করবে না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের ভয় করছি। (২৭) তখন তাঁর কওমের কাফের প্রধানরা বলল—আমরা তো আপনাকে আমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করি না; আর আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না এবং আমাদের উপর আপনাদের কোন প্রাধান্য দেখি না, বরং আপনারা সবাই মিথ্যাবাদী বলে আমরা মনে করি। (২৮) নূহ (আঃ) বললেন—হে আমার জাতি! দেখ তো আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীলের উপর থাকি, আর তিনি যদি তাঁর পক্ষ হতে আমাকে রহমত দান করে থাকেন, তারপরেও তা তোমাদের চোখে না পড়ে, তাহলে আমি কি উহা তোমাদের উপর তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চাপিয়ে দিতে পারি?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত নূহ (আঃ) যখন তাঁর জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন, তখন জাতি তাঁর নবুওয়ত ও রেসালতের উপর কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করেছিল। হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ্র হুকুমে তাদের প্রতিটি উক্তির উপযুক্ত জবাব দান করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের একটি কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ধর্মীয় ও ব্যবহারিক জীবনের বহু মূলনীতি ও মাসায়েলের তা'লীম দেয়া হয়েছে।

২৭ নং আয়াতে মুশরেকদের কতিপয় আপত্তি ও সন্দেহমূলক বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

হযরত নূহ (আঃ)-এর নবুওয়ত ও রেসালতের উপর তাদের প্রথম আপত্তি ছিল مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا আমরা তো দেখি যে আপনিও আমাদের মতই মানুষ মাত্র। আমাদের মত পানাহার করেন, হাট-বাজারে যাতায়াত করেন, নিদ্রা যান জাগ্রত হন, সবকিছু স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও আপনি নিজেকে আল্লাহ্র প্রেরিত রসূল ও বার্তাবাহক বলে যে অস্বাভাবিক দাবী তুলেছেন, তা আমরা কিরূপে মানতে পারি? তারা মনে করত যে, আল্লাহ্র পক্ষ হতে রসূলরূপে কোন মানুষের প্রেরিত হওয়া সমীচীন নয়, বরং ফেরেশতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন তাঁর বিশেষত্ব সবাই ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় মানতে বাধ্য হয়।

২৮ নং আয়াতে ইহার জবাবে এরশাদ হয়েছে—

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ
عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ হওয়া নবুওয়ত ও রেসালতের পরিপন্থী নয়। বরং চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, মানুষের নবী মানুষ হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। যেন মানুষ অনায়াসে তাঁর কাছে দ্বীন শিক্ষা করতে পারে, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারে। মানুষ ও ফেরেশতার স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। যদি ফেরেশতাকে নবী করে পাঠানো হত, তবে তাঁর কাছে ধর্মীয় আদর্শ শিক্ষা করা এবং তা পালন করা মানুষের জন্য দুষ্কর ও অসম্ভব হত। কেননা, ফেরেশতাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, নিদ্রা-তন্দ্রার প্রয়োজন হয় না, রিপুর তাড়না নেই, মানবীয় প্রয়োজনের সম্মুখীন হন না। অতএব, তাঁরা মানুষের দুর্বলতা উপলব্ধি করে যথাবিহিত তা'লীম দিতে পারতেন না এবং তাদের পূর্ণ তাবেদারী করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হত না। এ প্রসঙ্গটি পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্টভাবে বা ইশারা-ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার পুনরুক্তি করার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ করলে তোমরাও অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবে যে, মানুষ আল্লাহ্র নবী হতে পারবে না—এমন কোন কথা নেই। তবে আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাঁর কাছে এমন কোন অকাট্য প্রমাণ অবশ্যই থাকতে হবে— যা দেখে মানুষ সহজেই বোঝতে পারে যে, তিনি আল্লাহ্র প্রেরিত পয়গম্বর বা বার্তাবহ। সাধারণ লোকের জন্য নবীর মু'জেযাই তাঁর নবুওয়তের সত্যতার আকাট্য প্রমাণ। এজন্যই হযরত নূহ (আঃ) বলেছেন যে, আমি আল্লাহ্র তরফ হতে স্পষ্ট দলীল, অকাট্য প্রমাণ ও অনুগ্রহ নিয়ে এসেছি। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা-বিবেচনা করলে তোমরাও এটা অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু তোমদের ঈর্ষা-বিদ্বেষ তোমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও অন্ধ করেছে। তাই তোমরা অস্বীকার করে বসেছ এবং নিজেদের হঠকারিতার

وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَآ اَنَا
بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا
تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا
تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ
لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۚۖ اِنِّيْٓ اِذًا
لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا
فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ
بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ
اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ
وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٤﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ
فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ
اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ
بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا
وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٣٧﴾

(২৯) আর হে আমার জাতি! আমি তো এজন্য তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌র জিম্মায় রয়েছে। আমি কিন্তু ঈমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের পালনকর্তার সাক্ষাত লাভ করবে। বরঞ্চ তোমাদেরই আমি অজ্ঞ সম্প্রদায় দেখছি। (৩০) আর হে আমার জাতি! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তাহলে আমাকে আল্লাহ্ হতে রেহাই দেবে কে? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না? (৩১) আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভান্ডার রয়েছে এবং একথাও বলি না যে, আমি গায়বী খবরও জানি; একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা; আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্ছিত আল্লাহ্ তাদের কোন কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারী হব (৩২) তারা বলল—হে নূহ! আমাদের সাথে আপনি তর্ক করেছেন এবং অনেক কলহ করেছেন। এখন আপনার সেই আযাব নিয়ে আসুন, যে সম্পর্কে আপনি আমাদিগকে সতর্ক করেছেন, যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন। (৩৩) তিনি বলেন, উহা তোমাদের কাছে আল্লাহ্ই আনবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তখন তোমরা পালিয়ে তাঁকে অপারগ করতে পারবে না। (৩৪) আর আমি তোমাদের নসীহত করতে চাইলেও তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে গোমরাহ করতে চান; তিনিই তোমাদের পালনকর্তা এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। (৩৫) তারা কি বলে? আপনি কোরআন রচনা করে এনেছেন? আপনি বলে দিন আমি যদি রচনা করে এনে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার, আর তোমরা যেসব অপরাধ কর তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (৩৬) আর নূহ (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করা হলো যে, যারা ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছে তাদের ছাড়া আপনার জাতির অন্য কেউ ঈমান আনবেন না। অতএব, তাদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হবেন না। (৩৭) আর আপনি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশ মোতাবেক একটি নৌকা তৈরী করুন এবং পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। অবশ্যই তারা ডুবে মরবে।

উপর অটল রয়েছ।

কিন্তু পয়গম্বরগণের মাধ্যমে আগত আল্লাহ্‌র রহমত জোর-জবরদস্তি মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার জিনিষ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা সেদিকে আগ্রহান্বিত না হয়। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঈমানের অমূল্য দৌলত যা আমি নিয়ে এসেছি, আমার যদি সাধ্য থাকত তবে তোমাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও তোমাদেরকে তা দিয়েই দিতাম। কিন্তু এটি আল্লাহ্‌র চিরন্তন বিধানের পরিপন্থী। এ মূল্যবান সম্পদ জোর করে কারো মাথায় তুলে দেয়া যায় না। এতদ্বারা আরো সাব্যস্ত হচ্ছে যে, জোর-জবরদস্তি কাউকে মুমিন বা মুসলমান বানানো কোন নবীর যুগেই বৈধ ও অনুমোদিত ছিল না। তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে বলে যারা মিথ্যা দুর্নাম রটনা করে তাদেরও একথা অজানা নয়। তথাপি অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদের অন্তরে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এহেন অপবাদ ছড়ানো হয়।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টতঃ বোঝা গেল যে, কোন ফেরেশতাকে নবীরূপে পাঠানো হয়নি কেন? কারণ, ফেরেশতারা অসাধারণ শক্তি ও ক্ষমতাসম্পন্ন। সবদিক থেকেই তাদের সত্তা মানুষের তুলনায় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। সুতরাং, তাঁদের দেখলে তো ঈমান আনা বাধ্যতামূলক কাজ হত। নবীগণের সাথে যেরূপ ধৃষ্টতা ও হঠকারিতা করা হয়েছে, ফেরেশতাদের সামনে সেরূপ আচরণ করার কার সাধ্য ছিল? আর কোন পরাক্রমশালী শক্তির প্রভাবে বাধ্য হয়ে ঈমান আনা হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। বরং 'ঈমান বিল-গায়ব' অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার প্রবল পরাক্রম প্রত্যক্ষ না করেই তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করতে হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল— وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ অর্থাৎ, আমরা দেখছি যে, আপনার প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং আপনার আনুগত্য ও অনুসরণকারী সবাই আমাদের সমাজের মধ্যে সবচেয়ে ইতর, ও স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন। তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাসম্পন্ন, ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখি না। এই উক্তির মধ্যে দু'টি দিক রয়েছে। এক হচ্ছে, আপনার দাবী যদি সত্য ও সঠিক হতো, তাহলে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গই তা সর্বাগ্রে গ্রহণ করত। কিন্তু তারা তা প্রতাখ্যান করছে; আর স্থূলবুদ্ধি ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তা মেনে নিচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনার প্রতি ঈমান আনলে আমরাও আহম্মকরূপে পরিচিত ও ধিকৃত হব। দ্বিতীয় হচ্ছে— সমাজের নিকৃষ্ট, ইতর ও ছোট লোকগুলি আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। এক্ষণে আমরাও যদি আপনার আনুগত্য স্বীকার করি, তবে আমরাও মুসলমান ভাই হিসাবে তাদের সমকক্ষরূপে পরিগণিত হব, নামাযের কাতারে ও অন্যান্য মজলিসে তাদের সাথে এক বরাবর উঠাবসা করতে হবে। ফলে আমাদের আভিজাত্য ও কূলীনতার হানি হবে। অতএব, এ কাজ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বরং তাদের ঈমান কবুল করাটা আমাদের ঈমানের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। আপনি যদি তাদের নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়নের কথা বিবেচনা করতে পারি।

বাস্তবজ্ঞান বিবর্জিত কওমের জাহেল লোকেরা সমাজের দরিদ্র ও

দুর্বল শ্রেণীকে ইতর ও ছোটলোক সাব্যস্ত করেছিল—যাদের কাছে পার্থিব ধন-সম্পদ ও বিষয়-বৈভব ছিল না। মূলতঃ তা ছিল তাদের জাহেলী চিন্তাধারার ফল। বস্তুতঃপক্ষে ইজ্জত ও জিল্লতি, ধন-দৌলত বিদ্যা-বুদ্ধির অধীন নয়। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সম্পদ এবং সম্মানের মোহ একটি নেশার মত, যা অনেক সময় সত্য-ন্যায়কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, সত্য ও ন্যায় হতে বিচ্যুত করে। দরিদ্র ও দুর্বলদের সম্মুখে যেহেতু এরূপ কোন অন্তরায় থাকে না। কাজেই তারাই সর্বাগ্রে সত্য-ন্যায়কে বরণ করতে এগিয়ে আসে। প্রাচীনকাল হতে যুগে যুগে দরিদ্র-দুর্বলরাই সমসাময়িক নবীগণের উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিল, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন ঈমানের আহ্বান সম্বলিত রসূলে পাক (সাঃ)-এর পবিত্র চিঠি লাভ করল, তখন গুরুত্ব সহকারে নিজেই ইহার তদন্ত-তাহকীক করতে মনস্থ করল। কেননা, সে তওরাত ও ইঞ্জীল কিতাব পাঠ করে করে সত্য নবীগণের আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে পুংখানুপুংখরূপে পারদর্শী ছিল। কাজেই তৎকালে আরব দেশের যেসব ব্যবসায়ী সিরিয়ায় উপস্থিত ছিল, তাদের একত্রিত করে উক্ত আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করে। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল যে, তাঁর অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণী। তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করল, ইহা তো সত্য রসূল হওয়ার লক্ষণ। কেননা, যুগে যুগে দরিদ্র-দুর্বল শ্রেণীই প্রথমে নবীগণের আনুগত্য স্বীকার করেছে।

মোদ্দাকথা, দরিদ্র ও দুর্বল লোকদেরকে ইতর এবং হেয় মনে করা চরম মূর্খতা ও অন্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইতর ও ঘৃণিত তারাই-যারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা মালিককে চিনে না, তার নির্দেশ মেনে চলে না। হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইতর ও কমীনা কে? তিনি উত্তর দিলেন— যারা বাদশাহ ও রাজকর্মচারীদের খোশামোদ-তোষামোদে লিপ্ত হয়, তারাই কমীনা ও ইতর। আল্লামা ইবনুল আরাবী (রাঃ) বলেন, যারা দ্বীন-ধর্ম বিক্রি করে দুনিয়া হাসিল করে তারাই কমীনা। পুনরায় প্রশ্ন করা হল—সবচেয়ে কমীনা কে? তিনি জবাব দিলেন—যে ব্যক্তি অন্যের পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের দ্বীন ও ঈমানকে বরবাদ করে। হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-গণের নিন্দা-সমালোচনা করে, সে-ই ইতর ও অর্বাচীন। কারণ, তাঁরাই সমগ্র উম্মতের সর্বাপেক্ষা হিত সাধনকারী। তাঁদের মাধ্যমেই ঈমানের অমূল্য দৌলত ও শরীয়তের আহকাম সকলের কাছে পৌঁছেছে।

যাহোক, ২৯ নং আয়াতে কওমের লোকদের মূর্খতা প্রসূত ধ্যান-ধারণা খন্ডন করার জন্য **প্রথমতঃ** বলা হয়েছে যে, কারো ধন-সম্পদের প্রতি নবী-রসূলগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তাঁরা নিজেদের খেদমত ও তা'লীম-তবলীগের বিনিময়ে কারো থেকে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। তাঁদের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই দায়িত্বে। কাজেই, তাঁদের দৃষ্টিতে ধনী-দরিদ্র এক সমান। তোমরা এমন অহেতুক আশঙ্কা পোষণ করো না যে, আমরা ধন-সম্পদশালীরা যদি ঈমান আনয়ন করি তবে হয়ত আমাদের বিত্ত-সম্পদে ভাগ বসানো হবে।

দ্বিতীয়তঃ তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা ঈমান আনার পূর্বশর্ত হিসাবে চাপ সৃষ্টি করছ যেন আমি দীন-দরিদ্র ঈমানদারগণকে তাড়িয়ে দেই। কিন্তু আমার দ্বারা তা কখনো সম্ভবপর নয়। কারণ, আর্থিক দিক দিয়ে তারা দরিদ্র হলেও আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে তাদের প্রবেশাধিকার ও উচ্চমর্যাদা রয়েছে। এমন লোকদেরকে তাড়িয়ে দেয়া অন্যায়-অসঙ্গত।

وَلَآ اَعۡلَمُ الۡغَيۡبَ "আর আমি গায়বও জানি না।" কেননা, উক্ত জাহেলদের আরো বিশ্বাস ছিল যে, যারা সত্যিকার পয়গম্বর, তাঁরা নিশ্চয়ই গায়বের খবর জানবেন। হযরত নূহ (আঃ)-এর উক্তি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবুওয়ত ও রেসালতের জন্য গায়বের এল্‌ম অপরিহার্য নয়। আর তা হবেই বা কি করে? গায়বের এল্‌ম তো একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ ছেফত বা বৈশিষ্ট্য। কোন নবী, ওলী বা ফেরেশতা ইহার অংশীদার হতে পারে না। তাঁদের অত্র গুণে গুণান্বিত মনে করা স্পষ্ট শেরেকী। তবে হাঁ, আল্লাহ্ তাআলা তদীয় পয়গম্বরগণের মধ্যে যাঁকে যতটুকু ইচ্ছা অদৃশ্য জগতের এল্‌ম দান করেন। ইহা নবী-ওলীগণের এখতিয়ারভুক্ত নয় যে, তাঁরা যখন-তখন যে কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে বা বলতে পারবেন। আল্লাহ্ তাআলা যখন অবহিত করেন, তখন তাঁদের জন্য তা আর গায়ব থাকে না। অতএব, একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে আলেমুল-গায়ব বলা হারাম ও শেরেকী।

তাঁর তৃতীয় উক্তি হয়েছে— وَلَآ اَقُوۡلُ اِنِّىۡ مَلَكٌ "আর আমি একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা।" এখানে তাদের এ ভ্রান্ত চিন্তাধারা বাতিল করা হয়েছে যে, নবী-রসূলরূপে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ফেরেশতা প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় ছিল।

তাঁর চতুর্থ কথা হচ্ছে—তোমাদের দৃষ্টি দ্বারা দরিদ্র ঈমানদারগণকে যেরূপ লাঞ্ছিত, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র দেখছ, আমি কিন্তু তোমাদের মত একথা বলতে পারি না যে, আল্লাহ্ তাদের কোন কল্যাণ ও কামিয়াবী দান করবেন না। কারণ, প্রকৃত কল্যাণও কামিয়াবী ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতার জোরে হাসিল করা যায় না। বরং মানুষের অন্তরের অবস্থা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তা দান করা হয়। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই সম্যক অবহিত আছেন যে, কল্যাণ ও কামিয়াবী হাসিল করার জন্য কার অন্তর যোগ্য, আর কার অন্তর অযোগ্য। অতএব, তিনিই তার ফয়সালা করবেন।

পরিশেষে হযরত নূহ (আঃ) বলেন, তোমাদের মত আমিও যদি দরিদ্র ঈমানদারগণকে লাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত মনে করি, তাহলে আমিও জালেমরূপে পরিগণিত হবো।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রায় এক হাজার বছরের দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়া ও দেশবাসীকে সুপথে পরিচালিত করার চিন্তা-ভাবনা এবং পয়গম্বরসুলভ উৎসাহ-উদ্দীপনা এতদূর দান করেছিলেন যে, সারাজীবন তিনি অক্লান্তভাবে নিজ জাতিকে তওহীদ ও সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কওমের পক্ষ হতে তিনি কঠিন নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হন, তাঁর উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়; এমনকি তিনি অনেক সময় রক্তাক্ত হয়ে বেহুশ হয়ে পড়তেন। অতঃপর হুশ হলে পরে দোয়া করতেন—আয় আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা অজ্ঞ-মূর্খ, তারা জানে না, বোঝে না। তিনি এক পুরুষের পরে দ্বিতীয় পুরুষকে অতঃপর তৃতীয় পুরুষকে শুধু এ আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, *হয়ত তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত প্রাণপণ* চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা যখন ঈমান আনল না, তখন তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে তাদের সম্পর্কে ফরিয়াদ করলেন—

اِنِّىۡ دَعَوۡتُ قَوۡمِىۡ لَيۡلًا وَّنَهَارًا فَلَمۡ يَزِدۡهُمۡ دُعَآءِىۡۤ اِلَّا فِرَارًا

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আমি আমার জাতিকে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের শুধু সত্যপথ থেকে পলায়নের প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।'—(সূরা নূহ)

সুদীর্ঘকাল যাবত অসহনীয় কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করার পর তিনি দোয়া করলেন— رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ হে আল্লাহ্! আমার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। কেননা, ওরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। —(১৮ পারা, আয়াত ৩৯ সূরা আল-মুমেনুন।)

দেশবাসীর জুলুম-নির্যাতন, অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ সীমা অতিক্রম করার পর আল্লাহ্ তাআলা হযরত নূহ (আঃ)-কে উপরোক্ত আয়াত দ্বারা সম্বোধন করেন।—(বগভী ও মাযহারী)

৩৩ নং আয়াতে হযরত নূহ (আঃ)-কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আপনার কওমের মধ্যে যাদের ঈমান আনার যোগ্যতা ছিল, তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। ধৃষ্টতা ও হঠকারিতার কারণে তাদের অন্তর মোহরাঙ্কিত হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তাদের জন্য চিন্তিত, দুঃখিত বা বিমর্ষ হবেন না।

৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, অচিরেই আমি এ জাতির উপর মহাপ্লাবন আকারে আযাব অবতীর্ণ করব। কাজেই আপনি একখানি নৌকা তৈরী করুন যার মধ্যে আপনার পরিজনবর্গ, অনুসারীবৃন্দ ও প্রয়োজনীয় রসদপত্র ও উপকরণাদিসহ স্থান সঙ্কুলান হয়। যেন উহাতে আরোহণ করে প্লাবনের দিনগুলি নিরাপদে অতিবাহিত করতে পারেন। হযরত নূহ (আঃ) নৌকা তৈরী করলেন। অতঃপর প্লাবনের প্রাথমিক আলামত হিসাবে ভূমি হতে পানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল। নূহ (আঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হল সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় আরোহণ করাবার জন্য। আর মানুষের প্রয়োজনীয় ঘোড়া, গাধা, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রাণীর এক-এক জোড়া নৌকায় তুলে নেয়ার আদেশ দেয়া হল। তিনি আদেশ পালন করলেন।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও নৌকায় আরোহণকারীরা সংখ্যায় অতি অল্প ছিল।

আলোচ্য আয়াতগুলি সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এতক্ষণ বলা হল, এবার প্রত্যেক আয়াতের ব্যাখ্যা ও আনুষঙ্গিক মাসায়েল বর্ণনা করা হচ্ছে।

৩৬ নং আয়াতে এরশাদ করেছেন— হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছিল যে, তাঁর জাতির মধ্যে ভবিষ্যতে আর কেউ ঈমান আনবে না। তারা আপনার সাথে যেসব দুর্ব্যবহার করেছে আপনি তাতে চিন্তিত ও বিমর্ষ হবেন না। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা-অস্থিরতা থাকে। নিরাশ হওয়ার মধ্যেও এক প্রকার শান্তি রয়েছে। অতএব, আপনি তাদের সংশোধনের আশা ত্যাগ করুন এবং তাদের পরিণতি দেখার অপেক্ষায় থাকুন।

৩৭ নং আয়াতে তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। এরূপ অবস্থায়ই হযরত নূহ (আঃ)-এর মুখে তাঁর কওম সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছিল—

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ

يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার! এখন এই কাফেরদের মধ্যে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী কাউকে রাখবেন না। যদি তাদের রাখেন, তবে তাদের ভবিষ্যত বংশধররাও অবাধ্য কাফের হবে। (পারা ২৯ – সূরা নূহ, আয়াত ২৬)

এই বদদোয়া আল্লাহ্র দরবারে কবুল হল। যার ফলে সমস্ত কওমে নূহ (আঃ) ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

হযরত নূহ (আঃ)-কে নৌকা তৈরী শিক্ষা দান ঃ হযরত নূহ (আঃ)-কে যখন নৌকা তৈরীর নির্দেশ দেয়া হল, তখন তিনি নৌকাও চিনতেন না, তৈরী করতেও জানতেন না। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ করেছেন — وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا 'আর আপনি নৌকা তৈরী করুন আমার তত্ত্বাবধানে ও ওহী অনুসারে"। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নৌকা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও নির্মাণ কৌশল ওহীর মাধ্যমে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি শাল কাঠ দ্বারা উক্ত নৌকা তৈরী করেছিলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নৌকাখানি ৩০০ গজ দীর্ঘ, ৫০ গজ প্রস্থ, ৩০ গজ উঁচু ও ত্রিতল বিশিষ্ট ছিল। উহার দুইপার্শ্বে অনেকগুলি জানালা ছিল। এভাবে ওহীর মাধ্যমে হযরত নূহ (আঃ)-এর হাতে নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল। অতঃপর যুগে যুগে তার উন্নতি সাধিত হয়ে চলেছে।

প্রতিটি শিল্পকর্মের সূচনা ওহীর মাধ্যমে হয়েছে ঃ হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রচিত "আত-তিববুন-নব্বী" কিতাবে বর্ণিত আছে যে, মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার শিল্পকর্ম ওহীর মাধ্যমে কোন নবীর পবিত্র হস্তে শুরু হয়েছে। অতঃপর প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে তার মধ্যে উন্নতি-অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি যেসব ওহী নাযিল করা হয়েছিল তার অধিকাংশ ছিল ভূমি আবাদ করা, কৃষিকার্য ও শিল্পসংক্রান্ত। পরিবহনের জন্য চাকা চলতি গাড়ী হযরত আদম (আঃ)-ই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন, কালের বিবর্তনে বিভিন্ন প্রকার গাড়ী আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু সব গাড়ীর ভিত্তি চাকার উপর। গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী হতে শুরু করে মোটর ও রেলগাড়ী সর্বত্র চাকার কারবার। কাজেই, যিনি সর্বপ্রথম চাকা আবিষ্কার করেছেন তিনিই সবচেয়ে বড় আবিষ্কারক। আর একথা আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নবী হযরত আদম (আঃ)-ই ওহীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম চাকার আবিষ্কার করেছিলেন।

এদ্বারা আরো বোঝা গেল যে, মানুষের প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন। তাই আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় রসূলগণকে ওহীর সাহায্যে তা শিক্ষাদান করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত নূহ (আঃ)-কে নৌকা নির্মাণপদ্ধতি ও কলা-কৌশল শিক্ষা দানের সাথে সাথে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনার কওমের উপর এক মহাপ্লাবন আসবে, তারা সবাই ডুবে মরবে, তখন আপনি স্নেহপরবশ হয়ে তাদের জন্য কোন সুপারিশ যেন না করেন।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ
قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ
مُقِيمٌ ﴿٣٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ
كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ
اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤١﴾ وَهِيَ تَجْرِي
بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي
مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَآوِي
إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ
اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾
وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ
وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ
أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾

(৩৮) তিনি নৌকা তৈরী করতে লাগলেন, আর তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পার্শ্ব দিয়ে যেত, তখন তাঁকে বিদ্রূপ করত। তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ আমরাও তদ্রূপ তোমাদের উপহাস করছি। (৩৯) অতঃপর অচিরেই জানতে পারবে—লাঞ্ছনাজনক আযাব কার উপর আসে এবং চিরস্থায়ী আযাব কার উপর অবতরণ করে। (৪০) অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল এবং ভূ-পৃষ্ঠ উচ্ছসিত হয়ে উঠল, আমি বললাম ঃ সর্বপ্রকার জোড়ার দুটি করে এবং যাদের উপরে পূর্বাহ্নেই হুকুম হয়ে গেছে তাদের বাদ দিয়ে, আপনার পরিজনবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নিন। বলাবাহুল্য, অতি অল্পসংখ্যক লোকেই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল। (৪১) আর তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহ্র নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ণ, মেহেরবান। (৪২) আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চলল পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে, আর নূহ্ (আঃ) তাঁর পুত্রকে ডাক দিলেন আর সে সরে রয়েছিল, তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সাথে থেকো না। (৪৩) সে বলল, আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। নূহ্ (আঃ) বললেন, আজকের দিনে আল্লাহ্র হুকুম থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হল। (৪৪) আর নির্দেশ দেয়া হল — হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ, ক্ষান্ত হও। আর পানি হ্রাস করা হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল, আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হল, দুরাত্মা কাফেররা নিপাত যাক। (৪৫) আর নূহ্ (আঃ) তাঁর পালনকর্তাকে ডেকে বললেন— হে পরওয়ারদেগার, আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত; আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৩৮ নং আয়াতে নৌকা তৈরীকালীন সময়ে নূহ্ (আঃ)-এর কওমের উদাসীনতা, গাফলতি,অবজ্ঞা ও দুঃসাহস এবং এর শোচনীয় পরিণতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র আদেশক্রমে হযরত নূহ্ (আঃ) যখন নৌকা নির্মাণকার্যে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করত, আপনি কি করছেন? তিনি উত্তর দিতেন, অনতিবিলম্বে এক মহাপ্লাবন হবে, তাই নৌকা তৈরী করছি। তখন তারা বলত –"এখানে তো পান করার মত পানিও দুর্লভ, আর আপনি ডাঙ্গা দিয়ে জাহাজ চালাবার ফিকিরে আছেন।" তদুত্তরে হযরত নূহ্ (আঃ) বলতেন, যদিও আজ তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস করছ, কিন্তু মনে রেখো, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আমরাও তোমাদের প্রতি উপহাস করব। অর্থাৎ, তোমরা উপহাসের পাত্র হবে। বস্তুতঃ নবীগণ কখনো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন না। কাউকে উপহাস করা তাঁদের শান ও মর্যাদার পরিপন্থী, বরং হারাম। কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে—

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

অর্থাৎ, "এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে উপহাস করবে না। হতে পারে যে, উপহাসকারীদের চেয়ে যাদের উপহাস করা হচ্ছে (আল্লাহ্র কাছে) তারাই শ্রেষ্ঠতর।" (পারা ২৬ঃ সূরা হুজুরাত, ১১ আয়াত) সুতরাং পূর্বোক্ত আয়াতে উপহাস করার অর্থ কাজের মাধ্যমে জবাব দেয়া। সেমতে 'আমরা তোমাদেরকে উপহাস করব' বাক্যের অর্থ হচ্ছে— তোমরা যখন আযাবে পতিত হবে, তখন আমরা তোমাদেরকে বলব যে, 'এটা তোমাদের উপহাসের মর্মান্তিক পরিণতি।' যেমন ৩৯ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, "অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কাদের উপর লাঞ্ছনাজনক আযাব আসছে এবং চিরস্থায়ী আযাব কাদের উপর হয়।" প্রথম عذاب শব্দের দ্বারা দুনিয়ার আযাব এবং عَذَابٌ مُّقِيمٌ দ্বারা আখেরাতের চিরস্থায়ী আযাব উদ্দেশ্য।

৪০ আয়াতে প্লাবন আরম্ভকালীন করণীয় ও আনুষঙ্গিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে—

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ

অর্থাৎ, 'অবশেষে যখন আমার ফয়সালা কার্যকরী করার সময় হল এবং উনুন হতে পানি উথলে উঠতে লাগল।'

التَّنُّورُ তান্নূর শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। ভূপৃষ্ঠকেও তান্নূর বলা হয়, রুটি পাকানের তন্দুরকেও তান্নূর বলে, যমীনের উঁচু অংশকেও তান্নূর বলে। তাই তফসীরকার ইমামগণের কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতে তান্নূর অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি হয়ে পানি উথলে উঠছিল। কেউ কেউ বলেন— এখানে তান্নূর বলে হযরত আদম (আঃ)-এর রুটি পাকানো তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে, যা সিরিয়ার عین وردہ 'আইনে আরদাহ' নামক স্থানে অবস্থিত। উক্ত তন্দুরের ভেতর থেকেই সর্বপ্রথম পানি উঠতে শুরু করেছিল। কেউ বলেন — এখানে হযরত নূহ্ (আঃ)-এর তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে-যা কূফা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল। হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, শা'বী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ অধিকাংশ মুফাসসেরীন এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শা'বী (রহঃ) কসম করে বলেছেন যে, উক্ত তন্দুর কূফা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কূফার বর্তমান মসজিদের মধ্যবর্তী

স্থানে হযরত নূহ্ (আঃ) তাঁর নৌকা তৈরী করেছিলেন। আর তন্দুর ছিল ঐ মসজিদের প্রবেশ দ্বার।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা হযরত নূহ্ (আঃ)-কে মহাপ্লাবনের পূর্বাভাসস্বরূপ আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, যখন আপনার ঘরের উনুন ফেটে পানি উঠতে দেখবেন, তখন বুঝবেন যে, মহাপ্লাবন শুরু হয়েছে।— (তফসীরে-কুরতুবী ও মাযহারী)

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, তান্নুর শব্দের ব্যাখ্যায় মতভেদ পরিলক্ষিত হলেও আসলে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, প্লাবন যখন শুরু হয়েছে, তখন রুটি পাকানো তন্দুর হতেও পানি উঠেছে, সমতলভূমি হতেও উঠেছে আর উঁচু যমীন হতেও পানি উঠেছে। সিরিয়ার আইনুল আরদার তন্দুর হতেও উঠেছে এবং কূফার তন্দুর হতেও উঠেছে। অল্প সময়েই সব একাকার হয়েছে। যেমন কোরআন পাকের আয়াতে স্পষ্ট এরশাদ করা হয়েছে—

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا

অর্থাৎ, 'অতঃপর আমি মুষলধারায় বর্ষণের সাথে সাথে আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দিলাম এবং যমীনে প্রস্রবণরূপে প্রবাহমান করলাম।— (২৭ পারা ঃ সূরা আল-কামার, আয়াত-১১)

ইমাম শা'বী (রঃ) আরো বলেছেন যে, কূফার এই জা'মে মসজিদটি মসজিদে হারাম, মসজিদে-নববী ও মসজিদে-আকসার পর বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিশ্বের চতুর্থ মসজিদ।

তুফান শুরু হওয়া মাত্র হযরত নূহ্ (আঃ)-কে হুকুম দেয়া হল—

احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

অর্থাৎ, 'জোড়বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণী এক-এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নিন।' এতদ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত নূহ্ (আঃ)-এর জাহাজে সারা দুনিয়ার সব ধরনের প্রাণীর সমাবেশ করা হয়নি। বরং যেসব প্রাণী স্ত্রী-পুরুষের মিলনে জন্ম হয় এবং পানির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না, শুধু সেসব পশু-পাখীই উঠানো হয়েছিল জলজ প্রাণী উঠানো হয়নি। ডাঙ্গার প্রাণীকুলের মধ্যে যেসব পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, পুরুষ-স্ত্রীর মিলন ছাড়াই জন্ম হয় তাও বাদ পড়েছে। শুধু গরু, ছাগল, ঘোড়া-গাধা ইত্যাদি গৃহপালিত ও অতীব প্রয়োজনীয় পশু-পাখী কিশতিতে উঠানো হয়েছিল। এতদ্বারা এ সন্দেহ দূরীভূত হল যে, সারা দুনিয়ার সর্বপ্রকার প্রাণীকূলের স্থান সঙ্কুলান এতটুকু কিশতিতে কিভাবে হলো?

অতঃপর হযরত নূহ্ (আঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বেঈমান কাফেরদের বাদ দিয়ে আপনার পরিজনবর্গকে এবং সমস্ত ঈমানদারগণকে কিশতিতে তুলে নিন। তবে তৎকালে ঈমানদারদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল।

জাহাজে আরোহণকারীদের সঠিক সংখ্যা কোরআনে ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৮০ জন। যাদের মধ্যে হযরত নূহ্ (আঃ)-এর তিন পুত্র হাম, সাম, ইয়াফেস এবং তাদের ৩ জন স্ত্রীও ছিল। নূহ্ (আঃ)-এর চতুর্থ পুত্র কেন্'আন কাফেরদের সাথে থাকায় সে ডুবে মরেছিল।

যানবাহনে আরোহণের আদব ঃ ৪১ আয়াতে নৌকা-জাহাজ ইত্যাদি জল-যানে আরোহণ করার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ বলে আরোহণ করবে।

مجرى মাজরে' অর্থ চলা, গতিশীল হওয়া।

مرسى 'মুরসা' অর্থ স্থিতি বা থামা। অর্থাৎ, অত্র কিশতির গতি ও স্থিতি আল্লাহ্র নামে, এর চলা ও থামা আল্লাহ্ তাআলার মর্জি ও কুদরতের অধীন।

প্রতিটি যানবাহনের গতি-স্থিতি আল্লাহ্র কুদরতের অধীন ঃ সামান্য চিন্তা করলেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারত যে, জলযান, স্থলযান, ও শূন্যযান অথবা কোন জানদার সওয়ারী হোক, তা সৃষ্টি বা নির্মাণ করা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। স্থূলদৃষ্টিতে মানুষ হয়ত এই বলে আস্ফালন করতে পারে যে, আমরা তা তৈরী করেছি, আমরা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে তার লোহা-লক্কড়, তামা-পিতল, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি মূল উপাদান ও কাঁচামাল তারা সৃষ্টি করে না। এক তোলা লোহা বা এক ইঞ্চি কাঠ তৈরী করার ক্ষমতাও তাদের নেই। অধিকন্তু উক্ত কাঁচামাল দ্বারা রকমারী যন্ত্রাংশ তৈরী করার কলাকৌশল তাদের মস্তিষ্কে কে দান করেছেন? মানুষ শুধু নিজ বুদ্ধির জোরে যদি তা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করতে পারত, তাহলে দুনিয়ায় কোন নির্বোধ লোক থাকত না। সবাই এরিস্টটল, প্লেটো, এডিসন বনে যেত। কোথাকার কাঠ, কোন খনির লোহা, আর কোন দেশের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যানবাহনের কাঠামো তৈরী হয়। অতঃপর শত-শত টন, হাজার হাজার মণ মালামাল বহন করে যমীনের উপর দৌড়ানো বা হাওয়ার উপর উড়ার জন্য যে শক্তি অপরিহার্য তা পানি ও বায়ুর ঘর্ষণে বিদ্যুতরূপে হোক বা জ্বালানী তেল ইত্যাদি হোক সর্বাবস্থায় চিন্তা করে দেখুন, তন্মধ্যে কোন্টি মানুষ সৃষ্টি করেছে? বায়ু বা পানি কি সে সৃষ্টি করেছে? তৈল বা পেট্রোল কি সে সৃষ্টি করেছে? তার অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন শক্তি কি মানুষ সৃষ্টি করেছে?

মানুষ যদি বিবেককে সামান্য কাজে লাগায়, তাহলে অনায়াসে অনুধাবন করতে পারে যে, বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কারের যুগেও মানুষ একেবারে অক্ষম ও অসহায়। আর এটি অনস্বীকার্য সত্য যে, প্রত্যেকটি যানবাহনের গতি ও স্থিতি, নিয়ন্ত্রণ ও হেফাযত একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের অধীন।

আত্মভোলা মানুষ তাদের বাহ্যিক জোড়া-তালির কার্যকলাপ যাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নাম দিয়েছে তার উপর গৌরব ও অহংকারের নেশায় এমন মাতাল হয়েছে যে, মৌলিক সত্যটি তাদের চোখে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এহেন বিভ্রান্তির বেড়াজাল হতে মানুষকে মুক্ত করার জন্যই আল্লাহ্ পাক যুগে যুগে স্বীয় পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন।

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا একমাত্র আল্লাহ্র নামেই এর গতি ও স্থিতি বলে মৌল সত্যকে চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটি মাত্র দুই শব্দবিশিষ্ট একটি বাক্য হলেও বস্তুতঃ এটা এমন একটা ধারণার প্রতি পথনির্দেশ করে, যদ্দ্বারা মানুষ বস্তুজগতে বসবাস করেও ভাবজগতের অধিবাসীতে পরিণত হয় এবং সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে সৃষ্টিকর্তার বাস্তব উপস্থিতি অবলোকন করতে সক্ষম হয়।

মুমিনের দুনিয়াদারী ও কাফেরের দুনিয়াদারীর মধ্যে এখানেই স্পষ্ট ব্যবধান। যানবাহনে উভয়েই আরোহণ করে, কিন্তু মুমিন যখন কোন

যানবাহনে আরোহণ করে, তখন সে শুধু যমীনের দূরত্বই অতিক্রম করে না, বরং আধ্যাত্মিক জগতেও পরিভ্রমণ করে থাকে।

৪২ ও ৪৩ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ্ (আঃ)–এর পরিজনবর্গ কিশতিতে আরোহণ করল, কিন্তু 'কেনআন' নামক একটি ছেলে বাইরে রয়ে গেল। তখন পিতৃসুলভ স্নেহবশতঃ হযরত নূহ্ (আঃ) তাকে ডেকে বললেন, প্রিয় বৎস, আমাদের সাথে নৌকায় আরোহণ কর; কাফেরদের সাথে থেক না, তাহলে পানিতে ডুবে মরবে। কাফের ও দুশমনদের সাথে উক্ত ছেলেটির যোগ–সাজস ছিল এবং সে নিজেও কাফের ছিল। কিন্তু হযরত নূহ্ (আঃ) তার কাফের হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবহিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে যদি তিনি তার কুফরী সম্পর্কে অবহিত থেকে থাকেন, তাহলে তাঁর আহবানের মর্ম হবে–নৌকায় আরোহণের পূর্বশর্ত হিসাবে কুফরী হতে তওবা করে ঈমান আনার দাওয়াত এবং কাফেরদের সংসর্গ পরিত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হতভাগা 'কেনআন' তখনও প্লাবনকে অগ্রাহ্য করে বলছিল— আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে প্লাবন হতে আত্মরক্ষা করব। হযরত নূহ (আঃ) পুনরায় তাকে সতর্ক করে বললেন যে,— আজকে কোন উঁচু পর্বত বা প্রাসাদ কাউকে আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ্র খাস রহমত ছাড়া বাঁচার অন্য কোন উপায় নেই। দূর থেকে পিতা–পুত্রের কথোপকথন চলছিল। এমন সময় সহসা এক উত্তাল তরঙ্গ এসে উভয়ের মাঝে অন্তরালের সৃষ্টি করল এবং কেনআনকে নিমজ্জিত করল। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, হযরত নূহ্ (আঃ)–এর তুফানের সময় এক একটি ঢেউ বড় বড় পাহাড়ের চূড়া হতে ১৫ গজ এবং কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় ৪০ গজ উচ্চতা বিশিষ্ট ছিল।

আলোচ্য ৪৪ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, যমীন ও আসমান হুকুম পালন করল, প্লাবন সমাপ্ত হল, জুদী পাহাড়ে নৌকা ভিড়ল আর বলে দেয়া হল যে, দুরাত্মা কাফেররা চিরকালের জন্য আল্লাহ্র রহমত হতে দূরীভূত হয়েছে।

জুদী পাহাড় বর্তমানেও ঐ নামেই পরিচিত। সেটি হযরত নূহ্ (আঃ)–এর মূল আবাসভূমি, ইরাকের মোসেল শহরের উত্তরে ইবনে ওমর দ্বীপের অদূরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত।

বস্তুতঃ এটি একটি পর্বতমালার অংশবিশেষের নাম। এর অপর এক অংশের নাম আরারাত পর্বত। বর্তমান তওরাতে দেখা যায় যে, হযরত নূহ্ (আঃ) এর কিশতি আরারাত পর্বতে ভিড়েছিল। উভয় বর্ণনার মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নাই। প্রাচীন ইতিহাসে প্রচলিত বর্ণনায়ও দেখা যায় যে, জুদী পাহাড়েই কিশতি ভিড়েছিল। প্রাচীন ইতিহাসে আরো উল্লেখ আছে যে, ইরাকের বিভিন্নস্থানে উক্ত কিশতির ভগ্ন টুকরা এখনো অনেকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে, যা বরকতের জন্য সংরক্ষিত হয় এবং রোগ ব্যাধিতে ব্যবহার করা হয়।

তফসীরে তাবারী ও বগভীতে আছে যে, হযরত নূহ্ (আঃ) ১০ই রজব কিশতিতে আরোহণ করেছিলেন। দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত উক্ত কিশতি তুফানের মধ্যেই চলছিল। যখন কা'বা শরীফের পার্শ্বে পৌছল, তখন সাত বার কা'বা শরীফের তওয়াফ করল। আল্লাহ্ তাআলা বায়তুল্লাহ্ শরীফকে পানির উপরে তুলে রক্ষা করেছিলেন। পরিশেষে ১০ই মুহাররম অর্থাৎ, আশুরার দিন জুদী পাহাড়ে কিশতি ভিড়ল। হযরত নূহ্ (আঃ) স্বয়ং সেদিন শোকরানার রোযা রাখলেন এবং সহযাত্রী সবাইকে রোযা পালনের নির্দেশ দিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কিশতিতে অবস্থানরত যাবতীয় প্রাণীও সেদিন রোযা পালন করেছিল।— (তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী)

قَالَ يٰنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا
تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّيْٓ أَعِظُكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ
الْجٰهِلِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّيْٓ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ
بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْٓ أَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٤٧﴾
قِيْلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى أُمَمٍ
مِّمَّنْ مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿٤٨﴾
تِلْكَ مِنْ أَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ إِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ أَنْتَ
وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۚ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٩﴾
وَإِلٰى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾ يٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٥١﴾
وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ
عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا
مُجْرِمِيْنَ ﴿٥٢﴾ قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ
بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٣﴾

(৪৬) আল্লাহ্ বলেন— হে নূহ্! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চই সে দুরাচার! সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না, যার খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না। (৪৭) নূহ্ (আঃ) বলেন— হে আমার পালনকর্তা! আমার যা জানা নেই এমন কোন দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব। (৪৮) হুকুম হল—হে নূহ্ (আঃ)! আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা এবং আপনার নিজের ও সঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলির উপর বরকত সহকারে অবতরণ করুণ। আর অন্যান্য যেসব সম্প্রদায় রয়েছে আমি তাদেরকেও উপকৃত হতে দেব। অতঃপর তাদের উপর আমার দারুন আযাব আপতিত হবে। (৪৯) এটি গায়বের খবর, আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করছি। ইতিপূর্বে এটা আপনার এবং আপনার জাতির জানা ছিল না। আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। যারা ভয় করে চলে, তাদের পরিণাম ভাল, সন্দেহ নেই। (৫০) আর আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করেছি; তিনি বলেন— হে আমার জাতি, আল্লাহ্র বন্দেগী কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নেই, তোমরা সবাই মিথ্যা আরোপ করছ। (৫১) হে আমার জাতি! আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন মজুরী চাই না; আমার মজুরী তাঁরই কাছে যিনি আমাকে পয়দা করেছেন; তবু তোমরা কেন বোঝ না? (৫২) আর হে আমার কওম! তোমাদের পালন কর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর; তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমরা কিন্তু অপরাধীদের মত বিমুখ হয়ো না (৫৩) তারা বলল— হে হূদ, তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আস নাই, আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৪৬ আয়াতে আল্লাহ্র পক্ষ হতে হযরত নূহ্ (আঃ)-এর প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, মন-মানসিকতার দিক দিয়ে এ ছেলেটি আপনার পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নেই। সে একজন দুরাত্মা কাফের। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা না জেনে আমার কাছে কোন আবেদন করা আপনার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। ভবিষ্যতে অজ্ঞতা-সুলভ কাজ না করার জন্য আমি আপনাকে নসীহত করছি।

আল্লাহ্ তাআলার অত্র ফরমানের মধ্যে দু'টি বিষয় জানা গেল। প্রথম এই যে, হযরত নূহ্ (আঃ) উক্ত পুত্রটির চূড়ান্ত কাফের হওয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, বরং তার মুনাফেকীর কারণে তিনি তাকে ঈমানদার মনে করেছিলেন। তাই তিনি তার জন্য দোয়া করেছিলেন। জানা থাকলে তিনি কিছুতেই এমন দোয়া করতেন না। কেননা আল্লাহ্ তাআলা নূহ (আঃ)-কে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ 'অতঃপর মহাপ্লাবন যখন শুরু হবে, আপনি তখন কোন অবাধ্য কাফেরের জন্য আমার কাছে সুপারিশ করবেন না।'— এহেন স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের দুঃসাহস করা কোন নবীর পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুতঃপক্ষে এটি কুফরী অবস্থায় কেনআনকে রক্ষা করার আবদার ছিল না। বরং তাকে ঈমান দান করার জন্য খোদার দরবারে আকুল আবেদন ছিল। কিন্তু হযরত নূহ্ (আঃ)-এর মত একজন বিশিষ্ট নবী কর্তৃক ভালমত না জেনে-শুনে এরূপ দোয়া করাকেও আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেন নি, বরং এরূপ দোয়া তাঁর জন্য অসমীচীন হয়েছে বলে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। পয়গম্বরের উচ্চ মর্যাদার পক্ষে এটি এমন একটি ত্রুটি যা পরবর্তীকালে তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। তাই হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি যখন তাঁর কাছে সুপারিশের অনুরোধ জানাবে, তখনও তিনি উক্ত ত্রুটিকে ওজর হিসাবে তুলে ধরে বলবেন যে, আমি এমন একটি ভুল করেছি, যার ফলে আজ সুপারিশ করার হিম্মত হয় না।

কাফের ও যালেমের জন্য দোয়া করা জায়েয নয় ঃ উপরোক্ত বয়ান দ্বারা একটি মাসআলা জানা গেল যে, দোয়াকারীর কর্তব্য হচ্ছে যার জন্য ও যে কাজের জন্য দোয়া করা হবে— তা জায়েয, হালাল ও ন্যায়সঙ্গত কি না তা জেনে নেয়া। সন্দেহজনক কোন বিষয়ের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ হয়েছে। তফসীরে বয়যাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে রূহুল-মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে যেহেতু সন্দেহজনক ক্ষেত্রে দোয়া করা নিষিদ্ধ হয়েছে, কাজেই জেনে-শুনে অন্যায় ও অবৈধ কাজের পক্ষে দোয়া করা অধিকতর হারাম।

এতদ্বারা আরো জানা গেল যে, বর্তমানে অনেক পীর-বুযুর্গানের নীতি হচ্ছে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন দোয়ার জন্য তাঁদের কাছে আসে, পীর-বুযুর্গান তাদের জন্যই হাত তোলেন, মকসুদ হাসিলের দোয়া করেন। অথচ অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জানা থাকে যে, এ ব্যক্তি যালেম ও অন্যায়কারী, অথবা যে মকসুদের জন্য দোয়া করাচ্ছে তা তার জন্য হালাল নয়। এমন কোন চাকরী বা পদ লাভের জন্য দোয়া চায়, যার ফলে সে হারামে লিপ্ত হবে। অথবা কারো হক নষ্ট করে নিজে লাভবান হবে। জেনে শুনে এসব দোয়া করা তো হারাম বটেই, এমনকি সন্দেহজনক ব্যাপারেও প্রকৃত অবস্থা না জেনে দোয়ার জন্য হাত তোলাও সমীচীন নয়।

মুমিন ও কাফেরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব হতে পারে না ঃ এখানে আরো জানা গেল যে, মুমিন ও কাফেরের মধ্যে যতই নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক থাক না কেন, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উক্ত আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করা যাবে না। কোন ব্যক্তি যতই সম্ভ্রান্ত বংশীয় হোক না কেন, যতই বড় বুযুর্গের সন্তান হোক না কেন, এমনকি সৈয়দ বংশীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করুক না কেন,কিন্তু যদি সে ঈমানদার না হয়, তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে তার আভিজাত্য ও নবীর নিকটাত্মীয় হওয়ার কোন মূল্য নেই।। ঈমান, তাকওয়া ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হবে। যার মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ হয়েছে সে পর হলেও আপনজন। অন্যথায় আপন আত্মীয় হলেও সে পর।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও যদি আত্মীয়তার লক্ষ্য রাখা হতো, তাহলে ভাইয়ের উপর ভাই কখনো তলোয়ার চালাতো না। বদর, ওহুদ ও আহযাবের লড়াই তো একই বংশের লোকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। যাতে করে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও জাতীয়তা বংশ,বর্ণ,ভাষা বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে না, বরং ঈমান, তাকওয়া ও সৎকর্মশীলতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে। তারা যে কোন বংশের, যে কোন গোত্রের, যে কোন বর্ণের, যে কোন দেশের, যে কোন ভাষাভাষী হোক না কেন, সবাই মিলে এক জাতি, একই ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 'সকল মুসলমান ভাই-ভাই' আয়াতের এটাই মর্মকথা। অপরদিকে যারা ঈমান ও সৎকর্মশীলতা হতে বঞ্চিত, তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সদস্য নয়।

সূরা হুদের ৫০ হতে ৬০ পর্যন্ত ১১ আয়াতে বিশিষ্ট পয়গম্বর হযরত হুদ (আঃ)– এর আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর নামেই অত্র সূরার নামকরণ হয়েছে। অত্র সূরার মধ্যে হযরত নূহ (আঃ) হতে হযরত মুসা (আঃ) পর্যন্ত সাত জন আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) ও তদীয় উম্মতগণের কাহিনী কোরআন পাকের বিশেষ বাচনভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যার মধ্যে উপদেশ ও শিক্ষামূলক এমন তথ্যাদি তুলে ধরা হয়েছে, যা যে কোন অনুভূতিশীল মানুষের অন্তরে ভাবান্তর সৃষ্টি না করে পারে না। তাছাড়া ঈমান ও সৎকর্মের বহু মূলনীতি এবং উত্তম পথনির্দেশ রয়েছে।

যদিও অত্র সূরার মধ্যে সাত জন পয়গম্বরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সূরার নামকরণ করা হয়েছে হযরত হুদ (আঃ)-এর নামে। যাতে বোঝা যায় যে, এখানে হুযরত হুদ-এর ঘটনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ পাক হযরত হুদ (আঃ)-কে আদ জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। দৈহিক আকার-আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে 'আদ জাতিকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। হযরত হুদ (আঃ)- ও উক্ত জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন– أَخَاهُمْ هُودًا 'তাদের ভাই হুদ'—শব্দে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এত বড় বীর ও শক্তিশালী জাতি তাদের বিবেক ও চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। নিজেদের হাতে তৈরী প্রস্তরমূর্তিকে তারা তাঁদের মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল।

হযরত হুদ (আঃ) তাঁর কওমের নিকট যে দ্বীনী দাওয়াত পেশ করেন, তার তিনটি মূলকথা ৫০, ৫১, ও ৫২ এই তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমতঃ— তওহীদ বা একত্ববাদের আহবান এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্তা বা শক্তিকে এবাদত উপাসনার যোগ্য মনে করা বাতুলতা মাত্র। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি যে তওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছি, এজন্য জীবন উৎসর্গ করছি। তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি এহেন কষ্ট-ক্লেশের পথ কোন্ স্বার্থে অবলম্বন করেছি? আমি তো এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার বস্তুগত কোন ফায়দা বা স্বার্থ হাসিল হচ্ছে না। এটা যদি আল্লাহ্র নির্দেশ এবং আমার দায়িত্ব না হতো, তাহলে তোমাদেরকে দাওয়াত দিতে ও সংশোধন করতে গিয়ে এত কষ্ট-ক্লেশ বরণ করার কি প্রয়োজন ছিল?

ওয়াজ নছিহত ও দ্বীনী দাওয়াতের পারিশ্রমিকঃ কোরআন করীমে প্রায় নবী (আঃ)-গণের যবানীতে এ উক্তি ব্যক্ত হয়েছে যে, "আল্লাহ্র দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না।" এতে বোঝা যায় যে, দ্বীনী-দাওয়াত ও তবলীগের কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হলে তা ফলপ্রসূ হয় না। বাস্তব অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য দেয় যে, যারা ওয়াজ-নসিহত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, তাদের কথায় শ্রোতাদের অন্তরে কোন তাসীর করতে পারে না।

তৃতীয়তঃ কথা হচ্ছে, নিজেদের অতীত জীবনে কুফরী, শেরেকী ইত্যাদি যত গোনাহ করেছ, সেসব থেকে আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য ঐসব গোনাহ হতে তওবা কর। অর্থাৎ, দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা কর যে, আগামীতে আর কখনো এসবের ধারে-কাছেও যাবো না। যদি তোমরা এরূপ সত্যিকার তওবা ও এস্তেগফার করতে পার, (তবে তার বদৌলতে পরকালের চিরস্থায়ী সাফল্য ও সুখময় জীবন তো লাভ করবেই,) অধিকন্তু দুনিয়াতেও ইহার বহু উপকারিতা দেখতে পাবে। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটবে, যথাসময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, যার ফলে তোমাদের আহার্য-পানীয়ের প্রাচুর্য হবে, তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য বর্ধিত হবে।

এখানে 'শক্তি' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্যে দৈহিক শক্তি এবং ধন-বল ও জনবল সবই অন্তর্ভুক্ত। এতদ্বারা জানা গেল যে, তওবা ও এস্তেগফারের বদৌলতে ইহজীবনেও ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদির মধ্যে বরকত হয়ে থাকে।

হযরত হুদ (আঃ)-এর আহবানের জবাবে তাঁর দেশবাসী মূর্খতাসুলভ উত্তর দিল যে, আপনি তো আমাদেরকে কোন মু'জেযা দেখালেন না। শুধু মুখের কথায় আমরা নিজেদের বাপ-দাদার আমলের উপাস্য দেব-দেবীগুলোকে বর্জন করবো না। এবং আপনার প্রতি ঈমানও আনব না। বরং আমরা সন্দেহ করছি যে,আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে। তাই আপনি এমন অসংলগ্ন কথা বলছেন।

إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّيٓ أُشْهِدُ اللَّهَ
وَاشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِن دُونِهِۦ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا
ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ
إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَإِن
تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِۦٓ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا
غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُۥ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾ وَ
لَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ
نَجَّيْنَٰهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ
وَعَصَوْا رُسُلَهُۥ وَاتَّبَعُوٓا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾ وَأُتْبِعُوا فِي
هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَٰمَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ
أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ
مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾ قَالُوا يَٰصَٰلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَآ ۖ أَتَنْهَىٰنَآ أَن
نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾

(৫৪) বরং আমরা তো বলি যে, আমাদের কোন দেবতা তোমার উপরে শোচনীয় ভূত চাপিয়ে দিয়েছে। হূদ বললেন—আমি আল্লাহকে সাক্ষী করেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমার কোন সম্পর্ক নাই তাঁদের সাথে যাদেরকে তোমরা শরিক করছ; (৫৫) তাকে ছাড়া, তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও, অতঃপর আমাকে কোন অবকাশ দিও না। (৫৬) আমি আল্লাহ্‌র উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদেগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালনকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই। (৫৭) তথাপি যদি তোমরা মুখ ফেরাও, তবে আমি তোমাদেরকে তা পৌছিয়েছি যা আমার কাছে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে; আর আমার পালনকর্তা অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুই বিগড়াতে পারবে না; নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগারই প্রতিটি বস্তুর হেফাজতকারী। (৫৮) আর আমার আদেশ যখন উপস্থিত হল, তখন আমি নিজ রহমতে হূদ এবং তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে পরিত্রাণ করি এবং তাদেরকে এক কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করি। (৫৯) এ ছিল 'আদ জাতি, যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতকে অমান্য করেছে, আর তদীয় রসূলগণের অবাধ্যতা করেছে এবং প্রত্যেক উদ্ধত বিরোধীদের আদেশ পালন করেছে। (৬০) এ দুনিয়ায় তাদের পিছনে পিছনে লা'নত রয়েছে এবং কেয়ামতের দিনেও; জেনে রাখ, 'আদ জাতি তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে, হূদের জ্ঞাতি 'আদ জাতির প্রতি অভিসম্পাত রয়েছে জেনে রাখ। (৬১) আর সামূদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করি; তিনি বললেন—হে আমার জাতি। আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নাই। তিনিই যমীন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অতএব; তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে চল। আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন; সন্দেহ নেই। (৬২) তারা বলল—হে সালেহ, ইতিপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যা পূজা করত তুমি কি আমাদেরকে তার পূজা করতে নিষেধ কর? কিন্তু যার প্রতি তুমি আমাদের আহবান জানাচ্ছ আমাদের তাতে এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তদুত্তরে হযরত হূদ (আঃ) পয়গম্বরসুলভ নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন, তোমরা যদি আমার কথা না মান, তবে শোন, আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের সব অলীক উপাস্যদের প্রতি আমি রুষ্ট ও বিমুখ। এখন তোমরা ও তোমাদের দেবতারা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের, আমার উপর আক্রমণের চেষ্টা করে দেখ, আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশ দিও না। এত বড় কথা আমি এজন্য বলছি যে, আমি আল্লাহ্ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখি ; যিনি আমার এবং তোমাদের একমাত্র পালনকর্তা। ধরাধামে বিচরণশীল সকল প্রাণীই তাঁর মুঠোর মধ্যে। তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া কেউ কারো কোন ক্ষতি করতে পারে না। নিশ্চয় আমার পরওয়ারদেগার সরল পথে রয়েছেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সরল পথে চলবে, সে আল্লাহ্‌কে পাবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে সাহায্য করবেন।

সমগ্র জাতির মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে এমন নির্ভীক ঘোষণা ও তাদের দীর্ঘ দিনের লালিত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় আঘাত হানা সত্ত্বেও এত বড় সাহসী ও শক্তিশালী জাতির মধ্যে কেউ তাঁর একটি কেশও স্পর্শ করতে পারল না। বস্তুতঃ এটাও হযরত হূদ (আঃ)-এর একটি মু'জেযা। এর দ্বারা একে তো তাদের এ কথার জবাব দেয়া হয়েছে যে, আপনি কোন মু'জেযা প্রদর্শন করেননি। দ্বিতীয়তঃ তারা যে বলত আমাদের কোন কোন দেবতা আপনার মস্তিষ্ক বিবৃত করে দিয়েছে তাও বাতিল করা হল। কারণ দেব-দেবীর যদি কোন ক্ষমতা থাকত, তবে এত বড় কথা বলার পর ওরা তাঁকে জীবিত রাখত না।

অতঃপর তিনি বলেন,—তোমরা যদি এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে থাক, তবে জেনে রাখ, যে পয়গাম পৌছাবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে তোমাদের নিকট পৌছিয়েছি। অতএব তোমাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব ও গযব আপতিত হবে, তোমরা সমূলে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর আমার পরওয়ারদেগার তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে এ পৃথিবীতে আবাদ করাবেন। তোমরা যা করছ তাতে তোমাদেরই সর্বনাশ করছ, আল্লাহ্ তাআলার কোন ক্ষতি করছ না। আমার পালনকর্তা সবকিছু লক্ষ্য রাখেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন. তোমাদের সব ধ্যান-ধারণা ও কার্য-কলাপের তিনি খবর রাখেন।

কিন্তু হতভাগার দল হযরত হূদ (আঃ)-এর কোন কথায় কর্ণপাত করল না। তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার উপর অবিচল রইল। অবশেষে প্রচণ্ড ঝড়-তুফান রূপে আল্লাহ্‌র আযাব নেমে এল। সাত দিন আট রাত যাবত অনবরত ঝড় তুফান বইতে লাগল। বাড়ী-ঘর ধ্বসে গেল, গাছ-পালা উপড়ে পড়ল, গৃহ-ছাদ উড়ে গেল, মানুষ ও সকল জীবজন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে যমীনে নিক্ষিপ্ত হল, এভাবেই সুঠাম দেহের অধিকারী শক্তিশালী একটি জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল।

'আদ জাতির উপর যখন প্রতিশ্রুত আযাব নাযিল হয়, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুযায়ী হযরত হূদ (আঃ) ও সঙ্গী ঈমানদারগণকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আযাব হতে রক্ষা করেন।

'আদ জাতির কাহিনী ও আযাবের ঘটনা বর্ণনা করার পর অপরাপর লোকদের শিক্ষা ও সতর্কীকরণের জন্য এরশাদ করেছেন যে, কওমে আদ আল্লাহ্‌র আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ্‌র

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ
رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ
تَخْسِيْرٍ ﴿٦٣﴾ وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ
اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿٦٤﴾
فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ
مَكْذُوْبٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ
بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿٦٦﴾
وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٦٧﴾
كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَاۡ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ اَلَا بُعْدًا
لِّثَمُوْدَ ﴿٦٨﴾ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا
قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَآٰ اَيْدِيَهُمْ
لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّآ
اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٠﴾ وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا
بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ
وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾

(৬৩) সালেহ্ বললেন—হে আমার জাতি! তোমরা কি মনে কর, আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে বুদ্ধি-বিবেচনা লাভ করে থাকি আর তিনি যদি আমাকে নিজের তরফ হতে রহমত দান করে থাকেন, অতঃপর আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই তবে তার থেকে কে আমায় রক্ষা করবে? তোমরা তো আমার ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করতে পারবে না। (৬৪) আর হে আমার জাতি! আল্লাহ্র এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব তাকে আল্লাহ্র যমীনে বিচরণ করে খেতে দাও, এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শও করবে না। নতুবা অতি সত্বর তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে। (৬৫) তবু তারা উহার পা কেটে দিল। তখন সালেহ্ বললেন—তোমরা নিজেদের গৃহে তিনটি দিন উপভোগ করে নাও। ইহা এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হবে না। (৬৬) অতঃপর আমার আযাব যখন উপস্থিত হল, তখন আমি সালেহ্কে ও তদীয় সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে উদ্ধার করি, এবং সেদিনকার অপমান হতে রক্ষা করি। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা তিনিই সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী। (৬৭) আর ভয়ঙ্কর গর্জন পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করল, ফলে ভোর হতে না হতেই তারা নিজ নিজ গৃহসমূহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৬৮) যেন তাঁরা কোনদিনই সেখানে ছিল না। জেনে রাখ, নিশ্চয় সামূদ জাতি তাদের পালনকর্তার প্রতি অস্বীকার করেছিল। আরো শুনে রাখ, সামূদ জাতির জন্য অভিশাপ রয়েছে। (৬৯) আর অবশ্যই আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ইব্রাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল তারা বলল— সালাম, তিনিও বললেন— সালাম। অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে এলেন। (৭০) কিন্তু যখন দেখলেন যে, আহার্যের দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি সন্দিগ্ধ হলেন এবং মনে মনে তাঁদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগলেন। তারা বলল—ভয় পাবেন না। আমরা লূতের কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৭১) তাঁর স্ত্রীও নিকটেই দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে ফেলল। অতঃপর আমি তাকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পরের ইয়াকূবেরও। (৭২) সে বলল-কি দুর্ভাগ্য আমার! আমি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এতো ভারী আশ্চর্য কথা!

রসূলগণকে আমান্য করেছে, হঠকারী পাপিষ্ঠদের কথামত কাজ করেছে। যার ফলে দুনিয়াতে তাদের প্রতি গযব নাযিল হয়েছে এবং আখেরাতেও অভিশপ্ত আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে।

এখানে বোঝা যায় যে, 'আদ জাতি ঝড়-তুফানের কবলে পতিত হয়েছিল। কিন্তু 'সূরা মুমিনুন'-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, হয়ত উভয় প্রকার আযাবই নাযিল হয়েছিল। প্রথমে ঝড় তুফান শুরু হয়েছিল, চরম পর্যায়ে ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছিল।

৬১ থেকে ৬৮ পর্যন্ত ৮ আয়াতে হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যিনি 'আদ জাতির দ্বিতীয় শাখা 'কওমে সামূদ' -এর প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনিও তাঁর কওমকে সর্বপ্রথম তওহীদের দাওয়াত দিলেন। দেশবাসী তা প্রত্যাখ্যান করে বলল—"এ পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ড থেকে আমাদের সম্মুখে আপনি যদি একটি উষ্ট্রী বের করে দেখাতে পারেন, তাহলে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মানতে রাজী আছি।"

হযরত সালেহ্ (আঃ) তাদেরকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, তোমাদের চাহিদা মোতাবেক মু'জেযা প্রদর্শনের পরেও তোমরা যদি ঈমান আনতে দ্বিধা প্রকাশ কর, তাহলে কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার বিধান অনুসারে তোমাদের উপর আযাব নেমে আসবে, তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদের হঠকারিতা থেকে বিরত হল না। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অসীম কুদরতে তাদের চাহিদা মোতাবেক মু'জেযা জাহির করলেন। বিশাল প্রস্তরখণ্ড বিদীর্ণ হয়ে তাদের কথিত গুণাবলী সম্পন্ন উষ্ট্রী আত্ম-প্রকাশ করল। আল্লাহ্ তাআলা হুকুম দিলেন যে, এ উষ্ট্রীকে কেউ যেন কোনরূপ কষ্ট-ক্লেশ না দেয়। যদি এরূপ করা হয় তবে তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল হয়ে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করল, উষ্ট্রীকে হত্যা করল। তখন আল্লাহ্ তাআলা কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। হযরত সালেহ্ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণ নিরাপদে রক্ষা পেলেন। অন্য সবাই এক ভয়াবহ গর্জনে ধ্বংস হল। অত্র ঘটনায় বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর জাতি তাঁকে বলল

قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ অর্থাৎ, "তওহীদের দাওয়াত ও প্রতিমা পূজা থেকে আমাদের বারণ করার আগ পর্যন্ত আপনার সম্পর্কে আমরা উচ্চাশা পোষণ করতাম যে, আপনি আগামীতে আমাদের নেতৃত্ব দান করবেন।" এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলা বাল্যকাল হতেই নবীগণকে যোগ্যতা ও উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী করে থাকেন। যার ফলে সবাই তাঁদেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হতো। যেমন হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নবুওয়ত ঘোষণা করার পূর্বে সমগ্র আরববাসী তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী মনে করত, এবং 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কিন্তু নবুওয়তের দাবী ও মূর্তি পূজা থেকে বারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেসব লোক তাঁর বিরোধিতা ও শত্রুতা শুরু করেছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ অর্থাৎ, তারা যখন আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে অলৌকিক উষ্ট্রীকে হত্যা করল, তখন তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হল যে, মাত্র তিন দিন তোমাদিগকে অবকাশ দেয়া হল, এ তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ অবকাশের তিন দিন ছিল

বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। রবিবার প্রত্যূষে তাদের উপর আযাব নাযিল হল।

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ অর্থাৎ, ঐ পাপিষ্ঠদেরকে এক ভয়ঙ্কর গর্জন এসে পাকড়াও করল। এ ছিল হযরত জিবরাঈল (আঃ)–এর গর্জন, যা হাজার হাজার বজ্রধ্বনির সম্মিলিত শক্তির চেয়েও ভয়াবহ। যা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষ বা কোন জীবজন্তুর হতে পারে না। এরূপ প্রাণ কাঁপানো গর্জনেই সকলে মৃত্যুবরণ করেছিল।

অত্র আয়াতের মর্মার্থ থেকে বোঝা যায় যে, 'কওমে–সামূদ' ভয়ঙ্কর গর্জনে ধ্বংস হয়েছিল। অপর দিকে সূরা আ'রাফ'–এর এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে– فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ 'অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল।' এতে বোঝা যায় যে, ভূমিকম্পের ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, উভয় আয়াতের মর্মার্থে কোন বিরোধ নেই। হয়ত প্রথমে ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল। এবং তৎসঙ্গেই ভয়ঙ্কর গর্জনে সবাই ধ্বংস হয়েছিল।

এখানে হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ (আঃ)–এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সন্তান লাভের সু–সংবাদ দেয়ার জন্য তাঁর কাছে কতিপয় ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছিলেন। কেননা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) –এর স্ত্রী বিবি সারা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি সন্তানের জন্য একান্ত উদগ্রীব ছিলেন; কিন্তু উভয়ের বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হওয়ার কারণে দৃশ্যতঃ সন্তান লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতার মাধ্যমে সুসংবাদ দান করলেন যে, তাঁরা অচিরেই একটি পুত্রসন্তান লাভ করবেন। তাঁর নামকরণ করা হল ইসহাক। আরো অবহিত করা হল যে, হযরত ইসহাক (আঃ) দীর্ঘ জীবী হবেন, সন্তান লাভ করবেন, তাঁর সন্তানের নাম হবে 'ইয়াকুব' (আঃ)। উভয়ে নবুওয়তের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

ফেরেশতাগণ মানবাকৃতিতে আগমন করায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদেরকে সাধারণ আগন্তুক মনে করে মেহমানদারীর আয়োজন করেন। ভুনা গোশ্‌ত সামনে রাখলেন। কিন্তু তারা ছিলেন ফেরেশতা, পানাহারের উর্ধ্বে। কাজেই সম্মুখে আহার্য দেখেও তারা সেদিকে হাত বাড়ালেন না। এটা লক্ষ্য করে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আতঙ্কিত হলেন যে, হয়ত এদের মনে কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে। ফেরেশতাগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–এর অমূলক আশঙ্কা আন্দাজ করে উহা দূর করার জন্য স্পষ্টভাবে জানালেন যে, "আপনি শঙ্কিত হবেন না। আমরা আল্লাহ্‌র ফেরেশতা, আপনাকে একটি সুসংবাদ দান করা ও অন্য একটি বিশেষ কার্য সম্পাদানের জন্য আমরা প্রেরিত হয়েছি। তা হচ্ছে হযরত লূত (আঃ)–এর কওমের উপর আযাব নাযিল করা।" হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–এর স্ত্রী বিবি সারা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিলেন। যখন বুঝতে পারলেন যে, এরা মানুষ নন, ফেরেশতা; তখন পর্দার প্রয়োজন রইল না। বৃদ্ধকালে সন্তান লাভের সু–খবর শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন, এহেন বৃদ্ধ বয়সে আমার গর্ভে সন্তান জন্ম হবে! আর আমার এ স্বামীও তো অতি বৃদ্ধ। ফেরেশতাগণ উত্তর দিলেন, তুমি কি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করছ? যাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। বিশেষ করে তোমরা নবী পরিবারের লোক। তোমাদের পরিবারের উপর আল্লাহ্ তাআলার প্রভূত রহমত এবং অফুরন্ত বরকত রয়েছে। বাহ্যিক কার্য–কারণের উর্ধ্বে বহু অলৌকিক ঘটনাবলী তোমরা নিজ চোখে অবলোকন করছ। তা সত্ত্বেও বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ আছে কি? এ হচ্ছে ঘটনার সংক্ষিপ্তসার। এবার আয়াতসমূহের বিস্তারিত আলোচনায় আসা যাক।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–এর নিকট কোন সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। এই সুসংবাদের বিবরণ সামনের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—ফেরেশতার দলে হযরত জিবরাঈল (আঃ), হযরত মীকাঈল (আঃ) ও ইস্রাফীল (আঃ) এ তিন জন ফেরেশতা ছিলেন।– (কুরতুবী) তাঁরা মানবাকৃতিতে আগমন করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–কে সালাম করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যথারীতি সালামের জবাব দিলেন এবং তাদেরকে মানুষ মনে করে আতিথেয়তার আয়োজন করলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মেহমানদারীর প্রথা প্রবর্তন করেন।– (কুরতুবী) তাঁর নিয়ম ছিল যে, মেহমান ছাড়া একাকী কখনো খানা খেতেন না। খাবার সময় খোঁজ করে মেহমান নিয়ে এসে সাথে খেতে বসতেন।

তফসীরে কুরতুবীতে ইস্রাঈলী সূত্র উদ্ধৃত করে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একদিন তাঁর সাথে খানা খাওয়ার জন্য মেহমান তালাশ করছিলেন। এমন সময় জনৈক অচেনা লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। যখন খানা খেতে শুরু করবেন, তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আগন্তুক মুসাফিরকে বললেন—"বিসমিল্লাহ্ –আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি বল।" সে বলল—"আল্লাহ্ কাকে বলে আমি জানি না।" হযরত ইবরাহীম (আঃ) রাগান্বিত হয়ে তাকে দস্তরখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। যখন সে বের হয়ে গেল, তৎক্ষণাত হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপস্থিত হলেন এবং জানালেন যে, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন–আমি তার কুফরী সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সারা জীবন তাকে আহার্য–পানীয় দিয়ে আসছি। আর আপনি একে এক বেলা খাবার দিতে পারলেন না। একথা শোনা মাত্র হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ঐ লোকটির তালাশে ছুটলেন। অবশেষে তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি বেঁকে বসল এবং বলল, "আপনি প্রথমে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, পরে আবার সাধাসাধি করে আনতে গেলেন কেন? এ কারণ না জানা পর্যন্ত আমি খাদ্য স্পর্শ করব না।"

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করলেন। কাফের লোকটির মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হল। সে বলল— যে মহান পালনকর্তা ফেরেশতা প্রেরণ করে আপনাকে একথা জানিয়েছেন, তিনি সত্যই পরম দয়ালু। আমি তার প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর সে বিসমিল্লাহ বলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–এর সাথে খানা খেতে আরম্ভ করল।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর আতিথেয়তার অভ্যাস অনুযায়ী আগন্তুক ফেরেশতাগণকে মানুষ মনে করে অনতিবিলম্বে একটি বাছুর গরু জবেহ করলেন এবং উহা ভুনা করে মেহমান ফেরেশতাগণের আহারের জন্য তাদের সামনে রাখলেন।

৭০ তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, আগন্তুক ফেরেশতাগণ যদিও মানবাকৃতিতে আগমন করেছিলেন এবং মানবসুলভ পানাহারের বৈশিষ্ট্য তাদেরকে দান করা যদিও সম্ভব ছিল। কিন্তু পানাহার না করার মধ্যেই হেকমত নিহিত ছিল, যেন তাঁদের ফেরেশতা হওয়া প্রকাশ পায়। কাজেই মানবাকৃতি সত্ত্বেও তাঁদের পানাহার না করায় 'ফেরেশতা স্বভাব' বজায় রাখা হয়েছিল। যার ফলে তাঁরা আহার্যের দিকে হাত বাড়ান নাই।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ফেরেশতাদের হাতে কিছু তীর

قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ
الْبَيْتِ ۭ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿٧٣﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ
وَجَاۗءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٤﴾ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ
لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿٧٥﴾ يٰٓـاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ
جَاۗءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ﴿٧٦﴾ وَلَمَّا
جَاۗءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْۗءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا
يَوْمٌ عَصِيْبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَاۗءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ۭ وَمِنْ قَبْلُ
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۭ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَاۗءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ
لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ۭ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ
رَّشِيْدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ
وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ
اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ
لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا
يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ۭ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ۭ
اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۭ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ﴿٨١﴾

(৭৩) তারা বলল—তুমি আল্লাহ্‌র হুকুম সম্পর্কে বিস্ময়বোধ করছ? হে গৃহবাসীরা, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত ও প্রভূত বরকত রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রশংসিত মহিমায়। (৭৪) অতঃপর যখন ইব্রাহীম (আঃ)-এর আতঙ্ক দূর হল এবং তিনি সুসংবাদ প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি আমার সাথে তর্ক শুরু করলেন কওমে লূত সম্পর্কে। (৭৫) ইব্রাহীম (আঃ) বড়ই ধৈর্যশীল, কোমল অন্তর, আল্লাহ্‌মুখী সন্দেহ নেই। (৭৬) ইব্রাহীম, এহেন ধারণা পরিহার কর; তোমার পালনকর্তার হুকুম এসে গেছে, এবং তাদের উপর সে আযাব অবশ্যই আপতিত হবে, যা কখনো প্রতিহত হবার নয়। (৭৭) আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত হল। তখন তাঁদের আগমনে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন এবং তিনি বলতে লাগলেন—আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। (৭৮) আর তাঁর কওমের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর (গৃহ) পানে ছুটে আসতে লাগল। পূর্ব থেকেই তারা কু-কর্মে তৎপর ছিল। লূত (আঃ) বললেন—'হে আমার কওম, এ আমার কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতমা। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, এবং অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না, তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই। (৭৯) তারা বলল—তুমি তো জানই, তোমার কন্যাদের নিয়ে আমাদের কোন গরজ নেই। আর আমরা কি চাই, তাও তুমি অবশ্যই জান। (৮০) লূত (আঃ) বললেন—হায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকত অথবা আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম। (৮১) মেহমান ফেরেশতাগণ বলল—হে লূত (আঃ) আমরা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে প্রেরিত পেরেশতা। এরা কখনো তোমার দিকে পৌঁছতে পারবে না। ব্যস তুমি কিছুটা রাত থাকতে থাকতে নিজের লোকজন নিয়ে বাইরে চলে যাও। আর তোমাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রী নিশ্চয় তার উপরও তা আপতিত হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে। ভোর বেলাই তাদের প্রতিশ্রুতির সময়, ভোর কি খুব নিকটে নয়?

ছিল। তাঁরা উহার ফলক দ্বারা ভুনা গোশত স্পর্শ করছিলেন। তাঁদের এহেন আচরণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সন্ধিগ্ধ ও শঙ্কিত হলেন। কারণ, সে দেশে নিয়ম ছিল যে, অসদুদ্দেশে কেউ কারো বাড়ীতে মেহমান হলে সেখানে পানাহার করত না।-(তফসীরে কুরতুবী) অবশেষে ফেরেশতাগণ প্রকাশ করে দিলেন যে, আপনি ভীত হবেন না। আমরা মানুষই নই, বরং আল্লাহ্‌র ফেরেশতা।

আহ্‌কাম ও মাসায়েল

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামী আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত দেয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তদীয় তফসীরে যার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

সালামের সুন্নত ঃ قَالُوْا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ "তাঁরা সালাম বললেন, তিনিও বললেন সালাম।" এতদ্বারা বোঝা যায় যে, মুলসমানদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ-মোলাকাতের সময় পরস্পরকে সালাম করা কর্তব্য। আরো জানা গেল যে, আগন্তুক ব্যক্তি প্রথমে সালাম করবে, অন্যরা তার জবাব দেবে—এটাই বাঞ্ছনীয়।

পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎকালে বিশেষ কোন বাক্য উচ্চারণ করে একে অপরের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার রীতি পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। তবে এ ব্যাপারেও ইসলামের শিক্ষা অনন্য ও সর্বোত্তম। কেননা সালামের সুন্নত সম্মত বাক্য السلام عليكم-এর মধ্যে সর্বপ্রথম 'আস-সালামু' আল্লাহ্‌র একটি গুণ বাচক নাম হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র যিকর করা হল, সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য সালামতি ও নিরাপত্তার দোয়া করা হল, নিজের পক্ষ হতে তার জান-মাল ইজ্জতের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হল।

এখানে কোরআন পাকে ফেরেশতাদের পক্ষ হতে سَلٰمًا 'সালামান' এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর তরফ হতে শুধু سَلٰمٌ 'সালামুন্' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে সালাম ও জবাবের পূর্ণ বাক্য উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। কার্যতঃ অবশ্য এখানে উভয়ক্ষেত্রে সুন্নত মোতাবেক সালাম জবাবের পূর্ণ বাক্যই বোঝানো হয়েছে। হযরত রসূলে করীম (সাঃ)ও নিজের আচরণের মাধ্যমে সালামের পূর্ণ বাক্য শিক্ষা দান করেছেন। অর্থাৎ, প্রথম পক্ষ আস-সালামু আলাইকুম বলবে, তদুত্তরে দ্বিতীয় পক্ষ 'ওয়া-আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমতুল্লাহ্' বলবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হূদে পূর্ববর্তী অধিকাংশ আম্বিয়ারে কেরাম (আঃ) ও তাঁদের উম্মতগণের কাহিনী ও নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আসমানী আযাব অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত লূত (আঃ) ও তাঁর দেশবাসীর অবস্থা ও দেশবাসীর উপর কঠিন আযাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

হযরত লূত (আঃ)-এর কওম একে তো কাফের ছিল, অধিকন্তু তারা এমন এক জঘন্য অপকর্ম ও লজ্জাকর অনাচারে লিপ্ত ছিল, যা পূর্ববর্তী কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায় নাই, বন্য পশুরাও যা ঘৃণা করে থাকে। অর্থাৎ, পুরুষ কর্তৃক অন্য পুরুষের সাথে মৈথুন করা। ব্যভিচারের চেয়েও ইহা জঘন্য অপরাধ। এ জন্যই তাদের উপর এমন কঠিন আযাব অবতীর্ণ হয়েছে, যা অন্য কোন অপকর্মকারীদের উপর কখনো অবতীর্ণ হয় নাই।

হযরত লূত (আঃ)-এর ঘটনা যা অত্র আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সহ কতিপয় ফেরেশতাকে কওমে লূতের উপর আযাব নাযিল করার জন্য প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে তাঁরা ফিলিস্তীনে প্রথমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হন।

আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন জাতিকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করেন, তখন তাদের কার্যকলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আযাবই নাযিল করে থাকে। এ ক্ষেত্রেও ফেরেশতাগণকে নওজোয়ানরূপে প্রেরণ করেন। হযরত লূত (আঃ) ও তাঁদেরকে মানুষ মনে করে তাদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ মেহমানের আতিথেয়তা নবীর নৈতিক দায়িত্ব। পক্ষান্তরে দেশবাসীর কু-স্বভাব তাঁর অজানা ছিল না। উভয় সংকটে পড়ে তিনি স্বগতোক্তি করলেন— "আজকের দিনটি বড় সংকটময় দিন।"

আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এ দুনিয়াকে আজব শিক্ষাক্ষেত্র বানিয়েছেন। যার মধ্যে তাঁর অসীম কুদরত ও অফুরন্ত হেকমতের ভূরি ভূরি নিদর্শন রয়েছে। মূর্তিপূজারী আযরের গৃহে আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ)-কে পয়দা করেছেন। হযরত লূত (আঃ)-এর মত একজন বিশিষ্ট পয়গম্বরের স্ত্রী নবীর বিরুদ্ধাচরণ করে কাফেরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত। সম্মানিত ফেরেশতাগণ সুদর্শন নওজোয়ান আকৃতিতে যখন হযরত লূত (আঃ)-এর গৃহে উপনীত হলেন, তখন তাঁর স্ত্রী সমাজের দুষ্ট লোকদেরকে খবর দিল যে, আজ আমাদের গৃহে এরূপ মেহমান আগমন করেছেন।—(কুরতুবী ও মাযহারী)

হযরত লূত (আঃ)-এর আশঙ্কা যথার্থ প্রমাণিত হল। যার বর্ণনা ৭৮ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ "আর তাঁর কওমের লোকেরা আত্মহারা হয়ে তাঁর গৃহপানে ছুটে এল। আর আগে থেকেই তারা কু-কর্মে অভ্যস্থ ছিল।"

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জঘন্য কু-কর্মের প্রভাবে তারা এতদূর চরম নির্লজ্জ হয়েছিল যে, হযরত লূত (আঃ)-এর মত একজন সম্মানিত পয়গম্বরের গৃহ প্রকাশ্যভাবে অবরোধ করেছিল।

হযরত লূত (আঃ) যখন দেখলেন যে, তাদেরকে প্রতিরোধ করা দুষ্কর, তখন তাদেরকে দুষ্কৃতি হতে বিরত রাখার জন্য তাদের সর্দারদের নিকট স্বীয় কন্যাদের বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব দিলেন। তৎকালে কাফের পাত্রের সাথে মুসলিম পাত্রীর বিবাহ-বন্ধন বৈধ ছিল। হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত এ হুকুম বহাল ছিল। এ জন্যই হযরত (সাঃ) স্বীয় দুই কন্যাকে প্রথমে উতবা ইবনে আবু লাহাব ও আবুল আস ইবনে রবী'র কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। অথচ তখন তারা উভয়ে কুফরী হালতে ছিল। পরবর্তীকালে ওহীর মাধ্যমে কাফেরের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিবাহ হারাম ঘোষণা হয়।—(কুরতুবী)

কোন কোন তফসীরকারের মতে- এখানে হযরত লূত (আঃ) নিজের কন্যা দ্বারা সমগ্র জাতির বধূ কন্যাদের বুঝিয়েছেন। কেননা, প্রত্যেক নবী নিজ উম্মতের জন্য পিতৃতুল্য এবং উম্মতগণ তাঁর রূহানী সন্তানস্বরূপ। যেমন কোরআনের ২১ পারা সুরা আহযাবের ৬ষ্ঠ আয়াত اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ এর সাথে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ক্বেরাতে وهواب لهم বাক্যেও বর্ণিত আছে। যার মধ্যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে সমগ্র "উম্মতের পিতা" বলে অভিহিত করা হয়েছে। অত্র তফসীর অনুসারে হযরত লূত (আঃ)-এর কথার অর্থ হল, তোমরা নিজের কদাচার হতে বিরত হও এবং ভদ্রভাবে কওমের কন্যাদেরকে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করে বৈধভাবে স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর।

অতঃপর হযরত লূত (আঃ) তাদেরকে আল্লাহ্র আযাবের ভীতি প্রদর্শন করে বললেন فَاتَّقُوا اللّٰهَ "আল্লাহ্কে ভয় কর" এবং কাকুতি -মিনতি করে বললেন— وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ "আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপমানিত করো না।" তিনি আরো বললেন - اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ "তোমাদের মাঝে কি কোন ন্যায়নিষ্ঠ ভাল মানুষ নেই? আমার আকুল আবেদনে যার অন্তরে এতটুকু করুণার সৃষ্টি হবে।

কিন্তু তাদের মধ্যে শালীনতা ও মনুষত্বের লেশমাত্র ছিল না। তারা একযোগে বলে উঠল— "আপনি তো জানেনই যে, আপনার বধূ-কন্যাদের প্রতি আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আর আমরা কি চাই, তাও আপনি অবশ্যই জানেন।"

লূত (আঃ) এক সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন— হায়, আমি যদি তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হতাম, অথবা আমার আত্মীয়-স্বজন যদি এখানে থাকত, যারা এই জালেমদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতো, তাহলে কত ভালো হতো।

ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আঃ)-এর অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে প্রকৃত রহস্য ব্যক্ত করলেন এবং বললেন—আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনার দলই সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। আমরা মানুষ নই, বরং আল্লাহ্র প্রেরিত ফেরেশতা। তারা আমাদেরকে কাবু করতে পারবে না বরং আযাব নাযিল করে দুরাত্মা-দুরাচারদের নিপাত সাধনের জন্যই আমরা আগমন করেছি।

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, "আল্লাহ্ তাআলা হযরত লূত (আঃ)-এর উপর রহম করুন, তিনি নিরুপায় হয়ে সুদৃঢ় জামাতের আশ্রয় কামনা করেছিলেন।" তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত লূত (আঃ)-এর পরবর্তী প্রত্যেক নবী সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।—(কুরতুবী) স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কোরাইশ-কাফেরগণ হাজার রকম অপচেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাঁর হাশেমী গোত্রের লোকেরা সম্মিলিতভাবে তাঁকে আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে, যদিও ধর্ম-মতের দিক দিয়ে তাদের অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করত। এ জন্যই সম্পূর্ণ বনী-হাশেম গোত্র রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে শামিল ছিল। যখন কোরাইশ কাফেররা তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের দানা-পানি বন্ধ করে দিয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দুর্বৃত্তরা যখন হযরত লূত (আঃ)-এর গৃহদ্বারে সমবেত হল, তখন তিনি গৃহদ্বার রুদ্ধ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ গৃহে অবস্থান করছিলেন। আড়াল হতে দুষ্টদের কথাবার্তা চলছিল। তারা দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ এবং কপাট ভাঙ্গতে উদ্যোগী হল। এমন সংগীন মুহূর্তে হযরত লূত (আঃ) পূর্বোক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে অভয় দান করলেন এবং গৃহদ্বার খুলে দিতে বললেন। তিনি দুয়ার খুলে দিলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ওদের প্রতি তাঁর পাখার ঝাপটা দিলেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেল এবং ভাগতে লাগল।

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا
حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَ
مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ
قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا
تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾ قَالُوا يَا شُعَيْبُ
أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ
فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾ قَالَ
يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ
رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ
عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا
تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

(৮২) অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌছল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর-পাথর বর্ষণ করলাম। (৮৩) যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার নিকট চিহ্নিত ছিল। আর সেই পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়। (৮৪) আর মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েব (আঃ)-কে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন— হে আমার কওম! আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া আমাদের কোন মাবুদ নাই। আর পরিমাপে ও ওজনে কম দিও না, আজ আমি তোমাদেরকে ভাল অবস্থায়ই দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের উপর এমন একদিনের আযাবের আশঙ্কা করছি যেদিনটি পরিবেষ্টনকারী। (৮৫) আর হে আমার জাতি, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কোনরূপ ক্ষতি করো না, আর পৃথিবীতে ফাসাদ করে বেড়াবে না। (৮৬) আল্লাহ্ প্রদত্ত উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা ঈমানদার হও, আর আমি তো তোমাদের উপর সদা পর্যবেক্ষণকারী নই। (৮৭) তারা বলল— হে শোয়ায়েব (আঃ), আপনার নামায কি আপনাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব? আপনি তো একজন খাস মহৎ ব্যক্তি ও সৎপথের পথিক। (৮৮) শোয়ায়েব (আঃ) বললেন— হে দেশবাসী, তোমরা কি মনে কর। আমি যদি আমার পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীলের উপর কায়েম থাকি আর তিনি যদি নিজের তরফ হতে আমাকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, (তবে কি আমি তাঁর হুকুম অমান্য করতে পারি?) আর আমি চাই না যে— তোমাদেরকে যা ছাড়াতে চাই পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হব, আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আল্লাহ্‌র মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাই।

তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশক্রমে হযরত লূত (আঃ)-কে বললেন— আপনি কিছুটা রাত থাকতে আপনার লোকজনসহ এখান থেকে অন্যত্র সরে যান এবং সবাইকে সতর্ক করে দিন যে, তাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়, তবে আপনার স্ত্রী ব্যতীত। কারণ, অন্যদের উপর যে আযাব আপতিত হবে, তাকেও সে আযাব ভোগ করতে হবে।

ইহার এক অর্থ হতে পারে যে, আপনার স্ত্রীকে সাথে নেবেন না। (দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যে, তাকে পিছনে ফিরে চাইতে নিষেধ করবেন না।—(অনুবাদক)। আরেক অর্থ হতে পারে যে, সে আপনার হুশিয়ারী মেনে চলবে না।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর স্ত্রীও সাথে যাচ্ছিল। কিন্তু পাপিষ্ঠদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনাটা শুনে পশ্চাতে ফিরে তাকাল এবং কওমের শোচনীয় পরিণতি দেখে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। তৎক্ষণাৎ একটি প্রস্তরের আঘাতে সেও অক্কা পেল।—(কুরতুবী ও মাযহারী)

ফেরেশতারা আরো জানিয়ে দিলেন যে, إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ প্রত্যুষকালেই তাদের উপর আযাব আপতিত হবে। হযরত লূত (আঃ) বললেন— "আমি চাই, আরো জলদি আযাব আসুক।" ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন ঃ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ "প্রত্যুষকাল দূরে নয়, বরং সমাগত প্রায়।"

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অতঃপর উক্ত আযাবের ধরন সম্পর্কে কোরআন পাকে এরশাদ হয়েছে—যখন আযাবের হুকুম কার্যকরী করার সময় হল, তখন আমি তাদের বসতির উপরিভাগকে নীচে করে দিলাম এবং তাদের উপর অবিশ্রান্তভাবে এমন পাথর বর্ষণ করলাম, যার প্রত্যেকটি পাথর একজনের নামে চিহ্নিত ছিল।

বর্ণিত আছে যে, চারটি বড় বড় শহরে তাদের বসতি ছিল। ঐসব জনপদকেই কোরআন পাকের অন্য আয়াতে وَالْمُؤْتَفِكَاتُ 'মুতাফেকাত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর পাখা উক্ত শহর চতুষ্টয়ের যমীনের তলদেশে প্রবিষ্ট করতঃ এমনভাবে মহাশূন্যে উত্তোলন করলেন যে, সবকিছু নিজ নিজ স্থানে স্থির ছিল। এমনকি পানি ভর্তি পাত্র হতে এক বিন্দু পানিও পড়ল না বা নড়ল না। মহাশূন্য হতে কুকুর জানোয়ার ও মানুষের চিৎকার ভেসে আসছিল। ঐসব জনপদকে সোজাভাবে আকাশের দিকে তুলে উলটিয়ে যথাস্থানে নিক্ষেপ করা হল। তারা আল্লাহ্‌র আইন ও প্রাকৃতিক বিধানকে উলটিয়েছিল, তাই এটা ছিল তাদের উপযুক্ত শাস্তি।

হযরত লূত (আঃ)-এর নাফরমান জাতির শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করার পর দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সতর্ক করার জন্য এরশাদ হয়েছে —— وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ প্রস্তর বর্ষণের আযাব বর্তমানকালের জালেমদের থেকেও দূরে নয়। বরং কোরাইশ কাফেরদের জন্য ঘটনাস্থল ও ঘটনাকাল খুবই কাছে এবং অন্যান্য পাপিষ্ঠরাও যেন নিজেদেরকে এহেন আযাব হতে দূরে মনে না করে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, ''আমার উম্মতের কিছু লোক কওমের লূতের অপকর্মে

লিপ্ত হবে। যখন এরূপ হতে দেখবে, তখন তাদের উপরও অনুরূপ আযাব আসার অপেক্ষা কর।"

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) ও তাঁর কওমের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। তারা কুফরী ও শেরেকী ছাড়া ওজনে-পরিমাপেও লোকদের ঠকাতো। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন এবং ওজনে কম-বেশী করতে নিষেধ করলেন। আল্লাহ্র আযাবের ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও না-ফরমানীর উপর অটল রইল। ফলে এক কঠিন আযাবে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে গেল। وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا 'আর আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইব (আঃ)-কে প্রেরণ করছি।' 'মাদইয়ান' আসলে একটি শহরের নাম। মাদইয়ান ইবনে ইব্রাহীম ইহার পত্তন করেছিলেন। সিরিয়ার বর্তমান معان 'মোয়ান' নামক স্থানে উহা অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। উক্ত শহরের অধিবাসীগণকে মাদইয়ানবাসী বলার পরিবর্তে শুধু "মাদইয়ান" বলা হত। আল্লাহ্ তাআলার বিশিষ্ট পয়গম্বর হযরত শোয়ায়েব (আঃ) উক্ত মাদইয়ান কওমের লোক ছিলেন তাই তাঁকে "তাদের ভাই" বলা হয়েছে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ করে তাদের স্বজাতির এক ব্যক্তিকে তাদের কাছে পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করলেন, যেন তাঁর সাথে জানাশোনা থাকার কারণে সহজেই তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করে ধন্য হতে পারে।

قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ "তিনি বললেন— হে আমার জাতি! তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র এবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের মাবুদ হওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই। আর তোমরা ওজনে ও পরিমাপে কম দিও না।" এখানে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) নিজ জাতিকে প্রথমে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানালেন। কেননা, তারা ছিল মুশরেক, গাছপালার পূজা করত। এজন্যই মাদইয়ানবাসীকে 'আসহাবুল-আইকা' বা 'জঙ্গলওয়ালা' উপাধি দেয়া হয়েছে। এহেন কুফরী ও শেরেকীর সাথে সাথে আরেকটি মারাত্মক দোষ ও জঘন্য অপরাধ ছিল যে, আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয় কালে ওজনে-পরিমাপে হের-ফের করে লোকের হক আত্মসাৎ করত। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন।

এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, কুফরী ও শেরেকীই সকল পাপের মূল। যে জাতি ইহাতে লিপ্ত, তাদেরকে প্রথমই তওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়। ঈমান আনয়নের পূর্বে আমল ও কায়-কারবারের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় না। দুনিয়াতে তাদের সফলতা অথবা ব্যর্থতাও শুধু ঈমান বা কুফরীর ভিত্তিতে হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে আমলের কোন দখল থাকে না। কোরআন পাকে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীগণের ও তাঁদের জাতিসমূহের ঘটনাবলী ইহার প্রমাণ। তবে শুধু দুইটি জাতি এমন ছিল, যাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কুফরীর সাথে সাথে তাদের বদ-আমলেরও দখল ছিল। প্রথম, হযরত লূত (আঃ)-এর জাতি যাদের কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের কুফরী ও গর্হিত অপকর্মের কারণে তাদের বসতিকে উল্‌টিয়ে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কওম। যাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার জন্য কুফরী ও মাপে কম দেয়াকে কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

এতে করে বোঝা যায় যে, পুংমৈথুন ও মাপে কম দেয়া আল্লাহ্ তাআলার কাছে সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধ। কারণ ইহা এমন দু'টি কার্য যার ফলে সমগ্র মানব জাতির চরম সর্বনাশ সাধিত এবং সারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

ওজন-পরিমাপে হের-ফের করার হীন মানসিকতা দূর করার জন্য হযরত শোয়ায়েব (আঃ) প্রথমে স্বীয় দেশবাসীকে পয়গম্বরসুলভ স্নেহ ও দরদের সাথে বললেন إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ "বর্তমানে আমি তোমাদের অবস্থা খুব ভাল ও সচ্ছ দেখছি। তঞ্চকতার আশ্রয় গ্রহণ করার মত কোন কারণ দেখি না। তাই আল্লাহ্ তাআলার এ অনুগ্রহে শোকর আদায় করার জন্য হলেও তোমাদের পক্ষে তাঁর কোন সৃষ্ট জীবকে ঠকানো উচিত নয়। তোমরা যদি আমার কথা না শোন, আমার নিষেধ অমান্য কর, তাহলে আমার ভয় হয় যে, আল্লাহ্র আযাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এখানে আখেরাতের আযাব বোঝানো হয়েছে, দুনিয়ার আযাবও হতে পারে, আবার দুনিয়ার আযাব বিভিন্ন প্রকারও হতে পারে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন আযাব হচ্ছে, তোমাদের স্বচ্ছলতা খতম হয়ে যাবে, তোমরা অভাবগ্রস্ত দুর্ভিক্ষ কবলিত হবে। যেমন রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন—"যখন কোন জাতি মাপে কম দিতে শুরু করে তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধিজনিত শাস্তিতে পতিত করেন।"

ওজন-পরিমাপে কম দিতে নিষেধ করার মধ্যেই পরোক্ষভাবে যদিও সঠিক ওজন করার আদেশ হয়ে গেছে, তথাপি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হযরত শোয়ায়েব (আঃ) উদাত্ত আহ্বান জানালেন وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ "হে আমার জাতি। ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে ঠিক ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কম দিও না আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।" অতঃপর তিনি মমতার সাথে আরো বললেনঃ

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ

"মানুষের পাওনা ঠিকমত ওজন করে পুরোপুরি দিয়ে দেয়ার পর যে লভ্যাংশ উদ্বৃত্ত থাকে, তোমাদের জন্য তা-ই উত্তম। পরিমাণে স্বল্প হলেও আল্লাহ্ তাআলা তার মধ্যে বরকত দান করবেন, যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর। আর যদি অমান্য কর, তবে মনে রেখ-তোমাদের উপর কোন আযাব অবতীর্ণ হলে, তা থেকে তোমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমারনয়।"

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) সম্বন্ধে রসূলে করীম (সাঃ) মন্তব্য করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন 'খতীবুল-আম্বিয়া' বা নবীগণের মধ্যে প্রধান বক্তা। তিনি তাঁর সুললিত বয়ান ও অপূর্ব বাগ্মীতার মাধ্যমে স্বীয় জাতিকে বোঝানো এবং সৎপথে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু এত কিছু শোনার পরেও তাঁর কওমের লোকেরা পূর্ববর্তী বর্বর পাপিষ্ঠদের ন্যায় একই জবাব দিল। তারা নবীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতঃ আল্লাহ্র নবীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলল ঃ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

আপনার নামায কি আপনাকে শিখায় যে, আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দেই, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যার পূজা করে আসছে। আর আমাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করার

অধিকারী না থাকি? কোন্‌টা হালাল কোন্‌টা হারাম তা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে করে সব কাজ করতে হবে?

হযরত শোয়েব (আঃ) সম্পর্কে সারাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি অধিকাংশ সময় নামায ও নফল এবাদতে মগ্ন থাকেন। তাই তারা তাঁর মূল্যবান নীতি বাক্যসমূহকে বিদ্রূপ করে বলতো– আপনার নামায কি আপনাকে এসব আবোল–তাবোল কথাবার্তা শিক্ষা দিচ্ছে?

ওদের এসব মন্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, এরা ধর্মকে শুধু কতিপয় আচার–আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করতো। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মকে কোন দখল দিত না। তারা মনে করত, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধন–সম্পদ যেমন খুশী ভোগ দখল করতে পারে, এ ক্ষেত্রে কোন বিধি–নিষেধ আরোপ করা ধর্মের কাজ নয়। যেমন, বর্তমান যুগেও কোন কোন অবুঝ লোকের মধ্যে এহেন চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়।

অকৃত্রিম দরদ, নিঃস্বার্থ কল্যাণকামিতা ও সদুপদেশের জবাবে কওমের লোকেরা কতবড় রূঢ় মন্তব্য করল! কিন্তু হযরত শোয়ায়েব (আঃ)–এর চরিত্রে ছিল নবীসুলভ সহনশীলতা। তাই উপহাস–পরিহাসের পরেও তিনি দরদের সাথে তাদেরকে সম্বোধন করে বোঝাতে লাগলেনঃ

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا

হে আমার জাতি! তোমরা বলতো, যদি আমার প্রভুর পক্ষ হতে আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য আমার কাছে থাকে এবং আল্লাহ্ তাআলা যদি আমাকে সর্বাধিক উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, অর্থাৎ, দেহের জন্য প্রয়োজনীয় বাহ্যিক রিযিকও দান করেছেন অধিকন্তু বুদ্ধি–বিবেচনা তথা নবুওয়তের দুর্লভ মর্যাদাও দান করেছেন, এতদসত্ত্বেও কি আমি তোমাদের মত অন্যায় ও গোমরাহীর পথ অবলম্বন করব এবং সত্যের বাণী তোমাদেরকে পৌঁছাব না?

অতঃপর তিনি আরো বললেন –

وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ

তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি যে কাজ হতে তোমাদেরকে বাধা দেই, নিজেও তার কাছে কখনো যাই না। আমি যদি তোমাদেরকে নিষেধ করে নিজে সে কাজ করতাম তাহলে তোমাদের কথা বলার অবকাশ ছিল।

এতদ্দ্বারা বোঝা গেল যে, ওয়াজ নসিহত ও তবলীগকারীর কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা অপরিহার্য। অন্যথায় তার কথায় শ্রোতাদের কোন ফায়দা হয় না।

অতঃপর বলেন– اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

"আমার আপ্রাণ চেষ্টা এবং বার বার বোঝাবার একমাত্র উদ্দেশ্য তোমাদেরকে যথাসাধ্য সংশোধন করা। অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। আর চেষ্টা–সাধনাও নিজ বাহু বলে নয় বরং —

وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

"আমি যা কিছু করছি তা আল্লাহ্‌র মদদেই করছি। অন্যথায় আমার চেষ্টা করারও সাধ্য ছিল না। তাঁর উপরই আমি ভরসা রাখি এবং সর্বকাজে সর্বাবস্থায় তাঁরই প্রতি রুজু হই।"

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ
قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ
بِبَعِيْدٍ ۝٨٩ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ
وَّدُوْدٌ ۝٩٠ قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا
لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ؗ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا
بِعَزِيْزٍ ۝٩١ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ
اتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۝٩٢
وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ
مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّيْ
مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ۝٩٣ وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ
فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝٩٤ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا
بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ۝٩٥ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى
بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝٩٦ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ
فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۝٩٧

(৮৯) আর হে আমার জতি ! আমার সাথে জিদ করে তোমরা নূহ বা হুদ অথবা সালেহ (আঃ)–এর কওমের মত নিজেদের উপর আযাব ডেকে আনবে না। আর লূতের জাতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়। (৯০) আর তোমাদের পালনকর্তার কাছে মার্জনা চাও এবং তাঁরই পানে ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগার খুবই মেহেরবান অতিস্নেহময়। (৯১) তারা বলল— হে শোয়ায়েব (আঃ), আপনি যা বলেছেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝি নাই, আমরা তো আপনাকে আমাদের মধ্যে দূর্বল ব্যক্তিরূপে মনে করি। আপনার ভাই–বন্ধুরা না থাকলে আমরা আপনাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি নন ! (৯২) শোয়ায়েব (আঃ) বলেন— হে আমার জাতি, আমার ভাই–বন্ধুরা কি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র চেয়ে প্রভাবশালী ? আর তোমরা তাকে বিস্মৃত হয়ে পেছনে ফেলে রেখেছ, নিশ্চয় তোমাদের কার্যকলাপ আমার পালনকর্তার আয়ত্তে রয়েছে। (৯৩) আর হে আমার জাতি, তোমরা নিজ স্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি, অচিরেই জানতে পারবে কার উপর অপমানকর আযাব আসে আর কে মিথ্যাবাদী ? আর তোমরাও অপেক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। (৯৪) আর আমার হুকুম যখন এল, আমি শোয়ায়েব (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে রক্ষা করি আর পাপিষ্ঠদের উপর বিকট গর্জন পতিত হলো। ফলে ভোর না হতেই তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৯৫) যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করে নাই। জেনে রাখ, সামূদের প্রতি অভিসম্পাতের মত মাদইয়ানবাসীর উপরেও অভিসম্পাত। (৯৬) আর আমি মূসা (আঃ)–কে প্রেরণ করি আমার নিদর্শনাদি ও সুস্পষ্ট সনদসহ (৯৭) ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে, তবুও তারা ফেরাউনের হুকুমে চলতে থাকে, অথচ ফেরাউনের কোন কথা ন্যায়–সঙ্গত ছিলনা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নসীহত ও উপদেশ দানের পরে তিনি পুনরায় তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে সতর্ক করে বললেন–

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ
نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ

হে আমার কওম, সাবধান ! আমার সাথে বিদ্বেষ ও জিদ করে তোমরা নিজেদের উপর কওমে নূহ অথবা কওমে হুদ কিংবা সালেহ (আঃ)–এর কওমের মত বিপদ ডেকে আনবে না। আর লূত (আঃ)–এর জাতি ও তাদের শোচনীয় পরিণত তো তোমাদের থেকে খুব দূরেও নয়। অর্থাৎ, কওমে লূতের উল্টিয়ে দেয়া জনপদগুলি মাদইয়ান শহরের অদূরেই অবস্থিত। তাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনা তোমাদের সময় থেকে খুব আগের কোন ব্যাপার নয়। অতএব, উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং হঠকারিতা পরিত্যাগ কর।

কওমের লোকেরা একথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগল— "আপনার গোষ্ঠী–জ্ঞাতির কারণে আমরা এতদিন আপনাকে কিছু বলিনি। নতুবা অনেক আগেই প্রস্তর আঘাতে আপনাকে হত্যা করে ফেলতাম।"

এরপরে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে নসীহত করে বললেন— "তোমরা আমার আত্মীয়–স্বজনকে ভয় কর, সম্মান কর, অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তাআলাকে ভয় কর না।"

শেষ পর্যন্ত কওমের লোকেরা যখন হযরত শোয়ায়েব (আঃ)–এর কোন কথা মানল না, তখন তিনি বললেন— 'ঠিক আছে, তোমরা এখন আযাবের অপেক্ষা করতে থাক।' অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুসারে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)–কে এবং তাঁর সঙ্গী–সাথী ঈমানদারগণকে উক্ত জনপদ হতে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন এবং হযরত জিব্রাঈল (আঃ)–এর এক ভয়ঙ্কর হাঁকে অবশিষ্ট সবাই এক নিমেষে ধ্বংস হল।

আহকাম ও মাসায়েল

মাপে কম দেয়া ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে মাদইয়ানবাসী ধ্বংসে হওয়ার অন্যতম কারণ নির্দেশ করা হয়েছে মাপে কম দেয়াকে, আরবীতে যাকে 'ততফীফ' বলা হয়। কোরআন করীমের— وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ 'আয়াতে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ওলামায়ে উম্মতের 'এজমা' বা সর্ব–সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহা সম্পূর্ণ হারাম। ইমাম মালেক (রহঃ) তদীয় 'মোয়াত্তা' কিতাবে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)–এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, ওজনে–পরিমাপে কম দেয়ার কথা বলে, আসলে বোঝান হয়েছে– কারো কোন ন্যায্য পাওনা পুরোপুরি না দিয়ে কম দেয়া; তা ওজন ও পরিমাপ করার বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু হোক। কোন বেতনভোগী কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে গড়িমসি করে, কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কম সময় কাজ করে, কোন শিক্ষক যদি যত্ন সহকারে শিক্ষাদান না করে অথবা কোন নামাযী ব্যক্তি যদি নামাযের সুন্নতগুলি পালনে অবহেলা করে তবে তারাও উক্ত তাতফীফের অপরাধীদের তালিকাভুক্ত হবে।—(নাউজুবিল্লাহি মিনহু)

يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ
الْمَوْرُوْدُ ﴿٩٨﴾ وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۖ بِئْسَ
الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ﴿٩٩﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا
قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ﴿١٠٠﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ
اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ
شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿١٠١﴾ وَكَذٰلِكَ
اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۖ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ
شَدِيْدٌ ﴿١٠٢﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۖ
ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا
نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا
بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ﴿١٠٥﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي
النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ﴿١٠٦﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ
السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۗ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا
يُرِيْدُ ﴿١٠٧﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ
السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۗ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ﴿١٠٨﴾

(৯৮) কেয়ামতের দিন সে তার জাতির লোকদের আগে আগে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পৌঁছে দিবে, আর সেটা অতীব নিকৃষ্ট স্থান, যেখানে তারা পৌঁছেছে। (৯৯) আর এ জগতেও তাদের পেছনে লানত রয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও; অত্যন্ত জঘন্য প্রতিফল, যা তারা পেয়েছে। (১০০) এ হচ্ছে কয়েকটি জনপদের সামান্য ইতিবৃত্ত, যা আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। তন্মধ্যে কোন কোনটি এখনও বর্তমান আছে আর কোন কোনটির শিকড় কেটে দেয়া হয়েছে। (১০১) আমি কিন্তু তাদের প্রতি জুলুম করি নাই বরং তারা নিজেরাই নিজের উপর অবিচার করেছে। ফলে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা যেসব মাবুদকে ডাকতো আপনার পালনকর্তার হুকুম যখন এসে পড়ল, তখন কেউ কোন কাজে আসল না। তারা শুধু বিপর্যয়ই বৃদ্ধি করল। (১০২) আর তোমার পরওয়ারদেগার যখন কোন পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই মারাত্মক, বড়ই কঠোর। (১০৩) নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন প্রতিটি মানুষের জন্য যে আখেরাতের আযাবকে ভয় করে। উহা এমন একদিন, যেদিন সব মানুষেই সমবেত হবে, সেদিনটি যে হাযিরের দিন। (১০৪) আর আমি যে উহা বিলম্বিত করি, তা শুধু একটি ওয়াদার কারণে যা নির্ধারিত রয়েছে। (১০৫) যেদিন তা আসবে সেদিন আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। অতঃপর কিছু লোক হবে হতভাগ্য, আর কিছু লোক সৌবাগ্যবান। (১০৬) অতএব যারা হতভাগ্য তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। (১০৭) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদেগার যা ইচ্ছা করতে পারেন। (১০৮) আর যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতের মাঝে, সেখানেই চিরদিন থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রভু অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়।

মাসআলা ঃ তফসীরে কুরতুবীতে আছে যে, মাদইয়ানবাসীর আরেকটি দুষ্কর্ম ছিল যে, তারা প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার পার্শ্ব হতে স্বর্ণ-রৌপ্য কেটে রেখে সেগুলো বাজারে চালিয়ে দিত। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করেছিলেন।

হাদীস শরীফে আছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) মুসলিম রাষ্ট্রের মুদ্রা ভগ্ন করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কোরআন পাকের ১৯ পারা, সূরাহ্ নমল ৪৮ নং আয়াত تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামুল মোফাসেরীন হযরত জায়েদ ইবনে আসলাম বলেন—মাদইয়ানবাসীরা দীনার ও দিরহাম কেটে তা থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য আত্মসাৎ করতো। যাকে কোরআন করীমের ভাষায় মারাত্মক দুষ্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিযের (রহঃ) খেলাফত কালে এক ব্যক্তিকে দিরহাম কর্তনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। খলিফা তাকে দোর্রা মারা ও মস্তক মুন্ডন করে শহরে প্রদক্ষিণ করাবার নির্দেশ দিলেন।—(তফসীরেকুরতুবী

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হুদে হযরত নূহ (আঃ) থেকে হযরত মূসা (আঃ) পর্যন্ত বিশিষ্ট নবীগণ ও তাঁদের জাতিসমূহের ঘটনাবলী এক বিশেষ বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে বিবৃত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বহু উপদেশ, হেকমত, আহকাম ও হেদায়েত বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উক্ত ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য রসূলে করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে সমগ্র উম্মতে-মুহাম্মদীকে আহ্বান জানান হয়েছে। এরশাদ হয়েছে—

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ

অর্থাৎ, এটা পূর্ববর্তী যুগে কতিপয় শহর ও জনপদের কাহিনী, আমি আপনার সামনে তুলে ধরছি, যার উপর আল্লাহ্‌র আযাব আপতিত হয়েছে। তন্মধ্যে কোন কোন শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। আর কোন কোন জনপদকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, যেমন ক্ষেতের ফসল কর্তন করে তাকে সমান করার পর পূর্ববর্তী ফসলের কোন চিহ্ন থাকে না।

অতঃপর বলেন যে, আমি তাদের উপর কোন জুলুম করি নাই, বরং তারাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে। কেননা, তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা প্রভুকে পরিত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া, হাতে তৈরী মূর্তিকে বা অন্য কিছুকে মা'বুদ সাব্যস্ত করেছে। যার ফলে আল্লাহ্‌র আযাব যখন নেমে এল, তখন ঐসব কাল্পনিক মা'বুদেরা তাদের কোন সাহায্য করতে পারল না। আর আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন জনপদবাসীকে আযাবের সাথে পাকড়াও করেন, তখন অত্যন্ত শক্ত ও নির্মমভাবে পাকাড়ও করেন।' তখন আত্মরক্ষার জন্য কারো কোন গত্যন্তর থাকে না।

অতঃপর সবাইকে আখেরাতের চিন্তায় মশগুল করার জন্য এরশাদ করেন যে, এসব ঘটনাবলীর মধ্যে ঐসব লোকের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনাবলী রয়েছে, যারা পরকালের আযাবকে ভয় করে। যেদিন সমগ্র মানবজাতি একই ময়দানে সমবেত হবে, সেদিনটি এতই ভয়াবহ যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারবেন না।

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ۚ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا
يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ
مَنْقُوْصٍ ﴿۱۰۹﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَ
لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ
شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿۱۱۰﴾ وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ؕ
اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۱۱﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ
مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۱۲﴾ وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ
اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۱۱۳﴾ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا
مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى
لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿۱۱۴﴾ وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۱۵﴾ فَلَوْلَا
كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ
الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿۱۱۶﴾ وَمَا
كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿۱۱۷﴾

(১০৯) অতএব, তারা যেসবের উপাসনা করে তুমি সে ব্যাপারে কোনরূপ ধোঁকায় পড়বে না। তাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারা যেমন পূজা উপাসনা করত, এরাও তেমন করছে। আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে আযাবের ভাগ কিছু মাত্র কম না করেই পুরোপুরি দান করবো। (১১০) আর আমি মূসা (আঃ)-কে অবশ্যই কিতাব দিয়েছিলাম অতঃপর তাতে বিরোধ সৃষ্টি হল; বলাবাহুল্য তোমার পালনকর্তার পক্ষ হতে, একটি কথা যদি আগেই বলা না হত, তাহলে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত। তারা এ ব্যাপারে এমনই সন্দেহপ্রবণ যে, কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছে না। (১১১) আর যত লোকই হোক না কেন, যখন সময় হবে, তোমার প্রভু তাদের সকলেরই আমলের প্রতিদান পুরোপুরি দান করবেন। নিশ্চয় তিনি তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের খবর রাখেন। (১১২) অতএব, তুমি এবং তোমার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলে যাও— যেমন তোমায় হুকুম দেয়া হয়েছে এবং সীমা লঙ্ঘন করবে না, তোমরা যা কিছু করছ, নিশ্চয় তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। (১১৩) আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে। আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নাই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না। (১১৪) আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতেরও প্রান্তভাগে; পূণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক। (১১৫) আর ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। (১১৬) কাজেই, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলির মধ্যে এমন সৎকর্মশীল কেন রইল না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত; তবে মুষ্টিমেয় লোক ছিল যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছি। আর পাপিষ্ঠরা তো ভোগবিলাসে মত্ত ছিল—যার সামগ্রী তাদেরকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছিল। আসলে তারা ছিল মহা অপরাধী। (১১৭) আর তোমার পালনকর্তা এমন নন যে জনবসতিগুলোকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন, সেখানকার লোকেরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

অতঃপর রসূলে করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে পুনরায় এরশাদ করেছেন—

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

অর্থাৎ, আপনি দ্বীনের পথে দৃঢ়ভাবে সোজা চলতে থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর যারা কুফরী হতে তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে, তারাও সোজা পথে চলুক এবং আল্লাহ্ তাআলার নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে না। কেননা, তিনি তোমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছেন।

ইস্তেকামতের তাৎপর্য, উপকারিতা ও মাসায়েল ঃ 'ইস্তেকামতে'র আসল অর্থ হচ্ছে, কোনদিক একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা। বস্তুতঃ এ কোন সহজ কাজ নয়। কোন লৌহদন্ড বা পাথরের থাম একজন সুদক্ষ প্রকৌশলী হয়ত এমনভাবে দাঁড় করাতে পারে, কিন্তু কোন প্রাণীর পক্ষে সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকা কত দুষ্কর তা কোন সাধারণ বোধসম্পন্ন ব্যক্তির অজানা নয়।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ও সকল মুসলমানকে তাদের সর্বকার্যে সর্বাবস্থায় ইস্তেকামত অবলম্বন করার জন্য অত্র আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

'ইস্তেকামত' শব্দটি ছোট হলেও এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা, সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে— আকায়েদ, এবাদত, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ উপার্জন ও ব্যয় তথা নীতি-নৈতিকতার যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে তাঁরই নির্দেশিত সোজা পথে চলা। তন্মধ্যে কোন ক্ষেত্রে, কোন কার্যে এবং পরিস্থিতিতে গড়িমসি করা, বাড়াবাড়ি করা অথবা ডানে বামে ঝুঁকে পড়া ইস্তেকামতের পরিপন্থী।

দুনিয়ার যত গোমরাহী ও পাপাচার দেখা যায়, তা সবই ইস্তেকামত হতে সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। আকায়েদ অর্থাৎ, ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইস্তেকামত না থাকলে, মানুষ বেদ'আত হতে শুরু করে কুফরী ও শেরেকী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তাআলার তওহীদ, তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) যে সুষ্ঠু ও সঠিক মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্ধন পরিবর্জনকারী পথভ্রষ্টরূপে আখ্যায়িত হবে, তা তার নিয়ত যতই ভাল হোক না কেন। অনুরূপভাবে নবী ও রসূল (আঃ)-গণের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার যে সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে, সে ব্যাপারে ত্রুটি করা স্পষ্ট ধৃষ্টতা ও পথভ্রষ্টতা।

তেমনি কোন রসূলকে খোদায়ী গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিক বানিয়ে দেয়াও চরম পথভ্রষ্টতা। ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা এহেন বাড়াবাড়ির কারণেই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছে। এবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করার জন্য কোরআনে আযীম ও রসূলে করীম (সাঃ) যে পথনির্দেশ করেছেন, তার মধ্যে কোনরূপ কমতি বা গাফলতি মানুষকে যেমন ইস্তেকামতের আদর্শ হতে বিচ্যুত করে, অনুরূপভাবে তার মধ্যে নিজের পক্ষ হতে কোন বাড়াবাড়ি বা পরিবর্ধনও মানুষকে বেদ'আতে লিপ্ত করে। সে কল্পনাবিলাসে বিভোর থাকে যে, আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিল করছি, অথচ সে ক্রমানুয়ে আল্লাহ্ তাআলার বিরাগভাজন হতে থাকে। এজন্যই হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) স্বীয় উম্মতকে বেদ'আত ও নিত্য নতুন

সৃষ্ট প্রথা হতে অত্যন্ত জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন এবং বেদ'আতকে চরম গোমরাহী বলে অভিহিত করেছেন। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে, যখন কোন কার্য সে আল্লাহ্ ও রসূল (সাঃ)-এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবাদত হিসাবে করতে চায়, তখন কাজ করার আগে পূর্ণ তাহকীক করে জানতে হবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উক্ত কার্য ঐভাবে করেছেন কি না? যদি না করে থাকেন, তবে উক্ত কাজে নিজের শক্তি ও সময়ের অপচয় করবে না।

অনুরূপভাবে আদান-প্রদান, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন করীমে নির্দেশিত মূলনীতিগুলিকে রসূলে করীম (সাঃ) বাস্তবে রূপায়িত করে একটা সুষ্ঠু সঠিক মধ্যপন্থার পত্তন করেছেন। যার মধ্যে বন্ধুত্ব, শত্রুতা, ক্রোধ, ধৈর্য, মিতব্যয় ও দানশীলতা, জীবিকা উপার্জন, বৈরাগ্য সাধনা, আল্লাহ্র উপর নির্ভরতা, সম্ভাব্য চেষ্টা-তদ্বির করা, আবশ্যকীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহের প্রতি তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে এক নজীরবিহীন মধ্যপন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন। তা পুরোপুরি অবলম্বন করেই মানুষ সত্যিকার মানুষ হতে পারে। তা থেকে বিচ্যুত হলেই সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সারকথা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে দ্বীনের অনুশাসন মেনে চলাই ইস্তেকামতের তফসীর।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফী (রাঃ) রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) সমীপে আরজ করলেন, "ইয়া রসূলল্লাহ্ (সাঃ)! ইসলাম সম্পর্কে আপনি আমাকে এমন একটি ব্যাপক শিক্ষা দান করুন যেন আপনার পরে আমার কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়।" তিনি বললেন— قل أمنت بالله ثم استقم অর্থাৎ, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন, অতঃপর ইস্তেকামত অবলম্বন কর।—(মুসলিম শরীফ ও তফসীরে কুরতুবী)

ওসমান ইবনে হাযের আযদী বলেন— একবার আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম যে, "আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন। তদুত্তরে তিনি বললেন عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع অর্থাৎ — তাকওয়া বা খোদাভীতি ও ইস্তেকামত অবলম্বন কর, যার পন্থা হচ্ছে ধর্মীয় ব্যাপারে শরিয়তের অনুশাসন হুবহু মেনে চল, নিজের পক্ষ হতে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে যেয়ো না।—(দারেমী ও কুরতুবী)

এ দুনিয়ায় ইস্তেকামতই সবচেয়ে দুষ্কর কার্য। এজন্যই বুযুর্গানেদ্বীন বলেন যে, কারামতের চেয়ে ইস্তেকামতের মর্যাদা উর্ধ্বে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সর্বকার্যে ইস্তেকামত অবলম্বন করে, যদি জীবনভর তাঁর দ্বারা কোন অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত না হয়, তথাপি ওলীগণের মধ্যে তাঁর মর্যাদা সবার উর্ধ্বে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন— "পূর্ণ কোরআন পাকের মধ্যে অত্র আয়াতের চেয়ে কঠিন ও কষ্টকর কোন হুকুম রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর উপর নাযিল হয় নাই।" তিনি আরো বলেন—একবার সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাড়ি মোবারকের কয়েক গাছি পেকে গেছে দেখতে পেলেন, তখন আফসোস করে বললেন, আপনার দিকে দ্রুত গতিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসছে। তদুত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন—"সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে।" সূরা হুদে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির উপর কঠোর আযাবের ঘটনাবলীও এর কারণ হতে পারে। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন— 'ইস্তেকামতের' নির্দেশই ছিল বার্ধক্যের কারণ।

তফসীরে কুরতুবীতে হযরত আবু আলী সিরী হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি স্বপ্নে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জেয়ারত লাভ করে জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ), আপনি কি একথা বলেছেন যে, "সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে?" তিনি বললেন "হাঁ"। পুনরায় প্রশ্ন করলেন—উক্ত সূরায় বর্ণিত নবী (আঃ)-গণের কাহিনী ও তাঁদের কওমসমূহের উপর আযাবের ঘটনাবলী কি আপনাকে বৃদ্ধ করেছে? তিনি জবাব দিলেন—"না"। বরং فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ "ইস্তেকামত অবলম্বন কর যেমন তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" এ আয়াতই আমাকে বৃদ্ধ করেছে।

একথা স্পষ্ট যে, রসূলে করীম (সাঃ) পরিপূর্ণ মানুষের বাস্তব নমুনারূপে এ জগতে শুভাগমন করেছিলেন। ইস্তেকামতের উপর সুদৃঢ় থাকা ছিল তাঁর জন্মগত স্বভাব। তথাপি অত্র নির্দেশকে এতদূর গুরুভার মনে করার কারণ এই যে, অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে শুধু সোজা পথে দৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং كَمَا أُمِرْتَ "যেভাবে আপনাকে আদেশ করা হয়েছে" বলে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা হয়েছে। নবী ও রসূল (আঃ)-গণের অন্তরে অপরিসীম খোদাভীতি প্রবল প্রভাবের কথা কারো অজানা নয়। তাই পূর্ণ ইস্তেকামতের উপর কায়েম থাকা সত্ত্বেও রসূলে পাক (সাঃ) সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা যেরূপ ইস্তেকামতের নির্দেশ দিয়েছেন, তা পুরোপুরি আদায় করা হচ্ছে কি না?

আরেকটি কারণ হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের ইস্তেকামতের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। কেননা, আল্লাহ্র ফজলে তা পূর্ণ মাত্রায় হাসিল ছিল। কিন্তু উক্ত আয়াতে সমগ্র উম্মতকে সোজা পথে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ উম্মতের জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) অতীব চিন্তিত ও শঙ্কিত ছিলেন।

ইস্তেকামতের আদেশ দানের পর বলেন وَلَا تَطْغَوْا 'সীমালঙ্ঘন করো না। এটা طغيان শব্দ হতে গৃহীত। যার অর্থ সীমা অতিক্রম করা। এখানে সোজা পথে দৃঢ় থাকার আদেশ দান করেই শুধু ক্ষান্ত করা হয় নাই। বরং তার নেতিবাচক দিকটিও স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে যে, আকায়েদ, এবাদত, লেন-দেন ও নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা ও তদীয় রসূল (সাঃ)-এর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করো না। কেননা, এটাই পার্থিব ও ধর্মীয় সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় ও ফাসাদের মূল কারণ।

১১৩ নং আয়াতে মানুষকে ক্ষতি ও ধ্বংসে হতে থেকে রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে — وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ অর্থাৎ, "ঐসব পাপিষ্ঠদের দিকে একটুও ঝুঁকবে না, তাহলে কিন্তু তাদের সাথে সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে।" "লা-তারকানু" শব্দের মূল হচ্ছে ركون যার অর্থ "কোন দিকে সামান্যতম ঝোঁকা বা আকৃষ্ট হওয়া এবং তার প্রতি আস্থা বা সম্মতি জ্ঞাপন করা।" সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, পাপ-পঙ্কিলতায় লিপ্ত হওয়াকে তো সবাই ইহকাল ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর বলে বিশ্বাস করেই; অধিকন্তু পাপিষ্ঠদের প্রতি সামান্যতম ঝুঁকে পড়া, আকৃষ্ট হওয়া, আস্থা বা মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করাও সমান ক্ষতিকর।

এই ঝোঁকা ও আকর্ষণের অর্থ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের কয়েকটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নেই। বরং প্রত্যেকটি উক্তিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শুদ্ধ ও সঠিক।

"পাপিষ্ঠদের প্রতি মোটেই ঝুঁকবে না" এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন— "পাপিষ্ঠদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না, তাদের কথামত চলবে না।" হযরত ইবনে জোরাইজ বলেন—"পাপিষ্ঠদের প্রতি আদৌ আকৃষ্ট হবে না। হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন— "তাদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তা পছন্দ করো না।''—(কুরতুবী) 'সুদ্দী' (রঃ) বলেন—''তাদের অন্যায় কার্যে সম্মতি প্রকাশ বা নীরবতা অবলম্বন করবে না।" ইকরিমা (রাঃ) বলেন—তাদের সংসর্গে থাকবে না। কাযী 'বায়জাবী' (রঃ) বলেন—"বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে, লেবাস-পোশাকে, চাল-চলনে তাদের অনুকরণও অত্র নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।"

কাযী বায়জাবী (রাঃ) আরো বলেন—পাপাচার অনাচারকে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করার জন্য এখানে এমন কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যার চেয়ে অধিকতর জোরালো ভাষা কল্পনা করা যায় না। কেননা, পাপিষ্ঠদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ককেই শুধু নিষেধ করা হয়নি বরং তাদের প্রতি সামান্যতম আকৃষ্ট হওয়া, তাদের কাছে উপবেশন করা, তাদের কার্যকলাপের প্রতি মৌনতা অবলম্বনও নিষেধ করা হয়েছে।

ইমাম আওযায়ী (রাঃ) বলেন—সমগ্র জগতে ঐ আলেমই আল্লাহ্ তাআলার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়—যে নিজের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়।—(তফসীরে মাযহারী)

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা যায়—কাফের মুশরিক, বেদআতী ও পাপিষ্ঠদের সংসর্গ হতে দূরে থাকা একান্ত কর্তব্য। বস্তুতঃ মানুষের ভাল-মন্দ হওয়ার মধ্যে সংসর্গ ও পরিবেশের প্রভাবই সর্বাধিক। তবে একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজনবশতঃ অনন্যোপায় হয়ে তাদের কাছে যাওয়া জায়েয।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের দু'টি শব্দ সম্পর্কে বলেন—আল্লাহ্ তাআলা সম্পূর্ণ দ্বীনকে দুটি لا হরফের মাঝে জমা করে দিয়েছেন। এক وَلَا تَطْغَوْا সীমালঙ্ঘন করবে না, দ্বিতীয়- وَلَا تَرْكَنُوْا পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। প্রথম আয়াতে শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে খারাপ লোকদের সংস্পর্শে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এটাই সমস্ত দ্বীনদারীর সার সংক্ষেপ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রসূলে পাক (সাঃ)-এর মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত ঃ সূরা হূদে পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাঁদের জাতিসমূহের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর নবীয়ে-করীম (সাঃ) ও উম্মতে মুহাম্মদীকে কতিপয় হেদায়েত দেয়া হয়েছে। পূর্বোল্লেখিত فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ আয়াত হতে যার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে।

কোরআন পাকের অপূর্ব বাচনভঙ্গি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। এখানে যেসব আদেশ প্রদান করা হয়েছে, তাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে এবং উম্মতকে পরোক্ষভাবে উক্ত হুকুমের আওতায় আনা হয়েছে। যেমন— فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ "আপনি সোজা পথে দৃঢ় থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং যারা তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে তারাও সোজাপথে চলতে থাকবে।" (১১২ নং আয়াত) ১১৪ নং আয়াতে وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ "আপনি নামায কায়েম রাখুন।" ১১৫ তম আয়াতে وَاصْبِرْ 'আপনি ধৈর্যধারণ করুন' ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যেসব কাজে নিষেধ করা হয়েছে এবং তা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে সরাসরি উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন ১১২তম আয়াতে وَلَا تَطْغَوْا "আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে না" ১১৩ নং আয়াতে وَلَا تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ''এবং তোমরা পাপীদের প্রতি ঝুঁকবে না" বলা হয়েছে।

অনুসন্ধান করলে সমগ্র কোরআন মজীদে সাধারণতঃ একই বাচনভঙ্গি পরিলক্ষিত হবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদেশ করা হয়েছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে এবং নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে উম্মতের প্রতি সম্বোধন করে। যার মাধ্যমে রসূলে করীম (সাঃ)-এর মাহাত্ম্য ও উচ্চমর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে যে, নিন্দনীয় যত কাজ আছে, রসূলে পাক (সাঃ) নিজেই তা বর্জন করে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলাই তাঁকে এমন স্বভাব-প্রকৃতি দান করেছেন যে, কোন নিন্দনীয় প্রবৃত্তি বা পাপকার্যের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ হয় না। এমনকি ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেসব জিনিস জায়েয ও হালাল ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়া আল্লাহ্ তাআলার জানা ছিল; রসূলে পাক (সাঃ) জীবনে কখনো সেগুলোর কাছেও যান নি। যেমন মদ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি।

১১৪তম আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে তাঁকে ও তাঁর সমস্ত উম্মতকে নামায কায়েম রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ওলামায়ে-তফসীর, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ একমত যে, আলোচ্য আয়াতে সালাত অর্থ ফরয নামায, (বাহরে মুহীত ও তফসীরে কুরতুবী) এবং একামতে সালাত অর্থ পূর্ণ পাবন্দীর সাথে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করা। কোন কোন আলেমের মতে নামায কায়েম করার অর্থ সমুদয় সুন্নত ও মুস্তাহাবসহ নামায আদায় করা। কারো মতে এর অর্থ মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামায পড়া وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ এর তফসীর প্রসঙ্গে উপরোক্ত তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। মূলতঃ এটা কোন মতানৈক্য নয়। বস্তুতঃ আলোচ্য সবগুলোই একামতে সালাতের সঠিক মর্মার্থ।

নামায কায়েম করার নির্দেশ দানের পর সংক্ষিপ্তভাবে নামাযের ওয়াক্ত বর্ণনা করেছেন যে, "দিনের দু'প্রান্তে অর্থাৎ, শুরুতে ও শেষভাগে এবং রাতেরও কিছু অংশে নামায কায়েম করবে।" দিনের দু'প্রান্তের নামাযের মধ্যে প্রথমভাগের নামায সম্পর্কে সবাই একমত যে, সেটি ফজরের নামায। কিন্তু শেষ প্রান্তের নামায সম্পর্কে কেউ বলেন-তা মাগরিবের নামায। কেননা, দিন সম্পূর্ণ শেষ হওয়া মাত্র মাগরিবের নামায পড়া হয়। কেউ কেউ আসরের নামাযকেই দিনের শেষ নামায সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এটিই দিনের সর্বশেষ নামায। মাগরিবের ওয়াক্ত দিনের অংশ নয়, বরং দিন সমাপ্ত হওয়ার পর রাতের প্রথম প্রান্তে মাগরিবের নামায পড়া হয়। زُلَفًا শব্দ বহুবচন, তার একবচন زُلْفَة যার অর্থ হচ্ছে অংশ বা টুকরা। وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ অর্থাৎ, রাতের কিছু অংশের নামায সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, কাতাদা, যাহ্হাক প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরকারের অভিমত হচ্ছে যে, সেটি মাগরিব ও এশার নামায। হাদীসেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়, যাতে এরশাদ হয়েছে

যে, وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ মাগরিব ও এশার নামায। তফসীরে ইবনে কাসীর অনুসারে طَرَفَيِ النَّهَارِ অর্থ, ফজর ও আছরের নামায এবং وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ অর্থ মাগরিব ও এশার নামায। অতএব অত্র আয়াতে চার ওয়াক্ত নামাযের বর্ণনা পাওয়া গেল। অবশিষ্ট রইল জোহরের নামায। তার ওয়াক্ত সম্পর্কে কোরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ "নামায কায়েম কর, যখন সূর্য ঢলে পড়ে।"

আলোচ্য আয়াতে নামায কায়েম করার নির্দেশ দানের সাথে সাথে তার উপকারিতাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে— إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ অর্থাৎ, পুণ্যকার্য অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়।' শ্রদ্ধেয় তফসীরকারগণের মতে এখানে পুণ্যকার্য বলতে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, সদকাহ, সদ্ব্যবহার, উত্তম লেন-দেন প্রভৃতি যাবতীয় পুণ্যকার্য বোঝান হয়েছে। তবে তন্মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাগ্রগণ্য। অনুরূপভাবে পাপকার্যের মধ্যে সগীরা ও কবীরা যাবতীয় গোনাহ শামিল রয়েছে। কিন্তু কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াত এবং রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, এখানে পাপকার্য দ্বারা সগীরা গোনাহ বোঝান হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হচ্ছে, যাবতীয় নেক কাজ, বিশেষ করে নামায সগীরা গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। কোরআনে করীমে এরশাদ হয়েছে ঃ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ অর্থাৎ, তোমরা যদি বড় (কবীরা) গোনাহসমূহ হতে বিরত থাক যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট (সগীরা) গোনাহগুলি মিটিয়ে দেব।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, পাঞ্জেগানা নামায দ্বারা এক জুম'আ পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত এবং এক রমযান দ্বারা পরবর্তী রমযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী যাবতীয় (সগীরা) গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়া হয়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ হতে বিরত থাকে। অর্থাৎ, কবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না, কিন্তু সগীরা গোনাহ নামায, রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদি পুণ্যকর্ম করার ফলে আপনা-অপনিও মাফ হয়ে যায়। তবে "বাহরে মুহীত" নামক তফসীরে উসূল শাস্ত্রের মোহাক্কেক আলেমগণের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুণ্যকার্যের ফলে সগীরা গোনাহ মাফ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে, ভবিষ্যতে গোনাহ না করার সংকল্প থাকতে হবে এবং একই গোনাহে বার বার লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। অন্যথায় সগীরা গোনাহও মাফ হবে না। হাদীস শরীফের যেসব রেওয়ায়েতে গোনাহ মাফ হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, সেখানে সর্বত্র একই পাপকার্যে বার বার লিপ্ত না হওয়া, স্বীয় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা হতে দূরে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার শর্ত রয়েছে।

হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতসমূহে নিম্নবর্ণিত কাজগুলোকে কবীরা গোনাহ বলা হয়েছে ঃ (১) আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সত্তা অথবা গুণাবলীর মধ্যে অন্য কাউকে অংশীদার বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। (২) শরীয়তসম্মত ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ফরয নামায ছেড়ে দেয়া। (৩) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। (৪) ব্যভিচার করা। (৫) চুরি করা। (৬) মদ্য পান করা। (৭) মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। (৮) মিথ্যা কসম করা। (৯) মিথ্যা সাক্ষী দান করা। (১০) যাদু করা। (১১) সুদ খাওয়া। (১২) অবৈধভাবে এতীমের মাল আত্মসাৎ করা। (১৩) জেহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা। (১৪) সতী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা। (১৫) অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া। (১৬) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। (১৭) আমানতের মাল খেয়ানত করা। (১৮) অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে গালি দেয়া। (১৯) কোন নির পরাধ ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ইত্যাদি। কবীরা ও সগীরা গোনাহসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে উলামায়ে কেরাম অনেক কিতাব প্রণয়ন করেছেন।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে, নেক কাজ করার ফলেও অনেক গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, ''তোমাদের থেকে কোন মন্দ কাজ হলে পরে সাথে সাথে নেক কাজ কর, তাহলে উহার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।" তিনি আরো বলেছেন যে, মানুষের সাথে হাসি-খুশী ব্যবহার কর।—(মুসনাদে আহমদ ও তফসীরে ইবনে-কাসীর)

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সমীপে আরয করলাম যে, "ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ)! আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন।" তদুত্তরে তিনি বললেন—যদি তোমার থেকে কোন গোনাহর কাজ হয়ে যায়, তবে পরক্ষণেই কোন নেক কাজ কর, তাহলে গোনাহ মিটে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে এসব হাদীসে গোনাহ হতে তওবা করার সুন্নত তরীকা ও প্রশংসনীয় পন্থা বাতলে দেয়া হয়েছে। যেমন— মুসনাদে আহমদে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "যদি কোন মুসলমান কোন পাপকার্য করে বসে, তবে অযু করে তার দু'রাকাত নামায পড়া উচিত। তাহলে উক্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।" অত্র নামাযকে তওবার নামায বলে।—(ইবনে-কাসীর)

ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ এখানে ذٰلِكَ অর্থাৎ, "এটি শব্দ দ্বারা কোরআন মজীদের প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে অথবা ইতিপূর্বে বর্ণিত বিধি-নিষেধের প্রতিও ইশারা হতে পারে। সে মতে আয়াতের মর্ম হচ্ছে— এই কোরআন পাক অথবা এতে বর্ণিত হুকুম-আহকামসমূহ ঐসব লোকের জন্য স্মরণীয় হেদায়েত ও নসীহত, যারা উপদেশ শুনতে ও মানতে প্রস্তুত। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জেদী হঠকারী লোক যার নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কোন কথা চিন্তা-বিবেচনা করতে সম্মত নয়, তারা সুপথ হতে বঞ্চিত থাকে।

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ, ''আপনি সবর অবলম্বন করুন, ধৈর্যধারণ করুন, অবিচল থাকুন। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কখনো বিনষ্ট করেন না।"

'সবর' শব্দের আভিধানিক অর্থ বাঁধা, বন্ধন করা। স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখাকেও সবর বলে। সৎকার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ এবং পাপকার্য হতে দমন রাখাও সবরের অন্তর্ভুক্ত। এখানে রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে 'সবর' অবলম্বন ও ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দানের এক উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে আপনাকে ইস্তেকামত ও নামায কায়েম করা ইত্যাদি যেসব হুকুম দেয়া হয়েছে, আপনি তার উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকুন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধাচরণ ও জুলুম-নির্যাতনে ধৈর্যাবলম্বন করুন। অতঃপর এরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয়, আল্লাহ্ তাআলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" এখানে স্পষ্টতঃ 'মুহসিনীন' বা সৎকর্মশীল শব্দ ঐসব লোকের উপর প্রযোজ্য হবে যারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধি-নিষেধের পূর্ণ অনুসারী, অর্থাৎ, ধর্মীয় ব্যাপারে ইস্তেকামতের উপর কায়েম এবং শরীয়তের সীমারেখা পরিপূর্ণ

বজায় রেখে চলেন। পাপিষ্ঠ জালেমদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব বা অহেতুক সম্পর্ক রাখেন না, নামাযকে সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে আদায় করেন এবং শরীয়তের যাবতীয় অনুশাসন দৃঢ়তার সাথে মেনে চলেন।

মোটকথা, মুহসিনীনদের দলভুক্ত হতে হলে এমনভাবে সৎকার্য করতে হবে যা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) 'ইহসান' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য ও এবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি আল্লাহ্কে দেখছ অথবা অন্ততঃ এতটুকু ধারণা করবে যে, আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সত্তা ও মহান গুণাবলী সম্পর্কে যখন কোন ব্যক্তির এ পর্যায়ের প্রত্যয় হাসিল হবে, তখনকার যাবতীয় কার্যকলাপই সুষ্ঠু ও সুন্দর হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্যে তিনটি বাক্য বিশেষ প্রচলিত ছিল, যা তাঁরা প্রায়শঃই একে অপরকে লিখে পাঠাতেন। বাক্য তিনটি স্মরণ রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের কাজে মগ্ন হয়, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তার পার্থিব কাজগুলি অনায়াসলব্ধ এবং সুসম্পন্ন করে দেন। দ্বিতীয় বাক্য হচ্ছে—যে ব্যক্তি তার অন্তরকে ঠিক রাখবে অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুকেই অন্তর হতে বের করে দিয়ে অন্তরকে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার দিকে আকৃষ্ট করবে, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তার বাহ্যিক অবস্থা ভাল করে দেবেন। তৃতীয় বাক্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক ঠিক রাখবে, তার সাথে অন্যান্য সকলের সম্পর্ক আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং ঠিক করে দেবেন। (রূহুল বয়ান, ২য় জিলদ ১৩১ পৃঃ)

১১৬ ও ১১৭তম আয়াতে পূর্ববর্তী জাতিগুলির উপর আযাব নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণনা করে তা থেকে আত্মরক্ষার পথ নির্দেশ করা হয়েছে। এরশাদ করেছেন ঃ 'আফসোস, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে দায়িত্বশীল বিবেকবান কিছু লোক কেন ছিল না, যারা জাতিকে ফাসাদ সৃষ্টি করা হতে বিরত রাখত? তাহলে তো তারা সমূলে ধ্বংস হত না। তবে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছিল, যারা নবী (আঃ)-গণের যথার্থভাবে অনুসরণ করেছে এবং তারাই আযাব হতে নিরাপদ ছিল। অবশিষ্ট লোকেরা পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে অপকর্মে মেতে উঠেছিল।

অত্র আয়াতে সমঝদার বিবেকসম্পন্ন লোকদেরকে أُولُوا بَقِيَّةٍ বলা হয়েছে। بَقِيَّةٍ অবশিষ্ট বস্তুকে বলে। মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তুকে নিজের জন্য সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করতে অভ্যস্ত। প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্য সব জিনিস হাতছাড়া করেও সেটি ধরে রাখার চেষ্টা করে। এ জন্যই বিবেক-বিবেচনা ও দূরদর্শিতাকে بَقِيَّةٍ বলা হয়। কেননা, এটি সর্বাধিক প্রিয় ও মূল্যবান সম্পদ।

১১৭তম আয়াতে এরশাদ করেছেন যে, "আপনার পালনকর্তা জনপদগুলোকে অন্যায়ভাবে নিপাত করেন নাই এমতাবস্থায় যে, তার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল ও আত্ম-সংশোধনরত ছিল।" এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে অন্যায় অবিচারের কোন সম্ভাবনা নাই। যেসব জাতিকে ধ্বংস করা হয়, তারা প্রকৃতপক্ষেই নিপাতযোগ্য, অপরাধী।

কোন কোন তফসীরকারের মতে অত্র আয়াতে ظلم জুলুম অর্থ শেরেকী এবং مُصْلِحُوْنَ অর্থে ঐসব লোক যারা কাফের-মুশরেক হওয়া সত্ত্বেও তাদের লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, নীতি-নৈতিকতা ভাল। যারা মিথ্যা কথা বলে না, ধোকাবাজী করে না, কারো কোন ক্ষতি করে না। সেমতে অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে, শুধু কাফের বা মুশরেক হওয়ায় দুনিয়ায় কোন জাতির উপর খোদায়ী আযাব অবতীর্ণ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের কার্য-কলাপ ও চাল-চলন দ্বারা পৃথিবীতে ফেৎনা-ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি না করে। পূর্ববর্তী যতগুলি জাতি ধ্বংস হয়েছে তাদের বিশেষ বিশেষ অপকর্মই তজ্জন্য দায়ী। হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি তাঁকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট-ক্লেশ দিয়েছিল, হযরত শোয়াইব (আঃ)-এর দেশবাসী ওজনে-পরিমাপে হের-ফের করে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, হযরত লূত (আঃ)-এর কওম জঘন্য যৌন অপকর্মে অভ্যস্ত হয়েছিল, হযরত মূসা ও ঈসা (সাঃ)-এর কওমের লোকেরা নিজেদের নবীগণের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেছিল। তাদের এ সব কার্য-কলাপই দুনিয়ায় তাদের উপর আযাব নযিল হওয়ার মূল কারণ। শুধু কুফরী বা শেরেকীর কারণে দুনিয়ায় আযাব আপতিত হয় না। কেননা, তার শাস্তিতে তো দোযখের আগুনে চিরকাল ভোগ করবেই। এজন্যই কোন কোন আলেমের অভিমত হচ্ছে যে, কুফরী ও শেরেকীতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে রাজত্ব-বাদশাহী করা যেতে পারে, কিন্তু অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত হওয়ার পর তা বজায় থাকতে পারে না।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ
مُخْتَلِفِيْنَ ﴿١١٨﴾ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ
رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١١٩﴾ وَكُلًّا
نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ
فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا
يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ۖ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ﴿١٢١﴾ وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا
مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٢٢﴾ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ
كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٣﴾

سُوْرَةُ يُوْسُفَ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّاِحْدٰى عَشَرَةَ اٰيَةً وَّاثْنَا عَشَرَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿١﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا
لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ
اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ
الْغٰفِلِيْنَ ﴿٣﴾ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ
عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ﴿٤﴾

(১১৮) আর তোমার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই জাতিসত্তায় পরিনত করতে পারতেন আর তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হতো না। (১১৯) তোমার পালনকর্তা যাদের উপর রহমত করেছেন, তারা ব্যতীত সবাই চিরদিন মতভেদ করতেই থাকবে এবং এজন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমার আল্লাহ্‌র কথাই পূর্ণ হল যে, অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দ্বারা একযোগে ভর্তি করব। (১২০) আর আমি রসূলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলছি, যদ্দ্বারা তোমার অন্তরকে মজবুত করছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে। (১২১) আর যারা ঈমান আনে না, তাদেরকে বলে দাও যে, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় কাজ করে যাও আমরাও কাজ করে যাই। (১২২) এবং তোমরাও অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও অপেক্ষায় রইলাম। (১২৩) আর আল্লাহ্‌র কাছেই আছে আসমান ও যমীনের গোপন তথ্য; আর সকল কাজের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে; অতএব, তাঁরই বন্দেগী কর এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখ, আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমার পালনকর্তা কিন্তু বে-খবর নন।

সূরা ইউসুফ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১১১

অসীম মেহেরবান ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) আলিফ-লা-ম-রা; এগুলো সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত। (২) আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৩) আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমতে আমি এ কোরআন তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি। তুমি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (৪) যখন ইউসুফ পিতাকে বলল ঃ পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে। সূর্যকে এবং চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশে সেজদা করতে দেখেছি।

আনুষাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মতবিরোধ ঃ নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় দিক ঃ ১১৮তম আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা যদি ইচ্ছা করেন, তবে সকল মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন। তাহলে সবাই মুসলমান হয়ে যেত, কোন মতভেদ থাকত না। কিন্তু নিগূঢ় রহস্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলা এ দুনিয়াতে কাউকে কোন কাজের জন্য বাধ্য করেন না, বরং তিনি মানুষকে অনেকটা এখতিয়ার দান করেছেন। যার ফলে মানুষ ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য উভয়টাই করতে পারে। মানুষের মন-মানসিকতা বিভিন্ন হওয়ার কারণে তাদের মত ও পথ ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। ফলে সর্বযুগেই কিছু লোক সত্য-ন্যায়ের বিরোধিতা করে আসছে। তবে যাদের উপর আল্লাহ্ তাআলা খাস রহমত করেছেন অর্থাৎ, যারা সত্যিকারভাবে নবীগণের শিক্ষাকে অনুসরণ করেছে, তারা কখনো সত্য-বিচ্যুত হন নাই।

আলোচ্য আয়াতে যে মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা হচ্ছে—নবীগণের শিক্ষা ও সত্য দ্বীনের বিরোধিতা করা। পক্ষান্তরে ওলামায়ে-দ্বীন ও মুজতাহিদ আলেমগণের মধ্যে যে মতভেদ সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে চলে আসছে, তা আদৌ নিন্দনীয় এবং আল্লাহ্‌র রহমতের পরিপন্থী নয়। বরং সেটি একান্ত অবশ্যম্ভাবী, সাধারণ মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহ্‌র রহমতস্বরূপ। অত্র আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে যারা মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহগণের মতভেদকে বিভ্রান্তিকর ও ক্ষতিকর আখ্যা দিয়েছে, তাদের উক্তি অত্র আয়াতের মর্ম এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আমলের পরিপন্থী।

সূরা ইউসুফ

চারটি আয়াত ছাড়া সমগ্র সূরা-ইউসুফ মক্কায় অবতীর্ণ। এ সূরায় হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কাহিনীটি শুধুমাত্র এ সূরাতেই উল্লেখিত হয়েছে। সমগ্র কোরআনে কোথাও এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এটা একমাত্র ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কিত কাহিনীরই বৈশিষ্ট্য। এছাড়া অন্যসব আম্বিয়া (আঃ)-এর কাহিনী ও ঘটনাবলী সমগ্র কোরআনে প্রাসঙ্গিকভাবে খণ্ড খণ্ডভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-ইতিহাস এবং অতীত অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষের ভবিষ্যত জীবনের জন্যে বিরাট শিক্ষা নিহিত থাকে। এসব শিক্ষার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মানুষের মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার চাইতে অধিক গভীর ও অনায়াসলব্ধ হয়। এ কারণেই গোটা মানবজাতির জন্যে সর্বশেষ নির্দেশনামা হিসাবে প্রেরিত কোরআন পাকে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের ইতিহাসের নির্বাচিত অধ্যায়সমূহ সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে, যা মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত সংশোধনের জন্যে অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কিন্তু কোরআন পাক বিশ্ব-ইতিহাসের এসব অধ্যায়কে বিশেষ ও অনুপম রীতিতে এমনভাবে উদ্ধৃত করেছে যে, এর পাঠক অনুভবই করতে পারে না যে, এটি কোন ইতিহাসগ্রন্থ ; বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন কাহিনীর যতটুকু অংশ শিক্ষা ও উপদেশের জন্যে অত্যাবশ্যক সেখানে ঠিক ততটুকু অংশই বিবৃত করা হয়েছে। অতঃপর অন্য কোন ক্ষেত্রে এ অংশের প্রয়োজন অনুভূত হলে পুনর্বার তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণেই এসব কাহিনীর বর্ণনায় ঘটনার সাংঘটনিক ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। কোথাও কাহিনীর প্রথম অংশ পরে এবং শেষ অংশ আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনের এ বিশেষ বর্ণনা রীতিতেই স্বতন্ত্র নির্দেশ এই

যে, জগতের ইতিহাস ও অতীত ঘটনাবলী পরিবেশন করা পবিত্র কোরআনের লক্ষ্য নয়; বরং প্রত্যেক কাহিনী থেকেই কোন না কোন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা আসল লক্ষ্য।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করার একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, ইতিহাস রচনাও একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। এতে ইতিহাস রচয়িতাদের জন্যে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যে, বর্ণনা এমন সংক্ষিপ্ত না হয় যাতে পূর্ণ বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বর্ণনা এত দীর্ঘ হওয়াও সমীচীন নয়, যাতে তা পড়া ও স্মরণ রাখা কঠিন হয়।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ এই যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, ইহুদীরা পরীক্ষার্থ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলেছিল ঃ যদি আপনি সত্যিই আল্লাহ্‌র নবী হন, তবে বলুন ইয়াকুব-পরিবার সিরিয়া থেকে মিসরে কেন স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা কি ছিল? প্রত্যুত্তরে ওহীর মাধ্যমে পূর্ণ কাহিনী অবতারণ করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মু'জেযা ও তাঁর নবুওতের একটি বড় প্রমাণ। কেননা, তিনি ছিলেন নিরক্ষর এবং জীবনের প্রথম থেকেই মক্কায় বসবাসকারী। তিনি কারও কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি এবং কোন গ্রন্থও পাঠ করেননি। এতদসত্ত্বেও তওরাতে বর্ণিত আদ্যোপান্ত ঘটনাটি বিশুদ্ধরূপে বর্ণনা করে দেন। تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ অর্থাৎ, এগুলো সে গ্রন্থের আয়াত, যা হালাল ও হারামের বিধি-বিধান এবং প্রত্যেক কাজের সীমা ও শর্ত বর্ণনা করে। মানুষকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের জন্য একটি সুষম ও সরল জীবনব্যবস্থা দান করে। এগুলো অবতীর্ণ করার অঙ্গীকার তওরাতে পাওয়া যায় এবং ইহুদীরা এ সম্পর্কে অবহিতও বটে।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ, আমি একে আরবী কোরআন হিসাবে নাযিল করেছি, হয়তো এতে তোমরা বুঝতে পারবে।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী সম্পর্কে যারা প্রশ্ন তুলেছিল, তারা ছিল আরবের ইহুদী। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরই ভাষায় এ কাহিনী নাযিল করেছেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সততা ও সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাহিনীতে বর্ণিত বিধান ও নির্দেশাবলীকে চলার পথের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ আমি এ কোরআনকে ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করে আপনার কাছে সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি। নিঃসন্দেহে আপনি ইতিপূর্বে এসব ঘটনা সম্পর্কে অনবগত ছিলেন।

এতে ইহুদীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আমার পয়গম্বরের যেভাবে পরীক্ষা নিতে চেয়েছ, তাতেও তাঁর গুণগত উৎকর্ষ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা, তিনি পূর্ব থেকে নিরক্ষর এবং বিশ্ব-ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞও ছিলেন। সুতরাং তিনি এখন যে বিজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন, তার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র শিক্ষা ও ওহী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ .... অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতাকে বললেন ঃ পিতঃ আমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আরও দেখেছি যে, তারা আমাকে সেজদা করছে।

এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্ন। এর ব্যাখা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এগারোটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে ইউসুফ (আঃ)-এর এগার ভাই, সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ পিতা ও মাতা।

তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে ঃ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মাতা এ ঘটনার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন এবং তাঁর খালা তখন তার পিতার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। খালা এমনিতেও মায়ের সমতুল্য গণ্য হয়। বিশেষতঃ যদি পিতার ভার্যা হয়ে যায়, তবে সাধারণতঃ পরিভাষায় তাকে মা-ই বলা হবে।

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ
كَيْدًا ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ وَكَذٰلِكَ
يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ
عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ
اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ
وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّاۗىِٕلِيْنَ ۝ اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ
اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۭ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِۨ ۝
اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَ
تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝ قَالَ قَاۗىِٕلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا
يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ
اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰي يُوْسُفَ
وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ۝ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا
لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝ قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ
اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ۝ قَالُوْا لَىِٕنْ
اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝

(৫) তিনি বললেন ঃ বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৬) এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে বাণীসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন এবং পূর্ণ করবেন স্বীয় অনুগ্রহ তোমার প্রতি ও ইয়াকুব পরিবার–পরিজনের প্রতি; যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৭) অবশ্য ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৮) যখন তারা বলল ঃ অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটা সংহত শক্তিবিশেষ। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন। (৯) হত্যা কর ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন স্থানে। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে। (১০) তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং ফেলে দাও তাকে অন্ধকূপে যাতে কোন পথিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, যদি তোমাদের কিছু করতেই হয়। (১১) তারা বলল ঃ পিতঃ, ব্যাপার কি, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না? আমরা তো তার হিতাকাংখী। (১২) আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন— তৃপ্তিসহ খাবে এবং খেলাধুলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। (১৩) তিনি বললেন ঃ আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি যে, ব্যাঘ্র তাঁকে খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা তার দিক থেকে গাফেল থাকবে। (১৪) তারা বলল ঃ আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্ত্বেও যদি ব্যাঘ্র তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমরা সবই হারালাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ অর্থাৎ, বৎস। তুমি এ স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না। আল্লাহ্ না করুন, তারা এ স্বপ্ন শুনে তোমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তোমাকে বিপর্যস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে। কেননা, শয়তান হল মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ির লোভ দেখিয়ে মানুষকে এহেন অপকর্মে লিপ্ত করে দেয়,

স্বপ্নের তাৎপর্য স্তর ও প্রকারভেদ ঃ সর্বপ্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে— স্বপ্নের স্বরূপ এবং তা থেকে যেসব ঘটনা ও বিষয় জানা যায়, সেগুলোর গুরুত্ব ও পর্যায়। তফসীরে মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ স্বপ্নের তাৎপর্য এই যে, নিদ্রা কিংবা সংজ্ঞাহীনতার কারণে মানুষের মন যখন দেহের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন সে কল্পনাশক্তির পথে কিছু কিছু আকার-আকৃতি দেখতে পায়। এরই নাম স্বপ্ন। স্বপ্ন তিন প্রকার। তন্মধ্যে দু'প্রকার সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। এগুলোর কোন বাস্তবতা নেই। অবশিষ্ট একটির মৌলিকত্বের দিক দিয়ে নির্ভুল ও বাস্তব। কিন্তু এতে মাঝে মাঝে নানা উপসর্গ যুক্ত হয়ে এগুলোকেও অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্য করে দেয়।

এ উক্তির ব্যাখ্যা এই যে, কোন কোন সময় মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যেসব বিষয় ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, সেগুলোই স্বপ্নে নানা আকার-আকৃতি নিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কোন কোন সময় শয়তান আনন্দদায়ক ও ভয়াবহ উভয় প্রকার দৃশ্য ও ঘটনাবলী মানুষের স্মৃতিতে জাগিয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, এ উভয় প্রকার স্বপ্নই ভিত্তিহীন ও অবাস্তব। এগুলোর কোন বাস্তব ব্যাখ্যা হতে পারে না। এতদুভয়ের প্রথম প্রকারকে حديث النفس তথা মনের সংলাপ এবং দ্বিতীয় প্রকারকে تسويل شيطان অর্থাৎ, শয়তানের বিভ্রান্তি বলা হয়।

তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও বিশুদ্ধ। এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক প্রকার ইলহাম (খোদায়ী ইশারা), যা বান্দাকে আনন্দ অথবা সুসংবাদ দানের উদ্দেশে করা হয়। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে কোন কোন বিষয় বান্দার মন ও মস্তিষ্কে জাগিয়ে দেন।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন একটি সংযোগ বিশেষ। এর মাধ্যমে সে তার পালনকর্তার সাথে বাক্যালাপ করার গৌরব অর্জন করে। তিবরানী বিশুদ্ধ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।— (মাযহারী)

সূফী বুযুর্গগণের বর্ণনা অনুযায়ী এর স্বরূপ এই যে, জগতে অস্তিত্ব লাভের পূর্বে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ আকৃতি 'আলমে-মিসাল' অর্থাৎ, উপমা-জগতে বিদ্যমান থাকে, তেমনি 'মা'আনী' তথা অবস্তুবাচক বিষয়াদিরও বিশেষ আকার-আকৃতি বিদ্যমান থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের মন যখন বাহ্যিক দেহের ক্রিয়া-কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে, তখন মাঝে মাঝে উপমা জগতের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং সেখানকার আকার-অবয়ব সে দেখতে পায়। এছাড়া এসব আকার-অবয়ব অদৃশ্য জগৎ থেকে দেখানো হয়। মাঝে মাঝে এগুলোতেও এমনসব উপসর্গ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আসল সত্যের সাথে কিছু কিছু অবাস্তব কল্পনাও মিশ্রিত হয়ে পড়ে। এ কারণে ব্যাখ্যাদাতাদের পক্ষেও এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে

উপরোক্ত আকার-অবয়ব যাবতীয় উপসর্গ থেকে পরিচ্ছন্ন থাকে। তখনই সেগুলো হয় আসল সত্য। কিন্তু এগুলোর মধ্যেও কোন কোন স্বপ্ন থাকে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কারণ, তাতে বাস্তব ঘটনা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। এমতাবস্থায়ও যদি ব্যাখ্যা ভ্রান্ত হয়, তবে ঘটনা ভিন্ন আকার ধারণ করে। তাই একমাত্র সে স্বপ্নই আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রদত্ত ইলহাম ও বাস্তব সত্য বলে বিবেচিত হবে, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হবে, তাতে কোন উপসর্গের সংমিশ্রণ হবে না এবং ব্যাখ্যাও বিশুদ্ধ দেয়া হবে।

পয়গম্বরগণের সব স্বপ্ন ছিল এই পর্যায়ের। তাই তাদের স্বপ্নও ওহীর সমপর্যায়ভুক্ত। সাধারণ মুসলমানদের স্বপ্নে নানাবিধ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তাই তা কারও জন্যে প্রমাণ হয় না। তাদের স্বপ্নে কোন কোন সময় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিগত আকার-আকৃতির মিশ্রণ সংঘটিত হয়ে যায়, কোন সময় পাপের অন্ধকার ও মালিন্য স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করে দুর্বোধ্য করে দেয় এবং মাঝে মাঝে বিবিধ কারণে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যায়ও উপনীত হওয়া যায় না।

স্বপ্নের বর্ণিত তিনটি প্রকারই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ

স্বপ্ন তিন প্রকার। এক প্রকার শয়তানী। এতে শয়তানের পক্ষ থেকে কিছু কিছু বিষয় মনে জাগ্রত হয়। দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন হচ্ছে মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা কিছু দেখে, নিদ্রায়ও তাই সামনে আসে। তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও অভ্রান্ত। এটি নবুওয়তের ৪৬তম অংশ; অর্থাৎ, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইলহাম।

স্বপ্ন ও নবুওয়তের অংশ -এর অর্থ ও ব্যাখ্যা ঃ স্বপ্নের এ সত্য ও বিশুদ্ধ প্রকার সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত আছে। কোন হাদীসে নবুওয়তের ৪০তম অংশ, কোন হাদীসে ৪৬তম অংশ এবং কোন হাদীসে ৪৯তম, ৫০তম এবং ৭০তম অংশ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। এসব হাদীস তফসীরে-কুরতুবীতে একত্রে সন্নিবেশিত করে ইবনে আবদুল বারের বিশ্লেষণে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এগুলোর মধ্যে কোনরূপ পরস্পর বিরোধিতা নেই। বরং প্রত্যেকটি হাদীস স্ব-স্থানে বিশুদ্ধ ও সঠিক। যারা স্বপ্ন দেখে, তাদের অবস্থাভেদে বিভিন্নরূপ অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সততা, বিশ্বস্ততা, ধর্মপরায়ণতা ও পরিপূর্ণ ঈমান দ্বারা বিভূষিত, তার স্বপ্ন নবুওতের ৪০ তম অংশ হবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এসব গুণ কম তার স্বপ্ন ৪৬তম অথবা ৫০ তম অংশ হবে এবং যার মধ্যে এসব গুণ আরও কম তার স্বপ্ন নবুওয়তের ৭০তম অংশ হবে।

এখানে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের অংশ-এর অর্থ কি? তফসীরে মাযহারীতে এর তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে তেইশ বৎসর পর্যন্ত ওহী আগমন করতে থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ছয়মাস স্বপ্নের আকারে এ ওহী আগমন করে। অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ ষান্মাসিকে জিবরাঈলের মধ্যস্থতায় ওহী আগমন করে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের ৪৬তম অংশ। যেসব হাদীসে কম-বেশী সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোতে হয় কাছাকাছি হিসাবে বলা হয়েছে, না হয় সনদের দিক দিয়ে সেসব হাদীস ধর্তব্য নয়।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ স্বপ্ন' নবুওয়তের অংশ হওয়ার তাৎপর্য এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে স্বপ্নে এমন বিষয় দেখে, যা তার সাধ্যাতীত। উদাহরণতঃ কেউ দেখে যে, সে আকাশে উড়ছে। অথবা অদৃশ্য জগতের এমন কোন বিষয় দেখে, যার জ্ঞান অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতএব এরূপ স্বপ্নের মাধ্যমে খোদায়ী সাহায্য ও প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, যা প্রকৃতপক্ষে নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য। তাই স্বপ্নকে নবুওয়তের অংশ স্থির করা হয়েছে।

কাদিয়ানী দাজ্জালের একটি বিভ্রান্তি খণ্ডন ঃ এ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক লোক একটি অভিনব বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। তারা বলে ঃ নবুওয়তের অংশ যখন দুনিয়াতে অবশিষ্ট ও প্রচলিত আছে, তখন নবুওয়তও অবশিষ্ট ও প্রচলিত রয়েছে। অথচ এটা কোরআনের অকাট্য আয়াত ও অসংখ্য সহীহ্ হাদীসের পরিপন্থী এবং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের খতমে নবুওয়ত সম্পর্কিত সর্বসম্মত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা এ সহজ সত্যটি বুঝতে পারল না যে, কোন বস্তুর একটি অংশ বিদ্যমান থাকলে বস্তুটি বিদ্যমান থাকা জরুরী হয়ে পড়ে না। যদি কোন ব্যক্তির একটি নখ অথবা একটি চুল কোথাও বিদ্যমান থাকে, তবে কেউ একথা বলতে পারে না যে, এখানে ঐ ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। মেশিনের অনেক কল-কব্জার মধ্য থেকে কোন একটি কল-কব্জা অথবা একটি স্ক্রু যদি কারও কাছে থাকে এবং সে দাবী করে বসে যে, তার কাছে অমুক মেশিনটি আছে, তবে বিশ্ববাসী তাকে হয় মিথ্যাবাদী, না হয় আস্ত আহাম্মক বলতে বাধ্য হবে।

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সত্য স্বপ্ন অবশ্যই নবুওয়তের অংশ, কিন্তু নবুওয়ত নয়। নবুওয়ত তো আখেরী নবী মোহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে।

সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ لم يبق من النبوة الاالمبشرات অর্থাৎ, ভবিষ্যতে "মুবাশ্শিরাত" ব্যতীত নবুওয়তের কোন অংশ বাকী থাকবে না। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ "মুবাশ্শিরাত" বলতে কি বোঝায়? উত্তর হল ঃ সত্য স্বপ্ন। এতে প্রমাণিত হয় যে, নবুওয়ত কোন প্রকারে অথবা কোন আকারেই অবশিষ্ট নেই। শুধুমাত্র এর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অবশিষ্ট আছে যাকে মুবাশ্শিরাত অথবা সত্য স্বপ্ন বলা হয়।

কাফের ও ফাসেক ব্যক্তির স্বপ্নও সত্য হতে পারে ঃ মাঝে মাঝে পাপাচারী, এমন কি কাফের ব্যক্তিও সত্য স্বপ্ন দেখতে পারে। একথা কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং অভিজ্ঞতায় জানা। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দু'জন কারা-সঙ্গীর স্বপ্ন সত্য হওয়া এবং মিসর-সম্রাটের স্বপ্ন ও তা সত্য হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। অথচ তারা সবাই ছিল অমুসলমান। হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে পারস্য সম্রাটের স্বপ্নের কথা বর্ণিত আছে, যা সত্যে পরিণত হয়েছে। অথচ পারস্য সম্রাট মুসলমান ছিলেন না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ফুফু আতেকা কাফের থাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে সত্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ ছাড়া কাফের বাদশাহ্ বখতে নস্রের স্বপ্ন সত্য ছিল, যার ব্যাখ্যা হযরত দানিয়াল (আঃ) দিয়েছেন।

এতে বোঝা যায় যে, সত্য স্বপ্ন দেখা এবং তদনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া এতটুকু বিষয়ই কারও সৎ, ধার্মিক এমনকি মুসলমান হওয়ারও প্রমাণ নয়। তবে এটা ঠিক যে, সৎ ও সাধু ব্যক্তিদের স্বপ্ন সাধারণতঃ সত্য হবে—এটাই আল্লাহ্র সাধারণ রীতি। ফাসেক ও পাপাচারীদের সাধারণতঃ মনের সংলাপ ও শয়তানী প্ররোচনা ধরনের মিথ্যা স্বপ্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এর বিপরীতও হওয়া সম্ভব।

মোটকথা, সত্য স্বপ্ন সাধারণ মুসলমানদের জন্যে হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সুসংবাদ কিংবা হুশিয়ারীর চাইতে অধিক মর্যাদা রাখে না। এটা

স্বয়ং তাদের জন্যে কোন ব্যাপারে প্রমাণরূপে গণ্য নয় এবং অন্যের জন্যেও নয়। কোন কোন অজ্ঞ লোক এ ধরণের স্বপ্ন দেখে নানা রকম কুমন্ত্রণায় লিপ্ত হয়। কেউ একে নিজের ওলীত্বের লক্ষণ মনে করতে থাকে এবং কেউ স্বপ্নলব্ধ বিষয়াদিকে শরীয়তের নির্দেশের মর্যাদা দিতে থাকে। এসব বিষয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; বিশেষতঃ যখন একথাও জানা হয়ে গেছে যে, সত্য স্বপ্নের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে প্রবৃত্তিগত অথবা শয়তানী অথবা উভয় প্রকার ধ্যান-ধারণার মিশ্রণ আসতে পারে।

স্বপ্ন প্রত্যেকের কাছে বর্ণনা করা ঠিক নয় ঃ মাসআলা ঃ قَالَ يٰبُنَيَّ আয়াতে ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-কে স্বীয় স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিশীল নয়—এরূপ লোকের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করা উচিত নয়। এছাড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদর্শী নয়—এমন ব্যক্তির কাছেও স্বপ্ন ব্যক্ত করা সঙ্গত নয়।

মাসআলা ঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কষ্টদায়ক বিপজ্জনক স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করতে নেই। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র দয়া ও সহানুভূতির উপর ভিত্তিশীল—আইনগত হারাম নয়। সহীহ্ হাদীসসমূহে বলা হয়েছে, ওহুদ যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার তরবারি 'যুলফাকার' ভেঙ্গে গেছে এবং আরও কিছু গাভীকে জবাই হতে দেখেছি। এর ব্যাখ্যা ছিল হযরত হামযা (রাঃ)-সহ অনেক মুসলমানের শাহাদত বরণ। এটা একটা আশু মারাত্মক বিপর্যয় সম্পর্কিত ইঙ্গিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহাবীদের কাছে এ স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলেন।—(কুরতুবী)

মাসআলা ঃ এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, মুসলমানকে অপরের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে অপরের কোন মন্দ অভ্যাস অথবা কুনিয়ত প্রকাশ করা জায়েয। এটা গীবত তথা অসাক্ষাতে পরনিন্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণতঃ কেউ জানতে পারল যে, যায়েদ বকরের গৃহে চুরি করার অথবা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। এমতাবস্থায় বকরকে অবহিত করা তার কর্তব্য। এটা গীবতের মধ্যে গণ্য হবে না। আয়াতে ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-কে বলে দিয়েছেন যে, ভাইদের পক্ষ থেকে তার প্রাণ নাশের আশঙ্কা রয়েছে।

ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-কে কতিপয় নেয়ামত দানের ওয়াদা করেছেন। প্রথম—وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ স্বীয় নেয়ামত ও অনুগ্রহরাজির জন্যে আপনাকে মনোনীত করবেন। মিসর দেশে রাজ্য, সম্মান ও ধন-সম্পদ লাভের মাধ্যমে এ ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করেছে। দ্বিতীয়, وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ এখানে احاديث বলে মানুষের স্বপ্ন বোঝান হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। এতে আরও জানা গেল যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র, যা আল্লাহ্ তাআলা কোন কোন ব্যক্তিকে দান করেন। সবাই এর যোগ্য নয়।

মাসআলা ঃ তফসীরে কুরতুবীতে শাদ্দাদ ইবনুল-হাদের উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা চল্লিশ বৎসর পর প্রকাশ পায়। এতে বোঝা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্বপ্ন ফলে যাওয়া জরুরী নয়।

তৃতীয় ওয়াদা وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ -অর্থাৎ, আল্লাহ্ আপনার প্রতি স্বীয় নেয়ামতপূর্ণ করবেন। এতে নবুওয়ত দানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরবর্তী বাক্যসমূহেও এর প্রতি ইঙ্গিত আছে। كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ অর্থাৎ, যেভাবে আমি স্বীয় নবুওয়তের নেয়ামত আপনার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি ইতিপূর্বে পূর্ণ করেছি। এতে এদিকেও ইশারা হয়ে গেছে যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত শাস্ত্র যেমন ইউসুফ (আঃ)-কে দান করা হয়েছিল, তেমনিভাবে ইবরাহীম ও ইসহাক (আঃ)-কেও শেখানো হয়েছিল।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানবান, সুবিজ্ঞ। কাউকে কোন শাস্ত্র শেখানো তাঁর পক্ষে কঠিন নয় এবং তিনি প্রত্যেককেই তা শেখান না। বরং বিজ্ঞতা অনুযায়ী বেছে বেছে কোন কোন ব্যক্তিকে এ কৌশল শিখিয়ে দেন।

উল্লেখিত আয়াতসমূহের ৭নং আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এ সূরায় বর্ণিত ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীকে শুধুমাত্র একটি কাহিনীর নিরিখে দেখা উচিত নয়; বরং এতে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির বড় বড় নিদর্শন ও নির্দেশাবলী রয়েছে।

এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, যেসব ইহুদী পরীক্ষার উদ্দেশে নবী করীম (সাঃ)-কে এ কাহিনী জিজ্ঞেস করেছিল, তাদের জন্যে এতে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে সময় মক্কায় অবস্থানরত ছিলেন এবং তাঁর সংবাদ মদীনায় পৌঁছেছিল, তখন মদীনার ইহুদীরা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যে একদল লোক মক্কায় প্রেরণ করেছিল। তারা অস্পষ্ট ভঙ্গিতে এরূপ প্রশ্ন করেছিল যে, আপনি সত্য নবী হলে বলুন, কোন পয়গম্বরের এক পুত্রকে সিরিয়া থেকে মিসরে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তার বিরহ-ব্যথায় ক্রন্দন করতে করতে পিতা অন্ধ হয়ে যায়?

জিজ্ঞাসার জন্যে এ ঘটনাটি মনোনীত করার পেছন কারণ ছিল এই যে, এ ঘটনা সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ ছিল না এবং মক্কার কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাতও ছিল না। তখন মক্কায় কিতাবী সম্প্রদায়ের কেউ বাস করত না যে, তওরাত ও ইনজীলের বরাতে তার কাছ থেকে এ ঘটনার কোন অংশবিশেষ জানা যেত। বলাবাহুল্য, তাদের এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ণ সূরা ইউসুফ অবতীর্ণ হয়। এতে হযরত ইয়াকুব ও ইউসুফ (আঃ)-এর সম্পূর্ণ কাহিনী এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তওরাত ও ইনজীলেও তেমনটি হয়নি। তাই এর বর্ণনা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি প্রকাশ্য মু'জেযা।

আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইউসুফসহ হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বার জন পুত্র-সন্তান ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই সন্তান-সন্ততি হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে। ইয়াকুব (আঃ)-এর উপাধি ছিল 'ইসরাঈল'। তাই বারটি পরিবার সবাই 'বনী-ইসরাঈল' নামে খ্যাত হয়।

বারপুত্রের মধ্যে দশ জন জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী লাইয়্যা বিনতে লাইয়্যানের গর্ভে জন্মলাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পর ইয়াকুব (আঃ) লাইয়্যার ভগিনী রাহীলকে বিবাহ করেন। রাহীলের গর্ভে দু'পুত্র ইউসুফ ও বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই ইউসুফ (আঃ)-এর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বেনিয়ামিন এবং অবশিষ্ট দশ জন বৈমাত্রেয় ভাই। ইউসুফ জননী রাহীলও বেনিয়ামিনের জন্মের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।—(কুরতুবী)

৮নং আয়াত থেকে ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী শুরু হয়েছে। ইউসুফ

(আঃ)-এর ভ্রাতারা পিতা ইয়াকুব (আঃ)-কে দেখল যে, তিনি ইউসুফের প্রতি অসাধারণ মহব্বত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এটাও সম্ভবপর যে, তারা কোনরূপে ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্নের বিষয়ও অবগত হয়েছিল, যদ্দরুন তারা ইউসুফ (আঃ)-এর বিরাট মাহাত্ম্যের কথা টের পেয়ে তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। তারা পরস্পর বলাবলি করল ঃ আমরা পিতাকে দেখি যে, তিনি আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার অনুজ বেনিয়ামিনকে অধিক ভালবাসেন। অথচ আমরা দশ জন এবং তাদের জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে গৃহের কাজকর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থালীর কাজ করার শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হল এ বিষয় অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে অধিক মহব্বত করা। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই তোমরা হয় ইউসুফকে হত্যা কর, না হয় এমন দূরদেশে নির্বাসিত কর, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে না পারে।

৯ নং আয়াতে ভাইদের পরামর্শ বর্ণিত হয়েছে। কেউ মত প্রকাশ করল যে, ইউসুফকে হত্যা করা হোক। কেউ বলল ঃ তাকে কোন অন্ধকূপের গভীরে নিক্ষেপ করা হোক—যাতে মাঝখান থেকে এ কন্টক দূর হয়ে যায় এবং পিতার সমগ্র মনোযোগ তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। হত্যা কিংবা কূপে নিক্ষেপ করার কারণে যে গোনাহ্ হবে, তার প্রতিকার এই যে, পরবর্তীকালে তওবা করে তোমরা সাধু হয়ে যেতে পারবে। আয়াতের وَتَكُونُوا مِنۢ بَعْدِهِۦ قَوْمًا صَٰلِحِينَ বাক্যের এক অর্থ তাই বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফকে হত্যা করার পর তোমাদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। কেননা, পিতার মনোযোগের কেন্দ্র শেষ হয়ে যাবে। অথবা অর্থ এই যে, হত্যার পর পিতা-মাতার কাছে দোষ স্বীকার করে তোমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে।

ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা যে পয়গম্বর ছিল না, উপরোক্ত পরামর্শ তার প্রমাণ। কেননা, এ ঘটনায় তারা অনেকগুলো কবিরা গোনাহ করেছে। একজন নিরপরাধকে হত্যার সংকল্প, পিতার অবাধ্যতা ও তাঁকে কষ্ট প্রদান, চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ ও মিথ্যা চক্রান্ত ইত্যাদি। বিজ্ঞ আলেমগণের বিশ্বাস অনুযায়ী পয়গম্বরগণ দ্বারা নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও এরূপ গোনাহ হতে পারে না।

১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ভ্রাতাদের মধ্যেই একজন সমস্ত কথাবার্তা শুনে বলল ঃ ইউসুফকে হত্যা করো না। যদি কিছু করতেই হয় তবে, কূপের গভীরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ কর, যেখানে সে জীবিত থাকে এবং পথিক যখন কূপে আসে, তখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অপরদিকে তাকে নিয়ে তোমাদেরকে কোন দূরদেশে যেতে হবে না। কোন কাফেলা আসবে, তারা স্বয়ং তাকে সাথে করে দূর-দূরান্তে পৌঁছে দেবে।

এ অভিমত প্রকাশকারী ছিল তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, সবার মধ্যে রুবীল ছিল জ্যেষ্ঠ। সে-ই এ অভিমত দিয়েছিল। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই পরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসরে যখন ইউসুফ (আঃ)-এর ছোট ভাই বেনিয়ামিনকে আটক করা হয়, তখন সে বলেছিল ঃ আমি ফিরে গিয়ে পিতাকে কিভাবে মুখ দেখাব? তাই আমি কেনানে ফিরে যাব না।

ইমাম কুরতুবী এ স্থলে لقيط ও لقطة এর বিস্তারিত বিধানাবলী বর্ণনা করেছেন। এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই। তবে এ সম্পর্কে একটি মৌলিক বিষয় বুঝে নেয়া দরকার যে, ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জান ও মালের হেফাজত পথ-ঘাট ও সড়ক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ ইত্যাদি একমাত্র সরকারী বিভাগসমূহের দায়িত্ব নয়; প্রত্যেক ব্যক্তির স্কন্ধে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। পথে-ঘাটে ও সড়কে দাঁড়িয়ে অথবা নিজের কোন আসবাবপত্র ফেলে দিয়ে যারা পথিকদের চলার পথে অসুবিধা সৃষ্টি করে, তাদের সম্পর্কে হাদীসে কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তার জেহাদও গ্রহণীয় নয়। এমনিভাবে রাস্তায় কোন বস্তু পড়ে থাকার কারণে যদি অপরের কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকে; যেমন কাঁটা, কাঁচের টুকরো, পাথর ইত্যাদি, তবে এগুলোকে সরানো শুধু ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষেরই দায়িত্ব নয়; বরং প্রত্যেক মুসলমানকেই এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং যারা এ কাজ করে, তাদের জন্যে অশেষ প্রতিদান ও সওয়াবের অঙ্গীকার করা হয়েছে।

এ মূলনীতি অনুযায়ীই কারও হারানো মাল পেলে তা আত্মসাত না করাই শুধু তার দায়িত্ব নয়; বরং এটাও তার দায়িত্ব যে, মালটি উঠিয়ে সযত্নে রেখে দেবে এবং ঘোষণা করে মালিকের সন্ধান নেবে। সন্ধান পাওয়া গেলে এবং লক্ষণাদি বর্ণনার পর যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এ মাল তারই; তবে তাকে প্রত্যর্পন করবে। পক্ষান্তরে ঘোষণা ও খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও যদি মালিক না পাওয়া যায় এবং মালের গুরুত্ব অনুযায়ী অনুমিত হয় যে, মালিক আর তালাশ করবে না, তবে প্রাপক নিঃস্ব দরিদ্র হলে নিজেই তা ভোগ করতে পারবে। অন্যথায় ফকীর-মিসকীনকে দান করে দেবে। উভয় অবস্থায় সেটি প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে দানরূপে গণ্য করা হবে। দানের সওয়াব সে-ই পাবে; যেন পরকালের হিসাবে সেটি তার নামেই জমা করে দেয়া হবে।

এগুলো হচ্ছে জনসেবা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মূলনীতি। এগুলোর দায়িত্ব মুসলিম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আফসোস! মুসলমানরা নিজেদের দ্বীনকে বুঝলে এবং তা যথাযথ পালন করলে বিশ্ববাসীর চোখ খুলে যাবে। তারা দেখবে যে, সরকারের বড় বড় বিভাগ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যে কাজ সম্পন্ন করতে পারে না, তা অনায়াসে কিভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়।

১১ ও ১২ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভাইয়েরা পিতার কাছে এরূপ ভাষায় আবেদন পেশ করল ঃ আব্বাজান। ব্যাপার কি যে, আপনি ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের প্রতি আস্থা রাখেন না, অথচ আমরা তার পুরোপুরি হিতাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল আপনি তাকে আমাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে-ও স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলা করতে পারে। আমরা সবাই তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব।

তাদের এই আবেদন থেকেই বোঝা যায় যে, তারা ইতিপূর্বেও এ ধরনের আবেদন কোন সময়ে করেছিল, যা পিতা অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাই এবার কিঞ্চিৎ জোর ও পীড়াপীড়ি সহকারে পিতাকে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ আয়াতে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর কাছে প্রমোদ-ভ্রমণ এবং স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেননি। তিনি শুধু ইউসুফকে তাদের সাথে দিতে ইতস্ততঃ করেছেন, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। এতে বোঝা গেল যে, প্রমোদ ভ্রমণ ও খেলাধুলা বিধিবদ্ধ সীমার ভেতরে নিষিদ্ধ নয়, বরং সহীহ্ হাদীস থেকেও এর বৈধতা জানা

যায়। তবে শর্ত এই যে, খেলাধুলায় শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন বাঞ্ছনীয় নয় এবং তাতে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘিত হতে পারে এমন কোন কিছুর মিশ্রণও উচিত নয়।—(কুরতুবী)

ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা যখন আগামীকাল ইউসুফকে তাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে প্রেরণের আবেদন করল, তখন ইয়াকুব (আঃ) বললেন ঃ তাকে প্রেরণ করা আমি দু'কারণে পছন্দ করি না। প্রথমতঃ এ নয়নের মণি আমার সামনে না থাকলে আমি শান্তি পাই না। দ্বিতীয়তঃ আশঙ্কা আছে যে, জঙ্গলে তোমাদের অসাবধানতার মুহূর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে।

বাঘের আশঙ্কা হওয়ার কারণ এই যে, কেনানে বাঘের বিস্তর প্রাদুর্ভাব ছিল। কিংবা ইয়াকুব (আঃ) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি পাহাড়ের উপর আছেন। নীচে পাহাড়ের পাদদেশে ইউসুফ (আঃ)। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, কিন্তু একটি বাঘই এগিয়ে এসে তাঁকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর ইউসুফ (আঃ) মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেন।

এর ব্যাখ্যা এভাবে প্রকাশ পায় যে, দশটি বাঘ ছিল দশ জন ভাই এবং যে বাঘটি তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, সে ছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেয়ার অর্থ কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এ স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত ইয়াকুব (আঃ) স্বয়ং এ ভাইদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করেছিলেন এবং তাদেরকেই বাঘ বলেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে ওদের কাছে এই কথা প্রকাশ করেননি।— (কুরতুবী)

ভ্রাতারা ইয়াকুব (আঃ)-এর কথা শুনে বলল ঃ আপনার এ ভয়ভীতি অমূলক। আমাদের দশ জনের শক্তিশালী দল তার হেফাজতের জন্যে বিদ্যমান রয়েছি। আমাদের সবার বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘেই তাকে খেয়ে ফেলে, অস্তিত্বই নিষ্ফল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আমাদের দ্বারা কোন কাজের আশা করা যেতে পারে?

হযরত ইয়াকুব (আঃ) পয়গম্বর সুলভ গাম্ভীর্যের কারণে পুত্রদের সামনে একথা প্রকাশ করলেন না যে, আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করি। কারণ, এতে প্রথমতঃ তাদের মনোকষ্ট হত, দ্বিতীয়তঃ পিতার এরূপ বলার পর ভ্রাতাদের শত্রুতা আরও বেড়ে যেতে পারত। ফলে এখন ছেড়ে দিলেও অন্য কোন সময় কোন ছলছুতায় তাকে হত্যা করার ফিকিরে থাকত। তাই তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু ভাইদের কাছ থেকে অঙ্গীকারও নিয়ে নিলেন, যাতে ইউসুফের কোনরূপ কষ্ট না হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুবীল অথবা ইয়াহুদার হাতে বিশেষ করে তাকে সোপর্দ করে বললেন ঃ তুমি তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও অন্যান্য প্রয়োজনের ব্যাপারে দেখা-শোনা করবে এবং শীঘ্র ফিরিয়ে আনবে। ভ্রাতারা পিতার সামনে ইউসুফকে কাঁধে তুলে নিল এবং পালাক্রমে সবাই উঠাতে লাগল। কিছুদূর পর্যন্ত হযরত ইয়াকুবও (আঃ) তাদেরকে বিদায় দেয়ার জন্যে গেলেন।

কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে,তারা যখন ইয়াকুব (আঃ)-এর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, তখন ইউসুফ (আঃ) যে ভাইয়ের কাঁধে ছিলেন, সে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তখন ইউসুফ (আঃ) পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন, কিন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের সাথে সাথে দৌড়াতে অক্ষম হয়ে অন্য একজন ভাইয়ের আশ্রয় নিলেন। সে কোন রূপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করায় তৃতীয়, চতুর্থ এমনিভাবে প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু সবাই উত্তর দিল যে, 'তুই যে এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র-সূর্যকে সেজদা করতে দেখেছিস, তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোকে সাহায্য করবে।'

কুরতুবী এর ভিত্তিতেই বলেন যে, এ থেকে জানা গেল, ভাইয়েরা কোন না কোন উপায়ে ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্নের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। সে স্বপ্নই তাদের তীব্র ক্রোধ ও কঠোর ব্যবহারের কারণ হয়েছিল।

অবশেষে ইউসুফ (আঃ)-ইয়াহুদাকে বললেন ঃ আপনি জ্যেষ্ঠ। আপনিই আমার দুর্বলতা ও অল্পবয়স্কতা এবং পিতার মনোকষ্টের কথা চিন্তা করে দয়ার্দ্র হোন। আপনি ঐ অঙ্গীকার স্মরণ করুন, যা পিতার সাথে করেছিলেন। একথা শুনে ইয়াহুদার মনে দয়ার সঞ্চার হল এবং তাকে বললঃ যতক্ষণ আমি জীবিত আছি এসব ভাই তোকে কোন কষ্ট দিতে পারবে না।

ইয়াহুদার অন্তরে আল্লাহ্ তাআলা দয়া ও ন্যায়ানুগ কাজ করার প্রেরণা জাগ্রত করে দিলেন। সে অন্যান্য ভাইকে সম্বোধন করে বলল ঃ নিরপরাধকে হত্যা করা মহাপাপ। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং বালককে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চল। তবে তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে নাও যে, সে পিতার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করবে না।

ভাইয়েরা উত্তর দিল ঃ আমরা জানি, তোমার উদ্দেশ্য কি। তুমি পিতার অন্তরে নিজের মর্যাদার আসন সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও। শুনে রাখ, যদি তুমি আমাদের ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক হও, তবে আমরা তোমাকেও হত্যা করব। ইয়াহুদা দেখল যে, নয় ভাইয়ের বিপরীতে সে একা কিছুই করতে পারবে না। তাই সে বলল ঃ তোমরা যদি এ বালককে নিপাত করতে মনস্থ করে থাক, তবে আমার কথা শোন। নিকটেই একটি প্রাচীন কূপ রয়েছে। এতে অনেক ঝোপ-জঙ্গল গজিয়েছে। সর্প,বিচ্ছু ও হরেক রকমের ইতর প্রাণী এখানে বাস করে। তোমরা তাকে কূপে ফেলে দাও। যদি কোন সর্প ইত্যাদি দংশন করে তাকে শেষ করে দেয়, তবে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ এবং নিজ হাতে হত্যা করার দোষ থেকে তোমরা মুক্ত হলে। পক্ষান্তরে যদি সে জীবিত থাকে, তবে হয়তো কোন কাফেলা এখানে আসবে এবং পানির জন্য কূপে বালতি ফেলবে। ফলে সে বের হয়ে আসবে। তারা তাকে সাথে করে অন্য কোন দেশে পৌছিয়ে দেবে। এমতাবস্থায়ও তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهٖ وَاَجْمَعُوْۤا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٥﴾ وَجَآءُوْۤ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿١٦﴾ قَالُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَاۤ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ﴿١٧﴾ وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ؕ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۢ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖۤ اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۫ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٢﴾

(১৫) অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে চলল এবং অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল এবং আমি তাকে ইঙ্গিত করলাম যে, তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা বলবে এমতাবস্থায় যে, তারা তোমাকে চিনবে না। (১৬) তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এল। (১৭) তারা বলল ঃ পিতঃ আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আসবাব-পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। অতঃপর তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী। (১৮) এবং তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল। বললেন ঃ এটা কখনই নয়; বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন ছবর করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্য স্থল। (১৯) এবং একটি কাফেলা এল। অতঃপর তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল। সে বালতি ফেলল। বলল ঃ কি আনন্দের কথা! এ তো একটি কিশোর! তারা তাকে পণ্যদ্রব্য গণ্য করে গোপন করে ফেলল। আল্লাহ্ খুব জানেন যা কিছু তারা করেছিল। (২০) ওরা তাকে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল গুণাগুণতি কয়েক দেরহাম এবং তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল। (২১) মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল ঃ একে সম্মানে রাখ। সম্ভবতঃ সে আমাদের কাছে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এ জন্যে যে তাকে বাক্যাদির পূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেই। আল্লাহ্ নিজ কাজে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (২২) যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল, তখন তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম। এমননিভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ প্রস্তাবে ভাইয়েরা সবাই একমত হল। এ বিষয়টি তৃতীয় আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهٖ وَاَجْمَعُوْۤا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَاۤ

اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

অর্থাৎ, ভাইয়েরা যখন ইউসুফ(আঃ)-কে জঙ্গলে নিয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে সবাই ঐকমত্যে পৌঁছল, তখন আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আঃ)-কে সংবাদ দিলেন যে, একদিন আসবে, যখন তুমি ভাইদের কাছে তাদের এ কু-কর্মের কথা ব্যক্ত করবে। তারা তখন কিছুই বুঝতে পারবে না।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ এ ওহী সম্পর্কে দু'প্রকার ধারণা সম্ভবপর। (এক) কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তাঁর সান্ত্বনা ও মুক্তির সুসংবাদ দানের জন্যে এ ওহী আগমন করেছিল। (দুই) কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আঃ)-কে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী বলে দিয়েছিলেন। এতে আরও বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি এভাবে ধ্বংসে হওয়ার কবল থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমনি পরিস্থিতি দেখা দেবে যে, তুমি তাদের তিরস্কার করার সুযোগ পাবে; অথচ তারা তোমাকে চিনবেও না যে, তুমিই তাদের ভাই ইউসুফ।

ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি শৈশবে অবতীর্ণ এ ওহী সম্পর্কে তফসীর-মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, এটা নবুওয়তের ওহী ছিল না। কেননা, নবুওয়তের ওহী চল্লিশ বছর বয়ঃক্রমকালে অবতীর্ণ হয়। বরং এ ওহীটি ছিল এ ধরনের, যেমন মূসা (আঃ)-এর জননীকে ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত করানো হয়েছিল। ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি নবুওয়তের ওহীর আগমন মিসর পৌঁছা ও যৌবনে পদার্পণের পর শুরু হয়েছিল। বলা হয়েছে ঃ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ইবনে জরীর, ইবনে আবীহাতেম প্রমুখ একে ব্যতিক্রমধর্মী নবুওয়তের ওহীই আখ্যা দিয়েছেন; যেমন ঈসা (আঃ)-কে শৈশবেই নবুওয়তের ওহী দান করা হয়েছিল। — (মাযহারী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মিসর পৌঁছার পর আল্লাহ্ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-কে স্বীয় অবস্থা জানিয়ে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকট খবর পাঠাতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।—(কুরতুবী) এ কারণেই ইউসুফ (আঃ)- এর মত একজন পয়গম্বর জেল থেকে মুক্তি এবং মিসরের রাজত্ব লাভ করার পরও বৃদ্ধ পিতাকে স্বীয় নিরাপত্তার সংবাদ পৌঁছিয়ে নিশ্চিন্ত করার কোন ব্যবস্থা করেননি।

এ কর্মপন্থার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার কি কি রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা জানার সাধ্য কি? সম্ভবতঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যে কোন কিছুর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা রাখা যে আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয় নয়, এ বিষয়ে ইয়াকুব (আঃ)-কে সতর্ক করাও এর লক্ষ্য ছিল। এ ছাড়া শেষ পর্যন্ত যাচ্ঞাকারীর বেশে ভাইদেরকেই ইউসুফ (আঃ)-এর সামনে উপস্থিত করে তাদেরকেও তাদের পূর্বকৃত দুষ্কর্মের কিছু শাস্তি দেয়া উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদগণ এস্থলে ইউসুফ (আঃ)-কে কূপে

নিক্ষেপ করার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ যখন ওরা তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করতে লাগল, তখন তিনি কূপের প্রাচীর জড়িয়ে ধরলেন। ভাইয়েরা তার জামা খুলে তদ্দ্বারা হাত বেঁধে দিল। তখন ইউসুফ (আঃ) পুনরায় তাদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু তখনও সেই একই উত্তর পাওয়া গেল যে, যে এগারটি নক্ষত্র তোকে সেজদা করে, তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোর সাহায্য করবে। অতঃপর একটি বালতিতে রেখে তা কূপে ছাড়তে লাগল। মাঝপথে যেতেই উপর থেকে রশি কেটে দিল। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং ইউসুফের হেফাযত করলেন। পানিতে পড়ার কারণে তিনি কোনরূপ আঘাত পাননি। নিকটেই একখণ্ড ভাসমান প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হল। তিনি সুস্থ ও বহাল তবিয়তে তার উপর বসে গেলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে, জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ্র আদেশ পেয়ে তাঁকে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়ে দেন।

ইউসুফ (আঃ) তিন দিন কূপে অবস্থান করলেন। ইয়াহুদা প্রত্যহ গোপনে তাঁর জন্যে কিছু খাদ্য আনত এবং বালতির সাহায্যে তাঁর কাছে পৌঁছে দিত।

وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ অর্থাৎ, সন্ধ্যাবেলায় তারা ক্রন্দন করতে করতে পিতার নিকট পৌঁছল। ইয়াকুব (আঃ) ক্রন্দনের শব্দ শুনে বাইরে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি? তোমাদের ছাগপালের উপর কেউ আক্রমণ করেনি তো? ইউসুফ কোথায়? তখন ভাইয়েরা বলল ঃ

قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَـٰعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَـٰدِقِينَ

অর্থাৎ, পিতঃ, আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম এবং ইউসুফকে আসবাবপত্রের কাছে রেখে দিলাম। ইতিমধ্যে বাঘ এসে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে। আমরা যত সত্যবাদীই হই ; কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না।

ইবনে আরাবী 'আহ্কামুল-কোরআনে' বলেন ঃ পারস্পরিক (দৌড়) প্রতিযোগিতা শরীয়তসিদ্ধ এবং একটি উত্তম খেলা। এটা জেহাদেও কাজে আসে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং এ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। অশ্ব-প্রতিযোগিতা করানো (অর্থাৎ ঘোড়দৌড়)ও প্রমাণিত রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সালামা ইবনে আকওয়া' জনৈক ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন।

উল্লেখিত আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা আসল ঘোড়দৌড়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়। এছাড়া ঘোড়দৌড় ছাড়া দৌড়, তীরে লক্ষ্যভেদ ইত্যাদিতেও প্রতিযোগিতা করা বৈধ। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পক্ষকে তৃতীয় পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করাও জায়েয। কিন্তু পরস্পর হার-জিতে কোন টাকার অংশ শর্ত করা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত, যা কোরআন পাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আজকাল ঘোড়দৌড়ের যত প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তার কোনটিই জুয়া থেকে মুক্ত নয়। তাই এগুলো হারাম ও নাজায়েয।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা পারস্পরিক আলোচনার পর অবশেষে তাকে একটি অন্ধকূপে ফেলে দিল এবং পিতাকে এসে বলল যে, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে অতঃপর কাহিনী এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍ অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে এনেছিল, যাতে পিতার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে, বাঘই তাকে খেয়ে ফেলেছে।

কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাদের মিথ্যা ফাঁস করে দেয়ার জন্যে তাদেরকে একটি জরুরী বিষয় থেকে গাফেল করে দিয়েছিলেন। তারা যদি রক্ত লাগানোর সাথে সাথে জামাটিও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিত, তবে ইউসুফকে বাঘে খাওয়ার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারত। কিন্তু তারা অক্ষত ও আস্ত জামায় ছাগল ছানার রক্ত লাগিয়ে পিতাকে ধোকা দিতে চাইল। ইয়াকুব (আঃ) অক্ষত ও আস্ত জামা দেখে বললেন ঃ বাছারা, এ বাঘ কেমন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিল যে, ইউসুফকে তো খেয়ে ফেলেছে ; কিন্তু জামার কোন অংশ ছিন্ন হতে দেয়নি।

এভাবে ইয়াকুব (আঃ)-এর কাছে তাদের জালিয়াতি ফাঁস হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

– অর্থাৎ, ইউসুফকে বাঘে খায়নি; বরং তোমাদেরই মন একটি বিষয় খাড়া করেছে। এখন আমার জন্যে উত্তম এই যে, ধৈর্যধারণ করি এবং তোমরা যা বল, তাতে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করি।

মাসআলা ঃ ইয়াকুব (আঃ) জামা অক্ষত হওয়া দ্বারা ইউসুফ ভ্রাতাদের মিথ্যা সপ্রমাণ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, বিচারকের উচিত, উভয় পক্ষের দাবী ও যুক্তি প্রমাণের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আলামতের প্রতিও লক্ষ্য রাখা।

মাওয়ারদি বলেন ঃ হযরত ইউসুফের জামাও কিছু আশ্চর্যজনক বিষয়াদির স্মারক হয়ে রয়েছে। তিনটি বিরাট ঘটনা এ জামার সাথেই জড়িত রয়েছে।

প্রথম ঘটনা হল, রক্ত রঞ্জিত করে পিতাকে ধোকা দেয়া এবং জামার সাক্ষ্য দ্বারাই তাদের মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া; দ্বিতীয়, যুলায়খার ঘটনা। এতেও ইউসুফ (আঃ)-এর জামাটিই সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। তৃতীয়, ইয়াকুব (আঃ)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার ঘটনা। এতেও তাঁর জামাটিই মুজেযার প্রতীক প্রমাণিত হয়েছে।

ঘটনাচক্রে একটি কাফেলা এ স্থানে এসে যায়। তফসীরে-কুরতুবীতে বলা হয়েছে ঃ এ কাফেলা সিরিয়া থেকে মিসর যাচ্ছিল। পথ ভুলে এ জনমানবহীন জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়। তারা পানি সংগ্রহকারীদের কূপে প্রেরণ করল।

মিসরীয় কাফেলার পথ ভুলে এখানে পৌঁছা এবং এই অন্ধ কূপের সম্মুখীন হওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। কিন্তু যারা সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, তারা জানে যে, এসব ঘটনা একটি পরস্পর সংযুক্ত ও অটুট ব্যবস্থাপনার মিলিত অংশ। ইউসুফের স্রষ্টা ও রক্ষকই কাফেলাকে পথ থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন এবং কাফেলার লোকদেরকে এই অন্ধ কূপে প্রেরণ করেছেন। সাধারণ মানুষ যেসব ঘটনাকে আকস্মিক – ব্যাপারাধীন মনে করে, সেগুলোর অবস্থাও তদ্রূপ। দার্শনিকরা এগুলোকে দৈবাধীন ঘটনা আখ্যা দিয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এটা প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টজগতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অজ্ঞতার

পরিচায়ক। নতুবা সৃষ্টিপরম্পরায় দৈবাৎ কোন কিছু হয় না। আল্লাহ্ তাআলার অবস্থা হচ্ছে فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ (তিনি যা ইচ্ছা, তাই করেন।) তিনি গোপন রহস্যের অধীনে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যে, বাহ্যিক ঘটনাবলীর সাথে তার কোন সম্পর্ক বোঝা যায় না। মানুষ একেই দৈব ঘটনা মনে করে বসে।

মোটকথা, কাফেলার মালেক ইবনে দো'বর নামে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি এই কূপে পৌছলেন এবং বালতি নিক্ষেপ করলেন। ইউসুফ (আঃ) সর্বশক্তিমানের সাহায্য প্রত্যক্ষ করে বালতির রশি শক্ত করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির সাথে একটি সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল দৃষ্টিতে ভেসে উঠল। এ মুখমণ্ডলের ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও উপস্থিত ক্ষেত্রেও অনুপম সৌন্দর্য ও গুণ-গত উৎকর্ষের নিদর্শনাবলী তার মহত্ত্বের কম পরিচায়ক ছিল না। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কূপের তলদেশ থেকে ভেসে উঠা এই অল্পবয়স্ক, অপরূপ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে মালেক সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল ঃ يَٰبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَٰمٌ – আরে, আনন্দের কথা– এ তো বড় চমৎকার এক কিশোর বের হয়ে এসেছে। সহীহ্ মুসলিমের মি'রাজ রজনীর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমি ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের পর দেখলাম যে, আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র বিশ্বের রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেক তাঁকে দান করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সমগ্র বিশ্বে বন্টন করা হয়েছে।

وَأَسَرُّوهُ بِضَٰعَةً — অর্থাৎ , তারা তাঁকে একটি পণ্যদ্রব্য মনে করে গোপন করে ফেলল। উদ্দেশ্য এই যে, শুরুতে তো মালেক ইবনে দো'বর এ কিশোরকে দেখে অবাক বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল ; কিন্তু পরে চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করল যে, এটা জানাজানি না হওয়া উচিত এবং গোপন করে ফেলা দরকার, যাতে একে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ লাভ করা যায়। সমগ্র কাফেলার মধ্যে এ বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে সবাই এতে অংশীদার হয়ে যাবে।

এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ (আঃ) -এর ভ্রাতারা বাস্তব ঘটনা গোপন করে তাকে পণ্যদ্রব্য করে নিল, যেমন কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ইয়াহুদা প্রত্যহ ইউসুফ (আঃ)-কে কূপের মধ্যে খানা পৌছানোর জন্যে যেতো। তৃতীয় দিন তাকে কূপের মধ্যে না পেয়ে সে ফিরে এসে ভাইদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করল ঃ অতঃপর সব ভাই একত্রে সেখানে পৌছল এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর কাফেলার লোকদের কাছ থেকে ইউসুফকে বের করল। তখন তারা বলল ঃ এই ছেলেটি আমাদের গোলাম। পলায়ন করে এখানে এসেছে। তোমরা একে কব্জায় নিয়ে খুব খারাপ কাজ করেছ। একথা শুনে মালেক ইবনে দো'বর ও তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে গেল যে, তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হবে। তাই ভাইদের সাথে তাকে ক্রয় করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগল।

এমতবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, ইউসুফ ভ্রাতারা নিজেরাই ইউসুফকে পণ্যদ্রব্য স্থির করে বিক্রি করে দিল।

وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ -অর্থাৎ তাদের সব কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ তাআলার জানা ছিল।

উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা কি করবে এবং তাদের কাছ থেকে ক্রেতা কাফেলা কি করবে— সব আল্লাহ্ তাআলার জানা ছিল। তিনি তাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়ারও শক্তি রাখতেন। কিন্তু বিশেষ কোন রহস্যের কারণেই আল্লাহ্ তাআলা এসব পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করেননি ; বরং নিজস্ব পথে চলতে দিয়েছেন।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍ –আরবী ভাষায় شراء শব্দ ক্রয় করা ও বিক্রয় করা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলেও উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। যদি সর্বনামকে ইউসুফ ভ্রাতাদের দিকে ফেরানো হয়, তবে বিক্রয় করার অর্থ হবে এবং কাফেলার লোকদের দিকে ফেরানো হলে ক্রয় করার অর্থ হবে। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা বিক্রয় করে দিল কিংবা কাফেলার লোকেরা ইউসুফকে খুব সস্তা মূল্যে অর্থাৎ নামে মাত্র কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল।

কুরতুবী বলেন ঃ আরব বণিকদের অভ্যাস ছিল, তারা মোটা অঙ্কের লেন-দেন পরিমাপের মাধ্যমে করত এবং চল্লিশের উর্ধ্বে নয়, এমন লেন-দেন গণনার মাধ্যমে করত। তাই دَرَٰهِمَ শব্দের সাথে مَعْدُودَةٍ (গুণাগুনতি) শব্দের প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় যে, দিরহামের পরিমাণ চল্লিশের কম ছিল। ইবনে কাসীর আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে লেখেন ঃ বিশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছিল এবং দশ ভাই দুই দিরহাম করে নিজেদের মধ্যে তা বন্টন করে নিয়েছিল।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রাথমিক জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, কাফেলার লোকেরা যখন তাঁকে কূপ থেকে উদ্ধার করল, তখন ভ্রাতারা তাঁকে নিজেদের পলাতক ক্রীতদাস আখ্যা দিয়ে গুটিকতক দিরহামের বিনিময়ে তাঁকে বিক্রি করে দিল। প্রথমতঃ এ কারণে যে, তারা এ মহাপুরুষের সঠিক মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। দ্বিতীয়তঃ তাদের আসল লক্ষ্য তাঁর দ্বারা টাকা-পয়সা উপার্জন করা ছিল না; বরং পিতার কাছ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়াই ছিল মূল লক্ষ্য। তাই শুধু বিক্রি করে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি ; বরং তারা আশঙ্কা করছিল যে, কাফেলার লোকেরা তাকে এখানেই ছেড়ে যাবে এবং অতঃপর সে কোন রকমে পিতার কাছে পৌছে আগাগোড়া চক্রান্ত ফাঁস করে দেবে। তাই তফসীরবিদ মুজাহিদের বর্ণনা অনুযায়ী, তারা কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করল। যখন কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল, তখন তারা কিছুদূর পর্যন্ত কাফেলার পেছনে পেছনে গেল এবং তাদেরকে বলল ঃ দেখ, এর পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। একে মুক্ত ছেড়ে দিয়ো না; বরং বেঁধে রাখ। এ অমূল্য নিধির মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ কাফেলার লোকেরা তাঁকে এমনিভাবে মিসরে নিয়ে গেল।— (ইবনে-কাসীর)

এর পরবর্তী ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত রয়েছে। কোরআনের নিজস্ব সংক্ষিপ্তকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী কাহিনীর যতটুকু অংশ আপনা-আপনি বোঝা যায়, তার বেশী উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করা হয়নি; উদাহরণতঃ কাফেলার বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করে মিসর পর্যন্ত পৌছা, সেখানে পৌছে ইউসুফ (আঃ)-কে বিক্রি করে দেয়া ইত্যাদি। এগুলো ছেড়ে দিয়ে অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِٱمْرَأَتِهِۦٓ أَكْرِمِى مَثْوَىٰهُ - অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইউসুফ (আঃ) -কে মিসরে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল ঃ ইউসুফের বসবাসের সুবন্দোবস্ত কর।

তফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে ঃ কাফেলার লোকেরা তাঁকে মিসর নিয়ে যাওয়ার পর বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করতেই ক্রেতারা প্রতিযোগিতামূলকভাবে দাম বলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ইউসুফ (আঃ) -এর ওজনের সমান স্বর্ণ, সমপরিমাণ মৃগনাভি এবং সমপরিমাণ রেশমী

বস্ত্র দাম সাব্যস্ত হয়ে গেল।

আল্লাহ্ তাআলা এ রত্ন আযীযে মিসরের জন্যে অবধারিত করেছিলেন। তিনি বিনিময়ে উল্লেখিত দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ইউসুফ (আঃ)-কে ক্রয় করে নিলেন।

কোরআনের পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে জানা গেছে যে, এগুলো কোন দৈবাৎ ঘটনা নয়; বরং বিশ্ব পালকের রচিত অটুট ব্যবস্থাপনার অংশমাত্র। তিনি মিসরে ইউসুফ (আঃ)-কে ক্রয় করার জন্যে এ দেশের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন। ইবনে-কাসীর বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইউসুফ (আঃ)-কে ক্রয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন মিসরের অর্থমন্ত্রী। তাঁর নাম কিতফীর কিংবা ইতফীর বলা হয়ে থাকে। তখন মিসরের সম্রাট ছিলেন আমালেকা জাতির জনৈক ব্যক্তি রাইয়ান ইবনে ওসায়দ। তিনি পরবর্তীকালে ইউসুফ (আঃ)-এর হাতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁরই জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।—(মাযহারী) ক্রেতা আযীযে মিসরের স্ত্রীর নাম ছিল রাঈল কিংবা যুলায়খা। আযীযে-মিসর 'কিতফীর' ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন ঃ তাকে বসবাসের উত্তম জায়গা দাও-ক্রীতদাসের মত রেখো না এবং তার প্রয়োজনাদির সুবন্দোবস্ত কর।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং চেহারা দেখে শুভাশুভ নিরূপণকারী প্রমাণিত হয়েছেন। প্রথম, আযীযে-মিসর। তিনি স্বীয় নিরূপণ শক্তি দ্বারা ইউসুফ (আঃ)-এর গুণাবলী অবহিত হয়ে স্ত্রীকে উপরোক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়, হযরত শোআয়েব (আঃ)-এর ঐ কন্যা, যে মূসা (আঃ) সম্পর্কে পিতাকে বলেছিল ঃ يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ পিতঃ, 'তাকে চাকর রেখে দিন। কেননা, উত্তম চাকর ঐ ব্যক্তি, যে সবল, সুঠাম ও বিশ্বস্ত হয়।' তৃতীয় হযরত আবুবকর সিদ্দীক, যিনি ফারূকে আযম (রাঃ)-কে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেছিলেন। -(ইবনে কাসীর)

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ —অর্থাৎ, এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠা দান করলাম। এতে ভবিষ্যৎ ঘটনার সুসংবাদ রয়েছে যে, যে ইউসুফ এখন ক্রীতদাসের বেশে আযীযে মিসরের গৃহে প্রবেশ করেছে, অতি সত্বর সে মিসরের সর্বপ্রধান ব্যক্তি হবে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করবে।

وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ - এখানে শুরুতে و কে عطف এর অর্থে নিলে এ অর্থেরই একটি বাক্য উহ্য মেনে নেয়া হবে। অর্থাৎ, আমি ইউসুফ (আঃ)-কে রাজত্ব দান করেছি, যাতে সে পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচারের মাধ্যমে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে, এ দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারে এবং তাকে আমি বাক্যাদির পরিপূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি শিক্ষা দেই। উপরোক্ত কথাটি ব্যাপক অর্থবহ। ওহী যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করা, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা, যাবতীয় জরুরী জ্ঞান অর্জিত হওয়া, স্বপ্নের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ - অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কর্মে প্রবল ও শক্তিমান। যাবতীয় বাহ্যিক কারণ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সংঘটিত হয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যখন আল্লাহ্ তাআলা কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়ার সব উপকরণ তাঁর জন্যে প্রস্তুত করে দেন।

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য বুঝে না। তারা বাহ্যিক উপকরণাদিকেই সবকিছু মনে করে এগুলোর চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে এবং উপকরণ সৃষ্টিকারী ও সর্বশক্তিমানের কথা ভুলে যায়।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا —অর্থাৎ, যখন ইউসুফ (আঃ) পূর্ণ শক্তি ও যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও বুৎপত্তি দান করলাম।

'শক্তি ও যৌবন, কোন্ বয়সে অর্জিত হল, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ তখন বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। যাহ্হাক বিশ বছর এবং হাসান বসরী চল্লিশ বছর বর্ণনা করেছেন। তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করার অর্থ এস্থলে নবুওয়ত দান করা। এতে আরও জানা গেল যে, ইউসুফ (আঃ) মিসর পৌছারও অনেক পরে নবুওয়ত লাভ করেছিলেন। কূপের গভীরে যে ওহী তার কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, তা নবুওয়তের ওহী ছিল না; বরং আভিধানিক 'ওহী' ছিল, যা পয়গম্বর নয়-এমন ব্যক্তির কাছেও প্রেরণ করা যায়; যেমন মূসা (আঃ)-এর জননী এবং হযরত ঈসা (আঃ) -এর মাতা মরিয়ম সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে।

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ —আমি সৎকর্মশীলদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজত্ব ও সম্মান পর্যন্ত পৌছানো ছিল ইউসুফ (আঃ)-এর সদাচরণ, আল্লাহ্ ভীতি ও সৎকর্মের পরিণতি। এটা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য নয়, যে কেউ এমন সৎকর্ম করবে, সে এমনিভাবে আমার পুরস্কার লাভ করবে।

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ
وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ
رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ
قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ
مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾
قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا
إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾
وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ
كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۚ
وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ
نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ
نَفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٠﴾

(২৩) আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল, ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বলল ঃ শুন! তোমাকে বলছি, এদিকে আস। সে বলল ঃ আল্লাহ্ রক্ষা করুন; তোমার স্বামী আমার মালিক। তিনি আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমা লংঘনকারীগণ সফল হয় না। (২৪) নিশ্চয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত। যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করত। এমনিভাবে হয়েছে, যাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ বিষয় ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন। (২৫) তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বলল ঃ যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তাকে কারাগারে পাঠানো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া ছাড়া তার আর কি শাস্তি হতে পারে? (২৬) ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ সে-ই আমাকে আত্মসংবরণ না করতে ফুসলিয়েছে। মহিলার পরিবারের জনৈক সাক্ষী দিল যে, যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদি। (২৭) এবং যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী (২৮) অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন, তখন সে বলল ঃ নিশ্চয় এটা তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক। (২৯) ইউসুফ এ প্রসঙ্গ ছাড়। আর হে নারী। এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তুমি-ই পাপাচারিনী। (৩০) নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। সে তার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতেপাচ্ছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ

অর্থাৎ, যে মহিলার গৃহে ইউসুফ (আঃ) থাকতেন, সে তাঁর প্রকৃতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং তাঁর সাথে কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে তাঁকে ফুসলাতে লাগল। সে গৃহের সব দরজা বন্ধ করে দিল এবং তাঁকে বলল ঃ শীঘ্র এসে যাও, তোমাকেই বলছি।

প্রথম আয়াতে জানা গিয়েছিল যে, এ মহিলা ছিল আযীযে মিসরের স্ত্রী। কিন্তু এ স্থলে কোরআন 'আযীয-পত্নী' এই সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে 'যার গৃহে সে ছিল' এ শব্দ ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা এ কারণে আরও অধিক কঠিন ছিল যে, তিনি তারই গৃহে-তারই আশ্রয়ে থাকতেন। তার আদেশ উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না।

গোনাহ্ থেকে বাঁচার প্রধান অবলম্বন স্বয়ং আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা ঃ এর বাহ্যিক কারণ ঘটে এই যে, ইউসুফ (আঃ) যখন নিজেকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত দেখলেন, তখন পয়গম্বরসুলভ ভঙ্গিতে সর্বপ্রথম আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ তিনি শুধু নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পের উপর ভরসা করেননি। এটা জানা কথা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আশ্রয় লাভ করে, তাকে কেউ বিশুদ্ধ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। অতঃপর তিনি পয়গম্বরসুলভ বিজ্ঞতা ও উপদেশ প্রয়োগ করে স্বয়ং যুলায়খাকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে, তারও উচিত আল্লাহ্কে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা থেকে বিরত থাকা। তিনি বললেন ঃ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ তিনি আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে সুখে রেখেছেন। মনে রেখো, অত্যাচারীরা কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না।

বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমার স্বামী আযীযে-মিসর আমাকে লালন-পালন করেছেন, আমাকে উত্তম জায়গা দিয়েছেন। অতএব তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী। আমি তাঁর ইয্যতে হস্তক্ষেপ করব? এটা জঘন্য অনাচার, অথচ অনাচারীরা কখনও কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না। এভাবে তিনি যেন স্বয়ং যুলায়খাকেও এ শিক্ষা দিলেন যে, আমি কয়েকদিন লালন-পালনের কৃতজ্ঞতা যখন এতটুকু স্বীকার করি, তখন তোমাকে আরও বেশী স্বীকার করা দরকার।

এখানে ইউসুফ (আঃ) আযীযে-মিসরকে স্বীয় 'রব' – পালন কর্তা বলেছেন। অথচ এ শব্দটি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বৈধ নয়। কারণ, এ ধরনের শব্দ শেরকের ধারণা সৃষ্টিকারী এবং মুশরেকদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করার কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে, কোন দাস স্বীয় প্রভুকে 'রব' বলতে পারবে না এবং কোন প্রভু স্বীয় দাসকে 'বন্দা' বলতে পারবে না। কিন্তু এ হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য। এতে শেরক নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে এমন বিষয়বস্তুকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা শেরকের উপায় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তে শেরককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হলেও কারণ এবং উপায়াদির উপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। এ কারণে পূর্ববর্তী

শরীয়তসমূহে চিত্র নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে বিধায় একে শেরক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত রাখার কারণে শিরকের উপায়াদি তথা চিত্র ও শেরকের ধারণা সৃষ্টিকারী শব্দাবলীও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোটকথা, ইউসুফ (আঃ) এর إِنَّهُ رَبِّي 'তিনি আমার পালনকর্তা' বলা স্বস্থানে ঠিকই ছিল।

পক্ষান্তরে انه শব্দের সর্বনামটি আল্লাহ্র দিকে ফেরানোও সম্ভবপর। অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ্কেই 'রব' বলেছেন। বসবাসের উত্তম জায়গাও প্রকৃতপক্ষে তিনিই দিয়েছেন। সেমতে তাঁর অবাধ্যতা সর্ববৃহৎ জুলুম। এরূপ জুলুমকারী কখনও সফল হয় না।

সুদ্দী ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, এ নির্জনতায় যুলায়খা ইউসুফ (আঃ)-কে আকৃষ্ট করার জন্যে তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল। সে বলল ঃ তোমার মাথার চুল কত সুন্দর! ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ মৃত্যুর পর এই চুল সর্বপ্রথম আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরপর যুলায়খা বলল ঃ তোমার নেত্রদ্বয় কতই না মনের! ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হবে। যুলায়খা আরও বলল ঃ তোমার মুখমণ্ডল কতই না কমনীয়! ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ এগুলো সব মৃত্তিকার খোরাক। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মনে পরকালের চিন্তা এতে বেশী প্রবল করে দেন যে, ভরা যৌবনেও জগতের যাবতীয় ভোগ-বিলাস তাঁর দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। সত্য বলতে কি পরকালের চিন্তাই মানুষকে সর্বত্র সব অনিষ্ট থেকে নির্লিপ্ত রাখতে পারে।

পূর্ববর্তী আয়াতে ইউসুফ (আঃ) -এর বিরাট পরীক্ষা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, আযীযে-মিসরের স্ত্রী যুলায়খা গৃহের দরজা বন্ধ করে তাকে পাপকাজের দিকে আহবান করতে সচেষ্ট হল এবং নিজের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত করার সব উপকরণ উপস্থিত করে দিল, কিন্তু ইজ্জতের মালিক আল্লাহ্ এ সৎ যুবককে এহেন অগ্নিপরীক্ষায় দৃঢ়পদ রাখলেন। এর আরও বিবরণ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, যুলায়খা তো পাপকাজের কল্পনায় বিভোরই ছিল, ইউসুফ (আঃ)-এর মনেও মানবিক স্বভাববশতঃ কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা ঠিক সেই মুহূর্তে স্বীয় যুক্তি প্রমাণ ইউসুফ (আঃ)-এর সামনে তুলে ধরেন, যদ্দরুন সেই অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক ক্রমবর্ধিত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং তিনি মহিলার নাগপাশ ছিন্ন করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন।

এ আয়াতে هم শব্দটি (কল্পনা অর্থে) যুলায়খা ও ইউসুফ (আঃ)-উভয়ের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا একথা সুনিশ্চিত যে, যুলায়খার কল্পনা ছিল পাপকাজের কল্পনা। এতে ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কেও এ ধরনের ধারণা হতে পারত। অথচ মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী এটা নবুওয়ত ও রেসালতের পরিপন্থী। কেননা, সকল মুসলিম মনীষীই এ বিষয়ে একমত যে, পয়গম্বরগণ সর্বপ্রকার সগীরা ও কবীরা গোনাহ্ থেকে পবিত্র থাকেন। তাঁদের দ্বারা কবীরা গোনাহ্ ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা ভুলবশতঃ কোনরূপেই হতে পারে না। তবে সগীরা গোনাহ্ অনিচ্ছা ও ভুলবশতঃ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাঁদেরকে এর উপরও সক্রিয় থাকতে দেয়া হয় না; বরং সতর্ক করে তা থেকে সরিয়ে আনা হয়।

পয়গম্বরগণের পবিত্রতার এ বিষয়টি কোরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত হওয়া ছাড়াও তাঁদের যোগ্যতার প্রশ্নেও জরুরী। কেননা, যদি পয়গম্বরগণের দ্বারা গোনাহ্ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাঁদের আনীত ধর্ম ও ওহীর প্রতি আস্থার কোন উপায় থাকে না এবং তাঁদেরকে প্রেরণ ও তাঁদের প্রতি গ্রন্থ অবতারণের কোন উপকারিতাও অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক পয়গম্বরকেই গোনাহ থেকে পবিত্র রেখেছেন।

সহীহ্ বুখারীর হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা আমার উম্মতের এমন পাপচিন্তা ও কল্পনা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা সে কার্যে পরিণত করে না। (কুরতুবী)

বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলেন ঃ আমার বন্দা যখন কোন সৎকাজের ইচ্ছা করে, তখন শুধু ইচ্ছার কারণে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও। যদি সে সৎকাজটি সম্পন্ন করে, তবে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি কোন পাপকাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর আল্লাহ্র ভয়ে তা পরিত্যাগ করে, তখন পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও এবং যদি পাপকাজটি করেই ফেলে তবে একটি গোনাহ্ই লিপিবদ্ধ কর।—(ইবনে-কাসীর)

মোটকথা এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর অন্তরে যে কল্পনা অথবা ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। এটা গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর এ ধারণার বিপক্ষে কাজ করার দরুন আল্লাহ্ তাআলার কাছে তাঁর মর্যাদা আরও বেড়ে গেছে।

لَوْلَا أَنْ رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ অংশটি পরে উল্লেখ করা হলেও তা আসলে অগ্রে রয়েছে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর মনেও কল্পনা সৃষ্টি হত, যদি তিনি আল্লাহ্র প্রমাণ অবলোকন না করতেন। কিন্তু পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করার কারণে তিনি এ কল্পনা থেকে বেঁচে গেলেন। এ বিষয়বস্তুটি সঠিক, কিন্তু কোন কোন তফসীরবিদ এ অগ্র-পশ্চাৎকে ব্যাকরণিক ভুল আখ্যা দিয়েছেন। এদিক দিয়েও প্রথম তফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ, এতে ইউসুফ (আঃ)-এর আল্লাহ্ ভীতি ও পবিত্রতার মাহাত্ম্য আরও উচ্চে চলে যায়। কেননা, তিনি স্বাভাবিক ও মানবিক ঝোঁক সত্ত্বেও গোনাহ্ থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন।

لَوْلَا أَنْ رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ এখানে এর جزاء উহ্য রয়েছে। অর্থ এই যে, যদি তিনি পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন না করতেন, তবে এ কল্পনাতেই লিপ্ত থাকতেন। পালনকর্তার প্রমাণ দেখে নেয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও ধারণা অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল।

স্বীয় পালনকর্তার যে প্রমাণ ইউসুফ (আঃ)-এর দৃষ্টির সামনে এসেছিল, তা কি ছিল কোরআন পাক তা ব্যক্ত করেনি। এ কারণেই এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণ নানা মত ব্যক্ত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, হাসান বসরী (রহঃ) প্রমুখ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা মু'জেযা হিসেবে এ নির্জন কক্ষে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর চিত্র এভাবে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করে দেন যে, তিনি হাতের অঙ্গুলি দাঁতে চেপে তাঁকে হুশিয়ার করেছেন। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আযীযে-মিসরের মুখচ্ছবি তাঁর সম্মুখে ফুটিয়ে তোলা হয়। কেউ বলেন ঃ ইউসুফ (আঃ)-এর দৃষ্টি ছাদের দিকে উঠতেই সেখানে কোরআন পাকের এ আয়াত লিখিত দেখলেন ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا — অর্থাৎ, ব্যাভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। কেননা, এটা খুবই নির্লজ্জতা, (খোদায়ী শাস্তির কারণ) এবং (সমাজের জন্যে) অত্যন্ত মন্দ পথ। কেউ কেউ বলেছেন ঃ যুলায়খার গৃহে একটি মূর্তি ছিল। সে বিশেষ মুহূর্তটিতে যুলায়খা সেই মূর্তিটি কাপড় দ্বারা আবৃত করলে ইউসুফ (আঃ)-এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল ঃ এটা আমার উপাস্য। এর সামনে গোনাহ্ করার মত সাহস আমার নেই। ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ আমার উপাস্য আরও বেশী লজ্জা করার যোগ্যতাসম্পন্ন। তাঁর দৃষ্টিকে কোন পর্দা ঠেকাতে পারে না। কারও কারও মতে ইউসুফ (আঃ)-এর নবুওয়ত ও বিভুজ্ঞানই ছিল স্বয়ং পালনকর্তা সম্পর্কে তাঁর এই দিব্যদৃষ্টির কারণ।

তফসীরবিদ ইবনে-কাসীর এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য করেছেন, তা সব সুধীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ কোরআন-পাক যতটুকু বিষয় বর্ণনা করেছে, ততটুকু নিয়েই ক্ষান্ত থাকা দরকার। অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) এমন কিছু দেখেছেন, যদ্দরুন তাঁর মন থেকে সীমালংঘন করার সামান্য ধারণাও বিদূরিত হয়ে গেছে। এ বস্তুটি কি ছিল — তফসীরবিদগণ যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন; সেগুলোর যে কোন একটি হতে পারে; তাই নিশ্চিতরূপে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করা যায় না।—(ইবনে কাসীর)

كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

অর্থাৎ, আমি ইউসুফ (আঃ)-কে এ প্রমাণ এজন্যে দেখিয়েছি, যাতে তার কাছ থেকে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে দূরে সরিয়ে দেই। 'মন্দ কাজ' বলে সগীরা গোনাহ্ এবং 'নির্লজ্জতা' বলে কবীরা গোনাহ্ বোঝানো হয়েছে।—(মাযহারী)

এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে ইউসুফ; (আঃ)-এর কাছ থেকে সরানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইউসুফ (আঃ)-কে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতা থেকে সরানোর কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ) নবুওয়তের কারণে এ গোনাহ্ থেকে নিজেই দূরে ছিলেন, কিন্তু মন্দ কাজ নির্লজ্জতা তাঁকে আবেষ্টন করার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আমি এর জাল ছিন্ন করে দিয়েছি। কোরআন পাকের এ ভাষাও সাক্ষ্য দেয় যে, ইউসুফ (আঃ) কোন সামান্যতম গোনাহেও লিপ্ত হননি এবং তাঁর মনে যে কল্পনা জাগরিত হয়েছিল, তা গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নতুবা এখানে এভাবে ব্যক্ত করা হত যে, আমি ইউসুফকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে দিলাম- এভাবে বলা হত না যে, গোনাহকে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম।

কেননা, ইউসুফ আমার মনোনীত বন্দাদের একজন। এখানে مخلصين শব্দটি লামের যবর-যোগ مخلص এর বহুবচন। এর অর্থ মনোনীত। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার ঐ সব বন্দার অন্যতম, যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্ রেসালতের দায়িত্ব পালন ও মানবজাতির সংশোধনের জন্যে মনোনীত করেছেন। এমন লোকের চারপাশে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেফাজতের পাহারা থাকে, যাতে তাঁরা কোন মন্দ কাজে লিপ্ত হতে না পারেন। স্বয়ং শয়তানও তার বিবৃতিতে একথা স্বীকার করেছে যে, আল্লাহ্র মনোনীত বন্দাদের উপর তার কলা-কৌশল অচল। শয়তানের উক্তি এই ঃ

আপনার ইয্যত ও শক্তির কসম, আমি সব মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করব, তবে যেসব বন্দাকে আপনি মনোনীত করেছেন, তাদেরকে ছাড়া।

কোন কোন কেরাআতে এ শব্দটি مخلصين লামের যের-যোগেও পঠিত হয়েছে। مخلص ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র এবাদত ও আনুগত্য আন্তরিকতার সাথে করে— এতে কোন পার্থিব ও প্রবৃত্তিগত উদ্দেশ্য, সুখ্যাতি ইত্যাদির প্রভাব থাকে না। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তিই স্বীয় কর্ম ও এবাদতে আন্তরিক হয়, পাপ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা তাকে সাহায্য করেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা দু'টি শব্দ سوء ও فحشاء ব্যবহার করেছেন। প্রথমটির শাব্দিক অর্থ মন্দ কাজ এবং এর দ্বারা সগীরা গোনাহ্ বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-কে সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গোনাহ্ থেকেই মুক্ত রেখেছেন।

এ থেকে আরও বোঝা গেল যে, কোরআনে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি যে هم অর্থাৎ, কল্পনা শব্দটিকে সমৃদ্ধযুক্ত করা হয়েছে, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল, যা কবীরা ও সগীরা কোন প্রকারের গোনাহেরই অন্তর্ভুক্ত নয়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে যে, আযীযে-মিসরের পত্নী যখন ইউসুফ (আঃ)-কে পাপে লিপ্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃতা ছিল এবং ইউসুফ (আঃ) তা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মনে স্বাভাবিক ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বিধা-দ্বন্দ্বও ছিল, তখন আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় মনোনীত পয়গম্বরের সাহায্যার্থে অলৌকিকভাবে কোন এমন বস্তু তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করে দেন, যার ফলে সে অনিচ্ছাকৃত কল্পনাও তাঁর মন থেকে উধাও হয়ে যায়। সে বস্তুটি পিতা ইয়াকুব (আঃ)-এর আকৃতিই হোক কিংবা ওহীর কোন আয়াত।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ) এক নির্জন কক্ষে খোদায়ী প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই সেখান থেকে পলায়নোদ্যত হলেন এবং বাইরে চলে যাওয়ার জন্যে দরজার দিকে দৌড় দিলেন। আযীয-পত্নী তাঁকে ধরার জন্যে পেছনে দৌড় দিল এবং তাঁর জামা ধরে তাঁকে বহির্গমনে বাধা দিতে চাইল। তিনি পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়সংকল্প, তাই থামলেন না। ফলে জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে গেল। ইত্যবসরে ইউসুফ (আঃ) দরজার বাইরে চলে গেলেন এবং তাঁর পশ্চাতে যুলায়খাও তথায় উপস্থিত হল। ঐতিহাসিকসূত্রে বর্ণিত আছে যে, দরজা তালাবদ্ধ ছিল। ইউসুফ (আঃ) দৌড়ে দরজায় পৌছতেই আপনা-আপনি তালা খুলে নীচে পড়ে গেল।

উভয়ে দরজার বাইরে এসে আযীযে-মিসরকে সামনেই দন্ডায়মান দেখতে পেল। তার পত্নী চমকে উঠল এবং কথা বানিয়ে ইউসুফ (আঃ)-এর উপর দোষ ও অপবাদ চাপানোর জন্যে বলল ঃ যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি এ ছাড়া কি হতে পারে যে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে অথবা অন্য কোন কঠোর দৈহিক নির্যাতন।

ইউসুফ (আঃ) পয়গম্বরসুলভ ভদ্রতার খাতিরে সম্ভবতঃ সেই মহিলার গোপন অভিসন্ধির তথ্য প্রকাশ করতেন না, কিন্তু যখন সে নিজেই এগিয়ে এসে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের ইঙ্গিত করল, তখন বাধ্য হয়ে তিনিও সত্য প্রকাশ করে বললেন ঃ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي অর্থাৎ, সে-ই আমার দ্বারা স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করার জন্যে ফুসলাচ্ছিল।

ব্যাপার ছিল খুবই নাজুক এবং আযীযে-মিসরের পক্ষে কে সত্যবাদী, তার মীমাংসা করা সুকঠিন ছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণের কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে স্বীয় মনোনীত বন্দাদেরকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে নিষ্পাপ ও পবিত্র রাখেন, এমনিভাবে তাঁদেরকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রাখার অলৌকিকভাবে ব্যবস্থাও করে দেন। সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে কথা বলতে অক্ষম-এরূপ কচি শিশুদেরকে কাজে লাগানো হয়েছে। অলৌকিকভাবে তাদেরকে বাকশক্তি দান করে প্রিয় বন্দাদের পবিত্রতা সপ্রমাণ করা হয়েছে। যেমন হযরত মরিয়মের প্রতি যখন লোকেরা অপবাদ আরোপ করতে থাকে, তখন একদিনের কচি শিশু ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা বাকশক্তি দান করে তাঁর মুখে জননীর পবিত্রতা প্রকাশ করে দেন এবং স্বীয় কুদরতের একটি বিশেষ দৃশ্য সবার সামনে প্রকাশ করেন। বনী-ইসরাঈলের একজন সাধু ব্যক্তি জুরাইজের প্রতি গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এমনি ধরনের এক অপবাদ আরোপ করা হলে নবজাত শিশু সেই ব্যক্তির পবিত্রতার সাক্ষ্য দান করে। মূসা (আঃ)-এর প্রতি ফেরাউনের মনে সন্দেহ দেখা দিলে ফেরাউন-পত্নীর কেশ পরিচর্যাকারিণী মহিলার সদ্যজাত শিশু বাকশক্তি প্রাপ্ত হয়। সে মূসা (আঃ)-কে শৈশবে ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা করে।

ঠিক এমনিভাবে ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী একটি কচি শিশুকে আল্লাহ্ তাআলা বিজ্ঞ ও দার্শনিক সুলভ বাকশক্তি দান করলেন। এ কচি শিশু এ গৃহেই দোলনায় লালিত হচ্ছিল। তার সম্পর্কে ধারণা ছিলনা যে, সে এসব কর্মকান্ড দেখবে এবং বুঝবে, অতঃপর অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তা বর্ণনাও করে দেবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান স্বীয় আনুগত্যের পথে সাধনাকারীদের সঠিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলার জন্যে জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দেন যে, বিশ্বের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু তাঁর গুপ্ত বাহিনী। এরা অপরাধীকে ভালভাবেই চেনে, তার অপরাধের রেকর্ড রাখে এবং প্রয়োজন মুহূর্তে তা প্রকাশও করে দেয়। হাশরের ময়দানে হিসাব-কিতাবের সময় মানুষ যখন স্বীয় অপরাধসমূহ স্বীকার করতে অস্বীকার করবে, তখন তারই হস্তপদ, চর্ম ও গৃহপ্রাচীরকে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদাতারূপে দাঁড় করানো হবে। তারা তার প্রত্যেকটি কর্মকান্ড হাশরের লোকারণ্যের মধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেবে। তখন মানুষ বুঝতে পারবে যে, হস্তপদ, গৃহপ্রাচীর ও রক্ষা ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কোনটিই তার আপন ছিল না; বরং এরা সবাই ছিল রাব্বুল আলামীনের গোপন বাহিনী।

মোটকথা এই যে, যে ছোট্ট শিশুটি বাহ্যতঃ জগতের সবকিছু থেকে উদাসীন ও নির্বিকার অবস্থায় দোলনায় পড়েছিল, সে ইউসুফ (আঃ)-এর মু'জেযা হিসেবে ঠিক ঐ মুহূর্তে মুখ খুলল, যখন আযীযে-মিশর ছিল এ ঘটনা সম্পর্কে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত।

এ শিশুটি যদি এতটুকুই বলে দিত যে, ইউসুফ (আঃ) নির্দোষ এবং দোষ যুলায়খার, তবে তাও একটি মু'জেযারূপে ইউসুফ (আঃ)-এর পক্ষে তাঁর পবিত্রতার বিরাট সাক্ষ্য হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এ শিশুর মুখে একটি দার্শনিকসুলভ উক্তি উচ্চারণ করিয়েছেন যে, ইউসুফ (আঃ)-এর জামাটি দেখ—যদি তা সামনের দিকে ছিন্ন থাকে, যুলায়খার কথা সত্য ইউসুফ (আঃ) মিথ্যাবাদীরূপে সাব্যস্ত হবেন। পক্ষান্তরে যদি জামাটি পেছন দিকে ছিন্ন থাকে, তবে এতে এ ছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই নেই যে, ইউসুফ (আঃ) পলায়নরত ছিলেন এবং যুলায়খা তাঁকে পলায়নে বাধা দিতে চাচ্ছিল।

শিশুর বাকশক্তির অলৌকিকতা ছাড়াও এ বিষয়টি প্রত্যেকের হৃদয়ঙ্গম হতে পারত। অতঃপর যখন বর্ণিত আলামত অনুযায়ী জামাটি পেছন দিকে ছিন্ন দেখা গেল, তখন বাহ্যিক আলামতদৃষ্টেও ইউসুফ (আঃ)-এর পবিত্রতা সপ্রমাণ হয়ে গেল।

'সাক্ষ্যদাতা'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে, সে ছিল একটি কচি শিশু, যাকে আল্লাহ্ তাআলা অলৌকিকভাবে বাকশক্তি দান করেন। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে এ ব্যাখ্যা প্রমাণিত রয়েছে। ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদে, ইবনে হাব্বান স্বীয় গ্রন্থে এবং হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে এটি উল্লেখ করে বর্ণনাটিকে সহীহ্ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

কতিপয় বিধান ও মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় বিধান ও মাসআলা বোঝা যায় ঃ

মাসআলা ঃ (১) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, যে জায়গায় পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সে জায়গাকেই পরিত্যাগ করা উচিত; যেমন ইউসুফ (আঃ) সেখান থেকে পলায়ন করে এর প্রমাণ দিয়েছেন।

মাসআলা ঃ (২) আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশাবলী পালনে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার ত্রুটি না করা মানুষের অবশ্যই কর্তব্য; যদিও এর ফলাফল বাহ্যতঃ বের হতে দেখা না যায়। ফলাফল আল্লাহ্র হাতে। মানুষের কাজ হল স্বীয় শ্রম ও সাধ্যকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দাসত্বের পরিচয় দেয়া; যেমন ইউসুফ (আঃ) সব দরজা বন্ধ হওয়া এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তালাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দরজার দিকে দৌড় প্রদানে নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছেন। এহেন অবস্থায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্যের আগমনও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা হয়। বন্দা যখন নিজের চেষ্টা পূর্ণ করে ফেলে তখন আল্লাহ্র সাফল্যের উপকরণাদিও সরবরাহ করেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের শেষ দু'আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আযীযে-মিসর শিশুটির এভাবে কথা বলা দ্বারাই বোঝে নিয়েছিলেন যে, ইউসুফ (আঃ)-এর পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্যেই এ অস্বাভাবিক ঘটনার অবতারণা হয়েছে। অতঃপর তা বক্তব্য অনুযায়ী যখন দেখল যে, ইউসুফ (আঃ)-এর জামাটিও পেছন দিক থেকেই ছিন্ন, সে তখন নিশ্চিত হয়ে গেল যে, দোষ যুলায়খার এবং ইউসুফ (আঃ) পবিত্র। তদানুসারে সে যুলায়খাকে সম্বোধন করে বলল ঃ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ অর্থাৎ এসব তোমার ছলনা। তুমি নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাও। এরপর বলল ঃ নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক। একে বোঝা এবং এর জাল ছিন্ন করা সহজ নয়। কেননা, তারা বাহ্যতঃ কোমল, নাজুক ও অবলা হয়ে থাকে। যারা তাদেরকে দেখে, তারা তাদের কথায় দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে। কিন্তু বুদ্ধি ও ধর্মভীরুতার অভাববশতঃ তা অধিকাংশ সময় ছলনা হয়ে থাকে।—(মাযহারী)

তফসীর কুরতুবীতে আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, নারীদের ছলনা ও চক্রান্ত শয়তানের ছলনা ও চক্রান্তের চাইতে গুরুতর। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে বলেছেন إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا "শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল"। পক্ষান্তরে নারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ অর্থাৎ, তোমাদের চক্রান্ত খুবই জটিল। এটা জানা কথা যে, এখানে সব নারী বোঝানো হয়নি, বরং ঐসব নারী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা এ ধরনের ছল-চাতুরীতে লিপ্ত থাকে। আযীযে-মিসর যুলায়খার ভুল বর্ণনা

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً
وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا
رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا
إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَ
لَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ
لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ
إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ
إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ
كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا
الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ
أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ
رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا
بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ
مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾

(৩১) যখন সে তাদের চক্রান্ত শুনল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্যে একটি ভোজসভার আয়োজন করল। সে তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিয়ে বলল ঃ ইউসুফ এদের সামনে চলে এস। যখন তারা তাকে দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল এবং আপন হাত কেটে ফেলল। তারা বলল ঃ কখনই নয়—এ ব্যক্তি মানব নয়! এ তো কোন মহান ফেরেশতা! (৩২) মহিলা বলল ঃ এ ঐ ব্যক্তি, যার জন্যে তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করছিলে। আমি ওরই মন জয় করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে। আর আমি যা আদেশ দেই, সে যদি তা না করে, তবে অবশ্যই সে কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে। (৩৩) ইউসুফ বলল ঃ হে পালনকর্তা, তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৩৪) অতঃপর তার পালনকর্তা তার দোয়া কবুল করে নিলেন। অতঃপর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (৩৫) অতঃপর এসব নিদর্শন দেখার পর তারা তাকে কিছুদিন কারাগারে রাখা সমীচীন মনে করল। (৩৬) তাঁর সাথে কারাগারে দু'জন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ নিঙড়াচ্ছি। অপরজন বলল ঃ আমি দেখলাম যে, নিজ মাথায় রুটি বহন করছি। তা থেকে পাখী ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলুন। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল দেখতে পাচ্ছি। (৩৭) তিনি বললেন ঃ তোমাদেরকে প্রত্যহ যে খাদ্য দেয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দেব। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি ঐসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং পরকালে অবিশ্বাসী।

করার পর ইউসুফ (আঃ)-কে বলল ঃ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا অর্থাৎ, ইউসুফ, এ ঘটনাকে উপেক্ষা কর এবং বলাবলি করো-না, যাতে বেইজ্জতি না হয়। অতঃপর যুলায়খাকে সম্বোধন করে বলল ঃ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ অর্থাৎ, ভুল তোমারই। তুমি নিজে ভুলের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এতে বাহ্যতঃ বোঝানো হয়েছে যে, স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে ক্ষমা চাও। কারণ, নিজে অন্যায় করেছ এবং দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপিয়েছ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ অর্থাৎ, যখন যুলায়খা উক্ত মহিলাদের চক্রান্তের কথা জানতে পারল, তখন তাদেরকে একটি ভোজসভায় ডেকে পাঠাল।

এখানে মহিলাদের কানাঘুষাকে যুলায়খা مكر অর্থাৎ, চক্রান্ত বলেছে। অথচ বাহ্যতঃ তারা কোন চক্রান্ত করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা গোপনে গোপনে কুৎসা রটনা করত, তাই একে চক্রান্ত বলা হয়েছে।

وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً অর্থাৎ, তাদের জন্যে তাকিয়াযুক্ত আসন সজ্জিত করল।

وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا অর্থাৎ যখন মহিলারা ভোজসভায় উপস্থিত হল, তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করা হল। তন্মধ্যে কিছু খাদ্য চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার ছিল। তাই প্রত্যেককে এক একটি চাকুও দেয়া হল। এর বাহ্যিক উদ্দেশ্য তো ছিল ফল কাটা ; কিন্তু মনে অন্য ইচ্ছা লুক্কায়িত ছিল, যা পরে বর্ণিত হবে। অর্থাৎ আগত মহিলারা ইউসুফ (আঃ)-কে দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে এবং চাকু দিয়ে ফলের পরিবর্তে নিজ নিজ হাত কেটে ফেলবে।

وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ অর্থাৎ, এসব আয়োজন সমাপ্ত করার পর অন্য এক কক্ষে অবস্থানরত ইউসুফ (আঃ)-কে যুলায়খা বলল ঃ একটু বের হয়ে এস। ইউসুফ (আঃ) তার কু-উদ্দেশ্য জানতেন না। তাই বাইরে এসে ভোজসভায় উপস্থিত হলেন।

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا
إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

অর্থাৎ, সমাগত মহিলারা ইউসুফ (আঃ)-কে দেখল, তখন তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত হয়ে গেল এবং নিজ নিজ হাত কেটে ফেলল। অর্থাৎ ফল কাটার সময় যখন এ বিস্ময়কর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হল, তখন চাকু হাতেই লেগে গেল। অন্যমনস্কতার সময় প্রায়ই এরূপ হয়ে থাকে। তারা বলতে লাগল ঃ হায় আল্লাহ্, এ ব্যক্তি কখনই মানব নয়। সে তো মহানুভব ফেরেশতা! উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতারাই এরূপ নূরানী চেহারাযুক্ত হতে পারে।

قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ

فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ

যুলায়খা বলল ঃ দেখে নাও, এ ঐ ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করতে। বাস্তবিকই আমি তার কাছে নিজেকে সমর্পন করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সে নিষ্পাপ রয়েছে। ভবিষ্যতে সে আমার আদেশ পালন না করলে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে।

যুলায়খা যখন দেখল যে, সমাগত মহিলাদের সামনে তার গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে গেছে, তখন সে তাদের সামনেই ইউসুফ (আঃ)-কে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল। কোন কোন তফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, তখন আমন্ত্রিত মহিলারা ইউসুফ (আঃ) -কে বলতে লাগল ঃ তুমি যুলায়খার কাছে ঋণী। কাজেই তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়।

পরবর্তী আয়াতের কোন কোন শব্দ দ্বারাও মহিলাদের উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়; যেমন كَيْدَهُنَّ এবং يَدْعُونَنِي এগুলোতে বহু বচনে কয়েক জনের কথা বলা হয়েছে।

ইউসুফ (আঃ) দেখলেন যে, সমবেত মহিলারাও যুলায়খার সুরে সুর মিলিয়েছে এবং তাকে সমর্থন করছে। কাজেই তাদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার বাহ্যিক কোন উপায় নেই। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর দরবারে আরয করলেন ঃ

رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা! এই মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করছে, এর চাইতে জেলখানায়ই আমার অধিক পছন্দনীয়। যদি আপনি আমা থেকে ওদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন, তবে সম্ভবতঃ আমি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং নির্বুদ্ধিতার কাজ করে ফেলব। 'আমি জেলখানা পছন্দ করি'— ইউসুফ (আঃ)-এর এ উক্তি বন্দীজীবন প্রার্থনা বা কাম্য নয়; বরং পাপকাজের বিপরীতে এই পার্থিব বিপদকে সহজ মনে করার বহিঃপ্রকাশ। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ যখন ইউসুফ (আঃ) জেলে প্রেরিত হলেন, তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী আসল, আপনি নিজেকে জেলে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ, আপনি বলেছিলেন السِّجْنُ أَحَبُّ অর্থাৎ, এর চাইতে আমি জেলখানাকে অধিক পছন্দ করি। আপনি নিরাপত্তা চাইলে আপনাকে পুরোপুরি নিরাপত্তা দান করা হতো। এ থেকে বোঝা গেল যে, কোন বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্যে দোয়ায় 'এর চাইতে অমুক ছোট বিপদে পতিত করা আমি ভাল মনে করি, বলা সমীচীন নয়; বরং প্রত্যেক বিপদাপদের সময় আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তাই প্রার্থনা করা উচিত। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে সবরের দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, সবরের অর্থ হচ্ছে বিপদাপদে পতিত হওয়ার পর তা সহ্য করার ক্ষমতা। কাজেই আল্লাহ্‌র কাছে সবরের দোয়া করার পরিবর্তে নিরাপত্তার দোয়া করা উচিত।—(তিরমিযী)

'যদি আপনি ওদের চক্রান্তকে প্রতিহত না করেন তবে সম্ভবতঃ আমি ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ব'— ইউসুফ (আঃ)-এর একথা বলা নবুওয়তের জন্যে যে পবিত্রতা জরুরী, তার পরিপন্থী নয়। কারণ, এ পবিত্রতার সারমর্মই হচেছ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে নেবেন। যদিও নবুওয়তের কারণে এ লক্ষ্য পূর্ব থেকেই অর্জিত ছিল, তথাপি শিষ্টাচার প্রসূত চূড়ান্ত ভীতির কারণে এরূপ দোয়া করতে বাধ্য হয়েছেন। এ থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ব্যতিরেকে কোনব্যক্তিই গোনাহ্ থেকে বাঁচতে পারে না। আরও জানা গেল যে, প্রত্যেক গোনাহ্‌র কাজ মূর্খতাবশতঃ হয়ে থাকে। জ্ঞান মানুষকে গোনাহ্‌র কাজ থেকে বিরত রাখে।—(কুরতুবী)

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থাৎ তাঁর পালনকর্তা দোয়া কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্তকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। নিশ্চয় তিনি পরম শ্রোতা ও জ্ঞানী।

আল্লাহ্ তাআলা মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফ (আঃ)-কে বাঁচানোর জন্যে একটি ব্যবস্থা করলেন ইউসুফ (আঃ)-এর সচ্চরিত্রতা, খোদাভীতি ও পবিত্রতার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখে আযীযে-মিসর ও তার বন্ধুদের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ইউসুফ সৎ। কিন্তু শহরময় এ বিষয়ের কানা-ঘুষা হতে থাকে। এ কানা-ঘুষার অবসান করার জন্যে এটাই উত্তম পথ বিবেচিত হল যে, ইউসুফ (আঃ)-কে কিছুদিনের জন্যে জেলে আবদ্ধ রাখাই সমীচীন হবে। এ দ্বারা নিজের ঘরও রক্ষা পাবে এবং জনগণের মধ্যেও এ বিষয়ের আলোচনা স্তিমিত হয়ে পড়বে।

ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ অর্থাৎ, এর পর আযীয ও তাঁর পারিষদবর্গ কিছু দিনের জন্যে ইউসুফ (অঃ)-কে জেলে আবদ্ধ রাখাটাই মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করলেন এবং সেমতে ইউসুফ (আঃ) জেলে প্রেরিত হলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীর একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একথা বার বার বলা হয়েছে যে, কোরআন-পাক কোন ঐতিহাসিক ও কিস্সা-কাহিনীর গ্রন্থ নয়। এতে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা, উপদেশ ও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করা। সমগ্র কোরআন এবং অসংখ্য পয়গম্বরের ঘটনাবলীর মধ্যে একমাত্র ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীটিই কোরআন ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছে। নতুবা স্থানোপযোগী ঐতিহাসিক ঘটনার কোন অত্যাবশ্যকীয় অংশই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীটি আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করলে এতে শিক্ষা ও উপদেশের অনেক উপাদান এবং মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে। প্রাসঙ্গিক এ ঘটনাটিতেও অনেক হেদায়েত নিহিত রয়েছে।

ঘটনা এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর নিষ্পাপ চরিত্র ও পবিত্রতা দিবালোকের মত ফুটে উঠা সত্ত্বেও আযীযে-মিসর ও তার স্ত্রী লোক-নিন্দা বন্ধ করার উদ্দেশে কিছু দিনের জন্যে ইউসুফ (আঃ)-কে কারাগারে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা প্রকৃতপক্ষে ইউসুফ (আঃ)-এর দোয়া ও বাসনার বাস্তব রূপায়ন ছিল। কেননা, আযীযে-মিসরের গৃহে বাস করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইউসুফ (আঃ) কারাগারে পৌছলে সাথে আরও দু'জন অভিযুক্ত

কয়েদীও কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বাদশাহ্কে মদ্যপান করাত এবং অপরজন বাবুর্চি ছিল। ইবনে-কাসীর তফসীরবিদগণের বরাত দিয়ে লিখেছেন ঃ তারা উভয়েই বাদশাহ্র খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। মোকাদ্দমার তদন্ত চলছিল বলে তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল।

ইউসুফ (আঃ) কারাগারে প্রবেশ করে পয়গম্বরসুলভ চরিত্র, দয়া ও অনুকম্পার কারণে সব কয়েদীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং সাধ্যমত তাদের দেখাশোনা করতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন। কাউকে চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন। ধৈর্য শিক্ষা এবং মুক্তির আশা দিয়ে তার হিম্মত বাড়াতেন। নিজে কষ্ট করে অপরের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতেন এবং সারারাত আল্লাহ্র এবাদতে মশগুল থাকতেন। তাঁর এহেন অবস্থা দেখে কারাগারের সব কয়েদী তাঁর ভক্ত হয়ে গেল। কারাধ্যক্ষও তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হল এবং বলল ঃ আমার ক্ষমতা থাকলে আপনাকে ছেড়ে দিতাম। এখানে যাতে আপনার কোনরূপ কষ্ট না হয়, এখন শুধু সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে পারি।

ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে কারাগারে প্রবেশকারী দু'জন কয়েদী একদিন বলল ঃ আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন সৎ ও মহানুভব ব্যক্তি। তাই আপনার কাছে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে চাই। হযরত ইবনে-আব্বাস ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন ঃ তারা বাস্তবিকই এ স্বপ্ন দেখেছিল। আবদুল্লাহ্ ইবনে-মাসউদ বলেন ঃ প্রকৃত স্বপ্ন ছিল না। শুধু ইউসুফ (আঃ)-এর মহানুভবতা ও সততা পরীক্ষা করার উদ্দেশে স্বপ্ন রচনা করা হয়েছিল।

মোটকথা, তাদের একজন, অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাত, সে বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখি যে, আঙ্গুর থেকে শরাব বের করছি। দ্বিতীয় জন অর্থাৎ বাবুর্চি বলল ঃ আমি দেখি যে, আমার মাথায় রুটিভর্তি একটি ঝুড়ি রয়েছে। তা থেকে পাখীরা ঠুকরে ঠুকরে আহার করছে। তারা উভয় স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ জানাল।

ইউসুফ (আঃ)-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে; কিন্তু তিনি পয়গম্বরসুলভ ভঙ্গিতে এ প্রশ্নের উত্তর দানের পূর্বে ঈমানের দাওয়াত ও ধর্মপ্রচারের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। প্রচারের মূলনীতি অনুযায়ী প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তাদের অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশে একটি মু'জেযা উল্লেখ করলেন যে, তোমাদের জন্যে প্রত্যহ যে খাদ্য তোমাদের বাসা থেকে কিংবা অন্য কোন জায়গা থেকে আসে, তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে খাদ্যের প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে বলে দেই। বাস্তবে আমার সরবরাহকৃত তথ্য সব সত্য হয়।

ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي অর্থাৎ, এটা কোন ভবিষ্যৎ কথন, জ্যোতিষ বিদ্যা অথবা অতীন্দ্রিয়বাদের ভেল্‌কি নয় ; বরং আমার পালনকর্তা ওহীর মাধ্যমে আমাকে যা বলে দেন, আমি তাই তোমাদেরকে জানিয়ে দেই। নিঃসন্দেহে এ প্রকাশ্য মু'জেযাটি নবুওয়তের প্রমাণ এবং আস্থার অনেক বড় কারণ। এরপর প্রথমে কুফরের নিন্দা এবং কাফেরদের ধর্মের প্রতি স্বীয় বিমুখতা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আরও বলেছেন যে, আমি নবী পরিবারেরই একজন এবং তাঁদেরই সত্য ধর্মের অনুসারী। আমার পিতৃপুরুষ হচ্ছেন ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব। এ বংশগত আভিজাত্যও স্বভাবতঃ মানুষের আস্থা অর্জনে সহায়ক হয়। এরপর বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলার সাথে কাউকে খোদায়ী গুণাবলীতে অংশীদার মনে করা আমাদের জন্যে মোটেই বৈধ নয়। এ সত্য ধর্মের তওফীক আমাদের প্রতি এবং সব লোকের প্রতি আল্লাহ্ তাআলারই অনুগ্রহ। তিনি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দান করে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। কিন্তু অনেক লোক এ নেয়ামতের কদর ও অনুগ্রহ স্বীকার করে না। অতঃপর তিনি কয়েদীদেরকেই প্রশ্ন করলেন ঃ আচ্ছা তোমরাই বল, অনেক পালনকর্তার উপাসক হওয়া উত্তম, না এক আল্লাহ্র দাস হওয়া ভাল, যিনি সবার উপরে পরাক্রমশালী? অতঃপর অন্য এক পন্থায় মূর্তিপূজার অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করে বললেন ঃ তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কিছুসংখ্যক প্রতিমাকে পালনকর্তা মনে করে নিয়েছ। এরা শুধু নামসর্বস্বই, অথচ এদেরকেই তোমরা মা'বুদ সাব্যস্ত করে নিয়েছ। ওদের মধ্যে এমন কোন সত্তাগত গুণ নেই যে, ওদেরকে সামান্যতম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করা যেতে পারে। কারণ, ওরা সবাই চেতনা ও অনুভূতিহীন। এটা চাক্ষুষ বিষয়। ওদের সত্য উপাস্য হওয়ার অপর একটি উপায় ছিল এই যে, আল্লাহ্ তাআলা ওদের আরাধনার জন্যে নির্দেশ নাযিল করতেন। এমতাবস্থায় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বিবেকবুদ্ধি যদিও ওদের খোদায়ী স্বীকার না করত, কিন্তু আল্লাহ্র নির্দেশের কারণে আমরা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে ছেড়ে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করতাম। কিন্তু এখানে এরূপ কোন নির্দেশও নেই। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা এসব কৃত্রিম উপাস্যের এবাদতের জন্যে কোন প্রমাণ কিংবা সনদও নাযিল করেননি। বরং তিনি এ কথাই বলেছেন যে, নির্দেশ ও শাসনক্ষমতার অধিকার আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও নেই। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কারও এবাদত করো না। আমার পিতৃপুরুষেরা এ সত্য ধর্মই আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন ; কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য জানে না।

প্রচার ও দাওয়াত সমাপ্ত করার পর ইউসুফ (আঃ) কয়েদীদের স্বপ্নের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের একজন তো মুক্তি পাবে এবং চাকুরীতে পুনর্বহাল হয়ে বাদশাহ্কে মদ্যপান করাবে। অপর জনের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাকে শূলে চড়ানো হবে। পাখীরা তার মাথার মগজ ঠুকরে খাবে।

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۳۸﴾ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۳۹﴾ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۴۰﴾ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّاۤ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ﴿۴۱﴾ وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ؗ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿۴۲﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْۤ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ؕ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ﴿۴۳﴾

(৩৮) আমি আপন পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের ধর্ম অনুসরণ করছি। আমাদের জন্য শোভা পায় না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য সব লোকের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না। (৩৯) হে কারাগারের সঙ্গীরা। পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? (৪০) তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ্ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ্ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও এবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (৪১) হে কারাগারের সঙ্গীরা! তোমাদের একজন আপন প্রভুকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শূলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখী আহার করবে। তোমরা যে বিষয়ে জানার আগ্রহী তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। (৪২) যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিল ঃ আপন প্রভুর কাছে আমার আলোচনা করবে। অতঃপর শয়তান তাকে প্রভুর কাছে আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিল। ফলে তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হল। (৪৩) বাদশাহ বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী—এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে পারিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পয়গম্বরসুলভ অনুকম্পার অভিনব দৃষ্টান্ত ঃ ইবনে-কাসীর বলেন ঃ উভয় কয়েদীর স্বপ্ন পৃথক পৃথক ছিল। প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট ছিল এবং এটাও নির্দিষ্ট ছিল যে, যে ব্যক্তি বাদশাহ্‌কে মদ্যপান করাত, সে মুক্ত হয়ে চাকুরীতে পুনর্বহাল হবে এবং বাবুর্চিকে শূলে চড়ানো হবে। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) পয়গম্বরসুলভ অনুকম্পার কারণে নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, তোমাদের অমুককে শূলে চড়ানো হবে—যাতে সে এখন থেকেই চিন্তান্বিত না হয়ে পড়ে। বরং তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, একজন মুক্তি পাবে এবং অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে।

সবশেষে বলেছেন ঃ আমি তোমাদের স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তা নিছক অনুমানভিত্তিক নয় ; বরং এটাই আল্লাহ্‌র অটল ফয়সালা। যেসব তফসীরবিদ তাদের স্বপ্নকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলেছেন, তাঁরা একথাও বলেছেন যে, ইউসুফ (আঃ) যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন, তখন তারা উভয়েই বলে উঠল ঃ আমরা কোন স্বপ্নই দেখিনি, বরং মিছামিছি বানিয়ে বলেছিলাম। তখন ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ তোমরা এ স্বপ্ন দেখে থাক বা না থাক, এখন বাস্তবে তাই হবে, যা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মিথ্যা স্বপ্ন তৈরী করার যে গোনাহ্ করেছ, এখন তার শাস্তি তা'ই, যা ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে রেহাই পাবে, তাকে ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ যখন তুমি মুক্ত হয়ে কারাগারের বাইরে যাবে এবং শাহী দরবারে পৌছবে, তখন বাদশাহ্‌র কাছে আমার বিষয়েও আলোচনা করবে যে, এ নিরপরাধ লোকটি কারাগারে পড়ে রয়েছে। কিন্তু মুক্ত হয়ে লোকটি ইউসুফ (আঃ)-এর কথা ভুলে গেল। ফলে ইউসুফ (আঃ)-এর মুক্তি আরও বিলম্বিত হয়ে গেল এবং এ ঘটনার পর আরও কয়েক বছর তাঁকে কারাগারে কাটাতে হল। আয়াতে بِضْعَ سِنِيْنَ বলা হয়েছে। শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বোঝায়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এ ঘটনার পর আরও সাত বছর তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে।

قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ﴿٤٥﴾ يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ۚ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ﴿٥٠﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۫ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٥١﴾ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ﴿٥٢﴾

(৪৪) তারা বলল ঃ এটা কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই। (৪৫) দু' জন কারারুদ্ধের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর স্মরণ হলো, সে বলল, আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলছি। তোমরা আমাকে প্রেরণ কর। (৪৬) সে তথায় পৌঁছে বলল ঃ হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী—তাদেরকে খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক; আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে পথনির্দেশ প্রদান করুন ঃ যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অবগত করাতে পারি। (৪৭) বলল ঃ তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা কাটবে, তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষ সমেত রেখে দেবে। (৪৮) এবং এরপরে আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর; তোমরা এ দিনের জন্যে যা রেখেছিলে, তা খেয়ে যাবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা তুলে রাখবে। (৪৯) এরপরেই আসবে একবছর — এতে মানুষের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং এতে তারা রস নিঙড়াবে। (৫০) বাদশাহ্ বলল ঃ ফিরে যাও তোমাদের প্রভুর কাছে এবং জিজ্ঞেস কর তাঁকে ঃ ঐ মহিলার স্বরূপ কি, যারা স্বীয় হস্ত কর্তন করেছিল! আমার পালনকর্তা তো তাদের ছলনা সবই জানেন। (৫১) বাদশাহ্ মহিলাদেরকে বললেন ঃ তোমাদের হাল-হাকিকত কি, যখন তোমরা ইউসুফকে আত্মসংবরণ থেকে ফুসলিয়েছিলে? তারা বলল ঃ আল্লাহ্ মহান, আমরা তার সম্পর্কে মন্দ কিছু জানি না। আযীয-পত্নি বলল ঃ এখন সত্য কথা প্রকাশ হয়ে গেছে। আমিই তাকে আত্মসংবরণ থেকে ফুসলিয়েছিলাম এবং সে সত্যবাদী। (৫২) ইউসুফ বললেন ঃ এটা এজন্য, যাতে আযীয জেনে নেয় যে, আমি গোপনে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আরও এই যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাকে এগুতে দেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-এর মুক্তির জন্যে অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে একটি উপায় সৃষ্টি করলেন। বাদশাহ্ একটি স্বপ্ন দেখে উদ্বেগাকুল হলেন এবং রাজ্যের জ্ঞানী ব্যাখ্যাতা ও অতীন্দ্রিয়-বাদীদেরকে একত্রিত করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। স্বপ্নটি কারও বোধগম্য হল না। তাই সবাই উত্তর দিল ঃ اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ এখানে اضغاث শব্দটি ضغث এর বহুবচন। এর অর্থ এমন পুঁটলী, যাতে বিভিন্ন প্রকার আবর্জনা ও ঘাসখড় জমা থাকে। অর্থ এই যে, এ স্বপ্নটি মিশ্র ধরনের। এতে কল্পনা ইত্যাদি শামিল রয়েছে। আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না। সঠিক স্বপ্ন হলে ব্যাখ্যা দিতে পারতাম।

এ ঘটনা দেখে দীর্ঘকাল পর ইউসুফ (আঃ)-এর কথা মুক্তিপ্রাপ্ত সেই কয়েদীর মনে পড়ল। সে অগ্রসর হয়ে বলল ঃ আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারব। তখন সে ইউসুফ (আঃ)-এর গুণাবলী, স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শিতা এবং মজলুম হয়ে কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করে অনুরোধ করল যে, তাকে কারাগারে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হোক। বাদশাহ্ এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন এবং সে ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হল। কোরআন-পাক এসব ঘটনা একটিমাত্র শব্দ فَاَرْسِلُوْنِ দ্বারা বর্ণনা করেছে। এর অর্থ আমাকে পাঠিয়ে দিন। ইউসুফ (আঃ)-এর নামোল্লেখ, সরকারী মঞ্জুরী অতঃপর কারাগারে পৌঁছা এসব ঘটনা আপনা আপনি বোঝা যায়। তাই এগুলো পরিষ্কার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করা হয়নি ; বরং এ বর্ণনা শুরু করা হয়েছে ঃ يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ অর্থাৎ লোকটি কারাগারে পৌঁছে ঘটনার বর্ণনা শুরু করে প্রথমে ইউসুফ (আঃ)-এর صديق অর্থাৎ কথা ও কাজে সাচ্চা হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। অতঃপর দরখাস্ত করেছে যে, আমাকে একটি স্বপ্নের ব্যাখা বলে দিন। স্বপ্ন এই যে, বাদশাহ সাতটি মোটাতাজা গাভী দেখেছেন। এগুলোকেই অন্য সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও সাতটি গমের সবুজ শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ দেখেছেন।

لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, আপনি ব্যাখ্যা বলে দিলে অচিরাৎ আমি ফিরে যাব এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা বর্ণনা করব। এতে সম্ভবতঃ তারা আপনার জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে অবগত হবে।

তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে, 'আলমে-মিসালা' তথা প্রত্যাকৃতি-জগতে ঘটনাবলী যে আকারে থাকে, স্বপ্নে তাই দৃষ্টিগোচর হয়। এ জগতের প্রত্যাকৃতিসমূহের বিশেষ অর্থ আছে। স্বপ্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্র পুরোপুরিই এসব অর্থ জানার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-কে এ শাস্ত্র পুরোপুরি শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি স্বপ্নের বিবরণ শুনে বোঝে নিলেন যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী ও সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর ফলনসম্পন্ন সাত বছর। কেননা, মৃত্তিকা চষায় ও ফসল ফলানোর কাজে গাভীর বিশেষ ভূমিকা থাকে। এমনিভাবে সাতটি শীর্ণ গাভী ও সাতটি শুষ্ক শীষের অর্থ হচ্ছে, প্রথম সাতটি গাভীকে খেয়ে ফেলার অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী সাত বছরে খাদ্যশস্যের যে ভান্ডার সঞ্চিত থাকবে, তা সবই দুর্ভিক্ষের সাত বছর নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু বীজের জন্যে কিছু খাদ্যশস্য বেঁচে যাবে।

বাদশাহ্র স্বপ্নে বাহ্যতঃ এতটুকুই ছিল যে, সাত বছর ভাল ফলন হবে, এরপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) আরও কিছু বাড়িয়ে বললেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এক বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। এ বিষয়টি ইউসুফ (আঃ) এভাবে জানতে পারেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর যখন সর্বমোট সাতটি, তখন আল্লাহ্র চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অষ্টম বছর বৃষ্টিপাত ও উৎপাদন হবে। হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আঃ)-কে এ বিষয়ে জ্ঞাত করিয়েছিলেন, যাতে স্বপ্নের ব্যাখার অতিরিক্ত কিছু সংবাদ তারা লাভ করে, তাঁর জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ পায় এবং তাঁর মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। তদুপরি ইউসুফ (আঃ) শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি ; বরং এর সাথে একটি বিজ্ঞজনোচিত ও সহানুভূতিমূলক পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, প্রথম সাত বছরে সে অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হবেন, তা গমের শীষের মধ্যেই সংরক্ষিত রাখতে হবে — যাতে পুরানো হওয়ার পর গমে পোকা না লাগে — অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, শস্য যতদিন শীষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে পোকা লাগে না।

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ অর্থাৎ, প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ খরা ও দুর্ভিক্ষের সাত বছর আসবে এবং পূর্ব-সঞ্চিত শস্য ভান্ডার খেয়ে ফেলবে। বাদশাহ্ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, শীর্ণ ও দুর্বল গাভীগুলো মোটাতাজা ও শক্তিশালী গাভীগুলোকে খেয়ে ফেলছে। তাই ব্যাখ্যায় এর সাথে মিল রেখে বলেছেন যে, দুর্ভিক্ষের বছরগুলো পূর্ববর্তী বছরগুলোর সঞ্চিত শস্য ভান্ডার খেয়ে ফেলবে ; যদিও বছর এমন কোন বস্তু নয়, যা কোনকিছুকে ভক্ষণ করতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ও জীব-জন্তুতে দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে পূর্ব-সঞ্চিত শস্য ভান্ডার খেয়ে ফেলবে।

কাহিনীর গতিধারা দেখে বোঝা যায় যে, এ ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরে এসেছে এবং বাদশাহ্কে তা অবহিত করেছে। বাদশাহ্ বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চিন্ত ও ইউসুফ (আঃ)-এর গুণ গরিমায় মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কোরআন পাক এসব বিষয় উল্লেখ করা দরকার মনে করেনি। কারণ, এগুলো আপনা থেকেই বোঝা যায়। পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ অর্থাৎ, বাদশাহ্ আদেশ দিলেন যে, ইউসুফ (আঃ)-কে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এস। অতঃপর বাদশাহ্র জনৈক দূত এ বার্তা নিয়ে কারাগারে পৌছল।

ইউসুফ (আঃ) দীর্ঘ বন্দীজীবনের দুঃসহ যাতনায় অতিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করছিলেন। কাজেই বাদশাহ্র প্রেরিত বার্তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা পয়গম্বরগণকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তা অন্যের পক্ষে অনুধাবন করাও সম্ভব নয়।

তিনি দূতকে উত্তর দিলেন ঃ

قَالَ ارْجِعْ إِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ
إِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) দূতকে বললেন ঃ তুমি বাদশাহ্র কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস কর যে, আপনার মতে ঐ মহিলাদের ব্যাপারটি কিরূপ, যারা হাত কেটে ফেলেছিল? বাদশাহ্ এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করেন কি না এবং আমাকে দোষী মনে করেন কি না?

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ (আঃ) এখানে হস্তকর্তনকারিণী মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন, আযীয-পত্নীর নাম উল্লেখ করেননি ; অথচ সেই ছিল ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। বলাবাহুল্য, এতে ঐ নিমকের কদর করা হয়েছে, যা ইউসুফ (আঃ) আযীযের গৃহে লালিত পালিত হয়ে খেয়েছিলেন। প্রকৃত ভদ্র স্বভাবের লোকেরা স্বভাবতই এরূপ নিমকহালালী করার চেষ্টা করে থাকেন।—(কুরতুবী)

আরেক কারণ এই যে, নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। এ মহিলাদের মাধ্যমেও এ উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারত এবং এতে তাদেরও তেমন কোন অপমান ছিল না। তারা সত্য কথা স্বীকার করলে শুধু পরামর্শ দানের দোষ তাদের ঘাড়ে চাপত। আযীয-পত্নীর অবস্থা এরূপ ছিল না। সরাসরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে তাকে ঘিরেই তদন্তকার্য অনুষ্ঠিত হত। ফলে তার অপমান বেশী হত। ইউসুফ (আঃ) সাথে সাথে আরও বললেন ঃ إِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ অর্থাৎ, আমার পালনকর্তা তো তাদের মিথ্যা ও ছল-চাতুরী অবহিতই রয়েছেন। আমি চাই যে, বাদশাহ্ও বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবগত হোন। এ বাক্যে সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে নিজের পবিত্রতাও বর্ণিত হয়েছে।

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا
مَا رَحِمَ رَبِّيٓ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٥٣ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِي
بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا
مَكِينٌ أَمِينٌ ۝٥٤ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ
عَلِيمٌ ۝٥٥ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ
يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۝٥٦
وَلَأَجْرُ ٱلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ۝٥٧ وَجَآءَ
إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ۝٥٨ وَ
لَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا
تَرَوْنَ أَنِّيٓ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۝٥٩ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي
بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۝٦٠ قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ
أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَٰعِلُونَ ۝٦١ وَقَالَ لِفِتْيَٰنِهِ ٱجْعَلُوا۟ بِضَٰعَتَهُمْ فِي
رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ۝٦٢ فَلَمَّا رَجَعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيهِمْ قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا
ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ۝٦٣

(৫৩) আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয়—আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৫৪) বাদশাহ বলল ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে রাখব। অতঃপর যখন তার সাথে মতবিনিময় করল, তখন বলল ঃ নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন। (৫৫) ইউসুফ বলল ঃ আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান। (৫৬) এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। আমি স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছা পৌঁছে দেই এবং আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। (৫৭) এবং ঐ লোকদের জন্য পরকালে প্রতিদান উত্তম যারা ঈমান এনেছে ও সতর্কতা অবলম্বন করে। (৫৮) ইউসুফের ভ্রাতারা আগমন করল, অতঃপর তার কাছে উপস্থিত হল। সে তাদেরকে চিনল এবং তারা তাকে চিনল না। (৫৯) এবং সে যখন তাদেরকে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিল, তখন সে বলল ঃ তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখ না যে, আমি পুরা মাপ দেই এবং মেহমানদেরকে উত্তম সমাদার করি? (৬০) অতঃপর যদি তাকে আমার কাছে না আন, তবে আমার কাছে তোমাদের কোন বরাদ্দ নেই এবং তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে না। (৬১) তারা বলল ঃ আমরা তার সম্পর্কে তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমাদেরকে একাজ করতেই হবে। (৬২) এবং সে ভৃত্যদেরকে বলল ঃ তাদের পণ্যমূল্য তাদের রসদ-পত্রের মধ্যে রেখে দাও — সম্ভবতঃ তারা গৃহে পৌঁছে তা বুঝতে পারবে, সম্ভবত ঃ তারা পুনর্বার আসবে। (৬৩) তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল, তখন বললঃ হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্যে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন; যাতে আমরা খাদ্যশস্যের বরাদ্দ আনতে পারি এবং আমরা অবশ্যই তার পুরোপুরি হেফাযত করব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করা ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ইউসুফ (আঃ)-এর এ উক্তি বর্ণিত হয়েছিল ঃ আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পুরোপুরি তদন্তের পূর্বে আমি কারাগার থেকে মুক্তি পছন্দ করি না—যাতে আযীয ও বাদশাহ্র মনে পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মে যে, আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং অভিযোগটি নিছক মিথ্যা ছিল। এ উক্তিতে একটি অনিবার্য প্রয়োজনে নিজের মুখেই নিজের পবিত্রতা বর্ণিত হয়েছিল, যা বাহ্যতঃ নিজের শুচিতা নিজের বর্ণনা করার শামিল। এটা আল্লাহ্ তাআলার পছন্দনীয় নয় ; যেমন কোরআনে বলা হয়েছে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ

অর্থাৎ, আপনি কি তাদেরকে দেখেন না যারা নিজেরাই নিজেদেরকে শুচিশুদ্ধ বলে? বরং আল্লাহ্ তাআলারই অধিকার আছে, তিনি যাকে ইচ্ছা, শুচিশুদ্ধ সাব্যস্ত করবেন। সূরা নজমেও এ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি আয়াত রয়েছে ঃ

فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ অর্থাৎ, তোমরা নিজের শুচিতা নিজে দাবী করো না। আল্লাহ্ তাআলাই সম্যক জ্ঞাত আছেন, কে বাস্তবিক পরহেজগার ও আল্লাহ্ভীরু।

তাই আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ (আঃ) আপন পবিত্রতা প্রকাশ করার সাথে সাথেই এ সত্যও ফুটিয়ে তুলেছেন যে, আমার একথা বলা নিজের আল্লাহ্ভীরুতা ও পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্য নয় ; বরং সত্য এই যে, প্রত্যেক মানুষের মন, যার মৌল উপাদান চার বস্তু যথা—অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু দ্বারা গঠিত হয়েছে, এ মন আপন স্বভাবে প্রত্যেককে মন্দ কাজের দিকেই আকৃষ্ট করে। তবে ঐ মন এর ব্যতিক্রম, যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন এবং মন্দ স্পৃহা থেকে পবিত্র রাখেন। পয়গম্বরগণের মন এরূপই হয়ে থাকে। কোরআন পাকে এরূপ মনকে 'নফসেমুতমায়িন্না' আখ্যা দেয়া হয়েছে। মোটকথা, এমন কঠোর পরীক্ষার সময় গোনাহ্ থেকে বেঁচে যাওয়াটা আমার কোন সত্তাগত পরাকাষ্ঠা ছিল না; বরং আল্লাহ্ তাআলারই রহমত ও পথ প্রদর্শনের ফল ছিল। তিনি যদি আমার মন থেকে হীন প্রবৃত্তিকে বহিষ্কার করে না দিতেন, তবে আমিও সাধারণ মানুষের মত কু-প্রবৃত্তির হাতে পরাভূত হয়ে যেতাম।

কোন কোন হাদীসে আছে, ইউসুফ (আঃ)-এর একথা বলার কারণ এই যে, তাঁর মনেও এক প্রকার কল্পনা সৃষ্টি হয়েই গিয়েছিল, যদিও তা অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। কিন্তু নবুওয়তের মাপকাঠিতে এটাও পদস্খলনই ছিল। তাই একথা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি নিজের মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র মনে করি না।

মানব-মন তিন প্রকার ঃ আয়াতে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, এতে প্রত্যেক মানব-মনকেই لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ (মন্দ কাজের আদেশদাতা) বলা হয়েছে ; যেমন এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরামকে প্রশ্ন করলেন ঃ এরূপ সাথী সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা, যাকে সম্মান-সমাদর করলে, অর্থাৎ অন্ন দিলে, বস্ত্র দিলে সে তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে তার অবমাননা করা হলে অর্থাৎ তাকে ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ রাখা হলে সে তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! এর চাইতে অধিক মন্দ

দুনিয়াতে আর কোন কিছু হতে পারে না। তিনি বললেনঃ ঐ সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, তোমাদের বুকের মধ্যে যে মনটি আছে সে-ই এই ধরনের সাথী।—(কুরতুবী অন্য এক হাদীসে আছে, তোমাদের প্রধান শত্রু স্বয়ং তোমাদের মন। সে তোমাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে এবং নানাবিধ বিপদাপদে জড়িত করে দেয়।

মোটকথা, উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মানব-মন মন্দ কাজেই উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সূরা কিয়ামায় এ মানব-মনকেই 'লাওয়ামা' উপাধি দিয়ে এভাবে সম্মানিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা এর কসম খেয়েছেনঃ

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ এবং সূরা আল-ফজরে এ মনকেই 'মুতমায়িন্না' আখ্যায়িত করে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হয়েছে- يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ এভাবে মানব-মনকে এক জায়গায় لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ দ্বিতীয় জায়গায় لوامة এবং তৃতীয় জায়গায় مطمئنة বলা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক মানব-মন আপন সত্তার দিক দিয়ে لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ অর্থাৎ মন্দ কাজের আদেশদাতা। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ্ ও পরকালের ভয়ে মনের আদেশ পালনে বিরত থাকে, তখন তা لوامة হয়ে যায়। অর্থাৎ মন্দ কাজের জন্যে তিরস্কারকারী ও মন্দ কাজ থেকে তওবাকারী ; যেমন সাধারণ সাধু-সজ্জনদের মন এবং যখন কোন মানুষ নিজের মনের বিরুদ্ধে সাধনা করতে করতে মনকে এ স্তরে পৌঁছিয়ে দেয় যে, তার মধ্যে মন্দ কাজের কোন স্পৃহাই অবশিষ্ট থাকে না, তখন তা 'মুতমায়িন্না' হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ মন। পুণ্যবানরা চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে এ স্তর অর্জন করতে পারে; কিন্তু তা সদাসর্বদা অব্যাহত থাকা নিশ্চিত নয়। পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্ তাআলা আপনা-আপনি পূর্ব সাধনা ব্যতিরেকেই এ মন দান করেন এবং তাঁরা সদাসর্বদা এ স্তরেই অবস্থান করেন। এভাবে মনের তিনটি অবস্থার দিক দিয়ে তিন প্রকার ক্রিয়াকর্মকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ — বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমার পালনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। غَفُوْرٌ শব্দে ইঙ্গিত আছে যে, নফসে-আম্মারা যখন স্বীয় গোনাহ্র জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং 'লাওয়ামা' হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করে দেবেন। رَّحِيْمٌ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নফসে-মুতমায়িন্না প্রাপ্ত হওয়াও আল্লাহ্ তাআলার রহমত তথা দয়ারই ফল।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ বাদশাহ্ যখন ইউসুফ (আঃ) -এর দাবী অনুযায়ী মহিলাদের কাছে ঘটনার তদন্ত করলেন এবং যুলায়খা ও অন্যান্য সব মহিলা বাস্তব ঘটনা স্বীকার করল, তখন বাদশাহ্ নির্দেশ দিলেনঃ ইউসুফ (আঃ)-কে আমার কাছে নিয়ে এস—যাতে তাকে একান্ত উপদেষ্টা করে নেই। নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে সসম্মানে কারাগার থেকে দরবারে আনা হল। অতঃপর পারস্পরিক আলাপ ও আলোচনার ফলে তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাদশাহ্ বললেনঃ আপনি আজ থেকে আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানার্হ এবং বিশ্বস্ত।

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, যখন বাদশাহ্র দূত দ্বিতীয়বার কারাগারে ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে পৌঁছল এবং বাদশাহ্র পয়গাম পৌঁছাল, তখন ইউসুফ (আঃ) সব কারাবাসীদের জন্যে দোয়া করলেন এবং গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করলেন। তিনি বাদশাহ্র দরবারে পৌঁছে এ দোয়া করলেনঃ

حسبی ربی من دنیای وحسبی ربی من خلقه عز جاره وجل ثناؤه ولا اله غيره -

অর্থাৎ—আমার দুনিয়ার জন্যে আমার পালনকর্তাই যথেষ্ট এবং সকল সৃষ্টজীবের মোকাবেলায় আমার পালনকর্তা আমার জন্যে যথেষ্ট। যে তাঁর আশ্রয়ে আসে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই।

দরবারে পৌঁছে আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়ে দোয়া করেন এবং আরবী ভাষায় সালাম করেনঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ এবং বাদশাহ্র জন্যে হিব্রু ভাষায় দোয়া করলেন। বাদশাহ্ অনেক ভাষা জানতেন ; কিন্তু আরবী ও হিব্রু ভাষা তাঁর জানা ছিল না। ইউসুফ (আঃ) বলে দেন যে, সালাম আরবী ভাষায় এবং দোয়া হিব্রু ভাষায় করা হয়েছে।

এ রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, বাদশাহ্ ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা বলেন। তিনি তাঁকে প্রত্যেক ভাষায়ই উত্তর দেন এবং আরবী ও হিব্রু এই দু'টি অতিরিক্ত ভাষা শুনিয়ে দেন। এতে বাদশাহ্র মনে ইউসুফ (আঃ)-এর যোগ্যতা গভীরভাবে রেখাপাত করে।

অতঃপর বাদশাহ্ বললেনঃ আমি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনার মুখ থেকে সরাসরি শুনতে চাই। ইউসুফ (আঃ) প্রথমে স্বপ্নের এমন বিবরণ দিলেন, যা আজ পর্যন্ত বাদশাহ্ নিজেও কারও কাছে বর্ণনা করেননি। এরপর ব্যাখ্যা করলেন।

বাদশাহ্ বললেনঃ আমি আশ্চর্য বোধ করছি যে, আপনি এসব বিষয় কি করে জানলেন। অতঃপর তিনি পরামর্শ চাইলেন যে, এখন কি করা দরকার? ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ প্রথম সাত বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে। এ সময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণকে অধিক ফসল ফলানোর জন্যে নির্দেশ দিতে হবে। উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের কাছে সঞ্চিতও রাখতে হবে।

এভাবে দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্যে মিসরবাসীদের কাছে প্রচুর শস্যভান্ডার মজুদ থাকবে এবং আপনি তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত থাকবেন। রাজস্ব আয় ও খাস জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল সরকারের হাতে আসবে, তা ভিন্‌দেশী লোকদের জন্যে রাখতে হবে। কারণ, এ দুর্ভিক্ষ হবে সুদূরদেশ অবধি বিস্তৃত। ভিন্‌দেশীরা তখন আপনার মুখাপেক্ষী হবে। আপনি খাদ্যশস্য দিয়ে সেসব আর্তমানুষকে সাহায্য করবেন। বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করলেও সরকারী ধনভান্ডারে অভূতপূর্ব অর্থ সমাগমত হবে। এ পরামর্শ শুনে বাদশাহ্ মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বললেনঃ এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে এবং কে করবে? ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ

اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ, জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনি আমাকে সোপর্দ করুন। আমি এগুলোর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কেও আমার পুরোপুরি জ্ঞান আছে।—(কুরতুবী)

একজন অর্থমন্ত্রীর মধ্যে যেসব গুণ থাকার দরকার, উপরোক্ত দু'টি শব্দের মধ্যে ইউসুফ (আঃ) তার সবগুলোই বর্ণনা করে দিলেন। কেননা,

অর্থমন্ত্রীর জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সরকারী ধন-সম্পদ বিনষ্ট হতে না দেয়া ; বরং পূর্ণ হেফাযত সহকারে একত্রিত করা এবং অনাবশ্যক ও ভ্রান্ত খাতে ব্যয় না করা। দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে, যেখানে যে পরিমাণ ব্যয় করা জরুরী, সেখানে সেই পরিমাণ ব্যয় করা এবং এক্ষেত্রে কোন কম-বেশী না করা। حفيظ শব্দটি প্রথম প্রয়োজনের এবং عليم শব্দটি দ্বিতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা।

বাদশাহ্ যদিও ইউসুফ (আঃ)-এর গুণাবলীতে মুগ্ধ ও তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও বুদ্ধিমত্তায় পুরোপুরি বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি কার্যতঃ তাকে অর্থমন্ত্রীর পদ সোর্পদ করলেন না ; বরং এক বছর পর্যন্ত একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে দরবারে রেখে দিলেন।

এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ই নয় ; বরং যাবতীয় সরকারী দায়িত্বও তাঁকে সোপর্দ করে দেয়া হলো। সম্ভবতঃ এই বিলম্বের কারণ ছিল এই যে, নিকট-সান্নিধ্যে রেখে চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে পুরোপুরি অভিজ্ঞতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে এত বড় পদ দান করা উপযুক্ত ছিল না।

কোন কোন তফসীরবিদ লিখেছেন ঃ এ সময়েই যুলায়খার স্বামী কিতফীর মৃত্যু বরণ করে এবং বাদশাহ্‌র উদ্যোগে ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে যুলায়খার বিবাহ হয়ে যায়। তখন ইউসুফ (আঃ) যুলায়খাকে বললেন ঃ তুমি যা চেয়েছিলে, এটা কি তার চাইতে উত্তম নয়? যুলায়খা স্বীয় দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

আল্লাহ্ তাআলা সসম্মানে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন এবং খুব আমোদ-আহলাদে তাঁদের দাম্পত্য জীবন অতিবহিত হয়। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁদের দু'জন পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের নাম ছিল ইফরায়ীম ও মানশা।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, বিবাহের পর আল্লাহ্ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-এর অন্তরে যুলায়খার প্রতি এত গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন, যা যুলায়খার অন্তরে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি ছিল না। এমনকি, একবার ইউসুফ (আঃ) যুলায়খাকে অভিযোগের স্বরে বললেন ঃ এর কারণ কি যে, তুমি পূর্বের ন্যায় আমাকে ভালবাস না? যুলায়খা আরজ করলো ঃ আপনার ওসিলায় আমি আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা অর্জন করেছি। এ ভালবাসার সামনে সব সম্পর্ক ও চিন্তা-ভাবনা ম্লান হয়ে গেছে। এ ঘটনাটি আরও কিছু বর্ণনাসহ তফসীর কুরতুবী ও মাযহারীতে বর্ণিত হয়েছে।

ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতে সাধারণ মানুষের জন্যে কল্যাণকর অনেক পথনির্দেশ ও শিক্ষা নিহিত রয়েছে। পূর্বে এগুলোর আংশিক বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত আরও কিছু পথ-নির্দেশ নিম্নে বর্ণিত হচ্ছেঃ

(১) وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ ইউসুফ (আঃ) – এর উক্তিতে সৎ, আল্লাহ্‌ভীরু ও পরহেযগারদের জন্যে পথনির্দেশ এই যে, কোন গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার তওফীক হলে তজ্জন্যে গর্ব করা কিংবা এর বিপরীতে যারা গোনাহ্ করে, তাদেরকে হেয় মনে করা উচিত নয় ; বরং ইউসুফ (আঃ)-এর ন্যায় অন্তরে একথা বদ্ধমূল করতে হবে যে, এটা আমার কোন নিজস্ব গুণ নয় ; বরং আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপা। তিনি 'নফসে-আম্মারা'কে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে দেননি। নতুবা প্রত্যেকের মন স্বভাবগতভাবে তাকে মন্দ কাজের দিকে আকৃষ্ট করে।

اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কোন বিশেষ সরকারী পদ নিজে উপযাচক হয়ে গ্রহণ করা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জায়েয ; যেমন ইউসুফ (আঃ) দেশীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব চেয়ে নিয়েছিলেন।

কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এই যে, কোন বিশেষ পদ সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, অন্য কোন ব্যক্তি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে না এবং নিজে ভালরূপে তা সম্পাদন করতে পারবে বলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকে এবং তা ছাড়া কোন গোনাহে লিপ্ত হওয়ারও আশঙ্কা না থাকে, তবে পদটি নিজে চেয়ে নেয়াও জায়েয। তবে শর্ত এই যে, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ-কড়ির মোহে নয়, বরং জনগণের বিশুদ্ধ সেবা ও ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করাই উদ্দেশ্য থাকতে হবে। যেমন ইউসুফ (আঃ)-এর সামনে এ লক্ষ্যই ছিল। আর যেখানে এরূপ অবস্থা না হয়, সেখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন সরকারী পদ প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি নিজে কোন পদের জন্যে আবেদন করেছে, তিনি তাকে পদ দেননি।

মুসিলমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবদুর রহমান ইবনে সামরা (রাঃ)-কে বললেন ঃ কখনও প্রশাসকের পদ প্রার্থনা করো না। নিজে প্রার্থনা করে যদি প্রশাসকের পদ পেয়েও ফেল, তবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থন পাবে না। ফলে তুমি ভুল-ভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে বাঁচতে পারবে না। পক্ষান্তরে দরখাস্ত ব্যতিরেকে যদি তোমাকে কোন পদ দান করা হয়, তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থন পাবে। ফলে তুমি পদের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

মুসলিমের অপর এক হাদীসে আছে , এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে একটি পদ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ انا لن نستعمل على عملنا من اراده যে ব্যক্তি নিজে পদ প্রার্থনা করে, আমি তাকে সরকারী পদ দান করি না।

ইউসুফ (আঃ)-এর পদ প্রার্থনা বিশেষ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল ছিল ঃ ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাপারটি এই প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্ন। কারণ তিনি জানতেন যে, বাদশাহ্ কাফের। তার কর্মচারীরাও তেমনি। এ দিকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় স্বার্থবাদী মহল জনগণের প্রতি দয়ার্দ্র হবে না। ফলে লাখো মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না, যে গরীবের প্রতি সুবিচার করতে পারে। তাই তিনি নিজেই এ পদের জন্যে আবেদন করলেন। তবে এর সাথে নিজের কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্যও তাঁকে প্রকাশ করতে হয়েছে, যাতে বাদশাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এ পদ দান করেন।

অমুসলিম রাষ্ট্রে সরকারী পদ গ্রহণ করা জায়েয কি না ঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) মিসর-সম্রাটের চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। অথচ সম্রাট ছিল কাফের ; এ থেকে বোঝা যায় যে, কাফের অথবা ফাসেক শাসনকর্তার অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা বিশেষ অবস্থায় জায়েয।

কিন্তু ইমাম জাসসাস فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ (আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না) আয়াতের অধীনে লিখেছেন ঃ এ আয়াতদৃষ্টে জালেম ও কাফেরদের সাহায্য করা অবৈধ প্রমাণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, কাফেরদের অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা তাদের কার্যে অংশীদার হওয়া এবং সাহায্য করার নামান্তর। এ ধরনের সাহায্যকে কোরআন পাকের অনেক আয়াতে হারাম বলা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আঃ) এ চাকুরী শুধু গ্রহণই করেননি, বরং দরখাস্ত

করে লাভ করেছেন। তফসীরবিদ মুজাহিদের মতে এর বিশেষ কারণ এই যে, বাদশাহ্ তখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোরআন-হাদীসে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর কারণ এই যে, ইউসুফ (আঃ) বাদশাহ্র আচরণদৃষ্টে অনুভব করেছিলেন যে, তিনি তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না এবং শরীয়ত বিরোধী কোন আইন জারী করতে তাঁকে বাধ্য করবেন না। তাঁকে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। ফলে তিনি স্বীয় অভিমত ও ন্যায়নানুগ আইন অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন। শরীয়ত বিরোধী কোন আইন মানতে বাধ্য করা হবে না—এরূপ পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে কোন কাফের অথবা জালেমের চাকুরী করার মধ্যে যদিও কাফেরের সাথে সহযোগিতা করার দোষ বিদ্যমান থাকে তথাপি যে পরিস্থিতিতে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার শক্তি না থাকে এবং পদ গ্রহণ না করলে জনগণের অধিকার খর্ব হওয়ার অথবা অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রবল আশঙ্কা থাকে, সেই পরিস্থিতিতে এতটুকু সহযোগিতা করার অবকাশ ইউসুফ (আঃ)-এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, যতটুকুতে স্বয়ং কোন শরীয়তবিরোধী কাজ সম্পাদন করতে না হয়। কেননা, এটা প্রকৃতপক্ষে তার গোমরাহীর কাজে সাহায্য করা হবে না ; যদিও দূরবর্তী কারণ হিসেবে এতেও তার সাহায্য হয়ে যায়। উল্লেখিত পরিস্থিতিতে সাহায্যের দূরবর্তী কারণ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত অবকাশ আছে। ফেকাহ্বিদগণ এর পূর্ণ বিবরণ দান করেছেন। পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অনেকেই এহেন পরিস্থিতিতে অত্যাচারী শাসনকর্তাদের চাকুরী গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত আছে।—(কুরতুবী, মাযহারী)

আল্লামা মাওয়ারদি 'শরীয়তসম্মত রাজনীতি' সম্পর্কে স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, কেউ কেউ ইউসুফ (আঃ)-এর এ কর্মের ভিত্তিতে কাফের ও জালেম শাসকদের অধীনে চাকুরী কিংবা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করা এই শর্তে জায়েয বলেছেন যে, স্বয়ং তাকে শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করতে না হয়। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এ শর্ত সহকারেও এরূপ চাকুরী নাজায়েয বলেছেন। কারণ, এতেও জুলুমকারীদেরকে শক্তিশালী ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করা হয়। তাঁরা ইউসুফ (আঃ)-এর এ কাজের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করে থাকেন। এগুলোর সারমর্ম এই যে, এ কাজটি গ্রহণ করা ইউসুফ (আঃ)-এর সত্তা অথবা তাঁর শরীয়তের বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যান্যের জন্যে এখন তা জায়েয নয়। কিন্তু অধিকসংখ্যক আলেম ও ফেকাহ্বিদ প্রথমোক্ত মতামত গ্রহণ করে একে জায়েয বলেছেন।—(কুরতুবী)

তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতে আছে ঃ যে ক্ষেত্রে জানা যায় যে, আলেম পুণ্যবান ব্যক্তিরা এ পদ গ্রহণ না করলে সর্বসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে এবং সুবিচার পদে-পদে ব্যাহত হবে, সেখানে পদ গ্রহণ করা জায়েয এবং সওয়াবের কাজ ; শর্ত এই যে, এ পদ গ্রহণ করে যদি স্বয়ং তাকে কোন শরীয়তবিরোধী কাজ করতে না হয়।

মাসআলা ঃ ইউসুফ (আঃ)-এর إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজের কোন গুণগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা অবৈধ নয়। এটা কোরআনে নিষিদ্ধ 'নিজের মুখে নিজের পবিত্রতা জাহির করা'র অন্তর্ভুক্ত নয় ; অবশ্য যদি তা অহঙ্কার, গর্ব ও আস্ফালনবশতঃ না হয়।

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ
نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থাৎ, আমি ইউসুফকে বাদশাহ্র দরবারে যেভাবে মান-সম্মান ও উচ্চ পদমর্যাদা দান করেছি, এমনিভাবে আমি তাকে সমগ্র মিসরের শাসনক্ষমতা দান করেছি। এখানে সে যেভাবে ইচ্ছা আদেশ জারী করতে পারে। আমি যাকে ইচ্ছা, স্বীয় রহমত ও নেয়ামত দ্বারা সৌভাগ্যমন্ডিত করি এবং আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।

ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয় যে, এক বছর অভিজ্ঞতা অর্জনের পর বাদশাহ্র দরবারে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত পদাধিকারী ব্যক্তি ও কর্মকর্তাগণ এতে আমন্ত্রিত হন। ইউসুফ (আঃ)-কে রাজমুকুট পরিহিত অবস্থায় দরবারে হাজির করা হয় এবং শুধু অর্থ দফতরের দায়িত্ব নয়—যাবতীয় রাজকার্যই কার্যতঃ ইউসুফ (আঃ)-কে সোপর্দ করে বাদশাহ্ নির্জনবাসী হয়ে যান। —(কুরতুবী, মাযহারী)

ইউসুফ (আঃ) এমন সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করলেন যে, কারও কোন অভিযোগ রইল না। গোটা দেশ তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল এবং সর্বত্র শান্তি-শৃংখলা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করতে লাগল। রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে স্বয়ং ইউসুফ (আঃ)-ও কোনরূপ বাধাবিপত্তি কিংবা কষ্টের সম্মুখীন হননি।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ এসব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজক্ষমতা দ্বারা ইউসুফ (আঃ)-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্র বিধি-বিধান জারী করা এবং তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি কোন সময় এ কর্তব্য বিস্মৃত হননি এবং অব্যাহতভাবে বাদশাহ্কে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর অবিরাম দাওয়াত ও প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্ও মুসলমান হয়ে যান।

وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ অর্থাৎ, পরকালের প্রতিদান ও সওয়াব তাদের জন্যে দুনিয়ার নেয়ামতের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, যারা ঈমানদার এবং যারা তাকওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করে।

জনগণের সুখশান্তি নিশ্চিত করার জন্যে ইউসুফ (আঃ) এমন কাজ করেন, যার নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুখ-শান্তির সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইউসুফ (আঃ) পেটভরে খাওয়া ছেড়ে দেন। সবাই বলল ঃ মিসর সাম্রাজ্যের যাবতীয় ধন-ভান্ডার আপনার কব্জায়, অথচ আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন, এ কেমন কথা! তিনি বললেন ঃ সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অনুভূতি যাতে আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে না যায়, সেজন্যে এটা করি। তিনি শাহী বাবুর্চিদেরকে নির্দেশ দিলেন ঃ দিনে মাত্র একবার দুপুরের খাদ্য রান্না করবে যাতে রাজপরিবারের সদস্যবর্গও জনসাধারণের ক্ষুধায় কিছু অংশগ্রহণ করতে পারে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ্র কৃপায় মিসরের পূর্ণ শাসন ক্ষমতা লাভ করলেন। ৫৮তম আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েক আয়াতে ইউসুফ-ভ্রাতাদের খাদ্যশস্যের জন্যে মিসরে আগমন উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা হয়েছে যে, দশ ভাই মিসরে আগমন করেছিল ; ইউসুফ (আঃ)-এর সহোদর ছোট ভাই তাদের সাথে ছিল না।

কাহিনীর মধ্যবর্তী অংশ কোরআন বর্ণনা করেনি। কারণ, তা আপনা থেকেই বোঝা যায়।

ইবনে-কাসীর সুদ্দী, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদগণের বরাতে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা ঐতিহাসিক ও ইসরাঈলী রেওয়ায়েত

থেকে গৃহীত হলেও কিছুকটা গ্রহযোগ্য। কারণ, কোরআনের বর্ণনারীতিতে এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তাঁরা বলেছেন ঃ ইউসুফ (আঃ)-এর হাতে মিসরের শাসনভার অর্পিত হওয়ার পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশের জন্যে প্রভূত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ নিয়ে আসে। অঢেল ফসল উৎপন্ন হয় এবং তা অধিকতর পরিমাণে অর্জন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করা হয়। এরপর স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ পেতে থাকে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তা দীর্ঘ সাত বছর অব্যাহত থাকে। ইউসুফ (আঃ) পূর্ব থেকেই জ্ঞাত ছিলেন যে, দুর্ভিক্ষ সাত বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তাই দুর্ভিক্ষের প্রথম বছরে তিনি দেশের মওজুদ শস্য-ভান্ডার খুব সাবধানে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত রাখলেন।

মিসরের অধিবাসীদের কাছে তাদের প্রয়োজন পরিমাণে খাদ্যশস্য পূর্ব থেকে সঞ্চিত করানো হলো। এখন দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল এবং চুতর্দিক থেকে বুভুক্ষু জনসাধরারণ মিসরে আগমন করতে লাগল। ইউসুফ (আঃ) একটি বিশেষ পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে শুরু করলেন। অর্থাৎ, এক ব্যক্তিকে এক উট-বোঝাই খাদ্যশস্য দিতেন ; এর বেশী দিতেন না। কুরতুবী এর পরিমাণ এক ওসক্ অর্থাৎ, ষাট সা' লিখেছেন, যা আমাদের ওজন অনুযায়ী দু'শ দশ সের অর্থাৎ পাঁচ মনের কিছু বেশী হয়।

তিনি এ কাজটিকে এতটুকু গুরুত্ব দেন যে, বিক্রয় কার্যের তদারকি নিজেই করতেন। শুধু মিসরেই দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল না ; বরং দুর-দুরান্ত অঞ্চল এর করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর জন্মভূমি কেনান ছিল ফিলিস্তীনের একটি অংশ। অদ্যাবধি তা 'খলিল' নামে একটি সমৃদ্ধ শহরের আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে হযরত ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ (আঃ)-এর সমাধি অবস্থিত। এ এলাকাটিও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে ইয়াকুব (আঃ)-এর পরিবারেও অনটন দেখা দেয়। সাথে সাথেই মিসরের এ সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে অল্প মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর কানে এ সংবাদ পৌছে যে, মিসরের বাদশাহ্ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি পুত্রদেরকে বললেন ঃ তোমরাও যাও এবং মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে এসো।

এ কথাও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, একজনকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশী খাদ্যশস্য দেয়া হয় না। তাই তিনি সব পুত্রকেই পাঠাতে মনস্থ করলেন। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বেনিয়ামিন ছিলেন ইউসুফ (আঃ)-এর সহোদর। ইউসুফ নিখোঁজ হওয়ার পর ইয়াকুব (আঃ)-এর স্নেহ ও ভালবাসা তার প্রতিই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাই সান্ত্বনা ও দেখাশোনার জন্য তাঁকে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

দশ ভাই কেনান থেকে মিসর পৌছল। ইউসুফ (আঃ) শাহী পোশাকে রাজ্যাধিপতির বেশে তাদের সামনে এলেন। শৈশবে সাত বছর বয়সে ভ্রাতারা তাঁকে কাফেলার লোকজনের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল, কিন্তু এখন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর।—(কুরতুবী, মাযহারী)

বলাবাহুল্য, এত দীর্ঘ সময়ে মানুষের আকার-অবয়ব পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাদের ধারণায়ও একথা ছিল না যে, যে বালককে তারা গোলামরূপে বিক্রি করেছিল, সে কোন দেশের মন্ত্রী বা বাদশাহ্ হয়ে যেতে পারে। তাই তারা ইউসুফ (আঃ)-কে চিনল না; কিন্তু ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে চিনে ফেললেন। فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ বাক্যের অর্থ তাই। আরবী ভাষায় انكار শব্দের আসল অর্থ অপরিচিত মনে করা, তাই مُنكِرُونَ এর অর্থ অজ্ঞ ও অপরিচিত।

ইউসুফ (আঃ)-এর চিনে নেয়া সম্পর্কে সুদ্দীর বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর আরও বর্ণনা করেন যে, দশ ভাই দরবারে পৌছলে ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, যেমন সন্দেহযুক্ত লোকদেরকে করা হয়— যাতে তারা সম্পূর্ণ সত্য উদঘাটন করে। প্রথমতঃ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মিসরের অধিবাসী নও। তোমাদের ভাষাও হিব্রু। এমতাবস্থায় এখানে কিরূপে এলে? তারা বলল ঃ আমাদের দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। আমরা আপনার প্রশংসা শুনে খাদ্যশস্যের জন্যে এখানে এসেছি। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা যে সত্য বলছ এবং তোমরা কোন শত্রুর চর নও, একথা কেমন করে বিশ্বাস করব? তারা বলল ঃ আল্লাহ্র পানাহ্! আমাদের দ্বারা এরূপ কখনও হতে পারে না। আমরা আল্লাহ্র নবী ইয়্যাকুব (আঃ)-এর সন্তান। তিনি কেনানে বসবাস করেন।

হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর ও তাঁর পরিবারের বর্তমান অবস্থা জানা এবং ওদের মুখ থেকেই অতীতের কিছু ঘটনা বর্ণিত হোক — তাদেরকে প্রশ্ন করার পেছনে এটাই ছিল ইউসুফ (আঃ)-এর লক্ষ্য। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের পিতার আরও কোন সন্তান আছে কি? তারা বলল ঃ আমরা বারো ভাই ছিলাম। তন্মধ্যে ছোট এক ভাই জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমাদের পিতা তাকেই সর্বাধিক আদর করতেন। এরপর তার ছোট সহোদর ভাইকে আদর করতে শুরু করেন। তাই তাকে আমাদের সাথে এ সফরে পাঠাননি।

এসব কথা শুনে ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাখা এবং যথারীতি খাদ্যশস্য প্রদান করার আদেশ দিলেন।

বন্টনের ব্যাপারে ইউসুফ (আঃ)-এর রীতি ছিল এই যে, একবারে কোন এক ব্যক্তিকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশী খাদ্যশস্য দিতেন না। হিসাব অনুযায়ী যখন তা শেষ হয়ে যেত, তখন পুনর্বার দিতেন।

ভাইদের কাছে সব বিবরণ জানার পর তাঁর মনে এরূপ আকাঙ্খা উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, তারা পুর্নবার আসুক। এজন্যে একটি প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি স্বয়ং ভাইদেরকে বললেন ঃ

ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ

অর্থাৎ, তোমরা যখন পুনর্বার আসবে, তখন তোমাদের সে ভাইকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে, আমি কিভাবে পুরোপুরি খাদ্যশস্য প্রদান করি এবং কিভাবে অতিথি আপ্যায়ন করি।

এরপর একটি সাবধানবাণীও শুনিয়ে দিলেন ঃ

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ অর্থাৎ, তোমরা যদি ভাইকে সাথে না আন, তবে আমি তোমাদের কাউকেই খাদ্যশস্য দেব না। (কেননা, আমি মনে করব যে, তোমরা আমার সাথে মিথ্যা বলেছ।) এভাবে তোমরা আমার কাছে আসবে না।

অপর একটি গোপন ব্যবস্থা এই করলেন যে, তারা খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ যেসব নগদ অর্থকড়ি কিংবা অলংকার জমা দিয়েছিল, সেগুলো

গোপনে তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দেয়ার জন্যে কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন, যাতে বাড়ী পৌঁছে যখন তারা আসবাব খুলবে এবং নগদ অর্থ ও অলংকার পাবে, তখন যেন পুনর্বার খাদ্যশস্য নেয়ার জন্যে আসতে পারে।

মোটকথা, ইউসুফ (আঃ) কর্তৃক এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করার কারণ ছিল এই যে, ভবিষ্যতেও ভাইদের আগমন যেন অব্যাহত থাকে এবং ছোট সহোদর ভাইয়ের সাথেও তাঁর সাক্ষাত ঘটার সুযোগ উপস্থিত হয়।

অনুধাবনযোগ্য মাসআলা ঃ ইউসুফ (আঃ)-এর এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, যদি দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এমন চরমে পৌঁছে যে, সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অনেক লোক জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে, তবে সরকার এমন দ্রব্যসামগ্রীকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং খাদ্য শস্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। ফেকাহ্‌বিদগণ এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইউসুফ (আঃ)-এর অবস্থা সম্পর্কে পিতাকে অবহিত না করার কারণ ঃ ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনায় একটি চরম বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, একদিকে তাঁর পিতা আল্লাহ্‌র নবী ইয়াকূব (আঃ) তাঁর বিরহব্যথায় অশ্রু বিসর্জন করতে করতে অন্ধ হয়ে গেলেন এবং অন্যদিকে ইউসুফ (আঃ) স্বয়ং নবী ও রসূল পিতার প্রতি স্বভাবগত ভালবাসা ব্যতীত তাঁর অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে তিনি একবারও বিরহ-যাতনায় অস্থির ও মুহ্যমান পিতাকে কোন উপায়ে স্বীয় কুশল সংবাদ পৌঁছানোর কথা চিন্তাও করলেন না। সংবাদ পৌঁছানো তখনও অসম্ভব ছিল না, যখন তিনি গোলাম হয়ে মিসরে পৌঁছেছিলেন। আযীযে-মিসরের গৃহে তাঁর সবরকম স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধার সামগ্রী বিদ্যমান ছিল। তখন কারও মাধ্যমে পত্র অথবা খবর পৌঁছিয়ে দেয়া তাঁর পক্ষে তেমন কঠিন ছিল না। এমনিভাবে কারাগারের জীবনেও যে সংবাদ এদিক সেদিক পৌঁছতে পারে, তা কে না জানে। বিশেষতঃ আল্লাহ্ তাআলা যখন তাঁকে সসম্মানে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং মিসরের শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে আসে, তখন নিজে গিয়ে পিতার কাছে উপস্থিত হওয়া তাঁর সর্বপ্রথম কাজ উচিত ছিল। এটা কোন কারণে অসমীচীন হলে কমপক্ষে দূত প্রেরণ করে পিতাকে নিরুদ্বেগ করে দেয়া তো ছিল তাঁর জন্যে নেহাত মামুলী ব্যাপার।

কিন্তু আল্লাহ্‌র পয়গম্বর ইউসুফ (আঃ) এরূপ ইচ্ছা করেছেন বলেও কোথাও বর্ণিত নেই। নিজে ইচ্ছা করা দূরের কথা, যখন খাদ্যশস্য নেয়ার জন্যে ভ্রাতারা আগমন করল, তখনও আসল ঘটনা প্রকাশ না করে তাদেরকে বিদায় করে দিলেন।

এ অবস্থা কোন সামান্যতম মানুষের কাছ থেকেও কল্পনা করা যায় না। আল্লাহ্‌র মনোনীত পয়গম্বর হয়ে তিনি তা কিরূপে বরদাশত করলেন!

এ বিস্ময়কর নীরবতার জওয়াবে সব সময় মনে একথা জাগ্রত হয় যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ রহস্যের অধীনে ইউসুফ (আঃ)-কে আত্মপ্রকাশে বিরত রেখেছিলেন। তফসীর কুরতুবীতে পরে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আঃ)-কে নিজের সম্পর্কে কোন সংবাদ গৃহে প্রেরণ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তাআলার রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের পক্ষে তা বোঝা অসম্ভব। তবে মাঝে মাঝে কোন বিষয় কারও বোধগম্য হয়েও যায়। এখানে বাহ্যতঃ ইয়াকূব (আঃ)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল আসল রহস্য। এ কারণেই ঘটনার শুরুতে যখন ইয়াকূব (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউসুফকে বাঘে খায়নি; বরং এটা তাঁর ভাইদের দুষ্কৃতি, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পৌঁছে সরেযমীনে তদন্ত করা তাঁর কর্তব্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মনকে এদিকে যেতে দেননি। অতঃপর দীর্ঘদিন পর তিনি ছেলেদেরকে বললেন ঃ তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর। আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন কাজ করতে চান, তখন তার কারণাদি এমনিভাবে সন্নিবেশিত করে দেন।

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِىْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿٦٥﴾ قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِىْ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّاۤ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ يٰبَنِىَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَاۤ اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِىْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّىْۤ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾

(৬৪) বললেন, আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে কি সেরূপ বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই সম্পর্কে বিশ্বাস করেছিলাম? অতএব আল্লাহ্ উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু। (৬৫) এবং যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পণ্যমূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল ঃ হে আমাদের পিতা, আমরা আর কি চাইতে পারি। এই আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। এখন আমরা আবার আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে রসদ আনব এবং আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করব এবং এক এক উটের বরাদ্দ খাদ্যশস্য আমরা অতিরিক্ত আনব। ঐ বরাদ্দ সহজ। (৬৬) বললেন, তাকে ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার না দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছে দেবে; কিন্তু যদি তোমরা সবাই একান্তই অসহায় না হয়ে যাও। অতঃপর যখন সবাই তাঁকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেন ঃ আমাদের মধ্যে যা কথাবার্তা হলো সে ব্যাপারে আল্লাহ্ই মধ্যস্থ রইলেন। (৬৭) ইয়াকূব বললেন ঃ হে আমার বৎসগণ! সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহ্র কোন বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহ্রই চলে। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের। (৬৮) তারা যখন পিতার কথামত প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের বাঁচাতে পারল না। কিন্তু ইয়াকূবের সিদ্ধান্তে তাঁর মনের একটি বাসনা ছিল, যা তিনি পূর্ণ করেছেন। এবং তিনি তো আমার শেখানো বিষয় অবগত ছিলেন। কিন্তু অনেক মানুষ অবগত নয়। (৬৯) যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন সে আপন ভ্রাতাকে নিজের কাছে রাখল। বলল ঃ নিশ্চই আমি তোমার সহোদর। অতএব তাদের কৃতকর্মের জন্যে দুঃখ করো না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৬৩ পরবর্তী আয়াতসমূহে ঘটনার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা যখন মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল, তখন পিতার কাছে মিসরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথাও বলল ঃ আযীযে-মিসর ভবিষ্যতের জন্যে আমাদেরকে খাদ্যশস্য দেয়ার ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ছোট ভাইকে সাথে আনলে খাদ্যশস্য পাবে, অন্যথায় নয়। তাই আপনি ভবিষ্যতে বেনিয়ামিনকেও আমাদের সাথে প্রেরণ করবেন —যাতে ভবিষ্যতে আমরা খাদ্যশস্য পাই। আমরা তার পুরোপুরি হেফাযত করব। তার কোনরূপ কষ্ট হবে না।

পিতা বললেন ঃ আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? উদ্দেশ্য, এখন তোমাদের কথায় কি বিশ্বাস! একবার বিশ্বাস করে বিপদ ভোগ করেছি। তখনও হেফাযতের ব্যাপারে তোমরা এ ভাষাই প্রয়োগ করেছিলে।

এটা ছিল তাদের কথার উত্তর। কিন্তু পরে পরিবারের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পয়গম্বরসুলভ তাওয়াক্কুল এবং এ বাস্তবতায় ফিরে গেলেন যে, লাভ-ক্ষতি কোনটাই বন্দার ক্ষমতাধীন নয় — যতক্ষণ আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা না করেন। আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়ে গেলে তা কেউ টলাতে পারে না। তাই সৃষ্টজীবের উপর ভরসা করাও ঠিক নয় এবং তাদের কথার উপর নির্ভর করাও অসমীচীন।

তাই বললেন ঃ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا অর্থাৎ, তোমাদের হেফাযতের ফল তো ইতিপূর্বে দেখে নিয়েছি। এখন আমি আল্লাহ্র হেফাযতের উপরই ভরসা করি। وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু। তাঁর কাছেই আশা করি, তিনি আমার বার্ধক্য ও বর্তমান দুঃখ ও দুশ্চিন্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে অধিক কষ্টে নিপতিত করবেন না।

মোটকথা, ইয়াকূব (আঃ) বাহ্যিক অবস্থা ও সন্তানদের ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর ভরসা করলেন না। তবে আল্লাহ্র ভরসায় কনিষ্ঠ ছেলেকেও সাথে প্রেরণ করতে সম্মত হলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত সফরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই তাদের কথাবার্তা হচ্ছিল। আসবাবপত্র তখনও খোলা হয়নি। অতঃপর যখন আসবাবপত্র খোলা হল এবং দেখা গেল যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ পরিশোধিত মূল্য আসবাবপত্রের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তখন তারা অনুভব করতে পারল যে, একাজ ভুলবশতঃ হয়নি, বরং ইচ্ছাপূর্বক আমাদের পুঁজি আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তাই رُدَّتْ اِلَيْنَا বলা হয়েছে। অতঃপর তারা পিতাকে বলল ঃ مَا نَبْغِىْ অর্থাৎ, আমরা আর কি চাই? খাদ্যশস্যও এসে গেছে এবং এর মূল্যও ফেরত পাওয়া গেছে। এখন তো অবশ্যই ভাইকে নিয়ে পুনর্বার নির্বিঘ্নে যাওয়া দরকার। কারণ, এ আচরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আযীযে-মিসর আমাদের প্রতি খুবই সদয়। কাজেই কোন আশঙ্কার কারণ নেই ; আমরা পরিবারের জন্যে খাদ্যশস্য আনব, ভাইকেও হেফাজতে রাখব এবং ভাইয়ের অংশের বরাদ্দ অতিরিক্ত পাব। কারণ, আমরা যা এনেছি, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অল্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

مَا نَبْغِىْ বাক্যের এক অর্থ বর্ণিত হল। এ বাক্যের ما শব্দটি নেতিবাচক অর্থে নিলে বাক্যের আরেকটি অর্থ এরূপও হতে পারে যে, তারা পিতাকে বলল ঃ এখন তো আমাদের কাছে খাদ্যশস্য আনার জন্য মূল্যও রয়েছে। আমরা আপনার কাছে কিছুই চাই না— শুধু ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন।

এসব কথা শুনে পিতা উত্তর দিলেন ঃ

لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِىْ بِهٖ

অর্থাৎ, আমি বেনিয়ামিনকে তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র কসমসহ এরূপ ওয়াদা-অঙ্গীকার আমাকে দাও যে, তোমরা অবশ্যই তাকে সাথে নিয়ে আসবে। কিন্তু সত্যদর্শীদের দৃষ্টি থেকে এ বিষয় কোন সময় উধাও হয় না যে, মানুষ বাহ্যতঃ যত শক্তি-সামর্থ্যই রাখুক, আল্লাহ্‌র শক্তির সামনে সে নিতান্তই অপারগ ও অক্ষম। সে কাউকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কতটুকু ওয়াদা-অঙ্গীকারই বা করতে পারে। কারণ, তা পালন করার পূর্ণ শক্তি তার নেই। তাই ইয়াকুব (আঃ)-এ ওয়াদা-অঙ্গীকারের সাথে একটি ব্যতিক্রমও জুড়ে দিলেন ঃ إِلَّا أَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ অর্থাৎ, ঐ অবস্থা ব্যতীত, যখন তোমরা সবাই কোন বেষ্টনীতে পড়ে যাও। তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ এর অর্থ এই যে, তোমরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হও। কাতাদাহ্‌র মতে অর্থ এই যে, তোমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ও পরাভূত হয়ে পড়।

فَلَمَّا اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ অর্থাৎ, ছেলেরা যখন প্রার্থিত পন্থায় ওয়াদা-অঙ্গীকার করল অর্থাৎ, সবাই কসম খেল এবং পিতাকে আশ্বস্ত করার জন্যে কঠোর ভাষায় প্রতিজ্ঞা করল, তখন ইয়াকুব (আঃ) বললেন ঃ বেনিয়ামিনের হেফাযতের জন্যে হলফ নেয়া হলফ করার যে কাজ আমরা করেছি, আল্লাহ্ তাআলার উপরই তার নির্ভর। তিনি শক্তি দিলেই কেউ কারও হেফাযত করতে পারে এবং দেয় অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারে। নতুবা মানুষ অসহায়; তার ব্যক্তিগত সামর্থ্যাধীন কোন কিছু নয়।

মাসআলা ঃ (১) ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে যে ভুল করেছিল, তাতে অনেক কবীরা ও জঘণ্য গোনাহ্ সংঘটিত হয়েছিল। উদাহরণতঃ (এক) মিথ্যা কথা বলে ইউসুফকে তাদের সাথে খেলাধুলার জন্যে প্রেরণ করতে পিতাকে সম্মত করা। (দুই) পিতার সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। (তিন) কচি ও নিষ্পাপ ভাইয়ের সাথে নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করা। (চার) বৃদ্ধ পিতাকে নিদারুণ মনোকষ্ট দানে ভ্রূক্ষেপ না করা। (পাঁচ) একটি নিরপরাধ লোককে হত্যা করার পরিকল্পনা করা। (ছয়) একজন মুক্ত ও স্বাধীন লোককে জোরজবরদস্তি ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেয়া।

এগুলো ছিল চরম অপরাধ। ইয়াকুব (আঃ) যখন জানতে পারলেন যে, তারা মিথ্যা ভাষণ দিয়েছে এবং স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ইউসুফকে কোথাও রেখে এসেছে, তখন বাহ্যতঃ এটা ছেলেদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার কিংবা ওদেরকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়ার মত বিষয় ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং তারা যথারীতি পিতার কাছেই থাকে। এমনকি মিসর থেকে খাদ্যশস্য আনার জন্য পিতা তাদেরকেই প্রেরণ করেন। তদুপরি দ্বিতীয়বার তার ছোট ভাই সম্পর্কে পিতার কাছে আবেদন-নিবেদন করার সুযোগ পায় এবং অবশেষে তাদের কথা মেনে নিয়ে ছোট ছেলেকেও তাদের হাতেই সমর্পণ করেন।

এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান কোন গোনাহ্ ও ত্রুটি করে ফেললে পিতার কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষা ও উপদেশ দানের মাধ্যমে তার সংশোধন করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ সম্পর্কচ্ছেদ না করা। হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাই করেছিলেন। অবশেষে ছেলেরা সবাই কৃত অপরাধের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছে। অবশ্য যদি সংশোধনের আদৌ আশা না থাকে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে অন্যদের ধর্মীয় ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে সম্পর্কচ্ছেদ করাই সমীচীন।

মাসআলা ঃ (২) এখানে ইয়াকুব (আঃ) সদাচরণ ও সচ্চরিত্রতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ছেলেদের এহেন কঠিন অপরাধ সত্ত্বেও তিনি এমন আচরণ দেখিয়েছেন যে, তারা পুনর্বার ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে সাহসী হয়েছে।

মাসআলা ঃ (৩) এমতাবস্থায় সংশোধনের উদ্দেশে অন্যায়কারীকে একথা বলে দেয়াও সমীচীন যে, বিগত আচরণের কারণে তোমার কথা প্রত্যাখান করাই উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা ক্ষমা করে দিচ্ছি। এতে সে লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে পুরোপুরি তওবা করার সুযোগ পাবে ; যেমন ইয়াকুব (আঃ) প্রথমে বলে নিয়েছিলেন যে, বেনিয়ামিনের ব্যাপারেও কি আমি তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? কিন্তু বলার পর অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের তওবার কথা জেনে তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেছেন এবং ছোট ছেলেকে তাদের হাতে সঁপে দিয়েছেন।

মাসআলা ঃ (৪) কোন মানুষের ওয়াদা ও হেফাযতের আশ্বাসের উপর সত্যিকারভাবে ভরসা করা ভুল। প্রকৃত ভরসা শুধু আল্লাহ্‌র উপর হওয়া উচিত। তিনিই সত্যিকার কার্যনির্বাহী এবং কারণ উদ্ভাবক। কারণ সরবরাহ করা অতঃপর তাতে ক্রিয়াশক্তি দান করার ক্ষমতা তাঁরই। এ কারণেই ইয়াকুব (আঃ) বলেছেন ঃ

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا

কা'বে আহবার বলেন ঃ এবার ইয়াকুব (আঃ) শুধু ছেলেদের উপর ভরসা করেননি, বরং ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করেছেন। তাই আল্লাহ্ বললেন ঃ আমার ইয্যত ও প্রতাপের কসম, এখন আমি আপনার উভয় সন্তানকেই আপনার কাছে ফেরত পাঠাব।

মাসআলা ঃ (৫) যদি অন্য ব্যক্তির মাল অথবা কোন বস্তু আসবাব-পত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এবং বলিষ্ঠ আলামত দ্বারা বোঝা যায় যে, সে তাকে দেয়ার জন্যে ইচ্ছাপূর্বক আসবাব-পত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছে, তবে তা গ্রহণ করা এবং তাকে নিজ কাজে ব্যয় করা জায়েয। ইউসুফ-ভ্রাতাদের আসবাপত্রের মধ্যে যে পণ্যমূল্য পাওয়া গিয়েছিল সে সম্পর্কে বলিষ্ঠ আলামতের সাক্ষ্য ছিল এই যে, ভুল অথবা অনিচ্ছাবশতঃ তা হয়নি, বরং ইচ্ছাপূর্বকই তা ফেরত দেয়া হয়েছে। তাই ইয়াকুব (আঃ) তা ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেননি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভুলবশতঃ এসে যাওয়ার সন্দেহ থাকে, সেখানে মালিকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা ব্যতীত তা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

মাসআলা ঃ (৬) কোন ব্যক্তিকে এরূপ কসম দেয়া উচিত নয়, যা পূর্ণ করা তার সাধ্যাতীত। যেমন, ইয়াকুব (আঃ) বেনিয়ামিনকে সুস্থ ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কসম দেয়ার সাথে সাথে একটি অবস্থার ব্যতিক্রম প্রকাশ করেছেন যে, যদি তারা সম্পূর্ণ অপারগ ও অক্ষম হয়ে

পড়ে কিংবা সবাই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, তবে ভিন্ন কথা।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন সাহাবায়ে-কেরামের কাছ থেকে স্বীয় আনুগত্যের অঙ্গীকার নেন, তখন নিজেই তাতে 'সাধ্যের শর্ত' যুক্ত করে দেন। অর্থাৎ, আমরা সাধ্যানুযায়ী আপনার পুরোপুরি আনুগত্য করব।

মাসআলা ঃ (৭) ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছ থেকে এরূপ ওয়াদা-অঙ্গীকার নেয়া যে, তারা বেনিয়ামিনকে ফিরিয়ে আনবে — এ থেকে বোঝা যায় যে, (ব্যক্তির জামানত) বৈধ। অর্থাৎ, কোন মোকদ্দমার আসামীকে মোকদ্দমার তারিখে আদালতে হাযির করার জামানত নেয়া জায়েয।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে ইউসুফ-ভ্রাতাদের দ্বিতীয়বার মিসর সফরের কথা বর্ণিত হয়েছে। তখন ইয়াকূব (আঃ) তাদেরকে মিসর শহরে প্রবেশ করার জন্যে একটি বিশেষ উপদেশ দেন যে, তোমরা এগারো ভাই শহরের একই প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং নগর-প্রাচীরের কাছে পৌছে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেয়ো এবং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করো।

এরূপ উপদেশ দানের কারণ এই আশঙ্কা ছিল যে, স্বাস্থ্যবান, সুঠাম দেহী, সুদর্শন এবং রূপ ও ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী এসব যুবক সম্পর্কে যখন লোকেরা জানবে যে, এরা একই পিতার সন্তান এবং ভাই ভাই, তখন কারও বদ নজর গেলে তাদের ক্ষতি হতে পারে। অথবা সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রবেশ করার কারণে হয়তো কেউ হিংসাপরায়ণ হয়ে তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

ইয়াকূব (আঃ) তাদেরকে প্রথম সফরের সময় এরূপ উপদেশ দেননি; দ্বিতীয় সফরের প্রাক্কালেই দিয়েছেন। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, প্রথমবার তারা মুসাফিরের বেশে এবং দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় মিসরে প্রবেশ করেছিল। কেউ তাদেরকে চিনত না এবং তাদের প্রতি কারও অতিরিক্ত মনোযোগ দানের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু প্রথম সফরেই মিসর-সম্রাট তাদের প্রতি অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করেন। ফলে সাধারণ রাজকর্মচারী ও শহরবাসীদের কাছে তারা পরিচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং এখন কারও কুদৃষ্টি লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠে, কিংবা সবাইকে একটি জাঁকজমকপূর্ণ দল মনে করে হয়ত কেউ হিংসায় মেতে উঠতে পারে। এছাড়া এবারকার সফরে ছোট পুত্র বেনিয়ামিন সঙ্গে থাকাও তাদের প্রতি পিতার অধিকতর মনোযোগ দানের কারণ হতে পারে।

কুদৃষ্টির প্রভাব সত্য ঃ এতে বোঝা গেল যে, মানুষের চোখ (কুদৃষ্টি) লাগা এবং এর ফলে অন্য মানুষ অথবা জন্তু জানোয়ারের কষ্ট কিংবা ক্ষতি হওয়া সত্য। এটা মূর্খতাসুলভ কুসংস্কার নয়। এ কারণেই ইয়াকূব (আঃ) এ থেকে পুত্রদের রক্ষার চিন্তা করেছেন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও একে সত্যায়িত করেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ কুদৃষ্টি মানুষকে কবরে এবং উটকে উনানে ঢুকিয়ে দেয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেসব বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং উম্মতকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, তন্মধ্যে من كل عين لا مة ও রয়েছে। অর্থাৎ, আমি কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।—(কুরতুবী)

ইয়াকূব (আঃ) একদিকে কুদৃষ্টি অথবা হিংসার আশঙ্কাবশতঃ ছেলেদেরকে একই দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন এবং অন্যদিকে একটি বাস্তব সত্য প্রকাশ করাও জরুরী মনে করেছেন। এ সত্যের প্রতি ঔদাসীন্যের ফলে এ জাতীয় ব্যাপারাদিতে জনসাধারণ মূর্খতাসুলভ ধারণা ও কুসংস্কারের শিকার হয়ে পড়ে। সত্যটি এই যে, কোন মানুষের জ্ঞান ও মালের মধ্যে কুদৃষ্টির প্রভাব এক প্রকার মেসমেরিজম। ক্ষতিকর ঔষধ কিংবা খাদ্য যেমন মানুষকে অসুস্থ করে দেয় এবং শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতায় রোগব্যাধি জন্ম নেয়, তেমনি কুদৃষ্টি ও মেসমেরিজমের প্রভাবও এসব অভ্যস্ত কারণের অধীন। দৃষ্টি অথবা কল্পনার শক্তি বলে এদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। স্বয়ং এদের মধ্যে কোন সত্যিকার প্রভাবশক্তি নাই। বরং সব কারণ আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তি, ইচ্ছা ও এরাদায় অধীন। আল্লাহ্র তকদীরের বিপরীতে কোন উপকারী তদবীরে উপকার হতে পারে না এবং ক্ষতিকর তদবীরের ক্ষতির প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই ইয়াকূব (আঃ) বলেছেন ঃ

وَمَآ أُغْنِى عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ

تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ

অর্থাৎ, কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার যে তদবীর আমি বলেছি, আমি জানি যে, তা আল্লাহ্র ইচ্ছাকে এড়াতে পারবে না। আদেশ একমাত্র আল্লাহ্রই চলে। তবে মানুষের প্রতি বাহ্যিক তদবীর করার নির্দেশ আছে। তাই এ উপদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তদবীরের উপর ভরসা করি না; বরং আল্লাহ্র উপরই ভরসা করি। তাঁর উপরই ভরসা করা এবং বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবীরের উপর ভরসা না করা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

ইয়াকূব (আঃ) যে সত্য প্রকাশ করেছেন, ঘটনাচক্রে হয়েছেও কিছুটা তেমনি। এ সফরেও বেনিয়ামিনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার যাবতীয় তদবীর চূড়ান্ত করা সত্ত্বেও সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং বেনিয়ামিনকে মিসরে আটকে রাখা হয়েছে। ফলে ইয়াকূব (আঃ) আরও একটি আঘাত পেলেন। তাঁর তদবীরের ব্যর্থতা পরবর্তী আয়াতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য তাই যে, আসল লক্ষ্যের দিক দিয়ে তদবীর ব্যর্থ হয়েছে, যদিও কুদৃষ্টি হিংসা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার তদবীর সফল হয়েছে। কারণ, সফরে অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে যে দুর্ঘটনা অনিবার্য ছিল, ইয়াকূব (আঃ)-এর দৃষ্টি সেদিকে যায়নি এবং এর জন্যে কোন তদবীর করতে পারেননি। এ বাহ্যিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আল্লাহ্র উপর ভরসার বরকতে এ দ্বিতীয় আঘাত প্রথম আঘাতেরও প্রতিকার প্রমাণিত হয়েছে এবং পরিণামে পরম নিরাপত্তা ও ইয্যতের সাথে ইউসুফ ও বেনিয়ামিন উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছে।

পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই বর্ণিত হয়েছে যে, ছেলেরা পিতার আদেশ পালন করে বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। ফলে পিতার নির্দেশ কার্যকর হয়ে গেল। অবশ্য এ তদবীর আল্লাহ্র কোন নির্দেশকে এড়াতে পারত না, কিন্তু পিতৃ-সুলভ স্নেহ-মমতার চাহিদা ছিল যা, তা তিনি পূর্ণ করেছেন।

এ আয়াতের শেষভাগে ইয়াকূব (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলা হয়েছে— وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَٰهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

— অর্থাৎ, ইয়াকূব (আঃ) বড় বিদ্বান ছিলেন, কারণ, আমি তাঁকে বিদ্যা দান করেছিলাম। উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ লোকদের ন্যায় তাঁর বিদ্যা পুঁথিগত ও অনুশীলনলব্ধ নয় বরং তা ছিল সরাসরি আল্লাহ্র দান। এ কারণেই তিনি শরীয়তসম্মত ও প্রশংসনীয় বাহ্যিক তদবীর অবলম্বন করলেও তার উপর ভরসা করেননি। কিন্তু অনেক লোক এ সত্য জানে না

এবং অজ্ঞাতবশতঃ ইয়াকূব (আঃ) সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে যে, একজন পয়গম্বরের পক্ষে এ জাতীয় তদবীর শোভনীয় ছিল না।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ প্রথম শব্দটি দ্বারা এলম অনুযায়ী আমল করা বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তাঁকে যে এলম দিয়েছিলাম তিনি তদনুযায়ী আমল করতেন। এ কারণেই বাহ্যিক তদবীরের উপর ভরসা করেননি ; বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করেছেন।

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ
فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ, মিসরে পৌছার পর যখন সব ভাই ইউসুফ (আঃ)–এর দরবারে উপস্থিত হল এবং তিনি দেখলেন যে, ওয়াদা অনুযায়ী তারা তাঁর সহোদর ছোট ভাইকেও নিয়ে এসেছে, তখন ইউসুফ (আঃ) ছোট ভাই বেনিয়ামিনকে বিশেষভাবে নিজের সাথে রাখলেন। তফসীরবিদ কাতাদাহ বলেন ঃ সব ভাইয়ের বসবাসের ব্যবস্থা করে ইউসুফ (আঃ) প্রতি দু'জনকে একটি করে কক্ষ দিলেন। ফলে বেনিয়ামিন একা থেকে যায়। ইউসুফ তাকে নিজের সাথে অবস্থান করতে বললেন। যখন উভয়েই একান্তে গেলেন, তখন ইউসুফ (আঃ) সহোদর ভাইয়ের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন ঃ আমিই তোমার সহোদর ভাই ইউসুফ এখন তোমার কোন চিন্তা নেই। অন্য ভাইগণ এ যাবত যেসব দুর্ব্যবহার করেছে, তজ্জন্যে মনোকষ্টে পতিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই।

নির্দেশ ও মাসআলা ঃ আলোচ্য দু'আয়াত থেকে কতিপয় মাসআলা ও নির্দেশ জানা যায়।

(১) বদ নজর লাগা সত্য। সুতরাং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর ক্রিয়াকর্ম থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করার ন্যায় এ থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করাও সমভাবে শরীয়তসিদ্ধ।

(২) প্রতিহিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিশেষ নেয়ামত ও গুণগত বৈশিষ্ট্যকে গোপন রাখা দুরস্ত।

(৩) ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবীর করা তাওয়াক্কুল ও পয়গম্বরগণের পদমর্যাদার পরিপন্থী নয়।

(৪) যদি কেউ অন্য কারও সম্পর্কে আশঙ্কা পোষণ করে যে, সে দুঃখ-কষ্টে পতিত হবে, তবে তাকে অবহিত করা এবং দুঃখ কষ্টের হাত থেকে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য উপায় বলে দেয়া উত্তম, যেমন ইয়াকূব (আঃ) করেছিলেন।

(৫) যদি অন্য কারও কোন গুণ অথবা নেয়ামত দৃষ্টিতে বিস্ময়কর ঠেকে এবং নজর লেগে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে তা দেখে بارك الله অথবা ماشاء الله বলা দরকার, যাতে অন্যের কোন ক্ষতি না হয়।

(৬) নজর লাগা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে যে কোন সম্ভাব্য তদবীর করা জায়েয। তন্মধ্যে দোয়া-তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা প্রতিকার করাও অন্যতম; যেমন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জা'ফর ইবনে আবুতালেবের দু'ছেলেকে দুর্বল দেখে তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

(৭) বিজ্ঞ মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক কাজে আসল ভরসা আল্লাহ্‌র উপর রাখা। কিন্তু বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক উপায়াদিকেও উপেক্ষা করবে না এবং সাধ্যানুযায়ী বৈধ উপায়াদি অবলম্বন করতে ত্রুটি করবে না। ইয়াকূব (আঃ) তাই করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ও (সাঃ) তাই শিক্ষা দিয়েছেন।

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ
أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۝ قَالُوا
وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۝ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ
الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۝
قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا
كُنَّا سَارِقِينَ ۝ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ ۝ قَالُوا
جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَٰلِكَ نَجْزِي
الظَّالِمِينَ ۝ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ
اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا
كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ
دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝ قَالُوا إِن
يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي
نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا تَصِفُونَ ۝ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا
كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

(৭০) অতঃপর যখন ইউসুফ তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিল, তখন পানপাত্র আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিল। অতঃপর একজন ঘোষক ডেকে বলল ঃ হে কাফেলার লোকজন, তোমরা অবশ্যই চোর। (৭১) তারা ওদের দিকে মুখ করে বলল ঃ তোমাদের কি হারিয়েছে? (৭২) তারা বলল ঃ আমরা বাদশাহ্‌র পানপাত্র হারিয়েছি এবং যে কেউ এটা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে এবং আমি এর যামিন। (৭৩) তারা বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা তো জান, আমরা অনর্থ ঘটাতে এদেশে আসিনি এবং আমরা কখনও চোর ছিলাম না। (৭৪) তারা বলল ঃ যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে যে চুরি করেছে তার কি শাস্তি? (৭৫) তারা বলল ঃ এর শাস্তি এই যে, যার রসদপত্র থেকে তা পাওয়া যাবে, এর প্রতিদানে সে দাসত্বে যাবে। আমরা যালেমদেরকে এভাবেই শাস্তি দেই। (৭৬) অতঃপর ইউসুফ আপন ভাইদের থলের পূর্বে তাদের থলে তল্লাশী শুরু করলেন। অবশেষে সেই পাত্র আপন ভাইয়ের থলের মধ্য থেকে বের করলেন। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। সে বাদশাহ্‌র আইনে আপন ভাইকে কখনও দাসত্বে দিতে পারত না, কিন্তু আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন। আমি যাকে ইচ্ছা, মর্যাদায় উন্নীত করি এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছে অধিকতর এক জ্ঞানীজন। (৭৭) তারা বলতে লাগল ঃ যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। তখন ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে রাখলেন এবং তাদেরকে জানালেন না। মনে মনে বললেন ঃ তোমরা লোক হিসাবে নিতান্ত মন্দ এবং আল্লাহ্ খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যা তোমরা বর্ণনা করছ; (৭৮) তারা বলতে লাগল ঃ হে আযীয, তার পিতা আছেন, যিনি খুবই বৃদ্ধ-বয়স্ক। সুতরাং আপনি আমাদের একজনকে তার বদলে রেখে দিন। আমরা আপনাকে অনুগ্রহশীল ব্যক্তিদের একজন দেখতে পাচ্ছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সহোদর ভাই বেনিয়ামিনকে রেখে দেয়ার জন্যে ইউসুফ (আঃ) একটি কৌশল ও তদবীর অবলম্বন করলেন। যখন সব ভাইকে নিয়ম মাফিক খাদ্যশস্য দেয়া হল, তখন প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উটের পিঠে পৃথক পৃথক নামে চাপানো হল।

বেনিয়ামিনের যে খাদ্য শস্য উটের পিঠে চাপানো হল, তাতে একটি পাত্র গোপনে রেখে দেয়া হল। কোরআন পাক এ পাত্রটিকে এক জায়গায় السِّقَايَةَ শব্দের দ্বারা এবং অন্যত্র صُوَاعَ الْمَلِكِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। السِّقَايَةَ শব্দের অর্থ পানি পান করার পাত্র এবং صُوَاعَ শব্দটিও এমনি ধরনের পাত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়। একে ملك তথা বাদশাহ্‌র দিকে নির্দেশিত করার ফলে আরও জানা গেল যে, এ পাত্রটি বিশেষ মূল্যবান ও মর্যাদাবান ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, পাত্রটি 'যবরজদ' পাথর দ্বারা নির্মিত ছিল। আবার কেউ স্বর্ণ নির্মিত এবং রৌপ্য নির্মিতও বলেছেন। মোটকথা, বেনিয়ামিনের রসদপত্রে গোপনে রক্ষিত এ পাত্রটি যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া ছাড়াও বাদশাহ্‌র সাথে এর বিশেষ সম্পর্কও ছিল। বাদশাহ্ নিজে তা ব্যবহার করতেন, অথবা বাদশাহ্‌র আদেশে তা খাদ্যশস্য পরিমাপের পাত্ররূপে ব্যবহৃত হত।

ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ — অর্থাৎ, কিছুক্ষণ পর জনৈক ঘোষক ডেকে বলল ঃ হে কাফেলার লোকজন, তোমরা চোর।

এখানে ثم শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, এ ঘোষণা তৎক্ষণাৎ করা হয়নি ; বরং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর করা হয়েছে—যাতে কেউ জালিয়াতির সন্দেহ না করতে পারে। মোটকথা, ঘোষক ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাফেলাকে চোর আখ্যা দিল।

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ – অর্থাৎ ইউসুফ-ভ্রাতাগণ ঘোষণাকারীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল ঃ তোমরা আমাদেরকে চোর বলছ। প্রথমে একথা আমাদের বল যে, তোমাদের কি বস্তু চুরি হয়েছে?

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

— ঘোষণাকারীগণ বলল, বাদশাহ্‌র পানপাত্র হারিয়ে গেছে। যে ব্যক্তি তা বের করে দেবে সে এক উটের বোঝাই পরিমাণ খাদ্যশস্য পুরস্কার পাবে এবং আমি এর জামিন।

এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, ইউসুফ (আঃ) বেনিয়ামিনকে আটকানোর জন্যে এ কৌশল কেন করলেন, অথচ তিনি জানতেন যে, স্বয়ং তাঁর বিচ্ছেদের আঘাত পিতার জন্যে অসহনীয় ছিল? এমতাবস্থায় অপর ভাইকে আটকে তাঁকে আরও একটি আঘাত দেয়া তিনি কিরূপে পছন্দ করলেন ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ। তা এই যে, নিরপরাধ ভাইদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা, গোপনে তাদের আসবাব-পত্রের মধ্যে কোন বস্তু রেখে দেয়ার মত জালিয়াতি, কথা এবং প্রকাশ্যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা—এসব কাজ অবৈধ। আল্লাহ্‌র পয়গম্বর ইউসুফ (আঃ) এগুলো কিভাবে সহ্য করলেন?

কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন ঃ বেনিয়ামিন যখন ইউসুফ

৬৮২

(আঃ)–কে নিশ্চিতরূপে চিনে ফেলে, তখন সে নিজেই ভাইকে অনুরোধ করে যে, তাকে যেন ভাইদের কাছে ফেরত পাঠানো না হয়; বরং ইউসুফ (আঃ)–এর কাছে রাখা হয়। ইউসুফ (আঃ) প্রথমে এ অজুহাতই পেশ করলেন যে, তাকে এখানে রাখা হলে পিতার মনোকষ্টের অন্ত থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ তাকে এখানে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করতঃ আটক রাখা। বেনিয়ামিন ভাইদের সাথে বসবাস করতে এতই নারাজ ছিল যে, সে এ জাতীয় প্রস্তাবেও সম্মত হয়ে যায়।

কিন্তু এ ঘটনা সত্য হলেও পিতার মনোকষ্ট, ভাইদের লাঞ্ছনা এবং তাদেরকে চোর বলা শুধু বেনিয়ামিনের সম্মতির কারণে বৈধ হতে পারে না। কেউ কেউ কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ঘোষক বোধ হয় ইউসুফ (আঃ)–এর অজ্ঞাতসারে এবং বিনা অনুমতিতে ভাইদের চোর বলেছিল। এ উক্তি যেমন প্রমাণহীন, তেমনি ঘটনার সাথে বে–খাপ্পা। এমনিভাবে কেউ কেউ বলেন ঃ ভ্রাতাগণ ইউসুফ (আঃ)–কে পিতার কাছ থেকে চুরি করে বিক্রয় করেছিল। তাই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে। এটাও একটা নিছক ব্যাখ্যা বৈ নয়। অতএব, এসব প্রশ্নের বিশুদ্ধ উত্তর তা'ই – যা কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ গ্রন্থকার দিয়েছেন। তা এই যে, এ ঘটনায় যা করা হয়েছে এবং যা বলা হয়েছে, তা বেনিয়ামিনের বাসনার ফলশ্রুতিও ছিল না এবং ইউসুফ (আঃ)–এর প্রস্তাবের ফলও ছিল না; বরং এসব কাজ ছিল আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁরই অপার রহস্যের বহিঃপ্রকাশ। এসব কাজের মাধ্যমে ইয়াকূব (আঃ)–এর পরীক্ষার বিভিন্নস্তর পূর্ণতা লাভ করছিল। এ উত্তরের প্রতি স্বয়ং কোরআনের এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে। كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ – অর্থাৎ, আমি ইউসুফের খাতিরে এমনিভাবে তার ভাইকে আটকানোর কৌশল করেছি।

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে এ ফন্দি ও কৌশলকে আল্লাহ্ তাআলা নিজের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, এসব কাজ যখন আল্লাহ্র নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে, তখন এগুলোকে অবৈধ বলার কোন মানে নাই। এগুলো মূসা ও খিযিরের ঘটনায় নৌকা ভাঙ্গা, বালককে হত্যা করা ইত্যাদির মতই। এগুলো বাহ্যতঃ গোনাহ্র কাজ ছিল বলেই মূসা (আঃ) তা মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু খিযির (আঃ) সব কাজ আল্লাহ্র নির্দেশে বিশেষ উপযোগিতার অধীনে করে যাচ্ছিলেন। তাই এগুলো গোনাহের কাজ ছিল না।

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ

অর্থাৎ, শাহী ঘোষক যখন ইউসুফ (আঃ)–এর ভ্রাতাদেরকে চোর বলল, তখন তারা উত্তরে বলল ঃ সভাসদবর্গও আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন যে, আমরা এখানে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই।

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ – রাজকর্মচারীরা বললল ঃ যদি তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কি শাস্তি?

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

অর্থাৎ, ইউসুফের ভ্রাতাগণ বলল ঃ যার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হবে; সে নিজেই দাসত্ব বরণ করবে। আমরা চোরকে এমনি ধরনের সাজা দেই।

উদ্দেশ্য, ইয়াকূব (আঃ)–এর শরীয়তে চোরের শাস্তি এই যে, যার মাল চুরি করে সে চোরকে গোলাম করে রাখবে। রাজকর্মচারীরা এভাবে স্বয়ং ভ্রাতাদের কাছ থেকে ইয়াকূবী শরীয়ত অনুযায়ী চোরের শাস্তি জেনে নিল, যাতে বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হলে তারা নিজেদেরই ফয়সালা অনুযায়ী তাকে ইউসুফ (আঃ)–এর হাতে সোপর্দ করতে বাধ্য হয়।

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ —অর্থাৎ, সরকারী তল্লাশকারীরা প্রকৃত ষড়যন্ত্র ঢেকে রাখার জন্যে প্রথমেই অন্য ভাইদের আসবাবপত্র তালাশ করল। প্রথমেই বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র খুলল না, যাতে তাদের সন্দেহ না হয়।

ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ —অর্থাৎ, সব শেষে বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র খোলা হলে তা থেকে শাহীপাত্রটি বের হয়ে এল।

তখন ভাইদের অবস্থা দেখে কে? লজ্জায় সবার মাথা হেট হয়ে গেল। তারা বেনিয়ামিনকে গাল–মন্দ দিয়ে বলল ঃ তুমি আমাদের মুখে চুনকালি দিলে।

كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا

أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ — অর্থাৎ, এমনিভাবে আমি ইউসুফের খাতিরে কৌশল করেছি। তিনি বাদশাহ্র আইনানুযায়ী ভাইকে গ্রেফতার করতে পারতেন না। কেননা, মিসরের আইনে চোরকে মারপিট করে এবং চোরাই মালের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে ছেড়ে দেয়ার বিধান ছিল। কিন্তু তারা এখানে ইউসুফ–ভ্রাতাদের কাছ থেকেই ইয়াকূবী শরীয়তানুযায়ী চোরের বিধান জেনে নিয়েছিল। এ বিধান দৃষ্টে বেনিয়ামিনকে আটকে রাখা বৈধ হয়ে গেল। এমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছায় ইউসুফ (আঃ)– এর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ — অর্থাৎ, আমি যাকে ইচ্ছা, উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে দেই, যেমন এ ঘটনায় ইউসুফের মর্যাদা তাঁর ভাইদের তুলনায় উচ্চ করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরই তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বিদ্যমান রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞানের দিক দিয়ে সৃষ্টজীবের মধ্যে একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। একজন যত বড় জ্ঞানীই হোক, তার মোকাবিলায় আরও অধিক জ্ঞানী থাকে। মানব জাতির মধ্যে যদি কেউ এমন হয় যে, তার চাইতে অধিক জ্ঞানী আর নেই, তবে এ অবস্থায়ও আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জ্ঞান সবারই উর্ধ্বে।

নির্দেশ ও মাসআলা ঃ

(১) وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্যে মজুরী কিংবা পুরস্কার নির্ধারণ করে যদি এই মর্মে ঘোষণা দান করা হয় যে, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, সে এই পরিমাণ পুরস্কার কিংবা মজুরী পাবে, তবে তা জায়েয হবে; যেমন অপরাধীদেরকে গ্রেফতার করার জন্য কিংবা হারানো বস্তু ফেরত দেয়ার জন্যে এ ধরনের পুরস্কার–ঘোষণা সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। যদিও এ জাতীয় লেন–দেন ফিকাহ্ শাস্ত্রে বর্ণিত ইজারার সংজ্ঞানুরূপ নয়, তথাপি এ আয়াতদৃষ্টে তার বৈধতা প্রমাণিত হয়।—(কুরতুবী)

(২) وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ—দ্বারা বোঝা গেল যে, একজন অন্যজনের পক্ষে আর্থিক অধিকারের যামিন হতে পারে। সাধারণ ফিকাহ্বিদদের মতে এ

ব্যাপারে বিধান এই যে, প্রাপক আসল দেনাদার কিংবা যামিন এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একজনের কাছ থেকে তার পাওনা আদায় করে নিতে পারে। যদি যামিনের কাছ থেকে আদায় করা হয়, তবে সে দেনা পরিমাণ অর্থ আসল দেনাদারের কাছ থেকে নিয়ে নেবে।— (কুরতুবী)

(৩) كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ — থেকে জানা গেল যে, কোন শরীয়তসম্মত উপযোগিতার ভিত্তিতে যদি লেন-দেনের আকারে এমন পরিবর্তন করা হয়, যার ফলে বিধান পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে তা আইনতঃ জায়েয হবে। ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় একে حيلة (হীলা) বলা হয়। এর জন্য শর্ত এই যে, এর ফলে যেন শরীয়তের কোন বিধান বাতিল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শরীয়তের বিধান বাতিল হয়ে যায়— এরূপ হীলা সর্বসম্মতভাবে হারাম। যেমন যাকাত থেকে গা বাঁচানোর জন্যে কোন হীলা করা অথবা রমযানের পূর্বে কোন অনাবশ্যক সফরে বের হয়ে পড়া—যাতে রোযা না রাখার অজুহাত সৃষ্টি হয়। এরূপ করা সর্বসম্মতভাবে হারাম। এ জাতীয় হীলা করার কারণে কোন কোন জাতি আযাবে নিপতিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরূপ হীলা করতে নিষেধ করেছেন। এরূপ হীলার আশ্রয় নিলে কোন অবৈধ কাজ বৈধ হয়ে যায় না; বরং পাপের মাত্রা দ্বিগুণ হয়। এক পাপ আসল অবৈধ কাজের এবং দ্বিতীয় পাপ অবৈধ হীলার, যা একদিক দিয়ে আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে প্রতারণার নামান্তর। ইমাম বুখারী كتاب الحيل তথা হীলা অধ্যায়ে এ জাতীয় হীলার অবৈধতা প্রমাণ করেছেন।

اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ — অর্থাৎ, সে যদি চুরি করে থাকে তাতে আশ্চর্যের কি আছে! তার এক ভাই ছিল, সেও এমনিভাবে ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। উদ্দেশ্য এই যে, সে আমাদের সহোদর ভাই নয়—বৈমাত্রেয় ভাই। তার এক সহোদর ভাই ছিল সে-ও চুরি করেছিল।

ইউসুফ-ভ্রাতারা এখন স্বয়ং ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। এতে ইউসুফ (আঃ)-এর শৈশবকালীন একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে বেনিয়ামিনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উত্থাপনের জন্যে যেভাবে চক্রান্ত করা হয়েছে, তখন হুবহু তেমনিভাবে ইউসুফ (আঃ)-এর বিরুদ্ধেও তার অজ্ঞাতে চক্রান্ত করা হয়েছিল। তখন এই ভ্রাতারা ভালোভাবেই জানত যে, উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে ইউসুফ (আঃ) সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু এখন বেনিয়ামিনের প্রতি আক্রোশের আধিক্যবশতঃ সে ঘটনাটিকে চুরি আখ্যা দিয়ে ইউসুফ (আঃ)-কেও তাতে অভিযুক্ত করে দিয়েছে।

ঘটনাটি কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও মুজাহিদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ (আঃ)-এর জন্মের পর কিছুকালের মধ্যেই বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ করে। ফলে এ সন্তানপ্রসবই জননীর মৃত্যুর কারণ হয়। ইউসুফ ও বেনিয়ামিন উভয়েই মাতৃহীন হয়ে পড়লেন। তাদের লালন-পালন ফুফুর কোলে সম্পন্ন হতে লাগল। আল্লাহ্ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-কে শিশুকাল থেকেই এমন রূপ-সৌন্দর্য দান করেছিলেন যে, তাকে যেই দেখত, সেই আদর করতে বাধ্য হত। ফুফুর অবস্থাও ছিল তাই। তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে দৃষ্টি থেকে দূর হতে দিতেন না এবং দিতে পারতেন না। এদিকে পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর অবস্থাও এর চাইতে কম ছিল না। কিন্তু কচি শিশু হওয়ার কারণে কোন মহিলার রক্ষণাবেক্ষণে থাকা জরুরী বিধায় তাকে ফুফুর হাতে সমর্পণ করে দেন। শিশু যখন চলাফেরার যোগ্য হয়ে গেল, তখন ইয়াকুব (আঃ) তাকে নিজের সাথেই রাখতে চাইলেন। ফুফুকে একথা বললে প্রথমে আপত্তি করলেন। অতঃপর অধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ইউসুফকে পিতার হাতে সমর্পণ করলেন। কিন্তু ফেরত নেয়ার জন্যে গোপনে একটি ফন্দি আঁটলেন। ফুফু হযরত ইসহাক (আঃ)-এর কাছ থেকে একটি হাঁসুলি পেয়েছিলেন। এটিকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করা হত। ফুফু এই হাঁসুলিটিই ইউসুফ (আঃ)-এর কাপড়ের নীচে কোমরে বেঁধে দিলেন।

ইউসুফ (আঃ)-এর চলে যাওয়ার পর ফুফু জোরেশোরে প্রচার শুরু করলেন যে, তার হাঁসুলিটি চুরি হয়ে গেছে। অতঃপর তল্লাশী নেয়ার পর ইউসুফ (আঃ)-এর কাছ থেকে তা বের হল। ইয়াকুবী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ফুফু ইউসুফকে গোলাম করে রাখার অধিকার পেলেন। ইয়াকুব (আঃ) যখন দেখলেন যে, আইনত ফুফু ইউসুফের মালিক হয়ে গেছেন, তখন তিনি দ্বিরুক্তি না করে ইউসুফকে তার হাতে সমর্পণ করলেন। এরপর যতদিন ফুফু জীবিত ছিলেন, ইউসুফ (আঃ) তার কাছেই রইলেন।

এই ছিল ঘটনা, যাতে ইউসুফ (আঃ) চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর সবার কাছেই এ সত্য দিবালোকের মত ফুটে উঠেছিল যে, ইউসুফ (আঃ) চুরির এতটুকু সন্দেহ থেকেও মুক্ত ছিলেন। ফুফুর আদরই তাঁকে ঘিরে এ চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছিল। এ সত্য ভাইদেরও জানা ছিল। এদিক দিয়ে ইউসুফ (আঃ)- কে কোন চুরির ঘটনার সাথে জড়িত করা তাদের পক্ষে শোভনীয় ছিল না। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে তাদের যে বাড়াবাড়ি ও অবৈধাচরণ আজ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, এটা তারই সর্বশেষ অংশ ছিল।

فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ -অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) ভাইদের কথা শুনে একথা মনে মনেই রাখলেন যে, এরা দেখি এখনও পর্যন্ত আমার পেছনে লেগে রয়েছে। এখনো তারা আমাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করছে। কিন্তু তিনি ভাইদের কাছে একথা প্রকাশ হতে দিলেন না যে, তিনি তাদের একথা শুনেছেন এবং তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ — অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) মনে মনে বললেন ঃ তোমাদের স্তর ও অবস্থাই মন্দ যে, জেনেশুনে ভাইদের প্রতি চুরির দোষারোপ করছ। আরও বললেন ঃ তোমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলাই অধিক জানেন। প্রথম বাক্যটি মনে মনে বলেছেন এবং দ্বিতীয় বাক্যটি সম্ভবতঃ জোরেই বলছেন।

قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

ইউসুফ ভ্রাতারা যখন দেখল যে, কোন চেষ্টাই ফলবতী হচ্ছে না এবং বেনিয়ামিনকে এখানে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই; তখন তারা প্রার্থনা জানাল যে, এর পিতা নিরতিশয় বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল। এর বিচ্ছেদের যাতনা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আপনি এর পরিবর্তে আমাদের কাউকে গ্রেফতার করে নিন। আমরা দেখছি, আপনি খুবই অনুগ্রহশীল। এ ভরসায়ই আমরা এ প্রার্থনা জানাচ্ছি। অথবা অর্থ এই যে, আপনি পূর্বেও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ
اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا اسْتَيْــَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ
قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ
مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ
اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ
خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ
ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا
لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿٨١﴾ وَسْــَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا
وَالْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٨٢﴾ قَالَ بَلْ
سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ
يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٨٣﴾ وَتَوَلّٰى
عَنْهُمْ وَقَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ
الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى
تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿٨٥﴾ قَالَ اِنَّمَاۤ اَشْكُوْا
بَثِّيْ وَحُزْنِيْۤ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾

(৭৯) তিনি বললেন ঃ যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া আর কাউকে গ্রেফতার করা থেকে আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন। তা হলে তো আমরা নিশ্চিতই অন্যায়কারী হয়ে যাব। (৮০) অতঃপর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামর্শের জন্যে এখানে বসল। তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল ঃ তোমরা কি জান না যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা অন্যায় করেছ? অতএব আমি তো কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না, যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে আদেশ দেন অথবা আল্লাহ্ আমার পক্ষে কোন ব্যবস্থা করে দেন। তিনিই সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক। (৮১) তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল ঃ পিতঃ, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা তাই বলে দিলাম, যা আমাদের জানা ছিল এবং অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য ছিল না। (৮২) জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের লোকদেরকে যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকে, যাদের সাথে আমরা এসেছি। নিশ্চিতই আমরা সত্য বলছি। (৮৩) তিনি বললেন ঃ কিছুই না, তোমার মনগড়া একটি কথা নিয়েই এসেছ। এখন ধৈর্যধারণই উত্তম। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাদের সবাইকে একসঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৮৪) এবং তাদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ হায় আফসোস ইউসুফের জন্যে! এবং দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল। এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট। (৮৫) তারা বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্র কসম আপনি তো ইসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত হবেন না, যে পর্যন্ত মরণাপন্ন না হয়ে যান কিংবা মৃতবরণ না করেন। (৮৬) তিনি বললেন ঃ আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহ্র সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তা তোমরা জান না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ

ইউসুফ (আঃ) ভাইদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়ে বললেন ঃ যাকে ইচ্ছা গ্রেফতার করার ক্ষমতা আমাদের নেই, বরং যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে, তাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে গ্রেফতার করি, তবে আমরা তোমাদেরই ফতোয়া ও ফয়সালা অনুযায়ী জালেম হয়ে যাব। কারণ, তোমরাই বলেছ যে, যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হবে, সে-ই তার শাস্তি পাবে।

فَلَمَّا اسْتَيْــَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا — অর্থাৎ, ইউসুফ ভ্রাতারা যখন বেনিয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরস্পর পরামর্শ করার জন্যে একটি পৃথক জায়গায় একত্রিত হল।

قَالَ كَبِيْرُهُمْ —তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল ঃ তোমাদের কি জানা নেই যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে বেনিয়ামিনকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে কঠিন শপথ নিয়েছিলেন? তোমরা ইতিপূর্বেও ইউসুফের ব্যাপারে একটি মারাত্মক অন্যায় করেছ। তাই আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মিসর ত্যাগ করব না, যতক্ষণ পিতা নিজেই আমাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ না দেবেন অথবা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আমার এখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ না আসে। আল্লাহ্ তাআলাই সর্বোত্তম নির্দেশদাতা।

এখানে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উক্তি বর্ণিত হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন ইয়াহুদা। তিনি ছিলেন বয়সে সবার বড়। একদা ইউসুফ (আঃ)-কে হত্যা না করার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। কারও মতে তিনি হচ্ছেন শামউন। তিনি প্রভাব প্রতিপত্তির ও মর্যাদার দিক দিয়ে সবার বড় গণ্য হতেন।

اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ — অর্থাৎ, বড় ভাই বললেন আমি তো এখানেই থাকব। তোমরা সবাই পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে বল যে, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা বলছি, তা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট চাক্ষুষ ঘটনা। আমাদের সামনেই তার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে।

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ — অর্থাৎ, আমরা আপনার কাছে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিলাম যে, বেনিয়ামিনকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনব। আমাদের এ ওয়াদা ছিল বাহ্যিক অবস্থা বিচারে। অদৃশ্যের অবস্থা আমাদের জানা ছিল না যে, সে চুরি করে গ্রেফতার হবে এবং আমরা নিরুপায় হয়ে পড়ব। এ বাক্যের এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা ভাই বেনিয়ামিনের যথাসাধ্য হেফাযত করেছি, যাতে সে কোন অনুচিত কাজ করে বিপদে না পড়ে। কিন্তু আমাদের এ চেষ্টা বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্তই সম্ভবপর ছিল। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ও অজ্ঞাতে সে এমন কাজ করবে, আমাদের জানা ছিল না।

ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে পিতাকে একবার ধোকা দিয়েছিল। ফলে তারা জানত যে, এ বর্ণনায় পিতা কিছুতেই আশ্বস্ত হবেন না এবং তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। তাই অধিক জোর দেয়ার জন্যে বলল ঃ আপনি যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করেন, তবে যে শহরে আমরা ছিলাম (অর্থাৎ, মিসরে), তথাকার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এবং আপনি

ঐ কাফেলার লোকজনকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন যারা আমাদের সাথেই মিসর থেকে কিনান এসেছে। আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

এ ক্ষেত্রে তফসীরে-মাযহারীতে এ প্রশ্নটি পূর্ণব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ) পিতার সাথে এমন নির্দয় ব্যবহার কেন করলেন? নিজের অবস্থা তো পিতাকে জানালেনই না, তদুপরি ছোট ভাইকেও রেখে দিলেন। ভ্রাতারা বার বার মিসরে এসেছে ; কিন্তু তিনি তাদের কাছে আত্মপরিচয় প্রকাশ করলেন না এবং পিতার কাছেও সংবাদ পাঠালেন না। এসব প্রশ্নের উত্তরে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ

ইউসুফ (আঃ) এসব কাজ আল্লাহ্র নির্দেশেই করেছিলেন, ইয়াকূব (আঃ)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য।

মাসআলা ঃ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কারও সাথে কোন চুক্তির আবদ্ধ হয়, তখন তা বাহ্যিক অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়—অজানা বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। ইউসুফ-ভ্রাতারা পিতার সাথে বেনিয়ামিনের হেফাযত সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছিল, তা ছিল তাদের আয়ত্তাধীন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বেনিয়ামিনের চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়াতে অঙ্গীকারে কোন ত্রুটি দেখা দেয়নি।

তফসীরে-কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে আরও একটি মাসআলা বের করে বলা হয়েছে ঃ এ বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষ্যদান জানার উপর নির্ভরশীল। ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান যে কোনভাবে হোক, তদনুযায়ী সাক্ষ্য দেয়া যায়। তাই কোন ঘটনার সাক্ষ্য যেমন চাক্ষুষ দেখে দেয়া যায়, তেমনি কোন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেও দেয়া যায়। তবে আসল সূত্র গোপন করা যাবে না-বর্ণনা করতে হবে যে, ঘটনাটি সে নিজে দেখেনি—অমুক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেছে। এ নীতির ভিত্তিতেই মালেকী মাযহারের ফিকাহ্বিদগণ অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্যকেও বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি সৎ ও সঠিক পথে থাকে ; কিন্তু ক্ষেত্র এমন যে, অন্যেরা তাকে অসৎ কিংবা পাপকাজে লিপ্ত বলে সন্দেহ করতে পারে তবে তার পক্ষে এ সন্দেহের কারণ দূর করা উচিত, যাতে অন্যরা কু-ধারণার গোনাহে লিপ্ত না হয়। ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে কৃত পূর্ববর্তী আচরণের আলোকে বেনিয়ামিনের ঘটনায় ভাইদের সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, এবারও তারা মিথ্যা ও সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণের জন্যে জনপদ অর্থাৎ, মিসরবাসীদের এবং যুগপৎ কাফেলার লোকজনের সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমেও এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একবার তিনি উম্মুল-মুমিনীন হযরত সফিয়্যা (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মসজিদ থেকে এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। গলির মাথায় দু'জন লোককে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে দিলেন ঃ আমার সাথে সফিয়্যা বিনতে হুয়াই রয়েছে। ব্যক্তিদ্বয় আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আপনার সম্পর্কেও কেউ কু-ধারণা করতে পারে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই কারও মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া বিচিত্র নয়।-(বুখারী, মুসলিম, কুরতুবী)

ইয়াকূব (আঃ)-এর ছোট ছেলে বেনিয়ামিন মিসরে গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর ভ্রাতারা দেশে ফিরে এল এবং ইয়াকূব (আঃ)-কে যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনাল। তারা তাঁকে আশ্বস্ত করতে চাইল যে, এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ সত্যবাদী। বিশ্বাস না হলে মিসরবাসীদের কাছে কিংবা মিসর থেকে কেনানে আগত কাফেলার লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করা যায়। তারাও বলবে যে, বেনিয়ামিন চুরির কারণে গ্রেফতার হয়েছে। ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাপারে ছেলেদের মিথ্যা একবার প্রমাণিত হয়েছিল। তাই এবারও ইয়াকূব (আঃ) বিশ্বাস করতে পারলেন না ; যদিও বাস্তবে এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলেনি। এ কারণে এ ক্ষেত্রেও তিনি ঐ বাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা ইউসুফ (আঃ)-এর নিখোঁজ হওয়ার সময় উচ্চারণ করেছিলেন। بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ —অর্থাৎ, তোমরা যা বলছ, সত্য নয়। তোমরা মনগড়া কথা বলছ। কিন্তু আমি এবারও সবর করব। সবরই আমার জন্যে উত্তম।

এ থেকেই কুরতুবী বলেন ঃ মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে কথা বলেন তা ভ্রান্তও হতে পারে। এমনকি, পয়গম্বরও যদি ইজতিহাদ করে কোন কথা বলেন, তবে প্রথম পর্যায়ে তা সঠিক না হওয়াও সম্ভবপর। যেমন, এ ব্যাপারে হয়েছে। ইয়াকূব (আঃ) ছেলেদের সত্যকেও মিথ্যা মনে করে নিয়েছেন। কিন্তু পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরকে ভ্রান্তি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। কাজেই পরিণামে তাঁরা সত্যে উপনীত হন।

এমনও হতে পারে, যে মনগড়া কথা বলে ইয়াকূব (আঃ) ঐ কথা বুঝিয়েছেন যা মিসরে গড়া হয়েছিল। অর্থাৎ, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কৃত্রিম চুরি দেখিয়ে বেনিয়ামিনকে গ্রেফতার করে নেয়া। অবশ্য ভবিষ্যতে এর পরিণাম চমৎকার আকারে প্রকাশ পেত। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এদিকে ইঙ্গিতও হতে পারে। বলা হয়েছে ঃ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا — অর্থাৎ, আশা করা যায় যে, সম্ভবত ঃ শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদের সবাইকে আমার কাছে পৌঁছে দেবেন।

মোটকথা, ইয়াকূব (আঃ) এবার ছেলেদের কথা মেনে নেননি। এই না মানার তাৎপর্য ছিল এই যে, প্রকৃতপক্ষে কোন চুরিও হয়নি এবং বেনিয়ামিনও গ্রেফতার হয়নি। এটা যথাস্থানে নির্ভুল ছিল। কিন্তু ছেলেরা নিজ জ্ঞানমতে যা বলেছিল, তাও ভ্রান্ত ছিল না।

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ — অর্থাৎ, দ্বিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর ইয়াকূব (আঃ) এ ব্যাপারে ছেলেদের সাথে বাক্যালাপ ত্যাগ করে পালনকর্তার কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগলেন এবং বললেন ঃ ইউসুফের জন্যে বড়ই পরিতাপ। এ ব্যাথায় ক্রন্দন করতে তাঁর চোখ দু'টি শ্বেতবর্ণ ধারণ করল। অর্থাৎ, দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল কিংবা দুর্বল হয়ে গেল। তফসীরবিদ মুকাতিল বলেন ঃ ইয়াকূব (আঃ)- এর এ অবস্থা ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিল। فَهُوَ كَظِيمٌ —অর্থাৎ, অতঃপর তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কারও কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করতেন না। كظيم শব্দটি كظم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ভরে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুঃখ ও বিষাদে তাঁর মন ভরে গেল এবং মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কারও কাছে তিনি দুঃখের কথা বর্ণনা করতেন না।

এ কারণেই كظم শব্দটি ক্রোধ সংবরণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, মন ক্রোধে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মুখ অথবা হাত দ্বারা ক্রোধের কোন কিছু প্রকাশ না পাওয়া। হাদীসে আছে, ومن يكظم الغيظ ياجره الله —অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ প্রকাশ করে না, আল্লাহ্ তা আলা তাকে বড় প্রতিদান

দেবেন।

এক হাদীসে আছে, হাশরের দিন আল্লাহ্ তাআলা এরূপ লোকদেরকে প্রকাশ্য সমাবেশে এনে বলবেন ঃ জান্নাতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে যেটি ইচ্ছা, গ্রহণ কর।

ইমাম ইবনে জরীর এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বিপদমুহূর্তে إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বলার শিক্ষা এ উম্মতেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে এ বাক্যটি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য এভাবে জানা গেছে যে, তীব্র দুঃখ ও আঘাতের সময় ইয়াকূব (আঃ) এ বাক্যটির পরিবর্তে يَا أَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ বলেছেন। 'বায়হাকী শোআবুল-ঈমানে' ও হাদীসটি ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন।

ইউসুফের প্রতি ইয়াকূব (আঃ)-এর গভীর মহব্বতের কারণ ঃ ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর অসাধারণ মহব্বত ছিল। ইউসুফ (আঃ) নিখোঁজ হয়ে গেলে তিনি একেবারেই হতোদ্যম হয়ে পড়েন। কোন কোন রেওয়ায়েতে পিতা-ছেলের বিচ্ছেদের সময়কাল চল্লিশ বছর এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আশি বছর বলা হয়েছে। দীর্ঘ সময় তিনি ছেলের শোকে কাঁদতে কাঁদতে অতিবাহিত করেন। ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যায়। সন্তানের মহব্বতে এতটা বাড়াবাড়ি বাহ্যতঃ পয়গম্বরসুলভ পদমর্যাদার পক্ষে শোভনীয় নয়। কোরআন পাকে সন্তান-সন্ততিকে ফেৎনা আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফেৎনা ও পরীক্ষা বৈ নয়। পক্ষান্তরে কোরআন পাকের ভাষায় পয়গম্বরগণের শান হচ্ছে এই إِنَّا أَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ — অর্থাৎ আমি পয়গম্বরগণকে একটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত করেছি। সে গুণ হচ্ছে পরকালের স্মরণ। মালেক ইবনে দীনারের মতে এর অর্থ এই যে, আমি তাঁদের অন্তর থেকে সাংসারিক মহব্বত বের করে দিয়েছি এবং শুধু আখেরাতের মহব্বত দ্বারা তাদের অন্তর পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। কোন বস্তু গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আখেরাত।

এ বর্ণনা থেকে এ সন্দেহ আরও কঠিনভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াকূব (আঃ)-এর সন্তানের মহব্বতে এতটুকু ব্যাকুল হয়ে পড়া কেমন করে শুদ্ধ হতে পারে?

কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ) তফসীরে মাযহারীতে এ প্রশ্ন উল্লেখ করে হযরত মুজাদ্দিদে- আলফেসানীর এক বিশেষ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে সংসার ও সংসারের উপকরণাদির প্রতি মহব্বত নিন্দনীয়। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু সংসারের যেসব বস্তু আখেরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোর মহব্বত প্রকৃতপক্ষে আখেরাতেরই মহব্বত। ইউসুফ (আঃ)-এর গুণ-গরিমা শুধু দৈহিক রূপ-সৌন্দর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং পয়গম্বরসুলভ পবিত্রতা ও চারিত্রিক সৌন্দর্যও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সমষ্টির কারণে তাঁর মহব্বত সংসারের মহব্বত ছিল না, বরং প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের মহব্বত ছিল।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, এ মহব্বত যদিও প্রকৃতপক্ষে সংসারের মহব্বত ছিল না, কিন্তু সর্বাবস্থায় এতে একটি সাংসারিক দিকও ছিল। এ জন্যেই এটা হযরত ইয়াকূব (আঃ) – এর পরীক্ষার কারণ হয়েছে এবং তাঁকে চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের অসহনীয় যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। এই ঘটনার অদ্যোপান্ত এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে দীর্ঘতর হয়ে গেছে। নতুবা ঘটনার শুরুতে এত গভীর মহব্বত পোষণকারী পিতার পক্ষে পুত্রদের কথা শুনে নিশ্চুপ ঘরে বসে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর হত না, বরং তিনি অবশ্যই অকুস্থলে পৌছে খোঁজ-খবর নিতেন। ফলে তখনই যাতনার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারত। কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, তখন এদিকে দৃষ্টি যায়নি। এরপর ইউসুফ (আঃ)-কে পিতার সাথে যোগাযোগ করতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করা হল। ফলে মিসরের শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েও তিনি যোগাযোগের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এর চাইতে বেশী ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দেয়ার মত ঘটনাবলী তখন ঘটেছে, যখন ইউসুফ-ভ্রাতারা বার বার মিসর গমন করতে থাকে। তিনি তখনও ভাইদের কাছে গোপন রহস্য খোলেননি এবং পিতাকে সংবাদ দেয়ার চেষ্টা করেননি, বরং একটি কৌশলের মাধ্যমে অপর ভাইকেও নিজের কাছে আটকে রেখে পিতার মর্মবেদনাকে দ্বিগুণ করে দেন। এসব কর্মকাণ্ড ইউসুফ (আঃ) – এর মত একজন মনোনীত পয়গম্বর দ্বারা ততক্ষণ সম্ভবপর নয়, যতক্ষণ না তাঁকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেয়া হয়। এ কারণেই কুরতবী প্রমুখ তফসীরবিদ ইউসুফ (আঃ)-এর এসব কর্মকাণ্ডকে খোদায়ী ওহীর ফলশ্রুতি সাব্যস্ত করেছেন। কোরআনের كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ —অর্থাৎ, ছেলেরা পিতার এহেন মনোবেদনা সত্ত্বেও এমন অভিযোগহীন সবর দেখে বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্র কসম, আপনি তো সদাসর্বদা ইউসুফকেই স্মরণ করতে থাকেন। ফলে হয় আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন, না হয় মরেই যাবেন। (প্রত্যেক আঘাত ও দুঃখের একটা সীমা আছে। সাধারণতঃ সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষ দুঃখ-বেদনা ভুলে যায়। কিন্তু আপনি এত দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রথম দিনের মতই রয়েছেন এবং আপনার দুঃখ তেমনি সতেজ রয়েছে।)

ইয়াকূব (আঃ) ছেলেদের কথা শুনে বললেন ঃ إِنَّمَا أَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْ إِلَى اللّٰهِ —অর্থাৎ, আমি আমার ফরিয়াদ ও দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা তোমাদের অথবা অন্য কারও কাছে করি না ; বরং আল্লাহ্র কাছে করি। কাজেই আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। সাথে সাথে এ কথাও প্রকাশ করলেন যে, আমার স্মরণ করা বৃথা যাবে না। আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না। অর্থাৎ, আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমাকে সবার সাথে মিলিত করবেন।

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا
مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ
الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا
وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ
وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾ قَالَ
هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿٨٩﴾
قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ۗ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِيْ ۖ
قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ۗ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ
لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٠﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ
اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٔيْنَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ
الْيَوْمَ ۗ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٩٢﴾ اِذْهَبُوْا
بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَأْتِ بَصِيْرًا ۚ
وَأْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ
الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ
تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾

(৮৭) বৎসগণ! যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না। (৮৮) অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন বলল ঃ হে আযীয, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ্ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (৮৯) ইউসুফ বললেন ঃ তোমাদের জানা আছে কি, যা তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে করেছ, যখন তোমরা অপরিণামদর্শী ছিলে? (৯০) তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ! বললেন ঃ আমিই ইউসুফ এবং এ হল আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়, যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, আল্লাহ্ এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। (৯১) তারা বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের চাইতে আল্লাহ্ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম। (৯২) বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবান চাইতে অধিক মেহেরবান। (৯৩) তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দিও, এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এস। (৯৪) যখন কাফেলা রওয়ানা হল, তখন তাদের পিতা বললেন ঃ যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ না বল, তবে বলি ঃ আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। (৯৫) লোকেরা বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ –অর্থাৎ, বৎসরা, যাও। ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, কাফের ছাড়া কেউ তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।

ইয়াকূব (আঃ) এতদিন পর ছেলেদেরকে আদেশ দিলেন যে, যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ কর এবং তাদেরকে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। ইতিপূর্বে কখনও তিনি এমন আদেশ দেননি। এটা তকদীরেরই ব্যাপার। ইতিপূর্বে তাদেরকে পাওয়া তকদীরে ছিল না। তাই এরূপ কোন কাজও করা হয়নি। এখন মিলনের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল। তাই আল্লাহ্ তাআলা এর উপযুক্ত তদবীরও মনে জাগিয়ে দিলেন।

উভয়কে খোঁজ করার স্থান মিসরই সাব্যস্ত করা হল। এটা বেনিয়ামিনের বেলায় নির্দিষ্টই ছিল ; কিন্তু ইউসুফ (আঃ)-কে মিসরে খোঁজ করার বাহ্যতঃ কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন এর উপযুক্ত কারণাদিও উপস্থিত করে দেন। তাই এবার ইয়াকূব (আঃ) সবাইকে খোঁজ করার জন্য ছেলেদেরকে আবার মিসর যেতে নির্দেশ দিলেন। কেউ কেউ বলেন ঃ আযীযে-মিসর কর্তৃক ছেলেদের রসদপত্রের মধ্যে পণ্য ফেরত দেয়ার ঘটনা থেকে ইয়াকূব (আঃ) প্রথম বার আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, এই আযীযে মিসর খুবই ভদ্র ও দয়ালু ব্যক্তি। বিচিত্র নয় যে, সেই তাঁর হারানো ইউসুফ।

নির্দেশ ও মাসআলা ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ ইয়াকূব (আঃ)-এর ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জান, মাল ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে কোন বিপদ ও কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সবর ও আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে এর প্রতিকার করা এবং ইয়াকূব (আঃ) ও অন্যান্য পয়গম্বরের অনুসরণ করা।

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ মানুষ যত ঢোক গিলে, তন্মধ্যে দু'টি ঢোকই আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয়। (এক) বিপদে সবর ও (দুই) ক্রোধ সংবরণ।

হাদীসে আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, من بث لم يصبر অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বীয় বিপদ সবার কাছে বর্ণনা করে, সে সবর করেনি।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা ইয়াকূব (সাঃ)-কে সবরের কারণে শহীদদের সওয়াব দান করেছেন। এ উম্মতের মধ্যেও যে ব্যক্তি বিপদে সবর করবে, তাকে এমনি প্রতিদান দেয়া হবে।

ইমাম কুরতুবী ইয়াকূব (আঃ)-এর এই অগ্নিপরীক্ষার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ একদিন ইয়াকূব (আঃ) তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। আর তাঁর সামনে ঘুমিয়ে ছিলেন ইউসুফ (আঃ)। হঠাৎ ইউসুফ (আঃ)-এর নাক ডাকার শব্দ শুনে তাঁর মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও এমনি হল। তখন আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বললেন ঃ দেখ, আমার দোস্ত ও মকবুল বন্দা আমাকে সম্বোধন করার মাঝখানে অন্যের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, আমি তার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করে দিব, যদ্দ্বারা সে অন্যের দিকে তাকায় এবং যার দিকে মনোযোগ দিয়েছে, তাকে দীর্ঘকালের জন্যে বিচ্ছিন্ন করে দিব। কোন কোন রেওয়ায়েতেও এ ঘটনাটি

বর্ণিত হয়েছে।

তাই বুখারীর হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নামাযে অন্য দিকে তাকানো কেমন? তিনি বললেন ঃ এর মাধ্যমে শয়তান বান্দার নামায ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا অর্থাৎ, ইউসুফ-ভ্রাতারা যখন পিতার নির্দেশ মোতাবেক মিসরে পৌছল এবং আযীযে-মিসরের সাথে সাক্ষাত করল, তখন নিতান্ত কাতরভাবে কথাবার্তা শুরু করল। নিজেদের দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ করে বলতে লাগল ঃ হে আযীয ! দুর্ভিক্ষের কারণে আমরা পরিবারবর্গ নিয়ে খুবই কষ্টে আছি। এমন কি, এখন খাদ্যশস্য কেনার জন্যে আমাদের কাছে উপযুক্ত মূল্যও নেই। আমরা অপারগ হয়ে কিছু অকেজো বস্তু খাদ্যশস্য কেনার জন্যে নিয়ে এসেছি। আপনি নিজ চরিত্রগুণে এসব অকেজো বস্তু কবুল করে নিন এবং পরিবর্তে আমাদেরকে পুরোপুরি খাদ্যশস্য দিয়ে দিন, যা উত্তম মূল্যের বিনিময়ে দেয়া হয়। বলাবাহুল্য, আমাদের কোন অধিকার নেই। আপনি খয়রাত মনে করেই দিয়ে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা খয়রাতদাতাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন।

অকেজো বস্তুগুলো কি ছিল, কোরআন ও হাদীসে তার কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন ঃ এগুলো ছিল কৃত্রিম রৌপ্য মুদ্রা, যা বাজারে অচল ছিল। কেউ বলেন ঃ কিছু ঘরে ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্র ছিল। এ হচ্ছে مُّزْجٰىةٍ শব্দের অনুবাদ। এর আসল অর্থ এমন বস্তু, যা নিজে সচল নয় ; বরং জোরজবরদস্তি সচল করতে হয়।

ইউসুফ (আঃ) ভাইদের এহেন মিসকীনসুলভ কথাবার্তা শুনে এবং দুরবস্থা দেখে স্বভাবগতভাবে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। ঘটনা প্রবাহে অনুমিত হয় যে, ইউসুফ (আঃ)-এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে বিধি-নিষেধ ছিল, এখন তা অবসানের সময়ও এসে গিয়েছিল। তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় হযরত ইয়াকুব (আঃ) আযীযে-মিসরের নামে একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল এরূপ ঃ-

ইয়াকুব সফিউল্লাহ্ ইবনে ইসহাক যবিহুল্লাহ্ ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আযীযে-মিসর সমীপে।

বিনীত আরজ।

বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যেরই অঙ্গবিশেষ। নমরূদের আগুনের দ্বারা আমার পিতামহ ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌র পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। অতঃপর আমার পিতা ইসহাকেরও কঠোর পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। এরপর আমার সর্বাধিক প্রিয় এক পুত্রের মাধ্যমে আমার পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। তার বিরহ-ব্যথায় আমার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেছে। তারপর তার ছোট ভাই ছিল ব্যথিতের সান্ত্বনার একমাত্র সম্বল, যাকে আপনি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন। আমি বলি, আমরা পয়গম্বরদের সন্তান-সন্ততি। আমরা কখনও চুরি করিনি এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও কেউ চোর হয়ে জন্ম নেয়নি। ওয়াস্‌সালাম।

পত্র পাঠ করে ইউসুফ (আঃ) কেঁপে উঠলেন এবং কান্না রোধ করতে পারলেন না। এরপর নিজের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দিলেন। পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে ভাইদেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের স্মরণ আছে কি? তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিলে, যখন তোমাদের মূর্খতার দিন ছিল এবং যখন তোমরা ভাল-মন্দের বিচার করতে পারতে না?

এ প্রশ্ন শুনে ইউসুফ-ভ্রাতাদের মাথা ঘুরে গেল যে, ইউসুফের কাহিনীর সাথে আযীযে-মিসরের কি সম্পর্ক। অতঃপর তারা একথাও চিন্তা করল যে, শৈশবে ইউসুফ একটি স্বপ্ন দেখেছিল, যার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, কালে ইউসুফ কোন উচ্চ মর্তবায় পৌছবে এবং তার সামনে আমাদের সবাইকে মাথা নত করতে হবে। অতএব এ আযীযে-মিসরই স্বয়ং ইউসুফ নয় তো! এরপর আরও চিন্তা-ভাবনার পর কিছু কিছু আলামত দ্বারা চিনে ফেলল এবং আরও তথ্য জানার জন্যে বলল ঃ

ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ সত্যি সত্যিই কি তুমি ইউসুফ ঃ ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ হাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই। ভাইয়ের প্রসঙ্গ জুড়ে দেয়ার কারণ, যাতে তাদের লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি সাফল্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে দু'জনের খোঁজে তারা বের হয়েছিল, তারা উভয়েই এক জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। এরপর ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ

قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ۖ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন। প্রথমে আমাদের উভয়কে সবর ও তাকওয়ার দু'টি গুণ দান করেছেন। এগুলো সাফল্যের চাবিকাঠি এবং প্রত্যেক বিপদাপদের রক্ষাকবচ। এরপর আমাদের কষ্টকে সুখে, বিচ্ছেদকে মিলনে এবং অর্থ সম্পদের স্বল্পতাকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। নিশ্চয় যারা পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদাপদে সবর করে, আল্লাহ্ এহেন সৎকর্মীদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার ও ইউসুফ (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়া ছাড়া ইউসুফ-ভ্রাতাদের উপায় ছিল না। সবাই একযোগে বলল ঃ تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ আল্লাহ্‌র কসম, তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তুমি এরই যোগ্য ছিলে। আমরা নিজেদের কৃতকর্মে দোষী ছিলাম। আল্লাহ্ মাফ করুন। উত্তরে ইউসুফ (আঃ) পয়গম্বরসুলভ গাম্ভীর্যের সাথে বললেন ঃ

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ অর্থাৎ, তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়া তো দূরের কথা, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগও নেই। এ হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ। অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন।

يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের অন্যায় ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান।

অতঃপর বললেন ঃ

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ, আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার চেহারার উপর রেখে দাও। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। ফলে এখানে আসতেও সক্ষম হবেন। পরিবারের অন্যান্য সবাইকেও

আমার কাছে নিয়ে এস যাতে সবাই দেখা-সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে পারি ; আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত দ্বারা উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হতে পারি।

বিধান ও নির্দেশ ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে অনেক বিধান এবং মানবজীবনের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জানা যায়।

وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا — বাক্যে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ইউসুফ-ভ্রাতারা পয়গম্বরগণের আওলাদ। তাদের জন্যে সদ্কা-খয়রাত কেমন করে হালাল ছিল? এছাড়া সদকা হালাল হলেও চাওয়া কিভাবে বৈধ ছিল? ইউসুফ-ভ্রাতারা পয়গম্বর না হলেও ইউসুফ (আঃ)-তো পয়গম্বর ছিলেন। তিনি এ ভ্রান্তির কারণে তাদেরকে হুশিয়ার করলেন না কেন?

এর একটি পরিষ্কার উত্তর এই যে, এখানে 'সদ্কা' শব্দ বলে সত্যিকার সদ্কা বোঝানো হয়নি ; বরং কারবারে সুযোগ-সুবিধা দেয়াকেই 'সদ্কা' 'খয়রাত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, তারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খাদ্যশস্যের সওয়াল করেনি ; বরং কিছু অকেজো বস্তু পেশ করেছিল। অনুরোধের সারমর্ম ছিল এই যে, এসব স্বল্প মূল্যের বস্তু রেয়াত করে গ্রহণ করুন। এ উত্তরও সম্ভবপর যে, পয়গম্বরগণের আওলাদের জন্যে সদকা-খয়রাতের অবৈধতা শুধু উম্মতে মোহাম্মদীর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। তফসীরবিদগণের মধ্যে মুজাহিদদের উক্তি তাই।–(বয়ানুল-কোরআন)

إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ — দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা সদ্কা-খয়রাত দাতাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সদ্কা-খয়রাতের এক প্রতিদান হচ্ছে ব্যাপক, যা মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই দুনিয়াতেই পায় এবং তা হচ্ছে বিপদাপদ দূর হওয়া। অপর একটি প্রতিদান শুধু পরকালেই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ, জান্নাত। এটা শুধু ঈমানদারদের প্রাপ্য। এখানে আযীযে-মিসরকে সম্বোধন করা হয়েছে। ইউসুফ ভ্রাতারা তখনও পর্যন্ত জানত না যে, তিনি ঈমানদার, না কাফের। তাই তারা এমন ব্যাপক বাক্য বলেছে, যাতে ইহকাল ও পরকাল – উভয়কালই বোঝা যায়।—(বয়ানুল-কোরআন)

এছাড়া এখানে বাহ্যত ঃ আযীযে-মিসরকে সম্বোধন করে বলা উচিত ছিল যে, "আপনাকে আল্লাহ্ তাআলা উত্তম প্রতিদান দেবেন।' কিন্তু তারা জানত না যে, আযীযে-মিসর ঈমানদার। তাই সদ্কাদাতা মাত্রকেই আল্লাহ্ প্রতিদান দিয়ে থাকেন, এরূপ ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে,বিশেষভাবে তিনিই প্রতিদান পাবেন-এমন বলা হয়নি।—(কুরতুবী)

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا — দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়, এরপর আল্লাহ্ যখন তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন, তখন তার উচিত অতীত বিপদ ও কষ্টের কথা উল্লেখ না করে উপস্থিত নেয়ামত ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা। বিপদ মুক্তি ও খোদায়ী নেয়ামত লাভ করার পরও অতীত দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ করে হা-হুতাশ করা অকৃতজ্ঞতা। কোরআন পাকে এ ধরনের অকৃতজ্ঞকে كنود বলা হয়েছে إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ—كنود ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে, অনুগ্রহ স্মরণ না করে—শুধু কষ্ট ও বিপদাপদের কথাই স্মরণ করে।

এ কারণেই ইউসুফ (আঃ) ভাইদের ষড়যন্ত্রে দীর্ঘকাল ধরে যেসব বিপদাপদ ভোগ করেছিলেন, এ সময় সেগুলোর কথা মোটেই উল্লেখ করেননি, বরং আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহরাজির কথাই উল্লেখ করেছেন।

সবর ও তাকওয়া সমস্ত বিপদের প্রতিকার ঃ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ শীর্ষক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, তাকওয়া অর্থাৎ, গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা এবং বিপদে সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন, এ দু'টি গুণ মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেয়। কোরআন পাক অনেক জায়গায় এ দু'টি গুণের উপরই মানুষের সাফল্য ও কামিয়াবী নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে ঃ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا অর্থাৎ, তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে শত্রুদের শত্রুতামূলক কলা-কৌশল তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।

এখানে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, ইউসুফ (আঃ) দাবী করেছেন যে, তিনি মুত্তাকী ও সবরকারী, তাঁর তাকওয়া ও সবরের কারণে বিপদাপদ দূর হয়েছে এবং উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। অথচ কোরআন পাকে এরূপ দাবী করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ — অর্থাৎ, "নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করো না ; আল্লাহ্ তাআলাই বেশী জানেন কে মুত্তাকী।" কিন্তু এখানে প্রকৃতপক্ষে দাবী করা হয়নি, বরং আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে সবর ও তাকওয়া দান করেছেন, অতঃপর এর মাধ্যমে সব নেয়ামত দিয়েছেন।

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ — অর্থাৎ, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। এটা চরিত্রের উচ্চতম স্তর যে, অত্যাচারীকে শুধু ক্ষমাই করেননি, বরং একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এখন তোমাদেরকে তিরস্কার করা হবে না।

وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ অর্থাৎ, তোমরা সব ভাই আপন আপন পরিবারবর্গকে আমার কাছে মিসরে নিয়ে এস। পিতাকে আনাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখানে স্পষ্টতঃ পিতার পরিবর্তে পরিবারবর্গকে আনার কথা উল্লেখ করেছেন সম্ভবতঃ এ কারণে যে পিতাকে এখানে আনার কথা বলা আদবের খেলাফ মনে করেছেন। এছাড়া এ বিশ্বাস তো ছিলই যে, যখন পিতার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে এবং এখানে আসতে কোন বাধা থাকবে না, তখন পিতা নিজেই আগ্রহী হয়ে চলে আসবেন। কুরতুবী বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ভাইদের মধ্যে ইয়াহুদা বলল ঃ এই জামা আমি নিয়ে যাব। কারণ, তাঁর জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়েও আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম। ফলে পিতা অনেক আঘাত পেয়েছিলেন। এখন এর ক্ষতিপূরণও আমার হাতেই হওয়া উচিত।

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ — অর্থাৎ, কাফেলা শহর থেকে বের হতেই কেনানে ইয়াকূব (আঃ)-নিকটস্থ লোকদেরকে বললেন ঃ তোমরা যদি আমাকে বোকা না ঠাওরাও, তবে আমি বলছি যে, আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। মিসর থেকে কেনান পর্যন্ত হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী আট দিনের দূরত্ব ছিল। হযরত হাসান বসরীর বর্ণনা মতে আশি ফরসখ অর্থাৎ, প্রায় আড়াইশ' মাইলের ব্যবধান ছিল। আল্লাহ্ তাআলা এর দূর থেকে ইউসুফ (আঃ)-এর জামার মাধ্যমে তাঁর গন্ধ ইয়াকূব (আঃ)-এর মস্তিষ্কে পৌছে দেন। এটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বটে। অথচ ইউসুফ যখন কেনানেরই এক কূপের ভেতরে তিন দিন পড়ে রইলেন,তখন ইয়াকূব (আঃ) এ গন্ধ অনুভব করেননি। এ থেকেই জানা যায় যে, মু'জেযা পয়গম্বরগণের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় এবং প্রকৃতপক্ষে মু'জেযা পয়গম্বরগণের নিজস্ব কর্মকাণ্ডও নয়-সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার কর্ম। আল্লাহ্ তাআলা যখন ইচ্ছা করেন, মু'জেযা প্রকাশ করেন। ইচ্ছা না হলে

فَلَمَّآ أَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ أَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ ۚ إِنِّيْٓ أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾
قَالُوْا يٰٓأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ إِنَّا كُنَّا خٰطِـِٔيْنَ ﴿٩٧﴾
قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۗ إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾
فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا
مِصْرَ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ
وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓأَبَتِ هٰذَا تَأْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ
قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ۗ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيْٓ إِذْ أَخْرَجَنِيْ
مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ أَنْ نَّزَغَ
الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ إِخْوَتِيْ ۗ إِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۗ
إِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿١٠٠﴾ رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَ
عَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۫
أَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِيْ
بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠١﴾ ذٰلِكَ مِنْ أَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ ۚ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوْٓا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٢﴾

(৯৬) অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌছল, সে জামাটি তাঁর মুখে রাখল। অমনি তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না? (৯৭) তারা বলল ঃ পিতঃ, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করান। নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম। (৯৮) বললেন, সত্বরই আমি পালনকর্তার কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৯৯) অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌছল, তখন ইউসুফ পিতা-মাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ্ চাহেন তো শান্ত চিত্তে মিসরে প্রবেশ করুন। (১০০) এবং তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সামনে সেজদাবনত হল। তিনি বললেন ঃ পিতঃ এ হচ্ছে আমার ইতিপূর্বেকার স্বপ্নের বর্ণনা। আমার পালনকর্তা একে সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেয়ার পর। আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১০১) হে পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতাও দান করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। হে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের স্রষ্টা, আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও পরকালে। আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে স্বজনদের সাথে মিলিত করুন। (১০২) এগুলো অদৃশ্যের খবর, আমি আপনার কাছে প্রেরণ করি। আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা স্বীয় কাজ সাব্যস্ত করছিল এবং চক্রান্ত করছিল।

নিকটতম বস্তুও দূরবর্তী হয়ে যায়।

قَالُوْا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ — অর্থাৎ, উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্ত ধারণায়ই পড়ে রয়েছেন যে, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَمَّآ أَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ — অর্থাৎ, যখন সুসংবাদদাতা কেনানে পৌছল এবং ইউসুফের জামা ইয়াকূব (আঃ)-এর চেহারায় রাখল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। সুসংবাদদাতা ছিল জামা বহনকারী ইয়াহুদা।

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّيْٓ أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ —অর্থাৎ, আমি কি বলিনি যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আমি এমন বিষয় জানি, যা তোমরা জান না? অর্থাৎ, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলিত হবে।

قَالُوْا يٰٓأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ إِنَّا كُنَّا خٰطِـِٔيْنَ —বাস্তব ঘটনা যখন সবার জানা হয়ে গেল, তখন ইউসুফের ভ্রাতারা স্বীয় অপরাধের জন্যে পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল ঃ আপনি আমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে মাগফেরাতের দোয়া করুন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে তাদের মাগফেরাতের দোয়া করবে, সে নিজেও তাদের অপরাধ মাফ করে দেবে।

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ — ইয়াকূব (আঃ) বললেন ঃ আমি সত্বরই তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।

ইয়াকূব (আঃ) এখানে তৎক্ষণাৎ দোয়া করার পরিবর্তে অতিসত্বরই দোয়া করার ওয়াদা করেছেন। তফসীরবিদগণ এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, এর উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শেষ রাত্রে দোয়া করবেন। কেননা,তখনকার দোয়া বিশেষভাবে কবূল হয়। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবী থেকে নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা করেন ঃ কেউ আছে কি, যে দোয়া করবে—আমি কবূল করব? কেউ আছে কি, যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে—আমি ক্ষমা করব?

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ — কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ইউসুফ (আঃ) ভাইদের সাথে দু'শ উট বোঝাই করে অনেক আসবাবপত্র, বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দিলেন, যাতে গোটা পরিবার মিসরে আসার জন্যে ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। ইয়াকূব (আঃ) তাঁর আওলাদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তুত হয়ে মিসরের উদ্দেশে রওয়ানা হলে— এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা বাহাত্তর এবং অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিরানব্বই জন পুরুষ ও মহিলা ছিল।

অপরদিকে মিসর পৌছার সময় নিকটবর্তী হলে ইউসুফ (আঃ) ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য বাইরে আগমন করলেন। তাদের সাথে চার হাজার সশস্ত্র সিপাহীও সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশে জমায়েত হল। সবাই যখন মিসরে ইউসুফ (আঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি পিতা মাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন।

এখানে– أَبَوَيْهِ (পিতা–মাতা) উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ইউসুফ (আঃ)–এর মাতা তাঁর শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন। কিন্তু তারপর ইয়াকুব (আঃ) মৃতার ভগিনী লায়্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি ইউসুফ (আঃ)–এর খালা হওয়ার দিক দিয়েও মায়ের মতই ছিলেন এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতাই ছিলেন।

وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ —ইউসুফ (আঃ) পরিবারের সবাইকে বললেন ঃ আপনারা সবাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ভয়ে, অবাধে মিসরে প্রবেশ করুন। উদ্দেশ্য এই যে, ভিনদেশীদের প্রবেশের ব্যাপারে স্বভাবতঃ যেসব বিধি–নিষেধ থাকে আপনারা সেগুলো থেকে মুক্ত।

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ – অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) পিতা–মাতাকে রাজ সিংহাসনে বসালেন।

وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا – অর্থাৎ, পিতা–মাতা ও ভ্রাতারা সবাই ইউসুফ (আঃ)–এর সামনে সেজদা করলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এ কৃতজ্ঞতাসূচক সেজদাটি ইউসুফ (আঃ)–এর জন্যে নয়— আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশেই করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন ঃ উপাসনামূলক সেজদা প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তে আল্লাহ্ ছাড়া কারও জন্যে বৈধ ছিল না; কিন্তু সম্মানসূচক সেজদা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তে বৈধ ছিল। শিরকের সিঁড়ি হওয়ার কারণে ইসলামী শরীয়তে তাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা বৈধ নয়।

وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ – ইউসুফ (আঃ) –এর সামনে যখন পিতা–মাতা ও এগার ভাই একযোগে সেজদা করল, তখন শৈশবের স্বপ্নের কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি বললেন ঃ পিতঃ, এটা আমার শৈশবে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যাতে দেখেছিলাম যে, সূর্য, চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র আমাকে সেজদা করছে। আল্লাহ্‌র শোকর যে, তিনি এ স্বপ্নের সত্যতা চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন।

ইউসুফ (আঃ)–এর সবর ও শুকরিয়ার স্তর ঃ এরপর ইউসুফ (আঃ) পিতা–মাতার সামনে কিছু অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন। এখানে এক দন্ড থেমে একটু চিন্তা করুন, আজ যদি কেউ এতটুকু দুঃখ–কষ্টের সম্মুখীন হয়, যতটুকু ইউসুফ (আঃ)–এর উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং এত দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ ও নৈরাশ্যের পর পিতা–মাতার সাথে মিলন ঘটে, তবে সে পিতা–মাতার সামনে নিজের কাহিনী কিভাবে বর্ণনা করবে? কতটুকু কাঁদবে এবং কাঁদাবে? দুঃখ–কষ্টের করুণ কাহিনী বর্ণনা করতে কতদিন লাগবে? কিন্তু এখানে উভয়পক্ষই আল্লাহ্‌র রসূল ও পয়গম্বর। তাঁদের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন, ইয়াকুব (আঃ)–এর বিরহী প্রিয় ছেলে হাজারো দুঃখ–কষ্টের প্রান্তর অতিক্রম করে যখন পিতার সাথে মিলিত হন, তখন কি বলেন ঃ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي – অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন কারাগার থেকে আমাকে বের করেছেন এবং আপনাকে বাইরে থেকে এখানে এনেছেন; অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

ইউসুফ (আঃ)–এর দুঃখ–কষ্ট যথাক্রমে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। (এক) ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। (দুই) পিতা–মাতার কাছ থেকে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ। এবং (তিন) কারাগারের কষ্ট। আল্লাহ্‌র মনোনীত পয়গম্বর স্বীয় বিবৃতিতে প্রথমে ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করে কারাগার থেকে কথা শুরু করেছেন। কিন্তু এতে কারাগারে প্রবেশ করা এবং সেখানকার দুঃখ–কষ্টের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। বরং কারাগার থেকে অব্যাহতির কথা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতাসহ বর্ণনা করেছেন। কারাগার থেকে মুক্তি এবং তজ্জন্য আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে যেন একথাও বলে দিয়েছেন যে, তিনি কোন সময় কারাগারেও ছিলেন।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ (আঃ) কারাগার থেকে বের হওয়ার কথা তো উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ভ্রাতারা যে তাঁকে—কূপে নিক্ষেপ করেছিল, তা এদিক দিয়েও উল্লেখ করেননি যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে ঐ কূপ থেকে বের করেছেন। কারণ এই যে, ভাইদের অপরাধ পূর্বেই মাফ করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ তাই যে কোনভাবে কূপের কথা উল্লেখ করে ভাইদেরকে লজ্জা দেয়া সমীচীন মনে করেননি।—(কুরতুবী)

এরপর ছিল পিতা–মাতা থেকে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ও তার প্রতিক্রিয়াদি বর্ণনা করার পালা। তিনি সব বিষয় থেকে পাশ কাটিয়ে শুধু শেষ পরিণতি ও পিতা–মাতার সাথে সাক্ষাতের কথা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতাসহ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ আপনাকে গ্রাম থেকে মিসর শহরে এনে দিয়েছেন। এখানে এই নেয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইয়াকুব (আঃ)–এর বাসভূমি গ্রামে ছিল, সেখানে জীবন যাপনের সুযোগ–সুবিধা কম ছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে শহরে রাজকীয় সম্মানের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন।

এখন প্রথম অধ্যায়টি অবশিষ্ট রইল—অর্থাৎ, ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। একেও শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে এভাবে চুকিয়ে দিলেন যে, আমার ভ্রাতারা এরূপ ছিল না। শয়তান তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে কলহ সৃষ্টির এ কাজটি করিয়েছে।

এ হচ্ছে নবুওয়তের শান। নবীগণ দুঃখ–কষ্টে শুধু সবরই করেন না, বরং সর্বত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকও আবিষ্কার করে ফেলেন। এ কারণেই তাঁদের এমন কোন অবস্থা নেই, যেখানে তাঁরা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ নন। সাধারণ মানুষের অবস্থা এর বিপরীত। তারা আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত পেয়েও কোন নেয়ামতের কথা উল্লেখ করে না, কিন্তু কোন সময় সামান্য কষ্ট পেলে জীবনভর তা গেয়ে বেড়ায়। কোরআনে এ বিষয়েই অভিযোগ করে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ অর্থাৎ, মানুষ পালনকর্তার প্রতি খবুই অকৃতজ্ঞ।

ইউসুফ (আঃ) দুঃখ–কষ্টের ইতিকথা সংক্ষেপে তিন শব্দে ব্যক্ত করার পর বললেন ঃ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ – অর্থাৎ, আমার পালনকর্তা যে কাজ করতে চান, তার তদবীর সুক্ষ্ম করে দেন। নিশ্চয় তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।

১০১তম আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইউসুফ (আঃ) পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এরপর পিতা–মাতা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের ফলে যখন জীবনে শান্তি এল, তখন সরাসরি আল্লাহ্‌র প্রশংসা, গুণকীর্তন ও দোয়ায় মশগুল হয়ে গেলেন। বললেন ঃ

"হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছেন এবং অমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, আপনিই ইহকাল ও পরকালে আমার কার্যনির্বাহী। আমাকে পূর্ণ আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে পরিপূর্ণ সৎ বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত রাখুন।" 'পরিপূর্ণ সৎ বন্দা' পয়গম্বরগণই হতে

পারেন। তাঁরা যাবতীয় গোনাহ্ থেকে পবিত্র।—(মাযহারী)

এ দোয়ায় 'খাতেমা-বিলখায়র' অর্থাৎ, অন্তিম সময়ে পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়ার প্রার্থনাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ্ তাআলার প্রিয়জনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইহকাল ও পরকালে যত উচ্চ মর্তবাই লাভ করুন এবং যত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদ-মর্যাদাই তাঁদের পদচুম্বন করুক, তাঁরা কখনও গর্বিত হন না ; বরং সর্বদাই এসব অবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার অথবা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা করতে থাকেন। তাই তাঁরা দোয়া করতে থাকেন, যাতে আল্লাহ্-প্রদত্ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নেয়ামতসমূহ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, বরং সেগুলো আরও যেন বৃদ্ধি পায়।

ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী পুরোপুরি বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ —অর্থাৎ, এই কাহিনী ঐসব অদৃশ্য সংবাদের অন্যতম, যেগুলো আমি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে বলেছি। আপনি ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এজন্যে কলা-কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছিল।

এ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীটি পূর্ণ বিবরণসহ ঠিক ঠিক বলে দেয়া আপনার নবুওয়ত ও ওহীর সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা, কাহিনীটি হাজারো বছর পূর্বেকার। আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না যে, স্বচক্ষে দেখে বিবৃত করবেন এবং আপনি কারও কাছে শিক্ষাও গ্রহণ করেননি যে, ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে অথবা কারও কাছে শুনে বর্ণনা করবেন। অতএব, খোদায়ী ওহী ব্যতীত এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

কোরআন পাক শুধু এতটুকু বিষয় উল্লেখ করেছে যে, (আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না)। অন্য কোন ব্যক্তি অথবা গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জিত না হওয়ার কথা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি। কারণ, সমগ্র আরবের জানা ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মী বা নিরক্ষর। তিনি কারও কাছে লেখাপড়া করেননি। সবার আরও জানা ছিল যে, তাঁর সমগ্র জীবন মক্কায় অতিবাহিত হয়েছে। একবার চাচা আবুতালেবের সাথে সিরিয়া সফরে গমন করে মাঝপথ থেকেই ফিরে এসেছিলেন। দ্বিতীয় সফর, বাণিজ্য ব্যাপদেশে করেছিলেন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন অবস্থান করেই ফিরে আসেন। এ সফরেও কোন পন্ডিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত অথবা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। তাই এ ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি। তবে কোরআন পাকের অন্যত্র একথাও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا - অর্থাৎ, কোরআন অবতরণের পূর্বে এসব ঘটনা আপনিও জানতেন এবং আপনার স্বজাতিও জানত না।

ইমাম বগভী বলেন ঃ ইহুদী ও কোরাইশরা সম্মিলিতভাবে পরীক্ষার্থী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে বলুন, ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাটি কি এবং কিভাবে ঘটেছিল? যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে সব বলে দিলেন এবং এরপরও তারা কুফরী ও অস্বীকারে অটল রইল, তখন তিনি অন্তরে দারুণ আঘাত পেলেন। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনার রেসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও অনেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়— আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার কাজ হল প্রচার এবং সংশোধনের চেষ্টা করা। চেষ্টাকে সফল করা আপনার ক্ষমতাধীন নয়। অধিকন্তু এটা আপনার দায়িত্বও নয়। কাজেই দুঃখ করাও উচিত নয়।

وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ
مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿١٠٥﴾
وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٦﴾ اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ
تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّ
هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۚ عَلٰى
بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ۚ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾
وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۗ
اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾
حَتّٰىٓ اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ
نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّىَ مَنْ نَّشَآءُ ۗ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١١٠﴾
لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ
حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ
تَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١١١﴾

(১০৩) আপনি যতই চান, অধিকাংশ লোক বিশ্বাসকারী নয়। (১০৪) আপনি এর জন্যে তাদের কাছে কোন বিনিময় চান না। এটা তো সারা বিশ্বের জন্যে উপদেশ বৈ নয়। (১০৫) অনেক নিদর্শন রয়েছে নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম করে এবং তারা এসবের দিকে মনোনিবেশ করে না। (১০৬) অনেক মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শেরকও করে। (১০৭) তারা কি নির্ভীক হয়ে গেছে এ বিষয়ে যে, আল্লাহ্‌র আযাবের কোন বিপদ তাদেরকে আবৃত করে ফেলবে অথবা তাদের কাছে হঠাৎ কেয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা টেরও পাবে না? (১০৮) বলে দিন ঃ এই আমার পথ। আমি আল্লাহ্‌র দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই—আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ্ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (১০৯) আপনার পূর্বে আমি যতজনকে রসূল করে পাঠিয়েছি, তারা সবাই পুরুষই ছিল জনপদবাসীদের মধ্য থেকে। আমি তাঁদের কাছে ওহী প্রেরণ করতাম। তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে না, যাতে দেখে নিত কিরূপ পরিণতি হয়েছে তাদের, যার পূর্বে ছিল? সংযম কারীদের জন্যে পরকালের আবাসই উত্তম! তারা কি এখনও বোঝে না? (১১০) এমনকি যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না। (১১১) তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্যে পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হেদায়েত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ — অর্থাৎ, আপনি প্রচার ও বিশুদ্ধ পথ বলে দেয়ার যে চেষ্টা করছেন, সেজন্য তাদের কাছে তো কোন পারিশ্রমিক চান না যে, এটা মেনে নেয়া বা শোনা তাদের পক্ষে কঠিন হবে। আপনার কথাবার্তা তো নির্ভেজাল মঙ্গলাকাঙ্খা ও উপদেশ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আপনার এ চেষ্টার লক্ষ্য যখন পার্থিব উপকার লাভ নয়, বরং পরকালের সওয়াব ও জাতির হিতাকাঙ্খা, তখন এ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি কেন চিন্তিত হন?

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا

مُعْرِضُوْنَ অর্থাৎ, শুধু তাই নয় যে, এরা জেদ ও হঠকারিতাবশতঃ কোন শুভাকাঙ্খীর উপদেশ শ্রবণ করে না, বরং তাদের অবস্থা হল এই যে, নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে আল্লাহ্‌র যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর কাছ দিয়েও এরা উদাসীন হয়ে ও চোখ বুঁজে চলে যায়। একটুও লক্ষ্য করে না যে, এগুলো কার অপার শক্তির নিদর্শন। নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞান ও শক্তি অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। অতীতের আযাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তারা এগুলো থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে না।

যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও শক্তিতেই বিশ্বাস করে না, উপরোক্ত বর্ণনা ছিল তাদের সম্পর্কে। অতঃপর এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁর সাথে অন্য বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলা হয়েছে ঃ

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ —অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তারাও শেরকের সাথে করে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি গুণের সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, যা একান্ত অন্যায় ও নিছক মূর্খতা।

ইবনে-কাসীর বলেন ঃ যেসব মুসলমান ঈমান সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকার শেরকে লিপ্ত রয়েছে, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদের জন্যে যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচাইতে বিপজ্জনক হচ্ছে ছোট শেরক। সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন ঃ রিয়া (লোক দেখানে এবাদত) হচ্ছে ছোট শেরক। এমনিভাবে এক হাদীসে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়াকেও শেরক বলা হয়েছে। — (ইবনে কাসীর) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও নামে মান্নত করা এবং নিয়াজ দেয়াও ফেকাহ্‌বিদগণের মতে শেরকের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর তাদের অমনোযোগিতা ও মূর্খতার কারণে পরিতাপ ও বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা অস্বীকার ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও কিরূপে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের উপর কোন আযাব এসে যাবে কিংবা অতর্কিতে কেয়ামত এসে যাবে তাদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই।

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ
وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থাৎ, আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ তোমরা মান অথবা না

মান—আমার তরীকা এই যে, মানুষকে পূর্ণ বিশ্বাসসহকারে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিতে থাকব—আমি এবং আমার অনুসারীরাও।

উদ্দেশ্য এই যে, আমার দাওয়াত আমার কোন চিন্তাধারার উপর ভিত্তিশীল নয়; বরং এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি। এ দাওয়াত ও জ্ঞানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর অনুসারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন ঃ এতে সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জ্ঞানের বাহক এবং আল্লাহ্র সিপাহী। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের অন্তর পবিত্র এবং জ্ঞান সুগভীর। তাঁদের মধ্যে লৌকিকতার নাম-গন্ধও নেই। আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে স্বীয় রসূলের সংসর্গ ও সেবার জন্যে মনোনীত করেছেন। তোমরা তাঁদের চরিত্র অভ্যাস ও তরিকা আয়ত্ত কর। কেননা, তাঁরা সরল পথের পথিক।

وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ - ব্যাপক অর্থেও হতে পারে। এতে ঐসব ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যারা কেয়ামত পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাওয়াতকে উম্মত পর্যন্ত পৌছানোর কাজে নিয়োজিত থাকবেন। কলবী ও ইবনে যায়েদ বলেন ঃ এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুসরণের দাবী করে, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁর দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌছানো এবং কোরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকতর করা।—(মাযহারী)

وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ – অর্থাৎ, আল্লাহ্ শেরক থেকে পবিত্র এবং আমি মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই। উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, অধিকাংশ লোক ঈমানের সাথে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শেরকেও যুক্ত করে দেয়। তাই শেরক থেকে নিজের সম্পূর্ণ পবিত্রতার প্রকাশ করেছেন। সারকথা এই যে, আমার দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করা নয়; বরং আমি নিজেও আল্লাহ্র দাস এবং মানুষকেও তাঁর দাসত্ব স্বীকার করার দাওয়াত দেই। তবে দাওয়াতদাতা হিসেবে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয।

মুশরেকরা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করতে যে, আল্লাহ্র রসূল ও দূত মানুষ নয়; বরং ফেরেশতা হওয়া দরকার। এর উত্তর পরবর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছে ঃ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى — অর্থাৎ, তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন ও নিরর্থক যে, আল্লাহ্র রসূল ফেরেশতা হওয়া দরকার—মানব হতে পারে না। বরং ব্যাপার উল্টা। মানব জাতির জন্যে আল্লাহ্র রসূল সবসময় মানবই হয়েছেন। তবে সাধারণ লোকদের থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এই যে, তাঁর প্রতি সরাসরি আল্লাহ্র কাছ থেকে ওহী আগমন করে। এটা কারও প্রচেষ্টা ও কর্মের ফল নয়। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে উপযুক্ত মনে করেন, এ কাজের জন্যে মনোনীত করেন। এ মনোনয়ন এমন কতগুলো বিশেষ গুণের ভিত্তিতে হয়, যেগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না।

পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দাতার ও রসূলের নির্দেশাবলী অমান্য করে আল্লাহ্র আযাবকে ডেকে আনে। বলা হয়েছে ঃ

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

অর্থাৎ, তারা কি দেশ-ভ্রমণে বের হয় না, যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের শোচনীয় পরিণতি স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে? কিন্তু তারা ইহকালের বাহ্যিক আরাম-আয়েশ ও সাজ-সজ্জায় মত্ত হয়ে পরকাল ভুলে গেছে। অথচ পরহেযগারদের জন্যে পরকাল ইহকালের চাইতে অনেক উত্তম। তারা কি এতটুকুও বোঝে না যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ ভাল, না পরকালের চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ ও নেয়ামত ভাল?

অদৃশ্যের সংবাদ ও অদৃশ্যের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ এগুলো সব অদৃশ্যের সংবাদ, যা আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে বলি। এ বিষয়বস্তুটি প্রায় এমনি ভাষায় সূরা আলে ইমরানের ৪৩তম আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। সূরা হূদের ৪৮তম আয়াতে নূহ (আঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ -এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরদেরকে অদৃশ্যের সংবাদ বলে দেন। বিশেষ করে আমাদের শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে এসব অদৃশ্য সংবাদের বিশেষ অংশ দান করা হয়েছে, যার পরিমাণ পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের তুলনায় বেশী। এ কারণেই তিনি উম্মতকে এমন অনেক ঘটনা বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। 'কিতাবুল-ফিতান' শিরোনামে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন বর্ণনা সম্বলিত বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী হাদীসগ্রন্থসমূহে মওজুদ রয়েছে।

সাধারণ মানুষ 'অদৃশ্যের জ্ঞান' বলতে যে কোনরূপে অদৃশ্যের সংবাদ অবগত হওয়াকেই বোঝে। এ গুণ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ জন্যেই তাদের মতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) 'আলেমুল-গায়ব' (অদৃশ্যে জ্ঞানী) ছিলেন। কিন্তু কোরআন পাক পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ এতে জানা যায় যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ আলেমুল গায়ব হতে পারে না।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى

এ আয়াতে পয়গম্বরগণের সম্পর্কে رِجَالًا শব্দের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, পয়গম্বর সবসময় পুরুষই হন নারীদের মধ্যে কেউ নবী কিংবা রসূল হতে পারেন না।

ইবনে কাসীর ব্যাপকসংখ্যক আলেমের এ অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা কোন নারীকে নবী কিংবা রসূল নিযুক্ত করেননি। কোন কোন আলেম কয়েকজন মহিলা সম্পর্কে নবী হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন; উদাহরণতঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বিবি সারা, হযরত মূসা (আঃ)-এর জননী এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর জননী হযরত মরিয়ম। এ তিন জন মহিলা সম্পর্কে কোরআন পাকে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র নির্দেশে ফেরেশতারা তাঁদের সাথে বাক্যালাপ করেছে, সুসংবাদ দিয়েছেন কিংবা ওহীর মাধ্যমে স্বয়ং তারা কোন বিষয় জানতে পেরেছেন। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক আলেমের মতে এসব আয়াত দ্বারা উপরোক্ত তিন জন মহিলার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্র কাছে তাঁদের উচ্চ মর্যাদাশালিনী হওয়া বোঝা যায় মাত্র। এই ভাষা নবুওয়ত ও রেসালত প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট নয়।

এ আয়াতেই اَهْلِ الْقُرٰى শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা সাধারণতঃ শহর ও নগরবাসীদের মধ্য থেকে রসূল প্রেরণ করেছেন অজ

গ্রাম কিংবা বনাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য থেকে রসূল প্রেরিত হননি। কারণ, সাধারণতঃ গ্রাম বা বনাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বভাব-প্রকৃতি ও জ্ঞান বুদ্ধিতে নগরবাসীদের তুলনায় পশ্চাদপদ হয়ে থাকেন।— (ইবনে-কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পয়গম্বর প্রেরণ ও সত্যের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং পয়গম্বরদের সম্পর্কে কোন কোন সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছিল। উল্লেখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণের অশুভ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে না। যদি তারা সামান্যও চিন্তা করত এবং পারিপার্শ্বিক শহর ও স্থানসমূহের ইতিহাস পাঠ করত, তবে নিশ্চয়ই জানতে পারত যে, পয়গম্বরগণের বিরুদ্ধাচরণকারীরা এ দুনিয়াতে কিরূপ ভয়ানক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। কওমে-লূতের জনপদসমূহ উল্টে দেয়া হয়েছে। কওমে-আ'দ ও কওমে-সামূদকে নানাবিধ আযাব দ্বারা নাস্তানাবুদ করে দেয়া হয়েছে। পরকালের আযাব আরও কঠোরতর হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায়ই ক্ষণস্থায়ী। আসল চিন্তা পরকালের হওয়া উচিত। সেখানকার অবস্থান চিরস্থায়ী এবং সুখ-দুঃখও চিরস্থায়ী। আরও বলা হয়েছে যে, পরকালের সুখশান্তি তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকওয়ার অর্থ শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা।

এ আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা দ্বারা বর্তমান লোকদেরকে সতর্ক করা। তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের একটি সন্দেহ দূর করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে খোদায়ী আযাব থেকে ভয় প্রদর্শনের কথা অনেক লোক দীর্ঘ দিন থেকে শুনে আসছিল, কিন্তু তারা কোন আযাব আসতে দেখত না। এতে তাদের দুঃসাহস আরও বেড়ে যায়। তারা বলতে থাকে যে, আযাব যদি আসবারই হত, তবে এতদিনে কবেই এসে যেত ! তাই বলা হয়েছে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় করুণা ও রহস্যবশতঃ অনেক সময় অপরাধী সম্প্রদায়কে অবকাশ দান করেন। এ অবকাশ মাঝে মাঝে এত দীর্ঘতর হয় যে, অবাধ্যদের দুঃসাহস আরও বেড়ে যায় এবং পয়গম্বরগণ এক প্রকার অস্থিরতার সম্মুখীন হন। এরশাদ হয়েছেঃ

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا

فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ۗ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ

অর্থাৎ, পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যদেরকে লম্বা লম্বা অবকাশ দেয়া হয়েছে। এমন কি দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের উপর আযাব না আসার কারণে পয়গম্বরগণ এরূপ ধারণা করে নিরাশ হয়ে পড়েছেন যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত আযাবের সংক্ষিপ্ত ওয়াদার যে অবকাশ আমরা নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে স্থির করে রেখেছিলাম, সে সময়ে কাফেরদের উপর আযাব আসবে না এবং সত্যের বিজয় প্রকাশ পাবে না। পয়গম্বরগণ প্রবল ধারণা পোষণ করতে থাকেন, অনুমানের মাধ্যমে আল্লাহ্র ওয়াদার সময় নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের বোধশক্তি ভুল করেছে। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা তো কোন নির্দিষ্ট সময় বলেননি। আমরা বিশেষ বিশেষ ইঙ্গিতের মাধ্যমেই একটি সময় নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম। এমনকি নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁদের কাছে আমার সাহায্য এসে যায়, অর্থাৎ, ওয়াদা অনুযায়ী কাফেরদের উপর আযাব এসে যায়। অতঃপর এ আযাব থেকে আমি যাকে ইচ্ছা করেছি, বাঁচিয়ে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, পয়গম্বরগণের অনুসারী মুমিনদেরকে বাঁচানো হয়েছে এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। কেননা, আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে অপসৃত করা হয় না, বরং আযাব অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করে । কাজেই আযাবে বিলম্ব দেখে মক্কার কাফেরদের ধোঁকায় পতিত হওয়া উচিত নয়।

এ আয়াতে كُذِبُوْا শব্দটি প্রসিদ্ধ কেরাআত অনুযায়ী পাঠ করা হয়েছে। আমরা এর যে তফসীর বর্ণনা করেছি, এটাই অধিকতর স্বীকৃত ও স্বচ্ছ। অর্থাৎ, كُذِبُوْا শব্দের সারমর্ম হচ্ছে অনুমান ও ধারণা ভ্রান্ত হওয়া। এটা এক প্রকার ইজতেহাদী ভ্রান্তি। পয়গম্বরগণের দ্বারা এরূপ ইজতেহাদী ভ্রান্তি সম্ভবপর। তবে পয়গম্বর ও অন্যান্য মুজতাহিদদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পয়গম্বরগণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এরূপ ভুল ধারণার উপর স্থির থাকার সুযোগ দেয়া হতো না, বরং তাদেরকে বাস্তব বিষয় জ্ঞাত করে প্রকৃত সত্য ফুটিয়ে তোলা হতো। অন্যান্য মুজতাহিদের জন্যে এরূপ মর্যাদা নেই।

এমনিভাবে আয়াতে قَدْ كُذِبُوْا শব্দের মর্মও তাই যে, কাফেরদের উপর আযাব আসতে বিলম্ব হয়েছিল এবং পয়গম্বরগণ অনুমানের মাধ্যমে যে সময় মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন সে সময়ে আযাব আসেনি। ফলে তাঁরা ধারণা করেন যে, আমরা সময় নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে ভুল করেছি। এই তফসীরটি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে আল্লামা তীবী বলেন ঃ এই রেওয়ায়েত নির্ভুল। কারণ, সহীহ্ বুখারীতে তা বর্ণিত আছে।

কোন কোন কেরাআতে এ শব্দটি যাল-এর তশদীদসহ قَدْ كُذِّبُوْا পঠিত হয়েছে। كُذِّبُوْا ক্রিয়াপদটি تكذيب ধাতু থেকে উদ্ভূত। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, পয়গম্বরদের অনুমিত সময়ে আযাব না আসার কারণে তাঁরা আশঙ্কা করতে থাকেন যে, এখন যারা মুসলমান, তারাও বুঝি তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপ করতে শুরু করে যে, তাঁরা যা কিছু বলেছিলেন তা পূর্ণ হল না। এহেন দুর্বিপাকের সময় আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করে দেখালেন। অবিশ্বাসীদের উপর আযাব এসে গেল এবং মুমিনদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হল। ফলে পয়গম্বরগণের বিজয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠলো। لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ অর্থাৎ, পয়গম্বরগণের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্যে বিশেষ শিক্ষা রয়েছে।

এর অর্থ সব পয়গম্বরের কাহিনীতেও হতে পারে এবং বিশেষ করে ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতেও হতে পারে, যা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এ ঘটনায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার অনুগত বন্দাদের কি কি ভাবে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হয় এবং কূপ থেকে বের করে রাজসিংহাসনে এবং অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়ে উচ্চতম শিখরে কিভাবে পৌঁছে দেয়া হয় ! পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীরা পরিণামে কিরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করে !

مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ অর্থাৎ, এ কাহিনী কোন মনগড়া কথা নয়, বরং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থনকারী। কেননা, তওরাত ও ইনজীলে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ বলেন ঃ যতগুলো আসমানী গ্রন্থ ও সহীফা

سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَلٰثٌ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّسِتُّ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ① اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ② وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ③ وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۫ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ④ وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ⑤

সূরা রা'দ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৪৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) আলিফ-লাম-মীম-রা ; এগুলো কিতাবের আয়াত। যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না। (২) আল্লাহ্, যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সমন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (৩) তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু' দুপ্রকার সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে। (৪) এবং যমিনে বিভিন্ন শস্যক্ষেত্র রয়েছে— একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং আঙ্গুরের বাগান আছে আর শস্য ও খর্জ্জুর রয়েছে— একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত এবং কতক মিলিত নয়। এগুলোকে একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়। আর আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে উৎকৃষ্টতর করে দেই। এগুলোর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে। (৫) যদি আপনি বিস্ময়ের বিষয় চান, তবে তাদের একথা বিস্ময়কর যে, আমরা যখন মাটি হয়ে যাব, তখনও কি নতুনভাবে সৃজিত হব? এরাই স্বীয় পালনকর্তার সত্তায় অবিশ্বাসী হয়ে গেছে, এদের গর্দানেই লৌহ-শৃংখল পড়বে এবং এরাই দোযখী এরা তাতে চিরকাল থাকবে।

অবতীর্ণ হয়েছে, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী থেকে কোনটিই খালি নয়।— (মাযহারী)

وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ —অর্থাৎ, এ কোরআন সব বিষয়েরই বিস্তারিত বিবরণ। অর্থাৎ, কোরআন পাকে এমন প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ রয়েছে, যা ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের জন্যে জরুরী। এবাদত, লেন-দেন, চরিত্র, সামাজিকতা, রাষ্ট্র পরিচালনা রাজনীতি ইত্যাদি মানব জীবনের প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধান ও নির্দেশ এতে রয়েছে। আরও বলা হয়েছে ঃ এ কোরআন ঈমানদারদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। এতে বিশেষ করে ঈমানদারদের কথা বলার কারণ এই যে, উপকারিতা ঈমানদারগণই পেতে পারেন। যদিও কাফেরের জন্যেও কোরআন রহমত ও হেদায়েত, কিন্তু তাদের কুকর্ম ও অবাধ্যতার কারণে এ রহমত ও হেদায়েত তাদের পক্ষে শাস্তির কারণ হয়ে যায়।

শায়খ আবু মনসূর বলেন ঃ সমগ্র সূরা ইউসুফ এবং এতে সন্নিবেশিত কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা প্রদান করা যে, স্বজাতির হাতে আপনি যেসব নির্যাতন ভোগ করছেন, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও সেগুলো ভোগ করেছেন। কিন্তু পরিণামে আল্লাহ্ তাআলা পয়গম্বরগণকেই বিজয়ী করেছেন। আপনার ব্যাপারটিও তদ্রূপই হবে।

সূরা ইউসুফ সমাপ্ত

সূরা রা'দ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরাতুর রা'দ মক্কায় অবতীর্ণ। এতে সর্বমোট ৪৩টি আয়াত রয়েছে। এ সূরায়ও কোরআন পাকের সত্যতা, তওহীদ ও রেসালতের বর্ণনা এবং বিভিন্ন সন্দেহের উত্তর উল্লেখিত হয়েছে।

الٓمّٓرٰ এগুলো খণ্ডবর্ণ। এসবের অর্থ আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। উম্মতকে এর অর্থ বলা হয়নি। সর্বসাধারণের পক্ষে এর পেছনে পড়াও সমীচীন নয়।

হাদীসও কোরআনের মত খোদায়ী ওহী ঃ প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন পাক আল্লাহ্‌র কালাম এবং সত্য। কিতাব বলে কোরআনকেই বোঝানো হয়েছে এবং وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ বলেও কোরআনকেই বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু عطف এবং واو অক্ষরটি বাহ্যতঃ বোঝায় যে, কিতাব এবং الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ স্বতন্ত্র বিষয়। এমতাবস্থায় কিতাবের অর্থ কোরআন এবং الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ এর অর্থ ঐ ওহী যা কোরআন ছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এসেছে। কেননা, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে যে ওহী আসত, তা শুধু কোরআনেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বয়ং কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী কোন কিছু বলেন না ; বরং তাঁর উক্তি একটি ওহী, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রেরিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোরআন ছাড়া অন্য যেসব বিধি-বিধান দিয়েছেন, সেগুলোও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। পার্থক্য

এতটুকু যে, কোরআনের তেলাওয়াত করা হয় এবং সেগুলোর তেলাওয়াত হয় না। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, কোরআনের অর্থ ও শব্দ উভয়টি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোরআন ছাড়া হাদীসে যেসব বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলোর মর্ম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু শব্দ অবতীর্ণ নয়। এ জন্যেই নামাযে এগুলোর তেলাওয়াত হয় না।

সেমতে আয়াতের অর্থ এই যে, এই কোরআন এবং যেসব বিধি-বিধান আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়, সেগুলো সব সত্য এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত কিন্তু অধিকাংশ লোক চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে তা বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব ও তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ,তার সৃষ্টি ও কারিগরির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বিশ্বাস করতে হবে যে, এগুলোর এমন একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি সর্বশক্তিমান এবং সমগ্র সৃষ্টজগত যাঁর মুঠোর মধ্যে।

اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا অর্থাৎ, আল্লাহ্ এমন এক সত্তা, যিনি আকাশসমূহকে সুবিস্তৃত ও বিশাল গম্বুজাকার খুঁটি ব্যতীত উচ্চে উন্নীত রেখেছেন যেমন তোমরা আকাশসমূহকে এ অবস্থায়ই দেখ।

আকাশের দেহ দৃষ্টিগোচর হয় কি? সাধারণতঃ বলা হয় যে, আমাদের মাথার উপরে যে নীল রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তা আকাশের রঙ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন ঃ আলো ও অন্ধকারের সংমিশ্রণে এই রঙ অনুভূত হয়। নীচে তারকারাশীর আলো এবং এর উপরে অন্ধকার । উভয়ের সংমিশ্রণে বাইরে থেকে নীল রঙ অনুভূত হয় ; যেমন গভীর পানিতে আলো বিচ্ছুরিত হলে তা নীল দেখা যায়। কোরআন পাকের কতিপয় আয়াতে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ; যেমন এ আয়াতে تَرَوْنَهَا বলা হয়েছে এবং অন্য এক আয়াতে وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য প্রথমতঃ এর পরিপন্থী নয়। কেননা, এটা সম্ভব যে, আকাশের রঙও নীলাভ হবে অথবা অন্য কোন রঙ হবে ; কিন্তু মধ্যস্থলে আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণের ফলে নীল দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। শূন্যের রঙের মধ্যে যে আকাশের রঙও শামিল রয়েছে, এ কথা অস্বীকার করার কোন প্রমাণ নেই।

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ -অর্থাৎ অতঃপর আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিরাজমান হলেন, যা সিংহাসনের অনুরূপ। এ বিরাজমান হওয়ার স্বরূপ কারও বোধগম্য নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, যেরূপ বিরাজমান হওয়া তাঁর পক্ষে উপযুক্ত, সেরূপেই বিরাজমান রয়েছেন।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সূর্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করেছেন। প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে।

আজ্ঞাধীন করার অর্থ এই যে, উভয়কে যে যে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তারা অহর্নিশ তা করে যাচ্ছে। হাজারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ; কিন্তু কোন সময় তাদের গতি চুল পরিমাণও কম-বেশী হয়নি। তারা ক্লান্ত হয় না এবং কোন সময় নিজের নির্দিষ্ট কাজ ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ধাবিত হওয়ার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা সমগ্র বিশ্বের জন্যে নির্ধারিত সময় অর্থাৎ কেয়ামতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর মহাজগতের গোটা ব্যবস্থাপনা তছনছ হয়ে যাবে।

আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক গ্রহের জন্যে একটি বিশেষ গতি ও বিশেষ কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা সব সময় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্ধারিত গতিতে চলমান থাকে। চন্দ্র নিজ কক্ষপথ এক মাসে এবং সূর্য এক বছরে অতিক্রম করে।

এসব গ্রহের এক-একটির আয়তন পৃথিবীর চাইতে বহুগুণ বড়। এগুলো বিশেষ কক্ষপথে বিশেষ গতিতে হাজারো বছর যাবৎ একই ভঙ্গিতে চলমান রয়েছে। এদের কলকব্জা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, ভাঙ্গে না এবং মেরামতেরও প্রয়োজন দেখা দেয় না। বিজ্ঞানের বর্তমান চূড়ান্ত উন্নতির পরও মানব নির্মিত বস্তুসমূহের মধ্যে এদের পূর্ণ নজীর দূরের কথা, হাজার ভাগের এক ভাগ পাওয়াও অসম্ভব। প্রকৃতির এই ব্যবস্থাপনা উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলছে যে, এর পেছনে এমন একজন স্রষ্টা ও পরিচালক রয়েছেন, যিনি মানুষের অনুভূতি ও চেতনার বহু উর্ধ্বে।

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করেন। সাধারণতঃ মানুষ নিজের কলাকৌশলের জন্যে গর্ববোধ করে ; কিন্তু একটু চোখ খুলে দেখলেই বোঝা যাবে যে, তার কলাকৌশল কোন বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা সৃজিত বস্তুসমূহের নির্ভুল ব্যবহার বোঝে নেয়াই তার কলাকৌশলের শেষ গন্তব্য। পার্থিব বস্তুসামগ্রী ব্যবহার করার যে ব্যবস্থা, তাও মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। কেননা, মানুষ প্রত্যেক কাজে অন্য হাজারো মানুষ, জানোয়ার ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মুখাপেক্ষী, যেগুলোকে সে নিজ কলাকৌশলের মাধ্যমে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে না। আল্লাহ্‌র শক্তিই প্রত্যেক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে যে, আপনা থেকেই এসে জড়ো হয়। আপনার গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হলে স্থপতি থেকে শুরু করে রঙ পালিশকারী সাধারণ কর্মী পর্যন্ত শত শত মানুষ নিজেদের দৈহিক সামর্থ্য ও কারিগরি বিদ্যা নিয়ে আপনার সেবা করতে প্রস্তুত দেখা যাবে। বহু দোকানে বিক্ষিপ্ত নির্মাণ-সামগ্রী আপনি নিজ প্রয়োজনে প্রস্তুত পাবেন। কিন্তু নিজস্ব অর্থ অথবা কলাকৌশলের জোরে এসব বস্তুর মূল উপাদান সৃষ্টি করতে এবং সব মানুষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও কারিগরী প্রতিভা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে আপনি সক্ষম হবেন কি? আপনি কেন, কোন বৃহত্তর সরকারও আইনের জোরে এ ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে না। নিঃসন্দেহে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদান এবং তদ্দ্বারা বিশ্বব্যবস্থার নিখুঁত পরিচালনা একমাত্র চিরঞ্জীব ও মহা ব্যবস্থাপক আল্লাহ্‌রই কাজ। মানুষ একে নিজের কলাকৌশল মনে করলে তা মূর্খতা বৈ আর কিছু হবে না।

يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ অর্থাৎ, তিনি আয়াতসমূহকে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা করেন। এর অর্থ কোরআনের আয়াতসমূহ হতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা এগুলো নাযিল করেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর মাধ্যমে তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন।

অথবা আলোচ্য আয়াতের অর্থ আল্লাহ্ তাআলা অপার শক্তির নিদর্শনাবলীও হতে পারে। অর্থাৎ, আসমান যমীন ও স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব, এগুলো বিস্তারিতভাবে সর্বদা ও সর্বত্র মানুষের দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান রয়েছে।

لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ অর্থাৎ, সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও তার বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা আল্লাহ্ তাআলা এজন্যে কায়েম করেছেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে পরকাল ও কেয়ামতে বিশ্বাসী হও।

কেননা, এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা ও সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করার পর পরকালে মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করাকে আল্লাহ্‌র শক্তি বহির্ভূত মনে করা সম্ভব হবে না। যখন শক্তির অন্তর্ভুক্ত ও সম্ভবপর বোঝা যাবে, তখন দেখতে হবে যে, এ সংবাদ এমন এক ব্যক্তি দিয়েছেন, যিনি জীবনে কোন দিন মিথ্যা বলেননি। কাজেই তা বাস্তবতাসম্পন্ন ও প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না।

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে ভারী পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন।

ভূমণ্ডলের বিস্তৃতি তার গোলাকৃতির পরিপন্থী নয়। কেননা, গোলাকার বস্তু যদি অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠের মতই দৃষ্টিগোচর হয়। কোরআন পাক সাধারণ মানুষকে তাদের দৃষ্টিকোণে সম্বোধন করে। বাহ্যদর্শী ব্যক্তি পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠরূপে দেখে। তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্যে এর উপর সুউচ্চ ও ভারী পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে ভূ-পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্টজীবকে পানি পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পাহাড় শৃঙ্গে বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্যে কোন চৌবাচ্চা নেই। এবং তা তৈরী করারও প্রয়োজন নেই। অপবিত্র বা দূষিত সত্তয়ার ও কোন সম্ভাবনা নেই। অতঃপর এ ফল্গুধারা থেকেই কোথাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই লুকিয়ে থাকে। অতঃপর কূপের মাধ্যমে এ ফল্গুধারার সন্ধান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়।

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ অর্থাৎ, এ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নানাবিধ ফল-ফসল উৎপন্ন করছেন এবং প্রত্যেক ফলের-ফসলের দু'দু প্রকার সৃষ্টি করছেন ঃ লাল, সাদা, টক-মিষ্টি। زَوْجَيْنِ এর অর্থ দুই না হয়ে একাধিক হতে পারে, যেগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে দু'হবে। তাই বিষয়টি زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। زَوْجَيْنِ এর অর্থ নর ও মাদী হওয়াও অসম্ভব নয়। যেমন, অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেক বৃক্ষ নর ও মাদী হয়। উদাহরণতঃ খেজুর, পেঁপে ইত্যাদি। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যেও এরূপ সম্ভাবনা আছে ; যদিও গবেষণা এখনো এতটা অগ্রসর হয়নি।

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ -অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলাই রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। অর্থাৎ, দিনের আলোর পর রাত্রি নিয়ে আসেন ; যেমন কোন উজ্জ্বল বস্তুকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে দেয়া হয়।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -নিঃসন্দেহে সমগ্র সৃষ্টি ও তার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ

অর্থাৎ, অনেক ভূমিখণ্ড পরস্পর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নরূপ। কোনটি উর্বর ও কোনটি অনুর্বর, কোনটি নরম ও কোনটি শক্ত এবং কোনটি শস্যের উপযোগী এবং কোনটি বাগানের উপযোগী। এসব ভূখণ্ডে রয়েছে আঙ্গুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র এবং খেজুরবৃক্ষ। তন্মধ্যে কোন বৃক্ষ এমন যে, এক কাণ্ড উপরে পৌঁছে দু'কাণ্ড হয়ে যায় ; যেমন সাধারণ বৃক্ষ এবং কোনটিতে এক কাণ্ডই থাকে ; যেমন খেজুরবৃক্ষ ইত্যাদি।

এসব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয়, একই পানি দ্বারা সিক্ত হয় এবং চন্দ্র সূর্যের কিরণ ও বাতাস সবই এক রকম পায় ; কিন্তু এ সত্ত্বেও এসবের রঙ ও স্বাদ বিভিন্ন এবং আকারে ছোট ও বড়। সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নানা ধরনের বিভিন্নতা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, একই উৎস থেকে উৎপন্ন বিচিত্রধর্মী এসব ফল-ফসলের সৃষ্টি কোন একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সত্তার আদেশের অধীনে চালু রয়েছে—শুধু বস্তুর রূপান্তরে নয়। যেমন এক শ্রেণীর অজ্ঞ লোক তাই মনে করে। কেননা, নিছক বস্তুর রূপান্তর হলে সব বস্তু অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ বিভিন্নতা কিরূপে হত। একই জমি থেকে এক ফল এক ঋতুতে উৎপন্ন হয় এবং অন্য ফল অন্য ঋতুতে। একই বৃক্ষে একই ডালে বিভিন্ন প্রকার ছোট বড় এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল ধরে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ -নিঃসন্দেহে এতে আল্লাহ্‌র শক্তি, মাহাত্ম্য ও একত্বের বহু নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্যে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, যারা এসব বিষয়ে চিন্তা করে না, তারা বুদ্ধিমান নয়—যদিও দুনিয়াতে তারা বুদ্ধিমান ও সমঝদার বলে কথিত হয়।

কাফেরদের সন্দেহ ছিল তিনটি। (এক) তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশরের হিসাব-কিতাবকে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করত। এ কারণেই তারা পরাকালের সংবাদদাতা পয়গম্বরগণকে এবং তাঁদের নবুওয়তকে অস্বীকার করত। কোরআন পাকের এক আয়াতে তাদের এ সন্দেহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ তারা এসব কথা দ্বারা পয়গম্বরগণের প্রতি উপহাস করার জন্যে বলত এস, আমরা তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলি, সে বলে যে, তোমরা যখন মৃত্যুর পর খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে এবং ধূলিকণা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, তখন তোমাদেরকে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রমাণ ঃ আলোচ্য ৫ নং আয়াতে তাদের এ সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে ঃ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, কাফেররা আপনার সুস্পষ্ট মো'জেযা এবং নবুওয়তের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও আপনার নবুওয়ত স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে তারা নিষ্প্রাণ ও চেতনাহীন পাথরকে উপাস্য মানে, যে পাথর নিজের উপকার ও ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়, অপরের উপকার ও ক্ষতি কিরূপে করবে ?

কিন্তু এর চাইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এই উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয় বার আমাদেরকে কিরূপে সৃষ্টি করা হবে ; এটা কি সম্ভবপর ? কোরআন পাক এ আশ্চর্যের কারণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেনি। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সমগ্র সৃষ্টজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى
ظُلْمِهِمْ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ
كَفَرُوا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ إِنَّمَآ أَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ
لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثٰى وَمَا تَغِيضُ
الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ
مَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾
لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُونَهٗ
مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ
مِّنْ دُونِهٖ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا
وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
مِنْ خِيفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ
يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾

(৬) এরা আপনার কাছে মঙ্গলের পরিবর্তে দ্রুত অমঙ্গল কামনা করে। তাদের পূর্বে অনুরূপ অনেক শাস্তিপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে। আপনার পালনকর্তা মানুষকে তাদের অন্যায় সত্ত্বেও ক্ষমা করেন এবং আপনার পালনকর্তা কঠিন শাস্তিদাতাও বটে। (৭) কাফেররা বলে ঃ তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? আপনার কাজ তো ভয় প্রদর্শন করাই এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে পথপ্রদর্শক হয়েছে। (৮) আল্লাহ্ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্কুচিত ও বর্ধিত হয়। এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে। (৯) তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, মহোত্তম, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (১০) তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক বা তা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে আত্মগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক, সবাই তাঁর নিকট সমান। (১১) তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে তারা ওদের হেফাযত করে। আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ্ যখন কোন জাতির উপর বিপদ চান, তখন তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (১২) তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান ভয়ের জন্যে এবং আশার জন্যে এবং উত্থিত করেন ঘন মেঘমালা। (১৩) তাঁর প্রশংসা পাঠ করে বজ্র এবং সব ফেরেশতা, সভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন, অতঃপর যাকে ইচ্ছা, তাকে তা দ্বারা আঘাত করেন ; তথাপি তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী।

এনেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে এমন রহস্য নিহিত রেখেছেন, যা অনুভব করাও মানুষের সাধ্যাতীত। বলাবাহুল্য, যে সত্তা প্রথমবার কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পারেন, তাঁর পক্ষে পুনর্বার অস্তিত্বে আনা কিরূপে কঠিন হতে পারে? কোন নতুন বস্তু তৈরী করা মানুষের পক্ষেও প্রথমবার কঠিন মনে হয়, ; কিন্তু পুনর্বার তৈরী করতে চাইলে সহজ হয়ে যায়।

আশ্চর্যের বিষয়, কাফেররা একথা বিশ্বাস করে যে,প্রথমবার সমগ্র বিশ্বকে অসংখ্য হেকমতসহ আল্লাহ্ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। এরপর পুনর্বার সৃষ্টি করাকে তারা কিরূপে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করে ?

সম্ভবতঃ অবিশ্বাসীদের কাছে বড় প্রশ্ন যে, মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধূলিকণার আকারে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। বায়ু এসব ধূলিকণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়। অতঃপর কেয়ামতের দিন এসব ধূলিকণাকে কিরূপে একত্রিত করা হবে এবং একত্রিত করে কিরূপে জীবিত করা হবে ?

কিন্তু তারা দেখে না যে, তাদের বর্তমান অস্তিত্বের মধ্যেও সারা বিশ্বের কণা একত্রিত রয়েছে। বিশ্বের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বস্তুসমূহ, পানি, বায়ু ও এদের আনীত কণা মানুষের খাদ্যের মধ্যে শামিল হয়ে তার দেহের অংশে পরিণত হয়। এ বেচারী অনেক সময় জানেও না যে, যে লোক্‌মাটি সে মুখে পুরছে, তাতে কতগুলো কণা আফ্রিকার, কতগুলো আমেরিকার এবং কতগুলো প্রাচ্য দেশসমূহের রয়েছে? যে সত্তা অপার শক্তি ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্রিত করে, এমন মানুষ ও জন্তুর অস্তিত্ব খাড়া করেছেন, আগামীকাল এসব কণা একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কোন মুশকিল হবে? অথচ বিশ্বের সমস্ত শক্তি—পানি, বায়ু ইত্যাদি তাঁরই আজ্ঞাবহ। তাঁর ইঙ্গিতে বায়ু পানি এবং শূন্য তার ভিতরকার সব কণা যদি একত্রিত করে দেয়, তবে তা অবিশ্বাস্য হবে কেন?

সত্যি বলতে কি, কাফেররা আল্লাহ্ তাআলার শক্তি ও মহিমাকে চিনতেই পারেনি। তারা নিজেদের শক্তির নিরিখে আল্লাহ্‌র শক্তিকে বোঝে। অথচ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদু'ভয়ের মধ্যবর্তী সব বস্তু আপন আপন মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং আল্লাহ্ তাআলার আজ্ঞাধীন।

মোটকথা, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও কাফেরদের পক্ষে নবুওয়ত অস্বীকার করা যেমন আশ্চর্যের বিষয়, তার চাইতেও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কেয়ামতের পুনর্জীবন ও হাশরের দিন যে অস্বীকার করা।

এরপর অবিশ্বাসীদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এরা শুধু আপনাকেই অস্বীকার করে না ; বরং প্রকৃতপক্ষে পালনকর্তাকেও অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি এই যে, তাদের গর্দানে লৌহশৃঙ্খল পরানো হবে এবং তারা চিরকাল দোযখে বাস করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফেরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল এই ঃ যদি বাস্তবিকই আপনি আল্লাহ্‌র রসূল হয়ে থাকেন, তবে রসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? ৬ নং আয়াতে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে ঃ

"তারা বিপদমুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই আপনার কাছে বিপদ নাযিল হওয়ার তাগাদা করে (যে, আপনি নবী হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক আযাব এনে দিন। এতে বোঝা যায় যে, তারা আযাব আসাকে খুবই অবাস্তব অথবা অসম্ভব মনে করে।) অথচ তাদের পূর্বে অন্য কাফেরদের উপর অনেক আযাব এসেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। এমতাবস্থায় ওদের উপর আযাব অবাস্তব হল কিরূপে? এখানে مثلات শব্দটি مثلة —এর বহুবচন। এর অর্থ অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

এরপর বলা হয়েছে ঃ নিশ্চিতই আপনার পালনকর্তা মানুষের গোনাহ্ ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যারা এ ক্ষমা ও দয়া দ্বারা উপকৃত হয় না এবং অবাধ্যতায় ডুবে থাকে, তাদের জন্যে তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও বটে। কাজেই কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহ্ যখন ক্ষমাশীল, দয়ালু, তখন আমাদের উপর কোন আযাব আসতেই পারে না।

কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই যে, আমরা রসূল (সাঃ)-এর অনেক মু'জেযা দেখেছি ; কিন্তু বিশেষ ধরনের যেসব মু'জেযা আমরা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এর উত্তর তৃতীয় আয়াতে দেয়া হয়েছে ঃ

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

"কাফেররা আপনার নবুওয়তের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলে যে, আমরা যে বিশেষ মু'জেযা দেখতে চাই ; তা তাঁর উপর নাযিল করা হল না কেন? এর উত্তর এই যে, মু'জেযা জাহির করা পয়গম্বরের ইচ্ছাধীন নয় ; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্র কাজ। তিনি যখন যে ধরনের মু'জেযা প্রকাশ করতে চান, তাই করেন। তিনি কারও দাবী ও খায়েশ পূরণ করতে বাধ্য নন। এ জন্যেই বলা হয়েছে ঃ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ অর্থাৎ, আপনার কাজ শুধু কাফেরদেরকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা—মু'জেযা জাহির করা নয়।

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ —অর্থাৎ, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে পথপ্রদর্শক ছিল। আপনি একক নবী নন। জাতিকে পথপ্রদর্শন করা সব পয়গাম্বরেরই দায়িত্ব ছিল। মু'জেযা প্রকাশ করার ক্ষমতা কাউকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ্ তাআলা যখন যে ধরনের মু'জেযা প্রকাশ করতে চান, তাই করেন।

প্রত্যেক দেশে ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে পয়গম্বর আসা কি জরুরী? আয়াতে বলা হয়েছে ঃ প্রত্যেক কওমের জন্যে একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন সম্প্রদায় ও ভূখণ্ড পথপ্রদর্শক থেকে খালি থাকতে পারে না ; যে কোন পয়গম্বর হোক কিংবা পয়গম্বরের প্রতিনিধিরূপে তাঁর দাওয়াতের প্রচারক হোক। উদাহরণতঃ সূরা ইয়াসীনে পয়গম্বরের পক্ষ থেকে প্রথমে দু'ব্যক্তিকে কোন সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণের কথা উল্লেখিত রয়েছে। তাঁরা স্বয়ং নবী ছিলেন না। এরপর তাঁদের সাহায্য ও সমর্থনের জন্যে তৃতীয় ব্যক্তিকে পাঠানোর কথা বর্ণিত রয়েছে।

তাই এ আয়াত থেকে একথা আবশ্যকভাবে প্রমাণিত হয় না যে, আমাদের উপমহাদেশেও কোন নবী-রসূল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে রসূলের দাওয়াত পৌছানোর জন্যে যুগে যুগেই এ দেশে প্রচুর সংখ্যক সাধক প্রচারকের আগমন প্রমাণিত রয়েছে। এ ছাড়া এ জাতীয় অসংখ্য পথপ্রদর্শক যে এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাও সবার জানা।

এ পর্যন্ত তিন আয়াতে নবুওয়ত অস্বীকারকারীদের সন্দেহের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে। চর্তুথ আয়াতে আবার তওহীদের আসল বিষয়বস্তু উল্লেখিত হয়েছে। সূরার শুরু থেকেই এ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে এসেছে। বলা হয়েছে ঃ

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ .... عِندَهُ بِمِقْدَارٍ

অর্থাৎ, প্রত্যেক নারী যে গর্ভধারণ করে, তা ছেলে কি মেয়ে, সুশ্রী কি কুশ্রী, সৎ কি অসৎ—তা সবই আল্লাহ্ জানেন এবং নারীদের গর্ভাশয়ে যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ কোন সময় এক বা একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কোন সময় দ্রুত কোন সময় দেরীতে— তাও আল্লাহ্ জানেন।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার একটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'আলেমুল গায়ব'। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু ও সেসবের পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। এর সাথেই মানব সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রতিটি চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে না উভয়ই; না কিছুই না—শুধু পানি অথবা বায়ু রয়েছে—এসব বিষয়ের নিশ্চিত ও নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র তিনিই রাখেন। লক্ষণাদিদৃষ্টে কোন হাকীম অথবা ডাক্তার এ ব্যাপারে যে মত ব্যক্ত করে, তার মর্যাদা, ধারণা ও অনুমানের চাইতে বেশী নয়। অনেক সময় বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত প্রকাশ পায়। আধুনিক এক্সরে মেশিনও এ সত্য উধঘাটন করতে অক্ষম। এর সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই রাখেন। এ বিষয়টিই অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলাই জানেন যাকিছু গর্ভাশয়ে রয়েছে।

আরবী ভাষায় تَغِيضُ শব্দটি হ্রাস পাওয়া ও শুষ্ক হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এর বিপরীতে تزداد শব্দ এসে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে অর্থ হ্রাস পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, জননীর গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তার বিশুদ্ধ জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলাই রাখেন। এ হ্রাস-বৃদ্ধির অর্থ গর্ভজাত সন্তানের সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভে এক সন্তান আছে কিংবা বেশী এবং জন্মের সময়ও হ্রাস-বৃদ্ধিও হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান কত মাস, কত দিন ও কত ঘণ্টায় জন্মগ্রহণ করে একজন বাহ্যিক মানুষের অস্তিত্ব লাভ করবে, তার নিশ্চিত জ্ঞানও আল্লাহ্ ছাড়া কেউ রাখতে পারে না।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ গর্ভাবস্থায় নারীদের যে রক্তপাত হয়, তা গর্ভস্থ সন্তানের দৈহিক আয়ন ও স্বাস্থ্য হ্রাসের কারণে হয়। تَغِيضُ الْأَرْحَامُ বলে এই হ্রাস বোঝানো হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, হ্রাসের যত প্রকার রয়েছে, আয়াতের ভাষা সবগুলোতেই পরিব্যপ্ত।

وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ অনুমান ও মাপ রয়েছে। এর কমও হতে পারে না এবং বেশীও হতে পারে না। সন্তানের সব অবস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত। তার প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ্ তাআলার কাছে নির্ধারিত আছে। কতদিন গর্ভে থাকবে, কতকাল দুনিয়াতে জীবিত থাকবে এবং কি পরিমাণ রিযিক

পাবে—এসব বিষয়ে আল্লাহ্‌র অনুপম জ্ঞান তাঁর তওহীদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ এখানে غيب শব্দ দ্বারা ঐসব বস্তু বোঝানো হয়েছে যা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাছে অনুপস্থিত ; অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, নাকে ঘ্রাণ নেয়া যায় না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ বোঝা যায় না এবং হাতে স্পর্শ করা যায় না।

এর বিপরীত شهادة হচ্ছে ঐসব বস্তু, যেগুলো উল্লেখিত পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণ যে, তিনি প্রত্যেক অনুপস্থিতকে এমনিভাবে জানেন, যেমন উপস্থিত ও বিদ্যমানকে জেনে থাকেন।

الْكَبِيْرُ শব্দের অর্থ বড় এবং متعال এর অর্থ উচ্চ। উভয় শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তিনি সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাবলীর উর্ধ্বে এবং সবার চেয়ে বড়। কাফের ও মুশরেকরা সংক্ষেপে আল্লাহ্ তাআলার মহত্ত্ব ও উচ্চমর্যাদা স্বীকার করত, কিন্তু উপলব্ধি দোষে তারা আল্লাহ্‌কে সাধারণ মানুষের সমতুল্য জ্ঞান করে তাঁর জন্য এমন গুণাবলী সাব্যস্ত করত, যেগুলো তাঁর মর্যাদার পক্ষে খুবই অসম্ভব। উদাহরণতঃ ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা আল্লাহ্‌র জন্যে পুত্র সাব্যস্ত করেছে। কেউ কেউ তাঁর জন্যে মানুষের ন্যায় দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করেছে এবং কেউ কেউ বিশেষ দিক নির্ধারিণ করেছে। অথচ তিনি এসব অবস্থা ও গুণ থেকে উচ্চে উর্ধ্বে ও পবিত্র। কোরআন পাক তাদের বর্ণিত গুণাবলী থেকে পবিত্রতা প্রকাশের জন্যে বার বার বলেছে ঃ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ঐসব গুণ থেকে পবিত্র, যেগুলো তারা বর্ণনা করে।

প্রথম عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ এবং তৎপূর্ববর্তী اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى বাক্যে আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছিল। দ্বিতীয় الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ বাক্যে শক্তি ও মাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য মানুষের কল্পনার উর্ধ্বে। এর পরবর্তী আয়াতেও এ জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা একটি বিশেষ আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ

اسر শব্দটি سرارا থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আস্তে কথা বলার এবং جهر শব্দের অর্থ, জোরে কথা বলা। অপরকে শোনানোর জন্যে যে কথা বলা হয়, তাকে جهر বলে এবং যে কথা স্বয়ং নিজেকে শোনানোর জন্যে বলা হয়, তাকে سر বলে। مستخف শব্দের অর্থ যে গা ঢাকা দেয় এবং سارب এর অর্থ যে স্বাধীন নিশ্চিন্তভাবে পথ চলে।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞান সর্বব্যাপী। কাজেই যে ব্যক্তি আস্তে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে, তারা উভয়ই আল্লাহ্‌র কাছে সমান। তিনি উভয়ের কথা সমভাবে শোনেন এবং জানেন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় এবং যে ব্যক্তি দিবালোকে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে, তারা উভয়ই আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে সমান। উভয়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা তিনি সমভাবে জানেন এবং উভয়ের উপর তাঁর শক্তি সমভাবে পরিব্যাপ্ত। কেউ তাঁর ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত নয়।

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ

مُعَقِّبٰتٌ শব্দটি معقبة এর বহুবচন। যে দল অপর দলের পেছনে কাছাকাছি হয়ে আসে, তাকে معقبة অথবা متعقبة বলা হয়। مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ -এর শাব্দিক অর্থ, উভয় হাতের মাঝখানে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মুখ দিক। مِنْ خَلْفِهٖ - এর অর্থ পশ্চাদ্দিক। مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ এখানে مِّنْ কারণবোধক অর্থ দেয়; অর্থাৎ بامر الله কোন কেরাআতে এ শব্দটি بامر الله বর্ণিতও আছে।—(রূহুল-মা'আনী)

আয়াতের অর্থ যে, যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় এবং যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ঢেকে রাখতে চায় অথবা প্রকাশ্য সড়কে ঘোরাফেরা করে—এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। তার সম্মুখে ও পশ্চাদ্দিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। তাদের কাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। আল্লাহ্‌র নির্দেশে মানুষের হেফাযত করা তাদের দায়িত্ব।

সহীহ্ বুখারীর হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ফেরেশতাদের দু'টি দল হেফাযতের জন্যে নিযুক্ত রয়েছে। একদল রাত্রির জন্যে এবং একদল দিনের জন্যে। উভয় দল ফজরের ও আসরের নামাযের সময় একত্রিত হন। ফজরের নামাযের পর রাতের পাহারাদার দল বিদায় নেন এবং দিনের পাহারাদাররা কাজ বোঝে নেন। আসরের নামাযের পর তাঁরা বিদায় হয়ে যান রাতের ফেরেশতা দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন।

আবু দাউদের এক হাদীসে হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছুসংখ্যক হেফাযতকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার উপর যাতে কোন প্রাচীর ধ্বসে না পড়ে কিংবা সে কোন গর্তে পতিত না হয়, কিংবা কোন জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয়, ইত্যাদি বিষয়ে ফেরেশতাগণ তার হেফাযত করেন। তবে কোন মানুষকে বিপদাপদে জড়িত করার জন্যে যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ জারী হয়ে যায়, তখন হেফাযতকারী ফেরেশতারা সেখান থেকে সরে যায়।—(রূহুল-মা'আনী)

হযরত ওসমান গণী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে ইবনে-জরীর কতৃক বর্ণিত এক হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, হেফাযতকারী ফেরেশতাদের কাজ শুধু পার্থিব বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে হেফাযত করাই নয় ; বরং তারা মানুষকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখারও চেষ্টা করেন। মানুষের মনে সাধুতা ও আল্লাহ্‌ভীতির প্রেরণা জাগ্রত করেন যাতে সে গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে। এরপরও যদি সে ফেরেশতাদের প্রেরণার প্রতি উদাসীন হয়ে পাপে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে তারা দোয়া ও চেষ্টা করে যাতে সে শীঘ্র তওবা করে পাক হয়ে যায়। অগত্যা যদি সে কোনরূপেই হুশিয়ার না হয়, তখন তারা তার আমলনামায় গোনাহ্ লিখে দেয়। মোটকথা এই যে, হেফাযতকারী ফেরেশতা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের বিপদাপদ থেকে মানুষের নিদ্রায় ও জাগরণে হেফাযত করে। হযরত কা'ব আহবার বলেন ঃ মানুষের উপর থেকে খোদায়ী হেফাযতের এই পাহারা সরিয়ে দিলে জিনদের অত্যাচারে মানবজীবন অতিষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এসব রক্ষামূলক পাহারা ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর থাকে, যতক্ষণ তকদীরে-ইলাহী মানুষের হেফাযতের অনুমতি দেয়। যদি আল্লাহ্

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ
لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ
بِبَالِغِهِ ۚ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ
مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ
وَالْآصَالِ ۩ ﴿١٥﴾ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلْ
أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا
وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ
تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا
كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ
أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا
يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ
مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا
الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ
فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

(১৪) সত্যের আহ্বান একমাত্র তাঁরই এবং তাকে ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা তাদের কোন কাজে আসে না ; ওদের দৃষ্টান্ত সেরূপ, যেমন কেউ দু' হাত পানির দিকে প্রসারিত করে যাতে পানি তার মুখে পৌছে যায় ; অথচ পানি কোন সময় পৌছাবে না। কাফেরদের যত আহ্বান তার সবই পথভ্রষ্টতা। (১৫) আল্লাহ্কে সেজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিচ্ছায়াও সকাল-সন্ধ্যায়। (১৬) জিজ্ঞেস করুন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা কে? বলে দিন ঃ আল্লাহ্। বলুন ঃ তবে কি তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির করেছ, যারা নিজেদের ভাল-মন্দেরও মালিক নয়? বলুন ঃ অন্ধ চক্ষুষ্মান কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি অন্ধকার ও আলোর সমান হয়। তবে কি তারা আল্লাহ্র জন্য এমন অংশীদার স্থির করেছে যে, তারা কিছু সৃষ্টি করেছে, যেমন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ ? অতঃপর তাদের সৃষ্টি এরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? বলুন ঃ আল্লাহ্ই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী। (১৭) তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। অতঃপর স্রোতধারা স্ফীত ফেনারাশি উপরে নিয়ে আসে। এবং অলঙ্কার অথবা তৈজসপত্রের জন্যে যে বস্তুকে আগুনে উত্তপ্ত করে, তাতেও তেমনি ফেনারাশি থাকে। এমনিভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ্ এমনিভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।

তাআলাই কোন বান্দাকে বিপদে জড়িত করতে চান, তবে এসব রক্ষামূলক পাহারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং তারাই নিজেদের অবস্থা ও কাজকর্ম মন্দ ও অশান্তিতে পরিবর্তিত করে না নেয়। (তারা যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ্ তাআলাও স্বীয় কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন। বলাবাহুল্য,) যখন আল্লাহ্ তাআলাই কাউকে আযাব দিতে চান, তখন কেউ তা রদ করতে পারে না এবং আল্লাহ্র নির্দেশের বিপরীতে তার সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসতে পারে না।

সারকথা এই যে, মানুষের হেফাযতের জন্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত থাকে ; কিন্তু সম্প্রদায় যখন আল্লাহ্র নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে কুকর্ম, কুচরিত্র ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ্ তাআলাও স্বীয় রক্ষামূলক পাহারা উঠিয়ে নেন। এরপর আল্লাহ্র গযব ও আযাব তাদের উপর নেমে আসে। এ আযাব থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের অবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন কোন সম্প্রদায় আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার পথ ত্যাগ করে স্বীয় অবস্থায় মন্দ পরিবর্তন সূচিত করে, তখন আল্লাহ্ তাআলাও স্বীয় অনুকম্পা ও হেফাযতের কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন।

এ আয়াতের অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, কোন জাতির জীবনে কল্যাণকর বিপ্লব ততক্ষণ পর্যন্ত আসে না, যতক্ষণ তারা এ কল্যাণকর বিপ্লবের জন্যে নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নিজেদেরকে তার যোগ্য করে না নেয়।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ

অর্থাৎ,আল্লাহ্ তাআলাই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন। এটা মানুষের জন্যে ভয়েরও কারণ হতে পারে। কারণ, এটা যে জায়গায় পতিত হয় সবকিছু জ্বালিয়ে ছাইভস্ম করে দেয়। আবার এটা আশাও সঞ্চার করে যে, বিদ্যুৎ চমকানোর পর বৃষ্টি হবে, যা মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবনের অবলম্বন। এবং আল্লাহ্ তাআলাই বড় বড় ভারী মেঘমালাকে মৌসুমী বায়ুতে রূপান্তরিত করে উত্থিত করেন এবং জলপূর্ণ মেঘমালাকে শূন্যে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যান। এরপর স্বীয় ফয়সালা ও তকদীর অনুযায়ী যথা ইচ্ছা, তা বর্ষণ করেন।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ অর্থাৎ, রা'দ আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার তসবীহ্ পাঠ করে এবং ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে তসবীহ্ পাঠ করে। সাধারণের পরিভাষায় রা'দ বলা হয় মেঘের গর্জনকে, যা মেঘমালার পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়। এর তসবীহ্ পাট করার অর্থ ঐ তসবীহ্ যে সম্পর্কে কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে উল্লেখিত রয়েছে যে, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে এমন কোন বস্তু নেই, যে আল্লাহ্র তসবীহ্ পাঠ করে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই তসবীহ্ শুনতে সক্ষম হয় না। ==

কোন কোন হাদীসে আছে যে, বৃষ্টি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত ও আদিষ্ট

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰىؔ ۚ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ
لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ
سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۸﴾ اَفَمَنْ يَّعْلَمُ
اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا
الْاَلْبَابِ ﴿۱۹﴾ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ﴿۲۰﴾
وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ
يَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿۲۱﴾ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۲﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ
يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿۲۳﴾ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ
عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۴﴾ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ
وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ
لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿۲۵﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ
وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿۲۶﴾

(১৮) যারা পালনকর্তার আদেশ পালন করে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে এবং যারা আদেশ পালন করে না, যদি তাদের কাছে জগতের সবকিছু থাকে এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে সবই নিজেদের মুক্তিপণস্বরূপ দিয়ে দেবে। তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর হিসাব। তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান। (১৯) যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা বোধশক্তিসম্পন্ন। (২০) এরা এমন লোক, যারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। (২১) এবং যারা বজায় রাখে ঐ সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে এব কঠোর হিসাবের আশঙ্কা রাখে। (২২) এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্যে সবর করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি,তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল করে, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গৃহ। (২৩) তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (২৪) বলবে ঃ তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার। (২৫) এবং যারা আল্লাহ্র অঙ্গীকারকে দৃঢ় ও পাকা-পোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, ওরা ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্যে রয়েছে অভিসম্পাত এবং ওদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব। (২৬) আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা রুযী প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। তারা পার্থিব জীবনের প্রতি মুগ্ধ। পার্থিবজীবন পরকালের সামনে অতি সামান্য সম্পদ বৈ নয়।

ফেরেশতার নাম রা'দ। এই অর্থে তসবীহ্ পাঠ করার মানে সুস্পষ্ট।

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ - এখানে صواعق শব্দটি **صاعقة** এর বহুবচন। এর অর্থ বজ্র, যা মাটিতে পতিত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলাই এসব বিদ্যুৎ মর্ত্যে প্রেরণ করেন, যেগুলো দ্বারা যাকে ইচ্ছা জ্বালিয়ে দেন।

وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ এখানে **محال** শব্দটি মীমের যেরযোগে কৌশল, শাস্তি, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়, আয়াতের অর্থ এই যে, তারা আল্লাহ্ তাআলার তওহীদের ব্যাপারে পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে ; অথচ আল্লাহ্ তাআলা শক্তিশালী কৌশলকারী। তাঁর সামনে সবার চাতুরী অচল।

সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত ঃ উভয় দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, এসব দৃষ্টান্ত ময়লা ও আবর্জনা যেমন কিছুক্ষণের জন্যে আসল বস্তুর উপরে দৃষ্টিগোচর হয় ; কিন্তু পরিণামে তা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং আসল বস্তু অবশিষ্ট থাকে, তেমনি মিথ্যাকে যদিও কিছুদিন সত্যের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা যায় ; কিন্তু অবশেষে মিথ্যা বিলুপ্ত ও পর্যুদস্ত হয় এবং সত্য অবশিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত থাকে।—(জালালাইন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ —অর্থাৎ বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট; কিন্তু এটি তারাই বোঝতে পারে, যারা বুদ্ধিমান। পক্ষান্তরে অমনোযোগিতা ও গোনাহ্ যাদের বিবেককে অকর্মণ্য করে রেখেছে, তারা অতবড় তফাৎটুকুও বোঝে না।

তৃতীয় আয়াতে উভয় দলের বিশেষ বিশেষ কাজকর্ম ও লক্ষণের বর্ণনা শুরু হয়েছে। প্রথমে আল্লাহ্র বিধানাবলী পালনকারীদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ — অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে। সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের কাছ থেকে যেসব অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এখানে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল পালনকর্তা সম্পর্কিত অঙ্গীকার। এটি সৃষ্টির সূচনাকালে সকল আত্মাকে সমবেত করে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল বলা হয়েছিল ঃ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ —অর্থাৎ, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? উত্তরে সবাই সমস্বরে বলেছিল ঃ بَلٰى অর্থাৎ, হাঁ, আপনি অবশ্যই আমাদের পালনকর্তা। এমনিভাবে যাবতীয় বিধি—বিধানের আনুগত্য, সমস্ত ফরয কর্মপালন এবং অবৈধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উপদেশ এবং বান্দার পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ —অর্থাৎ, তারা কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। ঐ অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্ তাআলা ও বান্দার মধ্যে রয়েছে এবং এইমাত্র يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ঐসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো উম্মতের লোকেরা আপন পয়গম্বরের সাথে সম্পাদন করে এবং ঐসব অঙ্গীকারও বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি একে অপরের সাথে করে। আল্লাহ্

তাআলার আনুগত্যশীল বান্দাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা সেগুলো বজায় রাখে। এ বাক্যটির প্রচলিত তফসীর এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আত্মীয়তার যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে আদেশ করেছেন, তারা সেসব সম্পর্ক বজায় রাখে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এর অর্থ এই যে, তারা ঈমানের সাথে সৎকর্মকে অথবা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাসের সাথে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের প্রতি এবং তাঁদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসকে যুক্ত করে।

চতুর্থ গুণ এই ঃ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ —অর্থাৎ, তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে। এখানে خوف শব্দের পরিবর্তে خشية শব্দ ব্যবহার করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার প্রতি তাদের ভয় হিংস্র জন্তু অথবা ইতর মানুষের প্রতি স্বাভাবিক ভয়ের মত নয়। বরং তা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের এবং ওস্তাদের প্রতি শিষ্যের অভ্যাসগত ভয়ের মত। কষ্টদানের আশঙ্কা এ ভয়ের কারণ নয়।

وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ —অর্থাৎ, তারা মন্দ হিসাবকে ভয় করে। 'মন্দ হিসাব' বলে কঠোর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব বোঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা যদি কৃপাবশতঃ সংক্ষেপে ও মার্জনা সহকারে হিসাব গ্রহণ করেন, তবেই মানুষ মুক্তি পেতে পারে। নতুবা যার কাছ থেকেই পুরোপুরি ও কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব নেয়া হবে, তার পক্ষে আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হবে না। কেননা, এমন ব্যক্তি কে আছে, যে জীবনে কখনো কোন গোনাহ্ বা ত্রুটি করেননি ? এ হচ্ছে সৎ ও আনুগত্যশীল বান্দাদের পঞ্চম গুণ।

ষষ্ঠ গুণ এই ঃ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ —অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করার আশায় অকৃত্রিমভাবে ধৈর্যধারণ করে। প্রচলিত কথায় কোন বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাকেই সবরের অর্থ মনে করা হয়। কিন্তু আরবী ভাষায় এর অর্থ আরও অনেক ব্যাপক। কারণ, আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব-বিরুদ্ধ বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া ; বরং দৃঢ়তা সহকারে নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকা। এ কারণেই এর দু'টি প্রকার বর্ণনা করা হয়। (এক) صبر على الطاعة অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা,আলার বিধি-বিধান পালনে দৃঢ় থাকা এবং (দুই) صبر عن المعصية অর্থাৎ, গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা।

সবরের সাথে ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ কথাটি যুক্ত হয়ে ব্যক্ত করেছে যে, সবর সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নয়। কেননা, কোন না কোন সময় বে-সবর ব্যক্তিরও দীর্ঘদিন পরে হলেও সবর এসেই যায়। কাজেই যে সবর ইচ্ছাধীন নয়, তার বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এরূপ অনিচ্ছাধীন কাজের আদেশ আল্লাহ্ তাআলা দেন না।

সপ্তম গুণ হচ্ছেঃ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ —'নামায কায়েম করার' অর্থ পূর্ণ আদব ও শর্ত এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামায আদায় করা—শুধু নামায পড়া নয়। এ জন্যেই কোরআনে নামাযের নির্দেশ সাধারণতঃ اقامة صلوة শব্দ সহযোগে দেয়া হয়েছে।

অষ্টম গুণ হচ্ছে ঃ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু আল্লাহ্র নামেও ব্যয় করে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কাছে চান না ; বরং নিজেরই দেয়া রিযিকের কিছু অংশ তাও মাত্র শতকরা আড়াই ভাগের মত সামান্যতম পরিমাণ তোমাদের কাছে চান। এটা দেয়ার ব্যাপারে স্বভাবতঃ তোমাদের ইতস্ততঃ করা উচিত নয়।

অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার সাথে سِرًّا وَّعَلَانِيَةً শব্দ দু'টি যুক্ত হওয়ায় বোঝা যায় যে, সদ্কা-খয়রাত সর্বত্র গোপনে করাই সুন্নত নয় ; বরং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ। এ জন্যেই আলেমগণ বলেন যে, যাকাত ও ওয়াজিব সদকা প্রকাশ্যে দেয়াই উত্তম এবং গোপনে দেয়া সমীচীন নয়—যাতে অন্যেরাও শিক্ষা ও উৎসাহ পায়। তবে নফল সদ্কা-খয়রাত গোপনে দেয়াই উত্তম। যেসব হাদীসে গোপনে দেয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নফল সদ্কা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

নবম গুণ হচ্ছে وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ অর্থাৎ, তারা মন্দকে ভাল দ্বারা, শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা এবং অন্যায় ও জুলুমকে ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা প্রতিহত করে। মন্দের জওয়াবে মন্দ ব্যবহার করে না। কেউ অর্থাৎ কোন সময় কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তারা অধিকতর যত্ন সহকারে অধিক পরিমাণে এবাদত করে। ফলে গোনাহ্ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত মু'আয (রাঃ)-কে বলেন ঃ পাপের পর পুণ্য করে নাও, তাহলে তা পাপকে মিটিয়ে দিবে।

আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যশীলদের নয়টি গুণ বর্ণনা করার পর তাদের প্রতিদান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ دار শব্দের অর্থ এখানে دار آخرت অর্থাৎ পরকাল। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তাদের জন্যেই রয়েছে পরকালের সাফল্য।

অতঃপর عُقْبَى الدَّارِ অর্থাৎ, পরকালের সাফল্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা হচ্ছে, جَنّٰتُ عَدْنٍ তারা এগুলোতে প্রবেশ করবে। عدن শব্দের অর্থ হচ্ছে অবস্থান ও স্থায়িত্ব। উদ্দেশ্য এই যে, এসব জান্নাত থেকে কখনও তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে না; বরং এগুলোতে তাদের অবস্থান চিরস্থায়ী হবে। কেউ কেউ বলেন ঃ জান্নাতের মধ্যস্থলের নাম আদন। জান্নাতের স্থানসমূহের মধ্যে এটা উচ্চস্তরের।

এরপর তাদের জন্যে আরও একটি পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলার এ নেয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তানরাও এর অংশ পাবে। শর্ত এই যে, তাদের উপযুক্ত হতে হবে। এর ন্যূনতম স্তর হচ্ছে মুসলমান হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের বাপ-দাদা ও স্ত্রীদের নিজস্ব আমল যদিও এ স্তরে পৌছার যোগ্য নয়; কিন্তু আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের খাতিরে ও বরকতে তাদেরকেও এ উচ্চস্তরে পৌছিয়ে দেয়া হবে।

এরপর তাদের আরও একটি পরকালীন সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করতে করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে ঃ সবরের কারণে তোমরা যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এটা পরকালের কতই না উত্তম পরিণাম !

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ —অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্ তাআলার অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ করে আল্লাহ্ তাআলার অঙ্গীকারের মধ্যে সেই অঙ্গীকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সৃষ্টির সূচনাকালে আল্লাহ্র পালনকর্তৃত্ব ও একত্ব সম্পর্কে সব আত্মার কাছ

উমাইয়াকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর কাছে প্রেরণ করল। সে বলল ঃ আপনি যদি চান যে, আমরা আপনাকে রসূল বলে স্বীকার করে নেই এবং আপনার অনুসরণ করি, তবে আমাদের কতকগুলো দাবী আছে এগুলো কোরআনের মাধ্যমে পূরণ করে দিলে আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাব।

তাদের একটি দাবী ছিল এই যে, মক্কা শহরটি খুবই সংকীর্ণ। চতুর্দিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা উচ্চভূমি, যাতে না চাষাবাদের সুযোগ আছে এবং না বাগ–বাগিচা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের অবকাশ আছে। আপনি মু'জেযার সাহায্যে পাহাড়গুলোকে দূরে সরিয়ে দিন—যাতে মক্কার যমীন প্রশস্ত হয়ে যায়। আপনিই তো বলেন যে, দাউদ (আঃ)–এর জন্যে পাহাড়ও সাথে সাথে তসবীহ্ পাঠ করত। আপনার কথা অনুযায়ী আপনি তো আল্লাহ্র কাছে দাউদের চাইতে খাটো নন।

দ্বিতীয় দাবী ছিল এই যে, আপনার কথা অনুযায়ী সুলায়মান (আঃ)–এর জন্যে যেরূপ বায়ুকে আজ্ঞাবহ করে পথের বিরাট বিরাট দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, আপনিও আমাদের জন্যে তদ্রূপ করে দিন—যাতে সিরিয়া ইয়ামনের সফর আমাদের জন্যে সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় দাবী ছিল এই যে, ঈসা (আঃ) মৃতদেরকে জীবিত করতেন। আপনি তাঁর চাইতে কোন অংশে কম নন। আপনিও আমাদের জন্যে আমাদের দাদা কুসাইকে জীবিত করে দিন—যাতে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনার ধর্ম সত্য কি না। (মাযহারী, বগভী, ইবনে আবী হাতেম ইবনে মরদুওয়াইহ্)

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব হঠকারিতাপূর্ণ দাবীর উত্তরে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ

الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا

এখানে تسيير جبال বলে পাহাড়গুলোকে স্বস্থান থেকে হটানো, قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ বলে সংক্ষিপ্ত সময়ে লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করা এবং كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى বলে মৃতদেরকে জীবিত করে কথা বলা বোঝানো হয়েছে। لو . حرف شرط এর জওয়াব স্থানের ইঙ্গিতে উহ্য রয়েছে ; অর্থাৎ لَمَا اٰمَنُوْا যেমন কোরআনের অন্য এক জায়গায় এমনি বিষয়বস্তু এবং তার এরূপ জওয়াবই উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ

كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا

অর্থ এই যে, যদি কোরআনের সাহায্যে তাদের এসব দাবী পূরণ করে দেয়া হয়, তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা, তারা এসব দাবীর পূর্বে এমনসব মু'জেযা প্রত্যক্ষ করেছে, যেগুলো তাদের প্রার্থিত মু'জেযার চাইতে অনেক উর্ধ্বে ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর ইশারায় চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া, পাহাড়ের স্বস্থান থেকে সরে যাওয়া এবং বায়ুকে আজ্ঞাবহ করার চাইতে অনেক বেশী বিস্ময়কর। এমনিভাবে তাঁর হাতে নিষ্প্রাণ কঙ্করের কথা বলা এবং তসবীহ পাঠ করা কোন মৃত ব্যক্তির জীবিত হয়ে কথা বলার চাইতে অধিকতর বিরাট মু'জেযা। শবে মে'রাজে মসজিদে আকসা, অতঃপর সেখান থেকে নভোমণ্ডলের সফর এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রত্যাবর্তন, বায়ুকে বশ করা সুলায়মানী তখতের অলৌকিকতার চাইতে অনেক মহান। কিন্তু জালেমরা এগুলো দেখার পরও বিশ্বাস স্থাপন করেনি। অতএব এসব দাবীর পেছনেও তাদের নিয়ত যে টালবাহানা করা—কিছু মেনে নেয়া ও করা নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুশরেকদের এসব দাবীর লক্ষ্য এটাই ছিল যে, তাদের দাবী পূরণ না করা হলে তারা বলবে। (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তাআলাই এসব কাজ করার শক্তি রাখেন না, অথবা রসূলের কথা আল্লাহ্র কাছে শ্রবণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। এতে বোঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ্র রসূল নন। তাই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا অর্থাৎ, ক্ষমতা সবটুকু আল্লাহ্ তাআলারই। উদ্দেশ্য এই যে, উল্লেখিত দাবীগুলো পূরণ না করার কারণ এই নয় যে, এগুলো আল্লাহ্র শক্তি বহির্ভূত ; বরং বাস্তব সত্য এই যে, জগতের মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি স্বীয় রহস্যের কারণে এসব দাবী পূর্ণ করা সমীচীন মনে করেননি। কারণ, দাবী উত্থাপনকারীদের হঠকারিতা ও বদনিয়ত তাঁর জানা আছে। তিনি জানেন যে, এসব দাবী পূরণ করা হলেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا

– ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম মুশরেকদের এসব দাবী শুনে কামনা করতে থাকেন যে, মু'জেযা হিসেবে দাবীগুলো পূরণ করে দিলে ভালই হয়। মক্কার সবাই মুসলমান হয়ে যাবে এবং ইসলাম শক্তিশালী হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থ এই যে, মুসলমানরা মুশরেকদের ছলচাতুরী ও হঠকারিতা দেখা ও জানা সত্ত্বেও কি এখন পর্যন্ত তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়নি যে, এমন কামনা করতে শুরু করেছে? অথচ তারা জানে যে, আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে সব মানুষকে এমন হেদায়েত দিতে পারেন যে, মুসলমান হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু সবাইকে ইসলাম ও ঈমানে বাধ্য করা খোদায়ী রহস্যের অনুকূল নয়; খোদায়ী রহস্য এটাই যে, প্রত্যেকের নিজস্ব

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ
يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ
قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٢٩﴾ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي
أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ
هُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ
مَتَابِ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ
أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن
لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم
بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ
عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ
بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

(২৭) কাফেররা বলে ঃ তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হলো না? বলে দিন, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করেন এবং যে মনোনিবেশ করে, তাকে নিজের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। (২৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহ্র যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহ্র যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। (২৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তনস্থল। (৩০) এমনিভাবে আমি আপনাকে একটি উম্মতের মধ্যে প্রেরণ করেছি। তাদের পূর্বে অনেক উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে। যাতে আপনি তাদেরকে ঐ নির্দেশ শুনিয়ে দেন, যা আমি আপনার কাছে প্রেরণ করেছি। তথাপি তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। বলুন ঃ তিনিই আমার পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কারও উপাসনা নাই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করেছি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন। (৩১) যদি কোন কোরআন এমন হত, যার সাহায্যে পাহাড় চলমান হয় অথবা যমীন খণ্ডিত হয় অথবা মৃতরা কথা বলে, তবে কি হত? বরং সব কাজ তো আল্লাহ্র হাতে। ঈমানদাররা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় যে, যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে সব মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতেন? কাফেররা তাদের কৃতকর্মের কারণে সব সময় আঘাত পেতে থাকবে অথবা তাদের গৃহের নিকটবর্তী স্থানে আঘাত নেমে আসবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্র ওয়াদা না আসে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ওয়াদার খেলাফ করেন না। (৩২) আপনার পূর্বে কত রসূলের সাথে ঠাট্টা করা হয়েছে। অতঃপর আমি কাফেরদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছি, এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি। অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি। (৩৩) ওরা প্রত্যেকেই কি মাথার উপর স্ব স্ব কৃতকর্ম নিয়ে দণ্ডায়মান নয়? এবং তারা আল্লাহ্র জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলুন; নাম বল অথবা খবর দাও পৃথিবীর এমন কিছু জিনিস সম্পর্কে যা তিনি জানেন না? অথবা অসার কথাবার্তা বলছ? বরং সুশোভিত করা হয়েছে কাফেরদের জন্যে তাদের প্রতারণাকে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দান করা হয়েছে। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।

থেকে নেয়া হয়েছিল। কাফেরও মুশরেকরা দুনিয়াতে এসে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং আল্লাহ্র মোকাবেলায় শত শত পালনকর্তা ও উপাস্য তৈরী করেছে।

এছাড়া ঐসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলো পালন করা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' চুক্তির অধীনে মানুষের জন্যে অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ, কলেমায়ে তাইয়্যেবা- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলাল্লাহ্' প্রকৃতপক্ষে একটি মহান চুক্তির শিরোনাম। এর অধীনে আল্লাহ্ ও রসূলের বর্ণিত বিধি-বিধান পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকারও এসে যায়। তাই কোন মানুষ যখন আল্লাহ্ অথবা রসূলের কোন আদেশ অমান্য করে, তখন সে ঈমানের চুক্তিই লঙ্ঘন করে।

অবাধ্য বান্দাদের দ্বিতীয় স্বভাব এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ —অর্থাৎ, তারা ঐসব সম্পর্ক ছিন্ন করে, যেগুলো বজায় রাখতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে মানুষের যে সম্পর্ক, এখানে সেই সম্পর্কও বোঝানো হয়েছে। তাঁদের প্রদত্ত বিধি-বিধান অমান্য করাই হচ্ছে এ সম্পর্ক চিন্ন করার অর্থ। এছাড়া আত্মীয়তার সম্পর্কও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কোরআন পাকের স্থানে স্থানে এসব সম্পর্ক বজায় রাখা ও এগুলোর হক আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় স্বভাব এই ঃ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ —অর্থাৎ, তারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে। এ তৃতীয় স্বাভাবটি প্রকৃতপক্ষে প্রথমোক্ত দু'স্বভাবেরই ফলশ্রুতি। যারা আল্লাহ্ তাআলা ও মানুষের অঙ্গীকারের পরওয়া করে না এবং কারও অধিকার ও সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করে না, তাদের কর্মকাণ্ড যে অপরাপর লোকদের ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি কাটাকাটির বাজার গরম হবে। এটাই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ফাসাদ।

অবাধ্য বান্দাদের এই তিনটি স্বভাব বর্ণনা করার পর তাদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ —অর্থাৎ, তাদের জন্যে লা'নত ও মন্দ আবাস রয়েছে। লা'নতের অর্থ আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে থাকা এবং বঞ্চিত হওয়া। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে থাকাই সর্বাপেক্ষা বড় আযাব এবং সব বিপদের বড় বিপদ।

أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ —পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেমন অনুগত বান্দাদের প্রতিদান উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, তাদের স্থান হবে জান্নাতে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করে বলবে যে, এসব নেয়ামত তোমাদের সবর ও আনুগত্যের ফলশ্রুতি; তেমনিভাবে এ আয়াতে অবাধ্যদের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহ্ লা'নত ; অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে এবং তাদের জন্যে জাহান্নামের আবাস অবধারিত। এতে বোঝা যায় যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং আত্মীয় ও স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অভিসম্পাত ও জাহান্নামের কারণ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তফসীর বগভীতে আছে, একদিন মক্কার মুশরেকরা পবিত্র কা'বা প্রাঙ্গণে এক সভায় মিলিত হল। তাদের মধ্যে আবু জাহ্ল ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা আবদুল্লাহ্ ইবনে

ক্ষমতা অটুট থাকুক এবং এ ক্ষমতাবলে ইসলাম গ্রহণ করুক অথবা কুফর অবলম্বন করুক।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ

—হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ قارعة শব্দের অর্থ আপদ-বিপদ। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিকদের দাবী-দাওয়া পূরণ করার কারণ এই যে, তাদের বদনিয়ত ও হঠকারিতা জানা ছিল যে, পূরণ করলেও বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তারা আল্লাহ্র কাছে দুনিয়াতেও আপদ-বিপদে পতিত হওয়ার যোগ্য; যেমন মক্কাবাসীদের উপর কখনও দুর্ভিক্ষের, কখনও ইসলামী জেহাদ তথা বদর, ওহুদ ইত্যাদিতে হত্যা ও বন্দীত্বের বিপদ নাযিল হয়েছে। কারও উপর বজ্র পতিত হয়েছ এবং কেউ অন্য কোন বালা-মুসীবতে আক্রান্ত হয়েছে أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ -অর্থাৎ মাঝে মাঝে এমনও হবে যে, সরাসরি তাদের উপর বিপদ আসবে না; বরং তাদের নিকটবর্তী জনপদের উপর বিপদ আসবে যাতে তারা শিক্ষালাভ করে এবং নিজেদের কুপরিণামও দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ —অর্থাৎ, আপদ বিপদের এ ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা পূর্ণ না হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ্র ওয়াদা কোন সময় টলতে পারে না। ওয়াদা বলে এখানে মক্কা বিজয় বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ আসতে থাকবে। এমন কি, পরিশেষে মক্কা বিজিত হবে এবং তারা সবাই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে যাবে।

আলোচ্য আয়াতে أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কোন সম্প্রদায় ও জনপদের আশেপাশে আযাব অথবা আপদ-বিপদ নাযিল হলে তাতে আল্লাহ্ তাআলার এ রহস্যও নিহিত থাকে যে, পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোও হুশিয়ার হয়ে যায় এবং অন্যের দুরবস্থা দেখে তারাও নিজেদের ক্রিয়াকর্ম সংশোধন করে নেয়। ফলে অন্যের আযাব তাদের জন্যে রহমত হয়ে যায়, নতুবা একদিন অন্যদের ন্যায় তারাও আযাবে পতিত হবে।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ -অর্থাৎ, কাফের ও মুশরিকদের উপর দুনিয়াতেও বিভিন্ন প্রকার আযাব ও আপদ-বিপদের ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা পৌঁছে না যায়। কেননা, আল্লাহ্ কখনও ওয়াদার খেলাফ করেন না।

ওয়াদার অর্থ এখানে মক্কা বিজয়। আল্লাহ্ তাআলা এই ওয়াদা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়ে কাফের ও মুশরিকরা পর্যুদস্ত হবেই ; এর পূর্বেও অপরাদের কিছু কিছু সাজা তারা ভোগ করবে। ওয়াদার অর্থ এ স্থলে কেয়ামতও হতে পারে। এ ওয়াদা সব পয়গম্বরের সাথে সব সময়ই করা আছে। ওয়াদাকৃত সেই কেয়ামতের দিন প্রত্যেক কাফেরও অপরাধী কৃতকর্মের পুরোপুরি শাস্তি ভোগ করবে।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا
لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٤﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى
الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ
الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ
بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ اِلَيْهِ
اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ﴿٣٦﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ
اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ
مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَ
جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ
بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ
وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ ﴿٣٩﴾ وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ
الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا
الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ
وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ؕ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾

(৩৪) দুনিয়ার জীবনেই এদের জন্য রয়েছে আযাব এবং অতি অবশ্য আখেরাতের জীবন কঠোরতম। আল্লাহ্র কবল থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই। (৩৫) পরহেযগারদের জন্যে প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নিম্নে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও। এটা তাদের প্রতিদান, যারা সাবধান হয়েছে এবং কাফেরদের প্রতিফল অগ্নি। (৩৬) এবং যাদেরকে আমি গ্রন্থ দিয়েছি, তারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তজ্জন্যে আনন্দিত হয় এবং কোন কোন দল এর কোন কোন বিষয় অস্বীকার করে। বলুন, আমাকে এরূপ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি আল্লাহ্র এবাদত করি। এবং তাঁর সাথে অংশীদার না করি। আমি তাঁর দিকেই দাওয়াত দেই এবং তাঁর কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন। (৩৭) এমনিভাবেই আমি এ কোরআনকে আরবী ভাষায় নির্দেশরূপে অবতারণ করেছি। যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান পৌঁছার পর, তবে আল্লাহ্র কবল থেকে আপনার না কোন সাহায্যকারী আছে এবং না কোন রক্ষাকারী। (৩৮) আপনার পূর্বে আমি অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। কোন রসূলের এমন সাধ্য ছিল না যে আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করে। প্রত্যেকটি ওয়াদা লিখিত আছে। (৩৯) আল্লাহ যা ইচ্ছা, মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে। (৪০) আমি তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছি, তার কোন একটি যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই কিংবা আপনাকে উঠিয়ে নেই, তাতে কি– আপনার দায়িত্ব তো পৌঁছে দেয়া এবং আমার দায়িত্ব হিসাব নেয়া। (৪১) তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সমানে সঙ্কুচিত করে আসছি? আল্লাহ্ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নবী-রসূল সম্পর্কে কাফের ও মুশরিকদের একটি সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, তাদের মানুষ নয় বরং ফেরেশতা হওয়া দরকার। ফলে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাঁদের শ্রেষ্টত্ব বিতর্কের উর্ধ্বে থাকবে। কোরআন পাক তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জওয়াব একাধিক আয়াতে দিয়েছে।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমি তো রোযাও রাখি এবং রোযা ছাড়াও থাকি; (অর্থাৎ, আমি এমন নই যে, সব সময়ই রোযা রাখব। তিনি আরও বলেন ঃ আমি রাত্রিতে নিদ্রাও যাই এবং নামাযের জন্যে দণ্ডায়মানও হই ; (অর্থাৎ, এমন নই যে, সারারাত কেবল নামাযই পড়ব)। এবং মাংসও ভক্ষণ করি এবং নারীদেরকে বিবাহও করি। যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নতকে আপত্তিকর মনে করে, সে মুসলমান নয়। وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ, কোন রসূলের এ ক্ষমতা নেই যে, সে আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়া একটি আয়াতও নিজে আনতে পারেন।

কাফের ও মুশরিকরা সদাসর্বদা যেসব দাবী পয়গম্বরদের সামনে করে এসেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনেও সমসাময়িক মুশরিকরা যেসব দাবী করেছে, তন্মধ্যে দু'টি দাবী ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। (এক) আল্লাহ্র কিতাবে আমাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিধি-বিধান অবতীর্ণ হোক। যেমন সূরা ইউনুসে তাদের এ আবেদন উল্লেখিত আছে যে, ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ অর্থাৎ, আপনি বর্তমান কোরআনের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোরআন আনুন, যাতে আমাদের প্রতিমাসমূহের উপাসনা নিষিদ্ধ করা না হয় অথবা আপনি নিজেই এর আনীত বিধি-বিদান পরিবর্তন করে দিন—আযাবের জায়গায় রহমত এবং হারামের জায়গায় হালাল করে দিন।

(দুই) পয়গম্বরদের সুস্পষ্ট মু'জেযা দেখা সত্ত্বেও নতুন নতুন মু'জেযা দাবী করে বলা যে, অমুক ধরনের মু'জেযা দেখালে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। কোরআন পাকের উপরোক্ত বাক্যে اٰية শব্দ দ্বারা উভয় অর্থই হতে পারে। কারণ, কোরআনের পরিভাষায় কোরআনের আয়াতকেও আয়াত বলা হয় এবং মু'জেযাকেও। এ কারণেই 'এ আয়াত' শব্দের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ কোরআনী আয়াত অর্থ ধরে উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কোন পয়গম্বরের এরূপ ক্ষমতা নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে কোন আয়াত তৈরী করে নেবেন। কেউ কেউ এ আয়াতের অর্থ মু'জেযা ধরে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোন রসূল ও নবীকে আল্লাহ্ তাআলা এরূপ ক্ষমতা দেননি যে, যখন ইচ্ছা, যে ধরনের ইচ্ছা মু'জেযা প্রকাশ করেন। তফসীর রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, عموم مجاز এর ফায়দা আনুযায়ী এখানে উভয়বিধ অর্থ হতে পারে এবং উভয় তফসীর বিশুদ্ধ হতে পারে।

এদিক দিয়ে আলোচ্য আয়াতের সার বিষয়বস্তু এই যে, আমার রসূলের কাছে কোরআনী আয়াত পরিবর্তন করার দাবী অন্যায় ও ভ্রান্ত। আমি কোন রসূলকে এরূপ ক্ষমতা দেইনি। এমনিভাবে কোন বিশেষ ধরনের মু'জেযা দাবী করাও নবুওয়তের স্বরূপ-সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। কেননা, কোন নবী ও রসূলের এরূপ ক্ষমতা থাকে না যে, লোকদের খাহেশ অনুযায়ী মু'জেযা প্রদর্শণ করবেন।

لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ এখানে اجل শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ, كتاب শব্দটি এখানে ধাতু। এর অর্থ লিখা। বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক

বস্তুর মেয়াদ ও পরিমাণ আল্লাহ্ তাআলার কাছে লিখিত আছে। তিনি সৃষ্টির সূচনালগ্নে লিখে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে। কোথায় কোথায় যাবে, কি কি কাজ করবে এবং কখন ও কোথায় মরবে, তাও লিখিত আছে।

এমনিভাবে একথাও লিখিত আছে যে, অমুক যুগে অমুক পয়গম্বরের প্রতি কি ওহী এবং কি কি বিধি-বিধান অবতীর্ণ হবে। কেননা, প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির উপযোগী বিধি-বিধান আসতে থাকাই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুগ। আরও লিখিত আছে যে, অমুক পয়গম্বর দ্বারা অমুক সময়ে এই মু'জেযা প্রকাশ পাবে।

তাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এরূপ দাবী করা যে, অমুক ধরনের বিধি-বিধান পরিবর্তন করান অথবা অমুক ধরনের মু'জেযা দেখান— এটি একটি হঠকারিতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত দাবী, যা রেসালত ও নবুওয়তের স্বরূপ-সম্পর্কে অজ্ঞতার উপর ভিত্তিশীল।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ এখানে اُمُّ الْكِتٰبِ এর শাব্দিক অর্থ মূলগ্রন্থ। এতে লওহে-মাহ্ফূয বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে পারে না।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অপার শক্তি ও অসীম রহস্য জ্ঞান দ্বারা যে বিষয়কে ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যে বিষয়কে ইচ্ছা বহাল ও বিদ্যমান রাখেন। এরপর যা কিছু হয়, তা আল্লাহ্‌র কাছে সংরক্ষিত থাকে। এর উপর কারও কোন ক্ষমতা চলে না এবং তাতে হ্রাসবৃদ্ধিও হতে পারে না।

সুফীয়ান সওরী, ওয়াকী প্রমুখ তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ভিন্ন তফসীর বর্ণনা করেছেন। তাতে আয়াতের বিষয়বস্তুকে ভাগ্যলিপির সাথে সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্টজীবের ভাগ্য তথা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, সারা জীবনের রিযিক, সুখ কিংবা বিপদ এবং এসব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্ তাআলা সূচনালগ্নে সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের সময় ফেরেশতাদেরকেও লিখিয়ে দেয়া হয় এবং প্রতি বছর শবে কদরে এ বছরের ব্যাপারাদির তালিকা ফেরেশতাদেরকে সোপর্দ করা হয়।

মোটকথা এই যে, প্রত্যেক সৃষ্টজীবের বয়স, রিযিক, গতিবিধি ইত্যাদি সব নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এ ভাগ্যলিপি থেকে যতটুকু ইচ্ছা বাদ দেন এবং যতটুকু ইচ্ছা বহাল রাখেন। وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ -অর্থাৎ মিটানো ও বহাল রাখার পর যে মূলগ্রন্থ অবশেষে কার্যকর হয়, তা আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না।

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা কারও ভাগ্যলিপিতে যে বয়স, রিযিক ইত্যাদি লিখে দিয়েছেন, তা কোন কর্মের দরুন কম অথবা বেশী হতে পারে এবং দোয়ার কারণেও তা পরিবর্তিত হতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ভাগ্যলিপিতে বয়স, রিযিক, বিপদ অথবা সুখ ইত্যাদিতে কোন কর্ম অথবা দোয়ার কারণে যে পরিবর্তন হয়, তা ঐ ভাগ্যলিপিতে হয়, যা ফেরেশতাদের হাতে অথবা জ্ঞানে থাকে। এতে কোন সময় কোন নির্দেশ বিশেষ শর্তের সাথে সংযুক্ত থাকে। শর্তটি পাওয়া না গেলে নির্দেশটিও বাকী থাকে না। এ শর্তটি কোন সময় লিখিত আকারে ফেরেশতাদের জ্ঞানে থাকে এবং কোন সময় অলিখিত আকারে শুধু আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানে থাকে। ফলে নির্দেশটি যখন পরিবর্তন করা হয়, তখন সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এ ভাগ্যকে 'মুআল্লাক' (ঝুলন্ত) বলা হয়। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এতে 'মিটানো' ও বাকী রাখা'র কাজ অব্যাহত থাকে। কিন্তু আয়াতের শেষ বাক্য وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ -ব্যক্ত করেছে যে, 'মুআল্লাক ভাগ্য' ছাড়া একটি 'মুবরাম' (চূড়ান্ত) ভাগ্য আছে, যা মূলগ্রন্থে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার কাছে রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জানার জন্যেই। এতে ঐসব বিধান লিখিত হয়, যেগুলো কর্মও দোয়ার শর্তের পর সর্বশেষ ফলাফল হয়ে থাকে। এ জন্যেই এটা মিঠানো ও বহাল রাখা এবং হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। (ইবনে-কাসীর)

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ —এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা আপনার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, ইসলাম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে এবং কুফর ও কাফেররা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহ্‌র এ ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু আপনি এরূপ চিন্তা করবেন না যে, এ বিজয় কবে হবে। সম্ভবতঃ আপনার জীবদ্দশাতেই হবে এবং এটাই সম্ভব যে, আপনার ওফাতের পরে হবে। আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্যে তো এটাই যথেষ্ট যে, অপানি অহরহ দেখছেন, আমি কাফেরদের ভূখণ্ড

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ﴿٤٣﴾

سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اِثْنَتَانِ وَخَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّسَبْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿١﴾ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۗ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٣﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۗ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٥﴾

(৪২) তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা চক্রান্ত করেছে। আর সকল চক্রান্ত তো আল্লাহ্র হাতেই আছে। তিনি জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে। কাফেররা জেনে নেবে যে, পর জীবনের আবাসস্থল কাদের জন্য রয়েছে। (৪৩) কাফেররা বলে ঃ আপনি প্রেরিত ব্যক্তি নন। বলে দিন। আমার ও তোমাদের মধ্যে প্রকৃষ্ট সাক্ষী হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং ঐ ব্যক্তি, যার কাছে গ্রন্থের জ্ঞান আছে।

সূরা ইবরাহীম

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৫২ ll

(১) আলিফ-লাম-রা; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি— যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন— পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে। (২) তিনি আল্লাহ্ ; যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সবকিছুর মালিক। কাফেরদের জন্যে বিপদ রয়েছে, কঠোর আযাব; (৩) যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে; আল্লাহ্র পথে বাধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে আছে। (৪) আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (৫) আমি মূসাকে নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছিলাম যে, স্বজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিনসমূহ স্মরণ করান। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

চতুর্দিক থেকে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছি ; অর্থাৎ এসব দিক মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের অধিকৃত এলাকা হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে একদিন এ বিজয় চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। নির্দেশ আল্লাহ্র হাতেই। তাঁর নির্দেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

সূরা ইবরাহীম

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ও তার বিষয়বস্তু ঃ এটা কোরআন পাকের চতুর্দশতম সূরা— 'সূরা ইবরাহীম'। এটা মক্কায়, হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কতিপয় আয়াত সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, মক্কায়, হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ, না মদীনায় অবতীর্ণ।

এ সূরার শুরুতে রেসালাত, নবুওয়ত ও এসবের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা হয়েছে এবং এর সাথে মিল রেখেই সূরার নাম 'সূরা ইবরাহীম' রাখা হয়েছে।

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ —ব্যাকরণের দিক দিয়ে একে هذا এর خبر সাব্যস্ত করে এরূপ অর্থ নেয়াই অধিক স্পষ্ট যে, এটা ঐ গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। এতে অবতীর্ণ করার কাজটি আল্লাহ্র দিক সম্পৃক্ত করা এবং সম্বোধন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দিকে করার মধ্যে দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (এক) এ গ্রন্থটি অত্যন্ত মহান। কারণ, একে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করেছেন। (দুই) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কারণ, তিনি এ গ্রন্থের প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি।

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ এখানে ناس শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল যুগের মানুষই বোঝানো হয়েছে। ظلمات শব্দটি ظلمة এর বহুবচন। এর অর্থ অন্ধকার। এখানে ظلمات বলে কুফর শিরক ও মন্দকর্মের অন্ধকারসমূহ এবং نور বলে ইমানের আলো বোঝানো হয়েছে। এজন্যেই ظلمات শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, কুফর ও শিরকের প্রকার অনেক। অমনিভাবে মন্দ কর্মের সংখ্যাও গণনার বাইরে। পক্ষান্তরে نور শব্দটি একবচনে আনা হয়েছে। কেননা, ঈমান ও সত্য এক। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি এ গ্রন্থ এজন্যে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি এর সাহায্যে বিশ্বের মানুষকে কুফর, শিরক ও মন্দ কর্মের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে ঈমান ও সত্যের আলোর দিকে আনয়ন করেন। এখানে رب শব্দটি প্রয়োগ করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, গ্রন্থ ও পয়গম্বরের সাহায্যে সর্বস্তরের মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দেয়া—আল্লাহ্ তাআলার এ অনুগ্রহের একমাত্র কারণ হচ্ছে ঐ কৃপা ও মেহেরবানী, যা মানব জাতির স্রষ্টা ও প্রভু-প্রতিপালকত্বের কারণে

মানবজাতির প্রতি নিয়োজিত করে রেখেছেন।

إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

—এ আয়াতের শুরুতে যে অন্ধকার ও আলোর উল্লেখ করা হয়েছিল, বলাবাহুল্য, তা ঐ অন্ধকার ও আলো নয়, যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়। তাই তা ফুটিয়ে তোলার জন্যে এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ঐ আলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথ। এই পথে যারা চলে, তারা অন্ধকারে চলাচলকারীর অনুরূপ পথভ্রান্ত হয় না, হোঁচট খায় না এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে বিফল মনোরথ হয় না। আল্লাহ্‌র পথ বলে ঐ পথ বোঝানো হয়েছে, যেপথে চলে মানুষ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এবং তাঁর সন্তুষ্টির মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

এ স্থলে আল্লাহ্ শব্দটি পরে এবং তাঁর আগে তাঁর দু'টি গুণবাচক নাম عزيز ও حميد উল্লেখ করা হয়েছে عزيز শব্দের অর্থ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত এবং حميد শব্দের অর্থ ঐ সত্তা, যিনি প্রশংসার যোগ্য। এ দু'টি গুণবাচক শব্দকে আসল নামের পূর্বে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ পথ পথিককে যে সত্তার দিকে নিয়ে যায়, তিনি পরাক্রান্তও এবং প্রশংসার যোগ্য। ফলে এ পথের পথিক কোথাও হোঁচট খাবে না এবং তার প্রচেষ্টা বিফলে যাবে না; বরং তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছা সুনিশ্চিত। শর্ত এই যে, এপথ ছাড়তে পারবে না।

আল্লাহ্ তাআলার এ দু'টি গুণ আগে উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ —অর্থাৎ তিনি ঐ সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক। এতে কোন অংশীদার নেই। وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ - ويل শব্দের অর্থ কঠোর শাস্তি ও বিপর্যয়। অর্থ এই যে, যারা কোরআনরূপী নেয়ামত অস্বীকার করে এবং অন্ধকারেই থাকতে পছন্দ করে, তাদের জন্যে রয়েছে ধ্বংস ও বরবাদী, ঐ কঠোর আযাবের কারণে যা তাদের উপর আপতিত হবে।

সারকথা ঃ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সব মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আল্লাহ্‌র পথের আলোতে আনার জন্যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যে হতভাগা কোরআনকেই অস্বীকার করে, সে নিজেই নিজেকে আযাবে নিক্ষেপ করে। কোরআন যে আল্লাহ্‌র কালাম, যারা এ বিষয়টিই স্বীকার করে না, তারা তো নিশ্চিতরূপেই উপরোক্ত সাবধানবাণীর লক্ষ্য; কিন্তু যারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অস্বীকার করে না, তবে কার্যক্ষেত্রে কোরআনকে ত্যাগ করে বসেছে—তেলাওয়াতের সাথেও কোন সম্পর্ক রাখে না এবং বোঝা ও তা মেনে চলার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করে না, তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সাবধানবাণীর আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

এ আয়াতে কোরআনে অবিশ্বাসী কাফেরদের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। (এক) তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের তুলনায় অধিক পছন্দ করে এবং অগ্রাধিকার দেয়। এজন্যেই পার্থিব লাভ বা আরামের খাতিরে পরকালের ক্ষতি স্বীকার করে নেয়। এতে তাদের রোগ নির্ণয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কেন কোরআনের সুস্পষ্ট মু'জেযা দেখা সত্ত্বেও একে অস্বীকার করে? কারণ এই যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনের ভালবাসা তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে অন্ধ করে রেখেছে। তাই তারা অন্ধকারকেই পছন্দ করে এবং আলোর দিকে আসার কোন আগ্রহ রাখে না।

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, তারা নিজেরা তো অন্ধকারে থাকা পছন্দ করেই ; তদুপরি সর্বনাশের কথা এই যে, নিজেদের ভ্রান্তি ঢাকা দেয়ার জন্যে অন্যদেরকেও আলোর মহাসড়ক অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধা দান করে।

কোরআন বোঝার ব্যাপারে কোন কোন ভ্রান্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ঃ তৃতীয় অবস্থা وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ দ্বিবিধ হতে পারে। (এক) তারা স্বীয় মন্দ বাসনা ও মন্দ কর্মের কারণে এ চিন্তায় মগ্ন থাকে যে, আল্লাহ্‌র উজ্জ্বল ও সরল পথে কোন বক্রতা ও দোষ দৃষ্টিগোচর হলেই তার আপত্তি ও ভর্ৎসনা করার সুযোগ পাবে। ইবনে-কাসীর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

(দুই) তারা এরূপ খোঁজাখুঁজিতে লেগে থাকে যে, আল্লাহ্‌র পথে অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের কোন বিষয়বস্তু তাদের চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তির অনুকূলে পাওয়া যায় কি না, যেন সেটাকে তারা নিজেদের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে পারবে, তফসীরে কুরতুবীতে এ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আজকাল অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তি এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। তারা মনে মনে একটি চিন্তাধারা এখনও ভ্রান্তিবশতঃ এবং কখনও বিজাতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে গড়ে নেয়। এরপর কোরআন ও হাদীসে এর সমর্থন তালাশ করে। কোথাও কোন শব্দ এ চিন্তাধারার অনুকূলে দৃষ্টিগোচর হলেই একে নিজেদের পক্ষে কোরআনী প্রমাণ মনে করে। অথচ এ কর্মপন্থাটি নীতিগতভাবেই ভ্রান্ত। কেননা, মুমিনের কাজ হল নিজস্ব চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত মন নিয়ে কোরআন ও হাদীসকে দেখা। এরপর এগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে যা প্রমাণিত হয়, সেটাকে নিজের মতবাদ সাব্যস্ত করা।

أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ —উপরে যেসব কাফেরের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এ বাক্যে তাদেরই অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তারা পথভ্রষ্টতায় এতদূর পৌঁছে গেছে যে, সেখান থেকে সৎ পথে ফিরে আসা তাদের পক্ষে কঠিন।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আঃ) থেকে জগতে মানব-বসতি শুরু করেছেন এবং তাঁকেই মানব জাতির সর্বপ্রথম নবী ও পয়গম্বর মনোনীত করেন। এরপর পৃথিবীর জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পয়গম্বরের মাধ্যমে হেদায়েত ও পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা ততই সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রত্যেক যুগ ও জাতির অবস্থার উপযোগী বিধি-বিধান ও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মানব জগতের ক্রমঃবিকাশ যখন পূর্ণত্বের স্তরে উপনীত হয়েছে, তখন সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ওয়াল-আখেরীন, ইমামুল -আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-কে সমগ্র বিশ্বের জন্য রসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁকে যে গ্রন্থ ও সরীয়ত দান করা হয়েছে, তাঁকে সমগ্র বিশ্ব এবং কেয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে।

কোরআন আরবী ভাষায় কেন? এখন প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী

উম্মতদের প্রতি প্রেরিত রসূল তাদেরই ভাষাভাষী ছিলেন। ফলে তাদেরকে অনুবাদের শ্রম স্বীকার করতে হয়নি। শেষ পয়গম্বরের বেলায় এরূপ হল না কেন? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে শুধু আরবেই কেন আরবী ভাষা দিয়ে প্রেরণ করা হল এবং তাঁর গ্রন্থ কোরআনও আরবী ভাষায়ই কেন নাযিল হল? একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই এর উত্তর পরিষ্কার হবে। বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে শত শত ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এমতাবস্থায় সবাইকে হেদায়েত করার দু'টি মাত্র উপায় সম্ভবপর ছিল। (এক) প্রত্যেক জাতির ভাষায় পৃথক পৃথক কোরআন অবতীর্ণ হওয়া এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষাও তদ্রূপ প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। আল্লাহ্র অপার শক্তির সামনে এরূপ ব্যবস্থাপনা মোটেই কঠিন ছিল না; কিন্তু সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে এক রসূল, এক গ্রন্থ, এক শরীয়ত প্রেরণ করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে হাজারো মতবিরোধ সত্ত্বেও ধর্মীয়, চারিত্রিক ও সামাজিক ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের যে মহান লক্ষ্য অর্জন করা উদ্দেশ্য ছিল, এমতাবস্থায় তা অর্জিত হত না।

এছাড়া প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের কোরআন ও হাদীস ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় থাকলে কোরআন পরিবর্তনের অসংখ্য পথ খুলে যেত এবং কোরআন যে একটি সংরক্ষিত কালাম যা বিজাতি এবং কোরআন-অবিশ্বাসীরাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে, এ অলৌকিক বৈশিষ্ট্য খতম হয়ে যেত। এছাড়া একই ধর্ম এবং একই গ্রন্থ সত্ত্বেও এর অনুসারীরা শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং তাদের মধ্যে ঐক্যের কোন কেন্দ্রবিন্দুই অবশিষ্ট থাকত না। এক আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যাখ্যা ও তফসীরে বৈধ সীমার মধ্যে কত মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। অবৈধ পন্থায় যেসব মত বিরোধ হয়েছে, সেগুলোর তো ইয়ত্তাই নেই। এ থেকেই উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা সম্যক অনুমান করা যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যারা কোন না কোন স্তরে কোরআনের বিধি-বিধান পালন করে, তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

মোটকথা এই যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর নবুওয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্যে ব্যাপক হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কোরআনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীর শিক্ষা ও হেদায়েতের পন্থাকে কোন স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও সঠিক ও নির্ভুল মনে করতে পারে না। তাই দ্বিতীয় পন্থাটিই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তা এই যে, কোরআন একই ভাষায় অবতীর্ণ হবে এবং রসূলের ভাষাও কোরআনেরই ভাষা হবে। এরপর অন্যান্য দেশীয় ও আঞ্চলিক ভাষায় এর অনুবাদ প্রচার করা হবে। নায়েবে রসূল আলেমগণ প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশাবলী তাঁদের ভাষায় বোঝাবেন এবং প্রচার করবেন। আল্লাহ্ তাআলা এর জন্যে বিশ্বের ভাষাসমূহের মধ্য থেকে আরবী ভাষাকে নির্বাচন করেছেন। এর অনেক কারণ রয়েছে।

আরবী ভাষার কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ প্রথমতঃ আরবী ভাষা উর্ধ্ব জগতের সরকারী ভাষা। ফেরেশতাদের ভাষা আরবী, লওহে-মাহ্ফুযের ভাষা আরবী; যেমন আয়াত ঃ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ থেকে জানা যায়। জান্নাত মানুষের আসল দেশ সেখানে তাকে ফিরে যেতে হবে। সেখানকার ভাষাও আরবী।

তফসীরে কুরতুবী প্রমুখ গ্রন্থে আরও বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে হযরত আদম (আঃ)-এর ভাষা ছিল আরবী। পৃথিবীতে অবতরণ ও তওবা কবুল হওয়ার পর আরবী ভাষাই কিছু পরিবর্তিত হয়ে সুরইয়ানী ভাষার রূপ পরিগ্রহ করে। এ থেকে ঐ রেওয়ায়েতেরও সমর্থন পাওয়া যাও, যা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা পয়গম্বরগণের প্রতি যত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, সবগুলোর আসল ভাষা ছিল আরবী। জিবরাঈল (আঃ) সংশ্লিষ্ট পয়গম্বরের ভাষায় অনুবাদ করে তা পয়গম্বরগণের কাছে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় তা উম্মতের কাছে পৌছে দিয়েছেন। এই রেওয়ায়েতটি আল্লামা সুয়ূতী ইতক্বান গন্থে এবং অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এর মূল বিষয়বস্তু এই যে, সব ঐশী গ্রন্থের আসল ভাষা আরবী। কিন্তু কোরআন ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দেশীয় ও জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করে দেয়া হয়েছে। তাই সেগুলোর অর্থসম্ভার তো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু ভাষা ও শব্দ পরিবর্তিত। এটা একমাত্র কোরআনেরই বৈশিষ্ট্য যে, এর অর্থসম্ভারের মত শব্দাবলীও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোরআন দাবী করেছে যে, সমগ্র বিশ্বের জিন ও মানব একত্রিত হয়েও কোরআনের একটি ছোট সূরা-বরং আয়াতের অনুরূপ তুল্য রচনা করতে পারবে না। কেননা, এটা অর্থগত ও শব্দগত দিক দিয়ে আল্লাহ্র কালাম এবং আল্লাহ্র গুণ। কেউ এর অনুকরণ করতে সক্ষম নয়। অর্থগত দিক দিয়ে তো অন্যান্য ঐশীগ্রন্থ আল্লাহ্র কালাম; কিন্তু সেগুলোতে সম্ভবতঃ আসল আরবী ভাষার পরিবর্তে অনূদিত ভাষায় হওয়ার কারণে এই দাবী অন্য কোন ঐশীগ্রন্থ করেনি। নতুবা কোরআনের মত আল্লাহ্র কালাম হওয়ার সুবাদে প্রত্যেক গ্রন্থের অদ্বিতীয় ও অনুপম হওয়া নিশ্চিত ছিল।

আরবী ভাষার নিজস্ব গুণাবলীও এ ভাষাকে বেছে নেয়ার অন্যতম কারণ এ ভাষায় একটি উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করার জন্যে অসংখ্য উপায় ও পথ বিদ্যমান রয়েছে।

আরও একটি কারণ এই যে, মুসলমানকে আল্লাহ্ তাআলা প্রকৃতিগতভাবেই আরবী ভাষার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি অনায়াসে আরবী ভাষা যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু শিখে নিতে পারে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম যে দেশেই পৌছেছেন, অল্পদিনের মধ্যেই কোনরূপ জোর-জবরদস্তি ব্যতিরেকেই সে দেশের ভাষা আরবী হয়ে গেছে। আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, সিরিয়া, সুদান, মৌরিতানিয়া, মিসর, ইরাক—এসব দেশের কোনটিরই ভাষা আরবী ছিল না। কিন্তু আজ এগুলো আরবদেশ বলে কথিত হয়।

আরও একটি কারণ এই যে, আরবরা ইসলাম পূর্বকালে যদিও জঘন্য সব মন্দ কর্মে লিপ্ত ছিল; কিন্তু এমতাবস্থায়ও এ জাতির কর্মক্ষমতা, নৈপুণ্য ও ভাবাবেগ ছিল অনন্যসাধারণ। এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ পয়গম্বরকে তাদের মধ্য থেকে উত্থিত করেন, তাদের ভাষাকে কোরআনের জন্যে পছন্দ করেন এবং রসূল (সাঃ)-কে সর্বপ্রথম তাদের হেদায়েত ও শিক্ষার আদেশ দেন। وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম স্বীয় রসূলের চারপাশে তাদেরই এমন

ব্যক্তিবর্গকে জমায়েত করেন, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে নিজেদের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি সবকিছু উৎসর্গ করে দেন এবং তাঁর শিক্ষাকে প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করেন। এভাবে তাদের উপর তাঁর সংসর্গ ও শিক্ষার গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং তাদের দ্বারা এমন একটি আদর্শ সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে; যার নজীর ইতিপূর্বে আসমান ও যমীন প্রত্যক্ষ করেনি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই নজীরবিহীন দলটিকে কোরআনী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্যে নিযুক্ত করেন এবং বলেন ঃ بلغوا عنى ولو آية অর্থাৎ, তোমরা আমার কাছ থেকে শ্রুত প্রত্যেকটি কথা উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। সাহাবায় কেরাম এই নির্দেশটি অলঙ্ঘনীয় বলে গ্রহণ করে নেন এবং বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌঁছে কোরআনের শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পর পঁচিশ বৎসরও অতিক্রান্ত হয়নি, কোরআনের আওয়াষ প্রাচ্য-প্রাতীচ্য নির্বিশেষে তদানিন্তন পরিচিত পৃথিবীর সর্বত্র অনুরণিত হতে থাকে।

অপরদিকে আল্লাহ্ তাআলা তকদীরগত ও সৃষ্টিগতভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাওয়াত পর্যায়ে উম্মত (দুনিয়ার সব মুশরিক এবং গ্রন্থধারী ইহুদী ও খ্রীষ্টান যাদের অন্তর্ভুক্ত)-এর মধ্যে একটি বিশেষ নৈপুণ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা, গ্রন্থ রচনা ও প্রচারকার্যের এমন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে দেন যে, এর নজীর জগতের অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর ফলশ্রুতিতে অনারব জাতিসমূহের মধ্যে শুধু কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনের অদম্য স্পৃহাই জাগ্রত হয়নি ; বরং আরবী ভাষা শিক্ষা ও তার প্রসারের ক্ষেত্রে অনারবদের অবদান আরবদের চাইতেও কোন অংশে কম নয়।

বর্তমানে আরবী ভাষা, এর বাকপদ্ধতি এবং ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের যতগুলো গ্রন্থ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, সেগুলোর অধিকাংশই অনারব লেখকদের রচিত। এটি এক বিস্ময়কর সত্য বটে। কোরআন ও হাদীসের সংকলন, তফসীর ও ব্যাখ্যা ক্ষেত্রেও অনারবদের ভূমিকা আরবদের চাইতে কম নয়।

এভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর ভাষা এবং তাঁর গ্রন্থ আরবী হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বকে তা বেষ্টন করে নিয়েছে এবং দাওয়াত ও প্রচারের পর্যায়ে আরব ও অনারবের পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দেশ, জাতি এবং আরব-ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এমন আলেম সৃষ্টি হয়েছে, যাঁরা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় অত্যন্ত সহজভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক জাতির ভাষায় পয়গম্বর প্রেরণের যে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হতে পারতো, তা অর্জিত হয়ে গেছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ আমি মানুষের সুবিধার জন্যে পয়গম্বরগণকে তাদের ভাষায় প্রেরণ করেছি—যাতে পয়গম্বরগণ আমার বিধি-বিধান উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু হেদায়েত ও পথভ্রষ্টতা এরপরও মানুষের সাধ্যাধীন নয়। আল্লাহ্ তাআলাই স্বীয় শক্তিবলে যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্টতায় রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দেন। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

৫ম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আমি মূসা (আঃ)-কে আয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছি, যাতে সে স্বজাতিকে কুফর ও গোনাহের অন্ধকার থেকে ঈমান ও আনুগত্যের আলোতে নিয়ে আসে।

ايات —আয়াত শব্দের অর্থ তওরাতের আয়াতও হতে পারে। কারণ, সেগুলো নাযিল করার উদ্দেশ্যই ছিল সত্যের আলো ছড়ানো। আয়াতের অন্য অর্থ মু'জেযাও হয়। এখানে এ অর্থও উদ্দিষ্ট হতে পারে। মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা ন'টি মু'জেযা বিশেষভাবে দান করেছিলেন।

একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব ঃ এ আয়াতে 'কওম' শব্দ ব্যবহার করে নিজ কওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়বস্তুটিই যখন আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সেখানে 'কওম' শব্দের পরিবর্তে ناس (মানবমণ্ডলী) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ -এতে ইঙ্গিত আছে যে, মূসা (আঃ) শুধু বনী-ইসরাঈল ও মিসরীয় জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন, অপরদিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত সমগ্র বিশ্বমানবের জন্যে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ — অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)-কে নির্দেশ দেন যে, স্বজাতিকে 'আইয়্যামুল্লাহ্' স্মরণ করান।

আইয়্যামুল্লাহ্ ঃ ايام শব্দটি يوم -এর বহুবচন। এর অর্থ দিন, তা সুবিদিত। ايام الله শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) যুদ্ধ অথবা বিপ্লবের বিশেষ দিন, যেমন— বদর, ওহুদ, আহযাব, হুনায়ন ইত্যাদি যুদ্ধের ঘটনাবলী অথবা পূর্ববর্তী উম্মতের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনাবলী। এসব ঘটনায় বিরাট জাতির ভাগ্য ওলট-পালট হয়ে গেছে এবং তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় 'আইয়্যামুল্লাহ্' স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য হবে, এসব জাতির কুফরের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা এবং হুশিয়ার করা।

আইয়্যামুল্লাহ্‌র অপর অর্থ আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত ও অনুগ্রহও হয়। এগুলো স্মরণ করানোর লক্ষ্য হবে এই যে, ভাল মানুষকে যখন কোন অনুগ্রহদাতার অনুগ্রহ স্মরণ করানো হয়, তখন সে বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করতে লজ্জাবোধ করে।

কোরআন পাকের সংশোধন পদ্ধতি সাধারণতঃ এই যে, কোন কাজের নির্দেশ দিলে সাথে সাথে কাজটি করার কৌশলও বলে দেয়া হয়। এখানে প্রথম বাক্যে মূসা (আঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আয়াত শুনিয়ে অথবা মু'যেজা প্রদর্শন করে স্বজাতিকে কুফরের অন্ধকার থেকে বের করুন এবং ঈমানের আলোতে নিয়ে আসুন। এ বাক্যে এর কৌশল বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, অবাধ্যদেরকে দু'উপায়ে সৎপথে আনা যায়। (এক) শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা এবং (দুই) নেয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে আনুগত্যের দিকে আহবান করা وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ বাক্যে এ দু'টি উপায়ই উদ্দিষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের অবাধ্যদের অশুভ পরিণাম, তাদের আযাব, জেহাদে তাদের নিহত অথবা লাঞ্ছিত হওয়ার কথা স্মরণ করানো, যাতে তারা শিক্ষা অর্জন করে আত্মরক্ষা করে। এমনিভাবে এ জাতির উপর আল্লাহ্‌র যেসব নেয়ামত দিবারাত্র বর্ষিত হয় এবং যেসব বিশেষ নেয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছে, সেগুলো স্মরণ করিয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তওহীদের দিকে আহবান করুন ; উদাহরণতঃ তীহ্ উপত্যকায় তাদের মাথার উপর মেঘের ছায়া, আহারের জন্যে মান্না ও সালওয়ার অবতরণ, পানীয় জলের প্রয়োজনে পাথর থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَ
يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ
مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ⑥ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ⑦ وَقَالَ
مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ
اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ⑧ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ لَا
يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا
أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ
وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ⑨ قَالَتْ رُسُلُهُمْ
أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ
لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ
قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا
عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ⑩

(৬) যখন মূসা স্বজাতিকে বললেন ঃ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর— যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দেন। তারা তোমাদেরকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিত, তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখত। এবং এতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে বিরাট পরীক্ষা হয়েছিল। (৭) যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর। (৮) এবং মূসা বললেন ঃ তোমরা এবং পৃথিবীস্থ সবাই যদি কুফরী কর, তথাপি আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, যাবতীয় গুণের আধার (৯) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী কওমে–নূহ, আদ ও সামূদের এবং তাদের পরবর্তীদের খবর পৌছেনি? তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাদের কাছে তাদের পয়গম্বর প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর তারা নিজেদের হাত নিজেদের মুখে রেখে দিয়েছে এবং বলেছে ঃ যা কিছুসহ তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমরা তা মানি না এবং যে পথের দিকে তোমরা আমাদেরকে দাওয়াত দাও, সে সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ আছে, যা আমাদেরকে উৎকণ্ঠায় ফেলে রেখেছে। (১০) তাদের পয়গম্বরগণ বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা? তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন যাতে তোমাদের কিছু গোনাহ ক্ষমা করেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের সময় দেন। তারা বলত ঃ তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ! তোমরা আমাদেরকে ঐ উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও, যার এবাদত আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত। অতএব তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ —এখানে **آيات** –এর অর্থ নিদর্শন ও প্রমাণাদি। **صبار** শব্দটি **صبر** থেকে **مبالغة**–এর পদ। এর অর্থ অত্যন্ত সবরকারী। **شكور** শব্দটি **شكر** থেকে **مبالغة**–এর পদ। এর অর্থ অধিক কৃতজ্ঞ। বাক্যের অর্থ এই যে, অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও আযাব সম্পর্কিত হোক অথবা আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কিত হোক, উভয় অবস্থাতে অতীত ঘটনাবলীতে আল্লাহ্‌র অপার শক্তি ও অসীম রহস্যের বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে অত্যন্ত সবরকারী এবং অধিক শোকরকারী।

সংক্ষেপে শোকর ও কৃতজ্ঞতার স্বরূপ এই যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতা এবং হারাম ও অবৈধ কাজে ব্যয় না করা, মুখেও আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং স্বীয় কাজকর্মকেও তাঁর ইচ্ছার অনুগামী করা।

সবরের সারমর্ম হচ্ছে স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপারাদিতে অস্থির না হওয়া, কথায় ও কাজে অকৃজ্ঞতার প্রকাশ থেকে বেঁচে থাকা এবং ইহকালেও আল্লাহ্‌র রহমত আশা করা ও পরকালে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তিতে বিশ্বাস রাখা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৬ষ্ঠ আয়াতে পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, বনী–ইসরাঈলকে নিম্নলিখিত বিশেষ নেয়ামতটি স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে মূসা (আঃ)–কে আদেশ দেয়া হয়।

মূসা (আঃ)–এর পূর্বে ফেরাউন বনী–ইসরাঈলকে অবৈধভাবে গোলামে পরিণত করে রেখেছিল। এরপর এসব গোলামের সাথেও মানবোচিত ব্যবহার করা হত না। তাদের ছেলে –সন্তানকে জন্মগ্রহণের পরই হত্যা করা হত এবং শুধু কন্যাদেরকে খেদমতের জন্যে লালন–পালন করা হত। মূসা (আঃ)–কে প্রেরণের পর তাঁর বরকতে আল্লাহ্ তাআলা বনী–ইসরাঈলকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দান করেন।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

تاذن —শব্দটির অর্থ সংবাদ দেয়া ও ঘোষণা করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই ঃ একথা স্মরণযোগ্য যে, আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করে দেন, যদি তোমরা আমার নেয়ামত–সমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অর্থাৎ, সেগুলোকে আমার অবাধ্যতায় ও অবৈধ কাজে ব্যয় না কর এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মকে আমার মর্জির অনুগামী করার চেষ্টা কর, তবে আমি এসব নেয়ামত আরও বাড়িয়ে দেব। এ বাড়ানো নেয়ামতের পরিমাণেও হতে পারে এবং স্থায়িত্বেও হতে পারে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তওফীকপ্রাপ্ত হয়, যে কোন সময় নেয়ামতের বরকত ও বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় না।—(মাযহারী)

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ যদি তোমরা আমার নেয়ামতসমূহের নাশোকরী কর, তবে আমার শাস্তিও ভয়ঙ্কর। নাশোকরীর সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতায় এবং অবৈধ কাজে ব্যয় করা অথবা তাঁর ফরয ও ওয়াজিব পালনে অবহেলা করা। অকৃজ্ঞতার কঠোর শাস্তিস্বরূপ

قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن
على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطن
الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴿١١﴾ وما لنا الا
نتوكل على الله وقد هدىنا سبلنا ولنصبرن على ما
اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ﴿١٢﴾ وقال الذين
كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا
فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظلمين ﴿١٣﴾ ولنسكننكم الارض
من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ﴿١٤﴾ واستفتحوا
وخاب كل جبار عنيد ﴿١٥﴾ من ورائه جهنم ويسقى من ماء
صديد ﴿١٦﴾ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل
مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ﴿١٧﴾ مثل الذين
كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف
لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلل البعيد ﴿١٨﴾
الم تر ان الله خلق السموت والارض بالحق ان يشا يذهبكم
ويات بخلق جديد ﴿١٩﴾ وما ذلك على الله بعزيز ﴿٢٠﴾

(১১) তাদের পয়গম্বর তাদেরকে বলেন ঃ আমরাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপরে ইচ্ছা, অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয়; ঈমানদারদের আল্লাহ্র উপর ভরসা করা চাই। (১২) আমাদের আল্লাহ্র উপর ভরসা না করার কি কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনি আমাদেরকে আমাদের পথ বলে দিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে পীড়ন করেছ, তজ্জন্যে আমরা সবর করব। ভরসাকারিগণের আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা উচিত। (১৩) কাফেররা পয়গম্বরগণকে বলেছিল ঃ আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি জালেমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব। (১৪) তাদের পর তোমাদেরকে দেশে আবাদ করব। এটা ঐ ব্যক্তি পায়, যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আযাবের ওয়াদাকে ভয় করে। (১৫) পয়গম্বরগণ ফয়সালা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক অবাধ্য, হঠকারী ব্যর্থ কাম হল। (১৬) তার পেছনে দোযখ রয়েছে। তাতে পুঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে। (১৭) ঢোক গিলে তা পান করবে এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে এবং সে মরবে না। তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর আযাব। (১৮) যারা স্বীয় পালনকর্তার সত্তায় অবিশ্বাসী, তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্মের মত যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যায় ধূলিঝড়ের দিন। তাদের উপার্জনের কোন অংশই তাদের করতলগত হবে না। এটাই দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা। (১৯) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদেরকে বিলুপ্তিতে নিয়ে যাবেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন। (২০) এটা আল্লাহ্র পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

দুনিয়াতেও নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া যেতে পারে অথবা এমন বিপদ আসতে পারে যেন, নেয়ামত ভোগ করা সম্ভবপর না হয় এবং পরকালেও আযাবে গ্রেফতার হতে পারে।

এখানে এ বিষয়টি স্মরণীয় যে আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কৃতজ্ঞদের জন্যে প্রতিদান, সওয়াব ও নেয়ামত বৃদ্ধির ওয়াদা তাকিদ সহকারে করেছেন لازيدنكم কিন্তু এর বিপরীতে অকৃতজ্ঞদের জন্যে তাকিদ সহকারে لاعذبنكم (আমি অবশ্যই তোমাদেরকে শাস্তি দেব)। বলেননি; বরং শুধু 'আমার শাস্তিও কঠোর' বলেছেন। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ আযাবে পতিত হবে—এটা জরুরী নয়; বরং ক্ষমারও সম্ভাবনা আছে।

وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله ....

অর্থাৎ, মূসা (আঃ) স্বজাতিকে বললেন ঃ যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা বসবাস করে, তারা সবাই আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতসমূহের নাশোকরী করে, তবে স্মরণ রেখ, এতে আল্লাহ্ তাআলার কোন ক্ষতি নেই। তিনি সবার তারিফ, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার উর্ধ্বে। তিনি আপন সত্তায় প্রশংসনীয়। তোমরা তাঁর প্রশংসা না করলেও সব ফেরেশতা এবং সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁর প্রশংসায় মুখর।

কৃতজ্ঞতার উপকার সবটুকু তোমাদের জন্যেই। তাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার জন্যে তাকিদ করা হয়, তা নিজের জন্যে নয়; বরং দয়াবশতঃ তোমাদেরই উপকার করার জন্যে।

ইতিপূর্বে এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম হচ্ছে ছাইভস্মের মত, যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিটি কণা বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপর কেউ এগুলোকে একত্রিত করে কোন কাজে লাগাতে চাইলে তা অসম্ভব হয়ে যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف

— উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম বাহ্যতঃ সৎ হলেও তা আল্লাহ্ তাআলার কাছে গ্রহণীয় নয়। তাই সব অর্থহীন ও অকেজো।

وبرزوا لله جميعا فقال الضعفؤا للذين استكبروا إنا
كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من
شيء قالوا لو هدىنا الله لهدينكم سواء علينا أجزعنا أم
صبرنا ما لنا من محيص ﴿٢١﴾ وقال الشيطن لما قضي الأمر
إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان
لي عليكم من سلطن إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا
تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي
إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظلمين لهم
عذاب أليم ﴿٢٢﴾ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصلحت
جنت تجري من تحتها الأنهر خلدين فيها بإذن ربهم
تحيتهم فيها سلم ﴿٢٣﴾ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ﴿٢٤﴾
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال
للناس لعلهم يتذكرون ﴿٢٥﴾ ومثل كلمة خبيثة كشجرة
خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ﴿٢٦﴾

(২১) সবাই আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে এবং দুর্বলেরা বড়দেরকে বলবে ঃ আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম—অতএব, তোমরা আল্লাহ্র আযাব থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করবে কি? তারা বলবে ঃ যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথ দেখাতেন, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সৎপথ দেখাতাম। এখন তো আমরা ধৈর্যচ্যুত হই কিংবা সবর করি—সবই আমাদের জন্যে সমান—আমাদের রেহাই নেই। (২২) যখন সব কাজের ফয়সলা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। এতএব তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করো না এবং নিজেদেরকেই ভৎর্সনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহ্র শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (২৩) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তাতে পালনকর্তার নির্দেশে অনন্তকাল থাকবে। যেখানে তাদের সম্ভাষণ হবে সালাম। (২৪) তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ তাআলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন ঃ পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। (২৫) সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন—যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (২৬) এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেয়া হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এরপর উল্লেখিত আয়াতসমূহে প্রথমে মুমিন ও তার ক্রিয়াকর্মের একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। অতঃপর কাফের ও মুমিনদের ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। ২৪তম আয়াতে মুমিন ও তার ক্রিয়াকর্মের উদাহরণে এমন একটি বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার কাণ্ড মজবুত ও সুউচ্চ এবং শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত। ভূগর্ভস্থ ঝরণা থেকে সেগুলো সিক্ত হয়। গভীর শিকড়ের কারণে বৃক্ষটি এত শক্ত যে দমকা বাতাসে ভূমিস্মাৎ হয়ে যায় না। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উর্ধ্বে থাকার কারণে এর ফল ময়লা ও আবর্জনা থেকে মুক্ত। এ বৃক্ষের দ্বিতীয় গুণ এই যে, এর শাখা উচ্চতায় আকাশ-পানে ধাবমান। তৃতীয় গুণ এই যে, এর ফল সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়। এ বৃক্ষটি কি এবং কোথায়, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক তথ্য নির্ভর উক্তি এই যে, এটি হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ। এর সমর্থন অভিজ্ঞতা এবং চাক্ষুষ দেখা দ্বারাও হয় এবং বিভিন্ন হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড যে উচ্চ ও মজবুত, তা প্রত্যক্ষ বিষয়—সবাই জানে।

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ কোরআনে উল্লেখিত পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ এবং অপবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে হান্‌যল তথা মাকাল বৃক্ষ।— (মাযহারী)

মুসনাদ আহ্‌মদে মুজাহিদের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে খেজুর বৃক্ষের শাঁস নিয়ে এল। তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে একটি প্রশ্ন করলেন ঃ বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ হচ্ছে মরদে-মুমিনের দৃষ্টান্ত। (বুখারীর রেওয়ায়েত মতে এস্থলে তিনি আরও বললেন যে, কোন ঋতুতেই এ বৃক্ষের পাতা ঝরে না।) বল, এ কোন্ বৃক্ষ? ইবনে ওমর বলেন ঃ আমার মনে চাইল যে, বলে দেই—খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু মজলিসে আবু বকর, ওমর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে নিশ্চুপ দেখে আমি বলার সাহস পেলাম না। এরপর স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।

এ বৃক্ষ দ্বারা মুমিনের দৃষ্টান্ত দেয়ার কারণ এই যে, কালেমায়ে তাইয়্যেবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত ও অনড় শিকড় বিশিষ্ট, দুনিয়ার বিপদাপদ একে টলাতে পারে না। কামেল মুমিন সাহাবী ও তাবেয়ী; বরং প্রতি যুগের খাঁটি মুসলমানদের এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যারা ঈমানের মোকাবেলায় জান, মান ও কোন কিছুর পরওয়া করেননি। দ্বিতীয় কারণ তাঁদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তাঁরা দুনিয়ার নোংরামি থেকে সব সময় দূরে সরে থাকেন যেমন ভূ-পৃষ্ঠের ময়লা-আবর্জনা উঁচু বৃক্ষকে স্পর্শ করতে পারে না। এ দু'টি গুণ হচ্ছে أصلها ثابت -এর দৃষ্টান্ত। তৃতীয় কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের শাখা যেমন আকাশের দিকে উচ্চে ধাবমান, মুমিনের ঈমানের ফলাফলও অর্থাৎ, সৎকর্মও তেমনি আকাশের দিকে উত্থিত হয়। কোরআন বলে ঃ إليه يصعد الكلم الطيب —অর্থাৎ, পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ্ তাআলার যেসব যিকির, তসবীহ্-তাহ্‌লীল, তেলাওয়াতে কোরআন ইত্যাদি করে, সেগুলো সকাল বিকাল আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছতে থাকে।

চতুর্থ কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের ফল যেমন সব সময় সর্বাবস্থায়

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ
دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ
اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ
اِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ
يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ﴿٣١﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ
مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ
بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا
سَاَلْتُمُوْهُ ۗ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ
لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا
الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿٣٥﴾

(২৭) আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পার্থিবজীবনে এবং পরকালে। এবং আল্লাহ্ জালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা, তা করেন। (২৮) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহ্র নেয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে এবং স্বজাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসের আলয়ে—(২৯) দোযখের? তারা তাতে প্রবেশ করবে সেটা কতই না মন্দ আবাস! (৩০) এবং তারা আল্লাহ্র জন্যে সমকক্ষ স্থির করেছে, যাতে তারা তার পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। বলুনঃ মজা উপভোগ করে নাও। অতঃপর তোমাদেরকে অগ্নির দিকেই ফিরে যেতে হবে! (৩১) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা নামায কায়েম রাখুক এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক ঐদিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচা কেনা নেই এবং বন্ধুত্বও নাই। (৩২) তিনিই আল্লাহ্, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্যে ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলা ফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। (৩৩) এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। (৩৪) যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ্র নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ। (৩৫) যখন ইবরাহীম বললেনঃ হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন।

এবং সব ঋতুতে দিবারাত্র খাওয়া হয়, মুমিনের সৎকর্মও তেমনি সব সময়, সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে অব্যাহত রয়েছে এবং খেজুর বৃক্ষের প্রত্যেকটি অংশই যেমন উপকারী, তেমনি মুমিনের প্রত্যেক কথা ও কাজ, ওঠাবসা এবং এসবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্যে উপকারী ও ফলদায়ক। তবে শর্ত এই যে, কামেল মানুষ এবং আল্লাহ্ ও রসূলের শিক্ষার অনুযায়ী হতে হবে।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ বাক্যে اكل শব্দের অর্থ ফল ও খাদ্যোপযোগী বস্তু এবং حين শব্দের অর্থ প্রতিমুহূর্ত। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারও কারও অন্য উক্তিও রয়েছে।

কাফেরদের দৃষ্টান্ত ঃ এর বিপরীতে কাফেরদের দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে খারাপ বৃক্ষ দ্বারা। কলেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ যেমন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ, ঈমান, তেমনি কলেমায়ে খবীসার অর্থ কুফরী বাক্য ও কুফরী কাজকর্ম। পূর্বোল্লেখিত হাদীসে كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ অর্থাৎ, খারাপ বৃক্ষের উদ্দিষ্ট অর্থ হানযল বৃক্ষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ কেউ রসুন ইত্যাদি বলেছেন।

কোরআনে এই খারাপ বৃক্ষের অবস্থা এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এর শিকড় ভূগর্ভের অভ্যন্তরে বেশী যায় না। ফলে যখন কেউ ইচ্ছা করে, এ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে। اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ বাক্যের অর্থ তাই। কেননা, এর আসল অর্থ কোন বস্তুর অবয়বকে পুরোপুরি উৎপাটন করা।

কাফেরের কাজকর্মকে এ বৃক্ষের সাথে তুলনা করার কারণ তিনটি। (এক) কাফেরের ধর্ম বিশ্বাসের কোন শিকড় ও ভিত্তি নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নড়বড়ে হয়ে যায়। (দুই) দুনিয়ার আবর্জনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। (তিন) বৃক্ষের ফলফুল অর্থাৎ, কাফেরের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ্র দরবারে ফলদায়ক নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ঈমানের বিশেষ প্রতিক্রিয়া ঃ এরপর মুমিনের ঈমান ও কলেমায়ে তাইয়্যেবার একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ

—অর্থাৎ, মুমিনের কলেমায়ে-তাইয়্যেবা মজবুত ও অনড় বৃক্ষের মত একটি প্রতিষ্ঠিত উক্তি। একে আল্লাহ্ তাআলা চিরকাল কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন দুনিয়াতেও এবং পরকালেও। শর্ত এই যে, এ কলেমা আন্তরিকতার সাথে বলতে হবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র মর্ম পূর্ণরূপে বুঝতে হবে।

উদ্দেশ্য এই যে, এ কলেমায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে শক্তি যোগানো হয়। ফলে সে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ কলেমায় কায়েম থাকে, যদিও এর মোকাবেলায় অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। পরকালে এ কলেমাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে তাকে সাহায্য করা হবে। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে, আয়াতে পরকাল বলে বরযখ অর্থাৎ, 'কবর জগৎ' বোঝানো হয়েছে।

কবরের শাস্তি ও শান্তি কোরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কবরে মুমিনকে প্রশ্ন করার ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও সে আল্লাহ্র সমর্থনের বলে এই কলেমার উপর কায়েম থাকবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র সাক্ষ্য দেবে। এরপর বলেন ঃ আল্লাহ্র বাণী يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ -এর উদ্দেশ্য তাই। এ হাদীসটি হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আরও প্রায় চল্লিশ জন সাহাবী থেকে এ বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে-কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করেছেন। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী স্বীয় কাব্যপুস্তিকা التثبيت عند التبييت এবং شرح الصدور এ সত্তরটি হাদীসের বরাত উল্লেখ করে সেগুলোকে মুতাওয়াতির বলেছেন। এসব সাহাবী সবাই আলোচ্য আয়াতে আখেরাতের অর্থ কবর এবং আয়াতটিকে কবরের আযাব ও সওয়াব সম্পর্কিত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

মৃত্যু ও দাফনের পর কবরে পুনর্বার জীবিত হয়ে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া এবং এ পরীক্ষার সাফল্য ও অকৃতকার্যতার ভিত্তিতে সওয়াব অথবা আযাব হওয়ার বিষয়টি কোরআন পাকের প্রায় দশটি আয়াতে ইঙ্গিতে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সত্তরটি মুতাওয়াতির হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে। ফলে এ ব্যাপারে মুসলমানদের সন্দেহ করার অবকাশ নেই। তবে সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে সন্দেহ করা হয় যে, এই সওয়াব ও আযাব দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে এর বিস্তারিত উত্তর দানের অবকাশ নেই। সংক্ষেপে এতটুকু বোঝে নেয়া যথেষ্ট যে, কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়া সে বস্তুটির অনস্তিত্বশীল হওয়ার প্রমাণ নয়। জ্বিন ও ফেরেশতারাও দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তারা বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান যুগে রকেটের সাহায্যে যে মহাশূন্য জগৎ প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, ইতিপূর্বে তা কারও দৃষ্টিগোচর হত না; কিন্তু অস্তিত্ব ছিল। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বিপদে পতিত হয়ে ভিষণ কষ্টে অস্থির হতে থাকে; কিন্তু নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তি মোটেই তা টের পায় না।

যুক্তির কথা এই যে, এক জগতের অবস্থাকে অন্য জগতের অবস্থার সাথে তুলনা করা নিতান্তই ভুল। সৃষ্টিকর্তা যখন রসূলের মাধ্যমে পরজগতে পৌঁছার পর আযাব ও সওয়াবের সংবাদ দিয়েছেন, তখন এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদেরকে তো প্রতিষ্ঠিত বাক্যের উপর কায়েম রাখেন, ফলে কবর থেকেই তাদের শান্তির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জালেম অর্থাৎ, অস্বীকারকারী কাফের ও মুশরিকরা এ নেয়ামত পায় না। তারা মুনকার-নকীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। ফলে এখান থেকেই তারা এক প্রকার আযাবে জড়িত হয়ে পড়ে।

وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ —অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা যা চান, তাই করেন। তাঁর ইচ্ছাকে রুখে দাঁড়ায়, এমন কোন শক্তি নেই। হযরত উবাই ইবনে কাব আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হুযায়ফা ইবনে এয়ামান প্রমুখ সাহাবী বলেন ঃ মুমিনের এরূপ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, তার যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তা আল্লাহ্র ইচ্ছায়ই অর্জিত হয়েছে। এটা অর্জিত না হওয়া অসম্ভব ছিল। এমনিভাবে যে বস্তু অর্জিত হয়নি, তা অর্জিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁরা আরও বলেন ঃ যদি তুমি এরূপ বিশ্বাস না রাখ, তবে তোমার আবাস হবে জাহান্নাম।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۙ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ وَبِئْسَ الْقَرَارُ

—অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে দেখেন না, যারা আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের পরিবর্তে কুফর অবলম্বন করেছে এবং তাদের অনুসারী জাতিকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে? তারা জাহান্নামে প্রজ্বলিত হবে। জাহান্নাম অত্যন্ত মন্দ আবাস।

এখানে 'আল্লাহ্র নেয়ামত' বলে সাধারণভাবে অনুভূত, প্রত্যক্ষ ও মানুষের বাহ্যিক উপকার সম্পর্কিত নেয়ামত বোঝানো যেতে পারে ; যেমন পানাহার ও পরিধানের দ্রব্য সামগ্রী, জমিজমা, বাসস্থান ইত্যাদি এবং মানুষের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত বিশেষ নেয়ামতসমূহও ; যেমন, ঐশী গ্রন্থ এবং আল্লাহ্ তাআলার শক্তি ও রহস্যের নিদর্শনাবলী। এসব নিদর্শন স্বীয় অস্তিত্বের প্রতি গ্রন্থিতে, ভূমণ্ডল ও তার রহস্যমণ্ডিত জগতে মানবজাতির হেদায়েতের সামগ্রীরূপে বিদ্যমান রয়েছে।

এই উভয় প্রকার নেয়ামতের দাবী ছিল এই যে, মানুষ আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও শক্তিসামর্থ সম্যক উপলব্ধি করুক এবং তাঁর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করুক। কিন্তু কাফের ও মুশরিকরা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা ও নাফরমানী করেছে। এর ফলশ্রুতিতে তারা সমগ্র মানব সমাজকেই ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং নিজেরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

আলোচ্য ৩০-৩৪ আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের নিন্দা এবং তাদের অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে মুমিনদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের শোকর আদায় করার জন্যে কতিপয় বিধানের তাকিদ করা হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ্র মহান নেয়ামতসমূহ উল্লেখ করে সেগুলোকে আল্লাহ্র অবাধ্যতায় নিয়োজিত না করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা ঃ اَنْدَادًا শব্দটি ند -এর বহুবচন। এর অর্থ সমতুল্য, সমান। প্রতিমাসমূহকে انداد বলার কারণ এই যে, মুশরিকরা স্বীয় কর্মে তাদেরকে আল্লাহ্র সমতুল্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল। تمتع শব্দের অর্থ কোন বস্তু দ্বারা সাময়িকভাবে কয়েকদিন উপকৃত হওয়া। আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্ত মতবাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, তারা প্রতিমাসমূহকে আল্লাহ্র সমতুল্য ও তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আদেশ দেয়া হয়েছে ঃ আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে থাক; তোমাদের শেষ পরিণতি জাহান্নামের অগ্নি।

দ্বিতীয় আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলা হয়েছে ঃ "মক্কার কাফেররা তো আল্লাহ্র নেয়ামতকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করে নিয়েছে" আপনি আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে বলুন যে, তারা নামায কায়েম করুক এবং আমি যে রিযিক তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করুক। এ আয়াতে মুমিন বান্দাদের জন্যে বিরাট সুসংবাদ ও সম্মান রয়েছে। প্রথমে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে নিজের বান্দা বলেছেন, এরপর ঈমান-গুণে গুণান্বিত করেছেন, অতঃপর তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখ ও সম্মান দানের পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে, তারা নামায কায়েম করুক। নামাযের সময়ে অলসতা এবং নামাযের সুষ্ঠু

নিয়মাবলীতে ত্রুটি না করা চাই। এ ছাড়া আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু তাঁর পথেও ব্যয় করুক। ব্যয় করার উভয় পদ্ধতিকেই বৈধ রাখা হয়েছে—গোপনে অথবা প্রকাশ্যে। কোন কোন আলেম বলেন ঃ ফরয যাকাত-ফিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে হওয়া উচিত—যাতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়, আর নফল সদকা-খয়রাত গোপনে দান করা উচিত—যাতে রিয়া ও নাম-যশ অর্জনের মত মনোভঙ্গি সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে। ব্যাপারটি আসলে নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যদি প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে রিয়া ও নাম-যশের নিয়ত থাকে, তবে দানের ফযীলত খতম হয়ে যায়—ফরয হোক কিংবা নফল। পক্ষান্তরে যদি অপরকে উৎসাহিত করার নিয়ত থাকে, তবে ফরয ও নফল উভয়ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা বৈধ।

مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ এখানে خلال শব্দটি خلة এর বহুবচন হতে পারে। এর অর্থ স্বার্থহীন বন্ধুত্ব। একে باب مفاعلة এর ধাতুও বলা যায়; যেমন قتال ও دفاع ইত্যাদি। এমতাবস্থায় এর অর্থ দু'ব্যক্তির পরস্পর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব করা। এ বাক্যটি উপরে বর্ণিত নামায ও সদকার নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

উদ্দেশ্য এই যে, আজ আল্লাহ্ তাআলা নামায পড়ার এবং গাফিলতিবশতঃ বিগত যমানার না পড়া নামাযের কাযা করার শক্তি ও অবসর দিয়ে রেখেছেন। এমনিভাবে আজ টাকা-পয়সা ও অর্থ সম্পদ তোমার করায়ত্ত রয়েছে। একে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল করে নিতে পার। কিন্তু এমন একদিন আসবে, যখন এ দু'টি শক্তি ও সামর্থ তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। তোমার দেহও নামায পড়ার যোগ্য থাকবে না এবং তোমার মালিকানায়ও কোন টাকা-পয়সা থাকবে না, যদ্দ্বারা কারও পাওনা পরিশোধ করতে পার। সেদিন কোন কেনা-বেচাও হতে পারবে না যে, তুমি স্বীয় ত্রুটি ও গোনাহের কাফ্ফারার জন্যে কোন কিছু কিনে নেবে। সেদিন পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং সম্পর্কও কোন কাজে আসবে না। কোন প্রিয়জন কারও পাপের বোঝা বহন করতে পারবে না এবং তার আযাব কোনরূপে হটাতে পারবে না।

'ঐ দিন' বলে বাহ্যতঃ হাশর ও কেয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। মৃত্যুর দিনও হতে পারে। কেননা, এসব প্রতিক্রিয়া মৃত্যুর সময় থেকেই প্রকাশ পায়। তখন কারও দেহে কাজ করার ক্ষমতা থাকে না এবং কারও মালিকানায় টাকা-পয়সাও থাকে না।

এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ কিয়ামতের দিন কারও বন্ধুত্ব কারও কাজে আসবে না। এর উদ্দেশ্য এই যে, শুধু পার্থিব বন্ধুত্বই সেদিন কাজে আসবে না, কিন্তু যাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক আল্লাহ্র সন্তুষ্টির ভিত্তিতে এবং তাঁর দ্বীনের কাজের জন্যে হয়, তাদের বন্ধুত্ব তখনও উপকারে আসবে। সেদিন আল্লাহ্ তাআলার সৎ ও প্রিয় বান্দারা অপরের জন্যে সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন। বহু হাদীসে এ বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ —অর্থাৎ, দুনিয়াতে যারা পরস্পর বন্ধু ছিল, সেদিন পরস্পর শত্রু হয়ে যাবে; তারা বন্ধুর ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপিয়ে নিজেরা মুক্ত হয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্ ভীরু, তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ্ ভীরুরা সেখানেও সুপারিশের মাধ্যমে একে অপরের সাহায্য করবেন।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার অনেকগুলো নেয়ামত স্মরণ করিয়ে মানুষকে এবাদত ও আনুগত্যের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তাআলার সত্তাই হল যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, যাদের ওপর মানুষের অস্তিত্বের সূচনা ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এরপর তিনি আকাশ থেকে পানি অবতারণ করেছেন, যার সাহায্যে হরেক রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন। যাতে সেগুলো তোমাদের রিযিক হতে পারে। ثمرات শব্দটি ثمرة -এর বহুবচন। প্রত্যেক বস্তু থেকে অর্জিত ফলাফলকে ثمرة বলা হয়। তাই মানুষের খাদ্যজাতীয় বস্তু, পরিধেয় বস্তু এবং বসবাসের গৃহ —সবই ثمرات শব্দের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আয়াতে ব্যবহৃত رزق শব্দটিতে এসব প্রয়োজন শামিল রয়েছে।—(মাযহারী)

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তাআলাই নৌকা ও জাহাজসমূহকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন। এরা আল্লাহ্র নির্দেশে নদ-নদীতে চলাফেরা করে। আয়াতে ব্যবহৃত سخر শব্দের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা এসব জিনিসের ব্যবহার তোমাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। কাঠ, লোহা-লক্কড়, নৌকা তৈরীর হাতিয়ার এবং এগুলোর বিশুদ্ধ ব্যবহারের জ্ঞান-বুদ্ধি সবই আল্লাহ্ তাআলার দান। কাজেই এসব বস্তুর আবিষ্কারে গর্ব করা উচিত নয় যে, সে এগুলো আবিষ্কার অথবা নির্মাণ করেছে। কেননা, নৌকা ও জাহাজে যেসব বস্তু ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর কোনটিই সে সৃষ্টি করেনি এবং করতে পারে না। আল্লাহ্র সৃজিত কাঠ, লোহা, তামা ও পিতলের মধ্যে কৌশল প্রয়োগ করে এই আবিষ্কারের মুকুট সে নিজের মাথায় পরিধান করেছে। নতুবা বাস্তব সত্য এই যে, স্বয়ং তার অস্তিত্ব, হাত-পা, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিও তার নিজের তৈরী নয়।

এরপর বলা হয়েছে ঃ আমি তোমাদের জন্যে সূর্য ও চন্দ্রকে অনুবর্তী করে দিয়েছি। এরা উভয়ে সর্বদা একই নিয়মে চলাচল করে। دَائِبَيْنِ শব্দটি داب থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অভ্যাস। অর্থ এই যে, সর্বদা ও সর্বাবস্থায় চলা এ দু'টি গ্রহের অভ্যাসে পরিণত করে দেয়া হয়েছে। এর খেলাফ হয় না। অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, তারা তোমাদের আদেশ ও ইঙ্গিতে চলবে। কেননা, সূর্য ও চন্দ্রকে মানুষের আজ্ঞাধীন চলার অর্থে ব্যক্তিগত নির্দেশের অনুবর্তী করে দিলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিত। কেউ বলত, আজ দু'ঘন্টা পর সূর্যোদয় হোক। কারণ, রাতের কাজ বেশী। কেউ বলত, দু'ঘন্টা আগে সূর্যোদয় হোক। কারণ, দিনের কাজ বেশী। তাই আল্লাহ্ তাআলা আসমান ও আকাশসমূহকে মানুষের অনুবর্তী করেছেন ঠিকই; কিন্তু এরূপ অর্থে করেছেন যে, এগুলো সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার অপার রহস্যের অধীনে মানুষের কাজে নিয়োজিত আছে। এরূপ অর্থে নয় যে, তাদের উদয়, অস্ত ও গতি মানুষের ইচ্ছা ও মর্জীর অধীন।

এমনিভাবে রাত দিনকে মানুষের অনুবর্তী করে দেয়ার অর্থও এরূপ যে, এগুলোকে মানুষের সেবা ও সুখ বিধানের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।

وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে ঐ সমুদয় বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছ। আল্লাহ্র দান ও পুরস্কার কারও চাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। আমরা নিজেদের অস্তিত্বও তাঁর কাছে চাইনি। তিনি নিজ কৃপায় চাওয়া ব্যতীতই দিয়েছেন।

আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থনা কে করেছিল? এগুলো চাওয়া ছাড়াই আমাদের পালনকর্তা দান করেছেন। এ কারণেই কাযী বায়যাভী এ বাক্যের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে প্রত্যেক ঐ বস্তু দিয়েছেন, যা চাওয়ার যোগ্য; যদিও তোমরা চাওনি। কিন্তু বাহ্যিক অর্থ নেয়া হলেও কোন অসুবিধা নেই।

কারণ, মানুষ সাধারণতঃ যা যা চায়, তার অধিকাংশ তাকে দিয়েই দেয়া হয়। যেখানে বাহ্যদৃষ্টিতে তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় না, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যে অথবা সারা বিশ্বের জন্যে কোন না কোন উপযোগিতা নিহিত থাকে যা সে জানে না। কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ জানেন যে, তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করা হলে স্বয়ং তার জন্যে অথবা তার পরিবারের জন্যে অথবা সমগ্র বিশ্বের জন্যে বিপদের কারণ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় প্রার্থনা পূর্ণ না করাই বড় নেয়ামত। কিন্তু জ্ঞানের ত্রুটির কারণে মানুষ তা জানে না, তাই দুঃখিত হয়।

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত এত অধিক যে, সব মানুষ একত্রিত হয়ে সেগুলো গণনা করতে চাইলে গুণে শেষ করতে পারবে না। মানুষের নিজের অস্তিত্বই স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, দেহের প্রতিটি গ্রন্থি এবং শিরা-উপশিরায় আল্লাহ্ তাআলার অন্তহীন নেয়ামত নিহিত রয়েছে। শত শত সূক্ষ্ম নাজুক ও অভিনব যন্ত্রপাতি সজ্জিত এই ভ্রাম্যমান কারখানাটি সর্বদা কাজে মশগুল রয়েছে। এরপর রয়েছে নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু, সমুদ্র ও পাহাড়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু। আধুনিক গবেষণা ও তাতে আজীবন নিয়োজিত হাজারো বিশেষজ্ঞও এগুলোর কূল-কিনারা করতে পারেনি। এছাড়া সাধারণভাবে ধনাত্মক আকারে যেগুলোকে নেয়ামত মনে করা হয়, নেয়ামত সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রত্যেক রোগ-শোক দুঃখ-কষ্ট আপদ-বিপদ থেকে নিরাপদ থাকাও এক একটা স্বতন্ত্র নেয়ামত। একজন মানুষ কত প্রকার রোগে ও কত প্রকার মানসিক ও দৈহিক কষ্টে পতিত হতে পারে, তার গণনা কেউ করতে সক্ষম নয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার সম্পূর্ণ দান ও নেয়ামতের গণনা করাও আমাদের দ্বারা সম্ভবপর নয়।

অসংখ্য নেয়ামতের বিনিময়ে অসংখ্য এবাদত ও অসংখ্য শোকর জরুরী হওয়াই ছিল ইনসাফের দাবী। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা দুর্বলমতি মানুষের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যখন সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নেয় যে, যথার্থ শোকর আদায় করার সাধ্য তার নেই, তখন আল্লাহ্ তাআলা এ স্বীকারোক্তিকেই শোকর আদায়ের স্থলাভিষিক্ত করে নেন। আল্লাহ্ তাআলা দাউদ (আঃ)-এর এ ধরনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই বলেছিলেন : الان قد شكرت ياداود অর্থাৎ, স্বীকারোক্তি করাই শোকর আদায়ের জন্যে যথেষ্ট।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ অর্থাৎ, মানুষ খুবই জালেম এবং অত্যধিক অকৃতজ্ঞ। উদ্দেশ্য, কষ্ট ও বিপদে সবর করা, মুখ ও মনকে অভিযোগ থেকে পবিত্র রাখা, একজন রহস্যবিদের পক্ষ থেকে এসেছে বিধায় বিপদকে নেয়ামতই মনে করা, পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তিতে সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই ছিল ইনসাফের তাকিদ, কিন্তু সাধারণতঃ মানুষের অভ্যাস এ থেকে ভিন্ন। সামান্য কষ্ট ও বিপদ দেখা দিলেই তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং কাতরকণ্ঠে তা ব্যক্ত করতে শুরু করে। পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তি লাভ করলে তাতে মত্ত হয়ে আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়। একারণেই পূর্ববর্তী আয়াতে খাঁটি মুমিনের গুণ صَبَّارٍ شَكُورٍ (অধিক সবরকারী, অধিক শোকরকারী) ব্যক্ত হয়েছে।

এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'টি দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দোয়া : رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا—অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, এ (মক্কা) নগরীকে শান্তির আলয় করে দাও। সূরা বাক্বারায়ও এ দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে بلد শব্দটি الف ও لام ব্যতীত بلدا বলা হয়েছে। এর অর্থ অনির্দিষ্ট নগরী। কারণ এই যে, এ দোয়াটি যখন করা হয়েছিল, তখন মক্কা নগরীর পত্তন হয়নি। তাই ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় দোয়া করেছিলেন যে, এ জায়গাকে একটি শান্তির নগরীতে পরিণত করে দিন।

এরপর মক্কায় যখন জনবসতি স্থাপিত হয়ে যায়, তখন এ আয়াতে বর্ণিত দোয়াটি করেন। এ ক্ষেত্রে মক্কাকে নির্দিষ্ট করে দোয়া করেন যে, একে শান্তির আবাসস্থল করে দিন। দ্বিতীয় দোয়া এই যে, আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ। তাঁরা শিরক, মূর্তিপূজা এমনকি কোন গোনাহ্ও করতে পারেন না। কিন্তু এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করতে গিয়ে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এর কারণ এই যে, স্বভাবজাত ভীতির প্রভাবে পয়গম্বরগণ সর্বদা শঙ্কা অনুভব করতেন। অথবা আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচানোর দোয়া করা। সন্তানদেরকে এর গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে নিজেকেও দোয়ায় শামিল করে নিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বন্ধুর দোয়া কবুল করেছেন। ফলে তাঁর সন্তানরা শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে নিরাপদ থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মক্কাবাসীরা তো সাধারণভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এরই বংশধর। পরবর্তীতে তো তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা বিদ্যমান ছিল। বাহরে-মুহীত গ্রন্থে সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার বরাত দিয়ে ইসমাঈল (আঃ)-এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে কেউ প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপূজা করেননি, বরং যে সময় জুরহাম গোত্রের লোকেরা মক্কা অধিকার করে এর সন্তানদেরকে হরম থেকে বের করে দেয়, তখন তারা হরমের প্রতি অগাধ ভালবাসা ও সম্মানের কারণে এখানকার কিছু পাথর সাথে করে নিয়ে যায়। তারা এগুলোকে হরম ও বায়তুল্লাহর স্মারক হিসেবে সামনে রেখে এবাদত করত এবং এগুলোর প্রদক্ষিণ (তওয়াফ) করত। এতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যের কোনরূপ ধারণা ছিল না, বরং বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে নামায পড়া এবং বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করা যেমন আল্লাহ্ তাআলারই এবাদত, তেমনি তারা এই পাথরের দিকে মুখ করা এবং এগুলো তওয়াফ করাকে আল্লাহ্‌র এবাদতের পরিপন্থী মনে করত না। এরপর এ কর্মপন্থাই মূর্তিপূজার কারণ হয়ে যায়।

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن
تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ
ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَا
إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ
مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٨﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ
الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ
اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ
لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي
رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾

(৩৬) হে পালনকর্তা, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৭) হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায কায়েম রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুযী দান করুন, সম্ভবতঃ তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (৩৮) হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি তো জানেন আমরা যা কিছু গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্য করি। আল্লাহ্‌র কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই গোপন নয়। (৩৯) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাকে এই বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণ করেন। (৪০) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামায কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা, এবং কবুল করুন আমাদের দোয়া। (৪১) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। (৪২) জালেমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে কখনও বেখবর মনে করো না তাদেরকে তো ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে। (৪৩) তারা মস্তক উপরে তুলে ভীত-বিহবল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর উড়ে যাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৩৬ আয়াতে এই দোয়ার কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মূর্তিপূজা থেকে আমাদের অব্যাহতি কামনার কারণ এই যে, এ মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেছে। ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতা ও জাতির অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলেছিলেন। মূর্তিপূজা তাদেরকে সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

—অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার অনুসারী হবে অর্থাৎ, ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে, সে তো আমারই। উদ্দেশ্য, তার প্রতি যে দয়া ও কৃপা করা হবে, তা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করে তার জন্যে আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। এখানে অবাধ্যতার অর্থ যদি কর্মগত অবাধ্যতা অর্থাৎ, মন্দকর্ম নেয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ স্পষ্ট যে, আপনার কৃপায় তারও ক্ষমা আশা করা যায় এবং যদি অবাধ্যতার অর্থ কুফরী ও অস্বীকৃতি নেয়া হয়, তবে কাফের ও মুশরিকের ক্ষমা না হওয়া নিশ্চিত ছিল এবং ওদের জন্যে সুপারিশ না করার নির্দেশ ইবরাহীম (আঃ)-কে পূর্বেই দেয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাদের ক্ষমার আশা ব্যক্ত করা সঠিক হতে পারে না। তাই বাহ্‌রে মুহীত গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) আদৌ দোয়া অথবা সুপারিশের ভাষা প্রয়োগ করেননি এবং একথা বলেননি যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তবে তিনি পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক পয়গম্বরের আন্তরিক বাসনা এটাই ছিল যে, কোন কাফেরও যেন আযাবে পতিত না হয়। "আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু"—একথা বলে তিনি এই স্বভাবসুলভ বাসনা প্রকাশ করে দিয়েছেন মাত্র। একথা বলেননি যে, এদের সাথে ক্ষমা ও দয়ার ব্যবহার করুন। হযরত ঈসা (আঃ)-ও স্বীয় উম্মতের কাফেরদের সম্পর্কে এরূপ বলেছিলেন ঃ

وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ —অর্থাৎ, আপনি যদি ওদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান, সবই করতে পারেন। আপনার কাজে কেউ বাধাদানকারী নেই।

আল্লাহ্‌ তাআলার এ দু'জন মনোনীত পয়গম্বর কাফেরদের ব্যাপারে সুপারিশ করেননি। কারণ, এটা ছিল আদব ও শিষ্টাচারের পরিপন্থী। কিন্তু একথাও বলেননি যে, কাফেরদের উপর আযাব নাযিল করুন। বরং আদবের সাথে বিশেষ ভঙ্গিতে তাদের হেদায়েত ও ক্ষমার স্বভাবজাত বাসনা প্রকাশ করেছেন মাত্র।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ পান যে, দুগ্ধ-পোষ্য শিশু ও তার জননীকে শুষ্ক প্রান্তরে ছেড়ে আপনি শামে চলে যান, তখন তাঁর মনে এতটুকু বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আল্লাহ্‌ তাঁদেরকে বিনষ্ট করবেন না। তাঁদের জন্যে পানি অবশ্যই সরবরাহ করা হবে। তাই দোয়ায় بواد غيرذى ماء (জলহীন প্রান্তরে) বলেননি; غَيْرِ ذِي زَرْعٍ (চাষাবাদহীন) বলে আবেদন করেছেন যে, তাদেরকে ফলমূল দান করুন; যদিও তা অন্য জায়গা থেকে আনা হয়। এ কারণেই মক্কা মুকাররমায় আজ পর্যন্ত চাষাবাদের তেমন ব্যবস্থা না থাকলেও সারা বিশ্বের ফলমূল এত অধিক পরিমাণে সেখানে পৌছে থাকে যে, অন্যান্য অনেক শহরেই

সেগুলো পাওয়া দুষ্কর।—(বাহরে-মুহীত)

عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের ভিত্তি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী সূরা বাক্বারার তফসীরে বিভিন্ন রেওয়াতের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ) বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ করেন। তাঁকে যখন পৃথিবীতে নামানো হয়, তখন মু'জেযা হিসেবে সরন্দীপ পাহাড় থেকে এখানে পৌঁছানো হয় এবং জিবরাঈল বায়তুল্লাহর জায়গা চিহ্নিতও করে দেন। আদম (আঃ) স্বয়ং এবং তাঁর সন্তানরা এর চারদিক প্রদক্ষিণ করতেন। শেষ পর্যন্ত নূহের মহাপ্লাবনের সময় বায়তুল্লাহ্ উঠিয়ে নেয়া হয়; কিন্তু তার ভিত্তি সেখানেই থেকে যায়। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে এই ভিত্তির উপরই বায়তুল্লাহ্ পুনর্নির্মাণের আদেশ দেয়া হয়। হযরত জিবরাঈল প্রাচীন ভিত্তি দেখিয়ে দেন। ইবরাহীম (আঃ) নির্মিত এই প্রাচীর মূর্খতা যুগে বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কুরাইশরা তা নতুনভাবে নির্মান করে। এ নির্মানকাজে আবু তালেবের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও নবুওয়তের পূর্বে অংশ গ্রহণ করেন।

এতে বায়তুল্লাহ্র বিশেষণ محرم উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সম্মানিতও হতে পারে এবং সুরক্ষিতও। বায়তুল্লাহ্ শরীফের মধ্যে উভয় বিশেষণই বিদ্যমান। এটি যেমন চিরকাল সম্মানিত, তেমনি চিরকাল শত্রুর কবল থেকে সুরক্ষিত।

لِيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়ার প্রারম্ভে পুত্র ও তার জননীর অসহায়তা ও দুর্দশা উল্লেখ করার পর সর্বপ্রথম তাদেরকে নামায কায়েমকারী করার দোয়া করেন। কেননা, নামায দ্বারা ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় মঙ্গল সাধিত হয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, পিতা যদি সন্তানকে নামাযের অনুবর্তী করে দেয়, তবে এটাই সন্তানদের পক্ষে পিতার সর্ববৃহৎ সহানুভূতি ও হিতাকাঙ্ক্ষা হবে। ইবরাহীম (আঃ) যদিও সেখানে মাত্র একজন মহিলা ও ছেলেকে ছেড়েছিলেন; কিন্তু দোয়ায় বহুবচন ব্যবহার করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, ইবরাহীম (আঃ) জানতেন যে, এখানে শহর হবে এবং ছেলের বংশ বৃদ্ধি পাবে। তাই দোয়ায় সবাইকে শামিল রেখেছেন।

أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ – افئدة শব্দটি فؤاد এর বহুবচন। এর অর্থ অন্তর। এখানে افئدة শব্দটি نكرة এবং তার সাথে من অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে, যা تقليل ও تبعيض এর অর্থে আসে। তাই অর্থ এই যে, কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন। অতফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ যদি এ দোয়ায় 'কিছু সংখ্যক' অর্থবোধক অব্যয় ব্যবহার করা না হত; افئدة الناس বলা হত, তবে সারা বিশ্বের মুসলিম, অমুসলিম, ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মানুষ মক্কায় ভিড় করত, যা তাদের জন্যে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াত। এ তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আঃ) দোয়ায় বলেছেন ঃ কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন।

وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ – ثمرات শব্দটি ثمرة এর বহুবচন। এর অর্থ ফল, যা স্বভাবতঃ খাওয়া হয়। এদিক দিয়ে দোয়ার সারমর্ম এই যে, তাদেরকে খাওয়ার জন্যে সর্বপ্রকার ফল দান করুন।

ثمرة শব্দটি কোন সময় ফলশ্রুতি ও উৎপাদনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা খাওয়ার ফলের চেয়ে অনেক ব্যাপক। প্রত্যেক উপকারী বস্তুর ফলাফলকে তার ثمرة বলা যায়। মেশিন ও শিল্প কারখানার ثمرة বলতে তার উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীকে বোঝায়। চাকুরী ও মজুরীর ফলশ্রুতিতে যে পারিশ্রমিক ও বেতন পাওয়া যায়, তা চাকুরীর ثمرة। কোরআন পাকের এক আয়াতে এ দোয়ায় ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ বলা হয়েছে। এতে شجر শব্দ ব্যবহার না করে شيء (বস্তু) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ইবরাহীম (আঃ) তাদের জন্যে শুধু খাওয়ার ফলের দোয়াই করেন নি; বরং প্রত্যেক বস্তুর অর্জিত ফলাফলেরও দোয়া করেছেন। সম্ভবতঃ এ দোয়ার প্রভাবেই মক্কা মুকাররমা কোন কৃষিপ্রধান, অথবা শিল্প প্রধান এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের দ্রব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়, যা বোধ হয় জগতের অন্য কোন বৃহত্তম শহরেও পাওয়া যায় না।

لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, সন্তানদের জন্যে আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া এ কারণে করা হয়েছে, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়ে কৃতজ্ঞতার সওয়াবও অর্জন করে। এভাবে নামাযের অনুবর্তিতা দ্বারা দোয়া শুরু করে কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে শেষ করা হয়েছে। মাঝখানে আর্থিক সুখ-শান্তির প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এতে শিক্ষা রয়েছে যে, মুসলমানের এরূপই হওয়া উচিত। তার ক্রিয়াকর্ম, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার উপর পরকালের কল্যাণ চিন্তা প্রবল থাকা দরকার এবং সংসারের কাজ ততটুকুই করা উচিত, যতটুকু নেহায়েত প্রয়োজন।

رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে দোয়া সমাপ্ত করা হয়েছে। কাকুতি-মিনতি ও বিলাপ প্রকাশার্থ ربنا শব্দটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আপনি আমার অন্তরগত অবস্থা ও বাহ্যিক আবেদন নিবেদন সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

'অন্তরগত অবস্থা' বলে ঐ দুঃখ, মনোবেদনা ও চিন্তা-ভাবনা বোঝানো হয়েছে, যা একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননীকে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিঃসম্বল, ফরিয়াদরত অবস্থায় ছেড়ে আসা এবং তাদের বিচ্ছেদের কারণে স্বাভাবিকভাবে দেখা দিচ্ছিল। 'বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন' বলে ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া এবং হাজেরার ঐসব বাক্য বোঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্র আদেশ শোনার পর তিনি বলেছিলেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্ যখন নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তিনি আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তিনি আমাদেরকে বিনষ্ট করবেন না। আয়াতের শেষে আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানের বিস্তৃতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের বাহ্যিক ও অন্তরগত অবস্থাই কেন বলি, সমস্ত ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে কোন বস্তুই তাঁর অজ্ঞাত নয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ إِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ ۗ إِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ — এ আয়াতের বিষয়বস্তুও পূর্ববর্তী দোয়ার পরিশিষ্ট। কেননা, দোয়ার অন্যতম শিষ্টাচার হচ্ছে দোয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা। ইবরাহীম (আঃ) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ্ তাআলার একটি নেয়ামতের শোকর আদায় করেছেন, নেয়ামতটি এই যে, ঘোর বার্ধক্যের বয়সে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করে তাঁকে সুসন্তান হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক (আঃ) দান করেছেন।

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ
ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ
الرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿٤٤﴾ وَسَكَنتُمْ
فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ
وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ
وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ
وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ
غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ۖ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى
الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُم مِّن
قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا
بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

سُورَةُ الْحِجْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ آيَةً وَسِتُّ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾

(৪৪) মানুষকে ঐ দিনের ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের কাছে আযাব আসবে। তখন জালেমরা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিন, যাতে আমরা আপনার আহবানে সাড়া দিতে এবং পয়গম্বরগণের অনুসরণ করতে পারি। তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেতে না যে, তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে যেতে হবে না? (৪৫) তোমরা তাদের বাসভূমিতেই বসবাস করতে, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে এবং তোমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল যে, আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছি এবং আমি তোমাদেরকে ওদের সব কাহিনীই বর্ণনা করেছি। (৪৬) তারা নিজেদের মধ্যে ভীষণ চক্রান্ত করে নিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র সামনে রক্ষিত আছে তাদের কু-চক্রান্ত। তাদের কূটকৌশল পাহাড় টলিয়ে দেয়ার মত হবে না (৪৭) অতএব আল্লাহ্‌র প্রতি ধারণা করো না যে, তিনি রসূলগণের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৪৮) যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশসমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌র সামনে পেশ হবে। (৪৯) তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। (৫০) তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে। (৫১) যাতে আল্লাহ্ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৫২) এটা মানুষের একটি সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই—একক; এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে।

সূরা হিজর

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৯৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আলিফ-লা-ম-রা ; এগুলো পরিপূর্ণ গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত।

এ প্রশংসা বর্ণনায় এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পরিত্যক্ত শিশুটি আপনারই দান। আপনিই তার হেফাযত করুন। অবশেষে إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ —বলে প্রশংসা-বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণকারী অর্থাৎ, কবুলকারী।

প্রশংসা বর্ণনার পর আবার দোয়ায় মশগুল হয়ে যান ঃ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ এতে নিজের জন্যে ও সন্তানদের জন্যে নামায কায়েম রাখার দোয়া করেন। অতঃপর কাকুতি-মিনতি সহকারে আবেদন করেন যে, হে আমার পালনকর্তা, আমার দোয়া কবুল করুন।

সবশেষে একটি ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া করলেন ঃ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন ঐদিন, যেদিন হাশরের ময়দানে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে।

এতে তিনি মাতা-পিতার জন্যেও মাগফেরাতের দোয়া করেছেন। অথচ পিতা অর্থাৎ আযর যে কাফের ছিল, তা কোরআন পাকেই উল্লেখিত রয়েছে। সম্ভবতঃ এ দোয়াটি তখন করেছেন, যখন ইবরাহীম (আঃ)-কে কাফেরদের জন্যে দোয়া করতে নিষেধ করা হয়নি। অন্য এক আয়াতেও অনুরূপ উল্লেখিত আছে ঃ

وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا —অর্থাৎ, কোন অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহ্‌কে গাফেল মনে করো না। এখানে বাহ্যতঃ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাকে তার গাফলতি এবং শয়তান এ ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। পক্ষান্তরে যদি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য উম্মতের গাফেলদেরকে শোনানো এবং হুশিয়ার করা। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে এরূপ সম্ভাবনাই নেই যে, তিনি আল্লাহ্ তাআলাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর অথবা গাফেল মনে করতে পারেন।

لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ —অর্থাৎ, সেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হয়ে থাকবে। مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ —অর্থাৎ ভয় ও বিস্ময়ের কারণে মস্তক উপরে তুলে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকবে। لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ অর্থাৎ, অপলক নেত্রে চেয়ে থাকবে وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ তাদের অন্তর শূন্য ও ব্যাকুল হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এসব অবস্থা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার জাতিকে ঐ দিনের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন জালেম ও অপরাধীরা অপারগ হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে আরও কিছু সময় দিন। অর্থাৎ, দুনিয়াতে কয়েকদিনের জন্যে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করতে পারি এবং আপনার প্রেরিত পয়গম্বরগণের অনুসরণ করে এ আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের জওয়াবে

বলা হবেঃ এখন তোমরা একথা বলছ কেন? তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেয়ে বলনি যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের পতন হবে না এবং তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে এমনিভাবে বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকবে? তোমরা পুনর্জীবন ও পরজগত অস্বীকার করেছিলে।

وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ

فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ

এতে বাহ্যতঃ আরবের মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে وَأَنذِرِ النَّاسَ বলে আদেশ দেয়া হয়। এতে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের অবস্থা ও উত্থান-পতন তোমাদের জন্যে সর্বোত্তম উপদেশ। আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না। অথচ তোমরা এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থলেই বসবাস ও চলাফেরা কর। কিছু অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং কিছু সংবাদ পরম্পরার মাধ্যমে তোমরা একথাও জান যে, আল্লাহ্ তাআলা অবাধ্যতার কারণে ওদেরকে কিরূপ কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। এছাড়া আমিও ওদেরকে সৎপথে আনার জন্যে অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু এর পরও তোমাদের চৈতন্যোদয় হল না।

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ

مِنْهُ الْجِبَالُ অর্থাৎ, তারা সত্যধর্মকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে এবং সত্যের দাওয়াত কবুলকারী মুসলমানদের নিপীড়নের উদ্দেশে সাধ্যমত কূটকৌশল করেছে। আল্লাহ্ তাআলার কাছে তাদের সব গুপ্ত ও প্রকাশ্য কূটকৌশল বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এগুলোকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম। যদিও তাদের কূটকৌশল এমন মারাত্মক ও গুরুতর ছিল যে, এর মোকাবিলায় পাহাড়ও স্বস্থান থেকে অপসৃত হবে; কিন্তু আল্লাহ্র অপার শক্তির সামনে এসব কূটকৌশল তুচ্ছ ও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আয়াতে বর্ণিত শত্রুতামূলক কূটকৌশলের অর্থ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কূটকৌশলও হতে পারে। উদাহরণতঃ নমরূদ, ফেরাউন, কওমে-আদ, কওমে-সামূদ ইত্যাদি। এটাও সম্ভব যে, এতে আরবের বর্তমান মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মোকাবেলায় অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত ও কূটকৌশল করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা সব ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

অধিকাংশ তফসীরবিদ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ বাক্যের ان শব্দটি নেতিবাচক অব্যয় সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন যে, তারা যদিও অনেক কূটকৌশল ও চালবাজি করেছে, কিন্তু তাতে পাহাড়ের স্বস্থান থেকে হটে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। 'পাহাড়' বলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর সুদৃঢ় মনোবলকে বোঝানো হয়েছে। কাফেরদের কোন চালবাজি এ মনোবলকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারেনি।

এরপর উম্মতকে শোনানোর জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অথবা প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে হুশিয়ার করে বলা হয়েছে : فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ অর্থাৎ, কেউ যেন এরূপ মনে না করে যে, আল্লাহ্ তাআলা রসূলগণের সাথে বিজয় ও সাফল্যের যে ওয়াদা করেছেন, তিনি তার খেলাফ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলা মহাপরাক্রান্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তিনি পয়গম্বরগণের শত্রুদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং ওয়াদা পূর্ণ করবেন।

অতঃপর আবার কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিনে বর্তমান পৃথিবী পাল্টে দেয়া হবে এবং আকাশও। সবাই এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্র সামনে হাজির হবে।

পৃথিবী ও আকাশ পাল্টে দেয়ার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তাদের আকার ও আকৃতি পাল্টে দেয়া হবে ; যেমন কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে আছে যে, সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেয়া হবে। এতে কোন গৃহের ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না এবং পাহাড়, টিলা, গর্ত গভীরতা কিছুই থাকবে না। এ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআনে বলা হয়েছে : لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا অর্থাৎ, গৃহ ও পাহাড়ের কারণে বর্তমানে রাস্তা ও সড়ক বাঁক ঘুরে ঘুরে চলেছে। কোথাও উচ্চতা এবং কোথাও গভীরতা দেখা যায়। কেয়ামতের দিন এগুলো থাকবে না, বরং সব পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সম্পূর্ণতঃ এ পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য পৃথিবী এবং এ আকাশের পরিবর্তে অন্য আকাশ সৃষ্টি করা হবে। এ সম্পর্কে বর্ণিত কিছু সংখ্যক হাদীস দ্বারা গুণগত পরিবর্তনের কথা এবং কিছুসংখ্যক হাদীস দ্বারা সত্তাগত পরিবর্তনের কথাও জানা যায়।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, হাশরের পৃথিবী হবে সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবী। তার রঙ হবে রৌপ্যের মত সাদা। এর উপর কোন গোনাহ্র বা অন্যায় খুনের দাগ থাকবে না। মুসনাদে-আহমদে ও তফসীর ইবনে জরীরে উল্লেখিত হাদীসে এই বিষয়বস্তুটিই হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত সহল ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন ময়দার রুটির মত পরিষ্কার ও সাদা পৃথিবীর বুকে মানবজাতিকে পুনরুত্থিত করা হবে। এতে কোন বস্তুর চিহ্ন (গৃহ, উদ্যান, বৃক্ষ, পাহাড়, টিলা ইত্যাদি) থাকবে না। বায়হাকী এই আয়াতের তফসীরে এ তথ্যটি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাকেম নির্ভরযোগ্য সনদসহ হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, চামড়ার কুঞ্চন দূর করার জন্য চামড়াকে যেভাবে টান দেয়া হয়, কেয়ামতের দিন পৃথিবীকে সেভাবে টান দেয়া হবে। ফলে পৃথিবীর গর্ত, পাহাড় সব সমান হয়ে একটি সটান সমতল ভূমি হয়ে যাবে। তখন সব আদমসন্তান এই পৃথিবীতে জামায়েত হবে। ভীড় এত হবে যে, একজনের অংশে তার দাঁড়ানোর জায়গাটুকুই পড়বে। এরপর সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হবে। আমি পালনকর্তার সামনে সেজদায় নত হব। অতঃপর আমাকে সুপারিশের অনুমতি দান করা হবে। আমি সবার জন্য সুপারিশ করব যেন তাদের হিসাব কিতাব দ্রুত নিষ্পন্ন হয়।

শেষোক্ত রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং গর্ত, পাহাড়, দালান-কোঠা, বৃক্ষ ইত্যাদি

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۝٢
ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ
يَعْلَمُونَ ۝٣ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ
مَّعْلُومٌ ۝٤ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝٥ وَ
قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝٦ لَوْ
مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝٧ مَا نُنَزِّلُ
الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُّنظَرِينَ ۝٨ إِنَّا نَحْنُ
نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن
قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ۝١٠ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝١١ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝١٢
لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝١٣ وَلَوْ فَتَحْنَا
عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝١٤ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ
أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۝١٥ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ
بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝١٦ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ
رَّجِيمٍ ۝١٧ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ۝١٨

(২) কোন সময় কাফেররা আকাঙ্খা করবে যে, কি চমৎকার হত, যদি তারা মুসলমান হত। (৩) আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্বর তারা জেনে নেবে। (৪) আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি; কিন্তু তার নির্দিষ্ট সময় লিখিত ছিল। (৫) কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্ট সময়ের অগ্রে যায় না এবং পশ্চাতে থাকে না। (৬) তারা বলল ঃ হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, আপনি তো একজন উন্মাদ। (৭) যদি আপনি সত্যবাদী হন, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে আনেন না কেন? (৮) আমি ফেরেশতাদেরকে একমাত্র ফয়সালার জন্যেই নাযিল করি। তখন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না। (৯) আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। (১০) আমি আপনার পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি। (১১) ওদের কাছে এমন কোন রসূল আসেননি, যাদের সাথে ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে থাকেনি। (১২) এমনিভাবে আমি এ ধরনের আচরণ পাপীদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেই। (১৩) ওরা এর প্রতি বিশ্বাস করবে না। পূর্ববর্তীদের এমন রীতি চলে আসছে। (১৪) যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণও করতে থাকে (১৫) তবুও ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে না—বরং আমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। (১৬) নিশ্চয় আমি আকাশে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্যে সুশোভিত করে দিয়েছি। (১৭) আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি। (১৮) কিন্তু যে চুরি করে শুনে পালায়, তার পশ্চাদ্ধাবন করে উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড।

থাকবে না, কিন্তু সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা গিয়েছিল যে, হাশরের পৃথিবী বর্তমান স্থলে অন্য কোন পৃথিবী হবে। আয়াতে এই সত্তার পরিবর্তনই বোঝানো হয়েছে।

বয়ানুল-কোরআন গ্রন্থে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন ঃ এতদুভয়ের মধ্যে কোনরূপ পরস্পরবিরোধিতা নাই। এটা সম্ভব যে, প্রথমে শিঙ্গা ফুঁকার পর পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং হিসাব-কিতাবের জন্যে মানুষকে অন্য পৃথিবীতে স্থানান্তরিত করা হবে।

তফসীর মাযহারীতে মুসনাদ আবদ ইবনে হুমায়দ থেকে হযরত ইকরিমার উক্তি বর্ণিত আছে, যদ্দ্বারা উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থিত হয়। উক্তিটি এই ঃ এ পৃথিবী কুঁচকে যাবে এবং এর পার্শ্বে অন্য একটি পৃথিবীতে মানবমণ্ডলীকে হিসাব-কিতাবের জন্যে উপস্থিত করা হবে।

মুসলিম শরীফে হযরত সওবানের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট এক ইহুদী এসে প্রশ্ন করল ঃ যেদিন পৃথিবী পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন ঃ পুলসিরাতের নিকটে একটি অন্ধকারে থাকবে।

এ থেকেও জানা যায় যে, বর্তমান পৃথিবী থেকে পুলসিরাতের মাধ্যমে মানুষকে অন্যদিকে স্থানান্তর করা হবে। ইবনে জারীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এ মর্মে একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তখন বর্তমান পৃথিবী ও তার নদ-নদী অগ্নিতে পরিণত হবে। বিশ্বের বর্তমান এলাকাটি যেন তখন জাহান্নামের এলাকা হয়ে যাবে। বাস্তব অবস্থা আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানেন।

সূরা হিজর

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا —থেকে জানা গেল যে, পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল বৃত্তি সাব্যস্ত করে নেয়া এবং সাংসারিক বিলাস-ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহে মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নে মেতে থাকা কাফেরদের দ্বারাই হতে পারে, যারা পরকাল ও তার হিসাব-কিতাবে এবং পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করে না। মুমিনও পানাহার করে, জীবিকার প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যৎ কাজ-কারবারের পরিকল্পনাও তৈরী করে; কিন্তু মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে এ কাজ করে না। তাই প্রত্যেক কাজে হালাল ও হারামের চিন্তা করে এবং অনর্থক পরিকল্পনা প্রণয়নকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ চারটি বিষয় দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ঃ চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত না হওয়া (অর্থাৎ গোনাহ্র কারণে অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন না করা), কঠোর প্রাণ হওয়া দীর্ঘ আশা পোষণ করা এবং সংসারের প্রতি আসক্ত হওয়া।—(কুরতুবী)

দীর্ঘ আশা পোষণ করার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত ও লোভে মগ্ন এবং মৃত্যু ও পরকাল থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনায় মত্ত হওয়া।—(কুরতুবী) ধর্মীয় উদ্দেশ্যের জন্যে অথবা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ স্বার্থের জন্যে যেসব পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, এগুলোও পরকাল চিন্তারই একটি অংশ।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ এ উম্মতের প্রথম স্তরের মুক্তি পূর্ণ ঈমান ও সংসার নির্লিপ্ততার কারণে হবে এবং সর্বশেষ স্তরের লোক কার্পণ্য ও দীর্ঘ আকাঙ্খা পোষণের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

হযরত আবুদ্দারদা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার দামেশকের জামে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে দামেশকবাসীগণ ! তোমরা কি একজন সহানুভূতিশীল, হিতাকাঙ্খী ভাইয়ের কথা শুনবে? শুনে নাও, তোমাদের পূর্বে অনেক বিশিষ্ট লোক অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা প্রচুর ধন-সম্পদ একত্রিত করেছিল, সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরী করেছিল, আজ তারা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের গৃহগুলোই তাদের কবর হয়েছে এবং তাদের দীর্ঘ আশা ধোঁকা ও প্রতারণায় পর্যবসিত হয়েছে। আদ জাতি তোমাদের নিকটেই ছিল। তারা ধন, জন, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বাদি দ্বারা দেশকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। আজ এমন কেউ আছে কি, যে তাদের উত্তরাধিকার আমার কাছ থেকে দু'দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে সম্মত হবে?

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় দীর্ঘ আকাঙ্খার জাল তৈরী করে, তার আমল অবশ্যই খারাপ হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

মামুনের দরবারের একটি ঘটনা ঃ ইমাম কুরতুবী এ স্থলে মুত্তাসিল সনদ দ্বারা খলিফা মামুনুর রশীদের দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মামুনের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হত। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিত ব্যক্তিগণের অংশ গ্রহণের অনুমতি ছিল। এমনি এক আলোচনা সভায় জনৈক ইহুদী পণ্ডিত আগমন করল। আকার-আকৃতি, পোশাক ইত্যাদির দিকদিয়েও তাকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হচ্ছিল। তদুপরি তার আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অলংকারপূর্ণ এবং বিজ্ঞজনসুলভ। সভা শেষে মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি ইহুদী? সে স্বীকার করল। মামুন পরীক্ষার্থ তাকে বললেন ঃ তুমি যদি মুসলমান হয়ে যাও, তবে তোমার সাথে চমৎকার ব্যবহার করা হবে।

সে উত্তরে বলল ঃ আমি পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না। কথাবার্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল। কিন্তু এক বছর পর সে মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করল এবং আলোচনা সভায় ইসলামী ফেকা সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থিত করল। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে বললেন ঃ আপনি কি ঐ ব্যক্তি, যে বিগত বছর এসেছিল? সে বলল ঃ হাঁ, আমি ঐ ব্যক্তিই বটে। মামুন জিজ্ঞেস করলেন ঃ তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃত ছিলেন। এরপর এখন মুসলমান হওয়ার কি কারণ ঘটল?

সে বলল ঃ এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন হস্তলেখাবিশারদ। স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে উঁচু দামে বিক্রয় করি। আমি পরীক্ষার উদ্দেশে তওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করলাম। এগুলোতে অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে বেশকম করে লিখলাম। কপিগুলো নিয়ে আমি ইহুদীদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হলাম। ইহুদীরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে কপিগুলো কিনে নিল। অতঃপর এমনিভাবে ইঞ্জিলের তিন কপি কম-বেশ করে লিখে খ্রীষ্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানেও খ্রীষ্টানরা খুব খাতির যত্ন করে কপিগুলো আমার কাছ থেকে কিনে নিল। এরপর কোরআনের বেলায়ও আমি তাই করলাম। এরও তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে কম-বেশ করে দিলাম। এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ার্থ বের হলাম, তখন যে-ই দেখল, সে-ই প্রথমে আমার লেখা কপিটি নির্ভুল কি না, যাচাই করে দেখল। অতঃপর বেশ-কম দেখে কপিগুলো ফেরত দিয়ে দিল।

এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম যে, গ্রন্থটি হুবহু সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ্ তাআলা নিজেই এর সংরক্ষণ করছেন। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। এ ঘটনার বর্ণনাকারী কাযী ইয়াহ্ইয়া ইবনে আকতাম বলেন ঃ ঘটনাক্রমে সে বছরই আমার হজ্বব্রত পালন করার সৌভাগ্য হয়। সেখানে প্রখ্যাত আলেম সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার সাথে সাক্ষাৎ হলে ঘটনাটি তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে এরূপ হওয়াই বিধেয়। কারণ, কোরআন পাকে এ সত্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আকতাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোরআনের কোন আয়াতে আছে ? সুফিয়ান বললেন ঃ কোরআন পাক যেখানে তওরাত ও ইঞ্জিলের আলোচনা করেছে, সেখানে বলেছে ঃ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে আল্লাহর গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জিলের হেফাযতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ কারণেই যখন ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা হেফাযতের কর্তব্য পালন করেনি, তখন এ গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কোরআন পাক সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ —অর্থাৎ, আমিই এর সংরক্ষক।

আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং এর হেফাযত করার কারণে শত্রুরা হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও এর একটি নুক্তা এবং যের ও যবরে পার্থক্য আনতে পারেনি। রেসালত আমলের পর আজ চৌদ্দশ' বছর অতীত হয়ে গেছে। ধর্মীয় ও ইসলামী ব্যাপারাদিতে মুসলমানদের ত্রুটি ও অমনোযোগিতা সত্ত্বেও কোরআন পাক মুখস্থ করার ধারা বিশ্বের সর্বত্র পূর্ববৎ অব্যাহত রয়েছে। প্রতি যুগেই লাখে লাখে বরং কোটি কোটি মুসলমান যুবক বৃদ্ধ এবং বালক ও বালিকা এমন বিদ্যমান থাকে, যাদের বক্ষ-পাঁজরে আগাগোড়া কোরআন সংরক্ষিত রয়েছে। কোন বড় থেকে বড় আলেমের সাধ্য নেই যে, এক অক্ষর ভুল পাঠ করে। তৎক্ষণাৎ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেক লোক তার ভুল ধরে ফেলবে।

بروج শব্দটি برج এর বহুবচন। এটি বৃহৎ প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ, কাতাদাহ্, আবূ সালেহ্ প্রমুখ তফসীরবিদগণ এখানে بروج এর তফসীরে 'বৃহৎ নক্ষত্র' উল্লেখ করেছেন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশে বৃহৎ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি। এখানে 'অকাশ' বলে আকাশের শূন্য পরিমণ্ডলকে বোঝানো হয়েছে, যাকে সাম্প্রতিককালের পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়। আকাশগাত্র এবং আকাশের অনেক নীচে অবস্থিত শূন্য পরিমণ্ডল—এই উভয় অর্থে سماء শব্দের প্রয়োগ সুবিদিত। কোরআন পাকে শেষোক্ত অর্থেও স্থানে স্থানে سماء শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ যে আকাশের অভ্যন্তরে নয়; বরং শূন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিত, এর চূড়ান্ত আলোচনা কোরআন পাকের আয়াতের আলোকে এবং প্রাচীন ও আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের আলোকে ইনশাআল্লাহ্ সূরা ফোরকানের আয়াত تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا এর তফসীরে করা হয়।

উলকাপিণ্ড ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রথমতঃ প্রমাণিত হয় যে, শয়তানরা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আদম সৃষ্টির সময় ইবলীসের আকাশে অবস্থান এবং আদম ও হাওয়াকে প্রলুব্ধ করা ইত্যাদি আদমের

পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেকার ঘটনা। তখন পর্যন্ত জ্বিন ও শয়তানদের আকাশে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল না। আদমের ও ইবলীসের বহিষ্কারের পর এই প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সূরা জিনের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا

এ থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত শয়তানরা আকাশের সংবাদাদি ফেরেশতাদের পারস্পরিক কথাবার্তা থেকে শুনে নিত। এতদ্বারা এটা জরুরী হয় না যে, শয়তানরা আকাশে প্রবেশ করে সংবাদাদি শুনত। نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ বাক্য থেকেও বোঝা যায় যে, এরা চোরের মত শূন্য পরিমণ্ডলে মেঘের আড়ালে বসে সংবাদ শুনে নিত। এ বাক্য থেকে আরও জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বেও জ্বিন ও শয়তানদের প্রবেশাধিকার আকাশে নিষিদ্ধই ছিল, কিন্তু শূন্য পর্যন্ত পৌঁছে তারা কিছু কিছু সংবাদ শুনে নিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর ওহীর হেফাযতের উদ্দেশে আরও অতিরিক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে শয়তানদেরকে এ চুরি থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আকাশের অভ্যন্তরে ফেরেশতাদের কথাবার্তা আকাশের বাইরে থেকে শয়তানরা কিভাবে শুনতে পারত? উত্তর এই যে, এটা অসম্ভব নয়। খুব সম্ভব আকাশগাত্র শব্দ শ্রবণের প্রতিবন্ধক নয়। এছাড়া এটাও হতে পারে যে, ফেরেশতাগণ কোন সময় আকাশ থেকে নীচে অবতরণ করে পরস্পর কথাবার্তা বলত এবং শয়তানরা তা শুনে পালাত। বুখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এক হাদীস থেকে এ কথারই সমর্থন পাওয়া যায় যে, মাঝে মাঝে ফেরেশতারা আকাশের নীচে মেঘমালার স্তর পর্যন্ত অবতরণ করত এবং আকাশের সাংবাদাদি পরস্পর আলোচনা করত। শয়তানরা শূন্যে আত্মগোপন করে এসব সংবাদ শুনত। পরে উল্কাপাতের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। সূরা জ্বিনের وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ আয়াতের তফসীরে ইনশাআল্লাহ্-এর পূর্ণ বিবরণ আসবে।

কোরআন পাকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ওহীর হেফাযতের উদ্দেশে শয়তাদেরকে মারার জন্যে উল্কাপিণ্ডের সৃষ্টি হয়। এর সাহায্যে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করে দেয়া হয়, যাতে তারা ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে না পারে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, শূন্য পরিমণ্ডলে উল্কার অস্তিত্ব নতুন বিষয় নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বেও তারকা খসে পড়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যেত এবং পরেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় একথা কেমন করে বলা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য হিসেবে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করার উদ্দেশেই উল্কার সৃষ্টি? এতে যে প্রকান্তরে দার্শনিকদের ধারণাই সমর্থিত হয়। তারা বলেন ঃ সূর্যের খরতাপে যেসব বাষ্প মাটি থেকে উত্থিত হয়, তন্মধ্যে কিছু আগ্নেয় পদার্থও বিদ্যমান থাকে। উপরে পৌঁছার পর এগুলোতে সূর্যের তাপ অথবা অন্য কোন কারণে অতিরিক্ত উত্তাপ পতিত হলে এগুলো প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে এবং দর্শকরা মনে করে যে, কোন তারকাই বুঝি খসে পড়েছে। এটা আসলে তারকা নয়—উল্কা। সাধারণের পরিভাষায় একে 'তারকা খসে যাওয়া' বলেই ব্যক্ত করা হয়।

উত্তর এই যে, উভয় বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মাটি থেকে উত্থিত বাষ্প প্রজ্জ্বলিত হওয়া এবং কোন তারকা কিংবা গ্রহ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার পতিত হওয়া উভয়টিই সম্ভব। এমনটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ রীতি অনুযায়ী এরূপ ঘটনা পূর্ব থেকেই অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা বিশেষ কোন কাজ নেয়া হতো না। তাঁর আবির্ভাবের পর যেসব শয়তান চুরি-চামারি করে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে যায়, ওদেরকে বিতাড়িত করার কাজে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার ব্যবহার করা হয়।

আল্লামা আলুসী (রাহঃ) তাঁর রূহুল মা'আনী গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, হাদীসবিদ যুহ্রীকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বেও কি তারকা খসত? তিনি বললেন ঃ হাঁ। অতঃপর প্রশ্নকারী সূরা জ্বিনের উল্লেখিত আয়াতটি এ তথ্যের বিপক্ষে পেশ করলে তিনি বললেন ঃ উল্কা আগেও ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর যখন শয়তানদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হল, তখন থেকে উল্কা ওদেরকে বিতাড়নের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আকাশে তারকা খসে পড়ল। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ জাহেলিয়াত যুগে অর্থাৎ, ইসলাম পূর্বকালে তোমরা তারকা খসে যাওয়াকে কি মনে করতে? তাঁরা বললেন ঃ আমরা মনে করতাম যে, বিশ্বে কোন ধনের অঘটন ঘটবে অথবা কোন মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ কিংবা জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি বললেন ? এটা অর্থহীন ধারণা। কারও জন্মমৃত্যুর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব জ্বলন্ত অঙ্গার শয়তানদেরকে বিতাড়নের জন্যে নিক্ষেপ করা হয়।

মোটকথা, উল্কা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বক্তব্যও কোরআনের পরিপন্থী নয়। পক্ষান্তরে এটাও অসম্ভব নয় যে, এসব জ্বলন্ত অঙ্গার সরাসরি কোন তারকা থেকে খসে নিক্ষিপ্ত হয়। উভয় অবস্থাতে কোরআনের উদ্দেশ্য প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْۢبَتْنَا فِيهَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ
لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا
نُنَزِّلُهٗٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢١﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا
مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنٰكُمُوْهُ وَمَآ أَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ﴿٢٢﴾ وَ
إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا
الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ
رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَآنَّ
خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٨﴾
فَإِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٢٩﴾
فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ ﴿٣٠﴾ إِلَّآ إِبْلِيْسَ ۖ أَبٰىٓ أَنْ يَّكُوْنَ مَعَ
السّٰجِدِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالَ يٰٓإِبْلِيْسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ
لَمْ أَكُنْ لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٣٣﴾

(১৯) আমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। (২০) আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করছি এবং তাদের জন্যেও যাদের অন্নদাতা তোমরা নও। (২১) আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতারণ করি। (২২) আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুতঃ তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই (২৩) আমিই জীবনদান করি, মৃত্যুদান করি এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (২৪) আমি জেনে রেখেছি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে এবং আমি জেনে রেখেছি পশ্চাদগামীদেরকে। (২৫) আপনার পালনকর্তাই তাদেরকে একত্রিত করে আনবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানময়। (২৬) আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। (২৭) এবং জিনকে এর আগে লু-এর আগুনের দ্বারা সৃজিত করেছি। (২৮) আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন ঃ আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানব জাতির পত্তন করব। (২৯) অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো। (৩০) তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সেজদা করল। (৩১) কিন্তু ইবলীস—সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হল না। (৩২) আল্লাহ্ বললেন ঃ হে ইবলীস, তোমার কি হলো যে তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হলে না? (৩৩) বলল ঃ আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সেজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ এর এক অর্থ অনুবাদে নেয়া হয়েছে, অর্থাৎ রহস্যের তাকিদ অনুযায়ী প্রত্যেক উৎপন্ন বস্তুর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করেছেন। এরকম না হলে জীবন-ধারণ কঠিন হয়ে যেত এবং বেশী হলেও নানা অসুবিধা দেখা দিত। প্রয়োজনের তুলনায় গম, চাউল ইত্যাদি এবং উৎকৃষ্টতর ফল-মূল যদি এত বেশী উৎপন্ন হয়, যা মানুষ ও জন্তুদের খাওয়ার পরও অনেক উদ্বৃত্ত হয়, তবে পচা ছাড়া উপায় কি? এগুলো রাখাও কঠিন হবে এবং ফেলে দেয়ারও জায়গা থাকবে না।

এ থেকে জানা গেল যে, যেসব শস্য ও ফল-মূলের উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল সেগুলোকে এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করার শক্তিও আল্লাহ্ তাআলার ছিল যে, প্রত্যেকেই সর্বত্র সেগুলো বিনামূল্যে পেয়ে যেত এবং অবাধে ব্যবহার করার পরও বিরাট উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার পড়ে থাকত। কিন্তু এটা মানুষের জন্যে একটা বিপদ হয়ে যেত। তাই একটি বিশেষ পরিমাণে এগুলো নাযিল করা হয়েছে, যাতে তার মান ও মূল্য বজায় থাকে এবং অনাবশ্যক উদ্বৃত্ত না হয়।

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ —এর এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সব উৎপন্ন বস্তুকে আল্লাহ্ তাআলা একটি বিশেষ সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের মধ্যে উৎপন্ন করেছেন। ফলে তাতে সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফুল ও ফলকে বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন রঙ ও স্বাদ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার সমন্বয় ও সুন্দর দৃশ্য মানুষ উপভোগ করে বটে, কিন্তু এগুলোর বিস্তারিত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা তাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার।

وَأَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ থেকে وَمَآ أَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ পর্যন্ত খোদায়ী কুদরতের ঐ বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষ, জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী ও হিংস্র জন্তুর জন্যে প্রয়োজনমাফিক পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বত্র, সর্বাবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী পান, গোসল ধৌতকরণ এবং ক্ষেত ও উদ্যান সেচের জন্যে বিনামূল্যে পানি পেয়ে যায়। কূপ খনন ও পাইপ সংযোজনে কারও কিছু ব্যয় হলে তা সুবিধা অর্জনের মূল্য বৈ নয়। এক ফোঁটা পানির মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা কারও নেই এবং কারও কাছে তা দাবীও করা হয় না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে, খোদায়ী কুদরত কিভাবে সমুদ্রের পানিকে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র পৌছানোর অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। তিনি সমুদ্রে বাষ্প সৃষ্টি করেছেন। বাষ্প বৃষ্টির উপকরণ (মৌসুমী বায়ু) সৃষ্টি হয়েছে এবং উপরে বায়ু প্রবাহিত করে একে পাহাড়সম মেঘমালার পানিভর্তি জাহাজে পরিণত করেছে। অতঃপর এসব পানিভর্তি উড়ো জাহাজকে পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে দরকার পৌছে দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সেখানে যতটুকু পানি দেয়ার আদেশ হয়েছে, এই স্বয়ংক্রিয় উড়ন্ত মেঘমালা সেখানে সে পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছে।

এভাবে সমুদ্রের পানি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাসকারী মানুষ ও জীব-জন্তু ঘরে বসেই পেয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় পানির স্বাদ ও আন্যান্য গুণাগুণের মধ্যে অভিনব পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয়। কেননা, সমুদ্রের পানিকে আল্লাহ্ তাআলা এমন লবণাক্ত করেছেন যে, তা থেকে হাজার

হাজার টন লবণ উৎপন্ন হয়। এর রহস্য এই যে, পৃথিবীর বিরাট জলভাগে কোটি কোটি প্রকার জীব-জন্তু বাস করে। এরা পানিতেই মরে এবং পানিতেই পচে, গলে। এছাড়া সমগ্র স্থলভাগের ময়লা ও আবর্জনাযুক্ত পানি অবশেষে সমুদ্রের পানিতেই গিয়ে মিশে। এমতাবস্থায় সমুদ্রের পানি মিঠা হলে তা একদিনেই পচে যেত এবং এর উৎকট দুর্গন্ধে স্থলভাগে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষাই দুষ্কর হয়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তাআলা এই পানিকে এমন এসিডযুক্ত লোনা করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের আবর্জনা এখানে পৌঁছে ভস্ম ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মোটকথা, বর্ণিত রহস্যের ভিত্তিতে সমুদ্রের পানিকে লোনা বরং ক্ষারযুক্ত করা হয়েছে, যা পানও করা যায় না এবং পান করলেও পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। আল্লাহ্র ব্যবস্থাধীনে মেঘমালার আকারে পানির যেসব উড়ো জাহাজ তৈরী হয়, এগুলো শুধু সামুদ্রিক পানির ভান্ডারই নয়, বরং মৌসুমী বায়ু উত্থিত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে বর্ষিত হওয়ার সময় পর্যন্ত এগুলোতে বাহ্যিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে যে, লবণাক্ততা দূরীভূত হয়ে তা মিঠা পানিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সূরা মুরসালাতে এ দিকে ইঙ্গিত আছে। وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا —এখানে فرات শব্দের অর্থ এমন মিঠা পানি যদ্দ্বারা পিপাসা নিবৃত্ত হয়। অর্থ এই যে, আমি মেঘমালার প্রাকৃতিক যন্ত্রপাতি অতিক্রম করিয়ে সমুদ্রের লোনা ও ক্ষারযুক্ত পানিকে তোমাদের পান করার জন্যে মিঠা করে দিয়েছি।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ - এখানে সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদদের পক্ষ থেকে مستقدمين (অগ্রগামী দল) ও مستاخرين (পশ্চাদগামী দল)-এর তফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কাতাদাহ্ ও ইকরিমা বলেন ঃ যারা এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি, তারা পশ্চাদগামী। হযরত ইবনে আব্বাস ও যাহ্হাক বলেন ঃ যারা মরে গেছে, তারা অগ্রগামী এবং যারা জীবিত আছে, তারা পশ্চাদগামী। মুজাহিদ বলেন ঃ পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা অগ্রগামী এবং উম্মতে মুহাম্মদী পশ্চাদগামী। হাসান কাতাদাহ্ বলেন ঃ এবাদতকারী ও সৎকর্মশীলরা অগ্রগামী গোনাহ্গাররা পশ্চাদগামী। হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব, কুরতুবী, শা'বী প্রমুখ তফসীরবিদের মতে যারা নামাযের কাতারে অথবা জেহাদের সারিতে এবং অন্যান্য সৎকাজে এগিয়ে থাকে, তারা অগ্রগামী এবং যারা এসব কাজে পেছনে থাকে এবং দেরী করে, তারা পশ্চাদগামী। বলাবাহুল্য, এসব উক্তির মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। সবগুলোর সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার সর্বব্যাপী জ্ঞান উল্লেখিত সর্বপ্রকার অগ্রগামী ও পশ্চাদগামীতে পরিব্যাপ্ত।

কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ এ আয়াত থেকে নামাযের প্রথম কাতারে এবং আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যদি লোকেরা জানত যে, আযান দেয়া ও নামাযের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফযীলত কতটুকু, তবে সবাই প্রথম কাতারে দাঁড়াতে সচেষ্ট হত এবং প্রথম কাতারে সবার স্থান সংকুলান না হলে লটারীযোগে স্থান নির্ধারণ করতে হত।

কুরতুবী এতদসঙ্গে হযরত কা'বের উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, এ উম্মতের মধ্যে এমন মহাপুরুষও আছে, যারা সেজদায় গেলে পেছনের সবার গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। এ জন্যেই হযরত কা'ব পেছনের কাতারে থাকা পছন্দ করতেন যে, সম্ভবতঃ প্রথম কাতারসমূহে আল্লাহ্র কোন এমন নেক বান্দা থাকতে পারে, যার বরকতে আমার মাগফেরাত হয়ে যেতে পারে।

মানবদেহে আত্মা সঞ্চারিত করা এবং তাকে ফেরেশতাদের সেজদাযোগ্য করা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ রূহ (আত্মা) কোন যৌগিক, না মৌলিক পদার্থ—এ সম্পর্কে পন্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মতভেদ চলে আসছে। শায়খ আবদুর রঊফ মানাভী বলেন ঃ এ সম্পর্কে দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তির সংখ্যা এক হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে, কিন্তু এগুলোর সবই অনুমানভিত্তিক; কোনটিকেই নিশ্চিত বলা যায় না। ইমাম গাযযালী, ইমাম রাযী এবং অধিক সংখ্যক সূফী ও দার্শনিকদের উক্তি এই যে, রূহ কোন যৌগিক পদার্থ নয়, বরং একটি সূক্ষ্ম মৌলিক পদার্থ। রাযী এ মতের পক্ষে বারটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।

কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে রূহ একটি সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট বস্তু। نفخ শব্দের অর্থ ফুঁক দেয়া অথবা সঞ্চার করা। উপরোক্ত উক্তি অনুযায়ী রূহ যদি দেহবিশিষ্ট কোন বস্তু হয়ে থাকে, তবে সেটা ফুঁকে দেয়ার অনুকূল। তাই যদি রূহকে সূক্ষ্ম পদার্থ মেনে নেয়া হয়, তবে ফুঁকার অর্থ হবে দেহের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করা।—(বয়ানুল-কোরআন)

কাযী সানাউল্লা পানিপথী তফসীরে মাযহারীতে লিখেছেন ঃ রূহ দুই প্রকার—স্বর্গজাত ও মর্ত্যজাত। স্বর্গজাত রূহ আল্লাহ্ তাআলার একটি একক সৃষ্টি। এর স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীগণ এর আসল স্থান আরশের উপরে দেখতে পান। কেননা, এটা আরশের চাইতেও সূক্ষ্ম। স্বর্গজাত রূহ অন্তর্দৃষ্টিতে উপর-নীচে পাঁচটি স্তরে অনুভব করা হয়। পাঁচটি স্তর এই ঃ কল্ব, রূহ্, সির, খফী, আখ্ফা—এগুলো আদেশ- জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব। এ আদেশ জগতের প্রতি কোরআনে قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মর্ত্যজাত রূহ হচ্ছে ঐ সূক্ষ্ম বাষ্প, যা মানবদেহের চার উপাদান অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু থেকে উৎপন্ন। এই মর্ত্যজাত রূহকেই নফস বলা হয়।

আল্লাহ্ তাআলা মর্ত্যজাত রূহকে যাকে নফস বলা হয় উপরোক্ত স্বর্গজাত রূহের আয়নায় পরিণত করে দিয়েছেন। আয়নাকে সূর্যের বিপরীতে রাখলে যেমন অনেক দূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাতে সূর্যের ছবি প্রতিফলিত হয়, সূর্যকিরণে আয়নাও উজ্জ্বল হয় এবং তাতে সূর্যের উত্তাপও এসে যায়, যা কাপড়কে জ্বালিয়ে দিতে পারে, তেমনিভাবে স্বর্গজাত রূহের ছবি মর্ত্যজাত রূহের আয়নায় প্রতিফলিত হয়; যদিও তা মৌলিকত্বের কারণে অনেক উর্ধ্বে ও দূরত্বে অবস্থিত থাকে। প্রতিফলিত হয়ে স্বর্গজাত রূহের গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়া মর্ত্যজাত রূহের মধ্যে স্থানান্তরিত করে দেয়। নফসে সৃষ্ট এসব প্রতিক্রিয়াকেই আংশিক আত্মা বলা হয়।

মর্ত্যজাত রূহ্ তথা নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে প্রাপ্ত গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়াসহ সর্বপ্রথম মানবদেহের হৃৎপিন্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এ সম্পর্কেরই নাম হায়াত ও জীবন। মর্ত্যজাত রূহের সম্পর্কের ফলে সর্বপ্রথম মানুষের হৃৎপিন্ড জীবন ও ঐসব বোধশক্তি সৃষ্টি হয়, যেগুলোকে নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে লাভ করে। মর্ত্যজাত রূহ সমগ্র দেহে বিস্তৃত সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরায় সংক্রামিত হয়। এভাবে সে মানবদেহের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

মানবদেহের মর্ত্যজাত রূহের সংক্রামিত হওয়াকেই نفخ روح তথা আত্মা ফুঁকা বা আত্মা সঞ্চারিত করা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, এ সংক্রমণ কোন বস্তুতে ফুঁক ভরার সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল।

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ
اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ
يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ
الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي
الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ
الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ
عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾
لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ
آمِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ
سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا
بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ
عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾
إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾

(৩৪) আল্লাহ্ বললেন ঃ তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি বিতাড়িত। (৩৫) এবং তোমার প্রতি ন্যায় বিচারের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত। (৩৬) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (৩৭) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমাকে অবকাশ দেয়া হল, (৩৮) সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। (৩৯) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব। (৪০) আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। (৪১) আল্লাহ্ বললেন ঃ এটা আমা পর্যন্ত সোজা পথ। (৪২) যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই ; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে। (৪৩) তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। (৪৪) এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্যে এক-একটি পৃথক দল আছে। (৪৫) নিশ্চয় খোদাভীরুরা বাগান ও নির্ঝরিণীসমূহে থাকবে। (৪৬) বলা হবে ঃ এগুলোতে নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে প্রবেশ কর। (৪৭) তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের মত সামনা-সামনি আসনে বসবে। (৪৮) সেখানে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে না। (৪৯) আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৫০) এবং ইহাও যে, আমার শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৫১) আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের অবস্থা শুনিয়ে দিন। (৫২) যখন তারা তাঁর গৃহে আগমন করল এবং বলল ঃ সালাম। তিনি বললেন ঃ আমরা তোমাদের ব্যাপারেভীত।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা রূহকে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে مِنْ رُّوحِي বলেছেন, যাতে সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠে। কারণ মানবাত্মা উপকরণ ব্যতীত একমাত্র আল্লাহ্র আদেশেই সৃষ্ট হয়েছে। এছাড়া তার মধ্যে আল্লাহ্র নূর গ্রহণ করার এমন যোগ্যতা রয়েছে, যা মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের আত্মার মধ্যে নেই।

মানব সৃষ্টির মধ্যে মৃত্তিকাই প্রধান উপকরণ। এ জন্যেই কোরআন মানবসৃষ্টিকে মৃত্তিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানবসৃষ্টির উপকরণ দশটি জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তন্মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টিজগতের এবং পাঁচটি আদেশ জগতের। সৃষ্টিজগতের চার উপাদান আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং পঞ্চম হচ্ছে এ চার থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বাষ্প যাকে মর্ত্যজাত রূহ বা নফ্স বলা হয়। আদেশজগতের পাঁচটি উপকরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, কলব, রূহ, সির, খফী ও আখফা।

এ পরিব্যাপ্তির কারণে মানুষ খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং মা'রেফতের নূর, ইশক ও মহব্বতের জ্বালা বহনের যোগ্য পাত্র বিবেচিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার আকৃতিমুক্ত সঙ্গ লাভ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ المرء مع من احب অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গলাভ করবে, যাকে সে মহব্বত করে।

খোদায়ী দ্যুতির গ্রহণ ক্ষমতা এবং খোদায়ী সঙ্গলাভের কারণেই খোদায়ী রহস্য দাবী করেছে যে, মানুষকে ফেরেশতাগণ সেজদা করুক। আল্লাহ্ বলেন ঃ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (তারা সবাই তার প্রতি সেজদায় অবনত হলো)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত বান্দাদের উপর শয়তানী কারসাজির প্রভাব পড়ে না। কিন্তু বর্ণিত আদমের কাহিনীতে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম ও হাওয়ার উপর শয়তানের চক্রান্ত সফল হয়েছে। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কোরআন বলে ঃ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا (আলে-এমরান)। এ থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের উপরও শয়তানের ধোঁকা এ ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্র বিশেষ বান্দাদের উপর শয়তানের আধিপত্য বিস্তৃত না হওয়ার অর্থ এই যে, তাদের মন-মস্তিষ্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধির উপর শয়তানের এমন আধিপত্য বিস্তৃত হয় না যে, তাঁরা নিজ ভ্রান্তি কোন সময় বুঝতেই পারেন না। ফলে তওবা করার শক্তি হয় না কিংবা কোন ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ্ করে ফেলেন।

উল্লেখিত ঘটনাবলী এ তথ্যের পরিপন্থী নয়। কারণ, আদম ও হাওয়া তওবা করেছিলেন এবং তা কবুলও হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরামও তওবা করেছিলেন এবং শয়তানের চক্রান্তে যে গুনাহ্ করেছিলেন, তা মাফ করা হয়েছিল।

জাহান্নামের সাত দরজা ঃ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ — ইমাম আহ্মদ, ইবনে জরীর তাবারী ও বায়হাকী হযরত আলীর রেওয়ায়েতে লিখেন যে, উপর নীচের স্তরের দিক দিয়ে জাহান্নামের দরজা সাতটি। কেউ কেউ

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي
عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ
بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن
رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا
الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا آلَ
لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ
الْغَابِرِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ
مُّنكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَ
أَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ
اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا
حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ
مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾
قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا
تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي
إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧١﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾

(৫৩) তারা বলল ঃ ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে একজন জ্ঞানবান ছেলে-সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। (৫৪) তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আমাকে এমতাবস্থায় সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন আমি বার্ধক্যে পৌছে গেছি? (৫৫) তারা বলল ঃ আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি। অতএব আপনি নিরাশ হবেন না। (৫৬) তিনি বললেন ঃ পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়? (৫৭) তিনি বললেন ঃ অতঃপর তোমাদের প্রধান উদ্দেশ্য কি হে আল্লাহ্‌র প্রেরিতগণ? (৫৮) তারা বলল ঃ আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৫৯) কিন্তু লূতের পরিবার-পরিজন। আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে বাঁচিয়ে নেব। (৬০) তবে তার স্ত্রী। আমরা স্থির করেছি যে, সে থেকে যাওয়াদের দলভুক্ত হবে। (৬১) অতঃপর যখন প্রেরিতরা লূতের গৃহে পৌছল। (৬২) তিনি বললেন ঃ তোমরা তো অপরিচিত লোক। (৬৩) তারা বলল ঃ না, বরং আমরা আপনার কাছে ঐ বস্তু নিয়ে এসেছি, যে সম্পর্কে তারা বিবাদ করত। (৬৪) এবং আমরা আপনার কাছে সত্য বিষয় নিয়ে এসেছি এবং আমরা সত্যবাদী। (৬৫) অতএব আপনি শেষরাত্রে পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে যান এবং আপনি তাদের পশ্চাদনুসরণ করবেন না এবং আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছন ফিরে না দেখে। আপনারা যেখানে আদেশ প্রাপ্ত হচ্ছেন সেখানে যান। (৬৬) আমি লূতকে এ বিষয় পরিজ্ঞাত করে দেই যে, সকাল হলেই তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেয়া হবে। (৬৭) শহরবাসীরা আনন্দ-উল্লাস করতে করতে পৌছল। (৬৮) লূত বললেন ঃ তারা আমার মেহমান। অতএব আমাকে লাঞ্ছিত করো না। (৬৯) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার ইযযত নষ্ট করো না। (৭০) তারা বলল ঃ আমরা কি আপনাকে জগৎদ্বাসীর সমর্থন করতে নিষেধ করিনি। (৭১) তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা একান্ত কিছু করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে। (৭২) আপনার প্রাণের কসম, তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল।

এগুলাকে সাধারণ দরজার মত সাব্যস্ত করেছেন। প্রত্যেক দরজা বিশেষ প্রকারের অপরাধীদের জন্যে নির্দিষ্ট থাকবে।—(কুরতুবী)

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ — এ আয়াত থেকে জান্নাতের দু'টি বৈশিষ্ট্য জানা গেল। (এক) সেখানে কেউ কোন ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করবে না। দুনিয়ার অবস্থা এর বিপরীত। এখানে কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ করলে তো ক্লান্তি হয়ই ; বিশেষ আরাম এমনকি চিত্তবিনোদনেও মানুষ কোন না কোন সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দুর্বলতা অনুভব করে, তা যতই সুখকর কাজ ও বৃত্তি হোক না কেন।

দ্বিতীয়তঃ জানা গেল যে, জান্নাতের আরাম, সুখ ও নেয়ামত কেউ পেলে তা চিরস্থায়ী হবে। এগুলো কোন সময় হ্রাস পাবে না এবং এগুলো থেকে কাউকে বহিষ্কৃতও করা হবে না। সূরা ছোয়াদে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ —অর্থাৎ, এ হচ্ছে আমাদের রিযিক, যা কোন সময় শেষ হবে না। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ —অর্থাৎ, তাদেরকে কোন সময় এসব নেয়ামত ও সুখ থেকে বহিষ্কার করা হবে না। দুনিয়ার ব্যাপারাদি এর বিপরীত। এখানে যদি কেউ কাউকে কোন বিরাট নেয়ামত বা সুখ দিয়েও দেয় তুবও সদাসর্বদা এ আশঙ্কা লেগেই থাকে যে, দাতা কোন সময় নারাজ হয়ে যদি তাকে বের করে দেয়।

একটি তৃতীয় সম্ভাবনা ছিল এই যে, জান্নাতের নেয়ামত শেষ হবে না এবং জান্নাতীকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না, কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতে সে নিজেই যদি অতিষ্ট হয়ে যায় এবং বাইরে চলে যেতে চায়। কোরআন পাক এ সম্ভাবনাকেও একটি বাক্যে নাকচ করে দিয়েছে ঃ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا অর্থাৎ, তারাও সেখান থেকে ফিরে আসার বাসনা কোন সময়ই পোষণ করবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَعَمْرُكَ —রূহুল মা'আনীতে অধিকসংখ্যক তফসীরবিদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, لَعَمْرُكَ – এর মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর আয়ুর কসম রেখেছেন। বায়হাকী দালায়েলুন্নবুওয়াত গ্রন্থে এবং আবুনয়ীম ও ইবনে মারদুবিয়াহ্ প্রমুখ তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র সৃষ্টজগতের মধ্যে কাউকে মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর চাইতে অধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করেননি। এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলা কোন পয়গম্বর অথবা ফেরেশতার আয়ুর কসম খাননি। এবং আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আয়ুর কসম খেয়েছেন। এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ
أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَانتَقَمْنَا
مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ
الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾
وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٢﴾
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ
الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ
سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمُدَّنَّ
عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ
عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا
النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾

(৭৩) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তাদেরকে প্রচন্ড একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল। (৭৪) অতঃপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর কঙ্করের প্রস্তর বর্ষণ করলাম। (৭৫) নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৭৬) জনপদটি সোজা পথে অবস্থিত রয়েছে। (৭৭) নিশ্চয় এতে ঈমানদারদের জন্যে নিদর্শন আছে। (৭৮) নিশ্চয় গহীন বনের অধিবাসীরা পাপী ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। উভয় বস্তি প্রকাশ্য রাস্তার উপর অবস্থিত। (৮০) নিশ্চয় হিজরের বাসিন্দারা পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। (৮১) আমি তাদেরকে নিজের নিদর্শনাবলী দিয়েছি। অতঃপর তারা এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৮২) তারা পাহাড়ে নিশ্চিন্তে ঘর খোদাই করত। (৮৩) অতঃপর এক প্রত্যূষে তাদের উপর একটা শব্দ এসে আঘাত করল। (৮৪) তখন কোন উপকারে আসল না যা তারা উপার্জন করেছিল। (৮৫) আমি নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা আছে তা তাৎপর্যহীন সৃষ্টি করিনি। কেয়ামত অবশ্যই আসবে। অতএব পরম ঔদাসীন্যের সাথে ওদের ক্রিয়াকর্ম উপক্ষো করুন। (৮৬) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (৮৭) আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কোরআন দিয়েছি। (৮৮) আপনি চক্ষু তুলে ঐ বস্তুর প্রতি দেখবেন না, যা আমি তাদের মধ্যে কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্যে দিয়েছি, তাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না আর ঈমানদারদের জন্যে স্বীয় বাহু নত করুন। (৮৯) আর বলুন : আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক। (৯০) যেমন আমি নাযিল করেছি যারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত তাদের উপর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ এতেআল্লাহ্তাআলা সেসব জনপদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আরব থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এসব জনপদ অবস্থিত। এতদসঙ্গে আরও বলেছেন যে, এগুলোতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে।

অন্য এক আয়াতে এসব জনপদ সম্পর্কে আরও বলেছেন যে, لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا —অর্থাৎ, এসব জনপদ আল্লাহ্র আযাবের ফলে জনশূন্য হওয়ার পর পুনর্বার আবাদ হয়নি। তবে কয়েকটি জনপদ এর ব্যতিক্রম। এ বিবরণ সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা এসব জনপদ ও তাদের ঘর-বাড়ীকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে শিক্ষার উপকরণ করেছেন।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন এসব স্থান অতিক্রম করেছেন, তখন আল্লাহ্র ভয়ে তাঁর মস্তক নত হয়ে গেছে এবং তিনি সওয়ারীর উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে সেসব স্থান পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ কর্মের ফলে একটি সুন্নত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তা এই যে, যেসব স্থানে আল্লাহ্ তাআলার আযাব এসেছে, সেগুলোকে তামাশার ক্ষেত্রে পরিণত করা খুবই পাষাণ হৃদয়ের কাজ। বরং এগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করার পন্থা এই যে, সেখানে পৌঁছে আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির কথা ধ্যান করতে হবে এবং অন্তরে তাঁর আযাবের ভীতি সঞ্চার করতে হবে।

কোরআন পাকের বক্তব্য অনুযায়ী লূত (আঃ)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ আজও আরব থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার পার্শ্বে জর্দানের এলাকায় সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে যথেষ্ট নীচের দিকে একটি বিরাট মরুভূমির আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এর একটি বিরাট পরিধিতে বিশেষ এক প্রকার পানি নদীর আকার ধারণ করে আছে। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ, ইত্যাদি জন্তু জীবিত থাকতে পারে না। এ জন্যেই একে মৃত সাগর' ও 'লূত সাগর' নামে অভিহিত করা হয়। অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে, এতে পানির অংশ খুব কম এবং তেল জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তাই এতে কোন সামুদ্রিক জন্তু জীবিত থাকতে পারে না।

আজকাল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এখানে কিছুসংখ্যক আবাসিক দালান-কোঠা ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। পরকাল থেকে উদাসীন বস্তুবাদী মানুষ একে পর্যটন ক্ষেত্রে পরিণত করে রেখেছে। তারা নিছক তামাশা হিসেবে এসব এলাকা দেখার জন্যে গমন করে। এহেন উদাসীনতার প্রতিকারার্থে কোরআন পাক অবশেষে বলেছে : إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ, এসব ঘটনা ও ঘটনাস্থল প্রকৃতপক্ষে অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন মুমিনদের জন্যে শিক্ষাদায়ক। একমাত্র ঈমানদাররাই এ শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয় এবং অন্যরা এসব স্থানকে নিছক তামাশার দৃষ্টিতে দেখে চলে যায়।

সূরা ফাতিহা সমগ্র কোরআনের মূল অংশ ও সারমর্ম : আলোচ্য আয়াতসমূহে সূরা ফাতেহাকে 'মহান কোরআন' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূরা ফাতিহা এক দিক দিয়ে সমগ্র কোরআন। কেননা, ইসলামের সব মূলনীতিই এতে ব্যক্ত হয়েছে।

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ
أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾ الَّذِينَ
يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ
أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ
مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

سورة النحل مكية وهي مائة وثمان وعشرون آية وست عشرة ركوعا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿١﴾ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾ خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣﴾ خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٤﴾ وَالْأَنْعَامَ
خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾

(৯১) যারা কোরআনকে খন্ড খন্ড করেছে। (৯২) অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। (৯৩) ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে। (৯৪) অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না। (৯৫) বিদ্রূপকারীদের জন্যে আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট। (৯৬) যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। অতএব অতিসত্বর তারা জেনে নেবে। (৯৭) আমি জানি যে আপনি তাদের কথাবার্তায় হতোদ্যম হয়ে পড়েন। (৯৮) অতএব আপনি পালনকর্তার সৌন্দর্য স্মরণ করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। (৯৯) এবং পালনকর্তার এবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে।

সূরা নাহ্‌ল

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১২৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে গেছে। অতএব এর জন্যে তাড়াহুড়া করো না। ওরা যেসব শরীক সাব্যস্ত করছে সেসব থেকে তিনি পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে। (২) তিনি স্বীয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা, নির্দেশসহ ফেরেশতাদেরকে এই মর্মে নাযিল করেন যে, হুশিয়ার করে দাও, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব আমাকে ভয় কর। (৩) যিনি যথাবিধি আকাশরাজি ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তারা যাকে শরীক করে তিনি তার বহু উর্ধ্বে (৪) তিনি মানবকে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে গেছে। (৫) চতুষ্পদ জন্তুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্যে শীত বস্ত্রের উপকরণ আছে, আর অনেক উপকার হয়েছে এবং কিছুসংখ্যককে তোমরা আহার্যে পরিণত করে থাক। (৬) এদের দ্বারা তোমাদের সম্মান হয়, যখন বিকালে চারণভূমি থেকে নিয়ে আস এবং সকালে চারণভূমিতে নিয়ে যাও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হাশরে কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের পবিত্র সত্তার কসম খেয়ে বলেছেন যে, সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোককে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন যে, এই জিজ্ঞাসাবাদ কি বিষয় সম্পর্কে হবে? তিনি বললেন ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র উক্তি সম্পর্কে। তফসীর কুরতুবীতে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের মতে এর অর্থ অঙ্গীকারকে কার্যক্ষেত্রে পূর্ণ করা, যার শিরোনাম হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।' শুধু মৌখিক উচ্চারণ উদ্দেশ্য নয়। কেননা, মৌখিক স্বীকারোক্তি তো মুনাফিকরাও করত। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ ঈমান কোন বিশেষ বেশভূষা ও আকার-আকৃতি ধারণ করা দ্বারা এবং ধর্ম শুধু কামনা দ্বারা গঠিত হয় না, বরং ঐ বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, যা অন্তরের অন্তঃস্থলে আসন লাভ করে এবং কর্ম তার সত্যায়ন করে ; যেমন যায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আন্তরিকতা সহকারে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সাহাবায়ে-কেরাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, এ বাক্যে আন্তরিকতার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ যখন এ বাক্য মানুষকে আল্লাহ্‌র হারাম ও অবৈধ কর্ম থেকে বিরত রাখবে, তখন তা আন্তরিকতা সহকারে হবে।—(কুরতুবী)

প্রচারকার্যে সাধ্যানুযায়ী ক্রমোন্নতি ঃ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ — এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরাম গোপনে গোপনে এবাদত ও তেলাওয়াত করতেন এবং প্রচারকর্মও সংগোপনে একজন-দু'জনের মধ্যে চালু ছিল। কেননা, খোলাখুলি প্রচারকার্যে কাফেরদের পক্ষ থেকে উৎপীড়নের আশঙ্কা ছিল। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী ও উৎপীড়নকারী কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই তখন থেকে নিশ্চিন্তে প্রকাশ্যভাবে তেলাওয়াত, এবাদত ও প্রচারকার্য শুরু হয়।

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ —বাক্যে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের নেতা ছিল পাঁচ ব্যক্তি ঃ আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে এয়াগুস, ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং হারিস ইবনে তালাতিলা। এই পাঁচ জনই অলৌকিকভাবে একই সময়ে হযরত জিব্রাঈলের হস্তক্ষেপে মৃত্যুবরণ করে। এই ঘটনা থেকে প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই নীতি জানা গেল যে, যে ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে সত্যকথা বললে কোন উপকার আশা করা যায় না, পরন্তু বক্তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেখানে গোপনে সত্য প্রচার করাও দুরস্ত ও বৈধ। তবে যখন প্রকাশ্যভাবে বলার শক্তি অর্জিত হয়, তখন প্রকাশ্যভাবেই বলা উচিত।

শত্রুর উৎপীড়নের কারণে মন ছোট হওয়ার প্রতিকার ঃ وَلَقَدْ نَعْلَمُ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি শত্রুর অন্যায় আচরণে মনে কষ্ট পায় এবং হতোদ্যম হয়ে পড়ে, তবে এর আত্মিক প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার তসবীহ ও এবাদতে মশগুল হয়ে যাওয়া। আল্লাহ্ স্বয়ং তার কষ্ট দূর করে দেবেন।

সূরা নাহ্‌ল

এ সূরা নাহ্‌লকে বিশেষ কোন ভূমিকা ছাড়াই কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী ও ভয়াবহ বিষয়বস্তু দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এর কারণ ছিল মুশরিকদের এই উক্তি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদেরকে কেয়ামত ও আযাবের ভয় দেখায় এবং বলে যে, আল্লাহ্ ত'আলা তাকে জয়ী করা এবং বিরোধীদেরকে শাস্তি দেয়ার ওয়াদা করেছেন। আমাদের তো এরূপ কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। এর উত্তরে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে গেছে। তোমরা তাড়াহুড়া করো না।

'আল্লাহ্‌র নির্দেশ' বলে এখানে এ ওয়াদা বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ তাআলা রসূল (সাঃ)–এর সাথে করেছেন যে, তাঁর শত্রুদেরকে পরাভূত করা হবে এবং মুসলমানরা বিজয়, সাহায্য ও সম্মান–প্রতিপত্তি লাভ করবে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ভীতিপ্রদ স্বরে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে গেছে ; অর্থাৎ আসার পথেই রয়েছে, যা তোমরা অতি সত্বর দেখে নেবে।

কেউ কেউ বলেন যে, এখানে 'আল্লাহ্‌র নির্দেশ' বলে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। এর এসে যাওয়ার অর্থও এই যে, আসা অতি নিকটবর্তী। সমগ্র জগতের বয়সের দিক দিয়ে দেখলে কেয়ামতের নিকটবর্তী হওয়া কিংবা এসে পৌছাও দূরবর্তী বিষয় নয়।—(বাহ্‌রে–মুহীত)

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তাআলা শিরক থেকে পবিত্র। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যে আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করছে, এটা কুফরী ও শিরক। আল্লাহ্ তাআলা এ থেকে পবিত্র। —(বাহ্‌রে–মুহীত)

একটি কঠোর সতর্কবাণীর মাধ্যমে তওহীদের দাওয়াত দেয়া এই আয়াতের সারমর্ম। দ্বিতীয় আয়াতে ইতিহাসগত দলীল দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত হয়েছে যে, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে এবং বিভিন্ন সময়ে যে রসূলই আগমন করেছেন তিনি জনসমক্ষে তওহীদের বিশ্বাসই পেশ করেছেন। অথচ বাহ্যিক উপায়াদির মাধ্যমে একজনের অবস্থা ও শিক্ষা অন্য জনের মোটেই জানা ছিল না। চিন্তা করুন, কমপক্ষে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মহাপুরুষ, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা সবাই যখন একই বিষয়ের প্রবক্তা, তখন স্বভাবতঃই মানুষ একথা বোঝতে বাধ্য হয় যে, বিষয়টি ভ্রান্ত হতে পারে না। বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে এককভাবে এ যুক্তিটিই যথেষ্ট।

আয়াতে روح শব্দ বলে হযরত ইবনে আব্বাসের মতে ওহী এবং অন্যান্য তফসীরবিদগণের মতে হেদায়েত বোঝান হয়েছে।—(বাহ্‌র) এ আয়াতে তওহীদের ইতিহাসগত প্রমাণ পেশ করার পর পরবর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের বিশ্বাসকে যুক্তিগতভাবে আল্লাহ্ তাআলার বিভিন্ন নেয়ামত বর্ণনা করে প্রমাণ করা হচ্ছে।

فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ — অর্থাৎ এই দুর্বল মানবকে যখন বল ও বাক্‌শক্তি দান করা হল, তখন সে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কেই বিতর্ক উত্থাপন করতে লাগল।

এরপর ঐসব বস্তু সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, যেগুলো মানুষের উপকারার্থেই বিশেষভাবে সৃজিত হয়েছে। কোরআন সর্বপ্রথম আরববাসীকেই সম্বোধন করেছিল। আরবদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। তাই প্রথমে এসবের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا

অতঃপর চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা মানুষের যেসব উপকার হয়, তন্মধ্যে দু'টি উপকার বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । (এক) لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ —অর্থাৎ, এসব জন্তুর পশম দ্বারা মানুষ বস্ত্র এবং চামড়া দ্বারা পরিধেয় ও টুপী তৈরী করে শীতকালে উত্তাপ হাসিল করে।

(দুই) وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ –অর্থাৎ মানুষ এসব জন্তু যবেহ্ করে খোরাকও তৈরী করতে পারে। যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন দুধ দ্বারা উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে। অন্যান্য সাধারণ উপকার বোঝার জন্যে বলা হয়েছে ঃ وَمَنَافِعُ —অর্থাৎ, জন্তুগুলোর মাংস, চামড়া অস্থি ও পশমের মধ্যে আরও অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। এ অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে ঐসব নবাবিষ্কৃত বস্তুর প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলো জৈব উপাদান দ্বারা মানুষের খাদ্য, পোষাক, ঔষধ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত হবে।

পরিশেষে এসব জন্তুর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের ভারী জিনিসপত্রের দূর–দূরান্তের শহর পর্যন্ত পৌছে দেয়, যেখানে তোমাদের এবং তোমাদের জিনিসপত্রের পৌছা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভবপর নয়। উট ও গরু বিশেষভাবে মানুষের এ সেবা বিরাটাকারে সম্পন্ন করে থাকে। আজকাল রেলগাড়ী, ট্রাক ও উড়োজাহাজের যুগেও মানুষের কাছে এরা উপেক্ষিত নয়। কারণ, এমনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে এসব নবাবিষ্কৃত যানবাহন অকোজো হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে এসব জন্তুকে কাজে লাগায়।

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ
الْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٧ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ
وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨
وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
أَجْمَعِينَ ٩ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ
شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠ يُنبِتُ لَكُم بِهِ
الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ
الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١١ وَسَخَّرَ
لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ وَالنُّجُومُ
مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٢
وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۗ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ١٣ وَهُوَ الَّذِي
سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا
مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٤

(৭) এরা তোমাদের বোঝা এমন শহর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌঁছতে পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু অত্যন্ত দয়ার্দ্র পরম দয়ালু। (৮) তোমাদের আরোহণের জন্যে এবং শোভার জন্যে তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করেন, যা তোমরা জান না। (৯) সরল পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে এবং পথগুলোর মধ্যে কিছু বক্র পথও রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন। (১০) তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর। (১১) এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্যে উৎপাদন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (১২) তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই বিধানের কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১৩) তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে যেসব রঙ-বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করে। (১৪) তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলঙ্কার। তুমি তাতে জলযানসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র কৃপা অন্বেষণ কর এবং যাতে তার অনুগ্রহ স্বীকার কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَنْعَامٌ —অর্থাৎ, উট, বলদ ইত্যাদির বোঝা বহনের কথা আলোচিত হওয়ার পর ঐসব জন্তুর কথা প্রসঙ্গতঃ উত্থাপন করা উপযুক্ত মনে হয়েছে, যেগুলো সৃষ্ট হয়েছে সওয়ারী ও বোঝা বহনের উদ্দেশে। এদের দুধ ও গোশতের সাথে মানুষের কোন উপকার সম্পৃক্ত নয়। কেননা, বিভিন্ন চারিত্রিক রোগের কারণ বিধায় এগুলো শরীয়তের আইনে নিষিদ্ধ। বলা হয়েছে ঃ

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً — অর্থাৎ, আমি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা এগুলোতে সওয়ার হও—বোঝা বহনের কথাও প্রসঙ্গতঃ এর মধ্যে এসে গেছে এবং তোমাদের শোভা ও সৌন্দর্যের উপকরণ হওয়াও এগুলোকে সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ। এখানে 'শোভা' বলে ঐ শানশওকত বোঝানো হয়েছে, যা সর্বসাধারণের মধ্যে মালিকদের জন্যে বর্তমান থাকে।

কোরআনে রেল, মোটর ও বিমানের উল্লেখ ঃ সওয়ারীর তিনটি জন্তু ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করার পর পরিশেষে অন্যান্য যানবাহন সম্পর্কে ভবিষ্যত পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে ঃ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ — অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ঐসব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যেগুলো তোমরা জান না। এখানে ঐসব নবাবিষ্কৃত যানবাহন ও গাড়ী বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল না ; যেমন রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি ; যেগুলো এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, এ ছাড়া ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এগুলো সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কাজ। এতে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের কাজ এতটুকুই যে, বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির সৃজিত ধাতব পদার্থসমূহে সংযোজিত করে বিভিন্ন কলকব্জা তৈরী করেছে। অতঃপর তাতে প্রকৃতি প্রদত্ত বায়ু, পানি, অগ্নি ইত্যাদি থেকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করেছে, কিংবা প্রকৃতি প্রদত্ত খনি থেকে পেট্রোল বের করে এসব যানবাহনে ব্যবহার করেছে। প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান একজোট হয়েও কোন লোহা, পিতল সৃষ্টি করতে পারে না এবং এলুমিনিয়াম জাতীয় কোন হালকা ধাতু তৈরী করতে পারে না। এমনিভাবে বায়ু ও পানি সৃষ্টি করাও তার সাধ্যাতীত। প্রকৃতির সৃজিত শক্তিসমূহের ব্যবহার শিক্ষা করাই তার একমাত্র কাজ। জগতের যাবতীয় আবিষ্কার এ ব্যবহারেরই বিস্তারিত বিবরণ। তাই সামান্য চিন্তা করলেই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে, যাবতীয় নতুন আবিষ্কার পরম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাআলারই সৃষ্টি।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, পূর্বোল্লেখিত সব বস্তুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করে خلق বলা হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ যানবাহন উল্লেখ করার পর ভবিষ্যত পদবাচ্য ব্যবহার করে يخلق বলা হয়েছে। এ পরিবর্তন থেকে ফুটে উঠেছে যে, এ শব্দটি ঐসব যানবাহন সম্পর্কিত যেগুলো এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং আল্লাহ্ তাআলা জানেন যে, ভবিষ্যতে কি কি যানবাহন সৃষ্টি করতে হবে। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে তিনি সেগুলোর উল্লেখ করে দিয়েছেন।

মাসআলা ঃ কোরআন পাক প্রথমে انعام অর্থাৎ, উট, গরু ছাগল

ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছে এবং এদের উপকারিতাসমূহের মধ্যে মাংস ভক্ষণকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা সাব্যস্ত করেছে। এরপর পৃথকভাবে বলেছেঃ وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ এসব উপকারিতাসমূহের মধ্যে সওয়ার হওয়া এবং এসবের দ্বারা শোভা অর্জনের কথা তো উল্লেখ হয়েছে ; কিন্তু গোশত ভক্ষণের কথা বলা হয়নি। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত হালাল নয়। খচ্চর ও গাধার গোশত যে হারাম, এ বিষয়ে জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ একমত। একটি স্বতন্ত্র হাদীসে এগুলোর অবৈধতা পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ; কিন্তু ঘোড়ার ব্যাপারে দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণিত আছে। একটি দ্বারা হালাল ও অপরটি দ্বারা হারাম হওয়া বোঝা যায়। এ কারণেই এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ হয়ে গেছে। কারও মতে হালাল এবং কারও মতে হারাম। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) এই পরস্পরবিরোধী প্রমাণের কারণে ঘোড়ার গোশতকে গাধা ও খচ্চরের মাংসের অনুরূপ হারাম বলেননি ; কিন্তু মাকরূহ বলেছেন।—(আহ্‌কামুল-কোরআন-জাসসাস)

মাসআলা ঃ এ আয়াত থেকে সৌন্দর্য ও শোভার বৈধতা জানা যায় যদিও গর্ব ও অহঙ্কার করা হারাম। পার্থক্য এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যের সারমর্ম হচ্ছে মনের খুশী অথবা আল্লাহ্‌র নেয়ামত প্রকাশ করা। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে নেয়ামতের যোগ্য হকদার মনে করে না এবং অপরকেও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে না; বরং তার দৃষ্টিতে এ কথাই থাকে যে, এটা আল্লাহ্‌র নেয়ামত। পক্ষান্তরে গর্ব ও অহঙ্কারের মধ্যে নিজেকে নেয়ামতের যোগ্য হকদার গণ্য করা হয় এবং অপরকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা—এটা হারাম।—(বয়ানুল-কোরআন)

وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ — شجر শব্দটি প্রায়ই বৃক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকে। কোন কোন সময় এমন প্রত্যেক বস্তুকেও شجر বলা হয় যা ভূ-পৃষ্ঠে উৎপন্ন হয়। ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। আলোচ্য আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। কেননা, এর পরেই জন্তুদের চরার কথা বলা হয়েছে। ঘাসের সাথেই এর বেশীর ভাগ সম্পর্ক تُسِيْمُوْنَ শব্দটি اسامة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জন্তুকে চারণক্ষেত্রে চরার জন্যে ছেড়ে দেয়া।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ — এসব আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার নেয়ামত এবং অভিনব রহস্য সহকারে জগত সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তারা এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পায়, যার ফলে আল্লাহ্‌ তাআলার তওহীদে যেন মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠে। এ কারণেই নেয়ামতগুলো উল্লেখ করে বার বার এ বিষয়ের প্রতি হুশিয়ার করা হয়েছে। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, এতে চিন্তাশীলদের জন্যে প্রমাণ রয়েছে। কেননা, ফসল ও বৃক্ষ এবং এ সবের ফল ও ফুলের যে সম্পর্ক আল্লাহ্‌ তাআলার কারিগরি ও রহস্যের সাথে রয়েছে তা কিছুটা চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে বৈ কি। মানুষের চিন্তা করা দরকার যে, শস্য কণা কিংবা আঁটি মাটির নীচে ফেলে রাখলে এবং পানি দিলে আপনা-আপনি বিরাট মহীরূহে পরিণতি হতে পারে না এবং তা থেকে রঙ-বেরঙের ফুল উৎপন্ন হতে পারে না। যা হয়,তাতে কোন কৃষক ভূস্বামীর কর্মের দখল নেই। বরং সবই সর্বশক্তিমানের কারিগরি ও রহস্য। এরপর বলা হয়েছে যে, দিবারাত্র ও তারকারাজি আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশের অনুগত হয়ে চলে। শেষে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ —অর্থাৎ, এগুলোর মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্যে বহু প্রমাণ রয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব বস্তু যে আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশের অনুবর্তী, তা বোঝতে তেমন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। যার সামান্যতম বুদ্ধি আছে, সে বোঝে নিতে পারবে। কেননা, উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপাদনের মধ্যে তা কিছু না কিছু মানবীয় কর্মের দখল ছিল, এখানে তাও নেই।

এরপর মাটির অন্যান্য উৎপন্ন ফসলের কথা উল্লেখ করে অবশেষে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ অর্থাৎ, এতে তাদের জন্যে প্রমাণ রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ক্ষেত্রেও গভীর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। কেননা, এটা সম্পূর্ণ জাজ্জ্বল্যমান সত্য। কিন্তু মনোযোগ সহকারে এদিকে দেখা এবং উপদেশ গ্রহণ করা শর্ত। নতুবা কোন নির্বোধ ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তি যদি এদিকে লক্ষ্যই না করে, তবে তার কি উপকার হতে পারে?

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ রাত্রি ও দিবসকে অনুবর্তী করার অর্থ এই যে, এগুলোকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করার জন্যে স্বীয় কুদরতের অনুবর্তী করে দিয়েছেন। রাত্রি মানুষকে আরামের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে এবং দিবস তার কাজকর্মের পথ প্রশস্ত করে। এগুলোকে অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, রাত্রি ও দিবস মানুষের নির্দেশ মেনে চলবে।

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং এগুলোতে মানুষের উপকার বর্ণনা করার পর এখন সমুদ্রগর্ভে মানুষের উপকারের জন্য কি কি নিহিত রয়েছে, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে। সমুদ্রে মানুষের খাদ্যের চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে মানুষ টাটকা গোশত লাভ করে।

لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا — এ বাক্যে মাছকে টাটকা গোশত বলে আখ্যায়িত করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মাছকে যবেহ করা শর্ত নয়। এ যেন আপনা-আপনি তৈরী গোশত।

وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا — এটা সমুদ্রের দ্বিতীয় উপকার। ডুবুরীরা সমুদ্র থেকে মূল্যবান অলঙ্কার সামগ্রী বের করে আনে। حلية এর শাব্দিক অর্থ শোভা, সৌন্দর্য। এখানে ঐসব রত্নরাজি ও মণিমুক্তা বোঝানো হয়েছে, যা সমুদ্রগর্ভ থেকে নির্গত হয় এবং মহিলারা এর দ্বারা অলঙ্কার তৈরী করে বিভিন্ন পন্থায় ব্যবহার করে। এ অলঙ্কার মহিলারা পরিধান করে থাকে; কিন্তু কোরআন পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করে تَلْبَسُوْنَهَا বলেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মহিলাদের অলঙ্কার পরিধান করা প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের দেখার স্বার্থে। মহিলার সাজ-সজ্জা করাটা প্রকৃতপক্ষে পুরুষের অধিকার। সে স্ত্রীকে সাজ-সজ্জার পোশাক ও অলঙ্কার পরিধান করতে বাধ্যও করতে পারে। এছাড়া পুরুষরাও আংটি ইত্যাদিতে মণিমুক্তা ব্যবহার করতে পারে।

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ এটা সমুদ্রের তৃতীয় উপকার। فلك শব্দের অর্থ নৌকা। مواخر শব্দটি ماخرة এর বহুবচন। مخر

وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا
لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ أَفَمَن
يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ
لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَ
مَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ
شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ
أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾
وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوا أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ
وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا
يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى
اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن
فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

(১৫) এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন যে, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও। (১৬) এবং তিনি পথনির্ণয়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, এবং তারকা দ্বারাও মানুষ পথের নির্দেশ পায়। (১৭) যিনি সৃষ্টি করেন,তিনি কি সে লোকের সমতুল্য যে সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি চিন্তা করবে না? (১৮) যদি আল্লাহ্‌র নেয়ামত গণনা কর, শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৯) আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। (২০) এবং যারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যদের ডাকে, ওরা তো কোন বস্তুই সৃষ্টি করে না; বরং ওরা নিজেরাই সৃজিত। (২১) তারা মৃত-প্রাণহীন এবং কবে পুনরুত্থিত হবে, জানে না। (২২) আমাদের ইলাহ্ একক ইলাহ্। অনন্তর যারা পরজীবনে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকার প্রদর্শন করেছে। (২৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে অবগত। নিশ্চিতই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না। (২৪) যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল করেছেন? তারা বলে ঃ পূর্ববর্তীদের কিস্‌সা-কাহিনী। (২৫) ফলে কেয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতাহেতু বিপথগামী করে। শুনে নাও, খুবই নিকৃষ্ট বোঝা যা তারা বহন করে। (২৬) নিশ্চয় চক্রান্ত করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের চক্রান্তের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন। এরপর উপর থেকে তাদের মাথায় ছাদ ধ্বসে পড়ে গেছে এবং তাদের উপর আযাব এসেছে যেখান থেকে তাদের ধারণাও ছিলনা।

এর অর্থ পানি ভেদ করা। অর্থাৎ, ঐসব নৌকা ও সামুদ্রিক জাহাজ, যেগুলো পানির ঢেউ ভেদ করে পথ অতিক্রম করে।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা সমুদ্রকে দূর-দূরান্তের দেশে সফর করার রাস্তা করেছেন এবং দূর-দূরান্তে সফর করা ও পণ্যদ্রব্য আমদানী-রপতানী করা সহজ করে দিয়েছেন। একে জীবিকা উপার্জনের একটি উত্তম উপায় সাব্যস্ত করেছে। কেননা, সমুদ্রপথের ব্যবসা-বাণিজ্য করা সর্বাধিক লাভজনক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ - رواسى শব্দটি راسية এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী পাহাড়। تميد শব্দটি ميد থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আন্দোলিত হওয়া এবং অস্থিরভাবে টলমল করা।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা অনেক রহস্যের অধীনে ভূ-মণ্ডলকে নিবিড় ও ভারসাম্যবিহীন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেননি। তাই এটা কোন দিক দিয়ে ভারী এবং কোন দিক দিয়ে হালকা হয়েছে। অন্যথায় এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল, ভূ-পৃষ্ঠের অস্থিরভাবে আন্দোলিত হওয়া। সাধারণ বিজ্ঞানীদের ন্যায় পৃথিবীকে স্থিতিশীল স্বীকার করা হোক কিংবা কিছুসংখ্যক প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীর মত একে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান মনে করা হোক—উভয় অবস্থাতেই এটা জরুরী ছিল। এই অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা এবং পৃথিবীর উৎপাদনকে ভারসাম্য পূর্ণ করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীতে পাহাড়ের ওজন স্থাপন করেন—যাতে পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। এখন পৃথিবী অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের মত চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান কি না, এ সম্পর্কে কোরআন পাকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন কিছুই নেই। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে ফিসাগোর্সের অভিমত ছিল এই যে, পৃথিবী চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান। আধুনিক বিজ্ঞানীরা সবাই এ ব্যাপারে একমত। নতুন গবেষণা ও অভিজ্ঞতা এ মতবাদকে আরও ভাস্বর করে তুলছে। পাহাড়ের সাহায্যে যে অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা হয়েছে, তা পৃথিবীর জন্যে অন্যান্য গ্রহের ন্যায় যে গতি প্রমাণ করা হয়, তার জন্যে আরও অধিক সহায়ক হবে।

وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ উপরে বাণিজ্যিক সফরের কথা বলা হয়েছে। তাই এসব সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ করা এখানেও সমীচীন মনে হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্ তাআলা পথিকদের পথ অতিক্রম ও মনযিলে-মকসুদে পৌঁছার জন্যে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন। তাই বলা হয়েছে ঃ وَعَلَامَاتٍ অর্থাৎ, আমি পৃথিবীতে রাস্তা চেনার জন্যে পাহাড়, নদী, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদির সাহায্যে অনেক চিহ্ন স্থাপন করেছি। বলাবাহুল্য, ভূ-পৃষ্ঠ যদি একটি চিহ্নবিহীন পরিমণ্ডল হত তবে মানুষ কোন গন্তব্যস্থানে পৌঁছার জন্যে পথিমধ্যে কতই না ঘুরপাক খেত।

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ অর্থাৎ, পথিক যেমন ভূ-পৃষ্ঠের চিহ্নের দ্বারা রাস্তা চেনে, তেমনি তারকারাজির সাহায্যেও দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে রাস্তা চিনে নেয়। এ বক্তব্য এদিকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, তারকারাজি সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য অন্যকিছু হলেও রাস্তার পরিচয় লাভ করা এগুলোর অন্যতম উপকারিতা।

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ
كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ
الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٧﴾ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ
ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ بَلٰٓى اِنَّ
اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ
اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْا خَيْرًا لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ
هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٠﴾
جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا
مَا يَشَآءُوْنَ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣١﴾ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ
الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٢﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ
يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ
اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٣٣﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ
مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٤﴾

(২৭) অতঃপর কেয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন : আমার অংশীদাররা কোথায়, যাদের ব্যাপারে তোমরা খুব হঠকারিতা করতে? যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলবে : নিশ্চয়ই আজকের দিনে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি কাফেরদের জন্যে, (২৮) ফেরেশতারা তাদের জান এমতাবস্থায় কবজ করে যে, তারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে। তখন তারা আনুগত্য প্রকাশ করবে যে, আমরা তো কোন মন্দ কাজ করতাম না। হাঁ নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত আছেন, যা তোমরা করতে। (২৯) অতএব জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, এতেই অনন্তকাল বাস কর। আর অহংকারীদের আবাসস্থল কতই নিকৃষ্ট! (৩০) পরহেযগারদেরকে বলা হয় : তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল করেছেন? তারা বলে : মহাকল্যাণ। যারা এ জগতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে এবং পরকালের গৃহ আরও উত্তম। পরহেযগারদের গৃহ কি চমৎকার? (৩১) সর্বদা বসবাসের উদ্যান, তারা যাতে প্রবেশ করবে। এর পাদদেশে দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয়। তাদের জন্যে তাতে তা-ই রয়েছে, যা তারা চায়। এমনিভাবে প্রতিদান দেবেন আল্লাহ্র পরহেযগারদেরকে, (৩২) ফেরেশতা যাদের জান কবজ করেন তাদের পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশতারা বলে : তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে, তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর। (৩৩) কাফেররা কি এখন অপেক্ষা করছে যে,তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে কিংবা আপনার পালনকর্তার নির্দেশ পৌছবে? তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করেছিল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি অবিচার করেননি; কিন্তু তারা স্বয়ং নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। (৩৪) সুতরাং তাদের মন্দ কাজের শাস্তি তাদেরই মাথায় আপতিত হয়েছে এবং তারা যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই উল্টে তাদের উপর পড়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

০ কাফেরদের প্রথম সন্দেহ ছিল এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের কুফর, শিরক ও অবৈধ কাজকর্ম পছন্দ না করলে তিনি সজোরে আমাদেরকে বিরত রাখেন না কেন?

এ সন্দেহ যে অসার; তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই এর জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে শুধু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, এহেন অনর্থক ও বাজে প্রশ্ন শুনে আপনি দুঃখিত হবেন না। সন্দেহটি যে অসার, তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যে মূল ভিত্তির উপর এ দৃশ্যজগতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতে মানুষকে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন রাখা হয়নি। তাকে এক প্রকার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এ ক্ষমতাকে সে আল্লাহ্র আনুগত্যে প্রয়োগ করলে পুরস্কার এবং নাফরমানীতে প্রয়োগ করলে আযাবের অধিকারী হয়। কেয়ামত এবং হাশর ও নশরের যাবতীয় হাঙ্গামা এরই ফলশ্রুতি। যদি আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে আনুগত্যে বাধ্য করতে চাইতেন, তবে আনুগত্যের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কার ছিল? কিন্তু রহস্যের তাগিদে এরূপ বাধ্য করা সঠিক ছিল না। ফলে মানুষকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সুতরাং এখন কাফেরদের একথা বলা যে, আমাদের ধর্মমত আল্লাহ্র কাছে পছন্দ না হলে আমাদের বাধ্য করেন না কেন, একটি বোকামী ও হঠকারিতা প্রসূত প্রশ্ন বৈ নয়।

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ
مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ
كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ
وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾ إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾ وَ
أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ
بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾
لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا
أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا
ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

(৩৫) মুশরিকরা বলল ঃ যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে আমরা তাঁকে ছাড়া কারও এবাদত করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরাও করত না এবং তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোন বস্তুই আমরা হারাম করতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করেছে। রসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী পৌছিয়ে দেয়া। (৩৬) আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে। (৩৭) আপনি তাদেরকে সুপথে আনতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী করেন তিনি তাকে পথ দেখান না এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (৩৮) তারা আল্লাহ্‌র নামে কঠোর শপথ করে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই এর পাকাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে। কিন্তু, অধিকাংশ লোক জানে না। (৩৯) তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল তা প্রকাশ করা যায় এবং যাতে কাফেরেরা জেনে নেয় যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। (৪০) আমি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করি ; তখন তাকে কেবল এতটুকুই বলি যে, হয়ে যাও। সুতরাং তা হয়ে যায়। (৪১) যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র জন্যে গৃহত্যাগ করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেব এবং পরকালের পুরস্কার তো সর্বাধিক ; হায়! যদি তারা জানত। (৪২) যারা দৃঢ়পদ রয়েছে এবং তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপমহাদেশেও আল্লাহ্‌র কোন রসূল আগমন করেছেন কি?

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا এবং আরও একটি আয়াত وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ থেকে বাহ্যতঃ একথাই জানা যায় যে, উপমহাদেশীয় এলাকাসমূহেও আল্লাহ্ তাআলার পয়গম্বর অবশ্যই আগমন করে থাকবেন। তিনি হয় এখানকারই অধিবাসী হবেন, না হয় অন্য কোন দেশের হবেন এবং তাঁর প্রতিনিধি ও প্রচারক এখানে এসে থাকবেন। অপরপক্ষে لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ আয়াত থেকে বোঝা যায়, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে উম্মতের কাছে প্রেরিত হয়েছেন, তাদের কাছে তাঁর পূর্বে কোন রসূল আগমন করেননি। এর উত্তর এরূপ হতে পারে যে, এখানে বাহ্যতঃ আরব সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর নবুওয়ত দ্বারা সর্বপ্রথম সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল (আঃ)–এর পর কোন পয়গম্বরের আগমন হয়নি। এজন্যেই কোরআন পাকে তাদেরকে الْأُمِّيِّينَ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এতে অপরিহার্য হয়ে পড়ে না যে, অবশিষ্ট বিশ্বেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর পূর্বে কোন পয়গম্বর আসেননি।

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা ঃ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا **ঃ** — এটি هجرة থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ দেশ ত্যাগ করা। আল্লাহ্‌র জন্যে দেশ ত্যাগ করা ইসলামে একটি বড় এবাদত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ **الهجرة تهدم ما كان قبلها** অর্থাৎ, হিজরতের পূর্বে মানুষ যেসব গোনাহ্ করে, হিজরত সেগুলোকে খতম করে দেয়।

হিজরত কোন কোন অবস্থায় ফরয, ওয়াজিব এবং কোন কোন অবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম হয়ে থাকে। এর বিস্তারিত বিধান সূরা নিসার ৯৭ নম্বর আয়াত أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا এর অধীনে বর্ণিত হয়েছে। এখানে শুধু মুহাজিরদের সাথে আল্লাহ্ তাআলার কৃত ওয়াদাসমূহ বর্ণিত হবে।

হিজরত দুনিয়াতেও সচ্ছল জীবিকার কারণ হয় কি?

আলোচ্য আয়াত কতিপয় শর্তাধীনে মুহাজিরদের সাথে দু'টি বিরাট ওয়াদা করা হয়েছে, প্রথমতঃ দুনিয়াতেই উত্তম ঠিকানা দেয়ার এবং দ্বিতীয়তঃ পরকালে বেহিসাব সওয়াবের। "দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা" এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। বসবাসের জন্যে গৃহ এবং সৎ প্রতিবেশী পাওয়া, উত্তম রিযিক পাওয়া, শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সাফল্য পাওয়া, সাধারণের মুখে মুহাজিরদের প্রশংসা ও সুখ্যাতি থাকা এবং পুরুষানুক্রমে পারিবারিক ইয্যত ও গৌরব পাওয়া—সবই এর অন্তর্ভুক্ত।—(কুরতুবী)

আয়াতের শানে নুযূল মূলতঃ ঐ প্রথম হিজরত, যা সাহাবায়ে কেরাম আবিসিনিয়া অভিমুখে করেন। এরূপ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, আবিসিনিয়ার হিজরত এবং পরবর্তী কালের মদীনার হিজরত উভয়টি এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এ ওয়াদা বিশেষ করে ঐ সাহাবায়ে কেরামের জন্যে, যাঁরা আবিসিনিয়ায় কিংবা মদীনায় হিজরত করেছিলেন। আল্লাহ্‌র এ ওয়াদা দুনিয়াতে পূর্ণ হয়ে গেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে।

আল্লাহ্ তাআলা মদীনাকে তাঁদের জন্যে কি চমৎকার ঠিকানা করেছিলেন। উৎপীড়নকারী প্রতিবেশীদের স্থলে তাঁরা সহানুভূতিশীল, মহানুভব প্রতিবেশী পেয়েছিলেন। তাঁরা শত্রুদের বিপক্ষে বিজয় ও সাফল্য লাভ করেছিলেন। হিজরতের পর অল্প কিছুদিন অতিবাহিত হতেই তাঁদের সামনে রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। যাঁরা ছিলেন ফকীর মিসকীন, তাঁরা হয়ে যান বিত্তশালী, ধনী। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ বিজিত হয়। তাঁদের চরিত্র মাধুর্য ও সৎকর্মের কীর্তি আবহমানকাল পর্যন্ত শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সবার মুখে উচ্চারিত হয়। তাঁদেরকে এবং তাঁদের বংশধরকে আল্লাহ্ তাআলা অসামান্য ইয্যত ও গৌরব দান করেন। এগুলো হচ্ছে পার্থিব বিষয়। পরকালের ওয়াদা পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে আবু হাইয়্যান বলেন ঃ

والذين هاجروا عام فى المهاجرين كائنا ما كانوا فيشمل اولـهـم واخرهـم অর্থাৎ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا আয়াতটি বিশ্বের সমস্ত মুহাজিরের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, যেকোন অঞ্চল ও যুগের মুহাজির হোক না কেন। তাই প্রথম যুগের হিজরতকারী মুহাজির এবং কেয়ামত পর্যন্ত আরও যত মুহাজির হবে, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণ তফসীরবিদের তাগিদও তাই। আয়াতের শানে নুযুল বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ শ্রেণীর লোক হলেও শব্দের ব্যাপকতা ধর্তব্য হয়ে থাকে। তাই সারা বিশ্বের এবং সর্বকালের মুহাজির আলোচ্য ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। উভয় ওয়াদা সব মুহাজিরের ক্ষেত্রে পূর্ণ হওয়া একটি নিশ্চিত ও অনিবার্য ব্যাপার।

এমনি ধরণের এক ওয়াদা মুহাজিরদের জন্যে সূরা নেসার নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً

এতে বিশেষ করে বাসস্থানের প্রশস্ততা এবং জীবিকার স্বচ্ছলতার ওয়াদা দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাক এসব ওয়াদার সাথে মুহাজিরদের কিছু গুণাবলী এবং হিজরতের কিছু শর্তাবলীও বর্ণনা করেছে। তাই এসব ওয়াদার যোগ্য অধিকারী ঐসব মুহাজিরই হতে পারে, যারা এসব গুণের বাহক এবং যারা প্রার্থিত শর্তসমূহ পূর্ণ করে।

তন্মধ্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে فِي اللّٰهِ অর্থাৎ, হিজরত করার লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন হতে হবে। এতে পার্থিব কাজ-কারবারের মুনাফা, চাকুরী এবং প্রবৃত্তিগত উপকারিতা উদ্দেশ্য হতে পারবে না। দ্বিতীয় শর্ত মুহাজিরদের নির্যাতিত হওয়া; যেমন বলা হয়েছে ঃ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا তৃতীয় গুণ প্রাথমিক কষ্ট ও বিপদাপদে সবর করা ও দৃঢ়পদ থাকা; যেমন বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا চতুর্থ গুণ যাবতীয় বস্তুনিষ্ঠ কলাকৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভরসা শুধু আল্লাহ্‌র উপর রাখা; অর্থাৎ, কায়মনোবাক্যে এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, বিজয় ও সাফল্য একমাত্র তাঁরই হাতে; যেমন বলা হয়েছে ঃ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাথমিক বিপদাপদ ও কষ্ট তো প্রত্যেক কাজে হয়েই থাকে। এগুলো অতিক্রম করার পরও যদি কোন মুহাজির উত্তম ঠিকানা ও উত্তম অবস্থা না পায়, তবে কোরআনের ওয়াদায় সন্দেহ করার পরিবর্তে নিজের নিয়ত, আন্তরিকতা ও কর্মের উৎকর্ষতা যাচাই করা দরকার। এগুলোর ভিত্তিতেই এ ওয়াদা করা হয়েছে। যাচাই করার পর সে জানতে পারবে যে, দোষ তার নিজেরই। কোথাও হয়তো নিয়তে ত্রুটি রয়েছে, কোথাও হয়তো সবর, দৃঢ়তা ও ভরসার অভাব আছে।

দেশত্যাগ ও হিজরতের বিভিন্ন বিধি-বিধান ঃ ইমাম কুরতুবী এস্থলে হিজরত ও দেশ ত্যাগের প্রকার ও বিধি-বিধান সম্পর্কে একটি উপকারী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পাঠকবর্গের উপকারার্থে নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল।

কুরতুবী ইবনে-আরাবীর বরাত দিয়ে লিখেন ঃ দেশ ত্যাগ করা এবং দেশ ভ্রমণ করা কোন সময় কোন বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় এবং কোন সময় কোন বস্তুর অন্বেষণের জন্যে হয়। প্রথম প্রকারকে হিজরত বলে। হিজরত ছয় প্রকার ঃ

(প্রথম) দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে যাওয়া। এ প্রকার সফর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলেও ফরয ছিল এবং কেয়ামত পর্যন্ত শক্তিসামর্থ্যের শর্তসহ ফরয, যদি দারুল কুফরে জান, মাল ও আবরুর নিরাপত্তা না থাকে কিংবা ধর্মীয় কর্তব্য পালন সম্ভব না হয়। এরপরও যদি কেউ দারুল কুফরে অবস্থান করে, তবে সে গোনাহ্গার হবে।

দ্বিতীয়, বেদআতের স্থান থেকে চলে যাওয়া। ইবনে-কাসেম বলেন ঃ আমি ইমাম মালেকের মুখে শুনেছি, এমন জায়গায় কোন মুসলমানের বসবাস করা হালাল নয়, যেখানে পূর্ববর্তী মনীষীদেরকে গালিগালাজ করা হয়। এই উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে-আরাবী লিখেন ঃ এটা সম্পূর্ণ নির্ভুল। কেননা, যদি তুমি কোন গর্হিত কাজ বন্ধ করতে না পার, তবে নিজে সেখান থেকে দূরে সরে যাও। এটা তোমার জন্যে জরুরী; যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ

তৃতীয়, যেখানে হারামের প্রাধান্য, সেখান থেকে চলে যাওয়া। কেননা, হালাল অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

চতুর্থ, দৈহিক নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। এরূপ সফর জায়েয; বরং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত। যেস্থানে শত্রুদের পক্ষ থেকে দৈহিক নির্যাতনের আশঙ্কা থাকে, সেস্থান ত্যাগ করা উচিত; যাতে আশঙ্কা মুক্ত হওয়া যায়। সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই প্রকার সফর করেন। তিনি কওমের নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে ইরাক থেকে সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং বলেন ঃ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ তারপর হযরত মূসা (আঃ) এমনি এক সফর মিসর থেকে মাদইয়ান অভিমুখে করেন। যেমন কোরআন বলে ঃ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ

পঞ্চম, দূষিত আবহাওয়া ও রোগের আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। ইসলামী শরীয়ত এরও অনুমতি দেয়; যেমন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কয়েকজন রাখালকে মদীনার বাইরে বনভূমিতে অবস্থান করার আদেশ দেন। কেননা, শহরের আবহাওয়া তাদের অনুকূলে ছিল না। এমনিভাবে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) আবু ওবায়দাকে রাজধানী জর্দান থেকে স্থানান্তরিত করে কোন মালভূমিতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন, যেখানে আবহাওয়া দূষিত নয়।

ষষ্ঠ, ধন-সম্পদ হেফাজতের জন্য সফর করা। কোন স্থানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব দেখলে সে স্থান ত্যাগ করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। কেননা, মুসলমানের ধন-সম্পদও তার জানের ন্যায় সম্মানার্হ। এই ছয় প্রকার তো ছিল ঐ দেশ ত্যাগের যা কোন বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয়। আর শেষোক্ত প্রকার অর্থাৎ, কোন বস্তুর অন্বেষণে যে সফর করা হয়, তা নয় ভাগে বিভক্ত।

(১) শিক্ষার জন্য সফর অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সৃষ্টজগত, অপার শক্তি ও বিগত জাতিসমূহের অবস্থা সরেযমীনে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশে বিশ্ব-পর্যটন করা। কোরআন পাক এরূপ সফরে উৎসাহিত করে বলেছেঃ

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

হযরত যুলকারনাইনের সফরও কোন কোন আলেমের মতে এ ধরণের সফর ছিল। কেউ কেউ বলেন ঃ তাঁর সফর পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র আইন প্রয়োগ করার উদ্দেশে ছিল।

(২) হজ্বের সফর। কতিপয় শর্তসহ এ সফর যে ইসলামী ফরয, তা সুবিদিত।

(৩) জেহাদের সফর। এটাও যে ফরয, ওয়াজিব অথবা মোস্তাহাব, তা সব মুসলমানের জানা রয়েছে।

(৪) জীবিকার অন্বেষণে সফর। স্বদেশে জীবিকার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগৃহীত না হলে অন্যত্র সফর করে জীবিকা অন্বেষণ করা অপরিহার্য।

(৫) বাণিজ্যিক সফর অর্থাৎ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ অর্জন করার জন্যে সফর করা। শরীয়তে এটাও জায়েয। আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ আয়াতে ابتغاء فضل (কৃপা অন্বেষণ) বলে বাণিজ্য বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা হজ্বের সফরেও বাণিজ্যের অনুমতি দান করেছেন। অতএব বাণিজ্যের জন্যে সফর করা আরও উত্তমরূপে বৈধ হবে।

(৬) জ্ঞান অর্জনের জন্যে সফর। ধর্ম পালনের জন্যে যতটুকু জরুরী, ততটুকু জ্ঞান অর্জনের জন্যে সফর করা ফরযে আইন এবং এর বেশীর জন্যে ফরযে কেফায়া।

(৭) কোন স্থানকে পবিত্র মনে করে সেদিকে সফর করা। তিনটি মসজিদ ব্যতীত এরূপ সফর বৈধ নয় ঃ মসজিদে হারাম (মক্কা), মসজিদে নববী (মদীনা) এবং মসজিদে আকসা (বায়তুল মোকাদ্দাস)। এ হচ্ছে কুরতুবী ও ইবনে-আরাবীর অভিমত। অন্যান্য আলেমের মতে সাধারণ পবিত্র স্থানসমূহের দিকে সফর করাও জায়েয।

(৮) ইসলামী সীমান্ত সংরক্ষণের জন্যে সফর। একে 'রিবাত' বলা হয়। বহু হাদীসে রিবাতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত রয়েছে।

(৯) স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে সফর। হাদীসে একেও পুণ্যকাজ আখ্যা দেয়া হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে সফর করে, তার জন্যে ফেরেশতাদের দোয়া করার কথা উল্লেখিত রয়েছে। এটা তখন, যখন কোন বৈষয়িক স্বার্থের জন্যে নয়; বরং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে তাদের সাথে সাক্ষাত করা হয়।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوٓا أَهْلَ
ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ
ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾
أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ
أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ
فِى تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ
رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ
يَتَفَيَّؤُا ظِلَٰلُهُۥ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ
دَٰخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن
دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓا إِلَٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِ
إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَإِيَّٰىَ فَٱرْهَبُونِ ﴿٥١﴾ وَلَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ
ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا بِكُم
مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ ﴿٥٣﴾
ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

(৪৩) আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে; (৪৪) প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে নির্দেশাবলী ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (৪৫) যারা কুচক্র করে, তারা কি এ বিষয়ে ভয় করে না যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন কিংবা তাদের কাছে এমন জায়গা থেকে আযাব আসবে, যা তাদের ধারণাতীত? (৪৬) কিংবা চলাফেরার মধ্যেই তাদেরকে পাকড়াও করবে, তারা তো তা ব্যর্থ করতে পারবে না। (৪৭) কিংবা ভীতি প্রদর্শনের পর তাদেরকে পাকড়াও করবেন? তোমাদের পালনকর্তা তো অত্যন্ত নম্র, দয়ালু। (৪৮) তারা কি আল্লাহ্র সৃজিত বস্তু দেখে না, যার ছায়া আল্লাহ্র প্রতি বিনীতভাবে সেজদাবনত থেকে ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে। (৪৯) আল্লাহ্কে সেজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে এবং ফেরেশতাগণ; তারা অহংকার করে না। (৫০) তারা তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং তারা যা আদেশ পায়, তা করে। (৫১) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা দুই উপাস্য গ্রহণ করো না—উপাস্য তো মাত্র একজনই। অতএব আমাকেই ভয় কর। (৫২) যা কিছু নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আছে তা তাঁরই এবাদত করা শাশ্বত কর্তব্য। তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে? (৫৩) তোমাদের কাছে যে সমস্ত নেয়ামত আছে, তা আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা যখন দুঃখ-কষ্টে পতিত হও তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর। (৫৪) এরপর যখন আল্লাহ্ তোমাদের কষ্ট দূরীভূত করে দেন, তখনই তোমাদের একদল স্বীয় পালনকর্তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতে থাকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করা ঃ আলোচ্য আয়াতের فَسْـَٔلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ বাক্যটি যদিও বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক হওয়ার কারণে এ জাতীয় সব ব্যাপারকে শামিল করে। তাই কোরআনী বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগত ও ইতিহাসগত বিধি যে, যারা বিধি-বিধানের জ্ঞান রাখে না, তারা যারা জানে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নেবে এবং তাদের কথামত কাজ করা জ্ঞানহীনদের উপর ফরয হবে। একেই তকলীদ (অনুসরণ) বলা হয়। এটা কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ এবং যুক্তিগতভাবেও এ পথ ছাড়া আমল অর্থাৎ, কর্মকে ব্যাপক করার আর কোন উপায় নেই। সাহাবিগণের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনরূপ মতানৈক্য ছাড়াই এ বিধি পালিত হয়ে আসছে। যারা তকলীদ অস্বীকার করে, তারাও এ তকলীদ অস্বীকার করে না যে,যারা আলেম নয়, তারা আলেমদের কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে কাজ করবে। বলাবাহুল্য, আলেমরা যদি অজ্ঞ জনসাধারণকে কোরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি বলেও দেন, তবে তারা এগুলোকে আলেমদের উপর আস্থার ভিত্তিতেই গ্রহণ করবে। কারণ, তাদের মধ্যে প্রমাণাদিকে বোঝা ও পরখ করার যোগ্যতা কোথায়? জ্ঞানীদের উপর আস্থা রেখে কোন নির্দেশকে শরীয়তের নির্দেশ মনে করে পালন করার নামই তো তকলীদ। এ তকলীদ যে বৈধ বরং জরুরী, তাতে কোনরূপ মতবিরোধের অবকাশ নেই। তবে যেসব আলেম কোরআন, হাদীস ও ইজমার ক্ষেত্রসমূহ বোঝার যোগ্যতা রাখে,তারা কারও তকলীদ না করে এমন বিধি-বিধানে সরাসরি কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী কাজ করতে পারে, যেগুলো কোরআন ও হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত রয়েছে এবং যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ী আলেমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু যেসব বিধান পরিষ্কারভাবে কোরআন ও হাদীসে উল্লেখিত নেই অথবা যেগুলোতে কোরআনী আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধিতা দৃষ্টিগোচর হয় অথবা যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়িগণের মধ্যে আয়াত কিংবা হাদীসের অর্থ নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে, সেসব বিধি-বিধান ইজতিহাদী বিষয়রূপে গণ্য হয় এবং পরিভাষায় এগুলোকে 'মুজতাহাদ ফিহ্মাসআলা' বলে। নিজে মুজতাহিদ নয়, এমন প্রত্যেক আলেমের পক্ষেও এ জাতীয় মাসআলায় কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা জরুরী। ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে এক আয়াত কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য মনে করে অবলম্বন করা এবং অন্য আয়াত কিংবা হাদীসকে অনগ্রগণ্য সাব্যস্ত করে ছেড়ে দেয়া তার পক্ষে বৈধ নয়।

এমনিভাবে কোরআন ও সুন্নতে যেসব বিধানের পরিষ্কার উল্লেখ নেই সেগুলো কোরআন ও সুন্নাহ্ বর্ণিত মূলনীতি অনুসরণ করে বের করা এবং সেগুলোর শরীয়তসম্মত নির্দেশ নির্ধারণ করাও এমন মুজতাহিদদের কাজ, যারা আরবী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখেন ; কোরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কিত যাবতীয় শাস্ত্রে দক্ষতা রাখেন এবং আল্লাহ্ ভীতি ও পরহেযগারীতে উচ্চ মর্তবায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যেমন ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফে'য়ী মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল, আওযায়ী, ফকীহ আবুল্লাইস (রহঃ) প্রমুখ। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে নবুওয়ত যুগের নৈকট্য এবং সাহাবী ও তাবেয়িগণের সংসর্গের বরকতে শরীয়তের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য বোঝার বিশেষ রুচি এবং বর্ণিত বিধানের উপর অবর্ণিত বিধানকে অনুমান করে শরীয়তসম্মত নির্দেশ বের করার অসাধারণ দক্ষতা

দান করেছিলেন। এ জাতীয় ইজতিহাদী মাসআলায় সাধারণ আলেমদের পক্ষেও কোন না কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা অপরিহার্য। মুজতাহিদ ইমামদের মতের বিরুদ্ধে কোন নতুন মত অবলম্বন করা ভুল।

এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ের আলেম, মুহাদ্দিস ও ফেকাহবিদগণ, ইমাম গায্যালী, রাযী, তিরমিযী, তাহাভী, মুযানী, ইবনে হুমাম, ইবনে কুদামা (রহঃ) এবং এই শ্রেণীর আরও লক্ষ লক্ষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেম আরবী ভাষা ও শরীয়ত সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদী মাসআলাসমূহে সর্বদা মুজতাহিদ ইমামদের তকলীদ করে গেছেন। তাঁরা সব ইমামের বিপরীতে নিজমতে কোন ফতোয়া দেয়াকে বৈধ মনে করেননি।

তবে উল্লেখিত মনীষীবৃন্দ জ্ঞান ও আল্লাহ্ ভীতিতে অনন্যসাধারণ মর্তবার অধিকারী ছিলেন। ফলে তাঁরা মুজতাহিদ ইমামগণের উক্তি ও মতামতসমূহকে কোরআন ও সুন্নতের আলোকে যাচাই-বাছাই করতেন। অতঃপর তাঁরা যে ইমামের উক্তিকে কোরআন ও সুন্নতের অধিক নিকটবর্তী দেখতেন, সেই ইমামের উক্তি গ্রহণ করতেন। কিন্তু ইমামগণের মত ও পথের বাইরে, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে কোন মত আবিষ্কার করাকে তাঁরা কখনও বৈধ মনে করতেন না। তকলীদের আসল স্বরূপ এতটুকুই।

এরপর দিন দিন জ্ঞানের মাপকাঠি সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতির পরিবর্তে মানবিক স্বার্থপরতা প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে যদি কোন মাসআলায় যে কোন ইমামের উক্তি গ্রহণ করার এবং অন্য মাসআলায় অন্য ইমামের উক্তি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়, তবে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে মানুষ শরীয়ত অনুসরণের নামে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যাবে। যে ইমামের উক্তিতে সে নিজ প্রবৃত্তির স্বার্থ পূর্ণ হতে দেখবে, সেই ইমামের উক্তিকেই গ্রহণ করবে। বলাবাহুল্য এরূপ করার মধ্যে ধর্ম ও শরীয়তের অনুসরণ হবে কম এবং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হবে বেশী। অথচ দ্বীন ও শরীয়তের অনুসরণ না করে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা উম্মতের ইজমা দ্বারা হারাম। আল্লামা শাতেবী 'মুয়াফাকাত' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাধারণ তকলীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইবনে তাইমিয়া এ ধরনের অনুসরণকে স্বীয় ফতোয়া গ্রন্থে ইজমা দ্বারা হারাম বলেছেন। এ কারণে পরবর্তী ফেকাহবিদগণ এটা জরুরী মনে করেছেন যে, আমলকারীদের উপর কোন একজন ইমামেরই তকলীদ করা বাধ্যতামূলক করে দেয়া উচিত। এখান থেকেই ব্যক্তিভিত্তিক তকলীদের সূচনা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে একটি শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য দ্বীনী ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কায়েম রাখা এবং মানুষকে দ্বীনের আড়ালে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-এর একটি কীর্তি হুবহু এর দৃষ্টান্ত। তিনি সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে কোরআনের সাতটি কেরআতের মধ্য থেকে মাত্র একটিকে বহাল রেখেছেন। অথচ কোরআন সাত কেরআতেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাসনা অনুযায়ী জিবরাঈলের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বহির্বিশ্বে প্রচারিত হওয়ার পর সাত কেরআতে কোরআন পাঠ করার ফলে তাতে পরিবর্তনের আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন সাহাবিগণের সর্বসম্মতিক্রমে একই কেরআতে কোরআন লেখা ও পড়া বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়। খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ) সেই এক কেরআতে কোরআনের অনেক কপি লিখিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন এবং আজ পর্যন্তও সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় তা অনুসরণ করে যাচ্ছেন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য কেরআত সঠিক ছিল না। বরং দ্বীনের শৃঙ্খলা বিধান এবং কোরআনের হেফাযতের কারণে একটি মাত্র কেরআত অবলম্বন করা হয়েছে। এমনিভাবে সকল মুজতাহিদ ইমামই সত্য। তাদের মধ্যে কোন একজনকে তকলীদের জন্যে নির্দিষ্ট করার অর্থ কখনও এরূপ নয় যে, যে ব্যক্তি যে ইমামের তকলীদ করেছে তাকে ছাড়া অন্য ইমাম তার কাছে তকলীদের যোগ্য নয়। বরং যে ইমামের মধ্যে নিজের মতাদর্শ ও সুবিধা দেখতে পায় তারই তকলীদ করে এবং অন্য ইমামদেরকেও এমনিভাবে সম্মানিত মনে করে।

উদাহরণতঃ রোগী ব্যক্তি হাকীম ও ডাক্তারদের মধ্য থেকে কোন একজনকেই চিকিৎসার জন্যে নির্দিষ্ট করাকে জরুরী মনে করে। কারণ, সে যদি নিজ মতে এক সময় এক ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ওষুধ পান করে এবং অন্য সময় অন্য ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ওষুধ পান করে, তবে এটা তার ধ্বংসের কারণ হয়। অতএব সে যখন একজন ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্যে মনোনীত করে,তখন এর অর্থ কখনও এরূপ হয় না যে, অন্য ডাক্তার পারদর্শী নয় কিংবা চিকিৎসা করার যোগ্যতা রাখে না।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর যে বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার স্বরূপ এর চাইতে বেশী কিছু ছিল না। একে দলাদলির রঙ দেয়া এবং পারস্পরিক কলহ ও মতানৈক্য সৃষ্টিতে মেতে উঠা দ্বীনের কাজ নয় এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলেমগণ কোন সময় একে সুনজরে দেখেননি। কোন কোন আলেমের আলোচনা পারস্পরিক বিতর্কের রূপ ধারণ করে, যা পরে তিরস্কার ও ভর্ৎসনার সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর মূর্খতাসুলভ লড়াই ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, যা আজকাল সাধারণতঃ ধর্মপরায়ণতা ও মাযহাবপ্রীতির চিহ্ন হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ্ তাআলার কাছেই আমাদের অভিযোগ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ তকলীদ ও ইজতিহাদ সম্পর্কে এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা এ বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার। সাধারণ মুসলমানদের বোঝার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। পণ্ডিতসুলভ বিস্তারিত আলোচনা উসূলে ফেকাহ্র কিতাবাদিতে বিশেষ করে আল্লামা শাতেবীকৃত 'কিতাবুল মুয়াফাকাত' ৪র্থ খণ্ড, ইজতিহাদ অধ্যায়ে, আল্লামা সাইফুদ্দীন আমেদীকৃত 'আহকামুল আহকাম' ৩য় খণ্ড, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভীকৃত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' ও 'ইকদুল জীদ' এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভীকৃত 'আল ইসতিহাদ ওয়াল ইজতিহাদ' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

হাদীস অস্বীকার কোরআন অস্বীকারের নামান্তর ঃ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ এ আয়াতে ذِكر এর অর্থ সর্বসম্মতভাবে কোরআন পাক। আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদের কাছে কোরআনের আয়াত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে দিন। এতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন পাকের তত্ত্ব, তথ্য ও বিধানাবলী নির্ভুলভাবে বোঝা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানলাভ করেই কোরআনের বিধানাবলী আল্লাহ্র অভিপ্রেত পন্থায় বোঝাতে সক্ষম হত, তবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্পণ করার কোন অর্থ থাকত না।

আল্লামা শাতেবী 'মুয়াফাকাত' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন

যে, হাদীস আগাগোড়া কোরআনের ব্যাখ্যা। কেননা, কোরআন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে বলেছে ঃ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এই মহান চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন كان خلقه القرآن এর সারমর্ম এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে যে কোন উক্তি ও কার্য বর্ণিত রয়েছে, তা সব কোরআনেরই বক্তব্য। কোন কোনটি বাহ্যতঃ কোন আয়াতের তফসীর ও ব্যাখ্যা, যা সাধারণ আলেমরা জানেন এবং কোন কোনটি বাহ্যতঃ কোরআনে নেই, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর অন্তরে তা ওহী হিসেবে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। এটাও একদিক দিয়ে কোরআনই। কেননা, কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর কোন কথাই মনগড়া নয়; বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে প্রক্ষিপ্ত। وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ এতে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর এবাদত, লেন-দেন, চরিত্র ও অভ্যাস সবই আল্লাহ্ তাআলার ওহী ও কোরআনী নির্দেশের অনুসৃতি। তিনি যেখানেই নিজ ইজতিহাদ দ্বারা কোন কাজ করেছেন, সেখানে ওহী কিংবা নিষেধ না করার মাধ্যমে সত্যায়ন ও সমর্থন করা হয়েছে। ফলে তাও ওহীরই অনুসৃতি। মোটকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কোরআনের ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়তের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছে; যেমন সূরা জুমআ ও অন্যান্য সূরার কতিপয় আয়াতে গ্রন্থশিক্ষাদান বলে এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে।

অপরদিকে সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের হাদীসবিদ পর্যন্ত প্রতিভাধর মনীষীবৃন্দ প্রাণের চাইতেও অধিক হেফাযত করে হাদীসের একটি বিশাল ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সারাজীবন ব্যয় করে হাদীস বর্ণনার কিছু স্তর নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা যেসব হাদীসকে সনদের দিক দিয়ে শরীয়তের বিধানাবলীর ভিত্তি হওয়ার যোগ্য পাননি, সেগুলোকে পৃথক করে এমন হাদীসসমূহ গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যেগুলো সারা জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর বিশুদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।

যদি আজ কেউ হাদীসের এই ভাণ্ডারকে কোন ছলছুতায় অনির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করে,তবে এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোরআনী নির্দেশ অমান্য করে কোরআনের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেননি ; কিংবা তিনি বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু তা অব্যাহত ও সংরক্ষিত থাকেনি। উভয় অবস্থাতেই অর্থগতভাবে কোরআন সংরক্ষিত রইল না। অথচ এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা একথা বলে গ্রহণ করেছিলেন ঃ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অতএব উপরোক্ত দাবী কোরআনের এ আয়াতের পরিপন্থী হবে। এতে প্রমাণিত হল যে, যে ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে, সে প্রকৃতপক্ষে কোরআনই অস্বীকার করে। نعوذ بالله

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে تَوَفَّاهُمُ বলে কাফেরদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে ভয় প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহ্র আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারে। তোমরা যে মাটির উপর বসে আছ, তার অভ্যন্তরেই তোমাদেরকে বিলীন করে দেয়া যেতে পারে; কিংবা কোন ধারণাতীত জায়গা থেকে তোমরা আযাবে পতিত হতে পার; যেমন বদর যুদ্ধে এক হাজার অস্ত্রসজ্জিত বীরযোদ্ধা কয়েকজন নিরস্ত্র মুসলমানের হাতে এমন মার খেয়েছে, যার কল্পনাও তারা করতে পারত না। কিংবা এটাও হতে পারে যে, চলাফেরার মধ্যেই তোমরা কোন আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাও ; যেমন কোন দুরারোগ্য প্রাণঘাতী ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে অথবা উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়ে অথবা শক্ত জিনিসের সাথে টক্কর লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পার, কিংবা এরূপ শাস্তিও হতে পারে যে, অকস্মাৎ আযাব না এসে টাকা-পয়সা, স্বাস্থ্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সামগ্রী আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকবে এবং এভাবে হ্রাস পেতে পেতে গোটা সম্প্রদায়ই একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

দুনিয়ার আযাবও এক প্রকার রহমত ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে দুনিয়ার বিভিন্ন আযাব বর্ণনা করার পর সর্বশেষে বলা হয়েছে فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ এতে প্রথমে رب শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে হুশিয়ার করার জন্যে দুনিয়ার আযাব হচ্ছে প্রতিপালকত্বের তাকিদ। এরপর তাকিদের لام সহকারে আল্লাহ্র দয়ালু হওয়া ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার হুশিয়ারী প্রকৃতপক্ষে স্নেহ ও দয়ার কারণেই হয়ে থাকে, যাতে গাফেল মানুষ হুশিয়ার হয়ে স্বীয় কর্মকাণ্ড সংশোধন করে নেয়।

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ
لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ
تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ
يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ
أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ
أَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ
فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي
اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

(৫৫) যাতে ঐ নেয়ামত অস্বীকার করে, যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব মজা ভোগ করে নাও—সত্বরই তোমরা জানতে পারবে। (৫৬) তারা আমার দেয়া জীবনোপকরণ থেকে তাদের জন্যে একটি অংশ নির্ধারিত করে, যাদের কোন খবরই তারা রাখে না। আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা যে অপবাদ আরোপ করছ, সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (৫৭) তারা আল্লাহ্‌র জন্যে কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে—তিনি পবিত্র মহিমান্বিত এবং নিজেদের জন্যে ওরা তাই স্থির করে যা ওরা চায়। (৫৮) যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। (৫৯) তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট। (৬০) যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তাদের উদাহরণ নিকৃষ্ট এবং আল্লাহ্‌র উদাহরণই মহান, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।(৬১) যদি আল্লাহ্ লোকদেরকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুত সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না। (৬২) যা নিজেদের মন চায় না তাই তারা আল্লাহ্‌র জন্যে সাব্যস্ত করে এবং তাদের জিহবা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, তাদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ। স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, তাদের জন্যে রয়েছে আগুন এবং তাদেরকেই সর্বাগ্রে নিক্ষেপ করা হবে। (৬৩) আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে রসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর শয়তান তাদেরকে কর্মসমূহ শোভনীয় করে দেখিয়েছে। আজ সে-ই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬৪) আমি আপনার প্রতি এ জন্যেই গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে আপনি সরল পথ প্রদর্শনের জন্যে তাদেরকে পরিষ্কার বর্ণনা করে দেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে এবং ঈমানদারকে ক্ষমা করার জন্যে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

০ আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের দু'টি বদ-অভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে। প্রথমতঃ, তারা নিজেদের ঘরে কন্যা-সন্তানের জন্মগ্রহণকে এত খারাপ মনে করে যে, লজ্জায় মানুষের সামনে দেখা পর্যন্ত দেয় না এবং চিন্তা করতে থাকে যে, কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণের কারণে তার যে বে-ইজ্জতি হয়েছে, তা মেনে নিয়ে সবর করবে, না একে জীবিত কবরস্থ করে এ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। উপরন্তু মূর্খতা এই যে, যে সন্তানকে তারা নিজেদের জন্যে পছন্দ করে না, তাকেই আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলে যে, ফেরেশতারা হল আল্লাহ্ তাআলার কন্যা।

أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ তফসীরে বাহ্‌রে-মুহীতে ইবনে আতিয়্যার বরাত দিয়ে এ বাক্যের মর্ম উপরোক্ত দু'টি বদঅভ্যাসকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রথমতঃ তাদের এ ফয়সালাটিই মন্দ যে, কন্যা-সন্তান শাস্তি ও বে-ইজ্জতির কারণ। দ্বিতীয়তঃ যে বস্তুকে তারা নিজেদের জন্যে বে-ইজ্জতি মনে করে, তাকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে।

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা এবং মুখ লুকিয়ে ফেরা খোদায়ী রহস্যের মোকাবেলা করার নামান্তর। কেননা, নর ও নারীর সৃষ্টি আল্লাহ্‌র একটি সাক্ষাত প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধি।—(রুহুল-বয়ান)

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿۶۵﴾ وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ
مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿۶۶﴾
وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا
حَسَنًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۶۷﴾ وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى
النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ﴿۶۸﴾
ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ
بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۶۹﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ؕ وَمِنْكُمْ مَّنْ
يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ
قَدِيْرٌ ﴿۷۰﴾ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ
فُضِّلُوْا بِرَآدِّيْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ
اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿۷۱﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ
جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ
الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿۷۲﴾

(৬৫) আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তদ্দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন। নিশ্চয় এতে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা শ্রবণ করে। (৬৬) তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্যে উপাদেয়। (৬৭) এবং খেজুর বৃক্ষ ও আংগুর ফল থেকে তোমরা মধ্য ও উত্তম খাদ্য তৈরী করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (৬৮) আপনার পালনকর্তা মধুমক্ষিকাকে আদেশ দিলেন ঃ পর্বতগাত্রে, বৃক্ষ এবং উঁচু চালে গৃহ তৈরী কর, (৬৯) এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৭০) আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের মৃত্যুদান করেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মণ্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা জানত সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিজ্ঞ সর্বশক্তিমান। (৭১) আল্লাহ্ তাআলা জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অতএব যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে স্বীয় জীবিকা থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহ্র নেয়ামত অস্বীকার করে? (৭২) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া পয়দা করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। অতএব তারা কি মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করে?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গোবর ও রক্তের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কার দুধ বের করা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ জন্তুর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলীতে একত্রিত হলে পাকস্থলী তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলীর এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নীচে বসে যায় এবং দুধ উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত। এরপর যকৃত এই তিন প্রকার বস্তুকে পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়, রক্ত পৃথক করে রগের মধ্যে চালায় এবং দুধ পৃথক করে জন্তুর স্তনে পৌঁছে দেয়। এখন পাকস্থলীতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়, যা গোবর হয়ে বের হয়ে আসে।

মাসআলা ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য ব্যবহার করা দ্বীনদারীর পরিপন্থী নয়। তবে শর্ত এই যে, হালাল পথে উপার্জন করতে হবে এবং অপব্যয় যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হযরত হাসান বসরী তাই বলেছেন।—(কুরতুবী)

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা আহারের সময় এরূপ দোয়া করবে — اللّٰهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং ভবিষ্যতে আরও উত্তম খাদ্য দিন।

তিনি আরও বলেছেন ঃ দুধ পান করার সময় এরূপ দোয়া করবে— اللّٰهم بارك لنا فيه وزدنا منه অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং আরও বেশী দান করুন। এর চাইতে উত্তম খাদ্য চাওয়া হয়নি। কারণ, মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চাইতে উত্তম কোন খাদ্য নেই। তাই আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর প্রথম খাদ্য করেছেন দুধ, যা মায়ের স্তন থেকে সে লাভ করে।—(কুরতুবী)

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার সেসব নেয়ামতের উল্লেখ ছিল, যা মানুষের খাদ্য-দ্রব্যাদির প্রস্তুতিতে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর খোদায়ী নৈপুণ্য ও কুদরতের প্রকাশক। এ প্রসঙ্গে প্রথমে দুধের কথা উল্লেখিত হয়েছে, খোদায়ী কুদরত যা চতুষ্পদ জীব-জন্তুর উদরস্থিত রক্ত ও আবর্জনা জঞ্জালের মলিনতা থেকে পৃথক করে মানুষের জন্যে স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন খাদ্যের আকারে প্রদান করেছে, যার প্রস্তুতিতে মানুষের অতিরিক্ত নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না। এজন্যেই পূর্ববর্তী আয়াতে نُسْقِيْكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমরা দুধ পান করিয়েছি।

এরপরে এরশাদ করেছেন, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহের মধ্য থেকেও মানুষ তার খাদ্য ও লাভজনক সামগ্রী তৈরী করে। এই বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহ থেকে নিজেদের খাদ্যোপকরণ ও লাভজনক দ্রব্যসামগ্রীর প্রস্তুতিতে মানবীয় নৈপুণ্যেরও কিছুটা অবদান রয়েছে। আর এই নৈপুণ্যের ফলেই দু'ধরনের দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এর একটি হলো—মাদক দ্রব্য, যাকে মদ্য ও শরাব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো উত্তম জীবনোপরকরণ অর্থাৎ, উত্তম রিযিক। যেমন, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায় অথবা শুকিয়ে তাকে মজুতও করে নেয়া যায়। সুতরাং মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অপার শক্তিবলে খেজুর ও আঙ্গুর ফল মানুষকে দান করেছেন এবং তদ্দ্বারা খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। এখন এটা তাদের নিজের অভিরুচি যে, কি

প্রস্তুত করবে—মাদকদ্রব্য তৈরী করে বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করবে, না খাদ্য তৈরী করে শক্তি অর্জন করবে?

এ তফসীর অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত থেকে মাদকদ্রব্য অর্থাৎ, মদ হালাল হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বশক্তিমানের দান এবং সেগুলো ব্যবহার করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা। এগুলো সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র নেয়ামত; যেমন যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী এবং উপাদেয় বস্তুসমূহ। অনেক মানুষ এগুলোকে অবৈধ পন্থায়ও ব্যবহার করে। কিন্তু ভ্রান্ত ব্যবহারের ফলে আসল নেয়ামতের পর্যায় থেকে তা বিয়োজিত হয়ে যায় না। তবে এখানে কোন্ ব্যবহারটি হালাল ও কোন্‌টি হারাম, তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। এতদসত্ত্বেও এখানে سكر এর বিপরীত رزق حسن আনার কারণে জানা গেছে যে, سكر ভাল রিযিক নয়। অধিকাংশ তফসীরবিদগণের মতে سكر এর অর্থ মাদকদ্রব্য, যা নেশা সৃষ্টি করে।—(রুহুল মা'আনী, কুরতুবী, জাস্‌সাস)

(কোন কোন আলেমের মতে এর অর্থ সির্কা ও এমন নবীয, যা নেশা সৃষ্টি করে না। কিন্তু এখানে এ মতবিরোধ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।)

আলোচ্য আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। মদের নিষেধাজ্ঞা এর পরে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় মদ নিষিদ্ধ ছিল না। মুসলমানরা সাধারণভাবে তা পান করত। কিন্তু তখনও এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মদ্যপান ভাল নয়। পরবর্তীকালে স্পষ্টতঃ শরাবকে কঠোরভাবে হারাম করার জন্যে কোরআনে বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়।—(জাস্‌সাস, কুরতুবী- সংক্ষেপিত)

اوحى ০ এখানে وحى শব্দটি পারিভাষিক অর্থে নয়; আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, কাউকে কোন বিশেষ কথা গোপনে এমনভাবে বুঝিয়ে দেয়া যে অন্য ব্যক্তি তা বুঝতে না পারে।

النَّحْلِ —জ্ঞান, তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও সুকৌশলের দিক দিয়ে মৌমাছি সমস্ত জন্তুর মধ্যে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাকে সম্বোধনও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে করেছেন। অন্য জন্তুদের ব্যাপারে সামগ্রিক নীতি হিসেবে أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ বলেছেন, কিন্তু এ ছোট্ট প্রাণীটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ বলেছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটি অন্য জন্তুদের তুলনায় জ্ঞান-বুদ্ধি, চেতনা ও বোধশক্তিতে একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

মৌমাছিদের বোধশক্তি ও তীক্ষ্ম বুদ্ধি তাদের শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে সুন্দররূপে অনুমান করা যায়। এই দুর্বল প্রাণীর জীবন ব্যবস্থা মানুষের রাজনীতি ও শাসননীতির সাথে চমৎকার খাপ খায়। সমগ্র আইন-শৃঙ্খলা *একটি বড় মৌমাছির হাতে থাকে এবং সে-ই হয় মৌমাছিকুলের শাসক।* তার চমৎকার সংগঠন ও কর্মবন্টনের ফলে গোটা ব্যবস্থা বিশুদ্ধ ও সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হয়ে থাকে। তার অভাবনীয় ব্যবস্থাও অলঙ্ঘনীয় আইন ও বিধিমালা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। স্বয়ং এই 'রাণী মৌমাছি' তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ছয় হাজার থেকে বার হাজার পর্যন্ত ডিম দেয়। দৈহিক গড়ন ও অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক দিয়ে সে অন্য মৌমাছিদের চাইতে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সে কর্মবন্টন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত করে। তাদের কেউ দ্বার রক্ষকের কর্তব্য পালন করে এবং অজ্ঞাত ও বাইরের জনকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। কেউ কেউ ডিমের হেফাযত করে। কেউ কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের লালন-পালনে নিয়োজিত। কেউ স্থাপত্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক কর্ম সমাধা করে। তাদের নির্মিত অধিকাংশ চাকে বিশ হাজার পর্যন্ত ঘর থাকে। কেউ কেউ মোম সংগ্রহ করে স্থপতিদের কাছে পৌঁছাতে থাকে। তারা মোম দ্বারা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে। তারা বিভিন্ন উদ্ভিদের উপর জমে থাকা সাদা ধরনের গুড়া থেকে মোম সংগ্রহ করে। আখের গায়ে এই সাদা গুড়া প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। কোন কোন মৌমাছি বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের উপর বসে রস চুষে। এই রস তাদের পেটে পৌঁছে মধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মধু মৌমাছি ও তাদের সন্তানদের খাদ্য এবং এটি আমাদের সবার জন্যে সুস্বাদু খাদ্যনির্যাস এবং নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র। মৌমাছিদের এই বিভিন্ন দল অত্যন্ত তৎপরতা সহকারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন এবং সম্রাজ্ঞীর প্রত্যেকটি আদেশ মনেপ্রাণে শিরোধার্য করে নেয়। যদি কোন মৌমাছি আবর্জনার স্তূপে বসে যায়, তবে চাকের দারোয়ান তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দান করে এবং সম্রাজ্ঞীর আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। তাদের এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও কর্মকুশলতা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।—(আলজাওয়াহের)

এরপর ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত এই নির্দেশের যথাযথ ফলশ্রুতি বর্ণনা করা হয়েছেঃ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ, তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্যে রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। খাদ্য ও ঋতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রঙ বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই কোন বিশেষ অঞ্চলে কোন বিশেষ ফল-ফুলের প্রাচুর্য থাকলে সেই এলাকার মধুতে তার প্রভাব ও স্বাদ অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। মধু সাধারণতঃ তরল আকারে থাকে তাই একে পানীয় বলা হয়েছে। এ বাক্যেও আল্লাহ্‌র একত্ব ও অপার শক্তির অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান। একটি ছোট্ট প্রাণীর পেট থেকে কেমন উপাদেয় ও সুস্বাদু পানীয় বের হয়। অথচ প্রাণীটি স্বয়ং বিষাক্ত। বিষের মধ্যে এই বিষ-প্রতিষেধক বাস্তবিকই আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির অভাবনীয় নিদর্শন। এরপর সর্বশক্তিমানের আশ্চর্যজনক কারিগরি দেখুন, অন্যান্য দুধের জন্তুর দুধ ঋতু ও খাদ্যের পরিবর্তনে লাল ও হলদে হয় না, কিন্তু মৌমাছির মধু বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে।

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ — মধু যেমন বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্যে আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যাধির জন্যেও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র। কেন হবে না, স্রষ্টার ভ্রাম্যমান মেশিন সর্বপ্রকার ফল-ফুল থেকে বলকারক রস ও পবিত্র নির্যাস বের করে সুরক্ষিত গৃহে সঞ্চিত রাখে। যদি গাছ-গাছড়ার মধ্যে আরোগ্য লাভের উপাদান নিহিত থাকে, তবে এসব নির্যাসের মধ্যে কেন থাকবে না? কফজনিত রোগে সরাসরি এবং অন্যান্য রোগে অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মধু ব্যবহৃত হয়। *চিকিৎসকরা সালসা তৈরী করতে গিয়ে বিশেষভাবে একে* অন্তর্ভুক্ত করেন। এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজেও নষ্ট হয় না এবং অন্যান্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হতে দেয় না। এ কারণেই হাজারো বছর ধরে চিকিৎসকরা একে এলকোহল (Alcohol) - এর স্থলে ব্যবহার করে আসছেন। মধু বিরেচক এবং পেট থেকে দূষিত পদার্থ অপসারক। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) - এর কাছে কোন এক সাহাবী তাঁর ভাইয়ের অসুখের বিবরণ দিলে তিনি তাকে মধু পান করানোর মরামর্শ দেন। দ্বিতীয় দিনও এসে আবার সাহাবী বললেন ঃ অসুখ পূর্ববৎ বহাল রয়েছে। তিনি আবারও একই পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন সংবাদ এল যে, অসুখে কোন পার্থক্য হয়নি, তখন তিনি বললেন ঃ صدق الله وكذب بطن اخيك

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী। উদ্দেশ্য এই যে, ওষুধের দোষ নেই। রোগীর বিশেষ মেজাযের কারণে ওষুধ দ্রুত কাজ করেনি। এরপর রোগীকে আবার মধু পান করানো হয় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে شفاء শব্দটি نكرة تحت الاثبات — এতে মধু যে প্রত্যেক রোগের ওষুধ, তা বোঝা যায় না। কিন্তু شفاء শব্দের تنوين যা تعظيم এর অর্থ দিচ্ছে, তা থেকে অবশ্যই বোঝা যায় যে, মধুর নিরাময়শক্তি বিরাট ও স্বতন্ত্র ধরণের। কিছুসংখ্যক আল্লাহ্‌ওয়ালা বুযুর্গ এমনও রয়েছেন, যাঁরা মধু সর্বরোগের প্রতিষেধক হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। তাঁরা মহান পালনকর্তার উক্তির বাহ্যিক অর্থেই এমন প্রবল ও অটল বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁরা ফোঁড়া ও চোখের চিকিৎসাও মধুর মাধ্যমে করেন এবং দেহের অন্যান্য রোগেরও। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁর শরীরে ফোঁড়া বের হলেও তিনি তাতে মধুর প্রলেপ দিয়ে চিকিৎসা করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা কোরআনে কি মধু সম্পর্কে বলেননি যে, فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ —(কুরতুবী)

কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ (১) আয়াত থেকে জানা গেল যে, বুদ্ধিবিবেক ও চেতনা মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও আছে। وَلَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ তবে বুদ্ধির স্তর বিভিন্নরূপ। মানুষের বুদ্ধি সবচাইতে পূর্ণাঙ্গ। এ কারণেই সে শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে। উম্মাদনার কারণে যদি মানুষের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটে, তবে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষও বিধি-বিধান পালনের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মৌমাছিকে মারতে নিষেধ করেছেন।—(আবু দাউদ)

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, মধু মৌমাছির বিষ্ঠা, না মুখের লালা। দার্শনিক এরিষ্টটল কাঁচের একটি উৎকৃষ্ট পাত্রে চাক তৈরী করে তাতে মৌমাছিদেরকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি তাদের কর্মপদ্ধতি নিরীক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৌমাছিরা সর্বপ্রথম পাত্রের আভ্যন্তরভাগে মোম ও কাদার একটি মোটা প্রলেপ বসিয়ে দেয় এবং আভ্যন্তরভাগ পূর্ণরূপে আবৃত না হওয়া পর্যন্ত কাজই শুরু করেনি।

(৪) فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আরও জানা গেল যে, ওষুধের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা বৈধ। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা একে নেয়ামত হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ হাদীসে ওষুধ ব্যবহার ও চিকিৎসার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেউ কেউ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করেন ঃ আমরা কি ওষুধ ব্যবহার করব? তিনি বললেন ঃ হাঁ, রোগের চিকিৎসা করবে কারণ, আল্লাহ্ তাআলা যত রোগ সৃষ্টি করেছেন, তার ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। তবে একটি রোগের চিকিৎসা নেই। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন ঃ সেটি কোন্ রোগ? তিনি বললেন ঃ বার্ধক্য।—(আবু দাউদ, কুরতুবী)

এক রেওয়ায়েতে হযরত খুযায়মা (রাঃ) বলেন ঃ একবার আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমরা ঝাড়-ফুঁক করি কিংবা ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করি। এ ধরণের আত্মরক্ষা ও হেফাযতের ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র তকদীরকে পালটে দিতে পারে কি? তিনি বললেন ঃ এগুলোও তো তকদীরেরই প্রকারভেদ।

মোটকথা, চিকিৎসা করা ও ওষুধ ব্যবহার করা যে বৈধ, এ বিষয়ে সকল আলেমই একমত এবং এ সম্পর্কে বহু হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে ওমরের পরিবারে কাউকে বিচ্ছু দংশন করলে তাকে তিরইয়াক (বিষনাশক ওষুধ) পান করানো হত এবং ঝাড়-ফুঁক দ্বারা তার চিকিৎসা করা হত। তিনি একবার কাঁপুনির রোগীকে দাগ লাগিয়ে তার চিকিৎসা করেন।–(কুরতুবী)

কোন কোন সূফী, বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা চিকিৎসা পছন্দ করতেন না। সাহাবিগণের মধ্যেও কারও কার্যক্রম থেকে তা প্রকাশ পায়। যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁকে দেখতে যান এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার অসুখটা কি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমি নিজ গোনাহের কারণে চিন্তিত। হযরত ওসমান বললেন ঃ তাহলে কি চান? উত্তর হল ঃ আমি পালনকর্তার রহমত প্রার্থনা করি। হযরত ওসমান বললেন ঃ আপনি পছন্দ করলে চিকিৎসক ডেকে আনি। তিনি উত্তর দিলেন ঃ চিকিৎসকই তো আমাকে শয্যাশায়ী করেছেন। (এখানে রূপক অর্থে চিকিৎসক বলে আল্লাহ্ তাআলাকে বোঝানো হয়েছে।)

কিন্তু এ ধরনের ঘটনা প্রমাণ নয় যে, তাঁরা চিকিৎসাকে মকরূহ মনে করতেন। সম্ভবতঃ এটা তখন তাঁদের রুচিবিরুদ্ধ ছিল। তাই তাঁরা একে পছন্দ করেননি। এটা প্রবল আল্লাহ্‌ভীতি ও আল্লাহ্‌প্রেমে মত্ত থাকার ফলে বন্দার একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র। কাজেই একে চিকিৎসা অবৈধ অথবা মকরূহ হওয়ার প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যায় না। হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক চিকিৎসক ডেকে আনার অনুরোধ স্বয়ং চিকিৎসা বৈধ হওয়ার প্রমাণ; বরং কোন কোন অবস্থায় চিকিৎসা ওয়াজিবও হয়ে যায়।

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ — এখানে مَّنْ يُّرَدُّ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বেও মানুষের উপর দিয়ে এক প্রকার দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। সেটা ছিল তার প্রাথমিক শৈশবের যুগ। তখন সে কোনরূপ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ছিল না। তার হস্তপদ ছিল দুর্বল ও অক্ষম। সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করতে এবং উঠা-বসা করতে অপরের মুখাপেক্ষী ছিল। এরপর আল্লাহ্ তাআলা তাকে যৌবন দান করেছেন। এটা ছিল তার উন্নতির যুগ। এরপর ক্রমান্বয়ে তাকে বার্ধক্যের স্তরে পৌছে দেন। এ স্তরে তাকে দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও ক্ষয়ের ঐ সীমায় প্রত্যাবর্তিত করা হয়, যা শৈশবে ছিল।

أَرْذَلِ الْعُمُرِ বলে বার্ধক্যের সে বয়স বোঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের

দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ বয়স থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন ঃ

اللهم انى اعوذبك من سوء العمر وفى رواية من ان ارد الى....

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, আমি মন্দ বয়স থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। এক রেওয়ায়েতে আছে, অকর্মণ্য বয়সে ফিরিয়ে দেয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

أَرْذَلِ الْعُمُرِ এর নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। তবে উল্লেখিত সংজ্ঞাটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কোরআনও এর প্রতি لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا বলে ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ, যে বয়সে হুশ-জ্ঞান অবশিষ্ট না থাকে। ফলে সেসব জানা বিষয়ও ভুলে যায়।

أَرْذَلِ الْعُمُرِ —এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আরও অনেক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কেউ ৮০ বছর বয়সকে এবং কেউ ৯০ বছর বয়সকে أَرْذَلِ الْعُمُرِ বলেছেন। হযরত আলী (রাঃ) থেকে ৭৫ বছর বয়সের কথা বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا বার্ধক্যের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছার পর মানুষের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে এক বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার পর পুনরায় অজ্ঞ হয়ে যায়। সে আদ্যোপান্ত স্মৃতিভ্রমে পতিত হয়ে প্রায় সদ্য প্রসূত শিশুর মত হয়ে যায়, আর কোন কিছু খবর থাকে না। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করে সে এরূপ অবস্থায় পতিত হবে না।

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ — নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী। তিনি জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেকের বয়স জানেন এবং শক্তি দ্বারা যা চান, করেন। তিনি ইচ্ছা করলে শক্তিশালী যুবকের উপর অকর্মণ্য বয়সের লক্ষণাদি চাপিয়ে দেন এবং ইচ্ছা করলে একশ' বছরের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকেও শক্ত সমর্থ যুবক করে রাখেন। এসবই লা-শরীক সত্তার ক্ষমতাধীন।

জীবিকার শ্রেণী-বিভেদ মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ ঃ আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে যে, দারিদ্র্য, ধনাঢ্যতা এবং জীবিকার মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া যেমন, কারো দারিদ্র্য হওয়া কিংবা ধনী ও মধ্যবিত্ত হওয়া কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং এটা আল্লাহ্র অপার রহস্য ও মানবিক উপকারিতার তাগিদ এবং মানব জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। যদি এরূপ না হয় এবং ধন-দৌলতে সব মানুষ সমান হয়ে যায়, তবে বিশ্ব-ব্যবস্থায় ত্রুটি ও অনর্থ দেখা দেবে। তাই যেদিন থেকে পৃথিবীতে জনবসতি স্থাপিত হয়েছে, সেদিন থেকে কোন যুগে ও কোন সময়ে সব মানুষ ধন-সম্পদের দিক দিয়ে সমান হয়নি এবং হতে পারে না। যদি কোথাও জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে এরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে কিছু দিনের মধ্যে মানবিক কাজ-কারবারে ত্রুটি ও অনর্থ দৃষ্টিগোচর হবে। আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র মানবজাতিকে বুদ্ধি, মেধা, বল, শক্তি ও কর্মদক্ষতায় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে উচ্চ, নীচ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদ্যমান রয়েছে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারে না। এরই অপরিহার্য পরিণতি হিসেবে ধন-সম্পদেও বিভিন্ন শ্রেণী থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতার যথোপযুক্ত প্রতিদান পেতে পারে। যদি প্রতিভাবান যোগ্য ব্যক্তিকে অযোগ্যের সমান করে দেয়া হয়, তবে যোগ্য ব্যক্তির মনোবল ভেঙ্গে যাবে। যদি জীবিকায় তাকে অযোগ্যদের সমপর্যায়েই থাকতে হয়, তবে কিসে তাকে অধ্যবসায়, গবেষণা ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে? এর অনিবার্য পরিণতিতে কর্মদক্ষতায় বন্ধ্যাত্ব নেমে আসবে।

সম্পদ পুঞ্জীভূত করার বিরুদ্ধে কোরআনের বিধান ঃ তবে সৃষ্টিকর্তা যেখানে বুদ্ধিগত ও দেহগত শক্তিতে একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এর অধীনে রিযিক ও ধন-সম্পদে তারতম্য করেছেন, যেখানে এই অটল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, সম্পদের ভাণ্ডার এবং জীবিকা উপার্জনের কেন্দ্রসমূহ যেন কতিপয় ব্যক্তি অথবা বিশেষ শ্রেণীর অধিকারভুক্ত না হয়ে পড়ে, ফলে অন্যান্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির কাজ করার ক্ষেত্রই অবশিষ্ট না থাকে। অথচ সুযোগ পেলে তারা দৈহিক শক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করতে পারে। কোরআন পাক সূরা হাশরে বলে ঃ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ - অর্থাৎ, আমি সম্পদ বন্টনের আইন এজন্যে তৈরী করেছি, যাতে ধন-সম্পদ পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে।

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ - আলোচ্য আয়াতের অধীনে এখানে এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য ছিল যে, ধন-সম্পদে তারতম্য হওয়া একটি স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক এবং মানবিক উপকারিতার সাথে সঙ্গতিশীল ব্যাপার।

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا - আয়াতে একটি প্রধান নেয়ামত বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরই স্বজাতি থেকে তোমাদের স্ত্রী নির্ধারণ করেছেন, যাতে পরস্পর ভালবাসাও পূর্ণরূপে হয় এবং মানব জাতির আভিজাত্য এবং মাহাত্ম্যও অব্যাহত থাকে।

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً - অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্র পয়দা করেছেন।

এখানে প্রণিধান যোগ্য এই যে, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতা উভয়ের সহযোগে জন্মগ্রহণ করে। আলোচ্য আয়াতে তা শুধু জননী থেকে পয়দা করার কথা বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সন্তান প্রসব ও সন্তান প্রজননে পিতার তুলনায় মাতার দখল বেশী। পিতা থেকে শুধু একটি বীর্যবিন্দু নির্গত হয়। এ বিন্দুর উপর দিয়ে বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রান্ত হয়ে মানবাকৃতিতে পরিণত হওয়া, তাতে প্রাণ সঞ্চার হওয়া, সর্বশক্তিমানের এসব সৃষ্টিজনিত ক্রিয়াকর্মের স্থান মাতার উদরেই। এজন্যেই হাদীসে মাতার হককে পিতার হক থেকে অগ্রে রাখা হয়েছে।

এ বাক্যে পুত্রদের সাথে পৌত্রদের কথা উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ দম্পতি সৃষ্টির আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব বংশের স্থায়িত্ব, যাতে সন্তান ও সন্তানের সন্তান হয়ে মানব জাতির স্থায়িত্বের ব্যবস্থা হয়।

অতঃপর وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ বলে মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জন্মের পর মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাও সরবরাহ করছেন। আয়াতে ব্যবহৃত حفدة শব্দের আসল অর্থ সাহায্যকারী, সেবক। সন্তানদের জন্যে এ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতা-মাতার সেবক হওয়া সন্তানের কর্তব্য।—(কুরতুবী)

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوا
لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾ ضَرَبَ
اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنٰهُ
مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ
يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ
اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَهُوَ
كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي
هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا
كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾
وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا ۙ وَّ
جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْـِٔدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾
أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ
إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾

(৭৩) তারা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত করে, যে তাদের জন্যে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল থেকে সামান্য রুযী দেওয়ারও অধিকার রাখে না এবং শক্তিও রাখে না। (৭৪) অতএব, আল্লাহর কোন সদৃশ সাব্যস্ত করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না। (৭৫) আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, অপরের মালিকানাধীন গোলামের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন একজন যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে চমৎকার রুযী দিয়েছি। অতএব, সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে। উভয়ে কি সমান হয়? সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র, কিন্তু অনেক মানুষ জানে না। (৭৬) আল্লাহ্ আরেকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, দু'ব্যক্তির, একজন বোবা কোন কাজ করতে পারে না। সে মালিকের উপর বোঝা। যেদিকে তাকে পাঠায়, কোন সঠিক কাজ করে আসে না। সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির, যে ন্যায় বিচারের আদেশ করে এবং সরল পথে কায়েম রয়েছে? (৭৭) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। কিয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর শক্তিমান। (৭৮) আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর। (৭৯) তারা কি উড়ন্ত পাখীকে দেখে না? এগুলো আকাশের অন্তরীক্ষে আজ্ঞাধীন রয়েছে। আল্লাহ্ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে রাখে না। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ —বাক্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ সত্যের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই কাফেরসুলভ সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেয়। সত্যটি এই যে, সাধারণভাবে মানুষ আল্লাহ্ তাআলাকে মানবজাতির অনুরূপ মনে করে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, যেমন রাজা-বাদশাহ্‌কে আল্লাহ্‌র দৃষ্টান্তরূপে পেশ করে। অতঃপর এই ভ্রান্ত দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ্‌র কুদরতের ব্যবস্থাকেও রাজা-বাদশাহ্‌দের ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে বলতে থকে যে, কোন রাষ্ট্রে একা বাদশাহ্ যেমন সমগ্র দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিচালনা করতে পারেন না, অধীনস্থ মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদেরকে ক্ষমতা অর্পণ করে তাদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়, তেমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলার অধীনে আরও কিছুসংখ্যক উপাস্যও থাকা প্রয়োজন, যারা আল্লাহ্‌র কাজে সাহায্য করবে। মূর্তি পূজারী ও মুশরিকদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা তাই। আলোচ্য বাক্যটি তাদের সন্দেহের মূল উপড়ে দিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ্ তাআলার জন্যে সৃষ্টজীবনের দৃষ্টান্ত পেশ করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। তিনি দৃষ্টান্ত, উদাহরণ এবং আমাদের ধারণা-কল্পনার অনেক উর্ধ্বে।

لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا - এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জ্ঞান লাভ মানুষের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য নয়। জন্মের সময় তার কোন জ্ঞান ও নৈপুণ্য থাকে না। অতঃপর মানবিক প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে কিছু কিছু জ্ঞান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সরাসরি শিক্ষা দেয়া হয়। এসব জ্ঞান শিক্ষায় পিতামাতা ও ওস্তাদের কোন ভূমিকা নেই। সর্বপ্রথম তাকে কান্না শিক্ষা দেয়া হয়। তার এ গুণটিই তখন তার যাবতীয় অভাব মেটায়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-উত্তাপ কিংবা অন্য যে কোন কষ্ট অনুভব করলেই কান্না জুড়ে দেয়। সর্বশক্তিমান তার অভাব মেটানোর জন্যে পিতামাতার অন্তরে বিশেষ স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে দেন। শিশুর আওয়াজ শুনতেই তারা তার কষ্ট বুঝত ও তা দূর করতে সচেষ্ট হয়। যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শিশুকে এ কান্না শিক্ষা দেয়া না হত, তবে কে তাকে শিক্ষা দিত যে, কোন অসুবিধা দেখা দিলেই এভাবে শব্দ করতে হবে? এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা তাকে এলহামের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্যলাভ করার জন্যে মাড়ি ও ঠোঁটকে কাজে লাগাতে হবে। এ শিক্ষা প্রাকৃতিক ও সরাসরি না হলে কোন্ ওস্তাদের সাধ্য ছিল এ সদ্যজাত শিশুকে মুখ চালনা ও স্তন চোষা শিক্ষা দেয়া। এমনিভাবে তার প্রয়োজন যতই বাড়তে থাকে, সর্বশক্তিমান তাকে পিতামাতার মধ্যস্থতা ছাড়াই প্রাকৃতিকভাবে শিক্ষাদান করেন। কিছুদিন পর তার মধ্যে এমন নৈপুণ্য সৃষ্টি হতে থাকে যে, পিতামাতা ও নিকটস্থ অন্যান্য লোকের কথাবার্তা শুনে কিংবা কোন কোন বস্তু দেখে কিছু শিখতে থাকে। অতঃপর শ্রুত শব্দ ও দেখা বিষয় নিয়ে চিন্তা করার ও বোঝার নৈপুণ্য সৃষ্টি হয়।

তাই আয়াতে لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا এর পরে বলা হয়েছে : وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْـِٔدَةَ —অর্থাৎ, জন্মের শুরুতে যদিও কোন কিছুর জ্ঞান মানুষের মধ্যে ছিল না, কিন্তু সর্বশক্তিমান তার অস্তিত্বের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের অভিনব উপকরণ স্থাপন করে দিয়েছেন। এসব উপকরণের মধ্যে সর্বপ্রথম سمع অর্থাৎ, শ্রবণশক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একে অগ্রে আনার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, মানুষের সর্বপ্রথম জ্ঞান এবং সর্বাধিক জ্ঞান কানের পথেই আগমন করে। সূচনালগ্নে চক্ষু বন্ধ থাকে ; কিন্তু কান শ্রবণ করে। এরপরও চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ সারা জীবনে যত জ্ঞান অর্জন

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ
الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ
وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا
إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم
مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ
وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ
الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ
الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا
يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٥﴾ وَ
إِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ
شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ ۖ فَأَلْقَوْا
إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾ وَأَلْقَوْا إِلَى اللّٰهِ
يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾

(৮০) আল্লাহ্ করে দিয়েছেন তোমাদের গৃহকে অবস্থানের জায়গা এবং চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা করেছেন তোমার জন্যে তাঁবুর ব্যবস্থা। তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থান কালে পাও। ভেড়ার পশম, উটের বাবরি চুল ও ছাগলের লোম দ্বারা কত আসবাবপত্র ও ব্যবহারের সামগ্রী তৈরী করেছেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। (৮১) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে সৃজিত বস্তু দ্বারা ছায়া করে দিয়েছেন এবং পাহাড়সমূহে তোমাদের জন্যে আত্মগোপনের জায়গা করেছেন এবং তোমাদের জন্যে পোশাক তৈরী করে দিয়েছেন, যা তোমাদেরকে গ্রীষ্ম এবং বিপদের সময় রক্ষা করে। এমনিভাবে তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের পূর্ণতা দান করেন, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। (৮২) অতঃপর যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তবে আপনার কাজ হল সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া মাত্র। (৮৩) তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ চিনে, এরপর অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। (৮৪) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন বর্ণনাকারী দাঁড় করাব, তখন কাফেরদেরকে অনুমতি দেয়া হবে না এবং তাদের তওবাও গ্রহণ করা হবে না। (৮৫) যখন জালেমরা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের থেকে তা লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হবে না। (৮৬) মুশরিকরা যখন ঐ সব বস্তুকে দেখবে, যেসবকে তারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছিল, তখন বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, এরাই তারা যারা আমাদের শেরেকীর উপাদান, তোমাকে ছেড়ে আমরা যাদেরকে ডাকতাম। তখন ওরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমরা মিথ্যাবাদী। (৮৭) সেদিন তারা আল্লাহ্‌র সামনে আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যে মিথ্যা অপবাদ দিত তা বিস্মৃত হবে।

করে, তন্মধ্যে কানে শ্রুত জ্ঞানই সর্বাধিক। চোখে দেখা জ্ঞান তুলনামূলকভাবে কম।

এতদুভয়ের পর ঐসব জ্ঞানের পালা, যেগুলো মানুষ শোনা ও দেখা বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে অর্জন করে। কোরআনের উক্তি অনুযায়ী একাজটি মানুষের অন্তরের। তাই তৃতীয় পর্যায়ে أفئدة বলা হয়েছে। এটা فؤاد এর বহুবচন। অর্থ অন্তর। দার্শনিকরা সাধারণভাবে মানুষের মস্তিষ্ককে জ্ঞানবুদ্ধি ও বোধশক্তির কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কোরআনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কোন কিছু বোঝার ব্যাপারে যদিও মস্তিষ্কের প্রভাব রয়েছে, কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধির আসল কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর।

এখানে আল্লাহ্ তাআলা শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির উল্লেখ করেছেন ; বাকশক্তি ও জিহ্বার কথা উল্লেখ করেননি। কেননা, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বাকশক্তির প্রভাব নেই ; বাকশক্তি বরং জ্ঞান প্রকাশের উপায়। এছাড়া ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ 'শ্রবণশক্তির সাথে বাকশক্তির উল্লেখও প্রসঙ্গতঃ হয়ে গেছে। কেননা, অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, যে ব্যক্তি কানে শোনে, সে মুখে কথাও বলে। বোবা কথা বলতে অক্ষম, সে কানের দিক থেকেও বধির। সম্ভবতঃ তার কথা না বলার কারণই হচ্ছে কানে কোন শব্দ না শোনা। শব্দ শুনলে হয়তো সে তা অনুসরণ করে বলাও শিখত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا — এখানে بيوت শব্দটি بيت-এর বহুবচন। রাত্রিযাপন করা যায় এমন গৃহকে بيت বলা হয়। ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীরে বলেন ঃ 'যে বস্তু তোমার মাথার উপরে রয়েছে এবং তোমাকে ছায়া দান করে, তা ছাদ ও আকাশ বলে কথিত হয়। যে বস্তু তোমার অস্তিত্বকে বহন করছে, তা যমিন এবং যে বস্তু চারদিক থেকে তোমাকে আবৃত করে রাখে, তা প্রাচীর। এগুলো সব কাছাকাছি একত্রিত হয়ে গেলে তাই بيت তথা গৃহে পরিণত হয়।'

مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ এবং وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا থেকে প্রমাণিত হল যে, জীব-জন্তুর চামড়া, লোম ও পশম ব্যবহার করা মানুষের জন্য হালাল। এতে জন্তুটি যবেহকৃত হওয়া অথবা মৃত হওয়ারও কোন শর্ত নেই। এমনিভাবে যে জন্তুর পশম বা চামড়া আহরণ করা হবে, সেটির গোশত হালাল কি হারাম সেটা বিচার করারও কোন শর্ত নেই। সব রকম জন্তুর চামড়াই লবণ দিয়ে শুকানোর পর ব্যবহার করা হালাল। লোম ও পশমের উপর জন্তুর মৃত্যুর কোন প্রভাবই পড়ে না। তাই সেটি যথারীতি শুকিয়ে ব্যবহারোপযোগী করে নিলেই তা পাক হয়ে যায় এবং সেটি ব্যবহার করা হালাল ও জায়েয হয়ে যায়। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মযহাব তাই। তবে শূকরের চামড়া ও যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও লোম-পশম অপবিত্র ও ব্যবহারের অযোগ্য।

سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ — এখানে গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে রক্ষা করাকে মানুষের পোশাকের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। অথচ পোশাক মানুষকে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুর প্রভাব থেকেই রক্ষা করে। ইমাম কুরতুবী ও অন্যান্য তফসীরবিদগণ এ প্রশ্নের জওয়াবে বলেন যে, কোরআনে পাক আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সর্বপ্রথম এতে আরবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই এতে আরবদের অভ্যাস ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে

النحل ١٦ ٢٧٨ ربما ١٤

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا
فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ
أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا
عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ
هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ وَ
أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ
بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا
مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن
تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ
لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

(৮৮) যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমি তাদেরকে আযাবের পর আযাব বাড়িয়ে দেব। কারণ, তারা অশান্তি সৃষ্টি করত। (৮৯) সেদিন প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে আমি একজন বর্ণনাকারী দাঁড় করাব তাদের বিপক্ষে তাদের মধ্য থেকেই এবং তাদের বিষয়ে আপনাকে সাক্ষীস্বরূপ উপস্থাপন করব। আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ। (৯০) আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন — যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (৯১) আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহ্‌কে জামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন। (৯২) তোমরা ঐ মহিলার মত হয়ো না, যে পরিশ্রমের পর কাটা সূতা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে, তোমরা নিজেদের কসমসমূহকে পারস্পরিক প্রবঞ্চনার বাহানারূপে গ্রহণ কর এজন্যে যে, অন্য দল অপেক্ষা একদল অধিক ক্ষমতাবান হয়ে যায়। এতদ্বারা তো আল্লাহ্ শুধু তোমাদের পরীক্ষা করেন। আল্লাহ্ অবশ্যই কিয়ামতের দিন প্রকাশ করে দেবেন, যে বিষয়ে তোমরা কলহ করতে। (৯৩) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।

বক্তব্য রাখা হয়েছে। আরব হ'ল গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। সেখানে বরফ জমা ও শীতের কল্পনা করা কঠিন। তাই শুধু গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। হযরত থানভী (রহঃ) বয়ানুল কোরআনে বলেন ঃ কোরআন পাক এ সূরার শুরুতে لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ বলে পোশাকের সাহায্যে শীত থেকে আত্মরক্ষা ও উত্তাপ হাসিল করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছিল। তাই এখানে শুধু উত্তাপ প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ — এতে কোরআনকে যাবতীয় বিষয়ের বিশ্লেষণকারী বলা হয়েছে। 'যাবতীয় বিষয়' বলে প্রধানতঃ দ্বীনের যাবতীয় বিষয় বোঝানো হয়েছে। কেননা, ওহী ও নবুওয়তের লক্ষ্য এগুলোর সাথেই সম্পৃক্ত। তাই মানুষের আয়াসসাধ্য অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উদ্ভূত দৈনন্দিন সমস্যাদির তৈরী সমাধান কোরআন পাকে অনুসন্ধান করা ভুল। প্রসঙ্গতঃ এসব সমস্যাদির সমাধানের ব্যাপারে যে সব ইঙ্গিত রয়েছে, মানবীয় মেধার সংযোগে সেসব থেকেই সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন থাকে যে, কোরআন পাকে অনেক দ্বীনী খুঁটিনাটি বিষয়ও সবিস্তারে বর্ণিত হয়নি। এমতাবস্থায় কোরআনকে تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ — বলা যথার্থ হবে কিরূপে?

এর উত্তর এই যে, কোরআন পাকে সব বিষয়েরই মূলনীতি বিদ্যমান রয়েছে। সেসব মূলনীতির আলোকেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীস মাসআলা বর্ণনা করে। কিছু কিছু বিবরণ ইজমা ও কিয়াসের আওতায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস থেকে যেসব মাসআলা নির্গত হয়েছে, সেগুলোও পরোক্ষভাবে কোরআনেরই বর্ণিত মাসআলা।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ আয়াত সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এটি হচ্ছে কোরআন পাকের ব্যাপকতর অর্থবোধক একটি আয়াত। — (ইবনে-কাসীর)

হযরত আকসাম ইবনে সায়ফী (রাঃ) নামক একজন সাহাবী এ আয়াত শ্রবণ করেই মুসলমান হয়েছিলেন। ইমাম ইবনে-কাসীর হাফেযে হাদীস আবু ইয়ালার গ্রন্থ মা'রেফাতুচ্ছাহাবা থেকে সনদ-সহ এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আকসাম ইবনে সায়ফী স্বীয় গোত্রের সর্দার ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত দাবী ও ইসলাম প্রচারের সংবাদ পেয়ে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আগমন করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু গোত্রের লোকেরা বলল ঃ আপনি সবার প্রধান। আপনার নিজের যাওয়া সমীচীন নয়। আকসাম বললেন ঃ তবে গোত্র থেকে দুজন লোক মনোনীত কর। তারা সেখানে যাবে এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে জানাবে। মনোনীত দু'ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ আমরা আকসাম ইবনে সায়ফীর পক্ষ থেকে দু'টি বিষয় জানতে এসেছি। আকসামের প্রশ্ন দু'টি এই ঃ من انت وما انت আপনি কে এবং কি?

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আল্লাহ্‌র দাস ও তাঁর রসূল। এরপর তিনি সূরা নাহ্‌লের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ — উভয় দূত অনুরোধ করল

ঘটনায় কোরআন পাক বলেছে, আল্লাহ্‌র দ্বীনের অনুসারীরা যখন ফেৎনা

এ বাক্যগুলো আমাদেরকে আবার শোনানো হোক। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আয়াতটি একাধিকবার তেলাওয়াত করলেন। ফলে শেষ পর্যন্ত আয়াতটি তাদের মুখস্থ হয়ে গেল।

দূতদ্বয় আকসাম ইবনে সায়ফীর কাছে ফিরে এসে উল্লিখিত আয়াত শুনিয়ে দিল। আয়াতটি শুনেই আকসাম বলল ঃ এতে বোঝা যায় যে, তিনি উত্তম চরিত্রের আদেশ দেন এবং মন্দ ও অপকৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন করতে নিষেধ করেন। তোমরা সবাই তাঁর ধর্মের দীক্ষা নাও, যাতে তোমরা অন্যদের অগ্রে থাক এবং পেছনে অনুসারী হয়ে না থাক।—(ইবনে-কাসীর)।

এমনিভাবে হযরত ওসমান ইবনে মযউন (রাঃ) বলেন ঃ শুরুতে আমি লোকমুখে শুনে ঝোঁকের মাথায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, আমার অন্তরে ইসলাম বদ্ধমূল ছিল না। একদিন আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, হঠাৎ তাঁর উপর ওহী অবতরণের লক্ষণ প্রকাশ পেল। কতিপয় বিচিত্র অবস্থার পর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র দূত এসেছিল এবং এই আয়াত আমার প্রতি নাযিল হয়েছে। হযরত ওসমান ইবনে মযউন বলেন ঃ এই ঘটনা দেখে এবং আয়াত শুনে আমার অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল ও অটল হয়ে গেল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহব্বত আমার মনে আসন পেতে বসল। ইবনে কাসীর এ ঘটনা বর্ণনা করে এর সনদকে হাসান ও নির্ভুল বলেছেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ আয়াত ওলীদ ইবনে মুগীরার সামনে তেলাওয়াত করলে সে-ও প্রভাবান্বিত হয় এবং কুরায়শদের সামনে ভাষণ দেয় যে ঃ

والله ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اصله لمورق واعلاه لمثمر وما هو بقول بشر –

আল্লাহ্‌র কসম, এতে একটি বিশেষ মাধুর্য রয়েছে। এর মধ্যে একটি বিশেষ রওনক ও ঔজ্জ্বল্য রয়েছে। এর মূল থেকে শাখা ও পাতা গজাবে এবং শাখা ফলন্ত হবে। এটা কখনও কোন মানুষের বাক্য হতে পারে না।

তিনটি বিষয়ের আদেশ ও তিনটি বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তিনটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন ঃ সুবিচার, অনুগ্রহ ও আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ করতে নিষেধ করেছেন ঃ অশ্লীলতা, যাবতীয় মন্দ কাজ এবং জুলুম ও উৎপীড়ন। আয়াতে ব্যবহৃত ছয়টি শব্দের পারিভাষিক অর্থ ও সংজ্ঞার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

عدل — শব্দের আসল ও আভিধানিক অর্থ সমান করা। এর সাথে সম্বন্ধ রেখেই বিচারকদের জনগণের বিরোধ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় সুবিচারমূলক ফয়সালা করাকে عدل বলা হয়। اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ আয়াতে এ অর্থই বিধৃত হয়েছে। এ অর্থের দিক দিয়েই স্বল্পতা ও বাহুল্যের মাঝামাঝি সমতাকেও عدل বলা হয়। কোন কোন তফসীরবিদ এ অর্থের সাথে সম্বন্ধ রেখেই আলোচ্য আয়াতে বাইরে ও ভিতরে সমান হওয়া দ্বারা عدل শব্দের তফসীর করেছেন। অর্থাৎ, عدل এমন উক্তি অথবা কর্ম, যা মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে প্রকাশ পায় এবং অন্তরেও তদ্রূপ বিশ্বাস থাকে। বাস্তব সত্য এই যে, এখানে عدل শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে উপরোক্ত সব অর্থই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তফসীরবিদদের কাছ থেকে বর্ণিত এসব অর্থের মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই।

ইবনে আরবী বলেন ঃ 'আদল' শব্দের প্রকৃত অর্থ সমান করা। এরপর বিভিন্ন সম্পর্কের কারণে এর অর্থ বিভিন্ন হয়ে যায়। উদাহরণতঃ প্রথম আদল হচ্ছে মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে আদল করা। এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলার হককে নিজের ভোগবিলাসের উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের কামনা-বাসনার উপর অগ্রাধিকার দেয়া, আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালন করা এবং নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা।

দ্বিতীয় আদল হচ্ছে মানুষের নিজের সাথে আদ্‌ল করা। তা এই যে, দৈহিক ও আত্মিক ধ্বংসের কারণাদি থেকে নিজেকে বাঁচানো, নিজের এমন কামনা পূর্ণ না করা যা পরিণামে ক্ষতিকর হয় এবং সবর ও অল্পেতুষ্টি অবলম্বন করা, নিজের উপর অহেতুক বেশী বোঝা না চাপানো।

তৃতীয় আদ্‌ল হচ্ছে নি[illegible] বং সমগ্র সৃষ্টজীবের সাথে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করা, ছোটবড় ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা না করা, সবার জন্যে নিজের মনের কাছে সুবিচার দাবী করা এবং কোন মানুষকে কথা অথবা কার্য দ্বারা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কোনরূপ কষ্ট না দেয়া।

এমনিভাবে বিচারে রায় দেয়ার সময় পক্ষপাতিত্ব না করে সত্যের অনুকূলে রায় দেয়াও এক প্রকার আদল এবং প্রত্যেক কাজে স্বল্পতা ও বাহুল্যের পথ বর্জন করে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করাও আদল। আবু আবদুল্লাহ্ রাযী এ অর্থ গ্রহণ করেই বলেছেন যে, আদল শব্দের মধ্যে বিশ্বাসের সমতা, কার্যের সমতা, চরিত্রের সমতা—সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।—(বাহ্‌রেমুহীত)

ইমাম কুরতুবী আদলের অর্থ প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিবরণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ বিবরণ খুবই চমৎকার। এ থেকে আরও জানা গেল যে, আয়াতের আদল শব্দটিই যাবতীয় উত্তম কর্ম ও চরিত্র অনুসরণ এবং মন্দ কর্ম ও চরিত্র থেকে বেঁচে থাকার অর্থে পরিব্যাপ্ত।

اَلْاِحْسَانُ — এর আসল আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। তা দু'প্রকার। এক— কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসকে সুন্দর ও ভাল করা। দুই— কোন ব্যক্তির সাথে ভাল ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা। দ্বিতীয় অর্থের জন্যে আরবী ভাষায় احسان শব্দের সাথে الى অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন, এক আয়াতে وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ বলা হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উপরোক্ত উভয় প্রকার অর্থই এতে শামিল রয়েছে। প্রথম প্রকার এহ্‌সান অর্থাৎ, কোন কাজকে সুন্দর করা— এটাও ব্যাপক ; অর্থাৎ, এবাদত, কর্ম, চরিত্র, পারস্পরিক লেনদেন ইত্যাদিকে সুন্দর করা।

প্রসিদ্ধ 'হাদীসে-জিবরাঈলে' স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এহ্‌সানের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে এবাদতের এহ্‌সান। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌র এবাদত এভাবে করা দরকার, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি আল্লাহ্‌র উপস্থিতির এমন স্তর অর্জন করতে না পার, তবে এতটুকু বিশ্বাস তো প্রত্যেক এবাদতকারীরই থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তাআলা তার কাজ দেখছেন। কেননা, আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে কোন কিছু থাকতে পারে না — এটা ইসলামী বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশ ইহ্‌সান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এতে এবাদতের এহ্‌সান এবং যাবতীয় কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসের এহ্‌সান অর্থাৎ এগুলোকে প্রার্থিত উপায়ে বিশুদ্ধ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করা বোঝানো হয়েছে। এছাড়া মুসলমান, কাফের মানুষ ও

জীব-জন্তু নির্বিশেষে সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করার বিষয়টিও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ যার ঘরে তার বিড়াল খাবার ও অন্যান্য দরকারী বস্তু না পায় এবং যার পিঁজরায় আবদ্ধ পাখীর পুরোপুরি দেখাশোনা করা না হয়, সে যত এবাদতই করুক, এহ্সানকারী বলে গণ্য হবে না।

আয়াতে প্রথমে আদল ও পরে এহ্সানের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আদল হচ্ছে অন্যের অধিকার পুরোপুরি দেয়া এবং নিজের অধিকার পুরোপুরি নেয়া — কমও নয়, বেশীও নয়। তোমাকে কেউ কষ্ট দিলে তুমি তাকে ততটুকুই কষ্ট দাও, যতটুকু সে দিয়েছে। পক্ষান্তরে এহ্সান হচ্ছে অপরকে তার প্রাপ্য অধিকারের চাইতে বেশী দেয়া এবং নিজের অধিকার নেয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি না করা এবং কিছু কম হলেও গ্রহণ করে নেয়া। এমনিভাবে কেউ তোমাকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দিলে তুমি তার কাছ থেকে সমান প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দাও। বরং সৎকাজের মাধ্যমে মন্দকাজের প্রতিদান দাও। এমনিভাবে আদলের আদেশ হল ফরয ও ওয়াজিবের স্তরে এবং এহ্সানের আদেশ হল কর্মের স্তরে।

وَإِيتَائِ ذِى الْقُرْبٰى — এ হচ্ছে তৃতীয় আদেশ। ايتاء শব্দের অর্থ কোন কিছু দেয়া এবং قربى শব্দের অর্থ আত্মীয়তা। ذى القربى শব্দের অর্থ আত্মীয়-স্বজন। অতএব وَإِيتَائِ ذِى الْقُرْبٰى – এর অর্থ হল আত্মীয়-স্বজনকে কিছু দেয়া। কি বস্তু দেয়া, এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু অন্য এক আয়াতে তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ — অর্থাৎ, আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দান কর। বাহ্যতঃ আলোচ্য আয়াতেও তাই বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দিতে হবে। অর্থ দিয়ে আর্থিক সেবা করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে দেখাশোনা করা, মৌখিক সান্ত্বনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি সবই উপরোক্ত প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত। এহ্সান শব্দের মধ্যে আত্মীয়ের প্রাপ্য দেয়ার কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু অধিক গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে একে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ তিনটি ছিল ইতিবাচক নির্দেশ। অতঃপর তিনটি নিষেধাজ্ঞা তথা নীতিবাচক নির্দেশ বর্ণিত হচ্ছে।

وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ অশ্লীলতা, অসৎ কর্ম ও সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। প্রকাশ্য মন্দকর্ম অথবা কথাকে অশ্লীলতা বলা হয়, যাকে প্রত্যেকেই মন্দ মনে করে। 'মুনকার' তথা অসৎকর্ম এমন কথা অথবা কাজকে বলা হয় যা হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তবিদগণ একমত। তাই মতবিরোধের কারণে কোন পক্ষকে 'মুনকার' বলা যায় না। প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, কর্মগত ও চরিত্রগত যাবতীয় গোনাহ্ই মুনকারের অন্তর্ভুক্ত। بغى – শব্দের আসল অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। এখানে জুলুম ও উৎপীড়ন বোঝানো হয়েছে। মুনকার শব্দের যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে, তাতে فحشاء ও بغى ও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চূড়ান্ত মন্দ হওয়ার কারণে فحشاء কে পৃথক এবং অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে بغى –কে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এর প্রভাব অপরাপর লোক পর্যন্ত সংক্রমিত হয়। মাঝে মাঝে এই সীমালঙ্ঘন পারস্পরিক যুদ্ধ পর্যন্ত অথবা আরও অধিক সারা বিশ্বেও অশান্তি সৃষ্টির পর্যায়ে পৌছে যায়।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ জুলুম ব্যতীত এমন কোন গোনাহ্ নেই, যার বিনিময় ও শাস্তি দ্রুত দেয়া হবে। এতে বোঝা যায় যে, জুলুমের কারণে পরকালীন কঠোর শাস্তি তো হবেই; এর পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তাআলা জালেমকে শাস্তি দেন; যদিও সে বুঝতে পারে না যে, এটা অমুক জুলুমের শাস্তি। আল্লাহ্ তাআলা মজলুমের সাহায্য করারও অঙ্গীকার করেছেন।

আলোচ্য আয়াত যে ছয়টি ইতিবাচক ও নীতিবাচক নির্দেশ দান করেছে, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সাফল্যের অমোঘ প্রতিকার।

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম ঃ যেসব লেনদেন ও চুক্তি কথার মাধ্যমে জরুরী করে নেয়া হয়; অর্থাৎ, দায়িত্ব নেয়া হয়, কসম খাওয়া হোক বা না হোক, কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক বা না করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক, সবগুলোই عهد শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

এই আয়াতগুলো প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহেরই ব্যাখ্যা ও পূর্ণতা প্রদান। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ন্যায়বিচার ও ইহ্সানের আদেশ দেয়া হয়েছিল। عدل শব্দের মর্মার্থের মধ্যে প্রতিজ্ঞা পূরণও অন্তর্ভুক্ত।— (কুরতুবী)

কারও সাথে অঙ্গীকার করার পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অতি বড় গোনাহ্। কিন্তু এ ভঙ্গ করার কারণে কোন নির্দিষ্ট কাফফারা দিতে হয় না; বরং পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পিঠে একটি পতাকা লাগিয়ে দেয়া হবে, যা হাশরের মাঠে তার অপমানের কারণ হবে।

এমনিভাবে যে কাজের কসম খাওয়া হয়, তার বিপরীত করাও কবীরা গোনাহ্। তাতে তো পরকালে বিরাট শাস্তি হবেই দুনিয়াতেও কোন কোন অবস্থায় কাফ্ফারা জরুরী হবে।— (কুরতুবী)

اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِىَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ — এ আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কোন দলের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়ে গেলে পার্থিব স্বার্থ ও উপকারের জন্যে সে চুক্তি ভংগ করো না। উদাহরণতঃ তোমরা অনুভব কর যে, যে দল অথবা পার্টির সাথে চুক্তি হয়েছে, তারা দুর্বল ও সংখ্যায় কম কিংবা আর্থিক দিক দিয়ে নিঃস্ব। তাদের বিপরীতে অপরদল সংখ্যাগরিষ্ঠ, শক্তিশালী অথবা ধনাঢ্য। এমতাবস্থায় শুধু এই লোভে যে, শক্তিশালী ও ধনাঢ্য দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে মুনাফা অধিক হবে, প্রথম পার্টির সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা জায়েয নয়; বরং তোমরা অঙ্গীকারে অটল থাকবে এবং লাভ ও ক্ষতি আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করবে। তবে যে দল অথবা পার্টির সাথে অঙ্গীকার করা হয়, তারা যদি শরীয়ত বিরোধী কাজ-কর্ম করে বা করায় তবে তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েয। শর্ত এই যে, পরিষ্কার ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে, আমরা এখন থেকে আর এ চুক্তি পালন করব না। فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষে উপরোক্ত পরিস্থিতিকে মুসলমানদের পরীক্ষার উপায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয়ে পরীক্ষা নেন যে, তারা রৈপিক স্বার্থ ও কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে অংগীকার ভংগ করে, না আল্লাহ্র আদেশ পালনার্থে রিপুর প্রেরণাকে বিসর্জন দেয়?

وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا۟ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا۟ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍۭ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

(৯৪) তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহদ্বন্দ্বের বাহানা করো না। তা হলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে এ কারণে যে, তোমরা আমার পথে বাধাদান করেছ এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে। (৯৫) তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা উত্তম তোমাদের জন্যে, যদি তোমরা জ্ঞানী হও। (৯৬) তোমাদের কাছে যা আছে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, কখনও তা শেষ হবে না। যারা সবর করে, আমি তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দেব তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদানস্বরূপ যা তারা করত। (৯৭) যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত। (৯৮) অতএব, যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করুন। (৯৯) তার আধিপত্য চলে না তাদের উপর, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপন পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। (১০০) তার আধিপত্য তো তাদের উপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে অংশীদার মানে। (১০১) এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন তারা বলে ঃ আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না। (১০২) বলুন, একে পবিত্র ফেরেশতা পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ নাযিল করেছেন, যাতে মুমিনদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এটা মুসলমানদের জন্যে পথনির্দেশ ও সুসংবাদস্বরূপ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًا — এ আয়াতে আরও একটি বিরাট শাস্তি ও গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, যদি কেউ কসম খাওয়ার সময়ই কসমের খেলাফ করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং শুধু অন্যকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে কসম খায়, তবে এটা সাধারণ কসম ভঙ্গ করার চাইতেও অধিক বিপজ্জনক গোনাহ্। এর পরিণতিতে ঈমান থেকেই বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوتِهَا বাক্যের উদ্দেশ্য তাই।

وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا — অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার সামান্য মূল্যের বিনিময়ে ভঙ্গ করো না। এখানে 'সামান্য মূল্য' বলে দুনিয়ার মুনাফাকে বোঝানো হয়েছে। এগুলো পরিমাণে যত বেশীই হোক না কেন, পরকালের মুনাফার তুলনায় দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ সামান্যই বটে। যে ব্যক্তি পরকালের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত লোকসানের কারবার করে। কারণ, অনন্তকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট নেয়ামত ও ধন-সম্পদকে ক্ষণভঙ্গুর ও অপকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করা কোন বুদ্ধিমান পছন্দ করতে পারে না।

ইবনে আতিয়্যা বলেন ঃ যে কাজ সম্পন্ন করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব, সেটাই তার জন্যে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার। এরূপ কাজ সম্পন্ন করার জন্যে কারও কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা এবং বিনিময় না নিয়ে কাজ না করার অর্থই আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এমনিভাবে যে কাজ না করা ওয়াজিব, কারও কাছ থেকে বিনিময় নিয়ে তা সম্পাদন করার অর্থও আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

এতে বোঝা গেল, প্রচলিত সব রকম উৎকোচই হারাম। উদাহরণতঃ সরকারী কর্মচারী কোন কাজের বেতন সরকার থেকে পায়, সে বেতনের বিনিময়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। যদি সে একাজ করার জন্যে কারও কাছে বিনিময় চায় এবং বিনিময় ছাড়া কাজ করতে গড়িমসি করে, তবে সে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করছে। এমনিভাবে কর্তৃপক্ষ তাকে যে কাজ করার ক্ষমতা দেয়নি, উৎকোচের বিনিময়ে তা করাও আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল।—(বাহ্‌রে-মুহীত)

উৎকোচের সংজ্ঞা ঃ ইবনে আতিয়্যার এ আলোচনায় উৎকোচের সংজ্ঞাও এসে গেছে। তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতের ভাষায় তা এই ঃ

অর্থাৎ,—যে কাজ করা তার দায়িত্বে ওয়াজিব, তা করার জন্যে বিনিময় গ্রহণ করা অথবা যে কাজ না করা তার জন্যে ওয়াজিব, তা করার জন্যে বিনিময় গ্রহণ করাকে উৎকোচ বলে।—(বাহরে মুহীত, ৫৩৩ পৃঃ ৫ম খন্ড)

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ —অর্থাৎ, যা কিছু তোমাদের কাছে রয়েছে (এতে পার্থিব মুনাফা বোঝানো হয়েছে) তা সবই নিঃশেষ ও ধ্বংস হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে (এতে পরকালের সওয়াব ও আযাব বোঝানো হয়েছে) তা চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে।

مَا عِندَكُمْ শব্দ বলতে সাধারণতঃ ধন-সম্পদের দিকে মন যায়। শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা সৈয়দ আসগর হুসাইন সাহেব মরহুম বলেন ঃ ৮

শব্দটি আভিধানিকভাবে ব্যাপক অর্থবহ। এখানে ব্যাপক অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে কোন শরীয়তসম্মত বাধা নেই। তাই এতে পার্থিব ধন-সম্পদ তো অন্তর্ভুক্ত আছেই, এছাড়া দুনিয়াতে মানুষ আনন্দ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা, লাভ-লোকসান, বন্ধুত্ব-শত্রুতা ইত্যাদি যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়, সেগুলোও এতে শামিল রয়েছে। এগুলো সবই ধ্বংসশীল। তবে এসব অবস্থা ও ব্যাপারের যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং কেয়ামতের দিন যেগুলোর কারণে সওয়াব ও আযাব হবে, সেগুলো সব অক্ষয় হয়ে থাকবে। অতএব, ধ্বংসশীল অবস্থা ও কাজ-কারবারে মগ্ন হয়ে থাকা এবং জীবন ও জীবনের কর্মক্ষমতা এতেই নিয়োজিত করে চিরস্থায়ী আযাব ও সওয়াবের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

'হায়াতে তাইয়্যেবা' কি? সংখ্যা গরিষ্ঠ তফসীরবিদগণের মতে এখানে 'হায়াতে তাইয়্যেবা' বলে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এর অর্থ পারলৌকিক জীবন। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ীও এরূপ অর্থ নয় যে, সে কখনও অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না। বরং অর্থ এই যে, মুমিন ব্যক্তি কোন সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্টে পতিত হলেও দু'টি বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। এক, অল্পেতুষ্টি এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপনের অভ্যাস, যা দারিদ্র্যের মাঝেও কেটে যায়। দুই, তার এ বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটন ও অসুস্থতার বিনিময়ে পরকালে সুমহান, চিরস্থায়ী নেয়ামত পাওয়া যাবে। কাফের ও পাপাচারীর অবস্থা এর বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও অসুস্থতার সম্মুখীন হলে তার জন্যে সান্ত্বনার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে সে কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। প্রায়শঃ আত্মহত্যা করে। পক্ষান্তরে সে যদি সচ্ছল জীবনের অধিকারী হয়, তবে লোভের আতিশয্য তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। সে কোটিপতি হয়ে গেলে অর্বপতি হওয়ার চিন্তায় জীবনকে বিড়ম্বনাময় করে তোলে।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও উৎসাহিত করা হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায়ই মানুষ এসব বিধি-বিধানে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তাই ৯৮তম আয়াত থেকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ প্রার্থনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। প্রতিটি সৎকর্মের বেলায় এর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে কোরআন পাঠের সাথে এর উল্লেখ রয়েছে। এ বিশেষত্বের কারণ এটাও হতে পারে যে, কোরআন তেলাওয়াত এমন একটি কাজ, যদ্দ্বারা শয়তান পলায়ন করে।

যারা কোরআন পাঠ করে, তাদের কাছ থেকে দৈত্যদানব লেজ গুটিয়ে পালায়। এ ছাড়া কোন কোন বিশেষ আয়াত ও সূরা শয়তানী প্রভাব দূর করার জন্যে পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র। এগুলোর কার্যকারিতা ও উপকারিতা হাদীস ও কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত।— (বয়ানুল-কোরআন)

এ সত্ত্বেও যখন কোরআন তেলাওয়াতের সাথে শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য কাজের বেলায়ও এটা আরও জরুরী হয়ে যায়। এ ছাড়া স্বয়ং কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে শয়তানী কুমন্ত্রণারও আশঙ্কা থাকে। ফলে তেলাওয়াতের আদব-কায়দা কম হয়ে যায় এবং চিন্তাভাবনা ও বিনয়-নম্রতা থাকে না। এ জন্যেও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। —(ইবনে-কাসীর, মাযহারী)

ইবনে-কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন ঃ মানুষের শত্রু দু'রকম। এক, স্বয়ং মানবজাতির মধ্য থেকে ; যেমন সাধারণ কাফের। দুই, জিনদের মধ্য থেকে অবাধ্য শয়তানের দল। ইসলাম প্রথম প্রকার শত্রুকে জেহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শত্রুর জন্যে শুধু আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছে। কারণ, প্রথম প্রকার শত্রু স্বজাতীয়। তার আক্রমণ প্রকাশ্যভাবে হয়। তাই তার সাথে জেহাদ ও লড়াই ফরয করে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানের শত্রুতা দৃষ্টিগোচর হয় না। তার আক্রমণও মানুষের উপর সামনা-সামনি হয় না। তাই তাকে প্রতিহত করার জন্যে এমন সত্তার আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য করা হয়েছে, যিনি মানুষ ও শয়তান কারও দৃষ্টিগোচর নয়। আর শয়তানকে প্রতিহত করার বিষয়টি আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পন করার যথার্থতা এই যে, যে ব্যক্তি শয়তানের কাছে পরাজিত হবে, সে আল্লাহ্‌র দরবার থেকে বিতাড়িত এবং আযাবের যোগ্য হবে। মানবশত্রুর বেলায় এমন নয়। কাফেরদের সাথে যুদ্ধে কেউ পরাজিত হলে কিংবা নিহত হলে সে শহীদ ও সওয়াবের অধিকারী হবে। তাই দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা মানবশত্রুর মোকাবিলা করা সর্বাবস্থায় লাভজনক—জয়ী হলে শত্রুর শক্তি নিশ্চিহ্ন হবে এবং পরাজিত হলে শহীদ হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে সওয়াবের অধিকারী হবে।

মাসআলা ঃ কোরআন তেলাওয়াতের সময় 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম' পাঠ করা আলোচ্য আয়াতের আদেশ পালনকল্পে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে তা পাঠ করেননি বলেও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। তাই অধিকাংশ আলেম এ আদেশকে ওয়াজিব নয়—সুন্নত বলেছেন। ইবনে জরীর তাবারী এ বিষয়ে সবার ইজমা বর্ণনা করেছেন।

নামাযে আউযুবিল্লাহ্ শুধু প্রথম রাকাআতের শুরুতে, না প্রত্যেক রাকআতের শুরুতে পড়তে হবে, এ সম্পর্কে ফেকাহবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) মতে শুধু প্রথম রাকআতে পড়া উচিত। ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রত্যেক রাকআতের শুরুতে পড়তে হবে, এ সম্পর্কে ফেকাহ্‌বিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইমাম আবু হানীফার মতে শুধু প্রথম রাকআতে পড়া উচিত। ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রত্যেক রাকআতের শুরুতে পড়া মোস্তাহাব। উভয়পক্ষের প্রমাণাদি তফসীরে-মাযহারীতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআন তেলাওয়াত নামাযে হোক কিংবা নামাযের বাইরে—উভয় অবস্থাতে তেলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ পাঠ করা সুন্নত। তবে একবার পড়ে নিলে পরে যতবারই তেলাওয়াত হবে প্রথম আউযুবিল্লাহই যথেষ্ট হবে। মাঝখানে তেলাওয়াত বাদ দিয়ে কোন সাংসারিক কাজে মশগুল হলে পুনর্বার তেলাওয়াতের সময় আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়া উচিত।

কোরআন তেলাওয়াত ছাড়া অন্য কোন কালাম অথবা কিতাব পাঠ করার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়া সুন্নত নয়। সেক্ষেত্রে শুধু বিসমিল্লাহ্ পড়া উচিত।—(দুররে-মুখতার)

তবে বিভিন্ন কাজ ও অবস্থায় আউযুবিল্লাহ্‌র শিক্ষা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। উদাহরণতঃ কারও অধিক ক্রোধের উদ্রেক হলে হাদীসে আছে যে, আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করলে ক্রোধ দমিত হয়ে যায়।—(ইবনে-কাসীর)

হাদীসে আরও বলা হয়েছে, পায়খানায় প্রবেশ করার পূর্বে 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুসে ওয়াল খাবায়েসে' পাঠ করা মোস্তাহাব।—(শামী)

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভরসা শয়তানের আধিপত্য থেকে

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي
يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن
بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن
مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ
الْخَاسِرُونَ ﴿١٠٩﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ
مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٠﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن
نَّفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾

(১০৩) আমি তো ভালভাবেই জানি যে, তারা বলে ঃ তাকে জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা দেয়। যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা তো আরবী নয় এবং এ কোরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়। (১০৪) যারা আল্লাহ্‌র কথায় বিশ্বাস করে না, তদেরকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১০৫) মিথ্যা কেবল তারা রচনা করে, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না এবং তারাই মিথ্যাবাদী। (১০৬) যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি। (১০৭) এটা এ জন্যে যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (১০৮) এরাই তারা, আল্লাহ্ তা'আলা এদেরই অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই কান্ডজ্ঞানহীন। (১০৯) বলাবাহুল্য, পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (১১০) যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর দেশত্যাগী হয়েছে অতঃপর জেহাদ করেছে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা এসব বিষয়ের পরে অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১১) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্থনে সওয়াল-জওয়াব করতে করতে আসবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ ফল পাবে এবং তাদের উপর জুলুম করা হবে না।

মুক্তির পথ ঃ এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা শয়তানকে এমন শক্তি দেননি যাতে সে যে কোন মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অসাবধানতাবশতঃ কিংবা কোন স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তারই দোষ। তাই বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজ-কর্মে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখে (কেননা, তিনিই সৎকাজের তওফীকদাতা এবং প্রত্যেকটি অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী) এ ধরনের লোকের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। অবশ্য যারা আত্মস্বার্থের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার কথাবার্তা পছন্দ করে এবং আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে কোন সৎকাজের দিকে যেতে দেয় না এবং তারা সমস্ত মন্দ কাজের অগ্রভাগে থাকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মাসআলা ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তিকে হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়, যদি প্রবল বিশ্বাস থাকে যে, হুমকিদাতা তা কার্যে পরিণত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তবে এমন জবরদস্তির ক্ষেত্রে সে যদি মুখে কুফ্‌রী কালাম উচ্চারণ করে, তবে তাতে কোন গোনাহ্ নেই এবং তার স্ত্রী তার জন্যে হারাম হবে না। তবে শর্ত এই যে, তার অন্তর ঈমানে অটল থাকতে হবে এবং কুফ্‌রী কালামকে মিথ্যা ও মন্দ বলে বিশ্বাস করতে হবে।—(কুরতুবী, মাযহারী)

আলোচ্য আয়াতটি কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যাদেরকে মুশরিকরা গ্রেফতার করেছিল এবং হত্যার হুমকি দিয়ে কুফ্‌রী অবলম্বন করতে বলেছিল।

যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন হযরত আম্মার, তদীয় পিতা ইয়াসির, মাতা সুমাইয়্যা, সুহায়েব, বেলাল এবং খাব্বাব (রাঃ)। তাঁদের মধ্যে হযরত ইয়াসির ও তদীয় সহধর্মিণী সুমাইয়্যা কুফ্‌রী কালাম উচ্চারণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। হযরত ইয়াসিরকে হত্যা করা হয় এবং হযরত সুমাইয়্যাকে দু'উটের মাঝখানে বেঁধে উট দু'টিকে দু'দিকে হাঁকিয়ে দেয়া হয়। ফলে তিনি দ্বিখন্ডিত হয়ে শহীদ হন। এ দু'জন মহাত্মাই ইসলামের জন্যে সর্বপ্রথম শাহাদত বরণ করেন। এমনিভাবে হযরত খাব্বাবও কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে অস্বীকার করে হাসিমুখে শাহাদত বরণ করে নেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আম্মার প্রাণের ভয়ে কুফ্‌রির মৌখিক স্বীকারোক্তি করলেও তাঁর অন্তর ঈমানে অটল ছিল। শত্রুর কবল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হন, তখন অত্যন্ত দুঃখের সাথে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি যখন কুফ্‌রী কালাম বলেছিলে, তখন তোমার অন্তরের অবস্থা কি ছিল? তিনি আরয করলেন ঃ আমার অন্তর ঈমানের উপর স্থির এবং অটল ছিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে আশ্বাস দেন যে, তোমাকে এজন্যে কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এ সিদ্ধান্তের সত্যায়নেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

জোর-জবরদস্তির সংজ্ঞা ও সীমা ঃ اكراه -এর শাব্দিক অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তিকে এমন কথা বলতে অথবা এমন কাজ করতে বাধ্য করা, যা বলতে বা করতে সে সম্মত নয়। এরূপ জোর-জবরদস্তির দু'টি পর্যায় রয়েছে। এক, মনে-প্রাণে তাতে সম্মত নয়, কিন্তু এমন অক্ষম ও

অবশ্যও নয় যে, অস্বীকার করতে পারে না। ফেকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় এ স্তরকে اكراه غير ملجئ বলা হয়। এরূপ জবরদস্তির কারণে কুফুরী বাক্য বলা অথবা কোন হারাম কাজ করা জায়েয নয়। তবে কোন কোন খুঁটিনাটি বিধানে এর কারণেও কিছু প্রতিক্রিয়া প্রমাণিত হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহ্ শাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে।

জোর-জবরদস্তির দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে এমন অক্ষম ও অপারক করে দেয়া যে, সে যদি জোর-জবরদস্তিকারীদের কথামত কাজ না করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে কিংবা তার কোন অঙ্গহানি করা হবে। ফেকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় এ পর্যায়কে اكراه ملجئ বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এমন জোর-জবরদস্তি, যা মানুষকে ক্ষমতাহীন ও অক্ষম করে দেয়। এমন জবরদস্তির অবস্থায় অন্তর ঈমানের উপর স্থির ও অটল থাকার শর্তে মুখে কুফুরী কলেমা উচ্চারণ করা জায়েয। এমনিভাবে কাউকে হত্যা করা ছাড়া অন্য কোন হারাম কাজ করতে বাধ্য করলে তা করলেও কোন গোনাহ্ নেই।

কিন্তু উভয় প্রকার জোর-জবরদস্তির মধ্যে শর্ত এই যে, হুমকিদাতা যে বিষয়ের হুমকি দেয়, তা বাস্তবায়নের শক্তিও তার থাকতে হবে এবং যাকে হুমকি দেয়া হয় তার প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, সে যদি তার কথা না মানে, তবে যে বিষয়ের হুমকি দিচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত করে ফেলবে।—(মাযহারী)

লেনদেন দু'প্রকার। এক, যাতে আন্তরিকভাবে সম্মতি অপরিহার্য ; যেমন কেনা-বেচা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এগুলোতে আন্তরিকভাবে সম্মত হওয়া শর্ত। কোরআন বলে إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ —অর্থাৎ, অপরের মাল হালাল হয় না যে পর্যন্ত উভয় পক্ষের সম্মতিতে ব্যবসা ইত্যাদির আদান-প্রদান না হয়। হাদীসে আছে, لايحل مال امرئٍ مسلم الابطيب نفس منه "কোন মুসলমানের মাল হালাল হয় না, যে পর্যন্ত সে মনের খুশীতে তা দিতে সম্মত না হয়।"

এ জাতীয় লেনদেন যদি জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে করা হয়, তবে শরীয়তের আইনে তা অগ্রাহ্য হবে। জোর-জবরদস্তির অবস্থা কেটে গেলে যখন সে স্বাধীন হবে—জোর-জবরদস্তির অবস্থায় কৃত কেনা-বেচা অথবা দান-খয়রাত ইচ্ছা করলে সে বহালও রাখতে পারে, বাতিলও করে দিতে পারে।

কিছু কাজ ও বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলো শুধু মুখের কথার উপর নির্ভরশীল। ইচ্ছা, সম্মতি, খুশী ইত্যাদি শর্ত নয় ; যেমন বিয়ে, তালাক, তালাক প্রত্যাহার, গোলাম মুক্তকরণ ইত্যাদি। এ জাতীয় ব্যাপার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة - رواه ابوداود والترمذى অর্থাৎ, দু'ব্যক্তি যদি মুখে বিয়ের ইজাব-কবুল শর্তানুযায়ী করে নেয় অথবা কোন স্বামী স্ত্রীকে মুখে তালাক দিয়ে দেয় অথবা ১/২ তালাকের পর মুখে তা প্রত্যাহার করে নেয় হাসি-ঠাট্টার ছলে হলেও এবং অন্তরে বিয়ে, তালাক ও তালাক প্রত্যাহারের ইচ্ছা না থাকলেও মুখের কথা দ্বারা বিয়ে, তালাক এবং প্রত্যাহার বাস্তবায়িত হয়ে যাবে।—(মাযহারী)

ইমাম আযম আবু হানীফা, শা'বী, যুহ্‌রী, নখয়ী ও কাতাদাহ্ (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ জবরদস্তির অবস্থায় যদিও সে তালাক দিতে আন্তরিকভাবে সম্মত ছিল না, অক্ষম হয়ে তালাক শব্দ বলে দিয়েছে, তবুও তালাক হয়ে যাবে। কারণ, তালাক হওয়ার সম্পর্ক শুধু তালাক শব্দ বলে দেয়ার সাথে— মনের ইচ্ছা ও মনন শর্ত নয় ; যেমন, পূর্বোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে জবরদস্তি অবস্থায় তালাক হবে না। কেননা, হাদীসে আছে, رفع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكر هوا عليه অর্থাৎ, আমার উম্মত থেকে ভুল, বিস্মৃতি এবং যে কাজে তাদেরকে বাধ্য করা হয়, সব তুলে নেয়া হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফার মতে এ হাদীসটি পরকালীন বিধানের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, ভুল-বিস্মৃতির কারণে অথবা জবরদস্তির অবস্থায় কোন কথা অথবা কাজ শরীয়তের বিরুদ্ধে করে বা বলে ফেললে সেজন্যে কোন গোনাহ্ হবে না। দুনিয়ার বিধান এবং এ কাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, এগুলোর প্রতিফলন অনুভূত ও চাক্ষুস। এর প্রতিফলনের কারণে দুনিয়ার যেসব বিধান হওয়া সম্ভব, সেগুলো অবশ্যই হবে। উদাহরণতঃ একজন অন্য জনকে ভুলবশতঃ হত্যা করল। এখানে হত্যার গোনাহ্ এর পরকালের শাস্তি নিশ্চয়ই হবে না। কিন্তু হত্যার চাক্ষুস পরিণতি অর্থাৎ, নিহত ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ যেমন অবশ্যই হয়, তেমনি এর শরীয়তগত পরিণতিও সাব্যস্ত হবে যে, তার স্ত্রী ইদ্দতের পর পুনর্বিবাহ করতে পারবে এবং তার ধন-সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হবে। এমনিভাবে যখন তালাক, তা প্রত্যাহার ও বিয়ের শব্দ মুখে বলে দেয়, তখন তার শরীয়তগত পরিণতিও প্রতিফলিত হয়ে যাবে।—(মাযহারী, কুরতুবী)

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَىِٕنَّةً
يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ
اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا
يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ جَاۤءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ
فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٣﴾ فَكُلُوْا مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ
كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ
الدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٥﴾
وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا
حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۗ اِنَّ
الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ۗ ﴿١١٦﴾
مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۖ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الَّذِيْنَ
هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا
ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٨﴾

(১১২) আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে স্বাদ আস্বাদন করালেন, ক্ষুধা ও ভীতির। (১১৩) তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল আগমন করেছিলেন। অনন্তর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করল। তখন আযাব এসে ওদেরকে পাকড়াও করল এবং নিশ্চিতই ওরা ছিল পাপাচারী। (১১৪) অতএব, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তাঁরই এবাদতকারী হয়ে থাক। (১১৫) অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা জবাইকালে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। অতঃপর কেউ সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে নিরুপায় হয়ে পড়লে তবে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১৬) তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না। (১১৭) যৎসামান্য সুখ-সম্ভোগ ভোগ করে নিক। তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (১১৮) ইহুদীদের জন্যে আমি তো কেবল তাই হারাম করেছিলাম যা ইতিপূর্বে আপনার নিকট উল্লেখ করেছি। আমি তাদের প্রতি কোন জুলুম করিনি, কিন্তু তারাই নিজেদের উপর জুলুম করত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১১২তম আয়াতে ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদনের জন্যে 'লেবাস' শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক আস্বাদন করানো হয়েছে। অথচ পোশাক আস্বাদন করার বস্তু নয়। কিন্তু এখানে লেবাস শব্দটি পুরোপুরি পরিবেষ্টনকারী হওয়ার কারণে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, ক্ষুধা ও ভীতি তাদের সবাইকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে, যেমন পোশাক দেহের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়, ক্ষুধা এবং ভীতিও তাদের উপর তেমনিভাবে চেপে বসে।

আয়াতে বর্ণিত দৃষ্টান্তটি কোন কোন তফসীরবিদের মতে একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। এর সম্পর্ক বিশেষ কোন জনপদের সাথে নয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ একে মক্কা মুকাররমার ঘটনা সাব্যস্ত করেছেন। মক্কাবাসীরা সাত বছর পর্যন্ত নিদারুণ দুর্ভিক্ষে পতিত ছিল। এমনকি, মৃত জন্তু, কুকুর ও ময়লা-আবর্জনা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। এছাড়া মুসলমানদের ভয়ও তাদেরকে পেয়ে বসেছিল। অবশেষে মক্কার সরদাররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরয করল যে, কুফরী ও অবাধ্যতার দোষে পুরুষরা দোষী হতে পারে, কিন্তু শিশু ও মহিলারা তো নির্দোষ। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের জন্যে মদীনা থেকে খাদ্যসম্ভার পাঠিয়ে দেন।—(মাযহারী)

আবু সুফিয়ান কাফের অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অনুরোধ করেন যে, আপনি তো আত্মীয় বাৎসল্য, দয়া-দাক্ষিণ্য ও মার্জনা শিক্ষা দেন। আপনারই স্বজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষ দূর করে দেয়ার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের জন্যে দোয়া করেন এবং দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

উল্লেখিত চারের মধ্যেই হারাম বস্তু সীমাবদ্ধ নয় : ১১৫ তম আয়াতে ব্যবহৃত انما শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, হারাম বস্তু আয়াতে উল্লেখিত চারটিই। এর চাইতে আরও অধিক স্পষ্টভাবে قُلْ لَّاۤ اَجِدُ فِيْ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا আয়াত থেকে জানা যায় যে, এগুলো ছাড়া অন্য কোন বস্তু হারাম নয়। অথচ কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ইজমা দ্বারা আরও বহু বস্তু হারাম। এ সংশয়ের জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে চিন্তা করলেই খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে সাধারণ হালাল ও হারাম বস্তুসমূহের তালিকা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় ; বরং জাহেলিয়াত আমলের মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে যে অনেক বস্তু হারাম করে নিয়েছিল, অথচ আল্লাহ্ তদ্রূপ কোন নির্দেশ দেননি, সেগুলো বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, তাদের হারাম কৃত বস্তুসমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে শুধু এগুলোই হারাম। এ আয়াতের পুরোপুরি তফসীর এবং চারটি হারাম বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা মা'আরেফুল-কোরআন প্রথম খণ্ডে সূরা বাক্বারার ১৭৩ আয়াতের তফসীরে দ্রষ্টব্য।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْۢ
بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾
إِنَّ إِبْرٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ اجْتَبٰهُ وَهَدٰىهُ إِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَآتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ
الصّٰلِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ
اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾ ادْعُ إِلٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجٰدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ
صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾
إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

(১১৯) অনন্তর যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আপনার পালনকর্তা এসবের পরে তাদের জন্যে অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১২০) নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক, সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহ্রই অনুগত এবং তিনি শেরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (১২১) তিনি তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে মনোনীত করেছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। (১২২) আমি তাঁকে দুনিয়াতে দান করেছি কল্যাণ এবং তিনি পরকালেও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (১২৩) অতঃপর আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, ইবরাহীমের দ্বীন অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং শেরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (১২৪) শনিবার দিন পালন যে নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা তাদের জন্যেই যারা এতে মতবিরোধ করেছিল। আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। (১২৫) আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। (১২৬) আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম। (১২৭) আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহ্র জন্য ব্যতীত নয়, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না। (১২৮) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেযগার এবং যারা সৎকর্ম করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যে গোনাহ্ বোঝে-সুঝে করা হয় এবং যে গোনাহ্ না বোঝে করা হয় সবই তওবা দ্বারা মাফ হতে পারে ঃ আয়াতে إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ এর **جهل** শব্দ নয় বরং **جهالة** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। **جهل** শব্দটি علم এর বিপরীতে অজ্ঞানতা ও বোধহীনতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে **جهالة** এর অর্থ হয় মূর্খসুলভ কান্ড, যদিও তা বোঝে-সুঝে করা হয়। এতে বোঝা গেল যে, তওবা দ্বারা শুধু না বোঝে অথবা অনিচ্ছায় করা গোনাহ্ই মাফ হয় না; বরং যে গোনাহ্ সচেতনভাবে করা হয়, তাও মাফ হয়।

১২০ তম আয়াতে **امة** (উম্মত) শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর প্রসিদ্ধ অর্থ দল ও সম্প্রদায়। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে এখানে এ অর্থই বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আঃ) একাই এক ব্যক্তি, এক সম্প্রদায় ও কওমের গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। 'উম্মত' শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে জাতির অনুসৃত নেতা ও গুণাবলীর আধার। কোন কোন তফসীরকার এখানে এ অর্থই নিয়েছেন। **قانت** শব্দের অর্থ আজ্ঞাবহ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) উভয়গুণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অনুসৃত এ কারণে যে, সমগ্র বিশ্বের প্রসিদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সবাই একবাক্যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দ্বীনের অনুসরণকে সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করে। ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানরা তো তাঁর প্রতি অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখেই, আরবের মুশরিকরা মূর্তিপূজা সত্ত্বেও এ মূর্তি সংহারকের প্রতি ভক্তিতে গদগদ এবং তাঁর ধর্মের অনুসরণকে গর্বের বিষয় গণ্য করে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) যে, আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ ও অনুগত ছিলেন, এর বিশেষ স্বাতন্ত্র্য সেসমস্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ফুটে উঠে, যেগুলোতে আল্লাহ্র এ দোস্ত উত্তীর্ণ হন। নমরূদের আগুন, পরিবার-পরিজনকে জনশূন্য প্রান্তরে ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ, অনেক আশা-আকাঙ্খার পর পাওয়া পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যত হওয়া- এসব স্বাতন্ত্র্যের কারণেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে উল্লেখিত উপাধিসমূহে সম্মানিত করেন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি দ্বীনে ইবরাহিমীর অনুসরণের নির্দেশ ঃ আল্লাহ্ তাআলা যে শরীয়ত ও বিধানাবলী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দান করেছিলেন, শেষ নবী (সাঃ)-এর শরীয়তেও কতিপয় বিধান ছাড়া তদ্রূপ রাখা হয়েছে। যদিও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পয়গম্বর ও রসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর ; কিন্তু এখানে শ্রেষ্ঠতরকে স্বল্পশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অনুসরণ করার নির্দেশ দানের পেছনে দু'টি তাৎপর্য কার্যকর। এক, সেই শরীয়ত পূর্বে দুনিয়াতে এসে গেছে এবং সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ হয়েছে। সর্বশেষ শরীয়তও যেহেতু তদ্রূপ হবার ছিল, তাই একে অনুসরণ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই, আল্লামা যমখশরীর ভাষায় অনুসরণের এ নির্দেশও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্মানসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ সম্মান। এর বৈশিষ্ট্যের প্রতি ثم (অতঃপর) শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব একদিকে এবং এগুলোর মধ্যে সর্বোপরি গুণ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও হাবীবকে তাঁর দ্বীনের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি এবং পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম ঃ আলোচ্য ১২৫তম আয়াতে দাওয়াত ও প্রচারের পূর্ণাঙ্গ কর্মপন্থা, মূলনীতি ও শিষ্টাচারের পূর্ণ বিবরণ অল্প কথায় বিধৃত হয়েছে। তফসীর কুরতুবীতে

রয়েছে, হযরত হরম ইবনে হাইয়্যানের মৃত্যুর সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা অনুরোধ করল ঃ আমাদেরকে কিছু ওসীয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ "মানুষ সাধারণতঃ অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে ওসীয়ত করে। অর্থ-সম্পদ আমার কাছে নেই। কিন্তু আমি তোমদেরকে আল্লাহ্ তাআলার আয়াতসমূহ বিশেষতঃ সূরা নাহ্‌লের সর্বশেষ আয়াতসমূহের ব্যাপারে ওসীয়ত করছি। এগুলোকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে।" উল্লেখিত আয়াতসমূহই হচ্ছে সে আয়াত।

دعوة – এর শাব্দিক অর্থ ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো, আহ্বান করা। পয়গম্বরগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করা। এরপর নবী ও রসূলের সমস্ত শিক্ষা হচ্ছে এ দাওয়াতেরই ব্যাখ্যা। কোরআন পাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিশেষ পদবী হচ্ছে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী হওয়া। সূরা আহ্‌যাবের ৪৬তম আয়াতে বলা হয়েছে, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا এবং সূরা আহ্‌কাফের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে, يَٰقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়া উম্মতের উপরও ফরয করা হয়েছে। সূরা আলে-এমরানে আছে,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন থাকা উচিত, যারা মানুষকে মঙ্গলের প্রতি দাওয়াত দেবে (অর্থাৎ) সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে।

অন্য আয়াতে আছে,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ — অর্থাৎ, কথা-বার্তার দিক দিয়ে সে ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে হবে, যে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়?

বর্ণনায় বিষয়টিকে কোন সময় دعوت الى الله কোন সময় دعوت الى الخير এবং কোন কোন সময় دعوت الى سبيل الله শিরোনাম দেয়া হয়। সবগুলোর সারমর্ম এক। কেননা, আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়ার দ্বারা তাঁর দ্বীন এবং সরল পথের দিকেই দাওয়াত দেয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ -এতে আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণ رب (পালনকর্তা) উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি এর সম্বন্ধ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দাওয়াতের কাজটি লালন ও পালনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা যেমন তাঁকে পালন করেছেন, তেমনি তাঁরও প্রতিপালনের ভঙ্গিতে দাওয়াত দেয়া উচিত। এতে প্রতিপক্ষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে, তার উপর চাপ সৃষ্টি না হয় এবং অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়। স্বয়ং দাওয়াত শব্দটিও এই কর্ম প্রকাশ করে। কেননা, পয়গম্বরের দায়িত্ব শুধু বিধি-বিধান পৌঁছে দেয়া ও শুনিয়ে দেয়াই নয়; বরং লোকদেরকে তা পালন করার দাওয়াত দেয়াও বটে। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি কাউকে দাওয়াত দেয়, সে তাকে এমন সম্বোধন করে না, যাতে তার মনে বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মে অথবা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তামাশা করে না।

بِالْحِكْمَةِ 'হিকমত' শব্দটি কোরআন পাকে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এস্থলে কোন কোন তফসীরবিদ হিকমতের অর্থ কোরআন, কেউ কেউ কোরআন ও সুন্নাহ্ এবং কেউ কেউ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ স্থির করেছেন। রূহুল-মা'আনী বাহ্‌রেমুহীতের বরাত দিয়ে হিকমতের তফসীর নিম্নরূপ করেছেন انها الكلام الصواب الواقع من النفس اجمل موقع -অর্থাৎ, এমন বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা হয়, যা মানুষের মনে আসন করে নেয়। এ তফসীরের মধ্যে সব উক্তি সন্নিবেশিত হয়ে যায়। রূহুল-বয়ানের গ্রন্থকারও প্রায় এই অর্থটিই এরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ 'হিকমত বলে সে অন্তর্দৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুঁজে নেয় যে, প্রতিপক্ষের উপর বোঝা হয় না। নম্রতার স্থলে নম্রতা এবং কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে। যেখানে মনে করে যে, স্পষ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে সেখানে ইঙ্গিতে কথা বলে কিংবা এমন ভঙ্গি অবলম্বন করে, যদ্দরুন প্রতিপক্ষ লজ্জার সম্মুখীন হয় না এবং তার মনে একগুঁয়েমিভাবও সৃষ্টি হয় না।'

وَالْمَوْعِظَةِ - موعظة ও وعظ -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্যে নরম হয়ে যায়। উদাহরণতঃ তার কাছে কবুল করার সওয়াব ও উপকারিতা এবং কবুল না করার শাস্তি ও অপকারিতা বর্ণনা কর। — (কামুস, মুফরাদাতে-রাগিব)

الْحَسَنَةِ -এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোন স্বার্থ নেই—শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলেছেন।

موعظة শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকরী ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ অপমানবোধ করে। — (রূহুল-মা'আনী)

এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্যে حسنة শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে।

وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ - جادل শব্দটি مجادلة ধাতু থেকে উদ্ভূত। مجادلة এখানে বলে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক বোঝানো হয়েছে। بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ -এর অর্থ এই যে, যদি দাওয়াতের কাজে কোথাও তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তর্ক-বিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরকার। রূহুল-মা'আনীতে বলা হয়েছে, উত্তম পন্থার মানে এই যে, কথাবার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। বহুল প্রচলিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বাক্যাবলীর মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ দূরিভূত হয় এবং সে হঠকারিতার পথ পরিহার করে। কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, 'উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক' শুধু মুসলমানদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং আহ্‌লে কিতাব সম্পর্কে বিশেষভাবে কোরআন বলে যে,

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ —অন্য আয়াতে হযরত মূসা ও হারূন (আঃ)-কে فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا নির্দেশ দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের মত অবাধ্য কাফেরের সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত।

দাওয়াতের মূলনীতি ও শিষ্টাচার ঃ আলোচ্য আয়াতে দাওয়াতের জন্যে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) হিকমত। (দুই) সদুপদেশ এবং (তিন) উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক। কোন কোন তফসীরকার বলেন ঃ এ তিনটি বিষয় তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্যে বর্ণিত হয়েছে। হিকমতের মাধ্যমে দাওয়াত জ্ঞানী ও সুধীজনের জন্যে, উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত জনসাধারণের জন্যে এবং বিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াত তাদের জন্যে যাদের অন্তরে সন্দেহ ও দ্বিধা রয়েছে অথবা যারা হঠকারিতা ও একগুঁয়েমির কারণে কথা মেনে নিতে সম্মত হয় না।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) বয়ানুল-কোরআনে বলেন ঃ এ তিনটি বিষয় পৃথক পৃথক তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্যে হওয়া আয়াতের বর্ণনাপদ্ধতির দিক দিয়ে অযৌক্তিক মনে হয়।

বাহ্যিক অর্থ এই যে, দাওয়াতের এই সুষ্ঠু পন্থাগুলো প্রত্যেকের জন্যেই ব্যবহার্য। কেননা, দাওয়াতে সর্বপ্রথম হিকমতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের অবস্থা যাচাই করে তদনুযায়ী শব্দ চয়ন করতে হবে। এরপর এসব বাক্যে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যদ্বারা প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হতে পারে। বর্ণনাভঙ্গি ও কথাবার্তা সহানুভূতি পূর্ণ ও নরম রাখতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষ নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছু বলছে, আমারই উপকারার্থে এবং হিতাকাংখাবশতঃ বলছে—আমাকে শরমিন্দা করা অথবা আমার মর্যাদাকে আহত করা তার লক্ষ্য নয়।

অবশ্য রুহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার এখানে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বর্ণনা করে বলেছেন যে, আয়াতের বর্ণনাপদ্ধতি থেকে জানা যায়, আসলে দু'টি বিষয়ই দাওয়াতের মূলনীতি-হিকমত ও উপদেশ। তৃতীয় বিষয় বিতর্ক মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে দাওয়াতের পথে কোন কোন সময় এরও প্রয়োজন দেখা দেয়।

মোটকথা, দাওয়াতের মূলনীত দু'টি — হিকমত ও উপদেশ। এগুলো থেকে কোন দাওয়াত খালি থাকা উচিত নয়, আলেম ও বিশেষ শ্রেণীর লোকদেরকে দাওয়াত দেয়া হোক কিংবা সর্বসাধারণকে দাওয়াত দেয়া হোক। তবে দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন লোকদেরও সম্মুখীন হতে হয়, যারা সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত থাকে এবং দাওয়াতদানকারীর সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় বিতর্কের শিক্ষা দান করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ -এর শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে যে, যে বিতর্ক এ শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, শরীয়তে তার কোন মর্যাদা নেই।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ বাক্যে প্রথমত ঃ আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানকারী দেরকে আইনগত অধিকার দেয়া হয়েছে যে, যারা নির্যাতন চালায়, তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার জন্যে বৈধ, কিন্তু এই শর্তে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে না। যতটুকু জুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে; বেশী হতে পারবে না।

আয়াতের শেষে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রয়েছে, কিন্তু সবর করা উত্তম।

আয়াতের শানে নুযূল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবীদের পক্ষ থেকে নির্দেশ পালন ঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদগণের মতে এ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। ওহুদ যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবীর শাহাদত বরণ এবং হযরত হামযা (রাঃ)-কে হত্যার পর তাঁর লাশের নাক-কান কর্তনে ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। সহীহ্ বোখারীর রেওয়ায়েত তদ্রূপই। দার-কুতুনী হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে ঃ

ওহুদের যুদ্ধে-ময়দান থেকে মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সত্তর জন সাহাবীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। তাঁদের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য হযরত হামযা (রাঃ)-এর মৃতদেহও ছিল। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দারুণভাবে মর্মাহত হলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম., আমি হামযার পরিবর্তে মুশরিকদের সত্তর জনের মৃতদেহ বিকৃত করব। এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য وَإِنْ عَاقَبْتُمْ শীর্ষক তিনটি আয়াত নাযিল হয়েছে।—(তাফসীর কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, কাফেররা অন্যান্য সাহাবীদের মৃতদেহও বিকৃত করেছিল।—(তিরমিযি, আহমদ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে-হাব্বান)

এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই দুঃখের আতিশয্যে বিকৃতদেহ সাহাবীদের পরিবর্তে সত্তর জন মুশরিকের মৃতদেহ বিকৃত করার সংকল্প করেছিলেন। এটা আল্লাহ্র কাছে সে সমতা ও সুবিচারের অনুকূল ছিল না, যা তাঁর মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার আপনার রয়েছে বটে, কিন্তু সে পরিমাণই, যে পরিমাণ জুলুম হয়েছে। সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখে কয়েক জনের প্রতিশোধ সত্তর জনের উপর শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে ঠিক নয়। দ্বিতীয়তঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ন্যায়ানুগ আচরণের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি যদিও রয়েছে, কিন্তু তাও ছেড়ে দিন এবং অপরাধীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। এটা অধিক শ্রেয়ঃ।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এখন আমরা সবরই করব। একজনের উপরও প্রতিশোধ নেব না। এরপর তিনি কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দেন।—(মাযহারী)

মক্কা বিজয়ের সময় এসব মুশরিক পরাজিত হয়ে যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের হস্তগত হয়, তখন ওহুদ যুদ্ধের সময় কৃত সংকল্প পূর্ণ করার একটা উত্তম সুযোগ ছিল। কিন্তু উল্লেখিত আয়াত নাযিল হওয়ার সময়ই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করে সবর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাই মক্কা বিজয়ের সময় তিনি আয়াত অনুযায়ী সবর অবলম্বন করেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো মক্কা বিজয়ের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। এটাও সম্ভব যে, আয়াতগুলো বার বার নাযিল হয়েছে। প্রথমে ওহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং পরে মক্কা বিজয়ের সময় পুনর্বার অবতীর্ণ হয়েছে।—(মাযহারী)

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াতটি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতার আইন ব্যক্ত করেছে। এ কারণেই ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে, তার বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আহত করলে আহতকারীকে জখমের পরিমাণে জখম করা হবে। কেউ কাউকে হাত পা কেটে হত্যা করলে নিহতের ওলীকে অধিকার দেয়া হবে, সেও প্রথমে হত্যাকারীর হাত-পা কর্তন করবে, অতঃপর হত্যা করবে।

سورة بني اسراءيل مكية وهي مائة واحدى عشرة اية واثنا عشر ركوعا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ
اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝١ وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ
جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝٢
ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝٣
وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ
مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝٤ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا
عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ؕ
وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝٥ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ
وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ۝٦
اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۟ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ؕ
فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا
الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ۝٧

সূরা বনী ইসরাঈল

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১১১

পরম মেহেরবান দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত— যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি—যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। (২) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং সেটিকে বনী-ইসরাঈলের জন্যে হেদায়েতে পরিণত করেছি যে, তোমরা আমাকে ছাড়া কাউকে কার্যনির্বাহী স্থির করো না। (৩) তোমরা তাদের সন্তান, যাদেরকে আমি নূহের সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা। (৪) আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দু'বার অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং অত্যন্ত বড় ধরনের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। (৫) অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। (৬) অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম। (৭) তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

তবে কেউ যদি কাউকে পাথর মেরে কিংবা তীর দ্বারা আহত করে হত্যা করে, তাহলে এতে হত্যার প্রকারভেদের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর নয় যে, কি পরিমাণ আঘাত দ্বারা হত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তি কি পরিমাণ কষ্ট পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার সমতার কোন মাপকাঠি নেই। তাই হত্যাকারীকে তরবারি দ্বারাই হত্যা করা হবে।— (জাস্‌সাস)

মাসআলা ঃ আয়াতটি যদিও দৈহিক কষ্ট ও দৈহিক ক্ষতি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক এবং এতে আর্থিক ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একারণেই ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারও অর্থসম্পদ ছিনতাই করে, প্রতিপক্ষেরও অধিকার রয়েছে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার কিংবা অপহরণ করার। তবে শর্ত এই যে, যে অর্থসম্পদ সে ছিনিয়ে নেবে কিংবা অপহরণ করবে, তা ছিনতাইকৃত অর্থসম্পদের অভিন্ন প্রকার হতে হবে। উদাহরণতঃ নগদ টাকা-পয়সা ছিনতাই করলে বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকা-পয়সা তার কাছ থেকে ছিনতাই করলে *বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকা-পয়সা তার কাছ থেকে ছিনতাই কিংবা* অপহরণের মাধ্যমে নিতে হবে। খাদ্যশস্য বস্ত্র ইত্যাদি ছিনতাই করলে, সেই রকম খাদ্য শস্য ও বস্ত্র নিতে পারে। কিন্তু এক প্রকার সামগ্রীর বিনিময়ে অন্য কোন ব্যবহারিক বস্তু জোরপূর্বক নিতে পারবে না। কোন কোন ফেকাহ্‌বিদ সর্বাবস্থায় অনুমতি দিয়েছেন—এক প্রকার হোক কিংবা ভিন্ন প্রকার। এ মাসআলার কিছু বিবরণ কুরতুবী স্বীয় তফসীরে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা ফেকাহ্‌গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ —আয়াতে সাধারণ আইন বর্ণিত হয়েছিল। এতে সব মুসলমানের জন্যে সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ, কিন্তু সবর করা শ্রেয়ঃ বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সবর করতে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেননা, তাঁর মহত্ত্ব ও উচ্চপদ হেতু অন্যের তুলনায় এটাই ছিল তাঁর পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তাই বলা হয়েছে ঃ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ —অর্থাৎ, আপনি তো প্রতিশোধের ইচ্ছাই করবেন না– সবরই করুন। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আপনার সবর আল্লাহ্‌র সাহায্যে হবে। অর্থাৎ, সবর করা আপনার জন্যে সহজ করে দেয়া হয়েছে যে, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ -এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য তাদের সাথে থাকে, যারা দু'টি গুণে গুণান্বিত। এক তাকওয়া ও ইহ্‌সান। তাকওয়ার অর্থ সৎকর্ম করা এবং ইহ্‌সানের অর্থ এখানে সৃষ্ট জীবের সাথে সদ্ব্যবহার করা। অর্থাৎ, যারা শরীয়তের অনুসারী হয়ে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরের সাথে সদ্ব্যবহার করে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের সঙ্গে আছেন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্য (সাহায্য) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অনিষ্ট সাধন করার সাধ্য কার?

সূরা বনী-ইসরাঈল

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَسْرٰى শব্দটি اسراء ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ রাত্রে নিয়ে যাওয়া। এরপর لَيْلًا শব্দটি স্পষ্টতঃ এ অর্থ ফুটিয়ে তুলেছে। لَيْلًا শব্দটি نكرة ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনায়

সম্পূর্ণ রাত্রি নয়; বরং রাত্রির একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে। আয়াতে উল্লেখিত মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে 'ইসরা' বলা হয় এবং সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত যে সফর হয়েছে, তার নাম মে'রাজ। ইসরা অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর মে'রাজ সূরা নাজমে উল্লেখিত রয়েছে এবং অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মান ও গৌরবের স্তরে بِعَبْدِهٖ শব্দটি একটি বিশেষ প্রেমময়তার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং কাউকে 'আমার বান্দা' বললে এর চাইতে বড় সম্মান মানুষের জন্যে আর হতে পারে না।

কোরআন ও হাদীস থেকে দৈহিক মে'রাজের প্রমাণাদি ও ইমজা : ইসরা ও মে'রাজের সমগ্র সফর যে শুধু আত্মিক ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের সফরের মত দৈহিক ছিল, একথা কোরআন পাকের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আলোচ্য আয়াতের প্রথম سُبْحٰنَ শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, এ শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়। মে'রাজ যদি শুধু আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নজগতে সংঘটিত হত, তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? স্বপ্নে তো প্রত্যেক মুসলমান, বরং প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে যে, সে আকাশে উঠেছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ করেছে।

عبد শব্দ দ্বারা এদিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, শুধু আত্মাকে দাস বলে না; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই দাস বলা হয়। এছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মে'রাজের ঘটনা হযরত উম্মে হানী (রাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারও কাছে একথা প্রকাশ করবেন না; প্রকাশ করলে কাফেররা আপনার প্রতি আরও বেশী মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই হত, তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল?

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাফেররা মিথ্যারোপ করল এবং ঠাট্টা বিদ্রূপ করল। এমনকি, কতক নও-মুসলিম এ সংবাদ শুনে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতসব তুলকালাম কাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা ছিল কি? তবে, এ ঘটনার আগে এবং স্বপ্নের আকারে কোন আত্মিক মে'রাজ হয়ে থাকলে তা এর পরিপন্থী নয়

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِىْٓ اَرَيْنٰكَ আয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের মতে رؤيا (স্বপ্ন) বলে رؤيت (দেখা) বোঝানো হয়েছে। কিন্তু একে رؤيا শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই হতে পারে যে, এ ব্যাপারটিকে রূপক অর্থে رؤيا বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে যদি رؤيا শব্দের অর্থ স্বপ্নই নেয়া হয়, তবে এমনটিও অসম্ভব নয়। কারণ, মে'রাজের ঘটনাটি দৈহিক হওয়া ছাড়া এবং আগে কিংবা পরে আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নযোগেও হয়ে থাকবে। এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে যে স্বপ্নযোগে মে'রাজ হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে, তাও যথাস্থানে নির্ভুল। কিন্তু এতে শারীরিক মে'রাজ না হওয়া প্রমাণিত হয় না।

তফসীর কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াতির। নাক্কাশ এ সম্পর্কে বিশ জন সাহাবীর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং কাযী আয়ায শেফা গ্রন্থে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত পূর্ণরূপে যাচাই-বাছাই করে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পঁচিশ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁদের কাছ থেকে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। নামগুলো এই : হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, আলী মর্তুজা, ইবনে মাসউদ, আবু যর গিফারী, মালেক ইবনে ছা'ছা, আবু হোরায়রা, আবু সায়ীদ, ইবনে আব্বাস, শাদ্দাদ ইবনে আউস, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুর রহমান ইবনে কুর্য, আবু হাইয়্যা, আবু লায়লা, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, বুরায়দাহ্, আবু আইউব আনসারী, আবু উমামা, সামুরা ইবনে জুনদুব, আবুল হামরা, সোহায়ব রুমী, উম্মে হানী, আয়েশা, আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)।

এরপর ইবনে-কাসীর বলেন فحديث الاسراء اجمع عليه المسلمون واعرض عنه الزنادقة والملحدون সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী যিন্দীকরা একে মানেনি।

মে'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ইবনে-কাসীরের রেওয়ায়েত থেকে : ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের তফসীর এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করার পর বলেন : সত্য কথা এই যে, নবী করীম (সাঃ) ইসরা সফর জাগ্রত অবস্থায় করেন; স্বপ্নে নয়। মক্কা মোকাররমা থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এ সফর বোরাকযোগে করেন। বায়তুল-মোকাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে তিনি বোরাকটি অদূরে বেঁধে দেন এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করেন এবং কেবলার দিকে মুখ করে দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করেন। অতঃপর সিঁড়ি আনা হয়, যাতে নীচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্যে ধাপ বানানো ছিল। তিনি সিঁড়ির সাহায্যে প্রথমে প্রথম আকাশে, অতঃপর অবশিষ্ট আকাশসমূহে গমন করেন। এ সিঁড়িটি কি এবং কিরূপ ছিল, তার প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। ইদানিং-কালেও অনেক প্রকার সিঁড়ি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে। স্বয়ংক্রিয় লিফটের আকারে সিঁড়িও আছে। এই অলৌকিক সিঁড়ি সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধার কারণ নেই। প্রত্যেক আকাশে সেখানকার ফেরেশতারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং প্রত্যেক আকাশে সে সমস্ত পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাত হয়, যাঁদের অবস্থান কোন নির্দিষ্ট আকাশে রয়েছে। উদাহরণতঃ ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা (আঃ) এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তিনি পয়গম্বরগণের স্থানসমূহও অতিক্রম করে যান এবং এক ময়দানে পৌছেন, যেখানে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তিনি 'সিদরাতুল-মুনতাহা' দেখেন, যেখানে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙ-এর প্রজাপতি ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করছিল। ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত জিবরাঈলকে তাঁর স্বরূপে দেখেন। তাঁর ছয় শত পাখা ছিল। সেখানেই তিনি একটি দিগন্তবেষ্টিত সবুজ রঙের 'রফরফ' দেখতে পান। সবুজ রঙের গদিবিশিষ্ট পাল্কীকে রফরফ বলা হয়। তিনি বায়তুল-মা'মুরও দেখেন। বায়তুল-মামুরের নিকটেই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এই বায়তুল মামুরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। কেয়ামত পর্যন্ত তাদের পুনর্বার প্রবেশ করার পালা আসবে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বচক্ষে জান্নাত ও দোযখ পরিদর্শন করেন। সে সময় তাঁর উম্মতের জন্য প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামায ফরয হওয়ার নির্দেশ হয়। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেয়া হয়। এ দ্বারা সব এবাদতের মধ্যে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

অতঃপর তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন আকাশে যেসব পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল তাঁরাও তাঁর সাথে বায়তুল-মোকাদ্দাসে অবতরণ করেন। তাঁরা (যেন) তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত আগমন করেন। তখন নামাযের

সময় হয়ে যায় এবং তিনি পয়গম্বরগণের সাথে নামায আদায় করেন। সেটা সেদিনকার ফজরের নামাযও হতে পারে। ইবনে-কাসীর বলেন ঃ নামাযে পয়গম্বরগণের ইমাম হওয়ার এ ঘটনাটি কারও কারও মতে আকাশে যাওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যতঃ এ ঘটনাটি প্রত্যাবর্তনের পর ঘটে। কেননা, আকাশে পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত জিব্রাঈল সব পয়গম্বরগণের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে এখানে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল উর্ধ্ব জগতে গমন করা। কাজেই একাজটি প্রথমে সেরে নেয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সব পয়গম্বর বিদায় দানের জন্যে তাঁর সাথে বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত আসেন এবং জিব্রাঈলের ইঙ্গিতে তাঁকে সবাই ইমাম বানিয়ে কার্যতঃ তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়া হয়।

এরপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে বিদায় নেন এবং বোরাকে সওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতেই মক্কা মোকাররমা পৌছে যান।

মে'রাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলিমের সাক্ষ্য ঃ তফসীর ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে ঃ হাফেয আবু নায়ীম ইস্পাহানী দালায়েলুন্নবুওয়ত গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওয়াকেদীর সনদে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুযীর বাচনিক নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন ঃ

'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র লিখে হযরত দেহ্ইয়া ইবনে খলীফাকে প্রেরণ করেন। এরপর দেহ্ইয়ার পত্র পৌছানো, রোম সম্রাট পর্যন্ত পৌছা এবং তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন, এসব কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, যা সহীহ্ বোখারী এবং হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। এ বর্ণনার উপসংহারে বলা হয়েছে যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস পত্র পাঠ করার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অবস্থা জানার জন্যে আরবের কিছু সংখ্যক লোককে দরবারে সমবেত করতে চাইলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হরব ও তাঁর সঙ্গীরা সে সময় বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে সে দেশে গমন করেছিল। নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে দরবারে উপস্থিত করা হল। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে যেসব প্রশ্ন করেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ্ বোখারী, মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। আবু সুফিয়ানের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে এই সুযোগে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে এমন কিছু কথাবার্তা বলবে যাতে, সম্রাটের সামনে তাঁর ভাবমূর্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আবু সুফিয়ান নিজেই বলে যে, আমার এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার পথে একটি মাত্র অন্তরায় ছিল। তা এই যে, আমার মুখ দিয়ে কোন সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা বের হয়ে পড়লে সম্রাটের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হব এবং আমার সঙ্গীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ভৎসনা করবে। তখন আমার মনে মে'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা জাগে। এটা যে মিথ্যা ঘটনা তা সম্রাট নিজেই বোঝে নেবেন। আমি বললাম ঃ আমি তাঁর ব্যাপারটি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি? আবু সুফিয়ান বলল ঃ নবুওয়তের এই দাবীদারের উক্তি এই যে, সে এক রাত্রিতে মক্কা মোকাররমা থেকে বের হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পৌছেছে এবং প্রত্যুষের পূর্বে মক্কায় আমাদের কাছে ফিরে গেছে।

ইলিয়ার (বায়তুল-মোকাদ্দাসের) সর্বপ্রধান যাজক ও পন্ডিত তখন রোম সম্রাটের পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমি সে রাত্রি সম্পর্কে জানি। রোম সম্রাট তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি এ সম্পর্কে কিরূপে জানেন? সে বলল ঃ আমার অভ্যাস ছিল যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের সব দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত আমি শয্যা গ্রহণ করতাম না। সে রাত্রে আমি অভ্যাস অনুযায়ী সব দরজা বন্ধ করে দিলাম, কিন্তু একটি দরজা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হল না। আমি আমার কর্মচারীদের ডেকে আনলাম। তারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালাল। কিন্তু দরজাটি তাদের পক্ষেও বন্ধ করা সম্ভব হল না। (দরজার কপাট স্বস্থান থেকে মোটেই নড়ছিল না।) মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোন পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগাচ্ছি। আমি অপারগ হয়ে কর্মকার ও মিস্ত্রীদেরকে ডেকে আনলাম। তারা পরীক্ষা করে বলল ঃ কপাটের উপর দরজার প্রাচীরের বোঝা চেপে বসেছে। এখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করার কোন উপায় নেই। সকালে আমরা চেষ্টা করে দেখব, কি করা যায়। আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম এবং দরজার কপাট খোলাই থেকে গেল। সকাল হওয়া মাত্র আমি সে দরজার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, মসজিদের দরজার কাছে ছিদ্র করা একটি প্রস্তর খন্ড পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল যে, ওখানে কোন জন্তু বাঁধা হয়েছিল। তখন আমি সঙ্গীদেরকে বলেছিলাম ঃ আল্লাহ্ তাআলা এ দরজাটি সম্ভবতঃ একারণে বন্ধ হতে দেননি যে, হয়তবা আল্লাহ্র কোন প্রিয় বান্দা আগমন করেছিলেন। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, ঐ রাত্রে তিনি আমাদের মসজিদে নামায পড়েন। অতঃপর তিনি আরও বিশদ বর্ণনা দিলেন।—(ইবনে-কাসীর, ৩য় খন্ড, ২৪ পৃঃ)

ইসরা ও মে'রাজের তারিখ ঃ ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ মে'রাজের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। মূসা ইবনে ওকবার রেওয়ায়েত এই যে, ঘটনাটি হিজরতের ছয়মাস পূর্বে সংঘটিত হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ হযরত খাদীজার ওফাত নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। ইমাম যুহ্রী বলেন ঃ হযরত খাদীজার ওফাত নবুওয়ত প্রাপ্তির সাত বছর পরে হয়েছিল।

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে, মে'রাজের ঘটনা নবুওয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পরে ঘটেছে। ইবনে ইসহাক বলেন ঃ মে'রাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের সাধারণ গোত্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, মে'রাজের ঘটনাটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

হরবী বলেন ঃ ইসরা ও মে'রাজের ঘটনা রবিউসসানী মাসের ২৭ তম রাত্রিতে হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছে। ইবনে কাসেম সাহাবী বলেন ঃ নবুওয়ত প্রাপ্তির আঠার মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে। মুহাদ্দেসগণ বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করার পরে কোন সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেননি। কিন্তু সাধারণভাবে খ্যাত এই যে, রজব মাসের ২৭ তম রাত্রি মে'রাজের রাত্রি।

মসজিদে-হারাম ও মসজিদে-আকসা ঃ হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ মসজিদে-হারাম। অতঃপর আমি আরয করলাম ঃ এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এতদুভয়ের নির্মাণের মধ্যে কতদিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন ঃ চল্লিশ বছর। তিনি আরও বললেন ঃ এ তো হচ্ছে মসজিদদ্বয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্যে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাযের সময় হয়, সেখানেই নামায পড়ে নাও।—(মুসলিম)

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা বায়তুল্লাহ্র স্থানকে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তিস্তর

সপ্তম যমীনের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। মসজিদে আকসা হযরত সোলায়মান (আঃ) নির্মাণ করেছেন।—(নাসায়ী, তফসীর কুরতুবী, ১২৭ পৃঃ, ৪র্থ খন্ড)

বায়তুল্লাহ্র চারপাশে নির্মিত মসজিদকে মসজিদে-হারাম বলা হয়। মাঝে মাঝে সমগ্র হরমকেও মসজিদে হারাম বলে দেয়া হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে দু'টি রেওয়ায়েতের এ বৈপরিত্যও দূর হয়ে যায় যে, এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত উম্মে হানীর গৃহ থেকে ইসরার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে কা'বার হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্মেহানীর গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কা'বার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সূচনা হয়।

মসজিদে-আকসা ও শাম অঞ্চলের বরকত ঃ আয়াতে بَارَكْنَا حَوْلَهُ বলা হয়েছে। এখানে حول বলে সমগ্র সিরিয়াকে বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা আরশ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বরকতময় ভূপৃষ্ঠকে বিশেষ পবিত্রতা দান করেছেন।—(রূহুল-মা'আনী)

এর বরকতসমূহ দ্বিবিধ ঃ ধর্মীয় ও পার্থিব। ধর্মীয় বরকত এই যে, এ ভূভাগটি পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের কেবলা, বাসস্থান এবং সমাধিস্থান। জাগতিক বরকত হচ্ছে যে, এর উর্বর ভূমি, অসংখ্য ঝরণা ও বহমান নদ-নদী এবং অফুরন্ত ফল-ফসলের বাগানাদি। বিভিন্ন ধরনের সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটির তুলনা সত্যই বিরল।

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, হে শাম ভূমি! জনবসতিগুলোর মধ্যে তুমি আমার মনোনীত ভূ-ভাগ। আমি তোমার কাছেই স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে পৌঁছে দেব।—(কুরতুবী) মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জাল সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করবে, কিন্তু চারটি মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। (১) মদীনার মসজিদ, (২) মক্কার মসজিদ, (৩) মসজিদে আকসা এবং (৪) মসজিদে তূর।

ঘটনাপ্রবাহের আলোকে মসজিদুল-আকসা

প্রথম ঘটনা ঃ বর্তমান মসজিদে-আকসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ওফাতের কিছুদিন পরে সংশ্লিষ্ট প্রথম ঘটনাটি সংঘটি হয়। বায়তুল-মোকাদ্দাসের শাসনকর্তা ধর্মদ্রোহিতা ও কুকর্মের পথ অবলম্বন করলেন মিসরের জনৈক সম্রাট তার উপর চড়াও হয় এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আসবাপত্র লুট করে নিয়ে যায়, কিন্তু নগরী ও মসজিদকে বিধ্বস্ত করেনি।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ এর প্রায় চারশ' বছর পর সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ঘটনাটি। বায়তুল-মোকাদ্দাসে বসবাসকারী কতিপয় ইহুদী মূর্তিপূজা শুরু করে দেয় এবং অবশিষ্টরা অনৈক্যের শিকার হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়। পরিণামে পুনরায় মিসরের জনৈক সম্রাট তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং নগরী ও মসজিদ প্রাচীরেরও কিছুটা ক্ষতিসাধন করে। এরপর তাদের অবস্থান যৎকিঞ্চিত উন্নতি হয়।

তৃতীয় ঘটনা ঃ এর কয়েক বছর পর তৃতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়, যখন বাবেল সম্রাট বুখতা নছর বায়তুল-মোকাদ্দাস আক্রমণ করে এবং শহরটি পদানত করে প্রচুর ধন-সম্পদ লুট করে নেয়। সে অনেক লোককে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সাবেক সম্রাট পরিবারের জনৈক ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধিরূপে নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে।

চতুর্থ ঘটনা ঃ এর কারণ এই যে, উপরোক্ত নতুন সম্রাট ছিল মূর্তিপূজক ও অনাচারী সে বুখতা নছরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বুখতা নছর পুনরায় বায়তুল-মোকাদ্দাস আক্রমণ করে। এবার সে হত্যা ও লুটতরাজের চূড়ান্ত করে দেয়। আগুন লাগিয়ে সমগ্র শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এ দুর্ঘটনাটি সোলায়মান (আঃ) কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর সংঘটিত হয়। এরপর ইহুদীরা এখান থেকে নির্বাসিত হয়ে বাবেলে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে চরম অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্গতির মাঝে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়। অতঃপর ইরান সম্রাট বাবেলেও চড়াও হয়ে বাবেল অধিকার করে নেয়। ইরান সম্রাট নির্বাসিত ইহুদীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনরায় সিরিয়ায় পৌঁছে দেয় এবং তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীও তাদের হাতে প্রত্যার্পণ করে। এ সময় ইহুদীরা নিজেদের কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং নতুনভাবে বসতি স্থাপন করে ইরান সম্রাটের সহযোগিতায় পূর্বের নুমনা অনুযায়ী মসজিদে আকসা পুনর্নির্মাণ করে।

পঞ্চম ঘটনা ঃ ইহুদীরা এখানে পুনরায় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তারা আবার ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ১৭০ বছর পূর্বে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আন্তাকিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ইহুদীদের উপর চড়াও হয়। সে চল্লিশ হাজার ইহুদীকে হত্যা এবং চল্লিশ হাজারকে বন্দী ও গোলাম বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে মসজিদেরও অবমাননা করে, কিন্তু মসজিদের মূল ভবনটি রক্ষা পেয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্রাটের উত্তরাধিকারীরা শহর ও মসজিদকে সম্পূর্ণ ময়দানে পরিণত করে দেয়। এর কিছুদিন পর বায়তুল মোকাদ্দাস রোম সম্রাটের দখলে চলে যায়। তারা মসজিদের সংস্কার সাধন করে এবং এর আট বছর পর হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়াতে আগমন করেন।

ষষ্ঠ ঘটনা ঃ হযরত ইসা (আঃ)-এর সশরীরে আকাশে উত্থিত হওয়ার চল্লিশ বছর পর ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে। ইহুদীরা রোম সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে রোমকরা শহর ও মসজিদ পুনরায় বিধ্বস্ত করে পূর্বের ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। তখনকার সম্রাটের নাম ছিল তাইতিস। সে ইহুদীও ছিল না এবং খ্রীষ্টানও ছিল না। কেননা, তার অনেকদিন পর কনষ্টানটাইন প্রথম খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এরপর থেকে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমল পর্যন্ত মসজিদটি বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এটি পুনঃ নির্মাণ করান। এ ছয়টি ঘটনা তফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে তফসীরে বয়ানুল-কোরআনে লিখিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ছয়টি ঘটনার মধ্যে কোরআনে উল্লেখিত দু'টি ঘটনা কোন্গুলো? এর চূড়ান্ত ফয়সালা করা কঠিন। তবে বাহ্যতঃ এগুলোর মধ্যে যে ঘটনাগুলো অধিক গুরুতর ও প্রধান এবং যেগুলোর মধ্যে ইহুদীদের নষ্টামিও অধিক হয়েছে এবং শাস্তিও কঠোরতর পেয়েছে, সেগুলোই বোঝা দরকার। বলাবাহুল্য, সেগুলো হচ্ছে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনা। তফসীরে কুরতুবীতে এ প্রসঙ্গে সাহাবী হযরত হোযায়ফার বাচনিক একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতেও নির্ধারিত হয় যে, এখানে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। দীর্ঘ হাদীসটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

হযরত হোযায়ফা বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করলাম, বায়তুল মোকাদ্দাস আল্লাহ্ তাআলার কাছে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ। তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার সব গৃহের মধ্যে এটি একটি বৈশিষ্টপূর্ণ মহান গৃহ। এটি আল্লাহ্ তাআলা সোলায়মান ইবনে দাউদের (আঃ) জন্যে স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা ইয়াকূত ও যমরদ দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। সোলায়মান (আঃ) যখন এর নির্মাণকাজ আরম্ভ করেন, তখন আল্লাহ্ তাআলা জিনদেরকে তাঁর আজ্ঞাবহ করে দেন। জিনরা এসব মণিমুক্তা ও স্বর্ণরৌপ্য সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণ করে। হযরত হোযায়ফা বলেন ঃ আমি আরয করলাম, এরপর বায়তুল-মোকাদ্দাস থেকে মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য কোথায় এবং কিভাবে উধাও হয়ে গেল? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন— বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহ্র নাফরমানী করে, গোনাহ্ ও কুকর্মে লিপ্ত হল এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের ঘাড়ে বুখতা নছরকে চাপিয়ে দিলেন। বুখতা নছর ছিল অগ্নিউপাসক। সে সাতশ' বছর বায়তুল-মোকাদ্দাস শাসন করে। কোরআন পাকের فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ আয়াতে এ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। বুখতা ন'ছরের সৈন্যবাহিনী মসজিদে আকসায় ঢুকে পড়ে, পুরুষদের হত্যা, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়ীতে বহন করে নিয়ে যায় এবং স্বদেশ বাবেলে সংরক্ষিত রাখে। সে বনী-ইসরাঈলকে একশ' বছর পর্যন্ত লাঞ্ছনা সহকারে নানা রকম কষ্টকর কাজে নিযুক্ত করে রাখে।

এরপর আল্লাহ্ তাআলা ইরানের এক সম্রাটকে তার মোকাবেলার জন্যে তৈরী করে দেন। সে বাবেল জয় করে এবং অবশিষ্ট বনী-ইসরাঈলকে বুখতা নছরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে। বোখতা নছর যেসব ধন-সম্পদ বায়তুল-মোকাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়েছিল, ইরানী বাদশাহ্ সেগুলোও বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আবারও নাফরমানী কর এবং গোনাহ্র দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও পুনরায় হত্যা ও বন্দীত্বের আযাব তোমাদের উপর চাপিয়ে দেব। আয়াত عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا বলে একথাই বোঝানো হয়েছে।

বনী ইসরাঈলরা যখন বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফিরে এল এবং সমস্ত ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র তাদের হস্তগত হয়ে গেল, তখন আবারও পাপ ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ্ তাআলা রোম সম্রাটকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ আয়াতে এ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। রোম সম্রাট জলে ও স্থলে উভয় ক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করে অগণিত লোককে হত্যা ও বন্দী করে এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের সমস্ত ধন-সম্পদ এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়ীতে বোঝাই করে নিয়ে যায়। এসব ধন-সম্পদ রোমের স্বর্ণমন্দিরে এখনো পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং থাকবে। শেষ যমানায় হযরত মাহ্দী আবির্ভূত হয়ে এগুলোকে আবার এক লক্ষ সত্তর হাজার নৌকা বোঝাই করে বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনবেন এবং এখানেই আল্লাহ্ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষকে একত্রিত করবেন। (এ দীর্ঘ হাদীসটি কুরতুবী স্বীয় তফসীরে উদ্ধৃত করেছেন)

বয়ানুল-কোরআনে বলা হয়েছে, কোরআনে উল্লেখিত ঘটনাদ্বয়ের অর্থ দুইটি শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। (এক) মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ এবং (দুই) ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পর তাঁর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। উপরোল্লেখিত ঘটনাবলী প্রথম বিরুদ্ধাচরণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ঘটনাবলীর বিবরণের পর আলোচ্য আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

উল্লেখিত ঘটনাবলীর সারমর্ম এই যে, বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার ফয়সালা ছিল এই ঃ তারা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্র আনুগত্য করবে, ততদিন ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে কৃতকার্য ও সফলকাম থাকবে এবং যখনই ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়বে, তখনই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং শত্রুদের হাতে পিটুনি খাবে। শত্রুরা তাদের উপর প্রবল হয়ে শুধু তাদের জান ও মালেরই ক্ষতি করবে না; বরং তাদের পরম প্রিয় কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসও শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ থাকবে না। তাদের কাফের শত্রু বায়তুল-মোকাদ্দাসের মসজিদে ঢুকে এর অবমাননা করবে এবং একে পর্যুদস্ত করে ফেলবে। এটাও হবে বনী-ইসরাঈলের শাস্তির একটি অংশবিশেষ। কোরআন পাক তাদের দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছে। প্রথম ঘটনা মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত চলাকালীন এবং দ্বিতীয় ঘটনা ঈসা (আঃ)-এর আমলের। উভয় ক্ষেত্রেই বনী-ইসরাঈল সমকালীন শরীয়তের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। ফলে প্রথম ঘটনায় জনৈক অগ্নিপূজক সম্রাটকে তাদের উপর এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। সে অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা চালায়। দ্বিতীয় ঘটনায় জনৈক রোম সম্রাটকে তাদের উপর চাপানো হয়। সে হত্যা ও লুটতরাজ করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত মৃত্যের পুরীতে পরিণত করে দেয়। সাথে সাথে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয় ক্ষেত্রে বনী-ইসরাঈলরা যখন স্বীয় কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের দেশ, ধন-সম্পদ এবং জনবল ও সন্তান-সন্ততিকে পুনর্বহাল করে দেন।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ﴿٨﴾ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَ
يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ﴿٩﴾
وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٠﴾
وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ۗ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿١١﴾
وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ
وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ﴿١٢﴾ وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ
طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ۗ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿١٣﴾
اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ۗ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿١٤﴾ مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا
يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾ وَاِذَآ اَرَدْنَآ
اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا
الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ ۢ
بَعْدِ نُوْحٍ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۢ بَصِيْرًا ﴿١٧﴾

(৮) হয়ত তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু যদি পুনরায় তদ্রূপ কর, আমিও পুনরায় তাই করব। আমি জাহান্নামকে কাফেরদের জন্যে কয়েদখানা করেছি। (৯) এই কোরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে মহা পুরস্কার রয়েছে। (১০) এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি। (১১) মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে, সেভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষ তো খুবই দ্রুততা প্রিয় (১২) আমি রাত্রি ও দিনকে দু'টি নির্দশন করেছি। অতঃপর নিষ্প্রভ করে দিয়েছি রাতের নির্দশন এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা স্থির করতে পার বছরসমূহের গণনা ও হিসাব এবং আমি সব বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। (১৩) আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কেয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (১৪) পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট। (১৫) যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যেই পথ ভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোন রসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না। (১৬) যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করি অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে উঠে। তখন সে জনগোষ্ঠীর উপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তাকে উঠিয়ে আছাড় দেই। (১৭) নূহের পর আমি অনেক উম্মতকে ধ্বংস করেছি। আপনার পালনকর্তাই বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ জানা ও দেখার জন্যে যথেষ্ট।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ঐ ঘটনাদ্বয় উল্লেখ করার পর পরিশেষে আল্লাহ্ তাআলা এসব ব্যাপারে স্বীয় বিধি বর্ণনা করে বলেছেন ঃ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا —অর্থাৎ, তোমরা পুনরায় নাফরমানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে আমিও পুনরায় এমনি ধরনের শাস্তি ও আযাব চাপিয়ে দেব। বর্ণিত এ বিধিটি কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এতে বনী-ইসরাঈলের সেসব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রথমবার মূসার (আঃ) শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে এবং দ্বিতীয়বার ঈসার (আঃ) শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে যেভাবে তোমরা শাস্তি ও আযাবে পতিত হয়েছিলে, এখন তৃতীয় যুগ হচ্ছে শরীয়তে মুহাম্মদীয় যুগ যা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর বিরুদ্ধাচরণ করলেও তোমাদেরকে পূর্বের পরিণতিতেই ভোগ করতে হবে। আসলে তাই হয়েছে। তারা শরীয়তে-মুহাম্মদী ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হলে মুসলমানদের হাতে নির্বাসিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত তো হয়েছেই, শেষ পর্যন্ত তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসও মুসলমানদের করতলগত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, পূর্ববর্তী সম্রাটরা তাদেরকেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছিল এবং তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসেরও অবমাননা করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা বায়তুল-মোকাদ্দাস জয় করার পর শত শত বছর যাবত বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত মসজিদটি নতুনভাবে পুনঃনির্মাণ করেন এবং পয়গম্বরগণের এ কেবলার যথাযথ সম্মান পুনর্বহাল করেন।

বনী-ইসরাঈলের ঘটনাবলী মুসলমানদের জন্য শিক্ষাপ্রদ। বায়তুল মোকাদ্দাসের বর্তমান ঘটনা এ ঘটনা পরম্পরার একটি অংশ ঃ বনী-ইসরাঈলদের এসব ঘটনা কোরআন পাকে বর্ণনা করা এবং মুসলমানদেরকে শোনানোর উদ্দেশ্য বাহ্যতঃ এই যে, মুসলমানগণ এ খোদায়ী বিধি-ব্যবস্থা থেকে আলাদা নয়। তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব সম্মান, শান-শওকত, অর্থ-সম্পদও আল্লাহ্র আনুগত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন তারা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তখন তাদের শত্রু ও কাফেরদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, যাদের হাতে তাদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহেরও অবমাননা হবে।

একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঃ আল্লাহ্ তাআলা ভূপৃষ্ঠে এবাদতের জন্যে দু'টি স্থানকে এবাদতকারীদের কেবলা করেছেন। একটি বায়তুল-মোকাদ্দাস আর অপরটি বায়তুল্লাহ্। কিন্তু আল্লাহ্র আইন উভয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। বায়তুল্লাহ্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাফেরদের হাত থেকে একে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এরই পরিণতি হস্তী বাহিনীর সে ঘটনা, যা কোরআন পাকের সূরা ফীলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়ামানের খ্রীষ্টান বাদশাহ্ বায়তুল্লাহ্ ধ্বংস করার উদ্দেশে অভিযান করলে আল্লাহ্ তাআলা বিরাট হস্তী বাহিনীসহ তাকে বায়তুল্লাহ্র নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই পাখীদের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বরবাদ করে দেন।

কিন্তু বায়তুল-মোকাদ্দাসের ক্ষেত্রে এ আইন নেই। বরং আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, মুসলমানরা যখন পথভ্রষ্টতা ও গোনাহে লিপ্ত হবে, তখন শাস্তি হিসেবে তাদের কাছ থেকে এ কেবলাও ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং কাফেররা এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।

কাফের আল্লাহ্র বান্দা, কিন্তু প্রিয় বান্দা নয় ঃ উল্লেখিত প্রথম ঘটনায় কোরআন পাক বলেছে, আল্লাহ্র দ্বীনের অনুসারীরা যখন ফেৎনা

ও ফাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দেবেন, যারা তাদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের উপর হত্যা ও লুটতরাজ চালাবে। এ স্থলে কোরআন পাক عِبَادًا لَّنَا শব্দ ব্যবহার করেছে عبادنا বলেনি। অথচ এটাই ছিল সংক্ষিপ্ত। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্‌র দিকে কোন বান্দার সম্বন্ধ হয়ে যাওয়া তার জন্যে পরম সম্মানের বিষয়। যেমন, এ সূরার প্রারম্ভে أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ এর অধীনে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, শবে মে'রাজে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সম্মান ও অসাধারণ নৈকট্য লাভ করেছিলেন। কোরআন পাক এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাম অথবা কোন বিশেষ বর্ণনা করার পরিবর্তে শুধু عبده (দাস) বলে ব্যক্ত করেছে যে, মানুষের সর্বশেষ উৎকর্ষ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক তাকে দাস বলে আখ্যায়িত করা। বনী-ইসরাঈলকে শাস্তি দেয়ার জন্যে যেসব লোককে ব্যবহার করা হয়েছিল, তারা ছিল কাফের। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে عبادنا শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার পরিবর্তে اضافت তথা সম্বন্ধ পদ পরিহার করে عِبَادًا لَّنَا বলেছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিগতভাবে তো সমগ্র মানবমণ্ডলীই আল্লাহ্‌র বান্দা; কিন্তু ঈমান ব্যতীত প্রিয় বান্দা হয় না যে, তাদের اضافت তথা সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র দিকে হতে পারে।

'আকওয়াম' পথ ঃ কোরআন পাক যে পথনির্দেশ করে, তাকে 'আকওয়াম' বলা হয়েছে। 'আকওয়াম' সে পথ, যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিকটবর্তী, সহজ এবং বিপদাপদমুক্তও।— (কুরতুবী) এ থেকে বোঝা গেল যে, কোরআন পাক মানব জীবনের জন্যে যেসব বিধি-বিধান দান করে, সেগুলোতে এ তিনটি গুণই বিদ্যমান রয়েছে। যদিও মানুষ স্বল্পবুদ্ধির কারণে মাঝে মাঝে এ পথকে দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল মনে করতে থাকে ; কিন্তু রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে সমান। একমাত্র তিনিই এ সত্য জানতে পারেন যে, মানুষের উপকার কোন্ কাজে ও কিভাবে বেশী। স্বয়ং মানুষ যেহেতু সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাই সে নিজের ভালমন্দও পুরোপুরি জানতে পারে না।

সম্ভবতঃ এদিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য আয়াতসমূহের সর্বশেষ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ তো মাঝে মাঝে তাড়াহুড়া করে নিজের জন্যে এমন দোয়া করে বসে, যা পরিণামে তার জন্যে ধ্বংস ও বিপর্যয় ডেকে আনে। আল্লাহ্ তাআলা এমন দোয়া কবুল করে নিলে তা নিশ্চিতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা অধিকাংশ সময় এমন দোয়া তাৎক্ষণিকভাবে কবুল করেন না। শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজেই বুঝতে পারে যে, তার এ দোয়া ভ্রান্ত এবং তার জন্যে ভীষণ ক্ষতিকর ছিল। আয়াতের সর্বশেষ বাক্যে মানুষের একটি স্বভাবগত দুর্বলতা বিধির আকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ স্বভাবের তাড়নায়ই দ্রুততাপ্রিয়। সে বাহ্যিক লাভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টি রাখে, অথচ পরিণামদর্শিতায় ভুল করে; তাৎক্ষণিক সুখ অল্প হলেও তাকে বড় ও স্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার দান করে। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আলোচ্য আয়াতে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা বর্ণিত হয়েছে।

কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতটিকে একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনাটি এই যে, নযর ইবনে হারেস একবার ইসলামের বিরোধিতায় দোয়া করে বসে যে,

اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, যদি আপনার কাছে ইসলামই সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করুন। এমতাবস্থায় 'ইনসান' শব্দ দ্বারা এই বিশেষ ব্যক্তি অথবা তার সমস্বভাবযুক্তদের বুঝতে হবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে প্রথমে দিবারাত্রির পরিবর্তনকে আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে উজ্জ্বল করার মধ্যে বহুবিধ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও আরামের জন্যে উপযুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, রাত্রির অন্ধকারেই প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর ঘুম আসে। সমগ্র জগত একই সময়ে ঘুমায়। যদি বিভিন্ন লোকের ঘুমের জন্যে বিভিন্ন সময় নির্ধারিত থাকত, তবে জাগ্রতদের হট্টগোলে ঘুমন্তদের ঘুমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হত।

এখানে দিনকে ঔজ্জ্বল্যময় করার দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। (এক) দিনের আলোতে মানুষ রুযী অন্বেষণ করতে পারে। মেহনত, মজুরী, শিল্প ও কারিগরি সব কিছুর জন্যে আলো অত্যাবশ্যক। (দুই) দিবারাত্রির গমনাগমনের দ্বারা সন-বছরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। উদাহরণতঃ ৩৬০ দিন পূর্ণ হলে একটি সন পূর্ণতা লাভ করে।

এমনিভাবে অন্যান্য হিসাব-নিকাশও দিবারাত্রির গমনাগমনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দিবারাত্রির এই পরিবর্তন না হলে মজুরের মজুরী, চাকুরের চাকুরি এবং লেন-দেনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা সুকঠিন হয়ে যাবে।

আমলনামা গলার হার হওয়ার মর্মার্থ ঃ মানুষ যে কোন জায়গায় যে কোন অবস্থায় থাকুক, তার আমলনামা তার সাথে থাকে এবং তার আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে। মৃত্যুর পর তা বন্ধ করে রেখে দেয়া হয়। কেয়ামতের দিন এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়ে দেয়া হবে, যাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে ফয়সালা করে নিতে পারে যে, সে পুরস্কারের যোগ্য, না আযাবের যোগ্য। হযরত কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত আছে, সেদিন লেখাপড়া না জানা ব্যক্তিও আমলনামা পড়ে ফেলবে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইস্পাহানী হযরত আবু উমামার একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন কোন কোন লোকের আমলনামা যখন তাদের হাতে দেয়া হবে, তখন তারা নিজেদের কিছু কিছু সৎকর্ম তাতে অনুপস্থিত দেখে আরয করবে ঃ পরওয়ারদেগার। এতে আমার অমুক অমুক সৎকর্ম লেখা হয়নি। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে উত্তর হবে ঃ আমি সেসব সৎকর্ম নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। কারণ, তোমরা অন্যদের গীবত করতে।— (মাযহারী)

পয়গম্বর প্রেরণ ব্যতীত আযাব না হওয়ার ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতদৃষ্টে কোন কোন ফেকাহ্‌বিদের মতে যাদের কাছে কোন নবী ও রসূলের দাওয়াত পৌঁছেনি কাফের হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোন আযাব হবে না। কোন কোন ইমামের মতে ইসলামের যেসব আকীদা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায়। যেমন, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তওহীদ প্রভৃতি-সেগুলো যারা অস্বীকার করে, কুফরের কারণে তাদের আযাব হবে; যদিও তাদের কাছে নবী ও রসূলের দাওয়াত না পৌঁছে থাকে। তবে পয়গম্বরগণের দাওয়াত ও তবলীগ ব্যতীত সাধারণ গোনাহ্‌র কারণে আযাব হবে না। কেউ কেউ এখানে রসূল শব্দের ব্যাপক অর্থ নিয়েছেন; রসূল ও নবী অথবা তাদের

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا
لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا
سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ
وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ انْظُرْ كَيْفَ
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾
لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ﴿٢٢﴾ وَقَضَىٰ رَبُّكَ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ
فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ
الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ
رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ
مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴿٢٩﴾

(১৮) যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে দেই। অতঃপর তাদের জন্যে জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। (১৯) আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। (২০) এদেরকে এবং ওদেরকে প্রত্যেককে আমি আপনার পালনকর্তার দান পৌঁছে দেই এবং আপনার পালনকর্তার দান অবধারিত। (২১) দেখুন, আমি তাদের একদলকে অপরের উপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্তবায় শ্রেষ্ঠ এবং ফযীলতে শ্রেষ্ঠতম। (২২) স্থির করো না আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। (২৩) তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। (২৪) তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল : হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। (২৫) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমাশীল। (২৬) আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। (২৭) নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (২৮) এবং তোমার পালনকর্তার করুণার প্রত্যাশায় অপেক্ষমান থাকাকালে যদি কোন সময় তাদেরকে বিমুখ করতে হয়, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো। (২৯) তুমি একেবারে ব্যয়-কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।

কোন প্রতিনিধিও হতে পারেন কিংবা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও হতে পারে। কেননা, বিবেক-বুদ্ধিও এক দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র রসূল বটে।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীর মাযহারীতে লেখা রয়েছে, এতে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক ও কাফেরদের যেসব সন্তান বালেগ হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তাদের আযাব হবে না। কেননা, পিতা-মাতার কুফরের কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হবে না। অবশ্য এ প্রশ্নে ফেকাহ্‌বিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ।

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব : وَإِذَا أَرَدْنَا এবং أَمَرْنَا অতঃপর বাক্যদ্বয়ের বাহ্যিক অর্থ থেকে এরূপ সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, তাদেরকে ধ্বংস করাই ছিল আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্য। তাই প্রথমে তাদেরকে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে ঈমান ও আনুগত্যের আদেশ দেয়া অতঃপর তাদের পাপাচারকে আযাবের কারণ বানানো এসব তো আল্লাহ্ তাআলারই পক্ষ থেকে হয়। এমতাবস্থায় বেচারাদের দোষ কি? তারা তো অপারগ ও বাধ্য। এর জওয়াবের প্রতি তরজমায়ও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন এবং আযাব ও সওয়াবের পথ সুস্পষ্টভাবে বাতলে দিয়েছেন। কেউ যদি স্বেচ্ছায় আযাবের পথে চলারই ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্‌র রীতি এই যে, তিনি তাকে সেই আযাবের উপায়-উপকরণাদি সরবরাহ করে দেন। কাজেই আযাবের আসল কারণ স্বয়ং তাদের কুফরী ও গোনাহের সংকল্প – আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই একমাত্র কারণ নয়। তাই তারা ক্ষমার যোগ্য হতে পারে না।

ধনীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার : আয়াতে বিশেষভাবে অবস্থাপন্ন ধনীদের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই বিত্তশালী ও শাসক-শ্রেণীর চরিত্র ও কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এরা কুকর্মপরায়ণ হয়ে গেলে সমগ্র জাতি কুকর্মপরায়ণ হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে ধন-দৌলত দান করেন, কর্ম ও চরিত্রের সংশোধনের প্রতি তাদের অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা বিলাসিতায় পড়ে কর্তব্য ভুলে যাবে এবং তাদের কারণে সমগ্র জাতি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে। এমতাবস্থায় সমগ্র জাতির কুকর্মের শাস্তিও তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ ... যারা স্বীয় আমল দ্বারা শুধু ইহকাল লাভ করার ইচ্ছা করে, উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি শুধু তখন হবে, যখন তার প্রত্যেক কর্মকে ক্রমাগতভাবে ও সদাসর্বদা শুধু ইহকালের উদ্দেশেই আচ্ছন্ন করে রাখে-পরকালের প্রতি কোন লক্ষ্য না থাকে। পক্ষান্তরে পরকালের ইচ্ছা করা এবং তার প্রতিদানের বর্ণনায় أَرَادَ الْآخِرَةَ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ এই যে, মুমিন যখনই যে কাজে পরকালের ইচ্ছা ও নিয়ত করবে, তার সেই কাজ গ্রহণযোগ্য হবে; যদিও তার কোন কোন কাজের নিয়তে মন্দ মিশ্রিত হয়ে যায়।

প্রথমোক্ত অবস্থাটি শুধু কাফের বা পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরই হতে পারে। তাই তার কোন কর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। শেষোক্ত অবস্থাটি হল মুমিনের। তার যে কর্ম খাঁটি নিয়ত সহকারে অন্যান্য শর্তানুযায়ী হবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে কর্ম এরূপ হবে না, তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

বেদআত ও মনগড়া আমল যতই ভাল দেখা যাক-- গ্রহণযোগ্য নয় ঃ এ আয়াতে চেষ্টা ও কর্মের সাথে سَعْيُهَا শব্দযোগ করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্ম ও চেষ্টা কল্যাণকর ও আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না; বরং সেটিই ধর্তব্য হয়, যা (পরকালের) লক্ষ্যের উপযোগী। উপযোগী হওয়া না হওয়া শুধু আল্লাহ্ ও রসূলের বর্ণনা দ্বারাই জানা যেতে পারে। কাজেই যে সৎকর্ম মনগড়া পন্থায় করা হয়—সাধারণ বেদআতী পন্থাও এর অন্তর্ভুক্ত, তা দৃশ্যতঃ যতই সুন্দর ও উপকারী হোক না কেন—পরকালের জন্যে উপযোগী নয়। তাই সেটা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং পরকালেও কল্যাণকর নয়।

তফসীর রূহুল মা'আনী سَعْيُهَا শব্দের ব্যাখ্যায় সুন্নত অনুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে একথাও অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, কর্মেও দৃঢ়তা থাকতে হবে। অর্থাৎ, কর্মটি সুন্নত অনুযায়ী এবং দৃঢ় অর্থাৎ, সার্বক্ষণিকও হতে হবে। বিশৃঙ্খলা ভাবে কোন সময় করল কোন সময় করল না— এতে পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না।

পিতা-মাতার আদব, সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা পিতা-মাতার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের এবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরয করেছেন। যেমন, সূরা লোকমানে নিজের শোকরের সাথে পিতা-মাতার শোকরকে একত্রিত করে অপরিহার্য করেছেন। বলা হয়েছেঃ

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ, আমার শোকর কর এবং পিতা-মাতারও।

এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআলার এবাদতের পর পিতা-মাতার আনুগত্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজেব। সহীহ্ বুখারীর একটি হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে রয়েছে, কোন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ (মুস্তাহাব) সময় হলে নামায পড়া। সে আবার প্রশ্ন করল ঃ এরপর কোন্ কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার।—(কুরতুবী)

হাদীসের আলোকে পিতা-মাতার আনুগত্য ও সেবাযত্নের ফযীলত ঃ মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, মুস্তাদরাক হাকেমে বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফাযত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। (মাযহারী) (১) তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফাযত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও (মাযহারী) (২) তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।

(৩) হযরত আবু উমামার বাচনিক ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক কি? তিনি বললেন ঃ তাঁরা উভয়েই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁদের আনুগত্য ও সেবাযত্ন জান্নাতে নিয়ে যায় এবং তাঁদের সাথে বেআদবী ও তাঁদের অসন্তুষ্টি জাহান্নামে পৌঁছে দেয়।

(৪) বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে পিতা-মাতার আনুগত্য করে, তার জন্যে জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে, তার জন্যে জাহান্নামের দু'টি দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতা-মাতার মধ্য থেকে একজনই ছিল,তবে জান্নাত অথবা জাহান্নামের এক দরজা খোলা থাকবে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ঃ জাহান্নামের এই শাস্তিবাণী কি তখনও প্রযোজ্য যখন পিতা-মাতা এই ব্যক্তির প্রতি জুলুম করে? তিনি তিন বার বললেনঃ যদি পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি জুলুমও করে তবু পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে। এর সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সন্তানের নেই। তাঁরা জুলুম করলে সন্তান সেবাযত্ন ও আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে না।

(৫) বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে সেবাযত্নকারী পুত্র পিতা-মাতার দিকে দয়া ও ভালবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্বের সওয়াব পায়। লোকেরা আরয করল ঃ সে যদি দিনে একশ'বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, একশ'বার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সওয়াব পেতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ্। তাঁর ভাণ্ডারে কোন অভাব নেই।

পিতা-মাতার হক নষ্ট করার শাস্তি দুনিয়াতেও পাওয়া যায় ঃ (৬) বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমানে আবু বকরা (রাঃ) বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ সমস্ত গোনাহের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা যেগুলো ইচ্ছা করেন কেয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু পিতা-মাতার হক নষ্ট করা এবং তাঁদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর ব্যতিক্রম। এর শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেও দেয়া হয়। (এ সবগুলো রেওয়ায়েত তফসীরে-মাযহারী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।)

কোন কোন বিষয়ে পিতা-মাতার আনুগত্য ওয়াজিব এবং কোন কোন বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণের অবকাশ আছে ঃ এ ব্যাপারে আলেম ও ফেকাহ্‌বিদগণ একমত যে, পিতা-মাতার আনুগত্য শুধু বৈধ কাজে ওয়াজিব। অবৈধ ও গোনাহ্‌র কাজে আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই; বরং জায়েযও নয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق। অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর কাজে কোন সৃষ্ট-জীবের আনুগত্য জায়েয নয়।

পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁদের মুসলমান হওয়া জরুরী নয় ঃ ইমাম কুরতুবী এ বিষয়টির সমর্থনে বোখারী থেকে হযরত আসমার (রাঃ) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ আমার জননী মুশরিকা। তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করা জায়েয হবে কি? তিনি বললেন ঃ صلى أمك অর্থাৎ, "তোমার জননীকে আদর-আপ্যায়ন কর।" কাফের পিতা-মাতা সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন পাক বলে ঃ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا অর্থাৎ, যার পিতা-মাতা কাফের এবং তাকেও কাফের হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েয নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। বলাবাহুল্য, আয়াতে মারূফ' বলে তাদের সাথে

আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বোঝানো হয়েছে।

মাসআলা ঃ যে পর্যন্ত জেহাদ ফরযে আইন না হয়ে যায়, ফরযে কেফায়ার স্তরে থাকে, সে পর্যন্ত পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্যে জেহাদে যোগদান করা জায়েয নয়। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে জেহাদের অনুমতি নেয়ার জন্যে উপস্থিত হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল ঃ জ্বী হাঁ, জীবিত আছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ

তাহলে তুমি পিতা-মাতার সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করেই জেহাদ কর। অর্থাৎ, তাঁদের সেবাযত্নের মাধ্যমেই তুমি জেহাদের সওয়াব পেয়ে যাবে। অন্য রেওয়ায়েতে এর সাথে একথাও উল্লেখিত রয়েছে যে, লোকটি বলল ঃ আমি পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। একথা শুনে রসূলুল্লাম্ (সাঃ) বললেন ঃ যাও, তাঁদের হাসাও; যেমন কাঁদিয়েছ। অর্থাৎ, তাঁদেরকে গিয়ে বল ঃ এখন আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জেহাদে যাব না।— (কুরতুবী)

মাসআলা ঃ এ রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, কোন কাজ ফরযে-আইন না হলে এবং ফরযে কেফায়ার স্তরে থাকলে সন্তানের জন্যে পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সে কাজ করা জায়েয নয়। দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করা এবং তবলীগের কাজে সফর করাও এর অন্তর্ভুক্ত। ফরয পরিমাণ দ্বীনী জ্ঞান যার অর্জিত আছে, সে যদি বড় আলেম হওয়ার জন্যে সফর করে কিংবা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজে সফর করে, তবে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত তা জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার যে নির্দেশ কোরআন ও হাদীসে উক্ত হয়েছে, পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লা ইবনে ওমরের (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ পিতার সাথে সদ্ব্যবহার এই যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুদের সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। হযরত আবু উসায়দ বদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে বসেছিলাম, ইতিমধ্যে এক আনসার এসে প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! পিতা-মাতার এন্তেকালের পরও তাদের কোন হক আমার যিম্মায় আছে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ তাদের জন্যে দোয়া ও এস্তেগফার করা, তাঁরা কারো সাথে কোন অঙ্গীকার করে থাকলে তা পূরণ করা, তাঁদের বন্ধুবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের এমন আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা, যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাঁদেরই মাধ্যমে। পিতা-মাতার এসব হক তাঁদের পরও তোমার যিম্মায় অবশিষ্ট রয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে, হযরত খাদীজার (রাঃ) ওফাতের পর তিনি তাঁর বান্ধবীদের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করতেন। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হযরত খাদীজার (রাঃ) হক আদায় করা।

পিতা-মাতার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, বিশেষত ঃ বার্ধক্যে ঃ পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য পিতা-মাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোন সময়ও বয়সের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। কিন্তু ওয়াজেব ও ফরয কর্তব্যসমূহ পালনের ক্ষেত্রে স্বভাবতঃ সেসব অবস্থা প্রতিবন্ধক হয়, কর্তব্য পালন সহজ করার উদ্দেশে কোরআন পাক যেসব অবস্থায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে চিন্তাধারার লালন-পালনও করে এবং এর জন্যে অতিরিক্ত তাকিদও প্রদান করে। এটাই কোরআন পাকের সাধারণ নীতি।

বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পিতা-মাতা সন্তানের সেবাযত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্যও বিমুখতা প্রকাশ পায়, তবে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। অপরদিকে বার্ধক্যের উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয়। তৃতীয়তঃ বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনাও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতা-মাতার বাসনা এবং দাবীদাওয়াও এমনি ধরনের হয়ে যায়, যা পূর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। কোরআন পাক এসব অবস্থায় পিতা-মাতার মনোতুষ্টি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আজ পিতা-মাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদাপেক্ষা বেশী তাদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা তোমার জন্যে কোরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহ-মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষীতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাঁদের পূর্ব ঋণ শোধ করা কর্তব্য। كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পিতা-মাতার বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার সময় সম্পর্কিত কতিপয় আদেশ দান করা হয়েছে।

(এক) তাঁদেরকে 'উহ্'-ও বলবে না। এখানে 'উহ্' শব্দটি বলে এমন শব্দ বোঝানো হয়েছে, যদ্দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি, তাঁদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ পীড়া দানের ক্ষেত্রে 'উহ্' বলার চাইতেও কম কোন স্তর থাকলে তাও অবশ্য উল্লেখ করা হত। (মোটকথা, যে কথায় পিতা-মাতার সামান্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ।)

দ্বিতীয়, وَلَا تَنْهَرْهُمَا - نهر শব্দের অর্থ ধমক দেয়া। এটা যে কষ্টের কারণ তা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় আদেশ, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا প্রথমোক্ত দু'টি আদেশ ছিল নেতিবাচক তাতে পিতা-মাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমনসব কাজেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে পিতা-মাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তাঁদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নম্র স্বরে কথা বলতে হবে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন ঃ যেমন কোন গোলাম তার রূঢ় স্বভাবসম্পন্ন প্রভুর সাথে কথা বলে।

চতুর্থ আদেশ ঃ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ এর সারমর্ম এই যে, তাদের সামনে নিজেকে অক্ষম ও হেয় করে পেশ করবে; যেমন গোলাম প্রভুর সামনে। جناح শব্দের অর্থ পাখা। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পিতা-মাতার জন্যে নিজ নিজ পাখা নম্রতা সহকারে নত করে দেবে। শেষে مِنَ الرَّحْمَةِ বলে প্রথমতঃ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে এই ব্যবহার যেন নিছক লোক দেখানো না হয়, বরং আন্তরিক মমতা ও সম্মানের ভিত্তিতে হওয়া কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ এ দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, পিতা-মাতার সামনে নম্র ও হেয় পেশ হওয়া সত্যিকার ইয্যতের পটভূমি। কেননা, এরূপ করা বাস্তব অর্থে হেয় হওয়া নয়, বরং এর কারণ

মহব্বত ও অনুকম্পা।

পঞ্চম আদেশ, وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا এর সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার ষোল আনা সুখ-শান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাঁদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করবে যে, তিনি যেন করুণাবশতঃ তাঁদের সব মুশকিল আসান করেন এবং কষ্ট দূর করেন। সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও দোয়ার মাধ্যমে সর্বদা পিতা-মাতার খেদমত করা যায়।

মাসআলা ঃ পিতা-মাতা মুসলমান হলে তো তাঁদের জন্যে রহমতের দোয়া করা যাবেই, কিন্তু মুসলমান না হলে তাঁদের জীবদ্দশায় এ দোয়া জায়েয হবে এবং নিয়ত থাকবে এই যে, তাঁরা পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুন এবং ঈমানের তওফীক লাভ করুন। মৃত্যুর পর তাঁদের জন্যে রহমতের দোয়া করা জায়েয নয়।

পিতার আদব ও সম্মান সম্পর্কিত উল্লেখিত আদেশসমূহের কারণে সন্তানদের মনে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, পিতা-মাতার সাথে সদাসর্বদা থাকতে হবে তাঁদের এবং নিজেদের অবস্থাও সবসময় সমান যায় না। কোন সময় মুখ দিয়ে এমন কথাও বের হয়ে যেতে পারে, যা উপরোক্ত আদবের পরিপন্থী। এর জন্যে জাহান্নামের শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। কাজেই গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হবে। আলোচ্য সর্বশেষ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ আয়াতে মনের এই সংকীর্ণতা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বেআদবীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন সময় কোন পেরেশানী অথবা অসাবধানতার কারণে কোন কথা বের হয়ে গেলে এবং এজন্যে তওবা করলে আল্লাহ্ তাআলা মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন যে, কথাটি বেআদবী অথবা কষ্টদানের জন্যে বলা হয়নি। সুতরাং তিনি ক্ষমা করবেন। اوابين শব্দের অর্থ توابين অর্থাৎ, তওবাকারী। হাদীসে বাদ মাগরিব ছয় রাকআত এবং ইশরাকের নফল নামাযকে صلوٰة الاوابين বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই নামাযগুলো পড়ার তওফীক তাদেরই হয়, যারা اوابين অর্থাৎ, توابين (তওবাকারী)।

সকল আত্মীয়ের হক দিতে হবে ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পিতা-মাতার হক এবং তাঁদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা ছিল। আলোচ্য আয়াতে সকল আত্মীয়দের হক বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক আত্মীয়ের হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ, কমপক্ষে তাদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন যাপন ও সদ্ব্যবহার করতে হবে। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্যও এর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেকের উপরই তার সাধারণ আত্মীয়দেরও হক রয়েছে। সে হক কি এবং কতটুকু তার বিশদ বর্ণনা আয়াতে নেই। তবে সাধারণভাবে আত্মীয়তা বজায় রাখা এবং সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা যে এর অন্তর্ভুক্ত, তা না বললেও চলে। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) বলেনঃ যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ— এমন আত্মীয় মহিলা কিংবা বালক-বালিকা হয়, নিঃস্ব হয় এবং উপার্জন করতেও সক্ষম না হয়; এমনিভাবে সে যদি বিকলাঙ্গ কিংবা অন্ধ হয়, জীবনধারণের মত ধন-সম্পদের অধিকারী না হয়, তবে তার ভরণ-পোষণ করা সক্ষম আত্মীয়দের উপর ফরয। যদি একই স্তরের কয়েকজন আত্মীয় সক্ষম হয়, তবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে কয়েকজনকেই বহন করতে হবে। সূরা বাক্বারার আয়াত وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ দ্বারাও এ বিধানটি প্রমাণিত হয়। – (তফসীর-মাযহারী)

এ আয়াতে আত্মীয়, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের আর্থিক সাহায্যদানকে তাদের হক হিসাবে গণ্য করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি দাতার অনুগ্রহ প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। কেননা, তাদের হক তার যিম্মায় ফরয। দাতা সে ফরযই পালন করছে মাত্র; কারও প্রতি অনুগ্রহ করছে না।

تبذير অর্থাৎ, অপব্যয়ের নিষেধাজ্ঞা ঃ কোরআন পাক অপব্যয়কে দু'টি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। একটি تبذير এবং অপরটি اسراف আলোচ্য আয়াতে تبذير নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং وَلَا تُسْرِفُوا আয়াতে اسراف নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ উভয় শব্দ সমার্থবোধক। গোনাহ্‌র কাজে কিংবা অযথা অস্থানে ব্যয় করাকে اسراف ও تبذير বলা হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ গোনাহ্‌র কাজে কিংবা সম্পূর্ণ অযথা ও অস্থানে ব্যয় করাকে تبذير বলা হয় আর বৈধ স্থানে প্রয়োজনের চাইতে অধিক ব্যয় করাকে اسراف বলা হয়। তাই تبذير اسراف এর চাইতে গুরুতর। تبذير কারীদেরকে শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ কেউ নিজের সমস্ত মাল হক আদায় করার জন্যে ব্যয় করে দিলে তা অযথা ব্যয় হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্যায়-অহেতুক কাজে এক 'মুদ'ও (অর্ধ সের) ব্যয় করে, তবে তা অযথা ব্যয় বলে গণ্য হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ হক নয় এমন অস্থানে ব্যয় করাকে تبذير বলা হয় (মাযহারী)। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন ঃ হক পথে অর্থ উপার্জন করে নাহক পথে ব্যয় করাকে تبذير বলা হয়। একে اسراف ও বলে। এটা হারাম।— (কুরতুবী)

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ হারাম ও অবৈধ কাজে এক দিরহাম খরচ করাও تبذير এবং বৈধ ও অনুমোদিত কাজে সীমাতিরিক্ত খরচ করা, যদ্দরুন ভবিষ্যতে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়— এটাও تبذير এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যদি কেউ আসল মূলধন ঠিক রেখে তার মুনাফাকে বৈধ কাজে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে, তবে তা تبذير এর অন্তর্ভুক্ত নয়।—(কুরতুবী)

২৮ নং আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে অভূতপূর্ব নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কোন সময় যদি অভাবগ্রস্ত লোকেরা সওয়াল করে এবং আপনার কাছে দেয়ার মত কিছু না থাকার দরুন আপনি তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হন, তবে এ মুখ ফিরানো আত্মম্ভরিতাযুক্ত অথবা প্রতিপক্ষের জন্যে অপমানজনক না হওয়া উচিত; বরং তা অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ সহকারে হওয়া কর্তব্য।

এ আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে ইবনে জায়েদ রেওয়ায়েত করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অর্থ কড়ি চাইত। তিনি জানতেন যে, এদেরকে অর্থকড়ি দিলে তা দুষ্কর্মে ব্যয় করবে। তাই তিনি এদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করতেন এবং এটা ছিল তাদেরকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার একটি উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

মুসনাদে সাঈদ ইবনে মনসূর সাবা ইবনে হাকামের বাচনিক উল্লেখিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে কিছু বস্ত্র আসলে তিনি তা হকদারদের মধ্যে বন্টন করে দেন। বন্টন শেষ হওয়ার পর আরও কিছু

লোক আসলে তাদেরকে দেয়া সম্ভব হয়নি। তাদের সম্পর্কেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ ঃ ২৯ নং আয়াতে সরাসরি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন মিতাচার শিক্ষা দেয়া, যা অপরের সাহায্যে প্রতিবন্ধকও না হয় এবং নিজের জন্যেও বিপদ ডেকে না আনে। এ আয়াতের শানে-নুযূলে ইবনে মারদওয়াইয়াহ্ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে এবং বগভী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে একটি বালক উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ আমার আম্মা আপনার কাছে একটি কোর্তা প্রদানের প্রার্থনা করেছেন। তখন গায়ের কোর্তাটি ছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অন্য কোন কোর্তা ছিল না। তিনি বালকটিকে বললেন ঃ অন্য সময় যখন তোমার আম্মার সওয়াল পূর্ণ করার সামর্থ্য আমার থাকে, তখন এসো। ছেলেটি ফিরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল ঃ আম্মা বলছেন যে, আপনার গায়ের কোর্তাটিই অনুগ্রহ করে দিয়ে দিন। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজ শরীর থেকে কোর্তা খুলে ছেলেটিকে দিয়ে দিলেন। ফলে তিনি খালি গায়েই বসে রইলেন। নামাজের সময় হল। হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলেন। কিন্তু তিনি অন্য দিনের মত বাইরে এলেন না। সবার মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখা দেখা দিল। কেউ কেউ ভিতরে গিয়ে দেখল যে, তিনি কোর্তা ছাড়া খালি গায়ে বসে আছেন। তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ্র পথে বেশী ব্যয় করে নিজে পেরেশান হওয়ার স্তর ঃ এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ এ ধরনের ব্যয় করার নিষেধাজ্ঞা জানা যায়, যার পর নিজেকেই অভাবগ্রস্ত হয়ে পেরেশানী ভোগ করতে হয়। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ সাধারণ অবস্থায় যেসব মুসলমান ব্যয় করার পর কষ্টে পতিত হয় এবং পেরেশান হয়ে বিগত ব্যয়ের জন্যে অনুতাপ ও আফসোস করে, আয়াতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোরআন পাকের مَّحْسُورًا শব্দের মধ্যে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু যারা এতটুকু সৎসাহসী যে, পরবর্তী কষ্টের জন্যে মোটেই ঘাবড়ায় না এবং হকদারদের হকও আদায় করতে পারে, তাদের জন্যে এ নিষেধাজ্ঞা নয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি আগামীকল্যের জন্যে কিছুই সঞ্চয় করতেন না। যেদিন যা আসত, সেদিনই তা নিঃশেষে ব্যয় করে দিতেন। প্রায়ই তাঁকে ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্টও ভোগ করতে হত এবং পেটে পাথর বাঁধার প্রয়োজনও দেখা দিত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এমন অনেক রয়েছেন, যাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে স্বীয় ধন-সম্পদ নিঃশেষে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দিয়েছেন; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁদেরকে নিষেধ বা তিরস্কার কোন কিছুই করেননি। এ থেকে বোঝা গেল যে, আয়াতের নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্যে, যারা ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্ট সহ্য করতে পারে না এবং খরচ করার পর 'খরচ না করলেই ভাল হত' বলে অনুতাপ করে। এরূপ অনুতাপ তাদের বিগত সৎকাজকে নষ্ট করে দেয়। তাই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিশৃংখল খরচ নিষিদ্ধ ঃ আসল কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতটি বিশৃংখলভাবে খরচ করতে নিষেধ করেছে। ভবিষ্যৎ অবস্থা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যা কিছু হাতে আছে, তৎক্ষণাৎ তা খরচ করে ফেলা এবং আগামীকাল কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এলে অথবা ধর্মীয় প্রয়োজন দেখা দিলে অক্ষম হয়ে পড়া এটাই বিশৃংখলা (কুরতুবী)। কিংবা খরচ করার পর পরিবার-পরিজনের ওয়াজিব হক আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়াও বিশৃংখলা। (মাযহারী) مَلُومًا مَّحْسُورًا শব্দদ্বয় সম্পর্কে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, ملوم শব্দটি প্রথম অবস্থা অর্থাৎ, কৃপণতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, কৃপণতার কারণে হাত গুটিয়ে রাখলে মানুষের কাছে তিরস্কৃত হতে হবে। مَّحْسُورًا শব্দটি দ্বিতীয় অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ বেশী ব্যয় করে নিজে ফকীর হয়ে গেলে সে مَّحْسُورًا অর্থাৎ, শ্রান্ত, অক্ষম অথবা অনুতপ্ত হয়ে যাবে।

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ
خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ
فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ وَلَا
تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ
طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾ ذَٰلِكَ مِمَّا
أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿٣٩﴾ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَ
اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

(৩০) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা অধিক জীবনোপকরণ দান করেন এবং তিনিই তা সংকুচিতও করে দেন। তিনিই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত,—সব কিছু দেখছেন। (৩১) দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ। (৩২) আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। (৩৩) সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন; কিন্তু ন্যায়ভাবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি। অতএব, সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত। (৩৪) আর, এতীমের মালের কাছেও যেয়ো না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাংখা ছাড়া; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (৩৫) মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম; এর পরিণাম শুভ। (৩৬) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (৩৭) পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূপৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না। (৩৮) এ সবের মধ্যে যেগুলো মন্দ কাজ, সেগুলো তোমার পালনকর্তার কাছে অপছন্দনীয়। (৩৯) এটা ঐ হিকমতের অন্তর্ভুক্ত, যা আপনার পালনকর্তা আপনাকে ওহী মারফত দান করেছেন। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করবেন না। তাহলে অভিযুক্ত ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন। (৪০) তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্যে পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং নিজের জন্যে ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয় তোমরা গুরুতর গর্হিত কথাবার্তা বলছ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একের পর এক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য ৩১ আয়াতে এই ষষ্ঠ নির্দেশটি জাহেলিয়াত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্ত উল্লেখিত হয়েছে। জাহেলিয়াত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিযিকদানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ্ তাআলার কাজ। তোমাদেরকেও তো তিনিই রিযিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছ? বরং এ ক্ষেত্রে রিযিক দেয়ার বর্ণনায় সন্তানদের কথা অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে তোমাদেরকে দেব। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যে বান্দাকে নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ ও অন্য দরিদ্রদের সাহায্য করতে দেখেন, তাকে সে হিসাবেই দান করেন, যাতে সে নিজের প্রয়োজনও মেটাতে পারে এবং অন্যকেও সাহায্য করতে পারে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ انما تنصرون وترزقون بضعفائكم অর্থাৎ, তোমাদের দুর্বল শ্রেণীর জন্যেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে রিযিক দেয়া হয়। এতে জানা গেল যে, পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণকারী পিতা-মাতা যা কিছু পায়, তা দুর্বল চিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের ওসিলাতেই পায়।

ব্যভিচারের অবৈধতা সম্পর্কে এটি সপ্তম নির্দেশ। এতে ব্যভিচার হারাম হওয়ার দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) এটি একটি অশ্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায়। এ অর্থেই হাদীসে বলা হয়েছে اذا فاتك الحياء فافعل ماشئت অর্থাৎ, তোমার লজ্জাই যখন লোপ পাবে, তখন যা খুশী তাই করতে পার। এজন্যই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লজ্জাকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাব্যস্ত করেছেন। বলেছেন ঃ الحياء شعبة من الايمان (বুখারী)। দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাসৃষ্টি। ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়। বর্তমান বিশ্বে গোলযোগ, চুরি-ডাকাতি ও হত্যার যে ছড়াছড়ি, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তার অর্ধেকের চাইতে বেশী ঘটনার কারণ কোন পুরুষ ও নারী, যারা এ অপকর্মে লিপ্ত। এ অপরাধটি যদিও সরাসরি বান্দার হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় কিন্তু এখানে বান্দার হক সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, অপরাধটি এমন অনেকগুলো অপরাধ সঙ্গে নিয়ে আসে, যার দ্বারা বান্দার হক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হত্যা ও লুটতরাজের হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। এ কারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি ও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত পৃথিবী বিবাহিত

যিনাকারদের প্রতি অভিসম্পাত করে। জাহান্নামে এদের লজ্জাস্থান থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যে, জাহান্নামীরাও তা থেকে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। আগুনের আযাবের সাথে সাথে জাহান্নামে তাদের লাঞ্ছনাও হতে থাকবে।—(বাযযার)

হযরত আবু হোরায়রা বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যিনাকার ব্যক্তি যিনা করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্য পান করার সময় মুমিন থাকে না। হাদীসটি বুখারী, ও মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। আবু দাউদের রেওয়ায়েতে এর ব্যাখ্যা এই যে, এসব অপরাধী যখন অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন ঈমান তাদের অন্তর থেকে বাইরে চলে আসে। এরপর যখন অপরাধ থেকে ফিরে আসে, তখন ঈমানও ফিরে আসে।—(মাযহারী)

অন্যায় হত্যার অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটা অষ্টম নির্দেশ। অন্যায় হত্যা যে মহা অপরাধ, তা বিশ্বের দলমত ও ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে স্বীকৃত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ একজন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে আল্লাহ্র কাছে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়া লঘু অপরাধ। কোন কোন রেওয়ায়েতে এতদসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্ তাআলার সপ্ত আকাশ ও সপ্ত ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সম্মিলিতভাবে কোন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।—(ইবনে মাজা, মসনদ হাসান, বায়হাকী-মাযহারী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে একটি কথা দ্বারা ও হত্যাকারীর সাহায্য করে, হাশরের মাঠে সে যখন আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হবে, তখন তার কপালে লেখা থাকবে অর্থাৎ, এই লোকটিকে আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ করে দেয়া হয়েছে।—(মাযহারী, ইবনে মাজাহ্ হইতে)

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও হযরত মুয়াবিয়ার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক গোনাহ্ আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যে ব্যক্তি জেনে-শুনে ইচ্ছাপূর্বক কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার গোনাহ্ ক্ষমা করা হবে না।

অন্যায় হত্যার ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে মুসলমান আল্লাহ্ এক এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয়; কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়। (এক) বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি যিনা করে, তবে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করাই তার শরীয়তসম্মত শাস্তি। (দুই) সে যদি অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কেসাস হিসেবে হত্যা করতে পারে। (তিন) যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা।

কেসাস নেয়ার অধিকার কার? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই অধিকার নিহত ব্যক্তির ওলীর। যদি রক্ত সম্পর্কিত ওলী না থাকে, তবে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এ অধিকার পাবে। কারণ, সরকারও একদিক দিয়ে সব মুসলমানের ওলী।

فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ এটা ইসলামী আইনের একটা বিশেষ নির্দেশ। এর সারমর্ম এই যে, অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেয়া জায়েয নয়। প্রতিশোধের বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। যে পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির ওলী ইনসাফ সহকারে নিহতের প্রতিশোধ কেসাস নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত শরীয়তের আইন তার পক্ষে থাকবে। আল্লাহ্ তাআলা তার সাহায্যকারী হবে পক্ষান্তরে সে যদি প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে কেসাসের সীমা লঙ্ঘন করে, তবে সে মযলুমের পরিবর্তে জালেমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং জালেম মযলুম হয়ে যাবেন। আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে এবং তাকে জুলুম থেকে বাঁচাবে।

জাহেলিয়াত যুগের আরবে সাধারণতঃ এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীর পরিবার অথবা সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে যাকেই পাওয়া যেত, তাকেই হত্যা করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি গোত্রের সরদার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্তিকে কেসাস হিসেবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হত না; বরং এক খুনের পরিবর্তে দু-তিন কিংবা আরও বেশী মানুষের প্রাণ সংহার করা হত। কেউ কেউ প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হত না; বরং তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে অঙ্গ বিকৃত করা হত। ইসলামী কেসাসের আইনে এগুলো সব অতিরিক্ত ও হারাম। তাই فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ আয়াতে এ ধরনের বাড়াবাড়িকে প্রতিরোধ করা হয়েছে।

একটি স্মরণীয় গল্প ঃ একজন মুজাহিদ ইমামের সামনে জনৈক ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইসলামী ইতিহাসের সর্বাধিক জালেম এবং কুখ্যাত ব্যক্তি। সে হাজারো সাহাবী ও তাবেয়ীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তাই সাধারণভাবে তাকে মন্দ বলা যে মন্দ, সেদিকে কারও লক্ষ্য থাকে না। যে বুযুর্গ ব্যক্তির সামনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে দোষারোপ করা হয়, তিনি দোষারোপকারীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে এই অভিযোগের পক্ষে কোন সনদ অথবা সাক্ষ্য রয়েছে কি? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ যদি আল্লাহ্ তাআলা জালেম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাছ থেকে হাজারো নিরপরাধ নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ নেন, তবে মনে রেখ, যে ব্যক্তি হাজ্জাজের উপর কোন জুলুম করে, তাকেও প্রতিশোধের কবল থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে না। আল্লাহ্ তাআলা তার কাছ থেকেও হাজ্জাজের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তাঁর আদালতে কোন অবিচার নেই যে, অসৎ ও পাপী বান্দাদেরকে যা ইচ্ছা, তা দোষারোপ ও অপবাদ আরোপের জন্যে অন্যদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হবে।

এতীমদের মাল সম্পর্কে সাবধানতা ঃ প্রথম আয়াতে এতীমদের মালের রক্ষণা-বেক্ষণ এবং এ ব্যাপারে সাবধানতা সম্পর্কে নবম নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এতে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এতীমদের মালের কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ, এতে যেন শরীয়তবিরোধী অথবা এতীমদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না হয়। এতীমদের মালের হেফাযত ও ব্যবস্থাপনা যাদের দায়িত্বে অর্পিত হয় এ ব্যাপারে তাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। তারা শুধু এতীমদের স্বার্থ দেখে ব্যয় করবে। এ কর্মধারা ততদিন অব্যাহত থাকবে, যতদিন এতীম শিশু যৌবনে পদার্পণ করে নিজের মালের হেফাযত নিজেই করতে সক্ষম না হয়। এর সর্বনিম্ন বয়স পনর বৎসর এবং সর্বোচ্চ বয়স আঠার বৎসর।

অবৈধ পন্থায় যে কোন ব্যক্তি মাল খরচ করা জায়েয নয়। এখানে বিশেষ করে এতীমের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সে নিজে কোন হিসাব নেয়ার যোগ্য নয়। অন্যেরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে না। যেখানে

মানুষের পক্ষ থেকে হক দাবী করার কেউ না থাকে সেখানে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দাবী কঠোরতর হয়ে যায়। এতে ত্রুটি হলে সাধারণ মানুষের হকের তুলনায় গোনাহ্ অধিক হয়।

অঙ্গীকার পূর্ণ ও কার্যকরী করার নির্দেশ ঃ অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাকীদ হচ্ছে দশম নির্দেশ। অঙ্গীকার দুই প্রকার। (এক) যা বান্দা ও আল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে; যেমন সৃষ্টির সূচনাকালে বান্দা অঙ্গীকার করেছিল যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা আমাদের পালনকর্তা। এ অঙ্গীকারের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া এই যে, তাঁর নির্দেশাবলী মানতে হবে এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। এ অঙ্গীকার তো সে সময় প্রত্যেকেই করেছে—দুনিয়াতে সে মুমিন হোক কিংবা কাফের। এছাড়া মুমিনের একটি অঙ্গীকার রয়েছে যা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্যের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এর সারমর্ম আল্লাহ্ বিধানাবলীর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন।

দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকার যা এক মানুষ অন্য মানুষের সাথে করে। এতে ব্যক্তিবর্গ অথবা গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে সম্পাদিত সমস্ত রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও লেন-দেন সম্পর্কিত চুক্তি অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করা মানুষের জন্য ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে যেসব চুক্তি শরীয়তবিরোধী নয়, সেগুলো পূর্ণ করা ওয়াজিব। শরীয়তবিরোধী হলে প্রতিপক্ষকে জ্ঞাত করে তা খতম করে দেয়া ওয়াজিব। যে চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদি কোন এক পক্ষ তা পূর্ণ না করে, তবে আদালতে উত্থাপন করে তাকে পূর্ণ করতে বাধ্য করার অধিকার প্রতিপক্ষের রয়েছে। চুক্তির স্বরূপ হচ্ছে দুই পক্ষ সম্মত হয়ে কোন কাজ করা বা না করার অঙ্গীকার করা। যদি কোন লোক এক তরফাভাবে কারও সাথে ওয়াদা করে যে, অমুক বস্তু তাকে দেব অথবা অমুক কাজ করে দেব, তবে তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব। কেউ কেউ একেও উল্লেখিত অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ; কিন্তু পার্থক্য এই যে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে ব্যাপারটি আদালতে উত্থাপিত করে তাকে চুক্তি পালনে বাধ্য করা যায় ; কিন্তু এক তরফা চুক্তিকে আদালতে উত্থাপন করে পূর্ণ করতে বাধ্য করা যায় না। হাঁ, শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে কারও সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করলে সে গোনাহগার হবে। হাদীসে একে কার্যতঃ নিফাক বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا - অর্থাৎ কেয়ামতে অন্যায় ফরয, ওয়াজিব কর্ম এবং খোদায়ী বিধানাবলী পালন করা বা না করা সম্পর্কে যেমন জিজ্ঞাসাবাদ হবে, তেমনি পারস্পরিক চুক্তি সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে। এখানে শুধু 'প্রশ্ন করা হবে' বলে বক্তব্য শেষ করে দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন করার পর কি হবে, সেটাকে অব্যস্ত রাখার মধ্যে বিপদ যে গুরুতর হবে, সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

একাদশতম নির্দেশ হচ্ছে লেন-দেনের ক্ষেত্রে মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আদেশ এবং কম মাপার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা মুতাফফিফীনে উল্লেখিত আছে।

মাসআলা ঃ ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ আয়াতে মাপ ও ওজন সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে, তার সারমর্ম এই যে, যার যতটুকু হক, তার চাইতে কম দেয়া হারাম। কাজেই কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট ও অর্পিত কাজের চাইতে কম কাজ করে অথবা নির্ধারিত সময়ের চাইতে কম সময় দেয় অথবা শ্রমিক যদি কাজ চুরি করে, তবে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

কম মাপ দেয়া ও কম ওজন করার নিষেধাজ্ঞা ঃ মাসআলা وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ —তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে আবু হাইয়্যান বলেন ঃ এ আয়াতে মাপ পূর্ণ করার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর অর্পিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, মাপ ও ওজন পূর্ণ করার জন্যে বিক্রেতা দায়ী।

আয়াতের শেষে মাপ ও ওজন পূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا —এতে মাপ ও ওজন করা সম্পর্কে দু'টি বিষয় বলা হয়েছে। (এক) এর উত্তম হওয়া। অর্থাৎ, এরূপ করা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম। শরীয়তের আইন ছাড়াও যুক্তি ও স্বভাবগতভাবেও কোন বিবেকবান ব্যক্তি কম মাপা ও কম ওজন করাকে ভাল মনে করতে পারে না। (দুই) এর পরিণতি শুভ। এতে পরকালের পরিণতি তথা সওয়াব ও জান্নাত ছাড়াও দুনিয়ার নিকৃষ্ট পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত আছে। কোন ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা উপরোক্ত বাণিজ্যিক সততা ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না।

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا —এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে ঃ কানকে প্রশ্ন করা হবে ঃ তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ? চক্ষুকে প্রশ্ন করা হবে ঃ তুমি সারা জীবন কি কি দেখেছ? অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে ঃ সারা জীবনে মনে কি কি কল্পনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি কান দ্বারা শরীয়তবিরোধী কথাবার্তা শুনে থাকে ; যেমন কারও গীবত এবং হারাম গানবাদ্য কিংবা চক্ষু দ্বারা শরীয়তবিরোধী বস্তু দেখে থাকে ; যেমন বেগানা স্ত্রীলোক বা শ্ত্রী সুশ্রী বালকের প্রতি কুদৃষ্টি করা কিংবা অন্তরে কোরআন ও সুন্নাহ্‌বিরোধী বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারও সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোন অভিযোগ মনে কায়েম করে থাকে, তবে এ প্রশ্নের ফলে আযাব ভোগ করতে হবে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ প্রদত্ত সব নেয়ামত সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হবে। لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে সব নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এসব নেয়ামতের মধ্যে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে বিশেষভাবে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে এরূপ অর্থও বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হয়েছিল وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ —অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, তা কার্যে পরিণত করো না। এর সাথে সাথে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি জানাশোনা ছাড়াই উদাহরণতঃ কাউকে দোষারোপ করল কিংবা কোন কাজ করল, যদি তা কানে শোনার বস্তু হয়ে থাকে, তবে কানকে প্রশ্ন করা হবে, যদি চোখে দেখার বস্তু হয়, তবে চোখকে প্রশ্ন করা হবে এবং অন্তর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করার বস্তু হলে অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ ও কল্পনাটি সত্য ছিল, না মিথ্যা? প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষ্য দেবে। এটা হাশরের ময়দানে ভিত্তিহীন অভিযোগকারী এবং না জেনে আমলকারীদের জন্যে অত্যন্ত লাঞ্ছনার কারণ হবে। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে ঃ

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا

كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ, আজ (কেয়ামতের দিন) আমি এদের (অপরাধীদের) মুখ মোহর করে দেব। ফলে, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের।

এখানে কান, চক্ষু ও অন্তরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ স্বভাবতঃ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে এসব ইন্দ্রিয়চেতনা ও অনুভূতি এজন্যেই দান করেছেন, যাতে মনে যেসব কল্পনা ও বিশ্বাস আসে, সেগুলোকে এসব ইন্দ্রিয় ও চেতনা দ্বারা পরীক্ষা করে নেয়। বিশুদ্ধ হলে তা কার্যে পরিণত করবে এবং ভ্রান্ত হলে তা থেকে বিরত থাকবে। যে ব্যক্তি এগুলোকে কাজে না লাগিয়ে অজানা বিষয়াদির পেছনে লেগে পড়ে, সে আল্লাহ্‌র এই নেয়ামতসমূহের নাশোকরী করে।

অতঃপর পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান লাভ করে— কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা এবং সমস্ত দেহে ছড়ানো ঐ অনুভূতি, যদ্দ্বারা উত্তাপ ও শৈত্য উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু স্বভাবগতভাবে মানুষ অধিকতর জ্ঞান কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা লাভ করে। নাকে ঘ্রাণ নিয়ে, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করে এবং হাতে স্পর্শ করে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা হয়, সেগুলো শোনা ও দেখার বিষয়াদির তুলনায় অনেক কম। এখানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ তাই। এতদুভয়ের মধ্যেও কান অগ্রে উল্লেখিত হয়েছে। কোরআন পাকের অন্যত্র যেখানেই এ দু'টি ইন্দ্রিয় একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কানকেই অগ্রে রাখা হয়েছে। এর কারণও সম্ভবতঃ এই যে, মানুষের জানা বিষয়াদির মধ্যে কানে শোনার বিষয়াদির সংখ্যাই বেশী। এগুলোর তুলনায় চোখে দেখার বিষয়াদি অনেক কম।

৩৭ নং আয়াতে ত্রয়োদশতম নির্দেশ এই ঃ ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে পদচারণ করো না। অর্থাৎ, এমন ভঙ্গিতে চলো না, যদ্দ্বারা অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ পায়। এটা নির্বোধসুলভ কাজ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন এভাবে চলে ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করে দিতে চায় এটা তার সাধ্যাতীত। বুক টান করে চলার উদ্দেশ্য যেন অনেক উঁচু হওয়া। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পাহাড় তার চাইতে অনেক উঁচু। অহংকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরের একটি কবীরা গোনাহ্। মানুষের ব্যবহার ও চলাচলের যেসব বিষয় থেকে অহংকার ফুটে ওঠে, সেগুলোও অবৈধ। অহংকারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হেয় ও ঘৃণ্য মনে করা। হাদীসে এর জন্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

ইমাম মুসলিম হযরত আয়ায ইবনে আম্মার (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, নম্রতা ও হেয়তা অবলম্বন কর। কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহংকারের পথ অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন কারও উপর জুলুম না করে।—(মাযহারী)

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا —অর্থাৎ উল্লেখিত সব মন্দ কাজ আল্লাহ্‌র কাছে মকরূহ ও অপছন্দনীয়।

উল্লেখিত নির্দেশাবলীর মধ্যে যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ, সেগুলো যে মন্দ ও অপছন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু করণীয় আদেশও আছে ; যেমন পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি। যেহেতু এগুলোর মধ্যেও উদ্দেশ্য এদের বিপরীত কর্ম থেকে বেঁচে থাকা ; অর্থাৎ, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া থেকে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা থেকে বেঁচে থাকা, তাই এসবগুলোও হারাম ও অপছন্দনীয়।

হুশিয়ারী ঃ পূর্বোল্লেখিত পনেরটি আয়াতে বর্ণিত নির্দেশাবলী একদিক দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় সাধনা ও কর্মেরই ব্যাখ্যা, যা আঠারো আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল ঃ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا —এতে ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক চেষ্টা ও কর্মই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় নয়, বরং যে চেষ্টা ও কর্ম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নত ও শিক্ষার সাথে সঙ্গতিশীল, শুধু সেগুলোই গ্রহণীয়। এসব নির্দেশে গ্রহণীয় চেষ্টা ও কর্মের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো বর্ণিত হয়ে গেছে। তন্মধ্যে প্রথমে আল্লাহ্‌র হক ও পরে বান্দার হক বর্ণিত হয়েছে।

এই পনেরটি আয়াত সমগ্র তওরাতের সার সংক্ষেপ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সমগ্র তওরাতের বিধানাবলী সূরা বনী ইসরাঈলের পনের আয়াতে সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে।—(মাযহারী)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾ قُلْ
لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ
وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا
تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾
وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا
ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾ نَّحْنُ
أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ
يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا
لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا
عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً
أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن
يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ
رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾

(৪১) আমি এই কোরআনে নানাভাবে বুঝিয়েছি, যাতে তারা চিন্তা করে। অথচ এতে তাদের কেবল বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। (৪২) বলুন ঃ তাদের কথামত যদি তাঁর সাথে অন্যান্য উপাস্য থাকত; তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌঁছার পথ অন্বেষণ করত। (৪৩) তিনি নেহায়েত পবিত্র ও মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে থাকে তা থেকে বহু উর্ধ্বে (৪৪) সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যাকিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। (৪৫) যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। (৪৬) আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দেই, যাতে তারা একে উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কর্ণকুহরে বোঝা চাপিয়ে দেই। যখন আপনি কোরআনে পালনকর্তার একত্ব আবৃত্তি করেন, তখনও অনীহাবশতঃ ওরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (৪৭) যখন তারা কান পেতে আপনার কথা শোনে, তখন তারা কেন কান পেতে তা শোনে, তা আমি ভাল জানি এবং এও জানি গোপনে আলোচনাকালে যখন জালেমরা বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ। (৪৮) দেখুন, ওরা আপনার জন্যে কেমন উপমা দেয়। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব, ওরা পথ পেতে পারে না। (৪৯) তারা বলে ঃ যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি নতুন করে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব? (৫০) বলুন ঃ তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা। (৫১) অথবা এমন কোন বস্তু, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন; তথাপি তারা বলবে ঃ আমাদেরকে পুনর্বার কে সৃষ্টি করবে। বলুন ঃ যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃজন করেছেন। অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবে ঃ এটা কবে হবে? বলুন ঃ হবে, সম্ভবতঃ শীঘ্রই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَّابْتَغَوْا আয়াতে তওহীদের প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে যে, যদি সমগ্র সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা, মালিক ও পরিচালক এক আল্লাহ্ না হন; বরং তাঁর খোদায়ীতে অন্যরাও শরীক হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্যও হবে। মতানৈক্য হলে সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, তাদের সবার মধ্যে চিরস্থায়ী সন্ধি হওয়া এবং অনন্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকা স্বভাবগতভাবে অসম্ভব। এ প্রমাণটি এখানে নেতিবাচক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু কালাম শাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে এ প্রমাণটির ইতিবাচক যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক হওয়াও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শিক্ষিত পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

যমিন, আসমান ও এতদুভয়ের সব বস্তুর তসবীহ্ পাঠ করার অর্থ ঃ ফেরেশতারা সবাই এবং ঈমানদার মানব ও জ্বিনদের তসবীহ্ পাঠ করার বিষয়টি জাজ্জ্বল্যমান—সবারই জানা। কাফের মানব ও জ্বিন বাহ্যতঃ তসবীহ্ পাঠ করে না। এমনিভাবে জগতের অন্যান্য বস্তু, যেগুলোকে বিবেক ও চেতনাহীন বলা হয়ে থাকে, তাদের তসবীহ্ পাঠ করার অর্থ কি? কোন কোন আলেম বলেন ঃ তাদের তসবীহ্ পাঠের অর্থ অবস্থাগত তসবীহ্। অর্থাৎ, তাদের অবস্থার সাক্ষ্য। কেননা, আল্লাহ্ ব্যতীত সব বস্তুর সমষ্টিগত অবস্থা ব্যক্ত করছে যে, তারা স্বীয় অস্তিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; বরং স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় কোন বৃহৎ শক্তির মুখাপেক্ষী। অবস্থার এই সাক্ষ্যই হচ্ছে তাদের তসবীহ্।

কিন্তু অন্য চিন্তাবিদদের উক্তি এই যে, ইচ্ছাগত তসবীহ্ তো শুধু ফেরেশতা এবং ঈমানদার জ্বিন ও মানবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ্ তাআলা জগতের প্রত্যেকটি অণু—পরমাণুকে তসবীহ্ পাঠকারী বানিয়ে রেখেছেন। কাফেররাও সাধারণভাবে আল্লাহ্কে মানে এবং তাঁর মহত্ত্ব স্বীকার করে। যেসব বস্তুবাদী নাস্তিক এবং আজকালকার কম্যুনিষ্ট বাহ্যতঃ আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না তাদের অস্তিত্বের প্রত্যেকটি অংশও বাধ্যতামূলক ভাবে আল্লাহ্র তসবীহ্ পাঠ করছে; যেমন— বৃক্ষ, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি সব বস্তু আল্লাহ্র তসবীহ্ পাঠে মশগুল রয়েছে। কিন্তু তাদের এই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক তসবীহ্ সাধারণ মানুষের শ্রুতিগোচর হয় না। কোরআন পাকের وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ উক্তি একথা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিগত তসবীহ্ এমন জিনিস, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়। অবস্থাগত তসবীহ্ তো বিবেকবান ও বুদ্ধিমানরা বুঝতে পারে। এ থেকে জানা গেল যে, এই তসবীহ্ পাঠ শুধু অবস্থাগত নয়, সত্যিকারের; কিন্তু আমাদের বোধশক্তি ও অনুভূতির উর্ধ্বে।— (কুরতুবী)

হাদীসে একটি মু'জেযা উল্লেখিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর হাতের তালুতে কঙ্করের তসবীহ্ পাঠ সাহাবায়ে কেরাম নিজ কানে শুনেছেন। এটা যে মু'জেযা, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু 'খাসায়েসে-কুবরা' গ্রন্থে শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেন ঃ কঙ্করসমূহের তসবীহ্ পাঠ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর মু'জেযা নয়। তারা তো যেখানে থাকে সেখানেই তসবীহ্ পাঠ করে; বরং মু'জেযা এই যে, তাঁর পবিত্র হাতে আসার পর তাদের তসবীহ্ কানেও শোনা গেছে।

ইমাম কুরতুবী এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এর পক্ষে কোরআন ও হাদীস থেকে অনেক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন।

উদাহরণতঃ সূরা সাদে হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ —অর্থাৎ, আমি পাহাড়সমূহকে আজ্ঞাবহ করে দিয়েছি। তারা দাউদের সাথে সকাল-বিকাল তসবীহ্ পাঠ করে। সূরা বাক্বারায় পাহাড়ের পাথর সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ অর্থাৎ, কতক পাথর আল্লাহ্র ভয়ে নীচে পড়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাথরের মধ্যেও চেতনা, অনুভূতি ও আল্লাহ্র ভয় রয়েছে। সূরা মরিয়মে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্র পুত্র আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে বলা হয়েছে ঃ

وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا অর্থাৎ এরা আল্লাহ্র জন্যে পুত্র সাব্যস্ত করে। তাদের এই কুফরী বাক্যের কারণে পাহাড় ভীত হয়ে পতিত হয়। বলাবাহুল্য, এই ভয়-ভীতি তাদের চেতনা ও অনুভূতির পরিচায়ক। চেতনা ও অনুভূতি থাকলে তসবীহ্ পাঠ করা অসম্ভব নয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডেকে জিজ্ঞেস করে, আল্লাহ্কে স্মরণ করে-এমন কোন বান্দা তোমার উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে কি? যদি সে উত্তরে হাঁ বলে, তবে প্রশ্নকারী পাহাড় তাতে আনন্দিত হয়। এর প্রমাণ হিসেবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এ আয়াতটি পাঠ করেন ঃ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا অতঃপর বলেন ঃ এ আয়াত থেকে যখন প্রমাণিত হল যে, পাহাড় কুফরী বাক্য শুনে প্রভাবান্বিত হয় এবং ভীত হয়ে যায়, তখন তুমি কি মনে কর যে, তারা বাতিল কথাবার্তা শোনে; কিন্তু সত্য কথা ও আল্লাহ্র যিকর শোনে না এবং তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না? (কুরতুবী) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কোন জ্বিন, মানব, পাথর ও টিলা এমন নেই, যে মুয়াযযিনের আওয়ায শুনে কেয়ামতের দিন তার ঈমানদার ও সৎ হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য না দিবে।- (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ইবনে মাজা)

পয়গম্বরের উপর যাদুর ক্রিয়া হতে পারে ঃ পয়গম্বরগণ মানবিক বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নন। তাঁরা যেমন রোগাক্রান্ত হতে পারেন, জ্বর ব্যথায় ভুগতে পারেন, তেমনি তাঁদের উপর যাদুর ক্রিয়াও সম্ভবপর। কেননা, যাদুর ক্রিয়াও বিশেষ স্বভাবগত কারণে জ্বিন ইত্যাদির প্রভাবে হয়ে থাকে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপরও যাদুর ক্রিয়া হয়েছিল। শেষ আয়াতে কাফেররা তাঁকে যাদুগ্রস্ত বলেছে এবং কোরআন তা খণ্ডন করেছে। এর সারমর্ম হচ্ছে যে, যাদুগ্রস্ত বলে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পাগল বলা। কোরআন তা'ই খণ্ডন করেছে। অতএব যাদুর হাদীসটি এই আয়াতের পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি বিশেষ শানে নুযূল আছে। কুরতুবী সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেনঃ কোরআনে যখন সূরা লাহাব নাযিল হয়, যাতে আবু লাহাবের স্ত্রীরও নিন্দা উল্লেখ করা হয়েছে, যখন তার স্ত্রী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মজলিসে উপস্থিত হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন মজলিসে বিদ্যমান ছিলেন। তাকে দূর থেকে আসতে দেখে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বললেন ঃ আপনি এখান থেকে সরে গেলে ভাল হয়। কারণ, সে অত্যন্ত কটুভাষিণী। সে এমন কটু কথা বলবে, যার ফলে আপনি কষ্ট পাবেন। তিনি বললেন ঃ না, তার ও আমার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা পর্দা ফেলে দেবেন। অতঃপর সে মজলিসে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেখতে পেল না। সে হযরত আবু বকরকে সম্বোধন করে বলতে লাগল ঃ আপনার সঙ্গী আমার "হিজু" (কবিতার মাধ্যমে নিন্দা) করেছেন। হযরত আবু বকর বললেন, আল্লাহ্র কসম, তিনি তো কবিতাই বলেন না। অতঃপর সে একথা বলতে বলতে প্রস্থান করল যে, আপনিও তো তাকে সত্য বলে বিশ্বাসকারীদের অন্যতম। তাঁর প্রস্থানের পর হযরত আবু বকর আরয করলেন ঃ সে কি আপনাকে দেখেনি? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ যতক্ষণ সে এখানে ছিল, ততক্ষণ একজন ফেরেশতা আমাকে তার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছিল।

শত্রুর দৃষ্টি থেকে গোপন থাকার একটি আমল ঃ হযরত কা'ব বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মুশরিকদের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করতে চাইতেন, তখন কোরআনের তিনটি আয়াত পাঠ করতেন। এর প্রভাবে শত্রুরা তাঁকে দেখতে পেত না। আয়াতত্রয় এই ঃ এক আয়াত—সূরা কাহ্ফের وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا দ্বিতীয় আয়াত সূরা নাহলের أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ এবং তৃতীয় আয়াত সূরা জাসিয়ার أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً হযরত কা'ব বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই ব্যাপারটি আমি সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করি। তিনি কোন প্রয়োজনবশতঃ রোম দেশে গমন করেন। বেশ কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি রোমীয় কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়লে প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন। শত্রুরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। এহেন সংকট মুহূর্তে হঠাৎ হাদীসটি তাঁর মনে পড়ে। তিনি কালবিলম্ব না করে আয়াত তিনটি পাঠ করতেই শত্রুদের দৃষ্টির সামনে পর্দা পড়ে যায়। যে রাস্তায় তিনি চলছিলেন, শত্রুরাও সেই রাস্তায় চলাফেরা করছিল; কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না।

ইমাম সা'লাবী বলেন ঃ হযরত কা'ব থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি আমি 'রায়' অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করেছিলাম। ঘটনাক্রমে সায়লামের কাফেররা তাঁকে গ্রেফতার করে। তিনি কিছুদিন কয়েদ থাকার পর সুযোগ পেয়ে পলায়ন করেন। শত্রুরা তাঁকে পেছনে ধাওয়া করে। তিনি উল্লিখিত আয়াতত্রয় পাঠ করলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের চোখের উপর পর্দা ফেলে দেন। ফলে তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান; অথচ তারা পাশাপাশি চলছিল এবং তাদের কাপড় তাঁর কাপড় স্পর্শ করছিল।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ উপরোক্ত আয়াতত্রয়ের সাথে সূরা ইয়াসীনের ঐ আয়াতগুলোও মেলানো উচিত, যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হিজরতের সময় পাঠ করেছিলেন। তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁর বাসগৃহ ঘেরাও করে রেখেছিলে। তিনি আয়াতগুলো পাঠ করে তাদের মাঝখান দিয়ে চলে যান; বরং তাদের মাথায় ধুলা নিক্ষেপ করতে করতে যান; কিন্তু তাদের কেউ টেরও পায়নি। সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো এই ঃ

يس ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ۝ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

(৫২) যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহবান করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে। এবং তোমরা অনুমান করবে যে, সামান্য সময়ই অবস্থান করেছিলে। (৫৩) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৫৪) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন। তিনি যদি চান, তোমাদের প্রতি রহমত করবেন কিংবা যদি চান, তোমাদেরকে আযাব দিবেন। আমি আপনাকে ওদের সবার তত্ত্বাবধায়ক রূপে প্রেরণ করিনি। (৫৫) আপনার পালনকর্তা তাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন, যারা আকাশসমূহে ও ভূপৃষ্ঠে রয়েছে। আমি তো কতক পয়গম্বরকে কতক পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং দাউদকে যবুর দান করেছি। (৫৬) বলুনঃ আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে কর, তাদেরকে আহবান কর। অথচ ওরা তো তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না। (৫৭) যাদেরকে তারা আহবান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ। (৫৮) এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কেয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এটা তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। (৫৯) পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার ফলেই আমাকে নিদর্শনাবলী প্রেরণ থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। আমি তাদেরকে বোঝাবার জন্যে সামূদকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম। অতঃপর তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশেই নিদর্শনাবলী প্রেরণ করি। (৬০) এবং স্মরণ করুন, আমি আপনাকে বলে দিয়েছিলাম যে, আপনার পালনকর্তা মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং যে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি তাও কোরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্যে। আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু এতে তাদের অবাধ্যতাই আরও বৃদ্ধি পায়।

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ আমি স্বদেশ আন্দালুসে কর্ডোভার নিকটবর্তী মনসুর দুর্গে নিজেই এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। অবশেষে নিরূপায় অবস্থায় আমি শত্রুদের সম্মুখ দিয়ে দৌড়ে এক জায়গায় বসে গেলাম। শত্রুরা দু'জন অশ্বারোহীকে আমার পশ্চাদ্ধাবন করার উদ্দেশে প্রেরণ করে। আমি সম্পূর্ণ খোলা মাঠেই ছিলাম। আড়াল করার মত কোন বস্তুই ছিল না। আমি তখন বসে বসে সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো পাঠ করছিলাম। অশ্বারোহী ব্যক্তিদ্বয় আমার সম্মুখ দিয়ে "লোকটি কোন শয়তান হবে" বলতে বলতে যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই ফিরে গেল। বলাবাহুল্য তারা, আমাকে অবশ্যই দেখেনি। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে আমার দিক থেকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন।— (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ — يدعو শব্দটি دعاء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আওয়ায দিয়ে ডাকা। আয়াতের অর্থ এই যে, যেদিন আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সবাইকে হাশরের ময়দানের দিকে ডাকবেন। এই ডাকা ফেরেশতা ইসরাফীলের মাধ্যমে হবে। তিনি যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন, তখন সব মৃত জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। এছাড়া জীবিত হওয়ার পর হাশরের ময়দানে একত্রিত করার জন্যে আওয়ায দেয়াও সম্ভবপর।— (কুরতুবী)

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজের এবং পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। কাজেই ভাল নাম রাখবে। (অর্থহীন নাম রাখবে না।)

হাশরে কাফেররাও আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবেঃ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ — استجابت শব্দের অর্থ ডাকার পর আদেশ পালন করা এবং উপস্থিত হওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, হাশরের ময়দানে যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে, তখন তোমরা সবাই ঐ আওয়ায অনুসরণ করে একত্রিত হয়ে যাবে। بِحَمْدِهِ অর্থাৎ, ময়দানে আসার সময় তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে করতে উপস্থিত হবে।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায় যে, তখন মুমিন ও কাফের সবারই এই অবস্থা হবে। কেননা, আয়াতে প্রকৃতপক্ষে কাফেরদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কেই বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সবাই প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবে। তফসীরবিদদের মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেন ঃ কাফেররাও কবর থেকে বের হওয়ার সময় سبحانك وبحمدك বলতে বলতে বের হবে। কিন্তু তখনকার প্রশংসা ও গুণকীর্তন তাদের কোন উপকারে আসবে না —(কুরতুবী) কেননা, তারা মৃত্যুর পর যখন জীবন দেখবে, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের মুখ থেকে আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও গুণবাচক বাক্য উচ্চারিত হবে। এটা প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য আমল হবে না।

কোন কোন তফসীরবিদ একে বিশেষভাবে মুমিনদের অবস্থা আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, কাফেরদের সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে, যখন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তখন তারা একথা বলবে ঃ يَٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا হায় আফসোস! কে আমাদেরকে কবর থেকে জীবিত করে উত্থিত করেছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, তারা বলবে يَٰحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِى جَنۢبِ ٱللَّهِ হায় আফসোস! আমরা আল্লাহ্র ব্যাপারে বিরাট ত্রুটি করেছি।

কিন্তু সত্য এই যে, উভয় তফসীরের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। শুরুতে সবাই প্রশংসা করতে করতে উঠবে। পরে কাফেরদেরকে মুমিনদের কাছ থেকে পৃথক করে দেয়া হবে; যেমন সূরা ইয়াসীনের আয়াতে রয়েছে وَٱمْتَٰزُوا۟ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ অপরাধীরা, আজ তোমরা সবাই পৃথক হয়ে যাও। তখন কাফেরদের মুখ থেকে উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বাক্যাবলী উচ্চারিত হবে। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলে মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ হাশরে পুনরুত্থানের শুরু হাম্দ দ্বারা হবে। সবাই হাম্দ করতে করতে উত্থিত হবে এবং সব ব্যাপারে সমাপ্তিও হামদের মাধ্যমে হবে। যেমন- বলা হয়েছে, وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ অর্থাৎ, হাশরবাসীদের ফয়সালা হক অনুযায়ী করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্র জন্যে।

কটুভাষা ও কড়া কথা কাফেরদের সাথেও জায়েয নয় ঃ ৫৩ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে কড়া কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিনা প্রয়োজনে কঠোরতা করা যাবে না এবং প্রয়োজন হলে হত্যা পর্যন্ত করার অনুমতি রয়েছে।

হত্যা ও যুদ্ধের মাধ্যমে কুফরের শান-শওকত এবং ইসলামের বিরোধিতাকে নির্মূল করা যায়। তাই এর অনুমতি রয়েছে। গালি-গালাজ ও কটু কথা দ্বারা কোন দুর্গ জয় করা যায় না এবং কারও হেদায়েত হয় না। তাই এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি জনৈক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-কে গালি দিলে প্রত্যুত্তরে তিনিও তার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে হত্যা করতেও মনস্থ করেন, ফলে দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কুরতুবীর বক্তব্য এই যে, এই আয়াতে মুসলমানদেরকে পারস্পরিক কথাবার্তা বলা সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক মতানৈক্যের সময় কঠোর ভাষা প্রয়োগ করো না। এর মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-কলহ সৃষ্টি করে দেয়।

وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا —এখানে বিশেষভাবে যবুরের কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, যবুর গ্রন্থে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে দেশ ও সাম্রাজ্যের অধিকারীও হবেন। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّٰلِحُونَ বর্তমান প্রচলিত যবুরেও কেউ কেউ এ কথার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন।— (তফসীরে হক্কানী)

ইমাম বগভী স্বীয় তফসীরে এ স্থানে লেখেন ঃ যবুর আল্লাহ্র গ্রন্থ, যা হযরত দাউদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। এতে একশ পঞ্চাশটি সূরা রয়েছে এবং প্রত্যেকটি সূরা দোয়া, হামদ ও গুণকীর্তনে পরিপূর্ণ। এগুলোতে হালাল, হারাম এবং ফরয কর্তব্যাদির বর্ণনা নেই।

يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ – وسيلة শব্দের অর্থ এমন বস্তু যাকে অন্য কারও কাছে পৌঁছার উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ্র জন্যে ওসিলা হচ্ছে কথায় ও কাজে আল্লাহ্র মর্জির প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখা এবং শরীয়তের বিধি-বিধান অনুসরণ করা। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা সবাই সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণে মশগুল আছেন।

وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ আল্লাহ্র রহমতের আশা করতে থাকা এবং ভয়ও করতে থাকা-মানুষের এ দু'টি ভিন্নমুখী অবস্থা যে পর্যন্ত সমান সমান পর্যায়ে থাকে, সেই পর্যন্ত মানুষ সঠিক পথে অনুগমন করে। পক্ষান্তরে যদি কোন একটি অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে সেই পরিমাণে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।— (কুরতুবী)

وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ অর্থাৎ, শবে-মে'রাজে যে দৃশ্যাবলী আমি আপনাকে দেখিয়েছিলাম, তা মানুষের জন্যে একটি ফেতনা ছিল। আরবী ভাষায় 'ফেতনা' শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ গোমরাহী। আরিফ অর্থ পরীক্ষাও হয় এবং অন্য এক অর্থ হাঙ্গামা ও গোলযোগ। এখানে সব অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান। হযরত আয়েশা, সুফিয়ান, হাসান, মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে শেষোক্ত অর্থ নিয়েছেন। তাঁরা বলেন ঃ এটা ছিল ধর্মত্যাগের ফেতনা। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন শবে-মে'রাজে বায়তুল-মুকাদ্দাস, সেখান থেকে আকাশে যাওয়ার এবং প্রত্যুষের পূর্বে ফিরে আসার কথা প্রকাশ করলেন, তখন কোন কোন অপক্ক নও মুসলিম এ কথা মিথ্যা মনে করে মুরতাদ হয়ে গেল।— (কুরতুবী)

এ ঘটনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, رؤيا শব্দটি আরবী ভাষায় যদিও স্বপ্নের অর্থেও আসে, কিন্তু এখানে স্বপ্নের কিস্সা বোঝানো হয়নি। কারণ, এরূপ হলে কিছু লোকের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কোন কারণ ছিল না। স্বপ্ন তো প্রত্যেকেই দেখতে পারে; বরং এখানে رؤيا শব্দ দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় অভিনব ঘটনা দেখানো বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে কোন কোন তফসীরবিদ মে'রাজের ঘটনা ছাড়া অন্যান্য ঘটনা বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু সেগুলো এখানে খাপ খায় না। একারণেই অধিক সংখ্যক তফসীরবিদ মে'রাজের ঘটনাকে আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন।— (কুরতুবী)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ
ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِى كَرَّمْتَ
عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا
قَلِيلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ
جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ
وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْأَمْوَٰلِ
وَالْأَوْلَٰدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾ إِنَّ عِبَادِى
لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾ رَّبُّكُمُ الَّذِى
يُزْجِى لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ
إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنسَٰنُ
كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ
عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنتُمْ أَن
يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ
الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِۦ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

(৬১) স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদায় পড়ে গেল। কিন্তু সে বলল ঃ আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব, যাকে আপনি মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? (৬২) সে বলল ঃ দেখুন তো, এ না সে ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চ মর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দেব। (৬৩) আল্লাহ্ বলেন ঃ চলে যা, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে তোর অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে তাদের সবার শাস্তি –ভরপুর শাস্তি। (৬৪) তুই সত্যচ্যুত করে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়ায দ্বারা, স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের অর্থ–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততিতে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। ছলনা ছাড়া শয়তান তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না। (৬৫) আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই আপনার পালনকর্তা যথেষ্ট কার্যনির্বাহী। (৬৬) তোমাদের পালনকর্তা তিনিই, যিনি তোমাদের জন্যে সমুদ্রে জলযান চালনা করেন, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পারো। নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (৬৭) যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন শুধু আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহবান করে থাক তাদেরকে তোমরা বিস্মৃত হয়ে যাও। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করে নেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (৬৮) তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না। অথবা তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করবেন না, তখন তোমরা নিজেদের জন্যে কোন কর্মবিধায়ক পাবে না। (৬৯) অথবা তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, তিনি তোমাদেরকে আরেকবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না, অতঃপর তোমাদের জন্যে মহা ঝটিকা প্রেরণ করবেন না, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না, তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে সাহায্যকারী কাউকে পাবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَأَحْتَنِكَنَّ – احتناك শব্দের অর্থ কোন বস্তুর মূলোৎপাটন করা, ধ্বংস করা অথবা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা। وَاسْتَفْزِزْ – استفزز শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন করা। এখানে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা বোঝানো হয়েছে। بِصَوْتِكَ – صوت শব্দের অর্থ আওয়াজ। শয়তানের আওয়াজ কি? এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ গান, বাদ্যযন্ত্র ও রং- তামাশার আওয়াজই শয়তানের আওয়াজ। এর মাধ্যমে সে মানুষকে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ থেকে জানা গেল যে, বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনা হারাম।— (কুরতুবী)

ইবলীস হযরত আদমকে (আঃ) সেজদা না করার সময় দু'টি কথা বলেছিল। (এক) আদম মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে এবং আমি অগ্নির দ্বারা সৃজিত। আপনি মাটিকে অগ্নির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন? এ প্রশ্নটি আল্লাহ্‌র আদেশের বিপরীতে নির্দেশের রহস্য জানার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কোন আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিকার নেই একথা বলাই বাহুল্য। কারণ, দুনিয়াতে স্বয়ং মানুষ তার চাকরকে এ অধিকার দেয় না যে, সে তার চাকরকে কোন কাজ করতে বলবে এবং চাকর সেই কাজটি করার পরিবর্তে প্রভুকে প্রশ্ন করবে যে, এর রহস্য কি? তাই ইবলীসের এই প্রশ্নটিকে উত্তরের অযোগ্য সাব্যস্ত করে আয়াতে তার উত্তর দেয়া হয়নি। এছাড়া বাহ্যিক উত্তর এটাই যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমাত্র সে সত্তার, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি যখন যে বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, তখন তাই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে।

ইবলীসের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা হয়, তবে আমি আদমের গোটা বংশধরকে অবশ্য তাদের কয়েকজন ছাড়া পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা এর উত্তরে বলেছেন ঃ আমার খাঁটি বান্দা যারা, তাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা চলবে না; যদিও তোর গোটা বাহিনী ও সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত হয়। অবশিষ্ট অখাঁটি বান্দারা তোর বশীভূত হয়ে গেলে তাদেরও দুর্দশা তাই হবে, যা তোর জন্য নির্ধারিত, অর্থাৎ, জাহান্নামের আযাবে তোদের সবাই গ্রেফতার হবে। আয়াতের وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ বাক্যে শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতেকরে বাস্তবেও শয়তানের কিছু অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক বাহিনী জরুরী বিবেচিত হয় না; বরং এই বাকপদ্ধতিটি পূর্ণ বাহিনী তথা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তবে যদি এরূপ থেকেও থাকে, তবে তাও অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যারা কুফরের সমর্থনে যুদ্ধ করতে যায়, সেসব অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী শয়তানেরই অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। এখন প্রশ্ন রইল, শয়তান কিরূপে জানতে পারল যে, সে আদমের বংশধরগণকে কুমন্ত্রণা দিয়ে পথভ্রান্ত করতে সক্ষম হবে? সম্ভবতঃ সে মানুষের গঠনপ্রকৃতি দেখে বুঝে নিয়েছে যে, এর মধ্যে কুপ্রবৃত্তির প্রাবল্য হবে। তাই কুমন্ত্রণার ফাঁদে পড়ে যাওয়া কঠিন হবে না। এছাড়া এটা যে মিছামিছি দাবীই ছিল, তাও অবান্তর নয়।

وَشَارِكْهُمْ فِى الْأَمْوَٰلِ وَالْأَوْلَٰدِ –মানুষের ধন–সম্পদ ও সন্তান–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝ يَوْمَ
نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ
يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝ وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ
اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝ وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ
عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ
خَلِيْلًا ۝ وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ۝
اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ
عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝ وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ
مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا
قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ۝ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ
الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۖ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُوْدًا ۝ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ
رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝ وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ
اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝

(৭০) নিশ্চয় আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (৭১) স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব, অতঃপর যাদেরকে ডানহাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে, তারা নিজেদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম হবে না। (৭২) যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ ছিল সে পরকালেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রান্ত। (৭৩) তারা তো আপনাকে হটিয়ে দিতে চাচ্ছিল যে বিষয় আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা থেকে আপনার পদস্খলন ঘটানোর জন্যে তারা চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে, যাতে আপনি আমার প্রতি কিছু মিথ্যা সম্বন্ধযুক্ত করেন। এতে সফল হলে তারা আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিত। (৭৪) আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন। (৭৫) তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দিগুণ শাস্তির আস্বাদন করাতাম। এ সময় আপনি আমার মোকাবিলায় কোন সাহায্যকারী পেতেন না। (৭৬) তারা তো আপনাকে এ ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করে দিতে চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল যাতে আপনাকে এখান থেকে বহিষ্কার করে দেয়া যায়। তখন তারাও আপনার পর সেখানে অল্পকালই মাত্র টিকে থাকত। (৭৭) আপনার পূর্বে আমি যত রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল। আপনি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবেন না। (৭৮) সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন এবং ফজরের কোরআন পাঠও। নিশ্চয় ফজরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি হয়। (৭৯) রাত্রির কিছু অংশ কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্যে অতিরিক্ত। হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মোকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন। (৮০) বলুনঃ হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য।

সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানার অর্থ, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে এই যে, ধন-সম্পদ অবৈধ হারাম পন্থায় উপার্জন করা অথবা হারাম কাজে ব্যয় করাই হচ্ছে ধন-সম্পদে শয়তানের শরীকানা। সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানা কয়েকভাবে হতে পারেঃ সন্তান অবৈধ ও জারজ হলে, সন্তানের মুশরিকসুলভ নাম রাখা হলে, তাদের লালন-পালনে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করলে।— (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব কেন? ঃ ৭০ নং আয়াতে অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম-সন্তানদের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। (এক) এই শ্রেষ্ঠত্ব কি গুণাবলী ও কি কারণের উপর নির্ভরশীল? (দুই) অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কথা বলে কি বোঝানো হয়েছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আদম-সন্তানকে বিভিন্ন দিক দিয়ে এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যেগুলো অন্যান্য সৃষ্টজীবের মধ্যে নেই। উদাহরণতঃ সুশ্রী চেহারা, সুষম দেহ, সুষম প্রকৃতি এবং অঙ্গসৌষ্ঠব। এগুলো মানুষকে দান করা হয়েছে যা অন্য কোন জীবের মধ্যে নেই। এছাড়া বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে। এর সাহায্যে সে সমগ্র ঊর্ধ্ব-জগত ও অধঃজগতকে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা তাকে বিভিন্ন সৃষ্টবস্তুর সংমিশ্রণে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করার শক্তি দিয়েছেন, সেগুলো তার বসবাস, চলাফেরা, আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাকশক্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার যে নৈপুণ্য মানুষ লাভ করেছে, তা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের কথা অন্যকে বলে দেয়া, লেখা ও চিঠির মাধ্যমে গোপন ভেদ অন্যজন পর্যন্ত পৌঁছানো — এগুলো সব মানুষেরই স্বাতন্ত্র্য। কোন কোন আলেম বলেনঃ হাতের অঙ্গুলি দ্বারা আহার করাও মানুষেরই বিশেষ গুণ। মানুষ ব্যতীত সব জন্তু মুখে আহার্য গ্রহণ করে। বিভিন্ন জিনিসের সংমিশ্রণে খাদ্যবস্তুকে সুস্বাদু করাও মানুষেরই কাজ। অন্যান্য সব প্রাণী একক বস্তু আহার করে। কেউ কাঁচা গোশত, কেউ মাছ এবং কেউ ফল আহার করে। মানুষই কেবল সংমিশ্রিত খাদ্য প্রস্তুত করে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা মানুষের সর্বপ্রধান শ্রেষ্ঠত্ব। এর মাধ্যমে সে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর পরিচয় এবং তাঁর পছন্দ ও অপছন্দ জেনে পছন্দের অনুগমন করে এবং অপছন্দ থেকে বিরত থাকে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনার দিক দিয়ে সৃষ্টজীবকে এভাবে ভাগ করা যায় যে, সাধারণ জীব-জন্তুর মধ্যে কামভাব ও কামনা-বাসনা আছে, কিন্তু বুদ্ধি ও চেতনা নেই। ফেরেশতাদের মধ্যে বুদ্ধি ও চেতনা আছে, কিন্তু কামভাব ও বাসনা নেই। একমাত্র মানুষের মধ্যেই বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা আছে এবং কামভাব ও কামনা-বাসনাও আছে। এ কারণেই সে বুদ্ধি ও চেতনার সাহায্যে কামভাব ও বাসনাকে পরাভূত করে দেয় এবং আল্লাহ্ তাআলার অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেক নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। ফলে তার স্থান ফেরেশতার চাইতেও ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আদম-সন্তানকে অনেক সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠ করার অর্থ কি? এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই যে, সমগ্র ঊর্ধ্ব ও অধঃজগতের সৃষ্টজীব এবং সমস্ত জীব-জন্তুর চাইতেও আদম-সন্তান শ্রেষ্ঠ। এমনিভাবে বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষের সমতুল্য জ্বিন জাতির

চাইতেও আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব সবার কাছে স্বীকৃত। এখন শুধু ফেরেশতাদের ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, মানুষ ও ফেরেশতাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এ ব্যাপারে সুচিন্তিত কথা এই যে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সাধারণ ঈমানদার ও সৎকর্মী; যেমন আওলিয়া-দরবেশ, তাঁরা সাধারণতঃ ফেরেশতাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিশেষ ফেরেশতা; যেমন — জিবরাঈল, মীকাঈল প্রমুখ, তাঁরা সাধারণ সৎকর্মী মুমিনের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বিশেষ শ্রেণীর মুমিন — যেমন পয়গম্বর শ্রেণী, তাঁরা বিশেষ শ্রেণীর ফেরেশতাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। এখন রইল কাফের ও পাপিষ্ঠ মানুষের কথা। বলাবাহুল্য, এরা ফেরেশতাদের চাইতে উত্তম হওয়া তো দূরের কথা, আসল লক্ষ্য, সাফল্য ও মুক্তির দিক দিয়ে জন্তু-জানোয়ারের চাইতেও অধম। এদের সম্পর্কে কোরআনের ফয়সালা এই ঃ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জন্তুদের ন্যায়; বরং তাদের চাইতেও পথভ্রান্ত।— (মাযহারী)

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ —এখানে امام শব্দের অর্থ গ্রন্থ; যেমন — সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ এখানে إِمَامٍ مُبِينٍ অর্থ সুস্পষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভুলভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থের আশ্রয় নেয়া হয়। যেমন— কোন অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেয়া হয়।- (কুরতুবী)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীর হাদীস থেকেও জানা যায় যে, আয়াতে ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ। হাদীসের ভাষা এরূপ ঃ

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ
قال : يدعى احدهم فيعطى كتابه بيمينه

অর্থাৎ, يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ আয়াতের তফসীরে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন যে, এক এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে এবং তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে।

এ হাদীস থেকে নির্ণীত হয়ে গেল যে, ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ এবং গ্রন্থ অর্থ আমলানামা করা হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) ও মুজাহিদ থেকে এখানে ইমাম শব্দের অর্থ নেতাও বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম নিয়ে ডাকা হবে-এই নেতা পয়গম্বর ও তাঁদের নায়েব, মাশায়েখ এবং ওলামা হোক কিংবা পথভ্রষ্টতার প্রতি আহবানকারী নেতা হোক।— (কুরতুবী)

এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম দ্বারা ডাকা হবে এবং সবাইকে এক জায়গায় জমায়েত করা হবে। উদাহরণতঃ ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসারী দল, মূসা (আঃ)-এর অনুসারী দল, ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী দল এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী দল। এ প্রসঙ্গে এসব অনুসারীর প্রত্যেক নেতাদের নাম নেয়াও সম্ভবপর।

আমলনামাঃ কোরআন পাকের একাধিক আয়াত থেকে জানা যায় যে, শুধু কাফেরদেরকেই বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে; যেমন এক আয়াতে রয়েছে إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ অন্য এক আয়াতে রয়েছে— إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ —প্রথম আয়াতে স্পষ্টভাবে ঈমান না থাকার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে পরকালে অবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও কুফরই। এ থেকে জানা গেল যে, ডান হাতে আমলনামা ঈমানদারদেরকে দেয়া হবে, পরহেযগার হোক কিংবা গোনাহ্‌গার। তারা আনন্দচিত্তে আমলনামা পাঠ করবে, বরং অন্যদেরকেও পাঠ করত দেবে। এ আনন্দ ঈমান ও চিরস্থায়ী আযাব থেকে মুক্তির হবে যদিও কোন কোন কৃতকর্মের জন্যে তাদেরকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

কোরআন পাকে আমলনামা ডান অথবা বাম হাতে অর্পণের অবস্থা বর্ণিত হয়নি, কিন্তু কোন কোন হাদীসে تطاير الكتب শব্দটি উল্লেখিত আছে। অর্থাৎ আমলনামা উড়ে এসে হাতে পড়বে। কোন কোন হাদীসে আছে, সব আমলনামা আরশের নীচে একত্রিত হবে। অতঃপর বাতাস প্রবাহিত হবে এবং সবগুলোকে উড়িয়ে মানুষের হাতে পৌছে দেবে কারও ডান হাতে এবং কারও বাম হাতে।— (বয়ানুল-কোরআন)

إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ অর্থাৎ, যদি অসম্ভবকে ধরে নেয়ার পর্যায়ে আপনি তাদের ভ্রান্ত কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়ার কাছাকাছি হয়ে যেতেন, তবে আপনার শাস্তি ইহকালেও দ্বি গুণ হত এবং মৃত্যুর পর কবর অথবা পরকালেও দ্বি গুন হত। কেননা, নৈকট্যশীলদের মামুলী ভ্রান্তিকেও বিরাট মনে করা হয়। এ বিষয়বস্তুটি সে বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্নীদের সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে—

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ

অর্থাৎ, হে নবী পত্নীরা, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কাজ করে, তবে তাকে দিগুণ শাস্তি দেয়া হবে।

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ - استفزاز —এর শাব্দিক অর্থ, কর্তন করা। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে স্বীয় বাসভূমি মক্কা অথবা মদীনা থেকে বের করে দেয়া বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কাফেররা আপনাকে নিজ দেশ থেকে বের করে দেয়ার উপক্রম করেছিল। তারা যদি এরূপ করত, তবে এর শাস্তি ছিল এই যে, তারাও আপনার পরে বেশী দিন এ শহরে বাস করতে পারত না। এটি অপর একটি ঘটনার বর্ণনা, যার নির্ণয়েও দু'রকম রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। একটি মদীনা তাইয়েবার ঘটনা এবং অপরটি মক্কা মোকাররমার। মদীনার ঘটনা এই যে, একদিন মদীনার ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ হে আবুল কাসেম (সাঃ), যদি আপনি নবুওয়তের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তবে সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করাই আপনার পক্ষে সমীচীন। কেননা, সিরিয়াই হবে হাশরের মাঠ এবং সেটাই পয়গম্বরের বাসভূমি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মনে তাদের একথা কিছুটা রেখাপাত করে। তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি যখন সিরিয়া সফর করেন, তখন সিরিয়াকে অন্যতম বাসস্থান করার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু আলোচ্য وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ আয়াতটি নাযিল করে, তাঁকে এ ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে নিষেধ করে দেয়া হয়। ইবনে কাসীর রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে একে অসন্তোষজনক আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি অপর একটি ঘটনার প্রতিও আয়াতের ইঙ্গিত বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি মক্কায় সংঘটিত হয়। যা সূরাটির মক্কায় অবতীর্ণ হওয়াএর পক্ষে শক্তিশালী ইঙ্গিত। ঘটনাটি এই যে, একবার কোরায়শরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)

-কে মক্কা থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা করে। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে কাফেরদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যদি তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দেয়, তবে নিজেরাও মক্কায় বেশীদিন সুখে-শান্তিতে টিকতে পারবে না। ইবনে কাসীর আয়াতের ইঙ্গিত হিসেবে এ ঘটনাটিকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন এবং বলেছেন, কোরআন পাকের এই হুশিয়ারীও মক্কার কাফেররা খোলা চোখে দেখে নিয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন, তখন মক্কাওয়ালারা একদিনও মক্কায় আরামে থাকতে পারেনি। মাত্র দেড় বছর পর আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বদরের ময়দানে উপস্থিত করে দেন, যেখানে তাদের সত্তর জন সরদার নিহত হয় এবং গোটা শক্তি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর ওহুদ যুদ্ধের শেষ পরিণতিতে তাদের উপর আরও ভয়-ভীতি চড়াও হয়ে যায় এবং খন্দক যুদ্ধের সর্বশেষ সংঘর্ষ তো তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে দেয়। হিজরী অষ্টম বর্ষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সমগ্র মক্কা মোকাররমা জয় করে নেন।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا —এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার সাধারণ নিয়ম পূর্ব থেকেই এরূপই চালু রয়েছে যে, যখন কোন জাতি তাদের পয়গম্বরকে তাঁর মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়, তখন সেই জাতিকেও সেখানে বেশীদিন টিকিয়ে রাখা হয় না। তাদের উপর আল্লাহ্র আযাব নাযিল হয়।

শত্রুদের দুরভিসন্ধি থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার নামায ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শত্রুদের বিরোধিতা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বিভিন্ন প্রকার কষ্টে পতিত করার অপচেষ্টা এবং এর জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নামায কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুদের দুরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার হচ্ছে নামায কায়েম করা। সূরা হিজরের আয়াতে আরও স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِينَ

অর্থাৎ, আমি জানি যে, কাফেরদের পীড়াদায়ক কথাবার্তা শুনে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সেজদা কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।— (কুরতুবী)

এ আয়াতে আল্লাহ্র যিকর, প্রশংসা, তসবীহ্ ও নামাযে মশগুল হয়ে যাওয়াকে শত্রুদের উৎপীড়নের প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্র যিকর ও নামায বিশেষভাবে এ থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার। এ ব্যাখ্যাও অবান্তর নয় যে, শত্রুদের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করা আল্লাহ্র সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহ্র সাহায্য লাভ করার উত্তম পন্থা হচ্ছে নামায। যেমন কোরআন পাক বলে ঃ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ অর্থাৎ, সবর ও নামায দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর।

পাঞ্জেগানা নামাযের নির্দেশ ঃ **অধিকাংশ** তফসীরবিদের মতে এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্যে একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ। কেননা, دلوك শব্দের অর্থ আসলে ঝুঁকে পড়া। সূর্যের ঝুঁকে পড়া তখন শুরু হয়, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, সূর্যাস্তকেও دلوك বলা যায়। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এস্থলে শব্দের অর্থ সূর্যের ঢলে পড়াই নিয়েছেন।— (কুরতুবী, মাযহারী, ইবনে কাসীর)

إِلٰى غَسَقِ اللَّيْلِ - غَسَقِ শব্দের অর্থ রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া। ইমাম মালেক হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এ তফসীর বর্ণনা করেছেন।

এভাবে لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ اللَّيْلِ এর মধ্যে চারটি নামায এসে গেছে ঃ যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। এদের মধ্যে দু'নামাযের প্রথম ওয়াক্তও বলে দেয়া হয়েছে যে, যোহরের প্রথম ওয়াক্ত সূর্য ঢলার সময় থেকে শুরু হয় এবং এশার সময় غسق ليل অর্থাৎ, অন্ধকার পূর্ণ হয়ে গেলে হয়। একারণেই ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) সে সময়কে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন, যখন সূর্যাস্তের লাল আভার পর সাদা আভাও অস্তমিত হয়। এটা সবারই জানা যে, সূর্যাস্তের পর পর পশ্চিম দিগন্তে লাল আভা দেখা দেয়। এরপর এক প্রকার সাদা আভা দিগন্তে ছড়িয়ে থাকে। এরপর এই সাদা আভাও অস্তমিত হয়ে যায়। বলা-বাহুল্য, দিগন্তের শুভ্র আভা শেষ হয়ে গেলেই রাত্রির অন্ধকার পূর্ণতা লাভ করে। তাই আয়াতের এই শব্দের মধ্যে ইমাম আবু হানীফার মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অন্য ইমামগণ লাল আভা অস্তমিত হওয়াকে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন এবং একেই غَسَقِ اللَّيْلِ এর তফসীর স্থির করেছেন।

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ এখানে قُرْآنَ শব্দ বলে নামায বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইবনে-কাসীর, কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থই লিখেছেন। কাজেই আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ اللَّيْلِ বাক্যে চার নামাযের বর্ণনা ছিল এবং এতে পঞ্চম নামাযের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। একে আলাদা করে বর্ণনা করার মধ্যে এই নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

كَانَ مَشْهُودًا - شهادة ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। অর্থ উপস্থিত হওয়া। সহীহ্ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় দিবা-রাত্রির উভয় দল ফেরেশতা নামাযে উপস্থিত হয়। তাই একে مشهود বলা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে পাঞ্জেগানা নামাযের নির্দেশ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ণ তফসীর ও ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কথা ও কাজ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নামায আদায়ই করতে পারে না। জানি না, যারা কোরআনকে হাদীস ও রসূলের বর্ণনা ছাড়াই বোঝার দাবী করে, তারা নামায কিভাবে পড়ে? এমনিভাবে এ আয়াতে নামাযে কোরআন পাঠের কথাও সংক্ষেপে উল্লেখিত হয়েছে। এর বিবরণ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথা ও কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ, ফজরের নামাযে সামর্থ্যানুযায়ী দীর্ঘ কেরাআত করতে হবে। মাগরিবে দীর্ঘ কেরাআত এবং ফজরে সংক্ষিপ্ত কেরাআতের কথাও কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু তা কার্যতঃ পরিত্যক্ত। সহীহ্ মুসলিমের যে রেওয়ায়েতে মাগরিবের নামাযে সূরা আ'রাফ, মুরসালাত ইত্যাদি দীর্ঘ সূরা পাঠ করা এবং ফজরের নামাযে শুধু 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' পাঠ করার কথা বর্ণিত আছে, ইমাম কুরতুবী সেই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ

মাগরিবে দীর্ঘ কেরাআত ও ফজরে সংক্ষিপ্ত কেরাআতের এসব কদাচিৎ ঘটনা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সার্বক্ষণিক আমল ও মৌখিক উক্তি দ্বারা পরিত্যক্ত।

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ — تهجد শব্দটি নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়া এই পরস্পর বিরোধী দুই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির কিছু অংশে কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। কেননা, به —এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হয়েছে। (মাযহারী) কোরাআন পাঠসহ জাগ্রত থাকার অর্থ নামায পড়া। এ কারণেই শরীয়তের পরিভাষায় রাত্রিকালীন নামাযকে "নামাযে তাহাজ্জুদ" বলা হয়। সাধারণতঃ এর অর্থ, এরূপ নেয়া হয় যেকিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর যে নামায পড়া হয় তাই তাহাজ্জুদের নামায। কিন্তু তফসীর মাযহারীতে রয়েছে, আয়াতের অর্থ এতটুকুই যে, রাত্রির কিছু অংশে নামায পড়ার জন্য নিদ্রা ত্যাগ কর। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে নামায পড়লে যেমন এই অর্থ ঠিক থাকে, তেমনি প্রথমেই নামাযের জন্যে নিদ্রাকে পিছিয়ে নিলেও এ অর্থের ব্যতিক্রম হয় না। তাই তাহাজ্জুদের জন্যে প্রথমে নিদ্রা যাওয়ার শর্ত কোরআনের অভিপ্রেত অর্থ নয়। এরপর কোন কোন হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদের এই সাধারণ অর্থ প্রমাণ করা হয়েছে।

ইবনে কাসীর হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে তাহাজ্জুদের যে সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন, তাও এই ব্যাপক অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাসীর লেখেন ঃ

قال الحسن البصرى هو ماكان بعد العشاء ويحمل على ما كان بعد النوم অর্থাৎ, হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ এশার পরে পড়া হয় এমন প্রত্যেক নামাযকে তাহাজ্জুদ বলা যায়। তবে প্রচলিত পদ্ধতির কারণে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর পড়ার অর্থে বোঝা দরকার।

এর সারমর্ম এই যে, তাহাজ্জুদের আসল অর্থে নিদ্রার পরে হওয়ার শর্ত নেই এবং কোরআনের ভাষায়ও এরূপ শর্তের অস্তিত্ব নেই; কিন্তু সাধারণতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম শেষ রাত্রে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। তাই এভাবে পড়াই উত্তম হবে।

তাহাজ্জুদ ফরয না নফল? ঃ نَافِلَةً لَّكَ - نفل শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। এ কারণেই যেসব নামায, সদকা-খয়রাত ওয়াজিব ও জরুরী নয় — করলে সওয়াব পাওয়া যায় এবং না করলে গোনাহ্ নাই, সেগুলোকে নফল বলা হয়। আয়াতে নামাযে তাহাজ্জুদের সাথে نَافِلَةً لَّكَ শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে নফল। অথচ এটা সমগ্র উম্মতের জন্যেও নফল। এজন্যেই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে نَافِلَةً শব্দটিকে فريضة—এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ এরূপ স্থির করেছেন যে, সাধারণ উম্মতের ওপর তো শুধু পাঞ্জেগানা নামাযই ফরয; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর তাহাজ্জুদও একটি অতিরিক্ত ফরয। অতএব, এখানে نَافِلَةً শব্দের অর্থ অতিরিক্ত ফরয — নফলের সাধারণ অর্থে নয়।

এ ব্যাপারে সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সূরা মুযযাম্মেল অবতীর্ণ হয়, তখন পাঞ্জেগানা নামায ফরয ছিল না, শুধু তাহাজ্জুদের নামায সবা উপর ফরয ছিল। সূরা মুযযাম্মেলে —এর উল্লেখ রয়েছে। এরপর শবে-মে'রাজে যখন পাঞ্জেগানা নামায ফরয করা হয়, তখন তাহাজ্জুদের ফরয নামায সাধারণ উম্মতের পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে রহিত হয়ে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষেও রহিত হয় কিনা, সে ব্যাপারে মতভেদ থেকে যায়। আলোচ্য আয়াতের نَافِلَةً لَّكَ বাক্যের অর্থ তাই এই যে, তাহাজ্জুদের নামায রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষে একটি অতিরিক্ত ফরয। কিন্তু তফসীরে কুরতুবীতে কয়েক কারণে এ বক্তব্যকে অশুদ্ধ বলা হয়েছে। (এক) ফরযকে নফল শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কোন কারণ নেই। যদি রূপক অর্থ বলা হয়, তবে এটি এমন একটি রূপক অর্থ হবে, যার কোন প্রকৃত অর্থ নেই। (দুই) সহীহ্ হাদীসসমূহে শুধু পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এক হাদীসের শেষে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শবে -মে'রাজে প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেয়া হয়। এখানে যদিও সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে; কিন্তু সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই পাওয়া যাবে। এরপর বলা হয়েছে ঃ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ — অর্থাৎ, আমার কথা পরিবর্তিত হয় না। যখন পঞ্চাশ ওয়াক্তের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তখন সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই দেয়া হবে; যদিও কাজ হাল্কা করে দেয়া হয়েছে।

এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, সাধারণ উম্মত এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর পাঞ্জেগানা নামায ছাড়া কোন নামায ফরয ছিল না। আরও এক কারণ এই যে, نَافِلَةً শব্দটি যদি এখানে অতিরিক্ত ফরযের অর্থে হত, তবে এরপরে لك শব্দের পরিবর্তে عليك হওয়া উচিত ছিল, যা ওয়াজিব হওয়ার অর্থ দেয়। لك তো শুধু জায়েয হওয়া ও অনুমতির অর্থ বুঝায়।

তফসীরে মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের ফরয নামায যখন উম্মতের পক্ষে রহিত হয়ে যায়, তখন তা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষেও রহিত হয়ে যায় এবং সবার জন্যে নফল থেকে যায়। কিন্তু এমতাবস্থায় প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তাহলে نَافِلَةً لَّكَ বলার কি মানে হবে? তাহাজ্জুদ তো সবার জন্যেই নফল। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য কি? উত্তর এই যে, হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী সমগ্র উম্মতের নফল এবাদত তাদের গোনাহের কাফফারা এবং ফরয নামাযসমূহের ত্রুটি পূরণের উপকারে লাগে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গোনাহ্ থেকে এবং ফরয নামাযের ত্রুটি থেকেও মুক্ত। কাজেই তাঁর পক্ষে নফল এবাদত সম্পূর্ণ অতিরিক্ত বৈ নয়। তাঁর নফল এবাদত কোন ত্রুটি পূরণের জন্যে নয়; বরং তা শুধু অধিক নৈকট্য লাভের উপায়। -(কুরতুবী, মাযহারী)

"মাকামে মাহমুদ" ঃ আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -কে মাকামে মাহমুদের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। এই মাকাম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট — অন্য কোন পয়গম্বরের জন্যে নয়। এর তফসীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সহীহ্ হাদীসসমূহে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ হচ্ছে শাফাআতে কুবরার মাকাম। হাশরের ময়দানে যখন সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হবে এবং প্রত্যেক পয়গম্বরের সমীপে শাফাআতের দরখাস্ত করবে, তখন সব পয়গম্বরই ওযর পেশ করবেন। একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ই এই মহান সম্মান লাভ করবেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্যে শাফাআত করবেন। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর ও তফসীরে মাযহারীতে লিখিত রেওয়ায়েত সমূহের বিবরণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।

শাফাআতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদ নামাযের বিশেষ প্রভাব ঃ হযরত মুজাদ্দিদ আলফে-সানী (রহঃ) বলেন ঃ এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- কে প্রথমে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে; অতঃপর মাকামে মাহমুদ অর্থাৎ, শাফাআতে কুবরার ওয়াদা করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, শাফাআতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের নামাযের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান।

وَقُلْ رَّبِّ أَدْخِلْنِي — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথমে মক্কার কাফেরদের উৎপীড়ন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেয়ার অপকৌশলের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এর সাথে একথাও বলা হয়েছিল যে, তাদের এসব অপকৌশল সফল হবে না। তাদের মোকাবিলায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আসল তদবীরের পর্যায়ে শুধু পাঞ্জেগানা নামায কায়েম করা ও তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপর পরকালে তাঁকে সব পয়গম্বরের তুলনায় উচ্চ মকাম অর্থাৎ ''মাকামে মাহমুদ'' দান করার ওয়াদা করা হয়েছে; এ ওয়াদা পরকালে পূর্ণ হবে। আলোচ্য وَقُلْ رَّبِّ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইহকালেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কাফেরদের দুরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দেয়ার কৌশল মদীনায় হিজরতের আকারে ব্যক্ত করেছেন, অতঃপর وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ —আয়াতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দান করেছেন।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কায় ছিলেন, অতঃপর তাঁকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَقُلْ رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ — এখানে مخرج ও مدخل — এর অর্থ প্রকাশ করার স্থান ও বহির্গমনের স্থান। উভয়ের সাথে صدق বিশেষণ যুক্ত হওয়ার অর্থ এই যে, এই প্রবেশ ও বহির্গমন সব আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী উত্তম পন্থায় হোক। কেননা, আরবী ভাষায় صدق এমন কাজের জন্যে ব্যবহৃত হয়, যা বাহ্যতঃ ও অন্তরগত উভয় দিক দিয়ে সঠিক ও উত্তম হবে। কোরআন পাকে لسان صدق قدم صدق ও مقعد صدق শব্দগুলো এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

'প্রবেশ করার স্থান' বলে মদীনা এবং বহির্গমনের স্থান বলে মক্কা বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হে আল্লাহ্, মদীনায় আমার প্রবেশ উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। সেখানে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে এবং মক্কা থেকে আমার বের হওয়া উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। মাতৃভূমি এবং বাড়ী-ঘরের মহব্বতে অন্তর যেন জড়িয়ে না পড়ে। এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে আরও বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু এই তফসীরটি হযরত হাসান বসরী ও কাতাদা থেকে বর্ণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর একে সর্বাধিক বিশুদ্ধ তফসীর আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে জরীরও এ তফসীরই গ্রহণ করেছেন। তবে এখানে প্রথমে বহির্গমনের স্থান ও পরে প্রবেশ করার স্থান উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। এই ক্রম উল্টিয়ে দেয়ার মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মক্কা থেকে বের হওয়া স্বয়ং কোন লক্ষ্য ছিল না; বরং বায়তুল্লাহ্কে ত্যাগ করে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয় ছিল। অবশ্য ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে শান্তির আবাসস্থল খোঁজ করা ছিল এখানে লক্ষ্য। মদীনা প্রবেশের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার আশা ছিল তাই লক্ষ্যবস্তুকেই অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের জন্যে মকবুল দোয়া ঃ হিজরতের সময় আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- কে এ দোয়াটি শিক্ষা দেন যে, মক্কা থেকে বহির্গমন এবং মদীনায় পৌছা উভয়টি উত্তমভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন হোক। এ দোয়ার ফলেই হিজরতের সময় পশ্চাদ্ধাবনকারী কাফেরদের কবল থেকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং মদীনাকে বাহ্যতঃ ও অন্তরগত উভয় দিক দিয়েই তাঁর জন্যে ও মুসলমানদের জন্যে উপযোগী করেছেন। এ কারণেই কোন আলেম বলেন ঃ এই দোয়াটি লক্ষ্য অর্জনের শুরুতে প্রত্যেক মুসলমানদের মনে রাখা উচিত। প্রত্যেক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দোয়াটি উপকারী। পরবর্তী বাক্য وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا — এ দোয়ারই পরিশিষ্ট। হযরত কাতাদাহ্ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জানতেন যে, শত্রুদের চক্রান্ত-জালের মধ্যে অবস্থান করে রিসালতের কর্তব্য পালন সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই তিনি আল্লাহ্র দরবারে বিজয় ও সাহায্যের দোয়া করেন, যা কবুল হয় এবং এর শুভফল সবার দৃষ্টিগোচর হয়।

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿٨١﴾
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ
الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ
بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى
شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿٨٤﴾ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ
عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ
اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٥﴾ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ
لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴿٨٦﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ
كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ﴿٨٧﴾ قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى
اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ
كُلِّ مَثَلٍ ؗ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٨٩﴾ وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ
حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ﴿٩٠﴾ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ
نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٩١﴾ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ
كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ﴿٩٢﴾

(৮১) বলুন ঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। (৮২) আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। (৮৩) আমি মানুষকে নেয়ামত দান করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে দূরে সরে যায়; যখন তাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। (৮৪) বলুন ঃ প্রত্যেকেই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে। অতঃপর আপনার পালনকর্তা বিশেষরূপে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে। (৮৫) তারা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন ঃ রূহ আমার পালনকর্তার আদেশঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। (৮৬) আমি ইচ্ছা করলে আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম। অতঃপর আপনি নিজের জন্যে তা আনয়নের ব্যাপারে আমার মোকাবিলায় কোন দায়িত্ব বহনকারী পাবেন না। (৮৭) এ প্রত্যাহার না করা আপনার পালনকর্তার মেহেরবানী। নিশ্চয় আপনার প্রতি তাঁর করুণা বিরাট। (৮৮) বলুন ঃ যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। (৮৯) আমি এই কোরআনে মানুষকে বিভিন্ন উপকার দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি। (৯০) এবং তারা বলে ঃ আমরা কখনও আপনাকে বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্যে একটি ঝরণা প্রবাহিত করে দিন। (৯১) অথবা আপনার জন্যে খেজুরের ও আঙ্গুরের একটি বাগান হবে, অতঃপর আপনি তার মধ্যে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত করে দেবেন, (৯২) অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন, তেমনিভাবে আমাদের উপর আসমানকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে দেবেন অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ — এ আয়াতটি হিজরতের পর মক্কা বিজয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বায়তুল্লাহ্র চতুষ্পার্শ্বে তিনশ' ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। এই বিশেষ সংখ্যার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোন কোন আলেম বলেন ঃ বছরের প্রত্যেক দিনের জন্যে মুশরিকদের আলাদা আলাদা মূর্তি ছিল এবং তারা প্রত্যহ নির্ধারিত মূর্তিরই উপাসনা করত। (কুরতুবী) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন সেখানে পৌছেন, তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল, جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ এবং তিনি স্বীয় ছড়ি দ্বারা প্রত্যেক মূর্তির বক্ষে আঘাত করে যাচ্ছিলেন। —(বোখারী, মুসলিম)

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে, ঐ ছড়ির নীচ দিকে রাংতা অথবা লোহার রজত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কোন মূর্তির বুকে আঘাত করতেন, তখন তা উল্টে পড়ে যেত। এভাবে সব মূর্তিই ভূমিসাৎ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সেগুলো ভেঙ্গে চুরমার করার আদেশ দেন। —(কুরতুবী)

শেরক ও কুফরের চিহ্ন মিটিয়ে দেয়া ওয়াজিব ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ এ আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, মুশরিকদের মূর্তি ও অন্যান্য মুশরিকসুলভ চিহ্ন মিটিয়ে দেয়া ওয়াজিব। যেসব হাতিয়ার যন্ত্রপাতি গোনাহ্র কাজে ব্যবহৃত হয়, সেগুলো মিটিয়ে দেয়াও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে মুনযের বলেন ঃ কাষ্ঠ, পিতল ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত চিত্র ও ভাস্কর্যশিল্পও মূর্তির অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রঙ-বেরঙের চিত্র অঙ্কিত পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। এ থেকে সাধারণ চিত্রের বিধান জানা যায়। হযরত ঈসা (আঃ) যখন শেষ যমানায় আগমন করবেন, তখন সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী খ্রীষ্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে দেবেন এবং শূকর হত্যা করবেন। শিরক, কুফর ও বাতিলের আসবাবপত্র ভেঙ্গে দেয়া যে ওয়াজিব, এসব বিষয় তারই প্রমাণ।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ —কোরআন পাক যে অন্তরের ঔষধ এবং শেরক, কুফর, কুচরিত্র ও আত্মিক রোগসমূহ থেকে মনের মুক্তিদাতা এটা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। কোন কোন আলেমের মতে কোরআন যেমন আত্মিক রোগসমূহের ঔষধ, তেমনি বাহ্যিক রোগসমূহের অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কোরআনের আয়াত পাঠ করে রোগীর গায়ে ফুঁ দেয়া এবং তাবিজ লিখে গলায় ঝুলানো বাহ্যিক রোগ নিরাময়ের কারণ হয়ে থাকে। হাদীসের অনেক রেওয়ায়েত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আবু সাঈদ খুদরীর এই হাদীস সব গ্রন্থেই বিদ্যমান দেখা যায় যে, সাহাবীদের একটি দল একবার সফররত ছিলেন। কোন এক গ্রামের জনৈক এক সরদারকে বিচ্ছু দংশন করলে লোকেরা সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনারা এই রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন কি? সাহাবীরা সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে রোগীর গায়ে ফুঁ দিলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি এ কার্যক্রমকে জায়েয বলে মত প্রকাশ করেন।

এমনিভাবে আরও অনেক হাদীস থেকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর 'কুল আউযু' শীর্ষক সূরাসমূহ পাঠ করে ফুঁ দেয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সাহাবী ও তাবেয়ীগণও কোরআনের আয়াত দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। এ আয়াতের অধীনে কুরতুবী এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا — এ থেকে জানা যায় যে, বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে কোরআন পাঠ করলে যেমন কোরআন দ্বারা রোগের চিকিৎসা হয়ে থাকে, তেমনি অবিশ্বাস এবং কোরআনের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন ক্ষতি এবং বিপদাপদের কারণও হয়ে থাকে।

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ এখানে شاكلة শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে স্বভাব, অভ্যাস, প্রকৃতি, নিয়ত, রীতি ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সবগুলোর সারমর্ম পরিবেশ। অভ্যাস এবং প্রথা ও প্রচলনের দিক দিয়ে প্রত্যেক মানুষের একটি অভ্যাস ও মানসিকতা গড়ে উঠে। এই অভ্যাস ও মানসিকতা অনুযায়ী তার কাজকর্ম হয়ে থাকে। — (কুরতুবী) এতে মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, মন্দ পরিবেশ, মন্দ সংসর্গ ও মন্দ অভ্যাস থেকে বিরত থাকা দরকার এবং সৎলোকদের সংসর্গ ও সৎ অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। —(জাসসাস) কেননা, পরিবেশ সংসর্গ এবং প্রথা ও প্রচলিত রীতি দ্বারা মানুষের যে স্বভাব গড়ে উঠে, তার প্রত্যেক কাজ তদনুযায়ীই হয়ে থাকে। ইমাম জাসসাস এস্থলে شاكلة —এর এক অর্থ, সমভাবাপন্নও উল্লেখ করেছেন। এদিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমভাবাপন্ন ব্যক্তির সাথে অন্তরঙ্গ হয়। সাধু সাধুর সাথে এবং দুষ্ট দুষ্টের সাথে অন্তরঙ্গ হয় এবং তারই কর্মপন্থা অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তাআলার নিম্নোক্ত উক্তি এর নযীর ঃ

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ — অর্থাৎ ভ্রষ্টা নারী ভ্রষ্ট পুরুষদের জন্যে এবং পবিত্রা নারী পবিত্র পুরুষদের জন্যে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ পুরুষ ও নারীর সাথে অন্তরঙ্গ হয়। এর সারমর্মও এই যে, খারাপ সংসর্গ ও খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

আলোচ্য ৮৫ আয়াতে রূহ্ সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব উল্লেখিত হয়েছে। রূহ্ শব্দটি অভিধান, বাকপদ্ধতি এবং কোরআন পাকে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ তাই, যা এ শব্দ থেকে সাধারণভাবে বোঝা যায়। অর্থাৎ —প্রাণ যার বদৌলতে জীবন কায়েম রয়েছে। কোরআন পাকে এ শব্দটি জিবরাঈলের জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে যেমন نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ — এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্যেও কয়েক আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি স্বয়ং কোরআনও ওহীকে রূহ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন–

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا

রূহ্ বলে কি বোঝানো হয়েছে ঃ এ বিষয়ই এখানে প্রথম প্রণিধানযোগ্য যে, প্রশ্নকারীরা কোন্ অর্থের দিক দিয়ে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল? কোন কোন তফসীরবিদ বর্ণনার পূর্বাপর ধারার প্রতি লক্ষ্য করে প্রশ্নটি ওহী, কোরআন অথবা ওহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল সম্পর্কে সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এর পূর্বেও وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ — এ কোরআনের উল্লেখ ছিল এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আবার কোরআনের উল্লেখ রয়েছে। এর সাথে মিল রেখে তারা বুঝেছেন যে, এ প্রশ্নেও রূহ বলে ওহী, কোরআন অথবা জিবরাঈলকেই বোঝানো হয়েছে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে? কে আনে? কোরআন পাক এর উত্তরে শুধু এতটুকু বলেছে যে, আল্লাহ্র নির্দেশে ওহী আসে। ওহীর পূর্ণ বিবরণ ও অবস্থা বলা হয়নি।

কিন্তু যেসব সহীহ্ হাদীসে এ আয়াতের শানে-নুযুল বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোতে প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীরা জৈব রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং রূহের স্বরূপ অবগত হওয়াই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ, রূহ্ কি? মানবদেহে রূহ কিভাবে আগমন করে? কিভাবে এর দ্বারা জীবজন্তু ও মানুষ জীবিত হয়ে যায়? সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে মদীনার জনবসতিহীন এলাকায় পথ অতিক্রম করছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) —এর হাতে খর্জুর ডালের একটি ছড়ি ছিল। তিনি কয়েকজন ইহুদীর কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। তারা পরস্পরে বলাবলি করছিল ঃ মুহাম্মদ (সাঃ) আগমন করছেন। তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। অপর কয়েকজন নিষেধ করল। কিন্তু কয়েকজন ইহুদী প্রশ্ন করেই বসল। প্রশ্ন শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ছড়িতে ভর দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি অনুমান করলাম যে, তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হবে। কিছুক্ষণ পর ওহী নাযিল হলে তিনি এ আয়াত পাঠ করে শোনালেন ঃ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ বলাবাহুল্য, কোরআন অথবা ওহীকে রূহ্ বলা কোরআনের একটি বিশেষ পরিভাষা ছিল। এখানে তাদের প্রশ্নকে এ অর্থে নেয়া খুবই অবান্তর। তবে জৈব ও মানবীয় রূহের ব্যাপারটি এমন যে, এর প্রশ্ন প্রত্যেকের মনেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ জন্যেই ইবনে কাসীর, ইবনে জরীর, কুরতুবী, বাহ্রে মুহীত, রূহুল মা'আনী প্রমুখ সাধারণ তফসীরবিদরাই সাব্যস্ত করেছেন যে, জৈব রূহের স্বরূপ সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হয়েছিল। বর্ণনার পূর্বাপর ধারায় কোরআনের আলোচনা এবং মাঝখানে রূহের প্রশ্নোত্তর বেখাপ্পা বলে প্রশ্ন করা হলে এর উত্তর এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের বিরোধিতা এবং হঠকারিতাপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা এসেছে, যার উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) —এর রিসালত পরীক্ষা করা। এ প্রশ্নটিও তারই একটি অংশ; কাজেই বেখাপ্পা নয়। বিশেষ করে শানে নুযুল সম্পর্কে অপর একটি সহীহ্ হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে যে, প্রশ্নকারীদের উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রিসালত পরীক্ষা করা।

মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ কোরায়শরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -কে সঙ্গত অসঙ্গত প্রশ্ন করত। একবার তারা মনে করল যে, ইহুদীরা বিদ্বান লোক। তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেরও জ্ঞান রাখে। কাজেই তাদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন জেনে নেয়া দরকার; যেগুলো দ্বারা মুহাম্মদের পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। তদনুসারে কোরায়শরা কয়েকজন লোক ইহুদীদের কাছে প্রেরণ করল। তারা শিখিয়ে দিল যে, তোমরা তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করো। —(ইবনে কাসীর) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেই এক আয়াতের তফসীরে বর্ণিত রয়েছে যে, ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- কে যে প্রশ্ন করেছিল, তাতে এ কথাও *ছিল যে, রূহকে কিভাবে আযাব দেয়া হয়। তখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে* কোন আয়াত নাযিল হয়নি বিধায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাৎক্ষণিক উত্তরদানে বিরত থাকেন। এরপর ফেরেশতা জিবরাঈল قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন। -(ইবনে কাসীর)

প্রশ্ন মক্কায় করা হয়েছিল না মদীনায়? ঃ এ আয়াতে শানে নুযুল

সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাসের যে দু'টি হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ইবনে মাসউদের হাদীস অনুযায়ী প্রশ্নটি মদীনায় করা হয়েছিল। এ কারণেই কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতটিকে 'মদনী' সাব্যস্ত করেছেন যদিও সূরা বনী-ইসরাঈলের অধিকাংশই মক্কী। পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুসারে প্রশ্নটি মক্কায় করা হয়েছিল। এদিক দিয়ে গোটা সূরার ন্যায় এ আয়াতটিও মক্কী। এ কারণেই ইবনে কাসীর এ সম্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে ইবনে মাসউদের হাদীসের উত্তরে বলেছেন যে, সম্ভবতঃ এ আয়াতটি মদীনায় পুনর্বার নাযিল হয়েছে; যেমন কোরআনের অনেক আয়াতের পুনর্বার অবতরণ সবার কাছেই স্বীকৃত। তফসীরে মাযহারী ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রশ্ন মদীনায় এবং আয়াতকে মদনী সাব্যস্ত করেছে। তফসীর মাযহারী এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছে। (এক) এ রেওয়ায়েতটি বোখারী ও মুসলিমে বর্তমান। এর সনদ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের সনদের চাইতে শক্তিশালী। (দুই) এতে বর্ণনাকারী ইবনে মাসউদ স্বয়ং নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যতঃ এটাই বোঝা যায় যে, তিনি বিষয়টি কারও কাছে শুনেছেন।

উল্লেখিত প্রশ্নের জওয়াব ঃ প্রশ্নের উত্তরে কোরআন বলেছে ঃ

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي এই জওয়াবের ব্যাখ্যায় তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। তন্মধ্যে কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথীর উক্তিটিই সর্বাধিক বোধগম্য ও স্পষ্ট। তা এই যে, এ জওয়াবে যতটুকু বিষয় বলা জরুরী ছিল এবং যতটুকু বিষয় সাধারণ লোকের বোধগম্য ছিল, ততটুকুই বলে দেয়া হয়েছে। রূহের সম্পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন ছিল জওয়াবে তা বলা হয়নি। কারণ, তা বোঝা সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল এবং তাদের কোন প্রয়োজন এটা বোঝার উপর নির্ভরশীলও ছিল না। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে উত্তরে বলে দিন ঃ *রূহ্ আমার পালনকর্তার আদেশের অন্তর্ভুক্ত।* অর্থাৎ, রূহ্ সাধারণ সৃষ্টজীবের মত উপাদানের সমন্বয়ে এবং জন্ম ও বংশবিস্তারের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি ; বরং তা সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার আদেশ كُن (হও) দ্বারা সৃজিত। এই জওয়াব একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, রূহকে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করা যায় না। ফলে, রূহ্‌কে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করার ফলশ্রুতিতে যেসব সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সেগুলো দূর হয়ে গেল। রূহ্ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান মানুষের জন্যে যথেষ্ট। এর বেশী জ্ঞানের উপর তার কোন ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন আটকা নয়। তাই প্রশ্নের সেই অংশটিকে অনর্থক ও বাজে সাব্যস্ত করে জওয়াব দেয়া হয়নি; বিশেষতঃ যেক্ষেত্রে এর স্বরূপ বোঝা সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষেও সহজ নয়।

وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ — পূর্ববর্তী আয়াতে রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের প্রয়োজন পরিমাণে উত্তর দিয়ে রূহের স্বরূপ আবিষ্কারের প্রয়াস থেকে একথা বলে নিবৃত্ত করা হয়েছিল যে, মানুষের জ্ঞান যত বেশীই হোক না কেন, বস্তুনিচয়ের সর্বব্যাপী স্বরূপের দিক দিয়ে তা অল্পই । তাই অনাবশ্যক আলোচনা ও খোঁজাখুঁজিতে লিপ্ত হওয়া মূল্যবান সময় নষ্ট করারই নামান্তর। وَلَئِن شِئْنَا আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে যতটুকুই জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাও তার ব্যক্তিগত জায়গীর নয়। আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে তাও ছিনিয়ে নিতে পারে। কাজেই বর্তমান জ্ঞানের জন্য তার কৃতজ্ঞ থাকা এবং অনর্থক ও বাজে গবেষণায় সময় নষ্ট না করা উচিত। বিশেষতঃ যখন উদ্দেশ্য গবেষণা করা নয়; বরং অপরকে পরীক্ষা করা ও লজ্জিত করাই উদ্দেশ্য হয়। মানুষ যদি এরূপ করে, তবে এই বক্রতার পরিণতিতে তার অর্জিত জ্ঞানটুকু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। এ আয়াতে যদিও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উম্মতকে শোনানোই উদ্দেশ্য; অর্থাৎ রসূলের জ্ঞানও যখন তার ক্ষমতাধীন নয়, তখন অন্যের তো প্রশ্নই উঠে না।

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ — এ বিষয়বস্তুটি কোরআন পাকের কয়েকটি আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে। এতে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে সম্বোধন করে দাবী করা হয়েছে যে, যদি তোমরা কোরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম স্বীকার না কর; বরং কোন মানবরচিত কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানব; এর সমতুল্য কালাম রচনা করে তোমরা দেখিয়ে দাও। আয়াতে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, শুধু মানবই নয়, জ্বিনদেরকেও সাথে মিলিয়ে নাও। অতঃপর সবাই মিলে কোরআনের একটি সূরা বরং একটি আয়াতের অনুরূপও রচনা করতে সক্ষম হবে না।

এ বিষয়বস্তুর এখানে পুনরাবৃত্তি সম্ভবতঃ এ কারণে যে, তোমরা আমার রসূলকে নবুওয়ত ও রিসালত পরীক্ষা করার জন্যে রূহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন তাঁর প্রতি করে থাক। তোমরা কেন এসব *অনর্থক কাজে ব্যাপৃত রয়েছ? স্বয়ং কোরআনকে দেখে নিলেই তাঁর* নবুওয়ত ও রিসালত সম্পর্কে কোন সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকবে না। কেননা, সমগ্র বিশ্বের মানব ও জ্বিন যখন তাঁর সামান্যতম দৃষ্টান্ত রচনা করতে সক্ষম নয়, তখন এটা যে আল্লাহ্‌র কালাম, তাতে কি সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে? কোরআনের খোদায়ী কালাম হওয়া যখন এভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও রিসালত সম্পর্কেও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

সর্বশেষ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا —আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদিও কোরআনের মু'জেযা এতটুকু জাজ্বল্যমান যে, এরপর কোন প্রশ্ন ও সন্দেহের অবকাশ থাকে না; কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ লোক আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শোকর করে না এবং কোরআনরূপী নেয়ামতকেও মূল্য দেয় না। তাই পথভ্রষ্টতায় উদভ্রান্ত হয়ে তারা ঘোরাফেরা করে।

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ ۖ وَلَن نُّؤْمِنَ
لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ
كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٣﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ
الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٤﴾ قُل لَّوْ كَانَ فِي
الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ
مَلَكًا رَّسُولًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ
بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن
يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ
زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ
أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ
إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا
لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾

(৯৩) অথবা আপনার কোন সোনার তৈরী গৃহ হবে অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন এবং আমরা আপনার আকাশে আরোহণকে কখনও বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি অবতীর্ণ করেন আমাদের প্রতি এক গ্রন্থ, যা আমরা পাঠ করব। বলুন ঃ পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা, একজন মানব, একজন রসূল বৈ আমি কে? (৯৪) 'আল্লাহ্ কি মানুষকে পয়গম্বর করে পাঠিয়েছেন'? তাদের এই উক্তিই মানুষকে ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে হেদায়েত। (৯৫) বলুন ঃ যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করত, তবে আমি আকাশ থেকে কোন ফেরেশতাকেই তাদের নিকট পয়গম্বর করে প্রেরণ করতাম। (৯৬) বলুন ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি তো স্বীয় বান্দাদের বিষয়ে খবর রাখেন ও দেখেন। (৯৭) আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, সে ই তো সঠিক পথ প্রাপ্ত এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাদের জন্যে আপনি আল্লাহ্ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবেন না। আমি কেয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মূক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্যে অগ্নি আরও বৃদ্ধি করে দিব। (৯৮) এটাই তাদের শাস্তি। কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে ঃ আমরা যখন অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব? (৯৯) তারা কি দেখেনি যে, যে আল্লাহ্ আসমান ও যমিন সৃজিত করেছেন, তিনি তাদের মত মানুষও পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম? তিনি তাদের জন্যে স্থির করেছেন একটি নির্দিষ্ট কাল, এতে কোন সন্দেহ নেই; অতঃপর জালেমরা অস্বীকার ছাড়া কিছু করেনি। (১০০) বলুন ঃ যদি আমার পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে থাকত, তবে ব্যয়িত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অবশ্যই তা ধরে রাখতে। মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।

আনুষাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অসামঞ্জস প্রশ্নের পয়গম্বরসুলভ জওয়াব ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে যে সব প্রশ্ন ও ফরমায়েশ বিশ্বাস স্থাপনের শর্ত হিসেবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে করা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষ এগুলোকে এক প্রকার ঠাট্টা এবং বিশ্বাস স্থাপন না করার বেহুদা বাহানা ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারে না। এ ধরনের প্রশ্নের জওয়াবে মানুষ স্বভাবতই রাগের বশবর্তী হয়ে জওয়াব দেয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় পয়গম্বরকে যে জওয়াব শিক্ষা দিয়েছেন, তা প্রণিধানযোগ্য, সংস্কারকদের জন্যে চিরস্মরণীয় এবং কর্মের আদর্শ করার বিষয়। সবগুলো প্রশ্নের জওয়াবে তাদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করা হয়নি এবং হঠকারিতাপূর্ণ দুষ্টামিও ফুটিয়ে তোলা হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রূপাত্মক বাক্যও উচ্চারণ করা হয়নি; বরং সাধাসিধা ভাষায় আসল স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, সম্ভবতঃ তোমাদের ধারণা এই যে, আল্লাহ্র রসূলও সমগ্র খোদায়ী ক্ষমতার মালিক এবং সবকিছু করতে সক্ষম হওয়া উচিত। এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। রসূলের কাজ শুধু আল্লাহ্র পয়গাম পৌছানো। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রেসালত সপ্রমাণ করার জন্যে অনেক মু'জেযাও প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো নিছক আল্লাহ্ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতা দ্বারা হয়। রসূল খোদায়ী ক্ষমতা লাভ করেন না। তিনি একজন মানব, কাজেই মানবিক শক্তি বহির্ভূত নন। তবে যদি আল্লাহ্ তাআলাই তাঁর সাহায্যার্থে স্বীয় শক্তি প্রকাশ করেন, তবে তা ভিন্ন কথা।

মানবের রসূল মানবই হতে পারেন ঃ সাধারণ কাফের ও মুশরিকদের ধারণা ছিল, মানব আল্লাহ্র রসূল হতে পারে না। কেননা, সে মানবীয় অভাব ও প্রয়োজনে অভ্যস্ত হয়। কাজেই সাধারণ মানুষের উপর তার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই যে, তারা তাকে রসূল মনে করে অনুসরণ করবে। তাদের এ ধারণার জওয়াব কোরআন পাকে কয়েক জায়গায় বিভিন্ন শিরোনামে দেয়া হয়েছে। এখানে وَمَا مَنَعَ النَّاسَ আয়াতে যে জওয়াব দেয়া হয়েছে, তার সারমর্ম হলো যে, রসূলকে যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়, তাকে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। তারা মানব হলে রসূলেরও মানব হওয়া উচিত। কেননা, ভিন্ন শ্রেণীর সাথে পারস্পরিক মিল ব্যতীত হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের উপকার অর্জিত হয় না। ফেরেশতা ক্ষুধা পিপাসা জানে না, কাম-প্রবৃত্তিরও জ্ঞান রাখে না এবং শীত-গ্রীষ্মের অনুভূতি ও পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি থেকেও মুক্ত। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতি কোন ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করা হলে সে মানবের কাছেও উপরোক্তরূপ কর্ম আশা করতো এবং মানবের দুর্বলতা ও অক্ষমতা উপলব্ধি করতো না। এমনিভাবে মানব যখন বুঝত যে, সে ফেরেশতা, তার কাজকর্মের অনুকরণ করার যোগ্যতা মানুষের নেই, তখনই মানব তার অনুসরণ মোটেই করত না। সংশোধন ও পথ প্রদর্শনের উপকার তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন আল্লাহ্র রসূল মানব জাতির মধ্য থেকে হন। তিনি একদিকে মানবীয় ভাবাবেগ ও স্বভাবগত কামনা-বাসনার বাহকও হবেন এবং সাথে সাথে এক প্রকার ফেরেশতাসুলভ শানেরও অধিকারী হবেন– যাতে সাধারণ মানব ও ফেরেশতাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী বুঝে নিয়ে স্বজাতীয় মানবের কাছে পৌছাতে পারেন।

উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা এ সন্দেহও দূর হয়ে গেল যে, মানুষ ফেরেশতার কাছ থেকে উপকার লাভে সক্ষম না হলে রসূল মানব হওয়া

সত্ত্বেও ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী কিরূপে লাভ করতে পারবে?

প্রশ্ন হয় যে, রসূল ও উম্মতের সমজাতি হওয়া যখন শর্ত, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জ্বিন জাতির রসূল নিযুক্ত হলেন কিরূপে? জ্বিন তো মানবের সমজাতি নয়। উত্তর এই যে, রসূল শুধু মানবই নন ; বরং তিনি ফেরেশতাসুলভ ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদারও অধিকারী। এ কারণে তাঁর সাথে জ্বিনদেরও সম্পর্ক থাকতে পারে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ তোমরা মানব হওয়া সত্ত্বেও দাবী কর যে, তোমাদের রসূল ফেরেশতা হওয়া উচিত। এ দাবী অযৌক্তিক। যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বসবাস করত এবং তাদের প্রতি রসূল প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিত; তবে ফেরেশতাকেই রসূল করা হত। এখানে পৃথিবীতে বসবাসকারী ফেরেশতাদের বিশেষণ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে বিচরণ করে। এ থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাদের প্রতি ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করার প্রয়োজন তখনই হত, যখন পৃথিবীর ফেরেশতারা স্বয়ং আকাশে যেতে না পারত; বরং পৃথিবীতেই বিচরণ করতে হত। পক্ষান্তরে যদি তারা স্বয়ং আকাশে যাওয়ার শক্তি রাখত, তবে পৃথিবীতে রসূল প্রেরণ করার প্রয়োজনই দেখা দিত না।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে: যদি তোমরা আল্লাহ্র রহমতের ভান্ডারের মালিক হয়ে যাও, তবে তাতেও কৃপণতা করবে। কাউকে দেবে না এ আশঙ্কায় যে, এভাবে দিতে থাকলে ভাণ্ডারই নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ্র রহমতের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হয় না। কিন্তু মানুষ স্বভাবগতভাবে ছোটমনা ও কম সাহসী। অকাতরে দান করার সাহস তার নেই।

এখানে সাধারণ তফসীরবিদগণ 'পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার' শব্দের অর্থ নিয়েছেন ধনভাণ্ডার। পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, মক্কার কাফেররা ফরমায়েশ করেছিল, যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য নবী হন, তবে মক্কার শুষ্ক মরুভূমিতে নদী-নালা প্রবাহিত করে একে সিরিয়ার মত সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা করে দিন। এর জওয়াব পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা যেন আমাকে খোদাই মনে করে নিয়েছ। ফলে আমার কাছ থেকে খোদায়ী ক্ষমতা দাবী করছ। আমি তো একজন রসূল মাত্র। খোদা নই যে, তোমরা যা চাইবে, তাই করব। আলোচ্য আয়াতকে যদি এর সাথেই সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, মক্কার মরুভূমিকে নদী-নালা বিধৌত শস্য-শ্যামলা প্রান্তরে পরিণত করার ফরমায়েশ যদি আমার রেসালত পরীক্ষা করার জন্য হয়, তবে এর জন্যে কোরআনের অলৌকিকতার মু'জেযাটি যথেষ্ট। অন্য ফরমায়েশের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যদি জাতীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্যে হয়, তবে স্মরণ রেখ, যদি তোমাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী মক্কার ভূখণ্ডে তোমাদেরকে সবকিছু দেয়াও হয় এবং ধন-ভাণ্ডারের মালিক তোমাদেরকে করে দেয়া হয়, তবে এর পরিণামেও জাতীয় ও জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হবে না; বরং মানবীয় অভ্যাস অনুযায়ী যার হাতে এই ধন-ভাণ্ডার থাকবে, সে সর্প হয়ে তার উপর বসে যাবে, জনগণের কল্যাণার্থে ব্যয় করতে চাইবে না দারিদ্র্যের আশঙ্কা করবে। এমতাবস্থায় মক্কার গুটিকতক বিত্তশালীর আরও বিত্তশালী ও সুখী হওয়া ছাড়া জনগণের কি উপকার হবে? অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

কিন্তু হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) বয়ানুল কোরআনে এখানে রহমতের অর্থ নবুওয়ত ও রিসালত এবং ভাণ্ডারের অর্থ নবুওয়তের উৎকর্ষ নিয়েছেন। এ তফসীর অনুযায়ী পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এই যে, তোমরা আমার নবুওয়ত ও রিসালতের জন্য যেসব আগাগোড়াহীন অনর্থক দাবী করছ, সেগুলোর সারমর্ম এই যে, তোমরা আমার নবুওয়ত স্বীকার করতে চাও না। অতঃপর তোমরা কি চাও যে, নবুওয়তের ব্যবস্থাপনা তোমাদের হাতে অর্পণ করা হোক, যাতে তোমরা যাকে ইচ্ছা নবী করে দাও। এরূপ করা হলে এর পরিণতি হবে এই যে, তোমরা কাউকে নবুওয়ত দেবে না – কৃপণ হয়ে বসে থাকবে। হযরত থানভী (রহঃ) এই তফসীর লিপিবদ্ধ করে বলেছেন যে, এটা আল্লাহ্ তাআলার অন্যতম দান। তফসীরটি খুবই স্থানোপযোগী। এ স্থলে নবুওয়তকে রহমত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা এমন, যেমন— أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ আয়াতে সর্বস্বীকৃত মতে রহমত শব্দের অর্থ নবুওয়ত।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اِذْ جَاۤءَهُمْ
فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ
اَنْزَلَ هٰٓؤُلَاۤءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَاۤىِٕرَ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ
يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿١٠٢﴾ فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَ
مَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ﴿١٠٣﴾ وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اسْكُنُوا
الْاَرْضَ فَاِذَا جَاۤءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿١٠٤﴾ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ
وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿١٠٥﴾ وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ
لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٦﴾ قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ
لَا تُؤْمِنُوْا ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ
يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ
وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ
خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاۤءُ
الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ
سَبِيْلًا ﴿١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ
شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿١١١﴾

(১০১) আপনি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন, আমি মূসাকে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দান করেছি। যখন তিনি তাদের কাছে আগমন করেন, ফেরাউন তাকে বলল ঃ হে মূসা, আমার ধারণায় তুমি তো জাদুগ্রস্ত। (১০২) তিনি বললেন ঃ তুমি জান যে, আসমান ও যমীনের পালনকর্তাই এসব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন। হে ফেরাউন, আমার ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চলেছ। (১০৩) অতঃপর সে বনী ইসরাঈলকে দেশ থেকে উৎখাত করতে চাইল, তখন আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের সবাইকে নিমজ্জিত করে দিলাম। (১০৪) তারপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম ঃ এ দেশে তোমরা বসবাস কর। অতঃপর যখন পরকালের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমাদেরকে জড়ো করে নিয়ে উপস্থিত হব। (১০৫) আমি সত্যসহ এ কোরআন নাযিল করেছি এবং সত্যসহ এটা নাযিল হয়েছে। আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদাতা ও ভয়প্রদর্শক করেই প্রেরণ করেছি। (১০৬) আমি কোরআনকে যতিচিহ্নসহ পৃথক পৃথকভাবে পাঠের উপযোগী করেছি, যাতে আপনি একে লোকদের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ করেন এবং আমি একে যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। (১০৭) বলুন ঃ তোমরা কোরআনকে মান্য কর অথবা অমান্য কর; যারা এর পূর্ব থেকে এলম প্রাপ্ত হয়েছে, যখন তাদের কাছে এর তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা নতমস্তকে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে (১০৮) এবং বলে ঃ আমাদের পালনকর্তা পবিত্র, মহান। নিঃসন্দেহে আমাদের পালনকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। (১০৯) তারা ক্রন্দন করতে করতে নতমস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়। (১১০) বলুন ঃ আল্লাহ্ বলে আহবান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহবান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই। আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। (১১১) বলুন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ এতে মূসা (আঃ)-কে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। اٰيَة শব্দটি মু'জেযা এবং কোরআনী আয়াত অর্থাৎ, আহকামে এলাহীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে। একদল তফসীরবিদ এখানে اٰيَة -এর অর্থ মু'জেযা নিয়েছেন। নয় সংখ্যা উল্লেখ করায় নয়ের বেশী না হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু এখানে বিশেষ গুরুত্বের কারণে নয় উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস নয়টি মু'জেযা এভাবে গণনা করেছেন ঃ (১) মূসা (আঃ)-এর লাঠি, যা অজগর সাপ হয়ে যেত, (২) শুভ্র হাত, যা জামার নীচ থেকে বের করতেই চমকাতে থাকত, (৩) মুখের তোতলামি — যা দূর করে দেয়া হয়েছিল, (৪) বনী ইসরাঈলকে নদী পার করার জন্যে নদীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রাস্তা করে দেয়া, (৫) অস্বাভাবিকভাবে পঙ্গপালের আযাব প্রেরণ করা, (৬) তুফান প্রেরণ করা, (৭) শরীরের কাপড়ে এত উকুন সৃষ্টি করা, যা থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় ছিল না, (৮) ব্যাঙের আযাব চাপিয়ে দেয়া, ফলে প্রত্যেক পানাহারের বস্তুতে ব্যাঙ কিলবিল করতো এবং (৯) রক্তের আযাব প্রেরণ করা। ফলে প্রত্যেক পাত্রে ও পানাহারের বস্তুতে রক্ত দেখা যেত।

يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا —তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ কোরআন তেলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা মুস্তাহাব। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে, সে জাহান্নামে যাবে না, যে পর্যন্ত না দোহন করা দুধ পুনর্বার স্তনে ফিরে আসে। (অর্থাৎ, দোহন করা দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনিভাবে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়াও অসম্ভব)। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে ঃ আল্লাহ্ তাআলা দু'টি চক্ষুর উপর জাহান্নামের অগ্নি হারাম করেছেন। (এক) যে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে। (দুই) যে ইসলামী সীমান্তের হেফাযতে রাত্রিকালে জাগ্রত থাকে।-(বায়হাকী, হাকেম) হযরত নযর ইবনে সা'দ বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে সম্প্রদায়ে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারী রয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা সেই সম্প্রদায়কে তার কারণে অগ্নি থেকে মুক্তি দেবেন।—(রূহুল মা'আনী)

এগুলো সূরা বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ আয়াত। এ সূরার প্রারম্ভেও আল্লাহ্ তাআলার পবিত্রতা ও তওহীদের বর্ণনা ছিল এবং সর্বশেষ আয়াতগুলোতেও এ বিষয়বস্তুই বিবৃত হয়েছে। কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। (এক) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদিন দোআয় 'ইয়া আল্লাহ্, ইয়া রহমান' বলে আহবান করলে মুশরিকরা মনে করতে থাকে যে, তিনি দু'আল্লাহ্কে আহবান করেন। তারা বলাবলি করতে থাকে, যে আমাদেরকে তো একজন ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করেন অথচ নিজেই দু'উপাস্যকে ডাকেন। আয়াতের প্রথম অংশে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা-কেবল দু'টিই নয়, আরও অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে। যে নামেই ডাকা হবে, উদ্দেশ্য একই সত্তা। কাজেই তোমাদের জল্পনা-কল্পনা ভ্রান্ত।

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মক্কায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন নামাযে উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করতেন, তখন মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং কোরআন, জিবরাঈল ও স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাকে উদ্দেশ করে ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা

বলত। এর জওয়াবে আয়াতের শেষাংশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সশব্দ ও নিঃশব্দ উভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা, মধ্যবর্তী শব্দে পাঠ করলেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায় এবং সশব্দে পাঠ করলে মুশরিকরা নিপীড়নের যে সুযোগ পেত, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

তৃতীয় ঘটনা এই যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা আল্লাহ্ তাআলার জন্যে সন্তান সাব্যস্ত করত। আরবরা প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্র শরীক বলত। সাবেয়ী ও অগ্নিপূজারীরা বলত যে, আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নৈকট্যশীল কেউ না থাকলে তাঁর সম্মান ও মহত্ত্ব লাঘব হয়। এ দলত্রয়ের জওয়াবে সর্বশেষ আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে তিনটি বিষয়েরই খণ্ডন করা হয়েছে।

দুনিয়াতে সৃষ্টজীব যারা শক্তিলাভ করে সে কোন সময় নিজের চাইতে ছোট হয়। যেমন, সন্তান; কোন সময় নিজের সমতুল্য হয়। যেমন, অংশীদার এবং কোন সময় নিজের চাইতে বড় হয়। যেমন, সমর্থক ও সাহায্যকারী। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা নিজের জন্যে যথাক্রমে তিনটিই নাকচ করে দিয়েছেন।

মাসআলা ঃ উল্লেখিত আয়াতে নামাযে কোরআন তেলাওয়াতের আদব বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, খুব উচ্চৈঃস্বরে না হওয়া চাই এবং এমন নিঃশব্দেও না হওয়া চাই যে, মুক্তাদীরা শুনতে পায় না। বলাবাহুল্য এ বিধান বিশেষ করে 'জেহরী' (সশব্দে পঠিত) নামাযসমূহের জন্যে। যোহর ও আসরের নামাযে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে পাঠ করা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

'জেহরী' নামায বলতে ফজর, মাগরিব ও এশার নামায বোঝায়। তাহাজ্জুদের নামাযও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, এক হাদীসে রয়েছে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাহাজ্জুদের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর কাছ দিয়ে গেলে হযরত আবু বকরকে নিঃশব্দে এবং হযরত ওমরকে উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াতরত দেখতে পান। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বললেন ঃ আপনি এত নিঃশব্দে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরয করলেন ঃ যাঁকে শোনানো উদ্দেশ্য তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ তাআলা গোপনতম আওয়াযও শ্রবণ করেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ সামান্য শব্দ সহকারে পাঠ করুন। অতঃপর হযরত ওমরকে বললেন ঃ আপনি এত উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরয করলেন ঃ আমি নিদ্রা ও শয়তানকে বিতাড়িত করে দেয়ার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে আদেশ দিলেন, যে অনুচ্চ শব্দে পাঠ করুন। – (তিরমিযী)

নামাযের ভেতরে ও বাইরে সশব্দে ও নিঃশব্দে কোরআন তেলাওয়াত সম্পর্কিত মাসআলা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ আয়াত وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, এটি এজাযতের আয়াত। – (আহমদ তাবরানী) এ আয়াতে এরূপ নির্দেশও আছে যে, মানুষ যতই আল্লাহ্ তাআলার এবাদত ও তসবীহ্ পাঠ করুক, নিজের আমলকে কম মনে করা এবং ত্রুটি স্বীকার করা তার জন্যে অপরিহার্য।–(মাযহারী)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আবদুল মুত্তালিবের পরিবারে যখন কোন শিশু কথা বলার যোগ্য হয়ে যেত, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে এ আয়াত শিখিয়ে দিতেন ঃ

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي

الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে বাইরে গেলাম। তখন আমার হাত তাঁর হাতে আবদ্ধ ছিল। তিনি জনৈক দুর্দশাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করার সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার এই দুর্দশা কেন? লোকটি আরয করল ঃ রোগব্যাধি ও দারিদ্র্যের কারণে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য বলে দেই। এগুলো পাঠ করলে তোমার রোগব্যাধি ও অভাব-অনটন দূর হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এই ঃ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ — الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا

–এর কিছুদিন পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবার সেদিকে গমন করলে লোকটিকে সুখী দেখতে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। সে আরয করল ঃ যেদিন আপনি আমাকে বাক্যগুলো বলে দেন, সেদিন থেকে নিয়মিতই সেগুলো পাঠ করি। – (মাযহারী)

সূরা বনী ইস্‌রাইল সমাপ্ত

سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَعَشْرُ آيَاتٍ وَاثْنَا عَشَرَ رُكُوعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ
لَّهٗ عِوَجًا ۜ ﴿١﴾ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ
الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۙ ﴿٢﴾
مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۙ ﴿٣﴾ وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ
وَلَدًا ۗ ﴿٤﴾ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً
تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾ فَلَعَلَّكَ
بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰۤی اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ
اَسَفًا ﴿٦﴾ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَی الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ
اَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ؕ ﴿٨﴾
اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ
اٰيٰتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ اِذْ اَوَی الْفِتْيَةُ اِلَی الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَاۤ
اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾
فَضَرَبْنَا عَلٰۤی اٰذَانِهِمْ فِی الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۙ ﴿١١﴾

সূরা কাহ্ফ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ১১০

পরম দাতা ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(১) সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি। (২) একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি ভীষণ বিপদের ভয় প্রদর্শন করে এবং মুমিনদেরকে— যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে— তাদেরকে সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। (৩) তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে। (৪) এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্যে যারা বলে যে, আল্লাহ্‌র সন্তান রয়েছে। (৫) এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও নেই। কত কঠিন তাদের মুখের কথা। তারা যা বলে তা তো সবই মিথ্যা। (৬) যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবতঃ আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন। (৭) আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্যে শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে। (৮) এবং তার উপর যাকিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেব। (৯) আপনি কি ধারণা করেন যে, গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল? (১০) যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে তখন দোআ করে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। (১১) তখন আমি কয়েক বছরের জন্যে গুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই।

সূরা কাহ্ফ

সূরা কাহ্ফের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত : মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদে হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করে, সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদ থাকবে। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে হযরত আবুদ্দারদা থেকেই অপর একটি রেওয়ায়েতে এই বিষয়বস্তু সূরা কাহ্ফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ করা সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে।

মুসনাদে আহমদে হযরত সাহ্ল ইবনে মু'আযের রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পাঠ করে, তার জন্যে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটি নূর হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সূরা পাঠ করে, তার জন্যে যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত নূর হয়ে যায়।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন সূরা কাহ্ফ তেলাওয়াত করে, তার পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হয়ে যাবে, যা কেয়ামতের দিন আলো দেবে এবং বিগত জুমআ থেকে এই জুমআ পর্যন্ত তার সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। — (ইমাম ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েতটিকে মওকুফ বলেছেন)

হাফেয জিয়া মুকাদ্দাসী 'মুখতারাহ্' গ্রন্থে হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, সে আট দিন পর্যন্ত সর্বপ্রকার ফেৎনা থেকে মুক্ত থাকবে। যদি দাজ্জাল বের হয়, তবে সে তার ফেৎনা থেকেও মুক্ত থাকবে।— (এসব রেওয়ায়েত ইবনে-কাসীর থেকে গৃহীত।)

রূহুল-মা'আনীতে হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : সূরা কাহ্ফ সম্পূর্ণটুকু এক সময়ে নাযিল হয়েছে এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা এর সঙ্গে আগমন করেছেন। এতে এর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়।

শানে নুযূল : ইমাম ইবনে জরীর তাবারী হযরত ইবনে-আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন : যখন মক্কায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়তের চর্চা শুরু হয় এবং কোরায়শরা তাতে বিব্রত বোধ করতে থাকে, তখন তারা নযর ইবনে হারেস ও ওকবা ইবনে আবী মুয়ী'তকে মদীনার ইহুদী পণ্ডিতদের কাছে প্রেরণ করে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে তারা কি বলে, জানার জন্যে। ইহুদী পণ্ডিতরা তাদেরকে বলে দেয় যে, তোমরা তাঁকে তিনটি প্রশ্ন করো। তিনি এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে বুঝে নেবে যে, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল। অন্যথায় বোঝবে, তিনি একজন বাগাড়ম্বরকারী— রসূল নন। (এক) তাঁকে ঐসব যুবকের অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যারা প্রাচীনকালে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাদের ঘটনা কি? কেননা, এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা। (দুই) তাঁকে সে ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম এবং সারা বিশ্ব সফর করেছিল। তার ঘটনা কি? (তিন) তাঁকে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন কর যে, এটা কি?

উভয় কোরায়শী মক্কায় ফিরে এসে ভ্রাতৃসমাজকে বলল : আমরা একটি চূড়ান্ত ফয়সালার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফিরে এসেছি। অতঃপর তারা তাদেরকে ইহুদী আলেমদের কাহিনী শুনিয়ে দিল। কোরায়শরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এ প্রশ্নগুলো নিয়ে হাযির হল। তিনি শুনে বললেন :

আগামীকাল উত্তর দেব। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলেন। কোরায়শরা ফিরে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওহীর আলোকে জওয়াব দেবার জন্যে আল্লাহ্র তরফ থেকে ওহী আসার অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু ওয়াদা অনুযায়ী পর দিবস পর্যন্ত ওহী আগমন করল না; বরং পনের দিন এ অবস্থায়ই কেটে গেল। ইতিমধ্যে জিবরাঈলও এলেন না এবং কোন ওহীও নাযিল হল না। অবস্থাদৃষ্টে কোরায়শরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরম্ভ করে দিল। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খুবই দুঃখিত ও চিন্তিত হলেন।

পনের দিন পর জিবরাঈল সূরা কাহ্ফ নিয়ে অবতরণ করলেন। এতে ওহীর বিলম্বের কারণও বর্ণনা করে দেয়া হল যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করার ওয়াদা করা হলে ইনশাআল্লাহ্ বলা উচিত। এ ঘটনায় এরূপ না হওয়ার কারণে হুঁশিয়ার করার জন্যে বিলম্বে ওহী নাযিল করা হয়েছে। এ সম্পর্কে এ সূরায় নিম্নোক্ত আয়াত আসবে : وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَاْيْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ —এ সূরায় যুবকদের ঘটনাও পুরোপুরি বর্ণনা করা হয়েছে। তাদেরকে 'আসহাবে কাহ্ফ' বলা হয়। পূর্ব ও পশ্চিমে সফরকারী যুলকারনাইনের ঘটনাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে এবং রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের জওয়াবও।— (কুরতুবী, মাযহারী) কিন্তু রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের জওয়াব সংক্ষেপে দেয়াই সমীচীন ছিল। তাই সূরা বনী ইসরালের শেষে আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ কারণেই সূরা কাহ্ফকে সূরা বনী ইসরাঈলের পরে স্থান দেয়া হয়েছে।—সুয়ূতী)

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا -অর্থাৎ, পৃথিবীর জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন বস্তুর খনি—এগুলো সবই পৃথিবীর সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য। এখানে প্রশ্ন হয় যে, পৃথিবীর সৃষ্টজীবের মধ্যে সাপ, বিচ্ছু, হিংস্র জন্তু এবং অনেক ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বস্তুও রয়েছে। এগুলোকে পৃথিবীর সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য কিরূপে বলা যায়? উত্তর এই যে, দুনিয়াতে যেসব বস্তু বাহ্যতঃ ধ্বংসাত্মক ও খারাপ, সেগুলো একদিক দিয়ে খারাপ হলেও সমষ্টিগতভাবে কোন কিছুই খারাপ নয়। কেননা, প্রত্যেক মন্দ বস্তুর মধ্যে অন্যান্য নানা দিক দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা অনেক উপকারও নিহিত রেখেছেন। বিষাক্ত জন্তু ও হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা মানুষের চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত হাজারো অভাব পূরণ করা হয়। তাই যেসব বস্তু একদিক দিয়ে মন্দ, বিশ্বচরাচরের গোটা কারখানার দিক দিয়ে সেগুলোও মন্দ নয়।

শব্দার্থ : كهف – এর অর্থ বিস্তীর্ণ পার্বত্য গুহা। বিস্তীর্ণ না হলে তাকে غار বলা হয়। رقيم – এর শাব্দিক অর্থ مرقوم বা লিখিত বস্তু। এস্থলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতদৃষ্টে যাহহাক, সুদ্দী ও ইবনে জোবায়েরের মতে এর অর্থ একটি লিখিত ফলক। সমসাময়িক বাদশাহ্ এই ফলকে আসহাবে কাহ্ফের নাম লিপিবদ্ধ করে গুহার প্রবেশপথে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এ কারণেই আসহাবে-কাহ্ফকে রকীমও বলা হয়। কাতাদা, আতিয়্যা, আউফী ও মুজাহিদ বলেন : রকীম সে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত উপত্যকার নাম, যাতে আসহাবে-কাহ্ফের গুহা ছিল। কেউ কেউ স্বয়ং পাহাড়টিকেই রকীম বলেছেন। হযরত ইকরিমা বলেন : আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি যে, রকীম কোন লিখিত ফলকের নাম না জনবসতির নাম, তা আমার জানা নেই। কা'ব আহ্বার, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম রোমে অবস্থিত আয়লা অর্থাৎ, আকাবার নিকটবর্তী একটি শহরের নাম। فِتْيَةٌ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন فَتًى -অর্থ যুবক। فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ -এর শাব্দিক অর্থ কর্ণকুহর বন্ধ করে দেয়া। অচেতন নিদ্রাকে এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। কেননা, নিদ্রায় সর্বপ্রথম চক্ষু বন্ধ হয়, কিন্তু কান সক্রিয় থাকে। আওয়াজ শোনা যায়। অতঃপর যখন নিদ্রা পরিপূর্ণ ও প্রবল হয়ে যায়, তখন কানও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। জাগরণের সময় সর্বপ্রথম কান সক্রিয় হয়। আওয়াযের কারণে নিদ্রিত ব্যক্তি সচকিত হয়, অতঃপর জাগ্রত হয়।

আসহাবে কাহ্ফ ও রকীমের কাহিনী : এ কাহিনীতে কয়েকটি আলোচ্য বিষয় আছে। (এক) 'আসহাবে কাহ্ফ' ও 'আসহাবে রকীম' একই দলের দুই নাম, না তারা আলাদা দু'টি দল? যদিও কোন সহীহ হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই, কিন্তু ইমাম বোখারী 'সহীহ' নামক গ্রন্থে আসহাবে কাহফ ও আসহাবে রকীমের দু'টি আলাদা আলাদা শিরোনাম রেখেছেন। অতঃপর আসহাবে রকীম শিরোনামের অধীনে তিন ব্যক্তির গুহায় আটকে পড়া, তৎপর দোয়ার মাধ্যমে রাস্তা খুলে যাওয়ার প্রসিদ্ধ কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন, যা সব হাদীস গ্রন্থেই বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান আছে। ইমাম বোখারীর এ কাজ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর মতে আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীম পৃথক পৃথক দু'টি দল এবং আসহাবে রকীম ঐ তিন ব্যক্তিকে বলা হয়েছে, যারা কোন সময় পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিল। এরপর পাহাড়ের একটি বিরাট পাথর গুহার মুখে পড়ে যাওয়ায় গুহা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের বের হওয়ার পথ থাকে না। আটক ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সৎকাজের উসীলা দিয়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে যে, যদি আমরা এ কাজটি খাঁটিভাবে আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তবে নিজ কৃপায় আমাদের পথ খুলে দিন। প্রথম ব্যক্তির দোয়ায় পাথর কিছুটা সরে যায়। ফলে, ভিতরে আলো আসতে থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির দোয়ায় আরও একটু সরে যায় এবং তৃতীয় ব্যক্তির দোয়ায় রাস্তা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বোখারীর টীকায় বলেছেন যে, উপরোক্ত তিন ব্যক্তির নাম আসহাবে রকীম, হাদীসদৃষ্টে এর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। ব্যাপার এতটুকু যে, গুহার ঘটনার বর্ণনাকারী নো'মান ইবনে বশীরের রেওয়ায়েতে কোন কোন রাবী এই কথাগুলো সংযুক্ত করেছেন : নো'মান ইবনে বশীর বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে রকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। এই অতিরিক্ত কথাগুলো ফতহুল বারীতে বাযযার ও তাবারানীর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথমতঃ সেহাহ্ সেত্তা ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এই হাদীসের সাধারণ রাবীদের যেসব রেওয়ায়েত বিদ্যমান আছে, সেগুলোতে কেউ নো'মান ইবনে বশীরের উপরোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করেননি। স্বয়ং বোখারীর রেওয়ায়েতও এই বাক্য থেকে মুক্ত। দ্বিতীয়তঃ এই বাক্যেও একথার উল্লেখ নেই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তিকে আসহাবে রকীম বলেছিলেন; বরং বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে তিন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন। রকীমের অর্থ সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ উপরে বর্ণিত হয়েছে এটাই তার প্রমাণ যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে রকীমের অর্থ নির্ধারণ সম্পর্কে কোন হাদীস ছিল না। নতুবা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন অর্থ নির্দিষ্ট করে দিলে সাহাবী, তাবেয়ী ও অন্যান্য তফসীরবিদ এর বিপরীতে অন্য কোন অর্থ নেবেন—এটা কিরূপে সম্ভবপর ছিল? এ কারণেই বোখারীর টীকাকার হাফেয ইবনে হাজার আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীমের

দু'টি আলাদা আলাদা দল হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে একই দলের দুই নাম হওয়াই ঠিক। রকীমের আলোচনার সাথে সাথে গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তির আলোচনা এসে গেছে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, এই তিন ব্যক্তিই আসহাবে রকীম ছিল।

হাফেয ইবনে হাজার ও অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা অনুযায়ী আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীম একই দল।

এ কাহিনীর দু'টি অংশ রয়েছে। (এক) এ কাহিনীর আসল উদ্দেশ্য, যদ্দ্বারা ইহুদীদের প্রশ্নের জওয়াব হয়ে যায় এবং মুসলমানদের জন্যে হেদায়েত ও উপদেশ। (দুই) কাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমি-আসল উদ্দেশ্যের সাথে যার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণতঃ ঘটনাটি কোন কালে এবং কোন শহরে ও জনপদে সংঘটিত হয়, যে কাফের বাদশাহ্র কাছ থেকে পলায়ন করে তাঁরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে কে ছিল? তার ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তাধারা কি ছিল? সে তাঁদের সাথে কি ব্যবহার করেছিল, যদ্দরুন তাঁরা পলায়ন করতে ও গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন? তাঁদের সংখ্যা কত ছিল? তাঁরা কতকাল ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন? তাঁরা এখনও জীবিত আছেন, না মরে গেছেন?

কোরআন পাক স্বীয় বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতি ও বিশেষ বর্ণনাপদ্ধতি অনুযায়ী সমগ্র কোরআনে একটি মাত্র কাহিনী তথা ইউসুফ (আঃ)-এর ইতিবৃত্ত ব্যতীত কোন কাহিনী সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির অনুরূপ পূর্ণ বিবরণ ও ক্রমসহকারে বর্ণনা করেননি; বরং প্রত্যেক কাহিনীর শুধু ঐ অংশই বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন, যা মানবীয় হেদায়েত ও শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

আসহাবে কাহ্ফের কাহিনীতেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কোরআন বর্ণিত অংশগুলো এর আসল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অবশিষ্ট যেসব অংশ একান্ত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক, সেগুলো উল্লেখ করা হয়নি। আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা ও ঘুমের সময়কাল সম্পর্কিত প্রশ্নও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং জওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদত্ত হয়েছে যে, এ জাতীয় প্রসঙ্গে বেশী চিন্তা-ভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করা সমীচীন নয়। এগুলো আল্লাহ্র উপরই ছেড়ে দেয়া উচিত।

প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এই কর্মপন্থা অনুযায়ী এখানেও কাহিনীর ঐসব অংশ বাদ দেয়া উচিত ছিল, যেগুলো কোরআন ও হাদীস বাদ দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারকেই সর্ববৃহৎ কৃতিত্ব মনে করা হয়। পরবর্তী যুগের তফসীরবিদগণ এ জন্যেই তাঁদের গ্রন্থে কম-বেশী এসব অংশও বর্ণনা করেছেন। তাই আলোচ্য তফসীরে কাহিনীর যেসব অংশ স্বয়ং কোরআনে উল্লেখিত আছে, সেগুলো তো আয়াতের তফসীরের অধীনে বর্ণিত হবেই, এছাড়া অবশিষ্ট ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অংশও প্রয়োজন অনুসারে বর্ণনা করা হচ্ছে। বর্ণনা করার পরও সর্বশেষ ফলাফল এটাই হবে যে, এ ধরনের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করা অসম্ভব। কেননা, ইসলাম ও খ্রীষ্টীয় ইতিহাসে এ সম্পর্কে যাকিছু লিখিত আছে, সেগুলো এত বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী যে, একজন গ্রন্থকার যদি স্বীয় গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ইঙ্গিতের সাহায্যে কোন একদিক নির্দিষ্ট করেন, তবে অন্যজন এমনিভাবে অন্য দিককে অগ্রাধিকার দান করেন।

ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَیُّ الْحِزْبَیْنِ اَحْصٰی لِمَا لَبِثُوْۤا اَمَدًا ﴿۱۲﴾
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ فِتْیَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ
وَ زِدْنٰهُمْ هُدًی ﴿۱۳﴾ وَّ رَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا
رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا۠ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ
قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ﴿۱۴﴾ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْ
لَا یَاْتُوْنَ عَلَیْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَیِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی
عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا ﴿۱۵﴾ وَ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَ مَا یَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ
فَاْوٗۤا اِلَی الْكَهْفِ یَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَ یُهَیِّئْ لَكُمْ
مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿۱۶﴾ وَ تَرَی الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ
كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِیْنِ وَ اِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ
وَ هُمْ فِیْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ یَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ
الْمُهْتَدِ ۚ وَ مَنْ یُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِیًّا مُّرْشِدًا ﴿۱۷﴾ وَ
تَحْسَبُهُمْ اَیْقَاظًا وَّ هُمْ رُقُوْدٌ ۖۗ وَّ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِیْنِ وَ
ذَاتَ الشِّمَالِ ۖۗ وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیْدِ ؕ لَوِ اطَّلَعْتَ
عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿۱۸﴾

(১২) অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরুত্থিত করি, একথা জানার জন্যে যে, দুই দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ণয় করতে পারে। (১৩) আপনার কাছে তাদের ইতিবৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। (১৪) আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অতঃপর তারা বলল ঃ আমাদের পালনকর্তা আসমান ও যমীনের পালনকর্তা; আমরা কখনও তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না। যদি করি, তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। (১৫) এরা আমাদেরই স্বজাতি, এরা তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এদের সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চাইতে অধিক গোনাহগার আর কে? (১৬) তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হলে এবং তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের এবাদত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয়গ্রহণ কর। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্যে দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন। (১৭) তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বামদিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে চালান, সে-ই সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তার জন্যে পথপ্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবেন না। (১৮) তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই ডানদিকে ও বামদিকে। তাদের কুকুর ছিল সামনের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। যদি তুমি উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখতে, তবে পেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দ্বীনের হেফাযতের জন্যে গুহায় আশ্রয়গ্রহণের ঘটনা বিভিন্ন শহর ও ভূখণ্ডে অনেক সংঘটিত হয়েছে ঃ ইতিহাসবিদদের মতভেদের একটি বড় কারণ এই যে, খ্রীষ্টধর্মে বৈরাগ্যকে ধর্মের সর্বপ্রধান অঙ্গ মনে করা হয়েছিলে। ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ডেই এ ধরনের ঘটনাবলী এতবেশী সংঘটিত হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্যে গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে সারা জীবন সেখানেই কাটিয়ে দিয়েছেন। এখন যেখানে যেখানে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই আসহাবে কাহ্‌ফের ধারণা হওয়া ইতিহাসবিদদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

আসহাবে কাহ্‌ফের স্থান ও কাল ঃ তফসীরবিদ কুরতুবী আন্দালুসী তাঁর তফসীর গ্রন্থে এস্থলে কিছু শ্রুত ও কতিপয় চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন শহরের সাথে ঘটনাগুলো সম্পর্কযুক্ত। কুরতুবী সর্বপ্রথম যাহ্‌হাকের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, রকীম রোমের একটি শহরের নাম। এর একটি গুহায় একুশ জন লোক শায়িত রয়েছে। মনে হয় তারা যেন ঘুমিয়ে আছে। এরপর তফসীরবিদ ইবনে অতিয়্যা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি অনেক লোকের মুখে শুনেছি, সিরিয়ার একটি গুহায় কিছুসংখ্যক মৃতদেহ আছে। সেখানকার সেবায়েতরা বলে যে, এরাই আসহাবে কাহ্‌ফ। গুহার নিকটে একটি মসজিদ এবং একটি গৃহও নির্মিত আছে ঃ একে রকীম বলা হয়। মৃতদেহগুলোর সাথে একটি মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যমান।

দ্বিতীয় ঘটনা আন্দালুস গার্নাতার (স্পেনের গ্রানাডা)। ইবনে আতিয়্যা বলেন ঃ গার্নাতায় 'লাওশা' নামক গ্রামের অদূরে একটি গুহা আছে। একে রকীম বলা হয়। এই গুহায় কয়েকটি মৃতদেহ এবং তাদের সাথে একটি মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যমান আছে। অধিকাংশ মৃতদেহ মাংসবিহীন শুধু অস্থি-কঙ্কাল এবং কিছুসংখ্যক মৃতদেহে এখনও মাংস আছে। এভাবে বহু শতাব্দী পরেও বিশুদ্ধ উপায়ে তাদের কোন অবস্থা জানা যায় না। অনেকে বলে, এরাই আসহাবে কাহ্‌ফ। ইবনে আতিয়্যা বলেন ঃ এই সংবাদ শুনে আমি ৫০৪ হিজরীতে সেখানে পৌঁছে দেখি, বাস্তবিকই মৃতদেহগুলো তেমনি অবস্থায়ই পড়ে রয়েছে। তাদের নিকটবর্তী স্থানে একটি মসজিদ ও রোমীয় যুগের একটি গৃহ আছে, যাকে রকীম বলা হয়। মনে হয়, প্রাচীনকালে এটা ছিল একটা রাজপ্রাসাদ। তখনও এর কোন কোন প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল। এটা একটা জনশূন্য জঙ্গলে অবস্থিত। তিনি আরও বলেন ঃ গার্নাতার উপরিভাগে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। শহরটি রোমীয় স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। শহরের নাম 'রাকিউস' বলা হয়। আমি এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক আশ্চর্য বস্তু এবং কবর দেখেছি। আন্দালুসের অধিবাসী হয়েও কুরতুবী এসব ঘটনা বর্ণনা করার পরও এদের কোন একটিকেও আসহাবে কাহ্‌ফ বলতে অপ্রস্তুত। ইবনে আতিয়্যাও চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও দৃঢ়তার সাথে একথা বলেন না যে, এরাই আসহাবে কাহ্‌ফ। তাঁরা সাধারণ জনশ্রুতি বর্ণনা করেন মাত্র। অপর এক আন্দালুসী তফসীরবিদ আবু হাইয়্যান সপ্তম শতাব্দীতে (৬৫৪ হিজরীতে) গার্নাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই বসবাস করেন। তিনিও তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতে গার্নাতার এই গুহার প্রসঙ্গ কুরতুবীর মতই উল্লেখ করেছেন। তিনিও ইবনে আতিয়্যার চাক্ষুষ দেখার কথা বর্ণনা করার পর লিখেছেন ঃ আমি যখন আন্দালুসে (অর্থাৎ, কায়রোতে পুনর্বাসিত হওয়ার পূর্বে) ছিলাম, তখন অনেক মানুষ এই গুহাটি দেখতে আসত। তারা বলত যে, যদিও মৃতদেহগুলো এখন পর্যন্ত

বিদ্যমান রয়েছে এবং দর্শকরা এগুলো গণনাও করে, কিন্তু সর্বদাই তারা সংখ্যা বলতে ভুল করে। তিনি আরও লিখেছেন ঃ ইবনে আতিয়্যা যে রাকিউস শহরের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি গার্নাতার কেবলার দিকে অবস্থিত। আমি নিজে এই শহরে বহুবার গিয়েছি এবং তাতে বিরাট বিরাট অসাধারণ পাথর দেখতে পেয়েছি। অতঃপর আবু হাইয়্যান লিখেছেন ঃ ''যে কারণে আসহাবে কাহ্ফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়া সম্পর্কে প্রবল ধারণা জন্মে, তা এই যে, সেখানে খ্রীষ্টধর্মের চর্চা প্রবল। এমনকি, এটাই তাদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় কেন্দ্র''। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আবু হাইয়্যানের মতে আসহাবে কাহ্ফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়াই অগ্রগণ্য।– (তফসীরে কুরতুবী, নবম খণ্ড, ৩৫৬ পৃঃ)

তফসীরবিদ ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতেম উভয়ই আওফীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম একটি উপত্যকার নাম, যা ফিলিস্তীনের পাদদেশে আয়লার (আকাবা) অদূরে অবস্থিত। ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম এবং আরও কয়েকজন হাদীসবিদ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রকীম কি আমার জানা নেই, কিন্তু কা'বে আহ্বারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন যে, রকীম ঐ জনপদকে বলা হয়, যাতে আসহাবে কাহ্ফ গুহায় আশ্রয়গ্রহণের পূর্বে বসবাস করত।—(রূহুল-মা'আনী)

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনযের ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর সাথে রোমীয়দের মোকাবেলায় একটি জেহাদে অংশগ্রহণ করি, যাকে 'গাযওয়াতুল মুযীক' বলা হয়। এ সময় আমরা কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের গুহার নিকট উপস্থিত হই। হযরত মুয়াবিয়া গুহার ভেতরে প্রবেশ করে আসহাবে কাহ্ফের মৃতদেহগুলো প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস বাধা দিয়ে বললেন ঃ এরূপ করা ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কেও তাঁদের মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করতে বারণ করেছেন। তিনি তো আপনার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা কোরআনে বলেছেন ঃ ''আপনি তাদেরকে দেখলে পলায়ন করবেন এবং ভয়-ভীতিতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বেন''। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আব্বাসের বাধা মানলেন না। সম্ভবতঃ এ কারণে যে, কোরআনে তাঁদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা তাঁদের জীবদ্দশায় ছিল। এখনও তাঁদের সে অবস্থা থাকা জরুরী নয়। হযরত মুয়াবিয়া কয়েকজন লোককে দেখার জন্যে প্রেরণ করলেন। তারা গুহায় পৌঁছে যখন ভেতরে প্রবেশ করতে চাইল, তখন একটি দমকা হাওয়া এসে তাঁদেরকে গুহা থেকে বের করে দিল। — (রূহুল মা'আনী, ৫ম খণ্ড, ২২৭)

তফসীরবিদদের উল্লেখিত রেওয়ায়েত ও উক্তি মোটামুটিভাবে আসহাবে কাহ্ফের তিনটি স্থান নির্দেশ করে। (এক) পারস্য উপসাগরের উপকূলীয় শহর আকাবার (আয়লা) নিকটবর্তী স্থান। হযরত ইবনে আব্বাসের অধিকাংশ রেওয়ায়েত এরই সমর্থন করে।

(দুই) ইবনে আতিয়্যার দেখা ও আবু হাইয়্যানের সমর্থন দ্বারা এ ধারণা প্রবল হয় যে, এই গুহাটি স্পেনের গ্রানাডায় অবস্থিত। এ দু'টি স্থানের মধ্য থেকে আকাবার একটি শহর অথবা কোন বিশেষ দালান-কোঠার নাম রকীম হওয়াও বর্ণিত আছে। এমনিভাবে গ্রানাডায় গুহা সংলগ্ন বিরাট ভগ্ন প্রাচীরের নাম রকীম বলা হয়েছে। উপরোক্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কেউই এমন অকাট্য ফয়সালা গ্রহণ করেননি যে, এটাই আসহাবে কাহ্ফের গুহা। বরং উভয় প্রকার রেওয়ায়েত স্থানীয় জনশ্রুতি ও কিংবদন্তির উপর ভিত্তিশীল।

(তিন) কুরতুবী, আবু হাইয়্যান, ইবনে জরীর ইত্যাদি প্রায় সকল তফসীর গ্রন্থের রেওয়ায়েতে আসহাবে কাহ্ফ যে শহরে বাস করতেন, তার প্রাচীন নাম 'আফসূস' এবং ইসলামী নাম 'তরসূস' বলা হয়েছে। এ শহরটি যে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মধ্যে দ্বিমত নেই। এতে বোঝা যায় যে, এ গুহাটিও এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। কাজেই এর কোন একটিকে অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ এবং বাকীগুলোকে ভ্রান্ত বলার কোন প্রমাণ নেই। তিনটি স্থানেরই সমান সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এ সম্ভাবনাও কেউ নাকচ করতে পারে না যে, এসব গুহার ঘটনাবলীর নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও এগুলো কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের গুহা নাও হতে পারে এবং সে গুহাটি অন্য কোথাও অবস্থিত থাকতে পারে। আর এটাও জরুরী নয় যে, এখানে রকীম কোন শহর অথবা প্রাচীরেরই নাম হবে; বরং এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, রকীম ঐ ফলকের নাম, যার মধ্যে কোন বাদশাহ্ আসহাবে কাহ্ফের নাম অঙ্কিত করে গুহার মুখে টাঙ্গিয়ে রেখেছিলেন।

আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণা ঃ আধুনিক যুগের কোন কোন ইতিহাসবিদ ও আলেম খ্রীষ্টান ইতিহাস এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের সাহায্যে আসহাবে কাহ্ফের গুহার স্থান ও কাল নির্ণয়ের লক্ষ্যে যথেষ্ট আলোচনা ও গবেষণা করেছেন।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ আয়লার (আকাবা) নিকটবর্তী বর্তমান শহর পাট্রাকে প্রাচীন শহর রকীম সাব্যস্ত করেছেন। আরব ইতিহাসবিদরা এর নাম লেখেন 'বাত্রা'। তিনি বর্তমান ইতিহাস থেকে এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে গুহার চিহ্নও দেখা যায় বলে উল্লেখ করেছেন, যার সাথে মসজিদ নির্মাণের লক্ষণাদিও দেখা যায়। এর সমর্থনে তিনি লিখেছেন ঃ বাইবেলের ইশীয় গ্রন্থের অধ্যায় ১৮, আয়াত ২৭-এ যে জায়গাকে 'রকম' অথবা 'রাকেম' বলা হয়েছে, একেই বর্তমানে পাট্রা বলা হয়। কিন্তু এ বর্ণনায় সন্দেহ করা হয়েছে যে, ইশীয় গ্রন্থে বনী ইবনে ইয়ামীনের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পর্কে যে 'রকম' অথবা 'রাকেমের' উল্লেখ আছে, সেটা জর্দান নদী ও লূত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এখানে পাট্রা শহর অবস্থিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এজন্যে বর্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এ বর্ণনা মেনে নিতে ঘোর আপত্তি করেছেন যে, পাট্রা ও রাকেম একই শহর। (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, মুদ্রণ ১৯৪৬, সপ্তদশ খণ্ড, ৬৫৮ পৃঃ)

অধিকাংশ তফসীরবিদ 'আফসূস' নগরীকে আসহাবে কাহ্ফের স্থান সাব্যস্ত করেছেন। এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত রোমকদের সর্ববৃহৎ নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান। এটি তুরস্কের ইজমীর (স্মার্ণা) শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দক্ষিণে পাওয়া যায়।

হযরত মওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীও 'আরদুল কোরআন' গ্রন্থে পাট্রা শহরের নাম উল্লেখ করে বন্ধনীর ভেতরে রকীম লিখেছেন। কিন্তু এর কোন প্রমাণ তিনি পেশ করেননি যে, পাট্রা শহরের পুরনো নাম রকীম ছিল। মওলানা হিফযুর রহমান 'কাসাসুল কোরআনে' একেই গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রমাণস্বরূপ তওরাত ও 'সহীফা সুইয়ার' বরাত দিয়ে পাট্রা শহরের নাম রাকেমা বর্ণনা করেছেন। — (দায়েরাতুল মা'আরিফ, আরব থেকে গৃহীত)

জর্দানে আম্মানের নিকটবর্তী এক বিরান ভূমিতে একটি গুহার সন্ধান

পাওয়া গেলে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৬৩ ইং সনে সে স্থানটি খননের কাজ আরম্ভ করে। মাটি ও পাথর সরানোর পর অস্থি ও প্রস্তরে পূর্ণ ছয়টি শবাধার ও দু'টি সমাধি আবিষ্কৃত হয়। গুহার দক্ষিণ দিকে পাথরে খোদিত বাইজেন্টিনীয় ভাষায় লিখিত কিছু নকশাও আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় লোকদের ধারণা, এ স্থানটিই রকীম এবং এর পাশে আসহাবে কাহ্‌ফের এই গুহা।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) বয়ানুল-কোরআনে তফসীরে হাক্কানীর বরাত দিয়ে আসহাবে কাহ্‌ফের স্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃত করে লেখেন ঃ যে অত্যাচারী বাদশাহ্‌র ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আসহাবে কাহ্‌ফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার সময়কাল ছিল ২৫০ খ্রীষ্টাব্দ। এরপর তিন শ' বছর পর্যন্ত তাঁরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন। ফলে ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্মের ২০ বছর পূর্বে আসহাবে কাহ্‌ফ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন। তফসীরে-হাক্কানীতেও তাঁদের স্থান 'আফসূস' অথবা 'তরতূস' শহর সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। বর্তমানেও এর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে।

এসব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য প্রাচীন তফসীরবিদগণের রেওয়ায়েত ও আধুনিক ঐতিহাসবিদদের বর্ণনা থেকে পেশ করা হল। আমি পূর্বেই আরয করেছিলাম যে, কোরআনের কোন আয়াত বোঝা এসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয় এবং যে উদ্দেশে কোরআন এ কাহিনী বর্ণনা করেছে, তার কোন জরুরী অংশ এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত নয়। রেওয়ায়েত ও বর্ণনা এবং এগুলোর ইঙ্গিতাদিও এত বিভিন্নমুখী যে, সমগ্র গবেষণা এবং অধ্যবসায়ের পরেও কোনরূপ চূড়ান্ত ফয়সালা সম্ভবপর নয়, কিন্তু আজকাল শিক্ষিত মহলে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি যে অসাধারণ ঝোঁক পরিদৃষ্ট হয়, তার পরিতৃপ্তির জন্য এসব তথ্য উদ্ধৃত করা হল। এগুলো থেকে আনুমানিকভাবে এতটুকু জানা যায় যে, এ ঘটনাটি হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর যমানার কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হয়। অধিকাংশ রেওয়ায়েত এ বিষয়ে একমত। দেখা যায় যে, ঘটনাটি আফসূস অথবা তরতূস শহরের নিকটেই ঘটেছে।

আসহাবে কাহ্‌ফ এখনও জীবিত আছে কি? এ সম্পর্কে এটাই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট যে, তাদের ওফাত হয়ে গেছে। তফসীরে মাযহারীতে ইবনে ইসহাকের বিস্তারিত রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আসহাবে কাহ্‌ফের জাগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ্ বায়দূসীসের কাছে পৌছে সাক্ষাতের পর আসহাবে কাহ্‌ফ বাদশাহর কাছে বিদায় প্রার্থনা করে। বিদায়ী সালামের সাথে তারা বাদশাহর জন্যে দোয়া করে। বাদশাহর উপস্থিতিতেই তারা নিজেদের শয়নস্থলে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ্ তাআলা তখনই তাদেরকে মৃত্যুদান করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি ইবনে-জরীর ও ইবনে-কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদগণ উল্লেখ করেছেন ঃ "কাতাদা বলেন ঃ হযরত ইবনে আব্বাস হাবীব ইবনে মাসলামার সাথে এক জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রোম দেশে একটি গুহার কাছ দিয়ে যাবার সময় তাঁরা সেখানে মৃত লোকদের হাড় দেখতে পান। এক ব্যক্তি বলল ঃ এগুলো আসহাবে কাহ্‌ফের হাড়। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ তাদের হাড় তো তিনশ' বছর পূর্বেই মাটিতে পরিণত হয়ে গেছে।"

কাহিনীর এসব অংশ কোরআনে নেই এবং হাদীসেও বর্ণিত হয়নি। ঘটনার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা কোরআনের কোন আয়াত বোঝাও এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এসব বিষয়ের কোন অকাট্য ফয়সালা করা সম্ভবপর নয়।

اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ - فَتًى -এর বহুবচন فِتْيَةٌ অর্থ যুবক। তফসীরবিদগণ লিখেছেন, এ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, কর্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন এবং হেদায়েত লাভের উপযুক্ত সময় হচ্ছে যৌবনকাল। বৃদ্ধ বয়সে পূর্ববর্তী কর্ম ও চরিত্র এত শক্তভাবে শেকড় গেড়ে বসে যে, যতই এর বিপরীত সত্য পরিস্ফুট হোক না কেন, তা থেকে বের হয়ে আসা দুরূহ হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন যুবক। —(ইবনে-কাসীর, আবু হাইয়্যান)

وَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ -ইবনে-কাসীরের বরাত দিয়ে উপরে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের চিত্ত সুদৃঢ় করার ঘটনা তখন হয়েছে, যখন অত্যাচারী পৌত্তলিক বাদশাহ যুবকদেরকে দরবারে হাযির করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে হত্যার আশঙ্কা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁআলা তাদের অন্তরে স্বীয় মহব্বত, ভীতি ও মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন যে, এর মোকাবেলায় হত্যা, মৃত্যু ও যে কোন বিপদাপদ সহ্য করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে পরিষ্কারভাবে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করে যে, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যের এবাদত করে না—ভবিষ্যতেও করবে না। যারা আল্লাহ্‌র জন্যে কোন কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের এ ধরনের সাহায্য হয়ে থাকে।

فَأْوٗٓا اِلَى الْكَهْفِ -ইবনে কাসীর বলেন ঃ আসহাবে কাহ্‌ফের অবলম্বিত কর্মপন্থা ছিল এই যে, যে শহরে থেকে আল্লাহ্‌র এবাদত করা যায় না, সে শহর পরিত্যাগ করে গুহায় আশ্রয় নেয়া উচিত। এটাই সব পয়গম্বরের সুন্নত। তাঁরা এরূপ স্থান থেকে হিজরত করে এমন জায়গায় আশ্রয় নেন, যেখানে আল্লাহ্‌র এবাদত করা যেতে পারে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা আসহাবে কাহ্‌ফের তিনটি বিস্ময়কর অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এগুলো তাঁদের কারামত হিসেবে অলৌকিকভাবে প্রকাশ লাভ করেছে।

(এক) দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকা এবং তাতে খাদ্য ইত্যাদি ছাড়াই জীবিত থাকা সর্ববৃহৎ কারামত ও অলৌকিক কাণ্ড। পরবর্তী আয়াতে এর বিবরণ আসবে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই দীর্ঘ নিদ্রাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে গুহার অভ্যন্তরে এমনভাবে নিরাপদ রেখেছিলেন যে, সূর্য তাদের কাছ দিয়ে সকাল-বিকাল অতিক্রম করত, কিন্তু গুহার ভেতরে তাদের দেহে রোদ পড়ত না। কাছ দিয়ে অতিক্রম করার উপকারিতা জীবনের স্পন্দন প্রতিষ্ঠা, বাতাস, উত্তাপ ও শৈত্যের সমতা ইত্যাদি ছিল।

ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ -বাক্য থেকেও বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে রোদ থেকে হেফাযতের এই ব্যবস্থা আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির একটি নিদর্শন ছিল।— (মাযহারী)

দীর্ঘ নিদ্রার সময় আসহাবে কাহ্‌ফ এমতাবস্থায় ছিল যে, দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত ঃ দ্বিতীয় অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে,

আসহাবে কাহ্‌ফকে এত দীর্ঘকাল নিদ্রায় অভিভূত রাখা সত্ত্বেও তাদের দেহে নিদ্রার চিহ্নমাত্র ছিল না। বরং দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন ঃ তাদের চক্ষু খোলা ছিল। নিদ্রার কারণে দেহে যে শৈথিল্য আসে তাও তাদের মধ্যে ছিল না। বাহ্যতঃ এ অবস্থাও অসাধারণ এবং একটি কারামতই ছিল। এর কারণ ছিল তাদের হেফাযত করা — যাতে নিদ্রিত মনে করে কেউ তাদের উপর হামলা না করে অথবা তাদের আসবাবপত্র চুরি না করে। বিভিন্ন দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন থেকেও দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে পারে। এর আরেক কারণ ছিল এই যে, যাতে এক পার্শ্বকে মাটি খেয়ে না ফেলে।

আসহাবে কাহ্‌ফের কুকুর ঃ সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে গৃহে কুকুর কিংবা কোন প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সহীহ্ বোখারীর এক হাদীসে ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা জন্তুদের হেফাযতকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে, প্রত্যহ তার পুণ্য থেকে দু'কীরাত হ্রাস পায়।— (কীরাত একটি ছোট ওজনের নাম)। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে এক তৃতীয় প্রকার কুকুরের ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে ; অর্থাৎ, শস্যক্ষেত্রের হেফাযতের জন্যে পালিত কুকুর।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ্‌র ভক্ত আস্‌হাব কাহ্‌ফ কুকুর সঙ্গে নিলেন কেন? এর এক উত্তর এই যে, কুকুর পালনের নিষিদ্ধতা শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধান। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টধর্মে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, খুব সম্ভব তাঁরা সম্পদশালী ও পশুপালনকারী ছিলেন। এগুলোর হেফাযতের জন্যে কুকুর পালন করতেন। কুকুরের প্রভুভক্তি সুবিদিত। তাঁরা যখন শহর থেকে রওয়ানা হন, তখন কুকুরও তাঁদের অনুসরণ করতে থাকে।

সৎ সংসর্গের বরকত কুকুরেরও সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে ঃ ইবনে আতিয়্যা বলেন ঃ আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বলেছেন যে, তিনি ৪৬৯ হিজরীতে মিসরের জামে মসজিদে আবুল ফযল জওহরীর একটি ওয়ায শুনেছেন। তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ঃ যে ব্যক্তি সৎলোকদেরকে ভালবাসে, তাদের নেকীর অংশ সে-ও পায়। দেখ, আসহাবে কাহ্‌ফের কুকুর তাদেরকে ভালবেসেছে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ্ তাআলা কোরআনেও তার কথা উল্লেখ করেছেন।

কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে ইবনে আতিয়্যার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন ঃ একটি কুকুর যখন সৎলোক ও গুণীদের সংসর্গের কারণে এই মর্যাদা পেতে পারে, তখন আপনি অনুমান করুন, যেসব ঈমানদার তওহীদী লোক আল্লাহ্‌র ওলী ও সৎলোকদেরকে ভালবাসে, তাদের মর্যাদা কতটুকু হবে? এ ঘটনায় সেসব মুসলমানদের জন্যে সান্ত্বনা ও সুসংবাদ রয়েছে, যারা আমলে কাঁচা, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে মনে প্রাণে ভালবাসে।

সহীহ্ বোখারীর হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একদিন আমি ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। মসজিদের দরজায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা হল। সে প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ)! কেয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন ঃ তুমি কেয়ামতের জন্যে কি প্রস্তুতি নিয়েছ (যে, আসার জন্যে তাড়াহুড়া করছ)? একথা শুনে লোকটি মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হল। অতঃপর সে বলল ঃ আমি কেয়ামতের জন্যে অনেক নামায, রোযা ও দান-খয়রাত সঞ্চয় করিনি, কিন্তু আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ যদি তাই হয়, তবে (শুনে নাও), তুমি (কেয়ামতে) তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস। হযরত আনাস বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখে এ কথা শুনে আমরা এতই আনন্দিত হলাম যে, মুসলমান হওয়ার পর এর চাইতে বেশী আনন্দিত আর কখনো হইনি। হযরত আনাস আরও বলেনঃ (আলহামদুলিল্লাহ্,) আমি আল্লাহ্‌কে, তাঁর রসূলকে, আবু বকর ও ওমরকে ভালবাসি এবং আশা করি যে, তাঁদের সাথেই থাকব। — (কুরতুবী)

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٢٠﴾ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾

(১৯) আমি এমনিভাবে তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল ঃ তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? তাদের কেউ বলল ঃ একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। কেউ কেউ বলল ঃ তোমাদের পালনকর্তাই ভাল জানেন তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য পবিত্র। অতঃপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য; সে যেন নম্রতা সহকারে যায় ও কিছুতেই যেন তোমাদের খবর কাউকে না জানায়। (২০) তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না। (২১) এমনিভাবে আমি তাদের খবর প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করছিল, তখন তারা বলল ঃ তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর। তাদের পালনকর্তা তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল, তারা বলল ঃ আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মাণ করব। (২২) অজ্ঞাত বিষয়ে অনুমানের উপর ভিত্তি করে এখন তারা বলবে ঃ তারা ছিল তিন জন; তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর। একথাও বলবে ঃ তারা পাঁচ জন। তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। আরও বলবে ঃ তারা ছিল সাত জন। তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলুন ঃ আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের খবর অল্প লোকেই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করবেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَكَذَٰلِكَ — এ শব্দটি তুলনামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক অর্থ দেয়। এখানে দু'টি ঘটনার পারস্পরিক তুলনা বোঝানো হয়েছে। প্রথম ঘটনা আসহাবে কাহ্‌ফের দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রাভিভূত থাকা, যা কাহিনীর শুরুতে فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা দীর্ঘকালীন নিদ্রার পর সুস্থ থাকা এবং খাদ্য না পাওয়া সত্ত্বেও সবল ও সুঠাম দেহে জাগ্রত হওয়া। উভয় ঘটনা আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর তুল্য। তাই এ আয়াতে তাদেরকে জাগ্রত করার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে كذلك শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের নিদ্রা যেমন সাধারণ মানুষের নিদ্রার মত ছিল না, তেমনি তাদের জাগরণও স্বতন্ত্র ছিল। এরপর لِيَتَسَاءَلُوا বলা হয়েছে, অর্থাৎ, যাতে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, কতকাল ঘুমানো হয়েছে। এটা জাগ্রত করার আসল কারণ নয়; বরং একটি অভ্যস্ত ঘটনার বর্ণনা। এ কারণেই এর لام কে তফসীরবিদগণ لام عاقبت অথবা لام صيرورت নাম দিয়েছেন।—(আবু হাইয়্যান, কুরতুবী)

মোটকথা, তাদের দীর্ঘ নিদ্রা যেমন কুদরতের একটি নিদর্শন ছিল, এমনিভাবে শত শত বছর পর পানাহার ছাড়া সুস্থ-সবল অবস্থায় জাগ্রত হওয়াও ছিল আল্লাহ্‌র অপার শক্তির একটি নিদর্শন। আল্লাহ্‌র এটাও ইচ্ছা ছিল যে, শত শত বছর নিদ্রামগ্ন থাকার বিষয়টি স্বয়ং তারাও জানুক। তাই পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এর সূচনা হয় এবং সে ঘটনা দ্বারা চূড়ান্ত রূপ নেয়, যা পরবর্তী وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের গোপন রহস্য শহরবাসীরা জেনে ফেলে এবং সময়কাল নির্ণয়ে মতানৈক্য সত্ত্বেও দীর্ঘকাল গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার ব্যাপারে সবার মনেই বিশ্বাস জন্মে।

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ — কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে বলা হয়েছিল যে, গুহায় অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য হয় এবং তাদের এক দলের উক্তি শুদ্ধ ছিল। এখানে তারই বিবরণ দেয়া হয়েছে। আসহাবে কাহ্‌ফের এক ব্যক্তি প্রশ্ন তুলল যে, তোমরা কতকাল নিদ্রামগ্ন রয়েছ? কেউ কেউ উত্তর দিল ঃ একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। কেননা, তারা সকাল বেলায় গুহায় প্রবেশ করেছিল এবং জাগরণের সময়টি ছিল বিকাল। তাই মনে করল যে, এটা সেই দিন যেদিন আমরা গুহায় প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্য থেকেই অন্যেরা অনুভব করল যে, এটা সম্ভবতঃ সে দিন নয়। তাহলে কতদিন গেল জানা নেই। তাই তারা বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিয়ে বলল ঃ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ অতঃপর তারা এ আলোচনাকে অনাবশ্যক মনে করে জরুরী কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল যে, শহর থেকে কিছু খাদ্য আনার জন্যে একজনকে পাঠানো হোক।

إِلَى الْمَدِينَةِ — এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, গুহার নিকটে একটি বড় শহর ছিল। সেখানে তারা পূর্বে বসবাস করত। এ শহরের নাম সম্পর্কে আবু হাইয়্যান তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতে বলেন ঃ যে সময়ে আসহাবে কাহ্‌ফ এ শহর থেকে বের হয়েছিল তখন তার নাম ছিল 'আফসুস।' বর্তমানে এর

নাম 'তরসূস।' কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ এ শহরের উপর যখন মূর্তিপূজারীদের আধিপত্য ছিল, তখন এর নাম ছিল 'আফসূস।' অতঃপর যখন মুসলমান অর্থাৎ, তৎকালীন খ্রীষ্টানগণ শহরটি দখল করে নেয়, তখন এর নাম রেখে দেয় তরসূস।

بِوَرِقِكُمْ থেকে জানা যায় যে, তারা গুহায় আসার সময় কিছু টাকা-পয়সাও সাথে এনেছিল। অতএব, বোঝা গেল যে, প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা বৈরাগ্য ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।—(বাহ্‌রে-মুহীত)

أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا - ازكى শব্দের অর্থ পাক-সাফ। ইবনে জোবায়রের তফসীর অনুযায়ী এখানে হালাল খাদ্য বোঝানো হয়েছে। এর প্রয়োজন এজন্যে দেখা দেয় যে, যখন তারা শহর থেকে বের হয়েছিল, তখন সেখানে মূর্তিদের নামে পশু যবেহ্ করা হত এবং বাজারে তা-ই বিক্রি করা হত। তাই প্রেরিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, খাদ্য হালাল কিনা, তা যেন যাচাই করে আনা হয়।

এ থেকে জানা গেল যে, শহরে কিংবা যে বাজারে অথবা যে হোটেলে অধিকাংশ হারাম খাদ্য প্রচলিত, সেখানকার খাদ্য যাচাই না করে খাওয়া জায়েয নয়।

يَرْجُمُوكُمْ - رجم শব্দের অর্থ পাথর মেরে মেরে হত্যা করা। গুহায় যাওয়ার পূর্বে বাদশাহ্ হুমকি দিয়েছিল যে, তোমাদের এ ধর্ম পরিত্যাগ না করলে তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, তাদের মতে ধর্মত্যাগীদের শাস্তি ছিল প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে হত্যা, যাতে সবাই এতে অংশগ্রহণ করে এবং সমগ্র জাতি যেন ক্রোধ প্রকাশ করে হত্যা করে।

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ — আসহাবে কাহ্ফ নিজেদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে শহরে প্রেরণের জন্যে মনোনীত করে এবং খাদ্য আনার জন্যে তার কাছে অর্থ অর্পণ করে। কুরতুবী বলেন ঃ এ থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়। (এক) অর্থ-সম্পদে অংশীদারিত্ব জায়েয। (দুই) অর্থ-সম্পদের উকিল নিযুক্ত করা জায়েয এবং শরীকানাধীন সম্পদ কোন এক ব্যক্তি অন্যদের অনুমতিক্রমে ব্যয় করতে পারে। (তিন) খাদ্যদ্রব্যে কয়েকজন সঙ্গী শরীক হলে তা জায়েয ; যদিও খাওয়ার পরিমাণ বিভিন্নরূপ হয় — কেউ কম খায় আর কেউ বেশী খায়।

وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ — এ আয়াতে আসহাবে কাহ্ফের রহস্য শহরবাসীদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ার বিষয় এবং পরকাল ও কেয়ামতের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস অর্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

سَيَقُولُونَ —অর্থাৎ, তারা বলবে, 'তারা' কারা— এ সম্পর্কে দু'রকম সম্ভাবনা আছে-(এক) এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যারা আসহাবে কাহ্ফের আমলে তাদের নাম, বংশ ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ করেছিল। তাদের মধ্যেই কেউ কেউ তাদের সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি, কেউ কেউ দ্বিতীয় উক্তি এবং কেউ কেউ তৃতীয় উক্তি করেছিল। -(বাহ্‌র)

(দুই) سَيَقُولُونَ বাক্যে নাজরানের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর সাথে আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল। নাজরানের খ্রীষ্টান সম্প্রদায় তিন দলে বিভক্ত ছিল। এক দলের নাম ছিল 'মালকানিয়া'। এরা সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি, অর্থাৎ, তিন বলেছিল। দ্বিতীয় দলের নাম ছিল 'এয়াকূবিয়্যা'। তারা দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ, পাঁচ বলেছিল। তৃতীয় দল ছিল 'নাস্তরীয়া'। তারা তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ, সাত বলেছিল। কেউ কেউ বলেন ঃ তৃতীয় উক্তিটি ছিল মুসলমানদের। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীস এবং কোরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তৃতীয় উত্তরের বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হয়। —(বাহ্‌রে-মুহীত)

وَثَامِنُهُمْ -এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা সম্পর্কে আয়াতে তিনটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে ঃ তিন, পাঁচ ও সাত। প্রত্যেকটি সংখ্যার পর তাদের কুকুরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই উক্তিতে তাদের সংখ্যা ও কুকুরের গণনার মাঝখানে واو عاطفة (সংযোগকারী ওয়াও) ব্যবহার না করে বলা হয়েছে- ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ এবং خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ কিন্তু তৃতীয় উক্তিতে سبعة -এর পরে واو عاطفة এনে وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ বলা হয়েছে।

তফসীরবিদগণ এর কারণ এই লিখেন যে, আরবদের কাছে সংখ্যার প্রথম ধাপ ছিল সাত। সাতের পরে যে সংখ্যা আসত, তা অনেকটা পৃথক বলে গণ্য হত; যেমন আজকাল নয় সংখ্যাটি নয় পর্যন্ত একক সংখ্যা ধরা হয়। দশ থেকে দ্বি-সংখ্যা আরম্ভ হয়। এ কারণেই আরবরা তিন থেকে সাত পর্যন্ত সংখ্যা গণনায় واو عاطفة ব্যবহার করত না। সাতের পর কোন সংখ্যা বর্ণনা করতে হলে واو عاطفة এনে পৃথক করে বর্ণনা করত। এজন্যেই এই واو -কে واو ثمان নাম দেয়া হত। — (মাযহারী)

আসহাবে কাহ্ফের নাম ঃ প্রকৃতপক্ষে কোন সহীহ্ হাদীস থেকে আসহাবে কাহ্ফের নাম সঠিকভাবে প্রমাণিত নেই। তফসীরী ও ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে বিভিন্ন নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাবারানী 'মুজামে আওসাত' গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদ সহযোগে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, সেটিই বিশুদ্ধতর। এতে তাদের নাম নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

মুকসালমিনা, তামলিখা, মরতুনুস, সনুনুস, সারিনুতুস, যুনওয়াস, কায়াস্তারিতয়ুনুস।

فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا

অর্থাৎ, আপনি আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের সাথে বৃথা বিতর্কে প্রবৃত্ত হবেন না; বরং সাধারণ আলোচনা করুন। আপনি নিজেও তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত ঃ বর্ণিত উভয় বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আলেম সম্প্রদায়ের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক নীতি। কোন প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দিলে জরুরী বিষয়গুলো বর্ণনা করা উচিত। এরপরও যদি কেউ অনাবশ্যক আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়ে, তবে তার সাথে সাধারণ আলোচনা করে বিতর্ক শেষ করে দেয়া বাঞ্ছনীয়। নিজের দাবী প্রমাণ করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে যাওয়া এবং প্রতিপক্ষের দাবী খণ্ডনে অধিক জোর দেয়া অনুচিত। কারণ, এতে বিশেষ কোন উপকারিতা নেই। উপরন্তু অতিরিক্ত আলোচনা ও কথা কাটাকাটিতে মূল্যবান সময়ও নষ্ট হয় এবং পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় নির্দেশ এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ওহীর মাধ্যমে

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَن يَشَاءَ
اللَّهُ ۚ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ
رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ
ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا
لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ
يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَ
لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ
أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن
وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ
كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

(২৩) আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি 'আগামী কাল করব' (২৪) 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে' বলা ব্যতিরেকে। যখন ভুলে যান, তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন এবং বলুন ঃ আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে এর চাইতেও নিকটতম সত্যের পথনির্দেশ করবেন। (২৫) তাদের উপর তাদের গুহায় তিনশ' বছর, অতিরিক্ত আরও নয় বছর অতিবাহিত হয়েছে। (২৬) বলুন ঃ তারা কতকাল অবস্থান করেছে, তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন! তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না। (২৭) আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার যে কিতাব প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে, তা পাঠ করুন। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাঁকে ব্যতীত আপনি কখনই কোন আশ্রয়স্থল পাবেন না। (২৮) আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে আহবান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। (২৯) বলুন ঃ 'সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক।' আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।

আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে যে পরিমাণ তথ্য আপনাকে সরবরাহ করা হয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। কারণ, এতটুকুই যথেষ্ট। আরও বেশী জানার জন্যে খোঁজাখুঁজি ও মানুষের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার এক উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, তার অজ্ঞতা ও মূর্খতা জনসমক্ষে ফুটে উঠুক—এটাও পয়গম্বরী-চরিত্রের পরিপন্থী। তাই ভাল ও মন্দ উভয় উদ্দেশে অপরকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লেখিত চার আয়াতে আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী সমাপ্ত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম দু'আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতকালে কোন কাজ করার ওয়াদা বা স্বীকারোক্তি করলে এর সাথে 'ইনশাআল্লাহ্' বাক্যটি যুক্ত করতে হবে। কেননা, ভবিষ্যতে জীবিত থাকবে কিনা তা কারও জানা নেই। জীবিত থাকলেও কাজটি করতে পারবে কিনা, তারও নিশ্চয়তা নেই। কাজেই মুমিনের উচিত মনে মনে এবং মুখে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বললে এভাবে বলা দরকার ঃ যদি আল্লাহ্ চান, তবে আমি এ কাজটি আগামীকাল করব। ইনশাআল্লাহ্ বাক্যের অর্থ তাই।

তৃতীয় আয়াতে একটি বিরোধপূর্ণ আলোচনার ফয়সালা করা হয়েছে। এতে আসহাবে কাহ্ফের আমলের লোকদের মতামতও বিভিন্নরূপ ছিল এবং বর্তমান যুগের ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মতামতও বিভিন্নরূপ। অর্থাৎ, গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার সময়কাল। এ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, এই সময়কাল তিনশ' নয় বছর। কাহিনীর শুরুতে فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا বলে যে বিষয়টি সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, এখানে যেন তাই বর্ণনা করে দেয়া হল।

এরপর চতুর্থ আয়াতে আবার মতভেদকারীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আসল সত্য জান না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা। তিনি তিনশ' নয় বছরের সময়কাল বর্ণনা করেছেন। এতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত।

ভবিষ্যত কাজের জন্যে ইনশাআল্লাহ্ বলা ঃ 'লোবাব' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে প্রথম দু'আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, মক্কার কাফেররা যখন ইহুদীদের শিক্ষা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তখন তিনি ইনশাআল্লাহ্ না বলেই তাদের সাথে আগামীকাল জওয়াব দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। নৈকট্যশীলদেরকে সামান্য ত্রুটির জন্যেও হুঁশিয়ার করা হয়। তাই পনের দিন পর্যন্ত কোন ওহী আগমন করেনি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খুবই চিন্তিত হলেন। মুশরিকরা বিদ্রূপ ও উপহাসের সুযোগ পেল। পনের দিন বিরতির পর যখন এ সূরায় প্রশ্নের জওয়াব নাযিল হল, তখন এর সাথে হেদায়েতের জন্যে এ দু'টি আয়াতও অবতীর্ণ হল যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বলা হলে ইনশাআল্লাহ্ বলে এ কথার স্বীকারোক্তি করা উচিত যে, প্রত্যেক কাজ আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

মাসআলা ঃ এ আয়াত থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, এরূপ ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বলা মুস্তাহাব। দ্বিতীয়তঃ যদি ভুলক্রমে বাক্যটি না বলা হয়,

তবে যখনই স্মরণ হয়, তখনই তা বলা দরকার। আয়াতে বর্ণিত বিশেষ ক্ষেত্রের জন্যে এ বিধান। অর্থাৎ, শুধু বরকতলাভ ও দাসত্বের শীকারোক্তির জন্যে এ বাক্য বলা উদ্দেশ্য— কোন শর্ত লাগানো উদ্দেশ্য নয়। কাজেই এ থেকে জরুরী হয় না যে, কেনা-বেচা ও পারস্পরিক চুক্তির মধ্যেও অনুরূপ বিধান হবে। কেন-বেচার মধ্যে শর্ত লাগানো হয়, এবং উভয়পক্ষের জন্যে শর্ত লাগানোর উপর পারস্পরিক চুক্তি নির্ভরশীল থাকে। এসব ক্ষেত্রেও যদি চুক্তির সময় শর্ত লাগানো ভুলে যায় এবং পরে কোন সময় স্মরণে আসে, তবে যা ইচ্ছা তা শর্ত লাগাতে পারবে না। এ মাসআলায় কোন কোন ফেকাহ্‌বিদ ভিন্ন মতও পোষণ করেন।

তৃতীয় আয়াতে গুহায় নিদ্রার সময়কাল তিন শত বছর বলা হয়েছে। কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বাহ্যতঃ এ কথাই বোঝা যায় যে, এই সময়কাল আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীরের মতে এটাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের উক্তি। আবু হাইয়্যান, কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদও তাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হযরত কাতাদা প্রমুখ থেকে এ সম্পর্কে আরও একটি উক্তি বর্ণিত আছে। তা এই যে, তিন শত বছরের সময়কালের উক্তিটিও উপরোক্ত মতভেদকারীদের কারও কারও পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার উক্তি হচ্ছে শুধু اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا বাক্যটি। কেননা, তিন শত নয় বছর নির্দিষ্ট করার কথাটি যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, তবে পরে اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا বলার কোন প্রয়োজন থাকে না। এখানে প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাক সময়কাল প্রথমে তিন শত বছর বর্ণনা করেছে। এরপর বলেছে যে, এই তিন শতের উপর আরও নয় বেশী। প্রথমেই তিন শত নয় বলেনি কেন? তফসীরবিদগণ এর কারণ লিখেছেন যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে সৌর-বর্ষের প্রচলন ছিল। এই হিসাবে মোট তিনশ'ত বছরই হয়। ইসলামে চান্দ্র-বর্ষ প্রচলিত। চান্দ্র-বর্ষের হিসাবে প্রতি একশ' বছরে তিন বছর বেড়ে যায়। তাই তিনশ' সৌর-বছরে চান্দ্র বছর হিসাবে তিন শত নয় বছর হয়। এই দুই প্রকার বর্ষপঞ্জীর পার্থক্য বোঝাবার জন্যে উপরোক্ত ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

দাওয়াত ও তবলীগের বিশেষ রীতি ঃ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ -এ আয়াতের শানে নুযুল প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোই আয়াত অবতরণের কারণ হতে পারে। বগভী বর্ণনা করেন, মক্কার সরদার ওয়াইনা ইবনে হিস্‌ন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তখন তাঁর কাছে হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র সাহাবীদের অন্যতম। তাঁর পোশাক ছিন্ন এবং আকার-আকৃতি ফকীরের মত ছিল। তাঁর মত আরও কিছুসংখ্যক দরিদ্র ও নিঃস্ব সাহাবী মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ওয়াইনা বলল ঃ এই লোকদের কারণেই আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না এবং আপনার কথা শুনতে পারি না। এমন ছিন্নমূল মানুষের কাছে আমরা বসতে পারি না। আপনি হয় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে রাখুন, না হয় আমাদের জন্যে আলাদা এবং তাদের জন্যে আলাদা মজলিস অনুষ্ঠান করুন।

ইবনে মরদুইয়াহ্ আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া ইবনে খলফ জমহী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে পরামর্শ দেন যে, দরিদ্র, নিঃস্ব ও ছিন্নমূল মুসলমানদেরকে আপনি নিজের কাছে রাখবেন না; বরং কোরায়েশ সরদারদেরকে সাথে রাখুন। এরা আপনার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলে ধর্মের খুব উন্নতি হবে।

এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়—এতে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু নিষেধই নয়—নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ অর্থাৎ, আপনি নিজেকে তাদের সাথে বেঁধে রাখুন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, কোন সময় পৃথক হবেন না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্ক ও মনোযোগ তাদের প্রতি নিবদ্ধ রাখুন। কাজে-কর্মে তাদের কাছ থেকেই পরামর্শ নিন। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র এবাদত ও যিকির করে। তাদের কার্যকলাপ একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত। এসব অবস্থা আল্লাহ্‌র সাহায্য ডেকে আনে। আল্লাহ্‌র সাহায্য তাদের জন্যেই আগমন করে। ক্ষণস্থায়ী দুরবস্থা দেখে অস্থির হবেন না। পরিণামে সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করবে।

কোরায়েশ সরদারদের পরামর্শ কবুল না করার কারণও আয়াতের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে যে,তাদের মন আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপ তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসারী। এসব অবস্থা মানুষকে আল্লাহ্‌র রহমত ও সাহায্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তাদের জন্যে আলাদা মজলিস করার পরামর্শটি তো গ্রহণযোগ্য ছিল। এর ফলে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানো এবং তাদের পক্ষে তা কবুল করা সহজ হত। কিন্তু এ ধরনের মজলিস বন্টনের মধ্যে অবাধ্য ধনীদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখানো হত। ফলে দরিদ্র মুসলমানদের মন ভেঙ্গে যেত। তাই আল্লাহ্ তাআলা তা পছন্দ করেননি এবং এ ব্যাপারে পার্থক্য না করাকেই দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি স্থির করেছেন।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ
أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ
يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ
فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾ وَاضْرِبْ
لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ
وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ
آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾
وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا
أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ
ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾
وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ
خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ
أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ
سَوَّاكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾

(৩০) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না। (৩১) তাদেরই জন্যে আছে বসবাসের জান্নাত। তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়। (৩২) আপনি তাদের কাছে দু' ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা করুন। আমি তাদের একজনকে দু' টি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছি এবং এ দু' টিকে খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছি এবং দু'-এর মাঝখানে করেছি শস্যক্ষেত্র। (৩৩) উভয় বাগানই ফলদান করে এবং তা থেকে কিছুই হ্রাস করত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমি নহর প্রবাহিত করেছি। (৩৪) সে ফল পেল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সঙ্গীকে বলল ঃ আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী। (৩৫) নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল ঃ আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। (৩৬) এবং আমি মনে করি না যে, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব। (৩৭) তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বলল ঃ তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে? (৩৮) কিন্তু আমি তো একথাই বলি, আল্লাহ্ই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মানি না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জান্নাতীদের অলংকার ঃ يُحَلَّوْنَ فِيهَا এ আয়াতে জান্নাতী পুরুষদেরকেও স্বর্ণের কংকন পরানোর কথা বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অলংকার পরিধান করা পুরুষদের জন্যে যেমন শোভনীয় নয়, তেমনি সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জাও নয়। তাদেরকে কংকন পরানো হলে তারা বিশ্রী হয়ে যাবে।

উত্তর এই যে, শোভা ও সৌন্দর্য প্রথা ও প্রচলনের অনুসারী। এক দেশে যাকে শোভা ও সৌন্দর্য মনে করা হয়, অন্য দেশে প্রায়ই তা ঘৃণার বস্তু বলে বিবেচনা করা হয়। এর বিপরীতও হয়ে থাকে। এমনিভাবে এক সময় কোন বিশেষ বস্তু সৌন্দর্য বিবেচিত হয়, অন্য সময়ে তাকেই দোষ মনে করা হয়। জান্নাতে পুরুষদের জন্যেও অলংকার এবং রেশমী বস্ত্র শোভা ও সৌন্দর্য সাব্যস্ত করা হলে তা কারও কাছে অপরিচিত ঠেকবে না। এটা শুধু দুনিয়ার আইন যে, এখানে পুরুষদের জন্যে স্বর্ণের কোন অলংকার, এমনকি স্বর্ণের আংটি, ঘড়ির চেইন ইত্যাদিও ব্যবহার করা জায়েয নয়। এমনিভাবে রেশমী বস্ত্রও পুরুষদের জন্যে জায়েয নয়। কিন্তু জান্নাত পৃথক এক জগত। সেখানে এ আইন থাকবে না।

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ – ثمر শব্দের অর্থ বৃক্ষের ফল এবং সাধারণ ধন-সম্পদ। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ থেকে দ্বিতীয় অর্থ বর্ণিত হয়েছে। (ইবনে-কাসীর) কামুস গ্রন্থে আছে, ثمر শব্দটি বৃক্ষের ফল এবং নানা রকমের ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে জানা যায় যে, লোকটির কাছে শুধু ফলের বাগান ও শস্যক্ষেত্রই ছিল না, বরং স্বর্ণ-রৌপ্য ও বিলাস-ব্যসনের যাবতীয় সাজ সরঞ্জামও বিদ্যমান ছিল। স্বয়ং তার বাক্য, যা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا ও এ অর্থই বোঝায়।

وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ
إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسَىٰ رَبِّىٓ أَن
يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ
فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ
لَهُۥ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ
أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى
لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُۥ
مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ ٱلْوَلَٰيَةُ
لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾ وَٱضْرِبْ لَهُم
مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ
فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ
ٱلرِّيَٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ ٱلْمَالُ وَ
ٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ
عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَ
تَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾

(৩৯) যদি তুমি আমাকে ধনে ও সন্তানে তোমার চাইতে কম দেখ, তবে যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন একথা কেন বললে না; আল্লাহ্ যা চান, তাই হয়। আল্লাহ্‌র দেয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই। (৪০) আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তার (তোমার বাগানের) উপর আসমান থেকে আগুন প্রেরণ করবেন। অতঃপর সকাল বেলায় তা পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে। (৪১) অথবা সকালে তার পানি শুকিয়ে যাবে। অতঃপর তুমি তা তালাশ করে আনতে পারবে না। (৪২) অতঃপর তার সব ফল ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য সকালে হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল। বাগানটি কাঠসহ পুড়ে গিয়েছিল। সে বলতে লাগল ঃ হায়, আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম। (৪৩) আল্লাহ্ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোক হল না এবং সে নিজেও প্রতিকার করতে পারল না। (৪৪) এরূপ ক্ষেত্রে সব অধিকার সত্য আল্লাহ্‌র। তারই পুরস্কার উত্তম এবং তারই প্রদত্ত প্রতিদান শ্রেষ্ঠ। (৪৫) তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রনে শ্যামল-সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়; অতঃপর তা এমন শুস্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ্ এ সবকিছুর উপর শক্তিমান। (৪৬) ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদানপ্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম। (৪৭) যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্রিত করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না।

আনষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ — শো'আবুল ঈমানে হযরত আনাসের রেওয়ায়েত ক্রমে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ বলে দেয়া হয়, তবে কোন বস্তু তার ক্ষতি করতে পারবে না। (অর্থাৎ, পছন্দনীয় বস্তুটি নিরাপদ থাকবে।) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু দেখে এই কলেমা পাঠ করলে তা 'চোখলাগা' বা বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকবে।

حُسْبَانًا হযরত কাতাদাহ্‌র মতে এর তফসীর আযাব। ইবনে আব্বাস এর অর্থ নিয়েছেন অগ্নি এবং কেউ কেউ অর্থ নিয়েছেন প্রস্তর বর্ষণ। وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তার বাগান ও ধন-সম্পদের উপর কোন অদৃশ্য বিপদ পতিত হল। ফলে সব ধ্বংস হয়ে গেল। কোরআন পরিষ্কারভাবে কোন বিশেষ বিপদের নামোল্লেখ করেনি। বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, কোন অদৃশ্য আগুন এসে সবগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। যেমন-হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকেও حسبان শব্দের তফসীরে আগুনই বর্ণিত আছে।

وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾ مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

(৪৮) তারা আপনার পালনকর্তার সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে ঃ তোমরা আমার কাছে এসে গেছ; যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম। না, তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্যে কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। (৪৯) আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে; তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে ঃ হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি— সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না। (৫০) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ আদমকে সেজদা কর, তখন সবাই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জালেমদের জন্যে খুবই নিকৃষ্ট বদল। (৫১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজনকালে আমি তাদেরকে সাক্ষ্য রাখিনি এবং তাদের নিজেদের সৃজনকালেও না। এবং আমি এমনও নই যে, বিভ্রান্তকারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবো। (৫২) যেদিন তিনি বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা তখন তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা এ আহবানে সাড়া দেবে না। আমি তাদের মধ্যস্থলে রেখে দেব একটি মৃত্যু গহবর। (৫৩) অপরাধীরা আগুন দেখে বোঝে নেবে যে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে রাস্তা পরিবর্তন করতে পারবে না। (৫৪) নিশ্চয় আমি এ কোরআনে মানুষকে নানাভাবে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বুঝিয়েছি। মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তর্কপ্রিয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ কেয়ামতের দিন সবাইকে বলা হবে ঃ আজ তোমরা এমনিভাবে খালি হাতে কোন আসবাবপত্র না নিয়ে আমার সামনে এসেছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বাচনিক বর্ণিত রয়েছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন ঃ লোকসকল, তোমরা কেয়ামতে তোমাদের পালনকর্তার সামনে খালি পায়ে, খালি গায়ে, পায়ে হেঁটে উপস্থিত হবে। সেদিন সর্বপ্রথম যাকে পোশাক পরানো হবে, তিনি হবেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। একথা শুনে হযরত আয়েশা রাঃ প্রশ্ন করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, সব নারী-পুরুষই কি উলঙ্গ হবে এবং একে অপরকে দেখবে? তিনি বললেন ঃ সেদিন প্রত্যেককেই এমন ব্যস্ততা ও চিন্তায় ঘিরে রাখবে যে, কেউ কারও প্রতি দেখার সুযোগই পাবে না। সবার দৃষ্টি থাকবে উপরের দিকে।

কুরতুবী বলেন ঃ এক হাদীসে বলা হয়েছে, মৃতরা বরযখে একে অপরের সাথে নিজ নিজ কাফন পরিহিত অবস্থায় মোলাকাত করবে। এই হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা, এ হাদীসে কবর ও বরযখের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে; আর উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হাশরের ময়দানের অবস্থা। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, মৃত ব্যক্তি সে পোশাকেই হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে, যাতে তাকে দাফন করা হয়েছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ মৃতদেরকে ভাল কাফন দিয়ো। কেননা, তারা কেয়ামতের দিন এ কাফন পরিহিত হয়েই উত্থিত হবে। কেউ কেউ এ হাদীসটিকে শহীদদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন। কেউ কেউ বলেন ঃ এটা সম্ভব যে, হাশরের ময়দানে কিছু লোক পোশাক পরিহিত অবস্থায় এবং কিছু লোক উলঙ্গ অবস্থায় উত্থিত হবে। এভাবে উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়।— (মাযহারী)

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا অর্থাৎ, হাশরবাসীরা তাদের কৃতকর্মকে উপস্থিত পাবে। তফসীরবিদগণ এর অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানকে উপস্থিত পাবে। হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহঃ) বলতেন ঃ এরূপ অর্থ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। বহু হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, এসব কৃতকর্মই ইহকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির রূপ পরিগ্রহ করবে। তাদের আকার-আকৃতি সেখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সৎকর্মসমূহ জান্নাতের নেয়ামতের আকার ধারণ করবে আর মন্দ কর্মসমূহ জাহান্নামের আগুন ও সাপ-বিচ্ছু হয়ে যাবে।

হাদীসে আছে, যারা যাকাত দেয় না, তাদের মাল কবরে একটি বড় সাপের আকার ধারণ করে তাদেরকে দংশন করবে এবং বলবে انا مالك আমি তোমার মাল। সৎকর্ম সুশ্রী মানুষের আকারে কবরের নিঃসঙ্গ অবস্থায় আতঙ্ক দূর করার জন্যে আগমন করবে। কোরবানীর জন্তু পুলসিরাতের সওয়ারী হবে। মানুষের গোনাহ্ বোঝার আকারে প্রত্যেকের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হবে।

কোরআনে এতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের সম্পর্কে إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা উদরে আগুন ভর্তি করছে। এসব আয়াত ও রেওয়ায়েতকে সাধারণতঃ রূপক অর্থে ধরা হয়।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا
رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ
الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا
بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾ وَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ
يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي
آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا
إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا
كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا
مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا
لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ
أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ
بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا
جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

(৫৫) হেদায়েত আসার পর এ প্রতীক্ষাই শুধু মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে, কখন আসবে তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অথবা কখন আসবে তাদের কাছে আযাব সামনাসামনি। (৫৬) আমি রসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপেই প্রেরণ করি এবং কাফেররাই মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশে এবং তারা আমার নিদর্শনাবলীও যদ্দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়, সেগুলোকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছে। (৫৭) তার চাইতে অধিক জালেম কে, যাকে তার পালনকর্তার কালাম দ্বারা বোঝানো হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পূর্ববর্তী কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যেন তা না বোঝে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতার বোঝা। যদি আপনি তাদেরকে সৎপথের প্রতি দাওয়াত দেন, তবে কখনই তারা সৎপথে আসবে না। (৫৮) আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু, যদি তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পাকড়াও করেন, তবে তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন, কিন্তু তাদের জন্যে রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত সময়, যা থেকে তারা সরে যাওয়ার জায়গা পাবে না। (৫৯) এসব জনপদও তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা জালেম হয়ে গিয়েছিল এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্যে একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করেছিলাম। (৬০) যখন মূসা তাঁর যুবক (সঙ্গী)–কে বললেন ঃ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি আসব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। (৬১) অতঃপর যখন তাঁরা দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছালেন, তখন তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন। অতঃপর মাছটি সমুদ্রে সুড়ঙ্গপথ সৃষ্টি করে নেমে গেল। (৬২) যখন তাঁরা সেস্থানটি অতিক্রম করে গেলেন, মূসা সঙ্গীকে বললেন ঃ আমাদের নাশতা আন। আমরা এই সফরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি।

ইবলীসের সন্তান-সন্ততি ঃ وَذُرِّيَّتَهُ এ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, শয়তানের সন্তান-সন্ততি ও বংশধর আছে। কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে ذرية অর্থাৎ, বংশধর বলে সাহায্যকারী দল বোঝানো হয়েছে। কাজেই শয়তানের ঔরসজাত সন্তানাদি হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু হুমায়দী রচিত 'কিতাবুল জমায়ে বাইনাস-সহীহাইন' গ্রন্থে হযরত সালমান ফারেসীর রেওয়ায়েতে উল্লেখিত একটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেন ঃ তুমি তাদের মধ্য থেকে হয়ো না, যারা সবার আগে বাজারে প্রবেশ করে অথবা যারা সবার শেষে বাজার থেকে বের হয়। কেননা, বাজার এমন জায়গা, যেখানে শয়তান ডিম-বাচ্চা প্রসব করে রেখেছে। এ থেকে জানা যায় যে, ডিম থেকে শয়তানের বংশধর বৃদ্ধি পায়। এই হাদীসটি উদ্ধৃত করে কুরতুবী বলেন ঃ শয়তানের যে সাহায্যকারী বাহিনী আছে, এ কথা তো অকাট্যরূপেই প্রমাণিত আছে; ঔরসজাত সন্তান হওয়া সম্পর্কেও এ হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল।

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক তর্কপ্রিয়। এর সমর্থনে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে; রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন কাফেরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পেস করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হবে ঃ আমার প্রেরিত রসূল সম্পর্কে তোমার কর্মপন্থা কেমন ছিল? সে বলবে ঃ পরওয়ারদেগার, আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম এবং তাঁদের আনুগত্য করেছিলাম। আল্লাহ্ তাআলা বলবেন ঃ তোমার আমলনামা সামনে রাখা রয়েছে। এতে তো এমন কিছু নেই। লোকটি বলবে ঃ আমি এই আমলনামা মানি না। আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমার ফেরেশতারা তোমার দেখাশুনা করত। তারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। লোকটি বলবে ঃ আমি তাদের সাক্ষ্য মানি না। আমি তাদেরকে চিনি না এবং আমল করার সময় তাদেরকে দেখিনি। আল্লাহ্ বলবেন ঃ সামনে লওহে-মাহ্ফুয রয়েছে। এতেও তোমার অবস্থা এরূপই লিখিত রয়েছে। সে বলবে ঃ পরওয়ারদেগার, আপনি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় দিয়েছেন কি না? আল্লাহ্ বলবেন ঃ নিশ্চয় জুলুম থেকে তুমি আমার আশ্রয়ে রয়েছ। সে বলবে ঃ পরওয়ারদেগার, যেসব সাক্ষ্য আমি দেখিনি সেগুলো কিরূপে আমি মানতে পারি? আমার নিজের পক্ষ থেকে যে সাক্ষ্য হবে, আমি তাই মানতে পারি। তখন তার মুখ সীল করে দেয়া হবে এবং তার হাত-পা তার কুফর ও শেরক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। এরপর তাকে মুক্ত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ এ ঘটনায় 'মূসা' বলে প্রসিদ্ধ পয়গম্বর হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আঃ)–কে বোঝানো হয়েছে।

فتى এর শাব্দিক অর্থ যুবক। শব্দটিকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধ করা হলে অর্থ হয় খাদেম। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী যুবক দেখে খাদেম রাখা হয়, যেন সব রকম কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ভৃত্য ও খাদেমকে যুবক বলে ডাকা একটি ইসলামী শিষ্টাচার। ইসলামের শিক্ষা এই যে, চাকরদেরকেও গোলাম অথবা চাকর বলে সম্বোধন করো না; বরং ভাল খেতাব দ্বারা ডাক। এখানে فتى শব্দটিকে মূসা (আঃ)–এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই অর্থ হবে মূসা (আঃ)–এর খাদেম।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, এই খাদেম ছিল ইউশা' ইবনে নূন ইবনে ইফরায়ীম ইবনে ইউসুফ (আঃ)। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সে মূসা (আঃ)-এর ভাগ্নেয় ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করা যায় না। সহীহ্‌ রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তার নাম ছিল ইউশা' ইবনে নূন। অবশিষ্ট অবস্থার প্রমাণ নেই।— (কুরতুবী)

مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ এর শাব্দিক অর্থ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল। বলাবাহুল্য, এ ধরনের স্থান দুনিয়াতে অসংখ্য আছে। এখানে কোন জায়গা বোঝানো হয়েছে, কোরআন ও হাদীসে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই ইঙ্গিত ও লক্ষণাদি দৃষ্টে তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কাতাদাহ্‌ বলেন ঃ পারস্য উপসাগর ও রোম সাগরের সঙ্গমস্থল বোঝানো হয়েছে। ইবনে আতিয়্যার মতে আজারবাইজানের নিকটে একটি স্থান, কেউ কেউ জর্দান নদী ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থলের কথা বলেছেন। কেউ বলেনঃ এ স্থানটি তুঞ্জায় অবস্থিত। ইবনে আবী কা'বের মতে এটি আফ্রিকায় অবস্থিত। সুদ্দীর মতে এটি আর্মেনিয়ায় অবস্থিত। অনেকের মতে বাহরে-আন্দালুস ও বাহরে মুহীতের সঙ্গমস্থলই হচ্ছে এই স্থান। মোটকথা, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মূসা (আঃ)-কে সে স্থানটি নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন।— (কুরতুবী)

হযরত মূসা (আঃ) ও খিযিরের কাহিনী ঃ সহীহ্‌ বোখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেনঃ একদিন হযরত মূসা (আঃ) বনী-ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ঃ সব মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? হযরত মূসা (আঃ)-এর জানামতে তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। তাই বললেন ঃ আমিই সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর নৈকট্যশীল বন্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই এ জওয়াব তিনি পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দেয়াই ছিল আদব। অর্থাৎ, একথা বলে দেয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ্‌ তাআলাই ভাল জানেন, কে অধিক জ্ঞানী। এ জওয়াবের কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মূসা (আঃ)-কে তিরস্কার করে ওহী নাযিল হল যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বন্দা আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী। একথা শুনে মূসা (আঃ) প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি অধিক জ্ঞানী হলে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত। তাই বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্‌, আমাকে তাঁর ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ্‌ বললেন ঃ থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বন্দার সাক্ষাত পাবেন। মূসা (আঃ) নির্দেশমত থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে তাঁর খাদেম ইউশা' ইবনে নূনও ছিল। পথিমধ্যে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর মাথা রেখে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। (মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আরও একটি মু'জেযা প্রকাশ পেল যে,) মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ্‌ তাআলা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে, সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। ইউশা' ইবনে নূন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করছিল। মূসা (আঃ) নিদ্রিত ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা' ইবনে নূন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর কাছে বলতে ভুলে গেলেন এবং সেখান থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলায় মূসা (আঃ) খাদেমকে বললেন ঃ আমাদের নাশতা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নূনের মাছের ঘটনা মনে পড়ল। সে ভুলে যাওয়ার ওযর পেশ করে বলল ঃ শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর বলল ঃ মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন মূসা (আঃ) বললেন ঃ সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। (অর্থাৎ, মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটিই ছিল গন্তব্যস্থল।)

সেমতে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্যে পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তরখণ্ডের নিকটে পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছে। মূসা (আঃ) তদবস্থায়ই সালাম করলে খিযির (আঃ) বললেন ঃ এই (জনমানবহীন) প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল? মূসা (আঃ) বললেন ঃ আমি মূসা! হযরত খিযির প্রশ্ন করলেন ঃ বনী -ইসরাঈলের মূসা? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ হাঁ, আমিই বনী-ইসরাঈলের মূসা। আমি আপনার কাছে থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ্‌ তাআলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত খিযির বললেন ঃ আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না হে মূসা, আমাকে আল্লাহ্‌ তাআলা এমন এক জ্ঞান দান করেছেন, যা আপনার কাছে নেই; পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। মূসা (আঃ) বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ্‌, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোন কাজে আপনার বিরোধিতা করব না।

হযরত খিযির বললেন ঃ যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দেই।

একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেলে তাঁরা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা হযরত খিযিরকে চিনে ফেলল এবং কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই খিযির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে হযরত মূসা (আঃ) (স্থির থাকতে পারলেন না—) বললেন ঃ তারা কোন প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন যাতে সবাই ডুবে যায়? এতে আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। খিযির বললেন ঃ আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন মূসা (আঃ) ওযর পেশ করে বললেন ঃ আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না।

রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন ঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে,দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়ে ছিল (ইতিমধ্যে) একটি পাখী এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। খিযির মূসা (আঃ)-কে বললেন ঃ আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয়ে মিলে আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞানের মোকবিলায় এমন তুলনাও হয় না, যেমনটি এ পাখীর চঞ্চুর পানির সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানি।

অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কূল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ খিযির একটি বালককে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খিযির স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে

দিলেন। বালকটি মরে গেল। মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট গোনাহ্র কাজ করলেন! খিযির বললেন ঃ আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। মূসা (আঃ) দেখলেন, এ ব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাই বললেন ঃ এরপর যদি কোন প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওযর-আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। ওরা সোজা অস্বীকার করে দিল। হযরত খিযির এই গ্রামে একটি প্রাচীরকে পতনোন্মুখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। মূসা (আঃ) বিস্মিত হয়ে বললেন ঃ আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন; ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। খিযির বললেন ঃ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ অর্থাৎ, এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়।

এরপর খিযির উপরোক্ত ঘটনাত্রয়ের স্বরূপ মূসা (আঃ)-এর কাছে বর্ণনা করে বললেন ঃ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا অর্থাৎ, এ হচ্ছে সেসব ঘটনার স্বরূপ; যেগুলো দেখে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেনঃ মূসা (আঃ) যদি আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে আরও কিছু জানা যেত।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এই দীর্ঘ হাদীসে পরিস্কার উল্লেখ রয়েছে যে, মূসা বলতে বনী-ইসরাঈলের পয়গম্বর মূসা (আঃ) এবং তাঁর যুবক সঙ্গীর নাম ইউশা' ইবনে নূন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে যে বন্দার কাছে মূসা (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন খিযির (আঃ)। অতঃপর আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

সফরের কতিপয় আদব এবং পয়গম্বরসুলভ সংকল্পের একটি নমুনা ঃ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا এ বাক্যটি হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সফরসঙ্গী ইউশা' ইবনে নূনকে বলেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সফরের দিক ও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে তাঁর সঙ্গীকে অবহিত করা। সফরের জরুরী বিষয়াদি সম্পর্কে সঙ্গীকে অবহিত করাও একটি আদব। অহংকারীরা তাদের খাদেম ও পরিচালিকাদেরকে সম্বোধনেরই যোগ্য মনে করে না এবং নিজের সফর সম্পর্কে কোন কিছুই বলে না।

حُقُبًا শব্দটি حقبة এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে আশি বছরে এক হুকবা। কারও কারও মতে আরও বেশী সময়ে এক হুকবা হয়। এর কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। মূসা (আঃ) সঙ্গীকে বলে দিলেন যে, আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছাতে হবে। আমার সংকল্প এই যে, যতদিনই লাগুক, গন্তব্যস্থলে না পৌছা পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখব। আল্লাহ্ তাআলার আদেশ পালনে পয়গম্বরদের সংকল্প এমনি দৃঢ় হয়ে থাকে।

খিযিরের চাইতে মূসা (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব, তার বিশেষ প্রশিক্ষণ ও মু'জেযা ঃ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা (আঃ) পয়গম্বরকুলের মধ্যেও বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলার সাথে কথোপকথনের বিশেষ মর্যাদা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। হযরত খিযিরের নবুওয়ত সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। যদি নবী মেনেও নেয়া যায়, তবে তিনি রসূল ছিলেন না। তাঁর কোন গ্রন্থ নেই এবং কোন বিশেষ উম্মতও নেই। তাই মূসা (আঃ) হযরত খিযিরের চাইতে সর্বাবস্থায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা নৈকট্যশীলদের সামান্যতম ত্রুটিও সংশোধন করেন। তাঁদের প্রশিক্ষণের খাতিরে সামান্যতম ত্রুটির জন্যেও তিরস্কার করা হয় এবং সে মাপকাঠিতেই তাঁদের দ্বারা ত্রুটি পূরণ করিয়ে নেয়া হয়। আগাগোড়া কাহিনীটি এই বিশেষ প্রশিক্ষণেরই বহিঃপ্রকাশ। 'আমি সর্বাধিক জ্ঞানী' মূসা (আঃ)-এর মুখ থেকে অসতর্ক মুহূর্তে এ কথাটি বের হয়ে গেলে আল্লাহ্ তাআলা তা অপছন্দ করেন। তাঁকে হুঁশিয়ার করার জন্যে এমন এক বন্দার ঠিকানা তাঁকে দিলেন, যার কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান মূসা (আঃ)-এর কাছে ছিল না। যদিও মূসা (আঃ)-এর জ্ঞান মর্তবার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু তিনি সেই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। এদিকে আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)-কে জ্ঞানার্জনের অসীম প্রেরণা দান করেছিলেন। ফলে নতুন জ্ঞানের কথা শুনেই তিনি তা অর্জন করার জন্যে শিক্ষার্থীর বেশে সফর করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং আল্লাহ্ তাআলার কাছেই খিযিরের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে এখানেই খিযিরের সাথে মূসা (আঃ)-এর সাক্ষাৎ অনায়াসে ঘটাতে পারতেন অথবা মূসা (আঃ)-কেই পরিস্কার ঠিকানা বলে দিতে পারতেন। ফলে সেখানে পৌছা কষ্টকর হত না। কিন্তু ঠিকানা অস্পষ্ট রেখে বলা হয়েছে যে, যেখানে মৃত মাছ জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই খিযিরকে পাওয়া যাবে।

বোখারীর হাদীস থেকে মাছ সম্পর্কে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকেই থলেতে মাছ রেখে দেয়ার নির্দেশ হয়েছিল। তবে তা খাবার হিসেবে রাখার আদেশ হয়েছিল, না অন্য কোন উদ্দেশে তা জানা যায় না। তবে উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এই ভাজা মাছটি খাওয়ার জন্যে রাখা হয়েছিল এবং তারা তা থেকে কিছু অংশ খেয়েও ছিলেন। মাছটির অবশিষ্ট অংশই জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়।—(কুরতুবী)

মাছের বিষয়টি ভুলে না গেলে অবশ্য ব্যাপার সেখানেই শেষ হয়ে যেত। অথচ মূসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া ছিল এর উদ্দেশ্য। তাই উভয়েই মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং পূর্ণ একদিন ও একরাত্রির পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করলেন। এটা ছিল তৃতীয় পরীক্ষা। কেননা, এর আগেও ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করতে পারতেন। ফলে সেখানেই মাছের কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং এত দূরবর্তী সফরের প্রয়োজন হত না; কিন্তু মূসা (আঃ) আরও একটু কষ্ট করুক সম্ভবতঃ এটাই ছিল আল্লাহ্ তাআলার অভিপ্রায়। তাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভূত হয় এবং মাছের কথা মনে পড়ে। অতঃপর সেখান থেকেই তাঁরা পথচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চলেন।

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَ
مَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي
الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا
قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا
وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ
أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ
مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾
قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾
قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ
لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا
قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا
تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾
فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ
نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾

(৬৩) সে বলল ঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তরখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। (৬৪) মূসা বললেন ঃ আমরা তো এ স্থানটিই খুঁজছিলাম। অতঃপর তাঁরা নিজেদের চিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। (৬৫) অতঃপর তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম ও আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। (৬৬) মূসা তাঁকে বললেন ঃ আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন? (৬৭) তিনি বললেন ঃ আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। (৬৮) যে বিষয় বোঝা আপনার আয়ত্তাধীন নয়, তা দেখে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে? (৬৯) মূসা বললেন ঃ আল্লাহ্ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না। (৭০) তিনি বললেন ঃ যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি। (৭১) অতঃপর তারা চলতে লাগল ঃ অবশেষে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল, তখন তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন। মূসা বললেন ঃ আপনি কি এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে এতে ছিদ্র করে দিলেন? নিশ্চয়ই আপনি একটি গুরুতর মন্দ কাজ করলেন। (৭২) তিনি বললেন ঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারবেন না? (৭৩) মূসা বললেন ঃ আমাকে আমার ভুলের জন্যে অপরাধী করবেন না এবং আমার কাজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করবেন না। (৭৪) অতঃপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাত পেলেন, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মূসা বললেন? আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? নিশ্চয়ই আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মাছের সমুদ্রে চলে যাওয়ার কথাটি প্রথমবার سَرَبًا শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ সুড়ঙ্গ। পাহাড়ে রাস্তা তৈরী করার জন্যে অথবা শহরে ভূগর্ভস্থ পথ তৈরী করার উদ্দেশ্যে সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। এ থেকে জানা গেল যে, মাছটি সমুদ্রে যেদিকে যেত, সেদিকে একটি সুড়ঙ্গের মত পথ তৈরী হয়ে যেত। বোখারীর হাদীস থেকে তাই জানা যায়। দ্বিতীয়বার যখন ইউশা' ইবনে নূন দীর্ঘ সফরের পর এ ঘটনাটি উল্লেখ করেন, তখন وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা, পানিতে সুড়ঙ্গ তৈরী হওয়া স্বয়ং একটি অভ্যাসবিরুদ্ধ আশ্চর্য ঘটনা।

হযরত খিযিরের সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর নবুওয়তের প্রশ্ন ঃ কোরআন পাকে ঘটনার মূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি; বরং عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا (আমার বন্দাদের একজন) বলা হয়েছে। বোখারীর হাদীসে তাঁর নাম খিযির উল্লেখ করা হয়েছে। খিযির অর্থ সবুজ-শ্যামল। সাধারণ তফসীরবিদগণ তাঁর এই নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত, মাটি যেরূপই হোক না কেন। কোরআন পাক একথাও বর্ণনা করে যে, খিযির পয়গম্বর ছিলেন না, একজন ওলী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ আলেমদের মতে তিনি যে নবী ছিলেন, একথা কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা, এই সফরে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, তন্মধ্যে কয়েকটি নিশ্চিতরূপেই প্রচলিত শরীয়ত বিরোধী। আল্লাহ্‌র ওহী ব্যতীত শরীয়তের নির্দেশের কোনরূপ ব্যতিক্রম হতে পারে না। নবী ও পয়গম্বর ছাড়া আল্লাহ্‌র ওহী কেউ পেতে পারে না। ওলী ব্যক্তিও কাশফ ও এলহামের মাধ্যমে কোন কোন বিষয় জানতে পারেন, কিন্তু তা এমন প্রমাণ নয়, যার ভিত্তিতে শরীয়তের কোন নির্দেশ পরিবর্তন করা যায়। অতএব, প্রমাণিত হয় যে, খিযির আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন। তাঁকে ওহীর মাধ্যমে কিছুসংখ্যক প্রচলিত শরীয়ত বিরোধী বিশেষ বিধান দান করা হয়েছিল। তিনি যা কিছু করেছেন, তা এই ব্যতিক্রমী বিধানের অনুসরণেই করেছেন। কোরআনের নিম্মোক্ত বাক্যে তার পক্ষ থেকেও এ বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে ঃ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي অর্থাৎ, আমি নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু করিনি; বরং আল্লাহ্‌র নির্দেশেই করেছি।

মোটকথা, সাধারণ আলেমদের মতে হযরত খিযির (আঃ) ও একজন নবী। তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু অপার্থিব দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছিল এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞানও দান করা হয়েছিল। মূসা (আঃ) এগুলো জানতেন না। তাই তিনি আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। তফসীর কুরতুবী, বাহ্‌রে-মুহীত, আবু হাইয়্যান প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে।

কোন ওলীর পক্ষে শরীয়তের বাহ্যিক নির্দেশ অমান্য করা জায়েয নয় ঃ অনেক মূর্খ, পথভ্রষ্ট, সূফীবাদের কলঙ্ক লোক একথা বলে বেড়ায় যে, শরীয়ত ভিন্ন জিনিস আর তরীকত ভিন্ন জিনিস। অনেক বিষয় শরীয়তে হারাম, কিন্তু তরীকতে হালাল। কাজেই কোন ওলীকে প্রকাশ্য কবীরা গোনাহে লিপ্ত দেখেও আপত্তি করা ঠিক নয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকেই জানা গেল যে, তাদের এসব কথা পরিস্কার

ধর্মদ্রোহিতা ও বাতিল। হযরত খিযির (আঃ)-কে দুনিয়ার কোন ওলীর মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না এবং তাঁর কোন শরীয়তের বিরুদ্ধ কাজকে বৈধ বলা যায় না।

সাগরেদের পক্ষে উস্তাদের অনুসরণ অপরিহার্য ঃ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا এখানে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নবী ও শীর্ষস্থানীয় রসূল হওয়া সত্ত্বেও হযরত খিযিরের কাছে সবিনয় প্রার্থনা করেছেন যে, আমি আপনার জ্ঞান শিক্ষা করার জন্যে আপনার সাহচর্য কামনা করি। এ থেকে বোঝা গেল যে, সাগরেদ গুণে ওস্তাদ অপেক্ষা অনেক বড় হলেও উস্তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাঁর অনুসরণ করা ওয়াজিব। এটাই জ্ঞানার্জনের আদব।— (কুরতুবী, মাযহারী)

শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজে নির্বিকার থাকা আলেমের পক্ষে জায়েয নয় ঃ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا - وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ خُبْرًا হযরত খিযির (আঃ) মূসা (আঃ)-কে বললেন,আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। আসল তথ্য যখন আপনার জানা নেই, তখন ধৈর্য ধরবেনই বা কেমন করে? উদ্দেশ্য এই যে, আমি যে জ্ঞানলাভ করেছি, তা আপনার জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের। তাই আমার কাজকর্ম আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকবে। আসল তথ্য আপনাকে না বলা পর্যন্ত আপনি নিজ কর্তব্যের খাতিরে আপত্তি করবেন।

মূসা (আঃ) স্বয়ং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর কাছে গমনের এবং তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাই তাঁর কোন কাজ প্রকৃতপক্ষে শরীয়ত বিরোধী হবে না, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাই তিনি ধৈর্যধারণের ওয়াদা করে নিলেন। নতুবা এরূপ ওয়াদা করাও কোন আলেমের জন্যে জায়েয নয়। কিন্তু পরে শরীয়ত সম্পর্কে ধর্মীয় মর্যাদাবোধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৃত ওয়াদা ভুলে গেলেন।

প্রথম ঘটনাটি তেমন গুরুতরও ছিল না। শুধু নৌকাওয়ালাদের আর্থিক ক্ষতি অথবা পানিতে ডুবে যাওয়ার নিছক সম্ভাবনাই ছিল, যা পরে বাস্তবে পরিণত হয়নি। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীতে মূসা (আঃ) আপত্তি না করার ওয়াদাও করেননি। বালক হত্যার ঘটনা দেখে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এ প্রতিবাদের জন্যে কোন ওযরও পেশ করেননি। শুধু এতটুকু বললেন যে, ভবিষ্যতে প্রতিবাদ করলে আমাকে সাহচর্য দান না করার অধিকার আপনার থাকবে। কেননা, শরীয়তবিরুদ্ধ কাজ বরদাশত করা কোন নবী ও রসূলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে প্রকৃতপক্ষেও যেহেতু তিনি পয়গম্বর ছিলেন, তাই অবশেষে এই রহস্য উদঘাটিত হয় যে, এসব ঘটনা খিযির (আঃ)-এর জন্যে শরীয়তের সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত করে দেয়া হয়েছিল এবং তিনি ওহীর প্রত্যাদেশ অনুযায়ীই এগুলো সম্পাদন করেছিলেন।—(মাযহারী)

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হয় যে, খিযির (আঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জ্ঞান মূসা (আঃ)-এর জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। কিন্তু উভয় জ্ঞানই যখন আল্লাহ্ প্রদত্ত, তখন উভয়ের বিধি-বিধানে বৈপরীত্য ও বিরোধ কেন? এ সম্পর্কে তফসীর মাযহারীতে হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথীর বক্তব্য সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং আকর্ষণীয়। আমি তাঁর বক্তব্যের যে মর্ম বুঝতে পেরেছি, তার সার-সংক্ষেপ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে ওহী ও নবুওয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন, সাধারণতঃ তাঁদেরকে জন-সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁদের প্রতি গ্রন্থ ও শরীয়ত নাযিল করা হয়। এগুলোতে জনগণের হেদায়েত ও সংশোধনের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ থাকে। কোরআন পাকে যত নবী-রসূলের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের সবার উপরই শরীয়তের আইন প্রয়োগ ও সংশোধনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তাঁদের কাছে আগত ওহীও ছিল এই দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অপরদিকে কিছু সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্বও তাঁদের উপর রয়েছে। সেসবের জন্যে সাধারণভাবে ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু কোন কোন পয়গম্বরকেও আল্লাহ্ তাআলা এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত করেছেন। হযরত খিযির (আঃ) তাঁদেরই একজন। সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কিত দায়িত্ব আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত; যেমন অমুক ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হোক অথবা অমুককে নিপাত করা হোক অথবা অমুককে উন্নতি দান করা হোক। এগুলোর বিধি-বিধানও সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এসব আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে কিছুসংখ্যক এমনও থাকে যে, এক ব্যক্তিকে নিপাত করা শরীয়তের আইন বিরুদ্ধ, কিন্তু অপার্থিব আইনে এই বিশেষ ব্যাপারটিকে শরীয়তের সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রেখে ঐ পয়গম্বরের জন্যে বৈধ করে দেয়া হয়, যার যিম্মায় সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কিত এই বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় শরীয়তের আওতা বহির্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিজনিত এই নির্দেশটি শরীয়তের আইন-বিশেষজ্ঞদের জানা থাকে না। ফলে তারা একে হারাম বলতে বাধ্য হন এবং যাকে এই আইন থেকে পৃথক রাখা হয়, তিনি যথাস্থানে সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

মোটকথা, যেখানে বৈপরীত্য দেখা যায়, সেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে বিপরীত নয় বরং আনুষঙ্গিক ঘটনা শরীয়তের সাধারণ আইন থেকে ব্যতিক্রম থাকে মাত্র।

তাই এই ব্যতিক্রমটি নবুওয়ত সম্পর্কিত ওহীর মাধ্যমে হওয়া জরুরী। কোন কাশফ ও এলহাম এই ব্যতিক্রমের জন্যে যথেষ্ট নয়। হযরত খিযির কর্তৃক বালক হত্যা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ছিল, কিন্তু তাঁকে সৃষ্টিগতভাবে শরীয়তের এই আইনের উর্ধ্বে রেখে এ কাজের জন্যে আদেশ করা হয়েছিল। নবী নয়— এমন কোন ব্যক্তিকে তাঁর মাপকাঠিতে বিচার করে কোন হারামকে হালাল মনে করা যেমন ভণ্ড সূফীদের মধ্যে প্রচলিত আছে—সম্পূর্ণ ধর্মদ্রোহিতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর।

ইবনে আবী শায়বা হযরত ইবনে আব্বাসের রাঃ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার নাজদাহ্ হারুরী (খারেজী) ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখল যে, হযরত খিযির (আঃ) নাবালেগ বালককে কিরূপে হত্যা করলেন, অথচ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নাবালেগ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন? ইবনে আব্বাস জওয়াবে লিখলেন ঃ কোন বালক সম্পর্কে যদি তোমার ঐ জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়, যা খিযির (আঃ)-এর অর্জিত হয়েছিল, তবে তোমার জন্যেও নাবালেগ হত্যা করা জায়েয হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এই যে, খিযির (আঃ) নবুওয়তের ওহীর মাধ্যমে এই জ্ঞানলাভ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পর নবুওয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ এখন এই জ্ঞান কেউ লাভ করতে পারবে না।— (মাযহারী)

এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে শরীয়তের আইনের উর্ধ্বে সাব্যস্ত করার অধিকার একমাত্র ওহীর অধিকারী পয়গম্বরেরই রয়েছে।

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾
قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ
مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا
أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ
يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ
هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ
صَبْرًا ﴿٧٨﴾ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ
فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ
غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا
طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً
وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي
الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ
رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ
وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

(৭৫) তিনি বললেন ঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। (৭৬) মূসা বললেন ঃ এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না। আপনি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগ মুক্ত হয়ে গেছেন। (৭৭) অতঃপর তারা চলতে লাগল, অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার চাইল, তখন তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন, সেটি তিনি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মূসা বললেন ঃ আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন। (৭৮) তিনি বললেন ঃ এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি, আমি তার তাৎপর্য বলে দিচ্ছি। (৭৯) নৌকাটির ব্যাপার—সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ক্রটিযুক্ত করে দেই। তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ। সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। (৮০) বালকটির ব্যাপার—তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। (৮১) অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে মহত্তর, তার চাইতে পবিত্রতায় ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। (৮২) প্রাচীরের ব্যাপার—সেটি ছিল নগরের দু' জন পিতৃহীন বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ণ। সুতরাং আপনার পালনকর্তা দয়াবশত ঃ ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটা করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এই হল তার ব্যাখ্যা। (৮৩) তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন ঃ আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা করব।

أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, খিযির (আঃ) কুড়াল দ্বারা নৌকার একটি তক্তা বের করে দেন। ফলে নৌকায় পানি ঢুকে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এ কারণেই মূসা (আঃ) প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেন। কিন্তু ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, পানি নৌকায় প্রবেশ করেনি— মু'জেযার কারণে হোক কিংবা খিযির (আঃ) কর্তৃক এর কিছুটা মেরামত করার কারণে হোক। বগভীর রেওয়ায়েতে আছে যে, এই তক্তার জায়গায় খিযির (আঃ) একটি কাঁচ লাগিয়ে দেন। কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নৌকা ডুবে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। এর দ্বারা উপরোক্ত রেওয়ায়েতগুলো সমর্থিত হয়।

حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا আরবী ভাষায় غلام শব্দের অর্থ নাবালেগ বালক। যে বালককে খিযির (আঃ) হত্যা করেন, তার সম্পর্কে অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, সে নাবালেগ ছিল। পরবর্তী বাক্যে نَفْسًا زَكِيَّةً শব্দ থেকেও তার নাবালকত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা زكية শব্দের অর্থ গোনাহ্ থেকে পবিত্র। এ গুণটি হয় পয়গম্বরদের মধ্যে পাওয়া যায়, না হয় নাবালেগ বাচ্চাদের মধ্যে পাওয়া যায়। নাবালেগদের আমলনামায় কোন গোনাহ্ লিপিবদ্ধ করা হয় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَهْلَ قَرْيَةٍ হযরত খিযির (আঃ) যে জনপদে পৌঁছেন এবং যার অধিবাসীরা তাঁর আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করে, হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে সেটিকে এন্তাকিয়া ও ইবনে সীরীনের রেওয়ায়েতে 'আইকা' বলা হয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত আছে যে, সেটি ছিল আন্দালুসের একটি জনপদ।— (মাযহারী)

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ কা'ব আহবার থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এই নৌকাটি যে দরিদ্রদের ছিল, তারা ছিল দশ ভাই। তন্মধ্যে পাঁচ জন ছিল বিকলাঙ্গ। অবশিষ্ট পাঁচ ভাই মেহনত-মজুরী করে সবার জীবিকার ব্যবস্থা করত। নদীতে নৌকা চালিয়ে ভাড়া উপার্জন করাই ছিল তাদের মজুরী।

মিসকীনের সংজ্ঞা ঃ কারও কারও মতে মিসকীন এমন ব্যক্তি, যার কাছে কিছুই নেই। কিন্তু আলোচ্য আয়াত থেকে মিসকীনের সঠিক সংজ্ঞা এই জানা যায় যে, অত্যাবশ্যকীয় অভাব পূরণ করার পর যার কাছে নেসাব পরিমাণ মালও অবশিষ্ট থাকে না, সে-ও মিসকীনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আয়াতে যাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে, তাদের কাছে কমপক্ষে একটি নৌকা তো ছিল, যার মূল্য নেসাবের চাইতে কম নয়। কিন্তু নৌকাটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণে নিয়োজিত ছিল। তাই তাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে।— (মাযহারী) فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ

وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا বগভী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, নৌকাটি যেদিকে যাচ্ছিল, সেখানে একজন জালেম বাদশাহ্ এই পথে চলাচলকারী সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। হযরত খিযির এ কারণে নৌকার একটি তক্তা উপড়ে দেন, যাতে জালেম বাদশাহ্র লোকেরা ভাঙ্গা দেখে নৌকাটি ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্ররা বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়।

وَاَمَّا الْغُلٰمُ হযরত খিযির (আঃ) যে বালকটি হত্যা করেন,তার স্বরূপ এই বর্ণনা করেছেন যে, তার প্রকৃতিতে কুফর ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা নিহিত ছিল। তার পিতা-মাতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ লোক। হযরত খিযির (আঃ) বলেন ঃ আমার আশঙ্কা ছিল যে, ছেলেটি বড় হয়ে সৎকর্মপরায়ণ পিতা-মাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কুফরে লিপ্ত হয়ে পিতা-মাতার জন্যে ফেৎনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ভালবাসায় পিতা-মাতার ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

فَاَرَدْنَاۤ اَنْ یُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَیْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا অর্থাৎ, এজন্যে আমি ইচ্ছা করলাম যে, আল্লাহ্ তাআলা এই সৎকর্মপরায়ণ পিতা-মাতাকে এ ছেলের পরিবর্তে তার চাইতে উত্তম সন্তান দান করুক, যার কাজকর্ম ও চরিত্র হবে পবিত্র এবং সে পিতা-মাতার হকও পূর্ণ করবে।

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম আতিয়্যার বাচনিক বর্ণনা করেন যে, নিহত ছেলের পিতা-মাতাকে আল্লাহ্ তাআলা তার পরিবর্তে একটি কন্যা দান করেন, পরবর্তীকালে যার গর্ভে দু'জন নবী জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তাঁর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা একটি বিরাট উম্মতকে হেদায়েত দান করেন।

وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا হযরত আবু দ্দারদা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রাচীরের নীচে রক্ষিত এতীম বালকদের গুপ্তধন ছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার।— (তিরমিযী, হাকিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সেটি ছিল স্বর্ণের একটি ফলক। তাতে নিম্নলিখিত উপদেশবাক্যসমূহ লিখিত ছিল। হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-ও এই রেওয়ায়েতটি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।—(কুরতুবী)

(১) বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

(২) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে তকদীরে বিশ্বাস করে অথচ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়।

(৩) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে আল্লাহ্ তাআলাকে রিযিকদাতারূপে বিশ্বাস করে; এরপর প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনর্থক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।

(৪) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে মৃত্যুতে বিশ্বাস রাখে; অথচ আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকে।

(৫) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস রাখে; অথচ সৎকাজে গাফেল হয়।

(৬) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে দুনিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তন জেনেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে।

(৭) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্।

পিতা-মাতার সৎকর্মের উপকার সন্তান-সন্ততিরাও পায় ঃ وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত খিযির (আঃ)-এর মাধ্যমে এতীম বালকদের জন্যে রক্ষিত গুপ্তধনের হেফাযত এজন্যে করানো হয় যে, তাদের পিতা একজন সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ্র প্রিয় বন্দা ছিলেন। তাই আল্লাহ্ তাআলা তার সন্তান-সন্ততির উপকারার্থে এ ব্যবস্থা করেন। মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা এক বন্দার সৎকর্মপরায়ণতার কারণে তার পরবর্তী সন্তান-সন্ততি,বংশধর ও প্রতিবেশীদের হেফাযত করেন।— (মাযহারী)

হযরত শিবলী (রহঃ) বলতেনঃ আমি এই শহর এবং সমগ্র এলাকার জন্যে শান্তির কারণ। তাঁর ওফাতের পর তাঁর দাফন সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে দায়লামের কাফেররা দাজলা নদী অতিক্রম করে বাগদাদ নগরী অধিকার করে। তখন সবাই বলাবলি করতে থাকে যে, আমাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ চেপেছে, অর্থাৎ, শিবলীর ওফাত ও কাফেরদের হাতে বাগদাদের পতন—(কুরতুবী, ১১ খণ্ড, ২৯ পৃঃ)

তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলেম ও সৎকর্মপরায়ণদের সন্তান-সন্ততিদের খাতির করা এবং তাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হওয়া উচিত, যে পর্যন্ত না তারা পুরোপুরি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

اَنْ يَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا – اشد শব্দটি شدة এর বহুবচন। অর্থ শক্তি এবং সে বয়স, যাতে মানুষ পূর্ণ শক্তি অর্জন এবং ভালমন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। ইমাম আবু হানীফার রাঃ মতে পঁচিশ বছর বয়ঃক্রম এবং কারও কারও মতে চল্লিশ বছর বয়ঃক্রম। কেননা, কোরআন পাকে রয়েছে حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً (মাযহারী)

হযরত খিযির (আঃ) জীবিত আছেন, না ওফাত হয়ে গেছে ঃ হযরত খিযির (আঃ) জীবিত আছেন, না তাঁর ওফাত হয়ে গেছে ; এ বিষয়ের সাথে কোরআনে বর্ণিত ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। তাই কোরআন ও হাদীসে স্পষ্টতঃ এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। কোন কোন রেওয়ায়েত ও উক্তি থেকে তাঁর অদ্যাবধি জীবিত থাকার কথা জানা যায়। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এর বিপরীত বিষয় জানা যায়। ফলে এ ব্যাপারে সর্বকালেই আলেমদের বিভিন্নরূপ মতামত পরিদৃষ্ট হয়েছে। যাদের মতে তিনি জীবিত আছেন, তাদের প্রমাণ হচ্ছে মুস্তাদরাক হাকিম কর্তৃক হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত। তাতে বলা হয়েছে ঃ যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে যায়, তখন সাদা-কালো দাড়িওয়ালা জনৈক ব্যক্তি আগমন করে এবং ভিড় ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে কান্নাকাটি করতে থাকে। এই আগন্তুক সাহাবায়ে কেরামের দিকে মুখ করে বলতে থাকে। ''আল্লাহ্র দরবারেই প্রত্যেক বিপদ থেকে সবর আছে, প্রত্যেক বিলুপ্ত বিষয়ের প্রতিদান আছে বরং তিনি প্রত্যেক ধ্বংসীল বস্তুর স্থলাভিষিক্ত। তাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর এবং তাঁর কাছেই আগ্রহ প্রকাশ কর। কেননা, যে ব্যক্তি বিপদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়, সে-ই প্রকৃত বঞ্চিত।

আগন্তুক উপরোক্ত বাক্য বলে বিদায় হয়ে গেলে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও আলী (রাঃ) বললেন ঃ ইনি হযরত খিযির (আঃ)।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে যে, দাজ্জাল মদীনার নিকটবর্তী এক জায়গায় পৌঁছলে মদীনা থেকে এক ব্যক্তি তার মোকাবেলার জন্যে বের হবেন। তিনি তৎকালীন লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হবেন কিংবা শ্রেষ্ঠতম লোকদের অন্যতম হবেন। আবু ইসহাক বলেন ঃ এ ব্যক্তি হবেন হযরত খিযির (আঃ)।

ইবনে আবিদদুনিয়া 'কিতাবুল-হাওয়াতিফে' বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাঃ) হযরত খিযির (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাঁকে একটি দোয়া বলে দেন। যে ব্যক্তি এই দোয়া প্রত্যেক নামাযের পর পাঠ করবে ; সে বিরাট সওয়াব, মাগফেরাত ও রহমতা পাবে। দোয়াটি এই ঃ

يا من لا يشغله سمع عن سمع ويا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يبرم من الحاح الملحين اذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك -

"হে ঐ সত্তা, যার এক কথা শোনা অন্য কথা শোনার প্রতিবন্ধক হয় না; হে ঐ সত্তা যাকে একই সময়ে করা লাখো-কোটি প্রশ্ন বিভ্রান্ত করে না এবং হে ঐ সত্তা যিনি, দোয়ায় পীড়াপীড়ি করলে এবং বার বার বললে বিরক্ত হন না; আমাকে তোমার ক্ষমার স্বাদ আস্বাদন করাও এবং তোমার মাগফেরাতের স্বাদ দান কর।'

অতঃপর এ গ্রন্থেই হুবহু এই ঘটনা, এই দোয়া এবং হযরত খিযির (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের ঘটনা হযরত ওমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।

পক্ষান্তরে যারা হযরত খিযির (আঃ)-এর জীবদ্দশা অস্বীকার করে, তাদের বড় প্রমাণ হচ্ছে সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। হযরত ইবনে ওমর বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জীবনের শেষ দিকে এক রাত্রে আমাদেরকে নিয়ে এশার নামায পড়েন। নামায শেষে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেন

ارايتكم ليلتكم هذه فان على رأس مائة سنة منها لايبقى ممن هو على ظهر الارض احد -

"তোমরা কি আজকের রাতটি লক্ষ্য করছ? এই রাত থেকে একশ' বছর আজ যারা পৃথিবীতে আছে, তাদের কেউ জীবিত থাকবে না।"

হযরত ইবনে ওমর অতঃপর বলেন ঃ এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে অনেকেই অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, একশ' বছর অতীত হলে এ শতাব্দী শেষ হয়ে যাবে।

কেউ কেউ খিযির (আঃ)-এর জীবিত থাকার বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে জীবিত থাকলে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করা তাঁর জন্যে অপরিহার্য ছিল। কেননা, হাদীসে বলা হয়েছে لو كان موسى حيالما وسعه الا اتباعى অর্থাৎ, মূসা (আঃ)- জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁরও গত্যন্তর ছিল না। (কারণ, আমার আগমনের ফলে তাঁর ধর্ম রহিত হয়ে গেছে)। কিন্তু এটা অসম্ভব নয় যে, খিযির (আঃ)-এর জীবন ও নবুওয়ত সাধারণ পয়গম্বদের থেকে ভিন্নরূপ হবে। তাঁকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সৃষ্টিগত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাই তিনি সাধারণ মানুষ থেকে আলাদাভাবে নিজের কাজে নিয়োজিত আছেন। শরীয়তে মুহাম্মদীর অনুসরণের ব্যাপারে এটা সম্ভব যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়তের পর এ শরীয়তেরই অনুসরণ করে চলেছেন।

আবু হাইয়্যান বাহ্‌রে-মুহীত গ্রন্থে খিযির (আঃ)-এর সাথে কয়েকজন বুযুর্গের সাক্ষাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে, والجمهور على انه مات -অর্থাৎ, সাধারণ আলেমদের মতে তাঁর ওফাত হয়ে গেছে। -(ষষ্ঠ খণ্ড ১৪৭ পৃঃ)

তফসীর মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ্ বলেন ঃ হযরত সাইয়্যেদ আহ্‌মদ সেরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী তাঁর কাশ্‌ফের মাধ্যমে যেকথা বলেছেন, তার মধ্যেই সব বিতর্কের সমাধান নিহিত আছে। তিনি বলনে ঃ আমি নিজে কাশ্‌ফ জগতে হযরত খিযির (আঃ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমি ও ইলিয়াস (আঃ) উভয়েই জীবিত নই। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এরূপ ক্ষমতা দান করেছেন যে, আমরা জীবিত মানুষের বেশ ধারণ করে বিভিন্নভাবে মানুষকে সাহায্য করতে পারি।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, হযরত খিযির (আঃ)-এর মৃত্যু ও জীবদ্দশার সাথে আমাদের কোন বিশ্বাসগত অথবা কর্মগত বিষয় জড়িত নয়। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কোন কিছু বলা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে অতিরিক্ত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কোন একদিকের উপর বিশ্বাস রাখাও আমাদের জন্য জরুরী নয়। কিন্তু প্রশ্নটি জনগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত, তাই উল্লেখিত বিবরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ অর্থাৎ, তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। কারা প্রশ্ন করেছিল, এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা ছিল মক্কার কোরাইশ সম্প্রদায়। মদীনার ইহুদীরা তাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও সততা যাচাই করার জন্যে তিনটি প্রশ্ন বলে দিয়েছিল ঃ রূহ্, আসহাবে কাহ্‌ফ ও যুলকারনাইন। তন্মধ্যে দু'টি প্রশ্নের জওয়াব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় প্রশ্নের জওয়াব বর্ণিত হচ্ছে যে, যুলকারনাইন কে ছিল এবং তার কি অবস্থা ছিল?— (বাহ্‌রে মুহীত)

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَأَتْبَعَ
سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ
حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ
تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ
فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ﴿٨٧﴾ وَأَمَّا مَنْ
آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا
يُسْرًا ﴿٨٨﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ
عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا
بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ
وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوا يَا ذَا
الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ
نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا
مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
رَدْمًا ﴿٩٥﴾ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ
انْفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

(৮৪) আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম। (৮৫) অতঃপর তিনি এক কার্যোপকরণ অবলম্বন করলেন। (৮৬) অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌছলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। (৮৭) তিনি বললেন ঃ যে কেউ সীমালঙ্ঘনকারী হবে আমি তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবেন। তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। (৮৮) এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দেব। (৮৯) অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন। (৯০) অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। (৯১) প্রকৃত ঘটনা এমনিই। তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি। (৯২) আবার তিনি এক পথ ধরলেন। (৯৩) অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা একেবারেই বোঝতে পারছিল না। (৯৪) তারা বললঃ হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। (৯৫) তিনি বললেন ঃ আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। (৯৬) তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা গলিত তামা নিয়ে এস, আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যুলকারনাইন কে ছিলেন, কোন্ যুগে ও কোন্ দেশে ছিলেন এবং তার নাম যুলকারনাইন হল কেন? যুলকারনাইন নামকরণের হেতু সম্পর্কে বহু উক্তি ও তীব্র মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কেউ বলেন ঃ তাঁর মাথার চুলে দু'টি গুচ্ছ ছিল। তাই যুলকারনাইন, (দুই গুচ্ছওয়ালা) আখ্যায়িত হয়েছেন। কেউ বলেন ঃ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করার কারণে যুলকারনাইন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। কেউ এমনও বলেছেন যে, তাঁর মাথায় শিং এর অনুরূপ দু'টি চিহ্ন ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তাঁর মাথার দুই দিকে দু'টি ক্ষতচিহ্ন ছিল।

কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, কোরআন স্বয়ং তাঁর নাম যুলকারনাইন রাখেনি; বরং ইহুদীরা এ নাম বলেছিল। বোধহয় তিনি তাদের কাছে এ নামেই খ্যাত ছিলেন। যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কে কোরআন পাক যা বর্ণনা করেছে, তা এই ঃ

তিনি একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ ছিলেন এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করেছিলেন। এসব দেশে তিনি সুবিচার ও ইনসাফের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁকে লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সর্বপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম দান করা হয়েছিল। তিনি দিগ্বিজয়ে বের হয়ে পৃথিবীর তিন প্রান্তে পৌছেছিলেন—পাশ্চাত্যের শেষ প্রান্তে, প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে এবং উত্তরে পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত। এখানেই তিনি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে একটি সুবিশাল লৌহ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের লুটতরাজ থেকে এলাকার জনগণ নিরাপদ হয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশে প্রশ্ন উত্থাপনকারী ইহুদীরা এই জওয়াব শুনে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তারা আর অতিরিক্ত কোন প্রশ্ন করেনি যে, তাঁর নাম কেন যুলকারনাইন ছিল এবং তিনি কোন্ দেশে কোন্ যুগে বিদ্যমান ছিলেন? এতে বোঝা যায় যে, এসব প্রশ্নকে স্বয়ং ইহুদীরাও অনাবশ্যক ও অনর্থক মনে করেছে। বলাবহুল্য, কোরআন পাক ইতিহাস ও কাহিনীর ততটুকু অংশই উল্লেখ করে, যতটুকুর সাথে কোন ধর্মীয় বা পার্থিব উপকার জড়িত থাকে অথবা যার উপর কোন জরুরী বিষয় নির্ভরশীল থাকে। তাই এসব বিষয় কোরআন পাক বর্ণনা করেনি এবং কোন সহীহ্ হাদীসেও এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। যেহেতু কোরআন পাকের কোন আয়াত বোঝা এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়, তাই পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণও এসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেননি।

এখন এসব প্রশ্ন সমাধানের একমাত্র সম্বল হচ্ছে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অথবা বর্তমান তওরাত ও ইঞ্জীল। বলাবাহুল্য, উপর্যুপরি পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে বর্তমান তওরাত এবং ইঞ্জীলও ঐশী গ্রন্থের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। এগুলো এখন বলতে গেলে পুরাকাহিনীর পর্যায়ভুক্ত। এগুলো বর্তমানে প্রাচীন ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত এবং ইসরাঈল কিস্সা-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এসব কাহিনীর কোন সনদ নেই এবং কোন যমানার সুধীবৃন্দের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগ্য পরিগণিত হয়নি। তফসীরবিদগণও এ ব্যাপারে যা কিছু লিখেছেন, তাও এক ধরনের ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের সমষ্টি মাত্র। ফলে তাদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। বর্তমানকালে ইউরোপীয়রা ইতিহাসকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করেছে। তারা এ বিষয়ের গবেষণায় অপরিসীম অধ্যবসায় ও পরিশ্রম

নিয়োজিত করেছে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে সেখান থেকে বিভিন্ন শিলালিপি উদ্ধার করেছে এবং সেগুলোর সাহায্যে পুরাতত্ত্বের স্বরূপ আবিষ্কারে অভূত পূর্ব কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে প্রাপ্ত শিলালিপির মাধ্যমে কোন ঘটনার সমর্থনে সাহায্য পাওয়া গেলেও সেগুলো দ্বারা ঘটনার পাঠোদ্ধার সম্ভবপর নয়। এর জন্যে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহই ভিত্তি হতে পারে। এসব ব্যাপারে প্রাচীনকালে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহের অবস্থা একটু আগেই জানা গেছে যে, এগুলোর মর্যাদা কিস্‌সা-কাহিনীর চাইতে অধিক নয়। প্রাচীন ও আধুনিক তফসীরবিদগণও নিজ নিজ গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই উদ্ধৃত করেছেন। এখানেও এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু লেখা হচ্ছে। মাওলানা হিফযুর রহমান (রহঃ) 'কাসাসুল-কোরআন' গ্রন্থে এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিহাসের কৌতূহলী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বে শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকারী চার জন সম্রাট অতিক্রান্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে দু'জন ছিলেন মুমিন এবং দু'জন কাফের। মুমিন দু'জন হলেন হযরত সোলায়মান (আঃ) ও যুলকারনাইন এবং কাফের দু'জন নমরূদ ও বখতে-নসর।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যুলকারনাইন নামে পৃথিবীতে একাধিক ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করেছেন এবং এটাও আশ্চর্যের ব্যাপার যে, প্রতি যুগের যুলকারনাইনের সাথেই সিকান্দর (আলেকজাণ্ডার) উপাধিটিও যুক্ত রয়েছে।

খ্রীষ্টের প্রায় তিনশ' বছর পূর্বে সিকান্দার নামে একজন সম্রাট প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিলেন। তাকে সিকান্দার গ্রীক, মকদুনী, রূমী, ইত্যাদি উপাধিতেও স্মরণ করা হত। তার মন্ত্রী ছিলেন এরিস্টটল এবং তিনি দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে তার রাজ্য জয় করেন। সিকান্দার নামে খ্যাতিলাভকারী সর্বশেষ ব্যক্তি তিনিই ছিলেন। তার কাহিনী অধিক প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ তাকেও কোরআনে উল্লেখিত যুলকারনাইন বলে অভিমত দিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা, তিনি অগ্নিপূজারী মুশরেক ছিলেন। কোরআন পাকে যে যুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে, তার নবী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। কোরআনের আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

হাদীস ও ইতিহাসবিদ ইবনে-কাসীরের বক্তব্যে প্রথমতঃ জানা যায় যে, সিকান্দার বাদশাহ যিনি ঈসা (আঃ)-এর তিন শত বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন, দারা ও পারস্য সমগ্রাটদের সাথে যার যুদ্ধ হয়েছে এবং যিনি আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন নন।

দ্বিতীয় ঃ وانه كان نبيا বাক্য থেকে জানা গেল যে, ইবনে-কাসীরের মতে তার নবী হওয়ার ধারণাটি প্রবল। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি স্বয়ং ইবনে কাসীর আবু তোফায়েলের রেওয়ায়েতক্রমে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যুলকারনাইন নবী বা ফেরেশতা ছিলেন না; বরং একজন সৎকর্মপরায়ণ মুসলমান ছিলেন। তাই কোন কোন আলেম বলেছেন যে, انه এর সর্বনাম দ্বারা যুলকারনাইনকে নয়—খিযির (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, তবে কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন কে এবং কোন্ যুগে ছিলেন? এ সম্পর্কেও আলেমদের উক্তি-বিভিন্নরূপ। ইবনে কাসীরের মতে তার আমল ছিল সিকান্দার গ্রীক, মকদুনী থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আমল। তার উজির ছিলেন হযরত খিযির (আঃ)। ইবনে কাসীর 'আলবেদায়াহ্ ওয়ান্নেহায়াহ্' গ্রন্থে এ রেওয়ায়েতও বর্ণনা করেছেন যে, যুলকারনাইন পদব্রজে হজ্জের উদ্দেশে আগমন করলে হযরত ইবরাহীম (আঃ) মক্কা থেকে বের হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান, তাঁর জন্যে দোয়া করেন এবং কিছু উপদেশও প্রদান করেন। তফসীর ইবনে কাসীরে আযরকীর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, যুলকারনাইন ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে তওয়াফ করেন এবং কোরবানী করেন।

আবু রায়হান আল-বেরুনী 'কিতাবুল আসারিল বাকীয়া আনিল কুরূনিল্ খালীয়া' গ্রন্থে বলেনঃ কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন হচ্ছে আবু বকর ইবনে সুমাই ইবনে ওমর ইবনে আফরীকায়স হিমইয়ারী। তিনি দিগ্বিজয়ী ছিলেন। তুব্বা হিমইয়ারী ইয়ামেনী তার কবিতায় তাঁর জন্যে গর্ববোধ করে বলেছেন ঃ আমার দাদা যুলকারনাইন মুসলমান ছিলেন।

আবু হাইয়্যান বাহ্‌রে-মুহীতে এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর ও 'আল-বেদায়াহ্ ওয়ান্নেহায়াহ্' গ্রন্থে এর উল্লেখ করার পর বলেন ঃ এই যুলকারনাইন তিন জন ইয়ামেনী সম্রাটের মধ্যে প্রথম সম্রাট ছিলেন। সে-ই সাবা' কূপের মোকদ্দমায় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পক্ষে ন্যায় ফয়সালা দিয়েছিলেন। এ সমুদয় রেওয়ায়েতে যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব, সুনাম ও বংশপরম্পরা সংক্রান্ত মতভেদ সত্ত্বেও তাঁর আমল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আমল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا এখানে প্রণিধানেযোগ্য বিষয় যে, কোরআন পাক ذكره সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে مِّنْهُ ذِكْرًا এ দু'টি শব্দ কেন ব্যবহার করল? চিন্তা করলে দেখা যাবে, এ দু'টি শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন পাক যুলকারনাইনের আদ্যপান্ত কাহিনী বর্ণনা করার ওয়াদা করেনি; বরং তার আলোচনার একাংশ উল্লেখ করার কথা বলেছে। উপরে যুলকানারইনের নাম ও বংশপরম্পরা সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কোরআন পাক একে অনাবশ্যক মনে করে বাদ দেয়ার কথা প্রথমেই ঘোষণা করে দিয়েছে।

وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا আরবী অভিধানে سبب শব্দের অর্থ এমন বস্তু যদ্দ্বারা লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য নেয়া হয়। যন্ত্রপাতি, বৈষয়িক উপায়াদি, জ্ঞানবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।—(বাহ্‌রে-মুহীত)

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার জন্যে একজন সম্রাট ও রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে যেসব বিষয় অত্যাবশ্যকীয় مِنْ كُلِّ شَيْءٍ বলে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যুলকারনাইনকে ন্যায়বিচার, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও দেশ বিজয়েরই জন্যে সে যুগে যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল, তা সবই দান করেছিলেন।

فَاَتْبَعَ سَبَبًا অর্থাৎ, সব রকম ও দুনিয়ার সর্বত্র পৌছার উপকরণাদি তাকে দান করা হয়েছিল, কিন্তু সে সর্বপ্রথম পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে পৌছার উপকরণাদি কাজে লাগায়।

حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ অর্থাৎ, তিনি পশ্চিম প্রান্তে সে সীমা পর্যন্ত পৌছে গেলেন, যার পরে কোন জনবসতি ছিল না।

فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ — حَمِئَةٍ এর শাব্দিক অর্থ কালো জলাভূমি অথবা কাদা। এখানে সে জলাশয়কে বোঝানো রয়েছে, যার নীচে কালো রঙের কাদা থাকে। ফলে পানির রঙও কালো দেখায়। সূর্যকে এরূপ জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখার অর্থ এই যে, দর্শক মাত্রই অনুভব করে যে, সূর্য এই জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে। কেননা, এরপর কোন বসতি অথবা স্থলভাগ ছিল না। আপনি যদি সূর্যাস্তের সময় এমন কোন ময়দানে উপস্থিত থাকেন, যার পশ্চিমদিকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোন পাহাড়, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদি না থাকে, তবে আপনার মনে হবে যেন সূর্যটি মাটির অভ্যন্তরেই প্রবেশ করছে।

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا অর্থাৎ, ঐ কালো জলাশয়ের কাছে যুলকারনাইন এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আয়াতের পরবর্তী অংশ থেকে জানা যায় যে, সম্প্রদায়টি ছিল কাফের। তাই আল্লাহ্ তাআলার যুলকারনাইনকে ক্ষমতা দান করলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে প্রথমেই সবাইকে তাদের কুফরের শাস্তি প্রদান কর এবং ইচ্ছা করলে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার কর অর্থাৎ, প্রথমে দাওয়াত, তাবলীগ ও উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ও ঈমান কবুল করতে সম্মত কর। এরপর যারা মানে, তাদেরকে প্রতিদান এবং যারা না মানে তাদেরকে শাস্তি দাও। প্রত্যুত্তরে যুলকারনাইন দ্বিতীয় পথই অবলম্বন করে বললেন ঃ আমি প্রথমে তাদেরকে উপদেশের মাধ্যমে সৎপথে আনার চেষ্টা করব। এরপরও যারা কুফরে দৃঢ়পদ থাকবে, তাদেরকে শাস্তি দেব। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।

قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ এ থেকে জানা যায় যে, যুলকারনাইনকে আল্লাহ্ তাআলা নিজেই সম্বোধন করে একথা বলেছেন। যুলকারনাইনকে নবী সাব্যস্ত করা হলে এতে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না যে, ওহীর মাধ্যমেই তাঁকে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে নবী না মানলে কোন পয়গম্বরের মধ্যস্থতায়ই তাঁকে এই সম্বোধন করা হয়ে থাকবে। যেমন, রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত খিযির (আঃ) তাঁর সাথে ছিলেন। এছাড়া এতে নবুওয়তের ওহী না হয়ে আভিধানিক ওহী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন, হযরত মূসা (আঃ)-এর জননীর জন্যে কোরআনে وَأَوْحَيْنَا বলা হয়েছে। অথচ তিনি যে নবী ও রসূল ছিলেন না, সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আবু হাইয়্যান বাহ্‌রে-মুহীতে বলেন ঃ এখানে যুলকারনাইনকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হত্যা ও শাস্তির আদেশ। এ ধরনের আদেশ নবুওয়তের ওহী ব্যতীত দেয়া যায় না—কাশফ, এলহাম অথবা অন্য কোন উপায়ে তা হতে পারে না। তাই হয় যুলকারনাইনকে নবী মানতে হবে, না হয় তাঁর আমলে একজন নবীর উপস্থিতি স্বীকার করতে হবে, যাঁর মাধ্যমে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই বিশুদ্ধ নয়।

যুলকারনাইন পূর্বপ্রান্তে যে জাতিকে বসবাস করতে দেখেছেন, কোরআন পাক তাদের সম্পর্কে বলেছে যে, তারা গৃহ, তাঁবু, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির দ্বারা রোদ থেকে আত্মরক্ষা করত না, কিন্তু তাদের ধর্ম ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে কিছুই বলেনি এবং যুলকারনাইন তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন, তাও ব্যক্ত করেনি। বলাবাহুল্য, তারাও কাফেরই ছিল এবং যুলকারনাইন তাদের সাথেও এমন ব্যবহারই করেছেন, যা পশ্চিমা জাতির সাথে করেছেন বলে উপরে বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। কারণ, পূর্ববর্তী ঘটনার আলোকেই তা বোঝা যায়।— (বাহ্‌রে-মুহীত)

শব্দার্থ ঃ بَيْنَ السَّدَّيْنِ যে বস্তু কোন কিছুর জন্যে বাধা হয়ে যায়, سد তাকে বলা হয়; তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড় হোক, কৃত্রিম হোক কিংবা প্রাকৃতিক হোক। এখানে سدين বলে দুই পাহাড় বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের পথে বাধা ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাত। যুলকারনাইন এই গিরিপথটি বন্ধ করে দেন।

زُبَرَ الْحَدِيدِ — زبر শব্দটি زبرة এর বহুবচন। এর অর্থ পাত। এখানে লৌহখণ্ড বোঝানো হয়েছে। গিরিপথ বন্ধ করার জন্যে নির্মিতব্য প্রাচীর ইঁট-পাথরের পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল।

الصَّدَفَيْنِ দুই পাহাড়ের বিপরীত মুখী দুই দিক ঃ

قِطْرًا অধিকাংশ তফসীরবিদগণের মতে এর অর্থ গলিত তামা। কারও কারও মতে গলিত লোহা অথবা রাঙতা।—(কুরতুবী)

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۖ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

(৯৭) অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হল না। (৯৮) যুলকারনাইন বললেন ঃ এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য। (৯৯) আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করে আনব। (১০০) সেদিন আমি কাফেরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব। (১০১) যাদের চক্ষুসমূহের উপর পর্দা ছিল আমার স্মরণ থেকে এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না। (১০২) কাফেররা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি কাফেরদের অভ্যর্থনার জন্যে জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি। (১০৩) বলুন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। (১০৪) তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। (১০৫) তারাই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কেয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোন গুরুত্ব স্থির করব না। (১০৬) জাহান্নাম – এটাই তাদের প্রতিফল; কারণ, তারা কাফের হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে। (১০৭) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল ফেরদাউস। (১০৮) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না। (১০৯) বলুন ঃ আমার পালনকর্তার কথা, লেখার জন্যে যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

دَكَّاءَ অর্থাৎ, যে বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সমতল হয়ে যায়।

ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং কোথায়? যুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত ঃ ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে ইসরাঈলী রেওয়ায়েতে ও ঐতিহাসিক কিস্সা-কাহিনীতে অনেক ভিত্তিহীন অলীক কথাবার্তা প্রচলিত রয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদও এগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু স্বয়ং তাঁদের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। কোরআন পাক তাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত করেছেন। ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় ততটুকুই, যতটুকু কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তফসীর, হাদীস ও ইতিহাসবিদগণ এর অতিরিক্ত যেসব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো বিশুদ্ধও হতে পারে এবং অশুদ্ধও হতে পারে। ইতিহাসবিদগণের বিভিন্নমুখী উক্তিগুলো নিছক ইঙ্গিত ও অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। এগুলো শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ হলেও তার কোন প্রভাব কোরআনের বক্তব্যের উপর পড়ে না।

আমি এখানে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কিত সহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো উল্লেখ করছি। এরপর প্রয়োজন অনুসারে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতও বর্ণনা করা হবে।

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা ঃ কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ মানব সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্য মানবের মত তারাও নূহ (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততি। কোরআন পাক স্পষ্টতই বলেছে ঃ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ অর্থাৎ, নূহের মহাপ্লাবনের পর দুনিয়াতে যত মানুষ আছে এবং থাকবে, তারা সবাই নূহ (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততি হবে। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত এ ব্যাপারে একমত যে, তারা ইয়াফেসের বংশধর। একটি দুর্বল হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের অবশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তারিত ও সহীহ্ হাদীস হচ্ছে হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রাঃ)-এর হাদীসটি। এটি সহীহ্ মুসলিম ও অন্যান্য সব নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। হাদীসবিদগণ একে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। এতে দাজ্জালের আবির্ভাব, ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থান ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ উল্লেখিত আছে। হাদীসটির অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

হযরত নাওয়াস ইবনে-সামআন (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদিন ভোর বেলা দাজ্জালের আলোচনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন, যদ্দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, সে নেহাতই তুচ্ছ ও নগণ্য (উদাহরণতঃ সে কানা হবে।) পক্ষান্তরে কিছু কথা এমন বললেন, যদ্দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, তার ফেৎনা অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠোর হবে। (উদাহরণতঃ জান্নাত ও দোযখ তার সাথে থাকবে এবং অন্যান্য আরও অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটবে।) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বর্ণনার ফলে (আমরা এমন ভীত হয়ে পড়লাম,) যেন দাজ্জাল খর্জুর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যেই রয়েছে। (অর্থাৎ, অদূরেই বিরাজমান রয়েছে।) বিকালে যখন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি আমাদের মনের অবস্থা আঁচ করে নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি বুঝেছ? আমরা আরয করলাম ঃ আপনি দাজ্জালের

আলোচনা প্রসঙ্গে এমন কিছু কথা বলেছেন, যাতে বোঝা যায় যে, তার ব্যাপারটি নেহাতই তুচ্ছ এবং আরও কিছু কথা বলেছেন, যাতে মনে হয়, সে খুব শক্তিসম্পন্ন হবে এবং তার ফেৎনা হবে খুব গুরুতর। এখন আমাদের মনে হয়েছে যে, যেন সে আমাদের নিকটেই খর্জুরবৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তোমাদের সম্পর্কে আমি যেসব ফেৎনার আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে দাজ্জালের তুলনায় অন্যান্য ফেৎনা অধিক ভয়েরযোগ্য। (অর্থাৎ, দাজ্জালের ফেৎনা এতটুকু গুরুতর নয়, যতটুকু তোমরা মনে করছ।) যদি আমার জীবদ্দশায় সে আবির্ভূত হয়, তবে আমি নিজে তার মোকাবেলা করব। (কাজেই তোমাদের চিন্তান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই।) পক্ষান্তরে সে যদি আমার পরে আসে, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পরাভূত করার চেষ্টা করবে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানের সাহায্যকারী। (তার লক্ষণ এই যে,) সে যুবক, ঘন কোঁকড়ানো চুলওয়ালা হবে। তার একটি চক্ষু উপরের দিকে উত্থিত হবে (এবং অপর চক্ষুটি হবে কানা।) যদি আমি (কুৎসিত চেহারার) কোন ব্যক্তিকে তার সাথে তুলনা করি, তবে সে হচ্ছে আবদুল ওযযা ইবনে-কুত্না। (জাহেলিয়াত আমলে কুৎসিত চেহারার 'বনু-খোযাআ' গোত্রের এ লোকটির তুলনা ছিল না।) যদি কোন মুসলমান দাজ্জালের সম্মুখীন হয়ে যায়, তবে সূরা কাহ্ফের প্রথম আয়াতগুলো পড়ে নেয়া উচিত। (এতে সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।) দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহ্র বান্দারা, তোমরা তার মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাক।

আমরা আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ), সে কতদিন থাকবে। তিনি বললেন ঃ সে চল্লিশ দিন থাকবে, কিন্তু প্রথম দিন এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মতই হবে। আমরা আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, আমরা কি তাতে শুধু এক দিনের (পাঁচ ওয়াক্ত) নামাযই পড়ব? তিনি বললেনঃ না; বরং সময়ের অনুমান করে পূর্ণ এক বছরের নামায পড়তে হবে। আমরা আবার আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ , সে কেমন দ্রুতগতিতে সফর করবে? তিনি বললেন ঃ সে মেঘখণ্ডের মত দ্রুত চলবে, যার পেছনে অনুকূল বাতাস থাকে। দাজ্জাল কোন সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে তাকে মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেবে। তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে সে মেঘমালাকে বর্ষণের আদেশ দেবে। ফলে, বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং মাটিকে আদেশ দেবে; ফলে সে শস্য-শ্যামলা হয়ে যাবে। (তাদের চতুষ্পদ জন্তু তাতে চরবে।) সন্ধ্যায় যখন জন্তুগুলো ফিরে আসবে, তখন তাদের কুঁজ পূর্বের তুলনায় উঁচু হবে এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে। এরপর দাজ্জাল অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকেও কুফরের দাওয়াত দেবে। কিন্তু তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। সে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলে সেখানকার মুসলমানরা দুর্ভিক্ষে পতিত হবে। তাদের কাছে কোন অর্থ কড়ি থাকবে না। সে শস্যবিহীন অনুর্বর ভূমিকে সম্বোধন করে বলবে ঃ তোর গুপ্তধন বাইরে নিয়ে আয়। সেমতে ভূমির গুপ্তধন তার পেছনে পেছনে চলবে; যেমন মৌমাছিরা তাদের সরদারের পেছনে পেছনে চলে। অতঃপর দাজ্জাল একজন ভরপুর যুবক ব্যক্তিকে ডাকবে এবং তাকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দেবে। তার উভয় খণ্ড এতটুকু দূরত্বে রাখা হবে; যেমন তীর নিক্ষেপকারী ও তার লক্ষ্যবস্তুর মাঝখানে থাকে। অতঃপর সে তাকে ডাক দেবে। সে (জীবিত হয়ে) দাজ্জালের কাছে প্রফুল্ল চিত্তে চলে আসবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তাআলাই হযরত ঈসা (আঃ)-কে নামিয়ে দেবেন। তিনি দু'টি রঙিন চাদর পরে দামেস্ক মসজিদের পূর্ব দিককার সাদা মিনারে ফেরেশতাদের পাখার উপর পা রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মস্তক অবনত করবেন, তখন তা থেকে পানির ফোঁটা পড়বে। (মনে হবে যেন এখনই গোসল করে এসেছেন।) তিনি যখন মস্তক উঁচু করবেন, তখনও মোমবাতির মত স্বচ্ছ পানির ফোঁটা পড়বে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস যে কাফেরের গায়ে লাগবে, সে সেখানেই মরে যাবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর দৃষ্টির সমান দূরত্বে পৌঁছাবে। হযরত ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে খুঁজতে খুঁজতে বাবুল্লুদ্দে গিয়ে তাকে ধরে ফেলবেন। (এই জনপদটি এখনও বায়তুল-মোকাদ্দাসের অদূরে এ নামেই বিদ্যমান।) সেখানে তাকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে আসবেন, স্নেহভরে মানুষের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ শোনাবেন।

এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করবেন ঃ আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন লোক বের করব, যাদের মোকাবেলা করার শক্তি কারও নেই। কাজেই আপনি মুসলমানদেরকে সমবেত করে তূর পর্বতে চলে যান।

(সেমতে তিনিই তাই করবেন।) অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজের রাস্তা খুলে দেবেন। তাদের দ্রুত চলার কারণে মনে হবে যেন উপর থেকে পিছলে নীচে এসে পড়ছে। তাদের প্রথম দলটি তবরিয়া উপসাগরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার পানি পান করে এমন অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোন দিন পানি ছিল, একথা বিশ্বাস করতে পারবে না।

ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা তূর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্য মুসলমানরা নিজ নিজ দুর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের বস্তুসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি গরুর মস্তককে একশ' দীনারের চাইতে উত্তম মনে করা হবে। হযরত ঈসা (আঃ) ও অন্যান্য মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্যে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবেন। (আল্লাহ্ দোয়া কবুল করবেন।) তিনি মহামারী আকারে রোগব্যাধি পাঠাবেন। ফলে, অল্প সময়ের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে তূর পর্বত থেকে নীচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধ হাত পরিমিত স্থানও খালি নেই এবং (মৃতদেহ পচে) অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। (এ অবস্থা দেখে পুনরায়) হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করবেন (যেন এই বিপদও দূর করে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলা এ দোয়াও কবূল করবেন এবং বিরাটাকার পাখী প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মত। তারা (মৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, সেখানে ফেলে দেবে।) কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কোন নগর ও বন্দর এ বৃষ্টি থেকে বাদ থাকবে না। ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাঁচের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করবেন ঃ তোমার পেটের সমুদয় ফল-ফুল উদগীরণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। (ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে,) একটি ডালিম একদল লোকের আহারের জন্যে যথেষ্ট হবে এবং মানুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈরী করে ছায়া লাভ করবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উষ্ট্রীর দুধ একদল লোকের জন্যে, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের জন্যে

মুসনাদ আহ্‌মদ ও আবু দাউদে হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ ঈসা (আঃ) অবতরণের পর চল্লিশ বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে সাত বছরের কথা বলা হয়েছে। "ফতহুল বারী" গ্রন্থে হাফেজ ইবনে-হাজার একে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করে চল্লিশ বছরে মেয়াদকেই শুদ্ধ বলেছেন। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এই দীর্ঘ সময় সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হবে এবং অসংখ্য বরকত প্রকাশ পাবে। পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতার লেশমাত্র থাকবে না। দু'ব্যক্তির মধ্যে কোন সময় ঝগড়া-বিবাদ হবে না।— (মুসলিম ও আহমদ)

বোখারী হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহ্‌র হজ্ব ও ওমরা অব্যাহত থাকবে।— (মাযহারী)

বোখারী ও মুসলিম হযরত যয়নব বিনতে জাহশের রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদিন ঘুম থেকে এমন অবস্থায় জেগে উঠলেন যে, তাঁর মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাভ এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিলঃ

"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।" আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী মিলিয়ে বৃত্ত তৈরী করে দেখান।

হযরত যয়নব (রাঃ) বলেন ঃ একথা শুনে আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমাদের মধ্যে সৎকর্ম পরায়ণ লোক জীবিত থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, ধ্বংস হতে পারে; যদি অনাচারের আধিক্য হয়।— (আল-বেদায়া ওয়ান্নেহায়াহ্) ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে বৃত্ত পরিমাণ ছিদ্র হয়ে যাওয়া আসল অর্থেও হতে পারে এবং রূপক হিসেবে প্রাচীরটি দুর্বল হয়ে যাওয়ার অর্থেও হতে পারে।— (ইবনে কাসীর, আবু হাইয়্যান)

মুসনাদ আহ্‌মদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ ইয়াজুজ- মাজুজ প্রত্যহ যুলকারনাইনের দেয়ালটি খুঁড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা এ লৌহ-প্রাচীরের প্রান্ত সীমার এত কাছাকাছি পৌঁছে যায় যে, অপরপার্শ্বের আলো দেখা যেতে থাকে। কিন্তু তারা এ কথা বলে ফিরে যায় যে, বাকী অংশটুকু আগামী কাল খুঁড়ব। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে নেন। পরের দিন ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে। খননকার্যে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ্ পাক থেকে তা মেরামতের এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্ধ রাখা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা রয়েছে। যেদিন আল্লাহ্ তাআলা ওদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন ওরা মেহনত শেষে বলবে ঃ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমরা আগামীকাল অবশিষ্ট অংশটুকু খুঁড়ে ওপারে চলে যাব। (আল্লাহ্‌র নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তওফীক হয়ে যাবে।) অতএব পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশকে তেমনি অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু খুঁড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে।

এবং একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবারের জন্যে যথেষ্ট হবে। (চল্লিশ বছর যাবত এই অসাধারণ বরকত ও শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকার পর যখন কেয়ামতের সময় সমাগত হবে; তখন) আল্লাহ্ তাআলা একটি মনোরম বায়ু প্রবাহিত করবেন। এর পরশে সব মুসলমানের বগলের নীচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে; শুধু কাফের ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যাবে। তারা ভূপৃষ্ঠে জন্তু-জানোয়ারের মত খোলাখুলি অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কেয়ামত আসবে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে-ইয়াযীদের রেওয়ায়েতে ইয়াজুজ-মাজুজের কাহিনীর আরও অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছে ঃ তবরিয়া উপসাগর অতিক্রম করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বায়তুল-মোকাদ্দাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল-খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবে ঃ আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ্‌র আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে (যাতে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।)

দাজ্জালের কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) রেওয়ায়েতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, দাজ্জাল মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দূরে থাকবে। মদীনার পথসমূহে আসাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে মদীনার নিকটবর্তী একটি লবণাক্ত ভূমিতে আগমন করবে। তখন সমসাময়িক এক মহান ব্যক্তি তার কাছে এসে বলবেন ঃ আমি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বলছি যে, তুই সেই দাজ্জাল, যার সংবাদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে দিয়েছিলেন। (একথা শুনে) দাজ্জাল বলবে ঃ লোক সকল! যদি আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দেই তবে আমি যে খোদা এ ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করবে কি? সবাই উত্তর দেবে ঃ না। অতঃপর সে লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দেবে। লোকটি জীবিত হয়ে দাজ্জালকে বলবেন ঃ এবার আমার বিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে যে, তুই-ই সে দাজ্জাল। দাজ্জাল তাকে পুনরায় হত্যা করতে চাইবে, কিন্তু সমর্থ হবে না।– (মুসলিম)

সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরীর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-কে বলবেন ঃ আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে তুলে আনুন। তিনি আরয করবেন, হে পরওয়ারদেগার, তারা কারা? আল্লাহ্ তাআলা বলবেন ঃ প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী এবং মাত্র একজন জান্নাতী। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম শিউরে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমাদের মধ্যে সে একজন জান্নাতী কে হবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ চিন্তা করো না। এই নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী তোমাদের মধ্য থেকে এক এবং ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এক হাজারের হিসেবে হবে। মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র মানবজাতিকে দশ ভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে নয় ভাগে রয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজের লোক, আর অবশিষ্ট এক ভাগে সারা বিশ্বের মানুষ।– (রূহুল-মা'আনী)

ইবনে-কাসীর "আল-বেদায়া-ওয়ান্নেহায়াহ্" গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করে বলেন ঃ এতে বোঝা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার চাইতে অনেক বেশী হবে।

ইবনে-কাসীর "আল-বেদায়া-ওয়ান্নেহায়াহ্" গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে বলেন ঃ যদি মেনে নেয়া হয় যে, হাদীসের মূল বক্তব্যটি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নয়; বরং কা'ব আহবারের বর্ণনা, তবে এটা যে ধর্তব্য ও নির্ভরযোগ্য নয়, তা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি একে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বক্তব্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর খনন করার কাজটি তখন শুরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হবে। কোরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিদ্র করা যাবে না এটা তখনকার অবস্থা, যখন যুলকারনাইন প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন। কাজেই এতে কোন বৈপরীত্য নেই। তাছাড়া আরো বলা যায় যে, কোরআনে ছিদ্র বলে এপার-ওপার ছিদ্র বোঝানো হয়েছে। হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তাদের এ ছিদ্র এপার-ওপার হবে।- (বেদায়া, ২য় খণ্ড, ১১২ পৃঃ)

হাফেজ ইবনে-হাজার "ফতহুল বারী" গ্রন্থে এই হাদীসটি আবদ ইবনে-হুমায়দ ও ইবনে-হাব্বানের বরাত দিয়েও উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ তাঁরা সবাই হযরত কাতাদাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং কোন কোন হাদীসে সনদের ব্যক্তিবর্গ সহীহ্ বোখারীর ব্যক্তিবর্গ। তিনি হাদীসটি যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তিনি ইবনে-আরাবীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসে তিনটি মু'জেযা রয়েছে। (এক) আল্লাহ্ তাআলা তাদের চিন্তাধারা এদিকে নিবিষ্ট হতে দেননি যে, প্রাচীর খননের কাজ অবিরাম দিবারাত্র অব্যাহত রাখবে। নতুবা দিন ও রাত্রির কর্মসূচী আলাদা নির্ধারণ করে কাজ সমাপ্ত করা এত বড় জাতির পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। (দুই) আল্লাহ্ তাআলা প্রাচীরের উপরে উঠার পরিকল্পনা থেকেও তাদের চিন্তাধারাকে সরিয়ে রেখেছেন। অথচ ওয়াহ্ব ইবনে-মুনাব্বেহ্র রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা কৃষিশিল্পে পারদর্শী ছিল। সব রকম যন্ত্রপাতি তাদের কাছে ছিল। তাদের ভূখণ্ডে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষও ছিল। কাজেই প্রাচীরের উপরে আরোহণ করার উপায় সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। (তিন) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের মনে 'ইনশাল্লাহ্' বলার কথা জাগ্রত হল না। তাদের বের হওয়ার নির্ধারিত সময় আসলেই কেবল তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত হবে।

ইবনে-আরাবী বলেন ঃ এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাস রাখে। এটাও সম্ভব যে, বিশ্বাস ছাড়াই আল্লাহ্ তাআলা তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত করিয়ে দেবেন এবং এর বরকতে তারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করবে। - (আসারাতুস-সায়া, সৈয়দ মুহাম্মদ, ১৫৪ পৃঃ) কিন্তু বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, তাদের কাছেও পয়গম্বরদের দাওয়াত পৌঁছেছে। নতুবা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের জাহান্নামের শাস্তি না হওয়াই উচিত। কোরআন বলে ঃ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا এতে বোঝা যায় যে, তারাও ঈমানের দাওয়াত লাভ করেছে। কিন্তু তারা কুফরকে আঁকড়ে রেখেছে। তাদের কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাসী হবে। তবে রেসালত ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু এতটুকু বিশ্বাসই ঈমানের জন্যে যথেষ্ট নয়। মোটকথা, ইনশাল্লাহ্ কলেমা বলার পরও কুফরের অস্তিত্ব থাকতে পারে।

হাদীসসমূহের বর্ণনা থেকে অর্জিত ফলাফল ঃ উল্লেখিত হাদীসসমূহে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে নিম্নলিখিত বিষয়াদি প্রমাণিত হয়েছে ঃ

(১) ইয়াজুজ-মাজুজ সাধারণ মানুষের মতই মানুষ এবং নূহ (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততি। অধিকাংশ হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদগণ তাদেরকে ইয়াফেস ইবনে নূহের বংশধর সাব্যস্ত করেছেন। একথাও বলাবাহুল্য যে, ইয়াফেসের বংশধর নূহ (আঃ)-এর আমল থেকে যুলকারনাইনের আমল পর্যন্ত দূর-দূরান্তরে বিভিন্ন গোত্রে ও বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেসব সম্প্রদায়ের নাম ইয়াজুজ-মাজুজ, জরুরী নয় যে, তারা সবাই যুলকারনাইনের প্রাচীরের ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের কিছু গোত্র ও সম্প্রদায় প্রাচীরের এপারেও থাকতে পারে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজ শুধু তাদেরই নাম, যারা বর্বর, অসভ্য ও রক্তপিপাসু, যালেম। মোগল, তুর্কী অথবা মঙ্গোলীয় জাতি যারা সভ্যতা লাভ করেছে, তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা নামের বাইরে।

(২) ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার চাইতে অনেক গুণ বেশী, কমপক্ষে এক ও দশের ব্যবধান। - (২নং হাদীস)

(৩) ইয়াজুজ-মাজুজের যেসব সম্প্রদায় ও গোত্র যুলকারনাইনের প্রাচীরের কারণে ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে, তারা কেয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত এভাবেই আবদ্ধ থাকবে। তাদের বের হওয়ার সময় মেহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাব, অতঃপর দাজ্জালের আগমনের পরে হবে, যখন ঈসা (আঃ) অবতরণ করে দাজ্জালের নিধন কার্য সমাপ্ত করবেন। - (১নং হাদীস)

(৪) ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্ত হওয়ার সময় যুলকারনাইনের প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে সমতলভূমির সমান হয়ে যাবে। - (কোরআন) তখন ইয়াজুজ-মাজুজের অগণিত লোক একযোগে পর্বতের উপর থেকে অবতরণের সময় দ্রুতগতির কারণে মনে হবে যেন তারা পিছলে পিছলে নীচে গড়িয়ে পড়ছে। এই অপরিসীম বর্বর মানবগোষ্ঠীর সাধারণ জনবসতি ও সমগ্র পৃথিবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজের মোকাবেলা করার সাধ্য কারও থাকবে না। আল্লাহ্র রসূল হযরত ঈসা (আঃ) ও আল্লাহ্র আদেশে মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে তূর পর্বতে আশ্রয় নেবেন এবং যেখানে যেখানে কেল্লা ও সংরক্ষিত স্থান থাকবে, সেখানেই আত্মগোপন করে প্রাণ রক্ষা করবেন। পানাহারের রসদ-সামগ্রী নিঃশেষ হওয়ার পর জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে যাবে। এই বর্বর জাতি অবশিষ্ট জনবসতিকে খতম করে দেবে এবং নদ-নদীর পানি নিঃশেষে পান করে ফেলবে।— (১নং হাদীস)

(৫) হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরই দোয়ায় এই পঙ্গপাল সদৃশ অগণিত লোক নিপাত হয়ে যাবে। তাদের মৃতদেহ সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং দুর্গন্ধের কারণে পৃথিবীতে বাস করা দুরূহ হয়ে পড়বে।— (১নং হাদীস)

(৬) অতঃপর ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরই দোয়ায় তাদের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত অথবা অদৃশ্য করে দেয়া হবে এবং বিশ্বব্যাপী বৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে ধুয়ে পাক-সাফ করা হবে।— (১নং হাদীস)

(৭) এরপর প্রায় চল্লিশ বছর পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ভূপৃষ্ঠ তার বরকতসমূহ উদগীরণ করে দেবে। কেউ দরিদ্র থাকবে না এবং কেউ কেউকে বিব্রত করবে না। সর্বত্রই শান্তি ও সুখ বিরাজ

করবে।— (৩ নং হাদীস)

(৮) শান্তি ও শৃঙ্খলার সময় কা'বা গৃহের হজ্জ্ব ও ওমরাহ্ অব্যাহত থাকবে। (৪নং হাদীস)

হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওফাত হবে এবং তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রওজা মোবারকে সমাহিত হবেন। অর্থাৎ, তিনি হজ্জ্ব ও ওমরার উদ্দেশেই হেজায সফর করার সময় ওফাত পাবেন।— (মুসলিম)

(৯) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবনের শেষভাগে স্বপ্ন-ওহীর মাধ্যমে তাঁকে দেখানো হয় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরে একটি ছিদ্র হয়ে গেছে। তিনি একে আরবদের ধ্বংস ও অবনতির লক্ষণ বলে সাব্যস্ত করেন। প্রাচীরে ছিদ্র হয়ে যাওয়াকে কেউ কেউ প্রকৃত অর্থেও নিয়েছেন এবং কেউ কেউ রূপক অর্থে বোঝাছেন যে, প্রাচীরটি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, ইয়াজুজ-মাজুজের বের হওয়ার সময় নিকটে এসে গেছে এবং এর আলামত আরব জাতির অধঃপতনরূপে প্রকাশিত হবে। والله اعلم

(১০) হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণের পর পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন।— (৩নং হাদীস) তাঁর পূর্বে হযরত মাহ্দী (আঃ)-এর অবস্থানকাল চল্লিশ বছর হবে। তন্মধ্যে কিছুকাল হবে উভয়ের সহযোগিতায়। সৈয়দ শরীফ বরযঞ্জী "আসারাতুসসায়াহ্" গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় লেখেন ঃ দাজ্জালের হত্যা ও শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঈসা (আঃ) চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন এবং তাঁর মোট অবস্থানকাল হবে পঁয়তাল্লিশ বছর। ১১২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ঃ হযরত মাহ্দী (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ)-এর ত্রিশের উপর কয়েক বছর আগে আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর মোট অবস্থানকাল হবে চল্লিশ বছর। এভাবে পাঁচ অথবা সাত বছর পর্যন্ত উভয়ে একত্রে বসবাস করবেন। এই উভয়কালের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ন্যায় ও সুবিচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ভূপৃষ্ঠ তার সব বরকত ও গুপ্তধন উদগীরণ করে দেবে। কেউ ফকীর-মিসকীন থাকবে না। পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার লেশমাত্র থাকবে না। অবশ্য মেহদী (আঃ)-এর শেষ আমলে দাজ্জাল এসে মক্কা, মদীনা বায়তুল-মোকাদ্দাস ও তূর পর্বত ব্যতীত সর্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ফেৎনা ছড়িয়ে দেবে। এই ফেৎনাটি হবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফেৎনা। দাজ্জালের অবস্থান ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা মাত্র চল্লিশ দিন স্থায়ী হবে। তন্মধ্যে প্রথম দিন এক বছরের, দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে সাধারণ দিনেরই মত। এখানে প্রকৃতপক্ষেই দিনগুলো এমন দীর্ঘ করে দেয়া যেতে পারে। কেননা, শেষযুগে প্রায় সব ঘটনাই অভ্যাস বিরুদ্ধ ঘটবে। এমনও সম্ভব যে, দিন তো প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিকই থাকবে, কিন্তু হাদীস থেকে জানা যায় যে, দাজ্জাল হবে অসাধারণ যাদুকর। কাজেই তার যাদুর প্রভাবে দিবারাত্রির পরিবর্তন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ধরা না-ও পড়তে পারে। তারা একে একই দিন দেখবে ও মনে করবে। হাদীসে সে দিনে সাধারণ দিন অনুযায়ী অনুমান করে নামায পড়ার আদেশ বর্ণিত রয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, প্রকৃতপক্ষে দিবারাত্র পরিবর্তিত হতে থাকবে, কিন্তু মানুষ তা অনুভব করবে না। তাই এই এক বছরের দিনে তিনশ' ষাট দিনের নামায আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নতুবা দিনটি প্রকৃতপক্ষে একদিন হলে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী তাতে একদিনের নামাযই ফরয হত। মোটকথা, দাজ্জালের মোট অবস্থানকাল এমনি ধরনের চল্লিশ দিন হবে।

এরপর হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করার মাধ্যমে তার ফেৎনারও অবসান ঘটাবেন। কিন্তু এর সাথে সাথেই ইয়াজুজ-মাজুজও বের হবে। তারা ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র হত্যা ও লুটতরাজ করবে। তাদের অবস্থানকালও কয়েকদিন মাত্র হবে। এরপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর দোয়ায় তারা সবাই একযোগে মারা যাবে। মোটকথা, হযরত মেহদীর আমলের শেষভাগে এবং ঈসা (আঃ)-এর আমলের শুরুভাগে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের দু'টি ফেৎনা সংঘটিত হবে। এগুলো সারা বিশ্বের মানুষকে তছনছ করে দেবে। এই কয়েকদিন পূর্বে এবং পরে সমগ্র বিশ্বে ন্যায় এবং সুবিচার, শান্তি ও বরকত এবং ফল ও শস্যের অভূতপূর্ব আধিক্য হবে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর আমলে ইসলাম ব্যতীত কোন কলেমা ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না, কোন দীন-দুঃখী থাকবে না। হিংস্র এবং বিষাক্ত জীব-জন্তুও একে অপরকে কষ্ট দেবে না।

ইয়াজুজ-মাজুজ ও যুলকারনাইনের প্রাচীর সম্পর্কিত এসব তথ্য কোরআন ও হাদীসে উম্মতকে অবহিত করেছে। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা জরুরী এবং বিরোধিতা করা নাজায়েয। যুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত? ইয়াজুজ-মাজুজ কোন্ জাতি? তারা কোথায় বসবাস করে? এসব ভৌগোলিক আলোচনার উপর ইসলামের কোন আকীদা বিশ্বাস এবং কোরআনের কোন আয়াতের মর্ম ও ব্যাখ্যা নির্ভরশীল নয়। এতদসত্ত্বেও বিরোধী পক্ষের আবোল-তাবোল বকাবকির জওয়াব এবং অতিরিক্ত জ্ঞান লাভের উদ্দেশে আলেমরা এগুলো সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এ আলোচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

কুরতুবী স্বয়ং তফসীর গ্রন্থে সুদ্দীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের বাইশটি গোত্রের মধ্য থেকে একুশটি গোত্রকে যুলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। একটি গোত্র প্রাচীরের এপারে রয়ে গেছে। আর সে গোত্রটি হল তুর্ক। এরপর কুরতুবী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তুর্কদের সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে খাপ খায়। শেষ যমানায় তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের কথা ছহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। অতঃপর কুরতুবী বলেনঃ বর্তমান সময় তুর্ক জাতির বিপুল সংখ্যক লোক মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্যে অগ্রসরমান। তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। তিনিই মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচাতে পারেন। মনে হয় যেন তারাই ইয়াজুজ-মাজুজের অথবা কমপক্ষে তাদের অগ্রসেনাদল।— (কুরতুবী, একাদশ খণ্ড, ৫৮ পৃঃ) কুরতুবীর সময়কাল ষষ্ঠ হিজরী। তখন তাতারীদের ফেৎনা প্রকাশ পায় এবং তারা ইসলামী খেলাফতকে তছনছ করে দেয়। ইসলামী ইতিহাসে তাদের এই ফেৎনা সুবিদিত। তাতারীরা যে মোগল তুর্কদের বংশধর; তাও প্রসিদ্ধ।) কিন্তু কুরতুবী তাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজের সমতুল্য এবং অগ্রসেনাদল সাব্যস্ত করেছেন। তাদের ফেৎনাকে ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব বলেননি, যা কেয়ামতের অন্যতম আলামত। কেননা, মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের পর তাঁর আমলে ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হবে।

এ কারণেই আল্লামা আলুসী তফসীর রূহুল-মা'আনীতে যারা তাতারীদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ সাব্যস্ত করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ এরূপ ধারণা করা প্রকাশ্য রকমের পথভ্রষ্টতা এবং হাদীসের বর্ণনার সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ। তবে তিনিও বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে তাতারীদের ফেৎনা ইয়াজুজ-মাজুজের ফেৎনার সমতুল্য। -(১৬শ খণ্ড, ৪৪ পৃঃ) বর্তমান যুগে কিছুসংখ্যক ইতিহাসবিদ

বর্তমান রাশিয়া অথবা চীন অথবা উভয়কেই ইয়াজুজ-মাজুজ সাব্যস্ত করেন। তাদের উদ্দেশ্য যদি কুরতুবী ও আলুসীর মতই হয় যে, তাদের ফেৎনা ইয়াজুজ-মাজুজের ফেৎনার সমতুল্য, তবে তা ভ্রান্ত হবে না। কিন্তু তাঁরা যদি তাদেরকেই কেয়ামতের আলামতরূপে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হিসেবে সাব্যস্ত করেন, যার সময় ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের পরে বলা হয়েছে, তবে তা নিশ্চিতই ভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা ও হাদীসের বর্ণনার বিরুদ্ধাচরণ হবে।

খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় সপ্ত ভূখণ্ডের মধ্য থেকে ষষ্ঠ ভূখণ্ডের আলোচনায় ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারনাইনের প্রাচীর এবং তাদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণজনিত নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছেন ঃ

সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে পশ্চিমদিকে তুর্কীদের কাঞ্চাক ও চর্কস নামে অভিহিত গোত্রসমূহ বসবাস করে এবং পূর্বদিকে ইয়াজুজ-মাজুজের বসতি বিদ্যমান। তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে ককেশাস পর্বতমালা অবস্থিত। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই পর্বতমালা চতুর্থ ভূখণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু হয়ে এই ভূখণ্ডেরই শেষ উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর ভূমধ্য সাগর থেকে পৃথক হয়ে উত্তর-পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হয়ে পঞ্চম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ লাভ করেছে। এখান থেকে তা আবার প্রথমদিকে মোড় নিয়েছে এবং সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ করেছে। এখানে পৌঁছে তা দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম হয়ে চলে গেছে। এই পর্বতমালার মাঝখানে সিকান্দরী প্রাচীর অবস্থিত, আমরা এইমাত্র যার উল্লেখ করেছি এবং কোরআনও যার সংবাদ দিয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে খরদাযবাহ্ স্বীয় ভূগোল গ্রন্থে আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ্‌র একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, প্রাচীর খুলে গেছে। এতে তিনি অস্থির হয়ে উঠে বসেন এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে তাঁর মুখপাত্র সালামকে প্রেরণ করেন। সে ফিরে এসে এই প্রাচীরের অবস্থা বর্ণনা করে।— (ইবনে খলদুনের 'মুকাদ্দামা' ৭৯ পৃঃ)

আব্বাসী খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহ্ কর্তৃক যুলকারনাইনের প্রাচীর পর্যবেক্ষণের জন্যে একটি দল প্রেরণ করা এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে ফিরে আসার কথা ইবনে-কাসীরও "আল-বেদায়া ওয়ান্নেহায়াহ্" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, এই প্রাচীর লৌহনির্মিত। এতে বড় বড় তালাবদ্ধ দরজাও আছে এবং একটি উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। তফসীর কবীর ও তাবারী এই ঘটনা বর্ণনা করে লিখেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই প্রাচীর পরিদর্শন করে ফিরে আসতে চায়, গাইড তাকে এমন লতা-পাতা বিহীন প্রান্তরে পৌঁছে দেয়, যা সমরখন্দের বিপরীত দিকে অবস্থিত। - (তফসীর কবীর, ৫ম খণ্ড ৫১ পৃঃ)

শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহঃ) "আকীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতে ঈসা (আঃ)" গ্রন্থে ইয়াজুজ-মাজুজ ও যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যতটুকু বর্ণনা করেছেন তা অনুসন্ধান ও রেওয়ায়েতের মাপকাঠিতে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের। তিনি বলেন ঃ দুষ্কৃতকারী ও বর্বর মানুষদের লুন্ঠন থেকে আত্মরক্ষার জন্যে পৃথিবীতে এক নয়— বহু জায়গায় প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন বাদশাহগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করেছেন। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রসিদ্ধ হচ্ছে চীনের প্রাচীর। এর দৈর্ঘ্য আবু হাইয়্যান আন্দালুসী (ইরানের শাহী দরবারের ঐতিহাসিক) বার শ' মাইল বর্ণনা করেছেন। এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন চীন সম্রাট 'ফগফুর'। এর নির্মাণের তারিখ আদম (আঃ)-এর অবতরণের তিন হাজার চার শ' ষাট বছর পর বর্ণনা করা হয়। এই চীন প্রাচীরকে মোগলরা "আনকূদাহ্" এবং তুর্কীরা "বুরকূরকা" বলে থাকে। তিনি আরও বলেন ঃ এমনি ধরনের আরও কয়েকটি প্রাচীর বিভিন্ন স্থানে পরিদৃষ্ট হয়।

মওলানা হিফজুর রহমান সিহওয়ারী (রহঃ) কাসাসুল কোরআনে বিস্তারিতভাবে শাহ্ সাহেবের উপরোক্ত বর্ণনার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছে। এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

ইয়াজুজ-মাজুজের লুন্ঠন ও ধ্বংসকাণ্ড সাধনের পরিধি বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। একদিকে ককেশিয়ার পাদদেশে বসবাসকারীরা তাদের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার ছিল এবং অপরদিকে তিব্বত ও চীনের অধিবাসীরাও ছিল সর্বক্ষণ তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। এই ইয়াজুজ-মাজুজের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে একাধিক প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধ প্রাচীর হচ্ছে চীনের প্রাচীর। উপরে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রাচীর মধ্য-এশিয়ার বুখারা ও তিরমিযের নিকটে অবস্থিত। এর অবস্থানস্থলের নাম দরবন্দ। এই প্রাচীরটি খ্যাতনামা মোগল সম্রাট তৈমুরের আমলে বিদ্যমান ছিল। রোম সম্রাটের বিশেষ সভাসদ সীলা বর্জর জর্মেনীও তার গ্রন্থে এর কথা উল্লেখ করেছেন। আন্দালুসের সম্রাট কাস্টাইলের দূত ক্ল্যাফছুও তার ভ্রমণ কাহিনীতে এর উল্লেখ করেছেন। ১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি সম্রাটের দূত হিসেবে তৈমুরের দরবারে পৌঁছেন, তখন এ স্থান অতিক্রম করেন। তিনি লিখেন ঃ বাবুল হাদীদের প্রাচীর মুসেলের ঐ পথে অবস্থিত, যা সমরখন্দ ও ভারতের মধ্যস্থলে বিদ্যমান।— (তফসীরে জওয়াহেরুল-কোরআন, তানতাভী, ৯ম খণ্ড, ১৯৮পৃঃ)

তৃতীয় প্রাচীর রাশিয়ান এলাকা দাগিস্তানে অবস্থিত। এটিও দরবন্দ ও বাবুল আবওয়াব নামে খ্যাত। ইয়াকুত হমভী 'মুজামুল বুলদানে', ইদরীসী 'জুগরাফিয়া'য় এবং বুস্তানী দায়েরাতুল মাআরিফে' এর অবস্থা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

দাগিস্তানে দরবন্দ রাশিয়ার একটি শহর। শহরটি কাম্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এটি ৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৪৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৫° পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৪৮° ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। একে দরবন্দে নওশেরওয়াঁ নামেও অভিহিত করা হয়। তবে বাবুল-আবওয়াব নামে তা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

চতুর্থ প্রাচীর বাবুল-আবওয়াব থেকে পশ্চিম দিকে ককেশিয়ার সুউচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। সেখানে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে দারিয়াল নামে একটি প্রসিদ্ধ গিরিপথ রয়েছে। এই চতুর্থ প্রাচীরটি এখানে কাফকায অথবা জাবালে-কোফা অথবা কাফ পর্বতমালার প্রাচীর নামে খ্যাত। বুস্তানী এ সম্পর্কে বলেন ঃ

এবং এরই (অর্থাৎ, বাবুল-আবওয়াব প্রাচীরের) নিকটে আরও একটি প্রাচীর রয়েছে, যা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। সম্ভবতঃ পারস্যবাসীরা উত্তরাঞ্চলীয় বর্বরদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এটি নির্মাণ করেছে। এর নির্মাতা সম্পর্কে সঠিক ও বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা জানা যায়নি। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কেউ কেউ একে সিকান্দরের প্রতি, কেউ কেউ পারস্য সম্রাট নওশেরওয়াঁর প্রতি এর সম্বন্ধ নির্দেশ করেছে। ইয়াকূত বলেন ঃ গলিত তামা দ্বারা এটি নির্মিত হয়েছে।— (দায়েরাতুল-মা'আরিফ ৭ম খণ্ড, ৬৫ পৃঃ)

এসব প্রাচীর সবগুলোই উত্তরদিকে অবস্থিত এবং প্রায় একই উদ্দেশে নির্মিত হয়েছে। তাই এগুলোর মধ্যে যুলকারনাইনের প্রাচীর কোন্‌টি, তা নির্ণয় করা কঠিন। শেষোক্ত দু'টি প্রাচীরের ব্যাপারেই অধিক মতভিন্নতা দেখা দিয়েছে। কেননা, উভয়স্থানের নাম দরবন্দ এবং উভয়স্থলে প্রাচীরও বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখিত চারটি প্রাচীরের মধ্যে সবচাইতে বড় ও সবচাইতে প্রাচীন চীনের প্রাচীর যুলকারনাইনের প্রাচীর নয়, এ বিষয়ে সবাই একমত। এটি উত্তরদিকে নয়— দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত। কোরআন পাকের ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরটি উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত।

এখন উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত তিনটি প্রাচীর সম্পর্কিত পর্যালোচনা বাকী রয়ে গেল। তন্মধ্যে মাসউদী, ইসতাখরী, হমভী প্রমুখ ইতিহাসবিদ সাধারণভাবে সে প্রাচীরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেন, যা দাগিস্তান অথবা ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দ নামক স্থানে কাস্পিয়ানের তীরে অবস্থিত। বুখারা ও তিরমিযির দরবন্দে অবস্থিত প্রাচীরকে যারা যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেছেন, তারা সম্ভবতঃ দরবন্দ নাম দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। এখন যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ, দু'টি প্রাচীরের মধ্যে ব্যাপার সীমিত হয়ে গেছে। (এক) দাগিস্থান ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দের প্রাচীর এবং (দুই) আরও উচ্চে কাফকায অথবা কাফ অথবা ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীর ঃ উভয়স্থানে প্রাচীরের অস্তিত্ব ইতিহাসবিদদের কাছে প্রমাণিত রয়েছে।

হযরত মওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহঃ) "আকীদাতুল ইসলাম" গ্রন্থে উভয় প্রাচীরের মধ্য থেকে ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এটিই যুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর।

যুলকারনাইনের প্রাচীর এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে, না ভেঙ্গে গেছে ঃ ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিশেষজ্ঞরা আজকাল উপরোক্ত প্রাচীরসমূহের কোনটির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তারা একথাও স্বীকার করেন না যে, ইয়াজুজ-মাজুজের পথ অদ্যাবধি বন্ধ রয়েছে। এরই ভিত্তিতে কোন কোন মুসলমান ইতিহাসবিদও একথা বলতে লিখতে শুরু করেছেন যে, কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজ বহু পূর্বেই বের হয়ে গেছে। কেউ কেউ হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঝটিকার বেগে উত্থিত তাতারীদেরকেই এর নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বর্তমান যুগের পরাশক্তি রাশিয়া, চীন ও ইউরোপীয়দেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলে দিয়ে ব্যাপারটি সাঙ্গ করে দিয়েছেন। কিন্তু উপরের রূহুল মা'আনীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সহীহ্ হাদীসসমূহ অস্বীকার করা ছাড়া কেউ একথা বলতে পারে না। কোরআন পাক ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থানকে কেয়ামতের আলামত হিসেবে বর্ণনা করেছে। নাওয়াস ইবনে সামআন প্রমুখ বর্ণিত সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনাটি ঘটবে দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ ও দাজ্জাল হত্যার পরে। দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ যে আজো পর্যন্ত হয়নি, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে যুলকারনাইনের প্রাচীর বর্তমানে ভেঙ্গে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের কোন কোন গোত্র এপারে চলে এসেছে— একথা বলাও কোরআন ও হাদীসের কোন সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী নয়— যদি মেনে নেয়া হয় যে, তাদের সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণতকারী সর্বশেষ ও সর্বধ্বংসী হামলা এখনও হয়নি ; বরং তা উপরে বর্ণিত দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের পরে হবে।

এ ব্যাপারে হযরত ওস্তাদ আল্লামা কাশ্মীরী (রহঃ)-এর সুচিন্তিত বক্তব্য এই ঃ ইউরোপীয়দের এ বক্তব্যের কোন গুরুত্ব নেই যে, তারা সমগ্র ভূপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে যে, কোথাও এই প্রাচীরের অস্তিত্ব নেই। কেননা, স্বয়ং তাদেরই এ ধরনের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যে, পর্যটন ও অন্বেষণের উচ্চতম শিখরে পৌঁছা সত্ত্বেও অনেক অরণ্য, সমুদ্র ও দ্বীপ সম্পর্কে তারা অদ্যাবধি জ্ঞানলাভ করতে পারেনি। এ ছাড়া এরূপ সম্ভাবনাও দূরবর্তী নয় যে, কথিত প্রাচীরটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পাহাড়সমূহের পতন ও পারস্পরিক সংযুক্তির কারণে তা একটি পাহাড়ের আকার ধারণ করে ফেলেছে। কেয়ামতের পূর্বে প্রাচীরটি ভেঙ্গে যাবে অথবা দূরবর্তী পথ ধরে ইয়াজুজ-মাজুজের কিছু গোত্র এসে যাবে—কোরআন ও হাদীসের কোন অকাট্য প্রমাণ এ বিষয়েরও পরিপন্থী নয়।

যুলকারনাইনের প্রাচীর কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে— এর পক্ষে বড় প্রমাণ হচ্ছে কোরআন পাকের আয়াত— فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ অর্থাৎ, যুলকারনাইনের এই উক্তি যে, যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি এসে যাবে (অর্থাৎ, ইয়াজুজ-মাজুজের বেরিয়ে আসার সময় হবে,) তখন আল্লাহ্ তাআলা এই লৌহ প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ করে ভূমিসাৎ করে দেবেন। এ আয়াতে وَعْدُ رَبِّي (আমার পালনকর্তার ওয়াদা) এর অর্থ কেয়ামত নেয়া হয়েছে। অথচ কোরআনের ভাষ্য এই অর্থ অকাট্য নয়; বরং এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যুলকারনাইন ইয়াজুজ-মাজুজের পথ রুদ্ধ করার যে ব্যবস্থা করেছে, তা সদাসর্বদা যথাযথ থাকা জরুরী নয়। যখন আল্লাহ্ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজের পথ খুলে দেয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন এই প্রাচীর বিধ্বস্ত ও ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। এটা কেয়ামতের একান্ত নিকটবর্তী সময়ে হওয়াই জরুরী নয়। সেমতে সব তফসীরবিদই وَعْدُ رَبِّي এর অর্থে উভয় সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতে বলা হয়েছে ঃ

والوعد يحتمل ان يرادبه يوم القيامة وان يرادبه وقت خروج ياجوج وماجوج -

এটা এভাবেও হতে পারে যে, প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে রাস্তা এখনই খুলে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের আক্রমণের সূচনা হয়ে গেছে। ষষ্ঠ হিজরীর তাতারী ফেৎনাকে এর সূচনা সাব্যস্ত করা হোক কিংবা ইউরোপ, রাশিয়া ও চীনের আধিপত্যকে সাব্যস্ত করা হোক। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এসব সভ্য জাতির আবির্ভাব ও এদের সৃষ্ট ফেৎনাকে কোরআন হাদীসে বর্ণিত ফেৎনা আখ্যা দেয়া যায় না। কারণ, তাদের আবির্ভাব আইন ও কানুনের পন্থায় হচ্ছে। কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত সেই ফেৎনা এমন অকৃত্রিম হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ রক্তপাতের মাধ্যমে হবে, যা পৃথিবীর গোটা জনমণ্ডলীকেই ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে। বরং এর সারমর্ম আবার এই দাঁড়ায় যে, দুষ্কৃতকারী ইয়াজুজ-মাজুজেরই কিছু গোত্র এপারে এসে সভ্য হয়ে গেছে। তারাই ইসলামী দেশসমূহের জন্যে নিঃসন্দেহে বিরাট ফেৎনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজের সেসব বর্বর গোত্র হত্যা ও রক্তপাত ছাড়া কিছুই জানে না, তারা এখন পর্যন্ত আল্লাহর বাণীর তফসীর অনুযায়ী এপারে আসেনি। সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই হবে বেশী।

তাদের আবির্ভাব কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে।

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিরমিযী ও মুসনাদ আহমদের একটি হাদীস। তাতে উল্লেখিত রয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যহই প্রাচীরটি খনন করে। প্রথমতঃ এই হাদীসটি ইবনে কাসীরের মতে معلول দ্বিতীয়তঃ এতেও এ বিষয়ের বর্ণনা নেই যে, ইয়াজুজ-মাজুজ যেদিন 'ইনশাল্লাহ্' বলার বরকতে প্রাচীরটি অতিক্রম করবে, সেদিনটি কেয়ামতের কাছাকাছিই হবে। এই হাদীসে এ বিষয়েরও কোন প্রমাণ নেই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের গোটা জাতি এই প্রাচীরের পাশ্চাতে আবদ্ধ থাকবে। কাজেই তাদের কিছু দল অথবা গোত্র হয়তো দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে এপারে এসে গেছে। আজকালকার শক্তিশালী সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কোন কোন ইতিহাসবিদ একথাও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজ দীর্ঘ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে এপারে আসার পথ পেয়ে গেছে। উপরোক্ত হাদীস এর পরিপন্থী নয়।

মোটকথা; কোরআন ও হাদীসে এরূপ কোন প্রকাশ্য ও অকাট্য প্রমাণ নেই যে, যুলকারনাইনের প্রাচীর কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে অথবা কেয়ামতের পূর্বে এপারের মানুষের উপর তাদের প্রারম্ভিক ও মামুলী আক্রমণ হতে পারবে না। তবে তাদের চূড়ান্ত, ভয়াবহ ও সর্বনাশা আক্রমণ কেয়ামতের পূর্বে সেই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা ইতিপূর্বে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। মূলকথা এই যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর ভেঙ্গে রাস্তা খুলে গেছে বলে যেমন অকাট্য ফয়সালা করা যায় না; তেমনি একথাও বলা যায় না যে, প্রাচীরটি কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকা জরুরী। উভয়দিকেরই সম্ভাবনা রয়েছে। والله اعلم بحقيقة الحال

بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ - بعضهم এর সর্বনাম দ্বারা বাহ্যতঃ ইয়াজুজ-মাজুজকেই বোঝানো হয়েছে। তাদের একদল অপরদলের মধ্যে ঢুকে পড়বে— বাহ্যতঃ এই অবস্থা তখন হবে, যখন তাদের পথ খুলে যাবে এবং তারা পাহাড়ের উচ্চতা থেকে দ্রুতবেগে নীচে অবতরণ করবে। তফসীরবিদগণ অন্যান্য সম্ভাবনাও লিখেছেন।

فَجَمَعْنٰهُمْ এর সর্বনাম দ্বারা সাধারণ জিন ও মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের মাঠে সমগ্র জিন ও মানবজাতিকে একত্রিত করা হবে।

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ

তফসীর বাহরে-মুহীতে বর্ণিত আছে যে, এক্ষেত্রে বাক্য উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, فيجد بهم نفعا وينتفعون بذلك الاتخاذ উদ্দেশ্য এই যে, এসব কাফেররা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছে; তারা কি মনে করে যে, একাজ তাদেরকে উপকৃত করবে এবং এ দ্বারা তাদের কিছুটা কল্যাণ হবে? এই জিজ্ঞাসা অস্বীকারবোধক। অর্থাৎ, এরূপ মনে করা ভ্রান্তি ও মূর্খতা।

عِبَادِيْ (আমার দাস) বলে এখানে ফেরেশতা এবং সেসব পয়গম্বর গণকে বোঝানো হয়েছে দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য ও আল্লাহ্র শরীকরূপে স্থির করা হয়েছে; যেমন হযরত ওযায়ের ও ঈসা (আঃ)। কিছুসংখ্যক আরব ফেরেশতাদেরও উপাসনা করত, পক্ষান্তরে ইহুদীরা ওযায়ের (আঃ)-কে এবং খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্র শরীকরূপে গ্রহণ করেছে। তাই আয়াতে الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا বলে কাফেরদের এসব দলকেই বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এখানে "আমার বান্দা" অর্থ নিয়েছেন শয়তান। সুতরাং الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا এর অর্থ হবে যারা শয়তান ও জিনের উপাসনা করে। কেউ কেউ "আমার বান্দা" অর্থ ও সৃজিত এবং মালিকানাধীন বস্তু গ্রহণ করে একে ব্যাপকাকার করে দিয়েছেন। ফলে আগুন, মূর্তি, তারকা ইত্যাদি মিথ্যা উপাস্যও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তফসীরের সারসংক্ষেপে এ অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাহ্‌রে-মুহীত প্রভৃতি গ্রন্থে প্রথম তফসীরকেই প্রবল সাব্যস্ত করা হয়েছে।

اَوْلِيَآءَ এটি ولى এর বহুবচন। আরবী ভাষায় এ শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে এর অর্থ কার্যনির্বাহী, অভাব পূরণকারী, যা সত্য উপাস্যের বিশেষ গুণ। উদ্দেশ্য, তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা।

بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا এখানে প্রথম দুই আয়াত এমন ব্যক্তি ও দলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যারা কোন কোন বিষয়কে সৎ মনে করে তাতে পরিশ্রম করে। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে তাদের সে পরিশ্রম বৃথা এবং সে কর্মও নিষ্ফল। কুরতুবী বলেন, এ অবস্থা দু'টি কারণে সৃষ্টি হয়। (এক) ভ্রান্তবিশ্বাস এবং (দুই) লোক দেখানো মনোবৃত্তি। অর্থাৎ, সব বিশ্বাস ও ঈমান ঠিক নয়, সে যত ভাল কাজই করুক, যত পরিশ্রমই করুক, পরকালে সবই বৃথা ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হবে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্যে লোক দেখানো মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করে সে-ও তার সে কাজের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। এই ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে কোন কোন সাহাবী খারেজী সম্প্রদায়কে এবং কোন কোন তফসীরবিদ মু'তাযেলা, রাওয়াফেয ইত্যাদি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়কে আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এখানে সেসব কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী এবং কেয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে। اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ

তাই কুরতুবী, আবু হাইয়্যান, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এখানে প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সেসব কাফের সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ্,কেয়ামত ও হিসাব-কিতাব অস্বীকার করে। কিন্তু বাহ্যতঃ তারাও এর ব্যাপক অর্থের সাথে সম্পর্কহীন হতে পারে না, যাদের অপবিশ্বাস তাদের কর্মকে বরবাদ ও পরিশ্রম নিষ্ফল করে দেয়। হযরত আলী ও সা'দ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী থেকে এ ধরনের উক্তি বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী)

فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا অর্থাৎ, তাদের আমল বাহ্যতঃ বিরাট বলে দেখা যাবে, কিন্তু হিসাবের দাঁড়ি-পাল্লায় তার কোন ওজন হবে না। কেননা, কুফর ও শিরকের কারণে তাদের আমল নিষ্ফল ও গুরুত্বহীন হয়ে যাবে।

বোখারী ও মুসলিমে আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত মতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন জনৈক দীর্ঘদেহী স্থূলকায় ব্যক্তি আসবে, আল্লাহ্র কাছে মাছির ডানার সমপরিমাণও তার ওজন হবে না। অতঃপর তিনি বলেন, যদি এর সমর্থন চাও, তবে কোরআনের এই আয়াত পাঠ কর ঃ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন এমন এমন কাজকর্ম করা হবে, যেগুলো স্থূলতার দিক দিয়ে মদীনার পাহাড়সমূহের

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

سورة مريم مكية وهي ثمان وتسعون آية وست ركوعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

كهيعص ﴿١﴾ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١١﴾

(১১০) বলুন ঃ আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে।

সূরামারইয়াম

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৯৮

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

(১) কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। (২) এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি, (৩) যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে। (৪) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে; বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে; হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফলমনোরথ হইনি। (৫) আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। (৬) সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব-বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন সন্তোষজনক। (৭) হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করিনি। (৮) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা কেমন করে আমার পুত্র হবে অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা, আর আমিও যে বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত। (৯) তিনি বললেন ঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেন ঃ এটা আমার পক্ষে সহজ। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না। (১০) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন ঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না। (১১) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্কে স্মরণ করতে বলল ঃ

সমান হবে, কিন্তু ন্যায়বিচারের দাঁড়ি-পাল্লায় কোন ওজনই থাকবে না।

جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ - فردوس এর অর্থ সবুজে ঘেরা উদ্যান। এটি আরবী শব্দ, না অনারব এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যারা অনারব বলেন, তারাও ফারসী রোমী, না সুরইয়ানী ইত্যাদি সম্পর্কে নানা মত পোষণ করেন।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা যখন আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা কর, তখন জান্নাতুল-ফেরদাউসের প্রার্থনা কর। কেননা, এটা জান্নাতের সর্বোৎকৃষ্ট স্তর। এর উপরেই আল্লাহ্র আরশ এবং এখান থেকেই জান্নাতের সব নহর প্রবাহিত হয়েছে।— (কুরতুবী)

لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের এ স্থানটি তাদের জন্য অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নেয়ামত। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা এ আদেশ জারি করে দেবেন, যে জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে কখনও বের করা হবে না। কিন্তু এখানে একটি আশংকা ছিল এই যে, এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। সে স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে। যদি জান্নাতের বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি না থাকে, তবে জান্নাতও একটি কয়েদখানার মত মনে হতে থাকবে। আলোচ্য আয়াতে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, জান্নাতকে অন্যান্য গৃহের আলোকে দেখা মূর্খতা বৈ নয়। যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, জান্নাতের নেয়ামত ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বস্তুসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। জান্নাত থেকে বাইরে যাওয়ার কল্পনাও কোন সময় মনে জাগবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হাদীসে বর্ণিত শানে-নুযূল থেকে সূরা কাহ্ফের শেষ আয়াতে উল্লেখিত বাক্য। وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا সম্বন্ধে জানা যায় যে, এখানে উল্লেখিত শিরক দ্বারা "গোপন শিরক" অর্থাৎ, রিয়া তথা লোক দেখানো মনোবৃত্তি বোঝানো হয়েছে।

ইমাম হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মুসলমান আল্লাহ্র পথে জেহাদ করত এবং মনে মনে কামনা করত যে, জনসমাজে শৌর্য-বীর্য প্রচারিত হোক। তারই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (এ থেকে জানা গেল যে, জেহাদে এরূপ নিয়ত করলে জেহাদের সওয়াব পাওয়া যায় না।)

'ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্দুনিয়া' 'কিতাবুল ইখলাসে' তাউস থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে বললেন ঃ আমি মাঝে মাঝে যখন কোন সৎকর্ম সম্পাদনের অথবা এবাদতের উদ্যোগ গ্রহণ করি, তখন আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিই থাকে আমার উদ্দেশ্য ; কিন্তু সাথে সাথে এ কামনাও মনে জাগে যে, লোকেরা আমার কাজটি দেখুক। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একথা শুনে চুপ করে রইলেন। অবশেষে উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। আবু নঈম 'তারীখে-আসাকির' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে লিখেছেন ঃ জুনদুব ইবনে সুহায়েব যখন নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন অথবা দান-খয়রাত করতেন এবং এসব আমলের কারণে লোকদেরকে তার প্রশংসা করতে দেখতেন, তখন মনে মনে খুব আনন্দিত হতেন। ফলে আমল আরও বাড়িয়া দিতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, আয়াতে রিয়াকারীর গোপন শিরক থেকে বারণ করা হয়েছে। আমল আল্লাহ্‌র উদ্দেশে হলেও যদি তার সাথে কোনরূপ সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে তাও এক প্রকার গোপন শিরক। এর ফলে মানুষের আমল বরবাদ এবং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু অন্য কতিপয় সহীহ্ হাদীস থেকে এর বিপরীতও জানা যায়। উদাহরণতঃ তিরমিযী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একবার তিনি রসূলুল্লাহ্‌-এর কাছে আরয করলেন, আমি মাঝে মাঝে আমার ঘরের ভিতরে জায়নামাযে (নামাযরত) থাকি। হঠাৎ কোন ব্যক্তি এসে গেলে আমার কাছে ভাল লাগে যে, সে আমাকে নামাযরত অবস্থায় দেখেছে। এটা কি রিয়া হবে? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আবু হোরায়রা, আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন। এমতাবস্থায় তুমি দু'টি সওয়াব পাবে। একটি তোমার সে গোপন আমলের জন্য যা তুমি পূর্ব থেকে করছিলে এবং দ্বিতীয়টি তোমার প্রকাশ্য আমলের জন্যে যা লোকটি আসার পর হয়েছে। (এটা রিয়া নয়।)

সহীহ্-মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, একবার হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে কোন সৎকর্ম করার পর মানুষের মুখে তার প্রশংসা শোনে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ تلك عاجل بشرى المؤمن অর্থাৎ, এটা তো মুমিনের নগদ সুসংবাদ (যে তার আমল আল্লাহ্ তাআলা কবুল করেছেন এবং বান্দাদের মুখে তার প্রশংসা করিয়েছেন।)

তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতের তাৎপর্য এই যে, নিজের আমল দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির সাথে সৃষ্টজীবের সন্তুষ্টি অথবা নিজের সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিয়তকে শরীক করে নেয়া এমনকি, লোকমুখে প্রশংসা শুনে আমল আরও বাড়িয়ে দেয়া। এটা নিঃসন্দেহে রিয়া ও গোপন শিরক।

তিরমিযী ও মুসলিমে বর্ণিত শেষোক্ত রেওয়ায়েতগুলোর সম্পর্ক হল সে অবস্থার সাথে যে, আমল খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্যেই হয়ে থাকে, লোকমুখে সুখ্যাতি ও প্রশংসার প্রতি ভ্রূক্ষেপ থাকে না। অতঃপর যদি আল্লাহ্ তাআলা অনুগ্রহ করে লোকের মাঝে তার প্রসিদ্ধি সম্পন্ন করে দেন এবং মানুষের মুখ দিয়ে প্রশংসা করিয়ে দেন, তবে রিয়ার সাথে এ আমলের কোন সম্পর্ক নেই। এটা মুমিনের জন্যে (আমল কবুল হওয়ার) অগ্রিম সুসংবাদ। এভাবে বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়।

রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্যে হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী ঃ হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয় সর্বাধিক আশঙ্কা করি, তা হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, ছোট শিরক কি? তিনি বললেন ঃ রিয়া। —(আহমদ)

বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করে তাতে অতিরিক্ত আরও বর্ণনা করেছেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা যখন বান্দাদের কাজকর্মের প্রতিদান দেবেন, তখন রিয়াকার লোকদেরকে বলবেন ঃ তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেয়ার জন্যে তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশে তোমরা কাজ করেছিলে। এরপর দেখ, তাদের কাছে তোমাদের জন্যে কোন প্রতিদান আছে কি না।'

হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আমি শরীকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উর্ধ্বে। যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরীক করে, আমি সেই আমল শরীকের জন্যে ছেড়ে দেই। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত ; সে আমলকে খাঁটিভাবে আমি তার জন্যেই করে দেই, যাকে সে আমার সাথে শরীক করেছিল। —(মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনছেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের জন্যে সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাআলাও তার সাথে এমনি ব্যবহার করেন ; যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়। —(আহমদ, বায়হাকী, মাযহারী)

তফসীর কুরতুবীতে আছে, হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-কে এখলাস ও রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ এখলাস দ্বারা হচ্ছে সৎ ও ভাল কর্মের গোপনীয়তা পছন্দ করা এবং মন্দ কর্মের গোপনীয়তা পছন্দ না করা। এরপর যদি আল্লাহ্ তাআলা তোমার আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেন, তবে তুমি একথা বল ঃ হে আল্লাহ্, এটা আপনার অনুগ্রহ ও কৃপা ; আমার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফল নয়।

হাকীম তিরমিযী হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শিরকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ هو فيكم اخفى من دبيب অর্থাৎ, পিঁপড়ার নিঃশব্দ গতির মতই শিরক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ করে। তিনি আরও বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে তোমরা বড় শিরক ও ছোট শিরক (অর্থাৎ, রিয়া) থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তোমরা দৈনিক তিনবার এই দোয়া পাঠ করো اللّٰهم انى اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلمه

সূরা কাহ্‌ফের কতিপয় ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য ঃ হযরত আবু দ্দারদা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদ থাকবে। (মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী)

জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের কাছে বলল ঃ আমি মনে মনে ঘুম থেকে জেগে নামায পড়তে ইচ্ছা করি ; কিন্তু ঘুম প্রবল হয়ে যায়। তিনি বললেন ঃ তুমি যখন ঘুমাতে যাও তখন সূরা কাহ্‌ফের শেষ আয়াতগুলো قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠ কর। এর ফলে তুমি যখন জাগার ইচ্ছা করবে, আল্লাহ্ তাআলা তখনই তোমাকে জাগিয়ে দেবেন। —(ছালবী)

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ঃ ইবনে আরাবী বলেন ঃ আমাদের শায়খ তুরতুসী বলতেন ঃ তোমার মূল্যবান জীবনের সময়গুলো যেন সমসাময়িকদের সাথে প্রতিযোগিতা ও বন্ধু-বান্ধবের মেলামেশার মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে না যায়। দেখ, আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াত দ্বারা তাঁর বর্ণনা সমাপ্ত করেছেন ঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন

সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে যেন কাউকে শরীক না করে।—(কুরতুবী)

সূরা কাহ্‌ফে ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল। সূরা মারইয়ামেও এমনি ধরনের অত্যাশ্চর্য একটা বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্ভবতঃ এ সম্পর্কের কারণেই সূরা–কাহ্‌ফের পরে সূরা মারইয়ামকে স্থান দেয়া হয়েছে।— (রূহুল–মা'আনী)

সূরা মারইয়াম

كٓهٰيٰعٓصٓ এগুলো খণ্ডিত ও অবোধগম্য বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। বান্দার জন্য এর অর্থ অন্বেষণ করাও সমীচীন নয়।

نِدَآءً خَفِيًّا এতে জানা গেল যে, দোয়া অনুচ্চৈঃস্বরে ও গোপনে করাই উত্তম।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বর্ণনা মতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ ان خير الذكر الخفى وخير الرزق ما يكفى অর্থাৎ, অনুচ্চ যিকরই সর্বোত্তম এবং যথেষ্ট হয়ে যায় এমন যিকরই শ্রেষ্ঠ। (অর্থাৎ, যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হয় না এবং কমও হয় না।) – (কুরতুবী)

إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا অস্থির দুর্বলতা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, অস্থিই দেহের খুঁটি। অস্থির দুর্বলতা সমস্ত দেহের দুর্বলতার নামান্তর। اشتعال এর শাব্দিক অর্থ প্রজ্জ্বলিত হওয়া, এখানে চুলের শুভ্রতাকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করে তা সমস্ত মস্তকে ছড়িয়ে পড়া বোঝানো হয়েছে।

দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাবগ্রস্ততা প্রকাশ করা মোস্তাহাব ঃ এখানে দোয়ার পূর্বে হযরত যাকারিয়া (আঃ) তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ এই যে, এমতাবস্থায় সন্তান কামনা না করাই বিধেয় ছিল। ইমাম কুরতুবী তাঁর তফসীর গ্রন্থে দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করেছেন এই যে, দোয়া করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও অভাবগ্রস্ততা উল্লেখ করা দোয়া কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক।

الْمَوَالِيَ এটা مولى এর বহুবচন। আরবী ভাষায় এর অর্থ বহুবিধ। তন্মধ্যে এক অর্থ চাচাত ভাই ও স্বজন। এখানে উদ্দেশ্য তাই।

পয়গম্বরগণের ধন–সম্পদে উত্তরাধিকারিত্ব চলে না ঃ يَرِثُنِي

وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ অধিকসংখ্যক আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে এখানে উত্তরাধিকারিত্বের অর্থ আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব নয়। কেননা, প্রথমতঃ হযরত যাকারিয়ার কাছে এমন কোন অর্থ সম্পদ ছিল বলেই প্রমাণ নেই, যে কারণে চিন্তিত হবেন যে, এর উত্তরাধিকারী কে হবে! একজন পয়গম্বরের পক্ষে এরূপ চিন্তা করাও অবান্তর। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য সম্বলিত এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

–"নিশ্চিতই আলেমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিশ। পয়গম্বরগণ কোন দীনার ও দিরহাম রেখে যান না; বরং তাঁরা ইল্‌ম ও জ্ঞান ছেড়ে যান। যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করে, সে বিরাট সম্পদ হাসিল করে।" — '(আহ্‌মদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী)

স্বয়ং আলোচ্য আয়াতে এরপর يَرِثُنِي বাক্যের وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ যোগ এরই প্রমাণ যে, এখানে আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি। কেননা, যে পুত্রের জন্মলাভের জন্যে দোয়া করা হচ্ছে, তার পক্ষে ইয়াকুব বংশের আর্থিক উত্তরাধিকারী হবে, তাতে তাদের নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজনরা এবং তারা হচ্ছে সেসব موالى তথা স্বজন, যাদের উল্লেখ আয়াতে করা হয়েছে; তারা নিঃসন্দেহে আত্মীয়তায় হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) থেকে অধিক নিকটবর্তী। নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীর উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করা উত্তরাধিকার আইনের পরিপন্থী।

سُلَيْمَانُ دَاوُدَ আয়াতে সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি।

لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا - سمى শব্দের অর্থ সমনামও হয় এবং সমতুল্যও হয়। এখানে প্রথম অর্থ নেয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তাঁর পূর্বে 'ইয়াহ্‌ইয়া' নামে কারও নামকরণ করা হয়নি। নামের এই অনন্যতা ও অভূতপূর্বতাও কতক বিশেষ গুণে তাঁর অনন্যতার ইঙ্গিতবহ ছিল। তাই তাঁকে তাঁর বিশেষ গুণে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর কতক বিশেষ গুণ ও অবস্থা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কারও মধ্যে ছিল না। সেসব বিশেষ গুণে তিনি তুলনাহীন ছিলেন। উদাহরণতঃ চিরকুমার হওয়া ইত্যাদি। এতে জরুরী নয় যে, ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের চাইতে সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেননা, তাঁদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ ও মূসা কলীমুল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ও সুবিদিত।—(মাযহারী)

عِتِيًّا শব্দটি عتو থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রভাবান্বিত না হওয়া। এখানে অস্থির শুস্কতা বোঝানো হয়েছে। سَوِيًّا শব্দের অর্থ সুস্থ। শব্দটি একথা বোঝানোর জন্যে যুক্ত করা হয়েছে যে, যাকারিয়া (আঃ)–এর কোন মানুষের সাথে কথা না বলার এ অবস্থাটি কোন রোগবশতঃ ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ্‌র যিকর ও এবাদতে তাঁর জিহ্বা তিন দিনই পূর্ববৎ খোলা ছিল; বরং এ অবস্থা মু'জেযা ও গর্ভসঞ্চারের নিদর্শন স্বরূপই প্রকাশ পেয়েছিল। حنانا এর শাব্দিক অর্থ হৃদয়ের কোমলতা ও দয়ার্দ্রতা। এটা হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ)–কে স্বতন্ত্রভাবে দান করা হয়েছিল।

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَّحَنَانًا
مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۗ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَّبَرًّۢا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ
جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ
يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا
مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۫ فَاَرْسَلْنَا
اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ
بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ
لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ
يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ
هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ
اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾
فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ
قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ
اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهُزِّىْٓ
اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾

(১২) হে ইয়াহ্ইয়া দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ কর। আমি তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম। (১৩) এবং নিজের পক্ষ থেকে আগ্রহ ও পবিত্রতা দিয়েছি। সে ছি'ল পরহেযগার। (১৪) পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, নাফরমান ছিল না। (১৫) তার প্রতি শান্তি — যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। (১৬) এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। (১৭) অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। (১৮) মারইয়াম বলল ঃ আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহ্ভীরু হও। (১৯) সে বলল ঃ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। (২০) মারইয়াম বলল ঃ কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না? (২১) সে বলল ঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজসাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। (২২) অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। (২৩) প্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর-বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেন ঃ হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে, যেতাম! (২৪) অতঃপর ফেরেশতা তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়ায দিলেন যে, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় একটি নহর জারি করেছেন। (২৫) আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও; তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اِنْتَبَذَتْ শব্দটি نبذ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ দূরে নিক্ষেপ করা। انتباذ এর অর্থ হল জনসমাবেশ থেকে সরে দূরে চলে যাওয়া। مَكَانًا شَرْقِيًّا – অর্থাৎ, পূর্বদিকের কোন নির্জন স্থানে চলে গেলেন। নির্জন স্থানে যাওয়ার কি কারণ ছিল, সে সম্পর্কে সম্ভাবনা ও উক্তি বিভিন্নরূপ বর্ণিত আছে। কেউ বলেন ঃ গোসল করার জন্যে নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন। কেউ বলেন ঃ অভ্যাস অনুযায়ী এবাদতে মশগুল হওয়ার জন্যে কক্ষের পূর্বদিকস্থ কোন নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। কুরতুবীর মতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এ কারণেই খ্রীষ্টানরা পূর্বদিককে তাদের কেবলা করেছে এবং তারা পূর্বদিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا –অধিকসংখ্যক তফসীরবিদগণের মতে রূহ বলে জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ স্বয়ং ঈসা (আঃ)-কেই বোঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মারইয়ামের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী মানবের প্রতিকৃতি তার সামনে উপস্থিত করে দেন। কিন্তু এখানে প্রথম উক্তি অগ্রগণ্য। পরবর্তী বাক্যাবলী থেকে এরই সমর্থন পাওয়া যায়।

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا -ফেরেশতাকে তার আসল আকৃতিতে দেখা মানুষের জন্যে সহজ নয়— এতে কঠিন ভীতির সঞ্চার হয়; যেমন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হেরা গিরিগুহায় এবং পরবর্তীকালেও এরূপ ভয়-ভীতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ কারণে হযরত জিবরাঈল মারইয়ামের সামনে মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। মারইয়াম যখন পর্দার ভেতর আগত একজন মানুষকে নিকটে দেখতে পেলেন, তখন তার উদ্দেশ্য অসৎ বলে আশঙ্কা করলেন। তাই বললেন ঃ

اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ –আমি তোমাদের থেকে আল্লাহ্ রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা করি। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাঈল একথা শুনে [আল্লাহ্র কথা শুনে] আল্লাহ্র নামের সম্মানার্থে কিছুটা পেছনে সরে গেলেন।

اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا — এ বাক্যটি এমন, যেমন— কেউ কোন জালেমের কাছে অপারগ হয়ে এভাবে ফরিয়াদ করে ঃ যদি তুমি ঈমানদার হও, তবে আমার প্রতি জুলুম করো না। এ জুলুমে বাধা দেয়ার জন্যে তোমার ঈমান যথেষ্ট হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্কে ভয় করা এবং এই অপকর্ম থেকে বিরত থাকা তোমার জন্যে সমীচীন। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এ বাক্যটি আতিশয্য বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, যদি তুমি আল্লাহ্ভীরু হও, তবুও আমি তোমার থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। এর বিপরীত হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট। —(মাযহারী)

মৃত্যু কামনার বিধান ঃ মারইয়ামের মৃত্যু-কামনা পার্থিব দুঃখের কারণে হয়ে থাকলে ভাবাবেগে প্রাধান্যকে এর ওযর বলা হবে। এ ক্ষেত্রে মানুষ সর্বতোভাবে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের আওতাধীন থাকে না। পক্ষান্তরে যদি মারইয়াম ধর্মের দিক চিন্তা করে মৃত্যু কামনা করে থাকেন; অর্থাৎ, মানুষ দুর্নাম রটাবে এবং সম্ভবতঃ এর মোকাবেলায় আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না, ফলে বেছবর হওয়ার গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ব। মৃত্যু হলে এ গোনাহ্ থেকে বেঁচে যেতাম, তবে এরূপ মৃত্যু-কামনা নিষিদ্ধ নয়।

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا
فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾
فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾
يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾
قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي
مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ
حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَالسَّلَامُ
عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾ ذَٰلِكَ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾ مَا كَانَ
لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ
يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾

(২৬) যখন আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিও ঃ আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশে রোযা মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। (২৭) অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল ঃ হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। (২৮) হে হারূন-ভাগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। (২৯) অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বলল ঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? (৩০) সন্তান বলল ঃ আমি তো আল্লাহ্‌র দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। (৩১) আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। (৩২) এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। (৩৩) আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব। (৩৪) এ-ই মারইয়ামের পুত্র ঈসা। সত্যকথা, যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। (৩৫) আল্লাহ্ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, তিনি যখন কোন কাজ করা সিদ্ধান্ত করেন, তখন একথাই বলেন ঃ 'হও' এবং তা হয়ে যায়। (৩৬) তিনি আরও বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তার এবাদত কর। এটা সরল পথ। (৩৭) অতঃপর তাদের মধ্যে দলগুলো পৃথক পৃথক পথ অবলম্বন করল। সুতরাং মহাদিবস আগমনকালে কাফেরদের জন্যে ধ্বংস। (৩৮) সেদিন তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে, যেদিন তারা আমার কাছে আগমন করবে। কিন্তু আজ জালেমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মারইয়ামকে বলা হয়েছে ঃ তুমি বলে দিও, আমি মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। অথচ বাস্তবে মারইয়াম কোন মানত করেননি। এটা কি মিথ্যা বলার শিক্ষা নয়? উত্তর এই যে, এ শিক্ষার অর্থ হচ্ছে তুমি মানতও করে নিও এবং তা প্রকাশ করে দিও।

মৌনতার রোযা ইসলামী শরীয়তে রহিত হয়ে গেছে ঃ ইসলাম-পূর্বকালে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং কারও সাথে কথা না বলার রোযাও এবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলাম একে রহিত করে মন্দ কথাবার্তা, গালিগালাজ, মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকাকেই জরুরী করে দিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তা ত্যাগ করা ইসলামে কোন এবাদত নয়। তাই এর মানত করাও জায়েয নয়। আবু দাউদের রেওয়ায়েতে আছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ لا يتم بعد احتلام ولاصمات يوم الى الليل অর্থাৎ, সন্তান সাবালক হওয়ার পর পিতা মারা গেলে তাকে এতীম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা কোন এবাদত নয়। প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও উপকারী। আহার ও পান করার আদেশ বাহ্যতঃ অনুমতি প্রদানের অর্থে বোঝা যায়।

পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তি বিরুদ্ধ নয় ঃ পুরুষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করা একটি মু'জেযা। মু'জেযায় যত অসম্ভাব্যতাই থাকুক, তাতে দোষ নেই; বরং এতে অলৌকিকতা গুণটি আরও বেশী করে প্রকাশ পায়। কিন্তু এতে তেমন কোন অসম্ভাব্যতাও নেই। কারণ, চিকিৎসা শাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী নারীর বীর্যে ধারণশক্তির সাথে সাথে কারক শক্তিও রয়েছে। তাই যদি এই কারকশক্তি আরও বেড়ে গিয়ে সন্তান জন্মের কারণ হয়ে যায়, তবে তা তেমন অসম্ভব ব্যাপার নয়।— (বয়ানুল-কোরআন)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মারইয়ামকে খেজুরের গাছ নাড়া দিতে আদেশ করেছেন। অথচ কোনরূপ নাড়া ছাড়াই আপনা-আপনি কোলে খেজুর পতিত হওয়াও আল্লাহ্‌র কুদরতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে বোঝা যায় যে, রিযিক হাসিলের জন্যে চেষ্টা ও পরিশ্রম করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।— (রূহুল-মা'আনী)

سَرِيًّا এর আভিধানিক অর্থ ছোট নহর। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরত দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে একটি ছোট নহর জারী করে দেন, অথবা জিবরাঈলের মাধ্যমে জারী করিয়ে দেন। উভয় প্রকার রেওয়ায়েতেই রয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মারইয়ামের সান্ত্বনার উপকরণাদি উল্লেখ করার সময় প্রথমে পানি ও পরে খাদ্য তথা খেজুরের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এগুলো ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে খাদ্য ও পরে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

فَكُلِي وَاشْرَبِي কারণ সম্ভবতঃ এই যে, মানুষ স্বভাবগতভাবেই আহারের পূর্বে পানি যোগাড় করে; বিশেষতঃ ঐ খাদ্যের বেলায় যা খাওয়ার পর পিপাসিত হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে খাদ্যবস্তু আহার করে ও পরে পানি পান করে।— (রূহুল-মা'আনী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ এ কথাই বোঝা যায় যে, অদৃশ্য সুসংবাদের মাধ্যমে মারইয়াম যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দুর্নাম ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবেন, তখন নিজেই

সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। কতদিন পরে ফিরে এলেন, এ সম্পর্কে ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মারইয়াম সন্তান প্রসবের চল্লিশ দিন পর নিফাস থেকে পাক হয়ে ঘরে ফিরে আসেন।—(রূহুল-মা'আনী)

شَيْئًا فَرِيًّا আরবী ভাষায় فرى শব্দের আসল অর্থ কর্তন করা ও চিরে ফেলা। যে কাজ কিংবা বস্তু প্রকাশ পেলে অসাধারণ কাটাকাটি হয়, তাকে فرى বলা হয়। আবু হাইয়্যান বলেন ঃ প্রত্যেক বিরাট বিষয়কে فرى বলা হয় — ভালোর দিক দিয়ে বিরাট হোক কিংবা মন্দের দিক দিয়ে। এখানে শব্দটি বিরাট মন্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দের দিক দিয়ে অনন্য ও বিরাট বস্তুর জন্যেই শব্দটির ব্যবহার সুবিদিত।

يَاأُخْتَ هَارُونَ হযরত মূসা (আঃ)-এর ভাই ও সহচর হযরত হারূন (আঃ) মারইয়ামের আমলের শত শত বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এখানে মারইয়ামকে হারূন-ভগ্নি বলা বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বাকে যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তারা প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কোরআনে হযরত মারইয়ামকে হারূন-ভগিনী বলা হয়েছে। অথচ হারূন (আঃ) তার অনেক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যান। হযরত মুগীরা এ প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন ঃ তুমি বলে দিলে না কেন যে, বরকতের জন্যে পয়গম্বরদের নামে নাম রাখা এবং তাঁদের প্রতি সম্বন্ধ করা ঈমানদারদের সাধারণ অভ্যাস। (মুসলিম-তিরমিযী, নাসায়ী।) এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু'রকম হতে পারে। (এক) হযরত মারইয়াম হযরত হারূন (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন বলেই তাঁর সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে— যদিও তাদের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান রয়েছে; যেমন আরবদের রীতি রয়েছে যে, তারা তামীম গোত্রের ব্যক্তিকে اخا تميم এবং আরবের লোককে اخا عرب বলে অভিহিত করে। (দুই) এখানে হারূন বলে মূসা (আঃ)-এর সহচর হারূন নবীকে বোঝানো হয়নি; বরং মারইয়ামের ভ্রাতার নামও ছিল হারূন এবং এ নাম হারূন নবীর নামানুসারে বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল। এভাবে মারইয়াম হারূন-ভগিনী বলা সত্যিকার অর্থেই শুদ্ধ।

مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ কোরআনের এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওলী-আল্লাহ্ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততি মন্দ কাজ করলে তাতে সাধারণ লোকদের মন্দ কাজের তুলনায় বেশী গোনাহ্ হয়। কারণ, এতে তাদের বড়দের লাঞ্ছনা ও দুর্নাম হয়। কাজেই বুযুর্গদের সন্তানদের উচিত, সৎকাজ ও আল্লাহ্‌ভীতিতে অধিক মনোনিবেশ করা।

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, যে সময় পরিবারের লোকজন মারইয়ামকে ভর্ৎসনা করতে শুরু করে, তখন ঈসা (আঃ) মায়ের বুকের দুধ পান করছিলেন। তিনি তাদের ভর্ৎসনা শুনে স্তন্য ছেড়ে দেন এবং বামদিকে পাশ ফিরে তাদের দিকে মনোযোগ দেন। অতঃপর তর্জনী খাড়া করে বলেন ঃ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্‌র দাস।

এই প্রথম বাক্যেই হযরত ঈসা (আঃ) এই ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করে দেন যে, যদিও আমি অলৌকিক উপায়ে জন্মগ্রহণ করেছি; কিন্তু আমি আল্লাহ্ নই— আল্লাহ্‌র দাস। অতএব, কেউ যেন আমার উপাসনায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে।

آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا এ বাক্যে হযরত ঈসা (আঃ) তার দুগ্ধ পানের যমানায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবুওয়ত ও কিতাব লাভের সংবাদ দিয়েছেন, অথচ কোন পয়গম্বর চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে নবুওয়ত ও কিতাব লাভ করেননি। তাই এর মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার এটা স্থির সিদ্ধান্ত যে, তিনি যথাসময়ে আমাকে নবুওয়ত ও কিতাব দান করবেন। এটা হুবহু এমন, যেমন মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ আমাকে নবুওয়ত তখন দান করা হয়েছিল, যখন আদম (আঃ)-এর জন্মই হয়নি — তার খামীর তৈরী হচ্ছিল মাত্র। বলাবাহুল্য, এর উদ্দেশ্য হল এই যে, নবুওয়ত দানের ওয়াদা মহানবী (সাঃ)-এর জন্যে অকাট্য ও নিশ্চিত ছিল। আলোচ্য আয়াতেও এ নিশ্চয়তাকে 'নবী করেছেন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। নবী করার কথা প্রকাশ করে প্রকারান্তরে তিনি বলেছেন যে, আমার জননীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা, আমার নবী হওয়া এবং রেসালত লাভ করা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, আমার জন্মে কোন গোনাহের দখল থাকতে পারে না।

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ -তাকিদ সহকারে কোন কাজের নির্দেশ দেয়া হলে তাকে وصيت শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। ঈসা (আঃ) এখানে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নামায ও যাকাতের ওসিয়ত করেছেন। তাই এর অর্থ এই যে, খুব তাগিদ সহকারে উভয় কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

নামায ও রোযা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী (সাঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রসূলের শরীয়তেই ফরয রয়েছে। তবে বিভিন্ন শরীয়তে এগুলোর আকার-আকৃতি ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি বিভিন্নরূপ ছিল। হযরত ঈসা (আঃ)-এর শরীয়তেও নামায ও যাকাত ফরয ছিল। প্রশ্ন হতে পারে যে, ঈসা (আঃ) কোন সময় মালদার হননি। তিনি গৃহ নির্মাণ করেননি এবং অর্থকড়িও সঞ্চয় করেননি। এমতাবস্থায় তাঁকে যাকাতের আদেশ দেয়ার কি মানে? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, মালদারের উপর যাকাত ফরয — এটা ছিল তাঁর শরীয়তের আইন। ঈসা (আঃ) ও এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন যে, কোন সময় নিসাব পরিমাণ মাল একত্রিত হলে তাকেও যাকাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যদি সারা জীবন মালই সঞ্চিত না হয়, তবে তা এই আইনের পরিপন্থী নয়।— (রূহুল-মা'আনী)

مَا دُمْتُ حَيًّا অর্থাৎ, নামায ও যাকাতের নির্দেশ আমার জন্যে সর্বকালীন — যে পর্যন্ত জীবিত থাকি। বলাবাহুল্য, এতে পৃথিবীতে অবস্থাকালীন জীবন বোঝানো হয়েছে। কেননা, এসব ক্রিয়াকর্ম এই পৃথিবীতেই হতে পারে এবং পৃথিবীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। আকাশে উঠানোর পর অবতরণের সময় পর্যন্ত অব্যাহতির যমানা।

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي এখানে শুধু মাতার কথা বলা হয়েছে, পিতা-মাতার কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি অলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছি। শৈশবের এহেন অলৌকিক কথাবার্তা এর যথেষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ।

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের অলীক চিন্তাধারার মধ্যে বাহুল্য ও স্বল্পতা বিদ্যমান ছিল। খ্রীষ্টানরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে 'খোদার বেটা' বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদীরা তাঁর অবমাননায় এতটুকু ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যে, তাঁকে ইউসুফ মিস্ত্রীর জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করে। (নাউজুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার ভ্রান্ত

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا
يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا
نَّبِيًّا ﴿٤١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَ
لَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ
يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن
يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ أَرَاغِبٌ
أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾
قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَ
أَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا
أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾
وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾

(৩৯) আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিন যখন সব ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা অনবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না। (৪০) আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী হব পৃথিবীর এবং তার উপর যারা আছে তাদের এবং আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৪১) আপনি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করুন। নিশ্চয় তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী। (৪২) যখন তিনি তার পিতাকে বললেন ঃ হে আমার পিতা, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না, তার এবাদত কেন কর? (৪৩) হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে; যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। (৪৪) হে আমার পিতা, শয়তানের এবাদত করো না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। (৪৫) হে আমার পিতা, আমি আশঙ্কা করি, দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে। (৪৬) পিতা বলল ঃ হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। (৪৭) ইবরাহীম বললেন ঃ তোমার উপর শান্তি হোক, আমি আমার পালনকর্তার কাছে তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহেরবান। (৪৮) আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের এবাদত কর তাদেরকে; আমি আমার পালনকর্তার এবাদত করব। আশা করি, আমার পালনকর্তার এবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না। (৪৯) অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের এবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। (৫০) আমি তাদেরকে দান করলাম আমার অনুগ্রহ এবং তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ সুখ্যাতি। (৫১) এই কিতাবে মূসার কথা বর্ণনা করুন, তিনি ছিলেন মনোনীত এবং তিনি ছিলেন রসূল, নবী।

লোকদের ভ্রান্তি বর্ননা করে তাঁর সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। — (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ الْحَسْرَةِ কেয়ামতের দিবসকে পরিতাপের দিবস বলা হয়েছে। কারণ, জাহান্নামীরা সেদিন পরিতাপ করবে যে, তারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ হলে জান্নাত লাভ করত; কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে বিশেষ এক প্রকার পরিতাপ জান্নাতীদেরও হবে। হযরত মুআযের রেওয়ায়েতে তাবারানী ও আবু ইয়ালা বর্ণিত হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেসব মুহূর্ত আল্লাহ্র যিকর ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে, সেগুলোর জন্যে পরিতাপ করা ছাড়া জান্নাতীদের আর কোন পরিতাপ হবে না। হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে বগভী বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই পরিতাপ ও অনুশোচনা করবে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন ঃ এই পরিতাপ কিসের কারণে হবে? তিনি বললেন ঃ সৎকর্মশীলদের পরিতাপ হবে এজন্যে যে, তারা আরও বেশী সৎকর্ম কেন করল না, যাতে জান্নাতের আরও উচ্চস্তর অর্জিত হত। পক্ষান্তরে কুকর্মীরা পরিতাপ করবে যে, তারা কুকর্ম থেকে কেন বিরত হল না।

সিদ্দীক কাকে বলে? صِدِّيقًا نَّبِيًّا – صديق শব্দটি কোরআনের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংজ্ঞা সম্পর্কে আলেমদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন ঃ যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেননি, তিনি সিদ্দীক। কেউ বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং কথা ও কর্মে সত্যবাদী, অর্থাৎ, অন্তরে যেরূপ বিশ্বাস পোষণ করে, মুখে ঠিক তদ্রূপ প্রকাশ করে এবং তার প্রত্যেক কর্ম ও উঠা–বসা এই বিশ্বাসেরই প্রতীক হয়, সে সিদ্দীক। রূহুল মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদি গ্রন্থে শেষোক্ত অর্থই অবলম্বণ করা হয়েছে। সিদ্দীকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রকৃত সিদ্দীক নবী ও রসূলই হতে পারেন এবং প্রত্যেক নবী ও রসূলের জন্যে সিদ্দীক হওয়া একটি অপরিহার্য গুণ। কিন্তু এর বিপরীতে যিনি সিদ্দীক হন, তাঁর জন্যে নবী ও রসূল হওয়া জরুরী নয়; বরং নবী নয় – এমন ব্যক্তি যদি নবী ও রসূলের অনুসরণ করে সিদ্দীকের স্তর অর্জন করতে পারেন, তবে তিনিও সিদ্দীক বলে অভিহিত হবেন; হযরত মারইয়ামকে স্বয়ং কোরআন পাক 'সিদ্দীকা' وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ উপাধি দান করেছে। সাধারণ উম্মতের সংখ্যাধিক্যের মতে তিনি নবী নন এবং কোন নারী নবী হতেও পারেন না।

বড়দেরকে নসিহত করার পন্থা ও আদব ঃ يَا أَبَتِ আরবী অভিধানের দিক দিয়ে এ শব্দটি পিতার জন্যে সম্মান ও ভালবাসাসূচক সম্বোধন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বগুণে গুণান্বিত করেছিলেন। তিনি পিতার সামনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা মেজাযের সমতা ও বিপরীতমুখী বিষয়বস্তু সন্নিবেশের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পিতাকে কুফর ও শিরকে শুধু লিপ্তই নয় — এর উদ্যোক্তা রূপেও দেখেন। এই কুফর ও শিরক মিটানোর জন্যেই তিনি সৃজিত হয়েছিলেন। অপরদিকে পিতার আদব, মহত্ব ও ভালবাসা। এ দু'টি বিপরীতমুখী বিষয়কে হযরত খলীলুল্লাহ্ (আঃ) চমৎকারভাবে সমন্বিত করেছেন।

يَا أَبَتِ শব্দটি পিতার দয়া ও ভালবাসার প্রতীক। প্রথমতঃ তিনি

প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। এরপর কোন বাক্যে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করেননি, যা পিতার অবমাননা অথবা মনোকষ্টের কারণ হতে পারত; অর্থাৎ পিতাকে 'কাফের' 'গোমরাহ' ইত্যাদি বলেননি; বরং পয়গম্বরসুলভ প্রজ্ঞার সাথে শুধু তার দেব-দেবীর অক্ষমতা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে সে নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যে তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত নবুওয়তের জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে কুফর ও শিরকের সম্ভাব্য অশুভ পরিণতি সম্পর্কে পিতাকে হুশিয়ার করেছেন। এরপরও পিতা চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে অথবা পুত্রসুলভ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে সম্বোধন করল। হযরত খলীলুল্লাহ্ يَٰٓأَبَتِ বলে, মিষ্ট ভাষায় পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারণের পরিভাষায় يَٰبُنَيَّ প্রয়োগ করা সমীচীন ছিল। কিন্তু আযর তাঁর নাম নিয়ে يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ বলে, সম্বোধন করল। অতঃপর তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হুমকি এবং বাড়ী থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করে দিল। এ ক্ষেত্রে হযরত খলীলুল্লাহ্ এর কি জওয়াব দেন, তা শোনা ও স্মরণ রাখার যোগ্য। তিনি বলেন ঃ

سَلَٰمٌ عَلَيۡكَ এখানে سلام শব্দটি দ্বিবিধ অর্থের হতে পারে। (এক) বয়কটের সালাম; অর্থাৎ, কারও সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ভদ্রজনোচিত পন্থা হচ্ছে কথার উত্তর না দিয়ে 'সালাম' বলে পৃথক হয়ে যাওয়া। কোরআন পাক আল্লাহ্র প্রিয় ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রশংসায় বলে ঃ

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمًا অর্থাৎ, মূর্খরা যখন তাদের সাথে মূর্খসুলভ তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাঁরা তাদের মোকাবেলা করার পরিবর্তে সালাম শব্দ বলে দেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। (দুই), এখানে প্রচলিত সালামই বোঝানো হয়েছে। এতে আইনগত খটকা এই যে, কোন কাফেরকে প্রথমে সালাম করা হাদীসে নিষিদ্ধ। বোখারী ও মুসলিমে আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ 'খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের প্রথমে সালাম করো না।' কিন্তু এর বিপরীতে কোন কোন হাদীসে কাফের, মুশরেক ও মুসলমানদের এক সমাবেশকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সালাম করেছেন বলে প্রমাণিত রয়েছে। বোখারী ও মুসলিমে হযরত উসামার রেওয়ায়েতে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

سَأَسۡتَغۡفِرُ لَكَ رَبِّيٓ এখানেও উপরোক্ত খটকা বিদ্যমান যে, কোন কাফেরের জন্যে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা শরীয়তের আইনে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। একবার রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর চাচা আবু তালেবকে বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহ্র কসম, আমি আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ করে দেয়া হয়।' এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ অর্থাৎ, নবী ও ঈমানদারদের পক্ষে মুশরেকদের জন্যে ইস্তেগফার করা বৈধ নয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) চাচার জন্যে ইস্তেগফার ত্যাগ করেন।

খটকার জওয়াব এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতার সাথে ওয়াদা করা যে, আপনার জন্যে ইস্তেগফার করব— এটা নিষেধাজ্ঞার পূর্বেকার ঘটনা। নিষেধ পরে করা হয়।

وَأَعۡتَزِلُكُمۡ وَمَا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدۡعُواْ رَبِّي একদিকে তো হযরত খলীলুল্লাহ্ (আঃ) পিতার আদব ও মহব্বতের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে; অপরদিকে সত্য-প্রকাশ ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে এতটুকুও কলঙ্কিত হতে দেননি। বাড়ী থেকে বের হয়ে যাওয়ার যে আদেশ পিতা দিয়েছিল, আলোচ্য বাক্যে তা তিনি সানন্দে শিরোধার্য করে নেন এবং সাথে সাথে একথাও বলে দেন যে, আমি তোমার দেব-দেবীকে ঘৃণা করি এবং শুধু আমার পালনকর্তার এবাদত করি।

فَلَمَّا ٱعۡتَزَلَهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبۡنَا لَهُۥٓ إِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ

পূর্ববর্তী বাক্যে ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আশা করি, আমার পালনকর্তার কাছে দোয়া করে আমি বঞ্চিত ও বিফল মনোরথ হব না। বাহ্যতঃ এখানে গৃহ ও পরিবারবর্গ ত্যাগ করার পর নিঃসঙ্গতার আতঙ্ক ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার দোয়া বোঝানো হয়েছিল। আলোচ্য বাক্যে এই দোয়া কবুল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ) যখন আল্লাহ্র জন্যে নিজ গৃহ, পরিবারবর্গ ও তাদের দেব-দেবীকে বিসর্জন দিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই ক্ষতিপূরণার্থে তাঁকে পুত্র ইসহাক দান করলেন। এই পুত্র যে দীর্ঘায়ু ও সন্তানের পিতা হয়েছিলেন, তাও 'ইয়াকূব' (পৌত্র) শব্দ যোগ করে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। পুত্র দান থেকে বোঝা যায় যে, ইতিপূর্বে ইবরাহীম (আঃ) বিবাহ করেছিলেন। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পিতার পরিবারের চাইতে উত্তম একটি স্বতন্ত্র পরিবার দান করলেন, যা পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মহাপুরুষদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

كَانَ مُخۡلَصًا আল্লাহ্ তা'আলা যে ব্যক্তিকে নিজের জন্যে খাঁটি করে নেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না এবং নিজের সমস্ত কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্র জন্যে নিবেদিত করে দেয়, তাকে مخلص বলা হয়। পয়গম্বরগণই বিশেষভাবে এ গুণে গুণান্বিত হন; যেমন—কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ إِنَّآ أَخۡلَصۡنَٰهُم بِخَالِصَةٖ ذِكۡرَى ٱلدَّارِ অর্থাৎ আমি পয়গম্বরদেরকে পরকাল স্মরণ করার কাজের জন্যে বিশেষভাবে নিয়োজিত করেছি। উম্মতের মধ্যে যেসব কামেল পুরুষ পয়গম্বরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তারাও আংশিকভাবে এই মর্তবা লাভ করেন। এর আলামত এই যে, তাঁদেরকে গোনাহ্ ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয় এবং তাঁরা আল্লাহ্র হেফাযতে থাকেন।

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَ
وَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ
اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَ
كَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾
وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَّرَفَعْنٰهُ
مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ
مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ
وَاِسْرَآءِيْلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ
الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿٥٨﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾
اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ﴿٦٠﴾ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨالَّتِىْ وَعَدَ
الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ﴿٦١﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ
فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿٦٢﴾
تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

(৫২) আমি তাকে আহবান করলাম তূর পাহাড়ের ডান দিক থেকে এবং গূঢ়তত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশে তাকে নিকটবর্তী করলাম। (৫৩) আমি নিজ অনুগ্রহে তাঁকে দান করলাম তাঁর ভাই হারুনকে নবীরূপে। (৫৪) এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রসুল, নবী। (৫৫) তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তার পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। (৫৬) এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী। (৫৭) আমি তাকে উচ্চে উন্নীত করেছিলাম। (৫৮) এরাই তারা—নবীগণের মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নেয়ামত দান করেছেন। এরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, তাদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশধর এবং যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত করেছি, তাদের বংশোদ্ভূত। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তখন তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং ক্রন্দন করত। (৫৯) অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। (৬০) কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সুতরাং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোন জুলুম করা হবে না। (৬১) তাদের স্থায়ী বসবাস হবে যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। অবশ্যই তাঁর ওয়াদায় তারা পৌঁছবে। (৬২) তারা সেখানে সালাম ব্যতীত কোন অসার কথাবার্তা শুনবে না এবং সেখানে সকাল – সন্ধ্যা তাদের জন্যে রুযী থাকবে। (৬৩) এটা ঐ জান্নাত যার অধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে পরহেযগারদেরকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়টি সিরিয়ায় মিসর ও মাদইয়ানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্তমানেও পাহাড়টি এ নামেই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা একেও অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন।

الْاَيْمَنِ তূর পাহাড়ের ডানদিকে হযরত মূসা (আঃ)-এর দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কেননা, তিনি মাদইয়্যান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তূর পর্বতের বিপরীত দিকে পৌঁছার পর তূর পাহাড় তাঁর ডান দিকে ছিল।

نَجِيًّا কানাকানি ও বিশেষ কথাবার্তাকে مناجات এবং যার সাথে এরূপ কথাবার্তা বলা হয়, তাকে نجى বলা হয়।

وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ শব্দের অর্থ দান। হযরত মূসা (আঃ) দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর সাহায্যের জন্যে হারুনকেও নবী করা হোক। এই দোয়া কবুল করা হয়। আয়াতে وهبنا বলে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি মূসাকে 'হারুন' দান করেছি। এ কারণেই হযরত হারুন (আঃ)-কে هبة الله (আল্লাহ্‌র দান)-ও বলা হয়।— (মাযহারী)

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ বাহ্যতঃ এখানে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (আঃ)-কেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর পিতা ইবরাহীম ও ভ্রাতা ইসহাকের সাথে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি; বরং মাঝখানে হযরত মূসার কথা উল্লেখ করার পর তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তাঁর কথা উল্লেখ করাই এর উদ্দেশ্য। তাই আনুষঙ্গিকভাবে উল্লেখ না করে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রেরণকালের ক্রম অনুসারে পয়গম্বরদের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা, হযরত ইদরীস (আঃ) –এর কথা সবার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ সময়কালের দিক দিয়ে তিনি সবার অগ্রে।

كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ওয়াদা পূরণ করা একটি চারিত্রিক গুণ। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একে জরুরী মনে করে। এর বিপরীত করাকে হীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। হাদীসে ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর লক্ষণ বলা হয়েছে। এ জন্যেই আল্লাহ্‌র প্রত্যেক নবী ও রসূলই ওয়াদা পালনে সাচ্চা; কিন্তু এই বর্ণনা পরম্পরায় বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের সাথে বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এই গুণ অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান নেই; বরং এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তাঁর মধ্যে এই গুণটি একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে বিদ্যমান আছে। উদাহরণতঃ এইমাত্র হযরত মূসা (আঃ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মনোনীত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ এ গুণটিও সব পয়গম্বরের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত মূসা (আঃ) বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন, তাই তাঁর আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ওয়াদা পালনে হযরত ইসমাঈল (আঃ)–এর স্বাতন্ত্র্যের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহ্‌র সাথে কিংবা কোন বান্দার সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা ও যত্ন সহকারে তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেকে জবাই এর জন্যে পেশ করে দেবেন এবং তজ্জন্যে সবর করবেন। তিনি এ ওয়াদায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে একস্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন; কিন্তু লোকটি সময়মত আগমন না করায় তিনি সেখানে তিন

দিন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। (মাযহারী) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীতে মহানবী (সাঃ) প্রসঙ্গেও ওয়াদা করে সেস্থানে তিন দিন অপেক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী)

ওয়াদাপূরণ করার গুরুত্ব ও মর্তবা ঃ ওয়াদা পূরণ করা সকল পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মনীষীদের বিশেষ গুণ এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের অভ্যাস। এর বিপরীত করা পাপাচারী ও হীন লোকদের চরিত্র। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ الوعد دين ওয়াদা একটি ঋণ। অর্থাৎ,ঋণ পরিশোধ করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি ওয়াদা পূরণে যত্নবান হওয়াও জরুরী। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মুমিনের ওয়াদা ওয়াজিব।

ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ ওয়াদার ঋণ হওয়া এবং ওয়াজিব হওয়ার অর্থ এই যে, শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত ওয়াদা পূরণ না করা গোনাহ্। কিন্তু ওয়াদা এমন ঋণ নয় যে, তজ্জন্যে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিংবা জবরদস্তি আদায় করা যায়। ফেকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় একে বলা হয় ধর্মতঃ ওয়াজিব— বিচারে ওয়াজিব নয়।— (কুরতুবী)

পরিবার-পরিজন থেকে সংস্কার কাজ শুরু করা সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য ঃ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর আরও একটি বিশেষ গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবার পরিজনকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন। এখানে প্রশ্ন হলো যে, পরিবার-পরিজনকে সৎকাজের নির্দেশ দেয়া তো প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের দায়িত্বে ওয়াজিব। কোরআন পাকে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে ঃ قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ, নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর। সুতরাং এ ব্যাপারে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য কি? জওয়াব এই যে, বিষয়টি যদিও ব্যাপকভাবে সব মুসলমানের করণীয়; কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আঃ) এ কাজের জন্যে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ও সর্বপ্রযত্নে চেষ্টিত ছিলেন ; যেমন—মহানবী (সাঃ) - এর প্রতিও বিশেষ নির্দেশ ছিল যে, وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ, গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দেরকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করুন। এ নির্দেশ পালনার্থে তিনি পরিবারবর্গকে একত্রিত করে বিশেষ ভাষণ দেন।

এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পয়গম্বরগণ সবাই সমগ্র জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা সবাইকে সত্যের পয়গাম পৌছিয়েছেন, খোদায়ী নির্দেশের অনুগামী করেছেন। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারবর্গের কথা উল্লেখ করার কারণ কি ? জওয়াব এই যে, পয়গম্বরগণের দাওয়াতের বিশেষ কতিপয় মূলনীতি আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হেদায়েতের কাজ সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে শুরু করতে হবে। নিজ পরিবারের লোকজনের পক্ষে হেদায়েত মেনে নেয়া এবং মানানো অপেক্ষাকৃত সহজও। তাদের দেখাশোনাও সদাসর্বদা করা যায়। তারা যখন কোন বিশেষ রঙে রঞ্জিত হয়ে পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন একটি ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক দাওয়াত ও অন্যদের সংশোধনে বিরাট সহায়তা করে। মানবজাতির সংশোধনের সর্বাধিক কার্যকরী পন্থা হচ্ছে, একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় পরিবেশ অস্তিত্বে আনয়ন করা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেক ভাল অথবা মন্দ বিষয় শিক্ষা-দীক্ষা ও উপদেশের চাইতে পরিবেশের মাধ্যমেই অধিক প্রসার লাভ করে।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ হযরত ইদরীস (আঃ) নূহ (আঃ)-এর এক হাজার বছর পূর্বে তাঁর পিতৃপুরুষদের অন্যতম ছিলেন। (মুস্তাদরাক হাকিম) হযরত আদম (আঃ)- এর পর তিনিই সর্বপ্রথম নবী ও রসূল, যার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা ত্রিশটি সহীফা নাযিল করেন। (হামাখশারী) হযরত ইদরীস (আঃ) সর্বপ্রথম মানব, যাকে মু'জেযা হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। (বাহ্‌রে মুহীত) তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি কলমের সাহায্যে লেখা ও বস্ত্র সেলাই আবিষ্কার করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণতঃ পোশাকের স্থলে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতিও সর্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কার করেন এবং অস্ত্র-শস্ত্রের আবিষ্কারও তাঁর আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন। (বাহ্‌রে মুহীত, কুরতুবী, মাযহারী, রূহুল মা'আনী)

وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا অর্থাৎ, আমি ইদরীস (আঃ)-কে উচ্চ মর্তবায় সমুন্নত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁকে নবুওয়ত, রেসালত ও নৈকট্যের বিশেষ মর্তবা দান করা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ইদরীস (আঃ)-কে আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন ঃ

অর্থাৎ, এটা কা'বে আহ্‌বারের ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। এর কোন কোনটি বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা স্বীকৃত নয়। কোরআন পাকের আলোচ্য বাক্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না যে, এখানে মর্তবা উচ্চ করা বোঝানো হয়েছে, না জীবিত অবস্থায় তাকে আকাশে তুলে নেয়া বোঝানো হয়েছে। কাজেই আকাশে তুলে নেয়ার বিষয়টির অস্বীকৃতি অকাট্য নয়। কোরআনের তফসীর এর উপর নির্ভরশীল নয়। (বয়ানুল -কোরআন)

রসূল ও নবীর সংজ্ঞায় পার্থক্য ও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ বয়ানুল -কোরআন থেকে উদ্ধৃতি ঃ রসূল ও নবীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। বিভিন্ন আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনার পর আমার কাছে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, তা এই যে, যিনি উম্মতের কাছে নতুন শরীয়ত প্রচার করেন, তিনি রসূল। এখন শরীয়তটি স্বয়ং রসূলের দিক দিয়ে নতুন হোক, যেমন— তওরাত ইত্যাদি কিংবা শুধু উম্মতের দিক দিয়েই নতুন হোক, যেমন ইসমাঈল (আঃ)-এর শরীয়ত; এটা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রাচীন শরীয়তই ছিল, কিন্তু যে জুরহাম গোত্রের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা পূর্বে এ শরীয়ত সম্পর্কে কিছুই জানত না। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তারা এ শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এ অর্থের দিক দিয়ে রসূলের জন্য নবী হওয়া জরুরী নয়; যেমন—ফেরেশতা রসূল, কিন্তু নবী নন। অথবা যেমন— ঈসা (আঃ -এর প্রেরিত দূত। আয়াতে তাদেরকে اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ বলা হয়েছে, অথচ তারা নবী ছিলেন না।

যার কাছে ওহী আগমন করে, তিনি নবী; তিনি নতুন শরীয়ত প্রচার করুন কিংবা প্রাচীন শরীয়ত। উদাহরণতঃ বনী-ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত প্রচার করতো। এ থেকে জানা গেল যে, একদিক দিয়ে রসূল শব্দটি নবী শব্দের চাইতে ব্যাপক এবং অন্য দিক দিয়ে নবী শব্দটি রসূল শব্দের চাইতে ব্যাপক। যে আয়াতে উভয় শব্দ একক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন উল্লেখিত আয়াতসমূহে رَسُوْلًا نَّبِيًّا বলা হয়েছে, সেখানে কোন খটকা নেই। কেননা, বিশেষ ও ব্যাপকের একত্র সমাবেশ

অযৌক্তিক নয়; কিন্তু যেখানে উভয় শব্দ পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ وَّلَا نَبِيٍّ বাক্যে বলা হয়েছে, সেখানে স্থানের ইঙ্গিতে নবীর অর্থ হবে এমন ব্যক্তি, যিনি পূর্ববর্তী শরীয়ত প্রচার করেন।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمَ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنۡ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ এখানে শুধু হযরত ইদরীস (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে, وَمِمَّنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوۡحٍ এখানে শুধু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে, وَّمِنۡ ذُرِّيَّةِ اِبۡرٰهِيۡمَ এখানে ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে এবং وَاِسۡرَآءِيۡلَ এখানে হযরত মূসা, হারূন, যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে।

اِذَا تُتۡلٰى عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتُ الرَّحۡمٰنِ خَرُّوۡا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন প্রধান পয়গম্বরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাঁদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জনসাধারণের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ির আশঙ্কা ছিল; যেমন ইহুদীরা হযরত ওযায়রকে এবং খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসাকে খোদাই বানিয়ে দিয়েছে, তাই এই সমষ্টির পর তারা যে আল্লাহ্র সামনে সেজদাকারী এবং আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ছিলেন, একথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে, যাতে সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়িও না হয় এবং অবমাননাও না হয়।— (বয়ানুল-কোরআন)

কোরআন তেলাওয়াতের সময় কান্না অর্থাৎ অশ্রুসজল হওয়া পয়গম্বরদের সুন্নতঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কোরআনের আয়াত তেলাওয়াতের সময় কান্নার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রশংসনীয় এবং পয়গম্বরদের সুন্নত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও ওলী-আল্লাহ্দের থেকে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

কুরতুবী বলেন ঃ কোরআন পাকে সেজদার যে আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তার সাথে মিল রেখে সেজদায় দোয়া করা আলেমদের মতে মুস্তাহাব। উদাহরণতঃ সূরা সেজদায় এই দোয়া করা উচিত ঃ

اللّٰهم اجعلنى من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك
واعوذبك ان اكون من المستكبرين عن امرك

خلف লামের সাকিন যোগে এ শব্দটির অর্থ মন্দ উত্তরসূরী, মন্দ সন্তান-সন্ততি এবং লামের যবর যোগে এর অর্থ হয় উত্তম উত্তরসূরী এবং উত্তম সন্তান-সন্ততি। (মাযহারী) মুজাহিদ বলেন ঃ কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অস্তিত্ব থাকবে না, তখন এরূপ ঘটনা ঘটবে। তখন নামাযের প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপ করবে না এবং প্রকাশ্যে পাপাচার অনুষ্ঠিত হবে।

নামায অসময়ে অথবা জমাআত ছাড়া পড়া নামায নষ্ট করার শামিল এবং বড় গোনাহ্ ঃ আয়াতে 'নামায নষ্ট করা' বলে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, নখয়ী, কাসেম, মুজাহিদ, ইবরাহীম, ওমর ইবনে আবদুল আযীয প্রমুখ বিশিষ্ট তফসীরবিদদের মতে, অসময়ে নামায পড়া বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ সময়সহ নামাযের আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনটিতে ত্রুটি করা নামায নষ্ট করার শামিল, আবার কারও কারও মতে 'নামায নষ্ট করা। বলে জমাআত ছাড়া নিজ গৃহে নামায পড়া বোঝানো হয়েছে।— (কুরতুবী, বাহ্রে মুহীত)

খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) সকল সরকারী কর্মচারীদের কাছে এই নির্দেশনামা লিখে প্রেরণ করেছিলেন ঃ 'আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করে, সে দ্বীনের অন্যান্য বিধি-বিধান আরাও বেশী নষ্ট করবে।— (মুয়াত্তা মালেক)

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাযের আদব ও রোকন ঠিকমত পালন করছেন না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কবে থেকে এভাবে নামায পড়ছ? লোকটি বলল ঃ চল্লিশ বছর ধরে। হুযায়ফা বললেন ঃ তুমি একটি নামাযও পড়নি। যদি এ ধরনের নামায পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো— মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনীত আদর্শের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে।

তিরমীযিতে হযরত আবু মাসউদ আনসারীর বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রসূল করীম (সাঃ) বলেন ঃ ঐ ব্যক্তির নামায হয় না, যে নামাযে 'একামত' করে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুকূ ও সেজদায়, রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সেজদার মধ্যস্থলে সোজা দাঁড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে গুরুত্ব দেয় না, তার নামায হয় না।

وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ - شهوات (কুপ্রবৃত্তি) বলে দুনিয়ার সেসব আকর্ষণকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ ও নামায থেকে গাফেল করে দেয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক পোশাক আয়াতে উল্লেখিত কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত।— (কুরতুবী)

فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا আরবী ভাষায় غى শব্দটি رشاد এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে رشاد এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বিষয়কে غى বলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ 'গাই' জাহান্নামের একটি গর্তের নাম। এতে সমগ্র জাহান্নামের চাইতে অধিক আযাবের সমাবেশ রয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'গাই' জাহান্নামের একটি গুহার নাম। জাহান্নামও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তাআলা যাদের জন্যে এই গুহা প্রস্তুত করেছেন তারা হচ্ছে, যে যিনাকার যিনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে মদ্যপায়ী মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে সুদখোর সুদগ্রহণ থেকে বিরত হয় না, যারা পিতা-মাতার অবাধ্যতা করে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে নারী অপরের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তানে পরিণত করে।— (কুরতুবী)

لَا يَسۡمَعُوۡنَ فِيۡهَا لَغۡوًا - لغو বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তা,

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمۡرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَيۡنَ اَيۡدِيۡنَا وَمَا خَلۡفَنَا
وَمَا بَيۡنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ
الۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا فَاعۡبُدۡهُ وَاصۡطَبِرۡ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلۡ تَعۡلَمُ
لَهٗ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾ وَيَقُوۡلُ الۡاِنۡسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوۡفَ اُخۡرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾
اَوَلَا يَذۡكُرُ الۡاِنۡسَانُ اَنَّا خَلَقۡنٰهُ مِنۡ قَبۡلُ وَلَمۡ يَكُ شَيۡـًٔا ﴿٦٧﴾
فَوَرَبِّكَ لَنَحۡشُرَنَّهُمۡ وَالشَّيٰطِيۡنَ ثُمَّ لَنُحۡضِرَنَّهُمۡ حَوۡلَ جَهَنَّمَ
جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنۡزِعَنَّ مِنۡ كُلِّ شِيۡعَةٍ اَيُّهُمۡ اَشَدُّ عَلَى الرَّحۡمٰنِ
عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحۡنُ اَعۡلَمُ بِالَّذِيۡنَ هُمۡ اَوۡلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ وَاِنۡ
مِّنۡكُمۡ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتۡمًا مَّقۡضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّى
الَّذِيۡنَ اتَّقَوۡا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيۡنَ فِيۡهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾ وَاِذَا تُتۡلٰى عَلَيۡهِمۡ
اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لِلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا ۙ اَىُّ الۡفَرِيۡقَيۡنِ
خَيۡرٌ مَّقَامًا وَّاَحۡسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ وَكَمۡ اَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُمۡ مِّنۡ قَرۡنٍ هُمۡ
اَحۡسَنُ اَثَاثًا وَّرِءۡيًا ﴿٧٤﴾ قُلۡ مَنۡ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلۡيَمۡدُدۡ لَهُ
الرَّحۡمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰۤى اِذَا رَاَوۡا مَا يُوۡعَدُوۡنَ اِمَّا الۡعَذَابَ وَاِمَّا
السَّاعَةَ ؕ فَسَيَعۡلَمُوۡنَ مَنۡ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضۡعَفُ جُنۡدًا ﴿٧٥﴾

(৬৪) (জিবরাঈল বলল ঃ) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না, যা আমাদের সামনে আছে, যা আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা এ দুই-এর মধ্যস্থলে আছে, সবই তাঁর এবং আপনার পালনকর্তা বিস্মৃত হওয়ার নন। (৬৫) তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবার পালনকর্তা। সুতরাং তাঁরই বন্দেগী করুন এবং তাতে দৃঢ় থাকুন। আপনি কি তাঁর সমনাম কাউকে জানেন? (৬৬) মানুষ বলে ঃ আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব? (৬৭) মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না। (৬৮) সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব। (৬৯) অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহ্‌র সর্বাধিক অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। (৭০) অতঃপর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞাত আছি। (৭১) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌঁছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা। (৭২) অতঃপর আমি পরহেযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব। (৭৩) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন কাফেররা মুমিনদেরকে বলে ঃ দুই দলের মধ্যে কোনটি মর্তবায় শ্রেষ্ঠ এবং কার মজলিস উত্তম? (৭৪) তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি বিনাশ করেছি, তারা তাদের চাইতে সম্পদে ও জাঁক-জমকে শ্রেষ্ঠ ছিল। (৭৫) বলুন, যারা পথভ্রষ্টতায় আছে, দয়াময় আল্লাহ্ তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দেবেন; এমনকি অবশেষে তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা আযাব হোক অথবা কেয়ামতই হোক। সুতরাং তখন তারা জানতে পারবে কে মর্তবায় নিকৃষ্ট ও দলবলে দুর্বল।

গালিগালাজ এবং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ বোঝানো হয়েছে। জান্নাতবাসিগণ এ থেকে পবিত্র থাকবে। কোনরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবে না।

اِلَّا سَلٰمًا এটা পূর্ববাক্যের ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে যার যে কথা শোনা যাবে, তা শান্তি, নিরাপত্তা ও আনন্দ বৃদ্ধি করবে। পারিভাষিক সালামও এর অন্তর্ভুক্ত। জান্নাতিগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে সালাম করবে।— (কুরতুবী)

وَلَهُمۡ رِزۡقُهُمۡ فِيۡهَا بُكۡرَةً وَّعَشِيًّا জান্নাতে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং দিন ও রাত্রির অস্তিত্ব থাকবে না। সদা-সর্বদা একই প্রকার আলো থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন, রাত্রি ও সকাল-সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। এই রকম সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতবাসীরা তাদের জীবনোপকরণ লাভ করবে। একথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতিগণ যখন যে বস্তু কামনা করবে, তখনই কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে।

এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল-সন্ধ্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ সকাল-সন্ধ্যায় আহারে অভ্যস্ত। আরবরা বলে ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যার পূর্ণ আহার্য যোগাড় করতে পারে, সে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ শীল।

হযরত আনাস ইবনে মালেক এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন ঃ এ থেকে বোঝা যায় যে, মুমিনদের আহার দিনে দু'বার হয়—সকাল ও সন্ধ্যায়।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বোঝানো হয়েছে, যেমন দিবারাত্রি ও পূর্ব-পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের খায়েশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সর্দাসর্বদা উপস্থিত থাকবে।— (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاصۡطَبِرۡ لِعِبَادَتِهٖ - اصطبار — শব্দের অর্থ পরিশ্রম ও কষ্টের কাজে দৃঢ় থাকা। ইঙ্গিত রয়েছে যে, এবাদতের স্থায়িত্ব পরিশ্রমসাপেক্ষ। এবাদতকারীর এ জন্যে প্রস্তুত থাকা উচিত।

هَلۡ تَعۡلَمُ لَهٗ سَمِيًّا শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সম্নান। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে, মুশরিক ও প্রতিমা পূজারীরা যদিও এবাদতে আল্লাহ্ তাআলার সাথে অনেক মানুষ, ফেরেশতা, পাথর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে 'ইলাহ্' তথা উপাস্য বলত; কিন্তু কেউ কোনদিন কোন মিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহ্ রাখেনি। সৃষ্টিগত ও নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থাধীনেই দুনিয়াতে কোন মিথ্যা উপাস্য আল্লাহ্ নামে অভিহিত হয়নি। তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র কোন সমনাম নেই।

মুজাহিদ, ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ, ইবনে আব্বাস প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে এস্থলে سمى শব্দের অর্থ অনুরূপ সদৃশ বর্ণিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, পূর্ণতার গুণাবলীতে আল্লাহ্ তাআলার কোন সমতুল্য, সমকক্ষ নেই।

لَنَحۡشُرَنَّهُمۡ وَالشَّيٰطِيۡنَ ثُمَّ لَنُحۡضِرَنَّهُمۡ এখানে والشياطين এর واو

مع (সহ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক কাফেরকে তার শয়তানসহ একই শিকলে বেঁধে উত্থিত করা হবে। এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি হবে শুধু কাফেরদেরকে সমবেত করা সম্পর্কে। পক্ষান্তরে যদি মুমিন ও কাফের ব্যাপক অর্থে নেয়া হয়, তবে শয়তানদের সাথে তাদের সবাইকে সমবেত করার মর্মার্থ হবে এই যে, প্রত্যেক কাফের তো তার শয়তানের সাথে বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হবেই এবং মুমিনগণও এই মাঠে আলাদা থাকবে না; ফলে সবার সাথে শয়তানদের সহঅবস্থান হবে।— (কুরতুবী)

حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا হাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মুমিন, কাফের, ভাগ্যবান ও হতভাগা সবাইকে জাহান্নামের চারদিকে সমবেত করা হবে। সবাই ভীতিবিহ্বল নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মুমিন ও ভাগ্যবানদেরকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি খুশী, ধর্মদ্রোহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাতলাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ – شيعة শব্দের আসল অর্থ কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা বিশেষ মতবাদের অনুসারী। তাই সম্প্রদায় অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দলটি সর্বাধিক উদ্ধত হবে, তাকে সবার মধ্য থেকে পৃথক করে অগ্রে প্রেরণ করা হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ অপরাধের আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।— (মাযহারী)

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا অর্থাৎ, জাহান্নামে পৌছবে না, এমন কোন মুমিন ও কাফের থাকবে না। এখানে পৌছার অর্থ প্রবেশ নয়—অতিক্রম করা। হযরতই ইবনে মাসউদের এক রেওয়ায়েতে مرور (অতিক্রম করা) শব্দও বর্ণিত রয়েছে। যদিও প্রবেশ অর্থ নেয়া হয়, তবে মুমিন ও পরহেযগারদের প্রবেশ এভাবে হবে যে, জাহান্নাম তদের জন্যে শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে, তারা কোনরূপ কষ্ট অনুভব করবে না। হযরত আবু সুমাইয়ার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কোন সৎ ও পাপাচারী ব্যক্তি প্রথমাবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাদ পড়বে না। কিন্তু তখন মুমিন ও মুত্তাকীদের জন্যে জাহান্নাম শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে; যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর জন্যে নমরূদের অগ্নিকুণ্ডকে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেয়া হয়েছিল। এরপর মুমিনদেরকে এখান থেকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। আয়াতের পরবর্তী ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا বাক্যের অর্থ তাই।

خَيْرٌ مَّقَامًا وَّأَحْسَنُ نَدِيًّا এখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশে কাফেররা মুসলমানদের সামনে দু'টি বিষয় উপস্থাপিত করেছে। (এক) পার্থিব ধন–দৌলত ও সাজ–সরঞ্জাম এবং (দুই) চাকর–নওকর, দলবল ও পারিষদবর্গ। এসব বস্তু মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের কাছে বেশী ছিল। এ দু'টি বস্তুই মানুষের জন্যে নেশা হিসাবে কাজ করে এবং এগুলোর অহমিকাই ভাল ভাল জ্ঞানী ও সুধীজনকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। এ নেশাই মানুষের সামনে বিগত যুগের বড় বড় পুঁজিপতি ও রাজ্যাধিপতিদের দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস বিস্মৃতি করিয়ে তার বর্তমান অবস্থাকে তার ব্যক্তিগত গুণ–গরিমার ফল এবং স্থায়ী শান্তির উপায়রূপে প্রতিভাত করে দেয়। অবশ্য তাদের কথা স্বতন্ত্র, যারা কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী পার্থিব ধন–দৌলত মান–সম্মান ও প্রভাব–প্রতিপত্তিকে ব্যক্তিগত গুণ–গরিমার ফল অথবা চিরস্থায়ী সাথী মনে করে না; সাথে সাথে মুখেও আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত ব্যয় করার কাজেও আল্লাহ্র বিধি–বিধান মেনে চলে এবং কোন সময় গাফেল হয় না। তারাই শুধু পার্থিব ধন–দৌলতের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণতঃ অনেক পয়গম্বর, যেমন হযরত সোলায়মান (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ) এবং অনেক বিত্তশালী সাহাবী, উম্মতের মধ্যকার অনেক ওলী ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা অতুল বিত্তবৈভব দান করেছেন এবং সাথে সাথে ধর্মীয় সম্পদ ও অপরিমেয় আল্লাহ্ ভীতিতেও তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কাফেরদের এই বিভ্রান্তি কোরআন পাক এভাবে দূর করেছে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত ও সম্পদ আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয় এবং দুনিয়াতেও একে কোন ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠার লক্ষণ মনে করা হয় না। কেননা, দুনিয়াতে অনেক নির্বোধ মূর্খও এগুলো জ্ঞানী ও বিদ্বজ্জনের চাইতেও বেশী লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খুঁজে দেখলে এ সত্য উদঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণ তো বটেই, বরং এর চাইতেও বেশী ধন–দৌলত স্তূপীকৃত হয়েছে।

চাকর–নওকর, বন্ধু–বান্ধব ও পারিষদবর্গের আধিক্য সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রথমতঃ দুনিয়াতেই তাদের অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠে অর্থাৎ, বিপদের মুহূর্তে বন্ধু–বান্ধব ও আত্মীয়–স্বজন কোন কাজে আসে না। দ্বিতীয়তঃ যদি দুনিয়াতে তারা সেবাকর্মে নিয়োজিতও থাকে, তবুও তা কয়দিনের জন্যে? মৃত্যুর পর হাশরের মাঠে কেউ কারো সঙ্গী সাথী হবে না।

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾ لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

(৭৬) যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাদের পথপ্রাপ্তি বৃদ্ধি করেন এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ। (৭৭) আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন, যে আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে না এবং বলে ঃ আমাকে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অবশ্যই দেয়া হবে। (৭৮) সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে, অথবা দয়াময় আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হয়েছে? (৭৯) না, এটা ঠিক নয়। সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি দীর্ঘায়িত করতে থাকব। (৮০) সে যা বলে, মৃত্যুর পর আমি তা নিয়ে নেব এবং সে আমার কাছে আসবে একাকী। (৮১) তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্যে সাহায্যকারী হয়। (৮২) কখনই নয়, তারা তাদের এবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে। (৮৩) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফেরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত করে। (৮৪) সুতরাং তাদের ব্যাপারে আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি মাত্র। (৮৫) সেদিন দয়াময়ের কাছে পরহেযগারদেরকে অতিথিরূপে সমবেত করব, (৮৬) এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। (৮৭) যে দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না। (৮৮) তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। (৮৯) নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছ। (৯০) হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। (৯১) এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহ্‌র জন্যে সন্তান আহবান করে। (৯২) অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। (৯৩) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। (৯৪) তাঁর কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। (৯৫) কেয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا বোখারী ও মুসলিমের হযরত খাব্বাব ইবনে আরতের রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি 'আস ইবনে ওয়ায়েল কাফেরের কাছে কিছু পাওনার তাগাদায় গেলে সে বলল ঃ তুমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। খাব্বাব জওয়াব দিলেন ঃ এরূপ করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, চাই কি তুমি মরে পুনরায় জীবিত হতে পার। আ'স বলল ঃ ভালো তো, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব? এরূপ হলে তাহলে তোমার ঋণ তখনই পরিশোধ করব। কারণ, তখনও আমার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে।—(কুরতুবী)

কোরআন পাক এই আহাম্মক কাফেরের জওয়াবে বলেছে ঃ সে কিরূপে জানতে পারল যে, পুনরায় জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে? أَطَّلَعَ الْغَيْبَ সে কি উঁকি মেরে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে? أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا অথবা সে দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? বলাবাহুল্য, এরূপ কোন কিছুই হয়নি। এমতাবস্থায় সে মনে এরূপ ধারণা কিরূপে বদ্ধমূল করে নিয়েছে? وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ অর্থাৎ, সে যে, ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির কথা বলেছে, তা পরকালে পাওয়া তো দূরের কথা দুনিয়াতেও সে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাও ত্যাগ করতে হবে এবং অবশেষে আমিই তার অধিকারী হব। অর্থাৎ এই ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি তার হস্তচ্যুত হয়ে অবশেষে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাবে।

وَيَأْتِينَا فَرْدًا কেয়ামতের দিন সে একা আমার দরবারে উপস্থিত হবে। তার সাথে তখন না থাকবে সন্তান-সন্ততি এবং না থাকবে ধন-দৌলত।

وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا অর্থাৎ, এই স্বহস্তনির্মিত মূর্তি এবং মিথ্যা উপাস্য, সহায় হওয়ার আশায় কাফেররা যাদের এবাদত করত, তারা এই আশার বিপরীত তাদের শত্রু হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বাকশক্তি দান করবেন এবং তারা বলবে ঃ ইয়া আল্লাহ্, এদেরকে শাস্তি দিন। কেননা, এরা আপনার পরিবর্তে আমাদেরকে উপাস্য করে নিয়েছিল।

تَؤُزُّهُمْ أَزًّا আরবী অভিধানে حض – فز – از – هز শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ কোন কাজের জন্যে উৎসাহিত করা। লঘুতা, তীব্রতা ও কম-বেশীর দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য রয়েছে। از শব্দের অর্থ পূর্ণ শক্তি, কৌশল ও আন্দোলনের মাধ্যমে কাউকে কোন কাজের জন্যে প্রস্তুত বরং বাধ্য করে দেয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, শয়তানেরা কাফেরদেরকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে থাকে, মন্দ কাজের সৌন্দর্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেয় না।

إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا উদ্দেশ্য এই যে, আপনি তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়া-হুড়া করবেন না। শাস্তি সত্বরই হবে। কেননা, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে বসবাসের জন্যে যে গুনাগুনতি দিন ও সময় দিয়েছি, তা দ্রুত পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শাস্তিই শাস্তি। نَعُدُّ لَهُمْ অর্থাৎ, আমি তাদের

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

سورة طه مكية وهي مائة وخمس وثلاثون آية وثمانية ركوعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

طه ﴿١﴾ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴿٢﴾ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿٣﴾ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى ﴿٤﴾ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿٥﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ﴿٦﴾ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿٨﴾ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿٩﴾ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ ﴿١١﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾

(৯৬) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ্ ভালবাসা দেবেন। (৯৭) আমি কোরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা পরহেযগারদেরকে সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন। (৯৮) তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। আপনি কি তাদের কাহারও সাড়া পান, অথবা তাদের ক্ষীণতম আওয়াযও শুনতে পান?

সূরা ত্বোয়া-হা

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১৩৫

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(১) তোয়া-হা (২) আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ন করিনি। (৩) কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্য, যারা ভয় করে। (৪) এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমণ্ডল ও সমুচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। (৫) তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন। (৬) নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তাঁরই। (৭) যদি তুমি উচ্চকণ্ঠেও কথা বল, তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। (৮) আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য ইলাহ নেই। সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই। (৯) আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌছেছে কি। (১০) তিনি যখন আগুন দেখলেন, তখন পরিবারবর্গকে বললেন ঃ তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা আগুনে পৌছে পথের সন্ধান পাব। (১১) অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন, তখন আওয়াজ আসল হে মূসা, (১২) আমিই তোমার পালনকর্তা, অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছ।

জন্যে গণনা করছি। এর উদ্দেশ্য এই যে, কোন কিছুই বল্গাহীন নয়। তাদের বয়সের দিবারাত্রি গণনার মধ্যে রয়েছে। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের চলাফেরার এক একটি পদক্ষেপ, তাদের আনন্দও তাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত আমি গণনা করছি। গণনা শেষ হওয়া মাত্র তাদের উপর আযাব ঝাঁপিয়ে পড়বে।

খলীফা মামুনুর রশীদ একবার সূরা মারইয়াম পাঠ করলেন। এই আয়াত পর্যন্ত পৌছে তিনি দরবারে উপস্থিত আলেম ও ফেকাহ্‌বিদগণের মধ্য থেকে ইবনে সাম্মাকের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন ঃ এ সম্পর্কে কিছু বলুন। ইবনে সাম্মাক আরয করলেন ঃ আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসই যেখানে গুনতিকৃত, তখন তো তা খুবই দ্রুত নিঃশেষ হবে।

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا যারা বাদশাহ্ অথবা কোন শাসনকর্তার কাছে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে গমন করে, তাদেরকে وفد বলা হয়। হাদীসে রয়েছে ঃ তারা সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌছবে এবং প্রত্যেকের সওয়ারী তাই হবে, যা সে দুনিয়াতে পছন্দ করত। উদাহরণতঃ উট, ঘোড়া প্রভৃতি। কেউ কেউ বলেন ঃ তাদের সৎকর্মসমূহ তাদের প্রিয় সওয়ারীর রূপ ধারণ করবে। (রুহুল-মা'আনী, কুরতুবী)

وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে মৃত্তিকা, পাহাড় ইত্যাদিতে বিশেষ এক প্রকার বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান আছে, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনায় ন্যায় খোদায়ী বিধানাবলী প্রযোজ্য হওয়ার স্তর পর্যন্ত উন্নীত নয়। এই বুদ্ধি ও চেতনার কারণই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্‌র নামের তসবীহ্ পাঠ করে, যেমন—কোরআন বলে ঃ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র প্রশংসো-কীর্তন করে না, এমন কোন বস্তু দুনিয়াতে নেই। বস্তুসমূহের এই বুদ্ধি ও চেতনাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করলে বিশেষতঃ আল্লাহ্‌র জন্যে সন্তান সাব্যস্ত করলে পৃথিবী, পাহাড় ইত্যাদি ভীষণরূপে অস্থির ও ভীত হয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ জিন ও মানব ছাড়া সমস্ত সৃষ্টবস্তু শেরকের ভয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।— (রূহুল-মা'আনী)

وَعَدَّهُمْ عَدًّا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র মানবমণ্ডলীর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের পদক্ষেপ, তাদের লোকমা ও ঢোক আল্লাহ্‌র কাছে গণনাকৃত। এতে কম-বেশী হতে পারে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا অর্থাৎ, ঈমান ও সৎকর্মে দৃঢ়পদ ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করলে এবং বাইরের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হলে ঈমানদার সৎকর্মশীলদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি পয়দা হয়ে যায়। একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টজীবের মনেও আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দেন।

বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রার

রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন জিবরাঈলকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। অতঃপর জিবরাঈল সব আকাশে একথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধিবাসীরা সবাই সেই বান্দাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর এই ভালবাসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। তিনি আরও বলেন ঃ কোরআন পাকের এই আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا

(রূহুল-মা'আনী) হারেম ইবনে হাইয়্যান বলেন ঃ যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত ঈমানদারের অন্তর তার দিকে নিবিষ্ট করে দেন।— (কুরতুবী)

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আঃ) যখন স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ্র নির্দেশে মক্কার শুষ্ক পর্বতমালা বেষ্টিত মরুভূমিতে রেখে সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁদের জন্যে দোয়া করে বলেছিলেন ঃ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ হে আল্লাহ্ আমার নিঃসঙ্গ পরিবার পরিজনের প্রতি আপনি কিছু লোকের অন্তর আকৃষ্ট করে দিন। এ দোয়ার ফলেই হাজারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও মক্কা ও মক্কাবাসীদের প্রতি মহব্বতে সমগ্র বিশ্বের অন্তর আপ্লুত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে দূরতিক্রম্য বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে মানুষ এখানে পৌঁছে এবং বিশ্বের কোণে কোণে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়, তা মক্কার বাজারসমূহে পাওয়া যায়।

أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا বোধগম্য নয় — এমন ক্ষীণতম শব্দকে رِكْز বলা হয়; যেমন মরণোন্মুখ ব্যক্তি জিহ্বা সঞ্চালন করলে আওয়াজ হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সব রাজ্যাধিপতি, জাঁক-জমকের অধিকারী ও শক্তিধরদেরকে যখন আল্লাহ্ তাআলার আযাব পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেয়, তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের কোন ক্ষীণতম শব্দ এবং আচরণ-আলোড়ন আর শোনা যায় না।

সূরা ত্বোয়া-হা

এই সূরার অপর নাম সূরা কলীম। কারণ, এতে হযরত মূসা কলীমুল্লাহ্ (আঃ)-এর ঘটনার বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসনাদের দারেমীতে হযরত আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন আল্লাহ্ তাআলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করারও দুই হাজার বছর পূর্বে সূরা তোয়াহা ও সূরা ইয়াসীন, ফেরেশতাদেরকে শোনান, তখন ফেরেশতারা বলেছিলেন ঃ ঐ উম্মত অত্যন্ত ভাগ্যবান ও বরকতময়, যাদের প্রতি এই সূরাগুলো অবতীর্ণ হবে; তারা পুণ্যবান, যারা এগুলো হেফয্ করবে এবং তারা অপরিসীম সৌভাগ্যশীল, যারা এগুলো পাঠ করবে। এই বরকতময় সূরাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে হত্যার উদ্দেশে আগমনকারী ওমর ইবনুল খাত্তাবকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল।

طه — এই শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর অর্থ يا رجل (হে ব্যক্তি) এবং ইবনে ওমর থেকে يا حبيبى (হে আমার বন্ধু) বর্ণিত আছে। কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, طه ও يس রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অন্যতম নাম। কিন্তু হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) ও বিশিষ্ট আলেমগণ এ সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তাই নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য। তাঁরা বলেন ঃ কোরআন পাকের অনেক সূরার শুরুতে الم এর ন্যায় বেশ কিছুসংখ্যক খণ্ড অক্ষর উল্লেখিত হয়েছে। এগুলো متشابهات অর্থাৎ, গোপনভেদ যার মর্ম আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কেউ জানে না। طه শব্দটিও এরই অন্তর্ভুক্ত।

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ - لِتَشْقَىٰ শব্দটি شقاء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ক্লেশ, পরিশ্রম ও কষ্ট। কোরআন অবতরণের সূচনাভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম সারারাত এবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং তাহাজ্জুদের নামাযে কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পা ফুলে যায়। কাফেররা কোন রকমে হেদায়েত লাভ করুক এবং কোরআনের দাওয়াত কবুল করুক— তিনি সারাদিন এ চিন্তায়ই কাটিয়ে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এই উভয়বিধ ক্লেশ থেকে উদ্ধার করার জন্যে বলা হয়েছে ঃ আপনাকে কষ্টে ও পরিশ্রমে ফেলার জন্যে আমি কোরআন অবতীর্ণ করিনি। সারারাত জাগ্রত থাকা এবং কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার প্রয়োজন নেই। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিয়মিতভাবে রাতের সূচনাভাগে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়তেন।

এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু দাওয়াত ও প্রচার করা। একাজ সম্পন্ন করার পর কে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং কে দাওয়াত কবুল করল না, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আপনার দায়িত্ব নয়।— (কুরতুবী—সংক্ষেপিত)

إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ইবনে কাসীর বলেন ঃ কোরআন অবতরণের সূচনাভাগে সারারাত তাহাজ্জুদ ও কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে কোন কোন কাফের মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করতে থাকে যে, তাদের প্রতি কোরআন তো নয়—সাক্ষাত বিপদ নাযিল হয়েছে; রাতেও আরাম নেই, দিনের বেলায়ও শান্তি নেই। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন যে, সত্য সম্পর্কে বেখবর; হতভাগা, মূর্খরা জানে না যে, কোরআন ও কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা যে জ্ঞান প্রদান করেছেন তার কল্যাণকারীতা কত গভীর। যারা একে বিপদ মনে করে, তারা নির্বোধ। হযরত মুআবিয়ার বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা যার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের বিশেষ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি দান করেন।

এখানে ইবনে-কাসীর অপর একটি সহীহ্ হাদীসও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি আলেম সমাজের জন্যে খুবই সুসংবাদবহ। এই হাদীসটি হযরত সা'লাবা কর্তৃক ইবনে-হাকাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি এই ঃ

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের আমলের ফয়সালা করার জন্যে তাঁর সিংহাসনে উপবেশন করবেন, তখন আলেমগণকে বলবেন ঃ আমি আমার এলম ও হেকমত তোমাদের বুকে এ জন্যেই রেখেছিলাম, যাতে তোমাদের কৃত গোনাহ্ ও ত্রুটি সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেই। এতে আমি কোন পরওয়া করি না।'

কিন্তু এখানে সেসব আলেমগণকেই বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কোরআন বর্ণিত এলমের লক্ষণ অর্থাৎ আল্লাহ্র ভয় বিদ্যমান আছে। আয়াতের لِّمَنْ يَخْشَىٰ শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে। যাদের মধ্যে এই আলামত নেই, তারা এই হাদীসের যোগ্যপাত্র নয়।

عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ – استواء على العرش (আরশের উপর সমাসীন হওয়া) সম্পর্কে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের উক্তি হচ্ছে যে, এর স্বরূপ ও অবস্থা কারও জানা নেই। এটা مُتَشَابِهَاتٌ তথা দুর্বোধ্য বিষয়াদির অন্যতম। এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরশের উপর সমাসীন হওয়া সত্য। এ অবস্থা আল্লাহ্র শান অনুযায়ী হবে। জগতের কেউ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ আর্দ্র ও ভেজা মাটিকে ثرى বলা হয় যা মাটি খনন করার সময় নীচ থেকে বের হয়। মানুষের জ্ঞান এই ثرى পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। এর নীচে কি আছে, তা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। সমকালীন নতুন গবেষণা, নুতন নতুন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও মাটি খুঁড়ে এপার থেকে ওপারে চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা বহু বছর ধরে চালানো হয়েছে এবং এসব গবেষণা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলাফল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে, কিন্তু মাত্র ছয় মাইল গভীর পর্যন্তই এসব আধুনিক যন্ত্রপাতি কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। এর নীচে এমন প্রস্তর সদৃশ স্তর রয়েছে, যেখানে খনন কাজ চালাতে সকল যন্ত্রপাতি ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনাও ব্যর্থ হয়েছে। মাত্র ছয় মাইলের গভীরতা পর্যন্তই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে; অথচ মৃত্তিকার ব্যাস হাজারো মাইল। তাই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, পাতালের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই বিশেষ গুণ।

يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى মানুষ মনে যে কথা গোপন রাখে, কারও কাছে তা প্রকাশ করে না, তাকে বলা হয় سر পক্ষান্তরে اخفى বলে সে কথা বোঝানো হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত মনেও আসেনি, ভবিষ্যতে কোন সময় আসবে। আল্লাহ্ তাআলা এসব বিষয় সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকিফহাল। কোন মানুষের মনে এখন কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি থাকবে, তিনি সবই জানেন। ভবিষ্যত সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও জানে না যে, আগামীকাল তার মনে কি কথা উদিত হবে।

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কোরআন পাকের মাহাত্ম্য এবং সেই প্রসঙ্গে রসূলের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক এই যে, রেসালত ও দাওয়াতের কর্তব্য পালনের পথে যেসব বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ যেসব কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলো মহানবী (সাঃ)-এর জানা থাকা দরকার যাতে তিনি পূর্ব থেকেই এসব বিপদাপদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে অবিচল থাকতে পারেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ

অর্থাৎ, আমি পয়গম্বরগণের এমন কাহিনী আপনার কাছে এ জন্যে বর্ণনা করি, যাতে আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং আপনি নবুওয়তের দায়িত্ব বহন করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান।

এখানে উল্লেখিত মূসা (আঃ)-এর কাহিনীর সূচনা এভাবে ঃ একদা তিনি মাদইয়ান পৌঁছে হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর গৃহে এরূপ চুক্তির অধীনে অবস্থান করতে থাকেন যে, আট অথবা দশ বছর পর্যন্ত তাঁর খেদমত করবেন। তফসীর বাহ্রে-মুহীতের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি যখন উচ্চ মেয়াদ অর্থাৎ, দশ বছর পূর্ণ করেন তখন শোআয়ব (আঃ)-এর কাছে আরয করলেন ঃ এখন আমি জননী ও ভগ্নির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে মিসর যেতে চাই। ফেরাউনের সিপাহীরা তাঁকে গ্রেফতার ও হত্যার জন্যে খোঁজ করছিল। এ আশঙ্কার কারণেই তিনি মিসর ত্যাগ করেছিলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে এখন সে আশঙ্কা অবশিষ্ট ছিল না। শোআয়ব (আঃ) তাঁকে স্ত্রী অর্থাৎ, নিজের কন্যাসহ কিছু অর্থকড়ি ও আসবাবপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন। পথিমধ্যে শাম অঞ্চলের শাসকদের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কা ছিল, তাই তিনি পরিচিত পথ ছেড়ে অখ্যাত পথ অবলম্বন করলেন। তখন ছিল শীতকাল। স্ত্রী ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা এবং তাঁর প্রসবকাল ছিল নিকটবর্তী। সকাল-বিকাল যে কোন সময় প্রসবের সম্ভাবনা ছিল। রাস্তা ছিল অপরিচিত। তাই তিনি মরু অঞ্চলে পথ হারিয়ে তূর পর্বতের পশ্চিমে ও ডান দিকে চলে গেলেন। গভীর অন্ধকার। কনকনে শীত। বরফসিক্ত মাটি। এহেন দুর্যোগ-মুহূর্তে স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয়ে গেল। মূসা (আঃ) শীতের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে আগুন জ্বালাতে চাইলেন। তখনকার দিনে দিয়াশলাই-এর স্থলে চকমকি পাথর ব্যবহার করা হত। এই পাথরে আঘাত করলে আগুন জ্বলে উঠত। মূসা (আঃ) এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যর্থ হলেন। আগুন জ্বলল না। এই হতবুদ্ধি অবস্থার মধ্যেই তিনি তূর পর্বতে আগুন দেখতে পেলেন। সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে নূর। তিনি পরিবারবর্গকে বললেন ঃ তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি। দেখি, সেখানে গিয়ে আগুন আনা যায় কিনা। সম্ভবতঃ আগুনের কাছে কোন পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও পেতে পারি, যার কাছ থেকে পথের সন্ধান জানতে পারব। পরিবারবর্গের মধ্যে স্ত্রী যে ছিলেন, তা তো সুনিশ্চিত। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কোন খাদেমও সাথে ছিল। তাকে উদ্দেশ করেও সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কিছুসংখ্যক লোক সফর সঙ্গীও ছিল, কিন্তু পথ ভুলে তিনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।— (বাহ্রে-মুহীত)

فَلَمَّا أَتَاهَا — অর্থাৎ, যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন ;

মুসনাদে-আহমদে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ বর্ণনা করেন যে, মূসা (আঃ) আগুনের কাছে পৌছে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন যে, এটি একটি বিরাট আগুন, যা একটি সতেজ ও সবুজ বৃক্ষের উপর দাউ দাউ করে জ্বলছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর কারণে বৃক্ষের কোন ডাল অথবা পাতা পুড়ছে না; বরং আগুনের কারণে বৃক্ষের সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরও বেড়ে গেছে। মূসা (আঃ) এই বিস্ময়কর দৃশ্য কিছুক্ষণ পর্যন্ত দেখতে থাকলেন এবং অপেক্ষা করলেন যে, আগুনের কোন স্ফুলিঙ্গ মাটিতে পড়লে তিনি তা তুলে নেবেন।

অনেকক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন এমন হল না, তখন তিনি কিছু ঘাস ও খড়কুটা একত্রিত করে আগুনের কাছে ধরলেন। বলাবাহুল্য, এতে আগুন লেগে গেলেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু এগুলো আগুনের কাছে নিতেই আগুন পেছনে সরে গেল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আগুন তাঁর দিকে অগ্রসর হল। তিনি অস্থির হয়ে পেছনে সরে গেলেন। মোটকথা, আগুন লাভ করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। তিনি এই অত্যাশ্চর্য আগুনের প্রভাবে বিস্ময়াভিভূত ছিলেন, ইতিমধ্যে একটি গায়বী আওয়াজ হল।–(রূহুল-মা'আনী)

মূসা (আঃ) পাহাড়ের পাদদেশে এই ঘটনার সম্মুখীন হন। পাহাড়টি ছিল তাঁর ডানদিকে। এই উপত্যকার নাম ছিল 'তুয়া'।

نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى إِنِّيْٓ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ – বাহ্‌রে-মুহীত, রূহুল – মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে আছে, হযরত মূসা (আঃ) এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে সমভাবে শ্রবণ করেন। তার কোন দিক নির্দিষ্ট ছিল না। শুনেছেনও অপরূপ ভঙ্গিতে; শুধু কানে নয়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। এটা ছিল একটা মু'জেযার মতই। আওয়াজের সারমর্ম ছিল এই যে, যে বস্তুকে তুমি আগুন মনে করছ, তা আগুন নয়— আল্লাহ্ তাআলার দ্যুতি। এতে বলা হয়, আমিই তোমার পালনকর্তা। হযরত মূসা (আঃ) কিরূপে নিশ্চিত হলেন যে, এটা আল্লাহ্ তাআলারই আওয়াজ? এই প্রশ্নের আসল উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অন্তরে এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন যে, এটা আল্লাহ্ তাআলারই আওয়াজ। এ ছাড়া মূসা (আঃ) দেখলেন যে, এই আগুনের কারণে বৃক্ষ পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে তার সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, আওয়াজও সাধারণ মানুষের আওয়াজের ন্যায় একদিক থেকে আসেনি; বরং চতুর্দিক থেকে এসেছে এবং শুধু কানই নয়– হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ আওয়াজ শ্রবণে শরীক আছে; এসব অবস্থা থেকেও তিনি বোঝে নেন যে, এ আওয়াজ আল্লাহ্ তাআলারই।

মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার শব্দযুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছেন ঃ রূহুল-মা'আনীতে মুসনাদে আহমদের বরাতে ওয়াহাবের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, মূসা (আঃ)-কে যখন 'ইয়া মূসা' শব্দ প্রয়োগে আওয়াজ দেয়া হয়, তখন তিনি 'লাব্বায়েক' (হাজির আছি) বলে জওয়াব দেন এবং বলেন যে, আমি আওয়াজ শুনছি। কিন্তু কোথা থেকে আওয়াজ দিচ্ছেন, তা জানি না। আপনি কোথায় আছেন? উত্তরে বলা হল ঃ আমি তোমার উপরে, সামনে, পশ্চাতে ও তোমার সাথে আছি। অতঃপর মূসা (আঃ) আরয করলেন ঃ আমি স্বয়ং আপনার কালাম শুনছি, না আপনার প্রেরিত কোন ফেরেশতার কথা শুনছি? জওয়াব হল ঃ আমি নিজেই তোমার সাথে কথা বলছি। রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন ঃ এ থেকে জানা যায় যে, মূসা (আঃ) এই শব্দযুক্ত কালাম ফেরেশতাদের মধ্যস্থতা ব্যতীত নিজে শুনেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল-জমাআতের মধ্যে একদল আলেম এজন্যেই বলেন যে, শব্দযুক্ত কালামও চিরন্তন হওয়া সত্ত্বেও শ্রবণযোগ্য। এর কালাম নবীন হয় বলে যে প্রশ্ন তোলা হয়, তার জওয়াব তাদের পক্ষ থেকে এই যে, শব্দযুক্ত কালাম তখনই নবীন হয়, যখন তা বৈষয়িক ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এর জন্যে স্থূলতা ও দিক শর্ত। এরূপ কালাম বিশেষভাবে কানেই শোনা যায়। মূসা (আঃ) কোন নির্দিষ্ট দিক থেকে এ কালাম শোনেননি এবং শুধু কানেই শোনেননি; বরং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। বলাবাহুল্য, এ পরিস্থিতি নবীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত।

সম্ভ্রমের স্থলে জুতা খুলে ফেলা অন্যতম আদবঃ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ

জুতা খোলার নির্দেশ দেয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সম্ভ্রম প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা তার অন্যতম আদব। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, মূসা (আঃ)-এর পাদুকাদ্বয় ছিল মৃত জন্তুর চর্মনির্মিত। হযরত আলী, হাসান বসরী ও ইবনে জুরায়জ থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে। তাঁদের মতে মূসা (আঃ)-এর পদদ্বয় এই পবিত্র উপত্যকার মাটি স্পর্শ করে বরকত হাসিল করুক – এটাই ছিল জুতা খুলে রাখার উপকারিতা। কেউ কেউ বলেন ঃ বিনয় ও নম্রতার আকৃতি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশে এই নির্দেশ দেয়া হয়, যেমন পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করার সময় এরূপ করতেন।

হাদীসে রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বশীর ইবনে খাসাসিয়াকে কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটতে দেখে বলেছিলেন ঃ اذا كنت فى مثل هذا المكان فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ অর্থাৎ, তুমি যখন এ জাতীয় সম্মানযোগ্য স্থান অতিক্রম কর, তখন জুতা খুলে নাও।

জুতা পাক হলে তা পরিধান করে নামায পড়া সব ফেকাহ্‌বিদের মতে জায়েয। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাক জুতা পরিধান করে নামায পড়া প্রমাণিতও রয়েছে, কিন্তু সাধারণ সুন্নত এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, জুতা খুলে নামায পড়া হত। কারণ এটাই বিনয় ও নম্রতার নিকটবর্তী।—(কুরতুবী)

إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অংশকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান দান করেছেন; যেমন বায়তুল্লাহ্, মসজিদে-আকসা ও মসজিদে-নববী। তুয়া উপত্যকাও তেমনি পবিত্র স্থানসমূহের অন্যতম। এটা তূর পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত।—(কুরতুবী)

وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ﴿١٣﴾ اِنَّنِيْۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ
اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ﴿١٤﴾ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ
اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰى ﴿١٥﴾ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا
مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٦﴾ وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٧﴾
قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا
مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿١٨﴾ قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿١٩﴾ فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ
تَسْعٰى ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿٢١﴾
وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً
اُخْرٰى ﴿٢٢﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿٢٣﴾ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ
طَغٰى ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِيْۤ اَمْرِيْ ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ
عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿٢٨﴾ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ
اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾ هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهٖۤ اَزْرِيْ ﴿٣١﴾ وَاَشْرِكْهُ فِيْۤ اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾
كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا
بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا
عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰى ﴿٣٧﴾ اِذْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّكَ مَا يُوْحٰى ﴿٣٨﴾

(১৩) এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে, তা শুনতে থাক। (১৪) আমিই আল্লাহ্ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। অতএব আমার এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর। (১৫) কেয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকেই তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে। (১৬) সুতরাং যে ব্যক্তি কেয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করে। নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। (১৭) হে মূসা, তোমার ডানহাতে ওটা কি? (১৮) তিনি বললেন ঃ এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। (১৯) আল্লাহ্ বললেন ঃ হে মূসা, তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। (২০) অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। (২১) আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি তাকে ধর এবং ভয় করো না, আমি এখনি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব। (২২) তোমার হাত বগলে রাখ, তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অন্য এক নিদর্শনরূপে; কোন দোষ ছাড়াই। (২৩) এটা এজন্যে যে, আমি আমার বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই। (২৪) ফেরাউনের নিকট যাও, সে দারুণ উদ্ধত হয়ে গেছে। (২৫) মূসা বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। (২৬) এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। (২৭) এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন, (২৮) যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (২৯) এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন। (৩০) আমার ভাই হারুনকে। (৩১) তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন। (৩২) এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন। (৩৩) যাতে আমরা বেশী করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি। (৩৪) এবং বেশী পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি। (৩৫) আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন। (৩৬) আল্লাহ্ বললেন ঃ হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল। (৩৭) আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। (৩৮) যখন আমি তোমার মাতাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যা অতঃপর বর্ণিত হচ্ছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআন শ্রবণের আদব ঃ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى — ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ থেকে বর্ণিত রয়েছে, কোরআন শ্রবণ করার আদব এই যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাজে কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে, কোন অন্য কাজে ব্যাপৃত হবে না, দৃষ্টি নিম্নগামী রাখবে এবং কালাম বোঝার প্রতি মনোনিবেশ করবে। যে ব্যক্তি এরূপ আদব সহকারে কালাম শ্রবণ করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে তা বোঝারও তওফীক দান করেন।— (কুরতুবী)

اِنَّنِيْۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ — এই কালামে হযরত মূসা (আঃ)-কে ধর্মের সমুদয় মূলনীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে অর্থাৎ তওহিদ, রেসালত ও পরকাল। فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى বলে রেসালতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে فَاعْبُدْنِيْ এর অর্থ শুধু আমার এবাদত কর — আমা ব্যতীত কারও এবাদত করো না। এটা তওহীদের বিষয়বস্তু। অতঃপর اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ — বলে পরকালের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। فَاعْبُدْنِيْ — এই নির্দেশে নামাযের কথাও রয়েছে, কিন্তু নামাযকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামায সমস্ত এবাদতের সেরা এবাদত। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নামায ধর্মের স্তম্ভ, ঈমানের নূর এবং নামায বর্জন কাফেরদের আলামত।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ -উদ্দেশ্য এই যে, নামাযের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহ্র স্মরণ। নামায আদ্যোপান্ত যিকরই যিকর—মুখে, অন্তঃকরণে এবং সর্বাঙ্গে যিকর। তাই নামাযে যিকর তথা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া উচিত নয়। কোন কোন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী لِذِكْرِيْ শব্দের এক অর্থ এরূপও যে, কারও নিদ্রাভঙ্গ না হলে অথবা কোন কাজে ব্যাপৃত থাকার দরুন নামাযের কথা ভুলে গেলে এবং নামাযের সময় চলে গেলে যখনই নিদ্রাভঙ্গ হয় অথবা নামাযের কথা স্মরণ হয়, তখনই নামায পড়ে নিতে হবে।

اَكَادُ اُخْفِيْهَا — অর্থাৎ, কেয়ামতের ব্যাপারটি আমি সব সৃষ্টজীবের কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই; এমনকি পয়গম্বর ও ফেরেশতাদের কাছ থেকেও اكاد বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেয়ামত পরকালের ভাবনা দিয়ে মানুষকে ঈমান ও সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য না হলে আমি কেয়ামত আসবে— একথাও প্রকাশ করতাম না।

لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰى -(যাতে প্রত্যেককে তার কর্মানুযায়ী ফল দেয়া যায়।) এই বাক্যটি اٰتِيَةٌ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে অর্থ সুস্পষ্ট যে, এখানে কেয়ামত আগমনের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। রহস্য এই যে, দুনিয়া প্রতিদানের স্থান নয়। এখানে কেউ সৎ ও অসৎকর্মের ফল লাভ করে না। কেউ কিছু ফল পেলেও তা তার কর্মের সম্পূর্ণ ফল লাভ নয়— একটি নমুনা হয় মাত্র। তাই এমন দিনক্ষণ আসা অপরিহার্য, যখন প্রত্যেক সৎ ও অসৎকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পুরোপুরি দেয়া হবে।

পক্ষান্তরে যদি বাক্যটি اَكَادُ اُخْفِيْهَا এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে অর্থ এই যে, এখানে কেয়ামত ও মৃত্যুর সময়-তারিখ গোপন রাখার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। রহস্য এই যে, মানুষ কর্ম প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক এবং

ব্যক্তিগত কেয়ামত অর্থাৎ, মৃত্যুও বিশ্বজনীন কেয়ামত অর্থাৎ, হাশরের দিনকে দূরে মনে করে গাফেল না হোক। (রূহুল-মা'আনী)

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا –এতে হযরত মূসা (আঃ)-কে লক্ষ্য করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তুমি কাফের ও বেঈমানদের কথায় কেয়ামত সম্পর্কে অসাবধানতার পথ বেছে নিয়ো না। তা'হলে তা তোমার ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, নবী ও পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তাঁদের তরফ থেকে এরূপ অসাবধানতার সম্ভাবনা নেই। এতদসত্ত্বেও মূসা (আঃ)-কে এরূপ বলা আসল উদ্দেশ্য তাঁর উম্মত ও সাধারণ মানুষকে শোনানো। এতে তারা বোঝবে যে, আল্লাহ্র পয়গম্বরগণকেও যখন এমনভাবে তাকিদ করা হয়, তখন এ ব্যাপারে আমাদের কতটুকু যত্নবান হতে হবে।

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ — তোমার হাতে ওটা কি ? – আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে মূসা (আঃ)-কে এরূপ জিজ্ঞাসা করা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতি কৃপা, অনুকম্পা ও মেহেরবানীর সূচনা ছিল, যাতে বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী দেখা ও খোদায়ী কালাম শোনার কারণে তাঁর মনে যে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়ে যায়। এটা ছিল একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বোধন। এছাড়া এই প্রশ্নের আরও একটি রহস্য এই যে, পরক্ষণেই তাঁর হাতের লাঠিকে একটি সাপ বা অজগরে রূপান্তরিত করা উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমার হাতে কি আছে দেখে নাও। তিনি যখন দেখে নিলেন যে, সেটা কাঠের লাঠি মাত্র, তখন একে সাপে রূপান্তরিত করার মু'জেযা প্রদর্শন করা হল। নতুবা মূসা (আঃ)-এর মনে এরূপ সম্ভাবনাও থাকতে পারত যে, আমি বোধ হয় রাতের অন্ধকারে লাঠির স্থলে সাপই ধরে এনেছি।

قَالَ هِيَ عَصَايَ মূসা (আঃ)-কে শুধু এতটুকু প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হাতে কি? এর জওয়াবে লাঠি বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মূসা (আঃ) এখানে আসল জওয়াবের অতিরিক্ত আরও তিনটি বিষয় আরয করেছেন। (এক) উহা আমার লাঠি। (দুই) আমি একে অনেক কাজে লাগাই; প্রথমতঃ এর উপর ভর দেই; দ্বিতীয়তঃ এর দ্বারা আঘাত করে আমার ছাগপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং (তিন) এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও উদ্ধার হয়। এই দীর্ঘ ও বিস্তারিত জওয়াবে এশক ও মহব্বত এবং পরিপূর্ণ আদবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। এশক ও মহব্বতের দাবী এই যে, প্রেমাস্পদ যখন অনুকম্পাবশতঃ মনোযোগ দান করেছেন, তখন বক্তব্য দীর্ঘ করা উচিত, যাতে এই সুযোগ দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু সাথে সাথে আদবের দাবী এই যে, সীমাতিরিক্ত নিঃসঙ্কোচ হয়ে বক্তব্য অধিক দীর্ঘও না হওয়া চাই। এই দ্বিতীয় দাবীর প্রতি লক্ষ্য রেখে উপসংহারে সংক্ষেপে বলেছেন وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ — অর্থাৎ, আমি এর দ্বারা আরও অনেক কাজ নেই। এরপর তিনি সেসব কাজের বিস্তারিত বিবরণ দেননি।— (রূহুল-মা'আনী, মাযহারী)

তফসীর কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে এরূপ মাসআলা বের করা হয়েছে যে, প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে প্রশ্নে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়নি, জওয়াবে তাও বর্ণনা করে দেয়া জায়েয।

মাসআলা : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাতে লাঠি রাখা পয়গম্বরগণের সুন্নত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরও এই সুন্নত ছিল। এতে অসংখ্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার নিহিত আছে।— (কুরতুবী)

فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ –হযরত মূসা (আঃ)- এর হাতের লাঠি আল্লাহ্র নির্দেশে নিক্ষেপ করার পর তা সাপে পরিণত হয়। এই সাপ সম্পর্কে কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে كَأَنَّهَا جَانٌّ — আরবী অভিধানে ছোট ও সরু সাপকে جَانٌّ বলা হয়। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ –অজগর ও বৃহৎ মোটা সাপকে ثُعْبَانٌ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে حَيَّةٌ বলা হয়েছে এটা ব্যাপক শব্দ, প্রত্যেক ছোট, বড় মোটা সরু সাপকে حَيَّةٌ বলা হয়। সাপটির অবয়ব ও আকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করার অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, এটি যেখানে যে রূপ আকৃতি ধারণের প্রয়োজন হতো তাই ধারণ করতে সক্ষম ছিল। কখনো খুব সরু, কখনও বিশাল আকারের অজগর ইত্যাদি। ইমাম কুরতুবীর বর্ণনা অনুযায়ী চিকন সাপের ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল বলে 'জান্নুন' বলা হতো। লোকেরা দেখে ভীষণভাবে ভীত হতো বলে 'ছুওবানুন' বলা হতো।

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ – جناح আসলে জন্তুর পাখাকে বলা হয়। এখানে নিজের বাহুতে অর্থাৎ, বগলের নীচে হাত রেখে যখন বের করবে, তখন তা সূর্যের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে تَخْرُجْ بَيْضَاءَ এর এরূপ তফসীরই বর্ণিত আছে।–(মাযহারী)

اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ –স্বীয় রসূলকে দু'টি বিরাট মু'জেযার অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করার পর আদেশ করা হয়েছে যে, এখন উদ্ধত ফেরাউনকে ঈমানের দাওয়াত দেয়ার জন্যে চলে যাও।

হযরত মূসা (আঃ) যখন খোদায়ী কালামের গৌরব অর্জন করলেন এবং নবুওয়ত ও রেসালতের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন নিজ সত্তা ও শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলারই দারস্থ হলেন। কারণ, তাঁরই সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর। এ কাজে যেসব বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য, সেগুলো হাসিমুখে বরণ করার মনোবলও আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তাই তিনি আল্লাহ্র দরবারে পাঁচটি বিষয়ে দোয়া করলেন। প্রথম দোয়া رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার, আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন এবং এতে এমন প্রশস্ততা দান করুন যেন নবুওয়তের জ্ঞান বহন করার উপযোগী হয়ে যায়। ঈমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটু কথা শুনতে হয়, তা সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় দোয়া وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (অর্থাৎ, আমার কাজ সহজ করে দিন) এই উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিও নবুওয়তেরই ফলশ্রুতি ছিল যে, কোন কাজের কঠিন হওয়া অথবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়। এটাও আল্লাহ্ তাআলারই দান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে কারও জন্যে কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজ কঠিন হয়ে যায়। একারণেই হাদীসে মুসলমানদেরকে নিম্নোক্ত দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তারা নিজেদের কাজের জন্য আল্লাহ্র কাছে এভাবে দোয়া করবে ঃ

اللهم الطف بنافى تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير –

(অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্, প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করার ব্যাপারে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। কেননা, প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করে দেয়া আপনার পক্ষে সহজ।)

তৃতীয় দোয়া وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ - (অর্থাৎ, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বোঝতে পারে)। এই জড়তার কাহিনী এই যে, হযরত মূসা (আঃ) দুগ্ধ পান করার যমানায় তাঁর জননীর কাছেই ছিলেন এবং জননী ফেরআউনের দরবার থেকে দুধ পান করানোর ভাতা পেতে থাকেন। শিশু মূসা দুধ ছেড়ে দিলে ফেরাআউন ও তার স্ত্রী আছিয়া তাঁকে পালক পুত্ররূপে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। এ সময়েই একদিন শিশু মূসা (আঃ) ফেরাআউনের দাড়ি ধরে তার গালে এক চপেটাঘাত করে বসেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি একটি ছড়ি হাতে নিয়ে খেলা করছিলেন। এক সময় এই ছড়ি দ্বারা তিনি ফেরআউনের মাথায় আঘাত করে বসেন। ফেরআউন রাগান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। স্ত্রী আছিয়া বললেনঃ রাজাধিরাজ! আপনি অবুঝ শিশুর অপরাধ ধরবেন না। সে তো এখনও ভাল-মন্দের পার্থক্যও বোঝে না। আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ফেরআউনকে পরীক্ষা করানোর জন্যে আছিয়া একটি পাত্রে জলন্ত অঙ্গার ও অপর একটি পাত্রে মণিমুক্তা এনে মূসা (আঃ)-এর সামনে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, সে অবুঝ শিশু। শিশুসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী সে জলন্ত অঙ্গারটিকে উজ্জ্বল ও সুন্দর মনে করে তা ধরার জন্যে হাত বাড়াবে। মণিমুক্তার চাকচিক্য শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত হয় না। এতে ফেরআউন বোঝতে পারবে যে, সে যা করেছে, অজ্ঞতাবশতঃ করেছে। কিন্তু এখানে কোন সাধারণ শিশু ছিল না; ছিলেন আল্লাহ্র ভাবী রসূল যাঁর স্বভাব-প্রকৃতি জন্মলগ্ন থেকেই অনন্যসাধারণ হয়ে থাকে। মূসা (আঃ) আগুনের পরিবর্তে মণিমুক্তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াতে চাইলেন, কিন্তু জিবরাঈল তাঁর হাত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পাত্রে রেখে দিলেন এবং মূসা (আঃ) তৎক্ষণাৎ আগুনের স্ফুলিঙ্গ তুলে মুখে পুরে নিলেন। ফলে তাঁর জিহ্বা পুড়ে গেল। এতে ফেরআউন বিশ্বাস করল যে, মূসা (আঃ)-এর এই কর্ম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়; এটা ছিল নিতান্তই বালকসুলভ অজ্ঞতাবশতঃ। এই ঘটনা থেকেই মূসা (আঃ)-এর জিহ্বায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। কোরআনে একেই عقدة বলা হয়েছে এবং এটা দূর করার জন্যেই মূসা (আঃ) দোয়া করেন।—(মাযহারী, কুরতুবী)

প্রথমোক্ত তিনটি দোয়া ছিল সকল কাজে আল্লাহ্র সাহায্য হাসিল করার জন্যে। তৃতীয় দোয়ায় নিজের একটি দুর্বলতা নিরসনের জন্যে প্রার্থনা জানানো হয়েছে, কারণ রেসালত ও দাওয়াতের জন্যে স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়াও একটি জরুরী বিষয়। পরবর্তী এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, মূসা (আঃ)-এর সব দোয়া কবুল করা হয়। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, জিহ্বার তোতলামিও দূরীকরণ হয়ে থাকবে। কিন্তু স্বয়ং মূসা (আঃ) হযরত হারূনকে রেসালতের কাজে সহকারী করার যে দোয়া করেছেন, তাতে একথাও বলেছেন যে, هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا অর্থাৎ, হারূন আমার চাইতে অধিক বিশুদ্ধভাষী। এ থেকে জানা যায় যে, তোতলামির প্রভাব কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। এছাড়া ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর চরিত্রে যেসব দোষারোপ করেছিল; তন্মধ্যে একটি ছিল এই, وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ -অর্থাৎ সে তার বক্তব্য পরিষ্কার ব্যক্ত করতে পারে না। কোন কোন আলেম এর উত্তরে বলেনঃ হযরত মূসা (আঃ) স্বয়ং তাঁর দোয়ায় জিহ্বার জড়তা এতটুকু দূর করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যতটুকুতে লোকেরা তার কথা বোঝতে পারে। বলাবাহুল্য, সে পরিমাণ জড়তা দূর করে দেয়া হয়েছিল। এরপরও তোতলামির সামান্য প্রভাব থাকলে তা দোয়া কবূল হওয়ার পরিপন্থী নয়।

চতুর্থ দোয়া وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ —অর্থাৎ, আমার পরিবারবর্গ থেকেই আমার জন্যে একজন উযীর করুন। পূর্বোক্ত তিনটি দোয়া ছিল নিজ সত্তা সম্পর্কিত। এই চতুর্থ দোয়া রেসালতের করণীয় কাজ আনজাম দেয়ার জন্যে উপায়াদি সংগ্রহ করার সাথে সম্পর্ক রাখে। হযরত মূসা (আঃ) সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উযীর নিযুক্তিকে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন। অভিধানে উযীরের অর্থই বোঝা বহনকারী। রাষ্ট্রের উযীর তার বাদশাহ্র বোঝা দায়িত্ব সহকারে বহন করেন। তাই তাকে উযীর বলা হয়। এ থেকে হযরত মূসা (আঃ)-এর পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় যে, তিনি তার উপর অর্পিত বিরাট দায়িত্ব পালন করার জন্য একজন উযীর চেয়ে নিয়েছেন।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং চান যে, সে ভাল কাজ করুক এবং সুচারুরূপে রাষ্ট্র পরিচালনা করুক, তখন তার সাহায্যের জন্য একজন সৎ উযীর দান করেন। রাষ্ট্রপ্রধান কোন জরুরী কাজ ভুলে গেলে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি যে কাজ করতে চান, উযীর তাতে তাঁর সাহায্য করেন।—(নাসায়ী)

মূসা (আঃ) তাঁর দোয়ায় প্রথমে অনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, উযীর আমার পরিবারভুক্ত ব্যক্তি হওয়া চাই। অতঃপর নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, আমি যাকে উযীর করতে চাই, তিনি আমার ভাই হারূন—যাতে রেসালতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার কাছ থেকে শক্তি অর্জন করতে পারি।

হযরত হারূন (আঃ) হযরত মূসা (আঃ) থেকে তিন অথবা চার বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিন বছর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। মূসা (আঃ) যখন এই দোয়া করেন, তখন তিনি মিসরে অবস্থান করছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)-এর দোয়ার ফলে তাঁকেও পয়গম্বর করে দেন। ফেরেশতার মাধ্যমে তিনি মিসরেই এ সংবাদ প্রাপ্ত হন। মূসা (আঃ)-কে যখন মিসরে ফেরআউনকে দাওয়াত দেয়ার জন্যে প্রেরণ করা হয়, তখন হারূন (আঃ)-কে মিসরের বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্যে আদেশ দেয়া হয়। তিনি তাই করেন।—(কুরতুবী)

وَاَشْرِكْهُ فِىْ اَمْرِىْ — হযরত মূসা (আঃ) হারূন (আঃ)-কে নিজের উযীর করতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই তা করতে পারতেন। এ অধিকার তাঁর ছিল ; কিন্তু বরকতের জন্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনোনীত করার দোয়া করেছেন। সাথে সাথে তিনি তাঁকে নবুওয়ত ও রেসালতে শরীক করতেও চাইলেন। কোন নবী ও রসূলের এরূপ অধিকার নেই। তাই এর জন্যে পৃথক দোয়া করেছেন যে, তাঁকে আমার রেসালতের অংশীদার করে দিন।

সৎকর্মপরায়ণ সঙ্গী যিকর ও এবাদতেও সাহায্যকারী হয় ঃ كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا -অর্থাৎ, হযরত হারূনকে উযীর ও নবুওয়তে অংশীদার করলে এই উপকার হবে যে, আমরা বেশী পরিমাণে আপনার যিকর ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে

যে, তসবীহ্ ও যিকর মানুষ একাও যত ইচ্ছা করতে পারে। এতে কোন সঙ্গীর কাজের কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু চিন্তা করলে জানা যায় যে, তসবীহ্ ও যিকরের উপযুক্ত পরিবেশ এবং আল্লাহ্‌ভক্ত সঙ্গীদের অনেক প্রভাব রয়েছে। যার সঙ্গী-সহচর আল্লাহ্‌ভক্ত নয়, সে ততটুকু এবাদত করতে পারে না, যতটুকু আল্লাহ্‌ভক্তদের পরিবেশে একজন করতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকরে মশগুল থাকতে চায়, তার উপযুক্ত পরিবেশও তালাশ করা উচিত।

এ পর্যন্ত পাঁচটি দোয়া সমাপ্ত হল পরিশেষে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এসব দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ দান করা হয়েছে قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ — অর্থাৎ, হে মূসা, তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে প্রদান করা হল।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ –হযরত মূসা (আঃ)-কে এ সময় বাক্যালাপের গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে, নবুওয়ত ও রেসালত দান করা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ মু'জেযা প্রদান করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য আয়াতে তাঁকে সেসব নেয়ামতও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেগুলো জন্মের প্রারম্ভ থেকে এ যাবত প্রতিযুগে তাঁর জন্যে ব্যয়িত হয়েছে। উপর্যুপরি পরীক্ষা এবং প্রাণনাশের আশঙ্কার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা বিস্ময়কর পন্থায় তাঁর জীবন রক্ষা করেছেন। পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নেয়ামত উল্লেখিত হয়েছে, বাস্তব ঘটনার দিক দিয়ে সেগুলো পূর্ববর্তী। এগুলোকে এখানে أُخْرَىٰ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার অর্থ এরূপ নয় যে, এই নেয়ামতগুলো পরবর্তীকালের। বরং أُخْرَىٰ শব্দটি কোন সময় শুধু 'অন্য' অর্থ বোঝায়। এতে অগ্রপশ্চাতের কোন অর্থ থাকে না। এখানেও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। (রূহুল-মা'আনী)

মূসা (আঃ)-এর এই আদ্যোপান্ত কাহিনী হাদীসের বরাত দিয়ে সম্মুখে বর্ণিত হবে।

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ -অর্থাৎ, যখন আমি তোমার মাতার কাছে এমন ব্যাপারে ওহী করলাম, যা ওহীর মাধ্যমেই জানানো যেতে পারত। তা এই যে, ফেরআউন তার সিপাহীদেরকে ইসরাঈলী নবজাত শিশুদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে রেখেছিল। তাই সিপাহীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে তাঁর মাতাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হল যে, তাকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশঙ্কা করো না। আমি তাকে হেফাযতে রাখব এবং শেষে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব। বলাবাহুল্য, এসব কথা বিবেকগ্রাহ্য নয়। আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা এবং তাঁর হেফাযতের অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা একমাত্র তাঁর পক্ষ থেকে বিবৃতির মাধ্যমেই জানা যেতে পারে।

নবী-রসূল নয়--এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে কি? وحى শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন গোপন কথা, যা শুধু যাকে বলা হয় সেই জানে অন্য কেউ জানে না। এই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ওহী কারও বিশেষ গুণ নয়—নবী, রসূল সাধারণ সৃষ্টজীব বরং জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত এতে শামিল হতে পারে।

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ — আয়াতে মৌমাছিকে ওহীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা এই অর্থের দিক দিয়েই বলা হয়েছে। আলোচ্য أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ আয়াতেও আভিধানিক অর্থে 'ওহী' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এতে মূসা-জননীর নবী অথবা রসূল হওয়া জরুরী হয় না। যেমন – মারইয়ামের কাছেও এভাবে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছেছিল, অথচ বিশিষ্ট আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নবী অথবা রসূল ছিলেন না। এ ধরনের আভিধানিক ওহী সাধারণতঃ ইলহামের আকারে হয়; অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা কারও অন্তরে কোন বিষয়বস্তু জাগ্রত করে দেন এবং তাকে নিশ্চিত করে দেন যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই। ওলী-আল্লাহ্‌গণ সাধারণত এ ধরনের ইলহাম লাভ করেছেন। বরং আবু হাইয়্যান ও অন্য কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন যে, এ জাতীয় ওহী মাঝে মাঝে ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণতঃ হযরত মারইয়ামের ঘটনায় স্পষ্টতঃ বলা হয়েছে যে, ফেরেশতা জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এই ওহী শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সত্তার সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকে। জনসংস্কার এবং তবলীগ ও দাওয়াতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এর বিপরীত নবুওয়তের ওহীর উদ্দেশ্যই জনসংস্কারের জন্যে কাউকে নিয়োগ করা এবং প্রচার ও দাওয়াতের জন্যে আদিষ্ট করা। এরূপ ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে নিজের ওহীর প্রতি নিজেও বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অপরকেও তার নবুওয়ত ও ওহী মানতে বাধ্য করা; যারা না মানে, তাদেরকে কাফের আখ্যা দেয়।

ইলহামী ওহী তথা আভিধানিক ওহী এবং নবুওয়তের ওহী তথা পারিভাষিক ওহীর মধ্যে পার্থক্য তাই। আভিধানিক ওহী সর্বকালেই জারি আছে এবং থাকবে। কিন্তু নবুওয়ত ও নবুওয়তের ওহী শেষনবী মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। কোন কোন বুযুর্গের উক্তিতে একেই ''ওহী-তশরীয়ী'' ও ''গায়র-তশরীয়ী'র শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। শায়েখ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর কোন কোন বাক্যের বরাত দিয়ে নবুওয়তের দাবীদার কাদিয়ানী তার দাবীর বৈধতার প্রমাণ হিসেবে একে উপস্থিত করেছে, যা স্বয়ং ইবনে আরাবীর সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল। এই প্রশ্নের পুরাপুরি আলোচনা ও ব্যাখ্যা আমার পুস্তক 'খতমে নবুওয়তে' বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ
بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً
مِّنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۝ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ
أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ
فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ
يَا مُوسَىٰ ۝ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۝ اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي
وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۝ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝ فَقُولَا لَهُ
قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۝ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن
يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۝ قَالَ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ
وَأَرَىٰ ۝ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي
إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ
عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ۝ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن
كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ ۝ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ
كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۝

(৩৯) যে, তুমি (মূসাকে) সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, অতঃপর দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেবে। তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু উঠিয়ে নেবে। আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হও। (৪০) যখন তোমার ভগিনী এসে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব কে তাকে লালন-পালন করবে। অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মাতার কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু শীতল হয় এবং দুঃখ না পায়। তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেই; আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলে; হে মূসা, অতঃপর তুমি নির্ধারিত সময়ে এসেছ। (৪১) এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য তৈরী করে নিয়েছি। (৪২) তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। (৪৩) তোমরা উভয়ে ফেরআউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। (৪৪) অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে। (৪৫) তারা বলল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশঙ্কা করি যে, সে আমাদের প্রতি জুলুম করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে। (৪৬) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও দেখি। (৪৭) অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বল ঃ আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রসূল, অতএব আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা তোমার পালনকর্তার কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে আগমন করেছি। এবং যে সৎপথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি। (৪৮) আমরা ওহী লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার উপর আযাব পড়বে। (৪৯) সে বলল ঃ তবে হে মূসা, তোমাদের পালনকর্তা কে? (৫০) মূসা বললেন ঃ আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। (৫১) ফেরাউন বলল ঃ তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মূসা জননীর নাম ঃ রূহুল-মা'আনীতে আছে যে, তাঁর প্রসিদ্ধ নাম 'ইউহানিব'। 'ইতকান ' গ্রন্থে তাঁর নাম 'লাহইয়ানা বিনতে ইয়াসমাদ ইবনে লাভী' লিখিত রয়েছে। কেউ কেউ তাঁর নাম 'বারেখা' এবং কেউ কেউ 'বাযখত' বলেছেন। যারা তাবীয ইত্যাদি করে, তাদের কেউ কেউ তাঁর নামের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন ঃ আমরা এর কোন ভিত্তি খুঁজে পাইনি। খুব সম্ভব এগুলো ভিত্তিহীন জনশ্রুতি।

فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ —এখানে يم শব্দের অর্থ দরিয়া এবং বাহ্যতঃ নীলনদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতে এক আদেশ মূসা (আঃ)-এর মাতাকে দেয়া হয়েছে যে, এই শিশুকে সিন্দুকে পুরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। দ্বিতীয় আদেশ নির্দেশসূচকভাবে দরিয়াকে দেয়া হয়েছে যে, সে যেন এই সিন্দুককে তীরে নিক্ষেপ করে দেয়। দরিয়া বাহ্যতঃ চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন। একে আদেশ দেয়ার মর্ম বোঝে আসে না। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এখানে নির্দেশসূচক পদ বলা হলেও আদেশ বোঝানো হয়নি; বরং খবর দেয়া হয়েছে যে, দরিয়া একে তীরে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী আলেমগণের মতে এখানে আদেশই বোঝানো হয়েছে এবং দরিয়াকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা, তাদের মতে জগতের কোন সৃষ্টবস্তু বৃক্ষ ও প্রস্তর পর্যন্ত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন নয়, বরং সবার মধ্যেই বোধশক্তি ও উপলব্ধি বিদ্যমান রয়েছে। এই বোধশক্তি ও উপলব্ধির কারণেই কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সর্ব বস্তু আল্লাহ্র তসবীহ্ পাঠে মশগুল রয়েছে। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, মানব, জিন ও ফেরেস্তা ছাড়া কোন সৃষ্টবস্তুর মধ্যে এই পরিমাণ বোধশক্তি ও চেতনা নেই, যে পরিমাণ থাকলে হারাম ও হালালের বিধি-বিধান আরোপিত হতে পারে।

يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ — অর্থাৎ, এই সিন্দুক ও তন্মধ্যস্থিত শিশুকে সমুদ্রের তীর থেকে এমন ব্যক্তি কুড়িয়ে নেবে, যে আমার ও মূসার উভয়ের শত্রু; অর্থাৎ ফেরাউন। ফেরাউন যে আল্লাহ্র দুশমন, তা তার কুফরের কারণে সুস্পষ্ট। কিন্তু মূসা (আঃ)-এর দুশমন হওয়ার ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য। কারণ, তখন ফেরাউন মূসা (আঃ)-এর দুশমন ছিল না; বরং তাঁর লালন-পালনে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেছিল। এতদসত্ত্বেও তাকে মূসা (আঃ)-এর শত্রু বলা হয় শেষ পরিণামের দিক বিবেচনা করে অর্থাৎ অবশেষে ফেরাউনের শত্রুতে পরিণত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্র জ্ঞানে ছিল। একথা বলাও অযৌক্তিক হবে না যে, ফেরাউন ব্যক্তিগত পর্যায়ে তখন মূসা (আঃ)-এর শত্রুই ছিল। সে স্ত্রী আসিয়ার মনরক্ষার্থেই শিশু মূসার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তাই পরে যখন তার মনে সন্দেহ দেখা দিল, তখনই মূসাকে হত্যার আদেশ জারি করেছিল, যা আসিয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে প্রতিহত হয়ে যায়।-(রূহুল-মা'আনী, মাযহারী)

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي — এখানে مَحَبَّةً শব্দটি - আদরণীয় হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে তোমার অস্তিত্বের মধ্যে আদরণীয় হওয়ার গুণ নিহিত রেখেছি। ফলে যে'ই তোমাকে দেখত, সে-ই আদর করতে বাধ্য হত। হযরত ইবনে-আব্বাস ও ইকরামা থেকে এরূপ তফসীরই বর্ণিত হয়েছে।—(মাযহারী)

وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ — صنعت শব্দ দ্বারা এখানে উত্তম লালন-পালন বোঝানো হয়েছে। আরবে صنعت فرسى বাকপদ্ধতিটি এ অর্থেই বলা হয়, অর্থাৎ, আমি আমার ঘোড়ার উত্তম লালন-পালন করেছি। عَلٰى عَيْنِيْ বলে على حفظى বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা ছিল যে, মূসা (আঃ)-এর উত্তম লালন-পালন সরাসরি আল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে হবে। তাই মিসরের সর্ববৃহৎ ব্যক্তিত্ব ফেরাউনের গৃহে এই উদ্দেশ্য এমনভাবে সাধন করা হয়েছে যে, সে জানত না নিজের হাতে নিজেরই দুশমনকে লালন-পালন করছে।

اِذْ تَمْشِيْٓ اُخْتُكَ —মূসা (আঃ)-এর ভগিনী সিন্দুকের পেছনে পেছনে গিয়েছিলেন। এর পরবর্তী ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে— وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا — অর্থাৎ আমি বার বার তোমাকে পরীক্ষা করেছি। — (ইবনে আব্বাস) অথবা তোমাকে বার বার পরীক্ষায় ফেলেছি।— (যাহ্হাক)

হযরত মূসার (আঃ) জীবনের এ দীর্ঘ পরীক্ষার কাহিনী পাঠ করতে হলে নাসায়ী শরীফ তফসীর অধ্যায়ে হাদীসুল ফুতুন পাঠ করা যেতে পারে।

হযরত মূসার (আঃ) পর পর পরীক্ষার কাহিনী থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ কোরআন পাক মূসা (আঃ)-এর কাহিনীকে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, অধিকাংশ সূরায় এর কিছু না কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এই যে, এই কাহিনীতে হাজার হাজার শিক্ষা, রহস্য ও আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে মানুষের ঈমান সুদৃঢ় হয়। এগুলোতে কর্মোদ্দীপনা ও চারিত্রিক সংশোধনের নির্দেশাবলীও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য সূরায় কাহিনীটি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে; তাই এর শিক্ষা, উপদেশ ও নির্দেশাবলীর কিছু অংশও প্রসঙ্গক্রমে লিপিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

ফেরাউনের নিজের চেষ্টা-তদবীর এবং প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ তাআলার বিস্ময়কর পরিকল্পনা ঃ ফেরাউন যখন জানতে পারল যে, বনী-ইসরাঈলের মধ্যে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবে, তখন সে ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানদের জন্মরোধ করার উদ্দেশে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আদেশ জারি করে। এরপর জাতীয় ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে এক বছরের ছেলে-মেয়েদেরকে জীবিত রাখার এবং পরবর্তী বছরের ছেলেদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যে বছর ছেলেদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হত, সে বছরই মূসা (আঃ)-কে জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ করার ক্ষমতা আল্লাহ্ তাআলার ছিল, কিন্তু নির্বোধ ফেরাউনের উৎপীড়নমূলক পরিকল্পনা পূর্ণরূপে নস্যাৎ করা ও তাকে বোকা বানানোর ইচ্ছায় সন্তান হত্যার বছরেই মূসা (আঃ)-কে ভূমিষ্ঠ করালেন। আল্লাহ্ তাআলা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটালেন, যাতে মূসা (আঃ) স্বয়ং এই খোদাদ্রোহী জালেমের গৃহে লালিত-পালিত হন। ফেরাউন ও তার স্ত্রী পরম ঔৎসুক্যের সাথে মূসাকে নিজেদের গৃহে লালন-পালন করেন। সারা দেশের ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানরা মূসা সন্দেহে নিহত হচ্ছিল, আর মূসা (আঃ) স্বয়ং ফেরাউনের গৃহে আরাম-আয়েশ ও আদর-যত্নের সাথে বয়সের সিঁড়ি অতিক্রম করছিলেন।

মূসা জননীর প্রতি অলৌকিক নেয়ামত এবং ফেরাউনী পরিকল্পনার আরও একটি প্রতিশোধ ঃ মূসা (আঃ) যদি সাধারণ শিশুদের ন্যায় কোন ধাত্রীর দুধ কবূল করতেন, তবে তাঁর লালন-পালন শত্রু ফেরাউনের গৃহে এরপরও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে হত। কিন্তু তাঁর মাতা তাঁর বিরহে ব্যাকুল থাকতেন এবং মূসা (আঃ)-ও কোন কাফের মহিলার দুধ পেতেন। আল্লাহ্ তাআলা একদিকে তাঁর পয়গম্বরকে কাফের মহিলার দুধ থেকেও বাঁচিয়ে নিলেন এবং অপরদিকে তাঁর মাতাকেও বিরহের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন; মুক্তিও এমনভাবে দিলেন যে, ফেরাউনের পরিবার তাঁর কাছে ঋণী হয়ে রইল এবং উপঢৌকন ও উপহারের বৃষ্টিও বর্ষিত হল। নিজেরই প্রাণপ্রতিম সন্তানকে দুগ্ধ পান করানোর বিনিময়ে মূসা-জননী ফেরাউনের রাজদরবার থেকে ভাতাও পেলেন এবং ফেরাউনের গৃহে সাধারণ কর্মচারীদের ন্যায় থাকতে হল না।

শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের জন্যে একটি সুসংবাদ ঃ এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে শিল্পপতি তার শিল্পকাজে সওয়াবের নিয়ত রাখে, সে মূসা (আঃ)-এর জননীর ন্যায়। তিনি আপন শিশুকে দুধ পান করিয়ে অপরের কাছ থেকে ভাতা পেয়েছেন। — (ইবনে-কাসীর) উদ্দেশ্য এই যে, কোন রাজমিস্ত্রী মসজিদ, খানকাহ, মাদ্রাসা অথবা কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণকালে যদি শুধু মজুরী ও পয়সা উপার্জনের নিয়ত করে, তবে সে তাই পাবে। কিন্তু যদি সে এরূপ নিয়তও করে যে, এই নির্মাণ কাজ সৎকাজে নিয়োজিত হবে এর দ্বারা ধার্মিক ব্যক্তিরা উপকৃত হবে — এজন্যে একাজকে সে অন্য কাজের উপর অগ্রাধিকার দেয় তবে সে মূসা – জননীর ন্যায় মজুরীও পাবে এবং ধর্মীয় উপকারও লাভ করবে।

আল্লাহ্র বিশেষ বান্দাগণের প্রেমাস্পদসুলভ মাধুর্য প্রাপ্তি ঃ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ —আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বিশেষ বান্দাগণকে বিশেষ এক প্রকার প্রেমাস্পদসুলভ সৌন্দর্য দান করেন। ফলে তাদেরকে দেখে আপন-পর, শত্রু-মিত্র সবাই মহব্বত করতে থাকে। পয়গম্বরগণের স্তর তো অনেক উর্ধ্বে, অনেক ওলীর মধ্যেও এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করা গেছে।

মূসা (আঃ)-এর হাতে ফেরাউনী কাফেরের হত্যাকে 'ভুলক্রমে হত্যা' কেন সাব্যস্ত করা হল ঃ মূসা (আঃ) জনৈক ইসরাঈলী মুসলমানকে ফেরআউনী কাফেরের সাথে লড়াইরত দেখে ফেরাউনকে ঘুষি মারলেন; ফলে সে প্রাণ ত্যাগ করল। মূসা (আঃ) নিজেও এ কাজকে 'শয়তানের কাজ' বলে আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমাও করা হয়েছে।

কিন্তু এখানে একটি আইনগত প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ফেরাউনী ব্যক্তি কাফের এবং হরবী ছিল। তার সাথে মূসা (আঃ)-এর কোন শান্তিচুক্তি ছিল না এবং তাকে যিম্মী কাফেরদের তালিকাভুক্তও করা যেত না, যাদের জান-মাল ও সম্মানের হেফাযত করা মুসলমানদের দায়িত্বে ওয়াজিব। সে ছিল একান্তই হরবী কাফের। ইসলামী শরীয়তের আইনে এরূপ ব্যক্তিকে হত্যা করা গোনাহ্ নয়। এমতাবস্থায় এ হত্যাকে শয়তানের কাজ ও ভুল কি কারণে সাব্যস্ত করা হল?

বিশিষ্ট তফসীর গ্রন্থসমূহে কেউ কেউ এ প্রশ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেননি। আমি যখন হাকীমুল-উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)-এর নির্দেশে ''আহ্কামুল-কোরআন'' গ্রন্থের রচনায় নিয়োজিত ছিলাম, তখন এ প্রশ্ন উত্থাপন করায় তিনি উত্তরে বলছেন ঃ এ কথা ঠিক যে, এই ফেরাউনী কাফেরের সাথে সরাসরি ও প্রকাশ্য কোন শান্তি-চুক্তি অথবা যিম্মী হওয়া চুক্তি ছিল না। কিন্তু তখন মূসা (আঃ)-এর রাজত্ব ছিল

না এবং সেই নিহত ব্যক্তিরও ছিল না। বরং তারা উভয়েই ফেরাউনের রাজত্বে নাগরিক ছিল এবং একজন অপরজনের পক্ষ থেকে নিরাপদ ছিল। এটা ছিল এক প্রকার অলিখিত কার্যগত যুক্তি। ফেরাউনকে হত্যার ফলে এই কার্যগত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ হয়েছে। তাই একে 'ভুলক্রমে হত্যা' সাব্যস্ত করা হয়েছে। ভুলটি যেহেতু ইচ্ছাকৃত নয়- ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়েছে, তাই এটা মূসা (আঃ)-এর নবীসুলভ পবিত্রতার পরিপন্থী নয়।

এ কারণেই মাওলানা থানভী (রহঃ) অবিভক্ত ভারতে কোন মুসলমানের পক্ষে কোন হিন্দুর জান-মালের ক্ষতি করা বৈধ মনে করতেন না। কেননা, মুসলমান ও হিন্দু এ উভয় সম্প্রদায়ই তখন ইংরেজদের রাজত্বে বাস করত।

অক্ষমদের সাহায্য ও জনসেবা ইহকাল ও পরকালে উপকারী ঃ হযরত মূসা (আঃ) মাদইয়ান শহরের উপকণ্ঠে দুইজন মহিলাকে দেখলেন যে, তারা অক্ষমতার কারণে তাদের ছাগলকে পানি পান করাতে পারছে না। মহিলাদ্বয় সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং মূসা (আঃ) একজন মুসাফির ছিলেন। কিন্তু অক্ষমদের সেবা ভদ্রতা ছাড়া আল্লাহ্ তাআলার কাছেও পছন্দনীয় কাজ ছিল। তাই তিনি তাদের জন্যে পরিশ্রম স্বীকার করলেন এবং তাদের ছাগলকে পানি পান করিয়ে দিলেন। এ কাজের সওয়াব ও পুরস্কার আল্লাহ্র কাছে বিরাট। দুনিয়াতেও তাঁর এ কাজকেই প্রবাস জীবনের অসহায়ত্ব ও সম্বলহীনতার প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে নিজের শান অনুযায়ী জীবন গঠন করার সুযোগ তিনি এর মাধ্যমেই লাভ করেন এবং হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর সেবা ও তাঁর জামাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। যৌবনে পদার্পণ করার পর তাঁর মাতাকে যে দায়িত্ব পালন করতে হত, আল্লাহ্ তাআলা প্রবাস জীবনে তা একজন পয়গম্বরের হাতে সম্পন্ন করিয়ে দিয়েছেন।

দুই পয়গম্বরের মধ্যে চাকর ও মনিবের সম্পর্ক ঃ এর রহস্য ও অভাবনীয় উপকারিতা ঃ মূসা (আঃ) শোআয়ব (আঃ)-এর গৃহে অতিথি হয়ে ফেরাউনী সিপাহীদের কবল থেকে নিশ্চিন্ত হলে শোআয়ব (আঃ) স্বীয় কন্যার পরামর্শক্রমে তাঁকে চাকর রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। এতে আল্লাহ্র অনেক হেকমত এবং মানবজাতির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত নিহিত রয়েছে।

প্রথমতঃ শোআয়ব (আঃ) আল্লাহ্র নবী ও রসূল ছিলেন। একজন প্রবাসী মুসাফিরকে চাকুরীর বিনিময় ছাড়াই কিছুদিন নিজ গৃহে আশ্রয় দেয়া তাঁর পক্ষে মোটেই দুষ্কর ছিল না। কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ পয়গম্বরসুলভ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে একথা বোঝে নিয়েছিলেন যে, সৎসাহসী মূসা (আঃ) এ ধরনের আতিথ্য কবুল করবেন না এবং অন্যত্র চলে গেলে বিপদগ্রস্ত হবেন। তাই সকল প্রকার লৌকিকতা পরিহার করে লেন-দেনের পথ বেছে নিলেন। এতে অপরের জন্যেও নির্দেশ রয়েছে যে, অন্যের গৃহে গিয়ে তার গলগ্রহ হয়ে যাওয়া ভদ্রতার খেলাফ।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ তাআলার অভিপ্রায় ছিল মূসা (আঃ)-কে রেসালত ও নবুওয়ত দ্বারা ভূষিত করা। এর জন্যে যদিও কোনরূপ সাধনা ও কর্ম শর্ত নয় এবং কোন সাধনা ও কর্ম দ্বারা তা অর্জন করা যায় না ঃ কিন্তু আল্লাহ্র চিরাচরিত রীতি এই যে, তিনি পয়গম্বরগণকেও সাধনা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পথে পরিচালনা করেন। কেননা, এটা মানব চরিত্রের উৎকর্ষের উপায় এবং অপরের সংশোধনের প্রধান কারণ হয়ে থাকে। মূসা (আঃ)-এর জীবন এ পর্যন্ত রাজকীয় সম্মান ও জাঁকজমকের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে তাঁকে জনগণের পথপ্রদর্শক ও সংস্কারকের গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে হবে। শোআয়ব (আঃ)-এর সাথে শ্রম ও মজুরীর এই চুক্তিতে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন সম্পর্কিত অনুশীলনের গোপন ভেদও নিহিত ছিল।

তৃতীয়তঃ মূসা (আঃ)-এর কাছ থেকে ছাগল চরানোর কাজ নেয়া হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশ পয়গম্বরকে এ কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। ছাগল সাধারণতঃ পাল থেকে আলাদা হয়ে এদিক -ওদিক ছুটাছুটি করে। ফলে রাখালের মনে বার বার ক্রোধের উদ্রেক হয়। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সে যদি পলাতক ছাগল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তবে ছাগল হাতছাড়া হয়ে কোন বাঘের খোরাকে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছামত পরিচালনা করার জন্যে যদি রাখাল ছাগলকে মারপিট করে, ক্ষীণকায় জন্তু হওয়ার কারণে হাত-পা ভেঙ্গে যাওয়া বিচিত্র নয়। এ কারণে রাখালকে অত্যধিক ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হয়। পয়গম্বরগণের সাথে সাধারণ মানব সমাজের ব্যবহারও তদ্রূপ হয়ে থাকে। এতে পয়গম্বরগণ তাদের তরফ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেও পারেন না এবং তাদেরকে কঠোরতার মাধ্যমেও পথে আনতে পারেন না। ফলে দৈর্য ও সহনশীলতার অভ্যাসের পথই তাঁদেরকে অবলম্বন করতে হয়।

জাদুকর ও পয়গম্বরগণের কাজে সুস্পষ্ট পার্থক্য ঃ ফেরাউন সমবেত জাদুকরদের দেশ ও জাতির বিপদাশঙ্কা সামনে রেখে কাজ করতে বলেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে একে নিজের কাজ মনে করে আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু তারা কি করেছে? কাজ শুরু করার আগেই পারিশ্রমিকের ব্যাপারে দর-কষাকষি আরম্ভ করে দিয়েছে।

এর বিপরীতে আল্লাহ্-প্রেরিত পয়গম্বরগণ সব মানুষের সামনে এই ঘোষণা রাখেন ঃ وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ অর্থাৎ, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। পয়গম্বরগণের প্রচার ও দাওয়াত কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রভাব অত্যধিক। ইসলামী বায়তুল-মাল থেকে আলেম, মুফতী ও ওয়ায়েযদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে তাঁরা শিক্ষাদান, ওয়ায ও ইমামতির বেতন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এই বেতন গ্রহণ পরবর্তী ফেকাহ্বিদগণের মতে অপারগ অবস্থায় জায়েয হলেও জনগণের সংস্কারের ক্ষেত্রে এর কুফল অস্বীকার করার উপায় নেই। বলাবাহুল্য, বিনিময় গ্রহণ করার ফলে তাঁদের প্রচেষ্টার উপকারিতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

ফেরাউনী জাদুকরদের জাদুর স্বরূপ ঃ ফেরাউনী জাদুকররা তাদের লাঠি ও রশিগুলোকে বাহ্যতঃ সাপ বানিয়ে দেখিয়েছিল। প্রশ্ন এই যে, এগুলো কি বাস্তবিকই সাপ হয়ে গিয়েছিল? এ সম্পর্কে কোরআন পাকের ভাষা يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ - (জাদুর কারণে এগুলো ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করছে বলে মনে হচ্ছিল) থেকে জানা যায় যে, এগুলো সত্যিকার সাপ হয়ে যায়নি; বরং জাদুকররা এক প্রকার মেসমেরিজমের মাধ্যমে দর্শকদের কল্পনাশক্তিকে ক্রিয়াশীল করে দৃষ্টি-বিভ্রাট ঘটিয়ে দিয়েছিল। ফলে এগুলো দর্শকদের কাছে ছুটাছুটিরত সাপ বলে মনে হচ্ছিল।

অবশ্য এ দ্বারা এটা জরুরী নয় যে, জাদুবলে বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তিত হতে পারে না। এখানে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ফেরাউনী যাদুকরদের যাদু বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তন করার মত শক্তিশালী ছিল না।

গোত্রগত বিভক্তি সামাজিক কাজ কারবারের সীমা পর্যন্ত

নিন্দনীয় নয় ঃ ইসলাম দেশগত, ভাষাগত, বর্ণগত ও গোত্রগত বিভেদকে জাতীয়তার ভিত্তি স্থির করার তীব্র নিন্দা করেছে এবং এসব বিভেদ মিটানোর জন্যে প্রতি কাজে ও প্রতি পদক্ষেপে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী রাজনীতির ভিত্তিই হচ্ছে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। এতে আরবী, আজমী, ফারসী, হিন্দী ও সিন্ধী সবাই এক জাতির ব্যক্তিবর্গ। বিশ্বনবী (সাঃ) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করার জন্যে সর্বপ্রথম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একাত্মতা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিদায় হজ্বের ভাষণে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে এই কর্মপদ্ধতি ব্যক্ত করেন যে, আঞ্চলিক, বংশগত ও ভাষাগত বিভেদের মূর্তিকে ইসলাম ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। এদতসত্ত্বেও সামাজিক কাজ-কারবারের সীমা পর্যন্ত এসব পার্থক্যকে মূল্য দেয়ার অনুমতি ইসলামে আছে। কেননা, বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন গোত্রের পানাহার ও বসবাসের পদ্ধতি বিভিন্নরূপে হয়ে থাকে। এগুলোর বিপরীত করা খুবই কষ্টকর কাজ।

হযরত মূসা (আঃ) যে বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেছিলেন, তারা বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ্ তাআলা এসব গোত্রের পার্থক্যকে সামাজিক কাজ-কারবারে বৈধ রাখেন। ফলে দরিয়ার মধ্যেও প্রত্যেক গোত্রের জন্যে অলৌকিকভাবে আলাদা বারটি রাস্তা প্রকাশ করে দেন। এমনিভাবে তীহ্ প্রান্তরে পাথর থেকেও অলৌকিকভাবে আলাদা আলাদা বারটি ঝরণা প্রবাহিত করে দেন, যাতে গোত্র সমূহের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি না হয় এবং প্রত্যেক গোত্র তার নির্ধারিত পানি লাভ করতে পারে।

সমষ্টিগত শৃংখলা বিধানের জন্যে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা ঃ মূসা (আঃ) এক মাসের জন্যে তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পৃথক হয়ে তূর পর্বতে এবাদতে মশগুল হতে চেয়েছিলেন। তখন হারূন (আঃ)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে সাবাইকে নির্দেশ দিলেন যে, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা তার আনুগত্য করবে। পারস্পরিক মতভেদ ও অনৈক্য রোধ করাই ছিল এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। এ থেকে জানা যায় যে, কোন রাষ্ট্র, দল ও পরিবারের প্রধান যদি বিদেশ সফরে গমন করে, তবে প্রশাসনযন্ত্র চালু রাখার জন্যে কাউকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যাওয়া পয়গম্বরদের সুন্নত।

অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে বড় ধরনের মন্দকেও সাময়িকভাবে বরদাশত করা যায় ঃ মূসা (আঃ)-এর অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈলের মধ্যে গো-বৎস পূজার অনর্থ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। হারূন (আঃ) সবাইকে সত্যের দাওয়াত দেন, কিন্তু মূসা (আঃ)-এর ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি কোন দলের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেননি। এতে মূসা (আঃ) ক্রুদ্ধ হলে তিনি এই অজুহাতই পেশ করেন যে, আমি কঠোরতায় অবতীর্ণ হলে বনী ইসরাঈল শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত।

إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

-অর্থাৎ, আমি কোন দল থেকেই কঠোরভাবে বিভিন্নতা ও নিস্পৃহতার কথা ঘোষণা করিনি ; কারন তাহলে আপনি ফিরে এসে আমাকে অভিযুক্ত করে বলতেন যে, তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করেছ এবং আমার নির্দেশ পালন করনি।

মূসা (আঃ)-ও তাঁর এ অজুহাতকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেননি; বরং সঠিক মেনে নিয়ে তাঁর জন্যে দোয়া ও ইস্তেগফার করলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার জন্যে সাময়িকভাবে কোন মন্দ কাজের ব্যাপারে নম্রতা প্রদর্শন করলে তা দুরস্ত হবে।

মূসা (আঃ)-এর কাহিনীর উপরোল্লেখিত হেদায়েতসমূহের শেষে মূসা ও হারূন (আঃ)-কে একটি বিশেষ নির্দশন সহকারে ফেরাউনকে পথ প্রদর্শনের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে। নির্দেশটি এই ঃ

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

পয়গম্বরসুলভ দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ঃ এতে বলা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বাহক হোক না কেন, তার সাথেও সংস্কার ও পথ প্রদর্শনের কর্তব্য পালনকারীদের হিতাকাঙ্খার ভঙ্গিতে নম্রভাবে কথাবার্তা বলতে হবে। এরই ফলশ্রুতিতে সে কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হতে পারে এবং তার অন্তরে আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি হতে পারে।

হযরত মূসা (আঃ) কেন ভয় পেলেন? إِنَّنَا نَخَافُ মূসা ও হারূন (আঃ) এখানে আল্লাহ্ তাআলার সামনে দুই প্রকার ভয় প্রকাশ করেছেন। এক ভয় أَن يَفْرُطَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ সীমা লঙ্ঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরাউন সম্ভবতঃ আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করার আগেই ক্ষমতার অহমিকায় উত্তেজিত হয়ে উঠবে। দ্বিতীয় ভয় أَن يَطْغَىٰ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভবতঃ সে আপনার শানে অসমীচীন কথাবার্তা বলে আরও বেশী অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কথাবার্তার শুরুতে মূসা (আঃ)-কে নবুওয়ত ও রেসালত দান করা হলে তিনি হারূণ (আঃ)-কে তাঁর সাথে শরীক করার আবেদন করেন। তাঁর এ আবেদন কবূল করার সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বলে দেন ঃ

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا

অর্থাৎ, আমি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহু সবল করব এবং তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব। ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। এছাড়া এ আশ্বাসও দান করেন যে, তুমি যা যা প্রার্থনা করেছ, সবই তোমাকে দান করলাম।

قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ এসব প্রার্থিত বিষয়ের মধ্যে বক্ষ উন্মোচনও ছিল। বক্ষ উন্মোচনের সারমর্ম এই যে, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা ও ভয়ভীতি সৃষ্টি হবে না।

আল্লাহ্ তাআলার এসব ওয়াদার পর এই ভয় প্রকাশের অর্থ কি? এর এক উত্তর এই যে, তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব, ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না এই প্রথম ওয়াদাটি অস্পষ্ট। এর অর্থ প্রমাণ ও যুক্তির আধিপত্যও হতে পারে এবং বৈষয়িক আধিপত্যও হতে পারে। এছাড়া এ ধারণাও হতে পারে যে, প্রমাণাদি শোনা ও মু'জেযা দেখার পরই আধিপত্য হবে। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, ফেরাউন কথা শোনার আগেই তাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। বক্ষ উন্মোচনের জন্যে স্বভাবগত ভয় দুর হয়ে যাওয়াও জরুরী নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ ভয়ের বস্তু দেখে স্বভাবগতভাবে ভয় করা সব পয়গম্বরের সুন্নত। এ ভয় পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হয়। স্বয়ং মূসা (আঃ) তাঁরই লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়ার পর তাকে ধরতে ভয় পাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ لَا تَخَفْ ভয় করো না। অন্যান্য সব ভয়ের ক্ষেত্রে

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَّأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿٥٣﴾ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي النُّهٰى ﴿٥٤﴾ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى ﴿٥٥﴾ وَلَقَدْ أَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبٰى ﴿٥٦﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوسٰى ﴿٥٧﴾ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾ فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتٰى ﴿٦٠﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿٦١﴾ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٢﴾ قَالُوا إِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيدٰنِ أَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ﴿٦٣﴾ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿٦٤﴾ قَالُوا يٰمُوسٰى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقٰى ﴿٦٥﴾

(৫২) মূসা বললেন ঃ তাদের খবর আমার পালনকর্তার কাছে লিখিত আছে। আমার পালনকর্তা ভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃতও হন না। (৫৩) তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। (৫৪) তোমরা আহার কর এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তু চরাও। নিশ্চয় এতে বিবেকবানদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (৫৫) এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃজন করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদেরকে উত্থিত করব। (৫৬) আমি ফেরাউনকে আমার সব নিদর্শন দেখিয়ে দিয়েছি, অতঃপর সে মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অমান্য করেছে। (৫৭) সে বলল ঃ হে মূসা, তুমি কি যাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্যে আগমন করেছ? (৫৮) অতএব আমরাও তোমার মোকাবেলায় তোমার নিকট অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন ঠিক কর, যার খেলাফ আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না একটি পরিষ্কার প্রান্তরে। (৫৯) মূসা বলল ঃ তোমাদের ওয়াদার দিন উৎসবের দিন এবং পূর্বাহ্নে লোকজন সমবেত হবে। (৬০) অতঃপর ফেরাউন প্রস্থান করল এবং তার সব কলাকৌশল জমা করল অতঃপর উপস্থিত হল। (৬১) মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ দুর্ভাগ্য তোমাদের; তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। তাহলে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উদ্‌ভাবন করে, সে-ই বিফলমনোরথ হয়েছে। (৬২) অতঃপর তারা তাদের কাজে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল। (৬৩) তারা বলল ঃ এই দুইজন নিশ্চিতই যাদুকর, তারা তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায় এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা রহিত করতে চায়। (৬৪) অতএব তোমরা তোমাদের কলাকৌশল সুসংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে আস। আজ যে জয়ী হবে, সেই সফলকাম হবে। (৬৫) তারা বলল ঃ হে মূসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি।

এমনিভাবে স্বভাবগত ও মানবগত ভয় দেখা দিয়েছে, যা আল্লাহ্ তাআলা সুসংবাদের মাধ্যমে দূর করেছেন। এই ঘটনা প্রসঙ্গেই

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا ...... فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ

এবং আয়াতসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই মানবগত ভয়ের কারণেই শেষ নবী (সাঃ) মদীনার দিকে এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী প্রথমে আবিসিনিয়ার ও পরে মদীনার দিকে হিজরত করেন। আহযাব যুদ্ধে এই ভয় থেকেই আত্মরক্ষার জন্যে পরিখা খনন করা হয়। অথচ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা বার বার এসেছিল। কিন্তু সত্য এই যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদার প্রতি তারা সবাই পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু মানবের স্বভাবগত তাগিদ অনুযায়ী যে স্বভাবগত ভয় পয়গম্বরদের মধ্যেও দেখা দেয়, তা এই বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়।

إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرٰى আল্লাহ্ তাআলা বললেন ঃ আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সব শুনব এবং দেখব। সঙ্গে থাকার অর্থ সাহায্য করা। এর পূর্ণ স্বরূপ ও গুণ মানবের উপলব্ধির বাইরে।

মূসা (আঃ) ফেরাউনকে ঈমানের দাওয়াতসহ বনী-ইসরাঈলকে অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে মুক্তি দেয়ারও আহবান জানান ঃ এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরগণ যেমন মানব জাতিকে ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব বহন করেন, তেমনি স্ব-স্ব উম্মতকে পার্থিব ও অর্থনৈতিক দুর্গতির কবল থেকে মুক্ত করাও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য। তাই কোরআন পাকে মূসা (আঃ)-এর দাওয়াতে উভয় বস্তুটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى আয়াতে প্রথমোক্ত প্রকার নির্দেশ বিবৃত হয়েছে। মূসা (আঃ) ফেরাউনকে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাআলার ঐ কাজের কথা বলেছেন, যা সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিব্যাপ্ত এবং কেউ একাজ নিজে অথবা অন্য কোন মানব করেছে বলে দাবী করতে পারে না। ফেরাউন এ কথার কোন জওয়াব দিতে অক্ষম হয়ে আবোল-তাবোল প্রশ্ন তুলে এড়িয়ে গেল এবং মূসা (আঃ)-কে এমন একটি প্রশ্ন করল, যার সত্যিকার জওয়াব জনসাধারণের শ্রুতিগোচর হলে তারা মূসা (আঃ)-এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। প্রশ্নটি এই যে, অতীত যুগে যেসব উম্মত ও জাতি প্রতিমা পূজা করত, আপনার মতে তারা কিরূপ, তাদের পরিণাম কি হয়েছে? উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এর উত্তরে মূসা (আঃ) অবশ্যই বলবেন যে, তারা সবাই গোমরাহ ও জাহান্নামী। তখন ফেরাউন একথা বলার সুযোগ পাবে যে, আপনি তো সারা বিশ্বকেই বেওকুফ, গোমরাহ ও জাহান্নামী মনে করেন। একথা শুনে জনসাধারণ তাঁর প্রতি কুধারণা পোষণ করবে। ফলে ফেরাউনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পয়গম্বর মূসা (আঃ) এ প্রশ্নের এমন বিজ্ঞজনোচিত জওয়াব দিলেন, যার ফলে ফেরাউনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتٰبٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ফেরাউন অতীত উম্মতদের পরিণতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। এর উত্তরে মূসা (আঃ) যদি পরিষ্কার বলে দিতেন যে, তারা গোমরাহ্ ও জাহান্নামী, তবে ফেরাউন এরূপ দোষারোপের সুযোগ পেয়ে যেত যে, সে তো শুধু আমাদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকে গোমরাহ্ ও জাহান্নামী মনে করে। একথা জনগণের শ্রুতিগোচর হলে তারাও মূসা (আঃ)-এর প্রতি সন্দেহপরায়ণ

হয়ে যেত। মূসা (আঃ) এমন বিজ্ঞজনোচিত জওয়াব দিলেন যে, পূর্ণ বক্তব্যও ফুটে উঠেছে এবং ফেরাউনও বিভ্রান্তি ছড়াবার সুযোগ পায়নি। একেই বলে "সাপও মরেছে এবং লাঠিও ভাঙ্গেনি।" তিনি বললেন ঃ তাদের পরিণতি সম্পর্কিত জ্ঞান আমার পালনকর্তার কাছে আছে। আমার পালনকর্তা ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। ভুল করার অর্থ এক কাজ করতে গিয়ে অন্য কাজ হয়ে যাওয়া। ভুলে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ - ازواج শব্দের অর্থ হরেক রকম এবং شَتَّىٰ শব্দটি شتيت এর বহুবচন। এর অর্থ বিভিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, উদ্ভিদের অগণিত প্রকার সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসব প্রকার গণনা করে শেষ করতে পারে না। এরপর লতা-গুল্ম, ফল-ফুল ও বৃক্ষের ছালে আল্লাহ্ তাআলা এমন এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদগণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। হাজারো বছর ধরে গবেষণা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও কেউ একথা বলতে পারে না যে, এদের সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে, তাই চূড়ান্ত। এসব বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ মানুষ ও তাদের পালিত জন্তু এবং বন্য জন্তুদের খোরাক অথবা ভেষজ হয়ে থাকে। এদের কাঠ গৃহনির্মাণে এবং গৃহে ব্যবহারোপযোগী হাজারো রকমের আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ অর্থাৎ, এতে আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে বিবেকবানের জন্যে। نهى শব্দটি نهية এর বহুবচন। বিবেককে نهية (নিষেধকারক) বলার কারণ এই যে, বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করে।

প্রত্যেক মানুষের খামিরে বীর্যের সাথে ঐ স্থানের মাটিও শামিল থাকে যেখানে সে সমাধিস্থ হবে ঃ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ - منها শব্দের সর্বনাম দ্বারা মৃত্তিকা বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এখানে সব মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে; অথচ এক আদম (আঃ) ছাড়া সাধারণ মানুষ মৃত্তিকা দ্বারা নয়, বীর্য দ্বারা সৃজিত হয়েছে। আদম (আঃ)-এর সৃষ্টিই কেবল সরাসরি মৃত্তিকা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তবে "তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করেছি" বলার কারণ এরূপ হতে পারে যে, মানুষের মূল এবং সবার পিতা হলেন হযরত আদম (আঃ)-তাঁর মধ্যস্থতায় সবার সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেয়া মোটেই অযৌক্তিক নয়। কেউ বলেন ঃ সব বীর্য মূলতঃ মাটি থেকেই উৎপন্ন। তাই বীর্য দ্বারা সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি। কারও কারও মতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অপার শক্তিবলে প্রত্যেক মানুষের সৃজনে মাটি অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তাই প্রত্যেক মানুষের সৃজনকে প্রত্যক্ষভাবে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ কোরআনের ভাষা থেকে বাহ্যতঃ একথাই বোঝা যায় যে, মাটি দ্বারাই প্রত্যেক মানুষ সৃজিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণিত এক হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ মাতৃগর্ভে প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যে ঐ স্থানের কিছু মাটি শামিল করা হয়, যেখানে আল্লাহ্র জ্ঞানে তার সমাধিস্থ হওয়া অবধারিত। আবু নাঈম এই হাদীসটি ইবনে সিরীনের তাযকেরায় উল্লেখ করে বলেছেন এই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আতা খোরাসানী বলেন ঃ যখন মাতৃগর্ভে বীর্য স্থিতিশীল হয়, তখন সৃজনকাজে আদিষ্ট ফেরেশতা গিয়ে সে স্থানের মাটি নিয়ে আসে, যেখানে তার সমাধিস্থ হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর এই মাটি বীর্যের মধ্যে শামিল করে দেয়া হয়। কাজেই মানুষের সৃজন মাটি ও বীর্য উভয় বস্তু দ্বারাই হয়। আতা এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ এই আয়াত পেশ করেছেন ঃ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ (কুরতুবী)

তফসীরে মাযহারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক শিশুর নাভিতে মাটির একটি অংশ রাখা হয়। মৃত্যুর পর সে ঐ স্থানেই সমাধিস্থ হয়, যেখানকার মাটি তার খামিরে শামিল করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন ঃ আমি, আবুবকর ও ওমর একই মাটি থেকে সৃজিত হয়েছি এবং একই জায়গায় সমাধিস্থ হব। খতীব এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন ঃ হাদীসটি গরীব। ইবনে জওযী একে মওযুআত অর্থাৎ ভিত্তিহীন হাদীসসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু শায়খ মুহাদ্দিস মির্যা মুহাম্মদ হারেসী বদখশী (রহঃ) বলেন ঃ এই হাদীসের পক্ষে অনেক সাক্ষ্য হযরত ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত রয়েছে। ফলে রেওয়ায়েতটি শক্তিশালী হয়ে গেছে। কাজেই হাদীসটি হাসান (লিগায়রিহি-র) চাইতে কম নয়। -(মাযহারী)

مَكَانًا سُوًى ফেরাউন মূসা (আঃ) ও যাদুকরদের মোকাবেলার জন্যে নিজেই প্রস্তাব করল যে, প্রতিযোগিতাটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত, যা ফেরাউন বংশীয় লোকদের ও বনী-ইসরাঈলের লোকদের সমান দূরত্বে অবস্থিত— যাতে কোন পক্ষকেই বেশী দূরে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। মূসা (আঃ) এই প্রস্তাব সমর্থন করে দিন ও সময় এভাবে নির্দিষ্ট করে দিলেন مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى অর্থাৎ, এই প্রতিযোগিতা সাজ-সজ্জা দিনে হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য ঈদ অথবা কোন মেলা ইত্যাদিতে সমবেত হওয়ার দিন। এটা কোন্ দিন ছিল, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন ঃ ফেরাউন বংশীয়দের একটি নির্দিষ্ট ঈদের দিন ছিল। সেদিন তারা সাজ-সজ্জার পোশাক পরিধান করে শহরের বাইরে এক জায়গায় সমবেত হত। কেউ কেউ বলেন ঃ এটা ছিল নববর্ষের দিন। কেউ বলেন ঃ এটা শনিবার দিন ছিল যাকে তারা সম্মান করত। আবার কারও মতে এটা আশুরা অর্থাৎ মুহররম মাসের দশম দিবস ছিল।

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত মূসা (আঃ) দিন ও সময় নির্ধারণে অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের ঈদের দিন মনোনীত করেছেন, যাতে ছোট-বড় সকল শ্রেণীর লোকদের সমাবেশ পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল এই যে, এই সমাবেশ অত্যন্ত জমজমাট হবে ও সমগ্র শহরের অধিবাসীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। সময় রেখেছেন পূর্বাহ্ন, যা সূর্য বেশ উপরে উঠার পর হয়। এতে এক উপযোগিতা এই যে, এ সময়ে সবাই আপন আপন কাজ সমাধা করে সহজে এই ময়দানে উপস্থিত হতে পারবে। দ্বিতীয় উপযোগিতা এই যে, এই সময়টি আলো প্রকাশের দিক দিয়ে সমস্ত দিনের মধ্যেই উত্তম। এরূপ সময়েই একাগ্রতা ও স্থিরতা সহকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করা হয়। এরূপ সময়ের সমাবেশ থেকে যখন জনতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে,তখন সমাবেশের বিষয়বস্তু দূর দূরান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়। সেমতে সেদিন যখন আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনী যাদুকরদের বিপক্ষে বিজয় দান

করলেন, তখন একদিনেই সমগ্র শহরে বরং দূর দূরান্ত পর্যন্ত এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়ে।

فَجَمَعَ كَيْدَهُ ফেরাউন মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় কৌশল হিসাবে যাদুকর ও তাদের সাজ-সরঞ্জাম জমা করে নিল। হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে যাদুকরদের সংখ্যা বাহাত্তর ছিল বলে বর্ণিত আছে। সংখ্যা সম্পর্কে অন্যান্য আরও বিভিন্ন উক্তি আছে। চারশ' থেকে নয় লাখ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা সবাই শামঊন নামক জনৈক সরদারের নির্দেশমত কাজ করত। কথিত আছে যে, তাদের সরদার ছিল একজন অন্ধ ব্যক্তি।— (কুরতুবী)

যাদুকরদের প্রতি মূসা (আঃ)-এর পয়গম্বরসূলভ ভাষণ ঃ মু'জেযা দ্বারা যাদুর মোকাবেলা করার পূর্বে মূসা (আঃ) যাদুকরদের শুভেচ্ছামূলক উপদেশের কয়েকটি বাক্য বলে আল্লাহ্র আযাবের ভয় প্রদর্শন করলেন। বাক্যগুলো এই ঃ

وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ

অর্থাৎ, তোমাদের ধ্বংস অত্যাসন্ন। আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করো না অর্থাৎ তাঁর সাথে ফেরাউন অথবা অন্য কাউকে শরীক করো না। এরূপ করলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে আযাব দ্বারা পিষ্ট করে দেবেন এবং তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, পরিণামে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়।

বলাবাহুল্য, ফেরাউনের শয়তানী শক্তি ও লোক-লস্করের সহায়তায় যারা মোকাবেলা করার জন্যে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, এসব উপদেশমূলক বাক্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া তাদের জন্যে সুদূরপরাহত ছিল। কিন্তু পয়গম্বর ও তাঁদের অনুসারীগণের সত্যের একটি গোপন শক্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকে। তাদের সাদাসিধা ভাষাও পাষাণসম অন্তরে তীর ও ছুরির ন্যায় ক্রিয়া করে। মূসা (আঃ)-এর এসব বাক্য শ্রবণ করে যাদুকরদের কাতার ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। কারণ, এ জাতীয় কথাবার্তা কোন যাদুকরের মুখে উচ্চারিত হতে পারে না। এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকেই মনে হয়। তাই কেউ কেউ বললেন ঃ এদের মোকাবেলা করা সমীচীন নয়। আবার কেউ কেউ নিজের মতেই অটল রইল। فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ এর অর্থ তাই। এরপর এই মতভেদ দূর করার জন্যে তারা গোপনে পরামর্শ করতে লাগল وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ কিন্তু অবশেষে মোকাবেলার পক্ষেই সমষ্টির মত প্রকাশ পেল। তারা বলল ঃ

إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ

অর্থাৎ, তারা উভয়ে যাদুকর। তারা চায় তাদের যাদুর জোর তোমাদেরকে অর্থাৎ ফেরাউন বংশীয়দেরকে তোমাদের দেশ মিসর থেকে বহিষ্কার করে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, যাদুর সাহায্যে তোমাদের দেশ অধিকার করতে চায় এবং তোমাদের সর্বোত্তম ধর্মকে মিটিয়ে দিতে চায়। مُثْلَىٰ শব্দটি أَمْثَل এর স্ত্রীলিঙ্গ। এর অর্থ উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যে, ফেরাউনকে খোদা ও ক্ষমতাশালী মান্য কর, যে – এ ধর্মই উত্তম ও সেরা ধর্ম; এরা এই ধর্মকে রহিত করে তদস্থলে নিজেদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কোন কওমের সরদার ও প্রতিনিধিদেরকেও 'কওমের তরিকা' বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস ও আলী (রাঃ) থেকে তরিকার এই তফসীর বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা তোমাদের কওমের সরদার এবং সেরা লোক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে খতম করে দিতে চায়। কাজেই তাদের মোকাবেলায় তোমরা তোমাদের পূর্ণ কলাকৌশল ও শক্তি ব্যয় করে দাও এবং সব যাদুকর সারিবদ্ধ হয়ে একযোগে তাদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হও। فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا সারিবদ্ধ হওয়া প্রতিপক্ষের মনে ভীতি সঞ্চার করার পক্ষে বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। তাই যাদুকররা সারিবদ্ধ হয়ে মোকাবেলা করল।

যাদুকররা তাদের ভ্রূক্ষেপহীনতা ফুটিয়ে তোলার জন্যে প্রথমে মূসা (আঃ)-কে বলল ঃ প্রথমে আপনি নিজের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন, না আমরা করব? মূসা (আঃ) জওয়াবে বললেন ঃ بَلْ أَلْقُوا অর্থাৎ, প্রথমে আপনারাই নিক্ষেপ করুন এবং যাদুর লীলা প্রদর্শন করুন। মূসা (আঃ)-এর এই জওয়াবে অনেক রহস্য লুক্কায়িত ছিল। প্রথমতঃ মজলিসী শিষ্টাচারের কারণে এরূপ জওয়াব দিয়েছেন। যাদুকররা যখন প্রতিপক্ষকে প্রথমে আক্রমণ করার অনুমতি দানের সৎসাহস প্রদর্শন করল, তখন এর ভদ্রজনোচিত জওয়াব ছিল এই যে, মূসা (আঃ)-এর পক্ষ থেকে আরও অধিক সাহসিকতার সাথে তাদেরকে সূচনা করার অনুমতি দেয়া। দ্বিতীয়তঃ যাদুকররা তাদের স্থিরচিত্ততা ও চিন্তাহীনতা ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশে একথা বলেছিল। মূসা (আঃ) তাদেরকেই সূচনা করার সুযোগ দিয়ে নিজের চিন্তাহীনতা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় পেশ করেছেন। তৃতীয়তঃ যাতে মূসা (আঃ) -এর সামনে তাদের যাদুর সব লীলা-খেলা এসে যায় এবং এরপরই তিনি তাঁর মু'জেযা প্রকাশ করেন। এভাবে একই সময়ে সত্যের বিজয় দিবালোকের মত ফুটে উঠতে পারত। যাদুকররা মূসার (আঃ) কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে দিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক লাঠি ও দড়ি একযোগে মাটিতে নিক্ষেপ করল। সবগুলো লাঠি ও দড়ি দৃশ্যতঃ সাপ হয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করতে লাগল।

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾ وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۗ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۗ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾ فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ﴿٧٠﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۗ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۫ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ﴿٧١﴾ قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ۗ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿٧٣﴾ اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ۗ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿٧٤﴾ وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ﴿٧٥﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ﴿٧٦﴾

(৬৬) মূসা বললেন ঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে হল, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। (৬৭) অতঃপর মূসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন। (৬৮) আমি বললাম ঃ ভয় করো না, তুমি বিজয়ী হবে। (৬৯) তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তারা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না। (৭০) অতঃপর যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। তারা বলল ঃ আমরা হারুন ও মূসার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। (৭১) ফেরাউন বলল ঃ আমার অনুমতি দানের পূর্বেই? তোমরা কি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে; দেখছি সেই তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। অতএব আমি অবশ্যই তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলে চড়াব এবং তোমরা নিশ্চিতরূপেই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার আযাব কঠোরতর এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী। (৭২) যাদুকররা বলল ঃ আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না। অতএব তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে। (৭৩) আমরা আমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি— যাতে তিনি আমাদের পাপ এবং তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ, তা মার্জনা করেন। আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী। (৭৪) নিশ্চয় যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না। (৭৫) আর যারা তাঁর কাছে আসে এমন ঈমানদার হয়ে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে সুউচ্চ মর্তবা। (৭৬) বসবাসের এমন পুষ্পোদ্যান রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা তাদেরই পুরস্কার, যারা পবিত্র হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى এ থেকে জানা যায় যে, ফেরাউনী যাদুকরদের যাদু ছিল এক প্রকার নজরবন্দী, যা মেসমেরিজমের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে যায়। লাঠি ও দড়িগুলো দর্শকদের দৃষ্টিতেই নজরবন্দীর কারণে সাপ রূপে দৃষ্টিগোচর হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে এগুলো সাপ হয়নি। অধিকাংশ যাদু এরূপই হয়ে থাকে।

فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى অর্থাৎ এ পরিস্থিতি দেখে মূসা (আঃ) – এর মধ্যে ভয় সঞ্চার হল ; কিন্তু এ ভয়কে তিনি মনের মধ্যে গোপন রাখলেন — প্রকাশ হতে দেননি। এ ভয়টি যদি প্রাণের ভয় হয়ে থাকে, তবে মানবতার খাতিরে এরূপ হওয়া নবুওয়তের পরিপন্থী নয়। কিন্তু বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এটা প্রাণের ভয় ছিল না; বরং তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, এই বিরাট সমাবেশের সামনে যদি যাদুকররা জিতে যায়, তবে নবুওয়তের দাওয়াতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারবে না। এ কারণেই এর জওয়াবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ঃ لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى এতে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, যাদুকররা জিততে পারবে না। তুমিই বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করবে। এভাবে মূসা (আঃ)–এর উপরোক্ত আশঙ্কা দূর করে দেয়া হয়েছে।

وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ মূসা (আঃ)–কে ওহীর মাধ্যমে বলা হল যে, তোমার দক্ষিণ হস্তে যা আছে, তা নিক্ষেপ কর। এখানে মূসা (আঃ)–এর লাঠি বোঝানো হয়েছে; কিন্তু তা পরিষ্কার উল্লেখ না করে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের যাদুর কোন মূল্য নেই। এজন্যে পরোয়া করো না এবং তোমার হাতে যা–ই আছে, তাই নিক্ষেপ কর। এটা তাদের সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। সেমতে তাই হল। মূসা (আঃ) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা একটি বিরাট অজগর সাপ হয়ে যাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল।

যাদুকররা মুসলমান হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল ঃ মূসা (আঃ)–এর লাঠি যখন অজগর হয়ে তাদের কাল্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন যাদুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ যাদুকরদের বুঝতে বাকী রইল না যে, একাজ যাদুর জোরে হতে পারে না; বরং এটা নিঃসন্দেহে মু'জেযা, যা একান্তভাবে আল্লাহ্র কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা সেজদায় পড়ে গেল এবং ঘোষণা করল ঃ আমরা মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কোন কোন হাদীসে রয়েছে, যাদুকররা ততক্ষণ পর্যন্ত সেজদা থেকে মাথা তোলেনি, যতক্ষণ খোদায়ী কুদরত তাদেরকে জান্নাত ও দোযখ প্রত্যক্ষ না করিয়ে দেয়। — (রূহুল-মা'আনী)

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ আল্লাহ্ তাআলা যখন এই বিরাট সমাবেশের সামনে ফেরাউনের লাঞ্ছনা ফুটিয়ে তুললেন, তখন হতভম্ব হয়ে প্রথমে সে যাদুকরদেরকে বলতে লাগল ঃ আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা কিরূপে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে? সে যেন উপস্থিত জনতাকে বলতে চেয়েছিল যে, আমার অনুমতি ছাড়া এই যাদুকরদের কোন কথা ও কাজ ধর্তব্য নয়। কিন্তু এই প্রকাশ্য মু'জেযা দেখার পর কারও অনুমতির আবশ্যকতা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে না। তাই সে এখন যাদুকরদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করে বলল ঃ এখন জানা গেল যে, তোমরা সবাই মূসার শিষ্য। এই যাদুকরই

তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা চক্রান্ত করেই তার কাছে নতি স্বীকার করেছ।

فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ এখন ফেরাউন যাদুকরদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিল যে, তোমাদের হস্তপদ এমনভাবে কাটা হবে যে, ডান হাত কেটে বাম পা কাটা হবে। সম্ভবতঃ ফেরাউনী আইনে শাস্তির এই পন্থাই প্রচলিত ছিল অথবা এভাবে হস্তপদ কাটা হলে মানুষের শিক্ষার একটি নমুনা হয়ে যায়। তাই ফেরাউন এ ব্যবস্থাই প্রস্তাব হিসেবে দিয়েছে।

وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ অর্থাৎ হস্তপদ কাটার পর তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের শূলে চড়ানো হবে। ক্ষুধা ও পিপাসায় না মরা পর্যন্ত তোমরা ঝুলে থাকবে।

قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا

যাদুকররা ফেরাউনের কঠোর হুমকি ও শাস্তির ঘোষণা শুনে ঈমানের ব্যাপারে এতটুকুও বিচলিত হল না। তারা বলল ঃ আমরা তোমাকে অথবা তোমার কোন কথাকে ঐসব নিদর্শন ও মু'জেযার উপর প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। হযরত ইকরামা বলেন ঃ যাদুকররা যখন সেজদায় গেল, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে জান্নাতের উচ্চস্তর ও নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়ে দেন। তাই তারা বলল ঃ এসব নিদর্শন সত্ত্বেও আমরা তোমার কথা মানতে পারি না।— (কুরতুবী) এবং জগৎ-স্রষ্টা আসমান-যমিনের পালনকর্তাকে ছেড়ে আমরা তোমাকে পালনকর্তা স্বীকার করতে পারি না। فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ এখন তোমার যা খুশী, আমাদের সম্পর্কে ফয়সালা কর এবং যে সাজা দেয়ার ইচ্ছা দাও। إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا অর্থাৎ, তুমি আমাদেরকে শাস্তি দিলেও তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন পর্যন্তই হবে। মৃত্যুর পর আমাদের উপর তোমার কোন অধিকার থাকবে না। আল্লাহ্র অবস্থা এর বিপরীত। আমরা মৃত্যুর পূর্বেও তাঁর অধিকারে আছি এবং মৃত্যুর পরও থাকব। কাজেই তাঁর শাস্তির চিন্তা অগ্রগণ্য।

وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ যাদুকররা এখন ফেরাউনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করল যে, আমাদেরকে যাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ। নতুবা আমরা এই অর্থহীন কাজের কাছেও যেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্র কাছে এই পাপ কাজেরও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, যাদুকররা স্বেচ্ছায় মোকাবেলা করতে এসেছিল এবং এই মোকাবেলার জন্যে দর-কষাকষিও ফেরাউনের সাথে করেছিল — অর্থাৎ বিজয় হলে তারা কি পুরস্কার পাবে। এমতাবস্থায় ফেরাউনের বিরুদ্ধে যাদু করতে বাধ্য করার অভিযোগ করা কিরূপে শুদ্ধ হবে? এর এক কারণ এরূপও হতে পারে যে, যাদুকররা প্রথমে শাহী পুরস্কার ও সম্মানের লোভে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত ছিল। পরে তারা অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, তারা মু'জেযার মোকাবেলা করতে পারবে না। তখন ফেরাউন তাদেরকে মোকাবেলা করতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় কারণ এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, ফেরাউন তার রাজ্যে যাদুশিক্ষা বাধ্যতামূলক করে রেখেছিল। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই যাদু শিক্ষা করতে বাধ্য ছিল।— (রূহুল-মা'আনী)

ফেরাউন পত্নী আছিয়ার শুভ পরিণতি ঃ তফসীরে-কুরতুবীতে বলা হয়েছে, সত্য ও মিথ্যার এই সংঘর্ষের সময় ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া মোকাবেলার শুভ ফলাফলের জন্যে সদা উদগ্রীব ছিলেন। যখন তাঁকে মূসা ও হারুন (আঃ)-এর বিজয়ের সংবাদ শোনানো হল, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করলেন ঃ আমি মূসা ও হারুনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিজ-পত্নীর সংবাদ শুনে ফেরাউন আদেশ দিল ঃ একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উঠিয়ে তাঁর মাথার উপর ছেড়ে দাও। আছিয়া নিজের এই পরিণতি দেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ্ তাআলা পাথর তাঁর মাথায় পড়ার আগেই তাঁর প্রাণ কবজ করে নিলেন। এরপর তাঁর মৃতদেহের উপর পাথর পতিত হল।

ফেরাউনী যাদুকরদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনঃ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا থেকে وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ এসব বাক্য প্রকৃত সত্য যা খাঁটি ইসলামী বিশ্বাস ও পরজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো ঐ যাদুকরদের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে, যারা এইমাত্র মুসলমান হয়েছে এবং তারা ইসলামী বিশ্বাস কিংবা ধর্মের কোন শিক্ষাও পায়নি। এসব হযরত মূসা (আঃ) – এর সংসর্গের বরকত এবং তাদের আন্তরিকতার প্রভাবেই আল্লাহ্ তাআলা তাদের সামনে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের দ্বার মুহূর্তের মধ্যেই উন্মোচিত করে দেন। ফলে তারা প্রাণনাশের নিশ্চিত সম্ভাবনার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেনি এবং কঠোরতম শাস্তি ও বিপদের ভয়ও তাদেরকে টলাতে পারেনি। তারা যেন বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে বেলায়েতের ঐ স্তরে উন্নীত হয়ে গেছে, যে স্তরে উন্নীত হওয়া অন্যদের পক্ষে আজীবন চেষ্টা ও সাধনার পরও কঠিন হয়ে থাকে। فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও উবায়দ ইবনে উমায়র বলেন ঃ আল্লাহ্র কুদরত লীলা দেখ, তারা দিনের প্রারম্ভে কাফের যাদুকর ছিল এবং দিবাশেষে আল্লাহ্র ওলী ও শহীদ হয়ে গেল।— (ইবনে-কাসীর)।

وَلَقَدۡ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلٰى مُوۡسٰٓى ۙ اَنۡ اَسۡرِ بِعِبَادِىۡ فَاضۡرِبۡ لَهُمۡ طَرِيۡقًا فِى الۡبَحۡرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخۡشٰى ﴿٧٧﴾ فَاَتۡبَعَهُمۡ فِرۡعَوۡنُ بِجُنُوۡدِهٖ فَغَشِيَهُمۡ مِّنَ الۡيَمِّ مَا غَشِيَهُمۡ ﴿٧٨﴾ وَاَضَلَّ فِرۡعَوۡنُ قَوۡمَهٗ وَمَا هَدٰى ﴿٧٩﴾ يٰبَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ قَدۡ اَنۡجَيۡنٰكُمۡ مِّنۡ عَدُوِّكُمۡ وَوٰعَدۡنٰكُمۡ جَانِبَ الطُّوۡرِ الۡاَيۡمَنَ وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكُمُ الۡمَنَّ وَالسَّلۡوٰى ﴿٨٠﴾ كُلُوۡا مِنۡ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقۡنٰكُمۡ وَلَا تَطۡغَوۡا فِيۡهِ فَيَحِلَّ عَلَيۡكُمۡ غَضَبِىۡ ۚ وَمَنۡ يَّحۡلِلۡ عَلَيۡهِ غَضَبِىۡ فَقَدۡ هَوٰى ﴿٨١﴾ وَاِنِّىۡ لَغَفَّارٌ لِّمَنۡ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهۡتَدٰى ﴿٨٢﴾ وَمَاۤ اَعۡجَلَكَ عَنۡ قَوۡمِكَ يٰمُوۡسٰى ﴿٨٣﴾ قَالَ هُمۡ اُولَاۤءِ عَلٰۤى اَثَرِىۡ وَعَجِلۡتُ اِلَيۡكَ رَبِّ لِتَرۡضٰى ﴿٨٤﴾ قَالَ فَاِنَّا قَدۡ فَتَنَّا قَوۡمَكَ مِنۡۢ بَعۡدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوۡسٰٓى اِلٰى قَوۡمِهٖ غَضۡبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوۡمِ اَلَمۡ يَعِدۡكُمۡ رَبُّكُمۡ وَعۡدًا حَسَنًا ۚ اَفَطَالَ عَلَيۡكُمُ الۡعَهۡدُ اَمۡ اَرَدۡتُّمۡ اَنۡ يَّحِلَّ عَلَيۡكُمۡ غَضَبٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ فَاَخۡلَفۡتُمۡ مَّوۡعِدِىۡ ﴿٨٦﴾

(৭৭) আমি মূসার প্রতি এই মর্মে ওহী করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্যে সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্মাণ কর। পেছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশঙ্কা করো না এবং পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয় করো না। (৭৮) অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল। (৭৯) ফেরআউন তার সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছিল এবং সৎপথ দেখায়নি। (৮০) হে বনী-ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছি, তুর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করেছি এবং তোমাদের কাছে 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করেছি। (৮১) বলেছি ঃ আমার দেয়া পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং এতে সীমালংঘন করো না, তা হলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে এবং যার উপর আমার ক্রোধ নেমে আসে সে ধ্বংস হয়ে যায়। (৮২) আর যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল। (৮৩) হে মূসা, তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে তুমি ত্বরা করলে কেন? (৮৪) তিনি বললেন ঃ এই তো তারা আমার পেছনে আসছে এবং হে আমার পালনকর্তা, আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। (৮৫) বললেন ঃ আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি তোমার পর এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। (৮৬) অতঃপর মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন ক্রুদ্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায়। তিনি বললেন ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময়কাল তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدۡ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلٰى مُوۡسٰٓى যখন সত্য ও মিথ্যা, মু'জেযা ও যাদুর চূড়ান্ত লড়াই ফেরাউন ও ফেরাউন-বংশীয়দের কোমর ভেঙ্গে দিল এবং মূসা ও হারূন (আঃ)-এর নেতৃত্বে বনী-ইসরাঈল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল, তখন তাদেরকে সেখান থেকে হিজরত করার আদেশ দান করা হল। কিন্তু ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন এবং সামনে পথিমধ্যে সমুদ্র অন্তরায় হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। তাই মূসা (আঃ)-কে এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশে বলা হল যে, সমুদ্রে লাঠি মারলেই মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ হয়ে যাবে এবং পশ্চাদ্দিক থেকে ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবনের আশঙ্কা থাকবে না। এর বিস্তারিত ঘটনা এ সূরাতেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মূসা (আঃ) সমুদ্রে লাঠি মারতেই তাতে বারটি সড়ক নির্মিত হয়ে গেল। প্রত্যেক সড়কের উভয় পার্শ্বে পানির স্তূপ জমাট বরফের ন্যায় পাহাড়সম দণ্ডায়মান হয়ে গেল এবং মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ দৃষ্টিগোচর হল। সূরা শুআরায় বলা হয়েছে ঃ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٍ كَالطَّوۡدِ الۡعَظِيۡمِ বারটি সড়কের মধ্যবর্তী পানির প্রাচীরকে আল্লাহ্ তাআলা এমন করে দিলেন যে, এক সড়ক অতিক্রমকারীরা অন্য সড়ক অতিক্রমকারীদেরকে দেখত এবং কথাবার্তাও বলত। অন্যান্য গোত্রের কি অবস্থা হয়েছে, প্রত্যেকের থেকে এই দুশ্চিন্তা দূর করার উদ্দেশে এরূপ করা হয়েছিল। —(কুরতুবী)

মিসর থেকে বের হওয়ার সময় বনী-ইসরাঈলের কিছু অবস্থা ঃ তাদের সংখ্যা ও ফেরাউনী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ঃ তফসীরে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা (আঃ) রাত্রির সূচনাভাগে বনী-ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। বনী-ইসরাঈল ইতিপূর্বে শহরবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিল যে, তারা ঈদ উৎসব পালন করার জন্যে বাইরে যাবে। এই বাহানায় তারা ঈদের পরে ফেরৎ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিবতীদের কাছ থেকে কিছু অলংকার পত্র ধার করে নেয়। বনী-ইসরাঈলের সংখ্যা তখন ছয় লাখ তিন হাজার এবং অন্য রেওয়ায়েতে ছয় লাখ সত্তর হাজার ছিল। এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় অতিরঞ্জিত হতে পারে। তবে কোরআন পাক ও হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, তাদের বারটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল। এটাও খোদায়ী কুদরতের একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আমলে বনী ইসরাঈল যখন মিসরে আগমন করে, তখন তারা বার ভাই ছিল। এখন বার ভাইয়ের বার গোত্রের এত বিপুল সংখ্যক লোক মিসর থেকে বের হল যে, তাদের সংখ্যা ছয় লাখেরও অধিক বর্ণনা করা হয়। ফেরাউন তাদের মিসর ত্যাগের সংবাদ অবগত হয়ে সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করল। তাদের মধ্যে সত্তর হাজার কৃষ্ণ বর্ণের ঘোড়া ছিল এবং অগ্রবর্তী বাহিনীতে সাত লাখ সওয়ার ছিল। পশ্চাদ্দিক থেকে সৈন্যদের এই সয়লাব এবং সামনে ভূমধ্য সাগর দেখে বনী-ইসরাঈল ঘাবড়ে গেল এবং মূসা (আঃ)-কে বললঃ اِنَّا لَمُدۡرَكُوۡنَ অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। মূসা (আঃ) সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىۡ سَيَهۡدِيۡنِ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর তিনি আল্লাহ্র নির্দেশে সমুদ্রে লাঠি মারলেন এবং তাতে বারটি গোত্র এসব সড়ক দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেল। ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী সেখানে পৌঁছে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল যে, সমুদ্রের বুকে এই রাস্তা কিভাবে তৈরী

হয়ে গেল ! কিন্তু ফেরাউন সগর্বে সৈন্যদেরকে বলল ঃ এগুলো সব আমার প্রতাপের লীলা। এর কারণে সমুদ্রের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে রাস্তা তৈরী হয়ে গেছে। একথা বলে তৎক্ষণাৎ সে সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের ঘোড়া সমুদ্রের পথে চালিয়ে দিল এবং গোটা সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাতে আসার আদেশ দিল। যখন ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ সামুদ্রিক পথের মধ্যখানে এসে গেল এবং একটি লোকও তীরে রইল না, তখন আল্লাহ্ তাআলা সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার আদেশ দিলেন এবং সমুদ্রের সকল অংশ পরস্পর মিলিত হয়ে গেল। فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ বাক্যের সারমর্ম তাই। — (রূহুল-মা'আনী)

وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া এবং সমুদ্র পার হওয়ার পর আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)- কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় বনী-ইসরাঈলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে চলে আসুক, যাতে মূসা (আঃ)-কে তওরাত প্রদান করা যায় এবং বনী-ইসরাঈল স্বয়ং তাঁর বাক্যালাপের গৌরব প্রত্যক্ষ করে।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى এটা তখনকার ঘটনা, যখন বনী ইসরাঈল সমুদ্র পার হওয়ার পর সামনে অগ্রসর হয় এবং তাদেরকে একটি পবিত্র শহরে প্রবেশ করার আদেশ দেয়া হয়। তারা আদেশ অমান্য করে। তখন সাজা হিসেবে তাদেরকে তীহ্ নামক উপত্যকায় আটক করা হয়। তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই উপত্যকা থেকে বাইরে যেতে সক্ষম হয়নি। এই শাস্তি সত্ত্বেও মূসা (আঃ)- এর বরকতে তাদের উপর বন্দীদশায়ও নানা রকম নেয়ামত বর্ষিত হতে থাকে।

"মান্না" ও "সালওয়া" ছিল এইসব নেয়ামতেরই অন্যতম, যা তাদের আহারের জন্যে দেয়া হত।

যখন মূসা (আঃ)ও বনী-ইসরাঈল ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে সামনে অগ্রসর হল, তখন এক প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে তারা গমন করল। এই সম্প্রদায়ের পূজাপাট দেখে বনী-ইসরাঈল বলতে লাগল ঃ তারা যেমন উপস্থিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের জন্যেও এমনি ধরণের কোন খোদা বানিয়ে দাও। মূসা (আঃ) তাদের বোকামীসুলভ দাবীর জওয়াবে বললেন ঃ তোমরা তো নেহাতই মূর্খ। এই প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ বাতিল। اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তখন আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)-কে ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী-ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে তূর পর্বতে চলে এস। আমি তোমাকে তওরাত দান করব। এটা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্যে কর্মপন্থা নির্দেশ করবে। কিন্তু তওরাত লাভ করার পূর্বে তোমাকে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত অবিরাম রোযা রাখতে হবে। এরপর দশ দিন আরও বৃদ্ধি করে এই মেয়াদ চল্লিশ দিন করে দেয়া হল। মূসা (আঃ) বনী-ইসরাঈলসহ তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তাআলার এই ওয়াদাদৃষ্টে মূসা (আঃ)-এর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সীমা রইল না। তিনি তার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে আসার আদেশ দিয়ে নিজে সাগ্রহে আগে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যে, আমি অগ্রে পৌছে ত্রিশ দিবা-রাত্রির রোযা রাখব। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা হারুন (আঃ)-এর আদেশ মেনে চলবে। বনী-ইসরাঈল হারুন (আঃ)-এর সাথে পেছনে চলতে লাগল এবং মূসা (আঃ) দ্রুত গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তার ধারণা ছিল যে, তারাও অনতিবিলম্বে তূর পর্বতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা পথিমধ্যে গো-বৎস পূজার সম্মুখীন হয়ে গেল। বনী-ইসরাঈল তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং মূসা (আঃ)-এর পশ্চাতে গমনের প্রক্রিয়া বানচাল হয়ে গেল।

মূসা (আঃ) তূর পর্বতে উপস্থিত হলে আল্লাহ্ তাআলা বললেন ঃ وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى হে মূসা, তুমি স্বীয় সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে দ্রুত কেন চলে এলে।

ত্বরা করা সম্পর্কে মূসা (আঃ)-কে প্রশ্ন ও তার রহস্য ঃ মূসা (আঃ) তার সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে আশা করেছিলেন যে, তারাও বোধ হয় তূর পর্বতের নিকট পৌছে গেছে। তার এই ভ্রান্তি দূর করা এবং বনী ইসরাঈল যে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছে, এই খবর দেয়াই ছিল উপরোক্ত প্রশ্নের বাহ্যতঃ উদ্দেশ্য। (ইবনে-কাসীর) রূহুল-মা'আনীতে কাশশাফের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে ঃ এই প্রশ্নের কারণ ছিল মূসা (আঃ)- কে তার সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া এবং এই ত্বরা করার জন্যে হুশিয়ার করা যে, নবুওয়তের পদের তাগিদ অনুযায়ী কওমের সাথে থাকা, তাদেরকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখা এবং সঙ্গে আনা উচিত ছিল। তাঁর ত্বরা করার ফলশ্রুতিতে সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। এতে স্বয়ং ত্বরা করার কাজেরও নিন্দা করা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণের মধ্যে এই ত্রুটি না থাকা বাঞ্ছনীয়। "ইনতিসাফ" গ্রন্থের বরাত দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, এতে মূসা (আঃ)-কে কওমের সাথে সফর করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয় যে, যে ব্যক্তি কওমের নেতা, তার পশ্চাতে থাকা উচিত ; যেমন লূত (আঃ)-এর ঘটনায় আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নির্দেশ দেন যে, মুমিনদেরকে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে পড় এবং তাদেরকে অগ্রে রেখে তুমি সবার পশ্চাতে থাক। — وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ

আল্লাহ্ তাআলার উল্লেখিত প্রশ্নের জওয়াবে মূসা (আঃ) নিজ ধারণা অনুযায়ী আরয করলেন ঃ আমার সম্প্রদায়ও পেছনে পেছনে প্রায় এসেই গেছে। আমি একটু ত্বরা করে এসে গেছি ; কারণ, নির্দেশ পালনে অগ্রে অগ্রে থাকা নির্দেশদাতার অধিক সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বনী-ইসরাঈলের মধ্যে সংঘটিত গো-বৎস পূজার সংবাদ দেন যে, সামেরীর পথভ্রষ্ট করার কারণে তারা ফেৎনায় পতিত হয়েছে।

সামেরী কে ছিল? কেউ কেউ বলেন ঃ সামেরী ফেরাউন বংশীয় কিবতী ছিল। সে মূসা (আঃ)-এর প্রতিবেশী এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিল। মূসা (আঃ) যখন বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন, তখন সেও সাথে রওয়ানা হয়। কারও কারও মতে সে বনী-ইসরাঈলেরই সামেরা গোত্রের সরদার ছিল। সিরিয়ার এই সামেরা গোত্র সুবিদিত। হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়র বলেন ঃ এ পারস্য বংশোদ্ভূত লোক কিরমানের অধিবাসী ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ সে গো-বৎস পূজাকারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। কোনরূপে মিসর পৌছে সে বনী ইসরাঈলীদের ধর্মে দীক্ষা লাভ করে। কিন্তু তার অন্তরে ছিল কপটতা। —(কুরতুবী) কুরতুবীর টীকায় বলা হয়েছে ঃ সে ভারতবর্ষের জনৈক হিন্দু ছিল এবং গো-পূজা করত। সে মূসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কুফর অবলম্বন করে অথবা প্রথম থেকেই কপট মনে ঈমান প্রকাশ করে।

জনশ্রুতি এই ঃ সামেরীর নাম ছিল মূসা ইবনে যফর। ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, মূসা সামেরী যখন জন্মগ্রহণ

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ
الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا
جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هٰذَا إِلٰهُكُمْ وَإِلٰهُ مُوسٰى ۥ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ أَفَلَا
يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۥ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُونُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَإِنَّ
رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿٩٠﴾ قَالُوا لَنْ نَّبْرَحَ
عَلَيْهِ عٰكِفِينَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسٰى ﴿٩١﴾ قَالَ يٰهٰرُونُ مَا
مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿٩٢﴾ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٩٣﴾
قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ
تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾ قَالَ
فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهٖ
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ
لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ أَنْ تَقُولَ لَا
مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ ۚ وَانْظُرْ إِلٰى إِلٰهِكَ الَّذِي
ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

(৮৭) তারা বলল ঃ আমরা তোমার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি; কিন্তু আমাদের উপর ফেরআউনীদের অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা নিক্ষেপ করে দিয়েছি। এমনিভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করেছে। (৮৮) অতঃপর সে তাদের জন্য তৈরী করে বের করল একটা গো-বৎস—একটা দেহ, যার মধ্যে গরুর শব্দ ছিল। তারা বলল ঃ এটা তোমাদের উপাস্য এবং মূসারও উপাস্য, অতঃপর মূসা ভুলে গেছে। (৮৯) তারা কি দেখে না যে, এটা তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি ও উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না? (৯০) হারুন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিলেন ঃ হে আমার কওম, তোমরা তো এই গো-বৎস দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছ এবং তোমাদের পালনকর্তা দয়াময়। অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। (৯১) তারা বলল ঃ মূসা আমাদের কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা সদাসর্বদা এর সাথেই সংযুক্ত হয়ে বসে থাকব। (৯২) মূসা বললেন ঃ হে হারুন, তুমি যখন তাদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দেখলে, তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল? (৯৩) আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে? তবে তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করেছ? (৯৪) তিনি বললেন ঃ হে আমার জননী-তনয়, আমার শ্মশ্রু ও মাথার চুল ধরে আকর্ষণ করো না; আমি আশঙ্কা করলাম যে, তুমি বলবে ঃ তুমি বনী-ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা স্মরণে রাখনি। (৯৫) মূসা বললেন ঃ হে সামেরী, এখন তোমার ব্যাপার কি? (৯৬) সে বলল ঃ আমি দেখলাম যা অন্যেরা দেখেনি। অতঃপর আমি সেই প্রেরিত ব্যক্তির পদচিহ্নের নীচ থেকে এক মুঠি মাটি নিয়ে নিলাম। অতঃপর আমি তা নিক্ষেপ করলাম। আমাকে আমার মন এই মন্ত্রণাই দিল। (৯৭) মূসা বললেন ঃ দূর হ, তোর জন্য সারা জীবন এ শাস্তিই রইল যে, তুই বলবি ঃ 'আমাকে স্পর্শ করো না' এবং তোর জন্যে একটি নির্দিষ্ট ওয়াদা আছে, যার ব্যতিক্রম হবে না। তুই তোর সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, যাকে তুই ঘিরে থাকতি। আমরা সেটি জ্বালিয়ে দেবই। অতঃপর একে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছড়িয়ে দেবই।

করে তখন ফেরাউনের পক্ষ থেকে সমস্ত ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানের হত্যার আদেশ বিদ্যমান ছিল।

ফেরাউনী সিপাহীদের হাতে চোখের সামনে স্বীয় পুত্রহত্যার ভয়ে ভীতা জননী তাকে একটি জঙ্গলের গর্তে রেখে উপর থেকে ঢেকে দেয়। এদিকে আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলকে শিশুর হেফাযত ও পানাহারের কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি তাঁর এক অঙ্গুলিতে মধু, অন্য অঙ্গুলিতে মাখন এবং অপর অঙ্গুলিতে দুধ এনে শিশুকে চাটিয়ে দিতেন। অবশেষে সে গর্তের মধ্যে থেকেই বড় হয়ে গেল এবং পরিণামে কুফরে লিপ্ত হল ও বনী ইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করল।

أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا হযরত মূসা (আঃ) ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় ফিরে এসে জাতিকে সম্বোধন করলেন এবং প্রথমে তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা স্মরণ করালেন। এই ওয়াদার জন্যে তিনি বনী-ইসরাঈলকে নিয়ে তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে রওয়ানা হয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তওরাত প্রাপ্তির কথা ছিল। বলাবাহুল্য, তওরাত লাভ করলে বনী ইসরাঈলের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়ে যেত।

أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার এই ওয়াদার পর তেমন কোন দীর্ঘ মেয়াদও তো অতিক্রান্ত হয়নি যে, তোমরা তা ভুলে যেতে পার। এমন তো নয় যে, সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর তোমরা নিরাশ হয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছ।

أَمْ أَرَدْتُّمْ أَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ, ভুলে যাওয়ার অথবা অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই; এখন এছাড়া আর কি বলা যায় যে, তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় পালনকর্তার গযব ডেকে আনছ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا — ملك শব্দটি মীমের যবর এবং মীমের পেশযোগে ব্যবহৃত হয়। উভয়ের অর্থ এখানে স্ব-ইচ্ছা। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা গো-বৎস পূজায় স্বেচ্ছায় লিপ্ত হইনি ; বরং সামেরীর কাজ দেখে বাধ্য হয়েছি। বলাবাহুল্য,তাদের এই দাবী সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সামেরী অথবা তার কর্ম তাদেরকে বাধ্য করেনি। বরং তারা নিজেরাই চিন্তা-ভাবনার অভাবে তাতে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর তারা সামেরীর কর্মের ঘটনা বর্ণনা করেছে ঃ

وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ — أَوْزَارًا শব্দটি وزر এর বহুবচন। অর্থ বোঝা। মানুষের পাপও কেয়ামতের দিন বোঝার আকারে পিঠে সওয়ার হবে, তাই পাপকে وزر এবং পাপরাশিকে أَوْزَارًا বলা হয়। زينة শব্দের অর্থ এখানে অলংকার এবং কওম বলে ফেরাউনের কওমকে বোঝানো হয়েছে। বনী-ইসরাঈল ঈদের বাহানায় তাদের কাছ থেকে কিছু অলংকার ধার করেছিল এবং সেগুলো তাদের সাথে ছিল। এগুলোকে اوزار তথা পাপের বোঝা বলার কারণ এই যে, ধারের কথা বলে গৃহীত এসব অলংকার ফেরত দেয়া কর্তব্য ছিল। যেহেতু ফেরত দেয়া হয়নি, তাই এগুলোকে পাপ বলা হয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূন (আঃ) তাদেরকে এগুলো যে পাপ, সে সম্পর্কে হুশিয়ার

করে সেগুলোকে একটি গর্তে ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে সামেরী তার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্যে তাদেরকে বলেছিল এসব অলংকার অপরের ধন। এগুলো রাখা তোমাদের জন্যে বিপদস্বরূপ। তার এই কথা শুনে অলংকারগুলো গর্তে নিক্ষেপ করা হয়।

কাফেরদের মাল মুসলমানদের জন্যে কখন হালাল ? এখানে প্রশ্ন হয় যে, যেসব কাফের মুসলিম রাষ্ট্রে আইন মান্য করে বসবাস করে এবং যেসব কাফেরের সাথে জান ও মালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোন চুক্তি হয়, তাদের মাল তো মুসলমানদের জন্যে হালাল নয়, কিন্তু যেসব কাফের ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী নয় এবং যাদের সাথে কোন চুক্তিও হয়নি —ফেকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় যাদেরকে 'কাফের হরবী' বলা হয়, তাদের মাল মুসলমানদের জন্যে মূলতঃই হালাল। এমতাবস্থায় হারূন (আঃ) এই মালকে وزر তথা পাপ কেন বললেন এবং তাদের কবজা থেকে বের করে গর্তে নিক্ষেপ করার আদেশ কেন দিলেন? এর একটি প্রসিদ্ধ জওয়াব বিশিষ্ট তফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, কাফের হরবীর মাল যদিও মুসলমানদের জন্যে হালাল, কিন্তু তা গনীমতের মালের (যুদ্ধলব্ধ মালের) মতই বিধান রাখে। ইসলামপূর্ব কালে গনীমতের মাল সম্পর্কে এ আইন ছিল যে, তা কাফেরদের কবজা থেকে বের করে আনা জায়েয ছিল, কিন্তু মুসলমানদের জন্যে তা ব্যবহার করা ও ভোগ করা জায়েয নয়। বরং গনীমতের মাল একত্রিত করে কোন টিলা ইত্যাদির উপর রেখে দেয়া হত এবং আসমানী আগুন (বজ্র ইত্যাদি) এসে তা গ্রাস করে ফেলত। এটাই ছিল তাদের জেহাদ কবুল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে যে গনীমতের মালকে আসমানী আগুন গ্রাস করত না, সেই মাল জেহাদ কবুল না হওয়ার লক্ষণরূপে গণ্য হত। ফলে এরূপ মালকে অশুভ মনে করে কেউই তার কাছে যেত না। রসূল করীম (সাঃ)–এর শরীয়তে যেসব বিশেষ সুবিধা ও রেয়াত দেয়া হয়েছে, তন্মধ্যে গনীমতের মাল মুসলমানদের জন্যে হালাল করে দেয়াও অন্যতম। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই নীতি অনুযায়ী কিবতীদের যেসব মাল বনী–ইসরাঈলের অধিকারভুক্ত ছিল, সেগুলোকে গনীমতের মাল সাব্যস্ত করা হলেও তাদের জন্যে সেগুলো ভোগ করা বৈধ ছিল না। এ কারণেই এই মালকে أَوْزَارًا (পাপরাশি) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং হযরত হারূন (আঃ) –এর আদেশে সেগুলো গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

فَقَذَفْنَٰهَا —অর্থাৎ, আমরা এসব অলংকারপাতি নিক্ষেপ করে দিয়েছি। উল্লেখিত হাদীসুল ফুতূনের বর্ণনা অনুযায়ী এই কাজ হযরত হারূন (আঃ)–এর নির্দেশে করা হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সামেরী তাদেরকে প্ররোচিত করে অলংকারপাতি গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে দেয়। এখানে উভয় কারণে সমাবেশ হওয়াও অবান্তর নয়।

فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ –হাদীসে ফুতূনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হারূন (আঃ) সব অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে আগুন লাগিয়ে দেন, যাতে সবগুলো গলে এক অবয়বে পরিণত হয় এবং মূসা (আঃ)–এর ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা যায়। সবাই যখন নিজ নিজ অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করে দিল, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পৌছল এবং হারূন (আঃ)–কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমিও নিক্ষেপ করব? হারূন (আঃ) মনে করলেন যে, তার হাতেও কোন অলংকার আছে, তাই তিনি নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়ে দিলেন। তখন সামেরী হারূন (আঃ)–কে বলল ঃ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক—আপনি আমার জন্যে এই মর্মে দোয়া করলেই আমি নিক্ষেপ করব— নতুবা নয়। তার কপটতা ও কুফর হারূন (আঃ)–এর জানা ছিল না। তিনি দোয়া করলেন। তখন সে হাত থেকে যা নিক্ষেপ করল, তা অলংকারের পরিবর্তে মাটি ছিল। সে এই মাটি জিবরাঈল ফেরেশতার ঘোড়ার পায়ের নীচে থেকে সংগ্রহ করেছিল। কারণ, একদা সে এই বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যে মাটিকে জিবরাঈলের ঘোড়ার পা স্পর্শ করে, সেখানেই সজীবতা ও জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে সে বুঝে নিয়েছিল যে, এই মাটিতে জীবনের স্পন্দন নিহিত আছে। শয়তানের প্ররোচনায় সে এই মাটির দ্বারা একটি জীবিত গো–বৎস তৈরী করতে উদ্যত হল। মোটকথা, এই মাটির নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হোক কিংবা হারূন (আঃ)–এর দোয়ার বরকতে হোক—অলংকারাদির গলিত স্তূপ এই মাটি নিক্ষেপের এবং হারূন (আঃ)–এর দোয়া করার সাথে সাথেই একটি জীবিত গো–বৎসে পরিণত হয়ে আওয়াজ করতে লাগল। যে রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সামেরীই বনী–ইসরাঈলকে অলংকারাদি গর্তে নিক্ষেপ করতে প্ররোচিত করেছিল, তাতে এ কথাও উল্লেখিত হয়েছে যে, সে অলংকারাদি গলিয়ে একটি গো–বৎসের মূর্তি তৈরী করে নিয়েছিল, কিন্তু তাতে প্রাণ ছিল না। উপরোক্ত মাটি নিক্ষেপের পর তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এসব রেওয়ায়েত কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় এগুলো বিশ্বাস করা যায় না। তবে এগুলোকে মিথ্যা বলারও কোন প্রমাণ নেই।

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ –অর্থাৎ, সামেরী এসব অলঙ্কার দ্বারা একটি গো–বৎস অবয়ব তৈরী করে নিল, তাতে গরুর আওয়াজ ছিল। جسد (অবয়ব) শব্দ দৃষ্টে কোন কোন তফসরীবিদ বলেছেন যে, এটা অবয়ব ও দেহ ছিল— তাতে প্রাণ ছিল না। তবে বিশেষ এক কারণে তা থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল। অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তি প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে যে, তাতে প্রাণ ছিল।

فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ –অর্থাৎ, আওয়াজরত গো–বৎস দেখে সামেরী ও তার সঙ্গীরা অন্যদেরকে বলল ঃ এটাই তোমাদের এবং মূসার খোদা। কিন্তু মূসা বিভ্রান্ত হয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এ পর্যন্ত বনী–ইসরাঈলের অসার ওযর বর্ণিত হল। মূসা (আঃ)–এর ক্রোধ দেখে তারা এই ওযর পেশ করেছিল। এরপর ঃ

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا –বাক্যে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও পথভ্রষ্টতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাস্তবে যদি একটি গো–বৎস জীবিত হয়ে গরুর মত আওয়াজ করতে থাকে, তবে এই জ্ঞানপাপীদের একথা তো চিন্তা করা উচিত ছিল যে, এর সাথে খোদায়ীর কি সম্পর্ক? যে ক্ষেত্রে গো–বৎসটি তাদের কথার কোন জওয়াব দিতে পারে না এবং তাদের কোন উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, সে ক্ষেত্রে তাকে খোদা মেনে নেয়ার নির্বুদ্ধিতার পেছনে কোন যুক্তি আছে কি?

مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ –এখানে অনুসরণের এক অর্থ তো তাই, মূসা (আঃ)–এর কাছে তূর পর্বতে চলে যাওয়া। কোন কোন তফসীরবিদ অনুসরণের এরূপ অর্থ করেছেন যে, তারা যখন পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, তখন তুমি তাদের মোকাবেলা করলে না কেন? কেননা, আমার

উপস্থিতিতে এরূপ হলে আমি নিশ্চিতই তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ও যুদ্ধ করতাম। তোমারও এরূপ করা উচিত ছিল।

উভয় অর্থের দিক দিয়ে হারুন (আঃ)-এর বিরুদ্ধে মূসা (আঃ)-এর অভিযোগ ছিল এই যে, এহেন পথভ্রষ্টতায় হয় তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে, না হয় তাদের থেকে পৃথক হয়ে আমার কাছে চলে আসতে। তাদের সাথে সহ-অবস্থান মূসা (আঃ)-এর মতে ভ্রান্ত ও অন্যায় ছিল। হারুন (আঃ) এই কঠোর ব্যবহার সত্ত্বেও শিষ্টাচারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে মূসা (আঃ)-কে নরম করার জন্য 'হে আমার জননী-তনয়' বলে সম্বোধন করলেন। এতে কঠোর ব্যবহার না করার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ, আমি তো তোমার ভ্রাতা বৈ শত্রু নই। তাই আমার ওযর শুনে নাও। অতঃপর হারুন (আঃ) এরূপ ওযর বর্ণনা করলেন ঃ আমি আশঙ্কা করলাম যে, তোমার ফিরে আসার পূর্বে যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হই অথবা তাদেরকে ত্যাগ করে বার হাজার সঙ্গী নিয়ে তোমার কাছে চলে যাই, তবে বনী-ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে। তুমি রওয়ানা হওয়ার সময় اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ বলে আমাকে সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেইনি। (কারণ, এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, তুমি ফিরে এলে তারা সবাই সত্য উপলব্ধি করবে এবং ঈমান ও তওহীদে ফিরে আসবে।) কোরআন পাকের অন্যত্র হারুন (আঃ)-এর ওযরের মধ্যে এ কথাও রয়েছে ঃ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي অর্থাৎ, বনী-ইসরাঈল আমাকে শক্তিহীন ও দুর্বল মনে করেছে। কেননা, অন্যদের মোকাবেলায় আমার সঙ্গী-সাথী ছিল নগণ্য সংখ্যক। তাই তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ -(অর্থাৎ অন্যেরা যা দেখেনি, আমি তা দেখেছি।) এখানে জিবরাঈল ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। তাঁকে দেখার ঘটনা সম্পর্কে এক রেওয়ায়েত এই যে, যেদিন মূসা (আঃ)-এর মু'জেযায় ভূমধ্যসাগরে শুষ্ক রাস্তা হয়ে যায়, বনী-ইসরাঈল এই রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যায় এবং ফেরাউনী সৈন্যবাহিনী সাগরে নিমজ্জিত হয়, সেদিন জিবরাঈল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, সাগর পাড়ি দেয়ার পর মূসা (আঃ)-কে তূর পর্বতে গমনের আদেশ শোনানোর জন্যে জিবরাঈল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। সামেরী তাঁকে দেখেছিল, অন্যেরা দেখেনি। ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এর কারণ এই যে, সামেরী স্বয়ং জিবরাঈলের হাতে লালিত-পালিত হয়েছিল। তার জননী তাকে গর্তে নিক্ষেপ করলে জিবরাঈল প্রত্যহ তাকে খাদ্য পৌঁছানোর জন্যে আগমন করতেন। ফলে সে জিবরাঈলের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ছিল। অন্যদের সাথে পরিচিত ছিল না।—(বয়ানুল-কোরআন)

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ -রসূল বলে এখানে আল্লাহ্ প্রেরিত জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। সামেরীর মনে শয়তান একথা জাগ্রত করে দেয় যে, জিবরাঈলের ঘোড়ার পা যেখানে পড়ে, সেখানকার মাটিতে জীবনের বিশেষ প্রভাব থাকবে। তুমি এই মাটি তুলে নাও। সে পদচিহ্নের মাটি তুলে নিল। ইবনে-আব্বাসের রেওয়ায়েতে একথা বর্ণিত হয়েছে ঃ

সামেরীর মনে আপনা-আপনি জাগল যে, পদচিহ্নের মাটি যে বস্তুর উপর নিক্ষেপ করে বলা হবে যে, অমুক বস্তু হয়ে যা, তা তাই হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন ঃ সামেরী ঘোড়ার পদচিহ্নের এই প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যেখানেই এর পা পড়ে, সেখানেই অনতিবিলম্বে সবুজ বনানী সৃষ্টি হয়ে যায়। এ থেকেই সে বুঝে নেয় যে, এই মাটিতে জীবনের প্রভাব রয়েছে।—(কামালাইন) তফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ তফসীরকেই সাহাবী, তাবেয়ী এবং বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তফসীরবিদদের থেকে বর্ণিত বলা হয়েছে, অতঃপর এর বিরুদ্ধে আজ-কালকার বাহ্যদর্শীদের পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো খণ্ডন করা হয়েছে।—(বয়ানুল-কোরআন)

এরপর বনী-ইসরাঈলের স্তূপীকৃত অলঙ্কারাদি দ্বারা যখন সে একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরী করল, তখন নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী এই মাটি গো-বৎসের ভেতরে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ্র কুদরতে তাতে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠল এবং গো-বৎসটি হাম্বারব করতে লাগল। হাদীসে-ফুতূনে বলা হয়েছে যে, সামেরী হারুন (আঃ)-কে বলেছিল ঃ আমি মুঠির ভেতরের বস্তু নিক্ষেপ করব; কিন্তু শর্ত এই যে, আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য দোয়া করবেন। হারুন (আঃ) তার কপটতা ও গো-বৎস পূজার বিষয়ে অবগত ছিলেন না, তাই দোয়া করলেন। সে পদচিহ্নের মাটি তাতে নিক্ষেপ করল। তখন হারুন (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে তাতে জীবনের চিহ্ন দেখা দিল। এক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী এই সামেরী গো-পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। মিসরে পৌঁছে সে মূসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর ধর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা পূর্বেই কপটতা করে বিশ্বাস স্থাপন করে, এরপর তার কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস প্রকাশের বদৌলতে সে বনী-ইসরাঈলের সাথে সাগর পার হয়ে যায়।

فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ —হযরত মূসা (আঃ) সামেরীর জন্যে পার্থিব জীবনে এই শাস্তি ধার্য করেন যে, সবাই তাকে বর্জন করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, কারও গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবন এভাবেই সে বন্য জন্তুদের ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। সম্ভবতঃ এই শাস্তিটি একটি আইনের আকারে ছিল, যা পালন করা তার জন্যে এবং অন্যান্য বনী-ইসরাঈলীর জন্যে মূসা (আঃ)-এর তরফ থেকে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছিল। এটাও সম্ভবপর যে, আইনগত শাস্তির উর্ধ্বে স্বয়ং তার সত্তায় খোদায়ী কুদরতে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল, যদ্দরুন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যেরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না ; যেমন এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, মূসা (আঃ)-এর বদ-দোয়ায় তার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে অথবা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত।—(মা'আলেম) এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদ্ভ্রান্তের মত ঘোরাফেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চীৎকার করে বলতঃ لَا مِسَاسَ অর্থাৎ, আমাকে কেউ স্পর্শ করো না।

সামেরীর শাস্তির ব্যাপারে একটি রহস্য ঃ রুহুল-মা'আনী গ্রন্থে বাহরে-মুহীতের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, মূসা (আঃ) সামেরীকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন ; কিন্তু তার বদান্যতা ও জনসেবার কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে দেন। -(বয়ানুল-কোরআন)

إِنَّمَآ إِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾ كَذٰلِكَ
نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا
ذِكْرًا ﴿٩٩﴾ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾ خٰلِدِيْنَ
فِيْهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ
الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾ يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا
عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ إِذْ يَقُوْلُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً إِنْ
لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا ﴿١٠٥﴾
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ أَمْتًا ﴿١٠٧﴾ يَوْمَئِذٍ
يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ
فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ
لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهٗ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ﴿١١٠﴾ وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّوْمِ ۚ وَقَدْ
خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾ وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّ
صَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

(৯৮) তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহ্ই, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সব বিষয় তাঁর জ্ঞানের পরিধিভুক্ত। (৯৯) এমনিভাবে আমি পূর্বে যা ঘটেছে, তার সংবাদ আপনার কাছে বর্ণনা করি। আমি আমার কাছ থেকে আপনাকে দান করেছি পড়ার গ্রন্থ। (১০০) যে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কেয়ামতের দিন বোঝা বহন করবে। (১০১) তারা তাতে চিরকাল থাকবে এবং কেয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্যে মন্দ হবে। (১০২) যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সে দিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল চক্ষু অবস্থায়। (১০৩) তারা চুপিসারে পরস্পরে বলাবলি করবে ঃ তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে। (১০৪) তারা কি বলে তা আমি ভালোভাবে জানি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত উত্তম পথের অনুসারী সে বলবে ঃ তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে। (১০৫) তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। অতএব, আপনি বলুন ঃ আমার পালনকর্তা পাহাড়সমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। (১০৬) অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন। (১০৭) তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না। (১০৮) সেই দিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, যার কথা এদিক-সেদিক হবে না এবং দয়াময় আল্লাহ্র ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না। (১০৯) দয়াময় আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবে না। (১১০) তিনি জানেন যা কিছু তাদের সামনে ও পশ্চাতে আছে এবং তারা তাকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে না। (১১১) সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর সামনে সব মুখমণ্ডল অবনমিত হবে এবং সে ব্যর্থ হবে যে জুলুমের বোঝা বহন করবে। (১১২) যে ঈমানদার অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, সে জুলুম ও ক্ষতির আশঙ্কা করবে না। (১১৩) এমনিভাবে আমি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লাহ্ভীরু হয় অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায়।

لَنُحَرِّقَنَّهٗ –(অর্থাৎ, আমরা একে আগুনে পুড়িয়ে দেব।) এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই গো-বৎসটি স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকারাদি দ্বারা নির্মিত ছিল। এমতাবস্থায় একে আগুনে পোড়ানো হবে কিরূপে? কেননা, স্বর্ণ-রৌপ্য গলিত ধাতু—দগ্ধ হওয়ার নয়। উত্তর এই, প্রথমতঃ এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, গো-বৎসের মধ্যে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠার পরও তা স্বর্ণ-রৌপ্যই রয়ে গেছে, না এর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে রক্তমাংসে সম্পন্ন হয়ে গেছে। রক্তমাংসের গো-বৎস হয়ে থাকলে তাকে পোড়ানোর অর্থ হবে জবাই করে পুড়িয়ে দেয়া এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের গো-বৎস হলে পোড়ানোর অর্থ হবে রেতি দ্বারা ঘসে ঘসে কণা করে দেয়া—(দুররে-মনসূর) অথবা কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পোড়ানো।-(রূহুল-মা'আনী) অলৌকিকভাবে দগ্ধ করাও অবাস্তব নয়। –(বয়ানুল-কোরআন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا –বিশিষ্ট তফসীরবিদদের সর্বসম্মত মতে এখানে ذكر বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে।

مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا –অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কেয়ামতের দিন সে বিরাট পাপের বোঝা বহন করবে। কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে ; যথা— কোরআন তেলাওয়াত না করা, কোরআন পাঠ শিক্ষা করার চেষ্টা না করা, কোরআন ভুল পাঠ করা, অক্ষরসমূহের উচ্চারণ শুদ্ধ না করা, শুদ্ধ পড়লেও উদাসীন হয়ে কিংবা অযত্নে পাঠ করা, জাগতিক অর্থ ও সম্মান লাভের বাসনায় পাঠ করা। এমনিভাবে কোরআনের বিধানাবলী বোঝার চেষ্টা না করাও কোরআন থেকে মুখ ফিরানোর শামিল। বোঝার পর তা আমলে না আনা কিংবা বিরুদ্ধাচরণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখ ফিরানো। মোটকথা, কোরআনের হকের প্রতি বেপরওয়া হওয়া খুব বড় গোনাহ্। কেয়ামতের দিন এই গোনাহ্ ভারী বোঝা হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পিঠে চেপে বসবে। হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের মন্দ কর্ম ও গোনাহ্কে কেয়ামতের দিন ভারী বোঝার আকারে পিঠে চাপানো হবে।

يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ –হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ صور (ছূর) কি? তিনি বললেন ঃ শিঙ্গা। এতে ফুৎকার দেয়া হবে। অর্থ এই যে, صور শিঙ্গা এর মতই কোন বস্তু হবে। এতে ফেরেশতা ফুৎকার দিলে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলাই জানেন।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ
يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾ وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ
اِلٰۤى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ
اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا
عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿١١٧﴾ اِنَّ
لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾
فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ
الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا
وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۫ وَعَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهٗ
فَغَوٰى ﴿١٢١﴾ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٢﴾ قَالَ اهْبِطَا
مِنْهَا جَمِيْعًا ۢ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۬ۙ
فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ اَعْرَضَ
عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
اَعْمٰى ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْۤ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾
قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾

(১১৪) সত্যিকার অধীশ্বর আল্লাহ্ মহান। আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কোরআন গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না এবং বলুন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (১১৫) আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি। (১১৬) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ তোমরা আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদা করল। সে অমান্য করল। (১১৭) অতঃপর আমি বললাম ঃ হে আদম, এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন বের করে না দেয় তোমাদের জান্নাত থেকে। তাহলে তোমরা কষ্টে পতিত হবে। (১১৮) তোমাকে এই দেয়া হল যে, তুমি এতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং বস্ত্রহীন হবে না। (১১৯) এবং তোমার পিপাসাও হবে না এবং রৌদ্রেও কষ্ট পাবে না। (১২০) অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বলল ঃ হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা? (১২১) অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথভ্রান্ত হয়ে গেল। (১২২) এরপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাকে সুপথে আনয়ন করলেন। (১২৩) তিনি বললেন ঃ তোমরা উভয়েই এখান থেকে এক সঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। (১২৪) এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। (১২৫) সে বলবে ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। (১২৬) আল্লাহ্ বলবেন ঃ এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছেঃ كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলা হয়েছে, আপনার নবুওয়তের প্রমাণ ও আপনার উম্মতকে হুঁশিয়ার করার জন্যে আমি পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের অবস্থা ও ঘটনাবলী আপনার কাছে বর্ণনা করি। তন্মধ্যে মূসা (আঃ)-এর বিস্তারিত ঘটনা এই আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও কোন কোন দিক দিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হযরত আদম (আঃ)-এর কাহিনী। এখান থেকে এই কাহিনী শুরু করা হয়েছে। এতে উম্মতে মুহাম্মদীকে হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য যে, শয়তান মানব জাতির আদি শত্রু। সে সর্বপ্রথম তোমাদের আদি পিতা-মাতার সাথে শত্রুতা সাধন করেছে এবং নানা রকমের কৌশল, বাহানা ও শুভেচ্ছামূলক পরামর্শের জাল বিস্তার করে তাদেরকে পদস্খলিত করে দিয়েছে। এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্যে জান্নাত থেকে মর্ত্যে অবতরণের নির্দেশ জারী হয় এবং জান্নাতের পোশাক ছিনিয়ে নেয়া হয়। এরপর আল্লাহ্ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ভুলের ক্ষমা পেয়ে তিনি রেসালত ও নবুওয়তের উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্ত হন। তাই শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে মানব মাত্রেরই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। ধর্মীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে শয়তানী প্ররোচনা ও অপকৌশল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا —এখানে عهدنا শব্দটি امرنا অথবা وصينا শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।—(বাহ্‌রে মুহীত) উদ্দেশ্য এই যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আপনার অনেক পূর্বে আদম (আঃ)-কে তাকিদ সহকারে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, এই বৃক্ষের ফল-ফুল অথবা কোন অংশ আহার করো না, এমন কি এর নিকটেও যেয়ো না। এছাড়া জান্নাতের সব বাগ-বাগিচা ও নেয়ামত তোমাদের জন্যে অবারিত। সেগুলো ব্যবহার কর। আরও বলেছিলাম যে, ইবলীস তোমাদের শত্রু। তার কুমন্ত্রণা মেনে নিলে তোমাদের বিপদ হবে। কিন্তু আদম (আঃ) এসব কথা ভুলে গেলেন। আমি তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা পাইনি। এখানে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, نسيان ও عزم লক্ষণীয় نسيان শব্দের অর্থ ভুলে যাওয়া, অনবধান হওয়া এবং عزم -এর শাব্দিক অর্থ কোন কাজের জন্যে সংকল্পকে দৃঢ় করা। এ শব্দদ্বয় দ্বারা এখানে কি বোঝানো হয়েছে, তা হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বে একথা জেনে নেয়া জরুরী যে, আদম (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার প্রভাবশালী পয়গম্বরগণের অন্যতম ছিলেন এবং সব পয়গম্বর গোনাহ্ থেকে পবিত্র থাকেন।

প্রথম শব্দে বলা হয়েছে যে, আদম (আঃ) ভুলে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ভুলে যাওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন কাজ নয়। তাই একে পাপই গণ্য করা হয়নি। একটি সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان অর্থাৎ, আমার উম্মতের ভুলবশতঃ গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে।

আদম (আঃ)-এর এই ঘটনা প্রথমতঃ নবুওয়ত ও রেসালতের পূর্বেকার। এই অবস্থায় পয়গম্বরগণের কাছ থেকে গোনাহ্ প্রকাশ পাওয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জমাআতের কতক আলেমের মতে নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থী নয়। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভুল, যা গোনাহ্ নয়।

কিন্তু আদম (আঃ)-এর উচ্চ মর্তবা ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেও তাঁর জন্যে গোনাহ্ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ভর্ৎসনা করেন এবং সতর্ক করার জন্যে এই ভুলকে عصيان (অবাধ্যতা) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় عزم শব্দ ব্যবহার করে আয়াতে বলা হয়েছে, আদম (আঃ)-এর মধ্যে عزم তথা সংকল্পের দৃঢ়তা পাওয়া যায়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর অর্থ কোন কাজে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। আদম (আঃ) খোদায়ী নির্দেশ পালন করার পুরাপুরি সিদ্ধান্ত ও সংকল্প করে রেখেছিলেন, কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এই সংকল্পের দৃঢ়তা ক্ষুণ্ণ হয় এবং ভুল তাঁকে বিচ্যুত করে দেয়।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ -আল্লাহ্ তাআলা আদম (আঃ)-এর কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এটা তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এতে আদম সৃষ্টির পর সব ফেরেশতাকে আদমের উদ্দেশ্যে সেজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ইবলীসও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। কেননা, তখন পর্যন্ত ইবলীস জান্নাতের ফেরেশতাদের সাথে একত্রে বাস করত। ফেরেশতারা সবাই সেজদা করল, কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করল। অন্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল অহংকার। সে বলল ঃ আমি অগ্নিনির্মিত আর সে মৃত্তিকানির্মিত। অগ্নি মাটির তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমি কিরূপে তাকে সেজদা করব? এ কারণে ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হল। পক্ষান্তরে আদম ও হাওয়ার জন্যে জান্নাতের সব বাগ-বাগিচা ও অফুরন্ত নেয়ামতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হল। সবকিছু ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে শুধু একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হল যে, একে (অর্থাৎ, এর ফল-ফুল ইত্যাদিকে) আহার করো না এবং এর কাছেও যেয়ো না। সূরা বাক্বারা ও সূরা আ'রাফে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা উল্লেখ না করে শুধু অঙ্গীকার সংরক্ষিত রাখা ও তাতে অটল থাকা সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি আদমকে বললেন ঃ দেখ, সেজদার ঘটনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবলীস তোমাদের (অর্থাৎ, আদম ও হাওয়ার) শত্রু। যেন অপকৌশল ও ধোঁকার মাধ্যমে তোমাদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ না করে। এরূপ করলে এর পরিণতিতে তোমরা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবে। فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ -অর্থাৎ, শয়তান যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। ফলে, তোমরা বিপদে ও কষ্টে পড়ে যাবে। تشقى শব্দটি شقاوة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দ্বিবিধ— প্রথমটি পারলৌকিক কষ্ট অপরটি হল ইহলৌকিক কষ্ট। অর্থাৎ, দৈহিক কষ্ট ও বিপদ। এখানে দ্বিতীয় অর্থই হতে পারে। কেননা, প্রথম অর্থে কোন পয়গম্বর দূরের কথা, কোন সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানের জন্যেও এই শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। তাই ফাররা (রহঃ)-এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ هو ان ياكل من كد يديه অর্থাৎ, এখানে شقاوت এর অর্থ হাতে খেটে আহার্য উপার্জন করা। -(কুরতুবী) এখানে স্থানের ইঙ্গিতও দ্বিতীয় অর্থের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। কেননা, পরবর্তী আয়াতে জান্নাতের এমন চারটি নেয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনের স্তম্ভবিশেষ এবং জীবনধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ-অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব নেয়ামত জান্নাতে পরিশ্রম ও উপার্জন ছাড়াই পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখান থেকে বহিষ্কৃত হলে এসব নেয়ামতও হাতছাড়া হয়ে যাবে। সম্ভবতঃ এই ইঙ্গিতের কারণেই এখানে জান্নাতের বড় বড় নেয়ামতের উল্লেখ না করে শুধু এমন সব নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর উপর মানবজীবন নির্ভরশীল। এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, শয়তানের কুমন্ত্রণা মেনে নিয়ে তোমরা যেন জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত না হও এবং এসব নেয়ামত যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়। এরূপ হলে পৃথিবীতে এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করতে হবে। তফসীরবিদদের সর্বসম্মত বর্ণনা অনুযায়ী এ হচ্ছে فَتَشْقَىٰ শব্দের মর্ম। ইমাম কুরতুবী এখানে আরও উল্লেখ করেছেন যে, আদম (আঃ) যখন পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, তখন জিবরাঈল জান্নাত থেকে কিছু গম, চাউল ইত্যাদির বীজ এনে মাটিতে চাষ করার জন্যে দিলেন এবং বললেন ঃ যখন এগুলোর চারা গজাবে এবং দানা উৎপন্ন হবে, তখন এগুলো কর্তন করুন এবং পিষে রুটি তৈরী করুন। জিবরাঈল এসব কাজের পদ্ধতিও আদম (আঃ)-কে শিখিয়ে দিলেন। সেমতে আদম (আঃ) রুটি তৈরী করে খেতে বসলেন। কিন্তু হাত থেকে রুটি খসে গিয়ে পাহাড়ের নীচে গড়িয়ে গেল। আদম (আঃ) অনেক পরিশ্রমের পর রুটি কুড়িয়ে আনলেন। তখন জিবরাঈল বললেন ঃ হে আদম, আপনার এবং আপনার সন্তান-সন্ততির রিযিক পৃথিবীতে এমনি পরিশ্রম ও কষ্ট সহকারে অর্জিত হবে।

স্ত্রীর জরুরী ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব ঃ আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্ তাআলা আদম (আঃ)-এর সাথে হাওয়াকেও সম্বোধন করে বলেছেন ঃ عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ -শয়তান তোমারও শত্রু এবং তোমার স্ত্রীরও শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদের উভয়কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে না দেয়। কিন্তু আয়াতের শেষে فَتَشْقَىٰ একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। এতে স্ত্রীকে শরীক করা হয়নি। নতুবা স্থানের চাহিদা অনুযায়ী فتشقيا বলা হত। কুরতুবী এ থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, স্ত্রীর জীবনধারনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা স্বামীর দায়িত্ব। এসব সামগ্রী উপার্জন করতে গিয়ে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তা এককভাবে স্বামী করবে। একারণেই فَتَشْقَىٰ একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে অবতরণের পর জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উপার্জন করতে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হবে, তা আদম (আঃ)-কেই করতে হবে। কেননা, হাওয়ার ভরণ-পোষণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা তাঁর দায়িত্ব।

মাত্র চারটি বস্তু জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে পড়ে ঃ কুরতুবী বলেন ঃ এ আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর যিম্মায় ওয়াজিব, তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ—আহার, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশী কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ—অপরিহার্য নয়। এ থেকেই আরও জানা গেল যে, স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কারও ভরণ-পোষণ শরীয়ত কোন ব্যক্তির দায়িত্বে ন্যস্ত করেছে, তাতেও উপরোক্ত চারটি বস্তুই তার দায়িত্বে ওয়াজিব হবে ; যেমন— পিতা-মাতা অভাবগ্রস্ত ও অপারগ হলে তাঁদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সন্তানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফেকাহ্ গ্রন্থসমূহে এসম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত রয়েছে।

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ -জীবনধারণের প্রয়োজনীয় এই চারটি মৌলিক বস্তু জান্নাতে চাওয়া ও পরিশ্রম ছাড়াই পাওয়া যায়। জান্নাতে ক্ষুধা লাগে না—এতে সন্দেহ হতে পারে যে, যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগে, ততক্ষণ তো খাদ্যের স্বাদও পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পিপাসার্ত

না হওয়া পর্যন্ত কেউ মিঠা পানির স্বাদ অনুভব করতে পারে না। এই সন্দেহের উত্তর এই যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্টভোগ করতে হবে না; বরং ক্ষুধা লাগলে খাদ্য পাওয়া যাবে এবং পিপাসা হলে পানীয় পাওয়া যাবে–এতে বিলম্ব হবে না। এছাড়া জান্নাতী ব্যক্তির মন যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা পাবে।

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ থেকে وَعَصٰىٓ اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى –এই আয়াতে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা যখন আদম (আঃ)-ও হাওয়াকে নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল-ফুল আহার করতে ও তার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং হুঁশিয়ারও করে দিয়েছিলেন যে, ইবলীস তোমাদের উভয়ের দুশমন, তার ছলনা থেকে বেঁচে থাকবে, যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করে না দেয়, তখন এতটুকু সুস্পষ্ট নির্দেশের পরও এই মহান পয়গম্বর শয়তানের ধোঁকা বুঝতে পারলেন না কেন? এটা তো প্রকাশ্য অবাধ্যতা ও গোনাহ্। আল্লাহ্র নবী ও রসূল হয়ে তিনি এই গোনাহ্ কিরূপে করলেন? অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, পয়গম্বরগণ প্রত্যেক ছোট-বড় গোনাহ্ থেকেই পবিত্র থাকেন। এসব প্রশ্নের জওয়াব সূরা বাক্বারার তফসীরে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, সেখানে দ্রষ্টব্য। এ আয়াতে আদম (আঃ) সম্পর্কে প্রথমে عصى ও পরে غوى বলা হয়েছে। এর কারণও সূরা বাক্বারায় উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শরীয়তের আইনে আদম (আঃ)-এর এই কর্ম গোনাহ্ ছিল না, কিন্তু তিনি যেহেতু আল্লাহ্র নবী ও বিশেষ নৈকট্যশীল ছিলেন, তাই তাঁর সামান্য ভ্রান্তিকেও গুরুতর ভাষায় অবাধ্যতা বলে ব্যক্ত করতঃ সতর্ক করা হয়েছে। غوى শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে যাওয়া এবং (দুই) পথভ্রষ্ট অথবা গাফেল হওয়া। কুশায়রী, কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ এস্থলে প্রথম অর্থই অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ, আদম (আঃ) জান্নাতে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছিলেন, তা বাকী রইল না এবং তাঁর জীবন তিক্ত হয়ে গেল।

পয়গম্বরগণের সম্পর্কে একটি জরুরী নির্দেশ ঃ তাঁদের সম্মানের হেফাযতঃ কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী 'আহকামুল কোরআন' গ্রন্থে عصى ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন। উক্তিটি তাঁর ভাষায় এইঃ

لايجوز لاحدنا اليوم ان يخبر بذلك عن ادم الا اذا ذكرناه فى اثناء قوله تعالى عنه اوقول نبيه فاما ان يبتدى ذلك من قبل نفسه فليس بجائز لنافى ابائنا الادنين الينا المماثلين لنا فكيف فى ابينا الاقوم الاعظم الاكرم النبى المقدم الذى عذره الله سبحانه وتعالى وتاب عليه وغفرله–

"আজ আমাদের কারও জন্যে আদম (আঃ)-কে অবাধ্য বলা জায়েয নয়, তবে কোরআনের কোন আয়াতে অথবা হাদীসে এরূপ বলা হলে তা বর্ণনা করা জায়েয। কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে নিকটতম পিতৃপুরুষদের জন্যেও এরূপ শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যিনি আমাদের আদি পিতা, সর্বদিক দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের চাইতে অগ্রগণ্য, সম্মানিত ও মহান, আল্লাহ্ তাআলার সম্মানিত পয়গম্বর, আল্লাহ্ যাঁর তওবা কবুল করেছেন এবং ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, তাঁর জন্যে কোন অবস্থাতেই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা জায়েয নয়।"

এ কারণেই কুশায়রী আবু নছর বলেন ঃ কোরআনে ব্যবহৃত এই শব্দের কারণে আদম (আঃ)-কে গোনাহ্গার, পথভ্রষ্ট বলা জায়েয নয়। কোরআন পাকের যেখানেই কোন নবী অথবা রসূল সম্পর্কে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানেই হয় উত্তমের বিপরীত বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে, না হয় নবুওয়ত-পূর্ববর্তী বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে। তাই কোরআনী আয়াত ও হাদীসের রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে তো এসব বিষয় বর্ণনা করা জায়েয, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে তাঁদের সম্পর্কে এরূপ ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি নেই।-(কুরতুবী)

اِهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا –অর্থাৎ, জান্নাত থেকে নেমে যাও উভয়েই। এই সম্বোধন আদম ও ইবলীস উভয়কেও হতে পারে। এমতাবস্থায় بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ –এর অর্থ সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে পৌঁছেও শয়তানের শত্রুতা অব্যাহত থাকবে। যদি বলা হয় যে, শয়তানকে তো এর পূর্বেই জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, কাজেই এই সম্বোধনে তাকে শরীক করা অবান্তর; তাহলে এটা হতে পারে যে, এখানে আদম ও হাওয়াকে সম্বোধন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় পারস্পরিক শত্রুতার অর্থ হবে— তাদের সন্তান-সন্ততির পারস্পরিক শত্রুতা। বলাবাহুল্য, সন্তানদের পারস্পরিক শত্রুতা পিতা-মাতার জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলে।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ –এখানে যিকর-এর অর্থ কোরআনও হতে পারে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মোবারক সত্তাও হতে পারে, যেমন— অন্য আয়াতে ذِكْرًا رَّسُوْلًا বলা হয়েছে। উভয় অর্থের সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি কোরআন অথবা রসূলের প্রতি বিমুখ হয়, অর্থাৎ, কোরআনের তেলাওয়াত ও বিধি-বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে অথবা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; তার পরিণাম এই ঃ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى –অর্থাৎ, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং কেয়ামতে তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করা হবে। প্রথমোক্ত শাস্তিটি সে দুনিয়াতে পেয়ে যাবে এবং শেষোক্ত আযাব কেয়ামতে হবে।

কাফের ও পাপাচারীর জীবন দুনিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার স্বরূপ ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, দুনিয়াতে জীবিকার সংকীর্ণতা তো কাফের ও পাপাচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণগণও এর সম্মুখীন হন; বরং পয়গম্বরগণ এই পার্থিব জীবনে সর্বাধিক কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করে থাকেন। সহীহ্ বোখারী ও অন্যান্য সব হাদীস গ্রন্থে সা'দ প্রমুখের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ পয়গম্বরগণের প্রতি দুনিয়ার বালা-মুসীবত সবচাইতে বেশী কঠিন হয়। তাঁদের পর যে ব্যক্তি যে স্তরের সৎকর্মপরায়ণ ও ওলী হয়, সেই অনুযায়ী সে এসব কষ্ট ভোগ করে। এর বিপরীতে সাধারণতঃ কাফের ও পাপাচারীদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশে দেখা যায়। অতএব জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কোরআনের এই উক্তি পরকালের জন্যে হতে পারে, দুনিয়ার অভিজ্ঞতা এর বিপরীত মনে হয়।

এর পরিষ্কার ও নির্মল জওয়াব এই যে, এখানে দুনিয়ার আযাব বলে কবরের আযাব বোঝানো হয়েছে। কবরে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে দেয়া হবে। তাদের বাসস্থান কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। মুসনাদে বাযযারে হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং مَعِيْشَةً ضَنْكًا –এর তফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগত বোঝানো হয়েছে।-(মাযহারী)

وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ وَلَعَذَابُ
الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿١٢٧﴾ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ
الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿١٢٨﴾
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾
فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ
لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿١٣٠﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا
مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ
خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٣١﴾ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا
نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾ وَقَالُوْا
لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ
الْاُوْلٰى ﴿١٣٣﴾ وَلَوْ اَنَّاۤ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا
رَبَّنَا لَوْلَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ
اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿١٣٤﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ
فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿١٣٥﴾

(১২৭) এমনিভাবে আমি তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালঙ্ঘন করে এবং পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে। আর পরকালের শাস্তি কঠোরতর এবং অনেক স্থায়ী। (১২৮) আমি এদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে, এটা কি এদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করল না? নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১২৯) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং একটি কাল নির্দিষ্ট না থাকলে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেত। (১৩০) সুতরাং এরা যা বলে সে বিষয়ে ধৈর্য-ধারণ করুন এবং আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন রাত্রির কিছু অংশ ও দিবাভাগে, সম্ভবতঃ তাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (১৩১) আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্যে পার্থিবজীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (১৩২) আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাই না। আমিই আপনাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহ্‌ভীরুতার পরিণাম শুভ। (১৩৩) এরা বলে ঃ সে আমাদের কাছে তার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন? তাদের কাছে কি প্রমাণ আসেনি যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে আছে? (১৩৪) যদি আমি এদেরকে ইতিপূর্বে কোন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে এরা বলত ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের কাছে একজন রসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে তো আমরা অপমানিত ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শনসমূহ মেনে চলতাম। (১৩৫) বলুন, প্রত্যেকেই পথপানে চেয়ে আছে, সুতরাং তোমরাও পথপানে চেয়ে থাক। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জানতে পারবে কে সরল পথের পথিক এবং কে সৎপথ প্রাপ্ত হয়েছে।

হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়র জীবিকার সংকীর্ণতার অর্থ এরূপও বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ-লালসা বাড়িয়ে দেয়া হবে।- (মাযহারী) এর ফলে তাদের কাছে যত অর্থ-সম্পদই সঞ্চিত হোক না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদাসর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশঙ্কা তাদেরকে অস্থির করে রাখবে। সাধারণ ধনীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও সুবিদিত। ফলে তাদের কাছে সুখ-সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়; কিন্তু সুখ যাকে বলে, তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। কারণ, এটা অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ – يهد ক্রিয়াপদের فاعل এর ضمير – هدى শব্দের দিকে ফিরে, যা এর মধ্যেই আছে এবং هدى দ্বারা কোরআন অথবা রসূল বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআন অথবা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কি মক্কাবাসীদেরকে এই হেদায়েত দেননি এবং এ সম্পর্কে জ্ঞাত করেননি যে, তোমাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায় ও দল নাফরমানীর কারণে আল্লাহ্‌র আযাবে গ্রেফতার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, যাদের বাসভূমিতে এখন তোমরা চলাফেরা কর। এখানে فاعل এর ضمير আল্লাহ্‌র দিকে ফেরারও সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েত দেননি।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ –মক্কাবাসীরা ঈমান থেকে গা বাঁচানোর জন্যে নানারকম বাহানা খুঁজত এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শানে অশালীন কথাবার্তা বলত। কেউ জাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলত। কোরআন পাক এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দু'টি প্রতিকার বর্ণনা করেছে। (এক) আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না; বরং সবর করবেন। (দুই) আল্লাহ্‌র এবাদতে মশগুল হয়ে যান। وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ –বাক্যে একথা বলা হয়েছে।

শত্রুদের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে মশগুল হওয়া ঃ এ জগতে ছোট-বড়, ভাল-মন্দ কোন মানুষ শত্রুমুক্ত নয়। প্রত্যেকের কোন না কোন শত্রু রয়েছে। শত্রু যতই নগণ্য ও দুর্বল হোক না কেন, প্রতিপক্ষের কোন না কোন ক্ষতি করেই ছাড়ে; যদিও তা মৌখিক গালি-গালাজই হয়। সম্মুখে গালি-গালাজ করার হিম্মত না থাকলে পশ্চাতেই করে। তাই শত্রুর অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রত্যেকেই করে। কোরআন পাক দু'টি বিষয়ের সমষ্টিকে এর চমৎকার ও অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র হিসেবে বর্ণনা করেছে। (এক) সবর ; অর্থাৎ, স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত না হওয়া। (দুই) আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ ও এবাদতে মশগুল হওয়া। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র এই ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই এসব অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় যে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়, সে যতই শক্তিশালী, বিরাট ও প্রভাবশালী হোক না কেন, সে প্রায় ক্ষেত্রেই শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং প্রতিশোধের চিন্তা তার জন্যে একটি আলাদা আযাবে পরিণত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ্ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং মনে মনে ধ্যান করে যে, এ জগতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারও কোন

রকম ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং আল্লাহ্র সব কাজ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে, তাই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, এতে অবশ্যই কোন না কোন রহস্য আছে; তখন শত্রুর অনিষ্টপ্রসূত ক্রোধ ও ক্ষোভ আপনা-আপনি উধাও হয়ে যায়। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ لَعَلَّكَ تَرْضٰى অর্থাৎ, এই উপায় অবলম্বন করলে আপনি সন্তুষ্টির জীবন-যাপন করতে পারবেন। وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ -অর্থাৎ, আপনি আল্লাহ্ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করুন তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বান্দার আল্লাহ্র নাম নেয়ার অথবা এবাদত করার তওফীক হয়, এ কাজের জন্যে গর্ব ও অহংকার করার পরিবর্তে আল্লাহ্র প্রশংসা ও শোকর করাই তার ব্রত হওয়া উচিত। আল্লাহ্র স্মরণ ও এবাদত তাঁরই তওফীক দানের ফলশ্রুতি।

এই سبح بحمد -শব্দটি সাধারণ যিকর ও হামদের অর্থেও হতে পারে এবং বিশেষভাবে নামাযের অর্থেও হতে পারে। তফসীরবিদগণ সাধারণতঃ শেষোক্ত অর্থই নিয়েছেন। এর যেসব নির্দিষ্ট সময় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকেও তাঁরা নামাযের সময় সাব্যস্ত করেছেন। উদাহরণতঃ "সূর্যোদয়ের পূর্বে" বলে ফজরের নামায, "সূর্যাস্তের পূর্বে" বলে যোহর ও আসরের নামায এবং وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ -বলে রাত্রিকালীন সব নামায— মাগরিব, এশা ও তাহাজ্জুদসহ বোঝানো হয়েছে। অতঃপর وَاَطْرَافَ النَّهَارِ বলে এর আরও তাকীদ করা হয়েছে।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়; বরং মুমিনের জন্যে আশঙ্কার বস্তু ঃ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ -এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উম্মতকে পথ প্রদর্শন করাই লক্ষ্য। বলা হয়েছে, দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্থিব চাকচিক্য ও বিবিধ নেয়ামতের অধিকারী হয়ে বসে আছে। আপনি তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না। কেননা, এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ্ তাআলা যে নেয়ামত আপনাকে এবং আপনার মধ্যস্থতায় মুমিনদেরকে দান করেছেন, তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট।

পরিবারবর্গ ও সম্পর্কশীলদেরকে নামাযের আদেশ ও তার রহস্য ঃ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا অর্থাৎ, আপনি পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। বাহ্যতঃ এখানে আলাদা আলাদা দু'টি নির্দেশ রয়েছে। (এক) পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ এবং (দুই) নিজেও নামায অব্যাহত রাখা। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিজের নামায পুরোপুরি অব্যাহত রাখার জন্যেও আপনার পরিবেশ, পরিবারবর্গ ও স্বজনদের নিয়মিত নামাযী হওয়া আবশ্যক। কেননা, পরিবেশ ভিন্নরূপ হলে মানুষ স্বভাবতঃ নিজেও অলসতার শিকার হয়ে যায়।

স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতি ও সম্পর্কশীল সবাই اهل শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এদের দ্বারাই মানুষের পরিবেশ ও সমাজ গঠিত হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রত্যহ ফজরের নামাযের সময় হযরত আলী ও ফাতেমা (রাঃ)-এর গৃহে গমন করে الصلوة الصلوة (নামায পড়, নামায পড়) বলতেন।-(কুরতুবী)

ধনকুবের ও রাজরাজড়াদের ধনৈশ্বর্য ও জাঁকজমকের উপর যখনই হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়রের দৃষ্টি পড়ত, তখনই তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসতেন এবং পরিবারবর্গকে নামায পড়ার কথা বলতেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শোনাতেন। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) যখন রাত্রিকালে তাহাজ্জুদের জন্যে জাগ্রত হতেন, তখন পরিবারবর্গকেও জাগ্রত করে দিতেন এবং এই আয়াত পাঠ করে শোনাতেন।-(কুরতুবী)

যে ব্যক্তি নামায ও এবাদতে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ্ তার রিযিকের ব্যাপার সহজ করে দেন ঃ لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا -অর্থাৎ, আমি আপনার কাছে এই দাবী করি না যে, আপনি নিজের ও পরিবারবর্গের রিযিক নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা ও কর্মের জোরে সৃষ্টি করুন। বরং এ কাজটি আমি আমার নিজের দায়িত্বে রেখেছি। কেননা, রিযিক উপার্জন করা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে বেশীর মধ্যে মাটিকে নরম ও চাষোপযোগী করতে পারে এবং তাতে বীজ নিক্ষেপ করতে পারে, কিন্তু বীজের ভেতর থেকে অঙ্কুর উৎপন্ন করা এবং তাকে ফল-ফুলে সুশোভিত করার মধ্যে মানুষের কোন হাত নেই। এটা সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার কাজ। বৃক্ষ গজানোর পরও মানুষের সকল প্রচেষ্টা তার হেফাযত ও আল্লাহ্ কর্তৃক সৃজিত ফল-ফুল দ্বারা উপকৃত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র এবাদতে মশগুল হয়ে যায়, আল্লাহ্ তাআলা এই পরিশ্রমের বোঝাও তার জন্যে সহজ ও হালকা করে দেন।

بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى -অর্থাৎ, তওরাত, ইঞ্জীল ও ইবরাহিমী সহীফা ইত্যাদি খোদায়ী গ্রন্থ সর্বকালেই শেষ নবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও রেসালতের সাক্ষ্য দিয়েছে। এগুলোর বহিঃপ্রকাশ অবিশ্বাসীদের জন্যে পর্যাপ্ত প্রমাণ নয় কি?

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى অর্থাৎ, আজ তো আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেককে মুখ দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তার তরীকা ও কর্মকে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলে দাবী করতে পারে। কিন্তু এই দাবী কোন কাজে আসবে না। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তরীকা তাই হতে পারে, যা আল্লাহ্র কাছে প্রিয় ও বিশুদ্ধ। আল্লাহ্র কাছে কোন্টি বিশুদ্ধ, তার সন্ধান কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই পেয়ে যাবে। তখন সবাই জানতে পারবে যে, কে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং কে বিশুদ্ধ ও সরল পথে ছিল।

سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاۤءِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَّاِثْنَتَا عَشَرَةَ اٰيَةً وَّسَبْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ
مُّعْرِضُوْنَ ۝١ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ
وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝٢ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۗ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۗ
هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝٣
قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۫ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٤
بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚۖ فَلْيَاْتِنَا
بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۝٥ مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ
اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝٦ وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ
فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٧ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ
جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ۝٨ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ
الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۝٩ لَقَدْ
اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝١٠ وَكَمْ قَصَمْنَا
مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝١١

সূরা আম্বিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১১২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(১) মানুষের হিসাব-কিতাবের সময় নিকটবর্তী; অথচ তারা বেখবর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। (২) তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যখনই কোন নতুন উপদেশ আসে, তারা তা খেলার ছলে শ্রবণ করে। (৩) তাদের অন্তর থাকে খেলায় মত্ত। জালেমরা গোপনে পরামর্শ করে, 'সে তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; এমতাবস্থায় দেখে-শুনে তোমরা তার যাদুর কবলে কেন পড়? (৪) পয়গম্বর বললেন ঃ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের কথাই আমার পালনকর্তা জানেন। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (৫) এছাড়া তারা আরও বলে ঃ অলীক স্বপ্ন; না-সে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, না সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনয়ন করুক, যেমন নিদর্শনসহ আগমন করেছিলেন পূর্ববর্তীগণ। (৬) তাদের পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি; এখন এরা কি বিশ্বাস স্থাপন করবে? (৭) আপনার পূর্বে আমি মানুষই প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। অতএব তোমরা যদি না জান, তবে যারা স্মরণ রাখে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। (৮) আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্য ভক্ষণ করত না এবং তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। (৯) অতপর আমি তাদেরকে দেয়া আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম। সুতরাং তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা বাঁচিয়ে দিলাম এবং ধ্বংস করে দিলাম সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে। (১০) আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোঝ না? (১১) আমি কত জনপদের ধ্বংস সাধন করেছি যার অধিবাসীরা ছিল পাপী এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আম্বিয়ার ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ সূরা কাহ্‌ফ, মাইয়াম, তোয়া-হা ও আম্বিয়া—এই চারটি সূরা প্রথমভাগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম এবং আমার প্রাচীন সম্পদ ও উপার্জন। আমি সারাক্ষণ এগুলোর হেফাযত করি।—(কুরতুবী)

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ অর্থাৎ, মানুষের কাছ থেকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেয়ার দিন অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে ঘনিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কেননা, এই উম্মতই হচ্ছে সর্বসেষ উম্মত ; যদি ব্যাপক হিসেব ধরা হয়, তবে কবরের হিসেবও এতে শামিল রয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পরমুহূর্তেই এই হিসেব দিতে হয়। এজন্যেই প্রত্যেকের মৃত্যুকে তার কেয়ামত বলা হয়েছে।

من مات فقد قامت قيامته -যে ব্যক্তি মরে যায়, তার কেয়ামত তখনই শুরু হয়ে যায়। এ অর্থের দিক দিয়ে হিসেবের সময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। কারণ, মানুষ যত দীর্ঘায়ুই হোক, তার মৃত্যু দূরে নয়। বিশেষ করে যখন বয়সের শেষ সীমা অজানা, তখন প্রতিমুহূর্তে ও প্রতি পলে মানুষ মৃত্যু-আশঙ্কার সম্মুখীন।

আয়াতের উদ্দশ্য মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সব গাফেলকে সতর্ক করা ; তারা যেন পার্থিব কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে এই হিসেবের দিনকে ভুলে না বসে। কেননা, একে ভুলে যাওয়াই যাবতীয় অনর্থ ও গোনাহের ভিত্তি।

مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ

لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ যারা পরকাল ও কবরের আযাব থেকে গাফেল এবং তজ্জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, এটা তাদের অবস্থার অতিরিক্ত বর্ণনা। যখন তাদের সামনে কোরআনের কোন নতুন আয়াত আসে এবং পঠিত হয়, তখন তারা একে কৌতুক ও হাস্য উপহাসচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের অন্তর আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এর এ অর্থও হতে পারে যে, কোরআনের আয়াত শ্রবণ করার সময় তারা পূর্ববৎ খেলাধুলায় লিপ্ত থাকে, কোরআনের প্রতি মনোযোগ দেয়া না এবং এরূপ অর্থও হতে পারে যে, স্বয়ং কোরআনের আয়াতের সাথেই তারা রঙ-তামাশা করতে থাকে।

اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ, তারা পরস্পরে আস্তে আস্তে কানাকানি করে বলে ঃ এই লোকটি যে নিজেকে নবী ও রসূল বলে দাবী করে, সে তো আমাদের মতই মানুষ—ফেরেশতা তো নয় যে, আমরা তার কথা মেনে নেব। তাদের সামনে আল্লাহ্‌র যে কালাম পাঠ করা হত, তার মিষ্টতা, প্রাঞ্জলতা ও ক্রিয়াশক্তি কোন কাফেরও অস্বীকার করতে পারত না। এই কালাম থেকে লোকের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার উদ্দেশে তারা একে যাদু আখ্যায়িত করে লোকদেরকে বলত যে, তোমরা জান যে, এটা যাদু এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির কাছে যাওয়া এবং এই কালাম শ্রবণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এই কথাবার্তা গোপনে বলার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, মুসলমানরা শুনে ফেললে তাদের এই নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত ধোঁকাবাজি জনসমক্ষে ফাঁস করে দেবে।

بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ যেসব স্বপ্নের মানসিক অথবা শয়তানী কল্পনা শামিল থাকে, সেগুলোকে احلام বলা হয়। এ কারণেই এর অনুবাদ "অলিক কল্পনা" করা হয়েছে। অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা প্রথমে কোরআনকে যাদু বলেছে ঃ এরপর আরও অগ্রসর হয়ে বলতে শুরু

فَلَمَّآ أَحَسُّوا بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوا وَ
ارْجِعُوٓا إِلَىٰ مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُونَ ﴿١٣﴾
قَالُوا يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَىٰهُمْ حَتَّىٰ
جَعَلْنَٰهُمْ حَصِيدًا خَٰمِدِينَ ﴿١٥﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَٰهُ
مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَٰطِلِ
فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾
وَلَهُ مَن فِى السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ أَمِ اتَّخَذُوٓا ءَالِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿٢١﴾
لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَٰنَ اللَّهِ رَبِّ
الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾ لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ
يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُوا
بُرْهَٰنَكُمْ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِى
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾

(১২) অতঃপর যখন তারা আমার আযাবের কথা টের পেল, তখনই তারা সেখান থেকে পলায়ন করতে লাগল। (১৩) পলায়ন করো না এবং ফিরে এস, যেখানে তোমরা বিলাসিতায় মত্ত ছিলে ও তোমাদের আবাসগৃহে; সম্ভবতঃ কেউ তোমাদের জিজ্ঞেস করবে। (১৪) তারা বললঃ হায়, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম। (১৫) তাদের এই আর্তনাদ সব সময় ছিল, শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে করে দিলাম যেন কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি। (১৬) আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (১৭) আমি যদি ক্রীড়া উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম, তবে আমি আমার কাছে যা আছে তা দ্বারাই তা করতাম, যদি আমাকে করতে হত। (১৮) বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি; অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তোমরা যা বলছ, তার জন্যে তোমাদের দুর্ভোগ। (১৯) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা তাঁরই। আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না। (২০) তারা রাত্রিদিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে এবং ক্লান্ত হয় না (২১) তারা কি মৃত্তিকা দ্বারা তৈরী উপাস্য গ্রহণ করেছে, যে তারা তাদেরকে জীবিত করবে? (২২) যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ের ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র। (২৩) তিনি যা করেন, তৎসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। (২৪) তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে? বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ আন। এটাই আমার সঙ্গীদের কথা এবং এটাই আমার পূর্ববর্তীদের কথা। বরং তাদের অধিকাংশই সত্য জানে না; অতএব তারা টালবাহানা করে।

করেছে যে, এটা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবনও অপবাদ যে, এটা তাঁর কালাম। অবশেষে বলতে শুরু করেছে যে, আসল কথা হচ্ছে লোকটি একজন কবি। তার কালামে কবিসুলভ কল্পনা আছে।

فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ অর্থাৎ, সে বাস্তবিকই নবী ও রসূল হলে আমাদের ফরমায়েশী বিশেষ মু'জেযাসমূহ প্রদর্শন করুক। জওয়াবে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে দেখা গেছে যে, তাদেরকে তাদের আকাঙ্খিত মু'জেযাসমূহ প্রদর্শন করার পরও তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। প্রার্থিত মু'জেযা দেখার পরও যে জাতি ঈমানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেয়াই আল্লাহ্‌র আইন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) –এর সম্মানার্থে আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতকে আযাবের কবল থেকে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। তাই কাফেরদেরকে প্রার্থিত মু'জেযা প্রদর্শন করা সমুচিত নয়। অতঃপর أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ বাক্যে এ দিকেই ইশারা রয়েছে যে, তারা কি প্রার্থিত মু'জেযা দেখলে বিশ্বাস স্থাপন করবে? অর্থাৎ, তাদের কাছ থেকে এরূপ আশা করা বৃথা। তাই প্রার্থিত মু'জেযা প্রদর্শন করা হয় না।

فَسْـَٔلُوٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ এখানে أَهْلَ الذِّكْرِ (যাদের স্মরণ আছে) বলে তওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব আলেম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ মানুষ ছিলেন না ফেরেশতা ছিলেন, একথা যদি তোমাদের জানা না থাকে, তবে তওরাত ও ইঞ্জীলের আলেমদের কাছ থেকে জেনে নাও। কেননা, তারা সবাই জানে যে, পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বর মানুষই ছিলেন। তাই এখানে أَهْلَ الذِّكْرِ দ্বারা সাধারণ কিতাবধারী ইহুদী ও খ্রীষ্টান অর্থ নিলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ, তারা সবাই এ ব্যাপারের সাক্ষ্যদাতা। তফসীরের সার–সংক্ষেপে এই অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মাস্‌আলা ঃ তফসীরে কুরতুবীতে আছে এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের বিধি–বিধান জানে না, এরূপ মূর্খ ব্যক্তিদের উপর আলেমদের অনুসরণ করা ওয়াজেব। তারা আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করে তদনুযায়ী আমল করবে।

কোরআন আরবদের জন্যে সম্মান ও গৌরবের বস্তু ঃ كِتَٰبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ কিতাব অর্থ কোরআন এবং যিকর অর্থ এখানে সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও খ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ভাষা আরবীতে অবতীর্ণ কোরআন তোমাদের জন্যে একটি বড় সম্মান ও চিরস্থায়ী সুখ্যাতির বস্তু। একে যথার্থ মূল্য দেয়া তোমাদের উচিত। বিশ্বাসী একথা প্রত্যক্ষ করেছে যে, আল্লাহ্ তাআলা আরবদেরকে কোরআনের বরকতে সমগ্র বিশ্বের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও বিজয়ী করেছেন। জগদ্ব্যাপী তাদের সম্মান ও সুখ্যাতির ডঙ্কা বেজেছে। একথাও সবার জানা যে, এটা আরবদের স্থানগত, গোত্রগত অথবা ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়; বরং শুধু কোরআনের বরকতে সম্ভব হয়েছে। কোরআন না হলে আজ সম্ভবতঃ আরব জাতির নাম উচ্চারণকারীও কেউ থাকত না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোন কোন তফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতসমূহে ইয়ামনের হাযুরা ও কালাবা জনপদসমূহকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ্ তাআলা একজন রসূল প্রেরণ করেছিলেন। তার নাম এক

রেওয়ায়েত অনুযায়ী মূসা ইবনে মিশা এবং এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী শোআয়ব বলা হয়েছে। শোআয়ব নাম হলে তিনি মাদইয়ানবাসী শোআয়ব (আঃ) নন, অন্য কেউ। তারা আল্লাহ্ রসূলকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে জনৈক কাফের বাদশাহ্ বুখতে নসরের হাতে ধ্বংস করে দেন। বুখতে নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, যেমন ফিলিস্তীনে বনী-ইসরাঈল বিপথগামী হলে তাদের উপরও বুখতে নসরকে আধিপত্য দান করে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, কোরআন কোন বিশেষ জনপদকে নির্দিষ্ট করেনি। তাই আয়াতকে ব্যাপক অর্থেই রাখা দরকার। এর মধ্যে ইয়ামনের উপরোক্ত জনপদও শামিল থাকবে।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ অর্থাৎ আমি আকাশ পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছুকে ক্রীড়া ও খেলার জন্য সৃষ্টি করিনি। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কতক জনপদকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, পৃথিবী ও আকাশ এবং এতদুভয়ের সবকিছুর সৃষ্টি যেমন বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ রহস্য ও উপকারিতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি জনপদসমূহকে ধ্বংস করাও সাক্ষাৎ রহস্যের অধীনে ছিল। এই বিষয়বস্তুটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পৃথিবী, আকাশ ও সমগ্র সৃষ্টবস্তু সৃজনে আমার পূর্ণ শক্তি অফুরন্ত জ্ঞান ও বিচক্ষণতার যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়, তওহীদ ও রেসালতে অবিশ্বাসী কি সেগুলো দেখে না ও বোঝে না অথবা তারা কি মনে করে যে, আমি এসব বস্তু অনর্থক ও ক্রীড়াচ্ছলের সৃষ্টি করেছি?

لَاعِبِينَ শব্দটি لعب ধাতু থেকে উদ্ভূত। যে কোন লক্ষ্যহীন কাজকে لعب বলা হয়।— (রাগীব) যে কাজের পেছনে কোন শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ লক্ষ্যই থাকে না, নিছক সময় কাটানোর উদ্দেশে করা হয়, তাকে لهو বলা হয় ইসলামবিরোধীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে এবং তওহীদ অস্বীকার করে। প্রকৃতির এসব উজ্জ্বল নিদর্শন সত্ত্বেও তারা তওহীদ স্বীকার করে না। সুতরাং তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে যেন দাবী করে যে, এসব বস্তু অনর্থকই এবং খেলার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, এগুলো খেলা এবং অনর্থক নয়। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে বোঝা যাবে সৃষ্ট জগতের এক এক কণা এবং প্রকৃতির এক এক সৃষ্ট কর্মে হাজারো রহস্য লুক্কায়িত আছে। এগুলো সব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তওহীদের নীরব সাক্ষী।

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ

অর্থাৎ, আমি যদি ক্রীড়াচ্ছলে কোন কাজ গ্রহণ করতে চাইতাম এবং একাজ আমাকে করতেই হত,তবে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিল? একাজ তো আমার নিকটস্থ বস্তু দ্বারাই হতে পারত।

আরবী ভাষায় لو শব্দটি অবান্তর কাল্পনিক বিষয়াদির জন্যে ব্যবহার করা হয়। এখানেও لو শব্দ দ্বারা বর্ণনা শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যেসব বোকা উর্ধ্ব জগত ও অধঃজগতের সমস্ত আশ্চর্যজনক সৃষ্টবস্তুকে রং তামাশা ও ক্রীড়া মনে করে, তারা কি এতটুকুও বোঝো না যে, খেলা ও রং তামাশার জন্যে এত বিরাট বিরাট কাজ করা হয় না। একাজ যে করে, সে এভাবে করে না। আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, রং তামাশা ও ক্রীড়ার যে কোন কাজ কোন ভাল বিবেকবান মানুষের পক্ষেও সম্ভবপর নয়— আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য তো অনেক উর্ধ্বে।

لهو শব্দের আসল ও প্রসিদ্ধ অর্থ কর্মহীনতার কর্ম। এ অর্থ অনুযায়ীই উপরোক্ত তফসীর করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ لهو শব্দটি কোন সময় স্ত্রী ও সন্তান- সন্ততির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থ ধরা হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের দাবী খণ্ডন করা। তারা হযরত ঈসা ও ওযায়র (আঃ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি আমাকে সন্তানই গ্রহণ করতে হত, তবে মানবকে কেন গ্রহণ করতাম, আমার নিকটস্থ সৃষ্টিকেই গ্রহণ করতাম। والله اعلم

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ - قذف শব্দের আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা ও ছুঁড়ে মারা। يدمغ শব্দের অর্থ মস্তকে আঘাত করা। زهق এর অর্থ যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবী ও আকাশের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ আমি খেলার জন্য নয়, বরং বড় বড় রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করেছি। তন্মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলাও এক রহস্য। সৃষ্ট জগতের অবলোকন মানুষকে সত্যের দিকে এমনভাবে পথ প্রদর্শন করে যে, মিথ্যা তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারা হয়, ফলে মিথ্যার মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে।

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ অর্থাৎ আমার যেসব বান্দা আমার সান্নিধ্যে রয়েছে, (অর্থাৎ, ফেরেশতা) তারা সদাসর্বদা বিরতিহীনভাবে আমার এবাদতে মশগুল থাকে। তোমরা আমার এবাদত না করলে আমার খোদায়ীতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য দেখা দেবে না। মানুষ স্বভাবতঃ অপরকেও নিজের অবস্থার নিরিখে বিচার করে। তাই মানুষের স্থায়ী এবাদতের পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হতে পারে। (এক) কারও এবাদত করাকে নিজের পদমর্যাদার পরিপন্থী মনে করা। তাই এবাদতের কাছেই না যাওয়া। (দুই) এবাদত করার ইচ্ছা থাকা; কিন্তু মানুষ যেহেতু অল্প কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তাই স্থায়ী ও বিরামহীনভাবে এবাদত করতে সক্ষম না হওয়া। এ কারণে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের এবাদতে এ দু'টি অন্তরায় নেই। তারা এবাদতে অহংকারও করে না যে, এবাদতকে পদমর্যাদার খেলাফ মনে করবে এবং এবাদতে কোন সময় ক্লান্তও হয় না। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই এভাবে পূর্ণতা দান করা হয়েছে يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ অর্থাৎ ফেরেশতারা রাত দিন তসবীহ্ পাঠ করে এবং কোন সময় অলসতা করেন না।

আবদুল্লাহ্ ইবনে হারিস বলেনঃ আমি কা'বে আহ্বারকে প্রশ্ন করলামঃ তসবীহ্ পাঠ করা ছাড়া ফেরেশতাদের কি অন্য কোন কাজ নেই? যদি থাকে, তবে অন্য কাজের সাথে সদাসর্বদা তসবীহ্ পাঠ করা কিরূপে সম্ভবপর হয়? কা'ব বলেনঃ প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমার কোন কাজ ও বৃত্তি তোমাকে শ্বাস গ্রহণে বিরত রাখতে পারে কি? সত্য এই যে, ফেরেশতাদের তসবীহ্ পাঠ করা এমন, যেমন— আমাদের শ্বাস গ্রহণ করা ও পলকপাত করা। এ দু'টি কাজ সব সময় ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে এবং কোন কাজে অন্তরায় ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে না।—(কুরতুবী, (বাহ্‌রে মুহীত)

أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ এতে মুশরেকদের অর্বাচীনতা কয়েকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। (এক) তারা কেমন নির্বোধ যে, উপাস্য করতে গিয়েও পৃথিবীস্থ সৃষ্টজীবকেই উপাস্য করেছে। এটা

তো উর্ধ্ব জগতের ও আকাশের সৃষ্টিজীব থেকে সর্বাবস্থায় নিকৃষ্ট ও হেয়। (দুই) যাদেরকে উপাস্য করেছে, তারা কি তাদেরকে কোন সময় কাউকে জীবিত করতে ও প্রাণদান করতে দেখেছে। সৃষ্টজীবের জীবন ও মরণ উপাস্যের করায়ত্ত থাকা একান্ত জরুরী।

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ এটা তওহীদের প্রমাণ, যা সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল এবং যুক্তিগত প্রমাণের দিকেও ইঙ্গিতবহ। এই প্রমাণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে উল্লেখিত রয়েছে। অভ্যাসগত প্রমাণের ভিত্তি এই যে, পৃথিবী ও আকাশে দুই খোদা থাকলে উভয়ই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকরী হওয়া উচিত। অভ্যাসগতভাবে এটা অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজনও সেই নির্দেশ দেবে, একজন যা পছন্দ করবে, অন্যজনও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যখন দুই খোদার নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নরূপ হবে, তখন এর ফলশ্রুতি পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর কি হবে। এক খোদা চাইবে যে, এখন দিন হোক, অপর খোদা চাইবে এখন রাত্রি হোক। একজন চাইবে বৃষ্টি হোক, অন্যজন চাইবে বৃষ্টি না হোক। এমতাবস্থায় উভয়ের পরস্পরবিরোধী নির্দেশ কিরূপে প্রযোজ্য হবে। যদি একজন পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও খোদা থাকতে পারবে না। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উভয় খোদা পরস্পরে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করলে তাতে অসুবিধা কি? এর বিভিন্ন উত্তর কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু জেনে নেয়া যায় যে, যদি উভয়ই পরামর্শের অধীন হয় এবং একজন অন্যজনের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে না পারে, তবে এতে জরুরী হয়ে যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউ স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। বলাবাহুল্য, স্বয়ং সম্পূর্ণ না হয়ে খোদা হওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পরবর্তী لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ আয়াতেও এদিকে ইশারা পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কোন আইনের অধীন, যার ক্রিয়াকর্ম ধরপাকড় যোগ্য, সে খোদা হতে পারে না। খোদা তিনিই হবেন, যিনি কারও অধীন নয়, যাকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারও নেই। পরামর্শের অধীন দুই খোদা থাকলে প্রত্যেকেই অপরিহার্যরূপে অপরকে জিজ্ঞাসা করারও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় করার অধিকারী হবে। এটা খোদায়ী পদমর্যাদার নিশ্চিত পরিপন্থী।

هَٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي — এর এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ বলে কোরআন এবং ذكر مَنْ قَبْلِي বলে তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও আমার সঙ্গীদের কোরআন এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের তওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোন কিতাবে কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও এবাদত শিক্ষা দেয়া হয়েছে? তওরাত ও ইঞ্জীলের পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোথাও পরিষ্কার উল্লেখ নেই যে, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করে দ্বিতীয় উপাস্য গ্রহণ কর। বাহরে মুহীতে আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কোরআন আমার সঙ্গীদের জন্যেও উপদেশ এবং আমার পূর্ববর্তীদের জন্যেও। উদ্দেশ্য এই যে, আমার সঙ্গীদের জন্যে তা দাওয়াত ও বিধানাবলী ব্যাখ্যার দিক দিয়ে উপদেশ এবং পূর্ববর্তীদের জন্যে এই দিক দিয়ে উপদেশ যে, এর মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের অবস্থা, কাজকারবার ও কেচ্ছাকাহিনী জীবিত আছে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ
لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا
سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ
بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ
لَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٨﴾
وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ
كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾ اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ
كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ
تَمِيْدَ بِهِمْ ۪ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣١﴾
وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚۖ وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣٢﴾
وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ
فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ؕ
اَفَا۟ئِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ
الْمَوْتِ ؕ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ؕ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٥﴾

(২৫) আপনার পূর্বে আমি যে রসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর। (২৬) তারা বলল ঃ দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছে। তাঁর জন্য কখনও ইহা যোগ্য নয়; বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা (২৭) তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করে। (২৮) তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে, তা তিনি জানেন। তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত। (২৯) তাদের মধ্যে যে বলে যে, তিনি ব্যতীত আমিই উপাস্য, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দেব। আমি জালেমদেরকে এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। (৩০) কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? (৩১) আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে তারা পথপ্রাপ্ত হয়। (৩২) আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে (৩৩) তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে। (৩৪) আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে? (৩৫) প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহ্র সন্তান হওয়া তো দূরের কথা, তারা আল্লাহ্র সামনে এমন ভীত ও বিনীত থাকে যে, আগে বেড়ে কোন কথাও বলে না। এবং তাঁর আদেশের খেলাফ কখনও কোন কাজও করে না। কথায় আগে না বাড়ার অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে কোন কথা না বলা হয়, তারা নিজেরা আগে বেড়ে কথা বলার সাহস করে না। এ থেকে আরও জানা গেল যে, মজলিসে বসে প্রথমেই কথা বলা উচিত নয় ; বরং যে ব্যক্তি মজলিসের প্রধান, তার কথার জন্যে অপেক্ষা করা উচিত। প্রথমেই অন্যের কথা বলা শিষ্টাচারের পরিপন্থী।

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا এখানে رؤيت (দেখা) অর্থ জানা, চোখে দেখে জানা হোক কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা জানা হোক। কেননা, এরপর যে বিষয়বস্তু আসছে, তার সম্পর্কে কিছু চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে দেখার সাথে।

اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا – رتق শব্দের অর্থ বন্ধ হওয়া এবং فتق এর অর্থ খুলে দেয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি فتق ও رتق কোন কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার পূর্ণ ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আয়াতের তরজমা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল। আমি এদেরকে খুলে দিয়েছি। এখানে ''বন্ধ হওয়া'' ও ''খুলে দেয়ার'' অর্থ কি এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সাহাবায় কেরাম ও সাধারণ তফসীরবিদগণের যে উক্তি গ্রহণ করেছে তা হচ্ছে বন্ধ হওয়ার অর্থ আকাশের বৃষ্টি ও মাটির ফসল বন্ধ হওয়া এবং খুলে দেয়ার অর্থ এতদুভয়কে খুলে দেয়া।

তফসীরে ইবনে কাসীরে ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে আলোচ্য আয়াতের তফসীর জিজ্ঞাসা করলে তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এই শায়খের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তিনি যে উত্তর দেন, তা আমাকেও বলে যেয়ো। লোকটি হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পৌছে বলল যে, আয়াতে উল্লেখিত رتقا ও فتقنا বলে কি বোঝানো হয়েছে? হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ পূর্বে আকাশ বন্ধ ছিল। বৃষ্টি বর্ষণ করত না এবং মাটিও বন্ধ ছিল, তাতে বৃক্ষ, তরুলতা ইত্যাদি অঙ্কুরিত হত না আল্লাহ্ তাআলা যখন পৃথিবীতে মানুষ আবাদ করলেন, তখন আকাশের বৃষ্টি এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতা খুলে দিলেন। লোকটি আয়াতের এই তফসীর জেনে নিয়ে হযরত ইবনে ওমরের কাছে গেল। হযরত ইবনে ওমর এ তফসীর শুনে বললেন ঃ এখন আমি পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হলাম যে, বাস্তবিকই ইবনে আব্বাসকে কোরআনের ব্যুৎপত্তি দান করা হয়েছে। এর আগে আমি কোরআনের তফসীর সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের বর্ণনাসমূহকে দুঃসাহসিক উদ্যম মনে করতাম এবং পছন্দ করতাম না। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে কোরআনের বিশেষ রুচিজ্ঞান দান করেছেন। তিনি فتق ও رتق এর নির্ভুল তফসীর করেছেন।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে পানির অবশ্যই প্রভাব আছে। চিন্তাবিদদের মতে শুধু মানুষ ও জীবজন্তুই প্রাণী ও আত্মাওয়ালা নয়; বরং উদ্ভিদ এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা ও

জীবন প্রমাণিত আছে। বলাবাহুল্য, এসব বস্তু সৃজন, আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম।

ইবনে কাসীর ইমাম আহ্‌মদের সনদ দ্বারা হযরত আবু হুরায়রার এই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরয করলাম; "ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তু সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন।" জওয়াবে তিনি বললেন ঃ "প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে।"

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ আরবী ভাষায় অস্থির নড়াচড়াকে বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তাআলা পাহাড়সমূহের বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থির নড়াচড়া না করে। পৃথিবী নড়াচড়া করলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের অসুবিধা হত। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের প্রভাব কি, এ বিষয়ে দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। তফসীর কবীর প্রমুখ গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাঠকবর্গ দেখে নিতে পারেন। তফসীর বয়ানুলকোরআনে সূরা নমলের তফসীরে মাওলানা আশরাফ আলী থানভীও এ সম্পর্কে জরুরী আলোচনা করেছেন।

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ প্রত্যেক বৃত্তাকার বস্তুকে فلك বলা হয়। এ কারণেই সুতা কাটার চরকায় লাগানো গোল চামড়াকে فلكة المغزل বলা হয়। (রূহুল মা'আনী) এবং এ কারণেই আকাশকেও فلك বলা হয়ে থাকে। এখানে সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ বোঝানো হয়েছে। কোরআনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলা হয়নি যে, এই কক্ষপথগুলো আকাশের অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে শূন্যে। মহাশূন্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, কক্ষপথগুলো আকাশ থেকে অনেক নীচে মহাশূন্যে অবস্থিত।

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আরও জানা যায় যে, সূর্যও একটি কক্ষপথে বিচরণ করে। আধুনিক দার্শনিকগণ পূর্বে একথা অস্বীকার করলেও বর্তমানে তারাও এর প্রবক্তা হয়ে গেছেন। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে কাফের ও মুশরেকদের বিভিন্ন দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের দাবীসমূহের মধ্যে ছিল হযরত ঈসা (আঃ) অথবা ওযায়র (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র অংশীদার অথবা ফেরেশতা ও হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র সন্তান বলা। এই খণ্ডনের কোন জওয়াব তাদের কাছে ছিল না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে গেলে তার মধ্যে ক্রোধ ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এই বিরক্তির ফলশ্রুতিতেই মক্কার মুশরেকেরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দ্রুত মৃত্যু-কামনা করত ; যেমন – কোন কোন আয়াতে আছে نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (আমরা তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি)। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদের এই অনর্থক কামনার দু'টি জওয়াব দিয়েছেন। তা এই যে, আমার রসূল যদি শীঘ্রই মারা যান, তবে তাতে তোমাদের কি উপকার হবে? তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, তাঁর ওফাত হলে তোমরা বলবে, সে নবী ও রসূল নয়, রসূল হলে মৃত্যু হত না ; তবে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেসব নবীর নবুওয়ত স্বীকার কর, তাঁর কি মৃত্যুবরণ করেননি? তাঁদের মৃত্যুর কারণে যখন তাঁদের নবুওয়ত ও রেসালতে কোন ত্রুটি দেখা দেয়নি, তখন এই শেষ নবীর মৃত্যুতে তাঁর নবুওয়তের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা কিরূপে করা যায়? পক্ষান্তরে যদি তাঁর শীঘ্র মৃত্যু দ্বারা তোমরা তোমাদের ক্রোধ ঠাণ্ডা করতে চাও, তবে মনে রেখো, তোমরাও এই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। তোমাদেরকেও মরতে হবে। কাজেই কারও মৃত্যুতে আনন্দিত হওয়ার কি কারণ রয়েছে?

মৃত্যু কি? এরপর বলা হয়েছে كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ জীব-মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। এখানে প্রত্যেক نفس বলে পৃথিবীস্থ জীব বোঝানো হয়েছে। তাদের সবার মৃত্যু অপরিহার্য। ফেরেশতা জীব এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরও মৃত্যু হবে কি-না, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ মানুষসহ মর্ত্যের সব জীব এবং ফেরেশতাসহ সব স্বর্গীয় জীব এক মুহূর্তের জন্যে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কেউ কেউ বলেন ঃ ফেরেশতা এবং জান্নাতের হুর ও গেলমান মৃত্যুর আওতাবহির্ভূত।— (রূহুল-মা'আনী) আলেমদের সর্বসম্মত মতে আত্মার দেহপিঞ্জর ত্যাগ করাই মৃত্যু। একটি গতিশীল, প্রাণবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম ও নূরানী দেহকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা মানুষের সমগ্র দেহে সঞ্চারিত থাকে, যেমন গোলাপজল গোলাপ ফুলের মধ্যে বিরাজমান। ইবনে কাইয়্যেম আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে তার একশতটি প্রমাণ উপস্থিত করেছে।— (রূহুল-মা'আনী)

ذَائِقَةُ الْمَوْتِ শব্দে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক জীব মৃত্যুর বিশেষ কষ্ট অনুভব করবে। কেননা, স্বাদ আস্বাদন করার বাকপদ্ধতিটি এরূপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বলাবাহুল্য, দেহের সাথে আত্মার যে নিবিড় সম্পর্ক, তার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা বের হওয়ার সময় কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্তি এবং মহান প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের কথা ভেবে কোন কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা মৃত্যুতে যে আনন্দ ও সুখ লাভ করেন, এটা অন্য ধরনের আনন্দ ও সুখ। এই আনন্দ দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদজনিত স্বাভাবিক কষ্টের পরিপন্থী নয়। কারণ, কোন বড় সুখ ও বড় উপকার দৃষ্টিপথে থাকলে তার জন্যে ছোট কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যায়।

সংসারের প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ পরীক্ষা ঃ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً অর্থাৎ, আমি মন্দ ও ভাল উভয়ের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করি। মন্দ বলে প্রত্যেক স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়। যেমন— অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট এবং ভাল বলে প্রত্যেক পছন্দনীয় ও কাম্য বিষয় যেমন সুস্থতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এ সংসারে এই উভয় প্রকার বিষয় মানুষের পরীক্ষার জন্যে সামনে আসে। স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়ে সবর করে তার হক আদায় করতে হবে এবং কাম্য বিষয়ে শোকর করে তার হক আদায় করতে হবে। পরীক্ষা এই যে, কে এতে দৃঢ়পদ থাকে এবং কে থাকে না, তা দেখা। বুযুর্গগণ বলেন ঃ বিপদাপদে সবর করার তুলনায় বিলাস-ব্যসন ও আরাম-আয়েশে হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাক অধিক কঠিন। তাই হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ

بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر— অর্থাৎ, আমরা যখন বিপদে পতিত হলাম, তখন তো সবর করলাম, কিন্তু যখন সুখ ও আরাম-আয়েশে লিপ্ত হলাম, তখন সবর করতে পারলাম না। অর্থাৎ, এর হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকতে পারলাম না।

وَإِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا
الَّذِىْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝
خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ؕ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِىْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ۝
وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ لَوْ يَعْلَمُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا
عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝ بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً
فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا
مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ
وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝
اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ
اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ۝ بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَ
اٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى
الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَآ
اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ ۖ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ۝

(৩৬) কাফেররা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনার সাথে ঠাট্টা করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ থাকে না, একি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করে? এবং তারাই তো রহমান'-এর আলোচনায় অস্বীকার করে। (৩৭) সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ত্বরাপ্রবণ, আমি সত্বরই তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব। অতএব আমাকে শীঘ্র করতে বলো না। (৩৮) এবং তারা বলে ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে? (৩৯) যদি কাফেররা ঐ সময়টি জানত, যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (৪০) বরং তা আসবে তাদের উপর অতর্কিতভাবে, অতঃপর তাদেরকে তা হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তা রোধ করতেও পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। (৪১) আপনার পূর্বেও অনেক রসূলের সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়েছে। অতঃপর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা করত তা উল্টো ঠাট্টাকারীদের উপরই আপতিত হয়েছে। (৪২) বলুন ঃ 'রহমান' থেকে কে তোমাদেরকে হেফাযত করবে রাত্রে ও দিনে। বরং তারা তাদের পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। (৪৩) তবে কি আমি ব্যতীত তাদের এমন দেব-দেবী আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করবে? তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তারা আমার মোকাবেলায় সাহায্যকারীও পাবে না। (৪৪) বরং আমি তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম, এমনকি তাদের আয়ুষ্কালও দীর্ঘ হয়েছিল। তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে হ্রাস করে আনছি। এরপরও কি তারা বিজয়ী হবে? (৪৫) বলুন ঃ আমি তো কেবল ওহীর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সতর্ক করি, কিন্তু বধিরদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা সে সতর্কবাণী শোনে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ত্বরা-প্রবণতা নিন্দনীয় ঃ خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ - **عجل** -শব্দের অর্থ ত্বরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোন কাজ সময়ের পূর্বেই করা। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কোরআন পাকের অন্যত্রও একে মানুষের দুর্বলতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا —অর্থাৎ, মানুষ অত্যন্ত ত্বরাপ্রবণ। হযরত মূসা (আঃ) যখন বনী-ইসরাঈল থেকে অগ্রবর্তী হয়ে তূর পর্বতে পৌছে যান, তখন সেখানেও এই ত্বরাপ্রবণতার কারণে তাঁর প্রতি রোষ প্রকাশ করা হয়। পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণদের সম্পর্কে ''ভাল কাজে অগ্রগামী থাকাকে'' প্রশংসনীয়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এটা ত্বরা-প্রবণতা নয়। কারণ, এটা সময়ের পূর্বে কোন কাজ করা নয় ; রবং এ হচ্ছে সময়ে অধিক সৎ ও পূণ্যকাজ করার চেষ্টা।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মজ্জায় যেসব দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, তন্মধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে ত্বরা-প্রবণতা। স্বভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়কে আরবরা এরূপ ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করে। উদাহরণতঃ কারও স্বভাবে ক্রোধ প্রবল হলে আরবরা বলে ঃ লোকটি ক্রোধ দ্বারা সৃজিত হয়েছে।

سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِىْ — এখানে ايات (নির্দেশনাবলী) বলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী মু'জেযা ও অবস্থা বোঝানো হয়েছে ;—(কুরতুবী) যেমন বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে এ জাতীয় নিদর্শনাবলী স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। পরিণামে মুসলমানদের বিজয় সবার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ; অথচ তাদেরকে সর্বাধিক দুর্বল ও হেয় মনে করা হত।

وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَٰوَيْلَنَآ
إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ
فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ
خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا
مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾
ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ
مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَٰهُ ۚ أَفَأَنتُمْ لَهُۥ
مُنكِرُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَٰهِيمَ رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ وَ
كُنَّا بِهِۦ عَٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ
ٱلَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا۟ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا
عَٰبِدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِى ضَلَٰلٍ
مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّٰعِبِينَ ﴿٥٥﴾
قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى
فَطَرَهُنَّ وَأَنَا۠ عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٥٦﴾ وَ
تَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَٰمَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا۟ مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾

(৪৬) আপনার পালনকর্তার আযাবের কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা বলতে থাকবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম।' (৪৭) আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট। (৪৮) আমি মূসা ও হারুনকে দান করেছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ, আলো ও উপদেশ, আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্যে — (৪৯) যারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কেয়ামতের ভয়ে শঙ্কিত। (৫০) এবং এটা একটা বরকতময় উপদেশ, যা আমি নাযিল করেছি। অতএব তোমরা কি একে অস্বীকার কর? (৫১) আর, আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে তার সৎপন্থা দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাতও ছিলাম। (৫২) যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন ঃ ''এই মূর্তিগুলো কী, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছ'' ? (৫৩) তারা বলল ঃ আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এদের পূজা করতে দেখেছি। (৫৪) তিনি বললেন ঃ তোমরা প্রকাশ্য গোমরাহীতে আছ এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও। (৫৫) তারা বলল ঃ তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ আগমন করেছ, না তুমি কৌতুক করছ? (৫৬) তিনি বললেন ঃ না, তিনিই তোমাদের পালনকর্তা যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পালনকর্তা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন ; এবং আমি এই বিষয়েরই সাক্ষ্যদাতা। (৫৭) আল্লাহ্‌র কসম, যখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কেয়ামতে আমলের ওজন ও দাঁড়িপাল্লা ঃ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ – **موازين** শব্দটি **ميزان** –এর বহুবচন। অর্থ— ওজনের যন্ত্র তথা দাঁড়িপাল্লা। আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে দেখে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আমল ওজন করার জন্যে অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা দাঁড়িপাল্লা হবে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আমল ওজন করার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন দাঁড়িপাল্লা হবে। কিন্তু উম্মতের অনুসরণীয় আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দাঁড়িপাল্লা একটিই হবে। তবে বহুবচনে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, একটি দাঁড়িপাল্লাই অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লার কাজ দেবে। কেননা, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত কত যে সৃষ্টজীব হবে, তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। তদের সবার আমল এই দাঁড়িপাল্লায়ই ওজন করা হবে। **قسط** শব্দের অর্থ ইনসাফ, ন্যায়বিচার। অর্থাৎ, এই দাঁড়িপাল্লা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ওজন করবে – সামান্যও বেশ-কম হবে না। মুস্তাদরাকে হযরত সালমান (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন আমল ওজন করার জন্যে এত বিরাট ও বিস্তৃত দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে যে, তাতে আকাশ ও পৃথিবীকে ওজন করতে চাইলে এগুলোরও সংকুলান হয়ে যাবে।— (মাযহারী)

وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا — অর্থাৎ হিসাবের দিন এবং আমল ওজন করার সময় মানুষের সমস্ত ছোট–বড়, ভাল–মন্দ আমল উপস্থিত করা হবে, যাতে হিসাব ও ওজনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ ঃ তিরমিযী হযরত আয়েশার রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সামনে বসে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমার দু'টি ক্রীতদাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, কাজ–কারবারে কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ অমান্য করে। এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালি–গালাজ করি এবং হাতে মারপিটও করি। আমার ও এই গোলামদ্বয়ের ইনসাফ কিভাবে হবে? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তাদের নাফরমানী, কারচুপি এবং ঔদ্ধত্য ওজন করা হবে। এরপর তোমার গালি–গালাজ ও মারপিট ওজন করা হবে। তুমি যে শাস্তি দাও তা যদি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তবে অবশিষ্টটুকু তোমার অনুগ্রহ বলে গণ্য হবে। আর যদি অপরাধের তুলনায় শাস্তি বেশী হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। লোকটি একথা শুনে অন্যত্র সরে গেল এবং কান্না জুড়ে দিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি কি কোরআনে এই আয়াত পাঠ করনি وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ – –লোকটি আরয করল ঃ এখন তো তাদেরকে মুক্ত করে এই হিসাবের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই।—(কুরতুবী)

الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ — এই তিনটি গুণই তওরাতের। **فرقان** অর্থাৎ, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী, **ضياء** অর্থাৎ, মানবাত্মার জন্যে আলো এবং **ذكر** অর্থাৎ মানুষের জন্যে উপদেশ ও হেদায়েতের মাধ্যম। কেউ কেউ বলেন ঃ **فرقان** বলে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য বোঝানো হয়েছে, যা সর্বত্র মূসা (আঃ)–এর সাথে ছিল ; অর্থাৎ ফেরাউনের মত শত্রুর গৃহে তিনি লালিত–পালিত হয়েছেন, মোকাবেলার সময় আল্লাহ্ তাআলা ফেরাউনকে লাঞ্ছিত করেছেন, এরপর ফেরাউনী

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾
قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا
سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا
فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾ قَالُوْٓا
ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ
كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى
اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى
رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ اُفٍّ
لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾
قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾
قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾ وَاَرَادُوْا
بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا
اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ
اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿٧٢﴾

(৫৮) অতঃপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন ওদের প্রধানটি ব্যতীত ; যাতে তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করে।(৫৯) তারা বলল ঃ আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করল? সে তো নিশ্চয়ই কোন জালিম। (৬০) কতক লোকে বলল ঃ আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি; তাকে ইব্রাহীম বলা হয়। (৬১) তারা বলল ঃ তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তারা দেখে। (৬২) তারা বলল ঃ হে ইবরাহীম, তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছ? (৬৩) তিনি বললেন ঃ না, এদের এই প্রধানই তো একাজ করেছে। অতএব তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তারা কথা বলতে পারে। (৬৪) অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং বলল ঃ লোকসকল ; তোমরাই বে-ইনসাফ। (৬৫) অতঃপর তারা ঝুঁকে গেল মস্তক নত করে ঃ ''তুমি তো জান যে, এরা কথা বলে না''। (৬৬) তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর এবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? (৬৭) ধিক তোমাদের জন্যে এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরই এবাদত কর, ওদের জন্যে। তোমরা কি বোঝ না? (৬৮) তারা বলল ঃ একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। (৬৯) আমি বললাম ঃ 'হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' (৭০) তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল, অতঃপর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। (৭১) আমি তাঁকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্যে কল্যাণ রেখেছি। (৭২) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও পুরস্কারস্বরূপ দিলাম ইয়াকূব এবং প্রত্যেককেই সৎকর্মপরায়ণ করলাম।

সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের সময় সমুদ্রে রাস্তা সৃষ্টি হয়ে তিনি রক্ষা পান এবং ফেরাউনী সৈন্যবাহিনী সলিল-সমাধি লাভ করে। এমনিভাবে পরবর্তীতে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলার এই সাহায্য প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। ذكر ও ضياء উভয়টিই তওরাতের বিশেষণ। কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, الْفُرْقَانَ এর পরে واو দ্বারা পৃথক করা থেকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে فرقان তওরাত নয়—অন্য কোন বিষয়।

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ আয়াতের ভাষা বাহ্যতঃ একথাই বোঝায় যে, একথাটি ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের সামনে বলেছিলেন। কিন্তু এতে প্রশ্ন হয় যে, ইবরাহীম (আঃ) তাদের কাছে اِنِّيْ سَقِيْمٌ (আমি অসুস্থ)-এর ওযর পেশ করে তাদের সাথে ঈদের সমাবেশে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত ছিলেন। যখন মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুসন্ধানে রত হল যে, কাজটি কে করল? যদি ইবরাহীম (আঃ)-এর উপরোক্ত কথা পূর্বেই তাদের জানা থাকত, তবে এতসব খোঁজাখুঁজির কি প্রয়োজন ছিল? প্রথমেই তারা বোঝে নিত যে, ইবরাহীমই একাজ করেছে। এর জওয়াব হিসেবে তফসীরে সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম একাই এ মনোভাব পোষণ করতেন। সমগ্র সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় তাঁর কোন শক্তি ছিল না। একথা ভেবেই সম্ভবতঃ তাঁর কথার দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করেনি এবং ভুলেও যায়।—(বয়ানুল-কোরআন) এটাও সম্ভবপর যে, যারা খোঁজাখুঁজি করছিল, তারা অন্য লোক ছিল। ইবরাহীম (আঃ)-এর কথাবার্তা তারা জানত না। তফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ বলেন ঃ ইবরাহীম (আঃ) উপরোক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বলেননি ; বরং মনে মনে বলেছিলেন। অথবা সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দু'একজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে বলেছিলেন। এরপর মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটলে যখন খোঁজাখুঁজি শুরু হয়, তখন তারা এই তথ্য সরবরাহ করে।—(কুরতবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا — جُذٰذًا শব্দটি — جذ — এর বহুবচন। এর অর্থ খন্ড। অর্থাৎ, ইবরাহীম (আঃ) মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খন্ডবিখন্ড করে দিলেন।

اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ —অর্থাৎ, শুধু বড় মূর্তিটিকে ভাঙ্গার কবল থেকে রেহাই দিলেন। এটা হয় দৈহিক আকার-আকৃতিতে অন্য মূর্তিদের চাইতে বড় ছিল, না হয় আকার-আকৃতিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও পূজারীরা তাকে বড় বলে মান্য করত।

لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ - اليه শব্দের সর্বনাম দ্বারা ইবরাহীম (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই বর্ণনা করে আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এ কার্য দ্বারা ইবরাহীম (আঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা অমার দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং আমাকে জিজ্ঞেস করুক যে, তুমি একাজ কেন করলে? এরপর আমি তাদেরকে তাদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে জ্ঞাত করব। এর অন্য এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, ইবরাহীম (আঃ) এ আশায় কাজটি করলেন যে, তাদের উপাস্য মূর্তিদেরকে খন্ড-বিখন্ড দেখলে এরা যে পূজার যোগ্য নয়, এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। এরপর তারা ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (দুই) কলবী বলেন, সর্বনাম দ্বারা كبير (প্রধান মূর্তি)-কে

বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তারা ফিরে এসে যখন সবগুলো মূর্তিকে খন্ড-বিখন্ড এবং বড় মূর্তিকে আস্ত অক্ষত ও কাঁধে কুড়াল রাখা অবস্থায় দেখবে, তখন সম্ভবতঃ এই বড় মূর্তির দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, এরূপ কেন হল? সে যখন কোন উত্তর দেবে না তখন তার অক্ষমতাও তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি মিথ্যা নয়-- রূপক অর্থে ছিল, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ঃ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রেফতার করে আনল এবং তাঁর স্বীকারোক্তি নেয়ার জন্যে প্রশ্ন করল ঃ তুমি আমাদের দেবতাদের সাথে এ ব্যবহার করেছ কি? তখন ইবরাহীম (আঃ) জওয়াব দিলেন ঃ না, এদের প্রধানই একাজ করেছে। যদি তারা কথা বলার শক্তি রাখে, তবে তোমরা তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাজটি তো ইবরাহীম (আঃ) করেছিলেন। সুতরাং তা অস্বীকার করা এবং মূর্তিদের প্রধানকে অভিযুক্ত করা বাহ্যতঃ বাস্তববিরোধী কাজ, যাকে মিথ্যা বলা যায়। আল্লাহ্‌র দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আঃ) এহেন মিথ্যাচারের অনেক উর্ধ্বে। এ প্রশ্নের উত্তর দানের জন্যে তফসীরবিদগণ নানা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে তফসীরের সার-সংক্ষেপ তথা বয়ানুল-কোরআনে যে সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর এ উক্তি ধরে নেয়ার পর্যায়ে ছিল; অর্থাৎ, তোমারা একথা ধরে নাও না কেন যে, একাজ প্রধান মূর্তিই করে থাকবে। ধরে নেয়ার পর্যায়ে বাস্তববিরোধী কথা বলা মিথ্যার আওতায় পড়ে না; যেমন— কোরআনে আছে إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعٰبِدِينَ অর্থাৎ, রহমান 'আল্লাহ্' এর কোন সন্তান থাকলে আমি সর্বপ্রথম তাঁর এবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্মল ও দ্ব্যর্থহীন জওয়াব বাহ্‌রে-মুহীত, কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, এখানে اسناد مجازى তথা রূপক ভঙ্গিতে ইবরাহীম (আঃ) যে কাজ স্বহস্তে করেছেন, তা প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা, এ মূর্তিটিই ইবরাহীম (আঃ)-কে একাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর সম্প্রদায় এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করত। সম্ভবতঃ এ কারণেই বিশেষভাবে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণতঃ যদি কোন বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের হস্ত কর্তন করে বলে যে, আমি হস্ত কর্তন করিনি; বরং তোমার কর্ম এবং তোমার বক্রমুখিতাই হস্ত কর্তন করেছে। কেননা, তার কর্মই হস্ত কর্তনের কারণ।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) কার্যতঃও মূর্তি ভাঙ্গাকে প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছিলেন। রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মূর্তি ভাঙ্গার কুড়ালটি তিনি প্রধান মূর্তির কাঁধে অথবা হাতে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে দর্শকমাত্রই ধারণা করে যে, সে-ই একাজ করেছে। এরপর কথার মাধ্যমেও তিনি কাজটি প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছেন। বলাবাহুল্য, এটা রূপক ভঙ্গি। আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ উক্তি انبت الربيع البقلة (অর্থাৎ, বসন্তকালীন বৃষ্টি শস্য উৎপাদন করেছে।) এর দৃষ্টান্ত। উৎপাদনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলা। কিন্তু এ উক্তিতে বাহ্যিক কারণের দিকে উৎপাদনের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে। একে মিথ্যা অভিহিত করা যায় না। এমনিভাবে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি কার্যতঃ ও উক্তিগতভাবে সম্বন্ধ করাও কিছুতেই মিথ্যা নয়। অনেক দ্বীনী উপকারিতার কারণে এই রূপক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি উপকারিতা ছিল এই যে, দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক যে, সম্ভবতঃ পূজায় অন্যান্য ছোট মূর্তিকে শরীক করার কারণে বড় মূর্তিটি ক্রুদ্ধ হয়ে একাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হলে তওহীদের পথ খুলে যায় যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সাথে ছোট মূর্তিদের শরীকানা সহ্য করতে পারে না, তখন রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তাআলা এই প্রস্তরদের শরীকানা নিজের সাথে কিরূপে মেনে নেবেন?

দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, তখন তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল যে, যাদেরকে আমরা খোদা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি, তারা যদি বাস্তবিকই তদ্রূপ হত, তবে কেউ তাদেরকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারত না। তৃতীয় এই যে, যদি তিনি কাজটিকে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করে দেন, তবে যে মূর্তি অন্য মূর্তিদেরকে ভেঙ্গে দিতে পারে, তার মধ্যে বাকশক্তিও থাকা উচিত। তাই বলা হয়েছে ঃ فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ মোটকথা, কোন দ্ব্যর্থতার আশ্রয় না নিয়ে ইবরাহীম (আঃ)-এর উপরোক্ত উক্তিকে বাহ্যিক অর্থে রেখে বলা যায় যে, ইবরাহীম (আঃ) রূপক ভঙ্গিতে বড় মূর্তির দিকে কাজটির সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন। এরূপ করা হলে তাতে কোনরূপ মিথ্যা ও অবাস্তব সন্দেহ থাকে না। শুধু এক প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে।

হাদীসে ইবরাহীম (আঃ)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করার স্বরূপ ঃ এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, সহীহ্ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ ان ابراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث — অর্থাৎ, ইবরাহীম (আঃ) তিন জায়গা ব্যতীত কোন দিন মিথ্যা কথা বলেননি।—(বোখারী, মুসলিম) অতঃপর এই তিন জায়গার বিবরণ দিতে গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, তন্মধ্যে দু'টি মিথ্যা খাস আল্লাহ্‌র জন্যে বলা হয়েছে। একটি بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ —আয়াতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি ঈদের দিন সম্প্রদায়ের কাছে ওযর পেশ করে إِنِّي سَقِيمٌ (আমি অসুস্থ) বলা এবং তৃতীয়টি স্ত্রীর হেফাযতের জন্যে বলা হয়েছে। ঘটনা এই যে, ইবরাহীম (আঃ) স্ত্রী হযরত সারাহ্‌সহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান ছিল যালেম ও ব্যভিচারী। কোন ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে সে স্ত্রীকে পাকড়াও করত এবং তার সাথে ব্যভিচার করত। কিন্তু কোন কন্যা পিতার সাথে কিংবা ভগিনী স্বীয় ভাইয়ের সাথে থাকলে সে এরূপ করত না। ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রীসহ এই জনপদে পৌঁছার খবর কেউ এই যালেম ব্যভিচারীর কাছে পৌঁছে দিলে সে হযরত সারাহ্‌কে গ্রেফতার করিয়ে আনল। গ্রেফতারকারীরা ইবরাহীম (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ এই মহিলার সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক কি? ইবরাহীম (আঃ) যালেমের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বলে দিলেন ঃ সে আমার ভগিনী। (এটাই হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যা।) কিন্তু এতদসত্ত্বেও সারাহ্‌কে গ্রেফতার করা হল। ইবরাহীম (আঃ) সারাহ্‌কে বলে দিলেন যে, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তুমিও এর বিরপীত বলো না। কারণ, ইসলামী সম্পর্কে তুমি আমার ভগিনী। এখন এই দেশে আমরা দু'জনই মাত্র মুসলমান এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বে সম্পর্কশীল। ইবরাহীম (আঃ) যালেমের মোকাবেলা করতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে সবিনয় প্রার্থনার জন্যে নামায পড়তে শুরু করলেন। হযরত সারাহ্ যালেমের সামনে নীত হলেন। সে যখনই কুমতলবে তাঁর দিকে হাত বাড়াল, তখনি সে অবশ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। তখন সারাহ্‌কে অনুরোধ করল যে, তুমি দোয়া কর, যাতে আমি পূর্ববৎ

সুস্থ হয়ে যাই। আমি তোমাকে কিছুই বলব না। হযরত সারাহ্‌র দোয়ায় সে সুস্থ ও সবল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় খারাপ নিয়তে তাঁর দিকে হাত বাড়াতে চাইল, কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমে সে আবার অবশ হয়ে গেল। এমনিভাবে তিনবার এরূপ ঘটনার পর সে সারাহ্‌কে ফেরত পাঠিয়ে দিল। (এ হচ্ছে হাদীসের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ।) এই হাদীসে ইবরাহীম (আঃ)-এর দিকে পরিষ্কারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করা হয়েছে, যা নবুওয়তের শান ও পবিত্রতার খেলাফ। কিন্তু এর জওয়াব হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না ; বরং এটা ছিল অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় "তওরিয়া"। এর অর্থ দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বোঝা ও বক্তার নিয়তে অন্য অর্থ থাকা। জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ফেকাহ্‌বিদগণের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েয ও হালাল। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লেখিত হাদীসে এর প্রমাণ এই যে, ইবরাহীম (আঃ) নিজেই সারাহ্‌কে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তুমিও আমাকে ভাই বলো। ভগিনী বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন যে, আমরা উভয়েই ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী। বলাবাহুল্য এটাই "তওরিয়া"। এই তওরিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের "তাকায়্যুহ" থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাকায়্যুহ্‌র মধ্যে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় এবং তদনুযায়ী কাজও করা হয়। তওরিয়াতে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় না ; বরং বক্তা যে অর্থে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সত্য হয়ে থাকে ; যেমন— ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী হওয়া। উল্লেখিত হাদীসের ভাষায় এই কারণটি পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেছে যে, এটা মিথ্যা ছিল না ; বরং তওরিয়া ছিল। হুবহু এমনি ধরনের কারণ প্রথমোক্ত দুই জায়গায়ও বর্ণনা করা যেতে পারে। بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ —এর কারণ একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে মূর্তি ভাঙ্গার কাজটিকে রূপক অর্থে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। إِنِّي سَقِيمٌ বাক্যটিও তদ্রূপ। কেননা, سقيم (অসুস্থ) শব্দটি যেমন শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ, চিন্তান্বিত ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইবরাহীম (আঃ) দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েই "আমি অসুস্থ" বলেছিলেন, কিন্তু শ্রোতারা একে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বোঝেছিল। এই হাদীসেই "তিনটির মধ্যে দু'টি মিথ্যা আল্লাহ্‌র জন্যে ছিল" এই কথাগুলো স্বয়ং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা কোন গোনাহের কাজ ছিল না। নতুবা গোনাহের কাজ আল্লাহ্‌র জন্যে করার কোন অর্থই হতে পারে না ; গোনাহের কাজ না হওয়া তখনই হতে পারে, যখন এগুলো প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা না হয় ; বরং এমন বাক্য হয়, যার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে — একটি মিথ্যা ও অপরটি শুদ্ধ।

ইবরাহীম (আঃ)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা দেয়া মূর্খতা ঃ মির্যা কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পাশ্চাত্যের পন্ডিতদের মোহগ্রস্ত মুসলমান এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ সনদবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এ কারণে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে দিয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহ্‌র দোস্ত ইবরাহীম (আঃ)-কে মিথ্যাবাদী বলা জরুরী হয়ে পড়ে। কাজেই খলীলুল্লাহ্‌কে মিথ্যাবাদী বলার চাইতে সনদের বর্ণনাকারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে দেয়া সহজতর। কেননা, হাদীসটি কোরআনের পরপন্থী। এরপর তারা এ থেকে একটি সামগ্রিক নীতি আবিষ্কার করেছে যে, যে হাদীস কোরআনের পরিপন্থী হবেন, তা যতই শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হোক না কেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত আখ্যায়িত হবে। এই নীতিটি স্বস্থানে সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং মুসলিম উম্মতের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেয়ার পর্যায়ে স্বীকৃত। কিন্তু হাদীসবিদগণ সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেসব হাদীসকে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধসনদ দ্বারা প্রমাণিত পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীসও এরূপ নেই, যাকে কোরআনের পরিপন্থী বলা যায়। বরং স্বল্পবুদ্ধিতা ও বক্রবুদ্ধিতার ফলেই নির্দেশিত হাদীসকে কোরআনের বিরোধীরূপে খাড়া করে একথা বলে গা খালাস করা হয় যে, হাদীসটি কোরআন-বিরোধী হওয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য নয়। আলোচ্য হাদীসেই দেখা গেছে যে, "তিনটি মিথ্যা" বলে যে তওরিয়া বোঝানো হয়েছে, তা স্বয়ং হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এখন তওরিয়া বোঝাতে গিয়ে كذبات (মিথ্যা) শব্দ কেন ব্যবহার করা হল? এর কারণ তাই, যা ইতিপূর্বে সূরা তোয়া-হায় মূসা (আঃ)-এর কাহিনীতে হযরত আদম (আঃ)- এর ভুলকে غوى ও عصى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণে উল্লেখ করা হয়েছে ; অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্যশীল, তাদের সামান্যতম দুর্বলতাকে এবং আযীমত ত্যাগ করে রুখসত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে দেখা হয় না। কোরআন পাক এ ধরনের বিষয়ে পয়গম্বরগণের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার ক্রোধবাণী প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে। সুপারিশ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হাদীসে আছে যে, হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার জন্যে পয়গম্বরগণের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর কোন ত্রুটির কথা স্মরণ করে সুপারিশ করতে সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষনবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি এই মহাসুপারিশের জন্যে দন্ডায়মান হবেন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ হাদীসে বর্ণিত তওরিয়ার ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যে নিজের দোষ ও ত্রুটি সাব্যস্ত করে ওযর পেশ করবেন। এই ত্রুটির দিকে ইশারা করার জন্যে হাদীসে এগুলোকে كذبات তথা, 'মিথ্যা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এরূপ করার অধিকার ছিল এবং তাঁর হাদীস বর্ণনা করার সীমা পর্যন্ত আমাদেরও এরূপ বলার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আঃ) মিথ্যা বলেছে বললে তা জায়েয হবে না। সূরা তোয়া-হায় মূসা (আঃ)-এর কাহিনীতে কুরতুবী ও বাহ্‌রে-মুহীতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন অথবা হাদীসে কোন পয়গম্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দ কোরআন তেলাওয়াত, কোরআন শিক্ষা অথবা হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায়, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোন পয়গম্বর সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ বলা নাজায়েয ও ধৃষ্টতা বৈ নয়।

উল্লেখিত হাদীসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও আমল খাঁটি করার সূক্ষ্মতা ঃ হাদীসে ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে উল্লেখিত তিনটি মিথ্যার মধ্য থেকে দু'টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহ্‌র জন্যে ছিল, কিন্তু হযরত সারাহ্ সম্পর্কে কথিত তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়নি। অথচ স্ত্রীর আবরু রক্ষা করাও সাক্ষাত দ্বীনের কাজ। এ সম্পর্কে তফসীরে-কুরতুবীতে কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী থেকে একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ণিত রয়েছে। ইবনে আরাবী বলেন ঃ তৃতীয়-মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ না বলার বিষয়টি সৎকর্মপরায়ণ ও ওলীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। যদিও এটা দ্বীনেরই কাজ ছিল, কিন্তু এতে স্ত্রীর সতীত্ব ও হেরেমের হেফাযত সম্পর্কিত পার্থিব স্বার্থও জড়িত ছিল। এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়ার কারণেই একে فِي اللهِ (আল্লাহ্‌র মধ্যে) এবং لله (আল্লাহ্‌র জন্যে) এর তালিকা থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ —(খাঁটি এবাদত আল্লাহ্‌র

জন্যেই) স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার এই ব্যাপারটি আমাদের অথবা অন্য কারও হলে নিঃসন্দেহে একেও উপরোক্ত তালিকায় গণ্য করা হত। কিন্তু পয়গম্বরগণের মাহাত্ম্য সবার উপরে। তাঁদের জন্যে এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়াকেও পূর্ণ ইখলাসের পরিপন্থী মনে করা হয়েছে।

ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে নমরূদের অগ্নিকুন্ড পুষ্পোদ্যানে পরিণত হওয়ার স্বরূপ ঃ যারা মু'জেযা ও অভ্যাসবিরুদ্ধ কার্যাবলী অস্বীকার করে, তারা এ ব্যাপারে বিচিত্র ও অভিনব অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আসল কথা এই যে, যে গুণ কোন বস্তুর সত্তার জন্যে অপরিহার্য হয়, তা কোন সময় সেই বস্তু থেকে পৃথক হতে পারে না— দর্শনশাস্ত্রের এইনীতি একটি বাতিল ও প্রমাণহীন নীতি। সত্য এই যে, জগতের সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে কোন বস্তুর সত্তার জন্যে কোন গুণ অপরিহার্য নয়। বরং আল্লাহ্র চিরাচরিত অভ্যাস এই যে, অগ্নির জন্যে উত্তাপ ও প্রজ্বলিত করা জরুরী, পানির জন্যে ঠান্ডা করা ও নির্বাপণ করা জরুরী, কিন্তু এই জরুরী অবস্থা শুধু অভ্যাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ— যুক্তিসঙ্গত নয়। দার্শনিকগণও এর যুক্তিসম্মত হওয়ার কোন গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ পেশ করতে পারেননি; এই অপরিহার্যতা যখন অভ্যস্ত, তখন আল্লাহ্ তাআলা যদি কোন বিশেষ রহস্যের কারণে কোন অভ্যাস পরিবর্তন করতে চান, তবে তা পরিবর্তন করে দেন। এই পরিবর্তনে কোন যুক্তিগত অসম্ভাব্যতা নেই। আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে অগ্নি নির্বাপণ ও শীতল করার কাজ আর পানি প্রজ্বলন কাজ করতে শুরু করে; অথচ অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই এবং পানি পানিই থাকে ; তবে কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা দলের জন্যে তা আল্লাহ্র নির্দেশে স্বীয় বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে থাকে। পয়গম্বরগণের নবুওয়ত প্রমাণ করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা নমরূদের অগ্নিকুন্ডকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন ঃ তুই শীতল হয়ে যা। ফলে অগ্নি শীতল হয়ে গেল। যদি بَرْدًا (শীতল) শব্দের আগে وَّسَلٰمًا (নিরাপদ) শব্দ না থাকত, তবে অগ্নি হিমশীতল হয়ে অনিষ্টকর হয়ে যেত। নূহ (আঃ)-এর সলিল সমাধিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ أُغْرِقُوْا فَأُدْخِلُوْا نَارًا — অর্থাৎ, তারা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করেছে।

حَرِّقُوْهُ — অর্থাৎ, সমগ্র সম্প্রদায় ও নমরূদ সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হোক। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে, একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বালানী কাষ্ঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে। এরপর তাতে অগ্নি সংযোগ করে সাত দিন পর্যন্ত প্রজ্বলিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অগ্নিশিখা আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে। তখন তারা ইবরাহীম (আঃ)-কে এই জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। কিন্তু অগ্নিকুন্ডের নিকটে যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অগ্নির অসহ্য তাপের কারণে তার ধারে-কাছে যাওয়ার সাধ্য কারও ছিল না। শয়তান ইবরাহীম (আঃ)-কে 'মিনজানিকে' (এক প্রকার নিক্ষেপণ যন্ত্র) রেখে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি বাত্লে দিল। যে সময় ইবরাহীম (আঃ) মিনজানিকের মাধ্যমে অগ্নিসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন, তখন ফেরেশতাকুল বরং দ্যুলোক ও ভূলোকের সমস্ত সৃষ্টজীব চীৎকার করে উঠল ঃ ইয়া রব, আপনার দোস্তের এ কি বিপদ! আল্লাহ্ তাদের সবাইকে ইবরাহীম (আঃ)-এর সাহায্য করার অনুমতি দিলেন। ফেরেশতাগণ সাহায্য করার জন্যে ইবরাহীম (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলাই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি আমার অবস্থা দেখছেন। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি উপস্থিত আছি। উত্তর হল ঃ প্রয়োজন তো আছে, কিন্তু আপনার কাছে নয়, পালনকর্তার কাছে।—(মাযহারী)

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ — পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর পক্ষে সম্ভবতঃ অগ্নি অগ্নিই ছিল না ; বরং বাতাসে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাহ্যতঃ অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই ছিল এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর আশপাশ ছাড়া অন্য সব বস্তুকে দহন করছিল। ইবরাহীম (আঃ)-কে যেসব রশি দ্বারা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোও পুড়ে ছাইভস্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ)-এর দেহে সামান্য আঁচও লাগেনি।

ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে আছে, ইবরাহীম (আঃ) এই অগ্নিকুন্ডে সাত দিন ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করেছি, সারা জীবন তা ভোগ করিনি।—(মাযহারী)

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ — অর্থাৎ, ইবরাহীম ও লূতকে আমি নমরূদের অধিকারভুক্ত দেশ (অর্থাৎ, ইরাক) থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্যে কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ, সিরিয়া দেশ। সিরিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাসস্থল। আভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটি পয়গম্বরগণের পীঠস্থান। অধিকাংশ পয়গম্বর এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদ-নদীর প্রাচুর্য, ফল-মূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা শুধু সে দেশবাসীই নয়, বহির্বিশ্বের লোকেরাও ভোগ করে থাকে।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ۚ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً — অর্থাৎ, আমি তাঁকে (দোয়া ও অনুরোধ আনুযায়ী) পুত্র ইসহাক ও অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকূবও নিজের পক্ষ থেকে দান করলাম। দোয়ার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে نافلة বলা হয়েছে।

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿٧٣﴾
وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ
كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٤﴾
وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ۭ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾ وَنُوْحًا
اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ
الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوٗدَ
وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ
الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ
وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۡ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ
يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۭ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ
لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ
شٰكِرُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖٓ
اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۭ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾

(৭৩) আমি তাঁদেরকে নেতা করলাম। তাঁরা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন। আমি তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল করলাম সৎকর্ম করার, নামায কায়েম করার এবং যাকাত দান করার। তাঁরা আমার এবাদতে ব্যাপৃত ছিল। (৭৪) এবং আমি লূতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাঁকে ঐ জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। তারা মন্দ ও নাফরমান সম্প্রদায় ছিল। (৭৫) আমি তাকে আমার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। সে ছিল সৎকর্মশীলদের একজন। (৭৬) এবং স্মরণ করুন নূহকে ; যখন তিনি এর পূর্বে আহ্বান করেছিলেন, তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম, অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (৭৭) এবং আমি তাঁকে ঐ সম্প্রদায়ের বিপক্ষে সাহায্য করেছিলাম, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছিল। নিশ্চয়, তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম। (৭৮) এবং স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলেন। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি সুলায়মানকে সে ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম; তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম। (৮০) আমি তাঁকে তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? (৮১) এবং সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হত ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যে জনপদ থেকে লূত (আঃ)-কে উদ্ধার করার কথা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই জনপদের নাম ছিল সাদূম। এর অধীনে আরও সাতটি জনপদ ছিল। এগুলোকে জিবরাঈল (আঃ) ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। শুধু লূত (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদের বসবাসের জন্যে একটি জনপদ অক্ষত রেখে দেয়া হয়েছিল।—(কুরতুবী)

تَعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ - **خبائث** শব্দটি **خبيثة**—এর বহুবচন। অনেক নোংরা ও অশ্লীল অভ্যাসকে **خبائث** বলা হয়। "লাওয়াতাত" ছিল তাদের সর্বপ্রধান নোংরা অভ্যাস, যা থেকে বন্য জন্তুরাও বেঁচে থাকে। অর্থাৎ, পুরুষের সাথে পুরুষের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। এখানে বিরাট অপরাধ হওয়ার দিক দিয়ে এই একটিমাত্র অভ্যাসকে **خبائث** বলা হয়ে থাকলে তাও অবান্তর নয়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এ ছাড়া অন্যান্য নোংরা অভ্যাসও যে তাদের মধ্যে ছিল, তাও রেওয়ায়েতসমূহে উল্লেখিত আছে। রূহুল মা'আনীর বরাত দিয়ে তফসীরের সার-সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এদিক দিয়ে সমষ্টিকে **خبائث** বলা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়।

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ — **من قبل** এর অর্থ ইবরাহীম ও লূত (আঃ)-এর পূর্বে হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নূহ (আঃ)-এর যে আহ্বানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা নূহে আছে। তা এই যে, তিনি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে বলেছিলেন ঃ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا —অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার, পৃথিবীর বুকে কোন কাফের অধিবাসীকে থাকতে দিয়ো না। অন্যত্র আছে, নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় যখন কোনরূপেই তাঁর উপদেশ মানল না, তখন তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করলেন, اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ —অর্থাৎ, আমি অপারগ ও অক্ষম হয়ে গেছি, আপনিই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ - **كرب عظيم** (মহাসংকট) বলে হয় সমগ্র জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় ঐ জাতির নির্যাতন বোঝানো হয়েছে, যা তারা বন্যার পূর্বে নূহ (আঃ) ও তাঁর পরিবার-বর্গের প্রতি চালাত।

نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ -অভিধানে **نفش** শব্দের অর্থ রাত্রিকালে শস্যক্ষেত্রে জন্তু ঢুকে পড়ে ক্ষতিসাধন করা।

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ - فَفَهَّمْنٰهَا শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যতঃ মোকদ্দমা ও তার ফয়সালা বোঝা যায়। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে যে ফয়সালা পছন্দনীয় ছিল, তিনি তা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিলেন। মোকদ্দমা ও ফয়সালার বিবরণ বিভিন্ন তফসীরে বর্ণিত রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, দাউদ (আঃ)-এর ফয়সালাও শরীয়তের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিল না, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা সুলায়মান (আঃ)-কে যে ফয়সালা বুঝিয়ে দেন, তাতে উভয়পক্ষের রেয়াত ও উপকারিতা ছিল। তাই আল্লাহ্‌র কাছে তা পছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম বগভী হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্ ও যুহরী থেকে এভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন ঃ দুই লোক হযরত দাউদ (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক ও

অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। (সম্ভবতঃ বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিল। তাই) হযরত দাউদ (আঃ) রায় দিলেন যে, ছাগপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পন করুক। (কেননা, ফেকাহ্‌র পরিভাষায় 'যাওয়াতুল কেয়াম' অর্থাৎ, যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেয়া হয়। ছাগপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের মূল্যের সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেয়া হয়েছে।) বাদী ও বিবাদী উভয়ই হযরত দাউদের আদালত থেকে বের হয়ে আসলে (দরজায় তাঁর পুত্র) সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তা শুনিয়ে দেয়। হযরত সুলায়মান বললেন ঃ আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হত এবং উভয়পক্ষের জন্যে উপকারী হত। অতঃপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে একথা জানালেন। হযরত দাউদ বললেন ঃ এই রায় থেকে উত্তম এবং উভয়ের জন্যে উপকারী রায়টা কি? সুলায়মান বললেন ঃ আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত ছাগপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন শস্যক্ষেত্র ক্ষেতের মালিককে এবং ছাগ পাল ছাগলের মালিককে প্রত্যর্পণ করুন। হযরত দাউদ (আঃ) এই রায় পছন্দ করে বললেনঃ বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয়পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন।

রায়দানের পর কোন বিচারকের রায় ভঙ্গ ও পরিবর্তন ঃ এখানে প্রশ্ন হয়, দাউদ (আঃ) যখন এক রায় দিয়েছিলেন, তখন সুলায়মান (আঃ)- এর কি তা ভঙ্গ করার অধিকার ছিল? যদি হযরত দাউদ নিজেই তাঁর রায় শুনে নিজের সাবেক রায় ভঙ্গ করে দ্বিতীয় রায় জারি করে থাকেন, তবে কোন বিচারকের এরূপ করার অধিকার আছে কি না? কুরতুবী এখানে এ ধরনের বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে, যদি কোন বিচারক শরীয়তের প্রমাণাদি সাধারণ মুসলিম আইনবিদদের মতামতের বিপক্ষে কোন রায় শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দান করে, তবে সেই রায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল গণ্য হবে। অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায়ের বিপরীত রায় দেয়া শুধু জায়েযই নয়; বরং ওয়াজিব এবং এই বিচারককে পদচ্যুত করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কোন বিচারকের রায় শরীয়তসম্মত ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল এবং ইজতিহাদের মূলনীতির অধীন হয়, তবে অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায় ভঙ্গ করা জায়েয নয়। কেননা, এই রীতি প্রবর্তিত হলে মহা অনর্থ দেখা দেবে, ইসলামী আইন খেলার বস্তুতে পরিণত হবে এবং রোজই হালাল ও হারাম পরিবর্তিত হবে। তবে যদি রায়দানকারী বিচারক স্বয়ং ইজতিহাদের মূলনীতি অনুযায়ী রায়দান করার পর ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন যে, প্রথম রায় ও প্রথম ইজতিহাদে ভুল হয়ে গেছে, তবে তা পরিবর্তন করা জায়েয, বরং উত্তম। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) আবু মুসা আশআরীর নামে বিচার ও রায়দানের মূলনীতি সম্বলিত একটি বিস্তারিত চিঠি লিখেছিলেন। তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, রায় দেয়ার পর ইজতিহাদ পরিবর্তিত হয়ে গেলে প্রথম রায় পরিবর্তন করা উচিত। এই চিঠি দারাকুতনী সনদসহ বর্ণনা করেছেন।— (কুরতুবী সংক্ষেপিত)

পর্বত ও পক্ষীকুলের তসবীহ্ ঃ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ – হযরত দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা বাহ্যিক গুণাবলীর মধ্যে সুমধুর কণ্ঠস্বরও দান করেছিলেন। তিনি যখন যবূর পাঠ করতেন, তখন পক্ষীকূল শূন্যে থেমে যেত এবং তাঁর সাথে তসবীহ্ পাঠ করতে থাকত। এমনিভাবে পর্বত ও বৃক্ষ থেকেও তসবীহ্‌র আওয়াজ শোনা যেত। সুমধুর কণ্ঠস্বর ছিল একটি বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের তসবীহ্ পাঠে শরীক হওয়া ছিল আল্লাহ্‌র কুদরতের অধীন একটি মু'জেযা। মু'জেযার জন্য পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের মধ্যে জীবন ও চেতনা থাকা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেক অচেতন বস্তুর মধ্যেও মু'জেযা হিসেবে চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া প্রামাণ্য সত্য এই যে, পাহাড় ও পাথরসমূহের মধ্যেও তাদের উপযোগী জীবন ও চেতনা বিদ্যমান রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবু মুসা আশআরী অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি যখন কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাঁর তেলাওয়াত শোনার জন্যে থেমে পড়েন এবং নিবিষ্ট মনে শুনতে থাকেন। এরপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা তাকে হযরত দাউদ (আঃ)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরই দান করেছেন। আবু মুসা যখন জানতে পারলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর তেলাওয়াত শুনেছেন, তখন আরয করলেন ঃ আপনি শুনছেন— একথা আমার জানা থাকলে আমি আরও সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম।— (ইবনে-কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন তেলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিত্তাকর্ষক উচ্চারণ এক পর্যায়ে কাম্য ও পছন্দনীয়। তবে আজকালকার ক্বারীদের ন্যায় এতো বাড়াবাড়ি না হওয়া উচিত। তাঁরা শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করার জন্যে শুধু আওয়াজ সুন্দর করারই চেষ্টা করে থাকেন। ফলে তেলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্যই গায়ব হয়ে যায়।

বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শিক্ষা দান করা হয়েছিল ঃ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ – অস্ত্র জাতীয় সামগ্রীর মধ্যে যেগুলো পরিধান করে অথবা গলায় লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়, অভিধানে তাকেই لباس বলা হয়। এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধে হেফাযতের জন্যে ব্যবহৃত হয়। অন্য এক আয়াতে আছে وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ – অর্থাৎ, আমি দাউদের জন্যে লোহা নরম করে দিয়েছিলাম। এই নরম করার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। (এক) তাঁর হাতের স্পর্শে লোহা আপনা-আপনি নরম হয়ে যেত। তিনি মোমের ন্যায় তাকে যেভাবে ইচ্ছা মোটা-সরু করতে পারতেন। (দুই) আগুনে গালিয়ে নরম করার কৌশল তাঁকে বলে দেয়া হয়েছিল, যা আজকাল লৌহ কারখানাসমূহে অনুসৃত হয়।

যে শিল্প দ্বারা সাধারণ লোকের উপকার হয়, তা কাম্য ও পয়গম্বরগণের কাজ ঃ আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প দাউদ (আঃ)-কে শেখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর রহস্যও বলে দেয়া হয়েছে যে, لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ অর্থাৎ, যাতে এই বর্ম তোমাদেরকে যুদ্ধে সুতীক্ষ্ম তরবারির আঘাত থেকে হেফাযত করে। এই প্রয়োজন থেকে দ্বীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার, কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেয়াকে আল্লাহ্ তাআলা নেয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে জানা গেল যে, যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা

শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া সওয়াবের কাজ; তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। পয়গম্বরগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে বর্ণিত আছে; যেমন দাউদ (আঃ) থেকে শস্য বপন ও কর্তনের কাজ বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (আঃ) বলেন ঃ যে শিল্পী জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত মুসা –জননীর মত। তিনি নিজের সন্তানকেই দুধ পান করিয়েছেন এবং লাভের মধ্যে ফেরআউনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এমনিভাবে যে জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, সে জনসেবার সওয়াব তো পাবেই; তদুপরি শিল্পকর্মের পার্থিব উপকারও সে লাভ করবে। সূরা তোয়াহায় মূসা (আঃ)–এর কাহিনীতে এই হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে বায়ুকে বশীভূত করা এবং এতদসংক্রান্ত মাসআলা ঃ হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, সামরিক ঘোড়া পরিদর্শনে লিপ্ত হয়ে যখন সুলায়মান (আঃ)–এর আসরের নামায ফওত হয়ে যায়, তখন এই উদাসীনতার জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তিনি এর মূল কারণ ঘোড়াসমূহকে অকর্মণ্য করে দেন। আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি একাজ করেছিলেন। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ঘোড়ার চাইতে উত্তম ও দ্রুতগামী সওয়ারী বায়ু দান করলেন। এই ঘটনার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তফসীর সূরা সোয়াদে বর্ণিত হবে।

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً – এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ এর সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যেমন দাউদ (আঃ)–এর জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তাঁর আওয়াজের সাথে তসবীহ্ পাঠ করত, তেমনি সুলায়মান (আঃ)–এর জন্যে বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুতে ভর করে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে যেতেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, দাউদ (আঃ)–এর বশীভূতকরণের মধ্যে مع (সাথে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তাঁর সাথে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম এবং এখানে ل (জন্যে) বর্ণ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, বায়ুকে সুলায়মানের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছিলাম। এতে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে যে, উভয় বশীভূতকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। দাউদ (আঃ) যখন তেলাওয়াত করতেন, তখন পর্বত ও পক্ষীকূল স্বতঃস্ফূর্তভাবে তসবীহ্ পাঠ শুরু করত, তাঁর আদেশের জন্যে অপেক্ষা করত না। পক্ষান্তরে সুলায়মান (আঃ)–এর জন্যে বায়ুকে তাঁর আদেশের অধীন করে দেয়া হয়েছিল। তিনি যখন ইচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা বায়ুকে আদেশ করতেন, বায়ু তাঁকে তার বিশাল সিংহাসন এবং লোক লস্করসহ সেখানে পৌঁছে দিত; যেখানে নামতে চাইতেন, সেখানে নামিয়ে দিত এবং যখন ফিরে আসতে চাইতেন, ফিরিয়ে দিয়ে যেত।—(রূহুল–মা'আনী, বায়যাভী)

তফসীর ইবনে কাসীরে সুলায়মান (আঃ)–এর সিংহাসনের বাতাসে ভর করে চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সুলায়মান (আঃ) কাঠের একটি বিরাট ও বিস্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পারিষদবর্গ, সৈন্য–সামন্ত ও যুদ্ধাস্ত্রসহ এই সিংহাসনে সওয়ার হয়ে বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটকায় বিস্তৃত ও প্রশস্ত সিংহাসন তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হত, সেখানে পৌঁছে নামিয়ে দিত। এই হাওয়াই সিংহাসন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একমাসের দূরত্ব এবং দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একমাসের দূরত্ব অতিক্রম করত; অর্থাৎ, একদিনে দুই মাসের পথ এর সাহায্যে অতিক্রম করা যেত। ইবনে হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, সুলায়মান (আঃ)–এর সিংহাসনের উপর ছয় লক্ষ আসন স্থাপন করা হত। এগুলোতে সুলায়মান (আঃ)–এর সাথে ঈমানদার মানুষ এবং তাদের পেছনে ঈমানদার জিনরা উপবেশন করত। এরপর সমগ্র সিংহাসনের উপর ছায়া দান করার জন্যে পক্ষীকুলকে আদেশ করা হত, যাতে সূর্যের উত্তাপে কষ্ট না হয়। এরপর আদেশ অনুযায়ী বায়ু এই বিরাট সমাবেশকে যেখানে আদেশ হত, পৌঁছে দিত। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে সুলায়মান (আঃ) মাথা নত করে আল্লাহ্‌র যিকর ও শোকরে মশগুল থাকতেন, ডানে, বামে তাকাতেন না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করতেন।— (ইবনে কাসীর)

عَاصِفَةً এর শাব্দিক অর্থ প্রবল বায়ু। কোরআন পাকের অন্য আয়াতে এই বায়ুর বিশেষণ رخاء বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ মৃদু বাতাস, যাতে ধুলা উড়ে না এবং শূন্যে তরঙ্গ–সংঘাত সৃষ্টি হয় না। বাহ্যতঃ এই দু'টি বিশেষণ পরস্পর বিরোধী। কিন্তু উভয়টির একত্র সমাবেশ এভাবে সম্ভবপর যে, এই বায়ু সত্তাগতভাবে প্রখর ও প্রবল ছিল। ফলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে একমাসের পথ অতিক্রম করত; কিন্তু আল্লাহ্‌র কুদরত তাকে এমন করে দিয়েছিল যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় শূন্যে তরঙ্গ–সংঘাত সৃষ্টি হত না। বর্ণিত রয়েছে যে, এই সিংহাসনের চলার পথে শূন্যে কোন পাখীরও কোনরূপ ক্ষতি হত না।

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾ وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۗ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾ وَزَكَرِيَّاۤ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۫ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾

(৮২) এবং অধীন করেছি শয়তানদের কতককে, যারা তাঁর জন্যে ডুবুরীর কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম। (৮৩) এবং স্মরণ করুন আইয়্যুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিলেনঃ আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। (৮৪) অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দুঃখকষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশতঃ; আর এটা এবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ। (৮৫) এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলের কথা স্মরণ করুন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সবরকারী। (৮৬) আমি তাঁদেরকে আমার রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তাঁরা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ। (৮৭) এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহবান করলেনঃ তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গোনাহগার। (৮৮) অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি। (৮৯) এবং যাকারিয়ার কথা স্মরণ করুন, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহবান করেছিলঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস। (৯০) অতঃপর আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তার জন্যে তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম। তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে জিন ও শয়তানকে বশীভূতকরণঃ وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ –অর্থাৎ, আমি সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে শয়তানদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর জন্যে সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত; যেমন–অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে, يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ –অর্থাৎ, তারা সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মূর্তি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়ালা তৈরী করত। সুলায়মান তাদের অধিক পরিশ্রমের কাজেও নিয়োজিত করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করাতেন এবং আমিই তাদের রক্ষক ছিলাম।

شَيٰطِيْنَ –শয়তান হচ্ছে বুদ্ধি ও চেতনাবিশিষ্ট অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট সূক্ষ্ম দেহ। মানুষের ন্যায় তারাও শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট। এই জাতিকে বোঝাবার জন্যে আসলে جن অথবা جنات শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার নয়— কাফের, তাদেরকেই শয়তান বলা হয়। বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সব জিন সুলায়মান (আঃ)-এর বশীভূত ছিল, কিন্তু মুমিনরা বশীভূতকরণ ছাড়াই সুলায়মান (আঃ)-এর নিদর্শনাবলী ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে পালন করত। তাদের ক্ষেত্রে বশীভূতকরণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই বশীভূতকরণের অধীনে শুধু شَيٰطِيْنَ তথা কাফের জিনদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কুফর ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও জবরদস্তি সুলায়মান (আঃ)-এর আজ্ঞাধীন থাকত। সম্ভবতঃ এ কারণেই আয়াতের শেষে যোগ করা হয়েছে যে, আমিই তাদেরকে সামলিয়ে রাখতাম। নতুবা কাফের জিনদের তরফ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা বরাবরই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার হেফাযতে তারা কোন ক্ষতি করতে পারত না।

একটি সূক্ষ্ম তত্ত্বঃ দাউদ (আঃ)-এর জন্যে আল্লাহ্ তাআলা সর্বাধিক শক্ত ও ঘন পদার্থকে বশীভূত করেছিলেন; যথা পর্বত, লৌহ ইত্যাদি। সুলায়মান (আঃ)- এর জন্যে দেখাও যায় না এমন সূক্ষ্ম বস্তুকে বশীভূত করেছেন; যেমন বায়ু জিন ইত্যাদি। এতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার শক্তি সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত।—(তফসীর কবীর)

আইয়্যুব (আঃ)-এর কাহিনীঃ আইয়্যুব (আঃ)-এর কাহিনী সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসবিদগণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, এমন রেওয়ায়েতই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। কোরআন পাক থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তাঁর সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব সবই উধাও হয়ে গিয়েছিল, মৃত্যুবরণ করে কিংবা অন্য কোন কারণে। এরপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে দেন; বরং তাদের তুলনায় আরও অধিক দান করেন। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশের কিছু প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। হাফেয ইবনে কাসীর কাহিনীর বিবরণ এভাবে দিয়েছেনঃ

আল্লাহ্ তাআলা আইয়্যুব (আঃ)-কে প্রথম দিকে অগাধ ধন-দৌলত,

সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালান-কোঠা, যানবাহন, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান করেছিলেন। এরপর তাঁকে পয়গম্বরসুলভ পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে, এসবই তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং দেহেও কুষ্ঠের ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে। জিহ্বা ও অন্তর ব্যতীত দেহের কোন অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই জিহ্বা ও অন্তরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে সব প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি ভাগারে অর্থাৎ, আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয়। কেউ তাঁর কাছে যেত না। শুধু তাঁর স্ত্রী তাঁর দেখাশোনা করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইউসুফ (আঃ)-এর কন্যা অথবা পৌত্রী। তাঁর নাম ছিল লাইয়্যা বিনতে মেশা ইবনে ইউসুফ (আঃ)।— [ইবনে-কাসীর] সাহায্য-সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী মেহনত-মজুরী করে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ এবং তাঁর সেবাযত্ন করতেন। আইয়্যুব (আঃ)-এর এই পরীক্ষা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل অর্থাৎ, পয়গম্বরগণ সবচাইতে বেশী বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তাঁদের পর অন্যান্য সৎকর্মপরায়ণ পর্যায়ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হন। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে ঃ প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়ণতায় যে যত বেশী মজবুত; তার বিপদ এবং পরীক্ষাও তত অধিক হয় (যাতে এই পরিমাণেই মর্তবা আল্লাহ্‌র কাছে উচ্চ হয়)। আল্লাহ্ তাআলা আইয়্যুব (আঃ)-কে পয়গম্বরগণের মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবরের বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন (যেমন দাউদ (আঃ)-কে শোকরের এমনি স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছিল)। বিপদাপদ ও সংকটে সবর করার ক্ষেত্রে আইয়্যুব (আঃ) উপমেয় ছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে মায়সারাহ্ বলেন ঃ আল্লাহ্ যখন আইয়্যুব (আঃ)-কে অর্থকড়ি, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি জাগতিক নেয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি মুক্ত মনে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও এবাদতে আরও বেশী আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে আরয করেন ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার শোকর আদায় করি এ কারণে যে, তুমি আমাকে সহায়-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করেছ। এদের মহব্বত আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করি যে, তুমি আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন আমার ও তোমার মধ্যে কোন অন্তরায় অবশিষ্ট নেই।

আইয়্যুব (আঃ)-এর দোয়া সবরের পরিপন্থী ছিল না ঃ হযরত আইয়্যুব (আঃ) পার্থিব ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। কোন সময় হা-হুতাশ, অস্থিরতা ও অভিযোগের কোন বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেননি। সতী সাধ্বী স্ত্রী লাইয়্যা একবার-আরযও করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার অসংখ্য নেয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপাত করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন? পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিম্মত করতেন না যে, কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায়! (অথচ আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ-কষ্ট পেশ করা বে-সবরীর অন্তর্ভুক্ত নয়।) অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, যা তাঁকে দোয়া করতে বাধ্য করল। বলাবাহুল্য, তাঁর এই দোয়া দোয়াই ছিল— বেসবরী ছিল না। আল্লাহ্ তাআলা কোরআন পাকে তাঁর সবরের স্বাক্ষর রেখে বলেছেন ঃ إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا -(আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি)। যে কারণে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন, সেই কারণ বর্ণনায় রেওয়ায়েতসমূহে বিভিন্নরূপ এবং দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। তাই সেগুলো পরিত্যাগ করা হল।

ইবনে আবী হাতেম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আইয়্যুব (আঃ)-এর দোয়া কবুল হওয়ার পর তাঁকে আদেশ করা হল ঃ পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করুন। মাটিতে পরিষ্কার পানির ঝরণা দেখা দেবে। এই পানি পান করুন এবং তদ্দ্বারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগ-ব্যাধি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হযরত আইয়্যুব (আঃ) তদ্রূপই করলেন। ঝরণার পানি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষত-জর্জরিত ও অস্থিচর্মসার দেহ নিমেষের মধ্যে রক্ত-মাংসে ও কেশমণ্ডিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জন্যে জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি জান্নাতী পোশাক পরিধান করতঃ আবর্জনার স্তূপ থেকে একটু সরে গিয়ে একপাশে বসে রইলেন। স্ত্রী নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর দেখাশোনা করতে আগমন করলেন, কিন্তু তাঁকে তাঁর স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। একপাশে উপবিষ্ট আইয়্যুব (আঃ)-কে চিনতে না পেরে তিনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি জানেন কি, এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে থাকতেন, তিনি কোথায় গেলেন? কুকুর ও ব্যাঘ্র কি তাঁকে খেয়ে ফেলেছে? অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ করলেন। সবকিছু শুনে আইয়্যুব (আঃ) বললেন ঃ আমিই আইয়্যুব। কিন্তু স্ত্রী তখনও তাঁকে চিনতে না পেরে বললেন ঃ আপনি কি আমার সাথে পরিহাস করছেন? আইয়্যুব (আঃ) আবার বললেন ঃ লক্ষ্য করে দেখ, আমিই আইয়্যুব। আল্লাহ্ তাআলা আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এরপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ধন-দৌলত ফিরিয়ে দিলেন এবং সন্তান-সন্ততিও। শুধু তাই নয়, সন্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি সন্তানও দান করলেন।— (ইবনে-কাসীর)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ হযরত আইয়্যুব (আঃ)-এর সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা যখন তাঁকে সুস্থতা দান করলেন, তখন সন্তানদেরকেও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং স্ত্রীর গর্ভে নতুন সন্তানও এই পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করে। একেই কোরআনে وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। শা'বী বলেন ঃ এই উক্তি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের নিকটতম।— (কুরতুবী)

যুলকিফল নবী ছিলেন, না ওলী ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তিন জন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল ও ইদরীস যে নবী ও রসূল ছিলেন, তা কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। কোরআন পাকে তাঁদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয় জন হচ্ছেন যুলকিফল। ইবনে-কাসীর বলেন ঃ তাঁর নাম দু'জন পয়গম্বরের সাথে শামিল করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি পয়গম্বরগণের কাতারভুক্ত ছিলেন

না; বরং একজন সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। তফসীরবিদ ইবনে জরীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়াসা। (যিনি পয়গম্বর ছিলেন বলে কোরআনে উল্লেখ আছে) বার্ধক্যে উপনীত হয়ে একজনকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষ থেকে পয়গম্বরের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে। এ উদ্দেশে তিনি তাঁর সব সাহাবীকে একত্রিত করে বললেন ঃ আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করতে চাই। যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকবে, তাকেই আমি খলীফা নিযুক্ত করব। শর্ত তিনটি এই ঃ সদাসর্বদা রোযা রাখা, এবাদতে রাত্রি জাগরণ করা এবং কোন সময় রাগান্বিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্য থেকে জনৈক অখ্যাত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তাকে সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক বলে মনে করতঃ সে বলল ঃ আমি এই কাজের জন্যে উপস্থিত আছি। হযরত ইয়াসা' জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি সদাসর্বাদা রোযা রাখ, এবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোন সময় গোস্সা কর না? লোকটি বলল ঃ নিঃসন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। হযরত ইয়াসা' সম্ভবতঃ তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারেলেন না, তাই সেদিনকার মত তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশকে লক্ষ্য করে একথা বললেন। উপস্থিত সবাই নিশ্চুপ রইল এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তিই আবার দণ্ডায়মান হল। তখন হযরত ইয়াসা' তাকে খলীফা নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। যুলকিফল এই পদ লাভে সফল হয়েছে দেখেন, শয়তান তার সাঙ্গোপাঙ্গদেরকে বলল ঃ যাও কোনরূপে এই ব্যক্তি দ্বারা এমন কাজ করিয়ে নাও, যদ্দরুন তার এই পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাঙ্গপাঙ্গরা অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল ঃ সে আমাদের বশে আসার পাত্র নয়। ইবলীস বলল ঃ তাহলে কাজটি আমার হাতেই ছেড়ে দাও, আমি তাকে দেখে নেব। হযরত যুলকিফল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সারা দিন রোযা রাখতেন এবং সারারাত জাগ্রত থাকতেন। শুধু দুপুরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। শয়তান ঠিক দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত হল এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে? উত্তর হল ঃ আমি একজন বৃদ্ধ মযলুম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুক ভেতরে পৌছে দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল যে, আমার সাথে আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপর এই জুলুম করেছে, সেই যুলুম করেছে। এভাবে দুপুরের নিদ্রার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। যুলকিফল বললেন ঃ আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো। আমি তোমার বিচার করে দেব।

যুলকিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্যে অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে আগমন করল না। পরের দিন যখন তিনি মোকদ্দমার ফয়সালা করার জন্যে আদালতে বসলেন, তখনও এই বৃদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করলেন ; কিন্তু তাকে দেখা গেল না। দুপুরে যখন নিদ্রার জন্যে গৃহে গেলেন, তখন লোকটি এসে দরজা পিটাতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কে? উত্তর হল ঃ আমি একজন বৃদ্ধ মযলুম। তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে বলিনি যে, মজলিসে বসার সময় এসো। তুমি কালও আসনি, আজ সকাল থেকেও তোমার দেখা নেই। সে বলল ঃ হুযুর, আমার শত্রুপক্ষ খুবই ধূর্ত প্রকৃতির। আপনাকে মজলিসে বসা দেখলে তারা আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে স্বীকার করে নেয়। আপনি যখন মজলিস ত্যাগ করেন, তখন আবার অস্বীকার করে বসে। এই কথাবার্তার মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে গেল এবং নিদ্রা হল না। তিনি বাইরে এসে মজলিসে বৃদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, কিন্তু তার পাত্তা পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন দুপুর হলে তিনি নিদ্রায় ঢুলতে লাগলেন। গৃহে এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে দিলেন যে, কেউ যেন কড়া নাড়া না দেয়। বৃদ্ধ এদিনও আগমন করল এবং কড়া নাড়া দিতে চাইল। সবাই নিষেধ করলে সে জানালা পথে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় আঘাত করতে লাগল। যুলকিফল জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ আছে এবং বৃদ্ধ ঘরের ভেতরে উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি ভেতর ঢুকলে কি ভাবে? তখন যুলকিফল চিনতে পারলেন যে, সে শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তিনি বললেন ঃ তা হলে তুমি আল্লাহ্র দুশমন ইবলীস। সে স্বীকার করে বলল ঃ আপনি আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জালে আবদ্ধ হননি। এখন আমি আপনাকে কোনরূপে রাগান্বিত করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ইয়াসা' নবীর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। এ উদ্দেশেই আমি এসব কাণ্ড করেছি। এই ঘটনার কারণেই তাঁকে যুলকিফলের খেতাব দান করা হয়। যুলকিফল শব্দের অর্থ অঙ্গীকার ও দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত যুলকিফল তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন।—(ইবনে-কাসীর)

আলোচনার সারমর্ম এই যে, যুলফিকল হযরত ইয়াসা নবীর খলীফা সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। সম্ভবতঃ বিশেষ ও পছন্দনীয় আমলের কারণে আয়াতে পয়গম্বরগণের কাতারে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও অবাস্তব নয় যে, প্রথমে তিনি ইয়াসা' নবীর খলীফাই ছিলেন, পরে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নবুওয়তের পদও দান করেছিলেন।

وَذَا النُّوْنِ — হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আঃ) -এর কাহিনী কোরআন পাকের সূরা ইউনুস, সূরা আম্বিয়া, সূরা ছাফফাত ও সূরা নূনে বিবৃত হয়েছে। কোথাও তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও 'যুননূন' এবং কোথাও 'ছাহেবুল-হুত' উল্লেখ করা হয়েছে। নুন ও হুত উভয় শব্দের অর্থ মাছ। কাজেই যুন-নুন ও ছাহেবুল-হুতের অর্থ মাছওয়ালা। ইউনুস (আঃ)-কে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই আশ্চর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে যুন-নুনও বলা হয় এবং ছাহেবুল-হুত শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়।

ইউনুস (আঃ)-এর কাহিনী ঃ তফসীর ইবনে-কাসীরে আছে, ইউনুস (আঃ)-কে মুসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সৎকর্মের দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ইউনুস (আঃ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে যে, এখন আযাব এসেই যাবে। (কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আযাবের কিছু কিছু চিহ্নও ফুটে উঠেছিল) অনতিবিলম্বে তারা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা চতুষ্পদ জন্তু ও বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্তুদের বাচ্চারা মাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের খাঁটি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব হটিয়ে দেন। এদিকে ইউনুস (আঃ) ভাবছিলেন যে, আযাব আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব আসেনি এবং তাঁর সম্প্রদায় সুস্থ ও নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তান্বিত হলেন যে, এখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল।—(মাযহারী) এর ফলে ইউনুস (আঃ)-এর

প্রাণনাশেরও আশঙ্কা দেখা দিল। তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে একটি নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। মাঝিরা বলল যে, আরোহীদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা ডুবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে লটারী করা হলে ঘটনাচক্রে এখানে ইউনুস (আঃ)-এর নাম বের হল। (আরোহীরা বোধ হয় তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই) তারা তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে অস্বীকৃত হল। পুনরায় লটারী করা হল। এবারও ইউনুস (আঃ)-এর নামই বের হল। আরোহীরা তখনও দ্বিধাবোধ করলে তৃতীয়বার লটারী করা হল। কিন্তু নাম ইউনুস (আঃ)-এরই বের হল। এই লটারীর কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ অর্থাৎ, লটারীর ব্যবস্থা করা হলে ইউনুস (আঃ)-এর নামই তাতে বের হয়। তখন ইউনুস (আঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ্ তাআলা সবুজ সাগরে এক মাছকে আদেশ দিলে সে সাগরের পানি চিরে দ্রুতগতিতে সেখানে পৌঁছে যায় (ইবনে মাসউদের উক্তি) এবং ইউনুস (আঃ)-কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ্ তাআলা মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস (আঃ)-এর অস্থি-মাংসের যেন কোন ক্ষতি না হয় ; সে তার খাদ্য নয়, বরং তার উদর কয়েকদিনের জন্যে তাঁর কয়েদখানা। (ইবনে-কাসীর) কোরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই ইউনুস (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই কার্যক্রম আল্লাহ্ তাআলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি অসন্তোষের কারণ হন এবং তাঁকে সমুদ্রে মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়।

ইউনুস (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে তিন দিনের মধ্যে আযাব আসার ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। বাহ্যতঃ এটা তাঁর নিজের মতে ছিল না ; বরং আল্লাহ্র ওহীর কারণে ছিল। পয়গম্বরগণের সনাতন রীতি অনুযায়ী নিজের জনগোষ্ঠীকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াটাও বাহ্যতঃ আল্লাহ্র নির্দেশেই হয়ে থাকবে। এ পর্যন্ত এরূপ কোন ভ্রান্তি ছিল না, যা আল্লাহ্র অসন্তোষের কারণ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যখন সম্প্রদায়ের খাঁটি তওবা ও কান্নাকাটি কবুল করে তাদের উপর থেকে আযাব অপসৃত করেন, তখন তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে না আসা এবং হিজরতের উদ্দেশে সফর করা তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ছিল। তাঁর ইজতিহাদ ছিল এই যে, এই পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হব এবং আমার দাওয়াত প্রভাব হারিয়ে ফেলবে ; বরং প্রাণ-নাশেরও আশঙ্কা আছে। তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তজ্জন্যে আল্লাহ্ তাআলা ধরপাকড় করবেন না। নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে হিজরতের সংকল্প করা এবং ওহীর অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া যদিও গোনাহ্ ছিল না, কিন্তু উত্তম পন্থার খেলাফ অবশ্যই ছিল। তাই আল্লাহ্ তাআলা তা পছন্দ করেননি। পয়গম্বর ও আল্লাহ্র নৈকট্যশীলদের মর্তবা অনেক উর্ধ্বে। তাঁদের অভিরুচি-জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে তাঁদের পক্ষ থেকে সামান্য ত্রুটি হলে তজ্জন্যে ধৃত করা হয়। এ কারণেই ইউনুস (আঃ) আল্লাহ্র রোষে পতিত হন।

তফসীরে কুরতুবীতে কুশায়রী থেকেও বর্ণিত আছে যে, বাহ্যতঃ তাঁর পছন্দের বিপরীতে সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব হটে যাওয়ার পরই ইউনুস (আঃ)-এর প্রতি রোষের এই ঘটনা সংঘটিত হয়। মাছের পেটে কয়েকদিন অবস্থান করাও আযাবদানের উদ্দেশে নয়, শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশে ছিল ; যেমন পিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে শাসালে তা শিষ্টাচার শিক্ষাদান গণ্য হয়ে থাকে ; যাতে ভবিষ্যতে সে সতর্ক হয়।—(কুরতুবী) ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করার পর এবার আয়াতসমূহে বর্ণিত শব্দাবলীর তফসীর দেখুন।

ذَهَبَ مُغَاضِبًا — অর্থাৎ, ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। বাহ্যতঃ এখানে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখ থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। তাঁরা رب শব্দটিকে مُغَاضِبًا এর مفعول বলেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যও مغاضبا لربه অর্থাৎ, পালনকর্তার খাতিরে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। কাফের ও পাপাচারীদের প্রতি আল্লাহ্র খাতিরে রাগান্বিত হওয়া সাক্ষাত ঈমানের আলামত।—(কুরতুবী, বাহরে-মুহীত)

فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ —অভিধানের দিক দিয়ে نقدر শব্দের তিন রকম অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, যদি قدرت ধাতু থেকে উদ্ভূত হয়, তবে আয়াতের অর্থ হবে, তিনি ধারণা করলেন যে, আমি তাকে কাবু করতে পারব না। বলাবাহুল্য, এরূপ ধারণা কোন পয়গম্বর তো দূরের কথা, সাধারণ মুসলমানও করতে পারে না। কারণ, এরূপ মনে করা প্রকাশ্য কুফর। কাজেই আয়াতে এই অর্থ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়, এটা قدر ধাতু থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এর অর্থ সংকীর্ণ করা ; যেমন এক আয়াতে রয়েছে اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। আতা, সাঈদ ইবনে জুবায়র, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীরবিদগণ এ অর্থই নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ইউনুস (আঃ) মনে করলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়কে ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রতি কোনরূপ সংকীর্ণ আচরণ করা হবে না। তৃতীয়, তফসীরের অর্থে এটা قدر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বিচারে রায় দেয়া। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, ইউনুস (আঃ) মনে করলেন, এব্যাপারে আমার কোন ত্রুটি ধরা হবে না। কাতাদাহ্, মুজাহিদ, ফাররা প্রমুখ তফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন। মোটকথা, প্রথম অর্থের সম্ভাবনাই নেই, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অর্থ সম্ভবপর।

ইউনুস (আঃ)-এর দোয়া প্রত্যেকের জন্যে, প্রতি যুগের ও প্রতি মকসুদের জন্যে মকবুল ঃ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ — অর্থাৎ, আমি যেভাবে ইউনুস (আঃ)-কে দুশ্চিন্তা ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মুমিনকেও করে থাকি ; যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোনিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ —মাছের পেটে পাঠকৃত হযরত ইউনুস (আঃ)-এর এই দোয়াটি যদি কোন মুসলমান কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে পাঠ করে, তবে আল্লাহ্ তাআলা তা কবুল করবেন।—(মাযহারী)

হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর একজন উত্তরাধিকারী পুত্র লাভের একান্ত বাসনা ছিল। তিনি তারই দোয়া করেছেন, কিন্তু সাথে সাথে وَاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ও বলেছিলেন ঃ অর্থাৎ, পুত্র পাই বা না পাই ; সর্বাবস্থায় আপনিই উত্তম ওয়ারিশ। এটা পয়গম্বরসুলভ শিষ্টাচার প্রদর্শন

وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾ اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٩٢﴾ وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۗ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٤﴾ وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾ حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٩٧﴾ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۗ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ۗ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰىٓ ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٢﴾

(৯১) এবং সেই নারীর কথা আলোচনা করুন, যে তার কামপ্রবৃত্তিকে বশে রেখেছিল, অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন করেছিলাম। (৯২) তারা সকলেই তোমাদের ধর্মের ; একই ধর্মে তো বিশ্বাসী সবাই এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার বন্দেগী কর। (৯৩) এবং মানুষ তাদের কার্যকলাপ দ্বারা পারস্পরিক বিষয়ে ভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৯৪) অতঃপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, তার প্রচেষ্টা অস্বীকৃত হবে না এবং আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখি। (৯৫) যেসব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত ; (৯৬) যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। (৯৭) অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলে কাফেরদের চক্ষু উচ্চে স্থির হয়ে যাবে ; হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এ বিষয়ে বেখবর ছিলাম ; বরং আমরা গোনাহগারই ছিলাম। (৯৮) তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো দোযখের ইন্ধন। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে। (৯৯) এই মূর্তিরা যদি উপাস্য হত, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করত না। প্রত্যেকেই তাতে চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে থাকবে। (১০০) তারা সেখানে চীৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না। (১০১) যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তারা দোযখ থেকে দূরে থাকবে। (১০২) তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে।

বৈ নয়। কারণ, পয়গম্বরগণের আসল মনোযোগ আল্লাহ্ তাআলার দিকেই থাকা উচিত। অন্যের প্রতি মনোযোগ হলেও আসল বিষয় থেকে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে নয়।

وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا — তারা আগ্রহ ও ভয় অর্থাৎ, সুখ ও দুঃখ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্ তাআলাকে ডাকে। এর এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তারা এবাদত ও দোয়ার সময় আশা ও ভীতি উভয়ের মাঝখানে থাকে। আল্লাহ্ তাআলার কাছে কবুল ও সওয়াবের আশাও রাখে এবং স্বীয় গোনাহ্ ও ত্রুটির জন্যে ভয়ও করে।—(কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ — এখানে 'হারাম' শব্দটি 'শরীয়তগত অসম্ভব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তফসীরের সারসংক্ষেপে এর অনুবাদ করা হয়েছে 'অসম্ভব'।

لَا يَرْجِعُوْنَ বাক্যে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে لا অতিরিক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, যে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের জন্যে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা অসম্ভব। কোন কোন তফসীরবিদ حرام শব্দটিকে এখানে ওয়াজিব ও জরুরী অর্থে ধরে لا কে তার প্রচলিত না-বোধক অর্থে রেখেছেন। তাদের মতে আয়াতের মর্ম এই যে, যে জনপদকে আমি আযাব দ্বারা ধ্বংস করেছি, তাদের জন্যে দুনিয়াতে ফিরে না আসা ওয়াজিব ও জরুরী। — (কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পর তওবার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। যদি কেউ দুনিয়াতে এসে সৎকর্ম করতে চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো শুধু কেয়ামত দিবসের জীবনই হবে।

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ

এখানে حتى শব্দটি পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সংযুক্তির দিকে ইশারা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পুনরায় দুনিয়াতে জীবিত হয়ে ফিরে আসা অসম্ভব। এই অসম্ভাব্যতার চূড়ান্ত সীমা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে আসা তখন পর্যন্ত অসম্ভব, যে পর্যন্ত ইয়াজুজ মাজুজের ঘটনা সংঘটিত না হয়। এই ঘটনা কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। সহীহ্ মুসলিমে হযরত হুযায়ফা থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন সাহাবী একদিন পরস্পর কিছু আলোচনা করছিলাম। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ? আমরা বললাম ঃ আমরা কেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেন ঃ যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ না পায়, সে পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবে না। তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন।

আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্য فُتِحَتْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোন বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে। কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ্ তাআলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখন এই বাধা সরিয়ে দেয়া হবে। কোরআন পাক থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এই বাধা হচ্ছে যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কেয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। প্রাচীরটি এর পূর্বেও ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা তখনই সম্পূর্ণ সুগম

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ؕ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾ اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿١٠٦﴾ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٨﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ وَاِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٩﴾ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١١٠﴾ وَاِنْ اَدْرِيْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١١١﴾ قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١١٢﴾

سُوْرَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٍ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّعَشْرُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ﴿١﴾

(১০৩) মহা ত্রাস তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে ঃ আজ তোমাদের দিন, যে দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (১০৪) সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে। (১০৫) আমি উপদেশের পর যবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে। (১০৬) এতে এবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্যে পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু আছে। (১০৭) আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। (১০৮) বলুন ঃ আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা কি আজ্ঞাবহ হবে? (১০৯) অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দিন ঃ 'আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে সতর্ক করেছি এবং আমি জানি না, তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা নিকটবর্তী না দূরবর্তী। (১১০) তিনি জানেন, যে কথা সশব্দে বল এবং যে কথা তোমরা গোপন কর। (১১১) আমি জানি না সম্ভবতঃ বিলম্বের মধ্যে তোমাদের জন্যে একটি পরীক্ষা এবং এক সময় পর্যন্ত ভোগ করার সুযোগ। (১১২) পয়গম্বর বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি ন্যায়ানুগ ফয়সালা করে দিন। আমাদের পালনকর্তা তো দয়াময়, তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

সূরা হজ্জ

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৭৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(১) হে লোক সকল। তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার।

হবে। সূরা কাহ্ফে ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে।

حَدَبٍ শব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভূমি — বড় পাহাড় হোক কিংবা ছোট ছোট টিলা। সূরা কাহ্ফে ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থল সম্পর্কিত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাদের জায়গা পৃথিবীর উত্তরদিকস্থ পর্বতমালার পশ্চাতে। তাই আবির্ভাবের সময় তাদেরকে উত্তরদিকস্থ পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উছলিয়ে পড়তে দেখা যাবে।

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ, তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের এবাদত কর, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। দুনিয়াতে কাফেরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করেছে, এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবৈধ এবাদত তো হযরত ঈসা (আঃ) হযরত ওযায়র (আঃ) ও ফেরেশতাদেরও করা হয়েছে। অতএব তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? তফসীর কুরতুবীর এক রেওয়ায়েতে এই প্রশ্নের জওয়াব প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ কোরআন পাকের একটি আয়াত সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ করে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সম্পর্কে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। জানি না, সন্দেহের জওয়াব তাদের জানা আছে বলেই জিজ্ঞাসা করে না, না তারা সন্দেহের ও জওয়াবের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না। লোকেরা আরয করল ঃ আপনি কোন আয়াতের কথা বলছেন? তিনি বললেন ঃ আয়াতটি হলো এই,

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফেরদের বিতৃষ্ণার অবধি থাকে না। তারা বলতে থাকে ঃ এতে আমাদের উপাস্যদের চরম অবমাননা করা হয়েছে। তারা (কিতাবী আলেম) ইবনে যবআরীর কাছে পৌছে এ বিষয়ে নালিশ করল। তিনি বললেন ঃ আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তাদেরকে এর সমুচিত জওয়াব দিতাম। আগন্তুকরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কি জওয়াব দিতেন? তিনি বললেন ঃ আমি বলতাম যে, খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর এবং ইহুদীরা হযরত ওযায়র (আঃ)-এর এবাদত করে। তাদের সম্পর্কে (হে মুহাম্মদ) আপনি কি বলেন? (নাউযুবিল্লাহ্) তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? কাফেররা একথা শুনে খুবই আনন্দিত হল যে, বাস্তবিকই মুহাম্মদ এ একথার জওয়াব দিতে পারবেন না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰىٓ ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ

অর্থাৎ, যাদের জন্যে আমার পক্ষ থেকে পুণ্য ও সুফল অবধারিত হয়ে গেছে, তারা এই জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে থাকবে।

এই ইবনে যবআরী সম্পর্কেই কোরআন পাকের এই আয়াত নাযিল হয়েছিল ঃ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ অর্থাৎ, যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়, তখন আপনার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فزع اكبر ঃ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ (মহাত্রাস) বলে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। এর ফলে সব মৃত জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের জন্যে উত্থিত হবে। কারও কারও মতে

শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। ইবনে আরবী বলেন ঃ শিঙ্গায় তিনবার ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকার হবে ত্রাসের ফুৎকার। এতে সারা বিশ্বের মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। আয়াতে একেই فزع اكبر বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ফুৎকার হবে বজ্রের ফুৎকার। এতে সব মানুষ মারা যাবে এবং সব কিছু ফানা হয়ে যাবে। তৃতীয় ফুৎকার হবে পুনরুত্থানের ফুৎকার। এতে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এই বক্তব্যের সমর্থনে মসনদে আবু ইয়া'লা, বায়হাকী, ইবনে জারীর, তাবারী, ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে হযরত আবু হুরায়রার একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। — (মাযহারী)

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ হযরত ইবনে আব্বাস سجل শব্দের অর্থ করেছেন সহীফা। আলী ইবনে তালহা, আউফী, মুজাহিদ, কাতাদাহ্ প্রমুখও এই অর্থ করেছেন। ইবনে-কাসীর, ইবনে জরীর প্রমুখও এই অর্থ পছন্দ করেছেন। كتب শব্দের অর্থ এখানে مكتوب অর্থাৎ, লিখিত আয়াতের অর্থ এই যে, কোন সহীফাকে তার লিখিত বিষয়বস্তুসহ যেভাবে গুটানো হয়, আকাশ-মণ্ডলীকে সেইভাবে গুটানো হবে। (ইবনে-কাসীর, রূহুল-মা'আনী) سجل সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা কোন ব্যক্তি অথবা ফেরেশতার নাম। হাদীসবিদগণের কাছে এই রেওয়ায়েত গ্রাহ্য নয়। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বোখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের দিন পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নিজের হাতে রাখবেন। ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা সপ্ত আকাশকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্টবস্তুসহ এবং সপ্ত পৃথিবীকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্টবস্তুসহ গুটিয়ে একত্রিত করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ্ তাআলার হাতে সরিষার একটি দানা পরিমাণ হবে। — (ইবনে কাসীর)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ — زبور শব্দটি زبر এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যবুর। এখানে زبور বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে আছে, আয়াতে ذكر বলে তওরাত এবং زبور বলে তওরাতের পর অবতীর্ণ খোদায়ী গ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে; যথা ইঞ্জীল, যবুর ও কোরআন। — (ইবনে জরীর) যাহ্হাক থেকে এরূপ তফসীরই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়েদ বলেন ঃ ذكر বলে লওহে মাহফুয এবং زبور বলে পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ সকল খোদায়ী গ্রন্থই বোঝানো হয়েছে। বাজ্জাজ এ অর্থই পছন্দ করেছেন। — (রূহুল-মা'আনী)

الْأَرْضَ অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে এখানে ارض (পৃথিবী) বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। ইবনে জরীর ইবনে আব্বাস থেকে এই তফসীর বর্ণনা করেছেন এবং মুজাহিদ, ইবনে যুবায়র, ইকরিমা, সুদ্দী, আবুল আলিয়া থেকেও এই তফসীর বর্ণিত আছে। ইমাম রাযী বলেন ঃ কোরআনের অন্য আয়াতও এর সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ অর্থাৎ, সৎকর্মপরায়ণরা এই পৃথিবীর মালিক হবে। এটাও ইঙ্গিত যে, পৃথিবী বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। কারণ, দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক তো মুমিন-কাফের সবাই হয়ে যায়। এছাড়া এখানে সৎকর্মপরায়ণদের পৃথিবীর মালিক হওয়ার কথাটি কেয়ামতের আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। কেয়ামতের পর জান্নাতের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই।

ইবনে আব্বাসের অপর এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে ارض এর অর্থ এখানে সাধারণ পৃথিবী — অর্থাৎ দুনিয়ার পৃথিবীও এবং জান্নাতের পৃথিবীও। জান্নাতের পৃথিবীর মালিক যে এককভাবে সৎকর্মপরায়ণগণ হবে, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। তবে এক সময় তারা এককভাবে দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক হবে বলেও প্রতিশ্রুতি আছে। কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে এই সংবাদ দেয়া হয়েছে। এক আয়াতে আছে إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ পৃথিবী আল্লাহ্র। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর মালিক করেন এবং শুভ পরিণাম আল্লাহ্ভীরুদের জন্যেই। অপর এক আয়াতে আছে وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ মুমিন ও সৎকর্মীদেরকে আল্লাহ্ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা করবেন। আরও এক আয়াতে আছে.

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

—নিশ্চয় আমি আমার পয়গম্বরগণকে এবং মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং কেয়ামতের দিন সাহায্য করব। ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণেরা একবার পৃথিবীর বৃহদংশ অধিকারভুক্ত করেছিল। জগদ্বাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অটুট ছিল। মেহদী (আঃ)-এর যমানায় আবার এ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। — (রূহুল মাআনী, ইবনে কাসীর)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ — عالمين শব্দটি عالم এর বহুবচন। মানব, জিন, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড়পদার্থসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সবার জন্যেই রহমতস্বরূপ ছিলেন। কেননা, আল্লাহ্র যিকর ও এবাদত হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টজগতের সত্যিকার রূহ। এ কারণেই যখন পৃথিবী থেকে এই রূহ্ বিদায় নেবে, তখন পৃথিবীতে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলার কেউ থাকবে না। ফলে সব বস্তুর মৃত্যু তথা কেয়ামত এসে যাবে। যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্র যিকর ও এবাদত সব বস্তুর রূহ্, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেসব বস্তুর জন্যে রহমতস্বরূপ, তা আপনা-আপনি ফুটে উঠল। কেননা, দুনিয়াতে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র যিকর ও এবাদত তাঁরই প্রচেষ্টায় ও শিক্ষার দৌলতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ انا رحمة مهداة আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত রহমত।—(ইবনে-আসাকির) হযরত ইবনে ওমরের বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেনঃ انا رحمة مهداة برفع قوم وخفض اخرين অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্ প্রেরিত রহমত, যাতে (আল্লাহ্র আদেশ পালনকারী) এক সম্প্রদায়কে গৌরবের উচ্চাসনে আসীন করি এবং (আল্লাহ্র আদেশ অমান্যকারী) অপর সম্প্রদায়কে অধঃপতিত করে দেই।—(ইবনে-কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, কুফর ও শেরককে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে কাফেরদেরকে হীনবল করা এবং তাদের মোকাবেলায় জেহাদ করাও সাক্ষাত রহমত। এর ফলে আশা করা যায় যে, অবাধ্যদের জ্ঞান ফিরে আসবে এবং তারা ঈমান ও সৎকর্মের অনুসারী হয়ে যাবে।

সূরা আম্বিয়া সমাপ্ত

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى
وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ﴿٢﴾ وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ
شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ﴿٣﴾ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ
وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٤﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ
فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى
اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ
لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا وَتَرَى الْاَرْضَ
هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيْجٍ ﴿٥﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ
هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٦﴾

(২) যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল ; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহ্র আযাব সুকঠিন। (৩) কতক মানুষ অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে। (৪) শয়তান সম্পর্কে লিখে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথী হবে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং দোযখের আযাবের দিকে পরিচালিত করবে। (৫) হে লোকসকল। যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ—) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি ; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। (৬) এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

সূরা হজ্জ

সূরার বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ না মদীনায় অবতীর্ণ, সে সম্পর্কে তফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকেই উভয় প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। অধিকসংখ্যক তফসীরবিদগণ বলেন ঃ এই সূরাটি মিশ্র। এতে মক্কায় অবতীর্ণ ও মদীনায় অবতীর্ণ উভয় প্রকার আয়াতের সমাবেশ ঘটেছে। কুরতুবী এ উক্তিকেই বিশুদ্ধতম আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন ঃ এই সূরার কতিপয় বৈচিত্র্য এই যে, এর কিছু আয়াত রাত্রে, কিছু দিনে, কিছু সফরে; কিছু গৃহে অবস্থানকালে, কিছু মক্কায়,কিছু মদীনায় এবং কিছু যুদ্ধাবস্থায় ও কিছু শান্তিকালে অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া এর কিছু আয়াত রহিতকারী, কিছু আয়াত রহিত এবং কিছু মুহকাম তথা সুস্পষ্ট ও কিছু মুতাশাবিহ তথা অস্পষ্ট। সূরাটিতে অবতরণের সব প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ সফর অবস্থায় এই আয়াত অবতীর্ণ হলে রসূলে করীম (সাঃ) উচ্চৈঃস্বরে এর তেলাওয়াত শুরু করেন। সফরসঙ্গী সাহাবায়ে কেরাম তাঁর আওয়াজ শুনে এক জায়গায় সমবেত হয়ে গেলেন। তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন ঃ এই আয়াতে উল্লেখিত কেয়ামতের ভূকম্পন কোন্ দিন হবে তোমরা জান কি? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এটা সেই দিনে হবে, যেদিন আল্লাহ্ তাআলা আদম (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলবেন ঃ যারা জাহান্নামে যাবে, তাদেরকে উঠাও। আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করবেন, কারা জাহান্নামে যাবে? উত্তর হবে, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বললেন ঃ এই সময়েই ত্রাস ও ভীতির আধিক্যে বালকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। সাহাবায়ে-কেরাম একথা শুনে ভীত-বিহ্বল হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমাদের মধ্যে কে মুক্তি পেতে পারে? তিনি বললেন ঃ তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের এক হাজার ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এবং একজন তোমাদের মধ্য থেকে হবে। এই বিষয়বস্তু সহীহ্ মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে আবু সায়ীদ খুদরী থেকে বর্ণিত আছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সেদিন তোমরা এমন দুই সম্প্রদায়ের সাথে থাকবে যে, তারা যে দলে ভিড়বে, সেই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। একটি ইয়াজুজ-মাজুজের সম্প্রদায় ও অপরটি ইবলীস ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ এবং আদম সন্তানদের মধ্যে যারা তোমাদের পূর্বে মারা গেছে, তাদের সম্প্রদায়। (তাই নয়শত নিরানব্বই এর মধ্যে বৃহত্তর সংখ্যা তাদেরই হবে।) তফসীরে কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কেয়ামতের ভূকম্পন কবে হবে ঃ কেয়ামত শুরু হওয়া এবং মনুষ্যকুলের পুনরুত্থিত হওয়ার পর ভূকম্পন হবে, না এর আগেই হবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন ঃ কেয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে এই ভূকম্পন হবে এবং এটা কেয়ামতের সর্বশেষ আলামতরূপে গণ্য হবে। কোরআন পাকের অনেক আয়াতে এর উল্লেখ আছে; যথা—

(১) اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا (২) وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً
(৩) اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ইত্যাদি।

কেউ কেউ আদম (আঃ)-কে সম্বোধন সম্পর্কিত উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন যে, ভূকম্পন হাশর-নশর ও পুনরুত্থানের পর হবে। প্রকৃত সত্য এই যে, উভয় উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হওয়াও আয়াত ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং হাশর-নশরের পরে হওয়াও উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

কেয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যদাত্রী মহিলারা তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা ভুলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কেয়ামতের পূর্বেই এই দুনিয়াতে হয়,তবে এরূপ ঘটনা ঘটার ব্যাপারে কোন খটকা নেই। পক্ষান্তরে হাশর-নশরের পরে হলে এর ব্যাখ্যা এরূপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মারা গেছে, কেয়ামতের দিন সে তদবস্থায়ই উত্থিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে, তারাও তেমনিভাবে শিশুসহ উত্থিত হবে।— (কুরতুবী)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ এই আয়াত কট্টর বিতর্ককারী নযর ইবনে হারেস সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা এবং কোরআনকে বিগত লোকদের কল্পকাহিনী বলত। কেয়ামতে পুনরুত্থানও সে অস্বীকার করত।— (মাযহারী)

আয়াত যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তার হুকুম এ ধরণের বদভ্যাসযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে ব্যাপক।

মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির স্তর ও বিভিন্ন অবস্থা ঃ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ এই আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ বোখারীর এক হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরও চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিণ্ড হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেয়া হয় ঃ (১) তার বয়স কত হবে, (২) সে কি পরিমাণ রিযিক পাবে, (৩) সে কি কি কাজ করবে এবং (৪) পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা।- (কুরতুবী)

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদেরই বাচনিক এবং ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জরীর বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, বীর্য যখন কয়েক স্তর অতিক্রম করে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়, তখন মানব সৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহ্ তাআলাকে জিজ্ঞেস করে يارب مُخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ অর্থাৎ, এই মাংসপিণ্ড দ্বারা মানব সৃষ্টি আপনার কাছে অবধারিত কি না? যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয় غير مُخَلَّقَةٍ তবে গর্ভাশয়ে সেই মাংসপিণ্ডকে পাত করে দেয়া হয় এবং তা সৃষ্টির অন্যান্য স্তর অতিক্রম করে না। পক্ষান্তরে যদি জওয়াবে مُخَلَّقَةٍ বলা হয়, তবে ফেরেশতা জিজ্ঞেস করে, ছেলে না কন্যা, হতভাগা; না ভাগ্যবান, বয়স কত, কি কর্ম করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে? এসব প্রশ্নের জওয়াব তখনই ফেরেশতাকে বলে দেয়া হয়।— (ইবনে-কাসীর) وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ও مُخَلَّقَةٍ শব্দদ্বয়ের এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত আছে।— (কুরতুবী)

مُخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ উল্লেখিত হাদীস থেকে এই শব্দদ্বয়ের তফসীর এই জানা গেল যে, যে বীর্য দ্বারা মানবসৃষ্টি অবধারিত হয়, তা مخلقة এবং যা বিনষ্ট ও পাত হওয়া অবধারিত, তা غير مخلقة কোন কোন তফসীরকারক مخلقة ও غير مخلقة এর এরূপ তফসীর করেন যে, যে শিশুর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ, সুঠাম ও সুষম হয়, সে مخلقة অর্থাৎ, পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ অসম্পূর্ণ অথবা দৈহিক গড়ন ইত্যাদি অসম, সে غير مخلقة

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا অর্থাৎ, অতঃপর মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদেরকে দুর্বল শিশুর আকারে বের করি। এ সময় শিশুর দেহ, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান, নড়াচড়া ও ধারণশক্তি ইত্যাদি সবই দুর্বল থাকে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে এগুলোকে শক্তিদান করা হয় এবং পরিশেষে পূর্ণশক্তির স্তরে পৌঁছে যায়। ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ এর অর্থ তাই। اشد শব্দটি شدة এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, পর্যায়ক্রমে উন্নতির ধারা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যতক্ষণ তোমাদের প্রত্যেকটি শক্তি পূর্ণতা লাভ না করে, যা যৌবনকালে প্রত্যক্ষ করা হয়।

اَرْذَلِ الْعُمُرِ সেই বয়সকে বলা হয়, যে বয়সে মানুষের বুদ্ধি, চেতনা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ত্রুটি দেখা যায়। রসূলে করীম (সাঃ) এমন বয়স থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। সা'দের বাচনিক নাসায়ীতে বর্ণিত আছে— রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিম্নোক্ত দোয়া অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন এবং সা'দ (রাঃ)-ও এই দোয়া তাঁর সন্তানদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। দোয়াটি এই ঃ

اللّٰهم انى اعوذبك من البخل واعوذبك من الجبن واعوذبك من ان ارد الى ارذل العمر واعوذبك من فتنة الدنيا وعذاب القبر .

মানব সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের পর তার বয়সের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা ঃ মুসনাদে-আহমদ ও মুসনাদে আবু-ইয়ালায় বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালেকের বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত সন্তানদের সৎকর্ম পিতা-মাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কোন সন্তান অসৎকর্ম করলে তা তার নিজের আমলনামায়ও লিখা হয় না এবং পিতা-মাতার আমলনামায়ও রক্ষিত হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তার নিজের আমলনামা চালু হয়ে যায়। তখন তার হেফাযত ও তাকে শক্তি যোগানোর জন্যে সঙ্গীয় দুইজন ফেরেশতাকে আদেশ করা হয়। যখন সে মুসলমান অবস্থায় চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাকে উন্মাদ হওয়া, কুষ্ঠ ও ধবলকুষ্ঠ এই রোগত্রয় থেকে নিরাপদ করে দেন। যখন পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তার হিসাব হালকা করে দেন। ষাট বছর বয়সে পৌঁছলে সে আল্লাহ্‌র দিকে রুজুর তওফীক প্রাপ্ত হয়। সত্তর বছর বয়সে পৌঁছলে আসমানের অধিবাসী সব ফেরেশতা তাকে মহব্বত করতে থাকে। আশি বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ্ তাআলা তার সৎকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন এবং অসৎকর্মসমূহ মার্জনা করে দেন। নব্বই বছর বয়সে আল্লাহ্ তাআলা তার অগ্র-পশ্চাতের সব গোনাহ্ মাফ করে দেন এবং তাকে তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে শাফাআত করার অধিকার দান করেন ও শাফাআত কবুল করেন। তখন তার উপাধি হয়ে যায় "আমীনুল্লাহ্ ও আসিরুল্লাহ্ ফিল আরদ্ব" অর্থাৎ, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বন্দী।

وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ
فِى الْقُبُوْرِ ⑦ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ⑧ ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ لَهٗ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
عَذَابَ الْحَرِيْقِ ⑨ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ
بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ⑩ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ
فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ اِۨطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ اِۨنْقَلَبَ عَلٰى
وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ⑪
يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ۗ ذٰلِكَ هُوَ
الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ⑫ يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ۗ
لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ⑬ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ⑭ مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ
يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى
السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ⑮

(৭) এবং এ কারণে যে,কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, কবরে যারা আছে, আল্লাহ্ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। (৮) কতক মানুষ জ্ঞান; প্রমাণ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে। (৯) সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বিতর্ক করে, যাতে আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। তার জন্যে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা আছে এবং কেয়ামতের দিন আমি তাকে দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন করাব। (১০) এটা তোমার দুই হাতের কর্মের কারণে, আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। (১১) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহ্র এবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে এবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। (১২) সে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যে তার অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম পথভ্রষ্টতা। (১৩) সে এমন কিছুকে ডাকে, যার অপকার উপকারের আগে পৌঁছে। কত মন্দ এই বন্ধু এবং কত মন্দ এই সঙ্গী। (১৪) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে,আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন। (১৫) সে ধারণা করে যে, আল্লাহ্ কখনই ইহকালে ও পরকালে রসূলকে সাহায্য করবেন না, সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক; এরপর কেটে দিক ; অতঃপর দেখুক তার এই কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কি না।

কেননা, এই বয়সে সাধারণতঃ মানুষের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, কোন কিছুতে ঔৎসুক্য বাকী থাকে না। সে বন্দীর ন্যায় জীবন যাপন করে। অতঃপর মানুষ যখন 'আরযালে ওমর' তথা নিষ্কর্মা বয়সে পৌঁছে যায়,তখন সুস্থ ও শক্তিবান অবস্থায় যেসব সৎকর্ম করত, তা অব্যাহতভাবে তার আমলনামায় লিখা হয় এবং কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ثَانِىَ عِطْفِهٖ - **عطف** শব্দের অর্থ পার্শ্ব। অর্থাৎ, পার্শ্ব পরিবর্তনকারী। এখানে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বোঝানো হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ বুখারী ও ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন হিযরত করে মদীনায় বসবাস করতে শুরু করেন, তখন এমন লোকও এসে ইসলাম গ্রহণ করত, যাদের অন্তরে ইসলাম পাকাপোক্ত ছিল না। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের সন্তান ও ধন-দৌলতে উন্নতি দেখা গেলে তারা বলত ঃ এই ধর্ম ভাল। পক্ষান্তরে এর বিপরীত দেখা গেলে বলত ঃ এই ধর্ম মন্দ। এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে? বলা হয়েছে যে, তারা ঈমানের এক কিনারায় দণ্ডায়মান আছে। ঈমানের পর যদি তারা পার্থিব সুখ ও ধন-সম্পদ লাভ করে, তবে ইসলামে অটল হয়ে যায়, পক্ষান্তরে যদি পরীক্ষাস্বরূপ কোন বিপদাপদ ও পেরেশানীতে পতিত হয়, তবে ধর্ম ত্যাগ করে বসে।

مَنْ كَانَ يَظُنُّ সারকথা এই যে, ইসলামের পথ রুদ্ধকারী শত্রু চায় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূল ও তাঁর ধর্মকে সাহায্য না করুন। এরূপ শত্রুদের বোঝে নেয়া উচিত যে, এটা তখনই সম্ভবপর, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়তের পদ বিলুপ্ত করে দেয়া হবে এবং তাঁর প্রতি ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা যাঁকে নবুওয়তের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং ওহী দ্বারা ভূষিত করেছেন, ইহকাল ও পরকালে তাঁকে সাহায্য করার পাকাপোক্ত ওয়াদা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রয়েছে। যুক্তির দিক দিয়েও এই ওয়াদার খেলাফ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি রসূল ও তাঁর ধর্মের উন্নতির পথ রুদ্ধ করতে চায়, তার সাধ্য থাকলে এরূপ কৌশল অবলম্বন করা উচিত,যাতে নবুওয়তের পদ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। এই বিষয়বস্তুটি অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেয়ার ভঙ্গিতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে ওহী বন্ধ করতে চাইলে সে কোনরূপে আকাশে পৌঁছুক এবং সেখান থেকে ওহীর আগমন বন্ধ করে দিক। বলাবাহুল্য, কারও পক্ষে আকাশে যাওয়া ও আল্লাহ্ তাআলাকে ওহী বন্ধ করতে বলা মোটেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং তার কৌশল যখন কার্যকর নয়, তখন ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে আক্রোশের ফল কি? এই তফসীর হুবহু দুররে-মনসুর গ্রন্থে ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত আছে। আমার মতে আয়াতের এটাই সর্বোত্তম ও সাবলীল তফসীর।-(বয়ানুল-কোরআন- সহজকৃত)।

কুরতুবী এই তফসীরকেই আবু জা'ফর নাহ্হাস থেকে উদ্ধৃত করে বলেন ঃ এটা সবচাইতে সুন্দর তফসীর। তিনি ইবনে আব্বাস থেকেও এই তফসীর বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আয়াতের এরূপ তফসীর করেছেন

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ۝١٦ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٕيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝١٧ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝١٨ هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ؗ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۝١٩ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۝٢٠ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ۝٢١ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝٢٢ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ؕ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۝٢٣

(১৬) এমনিভাবে আমি সুস্পষ্ট আয়াতরূপে কোরআন নাযিল করেছি এবং আল্লাহ্-ই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন। (১৭) যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, সাবেয়ী, খ্রীষ্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরেক, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। সবকিছুই আল্লাহ্‌র দৃষ্টির সামনে। (১৮) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্‌কে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে, যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি পর্বতরাজি বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন। (১৯) এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা কাফের, তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। (২০) ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। (২১) তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। (২২) তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে ঃ দহনশাস্তি আস্বাদন কর। (২৩) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী।

যে, এখানে سماء বলে নিজ গৃহের ছাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই ; যদি কোন মূর্খ শত্রু কামনা করে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূল ও তাঁর ধর্মের সাহায্য না করুক এবং সে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করে, তবে সে বুঝে নিক যে, তার বাসনা কখনও পূর্ণ হবে না। এই বোকাসুলভ আক্রোশের প্রতিকার এছাড়া কিছুই নেই যে, সে তার ছাদে রশি ঝুলিয়ে ফাঁসি নিয়ে মরে যাক।—(মাযহারী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সমগ্র সৃষ্টবস্তুর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ ঃ সমগ্র সৃষ্টজগত স্রষ্টার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। সৃষ্টজগতের এই আজ্ঞানুবর্তিতা দুই প্রকার ; (১) সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার অধীনে বাধ্যতামূলক আনুগত্য। মুমিন, কাফের, জীবিত, মৃত, জড়পদার্থ ইত্যাদি কেউ এই আনুগত্যের আওতা বহির্ভূত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমভাবে আল্লাহ্ তাআলার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। বিশ্ব-চরাচরের কোন কণা অথবা পাহাড় আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে এতটুকুও নড়াচড়া করতে পারে না। (২) সৃষ্টজগতের ইচ্ছাধীন আনুগত্য। অর্থাৎ, স্ব-ইচ্ছায় আল্লাহ্ তাআলার বিধানাবলী মেনে চলা। এতে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য আছে। যারা আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, তারা মুমিন এবং যারা আনুগত্য বর্জন করে ও অস্বীকার করে তারা কাফের। আয়াতে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, এখানে সেজদা ও আনুগত্য বলে শুধু সৃষ্টিগত আনুগত্য নয় ; বরং ইচ্ছাধীন আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, ইচ্ছাধীন আনুগত্য তো শুধু বিবেকবান মানুষ, জিন ইত্যাদির মধ্যে হতে পারে। জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যে বিবেক ও চেতনাই নেই। এমতাবস্থায় এগুলোর মধ্যে ইচ্ছাধীন আনুগত্য কিভাবে হবে? এর উত্তর এই যে, কোরআন পাকের বহু আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিবেক, চেতনা ও ইচ্ছা থেকে কোন সৃষ্টবস্তুই মুক্ত নয়। সবার মধ্যেই কম-বেশী এগুলো বিদ্যমান আছে। মানব ও জিন জাতিকে আল্লাহ্ তাআলা বিবেক ও চেতনার একটি পূর্ণস্তর দান করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে আদেশ ও নিষেধের অধীন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সৃষ্টবস্তুর মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রকারকে সেই প্রকারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিবেক ও চেতনা দেয়া হয়েছে। মানব জাতিই সর্বাধিক বিবেক ও চেতনা লাভ করেছে। জন্তু-জানোয়ারের বিবেক ও চেতনা সাধারণতঃ অনুভব করা হয়। উদ্ভিদের বিবেক ও চেতনাও সামান্য চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা চেনা যায়, কিন্তু জড় পদার্থের বিবেক ও চেতনা এতই অল্প ও লুক্কায়িত যে, সাধারণ মানুষ তা বুঝতেই পারে না। কিন্তু তাদের স্রষ্টা ও মালিক বলেছেন যে, তারাও বিবেক ও চেতনার অধিকারী। কাজেই আলোচ্য আয়াতে সে আনুগত্যকে সেজদা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা ইচ্ছাধীন আনুগত্য। আয়াতের অর্থ এই যে, মানবজাতি ছাড়াও (জিনসহ) সব সৃষ্টবস্তু স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে সেজদা করে অর্থাৎ, আজ্ঞা পালন করে। শুধু মানব ও জিনই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে—(এক) মুমিন, অনুগত ও সেজদাকারী এবং (দুই) কাফের, অবাধ্য ও সেজদার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। সেজদার তওফীক না দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা শেষোক্ত দলকে হেয় করেছেন।

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا আয়াতে উল্লেখিত দুই পক্ষ হচ্ছে সাধারণ মুমিনগণ এবং তাদের বিপরীতে সব কাফের দল ; ইসলামের যুগের হোক কিংবা পূর্ববর্তী যুগসমূহের। তবে এই আয়াত সে দুই পক্ষ সম্পর্কে

অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বদরের রণক্ষেত্রে একে অপরের বিপক্ষে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত আলী, হামযা, ওবায়দা (রাঃ) ও কাফেরদের পক্ষ থেকে ওতবা ইবনে রবীয়া, তদীয় পুত্র ওলীদ ও তদীয় ভ্রাতা শায়বা এতে শরীক ছিল। তন্মধ্যে কাফের পক্ষের তিন জনই নিহত এবং মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত আলী ও হামযা অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। ওবায়দা গুরুতর আহত অবস্থায় ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর পায়ের কাছে প্রাণত্যাগ করেন। আয়াত যে এই সম্মুখযোদ্ধাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তা বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। কিন্তু বাহ্যতঃ এই হুকুম তাঁদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং সমগ্র উম্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— যে কোন যমানার উম্মত হোক না কেন।

জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানোর রহস্য ঃ এখানে সন্দেহ হয় যে, হাতে কংকন পরা নারীদের কাজ এবং এটা তাদেরই অলংকার। পুরুষদের জন্যে একে দোষণীয় মনে করা হয়। উত্তর এই যে, মাথায় মুকুট এবং হাতে কংকন পরিধান করা পুরাকালের রাজা–বাদশাহ্দের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, হিজরতের সফরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে গ্রেফতার করার জন্যে সুরাকা ইবনে মালেক অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিল। আল্লাহ্র হুকুমে তার ঘোড়ার পা মাটিতে পুঁতে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর দোয়ায় ঘোড়াটি উদ্ধার পায়। সুরাকা ইবনে মালেক তওবা করায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে ওয়াদা দেন যে, পারস্য সম্রাট কিস্রার কংকন যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে মুসলমানদের হস্তগত হলে তাকে তা দান করা হবে। অতঃপর হযরত ওমর ফারুকের খেলাফতকালে যখন পারস্য বিজিত হয় এবং সম্রাটের কংকন অন্যান্য মালের সাথে আগমন করে, তখন সুরাকা ইবনে মালেক তা দাবী করে বসে এবং তাকে তা প্রদানও করা হয়। মোটকথা সাধারণ পুরুষের মধ্যে যেমন মাথায় মুকুট পরিধান করার প্রচলন নেই, এটা রাজকীয় ভূষণ, তেমনি হাতে কংকন পরিধান করাকেও রাজকীয় ভূষণ মনে করা হয়। তাই জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানো হবে। কংকন সম্পর্কে এই আয়াতে এবং সূরা ফাতরে বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণ নির্মিত হবে, কিন্তু সূরা নিসায় রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারগণ বলেন ঃ জান্নাতীদের হাতে তিন রকম কংকন পরানো হবে— স্বর্ণ নির্মিত, রৌপ্য নির্মিত এবং মোতি নির্মিত। এই আয়াতে মোতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।— (কুরতুবী)

রেশমী পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম ঃ আলোচ্য আয়াতে আছে যে, জান্নাতীদের পোশাক রেশমের হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সমস্ত পরিচ্ছদ, বিছানা,পর্দা ইত্যাদি রেশমের হবে। রেশমী বস্ত্র দুনিয়াতে সর্বোত্তম গণ্য হয়। বলাবাহুল্য, জান্নাতের রেশমের উৎকৃষ্টতার সাথে দুনিয়ার রেশমের মান কোন অবস্থাতেই তুল্য নয়।

ইমাম নাসায়ী, বাযযার ও বায়হাকী আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ জান্নাতীদের রেশমী পোশাক জান্নাতের ফলের ভেতর থেকে বের হবে। হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে আছে: জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে রেশম উৎপন্ন হবে। জান্নাতীদের পোশাক এই রেশম দ্বারাই তৈরী হবে।— (মাযহারী)

ইমাম নাসায়ী হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الاخرة ومن شرب الخمر فى الدنيا لم يشربها فى الاخرة ومن شرب فى انية الذهب والفضة لم يشرب فيها فى الاخرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس اهل الجنة وشراب اهل الجنة وانية اهل الجنة ـ

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্য পান করবে, সে পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বর্ণ–রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে, সে পরকালে এসব পাত্রে পানাহার করবে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ এই বস্তুত্রয় জান্নাতীদের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট।— (কুরতুবী)

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এসব কাজ করে এবং তওবা না করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে; যেমন— আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করে তওবা করে না, সে পরকালে জান্নাতের মদ থেকে বঞ্চিত হবে।— (কুরতুবী)

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, যখন তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, তখন কোন বস্তু থেকে বঞ্চিত রাখলে তার মনে দুঃখ ও পরিতাপ থাকবে। অথচ জান্নাত দুঃখ ও পরিতাপের স্থান নয়। সেখানে কারও মনে বিষাদ ও আফসোস থাকা উচিত নয়। যদি আফসোস না হয়, তবে এই বঞ্চিত করারও উপকারিতা নেই। কুরতুবী এর চমৎকার জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ জান্নাতীদের স্থান ও স্তর বিভিন্নরূপ হবে। কেউ উপরের স্তরে এবং কেউ নিম্নস্তরে থাকবে। স্তরের এই ব্যবধান ও পার্থক্য সবাই অনুভবও করবে। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতীদের অন্তর এমন করে দেবেন যে, তাতে কোন কিছুর পরিতাপ ও আফসোস থাকবে না।

وَهُدُوٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَهُدُوٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿٢٤﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ؕ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٥﴾ وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿٢٦﴾ وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٢٩﴾ ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿٣٠﴾

(২৪) তারা পথপ্রদর্শিত হয়েছিল সৎবাক্যের দিকে এবং পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পথপানে। (২৫) যারা কুফর করে ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং সেই মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়, যাকে আমি প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্যে সমভাবে এবং যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব। (২৬) যখন আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহ্‌র স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তওয়াফকারীদের জন্যে, নামাযে দণ্ডায়মানদের জন্যে এবং রুকূ-সেজদাকারীদের জন্যে। (২৭) এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের জন্যে ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে। (২৮) যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ্ করার সময়। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। (২৯) এরপর তারা যেন দৈহিক ময়লা দূর করে দেয়, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং এই সুসংরক্ষিত গৃহের তওয়াফ করে। (৩০) এটা শ্রবণযোগ্য। আর কেউ আল্লাহ্‌র সম্মানযোগ্য বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পালনকর্তার নিকট তা তার জন্যে উত্তম। উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক;

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَهُدُوٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ **হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন ঃ এখানে কলেমায়ে তাইয়্যেবাহ্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বোঝানো হয়েছে।—(কুরতুবী)**

وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - سَبِيْلِ اللّٰهِ **(আল্লাহ্‌র পথ) বলে ইসলাম** বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা নিজেরা তো ইসলাম থেকে দূরে সরে আছেই; অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে বাধা দেয়।

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এটা তাদের দ্বিতীয় গোনাহ্। তারা মুসলমানদেরকে মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। 'মসজিদে-হারাম' ঐ মসজিদকে বলা হয়, যা বায়তুল্লাহ্‌র চতুষ্পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে। এটা মক্কার হেরেম শরীফের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু কোন কোন সময় মসজিদে-হারাম বলে মক্কার সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ বোঝানো হয়; যেমন— আলোচ্য ঘটনাতেই মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে শুধু মসজিদে-হারামে প্রবেশে বাধা দেয়নি ; বরং হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দান করেছিল। সহীহ্ হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত রয়েছে। কোরআন পাক এ ঘটনায় মসজিদে-হারাম শব্দটি সাধারণ হেরেমের অর্থে ব্যবহার করেছে এবং বলেছে ঃ وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

তফসীরে দুররে-মনসূরে এস্থানে হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে যে; আয়াতে মসজিদে হারাম বলে হেরেম বোঝানো হয়েছে।

মক্কার হেরেমে সব মুসলমানের সমান অধিকারের তাৎপর্য ঃ মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফের যে যে অংশে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম পালন করা হয়; যেমন— ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান, মিনার সমগ্র ময়দান, আরাফাতের সম্পূর্ণ ময়দান এবং মুযদালেফার গোটা ময়দান, এসব ভূখণ্ড সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যে সাধারণ ওয়াকফ। কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা এগুলোর উপর কখনও হয়নি এবং হতেও পারে না। এ বিষয়ে সমগ্র উম্মত ও ফেকাহ্‌বিদগণ একমত। এগুলো ছাড়া মক্কা মুকাররমার সাধারণ বাসগৃহ এবং হেরেমের অবশিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কেও কোন কোন ফেকাহ্‌বিদ বলেন যে, এগুলোও সাধারণ ওয়াকফ সম্পত্তি। এগুলো বিক্রয় করা ও ভাড়া দেয়া হারাম। প্রত্যেক মুসলমান যে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারে। তবে অধিক সংখ্যক ফেকাহ্‌বিদগণের উক্তি এই যে, মক্কার বাসগৃহসমূহের উপর ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা হতে পারে। এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা ও ভাড়া দেয়া জায়েয। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সফওয়ান ইবনে ওমাইয়ার বাসগৃহ ক্রয় করে কয়েদীদের জন্যে জেলখানা নির্মাণ করেছিলেন। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) থেকে এ ব্যাপারে উপরোক্ত উভয় প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। কিন্তু ফতওয়া শেষোক্ত উক্তি অনুযায়ী।— (রুহুল-মা'আনী) ফেকাহ্ গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে হেরেমের যে যে অংশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সর্বাবস্থায় সাধারণ ওয়াকফ। এগুলোতে প্রবেশে বাধা দেয়া হারাম। আলোচ্য আয়াত থেকে এই অবৈধতা প্রমাণিত হয়।

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ অভিধানে الحاد এর অর্থ সরল পথ

থেকে সরে যাওয়া। এখানে 'এলহাদের' অর্থ মুজাহিদ ও কাতাদাহর মতে কুফর ও শেরক। কিন্তু অন্য তফসীরকারকগণ একে সাধারণ অর্থে রেখেছেন। ফলে প্রত্যেক গোনাহ্ ও আল্লাহর নাফরমানী এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি, চাকরকে গালি দেয়া এবং মন্দ বলাও। এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই হযরত আতা বলেন ঃ 'হেরেমে এলহাদ' বলে এহ্‌রাম ব্যতীত হেরেমে প্রবেশ করা এবং হেরেমে নিষিদ্ধ— এমন কোন কাজ করাকে বোঝানো হয়েছে। যেমন— হেরেমে শিকার করা কিংবা হেরেমে কোন বৃক্ষ কর্তন করা ইত্যাদি। যেসব কাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ, সেগুলো সর্বত্রই গোনাহ্ এবং আযাবের কারণ। তবে বিশেষ করে হেরেমের কথা বলার কারণ এই যে, মক্কার হেরেমে সৎকাজের সওয়াব যেমন বেশী হয় তেমনি পাপকাজের আযাবও বহুলাংশে বেড়ে যায়।— (মুজাহিদের উক্তি)।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে এই আয়াতের এক তফসীর এরূপও বর্ণিত আছে যে, হেরেম শরীফ ছাড়া অন্যত্র পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই পাপ লিখা হয় না, যতক্ষণ তা কার্যে পরিণত করা না হয়, কিন্তু হেরেমে শুধু পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেই গোনাহ্ লিখা হয়। কুরতুবী এই তফসীরই হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ বলেছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর হজ্জ করতে গেলে দু'টি তাঁবু স্থাপন করতেন— একটি হেরেমের অভ্যন্তরে এবং অপরটি বাইরে। যদি পরিবারবর্গ অথবা চাকর-নওকরদের মধ্যে কাউকে কোন কারণে শাসন করার প্রয়োজন হত, তবে তিনি হেরেমের বাইরের তাঁবুতে যেয়ে একাজ করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেন ঃ আমাদেরকে ইহা বলা হয়েছে যে, মানুষ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সময় لا والله অথবা بلى والله ইত্যাদি যেসব বাক্য উচ্চারণ করে, এগুলোও হেরেমের অভ্যন্তরে 'এলহাদ' করার শামিল।— (মাযহারী)

বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের সূচনা ঃ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ অভিধানে بوأ শব্দের অর্থ কাউকে ঠিকানা ও বসবাসের গৃহ দেয়া। আয়াতের অর্থ এই ঃ একথা উল্লেখযোগ্য ও স্মর্তব্য যে, আমি ইবরাহীম (আঃ)-কে বায়তুল্লাহর অবস্থান স্থলের ঠিকানা দিয়েছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইবরাহীম (আঃ) পূর্ব থেকে এই ভূখণ্ডে বসবাস করতেন না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাঁকে সিরিয়া থেকে হিজরত করিয়ে এখানে আনা হয়েছিল। مَكَانَ الْبَيْتِ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বায়তুল্লাহ্ ইবরাহীম (আঃ)-এর আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এর প্রথম নির্মাণ আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতে আনার পূর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। আদম (আঃ)-ও তৎপরবর্তী পয়গম্বরগণ বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করতেন। নূহ (আঃ)-এর তুফানের সময় বায়তুল্লাহর প্রাচীর উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। তবে ভিত্তি ও নির্দিষ্ট জায়গা বিদ্যমান ছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে এই জায়গার কাছেই পুনর্বাসিত করা হয় এবং আদেশ দেয়া হয় ঃ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا অর্থাৎ, আমার এবাদতে কাউকে শরীক করো না। বলাবাহুল্য, হযরত ইবরাহীম (আঃ) শেরক করবেন, এরূপ কল্পনাও করা যায় না। তাঁর মূর্তি সংহার, মুশরেকদের মোকাবেলা এবং এই ব্যাপারে কঠিন অগ্নিপরীক্ষার ঘটনাবলী পূর্বেই ঘটেছিল। তাই এখানে সাধারণ মানুষকে শোনানো উদ্দেশ্য, যাতে তারা শেরক না করে। দ্বিতীয় আদেশ এরূপ দেয়া হয় وَطَهِّرْ بَيْتِيَ আমার গৃহকে পবিত্র রাখ। তখন গৃহ বিদ্যমান ছিল না, কিন্তু বায়তুল্লাহ্ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীরের নাম নয়; বরং যে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রথম বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এখন পুনরায় নির্মাণের আদেশ করা হচ্ছে, তাকেই বায়তুল্লাহ্ বলা হয়। এই ভূখণ্ডে সবসময় বিদ্যমান ছিল। একে পবিত্র করার আদেশ দানের কারণ এই যে, সে সময়ও জুরহাম ও আমালিকা গোত্র এখানে কিছু মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা এসব মূর্তির পূজা করত। – (কুরতুবী) এটাও সম্ভবপর যে, এই আদেশটি পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। পবিত্র করার অর্থ কুফর ও শেরক থেকেও পবিত্র রাখা। বাহ্যিক ময়লা আবর্জনা থেকেও পবিত্র রাখা। ইবরাহীম (আঃ)-কে একথা বলার উদ্দেশ্য অন্য লোকদেরকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট করা। কারণ, ইবরাহীম (আঃ) নিজেই একাজ করতেন! এতদসত্ত্বেও যখন তাঁকে একাজ করতে বলা হয়েছে, তখন অন্যদের এ ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়।

ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি তৃতীয় আদেশ এই وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, বায়তুল্লাহর হজ্জ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। – (বগভী) ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন ইবরাহীম (আঃ)-কে হজ্জ ফরয হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ দেয়া হয়, তখন তিনি আল্লাহর কাছে আরয করলেন ঃ এখানে তো জনমানবহীন বন্য প্রান্তর। ঘোষণা শোনার মত কেউ নেই ; যেখানে জনবসতি আছে সেখানে আমার আওয়াজ কিভাবে পৌছবে? আল্লাহ্ তাআলা বললেন ঃ তোমার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা। বিশ্বে পৌছানোর দায়িত্ব আমার। ইবরাহীম (আঃ) মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে আল্লাহ্ তাআলা তা উচ্চ করে দেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি আবু কুবায়স পাহাড়ে আরোহণ করে ঘোষণা করেন। দুই কানে অঙ্গুলি রেখে ডানে-বামে এবং পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে বললেন ঃ লোক সকল, তোমাদের পালনকর্তা নিজের গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের উপর এই গৃহের হজ্জ ফরয করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ পালন কর।' এই রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর এই আওয়াজ আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বের কোণে কোণে পৌছে দেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয়; বরং ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমনকারী ছিল, তাদের সবার কান পর্যন্ত এ আওয়াজ পৌছে দেয়া হয়। যার যার ভাগ্যে আল্লাহ্ তাআলা হজ্জ লিখে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জওয়াবে لبيك اللهم لبيك বলেছে অর্থাৎ, হাজির হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ইবরাহিমী আওয়াজের জওয়াবই হচ্ছে হজ্জে 'লাব্বাইকা' বলার আসল ভিত্তি। – (কুরতুবী, মাযহারী)

অতঃপর আয়াতে সেই প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, যা ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘোষণাকে সব মানবমণ্ডলী পর্যন্ত পৌছানোর কারণে কেয়ামত পর্যন্তের জন্যে কায়েম হয়ে গেছে। তা এই যে, يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ অর্থাৎ, বিশ্বের প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও মানুষ বায়তুল্লাহর দিকে চলে আসবে ; কেউ পদব্রজে, কেউ সওয়ার হয়ে। যারা সওয়ার হয়ে আসবে, তারাও দূর-দূরান্ত দেশ থেকে আগমন করবে। ফলে তাদের সওয়ারীর জন্তুগুলো কৃশকায় হয়ে যাবে। এই ঘোষণার দিন থেকে আজ পর্যন্ত হাজারো বছর অতীত হয়ে গেছে, বায়তুল্লাহর পানে আগমনকারীদের অবস্থা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। পরবর্তী পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের উম্মতও এই আদেশের অনুসারী ছিলেন। ঈসা (আঃ)-এর পর যে সুদীর্ঘ জাহেলিয়াতের যুগ অতিবাহিত হয়েছে,

তাতেও আরবের বাসিন্দারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও হজ্বের বিধান তেমনিভাবে পালন করেছে, যেমন ইবরাহীম (আঃ) থেকে বর্ণিত ছিল।

لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ অর্থাৎ, দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে তাদের এই উপস্থিতি তাদেরই উপকারের নিমিত্ত। এখানে منافع শব্দটি نكره ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ধর্মীয় উপকার তো অসংখ্য আছেই; পার্থিব উপকারও অনেক প্রত্যক্ষ করা হয়। কমপক্ষে এতটুকু বিষয় স্বয়ং বিস্ময়কর যে, হজ্বের সফরে বিরাট অঙ্কের টাকা ব্যয় হয়, যা কেউ কেউ সারা জীবন পরিশ্রম করে অল্প অল্প সঞ্চয় করে এবং এখানে একই সময়ে ব্যয় করে ফেলে, কিন্তু সারা বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও এরূপ ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, কোন ব্যক্তি হজ্ব অথবা ওমরায় ব্যয় করার কারণে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হয়ে গেছে; এ ছাড়া অন্যান্য কাজে যেমন, বিয়ে-শাদীতে, গৃহনির্মাণে টাকা ব্যয় করে নিঃস্ব ও ফকীর হওয়া হাজারো মানুষ যত্রতত্র দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ্ তাআলা হজ্ব ও ওমরার সফরে এই বৈশিষ্ট্যও নিহিত রেখেছেন যে, এতে কোন ব্যক্তি পার্থিব দারিদ্র্য ও উপবাসের সম্মুখীন হয় না। বরং কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, হজ্ব-ওমরায় ব্যয় করলে দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ততা দূর হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ বিষয়টিও সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে। হজ্বের ধর্মীয় কল্যাণ তো অনেক; তন্মধ্যে নিম্নে বর্ণিত কল্যাণটি কোন অংশে কম নয়। আবু হোরায়রার এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্যে হজ্ব করে এবং তাতে অশ্লীল ও গোনাহের কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকে, সে হজ্ব থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেন আজই মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে; অর্থাৎ, জন্মের অবস্থায় শিশু যেমন নিষ্পাপ থাকে, সে-ও তদ্রূপই হয়ে যায়।— (বুখারী, মুসলিম, মাযহারী)

বায়তুল্লাহ্র কাছে হাজীদের আগমনের এক উপকার তো উপরে বর্ণিত হল যে, তারা তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে।

দ্বিতীয় উপকার এরূপ বর্ণিত হয়েছে— وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ অর্থাৎ, যাতে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে সেসব জন্তুর উপর, যেগুলো আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছেন। এতে প্রথম জরুরী কথা এই যে, কোরবানীর গোশত ও তা থেকে অর্জিত উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য না থাকা উচিত, বরং আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র যিকর, যা এই দিনগুলোতে কোরবানী করার সময় জন্তুদের উপর করা হয়। এটাই এবাদতের প্রাণ। কোরবাণীর গোশত তাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। এটা বাড়তি নেয়ামত। 'নির্দিষ্ট দিনগুলো' বলে সেই দিনগুলো বোঝানো হয়েছে, যেগুলোতে কোরবানী করা জায়েয,অর্থাৎ, যিলহজ্ব মাসের ১০,১১ ও ১২ তারিখ। مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ এর অর্থ ব্যাপক; ওয়াজিব হোক কিংবা মোস্তাহাব সব রকম কোরবানী এর অন্তর্ভুক্ত।

فَكُلُوا مِنْهَا এখানে كلوا শব্দটি আদেশসূচক পদ হলেও অর্থ ওয়াজিব করা নয়; বরং অনুমতি দান ও বৈধতা প্রকাশ করা; যেমন— কোরআনের وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا আয়াতে শিকারের আদেশ অনুমতিদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ এর আভিধানিক অর্থ ময়লা, যা মানুষের দেহে জমা হয়। এহ্রাম অবস্থায় চুল মুণ্ডানো, কাটা, উপড়ানো, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি হারাম। তাই এগুলোর নীচে ময়লা জমা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্বের কোরবানী সমাপ্ত হলে দেহের ময়লা দূর করে দাও। অর্থাৎ, এহ্রাম খুলে ফেল, মাথা মুণ্ডাও এবং নখ কাট। নাভীর নীচের চুলও পরিষ্কার কর। আয়াতে প্রথমে কোরবানী ও পরে এহ্রাম খোলার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই ক্রম অনুযায়ীই করা উচিত। কোরবানীর পূর্বে নখ কাটা, মাথা মুণ্ডানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কেউ এরূপ করলে তাকে ক্রটিজনিত কোরবানী করতে হবে।

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ – نذور শব্দটি نذر এর বহুবচন। এর অর্থ মানত। এর স্বরূপ এই যে, শরীয়তের আইনে যে কাজ কোন ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়, যদি সে মুখে মানত করে যে, আমি একাজ করব অথবা আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার জন্যে একাজ করা জরুরী তবে একেই নযর বা মানত বলা হয়। একে পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদিও মূলতঃ তা ওয়াজিব ছিল না। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার জন্যে কাজটি গোনাহ্ ও নাজায়েয না হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি কেউ কোন গোনাহ্র কাজের মানত করে, সেই গোনাহ্র কাজ করা তার উপর ওয়াজিব নয়; বরং বিপরীত করা ওয়াজিব। তবে কসমের কাফ্ফারা আদায় করা জরুরী হবে। আবু হানীফা (রহঃ) প্রমুখ ফেকাহ্বিদের মতে কাজটি উদ্দিষ্ট এবাদত জাতীয় হওয়াও শর্ত; যেমন— নামায, রোযা, সদকা, কোরবানী ইত্যাদি। অতএব যদি কোন ব্যক্তি নফল নামায, রোযা, সদকা ইত্যাদির মানত করে তবে এই নফল তার যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। আলোচ্য আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। এতে মানত পূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

মাসআলা ঃ স্মর্তব্য যে, শুধু মনে মনে কোন কাজ করার ইচ্ছা করলেই মানত হয় না, যে পর্যন্ত মানতের শব্দ উচ্চারণ না করে। তফসীরে-মাযহারীতে এস্থলে নযর ও মানতের বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই।

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ এখানে তওয়াফ বলে তওয়াফে-যেয়ারত বোঝানো হয়েছে, যা যিলহজ্বের দশ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ ও কোরবানীর পর করা হয়। এই তওয়াফ হজ্বের দ্বিতীয় রোকন ও ফরয। প্রথম রোকন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। এটা আরও পূর্বে আদায় করা হয়। তওয়াফে-যেয়ারতের পর এহ্রামের সব বিধান পূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ এহ্রাম খুলে যায়।- (রূহুল-মা'আনী

بيت عتيق - عتيق শব্দের অর্থ মুক্ত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর গৃহের নাম بيت عتيق রেখেছেন ; কারণ আল্লাহ্ একে কাফের ও অত্যাচারীদের আধিপত্য ও অধিকার থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।— (রূহুল-মা'আনী) কোন কাফেরের সাধ্য নেই যে, একে অধিকারভুক্ত করে। আসহাবে-ফীল তথা হস্তী-বাহিনীর ঘটনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۗ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا
خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ
مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿٣١﴾ ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ
تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۗ
فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿٣٤﴾
الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى
مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٥﴾
وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا
فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا
لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا
دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۗ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا
لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٧﴾

(৩১) আল্লাহ্র দিকে একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সাথে শরীক না করে; এবং যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। (৩২) এটা শ্রবণযোগ্য। কেউ আল্লাহ্র নামযুক্ত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ের আল্লাহ্ভীতিপ্রসূত। (৩৩) চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে তোমাদের জন্যে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উপকার রয়েছে। অতঃপর এগুলোকে পৌঁছাতে হবে মুক্ত গৃহ পর্যন্ত। (৩৪) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে কোরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহ্র দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে। অতএব তোমাদের আল্লাহ্ তো একমাত্র আল্লাহ্ সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও; (৩৫) যাদের অন্তর আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং যারা নামায কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে, (৩৬) এবং কা'বার জন্যে উৎসর্গীকৃত উটকে আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে তোমাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় তাদের যবেহ্ করার সময় তোমরা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর। অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং আহার করাও যে কিছু যাচ্ঞা করে না তাকে এবং যে যাচ্ঞা করে তাকে। এমনিভাবে আমি এগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৩৭) এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে তাঁর কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া। এমনিভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহ্র মহত্ত্ব ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

حُرُمٰتِ اللّٰهِ –বলে আল্লাহ্র নির্ধারিত সম্মানযোগ্য বিষয়াদি অর্থাৎ, শরীয়তের বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। এগুলোর সম্মান তথা এগুলো সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা ইহকাল পরকালে সৌভাগ্য লাভের উপায়।

وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ – انعام –বলে উট, গরু, ছাগল, মেষ, দুম্বা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এগুলো এহ্রাম অবস্থায়ও হালাল। اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ –বাক্যে যেসব জন্তু ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ, মৃত জন্তু, যে জন্তুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়নি কিংবা যে জন্তুর উপর অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। এগুলো সর্বাবস্থায় হারাম–এহ্রাম অবস্থায় হোক কিংবা এহ্রামের বাইরে।

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ – رجس শব্দের অর্থ অপবিত্রতা, ময়লা اوثان শব্দটি وثن এর বহুবচন; অর্থ মূর্তি। মূর্তিদেরকে অপবিত্রতা বলা হয়েছে; কারণ ; এরা মানুষের অন্তরকে শেরকের অপবিত্রতা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়।

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ – قول زور –এর অর্থ মিথ্যা। যা কিছু সত্যের পরিপন্থী, তাই বাতিল ও মিথ্যাভুক্ত। শেরক ও কুফরের বিশ্বাস হোক কিংবা পারস্পরিক লেন–দেন ও সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যা বলা হোক। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ বৃহত্তম কবীরা গোনাহ্ এগুলো ঃ আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা–মাতার অবাধ্যতা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলা। তিনি শেষোক্ত শব্দ قَوْلَ الزُّوْرِ কে বার বার উচ্চারণ করেন। – (বোখারী)

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ – شَعَآئِر শব্দটি شعيرة – এর বহুবচন। এর অর্থ আলামত, চিহ্ন। যে যে বিষয়কে কোন বিশেষ মাযহাব অথবা দলের আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে তার شَعَآئِر বলা হয়। সাধারণের পরিভাষায় যে যে বিধানকে মুসলমান হওয়ার আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে শা'আয়েরে–ইসলাম' বলা হয়। হজ্বের অধিকাংশ বিধান তদ্রূপই।

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ –অর্থাৎ, আল্লাহ্র আলামতসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আন্তরিক খোদাভীতির লক্ষণ যার অন্তরে তাকওয়া ও খোদাভীতি থাকে, সে–ই এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, মানুষের অন্তরের সাথেই তাকওয়ার সম্পর্ক। অন্তরে খোদাভীতি থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সব কাজকর্মে পরিলক্ষিত হয়।

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى –অর্থাৎ, চতুষ্পদ জন্তু থেকে দুধ, সওয়ারী, মাল পরিবহণ ইত্যাদি সর্বপ্রকার উপকার লাভ করা তোমাদের জন্যে তখন পর্যন্ত হালাল, যে পর্যন্ত এগুলোকে হরম শরীফে যবেহ্ করার জন্যে উৎসর্গ না কর। হজ্ব অথবা ওমরাকারী ব্যক্তি যবেহ্ করার জন্যে যে জন্তু সাথে নিয়ে যায় তাকে হাদী বলা হয়। যখন কোন জন্তুকে হরমের হাদী হওয়ার জন্যে উৎসর্গ করা হয় তখন তা থেকে কোন উপকার লাভ

করা বিশেষ কোন অপারগতা ছাড়া জায়েয নয়। যদি কেউ উটকে হাদী করে সাথে নেয়, তার সাথে সওয়ারীর অন্য কোন জন্তু না থাকে এবং পায়ে হাঁটা তার জন্যে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, তবে এরূপ অপারগতার কারণে সে হাদীর উটে সওয়ার হতে পারে।

ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ —এখানে بيت عتيق (সম্মানিত গৃহ) বলে সম্পূর্ণ হরম বোঝানো হয়েছে। হরম বায়তুল্লাহ্রই বিশেষ আঙিনা ; যেমন—পূর্ববর্তী আয়াতে 'মসজিদে-হারাম' বলে হরম বোঝানো হয়েছে। محل অর্থাৎ, মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার স্থান। এখানে যবেহ্ করার স্থান বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, হাদীর জন্তু যবেহ্ করার স্থান বায়তুল্লাহ্র সন্নিকট; অর্থাৎ, সম্পূর্ণ হরম। এতে বোঝা গেল যে, হরমের ভিতরে হাদী যবেহ্ করা জরুরী, হরমের বাইরে জায়েয নয়। হরম মিনার কোবান গাহ্ও হতে পারে; মক্কা মোকাররমার অন্য কোন স্থানও হতে পারে। -(রূহুল-মা'আনী)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا —আরবী ভাষায় نسك ও منسك কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) জন্তু কোরবানী করা, (দুই) হজ্বের ক্রিয়াকর্ম এবং (তিন) এবাদত। কোরআন পাকে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দটি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তিন অর্থই হতে পারে। এ কারণেই তফসীরকারক মুজাহিদ প্রমুখ এখানে منسك -এর অর্থ কোরবানী নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এই উম্মতকে কোরবানীর যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা কোন নতুন আদেশ নয়, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও কোরবানীর আদেশ দেয়া হয়েছিল। কাতাদাহ্ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। তাঁর মতে আয়াতের অর্থ এই যে, হজ্বের ক্রিয়াকর্ম যেমন এই উম্মতের উপর আরোপ করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও হজ্ব ফরয করা হয়েছিল। ইবনে আরাফা তৃতীয় অর্থ ধরে আয়াতের অর্থ করেছেন যে, আমি আল্লাহ্র এবাদত পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ফরয করেছিলাম। এবাদতের পদ্ধতিতে কিছু কিছু পার্থক্য সব উম্মতেই ছিল, কিন্তু মূল এবাদত সবার মধ্যে অভিন্ন ছিল।

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ —আরবী ভাষায় خبت শব্দের অর্থ নিম্নভূমি। এ কারণে এমন ব্যক্তিকে خبيت বলা হয়, যে নিজেকে হেয় মনে করে। এ জন্যেই কাতাদাহ্ ও মুজাহিদ مخبتين -এর অর্থ করেছেন বিনয়ী। আমর ইবনে-আস বলেন ঃ এমন লোকদেরকে مخبتين বলা হয়, যারা অন্যের উপর জুলুম করে না। কেউ তাদের উপর জুলুম করলে তারা তার প্রতিশোধ নেয় না। সুফিয়ান বলেন ঃ যারা সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও অভাব-অনটনে আল্লাহ্র ফয়সালা ও তকদীরে সন্তুষ্ট থাকে, তারাই مخبتين

وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ - وجل -এর আসল অর্থ ঐ ভয়ভীতি, যা কারও মাহাত্ম্যের কারণে অন্তরে সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্র সৎকর্মপরায়ণ বন্দাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ তাআলার যিকর ও নাম শুনে তাদের অন্তরে এক বিশেষ ভীতি সঞ্চার হয়ে যায়।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ —পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মের আলামতরূপে গণ্য হয়, এমন বিশেষ বিধি-বিধান ও এবাদতকে شعائر বলা হয়। কোরবানীও এমন বিধানাবলীর অন্যতম। কাজেই এ ধরনের বিধানসমূহ পালন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ صَوَافَّ -শব্দের অর্থ সারিবদ্ধভাবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ জন্তু তিন পায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান থাকবে এবং এক পা বাঁধা থাকবে। উটের জন্য এই নিয়ম। দণ্ডায়মান অবস্থায় উট কোরবানী করা সুন্নত ও উত্তম। অবশিষ্ট সব জন্তুকে শোয়া অবস্থায় যবেহ্ করা সুন্নত।

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا —এখানে وجبت -এর سقطت যেমন বাকপদ্ধতিতে বলা হয় الشمس وجبت অর্থাৎ, সূর্য ঢলে পড়েছে। এখানে জন্তুর প্রাণ নির্গত হওয়া বোঝানো হয়েছে।

الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ —যাদেরকে কোরবানীর গোশত দেয়া উচিত। পূর্ববর্তী আয়াতে তাদেরকে بائس বলা হয়েছে। এর অর্থ দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত। এই আয়াতে তদস্থলে قانع ও معتر শব্দদ্বয়ের দ্বারা তার তফসীর করা হয়েছে। قانع ঐ অভাবগ্রস্ত ফকীরকে বলা হয়, যে কারও কাছে যাঞ্চা করে না, দারিদ্র্য সত্ত্বেও স্বস্থানে বসে থাকে এবং কেউ কিছু দিলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে معتر ঐ ফকীরকে বলা হয়, যে কিছু পাওয়ার আশায় অন্যত্র গমন করে—মুখে সওয়াল করুক বা না করুক।— (মাযহারী)

এবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং মনের তাকওয়া ও আনুগত্যই আসল উদ্দেশ্য ঃ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا

-বাক্যে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, কোরবানী একটি মহান এবাদত ; কিন্তু আল্লাহ্র কাছে এর গোশ্ত ও রক্ত পৌঁছে না এবং কোরবানীর উদ্দেশ্যও এগুলো নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য জন্তুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। অন্যান্য সব এবাদতের মূল উদ্দেশ্যও তাই। নামাযে উঠা-বসা করা, রোযায় ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহ্র আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য। আন্তরিকতা ও মহব্বত বর্জিত এবাদত প্রাণহীন কাঠামো মাত্র। কিন্তু এবাদতের শরীয়তসম্মত কাঠামোও এ কারণে জরুরী যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার আদেশ পালনের জন্যে এই কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

إِنَّ اللهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٨﴾ أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللهَ
عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ﴿٣٩﴾ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ
إِلَّا أَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ
فِيْهَا اسْمُ اللهِ كَثِيْرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ
عَزِيْزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا
الزَّكٰوةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ
الْأُمُوْرِ ﴿٤١﴾ وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ
وَّثَمُوْدُ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ﴿٤٣﴾ وَّأَصْحٰبُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ
مُوْسٰى فَأَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٤﴾
فَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا
وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ﴿٤٥﴾ أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ
لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَا أَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا
تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ﴿٤٦﴾

(৩৮) আল্লাহ্ মুমিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ্ কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। (৩৯) যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। (৪০) যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্। আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নির্জন গির্জা, এবাদতখানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহ্র নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ্র সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী শক্তিধর। (৪১) তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারভুক্ত। (৪২) তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে কওমে নূহ, আদ, সামূদ, (৪৩) ইবরাহীম ও লূতের সম্প্রদায়ও (৪৪) এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরা এবং মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল মূসাকেও। অতঃপর আমি কাফেরদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। অতএব কি ভীষণ ছিল আমাকে অস্বীকৃতির পরিণাম! (৪৫) আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল গোনাহ্গার। এই সব জনপদ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে! (৪৬) তারা কি এই উদ্দেশে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রথম আদেশ ঃ মক্কায় মুসলমানদের উপর কাফেরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কোন দিন যেত না যে, কোন না কোন মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহৃত হয়ে না আসত। মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফেরদের যুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ) জওয়াবে বলতেন ঃ সবর কর। আমাকে এখনও যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল।—(কুরতুবী)

যখন রসূলে করীম (সাঃ) মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে বাধ্য হন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হয়– اخرجوا نبيهم ليهلكن অর্থাৎ এরা তাদের পয়গম্বরকে বহিষ্কার করেছে। এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মদীনায় পৌঁছার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।–(কুরতুবী)

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হাইয়্যান, হাকিম প্রমুখের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এই প্রথম আয়াত কাফেরদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে অবতীর্ণ হল। ইতিপূর্বে সত্তরেরও অধিক আয়াতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

জেহাদ ও যুদ্ধের একটি রহস্য ঃ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ –এতে জেহাদ ও যুদ্ধের রহস্য এবং এটা যে নতুন নির্দেশ নয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মত ও পয়গম্বরদেরকেও কাফেরদের মোকাবেলায় যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরূপ না করা হলে কোন মাযহাব ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকত না এবং সব ধর্ম ও উপাসনালয় বিধ্বস্ত হয়ে যেত।

لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ –বিগত যমানায় যত ধর্মের ভিত্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে এবং পরিবর্তিত হয়ে কুফর ও শেরকে পরিণত হয়েছে, সেসব ধর্মের উপাসনালয়সমূহের নাম এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, স্ব স্ব যমনায় তাদের উপাসনালয়গুলোর সম্মান ও সংরক্ষণ ফরয ছিল। আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি কোন সময়ই নবুওয়ত ও ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; যেমন–অগ্নিপূজারী মজুস অথবা মূর্তিপূজারী হিন্দু। কেননা, তাদের এবাদতখানা কোন সময়ই সম্মানার্হ ছিল না।

صَوَامِعُ –শব্দটি صومعة এর বহুবচন। এটা খ্রীষ্টানদের সংসার ত্যাগী দরবেশদের বিশেষ এবাদতখানা। وَبِيَعٌ শব্দটি بيعة এর বহুবচন। খ্রীষ্টানদের সাধারণ গির্জাকে بيعة বলা হয়। وَّصَلَوٰتٌ শব্দটি صلوٰت এর বহুবচন। ইহুদীদের এবাদতখানাকে وَّصَلَوٰتٌ এবং মুসলমানদের এবাদতখানাকে وَّمَسٰجِدُ বলা হয়।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ ও জেহাদের আদেশ অবতীর্ণ না হলে কোন সময়েই কোন ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। মূসা (আঃ)–এর আমলে وَّصَلَوٰتٌ, ঈসা (আঃ)–এর আমলে وَبِيَعٌ ও صَوَامِعُ এবং

শেষনবী (সাঃ)-এর যমানায় মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত। —(কুরতুবী)

খোলাফায়ে রাশেদীনের পক্ষে কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ও তার প্রকাশ ঃ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ এই আয়াতে তাদেরই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে,যাদের বর্ণনা اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ আয়াতে ছিল ; অর্থাৎ, যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিনা কারণে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিলে তারা তাদের ক্ষমতাকে নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধের কাজে প্রয়োগ করবে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরে তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মুসলমানদের কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিলেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্মের উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। এ কারণেই হযরত ওসমান গনী (রাঃ) বলেনঃ ثناء قبل بلاء অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার এই এরশাদ কর্ম অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই কর্মীদের গুণ ও প্রশংসা-কীর্তন করার শামিল। এরপর আল্লাহ্ তাআলার এই নিশ্চিত সংবাদ দুনিয়াতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। চার জন খোলাফায়ে-রাশেদীন এবং মুহাজিরগণ اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا আয়াতের বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকেই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলেন এবং কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ তাদের কর্ম ও কীর্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যবহার করেন। তাঁরা নামায প্রতিষ্ঠিত করেন, যাকাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন, সৎকাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন।

এ কারণেই আলেমগণ বলেন ঃ এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, খোলাফায়ে-রাশেদীন সবাই এই সুসংবাদের যোগ্যপাত্র ছিলেন এবং তাঁদের আগমনে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা সত্য, বিশুদ্ধ এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা, সন্তুষ্টি ও আগমন সংবাদের অনুরূপ ছিল।—(রূহুল-মা'আনী)

এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযূলের ঘটনাভিত্তিক দিক। কিন্তু বলাবাহুল্য কোরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোন বিশেষ ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না ; বরং নির্দেশও ব্যাপক হয়ে থাকে। এ কারণেই তফসীরবিদ যাহ্হাক বলেন ঃ এই আয়াতে তাদের জন্যেই নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষমতাসীন থাকাকালে তাদের এমনসব কর্ম আনজাম দেয়া উচিত, যেগুলো খোলাফায়ে-রাশেদীন তাদের যমানায় আনজাম দিয়েছিলেন।—(কুরতুবী)

শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশে দেশভ্রমণ ধর্মীয় কাম্য ঃ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ -এই আয়াতে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশভ্রমণে উৎসাহিত করা হয়েছে। فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ -বাক্যে ইঙ্গিত আছে যে, অতীতকাল ও অতীত জাতিসমূহের অবস্থা সরেযমীনে প্রত্যক্ষ করলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তবে শর্ত এই যে, এসব অবস্থা শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখতে হবে। ইবনে আবী হাতেম কিতাবুত্তাফাক্কুরে মালেক ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)-কে আদেশ দেন যে, লোহার জুতা ও লোহার লাঠি তৈরী কর এবং আল্লাহ্র পৃথিবীতে এত গোরাফেরা কর যে, লোহার জুতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং লোহার লাঠি ভেঙ্গে যায়।—(রূহুল-মা'আনী) এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ হলে এই ভ্রমণ ও পর্যটনের উদ্দেশ্য জ্ঞান ও চক্ষুষ্মানতা অর্জন করা বৈ অন্য কিছু নয়।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللهُ وَعْدَهٗ ۚ وَاِنَّ يَوْمًا
عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٤٧﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ
اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿٤٨﴾ قُلْ
يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا
فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾ وَمَاۤ اَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّاۤ اِذَا تَمَنّٰۤى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ
فِيْۤ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ
اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ
فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَ
اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ
قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ اللهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٤﴾
وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ
السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ﴿٥٥﴾

(৪৭) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ আল্লাহ্ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান (৪৮) এবং আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি এমতাবস্থায় যে, তারা গোনাহগার ছিল। এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি এবং আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৯) বলুনঃ হে লোক সকল! আমি তো তোমাদের জন্যে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী (৫০) সুতরাং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে আছে পাপ মার্জনা এবং সম্মানজনক রুযী। (৫১) এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্যে চেষ্টা করে, তারাই দোযখের অধিবাসী। (৫২) আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে। এরপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়, (৫৩) এ কারণে যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, তাদের জন্যে, যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যারা পাষাণহৃদয়। গোনাহগাররা দূরবর্তী বিরোধিতায় লিপ্ত আছে (৫৪) এবং এ কারণেও যে, যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে; তারা যেন জানে যে, এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য; অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি বিজয়ী হয়। আল্লাহ্ই বিশ্বাসস্থাপনকারীকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। (৫৫) কাফেররা সর্বদাই সন্দেহ পোষণ করবে যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আকস্মিকভাবে কেয়ামত এসে পড়ে অথবা এসে পড়ে তাদের কাছে এমন দিবসের শাস্তি যা থেকে রক্ষার উপায় নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য ঃ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ –অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তার একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে। এই দিন বলে কেয়ামতের দিন বোঝানো যেতে পারে। এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, ভয়াবহ ঘটনাবলী ও ভয়ংকর অবস্থার কারণে এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান দীর্ঘ মনে হবে। অনেক তফসীরকারক এখানে এই অর্থই নিয়েছেন।

বাস্তবক্ষেত্রেও পরকালের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হতে পারে। কোন কোন হাদীসে এর পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুরায়রা বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদিন নিঃস্ব মুহাজিরদের উদ্দেশে বললেন, আমি তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি ; আরও বলছি যে, তোমরা ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন পূর্বে বেহেশতে যাবে আল্লাহ্র একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে। কাজেই নিঃস্বরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।—(মাযহারী)

তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই দ্বিতীয় অর্থটি كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব ঃ সূরা মা'আরেজে পরকালের দিনকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। আয়াত এই – এতেও উপরোক্ত উভয় প্রকার তফসীর হতে পারে। প্রত্যেকের সংকট ভিন্ন ভিন্ন ও কম-বেশী হবে, তাই দিনটি কারও কাছে এক হাজার বছরের সমান এবং কারও কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অনুভূত হবে। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী পরকালের দিনকে প্রকৃতই পঞ্চাশ হাজার বছরের ধরা হলে উভয় আয়াত বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়; অর্থাৎ, এক আয়াতে এক হাজার এবং অপর আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছরের উল্লেখ আছে।

مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ –এ থেকে জানা যায় যে, রসূল ও নবী এক নয় পৃথক পৃথক অর্থ রাখে। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট উক্তি এই যে, নবী তাঁকে বলা হয়, যাঁকে জনগণের সংস্কারের উদ্দেশে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবুওয়তের পদ দান করা হয় এবং তাঁর কাছে ওহী আগমন করে—তাঁকে কোন স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হোক বা কোন পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট করা হোক। যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হয়, তাঁর দৃষ্টান্ত হযরত মূসা, ঈসা (আঃ) ও শেষনবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)। এবং যিনি পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট , তাঁর দৃষ্টান্ত হযরত হারূন (আঃ)। তিনি মূসা (আঃ)-এর কিতাব তওরাত ও তাঁরই শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট ছিলেন। 'রসূল' তাঁকে বলা হয়, যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হয়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, যিনি রসূল হবেন তিনি নবীও হবেন। এটা জরুরী; কিন্তু যিনি নবী হবেন তাঁর রসূল হওয়া জরুরী নয়। এই ভাগাভাগি মানুষের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে ফেরেশতা ওহী নিয়ে আগমন করেন, তাঁকে রসূল বলা এর পরিপন্থী নয়। সূরা মারইয়ামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٥٩﴾ ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۖ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٣﴾ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦٤﴾

(৫৬) রাজত্ব সেদিন আল্লাহ্‌রই; তিনিই তাদের বিচার করবেন। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তারা নেয়ামতপূর্ণ কাননে থাকবে (৫৭) এবং যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে তাদের জন্যে লাঞ্ছনাকর শাস্তি রয়েছে। (৫৮) যারা আল্লাহ্‌র পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মরে গেছে; আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ্ সর্বোৎকৃষ্ট রিযিক দাতা। (৫৯) তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে পৌছাবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, সহনশীল। (৬০) এ তো শুনলে, যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে নিপীড়ন পরিমাণে প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং পুনরায় সে নিপীড়িত হয়, আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (৬১) এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে দাখিল করে দেন এবং আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, দেখেন। (৬২) এটা এ কারণেও যে, আল্লাহ্ই সত্য; আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহ্ই সবার উচ্চে, মহান। (৬৩) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূপৃষ্ঠ সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে খবরদার। (৬৪) নভোমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সব তাঁরই এবং আল্লাহ্ই অভাবমুক্ত প্রশংসার অধিকারী।

اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ -আয়াতে تمنى শব্দের অর্থ قرأ (আবৃত্তি করে) এবং امنية শব্দের অর্থ قراءة অর্থাৎ, আবৃত্তি করা। আরবী অভিধানে এ অর্থও প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আবু হাইয়্যান বাহ্‌রে-মুহীত গ্রন্থে এবং আরও অনেক তফসীরকারক এ তফসীরই গ্রহণ করেছেন। হাদীস গ্রন্থাদিতে এস্থলে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা ''গারানিক'' নামে খ্যাত। অধিকসংখ্যক হাদীসবিদগণের মতে ঘটনাটি ভিত্তিহীন। কেউ কেউ একে বানোয়াট ও ধর্মদ্রোহীদের আবিষ্কার বলে অ্যাখ্যা দিয়েছেন। আর যারা একে ধর্তব্যও বলেছেন, হাদীসের বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অকাট্য নির্দেশাবলী সম্পর্কে যেসব সন্দেহ দেখা দেয়, তাঁরা সেসব সন্দেহের জওয়াবও দিয়েছেন। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, এই আয়াতের তফসীর এই ঘটনার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং উপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এ আয়াতের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা। ঘটনাটিকে অহেতুক আয়াতের তফসীরের অংশ সাব্যস্ত করে সন্দেহ ও সংশয়ের দ্বার উন্মোচন এবং অতঃপর জওয়াবদানে ব্যাপৃত হওয়া মোটেই লাভজনক কাজ নয়। তাই এ পথ পরিহার করা হল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ভূপৃষ্ঠের সব কিছুকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। অধীন করার বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থ এরূপ মনে করা হয় যে, তারা মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলবে। এই অর্থের দিক দিয়ে এখানে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের পাহাড়, নদী, হিংস্রজন্তু, পশুপক্ষী ইত্যাদি হাজারো বস্তু মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলে না। কিন্তু কোন কিছুকে মানুষের সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত করে দেয়াও প্রকৃতপক্ষে তার অধীন করে দেয়ারই নামান্তর। এ কারণেই তফসীরের সার-সংক্ষেপে تسخير এর তরজমা ''কাজে নিয়োজিত করা'' দ্বারা করা হয়েছে। সবকিছুকে মানুষের আজ্ঞাধীন করে দেয়ার শক্তিও আল্লাহ তাআলার ছিল। কিন্তু এর পরিণাম স্বয়ং মানুষের জন্যে ক্ষতিদায়ক হত। কারণ, মানুষের স্বভাব, আশা-আকাঙ্খা ও প্রয়োজন বিভিন্নরূপ। একজন নদীকে একদিকে গতি পরিবর্তনের আদেশ করত, অন্যজন তার বিপরীত দিকে আদেশ করত। এর পরিণাম অনর্থ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই হত না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা সবকিছুকে আজ্ঞাধীন তো নিজেরই রেখেছেন, কিন্তু অধীন করার যে আসল উপকার তা মানুষকে পৌছে দিয়েছেন।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا -এই বিষয়বস্তুই প্রায় এমনি শব্দ সহযোগে আলোচ্য সূরার ৩৪ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থলে منسك শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেখানে نسك ও منسك কোরবানীর অর্থে হজ্বের বিধানাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছিল। এজন্যে সেখানে واو সহকারে وَلِكُلِّ اُمَّةٍ বলা হয়েছিল। এখানে منسك এর অন্য অর্থ (অর্থাৎ, যবেহ্ করার বিধানাবলী অথবা শরীয়তের বিধানাবলীর জ্ঞান) বোঝানো হয়েছে এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বিধান। তাই এখানে واو সহকারে বলা হয়নি।

এই আয়াতের তফসীরের সার-সংক্ষেপ এই যে, কোন কোন কাফের মুসলমানদের সাথে তাদের যবেহ্ করা জন্তু সম্পর্কে অনর্থক তর্ক-বিতর্ক করত। তারা বলত ঃ তোমাদের ধর্মের এই বিবাদ আশ্চর্যজনক যে, যে

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي
فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ
إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِي
أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾
لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي
الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾
وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ
تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ
إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا
لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِن نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي
وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ
يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ
النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾

(৬৫) তুমি কি দেখ না যে, ভূপৃষ্ঠে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা তৎসমুদয়কে আল্লাহ্ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান। (৬৬) তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যুদান করবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন। নিশ্চিয় মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। (৬৭) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে এবাদতের একটি নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা তারা পালন করে। অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। আপনি তাদেরকে পালনকর্তার দিকে আহবান করুন। নিশ্চয় আপনি সরল পথেই আছেন। (৬৮) তারা যদি আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত। (৬৯) তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। (৭০) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আকাশে ও ভূমণ্ডলে আছে এসব কিতাবে লিখিত আছে। এটা আল্লাহ্র কাছে সহজ। (৭১) তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর পূজা করে, যার কোন সনদ নাযিল করা হয়নি এবং সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। বস্তুতঃ জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৭২) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন তুমি কাফেরদের চোখে-মুখে অসন্তোষের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। যারা তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে, তারা তাদের প্রতি মারমুখো হয়ে উঠে। বলুন, আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দেব? তা আগুন ; আল্লাহ্ কাফেরদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন। এটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

জন্তুকে তোমরা স্বহস্তে হত্যা কর, তা তো হালাল এবং যে জন্তুকে আল্লাহ্ তাআলা সরাসরি মৃত্যুদান করেন অর্থাৎ, সাধারণ মৃতজন্তু তা হারাম। তাদের এই বিতর্কের জওয়াবে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(রূহুল মা'আনী) অতএব এখানে منسك এর অর্থ হবে যবেহ্ করার নিয়ম। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক উম্মত ও শরীয়তের জন্যে যবেহ্র বিধান পৃথক পৃথক রেখেছেন। রসূলে করীম (সাঃ)-এর শরীয়ত একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত। এই শরীয়তের বিধি-বিধানের মোকাবেলা কোন পূর্ববর্তী শরীয়তের বিধি-বিধান দ্বারা করাও জায়েয নয়; অথচ তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত মতামত ও বাতিল চিন্তাধারার দ্বারা এর মোকাবেলা করছ। এটা কিরূপে জায়েয হতে পারে? মৃতজন্তু হালাল নয়, এটা এই উম্মত ও শরীয়তেরই বৈশিষ্ট্য নয়; পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও তা হারাম ছিল। সুতরাং তোমাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ভিত্তিহীন কথার উপর ভিত্তি করে পয়গম্বরের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই নির্বুদ্ধিতা।—(রূহুল মা'আনী) সাধারণ তফসীরকারকদের মতে منسك শব্দের অর্থ এখানে শরীয়তের সাধারণ বিধি-বিধান। কেননা, অভিধানে এর অর্থ নির্দিষ্ট স্থান, যা কোন বিশেষ ভাল অথবা মন্দ কাজের জন্যে নির্ধারিত থাকে। এ কারণেই হজ্বের বিধি-বিধানকে مناسك الحج বলা হয়! কেননা, এগুলোতে বিশেষ বিশেষ স্থান বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে নির্ধারিত আছে। (ইবনে-কাসীর) কামুসে نسك শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে এবাদত। কোরআনে وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। مناسك বলে এবাদতের বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে এই দ্বিতীয় তফসীরও বর্ণিত আছে। ইবনে জরীর, ইবনে-কাসীর, কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে এই ব্যাপক অর্থের তফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, منسك বলে শরীয়তের সাধারণ বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরেক ও ইসলামবিদ্বেষীরা মুহাম্মদী শরীয়তের বিধানাবলী সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাদের তর্কের ভিত্তি এই যে, তাদের পৈতৃক ধর্মে এসব বিধান ছিল না। তারা কি শোনেনি যে, কোন পূর্ববর্তী শরীয়ত ও কিতাব দ্বারা নতুন শরীয়ত ও কিতাবের মোকাবেলা করা বাতিল। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক উম্মতকে তার সময়ে বিশেষ শরীয়ত ও কিতাব দিয়েছেন। অন্য কোন উম্মত ও শরীয়ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে না আসা পর্যন্ত সেই শরীয়তের অনুসরণ সে উম্মতের জন্যে বৈধ ছিল। কিন্তু যখন অন্য শরীয়ত আগমন করে, তখন তাদেরকে এই নতুন শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে। নতুন শরীয়তের কোন বিধান পূর্ববর্তী শরীয়তের বিরোধী হলে প্রথম বিধানকে 'মনসূখ' তথা রহিত এবং দ্বিতীয় বিধানকে 'নাসেখ' তথা রহিতকারী মনে করা হবে। কাজেই যিনি নতুন শরীয়তের বাহক, তাঁর সাথে কাউকে তর্ক-বিতর্কের অনুমতি দেয়া যায় না। আয়াতের সর্বশেষ বাক্য فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ-এর সারমর্মও তাই। অর্থাৎ, বর্তমানকালে যখন শেষনবী (সাঃ) একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছেন, তখন তাঁর শরীয়তের সব বিধি-বিধান নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করার অধিকার কারও নেই।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, প্রথম তফসীর ও এই দ্বিতীয় তফসীরের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই। কারণ, আয়াত যবেহ্ সম্পর্কিত তর্ক-বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক ও শরীয়তের সব বিধি-বিধান এতে শামিল। ভাষার ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়ে থাকে-অবতরণ স্থলের বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য নয়। কাজেই উভয়

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ
تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا۟ ذُبَابًا وَلَوِ
ٱجْتَمَعُوا۟ لَهُۥ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ
مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ
حَقَّ قَدْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾ ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ
ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ
ٱلْأُمُورُ ﴿٧٦﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَ
ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾
وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا
لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى
ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟
بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

(৭৩) হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনকিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। (৭৪) তারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য মর্যাদা বোঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশীল। (৭৫) আল্লাহ্ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রসূল মনোনীত করেন। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্ব দ্রষ্টা। (৭৬) তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা পশ্চাতে আছে এবং সবকিছু আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৭৭) হে মুমিনগণ, তোমরা রুকূ কর, সেজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর এবং সৎকাজ সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৭৮) তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষদাতা হও মানবমণ্ডলির জন্যে। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

তফসীরের সারমর্ম এই হবে যে, আল্লাহ্ তাআলা যখন প্রত্যেক উম্মতকে আলাদা আলাদা শরীয়ত দিয়েছেন যার মধ্যে বিভিন্নমুখী খুঁটিনাটি বিধানও থাকে, তখন কোন পূর্ববর্তী শরীয়তের অনুসারীর এরূপ অধিকার নেই যে, নতুন শরীয়ত সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করবে; বরং নুতন শরীয়তের অনুসরণ তার উপর ওয়াজিব। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ অর্থাৎ আপনি তাদের আপত্তি বা তর্ক-বিতর্কে প্রভাবান্বিত হবেন না; বরং যথারীতি সত্যের প্রতি দাওয়াতের কর্তব্য পালনে মশগুল থাকুন। কারণ, আপনি সত্য ও সরল পথে রয়েছেন। আপনার বিরোধীরাই পথচ্যুত।

একটি সন্দেহের কারণ ঃ উপরোক্ত আলোচনা থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেল যে, মুহাম্মদী শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরীয়ত মনসূখ হয়ে গেছে। এখন যদি খ্রীষ্টান, ইহুদী ইত্যাদি সম্প্রদায় বলে যে, এই আয়াতে স্বয়ং কোরআন বলেছে যে, প্রত্যেক শরীয়ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগমন করেছে। কাজেই ইসলামের আমলেও যদি আমরা মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর শরীয়ত মেনে চলি, তবে মুসলমানদের তাতে আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা, স্বয়ং কোরআনই আমাদেরকে এই অবকাশ দিয়েছে। এর উত্তর এই যে, আয়াতে প্রত্যেক উম্মতকে বিশেষ শরীয়ত দেয়ার কথা উল্লেখ করার পর বিশ্বের মানবমণ্ডলীকে এ আদেশও দেয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা যেন এর বিরোধিতা না করে। একথা বলা হয়নি যে, মুসলমানরা যেন পূর্ববর্তী শরীয়তের কোন বিধানের বিপক্ষে কথা না বলে। আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলো দ্বারা এই বিষয়বস্তু আরও ফুটে উঠে। এসব আয়াতে ইসলামের বিপক্ষে তর্ককারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তিনিই এর শাস্তি দিবেন। وَإِن جَٰدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

একটি উপমা দ্বারা শিরক ও মূর্তিপূজার বোকাসুলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা ঃ ضُرِبَ مَثَلٌ ঃ – এই শব্দটি সাধারণতঃ কোন বিশেষ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেয়ার জন্যে ব্যবহৃত হয়। এখানে তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে শেরক ও মূর্তিপূজার বোকামী একটি সুস্পষ্ট উপমা দ্বারা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, যে মূর্তিদেরকে তোমরা কার্যোদ্ধারকারী মনে কর, তারা এতই অসহায় ও শক্তিহীন যে, সবাই একত্রিত হয়ে একটি মাছির ন্যায় নিকৃষ্ট বস্তুও সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করা তো বড় কথা তোমরা রোজই তাদের সামনে মিষ্টান্ন, ফল-মূল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য রেখে দাও। মাছিরা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলে। মাছিদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের হয় না। অতএব তারা তোমাদেরকে বিপদ থেকে কিরূপে উদ্ধার করবে? এ কারণেই আয়াতের শেষে ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ বলে তাদের মূর্খতা ও বোকামী ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ, যাদের উপাস্যই এমন শক্তিহীন সেই উপাস্যের উপাসক আরও বেশী শক্তিহীন হবে। مَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ অর্থাৎ,এই নির্বোধ নিমকহারামরা আল্লাহ্‌র মর্যাদা বোঝেনি। ফলে এমন সর্বশক্তিমানের সাথে এমন শক্তিহীন

ও চেতনাহীন প্রস্তরসমূহকে শরীক সাব্যস্ত করেছে।

সূরা হজ্জের সেজদায়ে-তেলাওয়াত ঃ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ –সূরা হজ্জে এক আয়াত পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, যাতে সর্বসম্মতিক্রমে সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব। এখানে উল্লেখিত আয়াতে সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী (রহঃ)–এর মতে এই আয়াতে সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়। কেননা, এতে সেজদার সাথে রুকূ ইত্যাদিও উল্লেখিত হয়েছে। এতে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এখানে নামাযের সেজদা বোঝানো হয়েছে, যেমন وَاسْجُدِي وَارْكَعِي আয়াতে সবাই একমত যে, এতে নামাযের সেজদা উদ্দেশ্য। এই আয়াত তেলাওয়াত করলে সেজদা ওয়াজিব হয় না। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতেও সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ প্রমুখের মতে, এই আয়াতেও সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব। তাঁদের প্রমাণ সেই হাদীস, যাতে বলা হয়েছে ঃ সূরা হজ্জ অন্যান্য সূরার উপর এই শ্রেষ্ঠত্ব রাখে যে, এতে দু'টি সেজদায়ে তেলাওয়াত আছে। ইমাম আযমের মতে, এই হাদীসটি প্রামাণ্য নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহ্ ও হাদীসের কিতাবাদিতে দ্রষ্টব্য।

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ – جهاد ও مجاهدة শব্দের অর্থ কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্যে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্যে কষ্ট স্বীকার করা। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলমানরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জেহাদ বলা হয়। حَقَّ جِهَادِهِ এর অর্থ আল্লাহ্র ওয়াস্তে জেহাদ করা, তাতে জাগতিক নাম-যশ ও গনীমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা।

হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন ঃ حَقَّ جِهَادِهِ এর অর্থ জেহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা। কোন কোন তফসীরকারকের মতে এখানে জেহাদের অর্থ সাধারণ এবাদত ও আল্লাহ্র বিধি-বিধান পালনে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তা পালন করা।

যাহ্হাক ও মোকাতিল বলেন ঃ
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র জন্যে কাজ কর, যেমন করা উচিত এবং আল্লাহ্র এবাদত কর, যেমন করা উচিত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক বলেন ঃ এস্থলে জেহাদ বলে নিজ প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জেহাদ করা বোঝানো হয়েছে এবং এটাই حَقَّ جِهَادِهِ অর্থাৎ, যথাযোগ্য জেহাদ। ইমাম বগভী প্রমুখ এই উক্তির সমর্থনে একটি হাদীসও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার সাহাবায়ে-কেরামের একটি দল কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষে ফিরে এলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ

তোমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে চমৎকারভাবে ফিরে এসেছ। উদ্দেশ্য এই যে, প্রবৃত্তির অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জেহাদ এখনও অব্যাহত আছে। এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করে বলেছেন যে, এর সনদে ত্রুটি আছে।

জ্ঞাতব্য ঃ তফসীরে-মাযহারীতে এই দ্বিতীয় তফসীর অবলম্বন করে আয়াত থেকে একটি তত্ত্ব উদঘাটন করা হয়েছে তা এই যে, সাহাবায়ে-কেরাম যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে রত ছিলেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ তখনও চালু ছিল, কিন্তু হাদীসে একে ফিরে আসার পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবৃত্তির বাসনার বিরুদ্ধে জেহাদ যদিও রণক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল, কিন্তু স্বভাবতঃই এই জেহাদ শায়খে-কামেলের সংসর্গলাভের উপর নির্ভরশীল। তাই জেহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিতির পরই তা শুরু হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী আল্লাহ্র মনোনীত উম্মত ঃ هُوَ اجْتَبَاكُمْ –হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র বনী-ইসরাঈলের মধ্য থেকে কেনানা গোত্রকে মনোনীত করেছেন, অতঃপর কেনানার মধ্য থেকে কোরাইশকে, অতঃপর কোরাইশের মধ্য থেকে বনী-হাশেমকে এবং বনী-হাশেমের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন। –(মুসলিম, মাযহারী)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ –অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। 'ধর্মে সংকীর্ণতা নেই'—এই বাক্যের তাৎপর্য কেউ কেউ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এই ধর্মে এমন কোন গোনাহ্ নেই, যা তওবা করলে মাফ হয় না এবং পরকালীন আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় হতে পারে না। পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় গোনাহ্ও ছিল, যা তওবা করলেও মাফ হত না।

হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ তফসীরে-মাযহারীতে বলেন ঃ ধর্মে সংকীর্ণতা নেই, একথার তাৎপর্য এরূপ হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতকে সকল উম্মতের মধ্য থেকে নিজের জন্যে মনোনীত করেছেন। এর কল্যাণে এই উম্মতের জন্যে ধর্মের পথে কঠিনতর কষ্টও সহজ বরং আনন্দদায়ক হয়ে যায়। পরিশ্রমে সুখ লাভ হতে থাকে। বিশেষতঃ অন্তরে ঈমানের মাধুর্য সৃষ্টি হয়ে গেলে ভারী কাজও হালকা-পাতলা মনে হতে থাকে। হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ **جعلت قرة عيني في الصلوٰة** –অর্থাৎ, নামাযে আমার চক্ষু শীতল হয়। –(আহমদ, –নাসায়ী, হাকিম)

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ –অর্থাৎ, এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ) এর মিল্লাত। এখানে প্রকৃতপক্ষে কোরাইশী মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা সরাসরি ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর। এরপর কোরাইশদের অনুগামী হয়ে সব মুসলমান এই ফযীলতে শামিল হয়; যেমন-হাদীসে আছে ঃ
সব মানুষ ধর্মক্ষেত্রে কোরাইশদের অনুগামী। মুসলমান মুসলমান কোরাইশীদের অনুগামী এবং কাফের কাফের কোরাইশীদের অনুগামী।—(মাযহারী)

কেউ কেউ বলেন ঃ আয়াতে সব মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এদিক দিয়ে সবার পিতা যে, নবী করীম (সাঃ) হচ্ছেন উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা; যেমন তাঁর বিবিগণ 'উম্মাহাতুল-মুমেনীন' অর্থাৎ, মুমিনদের মাতা। নবী করীম (সাঃ) যে, হযরত ইবরাহীমের বংশধর; একথা সুস্পষ্ট ও সুবিদিত।

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا –অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম

(আঃ) কোরআনের পূর্বে উম্মতে মুহাম্মদী এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন; যেমন হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া কোরআনে বর্ণিত আছে ঃ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا

أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ –কোরআনে মুমিনদের নামকরণ করা হয়েছে মুসলিম। যদিও এই নামকরণকারী প্রত্যক্ষভাবে হযরত ইবরাহীম নন, কিন্তু কোরআনের পূর্বে তাঁর এই নামকরণ কোরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করার কারণ হয়েছে। তাই এর সম্বন্ধও ইবরাহীম (আঃ)–এর দিকে করে দেয়া হয়েছে।

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

–অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি আল্লাহ্ তাআলার বিধি-বিধান এই উম্মতের কাছে পৌছে দিয়েছিলাম তখন উম্মতে–মহাম্মদী তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য পয়গম্বর যখন এই দাবী করবেন, তখন তাঁদের উম্মতরা অস্বীকার করে বসবে। তখন উম্মতে–মুহাম্মদী সাক্ষ্য দেবে যে, সব পয়গম্বরগণ নিশ্চিতরূপেই তাদের উম্মতের কাছে আল্লাহ্ তাআলার বিধানাবলী পৌছে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট উম্মতদের পক্ষ থেকে তাদের এই সাক্ষ্যের উপর জেরা হবে যে, আমাদের যমানায় উম্মতে–মুহাম্মদীর অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপারে কিরূপে সাক্ষী হতে পারে? উম্মতে–মুহাম্মদীর তরফ থেকে জেরার জওয়াবে বলা হবে ঃ আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু আমরা আমাদের রসূল (সাঃ)–এর মুখে একথা শুনেছি, যাঁর সত্যবাদিতায় কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে। এই বিষয়বস্তু বোখারী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর হাদীসে বর্ণিত আছে।

فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ –উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যখন তোমাদের প্রতি এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যেগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে, তখন তোমাদের কর্তব্য আল্লাহ্র বিধানাবলী পালনে পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া। বিধানাবলীর মধ্যে এস্থলে শুধু নামায ও যাকাত উল্লেখ করার কারণ এই যে, দৈহিক কর্ম ও বিধানাবলীর মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক বিধানাবলীর মধ্যে যাকাত সর্বাধিক গুরুত্ববহ; যদিও শরীয়তের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য।

وَاعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ –অর্থাৎ, সবকাজে একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা কর এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া কর, তিনি যেন তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ বলেন ঃ এই বাক্যের অর্থ এই যে, কোরআন ও সুন্নাহ্কে অবলম্বন কর, সর্বাবস্থায় এগুলোকে আঁকড়ে থাক; যেমন এক হাদীসে আছে ঃ

আমি তোমাদের জন্যে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এ দু'টিকে অবলম্বন করে থাকবে; পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্র কিতাব ও অপরটি আমার সুন্নত। –(মাযহারী)

সূরা হজ্জ সমাপ্ত

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّ ثَمَانَ عَشْرَةَ اٰيَةً وَّ سِتُّ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٥ اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝٧ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝٨ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝٩ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝١٠ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝١١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝١٢ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝١٣ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝١٤ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۝١٥ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۝١٦ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ۝١٧

সূরা আল মু'মিনূন

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১১৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, (২) যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র; (৩) যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত, (৪) যারা যাকাত দান করে থাকে (৫) এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। (৬) তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। (৭) অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে। (৮) এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে (৯) এবং যারা তাদের নামাযসমূহের খবর রাখে, (১০) তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে, (১১) তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে। (১২) আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। (১৩) অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। (১৪) এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কত কল্যাণময়! (১৫) এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। (১৬) অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে। (১৭) আমি তোমাদের উপর সপ্তপথ সৃষ্টি করেছি এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে অনবধান নই।

সূরা আল মু'মিনূন

সূরা মু'মিনূনের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঃ মুসনাদে-আহ্‌মদের এক রেওয়ায়েতে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হত, তখন নিকটবর্তী লোকদের কানে মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় আওয়াজ ধ্বনিত হত। একদিন তাঁর কাছে এমনি আওয়াজ শুনে আমরা সদ্যপ্রাপ্ত ওহী শোনার জন্যে থেমে গেলাম। ওহীর বিশেষ অবস্থা সমাপ্ত হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কেবলামুখী হয়ে বসে গেলেন এবং নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে লাগলেন ঃ

اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا .

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্ আমাদেরকে বেশী দাও—কম দিও না। আমাদের সম্মান বৃদ্ধি কর—লাঞ্ছিত করো না। আমাদেরকে দান কর—বঞ্চিত করো না। আমাদেরকে অন্যের উপর অধিকার দাও—অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ো না এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক এবং আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট কর।" এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এক্ষণে দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। কেউ যদি এ আয়াতগুলো পুরোপুরি পালন করে, তবে সে সোজা জান্নাতে যাবে। এরপর তিনি উপরোল্লেখিত দশটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

ইমাম নাসায়ী তফসীর অধ্যায় ইয়াযীদ ইবনে বাবনুস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চরিত্র কিরূপ ছিল? তিনি বললেন ঃ তাঁর চরিত্র অর্থাৎ, স্বভাবগত অভ্যাস কোরআনে বর্ণিত আছে। অতঃপর তিনি এই দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন ঃ এগুলোই ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চরিত্র ও অভ্যাস।—(ইবনে-কাসীর)

সাফল্য কি এবং কোথায় ও কিরূপে পাওয়া যায় ঃ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ (সাফল্য) শব্দটি কোরআন ও হাদীসে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আযান ও একামতে দৈনিক পাঁচবার প্রত্যেক মুসলমানকে সাফল্যের দিকে আহ্বান করা হয়। এর অর্থ প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হওয়া।—(কামূস) এই শব্দটি যেমনি সংক্ষিপ্ত, তেমনি সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। কোন মানুষ এর চাইতে বেশী কোনকিছু কামনাই করতে পারে না। বলাবাহুল্য, একটি মনোবাঞ্ছাও অপূর্ণ না থাকা এবং একটি কষ্টও অবশিষ্ট না থাকা—এরূপ পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করা জগতে কোন মহত্তম ব্যক্তিরও আয়ত্তাধীন নয়। সপ্তরাজ্যের অধিকারী বাদশাহ্ হোক কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও পয়গম্বর হোক, জগতে অবাঞ্ছিত কোন কিছুর সম্মুখীন না হওয়া এবং অন্তরে বাসনা জাগ্রত হওয়া মাত্রই অবিলম্বে তা পূর্ণ হওয়া কারও জন্যে সম্ভবপর নয়। অন্য কিছু না হলেও প্রত্যেক নেয়ামতের অবসান ও ধ্বংসের খট্‌কা এবং যে কোন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে তো কেউ মুক্ত নয়।

এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দুনিয়াতে অর্জিতই হতে পারে না। কেননা, দুনিয়া কষ্ট ও শ্রমের আবাসস্থল এবং এর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব ও স্থিরতা নেই। এই অমূল্য সম্পদ অন্য এক জগতে পাওয়া যায়, যার নাম জান্নাত। সে দেশেই মানুষের প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা সর্বক্ষণ ও বিনা

প্রতীক্ষায় অর্জিত হবে।— وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ অর্থাৎ, তারা যা চাইবে, তাই পাবে। সেখানে কোন সামান্যতম ব্যথা ও কষ্ট থাকবে না এবং প্রত্যেকেই একথা বলতে বলতে সেখানে প্রবেশ করবে ঃ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْۤ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ الَّذِیْۤ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ

অর্থাৎ, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদের থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বীয় কৃপায় আমাদেরকে এমন এক স্থানে দাখিল করেছেন, যার প্রত্যেক বস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরন্তন।" এই আয়াতে আরও ইঙ্গিত আছে যে, বিশ্বজগতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কষ্ট ও দুঃখের সম্মুখীন হবে। তাই জান্নাতে পা রাখার সময় প্রত্যেকেই বলবে যে, এখন আমাদের দুঃখ দূর হল। কোরআন পাক সূরা আ'লায় সাফল্য লাভ করার ব্যবস্থাপত্র দিতে গিয়ে বলেছে ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى অর্থাৎ, যে নিজেকে পাপকর্ম থেকে পবিত্র রেখেছে সে সাফল্যলাভ করেছে। এর সাথে সাথে আরও ইঙ্গিত করেছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভের জায়গা আসলে পরকাল। যে সাফল্য কামনা করে, তার কাজ শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা নয়। বলা হয়েছে ঃ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى অর্থাৎ, তোমরা দুনিয়াকেই পরকালের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাক; অথচ পরকাল উত্তমও; কারণ তাতেই প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা অর্জিত ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হতে পারে এবং পরকাল চিরস্থায়ীও।

মোটকথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাফল্য তো একমাত্র জান্নাতেই পাওয়া যেতে পারে—দুনিয়া এর স্থানই নয়। তবে অধিকাংশ অবস্থার দিক দিয়ে সাফল্য অর্থাৎ, সফলকাম হওয়া ও কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করা—এটা দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে দান করে থাকেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা সেসব মুমিনকে সাফল্যদান করার ওয়াদা দিয়েছেন, যারা আয়াতে উল্লেখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সবই এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতে উল্লেখিত সাতটি গুণ ঃ সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু এটা একটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় একে আলাদা করে এখানে সে সাতটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই ঃ

প্রথম, নামাযে 'খুশূ' তথা বিনয়-নম্র হওয়া—'খুশূ'র আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর কল্পনাকে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ, অনর্থক নড়াচড়া না করা।—(বয়ানুল-কোরআন) বিশেষতঃ এমন নড়াচড়া, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নামাযে নিষিদ্ধ করেছেন। ফেকাহ্‌বিদগণ এ ধরনের নড়াচড়া 'নামাযের মাকরূহ্‌সমূহ' শিরোনামে সন্নিবেশিত করেছেন। তফসীরে মাযহারীতে খুশূর এই সংজ্ঞা হযরত আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য মনীষী থেকে খুশূর সংজ্ঞা সম্পর্কে যেসব উক্তি বর্ণিত আছে, সেগুলো মূলতঃ অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার বিশদ বিবরণ। উদাহরণতঃ হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ দৃষ্টি অবনত ও আওয়াজ ক্ষীণ রাখার নাম খুশূ। হযরত আতা বলেন ঃ দেহের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা 'খুশূ'। হাদীসে হযরত আবু যর থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ নামাযের সময় আল্লাহ্ তাআলা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ না নামাযী অন্য কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করে। যখন সে অন্য কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।—(আহমদ, নাসায়ী আবু দাউদ—মাযহারী) নবী করীম (সাঃ) হযরত আনাসকে নির্দেশ দেন ঃ সেজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ এবং ডানে-বামে ভ্রূক্ষেপ করো না।—(বায়হাকী-মাযহারী)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন ঃ لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه - অর্থাৎ, এই ব্যক্তির অন্তরে খুশূ থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতা থাকত।—(মাযহারী)

পূর্ণ মুমিনের দ্বিতীয় গুণ ঃ অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা। وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ - لغو -এর অর্থ অনর্থক কথা অথবা কাজ, যাতে কোন ধর্মীয় উপকার নেই। এর অর্থ উচ্চস্তরের গোনাহ্, যাতে ধর্মীয় উপকার তো নেই-ই; বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না থাকা এর নিম্নস্তর। একে বর্জন করা ন্যূনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসনীয়। রসূলুলল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه অর্থাৎ, 'মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্য মণ্ডিত হতে পারে।' এ কারণেই আয়াতে একে কামেল মুমিনদের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় গুণ যাকাত ঃ এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা। পরিভাষায় মোট অর্থ-সম্পদের একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে যাকাত বলা হয়। কোরআন পাকে এই শব্দটি সাধারণতঃ এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে সন্দেহ করা হয় যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কায় যাকাত ফরয হয়নি—মদীনায় হিজরতের পর ফরয হয়েছে। ইবনে-কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব এই যে, যাকাত মক্কাতেই ফরয হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুযযাম্মেল মক্কায় অবতীর্ণ, এ বিষয়ে সবাই একমত। এই সূরায়ও فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এর সাথে وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সরকারী পর্যায়ে যাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং 'নিসাব' ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের পর স্থিরীকৃত হয়। যাঁরা যাকাতকে মদীনায় অবতীর্ণ বিধানাবলীর মধ্যে গণ্য করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য তাই। যারা বলেন যে, মদীনায় পৌঁছার পরই যাকাতের আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা এস্থলে যাকাত শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা নিয়েছেন। আয়াতে এই অর্থের প্রতি আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সাধারণতঃ কোরআন পাকে যেখানে ফরয যাকাতের উল্লেখ করা হয়, সেখানে ايتاء - وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ ও وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ইত্যাদি শিরোনামে বর্ণনা করা হয়। এখানে শিরোনাম পরিবর্তন করে لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ বলাই ইঙ্গিত করে যে, এখানে পারিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। এ ছাড়া فٰعِلُوْنَ শব্দটি স্বতস্ফূর্তভাবে فعل (কাজ)-এর সাথে সম্পর্ক রাখে। পারিভাষিক যাকাত فعل নয়; বরং অর্থ-কড়ির একটা অংশ। فٰعِلُوْنَ শব্দ দ্বারা এই অংশ বোঝাতে গেলে ব্যাখ্যা ও বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই। মোটকথা, আয়াতে পারিভাষিক অর্থ নেয়া হলে যাকাত যে মুমিনের জন্যে অপরিহার্য ফরয তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে যাকাতের অর্থ আত্মশুদ্ধি নেয়া হলে তাও ফরযই। কেননা, শেরক, রিয়া, অহঙ্কার, হিংসা, শত্রুতা, লোভ-লালসা, কার্পণ্য ইত্যাদি থেকে নফসকে পবিত্র রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। এগুলো সব হারাম ও কবীরা গোনাহ্।

নফস্‌কে এগুলো থেকে পবিত্র করা ফরয।

চতুর্থ গুণ যৌনাঙ্গকে হারাম থেকে সংযত রাখা ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ অর্থাৎ, যারা স্ত্রী ও শরীয়তসম্মত দাসীদের ছাড়া সব পর নারী থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং এই দুই শ্রেণীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারও সাথে কোন অবৈধ পন্থায় কামবাসনা পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ অর্থাৎ, যারা শরীয়তের বিধি মোতাবেক স্ত্রী অথবা দাসীদের সাথে কামবাসনা পূর্ণ করে, তারা তিরস্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে—জীবনের লক্ষ্য করা যাবে না। এটা এই পর্যায়েরই কাজ যে, কেউ এরূপ করলে সে তিরস্কারযোগ্য হবে না।

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ অর্থাৎ, বিবাহিত স্ত্রী অথবা শরীয়তসম্মত দাসীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামবাসনা পূর্ণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোন পথ হালাল নয়; যেমন—যিনা তেমনি হারাম নারীকে বিবাহ করায়ও যিনার হুকুম বিদ্যমান। স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েয-নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা অথবা কোন পুরুষ অথবা বালক অথবা জীব-জন্তুর সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা-এগুলো সব নিষিদ্ধ ও হারাম। অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে استمناء باليد অর্থাৎ, হস্তমৈথুনও এর অন্তর্ভুক্ত।—(বয়ানুল-কোরআন, কুরতুবী, বাহ্‌রে-মুহীত)

পঞ্চম গুণ আমানত প্রত্যর্পণ করা ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ আমানত শব্দের আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোন ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটি মূল ধাতু হওয়া সত্ত্বেও একে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যাবতীয় প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়—হুকুকুল্লাহ্‌ তথা আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কিত আমানত হোক কিংবা হুকুকুল-এবাদ তথা বন্দার হক সম্পর্কিত হোক। আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরীয়ত আরোপিত সকল ফরয ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ্‌ বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করা। বন্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত যে অন্তর্ভুক্ত, তা সুবিদিত; অর্থাৎ, কেউ কারও কাছে টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত প্রত্যর্পণ করা পর্যন্ত এর হেফাযত করা তার দায়িত্ব। এছাড়া কেউ কোন গোপন কথা কারও কাছে বললে তাও তার আমানত। শরীয়তসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গোপন তথ্য ফাঁস করা আমানতে খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মজুর ও কর্মচারীকে অর্পিত কাজের জন্যে পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়, তাতে সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং মজুরী ও চাকুরীর জন্যে নির্ধারিত সময়ে সেই কাজই করা এবং অন্য কাজ না করাও আমানত। কামচুরি ও সময়চুরি বিশ্বাসঘাতকতা। এতে জানা গেল যে, আমানতের হেফাযত ও তার হক আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। উপরোক্ত বিবরণ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ গুণ অঙ্গীকার পূর্ণ করা ঃ অঙ্গীকার বলতে প্রথমতঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বোঝায়, যা কোন ব্যাপারে উভয়পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরূপ চুক্তি পূর্ণ করা ফরয এবং এর খেলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা প্রতারণা তথা হারাম। দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়; অর্থাৎ, একতরফাভাবে একজন অন্য জনকে কিছু দেয়ার অথবা অন্যজনের কোন কাজ করে দেয়ার ওয়াদা করা। এরূপ ওয়াদা পূর্ণ করাও শরীয়তের আইনে জরুরী ও ওয়াজিব। হাদীসে আছে العدة دين অর্থাৎ, ওয়াদা, এক প্রকার ঋণ। ঋণ আদায় করা যেমন ওয়াজিব, ওয়াদা পূর্ণ করাও তেমনি ওয়াজিব। শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতিরেকে এর খেলাফ করা গোনাহ্‌। উভয় প্রকার অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্যে প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমেও বাধ্য করতে পারে, কিন্তু এক তরফা ওয়াদা পূর্ণ করার জন্যে আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যায় না। ধর্মপরায়ণতার দৃষ্টিভঙ্গিতে একে পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত এর খেলাফ করা গোনাহ্‌।

সপ্তম গুণ নামাযে যত্নবান হওয়া ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ নামাযে যত্নবান হওয়ার অর্থ নামাযের পাবন্দী করা এবং প্রত্যেক নামায মোস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করা।— (রূহুল-মা'আনী) এখানে صلوات শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, এখানে পাঁচ ওয়াক্তের নামায বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মোস্তাহাব ওয়াক্তে পাবন্দী সহকারে আদায় করা উদ্দেশ্য। শুরুতেও নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে নামাযে বিনয়-নম্র হওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল। তাই সেখানে صلوٰة শব্দটি একবচন ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ, নামায ফরয হোক অথবা ওয়াজিব, সুন্নত কিংবা নফল হোক—নামায মাত্রেরই প্রাণ হচ্ছে বিনয়-নম্র হওয়া। চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লেখিত সাতটি গুণের মধ্যে যাবতীয় প্রকার আল্লাহ্‌র হক ও বন্দার হক এবং এতদসংশ্লিষ্ট সব বিধি-বিধান প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় এবং এতে অটল থাকে, সে কামেল মুমিন এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যেরহকদার।

এখানে এ বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এই সাতটি গুণ শুরুও করা হয়েছে নামায দ্বারা এবং শেষও করা হয়েছে নামায দ্বারা। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযকে নামাযের মত পাবন্দী ও নিয়ম-নীতি সহকারে আদায় করলে অবশিষ্ট গুণগুলো আপনা-আপনি নামাযীর মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত লোকরেদকে এই আয়াতে জান্নাতুল-ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারী বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর মালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্য, তেমনি এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের জান্নাত প্রবেশও সুনিশ্চিত। قَدْ اَفْلَحَ বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলী পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জান্নাতই।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ – سلالة অর্থ সারাংশ এবং طِيْن অর্থ আর্দ্র মাটি। অর্থ এই যে, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের করে তা দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সূচনা হযরত আদম (আঃ) থেকে এবং তাঁর সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে। তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুক্র অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً

বলে একথাই বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছে, এরপর সৃষ্টিধারা এই মাটির সূক্ষ্ম অংশ অর্থাৎ, শুক্র দ্বারা চালু করা হয়েছে। গরিষ্ঠসংখ্যক তফসীরবিদগণ আয়াতের এ তফসীরই লিখেছেন। একথা বলাও সম্ভবপর যে, سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ বলে মানুষের শুক্রই বোঝানো হয়েছে। কেননা, শুক্র খাদ্য থেকে উৎপন্ন এবং খাদ্য মাটি থেকে সৃষ্টি হয়।

মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর : আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ অর্থাৎ, মৃত্তিকার সারাংশ দ্বিতীয় বীর্য, তৃতীয় জমাট রক্ত, চতুর্থ মাংসপিণ্ড, পঞ্চম অস্থি-পিঞ্জর, ষষ্ঠ অস্থিকে মাংসে দ্বারা আবৃতকরণ ও সপ্তম সৃষ্টির পূর্ণত্ব অর্থাৎ, রূহ সঞ্চার করণ।

হযরত ইবনে-আব্বাস বর্ণিত একটি অভিনব তত্ত্ব : তফসীরে-কুরতুবীতে এস্থলে হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে এই আয়াতের ভিত্তিতেই 'শবে-কদর' নির্ধারণ সম্পর্কিত একটি অভিনব তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একবার সমবেত সাহাবিগণকে প্রশ্ন করলেন : রমযানের কোন্ তারিখে শবে কদর? সবাই উত্তরে 'আল্লাহ্ তাআলাই জানেন' বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হযরত ইবনে-আব্বাস তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : আমীরুল-মুমিনীন! আল্লাহ্ তাআলা সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মানুষের সৃষ্টিও সপ্ত স্তরে সম্পন্ন করেছেন এবং সাতটি বস্তুকে মানুষের খাদ্য করেছেন তাই আমার তো মনে হয় যে, শবে-কদরও রমযানের সাতাশতম রাত্রিতে হবে। খলীফা এই অভিনব প্রমাণ শুনে বিশিষ্ট সাহাবিগণকে বললেন : এই বালকের মাথার চুলও এখন পর্যন্ত পুরোপুরি গজায়নি ; অথচ সে এমন কথা বলেছে, যা আপনারা বলতে পারেননি। ইবনে আবী শায়বার মুসনাদে এই দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে। ইবনে-আব্বাস মানব-সৃষ্টির সপ্তস্তর বলে তাই বুঝিয়েছেন, যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের খাদ্যের সাতটি বস্তু সূরা আবাসার আয়াতে উল্লেখিত আছে : فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا এই আয়াতে আটটি বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সাতটি মানুষের খাদ্য এবং সর্বশেষ اب জন্তুদের খাদ্য।

মানব সৃষ্টির শেষ স্তর অর্থাৎ, রূহ ও জীবন সৃষ্টি করা : কোরআন পাক এ বিষয়টি এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। বলেছে : ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ অর্থাৎ, আমি অতঃপর তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি। এই বিশেষ বর্ণনার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত ছয় স্তর উপাদানও বস্তুজগতের বিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এই শেষ ও সপ্তম স্তর অন্য জগত, রূহ জগত তথা রূহ দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর ছিল। তাই একে অন্য ধরনের সৃষ্টি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রকৃত রূহ্ ও জৈব রূহ : এখানে خَلْقًا اٰخَرَ এর তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, শা'বী, ইকরামা, যাহ্হাক, আবুল আলিয়া প্রমুখ তফসীরবিদ 'রূহ্ সঞ্চার' দ্বারা করেছেন। তফসীরে-মাযহারীতে আছে, সম্ভবতঃ এই রূহ্ বলে জৈব রূহ্ বোঝানো হয়েছে, কারণ, এটাও বস্তুবাচক ও সূক্ষ্ম দেহবিশেষ, যা জৈব দেহের প্রতি রন্দ্রে রন্দ্রে অনুপ্রবিষ্ট থাকে। চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে রূহ বলেন। মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করার পর একে সৃষ্টি করা হয়। তাই একে ثم শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 'আলমে-আরওয়াহ্' তথা রূহ্ জগত থেকে প্রকৃত রূহকে এনে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই জৈব রূহের সাথে তার সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। এর স্বরূপ জানা মানুষের সাধ্যাতীত। এই প্রকৃত রূহকে মানব সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। অনাদিকালে আল্লাহ্ তাআলা এসব রূহকে সমবেত করে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ বলেছিলেন। উত্তরে সবাই সমস্বরে بَلٰى বলে আল্লাহ্র পালকত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। হ্যাঁ, মানবদেহের সাথে এর সম্পর্ক মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির পরে স্থাপিত হয়। এখানে 'রূহ্ সঞ্চার' দ্বারা যদি জৈব রূহের সাথে প্রকৃত রূহের সম্পর্ক স্থাপন বোঝানো হয়, তবে এটাও সম্ভবপর। মানবজীবন প্রকৃতপক্ষে এই প্রকৃত রূহের সাথে সম্পর্ক রাখে। জৈব রূহের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলেই মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠে এবং সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষকে মৃত বলা হয়। জৈব রূহ্ও তখন তার কাজ ত্যাগ করে।

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ – تخليق ও خلق এর আসল অর্থ

নতুনভাবে কোন সাবেক নমুনা ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করা, যা আল্লাহ্ তাআলারই বিশেষ গুণ। এই অর্থের দিক দিয়ে خالق (স্রষ্টা) একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই। অন্য কোন ফেরেশতা অথবা মানব কোন সামান্যতম বস্তুরও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিন্তু মাঝে মাঝে تخليق ও خلق শব্দ কারিগরীর অর্থেও ব্যবহার করা হয়। কারিগরীর স্বরূপ এর বেশী কিছু নয় যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই বিশ্ব ভূমণ্ডলে যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে পরস্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরী করা। একাজ প্রত্যেক মানুষই করতে পারে এবং এই অর্থের দিক দিয়ে কোন মানুষকেও কোন বিশেষ বস্তুর সৃষ্টিকর্তা বলে দেয়া হয়। স্বয়ং কোরআন বলেছে : وَتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলেছে : اَنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ এসব ক্ষেত্রে خلق শব্দ রূপকভঙ্গিতে কারিগরীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এমনিভাবে এখানে خالقين শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, সাধারণ মানুষ কারিগরীর দিক দিয়ে নিজেদেরকে কোন বস্তুর সৃষ্টিকর্তা মনে করে থাকে। যদি তাদেরকে রূপকভাবে সৃষ্টিকর্তা বলাও হয়, তবে আল্লাহ্ তাআলা সব সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ, কারিগরের মধ্যে সর্বোত্তম কারিগর।

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ পূর্ববর্তী ১২-১৪ তিন আয়াতে মানব সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন ১৫ ও ১৬ আয়াতে তার শেষ পরিণতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে : তোমরা সবাই এ জগতের আসা ও বসবাস করার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। কেউ এর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। অতঃপর বলা হয়েছে : ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ – অর্থাৎ, মৃত্যুর পর আবার কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে জীবিত করে পুনরুত্থিত করা হবে, যাতে তোমাদের ক্রিয়াকর্মের হিসাবান্তে তোমাদেরকে আসল ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নামে পৌঁছে দেয়া হয়। এ হচ্ছে মানুষের শেষ পরিণতি। অতঃপর সূচনা ও পরিণতি অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা এবং তাতে মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও নেয়ামতরাজির অল্প-বিস্তর বর্ণনা আছে, যা পরবর্তী আকাশ সৃষ্টির আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ – طَرَآئِقَ শব্দটি طريقة এর বহুবচন। একে স্তরের অর্থেও নেয়া যায়। অর্থ এই যে, স্তরে স্তরে সপ্ত

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّٰهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ
ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ⑱ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنّٰتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَ
أَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⑲ وَشَجَرَةً
تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ ⑳ وَ
إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا
مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ㉑ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ㉒
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ㉓ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
قَوْمِهِ مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ
اللّٰهُ لَأَنْزَلَ مَلٰئِكَةً ۖ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ㉔ إِنْ هُوَ
إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتّٰى حِينٍ ㉕ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي
بِمَا كَذَّبُونِ ㉖ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَ
وَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ㉗

(১৮) আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমান মত অতঃপর আমি জমিনে সংরক্ষন করি এবং আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম। (১৯) অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্যে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্যে এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক। (২০) এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্যে তৈল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে। (২১) এবং তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্যে তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর। (২২) তাদের পিঠে ও জলযানে তোমরা আরোহণ করে চলাফেরা করে থাক। (২৩) আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্র বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তোমরা কি ভয় কর না। (২৪) তখন তার সম্প্রদায়ের কাফের-প্রধানরা বলেছিল ঃ এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। সে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করতে চায়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই নাযিল করতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এরূপ কথা শুনিনি। (২৫) সে তো এক উন্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়। সুতরাং কিছুকাল তার ব্যাপারে অপেক্ষা কর। (২৬) নূহ বলেছিল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সাহায্য কর; কেননা, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (২৭) অতঃপর আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরী কর। এরপর যখন আমার আদেশ আসে এবং চুল্লী প্লাবিত হয়, তখন নৌকায় তুলে নাও, প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে, তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে পূর্বে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাদের ছাড়া। এবং তুমি জালেমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না। নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত হবে।

আকাশ তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। طريقة এর প্রসিদ্ধ অর্থ রাস্তা। এ অর্থও হতে পারে। কারণ, সবগুলো আকাশ বিধানাবলী নিয়ে পৃথিবীতে যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের পথ।

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِينَ এতে বলা হয়েছে যে, আমি মানুষকে শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেইনি। এবং আমি তাদের ব্যাপারে বেখবরও হতে পারি না; বরং তাদের পালন, বসবাস ও সুখের সরঞ্জামও সরবরাহ্ করেছি। আকাশ সৃষ্টি দ্বারা এ কাজের সূচনা হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে মানুষের জন্যে খাদ্য ও ফল-ফুল দ্বারা সুখের সরঞ্জাম সৃষ্টি করেছি। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّٰهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ

মানুষকে পানি সরবরাহের অতুলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ঃ এই আয়াতে আকাশ থেকে বারিবর্ষণের আলোচনার সাথে بِقَدَرٍ কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে খুবই দুর্বল। ফলে যেসব জিনিস তার জীবনের জন্যে অপরিহার্য, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশী হয়ে গেলে তার জন্যে বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি আযাব হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশী বর্ষিত হয়ে গেলে প্লাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জীবন-জীবিকার জন্যে বিপদ ও আযাব হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বারিবর্ষণও পরিমিতভাবে হয়, যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং সর্বনাশের কারণ হয় না। তবে যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা কোন কারণে প্লাবন-তুফান চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্র ভিন্ন।

অতঃপর আরবের মেজায ও রুচি অনুযায়ী এমন কিছুসংখ্যক বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পানি দ্বারা উৎপন্ন। বলা হয়েছে, খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান পানি সেচের দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে।

لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ বাক্যে অন্যান্য ফলের কথাও আলোচনা করা হয়েছে, অর্থাৎ, এসব বাগানে তোমাদের জন্যে খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া হাজারো প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছি। এগুলো তোমরা শুধু মুখরোচক হিসেবেও খাও এবং কোন কোন ফল গোলাজাত করে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ কর। وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ বাক্যের মতলব তাই। এরপর বিশেষ করে যয়তুন ও তার তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কেননা, এর উপকারিতা অপরিসীম। যয়তুনের বৃক্ষ তূর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ সায়না ও সিনিন সেই স্থানের নাম, যেখানে তূর পর্বত অবস্থিত। যয়তুনের তৈল মালিশ ও বাতি জ্বালানোর কাজেও আসে এবং ব্যঞ্জনেরও কাজ দেয়। তাই বলা হয়েছে تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ যয়তুন বৃক্ষের জন্যে বিশেষতঃ তূর পর্বতের উল্লেখ করার কারণ এই যে, এই বৃক্ষ সর্বপ্রথম তূর পর্বতেই উৎপন্ন হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন ঃ তুফানে-নূহের পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল, তা ছিল যয়তুন।—(মাযহারী)

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
الَّذِي نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا
وَّأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾
ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ
الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ وَأَتْرَفْنٰهُمْ
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ
وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا
لَّخٰسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظٰمًا أَنَّكُمْ
مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا
حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ
إِلَّا رَجُلٌ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ
رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِينَ ﴿٤٠﴾
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ
الظّٰلِمِينَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اٰخَرِينَ ﴿٤٢﴾

(২৮) যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌকায় আরোহণ করবে, তখন বল ঃ আল্লাহ্‌র শোকর, যিনি আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন। (২৯) আরও বল ঃ পালনকর্তা, আমাকে কল্যাণকরভাবে নামিয়ে দাও, তুমি শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী। (৩০) এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি পরীক্ষাকারী। (৩১) অতঃপর অন্য এক সম্প্রদায় আমি তার স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম। (৩২) এবং তাদেরই একজনকে তাদের মধ্যে রসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এই বলে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মাবুদ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? (৩৩) তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা কাফের ছিল, পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলত এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম, তারা বলল ঃ এতো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। তোমরা যা খাও, সেও তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। (৩৪) যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা নিশ্চিতরূপেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৩৫) সে কি তোমাদেরকে এই ওয়াদা দেয় যে, তোমরা মারা গেলে এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে? (৩৬) তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা কোথায় হতে পারে? (৩৭) আমাদের পার্থিবজীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না। (৩৮) সে তো এমন ব্যক্তি বৈ নয়, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করি না। (৩৯) তিনি বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সাহায্য কর, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (৪০) আল্লাহ্ বললেন ঃ কিছু দিনের মধ্যে তারা সকাল বেলা অনুতপ্ত হবে। (৪১) অতঃপর সত্য সত্যই এক ভয়ংকর শব্দ তাদেরকে হতচকিত করল এবং আমি তাদেরকে বাত্যা-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। অতঃপর ধ্বংস হোক পাপী সম্প্রদায়। (৪২) এরপর তাদের পরে আমি বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি।

এরপর আল্লাহ্ তাআলা এমন নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছে, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তি ও অপরিসীম রহমতের কথা স্মরণ করে তওহীদ ও এবাদতে মশগুল হয়। বলা হয়েছে ঃ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً অর্থাৎ, তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। অতঃপর এর কিছু বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে; نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا অর্থাৎ, এসব জন্তুর পেটে আমি তোমাদের জন্যে পাক-সাফ দুধ তৈরী করেছি, যা মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য। এরপর বলা হয়েছে ঃ শুধু দুধই নয়, এসব জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্যে অনেক (অগণিত) উপকারিতা রয়েছে। وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ চিন্তা করলে দেখা যায়, জন্তুদের দেহের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি লোম মানুষের কাজে আসে এবং তার দ্বারা মানুষের জীবনধারণের অসংখ্য প্রকার সরঞ্জাম তৈরী হয়। জন্তুদের পশম, অস্থি, অন্ত্র এবং সমস্ত অংশ দ্বারা মানুষ জীবিকার কত যে সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করে, তা গণনা করাও কঠিন। এসব উপকার ছাড়া আরও একটি বড় উপকার এই যে, হালাল জন্তুদের মাংসও মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ পরিশেষে জন্তু-জানোয়ারদের আরও একটি মহা উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের পিঠে অরোহণও কর এবং মাল পরিবহনের কাজেও নিযুক্ত কর। এই শেষ উপকারের মধ্যে জন্তুদের সাথে নদীতে চালাচলকারী নৌকাও শরীক আছে। মানুষ নৌকায় আরোহণ করে এবং মালপত্র একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। তাই এর সাথে নৌকার কথাও আলোচনা করে বলা হয়েছে ঃ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ চাকার মাধ্যমে চলে এমন সেব যানবাহনও নৌকার হুকুম রাখে।

وَفَارَ التَّنُّورُ - تنور চুল্লীকে বলা হয়, যা রুটি পাকানোর জন্যে তৈরী করা হয়। এই অর্থই প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এর অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। কেউ কেউ এ দ্বারা বিশেষ চুল্লীর অর্থই নিয়েছেন, যা কূফার মসজিদের এবং কারও কারও মতে সিরিয়ার কোন এক জায়গায় ছিল। এই চুল্লী উথলিত হওয়াকেই নূহ্ (আঃ)-এর জন্যে মহাপ্লাবনের আলামত ঠিক করা হয়েছিল।—(মাযহারী) হযরত নূহ্ (আঃ), তাঁর মহাপ্লাবন ও নৌকার ঘটনা পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বেকার আয়াতসমূহে হেদায়েতের আলোচনা প্রসঙ্গে নূহ্ (আঃ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্যান্য পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের অবস্থা সংক্ষেপে এবং নাম নির্দিষ্ট না করে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরকারকগণ বলেন ঃ লক্ষণাদি দৃষ্টে মনে হয়, এসব আয়াতে আ'দ অথবা সামূদ অথবা উভয় সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতি হযরত হূদ (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সামূদ সম্প্রদায়ের পয়গম্বর ছিলেন হযরত সালেহ্ (আঃ)। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, এসব সম্প্রদায় এক صَيْحَةً অর্থাৎ, ভয়ংকর শব্দ দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অন্যান্য আয়াতে সামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা মহা চীৎকার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ থেকে কোন কোন তফসীরকারক বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে قَرْنًا اٰخَرِينَ বলে

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا
رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ
بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ
أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٤٥﴾
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوا
أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوهُمَا
فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ
يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ
رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا
كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ
حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ
لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ
رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾

(৪৩) কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্ট কালের অগ্রে যেতে পারে না এবং পশ্চাতেও থাকতে পারে না। (৪৪) এরপর আমি একাদিক্রমে আমার রসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন উম্মতের কাছে তাঁর রসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদের একের পর এক ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা। (৪৫) অতঃপর আমি মূসা ও হারূনকে প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট সনদসহ, (৪৬) ফেরআউন ও তার অমাত্যদের কাছে অতঃপর তারা অহংকার করল এবং তারা উদ্ধত সম্প্রদায় ছিল। (৪৭) তারা বলল ঃ আমরা কি আমাদের মতই এ দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব; অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস? (৪৮) অতঃপর তারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। (৪৯) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যাতে তারা সৎপথ পায়। (৫০) এবং আমি মরিয়ম তনয় ও তাঁর মাতাকে এক নিদর্শন দান করেছিলাম এবং তাদেরকে এক অবস্থানযোগ্য স্বচ্ছ পানি বিশিষ্ট টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম। (৫১) হে রসূলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত। (৫২) আপনাদের এই উম্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা; অতএব আমাকে ভয় করুন। (৫৩) অতঃপর মানুষ তাদের বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করে দিয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে। (৫৪) অতএব তাদের কিছুকালের জন্যে তাদের অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত থাকতে দিন। (৫৫) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি। (৫৬) তাতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং তারা বোঝে না। (৫৭) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, (৫৮) যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে,

সামূদ সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাও সম্ভবপর যে, صَيْحَةً শব্দের অর্থ আযাব হলে আ'দ সম্প্রদায়ও উদ্দেশ্য হতে পারে।

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই দুনিয়ারই এবং কোন পুনরুজ্জীবন নেই। কেয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ কাফেরদের কথা তাই। যারা মুখে এই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তারা তো খোলাখুলি কাফেরই, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানেরও কথা ও কাজের মধ্যে এই অস্বীকৃতি ফুটে ওঠে। তারা পরকাল ও কেয়ামতের হিসাবের প্রতি কোন সময় লক্ষ্যও করে না। আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারগণকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا – طَيِّبَاتِ এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও উত্তম বস্তু। ইসলামী শরীয়তে যেসব বস্তু হারাম করা হয়েছে, সেগুলো পবিত্রও নয় এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই طَيِّبَاتِ দ্বারা শুধু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র ও হালাল বস্তুসমূহই বোঝতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণকে তাঁদের সময়ে দুই বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর, দুই সৎকর্ম কর। আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন, তাঁদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, তখন উম্মতের জন্যে এই আদেশ আরও পালনীয়। বস্তুতঃ আসল উদ্দেশ্যও উম্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা।

আলেমগণ বলেন ঃ এই দু'টি আদেশকে একসাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। খাদ্য হালাল হলে সৎকর্মের তওফীক আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সৎকর্মের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তাতে নানা বিপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে এবং ধূলি-ধূসরিত থাকে। এরপর আল্লাহ্‌র সামনে দোয়ার জন্যে হাত প্রসারিত করে ইয়া রব, ইয়া রব-বলে ডাকে, কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম দ্বারা তৈরী হয় এবং হারাম পথেই তাদের খাদ্য আসে। এরূপ লোকদের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে?—(কুরতুবী)

এ থেকে বোঝা গেল যে, এবাদতে ও দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে এবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য হয় না।

وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً – أُمَّةٌ শব্দটি সম্প্রদায় ও কোন বিশেষ পয়গম্বরের জাতির অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত। কোন সময় তরীকা ও দ্বীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ আয়াতে দ্বীন ও তরীকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই অর্থ বোঝানো হয়েছে।

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا – زبر শব্দটি زبور এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা সব পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَّ
قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ
فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي
غَمْرَةٍ مِنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿٦٣﴾
حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْأَرُوا
الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ
عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾
أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾
أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ
بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ
لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ
عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾
وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴿٧٤﴾

(৫৯) যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না (৬০) এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, (৬১) তারাই কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী। (৬২) আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। আমার এক কিতাব আছে, যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (৬৩) না, তাদের অন্তর এ বিষয়ে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এ ছাড়া তাদের আরও কাজ রয়েছে, যা তারা করছে (৬৪) এমনকি, যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করব, তখনই তারা চীৎকার জুড়ে দেবে। (৬৫) অদ্য চীৎকার করো না। তোমরা আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। (৬৬) তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শোনানো হত, তখন তোমরা উল্টো পায়ে সরে পড়তে। (৬৭) অহংকার করে এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করে যেতে। (৬৮) অতএব তারা কি এই কালাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? না তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি? (৬৯) না তারা তাদের রসূলকে চেনে না, ফলে তারা তাঁকে অস্বীকার করে? (৭০) না তারা বলে যে, তিনি পাগল? বরং তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে। (৭১) সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার অনুসারী হত, তবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। বরং আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ, কিন্তু তারা তাদের উপদেশ অনুধাবন করে না। (৭২) না আপনি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চান? আপনার পালনকর্তার প্রতিদান উত্তম এবং তিনিই রিযিকদাতা। (৭৩) আপনি তো তাদেরকে সোজা পথে দাওয়াত দিচ্ছেন; (৭৪) আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

একই দ্বীন ও তরীকা অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু উম্মতগণ তা মানেনি। তারা পরস্পর বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরীকা ও কিতাব আলাদা করে নিয়েছে। زبر শব্দটি কোন সময় زبرة এরও বহুবচন হয়। এর অর্থ খণ্ড ও উপদল। এখানে এই অর্থই সুস্পষ্ট। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা বিশ্বাস ও মূলনীতিতেও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, এসব মতবিরোধের ফলে দ্বীন ও মিল্লাত পৃথক হয়ে যায় না এবং এরূপ মতভেদকারীদেরকে ভিন্ন সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয় না। এই ইজতিহাদী ও শাখাগত মতবিরোধকে সাম্প্রদায়িকতার রং দেয়া মূর্খতা, যা কোন মুজতাহিদের মতেই জায়েয নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ — يُؤْتُونَ শব্দটি وَإِيتَاءُ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দেয়া ও খরচ করা। তাই দান-খয়রাত দ্বারা এর তফসীর করা হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে অর্থাৎ, যা আমল করার তা আমল করে। এতে দান-খয়রাত, নামায, রোযা ও সব সৎকর্ম শামিল হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ কেরআত অনুযায়ী যদিও এখানে দান-খয়রাতেরই আলোচনা হবে, কিন্তু উদ্দেশ্য হবে সাধারণ সৎকর্ম। যেমন এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করলাম যে, এই কাজ করে লোক ভীত-কম্পিত হবে? তারা কি মদ্যপান করে কিংবা চুরি করে? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ হে সিদ্দীক তনয়া, এরূপ নয়; বরং এরা তারা, যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং দান-খয়রাত করে। এতদসত্ত্বেও তারা শঙ্কিত থাকে যে, সম্ভবতঃ আমাদের এই কাজ আল্লাহ্‌র কাছে (আমাদের কোন ত্রুটির কারণে) কবুল হবে না। এ ধরনের লোকই সৎকাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী থাকে। (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা- মাযহারী) হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ আমি এমন লোক দেখেছি, যারা সৎকাজ করে ততটুকুই ভীত হয়, যতটুকু তোমরা মন্দ কাজ করেও ভীত হও না।— (কুরতুবী)

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ — দ্রুত সৎকাজ করার অর্থ এই যে, সাধারণ লোক যেমন পার্থিব মুনাফার পেছনে দৌড়ে এবং অপরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারা ধর্মীয় উপকারের কাজে তেমনি সচেষ্ট হয়। এ কারণেই তারা ধর্মের কাজে অন্যদের চাইতে অগ্রগামী থাকে। غَمْرَةٍ এর অর্থ এমন গভীর পানি, যাতে মানুষ ডুবে যায় এবং যা প্রবেশকারীকে নিজের মধ্যে গোপন করে নেয়। এ কারণেই غَمْرَةٍ শব্দ আবরণ ও আবৃতকারী বস্তু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে তাদের মুশরেকসুলভ মূর্খতাকে غَمْرَةٍ বলা হয়েছে, যাতে তাদের অন্তর নিমজ্জিত ও আবৃত ছিল এবং কোনদিক থেকেই আলোর কিরণ পৌঁছাত না।

وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ — অর্থাৎ, তাদের পথভ্রষ্টতার জন্যে তো এক শেরক ও কুফরের আবরণই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তারা এতেই ক্ষান্ত ছিল না, অন্যান্য কুকর্মও অনবরত করে যেত।

مُتْرَفِيهِمْ শব্দটি ترف থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ঐশ্বর্য ও

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া। এখানে কওমকে আযাবে গ্রেফতার করার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু ঐশ্বর্যশালীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারাই দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে নেয়। কিন্তু আল্লাহ্র আযাব যখন আসে, তখন সর্বপ্রথম তারাই অসহায় হয়ে পড়ে। এ আয়াতে তাদেরকে যে আযাবে গ্রেফতার করার কথা বলা হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস বলেন যে, এতে সে আযাব বোঝানো হয়েছে যা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারি দ্বারা তাদের সরদারদের উপর পতিত হয়েছিল। কারও কারও মতে এই আযাব দ্বারা দুর্ভিক্ষের আযাব বোঝানো হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বদদোয়ার কারণে মক্কাবাসীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে, তারা মৃত জন্তু, কুকুর এবং অস্থি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। রসূলে করীম (সাঃ) কাফেরদের জন্যে খুবই কম বদদোয়া করেছিলেন। কিন্তু এ স্থলে মুসলমানদের উপর তাদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে এরূপ দোয়া করেন-

اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنى يوسف

(বোখারী, মুসলিম, কুরতুবী)

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ অধিকাংশ তফসীরকারের মতে بِهِ শব্দের সর্বনাম হরমের দিকে ফেরে, যা পূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। হরমের সাথে কোরাইশদের গভীর সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের গর্ব সুবিদিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অর্থ এই যে, মক্কার কোরাইশদের আল্লাহ্র আয়াতসমূহ শুনে মুখ ঘুরিয়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ হরমের সাথে সম্পর্ক ও তত্ত্বাবধানপ্রসূত অহংকার ও গর্ব ছিল। سَامِرًا শব্দটি سمر থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ চাঁদনী রাতি। চাঁদনী রাতে বসে গল্প-গুজব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তাই سمر শব্দটি গল্পগুজব করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। سامر বলা হয় গল্প গুজবকারীকে। শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে বহুবচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুশরিকরা যে, আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, তার এক কারণ ছিল হরমের সাথে সম্পর্ক, তত্ত্বাবধানজনিত অহংকার ও গর্ব, দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হয়েছে এই যে, তারা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট গল্প-গুজবে মেতে থাকে, এটাই তাদের অভ্যাস। আল্লাহ্র আয়াতসমূহের প্রতি তাদের কোন ঔৎসুক্য নেই।

تَهْجُرُونَ শব্দটি هجر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাজে প্রলাপ ও গালি-গালাজ। আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করার এটা তৃতীয় কারণ। অর্থাৎ, তারা বাজে প্রলাপোক্তি ও গালিগালাজে অভ্যস্ত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে এমনি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য তারা বলত।

এশার পর গল্প-গুজব করে সময় নষ্ট করা ঃ রাত্রিকালে কিস্সা-কাহিনী বলার প্রথা আরব-আজমে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এতে অনেক ক্ষতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই প্রথা মিটানোর উদ্দেশে এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং এশার পর অনর্থক কিস্সা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ করে দেন। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, এশার নামাযের সাথে সাথে মানুষের সেদিনের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। এই নামায সারাদিনের গোনাহ্সমূহের কাফফারাও হতে পারে। কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া উত্তম। যদি এশার পর অনর্থক কিস্সা-কাহিনীতে লিপ্ত হয়, তবে প্রথমতঃ এটা স্বয়ং অনর্থক ও অপছন্দনীয়; এছাড়া এই প্রসঙ্গে পরনিন্দা, মিথ্যা এবং আরও বহু রকমের গোনাহ্ সংঘটিত হয়। এর আরেকটি কুপরিণতি এই যে,বিলম্বে নিদ্রা গেলে প্রত্যুষে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয় না। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) এশার পর কাউকে গল্প-গুজবে মত্ত দেখলে শাসিয়ে দিতেন এবং কতককে শাস্তিও দিতেন। তিনি বলতেন ঃ শীঘ্র নিদ্রা যাও; সম্ভবতঃ শেষরাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার তওফীক হয়ে যাবে।— (কুরতুবী)

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ থেকে أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ পর্যন্ত পাঁচটি এমন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুশরিকদের জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কোন না কোন স্তরে প্রতিবন্ধক হতে পারত। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ই যে অনুপস্থিত,তাও সাথে সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যেসব কারণ তাদের জন্যে ঈমানের পথে অন্তরায় হতে পারত, তার একটিও এখানে বর্তমান নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে যেসব কারণ হতে পারে, সেগুলো সবই বর্তমান রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের অস্বীকার নির্ভেজাল শত্রুতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। পরবর্তী আয়াতে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ অর্থাৎ, রেসালত অস্বীকার করার কোন যুক্তিসঙ্গত ও স্বভাবজাত কারণ তো বর্তমান নেই; এতদসত্ত্বেও তাদের অস্বীকারের কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, আর তারা সত্যকেই অপছন্দ করে— শুনতে চায় না। এর কারণ কুপ্রবৃত্তি ও কুবাসনার আধিক্য, রাজত্ব ও ক্ষমতার মোহ এবং মূর্খদের অনুসরণ। ঈমান ও নবুওয়ত স্বীকার করে নেয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে এটিও একটি।

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ অর্থাৎ, তাদের অস্বীকারের এক কারণ হতে পারত এই যে, যে ব্যক্তি সত্যের দাওয়াত ও নবুওয়তের দাবী নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি ভিন দেশের লোক। তাঁর বংশ, অভ্যাস, চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। এমতাবস্থায় তারা বলতে পারত যে, আমরা এই নবীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবগত নই; কাজেই তাঁকে নবী ও রসূল মেনে কিরূপে অনুসরণ করতে পারি? কিন্তু এখানে তো এরূপ অবস্থা নয়। বরং একথা সুস্পষ্ট ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্ভ্রান্ততম কোরাইশ বংশে এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু করে তাঁর যৌবন ও পরবর্তী সমগ্র যমানা তাদের সামনেই অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর কোন কর্ম, কোন অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল না। নবুওয়ত দাবী করার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র কাফের সম্প্রদায় তাঁকে 'সাদিক' ও 'আমীন'— সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে সম্বোধন করত। তাঁর চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কেউ কোনদিন কোন সন্দেহই করেনি। কাজেই তাদের এ অজুহাতও অচল যে, তারা তাঁকে চেনে না।

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِىْ طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُوْنَ ۝٧٥ وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ
وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ۝٧٦ حَتّٰۤى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ
اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۝٧٧ وَهُوَ الَّذِىْۤ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝٧٨ وَهُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى
الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝٧٩ وَهُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ
وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝٨٠ بَلْ قَالُوْا
مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ۝٨١ قَالُوْۤا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ
عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝٨٢ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا
مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٨٣ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ
وَمَنْ فِيْهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٨٤ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا
تَذَكَّرُوْنَ ۝٨٥ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ ۝٨٦ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝٨٧ قُلْ مَنْۢ
بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٨٨ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ۝٨٩

(৭৫) যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দূর করে দেই, তবুও তারা তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে। (৭৬) আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হল না এবং কাকুতি-মিনতিও করল না। (৭৭) অবশেষে যখন আমি তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দেব, তখন তাতে তাদের আশা ভঙ্গ হবে। (৭৮) তিনি তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা খুবই অল্প কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক। (৭৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তারই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (৮০) তিনিই প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং দিবা-রাত্রির বিবর্তন তাঁরই কাজ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (৮১) বরং তারা বলে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা বলত। (৮২) তারা বলে ঃ যখন আমরা মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? (৮৩) অতীতে আমাদেরকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এই ওয়াদাই দেয়া হয়েছে। এটা তো পূর্ববর্তীদের কল্প-কথা বৈ কিছুই নয়। (৮৪) বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বল। (৮৫) এখন তারা বলবে ঃ সবই আল্লাহ্‌র। বলুন, তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? (৮৬) বলুন ঃ সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? (৮৭) এখন তারা বলবে ঃ আল্লাহ্‌। বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? (৮৮) বলুন ঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? (৮৯) এখন তারা বলবে ঃ আল্লাহ্‌র। বলুন ঃ তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ

পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আযাবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহ্‌র কাছে অথবা রসূলের কাছে ফরিয়াদ করে। আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে আযাব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই ওরা আবার নাফরমানীতে মশগুল হয়ে যাবে। এ আয়াতে তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আযাবে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ)-এর দোয়ার বরকতে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা আল্লাহ্‌র কাছে নত হয়নি এবং কুফর ও শিরকেই আঁকড়ে থাকে।

মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দোয়ায় তা দূর হওয়া ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব সওয়ার হওয়ার দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং মৃত জন্তু, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবু সুফিয়ান রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং বলে ঃ আমি আপনাকে আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি? আপনি কি একথা বলেননি যে, আপনি বিশ্ববাসীদের জন্যে রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বাস্তবেও তাই। আবু সুফিয়ান বলল ঃ আপনি স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর যুদ্ধে তরবারী দ্বারা হত্যা করেছেন। এখন যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করছেন। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, যাতে এই আযাব আমাদের উপর থেকে সরে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দোয়া করলেন। ফলে, তৎক্ষণাৎ আযাব খতম হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ আয়াত নাযিল হয়।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আযাবে পতিত হওয়া এবং অতঃপর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল, কিন্তু মক্কার মুশরিকরা তাদের শিরক ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রইল।— (মাযহারী)

وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যাকে ইচ্ছা, আযাব, মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আশ্রয় দান করেন এবং কারও সাধ্য নেই যে, তার মোকাবেলায় কাউকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আযাব ও কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও একথা সত্য যে, আল্লাহ্ তাআলা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আযাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্তু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আযাব দেবেন, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফেরাতে পারবে না।— (কুরতুবী)

بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿٩٠﴾ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّى مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِى فِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَٰدِرُونَ ﴿٩٥﴾ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿١٠١﴾ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

(৯০) কিছুই নয়, আমি তাদের কাছে সত্য পৌছিয়েছি, আর তারা তো মিথ্যাবাদী। (৯১) আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। (৯২) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তারা শরীক করে, তিনি তা থেকে উর্ধ্বে। (৯৩) বলুনঃ ' হে আমার পালনকর্তা ! যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা যদি আমাকে দেখান, (৯৪) হে আমার পালনকর্তা ! তবে আপনি আমাকে গোনাহ্গার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।' (৯৫) আমি তাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছি, তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। (৯৬) মন্দের জওয়াবে তাই বলুন, যা উত্তম। তারা যা বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত। (৯৭) বলুনঃ ' হে আমার পালনকর্তা ! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, (৯৮) এবং হে আমার পালনকর্তা ! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।' (৯৯) যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলেঃ ' হে আমার পালনকর্তা ! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন, (১০০) যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।' কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (১০১) অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। (১০২) যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম, (১০৩) এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে। (১০৪) আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

এই দুই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনের অনেক আয়াতে মুশরিক ও কাফেরদের উপর আযাবের ভয় প্রদর্শন উল্লেখিত হয়েছে। কেয়ামতে এই আযাব হওয়া তো অকাট্য ও নিশ্চিতই, দুনিয়াতে হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এই আযাব দুনিয়াতে হয়, তবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলের পরে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে এবং তাঁর যমানায় তাঁর চোখের সামনে তাদের উপর কোন আযাব আসার সম্ভাবনাও আছে। দুনিয়াতে যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন আযাব আসে, তখন মাঝে মাঝে সেই আযাবের প্রতিক্রিয়া শুধু জালেমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সৎলোকও এর কারণে পার্থিব কষ্টে পতিত হয়। তবে পরকালে তারা কোন আযাব ভোগ করবে না, বরং এই পার্থিব কষ্টের কারণে তারা সওয়াবও পাবে। কোরআন পাক বলে ঃ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً অর্থাৎ, এমন আযাবকে ভয় কর, যা এসে গেলে শুধু জালেমদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং অন্যরাও এর কবলে পতিত হবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এই দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, হে আল্লাহ্, যদি তাদের উপর আপনার আযাব আমার সামনে এবং আমার চোখের উপরই আসে, তবে আমাকে এই জালেমদের সাথে রাখবেন না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিষ্পাপ ছিলেন বিধায় আল্লাহ্র আযাব থেকে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁকে এই দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যাতে সওয়াব বৃদ্ধির উদ্দেশে তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করেন এবং তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন।— (কুরতুবী)

وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ অর্থাৎ, আমি আপনার সামনেই তাদের উপর আযাব দেখিয়ে দিতে পুরোপুরি সক্ষম। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এই উম্মতের উপর ব্যাপক আযাব না আসার ওয়াদা হয়ে গেছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ অর্থাৎ, আপনার বর্তমানে আমি তাদেরকে ধ্বংস করব না। কিন্তু বিশেষ লোকদের উপর বিশেষ অবস্থায় দুনিয়াতেই আযাব আসা এর পরিপন্থী নয়। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকেও তাদের আযাব দেখিয়ে দিতে সক্ষম। মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আযাব এবং বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারির আযাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনেই তাদের উপর পতিত হয়েছিল।

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ — অর্থাৎ, আপনি মন্দকে উত্তম দ্বারা, জুলুমকে ইনসাফ দ্বারা এবং নির্দয়তাকে দয়া দ্বারা প্রতিহত করুন। এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রদত্ত উত্তম চরিত্রের শিক্ষা, যা মুসলমানদের পারস্পরিক কাজ কারবারে সর্বদাই প্রচলিত আছে। জলুম ও নির্যাতনের জওয়াবে কাফের ও মুশরিকদের ক্ষমা ও মার্জনাই করতে থাকা এবং তদেরকে প্রত্যাঘাত না করার নির্দেশ পরবর্তীকালে জেহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক জেহাদের অবস্থাও এই সচ্চরিত্রতার অনেক প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছে, যেমন— কোন নারীকে হত্যা না করা, শিশু হত্যা না করা, ধর্মীয় পুরোহিত, যারা মুসলমানদের মোকাবেলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা। কাউকে হত্যা করা হলে তার

নাক, কান ইত্যাদি 'মুছলা' না করা ইত্যাদি। তাই পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে শয়তান ও তার প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যাতে ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁর পক্ষ থেকে শয়তানের প্ররোচনায় ন্যায় ও সুবিচার-বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ না পায়। দোয়াটি এইঃ

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ

همز — শব্দের অর্থ প্রতারণা করা, চাপ দেয়া। পশ্চাদ্দিক থেকে আওয়াজ দেয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শয়তানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এটা একটা সুদূরপ্রসারী অর্থবহ দোয়া। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলমানদেরকে এই দোয়া পড়ার আদেশ করেছেন, যাতে ক্রোধ ও গোস্‌সার অবস্থায় মানুষ যখন বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে পড়ে, তখন শয়তানের প্ররোচনা থেকে এই দোয়ার বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে। এ ছাড়া শয়তান ও জিনদের অন্যান্য প্রভাব ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও এ দোয়াটি পরীক্ষিত। হযরত খালেদ (রাঃ)-এর রাত্রিকালে নিদ্রা আসত না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-তাঁকে নিম্ন বর্ণিত দোয়াটি পাঠ করে শোয়ার আদেশ দিলেন। তিনি পড়া শুরু করলে অনিদ্রার কবল থেকে মুক্তি পান। দোয়াটি এইঃ

اعوذ بكلمات الله التامة من غضب الله وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشيٰطين وان يحضرون ـ

اَنْ يَّحْضُرُوْنِ —সহীহ্ মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ শয়তান সব কাজে সর্বাবস্থায় তোমাদের কাছে আসে এবং সব কাজে অন্তরকে পাপকর্মে প্ররোচিত করতে থাকে।—(কুরতুবী)

এই প্ররোচনা থেকেই আশ্রয় প্রার্থনার জন্যে দোয়াটি শেখানো হয়েছে।

رَبِّ ارْجِعُوْنِ —অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় যখন কাফের ব্যক্তি পরকালের আযাব অবলোকন করতে থাকে, তখন এরূপ বাসনা প্রকাশ করে, আফসোস, আমি যদি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং সৎকর্ম করে এই আযাব থেকে রেহাই পেতাম!

ইবনে জরীর ইবনে জুরায়জের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি রহমতের ফেরেশতা ও রহমতের আয়োজন সামনে দেখতে পায়। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করে; তুমি কি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাও? সে বলে, আমি দুঃখ-কষ্টের জগতে ফিরে গিয়ে কি করব? আমাকে এখন আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যাও। কাফেরকে একথা জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, رَبِّ ارْجِعُوْنِ অর্থাৎ, আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

كَلَّا ۭ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاۗىِٕلُهَا ۭ وَمِنْ وَّرَاۗىِٕهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

بَرْزَخٌ —এর শাব্দিক অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী বস্তু। দুই অবস্থা অথবা দুই বস্তুর মাঝখানে যে বস্তু আড়াল হয় তাকে বরযখ বলা হয়। এ কারণেই মৃত্যুর পর কেয়ামত ও হাশর পর্যন্ত কালকে বরযখ বলা হয়। কারণ, এটা ইহলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে সীমা প্রাচীর। আয়াতের অর্থ এই যে, মরণোন্মুখ ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য। কেননা, এখন আযাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এই কথার কোন ফায়দা নেই। কারণ, সে বরযখে পৌঁছে গেছে। বরযখ থেকে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কেয়ামত ও হাশর-নশরের পূর্বে পুনর্জীবনও পায় না, এটাই আইন।

فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ —কেয়ামতের দিন দু'বার শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুঁৎকারের ফলে যমীন-আসমান ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারের ফলে পুনরায় সব মৃত জীবিত হয়ে উত্থিত হবে। কোরআন পাকের ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ আয়াতে একথার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে শিংগায় প্রথম ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুঁৎকার— এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে জুবায়রের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে প্রথম ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন এবং আতার রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। তফসীরে-মাযহারীতে একেই সঠিক বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের ভাষ্য এই যে, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে হাশরের ময়দানে আনা হবে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবমন্ডলীর জমজমাট সমাবেশের সামনে খাড়া করা হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, সে অমুকের পুত্র অমুক। যদি কারও কোন প্রাপ্য তার যিম্মায় থাকে, তবে সে সামনে এসে তা আদায় করুক। তখন এমনি সংকটময় সময় হবে যে, পুত্র আনন্দিত হবে পিতার যিম্মায় নিজের কোন প্রাপ্য আছে দেখলে এবং পিতা আনন্দিত হবে পুত্রের যিম্মায় নিজের কোন প্রাপ্য দেখলে। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-বোনের মধ্যে কারও যিম্মায় কারও প্রাপ্য থাকলে সেও তা আদায় করতে উদ্যত ও সচেষ্ট হবে। এই সংকটময় সময় সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ —বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তখন পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন কোন উপকারে আসবে না। কেউ কারও প্রতি রহম করবে না।

প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় বিভোর থাকবে। নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু তাই

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ

অর্থাৎ, সেদিনে প্রত্যেক মানুষ তার ভাই, পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে দূরে পলায়ন করবে।

হাশরে মুমিন ও কাফেরের অবস্থার পার্থক্যঃ কিন্তু এ আয়াতে কাফেরদের অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে —মুমিনগণের নয়। কারণ, উপরে কাফেরদের প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। মুমিনদের অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন বলে যে, اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ -অর্থাৎ, সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকেও আল্লাহ্ তাআলা (ঈমানদার হওয়ার শর্তে) তাদের পিতাদের সাথে সংযুক্ত করে দেবেন। হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন সবাই পিপসার্ত হবে, তখন যেসব মুসলমান সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, তারা জান্নাতের পানি নিয়ে বের হবে। মানুষ তাদের কাছে পানি চাইবে।

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا
رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا
وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ
رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾
فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ
تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ
الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾
قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ﴿١١٣﴾
قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ
لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾
وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾

(১০৫) তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হত না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। (১০৬) তারা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। (১০৭) হে আমাদের পালনকর্তা! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গোনাহগার হব। (১০৮) আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। (১০৯) আমার বন্দাদের একদলে বলতঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (১১০) অতঃপর তোমরা তাদেরকে ঠাট্টার পাত্ররূপে গ্রহণ করতে। এমনকি, তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে পরিহাস করতে। (১১১) আজ আমি তাদেরকে তাদের সবরের কারণে এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম। (১১২) আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমরা পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করলে বছরের গণনায়? (১১৩) তারা বলবে, আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। অতএব আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। (১১৪) আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমরা তাতে অল্পদিনই অবস্থান করেছ, যদি তোমরা জানতে? (১১৫) তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? (১১৬) অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ্, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। (১১৭) যে কেউ আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। (১১৮) বলুন ঃ হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।

তারা বলবে, আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে তালাশ করছি। এ পানি তাদের জন্যেই।—(মাযহারী)

এমনিভাবে হযরত ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে ইবনে আসাকির বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন বংশগত অথবা বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (কেউ কারও উপকার করতে পারবে না) —আমার বংশ ও আমার বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা ব্যতীত। আলেমগণ বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর বংশের মধ্যে সমগ্র মুসলমান উম্মতও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারণ, তিনি উম্মতের পিতা এবং তাঁর পুণ্যময়ী বিবিগণ উম্মতের মাতা। মোটকথা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কাজে আসবে না, কিন্তু এটা কাফেরদের অবস্থা। মুমিনগণ একে অপরের সুপারিশ ও সাহায্য করবে এবং তাদের সম্পর্ক উপকারী হবে।

وَلَا يَتَسَاءَلُونَ —অর্থাৎ, পরস্পর কেউ কারও সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এই আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ হাশরে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করবে না। এরপর কোন অবস্থানস্থলে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক হ্রাস পেলে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে।—(মাযহারী)

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে-ই হবে সফলকাম। পক্ষান্তরে যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে, সে দুনিয়াতে নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। এখন সে চিরকালের জন্যে জাহান্নামে থাকবে। এ আয়াতে শুধু কামেল মুমিন ও কাফেরদের ব্যাপারেই তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে, এখানে তাদেরই আমল ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। কামেল মুমিনদের পাল্লা ভারী হবে এবং সফলকাম হবে। কাফেরদের পাল্লা হাল্কা হবে। ফলে, তদেরকে চিরকালের জন্যে জাহান্নামে থাকতে হবে।

وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ - كالح অভিধানে এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার ওষ্ঠদ্বয় মুখের দাঁতকে আবৃত করে না। এক ওষ্ঠ উপরে উত্থিত এবং অপর ওষ্ঠ নীচে ঝুলে থাকে, ফলে দাঁত বের হয়ে থাকে। এটা খুব বীভৎস আকার হবে। জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির ওষ্ঠদ্বয়ও তদ্রূপ হবে এবং দাঁত খোলা ও বেরিয়ে থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَا تُكَلِّمُونِ —হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ এটা হবে জাহান্নামীদের সর্বশেষ কথা। এরপরই কথা না বলার আদেশ হয়ে যাবে। ফলে, তারা কারও সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না ; জন্তুদের ন্যায় একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করবে। বায়হাকী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেন ঃ কোরআনে জাহান্নামীদের পাঁচটি আবেদন উদ্ধৃত করা হয়েছে। তন্মধ্যে চারটির জওয়াব দেয়া হয়েছে এবং পঞ্চমটির জওয়াবে وَلَا تُكَلِّمُونِ বলা হয়েছে। এটাই হবে তাদের শেষ কথা। এরপর

سورة النور مدنية وهي اربع وستون اية وفيها تسع ركوعات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَاۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ① اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ② اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ③ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ④ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑤ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّاۤ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ⑥ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ⑦

সূরা আন্‌-নূর

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৬৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) এটা একটা সূরা যা আমি নাযিল করেছি, এবং দায়িত্বে অপরিহার্য করেছি। এতে আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (২) ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর-করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (৩) ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। (৪) যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই না'ফরমান। (৫) কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। (৬) এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। (৭) এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহ্‌র লানত।

তারা কিছুই বলতে পারবে না।—(মাযহারী)

সূরা মু'মিনূনের সর্বশেষ আয়াতসমূহ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا থেকে নিয়ে শেষ সূরা পর্যন্ত বিশেষ ফযীলত পূর্ণ। বগভী ও সা'লাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি জনৈক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কানে এই আয়াতসমূহ পাঠ করলে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্যলাভ করে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি তার কানে কি পাঠ করেছ। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ সে আল্লাহ্‌র কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি এই আয়াতগুলো পাহাড়ের উপর পাঠ করে দেয়, তবে পাহাড় তার স্থান থেকে সরে যেতে পারে।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ —এখানে اغْفِرْ ও ارْحَمْ উভয়ের مفعول তথা কর্মপদ উল্লেখ করা হয়নি অর্থাৎ, কি ক্ষমা করা হবে এবং কিসের প্রতি রহম করা হবে, তা বলা হয়নি। এতে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ; অর্থাৎ, মাগফেরাতের দোয়া ক্ষতিকর বস্তু দূর করাকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে এবং রহমতের দোয়া প্রত্যেক উদ্দিষ্ট ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। কেননা, ক্ষতি দূরীকরণ ও উপকার আহরণ মানবজীবন ও তার উদ্দেশ্যসমূহের নির্যাস। উভয়টিই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।—(মাযহারী) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিষ্পাপ ও রহমতপ্রাপ্তই ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁকে মাগফেরাত ও রহমতের দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে, তোমাদের এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান হওয়া উচিত।—(কুরতুবী)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ —সূরা মুমিনূনের সূচনা اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ আয়াত দ্বারা হয়েছিল এবং সমাপ্তি لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ দ্বারা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, ফালাহ্ অর্থাৎ, পরিপূর্ণ সফলতা মুমিনগণেরই প্রাপ্য এবং কাফেররা এ থেকে বঞ্চিত।

সূরা আন্‌-নূর

সূরা নূরের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ এই সূরার অধিকাংশ বিধান নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ ও পর্দা-পুশিদা সম্পর্কিত। এরই পরিপূরক হিসেবে ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা আল-মু'মেনূনে মুসলমানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য যেসব গুণের উপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছিল, তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ ছিল যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এটাই সতীত্ব অধ্যায়ের সারমর্ম। এ সূরায় সতীত্বের প্রতি গুরুত্বদানের জন্যে এতদসম্পর্কিত বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। এ কারণেই নারীদেরকে এই সূরা শিক্ষা দেয়ার জন্যে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে।

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) কুফাবাসীদের নামে এক ফরমানে লিখেছিলেন ঃ علموا نساء كم سورة النور অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীলোকদেরকে সূরা আন্‌-নূর শিক্ষা দাও।

এ সূরার ভূমিকা যে ভাষায় রাখা হয়েছে ; অর্থাৎ, سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا এটাও এ সূরার বিশেষ গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরার প্রথম আয়াতটি ভূমিকাস্বরূপ, যদ্দ্বারা এর বিধানাবলীর বিশেষ গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বিধানাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যভিচারের শাস্তি—যা সূরার উদ্দেশ্য—উল্লেখ করা হয়েছে। সতীত্ব ও তজ্জন্যে দৃষ্টির হেফাযত, অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গৃহে যাওয়া ও দৃষ্টিপাত করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধানাবলী পরে বর্ণিত হবে। ব্যভিচার সতর্কতার এমন বাধা ডিঙ্গিয়ে সতীত্বের বিপক্ষে চরম সীমায় উপনীত হওয়া এবং খোদায়ী বিধানাবলীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার নামান্তর। এ কারণেই ইসলামে মানবিক অপরাধসমূহের যেসব শাস্তি কোরআনে নির্ধারিত রয়েছে, তন্মধ্যে ব্যভিচারের শাস্তি সবচাইতে কঠোরতর ও অধিক। ব্যভিচার স্বয়ং একটি বৃহৎ অপরাধ; তদুপরি সে নিজের সাথে আরও শত শত অপরাধ নিয়ে আসে এবং সমগ্র মানবতার ধ্বংসের আকারে এর ফলাফল প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে যত হত্যা ও লুণ্ঠনের ঘটনাবলী সংঘটিত হয়; অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার কারণ কোন নারী ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক। তাই সূরার প্রথমে এই চরম অপরাধ ও নির্লজ্জতার মূলোৎপাটনের জন্যে এর শরীয়তানুগ শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

ব্যভিচার একটি মহা অপরাধ এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি ; তাই শরীয়তে এর শাস্তিও সবচাইতে গুরুতর রাখা হয়েছে : কোরআন পাক ও মুতাওয়াতির হাদীস চারটি অপরাধের শাস্তি ও তার পন্থা স্বয়ং নির্ধারিত করেছে এবং কোন বিচারক ও শাসনকর্তার মতামতের উপর ন্যস্ত করেনি। এসব নির্দিষ্ট শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'হুদূদ' বলা হয়। এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তি এভাবে নির্ধারিত করা হয়নি; বরং শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের গুণাগুণ, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে পরিমাণ শাস্তিকে অপরাধ দমনের জন্যে যথেষ্ট মনে করে, সেই পরিমাণ শাস্তি দিতে পারে। এ ধরনের শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'তা'যীরাত' (দণ্ড) বলা হয়। হুদূদ চারটি : চুরি, কোন সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ, মদ্যপান করা এবং ব্যভিচার করা। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক অপরাধই স্বস্থলে গুরুতর, জগতের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্যে মারাত্মক এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি, কিন্তু সবগুলোর মধ্যেও ব্যভিচারের অশুভ পরিণতি মানবিক সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন মারাত্মক আঘাত হানে, তেমনটি বোধ হয় অন্য কোন অপরাধে নেই।

(১) কোন ব্যক্তির কন্যা, ভগিনী ও স্ত্রীর উপর হাত রাখা তাকে ধ্বংস করার নামান্তর। সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ও নিজের সর্বস্ব কোরবানী করা ততটুকু কঠিন নয়, যতটুকু তার অন্দরমহলের উপর হাত রাখা কঠিন। এ কারণেই দুনিয়াতে রোজই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় যে, যাদের অন্দরমহলের উপর হাত রাখা হয়, তারা জীবন-পণ করে ব্যভিচারীর প্রাণসংহার করতে উদ্যত হয় এবং এই প্রতিশোধস্পৃহা বংশের পর বংশকে বরবাদ করে দেয়।

(২) যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে, সেখানে কারও বংশই সংরক্ষিত থাকে না ; জননী, ভগিনী, কন্যা ইত্যাদির সাথে বিবাহ হারাম; যখন এসব সম্পর্কও বিলীন হয়ে যায়, তখন আপন কন্যা ও ভগিনীকেও বিবাহে আনার সম্ভাবনা আছে, যা ব্যভিচারের চাইতেও কঠোরতর অপরাধ।

(৩) চিন্তা করলে দেখা যায় যে, জগতের যেখানেই অশান্তি ও অনর্থ দেখা দেয়, তার অধিকাংশ কারণই নারী এবং তার চাইতে কম কারণ অর্থ-সম্পদ। যে আইন নারী ও ধন-সম্পদের সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পারে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতে না দেয়, সে আইনই বিশ্ব শান্তির রক্ষাকবচ হতে পারে। আলোচ্য আয়াতে এই শাস্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ এতে ব্যভিচারিণী নারীকে অগ্রে এবং ব্যভিচারী পুরুষকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্তি উভয়ের একই। বিধানাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু পুরুষদেরকে সম্বোধন করে আদেশদান করা হয়, নারীরাও এতে প্রসঙ্গতঃ অন্তর্ভুক্ত থাকে; তাদেরকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনই মনে করা হয় না। সমগ্র কোরআনে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا পুংলিঙ্গ পদবাচ্য ব্যবহার করে যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নারীরাও উল্লেখ ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সম্ভবতঃ এর রহস্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা নারী জাতিকে সংগোপনে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাদের আলোচনাকেও পুরুষদের আলোচনার আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে। তবে এই পদ্ধতিদৃষ্টে কেউ এরূপ সন্দেহ করতে পারত যে, এসব বিধান পুরুষদের জন্যেই নির্দিষ্ট, নারীরা এগুলো থেকে মুক্ত। তাই বিশেষ বিশেষ আয়াতসমূহে স্বতন্ত্রভাবে নারীদের উল্লেখও করে দেয়া হয়; যেমন وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ যে ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের উল্লেখ উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে স্বাভাবিক ক্রম এরূপ হয় যে, অগ্রে পুরুষ ও পশ্চাতে নারীর উল্লেখ থাকে। চুরির শাস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا বলা হয়েছে। এতে চোর পুরুষকে চোর নারীর অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমতঃ নারীর উল্লেখ প্রসঙ্গতঃ রাখাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি ; বরং স্পষ্টতঃ উল্লেখকেই উপযুক্ত মনে করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ নারীকে পুরুষের অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে, এতে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। নারী অবলা এবং তাকে স্বভাবতই দয়ার পাত্রী মনে করা হয়। তাকে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা না হলে কেউ সন্দেহ করতে পারত যে, সম্ভবতঃ নারী এই শাস্তির আওতাধীন নয়। নারীকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ব্যভিচার একটি নির্লজ্জ কাজ। নারী দ্বারা এটা সংঘটিত হওয়া চরম নির্ভীকতা ও ঔদাসীন্যের ফলেই সম্ভবপর। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা তার স্বভাবে মজ্জাগতভাবে লজ্জা ও সতীত্ব সংরক্ষণের শক্তিশালী প্রেরণা গচ্ছিত রেখেছেন এবং তার হেফাযতের অনেক ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। কাজেই তার পক্ষ থেকে এ-কাজ ঘটা পুরুষের তুলনায় অধিকতর অন্যায়। চোরের অবস্থা এর বিপরীত পুরুষকে আল্লাহ্ তাআলা উপার্জনের শক্তি দিয়েছেন। তাকে গায়ে খেটে নিজের প্রয়োজনাদি মিটানোর সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন। এগুলো বাদ দিয়ে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করা পুরুষের জন্যে খুবই লজ্জা ও দোষের কথা। নারীর অবস্থা তদ্রূপ নয়। সে চুরি করলে পুরুষের তুলনায় তা লঘু ও স্বল্পস্তরের অপরাধ হবে।

فَاجْلِدُوا – جلد শব্দের অর্থ চাবুক মারা। শব্দটি جلد (চামড়া) থেকে উদ্ভূত। কারণ, চাবুক সাধারণতঃ চামড়া দ্বারা তৈরী করা হয়। কোন কোন তফসীরকার বলেন : جلد শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই বেত্রাঘাতের প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্তই সীমিত থাকা চাই এবং মাংসে পর্যন্ত না পৌঁছা চাই। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বেত্রাঘাতের শাস্তিকে কার্যের

মাধ্যমে এই মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন। যে চাবুক যেন এত শক্ত না হয় যে, মাংসে পর্যন্ত উপড়ে যায় এবং এমন নরমও যেন না হয় যে, বিশেষ কোন কষ্টই অনুভব না হয়। এস্থলে অধিকাংশ তফসীরবিদ এই হাদীসটি সনদ ও ভাষাসহ উল্লেখ করেছেন।

একশ' বেত্রাঘাতের উল্লেখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্যে নির্দিষ্ট; বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা ঃ স্মর্তব্য যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং লঘু থেকে গুরুতরের দিকে উন্নীত হয়েছে; যেমন মনের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কেও এমনি ধরনের পর্যায়ক্রমিক বিধান স্বয়ং কোরআনে বর্ণিত আছে। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত সর্বপ্রথম বিধান সূরা নিসার ১৫ ও ১৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

— 'তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চার জন পুরুষকে সাক্ষী আন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে, অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্যে অন্য কোন পথ করে দেন এবং তোমাদের যে পুরুষ এই অপকর্ম করে, তাকে শাস্তি দাও। অতঃপর সে যদি তওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়, তবে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা তওবা কবুলকারী, দয়ালু।' এই আয়াতদ্বয়ের পূর্ণ তফসীর সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তির প্রাথমিক যুগ সম্মুখে উপস্থিত করার উদ্দেশে এখানে আয়াতদ্বয়ের পুনরুল্লেখ করা হল। আয়াতদ্বয়ে প্রথমতঃ ব্যভিচার প্রমাণের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, চার জন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার হবে। দ্বিতীয়তঃ ব্যভিচারের শাস্তি নারীর জন্যে গৃহে আবদ্ধ রাখা এবং উভয়ের জন্যে কষ্ট প্রদান করা উল্লেখিত হয়েছে। এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত এই বিধান সর্বশেষ নয়— ভবিষ্যতে অন্য বিধান আসবে। আয়াতের أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا অংশের মর্ম তাই।

উল্লেখিত শাস্তিকে নারীদেরকে গৃহে অন্তরীণ রাখাকে তখনকার মত যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং উভয়কে শাস্তি প্রদানের বিষয়টি যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এই শাস্তি ও কষ্ট প্রদানের কোন বিশেষ আকার, পরিমাণ ও সীমা বর্ণনা করা হয়নি। বরং কোরআনের ভাষা থেকে জানা যায় যে, ব্যভিচারের প্রাথমিক শাস্তি শুধু 'তা'যীর' তথা দণ্ডবিধির আওতাধীন ছিল, যার পরিমাণ শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়নি ; বরং বিচারক ও শাসনকর্তার বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। তাই আয়াতে 'কষ্ট প্রদানের' অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে এসব অপরাধীর জন্যে অন্য ধরনের শাস্তি প্রবর্তিত হওয়া অসম্ভব নয়। সূরা নূরের উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস মন্তব্য করলেন ঃসূরা নিসায় أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا বলে যে ওয়াদা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্যে অন্য কোন পথ করবেন, সূরা নূরের এই আয়াত সেই পথ ব্যক্ত করে দিয়েছে; অর্থাৎ, পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যে একশ' বেত্রাঘাত করার শাস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছে। এতদসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস একশ' বেত্রাঘাতের শাস্তিকে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্যে নির্দিষ্ট করে বললেন ঃ يعنى الرجم للثيب والجلد للبكر অর্থাৎ, সেই পথ ও ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণ এই যে, বিবাহিত পুরুষ ও নারী এ অপরাধ করলে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে এবং অবিবাহিত পুরুষ ও নারী করলে একশ' বেত্রাঘাত করা হবে।

'হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব নাযিল করেন। কিতাবে যেসব বিষয় অবতীর্ণ হয়, তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল, যা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও করেছি। এখন আমি আশঙ্কা করছি যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ একথা বলতে না শুরু করে যে, আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্র কিতাবে পাই না। ফলে সে একটি ধর্মীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। মনে রেখো, প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্র কিতাবে সত্য এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রতি প্রযোজ্য— যদি ব্যভিচারের শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত হয় অথবা গর্ভ ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়।— (মুসলিম ২য় খণ্ড, ৬৫ পৃঃ)

এই রেওয়ায়েত সহীহ্ বুখারীতে আরও বিস্তারিত বর্ণিত আছে। -(বোখারী, ২য় খণ্ড, ১০০৯ পৃঃ)

জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ এস্থলে বিবাহিত ও অবিবাহিত শব্দগুলো শুধু সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশে লিখিত হয়েছে। আসলে 'মুহ্সিন' ও 'গায়র-মুহ্সিন' অথবা 'ছাইয়েব' ও 'বিকর' শব্দই হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় মুহ্সিন এমন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এ অর্থ বোঝানো হয়। তবে সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশে অনুবাদে শুধু বিবাহিত বলা হয়।

ব্যভিচারের শাস্তির পর্যায়ক্রমিক তিন স্তর ঃ উপরোক্ত রেওয়ায়েত ও কোরআনী আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে ; প্রথমে ব্যভিচারের শাস্তি লঘু রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ, বিচারক অথবা শাসনকর্তা নিজ বিবেচনা অনুযায়ী অপরাধী পুরুষ ও নারীকে কষ্ট প্রদান করবে এবং নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখবে। এই বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরের বিধান সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে যে, উভয়কে একশ' করে চাবুক মারতে হবে। তৃতীয় স্তরের বিধান রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উল্লেখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন যে, অবিবাহিতদের বেলায় শুধু একশ' বেত্রাঘাত করতে হবে; কিন্তু বিবাহিতদের শাস্তি রজম তথা প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা।

ইসলামী আইনের কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্যে শর্তাবলীও কড়া রাখা হয়েছে ঃ উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি সর্বাধিক কঠোর। এতদসঙ্গে ইসলামী আইনে এই অপরাধ প্রমাণের জন্যে শর্তাবলীও অত্যন্ত কড়া আরোপ করা হয়েছে, যাতে সামান্যও ত্রুটি থাকলে অথবা সন্দেহ দেখা দিলে ব্যভিচারের চরম শাস্তি হদ মাফ হয়ে অপরাধ অনুযায়ী শুধু দণ্ডমূলক শাস্তি অবশিষ্ট থেকে যায়। অন্যান্য ব্যাপারাদিতে দুই জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুই জন নারীর সাক্ষ্য প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ব্যভিচারের হদ জারি করার জন্যে চার জন পুরুষ সাক্ষীর চাক্ষুষ ও দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য জরুরী; যেমন সূরা নিসার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই সাক্ষ্যে দ্বিতীয় সাবধানতা ও কঠোরতা এই যে, যদি সাক্ষ্যের জরুরী কোন শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে সাক্ষ্যদাতাদের নিস্তার নেই। ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদের

উপর 'হদ্দে কযফ' জারি করা হবে ; অর্থাৎ, আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। তাই সামান্য সন্দেহ থাকলে কোন ব্যক্তি এই সাক্ষ্যদানে অগ্রসর হবে না। যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারের প্রমাণ না থাকে, কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা দুই জন পুরুষ ও নারীর অবৈধ অবস্থায় পরিলক্ষিত হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে বিচারক তাদের অপরাধের অনুপাতে দণ্ডমূলক শাস্তি বেত্রাঘাত ইত্যাদি জারি করতে পারেন।

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ব্যভিচারের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর বিধায় শাস্তি প্রয়োগকারীদের তরফ থেকে দয়াপরবশ হয়ে শাস্তি ছেড়ে দেয়ার কিংবা হ্রাস করার সম্ভাবনা আছে। তাই সাথে সাথে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, ধর্মের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান কার্যকর করণে অপরাধীদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া বৈধ নয়। দয়া, অনুকম্পা ও ক্ষমা সর্বত্র প্রশংসনীয়; কিন্তু অপরাধীদের প্রতি দয়া করার ফল সমগ্র মানবজাতির প্রতি নির্দয় হওয়া। তাই এটা নিষিদ্ধ ও অবৈধ।

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ, ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করার সময় মুসলমানদের একটি দল উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। ইসলামে সব শাস্তি বিশেষতঃ হুদুদ প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাতে দর্শকরা শিক্ষালাভ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে একদল লোককে উপস্থিত থাকার আদেশ দান ব্যভিচারের শাস্তির বৈশিষ্ট্য।

অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ-কারবার দমনের জন্যে ইসলামী শরীয়ত দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পাহারা বসিয়েছে। মেয়েদের জন্যে পর্দা অপরিহার্য করা হয়েছে। পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে। অলংকারের শব্দ ও নারীকণ্ঠের গানের শব্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, এটা নির্লজ্জ কাজে উৎসাহ যোগায়। সাথে সাথে যার মধ্যে এসব ব্যাপারে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাকে একান্তে বোঝাবার আদেশ আছে ; কিন্তু লাঞ্ছিত করার অনুমতি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি শরীয়ত আরোপিত সাবধানতাসমূহ ডিঙিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তার অপরাধ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, তদবস্থায় তার অপরাধ গোপন রাখা অন্যদের সাহস বাড়ানোর কারণ হতে পারে। তাই এ পর্যন্ত অপরাধ গোপন রাখার জন্যে শরীয়ত যতটুকু যত্নবান ছিল, এখন অপরাধীকে জনসমক্ষে হেয় ও লাঞ্ছিত করার জন্যেও ততটুকুই যত্নবান। এ কারণেই ব্যভিচারের শাস্তি শুধু প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি; বরং মুসলমানদের একটি দলকে তাতে উপস্থিত থাকার ও অংশ গ্রহণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

ব্যভিচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধান ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত প্রথম বিধান ছিল ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত। এই দ্বিতীয় বিধান ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে। এর সাথে মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারীর সাথে বিবাহেরও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তফসীর সম্পর্কে তফসীরকারদের উক্তি বিভিন্নরূপ। আয়াতের সূচনাভাগে শরীয়তের কোন বিধান নয় ; বরং একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যভিচার একটি অপকর্ম এবং এর অনিষ্ট সুদূরপ্রসারী। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ব্যভিচার একটি চারিত্রিক বিষ। এর বিষাক্ত প্রভাবে মানুষ চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে যায়। ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায় এবং দুশ্চরিত্রতাই বদ্ধমূল হয়ে যায়। হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। এরূপ চরিত্রভ্রষ্ট লোক ব্যভিচার ও ব্যভিচারে সম্মত করার উদ্দেশেই কোন নারীকে পছন্দ করে। ব্যভিচারের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে অপারগ অবস্থায় বিবাহ করতে সম্মত হয় ; কিন্তু সে মনে-প্রাণে বিবাহকে পছন্দ করে না। কেননা, বিবাহের লক্ষ্য হচ্ছে সৎ ও পবিত্র জীবনযাপন করা এবং সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি জন্ম দেয়া। এর জন্যে স্ত্রীর আজীবন ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ও অন্যান্য অধিকার মেনে নিতে হয়। চরিত্রভ্রষ্ট লোক এসব দায়িত্ব পালনকে সাক্ষাৎ বিপদ মনে করে। যেহেতু বিবাহ এ ধরনের লোকের উদ্দেশেই থাকে না, তাই তাদের আগ্রহ শুধু মুসলমান নারীদের প্রতিই নয়; বরং মুশরিকা নারীদের প্রতিও থাকে। মুশরিকা নারী যদি তার ধর্মের খাতিরে কিংবা কোন সামাজিক প্রথার কারণে বিবাহের শর্ত আরোপ করে, তবে বাধ্য হয়ে তাকে বিবাহ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। এ বিবাহ হালাল ও শুদ্ধ কি না অথবা শরীয়তমতে বাতিল হবে কি না, সেদিকে তারা বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করে না। কাজেই এরূপ চরিত্রভ্রষ্ট লোকদের বেলায় একথা সত্য যে, তারা যে নারীকে পছন্দ করবে, সে মুসলমান হলে ব্যভিচারিণী হবে— পূর্ব থেকে ব্যভিচারে অভ্যস্তা হোক কিংবা তাদের সাথে ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারিণী কথিত হোক। অথবা তারা কোন মুশরিকা নারীকে পছন্দ করবে, যাকে বিবাহ করাই ব্যভিচারের নামান্তর। এ হচ্ছে আয়াতের প্রথম বাক্যের অর্থ। অর্থাৎ, الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যস্ত এবং তওবা করে না, তার প্রতি কোন প্রকৃত মুমিন-মুসলমানের আগ্রহ থাকতে পারে না। কারণ, মুমিন-মুসলমানের আসল লক্ষ্য হল বিবাহ এবং বিবাহের শরীয়তসম্মত উপকারিতা ও লক্ষ্য অর্জন। এরূপ নারী দ্বারা এই লক্ষ্য অর্জন আশা করা যায় না ; বিশেষতঃ যখন একথাও জানা থাকে যে, এই নারী বিবাহের পরও ব্যভিচারের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করবে না। হাঁ, এরূপ নারীকে কোন ব্যভিচারীই পছন্দ করবে, যার আসল লক্ষ্য কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা—বিবাহ উদ্দেশ্য নয়। যদি এই ব্যভিচারিণী নারী কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে তার সাথে মিলনের জন্যে বিবাহের শর্ত আরোপ করে ; তবে অনিচ্ছা সহকারে বিবাহেও সম্মত হয়ে যায়। অথবা এরূপ নারীকে বিবাহ করতে কোন মুশরিক সম্মত হবে। যেহেতু মুশরিকের সাথে বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যভিচারের নামান্তর, তাই এতে দু'টি বিষয়ের সমাবেশ হবে, অর্থাৎ, সে মুশরিকও এবং ব্যভিচারীও। এ হচ্ছে আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ ; অর্থাৎ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ উল্লেখিত তফসীর থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বলে এমন পুরুষ ও নারীকে বোঝানো হয়েছে, যারা তওবা করে না এবং বদভ্যাসে অটল থাকে। যদি তাদের মধ্যে কোন পুরুষ ঘর-সংসার কিংবা সন্তান-সন্ততি লাভের উদ্দেশে কোন সতী-সাধ্বী নারীকে বিবাহ করে কিংবা কোন ব্যভিচারিণী নারী কোন সৎ পুরুষকে বিবাহ করে, তবে আয়াত দ্বারা এরূপ বিবাহের অশুদ্ধতা বোঝা যায় না। শরীয়ত মতে এরূপ বিবাহ শুদ্ধ হবে। ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী (রহঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট ফেকাহ্‌বিদগণের মাযহাব তাই। সাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ বিবাহ ঘটানোর ঘটনাবলী প্রমাণিত আছে। তফসীরে ইবনে কাসীরে হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরূপ ফতোয়াই বর্ণিত আছে। وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ আয়াতের এই শেষ বাক্যে কোন কোন তফসীরকারের মতে ذَٰلِكَ বলে যিনা তথা ব্যভিচারের দিকে ইশারা করা হয়েছে। বাক্যের অর্থ এই যে, ব্যভিচার যেহেতু অপকর্ম, তাই মুমিনদের জন্যে তা হারাম করা হয়েছে। এই তফসীরে অর্থের দিক দিয়ে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ذَٰلِكَ শব্দ দ্বারা ব্যভিচার বোঝানো আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে অবশ্যই সঙ্গতিহীন। তাই অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেন যে, ذالك দ্বারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহ এবং মুশরিক ও মুশরিকার

বিবাহের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুশরিক পুরুষের সাথে মুসলমান নারীর বিবাহ এবং মুশরিকা নারীর সাথে মুসলমান পুরুষের বিবাহ যে হারাম, তা তো কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় একমত। এ ছাড়া ব্যভিচারী পুরুষের সাথে সতী নারীর বিবাহ অথবা ব্যভিচারিণী নারীর সাথে সৎ পুরুষের বিবাহ অবৈধ বলেও এ বাক্য থেকে জানা যায়। এই অবৈধতা বিশেষভাবে তখন হবে, যখন সৎ পুরুষ ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করে তাকে ব্যভিচারে বাধা না দেয়; বরং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে। কেননা, এমতাবস্থায় এটা হবে দায়ূসী (ভেড়ুয়াপনা) যা শরীয়তে হারাম। এমনিভাবে কোন সম্ভ্রান্ত সতী নারী যদি কোন ব্যভিচারে অভ্যস্ত পুরুষকে বিবাহ করে এবং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে, তবে তা হারাম ও কবীরা গোনাহ্। কিন্তু এতে তাদের পারস্পরিক বিবাহ অশুদ্ধ কিংবা বাতিল হওয়া জরুরী নয়। শরীয়তের পরিভাষায় হারাম শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়।— (এক) কাজটি গোনাহ্। যে তা করে, সে পরকালে শাস্তিযোগ্য এবং ইহকালেও বাতিল বলে গণ্য। কোন পার্থিব বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য নয়; যেমন কোন মোশরিকা নারীকে অথবা চিরতরে হারাম এমন নারীকে বিবাহ করা। এরূপ বিবাহ কবীরা গোনাহ্ এবং শরীয়তে অস্তিত্বহীন। ব্যভিচার ও এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। (দুই) কাজটি হারাম। অর্থাৎ, শাস্তিযোগ্য গোনাহ্, কিন্তু দুনিয়াতে কাজটির কিছু ফল প্রকাশ পায় ও শুদ্ধ হয় ; যেমন কোন নারীকে ধোঁকা দিয়ে অথবা অপহরণ করে এনে শরীয়তানুযায়ী দু'জন সাক্ষীর সামনে তার সম্মতিক্রমে বিবাহ করা। এখানে কাজটি অবৈধ ও গোনাহ্ হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং সন্তানরা পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী যদি ব্যভিচারের উদ্দেশে এবং কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে বিবাহ করেও ব্যভিচার থেকে তওবা না করে, তবে তাদের এই বিবাহ হারাম, কিন্তু পার্থিব বিধানে বাতিল ও অস্তিত্বহীন নয়। বিবাহের শরীয়তারোপিত ফলাফল— যেমন ভরণ-পোষণ, মোহরানা, উত্তরাধিকার স্বত্ব ইত্যাদি সব তাদের উপর প্রযোজ্য হবে। এভাবে وَحُرِّمَ শব্দটি আয়াতে মুশরিকা নারীর ক্ষেত্রে প্রথম অর্থে এবং ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থে বিশুদ্ধ ও সঠিক। কোন কোন তফসীরকার আয়াতটিকে মনসূখ তথা রহিত বলেন, কিন্তু বর্ণিত তফসীর অনুযায়ী আয়াতটিকে মনসূখ বলার প্রয়োজন নেই।

ব্যভিচার সম্পর্কিত তৃতীয় বিধান ঃ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যভিচার অন্যান্য অপরাধের তুলনায় সমাজকে অধিক নষ্ট ও কলুষিত করে। তাই শরীয়ত এর শাস্তি সব অপরাধের চাইতে বেশী কঠোর রেখেছে। এক্ষণে কেউ যাতে কোন পুরুষ অথবা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস না করে সেজন্য ব্যভিচার প্রমাণ করার বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্বদান করাই ন্যায় ও সুবিচারের দাবী। শরীয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্যে চার জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য জরুরী। এই প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারও প্রতি প্রকাশ্য ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরীয়ত এই অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, কোন ব্যক্তি কারও প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস তখনই করবে, যখন সে নিজ চোখে এই অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখবে এবং শুধু তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করবে যে, তার সাথে আরও তিন জন পুরুষ এ অপকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। কেননা, যদি অন্য সাক্ষী না-ই থাকে কিংবা চার জনের চাইতে কম থাকে কিংবা তাদের সাক্ষ্যদানে সন্দেহ থাকে, তবে একা এই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে অপবাদ আরোপের শাস্তির ঝুঁকি নেয়া কোন অবস্থাতেই পছন্দ করবে না।

মুহ্সিনাত কারা ঃ محصنات শব্দটি احصان থেকে উদ্ভূত। শরীয়তের পরিভাষায় احصان দুই প্রকার। একটি ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও অপরটি অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। احصان এই যে, যার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং শরীয়তসম্মত পন্থায় কোন নারীকে বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গমও হতে হবে। এরূপ ব্যক্তির প্রতি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য احصان এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে, সৎ হতে হবে অর্থাৎ, পূর্বে কখনও তাঁর বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়নি। আলোচ্য আয়াতে মুহ্সিনাতের অর্থ তাই।— (জাস্সাস)

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا অর্থাৎ, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষের দাবীর কারণে হদ কার্যকর হয়, তার একটি শাস্তি তো তাৎক্ষণিক বাস্তবায়িত হয়ে গেছে ; তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হয়েছে ; দ্বিতীয় শাস্তি চিরকাল জারি থাকবে। তা এই যে, কোন মোকদ্দমায় তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহ্ তাআলার কাছে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তওবা পূর্ণ না করে। এরূপ তওবা করলেও হানাফী আলেমগণের মতে তার সাক্ষ্য কবুল করা হয় না। হাঁ, তবে গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়; যেমন তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে। إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ অর্থাৎ, যাদের উপর অপবাদের হদ কার্যকর করা হয়েছে, তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের অবস্থা শোধরায়, অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি দ্বারাও ক্ষমা করিয়ে নেয় তবে আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমাশীল, দয়ালু।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا বাক্যের এই ব্যতিক্রম ইমাম আবু হানীফা ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে পূর্ববর্তী আয়াতের শুধু শেষ বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে; অর্থাৎ, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ অতএব এই ব্যতিক্রমের উদ্দেশ্য এই যে, যার উপর অপবাদের হদ জারি করা হয়, সে ফাসেক, কিন্তু যদি সে খাঁটি মনে তওবা করে এবং উল্লেখিতভাবে নিজের অবস্থা শোধরায়, তবে সে ফাসেক থাকবে না এবং তার পরকালের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। এর ফলশ্রুতি এই যে, আয়াতের শুরুতে দুনিয়ার যে দু'টি শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ, আশিটি বেত্রাঘাত করা ও সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া— এ শাস্তিদ্বয় তওবা সত্ত্বেও স্বস্থানে বহাল থাকবে। কেননা, প্রথম বড় শাস্তিটি তো কার্যকর হয়েই গেছে। দ্বিতীয় শাস্তিটিও হদেরই অংশবিশেষ। এ বিষয়ে সবাই একমত যে তওবা দ্বারা হদ মাফ হয় না ; যদিও পরকালীন আযাব মাফ হয়ে যায়। অতএব দ্বিতীয় শাস্তি সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া তওবা দ্বারা মাফ হবে না। ইমাম শাফেয়ী ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে উল্লেখিত ব্যতিক্রম পূর্ববর্তী আয়াতের সব বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। এর অর্থ হবে এই যে, তওবা করার ফলে যেমন সে ফাসেক থাকবে না, তেমনি তার সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যাত হবে না। জাস্সাস ও মাযহারীতে উভয়পক্ষের প্রমাণাদি ও জওয়াব বিস্তারিত

উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন।

ব্যভিচার সম্পর্কিত চতুর্থ বিধান লেআন ঃ ملاعنة ও لعان শব্দের অর্থ একে অপরের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ ও ক্রোধের বদদোয়া করা। শরীয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ পদ্ধতিতে কয়েকটি শপথ দেয়াকে লেআন বলা হয়। যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার শুক্রজাত নয়, অপরপক্ষে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবী করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রদান করা হোক, তখন স্বামীকে স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হবে। সে যদি যথাবিহিত চার জন সাক্ষী পেশ করে দেয়, তবে স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চার জন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লেআন করানো হবে। প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে কোরআনে উল্লেখিত ভাষায় চার বার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হবে।

স্বামী যদি এসব কথা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরোক্ত ভাষায় পাঁচ বার কসম না খায়, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি পাঁচ বার কসম খেয়ে নেয়, তবে স্ত্রীর কাছ থেকে কোরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচ বার কসম নেয়া হবে। যদি সে কসম খেতে অস্বীকার করে তবে যে পর্যন্ত সে স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরোক্ত ভাষায় কসম খেতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম খেয়ে নেয়, তবে লেআন পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে পার্থিব শাস্তির কবল থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে। পরকালের ব্যাপার আল্লাহ্ তাআলাই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী পরকালের শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেআন হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্যে চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্বামীর উচিত হবে তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেয়া। সে তালাক না দিলে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। এটা তালাকেরই অনুরূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হতে পারবে না।

ইসলামী শরীয়তে লেআনের আইন স্বামীর মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত কোন ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা জরুরী যে,অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তি চার জন চাক্ষুষ সাক্ষী পেশ করবে। যদি তা করতে না পারে, তবে উল্টো তার উপরই ব্যভিচারের অপবাদের হদ জারি করা হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তো এটা সম্ভবপর যে, যখন চার জন সাক্ষী পাওয়া দুষ্কর হয়, তখন ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন না করে চুপ মেরে থাকবে, যাতে অপবাদের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকে, কিন্তু স্বামীর পক্ষে ব্যাপারটি খুবই নাজুক। সে যখন স্বচক্ষে দেখবে অথচ সাক্ষী নেই, তখন যদি সে মুখ খোলে, তবে অপবাদ আরোপের শাস্তি ভোগ করবে; আর যদি মুখ না খোলে, তবে আজীবন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং জীবন-ধারণও দুর্বিসহ হয়ে পড়বে। এ কারণে স্বামীর ব্যাপারটিকে সাধারণ আইনের আওতা-বহির্ভূত করে স্বতন্ত্র আইনের রূপ দেয়া হয়েছে। এ থেকে আরও জানা গেল যে, লেআন শুধু স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারেই হতে পারে। অন্যদের বিধান পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিধানের অনুরূপ। হাদীসের কিতাবাদিতে এ স্থলে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে লেআন আয়াতের শানে-নুযুল কোন্ ঘটনাটি, এ সম্পর্কে তফসীরকারদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কুরতুবী আয়াতের অবতরণ দু'বার ধরে উভয় ঘটনাকে শানে নুযুল সাব্যস্ত করেছেন। বোখারীর টীকাকার হাফেয ইবনে-হাজার এবং মুসলিমের টীকাকার ইমাম নববী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করে একই অবতরণের মধ্যে উভয় ঘটনাকে শানে-নুযুল আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য অধিক স্পষ্ট, যা পরে বর্ণিত হবে। একটি ঘটনা হেলাল ইবনে উমাইয়া ও তার স্ত্রীর,যা সহীহ্ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাসের জবানী বর্ণিত আছে। এই ঘটনার প্রাথমিক অংশ ইবনে অব্বাসেরই জবানী মুসনাদে আহ্মদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ যখন কোরআনে অপবাদের হদ সম্পর্কিত وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কারণ, এতে কোন নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী পুরুষের জন্যে জরুরী করা হয়েছে যে, হয় সে স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করবে, তন্মধ্যে একজন সে নিজে হবে, না হয় তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। এই আয়াত শুনে আনসারদের সরদার হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আয়াতগুলো কি ঠিক এভাবেই নাযিল হয়েছে? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সা'দ ইবনে উবাদার মুখে এরূপ কথা শোনে বিস্মিত হলেন? তিনি আনসারগণকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমরা কি শুনলে, তোমাদের সরদার কি কথা বলছেন? আনসারগণ বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আপনি তাঁকে তিরস্কার করবেন না। তাঁর একথা বলার কারণ তাঁর তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ। অতঃপর সা'দ ইবনে উবাদা নিজেই আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ ; আমার পুরোপুরি বিশ্বাস রয়েছে যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি আশ্চর্যবোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার উপর ভিন্ন পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্যে বৈধ হবে না যে, আমি তাকে শা'সাই এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেই; না আমার জন্যে এটা জরুরী যে, আমি চার জন লোক এনে অবস্থা দেখাই এবং সাক্ষী করি? যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংগ্রহ করব, ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ন করবে না? এস্থলে হযরত সা'দের ভাষা বিভিন্নরূপ বর্ণিত আছে, সবগুলোর সারমর্ম একই।—(কুরতুবী)

অপবাদের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত অবতরণ ও সা'দ ইবনে উবাদার এই কথাবার্তার অল্পদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হল। হেলাল ইবনে উমাইয়া এশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে শোনলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে করলেন। এদিকে আনসারগণ একত্রিত হয়ে বলতে লাগল যে, আমাদের সরদার সা'দ যে কথা বলেছিলেন, এক্ষণে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম।

এখন শরীয়তের আইন অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হেলাল ইবনে উমাইয়াকে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু হেলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে,আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। বোখারীর রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হেলালের ব্যাপার শুনে কোরআনের বিধান মোতাবেক তাকে বলেও দিয়েছিলেন যে, হয় দাবীর স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর, না হয় তোমার পিঠে অপবাদের শাস্তিস্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে। হেলাল উত্তরে আরয করলেন ঃ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ্ তাআলা অবশ্য এমন কোন বিধান নাযিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। এই কথাবার্তা চলছিল, এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আঃ) লেআনের আইন সম্বলিত আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন ; অর্থাৎ, وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ ...

আবু ইয়ালা এই রেওয়ায়েতটিই হযরত আনাস (রাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, লেআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হেলাল ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমার সমস্যার সমাধান নাযিল করেছেন। হেলাল আরয করলেন ঃ আমি আল্লাহ্ তাআলার কাছে এই আশাই পোষণ করেছিলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হেলালের স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন। স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেয়া হল। সে বলল ঃ আমার স্বামী হেলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী, তা আল্লাহ্ তাআলা জানেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের কেউ কি আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে তওবা করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ করবে? হেলাল আরয করলেন ঃ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ; আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেছি। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আয়াত অনুযায়ী উভয়কে লেআন করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হেলালকে বলা হল যে, তুমি কোরআনে বর্ণিত ভাষায় চার বার সাক্ষ্য দাও; অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্‌কে হাজির ও নাযির বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হেলাল আদেশ অনুযায়ী চার বার সাক্ষ্য দিলেন। পঞ্চম সাক্ষ্যের কোরআনী ভাষা এরূপ ঃ "যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হবে।" এই সাক্ষ্যের সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হেলালকে বললেন ঃ দেখ হেলাল, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কেননা, দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় অনেক হাল্কা। আল্লাহ্‌র আযাব মানুষের দেয়া শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। এর ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। কিন্তু হেলাল আরয করলেন ঃ আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এই সাক্ষ্যের কারণে পরকালের আযাব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষ্যের শব্দগুলোও উচ্চারণ করে দিলেন। অতঃপর হেলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরনের চার সাক্ষ্য অথবা কসম নেয়া হল। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ একটু থাম। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এই সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। আল্লাহ্‌র আযাব মানুষের আযাব অর্থাৎ, ব্যভিচারের শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর। একথা শুনে সে কসম খেতে ইতস্তত করতে লাগল। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি আমার গোত্রকে লাঞ্ছিত করব না। অতঃপর সে পঞ্চম সাক্ষ্যও একথা বলে দিয়ে দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহ্‌র গজব হবে। এভাবে লেআনের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উভয় স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অর্থাৎ, তাদের বিবাহ নাকচ করে দিলেন। তিনি আরও ফয়সালা দিলেন যে, এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত হবে— পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। কিন্তু সন্তানটিকে ধিকৃতও করা হবে না।— (মাযহারী)

দ্বিতীয় ঘটনাও বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। ঘটনার বিবরণ ইমাম বগভী ইবনে-আব্বাসের রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ অপবাদের শাস্তি সম্বলিত আয়াত নাযিল হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)মিম্বরে দাঁড়িয়ে তা মুসলমানদেরকে শুনিয়ে দিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আসেম ইবনে আদী আনসারীও ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীকে কোন পুরুষের সাথে লিপ্ত দেখে, তবে দেখা ঘটনা বর্ণনা করার কারণে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে, চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে এবং মুসলমানগণ তাকে ফাসেক বলবে। এমতাবস্থায় আমরা সাক্ষী কোথা থেকে আনব? সাক্ষীর খোঁজে বের হলে সাক্ষী আসা পর্যন্ত তারা কার্যসিদ্ধি করে পলায়ন করবে। এটা হুবহু প্রথম ঘটনায় সা'দ ইবনে মুয়াযের উত্থাপিত প্রশ্ন।

এক শুক্রবার এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এরপর একটি ঘটনা ঘটল। আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ওয়ায়মেরের বিবাহ আসেম ইবনে আদীর চাচাত বোন খাওলার সাথে হয়েছিল। ওয়ায়মের একদিন তার স্ত্রীকে শরীক ইবনে সাহমার সাথে লিপ্ত দেখতে পেলেন। শরীকও আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ছিল। ওয়ায়মের আসেমের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। আসেম 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি' পাঠ করলেন এবং পরবর্তী দিন জুমআর নামাযের সময় রসূলুল্লাহ্(সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, বিগত জুমআয় আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম পরিতাপের বিষয় এই যে, আমি নিজেই এতে জড়িত হয়ে পড়েছি। কেননা, আমার পরিবারের মধ্যেই এরূপ ঘটনা ঘটে গেছে। ইমাম বগভী উভয়কে উপস্থিত করা এবং তাদের মধ্যে লেআন করানোর ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।— (মাযহারী) বুখারী ও মুসলিমে সাহল ইবনে সা'দ সায়েদীর রেওয়ায়েত এর সার-সংক্ষেপ এভাবে বর্ণিত আছে যে, ওয়ায়মের আজলানী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে ভিন্ন পুরুষকে দেখে, তবে সেকি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে তাকেও হত্যা করা হবে? তার কি করা উচিত? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে বিধান নাযিল করেছেন। যাও স্ত্রীকে নিয়ে এস। বর্ণনাকারী সাহল বলেন ঃ তাদেরকে এনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মসজিদের মধ্যে লেআন করালেন। যখন উভয়পক্ষ থেকে পাঁচটি সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লেআন সমাপ্ত হল, তখন ওয়ায়মের বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, এখন যদি আমি তাকে স্ত্রীরূপে রাখি, তবে এর অর্থ এই হয় যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছি। তাই আমি তাকে তিন তালাক দিলাম।— (মাযহারী)

উপরোক্ত ঘটনাদ্বয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লেআনের আয়াত এর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার ও ইমাম বগভী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানকল্পে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হেলাল ইবনে উমাইয়ার ছিল এবং লেআনের আয়াত এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ওয়ায়মের এমনি ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়। হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না।

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ
لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ
مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّٰهَ
تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا
تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ
مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَوْلَا
إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا
هٰذَا إِفْكٌ مُبِينٌ ﴿١٢﴾ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا
بِالشُّهَدَاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا
لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ وَ
لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ
هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيٰتِ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾

(৮) এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী ; (৯) এবং পঞ্চমবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহ্‌র গযব নেমে আসবে। (১০) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী, প্রজ্ঞাময় না হলে কত কিছুই যে হয়ে যেত। (১১) যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করো না ; বরং এটা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু আছে, যতটুকু সে গোনাহ্ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। (১২) তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ? (১৩) তারা কেন এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করেনি ; অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহ্‌র কাছে মিথ্যাবাদী। (১৪) যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যা চর্চা করছিলে, তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করত। (১৫) যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহ্‌র কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল। (১৬) তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ্ তো পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। (১৭) আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরণের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। (১৮) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

কাজেই এ ব্যাপারে যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে পেশ করা হল তখন তিনি বললেন ঃ তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই। এর স্বপক্ষে ইঙ্গিত এই যে, হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় হাদীসের ভাষা হচ্ছে **فنزل جبرئيل** এবং ওমায়রের ঘটনায় ভাষা হচ্ছে **قد نزل الله فيك** এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমার অনুরূপ এক ঘটনায় এর বিধান নাযিল করেছেন।— (মাযহারী)

মাসআলা ঃ বিচারকের সামনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেআন হয়ে গেলে স্ত্রী স্বামীর জন্যে চিরতরে হারাম হয়ে যায়, যেমন দুগ্ধ পান করানোর ফলেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন চিরতরে অবৈধ হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ المتلاعنان لايجتمعان ابدا লেআনের সাথে সাথেই স্ত্রী স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে যায়, কিন্তু ইদ্দতের পর স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে চাইলে ইমাম আযমের মতে তা তখনই জায়েয হবে, যখন স্বামী তাকে তালাক দেয় কিংবা মুখে বলে দেয় যে, আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। স্বামী এরূপ না করলে বিচারক তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ জারি করবেন এবং তাও তালাকের অনুরূপ হবে। এরপর তিন হায়েয অতিবাহিত হলে স্ত্রী অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে।— (মাযহারী)

মাসআলা ঃ লেআনের পর এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে স্বামীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না; তাকে তার মাতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হেলাল ইবনে উমাইয়া ও ওয়ায়মের আজলানী উভয়ের ঘটনায়ই এই ফয়সালা দিয়েছিলেন।

লেআনের পর যে মিথ্যাবাদী, তার পরকালীন আযাব আরও বেড়ে যাবে, কিন্তু দুনিয়ার শাস্তি থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে। এমনিভাবে তাকে দুনিয়াতে ব্যভিচারিণী ও সন্তানকে জারয সন্তান বলাও কারও জন্যে জায়েয হবে না। হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফয়সালায় একথাও বলেছিলেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আন-নূরের অধিকাংশ আয়াত সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্যে প্রবর্তিত বিধানাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর বিপরীতে সতীত্ব ও পবিত্রতার ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও এর বিরুদ্ধাচরণের জাগতিক শাস্তি ও পারলৌকিক মহা বিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তাই পরম্পরায় প্রথমে ব্যভিচারের হদ, অতঃপর অপবাদের হদ ও পরে লেআনের কথা বর্ণিত হয়েছে। অপবাদের হদ প্রসঙ্গে চার জন সাক্ষীর অবর্তমানে কোন সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে মহাপাপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এরূপ অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রবর্তন করা হয়েছে। এ বিষয়টি সাধারণ মুসলিম সতী নারীদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ষষ্ঠ হিজরীতে কতিপয় মুনাফিক উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর প্রতি এমনি ধরণের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলমানও এ আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ব্যাপারটি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের পক্ষে অত্যধিক গুরুতর ছিল। তাই কোরআন পাকে আল্লাহ্ তাআলা হযরত আয়েশার পবিত্রতা ও সতীত্ব বর্ণনা করে এস্থলে উপরোক্ত দশটি আয়াত নাযিল করেছেন। এসব আয়াতে হযরত আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা করতঃ তাঁর ব্যাপারে যারা কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের

সবাইকে হুশিয়ার করা হয়েছে এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের বিপদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি কোরআন ও হাদীসে 'ইফ্‌কের ঘটনা' নামে খ্যাত। ইফ্‌ক শব্দের অর্থ জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। এসব আয়াতের তফসীর বোঝার জন্যে অপবাদের কাহিনীটি জেনে নেয়া অত্যন্ত জরুরী। তাই প্রথমে সংক্ষেপে কাহিনীটি বর্ণনা করা হচ্ছে।

মিথ্যা অপবাদের কাহিনী ঃ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এই ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ষষ্ঠ হিজরীতে যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরায়সী যুদ্ধে গমন করেন, তখন বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশার (রাঃ) উটের পিঠে পর্দাবিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রথমে পর্দাবিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার অভ্যাস। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করার পর শেষ রাত্রে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হল যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হয়। হযরত আয়েশার পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল ; তিনি জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিঁড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। তথায় তিনি হার তালাশ করতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশার পর্দাবিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বাহকরা মনে করেছে যে, তিনি ভেতরেই আছেন। উঠানোর সময়ও সন্দেহ হল না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়স্কা ক্ষীণাঙ্গিনী ছিলেন। ফলে আসনটি যে শূন্য — এরূপ ধারণাও কারও মনে উদয় হল না। হযরত আয়েশা ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, তখণ অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা কিংবা এদিক-ওদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে রইলেন। তিনি মনে করলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তদীয় সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবে যে, আমি আসনে অনুপস্থিত,তখন আমার খোঁজে তাঁরা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেদিক চলে গেলে তাঁদের জন্যে তালাশ করে নেয়া কঠিন হবে। তাই তিনি স্বস্থানেই চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন। সময় ছিল শেষ রাত্রি। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

অপরদিকে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তালকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ কাজের জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌছলেন। তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জ্বল ছিল না। তিনি শুধু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে হযরত আয়েশাকে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দাপ্রথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠের সাথে তাঁর মুখ থেকে 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' উচ্চারিত হয়ে গেল। এই বাক্য হযরত আয়েশার কানে পড়ার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। হযরত সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং নিজে উটের নাকের রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল দুশ্চরিত্র, মুনাফিক ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শত্রু। সে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও কানকথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল। পুরুষদের মধ্যে হযরত হাসসান, মিস্‌তাহ্ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ্ ছিল এ শ্রেণীভুক্ত। তফসীরে দুররে-মনসূরে ইবনে মরদুবিইয়াহর বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তিই বর্ণিত আছে যে, اعانه اى عبد الله بن ابى حسان ومسطح وحمنة

যখন এই মুনাফিক-রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) এতে খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশার তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। একমাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা হযরত আয়েশার পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দায় উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন। আয়াতগুলোর তফসীর পরে বর্ণিত হবে। অপবাদের হদ-এ বর্ণিত কোরআনী-বিধি অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হল। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে? ফলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত করা হল। বাযযার ও ইবনে মরদুবিয়াহ্ হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন জন মুসলমান মিসতাহ্, হামানাহ্ ও হাসসানের প্রতি হদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আসল অপবাদ-রচয়িতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের প্রতি দ্বিগুণ হদ প্রয়োগ করেন। অতঃপর মুসলমানরা তওবা করে নেয় এবং মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কায়েম থাকে।—(বয়ানুল-কোরআন)

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ ইমাম বগভী উপরোক্ত আয়াতসমূহে তফসীরে বলেছেন ঃ হযরত আয়েশার এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো অন্য কোন মহিলার ভাগ্যে জোটেনি। তিনি নিজেও আল্লাহর নেয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় গর্বভরে বর্ণনা করতেন। প্রথম, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবাহে আসার পূর্বে ফেরেশতা জিবরাঈল একটি রেশমী কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আগমন করেন এবং বলেন ঃ এ আপনার স্ত্রী।—(তিরমিযী) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাঈল তাঁর হাতের তালুতে এই ছবি নিয়ে এসেছিলেন।

দ্বিতীয়, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে ছাড়া কোন কুমারী বালিকাকে বিবাহ করেননি। তৃতীয়, তাঁর কোলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত হয়। চতুর্থ, হযরত আয়েশার গৃহেই তিনি সমাধিস্থ হন। পঞ্চম, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি তখনও ওহী অবতীর্ণ হত, যখন তিনি হযরত আয়েশার সাথে এক লেপের নীচে শায়িত থাকতেন। অন্য কোন বিবির এরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল না। ষষ্ঠ, আসমান থেকে তাঁর দোষমুক্ততার বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে। সপ্তম, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খলীফার কন্যা এবং সিদ্দীকা ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াতেই যাঁদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছে, তিনি তাঁদেরও অন্যতমা।

হযরত আয়েশার ফকীহ্ ও পণ্ডিতসুলভ জ্ঞানানুসন্ধান এবং বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য দেখে হযরত মূসা ইবনে তালহা (রাঃ) বলেন ঃ আমি আয়েশা সিদ্দীকার চাইতে অধিক শুদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী কাউকে দেখিনি।—(তিরমিযী)

তফসীরে-কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্ তাআলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার সাক্ষ্য দ্বারা তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করেন। হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর শিশু পুত্র ঈসা (আঃ)-এর সাক্ষ্য দ্বারা তাঁকে দোষমুক্ত করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্ তাআলা কোরআনের দশটি আয়াত নাযিল করে তাঁর দোষমুক্ততা ঘোষণা করেন, যা তাঁর গুণ ও জ্ঞান-গরিমাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ — افك শব্দের আভিধানিক অর্থ পাল্টে দেয়া, বদলে দেয়া। যে জঘন্য মিথ্যা সত্যকে বাতিলরূপে, বাতিলকে সত্যরূপে বদলে দেয় এবং ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ্ভীরুকে ফাসেক ও ফাসেককে আল্লাহ্ভীরু পরহেযগার করে দেয়, সেই মিথ্যাকে افك বলা হয়। عُصْبَةٌ শব্দের অর্থ দশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত লোকের দল। এর কম-বেশীর জন্যেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। مِّنكُمْ বলে মুমিনদেরকে বোঝানো হয়েছে। এই অপবাদের প্রকৃত রচয়িতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুমিন নয়— মুনাফিক ছিল, কিন্তু মুনাফিকরা মুসলমানী দাবী করত বিধায় তাদের ক্ষেত্রেও মুমিনদের বাহ্যিক বিধানাবলী প্রযোজ্য হত। তাই مِّنكُمْ শব্দে তাকেও শামিল করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দু'জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক এতে জড়িত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। অতঃপর মুমিনগণ সবাই তওবা করে এবং আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের তওবা কবুল করেন। হযরত হাসসান ও মিসতাহ্ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। তাঁরা উভয়েই বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর যোদ্ধাদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা কোরআন পাকে মাগফেরাত ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই হযরত আয়েশার সামনে কেউ হাসসানকে মন্দ বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না; যদিও তিনি অপবাদের শাস্তি-প্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন। হযরত আয়েশা বলতেন ঃ হাসসান রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে কবিতা রচনার মাধ্যমে কাফেরদের চমৎকার মোকাবেলা করেছেন। কাজেই তাঁকে মন্দ বলা সঙ্গত নয়। হাসসান কোন সময় হযরত আয়েশার কাছে আগমন করলে তিনি সসম্ভ্রমে তাঁকে আসন দিতেন।— (মাযহারী)

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم — এতে নবী করীম (সাঃ) হযরত আয়েশা, সাফওয়ান ও সকল মুমিন-মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁরা সবাই এই গুজবের কারণে মর্মাহত ছিলেন। অর্থ এই যে, এই গুজবকে তোমরা খারাপ মনে করো না। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা কোরআনে তাঁদের দোষমুক্ততা নাযিল করে তাঁদের সম্মান আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং যারা এই কুকাণ্ড করেছিল, তাদের সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী নাযিল করেছেন, যা কেয়ামত পর্যন্ত পঠিত হবে।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ — অর্থাৎ, যারা এই অপবাদের যতটুকু অংশ নিয়েছে, সে পরিমাণে তার গোনাহ্ লিখিত হয়েছে এবং সে অনুপাতেই তার শাস্তি হবে। যে ব্যক্তি এই খবর রচনা করে চালু করেছে, সে সর্বাধিক আযাব ভোগ করবে, যে খবর শুনে সমর্থন করেছে, সে তদপেক্ষা কম এবং যে শুনে নিশ্চুপ রয়েছে, সে আরও কম আযাবের যোগ্য হবে।

وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ — كبر শব্দের অর্থ বড়। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি অপবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে অর্থাৎ, একে রচনা করে চালু করেছে, তার জন্যে গুরুতর আযাব রয়েছে। বলাবাহুল্য, এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে-উবাই।— (বগভী)

لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ অর্থাৎ, তোমরা যখন এই অপবাদের সংবাদ শুনলে, তখন মুসলমান পুরুষ ও নারী নিজেদের সম্পর্কে অর্থাৎ, মুসলমান ভাই-বোনদের সম্পর্কে সুধারণা করলে না কেন এবং একথা বললে না কেন যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা? এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ بِأَنفُسِهِمْ শব্দ দ্বারা কোরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, যে মুলসমান অন্য মুসলমানের দুর্নাম রটায় ও তাকে লাঞ্ছিত করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই লাঞ্ছিত করে। কারণ, ইসলামের সম্পর্ক সবাইকে এক করে দিয়েছে। এ ধরনের সবক্ষেত্রে কোরআন এই ইঙ্গিত ব্যবহার করেছে। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের নিজেদের প্রতি দোষারোপ করো না। উদ্দেশ্য, কোন মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি দোষারোপ করো না।

এই আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে স্থানের দিকে লক্ষ্য করলে لولا اذ سمعتموه ظننتم بانفسكم خيرا সম্বোধন পদে বলা উচিত ছিল ; যেমন শুরুতে سَمِعْتُمُوهُ সম্বোধন পদে বলা হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাক এই সংক্ষিপ্ত বাক্য ছেড়ে দিয়ে পদ্ধতি পরিবর্তন করতঃ সম্বোধনপদের পরিবর্তে ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ বলেছে। এতে হাল্কা ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারা এই কাজের প্রেক্ষাপটে মুমিন কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে এটাই ছিল ঈমানের দাবী।

এখানে তৃতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই, আয়াতের শেষ বাক্য هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, খবরটি শোনামাত্রই মুসলমানদের 'এটা প্রকাশ্য মিথ্যা' বলে দেয়াই ছিল ঈমানের দাবী।

لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ এ আয়াতের প্রথম বাক্যে শিক্ষা আছে যে, এরূপ খবর রটনাকারীদের কথা চালু করার পরিবর্তে মুসলমানদের উচিত ছিল তাদের কাছে প্রমাণ দাবী করা। ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত প্রমাণ চার জন সাক্ষী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের কাছে এরূপ দাবী করা উচিত যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুবা মুখ বন্ধ কর। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে, যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহ্র কাছে তারাই মিথ্যাবাদী।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ যেসব মুসলমান ভুলক্রমে এই অপবাদে কোন

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن
يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ
أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ
اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ الْخَبِيثَاتُ
لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

(১৯) যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। (২০) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত এবং আল্লাহ্ দয়ালু, মেহেরবান না হতেন, তবে কত কিছুই হয়ে যেত। (২১) হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, জানেন। (২২) তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (২৩) যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্যে রয়েছে গুরুতর শাস্তি। (২৪) যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত ; (২৫) সেদিন আল্লাহ্ তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী। (২৬) দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে। তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। তাদের জন্যে আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

না কোনরূপে অংশ গ্রহণ করেছিল, এরপর তওবা করেছিল এবং কেউ কেউ শাস্তিও ভোগ করেছিল এই আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এই আয়াত তাদের সবাইকে একথাও বলেছে যে, তোমাদের অপরাধ খুবই গুরুতর ছিল। এর কারণে দুনিয়াতেও আযাব আসতে পারত, যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর এসেছে এবং পরকালেও কঠোর শাস্তি হত। কিন্তু মুসলমানদের সাথে আল্লাহ্ তাআলার আচরণ দয়া ও অনুগ্রহমূলক ইহকালেও এবং পরকালেও। তাই এই শাস্তি তোমাদের উপর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রথমে তিনি ইসলাম ও ঈমানের তওফীক দিয়েছেন, এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সংসর্গ দান করেছেন। এটা আযাব অবতরণের পথে প্রতিবন্ধক। এরপর কৃত গোনাহের জন্যে সত্যিকার তওবার তওফীক দিয়েছেন এবং তওবা কবুল করেছেন। পরকালে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়ার প্রভাবে তোমাদেরকে ক্ষমা, মার্জনা ও মাগফেরাতের ওয়াদা দিয়েছেন।

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ – تلقى শব্দের মর্ম এই যে, একে অন্যের কাছে জিজ্ঞাসা ও বর্ণনা করে। এখানে কোন কথা শুনে তার সত্যাসত্য যাচাই না করে সামনে চালু করে দেয়া বোঝানো হয়েছে।

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ অর্থাৎ, তোমরা একে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করেছিলে যে, যা শোনলে তাই অন্যের কাছে বলতে শুরু করেছিলে। তোমরা সত্যাসত্য যাচাই না করে এমন কথা চালু করে দিয়েছিলেন, যদ্দরুন অন্য মুসলমান দারুণ মর্মাহত হয় লাঞ্ছিত হয়, এবং তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ

সাহাবায়ে-কেরামকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেয়া হয়েছে ঃ وَلَا يَأْتَلِ -ائتلاء শব্দের অর্থ কসম খাওয়া। হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে মিসতাহ্ ও হাসসান জড়িয়ে পড়েছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করেন। তাঁরা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাঁদের দ্বারা একটি ভুল হয়ে যায় এবং তাঁরা খাঁটি তওবার তওফীক লাভ করেন। আল্লাহ্ তাআলা যেমন হযরত আয়েশার দোষমুক্ততা নাযিল করেন, এমনিভাবে এই মুসলমানদের তওবা কবুল করা ও ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করে দেন।

মিসতাহ্ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তাঁর জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হল, তখন কন্যা-বৎসল পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক কন্যাকে এমন কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহ্‌র প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম খেয়ে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। বলাবাহুল্য, কোন বিশেষ ফকিরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা নির্দিষ্টভাবে কোন বিশেষ মুসলমানের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ কারো আর্থিক সাহায্য করার পর যদি বন্ধ করে দেয়, তবে গোনাহ্‌র কোন কারণ

নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের দলকে আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বের জন্যে একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদেরকে খাঁটি তওবা এবং ভবিষ্যত সংশোধনের নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা স্বাভাবিক মনোকষ্টের কারণে গরীবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম খেয়েছিলেন, তাদেরকেও আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা আলোচ্য আয়াতে দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন কসম ভঙ্গ করে কাফ্‌ফারা দিয়ে দেয়। গরীবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া তাদের উচ্চমর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ্ তাআলা যেমন তাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত।

হযরত মিসতাহ্‌কে আর্থিক সাহায্য করা হযরত আবু বকরের দায়িত্ব বা ওয়াজিব কর্তব্য ছিল না। তাই আল্লাহ্ তাআলা কথাটি এভাবে বলেছেন ঃ যেসব জ্ঞানী-গুণীকে আল্লাহ্ তাআলা ধর্মীয় উৎকর্ষতা দান করেছেন এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার আর্থিক সঙ্গতিও রাখে, তাদের এরূপ কসম খাওয়াই উচিত নয়। আয়াতে أُولُوا الْفَضْلِ ও وَالسَّعَةِ এ অর্থই ব্যক্ত হয়েছে।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে ঃ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ অর্থাৎ, তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের গোনাহ্ মাফ করবেন? আয়াত শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বলে উঠেন ঃ والله انى احب ان يغفر الله لى অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন, আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি। এরপর তিনি হযরত মিসতাহ্‌র আর্থিক সাহায্য পুনর্বহাল করে দেন এবং বলেন ঃ এ সাহায্য কোন দিন বন্ধ হবে না।— (বুখারী, মুসলিম)

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ যেদিন তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাদের জিহবা ও হস্তপদাদি কথা বলবে এবং তাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে। হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন যে গোনাহ্‌গার তার গোনাহ্ স্বীকার করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে মাফ করে দেবেন এবং হাশরের মাঠে সবার দৃষ্টি থেকে তার গোনাহ্ গোপন রাখবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেখানেও অস্বীকার করে বলবে যে, আমি এ কাজ করিনি; পরিদর্শক ফেরেশতারা ভুলে এটা আমার আমলানায় লিখে দিয়েছে, তখন তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্য দেবে। الْيَوْمَ نَخْتِمُ আয়াতে একথাই বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে মুখে মোহর মেরে দেয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের জিহবা সাক্ষ্য দেবে। উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, তারা তাদের জিহবাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে না যে, সত্যমিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে। যেমন দুনিয়াতে এরূপ করার ক্ষমতা আছে, বরং তাদের জিহ্বা তাদের ইচ্ছার বিপরীতে সত্য কথা স্বীকার করবে। এটাও সম্ভবপর যে, এক সময় মুখ ও জিহবাকে বন্ধ করে দেয়া হবে। এরপর জিহ্বাকে সত্য কথা বলার আদেশ প্রদান করা হবে।

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ
لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

অর্থাৎ, দুশ্চরিত্রা নারীকূল দুশ্চরিত্র পুরুষকূলের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকূল দুশ্চরিত্রা নারীকূলের জন্যে উপযুক্ত। সচ্চরিত্রা নারীকূল সচ্চরিত্র পুরুষকূলের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষকূল সচ্চরিত্রা নারীকূলের জন্যে উপযুক্ত। এদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, এরা তা থেকে পবিত্র। এদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

এই সর্বশেষ আয়াতে প্রথমতঃ সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা মানবচরিত্রে স্বাভাবিকভাবে যোগসূত্র রেখেছেন। দুশ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষের প্রতি এবং দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারী পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনিভাবে সচ্চরিত্রা নারীদের আগ্রহ সচ্চরিত্র পুরুষদের প্রতি এবং সচ্চরিত্র পুরুষদের আগ্রহ সচ্চরিত্রা নারীদের প্রতি হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোঁজ করে নেয় এবং প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সে সেরূপই পায়।

এই সামগ্রিক অভ্যাস ও রীতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্ তাআলা পত্নীও তাঁদের উপযুক্তরূপ দান করেন। এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরকুল শিরোমণি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা বাহ্যিক পবিত্রতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতায় তাঁরই মত রমনীকুল দান করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা এই বিবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্টতমা ছিলেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি যার ঈমান নেই, সে-ই হযরত আয়েশা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। কোরআন পাকে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ ও হযরত লূত (আঃ)-এর বিবিগণ কাফের ছিল। কিন্তু তাদের সম্পর্কে এ কথাও প্রমাণিত আছে যে, কাফের হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্যভিচার ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ما بغت امرأة نبى قط অর্থাৎ, কোন পয়গম্বরের বিবিই কোনদিন ব্যভিচার করেনি।— (দুররে-মনসুর) এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরের বিবি কাফের হবে— এটা তো সম্ভবপর, কিন্তু ব্যভিচারিণী হবে— এটা সম্ভবপর নয়। কেননা, ব্যভিচারী স্বাভাবিকভাবেই জনগণের ঘৃণার পাত্র। কিন্তু কুফর প্রকৃতিগতভাবে ঘৃণার কারণ হয় না।— (বয়ানুল-কোরআন)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟
وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟
فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُوا۟
فَٱرْجِعُوا۟ ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَن تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَٰعٌ لَّكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟
فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل
لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ
بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ
أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ
عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن
زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

(২৭) হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (২৮) যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্যে অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা ভালোভাবে জানেন। (২৯) যে গৃহে কেউ বাস করে না, যাতে তোমাদের সামগ্রী আছে এমন গৃহে প্রবেশ করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই এবং আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর। (৩০) মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্ তা অবহিত আছেন। (৩১) ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্র সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অনুমতি ছাড়া কারোও গৃহে প্রবেশ করো নাঃ পরিতাপের বিষয়, ইসলামী শরীয়ত এ ব্যাপারটিকে যতই গুরুত্ব দিয়েছে, কোরআনে এর বিস্তারিত বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এর প্রতি জোর দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই মুসলমানরা আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীন। লেখা-পড়া জানা সৎ লোকেরাও একে গোনাহ্ মনে করে না এবং একে বাস্তবায়িত করার চেষ্টাও করে না। জগতের অন্যান্য সভ্য জাতি একে অবলম্বন করে তাদের সমাজ সুসংহত করে নিয়েছে, কিন্তু মুসলমানরাই সবার পেছনে পড়ে রয়েছে। ইসলামী বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিধানের প্রতিই উপেক্ষা প্রদর্শন শুরু হয়েছে। মোটকথা, অনুমতি চাওয়া কোরআন পাকের একটি অপরিহার্য বিধান, যাতে সামান্য অলসতা ও পরিবর্তনকেও হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) কোরআনের আয়াত অস্বীকার করার মতো গুরুতর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই বর্তমানে মুসলমানরা এসব বিধানের প্রতি এমন উপেক্ষা প্রদর্শন করে চলছে, যেন তাদের মতে এগুলো কোরআনের বিধানই নয়। ইন্নালিল্লাহ্ ....

অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা ঃ আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে বসবাসের জায়গা দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া করা হোক, সর্বাবস্থায় তারই গৃহ তার আবাসস্থল। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্য শান্তি ও আরাম। কোরআন পাক অমূল্য নেয়ামতরাজির উল্লেখ প্রসঙ্গে এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেঃ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্যে শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করেছেন। এই শান্তি ও আরাম তখনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে, যখন মানুষ অন্য কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে। তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেয়ার নামান্তর। এটা খুবই কষ্টের কথা। ইসলাম কাউকে অহেতুক কষ্ট দেয়াকে হারাম করেছে। অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলীর একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি ও কষ্টদান থেকে বিরত থাকা, যা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত মানুষের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্যও বটে। দ্বিতীয় উপকারিতা স্বয়ং সাক্ষাতপ্রার্থীর। সে যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনোচিতভাবে সাক্ষাত করবে, তখন প্রতিপক্ষ তার বক্তব্য যত্নসহকারে শুনবে। তার কোন অভাব থাকলে তা পূরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। এর বিপরীতে অভদ্রজনোচিত পন্থায় কোন ব্যক্তির উপর বিনানুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে আকস্মিক বিপদ মনে করে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় করে দিতে চেষ্টা করবে এবং হিতাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা থাকলেও তা নিস্তেজ হয়ে যাবে। অপরদিকে আগন্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার পাপে পাপী হবে।

তৃতীয় উপকারিতা নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন। কারণ, বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ করলে মাহ্রাম নয়, এমন নারীর উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোন রোগ সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। এদিকে লক্ষ্য করেই অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলীকে কোরআন পাক ব্যভিচার, অপবাদ ইত্যাদি শাস্তির বিধি-বিধান সংলগ্নে বর্ণনা করেছে।

চতুর্থ উপকারিতা এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহের নির্জনতায় এমন কাজ করে, যে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে না। যদি কেউ অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে ঢুকে পড়ে, তবে ভিন্ন লোক তার

গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। কারো গোপন কথা জবরদস্তি জানার চেষ্টা করাও গোনাহ্ এবং অপরের জন্যে কষ্টের কারণ। অনুমতি গ্রহণের কিছু মাসআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে এগুলো ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেখা যেতে পারে। অবশিষ্ট বিবিধ ও মাসআলা পরে বর্ণিত হবে।

মাসআলা ঃ আয়াতে يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যা পুরুষের জন্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নারীরাও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত, যেমন কোরআনের অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সম্বোধন করা সত্ত্বেও মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কতিপয় বিশেষ মাসআলা এর ব্যতিক্রম। তবে এগুলোর ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে বিশেষত্বের কথাও বর্ণনা করে দেয়া হয়। সাহাবয়ে কেরামের স্ত্রীগণের অভ্যাসও তাই ছিল। তাঁরা কারো গৃহে গেলে প্রথমে অনুমতি নিতেন। হযরত উম্মে আয়াস (রাঃ) বলেন ঃ আমরা চার জন মহিলা প্রায়ই হযরত আয়েশার গৃহে যেতাম এবং প্রথমে তাঁর কাছে অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভেতরে প্রবেশ করতাম।— (ইবনে-কাসীর)

মাসআলা ঃ এই আয়াতের ব্যাপকতা থেকে জানা গেল যে, অন্য কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়ার বিধানে নারী, পুরুষ, মাহ্রাম ও গায়র-মাহ্রাম সবাই শামিল রয়েছে। নারী নারীর কাছে গেলে অথবা পুরুষ পুরুষের কাছে গেলে সবার জন্যেই অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। এমনিভাবে এক ব্যক্তি যদি তার মা, বোন অথবা কোন মাহ্রাম নারীর কাছে যায়, তবুও অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। ঈমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি আমার মাতার কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি চাইব? তিনি বললেন ঃ হাঁ, অনুমতি চাও। সে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমি তো আমার মাতার গৃহেই বসবাস করি। তিনি বললেন, তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। লোকটি আবার বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমি তো সর্বদা তাঁর কাছেই থাকি। তিনি বললেন ঃ তবু অনমুতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। তুমি কি তোমার মাতাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ কর? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। কেননা, গৃহে কোন প্রয়োজনে তার অপ্রকাশযোগ্য কোন অঙ্গ খোলা থাকতে পারে।— (মাযহারী)

এই হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হল যে, আয়াতে তোমাদের নিজেদের গৃহ বলে এমন গৃহ বোঝানো হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একা থাকে—পিতা-মাতা, ভাই-বোন প্রমুখ থাকে না।

মাসআলা ঃ যে গৃহে শুধু নিজের স্ত্রী থাকে তাতে প্রবেশ করার জন্যে যদিও অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব নয় ঃ কিন্তু মোস্তাহাব ও সুন্নত এই যে, সেখানেও হঠাৎ বিনা খবরে যাওয়া উচিত নয়; বরং প্রবেশের পূর্বে পদধ্বনি দ্বারা অথবা গলা ঝেড়ে হুশিয়ার করা দরকার। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের স্ত্রী বলেন, আবদুল্লাহ্ যখন বাইরে থেকে গৃহে আসতেন, তখনই প্রথমে দরজার কড়া নেড়ে আমাকে হুশিয়ার করে দিতেন, যাতে তিনি আমাকে অপছন্দনীয় অবস্থায় না দেখেন। — (ইবনে-কাসীর) এক্ষেত্রে অনুমতি চাওয়া যে ওয়াজিব নয়, তা এ থেকে জানা যায় যে, ইবনে জুরায়জ হযরত আতাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নিজের স্ত্রীর কাছে যাওয়ার সময়ও কি অনুমতি চাওয়া জরুরী? তিনি বললেন ঃ না। ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন ঃ এর অর্থ ওয়াজিব নয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও মোস্তাহাব ও উত্তম।

অনুমতি গ্রহণের সুন্নত তরীকা ঃ আয়াতে حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟ وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا বলা হয়েছে, অর্থাৎ, দুইটি কাজ না করা পর্যন্ত কারও গৃহে প্রবেশ করো না। প্রথম استيناس শাব্দিক অর্থ প্রীতি বিনিময় করা। বিশিষ্ট তফসীরকারগণের মতে এর অর্থ অনুমতি হাসিল করা। এখানে استيناس শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি লাভ করার দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়— সে আতঙ্কিত হয় না। দ্বিতীয় কাজ এই যে, গৃহের লোকদেরকে সালাম কর। কোন কোন তফসীরকার এর অর্থ নিয়েছেন যে, প্রথমে অনুমতি লাভ কর এবং গৃহে প্রবেশের সময় সালাম কর। কুরতুবী এই অর্থই পছন্দ করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতে অগ্র-পশ্চাৎ নেই। তিনি আবু আইয়্যুব আনসারীর হাদীসের সারমর্ম তাই সাব্যস্ত করেছেন। মাওয়ারদী বলেন, যদি অনুমতি নেয়ার পূর্বে গৃহের কোন ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে, তবে প্রথমে সালাম করবে, এরপর অনুমতি চাইবে। নতুবা প্রথমে অনুমতি নেবে এবং গৃহে যাওয়ার সময় সালাম করবে। কিন্তু অধিকাংশ হাদীস থেকে সুন্নত তরীকা এটাই জানা যায় যে, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করবে, এরপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাত করতে চায়।

ইমাম বোখারী আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায়, তাকে অনুমতি দিও না। কারণ, সে সুন্নত তরীকা ত্যাগ করেছে। — (রূহুল-মা'আনী) আবু দাউদের এক হাদীসে আছে, বনী আমেরের জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে বাইরে থেকে বলল ঃ الج আমি কি ঢুকে পড়ব? তিনি খাদেমকে বললেন ঃ লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে বলুক ঃ السلام عليكم اادخل অর্থাৎ, সালাম করার পর বলবে যে, আমি প্রবেশ করতে পারি কি? খাদেম বাইরে যাওয়ার আগেই লোকটি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর কথা শুনে السلام عليكم اادخل বলল। অতঃপর তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। — (ইবনে-কাসীর) বায়হাকী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন لاتاذن لمن لايبدأ بالسلام —অর্থাৎ, যে প্রথমে সালাম করে না, তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিও না। — (মাযহারী) এই ঘটনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) - দু'টি সংশোধন করেছেন — প্রথমে সালাম করা উচিত এবং ادخل - এর স্থলে الج শব্দের ব্যবহার অসমীচীন। কেননা, الج শব্দটি ولوج থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন সংকীর্ণ জায়গায় ঢুকে পড়া। শব্দটি মার্জিত ভাষার পরিপন্থী। মোটকথা, এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, আয়াতে যে সালাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা অনুমতি চাওয়ার সালাম। অনুমতি গ্রহণের জন্যে বাইরে থেকে এই সালাম করা হয়, যাতে ভেতরের লোক এদিকে মনোনিবেশ করে এবং অনুমতি চাওয়ার বাক্য শোনে। গৃহে প্রবেশ করার সময় যথারীতি পুনরায় সালাম করতে হবে।

মাসআলা ঃ উপরে হাদীসগুলো থেকে প্রথমে সালাম ও পরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণের বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এতে নিজের নাম উল্লেখ করে অনুমতি চাওয়াই উত্তম। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাই করতেন। একবার তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দ্বারে এসে বললেন, السلام على رسول الله السلام عليكم ايدخل عمر অর্থাৎ, সালামের পর বললেন, ওমর প্রবেশ করতে পারে কি? — (ইবনে-কাসীর) সহীহ্ মুসলিমে আছে, হযরত আবু মুসা হযরত ওমরের কাছে গেলেন এবং

অনুমতি চাওয়ার জন্যে বললেন, السلام عليكم هذا ابو موسى السلام عليكم هذا الاشعرى এতেও তিনি প্রথমে নিজের নাম আবু মূসা বলেছেন, এরপর আরও নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যে আশআরী বলেছেন। এর কারণ এই যে, অনুমতি প্রার্থীকে না চেনা পর্যন্ত নিরুদ্বেগে জওয়াব দেয়া যায় না।

وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ — অর্থাৎ, যদি আপনাকে আপাততঃ ফিরে যেতে বলা হয়, তখন আপনার হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসা উচিত। একে খারাপ মনে করা অথবা সেখানেই অটল হয়ে বসে থাকা উভয়ই অসঙ্গত। পূর্ববর্তী কালের জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি সারা জীবন এই আশায় ছিলাম যে, কারো কাছে গিয়ে অনুমতি চাই এবং সে আমাকে জওয়াবে ফিরে যেতে বলে, তখন আমি ফিরে এসে কোরআনের এই আদেশ পালনের সওয়াব হাসিল করি; কিন্তু হায়, এই নেয়ামত কখনও আমার ভাগ্যে জুটল না।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ

مَتَاعٌ – শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুকে ভোগ করা, ব্যবহার করা এবং তদ্দ্বারা উপকৃত হওয়া। যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, তাকেও مَتَاعٌ বলা হয়। এই আয়াতে আভিধানিক অর্থই বোঝানো হয়েছে। 'অনুবাদ করা হয়েছে' ভোগ অর্থাৎ, ভোগ করার অধিকার। হযরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে বর্ণিত আছে, যখন বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত উল্লেখিত আয়াত নাযিল হয়, তখন তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, এই নিষেধাজ্ঞার পর কোরাইশদের ব্যবসাজীবী লোকেরা কি করবে? মক্কা ও মদীনা থেকে সুদূর শামদেশ পর্যন্ত তারা বাণিজ্যিক সফর করে। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সরাইখানা আছে। তারা এগুলোতে অবস্থান করে। এগুলোতে কোন স্থায়ী বাসিন্দা থাকে না। এখানে অনুমতি চাওয়ার কি উপায়? কার কাছ থেকে অনুমতি লাভ করা হবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় —(মাযহারী) শানে নুযুলের এই ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আয়াতে بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ বলে এমন গৃহ বোঝানো হয়েছে, যা কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয়; বরং সেটাকে ভোগ করার ও সেখানে অবস্থান করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। যেমন, বিভিন্ন শহরে ও প্রান্তরে এই উদ্দেশে নির্মিত মুসাফিরখানাসমূহ এবং একই কারণে মসজিদ, খানকাহ্, ধর্মীয় পাঠাগার, হাসপাতাল, ডাকঘর, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, জাতীয় চিত্তবিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এসব স্থানে প্রত্যেকেই বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে পারে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পর্দাপ্রথা ঃ নির্লজ্জতা দমন ও সতীত্ব সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ঃ মহিলাদের পর্দা সম্পর্কিত প্রথম আয়াত সূরা আহ্যাবে উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়। এর তারিখ কারো মতে তৃতীয় হিজরী এবং কারো মতে পঞ্চম হিজরী। তফসীর ইবনে-কাসীর ও নায়লুল আওতার গ্রন্থে পঞ্চম হিজরীকে অগ্রগণ্যতা দান করা হয়েছে। রূহুল-মা'আনীতে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, পঞ্চম হিজরীর যিলকদ মাসে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, পর্দার আয়াত এই বিয়ের সময়ই অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতসমূহ বনী-মুস্তালিক যুদ্ধ অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত অপবাদের ঘটনার সাথে সাথে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়। এই আলোচনা থেকে জানা যায় যে, সূরা নূরের পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ পরে এবং সূরা আহ্যাবের পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ আগে অবতীর্ণ হয়। সূরা আহযাবের আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার সময় থেকেই পর্দার বিধানাবলী প্রবর্তিত হয়। তাই সূরা আহযাবেই ইনশা-আল্লাহ্ পর্দা সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু সূরা নূরের আয়াতসমূহের তফসীর লিখিত হচ্ছে।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

শব্দটি غض থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কম করা এবং নত করা।— (রাগিব) দৃষ্টি নত রাখার অর্থ দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেয়া যার প্রতি দেখা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। ইবনে-কাসীর ও ইবনে-হাইয়্যান এ তফসীরই করেছেন। বেগানা নারীর প্রতি বদ-নিয়তে দেখা হারাম এবং বিনা নিয়ত দেখা মাকরূহ্—এ বিধানটি এর অন্তর্ভুক্ত। কোন নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখাও এর মধ্যে দাখিল। (চিকিৎসা ইত্যাদির কারণে প্রয়োজনীয় অঙ্গ এ থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত।) এ ছাড়া কারো গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উঁকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার করা শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত।

وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ যৌনাঙ্গ সংযত রাখার অর্থ এই যে, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এতে ব্যভিচার, পুংমৈথুন, দুই নারীর পারস্পরিক ঘর্ষণ— যাতে কামভাব পূর্ণ হয় এবং হস্তমৈথুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কাম-প্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে— দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। এ দু'টিকে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করে হারাম করে দেয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী হারাম ভূমিকাসমূহ—যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর হযরত ওবায়দা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যদ্দ্বারা আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ হয়, তাই কবীরা। কিন্তু আয়াতে তার দুই প্রান্ত—সূচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। সূচনা হচ্ছে চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। তাবারানী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

দৃষ্টিপাত শয়তানের একটি বিষাক্ত শর। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা সত্ত্বেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আমি তার পরিবর্তে তাকে সুদৃঢ় ঈমান দান করব, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ্ বাজালী থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোন বেগানা নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।— (ইবনে-কাসীর) হযরত আলী (রাঃ)-এর হাদীসে আছে, প্রথম দৃষ্টি মাফ এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিপাত গোনাহ্। এর উদ্দেশ্যও এই যে, প্রথম দৃষ্টিপাত

অকস্মাৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে ক্ষমার্হ। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও ক্ষমার্হ নয়।

শ্মশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করার বিধান ও অনুরূপ : ইবনে-কাসীর লিখেছেন : পূর্ববর্তী অনেক মনীষী শ্মশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন এবং অনেক আলেমের মতে এটা হারাম। সম্ভবতঃ এটা তখনকার ব্যাপারে, যখন বদনিয়ত ও কামভাব সহকারে দেখা হয়।

বেগানাকে দেখা হারাম সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ : وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ এ দীর্ঘ আয়াতের সূচনাভাগে সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের জন্যে ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু জোর দেয়ার জন্যে তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মাহ্‌রাম ব্যতীত কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীদের জন্যে হারাম। অনেক আলেমের মতে নারীদের জন্যে মাহ্‌রাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি দেখা সর্বাবস্থায় হারাম; কামভাব সহকারে বদ-নিয়তে দেখুক অথবা এ ছাড়াই দেখুক। তার প্রমাণ হযরত উম্মে-সালমা বর্ণিত হাদীস যাতে বলা হয়েছে : একদিন হযরত উম্মে-সালমা ও মায়মুনা (রাঃ) উভয়েই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে-মাকতুম তথায় আগমন করলেন। এই ঘটনার সময়কাল ছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁদের উভয়কে পর্দা করতে আদেশ করলেন। উম্মে-সালমা আরয করলেন : ইয়া রসূলাল্লাহ্, সে তো অন্ধ, সে আমাদেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে চেনেও না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন : তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তাকে দেখছ।— (আবু দাউদ, তিরমিযী) অপর কয়েকজন ফেকাহ্‌বিদ বলেন : কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্যে দোষনীয় নয়। তাদের প্রমাণ হযরত আয়েশার হাদীস, যাতে বলা হয়েছে : একবার ঈদের দিন মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই কুচকাওয়াজ নিরীক্ষণ করতে থাকেন এবং তাঁর আড়ালে দাঁড়িয়ে হযরত আয়েশাও এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত দেখে যান। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে নিষেধ করেননি। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কামভাব সহকারে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও অনুত্তম। আয়াতের ভাষাদৃষ্টে আরো বোঝা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে যদি এক নারী অন্য নারীর গোপন অঙ্গ দেখে, তবে তাও হারাম। কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষের গোপন অঙ্গ এবং সমস্ত দেহ মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতীত বাকীগুলো নারীর গোপন অঙ্গ। সবার কাছেই এসব জায়গা গোপন রাখা ফরয। কোন পুরুষ কোন পুরুষের গোপন অঙ্গ যেমন দেখতে পারে না, তেমনি কোন নারী অপর কোন নারীর গোপন অঙ্গও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সুতরাং পুরুষ কোন নারীর গোপন এবং নারী কোন পুরুষের গোপন অঙ্গ দেখলে তা আরও সন্দেহাতীত রূপে হারাম হবে। এটা আলোচ্য আয়াতের বিধান দৃষ্টি নত রাখার পরিপন্থী। কেননা, আয়াতের উদ্দেশ্য শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন প্রত্যেক বস্তু থেকে দৃষ্টি নত রাখা। এতে নারী কর্তৃক নারীর গোপন অঙ্গ দেখাও অন্তর্ভুক্ত।

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ

অভিধানে زينت এমন বস্তুকে বলা হয়, যদ্দ্বারা মানুষ নিজেকে সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য করে। এটা উৎকৃষ্ট বস্ত্র হতে পারে এবং অলংকারও হতে পারে। এসব বস্তু যদি কোন নারীর দেহে না থেকে পৃথকভাবে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এগুলো দেখা পুরুষদের জন্যে হালাল; যেমন বাজারে বিক্রির জন্যে মেয়েলী পোশাক ও অলংকার ইত্যাদি দেখায় কোন দোষ নেই। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতে زينت এর অর্থ নিয়েছেন সাজ-সজ্জার স্থান; অর্থাৎ, যেসব অঙ্গে সাজ-সজ্জার অলংকার ইত্যাদি পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, সাজ-সজ্জার স্থানসমূহ প্রকাশ না করা মহিলাদের উপর ওয়াজিব।— (রূহুল-মা'আনী) আয়াতের পরবর্তী অংশে নারীর এই বিধান থেকে দু'টি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে ; একটি যার প্রতি দেখা হয়, তার হিসেবে এবং অপরটি যে দেখে, তার হিসেবে।

পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম : প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে مَا ظَهَرَ مِنْهَا অর্থাৎ, নারীর কোন সাজ-সজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়, অবশ্য সেসব অঙ্গ ব্যতীত, যেগুলো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে অর্থাৎ, কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় সেসব অঙ্গ স্বভাবতঃ খুলেই যায়। এগুলো ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোন গোনাহ্ নেই।— (ইবনে-কাসীর) এতে কোন্ কোন্ অঙ্গ বোঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে হযরত ইবনে-মাসউদ ও হযরত ইবনে-আব্বাসের তফসীর বিভিন্ন রূপ। হযরত ইবনে মাসউদ বলেন مَا ظَهَرَ مِنْهَا বাক্যে উপরের কাপড় ; যেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজ-সজ্জার পোশাককে আবৃত রাখার জন্যে পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশতঃ বাইরে যাওয়ার সময় যেসব উপরের কাপড় আবৃত করা সম্ভবপর নয়, সেগুলো ব্যতীত সাজ-সজ্জার কোন বস্তু প্রকাশ করা জায়েয নয়। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন : এখানে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোন নারী প্রয়োজনবশতঃ বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংবা চলাফেরা ও লেন-দেনের সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালু আবৃত রাখা খুবই দুরূহ হয়। অতএব হযরত ইবনে-মাসউদের তফসীর অনুযায়ী নারীর জন্যে বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও খোলা জায়েয নয়। শুধু উপরের কাপড় বোরকা ইত্যাদি প্রয়োজনবশতঃ খুলতে পারে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে-আব্বাসের তফসীর অনুযায়ী মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও বেগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা জায়েয। এ কারণে ফেকাহ্‌বিদগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই একমত যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে যদি অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এগুলো দেখাও জায়েয নয় এবং নারীর জন্যে এগুলো প্রকাশ করাও জায়েয নয়। এমনিভাবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, গোপন অঙ্গ আবৃত করা যা নামাযে সর্বসম্মতিক্রমে ফরয এবং নামাযের বাইরে বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী ফরয, তা থেকে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতিক্রমভুক্ত। এগুলো খুলে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ ও দুরস্ত হবে।

কাযী বায়যাভী ও 'খাযেন' এ আয়াতের তফসীরে বলেন : নারীর আসল বিধান এই যে, সে তার সাজ-সজ্জার কোনকিছুই প্রকাশ করবে না। আয়াতের উদ্দেশ্য তাই মনে হয়। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে

স্বভাবতঃ যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো প্রকাশ করতে পারবে। বোরকা, চাদর, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। নারী কোন প্রয়োজনে বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট। লেন-দেনের প্রয়োজনে কোন সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও ক্ষমার্হ —গোনাহ্ নয়। কিন্তু এই আয়াত থেকে কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও পুরুষদের জন্যে জায়েয ; বরং পুরুষদের জন্যে দৃষ্টি নত রাখার বিধানই প্রযোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত খুলতে বাধ্য হয়, তবে শরীয়তসম্মত ওযর ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা পুরুষদের জন্যে অপরিহার্য। এই ব্যাখ্যায় পূর্বোল্লেখিত উভয় তফসীরই স্থান পেয়েছে। ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মাযহাবও এই যে, বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও বিনা প্রয়োজনে জায়েয নয়। যাওয়াজের গ্রন্থে ইবনে-হাজার মক্কী শাফেয়ী ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও এই মাযহাব বর্ণনা করেছেন। নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো খোলা অবস্থায়ও নামায হয়ে যায়, কিন্তু বেগানা পুরুষদের জন্যে এগুলো দেখা শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে জায়েয নয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেসব ফেকাহ্‌বিদের মতে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখা জায়েয, তাঁরাও এ বিষয়ে একমত যে, অনর্থ দেখা দেয়ার আশঙ্কা থাকলে মুখমণ্ডল ইত্যাদি দেখাও নাজায়েয। বলাবাহুল্য, মানুষের মুখমণ্ডলই সৌন্দর্য ও শোভার আসল কেন্দ্র। এটা অনর্থ, ফাসাদ, কামাধিক্য ও গাফিলতির যুগ। তাই বিশেষ-প্রয়োজন যেমন চিকিৎসা অথবা তীব্র বিপদাশঙ্কা ছাড়া বেগানা পুরুষের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখমণ্ডল খোলা নারীর জন্যে নিষিদ্ধ এবং তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করাও বিনা প্রয়োজনে পুরুষদের জন্যে জায়েয নয়।

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ অর্থাৎ, তারা যেন বক্ষদেশে ওড়না ফেলে রাখে। خمر শব্দটি خمار এর বহুবচন। অর্থ ঐ কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তদ্দ্বারা-গলা ও বক্ষ আবৃত হয়ে যায়। جيوب শব্দটি جيب এর বহুবচন-এর অর্থ জামার কলার। প্রাচীনকাল থেকে জামার কলার বক্ষদেশে থাকাই প্রচলিত। তাই জামার কলার আবৃত করার অর্থ বক্ষদেশ আবৃত করা। আয়াতের শুরুতে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই বাক্যে সাজ-সজ্জা গোপন রাখার তাকিদ এবং একটা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এর আসল কারণ জাহেলিয়াত যুগের একটি প্রথার বিলোপ সাধন করা। সে যুগে নারীরা ওড়না মাথার উপর ফেলে তার দুই প্রান্ত পৃষ্ঠদেশে ফেলে রাখত। ফলে গলা, বক্ষদেশ ও কান অনাবৃত থাকত। তাই মুসলমান নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন এরূপ না করে; বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত পরস্পর উল্‌টিয়ে রাখে, এতে সকল অঙ্গ আবৃত হয়ে পড়ে।— (রূহুল মা'আনী) এরপর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এমন পুরুষদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যাদের কাছে শরীয়তে পর্দা নেই। এই পর্দা না থাকার কারণ দ্বিবিধ। (এক), যেসব পুরুষকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, তাদের তরফ থেকে কোন অনর্থের আশঙ্কা নেই। তারা মাহ্‌রাম। আল্লাহ্ তাআলা তাদের স্বভাবকে দৃষ্টিগতভাবে এমন করেছেন, তারা এসব নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ করে ; স্বয়ং তাদের পক্ষ থেকে কোন অনর্থের সম্ভাবনা নেই। (দুই), সদাসর্বদা এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরস্পরের প্রতি সহজ ও সরল হয়ে থাকে। স্মর্তব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহ্‌রামকে যে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে এটা পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রম — গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারীর যে গোপন অঙ্গ নামাযে খোলা জায়েয নয়, তা দেখা মাহ্‌রামদের জন্যেও জায়েয নয়।

আলোচ্য আয়াতে পর্দা থেকে আট প্রকার মাহ্‌রাম পুরুষের এবং চার প্রকারের অন্যান্য ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে অবতীর্ণ সূরা আহ্‌যাবের আয়াতে মাত্র সাত প্রকার উল্লেখিত হয়েছে। সূরা নূরের আয়াতে পাঁচ প্রকার অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যা পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

হুঁশিয়ারী ঃ স্মরণ রাখা দরকার যে, এ স্থলে মাহ্‌রাম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বামীও এর অন্তর্ভুক্ত। ফেকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় যার সাথে বিবাহ শুদ্ধ নয়, তাকে মাহ্‌রাম বলা হয়। কিন্তু এই অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বার জন ব্যতিক্রমভুক্ত লোকের পূর্ণ বিবরণ এরূপ ঃ প্রথম স্বামী, যার কাছে স্ত্রীর কোন অঙ্গের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন مارای منى ولا رايت منه অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার বিশেষ অঙ্গ দেখেননি এবং আমি ও তাঁর বিশেষ অঙ্গ দেখিনি।

দ্বিতীয়, পিতা, দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়, শ্বশুর। তাতে দাদা, পরদাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চতুর্থ, নিজ গর্ভজাত সন্তান। পঞ্চম, স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ষষ্ঠ, ভ্রাতা। সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মামা, খালা ও ফুফার পুত্র, যাদেরকে সাধারণ পরিভাষায় ভাই বলা হয়, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা গায়ের -মাহ্‌রাম। সপ্তম, ভ্রাতুষ্পুত্র। এখানেও সহোদর, বৈমাত্রেয় বৈপিত্রেয়, ভ্রাতার পুত্র বোঝানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অষ্টম, ভগ্নিপুত্র। এখানেও সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়া বোন বোঝানো হয়েছে। এই আট প্রকার হলো মাহ্‌রাম। নবম أَوْ نِسَائِهِنَّ অর্থাৎ, নিজেদের স্ত্রীলোক ; উদ্দেশ্য মুসলমান স্ত্রীলোক। তাদের সামনেও এমনসব অঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই ব্যতিক্রম পর্দার বিধান থেকে —গোপন অঙ্গ আবৃত করা থেকে নয়। তাই নারী যেসব অঙ্গ তার মাহ্‌রাম পুরুষদের সামনে খুলতে পারে না, সেগুলো কোন মুসলমান স্ত্রীলোকের সামনেও খোলা জায়েয নয়। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে খোলা ভিন্ন কথা।

نِسَائِهِنَّ মুলসমান স্ত্রীলোক বলা থেকে জানা গেল যে, কাফের মুশরিক স্ত্রীলোকদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। তারা বেগানা পুরুষদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন ঃ এ থেকে জানা গেল যে, কাফের নারীদের সামনে অঙ্গ প্রকাশ করা কোন মুসলমান নারীর জন্যে জায়েয নয়। কিন্তু সহীহ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিবিদের সামনে কাফের রমণীদের যাতায়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কারো মতে কাফের নারী বেগানা পুরুষের মত। কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলমান ও কাফের উভয় প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন ; অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। ইমাম রাযী বলেন ঃ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুসলমান কাফের; সব নারীই نِسَائِهِنَّ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ কাফের নারীদের কাছে পর্দা করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা মোস্তাহাব আদেশ। রূহুল মা'আনীতে মুফতী আল্লামা আলুসী এই উক্তি অবলম্বন করে বলেছেন ঃ এই উক্তিই আজকাল মানুষের অবস্থার সাথে বেশী খাপ খায়। কেননা, আজকাল মুসলমান নারীদের কাফের নারীদের কাছে পর্দা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

দশম প্রকার أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ অর্থাৎ, যারা নারীদের

মালিকানাধীন। এতে দাস-দাসী উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ফেকাহ্‌বিদের মতে এখানে শুধু দাসী বোঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কাছে সাধারণ মাহ্‌রামের ন্যায় পর্দা করা ওয়াজিব। হযরত সাইদ ইবনে মুসাইয়্যেব তাঁর সর্বশেষ উক্তিতে বলেনঃ لايغرنكم اية النور فانه فى الاماء دون الذكور অর্থাৎ, তোমরা সূরা নূরের আয়াতদৃষ্টে বিভ্রান্ত হয়ো না যে, مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ শব্দের মধ্যে দাসরাও শামিল রয়েছে। এই আয়াতে শুধু দাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী ও ইবনে সিরীন বলেন ঃ পুরুষ দাসের জন্যে তার প্রভু নারীর কেশ পর্যন্ত দেখা জায়েয নয়।— (রূহুল-মা'আনী) এখন প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে যখন শুধু দাসীদেরকেই বোঝানো হয়েছে তখন তারা তো পূর্ববর্তী اَوْنِسَآئِهِنَّ শব্দের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাদেরকে আলাদা বর্ণনা করার প্রয়োজন কি? জাসসাস এর জওয়াবে বলেন ঃ نِسَآئِهِنَّ শব্দটি বাহ্যিক দিক দিয়ে শুধু মুসলমান নারীদের জন্যে প্রযোজ্য। দাসীদের মধ্যে যদি কেউ কাফেরও থাকে, তবে তাকে ব্যতিক্রমভুক্ত করার জন্যে এই শব্দটি আলাদা আনা হয়েছে।

একাদশ প্রকার اَوِالتّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের লোক বোঝানো হয়েছে, যাদের নারী জাতির প্রতি কোন আগ্রহ ও ঔৎসুক্যই নেই।— (ইবনে-কাসীর) ইবনে জরীর এই বিষয়বস্তুই আবু আবদুল্লাহ্, ইবনে জুবায়র, ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। কাজেই আয়াতে এমনসব পুরুষকে বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোন আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং তাদের রূপ-গুণের প্রতিও কোন ঔৎসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে। তবে নপুংসক ধরনের লোক যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। হযরত আয়েশার (রাঃ) হাদীসে আছে, জনৈক নপুংসক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করত। বিবিগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আগমন করতেন। রসূলুল্লাহ্ তখন তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন।

এ কারণেই ইবনে হাজার মক্কী মিনহাজের টীকায় বলেন ঃ পুরুষ যদিও পুরুষত্বহীন, লিঙ্গকর্তিত অথবা খুব বেশী বৃদ্ধ হয়, তবুও সে غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব।

এখানে غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ শব্দের সাথে اَوِالتّٰبِعِيْنَ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধ ইন্দ্রিয়বিকল লোক, যারা অনাহূত মেহমান হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্যে গৃহে ঢুকে পড়ে, তারা ব্যতিক্রমভুক্ত। একথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, তখন এমনি ধরনের কিছু নির্বোধ লোক বিদ্যমান ছিল। তারা অনাহূত হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্যে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করত। বিধানের আসল ভিত্তি নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল হওয়ার উপর—অনাহূত মেহমান হওয়ার উপর নয়।

দ্বাদশ প্রকার اَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে বোঝানো হয়েছে, যে এখনও সাবালকত্বের নিকটবর্তীও হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে মোরাহিক অর্থাৎ, সাবালকত্বের নিকটবর্তী। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। — (ইবনে কাসীর) ইমাম জাসসান বলেন ঃ এখানে طفل বলে এমন বালককে বোঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজ কারবারের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বোঝে না। এ পর্যন্ত পর্দা থেকে ব্যতিক্রমভুক্তদের বর্ণনা সমাপ্ত হল।

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ অর্থাৎ, নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যদ্দরুন অলঙ্কারাদিন আওয়াজ ভেসে উঠে এবং তাদের বিশেষ সাজ-সজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর। এই আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ অতঃপর নারীদেরকে এমনি আদেশ এবং শেষে নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের কাছে পর্দা করার আলাদা আলাদা আদেশদান করার পর আলোচ্য বাক্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কামপ্রবৃত্তির ব্যাপারটি খুবই সূক্ষ্ম। অপরের তা জানা কঠিন, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সমান দেদীপ্যমান। তাই উল্লেখিত বিধানসমূহে কোন সময় যদি কারো দ্বারা কোন ত্রুটি হয়ে যায়, তবে তার জন্যে তওবা করা নেহায়েত জরুরী। সে অতীত কর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ কর্মের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্যে কৃত সংকল্প হবে।

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن
فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا
تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ
خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي
زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ
مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ
لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ
اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾

(৩২) তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (৩৩) যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে অর্থ-কড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। যদি কেহ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৪) আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ্ ভীরুদের জন্যে দিয়েছি উপদেশ। (৩৫) আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য। তাতে পুতঃপবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (৩৬) আল্লাহ্ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে;

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ - ايامى শব্দটি - ايم - এর বহুবচন। অর্থ প্রত্যেকটি এমন নর ও নারী, যার বিবাহ বর্তমান নেই; আসলেই বিবাহ না করার কারণে হোক কিংবা বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে হোক। এমন নর ও নারীদের বিবাহ সম্পাদনের জন্যে তাদের অভিভাবকদেরকে আদেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে একথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে, নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার জন্যে কোন পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেয়ার পরিবর্তে অভিভাবকদের মাধ্যমে একাজ সম্পাদন করাই বিবাহের মসনুন ও উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা রয়েছে। বিশেষতঃ মেয়েদের বিবাহ তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে, এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই কোন কোন হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেয়া হয়েছে। ইমাম আযম ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে, এই বিধানটি একটি বিশেষ সুন্নত ও শরীয়তগত নির্দেশের মর্যাদা রাখে। যদি কোন প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত 'কুফূ' তথা সমতুল্য লোকের সাথে সম্পাদন করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদিও সুন্নতের বিরোধিতার কারণে বালিকাটি তিরস্কারের যোগ্য হবে, যদি সে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে।

ইমাম শাফেয়ী ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে অভিভাবকের মাধ্যমে না হলে প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহই বাতিল ও না হওয়ার শামিল বলে গণ্য হবে। এটা বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের আলোচনা ও উভয়পক্ষের প্রমাণাদির বর্ণনা করার স্থান নয়। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াত থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহে অভিভাবকদের মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়। এখন কেউ যদি অভিভাবকদের মধ্যস্থতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে কিনা আয়াত এ ব্যাপারে নিশ্চুপ; বিশেষতঃ এ কারণেও যে, ايامى (বিবাহহীন লোক) শব্দের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক বালকদের বিবাহ অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়া সবার মতেই শুদ্ধ — কেউ একে বাতিল বলে না। এমনিভাবে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করলে তাও শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুন্নতবিরোধী কাজ করার কারণে বালক-বালিকা উভয়কে তিরস্কার করা হবে।

বিবাহ ওয়াজিব, না সুন্নত, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপ : মুজতাহিদ ইমামগণ প্রায় সবাই একমত যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রবল ধারণা এই যে, সে বিবাহ না করলে শরীয়তের সীমার ভেতরে থাকতে পারবে না, গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং বিবাহ করার শক্তি-সামর্থ্যও রাখে, এরূপ ব্যক্তির জন্যে বিবাহ করা ফরয অথবা ওয়াজিব। সে যতদিন বিবাহ না করবে, ততদিন গোনাহ্গার থাকবে। হ্যাঁ, যদি বিবাহের উপায়াদি না থাকে; যেমন কোন উপযুক্ত নারী পাওয়া না গেলে কিংবা মুআজ্জল মোহর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সীমা পর্যন্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তার বিধান পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে যেন উপায়াদি সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং যতদিন উপায়াদি সংগৃহীত না হয়, ততদিন নিজেকে বশে রাখে ও ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে। এরূপ ব্যক্তির

জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরশাদ করেন যে, সে উপর্যুপরি রোযা রাখবে। রোযার ফলে কামোত্তেজনা স্তিমিত হয়ে যায়।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত ওকাফ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার স্ত্রী আছে কি? তিনি বললেন ঃ না! আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন শরীয়তসম্মত বাঁদী আছে কি? উত্তর হল ঃ না। প্রশ্ন হল ঃ তুমি কি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল? উত্তর হল ঃ হাঁ। উদ্দেশ্য এই যে, তুমি কি বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয়নির্বাহের সামর্থ্য রাখ? তিনি উত্তরে হাঁ বললে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তাহলে তো তুমি শয়তানের ভাই। তিনি আরও বললেন ঃ বিবাহ আমাদের সুন্নত। আমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি নিকৃষ্টতম, যে বিবাহহীন এবং তোমাদের মৃতদের মধ্যে সে সর্বাধিক নীচ, যে বিবাহ না করে মারা গেছে।—(মাযহারী)

যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গোনাহ্র আশঙ্কা প্রবল, ফেকাহ্বিদদের মতে এই হাদীসটিও সেক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। ওকাফের অবস্থা সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জানা ছিল যে, সে সবর করতে পারে না। এমনিভাবে মুসনাদে আহ্মদে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিবাহহীন থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।—(মাযহারী) এমনি ধরনের আরও অনেক হাদীস আছে। সবগুলো হাদীসই সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল থাকে। এর বিপরীতে এ ব্যাপারেও সব ফেকাহ্বিদ একমত যে, কোন ব্যক্তির যদি প্রবল ধারণা থাকে যে, সে বিবাহ করলে গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে, উদাহরণতঃ সে দাম্পত্যজীবনের হক আদায় করার শক্তি রাখে না, স্ত্রীর উপর জুলুম করবে কিংবা অন্য কোন গোনাহ নিশ্চিত হয়ে যাবে, তবে এরূপ ব্যক্তির জন্যে বিবাহ করা হারাম অথবা মকরূহ।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী অর্থাৎ, বিবাহ না করলেও যার গোনাহের সম্ভাবনা প্রবল নয় এবং বিবাহ করলেও কোন গোনাহের আশঙ্কা জোরদার নয়, এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে ফেকাহ্বিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ বলেন, তার পক্ষে বিবাহ করা উত্তম এবং কেউ বলেন, বিবাহ না করাই উত্তম। ইমাম আযম আবু হানীফার মতে নফল এবাদতে মশগুল হওয়ার চাইতে বিবাহ করা উত্তম। ইমাম শাফেয়ী বলেন, নফল এবাদতে মশগুল হওয়া উত্তম। এই মতভেদের আসল কারণ এই যে, বিবাহ সত্তাগতভাবে পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ন্যায় একটি মোবাহ্ তথা শরীয়তসিদ্ধ কাজ। যদি কেউ এই নিয়তে বিবাহ করে যে, এর মাধ্যমে সে গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং সুসন্তান জন্মদান করবে; তবে তা এবাদতে পরিণত হয়ে যায় এবং সে এরও সওয়াব পায়। মানুষ যদি এরূপ সদুদ্দেশে যে কোন মোবাহ্ কাজ করে; তা পরোক্ষভাবে তার জন্যে এবাদত হয়ে যায়। পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদিও এরূপ নিয়তের ফলে এবাদত হয়ে যায়। এবাদতে মশগুল হওয়া আপন সত্তায় একটি এবাদত। তাই ইমাম শাফেয়ী এবাদতের উদ্দেশে একান্তবাসকে বিবাহের চাইতে উত্তম বলেন। ইমাম আবু হানীফার মতে বিবাহের মধ্যে এবাদতের দিক অন্যান্য মোবাহ্ কর্মসমূহের তুলনায় প্রবল। সহীহ্ হাদীসসমূহে বিবাহকে পয়গম্বরগণের ও স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নত আখ্যা দিয়ে এর উপর যথেষ্ট জোর দেয়া হয়েছে। এসব হাদীসের সমষ্টি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ সাধারণ মোবাহ্ কর্মসমূহের ন্যায় একটি মোবাহ্ কর্ম নয়; বরং এটা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এতে এবাদতের মর্যাদা শুধু নিয়তের কারণে নয়; বরং পয়গম্বরগণের সুন্নত হওয়ার কারণেও বলবৎ থাকে। কেউ বলতে পারে যে, এভাবে তো পানাহার ও নিদ্রাও পয়গম্বরগণের সুন্নত। কারণ, তাঁরা সবাই এসব কাজ করেছেন। এর উত্তর সুস্পষ্ট যে, এগুলো পয়গম্বরগণের কাজ হওয়া সত্ত্বেও কেউ একথা বলেননি এবং কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি যে, পানাহার ও নিদ্রা পয়গম্বরগণের সুন্নত, বরং একে সাধারণ মানবীয় অভ্যাসের অধীন পয়গম্বরগণের কর্ম আখ্যা দেয়া হয়েছে। বিবাহ এরূপ নয়। বিবাহকে সুস্পষ্টভাবে পয়গম্বরগণের সুন্নত এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিজের সুন্নত বলা হয়েছে।

فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ অর্থাৎ, নারীদেরকে বিবাহে বাধা না দেয়া অভিভাবকদের জন্যে অপরিহার্য। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)ও বলেছেন, তোমাদের কাছে যদি কেউ বিবাহের পয়গাম নিয়ে আসে, তবে তার চরিত্র পছন্দনীয় হলে অবশ্যই বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এরূপ না করলে দেশে বিপুল পরিমাণে অনর্থ দেখা দেবে।—(তিরমিযী)

সারকথা এই যে, প্রভুরা যাতে বিবাহের অনুমতি দিতে ইতস্ততঃ না করে, সেজন্য এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বয়ং বিবাহ সম্পাদন করা তাদের যিম্মায় ওয়াজিব।

اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ যেসব দরিদ্র মুসলমান ধর্ম-কর্মের হেফাযতের জন্যে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই; আয়াতে তাদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন ধর্মের হেফাযত ও সুন্নতে রসূল (সাঃ) পালন করার সদুদ্দেশে বিবাহ করবে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও দান করবেন। যাদের কাছে দরিদ্র লোকেরা বিবাহের পয়গাম নিয়ে যায় আয়াতে তাদের প্রতিও নির্দেশ আছে যে, তারা যেন শুধু বর্তমান দারিদ্র্যের কারণেই বিবাহে অস্বীকৃতি না জানায়। অর্থকড়ি ক্ষণস্থায়ী বস্তু। এই আছে এই নেই। কাজের যোগ্যতা আসল জিনিস। এটা বিদ্যমান থাকলে বিবাহে অস্বীকৃতি জানান উচিত নয়।

হযরত ইবনে-মাসউদ বলেন ঃ তোমরা যদি ধনী হতে চাও, তবে বিবাহ কর। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ (ইবনে-কাসীর)

হুশিয়ারীঃ তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ স্মর্তব্য যে, বিবাহ করার কারণে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা তখন, যখন পবিত্রতা সংরক্ষণ ও সুন্নত পালনের নিয়তে বিবাহ করা হয়, অতঃপর আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা হয়। এর প্রমাণ পরবর্তী আয়াত ঃ

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

অর্থাৎ, যারা অর্থ-সম্পদের দিক দিয়ে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না এবং বিবাহ করলে আশঙ্কা আছে যে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করার কারণে গোনাহগার হয়ে যাবে, তারা যেন পবিত্রতা ও ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মালদার করে দেন। এই ধৈর্যের জন্যে হাদীসে একটি কৌশলও বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা বেশী পরিমাণে রোযা রাখবে। তারা এরূপ করলে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে বিবাহের সামর্থ্য পরিমাণে অর্থ-সম্পদ দান করবেন।

وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাদের যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। সাধারণভাবে

মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে মালিকদেরকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। গোলামের মুক্তি যখন নির্ধারিত পরিমাণ টাকা মালিককে অর্পণ করার উপর নির্ভরশীল থাকবে, তখন মুসলমানদের এ ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত। যাকাতের অর্থও তাকে দিতে পারবে। মালিকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে নিজেরাও তার সাহায্য করে অথবা চুক্তির বিনিময়ে কিছু হ্রাস করে দেয়। সাহাবায়ে কেরাম তাই করতেন। তাঁরা চুক্তির বিনিময়ে সামর্থ্য অনুযায়ী তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ অথবা আরও কম হ্রাস করে দিতেন।—(মাযহারী)

নূরের সংজ্ঞা ঃ নূরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম গাযযালী বলেন ঃ অর্থাৎ, যে বস্তু নিজে নিজে প্রকাশমান ও উজ্জ্বল এবং অপরাপর বস্তুকেও প্রকাশমান ও উজ্জ্বল করে। তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে, নূর প্রকৃতপক্ষে এমন একটি অবস্থার নাম, যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, অতঃপর এর মাধ্যমে চোখে দেখা যায়, এমনসব বস্তুকে অনুভব করে। যেমন, সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ তার বিপরীতে অবস্থিত ঘন পদার্থের উপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে আলোকিত করে; অতঃপর সেখান থেকে কিরণ প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে। এ থেকে জানা গেল যে, নূর শব্দটি তার আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার সত্তার জন্যে প্রযোজ্য নয়। কেননা, তিনি পদার্থও নন এবং পদার্থজাতও নন; বরং এগুলোর বহু উর্ধ্বে। কাজেই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার সত্তার জন্যে ব্যবহৃত 'নূর' শব্দটির অর্থ সকল তফসীরবিদের মতে 'মুনাওয়ের' অর্থাৎ, ঔজ্জ্বল্যদানকারী। অথবা অতিশয়ার্থবোধক পদের ন্যায় নূরওয়ালাকে 'নূর' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে; যেমন দানশীলকে 'দান' বলে ব্যক্ত করা হয় এবং ন্যায়পরায়ণ ন্যায়পরায়ণতা বলে দেয়া হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সব সৃষ্টজীবের নূর দাতা। এই নূর বলে হেদায়েতের নূর বোঝানো হয়েছে। ইবনে-কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর তফসীর এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ الله هادى اهل السماوات والارض আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীদের হেদায়েতকারী।

মুমিনের নূর ঃ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ মুমিনের অন্তরে আল্লাহ্ তাআলার যে নূরে-হেদায়েত আসে, এটা তার একটা বিচিত্র দৃষ্টান্ত। ইবনে-জরীর হযরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে এর তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ "এটা সেই মুমিনের দৃষ্টান্ত, যার অন্তরে আল্লাহ্ তাআলা ঈমান ও কোরআনের নূরে-হেদায়েত রেখেছেন"। আয়াতে প্রথমে আল্লাহ্ তাআলা নিজের নূর উল্লেখ করেছেন اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অতঃপর মুমিনের অন্তরের নূর উল্লেখ করেছেন مَثَلُ نُوْرِهٖ উবাই ইবনে কা'ব এই আয়াতের কেরআতও مَثَلُ نُوْرِهٖ এর পরিবর্তে مثل نور من أمن بـه পড়তেন। সাঈদ ইবনে জুবায়ের এই কেরআত এবং আয়াতের এই অর্থ হযরত ইবনে-আব্বাস থেকেও বর্ণনা করেছেন। ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর লিখেছেন ঃ مَثَلُ نُوْرِهٖ এর সর্বনাম দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দু'রকম উক্তি আছে। (এক), এই সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্ তাআলাকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্র নূরে হেদায়েত যা মুমিনের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে রাখা হয়েছে,তার দৃষ্টান্ত كَمِشْكٰوةٍ এটা হযরত ইবনে-আব্বাসের উক্তি। (দুই), সর্বনাম দ্বারা মুমিনকেই বোঝানো হয়েছে। বাক্যের বর্ণনাধারা থেকে মুমিনই বোঝা যায়। তাই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, মুমিনের বক্ষ একটি তাকের মত এবং এতে তার অন্তর একটি প্রদীপ সদৃশ। এতে যে স্বচ্ছ যয়তুন তৈলের কথা বলা হয়েছে, এটা নূরে-হেদায়েতের দৃষ্টান্ত যা মুমিনের স্বভাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে গ্রহণ করা। যয়তুন তৈল অগ্নি স্পর্শে প্রজ্জ্বলিত হয়ে যেমন অপরকে আলোকিত করে, এমনিভাবে মুমিনের অন্তরে রাখা নূরে-হেদায়েত যখন খোদায়ী ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়। সাহাবায়ে-কেরাম ও তাবেয়ীগণ এই দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এর কারণও সম্ভবতঃ এই যে, এই নূর দ্বারা শুধু মুমিনই উপকারলাভ করে। নতুবা এই সৃষ্টিগত নূরে-হেদায়েত যা সৃষ্টির সময় মানুষের অন্তরে রাখা হয়, তা বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরেই রাখা হয় না; বরং প্রত্যেক মানুষের মজ্জায় ও স্বভাবে এই নূরে-হেদায়েত রাখা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় যে, তারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাঁর মহান কুদরতের প্রতি সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তারা আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণা ও ব্যাখ্যায় যত ভুলই করুক, কিন্তু আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই বিশ্বাসী। তবে কিছুসংখ্যক বস্তুবাদীর কথা ভিন্ন। তাদের স্বভাবধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে তারা আল্লাহ্র অস্তিত্বই অস্বীকার করে।

একটি সহীহ্ হাদীস থেকে এই ব্যাপক অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে, كل مولود يولد على الفطرة অর্থাৎ, প্রত্যেকটি শিশু ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ফিতরতের দাবী থেকে সরিয়ে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে। এই ফিতরতের অর্থ ঈমানের হেদায়েত। ঈমানের হেদায়েত ও তার নূর প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে রাখা হয়। যখন পয়গম্বর ও তাঁদের নায়েবদের মাধ্যমে তাদের কাছে ওহীর জ্ঞান পৌছে, তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। তবে স্বভাবধর্ম বিকৃত কতিপয় লোকের কথা ভিন্ন। তারা নিজেদের কুকর্মের দ্বারা সৃষ্টিগত নূরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সম্ভবতঃ এ কারণেই আয়াতের শুরুতে নূর দান করার কথাটি ব্যাপকাকারে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ভূমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সবাই শামিল। এতে মুমিন ও কাফেরেরও প্রভেদ করা হয়নি। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যাকে ইচ্ছা, তাঁর নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। এখানে আল্লাহ্র ইচ্ছার শর্তটি সেই সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা হয়; বরং এর সম্পর্ক কোরআনের নূরের সাথে, যা প্রত্যেকের অর্জিত হয় না। যারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তওফীক পায়, তারাই এই নূর লাভ করে। নতুবা আল্লাহ্র তওফীক ছাড়া মানুষের চেষ্টাও অনর্থক, বরং মাঝে মাঝে ক্ষতিকরও হয়।

নবী করীম (সাঃ)-এর নূর ঃ ইমাম বগভী বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই আয়াতের তফসীরে আপনি কি বলেন? কা'ব আহবার তওরাত ও ইঞ্জীলে সুপণ্ডিত মুসলমান ছিলেন। তিনি বললেন ঃ এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র অন্তরের দৃষ্টান্ত। মিশকাত তথা তাক মানে তাঁর বক্ষদেশ, زُجَاجَةٍ তথা কাঁচপাত্র মানে তাঁর পূতঃপবিত্র অন্তর এবং مِصْبَاحٌ তথা প্রদীপ মানে নবুওয়ত। এই নবুওয়তরূপী নূরের বৈশিষ্ট্য এই

যে, প্রকাশিত ও ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই এতে মানবমণ্ডলীর জন্যে আলো ও ঔজ্জ্বল্য ছিল। এরপর ওহী ও ঘোষণা এর সাথে সংযুক্ত হলে এটা এমন নূরে পর্যবসিত হয়, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে দেয়।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রকাশ বরং তাঁর জন্মেরও পূর্বে তাঁর নবুওয়তের সুসংবাদবাহী অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় এসব ঘটনাকে 'এরহাসাত' বলা হয়। কেননা, 'মু'জেযা' শব্দটি বিশেষভাবে এমন ঘটনাবলী বোঝাবার জন্যে প্রয়োগ করা হয়, যেগুলো নবুওয়তের দাবীর সত্যতা প্রকাশ করার জন্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন পয়গম্বরের হাতে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে নবুওয়ত দাবীর পূর্বে এ ধরনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তার নাম দেয়া হয় 'এরহাসাত'। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) 'খাসায়েসে কোবরা' গ্রন্থে, আবু নায়ীম 'দালায়েলে-নবুওয়ত' গ্রন্থে এবং অন্যান্য আলেমগণও স্বতন্ত্র গ্রন্থাদিতে এসব ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। তফসীরে-মাযহারীতেও অনেক তথ্য বর্ণিত হয়েছে।

যয়তূন তৈলের বৈশিষ্ট্য ঃ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ এতে প্রমাণিত হয় যে, যয়তূন ও যয়তূন-বৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকারী। আলেমগণ বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা এতে অগণিত উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। একে প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এর আলো অন্যান্য তৈলের আলোর চাইতে অধিক স্বচ্ছ হয়। একে রুটির সাথে ব্যঞ্জনের স্থলে ব্যবহার করা হয়। এর ফলও ভক্ষিত হয়। এর তৈল বের করার জন্যে কোন যন্ত্র অথবা মাড়াইকল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না —আপনা-আপনি ফল থেকে তৈল বের হয়ে আসে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যয়তূন তৈল খাও এবং শরীরে মালিশও কর। কেননা, এটা কল্যাণময় বৃক্ষ।—(মাযহারী)

فِيْ بُيُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা অন্তরে নিজের নূরে-হেদায়েত রাখার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেন ঃ এই নূর দ্বারা সে-ই উপকার লাভ করে, যাকে আল্লাহ্ চান ও তওফীক দেন। আলোচ্য আয়াতে এমন মুমিনদের আবাসস্থল ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরূপ মুমিনদের আসল আবাসস্থল, যেখানে তারা প্রায়ই বিশেষতঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়ে দৃষ্টিগোচর হয় — সেসব গৃহ, যেগুলোকে উচ্চ রাখার জন্যে এবং যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা আদেশ করেছেন। এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বদা এমন লোকেরা আল্লাহ্ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদের বিশেষ গুণাবলী পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

এই বক্তব্যের ভিত্তি এই যে, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী فِيْ بُيُوتٍ এর সম্পর্ক يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ বাক্যের সাথে হবে। কেউ কেউ এর সম্পর্ক يُسَبِّحُ উহ্য শব্দের সাথে করেছেন, যার প্রমাণ পরবর্তী يُسَبِّحُ শব্দটি। কিন্তু প্রথমোক্ত সম্পর্ক বাক্যের বর্ণনাধারা দৃষ্টে উত্তম মনে হয়। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তে উল্লেখিত আল্লাহ্ তাআলার নূরে-হেদায়েত পাওয়ার স্থান সেসব গৃহ, যেখানে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এসব গৃহ হচ্ছে মসজিদ।

মসজিদ ঃ আল্লাহ্র ঘর, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব ঃ কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রমাণ হিসেবে হযরত আনাস বর্ণিত এই হাদীসটি পেশ করেছেন, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

"- যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমাকে মহব্বত করে। যে আমার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমার সাহাবিগণকে মহব্বত করে। যে সাহাবিগণের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন কোরআনকে মহব্বত করে। যে কোরআনের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন মসজিদসমূহকে মহব্বত করে। কেননা, মসজিদ আল্লাহ্র ঘর। আল্লাহ্ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন এবং এতে বরকত রেখেছেন। মসজিদও আল্লাহ্র হেফাযতে এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কিতরাও আল্লাহ্র হেফাযতে থাকে। তারা নামাযে মশগুল হয়, আল্লাহ্ তাদের কার্যোদ্ধার করেন এবং অভাব দূর করেন। তারা মসজিদে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা পশ্চাতে তাদের জিনিসপত্রের হেফাযত করেন।—(কুরতুবী)

রفع مساجد এর অর্থ ঃ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ - أَذِنَ শব্দটি إِذْن থেকে উদ্ভূত। অর্থ অনুমতি দেয়া। تُرْفَعَ শব্দটি رفع থেকে উদ্ভূত। অর্থ উচ্চ করা, সম্মান করা। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মসজিদসমূহকে উচ্চ করার অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি দেয়ার মানে আদেশ করা এবং উচ্চ করার মানে সম্মান করা। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ উচ্চ করার অর্থে আল্লাহ্ তাআলা মসজিদসমূহে অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন।—(ইবনে-কাসীর)

ইকরিমা ও মুজাহিদ বলেন ঃ رفع বলে মসজিদ নির্মাণ বোঝানো হয়েছে, যেমন কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ এখানে رفع قواعد বলে ভিত্তি নির্মাণ বোঝানো হয়েছে। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ رفع مساجد বলে মসজিদসমূহের সম্মান, ইযযত ও সেগুলোকে নাপাকী ও নোংরা বস্তু থেকে পবিত্র রাখা বোঝানো হয়েছে। যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে, মসজিদে কোন নাপাকী আনা হলে মসজিদ এমন কুঞ্চিত হয়, যেমন আগুনের সংস্পর্শে মানুষের চামড়া কুঞ্চিত হয়। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে নাপাকী, নোংরামি ও পীড়াদায়ক বস্তু অপসারণ করে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্যে জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করে দেবেন।—(ইবনে মাজাহ্)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে বাসগৃহের মধ্যেও মসজিদ অর্থাৎ, নামায পড়ার বিশেষ জায়গা তৈরী করার এবং তাকে পবিত্র রাখার জন্যে আদেশ করেছেন।—(কুরতুবী)

প্রকৃত কথা এই যে, تُرْفَعَ শব্দের অর্থে মসজিদ নির্মাণ করা, পাক-পবিত্র রাখা এবং মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাক-পবিত্র রাখার মধ্যে নাপাকী ও নোংরামি থেকে পবিত্র রাখা এবং দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র রাখা উভয়ই দাখিল। এ কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রসুন ও পিঁয়াজ খেয়ে মুখ না ধুয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ হাদীস গ্রন্থসমূহে একথা বর্ণিত আছে। সিগারেট, হুক্কা, পান, তামাক খেয়ে মসজিদে যাওয়াও তেমন নিষিদ্ধ। মসজিদে দুর্গন্ধযুক্ত কেরোসিন তৈল জ্বালানোও তেমনি নিষিদ্ধ।

সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) বলেন ঃ আমি দেখেছি, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে ব্যক্তির মুখে রসুন অথবা পেঁয়াজের দুর্গন্ধ অনুভব করতেন, তাকে মসজিদ থেকে বের করে 'বাকী' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন ঃ যে ব্যক্তি রসুন-পেঁয়াজ খেতে চায়, সে যেন উত্তমরূপে পাকিয়ে খায় যাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। এ হাদীসের আলোকে ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত যে, তার কাছে দাঁড়ালে কষ্ট হয়, তাকেও মসজিদ থেকে সরিয়ে দেয়া যায়। তার নিজেরও উচিত যতদিন এই রোগ থাকে, ততদিন গৃহে নামায পড়া।

رفع مساجد এর অর্থ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়িগণের মতে মসজিদ নির্মাণ করা এবং তাকে প্রত্যেক মন্দ বস্তু থেকে পাক-পবিত্র রাখা। কেউ কেউ মসজিদের বাহ্যিক শানশওকত ও সুউচ্চ নির্মাণ-কৌশলকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের প্রমাণ এই যে, হযরত ওসমান (রাঃ) শাল কাঠ দ্বারা মসজিদে নববীর নির্মাণগত শানশওকত বৃদ্ধি করেছিলেন এবং হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয মসজিদে নববীতে সুদৃশ্য কারুকার্য ও নির্মাণগত সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট যত্নবান হয়েছিলেন। তখন ছিল বিশিষ্ট সাহাবিগণের যুগ; কিন্তু কেউ তাঁর একাজ অপছন্দ করেননি। পরবর্তী বাদশাহ্‌রা তো মসজিদ নির্মাণে অঢেল অর্থকড়ি ব্যয় করেছেন। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক তাঁর খেলাফতকালে দামেশকের জামে মসজিদ নির্মাণ ও সুসজ্জিত করণে সমগ্র সিরিয়ার বার্ষিক আমদানির তিন গুণেরও অধিক অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তাঁর নির্মিত এই মসজিদ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। ইমাম আযম আবু হানীফার মতে যদি নাম-যশ খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশে না হয়, আল্লাহ্‌র নাম ও আল্লাহ্‌র ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে কেউ সুরম্য, সুউচ্চ ও মজবুত সুদৃশ মসজিদ নির্মাণ করে, তবে নিষেধ নেই; বরং সওয়াব আশা করা যায়।

মসজিদের কতিপয় ফযীলত ঃ আবু দাউদে হযরত আবু উমামাহ্ বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি গৃহে ওযূ করে ফরয নামাযের জন্যে মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব সেই ব্যক্তির সমান, যে এহ্‌রাম বেঁধে গৃহ থেকে হজ্বের জন্যে যায়। যে ব্যক্তি এশরাকের নামায পড়ার জন্যে গৃহ থেকে ওযূ করে মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব ওমরাকারীর অনুরূপ। এক নামাযের পরে অন্য নামায ইল্লিয়্যীনে লিখিত হয় যদি উভয়ের মাঝখানে কোন কাজ কিংবা কথাবার্তা না বলে। হযরত বুরায়দাহ্‌র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।—(মুসলিম)

যেসব গৃহ আল্লাহ্‌র যিকর, কোরআন শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষার জন্যে নির্দিষ্ট, সেগুলোও মসজিদের অনুরূপ ঃ তফসীরে বাহ্‌রে-মুহীতে আবু হাইয়্যান বলেন ঃ কোরআনের فِي بُيُوتٍ শব্দটি ব্যাপক। এতে যেমন মসজিদ বোঝানো হয়েছে, তেমনি যেসব গৃহে কোরআন শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, ওয়াজ-নসীহত অথবা যিকরের জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত, সেগুলোও বোঝানো হয়েছে, যেমন মাদ্রাসা, খানকাহ্ ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিও আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য।

أَذِنَ اللَّهُ **বাক্যে** أَذِنَ **শব্দের বিশেষ রহস্য ঃ** তফসীরবিদগণ সবাই একমত যে, এখানে أَذِنَ শব্দের অর্থ আদেশ করা। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, এখানে امر ও حكم শব্দের পরিবর্তে أَذِنَ শব্দ ব্যবহার করার রহস্য কি? রূহুল-মা'আনীতে এর একটি সূক্ষ্ম রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে শিক্ষা ও উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং আদেশের অপেক্ষা না করে শুধু অনুমতি লাভের আশায় থাকে।

وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ এখানে তসবীহ্ (পবিত্রতা বর্ণনা) তাহ্‌মীদ (প্রশংসা কীর্তন), নফল নামায, কোরআন তেলাওয়াত, ওয়াজ-নসীহত, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি সর্বপ্রকার যিকর বোঝানো হয়েছে।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوٰةِ وَ
إِيتَآءِ الزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾
لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ
مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ
بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَ
وَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ
كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ
سَحَابٌ ۚ ظُلُمَٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ
يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ
اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِى السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَٰٓفَّٰتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ
عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ
السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ
يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَٰلِهِ وَيُنَزِّلُ
مِنَ السَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَ
يَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَٰرِ ﴿٤٣﴾

(৩৭) এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (৩৮) (তারা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে,) যাতে আল্লাহ্ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুযী দান করেন। (৩৯) যারা কাফের, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি, সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহ্‌কে, অতঃপর আল্লাহ্ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৪০) অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই। (৪১) তুমি কি দেখ না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করতঃ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তার যোগ্য এবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। তারা যা করে, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (৪২) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৩) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন; অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎঝলক দৃষ্টিশক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ যেসব — মুমিন আল্লাহ্ তাআলার নূরে হেদায়েতের বিশেষ স্থান-মসজিদকে আবাদ রাখে, এখানে তাদের বিশেষ গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। এখানে **رجال** শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিধান আসলে পুরুষদের জন্যে, নারীদের জন্যে গৃহে নামায পড়া উত্তম।

মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকীতে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন **ঃ خير مساجد النساء قعر بيوتهن** অর্থাৎ, নারীদের উত্তম মসজিদ তাদের গৃহের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠ।

অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামই ব্যবসাজীবী ছিলেন ঃ এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের বেশীর ভাগই ব্যবসায়ী অথবা শিল্পী ছিলেন। ফলে তাঁদেরকে বাজারেই অবস্থান করতে হত। কেননা, আল্লাহ্‌র স্মরণে ব্যবসাবাণিজ্য অন্তরায় না হওয়া ব্যবসাজীবীদেরই গুণ হতে পারে। নতুবা একথা বলা অনর্থক হবে। –(রূহুল-মা'আনী)

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ এটা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত মুমিনদের সর্বশেষ গুণ। এতে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকর, আনুগত্য ও এবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত ও ভয়শূন্য হয়ে যায় না; বরং কেয়ামতের হিসাবের ভয়ে ভীত থাকে। এটা আল্লাহ্ –প্রদত্ত নূরে হেদায়েতেরই শুভ প্রতিক্রিয়া। পরিশেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতম প্রতিদান দেবেন। এরপর বলা হয়েছে,. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ অর্থাৎ, শুধু কর্মের প্রতিদানই শেষ নয়; বরং আল্লাহ্ নিজ কৃপায় তাদেরকে বাড়তি নেয়ামতও দান করবেন। وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কোন আইনের অধীন নন এবং তাঁর ভাণ্ডারে কোন সময় অভাবও দেখা দেয় না। তিনি যাকে ইচ্ছা, অপরিসীম রুযী দান করেন। এ পর্যন্ত যেসব সৎকর্মপরায়ণ মুমিনের বক্ষ নূরে-হেদায়েতের তাক এবং যারা বিশেষভাবে নূরে-হেদায়েতকে গ্রহণ করে, সেসব মুমিনের আলোচনা ছিল। অতঃপর সেসব কাফেরের কথা বলা হচ্ছে, যাদের স্বভাবে আল্লাহ্ তাআলা নূরে-হেদায়েতের উপকরণ রেখেছিলেন, কিন্তু যখন এই উপকরণকে ঔজ্জ্বল্য দানকারী ওহী তাদের কাছে পৌঁছল, তখন তারা তা অস্বীকার করে নূর থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল এবং অতল অন্ধকারেই রয়ে গেল। তারা কাফের ও অস্বীকারকারী — এ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনার পর বলা হয়েছে ঃ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ এই বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা নূরে-হেদায়েত থেকে বঞ্চিত। তারা খোদায়ী বিধি-বিধানের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে স্বভাবজাত নূরকেও বিলীন করে দিয়েছে। সুতরাং তারা আল্লাহ্‌র নূর কোথায় পাবে?

আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, শুধু জ্ঞান ও গুণের উপকরণ সংগৃহীত হলেই কেউ জ্ঞানী ও গুণী হয়ে যায় না; বরং এটা একান্ত আল্লাহ্‌র দান। এ কারণেই অনেক মানুষ, যারা দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেখবর, তারা পরকালের ব্যাপারে অত্যন্ত জ্ঞানী ও চক্ষুষ্মান হয়ে থাকে। এমনিভাবে এর বিপরীতে যারা দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত পারদর্শী ও বিচক্ষণ বলে গণ্য হয়, তাদের অনেকেই পরকালের ব্যাপারে

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُلْ لَا تُقْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

(৪৪) আল্লাহ্ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্নগণের জন্যে চিন্তার উপকরণ রয়েছে। (৪৫) আল্লাহ্ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে; আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম। (৪৬) আমি তো সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালনা করেন। (৪৭) তারা বলে ঃ আমরা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আনুগত্য করি; কিন্তু অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা বিশ্বাসী নয়। (৪৮) তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৯) সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রসূলের কাছে ছুটে আসে। (৫০) তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে; না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো অবিচারকারী। (৫১) মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে ঃ আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম। (৫২) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য। (৫৩) তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলে যে, আপনি তাদেরকে আদেশ করলে তারা সবকিছু ছেড়ে বের হবেই। বলুন ঃ তোমরা কসম খেয়ো না। নিয়মানুযায়ী তোমাদের আনুগত্য, তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে জ্ঞাত।

বেওকুফ ও মূর্খ হয়ে থাকে।—(মাযহারী)

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে যে, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু আল্লাহ্ তাআলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মশগুল। এই পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ হযরত সুফিয়ানের বর্ণনামতে এই যে, আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু আসমান, যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উপাদান চতুষ্টয় অগ্নি, পানি, মাটি, বাতাস সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সে কাজে ব্যাপৃত আছে এর চুল পরিমাণও বিরোধিতা করে না। এই আনুগত্যকেই তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বলা হয়েছে। সারকথা এই যে, তাদের পবিত্রতা বর্ণনা অবস্থাগত — উক্তিগত নয়। তাদের দেখেই মনে হয় যে, তারা আল্লাহ্ তাআলাকে পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তাঁর আনুগত্যে ব্যাপৃত আছে।

যমখশারী ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন ঃ এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এতটুকু বোধশক্তি ও চেতনা নিহিত রেখেছেন, যদ্দ্বারা সে তার স্রষ্টা ও প্রভুর পরিচয় জানতে পারে এবং এটাও অবাস্তব নয় যে, তাদেরকে বিশেষ প্রকার বাকশক্তি দান করা হয়েছে ও বিশেষ প্রকার তসবীহ্ ও এবাদত শেখানো হয়েছে, যাতে তারা মশগুল থাকে। كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ এই শেষ বাক্যে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার তসবীহ্ ও নামাযে সমগ্র সৃষ্টজগতই ব্যাপৃত আছে, কিন্তু প্রত্যেকের নামায ও তসবীহ্র পদ্ধতি ও আকার বিভিন্নরূপ। ফেরেশতাদের পদ্ধতি ভিন্ন, মানুষের পদ্ধতি ভিন্ন এবং উদ্ভিদরা অন্য পদ্ধতিতে নামায ও তসবীহ্ আদায় করে। জড়পদার্থের পদ্ধতিও ভিন্নরূপ। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াত থেকেও এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে ঃ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এই পথ প্রদর্শন এছাড়া কিছুই নয় যে, সে সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্যে ব্যাপৃত থেকে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এছাড়া তার নিজের জীবনধারণের প্রয়োজনাদি সম্পর্কেও তাকে এমন পথ প্রদর্শন করা হয়েছে যে, বড় বড় চিন্তাশীলদের চিন্তা তার কাছে হার মানে। বসবাসের জন্যে সে কেমন আশ্চর্যজনক বাসা, গর্ত ইত্যাদি তৈরী করে এবং খাদ্য ইত্যাদি হাসিল করার জন্যে কেমন কেমন কৌশল অবলম্বন করে!

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ এখানে سماء মানে মেঘমালা এবং جبال মানে বড় বড় মেঘখণ্ড। برد এর অর্থ শিলা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াত বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাবারী প্রমুখ এ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ বিশর নামক জনৈক মুনাফিক ও এক ইহুদীর মধ্যে জমি সংক্রান্ত কলহ-বিবাদ ছিল। ইহুদী তাকে বলল ঃ চল, তোমাদেরই রসূল দ্বারা এর মীমাংসা করিয়ে নেই। মুনাফিক বিশর ছিল অন্যায়ের উপর। সে জানত যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এজলাসে মোকদ্দমা গেলে তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং সে হেরে যাবে। কাজেই সে অস্বীকার করল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরিবর্তে কা'ব ইবনে আশরাফ ইহুদীর

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ
مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى
الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم
مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن
كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
آتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ
الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِّن
قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ
وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ
لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

(৫৪) বলুন ঃ আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। রসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া। (৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য। (৫৬) নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (৫৭) তোমরা কাফেরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করো না। তাদের ঠিকানা অগ্নি। কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তনস্থল। (৫৮) হে মুমিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়। এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্যে কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

কাছে মোকদ্দমা নিয়ে যেতে বলল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

সাফল্য লাভের চারটি শর্তঃ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ এই আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এই চারটি বিষয় যথাযথ পালন করে, সে-ই দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম।

একটি আশ্চর্য ঘটনা ঃ তফসীর-কুরতুবীতে এস্থলে হযরত ফারূকে আযমের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও পারস্পরিক পার্থক্য ফুটে উঠে। হযরত ফারূকে আযম একদিন মসজিদে নববীতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ জনৈক রূমী গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল ঃ

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله হযরত ফারূকে আযম জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি? সে বলল ঃ আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে মুসলমান হয়ে গেছি। হযরত ফারূকে আযম জিজ্ঞেস করলেন ঃ এর কোন কারণ আছে কি? সে বলল ঃ হাঁ, আমি তওরাত, ইঞ্জীল, যবূর ও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছি। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক মুসলমান কয়েদীর মুখে একটি আয়াত শুনে জানতে পারলাম যে, এই ছোট আয়াতটির মধ্যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত রয়েছে। এতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আগত। ফারূকে আযম জিজ্ঞেস করলেন ঃ আয়াতটি কি? রূমী ব্যক্তি উল্লেখিত আয়াতটিই তেলাওয়াত করল এবং সাথে সাথে তার অভিনব তফসীরও বর্ণনা করল যে, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ আল্লাহ্র ফরয কার্যাদির সাথে, وَرَسُولَهُ রসূলের সুন্নতের সাথে, وَيَخْشَ اللَّهَ অতীত জীবনের সাথে এবং وَيَتَّقْهِ ভবিষ্যত জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে। মানুষ যখন এই চারটি বিষয় পালন করবে, তখন তাকে فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ এর সুসংবাদ দেয়া হবে। فائز তথা সফলকাম সে ব্যক্তি, যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে স্থান পায়। ফারূকে আযম একথা শুনে বললেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর কথায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন ঃ اوتيت جوامع الكلم অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে সুদূরপ্রসারী অর্থবোধক বাক্যাবলী দান করেছেন। এগুলোর শব্দ সংক্ষিপ্ত এবং অর্থ সুদূর বিস্তৃত।—(কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নুযূল ঃ কুরতুবী আবুল-আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওহী অবতরণ ও নবুওয়ত ঘোষণার পর দশ বছর কাফের ও মুশরেকদের ভয়ে ভীত অবস্থায় মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করেন। এরপর মদীনায় হিজরতের আদেশ হলে সেখানেও সর্বদা মুশরেকদের আক্রমণের আশংকা ছিল। একবার জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় শান্তিতে ও সুখে বসবাস করব—এরূপ সময় কি কখনও আসবে? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এরূপ সময় অতিসত্বরই আসবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।—(কুরতুবী,বাহর) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা আয়াতে বর্ণিত ওয়াদা উম্মতে-মুহাম্মদীকে তার অস্তিত্বলাভের পূর্বেই তওরাত ও

ইঞ্জীলে দিয়েছিলেন।— (বাহ্‌রে-মুহীত)

আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছেন। (১) আপনার উম্মতকে পৃথিবীর খলীফা ও শাসনকর্তা করা হবে, (২) আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলামকে প্রবল করা হবে এবং (৩) মুসলমানদেরকে এমন শক্তি ও শৌর্যবীর্য দান করা হবে যে, তাদের অন্তরে শত্রুর কোন ভয়-ভীতি থাকবে না। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর এই ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পুণ্যময় আমলে মক্কা, খায়বর, বাহ্‌রাইন, সমগ্র আরব উপত্যকা ও সমগ্র ইয়ামন তাঁরই হাতে বিজিত হয় এবং তিনি হিজরের অগ্নিপূজারী ও শাম দেশের কতিপয় অঞ্চল থেকে জিযিয়া কর আদায় করেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিস, আম্মান ও আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী প্রমুখ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করেন ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) খলীফা হন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পর যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তিনি তা খতম করেন এবং পারস্য, সিরিয়া ও মিসর অভিমুখে সৈন্যাভিযান করেন। বসরা ও দামেস্ক তাঁরই আমলে বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কতক অংশ করতলগত হয়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অন্তরে ওমর ইবনে খাত্তাবকে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার ইলহাম করেন। ওমর ইবনে খাত্তাব খলীফা নিযুক্ত হয়ে শাসনব্যবস্থা এমনভাবে সুবিন্যস্ত করলেন যে, পয়গম্বরগণের পর পৃথিবী এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁর আমলে সিরিয়া পুরোপুরি বিজিত হয়। এমনিভাবে সমগ্র মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ করতলগত হয়। তাঁর হাতে কায়সার ও কিসরা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়। এরপর ওসমানী খেলাফতের আমলে ইসলামী বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহ, আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত, দূরপ্রাচ্যে চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান ও আহওয়ায ইত্যাদি সব তাঁর আমলেই মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়। সহীহ্ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে সমগ্র ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একত্রিত করে দেখানো হয়েছে। আমার উম্মতের রাজত্ব যেসব এলাকা পর্যন্ত পৌঁছবে সেগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা এই প্রতিশ্রুতি ওসমানী খেলাফতের আমলেই পূর্ণ করে দেন।— (ইবনে-কাসীর) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, খেলাফত আমার পরে ত্রিশ বছর থাকবে। এখানে খেলাফত অর্থ খেলাফতে রাশেদা, যা সম্পূর্ণরূপে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আদর্শের উপর ভিত্তিশীল ছিল। এই খেলাফত হযরত আলী (রাঃ) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কেননা, ত্রিশ বছরের মেয়াদ হযরত আলী (রাঃ) পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে যায়।

এই আয়াত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়তের প্রমাণ। কেননা, আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু পূর্ণ হয়েছে। এমনিভাবে আয়াতটি খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের সত্যতা, বিশুদ্ধতা ও আল্লাহ্‌র কাছে মকবুল হওয়ারও প্রমাণ। কেননা, আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা যে প্রতিশ্রুতি স্বীয় রসূল ও উম্মতকে দিয়েছিলেন,তার পুরোপুরি বিকাশ তাঁদের আমলে হয়েছে। যদি তাঁদের খেলাফতকে সত্য ও বিশুদ্ধ স্বীকার করা না হয়; যেমন রাফেযীদের ধারণা, তবে বলতে হবে যে, কোরআনের এই প্রতিশ্রুতি হযরত মাহ্‌দীর আমলে পূর্ণ হবে। এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার বৈ নয়। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, শত শত বছর পর্যন্ত সমগ্র উম্মত অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত করবে এবং কেয়ামতের নিকটতম সময়ে ক্ষণকালের জন্যে তারা রাজত্বলাভ করবে। এই প্রতিশ্রুতিতেই সেই রাজত্ব বোঝানো হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ্! সত্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্মের যেসব শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহ্ তাআলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেসব শর্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদাও সম্পূর্ণরূপে তাদের আমলে পূর্ণ হয়েছে। তাঁদের পরে ঈমান ও সৎকর্মের সে মাপকাঠি আর বিদ্যমান নেই; এবং খেলাফত ও রাজত্বের সে গাম্ভীর্য্যও আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ — كَفَرَ শব্দের আভিধানিক অর্থ অকৃতজ্ঞতা এবং পারিভাষিক অর্থ ঈমানের বিপরীত। এখানে উভয় প্রকার অর্থই বোঝানো যেতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, যখন আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেন, মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় শক্তি,শান্তি ও স্থিরতা লাভ করে এবং তাদের ধর্ম সুসংহত হয়ে যায়, তখনও যদি কোন ব্যক্তি কুফর করে অর্থাৎ, ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তবে এরূপ লোকেরাই সীমা লংঘনকারী। প্রথমাবস্থায় ঈমানের গণ্ডি অতিক্রম করে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় আনুগত্যের সীমা পার হয়ে যায়। কুফর ও অকৃতজ্ঞতা সর্বদা, সর্বাবস্থায় মহাপাপ, কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি এবং শৌর্য বীর্য ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এসব কাজ দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। তাই بعد ذلك বলে একে জোরদার করা হয়েছে। ইমাম বগভী বলেন ঃ তফসীরবিদ আলেমগণ বলেছেন যে, কোরআনের এই বাক্য সর্বপ্রথম সেসব লোকের উপর প্রতিফলিত হয়েছে, যারা খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল। তাদের দ্বারা এই মহাপাপ সংঘটিত হওয়ার পর পর আল্লাহ্ তাআলার উল্লেখিত নেয়ামতসমূহও হ্রাস পেয়ে যায়। তারা পারস্পরিক হত্যাযজ্ঞের কারণে ভয় ও ত্রাসের শিকারে পরিণত হয়। যারা ছিল পরস্পর ভাই ভাই, তারা একে অন্যকে হত্যা করতে থাকে। বগভী নিজস্ব সনদ দ্বারা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামের নিম্নোক্ত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হওয়ার সময় এই ভাষণটি দেন। ভাষণটি এই ঃ

"যেদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় পদার্পন করেন, সেদিন থেকে আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা তোমাদের শহর পরিবেষ্টন করে তোমাদের হেফাযতে নিয়োজিত রয়েছে। যদি তোমরা ওসমানকে হত্যা কর, তবে এই ফেরেশতারা ফিরে চলে যাবে এবং কখনও প্রত্যাবর্তন করবে না। আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে, সে আল্লাহ্‌র সামনে হস্তকর্তিত অবস্থায় হাযির হবে ; তার হাত থাকবে না। সাবধান, আল্লাহ্‌র তরবারি এখনও পর্যন্ত কোষবদ্ধ আছে। আল্লাহ্‌র কসম, যদি এই তরবারি কোষ থেকে বের হয়ে পড়ে, তবে কখনো কোষে ফিরে যাবে না। কেননা, যখন কোন নবী নিহত হন, তখন তাঁর পরিবর্তে সত্তর হাজার মানুষ নিহত হয় এবং যখন কোন খলীফাকে হত্যা করা হয়, তখন পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়।"—(মাযহারী)

সেমতে হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যার পর যে পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়, তা মুসলমানদের মধ্যে অব্যাহতই রয়েছে। হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীরা খেলাফত ও ধর্মীয় সংহতির ন্যায় নেয়ামতের বিরোধিতা এবং অকৃতজ্ঞতা করেছিল, তাদের পর রাফেযী ও খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা খোলাফায়ে-রাশেদীনের বিরোধিতায় দলবদ্ধ হয়েছিল। এই ঘটনা পরম্পরার মধ্যেই হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়।

আত্মীয়স্বজন ও মাহ্‌রামদের জন্যে বিশেষ সময়ে অনুমতি গ্রহণের আদেশ ঃ সামাজিকতা ও পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের উত্তম রীতিনীতি ইতিপূর্বে এই সূরার ২৭,২৮,২৯ আয়াতে 'অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী' শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কারও সাথে সাক্ষাত করতে গেলে অনুমতি ব্যতীত তার গৃহে প্রবেশ করো না। পুরুষের গৃহ হোক কিংবা নারীর, আগন্তুক পুরুষ হোক কিংবা নারী সবার জন্যে অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ ওয়াজিব করা হয়েছে। কিন্তু এসব বিধান ছিল বাইরে থেকে আগমনকারী অপরিচিতদের জন্যে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্য এক প্রকার অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক এমন আত্মীয় ও মাহ্‌রাম ব্যক্তিদের সাথে, যারা সাধারণতঃ এক গৃহে বসবাস করে ও সর্বক্ষণ যাতায়াত করতে থাকে, আর তাদের কাছে নারীদের পর্দাও জরুরী নয়। এ ধরনের লোকদের জন্যে গৃহে প্রবেশের সময় খবর দিয়ে কিংবা কমপক্ষে সশব্দ পদচারণা করে অথবা গলা ঝেড়ে প্রবেশের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই অনুমতি গ্রহণ এরূপ আত্মীয়দের জন্যে ওয়াজিব নয়—মোস্তাহাব। এটা তরক করা মকরূহ তানযিহী।

এটা হচ্ছে গৃহে প্রবেশের পূর্বের বিধান। কিন্তু গৃহে প্রবেশের পর তারা সবাই এক জায়গায় একে অপরের সামনে থাকে এবং একে অপরের কাছে যাতায়াত করে। এমতাবস্থায় তাদের জন্যে তিনটি বিশেষ নির্জনতার সময়ে আরও এক প্রকার অনুমতি চাওয়ার বিধান আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি সময় হচ্ছে ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে বিশ্রাম গ্রহণের সময় এবং এশার নামাযের পরবর্তী সময়। এই তিন সময়ে মাহ্‌রাম, আত্মীয়স্বজন এমনকি সমঝদার অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা এবং দাস-দাসীদেরকেও আদেশ করা হয়েছে তারা যেন কারও নির্জন কক্ষে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করে। কেননা, এসব সময়ে মানুষ স্বাধীন ও খোলাখুলি থাকতে চায়, অতিরিক্ত বস্ত্রও খুলে ফেলে এবং মাঝে মাঝে স্ত্রীর সাথে খোলাখুলি মেলামেশায় মশগুল থাকে। এসব সময়ে কোন বুদ্ধিমান বালক অথবা গৃহের কোন নারী অথবা নিজ সন্তানদের মধ্যে কেউ অনুমতি ব্যতীত ভেতরে প্রবেশ করলে প্রায়ই লজ্জার সম্মুখীন হতে হয় ও অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলাখুলিভাব ও বিশ্রামে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া তো বলাই বাহুল্য। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জন্যে বিশেষ অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এসব বিধানের পর একথাও বলা হয়েছে যে, لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ অর্থাৎ, এসব সময় ছাড়া একে অপরের কাছে অনুমতি ব্যতীত যাতায়াত করায় কোন দোষ নেই।

এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকেই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, এই-এই সময়ে জিজ্ঞেস না করে ভেতরে এসো না। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, ছেলেদের বয়স যখন সাত বছর হয়ে যায়, তখন নামায শিক্ষা দাও এবং পড়ার আদেশ কর। দশ বছর বয়স হয়ে গেলে কঠোরভাবে নামাযের আদেশ কর এবং দরকার হলে মারপিটের মাধ্যমে নামায পড়তে বাধ্য কর। এমনিভাবে এখানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আসল আদেশ দেয়া হয়েছে। উল্লেখিত বাক্যে বলা হয়েছে যে, তিন সময় ছাড়া অন্য সময় যদি তোমরা বিনানুমতিতে তাদেরকে আসতে দাও, তবে তোমাদের উপর এবং অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে তারা এলে তাদের উপর কোন جُنَاحٌ নেই। جُنَاحٌ শব্দটি সাধারণতঃ গোনাহ্ অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিছক 'অসুবিধা' ও 'দোষ' অর্থেও আসে। এখানে لا جناح এর অর্থ তাই। অর্থাৎ, কোন অসুবিধা নেই। এর ফলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের গোনাহ্‌গার হওয়ার সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল।—(বয়ানুল-কোরআন)

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ এর অর্থে মালিকানাধীন দাস ও দাসী উভয়ই শামিল রয়েছে। দাস যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তবে সে মাহ্‌রাম নয়, অপরিচিত ব্যক্তির অনুরূপ হুকুম রাখে। তার নারী প্রভুকেও তার কাছে পর্দা করতে হবে। তাই এখানে এর অর্থ হবে দাসী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক দাস যারা সর্বদাই গৃহে যাতায়াতে অভ্যস্ত।

মাসআলা ঃ এই বিশেষ অনুমতি গ্রহণ আত্মীয়দের জন্যে ওয়াজিব, না মোস্তাহাব, এ ব্যাপারে আলেম ও ফেকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এই বিধান এখনও কার্যকর আছে, না রহিত হয়ে গেছে, এতেও তারা মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফেকাহ্‌বিদদের মতে আয়াতটি মুহ্‌কাম ও অরহিত এবং নারী পুরুষ সবার জন্যে এর বিধান ওয়াজিব।—(কুরতুবী) কিন্তু এর ওয়াজিব হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণতঃ মানুষ এই তিন সময়ে নির্জনতা কামনা করে, এসময়ে প্রায়ই স্ত্রীর সাথেও লিপ্ত থাকে এবং মাঝে মাঝে আবৃত অঙ্গও খুলে যায়। যদি কেউ সাবধানতা অবলম্বন করতঃ এসব সময়েও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও কেবল তখনই করে, যখন কারও আগমনের সম্ভাবনা থাকে না, তবে তার জন্যে আত্মীয় ও অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকে অনুমতি গ্রহণে বাধ্য করাও ওয়াজিব নয় এবং আত্মীয়দের জন্যেও ওয়াজিব নয়। তবে এটা সর্বাবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম। কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে এর আমল যেন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এ কারণেই হযরত ইবনে-আব্বাস এক রেওয়ায়েতে এ ব্যাপারে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে যারা আমল করে না, তাদের কিছুটা ওযর বর্ণনা করেছেন।

প্রথম রেওয়ায়েতটি ইবনে-কাসীর ইবনে-আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন ঃ তিনটি আয়াতের আমল লোকেরা ছেড়েই দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি অনুমতি চাওয়ার আয়াত يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ এতে আত্মীয়-স্বজন ও অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকেও অনুমতি গ্রহণের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ এতে উত্তরাধিকার বন্টনের সময় ওয়ারিশদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বিধি অনুযায়ী অংশীদার নয়, এমন কিছু আত্মীয় বন্টণের সময় উপস্থিত হলে তাদেরকেও কিছু দান কর, যাতে তারা মনঃক্ষুণ্ণ না হয়। তৃতীয় আয়াত হচ্ছে إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ এতে বলা হয়েছে যে, সে ব্যক্তি সর্বাধিক সম্মান ও সম্ভ্রমের পাত্র, যে সর্বাধিক মোত্তাকী।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে ইবনে-আবী হাতেমেরই সূত্র ধরে হযরত ইকরিমা থেকে বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তি হযরত ইবনে-আব্বাসকে আত্মীয়দের অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলল যে, কেউ তো এই আদেশ পালন করে না। হযরত ইবনে- আব্বাস বললেন, আল্লাহ্ পর্দাশীল। তিনি পর্দার হেফাযত পছন্দ করেন।

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا
اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي
لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ
خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾ لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ
حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ
وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم
مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن
تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا
فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً
طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

(৫৯) তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়। এমনিভাবে আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৬০) বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে। তাদের জন্যে দোষ নেই, তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬১) অন্ধের জন্যে দোষ নেই, খঞ্জের জন্যে দোষ নেই, রোগীর জন্যে দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যেও দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে, যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহ্র কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দোয়া। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে পরবর্তী আয়াতে একটি তৃতীয় ব্যতিক্রমও নারীর ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্যে পর্দার বিধান শিথিল করা হয়েছে যে, অনাত্নীয় ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহ্রামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহ্রামেদের কাছে যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরী নয়, এই বৃদ্ধা নারীর জন্যে বেগানা পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত রাখা জরুরী নয়। তাই বলা হয়েছে وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ এর তফসীর উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্যে বলা হয়েছে যেসব অঙ্গ মাহ্রামের সামনে খোলা যায়—যে মাহ্রাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে যদি সাজ-সজ্জা না করে। পরিশেষে আরও বলা হয়েছে وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ অর্থাৎ, সে যদি মাহ্রাম নয় এরূপ ব্যক্তিদের সামনে আসতে পুরোপুরি বিরত থাকে, তবে তা তার জন্যে উত্তম।

গৃহে প্রবেশের পরবর্তী কতিপয় বিধান ও সামাজিক রীতিনীতি ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সেসব বিধান ও রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশের পর মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব। আয়াতের মর্ম ও বিধানাবলী হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে প্রথমে সেই পরিস্থিতি জেনে নেয়া উচিত, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কোরআন পাক ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাধারণ শিক্ষার মধ্যে হক্কুল-এবাদ তথা বন্দার হকের হেফাযতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তা কোন মুসলমানের অজানা নয়। অপরের অর্থ-সম্পদে তার অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করার কারণে ভীষণ শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সর্বশেষ রসূলের সংসর্গে থাকার জন্যে এমন ভাগ্যবান লোকদের মনোনীত করেছিলেন, যাঁরা আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশের প্রতি উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন এবং প্রত্যেকটি আদেশ পালনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতেন। কোরআনী শিক্ষার বাস্তবায়ন ও তার সাথে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র সংসর্গের পরশপাথর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা এমন একটি দল সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁদের জন্যে ফেরেশতারাও গর্ববোধ করে। অপরের অর্থ-সম্পদে তার ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত সামান্যতম হস্তক্ষেপ সহ্য না করা, কাউকে সামান্যতম কষ্টপ্রদান থেকে বিরত থাকা এবং এ ব্যাপারে খোদাভীতির উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত থাকা, এগুলো সকল সাহাবীরই গুণ ছিল। এ ধরনেরই কয়েকটি ঘটনা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে সংঘটিত হয় এবং এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়। তফসীরবিদগণ এসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কেউ এক ঘটনাকে এবং কেউ অন্য ঘটনাকে আয়াতে শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এতে কোন বিরোধ নেই। ঘটনাবলীর সমষ্টিই আয়াতের শানে নুযূল। ঘটনাবালী নিম্নরূপ ঃ

(১) ইমাম বগভী তফসীরবিদ সাঈদ ইবনে জুবায়র ও যাহ্হাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জগতের সাধারণ রীতি এবং অধিকাংশ লোকের স্বভাব এই যে, খঞ্জ, অন্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তির সাথে বসে খেতে তারা ঘৃণা বোধ করে।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা এ ধরনের বিকলাঙ্গ ছিলেন, তাঁরা মনে করলেন যে, আমরা কারও সাথে বসে একত্রে আহার করলে সম্ভবতঃ তার কষ্ট হবে। তাই তাঁরা সুস্থ ব্যক্তিদের সাথে আহারে যোগদান থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। অন্ধ ব্যক্তিও চিন্তা করল যে, কয়েকজন একত্রে আহারে বসলে ন্যায় ও মানবতা এই যে, একজন অপরজনের চাইতে বেশী খাবে না। আমি অন্ধ, তাই অনুমান করতে পারি না। সম্ভবতঃ অন্যের চাইতে বেশী খেয়ে ফেলব। এতে অন্যের হক নষ্ট হবে। খঞ্জ ব্যক্তি ধারণা করল, আমি সুস্থ লোকের মত বসতে পারি না, দু'জনের জায়গা নিয়ে ফেলি। আহারে অন্যের সাথে বসলে সম্ভবতঃ তার কষ্ট হবে। তাঁদের এই চরম সাবধানতার ফলে স্বয়ং তাঁরাই অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন হতেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে তাঁদেরকে অন্যের সাথে একত্রে আহার করার অনুমতি এবং এমন চুলচেরা সাবধানতা পরিহার করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

(২) বগভী ইবনে-জরীরের জবানী হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা উপরোক্ত ঘটনার অপর পিঠ। তা এই যে, কোরআন পাকে لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ অর্থাৎ, তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। আয়াতটি নাযিল হলে সবাই অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ন ব্যক্তিদের সাথে বসে খাওয়ার ব্যাপারে ইতস্ততঃ করতে লাগল, তারা ভাবল, রুগ্ন ব্যক্তি তো স্বভাবতঃই কম আহার করে, অন্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য কোন্‌টি তা জানতে পারে না এবং খঞ্জ সোজা হয়ে বসতে অক্ষম হওয়ার কারণে খোলাখুলিভাবে খেতে পারে না। অতএব সম্ভবতঃ তারা কম আহার করবে এবং আমরা বেশী খেয়ে ফেলব। এতে তাদের হক নষ্ট হবে। যৌথ খাদ্যদ্রব্যে সবার অংশ সমান হওয়া উচিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এ ধরনের সূক্ষ্মদর্শিতা ও লৌকিকতা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সবাই একত্রে আহার কর। মামুলী কম-বেশী হওয়ার চিন্তা করো না।

(৩) সায়ীদ ইবনে-মুসাইয়্যেব বলেন ঃ মুসলমানগণ জেহাদে যাওয়ার সময় নিজ নিজ গৃহের চাবি বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে যেত এবং বলে যেত যে, গৃহে যা কিছু আছে, তা তোমরা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা সাবধানতাবশতঃ তাদের গৃহ থেকে কিছুই খেত না। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। মুসনাদে বাযযারে হযরত আয়েশা থেকেও বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন যুদ্ধে গমন করলে সাধারণ সাহাবিগণও তাঁর সাথে জেহাদে যোগদান করতে আকাঙ্ক্ষী হতেন। তাঁরা তাদের গৃহের চাবি দরিদ্র বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে অনুমতি দিতেন যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমরা আমাদের গৃহে যা আছে, তা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা চরম আল্লাহ্ ভীতিবশতঃ আপন মনের ধারণায় 'অনুমতি হয়নি' আশঙ্কা করে পানাহার থেকে বিরত থাকত। বগভী হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের أَوْ صَدِيقِكُمْ (অর্থাৎ, বন্ধুর গৃহে পানাহার করায় দোষ নেই) শব্দটি হারেস-ইবনে আমরের ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কোন এক জেহাদে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে চলে যান এবং বন্ধু মালেক ইবনে যায়েদের হাতে গৃহ ও গৃহবাসীদের দেখাশোনার ভার সোপর্দ করেন। হারেস ফিরে এসে দেখলেন যে, মালেক ইবনে যায়েদ দুর্বল ও শুষ্ক হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসার পর তিনি বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার গৃহে খাওয়া-দাওয়া আমি পছন্দ করিনি।—(মাযহারী) বলাবাহুল্য, এ ধরনের সব ঘটনাই আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ হয়েছে।

মাসআলা ঃ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যেসব গৃহে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত পানাহার করার অনুমতি এই আয়াতে দেয়া হয়েছে, তার ভিত্তি এই যে, আরবের সাধারণ লোকাচার অনুযায়ী এসব নিকট আত্মীয়দের মধ্যে লৌকিকতার বালাই ছিল না।

দ্বিতীয় কাজ গৃহে প্রবেশের আদব-কায়দা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশ কর, তখন সেখানে যত মুসলমান আছে, তাদেরকে সালাম বল। আয়াতে وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ বলে তাই বোঝানো হয়েছে। কেননা, মুসলমান সকলেই এক অভিন্ন দল। অনেক সহীহ্ হাদীসে মুসলমানদের পরস্পরে একে অন্যকে সালাম করার উপর খুব জোর দেয়া হয়েছে এবং এর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا
مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ
الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ
فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ
الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ
يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ
يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَسِتُّ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ○

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن
لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

(৬২) মুমিন তো তারাই; যারা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রসূলের সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চলে যায় না। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোন কাজের জন্যে অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (৬৩) রসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহবানের মত গণ্য করো না। আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। (৬৪) মনে রেখো, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তা আল্লাহ্রই। তোমরা যে অবস্থায় আছ তা তিনি জানেন। যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি বলে দেবেন তারা যা করেছে। আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ই জানেন।

সূরা আল-ফুরকান

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৭৭

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

(১) পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হয়, (২) তিনি হলেন যাঁর রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে দু' টি আদেশ বর্ণিত হয়েছে। এক—যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলমানদেরকে কোন ধর্মীয় জেহাদ ইত্যাদির জন্যে একত্রিত করবেন, তখন ঈমানের দাবী হল সমবেত হওয়া এবং তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে সমাবেশ ত্যাগ না করা। কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁর কাছ থেকে যথারীতি অনুমতি গ্রহণ করা। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বিশেষ অসুবিধা ও প্রয়োজন না থাকলে অনুমতি প্রদান করুন। এই প্রসঙ্গে মুনাফিকদেরও নিন্দা করা হয়েছে, যারা ঈমানের দাবীর বিরুদ্ধে দুর্ণামের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থ মজলিসে উপস্থিত হয়, কিন্তু এরপর কারও আড়ালে চুপিসারে সরে পড়ে।

আহযাব যুদ্ধের সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন আরবের মুশরিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের যুক্তফ্রন্ট সম্মিলিতভাবে মদীনা আক্রমণ করে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে পরিখা খনন করেন। এ কারণেই একে 'গযওয়ায়ে খন্দক' তথা পরিখার যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়।—(কুরতুবী)

বায়হাকী ও ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং এবং সকল সাহাবী পরিখা খননে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মুনাফিকরা প্রথমতঃ আসতেই চাইত না। এসেও লোক দেখানোর জন্যে সামান্য কাজ করে চুপিসারে সরে পড়ত। এর বিপরীতে মুসলমানগণ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কাজ করে যেত এবং প্রয়োজন দেখা দিলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(মাযহারী)

এই আদেশ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মজলিসের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, না ব্যাপক? ফেকাহ্‌বিদগণ সবাই একমত যে, এই আদেশ একটি ধর্মীয় ও ইসলামী প্রয়োজনের খাতিরে জারি করা হয়েছে, এরূপ প্রয়োজন প্রতি যুগেই হতে পারে, তাই এটা বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মজলিসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং মুসলমানদের প্রত্যেক ইমাম ও আমীর তথা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার ও তার মজলিসেরও এই বিধান। তিনি সবাইকে একত্রিত হওয়ার আদেশ দিলে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিনানুমতিতে ফিরে যাওয়া নাজায়েয।—(কুরতুবী, মাযহারী, বয়ানুল-কোরআন) বলাবাহুল্য, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মজলিসের জন্যে এই আদেশ অধিক জোরদার এবং এর বিরোধিতা প্রকাশ্য দুর্ভাগ্য; যেমন মুনাফিকরা তা করেছে। ইসলামী সামাজিকতার রীতিনীতির দিক দিয়ে এই আদেশ পারস্পরিক সমাবেশ ও সাধারণ সভা-সমিতির জন্যেও কমপক্ষে মোস্তাহাব ও উত্তম। মুসলমানগণ যখন কোন মজলিসে কোন সমষ্টিগত ব্যাপার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা অথবা কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্যে একত্রিত হয়, তখন চলে যেতে হলে সভাপতির অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত।

দ্বিতীয় আদেশ সর্বশেষ আয়াতে এই দেয়া হয়েছে যে, لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ এর অর্থ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর তরফ থেকে মুসলমানদেরকে ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা اضافة الى الفاعل) আয়াতের অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন ডাকেন, তখন একে সাধারণ মানুষের ডাকার মত মনে করো না যে, সাড়া দেয়া,না দেয়া

ইচ্ছাধীন; বরং তখন সাড়া দেয়া ফরয হয়ে যায় এবং অনুমতি ছাড়া চলে যাওয়া হারাম হয়ে যায়। আয়াতের বর্ণনাধারার সাথে এই তফসীর অধিক খাপ খায়। তাই মাযহারী ও বয়ানুল–কোরআনে এই তফসীর গ্রহণ করা হয়েছে। এর অপর একটি তফসীর হযরত ইবনে–আব্বাস থেকে ইবনে–কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, دُعَاءَ الرَّسُوْلِ এর অর্থ মানুষের তরফ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে কোন কাজের জন্যে ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা اضافة الى المفعول)

এই তফসীরের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ এই যে, যখন তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে কোন প্রয়োজনে আহবান কর অথবা সম্বোধান কর, তখন সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁর নাম নিয়ে 'ইয়া মুহাম্মদ' (সাঃ) বলবে না— এটা বেআদবী; বরং সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা 'ইয়া রসূলাল্লাহ্' অথবা 'ইয়া নবীআল্লাহ্' বলবে। এর সারমর্ম এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করা মুসলমানদের জন্যে ওয়াজিব এবং যা আদবের পরিপন্থী কিংবা যদ্দ্বারা তিনি ব্যথিত হন, তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। এই আদেশের অনুরূপ সূরা হুজুরাতে আরও কতিপয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উদাহরণতঃ وَلَاتَجْهَرُوْالَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ অর্থাৎ, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সাথে কথা বল, তখন আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখ। প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না; যেমন লোকেরা পরস্পর বলে। আরও একটি উদাহরণ, اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاۗءِ الْحُجُرٰتِ অর্থাৎ, তিনি যখন গৃহে অবস্থান করেন, তখন বাইরে থেকে আওয়াজ দিয়ে ডেকো না; বরং বের হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাক।

হুশিয়ারী ঃ এই দ্বিতীয় তফসীরে বুযুর্গ এবং বড়দেরও একটি আদব জানা গেল। তা এই যে, মুরুব্বী ও বড়দেরকে নাম নিয়ে ডাকা বেআদবী। সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা আহবান করা উচিত।

সূরা আল-ফুরকান

সূরার বৈশিষ্ট্য ঃ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে সমগ্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ্ তিনটি আয়াতকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ এবং কিছু আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ।—(কুরতুবী) এ সূরার সারমর্ম কোরআনের মাহাত্ম্য এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর নবুওয়ত ও রিসালতের সত্যতা বর্ণনা করা এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জওয়াব প্রদান করা।

تَبٰرَكَ **শব্দটি** برکت থেকে উদ্ভূত। বরকতের অর্থ প্রভূত কল্যাণ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে। فرقان কোরআন পাকের উপাধি। এর আভিধানিক অর্থ, পার্থক্য করা। কোরআন সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বর্ণনা করে এবং মু'জেযার মাধ্যমে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের প্রভেদ ফুটিয়ে তোলে। তাই একে ফোরকান বলা হয়।

لِلْعٰلَمِيْنَ এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর রেসালত ও নবুওয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্যে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ এরূপ নন। তাঁদের নবুওয়ত ও রেসালত বিশেষ দল ও বিশেষ স্থানের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের যে ছয়টি বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে একটি এই যে, তাঁর নবুওয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য ব্যাপক।

فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا – تخليق এর পর تقدير উল্লেখ করা হয়েছে। تخليق এর অর্থ কোনরূপ নমুনা ব্যতিরেকেই কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা। তা যেমনই হোক।

প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুর বিশেষ বিশেষ রহস্য ঃ تقدير এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যে বস্তুই সৃষ্টি করেছেন, তার গঠন–প্রকৃতি, আকার–আকৃতি, ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সে কাজের উপযোগী করেছেন, যে কাজের জন্যে বস্তুটি সৃজিত হয়েছে। আকাশের গঠন–প্রকৃতি ও আকার–আকৃতি সে কাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল, যার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা আকাশ সৃষ্টি করেছেন। গ্রহ ও নক্ষত্র সৃজনে এমনসব উপাদান রাখা হয়েছে, যেগুলো তার উদ্দেশের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। ভূপৃষ্ঠে ও তার গর্ভে সৃজিত প্রত্যেকটি বস্তুর গঠন–প্রকৃতি, আকার–আকৃতি, কোমলতা ও কঠোরতা সে কাজের উপযোগী যার জন্যে এগুলো সৃজিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠকে পানির ন্যায় তরল করা হয়নি যে, তার উপরে কিছু রাখলে ডুবে যায় এবং পাথর বা লোহার ন্যায় শক্তও করা হয়নি যে, খনন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা, ভূপৃষ্ঠকে খনন করার প্রয়োজনও আছে, যাতে ভূগর্ভ থেকে পানি বের করা যায় এবং এতে ভিত্তি খনন করে সুউচ্চ দালান–কোঠা নির্মাণ করা যায়। পানিকে তরল করার মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত আছে। বাতাসও তরল,কিন্তু পানি থেকে ভিন্নরূপ। পানি সর্বত্র আপনা–আপনি পৌঁছে না। এতে মানুষকে কিছু পরিশ্রম করতে হয়। বাতাসকে আল্লাহ্ তাআলা বাধ্যতামূলক নেয়ামত করেছেন; কোনরূপ আয়াস ছাড়াই তা সর্বত্র পৌঁছে যায়; বরং কেউ বাতাস থেকে বেঁচে থাকতে চাইলে তার জন্যে তাকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। সৃষ্ট বস্তুসমূহের রহস্য বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান এটা নয়। প্রত্যেকটি সৃষ্টবস্তুই কুদরত ও রহস্যের এক অপূর্ব নমুনা। ইমাম গাযযালী (রহঃ) এ বিষয়ে الحكمة فى مخلوقات الله تعالى নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে শুরু থেকেই কোরআনের মাহাত্ম্য এবং যাঁর প্রতি তা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে عبده খেতাব দিয়ে তাঁর সম্মান ও গৌরবের বিস্ময়কর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কেননা, কোন সৃষ্ট মানবের জন্যে এর চাইতে বড় সম্মান কল্পনা করা যায় না যে, স্রষ্টা তাকে 'আমার' বলে পরিচয় দেন।

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا
وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ۝٣ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا
إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَاءُو
ظُلْمًا وَزُورًا ۝٤ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ
تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٥ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٦ وَقَالُوا
مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ
لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ۝٧ أَوْ يُلْقَىٰ
إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ
إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝٨ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ
الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝٩ تَبَارَكَ الَّذِي
إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ۝١٠ بَلْ كَذَّبُوا
بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝١١

(৩) তারা তাঁর পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়। (৪) কাফেররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ নয়, যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকেরা তাঁকে সাহায্য করেছে। অবশ্যই তারা অবিচার ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। (৫) তারা বলে, এগুলো তো পুরাকালের রূপকথা, যা তিনি লিখে রেখেছেন। এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর কাছে শেখানো হয়। (৬) বলুন, একে তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য অবগত আছেন। তিনি ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (৭) তারা বলে, এ কেমন রসূল যে, খাদ্য আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে? তাঁর কাছে কেন কোন ফেরেশতা নাযিল করা হল না যে, তাঁর সাথে সতর্ককারী হয়ে থাকত? (৮) অথবা তিনি ধন-ভাণ্ডার প্রাপ্ত হলেন না কেন, অথবা তাঁর একটি বাগান হল না কেন, যা থেকে তিনি আহার করতেন? জালেমরা বলে, তোমরা তো একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। (৯) দেখুন, তারা আপনার কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে! অতএব তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, এখন তারা পথ পেতে পারে না। (১০) কল্যাণময় তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দিতে পারেন—বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ। (১১) বরং তারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যে কেয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করেছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখান থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তি ও তার জওয়াবের বর্ণনা শুরু হয়ে কিছুদূর পর্যন্ত চলেছে।

তাদের প্রথম আপত্তি ছিল এই যে, কোরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কালাম নয়; বরং মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেই তা মিছামিছি উদ্ভাবন করেছেন অথবা পুরাকালের উপকথা ইহুদী, খ্রীষ্টানদের কাছে শুনে নিজের সঙ্গীদের দ্বারা লিখিয়ে নেন। যেহেতু তিনি নিজে নিরক্ষর—লেখাও জানেন না, পড়াও জানেন না, তাই লিখিত উপকথাগুলো সকাল-সন্ধ্যায় শ্রবণ করেন, যাতে মুখস্থ হয়ে যায়, এরপর মানুষের কাছে গিয়ে বলেন যে, এটা আল্লাহ্র কালাম।

কোরআন এই আপত্তির জবাবে বলেছে, أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ এর সারমর্ম এ যে, এই কালাম স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় যে, এর নাযিলকারী আল্লাহ্ তাআলা সেই পবিত্র সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোপন রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এ কারণেই তিনি কোরআনকে এক অলৌকিক কালাম করেছেন এবং বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা একে আল্লাহ্র কালাম বলে স্বীকার না কর, কোন মানুষের কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানুষ; এর অনুরূপ কালাম বেশী না হলেও একটি সূরা বরং একটি আয়াতই রচনা করে দেখাও। আরবের বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী লোকদের জন্যে এই চ্যালেঞ্জের জওয়াব দেয়া মোটেই কঠিন ছিল না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা পলায়নের পথ বেছে নিয়েছে এবং কোরআনের এক আয়াতের মোকাবেলায় অনুরূপ অন্য আয়াত রচনা করে আনার দুঃসাহস কারও হয়নি। অথচ তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরোধিতায় নিজেদের ধন-সম্পত্তি বরং সন্তান-সন্ততি ও প্রাণ পর্যন্ত ব্যয় করে দিতে কুণ্ঠিত ছিল না। কিন্তু কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা লিখে আনার মত ছোট্ট কাজটি করতে তারা সক্ষম হল না। এটা এ বিষয়ের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ যে, কোরআন কোন মানবরচিত কালাম নয়। নতুবা অন্য মানুষও এরূপ কালাম রচনা করতে পারত। এটা সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তাআলারই কালাম। অলঙ্কারগুণ ছাড়া এর অর্থ-সম্ভার ও বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে, যা একমাত্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাতসত্তার পক্ষ থেকেই সম্ভবপর হতে পারে। এই বিষয়বস্তুর পূর্ণ বিবরণ সূরা বাক্বারায় বিশদ আলোচনার আকারে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় আপত্তি ছিল এই যে, যদি তিনি রসূল হতেন, তবে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না, বরং ফেরেশতাদের মত পানাহারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন। এটাও না হলে কমপক্ষে তাঁর কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এত ধন-ভাণ্ডার অথবা বাগ-বাগিচা থাকত যে, তাঁকে জীবিকার কোন চিন্তা করতে হত না, হাটে-বাজারে চলাফেরা করতে হত না। এছাড়া তিনি যে আল্লাহ্র রসূল একথা আমরা কিরূপে মানতে পারি? প্রথমতঃ তিনি ফেরেশতা নন, দ্বিতীয়তঃ কোন ফেরেশতা তাঁর সাথে থাকেও না যে, তাঁর সাথে তাঁর কালামের সত্যায়ন করত। তাই মনে হয়, তিনি যাদুগ্রস্থ। ফলে তাঁর মস্তিষ্ক বিকল হয়ে গেছে এবং আগাগোড়াই বল্গাহীন কথাবার্তা বলেন। আলোচ্য আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾
وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ
ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَّا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا
كَثِيرًا ﴿١٤﴾ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ
الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ
خَالِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ﴿١٦﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ
عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ
مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَ
لَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا
بُورًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا
وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ
الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ
لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

(১২) অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। (১৩) যখন এক শিকলে কয়েকজন বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। (১৪) বলা হবে, আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না– অনেক মৃত্যুকে ডাক। (১৫) বলুন এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে? সেটা হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান (১৬) তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় সেখানে যা চাইবে, তাই পাবে। এই প্রার্থিত ওয়াদা পূরণ আপনার পালনকর্তার দায়িত্ব। (১৭) সেদিন আল্লাহ্ একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের এবাদত করত তাদেরকে, সেদিন তিনি উপাস্যদেরকে বলবেন, তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে পথভ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রান্ত হয়েছিলে? (১৮) তারা বলবে— আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করতে পারতাম না; কিন্তু আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন,ফলে তারা আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। (১৯) (আল্লাহ্ মুশরিকদেরকে বলবেন,) তোমাদের কথা তো তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করল, এখন তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং সাহায্যও করতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে গোনাহ্‌গার আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাব। (২০) আপনার পূর্বে যত রসূল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্য গ্রহণ করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের একের অপরের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। দেখি, তোমরা সবর কর কিনা। আপনার পালনকর্তা সব কিছু দেখেন।

سَبِيلًا অর্থাৎ, দেখুন, এরা আপনার সম্পর্কে কেমন অদ্ভুত কথাবার্তা বলে। এর অর্থ এই যে, এরা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এখন তাদের পথ পাওয়ার কোন উপায় নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়তের বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর কিছু বিশদ বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমরা মূর্খতা ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে একথা বলছ যে, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল হলে তাঁর কাছে অগাধ ধন-ভাণ্ডার থাকত,বিপুল সম্পত্তি ও বাগ-বাগিচা থাকত, যাতে তিনি জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকেন। এর উত্তর এই যে, এরূপ করা আমার জন্যে মোটেই কঠিন নয় যে, আমি আমার রসূলকে বিরাট ধনভাণ্ডার দান করি এবং বৃহত্তম রাষ্ট্রের অধিপতি করি; যেমন ইতিপূর্বে আমি হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)-কে অগাধ ধন-দৌলত ও বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন রাজত্ব দান করে এই শক্তিসামর্থ্য প্রকাশও করেছি। কিন্তু সর্বসাধারণের উপযোগিতা ও অনেক রহস্যের ভিত্তিতে পয়গম্বর সম্প্রদায়কে বস্তুনিষ্ঠ ও পার্থিব ধন-দৌলত থেকে পৃথকই রাখা হয়েছে। বিশেষ করে নবীকুল-শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা সাধারণ দরিদ্র মুসলমানগণের কাতারে এবং তাদের অনুরূপ অবস্থার মধ্যে রাখাই পছন্দ করেছেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও নিজের জন্যে এই অবস্থাই পছন্দ করেছেন। মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযীতে হযরত আবু উমামার জবানী রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আমার পালনকর্তা আমাকে বলেছেন, আমি আপনার জন্যে সমগ্র মক্কাভূমি ও তার পর্বতসমূহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেই। আমি আরয করলাম ঃ না, হে আমার পালনকর্তা, আমি একদিন পেট ভরে খেয়ে আপনার শোকর আদায় করব ও একদিন উপবাস করে সবর করব— এ অবস্থাই আমি পছন্দ করি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, আমি ইচ্ছা প্রকাশ করলে স্বর্ণের পাহাড় আমার সাথে ঘোরাফেরা করত।—(মাযহারী)

সারকথা এই যে, আল্লাহ্ তাআলার হাজারো রহস্য এবং সাধারণ মানুষের উপযোগিতার ভিত্তিতেই পয়গম্বরগণ সাধারণতঃ দরিদ্র ও উপবাসক্লিষ্ট থাকতেন। এটাও তাঁদের বাধ্যতামূলক অবস্থা নয়; বরং তাঁরা চাইলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে বিত্তশালী ও ঐশ্বর্যশালী করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদেরকে আল্লাহ্ তাআলা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, ধন-দৌলতের প্রতি তাঁদের কোন ঔৎসুক্যই হয় নাই। তাঁরা দারিদ্র্য ও উপবাসকেই পছন্দ করতেন।

কাফেরদের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, তিনি পয়গম্বর হলে সাধারণ মানুষের মতই পানাহার করতেন না এবং জীবিকা উপার্জনের জন্যে হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন না। এই আপত্তির ভিত্তি, অনেক কাফেরের এই ধারণা যে, আল্লাহ্‌র রসূল মানব হতে পারে না— ফেরেশতাই রসূল হওয়ার যোগ্য। কোরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে এর উত্তর দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, যেসব পয়গম্বরকে তোমার ও নবী ও রসূল বলে স্বীকার কর, তাঁরাও তো মানুষই ছিলেন; তাঁরা মানুষের মত পানাহার করতেন এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন। এ থেকে তোমাদের বুঝে নেয়া উচিত ছিল যে, পানাহার করা ও

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا
الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا
كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ
يَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا
وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ
تَنْزِيلًا ﴿٢٥﴾ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى
الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ
يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ
أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ
إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ
نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً
وَاحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾

(২১) যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না, তারা বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হল না কেন? অথবা আমরা আমাদের পালনকর্তাকে দেখি না কেন? তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে। (২২) যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্যে কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, কোন বাধা যদি তা আটকে রাখত। (২৩) আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপ করে দেব। (২৪) সেদিন জান্নাতীদের বাসস্থান হবে উত্তম এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। (২৫) সেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং সেদিন ফেরেশতাদের নামিয়ে দেয়া হবে, (২৬) সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহ্‌র এবং কাফেরদের পক্ষে দিনটি হবে কঠিন। (২৭) জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম! (২৮) হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! (২৯) আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়। (৩০) রসূল বললেন: হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে প্রলাপ সাব্যস্ত করেছে। (৩১) এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্যে আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। আপনার জন্যে আপনার পালনকর্তা পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট। (৩২) সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, তাঁর প্রতি সমগ্র কোরআন একদফায় অবতীর্ণ হল না কেন? আমি এমনিভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি আপনার অন্তকরণকে মজবুত করার জন্যে।

হাট-বাজারে চলাফেরা করা নবুওয়ত ও রেসালতের পরিপন্থী নয় وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ আয়াতে এই বিষয়টি বর্ণিত আছে।

মানব সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের অনুপস্থিতি বিরাট রহস্যের উপর ভিত্তিশীল ঃ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলার সবকিছু করার শক্তি ছিল। তিনি সকল মানবকে সমান বিত্তশালী করতে, সবাইকে সুস্থ সবল রাখতে এবং সবাইকে সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করতে পারতেন; কেউ হীনমন্য ও নীচ থাকতে পারত না; কিন্তু এর কারণে বিশ্বব্যবস্থায় ফাটল দেখা দেয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই আল্লাহ্ তাআলা কাউকে ধনী ও কাউকে নির্ধন করেছেন, কাউকে সবল ও কাউকে দুর্বল করেছেন, কাউকে সুস্থ ও কাউকে অসুস্থ করেছেন এবং কাউকে সম্মানী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও কাউকে অখ্যাত করেছেন। শ্রেণী, জাতি ও অবস্থার এই বিভেদের মধ্যে প্রতি স্তরের লোকদের পরীক্ষা নিহিত আছে। ধনীর কৃতজ্ঞতার এবং দরিদ্রের সবরের পরীক্ষা আছে। রুগ্ন ও সুস্থের অবস্থাও তদ্রূপ। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষা এই যে, যখন তোমার দৃষ্টি এমন ব্যক্তির উপর পতিত হয়, যে টাকা পয়সা ও ধন-দৌলতে তোমা অপেক্ষা বেশী, কিংবা স্বাস্থ্য, শক্তি, সম্মান ও প্রতিপত্তিতে তোমার চাইতে বড়, তখন তুমি কালবিলম্ব না করে এমন লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যারা এসব বিষয়ে তোমার চাইতে নিম্নস্তরের— যাতে তুমি হিংসার গোনাহ্ থেকে বেঁচে যাও এবং নিজের বর্তমান অবস্থার জন্যে আল্লাহ্ তাআলার শোকর করতে পার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا – رجا শব্দের সাধারণ অর্থ কোন প্রিয় ও কাম্য বস্তুর আশা করা এবং কোন সময় আশংকা করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (কিতাবুল-আযদাদ—ইবনুল-আম্বারী) এখানে এ অর্থই অধিক স্পষ্ট। অর্থাৎ, যারা আমার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অনর্থক মূর্খতাসুলভ প্রশ্ন ও ফরমায়েশ করার দুঃসাহস সেই করতে পারে, যে পরকালে মোটেই বিশ্বাসী নয়। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির উপর পরকালের ভয় এত প্রবল থাকে যে, এ ধরনের প্রশ্ন করার ফুরসতই তারা পায় না। নব্যশিক্ষার প্রভাবে অনেক লোক ইসলাম ও তার বিধানাবলী সম্পর্কে আপত্তি ও তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়। এটাও অন্তরে পরকালের সত্যিকার বিশ্বাস না থাকার আলামত। সত্যিকার বিশ্বাস থাকলে এ ধরনের অনর্থক প্রশ্ন অন্তরে দেখাই দিত না।

حِجْرًا مَّحْجُورًا – حجر এর শাব্দিক অর্থ সুরক্ষিত স্থান। محجور এর তাকীদ। আরবী বাচনভঙ্গিতে শব্দটি তখন বলা হয়, যখন সামনে বিপদ থাকে এবং তা থেকে বাঁচার জন্যে মানুষকে বলা হয় ঃ আশ্রয় চাই, আশ্রয় চাই। অর্থাৎ, আমাকে এই বিপদ থেকে আশ্রয় দাও। কেয়ামতের দিনেও যখন কাফেররা ফেরেশতাদেরকে আযাবের সাজ-সরঞ্জাম আনতে দেখবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী একথা বলবে। হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে এর অর্থ حراما محرما বর্ণিত আছে। অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন যখন তারা ফেরেশতাদেরকে আযাবসহ দেখবে এবং তাদের কাছে ক্ষমা করার ও জান্নাতে যাওয়ার আবেদন করবে কিংবা অভিপ্রায় প্রকাশ করবে, তখন ফেরেশতারা জওয়াবে حِجْرًا مَّحْجُورًا বলবে। অর্থাৎ, কাফেরদের জন্যে

জান্নাত হারাম ও নিষিদ্ধ।—(মাযহারী)

خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا - مستقر শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র আবাসস্থল। مقيل শব্দটি قيلولة থেকে উদ্ভূত—এর অর্থ দুপুরে বিশ্রাম করার স্থান। এখানে مقيل এর উল্লেখ সম্ভবতঃ এ কারণেও বিশেষভাবে করা হয়েছে যে, এক হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা দুপুরের সময় সৃষ্টজীবের হিসাবনিকাশ সমাপ্ত করবেন এবং দুপুরে নিদ্রার সময় জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে পৌঁছে যাবে।— (কুরতুবী)

تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ এখানে بِالْغَمَامِ এর অর্থ عن الغمام অর্থাৎ, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তা থেকে একটি হালকা মেঘমালা নীচে নামবে, যাতে ফেরেশতারা থাকবে। এই মেঘমালা চাঁদোয়ার আকারে আকাশ থেকে আসবে এবং এতে আল্লাহ্ তাআলার দ্যুতি থাকবে, আশেপাশে থাকবে ফেরেশতাদের দল। এটা হবে হিসাব-নিকাশ শুরু হওয়ার সময়। তখন কেবল খোলার নিমিত্তই আকাশ বিদীর্ণ হবে। এটা সেই বিদারণ নয়, যা শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার সময় আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্যে হবে। কেননা, আয়াতে যে মেঘমালা অবতরণের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার দেবার পর হবে। তখন আকাশ ও পৃথিবী পুনরায় বহাল হয়ে যাবে।—(বয়ানুল-কোরআন)

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا এই আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার ফলে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এর বিধান ব্যাপক। ঘটনাটি এই ঃ ওকবা ইবনে আবী মুয়ীত মক্কার অন্যতম মুশরেক সর্দার ছিল। সে কোন সফর থেকে ফিরে আসলে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করত এবং প্রায়ই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথেও সাক্ষাত করত। একবার নিয়ম অনুযায়ী সে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কেও আমন্ত্রণ জানাল। সে তাঁর সামনে খানা উপস্থিত করলে তিনি বললেন, আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করতে পারি না, যে পর্যন্ত তুমি সাক্ষ্য না দাও যে, আল্লাহ্ এক, এবাদতে তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি তাঁর রসূল। ওকবা এই কলেমা উচ্চারণ করল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শর্ত অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করলেন।

উবাই ইবনে-খাল্ফ ছিল ওকবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে যখন ওকবার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারল, তখন খুবই রাগান্বিত হল। ওকবা ওযর পেশ করল যে, কোরাইশ বংশের সম্মানিত অতিথি মুহাম্মদ (সাঃ) আমার গৃহে আগমন করেছিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে ফিরে গেলে তা আমার জন্য অবমাননাকর ব্যাপার হত। তাই আমি তাঁর মনোরঞ্জনের জন্যে এই কলেমা উচ্চারণ করেছি। উবাই বলল ঃ আমি তোমার এই ওযর কবুল করব না, যে পর্যন্ত তুমি গিয়ে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ না করবে। হতভাগ্য ওকবা বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সম্মত হল এবং তদ্রূপ করেও ফেলল। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াতেও উভয়কে লাঞ্ছিত করেছেন। তারা উভয়ে বদর যুদ্ধে নিহত হয়।—(বগভী) আয়াতে তাদের পরকালীন শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তি সামনে দেখে তারা পরিতাপ সহকারে হস্তদ্বয় দংশন করবে এবং বলবে ঃ হায় আমি যদি অমুককে অর্থাৎ, উবাই ইবনে খাল্ফকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!—(মাযহারী, কুরতুবী)

দুষ্কর্মপরায়ণ ও ধর্মদ্রোহী বন্ধুর বন্ধুত্ব কেয়ামতের দিন অনুতাপ ও দুঃখের কারণ হবে ঃ তফসীরে-মাযহারীতে আছে, আয়াতটি যদিও বিশেষভাবে ওকবার ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু এর ভাষা যেমন ব্যাপক, তার বিধানও তেমনি ব্যাপক। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে সম্ভবতঃ আয়াতে বন্ধুর নামের পরিবর্তে فلانا (অমুক) শব্দ অবলম্বন করা হয়েছে। আয়াতে বিধৃত হয়েছে যে, যে দুই বন্ধু পাপ কাজে সম্মিলিত হয় এবং শরীয়তবিরোধী কার্যাবলীতে একে অপরের সাহায্য করে, তাদের সবারই বিধান এই যে, কেয়ামতের দিন তারা এই বন্ধুত্বের কারণে কান্নাকাটি করবে। মুসনাদে-আহ্মদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর জবানী রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ لاتصاحب الامؤمنا ولاياكل مالك الاتقى কোন অমুসলিমকে সঙ্গী করো না এবং তোমার ধন-সম্পদ (বন্ধুত্বের দিক দিয়ে) যেন পরহেযগার ব্যক্তিই খায়। অর্থাৎ, পরহেযগার নয়, এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো না। হযরত আবু হুরায়রার জবানী রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل প্রত্যেক মানুষ (অভ্যাসগতভাবে) বন্ধুর ধর্ম ও চালচলন অবলম্বন করে। তাই কিরূপ লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত।—(বোখারী)

হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, আমাদের মজলিসী বন্ধুদের মধ্যে কারা উত্তম? তিনি বললেন, من ذكركم بالله رؤيته وزاد فى علمكم منطقه وذكركم بالاخرة عمله অর্থাৎ, যাকে দেখে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়, যার কথাবার্তায় তোমার জ্ঞান বাড়ে এবং যার কাজ দেখে পরকালের স্মৃতি তাজা হয়।—(কুরতুবী)

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا

অর্থাৎ, রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে পরিত্যাগ করেছে। আল্লাহ্র দরবারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই অভিযোগ কেয়ামতের দিন হবে, না এই দুনিয়াতেই এই অভিযোগ করেছেন, এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত আছে যে, তিনি দুনিয়াতেই এই অভিযোগ পেশ করেছেন এবং জওয়াবে তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ অর্থাৎ, আপনার শত্রুরা কোরআন অমান্য করলে তজ্জন্য আপনার সবর করা উচিত। কেননা, এটাই আল্লাহ্র চিরন্তন রীতি যে, প্রত্যেক নবীর কিছুসংখ্যক অপরাধী শত্রু থাকে এবং পয়গম্বরগণ তজ্জন্য সবর করেছেন।

কোরআনকে কার্যতঃ পরিত্যক্ত করাও মহাপাপ ঃ কোরআনকে পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য করার বাহ্যিক অর্থ কোরআনকে অস্বীকার করা, যা কাফেরদেরই কাজ। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, যে মুসলমান কোরআনে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু রীতিমত তেলাওয়াত করে না এবং আমলও করে না, সে-ও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به يقول يارب العالمين ان عبدك هذا اتخذنى مهجورا فاقض بينى وبينه ـ

যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করে, কিন্তু এরপর তাকে বেঁধে গৃহে ঝুলিয়ে

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ
يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ
سَبِيلًا ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ
وَزِيرًا ﴿٣٥﴾ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ
تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ
آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودَ وَ
أَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ
الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي
أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا
يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا
الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْ
لَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ
مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ
أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

(৩৩) তারা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থাপিত করলেই আমি আপনাকে তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি। (৩৪) যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে, তাদেরই স্থান হবে নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট। (৩৫) আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তাঁর সাথে তাঁর ভ্রাতা হারুনকে সাহায্যকারী করেছি। (৩৬) অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে যাও, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি। (৩৭) নূহের সম্প্রদায় যখন রসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল, তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানবমণ্ডলীর জন্য নিদর্শন করে দিলাম। জালেমদের জন্যে আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৩৮) আমি ধ্বংস করেছি আদ, সামূদ, কূপবাসী এবং তাদের মধ্যবর্তী অনেক সম্প্রদায়কে। (৩৯) আমি প্রত্যেকের জন্যেই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি এবং প্রত্যেককেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছি। (৪০) তারা তো সেই জনপদের উপর দিয়েই যাতায়াত করে, যার ওপর বর্ষিত হয়েছে মন্দ বৃষ্টি। তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না? বরং তারা পুনরুজ্জীবনের আশঙ্কা করে না। (৪১) তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন আপনাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে, বলে, 'এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ্ 'রসূল' করে প্রেরণ করেছেন? (৪২) সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়েই দিত, যদি আমরা তাদেরকে আঁকড়ে ধরে না থাকতাম। তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে অধিক পথভ্রষ্ট। (৪৩) আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? (৪৪) আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং আরও পথভ্রান্ত।

রাখে; রীতিমত তেলাওয়াত করে না এবং তার বিধানাবলীও পালন করে না, কেয়ামতের দিন সে গলায় কোরআন ঝুলন্ত অবস্থায় উত্থিত হবে। কোরআন আল্লাহ্র দরবারে অভিযোগ করে বলবে, আপনার এই বন্দা আমাকে ত্যাগ করেছিল। এখন আপনি আমার ও তার ব্যাপারে ফয়সালা দিন।—(কুরতুবী)

সূরার শুরু থেকে কাফের ও মুশরিকদের আপত্তিসমূহের জওয়াব দেয়া হচ্ছিল। ৩২ তম আয়াতে সেই পরম্পরারই অংশ। আপত্তির জওয়াবে কোরআনকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার এক তাৎপর্য এই বর্ণিত হয়েছে যে, এর মাধ্যমে আপনার অন্তরকে মজবুত রাখা উদ্দেশ্য। পর্যায়ক্রমে অবতারণের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অন্তর মজবুত হওয়ার বিবিধ কারণ আছে। প্রথমতঃ এর ফলে মুখস্থ রাখা সহজ হয়েছে। একটি বৃহদাকার গ্রন্থ এক দফায় নাযিল হয়ে গেলে এই সহজসাধ্যতা থাকত না। সহজে মুখস্থ হতে থাকার ফলে অন্তরে কোনরূপ পেরেশানী থাকে না। দ্বিতীয়তঃ কাফেররা যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি অথবা তাঁর সাথে কোন অশালীন ব্যবহার করত, তখনই তাঁর সান্ত্বনার জন্যে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যেত। সমগ্র কোরআন এক দফায় নাযিল হলে সেই বিশেষ ঘটনা সম্পর্কিত সান্ত্বনাবাণী কোরআন থেকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিত এবং মস্তিষ্ক সেদিকে ধাবিত হওয়াও স্বভাবতঃ জরুরী ছিল না। তৃতীয়তঃ আল্লাহ্ সঙ্গে আছেন, এই অনুভূতিই অন্তর মজবুত হওয়ার প্রধানতম কারণ। আল্লাহ্র পয়গাম আগমন সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ সঙ্গে আছেন। পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়ার রহস্য এই তিনের মধ্যেই সীমিত নয়, আরও অনেক রহস্য রয়েছে। তন্মধ্যে কতক সূরা বনী ইসরাঈলের وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ আয়াতে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।—(বয়ানুল-কোরআন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا এতে ফেরাউন সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অথচ তখন পর্যন্ত তওরাত মূসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়নি। কাজেই এখানে তওরাতের আয়াতে মিথ্যারোপ করার অর্থ হতে পারে না; বরং এ আয়াতের অর্থ হয় তওহীদের প্রমাণাদি, যা প্রত্যেক মানুষ নিজ বুদ্ধি-জ্ঞান দ্বারা বুঝতে পারে, এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করাকেই মিথ্যারোপ করা বলা হয়েছে, না হয় পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের ঐতিহ্য, যা কিছু না কিছু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে মিথ্যারোপ দ্বারা সেসব ঐতিহ্যের অস্বীকৃতি বোঝানো হয়েছে। যেমন কোরআন পাকের وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ আয়াতে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শিক্ষা তাদের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে।—(বয়ানুল-কোরআন)

নূহের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। অথচ তাদের যুগের পূর্বে কোন রসূল ছিলেন না এবং তারাও কোন রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করেনি। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। ধর্মের মূলনীতি সব পয়গম্বরেরই অভিন্ন, তাই একজনের প্রতি মিথ্যারোপ সবার প্রতি

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾

(৪৫) তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে বিলম্বিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। (৪৬) অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। (৪৭) তিনিই তো তোমাদের জন্যে রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন বাইরে গমনের জন্যে। (৪৮) তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্যে পানি বর্ষণ করি, (৪৯) তদ্দ্বারা মৃত ভূভাগকে সঞ্জীবিত করার জন্যে এবং আমার সৃষ্ট জীবজন্তু ও অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে। (৫০) এবং আমি তা তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণ করি, যাতে তারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না। (৫১) আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন ভয় প্রদর্শনকারী প্রেরণ করতে পারতাম। (৫২) অতএব আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন। (৫৩) তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, এটি মিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও এটি লোনা, বিস্বাদ; উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য আড়াল। (৫৪) তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম। (৫৫) তারা এবাদত করে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। কাফের তো তার পালনকর্তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। (৫৬) আমি আপনাকে সুসংবাদ ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। (৫৭) বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর কোন বিনিময় চাই না, কিন্তু যে ইচ্ছা করে, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক।

মিথ্যারোপ করার শামিল।

وَأَصْحٰبَ الرَّسِّ অভিধানে رس শব্দের অর্থ কাঁচা কূপ। কোরআন পাক ও কোন সহীহ্ হাদীসে তাদের বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখিত হয়নি। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিভিন্নরূপ। অধিক গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, তারা ছিল সামূদ গোত্রের অবশিষ্ট জনসমষ্টি এবং তারা কোন একটি কূপের ধারে বাস করত।—(কামূস, দুররে-মনসূর) তাদের শাস্তি কি ছিল, তাও কোরআনে ও কোন সহীহ্ হাদীসে বিবৃত হয়নি।—(বয়ানুল-কোরআন)

শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসরণ এক প্রকার মূর্তিপূজা : أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰىهُ এই আয়াতে ইসলাম ও শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসারীকে প্রবৃত্তির পূজারী বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তিও এক প্রকার মূর্তি যার পূজা করা হয়। তিনি এর প্রমাণ হিসেবে এই আয়াত তেলাওয়াত করেন।—(কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার সর্বময় ক্ষমতা এবং বন্দার প্রতি তাঁর নেয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে আল্লাহ্ তাআলার তওহীদও প্রমাণিত হয়।

أَلَمْ تَرَ إِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ রৌদ্র ও ছায়া দু'টি এমন নেয়ামত, যা ছাড়া মানুষের জীবন ও কাজ-কারবার চলতে পারে না। সর্বদা ও সর্বত্র রৌদ্রই রৌদ্র থাকলে মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্যে যে কি ভীষণ বিপদ হত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছায়ার অবস্থাও ভিন্নরূপ নয়। সর্বদা ও সর্বত্র কেবল ছায়া থাকলে; রোদ না আসলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে না এবং অন্যান্য হাজারো কাজ এতে বিঘ্নিত হবে। আল্লাহ্ তাআলা সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা এই নেয়ামত দুটি সৃষ্টি করে এগুলোকে মানুষের জন্যে আরাম ও শান্তির উপকরণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা দুনিয়ার সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিশেষ বিশেষ কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে যখন কারণগুলো অস্তিত্ব লাভ করে, তখন এই বস্তুসমূহও অস্তিত্ব লাভ করে এবং কারণের অনুপস্থিতিতে বস্তুও অনুপস্থিত থাকে। কারণ, শক্তিশালী কিংবা বেশী হলে ঘটনার অস্তিত্বও শক্তিশালী ও বেশী হয়ে যায়। কারণ দুর্বল কিংবা কম হলে ঘটনাও দুর্বল কিংবা কম হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা শস্য ও তৃণলতা উৎপন্ন করার কারণ মাটি, পানি ও বায়ুকে, আলোর কারণ চন্দ্র-সূর্যকে এবং বৃষ্টির কারণ মেঘমালা ও বায়ুকে করে রেখেছেন। তিনি এসব কারণ ও তাঁর প্রভাবাদির মধ্যে এমন অটুট ও শক্ত বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, হাজারো বছর ধরে তাতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা দেয়নি। সূর্য ও তার গতি এবং তা থেকে সৃষ্ট দিবারাত্রি ও রৌদ্র-ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এমন অটুট ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় যে, শত শত বরং হাজার হাজার বছরের মধ্যে তাতে এক মিনিট বরং এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয় না। চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির যন্ত্রপাতিতে কখনও দুর্বলতা আসে না এবং এগুলোর সংস্কার ও মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। যখন থেকে পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করেছে, তখন থেকে এক নিয়মে এবং একই গতিতে তা গতিশীল রয়েছে। অঙ্ক কষে হাজার বছর পরের ঘটনার সময় বলে দেয়া যায়।

কারণ ও ঘটনার এই অটুট ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ তাআলার সর্বময় ক্ষমতার অভাবনীয় দৃষ্টান্ত এবং তাঁর অপার রহস্যের অকাট্য প্রমাণ।

ব্যবস্থাপনার এই দক্ষতাই মানুষকে আল্লাহ্ সম্পর্কে উদাসীনতায় ফেলে দিয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে এখন শুধু বাহ্যিক কারণাদিই রয়ে গেছে। তারা এসব কারণকেই সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রভু মনে করতে শুরু করেছে। আসল শক্তি, যিনি কারণাদি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কারণাদির আবরণেই আবৃত হয়ে গেছেন। তাই পয়গম্বরগণ ও খোদায়ী কিতাবসমূহ মানুষকে বার বার হুশিয়ার করে দিয়েছে যে, দৃষ্টি সামান্য উর্ধ্বে তোল এবং তীক্ষ্ণ কর। প্রকৃত কারণাদির যবনিকার অন্তরালে যিনি এই ব্যবস্থাপনার পরিচালক, তাঁকে দেখলেই স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত বাণীই বিধৃত হয়েছে। أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ

আয়াতে গাফেল মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা প্রত্যহ দেখে—সকালে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া পশ্চিম দিকে লম্বমান থাকে, এরপর আস্তে আস্তে হ্রাস পেয়ে দুপুরে নিঃশেষ অথবা নিঃশেষিত প্রায় হয়ে যায়। এরপর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে গেলে এই ছায়াই আস্তে আস্তে পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রত্যেক মানুষ রোজই এই রৌদ্র ও ছায়ার উপকারিতা লাভ করে এবং স্বচক্ষে দেখে যে, এ সবগুলো সূর্যের উদয়, উর্ধ্বে গমন এবং পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার অপরিহার্য পরিণতি ও ফল। কিন্তু সূর্য গোলকের সৃষ্টি এবং তাকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে রাখার কাজটি কে করেছে, এটা চর্মচক্ষে ধরা পড়ে না। এর জন্যে অন্তর্চক্ষু ও দিব্যদৃষ্টি দরকার।

আলোচ্য আয়াতে মানুষকে অন্তর্চক্ষু দান করাই উদ্দেশ্য যে, ছায়ার হ্রাস বৃদ্ধি যদিও তোমাদের দৃষ্টিতে সূর্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু একথাও চিন্তা কর যে, সূর্যকে এমন অত্যুজ্জ্বল করে কে সৃষ্টি করল এবং তার গতিকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে কে কায়েম রাখল? যাঁর সর্বময় ক্ষমতা এগুলো করেছে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই রৌদ্র-ছায়ার নেয়ামত দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এই রৌদ্র-ছায়াকে এক অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন। যেখানে রৌদ্র, সেখানে সর্বদাই রৌদ্র থাকত এবং যেখানে ছায়া, সেখানে সর্বদাই ছায়া থাকত। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি এরূপ করেননি। وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا এর অর্থ তাই।

মানুষকে এই স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করার জন্যে ছায়ার প্রত্যাবর্তন ও হ্রাস পাওয়াকে আলোচ্য আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে: قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا অর্থাৎ, অতঃপর ছায়াকে আমি নিজের দিকে গুটিয়ে নেই। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্ তাআলা শরীর, শারীরিক বিষয় এবং দিকের উর্ধ্বে। তাঁর দিকে ছায়া সংকুচিত হওয়ার অর্থ এটাই যে, তাঁর সর্বময় ক্ষমতার দ্বারাই এসব কাজ হয়।

রাত্রিকে নিদ্রার জন্যে এবং দিনকে কর্মব্যস্ততার জন্যে নির্ধারণের রহস্য: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا আয়াতে রাত্রিকে 'লেবাস' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। লেবাস যেমন মানব-দেহকে আবৃত করে, রাত্রিও তেমনি একটি প্রাকৃতিক আবরণ, যা সমগ্র সৃষ্ট-জগতের উপর ফেলে দেয়া হয়। سُبَاتًا শব্দটি سبت থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ ছিন্ন করা। سبات এমন বস্তু, যদ্দ্বারা অন্য বস্তুকে ছিন্ন করা হয়।

নিদ্রাকে আল্লাহ্ তাআলা এমন করেছেন যে, এর ফলে সারাদিনের ক্লান্তি ও শ্রান্তি ছিন্ন তথা দূর হয়ে যায়। চিন্তা ও কল্পনা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মস্তিষ্ক শান্ত হয়। তাই سبات এর অর্থ করা হয় আরাম, শান্তি। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি রাত্রিকে আবৃতকারী করেছি, অতঃপর তাতে মানুষ ও প্রাণীদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিয়েছি, যা তাদের আরাম ও শান্তির উপকরণ।

এখানে কয়েকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। প্রথম, নিদ্রা যে আরাম; বরং আরামের প্রাণ, তা সবাই জানে, কিন্তু আলোর মধ্যে নিদ্রা আসা স্বভাবতঃই কঠিন হয়। নিদ্রা এলেও দ্রুত ভেঙ্গে যায়। আল্লাহ্ তাআলা নিদ্রার উপযোগী করে রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং শীতলও করেছেন। এমনিভাবে রাত্রি একটি নেয়ামত এবং নিদ্রা দ্বিতীয় নেয়ামত। তৃতীয় নেয়ামত এই যে, সারা বিশ্বের মানুষ ও জীব-জন্তুর নিদ্রা একই সময় রাত্রে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। নতুবা একজনের নিদ্রার সময় অন্যজন থেকে ভিন্ন হলে যখন কিছু লোক নিদ্রামগ্ন থাকত, তখন অন্য লোকেরা কাজে লিপ্ত ও হট্টগোলের কারণ হয়ে থাকত। এমনিভাবে যখন অন্যদের নিদ্রার সময় আসত, তখন যারা কাজ করত ও চলাফেরা করত, তারা তাদের নিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করত। এছাড়া প্রত্যেক মানুষের অনেক দরকার অন্য মানুষের সাথে জড়িত থাকে। এর ফলে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতাও গুরুতররূপে বিঘ্নিত হত।

এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যদি কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি হত যে, সবাইকে নিদ্রার জন্যে একই সময় নির্দিষ্ট করতে হবে, তবে প্রথমতঃ এরূপ চুক্তি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া সহজ ছিল না। তদুপরি চুক্তি যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা,তা তদারক করার জন্যে হাজারো বিভাগ খুলতে হত। এতদসত্ত্বেও সাধারণ আইনগত ও চুক্তিগত পদ্ধতিতে স্থিরীকৃত বিষয়াদিতে ঘুষ, রেয়াত ইত্যাদি কারণে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, এতে তাও বরাবর পরিলক্ষিত হত।

আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা নিদ্রার একটি বাধ্যতামূলক সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর এ সময়েই নিদ্রা আসে। কখনও কোন প্রয়োজনে জাগ্রত থাকতে হলে এর জন্যে আয়াস সহকারেই ব্যবস্থা করতে পারে। فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا বাক্যে দিনকে نشور অর্থাৎ, জীবন বলা হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত অর্থাৎ, নিন্দা এক প্রকার মৃত্যু। এই জীবনের সময়কেও সমগ্র মানব মণ্ডলীর মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে এক করে দেয়া হয়েছে। নতুবা কিছু কারখানা ও দোকান দিনে বন্ধ থাকত, রাত্রে খুলত এবং সেগুলো খুললে অন্যগুলো বন্ধ হয়ে যেত। ফলে উভয়েই ব্যবসায়িক অসুবিধার সম্মুখীন হত।

রাত্রিকে নিদ্রার জন্যে নির্দিষ্ট করে আল্লাহ্ তাআলা যেমন একটি বড় অনুগ্রহ করেছেন, তেমনিভাবে জীবন ধারণের অন্যান্য পারস্পরিক অভিন্ন প্রয়োজনের জন্যেও এমনি এক ও অভিন্ন সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উদাহরণতঃ সকাল-সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও আহারের প্রয়োজন একটি অভিন্ন বিষয়। এসব সময়ে সবাই এর চিন্তা করে। ফলে প্রত্যেকের জন্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ সহজ হয়ে যায়। হোটেল ও রেস্তোরাঁ এসব সময়ে খাদ্যদ্রব্যে ভরপুর হয়ে উঠে। প্রত্যেক গৃহে খাওয়া-দাওয়ার ব্যস্ততার জন্যে এসব সময় নির্দিষ্ট। নির্দিষ্টকরণের এই নেয়ামত আল্লাহ্ তাআলা স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا - طهور শব্দটি আরবী ভাষায়

অতিশয়ার্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এমন জিনিসকে طهور বলা হয়, যা নিজেও পবিত্র এবং অপরকেও তদ্দ্বারা পবিত্র করা যায়। আল্লাহ্ তাআলা পানিকে এই বিশেষ গুণ দান করেছেন যে, সে নিজেও পবিত্র এবং তদ্দ্বারা সর্বপ্রকার অপবিত্রতাকেও দূর করা যায়। সাধারণতঃ আকাশ থেকে কোন সময় বৃষ্টির আকারে এবং কোন সময় বরফ ও শিলার আকারে পতিত পানিই মানুষ ব্যবহার করে। অতঃপর এই পানিই পাহাড়-পর্বতের শিরা-উপশিরার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পাইপ লাইনের আকারে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই পানি কোথাও আপনা-আপনি ঝরণার আকারে নির্গত হয়ে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে থাকে এবং কোথাও মৃত্তিকা খনন করে কূপের আকারে বের করা হয়। সব পানিই নিজে পবিত্র ও অপরকে পবিত্রকারী। কোরআন, সুন্নাহ্ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা এর প্রমাণ।

وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا — اناسى শব্দটি انسى -এর বহুবচন এবং কেউ কেউ বলেন, انسان -এর বহুবচন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা মাটিকে সিক্ত করেন এবং জীব-জন্তু ও অনেক মানুষেরও তৃষ্ণা নিবারণ করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, জীব-জন্তু যেমন বৃষ্টির পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে, তেমনি মানুষও সবাই এই পানি দ্বারা উপকৃত হয় ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। এতদসত্ত্বেও আয়াতে 'অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করি' বলার কারণ কি? এতে বোঝা যায় যে, অনেক মানুষ এই পানি থেকে বঞ্চিত। উত্তর এই যে, এখানে 'অনেক মানুষ' বলে প্রান্তরের অধিবাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা সাধারণতঃ বৃষ্টির পানির উপর ভরসা করেই জীবন অতিবাহিত করে। নগরের অধিবাসীরা নহরের কিনারায় কূপের ধারে-কাছেই বসবাস করে। ফলে তারা বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে না।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ —আয়াতের বক্তব্য এই যে, আমি বৃষ্টিকে মানুষের মধ্যে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আনি ; কোন সময় এক জনপদে এবং কোন সময় অন্য জনপদে বর্ষণ করি। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, প্রায়ই মানুষের মধ্যে জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে যে, এ বছর বৃষ্টি বেশী, এ বছর কম। এটা প্রকৃত সত্যের দিক দিয়ে সঠিক নয় ; বরং বৃষ্টির পানি প্রতিবছর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে একই রূপে অবতীর্ণ হয় ; তবে আল্লাহ্র নির্দেশে এর পরিমাণ কোন জনপদে বেশী দেয়া হয় এবং কোন জনপদে কম করে দেয়া হয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হ্রাস করে কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে শাস্তি দেয়া ও হুশিয়ার করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টিও আযাব হয়ে যায়। যে পানি আল্লাহ্র বিশেষ রহমত, তাকেই অকৃজ্ঞ ও নাফরমানদের জন্যে আযাব ও শাস্তি করে দেয়া হয়।

কোরআনের দাওয়াত প্রচার করা বড় জেহাদ : وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا —এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। তখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহের বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই এখানে জেহাদকে به অর্থাৎ, কোরআনের সাথে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআনের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের সাথে বড় জেহাদ করুন। কোরআনের মাধ্যমে জেহাদ করার অর্থ তার বিধি-বিধান প্রচার করা এবং কোরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা, মুখে হোক, কলমের সাহায্যে হোক কিংবা অন্য কোন-পন্থায় হোক— এখানে সবগুলোকেই বড় জেহাদ বলা হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا — مَرَجَ শব্দের অর্থ স্বাধীন ছেড়ে দেয়া। এ কারণেই চারণভূমিকে مَرَجْ বলা হয়। সেখানে জন্তু-জানোয়ার স্বাধীনভাবে বিচরণ করে ও ঘাস খায়। عَذْبٌ মিঠা পানিকে বলা হয়। فُرَاتٌ -এর অর্থ সুপেয় مِلْحٌ এর অর্থ লোনা এবং أُجَاجٌ -এর অর্থ তিক্ত বিস্বাদ।

আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কৃপা ও অপার রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। (এক) সর্ববৃহৎ যাকে মহাসাগর বলা হয়। গোটা পৃথিবী এর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ এ জলধির বাইরে উন্মুক্ত, যাতে সারা বিশ্বের মানবসমাজ বসবাস করে। এই সর্ববৃহৎ দরিয়ার পানি রহস্যবশতঃ তীব্র লোনা ও বিস্বাদ। পৃথিবীর স্থলভাগে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝর্ণা, নদ-নদী, নহর ও বড় বড় দরিয়া আছে। এগুলোর পানি সবই মিষ্ট ও সুপেয়। মানুষের নিজের তৃষ্ণা নিবারণে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে এরূপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ্ তাআলা স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকারে সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থলভাগের চাইতে অনেক বেশী সামুদ্রিক জন্তু-জানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই পচে এবং সেখানেই মাটি হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনা অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্ট হত, তবে মিষ্ট পানি দ্রুত পচনশীল বিধায় দু'চার দিনেই পচে যেত। এই পানি পচে গেলে তার দুর্গন্ধে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবন-ধারণ দুরূহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাকে এত তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজস্ক্রিয় করে দিয়েছেন যেন সারা বিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী যে সকল সৃষ্টজীব সেখানে মরে তাও পচতে পারে ।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমতঃ এই নেয়ামত ও অনুগ্রহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ্ তাআলা দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এই সর্বময় ক্ষমতা বিধৃত হয়েছে যে, যেখানে মিঠা পানির নদী অথবা নহর সমুদ্রে পতিত হয় এবং মিঠা ও লোনা উভয় পানি একাকার হয়ে যায়, সেখানে দেখা যায় যে, উভয় পানি কয়েক মাইল পর্যন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, কিন্তু পরস্পর মিশ্রিত হয় না, অথচ উভয়ের মাঝখানে কোন অনতিক্রম্য অন্তরায় থাকে না।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا পিতা-মাতার দিক থেকে যে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা হয়, তাকে نسب বলা হয় এবং স্ত্রীর তরফ থেকে যে আত্মীয়তা হয়, তাকে, صهر বলা হয়। এসব সম্পর্ক ও আত্মীয়তা আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত। মানুষের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্যে এগুলো অপরিহার্য। কারণ, একা মানুষ কোন কাজই করতে পারে না।

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেই, আল্লাহ্ তাআলার বিধি-বিধান তোমাদের কাছে পৌঁছাই এবং ইহকাল ও পরকালে তোমাদের সাফল্যের জন্যে চেষ্টা করি। এতে আমার কোন পার্থিব স্বার্থ নেই। আমি এই শ্রমের কোন পুরস্কার বা প্রতিদান তোমাদের কাছে চাই না। এছাড়া আমার কোন উপকারও নেই। যার মন চায়, সে আল্লাহ্র পথ অবলম্বন করবে। বলাবাহুল্য, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আসলে উপকার তারই হবে। একে নিজের উপকার বলা পয়গম্বরসুলভ স্নেহ-মমতার দিকে ইঙ্গিত যে, আমি তোমাদের উপকারকেই নিজের

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ
بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ
بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا
الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾ تَبَارَكَ الَّذِي
جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ
أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ
هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ
لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا
عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ
مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ
يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ
مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

(৫৮) আপনি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন। তিনি বান্দার গোনাহ্ সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার। (৫৯) তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অর্ন্তবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়। তাঁর সম্পর্কে যিনি অবগত, তাকে জিজ্ঞেস কর। (৬০) তাদেরকে যখন বলা হয়, দয়াময়কে সেজদা কর, তখন তারা বলে, দয়াময় আবার কে? তুমি কাউকে সেজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা সেজদা করব? এতে তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পায়। (৬১) কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র। (৬২) যারা অনুসন্ধানপ্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতাপ্রিয় তাদের জন্যে তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে। (৬৩) রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম। (৬৪) এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে; (৬৫) এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ; (৬৬) বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা! (৬৭) এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। (৬৮) এবং যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহ্ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।

উপকার মনে করি। এর উদাহরণ যেমন, কোন বৃদ্ধ দুর্বল পিতা তার সন্তানকে বলে, তুমি খাও, পান কর ও সুখে থাক—এটাই আমার খাওয়া, পান করা ও সুখে থাকা। একে নিজের উপকার বলার কারণ এরূপও হতে পারে যে, এর সওয়াব তিনিও পাবেন; যেমন সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং সে তার নির্দেশ মোতাবেক সৎকাজ করে, এই সৎকাজের সওয়াব কর্মী নিজেও পুরোপুরি পাবে এবং যে নির্দেশ দেয়, সে-ও পাবে।— (মাযহারী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا - অর্থাৎ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা, অতঃপর নিজ অবস্থা অনুযায়ী আরশের উপর সমাসীন হওয়া, এগুলো সব দয়াময় আল্লাহ্র কাজ। এ বিষয়ে সত্যায়ন ও অনুসন্ধান করতে হলে কোন ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর। 'ওয়াকিফহাল' বলে আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং অথবা জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহের পণ্ডিতবর্গও হতে পারে, যারা নিজ নিজ পয়গম্বরের মাধ্যমে এ ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েছিল।—(মাযহারী)

قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ - رحمن - এর অর্থ আরবরা সবাই জানত; কিন্তু আল্লাহ্র জন্যে শব্দটি তারা ব্যবহার করত না। তাই প্রশ্ন করল যে, রহমান কে এবং কি?

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا - وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا -

এসব আয়াতে মানুষকে বলা উদ্দেশ্য যে, আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র সূর্য, চন্দ্র, এদের মাধ্যমে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, অন্ধকার, আলো এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমগ্র সৃষ্টজগত এ কারণে সৃষ্টি করেছি, যাতে চিন্তাশীলরা এগুলো থেকে আল্লাহ্র সর্বময় ক্ষমতা ও তওহীদের প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে এবং কৃতজ্ঞ বন্দারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। অতএব দুনিয়াতে যে ব্যক্তির সময় চিন্তা-ভাবনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে যায়, তার সময় অযথা নষ্ট হয় এবং তার পুঁজিও ধ্বংস হয়ে যায়।

ইবনে আরবী বলেন, আমি শহীদে আকবরের কাছে শুনেছি যে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, যার বয়স ষাট বছর হয় এবং তার অর্ধেক ত্রিশ বছর নিদ্রায় অতিবাহিত হয়ে যায় ও ছয় ভাগের এক অর্থাৎ, দশ বছর দিবাভাগে বিশ্রাম গ্রহণে অতিবাহিত হয়ে অবশিষ্ট মাত্র বিশ বছর কাজে লাগে। কোরআন পাক এস্থলে বড় বড় নক্ষত্র, গ্রহ ও সৌরজগতের কথা উল্লেখ করার পর একথাও বলেছে যে, কোরআন এসব বিষয়ের উল্লেখ বার বার এজন্যে করে, যাতে তোমরা এগুলোর সৃষ্টি, গতি ও এ থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এগুলোর স্রষ্টা ও পরিচালককে চিন এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁকে স্মরণ কর; এখন নভোমণ্ডল ও সৌরজগতের স্বরূপ ও আকার কি, এগুলো আকাশের অভ্যন্তরে অবস্থিত, না বাইরে শূন্য জগতে অবস্থিত—এ প্রশ্নের সাথে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোন বিষয় জড়িত নয় এবং এগুলোর স্বরূপ জানা মানুষের জন্যে সহজও নয়। যারা সারা জীবন এসব বিষয়ের গবেষণায় ব্যয় করেছেন, তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়

যে, তারাও কোন অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌঁছতে পারেননি। তারা যে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, তাও বিজ্ঞানীদের বিপরীত গবেষণার ফলে সংশয়ান্বিত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তাই তফসীরে এর চাইতে বেশী কোন আলোচনায় যাওয়াও কোরআনের জরুরী খেদমত নয়। কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, চন্দ্রে পৌঁছা এবং সেখানকার মাটি, শিলা, এবং গুহা-পাহাড়ের আলোকচিত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর কীর্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কোরআন পাক এসব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে যে সত্যানুসন্ধানের সবক দিতে চায়, তারা তাদের গবেষণা প্রচেষ্টার অহংকারে বিভোর হয়ে তা থেকে আরও দূরে সরে পড়েছে এবং সাধারণ লোকদের চিন্তা-ধারাকেও বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। কেউ এসব বিষয়কে কোরআন বিরোধী মনে করে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে বসে আবার কেউ কোরআন পাকের কদর্থ বর্ণনা করতে শুরু করে। তাই এ প্রশ্নের প্রয়োজন মাফিক বিস্তারিত আলোচনা জরুরী। সূরা হিজরের وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا আয়াতের অধীনে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, সূরা আল-ফোরকানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সেই আলোচনা নিম্নরূপ ঃ

প্রাচীন ও আধুনিক সৌর বিজ্ঞানের মতবাদ ও কোরআন পাকের বাণী ঃ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا এ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, بروج অর্থাৎ, গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। কেননা, فِي অব্যয়টি পাত্রের অর্থ দেয়। এমনিভাবে সূরা নূহে আছে ঃ

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا - এতে فِيهِنَّ -এর সর্বনাম سَبْعَ سَمَاوَاتٍ -কে বোঝায়। এ থেকে বাহ্যতঃ এটাই বোঝা যায় যে, চন্দ্র আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে। কিন্তু এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, কোরআনে سماء শব্দটি একটি বিরাটকায় এবং ধারণা ও কল্পনাতীত বিস্তৃতিশীল সৃষ্টবস্তুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোরআনের বর্ণনা আনুযায়ী এই সৃষ্টবস্তুর মধ্যে দরজা আছে এবং দরজাগুলোর মধ্যে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত। এই সৃষ্টবস্তুর সংখ্যা সাত বলা হয়েছে। سماء শব্দটির আরও একটি অর্থ আছে; অর্থাৎ আকাশের দিকে অবস্থিত প্রত্যেক সুউচ্চ বস্তুকেও سماء বলা হয়। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্য পরিমণ্ডল, যাকে আজকালকার পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়, এটাও سماء শব্দের অর্থের আওতাভুক্ত। وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ও এমনি ধরনের অন্য যেসব আয়াতে আকাশ থেকে পানি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোকে অধিকাংশ তফসীরবিদ দ্বিতীয় অর্থেই ধরেছেন। কারণ, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকেও একথা প্রমাণিত যে, বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়, সেসব মেঘমালার উচ্চতার কোন তুলনাই আকাশের উচ্চতার সাথে হয় না। স্বয়ং কোরআন পাকও অন্যান্য আয়াতে মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার কথা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ -এতে مزن শব্দটি مزنة -এর বহুবচন। এর অর্থ শুভ্র মেঘমালা। আয়াতের অর্থ এই যে, শুভ্র মেঘমালা থেকে তোমরা বৃষ্টি বর্ষণ করেছ, না আমি করেছি? অন্যত্র বলা হয়েছে, وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا এখানে معصرات -এর অর্থ পানিভর্তি মেঘ। আয়াতের অর্থ এই যে, আমিই পানিভর্তি মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি। কোরআন পাকের এসব বর্ণনা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোতে অধিকাংশ তফসীরবিদ سماء শব্দের দ্বিতীয় অর্থই নিয়েছেন, অর্থাৎ, শূন্য পরিমণ্ডল।

সারকথা এই যে, কোরআন পাক ও তফসীরবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী سماء শব্দটি শূন্য পরিমণ্ডল ও আকাশলোক উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় যেসব আয়াতে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের পাত্র হিসেবে فِي السَّمَاءِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর অর্থে উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান। অর্থাৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশলোকের অভ্যন্তরেও হতে পারে এবং আকাশের নীচে শূন্য পরিমণ্ডলেও হতে পারে। এই উভয় সম্ভাবনার বর্তমানে কোন অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, কোরআন নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহকে আকাশের অভ্যন্তরে সাব্যস্ত করেছে অথবা আকাশের বাইরের শূন্য পরিমণ্ডলে ; বরং কোরআনের ভাষাদৃষ্টে উভয়টিই সম্ভবপর। সৃষ্টজগতের গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা যাই প্রমাণিত হবে, কোরআনের কোন বর্ণনা তার পরিপন্থী হবে না।

সৃষ্টজগতের স্বরূপ ও কোরআন ঃ এখানে নীতিগতভাবে একথা বোঝে নেয়া জরুরী যে, কোরআন পাক কোন বিজ্ঞান অথবা সৌরবিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, যার আলোচ্য বিষয় হবে সৃষ্টজগতের স্বরূপ অথবা আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার, গতি ইত্যাদির বর্ণনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোরআন আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অর্ন্তবর্তী সৃষ্টজগতের কথা বার বার উল্লেখ করে এবং এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত দেয়। কোরআন পাকের এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে কেবল এমন কতিপয় বিষয় মানুষকে বলতে চায়, যেগুলো তার বিশ্বাস ও মতবাদ সংশোধনের সাথে জড়িত অথবা তার ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণতঃ কোরআন পাক আকাশ, পৃথিবী নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও তাদের গতি এবং গতি থেকে উদ্ভূত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা বার বার এ কারণে উল্লেখ করেছে, যাতে মানুষ এগুলোর বিস্ময়কর নির্মাণ-কৌশল ও অলৌকিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে এ বিশ্বাস করে যে, এগুলো আপনা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেনি। এগুলোর সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি সর্বশ্রেষ্ট প্রজ্ঞাময়, সর্বাধিক বিজ্ঞ এবং সর্বোপরি ক্ষমতাশালী ও শক্তিধর। এই বিশ্বাসের জন্যে আকাশমণ্ডলীর, শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের উপাদনের স্বরূপ, এগুলোর আসল আকার ও আকৃতি এবং গোটা ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অবস্থা জানা কস্মিনকালেও জরুরী নয়। বরং এর জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট, যতটুকু প্রত্যেকেই নিজের চোখে দেখে ও বোঝে। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের উদয়-অস্ত, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি, দিবারাত্রির পরিবর্তন, বিভিন্ন ঋতুতে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডে দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা, যাতে হাজারো বছর ধরে এক মিনিট, এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয়নি—এসব বিষয় দ্বারা ন্যূনতম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য হয় যে, এসব বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি চলমান নয় ; বরং এর একজন পরিচালক আছেন। এতটুক বোঝার জন্যে কোনরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। কোরআন পাকও এর প্রতি আহ্বান জানায়নি। কোরআন শুধু এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনারই দাওয়াত দেয়, যা সাধারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত হতে পারে। এ কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি

তৈরী করা অথবা এগুলো সংগ্রহ করা এবং আকাশলোকের আকার-আকৃতি নির্ণয় করার প্রতি মোটেই কোন গুরুত্ব দেননি। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা করার অর্থ যদি এর স্বরূপ, আকার-আকৃতি ও গতির দর্শন জানাই হত, তবে এর প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গুরুত্ব না দেয়া অসম্ভব ছিল ; বিশেষতঃ যখন এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, শিক্ষা ও শেখানোর কাজ দুনিয়াতে তৎকালেও বিদ্যমান ছিল। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ে পণ্ডিত গবেষণাকারী লোকের অভাব ছিল না। হযরত ঈসা (আঃ)-এর পাঁচ শত বছর পূর্বে ফিশাগোর্সের মতবাদ এবং এর অব্যবহিত পরে বেৎলীমূসের মতবাদ বিশ্বে প্রচলিত ও প্রসারিত ছিল। তখনকার পরিস্থিতির উপযোগী মানমন্দিরের যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে পবিত্র সত্তার প্রতি এসব আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং যেসব সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাছে এসব আয়াত পাঠ করেন, তারা কোন সময় এদিকে ভ্রূক্ষেপও করেননি। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সৃষ্টজগত সম্পর্কিত এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও তা ছিল না, যা আজকাল আধুনিকতাপ্রিয় আলেমগণ ইউরোপ ও তার গবেষণায় প্রভাবান্বিত হয়ে অবলম্বন করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, মহাশূন্য ভ্রমণ, চন্দ্র, মঙ্গলগ্রহ ও শুক্রগ্রহ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা কোরআন পাকের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার শামিল।

নির্ভুল তথ্য এই যে, কোরআন পাক প্রাচীন অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় না, এ বিষয়ে আলোচনা করে না এবং বিরোধিতাও করে না। সৃষ্ট-জগত ও সৃষ্টবস্তু সম্পর্কিত সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কোরআন পাকের বিজ্ঞজনোচিত নীতি ও পন্থা এটাই যে, সে প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ততটুকুই গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে, যতটুকু মানুষের ধর্মীয়ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কশীল, যতটুকু সে অনায়াসে অর্জন করতে পারে এবং যতটুকু অর্জনে সে আনুমানিক নিশ্চয়তাও লাভ করতে পারে। যেসব দার্শনিকসুলভ ও অনাবশ্যক আলোচনা গবেষণা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত, যা অর্জন করার পরও অকাট্যরূপে বলা যায় না যে, এটাই নির্ভুল; বরং সন্দেহ ও অস্থিরতা আরও বাড়ে, কোরআন এ ধরনের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করে না। কেননা, কোরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মনযিলে-মকসূদ এসব পৃথিবী ও আকাশস্থ সৃষ্টজগতের উর্ধ্বে স্রষ্টার ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত ও শান্তি অর্জন করা। এর জন্যে সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা জরুরী নয় এবং এ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান লাভ করাও মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। প্রতি যুগের বৈজ্ঞানিক ও সৌরবিজ্ঞান বিশারদদের কোন মতাবাদ ও গবেষণাকেই নিশ্চিত ও সর্বশেষ বলা যায় না। মানবীয় প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান, সৌরজগত, শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টজগত, মেঘ ও বৃষ্টি, মহাশূন্য, ভূগর্ভস্থ স্তর, পৃথিবীতে সৃষ্ট মখলুক, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, মনুষ্যজগত মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিষয়াদির মধ্য থেকে কোরআন পাক কেবল এগুলোর নির্যাস ও চাক্ষুষ অংশ এই পরিমাণে গ্রহণ করে, যদ্দ্বারা মানুষের ধর্মীয় পার্থিব প্রয়োজনও অভাব পূরণ হয়। সে মানুষকে অনাবশ্যক তথ্যানুসন্ধানের পঙ্কিলে নিমজ্জিত করে না। তবে কোথাও কোথাও কোন বিশেষ মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত অথবা স্পষ্টোক্তিও পাওয়া যায়।

কোরআনের তফসীরে দার্শনিক মতবাদসমূহের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার বিশুদ্ধ মাপকাঠি ঃ প্রাচীন ও আধুনিক সত্যপন্থী আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাকে যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত আছে, যদি কোন প্রাচীন অথবা আধুনিক মতবাদ সেগুলোর বিরুদ্ধে যায়, তবে তার কারণে কোরআনের আয়াতে টানা-হেঁচড়া ও সদর্থ বর্ণনা করা বৈধ নয়, বরং সেই মতবাদকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেয়া হবে। তবে যেসব বিষয়ে কোরআনে কোন স্পষ্টোক্তি নেই ; কোরআনের ভাষায় উভয় অর্থেরই অবকাশ আছে ; সেখানে যদি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন একটি মতবাদ শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে কোরআনের আয়াতকেও সেই অর্থে ধরে নেয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। যেমন, আলোচ্য আয়াত جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا সম্পর্কে বলা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত আছে, না আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে আছে, এ সম্পর্কে কোরআন পাক কোন সুস্পষ্ট ফয়সালা দেয়নি। আজকাল মহাশূন্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ গ্রহ-উপগ্রহে পৌছতে পারে। এতে ফিশাগোর্সীয় মতবাদই সমর্থন লাভ করেছে। দার্শনিক ফিসাগোর্স বলেন, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত নয়। কোরআন পাক ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আকাশ একটি প্রাচীর বেষ্টনী, যাতে দরজা আছে এবং দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। তাতে যে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না। এক্ষণে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করা হবে যে, নক্ষত্রসমূহকে শূন্য পরিমণ্ডলে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোন সদর্থ নয়; বরং দুই অর্থের মধ্য থেকে একটিকে নির্দিষ্টকরণ। কিন্তু যদি কেউ মূলতই আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে; যেমন আজকাল কোন কোন আধুনিক সৌরবিজ্ঞানী একথা বলেন অথবা কেউ যদি দাবী করে যে, রকেট ও বিমানের সাহায্যে আকাশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব; তবে কোরআনের দৃষ্টিতে এরূপ দাবী ভ্রান্ত সাব্যস্ত হবে। কেননা, কোরআন পাক একাধিক আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, আকাশে দরজা আছে এবং সেসব দরজা বিশেষ অবস্থায় খোলা হয়। এসব দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। প্রত্যেকেই যখন ইচ্ছা, আকাশে প্রবেশ করতে পারে না। উপরোক্ত দাবীর কারণে আয়াতের কোনরূপ সদর্থ বর্ণনা করা হবে না; বরং দাবীকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেয়া হবে।

এমনিভাবে কোরআন পাকের وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। এ ব্যাপারে বেৎলীমূসীয় মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেয়া হবে। তার মতে নক্ষত্রসমূহ আকাশগাত্রে প্রোথিত। তারা নিজেরা গতিশীল নয়; বরং আকাশের বিচরণের কারণে তারা বিচরণ করে।

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাচীন তফসীরবিদগণের মধ্যে যারা সৌরজগত সম্পর্কে বেৎলীমূসীয় মতবাদের ভক্ত ছিলেন, তাঁরা কোরআনের সেসব আয়াতের সদর্থ বর্ণনা করতেন, যেগুলো দ্বারা বেৎলীমূসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু বোঝা যেত। এমনিভাবে আজকাল কিছুসংখ্যক লেখক যেসব আয়াতকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের বিরোধী মনে করেন, তারা সেগুলোতে সদর্থ বর্ণনা করে সৌরবিজ্ঞানের অনুকূলে নেয়ার চেষ্টা করেন। এই উভয় পন্থাই অবৈধ; পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পর্যন্ত আধুনিক সৌরবিজ্ঞান যেসব নতুন গবেষণা উপস্থাপিত করেছে, তাতে আকাশের অস্বীকৃতি ছাড়া কোরআন ও সুন্নতের খেলাফ কোন কিছু নেই। কিছুসংখ্যক লোক জ্ঞানের ত্রুটিবশতঃ এগুলোকে কোরআন ও সুন্নতের খেলাফ মনে করতঃ সদর্থের পেছনে পড়ে যায়।

বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তফসীরবিদ সাইয়্যেদ মাহমুদ আলূসী বাগদাদীর তফসীরে রূহুল-মা'আনী পূর্ববর্তী মনীষীগণের তফসীরসমূহের চমৎকার সংক্ষিপ্ত সার এবং আরব, অনারব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় ও প্রামাণ্য তফসীর। এই তফসীরকার যেমন কোরআন ও সুন্নায় গভীর জ্ঞানী, তেমনি প্রাচীন এবং আধুনিক দর্শন ও সৌর-বিজ্ঞানেও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি তাঁর তফসীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি সম্পর্কে উপরোল্লেখিত মূলনীতিই অবলম্বন করেছেন। তাঁর পৌত্র আল্লামা সাইয়্যেদ মাহ্‌মুদ শুকরী আলূসী এসব বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে কোরআন পাকের আলোকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের মতবাদসমূহের সমর্থন পেশ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আধুনিকতাপ্রিয় আলেমগণের ন্যায় কোরআনের আয়াতে কোন প্রকার সদর্থের আশ্রয় নেয়া হয়নি। আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের সমর্থনে লিখিত তাঁর কয়েকটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করে দেয়াই যথেষ্ট। তিনি বলেন ঃ

رايت كثيرا من قواعدها لايعارض النصوص الواردة فى الكتاب والسنة على انها لو خالفت شيئا من ذلك لم يلتفت اليها ولـم نؤول النصوص لاجلها والتاويل فيها ليس من مذاهب السـلـف الحرية بالقبول بل لابد ان نقول ان المخالف لها مشتمل على خلل فيه فان العقل الصريح لايخالف النقل الصحيح بل كل منـهـما يصدق الاخر ويؤيده ـ

"আমি আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের অনেক রীতি-নীতিকে কোরআন ও সুন্নাহর বিপক্ষে দেখিনি। এতদসত্ত্বেও যদি তা কোরআন ও সুন্নাহ্‌বিরোধী হয়, তবে আমরা সেদিকে মুখ ফেরাব না এবং এর কারণে কোরআন ও সুন্নার সদর্থ করব না। কেননা, এরূপ সদর্থ পূর্ববর্তী মনীষীগণের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত মাযহাবে নেই। বরং আমরা তখন একথা বলব যে, যে মতবাদ কোরআন ও সুন্নাহ্‌বিরোধী, তাতে কোন না কোন ত্রুটি আছে। কারণ, সুস্থ বিবেক কোরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপক্ষে যেতে পারে না; বরং একটি অপরটির সত্যায়ন ও সমর্থন করে।"

সারকথা এই যে, সৌরজগত, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গতি ও আকার-আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা কোন নতুন বিষয়বস্তু নয়। হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে এসব প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধান অব্যাহত আছে। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ের চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ শত বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গুরু ফিশাগোর্স ইতালীর ক্রুতোনা শিক্ষালয়ে এ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা দিতেন। তাঁর পর খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় একশত চল্লিশ বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় গুরু বেৎলীমূস রুমীর আবির্ভাব ঘটে। সে সময়েই অপর এক দার্শনিক হেয়ারখোস খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জ্যামিতিক কোণ পরিমাপের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন ।

সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ফিশাগোর্স ও বেৎলীমূসের মতাবদ সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ছিল। বেৎলীমূস সমসাময়িক রাষ্ট্র ও জনগণের সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর মতবাদ এত প্রসার লাভ করে যে, এর মোকাবেলায় ফিশাগোর্সের মতবাদ অখ্যাতই থেকে যায়। যখন আরবী ভাষায় গ্রীক দর্শনের অনুবাদ হয়, তখন বেৎলীমূসের মতবাদই আরবী গ্রন্থাদিতে স্থানান্তরিত হয় এবং জ্ঞানীগণের মধ্যে সাধারণভাবে এই মতবাদই পতিচিতি লাভ করে। অনেক তফসীরকার কোরআনের আয়াতের তফসীরেও এই মতবাদকে সামনে রেখে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। হিজরী একাদশ শতাব্দী ও খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হয় এবং ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ এসব বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোপারনিক, জার্মানীতে কিলার এবং ইতালীতে গ্যালিলিও প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা নতুনভাবে এসব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং সবাই একমত হন যে, সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে বেৎলীমূসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং ফিশাগোর্সের মতবাদ নির্ভুল। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী এবং হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আইজ্যাক নিউটন বিজ্ঞানে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার ফিসাগোর্সের মতবাদকে আরো শক্তিশালী করে। তিনি গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, ভারী বস্তু শূন্যে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে পতিত হওয়ার কারণ তা নয়, যা বেৎলীমূসীয় মতবাদে ব্যক্ত হয়েছে যে, পৃথিবীর মধ্যস্থলে কেন্দ্র আছে এবং সব ভারী বস্তু স্বভাবতই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। নিউটন এই মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, সমস্ত নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে মধ্যাকর্ষণ শক্তি রয়েছে। পৃথিবীও এমন একটি শক্তি, এতেও মহাকর্ষণ বর্তমান। যে সীমা পর্যন্ত এই মধ্যাকর্ষণের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত, সেখান থেকে প্রত্যেক ভারী বস্তু নীচে পতিত হবে। কিন্তু যদি কোন বস্তু এই মধ্যাকর্ষণের প্রভাব-বলয়ের বাইরে চলে যায়, তবে তা আর নীচে পতিত হবে না।

অধুনা সোভিয়েত মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মুসলিম দার্শনিক আবু রায়হান আল-বেরুনীর গবেষণার সাহায্যে রকেট ইত্যাদি আবিষ্কার করতঃ এ বিষয়ে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে, বিপুল শক্তি ও দ্রুতগতির কারণে রকেট যখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ভেদ করে বাইরে চলে যায়, তখন তা আর নীচে পতিত হয় না; বরং একটি কৃত্রিম উপগ্রহের আকার ধারণ করতঃ তার কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকে। এসব কৃত্রিম উপগ্রহের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষজ্ঞরা গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছার কৌশল উদ্ভাবন করতে শুরু করেন এবং অবশেষে চন্দ্রে পদার্পন করতে সক্ষম হন। বর্তমান কালের বিজ্ঞানের সব শত্রু-মিত্র এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। এখন পর্যন্ত বার বার চন্দ্রপৃষ্ঠে গমন, সেখানকার মাটি, শিলা ইত্যাদি আনয়ন এবং বিভিন্ন চিত্র সংগ্রহের কাজ অব্যাহত আছে। অন্যান্য গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছার প্রচেষ্টাও হচ্ছে এবং মহাশূন্য পরিক্রমার ও পরিমাপের অনুশীলন চালু রয়েছে।

তন্মধ্যে সাফল্যের সাথে মহাশূন্য ভ্রমণ শেষে প্রত্যাবর্তনকারী মার্কিন নভোচারী জন গ্লেন স্বীয় সাফল্যের প্রতি শত্রু-মিত্র সবারই আস্থা অর্জন করেছেন। তাঁর একটি বিবৃতি আমেরিকার খ্যাতনামা মাসিক 'রিডার্স ডাইজেষ্ট'-এ এবং তার উর্দু অনুবাদ আমরিকা থেকে প্রকাশিত উর্দু মাসিক 'সায়রবীন'-এ বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হল। এ থেকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত হয়। জন গ্লেন তার দীর্ঘ প্রবন্ধে মহাশূন্যের অভিনব বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

এটাই একমাত্র বস্তু, যা মহাশূন্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব নির্দেশ করে এবং একথা বোঝায় যে, এমন কোন শক্তি আছে, যে এগুলোকে কেন্দ্রের সাথে জড়িত রাখে। অতঃপর লিখেন ঃ

এতদসত্ত্বেও মহাশূন্যে পূর্ব থেকেই যে ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রয়েছে, তদ্দৃষ্টে আমাদের প্রচেষ্টা খুবই নগণ্য। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও পরিমাপে মহাশূন্য পরিমাপ অসম্ভব ব্যাপার।

অতঃপর উড়োজাহাজের যান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে লিখেনঃ

কিন্তু একটি নিশ্চিত ও ইন্দ্রিয়বহির্ভূত শক্তি ছাড়া এর ব্যবহার সীমিত ও অনর্থক হয়ে যায়। কেননা, লক্ষ্য অর্জনের জন্যে জাহাজকে গতিপথ নির্দিষ্ট করতে হয়। এ কাজটি কম্পাসের সাহায্যে সমাধা করা হয়। যে শক্তি কম্পাসকে গতিশীল রাখে, সে আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের জন্যে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। একে আমরা দেখতে পারি না, শুনতে পারি না এবং তার ঘ্রাণ নিতে পারি না। অথচ ফলাফলের বিকাশ পরিষ্কার বোঝাতে থাকে যে, এখানে কোন গোপন শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান। অতঃপর সব ভ্রমণ-পরিভ্রমণের ফলাফল হিসেবে লিখেন ঃ খ্রীষ্টধর্মের মূলনীতি ও মতবাদের স্বরূপও ঠিক তাই। যদি আমরা এসব মূলনীতিকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয় যদিও এগুলোকে অনুভব করতে অক্ষম, কিন্তু এই পথপ্রদর্শক শক্তির ফলাফল ও প্রভাব আমরা নিজেদের ও অন্যান্য ভাইদের জীবনে খোলা চোখে দেখতে পারব। এ কারণেই আমরা আমাদের জানার ভিত্তিতে বলি যে, এই সৃষ্টজগতে একটি পথপ্রদর্শক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে।

এ হচ্ছে নভোচারী ও গ্রহবিজয়ীদের লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সারমর্ম। মার্কিন নভোচারীর উপরোক্ত বিবৃতি থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এসব প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সৃষ্টজগতের গোপন রহস্য ও তার স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছা তো দূরের কথা, সীমাহীন ও অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের আবর্তনের কথা জেনে মনের উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায়। তাঁকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এগুলোর পরিমাপ করা অসম্ভব এবং আমাদের সব প্রচেষ্টা এর মোকাবেলায় যৎসামান্য ও নগণ্য। সারকথা এই যে, সৃষ্টজগত, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের এই ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি নয়; বরং কোন মহান ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তির আদেশাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ কথাটিই পয়গম্বরগণ প্রথম পদক্ষেপেই সাধারণ মানুষকে বলে দিয়েছিলেন এবং কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে এর প্রতি বিশ্বাস করার জন্যে আকাশ পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

আপনি দেখলেন, পৃথিবীতে বসে মহাশূন্য, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের তথ্যানুসন্ধান এবং আকার-আকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাকারিগণ যেমন এসব বস্তুর স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি এবং অবশেষে নিজেদের অপারগতা ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছে, তেমনি পৃথিবী থেকে লাখো মাইল উচ্চে ভ্রমণকারী ও চন্দ্রগ্রহের পাথর, মাটি, শিলা ও চিত্র সংগ্রহকারীগণও এসবের স্বরূপ উদঘাটনের ক্ষেত্রে এর চাইতে বেশী সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

এসব তথ্যানুসন্ধান মানব ও মানবতাকে কি দান করেছে? ঃ মানুষের চেষ্টা-সাধনা, চিন্তাগত ক্রমোন্নতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কার নিঃসন্দেহে স্বস্থানে বৈধ ও সাধারণ দৃষ্টিতে প্রশংসার্হও, কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যে ঐন্দ্রজালিকতা দ্বারা মানব ও মানবতার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য-উপকার হয় না, তা চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের কাজ হতে পারে না। দেখা দরকার যে, এই পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত সাধনা এবং কোটি অর্বুদ টাকা, যা অনেক মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্যে যথেষ্ট হত, তার বহ্নুৎসব করে এবং চন্দ্র পৌঁছে সেখানকার মাটি, শিলা, কুড়িয়ে এনে মানব ও মানবতার কি উপকার সাধিত হয়েছে? বিপুল সংখ্যক মানব এখন ক্ষুধায় মরছে, তাদের বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান নেই। এই সাধনা ও প্রচেষ্টা তাদের দারিদ্র্য ও বিপদাপদের কোন সমাধান দিতে পেরেছে কি? অথবা তাদের রোগ-ব্যাধির কবল থেকে মুক্তির কোন ব্যবস্থা করেছে কি? অথবা তাদের জন্যে অন্তরগত শান্তি ও আরামের কোন উপকরণ সংগ্রহ করেছে কি? নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এসব প্রশ্নের জওয়াবে 'না' ব্যতীত কেউ কিছু বলতে পারবে না।

এ কারণেই কোরআন ও সুন্নাহ্ মানুষকে এমন নিষ্ফল কাজে লিপ্ত করা থেকে বিরত থাকে এবং কেবল দু'টি দিকের প্রতি লক্ষ্য করে মানুষকে সৃষ্টজগত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত দেয়। প্রথম, মানুষ যাতে এসব অত্যাশ্চর্য প্রভাবাদি দেখে সত্যিকার প্রভাব সৃষ্টিকারীও ইন্দ্রিয় বহির্ভূত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে, যে শক্তি এই ব্যবস্থার পরিচালক। তারই নাম আল্লাহ্। দ্বিতীয়, আল্লাহ্ তাআলা মানুষের উপকারের জন্যে পৃথিবীতে ও আকাশে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু গচ্ছিত রেখেছেন। মানুষের কাজ এই যে, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা সাধনার সাহায্যে এসব বস্তুকে ভূপৃষ্ঠের গোপন ভাণ্ডার থেকে বের করা এবং ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা করা। প্রথম দিকটি আসল লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় দিকটি নিছক প্রয়োজন মেটানোর জন্যে—কাজেই দ্বিতীয় পর্যায়ের। তাই এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মনোনিবেশ পছন্দনীয় নয়। সৃষ্টজগত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার এ দু'টি দিকই মানুষের জন্যে যেমন সহজ, তেমনি ফলপ্রসূ। এগুলোর ফলাফল সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে কোন মতভেদও নেই। তাদের সব মতভেদ সৌরজগত এবং গ্রহ-উপগ্রহের আকার-আকৃতি ও স্বরূপের সাথে সম্পৃক্ত। কোরআন এগুলোকে অনাবশ্যক ও অর্জনের অযোগ্য সাব্যস্ত করে বাদ দিয়েছে। মিসরের মুফতী আল্লামা নজীত তাঁর গ্রন্থ 'তওফীকুর রহমান'-এ সৌর বিজ্ঞানকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। একভাগ, গুণগত যা আকাশস্থ উপগ্রহের গতি ও হিসাব সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ভাগ কার্যগত, যা এসব হিসাব জানার উপযোগী প্রাচীন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত। তৃতীয়ভাগ পদার্থগত, যা সৌরজগত ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার-আকৃতি এবং স্বরূপ সম্পর্কিত। তিনি আরও লিখেন, প্রথমোক্ত দুই প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ নেই বললেই চলে। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য সত্ত্বেও অধিকাংশ ফলাফলে সবাই একমত। তাদের ঘোর মতভেদ কেবল তৃতীয় ভাগে সীমিত।

চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রথমোক্ত দুই প্রকারই মানুষের প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। তৃতীয় প্রকার যেমন অনাবশ্যক, তেমনি সুকঠিন। এ কারণেই কোরআন সুন্নাহ্ এবং সাধারণভাবে পয়গম্বরও এই তৃতীয় প্রকারের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করেননি।

এই বিশদ বর্ণনার সারমর্ম এই যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব, তওহীদ ও তাঁর অদ্বিতীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশে সৌরজগত, শূন্য পরিমণ্ডল ও ভূজগত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হুবহু কোরআনের উদ্দেশ্য। কোরআন যত্রতত্র এর প্রতি দাওয়াত দেয়। এসব বস্তুর সাথে মানুষের অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে, এদিক দিয়ে এসব বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করাও প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত কোরআনের উদ্দেশ্য। কোরআন এর প্রতিও দাওয়াত দেয়। তবে উভয় দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য। তা এই যে, কেউ যেন অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদিকেই আসল লক্ষ্য স্থির করে তাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে না পড়ে ; বরং বর্তমান জীবনকে আসল জীবনের পানে একটি সফর সাব্যস্ত করে তদনুযায়ী তাতে লিপ্ত হয়। তৃতীয় দিকটি যেহেতু মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং তা অর্জন সুকঠিনও, তাই কোরআন তাতে জীবন পাত করা থেকে বিরত থাকার

প্রতি ইঙ্গিত করে। এ থেকে আরো বোঝা গেল যে, বর্তমান বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতি ও তথ্যানুসন্ধানকে হুবহু কোরআনের উদ্দেশ্য মনে করা ভুল। কিছুসংখ্যক আধুনিকপন্থী আলেম তাই মনে করেন। এমনিভাবে কোরআনকে এগুলোর বিরোধী বলাও ভ্রান্ত। কিছুসংখ্যক রক্ষণশীল আলেম তাই বলেন। সত্য এই যে, কোরআন এসব বিষয় বর্ণনা করার জন্যে আগমন করেনি। কোরআনের আলোচ্য বিষয় তা নয়। মানুষের জন্যে এগুলো অর্জন করা সহজ নয় এবং মানুষের প্রয়োজনের সাথে এর কোন সম্পর্কও নেই। কোরআন এসব ব্যাপারে নিশ্চুপ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন কিছু প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে কোরআনের পরিপন্থী বলা শুদ্ধ নয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌঁছা, বসবাস করা, সেখানকার খনিজ দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া ইত্যাদি কোন বিষয় প্রমাণিত হয়ে গেলে তা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই এবং যে পর্যন্ত প্রমাণিত না হয়, অনর্থক তা নিয়ে ধ্যান-ধারণার জাল বোনা এবং তাতে জীবনপাত করে দেয়াও কোন বুদ্ধিমত্তা নয়।

সূরা আল-ফোরকানের বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেসালত ও নবুওয়তের প্রমাণ এবং এতদসম্পর্কে কাফের ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জওয়াব। এতে কাফের মুশরিক এবং নির্দেশাবলী অমান্যকারীদের শাস্তির প্রসঙ্গও উল্লেখিত হয়েছে। সূরার শেষ প্রান্তে আল্লাহ্ তাআলা সেই বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা রেসালতে পূর্ণরূপে বিশ্বাসী এবং যাদের বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, অভ্যাস সব আল্লাহ্ ও রসূলের ইচ্ছার অনুসারী ও শরীয়তের নির্দেশাবলীর সাথে সুসামঞ্জস্য।

কোরআন পাক এমন বিশেষ বান্দাদেরকে 'ইবাদুর রহমান'—রহমানের বান্দা উপাধি দান করেছে। এটা তাদের জন্যে সর্ববৃহৎ সম্মান। এমনিতে তো সমগ্র সৃষ্ট- জীবই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহ্র দাস এবং তাঁর ইচ্ছার অনুসারী। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কিছু বলতে পারে না; কিন্তু এখানে দাসত্ব বলে আইনগত ও ইচ্ছাগত দাসত্ব বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, স্বেচ্ছায় নিজের অস্তিত্ব, নিজের সমস্ত কামনা-বাসনা ও কর্মকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুগামী করে দেয়া, এ ধরনের বিশেষ বান্দাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা 'নিজের বান্দা' অভিহিত করে সম্মান দান করেছেন এবং সূরার শেষ পর্যন্ত তাদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। মাঝখানে কুফর ও গোনাহ্ থেকে তওবা ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

এখানে বিশেষ বান্দাদেরকে 'নিজের বান্দা' বলে সম্মানসূচক উপাধি-দান করা উদ্দেশ্য ছিল ; কিন্তু নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলার সুন্দর নামসমূহ ও গুণবাচক বিশেষণাবলীর মধ্য থেকে এখানে শুধু 'রহমান' শব্দকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবতঃ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস ও গুণাবলী আল্লাহ্ তাআলার রহমান (দয়াময়) গুণের ভাষ্যকার ও প্রতীক হওয়া উচিত।

আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলী ও আলামতঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্র বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস সংশোধন, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ্ ও রসূলের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রকারভেদ, দিবারাত্রি এবাদত পালনের সাথে আল্লাহ্ভীতি যাবতীয় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয়বস্তু শামিল আছে।

তাদের সর্বপ্রথম গুণ عِبَادُ হওয়া। عِبَادُ শব্দটি عبد এর বহুবচন। অর্থ বান্দা, দাস; যে তার প্রভুর মালিকানাধীন এবং যার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়াকর্ম প্রভুর আদেশ ও মর্জির উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ্ তাআলার বান্দা কথিত হওয়ার যোগ্য সে ব্যক্তি হতে পারে, যে তার বিশ্বাস, চিন্তাধারা, প্রত্যেক ইচ্ছা ও আকাঙ্খা এবং প্রত্যেকটি আচরণ ও স্থিরতাকে পালনকর্তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং যখন যে আদেশ হয়, তা পালনের জন্যে সদা উৎকর্ণ থাকে।

দ্বিতীয় গুণ ঃ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا -অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে। هون শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাম্ভীর্য, বিনয় অর্থাৎ, গর্বভরে না চলা, অহংকারীর ন্যায় পা না ফেলা। খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুন্নতবিরোধী। শামায়েলের হাদীস থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খুব ধীরে চলতেন না; বরং কিছুটা দ্রুতগতিতে চলতেন। হাদীসের ভাষা এরূপ, كانما الارض تطوى له -অর্থাৎ চলার সময় পথ যেন তাঁর জন্যে কুঞ্চিত হত। — (ইবনে কাসীর) এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার আলামত হওয়ার কারণে মকরূহ্ সাব্যস্ত করেছেন। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি অসুস্থ? সে বলল ঃ না। তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তিসহকারে চলার আদেশ দিলেন। — (ইবনে কাসীর)

হযরত হাসান বসরী يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا -আয়াতের তফসীরে বলেন, খাঁটি মুমিনদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা আল্লাহ্র সামনে হীন ও অক্ষম হয়ে থাকে। অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে দেখে অপারগ ও পঙ্গু মনে করে; অথচ তারা রুগ্নও নয় এবং পঙ্গুও নয়; বরং সুস্থ ও সবল। তবে তাদের উপর আল্লাহ্ ভীতি প্রবল, যা অন্যদের উপর নেই। তাদেরকে পার্থিব কাজকর্ম থেকে পরকালের চিন্তা নিবৃত্ত রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার কাজেই ব্যাপৃত, সে সর্বদা দুঃখই দুঃখ ভোগ করে। কারণ, সে তো দুনিয়া পুরোপুরি পায় না এবং পরকালের কাজে অংশগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি পানাহারের বস্তুর মধ্যেই আল্লাহ্র নেয়ামত সীমিত মনে করে এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, তার জ্ঞান খুবই অল্প এবং তার জন্যে শাস্তি তৈরী রয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

তৃতীয় গুণ ঃ وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا অর্থাৎ, যখন অজ্ঞতাসম্পন্ন লোক তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে, সালাম। এখানে جاهلون শব্দের অনুবাদ 'অজ্ঞতাসম্পন্ন' করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এর অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয়; বরং যারা মূর্খতার কাজ ও মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্বানও বটে। সালাম শব্দ বলে এখানে প্রচলিত সালাম বোঝানো হয়নি; বরং নিরাপত্তার কথাবার্তা বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী নাহ্হাস থেকে বর্ণনা করে যে, এখানে سلام শব্দটি تسليم থেকে নয়; বরং تسلم থেকে উদ্ভূত ; যার অর্থ নিরাপদ থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খদের জওয়াবে তারা নিরাপত্তার কথাবার্তা বলে, যাতে অন্যেরা কষ্ট না পায় এবং তারা নিজেরা গোনাহ্গার না হয়। হযরত মুজাহিদ, মোকাতিল প্রমুখ থেকে এই তফসীরই বর্ণিত আছে। -(মাযহারী)

চতুর্থ গুণ ঃ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا অর্থাৎ তারা রাত্রি

যাপন করে তাদের পালনকর্তার সামনে সেজদা করা অবস্থায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায়। এবাদতের রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ সময়টি নিদ্রা ও আরামের। এতে নামায ও এবাদতের জন্যে দণ্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোকদেখানো ও নামযশের আশংকাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিবারাত্রি আল্লাহ্‌র এবাদতে মশগুল থাকে। দিবাভাগে শিক্ষাদান, প্রচার, জেহাদ ইত্যাদি কাজ থাকে এবং রাত্রিকালে আল্লাহ্‌র সামনে এবাদত করে। হাদীসে তাহাজ্জুদের নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী হযরত আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়। কেননা, এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সব নেক বান্দার অভ্যাস ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য দানকারী, মন্দ কাজের কাফ্‌ফারা এবং গোনাহ থেকে নিবৃত্তকারী।—(মাযহারী)

হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, যে ব্যক্তি এশার পর দুই অথবা ততোধিক রাকআত পড়ে নেয়, সেও তাহাজ্জুদের ফযীলতের অধিকারী بات لله ساجدا وقائما — (মাযহারী, বগভী)। হযরত ওসমান গণীর জবানী রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করে, সে যেন অর্ধ রাত্রি এবাদতে অতিবাহিত করল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করে তাকে অবশিষ্ট অর্ধেক রাত্রিও এবাদতে অতিবাহিতকারী গণ্য করা হবে।

—(আহমদ, মুসলিম, মাযহারী)

পঞ্চম গুণ ঃ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ — অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণ দিবারাত্রি এবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না; বরং সর্বদা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং আখেরাতের চিন্তায় থাকে, যদ্দরুন কার্যতঃ চেষ্টাও অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহ্‌র কাছে দোয়াও করতে থাকে।

ষষ্ঠ গুণ ঃ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا — অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা ও ক্রটিও করে না বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে। আয়াতে اسراف এবং এর বিপরীতে اقتار শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

اسراف — এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরীয়তের পরিভাষায় হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ্ ইবনে জুরায়জের মতে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করা اسراف তথা অপব্যয়; যদিও তা এক পয়সা হয়। কেউ কেউ বলেন, বৈধ ও অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, تبذير তথা অনর্থক ব্যয় কোরআনের আয়াত দ্বারা হারাম ও গোনাহ্। আল্লাহ্ বলেন اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ -এদিক দিয়ে এই তফসীরের সারমর্মও হযরত ইবনে-আব্বাস প্রমুখের তফসীরের অনুরূপ হয়ে যায়; অর্থাৎ, গোনাহ্‌র কাজে যা-ই করা হয়, তা অপব্যয়।—(মাযহারী)

اقتار শব্দের অর্থ ব্যয়ে ক্রটি ও কৃপণতা করা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ যেসব কাজে আল্লাহ্ ও রসূল ব্যয় করার আদেশ দেন, তাতে কম ব্যয় করা। (সুতরাং মোটেই ব্যয় না করা উত্তমরূপে এর অন্তর্ভুক্ত হবে।) এই তফসীরও হযরত ইবনে-আব্বাস, কাতাদাহ্ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।—(মাযহারী) আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের গুণ এই যে, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ক্রটির মাঝখানে সততা ও মিতাচারের পথ অনুসরণ করে।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, **من فقه الرجل قصده فى معيشته** অর্থাৎ, ব্যয় করতে গিয়ে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।—(আহ্‌মদ, ইবনে-কাসীর)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণিত অপর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ ما عال من اقتصد — অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা ও সমতার উপর কায়েম থাকে, সে কখনও ফকীর ও অভাবগ্রস্ত হয় না।—(আহমদ, ইবনে-কাসীর)

সপ্তম গুণ ঃ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ -পূর্বোক্ত ছয়টি গুণের মধ্যে আনুগত্যের মূলনীতি এসে গেছে। এখন গোনাহ্ ও অবাধ্যতার প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ, তারা এবাদতে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে না এতে জানা গেল যে, শিরক সর্ববৃহৎ গোনাহ্।

অষ্টম গুণ ঃ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ এখান থেকে কার্যগত গোনাহসমূহের মধ্যে কতিপয় প্রধান ও কঠোর গোনাহ্ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা এসব গোনাহ্‌র কাছে যায় না। তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না। বিশ্বাস ও কর্মের এই তিনটি বড় গোনাহ্ বর্ণনা করার পর আয়াতে এরশাদ হচ্ছে, وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا -অর্থাৎ, যে ব্যক্তি উল্লেখিত গোনাহ্‌সমূহ করবে, সে তার শাস্তি ভোগ করবে। এ স্থলে আবু উবায়দা اثام শব্দের তফসীর করেছেন গোনাহ্‌র শাস্তি। কেউ কেউ বলেন ঃ اثام জাহান্নামের একটি উপত্যাকার নাম, যা নির্মম শাস্তিতে পূর্ণ। কোন কোন হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।—(মাযহারী)

يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۝٦٩ اِلَّا مَنْ
تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ
حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٧٠ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ۝٧١ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَ
اِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ۝٧٢ وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ
يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ۝٧٣ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا
مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۝٧٤
اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۝٧٥
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝٧٦ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ
رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ۝٧٧

سُوْرَةُ الشُّعَرَاۗءِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مِائَتَانِ وَسَبْعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّاِحْدٰى عَشَرَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمّٓ ۝١ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ
نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝٣ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ
مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ۝٤

(৬৯) কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। (৭০) কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৭১) যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে। (৭২) এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়। (৭৩) এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বোঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না। (৭৪) এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর। (৭৫) তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। (৭৬) তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উত্তম! (৭৭) বলুন, আমার পালনকর্তা পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাঁকে না ডাক। তোমরা মিথ্যা বলেছ। অতএব সত্বর নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি।

সূরা আশ-শো'আরা

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২২৭ আয়াত

আল্লাহ্র নামে শুরু, যিনি পরম মেহেরবান, অপরিসীম দয়ালু।

(১) ত্বা, সীন, মীম। (২) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবেন। (৪) আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে আকাশ থেকে তাদের কাছে কোন নিদর্শন নাযিল করতে পারি। অতঃপর তারা এর সামনে নত হয়ে যাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অতঃপর উল্লেখিত অপরাধসমূহ যারা করে, তাদের শাস্তি বর্ণিত হচ্ছে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনাধারা থেকে একথা নির্দিষ্ট যে, এই শাস্তি বিশেষভাবে কাফেরদের হবে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। কেননা, প্রথমে তো يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ কথাটি মুসলমান গোনাহ্গারদের জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ, তাদের এক গোনাহের জন্যে একই শাস্তি কোরআন ও হাদীসে উল্লেখিত আছে। শাস্তির অবস্থাগত অথবা পরিমাণগত বৃদ্ধি মুমিনদের জন্যে হবে না। এটা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য কুফরের যে শাস্তি, যদি কাফের ব্যক্তি কুফরের সাথে অন্য পাপও করে, তবে সেই শাস্তি দ্বিগুণ হয়ে যাবে দ্বিতীয়তঃ এই শাস্তি সম্পর্কে আয়াতে وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا কথাটিও বলা হয়েছে ; অর্থাৎ, তারা চিরকাল এই আযাবে লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে। কোন মুমিন চিরকাল আযাবে থাকবে না। মুমিন যত বড় পাপই করুক, পাপের শাস্তি ভোগ করার পর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে। মোটকথা এই যে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে, অর্থাৎ, কঠোরও হবে এবং চিরস্থায়ীও হবে। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যাদের শাস্তির কথা এখানে বলা হল, এরূপ কঠোর অপরাধী যদি তওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে সৎকর্ম করতে থাকে, তবে আল্লাহ্ তাআলা তাদের মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তওবার পর তাদের আমলনামায় পুণ্য থেকে যাবে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা এই যে, শিরক ও কুফর অবস্থায় যত পাপই করা হোক না কেন, তওবা করতঃ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সেসব বিগত পাপ মাফ হয়ে যাবে। কাজেই অতীতে তাদের আমলনামা যদিও গোনাহ্ ও মন্দ কর্মে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এখন ঈমান গ্রহণ করার কারণে সেগুলো সব মাফ হয়ে গেছে এবং গোনাহ্ ও মন্দ কর্মের স্থান ঈমান ও সৎকর্ম দখল করে নিয়েছে। মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করার এই তফসীর হযরত ইবনে-আব্বাস, হাসান বসরী, সায়ীদ ইবনে জুবায়র, মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا — ব্যবহৃত ঃ এটা পূর্বোক্ত اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا বাক্যে বিধৃত বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি। কুরতুবী কাফফাল থেকে বর্ণনা করেন যে, এই তওবা পূর্বোক্ত তওবা থেকে ভিন্ন ও আলাদা। কারণ, প্রথমটি ছিল কাফের ও মুশরিকদের তওবা, যারা হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়েছিল, এরপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ফলে তাদের মন্দ কর্মসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেয়া হয়। এখন মুসলমান পাপীদের তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই প্রথমোক্ত তওবার সাথে وَاٰمَنَ অর্থাৎ, বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় তওবায় তার উল্লেখ নেই। এতে বোঝা যায় যে, এটা তাদের তওবা, যারা পূর্ব থেকে মুমিনই ছিল ; কিন্তু অনবধানতাবশতঃ হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এরূপ লোক তওবা করার পর যদি মৌখিক তওবা করেই ক্ষান্ত না হয়, বরং ভবিষ্যতের জন্যে তাদের কর্মও সংশোধন করে, তবে তাদের তওবাকে বিশুদ্ধ ও সঠিক মনে করা হবে। এ

কারণেই শর্ত হিসেবে তওবার প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করার পর তার জওয়াবে শুধু يَتُوبُ উল্লেখ করা শুদ্ধ হয়েছে। কেননা, শর্তে শুধু মৌখিক তওবার উল্লেখ আছে এবং জওয়াবে যে তওবা উল্লেখিত হয়েছে, তা সৎকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি তওবা করে, অতঃপর সৎকর্ম দ্বারাও তওবার প্রমাণ দেয়, তাকে বিশুদ্ধরূপে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মনে করা হবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অতীত গোনাহ্ থেকে তওবা তো করে ; কিন্তু ভবিষ্যত ক্রিয়াকর্মে এর কোন প্রমাণ দেয় না, তার তওবা যেন তওবাই নয়। আয়াতের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার এই যে, যে মুসলমান অনবধানতাবশতঃ পাপে লিপ্ত হয়, অতঃপর তওবা করে এবং তওবার পর কর্মও এমন করে, যদ্দারা তওবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এ তওবাও আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হবে এবং বাহ্যতঃ এর উপকারিতাও তাই হবে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তার মন্দ-কাজকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেয়া হবে।

আল্লাহ্‌র বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা চলছিল। মাঝখানে পাপের পর তওবা করার বিধানা-বলী বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর পুনরায় অবশিষ্ট গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে।

দশম গুণ : وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ -অর্থাৎ, তারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে না। সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিল তো শেরক ও কুফর। এরপর সাধারণ পাপ কর্ম মিথ্যা কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রিয় বান্দাগণ এরূপ মজলিসে যোগদান করা থেকেও বিরত থাকে। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, এর অর্থ মুশরিকদের ঈদ, মেলা ইত্যাদি। হযরত মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বলেন, এখানে গান -বাজনার মাহফিল বোঝানো হয়েছে। আমর ইবনে-কায়েম বলেন, নির্লজ্জতা ও নৃত্যগীতের মাহফিল বোঝানো হয়েছে। যুহরী ও ইমাম মালেক বলেন, মদ্যপান করা ও করানোর মজলিস বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে-কাসীর) সত্য এই যে, এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এগুলো সবই মিথ্যা ও বাতিল মজলিস। আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের এরূপ মজলিস পরিহার করে থাকা উচিত। কেননা, ইচ্ছা করে বাজে ও বাতিল কর্ম দেখা ও তাতে যোগদান করার সমপর্যায়ভুক্ত।—(মাযহারী) কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতের يَشْهَدُونَ শব্দটিকে شهادة অর্থাৎ, সাক্ষ্য দেয়ার অর্থে নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। মিথ্যা সাক্ষ্য যে মহাবিপদ ও কবীরা গোনাহ্, তা কোরআন ও সন্নতে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। বোখারী ও মুসলিমে হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মিথ্যা সাক্ষ্যকে সর্ববৃহৎ কবীরা গোনাহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা দরকার। এছাড়া তার মুখে চুন-কালি মেখে বাজারে ঘুরিয়ে লাঞ্ছিত করা দরকার। এরপর দীর্ঘদিন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন।—(মাযহারী)

একাদশ গুণ : وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا -অর্থাৎ, যদি অনর্থক ও বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে তারা ঘটনাক্রমে কোনদিন গমন করে, তবে গাম্ভীর্য ও ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের মজলিসে তারা যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে যোগদান করে না, তেমনি যদি ঘটনাচক্রে তারা এমন মজলিসের কাছ দিয়েও গমন করে, তবে পাপাচারের এসব মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে যায়। অর্থাৎ, মজলিসের কাজকে মন্দ ও ঘৃণার্হ জানা সত্ত্বেও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজেদেরকে তাদের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অহংকারে লিপ্ত হয় না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একদিন ঘটনাক্রমে বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে গমন করেন। তিনি সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যান। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একথা জানতে পেরে বললেন, ইবনে মাসউদ করীম অর্থাৎ, ভদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, যাতে অনর্থক মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকদের ন্যায় চলে যাওয়ার নির্দেশ আছে।— (ইবনে-কাসীর)

দ্বাদশ গুণ : وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا — অর্থাৎ, এই প্রিয় বান্দাগণকে যখন আল্লাহ্ আয়াত ও আখেরাতের কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না ; বরং শ্রবণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে। অনবধান ও বোকা লোকদের ন্যায় এরূপ আচরণ করে না যে, তারা যেন শোনেইনি কিংবা দেখেইনি। এই আয়াতে দু'টি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। (এক) আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের উপর পতিত হওয়া অর্থাৎ, গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা। এটা প্রশংসনীয়, কাম্য ও বিরাট পুণ্য কাজ। (দুই) অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া ; অর্থাৎ, কোরআনের আয়াতসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বটে, কিন্তু আমলের ব্যাপারে এমন করা যেন শোনেইনি ও দেখেইনি অথবা আমলও করা হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা তাবেয়িগণের মতামতের খেলাফ নিজের মতে কিংবা জনশ্রুতির অনুসরণে ভ্রান্ত আমল করা। এটাও এক রকম অন্ধ-বধির হয়েই পতিত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

শরীয়তের বিধানাবলী পাঠ করাই যথেষ্ট নয় : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র আয়াতের প্রতি মনোনিবেশই না করা এবং অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করার যেমন নিন্দা করা হয়েছে ; তেমনি না বুঝে, না শুনে নিজের মতামতের উপর ভিত্তি করে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে মনোনিবেশ করা এবং আমল করারও নিন্দা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে-আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত শা'বীকে জিজ্ঞেস করেন, যদি আমি এমন কোন মজলিসে উপস্থিত হই, যেখানে সবাই সেজদারত আছে এবং আমি জানি না, এটা কোন্ প্রকার সেজদা, তবে আমিও কি তাদের সাথে সেজদায় শরীক হয়ে যাব? হযরত শা'বী বললেন, না। না বুঝে না শুনে কোন কাজে লেগে যাওয়া মুমিনের জন্যে বৈধ নয় ; বরং বুঝে-শুনে আমল করা তার জন্যে জরুরী। তুমি যখন সেজদার সেই আয়াতটি শোননি, যার ভিত্তিতে তারা সেজদা করছে এবং তুমি তাদের সেজদার স্বরূপও জান না, তখন এভাবে তাদের সাথে সেজদায় শরীক হয়ে যাওয়া জায়েয নয়।

ত্রয়োদশ গুণ : وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا — এতে নিজ সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করা হয়েছে যে, তাদেরকে আমার জন্যে চোখের শীতলতা স্বরূপ করে দিন। চোখের শীতলতা করার উদ্দেশ্য হযরত হাসান বসরীর তফসীর অনুযায়ী তাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে মশগুল দেখা। একজন মানুষের জন্য এটাই চোখের শীতলতা। যদি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়, তবে তাও দুরস্ত।

এখানে এই দোয়া দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না ; বরং তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরও আমল সংশোধন এবং চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টারই অংশ হিসেবে তাদের সৎকর্ম পরায়ণতার জন্যে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেন। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে দোয়ার এই অংশটিও প্রনিধানযোগ্য وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا আমাদেরকে মুত্তাকীগণের নেতা ও ইমাম করে দিন। এতে বাহ্যতঃ নিজের জন্যে জাঁকজমক, পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দোয়া আছে, যা কোরআনের অন্যান্য আয়াতদৃষ্টে নিষিদ্ধ, যেমন এক আয়াতে আছেঃ تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا -অর্থাৎ আমি পরকালের গৃহ তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা ভূপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে না এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। তাই কোন কোন আলেম এই আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের ইমাম ও নেতা স্বাভাবিকভাবে হয়েই থাকে। কাজেই এই দোয়ার সারমর্ম এই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে মুত্তাকী করে দিন। তারা মুত্তাকী হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তি মুত্তাকীগণের ইমাম ও নেতা কথিত হবেন। সুতরাং এখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দোয়া করা হয়নি ; বরং সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরকে মুত্তাকী করার দোয়া করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম নাখয়ী বলেন, এই দোয়ায় নিজের জন্যে কোন সরদারী ও নেতৃত্ব প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয় ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমাদেরকে এরূপ যোগ্য করে দিন, যাতে মানুষ ধর্ম ও আমলে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল দ্বারা তারা উপকৃত হয়। ফলে আমরা এর সওয়াব পাব। হযরত মকহুল শামী বলেন, দোয়ার উদ্দেশ্য নিজের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতির এমন উচ্চস্তর অর্জন করা, যদ্দ্বারা মুত্তাকীগণ লাভবান হয়। কুরতুবী উভয় উক্তি বর্ণনা করার পর বলেন, উভয় উক্তির সারকথা একই ; অর্থাৎ, যে সরদারী ও নেতৃত্ব ধর্ম ও পরকালের উপকারার্থে তলব করা হয়, তা নিন্দনীয় নয়—জায়েয। পক্ষান্তরে। لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا আয়াতে সেই সরদারী ও নেতৃত্বেই নিন্দা করা হয়েছে, যা পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের নিমিত্ত হয়। والله اعلم এ পর্যন্ত 'ইবাদুর রহমান' অর্থাৎ, কামেল মুমিনদের প্রধান গুণাবলীর বর্ণনা সমাপ্ত হল। অতঃপর তাদের প্রতিদান ও পরকালীন মর্তবার বিষয় বর্ণিত হচ্ছে।

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ - غرفة -শব্দের আভিধানিক অর্থ বালাখানা তথা উপরতলার কক্ষ। বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ এমন বালাখানা পাবে, যা সাধারণ জান্নাতীগণের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে তারকা-নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়।—(বোখারী, মুসলিম, মাযহারী) মুসনাদ আহমদ, বায়হাকী, তিরমিযী ও হাকিমে হযরত আবু মালেক আশআরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, জান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) এসব কক্ষ কাদের জন্যে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নম্র ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে, ক্ষুধার্তকে আহার করায় এবং রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে।—(মাযহারী)

وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا -অর্থাৎ, জান্নাতের অন্যান্য নেয়ামতের সাথে তারা এই সম্মানও লাভ করবে যে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে মোবারকবাদ জানাবে এবং সালাম করবে। এ পর্যন্ত খাঁটি মুমিনদের বিশেষ অভ্যাস, কর্ম ও এ সবের প্রতিদান ও সওয়াবের আলোচনা ছিল। শেষ আয়াতে পুনর্বার কাফের ও মুশরিকদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّىْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ — এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে অনেক উক্তি আছে। উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে যা লিখিত হয়েছে, তাই অধিক স্পষ্ট ও সহজ। তা এই যে, আল্লাহ্র কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব থাকত না যদি তোমাদের পক্ষ থেকে তাকে ডাকা ও তাঁর এবাদত করা না হত। কেননা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহ্র এবাদত করা। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ — অর্থাৎ, আমি মানব ও জিনকে আমার এবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি। এ হচ্ছে একটি সাধারণ বিধির বর্ণনা যে, এবাদত ব্যতীত মানুষের কোন মূল্য, গুরুত্ব ও সম্মান নেই। এরপর রেসালত এবং এবাদতে অবিশ্বাসী কাফের ও মুশরিকদেরকে বলা হয়েছেঃ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ — অর্থাৎ, তোমরা সবকিছুকে মিথ্যাই বলে দিয়েছ। এখন আল্লাহ্র কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব নেই।

فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا -অর্থাৎ, এখন এই মিত্যারোপ ও কুফর তোমাদের কণ্ঠহার হয়ে গেছে। তোমাদেরকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাবে লিপ্ত না করা পর্যন্ত এটা তোমাদের সাথে থাকবে।

সূরা আশ্-শোআরা

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ - بَاخِعٌ শব্দটি بخع থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ যবেহ্ করতে করতে বিখা' (গর্দানের একটি শিরা) পর্যন্ত পৌঁছা। এখানে অর্থ হলো নিজেকে কষ্ট ও ক্লেশে পতিত করা। আল্লামা আসকারী বলেন, এ ধরনের স্থানে বাক্যের আকার খবরবোধক হলেও প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য, নিষেধ করা। অর্থাৎ, হে পয়গম্বর, স্বজাতির কুফর ও ইসলামের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন দেখে দুঃখ ও বেদনায় আত্মঘাতী হবেন না। এই আয়াত থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, ভাগ্যে ঈমান নেই—কোন কাফের সম্পর্কে এরূপ জানা গেলেও তার কাছে ধর্ম প্রচারে বিরত হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ জানা গেল যে, ক্লেশ স্বীকারে সমতা দরকার। যে ব্যক্তি হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকে তার জন্যে অধিক দুঃখ না করা উচিত।

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ

আল্লামা যমখশরী বলেন, আসল বাক্য হচ্ছে فظلوا لها خاضعين অর্থাৎ, কাফেররা এই বড় নিদর্শন দেখে অনুগত ও নত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে বিনয়ের স্থান প্রকাশ করার উদ্দেশে اعناق (গর্দান) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, নত হওয়া ও বিনয়ী হওয়ার ভাব সর্বপ্রথম গর্দানে প্রকাশ পায়। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, আমি নিজ তওহীদ ও কুদরতের এমন

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ
مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ
زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨﴾
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ
ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ
إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي
فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾
قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ
فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾
قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾
وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَا
إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي
رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ
أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾

(৫) যখনই তাদের কাছে রহমান–এর কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) অতএব তারা তো মিথ্যারোপ করেছেই; সুতরাং যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা–বিদ্রূপ করত, তার যথার্থ স্বরূপ শীঘ্রই তাদের কাছে পৌছবে। (৭) তারা কি ভূপৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? আমি তাতে সর্বপ্রকার বিশেষ–বস্তু কত উদ্গত করেছি! (৮) নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (৯) আপনার পালনকর্তা তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু। (১০) যখন আপনার পালনকর্তা মূসাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিকট যাও; (১১) ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট; তারা কি ভয় করে না? (১২) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে দেবে। (১৩) এবং আমার মন হতবল হয়ে পড়ে এবং আমার জিহ্বা অচল হয়ে যায়। সুতরাং হারূনের কাছে বার্তা প্রেরণ করুন! (১৪) আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ আছে। অতএব আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (১৫) আল্লাহ্ বলেন, কখনই নয়, তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে। আমি তোমাদের সাথে থেকে শোনব। (১৬) অতএব তোমরা ফেরআউনের কাছে যাও এবং বল, আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রসূল। (১৭) যাতে তুমি বনী–ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও। (১৮) ফেরআউন বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন–পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। (১৯) তুমি সেই—তোমরা অপরাধ যা করবার করেছ। তুমি হলে কৃতঘ্ন। (২০) মূসা বলল, আমি সে অপরাধ তখন করেছি, যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম। (২১) অতঃপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম। এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে পয়গম্বর করেছেন। (২২) আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, তা এই যে, তুমি বনী–ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ। (২৩) ফেরাউন বলল, বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কি?

কোন নিদর্শন প্রকাশ করতেও সক্ষম, যাতে শরীয়তের নির্দেশাবলী ও খোদায়ী স্বরূপ জাজ্বল্যমান হয়ে সামনে এসে যায় এবং কারো পক্ষে অস্বীকার করার যো না থাকে। কিন্তু এসব নির্দেশ ও তত্ত্ব জাজ্বল্যমান না হওয়া বরং চিন্তা–ভাবনার উপর নির্ভরশীল থাকাই রহস্যের দাবী। চিন্তা–ভাবনাই মানুষের পরীক্ষা এবং এর ভিত্তিতেই সওয়াব ও আযাব বর্তিত। জাজ্বল্যমান বিষয়সমূহকে স্বীকার করা তো একটি স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। এতে এবাদত ও আনুগত্যের শান নেই।— (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

زَوْجٍ كَرِيمٍ – زَوْجٌ এর শাব্দিক অর্থ যুগল। এ কারণেই পুরুষ ও স্ত্রী, নর ও নারীকে زَوْجٌ বলা হয়। অনেক বৃক্ষের মধ্যেও নর ও নারী থাকে; সেগুলোকে এদিক দিয়ে زَوْجٌ বলা যায়। কোন সময় এ শব্দটি বিশেষ প্রকার ও শ্রেণীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ হিসেবে বৃক্ষের প্রত্যেক প্রকারকে زَوْجٌ বলা যায়। كَرِيمٍ শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় বস্তু।

আনুগত্যের জন্যে সহায়ক উপকরণ প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয় ঃ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন আদেশ পালনের ব্যাপারে কোন সহায়ক বস্তু প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয়; বরং বৈধ। যেমন মূসা (আঃ) আল্লাহ্র আদেশ পেয়ে তার বাস্তবায়ন সহজ ও ফলপ্রসূ করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কাজেই এখানে একথা বলা ভুল হবে যে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্র আদেশকে নির্দিধায় শিরোধার্য করে নিলেন না কেন এবং দেরী করলেন কেন? কারণ, মূসা (আঃ) যা করেছেন, তা আদেশ পালনেরই পর্যায়ে করেছেন।

হযরত মূসা (আঃ) এর জন্যে ضلال শব্দের অর্থ ঃ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ তুমি এক কিবতীকে হত্যা করেছিলে ফেরআউনের এই অভিযোগের জওয়াবে মূসা (আঃ) বললেন, ঃ হাঁ, আমি হত্যা অবশ্যই করেছিলাম; কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ছিল না; বরং কিবতীকে তার ভুল বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে ঘুষি মেরেছিলাম যার ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সারকথা এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড নবুওয়তের পরিপন্থী। আর এ হত্যাকাণ্ড অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই এখানে ضلال শব্দের অর্থ অজ্ঞাত তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে কিবতীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া। হযরত কাতাদাহ্ ও ইবনে যায়দের রেওয়ায়েত থেকে এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। আরবী ভাষায় ضلال শব্দের অর্থ একাধিক এবং সর্বত্রই এর অর্থ পথভ্রষ্টতা হয় না। এখানেও এর অনুবাদ 'পথভ্রষ্ট' করা ঠিক নয়।

মহিমান্বিত আল্লাহর সত্তা ও স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা মানুষের জন্যে সম্ভবপর নয় ঃ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিমান্বিত আল্লাহ্র স্বরূপ জানা সম্ভবপর নয়। কারণ, ফেরআউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহ্র স্বরূপ সম্পর্কে। মূসা (আঃ) স্বরূপ বর্ণনা করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় এবং

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾
قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاۗىِٕكُمُ
الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْۤ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٧﴾
قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾
قَالَ لَىِٕنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٢٩﴾
قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَاْتِ بِهٖۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٢﴾ وَّنَزَعَ يَدَهٗ
فَاِذَا هِيَ بَيْضَاۗءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗۤ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ
عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ڰ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿٣٥﴾
قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَاۗىِٕنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٣٦﴾ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ
سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٣٨﴾ وَّقِيْلَ
لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ
كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَاۗءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَىِٕنَّ
لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ
الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٤٣﴾

(২৪) মূসা বলল, তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (২৫) ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, তোমরা কি শুনছ না? (২৬) মূসা বলল, তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও পালনকর্তা। (২৭) ফেরাউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসূলটি নিশ্চয়ই বদ্ধ পাগল। (২৮) মূসা বলল, তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বোঝ। (২৯) ফেরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব। (৩০) মূসা বলল, আমি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট বিষয় নিয়ে আগমন করলেও কি? (৩১) ফেরাউন বলল, তুমি সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর। (৩২) অতঃপর তিনি লাঠি নিক্ষেপ করলে মুহূর্তের মধ্যে তা সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল। (৩৩) আর তিনি তার হাত বের করলেন, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে সুশুভ্র প্রতিভাত হলো। (৩৪) ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, নিশ্চয় এ একজন সুদক্ষ জাদুকর। (৩৫) সে তার জাদু বলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায়। অতএব তোমাদের মত কি? (৩৬) তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দিন এবং শহরে শহরে ঘোষক প্রেরণ করুন। (৩৭) তারা যেন আপনার কাছে প্রত্যেকটি দক্ষ জাদুকরকে উপস্থিত করে। (৩৮) অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে জাদুকরদেরকে একত্রিত করা হল। (৩৯) এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করা হল, তোমরাও সমবেত হও, (৪০) যাতে আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি—যদি তারাই বিজয়ী হয়। (৪১) যখন জাদুকররা আগমণ করল, তখন ফেরআউনকে বলল, যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে আমরা পুরস্কার পাব তো? (৪২) ফেরাউন বলল, হাঁ এবং তখন তোমরা আমার নৈকট্যশীলদের অর্ন্তভুক্ত হবে। (৪৩) মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন, নিক্ষেপ কর তোমরা যা নিক্ষেপ করবে।

এরূপ প্রশ্ন করাই অযথা।—(রূহুল মা'আনী)

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْۤ اِسْرَاۗءِيْلَ বনী ইসরাঈল ছিল শাম দেশের বাসিন্দা। তাদেরকে স্বদেশে যেতে ফেরাউন বাধা দিত। এভাবে চার শত বছর ধরে তারা ফেরআউনের বন্দীশালায় গোলামীর জীবন যাপন করছিল। তখন তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ছয় লাখ ত্রিশ হাজার। মূসা (আঃ) ফেরআউনকে সত্যের পয়গাম পৌছানোর সাথে সাথে বনী ইসরাঈলের প্রতি নির্যাতন থেকে বিরত হওয়ার এবং তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।—(কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পয়গম্বরসূলভ বিতর্কের একটি নমুনা ও তার কার্যকরী রীতিনীতি : দুই ভিন্নমুখী চিন্তাধারার বাহক ব্যক্তি ও দলের মধ্যে আদর্শগত বাকবিতণ্ডা যাকে পরিভাষায় মুনাযারা বা বিতর্ক বলা হয়, প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণভাবে এই বিতর্ক একটি হারজিতের খেলায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। মানুষের দৃষ্টিতে বিতর্কের সারমর্ম এতটুকুই যে, নিজের দাবী সর্বাবস্থায় উচ্চে থাকতে হবে যদিও এর ভ্রান্তি নিজেরও জানা হয়ে যায়। এই দাবীকে নির্ভুল ও জোরদার প্রমাণ করার জন্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ ও মেধাশক্তি নিঃশেষে ব্যয় করতে হবে। এমনিভাবে প্রতিপক্ষের কোন দাবী সত্য ও নির্ভুল হলেও তা খন্ডন করতে হবে এবং খণ্ডনে পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করতে হবে। ইসলামই এই বিতর্কে বিশেষ সমতা আনয়ন করেছে। এর মূলনীতি, ধারা, পদ্ধতি ও সীমা নির্ধারণ করে একে প্রচার ও সংশোধনকার্যের একটি উপকারী ও কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

আলোচ্য আয়াতে এর একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা লক্ষ্য করা যায়। হযরত মূসা ও হারুন (আঃ) যখন ফেরআউনের মত স্বৈরাচারী ও খোদায়ীর দাবীদারকে তার দরবারের সত্যের পয়গাম পৌছালেন, তখন সে মূসা (আঃ)-এর ব্যক্তিগত দু'টি বিষয় দ্বারা বিরোধী আলোচনা ও তর্কবিতর্কের সূত্রপাত করল, যেমন সুচতুর প্রতিপক্ষ সাধারণতঃ যখন আসল বিষয়ের জওয়াব দিতে সক্ষম হয় না; তখন অপর পক্ষের ব্যক্তিগত দুর্বলতা খোঁজ করে এবং বর্ণনা করে, যাতে সে লজ্জিত হয়ে যায় এবং জনমনে তার ভাবমূর্তী ক্ষুন্ন হয়। এখানেও ফেরআউন দু'টি বিষয় বর্ণনা করল। (এক) তুমি আমাদের লালিত-পালিত এবং আমাদের গৃহে থেকে যৌবনে পদার্পন করেছ। তোমার প্রতি আমাদের অনেক অনুগ্রহ আছে। কাজেই তোমার সাধ্য কি যে, আমাদের সামনে কথা বল। (দুই) তুমি একজন কিবতীকে অহেতুক হত্যা করেছ। এটা যেমন জুলুম, তেমনি নিমকহারামী ও কৃতঘ্নতা। যে সম্প্রদায়ের স্নেহে লালিত-পালিত হয়েছ এবং যৌবনে পদার্পন করেছ, তাদেরই একজনকে তুমি হত্যা করেছ। এর বিপরীতে হযরত মূসা (আঃ)-এর পয়গম্বরসুলভ জওয়াব দেখুন। প্রথমতঃ তিনি জওয়াবে প্রশ্নের ক্রম পরিবর্তন করে কিবতীর হত্যাকাণ্ডের জওয়াব প্রথমে দিলেন; যা ফেরআউন পরে উল্লেখ করেছিল এবং গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহ, যা ফেরআউন প্রথমে উল্লেখ করেছিল, তার জওয়াব পরে দিলেন। এই ক্রমপরিবর্তনের রহস্য এরূপ মনে হয় যে, তাঁর দুর্বলতার কারণে হত্যার বিষয়কে পাশ কাটিয়েই যাওয়া হয় এবং অন্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র রসূল এর জওয়াবকেই অগ্রাধিকার দিলেন এবং জওয়াবও মোটামুটি দোষ স্বীকারের মাধ্যমেই দিলেন। প্রতিপক্ষ বলবে যে, তিনি দোষ স্বীকার করে

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ
الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَىٰ
وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي
عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم
مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّا إِلَىٰ
رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾
فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ
قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿٥٦﴾
فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَٰلِكَ
وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَاءَى
الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ
رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ
فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾

(৪৪) অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, ফেরাউনের ইযযতের কসম, আমরাই বিজয়ী হব। (৪৫) অতঃপর মূসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করল, হঠাৎ তা তাদের অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। (৪৬) তখন জাদুকররা সেজদায় নত হয়ে গেল। (৪৭) তারা বলল, আমরা রাব্বুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, (৪৮) যিনি মূসা ও হারুনের রব। (৪৯) ফেরাউন বলল, আমার অনুমতি দানের পূর্বেই তোমরা কি তাকে মেনে নিলে? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব। (৫০) তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব। (৫১) আমরা আশা করি, আমাদের পালনকর্তা আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন। কারণ, আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে অগ্রণী। (৫২) আমি মূসাকে আদেশ করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও; নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (৫৩) অতঃপর ফেরাউন শহরে শহরে সংগ্রাহকদেরকে প্রেরণ করল, (৫৪) নিশ্চয় এরা (বনী-ইসরাঈলরা) ক্ষুদ্র একটি দল। (৫৫) এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। (৫৬) এবং আমরা সবাই সদা শংকিত। (৫৭) অতঃপর আমি ফেরআউনের দলকে তাদের বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাসমূহ থেকে বহিষ্কার করলাম (৫৮) এবং ধন-ভাণ্ডার ও মনোরম স্থানসমূহ থেকে। (৫৯) এরূপই হয়েছিল এবং বনী-ইসরাঈলকে করে দিলাম এসবের মালিক। (৬০) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। (৬১) যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম! (৬২) মূসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। (৬৩) অতঃপর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। (৬৪) আমি সেথায় অপর দলকে পৌঁছিয়ে দিলাম।

পরাজয় মেনে নিয়েছেন, তিনি মোটেই এদিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি।

হযরত মূসা (আঃ) জওয়াবেই কথা স্বীকার করে নিলেন যে, এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে ভুল ও বিচ্যুতি হয়ে গেছে; কিন্তু সাথে সাথে এ সত্যও ফুটিয়ে তুললেন যে, এটা একটা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত পদক্ষেপ ছিল, যা ঘটনাক্রমে অবাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করে ফেলে। লক্ষ্য ছিল, কিবতীকে ইসরাঈলীর প্রতি জুলুম থেকে বিরত করা। এই লক্ষ্যেই তাকে একটি ঘুষি মারা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে এতে মারা গেল। তাই এ হত্যাকাণ্ড ছিল ভ্রান্তিপ্রসূত। কাজেই আমার নবুওয়ত দাবীর সত্যতায় এটা কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আমি এই ভুল জানতে পেরে আইনগত ধর-পাকড়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। আল্লাহ্ তাআলা অতঃপর আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং আমাকে নবুওয়ত ও রেসালত দ্বারা ভূষিত করেন।

أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ অর্থাৎ, হযরত মূসা (আঃ) জাদুকরদেরকে বললেন, তোমাদের যা জাদু প্রদর্শন করবার, প্রদর্শন কর। এতে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখলে সন্দেহ হয় যে, মূসা (আঃ) তাদেরকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ দিচ্ছেন কেমন করে? কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা মূসা (আঃ)-এর পক্ষ থেকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ ছিল না, বরং তাদের যা কিছু করবার ছিল, তা বাতিল করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তবে যেহেতু প্রকাশ করা ব্যতীত বাতিল করা অসম্ভব ছিল, তাই তিনি জাদুকরদেরকে জাদু প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন; যেমন, কোন আল্লাহ্দ্রোহীকে বলা হয় যে, তুমি তোমার আল্লাহ্দ্রোহীতার প্রমাণাদি পেশ কর, যাতে আমি সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ করতে পারি। বলাবাহুল্য, একে আল্লাহ্দ্রোহিতায় সম্মতি বলা যায় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ এ বাক্যটি জাদুকরদের জন্যে কসম পর্যায়ের। মূর্খতাযুগে এর প্রচলন ছিল। পরিতাপের বিষয়! আজকাল মুসলমানদের মধ্যেও এরূপ কসম প্রচলিত হয়ে গেছে, যা এর চাইতেও মন্দ। উদাহরণতঃ বাদশাহ্র কসম, তোমার বাপের কবরের কসম ইত্যাদি। এ ধরনের কসম শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয; বরং এগুলো সম্পর্কে একথা বলা ভুল হবে না যে, আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কসম খাওয়া যেমন বিরাট পাপ, এসব নামের সত্য কসম খাওয়াও তার চাইতে কম পাপ নয়।— (রূহুল-মা'আনী)

قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ অর্থাৎ, যখন ফেরআউন জাদুকরদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে হত্যা, হস্তপদ কর্তন ও শূলে চড়ানোর হুমকি দিল, তখন জাদুকররা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে জওয়াব দিল, তুমি যা করতে পার, করো আমাদের কোন ক্ষতি নেই। আমরা নিহত হলেও পালনকর্তার কাছে পৌঁছে যাব। সেখানে আরামই আরাম।

এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, আজীবন জাদুর কুফরে লিপ্ত, ফেরআউনের উপাস্যতা স্বীকারকারী এবং ফেরআউনের পূজা-অর্চনাকারী এই জাদুকররা মূসা (আঃ)-এর মু'জেযা দেখে স্বজাতির বিপক্ষে, ফেরআউনের মত স্বৈরাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে ঈমানের কথা ঘোষণা করল কিরূপে? এটা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এখানে শুধু ঈমানের ঘোষণাই নয়; বরং ঈমানের এমন গভীর রঙও প্রকাশ পেয়েছে যে, কেয়ামত ও পরকাল যেন তাদের চোখের সামনে

উদ্ভাসিত হয়ে গেছে, তারা পরকালের নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে। ফলে দুনিয়ার যে কোন শাস্তি ও বিপদকে উপেক্ষা করে তারা فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ (তোমরা যা করবার, করে ফেল) বলে দিয়েছে। এটাও প্রকৃতপক্ষে মূসা (আঃ)-এরই মু'জেযা, যা লাঠি ও সুশুভ্র হাতের মু'জেযার চাইতে কোন অংশে কম নয়। এ ধরনের অনেক ঘটনা আমাদের প্রিয় রসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছে। এক মিনিটের মধ্যে সত্তর বছরের কাফেরের মধ্যে এমন অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যে, সে শুধু মুমিনই নয়; বরং যোদ্ধা সেজে শহীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

وَأَوْرَثْنٰهَا بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ —এ আয়াতে বাহ্যতঃ বলা হয়েছে যে, ফেরআউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তি, বাগ-বাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী-ইসরাঈলকে করে দেয়া হয়। কিন্তু এতে একটি ঐতিহাসিক জটিলতা এই যে, স্বয়ং কোরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয়, ফেরআউন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর বনী-ইসরাঈল মিসরে প্রত্যাবর্তন করেনি ; বরং তাদের আসল আবাসস্থল পবিত্রভূমি শামের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানেই তারা এক কাফের জাতির সাথে জেহাদ করে তাদের শহর অধিকার করার আদেশ প্রাপ্ত হয়। বনী-ইসরাঈল এই আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়। ফলে আযাব হিসেবে তীহের উন্মুক্ত ময়দানে একটি প্রাকৃতিক জেলখানা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। তারা সে ময়দান থেকে বের হতে পারত না। এমতাবস্থায়ই চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এই তীহ্ প্রান্তরেই তাদের উভয় পয়গম্বর হযরত মূসা ও হারূন (আঃ) ওফাত পান। এর পরেও ইতিহাসগ্রন্থ থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী-ইসরাঈল কোন সময় দলবদ্ধ জাতিগত পরিচিতি ও মর্যাদা নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেছে। কাজেই ফেরআউন সম্প্রদায়ের বিষয়-সম্পত্তি ও ধন-ভাণ্ডারের উপর বনী-ইসরাঈলের অধিকার কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? তফসীর রূহুল মা'আনীতে এ আয়াতের অধীনেই এ প্রশ্নের দু'টি জওয়াব তফসীরবিদ হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত হাসান বলেন, আলোচ্য আয়াতে বনী-ইসরাঈলকে ফেরআউনদের পরিত্যক্ত সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার কথা ব্যক্ত হয়েছে; কিন্তু একথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, এই ঘটনা ফেরআউনের ধ্বংসের তাৎক্ষণিক পর ঘটবে। তীহ্ প্রান্তরের ঘটনার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরেও যদি তারা মিসরে প্রবেশ করে থাকে, তবে আয়াতের অর্থে কোনরূপ তফাৎ দেখা দেয় না। ইতিহাস থেকে তাদের দলবদ্ধভাবে মিসরে প্রবেশ করার কথা প্রমাণিত না থাকার আপত্তি মোটেই ধর্তব্য নয়। কারণ, তখনকার ইতিহাস ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের লিখিত মিথ্যা বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। কাজেই এহেন ইতিহাসের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। এ কারণে কোরআনের আয়াতে কোনরূপ সদর্থ করার প্রয়োজন নেই। হযরত কাতাদাহ্ বলেন, এই ঘটনাটি কোরআন পাকের একাধিক সূরায় ব্যক্ত হয়েছে, যেমন সূরা আ'রাফের আয়াত ১৩৬, ১৩৭-এ, সূরা কাসাসের আয়াত ৫-এ, সূরা দোখানের আয়াত ২৫ থেকে ২৮-এ এবং সূরা শো'আরার আলোচ্য ৫৯ আয়াতে এ ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। এসব আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, বনী-ইসরাঈলকে বিশেষভাবে ফেরআউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বাগ-বাগিচা ও বিষয়-সম্পত্তির মালিক করা হয়েছিল। এর জন্যে বনী-ইসরাঈলের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী। কিন্তু এসব আয়াতের ভাষায় এ বিষয়েরও সুস্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে যে, বনী-ইসরাঈলকে ফেরআউন সম্প্রদায়ের অনুরূপ বাগ-বাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক করা হয়েছিল। এর জন্যে তাদের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী নয়; বরং অনুরূপ বাগ-বাগিচা শাম দেশেও অর্জিত হতে পারে। সূরা আ'রাফের আয়াত الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا শব্দ থেকে বাহ্যতঃ শামদেশকেই বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে بَارَكْنَا ইত্যাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলে শামদেশ সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হযরত কাতাদাহ্ বলেন যে, বিনা প্রয়োজনে কোরআনের আয়াতের সাথে ইতিহাসের সংঘর্ষ দেখানো দুরস্ত নয়। সারকথা এই যে, যদি ঘটনাবলীর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফেরআউনের ধ্বংসের পর বনী-ইসরাঈল কোন সময়ই সমষ্টিগতভাবে মিসর অধিকার করেনি, তবে হযরত কাতাদাহ্র তফসীর অনুযায়ী উল্লেখিত সব আয়াতে শামদেশে, তার বাগ-বাগিচা ও অর্থ-ভাণ্ডারের মালিক হওয়া বোঝানো যেতে পারে। والله اعلم

قَالَ أَصْحٰبُ مُوسٰىٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّآ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

– পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরআউনী সৈন্যবাহিনী যখন তাদের সামনে এসে যায়, তখন সমগ্র বনী-ইসরাঈল চীৎকার করে উঠল, হায়, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম! আর ধরা পড়ার মধ্যে সন্দেহ ও দেরীই বা কি ছিল, পশ্চাতে অতিবিক্রম সেনাবাহিনী এবং সম্মুখে সমুদ্র অন্তরায়। এই পরিস্থিতি মূসা (আঃ)-এরও অগোচরে ছিল না। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তখন ও সজোরে বললেন كَلَّا আমরা কিছুতেই ধরা পড়তে পারি না। কারণ এই বললেন যে, إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাদের পথ বলে দেবেন। ঈমানের পরীক্ষা এরূপ স্থলেই হয়ে থাকে। মূসা (আঃ)-এর চোখে-মুখে ভয়ভীতির চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি যেন উদ্ধারের পথ চোখে দেখে যাচ্ছিলেন। হুবহু এমনি ধরনের ঘটনা হিজরতের সময় সওর গিরিগুহায় আত্মগোপনের সময় আমাদের রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর সাথেও ঘটেছিল। পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রু এই গিরিগুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সামান্য নীচে দৃষ্টিপাত করলেই তিনি তাদের সামনে পড়ে যেতেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) অস্থিরতা প্রকাশ করলে তিনি হুবহু এই উত্তরই দেন لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا চিন্তা করো না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। এই ঘটনার মধ্যে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। যে, মূসা (আঃ) বনী-ইসরাঈলকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলেছিলেন إِنَّ مَعِيَ رَبِّي আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জওয়াবে مَعَنَا বলেছেন। অর্থাৎ আমাদের উভয়ের সাথে আল্লাহ্ আছেন। এটা উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য যে, এ উম্মতের ব্যক্তিবর্গ ও তাদের রসূল খোদায়ী সঙ্গ দ্বারা ভূষিত।

وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ﴿٦٦﴾
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
وَقَوْمِهِۦ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا۟ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَـٰكِفِينَ ﴿٧١﴾
قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾
قَالُوا۟ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا
كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ
لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٧٧﴾ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَ
ٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾
وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى
خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿٨٣﴾
وَٱجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَٱجْعَلْنِى مِن
وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَٱغْفِرْ لِأَبِىٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿٨٦﴾
وَلَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا
مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾

(৬৫) এবং মূসা ও তাঁর সংগীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। (৬৬) অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম। (৬৭) নিশ্চয় এতে একটি নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। (৬৮) আপনার পালনকর্তা অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (৬৯) আর তাদেরকে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন। (৭০) যখন তাঁর পিতাকে এবং তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কিসের এবাদত কর? (৭১) তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সারাদিন এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি। (৭২) ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তোমরা যখন আহবান কর, তখন তারা শোনে কি? (৭৩) অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে? (৭৪) তারা বলল ঃ না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি, তারা এরূপই করত। (৭৫) ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে আসছ (৭৬) তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা? (৭৭) বিশ্ব পালনকর্তা ব্যতীত তারা সবাই আমার শত্রু, (৭৮) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, (৭৯) যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন, (৮০) যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন, (৮১) যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন। (৮২) আমি আশা করি তিনিই বিচারের দিনে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন। (৮৩) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর (৮৪) এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর। (৮৫) এবং আমাকে নেয়ামত উদ্যানের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (৮৬) এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর। সে তো পথভ্রষ্টদের অন্যতম। (৮৭) এবং পুনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করো না, (৮৮) যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না; (৮৯) কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্র কাছে আসবে। (৯০) জান্নাত আল্লাহ্ভীরুদের নিকটবর্তী করাহবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ এই আয়াতে لِسَانَ বলে আলোচনা বোঝানো হয়েছে এবং এর লাম উপকারার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই যে, হে আল্লাহ্, আমাকে এমন সুন্দর তরিকা ও উত্তম নিদর্শন দান করুন, যা কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অনুসরণ করে এবং আমাকে উৎকৃষ্ট আলোচনা ও সদগুণাবলী দ্বারা স্মরণ করে।—(ইবনে-কাসীর, রূহুল মাআনী) আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। ফলে ইহুদী, খ্রীষ্টান এমন কি মক্কার মুশরেকরা পর্যন্ত ইবরাহীমী মিল্লাতকে ভালবাসে এবং নিজেদেরকে এর অনুসারী বলে। যদিও তাদের ধর্মমত ইবরাহীমী মিল্লাতের বিপরীতে কুফর ও শেরকে পরিপূর্ণ, তথাপি তাদের দাবী এই যে; আমরা ইবরাহীমী মিল্লাতে আছি। মুসলিম সম্প্রদায়ে তো যথার্থরূপেই মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী হওয়াকে নিজের জন্যে গর্বের বিষয় বলে মনে করে।

খ্যাতি ও যশোপ্রীতি নিন্দনীয়, কিন্তু কতিপয় শর্তসাপেক্ষে বৈধ ঃ যশোপ্রীতি অর্থাৎ, মানুষের কাছে নিজের সম্মান ও প্রশংসার আকাঙ্খা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কোরআন পাক পরকালের নেয়ামত লাভকে যশোপ্রীতি বর্জনের উপর নির্ভরশীল ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করেছেন যে, 'ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন হোক।' এটা বাহ্যতঃ যশোপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। কিন্তু আয়াতের ভাষার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এই দোয়ার আসল লক্ষ্য যশোপ্রীতি নয় বরং আল্লাহ্ তাআলার কাছে এই দোয়া যে, আমাকে এমন সৎকর্মের তওফীক দান করুন, যা আমার আখেরাতের সম্বল হয়, যা দেখে অন্যদের মনেও সৎকর্মের প্রেরণা জাগে এবং আমার পরেও যেন মানুষ সৎকর্মে আমার অনুসরণ করে। সারকথা এই যে, এই দোয়ার দ্বারা কোন সুখ্যাতি ও যশোলাভ উদ্দেশ্যই নয়। কোরআন ও হাদীসে যে যশোপ্রীতি নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়, তার অর্থ পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি ও তদ্দ্বারা পার্থিব মুনাফা অর্জন।

ইবনে আরাবী বলেন, আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে সৎকর্মের কারণে মানুষের মধ্যে প্রশংসা হয়, সে সৎকর্ম অন্বেষণ করা জায়েয। ইমাম গাযযালী বলেন, দুনিয়াতে সম্মান ও যশোপ্রীতি তিনটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ। (এক) যদি উদ্দেশ্য নিজেকে বড় এবং অন্যদেরকে ছোট ও হেয় প্রতিপন্ন করা না হয়; বরং এরূপ পরকালীন উপকারের লক্ষ্যে হয় যে, মানুষ তার ভক্ত হয়ে সৎকর্মে তার অনুসরণ করবে। (দুই) মিথ্যা গুণকীর্তন লক্ষ্য না হওয়া চাই। অর্থাৎ, যে গুণ নিজের মধ্যে নেই, তার ভিত্তিতে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা কামনা না করা। (তিন) যদি তা অর্জন করার জন্যে কোন গোনাহ্ অথবা ধর্মের ব্যাপারে শৈথল্য অবলম্বন করতে না হয়।

মুশরেকদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া বৈধ নয় ঃ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ অন্যত্র কোরআন পাকের এই ফরমান জারি হওয়ার পর এখন যার মৃত্যু কুফরের উপর নিশ্চিত ও

অবধারিত; তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করা অবৈধ ও হারাম। কেননা, আয়াতের অর্থ এই যে, নবী ও মুমিনদের জন্যে মুশরেকদের মাগফেরাতের দোয়া করা দ্ব্যর্থহীনরূপে নাজায়েয ; যদি তারা নিকটাত্মীয়ও হয়, যদিও তাদের জাহান্নামী হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

একটি জিজ্ঞাসা ও জওয়াব ঃ وَاغْفِرْ لِأَبِيْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّيْنَ —এ আয়াত থেকে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার পর হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর মুশরেক পিতার জন্যে কেন মাগফেরাতের দোয়া করলেন? আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত নিজেই কোরআন মজীদে এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرٰهِيْمَ لِأَبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا إِيَّاهُ

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيْمٌ

জওয়াবের সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) পিতার জন্যে তাঁর জীবদ্দশায় ঈমানের তওফীক দানের নিয়তে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করেছিলেন। ঈমানের পর মাগফেরাত নিশ্চিত ছিল। অথবা ইবরাহীম (আঃ)-এর ধারণা ছিল যে, তাঁর পিতা গোপনে ঈমান কবুল করেছে, যদিও তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর পিতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনি নিজের পূর্ণ নির্লিপ্ততা প্রকাশ করে দেন।

পিতার কুফর ও শেরক পিতার জীবদ্দশাতেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) জানতে পেরেছিলেন, না তার মৃত্যুর পর, না কেয়ামতের দিন জানবেন, এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ সূরা তওবায় উল্লেখিত হয়েছে।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন কোন অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কারো কোন উপকারে আসবে না। একমাত্র সে ব্যক্তি মুক্তি পাবে, যে সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহ্র কাছে পৌছবে। এই আয়াতের استثناء কে استثناء منقطع সাব্যস্ত করে কেউ কেউ তফসীর করেছেন যে, সেদিন কারো অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না, একমাত্র কাজে আসবে নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ, যাতে শেরক ও কুফর নেই। এই বাক্যের দৃষ্টান্ত হল, যদি কেউ যায়েদ সম্পর্কে কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, যায়েদের কাছে অর্থসম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিও আছে কি? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যদি এর উত্তরে বলে যে, সুস্থ অন্তঃকরণই তার অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। এর অর্থ এই যে, অর্থ-সম্পদ সন্তান-সন্ততি তো কিছুই নেই, তবে এগুলোর পরিবর্তে তার কাছে তার নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ আছে। এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতের সার-বিষয়বস্তু দাঁড়ায় এই যে, সেদিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কোন কাজেই আসবে না, কাজে আসবে শুধু নিজের ঈমান ও সৎকর্ম। একেই 'সুস্থ অন্তঃকরণ' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদদের মতে প্রসিদ্ধ তফসীর এই যে, আয়াতের استثناء টি متصل এবং অর্থ এই যে, কেয়ামতের দিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন ব্যক্তির কাজে আসবে না সেই ব্যক্তি ছাড়া, যার অন্তঃকরণ সুস্থ অর্থাৎ, সে ঈমানদার। সারকথা এই যে, কেয়ামতেও এসব বস্তু উপকারী হতে পারে; কিন্তু শুধু ঈমানদারের জন্যেই উপকারী হবে – কাফেরের কোন উপকারে আসবে না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ স্থলে وَّلَا بَنُوْنَ বলা হয়েছে, যার অর্থ পুত্র সন্তান। সাধারণ সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, দুনিয়াতেও বিপদের সময় পুত্র সন্তানের কাছ থেকে উপকারের আশা করা যায়। কন্যা-সন্তানদের কাছ থেকে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা দুনিয়াতেও বিরল। তাই কেয়ামতে বিশেষ করে পুত্র-সন্তানদের উপকারী না হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ দুনিয়াতে এদের কাছ থেকে উপকারের আশা হত।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, قلب سليم এর শাব্দিক অর্থ সুস্থ অন্তঃকরণ। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, এতে সেই অন্তঃকরণ বোঝানো হয়েছে, যা কলেমায়ে তওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং শেরক থেকে পবিত্র। এই বিষয়বস্তুই মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব থেকে ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন, সুস্থ অন্তঃকরণ একমাত্র মুমিনের হতে পারে। কাফেরের অন্তঃকরণ রুগ্ন হয়ে থাকে; যেমন কোরআন বলে فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩١﴾ وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٢﴾
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا
هُمْ وَالْغَاوٗنَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ﴿٩٥﴾ قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا
يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٩٦﴾ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٧﴾ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿١٠٠﴾
وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٢﴾
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٠٥﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ
اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٠٦﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ
اَطِيْعُوْنِ ﴿١٠٨﴾ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١١٠﴾ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ
الْاَرْذَلُوْنَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٢﴾ اِنْ حِسَابُهُمْ
اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٤﴾ اِنْ اَنَا
اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ
مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ ﴿١١٧﴾

(৯১) এবং বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। (৯২) তাদেরকে বলা হবে ঃ তারা কোথায়, তোমরা যাদের পূজা করতে (৯৩) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে, অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে? (৯৪) অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে (৯৫) এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে। (৯৬) তারা তথায় কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে বলবে ঃ (৯৭) আল্লাহ্‌র কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম, (৯৮) যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য গণ্য করতাম। (৯৯) আমাদেরকে দুষ্টকর্মীরাই গোমরাহ্ করেছিল। (১০০) অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই (১০১) এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই। (১০২) হায়, যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম। (১০৩) নিশ্চয়, এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১০৪) আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১০৫) নূহের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। (১০৬) যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বললেন, "তোমাদের কি ভয় নেই? (১০৭) আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত বার্তাবাহক। (১০৮) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১০৯) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (১১০) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।" (১১১) তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব যখন তোমার অনুসরণ করছে ইতরজনেরা? (১১২) "নূহ বললেন, তারা কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি দরকার? (১১৩) তাদের হিসাব নেয়া আমার পালনকর্তারই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে! (১১৪) আমি মুমিনগণকে তাড়িয়ে দেয়ার লোক নই। (১১৫) আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।" (১১৬) তারা বলল, "হে নূহ, যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে।" (১১৭) নূহ বললেন, "হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ঈমানের শর্তে উপকারী হতে পারে ঃ আলোচ্য আয়াতের বহুল প্রচলিত তফসীর অনুযায়ী জানা যায় যে, মানুষের অর্থ-সম্পদ কেয়ামতের দিনেও কাজে আসতে পারে, যদি সে মুসলমান হয়। এটা এভাবে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছিল কিংবা কোন সদকায়ে জারিয়া করেছিল, যদি সে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে মুমিনদের তালিকাভুক্ত হয়, তবে এ ব্যয়কৃত অর্থ ও সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব হাশরের ময়দানে ও হিসাবের দাঁড়িপাল্লায়ও তার কাজে আসবে। পক্ষান্তরে সে যদি মুসলমান না হয় কিংবা আল্লাহ্ না করুন মৃত্যুর পূর্বে বেঈমান হয়ে যায়, তবে দুনিয়াতে সম্পাদিত কোন সৎকর্ম তার কাজে আসবে না। সন্তান-সন্ততির ব্যাপারেও তাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান হলে পরকালেও সে তার সন্তান-সন্ততির উপকার পেতে পারে। এটা এভাবে যে, তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করবে অথবা সওয়াব পৌঁছাবে অথবা সে তার সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্মপরায়ণরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এখন তাদের সৎ কর্মের সওয়াব আপনা-আপনি সেও পেতে থাকবে এবং তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। অথবা হাশরের ময়দানে সন্তান-সন্ততি তার জন্যে সুপারিশ করবে। যেমন, কোন কোন হাদীসে সন্তান-সন্ততির সুপারিশ ও তা কবুল হওয়ার বিষয় প্রমাণিত আছে ; বিশেষতঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের সুপারিশ। এমনিভাবে সন্তান-সন্ততি যদি মুসলমান হয় এবং তাদের সৎকর্ম পিতা-মাতার সৎকর্মের স্তরে না পৌঁছে, তবে পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা বাপ-দাদার খাতিরে তাদেরকেও বাপ-দাদার উচ্চতম স্তরে পৌঁছিয়ে দেবেন। কোরআন পাকে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে — اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ, আমি আমার সৎবন্দাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকেও মিলিত করে দেব। আলোচ্য আয়াতের উল্লেখিত প্রসিদ্ধ তফসীর থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসে যেখানেই কেয়ামতে পারিবারিক সম্পর্ক কাজে না আসার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই উদ্দেশ্য এই যে, যারা মুমিন নয়, তাদের কাজে আসবে না। এমন কি, পয়গম্বরের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীও যদি মুমিন না হয়, তবে তাঁর পয়গম্বরী দ্বারা কেয়ামতের দিন তাদের কোন উপকার হবে না যেমন, হযরত লূত (আঃ)-এর পুত্র, নূহ (আঃ)-এর স্ত্রী এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতার ব্যাপার তাই। কোরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহের মর্মও তাই হতে পারে —

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ — فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

এবং لَا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ۔

সৎকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান ঃ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, শিক্ষাদান ও প্রচারকার্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দুরস্ত নয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষীগণ একে হারাম বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীগণ অপারক অবস্থায় একে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ, وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا আয়াতের অধীনে এসে গেছে।

فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾
فَأَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ
الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَ
إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾ كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ
قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ اٰيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَ
تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ
جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا
تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَّبَنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ
أَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنْ هٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا
نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنٰهُمْ ۗ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَ
مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾
كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾

(১১৮) অতএব, আমার ও তাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সংগী মুমিনগণকে রক্ষা করুন।" (১১৯) অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গিগণকে বোঝাই করা নৌকায় রক্ষা করলাম। (১২০) এরপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম। (১২১) নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১২২) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১২৩) আদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১২৪) তখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললেন ঃ 'তোমাদের কি ভয় নেই? (১২৫) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল। (১২৬) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১২৭) আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো পালনকর্তা দেবেন। (১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করছ? (১২৯) এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে? (১৩০) যখন তোমরা আঘাত হান, তখন জালেম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান। (১৩১) অতএব, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৩২) ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে সেসব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান। (১৩৩) তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু ও পুত্র-সন্তান, (১৩৪) এবং উদ্যান ও ঝরণা। (১৩৫) আমি তোমাদের জন্যে মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।" (১৩৬) তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ নাই দাও, উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। (১৩৭) এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস বৈ নয়। (১৩৮) আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। (১৩৯) অতএব, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৪০) এবং আপনার পালনকর্তা, তিনি তো প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৪১) সামূদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৪২) যখন তাদের ভাই সালেহ্‌, তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি ভয় কর না?

জ্ঞাতব্য ঃ এ স্থলে فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونِ আয়াতটি তাকীদের জন্যে এবং একথা ব্যক্ত করার জন্যে আনা হয়েছে যে, রসূলের আনুগত্য ও আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্যে কেবল রসূলের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা অথবা কেবল প্রচারকার্যে প্রতিদান না চাওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যে রসূলের মধ্যে সবগুলো গুণই বিদ্যমান আছে, তার আনুগত্য করা ও আল্লাহ্‌কে ভয় করা তো আরও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ভদ্রতা ও নীচতার ভিত্তি কর্ম ও চরিত্র-পরিবার ও জাঁকজমক নয় ঃ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ — এ আয়াতে প্রথমতঃ মুশরেকদের এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তোমার অনুসারী সকলেই নীচ লোক। আমরা সম্ভ্রান্ত ভদ্রজন হয়ে তাদের সাথে কিরূপে একাত্ম হতে পারি? নূহ (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃত হওয়ার এটাই ছিল কারণ। নূহ (আঃ) জওয়াবে বললেন, আমি তাদের কাজকর্মের অবস্থা জানি না। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমরা পারিবারিক ভদ্রতা অথবা ধন-সম্পদ, সম্মান ও জাঁকজমককে ভদ্রতার ভিত্তি মনে কর, এটা ভুল; বরং সম্মান ও অপমান অথবা ভদ্রতা ও নীচতা প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। তোমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইতরজন বলে দেয়াটা তোমাদের মূর্খতা বৈ কিছু নয়। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম ও চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। তাই প্রকৃতপক্ষে কে ইতরজন এবং কে ভদ্রজন, আমরা তার ফয়সালা করতে পারি না। — (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কতিপয় দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা ঃ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেন যে, رِيعٌ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলা হয়। হযরত মুজাহিদ থেকে ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, رِيعٌ উচ্চস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই ريع النبات উদ্ভূত হয়েছে। অর্থাৎ, বৃদ্ধিশীল উদ্ভিদ। آيَةً এর আসল অর্থ নিদর্শন। এস্থলে সুউচ্চ স্মৃতিসৌধ বোঝানো হয়েছে। تَعْبَثُونَ শব্দটি عبث থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অযথা, যাতে কোন প্রকার উপকার নেই। এখানে অর্থ এই যে, তারা অযথা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করত, যার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব করাই উদ্দেশ্য থাকত। مَصَانِعَ শব্দটি مصنع - এর বহুবচন। হযরত কাতাদা বলেন, مَصَانِعَ বলে পানির চৌবাচ্চা বোঝানো হয়েছে; কিন্তু হযরত মুজাহিদ বলেন যে, এখানে সুদৃঢ় প্রাসাদ বোঝানো হয়েছে। لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ইমাম বোখারী সহীহ্‌ বোখারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে لعل শব্দটি تشبيه অর্থাৎ, রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস এর অনুবাদে বলেন كانكم تخلدون —অর্থাৎ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে। — (রূহুল মাআনী)

বিনা প্রয়োজনে অট্টালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীয় ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিনা প্রয়োজনে গৃহ নির্মাণ ও অট্টালিকা নির্মাণ করা শরীয়ত মতে দূষণীয়। হযরত আনাসের জবানী ইমাম তিরমিযী বর্ণিত এই হাদীসের অর্থও তাই— অর্থাৎ, প্রয়োজনাতিরিক্ত দালান-কোঠার

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا
آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾
وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾
وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ
لَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ
لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ
عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ
الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَ
تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

(১৪৩) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (১৪৪) অতএব, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৪৫) আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (১৪৬) তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেয়া হবে? (১৪৭) উদ্যানসমূহের মধ্যে এবং ঝরণাসমূহের মধ্যে? (১৪৮) শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে? (১৪৯) তোমরা পাহাড় কেটে জাঁকজমকের গৃহ নির্মাণ করছ। (১৫০) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৫১) এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না; (১৫২) যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না।' (১৫৩) "তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের একজন। (১৫৪) তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নও। সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কোন নিদর্শন উপস্থিত কর।' (১৫৫) সালেহ্ বললেন, 'এই উষ্ট্রী, এর জন্যে আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি পানের পালা— নির্দিষ্ট এক-এক দিনের। (১৫৬) তোমরা একে কোন কষ্ট দিও না। তাহলে তোমাদেরকে মহাদিবসের আযাব পাকড়াও করবে। (১৫৭) তারা তাকে বধ করল। ফলে, তারা অনুতপ্ত হয়ে গেল। (১৫৮) এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৫৯) আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৬০) লূতের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৬১) যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি ভয় কর না? (১৬২) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (১৬৩) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৬৪) আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তা দেবেন। (১৬৫) সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর? (১৬৬) এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।'

মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। হযরত আনাসের অপর একটি রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায় — অর্থাৎ, প্রত্যেক দালান-কোঠা তার মালিকের জন্যে বিপদ, কিন্তু যে দালান-কোঠা জরুরী তা বিপদ নয়। রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে: বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ব্যতীত সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা মুহাম্মদী শরীয়তেও নিন্দনীয় ও দূষণীয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে فَارِهِينَ এর তফসীরে বলা হয়েছে অহংকারী। আবু সালেহ ও ইমাম রাগেবের মতে فَارِهِينَ এর তফসীর حاذقين অর্থাৎ, নিপুণ। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে এমন কারিগরি শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃহে রূপান্তরিত করতে পার। সারকথা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

উপকারী পেশা আল্লাহর নেয়ামত, যদি তাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করা না হয়ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উৎকৃষ্ট পেশা আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত এবং তদ্দ্বারা উপকার লাভ করা জায়েয। কিন্তু তা দ্বারা যদি গোনাহ্, হারাম কার্য অথবা বিনা প্রয়োজনে তাতে মগ্ন থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সেই পেশা অবলম্বন না-জায়েয; যেমন পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে বিনা প্রয়োজনে দালানের উচ্চতার নিন্দা করা হয়েছে।

অস্বাভাবিক কর্ম স্ত্রীর সাথেও হারামঃ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ আয়াতের من অব্যয়টি বর্ণনাবোধক হতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের যৌন অভিলাষ পূরণের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তাদেরকে ছেড়ে সমজাত পুরুষদেরকে যৌন অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছ। এটা হীনমন্যতার পরিচায়ক। من অব্যয়টি এখানে تبعيض এর জন্যেও হতে পারে। এমতাবস্থায় ইঙ্গিত হবে যে, তোমাদের স্ত্রীদের যে স্থান তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা স্বাভাবিক, সেই স্থান ছেড়ে স্ত্রীদের সাথে এমন অস্বাভাবিক কাজ তোমরা কর, যা নিশ্চিতই হারাম। এই দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, নিজ স্ত্রীর সাথে অস্বাভাবিক কর্ম করা হারাম। হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরূপ ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। نعوذ بالله منه (রূহুল মাআনী)

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي
لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنَاهُ وَ
أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٢﴾
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾
كَذَّبَ أَصْحَابُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا
تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾
قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَ
إِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ
إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ
فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾

(১৬৭) তারা বলল, "হে লূত, তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিষ্কৃত করা হবে।" (১৬৮) লূত বললেন, "আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি। (১৬৯) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর।" (১৭০) অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম। (১৭১) এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (১৭২) এরপর অন্যদেরকে নিপাত করলাম। (১৭৩) তাদের উপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। ভীতি-প্রদর্শিতদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট। (১৭৪) নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৭৫) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৭৬) বনের অধিবাসীরা পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৭৭) যখন শো'আয়ব তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি ভয় কর না? (১৭৮) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (১৭৯) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৮০) আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (১৮১) মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (১৮২) সোজা দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন কর। (১৮৩) মানুষকে তাদের বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না। (১৮৪) ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোক-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন। (১৮৫) তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্যতম। (১৮৬) তুমি আমাদের মত মানুষ বৈ তো নও। আমাদের ধারণা-তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। (১৮৭) অতএব, যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের কোন টুকরো আমাদের উপর ফেলে দাও। (১৮৮) শো'আয়ব বললেন, তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আমার পালনকর্তা ভালরূপে অবহিত। (১৮৯) অতঃপর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে দিল। ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করল। নিশ্চয় সেটা ছিল এক মহাদিবসের আযাব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ এখানে عَجُوزٌ বলে লূত (আঃ)-এর স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। সে কওমে লূতের এই কুকর্মে সম্মত ছিল এবং কাফের ছিল।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমকামীকে প্রাচীর চাপা দিয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে নীচে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেয়া জায়েয। হানাফী আলেমদের মাযহাব তাই। কেননা, লূত সম্প্রদায়কে এমনিভাবে নিপাত করা হয়েছিল। তাদের জনপদকে উপরে তুলে উল্টা করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। — (শামী ঃ কিতাবুল হুদূদ)

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ কারো কারো মতে **قسط** গ্রীক শব্দ, যার অর্থ ন্যায় ও সুবিচার। কেউ কেউ একে আরবী শব্দ **قسط** থেকে উদ্ভূত বলেছেন।

এর অর্থও সুবিচার। উদ্দেশ্য এই যে, দাঁড়িপাল্লা এবং এমনি ধরনের মাপ ও ওজনের অন্যান্য যন্ত্রপাতিকে সোজা ও সরলভাবে ব্যবহার কর, যাতে কম হওয়ার আশংকা না থাকে।

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ অর্থাৎ, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না। উদ্দেশ্য এই যে, চুক্তি অনুযায়ী যার যতটুকু প্রাপ্য, তাকে তার চাইতে কম দেয়া হারাম; তা কোন মাপ ও ওজনের বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু। এ থেকে জানা গেল যে, কোন শ্রমিক-কর্মচারী নির্ধারিত সময় চুরি করলে এবং কম সময় ব্যয় করলে তাও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে আসরের নামাযে শরীক না হতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে কিছু অজুহাত পেশ করল। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, **طففت** অর্থাৎ, তুমি ওজনে কম করেছ। যেহেতু নামায ওজনের বস্তু নয়, তাই এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর ইমাম মালেক বলেন, **وفاء وتطفيف** অর্থাৎ, প্রাপ্য অনুযায়ী করা অথবা কম করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হতে পারে। শুধু মাপ ও ওজনের সাথেই এই বিধান সংশ্লিষ্ট নয়; বরং কারো হক কম দেয়া, তা যেভাবেই হোক না কেন — হারাম। وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ আয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে।

فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ এই আয়াতের ঘটনা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা এই সম্প্রদায়ের উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন। ফলে তারা গৃহের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেত না। এরপর তিনি তাদের নিকটবর্তী এক মাঠের উপর গাঢ় কাল মেঘ প্রেরণ করেন। এই মেঘের নীচে সুশীতল বায়ু ছিল। গরমে অস্থির সম্প্রদায় দৌড়ে দৌড়ে এই মেঘের নীচে জমায়েত হয়ে গেল, তখন মেঘমালা তাদের উপর পানির পরিবর্তে অগ্নি বর্ষণ শুরু করল। ফলে সবাই ছাই-ভস্ম হয়ে গেল। — (রূহুল মা'আনী)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ
الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ
عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن
يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾
فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ
الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيَهُم
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ
جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾
وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا
ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا
يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ
اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ
الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

(১৯০) নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। (১৯১) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৯২) এই কোরআন তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। (১৯৩) বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে (১৯৪) আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি-প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন, (১৯৫) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১৯৬) নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে। (১৯৭) তাদের জন্যে এটা কি নিদর্শন নয় যে, বনী-ইসরাঈলের আলেমগণ এটা অবগত আছে? (১৯৮) যদি আমি একে কোন ভিন্নভাষীর প্রতি অবতীর্ণ করতাম, (১৯৯) অতঃপর তিনি তা তাদের কাছে পাঠ করতেন, তবে তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না। (২০০) এমনিভাবে আমি গোনাহ্‌গারদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। (২০১) তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ না করে মর্মন্তদ আযাব; (২০২) অতঃপর তা আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে পড়বে, তারা তা বুঝতেও পারবে না। (২০৩) তখন তারা বলবে, আমরা কি অবকাশ পাব না? (২০৪) তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত কামনা করে? (২০৫) আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই, (২০৬) অতঃপর যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হত, তা তাদের কাছে এসে পড়ে, (২০৭) তখন তাদের ভোগ-বিলাস তা তাদের কি উপকারে আসবে? (২০৮) আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি; কিন্তু এমতাবস্থায় যে, তার সতর্ককারী ছিল। (২০৯) স্মরণ করানোর জন্যে, এবং আমার কাজ অন্যায়াচরণ নয়। (২১০) এই কোরআন শয়তানরা অবতীর্ণ করেনি। (২১১) তারা এ কাজের উপযুক্ত নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। (২১২) তাদেরকে তো শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা রয়েছে। (২১৩) অতএব, আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করবেন না। করলে শাস্তিতে পতিত হবেন। (২১৪) আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন। (২১৫) এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হোন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দ ও অর্থসম্ভারের সমষ্টির নাম কোরআন ঃ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ আয়াত থেকে জানা গেল যে, আরবী ভাষায় লিখিত কোরআনই কোরআন। অন্য যে কোন ভাষায় কোরআনের কোন বিষয়বস্তুর অনুবাদকে কোরআন বলা হবে না।

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ থেকে বাহ্যতঃ এর বিপরীতে একথা জানা যায় যে, কোরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোন ভাষায় থাকলে তাও কোরআন। কেননা, إِنَّهُ এর সর্বনামটি বাহ্যতঃ কোরআনকে বোঝায়। زُبُر শব্দটি زبور এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআন পাক পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। বলাবাহুল্য, তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাব আরবী ভাষায় ছিল না। কেবল কোরআনের অর্থসম্ভার সেসব কিতাবে উল্লেখিত আছে বলেই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস এই যে, কোন সময় শুধু কোরআনের বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক অর্থে কোরআন বলে দেয়া হয়। কারণ, কোন কিতাবের বিষয়বস্তুই আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কোরআন উল্লেখিত হওয়ার অর্থও এই যে, কোরআনের কোন কোন বিষয়বস্তু সেগুলোতেও বিবৃত হয়েছে। অনেক হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুস্তাদরাক হাকেমে বর্ণিত হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আমাকে সূরা বাক্বারা 'প্রথম আলোচনা' থেকে দেয়া হয়েছে, সূরা তোয়াহা ও যেসব সূরা طسٓ দ্বারা শুরু হয় এবং যেসব সূরা حٰمٓ দ্বারা শুরু হয়, সেগুলো মূসা (আঃ)-এর ফলক থেকে দেয়া হয়েছে। এছাড়া সূরা ফাতেহা আরশের নীচ থেকে প্রদত্ত হয়েছে। তাবারানী, হাকেম, বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মুল্‌ক তওরাতে বিদ্যমান আছে এবং সূরা সাব্বিহিস্‌মা সম্পর্কে তো স্বয়ং কোরআন বলে যে, إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ অর্থাৎ, এই সূরার বিষয়বস্তু হযরত ইবরাহীম ও মূসা (আঃ)- এর সহীফাসমূহেও আছে। সব আয়াত ও রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, কোরআনের অনেক বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও বিদ্যমান ছিল। এতে এটা জরুরী নয় যে, এসব বিষয়বস্তুর কারণে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের যে অংশে এসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তাকে কোরআন বলতে হবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এর প্রবক্তা নয়; বরং অধিকাংশের বিশ্বাস এই যে, কোরআন যেমন শুধু শব্দের নাম নয়, তেমনি শুধু অর্থসম্ভারের নামও নয়। যদি কেউ কোরআনেরই বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন জায়গা থেকে চয়ন করে নিম্নরূপ বাক্য গঠন করে, الحمد لله العزيز الرحيم الذى له ملك السماوات وهو رب العالمين خالق كل شئ وهو المستعان তবে একে কেউ কোরআন বলতে পারবে না।

এমনিভাবে শুধু কোরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোন ভাষায় বিধৃত হলে তাকেও কোরআন বলা যায় না।

নামাযে কোরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্মতক্রমে অবৈধ ঃ এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত যে, নামাযে ফরয তেলাওয়াতের স্থলে কোরআনের শব্দাবলীর অনুবাদ ফারসী, উর্দু, ইংরেজী ইত্যাদি কোন ভাষায় পাঠ করা অপারক অবস্থা ছাড়া যথেষ্ট নয়। কোন

কোন ইমাম থেকে এ সম্পর্কে ভিন্ন উক্তিও বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে সেই উক্তির প্রত্যাহারও প্রমাণিত রয়েছে।

কোরআনের বাংলা অনুবাদকে বাংলা কোরআন' বলা জায়েয নয় ঃ এমনিভাবে আরবীর মূল বাক্যাবলী ছাড়া শুধু কোরআনের অনুবাদ কোন ভাষায় লেখা হলে তাকে সেই ভাষার কোরআন বলা জায়েয নয়; যেমন আজকাল অনেকেই শুধু বাংলা অনুবাদকে 'বাংলা কোরআন' ইংরেজী অনুবাদকে 'ইংরেজী কোরআন' বলে থাকে। এটা না-জায়েয ও ধৃষ্টতা। মূল বাক্যাবলী ছাড়া কোরআনকে অন্য কোন ভাষার 'কোরআন' নামে প্রকাশ করা এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করা না-জায়েয।

أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ এ আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ করাও আল্লাহ্ তাআলার একটি নেয়ামত। কিন্তু যারা এই নেয়ামতের নাশোকরী করে, বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের দীর্ঘ জীবনের নিরাপত্তা ও অবকাশ কোন কাজে আসবে না। ইমাম যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয প্রতিদিন সকালে তাঁর শ্মশ্রু ধরে নিজেকে সম্বোধন করে এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ এরপর অঝোরে কাঁদতে থাকতেন।

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ - عشيرة শব্দের অর্থ পরিবারবর্গ। اقربين বিশেষণ যুক্ত করে তাদের মধ্যেও নিকটতমদেরকে বোঝানো হয়েছে। এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, সমগ্র উম্মতের কাছে রেসালত প্রচার করা ও তাদেরকে সতর্ক করা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ফরয ছিল। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারের লোকদেরকে সতর্ক করার আদেশ দানের রহস্য কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে তবলীগ ও দাওয়াতকে সহজ ও কার্যকর করার এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। পদ্ধতিটি এই যে, পরিবারের সদস্যবর্গ অন্যদের তুলনায় নিকটবর্তী। কাজেই প্রত্যেক ভাল ও কল্যাণকর কাজে তারা অন্যদের চাইতে অগ্রণী থাকার অধিকার রাখে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে তাদের মধ্যে কোন মিথ্যা দাবীদার সুবিধা করতে পারে না। যার সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব পরিবারের লোকদের মধ্যে সুবিদিত, তার সত্য দাওয়াত কবুল করা তাদের জন্যে সহজও। নিকটতম আত্মীয়রা যখন কোন আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যায়, তখন তাদের সহমর্মিতা এবং সাহায্যও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। লোকেরা দলগত দিক দিয়েও তার সমর্থন করতে বাধ্য হয়। যখন সত্য ও সততার ভিত্তিতে নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের একটি পরিবেশ তৈরী হয়ে যায়, তখন প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যেকের পক্ষে ধর্মের নির্দেশাবলী পালন করা সহজ হয়ে যায় এবং তাদেরকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তি তৈরী হয়ে অপরাপর লোকদের কাছে দাওয়াত পৌছানোর কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا অর্থাৎ, নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। এতে পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছে। এটা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের সহজ-সরল উপায়। চিন্তা করলে দেখা যায়, যে পর্যন্ত পরিবেশ অনুকূল না হয়, সেই পর্যন্ত কোন মানুষের পক্ষে নিজে সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রতার অনুসারী হওয়া এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা স্বভাবগতভাবে সম্ভবপর হয় না। সমস্ত গৃহে যদি একজন লোক পূর্ণরূপে নামায পালন করতে চায়, তবে পাকা নামাযীর পক্ষেও যথাযথ হক আদায় করা সুকঠিন হবে। আজকাল হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর কারণ এই নয় যে, বাস্তবে তা পরিত্যাগ করা কঠিন কাজ; বরং কারণ এই যে, সমগ্র পরিবেশ ও সমগ্র জাতি-গোষ্ঠী যে ক্ষেত্রে গোনাহে লিপ্ত, সেখানে একা এক ব্যক্তির পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পরিবারের সবাইকে একত্রিত করে সত্যের এই পয়গাম শুনিয়ে দেন। তখন তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেও আস্তে আস্তে পরিবারের লোকদের মধ্যে ইসলাম ও ঈমান প্রবেশ লাভ করতে শুরু করে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পিতৃব্য হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চার করে।

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

سورة النمل مكية وهي ثلاث وتسعون آية وسبع ركوعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

طس ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٥﴾

(২১৬) যদি তারা আপনার অবাধ্যতা করে, তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, তা থেকে আমি মুক্ত। (২১৭) আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর, (২১৮) যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি নামাযে দণ্ডায়মান হন, (২১৯) এবং নামাযীদের সাথে উঠাবসা করেন। (২২০) নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (২২১) আমি আপনাকে বলব কি কার নিকট শয়তানরা অবতরণ করে? (২২২) তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গোনাহ্গারের উপর। (২২৩) তারা শ্রুত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (২২৪) বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। (২২৫) তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে? (২২৬) এবং এমন কথা বলে, যা তারা করে না। (২২৭) তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ্কে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ?

সূরা-নমল

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৯৩

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) ত্বা-সীন; এগুলো আল-কোরআনের আয়াত এবং আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের। (২) মুমিনদের জন্যে পথনির্দেশ ও সুসংবাদ। (৩) যারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে। (৪) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকাণ্ডকে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব, তারা উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (৫) তাদের জন্যেই রয়েছে মন্দ শাস্তি এবং তারাই পরকালে অধিকক্ষতিগ্রস্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কবিতার সংজ্ঞা ঃ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ অভিধানে এমন বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়, যাতে শুধু কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়। এর জন্যে ছন্দ, ওজন এবং সমিল শব্দ ইত্যাদিও শর্ত নয়। তর্কশাস্ত্রেও এ ধরনের বিষয়বস্তুকে 'কবিতাধর্মী প্রমাণ' এবং কবিতা-দাবীযুক্ত বাক্য বলা হয়। পারিভাষিক কবিতা ও গজলেও সাধারণতঃ কাল্পনিক বিষয়াদিরই প্রাধান্য থাকে। তাই কবিদের ভাষায় ছন্দযুক্ত সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়ে থাকে। কোন কোন তফসীরকারক কোরআনের شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ — لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ইত্যাদি আয়াতে পারিভাষিক কবিতার অর্থ ধরে বলেছেন যে, মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ওজনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দবিশিষ্ট বাক্যাবলী নিয়ে আগমনকারী বলত। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, কাফেরদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। কারণ, তারা কবিতার রীতি-নীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত ছিল। বলাবাহুল্য, কোরআন কবিতাবলীর সমষ্টি নয়।

একজন অনারব ব্যক্তিও এরূপ কথা বলতে পারে না। প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষী আরবরা বলা দূরের কথা; বরং কাফেররা তাঁকে আসল ও আভিধানিক অর্থে কবি অর্থাৎ, কাল্পনিক বিষয়াদি নিয়ে আগমনকারী বলত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যাবাদী বলা। কারণ, شعر (কবিতা) মিথ্যার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং كَذُوبٌ তথা মিথ্যাবাদীকে شَاعِرٌ বলা হয়। তাই প্রমাণাদিকে কবিতাধর্মী প্রমাণাদি বলা হয়ে থাকে। মোটকথা এই যে, ছন্দযুক্ত ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে যেমন কবিতা বলা হয়, তেমনি ধারণাপ্রসূত আনুমানিক বাক্যাবলীকেও কবিতা বলা হয়। এটা তর্কশাস্ত্রের পরিভাষা।

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ আলোচ্য আয়াতে কবিতার পারিভাষিক ও প্রসিদ্ধ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, যারা ওজনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলী রচনা করে, আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। ফতহুল-বারীর এক রেওয়ায়েত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, এই আয়াত নাযিল হবার পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা, হাসসান ইবনে সাবেত, কা'ব ইবনে মালেক প্রমুখ সাহাবী কবি ক্রন্দনরত অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্, আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন। আমরাও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের কি উপায়? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, আয়াতের শেষাংশে পাঠ কর। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের কবিতা যেন অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লেখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের প্রথমাংশে মুশরেক কবিদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, পথভ্রষ্ট লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ধত জিন তাদেরই কবিতার অনুসরণ করত এবং তা বর্ণনা করত। — (ফতহুল-বারী)।

ইসলামী শরীয়তে কাব্যচর্চার মান ঃ উল্লেখিত আয়াতের প্রথমাংশ থেকে কাব্যচর্চার কঠোর নিন্দা এবং তা আল্লাহ্র কাছে অপছন্দনীয় হওয়া বোঝা যায়। কিন্তু শেষাংশে যে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয়; বরং যে কবিতায় আল্লাহ্

তাআলার অবাধ্যতা করা হয় কিংবা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত রাখা হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয় অথবা যে কবিতা অশ্লীল ও অশ্লীলতার প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যেসব কবিতা গোনাহ্ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র সেগুলোকে আল্লাহ্ তাআলা إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ আয়াতের মাধ্যমে ব্যতিক্রমভুক্ত করে দিয়েছেন। কোন কোন কবিতা তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু এবং ওয়াজ ও উপদেশ সম্বলিত হওয়ার কারণে এবাদত ও সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে আছে, ان من الشعر لحكمة অর্থাৎ, কতক কবিতা জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে।—(বোখারী) হাফেয ইবনে হাজার বলেন, এই রেওয়ায়েতে 'হেকমত' বলে সত্যভাষণ বোঝানো হয়েছে। ইবনে বাত্তাল বলেন, যে কবিতায় আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব, তাঁর যিকর এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসা বর্ণিত হয়, সেই কবিতা কাম্য ও প্রশংসনীয়। উপরোক্ত হাদীসে এরূপ কবিতাই বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কবিতায় মিথ্যা ও অশ্লীল বর্ণনা থাকে, তা নিন্দনীয়। এর আরও সমর্থন নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে পাওয়া যায়। (১) ওমর ইবনে শারীদ তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার মুখ থেকে উমাইয়া ইবনে আবু সলতের একশ' লাইন পর্যন্ত কবিতা শ্রবণ করেন। (২) মুতারিক বলেন, আমি কূফা থেকে বসরা পর্যন্ত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)-এর সাথে সফর করেছি। প্রতি মনযিলেই তিনি কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। (৩) তাবারী প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ী সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা কবিতা রচনা করতেন, শুনতেন এবং শোনাতেন। (৪) ইমাম বোখারী বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) কবিতা বলতেন। (৫) আবু ইয়ালা ইবনে ওমর থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কবিতার বিষয়বস্তু উত্তম ও উপকারী হলে কবিতা ভাল এবং বিষয়বস্তু মন্দ ও গোনাহের হলে কবিতা মন্দ।—(ফতহুল বারী)

তফসীরে কুরতুবীতে আছে, মদীনা মুনাওয়ারার দশ জন জ্ঞানে-গরিমায় সেরা ফেকাহ্বিশারদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ প্রসিদ্ধ সৃজনশীল কবি ছিলেন। কাযী যুবায়র ইবনে বাক্কারের কবিতাসমূহ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংরক্ষিত ছিল। কুরতুবী আবু আমরের উক্তি বর্ণনা করেন যে, উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতাকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ মন্দ বলতে পারেন না। কেননা, ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসৃত প্রধান সাহাবিগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যিনি কবিতা রচনা করেননি অথবা অপরের কবিতা আবৃত্তি করেননি কিংবা শোনেননি ও পছন্দ করেননি।

যেসব রেওয়ায়েতে কাব্যচর্চার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র স্মরণ, এবাদত ও কোরআন থেকে গাফেল হয়ে কাব্যচর্চায় নিমগ্ন হওয়া নিন্দনীয়। ইমাম বোখারী একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হযরত আবু হোরায়রার এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন ঃ

لان يمتلئ جوف رجل قيحا يراه خير من ان يمتلئ شعرا

অর্থাৎ, পুঁজ দ্বারা পেট ভর্তি করা কবিতা দ্বারা ভর্তি করার চাইতে উত্তম। ইমাম বোখারী বলেন, আমার মতে এর অর্থ এই যে, কবিতা আল্লাহ্র স্মরণ, কোরআন ও জ্ঞানচর্চার উপর প্রবল হয়ে গেলে তা মন্দ এবং পরাভূত থাকলে মন্দ নয়। এমনিভাবে যেসব কবিতা অশ্লীল বিষয়বস্তু, অপরের প্রতি ভর্ৎসনা, বিদ্রূপ অথবা অন্য কোন শরীয়ত-বিরোধী বিষয়বস্তু সম্বলিত হয়, সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও না-জায়েয। এটা শুধু কবিতার বেলায়ই নয়, গদ্যে এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বিবৃত হলে তাওহারাম।—(কুরতুবী)

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) প্রশাসক আদী ইবনে নযলাকে অশ্লীল কবিতা বলার অপরাধে পদচ্যুত করে দেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) আমর ইবনে রবীয়া ও আবুল আহ্ওয়াসকে এই একই অপরাধে দেশান্তরিত করার আদেশ দেন। অতঃপর আমর ইবনে রবীয়া তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়।—(কুরতুবী)

যে জ্ঞান ও শাস্ত্র আল্লাহ্ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফেল করে দেয়, তা নিন্দনীয় ঃ ইবনে আবী জমরাহ্ বলেন, যে জ্ঞান ও শাস্ত্র অন্তরকে কঠোর করে দেয়, আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ করে এবং বিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও আত্মিক রোগ সৃষ্টি করে, তার বিধানও নিন্দনীয় কবিতার অনুরূপ।

সূরা অন-নমল,

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ অর্থাৎ যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কুকর্মকে শোভন করে দিয়েছি। ফলে তারা সেগুলোকেই উত্তম মনে করে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকে। কোন কোন তফসীরবিদ এই আয়াতের তফসীরে বলেন যে, এখানে أَعْمَالَهُمْ বলে তাদের সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তো সৎকর্মকে সুশোভিত করে তাদের সামনে রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু জালেমরা এদিকে ভ্রূক্ষেপও করেনি; বরং কুফর ও শেরকে লিপ্ত রয়েছে। ফলে তারা পথ-ভ্রষ্টতার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রথমোক্ত তফসীর অধিক স্পষ্ট। কারণ, প্রথমতঃ সুশোভিত করার কথাটি অধিকাংশ কুকর্মের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ — زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ সৎকর্মের জন্য এই শব্দের ব্যবহার খুবই কম; যেমন حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ দ্বিতীয়তঃ আয়াতে উল্লেখিত أَعْمَالَهُمْ (তাদের কর্ম) শব্দ একথা বোঝায় যে, এর অর্থ কুকর্ম-সৎকর্ম নয়।

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ
لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ
لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَ
مَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ
وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ
الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ
غَيْرِ سُوءٍ ۖ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا
قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا
سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَ
سُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا
مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

(৬) এবং আপনাকে কোরআন প্রদত্ত হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। (৭) যখন মূসা তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন ঃ 'আমি অগ্নি দেখেছি, এখন আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্যে কোন খবর আনতে পারব অথবা তোমাদের জন্যে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। (৮) অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে আসলেন, তখন আওয়াজ হল, ধন্য তিনি, যিনি আগুনের স্থানে আছেন এবং যারা আগুনের আশেপাশে আছেন। বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্‌ পবিত্র ও মহিমান্বিত। (৯) হে মূসা, আমি আল্লাহ্‌, প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১০) আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি।' অতঃপর যখন তিনি তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলেন, তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও দেখলেন না। হে মূসা, ভয় করবেন না। আমি যে রয়েছি, আমার কাছে পয়গম্বরগণ ভয় করেন না। (১১) তবে যে বাড়াবাড়ি করে এরপর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে। নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১২) আপনার হাত আপনার বগলে ঢুকিয়ে দিন, সুশুভ্র হয়ে বের হবে নির্দোষ অবস্থায়।' এগুলো ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। (১৩) অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু। (১৪) তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? (১৫) আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। তাঁরা বলেছিলেন, 'আল্লাহ্‌র প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।' (১৬) সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'হে লোকসকল, আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকূলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব।'

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ **মানুষের নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে স্বাভাবিক উপায়াদি অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়ঃ** মূসা (আঃ) এস্থলে দু'টি প্রয়োজনের সম্মুখীন হন। (এক), বিস্মৃত পথ জিজ্ঞাসা। (দুই), অগ্নি থেকে উত্তাপ আহরণ করা। কেননা, রাত্রি ছিল কনকনে শীতের। তাই তিনি তূর পাহাড়ের দিকে যেতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সাথে সাথে এই লক্ষ্যে সফলতার পূর্ণ বিশ্বাস ও দাবী করার পরিবর্তে তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করলেন, যাতে বান্দাসুলভ বিনয় ও আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে আশা ব্যক্ত হয়। এতে বোঝা যায় যে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্জনের জন্যে চেষ্টা-চরিত্র করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। তবে নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা উচিত। তাঁকে আগুন দেখানোর মধ্যেও সম্ভবতঃ এই রহস্য ছিল যে, এতে তাঁর উপর উভয় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারত — পথ পাওয়া এবং উত্তাপ আহরণ করা।—(রূহুল-মা'আনী)।

এস্থলে হযরত মূসা (আঃ) تَصْطَلُونَ ক্রিয়াপদটি বহুবচনে বলেছেন। অথচ তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ, শোআয়ব (আঃ)-এর কন্যাও ছিলেন। তার জন্যে সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে একজনকেও সম্বোধন করলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ও তাঁর পত্নীদের জন্যে বহুবচনের পদ ব্যবহার করেছেন বলে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে।

সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করা বরং ইশারা-ইঙ্গিতে বলা উত্তম ঃ আয়াতে قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ বলা হয়েছে। اهل শব্দের মধ্যে স্ত্রী এবং গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিও শামিল থাকে। এস্থলে মূসা (আঃ)- এর সাথে একমাত্র তাঁর স্ত্রীই ছিলেন, অন্য কেউ ছিল না, কিন্তু এই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মজলিসে কেউ স্ত্রীর আলোচনা করলে ব্যাপক শব্দের মাধ্যমে করা উচিত। যেমন সাধারণভাবে একথা বলার প্রচলন আছে যে, আমার পরিবারের লোক একথা বলে।

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ
اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

মূসা (আঃ)-এর আগুন দেখা এবং আগুনের মধ্য থেকে আওয়াজ আসার স্বরূপ ঃ মূসা (আঃ)-এর এই ঘটনা কোরআন পাকের অনেক সূরায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নামলের আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত দু'টি বাক্য চিন্তা-সাপেক্ষ – প্রথম بُورِكَ مَن فِي النَّارِ এবং দ্বিতীয় إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ সূরা তোয়াহায় এই ঘটনা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়েছে— إِذْ رَأَىٰ نَارًا থেকে

نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ
طُوًى - وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا
أَنَا فَاعْبُدْنِي

এসব আয়াতেও দু'টি বাক্য বিশেষভাবে চিন্তাসাপেক্ষ। প্রথম إِنِّي أَنَا رَبُّكَ এবং দ্বিতীয় إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ – সূরা কাসাসে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

এই সূরাত্রয়ের বর্ণনাভঙ্গি বিভিন্নরূপ হলেও বিষয়বস্তু প্রায় একই। তা এই যে, সে রাত্রিতে একাধিক কারণে হযরত মূসা (আঃ)– এর অগ্নি প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্ তাআলা তূর পাহাড়ের এক বৃক্ষে তাঁকে অগ্নি দেখালেন। সেই অগ্নি বা বৃক্ষ থেকে এ আওয়াজ শোনা গেল– إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - إِنِّي أَنَا رَبُّكَ - إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ - إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا –এটা সম্ভবপর যে, এই আওয়াজ বার বার হয়েছে — একবার এক শব্দে এবং অন্যবার অন্য শব্দে। তফসীরে বাহরে-মুহীতে আবু হাইয়্যান এবং রুহুল-মা'আনীতে আল্লামা আলুসী এই আওয়াজ শ্রবণের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তা এই যে; এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে একইরূপ শোনা যাচ্ছিল, যার কোন বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর ছিল না। শ্রবণও বিচিত্র ভঙ্গিতে হয়েছে — শুধু কর্ণ নয়, বরং হাত, পা ও অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই আওয়াজ শুনছিল। এটা ছিল একটা মু'জেযাবিশেষ।

এটা গায়বী আওয়াজ, নির্দিষ্ট কোন দিক ও অবস্থা ছাড়াই শ্রুত হচ্ছিলো, কিন্তু এর উৎপত্তিস্থল ছিল সেই অগ্নি অথবা বৃক্ষ, যা থেকে অগ্নির আকৃতি দেখানো হয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে মানুষের জন্যে বিভ্রান্তি ও তা প্রতিমাপূজার কারণ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক বর্ণনার সাথে সাথে তওহীদের বিষয়বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে وَسُبْحَانَ اللَّهِ শব্দ এই হুঁশিয়ারীর জন্যেই সংযুক্ত করা হয়েছে। সূরা তোয়াহায় لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا এবং সূরা কাসাসে أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ এই বিষয়বস্তুকেই জোরদার করার জন্যে আনা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হযরত মূসা (আঃ) তখন আগুন ও আলোর প্রয়োজন দারুণভাবে অনুভব করেছিলেন বলেই তাঁকে আগুনের আকৃতি দেখানো হয়েছিল। নতুবা আগুনের সাথে অথবা বৃক্ষের সাথে আল্লাহ্‌র কালাম ও আল্লাহ্‌র সত্তার কোন সম্পর্ক ছিল না। সাধারণ সৃষ্টবস্তুর ন্যায় আগুনও আল্লাহ্ তাআলার একটি সৃষ্টবস্তু ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে — أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ, ধন্য সে, যে অগ্নিতে আছে এবং যে আশেপাশে আছে। উপরোক্ত কারণেই এর তফসীরে তফসীরকারদের উক্তি বিভিন্নরূপ হয়ে গেছে। তফসীরে রুহুল মা'আনীতে এর বিবরণ দেয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ইকরিমা থেকে বর্ণিত আছে, مَن فِي النَّارِ বলে হযরত মূসা (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। কেননা, অগ্নিটি তো সত্যিকার অগ্নি ছিল না। যে বরকতময় স্থানে মূসা (আঃ) উপস্থিত হয়েছিলেন, দূর থেকে সেটা সম্পূর্ণ অগ্নি মনে হচ্ছিল। তাই মূসা (আঃ) অগ্নির মধ্যে হলেন। وَمَنْ حَوْلَهَا বলে আশেপাশে উপস্থিত ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে,, مَن فِي النَّارِ বলে ফেরেশতা এবং وَمَنْ حَوْلَهَا বলে হযরত মূসা (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহের সঠিক অর্থ বোঝার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হাসান বসরী (রাঃ)-এর একটি রেওয়ায়েত ও তার পর্যালোচনা ঃ ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুওয়াইহ্ প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও সায়ীদ ইবনে জুবায়র থেকে مَن فِي النَّارِ এর তফসীর প্রসঙ্গে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, مَن فِي النَّارِ বলে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র ও মহান সত্তা বোঝানো হয়েছে। বলাবাহুল্য, অগ্নি একটি সৃষ্টবস্তু এবং কোন সৃষ্টবস্তুর মধ্যে স্রষ্টার অনুপ্রবেশ হতে পারে না যে, আল্লাহ্ তাআলার সত্তা আগুনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল; যেমন অনেক প্রতিমাপূজারী মুশরেক প্রতিমার অস্তিত্বে আল্লাহ্ তাআলার সত্তার অনুপ্রবেশ বিশ্বাস করে। এটা তওহীদের ধারণার নিশ্চিত পরিপন্থী। বরং রেওয়ায়েতের অর্থ আত্মপ্রকাশ করা। উদাহরণতঃ আয়নায় যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, তা আয়নার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকে না— তা থেকে আলাদা ও বাইরে থাকে। এই আত্মপ্রকাশকে 'তাজাল্লী' তথা জ্যোতি বিকীরণও বলা হয়। বলাবাহুল্য, এই তজল্লী স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার সত্তার তাজল্লী ছিল না নতুবা আল্লাহ্ তাআলার সত্তা মূসা (আঃ) অবলোকন করে থাকলে পরবর্তী সময়ে তাঁর এই আবেদনের কোন অর্থ থাকে না যে, رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আপন সত্তা প্রদর্শন করুন, যাতে আমি দেখতে পারি। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে لَن تَرَانِي বলারও কোন অর্থ থাকে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত উক্তিতে আল্লাহ্ তাআলার আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ, অগ্নির আকারে জ্যোতি বিকীরণ বোঝানো হয়েছে। এটা যেমন অনুপ্রবেশ ছিল না, তেমনি সত্তার তাজাল্লীও ছিল না। বরং لَن تَرَانِي উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বস্তুজগতে আল্লাহ্ তাআলার সত্তাগত তাজাল্লী প্রত্যক্ষ করার শক্তি কারও নেই। এমতাবস্থায় এই আত্মপ্রকাশ ও তাজল্লীর অর্থ কি হবে? এর জওয়াব এই যে, এটা "মিছলী" তথা দৃষ্টান্তগত তাজল্লী ছিল, যা সূফী-বুযুর্গদের মধ্যে সুবিদিত। মানুষের পক্ষে এর স্বরূপ বোঝা কঠিন। প্রয়োজনমাফিক কিঞ্চিৎ বোধগম্য করার জন্যে আমি আমার আরবী ভাষায় লিখিত 'আহকামুল-কোরআন' গ্রন্থের সূরা কাসাসে এর কিছু বিবরণ লিখেছি। উৎসাহী পাঠকগণ সেখানে দেখে নিতে পারেন। إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ –এর পূর্বের আয়াতে মূসা (আঃ)–এর লাঠির মু'জেযা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে একথাও বলা হয়েছে যে, লাঠিকে সর্প হয়ে যেতে দেখে মূসা (আঃ) নিজেও ভয়ে পালাতে থাকেন। এরপরও মূসা (আঃ)– এর দ্বিতীয় মু'জেযা সুশুভ্র হাতের বর্ণনা আছে। মাঝখানে এই ব্যতিক্রম কেন উল্লেখ করা হল এবং এটা استثناء منقطع না متصل – এ সম্পর্কে তফসীরকার গণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ একে منقطع সাব্যস্ত করেছেন। তখন আয়াতের বিষয়বস্তু হবে এই যে, পূর্বের আয়াতে পয়গম্বরগণের মধ্যে ভয় না থাকার কথা বলা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাদের কথাও আলোচনা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ, যাদের দ্বারা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, এরপর তওবা করে সৎকর্ম অবলম্বন করে। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যদিও আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করে দেন, কিন্তু ক্ষমার পরেও গোনাহের কোন কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকার সম্ভাবনা আছে। ফলে

তারা সর্বদা ভীত থাকে। পক্ষান্তরে استثناء متصل সাব্যস্ত করা হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্‌র রসূল ভয় করেন না তাদের ব্যতীত, যাদের দ্বারা ত্রুটি-বিচ্যুতি অর্থাৎ, সগীরা গোনাহ্ হয়ে যায়। এরপর তা থেকেও তওবা করে নেন। এই তওবার ফলে সগীরা গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। কারণ, পয়গম্বরগণের যেসব পদস্খলন হয়, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সগীরা কবীরা কোন প্রকার গোনাহ্ নয়। তবে আকার থাকে গোনাহের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ইজতিহাদী ভ্রান্তি। এই বিষয়বস্তুর মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মূসা (আঃ)-এর দ্বারা কিবতী-হত্যার যে পদস্খলন ঘটেছিল, তা যদিও আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া তখনও বিদ্যমান ছিল এবং মূসা (আঃ)-এর মধ্যে ভয়-ভীতি সঞ্চারিত ছিল। এই পদস্খলন না ঘটলে সাময়িক ভয়-ভীতিও হত না।—(কুরতুবী)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا — বলাবাহুল্য, এখানে পয়গম্বরগণের নবুওয়ত রেসালত সম্পর্কিত জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। এর ব্যাপক আওতায় অন্যান্য জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত হলে তা অবান্তর নয়; যেমন হযরত দাউদ (আঃ)-কে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল। পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁদেরকে নবুওয়ত ও রেসালতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। রাজত্বও এমন নজিরবিহীন যে, শুধু মানুষের উপর নয় — জ্বিন ও জন্তু-জানোয়ারদের উপরও তাঁরা শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। এসব মহান নেয়ামতের পূর্বে আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানরূপী নেয়ামত উল্লেখ করা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয়েছে যে, জ্ঞানরূপী নেয়ামত অন্যান্য সব নেয়ামতের উর্ধ্বে।—(কুরতুবী)

পয়গম্বরগণের মধ্যে অর্থসম্পদের উত্তরাধিকার হয় না ঃ

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ বলে এখানে জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকার বোঝানো হয়েছে —আর্থিক উত্তরাধিকার নয়। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন نحن معاشر الانبياء لانورث অর্থাৎ, পয়গম্বরগণ উত্তরাধিকারী হন না এবং কেউ তাঁদের উত্তরাধিকারীও হয় না। তিরমিযী ও আবু দাউদে হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولادرهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ وافرا -অর্থাৎ, আলেমগণ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী; কিন্তু পয়গম্বরগণের মধ্যে জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকার হয়ে থাকে—আর্থিক উত্তরাধিকার হয় না। হযরত আবু আবদুল্লাহ্‌র রেওয়ায়েত এই বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে দেয়। তা এই যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) হযরত দাউদ (আঃ)-এর উত্তরাধিকারী এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত সুলায়মান (আঃ)- এর উত্তরাধিকারী।—(রূহুল-মা'আনী) যুক্তির দিক দিয়েও এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো যেতে পারে না। কারণ, হযরত দাউদ (আঃ)-এর ওফাতের সময় তাঁর উনিশ জন পুত্র সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো হলে এই পুত্রদের সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে উত্তরাধিকারী বলার কোন অর্থ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে উত্তরাধিকার এখানে বোঝানো হয়েছে, তাতে ভ্রাতারা অংশীদার ছিল না; বরং একমাত্র সুলায়মান (আঃ) উত্তরাধিকারী হন। এটা শুধু জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকারই হতে পারে। এর সাথে আল্লাহ্ তাআলা হযরত দাউদ (আঃ)- এর রাজত্বও হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তাঁর রাজত্ব জিন, জন্তু, জানোয়ার ও বিহংগকুলের উপরও সম্প্রসারিত করে দেন। বায়ুকে তাঁর নির্দেশাধীন করে দেন। এসব প্রমাণের পর তাবারীর সেই রেওয়ায়েত ভ্রান্ত হয়ে যায়, যাতে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরিবারস্থ কোন কোন ইমামের বরাত দিয়ে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝাতে চেয়েছেন।— (রূহুল মা'আনী)

হযরত সুলায়মান (আঃ)- এর ওফাত ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্মের মাঝখানে এক হাজার সাতশ' বছরের ব্যবধান বিদ্যমান। ইহুদীরা এক হাজার চারশ' বছরের ব্যবধান বর্ণনা করে। সুলায়মান (আঃ)-এর বয়স পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশী ছিল। —(কুরতুবী)

অহংকারবশতঃ না হলে নিজের জন্যে বহুবচন পদ ব্যবহার করা জায়েয ঃ ----- عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا -হযরত সুলায়মান (আঃ) একা হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্যে বহুবচনের পদ রাজকীয় বাকপদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রজাদের মধ্যে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ও সুলায়মান (আঃ)-এর আনুগত্যে শৈথিল্যও প্রদর্শন না করে। এমনিভাবে গভর্ণর, শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ তাদের অধীনস্থদের উপস্থিতিতে নিজের জন্যে বহুবচনের পদ ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, যদি তা শাসনতান্ত্রিক এবং নেয়ামত প্রকাশের উদ্দেশে হয়।—অংকার ও শ্রেষ্টত্ব প্রদর্শনের জন্যে না হয়।

বিহংগকুল ও চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও বুদ্ধি-চেতনা বিদ্যমান ঃ এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পশু-পক্ষী ও সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও কিছু পরিমাণে বুদ্ধি ও চেতনা বর্তমান। তবে তাদের চেতনা এ পরিমাণ নয়, যাতে শরীয়তের নির্দেশাবলী পালনে তারা আদিষ্ট হতে পারে। মানব ও জিনকে পূর্ণ মাত্রায় বুদ্ধি ও চেতনা দান করা হয়েছে। ফলে তারা আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশাবলী পালনের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম শাফে (রহঃ) বলেন, পাখীদের মধ্যে কবুতর সর্বাধিক বুদ্ধিমান। ইবনে আতিয়্যা বলেন, পিপীলিকা মেধাবী ও বুদ্ধিমান প্রাণী। তার ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। যে কোন বীজ তার হাতে এলে সে ওটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে, যাতে তা অঙ্কুরিত না হয়। এরূপ করে সে শীতকালের জন্যে তার খাদ্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত করে রাখে।—(কুরতুবী)

জ্ঞাতব্যঃ আয়াতে হুদহুদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে مَنْطِقَ الطَّيْرِ অর্থাৎ পক্ষীকুলের বুলির উল্লেখ করা হয়েছে। হুদহুদ পাখী জাতীয় প্রাণী। নতুবা হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে সমস্ত পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গের বুলি শেখানো হয়েছিল। পরের আয়াতে পিপীলিকার বুলি বোঝার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী তাঁর তফসীরে এস্থলে বিভিন্ন পক্ষীর বুলি ও সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক তার বিবরণ দান বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক পক্ষীর বুলি কোন না কোন উপদেশ বাক্য।

وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ — আভিধানিক দিক দিয়ে كل শব্দের মধ্যে কোন বস্তুর সমস্ত ব্যক্তিসত্তা শামিল থাকে। কিন্তু প্রায়ই সামগ্রিক ব্যাপকতা বোঝানো হয় না; বরং কোন বিশেষ লক্ষ্য পর্যন্ত ব্যাপকতা বোঝানো হয়; যেমন এখানে সেসব বস্তুর ব্যাপকতা বোঝানো হয়েছে, যেগুলো রাজ্য পরিচালনা ও রাজ্যশাসনে প্রয়োজনীয়। নতুবা একথা সহজবোধ্য যে, উড়োজাহাজ, মোটর, রেলগাড়ী ইত্যাদি হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর কাছে ছিল না।

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾
حَتّٰىٓ اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا
مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩﴾ وَتَفَقَّدَ
الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ﴿٢٠﴾
لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ
مُّبِيْنٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَ
جِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ﴿٢٢﴾ اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ
وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا
يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ
الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ
وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٥﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٦﴾ السجدة

(১৭) সুলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল। — জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হল। (১৮) যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, 'হে পিপীলিকা দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে।' (১৯) তার কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসলেন এবং বললেন, 'হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।' (২০) সুলায়মান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, 'কি হল, হুদহুদকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত? (২১) আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ।' (২২) কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে বলল, 'আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে 'সাবা' থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। (২৩) আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। (২৪) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না। (২৫) তারা আল্লাহ্‌কে সেজদা করে না কেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর। (২৬) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি মহা-আরশের মালিক।'

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ — এটা وزع থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি, তা থেকে কোন সময় পৃথক না হই। মোটকথা এই যে, সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এর আগে আয়াতের فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, বাহিনীকে প্রাচুর্যের কারণে বিরত রাখা, যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়।

وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ — এখানে রোযার অর্থ কবুল। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, আমাকে এমন সৎকর্মের তওফীক দিন, যা আপনার কাছে মকবুল হয়। রূহুল মা'আনীতে এর মাধ্যমে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, সৎকর্ম মকবুল হওয়াই জরুরী নয়; বরং এটা কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই পয়গম্বরগণ তাঁদের সৎকর্মসমূহ মকবুল হওয়ার জন্যেও দোয়া করতেন; যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) কাবা গৃহ নির্মাণের সময় দোয়া করেছিলেন رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا — এতে বোঝা গেল যে, কোন সৎকর্ম সম্পাদন করেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়; বরং তা কবুল হওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করাও বাঞ্ছনীয়।

সৎকর্ম মকবুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে না ঃ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ — সৎকর্ম সম্পাদন এবং তা মকবুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলার কৃপা দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি তার কর্মের উপর ভরসা করে জান্নাতে যাবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও। কিন্তু আমাকে আমার আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বেষ্টন করে আছে।— (রূহুল-মা'আনী)

হযরত সুলায়মান (আঃ)-ও এসব বাক্যে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্যে খোদায়ী কৃপা ও অনুগ্রহের দোয়া করছেন অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, আমাকে সেই কৃপাও দান কর, যদ্দ্বারা জান্নাতের উপযুক্ত হই।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ - تَفَقَّدَ — এর শাব্দিক অর্থ কোন জনসমাবেশে উপস্থিত ও অনুপস্থিতির খবর নেয়া। তাই এর অনুবাদে খোঁজ নেয়া ও পর্যবেক্ষণ করা বলা হয়েছে। হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা মানব, জ্বিন, জন্তু ও পশু-পক্ষীদের উপর রাজত্ব দান করেছিলেন। রাজ্যশাসনের নীতি অনুযায়ী সর্বস্তরের প্রজাদের দেখাশোনা করা ও খোঁজ-খবর নেয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে বলা হয়েছে- وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ -অর্থাৎ, সুলায়মান (আঃ) তাঁর পক্ষী প্রজাদেরকে পরিদর্শন করলেন এবং দেখলেন যে, তাদের মধ্যে কে উপস্থিত এবং কে অনুপস্থিত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরও এই সুঅভ্যাস ছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন, তিনি অসুস্থ হলে দেখার জন্যে তশরীফ নিয়ে যেতেন, সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং কেউ কোন কষ্টে থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতেন।

শাসকের জন্যে জনসাধারণের এবং পীর-মুর্শিদের জন্যে শিষ্য ও মুরীদদের খোঁজ-খবর নেয়া জরুরী ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) সর্বস্তরের প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন

এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতেন। এমন কি, যে হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে অন্যান্য পাখীর তুলনায় কম, সেই হুদহুদও তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকেনি। বরং বিশেষভাবে হুদহুদ সম্পর্কে তাঁর প্রশ্ন করার এক কারণ এটাও হতে পারে যে, হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে কম সংখ্যক ও দুর্বল। তাই প্রজাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে তিনি অধিক যত্নবান হয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) তাঁর খেলাফতের আমলে পয়গম্বরগণের এই সুন্নতকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মদীনার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে সবার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কাউকে কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। এ ধরনের অজস্র ঘটনা তাঁর জীবনীতে উল্লেখিত আছে। তিনি বলতেন, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় কোন ব্যাঘ্র কোন ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর জন্যেও ওমরকে প্রশ্ন করা হবে।—(কুরতুবী)

এ হচ্ছে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের রীতি-নীতি, যা পয়গম্বরগণ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং যার ফলে মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনসাধারণ সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করত। তাঁদের পর পৃথিবী এমন সুবিচার, ইনসাফ ও সাধারণ বিশ্বের শান্তি, সুখ ও নিশ্চয়তার সে দৃশ্য আর দেখেনি।

مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ — সুলায়মান (আঃ) বললেন, আমার কি হল যে, আমি হুদহুদকে সমাবেশে দেখতে পাচ্ছি না।

আত্মসমালোচনা ঃ এখানে স্থান ছিল একথা বলার—"হুদহুদের কি হল যে, সে সমাবেশে উপস্থিত নেই" বলার ভঙ্গি পরিবর্তন করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, হুদহুদ ও অন্যান্য পক্ষীকুলের অধীনস্থ হওয়া আল্লাহ্ তাআলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। হুদহুদের অনুপস্থিতি দেখে শুরুতে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর মনে এই আশংকা দেখা দিল যে, সম্ভবতঃ আমার কোন ত্রুটির কারণে এই অনুগ্রহ হ্রাস পেয়েছে এবং এক শ্রেণীর পাখী অর্থাৎ, হুদহুদ গায়ব হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, এরূপ কেন হল? সূফী-বুযুর্গদেরও অভ্যাস তাই। তাঁরা যখন কোন নেয়ামত হ্রাস পেতে দেখেন অথবা কোন কষ্ট ও উদ্বেগে পতিত হন, তখন তা নিরসনের জন্যে বৈষয়িক উপায়াদির দিকে মনোযোগ দানের পূর্বে আত্ম-সমালোচনা করেন যে, আমা দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কি কোন ত্রুটি হল, যদ্দরুন এই নেয়ামত প্রত্যাহার করা হয়েছে? কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে এ স্থলে বুযুর্গদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, اذا فقدوا امالهم تفقدوا اعمالهم অর্থাৎ, তাঁরা যখন উদ্দেশ্যে সফল হন না, তখন নিজেদের কার্যাবলীর খবর নেন যে, তাঁদের দ্বারা কি ত্রুটি হয়ে গেছে।

এই প্রাথমিক আত্মসমালোচনা ও চিন্তা-ভাবনার পর সুলায়মান (আঃ) বললেন, أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ —এখানে ام শব্দটি بَلْ — এর সমার্থবোধক।—(কুরতুবী) অর্থাৎ, হুদহুদকে দেখার ব্যাপারে আমার দৃষ্টি ভুল করেনি; বরং সে উপস্থিতই নয়।

পক্ষীকুলের মধ্যে হুদহুদকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, এতসব পক্ষীর মধ্যে শুধু হুদহুদকে খোঁজার কি কারণ ছিল? তিনি বললেন, সুলায়মান (আঃ) তখন এমন জায়গায় অবস্থানরত ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ্ তাআলা হুদহুদ পক্ষীকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তুসমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত ঝরণাসমূহকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আঃ) হুদহুদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, এই প্রান্তরে কতটুকু গভীরতায় পানি পাওয়া যাবে এবং কোথায় মাটি খনন করলে প্রচুর পানি পাওয়া যাবে। হুদহুদ জায়গা চিহ্নিত করে দিলে তিনি জিনদেরকে মাটি খনন করে পানি বের করার আদেশ দিতেন। তারা ক্ষিপ্রগতিতে খনন করে পানি বের করতে পারত। হুদহুদ তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস বলেন — قف ياوقاف كيف يرى الهدهد باطن الارض وهو لايرى الفخ حين يقع فيه জ্ঞানীগণ! এই সত্য জেনে নাও যে, হুদহুদ পাখী মাটির গভীরে অবস্থিত বস্তুকে দেখে, কিন্তু মাটির উপর বিস্তৃত জাল তার নজরে পড়ে না, যাতে সে আবদ্ধ হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা কারও জন্যে যে কষ্ট অথবা সুখ অবধারিত করে দিয়েছেন, তার বাস্তবরূপ লাভ করা অবশ্যম্ভাবী। কোন ব্যক্তি জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা অথবা গায়ের জোরে ও অর্থের জোরে তা থেকে বাঁচতে পারে না।

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ —প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনার পর এটা হচ্ছে শাসকসুলভ নীতির প্রকাশ যে, অনুপস্থিতকে শাস্তি দিতে হবে।

যে জন্তু কাজে অলসতা করে, তাকে সুষম শাস্তি দেয়া জায়েয ঃ হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে আল্লাহ্ তাআলা জন্তুদেরকে এরূপ শাস্তি দেয়া হালাল করে দিয়েছিলেন; যেমন সাধারণ উম্মতের জন্যে জন্তুদেরকে যবাই করে তাদের মাংস, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া এখন হালাল। এমনিভাবে পালিত জন্তু গাভী, বলদ, গাধা, ঘোড়া, উট ইত্যাদি কাজে অলসতা করলে প্রয়োজনমাফিক প্রহারের সুষম শাস্তি দেয়া এখনও জায়েয। অন্যান্য জন্তুকে শাস্তি দেয়া আমাদের শরীয়তে নিষিদ্ধ।—(কুরতুবী)

أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ —অর্থাৎ, হুদহুদ যদি তার অনুপস্থিতির কোন উপযুক্ত অজুহাত পেশ করে, তবে সে এই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া বিচারকের কর্তব্য। উপযুক্ত ওযর পেশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া উচিত।

أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ —অর্থাৎ, হুদহুদ তার ওযর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলল, আমি যা অবগত, আপনি তা অবগত নন। অর্থাৎ, আমি এমন এক সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা ছিল না।

পয়গম্বরগণ আলেমুল গায়ব ছিলেন না ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন, এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পয়গম্বরগণ আলেমুল গায়ব নন যে, সবকিছুই তাঁদের জানা থাকবে।

وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ —'সাবা' ইয়ামনের একটি প্রসিদ্ধ শহর, যার অপর নাম মাআরিবও। সাবা ও ইয়ামনের রাজধানী সানআর মধ্যে তিন দিনের দূরত্ব ছিল।

ছোট কি বড়কে বলতে পারে যে, আমার জ্ঞান আপনার চাইতে বেশী? ঃ হুদহুদের উপরোক্ত কথাবার্তা দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করেন যে, কোন শাগরেদ তার ওস্তাদকে এবং আলেম নয় এমন কোন ব্যক্তি

আলেমকে বলতে পারে যে, এ বিষয়ের জ্ঞান আপনার চাইতে আমার বেশী—যদি বাস্তবিকই এ বিষয়ে তার জ্ঞান অন্যের চাইতে বেশী হয়ে থাকে। কিন্তু রূহুল মাআনীতে বলা হয়েছে, পীর ও মুরুব্বীদের সামনে এ ধরনের কথাবার্তা শিষ্টাচার-বিরোধী। কাজেই বর্জনীয়। হুদহুদের উক্তিকে প্রমাণরূপে পেশ করা যায় না। কারণ, সে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং ওযরকে জোরদার করার জন্যে এ কথা বলেছে। এহেন প্রয়োজনে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ধরনের কোন কথা বললে তাতে দোষ নেই।

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ —অর্থ আমি এক নারীকে পেয়েছি, সে সাবা সম্প্রদায়ের রাণী। অর্থাৎ, তাদের উপর রাজত্ব করে। সাবার এই সম্রাজ্ঞীর নাম ইতিহাসে বিলকীস বিনতে শারাহীল বলা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তার জননী জিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তার নাম ছিল মালআমা বিনতে শীসান।—(কুরতুবী)। তার পিতামহ হুদহুদ ছিল সমগ্র ইয়ামনের একচ্ছত্র সম্রাট। তার চল্লিশটি পুত্র-সন্তান ছিল। সবাই সম্রাট হয়েছিল। বিলকীসের পিতা শারাহীল জনৈকা জিন নারীকে বিবাহ করেছিল। তারই গর্ভে বিলকীসের জন্ম হয়। জিন নারীকে বিবাহ করার বিভিন্ন কারণ বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, সে সাম্রাজ্য ও রাজত্বের অহংকারে অন্য লোকদেরকে বলত, তোমাদের কেউ কুলে-কৌলিন্যে আমার সমান নও। তাই আমি বিবাহই করব না। আমি অসম বিবাহ পছন্দ করি না। এর ফলশ্রুতিতে লোকেরা জনৈকা জিন নারীর সাথে তার বিবাহ ঘটিয়ে দেয়।—(কুরতুবী) প্রকৃতপক্ষে মানুষই ছিল তার সমগোত্র। কিন্তু সে মানুষকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করে তার সমান স্বীকার করেনি। সম্ভবতঃ এই অহংকারের ফলেই আল্লাহ্ তার বিবাহ এমন নারীর সাথে অবধারিত করে দেন, যে তার সমানও ছিল না এবং স্বজাতিও ছিল না।

জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কি?ঃ এ ব্যাপারে কেউ কেউ এ কারণে সন্দেহ করেছেন যে, তাঁরা জিন জাতিকে মানুষের ন্যায় সন্তান উৎপাদনের যোগ্য মনে করেন না। ইবনে আরাবী তাঁর তফসীর গ্রন্থে বলেন, এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, সহীহ্ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, মানব জাতির অনুরূপ জিনদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন ও নারী-পুরুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে, জিন নারীকে বিবাহ করা মানুষের জন্যে হালাল কিনা? এতে ফেকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই জায়েয বলেছেন। কেউ কেউ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় ভিন্ন জাতি হওয়ার কারণে হারাম সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ "আকামুল মারজান ফী আহকামিল জান" কিতাবে উল্লেখিত আছে। তাতে মুসলমান পুরুষের সাথে মুসলমান জিন নারীর বিবাহের কয়েকটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সন্তানাদি জন্মগ্রহণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহকারী বিলকীসের পিতা মুসলমানই ছিল না, তাই এ বিষয় নিয়ে এখানে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। তার কর্ম দ্বারা এই বিবাহের বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না। শরীয়তে সন্তান পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। বিলকীসের পিতা মানব ছিল। তাই বিলকীস মানব নন্দিনীই সাব্যস্ত হবে। কাজেই কোন কোন রেওয়ায়েতে সুলায়মান (আঃ) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ আছে, তা দ্বারা জিন নারীকে বিবাহ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কারণ, বিলকীস নিজে জিন ছিল না। সুলায়মান (আঃ)-এর বিবাহ সম্পর্কে আরও বর্ণনা পরে আসছে।

নারীর জন্যে বাদশাহ্ হওয়া অথবা কোন সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়েয কিনা? ঃ সহীহ্ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যবাসীরা তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই সংবাদ জানার পর মন্তব্য করেছিলেন, لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة অর্থাৎ, যে জাতি তাদের শাসনক্ষমতা একজন নারীর হাতে সমর্পণ করেছে, তারা কখনও সাফল্য লাভ করতে পারবে না। এ কারণেই আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন নারীকে শাসনকর্তৃত্ব, খেলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা যায় না; বরং নামাযের ইমামতির ন্যায় বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ, শাসন-কর্তৃত্বও একমাত্র পুরুষের জন্যই উপযুক্ত। বিলকীসের সম্রাজ্ঞী হওয়া দ্বারা ইসলামী শরীয়তের কোন বিধান প্রমাণিত হতে পারে না, যে পর্যন্ত একথা প্রমাণিত না হয় যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের পর তাকে রাজসিংহাসনে বহাল রেখেছিলেন। একথা কোন সহীহ্ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ —অর্থাৎ, কোন সম্রাট ও শাসনকর্তার জন্যে যেসব সাজ সরঞ্জাম দরকার, তা সবই বিদ্যমান ছিল। সেই যুগে যেসব বস্তু অনাবিষ্কৃত ছিল, সেগুলো না থাকা এর পরিপন্থী নয়।

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ —আরশের শাব্দিক অর্থ রাজসিংহাসন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, বিলকীসের সিংহাসন ৮০ হাত দীর্ঘ, ৪০ হাত প্রস্থ এবং ৩০ হাত উচ্চ ছিল এবং মোতি, ইয়াকূত ও মণিমাণিক্য দ্বারা কারুকার্য খচিত ছিল। তার পায়া ছিল মোতি ও জওহরের এবং পর্দা ছিল রেশমের। একের পর এক সাতটি তালাবদ্ধ প্রাচীরের অভ্যন্তরে সিংহাসনটি সংরক্ষিত ছিল।

وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ — -এতে জানা গেল যে, বিলকীসের সম্প্রদায় নক্ষত্রপূজারী ছিল। তারা সূর্যের এবাদত করত। কেউ কেউ বলেন, অগ্নিপূজারী ছিল।—(কুরতুবী)

أَلَّا يَسْجُدُوا - এর সম্পর্ক وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ অথবা فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ এর সাথে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌কে সেজদা না করার কথা শয়তান তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল অথবা শয়তান তাদেরকে সত্য পথ থেকে এভাবে নিবৃত্ত করল যে, আল্লাহ্‌কে সেজদা করবে না।

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٢٧ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ
هٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ۝٢٨ قَالَتْ
يٰٓأَيُّهَا الْمَلَؤُا إِنِّيْٓ أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ۝٢٩ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَإِنَّهُ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٣٠ أَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ۝٣١
قَالَتْ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَؤُا أَفْتُوْنِيْ فِيْٓ أَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا
حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ۝٣٢ قَالُوْا نَحْنُ أُولُوْا قُوَّةٍ وَّأُولُوْا بَأْسٍ شَدِيْدٍ ۙ
وَّالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ ۝٣٣ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوْكَ
إِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۚ وَ
كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ۝٣٤ وَإِنِّيْ مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ بِمَ
يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ۝٣٥ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ أَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ
اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ۝٣٦ اِرْجِعْ
إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ
أَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝٣٧ قَالَ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا
قَبْلَ أَنْ يَّأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ۝٣٨ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا اٰتِيْكَ
بِهٖ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَإِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِيْنٌ ۝٣٩

(২৭) সুলায়মান বললেন, 'এখন আমি দেখব তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদী। (২৮) তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয়।' (২৯) বিলকীস বলল, 'হে পারিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। (৩০) সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই ঃ অসীম দাতা, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু; (৩১) আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।' (৩২) বিলকীস বলল, 'হে পারিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।' (৩৩) তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব আপনি ভেবে দেখুন, আমাদেরকে কি আদেশ করবেন।' (৩৪) সে বলল, 'রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে। তারাও এরূপই করবে। (৩৫) আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি; দেখি, প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব আনে।' (৩৬) অতঃপর যখন দূত সুলায়মানের কাছে আগমন করল, তখন সুলায়মান বললেন, তোমরা কি ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক। (৩৭) ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত। (৩৮) সুলায়মান বললেন, হে পারিষদবর্গ, 'তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে? (৩৯) জনৈক দৈত্য-জিন বলল, 'আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং আমি একাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

লেখা এবং পত্রও সাধারণ কাজ-কারবারে শরীয়তসম্মত দলীলঃ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا — হযরত সুলায়মান (আঃ) সাবার সম্রাজ্ঞীর কাছে পত্র প্রেরণকে তাঁর সাথে দলীল সম্পন্ন করার জন্যে যথেষ্ট মনে করেছেন। এতে বোঝা গেল যে, সাধারণ কাজ-কারবারে লেখা এবং পত্র ধর্তব্য প্রমাণ। যে ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য প্রমাণ জরুরী, ফেকাহ্‌বিদগণ সেক্ষেত্রে পত্রকে যথেষ্ট মনে করেননি। কেননা, পত্র, টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। সাক্ষ্যদাতা আদালতের সামনে এসে বর্ণনা করবে, এর উপরই সাক্ষ্য নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। এ কারণেই আজকালও পৃথিবীর কোন আদালতে পত্র ও টেলিফোনের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণকে যথেষ্ট মনে করা হয় না।

কাফেরদের মজলিস হলেও সব মজলিসে মানবিক চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত ঃ فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ — হযরত সুলায়মান (আঃ) হুদহুদকে পত্রবাহকের দায়িত্ব দিয়ে মজলিসের এই শিষ্টাচারও শিক্ষা দিলেন যে, সম্রাজ্ঞীর হাতে পত্র অর্পণ করে মাথার উপর সওয়ার হয়ে থাকবে না; বরং সেখান থেকে কিছুটা সরে যাবে। এটাই রাজকীয় মজলিসের নিয়ম। এতে জানা গেল যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবিক চরিত্র সবার সাথেই কাম্য।

قَالَتْ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَؤُا إِنِّيْٓ أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ — كَرِيْمٌ - এর শাব্দিক অর্থ সম্মানিত; সম্ভ্রান্ত। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে কোন পত্রকে তখনই বলা হয়, যখন তা মোহরাঙ্কিত হয়। এ কারণেই এই আয়াতে كِتٰبٌ كَرِيْمٌ এর তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা, যুহায়র প্রমুখ كتاب مختوم অর্থাৎ ''মোহরাঙ্কিতপত্র'' দ্বারা করেছেন। এতে জানা গেল যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) পত্রের উপর তাঁর মোহর অঙ্কিত করেছিলেন। আমাদের রসূল (সাঃ) যখন অনারব বাদশাহ্‌দের অভ্যাস জানতে পারলেন যে, তারা মোহরবিহীন পত্র পাঠ করে না, তখন তিনিও বাদশাহ্‌দের পত্রের জন্যে মোহর নির্মাণ করান এবং কায়সার ও কেসরার পত্রে মোহর অঙ্কিত করে দেন। এতে বোঝা গেল যে, পত্রের উপর মোহর অঙ্কিত করা প্রাপক ও স্বীয় পত্র উভয়ের প্রতি সম্মান করার নামান্তর। আজকাল ইনভেলাপে পত্র বন্ধ করে প্রেরণ করার প্রচলন হয়ে গেছে। এটাও মোহরের বিকল্প। প্রাপকের সম্মান উদ্দেশ্য হলে খোলা চিঠি প্রেরণ করার পরিবর্তে ইনভেলাপে পুরে প্রেরণ করা সুন্নতের নিকটবর্তী।

সুলায়মান (আঃ)-এর পত্র কোন্ ভাষায় ছিল ঃ হযরত সুলায়মান (আঃ) আরব ছিলেন না; কিন্তু আরবী ভাষা জানা ও বোঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যে ক্ষেত্রে তিনি পক্ষীকূলের বুলি পর্যন্ত জানতেন, সে ক্ষেত্রে আরবী ভাষা তো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ছিল। এটা জানা মোটেও অসম্ভব নয়। কাজেই এটা সম্ভবপর যে, সুলায়মান (আঃ) আরবী ভাষায় পত্র লিখেছিলেন। কারণ, প্রাপক (বিলকীস) আরব বংশোদ্ভূত ছিল। সে পত্র পাঠ করেছিল এবং বুঝেছিল। এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, সুলায়মান (আঃ) তাঁর মাতৃভাষায় পত্র লিখেছিলেন এবং বিলকীস দো'ভাষীর মাধ্যমে পত্রের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল।—(রূহুল মা'আনী)

পত্র লেখার কতিপয় আদব ঃ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ কোরআন পাক মানব জীবনের কোন দিক সম্পর্কেও দিক নির্দেশ না দিয়ে ছাড়েনি। চিঠিপত্র প্রেরণের মাধ্যমে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনাও মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিষয়। এ স্থলে সাবার সম্রাজ্ঞী বিলকীসের নামে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর পত্র আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একজন পয়গম্বরের চিঠি। কোরআন পাক একে উত্তম আদর্শ হিসেবে উদ্ধৃত করেছে। তাই এই পত্রে পত্র লিখন সম্পর্কে যেসব দিক নির্দেশ পাওয়া যায়, সেগুলো মুসলমানদের জন্যেও অনুসরণীয়।

প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে, এর পর প্রাপকের ঃ এই পত্রে সর্বপ্রথম দিক নির্দেশ এই যে, পত্রটি সুলায়মান (আঃ) নিজের নাম দ্বারা শুরু করেছেন। প্রাপকের নাম কিভাবে লিখেছেন, কোরআনের ভাষায় তার উল্লেখ নেই। কিন্তু এ থেকে এটুকু জানা গেল যে, সর্বপ্রথম প্রেরকের নাম লেখা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এর উপকারিতা অনেক। উদাহরণতঃ পত্র পাঠ করার পূর্বেই প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পত্র পাঠ করছে, যাতে সে সেই পরিবেশে পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করে এবং চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাতে কার পত্র, কোথা থেকে আসল, প্রাপক কে এরূপ খোঁজাখুঁজি করার কষ্ট ভোগ করতে না হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বর্ণিত ও প্রকাশিত সব পত্রেই তিনি এই পন্থাই অবলম্বন করেছেন। তিনি من محمد عبد الله ورسوله এ কথার মাধ্যমে পত্র শুরু করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কোন বড়জন ছোটকে পত্র লেখে, তার নাম অগ্রে থাকলে তা আপত্তির বিষয় নয়। কিন্তু ছোটজন যদি তার পিতা, ওস্তাদ, পীর অথবা কোন মুরুব্বীর কাছে পত্র লেখে, তখন নাম অগ্রে থাকা আদবের খেলাফ হবে না কি? তার এরূপ করা উচিত কিনা? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কর্ম-ধারা বিভিন্নরূপ। অধিকাংশ সাহাবী সুন্নতের অনুসরণকে আদবের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর নামে যেসব চিঠি লিখেছেন, সেগুলোতেও নিজেদের নাম অগ্রে রেখেছেন। রূহুল মা'আনীতে বাহ্‌রে মুহীতের বরাত দিয়ে হযরত আনাস (রাঃ)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে—

ما كان احد اعظم حرمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اصحابه اذا كتبوا اليه كتابا بدأوا بانفسهم قلت وكتاب علاء الحضرمى يشهد له على ماروى .

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চাইতে অধিক সম্মানযোগ্য কেউ ছিল না; কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যখন তাঁর কাছেও পত্র লিখতেন, তখন নিজেদের নামই প্রথম লিপিবদ্ধ করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নামে আলায়ী হাযরামীর পত্র এই বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তবে রূহুল মা'আনীতে উপরোক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, এই আলোচনা উত্তম অনুত্তম সম্পর্কে—বৈধতা সম্পর্কে নয়। যদি কেউ নিজের নাম শুরুতে না লিখে পত্রের শেষে লিখে দেয়, তবে তাও জায়েয। ফকীহ্ আবুল-লাইস 'বুস্তান' গ্রন্থে বলেন, যদি কেউ প্রাপকের নাম দ্বারা পত্র শুরু করে, তবে এর বৈধতা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। কেননা, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পন্থাও নির্দ্বিধায় প্রচলিত আছে।

পত্রের জওয়াব দেয়াও পয়গম্বরগণের সুন্নত ঃ তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, কারও পত্র হস্তগত হলে তার জওয়াব দেয়া সমীচীন। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক্ত। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পত্রের জওয়াবকে সালামের জওয়াবের ন্যায় ওয়াজিব মনে করতেন। — (কুরতুবী)

চিঠিপত্রে বিস্‌মিল্লাহ্ লেখা ঃ হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর উল্লিখিত পত্র এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর লিখিত সব পত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, পত্রের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' লেখা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এখন বিস্‌মিল্লাহ্ লেখক নিজের নামের পূর্বে লিখবে না পরে, এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্রাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, বিস্‌মিল্লাহ্ সর্বাগ্রে এবং নিজের নাম এর পরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর প্রাপকের নাম লিখবে। কোরআন পাকে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর নাম পূর্বে ও বিস্‌মিল্লাহ্ পরে লিখিত আছে। বাহ্যতঃ এ থেকে বিস্‌মিল্লাহ্ পরে লেখারও বৈধতা জানা যায়। কিন্তু ইবনে আবী হাতেম ইয়াযীদ ইবনে রূমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) প্রকৃতপক্ষে তাঁর পত্র এভাবে লিখেছিলেনঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان بن داود الى بلقيس ابنة ذى شرح وقومها . ان لاتعلوا الخ .

বিলকীস তার সম্প্রদায়কে পত্রের মর্ম শোনানোর সময় সুলায়মান (আঃ)-এর নাম আগে উল্লেখ করেছে। কোরআন পাকে বিলকীসের উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। সুলায়মান (আঃ)-এর আসল পত্রে বিস্‌মিল্লাহ আগে ছিল না পরে, কোরআনে এ সম্পর্কে বর্ণনা নেই। এটাও সম্ভবপর যে, সুলায়মান (আঃ)-এর নাম খামের উপরে লিখিত ছিল এবং ভেতরে বিস্‌মিল্লাহ্ দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। পত্র শোনানোর সময় বিলকীস সুলায়মান (আঃ)-এর নাম অগ্রে উল্লেখ করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ করা সুন্নতঃ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ শব্দটি فتوى থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন বিশেষ প্রশ্নের জওয়াব দেয়া। এখানে পরামর্শ দেয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বোঝানো হয়েছে। সম্রাজ্ঞী বিলকীসের কাছে যখন সুলায়মান (আঃ)-এর পত্র পৌছল, তখন সে তার সভাসদদেরকে একত্রিত করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল যে, এ ব্যাপারে কি করা উচিত। সে তাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য একথাও বলল, আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। এর ফলেই সেনাধ্যক্ষগণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জওয়াবে পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেশ পালনের জন্যে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। তারা বলল, نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ — হযরত কাতাদা বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিলকীসের পরামর্শ-সভার সদস্য তিনশ' তের জন ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই দশ হাজার লোকের নেতা ও প্রতিনিধি ছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি সুপ্রাচীন। ইসলাম পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে এবং রাষ্ট্রের কর্মচারীদেরকে পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর কাছে ওহী আগমন করত এবং তিনি খোদায়ী নির্দেশ লাভ করতেন। এ কারণে কোন পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছিল না; কিন্তু উম্মতের জন্যে সুন্নত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশে তাঁকেও আদেশ করা হয়েছে وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ - অর্থাৎ, আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সাহাবায়ে কেরামের

সাথে পরামর্শ করুন। এতে একদিকে যেমন সাহাবায় কেরামের সন্তুষ্টি বিধান করা হয়। অপরদিকে ভবিষ্যৎ রাজকর্মচারীদেরকে পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করার তাকীদও হয়ে যায়।

সুলায়মান (আঃ)-এর পত্রের জওয়াবে বিলকীসের প্রতিক্রিয়াঃ রাষ্ট্রের অমাত্যবর্গকে পরামর্শে শরীক করে তাদের সহযোগিতা অর্জন করার পর সম্রাজ্ঞী বিলকীস নিজেই একটি মত স্থির করল, যার সারমর্ম এই ছিল ঃ হযরত সুলায়মানের পরীক্ষা নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তিনি বাস্তবিকই আল্লাহ্র পয়গম্বর কি-না। তিনি আল্লাহ্র আদেশ পালন করে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, না তিনি একজন আধিপত্যবাদী সম্রাট? এই পরীক্ষা দ্বারা বিলকীসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি পয়গম্বর হলে তাঁর আদেশ পালন করা হবে এবং বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় আমাদেরকে দাসে পরিণত করতে চান, তবে তার মোকাবেলা কিভাবে করা হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। এই পরীক্ষার পদ্ধতি সে এইরূপ স্থির করল যে, সুলায়মান (আঃ)-এর কাছে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করা হবে। যদি তিনি উপঢৌকন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে বোঝা যাবে যে, তিনি একজন সম্রাটই। পক্ষান্তরে তিনি পয়গম্বর হলে ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত কোন কিছুতে সন্তুষ্ট হবেন না। এই বিষয়বস্তু ইবনে জরীর একাধিক সনদে হযরত ইবনে-আব্বাস, মুজাহিদ, ইবনে জুরায়জ ও ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। একথাই এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ — অর্থাৎ, আমি সুলায়মান ও তাঁর সভাসদদের কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। এরপর দেখব; যেসব দূত উপঢৌকন নিয়ে যাবে, তারা ফিরে এসে কি পরিস্থিতি বর্ণনা করে।

সুলায়মান (আঃ) বিলকীসের উপঢৌকন গ্রহণ করলেন না ঃ

قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

-অর্থাৎ, যখন বিলকীসের দূত উপঢৌকন নিয়ে সুলায়মান (আঃ)-এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি দূতদেরকে বললেন, তোমরা কি অর্থ-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও?

আমাকে আল্লাহ্ যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছে, তা তোমাদের অর্থ-সম্পদের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাই আমি এই উপঢৌকন গ্রহণ করব না। এগুলো ফেরত নিয়ে যাও এবং তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরা সুখী থাক।

কোন কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয কিনা? ঃ হযরত সুলায়মান (আঃ) সম্রাজ্ঞী বিলকীসের উপঢৌকন কবুল করেননি। এ থেকে জানা যায় যে, কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয নয় অথবা ভাল নয়। মাসআলা এই যে, কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে যদি নিজের কিংবা মুসলমানদের কোন স্বার্থ বিঘ্নিত হয় কিংবা তাদের পক্ষে মতামত দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয নয়। —(রূহুল মা'আনী) হ্যাঁ, যদি উপঢৌকন গ্রহণ করলে কোন ধর্মীয় উপকার সাধিত হয়; যেমন এর মাধ্যমে কোন কাফের ব্যক্তির মুসলমানদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার অতঃপর মুসলমান হওয়ার আশা থাকে কিংবা তার কোন অনিষ্ট এর মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে কবুল করার অবকাশ আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নত এ ব্যাপারে এই যে, তিনি কোন কোন কাফেরের উপঢৌকন কবুল করেছেন এবং কারও কারও প্রত্যাখ্যান করেছেন। বোখারীর টীকা 'উমদাতুল কারী'তে এবং সিয়ারে কবীরের টীকায় হযরত কা'ব ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত আছে যে, বারার ভাই আমের ইবনে মালেক কাফের মুশরিক অবস্থায় কোন প্রয়োজনে মদীনায় আগমন করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে দু'টি অশ্ব এবং দু'টি বস্ত্রজোড়া উপঢৌকন হিসেবে পেশ করল। তিনি একথা বলে তার উপঢৌকন ফিরিয়ে দিলেন যে, আমি মুশরিকের উপঢৌকন গ্রহণ করি না। আয়ায ইবনে হেমার মাজাশেয়ী তাঁর খেদমতে একটি উপঢৌকন পেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মুসলমান? সে বলল, না। তিনি তার উপঢৌকন একথা বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে মুশরিকদের দান গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে এরূপ রেওয়ায়েতও বিদ্যমান আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন কোন মুশরিকের উপঢৌকন কবুল করেছেন। বর্ণিত আছে যে, আবু সুফিয়ান মুশরিক অবস্থায় তাঁকে একটি চামড়া উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং জনৈক খ্রীষ্টান একটি অত্যুজ্জ্বল রেশমী বস্ত্র উপঢৌকন হিসেবে পেশ করলে তিনি তা কবুল করেন।

এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে শামসুল-আয়েম্মা বলেন, আমার মতে কারণ ছিল এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কারও কারও উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে তার ইসলাম গ্রহণের আশা করছিলেন। পক্ষান্তরে কারও কারও উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে তার মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাই তার উপঢৌকন কবুল করেছেন।—(উমদাতুল-কারী)

বিলকীস উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করাকে নবী হওয়ার আলামত সাব্যস্ত করেছিল। এটা এ কারণে নয় যে, নবীর জন্যে মুশরিকের উপঢৌকন কবুল করা জায়েয নয়, বরং সে প্রকৃতপক্ষে ঘুষ হিসেবে উপঢৌকন প্রেরণ করেছিল, যাতে এর মাধ্যমে সে সুলায়মান (আঃ)-এর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে।

সুলায়মান (আঃ)-এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি ঃ কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে লেখেন, বিলকীসের দূতগণ নিজেরাও ভীত ও হতভম্ব হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। সুলায়মান (আঃ)- এর যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনিয়ে দিলে বিলকীস তার সম্প্রদায়কে বলল, পূর্বেও আমার এই ধারণাই ছিল যে, সুলায়মান দুনিয়ার সম্রাটদের ন্যায় কোন সম্রাট নন; বরং তিনি আল্লাহ্র কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। আল্লাহ্র পয়গম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর। এরূপ শক্তি আমাদের নেই। একথা বলে সে সুলায়মান (আঃ)-এর দরবারে হাযির হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। বার হাজার সেনাধ্যক্ষকে সাথে নিল, যাদের প্রত্যেকের অধীনে এক লক্ষ করে সৈন্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা এমন প্রতাপ দান করেছিলেন যে, তাঁর দরবারে কেউ প্রথমে কথা বলার সাহস করত না। একদিন তিনি দূরে ধূলিকণা উড়তে দেখে উপস্থিত সভাসদদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? তারা বলল, হে আল্লাহ্র নবী, সম্রাজ্ঞী বিলকীস সদল-বলে আগমন করেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, যখন সে সুলায়মান (আঃ)- এর দরবার থেকে ফরসখ অর্থাৎ, প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল, তখন হযরত সুলায়মান (আঃ) তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন,

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

সুলায়মান (আঃ) পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে, বিলকীস তাঁর দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করে আগমন করছে। এমতাবস্থায় তিনি

قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ
أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ
هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن
شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ
كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ
مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا
عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَ
كُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ
إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ
فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ
صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ
أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ
ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ
يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ
الْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾

(৪০) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত কৃপাশীল। (৪১) সুলায়মান বললেন, বিলকীসের সামনে তার সিংহাসনের আকার-আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিশা নেই? (৪২) অতঃপর যখন বিলকীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় এটা সেটাই। আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে গেছি। (৪৩) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যার এবাদত করত, সেই তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিল। নিশ্চয় সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৪৪) তাকে বলা হল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল সে ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলকীস বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। (৪৫) আমি সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহ্‌কে এই মর্মে প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। অতঃপর তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হল। (৪৬) সালেহ্ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কল্যাণের পূর্বে দ্রুত অকল্যাণ কামনা করছ কেন? তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন? সম্ভবতঃ তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে।

ইচ্ছা করলেন যে, সে রাজকীয় শক্তি ও শান-শওকতের সাথে একটি পয়গম্বরসুলভ মু'জেযাও প্রত্যক্ষ করুক। এটা তার বিশ্বাস স্থাপনে অধিক সহায়ক হবে। সুলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা জিন বশীভূত রাখার সাধারণ মু'জেযা দান করেছিলেন। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাআলার ইঙ্গিত পেয়ে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, বিলকীসের এখানে পৌঁছার পূর্বেই তার সিংহাসন কোনরূপে এখানে পৌঁছা দরকার। তাই পারিষদবর্গকে (তাদের মধ্যে জিনও ছিল) সম্বোধন করে এই সিংহাসন নিয়ে আসার জন্য বলে দিলেন। বিলকীসের সমস্ত ধন-সম্পদের মধ্য থেকে রাজকীয় সিংহাসনকে বেছে নেয়াও সম্ভবতঃ এ কারণে ছিল যে, এটাই তার সর্বাধিক সংরক্ষিত বস্তু ছিল। সিংহাসনটি সাতটি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি সুরক্ষিত মহলে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। বিলকীসের আপন লোকেরাও সেখানে গমন করত না। দরজা ও তালা না ভেঙ্গে সেটা বেহাত হয়ে যাওয়া এবং এত দূরবর্তী স্থানে পৌঁছে যাওয়া আল্লাহ্ তাআলার অগাধ শক্তি বলেই সম্ভবপর ছিল। এটা বিলকীসের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার অপরিসীম শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনের বিরাট উপায় হতে পারত। এর সাথে এ বিশ্বাসও অবশ্যম্ভাবী ছিল যে, সুলায়মান (আঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই কোন বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। ফলে তাঁর হাতে এমন অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশ লাভ করেছে।

قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ — مسلمين শব্দটি مسلم — এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত, আত্মসমর্পণকারী। পরিভাষায় ঈমানদারকে মুসলিম বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আত্মসমর্পণকারী, অনুগত। কারণ, তখন সম্রাজ্ঞী বিলকীসের ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং সে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করার পর মুসলমান হয়েছিল। কোরআনের পরবর্তী আয়াতের ভাষা থেকে তাই বোঝা যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ – অর্থাৎ, যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল। এই ব্যক্তি কে? এ সম্পর্কে এক সম্ভাবনা যে, স্বয়ং সুলায়মান (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্‌র কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। এমতাবস্থায় গোটা ব্যাপারটাই একটা মু'জেযা এবং বিলকীসকে পয়গম্বরসুলভ মু'জেযা দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এ ব্যাপারে আপত্তির কোন কিছু নেই। কিন্তু কাতাদা প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে ইবনে জরীর বর্ণনা করেন এবং কুরতুবী একেই অধিকাংশের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন যে, এই ব্যক্তি সুলায়মান (আঃ)-এর একজন সহচর ছিল। ইবনে ইসহাক তার নাম আসিফ ইবনে বারখিয়া বর্ণনা করেছেন। তিনি সুলায়মান (আঃ)-এর বন্ধু ছিলেন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে তাঁর খালাত ভাই ছিলেন। তিনি ইসমে আযম জানতেন। ইসমে আযমের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা উচ্চারণ করে যে দোয়াই করা হয়, তা কবুল হয় এবং যাই চাওয়া হয়, তাই পাওয়া যায়। এ থেকে জরুরী নয় যে, সুলায়মান (আঃ) ইসমে আযম জানতেন না। কেননা, এটা অবাস্তব নয় যে, সুলায়মান (আঃ) তাঁর এই মহান কীর্তি তাঁর উম্মতের কোন ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হওয়াকে অধিক উপযোগী মনে করেছেন। ফলে বিলকীসকে তা আরও বেশী প্রভাবিত করবে। তাই নিজে এই কাজ করার পরিবর্তে সহচরদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন أَيُّكُمْ يَأْتِينِي —(ফুসুসুল

হেকাম) এমতাবস্থায় এই ঘটনা আসিফ ইবনে বারখিয়ার কারামত হবে।

মু'জেযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য : প্রকৃত সত্য এই যে, মু'জেযার মধ্যে স্বভাবগত কারণাদির কোন দখল থাকে না ; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার কাজ। কোরআন পাকে বলা হয়েছে—

وَمَارَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى - - কারামতের অবস্থাও হুবহু তদ্রূপ। এতেও স্বভাবগত কারণাদির কোন দখল থাকে না ; বরং সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে কোন কাজ হয়ে যায়। মু'জেযা ও কারামত — এ উভয়টিরই প্রকাশ ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যদি কোন অলৌকিক কাজ ওহীর অধিকারী পয়গম্বরের হাতে প্রকাশ পায়, তবে তাকে মু'জেযা বলা হয়। পক্ষান্তরে এরূপ কাজই নবী ব্যতীত অন্য কারও হাতে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। আলোচ্য ঘটনায় যদি এই রেওয়ায়েত সহীহ্ হয় যে, বিলকীসের সিংহাসন আনার কাজটি সুলায়মান (আঃ)-এর সহচর আসিফ ইবনে বারখিয়ার হাতে সম্পন্ন হয়েছে, তবে একে কারামত বলা হবে। প্রত্যেক ওলীর গুণাবলী তাঁর পয়গম্বরের গুণাবলীর প্রতিবিম্ব এবং তাঁর কাছ থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে। তাই উম্মতের ওলীদের হাতে যেসব কারামত প্রকাশ পায়, সেগুলো পয়গম্বরের মু'জেযারূপে গণ্য হয়ে থাকে।

বিলকীসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা কারামত না তাসাররুফ : শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী একে আসিফ ইবনে বারখিয়ার তাসাররুফ সাব্যস্ত করেছেন। পরিভাষায় তাসাররুফের অর্থ কল্পনা ও দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে বিস্ময়কর কাজ প্রকাশ করা। এর জন্যে নবী, ওলী এমন কি মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। এটা মেসমেরিজমের অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া। সূফী বুযুর্গগণ মুরীদদের সংশোধনের নিমিত্ত মাঝে মাঝে এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগান। ইবনে আরাবী বলেন, পয়গম্বরগণ তাসাররুফের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। তাই হযরত সুলায়মান (আঃ) এ কাজে আসিফ ইবনে বারখিয়াকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কোরআন পাক এই তাসাররুফকে عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ (কিতাবের জ্ঞান) - এর ফলশ্রুতি বলেছে। এতে এই অর্থই অগ্রগণ্য হয় যে, এটা কোন দোয়া অথবা ইসমে আযমের ফল ছিল, যার তাসাররুফের সাথে কোন সম্পর্ক নেই; বরং এটা কারামতেরই সমার্থবোধক।

اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ - আমি এই সিংহাসন চোখের পলক মারার আগেই এনে দেব—আসিফের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, কাজটি তাঁর নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা হয়েছে। এটা তাসাররুফের আলামত। কেননা, কারামত ওলীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এই সন্দেহের জওয়াব এই যে, সম্ভবত : আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে আমি একাজ এত দ্রুত করে দেব।

সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? এতটুকু বর্ণনা করেই উল্লেখিত আয়াতসমূহে বিলকীসের কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছিল যে, সুলায়মান (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ইসলামে দীক্ষিতা হয়ে গেল। এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কোরআন পাক নিশ্চুপ। এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উয়ায়নাকে জিজ্ঞেস করল, সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? তিনি বললেন, তার ব্যাপার وَ اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ, কোরআন এ পর্যন্ত তার অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা পরিত্যাগ করে দিয়েছে। অতএব, আমাদের এ বিষয়ে খোঁজ নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইবনে আসাকির হযরত ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে বিলকীস পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যান এবং তাকে তার রাজত্ব বহাল রেখে ইয়ামনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রতি মাসে হযরত সুলায়মান (আঃ) সেখানে গমন করতেন এবং তিন দিন অবস্থান করতেন। হযরত সুলায়মান (আঃ) বিলকীসের জন্যে ইয়ামনে তিনটি নজিরবিহীন ও অনুপম প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন বলেও বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে।

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ ۖ بَلْ
أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ
أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾
وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَانظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ
بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾
وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ
لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَئِنَّكُمْ
لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ
تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ
لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَ
أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ
عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

(৪৭) তারা বলল, 'তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অকল্যাণের প্রতীক মনে করি।' সালেহ্ বললেন, 'তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহ্র কাছে; বরং তোমরা এমন সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। (৪৮) আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশময় অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং সংশোধন করত না। (৪৯) তারা বলল, 'তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্র নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা করব। অতঃপর তার দাবীদারকে বলে দেব যে, তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। আমরা নিশ্চয়ই সত্যবাদী। (৫০) তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক চক্রান্ত করেছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। (৫১) অতএব, দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণাম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নেস্তনাবুদ করে দিয়েছি। (৫২) এই তো তাদের বাড়ীঘর—তাদের অবিশ্বাসের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন আছে। (৫৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং পরহেযগার ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। (৫৪) স্মরণ কর লূতের কথা, তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ? অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছ! (৫৫) তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়। (৫৬) উত্তরে তাঁর কওম শুধু এ কথাটিই বললো, 'লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা শুধু পাকপবিত্র সাজতে চায়। (৫৭) অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম তাঁর স্ত্রী ছাড়া। কেননা, তার জন্যে ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত করেছিলাম। (৫৮) আর তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম মুষলধারে বৃষ্টি। সেই সতর্ককৃতদের উপর কতই না মারাত্মক ছিল সে বৃষ্টি। (৫৯) বল, সকল প্রশংসাই আল্লাহ্র এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি! শ্রেষ্ঠ কে! আল্লাহ্, না ওরা—তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে!

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تِسْعَةُ رَهْطٍ – رهط শব্দের অর্থ দল। এখানে নয় ব্যক্তির মধ্য থেকে প্রত্যেককেই رهط বলার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তারা তাদের অর্থ-সম্পদ, জাঁকজমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে গণ্য হত এবং প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল। কাজেই এই নয় ব্যক্তিকে নয় দল বলা হয়েছে। তারা ছিল হিজর জনপদের প্রধান। হিজর শামদেশের একটি স্থানের নাম।

لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সবাই মিলে রাতের অন্ধকারে তার উপর ও তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর উপর হানা দেব এবং সবাইকে হত্যা করব। এরপর তার হত্যার দাবীদার তদন্ত করলে আমরা বলে দেব, আমরা তো তাকে হত্যা করিনি এবং কাউকে হত্যা করতেও দেখিনি। একথায় আমরা সত্যবাদী গণ্য হব। কারণ, রাতের অন্ধকারে কে কাকে মেরেছে, তা আমরা নির্দিষ্ট করে জানবো না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাফেরদের এই স্বনামখ্যাত বাছাই করা বদমায়েশরা কুফর, শিরক, হত্যা ও লুণ্ঠনের অপরাধ নির্বিবাদে করে যাচ্ছে কোন চিন্তা ছাড়াই; কিন্তু এখানে এ চিন্তা তারাও করেছে যে, তারা যেন মিথ্যা না বলে এবং যেন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হয়। এ থেকে অনুমান করুন যে, মিথ্যা কত বড় গোনাহ্! বড় বড় অপরাধীরাও আত্মসম্মান রক্ষার্থে মিথ্যা বলত না। আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যে ব্যক্তিকে তারা সালেহ্ (আঃ)-এর ওলী তথা দাবীদার বলেছে, সে তো সালেহ্ (আঃ)-এরই পরিবারভুক্ত ছিল। তাকে তারা হত্যা তালিকার বাইরে কেন রাখল? জওয়াব এই যে, সম্ভবতঃ সে পারিবারিক দিক দিয়ে ওলী ছিল। কিন্তু কাফের ছিল এবং কাফেরদের সাথে সংঘবদ্ধ ছিল। সালেহ্ (আঃ) ও তাঁর স্বজনদের হত্যার পর সে বংশগত সম্পর্কের কারণে খুনের বদলা দাবী করবে। এটাও সম্ভবপর যে, সে মুসলমান ছিল, কিন্তু প্রভাবশালী হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করলে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। তাই তাকে বাদ দেয়া হয়েছে।

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই বাক্যে রসূলে করীম (সাঃ)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কারণ, আপনার উম্মতকে দুনিয়ার ব্যাপক আযাব থেকে নিরাপদ করে দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরও আল্লাহ্র মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। অধিকাংশ তফসীরবিদ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। কারও কারও মতে এই বাক্যটিও লূত (আঃ)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে। আয়াতে الَّذِينَ اصْطَفَىٰ বাক্যে বাহ্যতঃ পয়গম্বরগণকেই বোঝানো হয়েছে; যেমন অন্য আয়াতে وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এখানে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। সুফিয়ান সওরী এ মতই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতে الَّذِينَ اصْطَفَىٰ বলে সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হলে এই আয়াত দ্বারা পয়গম্বরগণ ছাড়া অন্যদেরকে সালাম বলার জন্যে 'আলাইহিস সালাম' বলার বৈধতা প্রমাণিত হয়। সূরা আহযাবের صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا আয়াতের তফসীরে ইনশাআল্লাহ্ তাআলা এ

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ
السَّمَآءِ مَآءً فَأَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ
لَكُمْ أَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦٠﴾
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ
لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ
قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾ أَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ
الْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ
ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٣﴾ أَمَّنْ يَّبْدَؤُا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ
ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦٤﴾
قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ
وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي
الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

(৬০) বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেছেন পানি; অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই। অতএব, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তারা সত্য বিচ্যুত সম্প্রদায়। (৬১) বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থিত রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। (৬২) বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর। (৬৩) বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? অতএব, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে অনেক উর্ধ্বে। (৬৪) বল তো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও মর্ত্য থেকে রিযিক দান করেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। (৬৫) বলুন, আল্লাহ্ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ গায়বের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে। (৬৬) বরং পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে; বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ।

সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হবে।

মাসআলা ঃ এই আয়াত থেকে খোতবার রীতিনীতিও প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও পয়গম্বরগণের প্রতি দরূদ ও সালাম দ্বারা খোতবা শুরু হওয়া উচিত। রসূলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের সকল খোতবা এভাবেই শুরু হয়েছে। বরং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম সুন্নত ও মোস্তাহাব।—(রূহুল-মাআ'আনী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ — مضطر শব্দটি اضطرار থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন অভাব হেতু অপারক ও অস্থির হওয়া। এটা তখনই হয়, যখন কোন হিতকামী, সাহায্যকারী ও সহায় না থাকে। কাজেই এমন ব্যক্তিকে مضطر বলা হয়, যে দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ্ তাআলাকেই সাহায্যকারী মনে করে এবং তাঁর প্রতি মনোযোগী হয়। এই তফসীর সুদ্দী, যুন্নুন মিসরী, সহ্‌ল ইবনে আবদুল্লাহ্ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরূপ অসহায় ব্যক্তিকে নিম্নরূপ ভাষায় দোয়া করতে বলেছেন ঃ

اللّٰهم رحمتك ارجو فلا تكلني الىٰ نفسي طرفة عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت ইয়া আল্লাহ্, আমি তোমার রহ্‌মত আশা করি। অতএব, আমাকে মুহূর্তের জন্যেও আমার নিজের কাছে সমর্পণ করো না। তুমিই আমার সবকিছু ঠিকঠাক করে দাও। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।—(কুরতুবী)

নিঃসহায়ের দোয়া একান্ত আন্তরিকতার কারণে অবশ্যই কবুল হয় ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন, আল্লাহ তাআলা নিঃসহায়ের দোয়া কবুল করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণাও করেছেন। এর আসল কারণ এই যে, দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ এবং সম্পর্কাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকেই কার্যোদ্ধারকারী মনে করে দোয়া করা এখলাস। আল্লাহ্ তাআলার কাছে এখলাসের বিরাট মর্তবা। মুমিন, কাফের, পরহেযগার ও পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে যার কাছ থেকেই এখলাস পাওয়া যায়, তার প্রতিই আল্লাহ্‌র রহমত নিবিষ্ট হয়। এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তারা যখন নৌকায় সওয়ার হয়ে সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করে এবং চতুর্দিক থেকে প্রবল ঢেউয়ের চাপে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তারা যেন মৃত্যুকে চোখের সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পায়। সেই সময় তারা পূর্ণ এখলাস সহকারে আল্লাহ্‌কে ডেকে বলে, আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাদের দোয়া কবুল করে যখন তাদেরকে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তারা পুনরায় শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এক সহীহ্ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয়—এতে কোন সন্দেহ নেই। (এক) উৎপীড়িতের দোয়া, (দুই) মুসাফিরের দোয়া এবং (তিন) সন্তানের জন্যে বদ-দোয়া। ইমাম কুরতুবী এই হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন, এই দোয়াত্রয়ের মধ্যেও কবুল হওয়ার পূর্বোক্ত কারণ অসহায়ত্ব বিদ্যমান আছে। কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি যখন দুনিয়ার সব সহায় ও সাহায্যকারী থেকে নিরাশ হয়ে উৎপীড়ন দূর করার জন্যে আল্লাহ্‌কে ডাকে, তখন সে-ও নিঃসহায়ই

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا ءَإِذَا كُنَّا تُرَٰبًا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا
لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن
قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُوا
فِى الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ
عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا
يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِى
كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ
إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُ
لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ
يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾

(৬৭) কাফেররা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মৃত্তিকা হয়ে যাব, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? (৬৮) এই ওয়াদাপ্রাপ্ত হয়েছি আমরা এবং পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ কিছু নয়। (৬৯) বলুন, পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে। (৭০) তাদের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করেছে এতে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। (৭১) তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে? (৭২) বলুন, অসম্ভব কি, তোমরা যত দ্রুত কামনা করছ তাদের কিয়দংশ তোমাদের পিঠের উপর এসে গেছে। (৭৩) আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৭৪) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে আপনার পালনকর্তা অবশ্যই তা জানেন। (৭৫) আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন ভেদ নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে না আছে। (৭৬) এই কোরআন বনী ইসরাঈল যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করে, তার অধিকাংশ তাদের কাছে বর্ণনা করে। (৭৭) এবং নিশ্চিতই এটা মুমিনদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। (৭৮) আপনার পালনকর্তা নিজ শাসনক্ষমতা অনুযায়ী তদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ। (৭৯) অতএব, আপনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন।

হয়ে থাকে। এমনিভাবে মুসাফির সফর অবস্থায় তার আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন ও দরদী স্বজনদের কাছ থেকে পৃথক থাকার কারণে নিঃসহায় হয়ে থাকে। পিতা সন্তানদের জন্যে পিতাসুলভ স্নেহ-মমতা ও বাৎসল্যের কারণে কখনও বদ-দোয়া করতে পারে না, যে পর্যন্ত তার মন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না যায় এবং নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে আল্লাহ্কে ডাকে। হাদীসবিদ আজেরী হযরত আবু যর (রাঃ)-এর জবানী রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র উক্তি এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া কখনও রদ করব না, যদিও সে কাফের হয়।— (কুরতুবী) যদি কোন নিঃসহায়, মজলুম; মুসাফির অনুভব করে যে, তার দোয়া কবুল হয়নি, তবে কু-ধারণার বশবর্তী ও নিরাশ না হওয়া উচিত। কারণ, মাঝে মাঝে দোয়া কবুল হলেও রহস্য ও উপকারিতাবশতঃ দেরীতে প্রকাশ পায়। অথবা তার উচিত নিজের অবস্থা যাচাই করা যে, তার এখলাস ও আল্লাহ্র প্রতি মনোযোগে কোন ত্রুটি আছে কিনা।

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ — রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদেরকে বলে দিন, যত মখলুক আকাশে আছে; যেমন ফেরেশতা, যত মখলুক পৃথিবীতে আছে; যেমন মানবজাতি, জিন, জাতি ইত্যাদি—তাদের কেউ গায়বের খবর জানে না, আল্লাহ্ ব্যতীত। আলোচ্য আয়াত পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরিষ্কারভাবে এ কথা ব্যক্ত করেছে যে, গায়ব তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণ—এতে কোন ফেরেশতা অথবা নবী-রসূলও শরীক হতে পারে না। এ বিষয়ের জরুরী ব্যাখ্যা সূরা আনআমের ৫৯ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ

اِدّٰرَكَ — শব্দে বিভিন্ন রূপের কেরাআত আছে এবং অর্থ সম্পর্কেও নানা জনের নানা উক্তি রয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ তফসীরের কিতাবাদিতে এর বিবরণ দেখে নিতে পারেন। এখানে এতটুকু বুঝে নেয়া যথেষ্ট যে, কোন কোন তফসীরকার اِدّٰرَكَ শব্দের অর্থ নিয়েছেন **تكامل** অর্থাৎ, পরিপূর্ণ হওয়া এবং فِى الْاٰخِرَةِ -কে اِدّٰرَكَ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করেছেন যে, পরকালে এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, তখন প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে সামনে এসে যাবে। তবে তখনকার জ্ঞান তাদের কোন কাজে লাগবে না। কারণ, দুনিয়াতে তারা পরকালকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করত। পক্ষান্তরে কোন কোন তফসীরকারের মতে اِدّٰرَكَ শব্দের অর্থ **ضل** ও **غاب** এবং فِى الْاٰخِرَةِ শব্দটি عِلْمُهُمْ—এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, পরকালের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান উধাও হয়ে গেছে। তারা একে বুঝতে পারেনি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত করে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, কেয়ামতের বাস্তবতা এবং তাতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন যুক্তির নিরিখে সম্ভবপর। এতে কোন যুক্তিগত জটিলতা নেই। যৌক্তিক সম্ভাব্যতার সাথে এর অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা পয়গম্বরগণের ও ঐশী কিতাবাদির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতার উপর সংবাদের বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য হওয়া নির্ভরশীল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এর সংবাদদাতা কোরআন এবং কোরআনের সত্যবাদিতা অনস্বীকার্য। এমন কি, বনী-ইসরাঈলের

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

(৮০) আপনি আহ্বান শোনাতে পারবেন না মৃতদেরকে এবং বধিরকেও নয়, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (৮১) আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে সৎপথে আনতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরকে শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। অতএব, তারাই আজ্ঞাবহ। (৮২) যখন প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না। (৮৩) যেদিন আমি একত্রিত করব একেকটি দলকে সেসব সম্প্রদায় থেকে, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত; অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে। (৮৪) যখন তারা উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিলে? অথচ এগুলো সম্পর্কে তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। না তোমরা অন্য কিছু করেছিলে? (৮৫) জুলুমের কারণে তাদের কাছে আযাবের ওয়াদা এসে গেছে। এখন তারা কোন কিছু বলতে পারবে না। (৮৬) তারা কি দেখে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্যে এবং দিনকে করেছি আলোকময়। নিশ্চয় এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৮৭) যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, অতঃপর আল্লাহ্ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়। (৮৮) তুমি পর্বতমালাকে দেখে অচল মনে কর, অথচ সেদিন এগুলো মেঘমালার মত চলমান হবে। এটা আল্লাহ্র কারিগরী, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছ, তিনি তা অবগতআছেন।

আলেমদের মধ্যে যেসব বিষয়ে কঠোর মতবিরোধ ছিল এবং যার মীমাংসা ছিল সুদূরপরাহত, কোরআন পাক সেসব বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ ফয়সালার পথ নির্দেশ করেছে। বলাবাহুল্য, যে আলেমদের মতবিরোধে বিচার-বিশ্লেষণ ও ফয়সালা করে তার সর্বাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ হওয়া নেহায়েত জরুরী। এতে বোঝা গেল যে, কোরআন সর্বাধিক জ্ঞান-সম্পন্ন এবং সত্যবাদী সংবাদদাতা। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সান্ত্বনার জন্যে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের বিরোধিতায় মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং আপনার ফয়সালা করবেন। আপনি আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখুন। কেননা, আল্লাহ্ সত্যকে সাহায্য করেন এবং আপনি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তা নিশ্চিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সমগ্র মানব জাতির প্রতি রসূলে করীম (সাঃ)-এর স্নেহ, মমতা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, তিনি সবাইকে আল্লাহ্র পয়গাম শুনিয়ে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে নেবেন। কেউ তাঁর এই পয়গাম কবুল না করলে তিনি নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিত হতেন, যেমন কারও সন্তান তার কথা অমান্য করে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাই কোরআন পাক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে وَلَا تَحْزَنْ এবং وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ বাক্যসমূহ এই সান্ত্বনা প্রদান সম্পর্কিত শিরোনামই ছিল। আলোচ্য আয়াতেও সান্ত্বনার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি সত্যের পয়গাম পৌছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। যারা এই পয়গাম কবুল করেনি, তাতে আপনার কোন দোষ ও ত্রুটি নেই, যদ্দরুন আপনি দুঃখিত হবেন ; বরং তারা কবুল করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের যোগ্যতাহীনতাকে তিনটি উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণ করা হয়েছে। (এক) তারা সত্য কবুল করার ব্যাপারে পুরোপুরি মৃতদেহের অনুরূপ। মৃতদেহ কারও কথা শুনে লাভবান হতে পারে না। (দুই) তাদের উদাহরণ বধিরের মত, যে বধির হওয়ার সাথে সাথে শুনতেও অনিচ্ছুক। কেউ তাকে কিছু শোনাতে চাইলে সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। (তিন) তারা অন্ধের মত। অন্ধকে কেউ পথ দেখাতে চাইলেও সে দেখতে পারে না। এই তিনটি উদাহরণ বর্ণনা করার পর পরিশেষে বলা হয়েছেঃ

إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ —অর্থাৎ, আপনি তো কেবল তাদেরকে শোনাতে পারেন, যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে। এই পূর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে শোনা ও শোনানোর অর্থ নিছক কানে অওয়াজ পৌছা নয় ; বরং এর অর্থ এমন শোনা, যা ফলপ্রদ হয়। যে শ্রবণ ফলপ্রদ নয়, কোরআন উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তাকে বধিরতারূপে ব্যক্ত করেছে। আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে—আয়াতের এই বাক্যে যদি শোনানোর অর্থ কেবল কানে আওয়াজ পৌছানোই হত, তবে কোরআনের এই উক্তি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা বিরোধী হয়ে যেত। কেননা, কাফেরদের কানে আওয়াজ পৌছানো এবং তাদের শ্রবণ ও জওয়াব দেয়ার প্রমাণ অসংখ্য। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখানে ফলদায়ক শ্রবণ বোঝানো হয়েছে। তাদেরকে মৃতদেহের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। এর অর্থও এই যে, মৃতরা যদি কোন সত্য কথা শুনেও ফেলে এবং তখন তা কবুলও করতে চায়, তবে

এটা তাদের জন্যে উপকারী নয়। কেননা, তারা দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে চলে গেছে। এখানে ঈমান ও কর্ম উপকারী হতে পারত। মৃত্যুর পর বরযখ ও হাশরের ময়দানে তো সব কাফেরই ঈমান ও সৎকর্মের বাসনা প্রকাশ করবে, কিন্তু সেটা ঈমান ও কর্ম গৃহীত হওয়ার সময় নয়। কাজেই আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, মৃতরা কারও কোন কথা শুনতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে এই আয়াত নিশ্চুপ। মৃতরা কারও কথা শুনতে পারে কিনা, এটা স্বস্থানে লক্ষণীয় বিষয় বটে।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা ঃ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যেসব বিষয়ে পরস্পর মতভেদ করেছেন, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) মৃতদের শ্রবণ প্রামাণ্য সাব্যস্ত করেন। হযরত উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) এর বিপরীত বলেন যে, মৃতরা শ্রবণ করতে পারে না। এ কারণেই অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কোরআন পাকে প্রথমতঃ এই সূরা নামলে এবং দ্বিতীয়তঃ সূরা রূমে প্রায় একই ভাষায় এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতেরে বিষয়টি এভাবে বিধৃত হয়েছে ঃ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ —অর্থাৎ, যারা কবরস্থ হয়ে গেছে, তাদেরকে আপনি শোনাতে পারবেন না।

উক্ত আয়াতত্রয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন আয়াতেই এরূপ বলা হয়নি যে, মৃতরা শুনতে পারবে না ; তিনটি আয়াতেই বলা হয়েছে যে, মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। তিনটি আয়াতেই এভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা থাকতে পারলেও আমরা নিজেদের ক্ষমতাবলে তাদেরকে শোনাতে পারি না।

এই আয়াতত্রয়ের বিপরীতে শহীদদের সম্পর্কে একটি চতুর্থ আয়াত একথা প্রমাণ করে যে, শহীদগণ তাদের কবরে বিশেষ এক প্রকার জীবন লাভ করেন এবং সে জীবন উপযোগী জীবনোপকরণও তারা প্রাপ্ত হন। তাঁদের জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সুসংবাদ শোনানো হয়। আয়াত এই ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

يُرْزَقُوْنَ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ

يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকতে পারে। শহীদদের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার সাক্ষ্যও এই আয়াত দিচ্ছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো বিশেষভাবে শহীদদের জন্যে প্রযোজ্য—সাধারণ মৃতদের জন্যে নয়, তবে এর জওয়াব এই যে, এই আয়াত দ্বারা কমপক্ষে এতটুকু তো সপ্রমাণ হয়েছে যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা, অনুভূতিও এ জগতের সাথে সম্পর্ক বাকী থাকতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা শহীদদেরকে যেমন এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁদের আত্মার সম্পর্ক দেহ ও কবরের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি আল্লাহ্ তাআলা যখন ইচ্ছা করবেন, অন্যান্য মৃতকেও এই সুযোগ দিতে পারবেন। মৃত ব্যক্তিরও শ্রবণ করার ক্ষমতা থাকতে পারে, এই মতের প্রবক্তা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের উক্তিও একটি সহীহ্ হাদীসের উপর ভিত্তিশীল। হাদীস এই ঃ

ما من احد يمر بقبر اخيه المسلم كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه الارد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ـ

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরিচিত কোন মুসলমান ভাইয়ের কবরের কাছ দিয়ে গমন করে, অতঃপর তাকে সালাম করে, আল্লাহ্ তাআলা সেই মৃত মুসলমানের আত্মা তার মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়ে দেন, যাতে সে সালামের জওয়াব দেয়।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি তার মৃত মুসলমান ভাইয়ের কবরে গিয়ে সালাম করলে সে তার সালাম শোনে এবং জওয়াব দেয়। এটা এভাবে হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা তখন তার আত্মা দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হল। (এক) মৃতরা শুনতে পারে এবং (দুই) তাদের শোনা এবং আমাদের শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়। বরং আল্লাহ্ তাআলা যখন ইচ্ছা করেন, শুনিয়ে দেন। এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুসলমানের সালাম করার সময় আল্লাহ্ তাআলা মৃতের আত্মা ফেরত এনে সালাম শুনিয়ে দেন এবং তাকে সালামের জওয়াব দেয়ার শক্তি দান করেন। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, মৃতরা সেগুলো শোনবে কিনা। তাই ইমাম গাযযালী ও আল্লামা সুবকী প্রমুখের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, সহীহ্ হাদীস ও উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত যে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথা-বার্তা শোনে, কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই যে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শোনে। এভাবে আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। এটা সম্ভবপর যে, মৃতরা একসময়ে জীবিতদের কথাবার্তা শোনে এবং অন্য সময় শোনতে পারে না। এটাও সম্ভব যে, কতক লোকের কথা শোনে এবং কতক লোকের কথা শোনে না, অথবা কতক মৃত শোনে এবং কতক মৃত শোনে না। কেননা, সূরা নমল, সূরা রূম ও সূরা ফাতেরের আয়াত দ্বারাও একথা প্রমাণিত যে, মৃতদেরকে শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয় ; বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে দেন। তাই যে যে ক্ষেত্রে সহীহ্ হাদীস দ্বারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে, সেখানে শ্রবণের বিশ্বাস রাখা দরকার এবং যেখানে প্রমাণিত নেই, সেখানে উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে—অকাট্যরূপে শোনে বলারও অবকাশ নেই এবং শোনে না বলারও সুযোগ নেই।

ভূগর্ভের জীব কি, কোথায় এবং কবে নির্গত হবে ঃ মুসনাদে আহমদে হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে পর্যন্ত দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পায়, সে পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। (১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া, (২) ধূম্র নির্গত হওয়া, (৩) অদ্ভুত একটি জীবের আবির্ভাব হওয়া, (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হওয়া, (৫) ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, (৬) দাজ্জাল, (৭) তিনটি চন্দ্র গ্রহণ—(এক) পশ্চিম, (দুই) পূর্বে এবং (তিন) আরব উপদ্বীপে ; (৮) এক অগ্নি, যা আদন থেকে নির্গত হবে এবং সব মানুষকে হাঁকিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবে। মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্যে অবস্থান করবে, অগ্নিও সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামতের নিটকবর্তী সময়ে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। دابة শব্দের تنوين -এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জন্তুটি অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট হবে। আরও জানা যায় যে, এই জীবটি সাধারণ জন্তুদের প্রজনন প্রক্রিয়া মোতাবেক জন্মগ্রহণ করবে না ; বরং অকস্মাৎ ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। এই হাদীস থেকে একথাও বোঝা যায় যে, এই আবির্ভাব কেয়ামতের

সর্বশেষ আলামতসমূহের অন্যতম। এরপর অনতিবিলম্বেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর আবু দাউদ তায়ালিসির বরাত দিয়ে হযরত তালহা ইবনে-ওমরের এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের এই জীব মক্কার সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে। সে মস্তকের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে মসজিদে-হারামে কৃষ্ণ প্রস্তর ও মকামে ইব্রাহীমের মাঝখানে পৌঁছে যাবে। মানুষ একে দেখে পালাতে থাকবে। একদল লোক সেখানেই থেকে যাবে। এই জন্তু তাদের মুখমণ্ডল তারকার ন্যায় উজ্জ্বল করে দেবে। এরপর সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রত্যেক কাফেরের মুখমণ্ডলে কুফরের চিহ্ন এঁকে দেবে। কেউ তার নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না। সে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরকে চিনবে।—(ইবনে-কাসীর) মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখে একটি অবিস্মরণীয় হাদীস শ্রবণ করেছি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, কেয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। সূর্য উপরে উঠার পর ভূগর্ভের জীব নির্গত হবে। এই আলামতদ্বয়ের মধ্যে যে-কোন একটি প্রকাশ হওয়ার অব্যবহিত পরেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।—(ইবনে-কাসীর)

শায়খ জামালুদ্দীন মহল্লী বলেন, জীব নির্গত হওয়ার সময় 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এরপর কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করবে না। অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এই বিষয়বস্তু পাওয়া যায়।—(মাযহারী) এ স্থলে ইবনে-কাসীর প্রমুখ ভূগর্ভের জীবের আকার-আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কোরআনের আয়াত ও সহীহ্ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, এটা একটা কিম্ভুতকিমাকার জীব হবে এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। মক্কা মোকাররমায় এর আবির্ভাব হবে, অতঃপর সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে। সে কাফের ও মুমিনকে চিনবে এবং তাদের সাথে কথা বলবে। কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এতটুকু বিষয়ের উপরই বিশ্বাস রাখা দরকার। এর অধিক জানার চেষ্টা করা জরুরী নয় এবং তাতে কোন উপকারও নেই।

ভূগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কি? এই প্রশ্নের জওয়াবে কেউ কেউ বলেন যে, কোরআনে উল্লেখিত বাক্যটিই হবে তার কথা। অর্থাৎ, أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ এই বাক্যটি সে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে শোনাবে। বাক্যের অর্থ এই ঃ অনেক মানুষ আজকের পূর্বে আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করবে না। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সে সময় এসে গেছে। এখন সবাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখনকার বিশ্বাস আইনতঃ ধর্তব্য হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত আছে এবং অপর এক রেওয়ায়েতে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই জীব সাধারণ কথাবার্তার অনুরূপ মানুষের সাথে কথা বলবে।—(ইবনে-কাসীর)

فَهُمْ يُوزَعُونَ এ শব্দটি وزع থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাধা দেয়া। অর্থাৎ, অগ্রবর্তী অংশকে বাধা দান করা হবে, যাতে পেছনে পড়া লোক তাদের সাথে মিলে যায়। কেউ কেউ وزع শব্দের অর্থ নিয়েছেন ঠেলে দেয়া। অর্থাৎ, তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলার আয়াতসমূহে মিথ্যা বলা স্বয়ং একটি গুরুতর অপরাধ ও গোনাহ্; বিশেষতঃ যখন কেউ চিন্তা-ভাবনাও ও বোঝা-শোনার চেষ্টা না করেই মিথ্যা বলতে থাকে। এমতাবস্থায় এটা দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায় যে, যারা চিন্তা-ভাবনা করা সত্ত্বেও সত্যের সন্ধান পায় না এবং চিন্তা-ভাবনাই তাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়, তাদের অপরাধ কিছুটা লঘু। তবে তা সত্ত্বেও আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তওহীদে মিথ্যারোপ করা তাদেরকে কুফর, পথভ্রষ্টতা ও চিরস্থায়ী আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ, এগুলো এমন জাজ্বল্যমান বিষয় যে, এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার ভ্রান্তি ক্ষমা করা হবে না।

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ - - - فَفَزِعَ - শব্দের অর্থ অস্থির ও উদ্বিগ্ন হওয়া। অন্য এক আয়াতে এ স্থলে فزع শব্দের পরিবর্তে صعق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অজ্ঞান হওয়া। যদি উভয় আয়াতকে সিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উভয় শব্দের সারমর্ম হবে এই যে, সিঙ্গার ফুঁক দেয়ার সময় প্রথমে সবাই অস্থির উদ্বিগ্ন হবে, এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং অবশেষে মরে যাবে। কাতাদাহ্ প্রমুখ তফসীরকার এই আয়াতকে দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যারপর সকল মৃত পুনরুজ্জীবন লাভ করবে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সবাই জীবিত হওয়ার সময় ভীতবিহ্বল অবস্থায় উত্থিত হবে। কেউ কেউ বলেন যে, তিন বার সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে সবাই অস্থির হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ফুৎকারে অজ্ঞান হয়ে মরে যাবে এবং তৃতীয় ফুৎকারে হাশর-নশর কায়েম হবে এবং সকল মৃত জীবিত হয়ে যাবে। কিন্তু কোরআনের আয়াত ও সহীহ্ হাদীস থেকে দুই ফুৎকারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।—(কুরতুবী, ইবনে-কাসীর) ইবনে মোবারক হাসান বসরী (রঃ) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, উভয় ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে।—(কুরতুবী)

إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের সময় কিছুসংখ্যক লোক ভীতবিহ্বল হবে না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর এক হাদীসে আছে যে, তাঁরা হবেন শহীদ। হাশরে পুনরুজ্জীবন লাভের সময় তাঁরা মোটেই অস্থির হবেন না।—(কুরতুবী) সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেছেন যে, তাঁরা হবেন শহীদ। তাঁরা হাশরের সময় তরবারি বাঁধা অবস্থায় আরশের চারি পার্শ্বে সমবেত হবেন। কুশায়রী বলেন, পয়গম্বরগণ আরও উত্তমরূপে এই শ্রেণীভুক্ত। কারণ, তাঁদের জন্যে রয়েছে শহীদের মর্যাদা এবং এর উপর নবুওয়তেরমর্যাদাও।—(কুরতুবী)

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ উদ্দেশ্য এই যে, পাহাড়সমূহ স্থানচ্যুত হয়ে মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে। দর্শক মেঘ-মালাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পায়, অথচ আসলে তা দ্রুত চলমান থাকে। যে বিশাল বস্তুর শুরু ও শেষ প্রান্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, সে বস্তু যখন কোন একদিকে চলমান হয় তখন তা যতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হোক না কেন, মানুষের দৃষ্টিতে তা অচল ও স্থিতিশীল মনে হয়। সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ঘন কাল মেঘে সবাই তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। এরূপ কাল মেঘ এক জায়গায় অচল ও স্থির মনে হয়, অথচ তা প্রকৃতপক্ষে চলমান থাকে। এই মেঘের গতিশীলতা দর্শক যখন বুঝতে পারে, তখন তা আকাশের দিগন্ত উন্মুক্ত করে দূরে চলে যায়।

মোটকথা এই যে, পাহাড়সমূহের অচল হওয়া দর্শকের দৃষ্টিতে এবং চলমান হওয়া বাস্তব সত্যের দিক দিয়ে। অধিকাংশ তফসীরবিদ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই সাব্যস্ত করেছেন।

صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ - صنع শব্দের অর্থ কারিগরিবিদ্যা,

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ
اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ ؕ هَلْ
تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ
الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَىْءٍ ۫ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ
الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩١﴾ وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ
وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

سُوْرَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٍ وَّثَمَانُوْنَ اٰيَةً وَّتِسْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمٓ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ
مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣﴾ اِنَّ فِرْعَوْنَ
عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً
مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ
الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤﴾ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا
فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥﴾

(৮৯) যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। (৯০) এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অগ্নিতে অধঃমুখে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা করছিলে, তারই প্রতিফল তোমরা পাবে। (৯১) আমি তো কেবল এই নগরীর প্রভুর এবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন। এবং সব কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আজ্ঞাবহদের একজন হই। (৯২) এবং যেন আমি কোরআন পাঠ করে শোনাই। পর যে ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলে আপনি বলে দিন, আমি তো কেবল একজন ভীতি প্রদর্শনকারী। (৯৩) এবং আরও বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। সত্বরই তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে দেখাবেন। তখন তোমরা তা চিনতে পারবে। এবং তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আপনার পালনকর্তা গাফেল নন।

সূরা আল-কাসাস
মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৮৮
দয়াময়, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি

(১) ত্বা-সীন-মীম। (২) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) আমি আপনার কাছে মূসা ও ফেরাউনের বৃত্তান্ত সত্য সহকারে বর্ণনা করছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে। (৪) ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী। (৫) দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার।

শিল্প। إتقان শব্দটি اتقن থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন কিছুকে মজবুত ও সংহত করা। বাহ্যতঃ এই বাক্যটি পূর্ববর্তী সব বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, দিবারাত্রির পরিবর্তন এবং সিঙ্গার ফুৎকার থেকে নিয়ে হাশর-নশর পর্যন্ত সব অবস্থা। উদ্দেশ্য এই যে, এগুলো মোটেই বিস্ময় ও আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা, এগুলোর স্রষ্টা কোন সীমিত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মানব অথবা ফেরেশতা নয় ; বরং বিশ্বজাহানের পালনকর্তা। যদি এই বাক্যটির সম্পর্ক নিকটতম وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً আয়াতের সাথে করা যায়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, পাহাড়সমূহের এই অবস্থা দর্শকের দৃষ্টিতে অচল, কিন্তু বাস্তবে চলমান ও গতিশীল হওয়াও মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। কেননা, এটা বিশ্বজাহানের পালনকর্তার কারিগরি, যিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا এটা হাশর-নশর ও হিসাব-নিকাশের পরবর্তী পরিণতির বর্ণনা, حسنة বলে এখানে কলেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বোঝানো হয়েছে—(কাতাদাহর উক্তি)। কেউ কেউ সাধারণ এবাদত ও আনুগত্য অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে তার কর্মের চাইতে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। বলাবাহুল্য, সৎকর্ম তখনই সৎকর্ম হয়, যখন তার মধ্যে প্রথম শর্ত ঈমান বিদ্যমান থাকে। 'উৎকৃষ্টতর প্রতিদান' বলে জান্নাতের অক্ষয় নেয়ামত এবং আযাব ও যাবতীয় কষ্ট থেকে চিরমুক্তি বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এই যে, এক নেকীর প্রতিদান দশ গুণ থেকে নিয়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে।—(মাযহারী)

وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ - فَزَعٍ বলে প্রত্যেক বড় বিপদ ও পেরেশানী বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক আল্লাহ্‌ভীরু পরহেযগারও পরিণামের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয়; যেমন কোরআন পাক বলে اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ অর্থাৎ, পালনকর্তার আযাব থেকে কেউ নিশ্চিন্ত ও ভাবনামুক্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। এ কারণেই পয়গম্বরগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও ওলীগণ সদাসর্বদা ভীত ও কম্পিত থাকতেন। কিন্তু সেদিন হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত হলে যারা সৎকর্ম নিয়ে আগমনকারী হবে, তারা সর্বপ্রকার ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত ও প্রশান্ত হবে।

رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে بلدة বলে মক্কা মোকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। এখানে বিশেষ করে মক্কার পালনকর্তা বলার কারণ মক্কার মাহাত্ম্য ও সম্মানিত হওয়ার বিষয়বস্তু প্রকাশ করা। حرم শব্দটি تحريم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাধারণ সম্মানও হয়ে থাকে। এই সম্মানের কারণে মক্কা ও পবিত্র ভূমির যেসব বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, সেগুলোও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন কেউ হেরেমে আশ্রয় নিলে সে নিরাপদ হয়ে যায়। হেরেমে প্রতিশোধ গ্রহণ করা ও হত্যাকাণ্ড সম্পাদন বৈধ নয়। হেরেমের ভূমিতে শিকার বধ করাও জায়েয নয়। বৃক্ষ কর্তন করা জায়েয নয় । এসব বিধানের কতকাংশ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا আয়াতে, কতকাংশ সূরা মায়েদার শুরুতে এবং কতকাংশ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

সূরা আন্-নাম্ল সমাপ্ত

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ
أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا
تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ
امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ
عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ
لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ
هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ
نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ
وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

(৬) এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত। (৭) আমি মূসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব। (৮) অতঃপর ফেরাউন-পরিবার মূসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল। (৯) ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তাদের কোন খবর ছিল না। (১০) সকালে মূসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসাজনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্বাসীগণের মধ্যে। (১১) তিনি মূসার ভগিনীকে বললেন, তার পেছন পেছন যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিতা হয়ে তাকে দেখে যেতে লাগল। (১২) পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীদেরকে মূসা থেকে বিরত রেখেছিলাম। মূসার ভগিনী বলল, 'আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের জন্যে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাঙ্ক্ষী? (১৩) অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না।

সূরা আল-কাসাস

মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল-কাসাস সর্বশেষ সূরা। হিজরতের সময় মক্কা ও জুহ্‌ফা (রাবেগ)-এর মাঝখানে এই সূরা অবতীর্ণ হয়। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হিজরতের সফরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন জুহ্‌ফা অর্থাৎ, রাবেগের নিকটে পৌঁছেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ, আপনার মাতৃভূমির কথা আপনার মনে পড়ে কি? তিনি উত্তরে বললেন, হাঁ মনে পড়ে বৈ-কি। অতঃপর জিবরাঈল তাঁকে এই সূরা শুনালেন। এই সূরার শেষভাগে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, পরিণামে মক্কা বিজিত হয়ে আপনার অধিকারভুক্ত হবে আয়াতটি এই ঃ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ সূরা কাসাসে সর্বপ্রথম মূসা (আঃ)-এর কাহিনী প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। অর্ধেক সূরা পর্যন্ত মূসা (আঃ)-এর কাহিনী ফেরাউনের সাথে এবং শেষভাগে কারূনের সাথে উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত মূসা (আঃ)-এর কাহিনী সমগ্র কোরআনে কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত আকারে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা কাহ্‌ফে তাঁর কাহিনী খিযির (আঃ)-এর সাথে বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে। এরপর সূরা তোয়াহায় বিস্তারিত ঘটনা আছে এবং এরই কিছু বিবরণ সূরা আন-নামলে অতঃপর সূরা আল-কাসাসে এর পুনরালোচনা রয়েছে। সূরা তোয়াহায় মূসা (সাঃ)-এর জন্যে বলা হয়েছে وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا -ইমাম নাসায়ী প্রমুখ হাদীসবিদ এই কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً .... আয়াতে বিধিলিপির মোকাবেলায় ফেরাউনী কৌশলের শুধু ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হওয়ার কথাই নয়; বরং ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গকে চরম বোকা বরং অন্ধ বানানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে বালক সম্পর্কে স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখার ভিত্তিতে ফেরাউন শঙ্কিত হয়েছিল এবং যার কারণে বনী-ইসরাঈলের অসংখ্য নবজাতক ছেলে সন্তানকে হত্যা করার আইন জারি করেছিল, তাকে আল্লাহ্ তাআলা এই ফেরাউনেরই গৃহে তারই হাতে লালিত-পালিত করালেন এবং জননীর মনস্তুষ্টির জন্যে তারই কোলে বিস্ময়কর পন্থায় পৌছে দিলেন। তদুপরি ফেরাউনের কাছ থেকে স্তন্যদানের খরচ যা, কোন কোন রেওয়ায়েতে দৈনিক এক দীনার বর্ণিত হয়েছে—আদায় করা হয়েছে। স্তন্যদানের এই বিনিময় একজন কাফের হরবীর কাছ থেকে তার সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই এর বৈধতায়ও কোনরূপ ত্রুটি নেই। যে বিপদাশঙ্কা দূর করার উদ্দেশে সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হয়েছিল, অবশেষে তা তারই গৃহ থেকে অগ্নেয়গিরির এক ভয়ংকর লাভা হয়ে বিস্ফোরিত হল এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তাআলা তাকে চর্মচক্ষে দেখিয়ে দিলেন। وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ থেকে مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ পর্যন্ত আয়াতের সারমর্ম তাই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ -শব্দটি এখানে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—নবুওয়তের ওহী বোঝানো হয়নি।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ
أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا
مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ
عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ
إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا
يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ
لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ
بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي
كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا
فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ
رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ
يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾

(১৪) যখন মূসা যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পরিণত বয়স্ক হয়ে গেলেন, তখন আমি তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানদান করলাম! এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১৫) তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবর। তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তাঁর নিজ দলের এবং অন্য জন তাঁর শত্রু দলের। অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী। (১৬) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৭) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। (১৮) অতঃপর তিনি প্রভাতে উঠলেন সে শহরে ভীত-শংকিত অবস্থায়। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গতকল্য যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, সে চীৎকার করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। মূসা তাকে বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। (১৯) অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, তখন সে বলল, গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, সে রকম আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হতে চাচ্ছ এবং সন্ধি স্থাপনকারী হতে চাও না। (২০) এসময় শহরের প্রান্ত থেকে একব্যক্তি ছুটে আসল এবং বলল, হে মূসা, রাজ্যের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব, তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ – **اشد**-এর শাব্দিক অর্থ শক্তি ও জোরের চরম সীমায় পৌছা। মানুষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে আস্তে আস্তে শক্তি-সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর এমন এক সময় আসে, যখন তার অস্তিত্বে যতটুকু শক্তি আসা সম্ভবপর, সবটুকুই পূর্ণ হয়ে যায়। এই সময়কেই **اشد** বলা হয়। এটা বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির মেজায অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারও এই সময় তাড়াতাড়ি আসে এবং কারও দেরীতে। কিন্তু আবদ ইবনে হুমায়দের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তেত্রিশ বছর বয়সে **اشد** এর যমানা আসে। একেই পরিণত বয়স বলা হয়। এতে দেহের বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে থেমে যায়। এরপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিরতিকাল। একে শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। চল্লিশ বছরের পর অবনতি ও দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, **استوى** তথা পরিণত বয়স তেত্রিশ বছর থেকে শুরু হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বর্তমান থাকে।—(রূহুল-মা'আনী, কুরতুবী)

آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا – **حكم** বলে নবুওয়ত ও রেসালত এবং **علم** বলে বিধি-বিধানের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا -অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে **مدينة** বলে মিসর নগরী বোঝানো হয়েছে। এতে প্রবেশ করার প্রসঙ্গ থেকে বোঝা গেল যে, মূসা (আঃ) মিসরের বাইরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর একদিন এমন সময়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন, যা সাধারণ লোকদের অসাবধানতার সময় ছিল। অতঃপর কিবতী-হত্যার ঘটনায় একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময়ে মূসা (আঃ) তাঁর সত্য ধর্ম প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। এরই ফলে কিছু লোক তাঁর অনুগত হয়েছিল। তাঁদেরকে তাঁর অনুসারীদল বলা হত। مِن شِيعَتِهِ শব্দটি এর সাক্ষ্য দেয়। এসব ইঙ্গিত থেকে ইবনে-ইসহাক ও ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, মূসা (আঃ) যখন জ্ঞান-বুদ্ধি লাভ করলেন এবং সত্য ধর্মের কিছু কিছু কথা মানুষকে বলতে শুরু করলেন, তখন ফেরাউন তাঁর শত্রু হয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। কিন্তু স্ত্রী আসিয়ার অনুরোধে সে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। তবে তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করে। এরপর মূসা (আঃ) অন্যত্র বসবাস করতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে গোপনে মিসর নগরীতে আগমন করতেন। عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا বলে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে দুপুর বোঝানো হয়েছে। এ সময় মানুষ দিবানিদ্রায় মশগুল থাকত।—(কুরতুবী)

فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ – **وكز** শব্দের অর্থ ঘুষি মারা। فَقَضَىٰ عَلَيْهِ –বাক পদ্ধতিতে فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ও **قضاء** তখন বলা হয়, যখন কারও ভবলীলা সম্পূর্ণ সাঙ্গ করে দেয়া হয়। তাই এখানে এর অর্থ হত্যা করা।–(মাযহারী)

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ -এই আয়াতের সারমর্ম এই যে, মূসা (আঃ) থেকে অনিচ্ছায় প্রকাশিত কিবতী-হত্যার ঘটনাকেও তিনি তাঁর নবুওয়ত ও রেসালতের পদমর্যাদার পরিপন্থী এবং তাঁর পয়গম্বরসুলভ মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে তাঁর গোনাহ্ সাব্যস্ত করে আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলাও ক্ষমা

করেছেন। এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, এই কিবতী কাফের শরীয়তের পরিভাষায় হরবী কাফের ছিল, যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাও বৈধ ছিল। কেননা, সে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী তথা আশ্রিত ছিল না এবং মূসা (আঃ)-এর সাথেও তার কোন চুক্তি ছিল না। এমতাবস্থায় মূসা (আঃ) একে 'শয়তানের কাজ' ও গোনাহ্ কেন সাব্যস্ত করেছেন? এর হত্যা তো বাহ্যতঃ সওয়াবের কাজ হওয়া উচিত ছিল। কারণ, সে একজন মুসলমানের উপর জুলুম করেছিল। তাকে বাঁচানোর জন্যে এই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল।

উত্তর এই যে, চুক্তি কোন সময় লিখিত হয় এবং কোন সময় কার্যগতও হয়। লিখিত চুক্তি যেমন সাধারণতঃ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যিম্মীদের সাথে চুক্তি অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ধরনের চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হারাম হয়ে থাকে। এমনিভাবে কার্যগত চুক্তিও অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

কার্যগত চুক্তি এরূপ ঃ যে স্থানে মুসলমান এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম অন্য কোন রাষ্ট্রে পরস্পর শান্তিতে বসবাস করে, একে অপরের উপর হামলা করা অথবা লুটতরাজ করাকে উভয়পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে; সেইস্থানে এ ধরনের জীবন যাপন ও আদান-প্রদানও এক প্রকার কার্যগত চুক্তি গণ্য হয়ে থাকে। এর বিরুদ্ধাচরণ বৈধ নয়।

সারকথা এই যে, এই কার্যগত চুক্তির কারণে কিবতীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে তা জায়েয হত না, কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) তাকে প্রাণে মারার ইচ্ছা করেন নি; বরং ইসরাঈলী লোকটিকে তার জুলুম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশে হাতে প্রহার করেছিলেন। এটা স্বভাবতঃ হত্যার কারণ হয় না। কিন্তু কিবতী এতেই মারা গেল। মূসা (আঃ) অনুভব করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্যে আরও কম মাত্রার প্রহারও যথেষ্ট ছিল কাজেই এই বাড়াবাড়ি তাঁর জন্যে জায়েয ছিল না। এ কারণেই তিনি একে শয়তানের কাজ আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ এটা হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর সুচিন্তিত অভিমত, যা তিনি আরবী ভাষায় 'আহকামুল কোরআন'—সূরা কাসাস লেখার সময় ব্যক্ত করেছিলেন। এটা তাঁর সর্বশেষ গবেষণার ফল। কেননা, ১৩৬২ হিজরীর ২রা রজব তারিখে তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি.......।

কোন কোন তফসীরকারক বলেন, কিবতীকে হত্যা করা যদিও বৈধ ছিল, কিন্তু পয়গম্বরগণ বৈধ কাজও ততক্ষণ করেন না, যতক্ষণ বিশেষভাবে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অনুমতি ও ইশারা না পান। এক্ষেত্রে মূসা (আঃ) বিশেষ অনুমতির অপেক্ষা না করেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তাই নিজ শান অনুযায়ী একে গোনাহ্ সাব্যস্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।—(রূহুল-মা'আনী)

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ —হযরত মূসা (আঃ)-এর এই বিচ্যুতি আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করলেন। তিনি এর শোকর আদায় করণার্থে আরয করলেন, আমি ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে সাহায্য করব না। এ থেকে বোঝা গেল যে, মূসা (আঃ) যে ইসরাঈলীর সাহায্যার্থে একাজ করেছিলেন, দ্বিতীয় ঘটনার পর প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সে নিজেই কলহপ্রিয় ছিল। কলহ-বিবাদ করা তার অভ্যাস ছিল। তাই তিনি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে সাহায্য না করার শপথ গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এ স্থলে مجرمين (অপরাধী)-এর তফসীরে كافرين (কাফের) বর্ণিত আছে। কাতাদাহ-এর বক্তব্যও এর কাছাকাছি। এই তফসীরের ভিত্তিতে মনে হয়, মূসা (আঃ) যে ইসরাঈলীকে সাহায্য করেছিলেন, সে-ও মুসলমান ছিল না, তবে মজলুম মনে করে তাকে সাহায্য করেছিলেন। মূসা (আঃ)-এর এই উক্তি থেকে দু'টি মাসআলা প্রমাণিত হয়।

(১) মজলুম কাফের ফাসেক হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত। (২) কোন জালেম অপরাধীকে সাহায্য করা জায়েয নয়। আলেমগণ এই আয়াতদৃষ্টে অত্যাচারী শাসনকর্তার চাকুরীকেও অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, এতে জুলুমে অংশগ্রহণ বোঝা যায়। পূর্ববর্তী মনীষীগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।—(রূহুল-মা'আনী) কাফের অথবা জালেমদের সাহায্য-সহযোগিতার নানাবিধ পন্থা বর্তমান। এর বিধিবিধান ফেকাহর গ্রন্থাবলীতে বিশদভাবে উল্লেখিত রয়েছে। বর্তমান লেখক আরবীতে লিখিত 'আহ্কামুল কোরআন' গ্রন্থে এ আয়াত প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাহকীক করেছে। জ্ঞানান্বেষী বিদ্বজ্জন তা দেখে নিতে পারেন।

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۬ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ؕ قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ٜ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰىٓ اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ؗ قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ٚ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾

(২১) অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর। (২২) যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। (২৩) যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌঁছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। এবং তাদের পশ্চাতে দু' জন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। (২৪) অতঃপর মূসা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী। (২৫) অতঃপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করল। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করেন। অতঃপর মূসা যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। (২৬) বালিকাদ্বয়ের একজন বলল পিতঃ, তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। (২৭) পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার বিবাহে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকুরী করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ চাহেন তো তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ণ পাবে। (২৮) মূসা বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হল। দু' টি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, তাতে আল্লাহ্র উপর ভরসা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ –শামদেশের একটি শহরের নাম মাদইয়ান। মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম (আঃ)–এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। এই অঞ্চল ফেরাউনী রাষ্ট্রের বাইরে ছিল। মিসর থেকে এর দূরত্ব ছিল আট মনযিল। মূসা (আঃ) ফেরাউনী সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবনের স্বাভাবিক আশংকাবোধ করে মিসর থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। বলাবাহুল্য, এই আশংকাবোধ নবুওয়ত ও তাওয়াক্কুল কোনটিরই পরিপন্থী নয়। মাদইয়ানের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, মাদইয়ানেও ইবরাহীম (আঃ) –এর বংশধরদের বসতি ছিল। মূসা (আঃ)ও এই বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মূসা (আঃ) সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মিসর থেকে বের হন। তাঁর সাথে পাথেয় বলতে কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, عَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ –অর্থাৎ, আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে সোজা পথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ্ তাআলা এই দোয়া কবুল করলেন। তফসীরকারগণ বর্ণনা করেন, এই সফরে মূসা (আঃ)– এর খাদ্য ছিল বৃক্ষপত্র। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, এটা ছিল মূসা (আঃ)–এর সর্বপ্রথম পরীক্ষা। তাঁর পরীক্ষাসমূহের বিশদ বিবরণ সূরা তোয়াহায় একটি দীর্ঘ হাদীসের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ – مَآءَ مَدْيَنَ বলে একটি কূপকে বোঝানো হয়েছে, যা থেকে এই জনপদের অধিবাসীরা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাত। وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ –অর্থাৎ, দু' জন রমণীকে দেখলেন, তারা তাদের ছাগপালকে পানির দিকে যেতে বাধা দিচ্ছিল, যাতে তাদের ছাগলগুলো অন্যদের ছাগলের সাথে মিশে না যায়।

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ؕ قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ٜ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ – **خَطْبٌ** শব্দের অর্থ শান, অবস্থা, উদ্দেশ্য এই যে, মূসা (আঃ) রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তোমরা তোমাদের ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? অন্যদের ন্যায় কূপের কাছে এনে পানি পান করাও না কেন? তারা জওয়াব দিল, আমাদের অভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ছাগলগুলোকে পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত তারা কূপের কাছে থাকে। তারা চলে গেলে আমরা ছাগলগুলোকে পানি পান করাই। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, তোমাদের কি কোন পুরুষ নেই যে, নারীদেরকে একাজে আসতে হয়েছে? রমণীদ্বয় এই সম্ভাব্য প্রশ্নের জওয়াবও সাথে সাথে দিয়ে দিল যে, আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি একাজ করতে পারেন না। তাই আমরা করতে বাধ্য হয়েছি।

এই ঘটনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল : (১) দুর্বলদেরকে সাহায্য করা পয়গম্বরগণের সুন্নত। মূসা (আঃ) দু'জন রমণীকে দেখলেন যে, তারা ছাগলকে পানি পান করাতে এসে ভিড়ের কারণে সুযোগ পাচ্ছে না। তখন তিনি তাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। (২) বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজনবশতঃ কথা বলায় দোষ নেই, যে পর্যন্ত

কোন অনর্থের আশংকা না হয়। (৩) আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন মহিলাদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্তও এই ধারা অব্যাহত ছিল। মদীনায় হিজরত করার পর মহিলাদের জন্যে পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পর্দার আসল লক্ষ্য তখনও স্বভাবগত ভদ্রতা ও লজ্জা-শরমের কারণে নারীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই রমণীদ্বয় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পুরুষদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করেনি এবং নিজেরাই কষ্ট স্বীকার করেছে। (৪) এধরনের কাজের জন্যে নারীদের বাইরে যাওয়া তখনও পছন্দনীয় ছিল না। একারণেই রমণীদ্বয় তাদের পিতার বার্ধক্যের ওযর বর্ণনা করেছে।

فَسَقٰى لَهُمَا –অর্থাৎ, মূসা, (আঃ) রমণীদ্বয়ের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কূপ থেকে পানি তুলে তাদের ছাগলকে পান করিয়েছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রাখালদের অভ্যাস ছিল যে, তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর পর একটি ভারী পাথর দ্বারা কূপের মুখ বন্ধ করে দিত। ফলে রমণীদ্বয় তাদের উচ্ছিষ্ট পানি পান করাত। এই ভারী পাথরটি দশ জনে মিলে স্থানান্তরিত করত। কিন্তু মূসা (আঃ) একাকী পাথরটি সরিয়ে দেন এবং কূপ থেকে পানি উত্তোলন করেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই রমণীদ্বয়ের একজন মূসা (আঃ) সম্পর্কে পিতার কাছে বলেছিল, সে শক্তিশালী।—(কুরতুবী)

ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

—মূসা (আঃ) সাত দিন থেকে কোনকিছু আহার করেননি। তখন এক বৃক্ষের ছায়ায় এসে আল্লাহ্ তাআলার সামনে নিজের অবস্থা ও অভাব পেশ করলেন। এটা দোয়া করার একটা সূক্ষ্ম পদ্ধতি। خَيْرٍ শব্দটি কোন কোন সময় ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয় ; যেমন اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۨالْوَصِيَّةُ আয়াতে। কোন কোন সময় শক্তির অর্থেও আসে ; যেমন اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ —আয়াতে। আবার কোন সময় এর অর্থ হয় আহার্য। আলোচ্য আয়াতে তাই উদ্দেশ্য।—(কুরতুবী)

فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ –কোরআনী রীতি অনুযায়ী এখানে কাহিনী সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা এরূপ ঃ রমণীদ্বয় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বাড়ী পৌছে গেলে বৃদ্ধ পিতা এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কন্যাদ্বয় ঘটনা খুলে বলল। পিতা দেখলেন, লোকটি অনুগ্রহ করেছে ; তাকে এর প্রতিদান দেয়া উচিত। তাই তিনি কন্যাদ্বয়ের একজনকে তাকে ডেকে আনার জন্যে প্রেরণ করলেন। বালিকাটি লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে সেখানে পৌছল। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পর্দার নিয়মিত বিধানাবলী অবতীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও সতী রমণীগণ পুরুষদের সাথে বিনাদ্বিধায় কথাবার্তা বলত না। প্রয়োজনবশতঃ সেখানে পৌছে বালিকাটি লজ্জা সহকারে কথা বলেছে। কোন কোন তফসীরে বলা হয়েছে যে, সে আস্তিন দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে কথা বলেছে। তফসীরে আরও বলা হয়েছে যে, মূসা (আঃ) তার সাথে পথ চলার সময় বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে চল এবং রাস্তা বলে দাও। বলাবাহুল্য, বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বেঁচে থাকাই ছিল এর লক্ষ্য। সম্ভবতঃ এ কারণেই বালিকাটি তাঁর সম্পর্কে পিতার কাছে বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছিল। এই বালিকাদ্বয়ের পিতা কে ছিলেন, এ সম্পর্কে তফসীরকারকগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু কোরআনের আয়াতসমূহ থেকে বাহ্যতঃ এ কথাই বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন হযরত শোয়ায়ব (আঃ)। যেমন এক আয়াতে আছে, وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا।—(কুরতুবী)

اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ —বালিকাটি নিজেই নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি ; বরং তার পিতার পয়গাম জানিয়ে দিয়েছে। কারণ, কোন বেগানা পুরুষকে স্বয়ং তার আমন্ত্রণ জানানো লজ্জা-শরমের পরিপন্থী ছিল।

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ –অর্থাৎ, শোয়ায়ব (আঃ)-এর এক কন্যা তার পিতার নিকট আরয করল, গৃহের কাজের জন্য আপনার একজন চাকরের প্রয়োজন আছে। আপনি তাকে নিযুক্ত করুন। কারণ, চাকরের মধ্যে দু'টি গুণ থাকা আবশ্যক। (এক) কাজের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং (দুই) বিশ্বস্ততা। আমরা পাথর তুলে পানি পান করানো দ্বারা তার শক্তি-সামর্থ্য এবং পথিমধ্যে আমাকে পশ্চাতে রেখে পথচলা দ্বারা তার বিশ্বস্ততার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

قَالَ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ অর্থাৎ বালিকাদ্বয়ের পিতা হযরত শোয়ায়ব (আঃ) নিজেই নিজের পক্ষ থেকে কন্যাকে হযরত মূসার (আঃ) বিবাহে দান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে পাত্রীর অভিভাবকের উচিত পাত্রপক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার অপেক্ষা না করা। বরং নিজের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব উত্থাপন করা পয়গম্বরগণের সুন্নত। উদাহরণতঃ হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর কন্যা হাফসা বিধবা হওয়ার পর নিজেই হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উসমান গনী (রাঃ)-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখেন।-(কুরতবী)

মাসআলা ঃ اُنْكِحَكَ শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের ব্যাপার পিতা সম্পন্ন করেছেন। ফেকাহ্‌বিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কন্যার অভিভাবক তার বিবাহকার্য সম্পন্ন করবে ; কন্যা নিজে করবে না। তবে কোন কন্যা প্রয়োজন ও বাধ্য-বাধকতার চাপে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করলে তা দুরস্ত হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াত এ সম্পর্কে কোন ফয়সালা দেয়নি।

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ
الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم
مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾
فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ
الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ
مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ
الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ
غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ
مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٢﴾
قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾
وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا
يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ
عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ
إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾

(২৯) অতঃপর মূসা (আঃ) যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তূর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসতে পারি অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। (৩০) যখন সে তার কাছে পৌছল, তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেয়া হল, হে মূসা। আমি আল্লাহ্‌, বিশ্ব পালনকর্তা। (৩১) আরও বলা হল, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে লাঠিকে সর্পের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখল, তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে লাগল এবং পেছন ফিরে দেখল না। হে মূসা, সামনে এস এবং ভয় করো না। তোমার কোন আশংকা নেই। (৩২) তোমার হাত বগলে রাখ। তা বের হয়ে আসবে নিরাময় উজ্জ্বল হয়ে এবং ভয় হেতু তোমার হাত তোমার উপর চেপে ধর। এই দু' টি ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের প্রতি তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ। নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায়। (৩৩) মূসা বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। কাজেই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (৩৪) আমার ভাই হারুন, সে আমা অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব, তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (৩৫) আল্লাহ্‌ বললেন, আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করব তোমার ভাই দ্বারা এবং তোমাদের প্রাধান্য দান করব। ফলে, তারা তোমার কাছে পৌছতে পারবে না। আমার নিদর্শনাবলীর জোরে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা প্রবল থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ –অর্থাৎ, মূসা (আঃ) চাকুরীর নির্দিষ্ট আট বছর বাধ্যতামূলক এবং দুই বছর ঐচ্ছিক মেয়াদ পূর্ণ করলেন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, মূসা (আঃ) আট বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন, না দশ বছরের? সহীহ্‌ বোখারীতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাসকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, অধিক মেয়াদ অর্থাৎ, দশ বছর পূর্ণ করেছিলেন। পয়গম্বরগণ যা বলেন তা পূর্ণ করেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)ও প্রাপককে তার প্রাপ্যের চাইতে বেশী দিতেন এবং তিনি উম্মতকেও নির্দেশ দিয়েছেন যে, চাকুরী, পারিশ্রমিক ও কেনাবেচার ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করবে।

نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ .... إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

–এই বিষয়বস্তু সূরা তোয়াহা ও সূরা নমলে বর্ণিত হয়েছে। সূরা তোয়াহায় إِنِّي أَنَا رَبُّكَ সূরা নমলে نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ এবং আলোচ্য সূরায় إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ বলা হয়েছে। বিভিন্ন সূরায় উল্লেখিত এসব আয়াতের ভাষা বিভিন্নরূপ হলেও অর্থ প্রায় একই। প্রত্যেক জায়গায় উপযুক্ত ভাষায় ঘটনা বিধৃত হয়েছে। অগ্নির আকারে এই তাজাল্লী ছিল —রূপক তাজাল্লী। কারণ, সত্তাগত তাজাল্লী এই দুনিয়াতে কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সত্তাগত তাজাল্লীর দিক দিয়ে স্বয়ং মূসা (আঃ)-কে لَن تَرَانِي বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না।—মানে, আমার সত্তাকে দেখতে পারবে না।

সৎকর্ম দ্বারা স্থানও বরকতময় হয়ে যায় ঃ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ –তূর পর্বতের এই স্থানকে কোরআন পাক 'বরকতময় ভূমি' বলেছে। বলাবাহুল্য, এর বরকতময় হওয়ার কারণ আল্লাহ্‌র তাজাল্লী, যা আগুনের আকারে এ স্থানে প্রদর্শিত হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, যে স্থানে কোন গুরুত্বপূর্ণ সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সে স্থানও বরকতময় হয়ে যায়।

ওয়াযে বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতা কাম্য ঃ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا –এ থেকে জানা গেল যে, ওয়ায ও প্রচারকার্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রশংসনীয় বর্ণনাভঙ্গি কাম্য। এই গুণ অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো নিন্দনীয় নয়।

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا بَيِّنَٰتٍ قَالُوا مَا هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ
مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ
مُوسَىٰ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِۦ وَمَن تَكُونُ
لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ
يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى فَأَوْقِدْ لِى
يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ
إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣٨﴾ وَٱسْتَكْبَرَ
هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا
لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ
فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً
يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾
وَأَتْبَعْنَٰهُمْ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ هُم
مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ
مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

(৩৬) অতঃপর মূসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে পৌঁছল, তখন তারা বলল, এতো অলীক জাদু মাত্র। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এ কথা শুনিনি। (৩৭) মূসা বলল, আমার পালনকর্তা সম্যক জানেন যে তার নিকট থেকে হেদায়েতের কথা নিয়ে আগমন করেছে এবং যে প্রাপ্ত হবে পরকালের গৃহ। নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হবে না। (৩৮) ফেরাউন বলল, হে পারিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। হে হামান, তুমি ইট পোড়াও, অতঃপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মূসার উপাস্যকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। আমার তো ধারণা এই যে, সে একজন মিথ্যাবাদী। (৩৯) ফেরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না। (৪০) অতঃপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম, তৎপর আমি তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব দেখ, জালেমদের পরিণাম কি হয়েছে। (৪১) আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম। তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত। কেয়ামতের দিন তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। (৪২) আমি এই পৃথিবীতে অভিশাপকে তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি এবং কেয়ামতের দিন তারা হবে দুর্দশাগ্রস্ত। (৪৩) আমি পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর মূসাকে কিতাব দিয়েছি মানুষের জন্যে জ্ঞানবর্তিকা, হেদায়েত ও রহমত, যাতে তারা স্মরণ রাখে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَأَوْقِدْ لِى يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ —ফেরাউন সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিল। তাই সে উযীর হামানকে মাটির ইট পুড়ে পাকা করার আদেশ করল। কারণ, কাঁচা ইট দ্বারা বিশাল ও সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, ফেরাউনের এই ঘটনার পূর্বে পাকা ইটের প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম ফেরাউন এটা আবিষ্কার করেছে। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে আছে, হামান এই প্রাসাদ নির্মাণের জন্যে পঞ্চাশ হাজার রাজমিস্ত্রী যোগাড় করল। মজুর এবং কাঠ ও লোহার কাজ যারা করত, তাদের সংখ্যা ছিল এর অতিরিক্ত। প্রাসাদটি এত উচ্চ নির্মিত হয়েছিল যে, তখনকার যুগে এত উচ্চ প্রাসাদ কোথাও ছিল না। প্রাসাদের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলকে আঁদেশ করলেন। তিনি এক আঘাতে একে ত্রিখণ্ডিত করে ভূমিসাৎ করে দিলেন। ফলে ফেরাউনের হাজারো সিপাহী–এর নীচে চাপা পড়ে প্রাণ ত্যাগ করে। —(কুরতুবী)

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ –অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ফেরাউনের পারিষদবর্গকে দেশ ও জাতির নেতা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ভ্রান্ত নেতারা জাতিকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত। এখানে অধিকাংশ তফসীরকার জাহান্নামের দিকে আহবান করাকে রূপক অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ, জাহান্নাম বলে কুফরী কাজকর্ম বোঝানো হয়েছে, যার ফল ছিল জাহান্নাম ভোগ করা। কিন্তু মাওলানা সাইয়্যেদ আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রঃ)–এর সুচিন্তিত অভিমত (ইবনে আরাবীর অনুকরণে) এই ছিল যে, হুবহু কাজকর্ম পরকালের প্রতিদান হবে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব কাজকর্ম করে, বরযখে ও হাশরে সেগুলোই আকার পরিবর্তন করে পদার্থের রূপ ধারণ করবে। সৎকর্মসমূহ পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান হয়ে জান্নাতের নেয়ামতে পর্যবসিত হবে এবং কুফর ও জুলুমের কার্যসমূহ সর্প, বিচ্ছু এবং নানারকম আযাবের আকৃতি ধারণ করবে। কাজেই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষকে কুফর ও জুলুমের দিকে আহবান করে, সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের দিকেই আহবান করে ; যদিও এ দুনিয়াতে কুফর ও জুলুম জাহান্নাম তথা আগুনের আকারে নয়। এদিক দিয়ে আয়াতে কোন রূপকতা নেই। এই অভিমত গ্রহণ করা হলে কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে রূপকতার আশ্রয় নেয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে ; উদাহরণত ঃ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا আয়াতে এবং فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ আয়াতে

وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ - مقبوح শব্দের বহুবচন। مقبوحين অর্থাৎ, বিকৃত। উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে কালবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ ধারণ করবে।

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ

بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ —'পূর্ববর্তী সম্প্রদায়' বলে নূহ, হূদ, সালেহ্ ও লূত (আঃ) এর সম্প্রদায় সমূহকে বোঝানো হয়েছে। তারা মূসা (আঃ)–এর পূর্বে অবাধ্যতার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। بَصَآئِرَ শব্দটি بصيرة —এর

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

(৪৪) মূসাকে যখন আমি নির্দেশনামা দিয়েছিলাম, তখন আপনি পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না। (৪৫) কিন্তু আমি অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। আর আপনি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলেন না যে, তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করতেন। কিন্তু আমিই ছিলাম রসূল প্রেরণকারী। (৪৬) আমি যখন মূসাকে আওয়াজ দিয়েছিলাম, তখন আপনি তূর পর্বতের পার্শ্বে ছিলেন না। কিন্তু এটা আপনার পালনকর্তার রহমতস্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আগমন করেনি, যাতে তারা স্মরণ রাখে। (৪৭) আর এ জন্য যে, তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদের কোন বিপদ হলে তারা বলত, হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদের কাছে কোন রসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম এবং আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম। (৪৮) অতঃপর আমার কাছ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য আগমন করল, তখন তারা বলল, মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, এই রসূলকে সেরূপ দেয়া হল না কেন? পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল, তারা কি তা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল, উভয়ই জাদু, পরস্পরে একাত্ম। তারা আরও বলেছিল, আমরা উভয়কে মানি না। (৪৯) বলুন, তোমরা সত্যবাদী হলে এখন আল্লাহর কাছ থেকে কোন কিতাব আন, যা এতদুভয় থেকে উত্তম পথপ্রদর্শক হয়। আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব। (৫০) অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। এখানে সেই নূর বোঝানো হয়েছে। যা আল্লাহ্ তাআলা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন। এই নূর দ্বারা মানুষ বস্তুর স্বরূপ দেখতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ এখানে ناس শব্দ দ্বারা মূসা (আঃ)-এর উম্মত বোঝানো হলে তাতে কোন খটকা নেই। কারণ, সেই উম্মতের জন্য তওরাতই ছিল জ্ঞানের আলোকবর্তিকা। পক্ষান্তরে যদি ناس শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীসহ সমগ্র মানবজাতিকে বোঝানো হয়, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর আমলে যে তওরাত বিদ্যমান আছে, তা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বলা কিরূপে ঠিক হবে? এ ছাড়া এ থেকে জরুরী হয় যে, মুসলমানদেরও তওরাত দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। অথচ হাদীসের এই ঘটনা সুবিদিত যে, হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশে তওরাতের উপদেশাবলী পাঠ করার অনুমতি চাইলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রাগান্বিত হয়ে বললেন, বর্তমান যুগে মূসা জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোন গত্যন্তর ছিল না। এর সারমর্ম এই যে, তোমার উচিত আমার শিক্ষা অনুসরণ করা। তওরাত ও ইন্জীলের শিক্ষা দেখা তোমার জন্যে ঠিক নয়। কিন্তু এর জওয়াবে একথা বলা যায় যে, সেই যুগের আহলে-কিতাবের হাতে তওরাতের যে কপি ছিল, তা ছিল পরিবর্তিত এবং যুগ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ ; যাতে কোরআন-অবতরণ অব্যাহত ছিল। তখন কোরআনের পূর্ণ হেফাযতের উদ্দেশে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন কোন সাহাবীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে মানুষ কোরআনের সাথে হাদীসকেও জুড়ে না দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য কোন রহিত খোদায়ী গ্রন্থ পড়া ও পড়ানো সাবধানতার পরিপন্থী ছিল। এ থেকে জরুরী নয় যে, সর্বাবস্থায় তওরাত ও ইনজীল পাঠ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই কিতাবসমূহের যে যে অংশে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে, সে সব অংশ পাঠ করা ও উদ্ধৃত করা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত ও প্রচলিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও কা'ব আহবার এ ব্যাপারে সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্য সাহাবিগণও তাদের একাজ অপছন্দ করেননি । কাজেই আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, তওরাত ও ইনজীলে যেসব অপরিবর্তিত বিষয়বস্তু অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে, এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকারূপে আছে, সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। কিন্তু বলাবাহুল্য, এগুলো দ্বারা একমাত্র তাঁরাই উপকৃত হতে পারেন, যাঁরা পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বুঝতে পারেন। তাঁরা হলেন বিশেষজ্ঞ আলেম শ্রেণী। জনসাধারণের উচিত এ থেকে বেঁচে থাকা। নতুবা তারা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। সত্য ও মিথ্যা বিমিশ্রিত অন্যান্য কিতাবের বিধান তাই। জনসাধারণের এগুলো পাঠ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করলে কোন ক্ষতি নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ —এখানে কওম বলে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর আরবদেরকে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইসমাঈলের পর থেকে শেষ নবী (সাঃ) পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হননি। সূরা ইয়াসীনেও এই বিষয়বস্তু আলোচিত হবে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে— وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ অর্থাৎ, এমন কোন উম্মত নেই, যার মধ্যে আল্লাহর কোন পয়গম্বর আসেননি। কিন্তু

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ
آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾
أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُوا
اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ
أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ
مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ
كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ
لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَ
مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

(৫১) আমি তাদের কাছে উপর্যুপরি বাণী পৌঁছিয়েছি। যাতে তারা অনুধাবন করে। (৫২) কোরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এতে বিশ্বাস করে। (৫৩) যখন তাদের কাছে এটা পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এটা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য। আমরা এর পূর্বেও আজ্ঞাবহ ছিলাম। (৫৪) তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে তাদের সবরের কারণে। তারা মন্দের জওয়াবে ভাল করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। (৫৫) তারা যখন অবাঞ্ছিত বাজে কথাবার্তা শ্রবণ করে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমাদের জন্যে আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। (৫৬) আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ্ তাআলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন। (৫৭) তারা বলে, যদি আমরা আপনার সাথে সুপথে আসি, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে উৎখাত হব। আমি কি তাদের জন্যে একটি নিরাপদ 'হরম' প্রতিষ্ঠিত করিনি? এখানে সর্বপ্রকার ফল-মূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিযিকস্বরূপ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৫৮) আমি অনেক জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন যাপনে মদমত্ত ছিল। এগুলোই এখন তাদের ঘর-বাড়ী। তাদের পর এগুলোতে মানুষ সামান্যই বসবাস করেছে। অবশেষে আমিই মালিক রয়েছি। (৫৯) আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রসূল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার বাসিন্দারা জুলুম করে।

নবী-রসূলের আগমন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এই উম্মতও নয়।

توصيل শব্দটি وَصَّلْنَا - وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ থেকে উদ্ভূত। এর আসল আভিধানিক অর্থ রশির সূতায় আরো সূতা মিলিয়ে রশিকে মজবুত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা কোরআন-পাকে একের পর এক হেদায়েত অব্যাহত রেখেছেন এবং অনেক উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর বার বার পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছে, যাতে শ্রোতারা প্রভাবান্বিত হয়।

তবলীগ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতি : এ থেকে জানা গেল যে, সত্য কথা উপর্যুপরি বলা ও পৌঁছাতে থাকা পয়গম্বরগণের তবলীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। মানুষের অস্বীকার ও মিথ্যারোপ তাঁদের কাজে ও কর্মাসক্তিতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। সত্যকথা একবার না মানা হলে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার তাঁরা পেশ করতে থাকতেন। কারও মধ্যে প্রকৃত অন্তর সৃষ্টি করে দেয়ার সাধ্য তো কোন সহৃদয় উপদেশদাতার নেই। কিন্তু নিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন আপোষহীন। আজকালও যারা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করেন, তাদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ -এই আয়াতে সেসব আহ্‌লে কিতাবের কথা বলা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও কোরআন অবতরণের পূর্বেও তওরাত ও ইন্‌জীল প্রদত্ত সুসংবাদের ভিত্তিতে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়তে বিশ্বাসী ছিল। এরপর যখন তিনি প্রেরিত হন, তখন সাবেক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কালবিলম্ব না করে মুসলমান হয়ে যায়। হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর পারিষদবর্গের মধ্য থেকে চল্লিশ জনের একটি প্রীতিনিধিদল যখন মদীনায় উপস্থিত হয় তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খায়বর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তারাও জেহাদে অংশ গ্রহণ করল। কেউ কেউ আহতও হল, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ নিহত হল না। তারা যখন সাহাবায়ে কেরামের আর্থিক দুর্দশা দেখল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অনুরোধ জানাল যে, আমরা আল্লাহ্‌র রহমতে ধনাঢ্য ও সম্পদশালী জাতি। আপনি অনুমতি দিলে আমরা দেশে প্রত্যাবর্তন করে সাহাবায়ে কেরামের জন্যে অর্থসম্পদ সরবরাহ করব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ থেকে وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। —(মাযহারী) হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত জাফর (রাঃ) মদীনায় হিজরতের পূর্বে যখন আবিসিনিয়ায় গমন করেন এবং নাজ্জাশীর দরবারে ইসলামী শিক্ষা পেশ করেন, তখনই আল্লাহ্ তাআলা তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেন। তারা ছিল খ্রীষ্টান এবং তওরাত ও ইন্‌জীলে উল্লেখিত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত। —(মাযহারী)

'মুসলিম' শব্দটি উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ উপাধি, না সব উম্মতের জন্যে ব্যাপক? إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ -অর্থাৎ, আহ্‌লে কিতাবের এই আলেমগণ বলল, আমরা তো কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মুসলমান ছিলাম। এখানে 'মুসলিম' শব্দের আভিধানিক অর্থ (অনুগত, আজ্ঞাবহ) নিলে বিষয়টি পরিষ্কার যে, তাদের কিতাবের কারণে

কোরআন ও শেষ নবী সম্পর্কে তাদের যে বিশ্বাস অর্জিত হয়েছিল, সেই বিশ্বাসকেই ইসলাম' ও মুসলিমীন' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমরা তো পূর্বেই এতে বিশ্বাসী ছিলাম। পক্ষান্তরে যে অর্থের দিক দিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীকে 'মুসলিম' বলা হয়, সেই অর্থ নিলে এতে প্রমাণিত হয় যে, 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ কেবলমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ উপাধি নয় ; বরং সব পয়গম্বরের ধর্ম ছিল ইসলাম এবং তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলিম। কিন্তু কোরআন পাকের কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় যে, ইসলাম ও মুসলিম শব্দ এই উম্মতের জন্যেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি স্বয়ং কোরআনেই আছে যে, هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ -আল্লামা সুয়ূতী এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রবক্তা। এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। তাঁর মতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো পূর্ব থেকেই ইসলাম গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম সব পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং এই উম্মতের জন্যে বিশেষ উপাধি— এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, এটা সম্ভবপর যে, গুণগত অর্থের দিক দিয়ে ইসলাম সকলের অভিন্ন ধর্ম হবে এবং মুসলিম উপাধি শুধু এই উম্মতের বিশেষ উপাধি হবে। উদাহরণতঃ সিদ্দীক, ফারূক ইত্যাদি উপাধির কথা বলা যায়। এগুলো বিশেষভাবে হযরত আবুবকর ও ওমরের উপাধি, কিন্তু গুণগত অর্থের দিক দিয়ে অন্যরাও সিদ্দীক ও ফারূক হতে পারেন।

أُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ -অর্থাৎ, আহলে কিতাবের মুমিনদেরকে দুইবার পুরস্কৃত করা হবে। কোরআন পাকে এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্রা বিবিগণের সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে- وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ -সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে তিন ব্যক্তির জন্যে দুইবার পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) যে কিতাবধারী পূর্বে তার পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (২) যে অপরের মালিকানাধীন গোলাম এবং আপন প্রভুরও আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্ ও রসূলেরও ফরমাবরদারী করে। (৩) যার মালিকানায় কোন বাঁদী ছিল। এই বাঁদীর সাথে বিবাহ ছাড়াই সহবাস করা তার জন্যে জায়েয ছিল। কিন্তু সে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে বিবাহিতা স্ত্রী করে নিল।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এই কয়েক প্রকার লোককে দুইবার পুরস্কৃত করার কারণ কি? এর জওয়াবে বলা যায় যে, তাদের প্রত্যেকের আমল যেহেতু দুটি, তাদেরকে দুইবার পুরস্কার প্রদান করা হবে। কিতাবধারী মুমিনের দুই আমল এই যে, সে পূর্বে এক পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছে। পবিত্র বিবিগণের দুই আমল এই যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আনুগত্য ও মহব্বত রসূল হিসেবেও করেন এবং স্বামী হিসেবেও করেন। গোলামের দুই আমল তার দ্বিমুখী আনুগত্য, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য এবং প্রভুর আনুগত্য। বাঁদীকে মুক্ত করে যে বিবাহ করে, তার এক আমল মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় আমল বিবাহ্ করা। কিন্তু এই জওয়াবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, দুই আমলের দুই পুরস্কার ইনসাফভিত্তিক হওয়ার কারণে সবার জন্যে ব্যাপক। এতে কিতাবধারী মুমিন অথবা পবিত্রাগণের কোন বৈশিষ্ট্য নেই ; বরং যে কেউ দুই আমল করবে, সে দুই পুরস্কার পাবে। এই প্রশ্নের জওয়াব সম্পর্কে আমি আহকামুল কোরআন সূরা কাসাসে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছি। কোরআনের ভাষা থেকে যা প্রমাণিত হয়, তা এই যে, এখানে উদ্দেশ্য শুধু দুই পুরস্কার নয়। কেননা, এটা প্রত্যেক আমলকারীর জন্যে সাধারণ কোরআনি বিধি لَآ أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ -অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কোন আমলকারীর আমল বিনষ্ট করেন না। বরং সে যতই সৎকর্ম করবে, তারই হিসেবে পুরস্কার পাবে। তবে উল্লেখিত প্রকারসমূহে দুই পুরস্কারের অর্থ এই যে, তাদেরকে প্রত্যেক আমলের দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে। প্রত্যেক নামাযের দ্বিগুণ, রোযা, সদকা, হজ্জ, ওমরা ইত্যাদি প্রত্যেকটির দ্বিগুণ সওয়াব তারা লাভ করবে। কোরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দুই পুরস্কারের জন্যে সংক্ষিপ্ত শব্দ ছিল اجرين কিন্তু কোরআন এর পরিবর্তে বলেছে, أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ - এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এর উদ্দেশ্য তাদের প্রত্যেক আমল দুইবার লিখা হবে এবং প্রত্যেক আমলের জন্যে দুই সওয়াব দেয়া হবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণ কি? এর সুস্পষ্ট জওয়াব এই যে, আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমতা আছে, তিনি বিশেষ কোন আমলকে অন্যান্য আমলের চাইতে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করতে পারেন এবং এর পুরস্কার বাড়িয়ে দিতে পারেন। কারও এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ তাআলা রোযার সওয়াব এত বাড়িয়ে দিলেন কেন? যাকাত ও সদকার সওয়াব এত বাড়ালেন না কেন? এটা সম্ভবপর যে, আলোচ্য আয়াতে ও বুখারীর হাদীসে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে, এগুলোর মর্তবা অন্যান্য আমলের চাইতে কোন না কোন দিক দিয়ে বেশী। তাই এই পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। কোন কোন আলেম যে দ্বিগুণ শ্রমকে এর কারণ সাব্যস্ত করেছেন, তারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। আয়াতের শেষ বাক্যে بِمَا صَبَرُوْا এর প্রমাণ হতে পারে। অর্থাৎ, শ্রমে সবর করা দ্বিগুণ সওয়াবের কারণ।

وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ -অর্থাৎ, তারা মন্দকে ভাল দ্বারা দূর করে। এই মন্দ ও ভাল বলে কি বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তফসীরকারকদের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ বলেন, ভাল বলে এবাদত এবং মন্দ বলে গোনাহ্ বোঝানো হয়েছে। কেননা, পুণ্য কাজ অসৎকাজকে মিটিয়ে দেয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত মুয়ায ইবনে জাবালকে বলেন, اتبع السيئة الحسنة تمحها— অর্থাৎ, গোনাহের পর নেক কাজ কর। নেককাজ গোনাহকে মিটিয়ে দেবে। কেউ কেউ বলেন, ভাল বলে জ্ঞান ও সহনশীলতা এবং মন্দ বলে অজ্ঞতা ও অনবধানতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তারা অপরের অজ্ঞতার জওয়াব জ্ঞান ও সহনশীলতা দ্বারা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, এগুলো সবই ভাল ও মন্দের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ আছে ঃ প্রথম, কারও দ্বারা কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তার প্রতিকার এই যে, এরপর সৎকাজে সচেষ্ট হতে হবে। সৎকাজ গোনাহের কাফফারা হয়ে যাবে ; যেমন উপরে মুয়াযের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়, কেউ কারও প্রতি উৎপীড়ন ও মন্দ আচরণ করলে শরীয়তের আইনে যদিও সমান সমান হওয়ার শর্তে প্রতিশোধ নেয়া জায়েয আছে, কিন্তু প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে মন্দের প্রত্যুত্তরে ভাল এবং উৎপীড়নের প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করাই উত্তম। এটা উৎকৃষ্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর। ইহকালে ও পরকালে এর উপকারিতা অনেক। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে এই পথনির্দেশটি আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে—

اِدۡفَعۡ بِالَّتِیۡ هِیَ اَحۡسَنُ فَاِذَا الَّذِیۡ بَیۡنَكَ وَ بَیۡنَهٗ عَدَاوَۃٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیۡمٌ

অর্থাৎ, মন্দ ও যুলুমকে উৎকৃষ্ট পন্থায় প্রতিহত কর। (যুলুমের পরিবর্তে অনুগ্রহ কর)। এরূপ করলে যে ব্যক্তি ও তোমার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।

سَلٰمٌ عَلَیۡكُمۡ لَا نَبۡتَغِی الۡجٰهِلِیۡنَ –অর্থাৎ,তাদের একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র এই যে, তারা কোন অজ্ঞ শত্রুর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা শোনে, তখন তার জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে একথা বলে দেয়, আমার সালাম গ্রহণ কর। আমি অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। ইমাম জাস্‌সাস বলেন, সালাম দুই প্রকার। (এক) মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম। (দুই) সন্ধি ও বর্জনমূলক সালাম। অর্থাৎ, প্রতিপক্ষকে বলে দেয়া যে, আমি তোমার অসার আচরণের প্রতিশোধ নেব না। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

'হেদায়েত' শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) শুধু পথ দেখানো। এর জন্যে জরুরী নয় যে, যাকে পথ দেখানো হয়, সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেই যাবে। (দুই) পথ দেখিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বরং সব পয়গম্বর যে হাদী অর্থাৎ, পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং হেদায়েত যে তাঁদের ক্ষমতাধীন ছিল, তা বলাই বাহুল্য। কেননা, এই হেদায়েতই ছিল, তাঁদের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা তাঁদের ক্ষমতাধীন না হলে তাঁরা নবুওয়ত ও রেসালতের কর্তব্য পালন করবে কিরূপে? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্(সাঃ)হেদায়েতের উপরে ক্ষমতাশালী নন। এতে দ্বিতীয় অর্থের হেদায়েত বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ, গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে আপনি কারও অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেবেন এবং তাকে মুমিন বানিয়ে দিবেন, এটা আপনার কাজ নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমতাধীন। হেদায়েতের অর্থ ও তার প্রকারসমূহের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সূরা বাকারার শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে।

সহীহ্ মুসলিমে আছে এই আয়াত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর পিতৃব্য আবু তালেব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে কোনরূপেই ইসলাম গ্রহণ করুক। এর প্রেক্ষাপটে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে বলা হচ্ছে যে, কাউকে মুমিন–মুসলমান করে দেয়া আপনার ক্ষমতাধীন নয়। তফসীরে রূহুল মা'আনীতে আছে, আবু তালেবের ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে বিনা প্রয়োজনে আলোচনা, বিতর্ক ও তাকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ, এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর মনোকষ্টের সম্ভাবনা রয়েছে।

وَقَالُوۡۤا اِنۡ نَّتَّبِعِ الۡهُدٰی مَعَكَ نُتَخَطَّفۡ مِنۡ اَرۡضِنَا –অর্থাৎ, হারেস ইবনে ওসমান প্রমুখ মক্কার কাফের তাদের ঈমান কবুল না করার এক কারণ এই বর্ণনা করল যে, আপনার শিক্ষাকে সত্য মনে করি, কিন্তু আমাদের আশংকা এই যে, আপনার পথনির্দেশ মেনে আমরা আপনার সাথে একাত্ম হয়ে গেলে সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেয়া হবে। —(নাসায়ী) কোরআন পাক তাদের এই খোঁড়া অজুহাতের তিনটি জওয়াব দিয়েছে ঃ

(১) اَوَ لَمۡ نُمَكِّنۡ لَّهُمۡ حَرَمًا اٰمِنًا یُّجۡبٰۤی اِلَیۡهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَیۡءٍ

অর্থাৎ, তাদের এই অজুহাত বাতিল। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা বিশেষভাবে মক্কাবাসীদের হেফাযতের জন্যে একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন। তা এই যে, তিনি মক্কার ভূখণ্ডকে নিরাপদ হারাম করে দিয়েছেন। সমগ্র আরবের গোত্রসমূহ কুফর, শিরক ও পারস্পরিক শত্রুতা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে একমত ছিল যে, মক্কার হরমের অভ্যন্তরে হত্যা ও যুদ্ধবিগ্রহ ঘোরতম হারাম। হরমের অভ্যন্তরে পিতার হত্যাকারীকে পেলে পুত্র চরম প্রতিশোধস্পৃহা সত্ত্বেও তাকে হত্যা করতে বা প্রতিশোধ নিতে পারত না। অতএব যে প্রভু নিজ কৃপায় কুফর ও শিরক সত্ত্বেও তাদেরকে এই ভূখণ্ডে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছেন, ঈমান কবুল করলে তিনি তাদেরকে ধ্বংস হতে দেবেন, এ আশংকা চরম মূর্খতা বৈ কিছু নয়। ইয়াহ্ইয়া ইবনে–সালাম বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা হরমের কারণে নিরাপদ ছিলে, আমার দেয়া রিযিক স্বচ্ছন্দে খেয়ে যাচ্ছিলে এবং আমাকে পরিত্যাগ করে অন্যের এবাদত করছিলে। এই অবস্থার কারণে তো তোমাদের ভয় হল না উল্টা ভয় হল আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে।—(কুরতুবী) আলোচ্য আয়াতে হরমের দুইটি গুণ বর্ণিত হয়েছে ঃ (১) এটা শান্তির আবাসস্থল, (২) এখানে বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে সর্ব প্রকার ফল–মূল আমদানী হয়, যাতে মক্কার বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজন সহজে মেটাতে পারে।

মক্কার হরমে প্রত্যেক প্রকার ফল–মূল আমদানী হওয়া বিশেষ কুদরতের নিদর্শন ঃ মক্কা মোকাররমা, যাকে আল্লাহ্ তাআলা নিজ গৃহের জন্যে সারা বিশ্বের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন, এটা এমন একটি স্থান যে, এখানে পার্থিব জীবনোপকরণের কোন বস্তু সহজে পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। কেননা, গম, ছোলা, চাউল ইত্যাদি মানুষের সাধারণ খাদ্যের উৎপাদনও এখানে না হওয়ার পর্যায়ে ছিল। ফল–মূল তরকারি ইত্যাদির তো কোন কথাই নেই। কিন্তু মক্কার এসব বস্তুর প্রাচুর্য দেখে বিবেক–বুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে পড়ে। প্রতি বছর হজ্বের মওসুমে মক্কার তিন লাখ জনসংখ্যার উপর আরও বার থেকে পনের লাখ মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যায়, যারা গড়ে দুই–আড়াই মাস সেখানে বাস করে। কিন্তু কখনও শোনা যায়নি যে, তাদের মধ্যে কেউ কোন দিন খাদ্যের অভাব ভোগ করেছে। বরং সবাই প্রত্যক্ষ করে যে, এখানে দিবা–রাত্রির সকল সময়ে প্রচুর পরিমাণ তৈরী খাদ্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের ثَمَرٰتُ كُلِّ شَیۡءٍ শব্দে চিন্তা করলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সাধারণ পরিভাষায় ثَمَرٰتُ শব্দটি বৃক্ষের সাথে সম্পর্ক রাখে। কাজেই স্থান ছিল এরূপ বলার ঃ ثمرات كل شجر এর পরিবর্তে ثَمَرٰتُ كُلِّ شَیۡءٍ বলার মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে যে, ثَمَرٰتُ শব্দের অর্থ এখানে শুধু ফল–মূল নয়; বরং এর অর্থ যে কোন উৎপাদন। মিল কারখানায় নির্মিত সামগ্রীও মিল–কারখানার ثَمَرٰتُ তথা উৎপাদন। এভাবে আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে মক্কার হরমে শুধু আহার্য ও পানীয় দ্রব্যাদিই আমদানী হবে না; বরং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সবকিছুই এখানে সরবরাহ করা হবে। তাই আজ খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে যে, মক্কায় যেমন প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের খাদ্য ও উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, জগতের অন্য কোন দেশেই বোধহয় তদ্রূপ পাওয়া যায় না। এ হচ্ছে মক্কার কাফেরদের অজুহাতের জওয়াব যে, যিনি তোমাদের কুফর ও শিরক সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি এতসব অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের দেশকে যাবতীয় বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এদেশে কোন কিছুই উৎপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্য–সামগ্রী এখানে এনে সমাবেশ করেছেন, সেই

বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এসব নেয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাবে— এরূপ আশংকা করা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা বৈ নয়।

(২) এরপর তাদের অজুহাতের দ্বিতীয় জওয়াব এই ঃ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا এতে বলা হয়েছে যে, জগতের অন্যান্য কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কুফর ও শেরকের কারণে তারা কিভাবে নিপাত হয়েছে। তাদের বসত-বাটি, সুদৃঢ় দুর্গ ও প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম মাটিতে মিশে গেছে। অতএব কুফর ও শেরকই হচ্ছে প্রকৃত আশঙ্কার বিষয়। এটা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। তোমরা এমনই বোকা ও নির্বোধ যে, কুফর ও শেরকের কারণে বিপদাশঙ্কা বোধ কর না, ঈমানের কারণে বিপদাশঙ্কা বোধ কর।

(৩) তৃতীয় জওয়াব এই ঃ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

এতে বলা হয়েছে, যদি ধরে নেয়ার পর্যায়ে ঈমান কবূল করার ফলে তোমাদের কোন ক্ষতি হয়েই যায়, তবে তা ক্ষণস্থায়ী। এ জগতের ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ ও ধন-দৌলত যেমন ক্ষণস্থায়ী, কারও কাছে চিরকাল থাকে না, তেমনি এখানকার কষ্টও ক্ষণস্থায়ী-দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই বুদ্ধিমানের উচিত, সেই কষ্ট ও সুখের চিন্তা করা, যা চিরস্থায়ী, অক্ষয়। চিরস্থায়ী ধন ও নেয়ামতের খাতিরে ক্ষণস্থায়ী কষ্ট সহ্য করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا -অর্থাৎ, অতীত সম্প্রদায়সমূহের যেসব জনপদকে আল্লাহ্র আযাব দ্বারা-বিধ্বস্ত করা হয়েছিল, এখন পর্যন্ত সেগুলোতে মানুষ সামান্যই মাত্র বসবাস করছে। বাজ্জাযের উক্তি অনুযায়ী এই 'সামান্য'র অর্থ যদি যৎসামান্য বাসস্থান কিংবা আবাস নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, সামান্য সংখ্যক বাসগৃহ ব্যতীত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহের কোন বাসগৃহ পুনরায় আবাদ হয়নি। কিন্তু হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, 'সামান্য'-র অর্থ সামান্যক্ষণ বা সামান্য সময় অর্থাৎ এসব জনপদে কেউ থাকলেও সামান্যক্ষণ থাকে; যেমন কোন পথিক অল্পক্ষণের জন্যে কোথাও বসে বিশ্রাম নেয়। একে জনপদের আবাদী বলা যায় না।

حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا - ام শব্দটি মূল ও ভিত্তির অর্থেও বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। امها এর সর্বনাম দ্বারা قرى বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, জনপদসমূহের মূল কেন্দ্রস্থল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা কোন সম্প্রদায়কে তখন পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তাদের প্রধান প্রধান নগরীতে কোন রসূলের মাধ্যমে সত্যের পয়গাম না পৌঁছে দেন। সত্যের দাওয়াত পৌঁছার পর যখন লোকেরা তা কবূল করে না, তখন জনপদসমূহের উপর আযাব নেমে আসে।

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলার পয়গম্বরগণ সাধারণতঃ বড় বড় শহরে প্রেরিত হতেন। তাঁরা ছোট শহর ও গ্রামে আসতেন না। কেননা, এরূপ শহর ও গ্রাম সাধারণতঃ শহরের অধীন হয়ে থাকে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও এবং শিক্ষাগত প্রয়োজনেও প্রধান শহরে কোন বিষয় ছড়িয়ে পড়লে তার আলোচনা আশপাশের ছোট শহর ও গ্রামে আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়ে; এ কারণেই কোন বড় শহরে রসূল প্রেরিত হয়ে দাওয়াত পেশ করলে এই দাওয়াত ছোট শহর ও গ্রামে স্বভাবতই পৌঁছে যেতো। ফলে সংশ্লিষ্ট সবার উপর আল্লাহ্র পয়গাম কবূল করা ফরয হয়ে যেতো এবং অস্বীকার ও মিথ্যারোপের কারণে সবার উপর আযাব নেমে আসাই ছিল স্বাভাবিক।

নির্দেশ ও আইন-কানুনে ছোট শহর ও গ্রাম বড় শহরের অধীন ঃ এ থেকে জানা গেল যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদির ক্ষেত্রে যেমন ছোট ছোট জনপদ বড় শহরের অধীন হয়ে থাকে, সেখান থেকেই তাদের প্রয়োজনাদি মিটে থাকে, তেমনি কোন নির্দেশ পালন করা সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের উপরও অপরিহার্য হয়ে যায়। না জানা অথবা না শোনার ওযর গ্রহণযোগ্য হয় না।

এ জন্যে রমযান ও ঈদের চাঁদের প্রশ্নেও ফেকাহ্‌বিদগণ বলেন যে, এক শহরে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা বিচারপতির নির্দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহেরও তা মেনে নেয়া জরুরী। কিন্তু অন্য শহরবাসীদের জন্যে এটা তখন সেই শহরের বিচারপতি কর্তৃক এই সাক্ষ্য প্রমাণ স্বীকার করে নিয়ে আদেশ জারী না করা পর্যন্ত জরুরী হবে না।—(ফতোয়া গিয়াসিয়া)

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا
عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٠﴾ اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا
حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ
شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ
الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ
اِلَيْكَ ؗ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ
كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ
الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا
يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٦٦﴾ فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ
يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ مَا
كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ
مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ
الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ؗ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾

(৬০) তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ নয়। আর আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বোঝ না? (৬১) যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর তাকে কেয়ামতের দিন অপরাধীরূপে হাযির করা হবে? (৬২) যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক দাবী করতে, তারা কোথায়? (৬৩) যাদের জন্যে শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম। আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম, যেমন আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে দায়মুক্ত হচ্ছি। তারা কেবল আমাদেরই এবাদত করত না। (৬৪) বলা হবে, তোমরা তোমাদের শরীকদের আহবান কর। তখন তারা ডাকবে। অতঃপর তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা আযাব দেখবে। হায়! তারা যদি সৎপথ প্রাপ্ত হত! (৬৫) যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রসূলগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে? (৬৬) অতঃপর তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। (৬৭) তবে যে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আশা করা যায়, সে সফলকাম হবে। (৬৮) আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ্ পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে উর্ধ্বে। (৬৯) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, আপনার পালনকর্তা তা জানেন। (৭০) তিনিই আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইহকাল ও পরকালে তাঁরই প্রশংসা। বিধান তাঁরই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى — অর্থাৎ, দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসন সবই ধ্বংসশীল। দুনিয়ার কাজকর্মের যে প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে, তা এখনকার ধন-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসন থেকে গুণগত দিক দিয়েও অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ধন-সম্পদ যতই উৎকৃষ্ট হোক, পরিশেষে ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিম্নস্তরের ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অধিকতর সুখদায়ক ও চিরস্থায়ী জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিতে পারে না।

বুদ্ধিমান তাকেই বলে, যে দুনিয়ার ঝামেলায় কম মগ্ন থাকে এবং পরকালের চিন্তা বেশী করে ঃ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, যদি কেউ মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করে যে, তার ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি যেন সর্বাধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দান করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদের শরীয়তসম্মত প্রাপক হবে—যারা আল্লাহ্ তাআলার এবাদত ও আনুগত্যে মশগুল রয়েছেন। কেননা, বুদ্ধির দাবী এটাই এবং দুনিয়াদারদের মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান তারাই। এই মাসআলা হানাফী মযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব দুররে মুখতারেও উল্লেখিত আছে।

হাশরের ময়দানে কাফের ও মুশরেকদেরকে প্রথম প্রশ্ন শেরক সম্পর্কে করা হবে। অর্থাৎ, যেসব শয়তান ইত্যাদিকে তোমরা আমার শরীক বলতে এবং তাদের কথামত চলতে, তারা আজ কোথায়? তারা তোমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারে কি? জওয়াবে মুশরিকদের একথা বলাই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিরক করিনি ; বরং এই শয়তানরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাই আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং শয়তানদের মুখ থেকে একথা বের করাবেন যে, আমরা বিভ্রান্ত করেছি ঠিকই, কিন্তু আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি। এজন্যে আমরাও অপরাধী, কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্ত তারাও নয়। কারণ, আমরা যেমন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, এর বিপরীতে পয়গম্বরগণ ও তাঁদের নায়েবগণ তাদেরকে হেদায়েতও করেছিলেন এবং প্রমাণাদি দ্বারা তাদের কাছে সত্যও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারা স্বেচ্ছায় পয়গম্বরগণের কথা অগ্রাহ্য করেছে এবং আমাদের কথা মেনে নিয়েছে। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে দোষমুক্ত হতে পারে? এ থেকে জানা গেল যে, সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সামনে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সত্যের দাওয়াত কবুল না করে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া কোন ধর্তব্য ওযর নয়।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ — এই আয়াতের এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, وَيَخْتَارُ -এর অর্থ বিধান জারীর ক্ষমতা। আল্লাহ্ তাআলা একাই যখন সৃষ্টিকর্তা, তাঁর কোন শরীক নেই, তখন বিধান জারীতেও তিনি একক। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টজীবের মধ্যে বিধান জারী করেন। সারকথা এই যে, সৃষ্টিগত ক্ষমতায় যেমন আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই, তেমনি বিধান জারী করার ক্ষমতায়ও তাঁর কোন অংশীদার নেই। এর অপর এক অর্থ ইমাম বগভী তাঁর তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে কাইয়্যেম যাদুল মা'আদের ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, وَيَخْتَارُ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা মানবজাতির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা সম্মান দানের জন্যে মনোনীত করেন। বগভীর উক্তি অনুযায়ী এটা মুশরিকদের এই কথার জওয়াব لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ —অর্থাৎ এই কোরআন আরবের দু'টি বড় শহর মক্কা ও তায়েফের

মধ্য থেকে কোন প্রধান ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করা হল না কেন? এরূপ করলে এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হত। একজন পিতৃহীন দরিদ্র লোকের প্রতি নাযিল করার রহস্য কি? এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, যে মালিক সমগ্র সৃষ্টজগতকে কোন অংশীদারের সাহায্য ব্যাতিরেকে সৃষ্টি করেছেন, কোন বান্দাকে বিশেষ সম্মান দানের জন্যে মনোনীত করার ক্ষমতাও তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রস্তাবের অনুসারী হবেন কেন যে, অমুক যোগ্য, অমুক যোগ্য নয়?

এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর এবং এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের বিশুদ্ধ মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা ঃ হাফেয ইবনে কাইয়্যেম এই আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান উদ্ভাবন করেছেন। তা এই যে, দুনিয়াতে এক স্থানকে অন্য স্থানের উপর অথবা এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এই শ্রেষ্ঠত্ব দান সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপার্জন ও কর্মের ফল নয়; বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি। তিনি সপ্ত–আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে উর্ধ্ব আকাশকে অন্যগুলোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অথচ সবগুলো আকাশের উপাদান একই ছিল। তিনি জান্নাতুল ফেরদাউসকে অন্য সব জান্নাতের উপর, জিবরাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল প্রমুখ বিশেষ ফেরেশতাগণকে অন্য ফেরশতাদের উপর, পয়গম্বরগণকে সমগ্র আদমসন্তানের উপর, তাঁদের মধ্যে দৃঢ়চেতা পয়গম্বরকে অন্য পয়গম্বগণের উপর, ইবরাহীম খলীল ও হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)–কে অন্য দৃঢ়চেতা পয়গম্বরগণের উপর, ইসমাঈল (আঃ)–এর বংশধরকে সমগ্র মানবজাতির উপর, কোরাইশকে তাদের সবার উপর, মুহাম্মদ (সাঃ)–কে সব বনী হাশেমের উপর এবং এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য মনীষীকে অন্য মুসলমানদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এগুলো সব আল্লাহ্ তাআলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি।

এমনিভাবে পৃথিবীর অনেক স্থানকে অন্য স্থানের উপর, অনেক দিন ও রাতকে অন্য দিন ও রাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করাও আল্লাহ্ তাআলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার প্রভাব। মোটকথা, শ্রেষ্ঠত্ব ও অশ্রেষ্ঠত্বের আসল মাপকাঠি এই মনোনয়ন ইচ্ছাই। তবে শ্রেষ্ঠত্বের অপর একটি কারণ মানুষের কর্মকাণ্ডও হয়ে থাকে। যেসব স্থানে সৎকর্ম সম্পাদিত হয়, সেসব স্থানও সৎকর্ম অথবা সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের বসবাসের কারণে পবিত্র ও পুণ্যময় হয়ে যায়। এই শ্রেষ্ঠত্ব উপার্জন ইচ্ছা ও সৎকর্মের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। সারকথা এই যে, দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি দু'টি। একটি ইচ্ছাধীন, যা সৎকর্ম ও উত্তম চরিত্র দ্বারা অর্জিত হয়। আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনকে সব সাহাবীর উপর এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আবু বকর, অতঃপর ওমর ইবনে খাত্তাব অতঃপর ওসমান গনী অতঃপর আলী মুর্তযা (রাঃ)–এর ক্রমকে উপরোক্ত উভয় মাপকাঠি দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। হযরত শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী (রহঃ)–এরও একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা, এই বিষয়বস্তুর উপর ফার্সী ভাষায় লিখিত আছে। বর্তমান লেখক এর ''বো'দিত তাফসীল লি মাস আলাতিত তাফযীল'' নামে উর্দু তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া আমি 'আহকামুল কোরআন' সূরা কাসাসেও আরবী ভাষায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুধীবর্গ অনুসন্ধিৎসু হলে সেখানে দেখে নিতে পারেন।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿٧١﴾
قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا
تُبْصِرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا
فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَيَوْمَ
يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٧٤﴾
وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ
فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٧٥﴾
اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ۪ وَاٰتَيْنٰهُ
مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ
اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿٧٦﴾
وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾

(৭১) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না? (৭২) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি দিনকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না? (৭৩) তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্যে রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৭৪) যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়? (৭৫) প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী আলাদা করব; অতঃপর বলব, তোমাদের প্রমাণ আন। তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য আল্লাহ্‌র এবং তারা যা গড়ত, তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে। (৭৬)কারূন ছিল মূসারসম্প্রদায়ভুক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি দুষ্টামি করতে আরম্ভ করল। আমি তাকে এত ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, দম্ভ করো না, আল্লাহ্ দাম্ভিকদেরকে ভালবাসেন না। (৭৭) আল্লাহ্ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেননা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ
بِضِيَآءٍ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা রাতের সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন। بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ অর্থাৎ, রাতে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে। এর বিপরীতে দিনের সাথে بِضِيَآءٍ বলে তার কোন উপকারিতা উল্লেখ করেননি। কারণ এই যে, দিবালোক নিজ সত্তাগতভাবে উত্তম। অন্ধকার থেকে আলোক যে উত্তম তা সুবিদিত। আলোকের অসংখ্য উপকারিতা এত সুবিদিত যে, তা বর্ণনা করার মোটেই প্রয়োজন নেই। রাত হচ্ছে অন্ধকার, যা সত্তাগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়। বরং মানুষের আরাম ও বিশ্রামের কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব। তাই একে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। এ কারণেই দিনের ব্যাপারের শেষে اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ এবং রাতের ব্যাপারের শেষে اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, দিনের শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও উপকারিতা এত বেশী যে, তা দৃষ্টিসীমায় আসতে পারে না, তবে শোনা যায়। তাই اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ বলা হয়েছে। কেননা, মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির সিংহভাগ কর্মের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। চোখে দেখা বিষয় সব সময় কানে শোনা বিষয়ের তুলনায় কম। রাতের উপকারিতা দিনের উপকারিতার তুলনায় কম। তা দেখাও যেতে পারে। তাই اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ বলা হয়েছে।—(মাযহারী)

সূরা কাসাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ফেরাউন ও ফেরাউন-বংশীয়দের সাথে মূসা (আঃ)-এর একক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাঁরই সম্প্রদায়ভুক্ত কারূনের সাথে তাঁর দ্বিতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, দুনিয়ার ধন-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এর মহব্বতে ডুবে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়ঃ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا কারূনের কাহিনীতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ধন-সম্পদ অর্জিত হওয়ার পর সে এই উপদেশ বেমালুম ভুলে যায়। এর নেশায় বিভোর হয়ে আল্লাহ্ তাআলার সাথে কৃতঘ্নতা করে এবং ধন-সম্পদে ফকীর-মিসকীনের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতেও অস্বীকৃত হয়। এর ফলে তাকে ধনভাণ্ডারসহ ভূগর্ভে বিলীন করে দেয়া হয়।

قَارُوْنَ —সম্ভবতঃ হিব্রু ভাষার একটি শব্দ। তার সম্পর্কে কোরআন থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, সে মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূসা (আঃ)-এর সাথে তার সম্পর্ক কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে-আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে তাকে মূসা (আঃ)-এর চাচাত ভাই বলা হয়েছে। এছাড়া আরও উক্তি আছে।—(কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী)

রূহুল-মা'আনীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে বলা হয়েছে যে, কারূন তওরাতের হাফেয ছিল এবং তওরাত তার অন্য সবার চাইতে বেশী মুখস্থ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সামেরীর অনুরূপ কপট বিশ্বাসী প্রমাণিত হল। তার কপট বিশ্বাসের কারণ ছিল পার্থিব সম্মান ও

জাঁকজমকের প্রতি অগাধ ও অন্যায় মোহ। মূসা (আঃ) ছিলেন সমগ্র বনী ইসরাঈলের নেতা এবং তাঁর ভ্রাতা হারুন (আঃ) ছিলেন তাঁর উযীর ও নবুওয়তের অংশীদার। এতে কারূনের মনে হিংসা জাগে যে, আমিও তাঁর জ্ঞাতি ভাই এবং নিকট স্বজন। এই নেতৃত্বে আমার অংশ নেই কেন? সেমতে সে মূসা (আঃ)-এর কাছে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিষয়। এতে আমার কোন হাত নেই। কিন্তু কারূন এতে সন্তুষ্ট হল না এবং মূসা (আঃ)-এর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে।

فَبَغٰى عَلَيْهِمْ – بغى কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থ-জুলুম করা। আয়াতের অর্থ এই যে, সে ধন-সম্পদের নেশায় অপরের প্রতি জুলুম করতে লাগল। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সালাম ও সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন, কারূন ছিল বিত্তশালী। ফেরাউন তাকে বনী ইসরাঈলের দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেছিল। এই পদে থাকা অবস্থায় সে বনী-ইসরাঈলের উপর নির্যাতন চালায়।—(কুরতুবী)

এর অপর অর্থ অহংকার করা। অনেক তফসীরবিদ এই অর্থ ধরেই বলেছেন যে, কারূন ধন-দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে বনী-ইসরাঈলের মোকাবেলায় অহংকার করতে থাকে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করে।

وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ – كنوز শব্দটি كنز এর বহুবচন। এর অর্থ ভূগর্ভস্থ ধন-ভাণ্ডার। শরীয়তের পরিভাষায় كنز এমন ধন-ভাণ্ডারকে বলা হয়, যার যাকাত দেয়া হয়নি। হযরত আতা থেকে বর্ণিত আছে যে, কারূন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর একটি বিরাট ভূগর্ভস্থ ধন-ভাণ্ডারপ্রাপ্ত হয়েছিল।—(রূহুল মা'আনী)

لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ – ناء শব্দের অর্থ বোঝার ভারে ঝুঁকিয়ে দেয়া। عصبة শব্দের অর্থ দল। উদ্দেশ্য এই যে, তার ধন-ভাণ্ডার ছিল বিরাট। এগুলোর চাবি এত অধিকসংখ্যক ছিল যে, তা বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। বলাবাহুল্য, চাবি সাধারণতঃ হালকা ওজনের হয়ে থাকে, যাতে বহন করা ও সঙ্গে রাখা কষ্টসাধ্য না হয়। কিন্তু প্রচুরসংখ্যক হওয়ার কারণে কারূনের চাবির ওজন এত বেশী ছিল, যা একদল লোকও সহজে বহন করতে পারত না। (রূহ্)

لَاتَفْرَحْ – فرح -এর শাব্দিক অর্থ আনন্দ, উল্লাস। কোরআন পাক অনেক আয়াতে এই فرح কে নিন্দনীয়রূপে ব্যক্ত করেছে, যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ —অন্য এক আয়াতে আছে وَلَاتَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ আরও এক আয়াতে আছে وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا কিন্তু কোন কোন আয়াতে এর অনুমতি বরং এক ধরনের আদেশও বর্ণিত আছে; যেমন وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ আয়াতে এবং فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا আয়াতে। এসব আয়াতের সমষ্টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেই আনন্দ ও উল্লাস নিন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ, যা দম্ভ ও অহংকারের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এটা তখনই হতে পারে, যখন এই আনন্দকে নিজস্ব ব্যক্তিগত গুণ ও ব্যক্তিগত অধিকার মনে করা হয়—আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও দয়া মনে না করা হয়। যে আনন্দ এই সীমা পর্যন্ত পৌঁছে না, তা নিষিদ্ধ নয়; বরং একদিক দিয়ে কাম্য। কারণ, এতে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

-অর্থাৎ, ঈমানদারগণ কারূনকে এই উপদেশ দিল, আল্লাহ্ তোমাকে যে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন, তদ্দ্বারা পরকালীন শান্তির ব্যবস্থা কর এবং দুনিয়াতে তোমার যে অংশ আছে তা ভুলে যেয়ো না।

দুনিয়ার অংশ কি? এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার বলেন, এর অর্থ মানুষের বয়স এবং এই বয়সের মধ্যে করা হয় এমন কাজকর্ম, যা পরকালে কাজে আসতে পারে। সদ্কা-খয়রাতসহ অন্যান্য সব সৎকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাসসহ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে এ অর্থই বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী) এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের তাগিদ ও সমর্থন হবে। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, তোমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন অর্থাৎ, টাকা-পয়সা, বয়স, শক্তি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি-এগুলোকে পরকালের কাজে লাগাও। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে তোমার অংশ ততটুকুই যতটুকু পরকালের কাজে লাগবে। অবশিষ্টাংশ তো ওয়ারিসদের প্রাপ্য। কোন কোন তফসীরকার বলেন, দ্বিতীয় বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন, তদ্দ্বারা পরকালের ব্যবস্থা কর, কিন্তু নিজের সাংসারিক প্রয়োজনও ভুলে যেয়ো না যে, সবকিছু দান করে নিজে কাঙ্গাল হয়ে যাবে। বরং যতটুকু প্রয়োজন, নিজের জন্যে রাখ। এই তফসীর অনুযায়ী দুনিয়ার অংশ বলে জীবন ধারণের উপকরণ বোঝানো হয়েছে।

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

(৭৮) সে বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধন-সম্পদে অধিক প্রাচুর্যশীল? পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। (৭৯) অতঃপর কারূন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হল। যারা পার্থিবজীবন কামনা করত, তারা বলল, হায়, কারূন যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেয়া হত! নিশ্চয় সে বড় ভাগ্যবান (৮০) আর যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে, যারা ঈমানদার এবং সৎকর্মী, তাদের জন্যে আল্লাহ্র দেয়া সওয়াবই উৎকৃষ্ট। এটা তারাই পায়, যারা সবরকারী। (৮১) অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না। (৮২) গতকল্য যারা তার মত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, তারা প্রত্যুষে বলতে লাগল, হায়, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন ও হ্রাস করেন। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে আমাদেরকেও ভূগর্ভে বিলীন করে দিতেন। হায়, কাফেররা সফলকাম হবে না। (৮৩) এই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। খোদাভীরুদের জন্যে শুভ পরিণাম। (৮৪) যে সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তদপেক্ষা উত্তম ফল পাবে এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, এরূপ মন্দ কর্মীরা সে মন্দ কর্ম পরিমাণেই প্রতিফল পাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي –কারও কারও মতে এখানে 'এলম' বলে তওরাতের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। যেমন রেওয়ায়েতে আছে যে, কারূন তওরাতের হাফেয ও আলেম ছিল। মূসা (আঃ) যে সত্তর জনকে তূর পর্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মনোনীত করেছিলেন, কারূন তাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এই জ্ঞান-গরিমার ফলে তার মধ্যে গর্ব ও অহংকার দেখা দেয় এবং সে একে ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে বসে। তার উপরোক্ত উক্তির অর্থ তাই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তা আমার নিজস্ব জ্ঞানগত গুণের কারণে পেয়েছি। তাই আমি নিজেই এর প্রাপক। এতে আমার প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই। কিন্তু বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এখানে এলম বলে অর্থনৈতিক কলাকৌশল বোঝানো হয়েছে। উদাহরণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তাতে আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহের কোন দখল নেই এটা অমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতা দ্বারা অর্জন করেছি। মূর্খ কারূন একথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা, শিল্প অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য—এগুলোও তো আল্লাহ্ তাআলারই দান ছিল;—তার নিজস্ব গুণ গরিমা ছিল না।

أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ –কারূনের উপরোক্ত উক্তির আসল জওয়াব তো তাই ছিল, যা উপরে লিখিত হয়েছে; অর্থাৎ, যদি স্বীকার করে নেয়া যায় যে, তোমার ধন-সম্পদ তোমার বিশেষ কর্মতৎপরতা ও কারিগরি জ্ঞান দ্বারাই অর্জিত হয়েছে তবুও তো তুমি আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পার না। কেননা, এই কারিগরি জ্ঞান ও উপার্জনশক্তিও তো আল্লাহ্ তাআলার দান। এই জওয়াব যেহেতু অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাই কোরআন পাক একে উপেক্ষা করে এই জওয়াব দিয়েছে যে, ধরে নাও, তোমার অর্থ-সম্পদ তোমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং এই ধন-সম্পদের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। অর্থের প্রাচুর্য কোন মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় এবং অর্থ সর্বাবস্থায় তার কাজে লাগে না। প্রমাণ হিসেবে কোরআন পাক অতীত যুগের বড় বড় ধনকুবেরদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। তারা যখন অবাধ্যতার পথে চলতে থাকে, তখন আল্লাহ্র আযাব তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করে। তখন অগাধ ধন-সম্পদ তাদের কোন কাজে আসেনি।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ .... –এই আয়াতে الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ –অর্থাৎ, আলেমদের মোকাবেলায় الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا বলা হয়েছে। এতে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ভোগসম্ভার কামনা করা এবং একে লক্ষ্য স্থির করা আলেমদের কাজ নয়। আলেমদের দৃষ্টি সর্বদা পরকালের চিরস্থায়ী সুখের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তাঁরা যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই দুনিয়ার ভোগসম্ভার উপার্জন করেন এবং তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।

لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا –এ আয়াতে পরকালের মুক্তি ও সাফল্য শুধু তাদের জন্য নির্ধারিত বলা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও অনর্থের ইচ্ছা করে না। علو শব্দের অর্থ অহংকার তথা নিজেকে অন্যের চাইতে বড় মনে করা ও অন্যকে ঘৃণিত ও হেয় মনে করা। فساد বলে, অপরের উপর জুলুম বোঝানো হয়েছে।—(সুফিয়ান

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۘ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

سورة العنكبوت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الم ﴿١﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾

(৮৫) যিনি আপনার প্রতি কোরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন। বলুন আমার পালনকর্তা ভাল জানেন কে হেদায়েত নিয়ে এসেছে এবং কে প্রকাশ্যে বিভ্রান্তিতে আছে। (৮৬) আপনি আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা কেবল আপনার পালনকর্তার রহমত। অতএব আপনি কাফেরদের সাহায্যকারী হবেন না। (৮৭) কাফেররা যেন আপনাকে আল্লাহ্‌র আয়াত থেকে বিমুখ না করে সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (৮৮) আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে। বিধান তাঁরই এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

সূরা আল-আনকাবূত

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৬৯

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিতেছি।

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? (৩) আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে। (৪) যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ। (৫) যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহ্‌র সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

সওরী)

কোন কোন তফসীরকারক বলেন, গোনাহ্ মাত্রই পৃথিবীতে ফাসাদের শামিল। কারণ, গোনাহের কুফলস্বরূপ বিশ্বময় বরকত হ্রাস পায়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, যারা অহংকার, যুলুম অথবা গোনাহের ইচ্ছা করে, পরকালে তাদের অংশ নেই।

জ্ঞাতব্য : যে অহংকারে নিজেকে অপরের চাইতে বড় ও অপরকে হেয় করা উদ্দেশ্য থাকে, আলোচ্য আয়াতে সেই অহংকারের অবৈধতা ও কুফল বর্ণিত হয়েছে। নতুবা অপরের সাথে গর্ব উদ্দেশ্য না হলে নিজে ভাল পোষাক পরা, উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করা এবং সুন্দর বাসগৃহের ব্যবস্থা নিন্দনীয় নয়; যেমন সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে।

গোনাহের দৃঢ় সংকল্পও গোনাহ্ : আয়াতে ঔদ্ধত্য ও ফাসাদের ইচ্ছার কারণে পরকাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয় থেকে জানা গেল যে, কোন গোনাহের বদ্ধপরিকরতার পর্যায়ে দৃঢ় সংকল্পও গোনাহ্। (রূহুল মা'আনী) তবে পরে যদি আল্লাহ্‌র ভয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করে, তবে গোনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় সওয়াব লিখা হয়। পক্ষান্তরে যদি কোন ইচ্ছা-বহির্ভূত কারণে সে গোনাহ্ করতে সক্ষম না হয়; কিন্তু চেষ্টা ষোলআনাই করে, তবে গোনাহ্ না করলেও তার আমলনামায় গোনাহ্ লিখা হবে।—(গাযযালী)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ -এর সারমর্ম এই যে, পরকালীন মুক্তি ও সাফল্যের জন্যে দু'টি বিষয় জরুরী। এক ঔদ্ধত্য ও অনর্থ সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা এবং (দুই) তাকওয়া তথা সৎকর্ম সম্পাদন করা। এই দুটি বিষয় থেকে বিরত থাকা যথেষ্ট নয়; বরং যেসব ফরয ও ওয়াজিব কর্ম রয়েছে, সেগুলো সম্পাদন করাও পরকালীন মুক্তির জন্য শর্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ —সূরার উপসংহারে এসব আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে এবং রেসালতের কর্তব্য পালনে অবিচল থাকার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্ক এই যে, এই সূরায় আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)-এর বিস্তারিত কাহিনী তথা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শত্রুতা, তার ভয় এবং পরিশেষে স্বীয় কৃপায় তাঁকে ফেরাউন ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী করার কথা আলোচনা করেছেন। অতএব সূরার শেষভাগে শেষ নবী রসূল (সাঃ)-এর এমনি ধরনের অবস্থার সার-সংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার কাফেররা তাঁকে বিব্রত করেছে, তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে এবং মক্কায় মুসলমানদের জীবন দুঃসহ করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাঁর চিরন্তন রীতি অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সবার উপর প্রকাশ্য বিজয় ও প্রাধান্য দান করেছেন এবং যে মক্কা থেকে কাফেররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল, সেই মক্কায় পুনরায় তাঁর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ -অর্থাৎ, যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয করেছেন তথা তিলাওয়াত, প্রচার ও মেনে চলা ফরয করেছেন, তিনি পুনরায় আপনাকে 'মা'আদে' ফিরিয়ে নেবেন। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে 'মাআদ' বলে মক্কা মোকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদিও কিছুদিনের জন্যে আপনাকে প্রিয় জন্মভূমি

বিশেষতঃ হরম ও বায়তুল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করতে হয়েছে, কিন্তু যিনি কোরআন নাযিল করেছেন এবং তা মেনে চলা ফরয করেছেন, তিনি অবশেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হিজরতের সময় রাত্রিবেলায় সওর গিরিগুহা থেকে বের হন এবং মক্কা থেকে মদীনাগামী প্রচলিত পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে সফর করেন। কারণ, শত্রুপক্ষ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিল। যখন তিনি মদীনার পথের প্রসিদ্ধ মনযিল রাবেগের নিকটবর্তী জোহ্‌ফা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন মক্কার পথ দৃষ্টিগোচর হল এবং বায়তুল্লাহ্ ও স্বদেশের স্মৃতি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখনই জিবরাঈল (আঃ) এই আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। এই আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, জন্মভূমি মক্কা থেকে আপনার এই বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী। পরিশেষে আপনাকে পুনরায় মক্কায় পৌছে দেয়া হবে। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ। এ কারণেই ইবনে-আব্বাসের এক রেওয়েতে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত জোহ্‌ফায় অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় মক্কীও নয়, মদনীওনয়।—কুরতুবী

কোরআন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় ঃ আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বিজয়ী বেশে পুনরায় মক্কা প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ এক হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয করেছেন, তিনি আপনাকে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়দান করে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন তেলাওয়াত ও কোরআনের নির্দেশ পালন করাই এই সাহায্য ও প্রকাশ্য বিজয়ের কারণ হবে।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ -এখানে وَجْهَهُ বলে আল্লাহ্ তাআলার সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। কোন কোন তফসীরকার বলেন, وَجْهَهُ বলে এমন আমল বোঝানো হয়েছে, যা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্যে করা হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে আমল আল্লাহ্‌র জন্য খাঁটিভাবে করা হয়, তাই অবশিষ্ট থাকবে— এছাড়া সব ধ্বংসশীল।

সূরা আল-কাসাস সমাপ্ত

সূরা আল আনকাবূত

وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ – يُفْتَنُونَ শব্দটি فِتْنَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরীক্ষা। ঈমানদার বিশেষতঃ পয়গম্বরগণকে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাঁদেরই হাতে এসেছে। এসব পরীক্ষা কোন সময় কাফের ও পাপাচারীদের শত্রুতা এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে; যেমন অধিকাংশ পয়গম্বর, শেষনবী মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলী এ ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। কোন সময় এই পরীক্ষা রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য কষ্টের মাধ্যমে হয়েছে। যেমন হযরত আইয়্যুব (আঃ)-এর হয়েছিল। কারও কারও বেলায় সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে দেয়া হয়েছে।

রেওয়ায়েতদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযূল সেসব সাহাবী, যাঁরা মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যাপক। সর্বকালের আলেম, সৎকর্মপরায়ণ ও ওলীগণ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং হতে থাকবেন।— (কুরতুবী)

فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا — অর্থাৎ, এসব পরীক্ষা বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা খাঁটি-অখাঁটি এবং সৎ ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা, খাঁটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতিসাধিত হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সৎ, অসৎ এবং খাঁটি-অখাঁটি পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তাআলার তো প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই জানা রয়েছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও প্রকাশ করে দেবেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব সাহেব (রহঃ) থেকে এর আরও একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সাধারণ মানুষ খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্য সম্পর্কে যে পদ্ধতিতে জ্ঞানলাভ করে, কোরআনে মাঝে মাঝে সেই পদ্ধতিতেও আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমেই এতদুভয়ের পার্থক্য জানে। তাই তাদের রুচি অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার মাধ্যমে আমি জেনে ছাড়ব কে খাঁটি এবং কে খাঁটি নয়। অথচ অনাদিকাল থেকেই এসব বিষয় আল্লাহ্ তাআলার জানা আছে।

وَمَنْ جٰهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۚ وَاِنْ جٰهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ۭ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۭ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ۭ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۭ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۡ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

(৬) যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যেই কষ্ট স্বীকার করে। আল্লাহ্ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া। (৭) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব। (৮) আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব যা কিছু তোমরা করতে (৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকাজ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করব। (১০) কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি ; কিন্তু আল্লাহ্র পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্র আযাবের মত মনে করে। যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আসে তখন তারা বলতে থাকে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম।' বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ্ কি তা সম্যক অবগত নন? (১১) আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন যারা মুনাফেক। (১২) কাফেররা মুমিনদেরকে বলে, 'আমাদের পথ অনুসরণ কর। আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব। অথচ তারা পাপভার কিছুতেই বহন করবে না। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী (১৩) তারা নিজেদের পাপভার এবং তার সাথে আরও কিছু পাপভার বহন করবে। অবশ্য তারা যেসব মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করে, সে সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ —'হিতাকাঙ্ক্ষা' ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অপরকে কোন কাজ করতে বলাকে وصيت বলা হয়।— (মাযহারী)

بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا — حسن শব্দটি ধাতু। এর অর্থ সৌন্দর্য। এখানে সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যবহারকে অতিশয়ার্থে حسن বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

وَاِنْ جٰهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ — অর্থাৎ, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর অবাধ্যতা না হয়, সেই সীমা পর্যন্ত পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি সন্তানকে কুফর ও শেরক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না; যেমন হাদীসে আছে, لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق অর্থাৎ,আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে কোন মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়।

আলোচ্য আয়াত হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি দশ জন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবিগণের অন্যতম ছিলেন এবং অত্যধিক পরিমাণে মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁর মাতা হেমনা বিনতে আবু সুফিয়ান পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করল, আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহন্তা রূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও।— (মুসলিম ও তিরমিযী) এই আয়াত হযরত সা'দকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল।

বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সা'দের জননী একদিন একরাত মতান্তরে তিন দিন তিন রাত শপথ অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে হযরত সা'দ উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল; কিন্তু আল্লাহ্র ফরমানের মোকাবেলায় তা ছিল তুচ্ছ। তাই জননীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন ঃ আম্মাজান, যদি আপনার দেহে একশ' আত্মা থাকত, এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন। আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তাঁর মাতা অনশন ভঙ্গ করল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেরদের পক্ষ থেকে ইসলামের পথ রুদ্ধ করার এবং মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কখনও শক্তি ও অর্থ প্রদর্শন করে এবং কখনও সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে মুসলমানগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তাদের এমন একটি অপকৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, কাফেররা মুসলমানগণকে বলত, তোমরা অহেতুক পরকালে শাস্তির ভয়ে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে পরকালে শাস্তি পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শাস্তি হবে, আমাদেরই হবে। তোমাদের গায়ে আঁচও লাগবে না।

এমনি ধরনের এক ব্যক্তির ঘটনা সূরা নজমের শেষ রুকূতে উল্লেখ

العنكبوت ٢٩ ٣٩٩ امن خلق ٢٠

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ
إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾
وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا
عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن
قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾
أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾
يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾

(১৪) আমি নূহ (আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তাদেরকে মহাপ্লাবন গ্রাস করেছিল। তারা ছিল পাপী। (১৫) অতঃপর আমি তাঁকে ও নৌকারোহীগণকে রক্ষা করলাম এবং নৌকাকে নিদর্শন করলাম বিশ্ববাসীর জন্যে। (১৬) স্মরণ কর ইবরাহীমকে। যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন; তোমরা আল্লাহ্র এবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বোঝ। (১৭) তোমরা তো আল্লাহ্র পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের এবাদত করছ, তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহ্র কাছে রিযিক তালাশ কর, তাঁর এবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (১৮) তোমরা যদি মিথ্যাবাদী বল, তবে তোমাদের পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যাবাদী বলেছে। স্পষ্টভাবে পয়গাম পৌঁছে দেয়াই তো রসূলের দায়িত্ব। (১৯) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টিকর্ম শুরু করেন অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন? এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ। (২০) বলুন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন।' অতঃপর আল্লাহ্ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম। (২১) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করেন। তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

করা হয়েছে। বলা হয়েছে, أَفَرَءَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ এতে উল্লেখিত আছে যে, **জনৈক ব্যক্তিকে** তার কাফের **সঙ্গীরা এ বলে** প্রতারিত করল যে, তুমি আমাদেরকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমরা কেয়ামতের দিন তোমার আযাব নিজেরা ভোগ করে তোমাকে বাঁচিয়ে দেব। সে কিছু অর্থ-কড়ি দেয়া শুরু করেও তা বন্ধ করে দিল। তার নির্বুদ্ধিতা ও বাজে কাজ সূরা নজমে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ মুসলমানগণের সাথে কাফেরদের এমনি ধরনের একটি উক্তি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। **আল্লাহ্ তাআলা এর জওয়াবে বলেছেন,** যারা এরূপ বলে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ অর্থাৎ, কেয়ামতের ভয়াবহ আযাব দেখে তারা তাদের পাপভার বহন করতে সাহসী হবে না। কাজেই তাদের এই ওয়াদা মিথ্যা। সূরা নজমে আরও বলা হয়েছে যে, তারা যদি কিছু পাপভার বহন করতে প্রস্তুতও হয়, তবুও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরকে এই ক্ষমতা দেয়া হবে না। কেননা, একজনের পাপে অন্যজনকে পাকড়াও করা ন্যায়-নীতির পরিপন্থী।

দ্বিতীয়তঃ বলা হয়েছে যে, তোমাদের পাপভার বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে— একথা তো ভ্রান্ত ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা স্বয়ং একটি বড় পাপ। এই পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদের বিভ্রান্ত করেছিল, তাদের পাপভারও এক সাথে বহন করবে।

যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয়, সে-ও পাপী; আসল পাপীর যে শাস্তি হবে, তার প্রাপ্যও তাই : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিপ্ত করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য করে, সে-ও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী। হযরত আবু হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সৎকর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের কারণে সৎকর্ম করবে, তাদের সবার কর্মের সওয়াব দাওয়াতদাতার আমলনামায়ও লেখা হবে এবং সৎকর্মীদের সওয়াব মোটেই হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা ও পাপ কাজের প্রতি দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের ফলে এই পাপ কাজে লিপ্ত হবে, তাদের সবার পাপভার এই দাওয়াতদাতার ঘাড়েও চাপবে এবং আসল পাপীদের পাপ মোটেই হ্রাস করা হবে না।— (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের বিরোধিতা ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপন্থীদের উপর কাফেরদের তরফ থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব-উৎপীড়নের কারণে তাঁরা কোন সময় সাহস হারাননি। তাই আপনিও কাফেরদের উৎপীড়নের পরওয়া করবেন না এবং রেসালতের কর্তব্য পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকুন।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আঃ)-এর কাহিনী

وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۖ وَمَا
لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ
إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم
مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ
وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم
مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ۘ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ
إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

(২২) তোমরা স্থলে ও অন্তরীক্ষে আল্লাহ্‌কে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন হিতাকাঙ্ক্ষী নেই, সাহায্যকারীও নেই। (২৩) যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ ও তাঁর সাক্ষাত অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে এবং তাদের জন্যেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (২৪) তখন ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এছাড়া কোন জওয়াব ছিল না যে, তারা বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৫) ইবরাহীম বললেন, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা রক্ষার জন্যে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। এরপর কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লানত করবে। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২৬) অতঃপর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন লূত। ইবরাহীম বললেন, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশে দেশত্যাগ করছি। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৭) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, তাঁর বংশধরদের মধ্যে নবুওয়ত ও কিতাব রাখলাম এবং দুনিয়াতে তাঁকে পুরস্কৃত করলাম। নিশ্চয় পরকালেও সে সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (২৮) আর প্রেরণ করেছি লূতকে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি।

উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমতঃ এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম পয়গম্বর, যিনি কুফর ও শেরকের মোকাবেলা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর সম্প্রদায়ের তরফ থেকে তিনি যতটুকু নির্যাতিত হয়েছিলেন, অন্য কোন পয়গম্বর ততটুকু হননি। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবন কাফেরদের নিপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত হয়। কোরআনে বর্ণিত তাঁর বয়স সাড়ে নয়শ' বছর তো অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা তাঁর প্রচার ও দাওয়াতের বয়স। এর আগে এবং প্লাবনের পরেও তাঁর আরও বয়স আছে।

মোটকথা, এই অসাধারণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তবলীগে ব্যয় করা এবং প্রতিক্ষেত্রেই কাফেরদের তরফ থেকে নানারকম উৎপীড়ন ও মারপিট সহ্য করা সত্ত্বেও কোন সময় সাহস না হারানো— এগুলো সব নূহ (আঃ)–এরই বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় কাহিনী হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমরূদের অগ্নি, অতঃপর শাম থেকে হিজরত করে এক তরুলতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান, আদরের দুলালকে যবেহ্ করার ঘটনা ইত্যাদি। হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত লূত (আঃ) ও তাঁর উম্মতের ঘটনাবলী এবং সূরার শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা এগুলো সব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও উম্মতে মুহাম্মদীর সান্ত্বনার জন্যে এবং তাদেরকে ধর্মের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্যে বর্ণিত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي — হযরত লূত (আঃ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর ভাগ্নেয়। নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে ইবরাহীম (আঃ)–এর মু'জেযা দেখে সর্বপ্রথম তিনি মুসলমান হন। তিনি এবং তাঁর পত্নী সারা, যিনি চাচাত বোনও ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, দেশত্যাগের সময় হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর সঙ্গী হন। কূফার একটি জনপদ কাওসা ছিল তাঁদের স্বদেশ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي অর্থাৎ, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশে দেশ–ত্যাগ করছি। উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন জায়গায় যাব, যেখানে পালনকর্তার এবাদতে কোন বাধা নেই।

হযরত নখয়ী ও কাতাদাহ বলেন, إِنِّي مُهَاجِرٌ হযরত ইবরাহীমের উক্তি। কেননা, এর পরবর্তী বাক্য وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ – তে নিশ্চিতরূপে তাঁরই অবস্থা। কোন কোন তফসীরকার إِنِّي مُهَاجِرٌ – কে হযরত লূত (আঃ)–এর উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে প্রথম তফসীরই উপযুক্ত। হযরত লূত (আঃ)–ও এই হিজরতে শরীক ছিলেন, কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর অধীন হওয়ার কারণে যেমন হযরত সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি হযরত লূত (আঃ)–এর হিজরতের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রথম পয়গম্বর, যাঁকে দ্বীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত করেন।— (কুরতুবী)

কোন কোন কর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও পাওয়া যায় ঃ

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۙ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾

(২৯) তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ? জওয়াবে তাঁর সম্প্রদায় কেবল একথা বলল, আমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৩০) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (৩১) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা জালেম। (৩২) সে বলল, এই জনপদে তো লূতও রয়েছে। তারা বলল, সেখানে কে আছে, তা আমরা ভাল জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করব তাঁর স্ত্রী ব্যতীত; সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (৩৩) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের কাছে আগমন করল, তখন তাদের কারণে সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল এবং তার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারা বলল, ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবই আপনার স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (৩৪) আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের উপর আকাশ থেকে আযাব নাজিল করব তাদের পাপাচারের কারণে। (৩৫) আমি বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি। (৩৬) আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোআয়বকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর, শেষ দিবসের আশা রাখ এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا অর্থাৎ, আমি ইবরাহীম (আঃ)–এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছি। তাঁকে মানবজাতির প্রিয় ও নেতা করেছি। ইহুদী, খ্রীষ্টান, প্রতিমাপূজারী সবাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও নিজদিগকে তাঁর অনুসৃত বলে স্বীকার করে। পরকালে তিনি সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ থেকে জানা গেল যে, কর্মের আসল প্রতিদান তো পরকালে পাওয়া যাবে, কিন্তু তার কিছু অংশ দুনিয়াতেও নগদ দেয়া হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে অনেক সৎকর্মের পার্থিব উপকারিতা ও অসৎকর্মের পার্থিব অনিষ্ট বর্ণিত হয়েছে।

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ – এখানে লূত (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের তিনটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম, পুংমৈথুন, দ্বিতীয়, রাহাজানি এবং তৃতীয়, মজলিসে সবার সামনে অপকর্ম করা। কোরআন পাক তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোন গোনাহ্ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গোনাহ। কোন কোন তফসীরকারক এ স্থলে সেসব গোনাহ্ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এই নির্লজ্জেরা তাদের প্রকাশ্য মজলিসে করত। উদাহরণতঃ পথিকদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দেয়া। উম্মে–হানী (রাঃ)–এর এক হাদীসে এসব অপকর্মের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অশ্লীল কাজটি তারা গোপনে নয়, প্রকাশ্য মজলিসের সবার সামনে করত।— (নাউযুবিল্লাহ্)

আয়াতে উল্লেখিত প্রথম গোনাহ্‌টিই সর্বাধিক মারাত্মক। তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এই অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে থাকে। এটা যে, ব্যভিচারের চাইতেও গুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ – থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চক্ষুষ্মানতা مستبصر এর অর্থ চক্ষুষ্মানত। উদ্দেশ্য এই যে, যারা কুফর ও শেরক করে করে আযাব ও ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তারা মোটেই বেওকুফ অথবা উন্মাদ ছিল না। বৈষয়িক কাজে অত্যন্ত চালাক ও হুশিয়ার ছিল। কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও চালাকী বস্তুজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তারা একথা বোঝেনি যে, সৎ ও অসতের পুরস্কার এবং শাস্তির কোন্ দিন আসা উচিত, যাতে পুরোপুরি সুবিচার হবে। কারণ দুনিয়াতে অধিকাংশ জালেম ও অপরাধী বুক ফুলিয়ে ঘুরাফেরা করে এবং মযলুম ও বিপদগ্রস্ত কোনঠাসা হয়ে থাকে। এই সুবিচারের দিনকে কেয়ামত ও পরকাল বলা হয়। এ ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ অকেজো।

সুরা রোমেও এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হবে। আয়াত ঃ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ অর্থাৎ, তারা জাগতিক কাজ কর্ম খুব বোঝে; কিন্তু পরকালের ব্যাপারে উদাসীন।

কোন কোন তফসীরবিদ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ বাক্যের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা পরকালেও বিশ্বাসী ছিল এবং সে তাঁকে সত্য মনে করত; কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে অস্বীকারে বাধ্য করে রেখেছিল।

وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ — মাকড়সাকে عنكبوت বলা হয়। মাকড়সা বিভিন্ন প্রকার আছে। কোন কোন মাকড়সা মাটিতে

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ
جٰثِمِيْنَ ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَّثَمُوْدَا۟ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ
وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ﴿٣٨﴾ وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَلَقَدْ
جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا
سٰبِقِيْنَ ﴿٣٩﴾ فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ
حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا
بِهِ الْاَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٠﴾ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا وَ
اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾
اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا
يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

(৩৭) কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৩৮) আমি আ'দ ও সামূদকে ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়ী-ঘর থেকেই তাদের অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল হুশিয়ার। (৩৯) আমি কারূন, ফেরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিল অতঃপর তারা দেশে দম্ভ করেছিল। কিন্তু তারা জিতে যায়নি। (৪০) আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি যুলুম করার ছিলেন না; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে। (৪১) যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ মাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল, যদি তারা জানত। (৪২) তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যা কিছুকে ডাকে, আল্লাহ্ তা জানেন। তিনি শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪৩) এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্যে দেই; কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বোঝে। (৪৪) আল্লাহ্ যথার্থরূপে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। এতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে।

বাসস্থান তৈরী করে। বাহ্যতঃ এখানে তা বোঝানো হয়নি। এখানে সে মাকড়সা বোঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরী করে এবং তাতে ঝুলতে থাকে। এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে। বলাবাহুল্য, জন্তু জানোয়ারের যত প্রকার বাসা ও ঘর বিদিত আছে, তন্মধ্যে মাকড়সার জালের তার দুর্বলতর। এই তার সামান্য বাতাসেও ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের এবাদত করে এবং অন্যের উপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জাল, যা অত্যন্ত দুর্বল। এমনিভাবে যারা কোন প্রতিমা অথবা কোন মানুষের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে।

মাসআলা ঃ মাকড়সাকে হত্যা করা এবং তার জাল পরিষ্কার করা সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন উক্তি আছে। কেউ কেউ এটা পছন্দ করেন না। কেননা, এই ক্ষুদ্র জন্তুটি হিজরতের সময় সওর গিরিগুহার মুখে জাল টেনে দেয়ার কারণে সম্মানের পাত্র হয়ে গেছে। খতীব হযরত আলী (রাঃ) থেকে একে হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সা'লাবী ও ইবনে আতিয়্যা হযরত আলী থেকেই বর্ণনা করেন যে, طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فان تركه يورث الفقر — অর্থাৎ মাকড়সার জাল থেকে তোমাদের গৃহ পরিষ্কার রাখ। গৃহে জাল রেখে দিলে দারিদ্র্য দেখা দেয়। উভয় রেওয়ায়েতের সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। তবে অন্যান্য হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের সমর্থন হয়, যাতে বলা হয়েছে যে, গৃহ ও গৃহের আঙিনা পরিষ্কার রাখ। — (রূহুল-মা'আনী)

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ

মাকড়সার জাল দ্বারা মুশরিকদের উপহাস্যদের দৃষ্টান্ত দেয়ার পর এখন বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা তওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও কেবল আলেমগণই জ্ঞান আহরণ করে। অন্যরা চিন্তা-ভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে ফোটে না।

আল্লাহ্‌র কাছে আলেম কে? ঃ ইমাম বগভী হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, সেই আলেম, যে আল্লাহ্‌র কালাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাঁর এবাদত পালন করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে।

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বোঝে নিলে কেউ আল্লাহ্‌র কাছে আলেম হয় না, যে পর্যন্ত কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কোরআন অনুযায়ী আমল না করে।

মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছ থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, এটা হযরত আমর ইবনে আসের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে তাদেরকেই আলেম বলেছেন, যারা আল্লাহ্ ও রসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বোঝে।

হযরত আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোন আয়াতে পৌছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ -

(ইবনে- কাসীর)

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۗ
اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۗ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا
بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا
بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ
وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۗ فَالَّذِيْنَ
اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ۗ وَ
مَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ
مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾
بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ۗ وَمَا يَجْحَدُ
بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ قُلْ
اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ
يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾

(৪৫) আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ্‌র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা কর। (৪৬) তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না, কিন্তু উত্তম পন্থায়; তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে বে-ইনসাফ। এবং বল, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ। (৪৭) এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি। অতঃপর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা একে মেনে চলে এবং এদেরও (মক্কাবাসীদেরও) কেউ কেউ এতে বিশ্বাস রাখে। কেবল কাফেররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (৪৮) আপনি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কিতাব লিখেননি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত। (৪৯) বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে ইহা (কোরআন) তো স্পষ্ট আয়াত। কেবল বে-ইনসাফরাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (৫০) তারা বলে, তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। (৫১) এটা কি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী লোকদের জন্যে রহমত ও উপদেশ আছে। (৫২) বলুন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ই সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। তিনি জানেন যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে আছে। আর যারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের আলোচনা ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান উদ্ধত কাফের এবং তাদের উপর বিভিন্ন রকম আযাবের বর্ণনা ছিল। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুমিনদের জন্যে সান্ত্বনাও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ বিরোধীদলের কেমন নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং এ বিষয়ের শিক্ষাও রয়েছে যে, তবলীগ ও দাওয়াতের কাজে কোন অবস্থাতেই সাহস হারানো উচিত না।

মানব সংশোধনের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র ঃ আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দাওয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র বলে দেয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থাপত্র পালন করলে পূর্ণ ধর্ম পালন করার পথ সুগম হয়ে যায় এবং এই পথে অভ্যাসগতভাবে যত বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়, সব দূর হয়ে যায়। এই অমোঘ ব্যবস্থাপত্রের দু'টি অংশ আছে, কোরআন তেলাওয়াত ও নামায কায়েম করা উম্মতকে উভয় বিষয়ের অনুবর্তী করাই এখানে আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু উৎসাহ ও জোর দানের জন্যে উভয় বিষয়ের নির্দেশ প্রথমতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেয়া হয়েছে, যাতে উম্মতের আগ্রহ বাড়ে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কার্যগত শিক্ষার ফলে তাদের পক্ষে আমল করা সহজ হয়ে যায়।

তন্মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত তো সব কাজের প্রাণ ও আসল ভিত্তি। এরপর নামাযকে অন্যান্য ফরয কর্ম থেকে পৃথক করে বর্ণনা করার এই রহস্যও বর্ণিত হয়েছে যে, নামায স্বকীয়ভাবেও একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এবং ধর্মের স্তম্ভ। এর উপকারিতা এই যে, যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে, নামায তাকে অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আয়াতে ব্যবহৃত فحشاء শব্দের অর্থ এমন সুস্পষ্ট মন্দ কাজ, যাকে মুমিন কাফের নির্বিশেষে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দ মনে করে; যেমন ব্যভিচার, অন্যায় হত্যা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে منكر এমন কথা ও কাজকে বলা হয়, যার হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়ত বিশারদগণ একমত। কাজেই ফিকাহ্‌বিদগণের ইজতিহাদী মতবিরোধের ব্যাপারে কোন এক দিককে منكر বলা যায় না। فحشاء ও منكر শব্দদ্বয়ের মধ্যে যাবতীয় অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ্ দাখিল হয়ে গেছে। যেগুলো স্বয়ং নিঃসন্দেহরূপে মন্দ এবং সৎকর্মের পথে সর্ববৃহৎ বাধা।

নামায যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, এর অর্থ ঃ একাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীসদৃষ্টে অর্থ এই যে, নামাযের মধ্যে বিশেষ একটি প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে। যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে, সে গোনাহ্ থেকে মুক্ত থাকে, তবে শর্ত এই যে, শুধু নামায পড়লে চলবে না; বরং কোরআনের ভাষা অনুযায়ী اقامت صلوٰة হতে হবে। اقامت এর শাব্দিক অর্থ সোজা খাড়া করা। যাতে কোন একদিকে ঝুঁকে না থাকে। তাই اقامت صلوٰة এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেভাবে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রীতিনীতি পালন সহকারে নামায আদায় করেছেন এবং সারা জীবন মৌখিক শিক্ষাও দান করেছেন, ঠিক সেভাবে নামায আদায় করা। অর্থাৎ, শরীর, পরিধানবস্ত্র নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া, নিয়মিত জমাআতে নামায পড়া এবং নামাযের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সুন্নত অনুযায়ী সম্পাদন করা। এগুলো প্রকাশ্য রীতিনীতি। অপ্রকাশ্য রীতিনীতি এই যে, আল্লাহ্‌র সামনে এমনভাবে বিনয়াবনত ও একাগ্রতা সহকারে দাঁড়ানো যেন

তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি এভাবে নামায কায়েম করে, সে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনা-আপনি সৎকর্মের তওফীক প্রাপ্ত হয় এবং যাবতীয় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার তওফীকও। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামায পড়া সত্ত্বেও গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে না, বুঝতে হবে যে, তার নামাযের মধ্যেই ত্রুটি বিদ্যমান। ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ এই আয়াতের অর্থ কি? তিনি বললেন, من لم تنهه صلٰوته عن الفحشاء والمنكر فلاصلٰوة له অর্থাৎ, যে ব্যক্তিকে তার নামায অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে না, তার নামায কিছুই নয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-মাসউদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার নামাযের আনুগত্য করে না, তার নামায কিছুই নয়। বলাবাহুল্য, অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত থাকাই নামাযের আনুগত্য।

হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, যার নামায তাকে সৎকর্ম সম্পাদন করতে এবং অসৎকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ না করে, তার নামায তাকে আল্লাহ্ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।

ইবনে কাসীর উপরোক্ত তিনটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন, এগুলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি নয়; বরং ইমরান ইবনে হুসাইন, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে তাঁরা এসব উক্তি করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল, অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সকাল হলে চুরি করে। তিনি বললেন, সত্বরই নামায তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে।— (ইবনে-কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই কথার পর সেই ব্যক্তি চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং তওবা করে নেয়।

একটি সন্দেহের জওয়াব ঃ এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, অনেক মানুষকে নামাযের অনুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় গোনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয় কি?

এর জওয়াবে কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত থেকে এতটুকু জানা যায় যে, নামায নামাযীকে গোনাহ করতে বাধা প্রদান করে; কিন্তু কাউকে কোন কাজ করতে বাধা প্রদান করলে সে তা থেকে বিরতও হবে, এটা জরুরী নয়। কোরআন হাদীসও তো সব মানুষকে গোনাহ করতে নিষেধ করে। কিন্তু অনেক মানুষ এই নিষেধের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই গোনাহ্ করতে থাকে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই অবলম্বন করা হয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন, নামাযের নিষেধ করার অর্থ শুধু আদেশ প্রদান করা নয়; বরং নামাযের মধ্যে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে যে, যে ব্যক্তি নামায পড়ে, সে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তওফীক প্রাপ্ত হয়। যার এরূপ তওফীক হয় না, চিন্তা করলে প্রমাণিত হবে যে, তার নামাযে কোন ত্রুটি রয়েছে এবং সে নামায কায়েম করার যথার্থ হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বোক্ত হাদীস থেকে এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়।

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ — অর্থাৎ, আল্লাহ্র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তোমাদের সব ক্রিয়াকর্ম জানেন। এখানে 'আল্লাহ্র স্মরণ'-এর এক অর্থ এই যে, বান্দা নামাযে অথবা নামাযের বাইরে আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তা সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় অর্থ এইরূপও হতে পারে যে, বান্দা যখন আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ্ ওয়াদা অনুযায়ী স্মরণকারী বান্দাকে ফেরেশতাদের সমাবেশেও স্মরণ করেন।

(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) আল্লাহ্র এই স্মরণ এবাদতকারী বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এ স্থলে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এই দ্বিতীয় অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে-জরীর ও ইবনে-কাসীর একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে এতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, নামায পড়ার মধ্যে গোনাহ থেকে মুক্তির আসল কারণ হল আল্লাহ্ স্বয়ং নামাযীর দিকে অভিনিবেশ করেন এবং ফেরেশতাদের সমাবেশে তাকে স্মরণ করেন। এর কল্যাণেই সে গোনাহ থেকে মুক্তি পায়।

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتٰبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا

— অর্থাৎ, কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক কর। উদাহরণতঃ কঠোর কথাবার্তার জওয়াব নম্র ভাষায়, ক্রোধের জওয়াব সহনশীলতার সাথে এবং মূর্খতাসুলভ হট্টগোলের জওয়াব গাম্ভীর্যপূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে দাও।

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا — কিন্তু যারা তোমাদের প্রতি জুলুম করে — তোমাদের গাম্ভীর্যপূর্ণ নম্র কথাবার্তা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মোকাবেলায় জেদ ও হঠকারিতা করে, তারা এই অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র নয়। তাদেরকে কঠোর ভাষায় জওয়াব দেয়া জায়েয, যদিও তখনও তাদের অসদাচরণের জওয়াবে অসদাচরণ না করা এবং যুলুমের জওয়াবে যুলুম না করাই শ্রেয়; যেমন কোরআনের অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ — অর্থাৎ, তোমরা যদি তাদের কাছ থেকে অন্যায় ও অবিচারের সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এরূপ করার অধিকার তোমাদের আছে, কিন্তু যদি সবর কর তবে এটা অধিক শ্রেয়ঃ।

আলোচ্য আয়াতে কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা নহ্লে মুশরিকদের সাথেও তর্কের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ আছে। এখানে বিশেষভাবে কিতাবধারীদের কথা বলার কারণ পরবর্তী একটি বাক্য, যাতে বলা হয়েছে— আমাদের ও তোমাদের ধর্মে অনেক বিষয় অভিন্ন। তোমরা চিন্তা করলে ইসলাম গ্রহণ করার পথে কোন অন্তরায় থাকা উচিত নয়। এরশাদ হয়েছে وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ অর্থাৎ, কিতাবধারীদের সাথে তর্ক বিতর্ক করার সময় তাদেরকে নিকটে আনার জন্যে তোমরা একথা বল যে, আমরা মুসলমানগণ সেই ওহীতেই বিশ্বাস করি, যা আমাদের পয়গম্বরের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং সেই ওহীতেও বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গম্বরের মধ্যস্থতায় প্রেরিত হয়েছে। কাজেই আমাদের সহিত বিরোধিতার কোন কারণ নেই।

আয়াতে বর্তমান তওরাত ও ইন্জীলের বিষয়বস্তু সত্যায়নের নির্দেশ আছে কি? এই আয়াতে কিতাবধারীদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও ইন্জীলের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস স্থাপনের কথা এভাবে বলা হয়েছে, আমরা এসব কিতাবের প্রতি এই অর্থে সংক্ষিপ্ত ঈমান রাখি যে, আল্লাহ্

তা'আলা এইসব কিতাবে যা কিছু নাযিল করেছেন, তাতে আমরা বিশ্বাস করি। এতে একথা জরুরী হয় না যে, বর্তমান তওরাত ও ইন্জীলের সব বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের ঈমান আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলেও এসব কিতাবে অসংখ্য পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে, মুসলমানদের ঈমান শুধু সেসব বিষয়বস্তুর প্রতি। যেগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল পরবর্তী বিষয়বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

বর্তমান তওরাত ও ইনজীলকে সত্যও বলতে নাই এবং মিথ্যাও বলতে নেই ঃ সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, কিতাবধারীরা তাদের তওরাত ও ইন্জীল আসল হিব্রু ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলমানদেরকে আরবী অনুবাদ শোনাত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা কিতাবধারীদেরকে সত্যবাদী বলো না এবং মিথ্যাবাদীও বলো না; বরং একথা বল اٰمَنَّا بِالَّذِیْٓ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَاُنْزِلَ اِلَیْکُمْ অর্থাৎ, আমরা সংক্ষেপে সেই ওহীতে বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা যেসব বিবরণ দাও, সেগুলো আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য নয়। তাই আমরা এর সত্যায়ন কিংবা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকি।

তফসীর গ্রন্থসমূহে তফসীরকারগণ কিতাবীদের যেসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলোরও অবস্থা তদ্রূপ। সেগুলো উদ্ধৃত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐতিহাসিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা। কোন কিছুর বৈধতা ও অবৈধতা এসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ করা যায় না।

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ

الْمُبْطِلُوْنَ অর্থাৎ, আপনি কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করতেন না এবং কোন কিতাব লিখতেও পারতেন না; বরং আপনি ছিলেন নিরক্ষর। যদি আপনি লেখাপড়া জানতেন, তবে মিথ্যাবাদীদের জন্যে অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকত যে, আপনি পূর্ববর্তী তওরাত ও ইন্জীল পাঠ করেছেন কিংবা উদ্ধৃত করেছেন এবং কোরআন যা কিছু বলে, তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরই উদ্ধৃতি মাত্র, কোন নতুন বিষয়বস্তুর নয়।

নিরক্ষর হওয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি বড় মু'জেযা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত সপ্রমাণ করার জন্যে যেসব সুস্পষ্ট মু'জেযা প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে তাঁকে পূর্ব থেকে নিরক্ষর রাখাও অন্যতম। তিনি লিখিত কোন কিছু পাঠ করতে পারতেন না এবং নিজে কিছু লিখতেও সক্ষম ছিলেন না। এই অবস্থায়ই জীবনের চল্লিশটি বছর তিনি মক্কাবাসীদের সামনে অতিবাহিত করেন। তিনি কোন কিতাবধারীদের সাথে মেলামেশা করেননি যে, তাদের কাছ থেকে কিছু শুনে নেবেন। কারণ, মক্কায় কোন কিতাবধারী বাস করত না। চল্লিশ বছর পূর্তির পর হঠাৎ তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন কালাম উচ্চারিত হতে থাকে যা বিষয়বস্তু ও অর্থের দিক দিয়ে ছিল মু'জেযা, তেমনি শাব্দিক বিশুদ্ধতা ও ভাষালঙ্কারের দিক দিয়েও ছিল অতুলনীয়।

কোন কোন আলেম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি প্রথমদিকে নিরক্ষর ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেন। প্রমাণ হিসেবে তারা হুদায়বিয়া ঘটনার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন যাতে বলা হয়েছে, সন্ধিপত্র লেখা হলে তাতে প্রথমে من محمد عبد الله ورسوله লিখিত ছিল। এতে মুশরিকরা আপত্তি তুলল যে, আমরা আপনাকে রসূল মেনে নিলে এই ঝগড়া কিসের? তাই আপনার নামের সাথে 'রসূলুল্লাহ্' শব্দটি আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। লেখক ছিলেন হযরত আলী মুর্তাযা (রাঃ)। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে শব্দটি মিটিয়ে দিতে বললেন। তিনি আদবের খাতিরে এরূপ করতে অস্বীকৃত হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে কাগজটি হাতে নিয়ে শব্দটি মিটিয়ে দিলেন এবং তদস্থলে من محمد عبد الله লিখে দিলেন।

এই রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে লিখে দিয়েছেন বলা হয়েছে। এ থেকে তাঁরা বোঝে নিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লেখা জানতেন। কিন্তু সত্য এই যে, সাধারণ পরিভাষায় অপরের দ্বারা লেখানোকেও 'সে লিখেছে' বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, এই ঘটনায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মু'জেযা হিসেবে তিনি নিজের নামও লিখে ফেলেছেন। এতদ্ব্যতীত নামের কয়েকটি অক্ষর লিখে দিলেই কেউ নিরক্ষতার সীমা পেরিয়ে যায় না। লেখার অভ্যাস গড়ে না উঠা পর্যন্ত তাকে অক্ষরজ্ঞানহীন ও নিরক্ষরই বলা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লেখা জানতেন— বিনা প্রমাণে এরূপ বললে তাঁর কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না; বরং চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিরক্ষর হওয়ার মধ্যেই তাঁর বড় শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ
وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَ
إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِالْكَٰفِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشَىٰهُمُ الْعَذَابُ مِن
فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾
يَٰعِبَادِىَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ أَرْضِى وَٰسِعَةٌ فَإِيَّٰىَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾
كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا۟
وَعَمِلُوا۟ الصَّٰلِحَٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِن
تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعَٰمِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ
صَبَرُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ
رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَئِن
سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ
مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِن
سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ
مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

(৫৩) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি আযাবের সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে আযাব তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই আকস্মিকভাবে তাদের কাছে আযাব এসে যাবে, তাদের খবরও থাকবে না। (৫৪) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে; অথচ জাহান্নাম কাফেরদেরকে ঘেরাও করছে। (৫৫) যেদিন আযাব তাদেরকে ঘেরাও করবে মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা যা করতে, তার স্বাদ গ্রহণ কর। (৫৬) হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব তোমরা আমারই এবাদত কর। (৫৭) জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৫৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কত উত্তম পুরস্কার কর্মীদের। (৫৯) যারা সবর করে এবং তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। (৬০) এমন অনেক জন্তু আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। আল্লাহ্ই রিযিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬১) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ্'। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? (৬২) আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা হ্রাস করেন। নিশ্চয়, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (৬৩) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

০ সূরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানগণের প্রতি কাফেরদের শত্রুতা, তওহীদ ও রেসালত অস্বীকার এবং সত্য ও সত্যপন্থীদের পথে নানারকম বাধা-বিঘ্ন বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানগণের জন্যে কাফেরদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, সত্য প্রচার করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এই কৌশলের নাম 'হিজরত' তথা দেশত্যাগ। অর্থাৎ, যে দেশে সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য করা হয়, সেই দেশ পরিত্যাগ করা।

হিজরতের বিধি-বিধান ও এ সম্পর্কিত সন্দেহের নিরসন ঃ إِنَّ أَرْضِى وَٰسِعَةٌ فَإِيَّٰىَ فَاعْبُدُونِ আল্লাহ্ বলেছেন, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। কাজেই কারও এই ওযর গ্রহণ করা হবে না যে, অমুক শহরে অথবা অমুক দেশে কাফেররা প্রবল ছিল বিধায় আমরা তওহীদ ও এবাদত পালনে অপারগ ছিলাম। তাদের উচিত, যে দেশে কুফর ও অবাধ্যতা করতে বাধ্য করা হয়, আল্লাহ্র জন্যে সেই দেশত্যাগ করা এবং এমন কোন স্থান তালাশ করা, যেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী নিজেরাও পালন করতে পারে এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে। একেই হিজরত বলা হয়।

স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার মধ্যে মানুষ স্বভাবতঃ দুই প্রকার আশংকা ও বাধার সম্মুখীন হয়। (এক) নিজের প্রাণের আশংকা যে, স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হলে পথিমধ্যে স্থানীয় কাফেররা বাধা দেবে এবং যুদ্ধ করতে উদ্যত হবে। এ ছাড়া অন্য কাফেরদের সাথেও প্রাণঘাতী সংঘর্ষের আশংকা বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী আয়াতে এই আশংকার জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ, জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেউ কোথাও কোন অবস্থাতেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। কাজেই মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হওয়া মুমিনের কাজ হতে পারে না। হেফাযতের যত ব্যবস্থাই সম্পন্ন করা হোক না কেন, মৃত্যু সর্বাবস্থায় আগমন করবে। মুমিনের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ্র নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসতে পারে না। তাই স্বস্থানে থাকা অথবা হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়ার মধ্যে মৃত্যুর ভয় অন্তরায় না হওয়া উচিত। বিশেষতঃ আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পালন করা অবস্থায় মৃত্যু আসা চিরস্থায়ী সুখ ও নেয়ামতের কারণ। পরকালে এই সুখ ও নেয়ামত পাওয়া যাবে। পরবর্তী দুই আয়াতে এর উল্লেখ আছে وَالَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ الصَّٰلِحَٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا .... – হিজরতের পথে দ্বিতীয় আশংকা এই যে, অন্য দেশে যাওয়ার পর রুযী রোজগারের কি ব্যবস্থা হবে? জন্মস্থানে তো মানুষ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, কিছু নিজের উপার্জন দ্বারা বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে। হিজরতের সময় এগুলো সব এখানে থেকে যাবে। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে জীবননির্বাহ কিরূপে হবে? পরের আয়াতত্রয়ে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, অর্জিত আসবাবপত্রকে রিযিকের যথেষ্ট কারণ মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলাই রিযিক দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে বাহ্যিক আয়োজন ছাড়াও রিযিকদান করেন এবং ইচ্ছা না করলে সব আয়োজন সত্ত্বেও মানুষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। প্রমাণস্বরূপ প্রথম বলা হয়েছে, وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ অর্থাৎ, চিন্তা

কর, পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন হাজারো জীব-জন্তু আছে যারা খাদ্য সঞ্চয় করার কোন ব্যবস্থা করে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা নিজ কৃপায় প্রত্যহ তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন। পণ্ডিতগণ বলেন, সাধারণ জীব-জন্তু এরূপই। কেবল পিপীলিকা ও ইঁদুর তাদের খাদ্য গর্তে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে। পিপীলিকা শীতকালে বাইরে আসে না। তাই গ্রীষ্মকালে গর্তে খাদ্য সঞ্চয়ের জন্যে চেষ্টা করে। জনশ্রুতি এই যে, পক্ষীকুলের মধ্যে কাকও তার খাদ্য বাসায় সঞ্চিত রাখে, কিন্তু রাখার পর বেমালুম ভুলে যায়। মোটকথা, পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত প্রকার জীব-জন্তুর মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই যে, তারা খাদ্য সংগ্রহ করার পর আগামীকালের জন্যে তা সঞ্চিত রাখে না এবং এর প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও তাদের নেই। হাদীসে আছে, পক্ষীকুল সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে। তাদের না আছে ক্ষেত-খলা, না আছে জমি ও বিষয়-সম্পত্তি। তারা কোন কারখানা অথবা অফিসের কর্মচারীও নয়। তারা আল্লাহ্ তাআলার উন্মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং পেটচুক্তি খাদ্যলাভ করে। এটা একদিনের ব্যাপার নয়— বরং তাদের আজীবন কর্মধারা।

রিযিকের আসল উপায় আল্লাহ্র দান, পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, স্বয়ং কাফেরদের জিজ্ঞেস করুন, কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে? চন্দ্র-সূর্য কার আজ্ঞাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। বৃষ্টি কে বর্ষণ করে? বৃষ্টি দ্বারা মাটি থেকে উদ্ভিদ কে উৎপন্ন করে? এসব প্রশ্নের জওয়াবে মুশরিকরাও স্বীকার করবে যে, এসব আল্লাহ্রই কাজ। আপনি বলুন, তা হলে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরের পূজাপাট ও অপরকে অভিভাবক কিরূপে মনে কর?

মোটকথা, হিজরতের পথে দ্বিতীয় বাধা ছিল জীবিকার চিন্তা। এটাও মানুষের ভুল। জীবিকা সরবরাহ করা মানুষের অথবা তার উপার্জিত সাজ-সরঞ্জামের আয়ত্তাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্র দান। তিনিই এ দেশে এর সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছিলেন, অন্য দেশেও তিনি তা দিতে পারেন। সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াও তিনি জীবনোপকরণ দান করতে সক্ষম। কাজেই এটা হিজরতের পথে অন্তরায় হওয়া ঠিক নয়।

হিজরত কখন ফরয অথবা ওয়াজিব হয়? ঃ হিজরতের সংজ্ঞা, শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ সূরা নিসা-এর ৯৭ থেকে ১০০ আয়াতে এবং বিধি-বিধান এই সূরারই ৮৯ আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে। একটি বিষয়বস্তু সেখানে বর্ণিত হয়নি, তাই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন খোদায়ী নির্দেশে মক্কা থেকে হিজরত করেন এবং সব মুসলমানকে সামর্থ্য থাকলে হিজরত করার আদেশ দেন, তখন মক্কা থেকে হিজরত করা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার উপর 'ফরযে আইন' ছিল। অবশ্য যাদের হিজরত করার সামর্থ্যই ছিল না, তাদের কথা ভিন্ন।

সে যুগে হিজরত শুধু ফরযই নয়; মুসলমান হওয়ার আলামত ও শর্তরূপেও গণ্য হত। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হিজরত করত না, তাকে মুসলমান গণ্য করা হত না এবং তার সাথে কাফেরের অনুরূপ ব্যবহার করা হত। সূরা নিসার ৮৯ আয়াতে অর্থাৎ, حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতে একথা বলা হয়েছে। তখন ইসলামে হিজরতের মর্যাদা ছিল কলেমায়ে শাহাদতের অনুরূপ। এই কলেমা যেমনি ফরয, তেমনি মুসলমান হওয়ার শর্তও। শক্তি থাকা সত্ত্বেও এই কলেমা মুখে উচ্চারণ না করলে অন্তরে বিশ্বাস থাকলেও সে মুসলমান গণ্য হবে না। তবে যে ব্যক্তি এই কলেমা মুখে উচ্চারণ করতে অক্ষম, তার কথা ভিন্ন। এমনিভাবে যারা হিজরত করতে সক্ষম ছিল না, তাদেরকে উপরোক্ত আইনের আওতাবহির্ভূত রাখা হয়। সূরা নিসার (৯৮) اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ আয়াতে তাই বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় অবস্থান করছিল, اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ থেকে পর্যন্ত আয়াতে তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

মক্কা বিজিত হয়ে গেলে হিজরতের উপরোক্ত আদেশে রহিত হয়ে যায়। কারণ, তখন মক্কা স্বয়ং দারুল-ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন এই মর্মে আদেশ জারী করেন, لا هجرة بعد الفتح অর্থাৎ, মক্কা বিজিত হওয়ার পর মক্কা থেকে হিজরত অনাবশ্যক। কোরআন ও হাদীস দ্বারাই মক্কা থেকে হিজরত ফরয হওয়া, অতঃপর তা রহিত হওয়া প্রমাণিত। ফেকাহ্বিদগণ এই বিশেষ ঘটনা থেকে নিম্নোক্ত মাসআলা চয়ন করেছেন ঃ

মাসআলা ঃ যে শহর অথবা দেশে ধর্মের উপর কায়েম থাকার স্বাধীনতা নেই, যেখানে কুফর, শিরক অথবা শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য করা হয়, সেখান থেকে হিজরত করে ধর্মপালনে স্বাধীনতা সম্পন্ন দেশে চলে যাওয়া ওয়াজিব, তবে যার সফর করার শক্তি নেই কিংবা তদ্রূপ স্বাধীন ও মুক্ত দেশই যদি পাওয়া না যায় তাহলে এমতাবস্থায় তার ওযর আইনতঃ গ্রহণীয় হবে।

মাসআলা ঃ কোন দারুল-কুফরে ধর্মীয় বিধানাবলী পালন করার স্বাধীনতা থাকলে সেখান থেকে হিজরত করা ফরয ও ওয়াজিব নয়, কিন্তু মোস্তাহাব। অবশ্য এজন্যে দারুল-কুফর হওয়া জরুরী নয়; বরং 'দারুল ফিস্ক' (পাপাচারের দেশ) যেখানে প্রকাশ্যে শরীয়তের নির্দেশাবলী অমান্য করা হয়, সেখান থেকেও হিজরত করার হুকুম এরূপ। যদিও শাসক মুসলমান হওয়ার কারণে একে দারুল-ইসলাম বলা হয়ে থাকে।

হাফেয ইবনে হাজার ফতহুল-বারীতে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হানাফী মাযহাবের কোন ধারাই এর পরিপন্থী নয়। মুসনাদে আহমদে আবু ইয়াহ্ইয়া থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, البلاد بلاد الله والعباد عباد الله حيثما اصبت خيرا فاقم অর্থাৎ, সব নগরীই আল্লাহ্র নগরী এবং সব বান্দা আল্লাহ্র বান্দা। কাজেই যেখানে তুমি কল্যাণের সামগ্রী দেখতে পাও, সেখানেই অবস্থান কর।—(ইবনে-কাসীর)

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন, যে শহরে ব্যাপকহারে গোনাহ্ ও অশ্লীল কাজ হয়, সেই শহর ছেড়ে দাও। হযরত আতা বলেন, কোন শহরে তোমাকে গোনাহ্ করতে বাধ্য করা হলে সেখান থেকে পালিয়ে যাও।—(ইবনে কাসীর)

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۚ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ
لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾ فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا
اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ
يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۗ فَسَوْفَ
يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ
مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٧﴾
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ
لَمَّا جَآءَهٗ ۚ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِيْنَ
جٰهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

سُوْرَةُ الرُّوْمِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّوْنَ اٰيَةً وَّسِتُّ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الٓمّٓ ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿٢﴾ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ
غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ﴿٣﴾ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۗ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ
قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۗ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٤﴾
بِنَصْرِ اللّٰهِ ۗ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾

(৬৪) এই পার্থিবজীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত। (৬৫) তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে। (৬৬) যাতে তারা তাদের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে এবং ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকে। সত্বরই তারা জানতে পারবে। (৬৭) তারা কি দেখে না যে, আমি একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি। অথচ এর চতুষ্পার্শ্বে যারা আছে, তাদের উপর আক্রমণ করা হয়। তবে কি তারা মিথ্যায়ই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামত অস্বীকার করবে? (৬৮) যে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সেসব কাফেরের আশ্রয়স্থল হবে? (৬৯) যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।

সূরা আর-রূম

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৬০

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) আলিফ-লাম-মীম, (২) রোমকরা পরাজিত হয়েছে, (৩) নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে, (৪) কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহ্‌র হাতেই। সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। (৫) আল্লাহ্‌র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের এই অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি, সূর্য ও চন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, বারিবর্ষণ ও তদ্দ্বারা উদ্ভিদ উৎপন্ন করার সমস্ত কাজ-কারবার যে আল্লাহ্‌ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন, একথা তারাও স্বীকার করে। এ ব্যাপারে কোন প্রতিমা ইত্যাদিতে তারা শরীক মনে করে না। কিন্তু এরপরও তারা খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে। এর কারণ বলা হয়েছে যে, أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশই বোঝে না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তারা উন্মাদ পাগল তো নয়; বরং চালাক ও সমঝদার। দুনিয়ার বড় বড় কাজ-কারবার সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। এতে তাদের অবুঝ হয়ে যাওয়ার কারণ কি? এর জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এই দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়া এবং দুনিয়ার বৈষয়িক ও ধ্বংসশীল কামনা-বাসনার আসক্তি তাদেরকে পরকাল ও পরিণামের চিন্তা-ভাবনা থেকে অন্ধ ও অবুঝ করে দিয়েছে। অথচ এই পার্থিবজীবন ক্রীড়া-কৌতুক অর্থাৎ, সময় ক্ষেপণের বৃত্তি বৈ কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত ও অক্ষয় জীবন।

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۚ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ

– এখানে حيوان শব্দটির ধাতুগত অর্থ হচ্ছে হায়াত তথা জীবন।– (কুরতুবী)

এতে পার্থিবজীবনকে ক্রীড়াকৌতুক বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্রীড়াকৌতুকের যেমন কোন স্থিতি নেই এবং এর দ্বারা কোন বড় সমস্যার সমাধান হয় না, অল্পক্ষণ পরেই সব তামাশা খতম হয়ে যায়, পার্থিবজীবনের অবস্থাও তদ্রূপ।

পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের আরও একটি মন্দ অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জগৎ সৃষ্টির কাজে আল্লাহ্‌কে একক স্বীকার করা সত্ত্বেও খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে অংশীদার মনে করে। তাদের এই অবস্থার চাইতেও আশ্চর্যজনক অবস্থা এই যে, তাদের উপর যখন কোন বড় বিপদ পতিত হয়, তখনও তারা বিশ্বাস ও স্বীকার করে যে, এ ব্যাপারে কোন প্রতিমা আমাদের সাহায্যকারী হতে পারে না। বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাই উদ্ধার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা যখন সমুদ্রে ভ্রমণরত থাকে এবং জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন এই আশংকা দূর করার জন্যে কোন প্রতিমাকে ডাকার পরিবর্তে তারা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাকেই ডাকে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের অসহায়ত্ব এবং সাময়িকভাবে জগতের সব অবলম্বন থেকে বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতে তাদের দোয়া কবুল করেন এবং উপস্থিত ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু জালেমরা যখন তীরে পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, তখন পুনরায় প্রতিমাদেরকে শরীক বলতে শুরু করে। فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ — আয়াতের উদ্দেশ্য তাই।

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, কাফেরও যখন নিজেকে অসহায় মনে করে তখন আল্লাহ্‌কেই ডাকে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত এই বিপদ থেকে তাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, তখন আল্লাহ্‌

তাআলা কাফেরেরও দোয়া কবুল করে নেন। কেননা, সে مضطر তথা অসহায়। আল্লাহ্ তাআলা অসহায়ের দোয়া কবুল করার ওয়াদা করেছেন।— (কুরতুবী)

অন্য এক আয়াতে আছে وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ অর্থাৎ, কাফেরদের দোয়া গ্রহণযোগ্য নয়। বলাবাহুল্য, এটা পরকালের অবস্থা। সেখানে কাফেররা আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য দোয়া করবে ; কিন্তু কবুল করা হবে না।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا .... উপরের আয়াতসমূহে মক্কার মুশরিকদের মূর্খতাসুলভ কর্মকাণ্ড আলোচিত হয়েছিল যে, সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্ তাআলাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা পাথরের স্বনির্মিত প্রতিমাকে তার খোদায়ীর অংশীদার সাব্যস্ত করে। তারা আল্লাহ্ তাআলাকে শুধু জগৎ সৃষ্টির মালিক মনে করে না; বরং বিপদ থেকে মুক্তি দেয়াও তাঁরই ক্ষমতাধীন বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু মুক্তির পর আবার শিরকে লিপ্ত হয়। কোন কোন মুশরিকের এক অজুহাত এরূপও পেশ করা হত যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আনীত ধর্মকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে তারা তাদের প্রাণনাশের আশংকা অনুভব করে। কারণ, সমগ্র আরব ইসলামের বিরোধী। তারা মুসলমান হয়ে গেলে অবশিষ্ট আরব তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে এবং প্রাণে বধ করবে।– (রুহুল-মা'আনী)

এর জওয়াবে আল্লাহ্ তাআলা বলেন যে, তাদের এই অজুহাতও অন্তঃসার শূন্য। আল্লাহ্ তাআলা বায়তুল্লাহ্র কারণে মক্কাবাসীদেরকে এমন মাহাত্ম্য দান করেছেন, যা পৃথিবীর কোন স্থানের অধিবাসীদের ভাগ্যে জুটেনি। আল্লাহ্ বলেন, আমি সমগ্র মক্কাভূমিকে হরম তথা আশ্রয়স্থল করে দিয়েছি। মুমিন, কাফের নির্বিশেষে আরবের বাসিন্দারা সবাই হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এতে খুন খারাবি হারাম মনে করে। মানুষ তো মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং বৃক্ষ কর্তন করাও সবার মতে অবৈধ। বহিরাগত কোন ব্যক্তি হরমে প্রবেশ করলে সে-ও হত্যার কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। অতএব মক্কার বাসিন্দারা যদি ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশংকা আছে বলে অজুহাত পেশ করে, তবে সেটা খোঁড়া অজুহাত বৈ নয়।

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا – এর আসল অর্থ ধর্মের পথে বাধা বিপত্তি দূর করার জন্যে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। কাফের ও পাপিষ্ঠদের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে জেহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার হচ্ছে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

উভয় প্রকার জেহাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা করা হয়েছে যে, যারা জেহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি। অর্থাৎ, যেসব ক্ষেত্রে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা অথবা উপকার ও অপকার সন্দেহ জড়িত থাকে, কোন্ পথ ধরতে হবে তা চিন্তা করে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা জেহাদকারীদেরকে সোজা, সরল ও সুগম পথ বলে দেন। অর্থাৎ, যে পথে তাদের কল্যাণ নিহিত, সে পথের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে দেন।

ইল্ম অনুযায়ী আমল করলে ইল্ম বাড়ে ঃ এই আয়াতের তফসীরে হযরত আবুদ্দারদা বলেন, আল্লাহ্ ইল্ম অনুযায়ী আমল করার জন্যে যারা জেহাদ করে, আমি তাদের সামনে নতুন নতুন ইলমের দ্বার খুলে দেই। ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন, যারা বিদ্যার্জনে ব্রতী হয়, আমি তাদের জন্যে আমলও সহজ করে দেই।—(মাযহারী)

সূরা আল- আনকাবূত সমাপ্ত

সূরা আর-রূম

সূরা অবতরণ এবং রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী ঃ সূরা আনকাবূতের সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্র পথে জেহাদ ও মুজাহাদা করে, আল্লাহ্ তাদের জন্যে তাঁর পথ খুলে দেন। আয়াতে তাদের জন্যে উদ্দেশ্য সফলতার সুসংবাদও প্রদত্ত হয়েছিল। আলোচ্য সূরা রূম যে ঘটনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, তা সেই খোদায়ী সাহায্যেরই একটি প্রতীক। এই সূরায় রোমক ও পারসকিদের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষই ছিল কাফের। তাদের মধ্যে কারও বিজয় এবং কারও পরাজয় বাহ্যতঃ ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে কোন কৌতূহলের বিষয় ছিল না। কিন্তু উভয় কাফের দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক এবং রোমকরা ছিল খৃস্টান আহ্লে কিতাব। ফলে এরা ছিল মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। কেননা, ধর্মের অনেক মূলনীতি—যথা পরকালে বিশ্বাস, রেসালত ও ওহীতে বিশ্বাস ইত্যাদিতে তারা মুসলমানদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে রোম সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্রে এই অভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি পত্রে কোরআনের এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন ঃ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ .... আহ্লে কিতাবদের সাথে মুসলমানদের এসব নৈকট্যই নিম্নোক্ত ঘটনার কারণ হয়েছিল।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মক্কায় অবস্থানকালে পারসিকরা রোমকদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। হাফেয ইবনে-হাজার প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী তাদের এই যুদ্ধ শাম দেশের আযরুআত ও বুসরার মধ্যস্থলে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মক্কার মুশরিকরা পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা, শিরক ও প্রতিমা পূজায় তারা ছিল পারসিকদের সহযোগী। অপরপক্ষে মুসলমানদের আন্তরিক বাসনা ছিল রোমকরা বিজয়ী হোক। কেননা, ধর্ম ও মযহাবের দিক দিয়ে তারা ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু হল এই যে, তখনকার মত পারসিকরা যুদ্ধে জয়লাভ করল। এমন কি তারা কনস্টান্টিনোপলও অধিকার করে নিল এবং সেখানে উপাসনার জন্যে একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করল। এটা ছিল পারস্য সম্রাট পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। এরপর তার পতন শুরু হয় এবং অবশেষে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

এই ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং মুসলমানদেরকে লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে, তারা হেরে গেছে। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়; বরং আহ্লে-কিতাব রোমকরা যেমন পারসকিদের মোকাবেলায় পারজয় বরণ করেছে, তেমনি আমাদের মোকাবেলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে মুসলমানরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়।—(ইবনে-জরীর, ইবনে আবী হাতেম)

সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই

রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন এসব আয়াত শুনলেন, তখন মক্কার চতুষ্পার্শ্বে এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের হর্ষোৎফুল্ল হওয়ার কোন কারণ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসকিদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খালফ কথা ধরল এবং বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। এরূপ হতে পারে না। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র দুশমন, তুই-ই মিথ্যাবাদী। আমি এই ঘটনার জন্যে বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি! যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয়, তবে আমি তোকে দশটি উষ্ট্রী দেব। উবাই এতে সম্মত হল। (বলাবাহুল্য, এটা ছিল জুয়া, কিন্তু তখন জুয়া হারাম ছিল না।) একথা বলে হযরত আবু বকর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)– এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি। কোরআনে এর জন্যে بِضْعِ سِنِيْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটি উষ্ট্রীর স্থলে একশ' উষ্ট্রী বাজি রাখছি, কিন্তু সময়কাল তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে সাত বছর নির্দিষ্ট করছি। হযরত আবু বকর আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিতে সম্মত হল।—(ইবনে জরীর, তিরমিযী)

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনে খাল্ফ বেঁচে ছিল না। হযরত আবু বকর তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশ' উষ্ট্রী দাবী করে আদায় করে নিলেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, উবাই যখন আশংকা করল যে, হযরত আবু বকরও হিজরত করে যাবেন, তখন সে বলল, আপনাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি একজন জামিন পেশ করেন। নির্ধারিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে একশ' উষ্ট্রী পরিশোধ করবে। হযরত আবু বকর তদীয় পুত্র আবদুর রহমানকে জামিন নিযুক্ত করলেন।

যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বাজিতে জিতে গেলেন এবং একশ' উষ্ট্রী লাভ করলেন, তখন সেগুলো নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, উষ্ট্রীগুলো সদকা করে দাও। আবু ইয়ালা ও ইবনে আসকেরে বারা ইবনে আযেব থেকে এ স্থলে এরূপ ভাষা বর্ণিত আছে ঃ هذا السحت تصدق به —এটা হারাম। একে সদকা করে দাও।—(রূহুল-মা'আনী)

জুয়া ঃ কোরআনের আয়াত অনুযায়ী জুয়া অকাট্য হারাম। হিজরতের পর যখন মদ্যপান হারাম করা হয়, তখন জুয়াও হারাম করা হয় এবং একে 'শয়তানী অপকর্ম' আখ্যা দেয়া হয়।

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ

ميسر ও ازلام বলে জুয়ার বিভিন্ন প্রকারকেই হারাম করা হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) উবাই ইবনে খাল্ফের সাথে যে দু'তরফা লেন-দেন ও হার-জিতের বাজি রেখেছিলেন, এটাও এক প্রকার জুয়াই ছিল। কিন্তু ঘটনাটি হিজরতের পূর্বেকার। তখন জুয়া হারাম ছিল না। কাজেই এ ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে জুয়ার যে মাল আনা হয়েছিল, তা হারাম মাল ছিল না।

তাই এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই মাল সদকা করে দেয়ার আদেশ কেন দিলেন? বিশেষ করে অন্য এক রেওয়ায়েতে এ সম্পর্কে سحت শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। এটা কিরূপে সঙ্গত হবে? ফেকাহ্‌বিদগণ এর জওয়াবে বলেন, এই মাল যদিও তখন হালাল ছিল, জুয়ার মাধ্যমে অর্থোপার্জন তখনও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পছন্দ করতেন না। তাই আবু বকরের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করে এই মাল সদকা করে দেয়ার আদেশ দেন। এটা এমন-যেমন মদ্যপান হালাল থাকার সময়ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) কখনও মদ্যপান করেননি।

যে রেওয়ায়েতে سحت শব্দ উল্লেখিত হয়েছে, প্রথমতঃ হাদীসবিদগণ সেই রেওয়ায়েতকে সহীহ্ বলে স্বীকার করেননি। যদি অগত্যা সহীহ্ মেনে নেয়া হয়, তবে سحت শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথম প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। দ্বিতীয় অর্থ মকরূহ ও অপছন্দনীয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, كسب الحجام سحت এখানে অধিকাংশ ফেকাহ্‌বিদের মতে سحت — এর অর্থ মকরূহ ও অপছন্দনীয়। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে এবং ইবনে-আসীর 'নেহায়া' গ্রন্থে سحت শব্দের বিভিন্ন অর্থ আরবদের বাক-পদ্ধতি ও হাদীসের মাধ্যমে সপ্রমাণ করেছেন।

ফেকাহবিদদের এই জওয়াব এ কারণেও গ্রহণ করা জরুরী যে, বাস্তবে এই মাল হারাম থাকলে নীতি অনুযায়ী যার কাছ থেকে নেয়া হয়েছিল, তাকেই ফেরত দেয়া অপরিহার্য ছিল। হারাম মাল সদকা করার আদেশ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং যখন মালিক জানা না থাকে কিংবা তার কাছে পৌঁছানো দুরূহ হয় কিংবা তাকে ফেরত দেয়ার মধ্যে অন্য কোন শরীয়তসিদ্ধ অপকারিতা নিহিত থাকে, তখনই হারাম মাল সদকা করা যায়। এক্ষেত্রে ফেরত না দেয়ার এরূপ কোন কারণ বিদ্যমান নেই।

وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ — অর্থাৎ, যেদিন রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, সেদিন আল্লাহ্‌র সাহায্যের কারণে মুসলমানরা উৎফুল্ল হবে। বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির দিক দিয়ে বাহ্যতঃ এখানে রোমকদের সাহায্য বোঝানো হয়েছে। তারা যদিও কাফের ছিল, কিন্তু অন্য কাফেরদের তুলনায় তাদের কুফর কিছুটা হালকা ছিল। কাজেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা অবান্তর নয়। বিশেষতঃ যখন তাদেরকে সাহায্য করলে মুসলমানরাও আনন্দিত হয় এবং কাফেরদের মোকাবেলায় তাদের জিত হয়।

এখানে মুসলমানদের সাহায্যও বোঝানো যেতে পারে। দুই কারণে এটা সম্ভবপর। (এক) মুসলমানরা রোমকদের বিজয়কে কোরআন ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণরূপে পেশ করেছিল। তাই রোমকদের বিজয় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সাহায্য ছিল। (দুই) তখনকার দিনে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যই ছিল কাফেরদের দুই পরাশক্তি। আল্লাহ্ তাআলা তাদের একেক অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে উভয়কে দুর্বল করে দেন, যা ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল।—(রূহুল-মা'আনী)

وَعْدَ اللّٰهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٦ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٧ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝٨ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝٩ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠ اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝١١ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝١٢ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝١٣ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ۝١٤ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ۝١٥

(৬) আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তার প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। (৭) তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না। (৮) তারা কি তাদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ্ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। (৯) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না অতঃপর দেখে না যে; তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি কি হয়েছে? তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল, তারা যমীন চাষ করত এবং তাদের চাইতে বেশী আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। (১০) অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ। কারণ, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। (১১) আল্লাহ্ প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এরপর তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (১২) যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে। (১৩) তাদের দেবতাগুলোর মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না এবং তারা তাদের দেবতাকে অস্বীকার করবে। (১৪) যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (১৫) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে;

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ

—অর্থাৎ, পার্থিব জীবনের এক পিঠ তাদের নখদর্পণে। ব্যবসা কিরূপে করবে, কিসের ব্যবসা করবে, কোথা থেকে কিনবে, কোথায় বেচবে কৃষিকাজ কিভাবে করবে, কবে বীজ বপন করবে, কবে শস্য কাটবে, দালান-কোঠা কিভাবে নির্মাণ করবে, বিলাস-ব্যসনের উপকরণ কিভাবে আহরণ করবে—এসব বিষয় তারা সম্যক অবগত। কিন্তু এই পার্থিব জীবনেরই অপর পিঠ সম্পর্কে তথাকথিত বড় বড় পণ্ডিত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অথচ এই পিঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব জীবনের স্বরূপ ও তার আসল লক্ষ্যকে ফুটিয়ে তোলা। অর্থাৎ, একথা প্রকাশ করা যে, দুনিয়া একটা মুসাফিরখানা। এখান থেকে আজ না হয় কাল যেতেই হবে। মানুষ এখানকার নয়; বরং পরকালের বাসিন্দা। এখানে কিছুদিনের জন্যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আগমন করেছে মাত্র। এখানে তার কাজ এই যে, স্বদেশে সুখে কালাতিপাত করার জন্যে এখান থেকে সুখের সামগ্রী সংগ্রহ করে সেখানে প্রেরণ করবে। বলাবাহুল্য, এই সুখের সামগ্রী হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম।

এবার কোরআন পাকের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করুন। يَعْلَمُوْنَ —এর সাথে ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا বলা হয়েছে। এতে ظَاهِرًا কে **নকরা** এনে ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা বাহ্যিক জীবনকেও পুরোপুরি জানে না—এর শুধু এক পিঠ জানে এবং অপর পিঠ জানে না। আর পরকাল সম্পর্কে তো সম্পূর্ণই বেখবর।

পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বুদ্ধিমত্তা নয় ঃ কোরআন পাক বিশ্বের খ্যাতনামা ধনৈশ্বর্যশীল ও ভোগ-বিলাসী জাতিসমূহের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তাদের অশুভ পরিণতিও দুনিয়াতে সবার সামনে এসেছে। আর পরকালের চিরস্থায়ী আযাব তো তাদের ভাগ্যলিপি হয়েছেই। তাই এসব জাতিকে কেউ বুদ্ধিমান ও দার্শনিক বলতে পারে না। পরিতাপের বিষয়, আজকাল যে ব্যক্তি অধিকতর অর্থ সঞ্চয় করতে পারে এবং বিলাস-ব্যসনের উৎকৃষ্টতর সামগ্রী যোগাড় করতে সমর্থ হয়, তাকেই সর্বাধিক বুদ্ধিমান বলা হয়, যদিও সে মানবতাবোধ থেকেও বঞ্চিত হয়। যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ লোককে বুদ্ধিমান বলা বুদ্ধির অবমাননা বৈ নয়। কোরআন পাকের ভাষায় একমাত্র তারাই বুদ্ধিমান, যারা আল্লাহ্ ও পরকাল চিনে, তার জন্যে আমল করে এবং সাংসারিক প্রয়োজনাদিকে প্রয়োজন পর্যন্তই সীমিত রাখে—জীবনের লক্ষ্য বানায় না। اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا .... — আয়াতের অর্থ তাই।

উল্লেখিত আয়াতত্রয় পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট ও তার সাক্ষ্যস্বরূপ। অর্থাৎ, তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য ও ধ্বংসশীল বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়ে জগৎরূপী কারখানার স্বরূপ ও পরিণাম সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে। যদি তারা নিজেরাও মনে মনে চিন্তা করত এবং ভাবত, তবে এ সৃষ্টি রহস্য তাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যেত যে, আল্লাহ্ তাআলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে অনর্থক ও বেকার সৃষ্টি করেননি। এগুলো সৃষ্টি করার কোন মহান লক্ষ্য ও বিরাট রহস্য রয়েছে। তা এই যে, মানুষ এ অগণিত নেয়ামতরাজির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে চিনবে এবং এই খোঁজে ব্যাপৃত হবে যে, তিনি কি কি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং কি কি কাজে অসন্তুষ্ট। অতঃপর তাঁর সন্তুষ্টির কাজ সম্পাদনে সচেষ্ট হবে

এবং অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। একথাও বলাবাহুল্য যে, এই উভয় প্রকার কাজের কিছু প্রতিদান ও শাস্তি হওয়াও জরুরী। নতুবা সৎ ও অসৎকে একই দাঁড়ি-পাল্লায় রাখা ন্যায় ও সুবিচারের পরিপন্থী। একথাও জানা যে, এই দুনিয়া মানুষের ভাল অথবা মন্দ কাজের প্রতিদান পুরোপুরি পাওয়ার স্থান নয়; বরং এখানে প্রায়ই এরূপ হয় যে, পেশাদার অপরাধীরা হাসি-খুশী জীবন-যাপন করে এবং সৎ ও সাধু ব্যক্তিরা বিপদাপদে জড়িত থাকে।

কাজেই এমন একসময় আসা জরুরী, যখন এসব কাজ-কারবার খতম হয়ে যাবে, ভাল ও মন্দ কর্মের হিসাব-নিকাশ হবে এবং ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দেয়া হবে। এই সময়েরই নাম কেয়ামত ও পরকাল।

সারকথা এই যে, তারা যদি চিন্তা-ভাবনা করত, তবে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে সবকিছুই সাক্ষ্য দিত যে, এগুলো চিরস্থায়ী নয়—ক্ষণস্থায়ী। এরপর অন্য জগত আসবে, যা চিরস্থায়ী হবে। প্রথম আয়াতের সারমর্ম তাই أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم —এই বিষয়বস্তুটি একটি যুক্তিগত প্রমাণ। পরবর্তী আয়াতে পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চাক্ষুষ ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহকে এর প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয়েছে এবং মক্কাবাসীদেরকে বলা হয়েছে যে,

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ — অর্থাৎ, মক্কাবাসীরা এমন এক ভূখণ্ডের অধিবাসী, যেখানে না আছে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ এবং না আছে সুউচ্চ ও সুরম্য দালান-কোঠা। কিন্তু তারা বাণিজ্যিক উদ্দেশে শাম ও ইয়ামন সফর করে। এসব সফরে তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম প্রত্যক্ষ করে না? তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীতে বড় বড় কীর্তি স্থাপনের যোগ্যতা দান করেছিলেন। তারা মৃত্তিকা খনন করে সেখান থেকে পানি বের করত এবং তদ্দ্বারা বাগ-বাগিচা ও কৃষিক্ষেত্র সিক্ত করত। ভূগর্ভস্থ গোপন ভাণ্ডার থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ ধাতু উত্তোলন করত এবং তদ্দ্বারা মানুষের উপকারার্থে বিভিন্ন প্রকার শিল্পদ্রব্য তৈরী করত। তারা ছিল তৎকালীন সুসভ্য জাতি। কিন্তু তারা বৈষয়িক ও ক্ষণস্থায়ী বিলাসিতায় মত্ত হয়ে আল্লাহ্ ও পরকাল বিস্মৃত হয়। স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা তাদের কাছে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ করেনি এবং পরিণামে দুনিয়াতেও আযাবে পতিত হয়। তাদের জনপদসমূহের জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, চিন্তা কর, এই আযাবে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন জুলুম হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে? অর্থাৎ, তারা নিজেরাই আযাবের কারণাদি সঞ্চয় করেছে।

فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ - يُحْبَرُونَ শব্দটি حبور থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আনন্দ, উল্লাস। জান্নাতীগণ যত প্রকার আনন্দ লাভ করবে, সবই এই শব্দের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একে ব্যাপক রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ অর্থাৎ, দুনিয়াতে কেউ জানে না যে, তার জন্যে জান্নাতে চক্ষু শীতল করার কি কি সামগ্রী যোগাড় রাখা হয়েছে। কোন কোন তফসীরকার এই আয়াতের অধীনে যে বিশেষ বিশেষ আনন্দদায়ক বস্তুসমূহ উল্লেখ করেছেন এগুলোর সবই এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ
فَاُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ
تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ
تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ
لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾
وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ
وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ
مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ
خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْىٖ بِهِ الْاَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَآ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٤﴾

(১৬) আর যারা কাফের এবং আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলছে, তাদেরকেই আযাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে। (১৭) অতএব, তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা স্মরণ কর সন্ধ্যায় ও সকালে, (১৮) এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁরই প্রশংসা। (১৯) তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বহির্গত করেন, জীবিত থেকে মৃতকে বহির্গত করেন, এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবে তোমরা উত্থিত হবে। (২০) তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ। (২১) আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২২) তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য! নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৩) তাঁর আরও নিদর্শন ঃ রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর কৃপা অন্বেষণ। নিশ্চয় এতে মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৪) তাঁর আরও নিদর্শন—তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসার জন্যে এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ

سبحان শব্দটি ধাতু। এর ক্রিয়া উহ্য আছে, অর্থাৎ, سبحوا الله সকালে حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ অর্থাৎ, সন্ধ্যায় حِيْنَ تُمْسُوْنَ – অর্থাৎ, وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ —এই বাক্যটি প্রমাণ হিসেবে মাঝখানে আনা হয়েছে। অর্থাৎ, সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা জরুরী। কারণ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য এবং এতদুভয়ের বাসিন্দারা তাঁর প্রশংসায় মশগুল। আয়াতের শেষভাগে وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ বলে আরও দুই সময়ে পবিত্রতা বর্ণনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। অপরাহ্ন তথা আসরের সময় এবং মধ্যাহ্ন তথা সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরবর্তী সময়।

বর্ণনায় সন্ধ্যাকে সকালের অগ্রে এবং অপরাহ্নকে মধ্যাহ্নের অগ্রে রাখা হয়েছে। সন্ধ্যাকে অগ্রে রাখার এক কারণ এই যে, ইসলামী তারিখ সন্ধ্যা তথা সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু হয়। আসরের সময়কে যোহরের অগ্রে রাখার এক কারণ সম্ভবতঃ এই যে, আসরের সময় সাধারণতঃ কাজ-কারবারে ব্যাপৃত থাকার সময়। এতে দোয়া, তসবীহ্ অথবা নামায সম্পন্ন করা স্বভাবতঃ কঠিন। এ কারণেই কোরআনে صلوٰة وسطى তথা আসরের নামাযের বিশেষ তাকীদ বর্ণিত হয়েছে—

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى

আলোচ্য আয়াতের ভাষায় নামাযের উল্লেখ নেই। কাজেই সর্বপ্রকার উক্তিগত ও কর্মগত যিকর এর অন্তর্ভুক্ত। যিকরের যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে নামায সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই নামায আরও উত্তমরূপেই আয়াতের মধ্যে দাখিল আছে বলা যায়। এ কারণেই কোন কোন আলেম বলেন, এই আয়াতে পাঞ্জেগানা নামায ও সেসবের সময়ের বর্ণনা আছে। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, কোরআনে পাঞ্জেগানা নামাযের স্পষ্ট উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত পেশ করলেন। অর্থাৎ, حِيْنَ تُمْسُوْنَ শব্দে মাগরিবের নামায, حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ শব্দে ফজরের নামায, عشيا শব্দে আসরের নামায এবং حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ শব্দে যোহরের নামায উল্লেখিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে এশার নামাযের প্রমাণ আছে ; অর্থাৎ, وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ হযরত হাসান বসরী বলেন, حِيْنَ تُمْسُوْنَ শব্দে মাগরিব ও এশা উভয় নামায ব্যক্ত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য আয়াত হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া এবং এ দোয়ার কারণে কোরআন পাকে তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয় প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে, وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى —হযরত ইবরাহীম (আঃ) সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করতেন।

হযরত মুআয ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, কোরআন পাকে হযরত ইবরাহীমের অঙ্গীকার পূর্ণ করার যে প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, তার কারণ ছিল এই দোয়া।

আবু দাউদ, তাবারানী, ইবনে সুন্নী প্রমুখ হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে

বর্ণনা করেন যে, فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ থেকে وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ পর্যন্ত এই তিন আয়াত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে এই দোয়া পাঠ করে, তার সারাদিনের আমলের ত্রুটিসমূহ এর বরকতে দূর করে দেয়া হয় এবং যে সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়ে, তার রাত্রিকালীন আমলের ত্রুটি দূর করে দেয়া হয়।—(রূহুল-মা'আনী)

সূরা রূমের শুরুতে রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের ঘটনা শোনানোর পর অবিশ্বাসী কাফেরদের পথভ্রষ্টতা ও সত্যের প্রতি উদাসীনতার কারণ সাব্যস্ত করা হয় যে, তারা ধ্বংসশীল পার্থিব জীবনকে লক্ষ্য স্থির করে পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। এরপর কেয়ামতে পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানকে যেসব বাহ্যদর্শী অবান্তর মনে করতে পারত, তাদেরকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জওয়াব দেয়া হয়েছে। প্রথমে নিজের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার অতঃপর চতুষ্পার্শ্বস্থ জাতিসমূহের অবস্থা ও পরিণাম পর্যবেক্ষণ করার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা সর্বশক্তিমান। তাঁর কোন শরীক ও অংশীদার নেই। এসব সাক্ষ্য-প্রমাণের অনিবার্য ফল দাঁড়ায় এই যে, এবাদতের যোগ্য একমাত্র তাঁর একক সত্তাকেই সাব্যস্ত করতে হবে। তিনি পয়গম্বরগণের মাধ্যমে কেয়ামত কায়েম হওয়ার বরং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষের পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে বিশ্বাস করতে হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এই পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ প্রজ্ঞার ছয়টি প্রতীক 'শক্তির নিদর্শনাবলী' শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো আল্লাহ্ তাআলার অনুপম শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন।

খোদায়ী কুদরতের প্রথম নিদর্শন ঃ মানুষের ন্যায় সৃষ্টির সেরা ও জগতের শাসককে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করা। জগতে যত প্রকার উপাদান আছে, তন্মধ্যে মৃত্তিকা সর্বনিকৃষ্ট উপাদান। এতে অনুভূতি, চেতনা ও উপলব্ধির নাম-গন্ধও দৃষ্টিগোচর হয় না। অগ্নি, পানি, বায়ু ও মৃত্তিকা এই উপাদান-চতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ছাড়া সবগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু গতি ও চেতনার আভাস পাওয়া যায়। মৃত্তিকা তা থেকেও বঞ্চিত। মানব সৃষ্টির জন্যে আল্লাহ্ তাআলা একেই মনোনীত করেছেন। ইবলীসের পথভ্রষ্টতার কারণও তাই হয়েছে যে, সে অগ্নি-উপাদানকে মৃত্তিকা থেকে সেরা ও শ্রেষ্ঠ মনে করে অহংকারের পথ বেছে নিয়েছে। সে বুঝল না যে, ভদ্রতা ও আভিজাত্যের চাবিকাঠি স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্র হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা মহান করতে পারেন।

মানব সৃষ্টির উপাদান যে মৃত্তিকা, একথা হযরত আদম (আঃ)-এর দিক দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনি সমগ্র মানব জাতির অস্তিত্বের মূলভিত্তি, তাই অন্যান্য মানুষের সৃষ্টিও পরোক্ষভাবে তাঁরই সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া অবান্তর নয়। এটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ মানুষের প্রজনন বীর্যের মাধ্যমে হলেও বীর্য যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত, তন্মধ্যে মৃত্তিকা প্রধান।

খোদায়ী কুদরতের দ্বিতীয় নিদর্শন ঃ দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তাআলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা পুরুষের সংগিনী হয়েছে। একই উপাদান থেকে একই স্থানে এবং একই খাদ্য থেকে উৎপন্ন সন্তানদের মধ্যে এই দু'টি প্রকারভেদ তিনি- সৃষ্টি করেছেন। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখশ্রী, অভ্যাস ও চরিত্রের সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্র পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার জন্যে এই সৃষ্টিই যথেষ্ট নিদর্শন। এরপর নারী জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ لِتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا — অর্থাৎ, তোমরা তাদের কাছে পৌঁছে শান্তি লাভ কর, এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ। কোরআন পাক একটিমাত্র শব্দে সবগুলোকে সন্নিবেশিত করে দিয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কারবারের সারমর্ম হচ্ছে মনের শান্তি ও সুখ। যে পরিবারে এটা বর্তমান আছে, সেই পরিবারে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল। যেখানে মানসিক শান্তি অনুপস্থিত, সেখানে আর যাই থাকুক বৈবাহিক জীবনের সাফল্য নেই। একথাও বলাবাহুল্য যে, পারস্পরিক শান্তি তখনই সম্ভবপর যখন নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি শরীয়তসম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেসব দেশ ও জাতি এর বিপরীত হারাম রীতি-নীতি প্রচলিত করেছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তাদের জীবনে কোথাও শান্তি নেই। জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় সাময়িক যৌন-বাসনা চরিতার্থ করার নাম শান্তি হতে পারে না।

বৈবাহিক জীবনের লক্ষ্য ঃ আলোচ্য আয়াত পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য মনের শান্তিকে স্থির করেছে। এটা তখনই সম্ভবপর, যখন উভয়পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তা আদায় করে নেয়। নতুবা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পারিবারিক শান্তি বরবাদ করে দেবে। এই অধিকার আদায়ের এক উপায় ছিল আইন প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করা ; যেমন অন্যদের অধিকারের বেলায় তাই করা হয়েছে। অর্থাৎ, একে অপরের অধিকার হরণকে হারাম করে তজ্জন্য কঠোর শান্তিবাণী শোনানো হয়েছে। শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ত্যাগ ও সহমর্মিতার উপদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, শুধু আইনের মাধ্যমে কোন জাতিকে সঠিক পথে আনা যায় না, যে পর্যন্ত তার সাথে আল্লাহ্ভীতি যুক্ত করে দেয়া না হয়। এ কারণেই সামাজিক ব্যাপারাদিতে বিধি-বিধানের সাথে সমগ্র কোরআনে সর্বত্র اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا ইত্যাদি বাক্য পরিশিষ্ট হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ — অর্থাৎ, এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন আছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একটি নিদর্শন এবং শেষভাগে একে 'অনেক নিদর্শন' বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আয়াতে উল্লেখিত বৈবাহিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ও তা থেকে অর্জিত পার্থিব ও ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এটা এক নয়—বহু নিদর্শন।

খোদায়ী কুদরতের তৃতীয় নিদর্শন ঃ তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন, বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং বিভিন্ন স্তরের বর্ণবৈষম্য; যেমন কোন স্তর শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হলদেটে। এখানে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন তো শক্তির মহানিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষার বিভিন্নতাও কুদরতের এক বিস্ময়কর লীলা। ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরবী, ফারসী, হিন্দী, তুর্কী, ইংরেজী ইত্যাদি কত বিভিন্ন ভাষা আছে। এগুলো বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রচলিত। তন্মধ্যে কোন কোন ভাষা পরস্পর এত ভিন্নরূপ যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না। স্বর ও উচ্চারণভঙ্গির বিভিন্নতাও ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে শামিল। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক পুরুষ, নারী, বালক ও

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে এমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন যে, একজনের কণ্ঠস্বর অন্য জনের কণ্ঠস্বরের সাথে পুরোপুরি মিল রাখে না। কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। অথচ এই কণ্ঠস্বরের যন্ত্রপাতি তথা জিহ্বা, ঠোঁট, তালু ও কণ্ঠনালী সবার মধ্যেই অভিন্ন ও একরূপ। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

এমনিভাবে বর্ণ-বৈষম্যের কথা বলা যায়। একই পিতা-মাতা থেকে একই প্রকার অবস্থায় দুই সন্তান বিভিন্ন বর্ণের জন্মগ্রহণ করে। এ হচ্ছে সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপুণ্য। এরপর ভাষা ও স্বর বিভিন্ন হয়। মানব জাতির বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে কি কি রহস্য নিহিত আছে, তা এক অতিদীর্ঘ আলোচনা। সামান্য চিন্তা-ভাবনা দ্বারা অনেক রহস্য বুঝে নেয়া কঠিনও নয়।

কুদরতের এই আয়াতে আকাশ, পৃথিবী; ভাষার বিভিন্নতা, বর্ণের বিভিন্নতা এবং বহুবিধ প্রসঙ্গে অনেক শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। এগুলো এত সুস্পষ্ট যে, অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই তা দেখতে পারে! তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ —অর্থাৎ, এতে জ্ঞানীদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

খোদায়ী কুদরতের চতুর্থ নিদর্শন ঃ মানুষের রাত্রে ও দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া এমনিভাবে রাত্রে ও দিবাভাগে জীবিকা অন্বেষণ করা। এই আয়াতে দিনে-রাত্রে নিদ্রাও বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণও। অন্য কতক আয়াতে নিদ্রা শুধু রাত্রে এবং জীবিকা অন্বেষণ শুধু দিনে করা হয়েছে। কারণ এই যে, রাত্রের আসল কাজ নিদ্রা যাওয়া এবং জীবিকা অন্বেষণের কাজও কিছু চলে। দিনে এর বিপরীতে আসল কাজ জীবিকা অন্বেষণ করা এবং কিছু নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণেরও সময় পাওয়া যায়। তাই উভয় বক্তব্যই স্ব স্ব স্থানে নির্ভুল। কোন কোন তফসীরকার সদর্থের আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতেও নিদ্রাকে রাত্রির সাথে এবং জীবিকা অন্বেষণকে দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত দেখিয়েছেন। কিন্তু এর প্রয়োজন নেই।

নিদ্রা ও জীবিকা অন্বেষণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিদ্রার সময় নিদ্রা যাওয়া এবং জাগরণের সময় জীবিকা অন্বেষণ করাকে মানুষের জন্মগত স্বভাবে পরিণত করা হয়েছে। এই উভয় বিষয়ের অর্জন মানুষের চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয় ; বরং এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র দান। আমরা দিন-রাত প্রত্যক্ষ করি যে, নিদ্রা ও বিশ্রামের উৎকৃষ্টতর আয়োজন সত্ত্বেও কোন কোন সময় নিদ্রা আসে না। মাঝে মাঝে ডাক্তারী বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহ্ যাকে চান উন্মুক্ত মাঠে রোদ ও উত্তাপের মধ্যেও নিদ্রা দান করেন।

জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দিনরাত প্রত্যক্ষ করা হয়। দুই ব্যক্তি সমান সমান জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন, সমান অর্থসম্পন্ন, সমান পরিশ্রম সহকারে জীবিকা উপার্জনের একই ধরনের কাজ নিয়ে বসে, কিন্তু একজন উন্নতি লাভ করে এবং অপরজন ব্যর্থ হয়। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াকে উপায়াদির উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। এর পেছনে অনেক রহস্য ও উপকারিতা আছে। তাই জীবিকা উপার্জন উপায়াদির মাধ্যমেই করা অপরিহার্য। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ আসল সত্য বিস্মৃত না হওয়া। উপায়াদিকে উপায়াদিই মনে করতে হবে এবং আসল রিযিকদাতা হিসাবে উপায়াদির স্রষ্টাকেই মনে করতে হবে।

এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ — অর্থাৎ, যারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, তাদের জন্যে এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। এতে শ্রবণের প্রসঙ্গ বলার কারণও সম্ভবতঃ এই যে, দৃশ্যতঃ নিদ্রা আপনা-আপনিই আসে, যদি আরামের জায়গা বেছে নিয়ে শয়ন করা হয়। এভাবে পরিশ্রম, মজুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারাও জীবিকা অর্জিত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র অদৃশ্য হাতের কারসাজি চর্মচক্ষুর অন্তরালে থাকে। পয়গম্বরগণ তা বর্ণনা করেন। তাই বলা হয়েছে, এসব নিদর্শন তাদের জন্যেই উপকারী, যারা পয়গম্বরগণের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং যখন বোধগম্য হয়, তখন মেনে নেয়— কোন হঠকারিতা করে না।

খোদায়ী কুদরতের পঞ্চম নিদর্শন ঃ পঞ্চম নিদর্শন এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে বিদ্যুতের চমক দেখান। এতে উহার পতিত হওয়ার এবং ক্ষতিকারিতারও আশংকা থাকে এবং এর পশ্চাতে বৃষ্টির আশাবাদও সঞ্চার হয়। তিনি এই বৃষ্টির দ্বারা শুষ্ক এবং মৃত মৃত্তিকাকে জীবিত ও সতেজ করে তাতে রকমারি প্রকারের বৃক্ষ ও ফল-ফুল উৎপন্ন করেন। এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

—অর্থাৎ, এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। কেননা, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা উদ্ভিদ ও ফল-ফুলের সৃজন যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, একথা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারাই বোঝা যেতে পারে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ
دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ۝٢٥ وَلَهٗ مَنْ فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ۝٢٦ وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٢٧ ضَرَبَ لَكُمْ
مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ
مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ
كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝٢٨
بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَّهْدِيْ
مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝٢٩ فَاَقِمْ وَجْهَكَ
لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا
تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٣٠ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا
الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝٣١ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا
دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۝٣٢

(২৫) তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্যে তোমাদের ডাক দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে। (২৬) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। (২৭) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্যে সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৮) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ঃ তোমাদের আমি যে রুযী দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা কি তাতে তোমাদের সমান সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর, যেরূপ নিজেদের লোককে ভয় কর? এমনিভাবে আমি সমঝদার সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করি। (২৯) বরং যারা বে-ইনসাফ, তারা অজ্ঞানতাবশতঃ তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে থাকে। অতএব, আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কে বোঝাবে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৩০) তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহ্র প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (৩১) সবাই তাঁর অভিমুখী হও এবং ভয় কর, নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (৩২) যারা তাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

খোদায়ী কুদরতের ষষ্ঠ নিদর্শন ঃ ষষ্ঠ নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ্ তাআলারই আদেশে কায়েম আছে। হাজার হাজার বছর সক্রিয় থাকার পরও এগুলোতে কোথাও কোন ত্রুটি দেখা দেয় না। আল্লাহ্ তাআলা যখন এই ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দেবেন, তখন এই মজবুত ও অটুট বস্তুগুলো নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে-চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতঃপর তাঁরই আদেশে সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে সমবেত হবে।

এই ষষ্ঠ নিদর্শনটি প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত সব নিদর্শনের সারমর্ম ও লক্ষ্য। একেই বোঝানোর জন্যে এর আগে পাঁচটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। এরপরে কয়েক আয়াত পর্যন্ত এই বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে।

وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى — যে বস্তু অন্য বস্তুর সাথে কিছু সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রাখে, তাকে তার مثل বলা হয়। সম্পূর্ণরূপে অন্য বস্তুর মত হওয়া এর অর্থ নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলার যে مثل আছে, একথা কোরআনের কয়েক জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে। একটি তো এখানে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ কিন্তু مثال ও مثل থেকে আল্লাহ্ তাআলার সত্তা পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে তওহীদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথমে একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তোমাদের গোলাম-চাকর তোমাদের মতই মানুষ ; আকার-আকৃতি, হাত-পা, মনের চাহিদা ইত্যাদি সব বিষয়ে তোমাদের শরীক। কিন্তু তোমরা তাদের ক্ষমতায় নিজেদের সমান কর না যে, তারাও তোমাদের ন্যায় যা ইচ্ছা করবে এবং যা ইচ্ছা ব্যয় করবে। নিজেদের পুরোপুরি সমকক্ষ তো দূরের কথা, তাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতায় সামান্যতম অংশীদারিত্বেরও অধিকার দাও না। কোন ক্ষুদ্র ও মামুলী শরীককেও তোমরা ভয় কর যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে সে আপত্তি করবে। গোলাম-চাকরদেরকে তোমরা এই মর্যাদাও দাও না। অতএব, চিন্তা কর, ফেরেশতা, মানব ও জিনসহ সমগ্র সৃষ্টজগত আল্লাহ্র সৃজিত ও তাঁরই দাস, গোলাম। তাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র সমকক্ষ অথবা তাঁর শরীক কিরূপে বিশ্বাস কর?

২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, কথাটি সরল ও পরিষ্কার, কিন্তু প্রতিপক্ষ কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে কোন জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা মানে না।

৩০ নং আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অথবা সাধারণ লোককে আদেশ করা হয়েছে যে, যখন জানা গেল যে, শিরক অযৌক্তিক ও মহা অন্যায়, তখন আপনি যাবতীয় মুশরিকসুলভ চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে শুধু ইসলামের দিকে মুখ করুন — فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا

এরপর ইসলাম ধর্ম যে ফিতরত তথা স্বভাব ধর্মের অনুরূপ, একথা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ — فطرة الله বাক্যটি পূর্ববর্তী فاقم বাক্যের ব্যাখ্যা এবং دين حنيف — এর একটি বিশেষ গুণের বর্ণনা, যার অনুসরণের আদেশ আগের বাক্যে দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, دين حنيف হচ্ছে دين فطرت। পরবর্তী বাক্যে এর অর্থ এরূপ বলা

হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ফিতরত বলে সেই ফিতরত বোঝানো হয়েছে, যার উপর আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

ফিতরত বলে কি বোঝানো হয়েছে ঃ এ সম্পর্কে তফসীরকারদের অনেক উক্তির মধ্যে দুইটি উক্তি প্রসিদ্ধ।

(এক) ফিতরত বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে মুসলমান সৃষ্টি করেছেন। যদি পরিবেশ কোন কিছু খারাপ না করে, তবে প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুসলমানই হবে। কিন্তু অভ্যাসগতভাবেই পিতা-মাতা তাকে ইসলামবিরোধী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। ফলে সে ইসলামের উপর কায়েম থাকে না। বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত এক হাদীসে তাই ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ এটাই অধিকাংশ পূর্ববর্তী মনীষীর উক্তি।

(দুই) ফিতরত বলে যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও তাঁকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এর ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায়।

কিন্তু প্রথম উক্তির বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি রয়েছে। (এক) এই আয়াতেই পরে বলা হয়েছে, لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ এখানে خلق الله বলে পূর্বোল্লেখিত فِطْرَتَ اللّٰهِ -কেই বোঝানো হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র এই ফিতরকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অথচ বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর পিতা-মাতা মাঝে-মাঝে সন্তানকে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান করে দেয়। যদি ফিতরতের অর্থ ইসলাম নেয়া হয়, যাতে পরিবর্তন না হওয়ার কথা স্বয়ং এই আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে, তা কিরূপে সহীহ্ হবে? এই পরিবর্তন তো সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়। সর্বত্রই মুসলমানদের চাইতে কাফের বেশী পাওয়া যায়। ইসলাম অপরিবর্তনীয় ফিতরত হলে এই পরিবর্তন কিরূপে ও কেন?

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, হযরত খিযির (আঃ) যে বালককে হত্যা করেছিলেন, তার সম্পর্কে সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে, এই বালকের ফিতরতে কুফর ছিল। তাই খিযির (আঃ) তাকে হত্যা করেন। ফিতরতের অর্থ ইসলাম নিলে প্রত্যেকেরই মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করা জরুরী। কাজেই এই হাদীস তার পরিপন্থী। তৃতীয় আপত্তি এই যে, ইসলাম যদি মানুষের ফিতরতে রক্ষিত এমন কোন বিষয় হয়ে থাকে, যার পরিবর্তন করতেও সে সক্ষম নয়, তবে এটা কোন ইচ্ছাধীন বিষয় হল না। এমতাবস্থায় ইসলাম দ্বারা পরকালের সওয়াব কিরূপে অর্জিত হবে। কারণ, ইচ্ছাধীন কাজ দ্বারাই সওয়াব পাওয়া যায়।

চতুর্থ আপত্তি এই যে, সহীহ্ হাদীসের অনুরূপ ফেকাহ্‌বিদগণের মতে সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে পিতা-মাতার অনুসারী মনে করা হয়। পিতা-মাতা কাফের হলে সন্তানকে কাফের ধরা হয় এবং তার কাফন-দাফন ইসলামী নিয়মে করা হয় না।

এসব আপত্তি ইমাম তুরপুশতী 'মাসাবীহ্' গ্রন্থের টীকায় বর্ণনা করেছেন। এর ভিত্তিতেই তিনি ফিতরতের অর্থ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় উক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই সৃষ্টিগত যোগ্যতা সম্পর্কে একথাও ঠিক যে, এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। যে ব্যক্তি পিতা-মাতা অথবা অন্য কারও প্ররোচনায় কাফের হয়ে যায়, তার মধ্যে ইসলামের সত্যতা চিনে নেবার যোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে যায় না। খিযির (আঃ)-এর হাতে নিহত বালক কাফের হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও এতে জরুরী হয় না যে, তার মধ্যে সত্যকে বোঝার যোগ্যতাই ছিল না। এই আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতাকে মানুষ নিজ ইচ্ছায় ব্যবহার করে। তাই এর কারণে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট। পিতা-মাতা সন্তানকে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান করে দেয়ার যে কথা বোখারী ও মুসলিমে আছে, তার অর্থও ফিতরতের দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, তার যোগ্যতা যদিও জন্মগত ও আল্লাহ্ প্রদত্ত ছিল এবং তাকে ইসলামের দিকেই নিয়ে যেত, কিন্তু বাধা-বিপত্তি অন্তরায় হয়ে গেছে এবং তাকে সেদিকে যেতে দেয়নি। পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত প্রথম উক্তির অর্থও বাহ্যতঃ মূল ইসলাম নয়; বরং ইসলামের এই যোগ্যতাই বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীগণের উক্তির এই অর্থ মোহাদ্দিস-ই-দেহলভী (রহঃ) মেশকাতের টীকা 'লুমআতে' বর্ণনা করেছেন।

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্' গ্রন্থে লিখিত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)-এর আলোচনা দ্বারা এরই সমর্থন পাওয়া যায়। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন মন ও মেজাযের অধিকারী অসংখ্য প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ এক প্রকার যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন, যদ্দ্বারা সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ —আয়াতের মর্মও তাই। অর্থাৎ, যে জীবনকে স্রষ্টা কোন বিশেষ উদ্দেশে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি পথ প্রদর্শনও করেছেন। আলোচ্য যোগ্যতাই হচ্ছে সেই পথ প্রদর্শন। আল্লাহ্ তাআলা মৌমাছির মধ্যে বৃক্ষ ও ফুল চেনা, বেছে নেয়া এবং রস পেটে আহরণ করে চাকে এনে সঞ্চিত করার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এমনিভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এমন যোগ্যতা রেখেছেন, যদ্দ্বারা সে আপন স্রষ্টাকে চিনতে পারে, তার কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য করতে পারে। এরই নাম ইসলাম।

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ —উল্লেখিত বক্তব্য থেকে এই বাক্যের উদ্দেশ্যও ফুটে উঠেছে যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত ফিতরত তথা সত্যকে চেনার যোগ্যতা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। ভ্রান্ত পরিবেশ কাফের করতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করতে পারে না।

এ থেকেই وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ — আয়াতের মর্মও পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে আমার এবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের প্রকৃতিতে আমি এবাদতের আগ্রহ ও যোগ্যতা রেখে দিয়েছি। তারা একে কাজে লাগালে তাদের দ্বারা এবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজ সংঘটিত হবে না।

বাতিলপন্থীদের সংসর্গ এবং ভ্রান্ত পরিবেশ থেকে দূরে থাকা ফরয ঃ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ বাক্যটি খবর আকারের। অর্থাৎ, খবর দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ফিতরতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু এতে এক অর্থ আদেশেরও আছে। অর্থাৎ, পরিবর্তন করা উচিত নয়। তাই এই বাক্য থেকে এ কথাও বোঝা গেল যে, মানুষকে এমনসব বিষয় থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা উচিত, যা তার সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে নিষ্ক্রিয় অথবা দুর্বল করে দেয়। এসব বিষয়ের বেশীর ভাগ হচ্ছে ভ্রান্ত পরিবেশ ও কুসংসর্গ অথবা নিজ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী ও পর্যবেক্ষক না হয়ে বাতিলপন্থীদের পুস্তকাদি পাঠ করা।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ —পূর্বের আয়াতে মানব প্রকৃতিকে সত্য গ্রহণের যোগ্য করার আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا
أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا
بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا
فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا
بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَ
الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ
فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن
شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي
النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

(৩৩) মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের পালনকর্তাকে আহ্বান করে তাঁরই অভিমুখী হয়ে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের পালনকর্তার সাথে শিরক করতে থাকে, (৩৪) যাতে তারা অস্বীকার করে যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব, মজা লুটে নাও, সত্বরই জানতে পারবে। (৩৫) আমি কি তাদের কাছে এমন কোন দলীল নাযিল করেছি, যে তাদেরকে আমার শরীক করতে বলে? (৩৬) আর যখন আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তারা তাতে আনন্দিত হয় এবং তাদের কৃতকর্মের ফলে যদি তাদেরকে কোন দুর্দশা পায়, তবে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। (৩৭) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং হ্রাস করেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৩৮) আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরও। এটা তাদের জন্যে উত্তম, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম। (৩৯) মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহ্‌র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। (৪০) আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারবে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র ও মহান। (৪১) স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।

প্রথমে সত্য গ্রহণের উপায় বলা হয়েছে যে, নামায কায়েম করতে হবে। কেননা, নামায কার্যক্ষেত্রে ঈমান, ইসলাম ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রকাশ করে। এরপর বলা হয়েছে وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ — অর্থাৎ, যারা শিরক করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। মুশরিকরা তাদের ফিতরত তথা সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে কাজে লাগায়নি। এরপর তাদের পথভ্রষ্টতা বর্ণিত হচ্ছে ঃ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا —অর্থাৎ, এই মুশরিক তারা, যারা স্বভাব ধর্মে ও সত্য ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে অথবা স্বভাব ধর্ম থেকে পৃথক হয়ে গেছে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। شيعا শব্দটি شيعة -এর বহুবচন। কোন একজন অনুসৃতের অনুসারী দলকে شيعة বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, স্বভাব ধর্ম ছিল তওহীদ। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সব মানুষেরই একে অবলম্বন করে এক জাতিতে একদল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা তওহীদকে ত্যাগ করে বিভিন্ন লোকের চিন্তাধারার অনুগামী হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারা ও অভিমতে বিরোধ থাকা স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা মযহাব বানিয়ে নিয়েছে। তাদের কারণে জনগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শয়তান তাদের নিজ নিজ মযহাবকে সত্য প্রতিপন্ন করার কাজে এমন ব্যাপৃত করে দিয়েছে যে, كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ —অর্থাৎ, প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে হর্ষোৎফুল্ল। তারা অপরের মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেয়। অথচ তারা সবাই ভ্রান্ত পথে পতিত রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ — পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল যে, রিযিকের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা হ্রাস করে দেন। এ থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিককে তার যথার্থ খাতে ব্যয় করে, তবে এর কারণে রিযিক হ্রাস পায় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি কৃপণতা করে এবং নিজের ধন-সম্পদ সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে, তবে এর ফলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় না।

এই বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এবং হাসান বসরী (রহঃ)-এর মতে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তাতে কৃপণতা করো না; বরং তা হৃষ্টচিত্তে যথার্থ খাতে ব্যয় কর। এতে তোমার ধন-সম্পদ হ্রাস পাবে না। এর সাথে সাথে আয়াতে ধন-সম্পদের কয়েকটি খাতও বর্ণনা করা হয়েছে। (এক) আত্মীয়-স্বজন, (দুই) মিসকীন, (তিন) মুসাফির। অর্থাৎ, আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে দান কর এবং তাদের জন্যে ব্যয় কর। সাথে সাথে আরও বলা হয়েছে যে, এটা তাদের প্রাপ্য, যা আল্লাহ্ তোমাদের ধন-সম্পদে শামিল করে দিয়েছেন। কাজেই দান করার সময় তাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছ বলে বড়াই করো না। কেননা, প্রাপকের প্রাপ্য পরিশোধ করা ইনসাফের দাবী; কোন অনুগ্রহ নয়।

ذوى القربى বলে বাহ্যতঃ সাধারণ আত্মীয় বোঝানো হয়েছে, মাহ্‌রাম হোক বা না হোক। حق বলেও ওয়াজিব—যেমন পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়ের হক কিংবা শুধু অনুগ্রহমূলক হক—সবই বোঝানো হয়েছে। অনুগ্রহমূলক দান অন্যদের করলে যে সওয়াব পাওয়া যায়, আত্মীয়-স্বজনকে করলে তার চাইতে বেশী সওয়াব

পাওয়া যায়। এমন কি, তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ যে ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন গরীব, সে তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের দান করলে তা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় নয়। কেবল আর্থিক সাহায্যই আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য নয় ; বরং তাদের দেখাশোনা, দৈহিক সেবা এবং তা সম্ভব না হলে ন্যূনপক্ষে মৌখিক সহানুভূতি ও সান্ত্বনাদানও তাদের প্রাপ্য। হযরত হাসান বলেন, যার আর্থিক সচ্ছলতা আছে, তার জন্যে আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য হল আর্থিক সাহায্য করা। পক্ষান্তরে যার সচ্ছলতা নেই, তার কাছে দৈহিক সেবা ও মৌখিক সহানুভূতি প্রাপ্য।—(কুরতুবী)

আত্মীয়-স্বজনের পরে মিসকীন ও মুসাফিরের প্রাপ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও ব্যাপক অর্থে তথা সচ্ছলতা থাকতে আর্থিক সাহায্য, নতুবা সদ্ব্যবহার।

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ اَمْوَالِ النَّاسِ —এই আয়াতে একটি কুপ্রথার সংস্কার করা হয়েছে, যা সাধারণ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রচলিত আছে। তা এই যে, আত্মীয়-স্বজনরা সাধারণতঃ একে অপরকে যা দেয় তাতে এদিকে দৃষ্টি রাখা হয় যে, সে-ও আমাদের সময়ে কিছু দেবে; বরং প্রথাগতভাবে কিছু বেশী দেবে। বিয়ে-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে এদিকে লক্ষ্য করেই উপহার-উপঢৌকন দেয়া হয়। আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, আত্মীয়দের প্রাপ্য আদায় করার বেলায় তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবে না এবং কোন প্রতিদানের দিকে দৃষ্টি রাখবে না। যে ব্যক্তি এই নিয়তে দেয় যে, তার ধন-সম্পদ আত্মীয়দের ধন-সম্পদে শামিল হয়ে কিছু বেশী নিয়ে ফিরে আসবে, আল্লাহ্র কাছে তার দানের কোন মর্যাদা ও সওয়াব নেই। কোরআন পাক এই 'বেশী'- কে لِّيَرْبُوَا۟ (সুদ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করেছে যে, এটা সুদের মতই ব্যাপার।

মাসআলা ঃ প্রতিদান পাওয়ার আশায় উপঢৌকন দেয়া ও দান করা খুবই নিন্দনীয় কাজ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে দান অথবা উপহার পায়, তার জন্যে নৈতিক শিক্ষা এই যে, সে-ও সুযোগমত এর প্রতিদান দেবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কেউ কোন উপঢৌকন দিলে সুযোগমত তিনিও তাকে উপঢৌকন দিতেন। এটা ছিল তাঁর অভ্যাস।—(কুরতুবী) তবে এই প্রতিদান এভাবে দেয়া উচিত নয় যে, প্রতিপক্ষ একে তার দানের প্রতিদান মনে করতে থাকে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ — অর্থাৎ, স্থলে, জলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের কুকর্মের কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। তফসীরে রূহুল-মা'আনীতে বলা হয়েছে, 'বিপর্যয়' বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলীর প্রাচুর্য, সব কিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ-বিপদ বোঝানো হয়েছে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, এসব পার্থিব বিপদাপদের কারণ মানুষের গোনাহ্ ও কুকর্ম, তন্মধ্যে শিরক ও কুফর সবচাইতে মারাত্মক। এরপর অন্যান্য গোনাহ্ আসে।

অন্য এক আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে, وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ অর্থাৎ, তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণে। অনেক গোনাহ্ তো আল্লাহ্ ক্ষমাই করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, এই দুনিয়ায় বিপদাপদের সত্যিকার কারণ তোমাদের গোনাহ্; যদিও দুনিয়াতে এসব গোনাহের পুরোপুরি প্রতিফল দেয়া হয় না এবং প্রত্যেক গোনাহ্র কারণেই বিপদ আসে না। বরং অনেক গোনাহ্ তো ক্ষমা করে দেয়া হয়। কোন কোন গোনাহ্র কারণেই বিপদ আসে। দুনিয়াতে প্রত্যেক গোনাহ্র কারণে বিপদ আসলে একটি মানুষও পৃথিবীতে বেঁচে থাকত না। বরং অনেক গোনাহ্ তো আল্লাহ্ মাফই করে দেন। যেগুলো মাফ করেন না, সেগুলোরও পুরোপুরি শাস্তি দুনিয়াতে দেন না; বরং সামান্য স্বাদ আস্বাদন করানো হয় মাত্র ; যেমন এই আয়াতের শেষে আছে, لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا — যাতে আল্লাহ্ তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান। এরপর বলা হয়েছে, কুকর্মের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ প্রেরণ করাও আল্লাহ্ তাআলার কৃপা ও অনুগ্রহই। কেননা, পার্থিব বিপদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গাফেল মানুষকে সাবধান করা, যাতে সে গোনাহ্ থেকে বিরত হয়। এটা পরিণামে তার জন্যে উপকারপ্রদ ও একটি বড় নেয়ামত। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানুষের গোনাহের কারণে আসে ঃ তাই কোন কোন আলেম বলেন, যে ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করে, সে সারা বিশ্বের মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু ও পশু-পক্ষীদের প্রতি অবিচার করে। কারণ, তার গোনাহ্র কারণে অনাবৃষ্টি ও অন্য যেসব বিপদাপদ দুনিয়াতে আসে, তাতে সব প্রাণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কেয়ামতের দিন এরা সবাই গোনাহ্গার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।

শাকীক যাহেদ বলেন, যে ব্যক্তি হারাম মাল খায়, সে কেবল যার কাছ থেকে এই মাল নেয়া হয়েছে, তার প্রতিই জুলুম করে না ; বরং সমগ্র মানব জাতির প্রতিই অবিচার করে থাকে। —(রূহুল-মা'আনী) কারণ, প্রথমতঃ একজনের জুলুম দেখে অন্যদের মধ্যেও জুলুম করার অভ্যাস গড়ে উঠে এবং এটা সমগ্র মানবতাকে গ্রাস করে নেয়। দ্বিতীয়তঃ তার জুলুমের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ আসে, যদ্দ্বারা সব মানুষই কম-বেশী প্রভাবান্বিত হয়।

একটি আপত্তির জওয়াব ঃ সহীহ্ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই বাণী বিদ্যমান রয়েছে যে, দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফেরের জান্নাত। কাফেরকে তার সৎ কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই ধন-সম্পদ ও স্বাস্থ্যের আকারে দান করা হয়। মুমিনের কর্মসমূহের প্রতিদান পরকালের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়। আরও বলা হয়েছে, দুনিয়াতে মুমিনের দৃষ্টান্ত একটি নাজুক শাখাবিশেষ, যাকে বাতাস কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে নিয়ে যায়। আবার কোন সময় সোজা করে দেয়। এমতাবস্থায়ই সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। অন্য এক হাদীসে আছে اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل —অর্থাৎ, দুনিয়াতে পয়গম্বরগণের উপর সর্বাধিক বিপদাপদ আসে। এরপর তাঁদের নিকটবর্তী, অতঃপর তাঁদের নিকটবর্তীদের উপর আসে।

এসব সহীহ্ হাদীস বাহ্যতঃ আয়াতের বিপরীত। দুনিয়াতে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষও করা হয় যে, মুমিন-মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে এবং কাফেররা বিলাসিতায় মগ্ন থাকে। আয়াত অনুযায়ী যদি দুনিয়ার বিপদাপদ ও কষ্ট গোনাহ্র কারণে হত, তবে ব্যাপার উল্টো হত।

জওয়াব এই যে, আয়াতে গোনাহ্কে বিপদাপদের কারণ বলা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কারণ বলা হয়নি যে, কারও উপর কোন বিপদ আসলে তা একমাত্র গোনাহ্র কারণেই আসবে এবং যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হবে, সে অবশ্যই গোনাহ্গার হবে। বরং নিয়ম এই যে, কারণ সংঘটিত হলে ঘটনা অধিকাংশ সময় সংঘটিত হয়ে যায় এবং কখনও অন্য কারণ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ۝ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ
يَصَّدَّعُونَ ۝ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ۝ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ
أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ
الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَ
لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا
عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ
فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ
كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَإِنْ
كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ۝

(৪২) বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। (৪৩) যে দিবস আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাহৃত হবার নয়, সেই দিবসের পূর্বে আপনি সরল ধর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন। সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৪৪) যে কুফর করে, তার কুফরের জন্যে সে-ই দায়ী এবং যে সৎকর্ম করে, তারা নিজেদের পথই শুধরে নিচ্ছে। (৪৫) যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে যাতে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রতিদান দেন। নিশ্চয় তিনি কাফেরদের ভালবাসেন না। (৪৬) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের আস্বাদন করান এবং যাতে তাঁর নির্দেশে জাহাজসমূহ বিচরণ করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (৪৭) আপনার পূর্বে আমি রসূলগণকে তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর যারা পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি দিয়েছি। মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। (৪৮) তিনি আল্লাহ্, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা পৌছান ; তখন তারা আনন্দিত হয়। (৪৯) তারা প্রথম থেকেই তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পূর্বে নিরাশ ছিল।

অন্তরায় হয়ে যাওয়ার ফলে প্রথম কারণের প্রভাব জাহির হয় না; যেমন কেউ দাস্ত আনয়নকারী ওষুধ সম্পর্কে বলে যে, এটা সেবন করলে দাস্ত হবে। একথা এস্থলে ঠিক, কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য ওষুধ ও যথাযথ খাদ্য অথবা জলবায়ুর প্রভাবেও দাস্ত হয় না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন উপসর্গের কারণে জ্বর নিরাময়কারী ওষুধের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না; ঘুমের বটিকা সেবন করেও অনেক সময় ঘুম আসে না।

কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই যে, গোনাহ্‌র কারণে বিপদাপদ আসা, এটাই গোনাহর আসল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য কারণও এর প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। ফলে বিপদাপদ প্রকাশ পায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন গোনাহ্ ছাড়াই বিপদাপদ আসাও এর পরিপন্থী নয়। কারণ, আয়াতে বলা হয়নি যে, গোনাহ্ না করলে কেউ কোন বিপদে পতিত হয় না। অন্য কোন কারণেও বিপদাপদ আসা সম্ভবপর ; যেমন পয়গম্বর ও ওলীগণের বিপদাপদের কারণ গোনাহ্ নয়; বরং তাঁদেরকে পরীক্ষা করা। পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা, এসব বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে।

এছাড়া কোরআন পাক সব বিপদাপদকে গোনাহর ফল সাব্যস্ত করেনি; এবং যেসব বিপদ সমগ্র বিশ্ব অথবা সমগ্র শহর কিংবা জনপদকেই ঘিরে ফেলে এবং তার প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষ ও জন্তুর মুক্ত থাকা সম্ভব হয় না, সেসব বিপদাপদকে সাধারণতঃ গোনাহ্‌র এবং বিশেষতঃ প্রকাশ্য গোনাহর ফল সাব্যস্ত করেছে। ব্যক্তিগত কষ্ট ও বিপদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। বরং এ ধরনের বিপদ কখনও পরীক্ষার জন্যেও প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তার পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে এই মুসীবত প্রকৃতপক্ষে তার জন্যে রহমত হয়ে দেখা দেয়। তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাউকে বিপদে পতিত দেখে একথা বলা যায় না যে, সে অত্যন্ত গোনাহ্‌গার। এমনিভাবে কাউকে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল দেখে এরূপ বলা যায় না যে, সে খুব সৎকর্মপরায়ণ বুযুর্গ। হাঁ, ব্যাপকাকারের বিপদাপদ—যেমন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদির প্রধান কারণ মানুষের প্রকাশ্য গোনাহ্ ও পাপাচার হয়ে থাকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (রহঃ) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' গ্রন্থে বলেন, এ জগতে ভাল-মন্দ, বিপদ-সুখ, কষ্ট ও আরামের কারণ দু'প্রকার ; (এক) বাহ্যিক ও (দুই) আভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক কারণ বলতে বৈষয়িক কারণই বোঝায়, যা সবার দৃষ্টিগ্রাহ্য বোধগম্য কারণ। আভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে মানুষের কর্মকাণ্ড এবং তার ভিত্তিতে ফেরেশতাদের সাহায্য-সমর্থন অথবা অভিশাপ ও ঘৃণা। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের কারণ সমুদ্র থেকে উত্থিত বাষ্প, মৌসুমী বায়ু যা উপরের বায়ুতে পৌছে বরফে পরিণত হয়, অতঃপর সূর্যকিরণে গলিত হয়ে বর্ষিত হয়। কিন্তু হাদীসে এসব বিষয়কে ফেরেশতাদের কর্ম বলা হয়েছে। বাস্তবে এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। একই বিষয়ের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তাই বাহ্যিক হেতু বিজ্ঞানীদের উল্লেখিত কারণ হতে পারে এবং আভ্যন্তরীণ কারণ ফেরেশতাদের কর্ম-উভয় প্রকার কারণ একত্রিত হয়ে গেলেই বৃষ্টিপাত আশানুরূপ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পন্ন হয় এবং তার একত্রীকরণ না হলে বৃষ্টিপাতে ত্রুটি দেখা দেয়।

হযরত শাহ্ সাহেব বলেন, এমনিভাবে দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু

কারণও প্রাকৃতিক-বৈষয়িক, যা সৎ-অসৎ চেনে না। অগ্নির কাজ জ্বালানো। সে মুত্তাকী ও পাপাচারী নির্বিশেষে সবাইকে জ্বালাবে। তবে যদি বিশেষ ফরমান দ্বারা তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, তবে তা ভিন্ন কথা। যেমন নমরূদের অগ্নিকে ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেয়া হয়েছিল। পানি ওজনবিশিষ্ট বস্তুকে নিমজ্জিত করার জন্যে। সে এ কাজ করবেই। এমনিভাবে অন্যান্য উপাদানসমূহও আপন-আপন কাজে নিয়োজিত আছে। এই প্রাকৃতিক কারণ কারও জন্যে সুখকর হয় এবং কারও জন্যে বিপদাপদেরও কারণ হয়ে পড়ে।

এসব বাহ্যিক কারণের ন্যায় মানুষের নিজের ভাল-মন্দ কর্মকাণ্ড এবং বিপদাপদও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হয়ে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি অথবা দলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার কারণ একত্রিত হয়ে যায়, তখন সেই ব্যক্তি অথবা দল জগতে পূর্ণমাত্রায় সুখ ও শান্তিলাভ করে। সবাই এটা প্রত্যক্ষ করে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অথবা দলের জন্যে প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণও বিপদাপদ আনয়ন করে এবং তার নিজের কর্মকাণ্ডও বিপদ ও কষ্ট ডেকে আনে, সেই ব্যক্তি অথবা দলের বিপদও পূর্ণমাত্রায় হয়ে থাকে, যা সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়।

মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণ তো বিপদাপদের উপরই একত্রিত আছে, কিন্তু তার সৎকর্ম শান্তি ও সুখ দাবী করে। এমতাবস্থায় তার এসব আভ্যন্তরীণ কারণ তার বাহ্যিক বিপদ দূরীকরণ অথবা হ্রাস করার কাজেই ব্যয়িত হয়ে যায়। ফলে তার সুখ ও আরাম পূর্ণমাত্রায় সামনে আসে না। এর বিপরীতে মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক কারণসমূহ সুখ ও আরাম চায়, কিন্তু আভ্যন্তরীণ কারণ অর্থাৎ, তার কাজকর্ম মন্দ হওয়ার কারণে বিপদাপদ চায়। এ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী চাহিদার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনে না সুখ-শান্তি পূর্ণমাত্রায় থাকে এবং না প্রভূত বিপদাপদ তাকে ঘিরে রাখে।

এমনিভাবে কোন কোন সময় প্রাকৃতিক কারণসমূহকে কোন উচ্চস্তরের নবী-রসূল ও ওলীয়ে কামেলের জন্যে প্রতিকূল করে তাঁর পরীক্ষার জন্যেও ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়টি বুঝে নিলে আয়াত ও হাদীসসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র ও ঐক্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। পরস্পর বিরোধিতা অবশিষ্ট থাকে না।

বিপদের সময় পরীক্ষা ও বিপদে ফেলা অথবা শাস্তি ও আযাবের মধ্যে পার্থক্য ঃ বিপদাপদ দ্বারা কিছু লোককে তাদের গোনাহর শাস্তি দেয়া হয় এবং কিছু লোককে মর্যাদা বৃদ্ধি অথবা কাফফারার জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ বিপদে নিক্ষেপ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে বিপদাপদের আকার একই রূপ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় উভয়ের পার্থক্য কিরূপে বোঝা যাবে? এর পরিচয় শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (রহঃ) লিখেছেন যে, যে সাধু ব্যক্তি পরীক্ষার্থে বিপদাপদে পতিত হয়, আল্লাহ্ তাঁর অন্তর প্রশান্ত করে দেন। সে এসব বিপদাপদে রোগীর তিক্ত ওষুধ খেতে অথবা অপারেশন করাতে কষ্ট সত্ত্বেও সম্মত থাকার মত সন্তুষ্ট থাকে; বরং এর জন্যে সে টাকা-পয়সা ব্যয় করে, সুপারিশ যোগাড় করে। যেসব পাপীকে শাস্তি হিসাবে বিপদে ফেলা হয়, তাদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের হা-হুতাশ ও হৈ-চৈ এর অন্ত থাকে না। মাঝে মাঝে অকৃতজ্ঞতা এমন কি, কুফরী বাক্যে পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এক পরিচয় এই বর্ণনা করেছেন যে, যে বিপদের কারণে মানুষ আল্লাহ্র প্রতি অধিক মনোযোগী, অধিক সতর্ক এবং তওবা ও এস্তেগফারের প্রতি অধিক আগ্রহী হয়, সে বিপদ শাস্তির বিপদ নয়; বরং মেহেরবানী ও কৃপা। পক্ষান্তরে যার অবস্থা এরূপ হয় না, বরং হা-হুতাশ করতে থাকে এবং পাপকার্যে অধিক উৎসাহী হয়, তার বিপদ খোদায়ী গযব ও আযাবের আলামত।

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ۚ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

— অর্থাৎ, আমি অপরাধী কাফেরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা কৃপাবশতঃ মুমিনের সাহায্য করাকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। বাহ্যতঃ এর ফলে কাফেরদের মোকাবেলায় মুসলমানদের কোন সময় পরাজিত না হওয়া উচিত ছিল। অথচ অনেক ঘটনা এর খেলাফও হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এর জওয়াব আয়াতের মধ্যেই নিহিত আছে যে, মুমিন বলে কাফেরদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্র ওয়াস্তে জেহাদ করে, তাদের বোঝানো হয়েছে। এমন খাঁটি লোকদের প্রতিশোধই আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং তাদের বিজয়ী করেন। যেখানে এর বিপরীত কোন কিছু ঘটে, সেখানে জেহাদকারীদের পদস্খলন তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে থাকে; যেমন ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে স্বয়ং কোরআনে আছে — اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا অর্থাৎ, তাদের কতক ভ্রান্ত কর্মের কারণে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়ে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্ তাআলা পরিণামে মুমিনদেরই বিজয় দান করেন—যদি তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। ওহুদ যুদ্ধে তাই হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শুধু নামে মুমিন, আল্লাহ্র বিধানাবলীর অবাধ্য এবং কাফেরদের বিজয়ের সময়ও গোনাহ্ থেকে তওবা করে না, তারা এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আল্লাহ্র সাহায্যের যোগ্য পাত্র নয়। এমনি যোগ্যতা ব্যতিরেকেও আল্লাহ্ তাআলা দয়াবশতঃ সাহায্য ও বিজয় প্রদান করে থাকেন। অতএব, এর আশা করা এবং দোয়া করতে থাকা সর্বাবস্থায় উপকারী।

فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ
أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ
لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾
وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ
بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ
ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ
كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ
الْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا
يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ
ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ
بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾

(৫০) অতএব, আল্লাহ্‌র রহমতের ফল দেখে নাও, কিভাবে তিনি মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। নিশ্চয় তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৫১) আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা শস্যকে হলদে হয়ে যেতে দেখে, তখন তো তারা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (৫২) অতএব, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না এবং বধিরকেও আহ্বান শোনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। (৫৩) আপনি অন্ধদেরও তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরই শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। কারণ, তারা মুসলমান। (৫৪) আল্লাহ্, তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন, অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিদান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (৫৫) যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহূর্তেরও বেশী অবস্থান করিনি। এমনিভাবে তারা সত্যবিমুখ হত। (৫৬) যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে, তারা বলবে, তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব মতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা তা জানতে না।'(৫৭) সেদিন জালেমদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তওবা করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও তাদের দেয়া হবে না। (৫৮) আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। আপনি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন, তবে কাফেররা অবশ্যই বলবে, তোমরা সবাই মিথ্যাপন্থী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না। মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা আছে কিনা, সাধারণ মৃতরা জীবিতদের কথা শোনে কিনা-সূরা নমলের তফসীরে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এই সূরার একটি বড় অংশ কেয়ামত অস্বীকারকারীদের আপত্তি নিরসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই উদ্দেশে আল্লাহ্ তাআলার সর্বশক্তি ও পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অনেক নিদর্শন বর্ণনা করে অনবধান মানুষকে সচেতন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখিত প্রথম আয়াতে এক নতুন ভঙ্গিতে এই বিষয়বস্তু প্রমাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ স্বভাবতই ত্বরা-প্রিয়। সে বর্তমানের বিষয়ে মগ্ন হয়ে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হয়ে যেতে অভ্যস্ত। তার এই অভ্যাসই তাকে অনেক মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিপতিত করে। যৌবনে তার মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় শক্তি থাকে। সে এই শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং বিশেষ কোন ভাবে গণ্ডিবদ্ধ থাকা তার কাছে কষ্টকর মনে হয়। মানুষকে হুশিয়ার করার জন্যে আলোচ্য আয়াতে শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে মানুষের অস্তিত্বের একটি পরপূর্ণ চিত্র পেশ করা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, মানুষের সূচনাও দুর্বল এবং পরিণতিও দুর্বল। মাঝখানে কিছু দিনের জন্যে সে শক্তিলাভ করে। এই ক্ষণস্থায়ী শক্তির যমানায় নিজের পূর্বের দুর্বলতা ও পরবর্তী দুর্বলতাকে বিস্মৃত না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বরং যে দুর্বলতা অতিক্রম করে সে শক্তি ও যৌবন পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার বিভিন্ন স্তর সর্বদা সামনে রাখা আবশ্যক।

خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ — বাক্যে মানুষকে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, তুমি তোমার আসল ভিত্তি দেখে নাও তা কতটুকু দুর্বল ; বরং তুমি তো ছিলে সাক্ষাত দুর্বলতার প্রতীক। তুমি ছিলে এক ফোঁটা নির্জীব, চেতনাহীন, অপবিত্র ও নোংরা বীর্য। এ বিষয়ে চিন্তা কর যে, কার শক্তি ও প্রজ্ঞা এই নোংরা ফোঁটাকে প্রথমে জমাট রক্তে, অতঃপর রক্তকে মাংসে রূপান্তরিত করেছে। এরপর মাংসের মধ্যে অস্থি গেঁথে দিয়েছে। অতঃপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করেছে। ফলে ক্ষুদ্র একটি অস্তিত্ব ভ্রাম্যমাণ ফ্যাক্টরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এতে হাজার হাজার বিচিত্র স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সংযুক্ত রয়েছে। আরও বেশী চিন্তা করলে দেখবে যে, এ একটা ফ্যাক্টরীই নয় ; বরং ক্ষুদ্র একটি জগত। এর অস্তিত্বের মধ্যে সারা বিশ্বের নমুনা শামিল রয়েছে। এর নির্মাণ কাজও কোন বিশাল ওয়ার্কশপেও নয় ; বরং মাতৃগর্ভের তিনটি অন্ধকারে সম্পন্ন হয়েছে। নয় মাস এই সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মাতৃগর্ভের রক্ত ও আবর্জনা খেয়ে খেয়ে মানুষের অস্তিত্ব সৃজিত হয়েছে।

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ এরপর আল্লাহ্ তাআলা তার বিকাশ লাভের জন্যে পথ সুগম করে দিয়েছেন। এ জগতে আসার পর তার অবস্থা ছিল এই ঃ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا — অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদের যখন বের করলেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। এখন শিক্ষা-দীক্ষার পালা শুরু হল। সর্বপ্রথম তিনি ক্রন্দনের কৌশল শিক্ষা দিলেন, যাতে মাতা-পিতা তোমাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে তোমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণে সচেষ্ট হয়। এরপর ঠোঁট ও মাড়ি চেপে জননীর বক্ষ থেকে দুধ বের করার বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, যাতে

তোমরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পার। কার সাধ্য ছিল যে, এই বোধশক্তিহীন শিশুকে তার বর্তমান প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট এ দু'টি বিদ্যা শিক্ষা দেয়? তার স্রষ্টা ব্যতীত কারও এরূপ করার শক্তি ছিল না। এ তো এক ক্ষীণ শিশু। একটু বাতাস লাগলেই বিমর্ষ হয়ে যাবে। সামান্য শীতে কিংবা গরমে অসুস্থ হয়ে পড়বে। নিজের কোন প্রয়োজন চাওয়ার ক্ষমতা নেই এবং কোন কষ্টও দূর করতে সক্ষম নয়। এখন থেকে চলুন এবং যৌবনকাল পর্যন্ত তার ক্রমোন্নতির সিঁড়িগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন, কুদরত ও শক্তির বিস্ময়কর নুমনা সামনে আসবে।

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً — এখন সে শক্তির সিঁড়িতে পা রেখে আকাশ-কুসুম পরিকল্পনায় মেতে উঠেছে, চন্দ্র ও মঙ্গল-গ্রহে জাল পাততে শুরু করেছে, জলে ও স্থলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছে এবং নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হয়ে مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (আমার চাইতে অধিক শক্তিশালী কে?)-এর শ্লোগান দিতে দিতে এতদূর পৌঁছে গেছে যে, আপন স্রষ্টা ও তাঁর বিধানাবলীর অনুসরণ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ্ বলেন, ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً —হে গাফেল, খুব মনে রেখ তোমার এই শক্তি ক্ষণস্থায়ী। তোমাকে আবার দুর্বল অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। ধীরে ধীরে দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবে এবং একসময়ে চুল সাদা হয়ে বার্ধক্য ফুটে উঠবে। এরপর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা হবে। পৃথিবীর ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থে নয়—নিজ অস্তিত্বের দেয়ালে লিখিত এই গোপন লিপি পাঠ করলে এ বিশ্বাস ছাড়া উপায় থাকবে না যে, يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ — অর্থাৎ, এগুলো সব সেই রাব্বুল ইয্যতেরই কারসাজি, তিনি যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। জ্ঞানেও তিনি শ্রেষ্ঠ, কুদরতেও তিনি শ্রেষ্ঠ। এরপরও কি তিনি মৃতদেহকে যখন ইচ্ছা, পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন কিনা এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে?

অতঃপর আবার কেয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রলাপোক্তি ও মূর্খতা বর্ণিত হচ্ছেঃ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ —অর্থাৎ, যেদিন কেয়ামত অস্বীকারকারীরা তখনকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলীতে অভিভূত হয়ে কসম খাবে যে, তারা এক মুহূর্তের বেশী অবস্থান করেনি। এর অর্থ দুনিয়ার অবস্থান হতে পারে। কারণ, তাদের দুনিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু এখন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই সুখের দিনকে সংক্ষিপ্ত মনে করে। তাই তারা কসম খেয়ে বলবে যে, দুনিয়াতে তাদের অবস্থান খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল।

এখানে কবর ও বরযখের অবস্থান অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, আমরা মনে করেছিলাম কবরে তথা বরযখে দীর্ঘকাল অবস্থান করতে হবে এবং কেয়ামত বহু বছর পরে সংঘটিত হবে। কিন্তু ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেছে। আমরা বরযখে অল্প কিছুক্ষণ থাকতেই কেয়ামত এসে হাযির। তাদের এরূপ মনে হওয়ার কারণ এই যে, কেয়ামত তাদের জন্যে সুখকর নয়; বরং বিপদই বিপদ হয়ে দেখা দেবে। মানুষের স্বভাব এই যে, বিপদে পড়ে অতীত সুখের দিনকে সে খুবই সংক্ষিপ্ত মনে করে। কাফেররা যদিও কবরে তথা বরযখেও আযাব ভোগ করবে, কিন্তু কেয়ামতের আযাবের তুলনায় সেই আযাব আযাব নয়—সুখ মনে হবে এবং সেই সময়কালকে সংক্ষিপ্ত মনে করে কসম খাবে যে, কবরে তারা মাত্র এক মুহূর্ত অবস্থান করেছে।

كَذٰلِكَ يَطۡبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوۡبِ الَّذِيۡنَ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ۝ فَاصۡبِرۡ اِنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ الَّذِيۡنَ لَا يُوۡقِنُوۡنَ ۝

سُوۡرَةُ لُقۡمٰنَ مَكِّيَّةٌ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

الٓمّٓ ۝ تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ الۡحَكِيۡمِ ۝ هُدًى وَّرَحۡمَةً لِّلۡمُحۡسِنِيۡنَ ۝ الَّذِيۡنَ يُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤۡتُوۡنَ الزَّكٰوةَ وَهُمۡ بِالۡاٰخِرَةِ هُمۡ يُوۡقِنُوۡنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنۡ رَّبِّهِمۡ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنۡ يَّشۡتَرِىۡ لَهۡوَ الۡحَدِيۡثِ لِيُضِلَّ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِيۡنٌ ۝ وَاِذَا تُتۡلٰى عَلَيۡهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسۡتَكۡبِرًا كَاَنۡ لَّمۡ يَسۡمَعۡهَا كَاَنَّ فِىۡۤ اُذُنَيۡهِ وَقۡرًا ۚ فَبَشِّرۡهُ بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍ ۝ اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ جَنّٰتُ النَّعِيۡمِ ۝ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ؕ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٍ تَرَوۡنَهَا وَاَلۡقٰى فِى الۡاَرۡضِ رَوَاسِىَ اَنۡ تَمِيۡدَ بِكُمۡ وَبَثَّ فِيۡهَا مِنۡ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَاَنۡزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنۡۢبَتۡنَا فِيۡهَا مِنۡ كُلِّ زَوۡجٍ كَرِيۡمٍ ۝

(৫৯) এমনিভাবে আল্লাহ্ জ্ঞানহীনদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন। (৬০) অতএব, আপনি সবর করুন। আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।

সূরা লোকমান

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৩৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু।

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) এগুলো প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত। (৩) হেদায়েত ও রহমত সৎকর্মপরায়ণদের জন্যে। (৪) যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (৫) এসব লোকই তাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে আগত হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই সফলকাম। (৬) একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে গোমরাহ্ করার উদ্দেশে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (৭) যখন ওদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন ওরা দম্ভের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা তা শুনতেই পায়নি অথবা যেন ওদের দু' কান বধির। সুতরাং ওদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। (৮) যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে ভরা জান্নাত। (৯) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্র ওয়াদা যথার্থ। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (১০) তিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন; তোমরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জন্তু। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর তাতে উদ্গত করেছি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদরাজি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হাশরে আল্লাহ্র সামনে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে কি ? ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাশরে কাফেররা কসম খেয়ে এই মিথ্যা কথা বলবে, আমরা দুনিয়াতে অথবা কবরে এক মুহূর্তের বেশী থাকিনি। অন্য এক আয়াতে মুশরিকদের এই উক্তি বর্ণিত আছে, وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشۡرِكِيۡنَ —অর্থাৎ, তারা কসম খেয়ে বলবে আমরা মুশরিক ছিলাম না। কারণ এই যে, হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলামীনের আদালত কায়েম হবে। তিনি সবাইকে স্বাধীনতা দেবেন। তারা সত্য কিংবা মিথ্যা যে কোন বিবৃতি দিতে পারবে। কেননা, রাব্বুল আলামীনের ব্যক্তিগত জ্ঞানও পূর্ণমাত্রায় আছে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্যে তিনি তাদের স্বীকারোক্তি করা না করার মুখাপেক্ষী নন। মানুষ যখন মিথ্যা বলবে, তখন তার মুখ মোহরাঙ্কিত করে দেয়া হবে এবং তার হস্ত-পদ ও চর্ম থেকে সাক্ষ্য নেয়া হবে। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা বিবৃত করে দেবে। এরপর আর কোন প্রমাণ আবশ্যক হবে না। اَلۡيَوۡمَ نَخۡتِمُ عَلٰۤى اَفۡوَاهِهِمۡ وَتُكَلِّمُنَاۤ ...... —আয়াতের অর্থ তাই। কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, হাশরের মাঠে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নরূপ হবে। এক অবস্থানস্থলে আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কারও কথা বলার অধিকার থাকবে না। যাকে অনুমতি দেয়া হবে, সে কেবল সত্য ও নির্ভুল কথা বলতে পারবে—মিথ্যা বলার সামর্থ্য থাকবে না। যেমন এরশাদ হয়েছে,

لَّا يَتَكَلَّمُوۡنَ اِلَّا مَنۡ اَذِنَ لَهُ الرَّحۡمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

কবরে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে না ঃ এর বিপরীতে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কবরে যখন কাফেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোর পালনকর্তা কে এবং মুহাম্মদ (সাঃ) কে? তখন সে বলবে, **هاه هاه لا ادرى** —অর্থাৎ, হায়, হায়, আমি কিছুই জানি না। সেখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা থাকলে 'আমার পালনকর্তা আল্লাহ্' বলে দেয়া মোটেই কঠিন ছিল না। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে যে, কাফেররা আল্লাহ্র সামনে মিথ্যা বলতে সক্ষম হবে এবং ফেরেশতাদের সামনে মিথ্যা বলতে পরবে না! কিন্তু চিন্তা করলে এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ, ফেরেশতা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং হস্ত-পদের সাক্ষ্য নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করার ক্ষমতাও তাদের নেই। তাদের সামনে মিথ্যা বলার শক্তি থাকলে সব কাফের ও পাপাচারীই কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ হৃদয়ের অবস্থা জানেন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নিয়ে মিথ্যা ফাঁস করে দেয়ার শক্তিও তিনি রাখেন। কাজেই হাশরে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এই স্বাধীনতা দান বিচার বিভাগীয় ন্যায়বিচারে কোনরূপ ত্রুটি সৃষ্টি করবে না।

সূরা আর-রূম সমাপ্ত

সূরা লোকমান

وَيُؤۡتُوۡنَ الزَّكٰوةَ মক্কায় অবতীর্ণ এ আয়াতে যাকাতের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, মূল যাকাতের আদেশ হিজরতের পূর্বে মক্কায়ই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবে যাকাতের নেসাব নির্ধারণ,

পরিমাণের বিবরণ এবং ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা আদায় করা ও যথার্থ খাতে ব্যয় করার ব্যবস্থাপনা হিজরী দ্বিতীয় সনে সম্পন্ন হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ – **اشترى** শব্দের আভিধানিক অর্থ ক্রয় করা। কোন কোন সময় এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করার অর্থেও **اشتراء** শব্দ ব্যবহৃত হয়। اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ইত্যাদি আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার মুশরিক ব্যবসায়ী নযর ইবনে হারেস বাণিজ্য ব্যাপদেশে বিভিন্ন দেশ সফর করত। সে একবার পারস্য দেশ থেকে কেসরা প্রমুখ আজমী সম্রাটগণের ঐতিহাসিক কাহিনীর বই ক্রয় করে আনল এবং মক্কার মুশরিকদেরকে বলল, মুহাম্মদ তোমাদেরকে আদ, সামূদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কিস্‌সা-কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইস ফেন্দিয়ার প্রমুখ পারস্য সম্রাটগণের সেরা কাহিনী শুনাই। মক্কার মুশরিকরা অত্যন্ত আগ্রহভরে তার আনীত কাহিনী শুনতে থাকে। কারণ, এগুলোতে শিক্ষা বলতে কিছু ছিল না যা পালন করার শ্রম স্বীকার করতে হয়; বরং এগুলো ছিল চটকদার গল্পগুচ্ছ। এর ফলে অনেক মুশরিক, যারা এর আগে কোরআনের অলৌকিকতা ও অদ্বিতীয়তার কারণে একে শোনার আগ্রহ পোষণ করত এবং গোপনে গোপনে শুনতও, তারাও কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ছুতা পেয়ে গেল।—(রূহুল-মা'আনী)

দুররে মনসূরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, উল্লেখিত ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাঁদী ক্রয় করে এনে তাকে কোরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে ফেরানোর কাজে নিয়োজিত করলো। কেউ কোরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শোনাবার জন্যে সে বাঁদীকে আদেশ করত ও বলত, মুহাম্মদ তোমাদেরকে কোরআন শুনিয়ে নামায পড়া, রোযা রাখা এবং ধর্মের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার কথা বলে। এতে কষ্টই কষ্ট। এস এ গানটি শুন এবং উল্লাস কর।

আলোচ্য আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে; এতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ ক্রয় করার অর্থ আজমী সম্রাটগণের কিস্‌সা-কাহিনী অথবা গায়িকা বাঁদী ক্রয় করা। শানে-নুযূলের প্রতি লক্ষ্য করলে আয়াতে **اشتراء** শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ ক্রয় করা।

পরে বর্ণিত لَهْوَ الْحَدِيْثِ – এর ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে **اشتراء** শব্দটিরও এ স্থলে ব্যাপক অর্থ হবে। অর্থাৎ এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করা। ক্রীড়া-কৌতুকের উপকরণ ক্রয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

لَهْوَ الْحَدِيْثِ – বাক্যটিতে **حديث** শব্দের অর্থ কথা, কিসসা-কাহিনী এবং لَهْوٌ শব্দের অর্থ গাফেল হওয়া। যেসব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে গাফেল করে দেয় সেগুলোকে لَهْوٌ বলা হয়। মাঝে মাঝে এমন কাজকেও لَهْوٌ বলা হয়, যার কোন উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নেই, কেবল সময় ক্ষেপণ অথবা মনোরঞ্জনের জন্যে করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ – এর অর্থ ও তফসীর কি, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও জাবের (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে তফসীর করা হয়েছে গান-বাদ্য করা।—(হাকেম, বায়হাকী)

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদগণের মতে গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক কিস্‌সা-কাহিনীসহ যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহ্‌র এবাদত ও স্মরণ থেকে গাফেল করে, সেগুলো সবই لَهْوَ الْحَدِيْثِ – বোখারী ও বায়হাকী স্ব-স্ব কিতাবে لَهْوَ الْحَدِيْثِ – এর এ তফসীরই অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন, **لهو الحديث هو الغناء واشباهه** – অর্থাৎ, لَهْوَ الْحَدِيْثِ – বলে গান ও তদনুরূপ অন্যান্য বিষয় বোঝানো হয়েছে (যা আল্লাহ্‌র এবাদত থেকে গাফেল করে দেয়)। বায়হাকীতে আছে لَهْوَ الْحَدِيْثِ – ক্রয় করার অর্থ গায়ক পুরুষ অথবা গায়িকা নারী ক্রয় করা কিংবা তদনুরূপ এমন অনর্থক বস্তু ক্রয় করা যা মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়। ইবনে জরীরও এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করেছেন।—(রূহুল-মা'আনী) তিরমিযীর এক রেওয়ায়েত থেকেও এরূপ ব্যাপক অর্থ প্রমাণিত হয়। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, গায়িকা বাঁদীদের ব্যবসা করো না। অতঃপর তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যবসা সম্পর্কেই وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ আয়াত নাযিল হয়েছে।

ক্রীড়া-কৌতুক ও তার সাজ-সরঞ্জামাদি সম্পর্কে শরীয়তের বিধান ঃ প্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক কেবল নিন্দার স্থলেই ক্রীড়া ও খেলাধুলার উল্লেখ করেছে। এই নিন্দার সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে মকরূহ হওয়া।—(রূহুল-মা'আনী, কাশ্‌শাফ) আলোচ্য আয়াতটি ক্রীড়া-কৌতুকের নিন্দায় সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

মুস্তাদরাক হাকেমে বর্ণিত হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, 'পার্থিব সকল খেলাধুলা বাতিল ; কিন্তু তিনটি বাতিল নয়; (১) তীর-ধনুক নিয়ে খেলা, (২) অশ্বকে প্রশিক্ষণ দানের খেলা এবং (৩) নিজের স্ত্রীর সাথে হাস্যরসের খেলা। এ তিন প্রকার খেলা বৈধ।

এ হাদীসে প্রত্যেক খেলাকে বাতিল সাব্যস্ত করে যে তিনটি বিষয়ের ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে খেলার অন্তর্ভুক্তই নয়। কেননা, খেলা এমন কাজকে বলা হয়, যাতে কোন উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই। বস্তুতঃ উপরোক্ত তিনটি বিষয়ই উপকারী। এগুলোর সাথে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা জড়িত। তীর নিক্ষেপ ও অশ্বকে প্রশিক্ষণ দেয়া তো জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস সন্তান প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যকে পূর্ণতা দান করে। এগুলোকে কেবল দৃশ্যতঃ ও বাহ্যিক দিক দিয়ে খেলা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো খেলা নয়। অনুরূপভাবে এই তিনটি বিষয় ছাড়া আরও অনেক কাজ আছে, যেগুলোর সাথে ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা সম্পৃক্ত রয়েছে এবং কেবল দৃশ্যতঃ সেগুলোকে খেলা মনে করা হয়। অন্যান্য হাদীসে সেগুলোকেও বৈধ এবং কতককে উত্তম কাজ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, যেসব কাজ প্রকৃতপক্ষে খেলা; অর্থাৎ, যাতে কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেগুলো অবশ্যই নিন্দনীয় ও মকরূহ। তবে কতক একেবারে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কতক প্রকাশ্য হারাম এবং কতক কমপক্ষে মকরূহ তানযিহী অর্থাৎ, অনুত্তম। যেসব কাজ প্রকৃতই খেলা, তার কোনটিই এ বিধানের বাইরে নয়। হাদীসে যেসব খেলাকে ব্যতিক্রমভুক্ত প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলো আসলে খেলার অন্তর্ভুক্তই নয়।

(১) যে খেলা দ্বীন থেকে পথভ্রষ্ট হওয়ার অথবা অপরকে পথভ্রষ্ট করার উপায় হয়, তা কুফর) যেমন আলোচ্য وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ

لَهْوَ الْحَدِيْثِ আয়াতে এর কুফর ও পথভ্রষ্টতা হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং এর শাস্তি অবমাননাকর আযাব উল্লেখ করা হয়েছে, যা কাফেরদের শাস্তি। কারণ, আয়াতটি নযর ইবনে হারেসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সে এই খেলাকে ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কাজে ব্যবহার করেছিল। তাই এ খেলা হারাম তো বটেই, কুফর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

(২) যে খেলা মানুষকে ইসলামী বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নেয় না; কিন্তু কোন হারাম কাজে ও গোনাহে লিপ্ত করে দেয়, এরূপ খেলা কুফর নয়; কিন্তু হারাম ও কঠোর গোনাহ। যেমন জুয়ার ভিত্তিতে হারজিতে সকল প্রকার খেলা অথবা যে খেলা নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয কর্মে অন্তরায় হয়।

অশ্লীল কবিতা, উপন্যাস এবং বাতিলপন্থীদের পুস্তক পাঠ করাও না-জায়েয **:** বর্তমান যুগে অধিকাংশ যুবক-যুবতী অশ্লীল উপন্যাস, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত। এসব বিষয় উপরোক্ত হারাম খেলারই অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে পথভ্রষ্ট বাতিলপন্থীদের চিন্তাধারা অধ্যয়ন করাও সর্ব সাধারণের জন্যে পথভ্রষ্টতার কারণ বিধায় না-জায়েয। তবে গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ জওয়াব দানের উদ্দেশে এগুলো পাঠ করলে তাতে আপত্তির কারণ নেই।

(৩) যেসব খেলায় কুফর নেই এবং কোন প্রকার গোনাহ্ নেই, সেগুলো মকরূহ্। কারণ, এতে অনর্থক কাজে শক্তি ও সময় বিনষ্ট করা হয়।

খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান : উপরোক্ত বিবরণ থেকে খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানও জানা গেছে যে, যেসব সাজ-সরঞ্জাম কুফর অথবা হারাম খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম এবং যেগুলো মকরূহ খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর ব্যবসা করাও মকরূহ। পক্ষান্তরে যেসব সাজ-সরঞ্জাম বৈধ ও ব্যতিক্রমভুক্ত খেলায় ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ এবং যেগুলো বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার খেলায় ব্যবহার করা হয়; সেগুলোর ব্যবসাও অবৈধ।

অনুমোদিত ও বৈধ খেলা : পূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে যে, যে খেলায় কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেসব খেলাই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে অথবা অন্য কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা লাভের জন্যে অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার জন্যে খেলা হয়, সে খেলা শরীয়ত অনুমোদন করে, যদি তাতে বাড়াবাড়ি না করা হয় এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিঘ্নিত না হয়। আর ধর্মীয় প্রয়োজনের নিয়তে খেলা হলে তাতে সওয়াবও আছে।

উপরে বর্ণিত হাদীসে তিনটি খেলাকে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে—তীর নিক্ষেপ, অশ্বারোহণ এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস করা। হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনামতে এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, 'মুমিনের শ্রেষ্ঠ খেলা সাঁতার কাটা এবং নারীর শ্রেষ্ঠ খেলা সূতা কাটা।'

সহীহ্ মুসলিমও মুসনাদে আহমদে হযরত সালাম ইবনে আকওয়া বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারী দৌড়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। প্রতিযোগিতায় কেউ তাঁকে হারাতে পারত না। তিনি একদিন ঘোষণা করলেন কেউ আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত আছে কি? আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। অতঃপর প্রতিযোগিতায় আমি জয়ী হয়ে গেলাম। এ থেকে জানা গেল যে, দৌড় প্রতিযোগিতা বৈধ।

খ্যাতনামা কুস্তিগীর রোকানা একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে কুস্তিতে অবতীর্ণ হলে তিনি তাকে ধরাশায়ী করে দেন।— (আবু দাউদ)

আবিসিনিয়ার কতিপয় যুবক মদীনা তাইয়্যেবায় সামরিক কলা-কৌশল অনুশীলনকল্পে বর্শা ইত্যাদি নিয়ে খেলায় প্রবৃত্ত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে নিজের পেছনে দাঁড় করিয়ে তাদের খেলা উপভোগ করাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন খেলাধুলা অব্যাহত রাখ। (বায়হাকী, কান্‌য) কতক রেওয়ায়েতে আরও আছে তোমাদের ধর্মে শুষ্কতা ও কঠোরতা পরিলক্ষিত হোক — এটা আমি পছন্দ করি না।

অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁরা কোরআন ও হাদীস সম্পর্কিত কাজে ব্যস্ততার ফলে অবসন্ন হয়ে পড়তেন, তখন অবসাদ দূর করার জন্যে মাঝে মাঝে আরবে প্রচলিত কবিতা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা মনোরঞ্জন করতেন।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে "তোমরা মাঝে মাঝে অন্তরকে বিশ্রাম ও আরাম দেবে।— (আবু দাউদ) এ থেকে অন্তর ও মস্তিষ্কের বিনোদন এবং এর জন্যে কিছু সময় বের করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

কতক খেলা, যেগুলো পরিষ্কার নিষিদ্ধ : এমনও কতক খেলা রয়েছে যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, যদিও সেগুলোতে কিছু কিছু উপকারিতা আছে বলেও উল্লেখ করা হয়, যেমন দাবা, চওসর ইত্যাদি। এগুলোর সাথে হারজিত ও টাকা-পয়সার লেনদেন জড়িত থাকলে এগুলো জুয়া ও অকাট্য হারাম। অন্যথায় কেবল চিত্তবিনোদনের উদ্দেশে খেলা হলেও হাদীসে এসব খেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হযরত বুরায়দা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি চওসর খেলায় প্রবৃত্ত হয়, সে যেন তার হাতকে শূকরের রক্তে রঞ্জিত করে। অনুরূপভাবে এক হাদীসে দাবা খেলোয়াড়ের প্রতি অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে।— (নসবুররায়াহ্)

এমনিভাবে কবুতর নিয়ে খেলা করাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। (আবু দাউদ, কান্‌য) এই নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক কারণ এই যে, সাধারণভাবে এসব খেলায় মগ্ন হলে মানুষ জরুরী কাজকর্ম এমন কি নামায, রোযা ও অন্যান্য এবাদত থেকেও অসাবধান হয়ে যায়।

গান ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত বিধান : কয়েকজন সাহাবী উল্লেখিত আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ - এর তফসীর করেছেন গান-বাজনা করা। অন্য সাহাবিগণ ব্যাপক তফসীর করে বলেছেন যে, আয়াতে এমন যে কোন খেলা বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে দেয়।

কোরআন পাকের لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ আয়াতে ইমাম আবু হানীফা, মুজাহিদ মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া প্রমুখ আলেমগণ زور শব্দের তফসীর করেছেন গান-বাজনা।

আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও ইবনে হাব্বান বর্ণিত হযরত আবু মালেক আশ আরীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন :

"আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পাল্টিয়ে তা পান করবে। তাদের সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করবে। আল্লাহ্

তাআলা তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং কতকের আকৃতি বিকৃত করে বানর ও শূকরে পরিণত করে দেবেন।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা মদ, জুয়া, তবলা ও সারেঙ্গী হারাম করেছেন। তিনি আরও বলেন, নেশাগ্রস্ত করে এমন প্রত্যেক বস্তু হারাম।— (আহমদ, আবু দাঊদ)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, "যখন জেহাদলব্ধ সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা হবে, যখন গচ্ছিত বস্তুকে লুটের মাল গণ্য করা হবে, যাকাতকে জরিমানার মত কঠিন মনে করা হবে, যখন পার্থিব সম্পদ লাভের উদ্দেশে শিক্ষা করা হবে, যখন মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য ও মাতার অবাধ্যতা শুরু করবে, যখন বন্ধুকে নিকটে টেনে নেবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, যখন মসজিদসমূহে হট্টগোল হবে, যখন পাপাচারী কুকর্মী ব্যক্তি গোত্রের নেতা হবে, যখন নীচতম ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের প্রধান হবে, যখন দুষ্ট লোকদের সম্মান করা হবে তাদের অনিষ্টের ভয়ে, যখন গায়িকা নারী ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন হবে, যখন মদ্যপান শুরু হবে, যখন মুসলিম সম্প্রদায়ের পরবর্তী লোকগণ পূর্ববর্তীগণকে অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা প্রতীক্ষা কর একটি লাল বর্ণযুক্ত বায়ুর, ভূমিকম্পের, ভূমিধ্বসের, আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার এবং কিয়ামতের এমন নিদর্শনসমূহের যেগুলো একের পর এক প্রকাশ হতে থাকবে, যেমন কোন মালার সূতা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একের পর এক খসে পড়তে থাকে।"

এতদ্ভিন্ন বহু প্রমাণ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে, যাতে গান-বাদ্য হারাম ও না-জায়েয বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে এবং কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে।

বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত সুললিত কণ্ঠে উপকারী তথ্যপূর্ণ কবিতা পাঠ নিষিদ্ধ নয় ঃ অপরপক্ষে কতক রেওয়ায়েত থেকে গান বৈধ বলেও জানা যায়। এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান এই যে, তবলা, সারিন্দা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রযুক্ত নারীকণ্ঠ নিঃসৃত গান হারাম। যেমন উপরোক্ত কোরআনী আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কেবল সুললিত কণ্ঠে যদি কোন কবিতা পাঠ করা হয় এবং পাঠক কোন নারী বা কিশোর না হয়, সাথে সাথে কবিতার বিষয়বস্তু অশ্লীল বা অন্য কোন পাপ-পঙ্কিলতাযুক্ত না হয় তবে জায়েয।

কোন কোন সূফী সাধক গান শুনেছেন বলে যে কথা প্রচলিত আছে তা এধরনের বৈধ গানেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তাঁদের শরীয়তের অনুসরণ ও রসূল (সাঃ)-এর অনুগমন দিবালোকের ন্যায় সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট। তাঁদের সম্পর্কে এরূপ পাপে জড়িয়ে পড়ার ধারণাও করা যেতে পারে না। অনুসন্ধানী সূফীগণ নিজেরাই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক এই বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত আকাশকে কোন স্তম্ভবিহীনভাবে সুবিশাল ছাদরূপে সৃষ্টি করাকে তাঁর অনন্য ক্ষমতা ও সৃষ্টি-কৌশলের উজ্জ্বল নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, এবং সাধারণভাবে প্রচলিত যে, আকাশ একটি গোলাকার বস্তু এবং এরূপ গোলাকার বস্তুতে সাধারণতঃ কোন স্তম্ভ থাকে না। তাহলে আকাশের স্তম্ভ না থাকার কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে?

এর উত্তর এই যে, কোরআনে করীম যেরূপভাবে অধিকাংশ জায়গায় পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে— এতে পৃথিবী বাহ্যতঃ গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী। কিন্তু এর বিশালত্ব ও সুবিস্তীর্ণতার দরুন সাধারণ দৃষ্টিতে তা সমতল বলে প্রতীয়মান হয়। এই সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি করেই বিছানা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আকাশ একটি ছাদের মত পরিদৃষ্ট হয়—যা নির্মাণের জন্য সাধারণতঃ স্তম্ভের প্রয়োজন। সাধারণভাবে প্রচলিত এরূপ ধারণা অনুযায়ীই আকাশকে স্তম্ভবিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা —কুদরতে কামেলা প্রকাশ ও প্রমাণের জন্য এই সুবিশাল গোলকের সৃষ্টিই যথেষ্ট। ইবনে-কাসীর এবং কিছুসংখ্যক তফসীরকারগণের গবেষণা নিঃসৃত সিদ্ধান্ত এই যে, কোরআন-হাদীস অনুসারে আকাশ ও পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার হওয়ার প্রমাণ মেলে না। বরং কোরআনের কোন কোন আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তা গুম্বজাকৃতি বলে জানা যায়। তাদের বক্তব্য এই যে, এক সহীহ্ হাদীসে সূর্য আরশের পাদদেশে পৌঁছে সেজদা করে বলে যে বর্ণনা রয়েছে, আকাশ পূর্ণ গোলাকার হওয়ার পরই তা হওয়া সম্ভব। কেননা, কেবল এ অবস্থাতেই এর উর্ধ্ব ও নিম্নদিক নির্ধারিত হতে পারে।— পরিপূর্ণ গোলকের কোন দিককে উপর বা নীচ বলা চলে না।

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ بَلِ
الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ
لِلّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ
حَمِيْدٌ ﴿١٢﴾ وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۚ
اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ
اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۚ
اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿١٤﴾ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ
بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّاتَّبِعْ
سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾ يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ
فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا
اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾ يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ
بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ۚ
اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا
تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾

(১১) এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি; অতঃপর তিনি ব্যতীত অন্যেরা যা সৃষ্টি করেছে, তা আমাকে দেখাও। বরং জালেমরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে। (১২) আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (১৩) যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলল ঃ হে বৎস, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। (১৪) আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু' বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। (১৫) পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো। (১৬) হে বৎস, কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে, তবে আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ গোপন ভেদ জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন। (১৭) হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। (১৮) অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহের বর্ণনানুযায়ী মহাত্মা লোকমান হযরত আইয়ূব (আঃ)-এর ভাগ্নে ছিলেন। মুকাতেল তাঁর খালাতো ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। 'বায়যাবী' ও অন্যান্য তফসীরে রয়েছে যে, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন এবং হযরত দাউদ (আঃ)– এর সময়েও বেঁচে ছিলেন।

তফসীরে দুররে মনসূরে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনানুযায়ী লোকমান জনৈক আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন—কাঠ চেরার কাজ করতেন। (ইবনে আবী শাইবাহ্, আহমদ ইবনে জরীর ও ইবনুল মুন্‌যির প্রমুখ 'যুহ্‌দ' নামক গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন)। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-এর নিকটে তাঁর (লোকমান) অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন যে, তিনি চেপ্টা নাকবিশিষ্ট, বেঁটে আকারের আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তিনি ফাটা পা ও পুরো ঠোঁটবিশিষ্ট আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন—(ইবনে কাসীর)

জনৈক কৃষ্ণকায় হাবশী হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের খেদমতে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করতে হাযির হয়। হযরত সাঈদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি কৃষ্ণকায় বলে দুঃখ করো না। কারণ, কালো বর্ণধারীদের মধ্যে এমন তিন জন মহান ব্যক্তি আছেন, যারা মানবকুলে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত—হযরত বেলাল, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব কর্তৃক মুক্ত গোলাম হযরত 'মাহ্‌জা' এবং হযরত লোকমান (আঃ)।

হযরত লোকমান কোন নবী ছিলেন না; বরং ওলী, প্রজ্ঞাবান ও বিশিষ্ট মনীষী ছিলেন ঃ ইবনে কাসীর বলেন যে, প্রাচীন ইসলামী মনীষীবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি নবী ছিলেন না। কেবল হযরত ইকরিমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু এর বর্ণনাসূত্র (সনদ) দুর্বল। ইমাম বগবী বলেন যে, একথা সর্বসম্মত যে, তিনি বিশিষ্ট ফকীহ্ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন, নবী ছিলেন না। —(মাযহারী)

ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন যে, তাঁর সম্পর্কে হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ) থেকে এক বিস্ময়কর রেওয়ায়েত আছে যে, আল্লাহ্ পাক হযরত লোকমানকে নবুওয়ত ও হেকমত (প্রজ্ঞা)–দুয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ দেন। তিনি হেকমতই (প্রজ্ঞা) গ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁকে নবুওয়ত গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। তিনি আরয করলেন যে, "যদি আমার প্রতি এটা গ্রহণ করার নির্দেশ হয়ে থাকে, তবে তা শিরোধার্য। অন্যথায় আমাকে ক্ষমা করুন।"

হযরত কাতাদা (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, মনীষী লোকমানের নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনি হেকমতকে (প্রজ্ঞা) নবুওয়ত থেকে সমধিক গ্রহণযোগ্য কেন মনে করলেন, যখন আপনাকে যে কোন একটা গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল? তিনি বললেন যে, নবুওয়ত বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ। যদি তা আমার ইচ্ছা ব্যতীত প্রদান করা হতো, তবে স্বয়ং মহান আল্লাহ্ তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন ; যাতে আমি সে কর্তব্যসমূহ পালন করতে সক্ষম হই। কিন্তু যদি আমি তা স্বেচ্ছায় চেয়ে নিতাম, তবে সে দায়িত্ব আমার উপর বর্তাতো।— (ইবনে কাসীর)

যখন মহাত্মা লোকমানের নবী না হওয়ার কথা অধিকাংশ ইসলামী বিশেষজ্ঞ কর্তৃক স্বীকৃত, তখন তাঁর প্রতি কোরআনে বর্ণিত যে নির্দেশ

أَنِ اشْكُرْ لِيْ (আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর)-তা এল্হামের মাধ্যমেও হতে পারে ; যা আল্লাহ্র ওলীগণ লাভ করে থাকেন।

মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে শরীয়তী মাসআলাসমূহ সম্পর্কে জনগণের নিকট ফতোয়া দিতেন। হযরত দাউদ (আঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তিনি এ ফতোয়া প্রদান কার্য পরিত্যাগ করেন এই বলে যে, এখন আর তার প্রয়োজন নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি ইসরাঈল গোত্রের বিচারপতি ছিলেন। হযরত লোকমানের বহু জ্ঞানগর্ভ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ বলেন যে, আমি হযরত লোকমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দশ হাজারের চাইতেও বেশী অধ্যায় অধ্যয়ন করেছি। — (কুরতুবী)

একদিন হযরত লোকমান এক বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বহু জ্ঞানগর্ভ কথা শোনাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো যে, আপনি কি সে ব্যক্তি-যে আমার সাথে অমুক বনে ছাগল চরাতো? লোকমান বলেন, হাঁ-আমিই সে লোক। অতঃপর লোকটি বললো, তবে আপনি এ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন যে, খোদার গোটা সৃষ্টিকুল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আপনার বাণী শোনার জন্যে দূর-দূরান্ত থেকে এসে জমায়েত হয়? উত্তরে লোকমান বললেন যে, এর কারণ আমার দু'টি কাজ-(এক) সর্বদা সত্য বলা, (দুই) অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত লোকমান বলেছেন যে, এমন কতকগুলো কাজ আছে যা আমাকে এ স্তরে উন্নীত করেছে। যদি তুমি তা গ্রহণ কর, তবে তুমিও এ মর্যাদা ও স্থান লাভ করতে পারবে। সে কাজগুলো এই ঃ নিজের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা এবং মুখ বন্ধ করা, হালাল জীবিকাতে তুষ্ট থাকা, নিজের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা, সত্য কথায় অটল থাকা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, মেহ্মানের আদর-আপ্যায়ন ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রতিবেশীর প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা। — (ইবনে কাসীর)

এসব জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে হলো আকীদাসমূহের পরিশুদ্ধিতা। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম কথা হলো কোন প্রকারের অংশীদারিত্ব স্থির না করে আল্লাহ্ পাককে গোটা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু বলে বিশ্বাস করা। সাথে সাথে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনা-আরাধনায় অংশী স্থাপন না করা। আল্লাহ্ পাকের কোন সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টার সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করার মত গুরুতর অপরাধ দুনিয়াতে আর কিছু হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (হে আমার প্রিয় বৎস, আল্লাহ্র অংশী স্থির করো না, অংশী স্থাপন করা গুরুতর জুলুম)। পরবর্তী পর্যায়ে মনীষী লোকমানের অন্যান্য-উপদেশাবলী ও জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। যা তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছিলেন। শিরক্ যে গুরুতর অপরাধ; সুতরাং কোন অবস্থাতেই এর নিকটবর্তী না হওয়ার হেদায়েতের উদ্দেশে আল্লাহ্ পাক অন্য এক নির্দেশ দান করেন।

মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাদেরকে মান্য করা ফরয ঃ আল্লাহ্ পাক ফরমান যে, যদিও সন্তানের প্রতি পিতা-মাতাকে মান্য করার ও তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বিশেষ তাকীদ রয়েছে এবং নিজের (আল্লাহ্র) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতিও তা করার জন্য সন্তানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু শিরক্ এমন গুরুতর অন্যায় মারাত্মক অপরাধ যে, মাতা-পিতার নির্দেশে, এমন কি বাধ্য করলে পরও কারো পক্ষে তা জায়েয হয়ে যায় না। যদি কারো পিতা-মাতা তাকে আল্লাহ্র সাথে অংশী স্থাপনে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকেন, এ বিষয়ে পিতা-মাতার কথাও রক্ষা করা জায়েয নয়।

এখানে যখন পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হেক্মত ও অন্তর্নিহিত রহস্য এই বর্ণনা করেছেন যে, তার মা ধরাধামে তার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন।— নয় মাস কাল উদরে ধারণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। আবার ভূমিষ্ট হওয়ার পরও দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যদানের কঠিন ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। যাতে দিন-রাত মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফলে তাঁর দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সন্তানের লালন-পালন ক্ষেত্রে মাকেই যেহেতু অধিক ঝুঁকি-ঝামেলা বহন করতে হয়, সেজন্য শরীয়তে মায়ের স্থান ও অধিকার পিতার অগ্রে রাখা হয়েছে। وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ আয়াতের মর্ম তাই। অতঃপর وَاِنْ جَاهَدٰكَ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকের সাথে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন-বিষয়ে পিতা-মাতাকে মান্য করাও হারাম।

ইসলামের অনন্য ন্যায়নীতি ঃ যদি পিতা-মাতা আল্লাহ্র অংশী স্থাপনে বাধ্য করার চেষ্টা করেন, তখন আল্লাহ্র নির্দেশ হল তাঁদের কথা না মানা। এমতাবস্থায় মানুষ স্বভাবতঃ সীমার মধ্যে স্থির থাকে না। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সন্তানের পক্ষে পিতা-মাতার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ ও অশোভন আচরণ করে তাঁদেরকে অপমানিত করার সম্ভাবনা ছিল। ইসলাম তো ন্যায়নীতির জ্বলন্ত প্রতীক— প্রত্যেক বস্তুরই একটি সীমা আছে। তাই অংশী স্থাপনের বেলায় পিতা-মাতার অনুসরণ না করার নির্দেশের সাথে সাথে এ হুকুমও প্রদান করেছে ঃ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا —অর্থাৎ, দ্বীনের বিরুদ্ধে তো তাঁদের কথা মানবে না, কিন্তু পার্থিব কাজকর্ম যথা শারীরিক সেবা-যত্ন বা ধন-সম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেন কার্পণ্য প্রদর্শিত না হয়। তাঁদের প্রতি বেআদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন করো না। তাঁদের কথাবার্তার এমনভাবে উত্তর দিবে না, যাতে অহেতুক মনোবেদনার উদ্রেক করে। মোটকথা, শিরক-কুফরীর ক্ষেত্রে তাঁদের কথা না মানার কারণে যে মর্মপীড়ার উদ্রেক হবে, তা তো অপারকতা হেতু বরদাশত করবে, কিন্তু প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। অন্যান্য ব্যাপারে যেন মনোকষ্টের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন থাকবে।

দ্বিতীয় উপদেশ আকায়েদ সম্পর্কে ঃ অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে, এর প্রতিটি বিন্দুকণা আল্লাহ্ পাকের অসীম জ্ঞানের আওতাধীন এবং সবকিছুর উপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য রয়েছে। কোন বস্তু যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায় না, অনুরূপভাবে কোন বস্তু যত দূরেই অবস্থিত থাক না কেন অথবা কোন বস্তু যত গভীর আঁধার বা যবনিকার অন্তরালেই থাক না কেন—মহান আল্লাহ্র জ্ঞান ও দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না এবং তিনি যে কোন বস্তুকে যখন ও যেখানে ইচ্ছা উপস্থিত করতে পারেন। يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ এর মর্মার্থ তাই। যাবতীয় বস্তু মহান আল্লাহ্র জ্ঞান ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয়ে

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿١٩﴾ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٢٠﴾ وَ
إِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ إِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٢١﴾
وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗ إِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ وَإِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا
يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۚ إِنَّ اللّٰهَ
عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلٰى
عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٢٤﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾ لِلّٰهِ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ أَنَّمَا
فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ بَعْدِهٖ
سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٧﴾

(১৯) পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর। (২০) তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যাকিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? এমন লোকও আছে ; যারা জ্ঞান, পথনির্দেশ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ্ সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করে। (২১) তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে দাওয়াত দেয়, তবুও কি? (২২) যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ্ অভিমুখী করে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র দিকে। (২৩) যে ব্যক্তি কুফরী করে, তার কুফরী যেন আপনাকে চিন্তিত না করে। আমারই দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর আমি তাদের কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করব। অন্তরে যাকিছু রয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ পরিজ্ঞাত। (২৪) আমি তাদেরকে স্বল্পকালের জন্যে ভোগবিলাস করতে দেব, অতঃপর তাদেরকে বাধ্য করব গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে। (২৫) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। বলুন, সকল প্রশংসাই আল্লাহ্র। বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না। (২৬) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যাকিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্র। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। (২৭) পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

থাকা—ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং একত্ববাদের আকীদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলীল।

তৃতীয় উপদেশ কর্ম পরিশুদ্ধিতা সম্পর্কে ঃ অবশ্য করণীয় কাজ তো অনেক। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নামায, এটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য কার্যাবলীর পরিশুদ্ধির কারণ এবং মাধ্যমও বটে। যেমন, নামায সম্পর্কে মহান পালনকর্তার এরশাদ রয়েছে — ''নিশ্চয়ই নামায যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে।'' এজন্য অবশ্য করণীয় সৎ কাজগুলোর মধ্য হতে শুধু নামাযের বর্ণনা দিয়েই যথেষ্ট করেছেন। يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ —অর্থাৎ হে বৎস, নামায প্রতিষ্ঠা কর। যেমন আগে বলা হয়েছে যে, নামায প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামায পড়ে নেয়া নয়, বরং যাবতীয় অংগসমূহ ও নিয়মাবলী পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা, যথাসময়ে আদায় করা, এর উপর স্থায়ী ও দৃঢ়পদ থাকা—এ সবই নামায প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত।

চতুর্থ উপদেশ চরিত্র সংশোধন সম্পর্কে ঃ ইসলাম একটি সমষ্টিগত ধর্ম—ব্যক্তির সাথে সাথে সমষ্টির সংশোধন এ জীবনব্যবস্থার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংগ। এজন্য নামাযের ন্যায় অবশ্য করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সাথেই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ— এ অবশ্য করণীয় কর্তব্যের বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—মানুষকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান কর ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখ। (এক) নিজের পরিশুদ্ধি, (দ্বিতীয়) গোটা মানবকুলের পরিশুদ্ধি— এর উভয়টাই পালন করতে বেশ দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করতে হয়, শ্রম—সাধনার প্রয়োজন হয়। এর উপর দৃঢ়পদ থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে সৃষ্টিকুলের পরিশুদ্ধির উদ্দেশে সৎকাজের আদেশের প্রতিদানে দুনিয়ায় সর্বদা শত্রুতা ও বিরোধিতাই জুটে থাকে। সুতরাং এ উপদেশের সাথে সাথে এরূপ উপদেশও প্রদান করা হয়েছে যে, وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ – অর্থাৎ, এসব কাজ সম্পন্ন করতে যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে, তাতে ধৈর্যধারণ করে স্থিরতা অবলম্বন করবে।

পঞ্চম উপদেশ সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে ঃ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ — وَلَا تُصَعِّرْ – এর উৎপত্তি صعر ধাতু থেকে –যার অর্থ উটের এক প্রকার ব্যাধি—যার ফলে এর ঘাড় বেঁকে যায়। যেমন মানুষের খিচুনী নামক প্রসিদ্ধ ব্যাধি, যার ফলে মুখমণ্ডল বাঁকা হয়ে যায়। এর অর্থ চেহারা ফিরিয়ে রাখা। যার মর্ম এই যে, লোকের সাথে সাক্ষাত বা কথোপকথনের সময় মুখ ফিরিয়ে রেখো না— যা তাদের প্রতি উপেক্ষা ও অহংকারের নিদর্শন এবং ভদ্রোচিত স্বভাব ও আচরণের পরিপন্থী। وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا — مرح শব্দের অর্থ গর্বভরে ঔদ্ধত্যের সহিত বিচরণ করা—অর্থাৎ, আল্লাহ্ ভূমিকে যাবতীয় বস্তু হতে নত ও পতিত করে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের সৃষ্টিও এ মাটি দিয়েই। তোমরা এর উপর দিয়েই চলাফেরা কর—নিজের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা কর। আত্মাভিমানীদের ধারা অনুসরণ করে অহংকারভরে বিচরণ করো না। সুতরাং এরপর বলেছেন إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ — আল্লাহ্ পাক কোন অহংকারী আত্মাভিমানীকে পছন্দ করেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ –অর্থাৎ, নিজ গতিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, দৌড়-ঝাপসহও চলো না, যা বভ্যতা ও শালীনতার পরিপন্থী। হাদীস শরীফে আছে যে, দ্রুতগতিতে চলা মুমিনের সৌন্দর্য ও মর্যাদাহানিকর

(জামে সগীর হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত)। এভাবে চলার ফলে নিজেরও দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বা অপরের দুর্ঘটনার কারণও ঘটতে পারে। আবার অত্যধিক মন্থর গতিতেও চলো না—যা সেসব গর্বস্ফীত আত্মাভিমানীদের অভ্যাস, যারা অন্যান্য মানুষের চাইতে নিজের অসার কৌলীন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে চায়। অথবা সেসব স্ত্রীলোকদের অভ্যাস, যারা অত্যধিক লজ্জা-সংকোচের দরুন দ্রুতগতিতে বিচরণ করে না। অথবা অক্ষম ব্যাধিগ্রস্তদের অভ্যাস। প্রথমটি তো হারাম। দ্বিতীয়টি যদি নারী জাতির অনুসরণে করা হয় তাও না-জায়েয। আর যদি এ উদ্দেশ্য না থাকে, তবে পুরুষের পক্ষে এটা একটা কলঙ্ক। তৃতীয় অবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন—সুস্থ থাকা সত্ত্বেও রোগগ্রস্তদের রূপ ধারণ করা।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন যে, সাহাবায়ে কেরামকে ইহুদীদের মত দৌড়াতে বারণ করা হতো। আবার খ্রীষ্টানদের ন্যায় ধীর গতিতে চলতেও বারণ করা হতো; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী চাল-চলন গ্রহণের নির্দেশ ছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলতে দেখলেন। মনে হচ্ছিল যেন সে এক্ষণি পড়ে যাবে। সুতরাং তিনি লোকটির নিকটে তার এরূপভাবে চলার কারণ জিজ্ঞেস করাতে সে বললো যে, সে একজন আলেম ও ক্বারী বলে এরূপভাবে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা (রাঃ) ফরমান যে, খলীফা ওমর (রাঃ)-এর চাইতে অনেক উন্নতমানের ক্বারী। কিন্তু তিনি যখন পথ চলতেন তখন মধ্যম গতিতে চলতেন। তিনি কথা বলার সময় এমন আওয়াজে বলতেন যেন অপর লোক অনায়াসে তা শুনতে পায়।

وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ — অর্থাৎ, তোমাদের স্বর ক্ষীণ কর। যার অর্থ স্বর প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চ করো না এবং হট্টগোল করো না। যেমন এমাত্র ফারূকে আযম সম্পর্কে বলা হলো যে, তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যেন উপস্থিত জনমণ্ডলী অনায়াসে তা শুনতে পায়, কোন প্রকার অসুবিধা না হয়।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ অর্থাৎ, চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে গাধার চীৎকারই অত্যন্ত বিকট ও শ্রুতিকটু। এখানে সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। (১) লোকের সঙ্গে সাক্ষাত ও কথোপকথনকালে আত্মম্ভরিতার সুরে মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে। (২) ধরাপৃষ্ঠে অহংকারভরে বিচরণ করতে বারণ করা হয়েছে। (৩) মধ্যবর্তী চাল-চলন গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (৪) উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আচার-আচরণেও এসব গুণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল।

শামায়েলে তিরমিযীতে হযরত হুসাইন (রাঃ) ফরমান—আমি আমার পিতা হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট মানুষের সাথে উঠা-বসা ও মেলামেশার কালে আঁ হযরত (সাঃ)- এর আচার-ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন ঃ 'নবীজী (সাঃ)-কে সর্বদা প্রসন্ন ও হাস্যোজ্জ্বল মনে হতো—তাঁর চরিত্রে নম্রতা, আচার-ব্যবহারে বিনয় বিদ্যমান ছিল। তাঁর স্বভাব মোটেই রুক্ষ ছিল না, কথাবার্তাও নীরস ছিল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বা অশ্লীল কথা বলতেন না, কারো প্রতি দোষারোপ করতেন না। কৃপণতা প্রকাশ করতেন না। যেসব দ্রব্য মনঃপূত হতো না সেগুলোর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করতেন না। কিন্তু (সেগুলো হালাল হলে এবং তার প্রতি কারো আকর্ষণ থাকলে) তা থেকে তাদেরকে নিরাশ করতেন না। এবং সে সম্পর্কে কোন মন্তব্যও করতেন না (বরং নীরবতা অবলম্বন করতেন), তিন বস্তু সম্পূর্ণভাবে (চিরতরে) বর্জন করেছিলেন। (১) ঝগড়া-বিবাদ, (২) অহঙ্কার, (৩) অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন কাজে আত্মনিয়োগ করা।

মহান আল্লাহ্র সর্বব্যাপী অসীম জ্ঞান ও অসাধারণ ক্ষমতার দৃশ্যাবলী অবলোকন করা সত্ত্বেও কাফের ও মুশরিকগণ স্বীয় শিরক ও কুফরীতে অনড় রয়েছে বলে সূরার প্রারম্ভে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী আর অপরপক্ষে স্বভাবসুলভ অনুগত মু'মিনগণের প্রশংসা-স্তুতি ও শুভ পরিণতির বর্ণনা ছিল। মধ্যস্থলে মহামতি লোকমানের উপদেশাবলীও এক প্রকার সেসব বিষয়ের পরিপূরকই ছিল। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাকের সর্বব্যাপী ও সর্বতোমুখী জ্ঞান ও ক্ষমতা এবং সৃষ্টিকুলের প্রতি তাঁর অজস্র কৃপা ও করুণারাজি বর্ণনা করে পুনরায় তওহীদের প্রতি আহবান করা হয়েছে।

سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ -অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের যাবতীয় বস্তু তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। অনুগত করে দেয়ার অর্থ কোন বস্তুকে কারো আজ্ঞাবহ করে দেয়া। প্রশ্ন হতে পারে যে, ভূ-মণ্ডলের সকল বস্তু তো আজ্ঞাবহ নয়। বরং অনেক বস্তুই তো মানুষের মর্জির বিপরীত কাজ করে। বিশেষ করে যেসব বস্তু নভোমণ্ডলে বিদ্যমান, সেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ হওয়ার তো কোন সম্ভাবনাই নেই। উত্তর এই যে, تسخير অর্থ কোন বস্তুকে কোন বিশেষ কাজে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োজিত করে রাখা। আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু মানুষের অনুগত করে দেয়ার অর্থ এই যে, সেসব বস্তু মানুষের সেবা ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করে দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে অনেক বস্তু তো এমন যে, সেগুলোকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার সাথে সাথে তাদের আজ্ঞাবহও করে দেয়া হয়েছে—তারা যখন যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহার করে। আবার কতক বস্তু এমনও আছে, যেগুলো মানুষের কাজে তো লাগিয়ে দেয়া হয়েছে —ফলে তা মানব-সেবায় যথারীতি অবশ্যই নিয়োজিত—কিন্তু প্রতিপালকোচিৎ হেকমতের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলোকে মানুষের অনুগত করে দেয়া হয়নি। যেমন, নভোমণ্ডলে অবস্থিত সৃষ্টিজগত, গ্রহ-নক্ষত্র, বজ্র-বিদ্যুৎ, বৃষ্টি-বাদল প্রভৃতি ; যেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ করে দেয়া হলে পর সেগুলোর উপর মানুষের স্বভাব, রুচি, প্রকৃতি ও অবস্থাবলীর বিভিন্নতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতো। একজন কামনা করতো যে, সূর্য অনতিবিলম্বে উদিত হোক। আবার অপরজন তার নিজস্ব প্রয়োজনে এর বিলম্বে উদয়ই কামনা করতো। একজন বৃষ্টি কামনা করতো ; অপরজন উন্মুক্ত প্রান্তরে সফরে আছে বলে বৃষ্টি না হওয়াই কামনা করতো। এমতাবস্থায় এরূপ পরস্পর বিপরীতধর্মী চাহিদা আকাশমণ্ডলের বস্তুসমূহের কার্যক্রমে বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্যের উদ্ভব ঘটাতো। এজন্যই আল্লাহ্ পাক এসব বস্তু মানবসেবায় নিয়োজিত অবশ্যই রেখেছেন ; কিন্তু তার আজ্ঞাবহ করে রাখেননি। এও এক প্রকারের করায়ত্তকরণই বটে।

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً - اسباغ অর্থ পরিপূর্ণ করে দেয়া। যার অর্থ আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য - অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য নেয়ামত বলতে সেসব নেয়ামতকেই বোঝায়, যা মানুষ তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুধাবন করতে পারে। যেমন, মনোরম আকৃতি, মানুষের সুঠাম ও সংবদ্ধ

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রত্যেক অংগ এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরী করা যেন তা মানুষের কাজে সর্বাধিক সহায়কও হয় অথচ আকৃতি-প্রকৃতিতেও কোন প্রকারের বিকৃতি না ঘটায়। অনুরূপভাবে জীবিকা, ধন-সম্পদ, জীবন-যাপনের মাধ্যমসমূহ, সুস্থতা ও কুশলাবস্থা—এসবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নেয়ামত ও অনুকম্পাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ দ্বীন ইসলামকে সহজ ও অনায়াসলব্ধ করে দেয়া, আল্লাহ্-রসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের তওফীক প্রদান, অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় ও প্রভাবশীলতা এবং শত্রুদের মোকাবেলায় মুসলমানদের প্রতি সাহায্য ও সহায়তা—এসবই প্রকাশ্য নেয়ামতসমূহের পর্যায়ভুক্ত। আর গোপনীয় নেয়ামত সেগুলো, যা মানব হৃদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত—যথা ঈমান, আল্লাহ্ পাকের পরিচয় লাভ এবং জ্ঞান-বুদ্ধি, সচ্চরিত্র, পাপসমূহ গোপন করা ও অপরাধসমূহের ত্বরিৎ শাস্তি আরোপিত না হওয়া ইত্যাদি।

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ — এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাঁর ক্ষমতার ব্যবহার এবং তাঁর নেয়ামত (কৃপা ও দয়াসমূহ) যে একেবারে অসীম ও অফুরন্ত,—কোন ভাষার সাহায্যে তা প্রকাশ করা চলে না, কোন কলম দিয়ে তা লিপিবদ্ধ করা চলে না, এ তথ্যটুকুই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি এরূপভাবে উদাহরণ পেশ করেছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যত বৃক্ষ আছে, যদি সেগুলোর সব শাখা-প্রশাখা দিয়ে কলম তৈরী করা হয় এবং বিশ্বের সাগরসমূহের পানি কালিতে রূপান্তরিত করে দেয়া হয় এবং এসব কলম আল্লাহ্ তাআলার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-গরিমা এবং তাঁর ক্ষমতা ব্যবহারের বিবরণ লিখতে আরম্ভ করে, তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে; তবু তাঁর অফুরন্ত প্রজ্ঞা ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেবল একটি মাত্র সমুদ্র কেন—যদি অনুরূপ আরো সাত সমুদ্রও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়, তবুও সব সাগর শেষ হয়ে যাবে তথাপি আল্লাহ্ পাকের মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। كَلِمَاتُ اللهِ – র ভাবার্থ আল্লাহ্ পাকের জ্ঞানপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় বাক্যাবলী।—(রূহ ও মাযহারী) আল্লাহ্ পাকের মহিমা, কৃপা ও করুণাও এর অন্তর্ভুক্ত। সাত সমুদ্র অর্থ এ নয় যে, সাত সমুদ্রের সংখ্যা সাতটিই; বরং অর্থ এই যে, এক সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সমুদ্র সংযুক্ত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেয়া হয়, তা সত্ত্বেও এসবগুলির পানি দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞাময় বাক্যসমূহ লিখে শেষ করা যাবে না। এখানে সাতের সংখ্যা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে—সীমিত করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়। যার প্রমাণ কোরআনের অন্য এক আয়াত—যেখানে বলা হয়েছে—'আল্লাহ্‌র মহিমাসূচক বাণীসমূহ প্রকাশ করতে যদি সমুদ্রকে কালিতে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়, তবে সমুদ্র শূন্য হয়ে যাবে—কিন্তু সে বাণীসমূহ শেষ হবে না। আর শুধু এ সমুদ্র নয়, অনুরূপ আরো সমুদ্র অন্তর্ভুক্ত করলেও অবস্থা একই থাকবে।' এ আয়াতে بِمِثْلِهِ বলে এরূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি এ ধারা বহুদূর পর্যন্ত চলতে থাকে যে, এক সমুদ্রের সাথে অনুরূপ অপর সমুদ্র সংযুক্তও হয়ে তার সাথে অনুরূপ তৃতীয়টা অনুরূপ চতুর্থটা—মোটকথা সমুদ্রসমূহের যতগুণ বা সংখ্যাই মেনে নেয়া হোক না কেন, এসবগুলোর পানি কালি হলেও আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহ লিখে শেষ করতে পারবে না। যুক্তি-বুদ্ধির দিক দিয়ে একথা সুস্পষ্ট যে সমুদ্র সাতটি কেন সাত হাজারও যদি হয়, তবুও তা সীমাবদ্ধ, শেষ অবশ্যই হবে—কিন্তু كَلِمَاتُ اللهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র বাক্যাবলী অসীম ও অনন্ত—কোন সসীম বস্তু অসীমকে কিরূপে সীমিত করতে পারে?

কতক রেওয়ায়েতে আছে যে, এ আয়াত ইহুদী পাদ্রীদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাযিল হয়েছে। মহানবী হযরত (সাঃ) যখন মদীনায় তশরীফ আনেন তখন কিছুসংখ্যক ইহুদী পাদ্রী হাযির হয়ে কোরআনের আয়াত وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (অর্থাৎ, তোমাদেরকে অতি সামান্য পরিমাণ জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে) প্রসংগে আপত্তির সুরে বললো, আপনি (নবীজী) বলেন যে, তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। এতে আপনি কি শুধু আপনাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। না আমাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মহানবী হযরত (সাঃ) বললেন—আমার উদ্দেশ্য সকলেই। অর্থাৎ, আমাদের জাতি এবং ইহুদী-খৃষ্টানগণও। তখন তারা আপত্তি করে বললো—আমাদেরকে তো আল্লাহ্ পাক তওরাত প্রদান করেছেন—যা تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ, সকল বস্তুর (রহস্য) বর্ণনাকারী। তিনি বললেন, এও আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় অতি নগণ্য। আবার তওরাতে যেসব জ্ঞান রয়েছে, সে সম্পর্কেও তোমরা পুরোপুরি অবহিত নও। কিন্তু আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় যাবতীয় আসমানী গ্রন্থ এবং সমস্ত নবীগণের সমষ্টিগত জ্ঞানও অতিশয় কিঞ্চিৎকর ও নগণ্য। এ বক্তব্যের সমর্থনেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ ...... (ইবনে-কাসীর)

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ
الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ
دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ
فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ
عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ
اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ
الْغَرُورُ ﴿٣٣﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ
يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

(২৮) তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান বৈ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। (২৯) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার খবর রাখেন? (৩০) এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহ্-ই সত্য এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে সব মিথ্যা। আল্লাহ্ সর্বোচ্চ, মহান। (৩১) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন? নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সহনশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (৩২) যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরংগ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহ্কে ডাকতে থাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে। কেবল মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। (৩৩) হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। অতএব, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। (৩৪) নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছেই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরোল্লেখিত ৩৩নং আয়াতে মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সমগ্র মানবকুলকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তাআলা ও কেয়ামত দিবস সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে সেজন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ -অর্থাৎ, হে মানব জাতি! স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় কর। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের মূল বা অন্য কোন গুণাবাচক নামের স্থলে 'রব'—(পালনকর্তা) বিশেষণটি চয়ন করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্কে ভয় করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কোন হিংস্র জন্তু বা শত্রু সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে মনে যেরূপ ভয়ের উদ্রেক হয়ে থাকে, সেরূপ ভয় নয়। কেননা, আল্লাহ্ পাক তো তোমাদের পালনকর্তা—সুতরাং তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের কোন আশংকা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং এক্ষেত্রে সে ধরনের ভয় বোঝানো হয়েছে, যা বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনের প্রতি তাঁদের মান-মর্যাদা ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। যেমন, পুত্র পিতাকে এবং ছাত্র তার শিক্ষককে ভয় করে। অথচ এঁরা তার শত্রু বা ক্ষতিসাধনকারী কেউ নয়। কিন্তু তাঁদের সম্ভ্রম ও প্রভাব হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। তাই তাদেরকে পিতা এবং ওস্তাদের নির্দেশ অনুসরণ ও পালনে বাধ্য করে। এখানেও একথাই বোঝানো হয়েছে —যেন আল্লাহ্ পাকের মহান মর্যাদা ও প্রতাপ তোমাদের হৃদয়ে পুরোপুরি স্থান করে নেয়, যেন তোমরা অনায়াসে তাঁর নবীর অনুসরণ ও নির্দেশ পালন করতে পার।

وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ

অর্থাৎ, সেদিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতাও নিজের পুত্রের উপকার করতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোন পুত্রও পিতার কোন কল্যাণ করতে পারবে না।

এখানে ঐ শ্রেণীর পিতা-পুত্রকে বোঝানো হয়েছে যাদের মধ্যে একজন মুমিন, অপরজন কাফের। কেননা মুমিন পিতা কিংবা পুত্র স্বীয় কাফের পুত্রের কিংবা পিতার শাস্তি বিন্দুমাত্রও হ্রাস করতে পারবে না।

এরূপ নির্দিষ্টকরণের কারণ, কোরআন করীমের অন্যান্য আয়াতসমূহ এবং হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েত—যেখানে একথা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন পিতা-মাতা সন্তানের জন্য এবং সন্তান পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে। আর এ সুপারিশ দ্বারা তারা লাভবান ও সফলকাম হবে। কোরআনে করীমে রয়েছে ঃ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছে—আর তারাও মুমিনে পরিণত হয়েছে ; আমি এ সন্তান-সন্ততিদেরকে তাদের পিতা-মাতার মর্যাদায় উন্নীত করে দেব। যদিও তাদের কার্যাবলী এ স্তরে পৌঁছার উপযোগী নয়। কিন্তু সৎ পিতা-মাতার কল্যাণে কেয়ামতের দিন তারা এ ফল লাভ করতে সক্ষম হবে, কিন্তু এক্ষেত্রে শর্ত এই যে, সন্তানকে মুমিন হতে হবে —যদিও কাজকর্মে কোন ত্রুটি ও শৈথিল্য থেকে থাকে।

অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে রয়েছে جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ অর্থাৎ, তারা অক্ষয় ও অবিনশ্বর স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবে এবং এক্ষেত্রে তাদের যোগ্য হিসাবে প্রতিপন্ন পিতা-মাতা, স্ত্রীগণ ও পুত্র-পরিজনও তাদের সাথে প্রবেশ

করবে। যোগ্য বলতে মুমিন হওয়া বোঝানো হয়েছে।

এ ৩৩ ও ৩৪নং আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি, অনুরূপভাবে স্বামী এবং স্ত্রী মুমিন হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সমশ্রেণীভুক্ত হয়, তবে হাশর ময়দানে একের দ্বারা অপরের উপকার সাধিত হবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসের রেওয়ায়েত সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করার কথা বর্ণিত আছে। সুতরাং উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত বিধি যে হাশর ময়দানে কোন পিতা সন্তানের বা কোন সন্তান পিতার কোন উপকার সাধন করতে পারবে না— তা শুধু সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন এদের মধ্যে একজন মুমিন এবং অপরজন কাফের হবে।—(মাযহারী)

অপর আয়াতে পাঁচটি বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ পাকেরই জন্য নির্দিষ্ট থাকা এবং অপর কোন সৃষ্টির সে জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমেই সূরায়ে লোকমান শেষ করা হয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

অর্থাৎ, কেয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ পাকেরই রয়েছে (অর্থাৎ, কোন্ বছর কোন্ তারিখে সংঘটিত হবে) এবং তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন (অর্থাৎ, কন্যা না পুত্র ; কোন্ আকৃতি-প্রকৃতির) এবং আগামীকাল কি অর্জন করবে তা কোন ব্যক্তি জানে না। (অর্থাৎ, ভাল-মন্দ কি লাভ করবে) অথবা কোন্ স্থানে মৃত্যুবরণ করবে, তাও কেউ জানে না।

প্রথম তিন বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞানযদিও একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর জ্ঞান নেই। কিন্তু বাক্যবিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গি থেকে একথাই বোঝা যায় যে, এসব বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ পাকের অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারেই সীমিত রয়েছে। অবশ্য অবশিষ্ট বস্তুদ্বয় সম্পর্কে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর তথ্য ও তত্ত্ব জানা নেই। এ পাঁচ বস্তুকে সূরায়ে আনআমের আয়াতে مَفَاتِحُ الْغَيْبِ (অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে)।

এলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ বরেণ্য ওস্তাদ শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রহঃ) তাঁর তফসীরের সংশ্লিষ্ট টীকায় এক সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্যবহ তথ্য প্রকাশ করেছেন। যদ্দ্বারা উল্লেখিত সব ধরনের প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়। তা এই যে, গায়ব দু'প্রকারের। (এক) অদৃশ্য নির্দেশাবলী, যথা শরীয়তের নির্দেশাবলী, আল্লাহ্ পাকের যাত ও সিফত, সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞানও এর অন্তর্গত, যাকে এলমে আকায়েদ বলা হয়। আর শরীয়তের সেসব নির্দেশাবলী— যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের কোন্ কোন্ কাজ পছন্দনীয়, কোন্গুলো অপছন্দনীয়, তা জানা যায়। এসব বস্তু গায়ব বা অদৃশ্যই বটে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ اكوان غيبية (অদৃশ্য ঘটনাবলী) অর্থাৎ, ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর সংশ্লিষ্ট জ্ঞান। প্রথম শ্রেণীভুক্ত অদৃশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলা নবী ও রসূলগণকে (সাঃ) প্রদান করেছেন। যার উল্লেখ কোরআনে করীমে এরূপভাবে রয়েছে—

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ও পছন্দনীয় রসূল ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর গোপনীয় ও অদৃশ্য তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকার —অর্থাৎ اكوان غيبية (ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলী)—এর পূর্ণ জ্ঞান তো আল্লাহ্ কাউকে প্রদান করেন না—তা সম্পূর্ণভাবে সেই মহান সত্তার সাথে নির্দিষ্ট। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ঘটনার আংশিক জ্ঞান যখন এবং যতটুকু ইচ্ছা প্রদান করেন। যা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বলে একে এল্‌মে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান বলা চলে না; বরং গোপন বার্তা বলা হয়।

আয়াতের শব্দাবলী সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ঃ এ আয়াতে পাঁচ বস্তুর জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট থাকার কথা বিশেষ গুরুত্বসহ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং পাঁচ বস্তুকে একই শিরোনামভুক্ত করে এগুলোর জ্ঞান মহান আল্লাহ্রই জন্য নির্দিষ্ট করে অন্য কোন সৃষ্টির এ জ্ঞান নেই, একথা বলে দেয়াই বাহ্যতঃ বাঞ্ছনীয় ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু উল্লেখিত আয়াতে এমনটি করা হয়নি। বরং প্রথম তিন বস্তুর জ্ঞান তো ইতিবাচকভাবে আল্লাহ্ পাকের জন্যই নির্দিষ্ট থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে ও অপর দু'বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো কোন জ্ঞান নেই বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার প্রথম তিন বস্তুর মধ্য হতে কেয়ামতের বর্ণনা এরূপভাবে করা হয়েছে — إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ অর্থাৎ কেয়ামতের তথ্য কেবল আল্লাহ্ পাকেরই জানা রয়েছে। দ্বিতীয় বস্তুর বর্ণনা শিরোনাম পাল্টিয়ে ক্রিয়াবাচক বাক্যে এরূপভাবে করা হয়েছে وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এখানে বৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের কোন উল্লেখই নেই বরং এখানে অবতরণ করার উল্লেখ রয়েছে। তৃতীয় বস্তুর বর্ণনা আবার শিরোনাম পাল্টিয়ে এরূপভাবে করা হয়েছে وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ শিরোনামের এরূপ পরিবর্তন বাক্যবিন্যাসের এক প্রকার রীতিও বলা যেতে পারে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আরো কিছু অভিনব তত্ত্ব ও তাৎপর্য পরিলক্ষিত হবে। যা হযরত থানবী 'বয়ানুল কোরআনে' বর্ণনা করেছেন।

যার সংক্ষিপ্ত-সার এই যে, শেষোক্ত দু'বস্তু অর্থাৎ, আগামীকাল মানুষ কি উপার্জন করবে এবং সে কোন্ স্থানে মৃত্যুবরণ করবে— যা মানুষের নিজ সত্তা-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার, মানুষের এগুলোর জ্ঞান অর্জন করার সম্ভাবনা হয়তো থাকতে পারতো। এ সম্ভাবনা অপনোদনের উদ্দেশে এ দুয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কোন জ্ঞান নেই বলে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যদ্দ্বারা প্রথম তিন বস্তুর জ্ঞান ও তথ্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো না থাকার কথা অতি উত্তমভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কেননা, যখন মানুষ নিজ কার্যাবলী ও উপার্জনাদি এবং নিজ পরিণতি অর্থাৎ, মৃত্যু ও মৃত্যুস্থল সম্পর্কে কিছু জানে না, তখন আকাশ, বৃষ্টিবর্ষণ ও মাতৃগর্ভের গভীর অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন ভ্রূণ সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে কি? সর্বশেষ বস্তুতে কেবল মৃত্যুস্থল সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। অথচ মৃত্যুস্থলের ন্যায় মৃত্যুক্ষণও মানুষের জানা নেই। কারণ এই যে, মৃত্যুস্থল নির্দিষ্টভাবে জানা না থাকলে বাহ্যিক অবস্থাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ এ সম্পর্কে কিছুটা অনুধাবন করতে পারে যে, সে যেখানে বসবাস করছে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে। অন্ততঃ যে স্থানে মারা যাবে সে স্থানটি দুনিয়াতে তো বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে মৃত্যুক্ষণ—যা অনাগত ভবিষ্যৎকাল; এখনো অস্তিত্ব পর্যন্ত লাভ করেনি। সুতরাং যে ব্যক্তি মৃত্যুস্থান কার্যতঃ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা জানে না, তার সম্পর্কে এরূপ ধারণা কিভাবে করা যেতে পারে যে, মৃত্যুক্ষণ—যার এখনো অস্তিত্বও নেই, তা সে জেনে নিতে সক্ষম হবে।

মোটকথা, এখানে এক বস্তুর নিষেধের সাথে সাথে অপর বস্তুসমূহের

سُورَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلٰثُونَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓ ۝ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَمْ

يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ

اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝ اَللّٰهُ

الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۚ

اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ

يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝ الَّذِيْۤ اَحْسَنَ

كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ

نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ

رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۚ قَلِيْلًا مَّا

تَشْكُرُوْنَ ۝ وَقَالُوْۤا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ

خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۚ بَلْ هُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝

সূরা সেজদাহ্

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৩০

পরম করুণাময় ও মহান দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ।

(১) আলিফ-লাম-মীম, (২) এ কিতাবের অবতরণ বিশ্বপালনকর্তার নিকট থেকে এতে কোন সন্দেহ নেই। (৩) তারা কি বলে, এটা সে মিথ্যা রচনা করেছে? বরং এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। সম্ভবতঃ এরা সুপথ প্রাপ্ত হবে। (৪) আল্লাহ্, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না? (৫) তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতঃপর তা তাঁর কাছে পৌছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। (৬) তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, (৭) যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। (৮) অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। (৯) অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ্ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১০) তারা বলে, আমরা মৃত্তিকায় মিশ্রিত হয়ে গেলেও পুনরায় নতুন করে সৃজিত হব কি? বরং তারা তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতকে অস্বীকার করে।

নিষেধও অতি উত্তমভাবে বোধগম্য হয়ে যায়। তাই এ দু'বস্তুকে নেতিবাচক শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমোক্ত তিন বস্তু প্রকাশ্যতঃই মানুষের নাগালের বাইরে বলে তাতে মানুষের জ্ঞানের কোন অধিকার না থাকাটাই সুস্পষ্ট। এ জন্যে এক্ষেত্রে হাঁ সূচক শিরোনাম অবলম্বন করে সেগুলো হক তাআলারই জন্য নির্দিষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে প্রথম বাক্য বিশেষ্যবাচক ও পরবর্তী দু'বাক্য ক্রিয়াবাচক বাক্যরূপে ব্যবহার করার মধ্যে সম্ভবতঃ এ প্রজ্ঞা ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, কেয়ামত তো এক সুনির্দিষ্ট বিষয়—এতে কোন নতুনত্ব নেই। পক্ষান্তরে সন্তান ধারণ ও বৃষ্টি বর্ষণের বিষয়টা ঠিক এমনটি নয়—এতে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব আরোপিত হতে থাকে। কিন্তু ক্রিয়াবাচক বাক্য নতুনত্ব প্রকাশ করে। এ জন্যেই একে উভয় স্থানেই ব্যবহার করা হয়েছে। আবার এ দুয়ের মধ্যেও হামলের (সন্তান ধারণ) ক্ষেত্রে তো আল্লাহ্ পাকের এলমের উল্লেখ রয়েছে وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ (অর্থাৎ, মার্তগর্ভে কি রয়েছে তা তিনিই জানেন) এবং বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে এলমের উল্লেখ নেই। এর কারণ এই যে, এখানে বৃষ্টি বর্ষণের কথা উল্লেখ করে আনুষঙ্গিকভাবে এও ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, বৃষ্টির সাথে মানব জাতির অগণিত কল্যাণ ও উপকার বিজড়িত, তা মহান আল্লাহ্ কর্তৃকই বর্ষিত হয়। এতে অন্য কারো কোন কর্তৃত্ব বা ভূমিকা নেই। অতএব, এ সম্পর্কিত জ্ঞান বাক্যের বর্ণনাভঙ্গি থেকেই প্রমাণিত হয়।

সূরা সেজদাহ্

مَّا اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ এখানে نَذِيْرٍ — ভয় প্রদর্শক বলে রসূলকে (সাঃ) বোঝানো হয়েছে। যার মর্ম এই যে, মহানবী (সাঃ) -এর পূর্বে মক্কার কুরাইশগণের নিকট কোন নবী আগমন করেননি। কিন্তু এর দ্বারা এ কথা বোঝায় না যে, এ পর্যন্ত নবীগণের দাওয়াতও তাদের নিকট পৌছেনি। কেননা, কোরআন করীমের অপর এক আয়াতে স্পষ্টভাবে এরশাদ হয়েছে যে, وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ —অর্থাৎ, দুনিয়াতে এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার মাঝে আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে কোন ভয় প্রদর্শক এবং তাঁর পক্ষ থেকে কোন দাওয়াত প্রদানকারীর আগমন হয়নি।

এ আয়াতে نَذِيْرٌ শব্দটি সাধারণ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাকের প্রতি আহবানকারী, চাই তিনি রসূল ও পয়গম্বর হোন বা তাদের কোন প্রতিনিধি বা ধর্মীয় আলেম হোন। এ আয়াত দ্বারা সকল সম্প্রদায় ও দলসমূহের নিকটে তওহীদের দাওয়াত পৌছে গেছে বলে বোঝা যায়। একথা যথাস্থানে সম্পূর্ণ সঠিক এবং আল্লাহ্ পাকের সর্বব্যাপী করুণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন ইমাম আবু হাইয়্যান বলেন যে, তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত কোন কালে, কোন স্থানে এবং কোন সম্প্রদায়ে কখনো ছিন্ন ও ক্ষুণ্ণ হয়নি। যখনি এক নবুওয়তের উপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সে নবুওয়তভিত্তিক জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ নিতান্ত নগণ্যসংখ্যক হয়ে পড়তেন, তখনি অপর নবী বা রসূল প্রেরিত হতেন। এতে বোঝা যায় যে, আরব সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও সম্ভবতঃ তওহীদের দাওয়াত পূর্ব থেকেই পৌছেছিল, কিন্তু এজন্য এটা আবশ্যক নয় যে, এ দাওয়াত স্বয়ং কোন নবী বা রসূল বহন করে এনেছিলেন — হতে পারে তাঁদের প্রতিনিধি আলেমগণের মাধ্যমে

পৌছেছিল, সুতরাং এ সূরা এবং সূরায়ে ইয়াসিন ও অন্যান্য সূরার যেসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আরবের কোরাইশ গোত্রে তাঁর পূর্বে কোন نَّذِيْرٌ (ভয় প্রদর্শক) আগমন করেননি তখন نَّذِيْرٌ বলতে এর পারিভাষিক তথ্যানুযায়ী নবী-রসূলকেই বোঝাবে এবং অর্থ হবে এই যে, এ সম্প্রদায়ে মহানবীর পূর্বে কোন রসূল বা নবী আগমন করেননি। যদিও অন্যান্য উপায়ে তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত এখানেও পৌছেছিল।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রেরণের পূর্বে বহু ব্যক্তি সম্পর্কে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) -এর দ্বীনের (জীবন বিধান) উপর অবস্থিত ছিলেন। তওহীদের (একত্ববাদ) প্রতি তাদের ঈমান ছিল। প্রতিমা পূজা করতে ও প্রতিমার নামে কোরবানী করতে তাঁরা ঘৃণা প্রকাশ করতেন।

রূহুল মা'আনীতে মূসা ইবনে ওকবা থেকে এ রেওয়ায়েত বর্ণিত করা হয়েছে যে, ওমর ইবনে নুফায়েল যিনি মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর সাথে সাক্ষাতও করেছিলেন। কিন্তু নবুওয়ত লাভের পূর্বে তাঁর ইন্তেকাল ঐ সালে হয়, যে সালে কোরাইশগণ বায়তুল্লাহ্ পুনঃ নির্মাণ করেন এবং এটা তাঁর নবুওয়ত লাভের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা।—মূসা ইবনে ওকবাহ্ তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোরাইশদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে বিরত রাখতেন এবং প্রতিমার নামে কোরবানী করাকে গর্হিত ও অশোভন বলে মন্তব্য করতেন। তিনি পৌত্তলিকদের জবাইকৃত জন্তুর গোশ্‌ত খেতেন না।

আবু দাউদ তাইয়ালেসী ওমর ইবনে নুফায়েল-তনয় হযরত সায়ীদ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে (যিনি আশারায়ে-মোবাশ্বারার অন্তর্ভুক্ত সাহাবী ছিলেন) এ রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি নবীজীর খেদমতে আরয করেছিলেন, আমার পিতার অবস্থা আপনি জানেন যে, তিনি তওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—প্রতিমা পূজার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতে পারি কি? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফরমান যে, হ্যাঁ, তাঁর মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা জায়েয। তিনি কেয়ামতের দিন এক স্বতন্ত্র উম্মতরূপে উঠবেন। (রূহুল মা'আনী)

অনুরূপভাবে ওরাকাহ্ বিন নাওফেল যিনি হুযূর (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির প্রারম্ভিক স্তরে এবং কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা পর্বে বর্তমান ছিলেন—তিনি তওহীদের উপরই বিশ্বাস রাখতেন এবং রসূলুল্লাহ্কে (সাঃ) দ্বীন প্রচারে সাহায্য করতে সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তিনি পরলোকগমন করেন। এসব ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, আরব জাতিসমূহ আল্লাহ্র তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত থেকে তো বঞ্চিত ছিলেন না, কিন্তু তাদের মাঝে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেনি। আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। এ তিন আয়াত —কোরআন যে সত্য এবং রসূলুল্লাহ্ যে প্রকৃত নবী তা প্রমাণ করে।

কেয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য ঃ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ অর্থাৎ, সেদিনের পরিমাণ তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর হবে এবং সূরায়ে মা'আরেজের আয়াতে রয়েছে — فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে।

এর এক সহজ উত্তর তো এই—যা বয়ানুল কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেদিনটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে বিধায় মানুষের নিকট অতিশয় দীর্ঘ বলে মনে হবে। এরূপ দীর্ঘানুভূতি নিজ নিজ ঈমান ও আমলানুপাতে হবে। যারা বড় অপরাধী তাদের নিকট সুদীর্ঘ এবং যারা কম অপরাধী তাদের নিকট কম দীর্ঘ বলে বোধ হবে। এমনকি সেদিন কিছু লোকের নিকট এক হাজার বছর বলে মনে হবে, আবার কারো কারো নিকট পঞ্চাশ হাজার বছর বলে মনে হবে। তফসীরে রূহুল মা'আনীতে ওলামা ও সূফীগণ কর্তৃক উক্ত আয়াতের আরো কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তা সবই কাল্পনিক ও অনুমান প্রসূত। কোনটাই কোরআনের মর্মভিত্তিক বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং সলফে সালেহীন—সাহাবেয়ে কেরাম ও তাবিয়ীন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নিরাপদ—তা হলো, তাঁরা পঞ্চাশ ও একের এ পার্থক্য আল্লাহ্ পাকের জ্ঞান ও অবগতির উপরই ছেড়ে দিয়েছেন এবং এ তত্ত্ব তাঁদের জানা নেই বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ هما يومان ذكرهما الله تعالى فى كتابه الله تعالى اعلم بهما واكره ان اقول فى كتاب الله ما لا اعلم - অর্থাৎ, এ দুদিন সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত এবং আল্লাহ্ পাকের গ্রন্থের যে বিষয় সম্পর্কে অবহিত নই সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। (ইহা আবদুর রাজ্জাক ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তা বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন।)

الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ অর্থাৎ যিনি যাবতীয় বস্তু অত্যন্ত সুন্দর ও নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন। কারণ এ বিশ্বজগতে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা এ জগতের কল্যাণ ও মঙ্গলোপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এর প্রতিটি বস্তুই মূলতঃ এক বিশেষ সৌন্দর্যের অধিকারী। এদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ও সুন্দর করে মানবকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন এরশাদ করেছেন। لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি মানবকে অতি সুন্দর গঠন ও উত্তম আকৃতি-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু বাহ্যতঃ যত অশ্লীল ও অকল্যাণকরই মনে হোক না কেন—কুকুর, শূকর, সাপ, বিচ্ছু, সিংহ, বাঘ প্রভৃতি বিষধর ও হিংস্র জন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে অকল্যাণকর বলে মনে হয়। কিন্তু গোটা বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনায় এগুলোর কোনটাই অপকৃষ্ট অমঙ্গলকর নয়।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) বলেছেন যে, যাবতীয় মৌলিক এবং আনুষঙ্গিক বস্তু كُلَّ شَيْءٍ এর অন্তর্গত। অর্থাৎ, যেসব বস্তু মৌলিক সত্তার অধিকারী ও দৃশ্যমান যথা—প্রাণীজগত, উদ্ভিত জগত, জড় জগত প্রভৃতি এবং আনুষঙ্গিক অদৃশ্য বস্তু যথা, স্বভাব-চরিত্র ও আমলসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এমন কি যেগুলো কুচরিত্র ও কুস্বভাব বলে কথিত যথা, ক্রোধ, লোভ, যৌন-কামনা প্রভৃতিও প্রকৃতিগতভাবে খারাপ নয়। যথাস্থানে ও যথাসময়ে ব্যবহৃত না হওয়ার দরুন এগুলো অপকৃষ্ট ও অকল্যাণকর প্রতিপন্ন হয়।

وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ — ইতিপূর্বে একথাই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক বিশ্ব-জগতের যাবতীয় বস্তু অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এর মাঝে সর্বাধিক সুদর্শন ও মনোরম মানুষের আলোচনা করেছেন। এর সাথে তাঁর পূর্ণ ও অনন্য ক্ষমতা প্রকাশার্থ একথাও ব্যক্ত করেছিলেন যে, মানবকে আমি সর্বোত্তম ও সেরা সৃষ্টি করে তৈরী করেছি। তার সৃষ্টি উপকরণ সর্বোন্নত ও সর্বোৎকৃষ্ট বলে সে শ্রেষ্ঠ নয়, বরং তার সৃষ্টি উপকরণ তো নিকৃষ্টতম বস্তু — বীর্য। অতঃপর তাঁর অনন্য ক্ষমতা ও অসাধারণ সৃষ্টিকৌশল প্রয়োগ করে এই নিকৃষ্টতম বস্তুকে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন সেরা সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করেছেন।

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝ فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؗ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ ۝ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۫ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝

(১১) বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (১২) যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি। (১৩) আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব। (১৪) অতএব এ দিবসকে ভুলে যাওয়ার কারণে তোমরা মজা আস্বাদন কর। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে স্থায়ী আযাব ভোগ কর। (১৫) কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। (১৬) তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। (১৭) কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে। (১৮) ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়। (১৯) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়নস্বরূপ বসবাসের জান্নাত। (২০) পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ — পূর্ববর্তী আয়াতে কেয়ামত অস্বীকারকারিগণের প্রতি সতর্কবাণী এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ সম্পর্কে তাদের যে বিস্ময়—তার উত্তর ছিল। এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, নিজের মৃত্যু সম্পর্কে যদি চিন্তা-ভাবনা কর, তবে এতে আল্লাহপাকের কুদরতে কামেলা ও অনন্য ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাবে। তোমরা নিজ অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতাবশতঃ মনে কর যে, মৃত্যু আপনা-আপনিই সংঘটিত হয়; কিন্তু ব্যাপার এমনটি নয় — বরং আল্লাহ্ পাকের নিকটে তোমাদের মৃত্যুর এক নির্দিষ্ট ক্ষণ রয়েছে; এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের মাধ্যমে এক বিশেষ ব্যবস্থাপনাও নির্ধারিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে আজরাঈল (আঃ)– এর ভূমিকাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সমস্ত প্রাণী জগতের মৃত্যু তাঁর উপর ন্যস্ত, যার মৃত্যু যখন এবং যে স্থানে নির্ধারিত ঠিক সে সময়েই তিনি তার প্রাণ বিয়োগ ঘটাবেন। আলোচ্য আয়াতে এর বর্ণনাই রয়েছে এখানে مَلَكُ الْمَوْتِ এক বচনে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অপর এক আয়াতে রয়েছে اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ —অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটায়—এখানে ملٰئكة বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, আজরাঈল (আঃ) একাকী একাজ সম্পন্ন করেন না; বহু ফেরেশতা তাঁর অধীনে একাজে অংশগ্রহণ করেন।

আত্মাবিয়োগ ও মালাকুল-মউত সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ ঃ প্রখ্যাত মুফাস্সির মুজাহিদ বলেন, মালাকুল-মউতের সামনে গোটা বিশ্ব কোন ব্যক্তির সামনে রক্ষিত বিভিন্ন খাবার সামগ্রীপূর্ণ একটা থালার মত তিনি যাকে চান তুলে নেন। বিষয়টি এক মারফু হাদীসেও আছে (ইমাম কুরতুবী তাযকিরাতে এটি বর্ণনা করেছেন)। অপর এক হাদীসে রয়েছে যে, নবীজী (সাঃ) একদা জনৈক সাহাবীর শিয়রে মালাকুল মউতকে দেখে বললেন যে, আমার সাহাবীর সাথে সহজ ও কোমল ব্যবহার করো। মালাকুল-মউত উত্তরে বললেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন-আমি প্রত্যেক মুমিনের সাথে নরম ব্যবহার করে থাকি এবং বলেন যে, যত মানুষ গ্রাম-গঞ্জে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বত বা সমুদ্র সৈকতে বসবাস করছে—আমি তাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন পাঁচ বার দেখে থাকি। এজন্য এদের ছোট-বড় প্রত্যেক সম্পর্কে আমি প্রত্যক্ষভাবে পুরোপুরি জ্ঞাত। অতঃপর বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ), এগুলো যা কিছু হয় সব আল্লাহ্র হুকুমে। অন্যথায় আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত আমি কোন মশারও প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে সক্ষম নই।

মালাকুল-মউতই কি অন্যান্য জীবজন্তুরও প্রাণ বিয়োগ ঘটান? উল্লেখিত হাদীসের রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ পাকের অনুমতি সাপেক্ষে মশার মৃত্যুও মালাকুল -মউতই ঘটায়। হযরত ইমাম মালেকও এক প্রশ্নের উত্তরে এ রকমই বলেন। কিন্তু অন্যান্য কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণের দ্বারা আত্মার বিয়োগ ঘটানো কেবল মানুষের জন্য নির্দিষ্ট কেবল তার মর্যাদার দরুন—অন্যান্য জীব-জন্তু আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে ফেরেশতাগণের মাধ্যম ব্যতীত আপনা-আপনিই মৃত্যুবরণ করে।—(কুরতুবী'র বরাত দিয়ে ইবনে আতিয়্যাহ্ বর্ণনা করেন)

এ বিষয়ই আবু শায়েখ, ওকাইলী, দায়লমী, প্রমুখ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবীজী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গ সবই আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা-স্তুতিতে মগ্ন। (এই

হল এগুলোর জীবন) যখন এদের গুণ-কীর্তন বন্ধ হয়ে যায়, তখনই আল্লাহ্ পাক এদের প্রাণ বিয়োগ ঘটান। জীব-জন্তুর মৃত্যু মালাকুল-মউতে'র উপর ন্যস্ত নয়। ঠিক একই মর্মে এক হাদীস হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

অপর এক হাদীস রয়েছে যে, যখন আল্লাহ্ পাক আযরাঈল (আঃ)-এর উপর গোটা বিশ্বের মৃত্যু সংঘটনের দায়িত্ব অর্পণ করেন, তখন তিনি (আযরাঈল) নিবেদন করেন; হে প্রভু আপনি আমার উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করলেন যার ফলে বিশ্ব জগৎ ও গোটা মানবজাতি আমাকে ভর্ৎসনা করবে এবং আমার প্রসংগ উঠলে অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করবে। প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ তাআলা বললেন ঃ আমি এর সুরাহা এভাবে করেছি যে, জগতে রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্যরূপে মৃত্যুর কিছু বাহ্যিক কারণ রেখে দিলাম যার ফলে প্রত্যেক মানুষ সেসব উপলক্ষ ও রোগ-ব্যাধিকে মৃত্যুর কারণরূপে আখ্যায়িত করবে এবং তুমি তাদের অপবাদ থেকে রক্ষা পাবে। —(কুরতবী)

ইমাম বগভী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন —যত প্রকারের রোগ-ব্যাধি ক্ষত ও আঘাত রয়েছে— এসবই মৃত্যু দূত—মানুষকে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতঃপর যখন মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসে, তখন মালাকুত-মউত মৃত্যু পথযাত্রীকে সম্বোধন করে বলেন, ওগো আল্লাহ্র বান্দা, আমার আগমনের পূর্বে তোমাদেরকে সাবধান করে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আমি রোগ-ব্যাধি ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকরূপে কত সংবাদ কত দূত পাঠিয়েছি। এখন আমি পৌঁছে গেছি। এরপর আর কোন সংবাদ প্রদানকারী বা কোন দূত আসবে না। এখন তুমি স্বীয় প্রভুর নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করবে—চাই স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক।—(মাযহারী)

মাসআলা ঃ কারো আত্মা বের করে নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত মালাকুল-মউত কারো মৃত্যুক্ষণ সম্পর্কে কিছুই জানেন না।—(আহমদ কর্তৃক মা'মার থেকে বর্ণিত—মাযহারী)

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের, মুশরেক ও কেয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রতি সতর্কবাণী ছিল। অতঃপর (إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا) থেকে খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুমিনগণের বিশেষ গুণাবলী ও তাদের সুমহান মর্যাদাসমূহের বর্ণনা রয়েছে। উল্লেখিত আয়াতে মুমিনগণের এক গুণ এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের শরীরের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে এবং শয্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ পাকের যিক্র ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করে। কেননা, এরা আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টি ও শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর করুণা ও পুণ্যের আশা করে থাকে। আশা-নিরাশাপূর্ণ এ অবস্থা তাদেরকে যিকর ও দোয়ার জন্য ব্যাকুল করে রাখে।

তাহাজ্জুদের নামায ঃ অধিকাংশ মুফাসসেরগণের মতে শয্যা পরিত্যাগ করে যিকর ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করার অর্থ তাহাজ্জুদ ও নফল নামায—যা ঘুম থেকে উঠার পর গভীর রাতে পড়া হয়। হাদীসের অপরাপর রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত মায়ায ইবনে জাবাল থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন যে, আমি একদা নবীজীর সংগে সফরে ছিলাম, সফরকালে একদিন আমি আরজ করলাম; ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ), আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন যার মাধ্যমে আমি বেহেশত লাভ করতে পারি এবং দোযখ থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। তিনি বললেন, তুমি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আল্লাহ্ পাক যার জন্যে তা সহজ করে দেন তার পক্ষে তা লাভ করা অতি সহজ। অতঃপর বললেন, সে আমল এই যে, আল্লাহর এবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করবে না। নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফে হজ্জ সম্পন্ন করবে। অতঃপর তিনি বললেন—এসো, তোমাকে পুণ্য দ্বারের সন্ধান দিয়ে দেই, (তা এই যে,) রোযা ঢাল স্বরূপ। (যা শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়) এবং সদকা মানুষের পাপানল নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মানুষের গভীর রাতের নামায; এই বলে কোরআন মজীদের উল্লেখিত আয়াত تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ তেলাওয়াত করেন।

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ), কাতাদাহ (রাঃ) ও যাহহাক (রাঃ) বলেন যে, সেসব লোকও শয্যা থেকে শরীরের পার্শ্বদেশ পৃথক হয়ে থাকা গুণের অধিকারী, যাঁরা এশা ও ফজর উভয় নামায জামাআতের সাথে আদায় করেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বিশুদ্ধ সনদসহ বর্ণিত আছে যে, উল্লেখিত আয়াত تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ যারা এশার নামাযের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে, এশার জামাতের জন্য প্রতীক্ষারত থাকেন, তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াত সেসব লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়টুকু নফল নামায আদায় করে করে কাটান (মুহাম্মদ বিন নসর এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন)। এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি শুয়ে বসে বা পার্শ্বদেশে শায়িত অবস্থায় চোখ উন্মীলনের সাথে সাথে আল্লাহ্ পাকের যিক্রে লিপ্ত হন তাঁরাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে-কাসীর ও অন্যান্য তফসীরকারগণ বলছেন যে, এসব বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে শেষরাতের নামাযই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন,—কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী মানবমণ্ডলীকে একত্রিত করবেন, তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক আহবানকারী, যার আওয়াজ সমগ্র সৃষ্টিকুল শুনতে পাবে, দাঁড়িয়ে আহবান করবেন,— হে হাশর ময়দানে সমবেত জনমণ্ডলী! আজ তোমরা জানতে পারবে যে, আল্লাহ্ পাকের নিকটে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী কে? অনন্তর সে ফেরেশতা تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (যাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে) এরূপ-গুণের অধিকারী লোকগণকে দাঁড়াতে আহবান জানাবেন। এ আওয়াজ শোনে এসব লোক দাঁড়িয়ে পড়বেন—যাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য—(ইবনে-কাসীর।) এই রেওয়ায়েতেরই কোন কোন শব্দে রয়েছে যে, এদেরকে হিসাব গ্রহণ ব্যতীতই বেহেশতে প্রেরণ করা হবে। অতঃপর অন্যান্য সমগ্র লোক দাঁড়াবে এবং তাদের হিসাব গ্রহণ করা হবে।—(মাযহারী)

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ
الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ
بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ۭ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿٢٢﴾
وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ
مِّنْ لِّقَاۗىِٕهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ﴿٢٣﴾ وَ
جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ڛ وَ
كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٢٥﴾ اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ
كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ۭ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ۭ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢٦﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ
الْمَاۗءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ
اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ۭ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى
هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَاَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ﴿٣٠﴾

(২১) গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (২২) যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে যালেম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব। (২৩) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, অতএব আপনি কোরআন প্রাপ্তির বিষয়ে কোন সন্দেহ করবেন না। আমি একে বনী ইসরাঈলের জন্যে পথ প্রদর্শক করেছিলাম। (২৪) তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। (২৫) তারা যে বিষয়ে মত বিরোধ করছে, আপনার পালনকর্তাই কেয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন। (২৬) এতে কি তাদের চোখ খোলেনি যে, আমি তাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদের বাড়ী-ঘরে এরা বিচরণ করে। অবশ্যই এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তারা কি শোনে না? (২৭) তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি উষর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে শস্য উদ্গত করি, যা থেকে ভক্ষণ করে তাদের জন্তুরা এবং তারা। তারা কি দেখে না? (২৮) তারা বলে তোমরা সত্যবাদী হলে বল, কবে হবে এই ফয়সালা? (২৯) বলুন, ফয়সালার দিনে কাফেরদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। (৩০) অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ

الْاَدْنٰى — يَرْجِعُوْنَ অর্থ নিকটতম عذاب الادنى (নিকটতম শাস্তি) বলে ইহলৌকিক বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধিকে বোঝানো হয়েছে এবং বৃহত্তম শাস্তি (عذاب الاكبر) বলতে পারলৌকিক শাস্তি বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহ্‌র দিকে যারা ফিরে আসে তাদের পক্ষে ইহলৌকিক বিপদাপদ রহমতস্বরূপ ঃ যার মর্ম এই যে, আল্লাহ্ পাক অনেক মানুষকে তাদের কৃত পাপের জন্য সাবধান করে দেয়ার উদ্দেশে ইহকালে তাদের উপর নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ও রোগ-ব্যাধি চাপিয়ে দেন, যেন তারা সতর্ক হয়ে পাপ থেকে ফিরে আসে এবং পরকালের কঠিনতম শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

অবশ্য যেসব লোক এরূপ দুর্যোগ-দুর্বিপাক সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র প্রতি ধাবিত না হয়— তাদের পক্ষে এটা দ্বিগুণ শাস্তি, (একটা) দুনিয়াতেই নগদ, (দ্বিতীয়টা) পরকালের কঠিনতম শাস্তি। কিন্তু নবী ও ওলীগণের উপর যে বিপদাপদ আসে, তাঁদের ব্যাপার এদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এগুলো তাঁদের পক্ষে পরীক্ষা স্বরূপ—যার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা উন্নত হতে থাকে। যার লক্ষণ ও পরিচয় এই যে, এরূপ বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধির সময়ও তাঁরা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এক প্রকারের আত্মিক শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকেন।

فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاۗىِٕهٖ — لقاء শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ —এ আয়াতে কার সাথে সাক্ষাৎ বোঝানো হয়েছে সে সম্বন্ধে মুফাস্‌সেরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। لِّقَاۗىِٕهٖ -র 'যমীর' (সর্বনাম) কিতাব—অর্থাৎ কোরআনের দিকে ধাবিত করে এই অর্থ করা যায় যে, যেরূপভাবে মহান আল্লাহ্ হযরত মূসা (আঃ)- কে গ্রন্থ প্রদান করেছেন অনুরূপভাবে আপনার প্রতিও আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না।

যেমন কোরআন সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ —অর্থাৎ, এবং নিশ্চয় আপনাকে কোরআন প্রদান করা হবে।

হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ্ (রাঃ)-এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, لِّقَاۗىِٕهٖ -র যমীর (সর্বনাম) হযরত মূসা (আঃ)- এর দিকে ধাবিত হয়েছে এ আয়াতে হযরত মূসা (আঃ) -এর সাথে রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) সাক্ষাতের সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনি এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না যে, হযরত মূসা (আঃ)- এর সাথে আপনার সাক্ষাৎ সংঘটিত হবে। সুতরাং মে'রাজের রাতে এক সাক্ষাৎকার সংঘটিত হওয়ার কথা বিশুদ্ধ হাদীসমূহ দ্বারা প্রমাণিত; অতঃপর কেয়ামতের দিন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, হযরত মূসাকে (আঃ) ঐশী গ্রন্থ প্রদানের দরুন যেভাবে মানুষ তাঁকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছে এবং নানাভাবে দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়েছে, আপনিও এসব কিছুর সম্মুখীন হবেন বলে নিশ্চিত থাকুন। তাই কাফেরদের প্রদত্ত দুঃখ-যন্ত্রণার ফলে আপনি মনক্ষুণ্ণ হবেন না; বরং নবীগণের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক রীতি মনে করে আপনি তা বরদাশত করুন।

কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের পরিচালক ও নেতা হওয়ার দু'টি শর্ত : وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ —অর্থাৎ, আমি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মাঝে কিছু লোককে নেতা ও অগ্রপথিক নিযুক্ত করেছিলাম যারা তাঁদের পয়গম্বরের প্রতিনিধি হিসাবে মহান প্রভুর নির্দেশানুসারে লোকদেরকে হেদায়েত করতেন—যখন তাঁরা ধৈর্য্যধারণ করতেন এবং আমার বাণীসমূহের উপর স্থির বিশ্বাস স্থাপন করতেন।

ইসরাঈল বংশের ওলামাগণের মধ্য হতে কতককে যে, জাতির নেতা ও পুরোধার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে, তার দু'টি কারণ রয়েছে। এ আয়াতে সে দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে—(১) ধৈর্যধারণ করা, (২) আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর অটুট বিশ্বাস স্থাপন করা। আরবী ভাষায় সবর করার অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপক। এর শাব্দিক অর্থ অনড় ও দৃঢ়বদ্ধ থাকা। এখানে সবর দ্বারা আল্লাহ্ পাকের আদেশসমূহ পালনে অটল ও দৃঢ়পদ থাকা এবং আল্লাহ্ পাক যেসব বস্তু বা কাজ হারাম ও গর্হিত বলে নির্দেশ করেছেন সেগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখা। শরীয়তের যাবতীয় নির্দেশাবলীই এর অন্তর্গত—যা এক বিরাট কর্মগত দক্ষতা ও সাফল্য। এর দ্বিতীয় কারণ আল্লাহ পাকের আয়াতসমূহের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন — আয়াতসমূহের মর্ম অনুধাবণ করা এবং অনুধাবণান্তে তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা— উভয়ই এর অন্তর্গত। এটা এক বিরাট জ্ঞানগত দক্ষতা ও সাফল্য।

সারকথা : আল্লাহ্ পাকের নিকটে নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্যের যোগ্য কেবল সেসব লোকই যারা কর্ম ও জ্ঞান উভয়দিকে পূর্ণতা লাভ করেছে। এখানে কর্মগত পূর্ণতা ও দক্ষতাকে জ্ঞানগত পূর্ণতা ও দক্ষতার পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ জ্ঞানের স্থান স্বভাবতঃ কর্মের পূর্বে। এতে ইংগীত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিকটে কর্মহীন শিক্ষা ও জ্ঞানের কোন মূল্য নেই।

ইবনে-কাসীর এ আয়াতের তফসীর প্রসংগে কিছুসংখ্যক ওলামার মন্তব্য উদ্ধৃত করেন; তা এই — بالصبر واليقين تنال الامامة فى الدين — অর্থাৎ, ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমেই দ্বীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করা যায়।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا

অর্থাৎ, তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি যদ্দ্বারা নানা প্রকারের শস্যাদি উদগত হয়। جرز জুরুয শুষ্ক ভূমিকে বলা হয় যেখানে কোন বৃক্ষলতা উদগত হয় না।

ভূমিতে পানি প্রবাহের বিশেষ কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা : শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহে, অনন্তর সেখানে নানাবিধ উদ্ভিদ ও তরু-লতা উদগত হওয়ার বর্ণনা কোরআনে করীমের বিভিন্ন জায়গায় এভাবে করা হয়েছে যে, ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়— ফলে ভূমি রসালো হয়ে শস্যাদি উৎপাদনের যোগ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ আয়াতে বৃষ্টির স্থলে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে শুষ্ক ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করে গাছপালা উদ্গত করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, অন্য কোন ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে সেখান থেকে নদী-নালার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে যেসব শুষ্ক ভূ-ভাগে সাধারণতঃ বৃষ্টি হয় না সেদিকে প্রবাহিত করা হয়।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কতক ভূমি এমন নরম ও কোমল হয় যে, তা বৃষ্টি বহন করার যোগ্যও নয়। —সেখানে পুরোপুরি বৃষ্টি বর্ষিত হলে দালান-কোঠা বিধবস্ত হবে, গাছপালা মুলোৎপাটিত হয়ে যাবে। তাই এরূপ ভূমি সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন যে, অধিক পরিমাণে বৃষ্টি কেবল সেসব ভূমিতেই বর্ষিত হয় যেগুলো তা বহন করার যোগ্যতা রাখে। অতঃপর পানি প্রবাহিত করে এমন ভূমি অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হয় যেগুলোর বৃষ্টি বহনের ক্ষমতা নেই। —যেমন মিসরের ভূমি। কিছুসংখ্যক তসফীরকার ইয়ামন ও শামের কতক ভূমি এরূপ বলে বর্ণনা করেছেন।—যেমন ইবনে আব্বাস ও হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধরনের সকল ভূমিই এর অন্তর্ভুক্ত। মিসরের ভূমি বিশেষভাবে এর অর্ন্তগত—সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু আবিসিনিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশসমূহ থেকে বৃষ্টির পানি নীল নদ দিয়ে মিসরে পৌছে—সাথে করে সেখানকার অত্যন্ত উর্বর লাল পলিমাটি বহন করে আনে। তাই মিসরবাসীরা সেখানে বৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর নতুন পানি ও পলিমাটি দ্বারা উপকৃত হয়।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ —অর্থাৎ কাফেররা পরিহাসচ্ছলে বলে থাকে যে, আপনি কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যে বিজয়ের কথা বলেন তা কখন সংঘটিত হবে? —আমরা তো এর কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।—আমরা তো মুসলমানদেরকে ভীত সন্ত্রস্তভাবে আত্মগোপন করে থাকতে দেখি।

এর উত্তরে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ —অর্থাৎ, আপনি (সাঃ) তাদের বলে দিন যে, তোমরা যে আমাদের বিজয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছো সেদিন তোমাদের জন্য সমূহ বিপদ বয়ে আনবে। কেননা, যখন আমরা বিজয় লাভ করবো, সেদিন তোমরা কঠিন শাস্তিতে জড়িয়ে পড়বে। তা ইহকালে হোক যেমন বদরের যুদ্ধে কিংবা পরকালে।

কোন কোন বিজ্ঞজন مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ এর অর্থ কেয়ামতের দিন বলে বর্ণনা করেছেন।

সূরা সেজদাহ সমাপ্ত

سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ ثَلٰثٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّتِسْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (١) وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (٢) وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ
وَكِيْلًا (٣) مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ
اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ
اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيْلَ (٤) اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ
فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْۤا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ وَ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَاۤ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (٥) اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ
اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى
بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ
تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا (٦)

সূরা আল-আহযাব

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত – ৭৩

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ।

(১) হে নবী! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন এবং কাফের ও কপট বিশ্বাসীদের কথা মানবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (২) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়, আপনি তার অনুসরণ করুন। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন। (৩) আপনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (৪) আল্লাহ্ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি। তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা 'যিহার' কর, তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ্ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন। (৫) তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহ্‌র কাছে ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোন বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা। আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী মুমিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করতে চাও, করতে পার। এটা লওহে-মাহ্‌ফূযে লিখিত আছে।

সূরা আল-আহ্‌যাব

সূরাতুল-আহযাব মদীনায় অবতীর্ণ হয়। এর অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় আল্লাহ্ পাক সমীপে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিশিষ্ট স্থান ও উচ্চ মর্যাদা সংশ্লিষ্ট। এ সূরার বিভিন্ন শিরোনামায় রসূল (সাঃ)-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আবশ্যকতা এবং তাঁকে দুঃখ-যন্ত্রণা দেয়া হারাম হওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। সূরার অবশিষ্ট বিষয়সমূহও এগুলোরই পরিপূরক ও সহায়ক।

শানে নুযূল : এ সূরা নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হিজরতের পর যখন মদীনায় তশরীফ নিয়ে যান, তখন মদীনার আশে-পাশে বনূ কোরায়জা, বনূ নযীর, বনূ কায়নুকা প্রভৃতি কতিপয় ইহুদী গোত্র বসবাস করত। রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীনের এটাই একান্ত কামনা ছিল যেন এসব লোক মুসলমান হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এসব ইহুদীর মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি নবীজীর (সাঃ) খেদমতে যাতায়াত করতে আরম্ভ করে এবং কপট ও বর্ণচোরা রূপ ধারণ করে নিজেদেরকে মৌখিকভাবে মুসলমান বলে প্রকাশ করতে থাকে, কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না। কিছু লোক মুসলমান হলে অপরাপরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছানো সহজতর হবে মনে করে নবীজী এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাদেরকে স্বাগতম জানালেন। এদের সাথে বিশেষ সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে লাগলেন, এবং ছোট-বড় সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। এমন কি ওদের দ্বারা কোন অসংগতিপূর্ণ কাজ সংঘটিত হলে পরও ধর্মীয় কল্যাণের কথা চিন্তা করে সেগুলোর প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করতেন না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সূরায়ে আহযাবের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে।—(কুরতুবী)

ইবনে জরীর (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে অপর এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, হিজরতের পর ওলীদ ইবনে মুগীরা, মুগীরা ও শাইবা ইবনে রবীয়া মদীনায় পৌঁছে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে হুযুরে পাকের খেদমতে এ প্রস্তাব পেশ করে যে, যদি আপনি ইসলামের প্রতি দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করেন, তবে আমরা আপনাকে মক্কার অর্ধেক সম্পদ প্রদান করবো। আবার মদীনার মুনাফিক ও ইহুদীরা এই মর্মে ভীতি প্রদর্শন করে যে, যদি তিনি নিজ দাবী ও দাওয়াত থেকে বিরত না থাকেন, তবে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলবো। এমতাবস্থায় এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়।—(রূহুল-মা'আনী)

সা'লাবী ও ওয়াহেদী এক তৃতীয় ঘটনা সনদহীনভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় মক্কার কাফের ও নবীজীর মাঝে 'যুদ্ধ নয় চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যখন আবু-সুফিয়ান, ইকরিমা ইবনে আবু জাহ্‌ল ও আবুল আ'ওয়ার সালামী মদীনায় পৌছে নবীজীর খেদমতে নিবেদন করলো যে, আপনি আমাদের উপাস্য দেব-দেবীদের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ পরিহার করুন এবং কেবল বলুন যে, (পরকালে) এরাও সুপারিশ করবে এবং উপকার ও কল্যাণ সাধন করবে। যদি আপনি এমনটি করেন, তবে আমরাও আপনার পালনকর্তার নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করবো। এভাবে আমাদের পারস্পরিক বিবাদ মিটে যাবে।

তাদের একথা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় বোধ হলো। মুসলমানগণ এদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। নবীজী (সাঃ) এরশাদ করলেন যে, আমি এদের সাথে সন্ধি

চুক্তিতে আবদ্ধ বলে এমনটি হতে পারে না। ঠিক এই সময় এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়।—(রূহুল মা'আনী)

এসব রেওয়ায়েত যদিও বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু এদের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই। এসব ঘটনাবলীও উল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হতে পারে।

এ আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি দুটো নির্দেশ রয়েছে—প্রথম, اتَّقِ اللّٰهَ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, দ্বিতীয় وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ —অর্থাৎ, অবিশ্বাসীদের অনুসরণ করো না। আল্লাহ্‌কে ভয় করার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এসব লোককে হত্যা করা চুক্তিভঙ্গের শামিল—যা সম্পূর্ণ হারাম এবং কাফেরদের অনুসরণ না করার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এসব ঘটনাবলী সম্পর্কে কাফেরদের যা মতামত তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, যার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে আসছে।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান যে, সমগ্র কোরআনের কোথাও তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করা হয়নি। যেমনটি অন্যান্য নবীগণকে সম্বোধনের বেলায় করা হয়েছে। যেমন— يا ادم . ياموسى . يانوح . يا ابراهيم প্রভৃতি। বরং খাতামুন্নাবিয়্যিন (সাঃ)-কে কোরআন পাকের যেখানেই সম্বোধন করা হয়েছে—তাঁর উপাধি—নবী বা রসূল প্রভৃতির মাধ্যমে করা হয়েছে। কেবল চার জায়গায়, তিনি যে রসূল তা প্রকাশ করার উদ্দেশে, তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যা একান্ত জরুরী ছিল।

এখানে মহানবী (সাঃ)-কে সম্বোধন করে দুটো নির্দেশ দেয়া হয়েছে—(এক) আল্লাহ্ পাককে ভয় করার—অর্থাৎ, মক্কার মুশরেকদের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা যেন লংঘন করা না হয়। (দুই) মুশরেক, মুনাফেক ও ইহুদীদের মতামত গ্রহণ না করার। প্রশ্ন হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তো যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত। চুক্তিভংগ করা মহাপাপ—(কবীরা গোনাহ্) এবং উপরে শানে-নুযূল প্রসংগে কাফের মুশরেকদের যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো গ্রহণ করা তো মারাত্মক পাপ ; আর তিনি (নবীজী) এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র— সুতরাং এ নির্দেশের কি প্রয়োজন ছিল? রূহুল মা'আনীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এসব নির্দেশের অর্থ ভবিষ্যতে এগুলোর উপর স্থির থাকা—যেমনভাবে তিনি এ ঘটনার সময়ও এসব হুকুমের উপর অটল ছিলেন এবং اتَّقِ اللّٰهَ —এর নির্দেশ প্রথম উল্লেখ করার কারণ এই যে, মুসলমানগণ শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ মক্কার মুশরেকদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করছিল। সুতরাং চুক্তি লংঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্য اتَّقِ اللّٰهَ —এর মাধ্যমে প্রথম হেদায়েত করা হয়েছে। অপরপক্ষে যেহেতু কোন মুসলমান মুশরেক-কাফেরদের অনুসরণের ইচ্ছাও পোষণ করতেন না, তাই এর উল্লেখ পরে করা হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, এ আয়াতে যদিও নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য গোটা উম্মত—তিনি তো ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, —তাঁর দ্বারা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু বিধান গোটা উম্মতের জন্য এবং সেটা বর্ণনার জন্যই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে যে, সম্বোধন করা হয়েছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে যার ফলে হুকুমের গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। কেননা, যে বিষয়ে আল্লাহ্‌র রসূলকেও সম্বোধন করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে কোন মানুষই এর আওতা বহির্ভূত থাকতে পারে না।

ইবনে-কাসীর বলেন যে, এ আয়াতে কাফের ও মুশরেকদের অনুসরণ থেকে বারণ করার মূল উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন তাদের সাথে কোন ব্যাপারে পরামর্শ না করেন—তাদেরকে অত্যধিক উঠাবসা, মেলামেশার সুযোগ না দেন। কেননা, এদের সঙ্গে অত্যধিক মেলামেশা ও শলা-পরামর্শ করা অনেক সময় এদের কথা গ্রহণ করার কারণরূপে পরিণত হতে পারে। সুতরাং যদিও নবীজীর পক্ষে তাদের কথা গ্রহণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখা এবং নিজের পরামর্শে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দান থেকেও নবীজীকে বারণ করা হয়েছে। পরন্তু এক্ষেত্রে اطاعت (অনুসরণ করা) শব্দ এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, এরূপ পরামর্শ ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্বভাবতঃ তাদের মতামতের কিছুটা অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং পরোক্ষভাবে হলেও তাদের মতামত কিছুটা প্রভাবান্বিত করতে পারে ; এরূপ কোন সুযোগও যাতে না হয়, তারই পথ বন্ধ করা হয়েছে। তাঁর পক্ষে ওদের অনুসরণের তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, উল্লেখিত আয়াতে কাফেরদের পক্ষ থেকে শরীয়ত বিরোধী ও হকের পরিপন্থী উক্তি অতি স্বাভাবিক এবং সেগুলোর অনুসরণ না করার নির্দেশও একান্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মুনাফেকগণ যদি আপনার নিকটে প্রকাশ্যভাবে কোন ইসলাম বিরোধী উক্তি করে, তবে তো তারা আর মুনাফেক থাকে না—পরিষ্কার কাফের হয়ে যায়—এমতাবস্থায় তাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে বলার প্রয়োজনীয়তা কি? এর উত্তর এই হতে পারে যে, মুনাফেকগণ একেবারে স্পষ্টভাবে তো ইসলাম বিরোধী কোন উক্তি করতো না, কিন্তু অন্যান্য কাফেরদের সমর্থনে কথা বলতো।

শানে নুযূল প্রসঙ্গে মুনাফেকদের যে ঘটনা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, যদি এটাকেই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলে ধরে নেয়া হয়, তবে তো কোন কথাই থাকে না। কেননা, এ ঘটনানুযায়ী যেসব ইহুদী কপটভাবে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করে ; তাদের সাথে বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করতে নবীজীকে বারণ করা হয়েছে।

এ আয়াতের উপসংহার اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا —বলে আল্লাহ্‌কে ভয় করার এবং কাফের ও মুনাফেকদের অনুসরণ না করার পূর্ব বর্ণিত যে হুকুম তার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, যে আল্লাহ্ যাবতীয় কর্মের পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়—মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও মংগল তাঁর পরিজ্ঞাত। একথা এজন্য বলা হয়েছে যে, কাফের ও মুনাফেকদের কোন কোন কথা এমনও ছিল যদ্দারা অন্যায়-অশান্তি লাঘব এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সদ্ভাবপূর্ণ পরিবেশ স্থাপন এরূপ, অন্যান্য কল্যাণ ও উপকার সাধনে সহায়ক হতো। কিন্তু এদের সাথে এরূপ সৌজন্যমূলক আচরণও মংগলের পরিপন্থী বলে হক তা'আলা নবীজীকে তা করতে বারণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর পরিণাম শুভ নয়।

وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

এটা পূর্ববর্তী হুকুমেরই অবশিষ্টাংশ—যেন আপনি কাফের ও মুনাফেকদের কথায় পড়ে তাদের অনুসরণ না করেন, বরং ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যাকিছু পৌঁছেছে, আপনি সাহাবায়ে কেরামসহ কেবল তাই অনুসরণ করুন। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম ও সমগ্র মুসলমানই এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত ; তাই বহুবচন ক্রিয়া بِمَا تَعْمَلُوْنَ

ব্যবহার করে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا –এটাও পূর্ববর্তী হুকুমের সমাপনী অংশবিশেষ। এরশাদ হয়েছে যে, আপনি এসব লোকের কথায় পড়ে কোন কাজে উদ্যোগী হবেন না, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জনে কেবল আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করুন। কেননা, অভিভাবকরূপে তিনিই যথেষ্ট। তাঁর বর্তমানে আপনার অন্য কারো সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন নেই।

মাসআলা ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, দ্বীন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কাফেরদের পরামর্শ গ্রহণ করা জায়েয নয়। অবশ্য অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণে কোন দোষ নেই।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি কাফের ও মুনাফিকদের পরামর্শানুযায়ী কাজ না করা ও তাদের কথায় কর্ণপাত না করার নির্দেশ রয়েছে। উল্লেখিত আয়াতসমূহে কাফেরদের মাঝে প্রচলিত তিনটি কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। প্রথমতঃ বর্বর যুগে আরববাসীরা অসাধারণ মেধাবী লোকের বক্ষাভ্যন্তরে দু'টি অন্তঃকরণ আছে বলে মনে করত। দ্বিতীয়তঃ নিজ পত্নীদের সম্পর্কে এপ্রথা প্রচলিত ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে তার মায়ের পিঠ বা অন্য কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করে বলতো যে, তুমি আমার পক্ষে আমার মায়ের পিঠের সমতুল্য, যাকে তাদের পরিভাষায় 'যিহার' বলা হতো ; তবে 'যিহার'কৃত সে স্ত্রী তার জন্যে চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যেত। ظهار এর উৎপত্তি ظهر থেকে—যার অর্থ—পিঠ।

তৃতীয়তঃ তাদের মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি অপর কারো পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করতো, তবে এ পোষ্যপুত্র তার প্রকৃত পুত্র বলেই পরিচিত হতো এবং তারই পুত্র বলে সম্বোধন করা হতো ; এ পোষ্যপুত্র সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পুত্রেরই মর্যাদাভুক্ত হতো। যথা—তারা প্রকৃত সন্তানের ন্যায়ই মীরাসের অংশীদার হতো এবং বংশ ও রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে যেসব নারীর সাথে বিয়ে-শাদী হারাম—এ পোষ্যপুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এরূপই মনে করা হতো। যেমন—বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার পরও ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা যেরূপ হারাম, অনুরূপভাবে পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীও সে ব্যক্তির পক্ষে হারাম বলে মনে করা হতো।

বর্বর যুগের এই তিনটি ভ্রান্ত ধারণা ও কুপ্রথার মধ্যে প্রথমটি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে ইসলামী শরীয়তে একে রদ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। এটা তো একান্তই শরীরতত্ত্ব বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপার যে, মানুষের বক্ষাভ্যন্তরে একটি অন্তঃকরণ থাকে, না দু'টি অন্তঃকরণ থাকে। এর স্পষ্ট অসারতা সর্বজন জ্ঞাত। এজন্য সম্ভবতঃ এর অসারতার বর্ণনা অপর দু'টো বিষয়ের সমর্থনে ভূমিকাস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বর্বর যুগের অধিবাসীদের মানুষের বক্ষ-মাঝে দু'টি অন্তঃকরণ আছে বলে যে বিশ্বাসের অসারতা ও অযৌক্তিকতা যেমন সাধারণ-অসাধারণ সর্বজনবিদিত, অনুরূপভাবে তাদের 'যিহার' ও পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক।

অবশিষ্ট দু'টি বিষয়-যিহার ও পালক পুত্রের হুকুম—এগুলো এমন সব সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, ইসলামে যেগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ্ পাক যার বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটিনাটি পর্যন্ত কোরআনে প্রদান করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের মত নিছক মূলনীতিগুলো উল্লেখ করে সবিস্তার বিশ্লেষণের ভার নবীজীর (সাঃ) উপর ন্যস্ত করেননি। এ দু'টি ব্যাপারে বর্বর আরবগণ নিজেদের খেয়াল-খুশীমত হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েয সংশ্লিষ্ট স্বকীয় কল্পনাপ্রসূত বিধি-বিধান প্রণয়ন করে রেখেছিল। এসব অমূলক ধারণা ও প্রথাসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করে যা প্রকৃত সত্য তা উদ্‌ঘাটন করে দেয়া সত্য ধর্ম ইসলামের অবশ্য কর্তব্য ছিল—তাই বলা হয়েছে— وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ অর্থাৎ, এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে মায়ের সদৃশ বলে ঘোষণা করে, তবে তার পক্ষে সে স্ত্রী প্রকৃত মায়ের ন্যায় চিরদিনের তরে হারাম হয়ে যায়। তোমাদের এরূপ বলার ফলে সে স্ত্রী প্রকৃত মা হয়ে যায় না। তোমাদের প্রকৃত মা তো সে-ই-যার উদর থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ।

এ আয়াতে 'যিহার-এর' দরুন স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাওয়ার জাহেলিয়াত যুগের ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এরূপ বলার ফলে শরীয়তের কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, এ সম্পর্কে 'সূরায়ে মোজাদালায়' এরূপ বলাকে পাপ বলে আখ্যায়িত করে এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার পর যদি যিহারের কাফ্‌ফারা আদায় করে ; তবে স্ত্রী তার জন্যে হালাল হয়ে যাবে। 'সূরায়ে মোজাদালায়' যিহারের কাফ্‌ফারার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ - ادعياء - دعى-এর বহুবচন, যার অর্থ পালক ছেলে—আয়াতের মর্ম এই, যেমন কোন মানুষের দু'টি অন্তঃকরণ থাকে না এবং যেমন স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করলে সে প্রকৃত মা হয়ে যায় না ; অনুরূপভাবে তোমাদের পোষ্য ছেলেও প্রকৃত ছেলেতে পরিণত হয় না। অর্থাৎ, অন্যান্য সন্তানদের ন্যায় সে মীরাসেরও অংশীদার হবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং সন্তানের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যেমন পিতার জন্য চিরতরে হারাম, কিন্তু পোষ্যপুত্রের স্ত্রী পালক পিতার তরে তেমনভাবে হারাম হবে না।

যেহেতু এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া বহু ক্ষেত্রে পড়ে থাকে ; সুতরাং এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, যখন পালক ছেলেকে ডাকবে বা তার উল্লেখ করবে, তখন তা তার প্রকৃত পিতার নামেই করবে। পালক পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করবে না। কেননা, এর ফলে বিভিন্ন ব্যাপারে নানাবিধ সন্দেহ ও জটিলতা উদ্ভবের আশঙ্কা রয়েছে।

বোখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)-কে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ (সাঃ) বলে সম্বোধন করতাম। (কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে পালক ছেলেরূপে গ্রহণ করেছিলেন।) এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরিত্যাগ করি।

মাসআলা ঃ এদ্দ্বারা বোঝা যায়, অনেকে যে অপরের সন্তানকে নিজ পুত্র বলে আহবান করে, তা যদি নিছক স্নেহজনিত হয়—পালক পুত্রে পরিণত করার উদ্দেশে না হয়, তবে যদিও জায়েয, কিন্তু তবুও বাহ্যতঃ যা নিষিদ্ধ, তাতে জড়িত হওয়া সমীচীন নয়।—(রূহুল বয়ান, বায়যাবী)

এ ব্যাপারটা কুরাইশদেরকে চরম বিভ্রান্তিতে ফেলে এক গুরুতর পাপে লিপ্ত করে রেখেছিল। এমন কি নবীজী (সাঃ)-কে পর্যন্ত এ অপবাদ দেয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছিল যে, তিনি নিজ পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন। অথচ যায়েদ (রাঃ) তাঁর সন্তান ছিলেন না ; বরং পালক পুত্র ছিলেন। যার বিবরণ এ সূরাতে পরে আছে।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, 'সূরায়ে আহ্যাবের' অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁকে দুঃখ-কষ্ট দেয়া হারাম হওয়া সংশ্লিষ্ট। সূরার প্রারম্ভে মুশরেক ও মুনাফেকদের প্রদত্ত জ্বালা-যন্ত্রণার বর্ণনা দেয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রাসঙ্গিক নানাবিধ উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল। অতঃপর অন্ধকার যুগের তিনটি অযৌক্তিক প্রথার অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে শেষ কুপ্রথাটি সম্পর্কে আলোচনার একটি সম্পর্ক নবীজীকে যন্ত্রণাদান সম্পর্কিত ছিল। কেননা, কাফেররা হযরত যায়েদের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী পুণ্যবতী যয়নবের (রাঃ) সাথে নবীজীর বিবাহ অনুষ্ঠানকালে জাহেলী যুগের এই পোষ্যপুত্রজনিত কুপ্রথার ভিত্তিতে অপবাদ দেয় যে, তিনি নিজের ছেলের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন। সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত নবীজীকে যন্ত্রণা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়বস্তু ছিল। আলোচ্য ৬ নং আয়াতে সমস্ত সৃষ্টিকুলের চাইতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাঁর অনুসরণ অধিক প্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করে বলা হয়েছে اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ – اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ -এর সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে মহানবীর (সাঃ) নির্দেশ পালন করা স্বীয় পিতা-মাতার নির্দেশের চাইতেও অধিক আবশ্যকীয়। যদি পিতা-মাতার হুকুম তাঁর (সাঃ) হুকুমের পরিপন্থী হয়, তবে তা পালন করা জায়েয নয়। এমন কি তাঁর (সাঃ) নির্দেশকে নিজের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার চাইতেও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সহীহ্ বোখারী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ 'এমন কোন মুমিনই নেই যার পক্ষে আমি (সাঃ) ইহকাল ও পরকালে সমস্ত মানবকুলের চাইতে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও আপনজন নেই। যদি তোমাদের মনে চায়, তবে এর সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য কোরআনের আয়াত— - اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ -পাঠ করতে পার।'

وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ —তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে উম্মতে মুসলিমার মা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ—ভক্তি-শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে মায়ের পর্যায়ভুক্ত হওয়া। মা-ছেলের সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহ্কাম, যথা—পরস্পর বিয়ে-শাদী হারাম হওয়া। মুহ্রিম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না করা এবং মীরাসে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, আয়াতের শেষে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আর নবীজীর শুদ্ধচারিণী পত্নীগণের সাথে উম্মতের বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়ার কথা অন্য এক আয়াতে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়া মা হওয়ার কারণেই ছিল, এমনটি হওয়া জরুরী নয়।

মাসআলা ঃ উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবীজীর পুণ্যবতী বিবিগণের (রাঃ) মধ্যে কারো প্রতি সামান্যতম বে-আদবী কিংবা অশিষ্টাচারও এজন্য হারাম যে, তাঁরা উম্মতের মা। উপরন্তু তাঁদেরকে দুঃখ দিলে নবীজীকেও দুঃখ দেয়া হয়, যা চরমভাবে হারাম।

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ – اولوا الارحام –শব্দগত শব্দার্থানুযায়ী সকল আত্মীয়-স্বজনই এর অন্তর্ভুক্ত—চাই সেসব ব্যক্তিবর্গ—যাদেরকে ফকীহগণ 'আসাবাত' (عصبات) বলে আখ্যায়িত করেছেন বা যাদেরকে বিশেষ পরিভাষানুযায়ী 'আসাবাতে'র মোকাবেলায় وَاُولُوا الْاَرْحَامِ নামে নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য কোরআনী আয়াতের মর্ম পরবর্তীকালে গৃহীত ফেকাহ্র এ পরিভাষা নয়।

সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তদীয় পত্নীগণের সাথে মুসলিম উম্মতের সম্পর্ক যদিও পিতা-মাতার চাইতেও উন্নততর ও অগ্রস্থানীয়, কিন্তু মীরাসের ক্ষেত্রে তাদের কোন স্থান নেই ; বরং মীরাস বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে বন্টিত হবে।

ইসলামের সূচনাকালে মীরাসের অংশীদারিত্ব ঈমান ও আত্মিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। পরবর্তী সময়ে তা রহিত করে আত্মীয়তার সম্পর্ককেই অংশীদারিত্ব নির্ধারণের ভিত্তি ধার্য করে দেয়া হয়েছে। স্বয়ং কোরআন করীমই তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছে। এতদসংশ্লিষ্ট রহিতকারী ও রহিত আয়াতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে সূরায়ে আনফালে প্রদত্ত হয়েছে। আয়াতে الْمُؤْمِنِيْنَ এর পরে আবার وَالْمُهٰجِرِيْنَ এর উল্লেখ এক্ষেত্রে তাঁদের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের উদ্দেশে করা হয়েছে।

কোন কোন মনীষীর মতে এখানে 'মু'মিনীন' বলে আনসারগণকে বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এ আয়াত হিজরতের মাধ্যমে মীরাসে অধিকার প্রদান সংক্রান্ত পূর্ববর্তী হুকুমের রহিতকারী (নাসেখ) বলে বিবেচিত হবে। কেননা, নবীজী হিজরতের প্রারম্ভিককালে মুহাজিরীন ও আনসারের মাঝে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত নির্দেশও দিয়েছিলেন। এ আয়াতের মাধ্যমে হিজরতের ফলে উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত সে হুকুমও রহিত করা হয়েছে।—(কুরতুবী)

اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا –অর্থাৎ, উত্তরাধিকার তো কেবল আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতেই লাভ করা যাবে। কোন অনাত্মীয় উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। কিন্তু ঈমানী ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের কারণে কাউকে কিছু প্রদান করতে চাইলে সে অধিকার বহাল থাকবে—নিজ জীবদ্দশায়ও দান ও উপঢৌকন হিসেবে তাদেরকে প্রদান করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য ওসিয়তও করা যাবে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾
لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرًا ﴿٩﴾ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ
زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ
الظُّنُونَا ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا
اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ
يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ
يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا
فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ
لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ
مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾

(৭) যখন আমি পয়গম্বরগণের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম এবং অঙ্গীকার নিলাম তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার— (৮) সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্যে। তিনি কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (৯) হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (১০) যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে। (১১) সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল। (১২) এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়। (১৩) এবং যখন তাদের একদল বলেছিল হে ইয়াসরেববাসী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ী-ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা। (১৪) যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হত, অতঃপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না। (১৫) অথচ তারা পূর্বে আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরার শুরুতে নবী করীম (সাঃ)-কে তাঁর উপর অবতারিত ওহী অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে "আপনার উপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে ওহী অবতারিত হয়েছে, তা অনুসরণ করুন।" আর আলোচ্য আয়াত اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ এর মাধ্যমে মুমিনগণের উপর পয়গম্বর (সাঃ)-এর নির্দেশাবলী পালন করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুটো কথাই আরো অধিক প্রমাণ ও প্রকাশের উদ্দেশে উল্লেখিত আয়াতদ্বয়েও দুটি বিষয় বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সাহেবে ওহীর পক্ষে তাঁর উপর অবতারিত ওহীর এবং অন্যান্যদের পক্ষে সাহেবে ওহীর অনুসরণ করা ওয়াজিব—অপরিহার্য।

নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ ঃ উল্লেখিত আয়াতে নবীগণ থেকে যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কথা আলোচিত হয়েছে তা সমস্ত মানবকুল থেকে গৃহীত সাধারণ অঙ্গীকার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন, মেশকাত শরীফে ইমাম আহমদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে—'রেসালত ও নবুওয়ত সংক্রান্ত অঙ্গীকার নবী ও রসূলগণ থেকে স্বতন্ত্ররূপে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যথা আল্লাহ্ পাকের বাণী وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ

নবী (আঃ)-গণ থেকে গৃহীত এ অঙ্গীকার ছিল নবুওয়ত ও রেসালত বিষয়ক দায়িত্বসমূহ পালন এবং পরস্পর সত্যতা প্রকাশ ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান সম্পর্কিত। ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হযরত কাতাদা (রাঃ) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে একথাও নবীগণের (আঃ) এ অঙ্গীকারভুক্ত ছিল যেন তাঁরা সকলে এ ঘোষণাও করেন যে—'মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল, তাঁর পরে কোন নবী আসবেন না।'

وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ –সাধারণভাবে সমস্ত নবীগণের কথা উল্লেখের পর পাঁচ জনের নাম বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীকুলের মধ্যে তাঁরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এঁদের মধ্যে রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর আবির্ভাব সকলের শেষে হয়ে থাকলেও وَمِنْكَ শব্দের মাধ্যমে নবীজীকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। যার কারণ হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ আমি (নবীকুলের মাঝে) সৃষ্টিগত দিক দিয়ে আগে, কিন্তু আবির্ভাব ও নবুওয়ত প্রাপ্তির দিক দিয়ে সকলের পরে।—(মাযহারী)

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) অনন্য ও মহান মর্যাদার বর্ণনা এবং মুসলমানদের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ অনুকরণ ও পদাঙ্ক অনুসরণের নির্দেশ ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আহ্‌যাব (সম্মিলিত বাহিনী) যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কিত কোরআন পাকের এ দু'রুকূ অবতীর্ণ হয়েছে।—যাতে মুসলমানদের উপর কাফের ও মুশরিকদের সম্মিলিত আক্রমণ ও কঠিন পরিবেষ্টনের পর মুসলমানদের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র নানাবিধ অনুগ্রহরাজি এবং রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) বিভিন্ন মু'জেযার বর্ণনা রয়েছে। আর আনুষঙ্গিকভাবে জীবনের বিভিন্ন দিক সংশ্লিষ্ট বহুবিধ হেদায়েত ও নির্দেশাবলী রয়েছে। এসব অমূল্য নির্দেশাবলীর দরুন কুরতুবী ও মাযহারীসহ সব বিশিষ্ট তফসীরকারকগণই আহযাবের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। আহযাব যুদ্ধে মুসলমানদের কঠিন বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করে এ মহাবিপর্যয়ের সময়ে মুসলমানদের এক অবস্থা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে— وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا –অর্থাৎ

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا
لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ
اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ
اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ
لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ اَشِحَّةً
عَلَيْكُمْ ۚ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ
اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ
سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا
فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝ يَحْسَبُوْنَ
الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ
بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ؕ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا
قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝ وَلَمَّا رَاَ
الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَ
صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ؗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ۝

(১৬) বলুন। তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর, তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না। তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে। (১৭) বলুন! কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের প্রতি অনুকম্পার ইচ্ছা? তারা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যদাতা পাবে না। (১৮) আল্লাহ্ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে এস। তারা কমই যুদ্ধ করে। (১৯) তারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায়। অতঃপর যখন বিপদ টলে যায় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তারা মুমিন নয়। তাই আল্লাহ্ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ্র জন্যে সহজ। (২০) তারা মনে করে শত্রুবাহিনী চলে যায়নি। যদি শত্রুবাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে যে, যদি তারা গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিত, তবেই ভাল হত। তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই করত। (২১) যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহ্র মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (২২) যখন মুমিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল।

আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে তোমরা বিভিন্ন ধারণা পোষণ করছিলে। এসব ধারণা দ্বারা সেসব ইচ্ছা বহির্ভূত ধারণাসমূহকেই বোঝানো হয়েছে—যেগুলো সঙ্কটকালে মানব মনে উদয় হয়—যেমন, মৃত্যু আসন্ন ও অনিবার্য; বাঁচার আর কোন উপায় নেই ইত্যাদি। এরূপ ইচ্ছা বহির্ভূত ধারণা ও কল্পনাসমূহ পরিপক্ব ঈমান বা পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। অবশ্য এগুলো চরম দুর্বিপাক ও কঠিন বিপদের পরিচায়ক ও সাক্ষ্যবাহক। কেননা, পর্বতবৎ অনড় ও দৃঢ়পদ সাহাবায়ে কেরামের অন্তরেও এ ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে।

মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অঙ্গীকারসমূহকে ভাঁওতা ও প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করতে লাগল ঃ

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا —অর্থাৎ, যখন কপটবিশ্বাসী এবং ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকেরা বলতে লাগল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের এসব অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বই কিছুই নয়। এতো ছিল তাদের আভ্যন্তরীণ কুফরীর বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তী পর্যায়ে যেসব মুনাফিক কার্যতঃ—বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিল তাদের দু'শ্রেণী ছিল। প্রথম শ্রেণী—যারা কিছু না বলেই পালাতে লাগল এবং বলতে লাগল يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا -অর্থাৎ, হে ইয়াসরেববাসীরা! তোমাদের টিকে থাকার উপায় নেই, সুতরাং ফিরে চল। আর অপর শ্রেণী যারা ছল-চাতুরী বের করে হযরত (সাঃ)-এর নিকট ফিরে যাওয়ার আবেদন করল। তাদের অবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ অর্থাৎ, এদের মাঝে একদল নবীজীর নিকট এই বলে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগল যে, আমাদের বাড়ী অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। কোরআন করীম এদের ছল-চাতুরীর স্বরূপ উধঘাটন করে দিয়েছে যে, এ সবকিছুই মিথ্যা। আসলে এরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে চায়, পরবর্তী কয়েক আয়াতে এদের কু-কীর্তি, অপকৃষ্টতা এবং মুসলমানদের সাথে এদের শত্রুতা অতঃপর এদের করুণ ও মর্মন্তুদ পরিণতির বর্ণনা রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এরপর অকপট ও খাঁটি মুসলিমগণের বর্ণনা প্রসংগে এদের অসম দৃঢ়তার প্রশংসা করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুসরণ-অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতাকে মূলনীতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। — لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) মধ্যে উত্তম অনুপম আদর্শ রয়েছে। এদ্বারা রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) বাণীসমূহ ও কার্যাবলী উভয়ই অনুসরণের হুকুম রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু বিশিষ্ট মুফাস্সেরগণের মতে এর বাস্তব ও কার্যকরীরূপ এই যে, যেসব কাজ করা বা পরিহার করা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দ্বারা অবশ্য করণীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে প্রমাণিত, তা অনুসরণ ওয়াজিব ও অপরিহার্য। আর যেগুলো করা বা বর্জন করা উত্তম (মুস্তাহাব) হওয়ার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা করা বা বর্জন করা আমাদের ক্ষেত্রেও মুস্তাহাবের স্তরেই থাকবে।—তা আমান্য করা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ
مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾ لِّيَجْزِيَ
اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ
يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۭ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۭ
وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾ وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ
الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا
تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾ وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَ
اَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٧﴾
يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾
وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ
اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾ يٰنِسَآءَ
النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ
لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

(২৩) মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। (২৪) এটা এজন্যে যাতে আল্লাহ্ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৫) আল্লাহ্ কাফেরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্ মুমিনদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২৬) কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ। (২৭) তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘর-বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূ-খণ্ডের মালিক করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা অভিযান করনি। আল্লাহ্ সর্ববিষয়োপরি সর্বশক্তিমান। (২৮) হে নবী! আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। (২৯) পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ্ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৩০) হে নবী পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। এটা আল্লাহ্র জন্যে সহজ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লেখিত আয়াতসমূহের সর্বশেষে তিন আয়াতে বনু-কোরায়যার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ অর্থাৎ, যে সকল আহ্‌লে কিতাব সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর সহযোগিতা করেছে, আল্লাহ্ পাক তাদের অন্তরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভীতি সঞ্চার করে তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত দুর্গ থেকে নীচে নামিয়ে দেন এবং তাদের ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ী মুসলমানগণের স্বত্বভুক্ত করে দেন।

সর্বশেষ আয়াতে মুসলমানদের অদূর ভবিষ্যতে জয়যাত্রার সুসংবাদ দান করা হয়েছে যে, এখন থেকে কাফেরদের অগ্রাভিযানের অবসান এবং মুসলমানদের বিজয় যুগের সূচনা হলো। আর এমনসব ভূ-খণ্ড তাদের অধিকারভুক্ত হবে যেগুলোর উপর কখনো তাদের পদচারণা পর্যন্ত হয়নি। যার বাস্তবায়ন সাহাবায়ে কেরামের যুগে বিশ্বমানব প্রত্যক্ষ করেছে। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের এক বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁদের অধিকারভুক্ত হয়। আল্লাহ্ পাক যা চান তাই করেন।

এই সূরার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সেসব বস্তু ও কার্যাবলী পরিহার করার প্রতি তাগিদ দেয়া, যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কষ্ট ও মর্ম বেদনার কারণ হতে পারে। এতদ্ভিন্ন তাঁর (সাঃ) আনুগত্য ও সন্তুষ্টি বিধান সম্পর্কিত নির্দেশাবলীও রয়েছে। উপরে বর্ণিত পরিখার যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনার মধ্যে রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) প্রতি কাফের ও মুনাফেকদের অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট প্রদান পরিণামে নির্যাতনকারী কাফের ও মুনাফিকদের চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননা এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অতুলনীয় বিজয় ও সাফল্যের বিবরণ ছিল। সংগে সংগে সেসব নিষ্ঠাবান মুমিনগণের প্রশংসা এবং পরকালে তাঁদের উচ্চ মর্যাদারও বর্ণনা ছিল, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আদেশ-ইঙ্গিতে নিজেদের সর্বস্ব কোরবান করে দিয়েছিলেন।

উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহে নবীজীর (সাঃ) পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যেন তাঁদের কোন কথা ও কাজের দ্বারা হুযূর পাকের (সাঃ) প্রতি কোন দুঃখ-যন্ত্রণা না পৌঁছে ; সেদিকে যেন তাঁরা যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন। আর তা তখনই হতে পারে, যখন তাঁরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের (সাঃ) প্রতি পূর্ণভাবে অনুগত থাকবেন। এ প্রসঙ্গে পুণ্যবতী পত্নীগণকে (রাঃ) সম্বোধন করে কয়েকটি নির্দেশ রয়েছে।

শুরুর আয়াতসমূহে তাঁদেরকে যে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কিত পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ) কর্তৃক সংঘটিত এক বা একাধিক এমন ঘটনা রয়েছে, যা নবীজীর মর্জির পরিপন্থী ছিল, যদ্দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অনিচ্ছাকৃতভাবেই দুঃখ পান।

এসব ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনা যা সহীহ্ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত জাবেরের (রাঃ) রেওয়ায়েতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, একদিন পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ) সমবেতভাবে রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) খেদমতে তাঁদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী পেশ করেন। বিশিষ্ট মুফাস্‌সের আবু হাইয়্যান এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তফসীরে বাহরে-মুহীতে প্রদান করেন যে, আহ্‌যাব যুদ্ধের পর বনু-নযীর

ও বনু-কোরায়যার বিজয় এবং গনীমতের মাল বণ্টনের ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ) ভাবলেন যে, মহনবী (সাঃ) হয়ত এসব গনীমতের মাল থেকে নিজস্ব অংশ রেখে দিয়েছেন। তাই তাঁরা সমবেতভাবে নিবেদন করলেন—ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) ! পারস্য ও রোমের সম্রাজ্ঞীরা নানাবিধ গহনাপত্র ও বহু মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে। তাদের সেবা-যত্নের জন্য অগণিত দাস-দাসী রয়েছে। আমাদের দারিদ্র্যপীড়িত জীর্ণ-শীর্ণ করুণ অবস্থা তো আপনি স্বয়ংই দেখতে পাচ্ছেন। তাই মেহেরবানীপূর্বক আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ খানিকটা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করুন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রাঃ) পক্ষ থেকে দুনিয়াদার ভোগ-বিলাসী রাজ-রাজড়াদের পরিবেশে বিদ্যমান জৌলুস ও সুযোগ-সুবিধা কিছুটা হলেও প্রদানের দাবীতে উপস্থাপিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কারণে বিশেষভাবে মর্মাহত হন যে, তাঁরা এতদিনের সংসর্গ এবং প্রশিক্ষণ লাভের পরও নবী গৃহের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। ফলে নবীজী (সাঃ) যে দুঃখিত হবেন তা তাঁরা ধারণা করতে পারেননি। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রাচুর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি দেখে তাঁদের মাঝে খানিকটা প্রাচুর্যের অভিলাষ উদয় হয়েছিল। ভাষ্যকার আবু হাইয়্যান বলেন যে, আহ্‌যাবের যুদ্ধের পর এ ঘটনা বর্ণনার দ্বারা একথাই সমর্থিত হয় যে, নবী পত্নীগণের (রাঃ) এ দাবীই ছিল তাঁদেরকে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কারণ।

কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে পরবর্তী সূরায়ে তাহ্‌রীমে সবিস্তারে বর্ণিত হযরত যয়নবের (রাঃ) গৃহে মধুপানের কারণে স্ত্রীগণের (রাঃ) পারস্পরিক আত্মমর্যাদাবোধের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিই তালাকের অধিকার প্রদানের কারণ। এক্ষণে যদি উভয় ঘটনা কাছাকাছি সময়েই সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে উভয় কারণরূপে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু অধিকার প্রদান সংক্রান্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলী দ্বারা একথারই সমর্থন অধিক মিলে যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের আর্থিক দাবীই এর কারণ ছিল। কেনেনা, আয়াতে এরশাদ হয়েছে إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا অর্থাৎ, যদি তোমরা পার্থিব জীবনের জৌলুস ও চাকচিক্য কামনা কর .... ।

এ আয়াতে সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে (রাঃ) অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, তাঁরা নবীজীর (সাঃ) বর্তমান দারিদ্রপীড়িত চরম আর্থিক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বরণ করে হয় তাঁর (সাঃ) সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখে জীবন যাপন করবেন অথবা তালাকের মাধ্যমে তাঁর থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। প্রথমাবস্থায় অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরস্কার এবং পরকালে স্বতন্ত্র ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী হবেন। আর দ্বিতীয় অবস্থা, অর্থাৎ—তালাক গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেও তাঁদেরকে দুনিয়ার আপরাপর লোকের ন্যায় বিশেষ জটিলতা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না; বরং সুন্নত মোতাবেক যুগল বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করে সসম্মানে বিদায় দেয়া হবে।

তিরমিযী শরীফে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন অধিকার প্রদানের এ আয়াত নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে এটি প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন। আয়াত শোনানোর পূর্বে বলেন যে, আমি তোমাকে একটি কথা বলব—উত্তরটা কিন্তু তাড়াহুড়া করে দেবে না। বরং তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শের পর দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, আমাকে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করা থেকে যে বারণ করেছিলেন, তা ছিল আমার প্রতি তাঁর (সাঃ) এক অপার অনুগ্রহ। কেননা, তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতা-মাতা কক্ষনো আমাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের পরামর্শ দেবেন না। এ আয়াত শোনার সংগে সংগেই আমি আরয করলাম যে, এ ব্যাপারে আমার পিতা-মাতার পরামর্শ গ্রহণের জন্য আমি যেতে পারি কি? আমি তো আল্লাহ্ পাক, তাঁর রসূল ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি। আমার পরে অন্যান্য সকল পুণ্যবতী পত্নীগণকে (রাঃ) কোরআনের এ নির্দেশ শোনানো হলো। আমার মত সবাই একই মত ব্যক্ত করলেন ; রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মোকাবেলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কেউ গ্রহণ করলেন না।—(তিরমিযী শরীফে এ হাদীস সহীহ্ ও হাছান বলে মন্তব্য করা হয়েছে।)

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রাঃ) একটি বৈশিষ্ট্য ঃ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ ও نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ এই দু আয়াতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রাঃ) এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা যদি ঘটনাক্রমে কোন পাপ কাজ করেন, তবে তাঁদেরকে অন্যান্য মহিলাগণের তুলনায় দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ, তাঁদের একটি পাপ অন্যদের দু'টি পাপের সমান হবে। অনুরূপভাবে তাঁদের দ্বারা কোন নেক কাজ সংঘটিত হলেও অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবেন।

একদিক দিয়ে আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সে আমলের প্রতিদান যা তারা অধিকার প্রদানের আয়াত নাযিল হওয়ার পর পার্থিব ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের উপর নবীজীর (রাঃ) সাথে দাম্পত্য সম্পর্ককে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। যার বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক তাঁদের একটি আমলকে দু'য়ের মানে উন্নত করেছেন। আর গোনাহর বেলায় দ্বিগুণ শাস্তিলাভও তাঁদের স্বতন্ত্র মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে।

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের উপর আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহরাজি ছিল অতি মহান। কেননা, আল্লহ্ পাক তাঁদেরকে নবীজীর (সাঃ) পত্নীরূপে মনোনীত করেছেন—তাঁদের গৃহে ওহী নাযিল করেছেন। সুতরাং তাঁদের নগণ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি আর দুর্বলতাও বড় বলে বিবেচিত হবে।

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ - فَاحِشَةٌ আরবী ভাষায় অশ্লীলতা, ব্যভিচার প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দটি সাধারণ পাপ-পঙ্কিলতা অর্থেও কোরআনে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে فَاحِشَةٌ শব্দ যিনা বা ব্যভিচার অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্ পাক সমস্ত নবীর স্ত্রীকূলকে এই জঘন্য ত্রুটি থেকে মুক্ত রেখেছেন। সমস্ত আম্বিয়া (আঃ)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে কারো দ্বারা এরূপ অপকর্ম সংঘটিত হয়নি। হযরত লূত ও নূহ (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ তাঁদের ধর্ম থেকে পরাঙ্মুখ ছিল-অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল, যার শাস্তিও তারা লাভ করেছিল, কিন্তু তাদের কারো উপরই ব্যভিচারের অপবাদ ছিল না। আযওয়াজে মোতাহ্‌হারাত থেকে কোন প্রকারের অশালীনতা ও অশ্লীলতার বহিঃপ্রকাশ তো সম্ভবই ছিল না। সুতরাং এ আয়াতে فَاحِشَةٌ অর্থ সাধারণ গোনাহ্ বা রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) কষ্টের কারণ হওয়া বোঝানো হয়েছে। এখানে فَاحِشَةٌ শব্দের সাথে مُّبَيِّنَةٍ শব্দের দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়। কেননা, যেনা বা ব্যভিচার কখনো প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত হয় না। বরং তা পর্দার আড়ালে গোপনে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং فاحشة مبينة

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا
نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾ يٰنِسَآءَ
النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾
وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى
وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ
اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ
مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٤﴾
اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ
وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ
الْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ
فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ
الذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾

(৩১) তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে, আমি তাকে দু'বার পুরস্কার দেব এবং তার জন্য আমি সম্মানজনক রিযিক প্রস্তুত রেখেছি। (৩২) হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। (৩৩) তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে—মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ্ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। (৩৪) আল্লাহ্র আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন। (৩৫) নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহ্র অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী—তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

এর অর্থ সাধারণ পাপ বা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কষ্ট দেয়া। বিশিষ্ট মুফাসসেরগণের মধ্যে মোকাতেল ইবনে সোলাইমান এ আয়াতে 'ফাহেশা'র অর্থ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাফরমানী বা তাঁর নিকট এমন দাবী পেশ করা যা তাঁর (সাঃ) পক্ষে পূরণ করা কঠিন বলে ব্যক্ত করেছেন।—(বায়হাকী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ হেদায়েত ঃ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ –পূর্ববর্তী আয়াত-সমূহে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সমীপে এমনসব দাবী পেশ করতে বারণ করা হয়েছে; তাঁর পক্ষে যা পূরণ করা কঠিন বা যা তাঁর মহান মর্যাদার পক্ষে অশোভনীয়। যখন তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন তখন সাধারণ নারীদের তুলনায় এসময় তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং তাঁদের এক আমলকে দু'য়ের সমতুল্য করে দেয়া হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের কর্মের পরিশুদ্ধি এবং রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) সান্নিধ্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি হেদায়েত দান করা হয়েছে। এসব হেদায়েত যদিও পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং সমগ্র মুসলিম নারীকুলের প্রতিই তা নির্দেশিত। কিন্তু এখানে তাঁদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, এসব আমল ও আহ্কাম তো সমস্ত মুসলিম রমণীকুলের প্রতি ওয়াজিব ও অবশ্য পালনীয়। তাই এগুলোর প্রতি তাঁদের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

নবীজীর (সাঃ) পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ কি? আয়াতের শব্দাবলী দ্বারা বাহ্যিকভাবে বোঝা যায়, রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হযরত মরিয়ম (সাঃ) সম্পর্কে কোরআনের বাণী এই اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক আপনাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র ও কালিমামুক্ত করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।' এতে হযরত মরিয়ম (আঃ) সমস্ত নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয়। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন—সমগ্র রমণীকুলের মধ্যে হযরত মরিয়ম, উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা, হযরত ফাতেমা এবং ফেরাউন পত্নী হযরত আসিয়াই (রাঃ) তোমাদের জন্যে যথেষ্ট। এ হাদীসে হযরত মরিয়মের সাথে আরো তিন জনকে নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে আযওয়াজে মোতাহ্হারাতের যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মার্যাদার কথা বলা হয়েছে, তা এক বিশেষ দিক বিবেচনায়-নবী পত্নী হিসেবে। এদিক দিয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহে সমস্ত রমণীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এদ্বারা সকল দিক দিয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না—যা কোরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থী।—(মাযহারী)

لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ এরপর اِنِ اتَّقَيْتُنَّ আল্লাহ্ পাক তাঁদের নবী পত্নী হিসেবে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তারই ভিত্তিতে এ শর্ত। এর উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া যেন তাঁরা নবীজীর (সাঃ) পত্নী হওয়ার উপর ভরসা করে বসে না থাকেন। বস্তুতঃ তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের শর্ত হলো

তাক্ওয়া এবং আহ্কামে ইলাহিয়ার অনুসরণ ও অনুকরণ।—(কুরতুবী ও মাযহারী)

এরপর আযওয়াজে মোতাহ্হারাতের উদ্দেশ্যে কয়েকটি হেদায়েত রয়েছে।

প্রথম হেদায়েত ঃ নারীদের পর্দা সম্পর্কিত, তাদের কণ্ঠ ও বাক্যালাপ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ অর্থাৎ, যদি পরপুরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে বাক্যালাপের সময় কৃত্রিমভাবে নারী কণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে। অর্থাৎ, এমন কোমলতা, যা শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনা সঞ্চার করে। যেমন এরপরে বিবৃত হয়েছে فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ অর্থাৎ, এরূপ কোমল কণ্ঠে বাক্যালাপ করো না, যাতে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকের মনে কুলালসা ও আকর্ষণের উদ্রেক করে। ব্যাধি অর্থ নেফাক (কপটতা) বা এর শাখা বিশেষ। প্রকৃত মুনাফিকদের মনে এমন লালসার সঞ্চার হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু কোন লোক খাঁটি মুমিন হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন হারামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে সে মুনাফিক নয় সত্য, কিন্তু অবশ্যই দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট। এরূপ দুর্বল ঈমান, যা হারামের দিকে আকৃষ্ট করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তা কপটতারই শাখাবিশেষ।—(মাযহারী)

প্রথম হেদায়েতের সারমর্ম এই যে, নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিৎ যাতে কোন অপরিচিত দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট লোকের অন্তরে কোন কামনা ও লালসার উদ্রেক তো করবেই না ; বরং তার নিকটও যেন ঘেঁষতে না পারে। আয়াতে বর্ণিত বাক্যালাপ-সংশ্লিষ্ট হেদায়েতসমূহ শ্রবণ করার পর উম্মাহাতুল মুমিনীনগণের কেউ যদি পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা বলতেন, তবে মুখে হাত রেখে বলতেন— যাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যায়। এজন্যই হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে। 'নবী করীম (সাঃ) নারীদেরকে নিজ নিজ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাক্যালাপ করতে বিশেষভাবে বারণ করেছেন।—(তাবারানী, মাযহারী)।

দ্বিতীয় হেদায়েত ঃ পূর্ণ পর্দা করা সম্পর্কিত وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ —অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং জাহেলিয়াত যুগের নারীদের মত দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘোরাফেরা করো না। এখানে পূর্ববর্তী জাহেলিয়াতযুগ বলে ইসলামপূর্ব অন্ধ যুগকে বোঝানো হয়েছে—যা বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। এ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এরপর আবার অপর কোন অজ্ঞতার প্রাদুর্ভাবও ঘটতে পারে, যে সময় একই রকম নির্লজ্জতা ও পর্দাহীনতা বিস্তার লাভ করবে। সেটা সম্ভবত ঃ এ যুগেরই অজ্ঞতা যা অধুনা বিশ্বের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত আসল হুকুম এই যে, নারীগণ গৃহেই অবস্থান করবে। অর্থাৎ, শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে বের হবে না। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, যেভাবে ইসলামপূর্ব অজ্ঞ যুগের নারীরা প্রকাশ্যভাবে বেপর্দা চলাফেরা করত—তোমরা সেরকম চলাফেরা করো না। تَبَرُّجٌ শব্দের মূল অর্থ প্রকাশ ও প্রদর্শন করা। এখানে এর অর্থ পরপুরুষ সমীপে নিজের রূপ প্রদর্শন করা। যেমন, অন্য আয়াতে রয়েছে غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ (অর্থাৎ, সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে)। নারীদের পর্দা সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা ও বিস্তারিত আহকাম এ সূরারই পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। এখানে কেবল উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত দু'টি বিষয় জানা গেছে। প্রতমতঃ—প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্ পাকের নিকট নারীদের বাড়ী থেকে বের না হওয়াই কাম্য—গৃহকর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ; এতেই তারা পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে। বস্তুতঃ শরীয়ত-কাম্য আসল পর্দা হল গৃহের অভ্যন্তরে অনুসৃত পর্দা।

দ্বিতীয়তঃ একথা জানা গেছে যে, শরয়ী প্রয়োজনের তাকিদে যদি নারীকে বাড়ী থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন না করে বের হয় ; বরং বোরকা বা গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে এমন চাদর ব্যবহার করে বের হবে। যেমন, সামনে সূরা আহযাবেরেই يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ —আয়াতে ইনশাআল্লাহ্ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

গৃহে অবস্থান প্রয়োজন সম্পর্কিত হুকুমের অন্তর্গত নয় ঃ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ দ্বারা নারীদের ঘরে অবস্থান ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে। যার মর্ম এই যে, নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে তো নিষিদ্ধ ও হারাম। কিন্তু প্রথমতঃ এ আয়াতেই وَلَا تَبَرَّجْنَ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয়, বরং সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশে বের হওয়া নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ এই সূরার পরবর্তীতে উল্লেখিত يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ আয়াতে এ হুকুমই রয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের বোরকা বা অন্য কোন প্রকারের পর্দা করে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি আছে।

এতদ্ভিন্ন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক হাদীস দ্বারাও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ যে এ হুকুমের অন্তর্গত নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেখানে আযওয়াজে মোতাহ্হারাতকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, 'প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদেরকে বাড়ী থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।' এছাড়া পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমল এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, প্রয়োজনীয় স্থলে মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমন, হজ্জ ও ওমরার সময় হুযুর (সাঃ)-এর সাথে তাঁর বিবিগণের গমনের কথা বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে তাঁর (সাঃ) সাথে তাঁদের বিভিন্ন যুদ্ধে গমন করাও প্রমাণিত রয়েছে। আবার অনেক রেওয়ায়েতে এ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুহ্রিম আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে নিজেদের বাড়ী থেকে বের হতেন এবং আত্মীয়-স্বজনের রোগ-ব্যাধির তথ্য নিতে যেতেন ও শোকানুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া নবীজীর (সাঃ) জীবদ্দশায় তাদের মসজিদে যাওয়ারও অনুমতি ছিল।

শুধু হুযুরের (সাঃ) সাথে ও তাঁর সময়েই এমন ঘটেনি ; বরং হুযুরের ইন্তেকালের পরও হযরত সাওদা ও যয়নব বিনতে জাহ্শ (রাঃ) ব্যতীত অন্যান্য স্ত্রীগণের হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশে গমন করার প্রমাণ রয়েছে। আর এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামও (রাঃ) কোন আপত্তি তোলেননি।

সারকথা এই যে, কোরআন পাকের ইঙ্গিত, নবীজীর আমল ও সাহাবাগণের ইজমা অনুসারে প্রয়োজন স্থলসমূহ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ আয়াতের মর্মের অন্তর্গত নয়, হজ্জ-ওমরাও যার অন্তর্ভুক্ত। আর স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি, নিজের পিতা-মাতা, মুহ্রিম আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ, অসুস্থ থাকা বিধায় এদের সেবা-শুশ্রূষা, অনুরূপভাবে যদি কারো জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান বা অন্য কোন পন্থা না থাকে,

তবে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশে বের হওয়াও এরই আওতাভুক্ত। প্রয়োজন স্থলসমূহে বের হওয়ার জন্য শর্ত হলো—অঙ্গ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের না হওয়া; বরং বোরকা বা বড় চাদর পরে বের হওয়া।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর বসরা গমন এবং উষ্ট্র যুদ্ধে (জংগে জামাল) তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে রাফেযীদের অসার ও অযৌক্তিক মন্তব্য :

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, কোরআন পাকের ইঙ্গিত, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমল এবং সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) ইজমা (সর্বসম্মত রায়) দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রয়োজনীয় স্থলসমূহ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ -আয়াতের আওতা বহির্ভূত। হজ্ব ও ওমরা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ যার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত উম্মে সালমা এবং সফিয়্যা (রাঃ) হজ্ব উপলক্ষে মক্কা তশরীফ নেন, তাঁরা সেখানে হযরত ওসমানের (রাঃ) শাহাদত ও বিদ্রোহ-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক অনৈক্যের ফলে মুসলিম উম্মতের সংহতি বিনষ্ট হওয়া আর সম্ভাব্য অশান্তি ও বিশৃংখলার আশঙ্কায় বিশেষভাবে উৎকণ্ঠিত ও উদ্বেগাকুল হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় হযরত তালহা, হযরত যুবায়র, হযরত নো'মান ইবনে বশীর, হযরত কা'ব ইবনে আযরা এবং আরো কিছুসংখ্যক সাহাবী (রাঃ) মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কা পৌছেন। কেননা, হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীগণ এঁদেরকেও হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। এঁরা বিদ্রোহীদের সাথে শরীক হতে পারেননি। বরং একাজ থেকে তাদেরকে বারণ করছিলেন। হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যার পর বিদ্রোহীরা এঁদেরকেও হত্যার পরিকল্পনা করে। তাই তাঁরা প্রাণ নিয়ে মক্কা মোয়াজ্জমা এসে পৌছেন এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার (রাঃ) খেদমতে এসে পরামর্শ চান। হযরত সিদ্দীকা (রাঃ) তাঁদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, যে পর্যন্ত বিদ্রোহীরা হযরত আলীকে পরিবেষ্টিত করে থাকবে সে পর্যন্ত যেন তাঁরা মদীনায় ফিরে না যান। আর যেহেতু হযরত আলী (রাঃ) বিদ্রোহীদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার ও বিচার-বিধান থেকে বিরত থাকছেন; সুতরাং আপনারা কিছুকাল যেখানে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করেন, সেখানে গিয়ে অবস্থান করুন। যে পর্যন্ত আমীরুল মুমিনীন (রাঃ) পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে শৃংখলা বিধানে সক্ষম না হন, সে পর্যন্ত আপনারা বিদ্রোহীদেরকে আমীরুল মুমিনীনের চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার লক্ষ্যে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করতে থাকুন, যাতে আমীরুল মুমিনীন এসব বিদ্রোহীর বাড়াবাড়ির প্রতিকার এবং ওদের প্রতিহত করতে সক্ষম হন।

এসব মহাত্মাবৃন্দ একথায় রাযী হয়ে বসরা চলে যেতে মনস্থ করেন। কেননা, তখন সেখানে মুসলিম সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল। এসব মহাত্মাবৃন্দ সেখানে যেতে মনস্থির করার পর তাঁরা উম্মুল মুমিনীন হযরত সিদ্দীকার (রাঃ) খেদমতে আরয করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত তিনিও যেন তাঁদের সাথে বসরাতেই অবস্থান করেন।

সে সময়ে হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীদের দাপট ও দৌরাত্ম্য এবং তাদের প্রতি আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীর (রাঃ) শরীয়তী শাস্তি প্রয়োগে অক্ষমতার কথা স্বয়ং নাহজুল-বালাগতের রেওয়ায়েতেও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য যে, নাহ্জুল-বালাগা শিয়া পণ্ডিতবর্গের নিকট বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে সমাদৃত। এই গ্রন্থে রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ)-কে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক সুহৃদ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ পর্যন্ত এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, যদি আপনি হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীদের যথোচিত শাস্তি বিধান করেন, তবেই তা বিশেষ কল্যাণ ও সুফল বয়ে আনবে। প্রতিউত্তরে হযরত আমীরুল মুমিনীন ফরমান যে, ভাই সকল। তোমরা যা বলছ সে সম্পর্কে আমি অজ্ঞ নই। কিন্তু এসব হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের দ্বারা মদীনা পরিবেষ্টিত থাকা অবস্থায় তা কি করে সম্ভব? তোমাদের ক্রীতদাস ও পার্শ্ববর্তী বেদুঈনরা পর্যন্ত তাদের সাথে রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের শাস্তির নির্দেশ জারী করে দেই, তবে তা কার্যকরী হবে কিভাবে?

হযরত সিদ্দীকা (রাঃ) একদিকে আমীরুল-মুমিনীনের (রাঃ) অক্ষমতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল ছিলেন। অপরদিকে হযরত ওসমানের (রাঃ) শাহাদতের কারণে মুসলমানগণ যে চরমভাবে মর্মাহত হয়েছে সে সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীরা আমীরুল-মুমিনীনের (রাঃ) মজলিসসমূহে সশরীরে শরীক থাকা সত্ত্বেও তিনি একান্ত অক্ষম ছিলেন বলে তাদের শাস্তি বিধান ও তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ বিলম্বিত হচ্ছিল, যারা আমীরুল মুমিনীনের (রাঃ) এই অক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিল না, এ ব্যাপারেও তারা তাঁকে (রাঃ) অভিযুক্ত করছিল। যাতে এ অভিযোগ-অনুযোগ অন্য কোন অশান্তি ও উচ্ছৃংখলার সূচনা না করে, সেজন্য জনগণকে ধৈর্যধারণের অনুরোধ করা, আমীরুল-মুমিনীনের শক্তি সঞ্চার করে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করা এবং পারস্পরিক অভিযোগ-অনুযোগ ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে উম্মতের মাঝে শান্তি ও সংহতি স্থাপনের উদ্দেশে তিনি (হযরত সিদ্দীকা) বসরা রওয়ানা করেন। এসময়ে ভাগ্নে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যোবায়র (রাঃ) প্রমুখও তাঁর সাথে ছিলেন। এ সফরের যে উদ্দেশ্য স্বয়ং উম্মুল মুমিনীন (রাঃ) হযরত কা'কার (রাঃ) নিকট ব্যক্ত করেছেন তা পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হবে। এই চরম অশান্তি ও অরাজকতার সময় মুমিনদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা যে কত মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী খেদমত ছিল, তা একেবারে সুস্পষ্ট এতদুদ্দেশে যদি উম্মুল মুমিনীনের (রাঃ) স্বীয় মুহরেম আত্মীয়-স্বজনের সাথে উটের হাওদায় পূর্ণ পর্দার মধ্যে বসরা গমনকে কেন্দ্র করে 'তিনি কোরআনী আহকামের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন' বলে শিয়া ও রাফেযী সম্প্রদায় অপপ্রচার করে থাকে, তবে তার কোন যৌক্তিকতা ও সারবত্তা আছে কি?

মুনাফেক ও দুষ্কৃতকারীদের যে অপকীর্তি পরবর্তী পর্যায়ে গৃহযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) কোন ধারণা বা কল্পনাও ছিল না। এ আয়াতের তফসীরের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

নবীজীর বিবিগণের প্রতি কোরআনের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হেদায়েতঃ وَأَقِمْنَ الصَّلَوٰةَ وَآتِينَ الزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ অর্থাৎ, নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের (সাঃ) অনুসরণ কর। দু-হেদায়েত সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপের সময় আপত্তিকর কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার,—বিনা প্রয়োজনে গৃহাভ্যন্তর থেকে বের হওয়া এবং এ আয়াতে রয়েছে তিন হেদায়েত। এ হল সর্বমোট পাঁচ হেদায়েত—যা নারীকুল সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়সমূহের অন্তর্গত।

এ পাঁচটি হেদায়েতের সব কয়টি সমস্ত মুসলমানের প্রতি

সমভাবে প্রযোজ্য ঃ উপরোক্ত হেদায়েতসমূহের মধ্যে শেষোক্ত তিনটি নবীজীর পুণ্যবতী বিবিগণের জন্য নির্দিষ্ট না হওয়া সম্পর্কে তো কারো সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন মুসলিম নারী-পুরুষই নামায, যাকাত এবং আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আওতা-বহির্ভূত নয়। বাকী রইল নারীকুলের পর্দা সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট দু'টি হেদায়েত। একটু চিন্তা করলে এও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাও কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং সমস্ত মুসলিম নারীর প্রতিও একই হুকুম।

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

এ আয়াতে পূর্ববর্তী বিশেষ সম্বোধনের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নিকট আমল (কর্ম) পরিশুদ্ধির বিশেষ হেদায়েতের মর্ম ও তাৎপর্য নবীজীর গৃহবাসীগণকে যাবতীয় আবিলতা ও কলুষতা বিমুক্ত করে দেয়া।

رِجْسٌ শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো প্রতিমা ও বিগ্রহ, আবার কখনো নিছক পাপ অর্থে, কখনো আযাব অর্থে, কখনো কলুষতা ও অপবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে।—(বাহরে মুহীত)

আয়াতে আহ্লে বাইতের মর্ম কি? উপরোক্ত আয়াতসমূহে নবী-পত্নীগণকে সম্বোধন করা হয়েছিল বলে স্ত্রীলিঙ্গবাচক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সাথে সাথে তাঁদের সন্তান-সন্ততি এবং পিতা-মাতাও আহ্লে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। সেজন্যই পুংলিঙ্গপদ عنكم ويطهركم ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোন কোন মুফাস্সেরের মতে আহ্লে বায়েত দ্বারা কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকেই বোঝানো হয়েছে। হযরত ইকরিমা এবং হযরত মোকাতিল এমতই পোষণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের রেওয়ায়েতও তিনি আহ্লে বায়েতের অর্থ পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ) বলেই মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে, যেগুলো ইবনে কাসীর এখানে নকল করেছেন—এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান-হুসাইনও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বাড়ী থেকে বাইরে তশরীফ নিতে যাচ্ছিলেন। সে সময় তিনি একটি কালো রুমী চাদর জড়ানো ছিলেন। এমন সময় সেখানে হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত ফাতেমা ও হযরত আলী (রাঃ) এঁরা সবাই একের পর এক তশরীফ আনেন। নবীজী (সাঃ) এঁদের সবাইকে চাদরের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আয়াত إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا তেলাওয়াত করেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে এরূপ রয়েছে যে, আয়াত তেলাওয়াত করার পর তিনি ফরমান اللهم هؤلاء اهل بيتى (হে আল্লাহ্ এরাই আমার আহ্লে বাইত)।—(ইবনে জরীর)

ইবনে-কাসীর এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে মুফাসসিরগণ প্রদত্ত এসব মতে মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। যারা বলেন যে, এ আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের শানে নাযিল হয়েছে—এবং আহলে বাইত বলে তাঁদেরকেই বোঝানো হয়েছে, তাঁদের এ মতে অন্যান্যগণও—আহ্লে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিপন্থী নয়। সুতরাং এটাই ঠিক যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণও আহ্লে বাইতের অন্তর্গত। কেননা, এ আয়াতের শানে নুযুলও এই। শানে নুযুলের মর্ম আয়াতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আবার নবীজীর এরশাদ মোতাবেক হযরত ফাতেমা, আলী, হাসান-হুসাইন (রাঃ) ও আহ্লে বাইত। وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

آيَاتِ اللَّهِ অর্থ কোরআন আর حكمت অর্থ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁর সুন্নত ও আদর্শ। যেমন, অধিকাংশ তফসীরকারগণ حكمت এর তফসীর সুন্নত বলে বর্ণনা করেছেন। اذْكُرْنَ শব্দে দু'টি ভাবার্থ হতে পারে—(১) এসব বিষয় স্বয়ং স্মরণ রাখা—যার ফলশ্রুতি ও পরিচয় হলো এগুলোর উপর আমল করা। (২) কোরআন পাকের যাকিছু তাঁদের গৃহে, তাঁদের সামনে নাযিল হয়েছে বা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁদেরকে যেসব শিক্ষা প্রদান করেছেন, উম্মতের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সেসবের আলোচনা করা এবং তাদেরকে সেগুলো পৌছে দেয়া।

ফায়েদা ঃ ইবনে আরাবী আহ্কামুল-কোরআন নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট থেকে কোন আয়াতে কোরআন বা হাদীস শোনে তবে তা অন্যান্য লোকের নিকট পৌছে দেয়া তার অবশ্য কর্তব্য। এমন কি কোরআনের যেসব আয়াত নবীজীর পুণ্যবর্তী স্ত্রীগণের গৃহে নাযিল হয়েছে অথবা নবীজীর (সাঃ) নিকট থেকে তাঁরা যেসব শিক্ষা লাভ করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে অপর লোকের সাথে আলোচনা করা তাঁদের উপরও বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্ পাকের এ আমানত উম্মতের অপরাপর লোকদের নিকট পৌছানো তাঁদের (পুণ্যবর্তী স্ত্রীগণের) অপরিহার্য কর্তব্য।

কোরআনের ন্যায় হাদীসের সংরক্ষণ ঃ এ আয়াতে যেরূপভাবে কোরআনের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা প্রদান উম্মতের জন্যে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে হেকমত শব্দের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীসসমূহের প্রচার এবং শিক্ষা প্রদানও বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সর্বাবস্থায়ই এ নির্দেশ পালন করেছেন। সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত মাআয (রাঃ) সম্পর্কেও এরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) নিকট থেকে একখানা হাদীস শোনেন, কিন্তু জনগণ এর প্রতি যথাযথ মর্যাদা আরোপ না করতে পারে অথবা কোন ভুল বোঝাবুঝিতে পতিত হতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করে তিনি তা সর্ব সাধারণের সামনে বর্ণনা করেননি। কিন্তু যখন তাঁর (মাআযের) মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি জনগণকে একত্রিত করে তাদের সামনে সে হাদীস পেশ করলেন এবং বললেন যে, নিছক ধর্মীয় স্বার্থে আমি এ যাবত এ সম্পর্কে কারো সাথে আলোচনা করিনি। কিন্তু এক্ষণে আমার মৃত্যু অত্যাসন্ন। সুতরাং উম্মতের এ আমানত তাদের হাতে পৌছে দেয়া একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। হযরত মাআয হাদীসে-রসূল উম্মতের নিকট না পৌছানোর পাপে যাতে পতিত না হন সেজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে জনগণকে ডেকে এ হাদীস শুনিয়ে দেন।

এ ঘটনাও এ সাক্ষ্যই প্রদান করে যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামই কোরআনের এ হুকুম পালন ওয়াজিব ও অবশ্য করণীয় বলে মনে করতেন। আর সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীসসমূহ জনগণের নিকট পৌছাবার ব্যবস্থা করতেন বলে হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব কোরআনের কাছাকাছি হয়ে পড়লো। এ সম্পর্কে সন্দেহের অবতারণা করা কোরআন পাকে সন্দেহের অবতারণা করারই নামান্তর।

কোরআনে পাকে সাধারণভাবে পুরুষদেরকে সম্বোধন করে নারীদেরকে আনুষঙ্গিকভাবে তার অন্তর্ভুক্ত করে দেয়ার তাৎপর্য ঃ যদিও নারী-পুরুষ উভয়ই কোরআন পাকের সাধারণ নির্দেশাবলীর আওতাধীন, কিন্তু সাধারণতঃ সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষদেরকে। আর নারী জাতি পরোক্ষভাবে এর অন্তর্গত। সর্বত্র يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ শব্দ-সমষ্টি ব্যবহার করে আনুষঙ্গিকভাবে নারীদেরকেও সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয়ই প্রচ্ছন্ন ও গোপনীয়। এর মধ্যেই তাদের মর্যাদা নিহিত। বিশেষ করে সমস্ত কোরআনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, কেবল হযরত মরিয়ম বিন্‌তে ইমরান ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের নাম কোরআন পাকে উল্লেখ নেই। যেখানে তাদের প্রসংগ এসেছে, সেখানে পুরুষের সাথে তাদের সম্পর্কসূচক শব্দ যথা ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ফেরাউন পত্নী ও ٱمْرَأَتَ نُوحٍ নূহপত্নী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত মরিয়মের বিশেষত্ব সম্ভবতঃ এই যে, কোন পিতার সাথে হযরত ঈসার (সাঃ) সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর ছিল না। তাই মায়ের সাথেই তাঁকে সম্পর্কযুক্ত করতে হয়েছিল এবং এ কারণেই মরিয়মের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।—(আল্লাহ্ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত।)

কোরআন করীমের এই প্রকাশভঙ্গি যদিও এক বিশেষ প্রজ্ঞা, যৌক্তিকতা ও মঙ্গলের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছিল ; কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের হীনমন্যতাবোধের উদ্রেক হওয়া একান্ত স্বাভাবিক ছিল। তাই বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এমন বহু রেওয়ায়েত রয়েছে, যাতে নারীরা রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) খেদমতে এ মর্মে আরয করেছে যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি—আল্লাহ্ পাক কোরআনের সর্বত্র পুরুষদেরই উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকেই সম্বোধন করেন। এদ্বারা বোঝা যায় যে, আমাদের (নারীদের) মাঝে কোন প্রকার পুণ্য ও কল্যাণই নেই। সুতরাং আমাদের কোন এবাদতই গ্রহণযোগ্য নয় বলে আশঙ্কা হচ্ছে। তিরমিযী শরীফে হযরত উম্মে আম্মারা থেকে, আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত আসমা বিনতে উমায়স (রাঃ) থেকেও এ ধরনের আবেদন উপস্থাপনের কথা বর্ণিত আছে—আর এসব রেওয়ায়েতে এ আবেদন উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার কারণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে নারীদেরকে স্বস্তি ও সান্ত্বনা প্রদান এবং তাদের আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট বিশেষ আলোচনা রয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্ পাক সমীপে মান-মর্যাদা ও তাঁর নৈকট্য লাভের ভিত্তি হল সৎকার্যাবলী, আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই।

অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকরের নির্দেশ এবং তার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য ঃ ইসলামের স্তম্ভ পাঁচ প্রকারের এবাদত। যথা-নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও জেহাদ। কিন্তু সমস্ত কোরআনে এর মধ্য থেকে এবাদত অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ নেই। কিন্তু কোরআন পাকের বহু আয়াতে আল্লাহ্‌র যিকর অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে। সূরায়ে আনফাল, সূরায়ে জুমআ এবং এই সূরায় وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ (অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণকারীগণ ও স্মরণকারিণীগণ) বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য প্রথমতঃ এই যে, আল্লাহ্‌র যিকর যাবতীয় এবাদতের প্রকৃত রূহ। হযরত মাআয ইবনে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) নিকটে জিজ্ঞেস করল যে, মুজাহিদগণের মাঝে সর্বাধিক প্রতিদান ও সওয়াবের অধিকারী কোন্ ব্যক্তি হবে? তিনি (সাঃ) বললেন ঃ যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্‌র যিকর করবে। অতঃপর জিজ্ঞেস করল যে, রোযাদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ সওয়াবের অধিকারী কে হবে? তিনি বললেন, যে আল্লাহ্‌র যিকর সবচেয়ে বেশী করবে। এরূপভাবে নামায, যাকাত, হজ্জ, সদ্‌কা প্রভৃতি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করল। তিনি প্রতিবার এ উত্তরই দিলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বাধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকর করবে, সে-ই সর্বোচ্চ প্রতিদান লাভ করবে।—(ইবনে কাসীর থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন।)

দ্বিতীয়তঃ যাবতীয় এবাদতের মধ্যে যিকরই সহজতর। এটা আদায় করা সম্পর্কে শরীয়তও কোন শর্ত আরোপ করেনি—অযুসহ বা বিনা অযুতে উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে সব সময়ে আল্লাহ্‌র যিকর করা যায়। এর জন্যে মানুষের কোন পরিশ্রমই করতে হয় না ; কোন অবসরেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর লাভ ও ফলশ্রুতি এত বেশী ও ব্যাপক যে, আল্লাহ্‌র যিকরের মাধ্যমে পার্থিব কাজকর্মও এবাদতে রূপান্তরিত হয়। আহার গ্রহণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দোয়া ; বাড়ী থেকে বের হওয়ার ও ফিরে আসার দোয়া, সফরে রওয়ানা করা ও সফরকালীন বাড়ী ফিরে আসার দোয়া, কোন কারবারের সূচনাপর্বে ও শেষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নির্দেশিত দোয়া— প্রভৃতি দোয়াসমূহের সারমর্ম এই যে, মুসলমান যেন কোন সময়েই আল্লাহ্ সম্পর্কে অমনোযোগী ও গাফেল থেকে কোন কাজ না করে, আর তারা যদি সকল কাজকর্মে এ নির্ধারিত দোয়াসমূহ পড়ে নেয়, তবে পার্থিব কাজ দ্বীনে (ধর্মে) পর্যবসিত হয়ে যায়।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ
يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۞ وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْۤ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ
عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ
مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا
قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
حَرَجٌ فِيْۤ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ
اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۞ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ؕ
سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرَا ۞
الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا
اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۞ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ
وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيْمًا ۞ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۞ وَّ
سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۞ هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ
لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۞

(৩৬) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। (৩৭) আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ্ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোকনিন্দার ভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহ্কেই অধিক ভয় করা উচিত।। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহ্র নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে। (৩৮) আল্লাহ্ নবীর জন্যে যা নির্ধারণ করেন, তাতে তাঁর কোন বাধা নেই। পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহ্র চিরাচরিত বিধান। আল্লাহ্র আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত। (৩৯) সেই নবীগণ আল্লাহ্র পয়গাম প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তাঁরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহ্ যথেষ্ট। (৪০) মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্র রসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (৪১) মুমিনগণ তোমরা আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। (৪২) এবং সকাল বিকাল আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর। (৪৩) তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও রহমতের দোয়া করেন—অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোকে বের করার জন্য। তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহও এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা প্রসংগেই নাযিল হয়েছে।

এক ঘটনা এই যে, হযরত যায়েদ বিন্ হারেসা (রাঃ) এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। অজ্ঞতার যুগে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে অতি অল্প বয়সে 'ওকায' নামক বাজার থেকে খরিদ করে এনে মুক্ত করে দেন। আর আরব দেশের প্রথানুযায়ী তাঁকে পোষ্য-পুত্রের গৌরবে ভূষিত করে লালন-পালন করেন। মক্কাতে তাঁকে 'মুহাম্মদের (সাঃ) পুত্র যায়েদ' নামে সম্বোধন করা হত। কোরআনে করীম এটাকে অজ্ঞতার যুগের ভ্রান্ত রীতি আখ্যায়িত করে তা নিষিদ্ধ করে দেয় এবং পোষ্যপুত্রকে তার প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে নির্দেশ দেয়। এ প্রসঙ্গেই এ সূরার প্রথমাংশের আয়াতসমূহ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ নাযিল হয়েছে? এসব হুকুম নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ (সাঃ) নামে ডাকা পরিহার করেন এবং তাঁর পিতা হারেসার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে থাকেন।

একটি সূক্ষ্ম বিষয় ঃ সমগ্র কোরআনে নবীগণ (সাঃ) ব্যতীত কোন শ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতম সাহাবাবীর নামেরও উল্লেখ নেই। একমাত্র যায়েদ ইবনে হারেসার (রাঃ) নাম রয়েছে। কোন কোন মহাত্মা এর তাৎপর্য এই বর্ণনা করেছেন যে, কোরআনের নির্দেশানুসারে রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) সাথে তাঁর পুত্রত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়ার ফলে এক বিশেষ সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। আল্লাহ্ পাক কোরআন করীমে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করে এরই বিনিময় প্রদান করেছেন।

রসূলুল্লাহ্ও (সাঃ) তাঁর প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ফরমান যে, যখনই তিনি (সাঃ) যায়েদ বিন হারেসকে কোন সৈন্যবাহিনীভূক্ত করে পাঠিয়েছেন—তাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ ইসলামের এই ছিল গোলামীর মর্মার্থ—শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের পর যারা যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছেন তাঁদেরকে নেতার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।

যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) যৌবনে পদার্পনের পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজ ফুফাত বোন হযরত যয়নব বিন্তে জাহ্শকে (রাঃ) তাঁর নিকট বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব পাঠান। হযরত যায়েদ (রাঃ) যেহেতু মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন সুতরাং হযরত যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্শ এ সম্বন্ধ স্থাপনে এই বলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন যে, আমরা বংশ মর্যাদায় তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে...وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ... নাযিল হয়। যাতে হেদায়েত হয়েছে যে, যদি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কারো প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে কোন কাজের নির্দেশ দান করেন, তবে সে কাজ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। শরীয়তানুযায়ী তা না করার অধিকার থাকে না। শরিয়তে একাজ যে লোক পালন করবে না, আয়াতের শেষে একে স্পষ্ট গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত যয়নব ও তাঁর ভাই এ আয়াত শুনে তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে বিয়েতে রাযী হয়ে যান। অতঃপর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

যার মোহর দশটি লাল দীনার (প্রায় চার তোলা স্বর্ণ) ও ষাট দেরহাম (প্রায় আঠারো তোলা রৌপ্য) এবং একটি ভারবাহী জন্তু, কিছু গৃহস্থালী আসবাবপত্র আনুমানিক পঁচিশ সের আটা ও পাঁচ সের খেজুর—রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন। (ইবনে কাসীর)। অধিকাংশ মুফাস্সেরীনের মতে এ ঘটনাই এ আয়াতের শানে নুযূল।

ইবনে কাসীর প্রমুখ মুফাস্সিরগণ অনুরূপ আরো দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একটি হলো জুলায়বীরের (রাঃ) ঘটনা যে, তিনি কোন এক আনসার সাহাবীর মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই আনসার ও তাঁর পরিবার-পরিজন এ সম্বন্ধ স্থাপনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবাই রাযী হয়ে যান এবং যথারীতি বিয়েও সম্পন্ন হয়ে যায়। নবীজী (সাঃ) তাদের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকা কামনা করে দোয়া করলেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন যে, তার গৃহে এত বরকত ও ধন-সম্পদের এত আধিক্য ছিল যে, মদীনার গৃহসমূহের মধ্যে এ বাড়ীটিই ছিল সর্বাধিক উন্নত ও প্রাচুর্যের অধিকারী এবং এর খরচের অঙ্কই ছিল সব চাইতে বেশী। পরবর্তীকালে হযরত জুলায়বীর (রাঃ) এক জেহাদে শাহাদত বরণ করেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর দাফন-কাফন নিজ হাতে সম্পন্ন করেন।

অনুরূপভাবে উম্মে কুলসুম বিন্তে ওকবা ইবনে আবী মুয়ীত সম্পর্কেও হাদীসের রেওয়ায়েতসমূহে এক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।—(ইবনে কাসীর, কুরতুবী)। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলোর মাঝে কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই। এরূপ একাধিক ঘটনাই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ হতে পারে।

বিয়ে শাদীতে বংশগত সমতাও রক্ষার নির্দেশ এবং তার স্তর ঃ উল্লেখিত বিয়েতে হযরত যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ্র (রাঃ) প্রথম পর্যায়ে অসম্মতির কারণ ছিল, উভয় পক্ষে বংশগত সমতা ও সামঞ্জস্য না থাকা এবং এ কারণ সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে-শাদী সমমর্যাদাসম্পন্ন বংশে দেয়া উচিত। এখন প্রশ্ন উঠে যে, এক্ষেত্রে হযরত যয়নব (রাঃ) ও তাঁর ভাইয়ের আপত্তি কেন গৃহীত হলো না?

উত্তর এই যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দম্পতিদ্বয়ের উভয়পক্ষে সকল ক্ষেত্রে সমতা ও সাদৃশ্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কোন কাফেরের সহিত কোন মুসলিম মেয়ের বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদিও মেয়ে এতে সম্মত থাকে। কেননা, এটা কেবল মেয়ের অধিকার নয় যে, শুধু তার সম্মতির কারণেই তা রহিত হয়ে যাবে; বরং আল্লাহ্র হক ও অধিকার এবং আল্লাহ্ কর্তৃক আরোপিত ফরয ও অবশ্য পালনীয় নির্দেশ। পক্ষান্তরে বংশগত ও অর্থনৈতিক সমতার ব্যাপারটা এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কেননা, এটা হলো মেয়ের অধিকার। আর বংশগত সমতার অধিকারের বেলায় মেয়ের সাথে সাথে তার অভিভাবকগণও শরীক। যদি কোন বিবেক সম্পন্না পূর্ণ বয়স্কা মেয়ে ধনাঢ্য পরিবারভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোন দরিদ্র ছেলের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে রাযী হয়ে নিজস্ব অধিকার পরিহার করে তবে তার সে অধিকার রয়েছে। কোন বিশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে কোন মেয়ে ও অভিভাবকবৃন্দ যদি বংশগত সমতার দাবী পরিহার করে এমন এক ব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে রাযী হয়ে যায়, যেটা বংশগতভাবে তাদের চাইতে হেয়, তবে তাদের এ অধিকার রয়েছে। বরং ধর্মীয় মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহার করা বিশেষ প্রশংসনীয় ও কাম্য। এজন্যই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বহু ক্ষেত্রে ধর্মীয় মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহার পূর্বক বিয়ের কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

কোরআন করীমের ব্যাখ্যা ও মর্মানুযায়ী একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উম্মতের প্রত্যেকের উপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হক ও অধিকার সব চাইতে বেশী। এমনকি স্বয়ং নিজের চাইতেও বেশী। তাই হযরত যয়নব ও আবদুল্লাহ্র ব্যাপারে যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বংশগত সমতার অধিকার পরিহার করে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার সাথে বিয়েতে সম্মতি দানের নির্দেশ দেন, তখন এই হুকুমের সামনে নিজেদের মতামত ও অধিকার পরিত্যাগ করা তাদের উপর ফরয ও অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এতে তাঁরা অসম্মতি প্রকাশ করলে এ আয়াত নাযিল হয়।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, যখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও বংশগত সমতা বজায় রাখা প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন, তবে তা রাখলেন না কেন? এর উত্তর উল্লেখিত বর্ণনার মাঝেই প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, অন্য কোন ধর্মীয় মঙ্গলের দিক বিবেচনা করে এই বংশগত সমতা পরিহারযোগ্য। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জীবদ্দশায়ও এরূপ ধর্মীয় মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে বংশগত সমতার অবর্তমানেও বহু বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে মূল মাসআলার উপর কোন প্রভাব পড়ে না।

কুফু বা সমতার মাসআলা ঃ বিয়ে শাদী এমন এক ব্যাপার যে, এতে দম্পতির উভয়ের মাঝে স্বভাবগত সাদৃশ্য না থাকলে বিয়ের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়, পরস্পরের হক ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়—পরস্পর কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করে। তাই শরীয়তে সমতা ও পারস্পরিক সাদৃশ্য বিধানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কোন উঁচু পরিবারের ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নীচু পরিবারের লোককে অপকৃষ্ট বলে মনে করবে। ইসলামে মান-মর্যাদার মূলভিত্তি তাকওয়া, নিষ্ঠা ও ধর্ম পরায়ণতা। এক্ষেত্রে বংশগত কৌলিন্য যতই থাক না কেন, আল্লাহ্র নিকটে এর সবিশেষ গুরুত্ব নেই। নিছক সামাজিক রীতিনীতি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য বিয়ে-শাদীতে সমতা রক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে তাদের অভিভাবকগণের মাধ্যমেই সংঘটিত হওয়া উচিত, অর্থাৎ, প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের পক্ষেও নিজের বিয়ের ব্যাপার নিজে উদ্যোগী হয়ে করা সংগত নয়—লজ্জা ও সম্ভ্রমের দিক বিবেচনায় এ দায়িত্ব পিতা-মাতা ও অন্যান্য অভিভাবকবৃন্দের উপরই ন্যস্ত থাকা উচিত। তিনি আরো এরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে সমকক্ষ পরিবারেই দেয়া উচিত। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) 'কিতাবুল আসার' নামক গ্রন্থে হযরত ফারূকে আযমের (রাঃ) উক্তি বর্ণিত করেছেন যে, আমি এ মর্মে ফরমান জারী করে দেব—যেন কোন সম্ভ্রান্ত খ্যাতনামা বংশের মেয়েকে অপেক্ষাকৃত অখ্যাত স্বল্প মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে বিয়ে দেয়া না হয়। অনরূপভাবে হযরত আয়েশা ও হযরত আনাস (রাঃ)-এর প্রতি বিশেষ তাকীদ দিয়েছেন, যেন সমতা রক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়, যা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে।

সারকথা এই যে, বিয়ে-শাদীতে উভয় পক্ষের সমতা ও সাদৃশ্যের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ শরীয়তের বিশেষভাবে কাম্য—যাতে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও মনের মিল স্থাপিত হয়। কিন্তু কুফূ'র (সার্বিক সমতা বিধান) চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ ও মঙ্গলের দিক যদি সামনে আসে তবে কনে ও তার অভিভাবকবৃন্দের পক্ষে তাদের এ

অধিকার পরিত্যাগ করে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে নেয়া জায়েয। বিশেষ করে কোন ধর্মীয় কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের উদ্দেশে এরূপ করা উত্তম ও অধিককাম্য।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ নবীজীর (সাঃ) নির্দেশ মোতাবেক হযরত যায়েদ বিন হারেসার সাথে হযরত যয়নবের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তাদের স্বভাব প্রকৃতিতে মিল হয়নি। হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত যয়নব (রাঃ) সম্পর্কে ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্ব, গোত্রগত কৌলিন্যাভিমান এবং আনুগত্য ও শৈথিল্য প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপন করতেন। অপরদিকে নবীজীকে (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে জানানো হয় যে, হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত যয়নবকে তালাক দিয়ে দেবেন ; অতঃপর হযরত যয়নব (রাঃ) হুযুরে পাকের (সাঃ) পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবেন। একদিন হযরত যায়েদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর খেদমতে এসব অনুযোগ পেশ করতে গিয়ে হযরত যয়নবকে তালাক দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। নবীজী (সাঃ) যদিও আল্লাহ্ পাক কর্তৃক অবহিত হয়েছিলেন যে, ঘটনার পরিণতি এ পর্যায়ে গিয়ে গড়াবে যে, হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত যয়নব (রাঃ)–কে তালাক দিয়ে দেবেন, অতঃপর হযরত যয়নব (রাঃ) নবীজীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন। কিন্তু দু'কারণে তিনি হযরত যায়েদকে তালাক দিতে বারণ করলেন। প্রথমতঃ তালাক দেয়া যদিও শরীয়তে জায়েয ; কিন্তু পছন্দনীয় ও কাম্য নয়। বরং বৈধ বস্তুসমূহের মাঝে নিকৃষ্টতম ও সর্বাধিক অবাঞ্ছনীয়। আর পার্থিব দিক থেকে কোন কার্য সংঘটিত হওয়া শরীয়তের হুকুমকে প্রভাবান্বিত করে না। দ্বিতীয়তঃ নবীজীর (সাঃ) অন্তরে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, যদি হযরত যায়েদ তালাক দেয়ার পর তিনি হযরত যয়নবের পাণি গ্রহণ করেন, তবে আরববাসী বর্বর যুগের প্রচলিত প্রথানুযায়ী এই অপবাদ দেবে যে, তিনি নিজ পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন। যদিও কোরআনে পাক সূরায়ে আহযাবের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্বর যুগের এ কুপ্রথাকে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলে খণ্ডন করে দিয়েছে। এরপর কোন–মুমিনের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টির আশংকা ছিল না ; কিন্তু যে কাফেরদের কোরআনের প্রতি কোন আস্থাই নেই, তারা বর্বরযুগের প্রথানুযায়ী পালকপুত্রকে সকল ব্যাপারে প্রকৃত পুত্রতুল্য মনে করে অপবাদের ঝড় তুলবে।—এ আশাংকাও তালাক প্রদান থেকে হযরত যায়েদকে বারণ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বন্ধুসুলভ দরদমাখা শাসনবাক্য কোরআন পাকের এ আয়াতসমূহে নাযিল হয়।

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ
أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ

অর্থাৎ "(সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন আল্লাহ্ পাক ও আপনি নিজে যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাকে বলছিলেন যে, তুমি নিজের স্ত্রীকে তোমার বিবাহধীনে থাকতে দাও।" এ ব্যক্তি হযরত যায়েদ। আল্লাহ্ পাক তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত করে তার প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়তঃ নবীজীর সাহচর্য লাভের গৌরব প্রদান করেন এবং নবীজী তাঁর প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন—তাঁকে গোলামী থেকে অব্যাহতি দানের মাধ্যমে। দ্বিতীয়তঃ নবীজী (সাঃ) তাঁকে এমন শিক্ষা–দীক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলেন যে, তাঁর প্রতি বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত যায়েদের প্রতি নবীজীর (সাঃ) প্রয়োগকৃত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। 'নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর।' এক্ষেত্রে আল্লাহ্কে ভয় করার নির্দেশ এ মর্মেও হতে পারে যে, তালাক একটি অপকৃষ্ট ও গর্হিত কাজ, সুতরাং এ থেকে বিরত থাক। আবার এ অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে যে, বিবাহধীনে বহাল রাখার পর স্বভাবগত গরমিল ও অবজ্ঞার দরুন তাঁর অধিকারসমূহ আদায়ের বেলায় যেন কোন প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন। তাঁর (সাঃ) এ উক্তি এ জায়গায় সম্পূর্ণ ঠিক ও যথার্থই ছিল। কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সংঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার এবং অন্তরে হযরত যয়নবের পাণি গ্রহণের বাসনা উদ্রেকের পর হযরত যায়েদের প্রতি তালাক না দেয়ার উপদেশ এক প্রকারের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক হিতাকাংখার বহিঃপ্রকাশেরই পর্যায়ভুক্ত ছিল, যা রসূলের পদমর্যাদার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বিশেষ করে এ কারণে যখন এর সাথে জনমণ্ডলীর অপবাদের আশঙ্কাও বিদ্যমান ছিল। তাই উল্লেখিত আয়াতে শাসন বাক্যের ভাষা ছিল এরূপ যে, 'আপনি যে কথা মনে মনে লুকিয়ে রাখছিলেন তা আল্লাহ্ পাক প্রকাশ করে দেবেন।' যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হযরত যয়নবের সহিত আপনার পরিণয় সম্পর্ক স্থাপনের সংবাদ সম্পর্কে আপনি অবহিত রয়েছেন এবং আপনার অন্তরেও বিয়ের বাসনার উদ্রেক করেছে তখন এ ইচ্ছা ও বাসনা গোপন রেখে এমন প্রকারের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক আলোচনা করেছেন যা আপনার মর্যাদার পরিপন্থী। জনমণ্ডলীর অপবাদের ভয় সম্পর্কে ফরমান যে, আপনি মানুষকে ভয় করছেন, অথচ ভয় তো করা উচিত কেবল আল্লাহ্কে। অর্থাৎ, যখন আপনি জ্ঞাত ছিলেন যে, এ ব্যাপার আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই সংঘটিত হবে—এতে যখন তাঁর অসন্তুষ্টির কোন আশংকাই নেই তখন নিছক মানুষের ভয়ে এ ধরনের উক্তি যুক্তিযুক্ত হয়নি।

এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট উপরে বর্ণিত বিবরণ 'তফসীরে ইবনে কাসীর' 'কুরতুবী' ও 'রূহুল মা'আনী' থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং আয়াত وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ এর ব্যাখ্যা এই যে, আপনি অন্তরে যে বিষয় গোপন রেখেছেন তা এ বাসনা যে, হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত যয়নবকে তালাক দিলে পর আপনি তাঁর পাণি গ্রহণ করবেন।

বস্তুতঃ কোরআন পাকের শব্দাবলীতেও হযরত যয়নুল আবেদীনের (রাঃ) রেওয়ায়েতে উপরে বর্ণিত এ তফসীরেরই সমর্থন মেলে। কেননা, এ আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলে দিচ্ছেন যে, অন্তরে লুকায়িত বস্তু তাই ছিল যে, আল্লাহ্ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আল্লাহ্ পাক পরবর্তী আয়াতে যে বিষয় প্রকাশ করেছেন তা হলো হযরত যয়নবের সাথে হুযুরের (সাঃ) বিয়ে। যেমন—বলেছেন زَوَّجْنَاكَهَا অর্থাৎ, আমি আপনাকে তাঁর (হযয়ত যয়নব) সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দিলাম।—(রূহুল মা'আনী)।

পক্ষান্তরে হযরত যয়নবের (রাঃ) বিয়ের ঘটনার সাথে তথাকথিত পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে হারাম হওয়া সংক্রান্ত বর্বর যুগের প্রচলিত কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণা কার্যকরভাবে অপনোদনের এক বিশেষ শরীয়তী উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। কেননা, সমাজ প্রচলিত কুপ্রথার কার্যকরভাবে মূল উৎপাটন তখনই সম্ভব যখন হাতে কলমে বাস্তবে করে দেখান হয়। হযরত যয়নবের বিয়ে সংশ্লিষ্ট আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ এ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্যই ছিল।

এ প্রসঙ্গে বোঝা যায়, যেন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সূরায়ে আহযাবের প্রথম আয়াতসমূহে বর্ণিত এই হুকুমের মৌখিক প্রচারই যথেষ্ট বলে মনে করতেন। এর কার্যকর ও বাস্তব প্রয়োগের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তার

প্রতি লক্ষ্য করেননি। তাই জানা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছিলেন। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্‌পাক এটি সংশোধন করে তা প্রকাশ করেছেন– - لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا অর্থাৎ আমি আপনার সাথে যয়নবের বিয়ে সম্পন্ন করেছি যাতে মুসলমানগণ নিজেদের পালক পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করতে গিয়ে কোন জটিলতার সম্মুখীন না হয়।

زَوَّجْنَاكَهَا —এর শাব্দিক অর্থ—আপনার সাথে তাঁর বিয়ে স্বয়ং আমি সম্পন্ন করে দিয়েছি। এর ফলে একথা বোঝা যায় যে, এ বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক সম্পন্ন করে দেয়ার মাধ্যমে বিয়ে-শাদীর সাধারণভাবে প্রচলিত শর্তাবলীর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এ বিয়ের প্রতি বিশেষ মর্যাদা আরোপ করেছেন। আবার এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, এ বিয়ের নির্দেশ আমি প্রদান করলাম, এখন আপনি শরীয়তী বিধি-বিধান ও শর্তাবলী মোতাবেক তা সম্পন্ন করে নিন। মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রথম অর্থ এবং কিছু সংখ্যক দ্বিতীয় অর্থ অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন।

অন্যান্য স্ত্রীলোকের সম্মুখে হযরত যয়নবের এরূপ উক্তি যে, তোমাদের বিয়ে তো তোমাদের পিতা-মাতা কর্তৃক সম্পন্ন হয় ; কিন্তু আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক আকাশে সম্পন্ন করেছেন-যা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে পরিলক্ষিত হয়। একথা উপরোক্ত উভয় অর্থের বেলায়ই প্রযোজ্য। যা প্রথম অর্থে অধিক স্পষ্ট ; অবশ্য দ্বিতীয় অর্থও এর পরিপন্থী নয়।

বিভিন্ন সন্দেহ ও প্রশ্নাবলীর উত্তরের সূচনা ঃ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا এ আয়াতের মাধ্যমে এ বিয়ের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত সন্দেহসমূহের উত্তরের সূচনা এরূপভাবে করা হয়েছে যে, অন্যান্য পুণ্যবতী স্ত্রীগণ থাকা সত্ত্বেও এ বিয়ের পেছনে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল?—এরশাদ হয়েছে যে, এটা আল্লাহ্ পাকের চিরন্তন বিধান যা কেবল মুহাম্মদের (সাঃ) জন্যই নির্দিষ্ট নয় ; আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের কালেই ধর্মীয় স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণের অনুমতি ছিল। যন্মধ্যে হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর যথাক্রমে একশত ও তিনশত স্ত্রী ছিল। সুতরাং রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) বেলায়ও বিভিন্ন ধর্মীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিয়েসহ একাধিক বিয়ের অনুমতি লাভ বিচিত্র কিছু নয়। এটা নবুওয়ত ও রেসালতের মহান মর্যাদা ও তাক্‌ওয়া পরহেযগারীর পরিপন্থীও নয়। সর্বশেষ বাক্যে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, বিয়ে-শাদী—অর্থাৎ কার সাথে কার বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে তা মানুষের জীবিকার ন্যায় আল্লাহ্ পাক কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার। এ সম্পর্কে ভাগ্যলিপিতে যা আছে তাই বাস্তবায়িত হবে। এক্ষেত্রেও হযরত যায়েদ ও হযরত যয়নবের স্বভাব প্রকৃতির বিভিন্নতা, হযরত যায়েদের অসন্তুষ্টি—পরিশেষে তালাক প্রদানের সংকল্প, এ সবকিছুই ভাগ্যলিপির পর্যায়ক্রমিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

পরবর্তী পর্যায়ে, অতীত কালে যেসব নবীগণের (আঃ) বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ছিল বলে উপরে জানা গেছে ; তাঁদের বৈশিষ্ট ও বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ অর্থাৎ এসব মহীয়ান নবীগণ (আঃ) সবাই আল্লাহ্ পাকের বাণীসমূহ নিজ নিজ উম্মতের নিকটে পৌছিয়েছেন।

একটি জ্ঞানগর্ভ নিগূঢ়তত্ত্ব ঃ সম্ভবতঃ এতে নবীগণের (আঃ) বহুসংখ্যক স্ত্রী থাকার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, এঁদের (আঃ) যাবতীয় কাজকর্ম ও বাণীসমূহ উম্মত পর্যন্ত পৌছা একান্ত আবশ্যক। পুরুষদের জীবনের এক বিরাট অংশ ঘরোয়া পরিবেশে স্ত্রী ও পুত্র পরিজনের সাথে কাটাতে হয়। এ সময় যেসব ওহী নাযিল হয়েছে বা স্বয়ং নবীজী যেসব নির্দেশ প্রদান করেছেন অথবা কোন কাজ করেছেন—এগুলো সবই উম্মতের আমানত স্বরূপ, যেগুলো কেবল পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মাধ্যমেই সহজতরভাবে উম্মতের নিকট পৌছানো সম্ভব ছিল। পৌছানের অন্যান্য পদ্ধতি জটিলতা মুক্ত নয়। তাই নবীগণের (আঃ) অধিক সংখ্যক স্ত্রী থাকলে তাঁদের পারিবারিক জীবনের কার্যক্রম ও কথাবার্তা এবং তাদের ঘরোয়া পরিবেশের চরিত্র ও রূপ রেখা সাধারণ উম্মত পর্যন্ত পৌছা সহজতর হবে।

নবীগণের (আঃ) যে অপর এক গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তা এই— وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ —অর্থাৎ এসব মহাত্মাবৃন্দ আল্লাহ্ পাককে ভয় করেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করেন না। ধর্মীয় কল্যাণ ও মঙ্গলার্থে কোন কাজ বা বিষয় প্রকাশ্য ও সরাসরি তবলীগের জন্য যদি তাঁরা আদিষ্ট হন তবে এতে তাঁরা কোন প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না। এরূপ করতে গিয়ে তাঁরা কোন মহলের কটাক্ষপাত ও বিরূপ সমালোচনারও কোন পরোয়া করেন না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে যখন সমগ্র নবীকুলেরই এরূপ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা আল্লাহ্ পাক ভিন্ন আর কাউকে ভয় করেন না। অথচ এর পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে وَتَخْشَى النَّاسَ (অর্থাৎ আপনি মানুষকে ভয় করেন)—এটা কিভাবে সম্ভব? উত্তর এই যে, উল্লেখিত আয়াতে নবীগণের (আঃ) আল্লাহ্ পাক ভিন্ন অন্য কাউকে ভয় না করা—এটা কেবল রেসালত-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং তবলীগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাঝে এমন এক বিষয় সম্পর্কে কটাক্ষপাতের ভয় উদ্রেক করেছে, যা ছিল বাহ্যতঃ একটি পার্থিব কাজ। তবলীগ ও রেসালতের সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু উল্লেখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে যখন আপনার নিকট একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এ বিয়ে বাস্তব ও কার্যকর তবলীগ এবং রেসালতের অংশবিশেষ, তখন কারো কটাক্ষপাত ও নিন্দাবাদের ভয় তাঁর কর্তব্য পথেও কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে পারেনি। তাই অবিশ্বাসী কাফেরদের পক্ষ থেকে নানাবিধ আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এ বিয়েকে বাস্তবরূপ প্রদান করা হয়েছিল। বস্তুতঃ অদ্যাবধিও এ সম্পর্কে বিভিন্ন অবান্তর প্রশ্নের অবতারণা হতে দেখা যায়।

উল্লেখিত আয়াতে সেসব লোকের ধারণা অপনোদন করা হয়েছে যারা বর্বর যুগের প্রথা অনুযায়ী হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে (রাঃ) নবীজীর সন্তান বলে মনে করতো এবং তিনি হযরত যয়নবকে (রাঃ) তালাক দেয়ার পর নবীজীর সাথে তাঁর বিয়ে সংঘটিত হওয়ায় তাঁর প্রতি পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন বলে কটাক্ষ করত। এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, হযরত যায়েদের পিতা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নন বরং তাঁর পিতা হারেসা (রাঃ)। কিন্তু এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ তাকীদ দেয়াচ্ছলে এরশাদ হয়েছে مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন। যে ব্যক্তির

সন্তান–সন্ততিদের মধ্যে কোন পুরুষ নেই, তাঁর প্রতি এরূপ কটাক্ষ করা কিভাবে যুক্তিসংগত হতে পারে যে, তাঁর পুত্র রয়েছে এবং তার পরিত্যক্তা স্ত্রী নবীজীর পুত্রবধূ বলে তাঁর জন্য হারাম হবে।

এই মর্মার্থ প্রকাশের জন্যে সংক্ষিপ্ত শব্দ সমষ্টি (ابا احد منكم) বললেই চলত। তদস্থলে কোরআনে হাকীমে অতিরিক্ত رجال শব্দ ব্যবহার করে এরূপ সন্দেহ অপনোদন করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর তো হযরত খাদীজার (রাঃ) গর্ভস্থ তিন পুত্র–সন্তান কাসেম, তাইয়্যেব ও তাহের এবং হযরত মারিয়ার গর্ভস্থ এক সন্তান ইব্রাহীম—মোট চার পুত্র–সন্তান ছিলেন। কেননা, এঁরা সবাই শৈশবাবস্থায় ইন্তেকাল করেন। এঁরা কেউই (পূর্ণ বয়স্ক) পুরুষ পর্যায়ে পৌছেননি। আবার এরূপও বলা যেতে পারে যে, এ আয়াত নাযিল হওয়াকালে কোন পুত্র সন্তান ছিল না। কাসেম, তাইয়্যেব তাহের (রাঃ) তো ইতিমধ্যেই ইন্তেকাল করেছিলেন। আর ইব্রাহীম তখন পর্যন্ত জন্মলাভই করেননি।

বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্ন ও কটাক্ষের উত্তর এ বাক্য দ্বারাই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে অপরাপর সন্দেহাবলী দূরীকরণার্থে এরশাদ করেন— وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ আরবী ভাষায় لكن শব্দ পূর্ববর্তী বাক্যে কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ থাকলে তা দূরীকরণার্থে ব্যবহৃত নয়। এস্থলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে যখন একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি উম্মতের অন্তর্গত কোন পুরুষের পিতা নন ; তখন এরূপ সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে যে, নবীগণ প্রত্যেকেই তো নিজ নিজ উম্মতের জনক। এ পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সকল পুরুষ—বরং সমগ্র নারী–পুরুষের পিতা। তাঁর প্রতি পিতৃত্ব আরোপের কথা অস্বীকার করা প্রকারান্তরে নুবওয়তকেই অস্বীকার করার নামান্তর।

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ শব্দের মাধ্যমে এর উত্তর দেয়া হয়েছে যে, প্রকৃত ঔরসী পিতা—যে ভিত্তিতে বিয়ে শাদী হালাল, হারাম সংক্রান্ত নির্দেশাবলী আরোপিত হয়—তা ভিন্ন জিনিস। আর নবী হিসেবে গোটা উম্মতের আত্মিক পিতা হওয়া বিভিন্ন জিনিস, এর সাথে উল্লেখিত আহ্‌কামের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং সম্পূর্ণ বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াল যে, তিনি উম্মতের অন্তর্গত কোন পুরুষের পিতা নন ; কিন্তু আধ্যাত্মিক পিতা সকলেরই।

এর মাধ্যমে কতক মুশরেককৃত অপর এক কটাক্ষেরও উত্তর হয়ে গেল। তা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অপুত্রক। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে কারো মাধ্যমে তাঁর বাণী ও কর্মধারা গতিশীল থাকতে পারে ও তাঁর বংশ বজায় থাকতে পারে এমন কোন পুত্রসন্তান তাঁর নেই। কিছু কাল পরেই এগুলো মিটে যাবে। উপরোক্ত শব্দসমূহের দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদিও তাঁর ঔরসজাত পুত্র–সন্তান নেই, কিন্তু তাঁর নবুওয়ত মিশনের প্রসার ও অগ্রগতি সাধনের জন্য ঔরসজাত পুত্র–সন্তানের কোন প্রয়োজন নেই। এ দায়িত্ব রূহানী সন্তানগণই পালন করে যাবেন। যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং রসূল উম্মতের রূহানী পিতা ; সুতরাং তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদের সকলের চাইতে অধিক সন্তানের অধিকারী।

এখানে যেহেতু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর বর্ণনা এসেছে এবং নবী হিসাবে তিনি বিশেষ ও অনন্য মর্যাদার অধিকারী, সুতরাং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ বিশেষণে ভূষিত করার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি নবীকুলের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্যও বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম জন। خاتم শব্দে দু'প্রকারের কেরাত রয়েছে। ইমাম হাসান ও ইমাম আসেমের কেরাতে خاتم এর تاء এর উপর যবর রয়েছে। অন্যান্য ইমামগণের কেরাতানুযায়ী উক্ত تاء যের বিশিষ্ট। কিন্তু উভয়ের সারমর্ম এক ও অভিন্ন—অর্থাৎ নবীগণের আবির্ভাব ধারার সমাপ্তি সাধনকারী। কেননা خاتم —উভয়ের একই অর্থ 'শেষ'। আবার উভয় শব্দ মোহরের অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অর্থের বেলায়ও সারকথা 'শেষ' অর্থই দাঁড়ায়। কেননা, কোন বস্তু বন্ধ করে দেয়ার জন্য মোহর সর্বশেষেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেরও যবর বিশিষ্ট خاتم শব্দ উভয়টার উভয় অর্থই কামূস, সিহাহ্, লিসানুল–আরব, তাজুল–উরুস প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় আরবী অভিধানসমূহে রয়েছে।

যাহোক, خاتم الانبياء এমন এক গুণ বা নবুওয়ত ও রেসালতের পূর্ণতার ক্ষেত্রে তাঁর সর্বোচ্চ স্থান ও মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করে। কেননা, প্রত্যেক বস্তুই ক্রমানুয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হয় এবং সর্বোচ্চ শিখরে পৌছলে এর পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। আর সর্বশেষ পরিণতিই এর মোক্ষম উদ্দেশ্য ; স্বয়ং কোরআনও তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে ঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের দ্বীন (জীবন–বিধান) পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতও (অনুগ্রহ) পূর্ণ করে দিলাম।

পূর্ববর্তী নবীগণের দ্বীনও নিজ নিজ যুগানুসারে পরিপূর্ণই ছিল, কোনটাই অসম্পূর্ণ ছিল না। কিন্তু সার্বিক পরিপূর্ণতার কথা সর্বোতভাবে নবীজীর দ্বীনের প্রতিই প্রযোজ্য, যা পূর্ববর্তী সবারই জন্য দলীল স্বরূপ এবং সে দ্বীন কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

এ ক্ষেত্রে وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ বিশেষণ সংযোজনের ফলে এ বিষয়টাও একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, নবীজী যেহেতু সমগ্র উম্মতের জনকের মর্যাদায় ভূষিত, সুতরাং তাঁকে অপুত্রক বলে আখ্যায়িত করা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। কেননা وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ শব্দদ্বয় একথাও ব্যক্ত করে দিয়েছে যে, পরবর্তীকালে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী গোটা মানবকূলই তাঁর (নবীজীর) উম্মতভুক্ত। তাই তাঁর উম্মতের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতের চাইতে অনেক বেশী হবে। ফলে নবীজীর (সাঃ) আধ্যাত্মিক সন্তানও অন্যান্য নবীগণের চাইতে বেশী হবে। وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ বিশেষণটি একথাও বোঝাচ্ছে যে, সমগ্র উম্মতের প্রতি হযরতের (সাঃ) স্নেহ–মমতা অন্যান্য নবীগণের তুলনায় অধিকতর। তাঁর পরে কোন ওহী বা নবীর আগমন হবে না বলে তিনি কেয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যাবলীর সমাধান ও যাবতীয় প্রয়োজনাদি মেটাবার পথ বাতলে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী নবীগণের একথা ভাবতে হতো না। কেননা, তাঁরা জানতেন যে, জাতির মাঝে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি প্রসার লাভ করলে তাঁদের পর অন্যান্য নবীগণ আবির্ভূত হয়ে এসবের সংশোধন ও সংস্কার সাধন করবেন। কিন্তু খাতামুল আম্বিয়ার (সাঃ) একথাও ভাবতে হতো যে, কেয়ামত পর্যন্ত উম্মত যে বিভিন্নমুখী অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হবে সেগুলো সম্পর্কে উম্মতকে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ তাঁকেই দিতে হবে। যে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) বিভিন্ন হাদীস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তাঁর পর অনুসরণযোগ্য যেসব ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটবে তাঁদের অধিকাংশের নামই তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে অন্যায় ও অসত্যের যত ধ্বজাধারীর প্রাদুর্ভাব ঘটবে ওদেরও যাবতীয় লক্ষণ, অবস্থা ও তথ্যাদি এমন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন, যেন একজন সাধারণ চিন্তাশীলেরও এ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, আমি তোমাদের জন্য এমন উজ্জ্বল

ও জ্যোতিস্মান পথ রেখে গেলাম যেখানে দিবারাত্রি দুটোই সমান—কখনো পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই।

এ আয়াতে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, উপরে হুযূর (সাঃ)-এর উল্লেখ 'রসূল' বিশেষণে করা হয়েছে। এজন্য বাহ্যত ঃ خاتم المرسلين خاتم الرسل শব্দের ব্যবহার অধিক যুক্তিসংগত ছিল বলে মনে হয়। অথচ কোরআনে হাকীম তদস্থলে وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ শব্দ গ্রহণ করেছে।

কারণ এই যে, অধিকাংশ আলেমগণের মতে নবী ও রসূলের মাঝে পার্থক্য শুধু একটাই—তা এই যে, নবী সেসব ব্যক্তিবর্গ যাঁদেরকে আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টিকুলের পরিশুদ্ধি ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল করে ধন্য করেছেন, চাই তাঁদের জন্য কোন স্বতন্ত্র আসমানী গ্রন্থ ও স্বতন্ত্র শরীয়ত নির্ধারিত হয়ে থাকুক—অথবা পূর্ববর্তী কোন নবীর গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসারীগণের হেদায়েতের জন্য আদিষ্ট হয়ে থাকুক—যেমন হযরত হারূণ (আঃ) হযরত মূসার (আঃ) গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসারীগণের হেদায়েতের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন।

অপরপক্ষে রসূল শব্দটি বিশেষভাবে ঐ নবীর প্রতি প্রযোজ্য, যাঁকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও শরীয়ত প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে রসূল শব্দের চাইতে নবী শব্দের মর্মার্থে ব্যাপকতা অধিক। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ এই যে, তিনি (সাঃ) নবীকুলের আগমন ধারা সমাপ্তকারী ও সর্বশেষ আগমনকারী। চাই তিনি স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী নবী হউন বা পূর্ববর্তী অনুসারী হউন। এ দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ পাকের নিকটে যত প্রকারের নবী হতে পারেন তাঁর (নবীজী) মাধ্যমে এঁদের সবার পরিসমাপ্তি ঘটলো। তাঁর পরে অন্য কোন নবী প্রেরিত হবেন না।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর প্রতি দুঃখ-যন্ত্রণা পৌছানো থেকে বিরত থাকার মর্মে প্রদত্ত উপদেশাবলী প্রসংগে আনুষঙ্গিকভাবে হযরত যায়েদ ও যয়নবের (রাঃ) ঘটনা এবং রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) সর্বশেষ নবী হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়েও তাঁর অনন্য ও অনুপম গুণাবলী বিবৃত হয়েছে। আর তাঁর সত্তা ও গুণাবলী গোটা বিশ্বে মুসলমানদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত বলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশে উল্লেখিত আয়াতে অধিক পরিমাণে আল্লাহ্ পাকের যিকরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا – হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ্ পাক যিকর ব্যতীত এমন কোন ফরযই আরোপ করেননি যার পরিসীমা ও পরিমাণ নির্ধারিত নেই। নামায দিনে পাঁচ বার এবং প্রত্যেক নামাযের রাকাত নির্দিষ্ট। রমজানের রোজা নির্ধারিত কালের জন্য। হজ্বও বিশেষ স্থানে বিশেষ অনুষ্ঠানাদি ও সুনির্দিষ্ট কর্ম-ক্রিয়ার নাম। যাকাতও বছরে একবারই ফরয হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র যিকর এমন এবাদত, যার কোন সীমা বা সংখ্যা নির্ধারিত নেই। বিশেষ সময়কালও নির্ধারিত নেই অথবা এর জন্য দাঁড়ানো বা বসার কোন বিশেষ অবস্থাও নির্ধারিত নেই। এমনকি পবিত্র এবং অযুসহ থাকারও কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি। সফরে থাকুক বা বাড়ীতে অবস্থান করুক, সুস্থ থাকুক বা অসুস্থ, স্থলভাগ হোক বা জলভাগ, রাত হোক বা দিন—সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকরের হুকুম রয়েছে।

এজন্যই এটি বর্জন করলে বর্জনকারীর কোন কৈফিয়তই গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না সে অনুভূতিহীন ও বেহুশ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অন্যান্য এবাদতের বেলায় অসুস্থতা ও অপরাগতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে অক্ষম বিবেচনা করে এবাদতের পরিমাণ হ্রাস বা একেবারে মাফ হয়ে যাওয়ার অবকাশও রয়েছে। কিন্তু যিকরুল্লাহ্ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক কোন শর্ত আরোপ করেননি। তাই এটি বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন অবস্থাতেই কোন ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকন্তু এর ফযিলত-বরকতও অগণিত।

ইমাম আহমদ (রাঃ) হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরামকে সম্বোধন করে ফরমান যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর সন্ধান দেব না যা তোমাদের যাবতীয় আমলের চাইতে উত্তম, তোমাদের প্রভুর নিকটে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য, তোমাদের মর্যাদা বিশেষভাবে বর্দ্ধনকারী, আল্লাহ্র রাস্তায় সোনা-রূপা দান করা এবং আল্লাহ্র পথে জেহাদের উদ্দেশে বের হয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করতে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করা বা নিজে শাহাদত বরণ করার চাইতে উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ), সেটা কি বস্তু ; কোন্ আমল? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফরমান—ذكر الله عزوجل 'মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্ পাকের যিকর।' —(ইবনে-কাসীর) ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিযী আরো রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ফরমান ঃ আমি নবীজীর (সাঃ) নিকট থেকে এমন এক দোয়া শিক্ষালাভ করেছি যা কখনো পরিত্যাগ করি না। তা এই ঃ

اللهم اجعلنى اعظم شكرك واتبع نصيحتك واكثر ذكرك واحفظ وصيتك (ابن كثير)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমাকে অধিক পরিমাণে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের, তোমার উপদেশের অনুসারী হওয়ার, অধিক পরিমাণে তোমার যিকর করার এবং তোমার ওসিয়ত সংরক্ষণের যোগ্য করে দাও।—(ইবনে-কাসীর)

এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্ পাকের নিকট অধিক পরিমাণে তাঁর যিকরের তওফিক প্রদানের জন্য দোয়া করেছেন।

জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) খেদমতে আরয করলো যে, ইসলামের আমল তথা, ফরয ও ওয়াজেবসমূহ তো অসংখ্য। আপনি আমাকে এমন একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সবকিছু অন্তর্ভুক্তকারী কথা বলে দিন, যা সুদৃঢ়ভাবে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ "তোমার যবান যেন সর্বদা আল্লাহ্র যিক্রে তর-তাজা থাকে।"—(মুসনাদ আহমদ ও ইবনে কাসীর) হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফরমান ঃ "তুমি আল্লাহ্র যিক্র এত অধিক পরিমাণে কর যেন লোকে তোমাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করে।"—(মুসনাদ-আহমদ, ইবনে-কাসীর)।

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا অর্থাৎ, সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর। সকাল-সন্ধ্যার দ্বারা সকল সময়কেই বোঝানো হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র যিকিরে বিশেষ বরকত ও তাকীদ রয়েছে বলে আয়াতে এ দু'সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ্র যিকর কোন বিশেষ সময়ের জন্য সীমিত ও নির্দিষ্ট নয়।

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ —অর্থাৎ, "যখন তুমি অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিক্রে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় যিক্র করতে থাকবে, বিনিময়ে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অজস্র ধারায় রহমত ও অনুকম্পা বর্ষণ করতে থাকবেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য দোয়া করতে থাকবেন।"

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۖ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿٤٤﴾ يٰۤاَيُّهَا
النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٤٥﴾ وَّدَاعِيًا اِلَى
اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ
اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٨﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا
نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ
وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا
لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْۤ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ
مِمَّاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ
خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۫ وَامْرَاَةً
مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ
يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا
مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْۤ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ
لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٠﴾

(৪৪) যেদিন আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবে ; সেদিন তাদের অভিবাদন হবে সালাম। তিনি তাদের জন্যে সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন। (৪৫) হে নবী ! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (৪৬) এবং আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (৪৭) আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে। (৪৮) আপনি কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা করুন ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। আল্লাহ্ কার্যনির্বাহীরূপে যথেষ্ট। (৪৯) মুমিনগণ ! তোমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ কর, অতঃপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নেই। অতঃপর তোমরা তাদেরকে কিছু দেবে এবং উত্তম পন্থায় বিদায় দেবে। (৫০) হে নবী ! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ্ আপনার করায়ত্ত করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি ও খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সে-ও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য—অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

উল্লেখিত আয়াতে صلوة শব্দটি আল্লাহ্ পাকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু উভয় স্থলে এর অর্থ এক নয়, আল্লাহ্‌র صلوة অর্থ, তিনি রহমত নাযিল করেন। আর ফেরেশতাগণের অর্থ, তাঁরা আল্লাহ্‌র দরবারে রহমত বর্ষণের জন্য দোয়া করেন।

হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষে صلوة অর্থ রহমত, ফেরেশতাদের পক্ষে মাগফেরাত কামনা করা এবং পরস্পর একে অপরের পক্ষে এর অর্থ দোয়া— صلوة এ তিন অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ - صلوة -এরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ—যা মুমিনগণের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যেদিন আল্লাহ্ পাকের সাথে এদের সাক্ষাৎ ঘটবে—তখন তাঁর পক্ষ থেকে এদেরকে সালাম অর্থাৎ, আস্‌সালামু আলাইকুমের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানানো হবে। ইমাম রাগেব প্রমুখের মতে, আল্লাহ্ পাকের সংগে সাক্ষাতের দিন হলো কেয়ামতের দিন। আবার কোন কোন তফসীরকারকের মতে এ সাক্ষাতের সময় হলো বেহেশতে প্রবেশকাল যেখানে তাদের প্রতি আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে। আবার কোন কোন মুফাস্‌সির মৃত্যু দিবসকে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের দিন বলে মন্তব্য করেছেন। সেদিন সমগ্র বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্ সমীপে উপস্থিত হওয়ার দিন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মালাকুল-মউত যখন কোন মুমিনের প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে আসেন, তখন তাঁর প্রতি সুসংবাদ পৌছানো হয় যে, আপনার পালনকর্তা আপনার জন্য সালাম প্রেরণ করেছেন। আর لقاء শব্দ এই তিন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই এসব উক্তির মাঝে কোন বিরোধ ও অসামঞ্জস্য নেই। বস্তুতঃ এ তিন অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে।—(রূহুল-মা'আনী)

মাসআলা ঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের পারস্পরিক অভিবাদন ও সম্ভাষণ আস্‌সালামু আলাইকুম হওয়া উচিত ; বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের প্রতি হোক, অথবা ছোটদের পক্ষ থেকে বড়দের প্রতি হোক।

রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) বিশেষ গুণাবলী ঃ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا —এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিশেষ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহের পুনরুল্লেখ। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পাঁচটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, داعيا الى الله ، شاهدا ، نذيرا ، مبشرا ، سراجا ، منيرا অর্থ ঃ তিনি কেয়ামতের দিন উম্মতের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবেন। যেমন সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে এক সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে। যার কিয়দাংশ হলো এই ঃ কেয়ামতের দিন হযরত নূহ (আঃ) উপস্থিত হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আপনি আমার বাণী ও বার্তাসমূহ আপনার উম্মতের নিকটে পৌছিয়ে ছিলেন কি? তিনি আরয করবেন যে, আমি যথারীতি পৌছে দিয়েছি। অতঃপর তাঁর উম্মতগণ একথা অস্বীকার করবে যে, তিনি ওদের নিকট আল্লাহ্‌র বার্তা পৌছে দিয়েছেন। অতঃপর হযরত নূহ (আঃ)-কে জিজ্ঞেস

করা হবে যে, আপনার এ দাবীর স্বপক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি? তিনি আরয করবেন যে, মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর উম্মত এর সাক্ষী। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি সাক্ষী হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদীকে পেশ করবেন এবং এ উম্মত তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তখন হযরত নূহের (আঃ) উম্মত এই বলে জেরা করবে যে, তারা আমাদের ব্যাপারে কিভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে—সে সময়ে এদের তো জন্মই হয়নি। আমাদের সুদীর্ঘ কাল পর এদের জন্ম। উম্মতে মুহাম্মদীর নিকটে এ জেরার উত্তর চাইলে পর তারা বলবে যে, সে সময়ে আমরা অবশ্য উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু আমরা এ সংবাদ আমাদের রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) নিকটে শুনেছি, যাঁর উপর আমাদের পূর্ণ ঈমান ও অটুট বিশ্বাস রয়েছে। এ সময় রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) নিকট থেকে তাঁর উম্মতের এ কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

সরকথা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজ সাক্ষ্যের মাধ্যমে স্বীয় উম্মতের কথা এই বলে সমর্থন করবেন যে, নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছিলাম।

আর مبشر অর্থ সুসংবাদ প্রদানকারী, যার মর্মার্থ এই যে, তিনি স্বীয় উম্মতের মধ্য থেকে সৎ ও শরীয়তানুসারী ব্যক্তিবর্গকে বেহেশতের সুসংবাদ দেন এবং نذير অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ, তিনি অবাধ্য ও নীতিচ্যুত ব্যক্তিবর্গকে আযাব ও শাস্তির ভয়ও প্রদর্শন করেন।

داع الى الله —এর অর্থ তিনি উম্মতকে আল্লাহ্ পাকের সত্তা ও অস্তিত্ব এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করবেন। وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ কে بِإِذْنِهِ –এর সংগে সম্পর্কযুক্ত করায় বোঝা যায় যে, তিনি মানবমণ্ডলীকে আল্লাহ্ পাকের দিকে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষেই আহ্বান করেন। এ শর্তের সংযোজন ইংগিতই করে যে, তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ অত্যন্ত কঠিন—যা আল্লাহ্‌র অনুমতি ও সাহায্য ব্যতীত মানুষের সাধ্যের বাইরে। سراج অর্থ প্রদীপ منير জ্যোতির্ময়। রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) পঞ্চম গুণ ও বৈশিষ্ট্য এই বলা হয়েছে যে, তিনি জ্যোতিস্মান প্রদীপ বিশেষ। আবার কতক মনীষী سراج منير –এর মর্মার্থ কোরআন পাক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোরআন পাকের বর্ণনাধারা ও প্রকাশভংগী দ্বারা এ কথাই বোঝা যায় যে, ইহাও হযরত (সাঃ)–এরই বৈশিষ্ট্য ও গুণ বিশেষ।

কোরআনে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই গুণাবলী তওরাতেও উল্লেখ রয়েছে। যেমন, ইমাম বুখারী (রাঃ) উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) এরশাদ করেন যে, আমি একদিন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আসের (রাঃ)–এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনুরোধ করলাম যে, তওরাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর যেসব গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে মেহেরবাণী পূর্বক আমাকে সেগুলো বলে দিন। তিনি এরশাদ করলেন, আমি তা অবশ্যই বলবো। আল্লাহ্‌র কসম! রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেসব গুণাবলীর বর্ণনা কোরআনে রয়েছে তা তওরাতেও রয়েছে। অতঃপর বললেনঃ

"হে নবী (সাঃ)! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদ প্রদানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মীদের (নিরক্ষরদের) আশ্রয়স্থল ও রক্ষাস্থলরূপে প্রেরণ করেছি। আপনি আমার বান্দাহ্ ও রসূল। আমি আপনার নাম متوكل (আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী) রেখেছি। আপনি কঠোর ও রুক্ষ্ম স্বভাববিশিষ্ট নন। বাজারে হৈ হুল্লোড়কারীও নন। আর না আপনি অন্যায় দ্বারা অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণকারী। বরং আপনি ক্ষমা করে দেন। পথভ্রষ্ট ও বক্র উম্মতকে সঠিক পথে দাঁড় না করিয়ে এবং তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলা পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক আপনাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন না। আপনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ অন্ধচোখ, বধির কান ও রুদ্ধ হৃদয়সমূহ খুলে দেবেন।"

উল্লেখিত আয়াতসমূহে বিয়ে ও তালাক সংশ্লিষ্ট এমন সাতটি হুকুমের আলোচনা রয়েছে যেগুলো কেবল রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) জন্যে নির্দিষ্ট এবং এরূপ বিশেষীকরণ রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের পরিচায়ক। এগুলোর মধ্যে কতক হুকুম তো এমন যে রসূলুল্লাহ্‌র সাথে সেগুলোর বিশেষীকরণ একেবারে স্পষ্ট ও জাজ্জ্বল্যমান। আবার কতক এমন সেগুলো যদিও সমগ্র মুসলমানের প্রতি প্রযোজ্য কিন্তু তাতে এমন কিছু ছোট খাট শর্তাবলী রয়েছে যা কেমন রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) জন্যেই নির্দিষ্ট

প্রথম হুকুম ঃ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ অর্থাৎ, আমি আপনার জন্যে আপনার বর্তমান স্ত্রীগণকে, যাদের মোহরানা আদায় করে দিয়েছেন, হালাল করে দিয়েছি। এ হুকুম বাহ্যতঃ সমস্ত মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এতে বিশেষীকরণের কারণ এই যে, আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় মহানবীর (সাঃ) সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ চারের অধিক স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের পক্ষে এক সঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী রাখা হালাল নয়। সুতরাং তার জন্যে এক সাথে চারের অধিক স্ত্রী হালাল করে দেয়া কেবল তাঁরই বৈশিষ্ট্য ছিল।

আর এ আয়াতে যে الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ বলা হয়েছে, এটা হালাল হওয়ার শর্ত নয় বরং বাস্তব ঘটনার প্রকাশ মাত্র যে, যত মহিলা নবীজীর (সাঃ) সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন নবীজী (সাঃ) তাদের সবার মোহরানা নগদ আদায় করে দিয়েছেন, বাকী রাখেননি। তাঁর (সাঃ) স্বভাবই এরূপ ছিল যে, যে জিনিস আদায়ের দায়িত্ব তাঁর উপর আরোপিত ছিল, তা কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করে দায়মুক্ত হয়ে যেতেন। এ ঘটনা প্রকাশের মাঝে সাধারণ মুসলমানদের জন্য তার অনুরূপ করার প্রেরণা রয়েছে।

দ্বিতীয় হুকুম ঃ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ অর্থাৎ, হুযুরের (সাঃ) মালিকানাধীনে যেসব নারী রয়েছেন তাঁরা তাঁর জন্যে হালাল। এ আয়াতে افاء শব্দের উৎপত্তি হয়েছে فيئ ধাতু থেকে—পারিভাষিক অর্থে فيئ সেসব সম্পর্কে বোঝায় যা কাফেরদের থেকে বিনাযুদ্ধে বা সন্ধিসূত্রে লাভ হয়। আবার কখনো فيئ শব্দ সাধারণ গনীমতের মাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বক্ষমাণ আয়াতে এর উল্লেখ কোন শর্ত হিসেবে নয় যে, আপনার জন্যে কেবল সেসব দাসীই হালাল যা 'ফায়' فيئ বা গনীমতের মাল হিসেবে আপনার অংশে পড়েছে। বরং তিনি যাদেরকে মূল্যের বিনিময়ে খরিদ করেছেন তারাও এর অন্তর্গত।

কিন্তু এই হুকুমে বাহ্যিকভাবে রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) কোন স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নেই, এ হুকুম সমগ্র উম্মতের জন্য। যে দাসী গনীমতের মাল হিসেবে ভাগে পড়ে বা দাম দিয়ে খরিদ করা হয় তা তাদের জন্য হালাল। কিন্তু সমগ্র আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গি এটাই চায় যে, উক্ত আয়াতসমূহে যেসব হুকুম রয়েছে তাতে রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) সাথে কিছু না কিছু বিশেষীকরণ অবশ্যই রয়েছে। এজন্যই রূহুল মা'আনীতে দাসীদের হালাল হওয়া প্রসংগেও রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) এক বৈশিষ্ট্য এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেরূপভাবে আপনার পরে আপনার মহিয়ষী স্ত্রীগণের বিয়ে কারো সাথে জায়েয নয়, অনুরূপভাবে যে দাসীকে আপনার জন্য হালাল করা হয়েছে

আপনার পরে সেও অন্য কারো জন্য হালাল হবে না। যেমন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ)-কে রোম সম্রাট মাকুকাস উপঢৌকন হিসেবে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং যেমন করে তাঁর (সাঃ) পরে মহিয়ষী স্ত্রীগণের কারো সাথে বিয়ে জায়েয ছিল না, এদের বিয়েও কারো সাথে জায়েয রাখা হয়নি।

তৃতীয় হুকুম ঃ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ এ আয়াতে خال ও عم একবচন এবং عمات ও خالات বহুবচন রূপে গ্রহণের অনেক কারণ আছে বলে আলেমগণ বর্ণনা করেছেন। তফসীরে রূহুল মা'আনী, আবু হাইয়্যান বর্ণিত এ কারণ গ্রহণ করেছেন যে, আরবী পরিভাষাই এরূপ—আরবী কবিতাই এর প্রমাণ—যাতে এর বহুবচন ব্যবহৃত হয় না, একবচনই ব্যবহৃত হয়।

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আপনার জন্য চাচা ও ফুফু এবং মামা ও খালার কন্যাগণকে হালাল করে দেয়া হয়েছে। চাচা ও ফুফুর মাঝে পিতৃ বংশীয়। মেয়ে এবং মামা ও খালার মাঝে মাতৃ বংশীয়া সকল মেয়ে তাদেরকে বিবাহ করার বৈধতা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিশেষত্ব নয় ; বরং সকল মুসলমানের জন্যে তাদেরকে বিবাহ করা হালাল। কিন্তু তাঁরা আপনার সাথে মক্কা থেকে হিজরত করেছে—এ কথাটি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য। সারকথা এই যে, সাধারণ উম্মতের জন্যে পিতৃ ও মাতৃকুলের এসব কন্যা কোন শর্ত ছাড়াই হালাল—হিজরত করুক অথবা না করুক ; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে কেবল তাঁরাই হালাল, যারা তাঁর সাথে হিযরত করে। "সাথে হিজরত" করার জন্যে সফরের সঙ্গে থাকা অথবা একই সময়ে হিজরত করা জরুরী নয় ; বরং যে কোন প্রকারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ন্যায় হিজরত করাই উদ্দেশ্য। ফলে এসব কন্যার মধ্যে যারা কোন কারণে হিজরত করেনি, তাদেরকে বিবাহ করা

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে হালাল রাখা হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চাচা আবু তালেবের কন্যা উম্মেহানী (রাঃ) বলেন ঃ আমি মক্কা থেকে হিজরত না করার কারণে আমাকে বিবাহ করা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে হালাল ছিল না। আমি তোলাকাদের মধ্যে গণ্য হতাম। মক্কা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যাদেরকে হত্যা অথবা বন্দী না করে মুক্ত করে দিয়িছিলেন, তাদেরকে "তোলাকা" বলা হত। (রুহুল মা'আনী, জাসসাস)।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে বিবাহের জন্যে হিজরতের উপরোক্ত শর্ত কেবল মাতৃ ও পিতৃ বংশীয়া কন্যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল সাধারণ উম্মতের মহিলাদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত ছিল না ; বরং তাদের শুধু মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট ছিল। পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত আরোপ করার রহস্য সম্ভবতঃ এই যে, পরিবারের মেয়েদের মধ্যে সাধারণতঃ বংশগত কৌলিন্যের গর্ব ও অহমিকা বিদ্যমান থাকে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সহধর্মিণী হওয়ার জন্যে এটা সমীচীন নয়। হিযরতের শর্ত আরোপ করে এই গর্ব ও অহমিকার প্রতিকার করা হয়েছে। কারণ হিজরত কেবল সে নারীই করবে, সে আল্লাহ্ ও রসূলের ভালবাসাকে গোটা পরিবার, দেশ ও বিষয় সম্পত্তির ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেবে। এছাড়া হিজরতের সময় মানুষ নানাবিধ দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয় এবং অল্লাহ্‌র পথে সহ্য করা দুঃখ কষ্ট কর্ম সংশোধনে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে।

চতুর্থ বিধান ঃ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ, যদি কোন মুসলমান মহিলা নিজেকে আপনার কাছে নিবেদন করে, অর্থাৎ, দেনমোহর ব্যতিরেকে আপনার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় এবং আপনিও তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হন, তবে আপনার জন্যে দেনমোহর ব্যতীতও বিবাহ হালাল। এই বিধান বিশেষভাবে আপনার জন্যে—অন্য মুমিনদের জন্য নয়।

উপরোক্ত বিধান যে একান্তভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। কেননা, সাধারণ লোকের জন্যে বিবাহে দেনমোহর অপরিহার্য শর্ত। এমনকি, বিবাহের সময় যদি কোন নারী বলে, দেনমোহর নেব না কিংবা কোন পুরুষ বলে, দেনমোহর দেব না—এই শর্তে বিবাহ করছি, তবে তাদের এসব উক্তি ও শর্ত শরীয়তের আইনে অসার হবে রবং "মোহরে মিসল" ওয়াজিব হবে।

এই বিধানের সাথে সম্পৃক্ত خَالِصَةً لَّكَ বাক্যটিকে কেউ কেউ কেবল চতুর্থ বিধানের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত বলেছেন। কিন্তু 'যমখশরী' প্রমুখ তফসীরবিদ একে উল্লেখিত সকল বিধানের সাথে জুড়ে দিয়েছেন ; অর্থাৎ সবগুলো বিধানই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ —আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে আপনার জন্যে এসব বিশেষ বিধান দেয়া হল। উল্লেখিত বিশেষ বিধানসমূহের প্রথম বিধান হচ্ছে—চারের অধিক পত্নী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে হালাল এবং চতুর্থ বিধান হচ্ছে—দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহ করা হালাল। এই বিধানদ্বয়ের মধ্যে অসুবিধা দূরীকরণ এবং অতিরিক্ত সুবিধা দানের বিষয়টি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। কিন্তু অবশিষ্ট দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম বিধানে বাহ্যতঃ তাঁর উপর অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও বাহ্যতঃ এসব কড়াকড়ি অসুবিধা বৃদ্ধি করে ; কিন্তু এতে আপনার অনেক উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এসব কড়াকড়ি না থাকলে আপনি অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন, যা মনোকষ্টের কারণ হত। তাই অতিরিক্ত কড়াকড়ির মধ্যেও আপনার অসুবিধা দূরীকরণই উদ্দেশ্য।

পঞ্চম বিধান ঃ আয়াতের مُّؤْمِنَةً শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, সাধারণ মুসলমানদের জন্যে ইহুদী ও খ্রীষ্টান নারীদেরকে বিবাহ করা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হালাল হলেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে হালাল নয় ; বরং এক্ষেত্রে নারীর ঈমানদার হওয়া শর্ত।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর উপরোক্ত পাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণনা করার পর সাধারণ মুসলমানদের বিধান সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানদের বিবাহের জন্য আমি যা ফরয করেছি, তা আমি জানি—উদাহরণতঃ সাধারণ মুসলমানদের বিবাহ দেনমোহর ব্যতিরেকে হতে পারে না এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টান নারীদের সাথে তাদের বিবাহ হতে পারে। এরূপভাবে পূর্বোক্ত বিধানসমূহে যেসব কড়াকড়ি ও শর্ত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিবাহের জন্যে জরুরী, সেগুলো অন্যদের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ۭ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ
مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۭ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ
وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا
فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿٥١﴾ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ
مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ
حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ
رَّقِيْبًا ﴿٥٢﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ
اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا
دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ
لِحَدِيْثٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۡ
وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ۭ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا
فَسْـَٔــلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۗءِ حِجَابٍ ۭ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۭ
وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ
مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ۭ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿٥٣﴾ اِنْ
تُبْدُوْا شَـيْـــًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٥٤﴾

(৫১) আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন দোষ নেই। এতে অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে; তারা দুঃখ পাবে না এবং আপনি যা দেন, তাতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ্ জানেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। (৫২) এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে, তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন। (৫৩) হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা আহূত হলে প্রবেশ করো, অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ্ সত্যকথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহ্র রসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ্র কাছে এটা গুরুতর অপরাধ। (৫৪) তোমরা খোলাখুলি কিছু বল অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অতঃপর ষষ্ঠ বিধান ঃ تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ — تَشَآءُ ترجى শব্দটি ارجاء থেকে উদ্ভূত। অর্থ পেছনে রাখা এবং تؤوى শব্দটি ايواء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ নিকটে আনা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি বিবিগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে বিশেষ বিধান। সাধারণ উম্মতের মধ্যে কোন ব্যক্তির একাধিক পত্নী থাকলে সকলের মধ্যে সমতা বিধান জরুরী এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করা হারাম। সমতার মানে ভরণ-পোষণে ও রাত্রি যাপনের সমতা করা। অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সমান সংখ্যক রাত্রি যাপন করতে হবে, কম-বেশী করা হারাম। কিন্তু এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধান করা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং আয়াতের শেষে আরও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, আপনি যে পত্নীকে একবার দূরে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ইচ্ছা করলে তাকে পুনরায় কাছে রাখতে পারেন। وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ বাক্যের অর্থ তাই।

আল্লাহ্ তাআলা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্মানার্থে তাঁকে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধান করার হুকুম থেকে মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই ব্যতিক্রম ও অনুমতি সত্ত্বেও কার্যতঃ সর্বদাই সমতা বজায় রেখেছেন।

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ —এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে পত্নীগণের মধ্যে সমতা বিধানের আদেশ থেকে অব্যাহতি দান এবং তাঁকে সর্বপ্রকার ক্ষমতাদানের কারণ ও রহস্য বর্ণিত হয়েছে। এর রহস্য এই যে, এতে সকল পত্নীর মন সন্তুষ্ট থাকবে এবং তাঁরা যা পাবেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এই বিধান তো বাহ্যতঃ পত্নীগণের পছন্দ ও বাসনার বিপরীত হওয়ার কারণে তাদের মর্মবেদনার কারণ হতে পারে। একে পত্নীগণের সন্তুষ্টির কারণ কিরূপে আখ্যায়িত করা হল? এর জবাব বর্ণিত হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে অধিকারই অসন্তুষ্টির আসল কারণ হয়ে থাকে। কারও কাছে কিছু পাওনা থাকলে সে যদি তা আদায় করতে ত্রুটি করে তবেই পাওনাদার দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যার কাছে কারও কোন পাওনা নেই, সে যদি সামান্য দয়াও প্রদর্শন করে, তবে প্রতিপক্ষ খুবই আনন্দিত হয়। এখানেও যখন বলা হয়েছে যে, পত্নীগণের মধ্যে সমতা বিধান করা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে জরুরী নয়; বরং তিনি এ ব্যাপারে স্বাধীন, তখন তিনি যে পত্নীকে যতটুকু মনোযোগ ও সঙ্গ দান করবেন, তাকে সে এক অনুগ্রহ ও দান মনে করে সন্তুষ্ট হবে।

অবশেষে বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা জানেন তোমাদের অন্তরে কি আছে। তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। উল্লেখিত আয়াতসমূহে এ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিবাহের সাথে কোন না কোন দিক দিয়ে সম্পর্ক রাখে, এরূপ বিধানসমূহ বিধৃত হয়েছে। এরপরও এমনি ধরনের কতক বিধান বর্ণিত হবে। মধ্যস্থলে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের অন্তরে যা আছে জানেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। বাহ্যতঃ পূর্ববর্তী ও

পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে একথা কোন সম্পর্ক রাখে না। রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে—বর্ণিত বিধানসমূহের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে চারের অধিক পত্নীগ্রহণের অনুমতি এবং দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহের অনুমতি দেখে কারও মনে শয়তানী কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা ছিল। তাই মধ্যস্থলে আলোচ্য আয়াত নির্দেশ দিয়েছে যে, মুসলমানরা যেন তাদের অন্তরকে এ ধরনের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, এসব বিশেষত্ব আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে, যা অনেক রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল।

সপ্তম বিধান ঃ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ অর্থাৎ, অতঃপর আপনার জন্যে অন্য মহিলাকে বিবাহ করা হালাল নয় এবং বর্তমান পত্নীগণের মধ্যে কাউকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যকে বিবাহ করাও হালাল নয়।

এ আয়াতে مِنْ بَعْدُ শব্দের দু'রকম তফসীর হতে পারে—(১) সেই নারীগণের পরে যারা বর্তমানে আপনার বিবাহে আছে, অন্য কাউকে বিবাহ করা হালাল নয়। কোন কোন সাহাবী ও তফসীরবিদ থেকেও এই তফসীর বর্ণিত আছে, যেমন হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা নবী পত্নীগণকে দু'টি বিষয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছিলেন—সাংসারিক ভোগবিলাস লাভের উদ্দেশে রসূলের (সাঃ) সঙ্গ ত্যাগ করা অথবা দুঃখ-কষ্ট ও সুখ যাই পাওয়া যায় তাকে বরণ করে নিয়ে তাঁর স্ত্রী হিসাবে থাকা। সে মতে পুণ্যময়ী পত্নীগণ সকলেই অতিরিক্ত ভরণ-পোষণের দাবী পরিত্যাগ করে সর্বাবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্নীত্বে থাকাকেও বেছে নেন। এরই পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সত্তাকেও এই নয় পত্নীর জন্যে সীমিত করে দেন। ফলে তাঁদের ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করা বৈধ রইল না।—(রূহুল মা'আনী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা নবী-পত্নীগণকে একমাত্র তাঁর জন্যেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর ওফাতের পরও তাঁরা অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারতেন না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেন যে, তিনি তাঁদের ব্যতীত অন্য কোন নারীকে বিবাহ করতে পারবেন না। এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকরিমা (রাঃ) থেকেও এই তফসীর বর্ণিত আছে।

(২) অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকরিমা, ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ থেকে مِنْ بَعْدُ শব্দের দ্বিতীয় তফসীর من بعد الاصناف المذكورة বর্ণিত আছে। অর্থাৎ, আয়াতের শুরুতে আপনার জন্যে যত প্রকার নারী হালাল করা হয়েছে, তাঁদের ব্যতীত অন্য কোন প্রকার নারীকে বিবাহ করা আপনার জন্যে হালাল নয়।

সুতরাং مِنْ بَعْدُ শব্দের অর্থ এই যে, যেসব প্রকার নারী তাঁর জন্যে হালাল করা হয়েছে ; কেবল তাঁদের মধ্যেই আপনার বিবাহ হতে পারে। সাধারণতঃ নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়াই শর্ত এবং পরিবারের নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে হিজরত করাও শর্ত। যাদের মধ্যে এই শর্তদ্বয় অনুপস্থিত, তাদেরকে বিবাহ করা হালাল নয়। এই তফসীর অনুযায়ী আলোচ্য বাক্যে কোন নতুন বিধান ব্যক্ত হয়নি, এবং পূর্বোক্ত বিধানেরই তাকীদ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে মাত্র। এ আয়াতের কারণে নয় জনের পর অন্য নারীকে বিবাহ করা হারাম হয়ে যায়নি ; বরং মুমিন নয়, এমন নারীকে ও হিজরত করেনি পরিবারের এমন নারীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়েছে মাত্র।

وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় তফসীর অনুযায়ী এ বাক্যের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, বর্তমান স্ত্রীগণ ব্যতীত অন্য নারীদেরকে বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে বিবাহ করা যদিও জায়েয ; কিন্তু এটা জায়েয নয় যে, একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বহাল করবেন। অর্থাৎ নিছক পরিবর্তন মানসে কোন বিবাহ বৈধ নয়। পরিবর্তনের নিয়ত ব্যতীত যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারেন।

পক্ষান্তরে প্রথম তফসীর অনুযায়ী অর্থ এই হবে যে, বর্তমান পত্নী তালিকায় নতুন কোন মহিলার সংযোজনও করতে পারবেন না এবং কাউকে পরিবর্তনও করতে পারবেন না। অর্থাৎ একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বিবাহ করতে পারবেন না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামী সামাজিকতার কতিপয় রীতি-নীতি ও বিধান বিবৃত হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, এসব আয়াতে বর্ণিত রীতি-নীতিগুলো প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গৃহ ও তাঁর পত্নীগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে ; যদিও এগুলো তাঁর ব্যক্তিসত্তার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। প্রথম বিধান খাওয়ার দাওয়াত ও মেহমানের কতিপয় রীতি-নীতি।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ ..... وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ

আয়াতে দাওয়াত ও আপ্যায়ন সম্পর্কিত তিনটি রীতি-নীতি বর্ণিত হয়েছে। এসবগুলো সকল মুসলমানের জন্যে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ; কিন্তু যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে, তা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গৃহে সংঘটিত হয়েছিল। তাই শিরোনামে بُيُوْتَ النَّبِيِّ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম রীতি এই যে, নবী (সাঃ)-এর গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না ! বলা হয়েছে ঃ

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ

দ্বিতীয় রীতি এই যে, প্রবেশের অনুমতি এমন কি, খাওয়ার দাওয়াত হলেও সময়ের পূর্বে উপস্থিত হয়ে আহার্য প্রস্তুতির অপেক্ষায় বসে থেকো না। غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ - ناظر শব্দের অর্থ এখানে অপেক্ষাকারী এবং انا শব্দের অর্থ খাদ্য রন্ধন করা। আয়াতে لَا تَدْخُلُوْا নিষেধাজ্ঞা থেকে দু'টি ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে—একটি اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ এর لا শব্দ দ্বারা এবং অপরটি غَيْرَ শব্দ দ্বারা। এর অর্থ এই যে, বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না এবং সময়ের পূর্বে এসে খাদ্য রন্ধনের অপেক্ষায় বসে থেকো না ; বরং যথাসময়ে আহ্বান করা হলে গৃহে প্রবেশ করবে। বলা হয়েছে— وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا

তৃতীয় রীতি এই যে, খাওয়া শেষে নিজ নিজ কাজে ছড়িয়ে পড়। পরস্পরে কথাবার্তা বলার জন্যে গৃহে অনড় হয়ে বসে থেকো না। বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ

মাসআলা ঃ এই রীতি সেই ক্ষেত্রে, যেখানে খাওয়ার পর দাওয়াত

প্রাপ্তদের বেশীক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্যে কষ্টের কারণ হয় ; যেমন সে একাজ সেরে অন্য কাজে মশগুল হতে চায় কিংবা তাদেরকে বিদায় দিয়ে অন্য মেহমানদেরকে খাওয়াতে চায়। উভয় অবস্থায় দাওয়াত প্রাপ্তদের বসে থাকা তার জন্যে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে সাধারণ অবস্থা ও নিয়ম দৃষ্টে জানা যায় যে, আহারের পর দাওয়াত প্রাপ্তদের বেশীক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্যে কষ্টের কারণ হবে না, সেখানে এই রীতি প্রযোজ্য নয়। আজকালকার দাওয়াতসমূহে তাই প্রচলিত আছে। আয়াতের পরবর্তী বাক্য এর প্রমাণ, যাতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

অর্থাৎ, আহারের পর কথাবার্তায় মশগুল হতে নিষেধ করার কারণ এই যে, এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কষ্ট অনুভব করতেন। কারণ, মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা অন্দরমহলে করা হত। সেখানে মেহমানদের বেশীক্ষণ বসে থাকা যে কষ্টের কারণ, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

দ্বিতীয় বিধান নারীদের পর্দা ঃ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ এতে শানে-নুযুলের বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে বর্ণনা এবং বিশেষভাবে নবী-পত্নীগণের উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্যে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বিধানের সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষদের কোন ব্যবহারিক বস্তু, পাত্র বস্ত্র ইত্যাদি নেয়া জরুরী হলে সামনে এসে নেবে না ; বরং পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। আরও বলা হয়েছে যে, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্য দেয়া হয়েছে।

পর্দার বিশেষ গুরুত্ব ঃ এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এস্থলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পুণ্যাত্মা পত্নীগণকে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে, যাদের অন্তরকে পাক-সাফ রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। পূর্বোল্লেখিত لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অপরদিকে যেসব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিধান দেয়া হয়েছে, তারা হলেন রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবায়ে কেরাম, যাদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা ফেরেশতাগণেরও উর্ধ্বে।

কিন্তু এসব বিষয় সত্ত্বেও তাঁদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। আজ এমন ব্যক্তি কে? যে তার মনকে সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র মন অপেক্ষা এবং তার স্ত্রীর মনকে পুণ্যাত্মা নবীপত্নীগণের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবী করতে পারে? আর এটা মনে করতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোন অনিষ্টের কারণ হবে না?

আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতরণের হেতু ঃ এসব আয়াতের শানেনুযুলে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। ঘটনাবলীর সমষ্টি এ আয়াত অবতরণের হেতু হতে পারে। আয়াতের শুরুতে দাওয়াতের শিষ্টাচার বর্ণিত হয়েছে যে, ডাকা না হলে খাওয়ার জন্যে যাবে না এবং খাওয়ার অপেক্ষায় পূর্ব থেকে বসে থাকবে না। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এর শানে নুযুল এই যে, এই আয়াত এমন লোভী ও পরভোজী লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা দাওয়াত ছাড়াই কারও গৃহে যেয়ে খাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে।

পর্দা সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধানের শানে-নুযুল সম্পর্কে ইমাম বুখারী দু'টি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাসের (রাঃ) বর্ণিত এক রেওয়ায়েত এই যে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) ! আপনার কাছে সৎ-অসৎ হরেক রকমের লোক আসা-যাওয়া করে, আপনি পত্নীগণকে পর্দা করার আদেশ দিলে খুবই ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত নাযিল হয়।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত ফারূকে আযমের (রাঃ) উক্তি বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ

"আমি আমার পালনকর্তার সাথে তিনটি বিষয়ে একইরূপ মতে পৌছেছি—

(১) আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এই মর্মে বাসনা প্রকাশ করলাম যে, আপনি মকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নিলে ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলা আদেশ নাযিল করলেন, তোমরা মকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নাও। (২) আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) আপনার পত্নীগণের সামনে সৎ-অসৎ প্রত্যেক ব্যক্তি আসে। আপনি তাদেরকে পর্দার আদেশ দিলে ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল। (৩) নবী-পত্নীগণের মধ্যে যখন পারস্পরিক আত্মমর্যাদাবোধ ও ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তখন আমি বললাম, যদি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম পত্নী তাঁকে দান করবেন। অতঃপর ঠিক এই ভাষায়ই কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল।"

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত ফারূকে আযমের (রাঃ) কথায় শিষ্টাচার লক্ষ্যণীয়। তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে একথা বলতে চেয়েছিলেন, আমার পালনকর্তা তিনটি বিষয়ে আমার সাথে একই মতে পৌছেছেন।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, পর্দার আয়াতের স্বরূপ সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। কারণ, আমি ছিলাম এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) বিবাহের পর বধূবেশে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গৃহে আগমন করেন এবং গৃহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওলীমার জন্যে কিছু খাদ্য প্রস্তুত করান এবং সাহাবায়ে কেরামকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার পর কিছু লোক পারস্পরিক কথাবার্তার জন্যে সেখানেই অনড় হয়ে বসে রইল। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং যয়নব (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি সংকোচবশতঃ প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন। লোকজনের এভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কষ্ট অনুভব করছিলেন। তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে অন্য পত্নীদের সাথে সাক্ষাৎ ও সালামের জন্যে চলে গেলেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন যে, লোকজন তেমনি বসে রয়েছে। তাঁকে ফিরে আসতে দেখে তাদের সম্বিৎ ফিরে এল এবং স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঘরে প্রবেশ করে অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় বের হয়ে এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি পর্দার আয়াত يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا পাঠ করে শোনালেন, যা তখনই অবতীর্ণ হয়েছিল।

এ ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি এসব আয়াত অবতরণের সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি ছিলাম। আমার সামনেই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল।— (তিরমিযী)

পর্দার আয়াতের শানে –নুযূল সম্পর্কে বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনাত্রয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। তিনটি ঘটনাই একত্রে আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে।

তৃতীয় বিধান রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পর কারও সাথে তাঁর পত্নীগণের বিবাহ বৈধ নয় ঃ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا এর পূর্বের বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কষ্ট হয়, এমন প্রত্যেক কথা ও কাজ হারাম করা হয়েছিল। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণের সাথে কারও বিবাহ হালাল নয়।

উপরে বর্ণিত সব বিধানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর পত্নীগণকে সম্বোধন করা হলেও বিধানাবলী সকল উম্মতের জন্যও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু এই সর্বশেষ বিধানটি এরূপ নয়। কেননা, সাধারণ উম্মতের জন্যে বিধান এই যে, স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত অতিবাহিত হলে স্ত্রী অপরকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু নবী পত্নীগণের জন্যে বিশেষ বিধান এই যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পর কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না।

এর কারণ এটাও হতে পারে যে, তাঁরা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী মুমিনগণের জননী। তবে তাঁদের জননী হওয়ার প্রভাব তাঁদের আত্মিক সন্তানদের উপর এভাবে প্রতিফলিত হয় না যে, তারা পরস্পর ভ্রাতা-ভগিনী হয়ে একে অপরকে বিবাহ করতে পারবে না। বরং বিবাহের অবৈধতা তাঁদের ব্যক্তিসত্ত্বা পর্যন্ত সীমিত রাখা হয়েছে।

এরূপ বলাও অবান্তর নয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর পবিত্র রওজা শরীফে জীবিত আছেন। তাঁর ওফাত কোন জীবিত স্বামীর আড়াল হয়ে যাওয়ার অনুরূপ। এ কারণেই তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা হয়নি এবং এর ভিত্তিতেই তাঁর পত্নীগণের অবস্থা অপরাপর বিধবা নারীদের মত হয়নি।

আরও একটি রহস্য এই যে, শরীয়তের নিয়মানুযায়ী জান্নাতে প্রত্যেক নারী তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে অবস্থান করবে। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) তাঁর পত্নীকে ওসিয়ত করেছিলেন, তুমি জান্নাতে আমার স্ত্রী থাকতে চাইলে আমার পর দ্বিতীয় বিবাহ করো না। কেননা জান্নাতে সর্বশেষ স্বামীই তোমাকে পাবে।—(কুরতুবী)

তাই আল্লাহ্ তাআলা নবী-পত্নীগণকে পয়গম্বরের পত্নী হওয়ার যে গৌরব ও সম্মান দুনিয়াতে দান করেছেন, পরকালে তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে তাঁদের বিবাহ অপরের সাথে হারাম করে দিয়েছেন।

এছাড়া কোন স্বামী স্বভাবগতভাবে এটা পছন্দ করে না যে, তার স্ত্রীকে অপরে বিবাহ করুক। কিন্তু এই স্বাভাবিক মনোবাসনা পূর্ণ করা সাধারণ মানুষের জন্যে শরীয়তের আইনে জরুরী নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই স্বাভাবিক বাসনার প্রতিও আল্লাহ্ তাআলা সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এটা তাঁর বিশেষ সম্মান।

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া অথবা তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা আল্লাহ্ তাআলার কাছে গুরুতর পাপ।

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا আয়াতের শেষে পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা অন্তরের গোপন ইচ্ছা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। তোমরা কোন কিছু গোপন কর বা প্রকাশ কর সবই আল্লাহ্র সামনে প্রকাশমান। এতে জোর দেয়া হয়েছে, উল্লেখিত বিধানাবলীর ব্যাপারে যেন কোন প্রকার সন্দেহ, সংশয় ও কুমন্ত্রণাকে অন্তরে স্থান না দেয়া হয় এবং এগুলোর বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা হয়।

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ
وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا
مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٥٥﴾ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٥٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ
يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ
لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٨﴾ يٰٓاَيُّهَا
النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾ لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ
الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ
لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٠﴾ مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ
اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي
الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٦٢﴾

(৫৫) নবী-পত্নীগণের জন্যে তাঁদের পিতা পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, সহধর্মিনী নারী এবং অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে গোনাহ্ নেই। নবী-পত্নীগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব বিষয় প্রত্যক্ষ করেন। (৫৬) আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর। (৫৭) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি (৫৮) যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। (৫৯) হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু (৬০) মুনাফেকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করব। অতঃপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে। (৬১) অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে। (৬২) যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহ্‌র রীতি। আপনি আল্লাহ্‌র রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য উল্লেখিত হয়েছিল এবং প্রসঙ্গক্রমে নবী-পত্নীগণের পর্দার বিষয় আলোচিত হয়েছিল। এর পরেও পর্দার কিছু বিধান বর্ণিত হবে। মাঝখানে সেই বিষয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে, যার জন্যে এসব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং তাঁর সম্মান, মহব্বত ও আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ দান।

আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করার আদেশ দান করা। কিন্তু তা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রথমে আল্লাহ্ স্বয়ং নিজের ও তাঁর ফেরেশতাগণের দরূদ পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সাধারণ মুমিনগণকে দরূদ প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছেন। এতে তাঁর মাহাত্ম্য ও সম্মানকে এত উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে যে, রসূলের (সাঃ) শানে যে কাজের আদেশ মুসলমানদেরকে দেয়া হয়, সেকাজ স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণও করেন। অতএব যে মুমিনগণের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুগ্রহের অন্ত নেই, তাদের তো এ কাজে খুব যত্নবান হওয়া উচিত। এ বর্ণনাভঙ্গীর আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে করে দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী মুসলমানদের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে এমন এক কাজে শরীক করে নিয়েছেন, যা তিনি নিজেও করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও।

সালাত ও সালামের অর্থ ঃ আরবী ভাষায় সালাত শব্দের অর্থ রহমত, দোয়া, প্রশংসাকীর্তন। আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি যে সালাত সম্পৃক্ত করা হয়েছে এর অর্থ তিনি রহমত নাযিল করেন। ফেরেশতাগণ সালাত প্রেরণ করেন কথার অর্থ তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে রহমতের দোয়া করেন। আর সাধারণ মুমিনদের তরফ থেকে সালাতের অর্থ দোয়া ও প্রশংসাকীর্তনের সমষ্টি। তফসীরবিদগণ এ অর্থই লিখেছেন। ইমাম বুখারী আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তাআলার সালাতের অর্থ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্মান ও ফেরেশতাগণের সামনে প্রশংসাকীর্তন করা। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্মান দুনিয়াতে এই যে, তিনি তাঁর নাম সমুন্নত করেছেন। ফলে আযান, একামত ইত্যাদিতে আল্লাহ্‌র নামের সাথে সাথে তাঁর নামও শামিল করে দিয়েছেন, তার ধর্ম পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রবল করেছেন; তাঁর শরীয়তের কাজ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন এবং তাঁর শরীয়তের হেফাযতের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। — পক্ষান্তরে পরকালে তাঁর সম্মান এই যে, তাঁর স্থান সমগ্র সৃষ্টির উর্ধ্বে রেখেছেন এবং যে সময় কোন পয়গম্বর ও ফেরেশতার সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না, তখনও তাঁকে সুপারিশের ক্ষমতা দিয়েছেন, যাকে "মাকামে-মাহ্‌মুদা" বলা হয়।

এই অর্থদৃষ্টে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, হাদীস অনুযায়ী দরূদ ও সালামে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণকেও শামিল করা হয়। কাজেই আল্লাহ্‌র সম্মান ও প্রশংসাকীর্তনে তাঁর সাথে অন্যকে কিরূপে শরীক করা যায়? এর জওয়াব রূহুল মা'আনী ইত্যাদি কিতাবে এই দেয়া হয়েছে যে, সম্মান ও প্রশংসাকীর্তনের অনেক স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লাভ করেছেন এবং এক স্তরে বংশধর, সাহাবী এবং সাধারণ মুমিনগণও শামিল রয়েছেন।

একটি সন্দেহের জওয়াব ঃ (এক) — সালাত শব্দ দ্বারা একই

সময়ে একাধিক অর্থ (রহমত, দোয়া ও প্রশংসা) নেয়াকে পরিভাষায় ''ওমুমে মুশতারিক'' বলা হয়, যা কারও কারও মতে জায়েয নয়। কাজেই এস্থলে সালাত শব্দের এক অর্থ নেয়াই সঙ্গত অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্মান, প্রশংসা ও শুভেচ্ছা। অতঃপর এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হলে এর সারমর্ম হবে রহমত, ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে হলে দোয়া, ও এস্তেগফার এবং সাধারণ মুমিনগণের তরফ থেকে হলে দোয়া, প্রশংসা ও সম্মানের সমষ্টি অর্থ হবে।

সালাম শব্দটি ধাতু, এর অর্থ সালামত ও নিরাপত্তা। এর উদ্দেশ্য ত্রুটি, দোষ ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকা। ''আসসালামু আলাইকা'' বাক্যের অর্থ এই যে, দোষত্রুটি বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা আপনার সঙ্গী হোক। আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী এটা على অব্যয় ব্যবহারের স্থান নয়। কিন্তু প্রশংসার অর্থ শামিল থাকার কারণে على অব্যয় যোগে عليك অথবা عليكم বলা হয়।

কেউ কেউ এখানে ''সালাম'' শব্দের অর্থ নিয়েছেন আল্লাহ্র সত্তা। কেননা, এটা তাঁর সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম। অতএব ''আসসালামু আলাইকুম'' বাক্যের অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ্ আপনার হেফাযত ও দেখাশোনার যিম্মাদার।

মাসআলা ঃ অধিকাংশ ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, কেউ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাম উল্লেখ করলে অথবা শুনলে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা, হাদীসে এরূপ ক্ষেত্রে দরূদ পাঠ না করার কারণে শাস্তিবাণী বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصل علىّ অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না।

অন্য এক হাদীসে আছে- البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علىّ -সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না।

০ একই মজলিসে বার বার নাম উচ্চারিত হলে একবার দরূদ পাঠ করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেকবার পাঠ করা মুস্তাহাব। মুহাদ্দিসগণই সর্বাধিক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাম উচ্চারণ করতে পারেন। কারণ, হাদীস চর্চাই তাঁদের সার্বক্ষণিক কাজ। এতে বার বার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাম আসে। তাঁরা প্রত্যেক বার দরূদ ও সালাম পাঠ করেন ও লেখেন। সমস্ত হাদীস গ্রন্থ এর সাক্ষ্য দেয়। বার বার দরূদ ও সালাম লিপিবদ্ধ করলে কিতাবের পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে যাবে—তাঁরা এ বিষয়েরও পরওয়া করেননি। অধিকাংশ ছোটখাট হাদীসে দু'এক লাইনের পরে এবং কোথাও কোথাও এক লাইনেই একাধিকবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাম আসে। কিন্তু হাদীসবিদগণ কোথাও দরূদ ও সালাম বাদ দেননি।

০ মুখে নাম উচ্চারণ করলে যেমন দরূদ ও সালাম ওয়াজিব, তেমনি কলমে লেখার সময়ও দরূদ ও সালাম লেখা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে সংক্ষেপে ''সাঃ'' লেখাও যথেষ্ট নয়। সম্পূর্ণ দরূদ ও সালাম লেখা বিধেয়।

০ দরূদ ও সালাম উভয়টি পাঠ করাই উত্তম ও মুস্তাহাব। কিন্তু কেউ উভয়ের মধ্যে যে কোন একটি পাঠ করলে অধিকাংশ ফেকাহ্‌বিদের মতে তাতে কোন গোনাহ্ নেই। ইমাম নভভী একে মাকরূহ বলেছেন। ইবনে হাজার হায়সমীর মতে এর অর্থ মাকরূহ তানযিহী। আলেমগণ উভয়টিই পাঠ করেন এবং মাঝে মাঝে যে কোন একটিও পাঠ করেন।

০ পয়গম্বরগণ ব্যতীত কারও জন্যে সালাত তথা দরূদ ব্যবহার করা অধিকাংশ আলেমদের মতে বৈধ নয়। ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের এই ফতোয়া বর্ণনা করেছেন ঃ

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে সেসব কাজকর্মের ব্যাপারে হুশিয়ার করা হয়েছিল, যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে কষ্টদায়ক। কিছুসংখ্যক মুসলমান অজ্ঞতা অথবা অনবধানতাবশতঃ অনিচ্ছাকৃতভাবে এ ধরণের কাজকর্মে লিপ্ত হত; যেমন দাওয়াত ব্যতিরেকেই তাঁর গৃহে চলে যাওয়া অথবা দাওয়াতের নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে এসে বসে থাকা অথবা খাওয়ার পর পারস্পরিক কথাবার্তায় মশগুল হয়ে বিলম্ব করা ইত্যাদি। এসব কাজের ব্যাপারে يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছিল।

এসব কষ্ট অনিচ্ছায় ও অনবধানতাবশতঃ হয়ে যেত। তাই এ ব্যাপারে কেবল হুশিয়ার করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে সেই কষ্টের উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামের শত্রু কাফের ও মুনাফেকদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাপূর্বক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেয়া হত। এতে দৈহিক নির্যাতনও দাখিল আছে, যা বিভিন্ন সময়ে কাফেরদের হাতে তিনি ভোগ করতেন এবং আত্মিক কষ্টও দাখিল আছে, যা বিদ্রূপ, দোষারোপ ও নবী-পত্নীগণের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাঁকে দেয়া হত। এই ইচ্ছাপূর্বক কষ্টদানের কারণে অভিসম্পাত এবং কঠোর শাস্তিবাণীও আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্ তাআলাকে কষ্টদানের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এমন কাজকর্ম করা ও কথাবার্তা বলা, যা স্বভাবতঃ মর্মপীড়ার কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সত্তা প্রভাব-গ্রহণজনিত সকল ক্রিয়ার উর্ধ্বে। তাঁকে কষ্ট দেয়ার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু স্বভাবতঃ পীড়াদায়ক কাজকর্মকে এখানে পীড়া ও কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এখানে আল্লাহ্কে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্য কি, এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে কষ্ট দেয়ার অর্থ এমন কাজকর্ম ও কথাবার্তা, যেগুলো সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মৌখিকভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এসব কাজ আল্লাহ্ তাআলার কষ্টের কারণ হয়। উদাহরণতঃ বিপদাপদের সময় মহাকালকে গালমন্দ দেয়া। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর কর্তা আল্লাহ্ তাআলা। কিন্তু কাফেররা মহাকালকে কর্তা মনে করে গালি দিত। ফলে এই গালি আসল কর্তা পর্যন্তই পৌছত। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ করা আল্লাহ্ তাআলার কষ্টের কারণ। সুতরাং আয়াতে আল্লাহ্কে কষ্ট দেয়ার অর্থ এ ধরণের কথাবার্তা ও কাজকর্ম করা।

অন্য তফসীরবিদগণ বলেন, এখানে প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কষ্ট প্রতিরোধ করা এবং এর জন্যে শাস্তিবাণী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কিন্তু আয়াতে রসূলের কষ্টকে আল্লাহ্র কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, রসূলকে কষ্ট দেয়া প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কেই কষ্ট দেয়া। এ সম্পর্কিত একটি হাদীস পরে উল্লেখ করা হবে। কোরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টেও এই তফসীরটি অগ্রগণ্য। কারণ, পূর্বেও রসূলের কষ্ট বর্ণিত আছে এবং পরেও তাই বর্ণিত হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর কষ্টই যে আল্লাহ্ তাআলার কষ্ট, একথা আবদুর রহমান ইবনে মুগাফফাল মুযানী (রাঃ)এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় ঃ

''রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। আমার পরে তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করো না। কেননা, যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসে, সে আমার

ভালবাসার কারণে তাদেরকে ভালবাসে আর যে তাদের সাথে শত্রুতা রাখে, সে আমার সাথে শত্রুতা রাখার কারণে শত্রুতা রাখে। যে তাদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়, যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেয়, যে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ সত্বরই তাকে পাকড়াও করবেন।"—(মাযহারী)

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কষ্টের কারণে আল্লাহ্ তাআলার কষ্ট হয়। অনুরূপভাবে আরও জানা গেল যে, কোন সাহাবীকে কষ্ট দিলে অথবা তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কষ্ট হয়।

এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতটি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপের দিনগুলোতে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফেকের ঘরে কিছু লোক সমবেত হয়ে এই অপবাদ প্রচার ও প্রসারিত করার কথাবার্তা বলত। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের কাছে অভিযোগ পেশ করে বলেন ঃ লোকটি আমাকে কষ্ট দেয়।—(মাযহারী)

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে যে কোন প্রকারে কষ্ট দেয়া কুফরী ঃ যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কোন প্রকার কষ্ট দেয়, তাঁর সত্তা অথবা গুণাবলীতে প্রকাশ্য অথবা ইঙ্গিতে কোন দোষ বের করে, সে কাফের হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াত দৃষ্টে তার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার অভিসম্পাত ইহকালেও হবে এবং পরকালেও।- (মাযহারী)

৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে কোন মুসলমানকে কষ্ট ও মিথ্যা অপবাদ দেয়া হারাম — যদি তারা আইনতঃ এর যোগ্য না হয়। সাধারণ মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ কথাটি যুক্ত করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে কারও কোন অপকর্মে জড়িত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, যার প্রতিফল স্বরূপ তাকে কষ্ট দেয়া শরীয়তের আইনে জায়েয। প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ ও রসূলকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপার ছিল। তাই তাতে উপরোক্ত শর্ত যুক্ত করা হয়নি। কারণ সেখানে কষ্ট দান বৈধ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

কোন মুসলমানকে শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট দেয়া হারাম ঃ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ আয়াত দ্বারা কোন মুসলমানকে শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্টদানের অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ "কেবল সে-ই মুসলমান, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে; কেউ কষ্ট না পায় আর কেবল সে-ই মুমিন, যার কাছ থেকে মানুষ তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে নিরুদ্বেগথাকে।—(মাযহারী)

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মুসলমান নারী ও পুরুষকে কষ্ট দেয়া হারাম ও মহাপাপ এবং বিশেষ করে রসূলে করীম (সাঃ)-কে পীড়া দেয়া কুফর ও অভিসম্পাতের কারণ। মুনাফেকদের পক্ষ থেকে সব মুসলমান ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দুই প্রকারে কষ্ট পেতেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব নির্যাতন বন্ধের ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে নারীদের পর্দা সংক্রান্ত কিছু অতিরিক্ত বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। মুনাফেকদের দ্বিবিধ নির্যাতনের একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের দাসীরা কাজ কর্মের জন্য বাইরে গেলে দুষ্ট প্রকৃতির মুনাফেকরা তাদেরকে উত্যক্ত করত এবং মাঝে মাঝে দাসী সন্দেহে স্বাধীন নারীদেরকেও উত্যক্ত করত। ফলে সাধারণভাবে মুসলমানগণ এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কষ্ট পেতেন।

দ্বিতীয় নির্যাতন ছিল এই যে, তারা সদাসর্বদা মিথ্যা খবর রটনা করত। উদাহরণতঃ এখন অমুক শত্রুপক্ষ মদীনা আক্রমণ করবে এবং সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। প্রথম প্রকার নির্যাতন থেকে স্বাধীন নারীদেরকে বাঁচানোর তাৎক্ষণিক ও সহজ ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন নারীদের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তোলা। কারণ, মুনাফেকরা স্বাধীন নারীদের পারিবারিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্থ্যের কারণে তাদেরকে সচরাচর উত্যক্ত করার সাহস পেত না। পরিচয়ের অভাবেই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হত। তাই স্বাধীন নারীদের পরিচয় ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, যাতে তারা অতি সহজে দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

অপরদিকে শরীয়ত স্বাধীন নারী ও দাসীদের পর্দার মধ্যে প্রয়োজন বশতঃ একটি পার্থক্যও রেখেছে। স্বাধীন নারীরা তাদের মাহ্‌রাম ব্যক্তির সামনে যতটুকু পর্দা করে, দাসীদের জন্যে গৃহের বাইরেও ততটুকু পর্দা রাখা হয়েছে। কারণ প্রভুর কাজকর্ম করাই দাসীর কর্তব্য, এতে তাকে বার বার বাইরেও যেতে হয়। এমতাবস্থায় মুখমণ্ডল ও হাত আবৃত রাখা কঠিন ব্যাপার। স্বাধীন নারীরা কোন প্রয়োজনে বাইরে গেলেও বার বার যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কাজেই পূর্ণ পর্দা পালন করা কঠিন নয়। তাই স্বাধীন নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন লম্বা চাদর মাথার উপর থেকে মুখমণ্ডলের সামনে ঝুলিয়ে নেয়, যাতে পর পুরুষের দৃষ্টিতে মুখমণ্ডল না পড়ে। ফলে তাদের পর্দাও পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল এবং দাসীদের থেকে স্বাতন্ত্র্যও ফুটে উঠল। অতঃপর মুনাফেকদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী শুনিয়ে দাসীদের হেফাযতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা যদি বিরত না হয়, তবে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ইহকালেও তাঁর নবী ও মুসলমানদের হাতে সাজা দেবেন।

উল্লেখিত আয়াতে স্বাধীন নারীর পর্দার জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে; يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ এতে يُدْنِينَ শব্দটি ادناء থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ নিকটে আনা। جلابيب শব্দটি جلباب এর বহুবচন। অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। এই চাদরের আকার-আকৃতি সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এই চাদর ওড়নার উপরে পরিধান করা হয়।—(ইবনে-কাসীর)

ইমাম মুহম্মদ ইবনে সিরীন বলেন ঃ আমি হযরত ওবায়দা সালমানী (রঃ)-কে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাবের আকার-আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং কেবল বামচক্ষু খোলা রেখে ادناء ও جلباب এর তফসীর কার্যতঃ দেখিয়ে দিলেন।

মস্তকের উপরদিক থেকে মুখমণ্ডলের উপর চাদর লটকানো হচ্ছে عَلَيْهِنَّ শব্দের তফসীর — অর্থাৎ নিজের উপর চাদরকে নিকটবর্তী করার অর্থ চাদরকে মস্তকের উপরদিক থেকে লটকানো।

এ আয়াত পরিষ্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে। ফলে উপরে বর্ণিত পর্দার প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তুর সমর্থন

হয়ে গেছে। তাতে বলা হয়েছিল যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু সতরের অন্তর্ভুক্ত না হলেও অনর্থের আশংকায় এগুলো আবৃত করা জরুরী। শুধুমাত্র অপারগতা এই হুকুম বহির্ভূত।

জরুরী জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াত স্বাধীন নারীদেরকে এক বিশেষ ধরনের পর্দার আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে, যাতে সাধারণ বাঁদীদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠে এবং দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। উল্লেখিত বর্ণনায় এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এর অর্থ এরূপ কখনও নয় যে, ইসলাম সতীত্ব সংরক্ষণে স্বাধীন নারী ও বাঁদীদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেছে এবং স্বাধীন নারীদের সতীত্ব সংরক্ষণ করে বাঁদীদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্য লম্পটরাই করে রেখেছিল। তারা স্বাধীন নারীদের উপর হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস করত না; কিন্তু বাঁদীদেরকে উত্যক্ত করতে দ্বিধা করত না। শরীয়ত তাদের সৃষ্ট পার্থক্যকে এভাবে কাজে লাগিয়েছে যে অধিকাংশ নারী তাদেরই স্বীকৃত নীতির মাধ্যমে আপনা আপনি নিরাপদ হয়ে গেছে।

এখন বাঁদীদের সতীত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারটিও ইসলামে স্বাধীন নারীদের অনুরূপ ফরয ও জরুরী। কিন্তু এর জন্য আইনগত কঠোরতা অবলম্বন করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। তাই পরবর্তী আয়াতে এ আইনও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা এই কুকর্ম থেকে বিরত হবে না, তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না; বরং যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও করা হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে। এ আইন বাঁদীদের সতীত্বও স্বাধীন নারীদের অনুরূপ সংরক্ষিত করে দিয়েছে।

মুসলমান হওয়ার পর ধর্ম ত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ঃ আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের দ্বিবিধ দুষ্কর্মের উল্লেখ করার পর তা থেকে বিরত না হলে এই শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে, مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا অর্থাৎ, ওরা যেখানেই থাকবে অভিসম্পাত ও লাঞ্ছনা ওদের সঙ্গী হবে এবং যেখানেই পাওয়া যাবে, গ্রেফতার করতঃ হত্যা করা হবে। এটা সাধারণ কাফেরদের শাস্তি নয়। কোরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, কাফেরদের জন্য শরীয়তে এরূপ আইন নেই; বরং তাদের জন্য আইন এই যে, প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হবে, তাদের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা হবে। এর পরও ইসলাম গ্রহণ না করলে মুসলমানদের অনুগত যিম্মী হয়ে থাকার আদেশ দেয়া হবে। তারা এটা মেনে নিলে তাদের জানমাল ও ইযযত-আবরুর হেফাযত করা মুসলমানদের মতই ফরয হয়ে যাবে। তবে কেউ যদি তা না মানে এবং যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ আছে।

আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে সর্বাবস্থায় বন্দী ও হত্যার আদেশ শোনানো হয়েছে। এর কারণ এই যে, ব্যাপারটি ছিল মুনাফিকদের, তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলত। কোন মুসলমান ইসলামের বিধানাবলীর প্রকাশ্য বিরোধিতা করলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে মুরতাদ বলা হয়। তার সাথে শরীয়তের কোন আপোষ নেই। তবে সে তওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুস্পষ্ট উক্তি এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্মপরম্পরা দ্বারা এটাই প্রমাণিত। মুসায়লামা কায্যাব ও তার দলের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে-কেরামের ঐকমত্যে জেহাদ পরিচালনা এবং মুসায়লামার হত্যা এর যথেষ্ট প্রমাণ। আয়াতের শেষে একে আল্লাহ্ তাআলার শাশ্বত রীতি বলা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তেও মুরতাদের শাস্তি হত্যাই ছিল।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল ঃ

(১) নারীরা প্রয়োজনবশতঃ গৃহ থেকে বের হলে লম্বা চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত করে বের হবে এবং চাদরটি মাথার উপরদিক থেকে ঝুলিয়ে মুখমণ্ডলও আবৃত করবে। প্রচলিত বোরকাও এ চাদরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

(২) মুসলমানদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হয়, এরূপ কোন গুজব ছড়ানো হারাম।

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۚ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَمَا
يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿۶۳﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ
وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿۶۴﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا
نَصِيْرًا ﴿۶۵﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا
اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿۶۶﴾ وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا
فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿۶۷﴾ رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ
لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿۶۸﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا
مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿۶۹﴾
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿۷۰﴾ يُّصْلِحْ
لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿۷۱﴾ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ
حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿۷۲﴾ لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ
الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ
اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۷۳﴾

(৬৩) লোকেরা আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহ্‌র কাছেই। আপনি কি করে জানবেন যে, সম্ভবতঃ কেয়ামত নিকটেই। (৬৪) নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন। (৬৫) তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। (৬৬) যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট পালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতাম ও রসূলের আনুগত্য করতাম। (৬৭) তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। (৬৮) হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করুন। (৬৯) হে মুমিনগণ! মূসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। তারা যা বলেছিল, আল্লাহ্ তা থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ছিলেন মর্যাদাবান। (৭০) হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। (৭১) তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (৭২) আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হল; কিন্তু মানুষ তা বহণ করল। নিশ্চয় সে জালেম-অজ্ঞ। (৭৩) যাতে আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ, মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত ও শাস্তির সতর্কবাণী শোনানো হয়েছিল। কাফেরদের অনেকদল স্বয়ং কেয়ামত ও পরকালেই বিশ্বাসী ছিল না এবং অবিশ্বাস হেতু ঠাট্টা-বিদ্রূপচ্ছলে জিজ্ঞাসা করত, কেয়ামত কবে হবে? আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জওয়াব দেয়া হয়েছে।

০ ৬৯তম আয়াতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ ও রসূলের বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, এই বিরোধিতা তাঁদের কষ্টের কারণ।

মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায় তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল। প্রথম আয়াতে সেই ঘটনা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। এর জন্যে জরুরী নয় যে, মুসলমানরা এরূপ কোন কাজ করেছিল; বরং কাজ করার পূর্বেই তাদেরকে এ কাহিনী শুনিয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হাদীসে কোন কোন সাহাবীর যে ঘটনা বর্ণিত আছে, তার অর্থ এই যে, তারা কখনও এদিকে লক্ষ্য করেননি যে, কথাটি রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) জন্যে কষ্টদায়ক হবে। কোন সাহাবী ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দিবেন এমন সম্ভাবনা ছিল না। ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দেয়ার যত কাহিনী বর্ণিত আছে, সবগুলোর কর্তাই মুনাফিক সম্প্রদায়। মূসা (আঃ)-এর কাহিনী কি ছিল, তা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বর্ণনা করে এ আয়াতের তফসীর করেছেন। ইমাম বুখারী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন—হযরত মূসা (আঃ) অত্যন্ত লজ্জাশীল হওয়ার কারণে তাঁর দেহ ঢেকে রাখতেন। তাঁর শরীর কেউ দেখত না। তিনি পর্দার আড়ালে গোসল করতেন। তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মধ্যে সকলের সামনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মূসা (আঃ) কারও সামনে গোসল করেন না দেখে কেউ কেউ বলাবলি করল— এর কারণ এই যে, তাঁর দেহে নিশ্চয় কোন খুঁত আছে— হয় তিনি ধবল কুষ্ঠরোগী, না হয় একশিরা রোগী। (অর্থাৎ তাঁর অণ্ডকোষ স্ফীত।) নতুবা তিনি অন্য কোন ব্যাধিগ্রস্ত। আল্লাহ্ তাআলা এ ধরনের খুঁত থেকে মূসা (আঃ)-এর নির্দোষিতা প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন। একদিন মূসা (আঃ) নির্জনে গোসল করার জন্যে কাপড় খুলে একখণ্ড পাথরের উপর তা রেখে দিলেন। গোসল শেষে যখন হাত বাড়িয়ে কাপড় নিতে চাইলেন, তখন প্রস্তর খণ্ডটি (আল্লাহ্‌র আদেশে) নড়ে উঠল এবং তাঁর কাপড়সহ দৌড়াতে লাগল। মূসা (আঃ) তাঁর লাঠি নিয়ে প্রস্তরের পেছনে পেছনে ''আমার কাপড়, আমার কাপড়'' বলতে বলতে দৌড় দিলেন। কিন্তু প্রস্তরটি থামল না — যেতেই লাগল। অবশেষে প্রস্তরটি বনী-ইসরাঈলের এক সমাবেশে পৌঁছে থেমে গেল। তখন সেসব লোক মূসা (আঃ)-কে উলঙ্গ অবস্থায় দেখে নিল এবং তাঁর দেহ নিখুঁত ও সুস্থ দেখতে পেল। (এতে তাদের বর্ণিত কোন খুঁত বিদ্যমান ছিল না।) এভাবে আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)-এর নির্দোষিতা সকলের সামনে প্রকাশ করে দিলেন। প্রস্তরখণ্ড থেমে যেতেই মূসা (আঃ) তাঁর কাপড় উঠিয়ে পরে নিলেন। অতঃপর তিনি লাঠি দ্বারা প্রস্তর খণ্ডকে মারতে লাগলেন। আল্লাহ্‌র কসম, মূসার (আঃ) আঘাতের কারণে পাথরের গায়ে তিন, চার অথবা পাঁচটি দাগ পড়ে গিয়েছিল।

وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا অর্থাৎ, মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। আল্লাহ্‌র কাছে কারও মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং তাঁর বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। মূসা (আঃ) যে

এরূপ ছিলেন, তার প্রমাণ কোরআনের অনেক ঘটনায় রয়েছে। এসব ঘটনায় তিনি যেভাবে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছেন, সেভাবেই কবুল হয়েছে। এসব দোয়ার মধ্যে বিস্ময়কর দোয়া এই যে,তিনি হারূন (আঃ)-কে পয়গম্বর করার দোয়া করলে আল্লাহ্‌ তাআলা তা কবুল করে তাঁকে তাঁর রেসালতে অংশীদার করে দেন। অথচ রেসালতের পদ কাউকে কারও সুপারিশের ভিত্তিতে দান করা হয় না। — (ইবনে-কাসীর)

পয়গম্বরগণকে যাবতীয় ক্রটিমুক্ত রাখা আল্লাহ্‌র রীতি : এ ঘটনায় সম্প্রদায়ের দোষারোপের জওয়াবে নির্দোষিতা প্রমাণের বিষয়টিকে আল্লাহ্‌ তাআলা এত অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন যে, অলৌকিকভাবে প্রস্তর খণ্ড কাপড় নিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে এবং মূসা (আঃ) নিরুপায় হয়ে মানুষের সামনে উলঙ্গ অবস্থায় হাজির হয়েছেন। এই গুরুত্ব প্রদান এদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর পয়গম্বরগণের দেহকে ঘৃণাত্মক খুঁত থেকে সাধারণভাবে পবিত্র ও মুক্ত রেখেছিলেন। বোখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সকল পয়গম্বরকেই উচ্চবংশে জন্মদান করা হয়েছে। কেননা সর্বসাধারণ যে বংশ ও পরিবারকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করে, সে পরিবারের কারও কথা শোনা ও মানা তাদের জন্যে কঠিন হয়। অনুরূপভাবে পয়গম্বরগণের ইতিহাসে কোন পয়গম্বরের অন্ধ, কানা, মুক অথবা বিকলাঙ্গ হওয়ারও প্রমাণ নেই। হযরত আইয়্যুব (আঃ)-এর ঘটনা দ্বারা এতে আপত্তি তোলা যায় না। কারণ সেটা খোদায়ী রহস্য অনুযায়ী একটা বিশেষ পরীক্ষার জন্যে ক্ষণস্থায়ী ব্যাধি ছিল, যা পরে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا – قول سديد এর তফসীর সত্য কথা, সরল কথা, সঠিক কথা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর সবগুলো উদ্ধৃত করে বলেন, সবই ঠিক। কোরআন পাক এস্থলে صادق – مستقيم ইত্যাদি শব্দ বাদ দিয়ে سديد শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা এ শব্দের মধ্যে সবগুলো গুণাবলীই বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই কাশেফী রুহুল-বয়ানে বলেন, قول سديد এমন কথা যা সত্য তাতে মিথ্যার নামগন্ধও নেই, সঠিক যাতে ভুলের নামগন্ধ নেই, গাম্ভীর্যপূর্ণ যাতে রসিকতার নামগন্ধও নেই, কোমল যা হৃদয় বিদারক নয়।

মুখ সংশোধন সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কর্মসংশোধনের কার্যকর উপায় : এ আয়াতে মুসলমানদের প্রতি মূল আদেশ হচ্ছে খোদাভীতি অবলম্বন কর। এর স্বরূপ যাবতীয় খোদায়ী বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য। অর্থাৎ, যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ ও মাকরূহ কাজ থেকে বিরত থাকা। বলাবাহুল্য, এটা মানুষের জন্য সহজ কাজ নয়। তাই খোদাভীতির আদেশের পর একটি বিশেষ কর্মের নির্দেশ দেয়া হয়েছে; অর্থাৎ, কথাবার্তা সংশোধন করা। এটাও খোদাভীতিরই এক অংশ; কিন্তু এমন অংশ, যা করায়ত্ত হয়ে গেলে খোদাভীতির অবশিষ্ট অংশগুলো আপনা-আপনি অর্জিত হতে থাকে। যেমন, এ আয়াতেই সঠিক কথা অবলম্বনের ফলশ্রুতিতে يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ এর ওয়াদা করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি মুখকে ভুলভ্রান্তি থেকে নিবৃত রাখ এবং সঠিক ও সরল কথা বলার অভ্যস্ত হয়ে যাও, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের সর্বকর্ম সংশোধণ করে দেবেন। আয়াতের শেষে আরও ওয়াদা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা এরূপ ব্যক্তির ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন।

কোরআনী বিধানসমূহে সহজকরণের বিশেষ গুরুত্ব : কোরআন পাকের সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে জানা যায় যে, যেখানেই কোন কঠিন ও দুরূহ আদেশ দেয়া হয়, সেখানেই তা সহজ করার নিয়মও বলে দেয়া হয়। খোদাভীতি সমস্ত ধর্মকর্মের নির্যাস এবং এতে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করার ব্যাপার। তাই সাধারণভাবে যেখানে আল্লাহ্‌কে ভয় করার আদেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে এর পরেই এমন কর্ম বলে দেয়া হয়েছে, যা অবলম্বন করলে খোদাভীতির অন্যান্য স্তম্ভ পালন করা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সহজ করে দেয়া হয়। আলোচ্য আয়াতে اتَّقُوا اللّٰهَ আদেশের পর وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا শিক্ষা দেয়া এরই একটি নযীর। এর পূর্বের আয়াতে اتَّقُوا اللّٰهَ আদেশের পর لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى বলে এ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সৎ ও প্রিয় বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়া খোদাভীতির পথে একটি বৃহৎ বাধা। এটা পরিত্যাগ করলে খোদাভীতি সহজ হয়ে যাবে।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ এতে খোদাভীতিকে সহজ করার জন্যে এমন লোকদের সংসর্গ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, যারা কথায় ও কাজে সাচ্চা। এর মানে যারা আল্লাহ্‌র ওলী। আরও এক আয়াতে اتَّقُوا اللّٰهَ আদেশের সাথে وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিৎ সে আগামীকাল অর্থাৎ, কেয়ামতের দিনের জন্যে কি পুঁজি প্রেরণ করেছে। এর সারমর্ম পরকাল চিন্তা। এটা খোদাভীতির সকল স্তম্ভকেই সহজ করে দেয়।

০ সমগ্র সূরায় রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সম্মান, সম্ভ্রম ও আনুগত্যের উপর জোর দেয়া হয়েছে। সূরার উপসংহারে এই আনুগত্যের সুউচ্চ মর্যাদা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য ও তাঁদের আদেশাবলী পালনকে ''আমানত'' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

আমানতের উদ্দেশ্য : এখানে আমানত শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ী প্রমুখ তফসীরবিদগণের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে; যেমন শরীয়তের ফরয কর্মসমূহ, সতীত্বের হেফাযত, ধন-সম্পদের আমানত, অপবিত্রতার গোসল, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, ধর্মের যাবতীয় কর্তব্য ও কর্ম এই আমানতের অন্তর্ভুক্ত। — (কুরতুবী)

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, শরীয়তের যাবতীয় আদেশ নিষেধের সমষ্টিই আমানত।

সারকথা এই যে, আমানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীয়তের বিধানাবলী দ্বারা আদিষ্ট হওয়া, যেগুলো পুরোপুরি পালন করলে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত এবং বিরোধিতা অথবা ক্রটি করলে জাহান্নামের আযাব প্রতিশ্রুত। কেউ কেউ বলেন, আমানতের উদ্দেশ্য খোদায়ী বিধানাবলীর ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা,যা বিশেষ স্তরের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার উপর নির্ভরশীল। উন্নতি এবং খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এই বিশেষ যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। যেসব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এই যোগ্যতা নেই, তারা স্বস্থানে যতই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তারা তাদের স্থান থেকে উন্নতি করতে পারে না। এ কারণেই আকাশ, পৃথিবী এমনকি, ফেরেশতাগণের মধ্যেও উন্নতি নেই। তারা নৈকট্যের নিজ নিজ স্থানেই অনড় হয়ে আছে। তাদের অবস্থা এই — وَمَا مِنَّاۤ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ অর্থাৎ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

আমানতের এই অর্থ অনুযায়ী আমানত সম্পর্কিত সকল হাদীস ও

রেওয়ায়েত পরস্পর সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়। অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তিসমূহও এতে প্রায় একমত হয়ে যায়।

আমানত কিরূপে পেশ করা হয়েছিল ঃ উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করেছিলাম। তারা সকলেই এর বোঝা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এর যথার্থ হক আদায় করার ব্যাপারে ভীত হয়ে গেল। কিন্তু মানুষ এই বোঝা বহন করে নিল।

এখানে চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, আকাশ,পৃথিবী ও পর্বতমালা বাহ্যতঃ অপ্রাণীবাচক ও চেতনাহীন বস্তু। তাদের সামনে আমানত পেশ করা এবং তাদের প্রত্যুত্তর দেয়া কি প্রকারে সম্ভব হল?

কেউ কেউ একে রূপক ও উপমা সাব্যস্ত করেছেন। যেমন কোরআন পাক এক জায়গায় উপমাস্বরূপ বলেছে ঃ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ অর্থাৎ আমি এই কোরআন পর্বতের উপর নাযিল করলে আপনি দেখতেন যে, পর্বতও এর ভারে নুয়ে পড়ত এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এখানে ধরে নেয়ার পর্যায়ে এই উপমা বর্ণিত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে পর্বতের উপরে অবতীর্ণ করা উদ্দেশ্য নয়। إِنَّا عَرَضْنَا আয়াতও তাঁদের মতে তেমনি একটি উপমা।

কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে এটা ঠিক নয়। কেননা, এর প্রমাণস্বরূপ যে আয়াত পেশ করা হয়েছে, তাতে কোরআন পাক لَوْ শব্দ ব্যবহার করে ব্যাপারটি যে নিছক ধরে নেয়ার পর্যায়ে, তা নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একে কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে রূপক ও উপমা মেনে নেয়া বৈধ হবে না। যদি প্রমাণ পেশ করা হয় যে, এসব বস্তু অচেতন ও জড়, এদের সাথে প্রশ্নোত্তর হতে পারে না, তবে তা কোরআনের অন্যান্য বর্ণনা দৃষ্টে প্রত্যাখ্যাত হবে। কারণ, কোরআন পাকের স্পষ্ট এরশাদ এই ঃ

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ্‌র হামদ, পবিত্রতা ঘোষণা করে। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্‌কে চেনা এবং তাঁকে স্রষ্টা, মালিক, সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে তাঁর স্তুতি পাঠ করা চেতনা ও উপলব্ধি ব্যতীত সম্ভবপর নয়। তাই এ আয়াত দৃষ্টে একথা প্রমাণিত হয় যে, উপলব্ধি ও চেতনা সকল সৃষ্টবস্তুর মধ্যে এমন কি, জড় পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। এই উপলব্ধি ও চেতনার ভিত্তিতেই তাদেরকে সম্বোধন করা যায় এবং তারা উত্তরও দিতে পারে। উত্তর শব্দ ও অক্ষরের মাধ্যমেও হতে পারে। এতে বুদ্ধিগত কোন অসম্ভাব্যতা নেই। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালাকে বাকশক্তি দিতে পারেন। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আক্ষরিক অর্থেই আমানত পেশ করা হয়েছে এবং তারা আক্ষরিক অর্থেই এ বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এতে কোন উপমা অথবা রূপকতা নেই।

আমানত ইচ্ছাধীন পেশ করা হয়েছিল, বাধ্যতামূলকভাবে নয় ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং যখন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করলেন, তখন তাদের তা বহন করতে অস্বীকার করার শক্তি কিরূপে হল? আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কারণে তাদের তো নিস্তনাবুদ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এছাড়া আকাশ ও পৃথিবী যে আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ ও অনুগত, তা কোরআনের আয়াত أَتَيْنَا طَائِعِينَ বাক্যটি দ্বারাও প্রমাণিত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা যখন তাদেরকে নির্দেশ দিলেন আমার আদেশ পালন করার জন্যে সানন্দে অথবা বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত হও, তখন তারা উত্তরে বলল, আমরা সানন্দে উপস্থিত আছি।

এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে, এ আয়াতে তাদেরকে এক শাসকসুলভ অনুবর্তিতার আদেশ দেয়া হয়েছিল, যাতে একথাও বলে দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা রাজী হও অথবা গররাযী, সর্বাবস্থায় এ আদেশ মানতে হবে। কিন্তু আমানত পেশ করার আয়াত এরূপ নয়। এতে আমানত পেশ করে তাদেরকে কবূল করা ও কবূল না করার এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল।

ইবনে-কাসীর ইবনে-আব্বাস, হাসান বসরী, মুজাহিদ প্রমুখ একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে আমানত পেশ করার এই বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে আকাশের সামনে অতঃপর পৃথিবীর সামনে এবং শেষে পর্বতমালার সামনে ইচ্ছাধীন আকারে এ বিষয় পেশ করেন যে, আমার আমানতের বোঝা নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে তোমরা বহন কর। প্রত্যেকেই বিনিময় কি, তা জানতে চাইলে বলা হল, তোমরা পূর্ণরূপে আমানত বহন করলে অর্থাৎ বিধানাবলী পুরোপুরি পালন করলে পুরস্কার, সওয়াব এবং আল্লাহ্‌র কাছে বিশেষ সম্মান লাভ করবে। পক্ষান্তরে বিধানাবলী পালন না করলে অথবা ত্রুটি করলে আযাব ও শাস্তি দেয়া হবে। একথা শুনে এসব বিশালকায় সৃষ্টি জওয়াব দিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা এখনও আপনার আজ্ঞাবহ দাস; কিন্তু আমাদেরকে যখন এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তখন আমরা এ বোঝা বহন করতে নিজেদেরকে অক্ষম পাচ্ছি। আমরা সওয়াবও চাই না এবং আযাবও ভোগ করার শক্তি রাখি না।

তফসীরে-কুরতুবীতে উদ্ধৃত হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আঃ)- কে সম্বোধন করে বললেন, আমি আমার আমানত আকাশ ও পৃথিবীর সামনে পেশ করেছিলাম তখন তারা এই বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এখন তুমি কি এর নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে এই আমানত বহন করতে সম্মত আছ? আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে পালনকর্তা, এর বিনিময় কি প্রতিদান পাওয়া যাবে? উত্তর হল, পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করলে পুরস্কার পাবে (যা আল্লাহ্‌র নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতের আকারে হবে)। পক্ষান্তরে যদি এই আমানত পণ্ড কর, তবে শাস্তি পাবে। আদম (আঃ) আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টিতে উন্নতি লাভের আগ্রহে এ বোঝা বহন করে নিলেন। বোঝা বহনের পর যোহর থেকে আসর পর্যন্ত যতটুকু সময়, ততটুকু সময়ও অতিবাহিত হতে পারেনি, ইতিমধ্যে শয়তান তাকে সুপ্রসিদ্ধ পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দিল এবং তিনি জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলেন।

আমানত কখন পেশ করা হয়েছিল? উপরে বর্ণিত রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আদম সৃষ্টির পূর্বেই আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করা হয়েছিল। আদম সৃষ্টির পর তাঁর কাছে একথাও প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তোমার পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর সামনেও এই আমানত পেশ করা হয়েছে। তাদের শক্তি ছিল না বিধায় তারা অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।

বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্বে এই

আমানত পেশ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কেননা, এই অঙ্গীকার আমানতের বোঝা বহন করার প্রথম দফা এবং পদের শপথ করার স্থলাভিষিক্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে আমানত বহনের যোগ্যতা জরুরী ছিল ঃ আল্লাহ্ তাআলা আদি তকদীরে স্থির করে নিয়েছিলেন যে, তিনি আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। এ প্রতিনিধিত্ব তাকেই দান করা যেত, যে খোদায়ী বিধানাবলী মেনে চলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারত। কেননা, এই প্রতিনিধিত্বের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্র আইন প্রয়োগ করবে এবং মানব জাতিকে খোদায়ী বিধানাবলীর আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই সৃষ্টিগতভাবে হযরত আদম (আঃ) এই আমানত বহন করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অথচ তিনি জানতেন যে, বিশালকায় সৃষ্টবস্তু এ ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।—(মাযহারী)

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا - ظلوم অর্থ নিজের প্রতি যুলুমকারী এবং جهول এর মর্মার্থ পরিণামের ব্যাপারে অজ্ঞ। এ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এতে সর্বাবস্থায় মানুষের নিন্দা করা হয়েছে যে, এই অর্বাচীন সাধ্যাতীত বিরাট বোঝা বহন করে নিজের প্রতি যুলুম করেছে; কিন্তু কোরআনী বর্ণনাদৃষ্টে বাস্তবে তা নয়। কেননা মানুষ বলে হযরত আদম (আঃ) বোঝানো হলে তিনি তো নিষ্পাপ পয়গম্বর। তিনি নিজের উপর অর্জিত দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে তাঁকে আল্লাহ্র প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। তাঁকে ফেরেশতাদের দ্বারা সেজদা করানো হয়। পরকালে তাঁর মর্যাদা ফেরেশতাদেরও উর্ধ্বে রাখা হয়। পক্ষান্তরে মানুষ বলে সমগ্র মানবজাতি বোঝানো হলে তাদের মধ্যে লাখো পয়গম্বর রয়েছেন এবং কোটি কোটি সৎকর্মপরায়ণ ওলী রয়েছেন, যাদের প্রতি ফেরেশতাগণও ঈর্ষা করেন। তাঁরা কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁরা এই খোদায়ী আমানতের যথার্থই হকদার ছিলেন। তাঁদের কারণে কোরআন পাক মানব জাতিকে "আশরাফুল মখলুকাত" আখ্যায়িত করেছে। বলা হয়েছে وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আদম (আঃ) ও সমগ্র মানব জাতি – কেউই নিন্দার পাত্র নয়। এ কারণেই তফসীরবিদগণ বলেন যে, উপরোক্ত বাক্যটি নিন্দার জন্যে নয়; বরং অধিকাংশ ব্যক্তির বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করার জন্যে অবতারণা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মানব জাতির অধিকাংশ যালেম ও অজ্ঞ প্রমাণিত হয়েছে। তারা এই আমানতের হক আদায় করেনি এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিকাংশের অবস্থা বিধায় একে মানব জাতিরই অবস্থা বলে দেয়া হয়েছে।

সারকথা এই যে, আয়াতে বিশেষভাবে সেই ব্যক্তিবর্গকে যালেম ও অজ্ঞ বলা হয়েছে, যারা শরীয়তের আনুগত্যে সফলকাম হয়নি এবং আমানতের হক আদায় করেনি। কাফের, মুনাফিক ও পাপাচারী মুসলমান সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, হাসান বসরী (রহঃ) প্রমুখ থেকে এই তফসীর বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী)

কেউ কেউ বলেন, ظلوم ও جهول শব্দদ্বয় এ স্থলে সরল গোবেচারা অর্থে আদরের সুরে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে আল্লাহ্ তাআলার মহব্বতে ও তাঁর নৈকট্যের আশায় পরিণামের কথা চিন্তা করেনি। এভাবে এ শব্দদ্বয় গোটা মানবজাতির জন্যেও হতে পারে। তফসীরে মাযহারীতে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহঃ) ও অন্যান্য সূফী বুযুর্গ থেকে এ ধরণের বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে।

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ এখানে لام অব্যয়টি কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা অর্থে নয়; বরং ব্যাকরণের পরিভাষায় একে لام عاقبة বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পরিণামে আল্লাহ্ তাআলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেবেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এক আরবী কবিতায় এই لام এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ولدوا للموت وبنوا للخراب অর্থাৎ জন্মগ্রহণ কর পরিণামে মৃত্যুর জন্যে এবং নির্মাণ কর পরিণামে বিধ্বস্ত হওয়ার জন্যে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক জন্মগ্রহণকারীর পরিণাম মৃত্যু এবং প্রত্যেক নির্মাণের পরিণাম ধ্বংস।

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ এর সাথে এ বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, মানুষ যে আমানতের বোঝা বহন করেছে, এর পরিণামে মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে — (এক) কাফের, মুনাফিক ইত্যাদি, যারা অবাধ্য হয়ে আমানত নষ্ট করে দেবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। (দুই) মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী। যারা আনুগত্যের মাধ্যমে আমানতের হক আদায় করবে। তাদের সাথে অনুগ্রহ ও ক্ষমা সুন্দর ব্যবহার করা হবে।

পূর্বে ظلوم ও جهول শব্দদ্বয়ের এক তফসীরে বলা হয়েছে যে, এটা সমগ্র মানবজাতির জন্যে নয়; বরং বিশেষ ধরনের লোকদের জন্যে বলা হয়েছে, যারা খোদায়ী আমানতকে নষ্ট করে দেবে। উপরোক্ত সর্বশেষ বাক্যেও এ তফসীরের সমর্থন রয়েছে।

সূরা আহযাব সমাপ্ত

سُوْرَةُ سَبَإٍ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ وَّخَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّسِتُّ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ
الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ① يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي
الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيْهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ② وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا
السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ
مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ
وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ③ لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ④ وَالَّذِيْنَ
سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ
اَلِيْمٌ ⑤ وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ
رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ⑥
وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ
اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ⑦

সূরা সাবা

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৫৪,

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি নভোমণ্ডলে যা আছে এবং ভূমণ্ডলে যা আছে সবকিছুর মালিক এবং তাঁরই প্রশংসা পরকালে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (২) তিনি জানেন যা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, যা সেখান থেকে নির্গত হয়, যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় এবং যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল। (৩) কাফেররা বলে, আমাদের উপর কেয়ামত আসবে না। বলুন, কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ—অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে তাঁর আগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু, না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ—সমস্তই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। (৪) তিনি পরিণামে যারা মুমিন ও সৎকর্ম পরায়ণ, তাদেরকে প্রতিদান দেবেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। (৫) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়, তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬) যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, তারা আপনার পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ কোরআনকে সত্য জ্ঞান করে এবং এটা মানুষকে পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ আল্লাহ্র পথপ্রদর্শন করে। (৭) কাফেররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তোমাদেরকে খবর দেয় যে; তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন সৃজিত হবে?

সূরা সাবা

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

عٰلِمِ الْغَيْبِ এটা رب শব্দের বিশেষণ, পূর্বে যার শপথ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর মধ্য থেকে এখানে অদৃশ্য জ্ঞান ও সর্বব্যাপী জ্ঞানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে কেয়ামত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। কাফেরদের কেয়ামত অস্বীকার করার বড় কারণ ছিল এই যে, সমস্ত মানুষ মরে মাটি হয়ে গেলে সেই মাটির কণাসমূহও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং সারা পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্রিত করা, অতঃপর প্রত্যেক মানুষের কণাকে অন্য মানুষের কণা থেকে আলাদা করে তার অস্তিত্বে সংযুক্ত করা কেমন করে সম্ভবপর ? একে অসম্ভব মনে করার ভিত্তি এটাই ছিল যে, তারা আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞান ও কুদরতকে নিজেদের জ্ঞান ও কুদরতের অনুরূপ মনে করে রেখেছিল। আল্লাহ্ তাআলা বলে দিয়েছেন যে, তাঁর জ্ঞান বিশ্বব্যাপী। আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত সবকিছু তিনি জানেন। কোন্ বস্তু কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাও তিনি জানেন। এমন সর্বব্যাপী জ্ঞান সম্পন্ন সত্তার জন্যে মানুষের কণাসমূহকে আলাদাভাবে সারা বিশ্ব থেকে একত্রিত করা এবং সেগুলো দ্বারা পুনরায় দেহ গঠন করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ এখানে কেয়ামতে অবিশ্বাসীদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারা বিদ্রূপ ও উপহাস করে বলত, এস, আমরা তোমাদেরকে এমন এক অদ্ভুত ব্যক্তির সন্ধান দেই, যে বলে তোমরা পূর্ণরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমাদেরকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে, অতঃপর তোমাদেরকে বর্তমান আকার-আকৃতিতেই জীবিত করা হবে।

বলাবাহুল্য এক অদ্ভুত ব্যক্তি বলে এখানে নবী করীম (সাঃ)-কে বোঝাতো, যিনি কেয়ামত ও তাতে মৃতদের জীবিত হওয়ার খবর দিতেন এবং সেসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতেন। কাফেররা সকলেই তাঁকে পূর্ণরূপে চিনত ও জানত। কিন্তু এখানে এভাবে উল্লেখ করেছে যেন তারা তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানে না। উপহাস এবং তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্যই এরূপ ভঙ্গিতে কথা বলা হয়েছিল।

مُزِّقْتُمْ —শব্দটি مزق থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চিরা ও খণ্ড-বিখণ্ড করা। كُلَّ مُمَزَّقٍ —এর অর্থ মানবদেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া। অতঃপর কাফেররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খবর দেয়া সম্পর্কে তাদের ধারণা এভাবে ব্যক্ত করেছে।

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٩﴾ ۞ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

(৮) সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, না হয় সে উন্মাদ এবং যারা পরকালে অবিশ্বাসী, তারা আযাবে ও ঘোর পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে। (৯) তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা আকাশের কোন খণ্ড তাদের উপর পতিত করব। আল্লাহ্ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (১০) আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও। আমি তাঁর জন্যে লৌহকে নরম করেছিলাম। (১১) এবং তাকে বলেছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি। (১২) আর আমি সোলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্যে গলিত তামার এক ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম। কতক জিন তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি জ্বলন্ত অগ্নির-শাস্তি আস্বাদন করাব। (১৩) তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। হে দাউদ পরিবার। কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ। (১৪) যখন আমি সোলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ —উদ্দেশ্য এই যে, দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত কণা একত্রিত হয়ে মানবদেহে পরিণত হওয়া এবং জীবিত হওয়া একটি উদ্ভট কথা। একে মেনে নেয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই তাঁর এই খবর হয় জেনে শুনে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা না হয় সে উন্মাদ, যার কথার কোন সঠিক ভিত্তি থাকে না।

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم —তফসীরে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তুসমূহে চিন্তা করলে এবং আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ কুদরত প্রত্যক্ষ করলে কাফেররা কেয়ামতকে অস্বীকার করতে পারবে না। সাথে সাথে আয়াতে অবিশ্বাসীদের জন্যে শাস্তির সতর্কবাণীও রয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর বিশাল সৃষ্টবস্তু তোমাদের জন্য বিরাট নেয়ামত। এগুলো প্রত্যক্ষ করার পরও তোমরা অবিশ্বাস ও অস্বীকারে অটল থাকলে আল্লাহ্ এসব নেয়ামতকেই তোমাদের জন্যে আযাবে রূপান্তরিত করে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। ফলে পৃথিবী তোমাদেরকে গ্রাস করে নেবে; আকাশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে তোমাদের উপর পতিত হবে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا অর্থাৎ, দাউদকে আমি আমার অনুগ্রহ দান করেছিলাম। فضل এর শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এমন বিশেষ গুণাবলী যা অন্যের চেয়ে অতিরিক্ত হিসাবে তাঁকে দান করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক পয়গম্বরকে কিছু কিছু বিশেষ স্বাতন্ত্র্যমূলক গুণাবলী দান করেছেন। এগুলোকে তাঁদের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব মনে করা হয়। হযরত দাউদ (আঃ)-এর বিশেষ গুণাবলী এই ছিল যে, তাঁকে রেসালতের সাথে সাথে সারা বিশ্বের রাজত্বও দান করা হয়েছিল। তিনি এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, আল্লাহ্র যিকির অথবা যবুর তেলাওয়াত করতে শুরু করলে পক্ষীকুলও শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় তা শোনার জন্যে সমবেত হয়ে যেত। এমনিভাবে তাঁকে একাধিক বিশেষ মু'জেযা দান করা হয়েছিল, যা পরে বর্ণিত হবে।

يَا جِبَالُ أَوِّبِي - أَوِّبِي শব্দটি تاويب থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বার বার করা। আল্লাহ্ তাআলা পর্বতমালাকে আদেশ দিয়েছিলেন, যখন দাউদ (আঃ) আল্লাহ্র যিকির ও তসবীহ্ পাঠ করেন, তখন তোমরাও সেসব বাক্য বার বার আবৃত্তি কর। (ইবনে-কাসীর)

হযরত দাউদ (আঃ)-এর সাথে পর্বতমালার এই তসবীহ্ পাঠ সেই সাধারণ তসবীহ্ থেকে ভিন্ন, যাতে সমগ্র সৃষ্টি অংশীদার এবং যা সর্বদা ও সর্বকালে অব্যাহত রয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ -অর্থাৎ, জগতের সব কিছুই আল্লাহ্ তাআলার সপ্রশংস তসবীহ পাঠ করে ; কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ্ বোঝে না। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত তসবীহ্ ছিল হযরত দাউদ (আঃ)-এর একটি মু'জেযা। তাই এ তসবীহ্ সাধারণ শ্রোতারাও শুনত এবং বোঝত।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, দাউদ (আঃ)-এর কণ্ঠের সাথে পর্বতমালার কণ্ঠ মেলানো প্রতিধ্বনিরূপে ছিল না, যা সাধারণভাবে কোন গম্বুজে

অথবা কূপে আওয়াজ দিলে সে আওয়াজ ফিরে আসার কারণে শোনা যায়। কেননা, কোরআন পাক একে দাউদ (আঃ)-এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহরূপে উল্লেখ করেছেন। প্রতিধ্বনির সাথে কারও শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্বের কোন সম্পর্ক নেই। এটা তো প্রত্যেকেই এমন কি কাফেরও সৃষ্টি করতে পারে।

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ —অর্থাৎ, আমি তাঁর জন্যে লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। এটা ছিল তাঁর দ্বিতীয় মু'জেযা। হযরত হাসান বসরী, কাতাদাহ, আনাস প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, আল্লাহ্ তাআলা মু'জেযারূপে লোহাকে তাঁর জন্যে মোমের মত নরম করে দিয়েছিলেন। লোহা দ্বারা কোন কিছুই তৈরী করতে অগ্নির প্রয়োজন হত না। হাতুড়ি অথবা অন্য কোন হাতিয়ারেরও প্রয়োজন ছিল না। অতঃপর আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি যাতে অনায়াসে লৌহবর্ম তৈরী করতে পারেন, সেজন্যে লোহাকে তাঁর জন্যে নরম করে দেয়া হয়েছিল। অন্য এক আয়াতে আরও আছে— وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তাঁকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। এখানে পরবর্তী وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ বাক্যটি এ শিক্ষাদানের পরিশিষ্ট। قدر শব্দটি تقدير থেকে উদ্ভূত। অর্থ একই জাতীয় ও একই প্রকার করে তৈরী করা। سرد -এর শাব্দিক অর্থ বয়ন করা। উদ্দেশ্য এই যে, বর্ম নির্মাণে তার কড়াসমূহের যথাযথভাবে সংযুক্ত কর যাতে একটি ছোট ও একটি বড় না হয়। ফলে মজবুতও হবে এবং দেখতেও সুন্দর হবে। এ তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।—(ইবনে কাসীর)।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, শিল্পকর্মে বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাও পছন্দনীয়। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা বিশেষভাবে এর নির্দেশ দিয়েছেন।

কেউ কেউ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ -এর অর্থ করেছেন যে, এই শিল্পকর্মের জন্যে সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেয়া উচিত—সারাক্ষণ এতে মশগুল থাকা উচিত নয়, যাতে এবাদত ও রাজকার্যে ব্যাঘাত না ঘটে। এ তফসীর থেকে জানা গেল যে, শিল্পী ও শ্রমিকদেরও উচিত এবাদত ও জ্ঞান লাভের জন্যে কিছু সময় বাঁচিয়ে নেয়া এবং সময় বিধিবদ্ধ করা।

শিল্প ও কারিগরির ফযীলত ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আবিষ্কার ও তৈরী করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং একে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর মহান পয়গম্বরগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত নূহ (আঃ)-কে জাহাজ নির্মাণ কৌশল এমনিভাবে শেখানো হয়েছিল। বলা হয়েছে ঃ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا —অর্থাৎ, আমার সামনে জাহাজ নির্মাণ করা। অনুরূপভাবে অন্য পয়গম্বরগণকেও বিভিন্ন শিল্পকর্ম শিক্ষা দেয়া বিভিন্ন রেওয়ায়েতে প্রমাণিত আছে। হাফেজ শামসুদ্দীন যাহবী রচিত "আত্তিব্বুন্নবভী" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, গৃহনির্মাণ, বস্ত্রবয়ন, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, মালপত্র আনা-নেয়ার জন্যে চাকাবিশিষ্ট গাড়ী তৈরী করে চালানো ইত্যাদি মানব জীবনের সকল প্রয়োজনীয় শিল্পকাজ আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শিল্পজীবি মানুষকে হেয় মনে করা গোনাহ ঃ আরবে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন শিল্পকাজ অবলম্বন করত এবং কোন শিল্পকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করা হত না। পেশা ও শিল্পের ভিত্তিতে কাউকে কম ও বেশী সম্মানী মনে করা হত না এবং এর ভিত্তিতে সমাজও গড়ে উঠত না। এগুলো কেবল আমাদের এ উপমহাদেশের একশ্রেণীর লোকের আবিষ্কার। তাদের সাথে বসবাস করার কারণে মুসলমানদের মধ্যেও এসব কুপ্রথা শিকড় গেড়ে বসেছে।

দাউদ (আঃ)-কে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দেয়ার রহস্য ঃ তফসীরে ইবনে-কাসীরে বর্ণিত আছে—হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর রাজত্বকালে ছদ্মবেশে বাজারে গমন করতেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে আগত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, দাউদ কেমন লোক? তাঁর রাজত্বে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সব মানুষ সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত করত। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ ছিল না। তাই যাকেই প্রশ্ন করা হত, সেই দাউদ (আঃ)-এর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও ন্যায় বিচারের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর শিক্ষার জন্যে একজন ফেরেশতা মানুষ বেশে প্রেরণ করেন। দাউদ (আঃ) যখন বাজারে যাওয়ার জন্যে ছদ্মবেশে বের হলেন, তখন এই ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হল। অভ্যাস অনুযায়ী তাকেও তিনি সেই প্রশ্ন করলেন। মানবরূপী ফেরেশতা জওয়াব দিল, দাউদ খুব ভাল লোক। নিজের জন্যে এবং উম্মত ও প্রজাদের জন্য তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি। তবে তাঁর মধ্যে এমন একটি অভ্যাস আছে, যা না থাকলে তিনি পুরোপুরি কামেল মানুষ হয়ে যেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কি অভ্যাস? ফেরেশতা বলল, তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ বায়তুল মাল তথা সরকারী ধনাগার থেকে গ্রহণ করেন।

একথা শুনে হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার কাছে কাকুতি-মিনতি ও দোয়া করতে থাকেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্, আমাকে এমন কোন হস্তশিল্প শিক্ষা দিন, যার পারিশ্রমিক দ্বারা আমি নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে পারি এবং জনগণের সেবা ও রাজকার্য বিনা পারিশ্রমিকে আনজাম দিতে সক্ষম হই। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে বর্মনির্মাণ কৌশল শিখিয়ে দিলেন। পয়গম্বরসুলভ সম্মানস্বরূপ তাঁর জন্যে লোহাকে মোমের মত নরম করে দেয়া হল, যাতে কাজটি সহজ হয় এবং অল্প সময়ে জীবিকা উপার্জন করে তিনি অবশিষ্ট সময় এবাদত ও রাজকার্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন।

মাসআলা ঃ খলীফা অথবা বাদশাহ তাঁর পূর্ণ সময় রাজকার্য সম্পাদনে ব্যায় করেন বিধায় তাঁর পক্ষে বায়তুল মাল থেকে ভরণ-পোষণের জন্য বেতন গ্রহণ করা জায়েয। কিন্তু জীবিকার অন্য কোন উপায় সম্ভব হলে তা অধিক পছন্দনীয়। হযরত দাউদ (আঃ)-এর জন্যে আল্লাহ্ তাআলা সারা বিশ্বের ধন-ভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন। ধনৈশ্বর্য, মণি-মাণিক্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্য ছিল ; আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁকে সরকারী ধনাগার ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করার অনুমতিও দান করা হয়েছিল। فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ আয়াতে নিশ্চয়তাও দেয়া হয়েছিল যে, আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যায় করুন। আপনার কাছে হিসেব চাওয়া হবে না। কিন্তু পয়গম্বরকে আল্লাহ্ তাআলা যে সুউচ্চ মর্যাদায় রাখতে চান, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর দাউদ (আঃ) এত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন।

আলেমগণ শিক্ষা ও প্রচারকার্য আনজাম দিয়ে থাকেন। কাযী

(বিচারক) ও মুফতী জনগণের কাজে তাঁদের সময় ব্যয় করেন। তাঁদের বেলায়ও একই বিধান। তাঁরা বায়তুলমাল থেকে ভরণ-পোষণের ব্যয় গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু জীবিকার জন্য কোন উপায় থাকলে এবং তা কর্তব্যকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করলে তাই উত্তম।

হযরত দাউদ (আঃ) নিজের এই কর্ম-নীতির ভিত্তিতে স্বীয় আমল ও অভ্যাস সম্পর্কে জনগণের অবাধ ও স্বাধীন মতামত জানার যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজের দোষ নিজে জানে না বিধায় অপরের কাছ থেকে জেনে নেয়া উচিত। হযরত ইমাম মালেকও এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা কি, তা তিনি জানতে চেষ্টা করতেন।

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ —দাউদ (আঃ)-এর বিশেষ শ্রেষ্ঠ ও অনুগ্রহ উল্লেখ করার পর হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সেখানে হযরত দাউদ (আঃ)-এজন্য আল্লাহ্ তাআলা পর্বতমালা ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে বায়ুকে সোলায়মান (আঃ)-এর অধীন করে দিয়েছিলেন। সোলায়মান (আঃ) তাঁর সিংহাসনে পরিবার-পরিজন ও সভাসদসহ আরোহণ করতেন। বায়ু তাঁর আজ্ঞাধীন হয়ে তিনি যেখানে ইচ্ছা করতেন সিংহাসনটি সেখানে নিয়ে যেত। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ এটি কর্মের প্রতিদানে সোলায়মান (আঃ)-এর জন্যে বায়ুকে অধীন করে দেয়া হয়েছিল। একদিন তিনি অশ্ব পরিদর্শনে এতই মশগুল হয়ে পড়েন যে, আসরের নামায কাযা হয়ে যায়। এই আমনোযোগিতার কারণ ছিল অশ্ব। তাই, এ কারণ খতম করার জন্যে অশ্বসমূহকে কোরবাণী করে দিলেন। কেননা, তাঁর শরীয়তে গরু মহিষের ন্যায় অশ্ব কোরবাণীও জায়েয ছিল। এসব অশ্ব তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। তাই, সরকারী ক্ষতির প্রশ্নই উঠে না। কোরবাণী করার কারণে নিজের ধন-সম্পদ নষ্ট করার প্রশ্নও দেখা দেয় না। সূরা ছোয়াদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সুলায়মান (আঃ) তাঁর আরোহণের জন্ত কোরবাণী করেছিলেন। তাই, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে আরোহণের জন্যে আরও উত্তম বাহন দান করলেন।—(কুরতুবী)।

غدو শব্দের অর্থ সকাল বেলায় চলা এবং رواح শব্দের অর্থ বিকালে চলা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সোলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসন বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে এক মাসের পথ অতিক্রম করত, অতঃপর বিকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এক মাসের পথ অতিক্রম করত। এভাবে দু'মাসের দূরত্ব একদিনে অতিক্রম করত।

وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ —অর্থাৎ, আমি সোলায়মান (আঃ)-এর জন্যে তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তামার ন্যায় শক্ত ধাতুকে আল্লাহ্ তাআলা সোলায়মান (আঃ)-এর জন্যে পানির ন্যায় বহমান তরল পদার্থে পরিণত করে দেন, যা প্রস্রবণের ন্যায় প্রবাহিত হত এবং উত্তপ্তও ছিল না। অনায়াসেই এতে পাত্রাদি তৈরী করা যেত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইয়ামনে অবস্থিত এই প্রস্রবণের দূরত্ব অতিক্রম করতে তিন দিন তিন রাত্রি লাগত। মুজাহিদ বলেন, ইয়ামনের সান'আ থেকে এই প্রস্রবণ শুরু হয়ে তিন দিন তিন রাত্রির পথ পর্যন্ত পানির ন্যায় প্রবাহিত ছিল। ব্যাকরণবিদ খলীল বলেন, আয়াতে ব্যবহৃত قطر শব্দের অর্থ গলিত তামা।—(কুরতুবী)।

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ —এ বাক্যটিও উহ্য سخرنا ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থ এই যে, আমি কিছু জিনকে সোলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর সামনে তাঁর পালনকর্তার আদেশক্রমে কাজ করত। 'সামনে' বলার তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই যে, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদিকে মানুষের অধীন করার ন্যায় জিনকে সোলায়মান (আঃ)-এর অধীন করা ছিল না। বরং এর ধরন ছিল এই যে, তারা চাকর-বাকরের মত অর্পিত দায়িত্ব পালন করত।

وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ -অর্থাৎ, কোন জিন যদি সোলায়মান (আঃ)-এর আনুগত্য না করে, তবে তাকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে পরকালে জাহান্নামের আযাব বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর একজন ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছিলেন। সে অবাধ্য জিনকে আগুনের চাবুক মেরে মেরে কাজ করতে বাধ্য করত।—(কুরতুবী)। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জিন জাতি আগুনের তৈরী। কাজেই আগুন তাদের মধ্যে কি ক্রিয়া করবে? এর জওয়াব এই যে, আগুন দ্বারা জিন সৃজিত হওয়ার অর্থ তাই, যা মাটির দ্বারা মানব সৃজিত হওয়ার অর্থ। অর্থাৎ, মানব অস্তিত্বের প্রধান উপাদান মাটি। কিন্তু তাকে মাটি ও পাথর দ্বারা আঘাত করা হলে সে কষ্ট পায়। এমনিভাবে জিন জাতির প্রধান উপাদান আগুন কিন্তু নির্ভেজাল ও তেজস্ক্রিয় অগ্নিতে তারাও জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ

এ আয়াতে সে সব কাজের কিছু বিবরণ দেয়া হয়েছে, যা সোলায়মান (আঃ) জিনদের দ্বারা করাতেন। مَحَارِيْبَ শব্দটি محراب -এর বহুবচন। অর্থ গৃহের শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ অংশ। বাদশাহ্ অথবা বড় লোকেরা নিজেদের জন্যে যে সরকারী বাসভবন নির্মাণ করে, তাকেও محراب বলা হয়। এ শব্দটি حرب থেকে উদ্ভূত। অর্থ যুদ্ধ। এ ধরনের বাসভবনকে সাধারণতঃ অপরের নাগাল থেকে সংরক্ষিত রাখা হয় এবং এর জন্যে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করা হয়। এর সাথে মিল রেখে গৃহের বিশেষ অংশকে محراب বলা হয়। মসজিদে ইমামের দাঁড়াবার জায়গাকেও এই স্বাতন্ত্র্যের কারণেই محراب বলা হয়। কখনও মসজিদ অর্থেই مَحَارِيْبَ শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কালে محاريب بنى اسرائيل এবং ইসলাম যুগে محاريب صحابه বলে তাঁদের মসজিদ বোঝানো হতো।

تَمَاثِيْلَ শব্দটি تمثال -এর বহুবচন। অর্থ চিত্র বিগ্রহ ইবনে আরাবী আহ্কামুল কোরআনে বলেন, চিত্র দু'প্রকার হয়ে থাকে—প্রাণীদের চিত্র ও অপ্রাণীদের চিত্র। অপ্রাণীও দু'প্রকার—(এক) জড়পদার্থ, যাতে হ্রাসবৃদ্ধি হয় না; যেমন পাথর, মৃত্তিকা ইত্যাদি। (দুই) হ্রাসবৃদ্ধি হয় এমন পদার্থ; যেমন বৃক্ষ, ফসল ইত্যাদি। জিনরা হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে উপরোক্ত সর্বপ্রকার বস্তুর চিত্র নির্মাণ করত। প্রথমতঃ تَمَاثِيْلَ শব্দের ব্যাপক ব্যবহার থেকে একথা জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সোলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনের উপর পাখীদের চিত্র অংকিত ছিল।

ইসলামে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, সোলায়মান (আঃ)-এর শরীয়তে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার ছিল না। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, তারা পুণ্যবান ব্যক্তিদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁদের চিত্র নির্মাণ করে উপসনালয়ে রাখত, যাতে তাঁদের উপাসনার কথা স্মরণ করে তারাও উপাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তারা এসব চিত্রকেই উপাস্য স্থির

করে নিয়েছে এবং মূর্তিপূজা শুরু হয়ে গেছে। এভাবে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে প্রাণীদের চিত্র মূর্তিপূজা প্রচলনে সহায়ক হয়েছে।

ইসলাম কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে এটা আল্লাহ্র অমোঘ বিধান। তাই এতে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, মূল হারাম বস্তু যেমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি তার উপায় ও নিকটবর্তী সহায়ক কারণসমূহকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মূল মহা-অপরাধ হচ্ছে শেরক ও মূর্তিপূজা। একে নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে যেসব ছিদ্রপথে মূর্তিপূজার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে, সেসব পথেও পাহারা বসিয়ে দেয়া হয়েছে এবং মূর্তিপূজার উপায় ও নিকটবর্তী কারণসমূহকেও হারাম করে দেয়া হয়েছে। এই নীতির ভিত্তিতেই প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম করা হয়েছে। অনেক সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এই নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত রয়েছে।

جِفَانٍ -শব্দটি جفنة -এর বহুবচন। অর্থ বড় পাত্র। যেমন টব ইত্যাদি। جواب শব্দটি جابية -এর বহুবচন। অর্থ ছোট চৌবাচ্চা। উদ্দেশ্য এই যে, ছোট চৌবাচ্চার সমান পানি ধরে, এমন বড় পাত্র নির্মাণ করত। قُدُورٍ শব্দটি قدر -এর বহুবচন। অর্থ ডেগ।

رَّاسِيَاتٍ স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, এমন বড় ও ভারী ডেগ নির্মাণ করত যা নাড়ানো যেত না। সম্ভবতঃ এগুলো পাথর খোদাই করে পাথরের চুল্লির উপরেই নির্মাণ করা হত, যা স্থানান্তর করার যোগ্য ছিল না। তফসীরবিদ যাহ্হাক এ তফসীরই করেছেন। اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ -হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)-এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ও তাঁদের পরিবারবর্গকে এই আয়াতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার আদেশ দিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতার স্বরূপ ও তার বিধান ঃ কুরতুবী বলেন, কৃতজ্ঞতার স্বরূপ হচ্ছে নেয়ামত দাতার নেয়ামত স্বীকার করা ও তাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা। কারও দেয়া নেয়ামতকে তার ইচ্ছার বিপরীতে ব্যবহার করা অকৃতজ্ঞতা। এ থেকে জানা গেল যে, কৃতজ্ঞতা কেবল মুখেই নয়, কর্মের মাধ্যমেও হতে হয়। কর্মগত কৃতজ্ঞতা হচ্ছে নেয়ামতদাতার নেয়ামতকে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী ব্যবহার করা। আবু আবদুর রহমান সুলামী বলেন, নামায, রোযা যাবতীয় সৎকর্মই কৃতজ্ঞতা। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী বলেন, খোদাভীতি ও সৎকর্মের নাম কৃতজ্ঞতা।—(ইবনে কাসীর)

আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাক কৃতজ্ঞতার আদেশ প্রসঙ্গে اشكرونى সংক্ষিপ্ত শব্দ না বলে اعملوا شكرا বাক্য ব্যবহার করে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত করেছে যে, দাউদ-পরিবারের কাছ থেকে কর্মগত কৃতজ্ঞতা কাম্য। সে মতে হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ) এবং তাঁদের পরিবারবর্গ মৌখিকভাবে ও কর্মের মাধ্যমে এই আদেশ পালন করেছেন। তাঁদের গৃহে এমন কোন মুহূর্ত যেত না যাতে ঘরের কেউ না কেউ এবাদতে মশগুল না থাকত। পরিবারের লোকজনকে সময় ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। ফলে দাউদ (আঃ)-এর জায়নামায কোন সময় নামাযী শূন্য থাকত না।—(ইবনে-কাসীর)

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলার কাছে হযরত দাউদ (আঃ)-এর নামায অধিক প্রিয়। তিনি অর্ধ রাত্রি ঘুমাতেন, অতঃপর রাতের এক তৃতীয়াংশ এবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং শেষের এক ষষ্ঠাংশে ঘুমাতেন। আল্লাহ্ তাআলার কাছে হযরত দাউদ (আঃ)-এর রোযাই অধিক প্রিয়। তিনি একদিন অন্তর অন্তর রোযা রাখতেন।— (ইবনে কাসীর)

হযরত ফুযায়েল (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই আদেশ অবতীর্ণ হলে তিনি আরয করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি আপনার শুকরিয়া কিভাবে আদায় করব? আমার মৌখিক অথবা কর্মগত শুকরিয়া তো আপনারই দান। এর জন্যেও তো শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ্ তাআলা বললেন, অর্থাৎ, হে দাউদ! এখন তুমি আমার শুকরিয়া আদায় করেছ। কেননা, যথাযথ শুকরিয়া আদায়ে তুমি তোমার অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পেরেছ এবং মুখে তা স্বীকার করেছ।

হাকীম তিরমিযী ও ইমাম জাস্সাস্ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন, তিনটি কাজ যে ব্যক্তি সম্পন্ন করবে সে দাউদ পরিবারের বৈশিষ্ট্য লাভ করতে সক্ষম হবে। সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ্ তিনটি কাজ কি? তিনি বললেন, (১) সন্তুষ্টি ও ক্রোধ উভয় অবস্থায় ন্যায়-বিচারে কায়েম থাকা, (২) স্বাচ্ছল্য ও দারিদ্র্য উভয় অবস্থায় মিতাচার অবলম্বন করা এবং (৩) গোপন ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে ভয় করা। -(কুরতুবী, আহ্কামুল- কোরআন—জাস্সাস্)।

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ শুকরিয়ার আদেশ দানের পর এ বাস্তব সত্যও তুলে ধরা হয়েছে যে, কৃতজ্ঞ বান্দাদের সংখ্যা অল্পই হবে। এতেও মুমিনগণকে কৃতজ্ঞতায় উৎসাহিত করা হয়েছে।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ -আয়াতে منساة শব্দের অর্থ লাঠি। কেউ কেউ বলেন, এটা আবিসিনীয় ভাষার শব্দ এবং কারও মতে আরবী শব্দ। نساة শব্দের অর্থ সরানো, পেছনে নেয়া। লাঠির সাহায্যে মানুষ ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে থাকে। তাই লাঠিকে منساة অর্থাৎ, সরানোর হাতিয়ার বলা হয়। এ আয়াতে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করে অনেক শিক্ষা ও পথনির্দেশের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে।

সোলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা ঃ এ ঘটনায় অনেক পথনির্দেশ রয়েছে। উদাহরণতঃ হযরত সোলায়মান (আঃ) অদ্বিতীয় ও অনুপম সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। সমগ্র বিশ্বের উপরেই নয় বরং জিনজাতি, পক্ষীকুল ও বায়ুর উপরও তাঁর হুকুম কার্যকর ছিল। কিন্তু এতসব উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পাননি। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর মৃত্যু আগমন করেছে। বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ দাউদ (আঃ) শুরু করেছিলেন এবং সোলায়মান (আঃ) তা শেষ করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কিছু নির্মাণ কাজ অবশিষ্ট ছিল। কাজটি অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল। তারা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ভয়ে কাজ করত। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ অবগত হতে পারলে তৎক্ষণাৎ কাজ ছেড়ে দিত। ফলে নির্মাণ অসমাপ্ত থেকে যেত। সোলায়মান (আঃ) খোদায়ী নির্দেশে এর ব্যবস্থা এই করলেন যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে তাঁর মেহ্রাবে প্রবেশ করলেন। মেহরাবটি স্বচ্ছ কাঁচের নির্মিত ছিল। বাইরে থেকে ভেতরের

সবকিছু দেখা যেত। তিনি নিয়মানুযায়ী এবাদতের উদ্দেশে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে আত্মা বের হয়ে যাওয়ার পরও দেহ লাঠির সাহায্যে স্বস্থানে অনড় থাকে। যথাসময়ে তাঁর আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে গেল। কিন্তু লাঠির উপর ভর করে তাঁর দেহ অনড় থাকায় বাইরে থেকে মনে হত, তিনি এবাদতেই মশগুল রয়েছেন। কাছে গিয়ে দেখার সাধ্য জিনদের ছিল না। তারা তাঁকে জীবিত মনে করে দিনের পর দিন কাজ করতে থাকে। অবশেষে এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণকাজও সমাপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ্ সোলায়মান (আঃ)-এর লাঠিতে উইপোকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কোরআন পাকে একে 'দাব্বাতুল আরদ' বলা হয়েছে। উইপোকা ভেতরে ভেতরে লাঠি খানা খেয়ে ফেলে। লাঠির ভর খতম হয়ে গেলে সোলায়মান (আঃ)-এর অসাড় দেহ মাটিতে পড়ে। তখন জিনরা জানতে পারে তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে।

জিনদের আল্লাহ্ তাআলা দূর-দূরান্তের পথ কয়েক মুহূর্তে অতিক্রম করার শক্তি দান করেছেন। তারা এমন পরিস্থিতি ও ঘটনা জানত, যা মানুষের জানা ছিল না। তারা যখন এসব ঘটনা মানুষের কাছে বর্ণনা করত, তখন মানুষ এগুলোকে গায়বের খবর মনে করত এবং বিশ্বাস করত যে, জিনরাও গায়বের খবর জানে। স্বয়ং জিনরাও সম্ভবতঃ অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করত। মৃত্যুর এই অভূতপূর্ব ঘটনা এ বিষয়ের স্বরূপ খুলে দিল। স্বয়ং জিনরাও টের পেল এবং সব মানুষও বোঝে নিল যে, জিনরা আলেমুল গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞানী) নয়। কারণ, তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হলে সোলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে এক বছর পূর্বেই জ্ঞাত হয়ে যেত এবং সারা বছরের হাড় ভাঙ্গা খাটুনি থেকে নিষ্কৃতি পেত। আয়াতের শেষ বাক্য ...... فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। একে عذاب مهين বলে হাড়ভাঙ্গা খাটুনিকে বোঝানো হয়েছে যাতে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করার জন্য সোলায়মান (আঃ) জিনদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর এই বিস্ময়কর ঘটনা আংশিক কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াতে এবং আংশিক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত রয়েছে।—(ইবনে-কাসীর)

এ অত্যাশ্চর্য ঘটনা থেকে এ শিক্ষাও অর্জিত হয় যে, মৃত্যুর কবল থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই। আরও বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা যে কাজ করতে চান তার ব্যবস্থা যেভাবে ইচ্ছা করতে পারেন। এ ঘটনায় তাই হয়েছে। এতে জানা যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ততক্ষণ পর্যন্তই নিজেদের কাজ করে যায়, যতক্ষণ আল্লাহ্ তাআলা চান। তিনি না চাইলে সবকিছু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে ; যেমন এ ঘটনায় লাটির ভর উইপোকার মাধ্যমে খতম করে দেয়া হয়েছে। জিনদের বিস্ময়কর কাজকর্ম, কীর্তি ও বাহ্যতঃ গায়বী বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার ঘটনাবলী দেখে এ বিষয়ের আশংকা ছিল যে, মানুষ তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নেবে। মৃত্যুর এই অভাবিত ঘটনা এ আশংকার মূলেও কুঠারাঘাত করেছে। সবাই জিনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা সম্পর্কে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করেছে।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আরও জানা গেল যে, মৃত্যুকালে সোলায়মান (আঃ) দু'টি কারণে এই বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। (এক) বায়তুল-মোকাদ্দাস নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা এবং (দুই) মানুষের সামনে জিনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা ফুটিয়ে তোলা, যাতে তাদের এবাদতের আশংকা না থাকে।—(কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, সোলায়মান (আঃ) বায়তুল-মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ সমাপনান্তে আল্লাহ্ তাআলার কাছে কয়েকটি দোয়া করেন, যা কবুল হয়। তন্মধ্যে একটি দোয়া এই যে, যে ব্যক্তি নামাযের নিয়তে এ মসজিদে প্রবেশ করবে। (অন্য কোন পার্থিব উদ্দেশ্য থাকবে না,) মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে তাকে গোনাহ্ থেকে এমন পবিত্র করে দিন, যেমন সে মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণের সময় ছিল।

সুদ্দীর রেওয়ায়েতে আছে, বায়তুল-মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপনান্তে সোলায়মান (আঃ) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বার হাজার গরু, বিশ হাজার ছাগল কোরবাণী করে মানুষকে ভোজে আপ্যায়িত করেন এবং আনন্দ উদযাপন করেন। অতঃপর 'ছখরার' উপর দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ্ তাআলার কাছে এসব দোয়া করেন— হে আল্লাহ্ ! আপনিই আমাকে শক্তি ও সম্পদ দান করেছেন। ফলে বায়তুল-মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। হে আল্লাহ্! আমাকে এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার তওফীক দিন এবং আমাকে আপনার দ্বীনের উপর ওফাত দিন। হেদায়েত প্রাপ্তির পর আর আমার অন্তরে কোন বক্রতা সৃষ্টি করবেন না। হে আমার পালনকর্তা! যে ব্যক্তি এই মসজিদে প্রবেশ করবে, আমি তার জন্যে আপনার কাছে পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করছি—(১) গোনাহগার ব্যক্তি তওবা করার জন্য এ মসজিদে প্রবেশ করলে আপনি তার তওবা কবুল করুন এবং তার গোনাহ্ মাফ করুন। (২) যে ব্যক্তি কোন ভয় ও আশংকা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশে এ মসজিদে প্রবেশ করবে, আপনি তাকে অভয় দিন এবং আশংকা থেকে মুক্তি দিন। (৩) রুগ্ন ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে আরোগ্য দান করুন। (৪) নিঃস্ব ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে ধনাঢ্য করুন। (৫) এ মসজিদে প্রবেশকারী যতক্ষণ এখানে থাকে, ততক্ষণ আপনি তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন। তবে কেউ কোন অন্যায় ও অধর্মের কাজে লিপ্ত হলে তার প্রতি নয়।—(কুরতুবী)

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, বায়তুল-মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ সোলায়মান (আঃ)-এর জীবদ্দশায়ই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব বর্ণিত ঘটনাও এর পরিপন্থী নয়। কারণ, বড় বড় নির্মাণ কাজে মূল নির্মাণ সমাপ্ত হয়ে গেলেও কিছু কিছু কাজ অবশিষ্ট থাকে। এখানেও সে ধরনের কাজই বাকী ছিল। এর জন্যে সোলায়মান (আঃ) উপরোক্ত কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর পর সোলায়মান (আঃ) লাঠিতে ভর দিয়ে এক বছর দণ্ডায়মান থাকেন। (কুরতুবী) কতক রেওয়ায়েতে আছে, জিনরা যখন জানতে পারল যে, সোলায়মান (আঃ) অনেক পূর্বেই মারা গেছে কিন্তু তারা টের পায়নি, তখন তাঁর মৃত্যুর সময়কাল জানার জন্যে একটি কাঠে উইপোকা ছেড়ে দিল। একদিন এক রাত্রিতে যতটুকু কাঠ উইপোকায় খেল, সেটি হিসাব করে তারা আবিষ্কার করল যে, সোলায়মান (আঃ)-এর লাঠি উইয়ে খেতে এক বছর সময় লেগেছে।

বগভী ইতিহাসবিদদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সোলায়মান (আঃ)-এর মোট বয়স তেপ্পান্ন বছর হয়েছিল। তিনি চল্লিশ বছর কাল রাজত্ব করেন। তের বছর বয়সে তিনি রাজকার্য হাতে নেন এবং চতুর্থ বছরে বায়তুল-মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন।—(মাযহারী, কুরতুবী)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ
كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ
غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم
بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ
قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجٰزِيٓ إِلَّا الْكَفُورَ ﴿١٧﴾
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً
وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾
فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ
أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ
صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ
إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ
إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَ
رَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن
دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

(১৫) সাবার অধিবাসীদের জন্যে তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন—দুটি উদ্যান, একটি ডানদিকে, একটি বামদিকে। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিযিক খাও এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। স্বাস্থ্যকর শহর এবং ক্ষমাশীল পালনকর্তা (১৬) অতঃপর তারা অবাধ্যতা করল ফলে আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্রবল বন্যা। আর তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং সামান্য কুলবৃক্ষ। (১৭) এটা ছিল কুফরের কারণে তাদের প্রতি আমার শাস্তি। আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না। (১৮) তাদের এবং যেসব জনপদের লোকদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেগুলোতে ভ্রমণ নির্ধারিত করেছিলাম। তোমরা এসব জনপদে রাত্রে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর। (১৯) অতঃপর তারা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের ভ্রমণের পরিসর বাড়িয়ে দাও। তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে উপাখ্যানে পরিণত করলাম এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২০) আর তাদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। ফলে তাদের মধ্যে মুমিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করল। (২১) তাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা ছিল না, তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে এবং কে তাতে সন্দেহ করে, তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আপনার পালনকর্তা সব বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক। (২২) বলুন, তোমরা তাদেরকে আহবান কর, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আল্লাহ্ ব্যতীত। তারা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহ্র সহায়কও নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রেসালত ও কেয়ামতে অবিশ্বাসী কাফেরদেরকে আল্লাহ্ তাআলার সর্বময় ক্ষমতা সম্পর্কে হুসিয়ার করার উদ্দেশে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের হাতে সংঘটিত বিস্ময়কর ঘটনা ও মো'জেযা বর্ণিত হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রথমে হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)-এর ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এ প্রসঙ্গেই সাবা সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্ তাআলার অগণিত নেয়ামত বর্ষণ, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার কারণে তাদের প্রতি আযাব অবতরণের আলাচনা আলোচ্য আয়াতসমূহে করা হয়েছে।

সাবা সম্প্রদায় ও তাদের প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ নেয়ামতরাজি ঃ ইবনে কাসীর বলেন, ইয়ামনের সম্রাট ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধি হচ্ছে সাবা। তাবাবেয়া সম্প্রদায়ও সাবা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা ছিল সে দেশের ধর্মীয় সম্প্রদায়। সূরা নমলে সোলায়মান (আঃ)-এর সাথে রাণী বিলকীসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনিও এ সম্প্রদায়েরই একজন ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সামনে জীবনোপকরণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং পয়গম্বরগণের মাধ্যমে এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার আদেশ দান করেছিলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা এ অবস্থার উপর কায়েম থাকে এবং সর্বপ্রকার সুখ ও শান্তি ভোগ করতে থাকে। অবশেষে ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে তারা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে, এমন কি আল্লাহ্ তাআলাকে অস্বীকার করতে থাকে। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্যে তের জন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। তাঁরা তাদেরকে সৎপথে আনার জন্যে সর্ব-প্রযত্নে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর বন্যার আযাব প্রেরণ করেন। ফলে তাদের শহর ও বাগ-বাগিচা বিধ্বস্ত হয়ে যায়।—(ইবনে কাসীর)

ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ কোরআনে উল্লেখিত 'সাবা' কোন পুরুষের নাম, না নারীর, না কোন ভূ-খণ্ডের নাম? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, সাবা একজন পুরুষের নাম। তার দশটি পুত্র সন্তান ছিল। তন্মধ্যে ছয় জন ইয়ামনে এবং চার জন শাম দেশে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামনে বসবাসকারী ছয় পুত্রের নাম মাদজাজ, কেন্দা, ইযদ, আশ'আরী, আনমার, হিমইয়ার, (তাদের থেকে ছয়টি গোত্র জন্মলাভ করে) এবং শাম দেশে বসবাসকারীদের নাম লখম, জুযাম, আমেলা, গাস্সান (তাদের গোত্রসমূহ এ নামেই সুবিদিত)। এ রেওয়ায়েতটি হাফেজ ইবনে আবদুল বারও তার 'আলকাসদু ওয়াল উমামু বেমারেফতে আস্ সাবিলিল আরবি ওয়াল আজম' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

বংশতালিকা বিশেষজ্ঞ আলেমগণের বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর বলেন, এরা দশ জন সাবার ঔরসজাত ও প্রত্যক্ষ পুত্র ছিল না। বরং তার দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ পুরুষে এরা জন্মগ্রহণ করেছিল। অতঃপর তাদের গোত্রসমূহ শাম ও ইয়ামনে বিস্তার লাভ করে এবং তাদেরই নামে পরিচিত হয়।

সাবার আসল নাম ছিল আবদে শাম্স। সাবা আবদে শামস ইবনে ইয়াশহাব ইবনে কাহ্তান থেকে তার বংশতালিকা বোঝা যায়। ইতিহাসবিদগণ লেখেন, সাবা আবদে শামস তার আমলে শেষনবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ মানুষকে শুনিয়েছিল। সম্ভবতঃ তওরাত ও ইনজীল থেকে সে এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছিল। অথবা

জ্যোতিষী ও অতিন্দ্রীয়বাদীদের মাধ্যমে অবগত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শানে সে কয়েক লাইন আরবী কবিতাও বলেছিল। এসব কবিতায় তাঁর আবির্ভাবের উল্লেখ করে বাসনা প্রকাশ করেছিল যে, আমি তাঁর আমলে থাকলে তাঁকে সাহায্য করতাম এবং আমার সম্প্রদায়কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতাম।

সাবার সন্তানদের ইয়ামনে ও শামে বসতি স্থাপন করার ঘটনাটি তাদের উপর বন্যার আযাব আসার পরবর্তী ঘটনা। বন্যার পর তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল।—(ইবনে কাসীর) কুরতুবী সাবা সম্প্রদায়ের সময়কাল হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পূর্বে উল্লেখ করেছেন। فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ আরবী অভিধানে عرم শব্দের একাধিক অর্থ সুবিদিত। তফসীরকারগণ প্রত্যেক অর্থের দিক দিয়েই এ আয়াতের তফসীর করেছেন। কিন্তু কামুস, সেহাহ্, জওহরী ইত্যাদি অভিধানে বর্ণিত অর্থ কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। এসব অভিধানে عرم এর অর্থ লেখা হয়েছে বাঁধ, যা পানি আটকানোর জন্যে নির্মাণ করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাসও عرم-এর অর্থ বাঁধই বর্ণনা করেছেন।—(কুরতুবী)

ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এই বাঁধের ইতিহাস এই ঃ ইয়ামনের রাজধানী সানআ থেকে তিন মনযিল দূরে মাআরেব নগরী অবস্থিত ছিল। এখানে ছিল সাবা সম্প্রদায়ের বসতি। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় শহরটি অবস্থিত ছিল বিধায় উভয় পাহাড়ের উপর থেকে বৃষ্টির পানি বন্যার আকারে নেমে আসত। ফলে শহরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যেত। দেশের সম্রাটগণ (তাদের মধ্যে রাণী বিলকীসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়) উভয় পাহাড়ের মাঝখানে একটি শক্ত ও মজবুত বাঁধ নির্মাণ করলেন। এ বাঁধ পাহাড় থেকে আগত বন্যার পানি রোধ করে পানির একটি বিরাট ভাণ্ডার তৈরী করে দেয়। পাহাড়ী ঢলের পানিও এতে সঞ্চিত হতে থাকে। বাঁধের উপরে-নীচে ও মাঝখানে পানি বের করার তিনটি দরজা নির্মাণ করা হয় যাতে সঞ্চিত পানি সুশৃংখলভাবে শহরের লোকজনের মধ্যে এবং তাদের ক্ষেতে ও বাগানে পৌঁছানো যায়। প্রথমে উপরের দরজা খুলে পানি ছাড়া হত। উপরের পানি শেষ হয়ে গেলে মাঝখানের এবং সর্বশেষে নীচের তৃতীয় দরজা খুলে দেয়া হত। পরবর্তী বছর বৃষ্টির মওসুমে বাঁধের তিনটি স্তরই আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত। বাঁধের নীচে পানি সংরক্ষণ করার উদ্দেশে একটি সুবৃহৎ আধার নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে পানির বারটি খাল তৈরী করে শহরের বিভিন্ন দিকে পৌঁছানো হয়েছিল। সব খালে একই গতিতে পানি প্রবাহিত হত এবং নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাত।

শহরের ডানে ও বায়ে অবস্থিত পাহাড়দ্বয়ের কিনারায় ফল-মূলের বাগান তৈরী করা হয়েছিল। এসব বাগানে খালের পানি প্রবাহিত হত। এসব বাগান পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় পাহাড়ের কিনারায় দু'সারিতে বহুদূর পর্যন্ত ছিল। এগুলো সংখ্যায় অনেক হলেও কোরআন পাক جَنَّتَانِ অর্থাৎ, দু'টি বাগানের কথা ব্যক্ত করেছে। কারণ, এক সারির সমস্ত বাগান পরস্পর সংলগ্ন হওয়ার কারণে এক বাগান এবং অপর সারির সমস্ত বাগানকে একই কারণে দ্বিতীয় বাগান বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এসব বাগানে সবরকম বৃক্ষ ফল-মূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। কাতাদাহ্ প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী একজন লোক মাথায় খালি ঝুড়ি নিয়ে গমন করলে গাছ থেকে পতিত ফলমূল দ্বারা তা আপনা-আপনি ভরে যেত ; হাত লাগানোরও প্রয়োজন হত না।—(ইবনে কাসীর)

كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ -আল্লাহ্ তাআলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত এই অফুরন্ত জীবনোপকরণ ব্যবহার কর এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সৎকর্ম ও আল্লাহ্র আনুগত্য করতে থাক। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের এ শহরকে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর শহর করেছেন। শহরটি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত ছিল এবং আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধি ছিল। সমগ্র শহরে মশা-মাছি, ছারপোকা ও সাপ-বিচ্ছুর মত ইতর প্রাণীর নামগন্ধও ছিল না। বাইরে থেকে কোন ব্যক্তি শরীরে ও কাপড়-চোপড়ে উকুন ইত্যাদি নিয়ে এ শহরে পৌঁছালে সেগুলো আপনা-আপনি মরে সাফ হয়ে যেত।—(ইবনে কাসীর)

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ-এর সাথে وَرَبٌّ غَفُورٌ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব নেয়ামত ও ভোগ-বিলাস কেবল পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং শুকরিয়া আদায় করতে থাকলে পরকালে আরও বৃহৎ ও স্থায়ী নেয়ামতের ওয়াদা রয়েছে। কারণ, এসব নেয়ামতের স্রষ্টা ও তোমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল। শুকরিয়া আদায়ে ঘটনাক্রমে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তিনি ক্ষমা করবেন।

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ -অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা সুবিস্তৃত নেয়ামত ও পয়গম্বরগণের হুশিয়ারী সত্ত্বেও যখন সাবা সম্প্রদায় আল্লাহ্র আদেশ পালনে বিমুখ হল, তখন আমি তাদের উপর বাঁধভাঙ্গা বন্যা ছেড়ে দিলাম। বন্যাকে বাঁধের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করার কারণ এই যে, যে বাঁধ তাদের হেফাযত ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় ছিল, আল্লাহ্ তাআলা তাকেই তাঁদের বিপর্যয় ও মুসিবতের কারণ করে দিলেন। তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তাআলা যখন এ সম্প্রদায়কে বাঁধ ভাংঙ্গা বন্যা দ্বারা ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন এই সুবৃহৎ বাঁধের গোড়ায় অন্ধ ইঁদুর নিয়োজিত করে দিলেন। তারা এর ভিত্তি দুর্বল করে দিলেন। বৃষ্টির মওসুমে পানির চাপে দুর্বল ভিতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়ে গেল। অবশেষে বাঁধের পেছনে সঞ্চিত পানি সমগ্র উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। শহরের সমস্ত ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হল এবং গাছপালা উজাড় হয়ে গেল। পাহাড়ের কিনারায় দু'সারি উদ্যানের পানি শুকিয়ে গেল।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ বর্ণনা করেন, তাদের কিতাবে লিখিত ছিল যে, এ বাঁধটি ইঁদুরের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সে মতে বাঁধের কাছে ইঁদুর দেখে তারা বিপদ সংকেত বোঝতে পারল। ইঁদুর নিধনের উদ্দেশে তারা বাঁধের নীচে অনেক বিড়াল ছেড়ে দিল যাতে ইঁদুররা বাঁধের কাছে আসতে না পারে। কিন্তু আল্লাহ্র তকদীর প্রতিরোধ করার সাধ্য কার? বিড়ালেরা ইঁদুরের কাছে হার মানল এবং ইঁদুরেরা বাঁধের ভিত্তিতে প্রবিষ্ট হয়ে গেল।—(ইবনে কাসীর)

ঐতিহাসিক বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোক ইঁদুর দেখা মাত্রই সেস্থান ত্যাগ করে আস্তে আস্তে অন্যত্র সরে গেল। অবশিষ্টরা সেখানেই রয়ে গেল ; কিন্তু বন্যা শুরু হলে তারাও স্থানান্তরিত হয়ে গেল এবং অধিকাংশই বন্যায় প্রাণ হারাল। মোটকথা, সমস্ত শহর জনশূন্য হয়ে গেল। যেসব অধিবাসী অন্য দেশে চলে গিয়েছিল, তাদের কিছু বিবরণ উপরে মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। ছয়টি গোত্র ইয়ামনে এবং চারটি গোত্র শাম দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মদীনার বসতিও তাদের কতক গোত্র থেকে শুরু হয়। ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বন্যার ফলে শহর ধ্বংসে

হওয়ার পর তাদের দু'সারি উদ্যানে অবস্থা পরবর্তী আয়াত এভাবে বিধৃত হয়েছে ঃ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তাদের মূল্যবান ফল-মূলের বৃক্ষের পরিবর্তে তাতে এমন বৃক্ষ উৎপন্ন করলেন, যার ফল ছিল বিস্বাদ। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে خَمْطٍ এর অর্থ এরাফ বৃক্ষ। জওহরী লিখেন, এক প্রকার এরাফ বৃক্ষে কিছু ফল ধরে এবং তা খাওয়াও হয়। কিন্তু এই বৃক্ষের ফলও বিস্বাদ ছিল। আবু ওবায়দা বলেন, তিক্ত ও কাঁটাবিশিষ্ট বৃক্ষকে خَمْطٍ বলা হয়। اَثْلٍ শব্দের অর্থ ঝাউ গাছ, যার কোন ফল খাওয়ার যোগ্য হয় না। কেউ কেউ বলেন, اَثْلٍ এর অর্থ বাবলা গাছ যা কাঁটাবিশিষ্ট হয় এবং যার ফল ছাগলকে খাওয়ানো হয়।

سِدْرٍ -এর অর্থ কুলগাছ। এর এক প্রকার বাগানে যত্ন সহকারে লাগানো হয় এবং ফল হয় সুস্বাদু। এরূপ গাছে কাঁটা কম এবং ফল বেশী হয়। অপর প্রকার জংলী কুলগাছ। এটা জঙ্গলে স্বউদ্গত ও কাঁটাবিশিষ্ট ঝাড় হয়ে থাকে এবং কাঁটা বেশী ও ফল কম হয়ে থাকে। আয়াতে سِدْرٍ শব্দের সাথে قَلِيْلٍ যুক্ত করে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই বাগানে কুলগাছও জংলী কিংবা স্বউদ্গত ছিল, যাতে ফল কম ও টক হয়ে থাকে।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا -অর্থাৎ, আমি এ শাস্তি তাদেরকে কুফরের কারণে দিয়েছিলাম।

জ্ঞাতব্য ঃ এ ঘটনায় বলা হয়েছে যে, সাবা সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ্ তাআলা তের জন পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন। অথচ পূর্বে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, সাবা সম্প্রদায় ও বাঁধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা হযরত ঈসা আঃ)-এর পর ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পূর্বে অন্তর্বর্তীকালে সংঘটিত হয়েছিল। একে فترة -এর কাল বলা হয়। অধিকাংশ আলেমের মতে এ সময়ে কোন নবী রসূল প্রেরিত হয়নি। অতএব এই তের জন পয়গম্বর প্রেরণ কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে? এর জওয়াবে রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে। বাঁধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা অন্তর্বর্তীকালে সংঘটিত হলে একথা জরুরী হয় না যে, এই পয়গম্বরগণও সে সময়েই আগমন করেছিলেন। এটা সম্ভবপর যে, তাঁরা অন্তর্বর্তীকালের পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাদের কুফর ও অবাধ্যতা অন্তর্বর্তীকালে তাদের উপর নাযিল করা হয়েছিল।

وَهَلْ نُجٰزِيْ اِلَّا الْكَفُوْرَ - كفور শব্দের অর্থ অতিশয় কুফরকারী। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি অতিশয় কুফরকারী ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না। এটা বাহ্যতঃ সেসব আয়াত ও সহীহ্ হাদীসের পরিপন্থী, যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত আছে যে,মুসলমান গোনাহ্গারকেও তাদের কর্ম অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তি দেয়া হবে যদিও পরিণামে শাস্তি ভোগ করার পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হবে। এই খটকার জওয়াবে কেউ কেউ বলেন, এখানে যে কোন শাস্তি উদ্দেশ্য নয়; বরং সাবা সম্প্রদায়ের অনুরূপ ব্যাপক আযাব বোঝানো হয়েছে। এরূপ আযাব বিশেষভাবে কাফেরদের জন্যে নির্দিষ্ট। মুসলমানদের উপর এরূপ আযাব আসে না।—(রূহুল মা'আনী)

হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, صدق الله العظيم لايعاقب بمثل فعله الا الكفور অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা সত্য বলেছেন যে, মন্দ কাজের যথাযোগ্য শাস্তি কাফের ব্যতীত কাউকে দেয়া হয় না। (ইবনে কাসীর) মুমিনকে তার গোনাহের মধ্যেও কিছুটা অবকাশ দেয়া হয়।

রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, এ আয়াতের আক্ষরিক অর্থই উদ্দেশ্য। শাস্তি হিসেবে শাস্তি—কেবল কাফেরকেই দেয়া যায়। মুসলমান পাপীকে যে শাস্তি দেয়া হয়, তা কেবল দৃশ্যতঃ শাস্তি হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য থাকে, তাকে গোনাহ্ থেকে পবিত্র করা। উদাহরণতঃ স্বর্ণকে আগুনে পোড়ার উদ্দেশ্য তার ময়লা দূর করা। এমনিভাবে কোন মুমিনকে পাপের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে তার উদ্দেশ্য হবে তার দেহের সেই অংশ জ্বালিয়ে দেয়া, যা হারাম দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। এটা হয়ে গেলে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে। তখন তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হবে।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً

وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ এ আয়াতে সাবাবাসীদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার আরও একটি নেয়ামত ও তাদের অকৃতজ্ঞতা এবং মূর্খতার আলোচনা রয়েছে। তারা স্বয়ং এই নেয়ামতের পরিবর্তন করে কঠোরতার দোয়া ও বাসনা প্রকাশ করেছিল। الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا বলে শাম দেশের গ্রামাঞ্চল বোঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত নাযিল হওয়ার কথা একাধিক আয়াতে শাম দেশের জন্যে বর্ণিত আছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যেসব জনপদকে আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করেছিলেন তাদেরকে প্রায়ই ব্যবসায়ের উদ্দেশে শামের সফর করতে হত। মাআরেব শহর থেকে শামের দূরত্ব ছিল অনেক। রাস্তাও সহজ ছিল না। আল্লাহ্ তাআলা সাবাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের শহর মাআরেব থেকে শাম পর্যন্ত অল্প অল্প দূরত্বে জনবসতি প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এসব জনবসতি সড়কের কিনারায় অবস্থিত ছিল। তাই আয়াতে قُرًى ظَاهِرَةً দৃশ্যমান জনপদ বলা হয়েছে। এসব জনবসতির ফলে কোন মুসাফির গৃহ থেকে বেরিয়ে দুপুরে বিশ্রাম অথবা খাদ্যগ্রহণ করতে চাইলে অনায়াসেই কোন জনপদে পৌঁছে নিয়মিত খাদগ্রহণ করে বিশ্রাম করতে পারত। অতঃপর যোহরের পর রওয়ানা হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্য বস্তীতে পৌঁছে রাত্রি অতিবাহিত করতে পারত। وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ বাক্যের অর্থ এই যে, জনবসতিগুলো এমন সুষম ও সমান দূরত্ব গড়ে উঠেছিল যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক বস্তী থেকে অন্য বস্তীতে পৌঁছা যেত।

سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ -এটা সাবা সম্প্রদায়ের প্রতি তৃতীয় নেয়ামত। অর্থাৎ, বস্তীসমূহের সমান দূরত্বের কারণে সমতালে পথ অতিক্রম করা হত। পথও সবটুকু নিরাপদ ছিল। চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। দিবারাত্রি সর্বক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে সফর করা যেত।

فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ

اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ -অর্থাৎ, জালেমরা আল্লাহ্ তাআলার উপরোক্ত নেয়ামতের মূল্য বুঝল না। তারা না-শোকরী করে নিজেরাই দোয়া করল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জন্যে ভ্রমণের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। নিকটবর্তী গ্রাম যেন না থাকে। মাঝখানে জঙ্গল ও জনহীন প্রান্তর থাকুক, যাতে কিছু কষ্টও সহ্য করতে হয়। তাদের অবস্থা ছিল বনী-ইসরাঈলের অনুরূপ, যারা কোনরূপ কষ্ট ও শ্রমের ব্যতিরেকেই মান্না ও সালওয়া রিযিক হিসেবে পেত। এতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছিল, হে আল্লাহ্, এর পরিবর্তে আমাদেরকে সবজি ও তরকারী দান করুন। আল্লাহ্ তাআলা সাবাবাসীদের না-শোকরীর কারণে তাদেরকে উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে সম্পূর্ণ বরবাদ ও সর্বস্বহারা করে দেয়া হয়। ফলে দুনিয়াতে তাদের ভোগবিলাস ও ধনৈশ্বর্যের কাহিনীই রয়ে গেছে

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فُزِّعَ
عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْكَبِيْرُ ﴿۲۳﴾ قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَ
اِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۴﴾ قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ
عَمَّاۤ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۵﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ
بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿۲۶﴾ قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ
بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۷﴾ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً
لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸﴾ وَيَقُوْلُوْنَ
مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۲۹﴾ قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا
تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿۳۰﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ
تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚۖ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ
اِۨلْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَاۤ اَنْتُمْ
لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿۳۱﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْۤا اَنَحْنُ
صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿۳۲﴾

(২৩) যার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়, তার জন্যে ব্যতীত আল্লাহ্‌র কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না। যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পরে বলবে, তোমাদের পালনকর্তা কি বললেন? তারা বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনিই সবার উপরে মহান। (২৪) বলুন, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক দেয়। বলুন, আল্লাহ্‌। আমরা অথবা তোমরা সৎপথে অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি ও আছ? (২৫) বলুন, আমাদের অপরাধের জন্যে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু কর, সে সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হব না। (২৬) বলুন, আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে সমবেত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন। তিনি ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ। (২৭) বলুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদাররূপে সংযুক্ত করেছ, তাদেরকে এনে আমাকে দেখাও। বরং তিনিই আল্লাহ্‌, পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। (২৮) আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (২৯) তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, এ ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে? (৩০) বলুন, তোমাদের জন্যে একটি দিনের ওয়াদা রয়েছে যাকে তোমরা এক মুহূর্তও বিলম্বিত করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবে না। (৩১) কাফেররা বলে, আমরা কখনও এ কোরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবেও নয়। আপনি যদি পাপিষ্ঠদেরকে দেখতেন, যখন তাদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম। (৩২) অহংকারীরা দুর্বলকে বলবে, তোমাদের কাছে হেদায়েত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই তো ছিলে অপরাধী।

এবং তারা উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে।

وَمَزَّقْنٰهُمْ শব্দটি تَمْزِيْق থেকে উদ্ভূত। অর্থ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা। অর্থাৎ, মাআরেব শহরের কিছু অধিবাসী ধ্বংস হয়ে গেল এবং কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আরবে তাদের ধ্বংস ও বিচ্ছিন্নতার ঘটনাটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রে আরবরা বলত, অর্থাৎ, তারা সাবা সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্যে পালিত লোকদের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ —অর্থাৎ, সাবা সম্প্রদায়ের উত্থান-পতন ও অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে অনেক নিদর্শন ও শিক্ষা রয়েছে। শিক্ষা রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্যে, যে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়ে সবর করে এবং কোন নেয়ামত ও সুখ অর্জিত হলে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে। এভাবে সে জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় উপকারই লাভ করে। বোখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, মুমিনের অবস্থা বিস্ময়কর, তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা যে আদেশই জারী করেন, সব মঙ্গলই মঙ্গল এবং উপকারই উপকার হয়ে থাকে। যে কোন নেয়ামত, সুখ ও আনন্দের বিষয় লাভ করলে আল্লাহ্ তাআলার শোকর আদায় করে। ফলে সেটা তার পরকালের জন্যে মঙ্গলজনক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি সে কোন কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তবে সবর করে, যার বিরাট পুরস্কার ও সওয়াব সে পায়। ফলে বিপদও তার জন্যে উপকারী হয়ে যায়।—(ইবনে কাসীর)

কোন কোন তফসীরবিদ صَبَّار শব্দটিকে সবরের সাধারণ অর্থে নিয়েছেন যাতে এবাদতে দৃঢ় থাকা এবং গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকাও অন্তর্ভুক্ত। এ তফসীর অনুযায়ী মুমিন সর্বাবস্থায় সবর ও শোকরের প্রতীক হয়ে থাকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার সময় ফেরেশতাগণ সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়, অতঃপর তারা একে অপরকে আদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সহীহ্ বোখারীতে হযরত আবু হোরায়রার উদ্ধৃত রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্ তাআলা আকাশে কোন আদেশ জারী করেন, তখন সমস্ত ফেরেশতা বিনয় ও নম্রতা সহকারে পাখা নাড়তে থাকে (এবং সংজ্ঞাহীনের মত হয়ে যায়।) অতঃপর তাদের মন থেকে অস্থিরতা ও ভয়ভীতির প্রভাব দূর হয়ে গেলে তারা বলে তোমাদের পালনকর্তা কি বলেছেন? অন্যরা বলে, অমুক সত্য আদেশ জারী করেছেন।

মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ যখন কোন আদেশ দেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তসবীহ্ পাঠ করতে থাকে। তাদের তসবীহ্ শুনে তাদের নিকটবর্তী আকাশের ফেরেশতাগণও তসবীহ্ পাঠ করে। অতঃপর তাদের তসবীহ্ শুনে তাদের নীচের আকাশের ফেরেশতাগণ তসবীহ্ পাঠ করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ তথা সর্বনিম্ন আকাশের ফেরেশতাগণও তসবীহ্ পাঠে আত্মনিয়োগ হয়ে যায়। অতঃপর তারা আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞেস করে, আপনাদের পালনকর্তা কি আদেশ দিয়েছেন? তারা তা বলে দেয়।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَ
النَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ۭ وَاَسَرُّوا
النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۭ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا ۭ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ
مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۞ وَ
قَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۞ قُلْ
اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُوْنَ ۞ وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ
عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۡ فَاُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ
جَزَاۗءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ۞ وَ
الَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰۗىِٕكَ فِي الْعَذَابِ
مُحْضَرُوْنَ ۞ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ
مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۭ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ
يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۞ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا
ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰۗىِٕكَةِ اَهٰٓؤُلَاۗءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۞

(৩৩) দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, বরং তোমরাই তো দিবারাত্রি চক্রান্ত করে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহ্‌কে না মানি এবং তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করি। তারা যখন শাস্তি দেখবে, তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে। বস্তুতঃ আমি কাফেরদের গলায় বেড়ী পরাব। তারা সে প্রতিফলই পেয়ে থাকে যা তারা করত। (৩৪) কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করা হলেই তার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলতে শুরু করেছে, তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা মানি না। (৩৫) তারা আরও বলেছে, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধ, সুতরাং আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। (৩৬) বলুন আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং পরিমিত দেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না। (৩৭) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তারা তাদের কর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবে এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। (৩৮) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়, তাদেরকে আযাবে উপস্থিত করা হবে। (৩৯) বলুন, আমার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং সীমিত পরিমাণে দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিযিক দাতা। (৪০) যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করত?

এভাবে তাদের নীচের আকাশের ফেরেশতারা উপরের ফেরেশতাগণকে একই প্রশ্ন করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত সওয়াল ও জওয়াব পৌঁছে যায়।—(মাযহারী)

বিতর্কে প্রতিপক্ষের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং উত্তেজনা থেকে বিরত থাকা ঃ وَ اِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

—এতে মুশরিক ও কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলাই স্রষ্টা, মালিক ও সর্বশক্তিমান। এতে মূর্তিদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। এসব বিষয়ের পর মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে একথা বলাই সঙ্গত ছিল যে, তোমরাই মূর্খ ও পথভ্রষ্ট। তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মূর্তি ও শয়তানদের পূজা কর। কিন্তু কোরআন পাক এক্ষেত্রে যে বিজ্ঞজনোচিত বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করেছে, তা দাওয়াত, তবলীগ ও ইসলাম বিরোধীদের সাথে বিকর্তকারীদের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ। এ আয়াতে তাদেরকে কাফের বা পথভ্রষ্ট বলার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, এসব সুস্পষ্ট প্রমাণাদির আলোকে কোন সমঝদার ব্যক্তি তওহীদ ও শিরক উভয়টিকে সত্য বলে মানতে পারে না এবং তওহীদপন্থী ও শিরকপন্থী উভয়কে সত্যপন্থী আখ্যা দিতে পারে না। বরং এটা নিশ্চিত যে, এতদুভয়ের মধ্যে একদল সত্যপথে ও অপর দল ভ্রান্তপথে আছে। এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর এবং ফয়সালা কর যে, আমরা সৎপথে আছি, না তোমরা। প্রতিপক্ষকে কাফের ও পথভ্রষ্ট বললে সে উত্তেজিত হয়ে যেত। তাই তা বলা হয়নি এবং সহানুভূতিমূলক বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে কঠোরপ্রাণ প্রতিপক্ষও চিন্তা করতে বাধ্য হয়।—(কুরতুবী, বয়ানুল কোরআন।)

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের এবং আল্লাহ্ যে সর্বশক্তিমান তার বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে রেসালতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমাদের রসূলে করীম (সাঃ) বিশ্বের সমগ্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

كَاۗفَّةً لِّلنَّاسِ শব্দটি আরবী বাকপদ্ধতিতে সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে কোন ব্যতিক্রম থাকে না। বাক্যপ্রকরণে শব্দটি حال বিধায় للناس كافة বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু রেসালতের ব্যাপকতা বর্ণনার লক্ষ্যে শব্দটিকে আগে রাখা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পার্থিব ধন-সম্পদ ও সম্মানকে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার দলীল মনে করা ধোঁকা ঃ পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে পার্থিব ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের নেশায় লোকেরা সর্বদাই সত্যের বিরোধীতা এবং পয়গম্বর ও সৎলোকদের সাথে শত্রুতার পথ অবলম্বন করেছে। শুধু তাই নয়, তারা সত্যপন্থীদের মোকাবেলায় নিজেদের অবস্থার উপর নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট থাকার এই দলীলও উপস্থাপিত করেছে যে, আল্লাহ্ তাআলা যদি আমাদের কার্যকলাপ ও অভ্যাস-আচরণ পছন্দ না করবেন, তবে আমাদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও শাসন ক্ষমতায় কেন সমৃদ্ধ করবেন। কোরআন পাক এর জওয়াব বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দিয়েছে। এমনি ধনের এক ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং এতে এই অসার দলীলের জওয়াব দান করা হয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত আছে, জাহেলিয়াত আমলে দু'ব্যক্তি এক শরীকী ব্যবসা করত। কিছুদিন পর এক ব্যক্তি সেস্থান পরিত্যাগ করে কোন সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় চলে যায়। যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবির্ভূত হলেন এবং তাঁর নবুওয়ত সম্পর্কে জানাজানি হল, তখন উপকূলবর্তী সঙ্গী মক্কার সঙ্গীর কাছে চিঠি লিখে নবুওয়ত দাবীর ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইল। জওয়াবে মক্কার সঙ্গী লিখল, কোরাইশ গোত্রের কেউ তাঁর অনুসরণ করে না। কেবল নিঃস্ব, দরিদ্র ও নিম্নস্তরের লোকজনই তার সাথে রয়েছে। উপকূলবর্তী সঙ্গী তার ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করে মক্কায় আগমন করল এবং সঙ্গীকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। সে তওরাত' ইনজীল ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ কিছু কিছু অধ্যয়ন করত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিসের দাওয়াত দেন? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দাওয়াতের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো বিবৃত করলেন। তাঁর মুখে ইসলামের দাওয়াত শুনা মাত্রই আগন্তুক বলে উঠল ঃ اشهد انك رسول الله -(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চতই আল্লাহ্র রসূল)। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার দাওয়াতের সত্যতা কিরূপে জানতে পারলে? সে আরয করল, (জ্ঞান বুদ্ধির মাধ্যমে আপনার দাওয়াতের সত্যতা জানতে পেরেছি এবং এর লক্ষ্যন এই দেখেছি যে,) পূর্বে যত পয়গম্বর আগমন করেছেন, শুরুতে তাঁদের সকলের অনুসারী দরিদ্র, নিঃস্ব ও নিম্নস্তরের লোকই ছিল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য وَمَآ اَرْسَلْنَا فِیْ قَرْیَةٍ مِّنْ نَّذِیْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ আয়াত অবতীর্ণ হয়।-(ইবনে কাসীর, মাযহার) مترف শব্দটি ترف থেকে উদ্ভূত। অর্থ ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য। مترفين বলে বিত্তশালী ও সরদারকে বোঝানো হয়েছে। ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যখনই আমি কোন রসূল প্রেরণ করেছি, তখনই ধনৈশ্বর্য্য ও ভোগ-বিলাসে লালিত-পালিত লোকেরা কুফর ও অস্বীকারের মাধ্যমে তাঁর মোকাবেলা করেছে।

৩৫ নং আয়াতে তাদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে ঃ

نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِیْنَ -অর্থাৎ, আমরা ধনেজনে সবদিক দিয়েই তোমাদের অপেক্ষা বেশী সমৃদ্ধ। সুতরাং আমরা আযাবে পতিত হব না। (বাহ্যতঃ তাদের উক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে আমরা শাস্তিযোগ্য হলে আমাদেরকে এই বিপুল ধনৈশ্বর্য্য কেন দিতেন?) ৩৬ ও ৩৭ আয়াতে তাদের জওয়াব দেয়া হয়েছে যে,

قُلْ اِنَّ رَبِّیْ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیَقْدِرُ এবং وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ জওয়াবের সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্র কাছে প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার দলীল নয়; বরং সৃষ্টিগত সুবিবেচনার ভিত্তিতে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তাআলা যাকে ইচ্ছা অগাধ ধন-সম্পদ দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন। এর রহস্য তিনিই জানেন। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে আল্লাহ্র প্রিয় হওয়ার দলীল মনে করা মূর্খতা। আল্লাহ্র প্রিয় হওয়া একমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এগুলো অর্জন করে না, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য তাকে আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র করতে পারে না।

এ বিষয়বস্তুটি কোরআন পাক বিভিন্ন আয়াতে ব্যক্ত করেছে। এক আয়াতে আছে ঃ اَیَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِیْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْرٰتِ بَلْ لَّا یَشْعُرُوْنَ - অর্থাৎ, তারা কি মনে করে যে, আমি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদেরকে যে সাহায্য করি, তা তাদের জন্যে পরিণাম ও পরকালের দিক দিয়েও মঙ্গলজনক। (কখনই নয়।) বরং তারা আসল সত্য সম্পর্কে বে-খবর। (অর্থাৎ, যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি মানুষকে আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে দেয়, তা তার জন্যে শাস্তিস্বরূপ।)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের রূপ ও ধন-সম্পদ দেখেন না, তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। (আহমদ, ইবনে কাসীর)

فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِی الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ

এতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তারাই আল্লাহ্র প্রিয়জন। দুনিয়াতে কেউ তাদের মূল্য বুঝুক বা না বুঝুক, পরকালে তারা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। ضعف অর্থ এক বস্তুর দ্বিগুণ অথবা বহুগুণ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে বিত্তশালীরা যেমন তাদের বিত্ত বাড়ানোর কাজে ব্যাপৃত থাকে, তেমনি আল্লাহ্ তাআলা পরকালে মুমিন ও সৎকর্মীদের কর্মের প্রতিদান বাড়িয়ে দেবেন। এক কর্মের প্রতিদান দশগুণ হবে এবং এতেই সীমিত থাকবে না, আন্তরিকতা ও অন্যান্য কারণে এক কর্মের প্রতিদান সাতশ' গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে বলে সহীহ্ হাদীসসমূহে প্রমাণিত রয়েছে বরং তার বেশীও হতে পারে। তারা জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে চিরকালের জন্যে দুঃখ ও কষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে। ঘরের যে অংশ অন্য অংশ থেকে উঁচু ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় তাঁকে غرفة বলে। এরই বহুবচন غرفات-(মাযহারী)

এ ৩৯ নং আয়াতটি প্রায় অনুরূপ শব্দেই পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে। এখানে বাহ্যতঃ এ বিষয়বস্তুরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তবে এতে সামান্য পার্থক্য এই যে, এখানে لِمَنْ یَّشَآءُ শব্দের পরে مِنْ عِبَادِهٖ এবং وَیَقْدِرُ শব্দের পরে له অতিরিক্ত সংযুক্ত হয়েছে। مِنْ عِبَادِهٖ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, এ বিধানটি বিশেষ বান্দা অর্থাৎ, মুমিনদের জন্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিনগণ যেন ধন-সম্পদের মহব্বতে এমন ডুবে না যায় যে, আল্লাহ্ প্রদর্শিত হক ও খাতে ব্যয় করতে কার্পণ্য করতে থাকে। পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব কাফের ও মুশরেকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল, যারা পার্থিব ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে গর্ব করত এবং এগুলোকে পরকালীন সাফল্যের দলীল বলে বর্ণনা করত। ফলে সম্বোধিত ব্যক্তি ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এটা নিছক পুনরাবৃত্তি রয়নি।

কেউ কেউ আয়াতদ্বয়ের এই পাথর্ক্য বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম আয়াতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে রিযিক বন্টনের উল্লেখ ছিল । অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় রহস্য ও পার্থিব কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাউকে অধিক এবং কাউকে অল্প রিযিক দেন। আর এ আয়াতে একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, একই ব্যক্তি কখনও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, কখনও দারিদ্র্য ও রিক্ততার সম্মুখীন হয়। এ আয়াতে یَقْدِرُ শব্দের পরে বর্ণিত له সর্বনামে এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ভাষ্য অনুযায়ীও নিছক পুনরাবৃত্তি রইল না; বরং প্রথম আয়াত বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে এবং এ আয়াত একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

যে ব্যয় শরীয়ত সম্মত নয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই ঃ হযরত জাবেরের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, সৎকাজ সদকা। মানুষ নিজের ও পরিবার পরিজনের জন্যে যা ব্যয় করে, তাও সদকার পর্যায়ে পড়ে। সম্মান ও আবরু রক্ষার্থে যা ব্যয় করা হয়, তাও সদকা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার আদেশ অনুযায়ী ব্যয় করে তাকে বিনিময় দান আল্লাহ্ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে ব্যয় অযথা, প্রয়োজনাতিরিক্ত

قَالُوا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ
الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۗ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ
النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا
بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ
يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ۗ وَقَالَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٣﴾
وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ
مِنْ نَّذِيْرٍ ﴿٤٤﴾ وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ
مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٥﴾ قُلْ اِنَّمَآ
اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ
تَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ
بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿٤٦﴾ قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ
فَهُوَ لَكُمْ ۗ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيْدٌ ﴿٤٧﴾ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٤٨﴾

(৪১) ফেরেশতারা বলবে, আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই; বরং তারা জিনদের পূজা করত। তাদের অধিকাংশই শয়তানে বিশ্বাসী। (৪২) অতএব আজকের দিনে তোমরা একে অপরের কোন উপকার ও অপকার করার অধিকারী হবে না। আর আমি জালেমদেরকে বলব, তোমরা আগুনের যে শাস্তিকে মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর। (৪৩) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের বাপ-দাদারা যার এবাদত করত এ লোকটি যে তা থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। তারা আরও বলে, এটা মনগড়া মিথ্যা বৈ নয়। আর কাফেরদের কাছে যখন সত্য আগমন করে, তখন তারা বলে, এতো এক সুস্পষ্ট যাদু। (৪৪) আমি তাদেরকে কোন কিতাব দেইনি, যা তারা অধ্যয়ন করবে এবং আপনার পূর্বে তাদের কাছে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিনি। (৪৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছে। আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম, এরা তার এক দশমাংশও পায়নি। এরপরও তারা আমার রসূলগণকে মিথ্যা বলেছে। অতএব কেমন হয়েছে আমার শাস্তি। (৪৬) বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র নামে এক একজন করে ও দু' দু' জন করে দাঁড়াও, অতঃপর চিন্তা-ভাবনা কর—তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই। তিনি তো আসন্ন কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করেন মাত্র। (৪৭) বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না বরং তা তোমরাই রাখ। আমার পুরস্কার তো আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। প্রত্যেক বস্তুই তাঁর সামনে। (৪৮) বলুন, আমার পালনকর্তা সত্য দ্বীন অবতরণ করেছেন। তিনি আলেমুলগায়ব ।

নির্মাণ কাজে অথবা পাপ কাজে করা হয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই।

হযরত জাবেরের শিষ্য ইবনুল মুনকাদির এই হাদীস **শুনে তাঁকে** জিজ্ঞেস করলেন, আবরু রক্ষার্থে ব্যয় করার অর্থ কি? তিনি বললেন, এর অর্থ যে ব্যক্তিকে দান না করলে দোষ বের করবে, নিন্দাবাদ করে ফিরবে অথবা গালমন্দ করবে বলে মনে হয়, সম্মান রক্ষার্থে তাকে দান করা।—(কুরতুবী)

যে বস্তুর ব্যয় হ্রাস পায় তার উৎপাদনও হ্রাস পায় ঃ এ আয়াতের ইঙ্গিত থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্যে যে সমস্ত ব্যবহার্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো যে পর্যন্ত ব্যয়িত হতে থাকে, সে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সেগুলোর পরিপূরকও হতে থাকে। যে বস্তু বেশী ব্যয়িত হয়, আল্লাহ্ তাআলা তার উৎপাদনও বাড়িয়ে দেন। জীব-জানোয়ারের মধ্যে ছাগল ও গরু সর্বাধিক ব্যয়িত হয়। এগুলো যবেহ করে গোশত খাওয়া হয়। কোরবানী, কাফফারা, মান্নত প্রভৃতিতে যবেহ্ করা হয়। এগুলো যত বেশী কাজে লাগে, আল্লাহ্ তাআলা সে অনুপাতে এগুলোর উৎপাদনও বৃদ্ধি করেন। আমরা সর্বত্রই এটা প্রত্যক্ষ করি। সর্বদা ছুরির নীচে থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে ছাগলের সংখ্যা বেশী। কুকুর ও বিড়ালের সংখ্যা এত নয়, অথচ এগুলোর সংখ্যাই বেশী হওয়া উচিত ছিল। কারণ, এরা একই গর্ভ থেকে চার পাঁচটি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে। গরু ছাগল বেশীর চেয়ে বেশী দু'টি বাচ্চা প্রসব করে। তদুপরি এগুলোকে সর্বদাই যবেহ্ করা হয়। পক্ষান্তরে কুকুর বিড়ালকে কেউ হাতও লাগায় না। এতদসত্ত্বেও একটা অনস্বীকার্য যে, দুনিয়াতে গরু-ছাগলের সংখ্যা কুকুর বিড়ালের তুলনায় অনেক বেশী। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে যেদিন থেকে গো-হত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে সেখানে গরুর উৎপাদনও অপেক্ষাকৃত হ্রাস পেয়েছে। নতুবা যবেহ না হওয়ার কারণে প্রতিটি বস্তী ও বাড়ী গরুতে ভরপুর থাকা উচিত ছিল।

আরবরা যখন থেকে পরিবহনের কাজে উটের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে উটের উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছে। কোরবানীর মোকাবেলায় অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির আশংকা ব্যক্ত করে আজকাল যে বিধর্মীসুলভ আলোচনার অবতারণা করা হয়, উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে তার অসারতা প্রমাণিত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ কারও মতে معشار শব্দের অর্থ عشر অর্থাৎ দশ ভাগের একভাগ। কারও মতে عشر العشر অর্থাৎ একশ' ভাগের একভাগ এবং কারও মতে عشر العشير অর্থাৎ, একহাজার ভাগের একভাগ। বলাবাহুল্য শব্দটিতে عشر এর তুলনায় অতিশয়তা আছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতকে পার্থিব ধনৈশ্বর্য, শাসনক্ষমতা, সুদীর্ঘ বয়স, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্য, ইত্যাদি যে পরিমাণে দান করা হয়েছিল, মক্কাবাসীরা তার দশ ভাগের এক বরং হাজার ভাগের এক ভাগও পায়নি। তাই পূর্ববর্তীদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। তারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আযাবে পতিত হয়েছিল এবং সে আযাব যখন এসে যায়, তখন তাদের শক্তি, সামর্থ্য, বীরত্ব, ধনৈশ্বর্য ও সুরক্ষিত দুর্গ কোন কাজেই আসেনি।

মক্কার কাফেরদের প্রতি দাওয়াত ঃ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ —এতে

মক্কাবাসীদের উপর প্রমাণ চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্য সত্যানুসন্ধানের একটি সংক্ষিপ্ত পথ বলে দেয়া হয়েছে। তা এই যে, তোমরা শুধুমাত্র একটি কাজ কর– 'আল্লাহ্‌র উদ্দেশে দাঁড়ানোর অর্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দাঁড়ানো নয় যে, বসা অথবা শোয়া থেকে সটান দাঁড়াতে হবে ; বরং বাকপদ্ধতিতে এর অর্থ হয় কোন কাজের জন্যে তৎপর হওয়া। এখানে لِلّٰهِ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে শব্দটি যোগ করার উদ্দেশ্য এই যে, একান্তভাবে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্যে বিগত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হও, যাতে অতীত ধারণা ও কর্ম সত্য গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক না হয়। দু' দু'জন ও এক একজন বলার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয় ; বরং অর্থ এই যে, দু'টি পন্থায় চিন্তা-ভাবনা করা যায়, (এক)—একান্তে ও নির্জনতায় নিজে নিজে চিন্তা-ভাবনা করা এবং (দুই) — বন্ধুবর্গ ও মুরুব্বীদের সাথে পরামর্শক্রমে পারস্পরিক পর্যালোচনার পর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। তোমরা এই উভয় পন্থা অথবা এতদুভয়ের মধ্যে পছন্দমত যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন কর।

ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا এটা اَنْ تَقُوْمُوْا বাক্যের সাথে সংযুক্ত। এতে দাঁড়ানোর লক্ষ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সব পুরাতন ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে মোহাম্মদ (সাঃ) -এর দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে তৎপর হয়ে যাও। এ দাওয়াত সত্য কি মিথ্যা তা ভেবে দেখ। তা একাই কর অথবা অন্যান্যদের সাথে পরার্মশক্রমেই কর।

অতঃপর এই চিন্তা-ভাবনার একটি সুস্পষ্ট পন্থা বলে দেয়া হয়েছে যে, দলবল ও অর্থকড়ির প্রাচুর্যহীন, একা এক ব্যক্তি যদি তার স্বজাতি বরং সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে তাদের যুগযুগব্যাপী বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীতে কোন ঘোষণা দেয়, তবে তা দু'উপায়েই সম্ভব। (এক) হয় ঘোষণাকারী বদ্ধ পাগল ও উন্মাদ হবে, ফলে নিজের হিতাহিত চিন্তা না করে সমগ্র জাতিকে শত্রুতে পরিণত করে বিপদ ডেকে আনবে নয়তো (দুই) তাঁর ঘোষণা আমোঘ সত্য হবে এবং তিনি হবেন আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল। তাই আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে কারও পরওয়া করেন না।

এখন তোমরা মুক্তমনে চিন্তা কর, এতদুভয়ের মধ্যে বাস্তব ঘটনা কোনটি? এভাবে চিন্তা করলে তোমাদের পক্ষে নিশ্চিতভাবে এ বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না যে, মোহাম্মদ (সাঃ) উন্মাদ ও পাগল হতে পারেন না। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি, বিবেচনা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে সমগ্র মক্কা ও গোটা কোরাইশ সম্যক অবগত। তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর স্বজাতীর মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত কার্যকলাপ তাদের সামনে সংঘটিত হয়েছে। কখনও কেউ তাঁর কথা ও কর্মকে জ্ঞানবুদ্ধি, গাম্ভীর্য ও শালীনতার পরিপন্থী পায়নি। কেবল এক কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ব্যতীত আজও কেউ তাঁর কোন কথা ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞানবুদ্ধির বিপরীত হওয়ার ধারণা করতে পারে না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি উন্মাদ হতে পারেন না। আয়াতের পরবর্তী مَا بِصَاحِبِكُمْ বাক্যে তাই প্রকাশ করা হয়েছে। صاحبكم (তোমাদের সঙ্গী) শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোন বহিরাগত অজ্ঞাত পরিচয় মুসাফির ব্যক্তির মুখ থেকে স্বজাতীর বিরুদ্ধে কোন কথা শুনলে কেউ হয়তো তাকে উন্মাদ বলতে পারে। কিন্তু তিনি তো তোমাদের শহরের বাসিন্দা, তোমাদের গোত্রেরই একজন এবং তোমাদের দিবারাত্রির সঙ্গী। তাঁর কোন অবস্থা তোমাদের অগোচরে নয়। ইতিপূর্বে তোমরা কখনও তাঁর। সম্পর্কে এ ধরনের সন্দেহ করনি।

যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তিনি উন্মাদ নন, তখন শেষোক্ত বিষয়ই নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি আল্লাহ্‌র নির্ভীক রসূল। আয়াতে বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছেঃ

اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ – অর্থাৎ, তিনি তো কেবল কেয়ামতের ভয়াবহ আযাব থেকে মানুষকে সতর্ক করেন।

اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ অর্থাৎ, আমার আলেমুল-গায়ব পালনকর্তা সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারেন। ফলে মিথ্যা চুরমার হয়ে যায়। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ . قذف – শব্দের আভিধানিক অর্থ ছুঁড়ে মারা। এখানে উদ্দেশ্য হল মিথ্যার মোকাবেলায় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। বিষয়টি قذف শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার তাৎপর্য্য সম্ভবতঃ এই যে, মিথ্যার উপর সত্যের আঘাতের গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি হয়। এটা একটা উপমা। কোন ভারী বস্তুকে হালকা বস্তুর উপর নিক্ষেপ করলে যেমন তা চুরমার হয়ে যায়, তেমনিভাবে সত্যের মোকাবেলায় মিথ্যাও চুরমার হয়ে যায়। তাই অতঃপর বলা হয়েছে وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ অর্থাৎ, সত্যের মোকাবেলায় মিথ্যা এমন পর্যুদস্ত হয়ে যায় যে, তা কোন বিষয়ের সূচনা বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে না।

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿٥٤﴾

سورة فاطر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾

(৪৯) বলুন, সত্য আগমন করেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে এবং না পারে পুনঃ প্রত্যাবর্তিত হতে। (৫০) বলুন, আমি পথভ্রষ্ট হলে নিজের ক্ষতির জন্যেই পথভ্রষ্ট হব ; আর যদি আমি সৎপথ প্রাপ্ত হই, তবে তা এ জন্যে যে, আমার পালনকর্তা আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী। (৫১) যদি আপনি দেখতেন, যখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, অতঃপর পালিয়েও বাঁচতে পারবে না এবং নিকটবর্তী স্থান থেকে ধরা পড়বে। (৫২) তারা বলবে, আমরা সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কিন্তু তারা এতদূর থেকে তার নাগাল পাবে কেমন করে? (৫৩) অথচ তারা পূর্ব থেকে সত্যকে অস্বীকার করছিল। আর তারা সত্য হতে দূরে থেকে অজ্ঞাত বিষয়ের উপর মন্তব্য করত। (৫৪) তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল হয়ে গেছে, যেমন— তাদের সতীর্থদের সাথেও এরূপ করা হয়েছে, যারা তাদের পূর্বে ছিল। তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত।

সূরা ফাতির

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৪৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক — তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সক্ষম। (২) আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতীত। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (৩) হে মানুষ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ –অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এটা হাশর দিবসের অবস্থা। তখন কাফের ও পাপাচারীরা ভীত-বিহ্বল হয়ে পালাতে চাইবে। কিন্তু পরিত্রাণ পাবে না দুনিয়াতে কোন অপরাধী পলায়ন করলে তাকে খোঁজ করতে হয়; সেখানে তাও হবে না; বরং সবাই স্বস্থানে গ্রেফতার হবে, কেউ পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে না। কেউ কেউ একে অন্তিম কষ্ট ও মুমূর্ষু অবস্থা বলে সাব্যস্ত করেছেন। যখন মৃত্যুর সময় হবে এবং তাদের উপর ভীতি উপস্থিত হবে, তখন ফেরেশতাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না ; বরং স্বস্থানেই আত্মা বের হয়ে যাবে।

وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ – تناوش অর্থ হাত বাড়িয়ে কোন কিছু তুলে নেয়া। বলাবাহুল্য, যে বস্তু বেশী দূরে নয়, হাতের নাগালের মধ্যে, তাই হাত বাড়িয়ে তোলা যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফের ও মুশরেকরা কেয়ামতের দিন সত্যাসত্য সামনে এসে যাওয়ার পর বলবে, আমরা কোরআনের প্রতি অথবা রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কিন্তু তারা জানে না যে, ঈমানের স্থান তাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। কেননা, কেবল পার্থিব জীবনের ঈমানই গ্রহণীয়। পরকাল কর্মজগৎ নয়। সেখানকার কোন কর্ম হিসাবে ধরা যাবে না। তাই এটা কেমন করে সম্ভব যে, তারা ঈমানরূপী ধন হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে?

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ – قذف অর্থ কোন বস্তু নিক্ষেপ করা। আরবী বাকপদ্ধতিতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নিছক কাল্পনিক কথাবার্তা বলাকে رجم بالغيب অথবা قذف بالغيب বলে ব্যক্ত করা হয়। অর্থাৎ, সে অন্ধকারে তীর চালায়, যার কোন লক্ষ্যস্থল নেই। এখানে مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যা কিছু বলে, তা তাদের মন থেকে দূরে থাকে—মনে তার বিশ্বাস রাখে না।

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ –অর্থাৎ, তাদের ও তাদের প্রিয় ও উদ্দিষ্ট বস্তুর মাঝখানে পর্দার অন্তরাল করে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়েছে। কেয়ামতের অবস্থায়ও এ বিষয়টি প্রযোজ্য। কেয়ামতে তারা মুক্তি ও জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী হবে ; কিন্তু তা লাভ করতে পারবে না। দুনিয়াতে মৃত্যুর বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। দুনিয়াতে তাদের লক্ষ্য ছিল পার্থিব ধন-সম্পদ। মৃত্যু তাদের ও তাদের এই উদ্দেশ্যের মাঝখানে অন্তরায় হয়ে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে।

كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ – اشياع শব্দটি شيعة –এর বহুবচন। অর্থ অনুসারী ও সতীর্থ। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে অর্থাৎ, তাদের অভীষ্ট ও ইপ্সিত বস্তু থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়েছে তা ইতিপূর্বে তাদের মতই কুফরী কর্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদেরকে দেয়া হয়েছে। কেননা, তারা সবাই সন্দেহে নিপতিত ছিল। অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর রেসালত এবং কোরআনের আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ার বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ও ঈমান ছিল না।

সূরা ফাতির

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا ফেরেশতাগণকে রসূল অর্থাৎ, বার্তাবাহক করার বাহ্যিক অর্থ এই যে, তাদেরকে আল্লাহ্‌র দূত নিযুক্ত করে

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ ﴿٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٥﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ
عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾ الَّذِينَ
كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ
اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ
عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ
الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ﴿٩﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَ
الَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ
يَبُورُ ﴿١٠﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ
أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ
مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

(৪) তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকেও তো মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। আল্লাহ্র প্রতিই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়। (৫) হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। সুতরাং, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে। এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। (৬) শয়তান তোমাদের শত্রু অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহবান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়। (৭) যারা কুফর করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (৮) যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি সমান যে মন্দকে মন্দ মনে করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং আপনি তাদের জন্যে অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংসে করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জানেন তারা যা করে। (৯) আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। অতঃপর আমি তা মৃত ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর তদ্বারা সে ভূ-খণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই। এমনিভাবে হবে পুনরুত্থান। (১০) কেউ সম্মান চাইলে জেনে রাখুক, সমস্ত সম্মান আল্লাহরই জন্যে। তাঁরই দিকে আরোহণ করে সৎবাক্য এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়। যারা মন্দ কার্যের চক্রান্তে লেগে থাকে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। (১১) আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, তারপর করেছেন তোমাদেরকে যুগল। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসব করে না; কিন্তু তাঁর জ্ঞাতসারে। কোন বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায় না এবং তার বয়স হ্রাস পায় না; কিন্তু তা লিখিত আছে কিতাবে। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।

পয়গম্বরগণের কাছে পাঠানো হয়। তারা আল্লাহ্র ওহী ও হুকুম আহকাম পৌঁছে দেয়। রসূল অর্থ এখানে মাধ্যমও হতে পারে। অর্থাৎ, তারা সাধারণ সৃষ্টি ও আল্লাহ্ তাআলার মাঝখানে মাধ্যম হয়ে থাকে। সৃষ্টির মধ্যে পয়গম্বরগণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের ও আল্লাহ্ তাআলার মধ্যেও ফেরেশতারা ওহীর মাধ্যম হয় এবং সাধারণ সৃষ্টি পর্যন্ত আল্লাহ্র রহমত অথবা আযাব পৌঁছানোর কাজেও ফেরেশতারাই মাধ্যম হয়ে থাকে।

أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাগণকে পালকবিশিষ্ট ডানা দান করেছেন যদ্দ্বারা তারা উড়তে পারে। এর কারণ সুস্পষ্ট যে, তারা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব বার বার অতিক্রম করে। এটা দ্রুতগতি সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভবপর। উড়ার মাধ্যমে দ্রুতগতি হয়ে থাকে।

ফেরেশতাগণের পাখার সংখ্যা বিভিন্ন। কারও দুই দুই, কারও তিন তিন এবং কারও চার চার খানা পাখা রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। মুসলিমের হাদীসে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর ছয়শ' পাখা রয়েছে বলে প্রমাণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ চার পর্যন্ত উল্লেখিত হয়েছে। — (কুরতুবী, ইবনে কাসীর)

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে যত বেশী ইচ্ছা যোগ করতে সক্ষম। বাহ্যতঃ এটা পাখার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, ফেরেশতাগণের পাখা দু'-চারের মধ্যেই সীমিত নয়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তা আরও অনেক বেশী হতে পারে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতও তাই। যুহরী, কাতাদাহ প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, এখানে অধিক সৃষ্টি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে ফেরেশতাদের পাখার আধিক্যও অন্তর্ভুক্ত। দৈহিক সৌন্দর্য, চরিত্র মাধুর্য, সুললিত কণ্ঠ এবং বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর সংযোজনও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আবু হাইয়্যান বাহ্‌রে মুহীতে এ মতের আলোকেই তফসীর করেছেন। এ তফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যে সৌন্দর্য ও পরাকাষ্ঠা অর্জন করে, তা আল্লাহ্ তাআলার দান ও নেয়ামত। এজন্যে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا এখানে রহমত বলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার নেয়ামত বোঝানো হয়েছে। যেমন, ঈমান, জ্ঞান, সৎকর্ম, নবুওয়ত ইত্যাদি এবং রিযিক, সাজ-সরঞ্জাম, সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ, ইযযত-আবরু ইত্যাদি। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যার জন্যে স্বয়ং অনুগ্রহের দরজা খুলে দেয়ার ইচ্ছা করেন, তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

এমনিভাবে দ্বিতীয় বাক্যের অর্থও ব্যাপক। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যা বারণ করেন, তা কেউ খুলতে পারে না। সেমতে আল্লাহ্ তাআলা কোন বান্দা থেকে দুনিয়ার বিপদাপদ ফিরিয়ে রাখতে চাইলে তাকে কষ্ট দেয়ার সাধ্য কারও নেই। এমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলা কোন কারণ বশতঃ কোন বান্দাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে, তাকে তা দেয়ার সাধ্য কারও নেই।—(আবু হাইয়্যান)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ – غرور শব্দটি আধিক্যবোধক। অর্থাৎ, অতি প্রবঞ্চক। এতে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে। তার কাজই মানুষকে

প্রতারিত করে কুফর ও গোনাহে লিপ্ত করা। 'শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে ধোঁকা না দেয়'—এর অর্থ শয়তান যেন মন্দ কর্মকে শোভনীয় করে তোমাদেরকে তাতে লিপ্ত করে না দেয়। তখন তোমাদের অবস্থা হবে যে, তোমরা গোনাহ্ করার সাথে সাথে মনে করতে থাকবে যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রিয় এবং তোমাদের শাস্তি হবে না।—(কুরতুবী)

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ইমাম বগভী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দোয়া করেছিলেন ঃ হে আল্লাহ্ ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আবু জাহলের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তি ও সামর্থ্য দান কর। আল্লাহ্ তাআলা ওমর ইবনে খাত্তাবকে সৎপথ প্রদর্শন করে ইসলামের শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেন এবং আবু জাহ্ল তার পথভ্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে থাকে। তখনই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।—(মাযহারী)

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, কেউ সম্মান ও ক্ষমতা কামনা করলে তার জেনে রাখা উচিত যে, তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও সাধ্যে নেই। তারা যাদেরকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছে অথবা সম্মান পাওয়ার আশায় যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে রেখেছে, তারা কাউকে সম্মান দিতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে সম্মান ও ক্ষমতা লাভের পন্থা বর্ণিত হয়েছে। এই পন্থার দু'টি অংশের প্রথমটি হচ্ছে সৎবাক্য অর্থাৎ, কলেমায়ে তাওহীদ এবং আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান। আর দ্বিতীয় অংশ সৎকর্ম। অর্থাৎ, অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনুযায়ী শরীয়তের অনুসরণে কর্ম সম্পাদন করা। হযরত শাহ্ আবদুল কাদির (রহঃ) 'মুযেহুল কোরআনে' বলেন সম্মান লাভের এই ব্যবস্থাপত্র সম্পূর্ণ নির্ভুল ও পরীক্ষিত। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহ্র যিকর ও সৎকর্ম যথারীতি স্থায়ী হতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে এই যিকর ও সৎকর্ম করলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে ইহ ও পরকালে অক্ষয় ও অতুলনীয় সম্মান দান করেন।

আলোচ্য আয়াতে এই দু'টি অংশ ব্যক্ত করার জন্যে বলা হয়েছে ঃ সৎবাক্য আল্লাহ্র দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাঁকে পৌঁছায়। وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকরণে কয়েকটি সম্ভাব্যতা বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রত্যেক সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। তফসীরবিদগণ এসব সম্ভাব্যতার প্রেক্ষাপটে এর ভিন্ন ভিন্ন তফসীর করেছেন। প্রথম সম্ভাবনা অনুযায়ী তরজমা করা হয়েছে যে, সৎবাক্য আল্লাহ্র দিকে আরোহণ করে, কিন্তু তার উপায় হয় সৎকর্ম। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ, যাহহাক, শহর ইবনে হাওশব প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদও এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহ্র দিকে আরোহণ করা ও করানোর অর্থ আল্লাহ্র কাছে কবুল হওয়া। তাই এ বাক্যের সারমর্ম এই যে, কলেমায়ে তওহীদ হোক অথবা অন্য কোন যিকর-তসবীহ্ই হোক— কোনটিই সৎকর্ম ব্যতিরেকে আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয় না। সৎকর্মের প্রধান অংশ হচ্ছে আত্মিক বিশ্বাস। অর্থাৎ, আল্লাহ্ ও তাঁর তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা। এটি ব্যতীত কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কিংবা অন্য কোন যিকর মকবুল নয়।

সৎকর্মের অন্যান্য অংশ হচ্ছে নামায, রোযা ইত্যাদি সম্পাদন এবং হারাম ও মাকরূহ কর্ম বর্জন। এসব কর্মও পূর্ণরূপে কবুল হওয়া শর্ত। অতএব, যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে না, সে মুখে যতই কলেমায়ে তওহীদ উচ্চারণ করুক —আল্লাহ্ তাআলার কাছে কিছুই কবুল হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে; কিন্তু অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদন করে না অথবা তাতে ত্রুটি করে, তার যিকির ও কলেমায়ে তওহীদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না, বরং সে চিরকালীন আযাব থেকে মুক্তি পাবে এবং সে পরিপূর্ণ কবুলিয়ত লাভ করতে পারবে না। ফলে সৎকর্ম বর্জন ও ত্রুটি পরিমাণে আযাব ভোগ করবে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা কোন কথাকে কাজ ছাড়া এবং কোন কথা ও কাজকে নিয়ত ছাড়া এবং কোন কথা, কাজ ও নিয়তকে সুন্নত অনুযায়ী না হওয়া পর্যন্ত কবুল করেন না।—(কুরতুবী)

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, যে কোন কাজ সুন্নত অনুযায়ী হওয়া তা পূর্ণরূপে কবুল হওয়ার শর্ত। কথা, কর্ম ও নিয়ত প্রভৃতি ঠিক হওয়ার পর যদি কর্মপন্থা সুন্নত মোতাবেক না হয়, তবে সেগুলো পূর্ণরূপে কবুল হবে না।

বাস্তব সত্য এই যে, কলেমায়ে তওহীদ ও তসবীহ যেমন সৎকর্ম ব্যতীত যথেষ্ট নয়, তেমনি সৎকর্ম এবং আল্লাহ্র হুকুম -আহকাম ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ মেনে চলাও যিকর ব্যতীত ফোটে উঠে না; প্রচুর যিকরই সৎকর্মকে শোভনীয় ও গ্রহণযোগ্য করে থাকে।

وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন, তা পূর্বেই লওহে মাহফুযে লিখিত রয়েছে। অনুরূপভাবে স্বল্প জীবনও পূর্ব থেকে লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ থাকে। যার সারমর্ম দাঁড়াল এই যে, এখানে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং গোটা মানবজাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয় এবং কাউকে তার চেয়ে কম। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এই তফসীর বর্ণনা করেছেন। জাসসাস, হাসান বসরী ও যাহ্হাক প্রমুখের মতও তাই। কেউ কেউ বলেন, যদি আয়াতের অর্থ একই ব্যক্তির বয়সের হ্রাসবৃদ্ধি ধরে নেয়া যায়, তবে বয়স হ্রাস করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স আল্লাহ্ তাআলা যা লিখে দিয়েছেন, তা নিশ্চিত কিন্তু এই নির্দিষ্ট বয়ঃক্রম থেকে একদিন অতিবাহিত হলে একদিন হ্রাস পায়, দু'দিন অতিবাহিত হলে দু'দিন হ্রাস পায়। এমনিভাবে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি নিঃশ্বাস তার জীবনকে হ্রাস করতে থাকে। এই তফসীর শা'বী,ইবনে জুবায়র, আবু মালেক, ইবনে আতিয়্যা ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত আছে।— (রুহুল-মা'আনী)

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইমাম নাসায়ী বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালেকের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, ''যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক প্রশস্ত ও জীবন দীর্ঘ হোক, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।'' বোখারী, মুসলিম ও আবু দাউদেও এই হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীস থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের ফলে জীবন দীর্ঘ হয়। কিন্তু অপর এক হাদীস এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দিয়েছে। হাদীসটি এই ঃ

ঃ ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতে হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বলেন, (বয়স তো আল্লাহ্ তাআলার কাছে একই বলে নির্দিষ্ট ও অবধারিত) নির্দিষ্ট সে মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে কাউকে এক মুহূর্তও অবকাশ দেয়া হয় না। তবে জীবন দীর্ঘ হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۖ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَ
هَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ
حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ
فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ
فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۚ
ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا
يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ
سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ
وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى
اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ
وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾ وَ
لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا
لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنْذِرُ
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ
وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

(১২) দু' টি সমুদ্র সমান হয় না — একটি মিঠা ও তৃষ্ণানিবারক এবং অপরটি লোনা। উভয়টি থেকেই তোমরা তাজা গোশত্ (মৎস্য) আহার কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য গয়নাগাটি আহরণ কর। তুমি তাতে তার বুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১৩) তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। ইনি আল্লাহ্; তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়। (১৪) তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শেরক অস্বীকার করবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্র ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না। (১৫) হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ্র গলগ্রহ। আর আল্লাহ্; তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (১৬) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে এক নতুন সৃষ্টির উদ্ভব করবেন। (১৭) এটা আল্লাহ্র পক্ষে কঠিন নয়। (১৮) কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কেউ যদি তার গুরুতর ভার বহন করতে অন্যকে আহবান করে কেউ তা বহন করবে না— যদি সে নিকটবর্তী আত্মীয়ও হয়। আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে, স্বীয় কল্যাণের জন্যেই। আল্লাহ্র নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন।

তাআলা তাকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দান করেন। তারা সে ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে থাকে। সে না থাকলেও কবরে তাদের দোয়া পেতে থাকে। (অর্থাৎ, মৃত্যুর পরও সে জীবিতাবস্থার ন্যায় লাভ করতে থাকে। ফলে তার বয়স যেন বেড়ে গেল। ইবনে-কাসীর উভয় রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।) সারকথা, যেসব হাদীসে কোন কোন কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সম্পাদন করলে বয়স বেড়ে যায়, সেগুলোর অর্থ বয়সের বরকত ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা যে সমস্ত মূর্তি, কতক নবী ও ফেরেশতার পূজা কর; বিপদ মুহূর্তে তাদেরকে আহবান করলে প্রথমতঃ তারা শুনতেই পারবে না। কেননা, মূর্তির মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতাই নেই। নবী ও ফেরেশতাগণের মধ্যে যোগ্যতা থাকলেও তারা সর্বত্র বিদ্যমান নয়, এবং প্রত্যেকের কথা শুনে না। অতঃপর বলা হয়েছে, ফেরেশতা ও নবী যদি ধরে নেয়ার পর্যায়ে শুনেও,তবে তারা তোমাদের আবেদন পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্ তাআলার অনুমতি ব্যতিরেকে তারা তাঁর কাছে কারও জন্যে সুপারিশও করতে পারে না।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াত তার পক্ষেও নয় — বিপক্ষেও নয়। সূরা রূমে এই আলোচনার বিস্তারিত প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন কোন মানুষ অন্য মানুষের পাপভার বহন করতে পারবে না। প্রত্যেককে নিজের বোঝা নিজেই বহন করতে হবে। সূরা আনকাবুতে বলা হয়েছে : وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ অর্থাৎ, যারা পথভ্রষ্ট করে,তারা নিজেদের পথভ্রষ্টতার বোঝাও বহন করবে এবং তৎসহ তাদের বোঝাও বহন করবে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। এর অর্থ এমন নয় যে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদের বোঝা তারা কিছুটা হালকা করে দেবে। বরং তাদের বোঝা তাদের উপর পুরোপুরিই থাকবে, কিন্তু পথ-ভ্রষ্টকারীদের অপরাধ দ্বিগুণ হওয়ার কারণে তাদের বোঝাও দ্বিগুণ হয়ে যাবে — একটি পথভ্রষ্ট হওয়ার ও অপরটি পথভ্রষ্ট করার। অতএব উভয় আয়াতে কোন বৈপরীত্য নেই।

হযরত ইকরিমা উল্লেখিত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সেদিন এক পিতা তার পুত্রকে বলবে, তুমি জান যে, আমি তোমার প্রতি কেমন স্নেহশীল ও সদয় পিতা ছিলাম। পুত্র স্বীকার করে বলবে, নিশ্চয় আপনার ঋণ অসংখ্য। আমার জন্যে পৃথিবীতে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। অতঃপর পিতা বলবে, বৎস, আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী। তোমার পুণ্যসমূহের মধ্য থেকে আমাকে যৎসামান্য দিয়ে দাও এতে আমার মুক্তি হয়ে যাবে। পুত্র বলবে, পিতা আপনি সামান্য বস্তুই চেয়েছেন — কিন্তু আমি কি করব, যদি আমি তা আপনাকে দিয়ে দেই, তবে আমারও যে সে অবস্থা হবে। অতএব আমি অক্ষম। অতঃপর সে তার সহধর্মীনিকেও এই কথা বলবে যে, দুনিয়াতে আমি তোমার জন্যে সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি। আজ তোমার সামান্য পুণ্য আমি চাই। তা দিয়ে দাও। সহধর্মীনীও পুত্রের অনুরূপ জওয়াব দেবে।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢٠﴾
وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَآءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ
إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي
الْقُبُوْرِ ﴿٢٢﴾ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ ﴿٢٣﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ
بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ﴿٢٤﴾
وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ
أَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٢٦﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ
اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا
أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ
وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ
يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوْا مِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴿٢٩﴾

(১৯) দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন সমান নয়। (২০) সমান নয় অন্ধকার ও আলো। (২১) সমান নয় ছায়া ও তপ্তরোদ। (২২) আরও সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্ শ্রবণ করান যাকে ইচ্ছা। আপনি কবরে শায়িতদেরকে শুনাতে সক্ষম নন। (২৩) আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী। (২৪) আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি। (২৫) তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা এবং উজ্জ্বল কিতাবসহ এসেছিলেন। (২৬) অতঃপর আমি কাফেরদেরকে ধৃত করেছিলাম। কেমন ছিল আমার আযাব। (২৭) তুমি কি দেখনি আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দ্বারা আমি বিভিন্ন বর্ণের ফল-মূল উদগত করি। পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ — সাদা, লাল ও নিকষ কালো কৃষ্ণ, (২৮) অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু, চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ক্ষমাময়। (২৯) যারা আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না।

হযরত ইকরিমা বলেন, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى বাক্যের অর্থ তাই। কোরআন পাক একাধিক আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ এ আয়াতের শুরুতে কাফেরদের-কে মৃতদের সাথে এবং মুমিনগণকে জীবিতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এরই সাথে সামঞ্জস্য রেখে مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ (কবরস্থ লোক)-এর অর্থ হবে কাফের। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি যেমন মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না, তেমনি এই জীবিত কাফেরদেরও বোঝাতে পারবেন না।

এ আয়াত পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে শ্রবণ করানোর অর্থ উপকারী ও কার্যকররূপে শোনানো।

ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ফল-মূলের اختلاف الوان তথা বর্ণ বৈচিত্র্যকে ব্যাকরণিক প্রকরণের দিক দিয়ে অবস্থাজ্ঞাপক বানিয়ে **مختلف** শব্দটিকে منصوب উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর পাহাড়, মানুষ, চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদির **اختلاف** তথা বর্ণ-বৈচিত্র্যকে **صفت** এর আকারে **مختلف** অর্থাৎ, مرفوع বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ফল-মূলের বর্ণ-বৈচিত্র্য এক অবস্থায় স্থির থাকে না— প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু পাহাড়,মানুষ ও জীব-জন্তুর বর্ণ সাধারণতঃ অপরিবর্তিত থাকে।

আর পর্বতের ক্ষেত্রে جُدَدٌ বলা হয়েছে। جُدَدٌ শব্দটি جدة এর বহুবচন। এর প্রসিদ্ধ অর্থ ছোট গিরিপথ, যাকে جاده ও বলা হয়। কেউ কেউ جدة এর অর্থ নিয়েছেন অংশ বা খণ্ড। উভয় অবস্থার উদ্দেশ্য পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হওয়া। এতে সর্বপ্রথম সাদা ও সর্বশেষে কাল রঙ উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝখানে লাল উল্লেখ করে مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهٗ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, দুনিয়াতে আসল বর্ণ দু'টি— সাদা ও কাল। অবশিষ্ট সব বর্ণ এ দু'টির বিভিন্ন স্তরের সংমিশ্রনে গঠিত হয়।

كَذٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا অধিকাংশ তফসীর-বিদের মতে এখানে كَذٰلِكَ শব্দের পর বিরতি রয়েছে যা এ বিষয়ের আলামত যে, এটা পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিভিন্ন প্রকারে ও বর্ণে প্রজ্ঞাসহকারে সৃষ্টি করা আল্লাহ্ তাআলার অসীম শক্তি ও প্রজ্ঞার উজ্জ্বল নিদর্শন।

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, كَذٰلِكَ শব্দের সম্পর্ক পরবর্তী বাক্যের সাথে। অর্থাৎ, ফল-মূল, পাহাড়, মানুষ, ও জীবজন্তু সর্বদা বিভিন্ন রকম। কেউ এর সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করে এবং কেউ কম। এটা জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। যার জ্ঞান যে পর্যায়ের তার খোদা-ভীতিও সে পর্যায়ের হয়ে থাকে।— (রূহুল-মা'আনী)

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ এতে নবী করীম (সাঃ)- কে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশে বলা হয়েছিল যে, আপনার সতর্কীকরণ ও প্রচারের উপকার তারাই লাভ করে, যারা না দেখে আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করে। এর সাথে সংগতি রেখে আলোচ্য إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ আয়াতে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা খোদাভীতি

অর্জন করেছে। পূর্বে যেমন কাফের ও তাদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে, তেমনি এখানে ওলী-আল্লাহ্গণের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। إِنَّمَا শব্দটি আরবীতে সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়। তাই এ বাক্যের বাহ্যিক অর্থ এই যে, কেবল আলেম ও জ্ঞানীগণই আল্লাহ্কে ভয় করে। কিন্তু ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, إِنَّمَا শব্দটি যেমন সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রকাশ করে তেমনি কারও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়ও এটি ব্যবহৃত হয়। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ খোদাভীতি আলেমগণের বিশেষ ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যে আলেম নয় তার মধ্যে খোদাভীতি না থাকা জরুরী হয় না।— (বাহরে মুহীত, আবু হাইয়ান।)

আয়াতে علماء বলে এমন লোক বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং পৃথিবীর সৃষ্টবস্তু সামগ্রী, তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আল্লাহ্র দয়া-করুণা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন। কেবল আরবী ভাষা, ব্যাকরণ-অলংকারাদি সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিকেই কোরআনের পরিভাষায় আলেম বলা হয় না, যে পর্যন্ত সে আল্লাহ্র মারেফত উপরোক্তরূপে অর্জন না করে।

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, সে ব্যক্তিই আলেম যে একান্তে ও জনসমক্ষে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ যা পছন্দ করেন, তা কামনা করে এবং আল্লাহ্ যা অপছন্দ করেন, সে তাকে ঘৃণা করে।

সারকথা, যার মধ্যে যে পরিমাণ খোদাভীতি হবে, সে সেই পরিমাণ আলেম হবে। আহমদ ইবনে সালেহ্ মিসরী বলেন, অধিক রেওয়ায়েত ও অধিক জ্ঞান দ্বারা খোদাভীতির পরিচয় পাওয়া যায় না; বরং কোরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ দ্বারা এর পরিচয় পাওয়া যায়।— (ইবনে-কাসীর)

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহ্রাওয়ার্দী (রহঃ) বলেন— এ আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যার মধ্যে খোদাভীতি নেই, সে আলেম নয়। —(মাযহারী)

তবে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আল্লাহ্র ভয় নেই; এমনও তো অনেক আলেম দেখা যায়— উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বলার আর অবকাশ নেই। কেননা, উপরের বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্র কাছে কেবল আরবী জানার নাম এলম এবং যে তা জানে তার নাম আলেম নয়। যার মধ্যে আল্লাহ্র ভয় নেই, কোরআনের পরিভাষায় সে আলেমই নয়। তবে এই ভয় কোন সময় কেবল বিশ্বাসগত ও যৌক্তিক হয়ে থাকে। এর কারণে মানুষ নিজের উপর জোর দিয়ে শরীয়তের বিধিনিষেধ পালন করে। আবার কখনও এই ভয় বদ্ধমূল অভ্যাসের পর্যায়ে পৌছে যায়। এ পর্যায়ে শরীয়তের অনুসরণ মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায়। এই দুই স্তরের ভয়ের মধ্যে প্রথমটি অবলম্বন করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং এটা আলেমের জন্যে জরুরী। দ্বিতীয়টি অবলম্বন করা উত্তম —জরুরী নয়।—(বয়ানুল-কোরআন)

পূর্ববর্তী এক আয়াতে খোদাতত্ত্ব-জ্ঞানী হক্কানী আলেমগণের একটি বৈশিষ্ট্য—আল্লাহ্র প্রতি ভয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিষয়টির সম্পর্ক ছিল অন্তরের সাথে। আলোচ্য প্রথম আয়াতে তাদেরই এমন কতিপয় গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হচ্ছে, যেগুলোর সম্পর্ক দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। অর্থাৎ, এগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আদায় করা হয়। তন্মধ্যে প্রথম গুণ হচ্ছে তেলাওয়াতে কোরআন। আয়াতে এমন লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা নিয়মিতভাবে সর্বদা কোরআন তেলাওয়াত করে।

দ্বিতীয় গুণ নামায কায়েম করা এবং তৃতীয় গুণ আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করা। এর সাথে 'গোপনে ও প্রকাশ্যে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অধিকাংশ এবাদত গোপনে করাই উত্তম। কিন্তু ধর্মীয় উপযোগীতার কারণে মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও জরুরী হয়ে যায়। যেমন, মিনারে আযান দিয়ে অধিকতর লোক সমাগমের ব্যবস্থা করে জমাআতে নামায আদায় করার বিধান রয়েছে। এমনিভাবে অপরকে উৎসাহিত করার জন্যে মাঝে মাঝে আল্লাহ্র পথে প্রকাশ্যে দান করা জরুরী হয় যায়। নামায ও আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে ফেকাহ্বিদগণ বলেন, ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ হলে প্রকাশ্যে করা উত্তম। এছাড়া নফল নামায ও নফল ব্যয় গোপনে করাই বাঞ্ছনীয়।

যারা উপরোক্ত তিনটি গুণের অধিকারী, তাদের সম্পর্কে অতঃপর বলা হয়েছে يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ - تَبُورَ শব্দটি بوار থেকে উদ্ভূত। অর্থ বিনষ্ট হওয়া। আয়াতে অর্থ হচ্ছে যে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে লোকসানের আশংকা নেই। প্রার্থী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে দুনিয়াতে মুমিনের জন্যে কোন সৎকাজে সওয়াব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার অবকাশ নেই। কেননা, পূর্ণ ক্ষমা ও বখশিস কেবল মানুষের কর্মের বিনিময়েই সম্ভবপর নয়। মানুষ যত কর্মই করুক আল্লাহ্র মহিমা ও প্রাপ্য এবাদতের পক্ষে তা যথেষ্ট হতে পারে না। কাজেই আল্লাহ্র কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কারও মাগফেরাত হবে না। এক হাদীসে তাই বলা হয়েছে। এছাড়া অনেক সৎকর্মে গোপন শয়তানী অথবা রিপুগত চক্রান্তও শামিল হয়ে যায়। ফলে সে সৎকর্ম কবুল হয় না। মাঝে মাঝে সৎকর্মের পাশাপাশি কোন মন্দ কর্মও হয়ে যায় যা সৎকর্ম কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাই আয়াতে يَرْجُونَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাবতীয় সৎকর্ম সম্পাদন করার পরও মুক্তি ও উচ্চ মর্যাদা লাভে নিশ্চিত হওয়ার অধিকার কারও নেই— বেশীর চেয়ে বেশী আশাই করতে পারে।—(রুহুল-মা'আনী)

সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে ঃ এ আয়াতে বর্ণিত সৎকর্মসমূহকে রূপক অর্থে ও উদাহরণ স্বরূপ ব্যবসা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে ঈমান এবং আল্লাহ্র পথে জেহাদকেও ব্যবসা বলা হয়েছে।

সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে এ অর্থে যে, ব্যবসায়ী এ আশায় পুঁজি বিনিয়োগ করে যে, এতে তার পুঁজি বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফা অর্জিত হবে। কিন্তু দুনিয়ার প্রতিটি ব্যবসায়ে মুনাফার সাথে সাথে লোকসানেরও আশংকা থাকে। আলোচ্য আয়াতে ব্যবসায়ের সাথে لَّن تَبُورَ শব্দ যোগ করে ইশারা করা হয়েছে যে, পরকালের এই ব্যবসায়ে লোকসান ও ক্ষতির কোন আশংকা নেই। সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ সৎকর্মে কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে দুনিয়ার সাধারণ ব্যবসায়ের মত কোন ব্যবসা করে না, বরং তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে কখনও লোকসান হয় না। 'তারা প্রার্থী— একথা বলে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তিনি প্রার্থীদেরকে নিরাশ করবেন না; বরং তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। পরবর্তী বাক্যে আরও বলা হয়েছে যে, তাদের আশা তো কেবল কর্মের পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া পর্যন্ত সীমিত; কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কৃপায় তাদের আশা অপেক্ষাও বেশী দান করবেন।

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ
شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا
الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ
هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ
فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا
لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ
لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ
عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ
يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ
الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ
تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾

(৩০) পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ্ তাদের সওয়াব পুরোপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩১) আমি আপনার প্রতি যে কিতাব প্রত্যাদেশ করেছি, তা সত্য — পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সব জানেন, দেখেন। (৩২) অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ। (৩৩) তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জান্নাতে। তথায় তারা স্বর্ণনির্মিত, মোতি খচিত কংকন দ্বারা অলংকৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। (৩৪) আর তারা বলবে— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩৫) যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন, তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না ক্লান্তি। (৩৬) আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। (৩৭) সেখানে তারা আর্ত চীৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব,পূর্বে যা করতাম, তা করব না। (আল্লাহ্ বলবেন,) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ এখানে لِيُوَفِّيَهُمْ শব্দটি لَنْ تَبُورَ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, তাদের ব্যবসায়ে লোকসান তো হবেই না, উপরন্তু আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান ও সওয়াব পুরোপুরি দেয়ার পরেও স্বীয় অনুগ্রহে তাদের ধারণাতীত অনেক বেশী দেবেন।

এই বেশীর মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার সে ওয়াদাও অন্তর্ভুক্ত, যাতে বলা হয়েছে, মুমিনের পুরস্কার আল্লাহ্ তাআলা বহুগুণ বেশী দান করেন, যা কমপক্ষে কৃতকর্মের দশগুণ এবং বেশীর পক্ষে সাতশ' গুণ বা তার চেয়েও বেশী। অন্যান্য পাপীর জন্যে মুমিনের সুপারিশ কবুল করাও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের শামিল। এ অনুগ্রহের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুমিনের প্রতি দুনিয়াতে যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছিল, পরকালে মুমিন তার জন্যে সুপারিশ করবে। ফলে জাহান্নামের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মুমিনের সুপারিশে সে মুক্তি পাবে।—(মাযহারী)

বলাবাহুল্য, সুপারিশ কেবল ঈমানদারের জন্যে হতে পারবে, কাফেরের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেয়া হবে না। এমনিভাবে জান্নাতে আল্লাহ্ তাআলার দীদারও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের প্রধান অংশ।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا – ثُمَّ অব্যয়টি পূর্বাপর সংযোগ স্থাপনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। ফলে বোঝা যায় পূর্বাপর উভয় বাক্য অভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। পূর্ববর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু পূর্বে এবং পরবর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু পরে বোঝায়। অতঃপর এই পূর্বাপর কখনও কালের দিক দিয়ে এবং কখনও মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়েও হয়। এ আয়াতে ثم অব্যয় দ্বারা পূর্বের আয়াতে বর্ণিত أَوْحَيْنَا বাক্যের উপর عطف করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি এই সত্য ও পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবসমূহের সমর্থক কোরআন প্রথমে আপনার কাছে প্রত্যাদেশ করেছি। এরপর আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকেও এর অধিকারী করেছি। এখন এটা সুস্পষ্ট যে, কোরআন ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে প্রেরণ করা মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়ে অগ্রে এবং উম্মতে মোহাম্মদীকে দান করা পশ্চাতে হয়েছে। উম্মতকে কোরআনের অধিকারী করার অর্থ এও হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উম্মতের জন্যে অর্থ-কড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র কিতাব রেখে গেছেন।

উম্মতে মুহাম্মদী বিশেষতঃ আলেমগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا অর্থাৎ, আমার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। অধিকাংশ তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন উম্মতে মুহাম্মদী। এতে আলেমগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য মুসলমানগণ আলেমগণের মধ্যস্থতায় এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا বলে উম্মতে মুহাম্মদীকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে তাঁর প্রত্যেকটি অবতীর্ণ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন। (অর্থাৎ, কোরআন পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক বিধায় সমস্ত ঐশীগ্রন্থের বিষয়বস্তুর সমষ্টি। এর উত্তরাধিকারী হওয়া যেন সমস্ত আসমানী কিতাবেরই

উত্তরাধিকারী হওয়া।) অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ

"এ উম্মতের যালেমদেরকেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করা হবে, মধ্যপন্থীদের হিসাব সহজভাবে নেয়া হবে, আর যারা সৎকর্মে অগ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।—(ইবনে-কাসীর)

আয়াতের اصْطَفَيْنَا শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর সর্ববৃহৎ শ্রেষ্ঠত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। কেননা, এ শব্দটি কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হয়েছে। এক আয়াতে আছে— اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা উম্মতে-মুহাম্মদীকে اصطفا । অর্থাৎ, মনোনয়নে পয়গম্বরগণের সাথে শরীক করে দিয়েছেন। তবে মনোনয়নের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। পয়গম্বর ও ফেরেশতাগণের মনোনয়ন উচ্চস্তরে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর মনোনয়ন এর পরের স্তরে হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী তিন প্রকার ঃ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرٰتِ এই বাক্যটি প্রথমোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ, আমি যাদেরকে মনোনীত করে কোরআনের অধিকারী করেছি, তারা তিন প্রকার। যালেম, মধ্যপন্থী ও সৎকর্মে অগ্রগামী।

ইবনে-কাসীর এই প্রকারত্রয়ের তফসীর এভাবে করেছেন ঃ যালেম সে ব্যক্তি যে কোন কোন ফরয ও ওয়াজিব কাজে ত্রুটি করে এবং কোন কোন নিষিদ্ধ কজেও জড়িত হয়ে পড়ে। মধ্যপন্থী সে ব্যক্তি, যে সমস্ত ফরয ও ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্য থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু মাঝে মাঝে কোন কোন মোস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয় এবং কোন কোন মাকরূহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। সৎকর্মে অগ্রগামী সে ব্যক্তি, যে যাবতীয় ফরয, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু কোন কোন মোবাহ্ বিষয়, এবাদতে ব্যাপৃত থাকার কারণে অথবা হারাম সন্দেহে ছেড়ে দেয়।—(ইবনে-কাসীর)

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব ঃ উল্লেখিত তফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, যালেমও আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। একে বাহ্যতঃ অবাস্তব মনে করে কেউ কেউ বলেছেন যে, যালেম উম্মতে মুহাম্মদী ও মনোনীতদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ অনেক সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ তিন প্রকার লোকই উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত এবং اصْطَفَيْنَا গুণের বাইরে নয়। এটি হল উম্মতে মুহাম্মদীর মুমিন বান্দাদের একান্ত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কার্যতঃ ত্রুটিযুক্ত, সেও এই মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। ইবনে-কাসীর এ প্রসঙ্গে এ সম্পর্কিত সমুদয় হাদীস সমাবেশ করেছেন।

উম্মতে মুহাম্মদীর আলেম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকে আমার কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্র কিতাব ও রসূল (সাঃ)-এর শিক্ষার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী হচ্ছেন ওলামায়ে কেরাম। হাদীসেও বলা হয়েছে – العلماء ورثة الانبياء – এর সারমর্ম এই যে, যারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রচারকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং নিষ্ঠাসহকারে এ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন, তারা আল্লাহ্ মনোনীত বান্দা ও ওলী। হযরত সা'লাবা ইবনে হাকাম (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা আলেমগণকে সম্বোধন করে বলবেন, আমি তোমাদের বক্ষে আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শুধু এজন্যে রেখেছিলাম যে, তোমরা যে কর্মই কর না কেন, তোমাদেরকে ক্ষমা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, যার মধ্যে আল্লাহ্র ভয় নেই, সে আলেমগণের তালিকাভুক্ত নয়; তাই আল্লাহ্ ভীতির রঙে রঞ্জিত আলেমগণকেই এই সম্বোধন করা হবে। তাঁদের পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে পাপ কর্মে লেগে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তবে মানুষ হিসেবে তারাও মাঝে-মাঝে ভুল-ত্রুটি করেন। হাদীসে তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদের কর্ম যেমনই হোক, মাগফেরাত তোমাদের জন্যে অবধারিত।— (ইবনে কাসীর)

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, হাশরে আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে একত্রিত করবেন, অতঃপর আলেমগণকে এক বিশেষ জায়গায় সমবেত করে বলবেন ঃ

"আমি তোমাদের অন্তরে আমার এলেম এ জন্যে রেখেছিলাম যে, আমি জানতাম (যে, তোমরা এই আমানতের হক আদায় করবে।) তোমাদেরকে আযাব দেয়ার জন্যে তোমাদের বক্ষে আমি আমার এলেম রাখিনি। যাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।—(মাযহারী)

জ্ঞাতব্য ঃ আয়াতে সর্বপ্রথম জালেম, অতঃপর মিতাচারী বা মধ্যপন্থী ও সর্বশেষে সৎকর্মে অগ্রগামী উল্লেখিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, যালেমের সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের চেয়ে কম মিতাচারী মধ্যপন্থী এবং আরও কম সৎকর্মে অগ্রগামী। যাদের সংখ্যা বেশী, তাদেরকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۚ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

অর্থাৎ, শুরুতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মনোনীত বান্দাগণের মধ্যে তিন প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন – ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ অর্থাৎ,এদেরকে মনোনীতদের মধ্যে গণ্য করা আল্লাহ্ তাআলার মহা অনুগ্রহ। প্রতিদান স্বরূপ তারা জান্নাতে যাবে, তাদেরকে স্বর্ণের কংকন এবং মুক্তার অলংকার পরানো হবে। তাদের পোষাক হবে রেশমের।

দুনিয়াতে পুরুষদের জন্যে স্বর্ণের অলংকার ও রেশমী পোষাক উভয়টি পরিধান করা হারাম। এর বিনিময়ে জান্নাতে তাদেরকে এসব বস্তু দেয়া হবে। এরূপ বলা ঠিক হবে না যে, অলংকার নারীর ভূষণ, পুরুষদের জন্যে শোভনীয় নয়। কেননা, দুনিয়ার অবস্থার সাথে জান্নাত ও পরকালের অবস্থার তুলনা করা একান্ত নির্বুদ্ধিতা।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, জান্নাতীদের মস্তকে মুক্তা খচিত মুকুট থাকবে। এর নিম্নস্তরের মুক্তার আলোকে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত উদ্ভাসিত হবে। —(মাযহারী)

তফসীরবিদগণ বলেন, প্রত্যেক জান্নাতীর হাতে একটি স্বর্ণ নির্মিত ও একটি রৌপ্যনির্মিত কংকন থাকবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের এক আয়াতে স্বর্ণ নির্মিত এবং এক আয়াতে রৌপ্য নির্মিত কংকনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ তফসীর দৃষ্টে উভয় আয়াতে কোন বৈপরীত্য নেই।— (কুরতুবী)

দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্র ও রেশমী পোষাক ব্যবহার করবে, সে জান্নাতে এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, রেশমী পোষাক পরিধান

করো না; সোনা-রূপার পাত্রে পানি পান করো না এবং এসবের দ্বারা তৈরী পাত্রে আহার করো না। কারণ, এগুলো দুনিয়াতে কাফেরদের জন্যে এবং তোমাদের জন্যে পরকালে।— (বোখারী-মুসলিম)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ — অর্থাৎ, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় বলবে, আল্লাহ্‌র শোকর, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। এই দুঃখ কি? এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার দুঃখই এর অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়াতে মানুষ যত রাজাধিরাজ অথবা নবী ও ওলী হোক না কেন, দুঃখকষ্টের কবল থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই।

এ কারণেই সূফীবর্গ দুনিয়াকে "দারুল-আহযান" দুঃখ কষ্টের আলয় বলেন। আয়াতে উল্লেখিত দুঃখের মধ্যে প্রথমতঃ দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখ, দ্বিতীয়তঃ কেয়ামত ও হাশর-নশরের দুঃখ-কষ্ট, তৃতীয়তঃ হিসাব-নিকাশের দুঃখ-কষ্ট এবং চতুর্থতঃ জাহান্নামের শাস্তি ও দুঃখ কষ্টও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতীদের এসব দুঃখ-কষ্টই দূর করে দেবেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমায় বিশ্বাসী, তারা মৃত্যুর সময়, কবরে ও হাশরে কোথাও উৎকণ্ঠা বোধ করে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তারা কবর থেকে উঠার সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ বলতে বলতে উঠছে।— (তিবরানী, মাযহারী)

হযরত আবুদ্দারদার হাদীসে বলা হয়েছে যে, উল্লেখিত যালেম শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা এ উক্তি করবে। কেননা, হাশরে সে প্রথমে দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগের সম্মুখীন হবে। অবশেষে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ পাওয়ার কারণে তার এসব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এ হাদীসটি ইবনে ওমরের হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা, যালেম ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় হাশরেও একটি অতিরিক্ত দুঃখের সম্মুখীন হবে, যা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দূর হয়ে যাবে। সারকথা, সৎকর্মে অগ্রগামী, মিতাচারী ও যালেম সকল শ্রেণীর জান্নাতীই এ উক্তি করবে; কিন্তু প্রত্যেকের দুঃখের তালিকা আলাদা আলাদা হওয়া অবান্তর নয়।

ইমাম জাস্সাস বলেন, পার্থিব জীবনে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত না থাকাই মুমিনের শান। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, দুনিয়া মুমিনের জন্যে কয়েদখানা। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও প্রধান সাহাবীগণের জীবনালেখ্যে দেখা যায়, তাদেরকে প্রায়ই চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখা যেত।

الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ

আয়াতে জান্নাতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে। (এক) জান্নাতে বসবাসের জায়গা। এর বিলুপ্তি অথবা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কোনও আশংকা নেই। (দুই) সেখানে কেউ কোন দুঃখের সম্মুখীন হবে না। (তিন) সেখানে কেউ কোন ক্লান্তিও বোধ করবে না। দুনিয়াতে মানুষ ক্লান্ত হয় এবং কাজকর্ম পরিহার করে নিদ্রার প্রয়োজন অনুভব করে জান্নাত এ থেকে পবিত্র হবে। কোন কোন হাদীসেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত রয়েছে।— (মাযহারী)

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ - অর্থাৎ, জাহান্নামে যখন কাফেররা ফরিযাদ করবে যে, হে আমাদের পালনকর্তা; আমাদেরকে এ আযাব থেকে মুক্ত করুন, আমরা সৎকর্ম করব এবং অতীত কুকর্ম ছেড়ে দেব, তখন জওয়াব দেয়া হবে যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করে বিশুদ্ধ পথে আসতে পারে? হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে জয়নুল আবেদীন (রাঃ) বলেন, এর অর্থ সতের বছর বয়স। হযরত কাতাদাহ্ আঠার বছর বয়স বলেছেন। আসল অর্থ সাবালক হওয়ার বয়স। এতে সতর বা আঠারোর পার্থক্য হতে পারে। কেউ সতের বছরে এবং কেউ আঠারো বছরে সাবালক হতে পারে। শরীয়তে এ বয়সটি প্রথম সীমা, যাতে প্রবেশ করার পর মানুষকে নিজের ভাল-মন্দ বোঝার জ্ঞান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দান করা হয়। তাই সাধারণ কাফেরদেরকে উপরোক্ত কথাটি বলা হবে, তারা বয়োবৃদ্ধ হোক অথবা অল্পবয়স্ক। তবে যে ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার পরও সতর্ক হয়নি এবং প্রকৃতির প্রমাণাদি দেখে ও পয়গম্বরগণের কথাবার্তা শুনে সত্যের পরিচয় গ্রহণ করেনি সে অধিক ধিক্কারযোগ্য হবে।

সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি কেবল সাবালক হওয়ার বয়স পায়, তাকেও আল্লাহ্ তাআলা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা দান করেন। সে তা না বুঝলে তিরস্কার ও আযাবের যোগ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দীর্ঘ বয়স পায়, তার সামনে আল্লাহ্‌র প্রমাণাদি আরও পূর্ণ হয়ে যায়। সে কুফর ও গোনাহ্ থেকে বিরত না হলে অধিকতর শাস্তি ও তিরস্কারের যোগ্য হবে।

হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা যে বয়সে গোনাহ্‌গার বান্দাদেরকে লজ্জা দেন, তা হচ্ছে ষাট বছর। হযরত ইবনে আব্বাসও এক রেওয়ায়েতে চল্লিশ ও অন্য রেওয়ায়েতে ষাট বছর বলেছেন। এ বয়সে মানুষের উপর আল্লাহ্‌র প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষের জন্যে কোন ওযর আপত্তি পেশ করার অবকাশ থাকে না। ইবনে-কাসীর হযরত ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সতের আঠারো বছর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতও ষাট বছরের রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সতের আঠার বছর বয়সে মানুষ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। এ কারণেই এ বয়স থেকে সে শরীয়তের বিধানাবলী পালনে আদিষ্ট হয়। কিন্তু ষাট বছর এমন সুদীর্ঘ বয়স যে, এতেও কেউ সত্যের পরিচয় লাভ না করলে তার ওযর আপত্তি করার কোন অবকাশ থাকে না। এ কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীর বয়সের গড় ষাট থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ এতে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষকে সাবালকত্বের বয়স থেকে কমপক্ষে তার স্রষ্টা ও মালিককে চিনা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি প্রদান করা হয়। এ কাজের জন্যে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা শুধু তা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং তার বুদ্ধিকে সাহায্য করার জন্যে ভীতি-প্রদর্শনকারীও প্রেরণ করেছেন। "নযীর" শব্দের অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী। প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই নযীর তথা ভীতি প্রদর্শনকারী যে স্বীয় কৃপাগুণে নিজের লোকদেরকে ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়। কোরআন পাকে এ শব্দের দ্বারা পয়গম্বরগণ ও তাঁদের নায়েব আলেমগণকে বোঝানো হয়। আয়াতের সারমর্ম এই যে, সত্য মিথ্যার পরিচয় লাভ করার জন্যে আমি জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছি, পয়গম্বরও প্রেরণ করেছি।

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ
فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا
مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ
شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا
مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا
فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِنْهُ ۚ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ
بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ
أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى
الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾ اسْتِكْبَارًا
فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا
بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

(৩৮) আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত। (৩৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন। অতএব যে কুফরী করবে তার কুফরী তার উপরই বর্তাবে। কাফেরদের কুফর কেবল তাদের পালনকর্তার ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের কুফর কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (৪০) বলুন, তোমরা কি তোমাদের সে শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ, যাদেরকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা ডাক? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও। না আসমান সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে, না আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি যে, তারা তার দলীলের উপর কায়েম রয়েছে, বরং জালেমরা একে অপরকে কেবল প্রতারণামূলক ওয়াদা দিয়ে থাকে। (৪১) নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশালী। (৪২) তারা জোর শপথ করে বলত, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আগমন করলে তারা অন্য যে কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর সৎপথে চলবে। অতঃপর যখন তাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করল, তখন তাদের ঘৃণাই কেবল বেড়ে গেল। (৪৩) পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যের কারণে এবং কুচক্রের কারণে। কুচক্র কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। তারা কেবল পূর্ববর্তীদের দশারই অপেক্ষা করছে। অতএব আপনি আল্লাহ্‌র বিধানে পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহ্‌র রীতি-নীতিতে কোন রকম বিচ্যুতিও পাবেননা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ — خَلَائِفَ শব্দটি خليفة এর বহুবচন। অর্থ স্থলাভিষিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে একের পর এক ভূমি, বাসগৃহ ইত্যাদির মালিক করেছি। একজন চলে গেলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে আল্লাহ্ তাআলার দিকে রুজু করার জন্য শিক্ষা রয়েছে। আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকেও বলা হতে পারে যে, আমি বিগত জাতিসমূহের পরে তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে তোমাদেরকে মালিক ও ক্ষমতাশালী করেছি। সুতরাং পূর্ববর্তীদের অবস্থা থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। জীবনের সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারিও না।

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ — আকাশসমূহকে স্থির রাখার অর্থ এরূপ নয় যে, তাদের গতিশীলতা রহিত করে দেয়া হয়েছে; বরং এর অর্থ স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হওয়া ও টলে যাওয়া। — أَنْ تَزُولَا শব্দটি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং এ আয়াতে আকাশ স্থিতিশীল অথবা গতিশীল – এ বিষয়ের কোন প্রমাণ নেই।

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ — وَلَا يَحِيقُ অর্থ لا يحيط কিংবা لا يصيب — অর্থাৎ, কুচক্রের শাস্তি অন্য কারও উপর পতিত হয় না — কুচক্রীর উপরই পতিত হয়। যে ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট কামনা করে, সে নিজেই অনিষ্টের শিকার হয়ে যায়।

এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, দুনিয়াতে অনেক সময় কুচক্রীদের চক্রান্ত সফল হতে দেখা যায় এবং যার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকে, তার ক্ষতি হয়ে যায়। এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, এটা তুচ্ছ ক্ষতি। আর কুচক্রীর ক্ষতি হচ্ছে পারলৌকিক আযাব, যা যেমন গুরুতর, তেমনি চিরস্থায়ী। এর বিপরীতে পার্থিব ক্ষতি তুচ্ছ ব্যাপার।

কেউ কেউ এর জওয়াবে বলেন, কোন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা ও তার উপর যুলুম করার প্রতিফল জালেমের উপর প্রায়ই দুনিয়াতেও পতিত হয়। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কোরাযী বলেন ঃ তিনটি কাজ যারা করে, তারা দুনিয়াতেও প্রতিফল ও শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। (এক) কোন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে কষ্ট দেয়া, (দুই) যুলুম করা এবং (তিন) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।— (ইবনে-কাসীর)

বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অসহায় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি রাখে না অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও সবর করে, তার উপর জুলুমের শাস্তি থেকে দুনিয়াতেও কাউকে বাঁচতে দেখা যায়নি।

সুতরাং আয়াতে সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়নি ; বরং অধিকাংশ ঘটনার দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

سورة يٰسٓ مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يس ﴿١﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

(৪৪) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখত তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আকাশ ও পৃথিবীতে কোন কিছুই আল্লাহ্কে অপারগ করতে পারে না। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। (৪৫) যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন সে নির্দিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে তখন আল্লাহ্‌র সব বান্দা তাঁর দৃষ্টিতে থাকবে।

সূরা ইয়াসীন

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৮৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) ইয়া-সীন, (২) প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম (৩) নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রসূলগণের একজন, (৪) সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। (৫) কোরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ, (৬) যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করেন, যাদের পূর্ব পুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফেল। (৭) তাদের অধিকাংশের জন্যে শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (৮) আমি তাদের গর্দানে চিবুক পর্যন্ত বেড়ী পরিয়েছি। ফলে তাদের মস্তক উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। (৯) আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না।

সূরা ইয়াসীন

সূরা ইয়াসীনের ফযিলত ঃ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, يس قلب القران অর্থাৎ, সূরা ইয়াসীন কোরআনের হৃদপিণ্ড। এ হাদীসে আরও আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন আল্লাহ্ ও পরকালের কল্যাণ লাভের নিয়তে পাঠ করে, তার মাগফেরাত হয়ে যায়। তোমরা তোমাদের মৃতদের উপর এ সূরা পাঠ কর। — (রূহুল-মা'আনী, মাযহারী)

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, সূরা ইয়াসীনকে কোরআনের হৃদপিণ্ড বলার কারণ এমনও হতে পারে যে, এ সূরায় কেয়ামত ও হাশর-নশরের বিষয় বিশদ ব্যাখ্যা ও অলংকার সহকারে বর্ণিত হয়েছে। পরকালে বিশ্বাস ঈমানের এমন একটি মূলনীতি, যার উপর মানুষের সকল আমল ও আচরণের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল। পরকালভীতিই মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং অবৈধ বাসনা ও হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে। অতএব দেহের সুস্থতা যেমন অন্তরের সুস্থতার উপর নির্ভরশীল তেমনি ঈমানের সুস্থতা পরকাল চিন্তার উপর নির্ভরশীল। (রূহুল-মা'আনী) এ সূরার নাম যেমন সূরা-ইয়াসীন প্রসিদ্ধ, তেমন এক হাদীসে এর নাম ''আযীমা''ও বর্ণিত আছে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, তওরাতে এ সূরার নাম ''মুয়িম্মাহ্'' বলে উল্লেখিত আছে। অর্থাৎ, এ সূরা তার পাঠকের জন্যে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও বরকত ব্যাপক করে দেয়। এ সূরার পাঠকের নাম ''শরীফ'' বর্ণিত আছে। আরও বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন এর সুপারিশ ''রবীয়া'' গোত্র অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের জন্যে কবুল হবে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম ''মুদাফিয়াও'' বর্ণিত আছে; অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকদের থেকে বালা-মুসিবত দূর করে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম ''কাযিয়া'' - ও উল্লেখিত হয়েছে; অর্থাৎ, এ সূরা পাঠকের প্রয়োজন মিটায়। — (রূহুল-মা'আনী)

হযরত আবু যর (রাঃ) বর্ণনা করেন, মরণোন্মুখ ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হলে তার মৃত্যু সহজ হয়। — (মাযহারী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন তার অভাব-অনটনের বেলায় পাঠ করে, তবে তার অভাব পূরণ হয়ে যায়।—(মাযহারী)

ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাসীর বলেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে স্বস্তিতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে, সে সকাল পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে। তিনি আরও বলেন, আমাকে এ বিষয়টি এমন এক ব্যক্তি বলেছেন, যিনি এর বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। — (মাযহারী)

يس শব্দ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, এটা খণ্ড বাক্য। এর অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ কথাই বলা হয়েছে। আহ্কামূল-কোরআনে বর্ণিত ইমাম মালেকের উক্তি এই যে, এটা আল্লাহ্ তাআলার অন্যতম নাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এক রেওয়ায়েতে তাই বর্ণিত রয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা আবিসিনীয় শব্দ। এর অর্থ ''হে মানুষ'' আর এখানে মানুষ বলে নবী করীম (সাঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে জুবায়েরের (রাঃ) বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ''ইয়াসীন'' রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাম। রুহুল-মা'আনীতে আছে, ইয়া ও সীন — এ দু'টি অক্ষর দ্বারা নবী করীম (সাঃ)-এর নাম রাখার মধ্যে বিরাট রহস্য নিহিত।

ইয়াসীন কারও নাম রাখা কিরূপ ? ইমাম মালেক এটা পছন্দ করেননি। কারণ, তাঁর মতে এটা আল্লাহ্ তাআলার অন্যতম নাম এবং এর সঠিক অর্থ জানা নেই। কাজেই এর অর্থ رازق ও خالق এর ন্যায় আল্লাহ্ তাআলার বৈশিষ্ট্যমূলক কোন নাম হওয়াও সম্ভব। তবে শব্দটি يٰسِين বর্ণমালার মাধ্যমে লেখা হলে তা কারও নাম রাখা জায়েয। কারণ, কোরআনে سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ উল্লেখিত আছে। (ইবনে আরাবী)

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ – অর্থাৎ, আরবদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবত কোন সতর্ককারী পয়গম্বর আগমন করেননি। পিতৃপুরুষ অর্থ নিকটবর্তী পিতৃপুরুষ। আরবদের উর্ধ্বতন পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর সাথে হযরত ইসমাঈল (আঃ)–এর পর বহু শতাব্দী ধরে আরবদের মধ্যে কোন পয়গম্বর আবির্ভূত হননি। তবে দ্বীনের প্রচারকার্য সব সময়ই অব্যাহত ছিল, যার উল্লেখ কোরআন পাকের আয়াতেও আছে। এছাড়া وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ আয়াত দৃষ্টেও জানা যায় যে, আল্লাহ্র রহমত কোন জাতিকে কোন সময়ই দাওয়াত ও সতর্কীকরণ থেকে বঞ্চিত রাখেনি। এতদসত্ত্বেও প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দাওয়াত ততটুকু কার্যকর হয় না, যতটুকু স্বয়ং পয়গম্বরের দাওয়াত ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। তাই আয়াতে আরবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি। এরই ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে সাধারণভাবে শিক্ষা–দীক্ষার কোন সুদৃঢ় ব্যবস্থা ছিল না। আর এ কারণেই তাদের উপাধি ছিল 'উম্মী' অর্থাৎ নিরক্ষর।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۞ اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا

আল্লাহ্ তাআলা কুফর ও ঈমান এবং জান্নাত ও জাহান্নামের উভয় রাস্তা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। ঈমানের দাওয়াতের জন্যে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেছেন। মানুষকে ভাল মন্দ বিবেচনা করে যে কোন রাস্তা অবলম্বন করার ক্ষমতাও দান করেছেন। কিন্তু যে হতভাগা কুদরতের নিদর্শনাবলীতে চিন্তা–ভাবনা করে না, পয়গম্বরগণের দাওয়াতের প্রতি কর্ণপাত করে না এবং আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কেও চিন্তা–ভাবনা করে না, সে স্বেচ্ছায় যে পথ অবলম্বন করে নেয়, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য সে পথেরই উপকরণ সংগ্রহ করে দেন। যে কুফর অবলম্বন করে, তার জন্যে কুফরে উন্নতি লাভেরই ব্যবস্থা হতে থাকে। এ বিষয়টিই لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ লোকের জন্যে তাদের ভ্রান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কারণে এ উক্তি অবধারিত হয়ে গেছে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

অতঃপর তাদের অবস্থার একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের অবস্থা এমন যার গলদেশে বেড়ী পরিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে — নীচের দিকে তাকাতেই পারে না। অতএব তারা নিজেদেরকে কোন গর্তে পতিত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে না।

দ্বিতীয় উদাহরণ এমন— যেন কারও চারিদিকে দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা এই চার দেয়ালের অভ্যন্তরে আবদ্ধ হয়ে বাইরের বিষয়াদি সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে। ফলে এভাবে বাইরের সে কাফেরদের চারদিকেও যেন তাদের বিদ্বেষ ও হঠকারিতা অবরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে। সেই সত্য বিষয়াদি যেন তাদের কানে পৌঁছতেই পারে না।

ইমাম রাযী বলেন, দৃষ্টির বাধা দু'রকম হয়ে থাকে। একটি বাধা এমন যার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আপন সত্তাও দেখতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয় বাধা এমন যার ফলে নিজের আশেপাশে কিছুই দেখে না। কাফেরদের জন্যে সত্য দর্শনের পথে উভয় প্রকার বাধাই বিদ্যমান ছিল। তাই প্রথম উদাহরণে প্রথমোক্ত বাধা বর্ণিত হয়েছে। যার গলা নীচের দিকে নোয়াতে পারে না, যে নিজের অস্তিত্বও দেখতে পারে না। দ্বিতীয় উদাহরণ শেষোক্ত বাধা বিধৃত হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আশেপাশের কোন কিছুই দেখতে পায় না।— (রূহুল–মা'আনী)

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾
إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ
فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّأَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى
وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنٰهُ فِيْ
إِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ إِذْ
جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا
فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالُوْا
مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ
لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾ قَالُوْا
إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ
مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ أَئِنْ
ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا
الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾
اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾

(১০) আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে দু'য়েই সমান; তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (১১) আপনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ অনুসরণ করে এবং দয়াময় আল্লাহ্‌কে না দেখে ভয় করে। অতএব আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের। (১২) আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। (১৩) আপনি তাদের কাছে সে জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, যখন সেখানে রসূলগণ আগমন করেছিলেন। (১৪) আমি তাদের নিকট দু'জন রসূল প্রেরণ করেছিলাম, অতঃপর ওরা তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে। তারা সবাই বলল, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (১৫) তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, রহমান আল্লাহ্ কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলে যাচ্ছ। (১৬) রসূলগণ বলল, আমাদের পরওয়ারদেগার জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (১৭) পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব। (১৮) তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে অশুভ-অকল্যাণকর দেখছি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। (১৯) রসূলগণ বলল, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই! এটা কি এজন্যে যে, আমরা তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছি? বস্তুতঃ তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় বৈ নও। (২০) অতঃপর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর। (২১) অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করে না, অথচ তারা সুপথ প্রাপ্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ - অর্থাৎ, আমি তাদের সেসব কর্ম লিপিবদ্ধ করব, যা তারা পূর্বাহ্নে প্রেরণ করে। কর্ম সম্পাদনকে 'পূর্বাহ্নে প্রেরণ করা' বলে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যেসব ভাল-মন্দ কর্ম দুনিয়াতে কর, সেগুলো এখানেই খতম হয়ে যায় না; বরং এগুলো তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বল হয়ে তোমাদের মৃত্যুর পূর্বেই পৌঁছে যায়, যার সাথে পর-জীবনে সাক্ষাৎ ঘটবে। তা সৎকর্ম হলে জান্নাতের কুসুমাস্তীর্ণ উদ্যানে পরিণত হবে এবং অসৎকর্ম হলে জাহান্নামের অঙ্গারের আকার ধারণ করবে। লিপিবদ্ধ করার আসল উদ্দেশ্য সংরক্ষিত করা। লিপিবদ্ধ করাও এর এক উপায়, যাতে ভুল-ভ্রান্তির ও কম-বেশী হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

কর্মের মত তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লেখা হয় ঃ وَاٰثَارَهُمْ অর্থ তাদের সম্পাদিত কর্মসমূহের ন্যায়, কর্মসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লিপিবদ্ধ করা হয়। اثار এর অর্থ কর্মের ক্রিয়া তথা ফলাফল, যা পরবর্তীকালে প্রকাশ পায় ও টিকে থাকে উদাহরণতঃ কেউ মানুষকে দ্বীনী শিক্ষা দিল, বিধি-বিধান বর্ণনা করল অথবা কোন পুস্তক রচনা করল, যদ্দ্বারা মানুষের দ্বীনী ফায়দা হয় অথবা ওয়াকফ ইত্যাদি ধরনের কোন জনহিতকর কাজ করল— তার এই সৎকর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যতদূর পৌঁছবে এবং যতদিন পর্যন্ত পৌঁছতে থাকবে, সবই তার আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। অনুরূপভাবে কোন রকম মন্দকর্ম যার মন্দ ফলাফল ও ক্রিয়া পৃথিবীতে থেকে যায়— কেউ যদি নিপীড়নমূলক আইন-কানুন প্রবর্তন করে কিংবা এমন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যা মানুষের আমল-আখলাককে ধ্বংস করে দেয় কিংবা মানুষকে কোন মন্দ পথে পরিচালিত করে,তবে তার এ মন্দকর্মের ফলাফল ও প্রভাব যে পর্যন্ত থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত তা দুনিয়াতে কায়েম থাকবে, ততদিন তার আমলনামায় সব লিখিত হতে থাকবে। যেমন, এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

যে ব্যক্তি কোন উত্তম প্রথা প্রবর্তন করে, তার জন্যে রয়েছে এর সওয়াব এবং যত মানুষ এই প্রথার উপর আমল করবে, তাদের সওয়াব—অথচ পালনকারীদের সওয়াব মোটেও হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কুপ্রথা প্রবর্তন করে, সে তার গোনাহ্ ভোগ করবে এবং যত মানুষ এই কুপ্রথা পালন করতে থাকবে, তাদের গোনাহ্ও তার আমলনামায় লিখিত হবে— অথচ পালনকারীদের গোনাহ্ হ্রাস করা হবেনা।—(ইবনে-কাসীর)

اثار শব্দের অর্থ পদাংকও হয়ে থাকে। হাদীসে আছে; কেউ নামাযের জন্যে মসজিদে গমন করলে তার প্রতি পদক্ষেপে সওয়াব লেখা হয়। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আয়াতে اثار বলে এই পদাংকই বোঝানো হয়েছে। নামাযের সওয়াব যেমন লেখা হয়, তেমনি নামাযে যাওয়ার সময় যত পদক্ষেপ হতে থাকে তাও প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পুণ্য লিখিত হয়। মদীনা তাইয়্যেবায় যাদের বাসগৃহ মসজিদে নববী থেকে দূরে অবস্থিত ছিল, তাঁরা মসজিদের কাছাকাছি বাসগৃহ নির্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁদেরকে তা থেকে বারণ করে বললেন, তোমরা যেখানে আছ, সেখানেই থাক। দূর থেকে হেঁটে মসজিদে এলে সময় বিনষ্ট হয় না। পদক্ষেপ যত বেশী হবে, তোমাদের সওয়াব তত বেশী হবে। ইবনে-কাসীর এ সম্পর্কিত

রেওয়ায়েতসমূহ একত্রিত করে দিয়েছেন।

এতে এমন প্রশ্ন দেখা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। আর হাদীসসমূহে উল্লেখিত ঘটনা মদীনা তাইয়্যেবার, এটা কিরূপে সম্ভবপর? জওয়াব এই যে, আয়াতের অর্থ এই মর্মে ব্যাপক যে, প্রত্যেক কর্মের ফলাফলও লেখা হয়। এ আয়াতটি মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়ে থাকবে। কিন্তু পরবর্তীকালে মদীনায় উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রমাণ হিসাবে আয়াতটি উল্লেখ করেন এবং পদাংককেও কর্মের ফলাফল হিসাবে গণ্য করেন, যেগুলো লিখিত হওয়ার কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে বর্ণিত উভয় তফসীরের বাহ্যিক বৈপরীত্যও দূর হয়ে যায়।— (ইবনে-কাসীর)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ – কোন বিষয় প্রমাণ করার জন্যে অনুরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করাকে ... বলা হয়। পূর্বোল্লেখিত কাফেরদেরকে হুশিয়ার করার উদ্দেশে কোরআন পাক দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীনকালের একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন যা এক জনপদে সংঘটিত হয়েছিল।

কাহিনীতে উল্লেখিত জনপদ কোন্‌টি? কোরআন পাক এই জনপদের নাম উল্লেখ করেনি। ঐতিহাসিক বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে আব্বাস, কা'বে আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ প্রমুখের উদ্ধৃতিক্রমে জনপদের নাম ইন্তাকিয়া উল্লেখ করেছেন। আবু হাইয়্যান ও ইবনে-কাসীর বলেন, তফসীরবিদগণ থেকে এর বিপরীতে কোন উক্তি বর্ণিত নেই। মু'জামুল-বুলদানের বর্ণনা অনুযায়ী ইন্তাকিয়া শামদেশের একটি প্রাচীন নগরী। যা তার সমৃদ্ধি ও স্থাপত্যের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল। এ নগরীর দুর্গ ও নগর-প্রাচীন দর্শনীয় বস্তু ছিল। এতে খ্রীষ্টানদের বড় বড় স্বর্ণ-রৌপ্যের কারুকার্য খচিত সুশোভিত গির্জা অবস্থিত রয়েছে। এটি একটি উপকূলীয় নগরী। ইসলামী আমলে শামবিজয়ী হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল-জাররাহ্ (রাঃ) এ শহরটি জয় করেছিলেন। মুজামুল-বুলদানে আরও উল্লেখ আছে যে, এ কাহিনীতে বর্ণিত হাবীব নাজ্জারের সমাধি এ শহরেই অবস্থিত। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এর যেয়ারত করতে আসে। যার বিবরণ পরে বর্ণনা করা হবে। এই বর্ণনা থেকে আরও জানা যায় যে, আয়াতে উল্লেখিত জনপদ হচ্ছে— এই ইন্তাকিয়া নগরী। তবে এখানে কোন নগরী নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং তার প্রয়োজনও নেই।

اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ বর্ণিত জনপদে তিন জন রসূল প্রেরিত হয়েছিলেন। এ আয়াতে তারই বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রথমে দু'জন রসূল প্রেরিত হলে জনপদের অধিবাসীরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করতে শুরু করে এবং অমান্য করে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশে তৃতীয় একজন রসূল প্রেরণ করলেন। অতঃপর রসূলত্রয় সম্মিলিতভাবে জনপদ-বাসীদেরকে বললেন, اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ (আমরা অবশ্যই তোমাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হয়েছি)।

এখানে রসূলের অর্থ কি এবং এ রসূল কারা ছিলেন? রসূল ও মুরসাল শব্দ দু'টি কোরআন পাকে সাধারণতঃ নবী ও পয়গম্বর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ প্রেরণ করাকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এটাও এ বিষয়ের ইঙ্গিত যে, এখানে রসূলের অর্থ নবী ও পয়গম্বর। ইবনে-ইসহাক, হযরত ইবনে-আব্বাস, কা'বে আহ্‌বার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই জনপদে প্রেরিত তিন জনই আল্লাহ্ তাআলার পয়গম্বর ছিলেন। তাঁদের নাম সাদেক, সদূক ও শালুম বলে বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েতে তৃতীয় জনের নাম শামউনও উল্লেখ করা হয়েছে।— (ইবনে-কাসীর)

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ - تطير শব্দের অর্থ অশুভ ও অলক্ষুণে মনে করা। উদ্দেশ্য এই যে, শহরবাসীরা প্রেরিত লোকদের কথা আমান্য করল এবং বলতে লাগল, তোমরা অলক্ষুণে। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তাদের অবাধ্যতা এবং রসূলগণের কথা অমান্য করার কারণে জনপদে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায়। ফলে তারা তাঁদেরকে অলক্ষুণে বলল। অথবা অন্য কোন কষ্ট -দুর্ভোগ হয়ে থাকবে। কাফেরদের সাধারণ অভ্যাস এই যে, কোন বিপদাপদ দেখলে তার কারণ হেদায়েতকারী ব্যক্তিবর্গকে সাব্যস্ত করে।

قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ – অর্থাৎ, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই। অর্থাৎ, এ অমঙ্গল তোমাদেরই কুকর্মের ফল। طائر শব্দটি প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গল অর্থে বলা হয়। কিন্তু কখনও অমঙ্গলের প্রতিদান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। — (ইবনে-কাসীর, কুরতুবী)

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى — প্রথম আয়াতে ঘটনাস্থলকে قرية শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ সাধারণ জনপদ; তা— ছোট বস্তিই হোক অথবা বড় কোন শহর। আর এ আয়াতে সে জায়গাটিকে مدينة শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যা কেবল বড় শহর অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এতে জানা গেল যে, ঘটনাস্থলটি কোন বড় শহরই ছিল। সুতরাং এতে সে উক্তিরই সমর্থন হয়, যাতে একে ইন্তাকিয়া বলা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ অর্থ এই যে, শহরের কোন একপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এল। رَجُلٌ يَّسْعٰى এতে يَسْعٰى শব্দটি سعى থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ দৌড়ানো। কাজেই অর্থ দাঁড়াল যে, নগরীর দূরবর্তী কোন এক প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল।

وَمَا لِيَ لَآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ﴿٢٢﴾
ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدۡنِ ٱلرَّحۡمَٰنُ بِضُرّٖ لَّا تُغۡنِ عَنِّي
شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّيٓ إِذٗا لَّفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّيٓ
ءَامَنتُ بِرَبِّكُمۡ فَٱسۡمَعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ٱدۡخُلِ ٱلۡجَنَّةَۖ قَالَ يَٰلَيۡتَ قَوۡمِي
يَعۡلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ ﴿٢٧﴾ وَمَآ
أَنزَلۡنَا عَلَىٰ قَوۡمِهِۦ مِنۢ بَعۡدِهِۦ مِن جُندٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾
إِن كَانَتۡ إِلَّا صَيۡحَةٗ وَٰحِدَةٗ فَإِذَا هُمۡ خَٰمِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَٰحَسۡرَةً عَلَى
ٱلۡعِبَادِۚ مَا يَأۡتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمۡ يَرَوۡاْ
كَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ أَنَّهُمۡ إِلَيۡهِمۡ لَا يَرۡجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِن
كُلّٞ لَّمَّا جَمِيعٞ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُونَ ﴿٣٢﴾ وَءَايَةٞ لَّهُمُ ٱلۡأَرۡضُ ٱلۡمَيۡتَةُ
أَحۡيَيۡنَٰهَا وَأَخۡرَجۡنَا مِنۡهَا حَبّٗا فَمِنۡهُ يَأۡكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلۡنَا فِيهَا جَنَّٰتٖ
مِّن نَّخِيلٖ وَأَعۡنَٰبٖ وَفَجَّرۡنَا فِيهَا مِنَ ٱلۡعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأۡكُلُواْ مِن
ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتۡهُ أَيۡدِيهِمۡۚ أَفَلَا يَشۡكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ
ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٣٦﴾
وَءَايَةٞ لَّهُمُ ٱلَّيۡلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظۡلِمُونَ ﴿٣٧﴾

(২২) আমার কি হল যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে, আমি তাঁর এবাদত করব না? (২৩) আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্যান্যদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করব? করুণাময় যদি আমাকে কষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনই কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না। (২৪) এরূপ করলে আমি প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হব। (২৫) আমি নিশ্চিতভাবে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব আমার কাছ থেকে শুনে নাও। (২৬) তাকে বলা হল, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলল হায়, আমার সম্প্রদায় যদি কোন ক্রমে জানতে পারত – (২৭) যে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (২৮) তারপর আমি তার সম্প্রদায়ের উপর আকাশ থেকে কোন বাহিনী অবতীর্ণ করিনি এবং আমি (বাহিনী) অবতরণকারীও না। (২৯) বস্তুতঃ এ ছিল এক মহানাদ। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। (৩০) বান্দাদের জন্যে আক্ষেপ যে, তাদের কাছে এমন কোন রসূলই আগমন করেনি যাদের প্রতি তারা বিদ্রূপ করে না। (৩১) তারা কি প্রত্যক্ষ করে না, তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যে, তারা তাদের মধ্যে আর ফিরে আসবে না। (৩২) ওদের সবাইকে সমবেত অবস্থায় আমার দরবারে উপস্থিত হতেই হবে। (৩৩) তাদের জন্যে একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী। আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। (৩৪) আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে নির্ঝরিণী। (৩৫) যাতে তারা তার ফল খায়। তাদের হাত একে সৃষ্টি করে না। অতঃপর তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না কেন? (৩৬) পবিত্র তিনি, যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, তাদেরই মানুষকে এবং যা তারা জানে না, তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। (৩৭) তাদের জন্যে এক নিদর্শন রাত্রি, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, তখনই তারা অন্ধকারে থেকে যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শহরের প্রান্ত থেকে আগন্তুক ব্যক্তির ঘটনা : কোরআন পাক তাঁর নাম ও অবস্থা উল্লেখ করেনি। ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে-আব্বাস, কা'ব আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নাম ছিল হাবীব। তাঁর পেশা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, তিনি 'নাজ্জার' অর্থাৎ, ছুতার ছিলেন। ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনিও প্রথমে মূর্তি পূজারী ছিলেন। পূর্বে প্রেরিত রসূলদ্বয়ের সাথে সাক্ষাতের পর তাঁদের শিক্ষায় অথবা তাঁদের মো'জেযা দেখে তিনি মুসলমান হয়ে যান এবং কোন এক গুহায় এবাদতে মশগুল হন। তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে, শহরবাসীরা রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলে তাঁদেরকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তিনি আপন সম্প্রদায়ের শুভেচ্ছা ও রসূলগণের প্রতি সহানুভূতির মনোভাবে নিয়ে দ্রুত সম্প্রদায়ের মধ্যে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে রসূলগণের অনুসরণ করার উপদেশ দিলেন। অবশেষে তিনি নিজের ঈমান ঘোষণা করে বললেন, إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمۡ فَٱسۡمَعُونِ – অর্থাৎ, আমি তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম—তোমরা শুনে রাখ। এ ঘোষণাটি সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যেও হতে পারে এবং এতে 'তোমাদের পালনকর্তা' বলে বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও তারা তা স্বীকার করত না। ঘোষণাটি রসূলগণের উদ্দেশ্যেও হতে পারে এবং فَٱسۡمَعُونِ বলার উদ্দেশ্য এই যে, আপনারা শুনুন এবং আল্লাহ্‌র সামনে আমার ঈমানের সাক্ষ্য দিন।

قِيلَ ٱدۡخُلِ ٱلۡجَنَّةَۖ قَالَ يَٰلَيۡتَ قَوۡمِي يَعۡلَمُونَ — অর্থাৎ, উপদেশ দানের উদ্দেশে শহরের প্রান্ত থেকে আগত ব্যক্তিকে বলা হল; জান্নাতে প্রবেশ কর। বাহ্যতঃ কোন ফেরেশতার মাধ্যমে তা বলা হয়েছে। জান্নাতে প্রবেশ করার অর্থ এ সুসংবাদ দেয়া যে, জান্নাত তোমার জন্যে অবধারিত হয়ে গেছে। সময় এলে অর্থাৎ, হাশর-নশরের পর তুমি তা লাভ করবে। —(কুরতুবী)

এছাড়া এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, তাঁকে তাঁর জান্নাতের স্থান তখন দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া বরযখ অর্থাৎ, কবর জগতেও জান্নাতীদেরকে জান্নাতের ফল-ফুল ও আরাম-আয়েশের উপকরণ পৌঁছানো হয়। তাই তার বরযখে পৌঁছা একদিক দিয়ে জান্নাতেই প্রবেশ করার শামিল।

কোরআন পাকের উপরোক্ত বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লোকটিকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। কেননা, কেবল জান্নাতে প্রবেশ অথবা জান্নাতের বিষয়াদি দেখা মৃত্যুর পরই সম্ভবপর।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় হযরত ইবনে-আব্বাস, মুকাতিল, মুজাহিদ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, হাবীব ইবনে ইসমাইল নাজ্জার নামক এক ব্যক্তি সেই ব্যক্তিত্রয়ের অন্যতম, যাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের দশ বছর পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তুব্বা আকবর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আগমনের সংবাদ পাঠ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ওয়ারাকা ইবনে নওফেলও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়েছিলেন।—(বোখারী)

এটা একমাত্র তাঁরই বৈশিষ্ট্য যে, জন্ম ও নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তিন ব্যক্তি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। অন্য কোন পয়গম্বরের বেলায়

এমন হয়নি।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বর্ণনা করেন, হাবীব নাজ্জার কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ ছিলেন। তাঁর বাসগৃহ শহরের সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কাল্পনিক উপাস্যদের কাছে আরোগ্য লাভের দোয়া করতে করতে তার সত্তর বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। প্রেরিত রসূলগণ ঘটনাক্রমে সে প্রান্তবর্তী দ্বার দিয়ে ইন্তাকিয়া শহরে প্রবেশ করলে সর্বপ্রথম তার সাথেই তাঁদের দেখা হয়। তাঁরা তাকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করার এবং এক আল্লাহ্র উপাসনা করার দাওয়াত দিলেন। তিনি বললেন, আপনাদের দাবী যে সত্য, তার কোন প্রমাণ বা নির্দশন আছে কি? তাঁরা হাঁ বললে তিনি স্বীয় কুষ্ঠরোগের কথা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা এ ব্যাধি দূর করতে পারেন কি? রসূলগণ বললেন, হাঁ; আমরা আমাদের পরওয়ারদেগারের কাছে দোয়া করব। তিনি তোমাকে রোগমুক্ত করবেন। তিনি বললেন, আশ্চর্যের কথা, আমি সত্তর বছর ধরে দেব-দেবীদের কাছে দোয়া করছি; কিন্তু কোনই উপকার পাইনি। আপনাদের পরওয়ারদেগার একদিনে কিরূপে আমার অবস্থা পাল্টে দেবেন? রসূলগণ বললেন, হাঁ আমাদের রব সর্বশক্তিমান। তুমি যাদেরকে উপাস্য স্থির করেছ, তাদের কোন গুরুত্বই নেই। তারা কারও উপকার বা অপকার করতে পারে না। একথা শুনে হাবীব আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। রসূলগণ তাঁর জন্যে দোয়া করলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করে দিলেন। ফলে তাঁর ঈমান আরও দৃঢ়তর হয়ে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, সারাদিনে যা উপার্জন করব, তার অর্ধেক আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দেব। সুতরাং যখন রসূলগণের বিরুদ্ধে শহরবাসীদের বিক্ষোভের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি ছুটে এলেন এবং সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে স্বীয় ঈমান ঘোষণা করে দিলেন। ফলে গোটা সম্প্রদায় তাঁর শত্রু হয়ে গেল এবং সবাই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, লাথি মেরে মেরে সবাই তাঁকে শহীদ করে দিল। কতক রেওয়ায়েতে প্রস্তর বর্ষণের কথা আছে। বেদম প্রহারের সময়ও তিনি **رب اهد قومى** (হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করুন) বলে যাচ্ছিলেন।

يٰلَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَ لِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ

— হাবীব নাজ্জার বীরত্বের সাথে আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সাথে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহমূলক ব্যবহার করে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ দেন। তিনি যখন এই সম্মান, অনুগ্রহ ও জান্নাতের নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করলেন, তখন সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করে বাসনা প্রকাশ করলেন যে, হায় আমার সম্প্রদায় যদি আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হত যে, রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রতিদানে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে কেমন অনুগ্রহ, সম্মান ও চিরস্থায়ী নেয়ামত দান করেছেন, তবে সম্ভবতঃ তারাও বিশ্বাস স্থাপন করত। আলোচ্য আয়াতে এই বাসনাই ব্যক্ত হয়েছে।

পয়গম্বরসুলভ দাওয়াত ও সংস্কার ঃ প্রেরিত রসূলত্রয় মুশরেক ও কাফেরদের সাথে যেভাবে কথা বলেছেন, তাদের কঠোর ও তিক্ত কথার যেভাবে জওয়াব দিয়েছেন, অনুরূপভাবে তাঁদের দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণকারী হাবীব নাজ্জার স্বীয় সম্প্রদায়ের সামনে যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন, সেসব বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এতে ধর্ম প্রচারক ও সংস্কারকার্যে ব্রতী লোকদের জন্যে চমৎকার পথনির্দেশ রয়েছে।

রসূলগণের উপদেশমূলক প্রচার ও শিক্ষার জওয়াবে মুশরেকরা তিনটি কথা বলেছে ঃ

(১) তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, আমরা তোমাদের কথা মানব কেন?

(২) করুণাময় আল্লাহ্ কারও প্রতি কোন পয়গাম ও কিতাব নাযিল করেননি।

(৩) তোমরা নির্জলা মিথ্যা কথা বলছ।

চিন্তা করুন, নিঃস্বার্থ উপদেশমূলক আলাপ-আলোচনার জওয়াবে এরূপ উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তার কি জওয়াব হতে পারত? কিন্তু রসূলগণ কি জওয়াব দিলেন। তাঁরা শুধু বললেন, رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ অর্থাৎ, হে আমাদের পালনকর্তা, জানেন, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। আরও বললেন, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ অর্থাৎ, আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করেছি এবং আল্লাহ্র পয়গাম সুস্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। লক্ষ্য করুন, তাঁদের ভাষায় প্রতিপক্ষের উস্কানিমূলক কথাবার্তার কোন প্রতিক্রিয়া আছে কি? কেমন স্নেহপূর্ণ জওয়াব দিয়েছেন।

এরপর মুশরেকেরা আরও বলল, তোমরা অলক্ষুণে, তোমাদের কারণেই আমরা বিপদাপদে পড়েছি। এর নির্দিষ্ট জওয়াব ছিল এই ঃ অলক্ষুণে তোমরা নিজেরাই। তোমাদের কুকর্মের কুফল তোমাদের গলার হার হয়েছে। কিন্তু রসূলগণ এ বিষয়টি অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে তারাই যে অলক্ষুণে, তা পরিষ্কার হয়নি। তাঁরা বললেন, طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের অমঙ্গলই তোমাদের সাথে রয়েছে। অতঃপর আবার স্নেহের ভঙ্গিতে বললেন, أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ অর্থাৎ, তোমরা চিন্তা কর, আমরা তোমাদের কি ক্ষতি করলাম। আমরা তো কেবল তোমাদেরকে শুভেচ্ছামূলক উপদেশই দিয়েছি। হাঁ, তাঁদের সর্বাপেক্ষা কঠোর বাক্য ছিল এই ঃ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُوْنَ অর্থাৎ, তোমরাই সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। তোমরা তিলকে তালে পরিণত কর।

এ হচ্ছে রসূলগণের সংলাপ। এখন তাঁদের দাওয়াতে সাড়াদানকারী নওমুসলিমের সংলাপের প্রতিও লক্ষ্য করুন। তিনি প্রথম দু'টি কথা বলে সম্প্রদায়কে রসূলগণের কথা মেনে নেয়ার আহবান জানালেন। প্রথম এই যে, চিন্তা কর, এরা দূর-দূরান্ত থেকে তোমাদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্যে এসেছেন। সফরের কষ্ট সহ্য করেছেন, তদুপরি তোমাদের কাছে কোন রকম বিনিময়ও কামনা করেন না। এরূপ নিঃস্বার্থ লোকদের কথা চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে। দ্বিতীয় এই যে, তাঁরা যা বলেছেন, তা একান্ত, জ্ঞান-বুদ্ধি, ন্যায়-নীতি ও হেদায়েতের কথা। এরপর সম্প্রদায়কে তাদের ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশে বললেন, তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র এবাদত পরিত্যাগ করে স্বহস্ত-নির্মিত মূর্তিকে ত্রাণকর্তা মনে করে বসেছ। অথচ তারা তোমাদের এতটুকু উপকার করার শক্তি রাখে না এবং আল্লাহ্র কাছেও তাদের কোন মর্যাদা নেই যে, সুপারিশ করে তোমাদেরকে বিপদমুক্ত করবে।

কিন্তু হাবীব নাজ্জার কথাগুলো তাদেরকে সরাসরি না বলে নিজের সাথে সংযুক্ত করার পন্থা অবলম্বন করলেন।

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ — অর্থাৎ, এভাবে তিনি প্রতিপক্ষের জন্যে উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় যখন তাঁর নম্রতা ও সৌজন্যবোধের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করল না এবং তাঁকে হত্যা করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখনও তিনি

বদদোয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র কাছে প্রাণ সঁপে দিলেন। বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে সুমতি দান করুন।

বর্তমান যুগের প্রচারক ও সংস্কারকগণ সাধারণভাবে এই পয়গম্বরসুলভ আদর্শ পরিত্যাগ করেছেন। ফলে মানুষের মধ্যে তাদের দাওয়াত ও প্রচার ফলপ্রসূ হচ্ছে না। বক্তৃতা-বিবৃতিতে মনের ক্ষোভ মেটানো এবং প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্রূপাত্মক বাক্য বর্ষণ করাকে আজকাল বাহাদুরী জ্ঞান করা হয়, যা প্রতিপক্ষকে আরও বেশী জেদ ও হঠকারিতার আবর্তে নিক্ষেপ করে।

এতে وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ .... فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ মিথ্যারোপকারী ও হাবীব নাজ্জারকে শহীদকারী সম্প্রদায়ের উপর আসমানী আযাবের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে আযাব দেয়ার জন্যে আমাকে আকাশ থেকে ফেরেশতাদের কোন বাহিনী পাঠাতে হয়নি এবং এরূপ বাহিনী পাঠানো আমার রীতিও নয়। কারণ, আল্লাহ্‌র একজন ফেরেশতাই বড় বড় শক্তিশালী বীর সম্প্রদায়কে মুহূর্তে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। কাজেই তাঁর জন্যে ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করার কি প্রয়োজন। এরপর তাদের উপর আগত আযাবের বিষয় বর্ণনা করে বলা হয়েছে, একজন ফেরেশতার বিকট চীৎকারের ফলে তারা সবাই নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতা জিব্রাঈল আমীন শহরের দরজার দুই বাহু ধরে এমন কঠোর ও বিকট আওয়াজ দিলেন, যার ফলে সবারই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। তাদের মৃত্যুকে কোরআন خٰمِدُوْنَ শব্দে ব্যক্ত করেছে। خامد এর অর্থ আগুন নিভে যাওয়া। প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণ সহজাত তাপের উপর নির্ভরশীল। এই তাপ খতম হওয়ার নামই মৃত্যু।

সূরা ইয়াসীনের অধিকতর বিষয়বস্তু হচ্ছে কুদরতের নিদর্শনাবলী এবং আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত ও অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করে পরকাল সপ্রমাণ করা এবং হাশর-নশরের বিশ্বাসে মানুষকে পাকাপোক্ত করা। উল্লেখিত আয়াতসমূহে কুদরতের এমন ধরনের নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলো একদিকে আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণ শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং অপরদিকে মানুষ ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নেয়ামত ও অনুগ্রহ এবং সেগুলোর অভাবনীয় রহস্যের সাক্ষী।

প্রথম আয়াতে ধরিত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে, যা সবসময় সব মানুষের সামনে রয়েছে। শুষ্ক ধরিত্রীর উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ফলে তাতে এক প্রকার জীবন সঞ্চারিত হয় এবং উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও ফল-মূল জন্মায়। অতঃপর এসব বৃক্ষকে বৃদ্ধি করা ও অব্যাহত রাখার জন্যে ভূ-গর্ভে ও ভূ-পৃষ্ঠে প্রস্রবণ প্রবাহিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ – অর্থাৎ, বায়ু, মেঘমালা এবং ধরিত্রীর সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য মানুষ যাতে সেসব বৃক্ষের ফল-মূল ভক্ষণ করতে পারে। এগুলো তো প্রত্যক্ষ বিষয়, অতঃপর মানুষকে এমন এক বিষয়ে হুশিয়ার করা হয়েছে, যার জন্যে সমগ্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কাজে মানুষের কোন হাত নেই : বলা হয়েছে وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ অধিকাংশ তফসীরবিদ এর অনুবাদ করেছেন, তাদের হাত এসব ফল তৈরী করেনি। এ বাক্যটি মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে যে, একটু চিন্তা কর, এই শস্য-শ্যামল ধরিত্রীতে এ ছাড়া তোমার কাজ কি যে, তুমি মাটিতে বীজ বপন করেছ, তাকে সিক্ত করেছ, নরম করেছ যাতে অংকুরোদগমে অসুবিধা না হয়। কিন্তু বীজ থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা, বৃক্ষকে পত্র-পল্লবে সজ্জিত করা এবং তাকে ফলে ও ফুলে সমৃদ্ধ করা— এসব কাজে তোমার কি হাত আছে? এগুলো তো একান্তভাবে সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তাআলারই কাজ। তাই এসব বস্তু দ্বারা উপকার লাভ করায় সেই স্রষ্টা ও মালিককে বিস্মৃত না হওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য।

মানুষের খাদ্য ও জীবজন্তুর খাদ্যের বিশেষ পার্থক্য : ইবনে জরীর প্রমুখ তফসীরবিদ وَمَا عَمِلَتْهُ বাক্যের ما কে موصول এর অর্থে ধরে অনুবাদ করেছেন এসব বস্তু সৃষ্টি করেছি, যাতে মানুষ এগুলোর ফল-মূল ভক্ষণ করে এবং সেই বস্তুও ভক্ষণ করে, যা এসব উদ্ভিদ ও ফল-মূল দিয়ে মানুষ স্বহস্তে তৈরী করে। উদাহরণতঃ ফল-মূল দিয়ে নানারকম হালুয়া, আচার, চাটনী ইত্যাদি তৈরী করা হয়। সারকথা এই যে, ফল-মূল মানুষের কর্ম ছাড়াও খাওয়ার সুযোগ্য করে সৃজিত হয়েছে এবং এক এক ফল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ও উপাদেয় বস্তু তৈরী করার নৈপুণ্যও আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় ফল সৃষ্টি করা যেমন একটি নেয়ামত, তেমনি ফল দিয়ে নানা রকমের সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য তৈরীর নৈপুণ্য শিক্ষা দেয়াও একটি নেয়ামত। এই তফসীর উদ্ধৃত করে ইবনে কাসীর বলেন, হযরত মাসউদের এক কেরাত দ্বারাও এই তফসীরটি সমর্থিত হয়। তাঁর কেরাতে ما শব্দের পরিবর্তে وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ রয়েছে।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۖۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ — এখানে আকাশে ও দিগন্তে বিস্তৃত সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। نَسْلَخُ এর শাব্দিক অর্থ চামড়া বের করা। কোন জন্তুর দেহ থেকে চামড়া অথবা অন্য কোন বস্তুর উপর থেকে আবরণ সরিয়ে দিলে ভিতরের বস্তু প্রকাশ পায়। এ দৃষ্টান্তে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে অন্ধকারই আসল; আলোক বৈপত্তিক বিষয়। এটা গ্রহ ও তারকার মাধ্যমে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে নেয়। আল্লাহ্ তাআলার ব্যবস্থাধীনে নির্দিষ্ট সময়ে আলোকে উপর থেকে সরিয়ে নিলে অন্ধকারই থেকে যায়। একেই রাত্রি বলা হয়।

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ
قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي
لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾
وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا
قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا
تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا
قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنظُرُونَ
إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم
مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا
مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

(৩৮) সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণ। (৩৯) চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। (৪০) সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে। (৪১) তাদের জন্যে একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। (৪২) এবং তাদের জন্যে নৌকার অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে। (৪৩) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি, তখন তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না। (৪৪) কিন্তু আমারই পক্ষ থেকে কৃপা এবং তাদেরকে কিছুকাল জীবনোপভোগ করার সুযোগ দেয়ার কারণে তা করি না। (৪৫) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা সামনের আযাব ও পেছনের আযাবকে ভয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তখন তারা তা অগ্রাহ্য করে। (৪৬) যখনই তাদের পালনকর্তার নির্দেশাবলীর মধ্য থেকে কোন নির্দেশ তাদের কাছে আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৭) যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন,. তা থেকে ব্যয় কর। তখন কাফেররা মুমিনগণকে বলে, ইচ্ছা করলেই আল্লাহ্ যাকে খাওয়াতে পারতেন, আমরা তাকে কেন খাওয়াব ? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত রয়েছ। (৪৮) তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে বল এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে? (৪৯) তারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের পারস্পরিক বাকবিতণ্ডাকালে। (৫০) তখন তারা ওছিয়ত করতেও সক্ষম হবে না। এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না। (৫১) শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে. তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। (৫২) তারা বলবে., হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল? রহমান আল্লাহ্ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ অর্থাৎ, সূর্য তার অবস্থানস্থলের দিকে চলতে থাকে। এই অবস্থানস্থল ও স্থানগত ও কালগত উভয় প্রকার হতে পারে। مستقر শব্দটি কখনও ভ্রমণের শেষ সীমার অর্থেও ব্যবহৃত হয় যদিও সাথে সাথে বিরতি না দিয়ে দ্বিতীয় ভ্রমণ শুরু হয়ে যায়। — (ইবনে-কাসীর)

কোন কোন তফসীরবিদ এখানে কালগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন; অর্থাৎ, সেই সময়, যখন সূর্য তার নির্দিষ্ট গতি সমাপ্ত করবে। সে সময়টি কেয়ামতের দিন। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্য তার কক্ষ পথে মজবুত ও অটল ব্যবস্থাধীনে পরিভ্রমণ করছে। এতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। সূর্যের এই গতি চিরস্থায়ী নয়। তার একটি বিশেষ অবস্থানস্থল আছে; যেখানে পৌঁছে তার গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কেয়ামতের দিন। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত আছে। — (ইবনে-কাসীর)

কতক তফসীরবিদ কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসের ভিত্তিতে আয়াতে স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন।

আবু যর গেফারী (রাঃ) একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে সূর্যাস্তের সময় মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, আবু যর, সূর্য কোথায় অস্ত যায় জান? আবু যর বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নীচে পৌঁছে সেজদা করে। অতঃপর বললেন, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا আয়াতে مستقر বলে তাই বোঝানো হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকেও এই সম্বন্ধে হাদীস বর্ণিত রয়েছে যে, প্রত্যেক সূর্য আরশের নীচে পৌঁছে সেজদা করে এবং নুতন পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিভ্রমণ শুরু করে। অবশেষে এমন একদিন আসবে, যখন তাকে নতুন পরিভ্রমণের অনুমতি দেয়া হবে না, বরং পশ্চিমে অস্ত গিয়ে পশ্চিম থেকেই উদিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। এটা হবে কেয়ামত সন্নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত। তখন তওবা ও ঈমানের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কোন গোনাহ্‌গার, কাফের ও মুশরিকের তওবা কবুল করা হবে না। — (ইবনে কাসীর)

নামাযের ওয়াক্তসমূহের পরিচয়, কেবলার দিক নির্ধারণ, বছর, মাস ও দিন তারিখের সঠিক ধারণা, প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান অঙ্ক শাস্ত্রের হিসাবাদির মাধ্যমেও অর্জন করা যায়। কিন্তু শরীয়ত এগুলোর ভিত্তি অঙ্ক শাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের উপর রাখার পরিবর্তে সাধারণের প্রত্যক্ষকরণের উপর রেখেছে। চাঁদের হিসাবে বছর, মাস ও দিন-তারিখে নির্ধারিত হয়; কিন্তু চাঁদ হল কি হল না, তার ভিত্তি কেবল চাঁদ দেখা ও প্রত্যক্ষ করার উপর রাখা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই হজ্ব ও রোযার তারিখ নির্ধারিত হয়। চাঁদের ক্রমবৃদ্ধি, আত্মগোপন ও উদয়ের রহস্য সম্পর্কে কতিপয় সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলে কোরআন তার জওয়াবে বলে قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ অর্থাৎ, আপনি উত্তরে বলুন, চাঁদের এসব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য মাসের শুরু, শেষ ও দিন-তারিখ জেনে হজ্বের দিন নির্দিষ্ট করা। এ জওয়াব ব্যক্ত করেছে যে, তোমাদের প্রশ্ন অনর্থক। এ

রহস্য জানার উপর তোমাদের কোন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয় নির্ভরশীল নয়। তাই তোমাদের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে, এমন প্রশ্ন করাই দরকার।

এ ভূমিকার পর আসল ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করুন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কুদরত ও প্রজ্ঞার কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর মানুষকে তওহীদ ও সর্বব্যাপী কুদরতে বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সর্ব প্রথম পৃথিবীর কথা উল্লেখ করে বলেছেন, وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ অতঃপর পানি বর্ষণ করে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কথা বলেছেন, أَحْيَيْنَاهَا এ বিষয়টি সব মানুষই দেখে ও জানে। এরপর আকাশ ও আকাশ সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচনা শুরু করে প্রথমে দিবা ও রাত্রির দৈনন্দিন পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ এরপর সর্ববৃহৎ গ্রহ সূর্য ও চন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে সূর্য সম্পর্কে বলেছেন, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا

ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ চিন্তা করুন, এর উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, সূর্য আপনা আপনি, নিজ ইচ্ছায় ও শক্তি বলে বিচরণ করে না। সে একজন পরাক্রমশালী ও বিচক্ষণ সত্তার নির্ধারিত নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করে যাচ্ছে।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ — عرجون অর্থ শুষ্ক খেজুর শাখা, যা বেঁকে ধনুকের মত হয়ে যায়। مَنَازِلَ শব্দটি منزل এর বহুবচন। অর্থ অবতরণস্থল। আল্লাহ্ তাআলা চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের চলার জন্যে বিশেষ সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এই সীমাকেই 'মনযিল' বলা হয়।

চন্দ্রের মনযিল ঃ চন্দ্র এক মাসে তার পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে। তাই তার মনযিল ত্রিশ অথবা উনত্রিশটি হয়ে থাকে। প্রত্যেক মাসে চন্দ্র কমপক্ষে একদিন উধাও হয়ে থাকে। ফলে সাধারণভাবে তার মনযিল আটাশটিই বলা হয়। সৌরবিজ্ঞানীরা এসব মনযিলের বিপরীতে অবস্থিত নক্ষত্রসমূহের সাথে মিল রেখে এগুলোর বিশেষ বিশেষ নাম রেখেছেন। জাহেলিয়াত যুগের আরবেও এসব নামেই মনযিলসমূহ চিহ্নিত হত। কোরআন পাক এসব পারিভাষিক নামের উর্ধ্বে। চন্দ্র বিশেষ বিশেষ দিনে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, কোরআন মনযিল বলে শুধু সে দূরত্বকেই বুঝিয়ে থাকে।

সূরা ইউনুসে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সূরা ইউনুসের আয়াত এই ঃ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ এতে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের মনযিল উল্লেখ করা হয়েছে। পার্থক্য এই যে, চন্দ্রের মনযিলসমূহ চাক্ষুস চোখে চেনা যায় এবং সূর্যের মনযিলসমূহ অঙ্ক শাস্ত্রের হিসাবের মাধ্যমে জানা যায়। حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ বাক্যে মাসের শেষে চাঁদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। চাঁদ ষোল কলায় পরিপূর্ণ হওয়ার পর হ্রাস পেতে পেতে মাসের শেষে ধনুকের আকার ধারণ করে। আরবদের পরিবেশ উপযোগী ''শুষ্ক খর্জুর শাখার মত'' বলে এর দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে।

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ — অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। فَلَكٍ শাব্দিক অর্থ আকাশ নয়, বরং সেই বৃত্ত যাতে কোন গ্রহ বিচরণ করে। সূরা আম্বিয়ায় এ আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বোঝা যায়, চন্দ্র আকাশ গাত্রে প্রোথিত নয়। বাৎলীমুসীয় মতবাদ প্রমাণ করে যে, চন্দ্র আকাশগাত্রে প্রোথিত। কোরআনের আয়াত থেকে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের নীচে এক বিশেষ কক্ষ পথে বিচরণ করে। আধুনিক গবেষণা এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণের ঘটনাবলী এ বিষয়টিকে নিশ্চিত করেছে।

وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ — এতে সমুদ্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে কুদরতের বহিঃপ্রকাশ আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা নৌকাসমূহকে স্বয়ং ভারী বস্তু দ্বারা বোঝাই হওয়া সত্ত্বেও পানির উপর চলার যোগ্য করে দিয়েছেন। পানি এগুলোকে নিমজ্জিত করার পরিবর্তে দূর-দূরান্তের দেশে পৌঁছে দেয়। বলা হয়েছে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকে নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। এখানে সন্তান-সন্ততির কথা বলার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সন্তান-সন্ততি মানুষের বড় বোঝা। বিশেষতঃ যখন তারা চলাফেরার যোগ্য না থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তোমরাই কেবল নৌকাসমূহে আরোহণ কর না, বরং সন্তান-সন্ততি ও তাদের সমস্ত আসবাবপত্রও এসব নৌকা বহন করে। وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ বাক্যের অর্থ এই যে, মানুষের আরোহণ ও বোঝা বহনের জন্যে কেবল নৌকাই নয়, নৌকার অনুরূপ আরও যানবাহন সৃষ্টি করেছি। আরবরা তাদের প্রথা অনুযায়ী এর অর্থ নিয়েছে উটের সওয়ারী। কারণ, বোঝা বহনে উট সমস্ত জন্তুর সেরা। বড় বড় বোঝার স্তূপ নিয়ে দেশ-বিদেশ সফর করে। তাই আরবরা উটকে سفينة البر অর্থাৎ, স্থলের জাহাজ বলে থাকে।

কোরআনে উড়োজাহাজের উল্লেখ ঃ কিন্তু কোরআন এখানে উট অথবা অন্য কোন বিশেষ যানবাহনের উল্লেখ করেনি, বরং অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে। ফলে এতে এমনসব যানবাহন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা অধিকতর মানুষ ও তাদের আসবাবপত্র বহন করে মনযিলে মকসুদে পৌঁছে দেয়। এটা সুস্পষ্ট যে, বর্তমান যুগে যেসব যানবাহন প্রচলিত আছে তন্মধ্যে আয়াতে প্রধানতঃ উড়োজাহাজই বোঝানো হয়েছে। নৌকার সাথে এর উপমাও এর সমর্থক। পানির জাহাজ যেমন পানির উপর সন্তরণ করে পানি তাকে নিমজ্জিত করে না, তেমনি উড়োজাহাজ বাতাসে সন্তরণ করে। বাতাস তাকে নীচে ফেলে দেয় না। কোরআন পাক আলোচ্য বাক্যটি অস্পষ্ট রেখেছে, যাতে কেয়ামত পর্যন্ত যত যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সবই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদিতে আল্লাহ্ তাআলার শক্তি ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে আল্লাহ্র পরিচয় লাভ ও তওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। এছাড়া এ দাওয়াত কবুলের ফলস্বরূপ জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত ও সুখের ওয়াদা এবং কবুল না করার কঠোর শাস্তির সতর্কবাণীও বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ও পরবর্তী আয়াতসমূহে মক্কার কাফেরদের বক্রতা বিবৃত হয়েছে যে, তাদের উপর সওয়াবের ওয়াদা কিংবা শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে কাফেরদের সাথে মুসলমানদের দুটি সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানরা যখন তাদের বলে, তোমরা আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় কর, যা দুনিয়াতেই তোমাদের সামনেও আসতে পারে এবং পরকালে আসা তো নিশ্চিতই। তোমরা এ শাস্তিকে ভয় করে বিশ্বাস স্থাপন করলে

তা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক হবে। কিন্তু তারা একথা শুনেও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

পরোক্ষভাবে রিযিক প্রাপ্তির রহস্য ঃ দ্বিতীয় সংলাপ এই যে, মুসলমানরা গরীব মিসকীনকে সাহায্য করার জন্যে এবং ক্ষুধার্তকে খাদ্যদানের জন্যে কাফেরদেরকে বলত যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে কিছু অভাব গ্রস্তদেরকেও দান কর। এর জওয়াবে তারা ঠাট্টা করে বলত, তেমরাই বল যে, সকলের রিযিকদাতা আল্লাহ্। তিনিই তাদেরকে দেননি; অতএব আমরা কেন দেব? তোমাদের এই উপদেশ প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা। কেননা, তোমরা আমাদেরকে রিযিকদাতা বানাতে চাও। বলাবাহুল্য, কাফেররাও আল্লাহ্ তাআলাকে রিযিকদাতা বলে স্বীকার করত। এ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে।

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ অর্থাৎ, আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছে, অত:পর পৃথিবীতে উদ্ভিদের জীবন সঞ্চারিত হয়েছে এবং নানা রকম ফল-মূল উদগত হয়েছে, তবে তারা স্বীকার করবে, আল্লাহ্ তাআলাই বর্ষণ করেছেন।

এ থেকে জানা গেল যে, তারা আল্লাহ্ তাআলাকেই রিযিকদাতা বলে বিশ্বাস করতো। কিন্তু মুসলমানদের জওয়াবে ঠাট্টার ছলে উপরোক্ত কথা বলেছে। এ বোকারা যেন আল্লাহ্র পথে ব্যয় এবং গরীবদের সাহায্য করাকে আল্লাহ্র রিযিকদাতা হওয়ার পরিপন্থী মনে করত। রিযিকদাতা আল্লাহ্র প্রজ্ঞাময় আইন এই যে, তিনি একজনকে দান করে অন্যজনকে দেয়ার মাধ্যম করেন এবং এই মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অন্যদেরকে দেন। তিনি সবাইকে নিজে প্রত্যক্ষভাবে রিযিক দিতেও সক্ষম জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষীকে তিনি এমনিভাবে রিযিক দান করেন। তাদের মধ্যে কেউ দরিদ্র ও কেউ ধনী নেই এবং কেউ কাউকে কিছু দেয়ও না। সবাই প্রকৃতির দস্তরখান থেকে আহার করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রাণ সঞ্চার করার জন্যে রিযিকের ব্যাপারে একজনকে অপরজনের মাধ্যম করা হয়েছে, যাতে দাতা সওয়াব পায় এবং গ্রহিতা তার অনুগ্রহ স্বীকার করে। কেননা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার উপরই সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি রচিত এই ভিত্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে, যখন মানুষ একে অপরের মুখাপেক্ষী হয়; দরিদ্র ধনীর পয়সার মুক্ষাপেক্ষী হয় এবং ধনী দরিদ্রের শ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং তাদের কেউ কারও প্রতি অমুখাপেক্ষী না হয়। চিন্তা করলে দেখা যায়, কারও প্রতি কারও কোন ঋণ নেই। একজন অপরজনকে কিছু দিলে নিজের স্বার্থেই দান করে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কাফেররা তো আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসই রাখে না এবং ফেকাহবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী তারা খুঁটিনাটি বিধানাবলী পালনে আদিষ্টও নয়। এমতাবস্থায় মুসলমানরা কিসের ভিত্তিতে কাফেরদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আদেশ দিত? এর উত্তর এই যে, মুসলমানদের এই আদেশ কোন শরীয়তগত বিধান পালন করানোর উদ্দেশে নয় ; বরং মানবিক সহমর্মিতা দায়িত্ববোধের প্রচলিত নীতির ভিত্তিতে ছিল।

مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً কাফেররা যে مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ বলে ঠাট্টা ও পরিহাসচ্ছলে মুসলমানদেরকে জিজ্ঞেস করত, তোমরা যে কেয়ামতের প্রবক্তা, তা কোন্ বছর ও কোন্ তারিখে সংঘটিত হবে? বর্ণিত আয়াতে তারই জওয়াব দেয়া হয়েছে। তাদের প্রশ্ন বাস্তব বিষয় জানার জন্যে নয়; বরং নিছক ঠাট্টা ও পরিহাসের ছলে ছিল। জানার জন্যে হলেও কেয়ামতের সন-তারিখের নিশ্চিত জ্ঞান কাউকে না দেয়াই খোদায়ী রহস্যের দাবী ছিল। তাই আল্লাহ্ তাআলা এ জ্ঞান তাঁর নবী-রসূলকেও দান করেননি। নির্বোধদের এই প্রশ্ন অনর্থক ও বাজে ছিল বিধায় এর জওয়াবে কেয়ামতের তারিখ বর্ণনা করার পরিবর্তে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, যে বিষয়ের আগমন অবশ্যম্ভাবী তার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং সন-তারিখ খোঁজাখুঁজিতে সময় নষ্ট না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কেয়ামতের খবর শুনে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সৎকর্ম সম্পাদন করাই ছিল বিবেকের দাবী, কিন্তু তারা এমনি গাফেল যে, কেয়ামতের আগমনের পর তারা যেন চিন্তা করার অপেক্ষায় আছে। তাই বলা হয়েছে যে, তারা কেয়ামতের অপেক্ষা করছে। অথচ কেয়ামত হবে একটি মাত্র মহানাদ যা তাদেরকে তখন অতর্কিতে আঘাত হানবে, যখন তারা নিজেদের কাজ-কারবার ও পারস্পরিক লেন-দেনের বাক-বিতণ্ডায় ব্যস্ত থাকবে। সবাই তদাবস্থায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে।

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ অর্থাৎ, তখন যারা একত্রিত হবে, তারা একজন অপরজনকে কোন কাজের ওসিয়ত করারও সুযোগ পাবে না এবং যারা ঘরের বাইরে থাকবে, তারা ঘরে প্রত্যাবর্তন করারও সময় পাবে না। আপন আপন জায়গায় মরে পড়ে থাকবে। প্রথম ফুঁকের এই ঘটনায় সমগ্র বিশ্ব আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে।

এরপর বলা হয়েছে, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ - أجداث শব্দটি جدث এর বহুবচন। অর্থ কবর। يَنسِلُونَ শব্দটি نسلان থেকে উদ্ভুত। অর্থ দ্রুত চলা। অন্য এক আয়াতে আছে يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا অর্থাৎ, তারা দ্রুত কবর থেকে বের হবে। এক আয়াতে বলা হয়েছে, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ অর্থাৎ, হাশরের সময় মানুষ কবর থেকে উঠে দেখতে থাকবে। এ বক্তব্য পূর্ববর্তী বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। কারণ, প্রথমাবস্থায় বিস্মিত হয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে থাকবে এবং পরে দ্রুত গতিতে হাশরের দিকে দৌড়াতে থাকবে। কোরআনের আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাগণ সবাইকে ডেকে হাশরের ময়দানে আনবে। এতে বোঝা যায় যে, মানুষ স্বেচ্ছায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে না, বরং ফেরেশতাগণের ডাকার কারণে বাধ্যতামূলকভাবে দৌড়তে দৌড়তে উপস্থিত হবে।

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا কাফেররা কবরেও আরামে ছিল না, বরং আযাবে পতিত ছিল। কিন্তু কেয়ামতের আযাবের তুলনায় সে আযাবকে আরাম বলেই মনে হবে। তাই তারা বলবে, কে আমাদেরকে কবর থেকে বের করল? সেখানে থাকলেই তো ভাল হত। ফেরেশতাগণ অথবা মুমিনগণ এর জওয়াবে বলবে ঃ

هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ অর্থাৎ, করুণাময় আল্লাহ্ যে কেয়ামতের ওয়াদা দিয়েছিলেন, এই হল সে কেয়ামত। রসূলগণ তোমাদেরকে সে সত্য সংবাদই শুনিয়েছিলেন, কিন্তু তোমরা ভ্রূক্ষেপ করনি। এখানে আল্লাহ্র 'রহমান' গুণটি উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি তো স্বীয় রহমতেই তোমাদের জন্যে এ আযাব থেকে বেঁচে থাকার বহু ব্যবস্থা করেছিলেন। পূর্বাহ্নে এর ওয়াদা দেয়া এবং কিতাব ও পয়গম্বরগণের মাধ্যমে এর খবর তোমাদের কাছে পৌঁছানো আল্লাহ্র 'রহমান' গুণেরও বহিঃপ্রকাশ ছিল।

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ
أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فٰكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلٰلٍ
عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فٰكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾
سَلٰمٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنِ اعْبُدُونِي هٰذَا صِرٰطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ
مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ اَلْيَوْمَ
نَخْتِمُ عَلٰى أَفْوٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرٰطَ فَأَنّٰى
يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطٰعُوا
مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا
يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ
مُبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٧٠﴾

(৫৩) এটা তো হবে কেবল এক মহানাদ। সে মুহূর্তেই তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। (৫৪) আজকের দিনে কারও প্রতি জুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করবে কেবল তারই প্রতিদান পাবে। (৫৫) এদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। (৫৬) তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে। (৫৭) সেখানে তাদের জন্যে থাকবে ফল-মূল এবং যা চাইবে। (৫৮) করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'। (৫৯) হে অপরাধীরা, আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও। (৬০) হে বনী-আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের এবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (৬১) এবং আমার এবাদত কর। এটাই সরল পথ। (৬২) শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝনি? (৬৩) এই সে জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো। (৬৪) তোমাদের কুফরের কারণে আজ এতে প্রবেশ কর। (৬৫) আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। (৬৬) আমি ইচ্ছা করলে তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথের দিকে দৌড়াতে চাইলে কেমন করে দেখতে পেত! (৬৭) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে স্ব স্ব স্থানে আকার বিকৃত করতে পারতাম, ফলে তারা আগেও চলতে পারত না এবং পেছনেও ফিরে যেতে পারত না। (৬৮) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেই। তবুও কি তারা বুঝে না? (৬৯) আমি রসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্যে শোভনীয়ও নয়। এটা তো এক উপদেশ ও প্রকাশ্য কোরআন। (৭০) যাতে তিনি সতর্ক করেন জীবিতকে এবং যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগপ্রতিষ্ঠিত হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فٰكِهُونَ জাহান্নামীদের দুরবস্থা বর্ণনা করার পর কেয়ামতে জান্নাতীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তাদের চিত্তবিনোদনে মশগুল থাকবে। فٰكِهُونَ এর অর্থ আনন্দিত, স্বাচ্ছন্দ্যশীল ঃ فِي شُغُلٍ এর এক অর্থ এমনও হতে পারে যে, তারা জাহান্নামীদের দুরবস্থা থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে।

এ স্থলে فِي شُغُلٍ সংযুক্ত করার কারণ এ ধারণা নিরসন করাও হতে পারে যে, জান্নাতে ফরয-ওয়াজিব কোন এবাদত থাকবে না এবং জীবিকা উপার্জনেরও কোন প্রয়োজন থাকবে না। এমন বেকার অবস্থায় মানুষ সাধারণতঃ অস্বস্তি বোধ করে। তাই বলা হয়েছে যে, জান্নাতীরা বিনোদনমূলক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে। কাজেই অস্বস্তিবোধ করার প্রশ্নই দেখা দেয় না।

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ — أَزْوَاجٌ শব্দের অর্থে জান্নাতের হুর এবং দুনিয়ার স্ত্রী সবাই অন্তর্ভুক্ত।

وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ শব্দটি دعوة থেকে উদ্ভূত। অর্থ আহবান করা। অর্থাৎ, জান্নাতীরা যে বস্তুকেই ডাকবে, তা পেয়ে যাবে। কোরআন করীম এক্ষেত্রে يسئلون বলেনি। কেননা, চেয়ে লাভ করাও এক প্রকার শ্রম ও কষ্ট, যা থেকে জান্নাত পবিত্র। সেখানে প্রতিটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীই উপস্থিত থাকবে।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ হাশরের ময়দানে প্রথমে মানুষ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সমবেত হবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে – كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ অর্থাৎ, তারা হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত। কিন্তু পরে কর্মের ভিত্তিতে তাদের পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করা হবে। কাফের, মুমিন, সৎকর্মী ও অসৎকর্মী লোকগণ পৃথক পৃথক জায়গায় অবস্থান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ অর্থাৎ, যখন মানুষকে জোড়া জোড়া করা হবে। আলোচ্য আয়াতেও এই পৃথকীকরণ ব্যক্ত হয়েছে।

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ অর্থাৎ, সমস্ত মানুষ এমনকি, জিনদেরকেও কেয়ামতের দিন বলা হবে, আমি কি তোমাদেরকে দুনিয়াতে শয়তানের এবাদত না করার আদেশ দেইনি? এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাফেররা সাধারণতঃ শয়তানের এবাদত করত না, বরং দেব-দেবী অথবা অন্য কোন বস্তুর পূজা করত। কাজেই তাদেরকে শয়তানের এবাদত করার অভিযোগে কেমন করে অভিযুক্ত করা যায়? জওয়াব এই যে, প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক অবস্থায় কারও আনুগত্য করার নামই এবাদত। তারাও চিরকাল শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ করেছিল বিধায় তাদেরকে শয়তানের এবাদতকারী বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি অর্থের মহব্বতে এমনসব কাজ করে, যদ্দারা অর্থ বৃদ্ধি পায় এবং স্ত্রীর মহব্বতে এমনসব কাজ করে যদ্দারা স্ত্রী সন্তুষ্ট হয়, হাদীসে তাদেরকে অর্থের দাস ও স্ত্রীর দাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى أَفْوٰهِهِمْ হাশরে হিসাব- নিকাশের জন্যে

উপস্থিতির সময় প্রথমে প্রত্যেকেই যা ইচ্ছা ওযর বর্ণনা করার স্বাধীনতা পাবে। মুশরিকরা সেখানে কসম করে কুফর ও শিরক অস্বীকার করবে। তারা বলবে, وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ কেউ বলবে, আমাদের আমলনামায় ফেরেশতা যা কিছু লিখেছে, আমরা তা থেকে মুক্ত। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবেন, যাতে তারা কোন কিছুই বলতে না পারে। অতঃপর তাদেরই হাত, পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রাজসাক্ষী করে কথা বলার যোগ্যতা দান করা হবে। তারা কাফেরদের যাবতীয় কার্যকলাপের সাক্ষ্য দেবে। আলোচ্য আয়াতে হাত ও পায়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে। অন্য আয়াতে মানুষের কর্ণ,চক্ষু ও চর্মের সাক্ষ্য দানের উল্লেখ রয়েছে।

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ - تعمير শব্দটি نعمر থেকে উদ্ভূত। অর্থ দীর্ঘায়ু দান করা। تنكيس শব্দটি ننكس থেকে উদগত। অর্থ উপুড় করা। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার আরও একটি বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণী সর্বদা আল্লাহ্র কর্মের অধীনে থাকে এবং তাঁর কর্ম তাদের মধ্যে অবিরাম অব্যাহত থাকে। একটি নোংরা ও নিষ্প্রাণ ফোটা থেকে তাদের অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে। জননীর গর্ভাশয়ের তিন অন্ধকারে এই ক্ষুদ্র জগতের সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এই অস্তিত্বের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর আত্মা সঞ্চার করে তাকে জীবিত করা হয়েছে। নয় মাস জননী গর্ভে লালিত পালিত হয়ে সে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করেছে এবং পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে। পূর্ণাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিটি অঙ্গ দুর্বল প্রকৃতি তার উপযুক্ত খাদ্য তার মায়ের স্তনে সৃষ্টি করে তাকে ধাপে ধাপে শক্তি দান করেছেন। অতঃপর *যৌবন পর্যন্ত অনেক স্তর অতিক্রম করে তার যাবতীয় শক্তি সুঠাম* ও সবল হয়েছে। ফলে সে শক্তি ও শৌর্য দাবী করতে শুরু করেছে এবং তার মধ্যে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার মনোবল সৃষ্টি হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করলেন, তখন তার সমস্ত বল ও শক্তি হ্রাস পেতে শুরু করেছে। এই হ্রাস প্রাপ্তিও অনেক স্তর অতিক্রম করে অবশেষে বার্ধক্যের শেষ সীমানায় উপনীত হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়,এখানে পৌছে সে আবার সে স্তরেই পৌছে গেছে, যে স্তরটি শৈশবে অতিক্রম করেছিল। তার সকল অভ্যাস ও ক্রিয়াকর্ম বদলে গেছে। যেসব বস্তু এক সময় তার সর্বাধিক প্রিয় ছিল, সেগুলোই এখন সর্বাধিক ঘৃণিত হয়ে গেছে। পূর্বে যা ছিল সুখের বিষয়, এখন তা হয়ে গেছে কষ্টের বিষয়। আলোচ্য আয়াতে একেই উপুড় করা বলা হয়েছে।

মানুষ দুনিয়াতে চোখে দেখা অথবা কানে শোনা বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক আস্থা পোষণ করে। বার্ধক্যে পৌছলে এগুলোও আস্থাভাজন থাকে না। শ্রবণশক্তির দুর্বলতার কারণে কথাবার্তা পূর্ণরূপে বোঝা কঠিন হয় এবং দৃষ্টি শক্তির বৈকল্যের কারণে সঠিকভাবে দেখা দুরূহ হয়ে পড়ে।

মানুষের অস্তিত্বে এসব পরিবর্তন যেমন আল্লাহ্ তাআলার বিস্ময়কর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ, তেমনি এতে মানুষের প্রতি এক বিরাট অনুগ্রহও বিদ্যমান। স্রষ্টা মানুষের অস্তিত্বে যেসব শক্তি গচ্ছিত রেখেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সরকারী যন্ত্রপাতি। এগুলো তাকে দান করে বলে দেয়া হয়েছে যে, এগুলোর মালিক তুমি নও এবং এগুলো চিরস্থায়ীও নয়। অবশেষে তোমার কাছ থেকে ফেরত নেয়া হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে *সবগুলো শক্তি একযোগে ফেরত নেয়া বাহ্যতঃ সঙ্গত ছিল। কিন্তু করুণাময় আল্লাহ্ এগুলো ফেরত নেয়ার জন্যেও দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তি* নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং ক্রমানুয়ে ফেরত নিয়েছেন, যাতে মানুষ সাবধান হয়ে পরকালের সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ নবুওয়ত অমান্যকারী কাফেররা মানুষের মনে কোরআনের বিস্ময়কর প্রভাবের কথা অস্বীকার করতে পারত না। কারণ, এটা ছিল সাধারণ প্রত্যক্ষ বিষয়। তাই তারা কখনও কোরআনকে যাদু এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে যাদুকর বলত এবং কখনও কোরআনকে কবিতা এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কবি বলে আখ্যা দিত। এভাবে তারা প্রমাণ করতে চাইত যে, এই অনন্য সাধারণ প্রভাব খোদায়ী কালাম হওয়ার কারণে নয়,বরং হয় এটা যাদু, যা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে, না হয় কবিতা, যা সাধারণের মনে সাড়া জাগাতে পারে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমি নবীকে কবিতা ও কাব্য শিক্ষা দেইনি এবং তা তাঁর জন্যে শোভনীয়ও নয়। সুতরাং তাঁকে কবি বলা ভ্রান্ত।

এখানে প্রশ্ন দেখা যায় যে, কাব্য রচনা আরব জাতির মজ্জাগত বিষয়। তাদের নারী ও বালক-বালিকারাও অনর্গল কবিতা বলে। কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে তারা সম্যক জ্ঞাত। সুতরাং তারা কিসের ভিত্তিতে কোরআনকে কবিতা এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কবি বলেছে? কারণ, কোরআন কবিতার ছন্দ ও শেষ অক্ষরের মিল মেনে চলেনি। একে কোন মূর্খ এবং কাব্য চর্চা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও কবিতা বলতে পারে না।

এর জওয়াব এই যে, কবিতা আসলে কাল্পনিক স্বরচিত বিষয়কে বলা হয়, তা পদ্যেই হোক অথবা গদ্যে। কোরআনকে কবিতা এবং *রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -কে কবি বলার পেছনে কাফেরদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে,* তাঁর আনীত কালাম নিছক কাল্পনিক গল্প-গুজব অথবা তারা বোঝাতে চেয়েছিল যে, পদ্য ও কবিতা যেমন বিশেষ প্রভাব রাখে, এর প্রভাবও ঠিক তেমনি। ইমাম জাসসাস রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কখনও কোন কবিতা আবৃত্তি করতেন কি? তিনি উত্তরে বললেন, সাধারণতঃ করতেন না; তবে ইবনে-তুরফার এক পংক্তি কবিতা তিনি একবার আবৃত্তি করেছিলেন।

পংক্তিটি এইঃ

ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا

وياتيك بالاخبار من لم تزود

তিনি একে ছন্দ পরিবর্তন করে, من لم تزود بالاخبار আবৃত্তি করলে হযরত আবুবকর (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, কবিতাটি এভাবে নয়। তখন তিনি বললেন, আমি কবি নই এবং কাব্যচর্চা আমার জন্যে শোভনীয়ও নয়।

তিরমিযী, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে কাসীরও তাঁর তফসীরে-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ থেকে

প্রতীয়মান হল যে, স্বয়ং কোন কবিতা রচনা করা তো দূরের কথা, তিনি অন্যের কবিতা আবৃত্তি করাও নিজের জন্যে শোভনীয় মনে করতেন না।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

سُورَةُ الصّٰفّٰت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾

(৭১) তারা কি দেখে না, তাদের জন্যে আমি আমার নিজ হাতের তৈরী বস্তুর দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তারাই এগুলোর মালিক। (৭২) আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি। ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। (৭৩) তাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে অনেক উপকারিতা ও পানীয় রয়েছে। তবুও কেন তারা শুকরিয়া আদায় করে না? (৭৪) তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে। (৭৫) অথচ এসব উপাস্য তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে না এবং এগুলো তাদের বাহিনী রূপে ধৃত হয়ে আসবে। (৭৬) অতএব তাদের কথা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে। আমি জানি যা তারা গোপনে করে এবং যা তারা প্রকাশ্যে করে। (৭৭) মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? অতঃপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডাকারী। (৭৮) সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? (৭৯) বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (৮০) যিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন। তখন তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও। (৮১) যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হাঁ, তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (৮২) তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায়। (৮৩) অতএব পবিত্র তিনি, যাঁর হাতে সবকিছুর রাজত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

সূরা আস্-সাফ্ফাত

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১৮২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্ তাআলার নামে শুরু—

(১) শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, (২) অতঃপর ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারীদের, (৩) অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের—

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

— আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু সৃজনে মানুষের উপকারিতা এবং প্রকৃতির অসাধারণ কারিগরি উল্লেখ করার সাথে আল্লাহ্ তাআলার আরও একটি মহা অনুগ্রহ বিধৃত হয়েছে। তা এই যে, চতুষ্পদ জন্তু সৃজনে মানুষের কোনই হাত নেই। এগুলো একান্তভাবে প্রকৃতির স্বহস্ত নির্মিত। আল্লাহ্ তাআলা মুমিনকে কেবল চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা উপকার লাভের সুযোগ ও অনুমতিই দেননি, বরং তাদেরকে এগুলোর মালিকও করে দিয়েছেন। ফলে তারা এগুলোতে সর্বপ্রকারে মালিকসুলভ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। নিজে এগুলোকে কাজে লাগাতে পারে অথবা এগুলো বিক্রী করে সে মূল্য দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

মালিকানার মূল কারণ আল্লাহ্র দান, পুঁজি ও শ্রম নয় ঃ আজকাল নতুন নতুন অর্থনৈতিক মতবাদের মধ্যে জোরেসোরে আলোচনা চলছে যে, বস্তুনিচয়ের মালিকানায় পুঁজি মূল কারণ, না শ্রম? পুঁজিবাদি অর্থনীতির প্রবক্তারা পুঁজিকেই মূল কারণ সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা শ্রমকে মালকানার আসল কারণ আখ্যা দেয়। আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, বস্তুনিচয়ের মালিকানায় এতদুভয়ের কোনই প্রভাব নেই। কোন বস্তুর সৃষ্টিই মানুষের করায়ত্ত নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ্র কাজ। বুদ্ধি ও বিবেকের দাবী এই যে, যে যে বস্তু সৃষ্টি করে, তার মালিকও সেই হবে। এভাবে মূল ও সত্যিকার মালিকানা জগতের বস্তুনিচয়ের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলারই। যে কোন বস্তুর মধ্যে মানুষের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্র দানের কারণে হতে পারে। বস্তুনিচয়ের মালিকানার প্রমাণ ও তা হস্তান্তরের আইন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পয়গম্বরগণের মাধ্যমে পৃথিবীতে জারি করেছেন। এই আইনের বিরুদ্ধে কেউ কোন বস্তুর মালিক হতে পারে না।

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ এতে আরও একটি অনুগ্রহ ও নেয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উট, ঘোড়া, হাতী, বলদ ইত্যাদি অধিকাংশ জীব-জন্তু মানুষ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তাদের সামনে মানুষ একান্তই দুর্বল। ফলে এসব জন্তু মানুষের বশীভূত না হওয়াই ছিল যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এগুলো সৃষ্টি করে যেমন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি এসব জন্তুকে স্বভাবগতভাবে মানুষের বশীভূতও করে দিয়েছেন। ফলে একজন বালকও একটি শক্তিশালী ঘোড়ার মুখে অনায়াসে লাগাম পরিয়ে দিতে পারে। এরপর তার পিঠে চেপে বসে যত্রতত্র নিয়ে যেতে পারে। এটাও মানুষের কোন বাহাদুরী নয়; একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার দান।

وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ এখানে جُندٌ এর অর্থ প্রতিপক্ষ নেয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য স্থির করেছে, তারাই কেয়ামতের দিন তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ আয়াতের তফসীর এই যে, কাফেররা সাহায্য পাওয়ার আশায় মূর্তিদেরকে উপাস্য স্থির করেছিল, কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, স্বয়ং তারাই মূর্তিদের সেবাদাস ও সিপাহী হয়ে গেছে। তারা মূর্তিদের হেফাযত করে। কেউ বিরুদ্ধে গেলে তারা ওদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে। অথচ তাদেরকে সাহায্য করার যোগ্যতা

মূর্তিদের নেই।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ — সূরা ইয়াসীনের আলোচ্য সর্বশেষ পাঁচটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে, যা কোন কোন রেওয়ায়েতে উবাই ইবনে খলফের ঘটনা বলে এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আ'স ইবনে ওয়ায়েলের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয়ের তরফ থেকে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রথম রেওয়ায়েতটি বায়হাকী শো'আবুল-ঈমান এবং দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি এই যে, আ'স ইবনে ওয়ায়েল মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় কুড়িয়ে তাকে স্বহস্তে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলল, এই যে হাড়টি চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় দেখছেন, আল্লাহ্ তাআলা একেও জীবিত করবেন কি? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে মৃত্যু দেবেন, পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং জাহান্নামে দাখিল করবেন। — (ইবনে-কাসীর)

خَصِيمٌ مُّبِينٌ অর্থাৎ, নিকৃষ্ট বীর্য থেকে সৃষ্ট এ মানুষ আল্লাহ্‌র কুদরত অস্বীকার করে কেমন খোলাখুলি বাকবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়েছে!

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا আ'স ইবনে ওয়ায়েল পুরাতন হাড়কে স্বহস্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এর পুনরুজ্জীবন অসম্ভব মনে করেছিল। এখানে ضرب مثل (দৃষ্টান্ত বর্ণনা) বলে এ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। এরপর বলা হয়েছেঃ

وَنَسِيَ خَلْقَهُ অর্থাৎ, এ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার সময় সে নিজের সৃষ্টি তত্ত্ব ভুলে গেল যে, নিকৃষ্ট, নাপাক ও নিষ্প্রাণ একটি শুক্রবিন্দুতে প্রাণসঞ্চার করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি সে এই মূল তত্ত্ব বিস্মৃত না হত, তবে এরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে খোদায়ী কুদরতকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পারত না।

جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا আরবে মারখ ও ইফার নামক দুই ধরনের বৃক্ষ ছিল। আরবরা এই দুই প্রকারের দু'টি শাখা মিসওয়াকের পরিমাণে কেটে নিত। অতঃপর সম্পূর্ণ তাজা ও রস ভর্তি শাখাদ্বয়কে পরস্পর ঘষে আগুন জ্বালাত। আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। — (কুরতুবী)

এছাড়া আয়াতের মর্ম এও হতে পারে যে, প্রত্যেক বৃক্ষ শুরুতে সবুজ ও সতেজ থাকার পর পরিশেষে শুকিয়ে আগুনের ইন্ধন হয়ে যায়। কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও তাইঃ

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ

— অর্থাৎ, তোমরা কি সে আগুনের প্রতি লক্ষ্য কর না, যাকে তোমরা প্রজ্জ্বলিত করে কাজে লাগাও? যে বৃক্ষ এই আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়, সেটি কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমি?

কিন্তু আলোচ্য আয়াতে شجر শব্দের সাথে اخضر (সবুজ) বিশেষণ উল্লেখ থাকায় বাহ্যিক অর্থ সে বিশেষ বৃক্ষই হবে যা থেকে সবুজতা সত্ত্বেও আগুন নির্গত হয়।

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ কোন কিছু তৈরী করতে চাইলে প্রথমে উপকরণ সংগ্রহ করে, অতঃপর কারিগর ডাকে, অতঃপর বেশ কিছুকাল কাজ করার পর বাঞ্ছিত বস্তুটি তৈরী হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন এতসব সাত-পাঁচের প্রয়োজন হয় না। তিনি যখন যে বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন সে বস্তুকে কেবল আদেশ দেয়াই যথেষ্ট হয়। তিনি যে বস্তুকে 'হয়ে যা' বলেন, তা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়। এতে জরুরী হয় না যে, প্রত্যেক বস্তুই তাৎক্ষণিকভাবে সৃজিত হবে; বরং স্রষ্টার রহস্যের অধীনে যে বস্তুর তাৎক্ষণিক সৃষ্টি উপযোগী হয়, তা তাৎক্ষণিকভাবেই সৃজিত হয়। পক্ষান্তরে যে বস্তুর পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি কোন রহস্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তাকে পর্যায়ক্রমেই সৃষ্ট করা হয়। এমতাবস্থায় প্রথমেই পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টির আদেশ জারি করা হয় অথবা প্রত্যেক পর্যায়ে আলাদাভাবে كُن (হয়ে যা) আদেশ জারি করা হয়।

সূরা আস্-সাফ্ফাত

সূরার বিষয়বস্তুঃ এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য সূরার মত এর মৌলিক বিষয়বস্তুও ঈমানতত্ত্ব। এতে তওহীদ, রেসালত ও আখেরাতের বিশ্বাসসমূহ বিভিন্ন পন্থায় প্রমাণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুশরিকদের ভ্রান্ত আকীদাসমূহেরও খণ্ডন করা হয়েছে। এতে জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাসমূহের চিত্রায়ন হয়েছে। পয়গম্বরগণের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত বিশ্বাসসমূহ প্রমাণ করা এবং কাফেরদের সন্দেহ ও আপত্তি নিরসনের পর অতীতে যারা এসব বিশ্বাসকে সত্য বলে স্বীকার করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ্ তাআলা কি আচরণ করেছেন এবং যারা অস্বীকার ও শিরকের পথ অবলম্বন করেছে, তাদের পরিণতি কি হয়েছে সেসব বিষয় বিবৃত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নূহ (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁদের পুত্রগণ, হযরত মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ), হযরত ইলিয়াস (আঃ), হযরত লূত (আঃ) ও হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনাবলী কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কার মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহ্‌র কন্যা' বলে অভিহিত করত। কাজেই, এ সূরার উপসংহারে বিশদভাবে এ বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে। সূরার সামগ্রিক বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, এতে বিশেষভাবে ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত বিশেষ বিষয়ের খণ্ডন করাই লক্ষ্য। এ কারণেই সূরাটি ফেরেশতাগণের শপথ এবং তাদের আনুগত্যের গুণাবলী বর্ণনার মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে।

إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ④ رَّبُّ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ
الْمَشَارِقِ ⑤ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ⑥ وَحِفْظًا
مِّن كُلِّ شَيْطَٰنٍ مَّارِدٍ ⑦ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ
مِن كُلِّ جَانِبٍ ⑧ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ⑨ إِلَّا مَنْ خَطِفَ
الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ⑩ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم
مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ⑪ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ⑫
وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ⑬ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ⑭ وَقَالُوا إِنْ
هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑮ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ⑯
أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ⑰ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ⑱ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ
وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ⑲ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ⑳ هَٰذَا
يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ㉑ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا
وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ㉒ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ
صِرَاطِ الْجَحِيمِ ㉓ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ㉔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ㉕ بَلْ
هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ㉖ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ㉗
قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ㉘ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ㉙

(৪) নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ এক। (৫) তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। (৬) নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি। (৭) এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। (৮) ওরা উর্ধ্ব জগতের কোনকিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। (৯) ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে। ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। (১০) তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (১১) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি? আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এঁটেল মাটি থেকে। (১২) বরং আপনি বিস্ময় বোধ করেন আর তারা বিদ্রূপ করে। (১৩) যখন তাদেরকে বোঝানো হয়, তখন তারা বোঝে না। (১৪) তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন বিদ্রূপ করে (১৫) এবং বলে, কিছুই নয়, এযে স্পষ্ট যাদু, (১৬) আমরা যখন মরে যাব, এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? (১৭) আমাদের পিতৃপুরুষগণও কি? (১৮) বলুন, হাঁ এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত। (১৯) বস্তুতঃ সে উত্থান হবে একটি বিকট শব্দ মাত্র—যখন তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। (২০) এবং বলবে, দুর্ভাগ্য আমাদের! এটাই তো প্রতিফল দিবস। (২১) বলা হবে, এটাই ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (২২) একত্রিত কর গোনাহগারদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের এবাদত তারা করত (২৩) আল্লাহ্ ব্যতীত। অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে, (২৪) এবং তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে; (২৫) তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? (২৬) বরং তারা আজকের দিনে আত্মসমর্পনকারী। (২৭) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (২৮) বলবে, তোমরা তো আমাদের কাছে ডান দিক থেকে আসতে। (২৯) তারা বলবে, বরং তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম বস্তু তওহীদ ঃ সূরাটিতে তওহীদ তথা একত্ববাদ সংক্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রথম চার আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হল একথা বর্ণনা করা যে, إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ (অর্থাৎ, নিশ্চিতই তোমাদের মাবুদ একজন।) কিন্তু বর্ণনার আগে তিনটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে। এসব শপথের নির্ভেজাল শাব্দিক অনুবাদ এই ঃ- শপথ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোদের, অতঃপর শপথ প্রতিরোধকারীদের, অতঃপর শপথ কোরআন তেলাওয়াতকারীদের। কিন্তু এ তিন প্রকার লোক কারা? কোরআনে তার সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। ফলে এর তফসীরে বিভিন্ন রকম উক্তি করা হয়েছে। কেউ বলেন ঃ এখানে আল্লাহ্‌র পথে জেহাদকারী গাজীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা মিথ্যা শক্তির বিরুদ্ধে বাধার প্রাচীর দাঁড় করার জন্যে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং সারিবদ্ধ হওয়ার সময় যিকর তথা তসবীহ্ ও কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকে।

কেউ বলেন ঃ আয়াতে সেসব নামাযীকে বোঝানো হয়েছে, যারা মসজিদে সারিবদ্ধ হয়ে শয়তানী চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্মের প্রতি বাধা আরোপ করে এবং নিজেদের সমগ্র ধ্যান ধারণাকে যিকর ও তেলাওয়াতে নিবদ্ধ করে দেয়।—(তফসীরে কবীর ও কুরতুবী) এতদ্ব্যতীত কোরআনের ভাষার সাথে তেমন সামঞ্জস্যশীল নয়, এ ধরনের আরও কিছু তফসীর বর্ণিত রয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে স্বীকৃত তফসীর এই যে, আয়াতে ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে এবং তাদেরই তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম বিশেষণ হচ্ছে وَالصَّافَّاتِ صَفًّا এটি صف শব্দ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ কোন জনসমষ্টিকে এক সরল রেখায় সন্নিবেশিত করা।— (কুরতুবী) কাজেই আয়াতের অর্থ হবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো ব্যক্তিবর্গ।

এ সূরায়ই এরপরেও ফেরেশতাগণের সারিবদ্ধ হওয়ার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। ফেরেশতাগণের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এটা কখন হয়? এ প্রশ্নের জওয়াবে তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ) ও কাতাদাহ্ (রাঃ) প্রমুখ বলেন যে, ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা শূন্য পথে সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র আদেশের অপেক্ষায় উৎকর্ণ থাকে। যখনই কোন আদেশ হয়, তখনই তা কার্যে পরিণত করে।—(মাযহারী) কারও কারও মতে এটা কেবল এবাদতের সময়ই হয়। অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ যখন এবাদত, যিকর ও তসবীহে মশগুল হয়, তখন সারিবদ্ধ হয়।— (তফসীরে কবীর)

শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, দ্বীনের প্রত্যেক কাজে নিয়ম ও শৃঙ্খলা ও উত্তম রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা কাম্য এবং আল্লাহ্ তাআলার পছন্দনীয়। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্ তাআলার এবাদত হোক কিংবা তাঁর আদেশ পালন হোক, উভয় কর্ম সারিবদ্ধ হওয়ার পরিববর্তে এলোমেলোভাবে একত্রিত হয়েও ফেরেশতাগণ সম্পাদন করতে পারত, কিন্তু এহেন বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে তাদেরকে সারিবদ্ধ হওয়ার তওফীক দেয়া হয়েছে। আয়াতে তাদের উত্তম গুণাবলীর মধ্যে সর্বাগ্রে এ গুণটি উল্লেখ করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা আল্লাহ্ তাআলার খুবই পছন্দনীয়।

নামাযে সারিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব ঃ বস্তুত মানবজাতিকেও এবাদতের সময় সারিবদ্ধ হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তৎপ্রতি জোর দেয়া হয়েছে। হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ্ বর্ণনা করেন যে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে বললেন ঃ তোমরা (নামাযে) সারিবদ্ধ হও না কেন, যেমন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার সামনে সারিবদ্ধ হয়? সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার সামনে কিভাবে সারিবদ্ধ হয়? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ তারা কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায় (অর্থাৎ, মাঝখানে জায়গা খালি রাখে না)।—(তফসীরে মাযহারী)

নামাযের কাতার পূর্ণ করা ও সোজা রাখার উপর জোর দিয়ে এত অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলো একত্রে সংগ্রহ করলে একটি পূর্ণ পুস্তিকা রচিত হতে পারে। হযরত আবু মাসউদ বদরী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) নামাযে আমাদের কাঁধে হাত লাগিয়ে বলতেন ঃ সোজা হয়ে থাক, আগে পিছে থেকো না। নতুবা তোমাদের অন্তরে অনৈক্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।—(মুসলিম, নাসায়ী)।

ফেরেশতাগণের দ্বিতীয় বিশেষণ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا বর্ণিত হয়েছে। এটা زجر থেকে উৎপন্ন। অর্থ প্রতিরোধ করা, ধমক দেয়া, অভিশাপ দেয়া। হযরত থানভী (রহঃ) এর অনুবাদ করেছেন প্রতিরোধকারী। ফলে এ শব্দের সবগুলো সম্ভাব্য অর্থ এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ফেরেশতাগণ কিসের প্রতিরোধ করে? কোরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ তফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, এখানে ফেরেশতাগণের সে কর্মকাণ্ড বোঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা শয়তানদেরকে উর্ধ্ব জগতে পৌছতে বাধা দান করে। খোদ কোরআন পাকে এ সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা পরে উল্লেখিত হবে।

তৃতীয় বিশেষণ হচ্ছে فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ 'যিকর' এর তেলাওয়াত করে। যিকরের মর্মার্থ উপদেশ বাক্যও হয় এবং আল্লাহ্র স্মরণও হয়। প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে যেসব উপদেশ নাযিল করেছেন, তারা সেগুলো তেলাওয়াত করে। এ তেলাওয়াত পুণ্য অর্জন ও এবাদত হিসেবেও হতে পারে অথবা ওহী বহনকারী ফেরেশতাগণ পয়গম্বরগণের সামনে উপদেশপূর্ণ ঐশী গ্রন্থ তেলাওয়াতের মাধ্যমে যে পয়গাম পৌছান, তাও বোঝানো যেতে পারে। পক্ষান্তরে 'যিকর' – এর অর্থ আল্লাহ্র স্মরণ নেয়া হলে উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা যেসব বাক্য পাঠে রত থাকে, সেগুলো আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা জ্ঞাপন করে।

কোরআন পাক এখানে ফেরেশতাগণের উল্লেখিত বিশেষণ বর্ণনা করে আনুগত্য ও দাসত্বের সব ক'টি গুণই সান্নিবেশিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ, এবাদতের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে থাকা, আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে শয়তানী শক্তিসমূহকে প্রতিরোধ করা এবং আল্লাহ্র বিধানাবলী ও উপদেশাবলী নিজে পাঠ করা ও অপরের কাছে পৌছানো। বলাবাহুল্য দাসত্বের কোন কর্মকাণ্ড এ তিনটি শাখার বাইরে থাকতে পারে না। অতএব উল্লেখিত চারখানি আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াল এই যে, যে সব ফেরেশতা দাসত্বের যাবতীয় গুণের অধিকারী তাদের শপথ—একজনই তোমাদের সত্য মা'বুদ।

ফেরেশতাগণের শপথ করার কারণ ঃ এ সূরায় বিশেষভাবে ফেরেশতাগণের শপথ করার কারণ এই যে, মক্কার কাফেররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা বলে অভিহিত করত। সেমতে সূরার শুরুতেই ফেরেশতাগণের শপথ করে তাদের এমন গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে তাদের পরিপূর্ণ দাসত্ব প্রকাশ পায়। ফেরেশতাগণের এসব দাসত্ব জ্ঞাপক গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা করলে তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ্ তাআলার সাথে তাদের সম্পর্ক পিতা ও কন্যার নয়, বরং তাদের মধ্যে দাস ও প্রভুর সম্পর্ক।

আল্লাহ্ তাআলার নামে শপথ ঃ কোরান পাকে আল্লাহ্ তাআলা ঈমান ও বিশ্বাস সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়ের উপর জোর দেয়ার জন্যে বিভিন্ন ধরনের শপথ করেছেন। কখনও আপন সত্তার এবং কখনও বিশেষ বিশেষ সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বহু প্রশ্ন দেখা দিতে পারে বিধায় কোরআন পাকের তফসীরে এটি একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম (রহঃ) এ সম্পর্কে 'আত্তিবইয়ান ফী আকসামিল কোরআন' নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) উসূলে তফসীর সম্পর্কিত 'এতকান' গ্রন্থের ৬৭ তম অধ্যায়ে এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে তার কিছু জরুরী অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তাআলার শপথ করার ফলে প্রশ্ন জাগে যে, তিনি তো পরম স্বয়ম্ভর ও অমুখাপেক্ষী। কাউকে আশ্বস্ত করার জন্যে শপথ করার তাঁর কি প্রয়োজন?

এতকানে আবুল কাসেম কুশায়রী (রহঃ) থেকে এ প্রশ্নের জওয়াবে বর্ণিত রয়েছে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলার জন্যে শপথ করার কোনই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁর অপার স্নেহ ও করুণাবশতঃই তিনি তা করেছেন। যাতে তারা কোন না কোন উপায়ে সত্য বিষয় কবুল করে নেয় এবং আযাব থেকে অব্যাহতি পায়। জনৈক মরুবাসী

وَفِى السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ

আয়াত শুনে বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্র মত মহান সত্তাকে কে অসন্তুষ্ট করল এবং কে তাঁকে শপথ করতে বাধ্য করল?

সারকথা, মানুষের প্রতি স্নেহ ও করুণাই শপথ করার কারণ। সাংসারিক বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করার সুবিদিত পন্থা যেমন দাবীর স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করার এবং সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে শপথ করা, তেমনি আল্লাহ্ তাআলা মানুষের এই পরিচিত পন্থাই নিজেও অবলম্বন করেছেন। তিনি কোথাও شهادة শব্দের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে জোরদার করেছেন— যেমন, شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ এবং কোথাও শপথ বাক্যের দ্বারা যেমন اِىْ وَرَبِّىْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ সাধারণতঃ শপথ করা হয় নিজের চেয়ে উত্তম সত্তার। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আপন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করেছেন, যা আল্লাহ্ অপেক্ষা উত্তম তো নয়ই, বরং সব দিক দিয়েই অধম।

উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তাআলা অপেক্ষা বড় কোন সত্তা যখন নেই এবং হতেও পারে না, তখন আল্লাহ্ তাআলার শপথ যে, সাধারণ সৃষ্টির শপথের মত হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। তাই আল্লাহ্ তাআলা কোথাও আপন সত্তার শপথ করেছেন যেমন اِىْ وَرَبِّىْ এ ধরনের শপথ কোরআন পাকে সাত জায়গায় বর্ণিত হয়েছে — কোথাও আপন কর্ম, গুণাবলী এবং কোরআনের শপথ করেছেন, যেমন – وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কারণ, সৃষ্টবস্তু আধ্যাত্মজ্ঞানের মাধ্যম বিধায় পরিণামে

আল্লাহ্র সত্তা থেকে পৃথক নয়।— (ইবনে-কাইয়েম)

বিভিন্ন উদ্দেশে ও লক্ষ্যে সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কোথাও কোন সৃষ্ট বস্তুর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার লক্ষ্যে তার শপথ করা হয়েছে, যেমন-কোরআন পাকে রসূলে করীম (সাঃ)-এর আয়ুষ্কালের শপথ করে বলা হয়েছেঃ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ইবনে মরদুবিয়্যাহ্ হযরত ইবনে-আব্বাসের উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। তাই সমগ্র কোরআনে কোন নবী ও রসূলের সত্তার শপথ উল্লেখিত হয়নি; কেবল রসূলে করীম (সাঃ)-এর আয়ুষ্কালের শপথ উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ - এর শপথও তূর পর্বত ও কিতাবের মহত্ত্ব প্রকাশ করার জন্যে করা হয়েছে।

মাঝে মাঝে কল্যাণবহুল হওয়ার কারণে কোন কোন বস্তুর শপথ করা হয়— যেমন, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ কোন কোন ক্ষেত্রে কোন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা হয় এজন্যে যে, সে বস্তুর সৃষ্টি আল্লাহ্ তাআলার মহান কুদরতের পরিচায়ক এবং বিশ্ব স্রষ্টার পরিচয় লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে থাকে। তবে সাধারণতঃ যে বস্তুর শপথ করা হয়, তার কিছু না কিছু প্রভাব সে বিষয়বস্তু প্রমাণে অবশ্যই থাকে, যার জন্যে শপথ করা হয়। প্রতিটি শপথের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে এই প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ সাধারণ মানুষের জন্যে শরীয়তের প্রসিদ্ধ বিধান এই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কারও শপথ করা বৈধ নয়। আল্লাহ্ তাআলা যে সৃষ্টবস্তুর শপথ করেছেন, তা কি এ বিষয়ের প্রমাণ নয় যে, অন্যের জন্যেও গায়রুল্লাহ্র শপথ করা বৈধ? এ প্রশ্নের জওয়াবে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেনঃ

'আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্ট যে কোন বস্তুর শপথ করার এখতিয়ার রাখেন, কিন্তু অন্য কারও জন্যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কিছুর শপথ করা বৈধ নয়।—(মাযহারী)

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যদি নিজেকে আল্লাহ্ তাআলার অনুরূপ মনে করে, তবে তা নিতান্তই ভ্রান্ত ও বাতিল হবে। শরীয়ত সাধারণ মানুষের জন্যে গায়রুল্লাহ্র শপথ নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার ব্যক্তিগত কাজকে এর বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা বাতিল।

এখন উল্লেখিত আয়াতসমূহের তফসীর লক্ষ্য করুন।

প্রথম চার আয়াতে ফেরেশতাগণের শপথ করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের সত্য মা'বুদ এক আল্লাহ্। শপথের সাথে সাথে উল্লেখিত ফেরেশতাগণের গুণাবলী সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলে যদিও এগুলো তওহীদেরই দলীল বলে মনে হয়, কিন্তু পরবর্তী ছয় আয়াতে আলাদাভাবে তওহীদের দলীল বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ - তিনি পালনকর্তা আসমানসমূহের, যমীনের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর এবং তিনি পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। অতএব যে সত্তা এতসব মহাসৃষ্টির স্রষ্টা ও পালনকর্তা, এবাদতের যোগ্যও তিনিই হবেন। সমগ্র সৃষ্টজগত তাঁর অস্তিত্ব ও একত্বের দলীল। এখানে مشارق শব্দটি مشرق এর বহুবচন। সূর্য বছরের প্রতিদিন এক নতুন জায়গা থেকে উদিত হয়। তাই উদয়াচল অনেক। এ কারণেই এখানে বহুবচন পদবাচ্য হয়েছে।

السَّمَاءَ الدُّنْيَا - এখানে إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ অর্থ পৃথিবীর নিকটতম আকাশ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি। এখন এটা জরুরী নয় যে, তারকারাজি আকাশগাত্রেই খচিত হবে, বরং আকাশ থেকে পৃথক হলেও পৃথিবী থেকে দেখলে আকাশেই খচিত বলেই মনে হবে। তারকারাজির কারণে গোটা আকাশ ঝলমল করতে থাকে। এখানে কেবল এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, এই তারকা শোভিত আকাশ সাক্ষ্য দেয় যে, এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি, বরং একজন স্রষ্টা এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। যে সত্তা এসব মহান বস্তুকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম তাঁর কোন শরীক বা অংশীদারের প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া মুশরিকদের কাছেও একথা স্বীকৃত যে, সমগ্র সৌরজগতের স্রষ্টাই আল্লাহ্ তাআলা। অতএব আল্লাহ্কে স্রষ্টা ও মালিক জেনেও অন্যের এবাদত করা সত্যি সত্যিই মহা অবিচার ও যুলুম।

কোরআন পাকের দৃষ্টিকোণে তারকারাজি আকাশগাত্রে গাঁথা, না আকাশ থেকে আলাদা, এছাড়া সৌর বিজ্ঞানের সাথে কোরআনের সম্পর্ক কি?- এই আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে 'সূরা-হিজরে' বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে।

وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ থেকে ثَاقِبٌ পর্যন্ত আয়াতসমূহে শোভা ও সাজ-সজ্জা ছাড়া তারকারাজির আরও একটি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলোর সাহায্যে দুষ্ট প্রকৃতির শয়তানদেরকে ঊর্ধ্ব জগতের কথাবার্তা শোনা থেকে বিরত রাখা হয়। শয়তানরা গায়েবী সংবাদ শোনার জন্যে আকাশের কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাদেরকে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার সুযোগ দেয়া হয় না। কোন শয়তান যৎসামান্য শুনে পালালে তাকে শিখায়িত উল্কাপিণ্ডের আঘাতে ধ্বংস করে দেয়া হয়, যাতে সে পৃথিবীতে পৌঁছে ভক্ত অতিন্দ্রিয়বাদী ও জ্যোতিষীদেরকে কিছু বলতে না পারে। এই জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে شِهَابٌ ثَاقِبٌ বলা হয়েছে।

উল্কাপিণ্ডের কিছু বিবরণ সূরা হিজরে উল্লেখিত হয়েছে। তবুও এখানে এতটুকু বলে দেয়া প্রয়োজন যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতে উল্কাপিণ্ড প্রকৃতপক্ষে ভূ-ভাগে উৎপন্ন এক প্রকার উপাদান, যা বাষ্পের সাথে উপরে উত্থিত হয় এবং অগ্নিমণ্ডলের নিকটে পৌঁছে বিস্ফোরিত হয়ে যায়। কিন্তু কোরআন পাকের বাহ্যিক ভাষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উল্কাপিণ্ড ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোন উপাদান নয়, বরং ঊর্ধ্বজগতেই তা উৎপন্ন হয়। এখানে প্রাচীন তফসীরবিদগণের বক্তব্য ছিল এই যে, উল্কাপিণ্ড সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিকদের ধারণা নিছক অনুমান ও আন্দাজের উপর নির্ভরশীল। কাজেই এর ভিত্তিতে কোরআনের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। এছাড়া ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোন উপাদান উপরে পৌঁছে বিস্ফোরিত হয়ে গেলেও তা কোরআনের পরিপন্থী নয়।

কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এ প্রশ্নই খতম করে দিয়েছে। আধুনিক কালের বিজ্ঞানীদের ধারণা এই যে, উল্কাপিণ্ড অসংখ্য তারকারাজিরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ যা সাধারণতঃ বড় আকারের ইটের সমান হয়ে থাকে। এগুলো মহাশূন্যে অবস্থান করে এবং ৩৩ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এগুলোর সমষ্টিকেই 'উল্কা' (Shooting Star) বলা হয়। পৃথিবীর নিকটবর্তী হলে এরা পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ দ্বারাও আকৃষ্ট হয়। তখন প্রচণ্ড বেগে এ উল্কা ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ছুটে আসে। বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরে ৬০ মাইল দূরত্বে পৌঁছলে তা বাতাসের ঘর্ষণে

প্রজ্বলিত ও ভস্মীভূত হয়। উর্ধ্বাকাশে পরিলক্ষিত অধিকাংশ উল্কাই বায়ুমণ্ডলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায়। (ইংরেজীতে এগুলোকে Meteoriod বলা হয়)। আগষ্টের ১০ তারিখ এবং নভেম্বরের ২৭ তারিখে এগুলো অধিক পরিলক্ষিত হয় এবং ২০ শে এপ্রিল, ২৮শে নভেম্বর, ১৮ই অক্টোবর ও ৬, ৯ ও ১৩ই ডিসেম্বরের রাতে হ্রাস পায়।— (আল্ জাওয়াহির)

আধুনিক বিজ্ঞানের এই গবেষণা কোরআন পাকের বর্ণনার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। যারা উল্কাপিণ্ডের সাহায্যে শয়তান ধ্বংস করাকে অলীক মনে করে, তাদের সম্পর্কে তানুতাভী মরহুম 'আল্ জাওয়াহির' গ্রন্থে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেনঃ

কোরআন পাক সাময়িক সৌর-বিজ্ঞানের বিপরীতে কোন কথা বলুক, এটা আমাদের পূর্বপুরুষদের একশ্রেণীর জ্ঞানী ও দার্শনিকদের কাছে অসহনীয় ছিল। কিন্তু তফসীরবিদগণ তাদের 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদ গ্রহণ করে কোরআনকে পরিত্যাগ করতে সম্মত হননি। বরং তাঁরা বৈজ্ঞানিক মতবাদ পরিত্যাগ করে কোরআনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। কিছুদিন পর আপনা-আপনিই একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল ছিল। এখন বলুন, যদি আমরা স্বীকার করে নেই যে, এই তারকারাজি শয়তানদেরকে জ্বালায় পোড়ায় এবং কষ্ট দেয়, তবে এতে বাধা কিসের? আমরা কোরআন পাকের এই বর্ণনা স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় আছি যখন বিজ্ঞানও অকুণ্ঠচিত্তে এ সত্য স্বীকার করে নেবে।— (আল-জাওয়াহির ১৪ পৃঃ অষ্টম খণ্ড)

আসল উদ্দেশ্য ঃ এখানে আকাশমণ্ডলী, তারকারাজি ও উল্কাপিণ্ডের আলোচনার এক উদ্দেশ্য তওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রমাণ করা। অর্থাৎ, যে সত্তা এককভাবে এই সুবিশাল সৌর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনিই এবাদত ও উপাসনার যোগ্য। দ্বিতীয়তঃ এতে তাদের ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে যারা শয়তানদেরকে দেবতা অথবা উপাস্য সাব্যস্ত করে। কারণ, শয়তান এক বিতাড়িত ও পরাভূত সৃষ্টজীব। খোদায়ীর সাথে তাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

এছাড়া এই বিষয়বস্তুর ভেতর ওদেরও পরিপূর্ণ খণ্ডন রয়ে গেছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কোরআন তথা ওহীকে অতীন্দ্রিয় বিষয় বলে আখ্যায়িত করতো। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন পাক অতীন্দ্রিয়বাদীদের বিরোধিতা করে। তাদের জানা বিষয়সমূহের সর্ববৃহৎ উৎস হচ্ছে শয়তান। অথচ কোরআন বলে যে, শয়তানদের উর্ধ্ব জগত পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভবপর নয়। তারা অদৃশ্য জগতের সত্য সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে না। অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কে কোরআন বর্ণিত এ বিশ্বাসের পর কোরআন কিরূপে অতীন্দ্রিয়াবাদ হতে পারে? এভাবে আলোচ্য আয়াতসমূহ তওহীদ ও রেসালত উভয় বিষয়বস্তুর সত্যতার প্রতি ইংগিত বহন করে। অতঃপর এসব নভোমণ্ডলীয় সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমেই পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে।

তওহীদের বিশ্বাস সপ্রমাণ করার পর আলোচ্য ১১ থেকে ১৮ এই আটটি আয়াতে পরকালের বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে মুশরিকদের উত্থাপিত সন্দেহের জওয়াবও দেয়া হয়েছে। সর্ব প্রথম আয়াতে মানুষের পুনরুজ্জীবন যে সম্ভবপর, তার পক্ষে জোরালো যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এই যুক্তির সারমর্ম এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত মহান সৃষ্টবস্তুসমূহের মোকাবেলায় মানুষ নেহায়েত দুর্বল সৃষ্টজীব। তোমরা যখন একথা স্বীকার কর যে, আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতা, চন্দ্র, তারকারাজি, সূর্য ও উল্কাপিণ্ডের ন্যায়, বস্তুসমূহকে স্বীয় কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তখন তার জন্যে মানুষের মত দুর্বল প্রাণীকে মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জীবিত করা কঠিন হবে কেন? শুরুতে যেমন তিনি তোমাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে তোমাদের দেহে আত্মা সঞ্চারিত করেছিলেন, তেমনিভাবে মৃত্যুর পর যখন তোমরা পুনরায় মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে, তখনও আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে পুনরায় জীবন দান করবেন।

'আমি তাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি'—একথার এক অর্থ এই যে, তাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় অর্থ প্রত্যেক মানুষই মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে। কারণ, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের মূল উপাদান পানি মিশ্রিত মাটি। কেননা, প্রত্যেক মানুষের জন্ম বীর্য থেকে এবং বীর্য রক্ত দ্বারা গঠিত হয়। রক্ত খাদ্যের নির্যাস। খাদ্য যে কোন আকারেই থাকুক না কেন, উদ্ভিদ তার মূল পদার্থ, আর উদ্ভিদ মাটি ও পানি থেকে উৎপন্ন।

মোটকথা, প্রথম আয়াতে পরকাল বিশ্বাসের যুক্তিভিত্তিক দলীল পেশ করা হয়েছে এবং এটা স্বয়ং তাদের কাছেই এ প্রশ্ন রেখে শুরু করা হয়েছে যে, তোমরা কঠিনতর সৃষ্টজীব, না আমি যাদের উল্লেখ করেছি তারা কঠিনতর? জওয়াব বর্ণনা সাপেক্ষ ছিল না। অর্থাৎ, উল্লেখিতদের সৃষ্টিই কঠিনতর। তাই জওয়াব উল্লেখ করার পরিবর্তে একথা বলে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, "আমি তাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।"

পরকালের যুক্তিপ্রমাণ শুনে মুশরিকরা যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করত, পরবর্তী পাঁচ আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে। মুশরিকদের সামনে পরকালের দু'রকম প্রমাণ বর্ণনা করা হত। (১) যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ। যেমন, ১১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং (২) ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ। অর্থাৎ, তাদেরকে মো'জেযা দেখিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত বর্ণনা করে বলা হত, তিনি আল্লাহ্র নবী। নবী কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না। তাঁর কাছে ঐশী সংবাদাদি আগমন করে। তিনি যখন বলেছেন যে, কেয়ামত আসবে, হাশর-নশর হবে এবং মানুষের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে, তখন তাঁর এসব সংবাদ নিশ্চিত সত্য। এসব মেনে নেয়া উচিত। যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি শুনে মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ —অর্থাৎ, আপনি তো তাদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও তারা পথে আসছে না। কিন্তু তারা উল্টো আপনার প্রমাণাদির প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করে। তাদেরকে যতই বোঝানো হোক, তারা বোঝে না। ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদির বেলায় তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ —অর্থাৎ, তারা আপনার নবুওয়ত ও শেষ পর্যন্ত পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে— এমন কোন মো'জেযা দেখলে তাকেও বিদ্রূপচ্ছলে উড়িয়ে দিয়ে বলতে থাকে, এটা প্রকাশ্য যাদু। তাদের কাছে এই উপহাস ও ঠাট্টার একটি মাত্র দলীল আছে। তা এই যে,

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ

অর্থাৎ, এটা আমাদের কল্পনায়ও আসে না যে, আমরা অথবা আমাদের পিতৃপুরুষগণ মাটি ও হাড়ে পরিণত হওয়ার পর কেমন করে

পুনরুত্থিত হব? ফলে আমরা কোনও যুক্তিভিত্তিক দলীল মানি না এবং কোন মোজেযা ইত্যাদিও স্বীকার করি না। আল্লাহ্ তাআলা এর জওয়াবে পরিশেষে একটি মাত্র বাক্য উল্লেখ করেছেন ঃ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ অর্থাৎ, আপনি বলে দিন, হ্যাঁ, তোমরা অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত হবে এবং লাঞ্ছিত ও অপমাণিত হয়ে জীবিত হবে।

পরকালের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করার পর আল্লাহ্ তাআলা ১৯-২৬ আয়াতসমূহে হাশর-নশরের কিছু ঘটনা এবং পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর কাফের ও মুসলমানগণ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, তার আলোচনা করেছেন।

১৯ নং আয়াতে মৃতদের জীবিত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ —অর্থাৎ, কেয়ামত তো কেবল একটি বিকট আওয়াজ। আরবী ভাষায় زَجْرَةٌ শব্দের একাধিক অর্থ হয়ে থাকে। এক অর্থ গৃহপালিত পশুদেরকে প্রস্থানোদ্যত করার জন্যে এমন আওয়াজ করা, যা শুনে তারা প্রস্থান করতে থাকে। এখানে মৃতদেরকে জীবিত করার উদ্দেশে ইসরাফীল (আঃ)-এর শিংগায় দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। একে زَجْرَةٌ বলে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, জন্তুদেরকে চালনা করার জন্যে যেমনি কিছু আওয়াজ করা হয়, তেমনি মৃতদেরকে জীবিত করার জন্যেও এই ফুৎকার দেয়া হবে।—(কুরতুবী)।

যদিও আল্লাহ্ তাআলা শিংগায় ফুঁক দেয়া ছাড়াই মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম, কিন্তু হাশর ও নশরের দৃশ্যকে ভীতিপূর্ণ করার জন্যে শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। (তফসীরে-কবীর) কাফেরদের উপর ফুৎকারের প্রভাব হবে এই যে, فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ —সহসাই তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। অর্থাৎ, দুনিয়াতে যেমন তারা প্রত্যক্ষ করতো তেমনি সেখানেও প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কেউ কেউ এর মর্ম এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তারা অস্থির অবস্থায় একে অপরকে দেখতে শুরু করবে।—(কুরতুবী)।

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ -অর্থাৎ, যারা শিরকের ন্যায় গুরুতর জুলুম করেছে, তাদেরকে এবং তাদের সতীর্থদেরকে একত্রিত কর। এখনে সতীর্থদের জন্যে أَزْوَاجٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ "জোড়া"। এ শব্দটি স্বামী ও স্ত্রীর অর্থেও বহুল ব্যবহৃত। এ কারণেই কোন কোন তফসীরবিদ-এর অর্থ মুশরিক পুরুষদের 'মুশরিক স্ত্রী' বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে أَزْوَاجٌ-এর অর্থ সতীর্থই।

এ ছাড়া وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ -বাক্য দ্বারা বলে দেয়া হয়েছে যে, মুশরিকদের কাছে তাদের মিথ্যা উপাস্য প্রতিমা ও শয়তানদেরকেও একত্রিত করা হবে, দুনিয়াতে তারা যাদেরকে আল্লাহ্র সাথে অংশীদার করত। এভাবে হাশরের ময়দানে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্ব সকলের দৃষ্টিতে সন্দেহাতীতভাবে ফুটে উঠবে।

এরপর ফেরেশতাগণকে আদেশ করা হবে ঃ

فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ —অর্থাৎ, এদেরকে জাহান্নামের পথ প্রদর্শন কর। তখন ফেরেশতাগণ ওদেরকে নিয়ে পুলসিরাতের নিকটে পৌছলে পুনরায় আদেশ হবে ঃ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ —এদেরকে থামাও, এদেরকে প্রশ্ন করা হবে। সেমতে সেখানে তাদেরকে বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করা হবে, যা কোরআন ও হাদীসের বহু স্থানে বর্ণিত রয়েছে।

হাশরের ময়দানে বড় বড় কাফের সর্দার তাদের অনুগামীদের সাথে সমবেত হয়ে একে অপরের কোন সাহায্য করতে পারবে না বরং তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি শুরু করে দেবে। ২৭-৪০ আয়াতসমূহে একথা কাটাকাটিরই কিছুটা চিত্র ফুটিয়ে তুলে উভয় দলের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতসমূহের মর্ম সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য।

إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ —এ বাক্যে يَمِين শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে। এক অর্থ শক্তি ও বল। উপরে এ অর্থ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা বেশ প্রবলভাবে আমাদের নিকট আসতে এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে। এ তফসীরই অধিক পরিচ্ছন্ন ও প্রকৃষ্ট। এ ছাড়া يَمِين -এর অর্থ শপথও হয়ে থাকে। তাই কেউ কেউ এর তফসীর করেছেন যে, তোমরা আমাদের নিকট শপথ নিয়ে আসতে। অর্থাৎ, শপথ করে করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করতে যে, আমাদের ধর্ম সঠিক এবং রসূলের শিক্ষা (নাউযুবিল্লাহ্) ভ্রান্ত। কোরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত উভয় তফসীরই স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাটে।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا
قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ إِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ﴿٣١﴾ فَأَغْوَيْنٰكُمْ إِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ
يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٤﴾
إِنَّهُمْ كَانُوْٓا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُوْلُوْنَ
أَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ
الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ
مَّعْلُوْمٌ ﴿٤١﴾ فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٤٣﴾ عَلٰى سُرُرٍ
مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ
لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ
الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ
يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ ﴿٥١﴾ يَّقُوْلُ
أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا
أَإِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ
فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللّٰهِ إِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٦﴾

(৩০) এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কতৃত্ব ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। (৩১) আমাদের বিপক্ষে আমাদের পালনকর্তার উক্তিই সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। (৩২) আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। কারণ, আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম। (৩৩) তারা সবাই সেদিন শাস্তিতে শরীক হবে। (৩৪) অপরাধীদের সাথে আমি এমনি ব্যবহার করে থাকি। (৩৫) তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত (৩৬) এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? (৩৭) না, তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন এবং রসূলগণের সত্যতা স্বীকার করেছেন। (৩৮) তোমরা অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করবে। (৩৯) তোমরা যা করতে, তারই প্রতিফল পাবে। (৪০) তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্র বাছাই করা বান্দা। (৪১) তাদের জন্যে রয়েছে নির্ধারিত রুযী (৪২) ফল-মূল এবং তারা সম্মানিত, (৪৩) নেয়ামতের উদ্যানসমূহ (৪৪) মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন। (৪৫) তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ পানপাত্র, (৪৬) সুশুভ্র, যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু। (৪৭) তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই এবং তারা তা পান করে মাতালও হবে না। (৪৮) তাদের কাছে থাকবে নত, আয়তলোচনা তরুণীগণ; (৪৯) যেন তারা সুরক্ষিত ডিম। (৫০) অতঃপর তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (৫১) তাদের একজন বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল। (৫২) সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, (৫৩) আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হব? (৫৪) আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি তাকে উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? (৫৫) অতঃপর সে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে। (৫৬) সে বলবে, আল্লাহ্র কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ —এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, যদি কেউ অপরকে অবৈধ কাজের দাওয়াত দেয় এবং তাকে পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করে, তবে পাপ কাজের প্রতি আহ্বান জানানোর কারণে আযাব অবশ্যই তাকেও ভোগ করতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার আমন্ত্রণ কবুল করে, সে-ও আপন কর্মের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। 'আমাকে অমুক ব্যক্তি পথভ্রষ্ট করেছিল' একথা বলে সে পরকালে আযাব থেকে নিস্কৃতি পাবে না। তবে যদি সে পাপ কাজটি স্বেচ্ছায় না করে বরং জোর-জবরদস্তিতে পড়ে প্রাণ রক্ষার্থে করে থাকে, তবে ইন্শাআল্লাহ্ সে ক্ষমা পাবে বলে আশা করা যায়।

জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর ৪১-৬১ আয়াতসমূহে জান্নাতীদের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দশ আয়াতে সাধারণ জান্নাতীদের আরাম-আয়েশ বিবৃত হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে একজন বিশেষ জান্নাতীর শিক্ষাপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দশ আয়াতে বর্ণিত কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

أُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ —এ আয়াতের শাব্দিক অর্থ এই যে, তাদের জন্য এমন রুযী তথা খাদ্য-সামগ্রী রয়েছে, যার অবস্থা জানা হয়ে গেছে। তফসীরবিদগণ এর বিভিন্ন মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন, এতে বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত বেহেশতী খাদ্য-সামগ্রীর বিশদ বিবরণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন।

فَوَاكِهُ শব্দটি فَاكِهَةٌ -এর বহুবচন। (যে ক্ষুধার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে নয়; বরং স্বাদ হাসিল করার জন্যে খাওয়া হয়, তাকেই আরবী ভাষায় فَاكِهَةٌ বলা হয়। ফল-মূলও স্বাদ হাসিল করার জন্যে খাওয়া হয়। তাই এর অনুবাদ করা হয় 'ফল-মূল'। অন্যথায় এর অর্থ ফল-মূলের অর্থের চেয়ে ব্যাপক। ইমাম রাযী فَوَاكِهُ শব্দ থেকে এ সূক্ষ্ম তত্ত্ব বের করেছেন যে, জান্নাতে যেসব খাদ্য-সামগ্রী দেয়া হবে, তা সবই স্বাদ ভোগ করার জন্যে দেয়া হবে—ক্ষুধা মেটানোর জন্যে নয়।

وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ —বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, জান্নাতীদেরকে এ রিযিক পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদাসহকারে দেয়া হবে। কারণ, সম্মান ব্যতীত সুস্বাদু খাদ্যও বিস্বাদ হয়ে যায়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, কেবল খানা খাওয়ালেই মেহমানের হক আদায় হয়ে যায় না বরং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ —এটা জান্নাতীদের মজলিসের চিত্র। তারা রাজাসনে মুখোমুখি হয়ে বসবে। কারও দিকে কারও পিঠ থাকবে না। এর বাস্তব চিত্র কি হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলাই সঠিক জানেন। কেউ কেউ বলেন, মজলিসের পরিধি এত সুদূর বিস্তৃত হবে যে, একে অপরের দিকে পিঠ করার প্রয়োজন হবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতীদেরকে এমন দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তি দান করবেন, যার ফলে তারা দূরে উপবিষ্টদের সাথে স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে পারবে।

لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ — لَذَّةٍ —শব্দটি আসলে ধাতু। অর্থ সুস্বাদু হওয়া। তাই কেউ কেউ বলেন, এখানে আসলে ছিল ذات لذة —অর্থাৎ, স্বাদবিশিষ্ট।

এটা ধাতু হলেও ধাতু কর্তার অর্থে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, সেই পানীয় পানকারীদের জন্যে 'সাক্ষাৎ স্বাদ' হবে।

لَا فِيهَا غَوْلٌ - غَوْلٌ —এর অর্থ কেউ 'মাথাব্যথা' এবং কেউ 'পেটব্যথা' বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ 'দুর্গন্ধ ও আবর্জনা' কেউ 'মতিভ্রম হওয়া' উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দটি উল্লেখিত সব অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। হাকেম ইবনে জরীর বলেন, এখানে غَوْلٌ -এর অর্থ আপদ। অর্থাৎ, জান্নাতের শরাবে দুনিয়ার শরাবের মত কোন আপদ হবে না।

قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ —অর্থাৎ, জান্নাতের হূরদের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, তারা হবে 'আনতনয়না'। যেসব স্বামীর সাথে আল্লাহ্ তাআলা তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে দেবেন, তারা তাদের ছাড়া কোন ভিন্ন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। আল্লামা ইবনে জওযী বর্ণনা করেন যে, তারা তাদের স্বামীদেরকে বলবে, —আমার পালনকর্তার ইয্যতের কসম, জান্নাতে তোমার চেয়ে উত্তম ও সুশ্রী পুরুষ আমার দৃষ্টিগোচর হয় না। যে আল্লাহ্ আমাকে তোমার স্ত্রী এবং তোমাকে আমার স্বামী করেছেন, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই।

আল্লামা ইবনে জওযী قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ -এর আরও একটি অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীদের দৃষ্টি নত রাখবে। অর্থাৎ, তারা নিজেরা এমন 'অনিন্দ্য সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি নিবেদিতা' হবে যে, স্বামীদের মনে অন্য কোন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার বাসনাই হবে না।—(তফসীর যাদুল মাসীর)

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ —এখানে জান্নাতের হূরগণকে লুকানো ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরবদের কাছে এই তুলনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। যে ডিম পাখার নীচে লুকানো থাকে, তার উপর বাইরের ধূলিকণার কোন প্রভাব পড়ে না। ফলে তা খুব স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন থাকে। এছাড়া এর রঙ সাদা হলুদাভ হয়ে থাকে, যা আরবদের কাছে রমণীদের সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক রঙ হিসাবে গণ্য হত। তাই এর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

এক জান্নাতী ও তার কাফের সঙ্গী ঃ প্রথম দশ আয়াতে জান্নাতীদের ব্যাপক অবস্থা বর্ণনা করার পর কোন এক জান্নাতীর বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সে জান্নাতের মজলিসে পৌঁছার পর তার এক কাফের বন্ধুর কথা স্মরণ করবে। বন্ধুবর দুনিয়াতে থাকাকালে পরকাল অস্বীকার করত। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার অনুমতিক্রমে সে জাহান্নামের অভ্যন্তরে উঁকি দিয়ে সে বন্ধুর সাথে কথা বলার সুযোগ পাবে। কোরআন পাকে এই জান্নাতী ব্যক্তির নাম-ঠিকানা উক্ত হয়নি। তাই নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, সে কে? এতদসত্ত্বেও কোন কোন তফসীরবিদ ধারণা করেছেন যে, সে মুমিন ব্যক্তিটির নাম 'ইয়াহুদাহ' এবং তার কাফের সঙ্গীর নাম 'মাতরূস'। তারাই সে সঙ্গীদ্বয়, যাদের উল্লেখ সূরা কাহ্ফের وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ আয়াতে করা হয়েছে।—(মাযহারী)।

কুসংসর্গ থেকে আত্মরক্ষার শিক্ষা ঃ মোটকথা, জান্নাতী ব্যক্তি যে-ই হোক না কেন, এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা দেয়া যে, প্রত্যেকটি মানুষের উচিত তার বন্ধু মহলকে যাচাই করে দেখা যে, তাদের মধ্যে কেউ তাকে জাহান্নামের পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে কি না। কুসংসর্গের সম্ভাব্য ধ্বংসকারিতার সঠিক অনুমান পরকালেই হবে। তখন এ ধ্বংসকারিতা থেকে আত্মরক্ষার কোন পথই খোলা থাকবে না। তাই দুনিয়াতেই যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে বন্ধুত্ব ও একাত্মতার সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। প্রায়ই কোন কাফের অথবা খোদাদ্রোহী ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার পর মানুষ অজ্ঞাতেই তার চিন্তাধারা, মতবাদ ও জীবন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। এটা পরকালীন পরিণতির জন্যে চরম বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়।

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝٥٧ اَفَمَا نَحْنُ
بِمَيِّتِيْنَ ۝٥٨ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝٥٩ اِنَّ
هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٦٠ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ۝٦١ اَذٰلِكَ
خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ۝٦٢ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ۝٦٣
اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ۝٦٤ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ
الشَّيٰطِيْنِ ۝٦٥ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝٦٦
ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ۝٦٧ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى
الْجَحِيْمِ ۝٦٨ اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ۝٦٩ فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ
يُهْرَعُوْنَ ۝٧٠ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٧١ وَلَقَدْ
اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۝٧٢ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُنْذَرِيْنَ ۝٧٣ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝٧٤ وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ
فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۝٧٥ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝٧٦
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ۝٧٧ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝٧٨
سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ۝٧٩ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝٨٠
اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٨١ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝٨٢

(৫৭) আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের সাথেই উপস্থিত হতাম। (৫৮) এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না (৫৯) আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমরা শাস্তি প্রাপ্তও হব না। (৬০) নিশ্চয় এ–ই মহা সাফল্য। (৬১) এমন সাফল্যের জন্যে পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত। (৬২) এই কি উত্তম আপ্যায়ন, না যাক্কুম বৃক্ষ? (৬৩) আমি যালেমদের জন্য একে বিপদ করেছি। (৬৪) এটি একটি বৃক্ষ, যা উদগত হয় জাহান্নামের মূলে। (৬৫) এর গুচ্ছ শয়তানের মস্তকের মত। (৬৬) কাফেররা একে ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। (৬৭) তদুপরি তাদেরকে দেয়া হবে। ফুটন্ত পানির মিশ্রণ, (৬৮) অতঃপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে। (৬৯) তারা তাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী। (৭০) অতঃপর তারা তাদের পদাংক অনুসরণে তৎপর ছিল। (৭১) তাদের পূর্বেও অগ্রবর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল। (৭২) আমি তাদের মধ্যে ভীতিপ্রদর্শনকারী প্রেরণ করেছিলাম। (৭৩) অতএব লক্ষ্য করুন, যাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (৭৪) তবে আল্লাহর বাছাই করা বান্দাদের কথা ভিন্ন। (৭৫) আর নূহ আমাকে ডেকেছিল। আর কি চমৎকারভাবে আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। (৭৬) আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে এক মহাসংকট থেকে রক্ষা করেছিলাম। (৭৭) এবং তার বংশধরদেরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছিলাম। (৭৮) আমি তার জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (৭৯) বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। (৮০) আমি এভাবেই সৎকর্ম পরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (৮১) সে ছিল আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্যতম। (৮২) অতঃপর আমি অপরাপর সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মৃত্যুর বিলুপ্তিতে বিস্ময় প্রকাশ ঃ এখানে জান্নাতী ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে জান্নাতের নেয়ামতসমূহ লাভ করে আনন্দের আতিশয্যে বলবে ঃ আমাদের আর কখনও মৃত্যু হবে না কি। এ বাক্যের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সে জান্নাতের অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করবে না, বরং চরম পর্যায়ের আনন্দ অর্জিত হওয়ার পর মানুষ প্রায়ই এমন কথা বলে ফেলে, যেন তার আনন্দ অর্জিত হয়েছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। জান্নাতী ব্যক্তির বাক্যটিও এমনি ধরনের।

অবশেষে কোরআন পাক এ ঘটনার আসল শিক্ষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে ঃ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ অর্থাৎ, এমনি ধরনের সাফল্যের জন্যে আমলকারীদের আমল করা উচিত।

জাহান্নাম ও জান্নাত উভয়ের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেকটি লোককে এ বিষয়টির মূল্যায়ন করার দাওয়াত দিয়েছেন যে, উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম তা চিন্তা করে দেখ। সেমতে ৬২–৭৪ আয়াতে বলা হয়েছে اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ জান্নাতের যেসব নেয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো উত্তম, না জাহান্নামীদের খাদ্য যাক্কুম বৃক্ষ উত্তম?

যাক্কুম কি? যাক্কুম নামের এক রকম বৃক্ষ আরব উপদ্বীপের তাহামা অঞ্চলে পাওয়া যায়। আল্লামা আলুসী লিখেন ঃ এটা অন্যান্য অনুর্বর মরু এলাকায়ও উৎপন্ন হয়। কেউ কেউ বলেন, এটা সে বৃক্ষ যাকে উর্দুতে 'থোহড়' বলা হয়। এরই কাছাকাছি আরও একটি বৃক্ষ ভারতবর্ষে 'নাগফন' বাংলায় ফণীমনসা নামে খ্যাত। কেউ কেউ একেই যাক্কুম বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং এটাই অধিক যুক্তিসম্মত। এ সম্পর্কে তফসীরবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে যে, দুনিয়ার এ যাক্কুমই জাহান্নামীদের খাদ্য হবে, না সেটা অন্য কোন বৃক্ষ? কেউ কেউ বলেন ঃ আয়াতে দুনিয়ার যাক্কুমই বোঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামের যাক্কুম হবে ভিন্ন বস্তু; দুনিয়ার যাক্কুমের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বাহ্যতঃ মনে হয়, পৃথিবীতে যেমন সাপ–বিচ্ছু প্রভৃতি রয়েছে, তেমনি জাহান্নামেও আছে। কিন্তু জাহান্নামের সাপ–বিচ্ছু দুনিয়ার সাপ–বিচ্ছু অপেক্ষা বহুগুণে ভয়ংকর হবে। এমনিভাবে জাহান্নামের যাক্কুমও প্রজাতি হিসাবে দুনিয়ার যাক্কুমের মত হলেও দুনিয়ার যাক্কুম অপেক্ষা অনেক বেশী কষ্টভক্ষ্য হবে।

اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ, আমি যাক্কুম বৃক্ষকে যালেমদের জন্যে ফেৎনা বানিয়েছি। এক্ষেত্রে কোন কোন তফসীরবিদ 'ফেৎনার' অর্থ করেছেন আযাব। অর্থাৎ, এ বৃক্ষকে আযাবের হাতিয়ার বানিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের বক্তব্য এই যে ফেৎনার অর্থ 'পরীক্ষা।' উদ্দেশ্য এই যে, এ বৃক্ষের আলোচনা করে আমি পরীক্ষা করতে চাই যে, কে এর প্রতি বিশ্বাস করে, আর কে বিদ্রূপ করে? সেমতে আরবের কাফেররা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা এ আযাবকে ভয় করে বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্তে উপহাস ও ঠাট্টার পথ বেছে নিয়েছে। বর্ণিত আছে যে, কাফেরদেরকে যাক্কুম খাওয়ানোর আলোচনাসম্বলিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলে আবু জাহ্‌ল তার সহচরদেরকে বলল ঃ তোমাদের বন্ধু (মুহাম্মদ) বলে যে, আগুনের ভেতরে নাকি একটি-বৃক্ষ আছে, অথচ আগুন বৃক্ষকে হজম করে ফেলে। খোদার কসম, আমরা জানি যে, খেজুর ও মাখনকে যাক্কুম বলা হয়। অতএব এসো এই খেজুর ও মাখন খেয়ে

নাও।— (দুররে মনসুর) আসলে বর্বরীয় ভাষায় খেজুর ও মাখনকে যাক্কুম বলা হয়। তাই আবু জাহল বিদ্রূপের এই পন্থা অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্ তাআলা একটি মাত্র বাক্যে উভয় বিষয়ের জওয়াব দিয়ে দিয়েছেন ঃ

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ অর্থাৎ, যাক্কুম তো জাহান্নামের গভীরে উদগত একটি বৃক্ষ। কাজেই এর অর্থ খেজুর ও মাখন নয় এবং আগুনের ভেতরে বৃক্ষ থাকার আপত্তিও যুক্তিসঙ্গত নয়। বৃক্ষটি যখন আগুনেই জন্ম লাভ করে, তখন আল্লাহ্ তাআলা এতে এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে রেখেছেন যে, তা আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আগুনের সাহায্যে বিকশিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আগুনের মধ্যে জীবিত থাকতে পারে, এমন অনেক প্রাণী পৃথিবীতেও বিদ্যমান রয়েছে। আগুন তাদেরকে দহন করার পরিবর্তে আরও বিকশিত করে।

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ — এতে যাক্কুম ফলকে শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এখানে شَيَاطِين এর অনুবাদ করেছেন, সাপ। অর্থাৎ, যাক্কুম ফল সাপের মত হয়ে থাকে। ফণিমনসা এ কারণেই বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, এখানে شَيَاطِين বলে তার সাধারণ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যাক্কুম ফল শয়তানের মাথার ন্যায় কুৎসিত।

পূর্ববর্তী আয়াতে আলোচনা ছিল যে, প্রথম উম্মতদের কাছেও সতর্ককারী পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছিলেন, অধিকাংশ লোকই তাদের কথা মানেনি। ফলে তাদের পরিণতি খুবই অশুভ হয়েছে। এখানে ৭৫-৮২ আয়াতে এরই কিছু বিশদ বিবরণ পেশ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্ব প্রথম হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনা বিবৃত হয়েছে। অবশ্য তা বিস্তারিতভাবে সূরা হূদে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে আয়াতসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে।

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ - এতে নূহের যে প্রার্থনা বোঝানো হয়েছে যাতে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে, "হে পরোয়ারদেগার, পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্যে একজনও অবশিষ্ট রেখো না।" বলে আবেদন জানান।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ — (আমি তার বংশধরকেই অবশিষ্ট রেখেছি।)

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর সময়ে আগত জলোচ্ছ্বাসে পৃথিবীর অধিকাংশ জনবসতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এর পর তাঁরই তিন পুত্র থেকে সারা বিশ্বে মানব গোষ্ঠী বিস্তার লাভ করে।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ - (আমি তার জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রচলিত রেখেছি যে, নূহের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ববাসীদের মধ্যে।)-এর মর্মার্থ এই যে, আমি নূহ (আঃ)-এর পরবর্তী লোকদের দৃষ্টিতে তাকে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করে দিয়েছি। ফলে তারা কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর জন্যে নিরাপত্তার দোয়া করতে থাকবে। বাস্তব ঘটনাও তাই। সুতরাং বিশ্বের সমস্ত আসমানী ধর্ম গ্রন্থে হযরত নূহ (আঃ)-এর নবুওয়ত ও পবিত্রতায় বিশ্বাসী মুসলমানদের কথা তো বলাই বাহুল্য, ইহুদী ও খ্রীষ্টানরাও তাঁকে নিজেদের নেতা বলে মান্য করে।

وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ﴿٨٣﴾ اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٤﴾
اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٨٥﴾ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ
تُرِيْدُوْنَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ﴿٨٨﴾
فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ
فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ
ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ﴿٩٣﴾ فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ﴿٩٤﴾ قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا
تَنْحِتُوْنَ ﴿٩٥﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا
فَاَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ ﴿٩٧﴾ فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٩٨﴾
وَقَالَ اِنِّيْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ
الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ
قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى
قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ
الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٣﴾ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿١٠٤﴾
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾ اِنَّ
هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٧﴾

(৮৩) আর নূহপন্থীদেরই একজন ছিল ইবরাহীম। (৮৪) যখন সে তার পালনকর্তার নিকট সুস্থ চিত্তে উপস্থিত হয়েছিল, (৮৫) যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিল : তোমরা কিসের উপাসনা করছ? (৮৬) তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত মিথ্যা উপাস্য কামনা করছ? (৮৭) বিশ্বজগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? (৮৮) অতঃপর সে একবার তারকাদের প্রতি লক্ষ্য করল। (৮৯) এবং বলল : আমি পীড়িত। (৯০) অতঃপর তারা তার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল। (৯১) অতঃপর সে তাদের দেবালয়ে,গিয়ে ঢুকল এবং বলল : তোমরা খাচ্ছ না কেন? (৯২) তোমাদের কি হল যে, কথা বলছ না? (৯৩) অতঃপর সে প্রবল আঘাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। (৯৪) তখন লোকজন তার দিকে ছুটে এলো ভীত-সন্ত্রস্ত পদে। (৯৫) সে বলল : তোমরা স্বহস্ত নির্মিত পাথরের পূজা কর কেন? (৯৬) অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন! (৯৭) তারা বলল : এর জন্যে একটি ভিত নির্মাণ কর এবং অতঃপর তাকে আগুনের স্তূপে নিক্ষেপ কর। (৯৮) তারপর তারা তার বিরুদ্ধে মহা ষড়যন্ত্র আঁটতে চাইল, কিন্তু আমি তাদেরকেই পরাভূত করে দিলাম। (৯৯) সে বলল : আমি আমার পালনকর্তার দিকে চললাম, তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন। (১০০) হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে এক সৎপুত্র দান কর। (১০১) সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। (১০২) অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম তাকে বলল : বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ্ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বললঃ পিতঃ! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে,তাই করুন। আল্লাহ্ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। (১০৩) যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাকে যবেহ্ করার জন্যে শায়িত করল, (১০৪) তখন আমি তাকে ডেকে বললাম : হে ইবরাহীম, (১০৫) তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১০৬) নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। (১০৭) আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ্ করার জন্যে এক মহান জন্তু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনার পর কোরআন পাক হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পূতঃপবিত্র জীবনের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছে। উভয় ঘটনায় হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র জন্যে অপূর্ব ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। আলোচ্য আয়তসমূহে তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার প্রথম ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে, যার বিশদ বিবরণ সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে ৮৩-৯৮ আয়াতে ঘটনাটি যে ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বটে।

وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ — মৌলিক মতবাদ ও পন্থা-পদ্ধতিতে একমত লোকের দলকে আরবী ভাষায় شيعة বলা হয়। এখানে شِيْعَتِهٖ শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যতঃ নূহ (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। তাই আয়াতের মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পূর্বসূরী পয়গম্বর নূহ (আঃ)-এর পন্থাবলম্বী ছিলেন এবং ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহে উভয়েরই পরিপূর্ণ ঐকমত্য ছিল। উভয়ের শরীয়তও একই রকম অথবা কাছাকাছি ছিল। উল্লেখ্য যে, কোন কোন ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মাঝে দু'হাজার ছ'শ চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। তাদের মাঝে হযরত হুদ ও সালেহ্ (আঃ) ব্যতীত কোন নবী আবির্ভূত হননি।—(কাশ্শাফ)

اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ — এর নির্ভেজাল শাব্দিক অনুবাদ এই যে, যখন তিনি আগমন করলেন তাঁর পালনকর্তার নিকট পরিচ্ছন্ন অন্তরে। আল্লাহ্র নিকট আগমন করার অর্থ আল্লাহ্র দিকে রুজু করা, তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা এবং তাঁর এবাদত করা। এর সাথে ''পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে'' কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র কোন এবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয় না, যতক্ষণ এবাদতকারীর মন ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মন্দ প্রেরণা থেকে পবিত্র না হয়।

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ এসব আয়াতের পটভূমিকা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায় এক বিশেষ দিনে উৎসব উদযাপন করত। নির্ধারিত পরবের দিনে তারা ইবরাহীম (আঃ)-কেও আমন্ত্রণ জানাল যে, আপনিও আমাদের সাথে উৎসবে চলুন। উদ্দেশ্য, হযরত ইবরাহীম (আঃ) উৎসবে যোগদান করলে হয়তো তাদের ধর্মের প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে নিজের ধর্মের দাওয়াত ত্যাগ করবেন।—(দুররে মনসূর, ইবনে জরীর) কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) মনে মনে এই সুযোগকে অন্যভাবে ব্যবহার করতে চাইলেন যে, গোটা সম্প্রদায় উৎসব উদযাপন করতে চলে যাবে, তখন আমি তাদের দেবমন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমাসমূহকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেব। যাতে তারা ফিরে এসে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্বের বাস্তব দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। হয়তো বা এতে করে তাদের কারো কারো অন্তরে নিজেদের প্রতিমাসমূহকে অসহায় ও অক্ষম দেখে ঈমান জাগ্রত হবে এবং সে শিরক থেকে তওবা করে নেবে। এ উদ্দেশে হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে উৎসবে যেতে অস্বীকার করলেন। আর অস্বীকারের পথ এই বেছে নিলেন যে, প্রথমে তারকার দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করলেন এবং অতঃপর বললেন : আমি অসুস্থ। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে অপারগ মনে করে ছেড়ে উৎসবে চলে গেল।

এ ঘটনার সাথে একাধিক তফসীর ও ফেকাহ্ সংক্রান্ত আলোচনার

সম্পর্ক রয়েছে। নিম্নে সেসব আলোচনার সারমর্ম উল্লেখ করা হল।

তারকার দিকে দৃষ্টিপাত করার উদ্দেশ্য ঃ সর্ব প্রথম আলোচনা এই যে, জওয়াব দেয়ার পূর্বে ইবরাহীম (আঃ) যে তারকার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তার উদ্দেশ্য কি ছিল? কেউ কেউ বলেন ঃ এটা নিছক একটা উদ্দেশ্যহীন ও অনিচ্ছাধীন কর্ম ছিল। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা করার সময় মানুষ মাঝে মাঝে অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায় আকাশের দিকে দেখতে থাকে। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন উৎসবে যোগদান করার দাওয়াত দেয়া হল, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এ দাওয়াত কিভাবে এড়ানো যায়। এই ভাবনার মধ্যেই তিনি অনিচ্ছায় তারকার দিকে দেখতে থাকেন এবং এরপর জওয়াব দেন। এ ব্যাখ্যাটি বাহ্যতঃ অমলিন মনে হলেও কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির আলোকে একে সঠিক বলে মেনে নেয়া কঠিন। কারণ, প্রথমত ঃ কোরআন পাকের বর্ণনাপদ্ধতি এই যে, সে ঘটনাবলীর কেবল গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী অংশই বর্ণনা করে এবং অনাবশ্যক বিবরণ বাদ দেয়। খোদ আলোচ্য আয়াতসমূহেই ঘটনার বেশ কয়েকটি অংশ উহ্য রয়েছে। এমনকি, ঘটনার পূর্ণ পটভূমিও বর্ণনা করা হয়নি। তাই এটা বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয় যে, কোরআন পাক ঘটনার পটভূমিকা তো দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশংকায় বাদ দিয়েছে অথচ ঘটনার সাথে দূরের সম্পর্কও নেই, এমন একটি নিশ্চিত অনিচ্ছাধীন কর্ম পূর্ণ এক আয়াতে ব্যক্ত করেছে। দ্বিতীয়তঃ তারকারাজিকে দেখার মধ্যে বিশেষ কোন রহস্য না থাকলে এবং এটা নিতান্তই অনিচ্ছাধীন কর্ম হলে আরবী ব্যাকরণ দৃষ্টে فَنَظَرَ نَظْرَةً إِلَى النُّجُومِ বলা উচিত ছিল — فِي النُّجُومِ নয়।

এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তারকারাজিকে দেখার মধ্যে ইবরাহীম (আঃ)-এর দৃষ্টিতে কোন বিশেষ উপযোগিতা ছিল। তাই কোরআন পাকও গুরুত্ব সহকারে এর উল্লেখ করেছে। এখন সে উপযোগিতা কি ছিল? এ প্রশ্নের জওয়াবে অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন ঃ প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের নিতান্ত ভক্ত ছিল। তাই তারকারাজি দেখে দেখে জওয়াব দিলেন, যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে যে, তিনি নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে যা বলেছেন, তা ভিত্তিহীন নয়, বরং তারকারাজির গতিবিধি লক্ষ্য করেই বলেছেন। ইবারহীম (আঃ) নিজে যদিও জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না; কিন্তু উৎসবে যোগদান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে তিনি সে পন্থাই অবলম্বন করলেন, যা তাদের দৃষ্টিতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য। তিনি মুখে জ্যোতিঃশাস্ত্রের কোন বরাত দেননি এবং এ কথাও বলেননি যে, তারকারাজিকে দেখার উদ্দেশ্য জ্যোতিঃশাস্ত্রের সাহায্য নেয়া। তাই এতে মিথ্যার নাম-গন্ধও আবিষ্কার করা যায় না।

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর এই কর্ম দ্বারা হয়তো সে কাফেররা উৎসাহিত হয়ে থাকবে। যারা কেবল জ্যোতিঃশাস্ত্রেই বিশ্বাসী ছিল না, বরং জগতের কাজ-কারবারে তারকারাজিকে সত্যিকার প্রভাবশালী বলেও মনে করত। এর জওয়াব এই যে, কাফেররা উৎসাহিত তখন হত, যখন ইবরাহীম (আঃ) পরবর্তী সময়ে পরিষ্কারভাবে তাদের পথভ্রষ্টতা বর্ণনা না করতেন। এখানে তো যাবতীয় কলাকৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছিল, তাদেরকে তওহীদের দাওয়াত অধিকতর কার্যকররূপে দেয়ার উদ্দেশে। সেমতে এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি পথভ্রষ্টতা পুংখানুপুংখরূপে বর্ণনা করেছেন। তাই কেবল এই অস্পষ্ট কর্ম দ্বারা কাফেরদের উৎসাহিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এখানে আসল লক্ষ্য ছিল উৎসবে যোগদানের দাওয়াত এড়িয়ে যাওয়া, যাতে তওহীদের দাওয়াতের জন্যে অধিক কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

ইবরাহীম (আঃ)-এর অসুস্থতার তাৎপর্য ঃ আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তৃতীয় আলোচনা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বগোত্রের আমন্ত্রণের জওয়াবে বলেছিলেন ঃ إِنِّي سَقِيمٌ আমি অসুস্থ। এখানে প্রশ্ন এই যে, তিনি কি বাস্তবিকই তখন অসুস্থ ছিলেন? কোরআন পাকে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। কিন্তু সহীহ্ বুখারীর এক হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি তখন এমন অসুস্থ ছিলেন না যে, মেলায় যেতে পারেন না। তাই প্রশ্ন উঠে, তিনি একথা কেমন করে বললেন?

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে এ বাক্যের সাহায্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) – "তওরিয়া" করেছিলেন। তওরিয়ার অর্থ এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তবের প্রতিকূলে এবং বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তবের অনুকূলে। এখানে ইবরাহীম (আঃ)-এর বাক্যের বাহ্যিক অর্থ তো এটাই যে, 'আমি এখন অসুস্থ, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দিষ্ট অর্থ তা ছিল না। আসল অর্থ কি ছিল, সে সম্পর্কে তফসীরবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেন, এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানসিক সঙ্কোচন, যা স্বগোত্রের মুশরিকসুলভ কাণ্ডকীর্তি দেখে তাঁর মনে সৃষ্টি হচ্ছিল। এখানে سَقِيمٌ শব্দের ব্যবহার থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ, এটা مريض শব্দ অপেক্ষা অর্থের দিক দিয়ে অনেকটা হাল্কা। 'আমার মন খারাপ বলেও এ অর্থ অনেকটা ব্যক্ত করা যায়। বলাবাহুল্য, এ বাক্যে 'মানসিক সঙ্কোচন' অর্থেরও পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, إِنِّي سَقِيمٌ বলে ইবরাহীম (আঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। কারণ, আরবী ভাষায় اسم فاعل এর পদবাচ্য বহুল পরিমাণে ভবিষ্যত কালের জন্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোরআন পাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে- إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ এর বাহ্যিক অর্থ আপনিও মৃত এবং তারাও মৃত। কিন্তু এখানে এরূপ অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং অর্থ হল, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। এমনিভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ) إِنِّي سَقِيمٌ এর অর্থ নিয়েছিলেন যে, "আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব।" একথা বলার কারণ এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক মানুষের অসুস্থ হওয়া স্থির নিশ্চিত। কেউ বাহ্যিকভাবে অসুস্থ না হলেও মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে মন-মেজাযে ত্রুটি সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

যদি কেউ এসব ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়, তবে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তখন বাস্তবিকই কিছুটা অসুস্থ ছিলেন; তবে উৎসবে যোগদানে প্রতিবন্ধক হতে পারে, এমন অসুস্থতা ছিল না। তিনি তাঁর মামুলী অসুস্থতার কথাই এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে শ্রোতারা মনে করে নেয় যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কাজেই মেলায় যাওয়া সম্ভবপর নয়। ইবরাহীম (আঃ)-এর তওরিয়া এ ব্যাখ্যা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত এবং সন্তোষজনক। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি إِنِّي سَقِيمٌ এর জন্যে كذبة (মিথ্যা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উপরোক্ত ব্যাখ্যা দৃষ্টে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এর অর্থ তওরিয়া, যা বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে মিথ্যা মনে হয়, কিন্তু বক্তার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে মিথ্যা হয় না। এ হাদীসেরই কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে ঃ

এগুলোর মধ্যে কোন মিথ্যা এরূপ নয়, যা আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতিরক্ষা ও

সমর্থনে বলা হয়নি।

এ বাক্যটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে كذب শব্দটি সাধারণ অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ রাখে। এ হাদীস সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ সূরা আম্বিয়ার بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে।

তওরিয়ার শরীয়তসম্মত বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে এ বিষয়টি জানা যায় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তওরিয়া করা জায়েয। তওরিয়া দুই প্রকার। (এক) – উক্তিগত। অর্থাৎ, এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তব ঘটনার প্রতিকূল, কিন্তু বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তব ঘটনার অনুকূল। (দুই) – কর্মগত। অর্থাৎ, এমন কাজ করা, যার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণ দর্শকের বোঝে নেয়া উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন। একে ' 'ঈহাম''–ও বলা হয়। তারকারাজির দিকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর দৃষ্টিপাত করাও অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ঈহামই ছিল এবং নিজেকে অসুস্থ বলা ছিল তওরিয়া।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত উভয় প্রকার তওরিয়া স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে ছিলেন এবং কাফেররা তাঁর সন্ধান করছিল, তখন পথে এক ব্যক্তি হযরত আবুবকর (রাঃ)–কে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল ঃ ইনি কে? হযরত আবু বকর জওয়াব দিলেন ঃ هو هاد يهديني "ইনি আমার পথপ্রদর্শক, আমাকে পথ দেখান।" এতে লোকটি সাধারণ পথপ্রদর্শক বোঝেই চলে যায়। অথচ হযরত আবু বকরের উদ্দেশ্য ছিল, "ইনি আমার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক।"—(রুহুল মা'আনী)

এমনিভাবে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে জেহাদের জন্যে কোন দিকে যেতে হলে মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় সেদিকে রওয়ানা হওয়ার পরিবর্তে অন্যদিকে রওয়ানা হতেন, যাতে দর্শকরা সঠিক গন্তব্যস্থল জানতে না পারে। এটা ছিল কর্মগত তওরিয়া তথা ঈহাম।— (মুসলিম)

কৌতুক ও হাস্যরসের ক্ষেত্রেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে তওরিয়ার প্রমাণ আছে। শামায়েল তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার এক বৃদ্ধাকে দেখে কৌতুকচ্ছলে বললেন ঃ কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। বৃদ্ধা একথা শুনে হায় আফসোস শুরু করলে তিনি এর ব্যাখ্যা করে বললেন ঃ বৃদ্ধাদের জান্নাতে না যাওয়ার অর্থ এই যে, তারা বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে যাবে না – ষোড়শী যুবতী হয়ে যাবে।

পুত্র কোরবানীর ঘটনা ঃ ৯৯–১১৩ আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর পবিত্র জীবনালেখ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র জন্যে তাঁর একমাত্র পুত্রের কোরবানী পেশ করেছিলেন। এখানে কয়েকটি ঐতিহাসিক বিবরণ বর্ণনা করা হচ্ছে।

وَقَالَ إِنِّيْ ذَاهِبٌ إِلٰى رَبِّيْ .... — (ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের দিকে চললাম।) দেশবাসীর তরফ থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েই তিনি একথা বলেছিলেন। সেখানে তাঁর ভাগিনেয় লূত (আঃ) ব্যতীত কেউ তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেনি। পরওয়ারদেগারের দিকে চলে যাওয়ার অর্থ দারুল–কুফর পরিত্যাগ করে আমার পরওয়ারদেগার যেখানে আদেশ করেন, সেখানে চলে যাব। সেখানে আমি তাঁর এবাদত করতে পারব। সেমতে তিনি পত্নী সারা ও ভাগিনেয় হযরত লূতকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে অবশেষে সিরিয়ায় পৌছলেন। তখনো পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর কোন সন্তান ছিলনা। তাই তিনি পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত দোয়া করলেন।

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (পরওয়ারদেগার, আমাকে সৎপুত্র দান কর।) তাঁর এ দোয়া কবুল হয় এবং আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এক পুত্রের সুসংবাদ দেন।

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ — (অতঃপর আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।) "সহনশীল" বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ নবজাত তার জীবনে সবর, ধৈর্য ও সহনশীলতার এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে, যার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কেউ পেশ করতে পারবে না। এ পুত্রের জন্মলাভের ঘটনা এই ঃ হযরত সারা যখন দেখলেন যে, তাঁর গর্ভে কোন সন্তান হচ্ছে না, তখন তিনি নিজেকে বন্ধাই মনে করলেন। এদিকে মিসরের সম্রাট ফেরাউন তার হাজেরা নাম্নী কন্যাকে হযরত সারার খেদমতের জন্যে দান করেছিল। হযরত সারা হাজেরাকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর খেদমতে দিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি তাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে নিলেন। এ হাজেরার গর্ভেই এ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার নাম রাখেন ইসমাঈল।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ إِنِّيْ أَرٰى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ

— (অতঃপর যখন পুত্র পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ্ করছি।) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই স্বপ্ন হযরত ইবরাহীম (আঃ)–কে উপর্যুপরি তিন দিন দেখানো হয়।—(কুরতুবী) একথা স্বীকৃত সত্য যে, পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহীই বটে। তাই এ স্বপ্নের অর্থ ছিল এই যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আঃ)–এর প্রতি একমাত্র পুত্রকে যবেহ্ করার হুকুম হয়েছে। এ হুকুমটি সরাসরি কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও নাযিল করা যেত, কিন্তু স্বপ্নে দেখানোর তাৎপর্য হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর আনুগত্য পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাওয়া। স্বপ্নের মাধ্যমেও প্রদত্ত আদেশে মানব মনের পক্ষে ভিন্ন অর্থ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) ভিন্ন অর্থের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র আদেশের সামনে মাথা নত করে দেন।—(তফসীরে–কবীর)

এছাড়া এখানে আল্লাহ্ তাআলার প্রকৃত লক্ষ্য হযরত ইসমাঈল (আঃ)–কে যবেহ্ করা ছিল না কিংবা ইবরাহীম (আঃ)–কেও এ আদেশ দেয়া ছিল না যে, প্রাণপ্রতিম পুত্রকেই যবেহ্ করে ফেল। বরং উদ্দেশ্য ছিল যে, নিজের পক্ষ থেকে যবেহ্ করার সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করে যবেহ্ করতে উদ্যত হয়ে যাও। বস্তুতঃ এ নির্দেশ সরাসরি মৌখিক দেয়া হলে তাতে পরীক্ষা হতো না। তাই তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, তিনি পুত্রকে যবেহ্ করছেন। এতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) বোঝে নিলেন যে, যবেহ্ করার নির্দেশ হয়েছে এবং তিনি যবেহ্ করতে পুরোপুরি প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এভাবে পরীক্ষাও পূর্ণতা লাভ করল এবং স্বপ্নও সত্যে পরিণত হল। অথচ মৌখিক আদেশের মাধ্যমে হলে তাতে পরীক্ষা হত না। অথবা পরে রহিত করতে হত। এ বিষয়টি কত যে ভীষণ পরীক্ষা সেদিকে ইঙ্গিত করার জন্যে এখানে فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ কথাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, অনেক কামনা–বাসনা ও দোয়া–প্রার্থনার পর পাওয়া এই প্রাণপ্রতিম পুত্রকে কোরবানী করার নির্দেশ এমন সময় দেয়া হয়েছিল, যখন পুত্র পিতার সাথে চলা–ফেরার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল এবং লালন–পালনের দীর্ঘ কষ্ট সহ্য করার পর এখন সময় এসেছিল আপদে–বিপদে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ানোর। তফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, সে

সময় হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বয়স ছিল তের বছর। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি সাবালক হয়ে গিয়েছিলেন। — (মাযহারী)

فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى (অতএব তুমিও ভেবে দেখ, তোমার অভিমত কি?) হযরত ইবরাহীম (আঃ) একথা হযরত ইসমাঈলকে এজন্যে জিজ্ঞেস করেননি যে, তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে কোনরূপ সন্দিগ্ধ ছিলেন। বরং প্রথমতঃ তিনি পুত্রের পরীক্ষাও নিতে চেয়েছিলেন যে, এ পরীক্ষায় সে কতদূর উত্তীর্ণ হয়? দ্বিতীয়তঃ পয়গম্বরগণের চিরন্তন কর্মপদ্ধতি এই যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু আনুগত্যের জন্যে সর্বদা উপযোগী ও যথাসম্ভব সহজ পথ অবলম্বন করেন। যদি ইবরাহীম (আঃ) পূর্বাহ্নে কিছু না বলেই পুত্রকে যবেহ্ করতে উদ্যত হতেন, তবে বিষয়টি উভয়ের পক্ষেই কঠিন হয়ে যেতে পারত। তিনি পরামর্শের ভঙ্গিতে ব্যাপারটি উল্লেখ করলেন, যাতে পুত্র পূর্ব থেকেই আল্লাহ্‌র নির্দেশের কথা জেনে যবেহ্‌র ব্যাপারে প্রস্তুত হতে পারে। এছাড়া পুত্রের মনে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলেও তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সম্মত করা যাবে।—(রূহুল মা'আনী, বয়ানুল-কোরআন)

কিন্তু সে পুত্রও ছিলেন খলীলুল্লাহরই পুত্র, ভাবী পয়গম্বর। তিনি জওয়াব দিলেন ঃ يٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ (পিতঃ আপনাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা সেরে ফেলুন।) এতে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর অতুলনীয় বিনয় ও আত্মনিবেদনের পরিচয় তো পাওয়া যায়ই, তদুপরি প্রতীয়মান হয় যে, এহেন কচি বয়সেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে কি পরিমাণ মেধা ও জ্ঞান দান করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সামনে আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশের বরাত দেননি—বরং একটি স্বপ্নের কথা বলেছিলেন মাত্র। কিন্তু ইসমাঈল (আঃ) বোঝে নিলেন যে, পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। কাজেই এ স্বপ্নও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র একটি নির্দেশ। অতএব তিনি জওয়াবে স্বপ্নের পরিবর্তে নির্দেশের কথা বললেন।

হযরত ইসমাঈল (আঃ) নিজের পক্ষ থেকে পিতাকে এ আশ্বাসও দিলেন যে, سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ (ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে সবরকারীদের মধ্যে পাবেন।) এ বাক্যে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর চূড়ান্ত আদব ও বিনয় লক্ষ্যণীয়। প্রথমতঃ তিনি "ইনশাল্লাহ্" বলে ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করেছেন এবং এ ওয়াদায় দাবীর যে বাহ্যিক আকার ছিল, তাও খতম করে দিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি একথাও বলতে পারতেন, "ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন", কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি বললেন, "সবরকারীদের মধ্যে পাবেন।" এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সবর ও সহনশীলতা একা আমারই কৃতিত্ব নয়; বরং দুনিয়াতে আরও বহু সবরকারী হয়েছেন। ইনশাআল্লাহ্ আমিও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। এভাবে তিনি উপরোক্ত বাক্যে অহংকার, ও অহমিকার নাম গন্ধটুকু পর্যন্ত খতম করে দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় ও বশ্যতা প্রকাশ করেছেন।—(রূহুল মা'আনী) এর দ্বারা এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষ কোন ব্যাপারে নিজের উপর যত আত্মবিশ্বাসই পোষণ করুক না কেন, গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পেতে পারে এমন দাবী করা মোটেই উচিত নয়। কোথাও এমন কথা বলার প্রয়োজন হলে ভাষা এমন হওয়া উচিত যাতে নিজের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা প্রকাশ পায়।

فَلَمَّاۤ اَسْلَمَا (যখন তাঁরা উভয়েই নত হয়ে গেলেন।) اسلام শব্দের অর্থ নত হওয়া, অনুগত হওয়া ও বশীভূত হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশের সামনে নত হয়ে পিতা-পুত্রকে যবেহ্ করতে এবং পুত্র যবেহ্ হতে সম্মত হলেন। এরপর কি হল, তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতা-পুত্রের এই আত্ম নিবেদনমূলক কার্যক্রম এমন বিস্ময়কর ও অভাবিত ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ইতিহাস ও তফসীরভিত্তিক কোন কোন রেওয়ায়েতে জানা যায় যে, শয়তান তিন বার হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে প্রতারিত করার চেষ্টা করে এবং ইবরাহীম (আঃ) প্রত্যেক বারই তাকে সাতটি কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেন। অদ্যাবধি এই প্রশংসনীয় কাজের স্মৃতি মীনায় তিন বার কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। অবশেষে পিতা-পুত্র উভয়েই যখন এই অভিনব এবাদত উদযাপন করার উদ্দেশে কোরবানগাহে পৌঁছলেন,তখন ইসমাঈল (আঃ) পিতাকে বললেন, পিতঃ আমাকে খুব শক্ত করে বেঁধে নিন, যাতে আমি বেশী ছটফট করতে না পারি। আপনার পরিধেয় বস্ত্রও সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ছিটা তাতে না পড়ে। এতে আমার সওয়াব হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া রক্ত দেখলে আমার মা অধিক ব্যাকুল হবেন। আপনার ছুরিটাও ধার দিয়ে নিন এবং তা আমার গলায় দ্রুত চালাবেন যাতে আমার প্রাণ সহজে বের হয়ে যায়। কারণ, মৃত্যু বড় কঠিন ব্যাপার। আপনি আমার মায়ের কাছে পৌঁছে আমার সালাম বলবেন। যদি আমার জামা তাঁর কাছে নিয়ে যেতে চান, তবে নিয়ে যাবেন। হয়তো এতে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন। একমাত্র পুত্রের মুখে এসব কথা শুনে পিতার মানসিক অবস্থা যে কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) দৃঢ়তার অটল পাহাড় হয়ে জওয়াব দিলেন ঃ বৎস,আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করার জন্যে তুমি আমার চমৎকার সহায়ক হয়েছ। অতঃপর তিনি পুত্রকে চুম্বন করলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাকে বেঁধে নিলেন।

وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ - (এবং তাকে উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেন যে, তাকে কাত করে এমনভাবে শুইয়ে দিলেন, যাতে কপালের এক দিক মাটি স্পর্শ করেছিল। (মাযহারী) আভিধানিক দিক দিয়ে এ তফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ, আরবী ভাষায় جبين কপালের দুই পার্শ্বকে বলা হয়। কপালের মধ্যস্থলকে বলা হয় جبهة এ কারণেই হযরত থানভী (রহঃ) এর অনুবাদ করেছেন, বালুর উপর শুইয়ে দিলেন।" কিন্তু অন্যান্য কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ করেছেন "উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।" যাই হোক ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে এভাবে শোয়ানোর কারণ বর্ণিত হয়েছে যে, শুরুতে ইবরাহীম (আঃ) তাকে সোজা করে শুইয়ে দিলেন, কিন্তু বার বার ছুরি চালানো সত্ত্বেও গলা কাটছিল না। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কুদরতে পিতলের একটি টুকরা মাঝখানে অন্তরায় করে দিয়েছিলেন। তখন পুত্র নিজেই আবদার করে বললেন পিতঃ আমাকে কাত করে শুইয়ে দিন। কারণ, আমার মুখমণ্ডল দেখে আপনার মধ্যে পৈতৃক স্নেহ উথলে উঠে। ফলে গলা পূর্ণরূপে কাটা হয় না এছাড়া ছুরি দেখে আমিও ঘাবড়ে যাই। সেমতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাকে এভাবে শুইয়ে ছুরি চালাতে থাকেন।— (মাযহারী)

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰۤاِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا — আমি তাকে ডেকে বললাম ঃ হে ইবরাহীম তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ।) অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে তোমার যা করণীয় ছিল, তাতে সত্যি নিজের পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি রাখনি। (স্বপ্নেও সম্ভবতঃ এ বিষয়টিই শেখানো হয়েছিল যে, ইবরাহীম (আঃ) যবেহ্ করার জন্য পুত্রের গলায় ছুরি চালাচ্ছেন।) এখন এই পরীক্ষা পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই তাকে ছেড়ে দাও।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَٰلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾ وَبَشَّرْنَاهُ
بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۚ وَ
مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ
مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾
وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾
وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي
الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾ وَإِنَّ إِلْيَاسَ
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ
بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ
الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ
إِلْ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّهُ مِنْ
عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾

(১০৮) আমি তার জন্যে এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি যে, (১০৯) ইবরাহীমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (১১০) এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১১১) সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের একজন। (১১২) আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাকের, সে সৎকর্মীদের মধ্য থেকে একজন নবী। (১১৩) তাকে এবং ইসহাককে আমি বরকত দান করেছি। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মী এবং কতক নিজেদের উপর স্পষ্ট জুলুমকারী। (১১৪) আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি। (১১৫) তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে উদ্ধার করেছি মহা সংকট থেকে। (১১৬) আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম, ফলে তারাই ছিল বিজয়ী। (১১৭) আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব। (১১৮) এবং তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছিলাম। (১১৯) আমি তাদের জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (১২০) মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (১২১) এভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১২২) তারা উভয়েই ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের অন্যতম। (১২৩) নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল রসূল। (১২৪) যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল ঃ তোমরা কি ভয় কর না? (১২৫) তোমরা কি 'বা' আল' দেবতার এবাদত করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে (১২৬) যিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা? (১২৭) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব তারা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে আসবে। (১২৮) কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার খাঁটি বান্দাগণ নয়। (১২৯) আমি তার জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (১৩০) ইলিয়াসের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (১৩১) এভাবেই আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১৩২) সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। (১৩৩) নিশ্চয় লূত ছিলেন রসূলগণের একজন।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ — (আমি খাঁটি বান্দাদেরকে এমনি প্রতিদিন দিয়ে থাকি।) অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কোন বান্দা যখন আল্লাহ্‌র আদেশের সামনে নতশির হয়ে নিজের সমস্ত ভাবাবেগকে কোরবান করতে উদ্যত হয়ে যায়, তখন আমি পরিশেষে তাকে পার্থিব কষ্ট থেকেও বাঁচিয়ে রাখি এবং পরকালের সওয়াবও তার আমলনামায় লিখে দেই।

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ — (আমি যবেহ করার জন্যে এক মহান জীব এর বিনিময়ে দিলাম।) বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) উপরোক্ত গায়েবী আওয়ায শুনে উপরের দিকে তাকালে হযরত জিবরাঈলকে একটি ভেড়া নিয়ে দাঁড়ানো দেখলেন।

মোটকথা, এ জান্নাতী ভেড়া হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দেয়া হলে তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে পুত্রের পরিবর্তে সেটি কোরবানী করলেন। একে عَظِيمٍ (মহান) বলার কারণ এই যে, এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছিল এবং এর কোরবানী কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না।—(মাযহারী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ — (তাঁদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে কিছু সৎকর্মী এবং কিছু নিজেদের প্রকাশ্য ক্ষতি সাধনে লিপ্ত।) এ আয়াতের মাধ্যমে ইহুদীদের এই মিথ্যা ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণের বংশধর হওয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মুক্তির জন্যে যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছে যে, কোন সৎলোকের সাথে বংশগত সম্পর্ক থাকা মুক্তির জন্যে যথেষ্ট নয়, বরং এটা মানুষের নিজের বিশ্বাস ও কর্মের উপর ভিত্তিশীল।

১১৪-১২২ আয়াতসমূহে তৃতীয় ঘটনা হযরত মূসা ও হারূন (আঃ) সম্পর্কিত। এ ঘটনা ইতিপূর্বে কয়েক জায়গায় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এখানে বর্ণিত সেসব ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। এখানে ঘটনাটি উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর খাঁটি ও অনুগত বান্দাদেরকে কিভাবে সাহায্য করেন এবং তাদেরকে কি কি নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন। সেমতে এখানে আল্লাহ্ তাআলা মূসা ও হারূন (আঃ)-এর প্রতি তাঁর নেয়ামতসমূহের আলোচনা করেছেন। আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ দু'ধরনের হয়ে থাকে—(এক) ধনাত্মক নেয়ামত, অর্থাৎ, উপকারী وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ — আয়াতে এধরনের নেয়ামতের দিকে ইংগিত রয়েছে। (দুই) ঋণাত্মক নেয়ামত। অর্থাৎ, ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখার নেয়ামত। পরবর্তী নেয়ামতসমূহে এ ধরনের নেয়ামতেরই বিবরণ দেয়া হয়েছে।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) ঃ ১২৩-১৩২ আয়াতসমূহে চতুর্থ ঘটনা হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর বর্ণনা। আয়াতসমূহের তফসীরের পূর্বে হযরত ইলিয়াস (আঃ) সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

কোরআন পাকে মাত্র দু'জায়গায় হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর আলোচনা দেখা যায়—সূরা আনআমে ও সূরা সাফফাতের আলোচ্য আয়াতসমূহে। সূরা আনআমে কেবল পয়গম্বরগণের তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু কোন ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি। তবে এখানে খুবই সংক্ষেপে তাঁর দাওয়াত ও প্রচারের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

যেহেতু কোরআন পাকে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর জীবনালেখ্য বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসেও তা নেই, তাই তাঁর সম্পর্কে তফসীরের কিতাবাদিতে যেসব বিভিন্ন উক্তি ও বিচ্ছিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়,এগুলোর অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত।

অল্প সংখ্যক তফসীরবিদের বক্তব্য এই যে, ইলিয়াস হযরত ইদরীস (আঃ)-এরই অপর নাম, এই দু'ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেউ কেউ আরও বলেন যে, হযরত ইলিয়াস (আঃ) ও হযরত খিযির (আঃ) অভিন্ন ব্যক্তি। (দুররে মনসুর) কিন্তু অনুসন্ধানবিদগণ দু'টি উক্তিই খণ্ডন করেছেন। কোরআন পাকও হযরত ইদরীস এবং হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর আলোচনা এমন পৃথক পৃথকভাবে করেছে যে, উভয়কে একই ব্যক্তি সাব্যস্ত করার কোন অবকাশ দেখা যায় না। তাই ইবনে কাসীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বলেন যে, তাঁরা যে আলাদা আলাদা রসূল, এটাই সহীহ্।—(আলবেদায়াওয়ান্নেহায়া)।

নবুওয়ত লাভের সময়কাল ও স্থান ঃ হযরত ইলিয়াস (আঃ) কখন এবং কোথায় প্রেরিত হয়েছিলেন, কোরআন ও হাদীস থেকে তাও জানা যায় না। কিন্তু ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, তিনি হযরত হিয্কীল (আঃ)-এর পর এবং হযরত আল্ইয়াস' (আঃ)-এর পূর্বে বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এ সময়ে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের অপকর্মের কারণে বনী ইসরাঈলের সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক অংশকে 'ইয়াহুদাহ্' অথবা 'ইয়াহুদিয়্যাহ' বলা হত। এর রাজধানী ছিল বায়তুল-মোকাদ্দাসে অবস্থিত। আর অপর অংশের নাম ছিল 'ইসরাঈল'। এর রাজধানী তৎকালীন সামেরাহ্ এবং বর্তমান নাবলুসে অবস্থিত ছিল। হযরত ইলিয়াস (আঃ) জর্দানে 'অলআদ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখনকার ইসরাঈলের শাসনকর্তার নাম বাইবেলে আখিয়াব এবং আরবী ইতিহাসে 'আজিব' অথবা 'আখিব' বলে উল্লেখিত রয়েছে। তার স্ত্রী ঈযবীল 'বা'আল' নামক এক দেবমূর্তির পূজা করত। সে ইসরাঈলে বা'আলের নামে এক সুবিশাল বধ্যভূমি নির্মাণ করে বনী ইসরাঈলকে মূর্তি পূজায় আকৃষ্ট করেছিল। হযরত ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এ ভূখণ্ডে তওহীদ প্রচার করার এবং বনী ইসরাঈলকে মূর্তি পূজা থেকে বিরত রাখার নির্দেশ লাভ করেন।—(তফসীরে ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, মাযহারী, বাইবেলের কিতাবে সালাতীন)।

স্ব সম্প্রদায়ের সাথে সংঘর্ষ ঃ অন্যান্য পয়গম্বরগণকেও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে গুরুতর সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে, হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর বেলাও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে কোরআন পাকে এসব সংঘর্ষের বিস্তারিত বিবরণদানের পরিবর্তে কেবল এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক অংশটি বিবৃত হয়েছে যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল এবং কয়েকজন নিষ্ঠাবান লোক ছাড়া কেউ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল না। ফলে পরকালে তাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

কোন কোন তফসীরবিদ এখানে এ সংঘর্ষের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করেছেন। প্রচলিত তফসীরিসমূহের মধ্যে তফসীরে মযহারীতে আল্লামা বগভীর বরাত দিয়ে হযরত ইলিয়াস (আঃ) সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখিত ঘটনাবলীর প্রায় সবটুকুই বাইবেল থেকে গৃহীত। অন্যান্য তফসীরেও এসব ঘটনার কিছু অংশ ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ, কা'বে আহ্বার প্রমুখের বরাত সহকারে বর্ণিত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

এ সমস্ত রেওয়ায়েতের অভিন্ন সার-সংক্ষেপ এই যে, হযরত ইলিয়াস (আঃ) ইসরাঈলীদের শাসনকর্তা আখিয়াব ও তার প্রজাবৃন্দকে বা'আল দেবমূর্তির পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং তওহীদের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু দু'একজন সত্যপন্থী ছাড়া কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না, বরং তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করার চেষ্টা করল। এমনকি, বাদশাহ্ আখিয়াব ও রাণী ঈযবিল তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করল। ফলে তিনি সুদূর এক গুহায় আশ্রয় নিলেন এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি দোয়া করলেন যেন ইসরাঈলের অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। তাতে করে দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্যে যদি তিনি তাদেরকে মো'জেযা প্রদর্শন করেন, তাহলে হয়তো তারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। এই দোয়ার ফলে ইসরাঈলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

এরপর হযরত ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহ্র আদেশে সম্রাট আখিয়াবের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন ঃ এই দুর্ভিক্ষের কারণ আল্লাহ্র নাফরমানী। তোমরা এখনও নাফরামানী থেকে বিরত হলে এ আযাব দূর হতে পারে। আমার সত্যতা পরীক্ষা করারও এটা সুবর্ণ সুযোগ। তুমি বলে থাক যে, ইসরাঈল সাম্রাজ্যে তোমাদের উপাস্য বা'আল দেবতার সাড়ে চারশ' নবী আছে। তুমি একদিন তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত কর। তারা বা'আল-এর নামে কোরবানী পেশ করুক আর আমি আল্লাহ্র নামে কোরবানী পেশ করব। যার কোরবানী আকাশ থেকে অগ্নিবিদ্যুৎ এসে ভস্ম করে দেবে, তার ধর্মই সত্য বলে সাব্যস্ত হবে। সবাই এ প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিল।

সেমতে "কোহে করমল" নামক স্থানে উভয় পক্ষের সমাবেশ হল। বা'আল দেবতার মিথ্যা নবীরা তাদের কোরবানী পেশ করল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বা'আলের উদ্দেশে অনুনয়-বিনয় সহকারে প্রার্থনা করল, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অতঃপর হযরত ইলিয়াস (আঃ) কোরবানী পেশ করলে আকাশ থেকে অগ্নিবিদ্যুৎ এসে তা ভস্ম করে দিল। এ দৃশ্য দেখে অনেকেই সেজদায় পড়ে গেল। তাদের সামনে সত্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। কিন্তু বা'আল দেবের মিথ্যা নবীরা এর পরেও সত্য গ্রহণ করল না; ফলে হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাদেরকে কায়শুন উপত্যকায় হত্যা করিয়ে দিলেন।

এই ঘটনার পর মুষলধারে বৃষ্টি হল এবং সম্পূর্ণ ভূখণ্ড ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। কিন্তু আখিয়াবের পত্নী ঈযবিলের তাতেও চক্ষু খুলল না। সে বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে উল্টা হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর শত্রু হয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার প্রস্তুতি শুরু করল। হযরত ইলিয়াস (আঃ) খবর পেয়ে পুনরায় সামেরাহ থেকে আত্মগোপন করলেন এবং কিছু দিন পর বনী-ইসরাঈলের অপর রাষ্ট্র ইয়াহুদিয়াহ পৌছে দ্বীনের তবলীগ আরম্ভ করলেন। কারণ, সেখানেও আস্তে আস্তে বা'আল পূজার আধিপত্য ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানকার সম্রাট ইহুরামও হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর কথা শুনল না। অবশেষে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী সেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। কয়েক বছর পর তিনি আবার ইসরাঈলে ফিরে এলেন এবং আখিয়াব ও তদীয় পুত্র আখযিয়াকে সত্য পথে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা পূর্ববৎ কুকর্মেই লিপ্ত রইল। অবশেষে তাদেরকে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক ব্যাধির শিকার করে দেয়া হল। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তার পয়গম্বরকে তুলে নিলেন।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) জীবিত আছেন কি ? ইতিহাসবিদ ও

তফসীরবিদদের মধ্যে এখানে এ বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে যে, ইলিয়াস (আঃ) জীবিত আছেন, না মৃত্যুবরণ করেছেন? তফসীরে মাযহারীতে বগভীর বরাত দিয়ে বর্ণিত দীর্ঘ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, ইলিয়াস (আঃ)-কে অগ্নিঅশ্বে সওয়ার করিয়ে আকাশে তুলে নেয়া হয় এবং তিনি হযরত ঈসা (আঃ)- এর মতই জীবিত রয়েছেন। আল্লামা সুয়ূতী ও ইবনে আসাকির হাকেম প্রমুখের বরাত দিয়ে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জীবিত আছেন। কা'বে আহবার বর্ণনা করেন যে, চার জন পয়গম্বর এখনো জীবিত আছেন। হযরত খিযির ও হযরত ইলিয়াস-এ দু'জন পৃথিবীতে এবং হযরত ঈসা ও হযরত ইদরীস আকাশে জীবিত আছেন। (দুররে মনসূর) এমনকি, কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, হযরত খিযির ও হযরত ইলিয়াস (আঃ) প্রতি বছর রমযান মাসে বায়তুল-মোকাদ্দাসে একত্রিত হন এবং রোযা রাখেন।— (কুরতুবী)

কিন্তু হাকেম ও ইবনে কাসীরের মত অনুসন্ধানবিদ আলেমগণ এসব রেওয়ায়েতকে বিশুদ্ধ মনে করেননি।

সারকথা, হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর জীবিত থাকার বিষয়টি কোন নির্ভরযোগ্য ইসলামী রেওয়ায়েত দ্বারা প্রামাণ্য নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে নীরব থাকাই উত্তম পথ। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষা এই যে, ''এগুলোকে সত্যও বলবে না এবং মিথ্যাও বলবে না।'' ইলিয়াস (আঃ)-এর ব্যাপারে এ শিক্ষা গ্রহণ করাই উচিত।

আয়াতসমূহের তফসীর লক্ষ্যণীয়—

أَتَدْعُونَ بَعْلًا (তোমরা কি বা'আল দেবতার পূজা কর?) ''বা'আল''-এর আভিধানিক অর্থ স্বামী, মালিক ইত্যাদি কিন্তু এটা হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবমূর্তির নাম ছিল। বা'আল পূজার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। হযরত মূসা (আঃ)-এর যমানায় সিরিয়া অঞ্চলে এর পূজা হত এবং এটা ছিল তাদের সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা। সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর— বা'আলবাক্কাকেও এ দেবতার নামেই নামকরণ করা হয়েছে। কারও কারও ধারণা এই যে, আরবদের প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি হুবালও এই বা'আলেরই অপর নাম।—(কাছাছুল-কোরআন)

وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করেছ?) এখানে উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তাআলা। ''সর্বোত্তম স্রষ্টা''-এর অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য কোন স্রষ্টা হতে পারে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে সমস্ত মিথ্যা উপাস্যকে তোমরা স্রষ্টা বলে সাব্যস্ত করে রেখেছ, তিনি ওদের সবার তুলনায় অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল।—(কুরতুবী) কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে خالق শব্দটি صانع (নির্মাতা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি সমস্ত নির্মাতার সেরা ও উত্তম নির্মাতা। কেননা, অন্যান্য নির্মাতারা কেবল বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করে কোন বস্তু তৈরী করে। কোন বস্তুকে নাস্তি থেকে আস্তিত্বে আনয়ন করা তাদের ক্ষমতার বাইরে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাআলা অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্ব দান করার নিজস্বভাবেই ক্ষমতা রাখেন।—(বয়ানুল-কোরআন)

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সৃষ্টিগুণকে সম্পৃক্ত করা জায়েয নয় ঃ এখানে স্মর্তব্য যে, خلق শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ, কোন বস্তুকে নাস্তি থেকে নিজস্ব ক্ষমতায় অস্তিত্বে আনয়ন করা। তাই এটা আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণ। অন্য কারও সাথে এ গুণের সংযুক্তি জায়েয নয়। আমাদের যুগে প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, লেখকদের রচনা, কবিদের কবিতা এবং চিত্র শিল্পীদের চিত্রকর্মকে তাদের সৃষ্টি বলে দেয়া হয়। এটা মোটেই বৈধ নয়। স্রষ্টা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ হতে পারে না। তাই লেখকদের লেখাকে চিন্তার ফসল অথবা রচনা ইত্যাদি বলাই উচিত—সৃষ্টি নয়।

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ — (অতঃপর ওরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ফলে ওদেরকে গ্রেফতার করা হবে।) উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র সত্য রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করার মজা তাদেরকে আস্বাদন করতে হবে। এর অর্থ পরকালের আযাব এবং দুনিয়ার অশুভ পরিণতি উভয়ই হতে পারে। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইলিয়াস (আঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতিতে ইয়াহুদাহ্ ও ইসরাঈল উভয় সাম্রাজ্যই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এর বিশদ বিবরণ তফসীরে মাযহারীতে এবং বাইবেলে পাওয়া যাবে।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ - এখানে مخلصين শব্দের লাম-এর উপর 'যবর' রয়েছে। এর অর্থ হল এমন লোক যাদেরকে নিখাদ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে তাঁর আনুগত্য এবং পুরস্কার ও সওয়াবের জন্যে খাঁটি করে নিয়েছেন। সুতরাং এর অনুবাদ নিষ্ঠাবান অপেক্ষা ''মনোনীত'' করা অধিক সমীচীন।

سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ''ইলিয়াসীন'' ও ইলিয়াস (আঃ)-এর আর এক নাম। আরবরা প্রায়ই অনারব নামের শেষে ''ইয়া'' ও ''নূন'' বর্ণ সংযুক্ত করে দেয়। যেমন, سينا থেকে سنين বলে। এখানেও তেমনি দু'টি বর্ণ সংযুক্ত করা হয়েছে।

১৩৩-১৩৮ আয়াতসমূহে পঞ্চম ঘটনা হযরত লূত (আঃ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনা পূর্বে কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। এখানে মক্কার লোকদেরকে বিশেষভাবে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা সিরিয়ার বাণিজ্যিক সফরে সাদ্দুমের সে এলাকা দিবারাত্রি অতিক্রম কর, যেখানে এসব দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তোমরা এ থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ কর না। 'সকাল' ও 'সন্ধ্যা' বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আরবরা সাধারণতঃ এ সময়েই এ এলাকা অতিক্রম করত। কাযী আবু সাঈদ বলেন ঃ খুব সম্ভব সাদ্দুম এলাকাটি রাস্তার এমন মনযিলে অবস্থিত ছিল, যেখান থেকে প্রস্থানকারীরা ভোরে রওয়ানা হত এবং আগমনকারীরা সন্ধ্যায় আগমন করত।— (তফসীরে-আবু সউদ)

إِذْ نَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِى ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ
دَمَّرْنَا ٱلْءَاخَرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِٱلَّيْلِ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى
ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾
فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾
لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ فَنَبَذْنَٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ
سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ
مِا۟ئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَـَٔامَنُوا۟ فَمَتَّعْنَٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾
فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ
إِنَٰثًا وَهُمْ شَٰهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾
وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَٰنٌ
مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾ فَأْتُوا۟ بِكِتَٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٥٧﴾ وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ
وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾
سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾

(১৩৪) যখন আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম; (১৩৫) কিন্তু এক বৃদ্ধাকে ছাড়া; সে অন্যান্যদের সঙ্গে থেকে গিয়েছিল। (১৩৬) অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমি সমূলে উৎপাটিত করেছিলাম। (১৩৭) তোমরা তাদের ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে গমন কর ভোর বেলায় (১৩৮) এবং সন্ধ্যায়, তার পরেও কি তোমরা বোঝ না? (১৩৯) আর ইউনুসও ছিলেন পয়গম্বরগণের একজন। (১৪০) যখন পালিয়ে তিনি বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। (১৪১) অতঃপর লটারী (সুরতি) করালে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। (১৪২) অতঃপর একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল, তখন তিনি অপরাধী গণ্য হয়েছিলেন। (১৪৩) যদি তিনি আল্লাহ্‌র তসবীহ্ পাঠ না করতেন, (১৪৪) তবে তাঁকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত। (১৪৫) অতঃপর আমি তাঁকে এক বিস্তীর্ণ-বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন তিনি ছিলেন রুগ্ন। (১৪৬) আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদগত করলাম। (১৪৭) এবং তাঁকে, লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম। (১৪৮) তারা বিশ্বাস স্থাপন করল অতঃপর আমি তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম। (১৪৯) এবার তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমার পালনকর্তার জন্যে কি কন্যা সন্তান রয়েছে এবং তাদের জন্যে কি পুত্র-সন্তান? (১৫০) না কি আমি তাদের উপস্থিতিতে ফেরেশতাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি? (১৫১) জেনো, তারা মনগড়া উক্তি করে যে, (১৫২) আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। (১৫৩) তিনি কি পুত্র-সন্তানের স্থলে কন্যা-সন্তান পছন্দ করেছেন? (১৫৪) তোমাদের কি হল? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? (১৫৫) তোমরা কি অনুধাবন কর না? (১৫৬) না কি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন দলীল রয়েছে? (১৫৭) তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব আন। (১৫৮) তারা আল্লাহ্ ও জ্বিনদের মধ্যে সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে, অথচ জ্বিনেরা জানে যে, তারা গ্রেফতার হয়ে আসবে। (১৫৯) তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। (১৬০) তবে যারা আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান বন্দা, তারা গ্রেফতার হয়ে আসবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৩৯-১৪৮ সূরায় সর্বশেষ ঘটনা হযরত ইউনুস (আঃ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি সূরা ইউনুসের শেষভাগে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। তবে বিশেষভাবে আয়াতগুলো সম্পর্কে কতিপয় জরুরী বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল।

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ - কোন কোন তফসীর ও ইতিহাসবিদ এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যে, হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের ঘটনার পূর্বেই রসূল পদে বরিত হয়েছিলেন, না পরে বরিত হয়েছেন? কেউ কেউ বলেন যে, মাছের ঘটনার পরে তিনি রসূল হন। কিন্তু কোরআন পাকের বাহ্যিক বর্ণনা এবং অনেক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এটাই প্রবল যে, তিনি পূর্বেই রসূলপদে অভিষিক্ত ছিলেন। মাছের ঘটনা পরে সংঘটিত হয়।

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ — (যখন তিনি পলায়ন করেন যাত্রী বোঝাই নৌকার দিকে। اباق শব্দের অর্থ প্রভুর নিকট থেকে কোন গোলামের পালিয়ে যাওয়া। হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জন্যে এ শব্দ ব্যবহার করার কারণ এই যে, তিনি তাঁর পরওয়ারদেগারের ওহীর অপেক্ষা না করেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। পয়গম্বরগণ,আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বন্দা। তাঁদের সামান্য পদস্খলনও বিরাটাকারে ধরপাকড়ের কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই এই কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

فَسَاهَمَ - (অর্থাৎ, তিনি লটারী তথা সুরতির সম্মুখীন হলেন। (এই সুরতি তখন করা হয়, যখন নৌকা নদীর মাঝখানে তুফানে পড়ে এবং অতিরিক্ত বোঝাই হওয়ার কারণে ডুবে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ সময় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এক ব্যক্তিকে নদীতে ফেলে দেয়া হোক। কাকে ফেলে দেয়া হবে, তা নির্ধারণকল্পে এই সুরতি পরীক্ষা করা হয়েছিল যে, লোকটি কে?

فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ — (অতঃপর তিনি পরাজিত হলেন।) ادحاض এর আভিধানিক অর্থ কাউকে অকৃতকার্য করে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, লটারীতে তাঁরই নাম বের হয়ে এল এবং তিনি নিজেকে নদীতে নিক্ষেপ করলেন। এতে আত্মহত্যার সন্দেহ করা উচিত নয়। কারণ, নদীর কিনারা সম্ভবতঃ নিকটেই ছিল। তিনি সাঁতার কেটে কিনারায় পৌঁছার ইচ্ছায় নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ - এ আয়াত থেকে একথা অনুমান করা ঠিক নয় যে, ইউনুস (আঃ) তসবীহ্ পাঠ না করলে মাছটি কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকত। বরং উদ্দেশ্য এই যে, এ মাছের পেটেই ইউনুস (আঃ)-এর কবর হয়ে যেত।

তসবীহ্ ও এস্তেগফার দ্বারা বিপদাপদ দূর হয় ঃ এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে তসবীহ্ ও এস্তেগফার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে যে, ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় বিশেষভাবে এ কলেমা পাঠ করতেন ঃ

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ — এ কলেমার বরকতেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এই পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করেন। তিনি মাছের পেট থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। এ জন্যেই বুযুর্গগণের চিরাচরিত রীতি এই যে, তাঁরা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত বিপদাপদের

সময় উল্লেখিত কলেমা সোয়া লাখ বার পাঠ করেন। এর বরকতে আল্লাহ্ তাআলা বিপদ দূর করেন।

আবু দাউদ হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছের এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ মাছের পেটে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর পঠিত দোয়া যে কোন মুসলমান যে কোন উদ্দেশে পাঠ করবে, তার দোয়া কবুল হবে।—(কুরতুবী)

فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ — (অতঃপর আমি তাঁকে প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম। তিনি তখন পীড়িত ছিলেন।) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মাছের পেটে থাকার কারণে ইউনুস (আঃ) তখন খুবই দুর্বল ছিলেন। তাঁর শরীরে কোন লোমও অবশিষ্ট ছিল না।

وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ -(আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষও উদগত করে দিয়েছিলাম।) কাণ্ডবিহীন বৃক্ষকে يَقْطِيْن বলা হয়। রেওয়ায়েয়েতে লাউ গাছের কথা উল্লেখ আছে। ছায়ার জন্যে এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। شَجَرَةٌ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, হয় আল্লাহ্ তাআলা লাউ গাছকেই কাণ্ডবিশিষ্ট করে দিয়েছিলেন, না হয় অন্য কোন বৃক্ষ ছিল যার উপর লতাপাতা জড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, যাতে ছায়া ঘন হয়। অন্যথায় শুধু লতার দ্বারা ছায়া পাওয়া কঠিন।

وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ — (আমি তাকে এক লাখ অথবা ততোধিক লোকের প্রতি পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম।) এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলা তো সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন, তিনি এই সন্দেহ প্রকাশ করলেন কেন? এর জওয়াব এই যে, এক লাখ অথবা ততোধিক বাক্যটি সাধারণ মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, একজন সাধারণ মানুষ তাদেরকে দেখলে একথা বলত যে, তাদের সংখ্যা এক লাখ অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী। হযরত থানভী (রাঃ) বলেন ঃ এখানে সন্দেহ প্রকাশ উদ্দেশ্যই নয়। তাদেরকে এক লাখও বলা যায়, ততোধিকও বলা যায়। কারণ, ভগ্নাংশের প্রতি লক্ষ্য না করলে তাদের সংখ্যা এক লাখ ছিল এবং ভগ্নাংশও গণনা করা হলে এক লাখের কিছু বেশী ছিল।—(বয়ানুল-কোরআন)

এ বাক্যটি যেহেতু মাছের ঘটনার পরে উল্লেখিত হয়েছে, তাই এর ভিত্তিতে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, ইউনুস (আঃ) এ ঘটনার পরে নবুওয়ত লাভ করেছিলেন। আল্লামা বগভী এমনও বলেছেন যে, এ আয়াতে তাঁকে নায়নুয়ার দিক প্রেরণ করার উল্লেখ নেই; বরং মাছের ঘটনার পরে তাঁকে অন্য এক সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ অথবা ততোধিক। কিন্তু কোরআন পাক ও হাদীস থেকে এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। এখানে ঘটনার শুরুতেই ইউনুস (আঃ)-এর রেসালত উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মাছের ঘটনা রসূল হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর এখানে বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করার কারণ এই যে, সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে পুনরায় সেখানেই প্রেরণ করা হয়েছিল। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা অল্পসংখ্যক লোক ছিল না, বরং তাদের সংখ্যা ছিল লাখেরও উপরে।

فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ — (বস্তুতঃ তারা বিশ্বাস স্থাপন করল, ফলে আমি তাদেরকে কিছুকাল পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।) ''কিছুকাল পর্যন্ত'' উদ্দেশ্য এই যে, যতদিন তারা পুনরায় কুফর ও শিরকে লিপ্ত না হল, ততদিন তারা আযাব থেকেও বেঁচে রইল।

এপর্যন্ত পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী, উপদেশ ও শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছিল। এখন ১৪৯-১৬৬ আয়াতে আবার তওহীদ সপ্রমাণ করা ও শিরক বাতিল করার আসল বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে এক বিশেষ ধরণের শিরক খণ্ডন করা হয়েছে। মক্কার কাফেরদের বিশ্বাস ছিল যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র কন্যা এবং জ্বিন সরদার-দুহিতারা ফেরেশতাগণের জননী। আল্লামা ওয়াহেদী বলেন ঃ এ বিশ্বাস কোরাইশ গোত্র ছাড়াও জুহাইনা, বনু সালমা, বনু-খোযা'আ ও বনু সালীহ্দের মধ্যেও বদ্ধমূল ছিল।—(তফসীর-কবীর)

فَاسْتَفْتِهِمْ ...... اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ এসব আয়াতে কাফেরদের উপরোক্ত বিশ্বাস খণ্ডনের দলীল পেশ করা হয়েছে। প্রথমতঃ তোমাদের এ বিশ্বাস স্বয়ং তোমাদের প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ, তোমরা কন্যা-সন্তানকে লজ্জার কারণ মনে কর। যে বস্তু তোমাদের জন্যে লজ্জাজনক, তা আল্লাহ্র জন্যে কেন লজ্জাজনক হবে না? এরপর তোমরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা বলে সাব্যস্ত করেছ। তোমাদের কাছে এর কোন দলীল আছে কি? কোন দাবী প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিন রকম দলীল হতে পারে—(১) চাক্ষুষ দলীল, (২) ইতিহাসভিত্তিক দলীল অর্থাৎ, এমন ব্যক্তির উক্তি, যার সততা সর্বজন স্বীকৃত এবং (৩) যুক্তিভিত্তিক দলীল। প্রথমোক্ত দলীল নিশ্চিত অনুপস্থিত। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা যখন ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেন, তখন তোমরা উপস্থিত ছিলে না। কাজেই ফেরেশতাগণ যে নারী, তাই জানা সম্ভব নয়।

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ - আয়াতের মর্ম তাই। ইতিহাসভিত্তিক দলীলও তোমাদের কাছে নেই। কারণ, সর্বজন স্বীকৃত সত্যবাদী ব্যক্তির উক্তিই ধর্তব্য হয়ে থাকে। অথচ যারা এই বিশ্বাসের প্রবক্তা, তারা মিথ্যাবাদী। সুতরাং তাদের উক্তি দলীল হতে পারে না।

اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ — আয়াতের অর্থ তাই। পক্ষান্তরে যুক্তিগত দলীলও তোমাদের সমর্থন করে না। কারণ, স্বয়ং তোমাদের ধারণা অনুযায়ী পুত্র-সন্তানের মোকাবেলায় কন্যা-সন্তান হীন। এখন যে সত্তা সমগ্র সৃষ্টজগতের সেরা তিনি নিজের জন্যে হীন বস্তু কেমন করে পছন্দ করতে পারেন? اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। এখন একটি মাত্র পথ অবশিষ্ট থাকে। তা এই যে, কোন্ আসমানী কিতাব ওহীর মাধ্যমে তোমাদেরকে এই বিশ্বাস শিক্ষা দিয়েছে। এমনটি হয়ে থাকলে সে ওহী ও কিতাব এনে দেখাও। اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ فَأْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ আয়াতের অর্থ তাই।

হঠকারীদের জন্যে আক্রমণাত্মক উত্তরই অধিক উপযুক্ত ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, যারা হঠকারিতায় বদ্ধপরিকর, তাদেরকে আক্রমণাত্মক জওয়াব দেয়াই অধিক উপযুক্ত। আক্রমণাত্মক জওয়াব বলা হয় প্রতিপক্ষের দাবী তারই অন্য কোন স্বীকৃত নীতি দ্বারা খণ্ডন করা। এতে এটা জরুরী হয় না যে, সেই অন্য নীতি আমরাও স্বীকার করি; বরং প্রায়ই সে নীতিও ভ্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিপক্ষকে বোঝানোর জন্যে একে কাজে লাগানো হয়। এখানে আল্লাহ্ তাআলা তাদের বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্যে স্বয়ং তাদেরই এই নীতি ব্যবহার করেছেন যে, কন্যা-সন্তান লজ্জা ও দোষের বিষয়। বলাবাহুল্য, এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ তাআলার মতেও কন্যা-সন্তান লজ্জার বিষয়। এছাড়া এর অর্থ এমনও নয় যে, কাফেররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যাসন্তান না বলে পুত্র-সন্তান বললে সঠিক হত। বরং এটা ইলযামী জওয়াব, যার

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ
صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ
الصَّافُّونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾
لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾
فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا
الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ
الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ
الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى
الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

سورة ص مكية وهي ثمان وثمانون آية وخمس ركوعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

صٓ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿٢﴾
كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴿٣﴾

(১৬১) অতএব তোমরা এবং তোমরা যাদের উপাসনা কর, (১৬২) তাদের কাউকেই তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। (১৬৩) শুধুমাত্র তাদের ছাড়া যারা জাহান্নামে পৌঁছবে। (১৬৪) আমাদের প্রত্যেকের জন্যে রয়েছে নির্দিষ্ট স্থান। (১৬৫) এবং আমরাই সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকি। (১৬৬) এবং আমরাই আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করি। (১৬৭) তারা তো বলত ঃ (১৬৮) যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের কোন উপদেশ থাকত, (১৬৯) তবে আমরা অবশ্যই আল্লাহ্র মনোনীত বন্দা হতাম। (১৭০) বস্তুতঃ তারা এই কোরআনকে অস্বীকার করেছে। এখন শীঘ্রই তারা জেনে নিতে পারবে, (১৭১) আমার রসূল ও বন্দাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, (১৭২) অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। (১৭৩) আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী। (১৭৪) অতএব আপনি কিছুকালের জন্যে তাদেরকে উপেক্ষা করুন (১৭৫) এবং তাদেরকে দেখতে থাকুন। শীঘ্রই তারাও এর পরিণাম দেখে নেবে। (১৭৬) আমার আযাব কি তারা দ্রুত কামনা করে? (১৭৭) অতঃপর যখন তাদের আঙিনায় আযাব নাযিল হবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ। (১৭৮) আপনি কিছুকালের জন্যে তাদেরকে উপেক্ষা করুন (১৭৯) এবং দেখতে থাকুন, শীঘ্রই তারাও এর পরিণাম দেখে নেবে। (১৮০) পবিত্র আপনার পরওয়ারদেগারের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে। (১৮১) পয়গম্বরগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (১৮২) সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্র নিমিত্ত।

সূরা ছোয়াদ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৮৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্র নামে শুরু ঃ

(১) ছোয়াদ—শপথ উপদেশপূর্ণ কোরআনের, (২) বরং যারা কাফের, তারা অহংকার ও বিরোধিতায় লিপ্ত। (৩) তাদের আগে আমি কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, অতঃপর তারা আর্তনাদ করতে শুরু করেছে, কিন্তু তাদের নিষ্কৃতি লাভের সময় ছিল না।

লক্ষ্য স্বয়ং তাদেরই স্বীকৃত ধারণা দিয়ে তাদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করা। নতুবা এ জাতীয় বিশ্বাসের সত্যিকার জওয়াব তাই, যা কোরআন পাকের কয়েক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, তাঁর কোন সন্তানের প্রয়োজন নেই এবং সন্তান থাকা তাঁর মহান মর্যাদার যোগ্যও নয়।

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا —(তারা আল্লাহ্ তাআলা ও জ্বিনদের মধ্যে বংশ সম্পর্ক স্থির করেছে।) এটা মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনা যে, জ্বিন সরদার-দুহিতারা ফেরেশতাগণের জননী। কাজেই (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তাআলা ও জ্বিন সরদার-দুহিতাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের ফলেই ফেরেশতাগণ জন্মলাভ করেছে। এক রেওয়ায়েতে আছে, মুশরিকরা যখন ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা সাব্যস্ত করল, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তবে তাদের জননী কে? তারা জওয়াবে বলল ঃ জ্বিন সরদার-দুহিতারা।—(ইবনে-কাসীর) কিন্তু এই তফসীরে খটকা থেকে যায় যে, আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ও জ্বিনদের মধ্যে বংশগত সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্ক তো বংশগত সম্পর্ক নয়।

সুতরাং অপর একটি তফসীর এখানে অগ্রগণ্য মনে হয়, যা হযরত ইবনে-আব্বাস, হাসান বসরী ও যাহ্হাক থেকে বর্ণিত রয়েছে। তাঁরা বলেন ঃ কোন কোন আরববাসীর বিশ্বাস ছিল যে, (নাউযুবিল্লাহ্) ইবলীস আল্লাহর ভ্রাতা। আল্লাহ্ মঙ্গলের স্রষ্টা আর সে অমঙ্গলের স্রষ্টা। এখানে এই বাতিল বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে।

وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (জ্বিনদের বিশ্বাস এই যে, তারা গ্রেফতার হবে।) উদ্দেশ্য এই যে, যেসব শয়তান ও জ্বিনকে তোমরা আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থির করে রেখেছ, তারা স্বয়ং ভালরূপেই জানে যে, পরকালে তাদেরকেও মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। উদাহরণতঃ ইবলীস তার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছে। এখন যে নিজেই আযাবে গ্রেফতার হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাকে আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করা কত বড় বোকামি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ যুক্তি প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ করার পর ১৬৭-১৭৯ আয়াতসমূহে কাফেরদের হঠকারিতা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত আগমনের পূর্বে বাসনা প্রকাশ করে বলত যে, কোন পয়গম্বর আগমন করলে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম। কিন্তু যখন মহানবী (সাঃ)-এর আগমন ঘটল, তখন তারা জেদ ও হঠকারিতার পথ অবলম্বন করল। অতঃপর রসূলে করীম (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের উৎপীড়নে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। সেদিন দূরে নয়, যখন আপনি বিজয়ী ও কৃতকার্য হবেন এবং তারা হবে পরাভূত ও আযাবের লক্ষ্যবস্তু। পরকালে তো তা পরিপূর্ণভাবেই দেখা যাবে, তদুপরি দুনিয়াতেও আল্লাহ্ দেখিয়েছেন যে, বদর যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত প্রতিটি জেহাদে আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে সাফল্য দান করেছেন এবং শত্রুপক্ষকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন।

আল্লাহ্ ওয়ালাদের বিজয়ের মর্ম ঃ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا ..... وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ এসব আয়াতের অর্থ এই যে, আমি পূর্বাহ্নেই স্থির করে রেখেছি যে, আমার বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বন্দা পয়গম্বরগণই বিজয়ী

হবেন। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে, কোন কোন পয়গম্বর তো দুনিয়াতে বিজয়ী হননি। জওয়াব এই যে, জানা পয়গম্বরগণের মধ্যে অধিকাংশ পয়গম্বরের সম্প্রদায় মিথ্যারোপের অপরাধে আযাবে পতিত হয়েছে, কিন্তু পয়গম্বরগণকে আযাব থেকে দূরে রাখা হয়েছে। মাত্র কয়েকজন পয়গম্বর দুনিয়াতে শেষ পর্যন্ত বৈষয়িক বিজয় লাভ করতে সক্ষম হননি, কিন্তু যুক্তিতর্কে তাঁরাই সর্বদা উর্ধ্বে রয়েছেন এবং আদর্শগত বিজয় লাভ করেছেন। তবে এই বিজয়ের বৈষয়িক আলামত পরীক্ষা ইত্যাদির মত বিশেষ কোন উপযোগিতার কারণে পরকাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। হযরত থানভী (রহঃ)–এর ভাষায় এর দৃষ্টান্ত এমন যে, কোন ঘৃণিত দস্যু কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার সাথে সফররত অবস্থায় পথিমধ্যে দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হলে সরকারী কর্মকর্তা খোদা–প্রদত্ত অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার কারণে হয়ত দস্যুকে তোষামোদ করবেন; কিন্তু রাজধানীতে পৌঁছে দস্যুকে গ্রেফতার করে শাস্তি দেবে। সুতরাং এই সাময়িক প্রতিপত্তির কারণে দস্যুকে শাসক এবং কর্মকর্তাকে শাসিত বলা যায় না। বরং আসল অবস্থার দিক দিয়ে দস্যু প্রতিপত্তিসত্ত্বেও শাসিত এবং সরকারী কর্মকর্তা পরাভূত অবস্থায়ও শাসক। এ বিষয়টিই হযরত ইবনে–আব্বাস সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ان لم ينصروا في الدنيا ينصروا في الاخرة — (বয়ানুল–কোরআন)

কিন্তু সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, পার্থিব বিজয় হোক কিংবা পারলৌকিক বিজয়, কোন জাতি কেবল বংশগত বৈশিষ্ট্য অথবা ধর্মের সাথে নামে মাত্র সম্পর্কের দ্বারা তা অর্জন করতে পারে না। বরং মানুষ যখন নিজেকে আল্লাহ্‌র বাহিনীর একজন সৈনিকরূপে গড়ে তোলে, তখনই তা অর্জিত হতে পারে। এর অপরিহার্য মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আনুগত্যকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এখানে جندنا (আমার বাহিনী) শব্দটি ব্যক্ত করছে যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে সে নিজের সকল কর্মশক্তি শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যয় করার জন্য আল্লাহ্‌র সাথে চুক্তি করে। এই শর্তের উপরই বৈষয়িক অথবা আদর্শগত, পার্থিব অথবা পারলৌকিক বিজয় নির্ভরশীল।

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ — (যখন সে আযাব তাদের আঙিনায় নেমে আসবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সে সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ।) আরবী বাক–পদ্ধতিতে আঙিনায় নেমে আসার অর্থ কোন বিপদ একেবারে সামনে এসে উপস্থিত হওয়া বোঝায়। ''সকাল'' বলার কারণ এই যে, আরবে শত্রুরা সাধারণতঃ এ সময়েই আক্রমণ পরিচালনা করত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–ও তাই করতেন। তিনি কোন শত্রুর ভূখণ্ডে রাত্রি বেলায় পৌঁছালেও আক্রমণের জন্যে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।—(মাযহারী) হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন সকাল বেলায় খয়বর দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন এই বাক্যাবলী উচ্চারণ করেন ঃ الله اكبر خربت خيبر ، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين (অর্থাৎ, আল্লাহ্ মহান। খয়বর বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতরণ করি, তখন যাদেরকে পূর্ব–সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল খুবই মন্দ হয়।)

উপরোক্ত ১৮০ –১৮২ আয়াতগুলোর মাধ্যমে সূরা সাফ্‌ফাত সমাপ্ত করা হয়েছে। সত্য বলতে কি, এই সুন্দর সমাপ্তির ব্যাখ্যার জন্যে বিরাট পুস্তক দরকার। সংক্ষেপে বলা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা এই সংক্ষিপ্ত তিনটি আয়াতের মধ্যে সূরার সমস্ত বিষয়বস্তু ভরে দিয়েছেন। তওহীদের বর্ণনা দ্বারা সূরার সূচনা হয়েছিল, যার সারমর্ম ছিল এই যে, মুশরিকরা আল্লাহ্ সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণনা করে, আল্লাহ্ তাআলা সেগুলো থেকে পবিত্র। সেমতে আলোচ্য প্রথম আয়াতে সে দীর্ঘ বিষয়বস্তুর দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। এরপর সূরায় পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছিল। সেমতে দ্বিতীয় আয়াতে সেগুলোর দিকে ইশারা করা হয়েছে। অতঃপর পুংখানুপুংখরূপে কাফেরদের বিশ্বাস, সন্দেহ ও আপত্তিসমূহ যুক্তি ও উক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করে বলা হয়েছিল যে, শেষ বিজয় সত্যপন্থীরাই অর্জন করবে। এসব বিষয়বস্তু যে ব্যক্তিই জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে পাঠ করবে, সে অবশেষে আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও স্তুতি পাঠ করতে বাধ্য হবে। সেমতে এই প্রশংসা ও স্তুতির উপরই সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

এছাড়া এই তিন আয়াতে ইসলামের বুনিয়াদী বিশ্বাস—তওহীদ ও রেসালতের বিষয় প্রত্যক্ষভাবে এবং পরকালের বিষয় পরোক্ষভাবে স্থান পেয়েছে। এগুলো সপ্রমাণ করাই ছিল সূরার আসল লক্ষ্য। এতদসঙ্গে এ শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে তার প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ, ভাষণ ও বৈঠক আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব বর্ণনা ও প্রশংসা দিয়ে সমাপ্ত করবে। সেমতে আল্লামা কুরতুবী এক্ষেত্রে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)–এর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে নামায সমাপনান্তে سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ এই আয়াত তিনটি তেলাওয়াত করতে একাধিকবার শুনেছি। এছাড়া কতিপয় তফসীর গ্রন্থে এ মর্মে হযরত আলী (রাঃ)–এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন পূর্ণমাত্রায় পুরস্কার পেতে চায়, তার প্রত্যেক বৈঠক শেষে এই আয়াতত্রয় তেলাওয়াত করা উচিত। এ উক্তিই ইবনে হাতেম হযরত শা'বীর বাচনিক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন।—(তফসীর ইবনে–কাসীর)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূরা ছোয়াদ

শানে নুযূল ঃ এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলোর পটভূমিকা এই যে, রসূলে–করীম (সাঃ)–এর পিতৃব্য আবুতালেব ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও ভ্রাতুষ্পুত্রের পূর্ণ দেখা–শোনা ও হেফাযত করে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন কোরাইশ সরদাররা এক পরামর্শসভায় মিলিত হল। এতে আবু জহল, আ'স ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে এয়াগুস ও অন্যান্য সরদার যোগদান করল। তারা পরামর্শ করল যে, আবু তালেব রোগাক্রান্ত। যদি তিনি পরলোকগমন করেন এবং তার অবর্তমানে আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)–এর বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তবে আরবের লোকেরা আমাদেরকে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে। বলবে ঃ আবু তালেবের জীবদ্দশায় তো তারা মুহাম্মদ (সাঃ)–এর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না, এখন তার মৃত্যুর পর তাকে উৎপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। তাই আমরা আবু তালেব জীবিত থাকতেই তার সাথে মুহাম্মদ (সাঃ)–এর ব্যাপারে একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চাই, যাতে সে আমাদের দেব–দেবীর নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করে।

সেমতে তারা আবু তালেবের কাছে গিয়ে বলল ঃ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের উপাস্য দেব–দেবীর নিন্দা করে। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের

وَعَجِبُوٓا أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ
كَذَّابٌ ﴿٤﴾ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾
وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا
لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا
اخْتِلَاقٌ ﴿٧﴾ أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن
ذِكْرِي ۖ بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴿٨﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ
رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾ أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿١٠﴾ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ
الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ
وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ۚ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾ إِن
كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾ وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ
إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴿١٥﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا
عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا
يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾
إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾

(৪) তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফেররা বলে এ-তো এক মিথ্যাচারী যাদুকর। (৫) সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। (৬) তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় দৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশে প্রণোদিত। (৭) আমরা সাবেক ধর্মে এ ধরনের কথা শুনিনি। এটা মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়। (৮) আমাদের মধ্য থেকে শুধু কি তারই প্রতি উপদেশবাণী অবতীর্ণ হল? বস্তুতঃ ওরা আমার উপদেশ সম্পর্কে সন্দিহান; বরং ওরা এখনও আমার মার আস্বাদন করেনি। (৯) না কি তাদের কাছে আপনার পরাক্রান্ত দয়াবান পালনকর্তার রহমতের কোন ভাণ্ডার রয়েছে? (১০) না কি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর উপর তাদের সাম্রাজ্য রয়েছে? থাকলে তাদের আকাশে আরোহণ করা উচিত রশি ঝুলিয়ে। (১১) এক্ষেত্রে বহু বাহিনীর মধ্যে ওদেরও এক বাহিনী আছে, যা পরাজিত হবে। (১২) তাদের পূর্বেও মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, আদ, কীলক বিশিষ্ট ফেরাউন, (১৩) সামূদ, লূতের সম্প্রদায় ও আইকার লোকেরা। এরাই ছিল বহু বাহিনী। (১৪) এদের প্রত্যেকেই পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। ফলে আমার আযাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (১৫) কেবল একটি মহানাদের অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলার অবকাশ থাকবে না। (১৬) তারা বলে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের প্রাপ্য অংশ হিসাব দিবসের আগেই দিয়ে দাও। (১৭) তারা যা বলে তাতে আপনি সবর করুন এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন। সে ছিল আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (১৮) আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত;

দেব-দেবী সম্পর্কে এছাড়া কিছুই বলতেন না যে, এগুলো চেতনাহীন, নিষ্প্রাণ মূর্তি মাত্র; তোমাদের স্রষ্টাও নয়, অন্নদাতাও নয়। তোমাদের কোন লাভ-লোকসান তাদের করায়ত্ত নয়। আবু তালেব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে মজলিসে ডেকে এনে বললেন ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র, এ কোরাইশ সরদাররা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি নাকি তাদের উপাস্য দেব-দেবীর নিন্দা কর। তাদেরকে তাদের ধর্মে ছেড়ে দাও এবং তুমি আল্লাহ্র এবাদত করে যাও। এ সম্পর্কে কোরাইশের লোকেরাও বলাবলি করে।

অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ চাচাজান, "আমি কি তাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেবো না, যাতে তাদের মঙ্গল রয়েছে?" আবু তালেব বললেন ঃ সে বিষয়টা কি? তিনি বললেন ঃ আমি তাদেরকে এমন একটি কলেমা বলাতে চাই, যার বদৌলতে সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং তারা সমগ্র অনারবের অধীশ্বর হয়ে যাবে। একথা শুনে আবু জহ্ল বলে উঠল ঃ বল, সেই কলেমা কি? তোমার পিতার কসম আমরা এক কলেমা নয়, দশ কলেমা বলতে প্রস্তুত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ ব্যস "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলে দাও। একথা শুনে সবাই পরিধেয় বস্ত্র ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল ঃ আমরা কি সমস্ত দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করে মাত্র একজনকে অবলম্বন করব? এ যে, বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটেও সূরা ছোয়াদের আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে-কাসীর)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ — (তাদের সরদাররা একথা বলে প্রস্থান করল)-এতে উল্লেখিত ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তওহীদের দাওয়াত শুনে তারা মজলিস ত্যাগ করেছিল।

وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ এর শাব্দিক অর্থ "কীলকওয়ালা ফেরাউন"। এর তফসীরে তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেন ঃ এতে তার সাম্রাজ্যের দৃঢ়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই হযরত থানভী (রহঃ) এর তরজমা করেছেন—"যার খুঁটি আমূল বিদ্ধ ছিল।" কেউ কেউ বলেন ঃ সে মানুষকে চিৎ করে শুইয়ে তার চার হাত-পায়ে কীলক এঁটে দিত এবং তার উপরে সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দিত। এটাই ছিল তার শাস্তি দানের পদ্ধতি। কেউ কেউ বলেন ঃ সে রশি ও কীলক দ্বারা বিশেষ এক প্রকার খেলা খেলত। কেউ কেউ আরও বলেন ঃ এখানে কীলক বলে অট্টালিকা বোঝানো হয়েছে। সে সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল।—(কুরতুবী)

أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ এটা مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ বাক্যের বর্ণনা। অর্থাৎ, এ আয়াতে যেসব দলের ইঙ্গিত করা হয়েছিল, তারা এরাই। হযরত থানভী (রহঃ) এ অর্থ অনুযায়ীই তফসীর করেছেন। কিন্তু অন্য তফসীরবিদগণ এর অর্থ করেছেন, এরাই ছিল সে দল অর্থাৎ, প্রকৃত শৌর্যবীর্যের অধিকারী সম্প্রদায়ই ছিল আদ, সামূদ প্রমুখ। তাদের মোকাবেলায় মক্কার মুশরিকরা তো তুচ্ছ ও নগণ্য। তারাই যখন খোদায়ী আযাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি, তখন এই মুশরিকরা কি আত্মরক্ষা করবে?—(কুরতুবী)

مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ আরবীতে فَوَاقٍ এর একাধিক অর্থ হয়। (এক) একবার দুগ্ধ দোহনের পর পুনরায় স্তনে দুগ্ধ আসার মধ্যবর্তী সময়কে فَوَاقٍ বলা হয়। (দুই) সুখ-শান্তি। উদ্দেশ্য এই যে, ইসরাফিলের শিঙ্গার ফুঁক

অনবরত চলতে থাকবে এতে কোন বিরতি হবে না।—(কুরতুবী)

عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا আসলে কাউকে পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত দলীল দস্তাবেজকে قط বলা হয়। কিন্তু পরে শব্দটি ''অংশ'' অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। এখানে তা-ই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, পরকালের শাস্তি ও প্রতিদানে আমাদের যা অংশ রয়েছে, তা এখানেই আমাদেরকে দিয়ে দিন।

কাফেরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মর্মবেদনা অনুভব করতেন। এই মর্মবেদনা দূরীকরণের উদ্দেশে সান্ত্বনার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা এখানে অতীত পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। সেমতে আলোচ্য আয়াতসমূহেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সবর শিক্ষা দিয়ে কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ — (স্মরণ করুন, আমার বান্দা দাউদকে যে ছিল শক্তিশালী।) প্রায় সমস্ত তফসীরবিদই এর একই ধরনের অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, দাউদ (আঃ) খুবই শক্তি ও সাহসিকতার পরিচয় দিতেন। إِنَّهُ أَوَّابٌ (নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।)
বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় নামায ছিল দাউদ (আঃ)- এর নামায এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোযা ছিল দাউদ (আঃ)- এর রোযা। তিনি অর্ধরাত্রি নিদ্রা যেতেন, এক তৃতীয়াংশ এবাদত করতেন এবং পুনরায় রাত্রির ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন এবং তিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন। শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না। নিঃসন্দেহে দাউদ (আঃ) আল্লাহ্‌র দিকে খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।—(ইবনে-কাসীর)

এবাদতের উপরোক্ত পদ্ধতি সর্বাধিক পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, এতে কষ্ট বেশী হয়। সারা জীবন রোযা রাখলে মানুষ রোযায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে কিছুদিন পর রোযায় কোন কষ্টই অনুভূত হয় না। কিন্তু একদিন পর পর রোযা রাখলে কষ্ট অব্যাহত থাকে। এছাড়া এই পদ্ধতিতে মানুষ এবাদতের সাথে সাথে নিজের পরিবার-পরিজনের এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকারও পুরোপুরি আদায় করতে পারে।

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ — এ আয়াতে দাউদ (আঃ) -এর সাথে পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের এবাদতে ও তসবীহে শরীক হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এর ব্যাখ্যা সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ্ পাঠকে আল্লাহ্ তাআলা এখানে দাউদ (আঃ)-এর প্রতি নেয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এটা দাউদ (আঃ)-এর প্রতি নেয়ামত হল কেমন করে? পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ্ পাঠে তাঁর বিশেষ কি উপকার হত?

এর এক উত্তর এই যে, এতে দাউদ (আঃ)- এর একটি মো'জেযা প্রকাশ পেয়েছে। বলাবাহুল্য, মো'জেযা এক বড় নেয়ামত। এছাড়া হযরত থানভী (রহঃ)-এর এক সূক্ষ্ম জওয়াবে বলেন ঃ পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ্‌র ফলে যিকরের এক বিশেষ আনন্দ ঘন পরিবেশ সৃষ্টি হত। ফলে এবাদতে স্ফূর্তি, সজীবতা ও সাহসিকতা অনুভূত হত। সঙ্ঘবদ্ধ যিকরের আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে যিকিরের বরকত পরস্পরের উপর প্রতিফলিত হতে থাকে। সুফী বুযুর্গগণের মধ্যে যিকরের একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এতে যিকরের অবস্থায় ধ্যান করা হয় যে, সমগ্র সৃষ্টজগৎ যিকর করে যাচ্ছে। আত্মশুদ্ধি ও এবাদত স্পৃহায় এ পদ্ধতির প্রভাব বিস্ময়কর। আলোচ্য আয়াতে এই বিশেষ পদ্ধতির ভিত্তিও পাওয়া যায়।—(মাসায়েলে মুলূক)

চাশ্‌তের নামায ঃ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ যোহরের পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত সময়কে عشى বলা হয়। আর اشراق এর অর্থ সকাল, যখন সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এই আয়াতকে চাশ্‌তের নামায শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। চাশ্‌তের নামাযকে সালাতে আওয়াবীন এবং কেউ কেউ সালাতে এশরাকও বলেন। পরবর্তীতে ''সালাতে আওয়াবীন'' নাম মাগরিবের পরে ছয় রাকাতের জন্যে এবং 'সালাতে এশরাক' নাম সূর্যোদয় সংলগ্ন দুই অথবা চার রাকআত নফল নামযের জন্যে অধিক খ্যাত হয়ে গেছে।

চাশ্‌তের নামায দুই রাকআত থেকে বার রাকআত পর্যন্ত যত রাকআত ইচ্ছা পড়া যায়। হাদীসে এর অনেক উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযীতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি চাশ্‌তের দুই রাকআত নামায নিয়মিত পড়ে, তার গোনাহ্ মাফ করা হয় যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হয়। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ বলেন ঃ যে ব্যক্তি চাশ্‌তের বার রাকআত নামায পড়বে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্যে জান্নাতে স্বর্ণের প্রাসাদ তৈরী করে দেবেন।—(কুরতুবী)

আলেমগণ বলেন ঃ চাশ্‌তের নামায দুই থেকে বার পর্যন্ত যত রাকআত ইচ্ছা পড়া যায়। কিন্তু এর জন্যে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে নিয়মিত পড়াই উত্তম। এই নিয়মিত সংখ্যা চার রাকআত হওয়াই শ্রেয়। কেননা, চার রাকআত পড়াই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরও নিয়ম ছিল।

وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ
وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾
إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ
بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ
سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ
نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ
ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ
مَآبٍ ﴿٢٥﴾ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا
يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ
ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

(১৯) আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হত। সবাই ছিল তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (২০) আমি তাঁর সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা। (২১) আপনার কাছে দাবীদারদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে, যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে এবাদতখানায় প্রবেশ করেছিল। (২২) যখন তারা দাউদের কাছে অনুপ্রবেশ করল, তখন সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা বলল ঃ ভয় করবেন না; আমরা বিবদমান দুটি পক্ষ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব, আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। (২৩) সে আমার ভাই, সে নিরানব্বই দুম্বার মালিক আর আমি মালিক একটি মাদী দুম্বার। এরপরও সে বলে ঃ এটিও আমাকে দিয়ে দাও। সে কথাবার্তায় আমার উপর বলপ্রয়োগ করে। (২৪) দাউদ বলল ঃ সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। দাউদের খেয়াল হল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করল। (২৫) আমি তার সে অপরাধ ক্ষমা করলাম। নিশ্চয় আমার কাছে তার জন্যে রয়েছে উচ্চ মর্তবা ও সুন্দর আবাসস্থল। (২৬) হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে,তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়। (২৭) আমি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফেরদের ধারণা। অতএব, কাফেরদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ অর্থাৎ, জাহান্নাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ –(আমি তাকে হেকমত ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা দান করেছি।) হেকমত অর্থ প্রজ্ঞা। অর্থাৎ, আমি তাকে অসাধারণ বিবেকবুদ্ধি দান করেছিলাম। কেউ কেউ হেকমতের অর্থ নিয়েছেন নবুওয়ত। وَفَصْلَ الْخِطَابِ এর বিভিন্ন তফসীর করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর ভাবার্থ অসাধারণ বাগ্মিতা। হযরত দাউদ (আঃ) উচ্চস্তরের বক্তা ছিলেন। বক্তৃতায় হামদ ও সালাতের পর **اما بعد** শব্দ সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর ভাবার্থ সর্বোত্তম বিচারশক্তি। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ঝগড়া-বিবাদ মেটানো ও বাদানুবাদ মীমাংসা করার শক্তি দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দগুলোর মধ্যে একই সময়ে উভয় অর্থের পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। হযরত থানভী (রহঃ) যে তরজমা করেছেন, তাতেও উভয় অর্থ একত্রিত থাকতে পারে।

আলোচ্য ২১-২৫ আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কোরআন পাকে এ ঘটনা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে কেবল এতটুকু বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর এবাদতখানায় বিবাদমান দু'টি পক্ষ পাঠিয়ে কোন এক বিষয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন। দাউদ (আঃ) এ পরীক্ষার ফলে সতর্ক হয়ে যান এবং আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। আল্লাহ্ তাআলাও তাঁকে ক্ষমা করে দেন। কোরআন পাকের আসল লক্ষ্য এখানে এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা যে, হযরত দাউদ (আঃ) সব ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলার দিকে রুজু করতেন এবং কোন সময় সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলেও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনায় রত হয়ে যেতেন। তাই এখানে এসব বিষয়ের বিবরণ দেয়া হয়নি যে, সে পরীক্ষা কি ছিল, দাউদ (আঃ) কি ভুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং যা আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন?

তাই কোন কোন অনুসন্ধানী ও সাবধানী তফসীরবিদ এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ রহস্য ও উপযোগিতার কারণে তাঁর প্রথিতযশা পয়গম্বরের এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পরীক্ষার বিশদ বিবরণ দেননি। আমাদেরও এর পেছনে পড়া উচিত নয়। যতটুকু বিষয় কোরআন পাকে উল্লেখিত হয়েছে, ততটুকুতেই ঈমান রাখা দরকার। হাফেয ইবনে কাসীরের মত অনুসন্ধানী তফসীরবিদও এ নীতিই অনুসরণ করে ঘটনার বিবরণ দানে বিরত রয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা সর্বাধিক সাবধানী ও বিপদমুক্ত পথ। এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত আছে – **ابهموا ما ابهمه الله** অর্থাৎ, আল্লাহ্ যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও। বলাবাহুল্য, এতে এমনসব বিষয়কে অস্পষ্ট রাখতে বলা হয়েছে, যেগুলোর সাথে আমাদের কর্ম এবং হালাল ও হারামের সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কর্ম সম্পর্কিত বিষয়সমূহের অস্পষ্টতা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে দূর করে দিয়েছেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) এই যাচাই ও ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন ঃ মোকদ্দমার দু'পক্ষ প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করে এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা শুরু করে। মোকদ্দমা পেশ করার আগেই তারা হযরত দাউদ (আঃ)-কে ন্যায় বিচার করার এবং অবিচার না করার উপদেশ দিতে থাকে। কোন সাধারণ ব্যক্তি হলে এ ধরনের ধৃষ্টতার কারণে তাদের জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে উল্টো শাস্তি দিত। আল্লাহ্ তাআলা হযরত দাউদ

(আঃ)-কে পরীক্ষা করলেন যে, তিনিও ক্রোধান্বিত হয়ে তাদেরকে শাস্তি দেন, না পয়গম্বরসুলভ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদের কথাবার্তা শুনেন।

হযরত দাউদ (আঃ) এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কিন্তু একটি ভুল রয়ে গেল। তা এই যে, ফয়সালা দেয়ার সময় জালেমকে সম্বোধন না করে তিনি মজলুমকে সম্বোধন করলেন। এ থেকে এক প্রকার পক্ষপাতিত্ব বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি অবিলম্বে সতর্ক হয়ে গেলেন এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আল্লাহ্ তাআলাও তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।—(বয়ানুল-কোরআন)

কোন কোন তফসীরবিদ ভুলের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আঃ) বিবাদীকে চুপ থাকতে দেখে তার বিবৃতি শোনা ব্যতিরেকেই কেবল বাদীর কথা শুনে এমন উপদেশ দেন যা থেকে মোটামুটি বাদীর সমর্থন হচ্ছিল। অথচ আগে বিবাদীকে তার বক্তব্য পেশ করতে বলা উচিত ছিল। দাউদ (আঃ) যদিও কেবল উপদেশের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছিলেন এবং মোকদ্দমার ফয়সালা দেননি, তবুও এটা তাঁর মত সম্মানিত পয়গম্বরের পক্ষে সমীচীন ছিল না এ কারণেই তিনি পরে হুশিয়ার হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন।—(রূহুল-মা'আনী)

কেউ কেউ বলেন ঃ হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর সময়সূচী যেভাবে নির্ধারণ করেছিলেন, তাতে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই তাঁর গৃহের কোন না কোন ব্যক্তি এবাদত, যিকর ও তসবীহে মশগুল থাকত। একদিন তিনি আল্লাহ্ তাআলার দরবারে নিবেদন করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, দিন ও রাতের মধ্যে এমন কোন মুহূর্ত যায় না, যখন দাউদের পরিবারের কেউ না কেউ আপনার এবাদত, যিকর ও তসবীহে নিয়োজিত থাকে না। আল্লাহ্ বললেন ঃ দাউদ, এটা আমার দেয়া তওফীকের কারণেই হয়। আমার সাহায্য না থাকলে তোমার এরূপ করার সাধ্য নেই। আমি একদিন তোমাকে তোমার অবস্থার উপর ছেড়ে দেব। সেমতে আল্লাহ্ তাআলার এই উক্তির পর উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। দাউদ (আঃ)-এর এবাদতে নিয়োজিত থাকার সময় এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁর সময়সূচী বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। তিনি বিবাদ মীমাংসা করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর পরিবারের অন্য কেউ তখন এবাদত ও যিকরে মশগুল ছিল না। এতে দাউদ (আঃ) বোঝতে পারেন যে, আল্লাহ্‌র কাছে এবাদতের গর্ব প্রকাশ করা ভুল ছিল। তাই তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। মুস্তাদরাক হাকেমে সহীহ্ সনদ সহকারে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাসের একটি উক্তি দ্বারাও এ ব্যাখ্যার সমর্থন হয়।—(আহকামুল কোরআন)।

উপরোক্ত সবগুলো ব্যাখ্যার অভিন্ন স্বীকৃত বিষয় এই যে, মোকদ্দমাটি কাল্পনিক নয়— সত্যিকার ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং দাউদ (আঃ) - এর যাচাই ও পরীক্ষার সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। এর বিপরীতে অনেক তফসীরবিদের ব্যাখ্যার সারমর্ম এই যে, মোকদ্দমার পক্ষদ্বয় মানুষ নয়—ফেরেশতা ছিল এবং আল্লাহ্ তাআলা দাউদ (আঃ)-এর সামনে একটি কাল্পনিক মোকদ্দমা পেশ করার জন্যে তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন যাতে দাউদ (আঃ) নিজের ভুল বোঝতে পারেন।

অধিকাংশ তফসীরবিদ শেষোক্ত দু'টি ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের কোন কোন উক্তি থেকেও এ দু'টি ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়।—(রূহুল মা'আনী, তফসীরে আবু সউদ, যাদুল মাসীর, তফসীরে কবীর ইত্যাদি।)

إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (যখন তারা এবাদতখানার প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করল।) مِحْرَابٌ আসলে বাড়ীর উপর তলা অথবা কোন গৃহের সম্মুখভাগকে বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষভাবে মসজিদ অথবা এবাদতখানার সামনের অংশকে বোঝানোর জন্যে শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। কোরআনে এটি এবাদতখানার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী লিখেন, আজকাল মসজিদসমূহে যে বৃত্তাকারের মেহরাব নির্মাণ করা হয়, তা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে ছিল না।—(রূহুল মা'আনী)

فَفَزِعَ مِنْهُمْ (হযরত দাউদ (আঃ) তাদেরকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন।) ঘাবড়ানোর কারণ সুস্পষ্ট। অসময়ে দু'ব্যক্তির পাহারা ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা সাধারণতঃ মন্দ অভিপ্রায়েই হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক ভীতি নবুওয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থী নয় ঃ এ থেকে জানা গেল যে, কোন ভয়াবহ জিনিস দেখে স্বাভাবিকভাবে ভীত হয়ে যাওয়া নবুওয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থী নয়। তবে এই ভীতিকে মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে কর্তব্য কাজ ছেড়ে দেয়া অবশ্যই মন্দ। কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের শানে বলা হয়েছে وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللّٰهَ (তারা আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে ভয় করেন না।) অতঃপর প্রশ্ন হতে পারে যে, এখানে হযরত দাউদ (আঃ) ভীত হলেন কেন? জওয়াব এই যে, ভয় দু'রকম হয়ে থাকে। এক ভয় ইতর প্রাণীদের কষ্ট দেয়ার আশংকায় হয়ে থাকে। আরবীতে একে خوف বলা হয়। দ্বিতীয় ভয় কোন মহান ব্যক্তির মাহাত্ম্য, প্রতাপ ও প্রভাবের কারণে হয়ে থাকে। আরবীতে একে خشية বলা হয়। (মুফরাদাতে রাগিব) শেষোক্ত ভয় আল্লাহ্ ব্যতীত কারও জন্যে হওয়া উচিত নয়। তাই পয়গম্বরগণ আল্লাহ্ ব্যতীত কারও প্রতি এ ধরনের ভয়ে ভীত হতেন না। তবে স্বাভাবিক পর্যায়ে ইতর বস্তুর ভয় তাঁদের মধ্যেও ছিল।

অনিয়ম দেখলে প্রকৃত অবস্থা জানা পর্যন্ত সবর করা উচিত قَالُوا لَا تَخَفْ —(তারা বলল ঃ আপনি ভীত হবেন না।) আগন্তুকরা একথা বলে তাদের বক্তব্য শুরু করে দেয় এবং দাউদ (আঃ) চুপচাপ তাদের কথা শুনতে থাকেন। এ থেকে জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি হঠাৎ নিয়মের ব্যতিক্রম করে ফেললে সাথে সাথেই তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়, বরং প্রথমে তার কথা শুনে নেয়া দরকার, যাতে জানা যায় যে, এরূপ ব্যতিক্রম করার বৈধতা ছিল কিনা। অন্য কেউ হলে আগন্তুকদের উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ বকাবকি শুরু করে দিত, কিন্তু দাউদ (আঃ) আসল ব্যাপার জানার জন্যে অপেক্ষা করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, সম্ভবতঃ এরা অসুবিধাগ্রস্ত। وَلَا تُشْطِطْ (এবং অবিচার করবেন না।) আগন্তুকদের কথা বলার এ ভঙ্গি বাহ্যতঃ ধৃষ্টতাপূর্ণ ছিল। প্রথমতঃ প্রাচীর ডিঙিয়ে অসময়ে আসা, অতঃপর এসেই দাউদ (আঃ)-এর মত মহান পয়গম্বরকে সুবিচার করার এবং অবিচার থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দেয়া—এগুলোর সবই ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। কিন্তু দাউদ (আঃ) সবর করেন এবং তাদেরকে গালমন্দ করেননি।

অভাবগ্রস্তদের ভুলভ্রান্তিতে বড়দের যথাসম্ভব ধৈর্য ধরা উচিত ঃ এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা যাকে উচ্চ পদমর্যাদা দান করেন এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনাদি তার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে, তার উচিত অভাবগ্রস্তদের অনিয়ম ও কথাবার্তায় ভুলভ্রান্তিতে যথাসম্ভব ধৈর্য ধরা। এটাই তার পদমর্যাদার দাবী। বিশেষভাবে শাসক, বিচারক ও মুফতীগণের এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।—(রূহুল মা'আনী)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ —(দাউদ (আঃ) বললেন, সে তোমার দুম্বীকে তার দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে।) এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য— (১) হযরত দাউদ (আঃ) এ কথাটি কেবল বাদীর বর্ণনা শুনেই বলে দিয়েছেন—বিবাদীর বিবৃতি শুনেননি। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটাই ছিল তাঁর ভুল, যে কারণে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু অন্যান্য তফসীরবিদগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে এখানে মোকদ্দমার পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হচ্ছে না; কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে। দাউদ (আঃ) নিশ্চয়ই বিবাদীর কথাও শুনে থাকবেন। ফয়সালার এটাই সুবিদিত পন্থা।

এছাড়া এমনও হতে পারে যে, আগন্তুকরা যদিও তাঁর কাছে আদালতী মীমাংসা কামনা করেছিল, কিন্তু তখন আদালত অথবা কাছারির সময় ছিল না এবং সেখানে রায় কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উপায়ও ছিল না। তাই দাউদ (আঃ) বিচারকের পদমর্যাদায় নয়—মুফতীর পদমর্যাদায় ফতোয়া দেন। মুফতীর কাজ ঘটনার তদন্ত করা নয় বরং, প্রশ্ন মোতাবেক জওয়াব দেয়া।

কাজ-কারবারে শরীক হওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা প্রয়োজন : وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (শরীকদের অনেকেই একে অন্যের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে।) এতে বলা হয়েছে যে,দু'ব্যক্তি কোন কাজ-কারবারে শরীক হলে প্রায়ই একের দ্বারা অপরের অধিকার ক্ষুন্ন হয়ে যায়। কোন সময় এক ব্যক্তি একটি কাজকে মামুলী ভেবে করে ফেলে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা গোনাহের কারণ হয়ে যায়। তাই কাজ-কারবারে খুবই সাবধানতা আবশ্যক।

وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ (দাউদের ধারণা হল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি।) মোকদ্দমার বিবরণকে যদি হযরত দাউদ (আঃ)-এর ভুলের দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা হয় তবে এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে ভুলের সাথে এর কোন সম্পর্ক না থাকলেও উভয় পক্ষের মোটামুটি অবস্থা এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল যে, এরা পরীক্ষার্থে প্রেরিত হয়েছে। একদিকে তারা মোকদ্দমার ফয়সালা ত্বরান্বিত করার জন্যে বিলম্ব সহ্য করেনি এবং সাহসিকতার সাথে প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে। অপরদিকে মোকদ্দমা পেশ করার সময় বিবাদী চুপচাপ বসে রয়েছে এবং কথায় ও কাজে বাদীর কথা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে।

যদি বাদীর বর্ণিত ঘটনা বিবাদী পূর্বেই সমর্থন করত, তবে ফয়সালার জন্যে দাউদ (আঃ)-এর কাছে আসার কোন প্রয়োজনই ছিল না। দাউদ (আঃ)-এর ফয়সালা যে বাদীর পক্ষে হবে, এটা সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও বুঝতে পারত। পক্ষদ্বয়ের এই রহস্যপূর্ণ তৎপরতা ব্যক্ত করছিল যে, এটি একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা। দাউদ (আঃ) ও টের পেয়ে গেলেন যে, এরা আল্লাহ্ প্রেরিত এবং এতে আমার পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ফয়সালা শোনার পর তারা একে অপরের প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসল এবং মুহূর্তের মধ্যে আকাশে চলে গেল।

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (অতঃপর তিনি তাঁর পরওয়ারদেগারের দরবারে প্রার্থনা করলেন এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়ে রুজু হলেন।) এখানে "রুকূ" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে, এখানে সেজদা বোঝানো হয়েছে। হানাফী আলেমগণের মতে এ আয়াত তেলাওয়াত করলে সেজদা ওয়াজেব হয়।

وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ —(নিশ্চয় দাউদের জন্যে আমার কাছে বিশেষ নৈকট্য ও শুভ পরিণতি রয়েছে।) এ আয়াতের মাধ্যমে ঘটনার সমাপ্তি টেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত দাউদ (আঃ) যে ভুলই করে থাকুন, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা ও রুকূর পর আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভুল-ভ্রান্তির জন্য সতর্ক করতে হলে প্রজ্ঞার প্রয়োজন : এ ঘটনা সম্পর্কিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দাউদ (আঃ)-এর বিচ্যুতি যাই হোক না কেন, আল্লাহ্ তাআলা সরাসরি ওহীর মাধ্যমেও তাঁকে এ বিষয়ে হুশিয়ার করতে পারতেন। কিন্তু এর পরিবর্তে একটি মোকদ্দমা পাঠিয়ে হুশিয়ার করার এই বিশেষ পন্থা কেন অবলম্বন করা হল? প্রকৃতপক্ষে এখানে যারা "সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের" কর্তব্য পালন করে, তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে তার ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে হুশিয়ার করতে হলে তা প্রজ্ঞা সহকারে করতে হবে। একাজে এমন পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই নিজের ভুল উপলব্ধি করতে পারে এবং মৌখিকভাবে হুশিয়ার করার প্রয়োজনই দেখা না দেয়। এর জন্যে এমন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কাজ করা অধিক কার্যকর যাতে কারও মনে কষ্ট না লাগে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ও ফুটে উঠে।

০ হযরত দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা নবুওয়তের সাথে শাসনক্ষমতা এবং নামাযও দান করেছিলেন। সুতরাং আলোচ্য ২৬ নং আয়াতে শাসন কার্যের জন্যে তাঁকে একটি মৌলিক পথ নির্দেশ দান করা হয়েছে। এ নির্দেশ নামায় তিনটি মৌলিক বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

(১) আমি আপনাকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি করেছি, (২) সেমতে আপনার মূল কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়ানুগ ফয়সালা করা, (৩) এ কর্তব্য পালনের জন্যে নফসানী খেয়ালখুশীর অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধি করার অর্থ সূরা বাক্বারায় বর্ণিত হয়েছে। এ থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রের এ মূলনীতি ফুটে উঠে যে, সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্ তাআলারই। পৃথিবীর শাসকবর্গ তারই নির্দেশানুযায়ী চলার জন্য আদিষ্ট। কেউ এর বাইরে যাবে না সুতরাং মুসলমানদের শাসনকর্তা, উপদেষ্টা পরিষদ অথবা আইনসভা ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা অথবা সম্পাদনা করতে পারলেও আইন রচনা করতে পারে না। তারা আল্লাহ্‌র আইনসমূহের উপস্থাপক মাত্র।

ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল কর্তব্য : এখানে একথাও পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী কাজ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যাপারাদি ও কলহ-বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করা।

ইসলাম একটি চিরন্তন ধর্ম : তাই সে শাসনকার্যের জন্যে সেসব প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নির্দিষ্ট করেনি, যেগুলো সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে যায়, বরং সে কতগুলো মৌলিক নির্দেশ দান করেছে, যার আলোকে সর্ব যুগের উপযোগী প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নিজে থেকেই মীমাংসা করা যায়। এ কারণেই এখানে বলে দেয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্রের আসল কাজ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এর প্রশাসনিক বিশ্লেষণ সর্ব যুগের সুধী মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক : সেমতে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে পৃথক থাকবে, না একীভূত থাকবে—এ ব্যাপারে

অপরিবর্তনীয় কোন নির্দিষ্ট বিধান দেয়া হয়নি যা কোন কালেই পরিবর্তিত হতে পারবে না। যদি কোন যুগে শাসকবর্গের বিশ্বস্ততা ও সততায় পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা যায়, তবে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথক সত্তা বিলোপ করা সম্ভব। কোন যুগে শাসকবর্গ এরূপ আস্থাভাজন না হলে বিচার বিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথকও রাখা যায়।

হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ্র মনোনীত পয়গম্বর ছিলেন। তাঁর চেয়ে অধিক বিশ্বস্ততা ও সততার দাবী কে করতে পারত? তাই তাঁকে একই সময়ে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার দায়িত্বও অর্পন করা হয়েছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আমিরুল মু'মেনীন নিজেই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। পরবর্তী ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে এ পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয় এবং আমিরুল মু'মেনীনকে শাসন বিভাগের এবং প্রধান বিচারপতিকে বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করা হয়।

তৃতীয় যে নির্দেশের উপর আলোচ্য আয়াতে সর্বাধিক জোর দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে 'খেয়াল-খুশীর' অনুসরণ করো না এবং হিসাব দিবসের কথা সর্বদা মনে রেখো। যেহেতু এটা সুবিচার প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি, তাই এর উপর সর্বাধিক জোর দেয়া হয়েছে। যে শাসক অথবা বিচারকের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় এবং পরকালের চিন্তা থাকবে, সে-ই সত্যিকার অর্থে ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে। তা না হলে আপনি যত উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আইনই রচনা করুন না কেন, খেয়াল-খুশীর দুরন্তপনা সর্বত্র নতুন ছিদ্রপথ বের করে নেবে। খেয়াল-খুশীর উপস্থিতিতে কোন উৎকৃষ্টতার আইনব্যবস্থাই ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের পরিস্থিতিই এর সাক্ষ্য বহন করে।

দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম দেখার বিষয় চরিত্র ঃ এখান থেকে আরও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে, শাসক, বিচারক অথবা কোন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করার জন্যে সর্বপ্রথম দেখতে হবে, তার মধ্যে খোদাভীতি ও পরকাল চিন্তা আছে কিনা এবং তার চরিত্র ও কর্ম কিরূপ? যদি বোঝা যায়, তার অন্তরে খোদাভীতির পরিবর্তে খেয়াল-খুশীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তবে সে যত উচ্চ ডিগ্রীধারীই হোক না কেন, নিজ বিষয়ে যত বিশেষজ্ঞ ও কর্মঠই হোক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে সে কোন উচ্চপদের যোগ্য নয়।

আয়াতসমূহের সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা ঃ আলোচ্য ২৭-২৯ নং আয়াতসমূহে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, বিশেষতঃ পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)-এর ঘটনাবলীর মাঝখানে খুব সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা সহকারে উল্লেখিত হয়েছে। ইমাম রাযী বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি হঠকারিতাবশতঃ কোন বিষয় বুঝতে না চায়, তবে তার সাথে বিজ্ঞজনোচিত পন্থা এই যে, আলোচ্য বিষয়বস্তু ছেড়ে দিয়ে কোন অসংলগ্ন কথা শুরু করতে হবে। যখন তার চিন্তাধারা প্রথম বিষয় থেকে সরে যাবে, তখন কথা প্রসঙ্গেই তাকে প্রথম বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য করতে হবে। এখানে পরকাল সপ্রমাণ করার জন্যে এ পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঘটনার পূর্বে কাফেরদের হঠকারিতার আলোচনা চলছিল, যা وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ আয়াতে এসে শেষ হয়েছিল। এর সারমর্ম ছিল এই যে, তারা পরকাল অস্বীকার করে এবং পরকালের প্রতি বিদ্রূপ করে। এরই সাথে সাথে পরে বলা হয়েছে যে, اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ (তাদের কথাবার্তায় সবর করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন।) এভাবে একটি নতুন বিষয় শুরু করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু দাউদ (আঃ)-এর ঘটনা একথা বলে শেষ করা হয়েছে যে, হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করবে। এখন আলোচ্য আয়াত থেকে এক অনুভূত পন্থায় পরকাল সপ্রমাণ করা হয়েছে। কারণ, যে সত্তা তার প্রতিনিধিকে পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেয় এবং কুকর্মীদেরকে শাস্তি ও সৎকর্মীদেরকে শান্তি দিতে বলে, সে কি নিজে এই সৃষ্টজগতে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবে না? অবশ্যই সে ভালমন্দ সবাইকে এক লাঠি দিয়ে হাঁকাবার পরিবর্তে পাপাচারীদেরকে শাস্তি দেবে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করবে। এটাই তার প্রজ্ঞার দাবী এবং এটাই জগৎ সৃষ্টির লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে কেয়ামত ও পরকাল অবশ্যম্ভাবী। যারা পরকাল অস্বীকার করে, তারা যেন পরোক্ষভাবে এ দাবীই করে যে, এ জগৎ এমনি উদ্দেশ্যহীন ও অযথা সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে ভালমন্দ সব মানুষ জীবন যাপন করে মরে যাবে এবং এরপর তাদের জিজ্ঞাসাকারী কেউ থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার প্রজ্ঞায় যারা বিশ্বাসী তারা একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ
اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ
لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٩﴾ وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ
نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٣٠﴾ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ
الْجِيَادُ ﴿٣١﴾ فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ حَتّٰى
تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَ
الْاَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ
اَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ
بَعْدِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ
رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَّاٰخَرِيْنَ
مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ
حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٠﴾ وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ
اَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ﴿٤١﴾
اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ
اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٤٣﴾

(২৮) আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফেরদের সমতুল্য করে দেব? না খোদাভীরুদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব। (২৯) এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে। (৩০) আমি দাউদকে সোলায়মান দান করেছি। সে একজন উত্তম বান্দা। সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। (৩১) যখন তার সামনে অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হল, (৩২) তখন সে বলল ঃ আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের স্মরণে বিস্মৃত হয়ে সম্পদের মহব্বতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি—এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। (৩৩) এগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতঃপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল। (৩৪) আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ। অতঃপর সে রুজু হল। (৩৫) সুলায়মান বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। (৩৬) তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে পৌঁছাতে চাইত। (৩৭) আর সকল শয়তানকে তার অধীন করে দিলাম অর্থাৎ, যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী। (৩৮) এবং অন্য আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকত শৃঙ্খলে। (৩৯) এগুলো আমার অনুগ্রহ, অতএব, এগুলো কাউকে দাও অথবা নিজে রেখে দাও—এর কোন হিসেব দিতে হবে না। (৪০) নিশ্চয় তার জন্যে আমার কাছে রয়েছে মর্যাদা ও শুভ পরিণতি। (৪১) স্মরণ করুন, আমার বান্দা আইয়্যুবের কথা, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলল ঃ শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌঁছিয়েছে। (৪২) তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। ঝরণা নির্গত হল গোসল করার জন্যে শীতল ও পান করার জন্যে। (৪৩) আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও অনেক আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশস্বরূপ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ... اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ —(আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করে দেব, না পরহেযগারদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব?) অর্থাৎ, এমন কখনও হতে পারে না। বরং উভয় দলের পরিণতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। এ থেকেই জানা গেল যে, পরকালীন বিধানাবলীর ক্ষেত্রে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হবে। এ পৃথিবীতে হয়তো এমনটি সম্ভবপর যে, কাফেররা মুমিন অপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ সুখ-শান্তিপ্রাপ্ত হবে। এ থেকে একথাও বলা যায় না যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কাফেরের পার্থিব অধিকার মুমিনের সমান হতে পারে না, বরং কাফেরকে মুসলমানের সমান মানবিক অধিকার দেয়া যেতে পারে। সেমতে ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তাদেরকে যাবতীয় মানবিক অধিকার মুসলমানদের সমানই দেয়া হবে।

০ আলোচ্য ৩০-৩৩ নং আয়াতসমূহে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রসিদ্ধ বিবরণের সারমর্ম এই যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) অশ্বরাজি পরিদর্শনে এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়েন যে, নামায পড়ার নিয়মিত সময় আসর অতিবাহিত হয়ে যায়। পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি সমস্ত অশ্ব যবেহ্ করে দেন। কেননা, এগুলোর কারণেই আল্লাহ্‌র স্মরণ বিঘ্নিত হয়েছিল।

এ নামায নফল হলেও কোন আপত্তির কারণ নেই। কেননা, পয়গম্বরগণ এতটুকু ক্ষতিও পূরণ করার চেষ্টা করে থাকেন। পক্ষান্তরে তা ফরয নামায হলে ভুলে যাওয়ার কারণে তা কাযা হতে পারে এতে কোন গোনাহ্ হয় না। কিন্তু সুলায়মান (আঃ) স্বীয় উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এরও প্রতিকার করেছেন।

এ তফসীরটি কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবনে কাসীরের ন্যায় অনুসন্ধানী আলেমও এই তফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আল্লামা সুয়ূতী বর্ণিত রসূলে করীম (সাঃ)-এর এক উক্তি থেকেও এই তফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়।

কিন্তু এতে সন্দেহ হয় যে, অশ্বরাজি আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি পুরস্কার ছিল। নিজের সম্পদকে এভাবে বিনষ্ট করা একজন পয়গম্বরের পক্ষে শোভা পায় না। তফসীরবিদগণ এর জওয়াবে বলেন যে, এ অশ্বরাজি সুলায়মান (আঃ)-এর ব্যক্তিগত মালিকাধীন ছিল। তার শরীয়তে গরু,ছাগল ও উটের ন্যায় অশ্ব কোরবানী করাও বৈধ ছিল। তাই তিনি অশ্বরাজি বিনষ্ট করেননি; বরং আল্লাহ্‌র নামে কোরবানী করেছেন।

কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহের আরও একটি তফসীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তাতে ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সামনে জেহাদের জন্যে তৈরী অশ্বরাজি পরিদর্শনের নিমিত্ত পেশ করা হলে সেগুলো দেখে তিনি খুব আনন্দিত হন। সাথে সাথে তিনি বললেন ঃ এই অশ্বরাজির প্রতি আমার যে মহব্বত ও মনের টান, তা পার্থিব মহব্বতের কারণে নয়; বরং আমার পালনকর্তার স্মরণের কারণেই। কারণ, এগুলো জেহাদের উদ্দেশে তৈরী করা হয়েছে। জেহাদ একটি উচ্চস্তরের এবাদত। ইতিমধ্যে অশ্বরাজির দল তাঁর দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। তিনি আদেশ দিলেন ঃ এগুলোকে আবার আমার সামনে উপস্থিত কর। সেমতে পুনরায় উপস্থিত করা হলে তিনি অশ্বরাজির

গলদেশে ও পায়ে আদর করে হাত বুলালেন।

এই তফসীর অনুযায়ী عَنْ ذِكْرِ رَبِّي বাক্যে عن কারণার্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং تَوَارَتْ এর সর্বনাম দ্বারা অশ্বরাজিই বোঝানো হয়েছে। এখানে مسح এর অর্থ কর্তন করা নয়; বরং আদর করে হাত বুলানো।

প্রাচীন তফসীরবিদগণের মধ্যে হাফেয ইবনে জরীর, তাবারী, ইমাম রাযী প্রমুখ এ তফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই তফসীর অনুযায়ী সম্পদ নষ্ট করার সন্দেহ হয় না।

কোরআন পাকের ভাষ্যদৃষ্টে উভয় তফসীরের অবকাশ আছে। কিন্তু প্রথম তফসীরের পক্ষে একটি হাদীস থাকায় তার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূর্য ফিরিয়ে আনার কাহিনী ঃ কেউ কেউ প্রথম তফসীর অবলম্বন করে আরও বলেছেন যে, আসরের নামায কাযা হয়ে যাওয়ার পর সোলায়মান (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার কাছে অথবা ফেরেশতাগণের কাছে সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার নিবেদন জানান। সেমতে সূর্যকে ফিরিয়ে আনা হলে তিনি নিয়মিত এবাদত পূর্ণ করেন। এরপর পুনরায় সূর্য অস্তমিত হয়। তাদের মতে رُدُّوهَا বাক্যের সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে।

কিন্তু আল্লামা আলুসী প্রমুখ অনুসন্ধানী তফসীরবিদগণ এই কাহিনী খণ্ডন করে বলেছেন ঃ رُدُّوهَا বাক্যের সর্বনাম দ্বারা অশ্বরাজিই বোঝানো হয়েছে— সূর্য নয়। এর কারণ এটা নয় যে, সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা আল্লাহ্ তাআলার নেই; বরং কারণ এই যে, এ কাহিনী কোরআন ও হাদীসের কোন দলীল দ্বারা প্রামাণ্য নয়।—(রূহুল মা'আনী)

আল্লাহ্র স্মরণে শৈথিল্য হলে নিজের উপর শাস্তি নির্ধারণ করা ধর্মীয় মর্যাদাবোধের দাবী ঃ সর্বাবস্থায় এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন সময় আল্লাহ্র স্মরণে শৈথিল্য হয়ে গেলে নিজেকে শাস্তি দেয়ার জন্যে কোন মুবাহ্ (অনুমোদিত) কাজ থেকে বঞ্চিত করে দেয়া জায়েয। সূফী বুযুর্গগণের পরিভাষায় একে 'গায়রত' বলা হয়।—(বয়ানুল -কোরআন)

কোন সৎকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যে নিজের উপর এ ধরনের শাস্তি নির্ধারণ করা আত্মশুদ্ধির একটি ব্যবস্থা। এ ঘটনা থেকে এর বৈধতা বরং পছন্দনীয়তা জানা যায়। হুযুরে আকরাম (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার আবু জুহায়ম (রাঃ) তাঁকে একটি শামী চাদর উপহার দেন। চাদরটি ছিল কারুকার্যখচিত। তিনি চাদর পরিধান করে নামায পড়লেন এবং ফিরে এসে হযরত আয়েশাকে বললেন, চাদরটি আবু জুহায়মের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। কেননা, নামাযে আমার দৃষ্টি এর কারুকার্যের উপর পড়ে গিয়েছিল এবং আমার মনোনিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার উপক্রমহয়েছিল।—(আহকামুল-কোরআন)

এমনিভাবে হযরত আবু তালহা (রাঃ) একবার তাঁর বাগানে নামাযরত অবস্থায় একটি পাখী দেখে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যান। ফলে নামাযের নিবিষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়। পরে তিনি বাগানটি সদকা করে দেন।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই উদ্দেশ্যের জন্যে বৈধ শাস্তি নির্ধারণ করা উচিত। কারণ, অহেতুক কোন সম্পদ বিনষ্ট করা জায়েয নয়। সুতরাং সম্পদ বিনষ্ট হয়, এরূপ কোন কাজ করা বৈধ নয়। সূফীগণের মধ্যে হযরত শিবলী (রহঃ) একবার এ ধরনের শাস্তি হিসেবে তাঁর বস্ত্র জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব শে'রানী (রহঃ)-এর মত অনুসন্ধানী সূফী বুযুর্গগণ তাঁর এই কর্মকে সঠিক বলে আখ্যা দেননি।—(রূহুল মা'আনী)

ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যের কাজকর্ম দেখাশোনা করা শাসনকর্তার উচিত ঃ এ ঘটনা থেকে আরও জানা যায় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অধীনস্থ বিভাগসমূহের কাজকর্ম স্বয়ং দেখাশোনা করা উচিত; কাজকর্ম অধীনস্থদের উপর ছেড়ে নিশ্চিত বসে থাকা উচিত নয়। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আঃ) অধীনস্থদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও স্বয়ং অশ্বরাজি পরিদর্শন করেন। খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কর্ম থেকেও তাই প্রমাণিত আছে।

এক এবাদতের সময় অন্য এবাদতে মশগুল থাকা ভুল ঃ এ ঘটনা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এক এবাদতের নির্দিষ্ট সময় অন্য এবাদতে ব্যয় করা অনুচিত। বলাবাহুল্য, জেহাদের অশ্ব পরিদর্শন করা একটি বৃহত্তম এবাদত, কিন্তু সময়টি ছিল এ এবাদতের পরিবর্তে নামাযের জন্যে নির্দিষ্ট। তাই হযরত সোলায়মান (আঃ) একে ভুল গণ্য করে তার প্রতিকার করেছেন। এ কারণেই আমাদের ফেকাহ্বিদগণ লিখেন ঃ জুমআর আযানের পর যেমন ক্রয়-বিক্রয়ে মশগুল থাকা জায়েয নয়, তেমনি জুমআর নামাযের প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কোন কাজে মশগুল হওয়াও বৈধ নয়, যদিও তা তেলাওয়াতে কোরআন অথবা নফল পড়ার এবাদত হয়।

০ আলোচ্য ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আরও একটি পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, এই পরীক্ষার সময় একটি নিষ্প্রাণ দেহ সোলায়মান (আঃ) – এর সিংহাসনে রেখে দেয়া হয়েছিল। এখন সে নিষ্প্রাণ দেহটি কি ছিল, একে সিংহাসনে রাখার অর্থ কি এবং এর মাধ্যমে পরীক্ষা কিভাবে হল, এসব বিবরণ কোরআন পাকে বিদ্যমান নেই এবং কোন সহীহ্ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নেই। তাই হাফেয ইবনে কাসীরের সে মনোভাব এখানেও তাই দেখা যায় যে, কোরআন পাক যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে। তার বিশদ বিবরণ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেবল এ বিষয়ের উপর ঈমান রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তাআলা সোলায়মান (আঃ)-কে কোনভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহ্র দিকে আরও বেশী রুজু হয়েছিলেন। এতেই কোরআন পাকের আসল লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়।

তবে কোন কোন তফসীরবিদ এ পরীক্ষার বিবরণ খোঁজ করারও প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা এ ক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কোন কোনটি নির্ভেজাল ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত। উদাহরণতঃ হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর রাজত্বের রহস্য তাঁর আংটির মধ্যে নিহিত ছিল। একদিন এক শয়তান এই আংটি করায়ত্ত করে নেয় এবং এর কারণে সে সোলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনে তাঁরই আকৃতি ধারণ করে বাদশাহ্রূপে জেঁকে বসে। চল্লিশ দিন পর সোলায়মান (আঃ) সে আংটি একটি মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেন এবং পুনরায় সিংহাসন লাভ করতে সমর্থ হন। এই রেওয়ায়েতটি আরও কতিপয় কাহিনীসহ কয়েকটি তফসীরগ্রন্থেও উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু হাফেজ ইবনে কাসীর এ ধরনের সমস্ত রেওয়ায়েতই ইসরাঈলী গণ্য করার পর লিখেন ঃ

"আহলে-কিতাবের একটি দল হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে পয়গম্বর বলেই মানে না। বাহ্যতঃ এসব মিথ্যা কাহিনী তাদেরই অপকীর্তি।" সুতরাং এ ধরনের রেওয়ায়েতকে আলোচ্য আয়াতের তফসীর বলা কিছুতেই জায়েয নয়।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আরও একটি ঘটনা সহীহ্ বুখারী ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত আছে। আলোচ্য আয়াতের সাথে এ ঘটনার কিছু সাদৃশ্য দেখে কেউ কেউ একে আলোচ্য আয়াতের তফসীর বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনার সারমর্ম এই ঃ একবার হযরত সোলায়মান (আঃ) স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, এ রাত্রিতে আমি সকল বিবির সঙ্গে সহবাস করব এবং তাদের প্রত্যেকের গর্ভ থেকে এক একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তারা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করবে। কিন্তু এ মনোভাব ব্যক্ত করার সময় তিনি ''ইনশাল্লাহ্'' বলতে ভুলে গেলেন। একজন মহামান্য পয়গম্বরের এ ত্রুটি আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করলেন না এবং আল্লাহ্ পাক তাঁর এ প্রয়াস নিষ্ফল করে দিলেন। ফলে বিবিগণের মধ্যে মাত্র একজনের গর্ভ থেকে একটি মৃত ও পার্শ্ববিহীন সন্তান ভূমিষ্ঠ হল।

কোন কোন তফসীরবিদ এ ঘটনার ভিত্তিতে বলেন ঃ সিংহাসনে নিষ্প্রাণ দেহ রাখার অর্থ এই যে, সুলায়মান (আঃ)-এর জনৈক চাকর এ মৃত সন্তানকে এনে তাঁর সিংহাসনে রেখে দেয়। এতে সুলায়মান (আঃ) বুঝে নেন যে, এটা তাঁর ইনশাআল্লাহ্ না বলার ফল। সেমতে তিনি আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

কাযী আবুস সউদ, আল্লামা আলুসী প্রমুখের মত কতিপয় বিজ্ঞ তফসীরবিদও এ তফসীর অবলম্বন করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) বয়ানুল-কোরআনের তদনুরূপ তফসীর করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাকেও আয়াতের অকাট্য তফসীর বলা যায় না। কারণ, এ ঘটনার সবগুলো রেওয়ায়েতের মধ্যে কোথাও এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঘটনাটি আলোচ্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারীর হাদীসটি কিতাবুল জেহাদ, কিতাবুল-আম্বিয়া, কিতাবুল-আইমান প্রভৃতি অধ্যায়ের একাধিক তরিকায় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কিতাবুত্-তফসীরে সূরা ছোয়াদের তফসীর প্রসঙ্গে কোথাও এর উল্লেখ নেই। বরং وَهَبْ لِي مُلْكًا আয়াতের অধীনে অন্য একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। অথচ এই হাদীসের কোন বরাত পর্যন্ত দেননি। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম বুখারীর মতেও হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তফসীর নয়। বরং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অন্যান্য পয়গম্বরের যেমন অন্যান্য আরও অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে এটাও একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এটা কোন আয়াতের তফসীর হওয়া জরুরী নয়।

তৃতীয় এক তফসীর ইমাম রাযী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সোলায়মান (আঃ) একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে এত দুর্বল হয়ে পড়েন যে, যখন তাঁকে সিংহাসনে বসানো হত, তখন মনে হত যেন একটি নিষ্প্রাণ দেহ সিংহাসনে রেখে দেয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন। তখন তিনি আল্লাহ্ তাআলার দিকে রুজু হয়ে শুকরিয়া আদায় করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এছাড়া তিনি ভবিষ্যতের জন্যে নজিরবিহীন রাজত্বের জন্যও দোয়া করেন।

কিন্তু এ তফসীরও অনুমানভিত্তিক। কোরআন পাকের ভাষ্যের সাথে এর তেমন মিল নেই এবং কোন রেওয়ায়েতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাস্তব সত্য এই যে, আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার নিশ্চিত বিবরণ জানার কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। আমরা এ জন্যে আদিষ্টও নই। সুতরাং এতটুকু ঈমান রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ তাআলা সোলায়মান (আঃ)-কে কোন পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহ্ তাআলার দিকে অধিকতর রুজু হয়েছেন।

কোরআন পাকে এই ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে দাওয়াত দেয়া যে, তারা কোন বিপদাপদ অথবা পরীক্ষায় পতিত হলে তাদের পক্ষেও সোলায়মান (আঃ)-এর মত আল্লাহ্ তাআলার দিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক রুজু হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সোলায়মান (আঃ)-এর পরীক্ষার বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ্ তাআলার উপর সমর্পণ করাই বাঞ্ছনীয়।

وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِي — (আমাকে এমন সাম্রাজ্য দিন যা আমার পরে কেউ পেতে পারবে না)। কেউ কেউ এ দোয়ার অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আমার আমলে আমার মত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী অন্য কেউ যেন না হয়। তাঁদের মতে 'আমার পরে' শব্দটির অর্থ 'আমাকে ছাড়া'। হযরত থানভীও এরূপ অনুবাদই করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ দোয়ার অর্থ এই যে, আমার পরেও কেউ যেন এরূপ সাম্রাজ্যের অধিকারী না হয়। সুতরাং বাস্তবেও তাই দেখা যায়। হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে যেরূপ সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল, তেমন রাজত্বের অধিকারী পরবর্তী কালে কেউ হতে পারেনি। কেননা, বাতাস অধিনস্ত হওয়া, জিন জাতির বশীভূত হওয়া এগুলো পরবর্তীকালে কেউ লাভ করতে পরেনি। কেউ কেউ বিভিন্ন আমল ও সাধনার মাধ্যমে কোন কোন জিনকে বশীভূত করে নেয়। এটা তার পরিপন্থী নয়। কেননা, হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর জিন বশীভূত করণের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না। আমল বিশেষজ্ঞরা দু'একজন অথবা কয়েকজন জিনকে বশীভূত করে নেয়া ; কিন্তু সুলায়মান (আঃ) জিনদের উপর যেরূপ সর্বব্যাপী রাজত্ব কায়েম করেছিলেন, তদ্রূপ কেউ কায়েম করতে পারেনি।

রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভের দোয়া ঃ এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, পয়গম্বরগণের কোন দোয়া আল্লাহ্ তাআলার অনুমতি ব্যতিরেকে হয় না। হযরত সুলায়মান (আঃ) এ দোয়াটিও আল্লাহ্ তাআলার অনুমতিক্রমেই করেছিলেন। ক্ষমতালাভই এর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং এর পেছনে আল্লাহ্ তাআলার বিধানাবলী প্রয়োগ করা ও সত্যকে সমুন্নত করার অনুপ্রেরণাই কার্যকর ছিল। আল্লাহ্ তাআলা জানতেন যে, রাজত্ব লাভের পর সুলায়মান (আঃ) এসব মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যেই কাজ করবেন এবং প্রতিপত্তি লাভের বাসনা তার অন্তরে স্থান পাবে না। তাই তাকে এরূপ দোয়ার অনুমতি দেয়া হয় এবং তা কবুলও করা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্যে নিজের পক্ষ থেকে শাসনক্ষমতা প্রার্থনা করা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এতে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ লাভের কামনা-বাসনা শামিল হয়ে যায়। সেমতে কেউ যদি এরূপ বাসনা থেকে মুক্ত থাকবে বলে দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং সত্যকে সমুন্নত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ক্ষমতা লাভ করার প্রত্যাশী না হয়, তবে তার জন্যে রাজত্ব লাভের দোয়া করা বৈধ।—(রূহুল মা'আনী)।

مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ — (শৃঙ্খলিত অবস্থায়—) জিন জাতিকে বশীকরণ এবং তারা যে যে কাজ করত, তার বিবরণ সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, অবাধ্য জিনদেরকে সুলায়মান (আঃ) শেকলে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এখন এটা জরুরী নয় যে, এগুলো দৃষ্টিগ্রাহ্য লোহার শেকলই হবে। বরং জিনদেরকে আবদ্ধ করার জন্যে অন্য কোন পন্থাও অবলম্বন করা সম্ভব, যা সহজে বোঝাবার জন্যে এখানে শেকল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

রসূলে করীম (সাঃ)-কে সবর শিক্ষাদানের উদ্দেশে এখানে আইয়্যুব (আঃ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ সূরা

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۗ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿٤٤﴾ وَاذْكُرْ عِبٰدَنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ اِنَّاۤ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۗ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٨﴾ هٰذَا ذِكْرٌ ۗ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٩﴾ جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿٥٠﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾ هٰذَا ۗ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾ هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۗ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۗ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۗ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى النَّارِ ﴿٦١﴾ وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٦٢﴾

(৪৪) তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও, তদ্দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না। আমি তাকে পেলাম সবরকারী। চমৎকার বান্দা সে। নিশ্চয় সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। (৪৫) স্মরণ করুন, হাত ও চোখের অধিকারী আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা। (৪৬) আমি তাদের এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলাম। (৪৭) আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত। (৪৮) স্মরণ করুন, ইসমাঈল, আল ইয়াসা' ও যুলকিফ্লের কথা। তারা প্রত্যেকেই গুণীজন। (৪৯) এ এক মহৎ আলোচনা। খোদাভীরুদের জন্যে রয়েছে উত্তম ঠিকানা—(৫০) তথা স্থায়ী বসবাসের জান্নাত ; তাদের জন্যে তার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। (৫১) সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে চাইবে অনেক ফল-মূল ও পানীয়। (৫২) তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কা রমণীগণ। (৫৩) তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে বিচারদিবসের জন্যে। (৫৪) এটা আমার দেয়া রিযিক যা শেষ হবে না। (৫৫) এটা তো শুনলে, এখন দুষ্টদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট ঠিকানা (৫৬) তথা জাহান্নাম। তারা সেখানে প্রবেশ করবে। অতএব, কত নিকৃষ্ট সেই আবাসস্থল। (৫৭) এটা উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ ; অতএব তারা একে আস্বাদন করুক। (৫৮) এ ধরনের আরও কিছু শাস্তি আছে। (৫৯) এই তো একদল তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে। তাদের জন্যে অভিনন্দন নেই। তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৬০) তারা বলবে, তোমাদের জন্যেও তো অভিনন্দন নেই। তোমরাই আমাদেরকে এ বিপদের সম্মুখীন করেছ। অতএব, এটি কতই না ঘৃণ্য আবাসস্থল। (৬১) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, যে আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে, আপনি জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। (৬২) তারা আরও বলবে, আমাদের কি হল যে, আমরা যাদেরকে মন্দ লোক বলে গণ্য করতাম, তাদেরকে এখানে দেখছি না।

আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বর্ণিত হচ্ছে—

مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ —(শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট দিয়েছে। এ যন্ত্রণা ও কষ্টের বিবরণ দিতে গিয়ে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, হযরত আইয়্যুব (আঃ) যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তা শয়তানের প্রবলতার কারণে দেখা দিয়েছিল। ঘটনা এই যে, একবার ফেরেশতাগণ আইয়্যুব (আঃ)-এর খুব প্রশংসা করলে শয়তান প্রতিহিংসায় অস্থির হয়ে গেল। সে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করল ঃ আমাকে তার দেহ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর এমন প্রবলতা দেয়া হোক, যদ্দ্বারা আমি তার সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আল্লাহ্ তাআলারও উদ্দেশ্য ছিল আইয়্যুব (আঃ)-কে পরীক্ষা করা। তাই শয়তানকে তার প্রার্থিত অধিকার দেয়া হল। অতঃপর সে তাঁকে রোগাক্রান্ত করে দিল।

কিন্তু বিজ্ঞ তফসীরবিদগণ এ কাহিনী খণ্ডন করে বলেন ঃ কোরআন পাকের বর্ণনা অনুযায়ী শয়তান পয়গম্বরগণের উপর প্রবলতা অর্জন করতে পারে না। তাই এটা সম্ভব নয় যে, শয়তান আইয়্যুব (আঃ)-কে রোগাক্রান্ত করে দেবে।

কেউ কেউ বলেন, রুগ্নাবস্থায় শয়তান আইয়্যুব (আঃ)-এর অন্তরে কুমন্ত্রণা জাগ্রত করত। এতে তিনি আরও অধিক কষ্ট অনুভব করতেন। আলোচ্য আয়াতে তাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা তাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আইয়্যুব (আঃ)-এর রোগ কি ছিল ? কোরআন পাকে কেবল বলা হয়েছে যে, আইয়্যুব (আঃ) কোন গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রোগটি কি ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। হাদীসেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে এর কোন বিবরণ বর্ণিত নেই। তবে কোন কোন সাহাবীর উক্তি থেকে জানা যায় যে, তাঁর সর্বাঙ্গে ফোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। ফলে ঘৃণাভরে লোকেরা তাঁকে একটি আবর্জনার স্তূপে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু গবেষক তফসীরবিদগণ এ রেওয়ায়েতের সত্যতা স্বীকার করেননি। তাঁরা বলেন, মানুষের ঘৃণা উদ্রেক করার মত কোন রোগে পয়গম্বরগণকে আক্রান্ত করা হয় না। সুতরাং হযরত আইয়্যুব (আঃ)-এর রোগও এমন হতে পারে না। বরং এটা কোন সাধারণ রোগই ছিল। কাজেই উপরোক্ত রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য নয়।—(রূহুল-মা'আনী, আহ্কামুল কোরআন থেকে সংক্ষেপিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا -(তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা লও।) আইয়্যুব-পত্নীর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার এই বিশেষ অনুগ্রহের দ্বারা কয়েকটি মাস্আলা জানা যায়।

ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আইয়্যুবের (আঃ) অসুস্থতার সময় একদা শয়তান চিকিৎসকের বেশে আইয়্যুবের (আঃ) পত্নীর সাথে সাক্ষাত করেছিল। তিনি ওকে চিকিৎসক মনে করে স্বামীর চিকিৎসা করতে অনুরোধ করেন। শয়তান বলল, এই শর্তে চিকিৎসা করতে পারি যে, আরোগ্য লাভ করলে একথার স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আমিই তাঁকে আরোগ্য দান করেছি। এ স্বীকৃতিটুকু

ছাড়া আমি আর কোন পারিশ্রমিক চাই না।

স্ত্রী হযরত আইয়্যুবকে একথা বললে, তিনি বললেন,—তোমার সরলতা দেখে সত্যই দুঃখ হয়। ওতো শয়তান ছিল।

এ ঘটনার বিশেষতঃ তাঁর স্ত্রীর মুখ দিয়ে শয়তান কর্তৃক এমন একটা প্রস্তাব তাঁর সামনে উচ্চারিত করানোর বিষয়টা তিনি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি খুব দুঃখ পেলেন। কারণ, প্রস্তাবটা ছিল শেরেকীতে লিপ্ত করার একটা সূক্ষ্ম অপপ্রয়াস। তাই তিনি শপথ করে বসলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে সুস্থ করে তুললে স্ত্রীর এ অপরাধের জন্য তাঁকে একশত বেত্রাঘাত করব।

সে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন, কছম ভঙ্গ করো না, বরং হাতে এক মুঠো তৃণশলাকা নিয়ে তদ্দ্বারা স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করে কছম পূর্ণ কর।

এ ঘটনা থেকে জানা গেল, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে একশ' বেত্রাঘাত করার প্রতিজ্ঞা করে এবং পরে পৃথক পৃথক একশ' বেত্রাঘাত করার পরিবর্তে সবগুলো বেতের একটি আঁটি তৈরী করে নিয়ে তদ্দ্বারা একবার আঘাত করে, তবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়। তাই হযরত আইয়্যুব (আঃ)-কে এরূপ করার হুকুম করা হয়েছিল। ইমাম আবু হানীফার মাযহাব তাই। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম লিখেছেন যে, এর জন্যে দু'টি শর্ত রয়েছে—(১) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গায়ে প্রত্যেকটি বেত দৈর্ঘ্য-প্রস্থে লাগতে হবে এবং (২) এর কারণে কিছু না কিছু কষ্ট অবশ্যই পেতে হবে। যদি মোটেই কষ্ট না পায়, তবে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে না। হযরত থানভী বয়ানুল-কোরআনে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার যে উক্তি করেছেন, তার অর্থও সম্ভবতঃ তাই। নতুবা হানাফী ফকীহ্‌গণ পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে, উপরোক্ত শর্তদ্বয়সহ আঘাত করা হলে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়।—(ফতহুল কাদীর)

শরীয়তের দৃষ্টিতে কৌশল ঃ দ্বিতীয় মাসআলা এই যে, কোন অসমীচীন অথবা মাকরূহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শরীয়তসম্মত কোন কৌশল অবলম্বন করা জায়েয। বলাবাহুল্য, হযরত আইয়্যুব (আঃ)-এর প্রতিজ্ঞার আসল দাবী এই যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে পূর্ণ একশ' বেত্রাঘাত করবেন। কিন্তু তাঁর পত্নী যেহেতু নিরপরাধ ছিলেন এবং স্বামীর নজিরবিহীন সেবাশুশ্রূষা করেছিলেন, তাই আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং আইয়্যুব (আঃ)-কে একটি কৌশল শিক্ষা দিলেন এবং বলে দিলেন যে, এভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। তাই ঘটনাটি কৌশলের বৈধতা জ্ঞাপন করে।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করা তখনই জায়েয যখন একে শরীয়তসম্মত উদ্দেশ্য বানচাল করার উপায় না করা হয়। পক্ষান্তরে যদি কৌশলের উদ্দেশ্য কোন হকদারের হক বাতিল করা হয় অথবা প্রকাশ্য হারাম কাজকে তার মূলপ্রাণ বজায় রেখে নিজের জন্যে হালাল করা হয়, তবে এরূপ কৌশল সম্পূর্ণ না-জায়েয। উদাহরণতঃ যাকাত থেকে গা বাঁচানোর জন্যে কেউ কেউ বছর পূর্ণ হওয়ার সামান্য আগেই নিজের ধন-সম্পদ স্ত্রীর মালিকানায় সমর্পণ করে কিছুদিন পর স্ত্রী স্বামীর মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়। যখন পরবর্তী বছর কাছাকাছি হয়, তখন স্বামী আবার স্ত্রীকে দান করে দেয়। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কারও উপর যাকাত ওয়াজেব হয় না। এরূপ কৌশল শরীয়তের উদ্দেশ্যকে বানচাল করারই অপচেষ্টা। তাই হারাম। এর শাস্তি হয় তো যাকাত আদায় না করার শাস্তির চেয়েও গুরুতর হবে।—(রূহুল-মা'আনী)।

অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা ঃ তৃতীয় মাসআলা এই যে, কোন ব্যক্তি কোন অসমীচীন, ভ্রান্ত অথবা অবৈধ কাজের প্রতিজ্ঞা করলে প্রতিজ্ঞা হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হবে। যদি কাফফারা ওয়াজেব না হত, তবে আইয়্যুব (আঃ)-কে কৌশল শিখানো হত না। এতদসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা করলে তা ভেঙ্গে কাফফারা আদায় করাই শরীয়তের বিধান। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন প্রতিজ্ঞা করে, অতঃপর দেখে যে, এ প্রতিজ্ঞার বিপরীত কাজ করাই উত্তম, তবে তার উচিত উত্তম কাজটি করা এবং প্রতিজ্ঞার কাফফারা আদায় করা।

أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ —এর শাব্দিক অর্থ তাঁরা হস্ত ও দৃষ্টিবিশিষ্ট ছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা তাঁদের জ্ঞানগত ও কর্মগত শক্তি আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যে নিয়োজিত করতেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যেই ব্যয়িত হওয়া উচিত। যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এতে ব্যয়িত হয় না, সেগুলোর থাকা না থাকা উভয়ই সমান।

পরকালচিন্তা পয়গম্বরগণের স্বাতন্ত্র্যমূলক গুণ ঃ ذِكْرَى الدَّارِ —শাব্দিক অর্থ গৃহের স্মরণ। গৃহ বলে এখানে পরকাল বোঝানো হয়েছে। পরকালের পরিবর্তে গৃহ বলে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, পরকালই মানুষের আসল গৃহ। অতএব, পরকাল চিন্তাকেই তাদের যাবতীয় চিন্তা ও কর্মের ভিত্তি করা উচতি। এ থেকে জানা গেল যে, পরকাল চিন্তা মানুষের চিন্তাগত ও কর্মগত শক্তিকে অধিকতর ঔজ্জ্বল্য দান করে। কোন কোন খোদাদ্রোহীর এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, পরকাল চিন্তা মানুষের শক্তিসমূহকে ভোঁতা করে দেয়।

হযরত আল ইয়াসা (আঃ) ঃ وَالْيَسَعَ (আল ইয়াসা [আঃ]-কে স্মরণ করুন।) হযরত আল ইয়াসা' (আঃ) বনী ইসরাঈলের অন্যতম পয়গম্বর। কোরআন পাকে মাত্র দু'জায়গায় তাঁর উল্লেখ দেখা যায় এখানে ও সূরা আনআমে। কিন্তু কোথাও তাঁর বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করা হয়নি বরং পয়গম্বরগণের তালিকায় তাঁর নাম গণনা করা হয়েছে মাত্র।

ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর চাচাত ভাই এবং তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। ইলিয়াস (আঃ)-এর পর তাঁকেই নবুওয়ত দান করা হয়। বাইবেলে তাঁর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাতে তাঁর নাম 'ইলিশা' ইবনে সাকেত' উল্লেখিত হয়েছে।

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ —(তাদের কাছে আনতনয়না সম বয়স্কা রমণীগণ থাকবে।) অর্থাৎ, জান্নাতের হুরগণ থাকবে। ''সমবয়স্কা''-এর এক অর্থ তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে এবং অপর অর্থ স্বামীদের সমবয়স্কা হবে। প্রথম অর্থে সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, তাদের পরস্পর ভালবাসা, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক হবে—সপত্নীসুলভ হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা থাকবে না। বলাবাহুল্য, এটা স্বামীদের জন্যে পরম সুখের ব্যাপার।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের মিল থাকা উত্তম ঃ দ্বিতীয় অর্থে স্বামীদের সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, এর কারণে মনের ও মতের মিল অধিক হবে। ফলে একে অপরের সুখ ও কৌতূহলের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর বয়সের তারতম্যের দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ, এ থেকেই পারস্পরিক ভালাবাসা জন্মায় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক মধুময় ও স্থায়ী হয়।

أَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ
تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَّمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ
الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا
كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلٰى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِنْ يُّوحٰى
إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي
خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي
فَقَعُوا لَهُ سٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا
إِبْلِيسَ ۖ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يٰإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ
أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ
الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ
مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَّإِنَّ عَلَيْكَ
لَعْنَتِي إِلٰى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلٰى يَوْمِ
يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلٰى يَوْمِ
الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾

(৬৩) আমরা কি অহেতুক তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র করে নিয়েছিলাম, না আমাদের দৃষ্টি ভুল করছে? (৬৪) এটা অর্থাৎ, জাহান্নামীদের পারস্পরিক বাক-বিতণ্ডা অবশ্যম্ভাবী। (৬৫) বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। (৬৬) তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর পালনকর্তা, পরাক্রমশালী, মার্জনাকারী। (৬৭) বলুন, এটি এক মহাসংবাদ, (৬৮) যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। (৬৯) উর্ধ্ব জগৎ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না যখন ফেরেশতারা কথাবার্তা বলছিল। (৭০) আমার কাছে এ ওহীই আসে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (৭১) যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। (৭২) যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সেজদায় নত হয়ে যেয়ো। (৭৩) অতঃপর সমস্ত ফেরেশতাই একযোগে সেজদায় নত হল, (৭৪) কিন্তু ইবলীস; সে অহংকার করল এবং অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (৭৫) আল্লাহ্ বললেন, হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? (৭৬) সে বলল ঃ আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। (৭৭) আল্লাহ্ বললেন ঃ বের হয়ে যা, এখান থেকে। কারণ, তুই অভিশপ্ত। (৭৮) তোর প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে। (৭৯) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (৮০) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোকে অবকাশ দেয়া হল (৮১) সে সময়ের দিন পর্যন্ত যা জানা। (৮২) সে বলল, আপনার ইয্যতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার সার-সংক্ষেপ ঃ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ এ সূরার আসল লক্ষ্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেসালত প্রমাণ এবং কাফেরদের দাবী খণ্ডন করা। সূরার শুরুতেই এটা স্পষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী দ্বিবিধ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে—(এক) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়া যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের মত আপনিও কাফেরদের অহেতুক কার্যকলাপে সবর করুন। (দুই) এসব ঘটনা থেকে তারাও শিক্ষালাভ করুক, যারা একজন সত্য পয়গম্বরের রেসালত অস্বীকার করে যাচ্ছে। এর পর মুমিনদের শুভ পরিণতি ও কাফেরদের তীব্র শাস্তির চিত্র অংকন করে কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং হুশিয়ার করা হয়েছে যে, যাদের অনুকরণ করে আজ তোমরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করছ, কেয়ামতের দিন তারাই তোমাদের সাহায্য সহায়তা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। তারা তোমাদেরকে গালমন্দ করবে এবং তোমরা তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করবে।

এসব বিষয়বস্তুর পর উপসংহারে আবার আসল দাবী অর্থাৎ, রেসালতের প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। প্রমাণাদি পেশ করার সাথে সাথে উপদেশ প্রসঙ্গে দাওয়াতও দেয়া হয়েছে।

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلٰى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (উর্ধ্ব জগতের কোন জ্ঞানই আমার ছিল না যখন তারা কথাবার্তা বলছিল।) অর্থাৎ, আমার রেসালতের উজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, আমি তোমাদেরকে উর্ধ্ব জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করে থাকি যা ওহী ছাড়া অন্য কোন উপায়েই আমার জানার কথা নয়। এসব বিষয়াদির এক অর্থ সেসব আলোচনা, যা আদম সৃষ্টির সময় আল্লাহ্ তাআলা ও ফেরেশতাগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সূরা বাক্বারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ফেরেশতাগণ বলেছিল, أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ — আপনি কি পৃথিবীতে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং রক্তগঙ্গা বহাবে? এসব কথাবার্তাকে এখানে اختصام বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ "ঝগড়া করা" অথবা "বাকবিতণ্ডা করা।" অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, ফেরেশতাগণের এই প্রশ্ন কোন আপত্তি অথবা বাকবিতণ্ডার উদ্দেশে ছিল না, বরং তারা কেবল আদম সৃষ্টির রহস্য জানতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তরের বাহ্যিক আকার বাকবিতণ্ডার অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল বিধায় একে اختصام শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। মাঝে মাঝে কোন ছোট বড়কে কোন প্রশ্ন করলে বড় তার আলোচনা প্রসঙ্গে কৌতুকবশতঃ এ প্রশ্নোত্তরকে ঝগড়া বলে ব্যক্ত করে দেয়।

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ —(যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন) এখানে আল্লাহ্ তাআলা ও ফেরেশতাগণের উপরোক্ত কথাবার্তার প্রতি ইঙ্গিত করার সাথে সাথে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, ইবলীস নিছক প্রতিহিংসা ও অহংকারবশতঃ আদম (আঃ)-কে সেজদা করতে অস্বীকার করেছিল। তেমনিভাবে আরবের মুশরিকরাও প্রতিহিংসা ও অহংকারের কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত অস্বীকার করে যাচ্ছে। ফলে ইবলীসের যে পরিণতি হয়েছে, তাদেরও তাই হবে।—(তফসীরে-কবীর)

لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ - এখানে আদম (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

سورة الزمر مكية وهي خمس وسبعون آية وثمان ركوعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٥﴾

(৮৩) তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া। (৮৪) আল্লাহ্ বললেন ঃ তাই ঠিক, আর আমি সত্য বলছি – (৮৫) তোর দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব। (৮৬) বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না আর আমি লৌকিকতাকারীও নই। (৮৭) এটা তো বিশ্ববাসীর জন্যে এক উপদেশ মাত্র। (৮৮) তোমরা কিছুকাল পরে এর সংবাদ অবশ্যই জানতে পারবে।

সূরা আল-যুমার

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৭৫ ।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। (২) আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব, আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র এবাদত করুন। (৩) জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ এবাদত আল্লাহ্‌রই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের এবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৪) আল্লাহ্ যদি সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন, তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যা কিছু ইচ্ছা মনোনীত করতেন, তিনি পবিত্র। তিনি আল্লাহ্, এক, পরাক্রমশালী। (৫) তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

যে, আমি নিজ হাতে তাঁকে সৃষ্টি করেছি। সকল তফসীরবিদই এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষের ন্যায় আল্লাহ্ তাআলারও হাত আছে, এখানে তা বোঝানো হয়নি। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কাজেই এর অর্থ হল আল্লাহ্‌র কুদরত। আরবী ভাষায় يد শব্দটি কুদরত অর্থে বহুল ব্যবহৃত। উদাহরণতঃ এক আয়াতে আছে بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি আদমকে নিজ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এমনিতে সৃষ্ট জগতের সব কিছুই আল্লাহ্‌র কুদরত দ্বারা সৃজিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন বস্তুর বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করতে চান, তখন তাকে বিশেষভাবে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেন। যেমন কা'বাকে বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র ঘর) সালেহ্ (আঃ)-এর উষ্ট্রীকে ''নাকাতুল্লাহ্'' (আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী), ঈসা (আঃ)-কে কলেমাতুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র বাক্য) অথবা 'রুহুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র রূহ) বলা হয়েছে। এখানেও হযরত আদম (আঃ)-এর সম্মান প্রকাশ করার উদ্দেশে এই সম্বন্ধ করা হয়েছে।— (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার নিন্দা ঃ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (আমি কৃত্রিমতাশ্রয়ী নই।) উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার আশ্রয়ে নবুওয়ত, রেসালত ও জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করছি না, বরং আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানই যথাযথভাবে প্রচার করছি। এ থেকে জানা গেল যে, লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। সেমতে এর নিন্দায় বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর একটি উক্তিও বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

''লোকসকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে জানে, সে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করুক, কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তার ক্ষেত্রে الله اعلم (আল্লাহ্ ভাল জানেন) বলে ক্ষান্ত থাকুক। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূল সম্পর্কে বলেছেন ঃ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ —(রূহুল- মা'আনী)

সূরা আল-যুমার

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ - دين শব্দের অর্থ এখানে এবাদত অথবা আনুগত্য। অর্থাৎ, ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলা। এর পূর্ববর্তী বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র এবাদত ও আনুগত্যকে তাঁরই জন্যে খাঁটি করুন, যাতে শিরক, রিয়া ও নাম-যশের নাম-গন্ধও না থাকে। এরই তাকীদার্থে দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, খাঁটি এবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই শোভনীয়। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর যোগ্য নয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমি মাঝে মাঝে দান-খয়রাত করি অথবা কারও প্রতি অনুগ্রহ করি। এতে আমার নিয়ত আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিও থাকে এবং এটাও থাকে যে, মানুষ আমার প্রশংসা করবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ সে সত্তার কসম, যাঁর

হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহ্ তাআলা এমন কোন বস্তু কবুল করেন না, যাতে অন্যকে শরীক করা হয়। অতঃপর তিনি প্রমাণ স্বরূপ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন।—(কুরতুবী)

নিষ্ঠা অনুপাতে আল্লাহ্‌র নিকট আমল গৃহীত হয় ঃ কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌র কাছে আমলের হিসাব গণনা দ্বারা নয়—ওজন দ্বারা হয়ে থাকে وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ এবং উল্লেখিত আয়াতসমূহের বক্তব্য এই যে, আল্লাহ্‌র কাছে আমলের মূল্যায়ন ও ওজন নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়তের অনুপাতে হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, পূর্ণ ঈমান ব্যতিরেকে নিয়ত পূর্ণরূপে খাঁটি হতে পারে না। কেননা, পূর্ণ খাঁটি নিয়ত এই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে লাভ-লোকসানের মালিক গণ্য করা যাবে না। নিজের কাজকর্মে কাউকে ক্ষমতাশালী মনে করা যাবে না এবং কোন এবাদত ও আনুগত্যে অপরের কল্পনা ও ধ্যান করা যাবে না। অনিচ্ছাধীন জল্পনা-কল্পনা আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করে দেন।

যে সাহাবায়ে কেরাম মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রথম সারিতে অবস্থিত, তাঁদের আমল ও সাধনার পরিমাণ তেমন একটা বেশী দেখা যাবে না কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদের সামান্য আমল ও সাধনা অবশিষ্ট উম্মতের বড় বড় আমল ও সাধনার চেয়ে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ তো তাঁদের পূর্ণ ঈমান ও পূর্ণ নিষ্ঠার কারণেই ছিল।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

এ হল আরবের মুশরেকদের অবস্থা। তখনকার দিনে সাধারণ মুশরেকরাও প্রায় এ বিশ্বাসই রাখত যে, আল্লাহ্ তাআলাই সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং সব কিছুতে ক্ষমতাশালী। শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করলে তারা নিজেদের কল্পনা অনুযায়ী ফেরেশতাগণের আকার-আকৃতিতে মূর্তি-বিগ্রহ তৈরী করল। অতঃপর এই বিশ্বাস পোষণ করে নিল যে, এসব মূর্তি-বিগ্রহের প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করলে সে ফেরেশতাগণ সন্তুষ্ট হবে, যাদের আকৃতিতে মূর্তি -বিগ্রহ নির্মিত হয়েছে। ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীল। অথচ তারা জানত যে, এসব মূর্তি তাদেরই হাতের তৈরী। এদের কোন বুদ্ধি-জ্ঞান, চেতনা-চৈতন্য, ও শক্তি-বল কিছুই নেই। তারা আল্লাহ্ তাআলার দরবারকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের দরবারের মতই ধারণা করে নিয়েছিল। রাজ দরবারের নৈকট্যশীল ব্যক্তি কারও প্রতি প্রসন্ন হলে রাজার কাছে সুপারিশ করে তাকেও রাজার নৈকট্যশীল করে দিতে পারে। তারা মনে করত, ফেরেশতাগণও রাজকীয় সভাসদবর্গের ন্যায় যে কারও জন্যে সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু তাদের এসব ধারণা শয়তানী, বিভ্রান্তি ও ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমতঃ এসব মূর্তি-বিগ্রহ ফেরেশতাগণের আকৃতির অনুরূপ নয়। হলেও আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ নিজেদের পূজা-অর্চনায় কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় এমন যে কোন বিষয়কে তারা স্বভাবগতভাবে ঘৃণা করে। এতদ্ব্যতীত তারা আল্লাহ্‌র দরবারে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন সুপারিশ করতে পারে না, যে পর্যন্ত না তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা কোন বিশেষ ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেন।

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا –যারা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র সন্তান বলে আখ্যা দিত, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ্ তাআলার কোন সন্তান হত, তবে তা তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত হওয়া অসম্ভব। কেননা, জবরদস্তি সন্তান তাঁর উপর চাপতে পারে না। যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হত, তবে তাঁর সত্তা ব্যতীত সবই তো তাঁর সৃষ্ট, অতএব, তাদের মধ্য থেকেই কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করতেন। সন্তান ও সন্তান জন্মদাতা উভয়ের সমজাত হওয়া অত্যাবশ্যক। অথচ সৃষ্টি স্রষ্টার সমজাত হতে পারে না। তাই সৃষ্টিকে সন্তানরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব।

يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ . تكوير অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর রেখে তাকে আচ্ছাদিত করে দেয়া। কোরআন পাক দিবারাত্রির পরিবর্তনকে এখানে সাধারণের জন্যে تكوير শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। রাত্রি আগমন করলে যেন দিনের আলোর উপর পর্দা রেখে দেয়া হয় এবং দিনের আগমনে রাত্রির অন্ধকার যেন যবনিকার অন্তরালে চলে যায়।

চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই গতিশীল ঃ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى – এ থেকে জানা যায় যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই বিচরণ করে। সৌর বিজ্ঞান ও ভূ-তত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা কোরআন পাক অথবা যে কোন আসমানী গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রসঙ্গক্রমে কোথাও কোন বিষয় বর্ণিত হলে তার উপর ঈমান রাখা ফরয। বৈজ্ঞানিকদের প্রাচীন ও আধুনিক গবেষণা তো নিত্য পরিবর্তনশীল বিষয়; কিন্তু কোরআন পাকের তথ্যাবলী অপরিবর্তনীয়। আলোচ্য আয়াত এতটুকু ব্যক্ত করেছে যে, চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই গতিশীল। এর উপর বিশ্বাস রাখা ফরয। এখন আমাদের সামনে সূর্যের উদয় ও অস্ত পৃথিবীর ঘূর্ণন দ্বারা হয়, না স্বয়ং সূর্যের ঘূর্ণন দ্বারা হয়, তা কোরআন পাক বর্ণনা করেনি। অভিজ্ঞতার আলোকে যা জানা যায়, তা মেনে নিতে আপত্তি নেই।

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ
مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۭ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ
بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۣ وَلَا
يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ۭ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِّزْرَ اُخْرٰى ۭ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۭ اِنَّهٗ
عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ
مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ
مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ قُلْ تَمَتَّعْ
بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ڰ اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۝ اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ
اٰنَاۗءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَاۗىِٕمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ۭ
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۭ اِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝ قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا
رَبَّكُمْ ۭ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۭ وَاَرْضُ اللّٰهِ
وَاسِعَةٌ ۭ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(৬) তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে। অতঃপর তা থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে। তিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? (৭) যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের থেকে বেপরওয়া। তিনি তাঁর বান্দাদের কাফের হয়ে পড়া পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্যে তা পছন্দ করেন। একের পাপ ভার অন্যে বহন করবে না। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও অবগত। (৮) যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন তাকে নেয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্যে পূর্বে ডেকেছিল এবং আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করে; যাতে করে অপরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। বলুন, তুমি তোমার কুফর সহকারে কিছুকাল জীবনোপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। (৯) যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না: বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান। (১০) বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ। তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহ্র পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ –আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টিকে اَنْزَلَ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ আকাশ থেকে নাযিল করা। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোর সৃষ্টিতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানির প্রভাব অত্যধিক। তাই এগুলোও যেন আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে বলা যায়। মানুষের পোশাকের ক্ষেত্রেও কোরআন পাক এ শব্দ ব্যবহার করেছে। বলা হয়েছে— قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا — খনিজ পদার্থ লোহার ক্ষেত্রেও তাই বলা হয়েছে— وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ –সবগুলোর সারমর্মই এই যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কুদরতে এগুলো সৃষ্টি করে মানুষকে দান করেছেন।—(কুরতুবী)

خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ — এতে মানব সৃষ্টির অন্তর্নিহিত খোদায়ী কুদরতের কিছু রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্র কুদরতে এটাও ছিল যে, তিনি মায়ের পেটে সন্তানকে একই সময়ে পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে এরূপ করেননি, বরং خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ তথা পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ফলে যে নারীর গর্ভে এই ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি হতে থাকে, সে ধীরে ধীরে এই বোঝা বহনে অভ্যস্ত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই অনুপম সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে শত শত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এবং রক্ত ও প্রাণ সঞ্চালনের জন্যে চুলের মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা-উপশিরার স্থান করা হয়। কিন্তু সাধারণ শিল্পিদের মত একাজ কোন খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে করা হয় না বরং তিনটি অন্ধকারের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়, যেখানে কোন মানুষের পক্ষে কিছু সৃষ্টি করা তো দূরের কথা চিন্তা-কল্পনাও সেখানে পৌঁছার পথ পায় না।

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ — অর্থাৎ, তোমাদের ঈমান দ্বারা আল্লাহ্র কোন উপকার হয় না এবং কুফর দ্বারাও কোন ক্ষতি হয় না। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, হে আমার বান্দারা, যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকগণ এবং জিন ও মানব সবাই চূড়ান্ত পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তবুও আমার রাজত্ব বিন্দু পরিমাণও হ্রাস পায় না।—(ইবনে কাসীর)

وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ - -অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তার বান্দাদের কুফর পছন্দ করেন না। এখানে رضا শব্দের অর্থ মহব্বত করা অথবা আপত্তি ব্যতিরেকে কোন কাজের ইচ্ছা করা। এর বিপরীতে سخط শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ কোন কিছুকে অপছন্দ করা অথবা আপত্তিকর সাব্যস্ত করা যদিও তার সাথে ইচ্ছাও জড়িত থাকে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জমাআতের বিশ্বাস এই যে, দুনিয়াতে কোন ভাল অথবা মন্দ কাজ, ঈমান অথবা কুফর আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। তাই প্রত্যেকটি কাজের অস্তিত্ব লাভের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা শর্ত। তবে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ও পছন্দ কেবল ঈমান ও ভাল কাজের সাথেই সম্পৃক্ত। কুফর, শিরক ও পাপাচার তিনি পছন্দ করেন না। শায়খুল ইসলাম নাভী 'উসূল ও যাওয়াবেত গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

সত্যপন্থীদের মাযহাব তকদীরে বিশ্বাস করা। আরও এই যে, ভাল-মন্দ সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্র আদেশ ও তকদীর দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে এবং আল্লাহ্ তাআলা এগুলো সৃষ্টির ইচ্ছাও করেন। কিন্তু তিনি

পাপাচারকে অপছন্দ করেন যদিও কোন উপযোগিতার কারণে এসব পাপাচার সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। এই উপযোগিতা কি, তা তিনি জানেন।—(রূহুল-মা'আনী)

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ –এই বাক্যের পূর্বে কাফেরদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কুফর ও পাপাচারের স্বাদ উপভোগ করে নাও। অবশেষে তোমরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। এরপর এ বাক্যে অনুগত মুমিনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং একে أَمَّنْ প্রশ্নবোধক শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। তফসীরবিদগণ বলেন, এর পূর্বে একটি বাক্য উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ, কাফেরকে বলা হবে—তুমি উত্তম, না সে অনুগত মুমিন বান্দা উত্তম, যার কথা এখন উল্লেখ করা হবে? قَانِتٌ শব্দের কয়েক রকম তরজমা করা হয়েছে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, এর অর্থ আনুগত্যশীল। শব্দটি যখন বিশেষভাবে নামাযের ক্ষেত্রে বলা হয়, যেমন وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ –তখন এর অর্থ হবে সে ব্যক্তি, যে নামাযে দৃষ্টি নত রাখে এবং এদিক-সেদিক দেখে না, নিজের কোন অঙ্গ অথবা কাপড় নিয়ে খেলা করে না এবং দুনিয়ার কোন বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযে স্মরণ করে না। ভুল ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা এর পরিপন্থী নয়।—(কুরতুবী)

آنَاءَ اللَّيْلِ –এর অর্থ রাত্রির প্রহরসমূহ। অর্থাৎ, রাত্রির শুরুভাগ, মধ্যবর্তী ও শেষাংশ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হাশরের ময়দানে সহজ হিসাব কামনা করে, তার উচিত হবে আল্লাহ্‌ যেন তাকে রাত্রির অন্ধকারে সেজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায় পান। তার মধ্যে পরকালের চিন্তা এবং রহমতের প্রত্যাশাও থাকা দরকার। কেউ কেউ মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়কেও آنَاءَ اللَّيْلِ বলেছেন।—(কুরতুবী)

وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ –এর পূর্বের বাক্যে সৎকাজের নির্দেশ রয়েছে। এতে কেউ আপত্তি করতে পারত যে, আমি যে শহরে অথবা রাষ্ট্রে বাস করছি কিংবা যে পরিবেশে আটকে আছি তা সৎকাজের প্রতিবন্ধক। এর জওয়াব এ বাক্যে দেয়া হয়েছে যে, কোন বিশেষ রাষ্ট্র কিংবা শহর অথবা বিশেষ পরিবেশ থেকে যদি শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালন করা দুষ্কর হয়, তবে তা ত্যাগ করা উচিত, আল্লাহ্‌র পৃথিবী সুপ্রশস্ত। সুতরাং আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ পালনের উপযোগী কোন স্থানে ও পরিবেশে গিয়ে বসবাস করা দরকার। এতে অনুপযুক্ত পরিবেশ থেকে হিজরত করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হিজরতের বিস্তারিত বিধি-বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ – بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থ সবরকারীদের সওয়াব কোন নির্ধারিত পরিমাণে নয়—অপরিসীম ও অগণিত দেয়া হবে। হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়াতে কারও কাছে কারও কোন প্রাপ্য থাকলে তাকে নিজের প্রাপ্য দাবী করে আদায় করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে দাবী ব্যতিরেকেই সবরকারীরা তাদের সওয়াব পাবে।

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। দাতাগণ আগমন করলে তাদের দান খয়রাত ওজন করে সে হিসাবে পূর্ণ সওয়াব দান করা হবে। এমনিভাবে নামায, হজ্জ ইত্যাদি এবাদতকারীদের এবাদত মেপে তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে। অতঃপর বালা-মুসিবতে সবরকারীরা আগমন করলে তাদের জন্যে কোন ওজন ও মাপ হবে না, বরং তাদেরকে অপরিমিত ও অগণিত সওয়াব দেয়া হবে। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন— إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ —ফলে যাদের পার্থিব জীবন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয়েছে, তারা বাসনা প্রকাশ করবে—হায়, দুনিয়াতে আমাদের দেহ কাঁচির সাহায্যে কর্তিত হলে আজ আমরাও সবরের এমনি প্রতিদান পেতাম।

ইমাম মালেক (রহঃ) এ আয়াতে صابرين –এর অর্থ নিয়েছেন, যারা দুনিয়াতে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে সবর করে। কেউ কেউ বলেন, যারা পাপকাজ থেকে সংযম অবলম্বন করে, আয়াতে তাদেরকে صابر বলা হয়েছে। কুরতুবী বলেন, صابرون শব্দকে অন্য কোন শব্দের সাথে সংযুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপকাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী। পক্ষান্তরে বিপদাপদে সবরকারীর অর্থে ব্যবহার করা হলে তার সাথে সে বিপদও সংযুক্ত হয়ে উল্লেখিত হয়। যেমন বলা হয়— صابر على كذا অর্থাৎ, অমুক বিপদে সবরকারী।

قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ
أَكُوْنَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٣﴾ قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِيْنِيْ ﴿١٤﴾ فَاعْبُدُوْا مَا
شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ۗ قُلْ إِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا أَنْفُسَهُمْ وَ
أَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ أَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١٥﴾ لَهُمْ مِّنْ
فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۗ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ
عِبَادَهٗ ۗ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴿١٦﴾ وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ أَنْ
يَّعْبُدُوْهَا وَأَنَابُوْٓا إِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِيْنَ
يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهٗ ۗ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ
وَأُولٰٓئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۗ
أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ
فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۗ وَعْدَ اللّٰهِ ۗ لَا يُخْلِفُ
اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿٢٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ
فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا
ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ۗ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

(১১) বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র এবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি। (১২) আরও আদিষ্ট হয়েছি, সর্ব প্রথম নির্দেশ পালনকারী হওয়ার জন্যে। (১৩) বলুন, আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হলে এক মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি। (১৪) বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তাআলারই এবাদত করি। (১৫) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার এবাদত কর। বলুন, কেয়ামতের দিন তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা নিজেদের ও পরিবারবর্গের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। (১৬) তাদের জন্যে উপর দিক থেকে এবং নীচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভয় কর। (১৭) যারা শয়তানী শক্তির পূজা-অর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্ অভিমুখী হয়, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। অতএব, সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে, (১৮) যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম, তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ্ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান। (১৯) যার জন্যে শাস্তির হুকুম অবধারিত হয়ে গেছে আপনি কি সে জাহান্নামীকে মুক্ত করতে পারবেন? (২০) কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্যে নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না। (২১) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর সে পানি যমীনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন, এরপর তদ্দ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। এরপর আল্লাহ্ তাকে খড়-কুটায় পরিণত করে দেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশ রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ ...... أُولُوا الْأَلْبَابِ

এ আয়াতের তফসীরে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে কাসীর কর্তৃক গৃহীত উক্তি অনুযায়ী এখানে **قول** অর্থ আল্লাহ্‌র কালাম কোরআন অথবা তৎসহ রসূলের শিক্ষাসমূহ। এগুলো সবই উত্তম। তাই স্থানোপযোগী বাহ্যিক বাক্য এরূপ ছিলঃ **يستمعون القول فيتبعونه** কিন্তু এ স্থলে أَحْسَنَ শব্দটি যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কোরআন ও রসূলের শিক্ষাসমূহের অনুসরণ চক্ষু বন্ধ করে করেনি। মূর্খরা তাই করে। তারা কারও কথা শুনে হিতাহিত বিবেচনা না করেই তার অনুসরণ শুরু করে দেয়। বরং তারা আল্লাহ্ ও রসূলের কথাকে সত্য ও উত্তম দেখার পর তার অনুসরণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে আয়াতের শেষাংশে তাদেরকে أُولُوا الْأَلْبَابِ তথা বোধশক্তি সম্পন্ন খেতাব দেয়া হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত কোরআনের মধ্যেই তওরাত সম্পর্কে হযরত মূসা (আঃ)-কে প্রদত্ত আদেশের ভেতরে রয়েছে। বলা হয়েছেঃ

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا بِأَحْسَنِهَا এতেও أَحْسَنَ বলে সমগ্র তওরাত ও তার বিধি-বিধান বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তেমনি **قول** অর্থ কোরআন এবং **اتباع احسن** অর্থ সমগ্র কোরআনের অনুসরণ। পরবর্তী এক আয়াতে একেই أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ বলা হয়েছে। এই তফসীর অনুযায়ী কেউ কেউ আরও বলেন যে, কোরআন পাকেও অনেক أَحْسَنَ (ভাল) ও **حسن** (উত্তম) শ্রেণীর বিধান রয়েছে। উদাহরণতঃ প্রতিশোধ নেয়া ও ক্ষমা করা উভয়টি জায়েয, কিন্তু ক্ষমা করা উত্তম ও শ্রেয়ঃ বলা হয়েছে- وَأَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ -অনেক ব্যাপারে কোরআন মানুষকে বৈধ দু'টি পন্থার যে কোন একদিক অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু তন্মধ্যে একটি পন্থাকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলেছে; যেমন, وَأَنْ تَعْفُوْٓا أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى - অনেক ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু বাধ্য বাধকতার উপর আমল করাকে উত্তম বলা হয়েছে। অতএব, আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, এসব লোক কোরআনের সাবধানতার বিধানও শুনে বাধ্যবাধকতাও শুনে; কিন্তু অনুসরণ করে বাধ্যবাধকতার উপর এবং أَحْسَنَ ও **حسن** শ্রেণীর দু'পন্থার মধ্য থেকে أَحْسَنَ -কে অবলম্বন করে।

অনেক তফসীরবিদ এক্ষেত্রে **قول** -এর অর্থ নিয়েছেন সাধারণ মানুষের কথাবার্তা। এতে তওহীদ, শিরক, কুফর, ইসলাম, সত্য, মিথ্যা ইত্যাদি সব রকম কথাবার্তাই অন্তর্ভুক্ত। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, যারা কাফের, মুমিন, সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দ নির্বিশেষে এসব কথাই শুনে, কিন্তু অনুসরণ উত্তমটিরই করে, তওহীদ ও শিরকের কথা শুনে তওহীদের অনুসরণ করে এবং সত্য ও মিথ্যা কথা শুনে সত্যের অনুসরণ করে। সত্যেরও বিভিন্ন স্তর থাকলে সর্বোত্তম স্তরের অনুসরণ করে। এ কারণেই তাদেরকে দু'টি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। (এক) هَدٰىهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ, তাদেরকে আল্লাহ্ হেদায়েত দান করেছেন, ফলে বিভিন্ন প্রকার কথা শুনে বিভ্রান্ত হয় না। (দুই) — وَأُولٰٓئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ অর্থাৎ, তারাই বুদ্ধিমান। বস্তুতঃ ভাল-মন্দ ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করাই বুদ্ধির কাজ।

তাই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত আমর ইবনে নুফায়েল, আবু যর গেফারী ও সালমান ফারসী (রাঃ) প্রমুখ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমর ইবনে নুফায়েল জাহেলিয়াত যুগেও শিরক ও মূর্তি পূজাকে ঘৃণা করতেন। আবু যর গেফারী ও সালমান ফারসী মুশরিক, ইহুদী, খ্রীষ্টান

أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ أُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٢﴾ اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾ أَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۚ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾

(২২) আল্লাহ্ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে,(সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়) যাদের অন্তর আল্লাহ্র স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্যে দুর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে। (২৩) আল্লাহ্ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠিত। এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহ্র স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহ্র পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ্ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (২৪) যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার মুখ দ্বারা অশুভ আযাব ঠেকাবে এবং এরূপ জালেমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর,—সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়? (২৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে তাদের কাছে আযাব এমনভাবে আসল, যা তারা কল্পনাও করত না। (২৬) অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করালেন, আর পরকালের আযাব হবে আরও গুরুতর—যদি তারা জানত। (২৭) আমি এ কোরআনে মানুষের জন্যে সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে; (২৮) আরবী ভাষার এ কোরআন বক্রতামুক্ত, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে। (২৯) আল্লাহ্ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ঃ একটি লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে, আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন—তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৩০) নিশ্চয় তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। (৩১) অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা সবাই তোমাদের পালনকর্তার সামনে কথা কাটাকাটি করবে।

ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীদের কথাবার্তা শুনে ও তাদের রীতিনীতি আচার-আচরণ পরখ করার পর ইসলামকেই গ্রহণ করেছেন।—(কুরতুবী)

فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِي الْأَرْضِ - يَنَابِيعَ শব্দটি يَنبوع এর বহুবচন। অর্থ ভূমি থেকে নির্গত ঝর্ণা। উদ্দেশ্য এই যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করাই এক বড় নেয়ামত, কিন্তু একে ভূগর্ভে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা না করা হলে মানুষ তদ্দ্বারা কেবল বৃষ্টির দিনে অথবা এর অব্যবহিত পরে কয়েকদিন উপকৃত হতে পারত। অথচ পানির অপর নাম জীবন। পানি ব্যতীত মানুষ একদিনও বাঁচতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তাআলা কেবল এ নেয়ামত নাযিল করেই ক্ষান্ত হননি, একে সংরক্ষিত করার জন্যেও বিস্ময়কর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিছু পানি তো ভূমির গর্তে, চৌবাচ্চায় ও পুকুরসমূহে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং অনেক বড় ভাণ্ডারকে বরফে পরিণত করে পর্বতের চূড়ায় তুলে রাখা হয়। ফলে পানি পচে যাওয়ার ও দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অতঃপর সে বরফ আস্তে আস্তে গলে পর্বতের শিরা-উপশিরার পথে ভূমিতে নেমে আসে এবং স্থানে স্থানে ঝর্ণার আকারে আপনা-আপনি নির্গত হয়। এরপর নদী-নালার আকার ধারণ করে সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হতে থাকে।

এই পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ কোরআনে পাকে সূরায়ে মু'মেনূনের فَأَسْكَنّٰهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ -আয়াতের তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهٗ –ফসল উৎপন্ন হওয়ার সময় এবং পাকার সময় তার উপর বিভিন্ন রং বিবর্তিত হতে থাকে। যেহেতু সব রংই বিবর্তনশীল ও নিত্যনতুন তাই حال শব্দটিকে ব্যাকরণিক নিয়মে ...(বর্তমানকাল বাচক) প্রয়োগ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِأُولِي الْأَلْبَابِ — অর্থাৎ পানি বর্ষণ, তাকে সংরক্ষিত করে মানুষের কাজে লাগানো, তদ্দ্বারা নানা রকমের উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপন্ন করা, বৃক্ষের উপর দিয়ে বিভিন্ন রঙের বিবর্তনের পর তা শুকিয়ে খাদ্যশস্য আলাদা এবং ভূষি আলাদা হওয়া এসব বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্যে অনেক উপদেশ রয়েছে। এগুলো আল্লাহ্র মহান কুদরত ও প্রজ্ঞার দলীল। এগুলো দেখে মানুষ নিজের সৃষ্টির রহস্যও অবগত হতে পারে, যা স্রষ্টাকে চেনার ও জানার উপায় হতে পারে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ — شَرَحَ এর শাব্দিক অর্থ উন্মুক্ত করা, ছড়ানো ও প্রশস্ত করা। বক্ষ উন্মোচনের অর্থ অন্তরের প্রশস্ততা। এর উদ্দেশ্য অন্তরে এরূপ যোগ্যতা থাকা যে, আল্লাহ্র সৃষ্টিগত নিদর্শনাবলী—আকাশ, পৃথিবী ও মানব সৃষ্টি ইত্যাদিতে চিন্তা-ভাবনা করে শিক্ষা ও উপকার লাভ করতে পারে এবং অবতীর্ণ কিতাব ও বিধি-বিধানে চিন্তা-ভাবনা করে লাভবান হতে পারে। এর বিপরীতে আসে অন্তরের সংকীর্ণতা (قساوت قلب) কোরআনের يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا আয়াতে এবং এস্থলের لِلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ আয়াতে বক্ষ উন্মোচনের বিপরীত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের সামনে أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলে আমরা شرح صدر তথা বক্ষ উন্মোচনের অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ ঈমানের নূর মানুষের অন্তরে প্রবেশ করলে অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ্র বিধি-বিধান হৃদয়ঙ্গম করা এবং সে অনুযায়ী আমল

করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। আমরা আরয করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ্ এর লক্ষণ কি? তিনি বললেনঃ الانابة الى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور والتاهب للموت قبل نزوله

এর লক্ষণ হচ্ছে, চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি অনুরাগী হওয়া, ধোঁকার বাসস্থান (অর্থাৎ, দুনিয়ার আনন্দ-কোলাহল) থেকে দূরে সরে থাকা এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা।—(রুহুল মা'আনী)

আলোচ্য আয়াতটি أَفَمَن প্রশ্নবোধক শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তির অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে এবং সে তার পালনকর্তার তরফ থেকে আগত নূরের আলোকে কর্ম সম্পাদন করে, সে কি সে ব্যক্তির সমান, যে সংকীর্ণ অন্তর ও কঠোর প্রাণ? এর বিপরীতে কঠোর প্রাণ ব্যক্তির উল্লেখ পরবর্তী আয়াতে করা হয়েছে।

فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم - قساوة শব্দের অর্থ কঠোর প্রাণ হওয়া, কারও প্রতি দয়ার্দ্র না হওয়া। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকর ও বিধানাবলী থেকে কোন প্রভাব কবুল করে না।

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ - এর পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বান্দাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল — يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ -এ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, সমগ্র কোরআনই أَحْسَنَ الْحَدِيثِ তথা উত্তম বাণী। حديث-এর শাব্দিক অর্থ এমন কথা অথবা কাহিনী, যা বর্ণনা করা হয়। কোরআনকে 'উত্তম বাণী' বলে আখ্যায়িত করার মর্ম এই যে, মানুষ যা কিছু বলে, তন্মধ্যে উত্তম বাণী হচ্ছে কোরআন। অতঃপর কোরআনের কতিপয় বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে—(১) مُّتَشَابِهًا -এর অর্থ কোরআনের বিষয়বস্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর এক আয়াতের ব্যাখ্যা ও সত্যায়ন অন্য আয়াত দ্বারা হয়। এতে পরস্পর বিরোধিতা নেই। (২) مَّثَانِيَ এটা مثنى-এর বহুবচন। অর্থাৎ, কোরআনে একই বিষয়বস্তু বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। (৩) تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যে ভীত, কোরআন পাঠ করে তাদের দেহের লোম শিউরে উঠে।(৪) ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ... অর্থাৎ, কোরআন তেলাওয়াতের প্রভাবে কখনও আযাবের কথা শুনে দেহের লোম শিউরে উঠে এবং কখনও রহমত ও মাগফেরাতের বর্ণনা শুনে দেহ ও অন্তর সবই আল্লাহ্‌র স্মরণে নরম হয়ে যায়। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ অবস্থা তাই ছিল। তাঁদের সামনে কোরআন পাঠ করা হলে তাঁদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে যেত এবং দেহের লোম শিউরে উঠত।—(কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ্‌র ভয়ে যে বান্দার লোম শিউরে উঠে, আল্লাহ্ তার দেহকে আগুনের জন্যে হারাম করে দেন—(কুরতুবী)

أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ -এতে জাহান্নামের ভয়াবহতার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষের অভ্যাস এই যে, কোন কষ্টদায়ক বিষয়ের সম্মুখীন হলে মানুষ তার মুখমণ্ডলকে বাঁচানোর জন্যে হাত ও পা-কে ঢালরূপে ব্যবহার করে। কিন্তু জাহান্নামীরা হাত-পায়ের দ্বারা প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। তাদের আযাব সরাসরি তাদের মুখমণ্ডলে পতিত হবে। সে প্রতিরক্ষা করতে চাইলে মুখমণ্ডলকেই ঢাল বানাতে পারবে। কেননা, তাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।—(নাউযুবিল্লাহ্)

তফসীরবিদ 'আতা ইবনে যায়েদ বলেন, জাহান্নামীকে জাহান্নামে হাত-পা বেঁধে হিঁচড়ে নিক্ষেপ করা হবে।—(কুরতুবী)

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ -যে ভবিষ্যৎকালে মরবে, তাকে مَيِّتٌ এবং যে অতীতকালে মরে গেছে, তাকে مَيْتٌ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং আপনার শত্রু-মিত্র সবাই মৃত্যুবরণ করবে। এরূপ বলার উদ্দেশ্য সবাইকে পরকাল চিন্তায় মনোযোগী করা এবং পরকালের কাজে আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করা। প্রসঙ্গতঃ একথাও বলে দেয়া উদ্দেশ্য যে, সৃষ্টির সেরা এবং পয়গম্বরকুলের মধ্যমনি হওয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মৃত্যুর আওতাবহির্ভূত নন, যাতে তাঁর ইন্তেকালের পর মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি না হয়।—(কুরতুবী)

হাশরের আদালতে মযলুমের হক কিরূপে আদায় করা হবে? ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ —হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে إِنَّكُمْ শব্দের মধ্যে মুমিন, কাফের, মুসলমান, জালেম ও মযলুম সবাই অন্তর্ভুক্ত। তারা সবাই নিজ নিজ মোকদ্দমা আল্লাহ্ তাআলার আদালতে দায়ের করবে এবং আল্লাহ্ তাআলা যালেমকে মযলুমের হক দিতে বাধ্য করবেন। বুখারীতে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ধরন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কারও যিম্মায় কারও কোন হক থাকলে তার উচিত দুনিয়াতেই তা আদায় করা অথবা ক্ষমা নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। কেননা, পরকালে দীনার-দেরহাম থাকবে না যে, তা দিয়ে হক আদায় করা যাবে। সেখানে জালেম ব্যক্তির কিছু সৎকর্ম থাকলে তা জুলুমের পরিমাণে তার কাছ থেকে নিয়ে মযলুম ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হবে। তার কাছে কোন সৎকর্ম না থাকলে মযলুমের গোনাহ্ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে।

সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক দিন সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? তাঁরা আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, (সাঃ) আমরা তো তাকেই নিঃস্ব মনে করি, যার কাছে নগদ অর্থকড়ি এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। তিনি বললেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সত্যিকার নিঃস্ব সে ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিন অনেক নামায, রোযা ও হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু দুনিয়াতে সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করেছিল, কারও অর্থকড়ি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে হত্যা করেছিল এবং কাউকে প্রহার করে দুঃখ দিয়েছিল—এসব মযলুম সবাই আল্লাহ্‌র সামনে তাদের যুলুমের প্রতিকার দাবী করবে।—ফলে তার সৎকর্মসমূহ তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। যদি তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যায় এবং মযলুমের হক অবশিষ্ট থাকে তবে মযলুমের গোনাহ্ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব, এ ব্যক্তি সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কেয়ামতে নিঃস্ব হয়ে যাবে। সেই প্রকৃত নিঃস্ব।

যুলুম ও হকের বিনিময়ে সবরকম আমল দেয়া হবে কিন্তু ঈমান দেয়া হবে নাঃ তফসীরে মাযহারীতে লিখিত আছে, মযলুমের হকের বিনিময়ে যালেমের আমল দেয়ার অর্থ এই যে, ঈমান ব্যতীত অন্যান্য আমল দেয়া হবে। কেননা, সব যুলুমই কর্মগত গোনাহ্—কুফর নয়। কর্মগত গোনাহ্সমূহের শাস্তি হবে সীমিত। কিন্তু ঈমান একটি অসীম

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ
إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِي جَاءَ
بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ مَا
يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ
عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ
بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾
وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ
ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ
ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ
حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يَا قَوْمِ
اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾
مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٤٠﴾

(৩২) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য আগমন করার পর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে হবে? কাফেরদের বাসস্থান জাহান্নামে নয় কি? (৩৩) যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য মেনে নিয়েছে; তারাই তো খোদাভীরু। (৩৪) তাদের জন্যে পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে, যা তারা চাইবে। এটা সৎকর্মীদের পুরস্কার (৩৫) যাতে আল্লাহ্‌ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদেরকে দান করেন। (৩৬) আল্লাহ্‌ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ্‌ যাকে গোমরাহ্‌ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (৩৭) আর আল্লাহ্‌ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আল্লাহ্‌ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? (৩৮) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে—আল্লাহ্‌। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্‌ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে। (৩৯) বলুন, হে আমার কওম, তোমরা তোমাদের জায়গায় কাজ কর, আমিও কাজ করছি। সত্বরই জানতে পারবে (৪০) কার কাছে অবমাননাকর আযাব এবং চিরস্থায়ী শাস্তি নেমে আসে।

আমল, এর পুরস্কারও অসীম। অর্থাৎ, চিরকাল জান্নাতে বসবাস করা; যদিও তা গোনাহের শাস্তি ভোগ করা এবং কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করার পরে হয়। এর সারমর্ম এই যে, যালেমের ঈমান ব্যতীত সব সৎকর্মই যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে কেবল ঈমান বাকী থাকবে, তখন তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেয়া হবে না, বরং মযলুমদের গোনাহ তার উপর চাপিয়ে হক আদায় করা হবে। ফলে সে গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অনন্তকাল সেখানে থাকবে। মাযহারীর বর্ণনা মতে ইমাম বায়হাকীও তাই বলেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ এ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ এবং দু'জায়গায় صدق –এর অর্থ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আনীত শিক্ষাসমূহ, তা কোরআনই হোক অথবা হাদীস হোক। وَصَدَّقَ بِهٖ বাক্যে এর সত্যায়নকারী সব মুমিন–মুসলমানই অন্তর্ভুক্ত।

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ — কাফেররা একবার রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামকে একথা বলে ভয় দেখিয়েছিল যে, যদি আপনি আমাদের প্রতিমাদের প্রতি বে–আদবী প্রদর্শন করেন, তবে তাদের কোপানল থেকে আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না; তাদের প্রভাব খুব সাংঘাতিক। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং জওয়াবে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন?

সে জন্যেই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে বান্দার অর্থ নিয়েছে বিশেষ বান্দা অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)। তফসীরের সার–সংক্ষেপে এ অর্থই অবলম্বন করা হয়েছে। অন্যান্য তফসীরবিদগণ বলেন যে, এখানে যে কোন বন্দা বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতের অপর এক কেরাত عباده বর্ণিত আছে। এ কেরাত দ্বিতীয় তফসীরের সমর্থক। বিষয়বস্তু সর্বাবস্থায় ব্যাপক; অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাঁর প্রত্যেক বন্দার জন্যেই যথেষ্ট।

শিক্ষা ও উপদেশ ঃ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ — অর্থাৎ, কাফেররা আপনাকে তাদের মিথ্যা উপাস্যদের কোপানলের ভয় দেখায়। এ আয়াত পাঠ করে পাঠকবর্গ সাধারণতঃ মনে করে যে, এটা আর কি, এতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)–এর প্রতি কাফেরদের হুমকি বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। তারা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা করে না যে, এতে আমাদের জন্যে কি পথনির্দেশ রয়েছে। অথচ সুস্পষ্ট ব্যাপার এই যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ভয় দেখিয়ে বলে, তুমি অমুক হারাম অথবা পাপ কাজ না করলে তোমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অথবা শাসকশ্রেণী তোমার প্রতি রাগান্বিত হবেন এবং তোমার ক্ষতি করবেন, এরূপ ভীতি প্রদর্শনকারী ব্যক্তিও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যদিও সে মুসলমান হয়। আমাদের সমাজে এরূপ ঘটনার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। অধিকাংশ চাকুরির ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধানাবলী অমান্য করবে, না অফিসারবর্গের কোপানলের শিকার হবে, এরূপ টানা–পোড়েনের সম্মুখীন হতে হয়। আলোচ্য আয়াত তাদের সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কি তোমাদের হেফাযতের জন্যে যথেষ্ট নন? তোমরা খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্যে গোনাহ্‌ না করার সংকল্প করলে এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর বিপক্ষে কোন শাসক ও কর্মকর্তার রক্তচক্ষুর পরওয়া না করলে আল্লাহ্‌র সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে। বেশীর চেয়ে বেশী চাকুরি নষ্ট হয়ে গেলেও আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের জীবিকার অন্য ব্যবস্থা করে দেবেন। নিজেই এ ধরনের চাকুরি ছেড়ে দেয়ার চেষ্টায় থাকা মুসলমানের কর্তব্য। কোন উপযুক্ত জায়গা পেয়ে গেলে অনতিবিলম্বে এ ধরনের চাকুরি ত্যাগ করা উচিত।

إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾ اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرٰى إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُل لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهٖٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾ قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهٰدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِن سُوٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾

(৪১) আমি আপনার প্রতি সত্য ধর্মসহ কিতাব নাযিল করেছি মানুষের কল্যাণকল্পে। অতঃপর যে সৎপথে আসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই আসে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্যে পথভ্রষ্ট হয়। আপনি তাদের জন্যে দায়ী নন। (৪২) আল্লাহ্ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৪৩) তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে? বলুন, তাদের কোন এখতিয়ার না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও? (৪৪) বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহ্রই ক্ষমতাধীন, আসমান ও যমীনে তাঁরই সাম্রাজ্য। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৪৫) যখন খাঁটিভাবে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে। (৪৬) বলুন, হে আল্লাহ্, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। (৪৭) যদি গোনাহ্গারদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা কেয়ামতের দিন সে সবকিছুই নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেবে। অথচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করত না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মৃত্যু ও নিদ্রাকালীন প্রাণ হরণের পার্থক্য ঃ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا - توفى এর শাব্দিক অর্থ লওয়া ও করায়ত্ত করা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, প্রাণীদের প্রাণ সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণই আল্লাহ্ তাআলার আয়ত্তাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা তা হরণ করতে ও ফিরিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্ তাআলার এ কুদরত প্রত্যেক প্রাণীই প্রত্যহ দেখে ও অনুভব করে। নিদ্রার সময় তার প্রাণ আল্লাহ্ তাআলার এক প্রকার করায়ত্তে চলে যায় এবং জাগ্রত হওয়ার পর ফিরে পায়। অবশেষে এমন এক সময় আসবে, যখন তা সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়ে যাবে এবং ফিরে পাওয়া যাবে না।

তফসীরে মাযহারীতে আছে, প্রাণ হরণ করার অর্থ তার সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। কখনও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সবদিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, এরই নাম মৃত্যু। আবার কখনও শুধু বাহ্যিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। আভ্যন্তরীণভাবে যোগাযোগ থাকে। এর ফলে কেবল বাহ্যিকভাবে জীবনের লক্ষণ, চেতনা ও ইচ্ছাভিত্তিক নড়াচড়ার শক্তি বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় এবং আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক বাকী থাকে। ফলে সে শ্বাস গ্রহণ করে ও জীবিত থাকে। এটা এভাবে করা হয় যে, মানুষের প্রাণকে 'আলমে মিছাল' অধ্যয়নের দিকে নিবিষ্ট করে এ জগৎ থেকে বিমুখ ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়, যাতে মানুষ পরিপূর্ণ আরাম লাভ করতে পারে। যখন আভ্যন্তরীণ সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, তখন দেহে জীবন সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতে توفى শব্দটি উপরোক্ত উভয় প্রকার প্রাণ হরণের অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করে। মৃত্যু ও নিদ্রার উপরোক্ত পার্থক্যের সমর্থন হযরত আলী (রাঃ)-এর এক উক্তি থেকেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'নিদ্রার সময় মানুষের প্রাণ তার দেহ থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু প্রাণের একটি রেশ দেহে বাকী থাকে। ফলে মানুষ জীবিত থাকে। এ রেশের মাধ্যমেই সে স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ন আলমে মিছালের দিকে প্রাণের নিবিষ্ট থাকা অবস্থায় দেখা হলে তা সত্য স্বপ্ন হয় এবং সেদিক থেকে দেহের দিকে ফিরে আসার সময় দেখলে তাতে শয়তানের কারসাজি শামিল হয়ে যায়। ফলে সেটা সত্য স্বপ্ন থাকে না।' তিনি আরও বলেন, 'নিদ্রাবস্থায় প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে যায় ; কিন্তু জাগরণের সময় এক নিমেষের চেয়েও কম সময়ে দেহে ফিরে আসে।

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ —সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামায কিসের দ্বারা শুরু করতেন? তিনি বললেন, তিনি যখন তাহাজ্জুদের জন্যে উঠতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন ঃ

اللّٰهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ) বলেন, আমি কোরআন পাকের এমন এক আয়াত জানি যা পাঠ করে দোয়া করলে সে দোয়া কবূল হয়।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٨﴾ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا
خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ اِنَّمَاۤ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ
وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٥٠﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ
مَا كَسَبُوْا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰۤؤُلَاۤءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ
مَا كَسَبُوْا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥١﴾ اَوَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا
اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾ وَاَنِيْبُوْۤا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ
قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٥٤﴾ وَاتَّبِعُوْۤا اَحْسَنَ
مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى
مَا فَرَّطْتُّ فِىْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

(৪৮) আর দেখবে, তাদের দুষ্কর্মসমূহ এবং যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে ঘিরে নেবে। (৪৯) মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকতে শুরু করে, এরপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে নেয়ামত দান করি, তখন সে বলে, এটা তো আমি পূর্বের জানা মতেই প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না। (৫০) তাদের পূর্ববর্তীরাও তাই বলত, অতঃপর তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন উপকারে আসেনি। (৫১) তাদের দুষ্কর্ম তাদেরকে বিপদে ফেলেছে, এদের মধ্যেও যারা পাপী, তাদেরকেও অতিসত্বর তাদের দুষ্কর্ম বিপদে ফেলবে। তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। (৫২) তারা কি জানেনি যে, আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত দেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৫৩) বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গোনাহ্ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৫৪) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না ; (৫৫) তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ কর তোমাদের কাছে অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে আযাব আসার পূর্বে, (৫৬) যাতে কেউ না বলে, হায়, হায়, আল্লাহ্ সকাশে আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি এবং আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -(কুরতুবী)

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ –হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) এ আয়াত পাঠ করে বললেন, ধ্বংস হোক লোক দেখানো এবাদতকারীরা, ধ্বংস হোক লোক দেখানো এবাদতকারীরা, এ আয়াত তাদের সম্পর্কেই, যারা দুনিয়াতে মানুষকে দেখানোর জন্যে সৎকর্ম করত এবং লোকেরাও তাদেরকে সৎ মনে করত। তারা ধোঁকায় ছিল যে, এসব সৎকর্ম পরকালে তাদের মুক্তির উপায় হবে। কিন্তু এগুলোতে যেহেতু নিষ্ঠা ছিল না, তাই আল্লাহ্র কাছে এরূপ সৎকর্মের কোন পুরস্কার ও সওয়াব নেই। ফলে পরকালে তাদের ধারণার বিপরীতে শাস্তি হতে থাকবে।—(কুরতুবী)

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ ঃ হযরত রবী ইবনে খাইসমকে কেউ হযরত হোসাইন (রাঃ) – এর শাহাদত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন, অতঃপর বললেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধ সম্পর্কে যখন তোমার মনে খট্‌কা দেখা দেয়, তখন এ আয়াত পাঠ করে নিও।—রুহুল মা'আনী এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেন ঃ এটি একটি বিরাট আদব ও শিক্ষা। এটা সদাসর্বদা মনে রাখা উচিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا – হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিছু লোক ছিল, যারা অন্যায় হত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল। আরও কিছু লোক ছিল, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরয করল ঃ আপনি যে ধর্মের দাওয়াত দেন, তা তো খুবই উত্তম, কিন্তু চিন্তার বিষয় হল এই যে, আমরা অনেক জঘন্য গোনাহ্ করে ফেলেছি। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে আমাদের তওবা কবুল হবে কি? এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(কুরতুবী)

তাই আয়াতের বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক বড় গোনাহ্ এমনকি শিরক ও কুফর থেকে তওবা করলেও তওবা কবুল হয়। সত্যিকার তওবা দ্বারা সবরকম গোনাহ্ই মাফ হতে পারে। তাই আল্লাহ্র রহমত থেকে কারও নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, এই আয়াতটি গোনাহ্‌গারদের জন্যে কোরআনের সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক আয়াত। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ –আয়াতই হল সর্বাধিক আশার আয়াত।

وَاتَّبِعُوْۤا اَحْسَنَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ –এখানে 'উত্তম অবতীর্ণ বিষয়' বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। সমগ্র কোরআনই উত্তম। একে এদিক দিয়েও উত্তম বলা যায় যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ইত্যাদি যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তন্মধ্যে উত্তম ও পূর্ণতম কিতাব হচ্ছে কোরআন।—(কুরতুবী)

اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٥٧﴾ اَوْ
تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ
الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ
وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا
عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ۚ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۖ لَا
يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦١﴾ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَّ
هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿٦٢﴾ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾ قُلْ
اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ
اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللّٰهَ
فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ
قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ
مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾

(৫৭) অথবা না বলে, আল্লাহ্ যদি আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে অবশ্যই আমি পরহেযগারদের একজন হতাম। (৫৮) অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় না বলে, যদি কোনরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাব। (৫৯) হাঁ, তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসেছিল ; অতঃপর তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলে। (৬০) যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কেয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কাল দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নামে নয় কি? (৬১) আর যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকত, আল্লাহ্ তাদেরকে সাফল্যের সাথে মুক্তি দেবেন, তাদেরকে অনিষ্ট স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (৬২) আল্লাহ্ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। (৬৩) আসমান ও যমীনের চাবি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৪) বলুন, হে মূর্খরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের এবাদত করতে আদেশ করছ? (৬৫) আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহ্র শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। (৬৬) বরং আল্লাহ্রই এবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন। (৬৭) তারা আল্লাহ্কে যথার্থরূপে বোঝেনি। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى .... فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ - এই তিনটি আয়াতে সে বিষয়বস্তুরই ব্যাখ্যা ও তাকীদ করা হয়েছে, যা পূর্বেকার তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, কোন বৃহত্তম অপরাধী, কাফের, পাপাচারীরও আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তওবা করলে আল্লাহ্ তার সমস্ত অতীত গোনাহ্ মাফ করে দেন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, তওবার সময় হল মৃত্যুর পূর্বে। মৃত্যুর পরে কেয়ামতের দিন কেউ তওবা করলে অথবা অনুতপ্ত হলে তাতে কোন উপকার হবে না।

কোন কোন কাফের ও পাপাচারী কেয়ামতের দিন বিভিন্ন বাসনা প্রকাশ করবে। কেউ অনুতাপ করে বলবে, হায়, আমি আল্লাহ্র আনুগত্যে কেন শৈথিল্য করেছিলাম! কেউ সেখানেও তকদীরের উপর দোষ চাপিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইবে। সে বলবে, যদি আল্লাহ্ তাআলা আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতাম। কিন্তু আল্লাহ্ পথপ্রদর্শন না করলে আমি কি করব? কেউ বাসনা করবে যে, আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলে আমি পাকাপোক্ত মুসলমান হয়ে যাব এবং আল্লাহ্র বিধানাবলী পুরোপুরি মেনে চলব। কিন্তু তখনকার এসব অনুতাপ ও বাসনা কোন কাজেই আসবে না।

উপরোক্ত তিন রকম বাসনা তিন ধরনের লোকদেরও হতে পারে এবং একই দলের পক্ষ থেকেও হতে পারে। তারা একের পর এক করে তিন রকম বাসনাই ব্যক্ত করবে। কেননা, সর্বশেষ বাসনা, যাতে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এটা আযাব প্রত্যক্ষ করার পরেই হবে। এতে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, পূর্বোক্ত দু'টি বাসনা আযাব প্রত্যক্ষ করার পূর্বেকার। কেয়ামতের দিন শুরুতেই তারা নিজেদের কর্মের ত্রুটিবিচ্যুতি স্মরণ করে বলবে : يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ –এরপর ওযর ও বাহানা করে বলবে, আল্লাহ্ হেদায়েত করলে আমরাও অনুগত মুত্তাকী হয়ে যেতাম। কাজেই আমাদের কি দোষ। এরপর আযাব প্রত্যক্ষ করে বাসনা করবে, আমাদেরকে যদি পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেয়া হত। আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য তিনটি আয়াতে বলে দিয়েছেন, আল্লাহ্র মাগফেরাত ও রহমত খুব বিস্তৃত ; কিন্তু তা লাভ করতে হলে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করতে হবে। আমি এখনই বলে দিচ্ছি—মৃত্যুর পরে যেন তোমরা পরিতাপ না কর এবং এ ধরনের অনর্থক বাসনা প্রকাশ না কর।

بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا আল্লাহ্ তাআলা হেদায়েত করলে আমরা পরহেযগার হয়ে যেতাম—এখানে কাফেরদের এ উক্তির জওয়াব দেয়া হয়েছে। এর সারকথা এই যে, আল্লাহ্ পুরোপুরিই হেদায়েত করেছিলেন এবং কিতাব ও আয়াত প্রেরণ করেছিলেন। তবে হেদায়েত করার পর কাউকে আনুগত্যে বাধ্য করেননি, বরং সত্য ও মিথ্যা যে কোন পথ অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এটাই ছিল বান্দার পরীক্ষা। এর উপরই ছিল তার সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল। সে স্বেচ্ছায় গোমরাহীর পথ অবলম্বন করেছে, এজন্য সে নিজেই দায়ী।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - مَقَالِيْدُ শব্দটি مقلاد অথবা مقليد এর বহুবচন। অর্থ তালার চাবি। কেউ কেউ বলেন, শব্দটি আসলে ফারসী থেকে আরবীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফারসীতে চাবিকে كليد বলা হয়। আরবী রূপান্তর করে প্রথমে একে مَقَالِيْدُ করা হয়েছে। এরপর

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾
وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ
وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتْ
كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾ وَسِيقَ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتّٰى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ
أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ
يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هٰذَا ۚ قَالُوا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٧١﴾
قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى
الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ
حَتّٰى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خٰلِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ
نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِينَ ﴿٧٤﴾

(৬৮) শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। (৬৯) পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে, পয়গম্বরগণ ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে—তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (৭০) প্রত্যেকে যা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা কিছু করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (৭১) কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বর আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং সতর্ক করত এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে? তারা বলবে, হাঁ, কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে। (৭২) বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্যে। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল। (৭৩) যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। (৭৪) তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার।

এর বহুবচন اقليد ব্যবহৃত হয়েছে।—(রূহুল-মা'আনী) চাবি কারও হাতে থাকা তার মালিক ও নিয়ন্ত্রক হওয়ার লক্ষণ। তাই আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, আকাশে ও পৃথিবীতে লুক্কায়িত সকল ভাণ্ডারের চাবি আল্লাহ্র হাতে। তিনিই এগুলোর রক্ষক, তিনিই নিয়ন্ত্রক, যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা, যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন না। হাদীস শরীফে—

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا

قوة الا بالله العلي العظيم —এই কলেমাকে আকাশ ও পৃথিবীর চাবি বলা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল এ কলেমা পাঠ করে, তাকে আল্লাহ্ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের নেয়ামত দান করেন। ইবনে জওযী এ ধরনের রেওয়াতকে মনগড়া বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য হাদীসবিদগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, যা আমলের ফযীলতে ধর্তব্য হতে পারে।—(রূহুল-মা'আনী)

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِينِهِ

কেয়ামতের দিন পৃথিবী আল্লাহ্র মুঠোতে থাকবে এবং আকাশ ভাঁজ করা অবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে। পূর্ববর্তী আলেমগণের মতে আক্ষরিক অর্থেই এমনটি হবে। কিন্তু আয়াতের বিষয়বস্তু مُتَشٰبِهٰتٌ -এর অন্তর্ভুক্ত, যার স্বরূপ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। এর স্বরূপ জানার চেষ্টা করাও সাধারণ লোকের জন্য নিষিদ্ধ। বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্র যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও বিশুদ্ধ। এ আয়াতের বাহ্যিক ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার 'মুঠি' ও 'ডান হাত' আছে। এগুলো দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অথচ আল্লাহ্ তাআলা দেহ ও দেহত্ব থেকে পবিত্র ও মুক্ত। তাই আয়াতের উপসংহারে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোকে নিজেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করো না। আল্লাহ্ এগুলো থেকে পবিত্র سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

পরবর্তী আলেমগণ আলোচ্য আয়াতকে দৃষ্টান্ত ও রূপক সাব্যস্ত করে এর অর্থ করেছেন যে, 'এ বস্তু আমার মুঠিতে ও ডান হাতে, এরূপ বলে রূপক ভঙ্গিতে বোঝানো হয় যে, বস্তুটি পূর্ণরূপে আমার করায়ত্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন। আয়াতে তাই বোঝানো হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ

صعق এর শাব্দিক অর্থ বেহুঁশ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে বেহুঁশ হবে, অতঃপর মারা যাবে। যারা পূর্বেই মৃত, তাদের আত্মা বেহুঁশ হয়ে যাবে।—(বয়ানুল-কোরআন) إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ —দুররে মনসূরের রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই ব্যতিক্রমের মধ্যে চার ফেরেশতা-জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফীল ও আযরাঈল এবং কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও অন্তর্ভুক্ত। তাদের ব্যতিক্রমের অর্থ এই যে, সিংগা ফুঁকের প্রভাবে তাদের মৃত্যু হবে না। কিন্তু পরে তারাও মারা যাবে। আল্লাহ্ ব্যতীত তখন কেউ জীবিত থাকবে না। ইবনে কাসীর এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্যেও সবশেষে আযরাঈলের মৃত্যু হবে। সূরা নমলেও এ ধরনের এক আয়াত বর্ণিত রয়েছে। সেখানে صعق-এর পরিবর্তে فزع শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানেও এর কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَاءِ — অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে হিসাব—

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٥﴾

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٢﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ
وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ
اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿٣﴾ مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا
يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴿٤﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ
الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۠ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۢ بِرَسُوْلِهِمْ
لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾ وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ
كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٦﴾ اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ
حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ
لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ
لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٧﴾

(৭৫) আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন, তারা আরশের চার পাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছে। তাদের সবার মাঝে ন্যায় বিচার করা হবে। বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্‌র।

সূরা আল-মু'মিন

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৮৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু ঃ

(১) হা-মীম—(২) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, (৩) পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবূলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন। (৪) কাফেররাই কেবল আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে। কাজেই নগরীসমূহে তাদের বিচরণ যেন আপনাকে বিভ্রান্তিতে না ফেলে। (৫) তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, আর তাদের পরে অন্য অনেক দলও। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ পয়গম্বরকে আক্রমণ করার ইচ্ছা করেছিল এবং তারা মিথ্যা বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল, যেন সত্যধর্মকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। কেমন ছিল আমার শাস্তি! (৬) এভাবে কাফেরদের বেলায় আপনার পালনকর্তার এ বাক্য সত্য হল যে, তারা জাহান্নামী। (৭) যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

নিকাশের সময় সমস্ত পয়গম্বরগণও উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সাক্ষীও উপস্থিত থাকবে। সাক্ষীগণের এ তালিকায় স্বয়ং পয়গম্বরগণও থাকবেন। যেমন, এক আয়াতে আছে— اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۢ بِشَهِيْدٍ - ফেরেশতাগণও থাকবে। যেমন, কোরআনে আছে— مَعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ —উম্মতে মোহাম্মদীও থাকবে। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ এবং স্বয়ং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও থাকবে। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে— وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ

نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ — উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের নিজেদের প্রাসাদ ও বাগ-বাগিচা তো থাকবেই, উপরন্তু তাদেরকে অন্য জান্নাতীদের কাছে সাক্ষাৎ ও বেড়ানোর জন্যে গমন করার অনুমতিও দেয়া হবে।—(তিবরানী) আবূ নয়ীম ও জিয়ার এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল, ইয়া রসূলাল্লাহ্, আপনার প্রতি আমার ভালবাসা এত সুগভীর যে, বাড়ীতে গেলেও আপনাকেই স্মরণ করি এবং পুনরায় আপনার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরতে পারি না। কিন্তু যখন আমি আমার মৃত্যু ও আপনার ওফাতের কথা স্মরণ করি, তখন বিমর্ষ হয়ে পড়ি। কারণ, মৃত্যুর পর আপনি তো জান্নাতে পয়গম্বরগণের সাথে উচ্চাসনে আসীন থাকবেন, আর আমি জান্নাতে গেলেও নিম্নস্তরেই স্থান পাব। কাজেই আমার চিন্তা এই যে, আপনাকে কিরূপে দেখব? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার কথা শুনে কোন জওয়াব দিলেন না। অবশেষে জিবরাঈল (আঃ) নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে আগমন করলেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ
النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا

এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করতে থাকলে মুসলমানগণ পয়গম্বর ও সিদ্দীক প্রমুখের সঙ্গেই থাকবে। আর আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তারা উচ্চস্তরে গমনাগমনেরও অনুমতি লাভ করবে।

সূরা আল-মু'মিন

সূরার বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত ঃ এখান থেকে সূরা আহকাফ পর্যন্ত সাতটি সূরা 'হা-মীম' বর্ণযোগে শুরু হয়েছে। এগুলোকে আল-হা-মীম' অথবা 'হাওয়ামীম' বলা হয়। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আল-হা-মীম কোরআনের রেশমী বস্ত্র, অর্থাৎ, সৌন্দর্য। মুসইর ইবনে কেদাম বলেন, এগুলিকে عرائس অর্থাৎ, নববধূ বলা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি নির্যাস থাকে, কোরআনের নির্যাস হল আল-হা-মীম অথবা হাওয়ামীম।—(ফাযায়েলুল কোরআন)

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) কোরআনের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এক ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের বসবাসের জন্যে জায়গার খুঁজে বের হল। সে এক শস্য শ্যামল প্রান্তর দেখে খুব আনন্দিত হল। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে হঠাৎ উর্বর বাগ-বাগিচাও দেখতে পেল। এগুলো দেখে সে বলতে লাগল, আমি তো বৃষ্টির প্রথম শ্যামল্য দেখেই বিস্ময় বোধ করছিলাম, এটা তো আরও বিস্ময়কর। এখন বুঝুন, প্রথম শ্যামলের উদাহরণ হল সাধারণ কোরআন। আর উর্বর বাগ-বাগিচা হল আল-হামীম। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এ কারণেই বলেন, আমি যখন

কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে আল-হামীমে পৌঁছি, তখন এতে আমার চিত্ত যেন বিনোদিত হয়ে উঠে।

বিপদাপদ থেকে হেফাযত : মুসনাদ বায্যারে আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে আয়াতুল কুরসী এবং সূরা মুমিনের প্রথম তিন আয়াত إِلَيْهِ الْمَصِيرُ পর্যন্ত পাঠ করবে সে সেদিন যে কোন কষ্ট ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।— (ইবনে কাসীর)

শত্রু থেকে হেফাযত : আবু দাউদ ও তিরমিযীতে হযরত মুহাল্লাব ইবনে আবু সফরাহ্ (রাঃ)-এর সনদে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন এক জেহাদের রাত্রিকালীন হেফাযতের জন্যে বলেছিলেন, রাত্রিতে তোমরা আক্রান্ত হলে حٰمٓ لا ينصرون পড়ে নিও। অর্থাৎ, হা-মীম শব্দ দ্বারা দোয়া করতে হবে যে, শত্রুরা সফল না হোক। কোন কোন রেওয়ায়েতে حٰمٓ لا ينصرون (নূন ব্যতিরেকে) বর্ণিত আছে। এর অর্থ এই যে, তোমরা হা-মীম-বললে শত্রুরা সফল হবে না। এ থেকে জানা গেল যে, হা-মীম শত্রু থেকে হেফাযতের দুর্গ।—(ইবনে কাসীর)

একটি বিস্ময়কর ঘটনা : হযরত সাবেত বেনানী (রহঃ) বলেন, দু'রাকআত নামায পড়ার জন্যে আমি একটি বাগানে গেলাম এবং নামাযের পূর্বে সূরা মুমিনের إِلَيْهِ الْمَصِيرُ পর্যন্ত তিন আয়াত পাঠ করলাম। হঠাৎ দেখি এক ব্যক্তি আমার পেছনে সাদা একটি খচ্চরে সওয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দেহে ছিল এয়ামেনী পোশাক। লোকটি আমাকে বলল, যখন তুমি غَافِرِ الذَّنْبِ পড় তখন তার সাথে এই দোয়াও পাঠ করো ياغافرالذنب اغفرلى অর্থাৎ, হে পাপ ক্ষমাকারী আমাকে ক্ষমা করুন, যখন وَقَابِلِ التَّوْبِ পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো ياقابل التوب اقبل توبتى অর্থাৎ, হে তওবা কবুলকারী, আমার তওবা কবুল করুন, যখন شَدِيدِ الْعِقَابِ পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো ياشديد العقاب لا تعاقبنى অর্থাৎ, হে কঠোর শাস্তিদাতা, আমাকে শাস্তি দেবেন না এবং যখন ذِي الطَّوْلِ পড়, তখন এর সাথে এ দোয়া পাঠ করো ياذا الطول طل على بخير অর্থাৎ, হে অনুগ্রহকারী, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

সাবেত বেনানী বলেন, এ উপদেশ শোনার পর আমি সেদিকে তাকিয়ে তাকে দেখতে পেলাম না। আমি তার খুঁজে বাগানের দরজায় এসে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন এয়ামেনী পোশাক পরিহিত ব্যক্তি এ পথে গিয়েছে কি? সবাই বলল, আমরা এমন কোন লোক দেখিনি।

সমাজ সংস্কারে এসব আয়াতের প্রভাব এবং সংস্কারকদের জন্যে হযরত ওমর ফারূকের এক মহান নির্দেশ : ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেন, সিরিয়ার জনৈক প্রভাবশালী শক্তিধর ব্যক্তি হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর নিকট আসা-যাওয়া করত। কিছুদিন পর্যন্ত তার আগমন বন্ধ থাকায় তিনি লোকদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল, আমিরুল মুমিনীন, তার কথা বলবেন না, সে তো মদ্য পান করে বিভোর হয়ে থাকে। অতঃপর খলীফা তার সচিবকে ডেকে বললেন, তার কাছে এ চিঠি লিখ—

ওমর ইবনে খাত্তাবের পক্ষ থেকে অমুকের পুত্র অমুকের নামে—তোমার প্রতি সালাম। অতঃপর আমি তোমার জন্যে সে আল্লাহ্র প্রশংসা করি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং বড় সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'

অতঃপর তিনি মজলিসে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, সবাই মিলে তার জন্যে দোয়া কর, যেন আল্লাহ্ তাআলা তার মন ফিরিয়ে দেন এবং তার তওবা কবুল হয়। তিনি দূতের হাতে চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, লোকটির নেশার ঘোর না কাটা পর্যন্ত তার হাতে চিঠি দিও না এবং অন্য কারো কাছেও দিও না। লোকটি খলীফার চিঠি পেয়ে তা পাঠ করল এবং চিন্তা করতে লাগল, এতে আমাকে শাস্তির ভয়ও দেখানো হয়েছে এবং ক্ষমা করারও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। অতঃপর সে কান্না শুরু করল এবং এমন তওবা করল যে, জীবনে কখনও আর মদের কাছেও গেল না।

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) এই প্রতিক্রিয়ার সংবাদ পেয়ে বললেন, এ ধরনের ব্যাপারে তোমাদের এমনি করা উচিত। যখন কোন মুসলমান ভাই ভ্রান্তিতে পতিত হয়, তখন তাকে ঠিক পথে আনার চিন্তা করো না, তাকে আল্লাহর রহমতের ভরসা দাও এবং আল্লাহ্র কাছে তার তওবার জন্যে দোয়া কর। তোমরা তার বিপক্ষে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না। অর্থাৎ, তাকে গালমন্দ করে অথবা রাগান্বিত করে যদি দ্বীন থেকে আরও দূরে সরিয়ে দাও, তবে তাই হবে শয়তানের সাহায্য।—(ইবনে কাসী)

যারা সমাজ সংস্কার তথা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করে, তাদের জন্যে এ কাহিনীর মধ্যে মূল্যবান নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তিকে সংশোধন করা উদ্দেশ্য থাকে, তার জন্যে নিজেও দোয়া কর, এরপর কৌশলে তাকে ঠিক পথে আন। তাকে উত্তেজিত করলে কোন ফায়দা তো হবেই না; বরং শয়তানকে সাহায্য করা হবে। শয়তান তাকে আরও পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেবে। এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন :- حٰمٓ কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটা আল্লাহর নাম। কিন্তু পূর্ববর্তী ইমামগণের মতে এসব খণ্ডিত শব্দগুলোই مُتَشَابِهَاتٌ যার একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন ; অথবা এগুলো আল্লাহ্ ও রসূলের মধ্যকার কোন গোপন সংকেত।

غَافِرِ الذَّنْبِ পাপ ক্ষমাকারী ও وَقَابِلِ التَّوْبِ তওবা কবুলকারী – এ দু'টি শব্দ অর্থের দিক দিয়ে এক হলেও আলাদা আলাদা আনা হয়েছে। কারণ, প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্ তাআলা তওবা ব্যতিরেকেও বান্দার পাপ ক্ষমা করতে সক্ষম এবং তওবাকারীদেরকে ক্ষমা করা তাঁর একটি গুণ।

ذِي الطَّوْلِ এর শাব্দিক অর্থ প্রশস্ততা ও ধনাঢ্যতা কিন্তু সামর্থ্য এবং কৃপা ও অনুগ্রহের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।—(মাযহারী)

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا এই আয়াত কোরআন সম্পর্কে বিতর্ককে কুফর সাব্যস্ত করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন :

ان جدالاً فى القران كفر অর্থাৎ, কোরআন সম্পর্কে কোন কোন বিতর্ক কুফর।— (মাযহারী)

এক হাদীসে আছে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দু'ব্যক্তিকে কোরআনের কোন এক আয়াত সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করতে শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে বাইরে চলে আসেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দিয়েছিল।— (মাযহারী)

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ
مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ؕ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ
فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ
اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ﴿١٠﴾ قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا
اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى
خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿١١﴾ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ
كَفَرْتُمْ ۚ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ؕ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ﴿١٢﴾
هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ؕ
وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾ فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ
الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾ رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ
يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ
يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ
مِنْهُمْ شَيْءٌ ؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

(৮) হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৯) এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য। (১০) যারা কাফের তাদেরকে উচ্চৈঃস্বরে বলা হবে, তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের আজকের এ ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র ক্ষোভ অধিক ছিল, যখন তোমাদেরকে ঈমান আনতে বলা হয়েছিল, অতঃপর তোমরা কুফরী করেছিলে। (১১) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দু' বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু' বার জীবন দিয়েছেন। এখন আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতঃপর এখনও নিষ্কৃতির কোন উপায় আছে কি? (১২) তোমাদের এ বিপদ এ কারণে যে, যখন এক আল্লাহ্‌কে ডাকা হত, তখন তোমরা কাফের হয়ে যেতে, আর যখন তাঁর সাথে শরীককে ডাকা হত, তখন তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে। এখন আদেশ তাই, যা আল্লাহ্ করবেন, যিনি সর্বোচ্চ, মহান। (১৩) তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে নাযিল করেন রুযী। চিন্তা-ভাবনা তারাই করে, যারা আল্লাহ্‌র দিকে রুজু থাকে। (১৪) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে খাঁটি বিশ্বাস সহকারে ডাক, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (১৫) তিনিই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মালিক, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তত্ত্বপূর্ণ বিষয়াদি নাযিল করেন, যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে। (১৬) যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র।

উপরোক্ত বিতর্কের অর্থ কোরআনের আয়াতে খুঁত বের করা, অনর্থক সন্দেহ সৃষ্টি করে তাতে বাকবিতণ্ডা করা অথবা কোন আয়াতে এরূপ অর্থ করা, যা অন্য আয়াত ও সুন্নতের পরিপন্থী। এটা কোরআন বিকৃত করার নামান্তর। নতুবা কোন অস্পষ্ট অথবা সংক্ষিপ্ত বাক্যের অর্ত খোঁজা, দুর্বোধ্য বাক্যের সমাধান অন্বেষণ করা অথবা কোন আয়াত থেকে বিধানাবলী চয়ন করার কাজে পারস্পরিক আলোচনা গবেষণা করা উপরোক্ত বিতর্কের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটা পুণ্য কাজ।— (বায়যাভী, কুরতুবী, মাযহারী)

فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ কোরায়শরা শীতকালে এয়ামনে এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফরে যেত। বায়তুল্লাহ্‌র সেবক হওয়ার সুবাদে সমগ্র আরবে তাদের সম্মান ও সুখ্যাতি ছিল। ফলে তারা নিরাপদে সফর করত এবং অগাধ বাণিজ্যিক মুনাফা অর্জন করত। এর মাধ্যমেই তাদের ধনাঢ্যতা ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাদের এই সুখ্যাতি ও প্রভাব কায়েম থাকা তাদের জন্যে গর্ব ও অহংকারের বিষয় ছিল। তারা বলত, আমরা আল্লাহ্‌র কাছে অপরাধী হলে এসব নেয়ামত ও ধনৈশ্বর্য ছিনিয়ে নেয়া হত। এই পরিস্থিতির কারণে কিছুসংখ্যক মুসলমানের মাঝেও সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ তাৎপর্য ও কল্যাণের ভিত্তিতে তাদেরকে সাময়িক অবকাশ দিয়ে দেখেছেন। এতে আপনি অথবা মুসলমানরা যেন ধোঁকায় না পড়েন। সাময়িক অবকাশের পর তারা আযাবে পতিত হবে এবং বর্তমান প্রভাব-প্রতিপত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। বস্তুতঃ বদর যুদ্ধে এর সূচনা হয়ে মক্কা বিজয় পর্যন্ত হয়ে বছরে কোরাইশদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

الَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ আরশ বহনকারী ফেরেশতা বর্তমানে চার জন এবং কেয়ামতের দিন আট জন হয়ে যাবে। আরশের চারপাশে কত ফেরেশতা আছে, তার সংখ্যা আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে তাদের সারির সংখ্যা লাখ পর্যন্ত বর্ণিত আছে তাদেরকে 'কাররুবী' বলা হয়। তারা সবাই আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্যশীল ফেরেশতা। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ ফেরেশতাগণ মুমিনদের জন্যে, বিশেষতঃ যারা গোনাহ্ থেকে তওবা করে এবং শরীয়তের পথে চলে, তাদের জন্যে বিভিন্ন দোয়া করেন। এটা হয় আল্লাহ্ তাআলার আদেশের কারণে, না হয় তাদের স্বভাব ও অভ্যাসই আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের জন্যে দোয়ায় মশগুল থাকা। এ কারণেই হযরত মুতরিফ ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্‌র বন্দাদের মধ্যে মুমিনদের সর্বাধিক হিতাকাঙ্ক্ষী আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ। মুমিনদের জন্যে তাঁরা দোয়া করেন যে, তাদেরকে ক্ষমা করা হোক, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হোক এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল করা হোক।

এতদসঙ্গে তারা এ দোয়াও করেন— وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ — তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা মাগফেরাতের যোগ্য, অর্থাৎ, যারা ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরকেও এদের সাথেই জান্নাতে দাখিল করুন।

এ থেকে জানা গেল যে, মুক্তির জন্যে ঈমান শর্ত। ঈমানের পর অন্যান্য সৎকর্মে মুসলমানদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানগণ নিম্নস্তরের হলেও আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাদের

পূর্বপুরুষগণকেও জান্নাতে তাদের স্তরেই স্থান দেবেন, যাতে তাদের আনন্দ ও সন্তুষ্টি পূর্ণ হয়। কোআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়র (রাঃ) বলেন, মুমিন জান্নাতে পৌছে তার পিতা, পুত্র, ভাই প্রমুখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে যে, তারা কোথায়? তাকে বলা হবে, তারা তোমার মত আমল করেনি। (তাই তারা এখানে পৌছতে পারবে না)। মুমিন বলবে, আমি যে আমল করেছি, তা কেবল নিজের জন্যেই করিনি–তাদের জন্যেও করেছি। এরপর তাদেরকেও জান্নাতে দাখিল করার আদেশ হবে।— (ইবনে–কাসীর)

এ রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, এটা সাহাবীর উক্তি হলেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর উক্তির পর্যায়ভুক্ত। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আয়াতে যে صلاحية তথা যোগ্যতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তার অর্থ শুধু ঈমান, আমলসহ ঈমান নয়।

رَفِيعُ الدَّرَجٰتِ কেউ কেউ درجات –এর অর্থ করেছেন গুণাবলী। অতএব, رَفِيعُ الدَّرَجٰتِ –এর অর্থ তাঁর পূর্ণত্বের গুণাবলী সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। ইবনে কাসীর একে বাহ্যিক আঙ্গিকে রেখে বলেছেন যে, এর অর্থ 'তাঁর মহান আরশ সমুচ্চ'। আল্লাহর আরশ সমস্ত পৃথিবী ও আকাশসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং সবার ছাদস্বরূপ উচ্চ। সূরা মাআরেজে বলা হয়েছে—

مِّنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

এ আয়াত সম্পর্কে ইবনে–কাসীরের গবেষণাপ্রসূত অভিমত এই যে, আয়াতে উল্লিখিত পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণ হল সে দূরত্বের বিশ্লেষণ যা মাটির সপ্তম স্তর থেকে আরশ পর্যন্ত রয়েছে। তাঁর মতে এ ব্যাখ্যা বহু সংখ্যক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তফসীরবিদের কাছে অগ্রগণ্য। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, অনেক আলেমের মতে আল্লাহর আরশ একটি লাল ইয়াকুত প্রস্তর দ্বারা নির্মিত, যার ব্যাস পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্বের সমান। এমনিভাবে তার উচ্চতা মাটির সপ্তম স্তর থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্বের সমান। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, رَفِيعُ الدَّرَجٰتِ –এর অর্থ আল্লাহ্ তাআলা মুমিন–মুত্তাকীদের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী। যেমন, কোরআনের অন্যান্য আয়াতও এর সাক্ষ্য বহন করে। এক আয়াতে আছে, هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ অন্য এক আয়াতে আছে نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ

بٰرِزُونَ – يَوْمَ هُمْ بٰرِزُونَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ –এর মর্ম এই যে, হাশরের ময়দানকে যেহেতু একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেয়া হবে, যাতে কোন পাহাড়, গর্ত অথবা দালান–কোঠা ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না; তাই সবাই উন্মুক্ত ময়দানে দৃষ্টির সামনে থাকবে।

يَوْمَ التَّلَاقِ ও لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ উল্লেখিত আয়াতসমূহে এ বাক্যটি يَوْمَ هُمْ بٰرِزُونَ –এর পরে এসেছে। বলাবাহুল্য, يَوْمَ التَّلَاقِ তথা সাক্ষাত ও সমাবেশের দিন দ্বিতীয় ফুঁকের পরে হবে। এমনিভাবে يَوْمَ هُمْ بٰرِزُونَ –এর ঘটনাও তখন হবে, যখন দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে নতুন ভূপৃষ্ঠ সমতল করে দেয়া হবে, যাতে কোন আড়াল থাকবে না। এরপরে لِمَنِ الْمُلْكُ বাক্যটি আনার কারণে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার এ বাণী দ্বিতীয় ফুঁকের মাধ্যমে সবকিছু পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরে বাস্তবায়িত হবে। কুরতুবী এর সমর্থনে হযরত অবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি এই ঃ সমস্ত মানুষ এমন এক পরিষ্কার ভূ–খণ্ডে একত্রিত হবে, যাতে কেউ কোন গোনাহ্ করেনি। তখন আল্লাহ্র আদেশে এক ঘোষক ঘোষণা করবে, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (আজকের দিনে রাজত্ব কার?)

মুমিন–কাফের নির্বিশেষে সবাই এর জওয়াবে বলবে لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ মুমিনরা তো তাদের বিশ্বাস ও আকীদা অনুযায়ী আনন্দ ও হৃষ্টচিত্তে একথা বলবে। কিন্তু কাফেররা বাধ্য হয়ে দুঃখ সহকারে একথা স্বীকার করবে।

কিন্তু অন্য কোন কোন রেওয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা এ উক্তি তখন করবেন, যখন প্রথম ফুঁকের পর সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং জিবরাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও আযরাঈল প্রমুখ নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণও মৃত্যুবরণ করবেন এবং এক আল্লাহর সত্তা ব্যতীত কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই পরিবেশে আল্লাহ্ বলবেন, 'আজকের দিনে রাজত্ব কার?' তখন যেহেতু কোন জওয়াবদাতা থাকবে না, তাই আল্লাহ্ নিজেই জওয়াব দেবেন ঃ 'প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহ্র।' হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এতে আল্লাহ্ তাআলাই প্রশ্নকারী এবং জওয়াবদাতাও তিনিই। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযীও তাই বলেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও ইবনে ওমর (রাঃ)–এর এ হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়—কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র পৃথিবীকে বাম হাতে এবং সমগ্র আসমানসমূহকে ডান হাতে গুটিয়ে বলবেন, انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون অর্থাৎ, আমিই বাদশাহ্ ও প্রভু, আজ প্রতাপশালী ও অহংকারীরা কোথায়? তফসীর দুররে মনসূরে উল্লেখিত দু'টি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে ; এ প্রশ্নটি উপরোক্ত একবার প্রথম ফুঁৎকারের সময় এবং আর একবার দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সময় দু'বারই হয়তো উচ্চারিত হবে। বয়ানুল–কোরআনে বলা হয়েছে, দু'বার মেনে নেয়ার উপরই কোরআন পাকের তফসীর নির্ভরশীল নয়, বরং এটা সম্ভবপর যে, উল্লেখিত আয়াতে প্রথম ফুঁকের পরবর্তী ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তখন সবাইকে উপস্থিত ধরে নিয়ে এই কলেমা বলা হবে।

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ؕ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ۝ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ۝ وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْۤا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ۝

(১৭) আজ প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। আজ যুলুম নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (১৮) আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপিষ্ঠদের জন্যে কোন বন্ধু নেই এবং সুপারিশকারীও নেই; যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে। (১৯) চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন। (২০) আল্লাহ্ ফয়সালা করেন সঠিকভাবে, আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, তারা কিছুই ফয়সালা করে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (২১) তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে না, যাতে দেখত তাদের পূর্বসুরিদের কি পরিণাম হয়েছে? তাদের শক্তি ও কীর্তি পৃথিবীতে এদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের গোনাহের কারণে ধৃত করেছিলেন এবং আল্লাহ্ থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ হয়নি। (২২) এর কারণ এই যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করত, অতঃপর তারা কাফের হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তাদের ধৃত করেন। নিশ্চয় তিনি শক্তিধর, কঠোর শাস্তিদাতা। (২৩) আমি আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছি (২৪) ফেরাউন, হামান ও কারূনের কাছে, অতঃপর তারা বলল, সে তো জাদুকর, মিথ্যাবাদী। (২৫) অতঃপর মূসা যখন আমার কাছ থেকে সত্যসহ তাদের কাছে পৌছাল ; তখন তারা বলল, যারা তার সঙ্গী হয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা কর, আর তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ। কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থই হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ –অপরের অলক্ষ্যে নর-নারীর প্রতি কামদৃষ্টিতে তাকানো এবং কাউকে দেখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া অথবা অন্যে অনুভব করতে পারে না এমনভাবে তাকানো, এগুলোই দৃষ্টির চুরি। আল্লাহ্ তাআলার কাছে এগুলো গোপন নয়, দেদীপ্যমান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ফেরাউন বংশীয় মুমিন ঃ উপরে স্থানে স্থানে তওহীদ ও রেসালত অস্বীকারকারীদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে কাফেরদের বিরোধিতা ও হঠকারিতা উল্লেখিত হয়েছে। এর ফলে স্বভাবগত কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হতেন। তাঁর সান্ত্বনার জন্যে উপরোক্ত প্রায় দু'রুকূতে হযরত মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এতে ফেরাউন ও ফেরাউন গোত্রের সাথে একজন মহৎ ব্যক্তির দীর্ঘ কথোপকথন উক্ত হয়েছে, যিনি ফেরাউন গোত্রের একজন হওয়া সত্ত্বেও মূসা (আঃ)-এর মোজেযা দেখে ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ঈমান তখন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। কথোপকথনের সময় তার ঈমানও জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

মোকাতেল, সুদ্দী, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, ইনি ফেরাউনের চাচাত ভাই ছিলেন। কিবতী হত্যার ঘটনায় যখন ফেরাউনের দরবারে মূসা (আঃ)-কে পাল্টা হত্যা করার পরামর্শ চলছিল, তখন তিনিই শহরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে মূসা (আঃ)-কে অবহিত করেছিলেন এবং মিসরের বাইরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সূরা কাসাসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى

এই মুমিন ব্যক্তির নাম কেউ কেউ 'হাবীব' বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাবীব সেই ব্যক্তির নাম, যার কাহিনী সূরা ইয়াসীনে ব্যক্ত হয়েছে। সোহায়লীর মতে, এই মুমিন ব্যক্তির নাম 'শামআন'। কেউ কেউ তার নাম 'হিযকীল' বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তাই বর্ণিত আছে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, সিদ্দীক কয়েকজন মাত্র। একজন সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত হাবীব নাজ্জার, দ্বিতীয় ফেরাউন বংশীয় মুমিন ব্যক্তি এবং তৃতীয় হযরত আবু বকর। ইনি সবার শ্রেষ্ঠ।—(কুরতুবী)

يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗ — এ থেকে জানা গেল যে, কেউ জনসমক্ষে তার ঈমান প্রকাশ না করলে এবং অন্তরে পাকাপোক্ত বিশ্বাস পোষণ করলে সে মুমিন বলে গণ্য হবে। কিন্তু কোরআন-হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, ঈমান মকবুল হওয়ার জন্যে কেবল অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়; বরং মুখে স্বীকার করা শর্ত। মৌখিক স্বীকারোক্তি না করা পর্যন্ত কেউ মুমিন হবে না। তবে জনসমক্ষে ঘোষণা করা জরুরী নয়। এর প্রয়োজন কেবল এ জন্যে

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾ يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ۗ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾

(২৬) ফেরাউন বলল; তোমরা আমাকে ছাড়, মূসাকে হত্যা করতে দাও, ডাকুক সে তার পালনকর্তাকে! আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (২৭) মূসা বলল, যারা হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে না এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে আমি আমার ও তোমাদের পালনকর্তার আশ্রয় নিয়ে নিয়েছি। (২৮) ফেরাউন গোত্রের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখত, সে বলল, তোমরা কি একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ্, অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট আগমন করেছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যাবাদিতা তার উপরই চাপবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তির কথা বলছে, তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর পড়বেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না। (২৯) হে আমার কওম, আজ এদেশে তোমাদেরই রাজত্ব, দেশময় তোমরাই বিচরণ করছ; কিন্তু আমাদের আল্লাহ্র শাস্তি এসে গেলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন বলল, আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বোঝাই, আর আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই দেখাই। (৩০) সে মুমিন ব্যক্তি বলল: হে আমার কওম, আমি তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মতই বিপদসঙ্কুল দিনের আশংকা করি। (৩১) যেমন, কওমে নূহ্, আদ, সামূদ ও তাদের পরবর্তীদের অবস্থা হয়েছিল। আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করার ইচ্ছা করেন না। (৩২) হে আমার কওম, আমি তোমাদের জন্যে প্রচণ্ড হাঁক-ডাকের দিনের আশংকা করি,

যে, মানুষ যে পর্যন্ত তার ঈমান সম্বন্ধে জানতে না পারবে, সে পর্যন্ত তার সাথে মুসলমানসুলভ ব্যবহার করতে পারবে না।—(কুরতুবী)

ফেরাউন গোত্রের মুমিন ব্যক্তি তার কথোপকথনে ফেরাউন ও ফেরাউন পরিবারকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সত্য ও ঈমানের দিকে দাওয়াত দেন এবং তাদেরকে মূসা-হত্যার প্রচেষ্টা থেকেও বিরত রাখেন।

وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ — এর تنادى এটা تناد এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থ একে অপরকে ডাক দেয়া। কেয়ামতের দিন প্রচণ্ড ডাকাডাকি হবে বলে একে يَوْمَ التَّنَادِ বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যারা আল্লাহ্ বিরোধী, তারা দণ্ডায়মান হোক। এতে তকদীর অস্বীকারকারীদেরকে বোঝানো হবে। অতঃপর জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে এবং জাহান্নামীরা জান্নাতী ও আ'রাফ-বাসীদেরকে ডেকে কথাবার্তা বলবে। তখন প্রত্যেক ভাগ্যবান ও হতভাগার নাম পিতার নামসহ ডেকে ফলাফল ঘোষণা করা হবে যে, অমুকের পুত্র অমুক ভাগ্যবান ও সফলকাম হয়েছে। এরপর সে কোনদিন হতভাগা হবে না এবং অমুকের পুত্র অমুক হতভাগ্য হয়েছে, অতঃপর সে কখনো ভাগ্যবান হবে না।—(মাযহারী) মুসনাদে বাযযার ও বায়হাকীতে বর্ণিত হযরত আনাসের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের এই ঘোষণা আমল ওজনের পর হবে।

হযরত আবূ হাযেম আ'রাজ (রাঃ) নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন, হে আ'রাজ, কেয়ামতের দিন ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক-তুমি তাদের সাথে দণ্ডায়মান হবে। আবার ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক—তুমি তাদের সাথেও দণ্ডায়মান হবে। আরও ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক—তুমি তখনও দণ্ডায়মান হবে। আমি মনে করি, প্রত্যেক গোনাহের ঘোষণার সময় তোমাকে দণ্ডায়মান হতে হবে। কারণ, তুমি সর্বপ্রকার গোনহ্ই সঞ্চয় করে রেখেছ।—(মাযহারী)

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ
اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ
بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۖ حَتّٰۤى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ
لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ
مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ﴿٣٤﴾ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ
اَتٰىهُمْ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ
اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ
لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْۤ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ
اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۚ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ
عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٧﴾
وَقَالَ الَّذِيْۤ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾
يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۫ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ
الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ
عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

(৩৩) যেদিন তোমরা পেছনে ফিরে পলায়ন করবে; কিন্তু আল্লাহ্ থেকে তোমাদেরকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (৩৪) ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, অতঃপর তোমরা তার আনীত বিষয়ে সন্দেহই পোষণ করতে। অবশেষে যখন সে মারা গেল, তখন তোমরা বলতে শুরু করলে, আল্লাহ্ ইউসুফের পরে আর কাউকে রসূলরূপে পাঠাবেন না। এমনিভাবে আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী, সংশয়ী ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করেন। (৩৫) যারা নিজেদের কাছে আগত কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের একাজ আল্লাহ্ ও মুমিনদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক। এমনিভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক অহংকারী-স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর এঁটে দেন। (৩৬) ফেরাউন বলল, হে হামান, তুমি আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, হয়তো আমি পৌছে যেতে পারব (৩৭) আকাশের পথে, অতঃপর উকি মেরে দেখব মূসার আল্লাহ্‌কে। বস্তুতঃ আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবেই ফেরাউনের কাছে সুশোভিত করা হয়েছিল তার মন্দ কর্মকে এবং সোজা পথ থেকে তাকে বিরত রাখা হয়েছিল। ফেরাউনের চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ারই ছিল। (৩৮) মুমিন লোকটি বলল : হে আমার কওম, তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করব। (৩৯) হে আমার কওম, পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ। (৪০) যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে পুরুষ অথবা নারী মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিযিক দেয়া হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ —অর্থাৎ, তোমরা যখন পেছনে ফিরে প্রত্যাবর্তন করবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে হিসাবের জায়গা থেকে যখন জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, এটা তখনকার অবস্থার বর্ণনা। এর সারমর্ম এই যে, উপরে يَوْمَ التَّنَادِ-এর তফসীরে উল্লেখিত ঘোষণাবলী সমাপ্ত হওয়ার পর তাদেরকে হিসাবের জায়গা থেকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

কোন কোন তফসীরবিদের মতে এটা দুনিয়াতে প্রথম ফুঁকের সময়কার অবস্থা। যখন প্রথম ফুঁক দেয়া হবে এবং পৃথিবী বিদারিত হবে, তখন মানুষ এদিক-ওদিক দৌড়ে পালাতে চাইবে, কিন্তু চতুর্দিকে ফেরেশতাদের পাহারা থাকবে, পলায়নের কোন পথ থাকবে না। তাদের মতে يَوْمَ التَّنَادِ বলতে প্রথম ফুঁকের সময় বোঝানো হয়েছে। তখন চতুর্দিক থেকে আর্তচীৎকার শোনা যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস ও যাহ্হাক থেকে বর্ণিত আয়াতের অপর কেরাত ند থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এটা ند ধাতু থেকে উদগত, যার অর্থ পলায়ন করা। এ তফসীর অনুযায়ী يَوْمَ التَّنَادِ এর অর্থও পলায়নের দিন এবং تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ —এরই ব্যাখ্যা।

তফসীরে মাযহারীতে উদ্ধৃত হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর এক দীর্ঘ হাদীসে কেয়ামতের দিন তিন ফুঁকের উল্লেখ আছে। প্রথম ফুঁকের ফলে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে ব্যস্ততা, অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা দেখা দেবে। একে 'নফখায়ে ফাযা' বলা হয়। দ্বিতীয় ফুঁকের ফলে সবাই বেহুশ হয়ে মারা যাবে। একে 'নফখায়ে ছা'ক' বলা হয়। তৃতীয় ফুঁকের ফলে সবাই পুনরুজ্জীবিত হবে। একে 'নফখায়ে নশর' বলা হয়। প্রথম ফুঁকই দীর্ঘায়িত হয়ে দ্বিতীয় ফুঁকে পরিণত হবে। কাজেই উভয়ের সমষ্টিকেই সাধারণভাবে প্রথম ফুঁক বলা হয়ে থাকে। এ হাদীসেও নফখায়ে ফাযা'র সময় লোকজনের এদিক-ওদিক পলায়নের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, وهو الذى يقول الله عنه يوم التناد — ফলে জানা গেল যে, আয়াতে يَوْمَ التَّنَادِ বলে প্রথম ফুঁকের সময় মানুষের এদিক-ওদিক ব্যাকুল ছুটাছুটি বোঝানো হয়েছে। والله اعلم

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ — অর্থাৎ, ফেরাউন ও হামানের অন্তর যেমন মূসা (আঃ) ও মুমিন ব্যক্তির উপদেশে প্রভাবান্বিত হয়নি, এমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক উদ্ধত, স্বৈরাচারীর অন্তরে মোহর এঁটে দেন। ফলে তাতে ঈমানের নূর প্রবেশ করে না এবং সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারবে না। আয়াতে مُتَكَبِّرٍ ও جَبَّارٍ শব্দদ্বয়কে قَلْبِ -এর বিশেষণ করা হয়েছে। কারণ, সকল নৈতিকতা ও ক্রিয়াকর্মের উৎস হচ্ছে অন্তর। অন্তর থেকেই ভাল-মন্দ কর্ম জন্ম লাভ করে। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের দেহে একটি মাংসপিণ্ড (অর্থাৎ, অন্তর) এমন আছে, যা ঠিক থাকলে সমগ্র দেহ ঠিক থাকে এবং যা নষ্ট হলে সমগ্র দেহ নষ্ট হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا —এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, ফেরাউন তার মন্ত্রী হামানকে আদেশ দিল যে, একটি গগনচুম্বী সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। আমি এতে আরোহণ করে খোদাকে দেখে নিতে চাই। বলাবাহুল্য, এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা কোন স্বল্প বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও করতে পারে না। মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি ফেরাউন যদি বাস্তবিকই এরূপ পরিকল্পনা করে থাকে, তবে এটা তার চরম বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। মন্ত্রীবর যদি এই আদেশ পালন করে থাকে, তবে

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ٤١
تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ
وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ٤٢ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ
اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَلَا فِى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ
اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ٤٣ فَسَتَذْكُرُوْنَ
مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۚ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ
بِالْعِبَادِ ٤٤ فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ
بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ٤٥ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا
غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ
فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ٤٦ وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ
فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ
تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ٤٧
قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ
بَيْنَ الْعِبَادِ ٤٨ وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ
ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ٤٩

(৪১) হে আমার কওম, ব্যাপার কি, আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও জাহান্নামের দিকে (৪২) তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও, যাতে আমি আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করি এবং তাঁর সাথে শরীক করি এমন বস্তুকে, যার কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র দিকে। (৪৩) এতে সন্দেহ নেই যে, তোমরা আমাকে যার দিকে দাওয়াত দাও, ইহকালে ও পরকালে তার কোন দাওয়াত নেই। আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌র দিকে এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামী। (৪৪) আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে রয়েছে। (৪৫) অতঃপর আল্লাহ্ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল। (৪৬) সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর। (৪৭) যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বির্তক করবে, অতঃপর দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা এখন জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে নিবৃত করবে কি? (৪৮) অহংকারীরা বলবে, আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ফয়সালা করে দিয়েছেন। (৪৯) যারা জাহান্নামে আছে, তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বল, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব লাঘব করে দেন।

এটা 'হবু রাজার গবু মন্ত্রীরই' বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কোন রাজ্যাধিপতির তরফ থেকে এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা আশা করা যায় না। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটা ফেরাউনও জানত যে, যত উচ্চ প্রাসাদই নির্মাণ করা হোক না কেন, তা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। কিন্তু সে লোকজনকে বোকা বানানো ও দেখানোর জন্যে এ কাণ্ড করেছিল। কোন সহীহ্ ও শক্তিশালী রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, এরূপ কোন আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, এই সুউচ্চ নির্মাণকাজ শুরু করা হয়েছিল। যা উচ্চতায় পৌঁছা মাত্রই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۚ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

–এটা স্বগোত্রকে সত্যের দিকে আহ্বান করার উদ্দেশে মুমিন ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আজ তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত করছ না, কিন্তু আযাব যখন তোমাদেরকে গ্রাস করবে, তখন আমার কথা স্মরণ করবে। তবে সে স্মরণ নিষ্ফল হবে। এই দীর্ঘ কথোপকথন, উপদেশ ও দাওয়াতের ফলে যখন মুমিন ব্যক্তির ঈমান জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন তিনি ভাবনায় পড়লেন যে, তারা তার প্রতি নির্যাতন চালানোর চেষ্টা করবে। তাই বললেন, আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করেছি। তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষক। মোকাতেল বলেন, তাঁর ধারণা অনুযায়ী ফেরাউন গোত্রের লোকেরা তাঁর প্রতি নির্যাতনে তৎপর হলে তিনি পাহাড়ের দিকে পালিয়ে তাদের নাগালের বাইরে চলে যান। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তাকে ফেরাউন গোত্রের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং খোদ ফেরাউন গোত্রকে কঠোর আযাব গ্রাস করে নিল। মুমিন ব্যক্তিকে রক্ষা করার বিশদ বিবরণ কোরআন পাকে উল্লেখিত হয়নি। কিন্তু ভাষাদৃষ্টে জানা যায় যে, ফেরাউন গোত্র তাকে হত্যা করার ও কষ্ট দেয়ার জন্যে অনেক ষড়যন্ত্র করেছিল। ফেরাউন গোত্র যখন সলিল সমাধি লাভ করল, তখন এই মুমিন বান্দাকে মূসা (আঃ)–এর সাথে রক্ষা করা হয়, এরপর পরকালের মুক্তি তো বলাই বাহুল্য।

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا

اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ–এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, ফেরাউন গোত্রের আত্মাসমূহকে কাল পাখীর আকৃতিতে প্রত্যহ সকাল–সন্ধ্যা দু'বার জাহান্নামের সামনে হাযির করা হয় এবং জাহান্নামকে দেখিয়ে বলা হয়, এটা তোমাদের আবাসস্থল।–(মাযহারী)

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকে কবর জগতে সকাল–সন্ধ্যা সে স্থান দেখানো হয়, যেখানে কেয়ামতের হিসাব–নিকাশের পর সে পৌঁছবে। সে স্থান দেখিয়ে প্রত্যহ তাকে বলা হয়, তুমি অবশেষে এখানে পৌঁছবে। কেউ জান্নাতী হলে তাকে জান্নাতের স্থান এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামের স্থান দেখানো হয়।

قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۭ قَالُوْا بَلٰى ۭ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰۗؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝٥٠ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۝٥١ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْۗءُ الدَّارِ ۝٥٢ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ الْكِتٰبَ ۝٥٣ هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ۝٥٤ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝٥٥ اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝٥٦ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٥٧ وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ڏ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْۗءُ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝٥٨

(৫০) রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রসূল আসেননি? তারা বলবে হাঁ। রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দোয়া কর। বস্তুতঃ কাফেরদের দোয়া নিষ্ফলই হয়। (৫১) আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে। (৫২) সেদিন যালেমদের ওযর-আপত্তি কোন উপকারে আসবে না, তাদের জন্যে থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্যে থাকবে মন্দ গৃহ। (৫৩) নিশ্চয় আমি মূসাকে হেদায়েত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম। (৫৪) বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশ ও হেদায়েতস্বরূপ। (৫৫) অতএব, আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (৫৬) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের কাছে আগত কোন দলীল ব্যতিরেকে, তাদের অন্তরে আছে কেবল আত্মম্ভরিতা, যা অর্জনে তারা সফল হবে না। অতএব, আপনি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (৫৭) মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টি কঠিনতর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না। (৫৮) অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং কুকর্মী। তোমরা অল্পই অনুধাবন করে থাক।

কবরের আযাব ঃ কবরের আযাব যে সত্য, উপরোক্ত আয়াত তার প্রমাণ। এছাড়া অনেক মুতাওয়াতের হাদীস এবং 'উম্মতের ইজমা' এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا — এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাঁর রসূল ও মুমিনগণকে সাহায্য করেন ইহকালেও এবং পরকালেও। বলাবাহুল্য, এ সাহায্য কেবল শত্রুদের বিরুদ্ধেই সীমিত। অধিকাংশ পয়গম্বরের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কিন্তু কোন কোন পয়গম্বর যেমন, ইয়াহ্ইয়া, যাকারিয়া ও শোয়ায়ব (আঃ)-কে শত্রুরা শহীদ করেছে এবং কতককে দেশান্তরিত করেছে। যেমন, ইবরাহীম ও খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সাঃ)। তাঁদের ক্ষেত্রে আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের ব্যাপারে সন্দেহ হতে পারে।

ইবনে কাসীর ইবনে জরীরের বরাত দিয়ে এর জওয়াব দেন যে, আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের অর্থ শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ, তা পয়গম্বরগণের বর্তমানে তাঁদেরই হাতে হোক, কিংবা তাঁদের ওফাতের পরে হোক। এর অর্থ কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই সমস্ত পয়গম্বর ও মুমিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পয়গম্বর-হত্যাকারীদের আযাব ও দুর্দশার বর্ণনা দ্বারা ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। হযরত ইয়াহ্ইয়া, যাকারিয়া ও শোয়ায়ব (আঃ)-এর হত্যাকারীদের উপর বহিঃশত্রু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে হত্যা করেছে। নমরূদকে আযাব দেয়া হয়েছে। ঈসা (আঃ)-এর শত্রুদের উপর আল্লাহ্ তাআলা রোমকদের চাপিয়ে দেন। তারা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছে। কেয়ামতের প্রাক্কালে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে শত্রুদের উপর প্রবল করবেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শত্রুদেরকে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের হাতেই পরাভূত করেছেন। তাদের বড় বড় সরদার নিহত হয়েছে, কিছু বন্দী হয়েছে এবং অবশিষ্টরা মক্কা বিজয়ের দিন গ্রেফতার হয়েছে। অবশ্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর ধর্মই জগতের সমস্ত ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং তাঁর জীবদ্দশায়ই সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ —যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে। অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন। সেখানে পয়গম্বর ও মুমিনগণের জন্যে আল্লাহ্‌র সাহায্য বিশেষভাবে প্রকাশ লাভ করবে।

اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ —অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে বিতর্ক করে। উদ্দেশ্য এ ধর্মকে অস্বীকার করা। এর কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, তাদের অন্তরে অহংকার রয়েছে। তারা বড়ত্ব চায় এবং নির্বুদ্ধিতাবশতঃ মনে করে যে, তাদের ধর্মে কায়েম থাকলে এ বড়ত্ব অর্জিত হতে পারে। এ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হবে। কোরআন পাক বলে দিয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত তারা তাদের কল্পিত বড়ত্ব ও নেতৃত্ব লাভ করতে পারবে না।—(কুরতুবী)

إِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾ اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ
لٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ ۘ لَّا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذٰلِكَ
يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾ اللّٰهُ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ
فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ ذٰلِكُمُ
اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ ﴿٦٤﴾ هُوَ
الْحَيُّ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٦٥﴾ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ
مِنْ رَّبِّي ۡ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٦٦﴾

(৫৯) কেয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৬০) তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার এবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে। (৬১) তিনিই আল্লাহ্, যিনি রাত্র সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্যে এবং দিবসকে করেছেন দেখার জন্যে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। (৬২) তিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা, সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? (৬৩) এমনিভাবে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়, যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। (৬৪) আল্লাহ্ পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্যে বাসস্থান, আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন পরিচ্ছন্ন রিযিক। তিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা। বিশ্বজগতের পালনকর্তা, আল্লাহ্ বরকতময়। (৬৫) তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকে ডাক তাঁর খাঁটি এবাদতের মাধ্যমে। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ্র। (৬৬) বলুন, যখন আমার কাছে আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে, তখন আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যার পূজা কর, তার এবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্ব পালনকর্তার অনুগত থাকতে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

দোয়ার স্বরূপ ঃ দোয়ার শাব্দিক অর্থ ডাকা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রয়োজনে ডাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও যিকরকেও দোয়া বলা হয়। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বিশেষ সম্মানের কারণে এই আয়াতে তাদেরকে দোয়া করার আদেশ করা হয়েছে এবং তা কবূল করার ওয়াদা করা হয়েছে। যারা দোয়া করে না, তাদের জন্যে শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

কা'বে আহবার থেকে বর্ণিত আছে, পূর্ব যুগে কেবল পয়গম্বর–গণকেই বলা হত, দোয়া করুন ; আমি কবূল করব। এখন এই আদেশ সকলের জন্যে ব্যাপক করে দেয়া হয়েছে এবং এটা উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য।—ইবনে কাসীর)

এ আয়াতের তফসীরে নো'মান ইবনে বশীর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, ان الدعاء هو العبادة অর্থাৎ, দোয়াই এবাদত। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।—(ইবনে কাসীর)

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আরবী ব্যাকরণিক নিয়মে ان الدعاء هو العبادة বাক্যের এক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, এবাদতেরই নাম দোয়া। অর্থাৎ, প্রত্যেক দোয়াই এবাদত। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, প্রত্যেক এবাদতই দোয়া। এখানে অর্থ এই যে, শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে দোয়া ও এবাদত যদিও পৃথক পৃথক, কিন্তু উভয়ের ভাবার্থ এক। অর্থাৎ, প্রত্যেক দোয়াই এবাদত এবং প্রত্যেক এবাদতই দোয়া। কারণ এই যে, এবাদত বলা হয় কারও সামনে চূড়ান্ত দীনতা অবলম্বন করাকে। বলাবাহুল্য, নিজেকে কারও মুখাপেক্ষী মনে করে তার সামনে সওয়ালের হস্ত প্রসারিত করা বড় দীনতা, যা এবাদতের অর্থ। এমনিভাবে প্রত্যেক এবাদতের সারমর্মও আল্লাহ্র কাছে মাগফেরাত ও জান্নাত তলব করা এবং ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করা। এ কারণেই এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি আমার হাম্দ ও প্রশংসায় এমন মশগুল হয় যে, নিজের প্রয়োজন চাওয়ারও অবসর পায় না, আমি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশী দেব। (অর্থাৎ, তার অভাব পূরণ করে দেব।) তিরমিযী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে ঃ

من شغله القران عن مسألتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াতে এমনিভাবে মশগুল হয় যে, আমার কাছে প্রয়োজন চাওয়ারও সময় পায় না, আমি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশী দেব। এ থেকে বোঝা গেল যে, প্রত্যেক এবাদতই দোয়ার মত ফায়দা দেয়।

আরাফাতের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আরাফাতে আমার দোয়া ও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের দোয়া এই কলেমা ঃ

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علیٰ

كل شئ قدير –এতে এবাদত ও যিকরকে দোয়া বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে দোয়া অর্থে এবাদত বর্জনকারীকে জাহান্নামের শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে, যদি সে অহংকারবশতঃ বর্জন করে। কেননা, অহংকারবশতঃ দোয়া বর্জন করা কুফরের লক্ষণ, তাই সে জাহান্নামের

যোগ্য হয়ে যায়। নতুবা সাধারণ দোয়া ফরয বা ওয়াজিব নয়। দোয়া না করলে গোনাহ্ হয় না। তবে দোয়া করা সমস্ত আলেমের মতে মোস্তাহাব ও উত্তম এবং হাদীস অনুযায়ী বরকত লাভের কারণ।—(মাযহারী)

দোয়ার ফযীলত ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কাছে দোয়া অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোন বিষয় নেই।—(তিরমিযী)

তিনি আরও বলেন, الدعاء مخ العبادة দোয়া এবাদতের মগজ।—(তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা যাচ্ঞা ও প্রার্থনা পছন্দ করেন। অভাব-অনটনের সময় সচ্ছলতার জন্যে দোয়া করে রহমত প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করা সর্ববৃহৎএবাদত।—(তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে তার প্রয়োজন প্রার্থনা করে না, আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হন।—(তিরমিযী)

তফসীরে মাযহারীতে এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, দোয়া না করার কারণে আল্লাহ্র গযবের হুমকি তখন প্রযোজ্য, যখন কেউ নিজেকে বড় ও বেপরোয়া মনে করে দোয়া ত্যাগ করে। إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, তোমরা দোয়া করতে অপারক হয়ো না ; কেননা, দোয়াসহ কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।—(ইবনে হাব্বান)

এক হাদীসে আছে, দোয়া মুমিনের হাতিয়ার, ধর্মের স্তম্ভ এবং আকাশ ও পৃথিবীর নূর।—(হাকেম)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যার জন্যে দোয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, তার জন্য রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। নিরাপত্তা প্রার্থনা করা অপেক্ষা কোন পছন্দনীয় দোয়া আল্লাহ্র কাছে করা হয়নি।—(তিরমিযী) عافيت তথা 'নিরাপত্তা' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ। এতে অনিষ্ট থেকে হেফাযত ও প্রত্যেক অভাব-অনটন পূরণই অন্তর্ভুক্ত।

কোন গোনাহ্ অথবা সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া করা হারাম। এরূপ দোয়া কবুল হয় না।

দোয়া কবুলের ওয়াদা ঃ উপরোক্ত আয়াতে ওয়াদা রয়েছে যে, বান্দা আল্লাহ্র কাছে যে দোয়া করে, তা কবুল হয়। কিন্তু মানুষ মাঝে মাঝে দোয়া কবুল না হওয়াও প্রত্যক্ষ করে। এর জওয়াবে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, মুসলমান আল্লাহ্র কাছে যে দোয়াই করে, আল্লাহ্ তা দান করেন, যদি তা কোন গোনাহ অথবা সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না হয়। দোয়া কবুল হওয়ার উপায় তিনটি। তন্মধ্যে কোন না কোন উপায়ে দোয়া কবুল হয়। (এক) যা চাওয়া হয়, তাই পাওয়া। (দুই) প্রার্থিত বিষয়ের পরিবর্তে পরকালের কোন সওয়াব ও পুরস্কার দান করা এবং (তিন) প্রার্থিত বিষয় না পাওয়া। কিন্তু কোন সম্ভাব্য আপদ-বিপদ সরে যাওয়া।—(মাযহারী)

দোয়া কবুলের শর্ত ঃ উপরোক্ত আয়াতে বাহ্যতঃ কোন শর্ত উল্লেখ নেই। এমন কি মুসলমান হওয়াও দোয়া কবুলের শর্ত নয়। কাফের ব্যক্তির দোয়াও আল্লাহ্ তাআলা কবুল করেন। ইবলীস কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার দোয়া করেছিল। আল্লাহ্ তাআলা তা কবুল করেছেন। দোয়ার জন্যে কোন সময় এবং ওযু শর্ত নয়। তবে নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে কোন কোন বিষয়কে দোয়া কবুলের পথে বাধা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, কোন কোন লোক খুব সফর করে এবং আকাশের দিকে হাত তুলে 'ইয়া রব' 'ইয়া রব' বলে দোয়া করে ; কিন্তু তাদের পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পন্থায় অর্জিত। এমতাবস্থায় তাদের দোয়া কিরূপে কবুল হবে?—(মুসলিম)

এমনিভাবে অসাবধান বেপরোয়া ও অন্যমনস্কভাবে দোয়ার বাক্যাবলী উচ্চারণ করলে তাও কবুল হয় না বলেও হাদীসে বর্ণিত আছে।—(তিরমিযী)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্র নেয়ামত ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের কতিপয় নিদর্শন পেশ করে তওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا — চিন্তা করুন, নিদ্রা কত বড় নেয়ামত। আল্লাহ্ তাআলা সকল শ্রেণীর মানুষ বরং জন্তু-জানোয়ারকে পর্যন্ত স্বভাবগতভাবে নিদ্রার একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সে সময়টিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে নিদ্রার উপযোগী করে দিয়েছেন। এখন রাত্রিবেলায় নিদ্রা আসা সকলেরই স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত করে দেয়া হয়েছে। নতুবা মানুষ কাজ-কারবারের জন্যে যেমন নিজ নিজ স্বভাব ও সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্দিষ্ট করে, নিদ্রাও যদি তেমনি ইচ্ছাধীন ব্যাপার হত এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে নিদ্রার পরিকল্পনা করত, তবে নিদ্রিতরাও নিদ্রার সুখ পেত না এবং জাগ্রতদেরেও কাজ-কারবারের শৃঙ্খলা বজায় থাকত না। কারণ, মানুষের প্রয়োজন পারস্পরিক জড়িত থাকে। বিভিন্ন সময়ে নিদ্রা গেলে জাগ্রতদের সেই কাজ, যা নিদ্রিতদের সাথে জড়িত, বিঘ্নিত হয়ে যেত এবং নিদ্রিতদের সেই কাজও পণ্ড হয়ে যেত, যা জাগ্রতদের সাথে জড়িত। যদি কেবল মানুষের নিদ্রার সময় নির্দিষ্ট থাকত এবং জন্তু-জানোয়ারের নিদ্রার সময় ভিন্ন হত, তবুও মানুষের কাজের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হত।

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ -মানুষের আকৃতি আল্লাহ্ তাআলা সকল প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট করে গঠন করেছেন। তাকে চিন্তা ও হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি দিয়েছেন। সে হস্ত-পদ দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র ও শিল্পসামগ্রী তৈরী করে নিজের সুখের ব্যবস্থা করে নেয়। তার পানাহারও সাধারণ জন্তু-জানোয়ার থেকে স্বতন্ত্র। জন্তু-জানোয়াররা মুখে ঘাস খায় ও পান করে আর মানুষ হাতে সাহায্যে করে। সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য এক জাতীয়, কেউ শুধু মাংস খায়, কেউ ঘাস ও লতা-পাতা খায়। কিন্তু মানুষ তার খাদ্যকে বিভিন্ন প্রকার বস্তু, ফল-মূল, তরি-তরকারী, মাংস ও মসলা দ্বারা মুখরোচক ও স্বাদযুক্ত করে খায়। এক এক ফল দ্বারা রকমারী খাদ্য-আচার, মোরব্বা ও চাটনী তৈরী করে খায়।

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾

(৬৭) তিনিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা, অতঃপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, অতঃপর জমাট রক্ত দ্বারা, অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর, অতঃপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারও কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিত কালে পৌছ এবং তোমরা যাতে অনুধাবন কর। (৬৮) তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। যখন তিনি কোন কাজের আদেশ করেন, তখন একথাই বলেন, 'হয়ে যা'—তা হয়ে যায়। (৬৯) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা কোথায় ফিরছে? (৭০) যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে। অতএব, সত্বরই তারা জানতে পারবে, (৭১) যখন বেড়ি ও শৃঙ্খল তাদের গলদেশে পড়বে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে (৭২) ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে, (৭৩) অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, কোথায় গেল যাদেরকে তোমরা শরীক করতে (৭৪) আল্লাহ্ ব্যতীত? তারা বলবে, তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে; বরং আমরা তো ইতিপূর্বে কোন কিছুর পূজাই করতাম না। এমনিভাবে আল্লাহ্ কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করেন। (৭৫) এটা এ কারণে যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ-উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা ঔদ্ধত্য করতে। (৭৬) প্রবেশ কর তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্যে। কত নিকৃষ্ট দাম্ভিকদের আবাসস্থল! (৭৭) অতএব আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতঃপর আমি কাফেরদেরকে যে শাস্তির ওয়াদা দেই, তার কিয়দংশ যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই অথবা আপনার প্রাণ হরণ করে নেই, সর্বাবস্থায় তারা তো আমারই কাছে ফিরে আসবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ — এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, জাহান্নামীদেরকে প্রথমে حميم অর্থাৎ, ফুটন্ত পানিতে ও পরে جحيم অর্থাৎ, জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ থেকে আরও জানা যায় যে, حميم জাহান্নামের বাইরের কোন স্থান, যার ফুটন্ত পানি পান করানোর জন্যে জাহান্নামীদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। সূরা সাফফাতের আয়াত ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ থেকেও তাই জানা যায়। কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় যে, جحيم ও حميم একই স্থান এবং حميم-এর মধ্যেই جحيم অবস্থিত। আয়াতটি এই ঃ

هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ

এতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হামীমও জাহান্নামের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

চিন্তা করলে জানা যায় যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। জাহান্নামেরই অনেক স্তরে বিভিন্ন প্রকার আযাব থাকবে। এর মধ্যে এক স্তর হামীম অর্থাৎ, ফুটন্ত পানিরও থাকবে। স্বতন্ত্র ও আলাদা হওয়ার কারণে একে জাহান্নামের বাইরেও বলা যায় এবং জাহান্নামেরই এক স্তর হওয়ার কারণে একে জাহান্নামও বলা যায়। ইবনে-কাসীর বলেন, জাহান্নামীদেরকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় কখনও টেনে হামীমে এবং কখনও জাহীমে নিক্ষেপ করা হবে।

قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا – অর্থাৎ, জাহান্নামে পৌছে মুশরিকরা বলবে — আমাদের উপাস্য প্রতিমা ও শয়তান আজ উধাও হয়ে গেছে। অর্থাৎ, আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, যদিও তারা জাহান্নামের কোন কোণে পড়ে আছে। তারাও যে জাহান্নামেই থাকবে, এ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ —

فرح — بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ -এর অর্থ আনন্দিত ও উল্লসিত হওয়া এবং مرح -এর অর্থ দম্ভ করা, অর্থ-সম্পদের অহংকারী হয়ে অপরের অধিকার খর্ব করা। مرح সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় ও হারাম। পক্ষান্তরে مرح অর্থাৎ, আনন্দ যদি ধন-সম্পদের নেশায় আল্লাহকে ভুলে গোনাহের কাজ দ্বারা হয়, তবে হারাম ও না-জায়েয। আলোচ্য আয়াতে এই আনন্দই বোঝানো হয়েছে। কারূনের কাহিনীতেও مرح এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে–

لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ — অর্থাৎ, আনন্দ-উল্লাস করো না। আল্লাহ্ তাআলা আনন্দ-উল্লাসকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আনন্দ-উল্লাসের আরেক স্তর হল পার্থিব নেয়ামত ও সুখকে আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও দান মনে করে তজ্জন্যে আনন্দ প্রকাশ করা। এটা জায়েয, মোস্তাহাব বরং আদিষ্ট কর্তব্য। এ আনন্দ সম্পর্কে কোরআন বলে, فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا অর্থাৎ, এ কারণে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। আলোচ্য আয়াতে مرح -কে সর্বাবস্থায় আযাবের কারণ বলা হয়েছে এবং فرح -এর সাথে بِغَيْرِ الْحَقِّ কথাটি যুক্ত করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, অন্যায় ও অবৈধ ভোগের মাধ্যমে আনন্দ করা হারাম এবং ন্যায় ও বৈধ ভোগের কারণে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আনন্দিত হওয়া এবাদত ও সওয়াবের কাজ।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ —এ আয়াত থেকে জানা যায়

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ
وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ
هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ
لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَ
لِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ
تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿٨١﴾
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَ
آثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾
فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ
وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا
قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾
فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ اللَّهِ
الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

(৭৮) আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি। আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন নিয়ে আসা কোন রসূলের কাজ নয়। যখন আল্লাহ্র আদেশ আসবে, তখন ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৭৯) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোন কোনটিকে বাহন হিসাবে ব্যবহার কর এবং কোন কোনটিকে ভক্ষণ কর। (৮০) তাতে তোমাদের জন্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। আর এজন্যে সৃষ্টি করেছেন; যাতে সেগুলোতে আরোহণ করে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার। এগুলোর উপর এবং নৌকার উপর তোমরা বাহিত হও। (৮১) তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান। অতএব, তোমরা আল্লাহ্র কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? (৮২) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। তারা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী এবং শক্তি ও কীর্তিতে অধিক প্রবল ছিল, অতঃপর তাদের কর্ম তাদেরকে কোন উপকার দেয়নি। (৮৩) তাদের কাছে যখন তাদের রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, তখন তারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমার দম্ভ প্রকাশ করেছিল। তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছিল, তাই তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছিল। (৮৪) তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, আমরা এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম, তাদেরকে পরিহার করলাম। (৮৫) অতঃপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল। আল্লাহ্র এ নিয়মই পূর্ব থেকে তাঁর বন্দাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে কাফেররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সানন্দে কাফেরদের আযাবের অপেক্ষা করছিলেন। তাই তাঁর সান্ত্বনার জন্যে আয়াতে বলা হয়েছে, আপনি সবর করুন। আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের আযাবের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে—আপনার জীবদ্দশায় অথবা ওফাতের পরে। কাফেরদের আযাবে অপেক্ষা করা বাহ্যতঃ 'রহমাতুল্লিল আলামীন' (বিশ্বজগতের জন্যে রহমত) গুণের পরিপন্থী। কিন্তু অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়ার লক্ষ্য যদি নির্যাতিত-নিরপরাধ মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়, তবে অপরাধীদেরকে সাজা দেয়া দয়া ও অনুকম্পার পরিপন্থী নয়। কোন অপরাধীকে শাস্তি দেয়া কারও মতেই দয়ার পরিপন্থীরূপে গণ্য হয় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ —অর্থাৎ, এই অপরিণামদর্শী কাফেরদের কাছে যখন আল্লাহ্র পয়গম্বরগণ তওহীদ ও ঈমানের স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করলেন, তখন তারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমাকে পয়গম্বরগণের জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও সত্য মনে করে পয়গম্বরগণের উক্তি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হল। কাফেররা যে জ্ঞান নিয়ে গর্বিত ছিল, সেটা হয় তাদের নিরেট মূর্খতা ছিল। অর্থাৎ, তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য মনে করে একেই জ্ঞান-গরিমারূপে আখ্যায়িত করেছিল, না হয় এর অর্থ ছিল পার্থিব ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মের জ্ঞান। এতে বাস্তবিকই তারা পারদর্শী ছিল। গ্রীক দার্শনিকদের 'ইলাহিয়্যাত' সম্পর্কিত অধিকাংশ জ্ঞান ও গবেষণা প্রথমোক্ত নিরেট মূর্খ শ্রেণীর জ্ঞান-গরিমার দৃষ্টান্ত। তাদের এসব জ্ঞানের কোন দলীল নেই। এগুলোকে জ্ঞান বলা জ্ঞানের অবমাননা বৈ নয়। কাফেরদের পার্থিব জ্ঞানের উল্লেখ কোরআন পাক সূরা রূমে এভাবে করেছে — يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ অর্থাৎ, তারা পার্থিব জীবন ও তার উপকার অর্জনের বিষয়ে তো কিছু জানে, বোঝে; কিন্তু পরকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন, যেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে এবং যেখানকার সুখ ও দুঃখ চিরস্থায়ী। আলোচ্য আয়াতেও যদি দুনিয়ার বাহ্যিক জ্ঞান, অর্থ নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কেয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে এবং পরকালের সুখ ও কষ্ট সম্পর্কে অজ্ঞ উদাসীন, তাই নিজেদের বাহ্যিক জ্ঞানে আনন্দিত ও বিভোর হয়ে পয়গম্বরগণের জ্ঞানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না।— (মাযহারী)

فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ ... অর্থাৎ, আযাব সম্মুখে আসার পর তারা ঈমান আনছে। এ সময়কার ঈমান আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় ও ধর্তব্য নয়। হাদীসে আছে— يقبل الله توبة العبد مالم يغرغر অর্থাৎ, মুমূর্ষু অবস্থা ও মৃত্যু কষ্ট শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা বন্দার তওবা কবুল করেন। মৃত্যু কষ্ট শুরু হলে পর তওবা করলে কবুল হয় না। এমনিভাবে আসমানী আযাব সামনে এসে যাওয়ার পর কারও তওবা ও ঈমান কবুল হয় না।

সূরা মু'মিন সমাপ্ত

سورة حٰم السجدة مكية وهي اربع وخمسون اية وست ركوعات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۝ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝ قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ۗ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ۗ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۗ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ۝

সূরা হা-মীম সেজদাহ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৫৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্র নামে শুরু—

(১) হা-মীম, (২) এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। (৩) এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কোরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য, (৪) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনে না। (৫) তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্ণে আছে বোঝা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব, আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। (৬) বলুন, আমিও তোমাদের মতই মানুষ, আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ, অতএব তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ, (৭) যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে। (৮) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। (৯) বলুন, তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু' দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থির কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। (১০) তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন— পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্যে। (১১) অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধূম্রকুঞ্জ, অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম।

সূরা হা-মীম সেজদাহ

পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের জন্যে **'আল-হা-মীম'** অথবা **'হাওয়ামীম'** নামক সাতটি সূরার নামের সাথে আরও কিছু শব্দ সংযোজন করা হয়। উদাহরণতঃ সূরা মু'মিনের হামীমকে **'হা-মীম' আল-মু'মিন'** এবং আলোচ্য সূরার হা-মীমকে 'হা-মীম আস্‌সাজদাহ' অথবা হা-মীম 'ফুস্‌সিলাত'ও বলা হয়। এ সূরার এ দু'টি নাম সুবিদিত।

এ সূরার প্রথম সম্বোধনের পাত্র আরবের কোরায়শ গোত্র, তাদের সামনে কোরআন নাযিল হয়েছে এবং তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। তারা কোরআনের অলৌকিকতা প্রত্যক্ষ করেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অসংখ্য মো'জেযা দেখেছে। এতদসত্ত্বেও তারা কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা, শ্রবণ করাও পছন্দ করেনি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শুভেচ্ছামূলক উপদেশের জওয়াবে অবশেষে তারা বলে দিয়েছে, আপনার কথাবার্তা আমাদের বুঝে আসে না, আমাদের অন্তর এগুলো কবুল করে না এবং আমাদের কানও এগুলো শুনতে প্রস্তুত নয়। আপনার ও আমাদের মাঝখানে অন্তরাল আছে। সুতরাং এখন আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন।

সূরার প্রথম পাঁচ আয়াতের ভাবার্থ তাই। এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে কোরায়শকে উদ্দেশ করে বলেছেন, কোরআন আরবী ভাষায় তোমাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর বিষয়বস্তু বুঝতে তোমাদের বেগ পেতে না হয়। এতদসঙ্গে কোরআনের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ - تفصيل -এর আসল অর্থ বিষয়বস্তু পৃথক পৃথকভাবে বিবৃত করা, এখানে উদ্দেশ্য খুলে খুলে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা — পৃথকভাবে হোক কিংবা একত্রে। কোরআন পাকের আয়াতসমূহে বিধানাবলী, কাহিনী, বিশ্বাস, মিথ্যাপন্থীদের খণ্ডন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বস্তু আলাদা আলাদাও বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয়বস্তুকে উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোরআন পাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশেষণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। অর্থাৎ, যারা মেনে চলে, তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখের সুসংবাদ এবং যারা মেনে চলে না, তাদেরকে অনন্ত আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে।

এসব বিশেষণ বর্ণনা করে পরিশেষে لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, কোরআন পাকের আরবী ভাষায় নাযিল হওয়া, স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়া এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হওয়া— এসব বিষয় তাদের জন্যে উপকারী হতে পারে, যারা চিন্তা-ভাবনা ও হৃদয়ঙ্গম করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আরব কোরায়শরা এসব সত্ত্বেও কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে—হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা, শোনাও পছন্দ করেনি। فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ আয়াতে তাই উল্লেখিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে কাফেরদের একটি প্রস্তাব ঃ আলোচ্য সূরায় কোরায়শ কাফেরদের প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রাথমিক যুগে বলপূর্বক ইসলামী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে ভীত-সন্ত্রস্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু ইসলাম তাদের মর্জির বিপরীতে দিন দিন সমৃদ্ধ ও শক্তিশালীই হয়েছে। প্রথমে ওমর ইবনে খাত্তাবের ন্যায় অসম সাহসী বীর পুরুষ ইসলামে দাখিল হন। অতঃপর সর্বজনস্বীকৃত কোরায়শ সরদার

হামযা মুসলমান হয়ে যান। ফলে কোরায়শ কাফেররা ভীতি প্রদর্শনের পথ পরিত্যাগ করে প্রলোভন ও প্ররোচনার মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার কৌশল চিন্তা করতে শুরু করে। এমনি ধরনের এক ঘটনা হাফেয ইবনে কাসীর মুসনাদে বাযযার, আবু ইয়া'লা ও বগভীর রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এসব রেওয়ায়েতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকায় ইবনে কাসীর বগভীর রেওয়ায়েতকে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাস্তবের নিকটবর্তী সাব্যস্ত করেছেন। এ সবের পর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের কিতাব 'আস-সীরত' থেকে ঘটনাটি উদ্ধৃত করে একে সব রেওয়ায়েতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই এস্থলে ঘটনাটি ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী বলেন, আমার কাছে রেওয়ায়েত পৌছেছে যে, কোরাইশ সরদার ওতবা ইবনে রবীয়া একদিন একদল কোরাইশসহ মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিল। অপরদিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মসজিদের এক কোণে একাকী বসেছিলেন। ওতবা তার সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা যদি মত দাও, তবে আমি মুহাম্মদের সাথে কথাবার্তা বলি। আমি তার সামনে কিছু লোভনীয় বস্তু পেশ করব। যদি সে কবুল করে, তবে আমরা সেসব বস্তু তাকে দিয়ে দেব — যাতে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত্ত হয়। এটা তখনকার ঘটনা, যখন হযরত হামযা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইসলামের শক্তি দিন দিন বেড়ে চলছিল। ওতবার সঙ্গীরা সমস্বরে বলে উঠল, হে আবুল ওলীদ, (ওতবার ডাকনাম,) আপনি অবশ্যই তার সাথে আলাপ করুন।

ওতবা সেখান থেকে উঠে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে গেল এবং কথাবার্তা শুরু করল ঃ প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র ! আপনি জানেন, কোরাইশ বংশে আপনার অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। আপনার বংশ সুদূর বিস্তৃত এবং আমরা সবাই আপনার কাছে সম্মানার্হ। কিন্তু আপনি জাতিকে এক গুরুতর সংকটে জড়িত করে দিয়েছেন। আপনার আনীত দাওয়াত জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছে, তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে, তাদের উপাস্য দেবতা ও ধর্মের গায়ে কলঙ্ক আরোপ করেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছে। এখন আপনি আমার কথা শুনুন। আমি কয়েকটি বিষয় আপনার সামনে পেশ করছি, যাতে আপনি কোন একটি পছন্দ করে নেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, আবুল ওলীদ, বলুন, আপনি কি বলতে চান। আমি শুনব।

আবুল ওলীদ বলল ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র! যদি আপনার পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ অর্জন করা হয়, তবে আমরা ওয়াদা করছি, আপনাকে কোরাইশ গোত্রের সেরা বিত্তশালী করে দেব। আর যদি শাসনক্ষমতা অর্জন করা লক্ষ্য হয়, তবে আমরা আপনাকে কোরাইশের প্রধান সরদার মেনে নেব এবং আপনার আদেশ ব্যতীত কোন কাজ করব না। আপনি রাজত্ব চাইলে আমরা আপনাকে রাজারূপেও স্বীকৃতি দেব। পক্ষান্তরে যদি কোন জিন অথবা শয়তান আপনাকে দিয়ে এসব কাজ করায় বলে আপনি মনে করেন এবং আপনি সেটাকে বিতাড়িত করতে অক্ষম হয়ে থাকেন, তবে আমরা আপনার জন্যে চিকিৎসক ডেকে আনব; সে আপনাকে এই কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার আমরাই বহন করব। কেননা, আমরা জানি, মাঝে মাঝে জিন অথবা শয়তান মানুষকে কাবু করে ফেলে এবং চিকিৎসার ফলে তা সেরে যায়।

ওতবার এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আবুল ওলীদ ! আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে কি? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, এবার আমার কথা শুনুন। সে বলল, অবশ্যই শুনব।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কোন জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে আলোচ্য সূরা 'ফুসসিলাত' তেলাওয়াত করতে শুরু করে দিলেন। বাযযার ও বগভীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তেলাওয়াত করতে করতে যখন فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ পর্যন্ত পৌছলেন, তখন ওতবা তাঁর মুখে হাত রেখে দিল এবং বংশ ও আত্মীয়তার কসম দিয়ে বলল, আমার প্রতি দয়া করুন, আর পাঠ করবেন না। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তেলাওয়াত শুরু করলে ওতবা চুপচাপ শুনতে থাকে এবং হাতের পিঠ পিছনে লাগিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেজদার আয়াতে পৌছে সেজদা করলেন এবং ওতবাকে বললেন ঃ আবুল ওলীদ ! আপনি যা শুনবার শুনলেন। এখন আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। ওতবা সেখান থেকে উঠে তার লোকজনের দিকে চলল। তারা দূর থেকে ওতবাকে দেখে পরস্পর বলতে লাগল, আল্লাহ্র কসম, আবুল ওলীদের মুখমণ্ডল বিকৃত দেখা যাচ্ছে। সে যে মুখ নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিল, সে মুখ আর নেই। ওতবা মজলিসে পৌছলে সবাই বলল, বলুন, কি খবর আনলেন। ওতবা বলল, খবর এই ঃ

আল্লাহ্র কসম ! আমি এমন কালাম শুনেছি, যা জীবনে কখনও শুনিনি। আল্লাহ্র কসম, সেটা জাদু নয়, কবিতা নয় এবং অতীন্দ্রিয়-বাদীদের শয়তান থেকে অর্জিত কথাও নয়। হে কোরায়শ সম্প্রদায়, তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং ব্যাপারটি আমার কাছে সোপর্দ কর। আমার মতে তোমরা তার মোকাবেলা ও তাঁকে নির্যাতন করা থেকে সরে আস এবং তাঁকে তাঁর কাজ করতে দাও। কেননা, তাঁর এই কালামের এক বিশেষ পরিণতি প্রকাশ পাবেই। তোমরা এখন অপেক্ষা কর। অবশিষ্ট আরবদের আচরণ দেখে যাও। যদি তারাই কোরায়শের সহযোগিতা ব্যতীত তাঁকে পরাভূত করে ফেলে, তবে বিনা শ্রমেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর সে যদি সবার উপর প্রবল হয়ে যায়, তবে তার রাজত্ব হবে তোমাদেরই রাজত্ব; তার ইযযত হবে তোমাদেরই ইযযত। তখন তোমরাই হবে তার সাফল্যের অংশীদার।

তার সঙ্গীরা তার একথা শুনে বলল, আবুল ওলীদ, তোমাকে তো মুহাম্মদ কথা দিয়ে জাদু করেছে। ওতবা বলল, আমারও অভিমত তাই। এখন তোমাদের যা মন চায়, তাই কর।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ – এ ক্ষেত্রে কাফেরদের তিনটি উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। এক, আমাদের অন্তরে পর্দা পড়ে আছে, ফলে আমরা আপনার কথা বুঝতে পারি না। দুই, আমাদের কান বধির, ফলে আপনার কথা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না এবং তিন, আমাদের ও আপনার মাঝখানে অন্তরাল রয়েছে। কোরআন এসব উক্তি নিন্দার ছলে উদ্ধৃত করেছে। ফলে এসব উক্তি ভ্রান্ত মনে হয়। কিন্তু অন্যত্র কোরআন নিজেই তাদের এরূপ অবস্থা বর্ণনা করেছে। সূরা আনআমের আয়াতে আছে— وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا –এমনি ধরনের আয়াত সূরা বনী-ইসরাঈল ও সূরা কাহ্ফেও রয়েছে।

এর জওয়াব এই যে, কাফেরদের এরূপ বলার উদ্দেশ্য ছিল একথা বোঝানো যে, আমরা অক্ষম ও অপারক, আমাদের অন্তরে আবরণ, কানে ছিপি এবং আপনার ও আমাদের মধ্যবর্তী অন্তরাল আছে। এমতাবস্থায় আমরা কিরূপে আপনার কথা শুনব ও মানব? কোরআন তাদের অবস্থা

বর্ণনা করে তাদেরকে অক্ষম ও অপারক সাব্যস্ত করেনি, বরং এর সারমর্ম এই যে, তাদের মধ্যে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ শ্রবণ করার ও বোঝবার পূর্ণ যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তারা যখন সেদিকে কর্ণপাত করল না এবং বোঝবার ইচ্ছাও করল না, তখন শাস্তিস্বরূপ তাদের উপর অমনোযোগিতা ও মূর্খতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তাও ইচ্ছাশক্তি ছিনিয়ে নিয়ে নয়, বরং এখনও তারা ইচ্ছা করলে শোনার ও বোঝার যোগ্যতা ফিরে আসবে। — (বয়ানুল-কোরআন)

কাফেরদের অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পয়গম্বরসুলভ জওয়াব ঃ কাফেররা তাদের অন্তরের উপর আবরণ ও কানে ছিপি থাকার কথা স্বীকার করে একথা বোঝায়নি যে, তারা বাস্তবিকই নির্বোধ ও বধির, বরং এটা ছিল এক প্রকার ঠাট্টা। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এই পাশবিক ঠাট্টা-বিদ্রূপের এ জওয়াব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের মোকাবেলায় কোন কঠোর কথা বলবেন না, বরং বিনয়ের সাথে বলুন, আমি আল্লাহ্ নই যে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারব, বরং আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। পার্থক্য এই যে, আল্লাহ্ ওহী প্রেরণ করে আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন এবং ওহীর সমর্থনে বিভিন্ন মো'জেযা দান করেছেন। এর ফলে তোমাদের উচিত ছিল আমার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। এখন আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা এবাদত ও আনুগত্যে একমাত্র আল্লাহ্র অভিমুখী হয়ে যাও এবং অতীত গোনাহের জন্যে তওবা করে নাও।

শেষ বাক্যে সুসংবাদদান ও সতর্ককরণের উভয় দিক তাদের সামনে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, মুশরিকদের জন্যে রয়েছে চরম দুর্ভোগ এবং মু'মিনদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী সওয়াব। মুশরিকদের দুর্ভোগের কারণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, لَا يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ অর্থাৎ, তারা যাকাত প্রদান করে না। এতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথম এই যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ, আর যাকাত ফরয হওয়ার আদেশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, ফরয হওয়ার পূর্বেই কাফেরদেরকে যাকাত প্রদান না করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা কিরূপে সঙ্গত হয়েছে?

ইবনে-কাসীর এর জওয়াবে বলেন যে, আসলে যাকাত প্রাথমিক যুগেই নামাযের সাথে ফরয হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুয্যাম্মিলের আয়াতে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু নেসাবের বিবরণ এবং আদায় করার ব্যবস্থাপনা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই একথা বলা ঠিক নয় যে, মক্কায় যাকাত ফরয ছিল না।

কাফেররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট কিনা ঃ দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অনেক ফেকাহ্‌বিদের মতে কাফেররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট নয়। অর্থাৎ, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের বিধানাবলী তাদের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। তাদের প্রতি আরোপিত আদেশ এই যে, তারা প্রথমে ঈমান গ্রহণ করবে। ঈমানের পরে ফরয কর্মসমূহের বিধান আসবে। অতএব, তাদের উপর যখন যাকাতের আদেশ আরোপিত নয়, তখন এটা না করার কারণে তারা শাস্তির পাত্র হবে কেন?

জওয়াব এই যে, অনেক ফেকাহ্‌বিদের মতে কাফেররাও শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট। তাঁদের মতে আয়াতে কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। যারা কাফেরদেরকে আদিষ্ট বলে গণ্য করেন না, তারা বলতে পারেন যে, আয়াতে যাকাত না দেয়ার কারণে নিন্দা করা হয়নি; বরং তাদের যাকাত না দেয়ার ভিত্তি ছিল কুফর এবং যাকাত না দেয়া কুফরেরই আলামত ছিল। তাই তাদেরকে শাসানোর সারমর্ম এই যে, তোমরা মু'মিন হলে যাকাত প্রদান করতে। তোমাদের দোষ মু'মিন না হওয়া। — (বয়ানুল-কোরআন)

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ইসলামী বিধানাবলীর মধ্যে নামায সর্বাগ্রে। এর উল্লেখ না করে বিশেষভাবে যাকাতের উল্লেখ করার রহস্য কি? কুরতুবী প্রমুখ এর জওয়াবে বলেন যে, কোরায়শ ছিল ধনাঢ্য সম্প্রদায়। দান-খয়রাত ও গরীবের সাহায্য করা তাদের বিশেষ গুণ ছিল। কিন্তু যারা মুসলমান হয়ে যেত, কোরায়শরা তাদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক সাহায্য থেকেও বঞ্চিত করত। এর নিন্দা করার জন্যেই বিশেষভাবে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে।

لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ — مَمْنُونٍ শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন ও সৎকর্মীদেরকে পরকালে স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার দেয়া হবে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ এই করেছেন যে, মু'মিন ব্যক্তির অভ্যস্ত আমল কোন সময় কোন অসুস্থতা, সফর কিংবা অন্য কোন ওযরবশতঃ তরক হয়ে গেলেও সে আমলের পুরস্কার ব্যাহত হয় না; বরং আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করেন, আমার বান্দা সুস্থ অবস্থায় অথবা অবসর সময়ে যে আমল নিয়মিত করত, তার ওযর অবস্থায় সে আমল না করা সত্ত্বেও তার আমলনামায় তা লিখে দাও। এ বিষয়বস্তুর হাদীস সহীহ্ বোখারীতে হযরত আবু মুসা আশআরী থেকে, শরহুস্‌সুন্নায় হযরত ইবনে ওমর ও আনাস (রাঃ) থেকে এবং রাযীনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। — (মাযহারী)

আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদেরকে তাদের শিরক ও কুফরের কারণে এক সাবলীল ভঙ্গিতে হুশিয়ার করা উদ্দেশ্য। এতে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিগুণ তথা বিরাটকায় আকাশ ও পৃথিবীকে অসংখ্য রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করার বিশদ বিবরণ দিয়ে তাদেরকে এই বলে শাসানো হয়েছে যে, তোমরা এমন নির্বোধ যে, মহান স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমানের সাথেও অপরকে শরীক সাব্যস্ত কর? এমনি ধরনের হুশিয়ারী ও বিবরণ সূরা বাক্বারার তৃতীয় রুকূতে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে—

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

সূরা বাক্বারার এসব আয়াতে সৃষ্টির দিন নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং বিবরণও দেয়া হয়নি। আলোচ্য আয়াতসমূহে এগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবী কোন্‌টির পর কোন্‌টি এবং কোন্ কোন্ দিনে সৃজিত হয়েছে ঃ বয়ানুল কোরআনে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয় এমনিতে কোরআন পাকে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বহু জায়গায় বিবৃত হয়েছে, কিন্তু কোন্‌টির পরে কোন্‌টি সৃজিত হয়েছে, এর উল্লেখ সম্ভবতঃ মাত্র তিন আয়াতে করা হয়েছে — (এক), — হা-মীম সাজদার আলোচ্য আয়াত, (দুই) – সূরা বাক্বারায় উল্লেখিত আয়াত এবং (তিন) — সূরা নাযেয়াতের নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ۚ بَنٰىهَا ۞ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ۞ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ۞ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ۞ اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ۞ وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا

বাহ্যদৃষ্টিতে এসব বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু বিরোধও দেখা যায়। কেননা, সূরা বাক্বারা ও সূরা হা-মীম সেজদার আয়াত থেকে জানা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে এবং সূরা নাযেয়াতের আয়াত থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, আকাশ সৃজিত হওয়ার পরে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে। সবগুলো আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আমার মনে হয় যে, প্রথমে পৃথিবীর উপকরণ সৃজিত হয়েছে। এমতাবস্থায়ই ধূম্রকুঞ্জের আকারে আকাশের উপকরণ নির্মিত হয়েছে। এরপর পৃথিবীকে বর্তমান আকারে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এতে পর্বতমালা, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর আকাশের তরল ধূম্রকুঞ্জের উপকরণকে সপ্ত আকাশে পরিণত করা হয়েছে। আশা করি সবগুলো আয়াতই এই বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বাকী প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। —(বয়ানুল কোরআন – সূরা বাক্বারা)

সহীহ্ বোখারীতে এ আয়াতের অধীনে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। তাতে হযরত ইবনে আব্বাস এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাই মাওলানা থানভী (রহঃ) উপরে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরে উদ্ধৃত এর ভাষা নিম্নরূপঃ

মদীনার ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে রবিবার ও সোমবার দিন, পর্বতমালা ও খনিজ দ্রব্যাদি মঙ্গলবার দিন, উদ্ভিদ, ঝরণা, অন্যান্য বস্তুনিচয় ও জনশূন্য প্রান্তর বুধবার দিন সৃষ্টি করেন। এতে মোট চার দিন সময় লাগে। আলোচ্য سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে। অতঃপর বললেন, এবং বৃহস্পতিবার দিন আকাশ সৃষ্টি করেন। আর শুক্রবার তারকারাজি, সূর্য, চন্দ্র ও ফেরেশতা সৃজিত হয়। শুক্রবার দিনের তিন প্রহর বাকী থাকতে এসব কাজ সমাপ্ত হয়। এই প্রহরত্রয়ের দ্বিতীয় প্রহরে সম্ভাব্য বিপদাপদ সৃষ্টি করা হয় এবং তৃতীয় প্রহরে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। তাঁকে জান্নাতে স্থান দেয়া হয় এবং ইবলীসকে আদেশ করা হয় আদমের উদ্দেশে সেজদা করতে। ইবলীস অস্বীকার করলে তাকে জান্নাত থেকে বহিস্কার করা হয়। এসব কাজ তৃতীয় প্রহরের শেষ পর্যন্ত সমাপ্তি লাভ করে। — (ইবনে-কাসীর)

ইবনে-কাসীরের মতে হাদীসটি غريب (অর্থাৎ, তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত।)

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবু হোরায়রার বাচনিক এক রেওয়ায়েতে জগৎ সৃষ্টির শুরু শনিবার থেকে ব্যক্ত হয়েছে। এই হিসাব মতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সাত দিনে হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু কোরআনের আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, এই সৃষ্টিকাজ ছয় দিনে হয়েছে। এক আয়াত আছেঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ

– অর্থাৎ, আমি আকাশ পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। এ কারণে হাদীসবিদগণ উপরোক্ত রেওয়ায়েতটি অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ রেওয়ায়েতটিকে কা'বে আহবারের উক্তি বলেও অভিহিত করেছেন। — (ইবনে-কাসীর)

ইবনে-আব্বাসের বাচনিক প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতও ইবনে-কাসীরের মতে অগ্রাহ্য। এর এক কারণ এই যে, এতে আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির সাথে শুক্রবারের শেষ প্রহরে এবং একই প্রহরেই সেজদার আদেশ ও ইবলীসকে জান্নাত থেকে বহিষ্কারের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে।

অথচ কোরআনের একাধিক আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, আদম সৃষ্টির ঘটনা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির অনেক পরে হয়েছে। তখন পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং জিন ও শয়তানরা সেখানে বসবাসরত ছিল। সে সময়েই বলা হয়েছিল اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً — (মাযহারী)

সারকথা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিনকাল ও ক্রম সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহের মধ্য থেকে কোনটিকেই কোরআনের ন্যায় অকাট্য ও নিশ্চিত বলা যায় না। বরং এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ইবনে-কাসীর মুসলিম ও নাসাঈর বর্ণনা সম্পর্কেও তাই বলেছেন। তাই কোরআনের আয়াতকেই মূলভিত্তি সাব্যস্ত করে উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা উচিত। আয়াতসমূহকে একত্রিত করার ফলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু মাত্র ছয় দিনে সৃজিত হয়েছে। সূরা হা-মীম সেজদার আয়াত থেকে দ্বিতীয়তঃ জানা যায় যে, পৃথিবী, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ইত্যাদি সৃষ্টিতে পূর্ণ চার দিন লেগেছে। তৃতীয়তঃ জানা যায় যে, আকাশমণ্ডলীর সৃজনে দু'দিন ব্যয়িত হয়েছে। এতে পূর্ণ দু'দিনের বর্ণনা নাই, বরং পুরোপুরি দু'দিন না লাগারও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সর্বশেষ দিন শুক্রবারের কিছু অংশ বেঁচে গিয়েছিল। এসব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই বোঝা যায় যে, ছয় দিনের মধ্য থেকে প্রথম চার দিন পৃথিবী সৃজনে এবং অবশিষ্ট দু'দিন আকাশ সৃজনে ব্যয়িত হয়েছে এবং পৃথিবী আকাশের পূর্বে সৃজিত হয়েছে। কিন্তু সূরা নাযেয়াতের আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ করা হয়েছে। তাই বয়ানুল-কোরআনের বক্তব্য অবান্তর নয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির কাজ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দু'দিনে পৃথিবী ও তার উপরিভাগের পর্বতমালা ইত্যাদির উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর দু'দিনে সপ্ত আকাশ সৃজিত হয়েছে। এরপর দু'দিনে পৃথিবীর বিস্তৃতি ও তৎমধ্যবর্তী পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, নদ-নদী, ঝরণা ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পন্ন করা হয়েছে। এভাবে পৃথিবী সৃষ্টির চার দিন উপর্যুপরি রইল না। সূরা হা-মীম সেজদার আয়াতে প্রথমে خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলে মুশরিকদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে। অতঃপর আলাদা করে বলা হয়েছে — وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ —এতে তফসীরবিদগণ একমত যে, এই চার দিন প্রথমোক্ত দু'দিনসহ, পৃথক চার দিন নয়। নতুবা সর্বমোট আট দিন হয়ে যাবে, যা কোরআনের বর্ণনার বিপরীত।

এখন চিন্তা করলে জানা যায় যে, خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ বলার পর

যদি পর্বতমালা ইত্যাদির সৃষ্টিও দু'দিনে বলা হত, তবে মোট চারদিন আপনা-আপনিই জানা যেত, কিন্তু কোরআন পাক পৃথিবী সৃষ্টির অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করে বলেছে, এ হল মোট চার দিন। এতে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই চার দিন উপর্যুপরি ছিল না; বরং দু'ভাগে বিভক্ত ছিল — দু'দিন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে এবং দু'দিন তার পরে। আয়াতের خلق فيها رواسى من فوقها বাক্যে আকাশ সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا — ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্যে পৃথিবীতে পর্বতমালা সৃজিত হয়েছে। কোরআনের একাধিক আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। এর জন্যে পর্বতমালাকে পৃথিবীর উপরিভাগে সুউচ্চ করে স্থাপন করা জরুরী ছিল না; বরং ভূগর্ভেও স্থাপন করা যেত। কিন্তু পর্বতমালাকে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে স্থাপন করা এবং মানুষ ও জীব-জন্তুর নাগালের বাইরে উচ্চ করার মধ্যে পৃথিবীবাসীর জন্য হাজারো বরং অসংখ্য উপকারিতা ছিল। তাই আয়াতে مِن فَوْقِهَا বলে এই নেয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ — اقوات শব্দটি قوت -এর বহুবচন। অর্থ রিযিক, রুযী, খাদ্য। মানুষের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল দ্রব্যসামগ্রীও এর অন্তর্ভুক্ত। — (যাদুল-মাসীর)

হযরত হাসান ও সুদ্দী এ আয়াতের তফসীরে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর প্রতি অংশে তার অধিবাসীদের উপযোগী রিযিক ও রুযী নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নির্দিষ্ট করার অর্থ এই যে, প্রত্যেক ভূ-খণ্ডে নির্দিষ্ট বস্তুসমূহ নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। এর ফলে প্রত্যেক ভূ-খণ্ডের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। প্রত্যেক ভূ-খণ্ডে তার অধিবাসীদের মেজায ও রুচি মোতাবেক বিভিন্ন প্রকার খনিজ দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে।

এতে প্রত্যেক ভূ-খণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ বিভিন্নরূপ হয়েছে। কোন ভূ-খণ্ডে গম, কোন ভূ-খণ্ডে চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য রয়েছে। কোথাও তুলা, কোথাও পাট, কোথাও সেব, আঙ্গুর এবং কোথাও আম এবং কলা উৎপন্ন হতে দেখা যায়। ইকরিমা ও যাহ্হাকের উক্তি অনুযায়ী এতে এ উপকারও আছে যে, বিশ্বের সব দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। কোন ভূ-খণ্ডই অন্য ভূ-খণ্ডের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। পারস্পরিক স্বার্থের উপরই পারস্পরিক সহযোগিতার মজবুত প্রাচীর নির্মিত হতে পারে। ইকরিমা বলেন, কোন কোন ভূ-খণ্ডে লবণ স্বর্ণের ন্যায় ওজন করেও বিক্রয় করা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে যেন তার অধিবাসীদের খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক ইত্যাদি প্রয়োজনের একটি মহা-গুদামে পরিণত করে দিয়েছেন। এতে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ও বসবাসকারী কোটি কোটি মানুষ ও অসংখ্য জীব-জন্তুর প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যসামগ্রী রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীর গর্ভে এগুলো বৃদ্ধি পাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কেয়ামত পর্যন্ত নির্গত হতে থাকবে। মানুষের কাজ এই যে, সে এগুলো ভূ-গর্ভ থেকে বের করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবে। অতঃপর سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ বাক্যটি অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ-এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থ এই যে, এসব মহান সৃষ্টি ঠিক চার দিনে সমাপ্ত হয়েছে। সাধারণের পরিভাষায় যাকে চার বলে দেয়া হয়, তা কোন সময় চার থেকে কম ও কোন সময় চার থেকে কিছু বেশীও হয়ে থাকে। কিন্তু ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে তাকে চারই বলে দেয়া হয়। আয়াতে سَوَاءً শব্দ যোগ করে এই সম্ভাবনা নাকচ করে বলা হয়েছে যে, একাজ পূর্ণ চার দিনেই হয়েছে। لِّلسَّائِلِينَ -এর অর্থ এই যে, যারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের জন্যে এই গণনা। ইবনে-জরীর ও দুররে-মনসূরে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীরা এই জিজ্ঞাসা করেছিল। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, এসব সৃষ্টি ঠিক চার দিনে হয়েছে। —(ইবনে-কাসীর, কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী)

ইবনে-যায়েদ প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ ... وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا لِّلسَّائِلِينَ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। তারা سائلين -এর অর্থ নিয়েছেন, প্রত্যাশী ও অভাবী। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী তাদের উপকারার্থ সৃষ্টি করা হয়েছে। যারা এগুলোর প্রত্যাশী ও অভাবী। প্রত্যাশী ও অভাবী ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে অপরের কাছে সওয়ালের হাত বাড়ায়। তাই তাকে سائلين বলে ব্যক্ত করা হয়েছে—(বাহ্রে-মুহীত)

ইবনে-কাসীর এ তফসীর উদ্ধৃত করে বলেন, এটা কোরআনের এ আয়াতের অনুরূপ اعطاكم من كل ما سالتموه অর্থাৎ, তোমরা যা চেয়েছ, তা সবই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন। এখানেও চাওয়ার অর্থ অভাবী হওয়া। চাওয়াই শর্ত নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এসব বস্তু তাদেরকেও দিয়েছেন, যারা চায়নি।

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ কোন কোন তফসীরবিদের মতে, আকাশ ও পৃথিবীকে এই আদেশ দেয়া এবং প্রত্যুত্তরে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করা আক্ষরিক অর্থে নয়; বরং রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেক আদেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত দেখা গেছে। কিন্তু ইবনে আতিয়্যা ও অন্যান্য অনুসন্ধানী তফসীরবিদ বলেন যে, এখানে কোন রূপক অর্থ নাই; বরং আক্ষরিক অর্থেই বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সম্বোধন বোঝার চেতনা, অনুভূতিও সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং জওয়াব দেয়ার জন্যে তাদেরকে বাকশক্তিও দান করা হয়েছিল। তফসীরে বাহ্রে-মুহীতে এ তফসীরকেই উত্তম বলা হয়েছে।

ইবনে কাসীর এ তফসীর উদ্ধৃত করে কারও কারও এ উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, পৃথিবীর পক্ষ থেকে এই জওয়াব সেই ভূ-খণ্ড দিয়েছিল, যার উপর বায়তুল্লাহ্ নির্মিত হয়েছে এবং আকাশের সেই অংশ জওয়াব দিয়েছিল, যা বায়তুল্লাহ্র বরাবরে অবস্থিত এবং যাকে ''বায়তুল-মামুর'' বলা হয়।

فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِیْ یَوْمَیْنِ وَاَوْحٰی فِیْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا
وَزَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیْحَ ۖ وَحِفْظًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ
الْعَلِیْمِ ﴿١٢﴾ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ
عَادٍ وَّثَمُوْدَ ﴿١٣﴾ اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَیْنِ اَیْدِیْهِمْ وَمِنْ
خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ۚ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓىِٕكَةً
فَاِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾ فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِی
الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؕ اَوَلَمْ یَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ
الَّذِیْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَكَانُوْا بِاٰیٰتِنَا یَجْحَدُوْنَ ﴿١٥﴾
فَاَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیْحًا صَرْصَرًا فِیْۤ اَیَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِیْقَهُمْ
عَذَابَ الْخِزْیِ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰی وَهُمْ
لَا یُنْصَرُوْنَ ﴿١٦﴾ وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَیْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰی عَلَی الْهُدٰی
فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿١٧﴾ وَ
نَجَّیْنَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ ﴿١٨﴾ وَیَوْمَ یُحْشَرُ اَعْدَآءُ
اللّٰهِ اِلَی النَّارِ فَهُمْ یُوْزَعُوْنَ ﴿١٩﴾ حَتّٰۤی اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ
عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿٢٠﴾

(১২) অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দু' দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা। (১৩) অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামূদের আযাবের মত (১৪) যখন তাদের কাছে রসূলগণ এসেছিলেন সম্মুখ দিক থেকে এবং পেছন দিক থেকে এ কথা বলতে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও পূজা করো না। তারা বলেছিল, আমাদের পালনকর্তা ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন, অতএব, আমরা তোমাদের আনীত বিষয় অমান্য করলাম। (১৫) যারা ছিল আদ, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর? বস্তুতঃ তারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করত। (১৬) অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আযাব আস্বাদন করানোর জন্যে তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু বেশ কতিপয় অশুভ দিনে। আর পরকালের আযাব তো আরও লাঞ্ছনাকর এমতাবস্থায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। (১৭) আর যারা সামূদ, আমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছিলাম, অতঃপর তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পছন্দ করল। অতঃপর তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আযাবের বিপদ এসে ধৃত করল। (১৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও সাবধানে চলত, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম। (১৯) যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে। এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। (২০) তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَاَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیْحًا صَرْصَرًا এটা صٰعِقَةً এরই ব্যাখ্যা, যা পূর্বের আয়াতে আদ ও সামূদের صٰعِقَةً বলে বর্ণিত হয়েছে। صٰعِقَةً শব্দের আসল অর্থ অচেতন ও বেহুশকারী বস্তু। এ কারণেই বজ্রকেও صٰعِقَةً বলা হয়। আকস্মিক বিপদ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আদ সম্প্রদায়ের উপর চাপানো ঝড়ও একটি صٰعِقَةً ছিল। একেই ريح صرصر নামে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ ঝঞ্ঝাবায়ু, যাতে বিকট আওয়াজ থাকে। — (কুরতুবী)

যাহ্হাক বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন। কেবল প্রবল শুষ্ক বাতাস প্রবাহিত হত। অবশেষে আট দিন ও সাত রাত্রি পর্যন্ত উপর্যুপরি তুফান চলতে থাকে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এ ঘটনা শাওয়ালের শেষ দিকে এক বুধবার থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বস্তুতঃ যে কোন সম্প্রদায়ের উপর আযাব এসেছে, তা বুধবারেই এসেছে। — (কুরতুবী, মাযহারী)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের মঙ্গল চাইলে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং প্রবল বাতাসকে তাদের থেকে নিবৃত রাখেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ কোন জাতিকে বিপদগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের উপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন এবং প্রবল বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে।

فِیْۤ اَیَّامٍ نَّحِسَاتٍ ইসলামের নীতি এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, কোন দিন ও রাত্রি আপন সত্তার দিক দিয়ে অশুভ নয়। আদ সম্প্রদায়ের ঝঞ্ঝাবায়ুর দিনগুলোকে অশুভ বলার তাৎপর্য এই যে, এই দিনগুলো তাদের পক্ষে তাদের কুকর্মের কারণে অশুভ হয়ে গিয়েছিল। এতে সবার জন্যে অশুভ হওয়া জরুরী হয় না। — (মাযহারী, বয়ানুল-কোরআন)

فَهُمْ یُوْزَعُوْنَ এটা وزع থেকে উদ্ভূত। অর্থ বাধা দেয়া, নিষেধ করা। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন যে, বিপুল সংখ্যক জাহান্নামীকে হাশরের ময়দান ও হিসাবের জায়গার দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষিপ্ততা এড়ানোর উদ্দেশে অগ্রবর্তী অংশকে থামিয়ে দেয়া হবে, যাতে যারা পেছনে পড়ে, তারাও তাদের সাথে এসে মিলিত হতে পারে, কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন, তাদেরকে হিসাবের জায়গার দিকে হাঁকিয়ে, ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। — (কুরতুবী)

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ
الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ
سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ
لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي
ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِن
يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ
الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ
قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا
خَاسِرِينَ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ
وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا
دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾

(২১) তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ্ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (২২) তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না — এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না। (২৩) তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ। (২৪) অতঃপর যদি তারা সবর করে, তবুও জাহান্নামই তাদের আবাসস্থল। আর যদি তারা ওযরখাহী করে, তবে তাদের ওযর কবুল করা হবে না। (২৫) আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অতঃপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র-পশ্চাতের আমল তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছিল। তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের ব্যাপারে। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত। (২৬) আর কাফেররা বলে, তোমরা এ কোরআন শ্রবণ করো না এবং এর আবৃত্তিতে হট্টগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হও। (২৭) আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের মন্দ ও হীন কাজের প্রতিফল দেব। (২৮) এটা আল্লাহ্‌র শত্রুদের শাস্তি-জাহান্নাম। তাতে তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফলস্বরূপ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ ...... আয়াতের অর্থ এই যে, মানুষ গোপনে কোন গোনাহ্ ও অপরাধ করতে চাইলে অপরের কাছে গোপন করতে পারে, কিন্তু নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে গোপন করতে পারে না। যখন একথা জানা যায় যে, আমাদের কর্ণ, চক্ষু, হাত, পা ও দেহের ত্বক আসলে আমাদের নয়; বরং রাজসাক্ষী, তাদেরকে আমাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা সত্য সাক্ষ্য দেবে, তখন গোপনে কোন অপরাধ ও গোনাহ্ করার কোন পথই উন্মুক্ত থাকে না। সুতরাং এই অপমান থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরাধই না করা। কিন্তু তোমরা যারা তওহীদ ও রেসালত স্বীকার কর না, তোমাদের চিন্তাই এদিকে ধাবিত হয় না যে, তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও কথা বলতে শুরু করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সামনে সাক্ষ্য দেবে। তবে এতটুকু বিষয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝতে সক্ষম যে, যিনি আমাদেরকে একটি নিকৃষ্ট বস্তু থেকে সৃষ্টি করে শ্রোতা ও চক্ষুষ্মান মানুষ করেছেন, লালন-পালন করে পরিণত বয়সে উপনীত করেছেন, তাঁর জ্ঞান কি আমাদের যাবতীয় কর্ম ও অবস্থাকে বেষ্টনকারী হবে না? কিন্তু তোমরা এই জাজ্বল্যমান বিষয়ের বিপরীতে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অনেক কাজ-কর্মের খবর রাখেন না। কাজেই তোমরা কুফর ও শিরক করতে সাহসী হয়েছিলে। বলাবাহুল্য, তোমাদের এ বিশ্বাসই তোমাদেরকে বরবাদ করেছে।

হাশরে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যদান ঃ সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি হেসে উঠলেন, অতঃপর বললেন, তোমরা জান, আমি কি কারণে হেসেছি? আমরা আরয করলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই জানেন। তিনি বললেন, আমি সে কথা স্মরণ করে হেসেছি, বা হাশরে হিসাবের জায়গায় বন্দা তার পালনকর্তাকে বলবে। সে বলবে হে পরওয়ারদেগার, আপনি কি আমাকে যুলুম থেকে আশ্রয় দেননি? আল্লাহ্ বলবেন, অবশ্যই দিয়েছি। তখন বন্দা বলবে, তাহলে আমি আমার হিসাব নিকাশের ব্যাপারে অন্য কারও সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট নই। আমার অস্তিত্বের মধ্য থেকেই কোন সাক্ষী না দাঁড়ালে আমি সন্তুষ্ট হব না। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا অর্থাৎ, ভাল কথা, তুমি নিজেই তোমার হিসাব করে নাও। এরপর তার মুখে মোহর এঁটে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা তার ক্রিয়া-কর্ম বর্ণনা কর। এতে প্রত্যেক অঙ্গ কথা বলতে শুরু করবে এবং সত্য সাক্ষ্য দেবে। এরপর তার মুখ খুলে দেয়া হবে। তখন সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলবে, অর্থাৎ, তোমরা ধ্বংস হও, আমি তো দুনিয়াতে যাকিছু করেছি, তোমাদেরই সুখের জন্যে করেছি। এখন তোমরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে শুরু করলে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, এ ব্যক্তির মুখে মোহর এঁটে দেয়া হবে এবং উরুকে বলা হবে, তুমি কথা বল এবং তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। তখন মানুষের উরু, মাংস, অস্থি সকলেই তার কর্মের সাক্ষ্য দেবে। — (মাযহারী)

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, অনাগত দিন মানুষকে ডেকে বলে, আমি নতুন দিন। তুমি যাকিছু আমার মধ্যে করবে, কেয়ামতের দিন আমি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেব। তাই তোমার

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ
وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ
تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِنْ
غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ
لَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا
يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ
الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ
عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾

(২৯) কাফেররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! যেসব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়। (৩০) নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। (৩১) ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা দাবী কর। (৩২) এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন। (৩৩) যে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? (৩৪) সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। (৩৫) এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। (৩৬) যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৩৭) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহ্‌কে সেজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই এবাদত কর। (৩৮) অতঃপর তারা যদি অহংকার করে, তবে যারা আপনার পালনকর্তার কাছে আছে, তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্ত হয় না।

উচিত আমি শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই কোন পুণ্য কাজ করে নেয়া, যাতে আমি এসম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারি। যদি আমি চলে যাই, তবে আমাকে কখনও পাবে না। এমনিভাবে প্রত্যেক রাত্রি মানুষকে ডেকে একথা বলে। —(কুরতুবী)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ কাফেররা কোরআনের মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে এবং সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এ দুষ্কর্মের আশ্রয় নিয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবু জাহল অন্যদেরকে প্ররোচিত করল যে, মুহাম্মদ যখন কোরআন তেলাওয়াত করে, তখন তোমরা তার সামনে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে থাকবে, যাতে সে কি বলছে তা কেউ বুঝতে না পারে। কেউ কেউ বলেন, কাফেররা শিস দিয়ে তালি বাজিয়ে এবং নানারূপ শব্দ করে কোরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে বিরত রাখার প্রস্তুতি নিয়েছিল।—(কুরতুবী)

নীরবতার সাথে কোরআন শ্রবণ করা ওয়াজিব ঃ হৈ-হুল্লোড় করা কাফেরদের অভ্যাস ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল, তেলাওয়াতে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশে গণ্ডগোল করা কুফরের আলামত। আরও জানা গেল যে, নীরবতার সাথে শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং ঈমানের আলামত। আজকাল রেডিওতে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় এবং প্রত্যেক হোটেল ও জনসমাবেশে রেডিও খুলে দেয়া হয়। হোটেলের কর্মচারীরা তাদের কাজ-কর্মে এবং গ্রাহকরা খানাপিনায় মশগুল থাকে। ফলে দৃশ্যতঃ এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় যা কাফেরদের আলামত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে হেদায়েত করুন। এরূপ পরিবেশে কোরআন তেলায়াতের জন্যে রেডিও খোলা উচিত নয়। যদি বরকত হাসিলের জন্যে খোলাই হয়, তবে কয়েক মিনিট সব কাজ-কর্ম বন্ধ রেখে নিজেরাও মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত এবং অপরকে শোনার সুযোগ দেয়া বাঞ্ছনীয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত কোরআন, রেসালত ও তওহীদ অস্বীকারকারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের সৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে তওহীদের দাওয়াত ও অস্বীকারকারীদের পরিণাম এবং পরকালের আযাব তথা জাহান্নামের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখান থেকে মুমিন ও কামেলদের অবস্থা, ইহকাল ও পরকালে তাদের সম্মান এবং তাদের জন্যে বিশেষ পথনির্দেশ উল্লেখিত হয়েছে। মুমিন ও কামেল তারাই, যারা কর্মে ও চরিত্রে অবিচল, পুরোপুরিভাবে শরীয়তের অনুসারী এবং যারা অপরকেও আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয় এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গেই যারা ইসলামের দাওয়াত দেয়, তাদের জন্যে সবর এবং মন্দের জওয়াবে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استقامت -এর অর্থ ঃ বলা হয়েছে ঃ

اسْتَقَامُوا অর্থাৎ, যারা খাঁটি মনে আল্লাহ্‌কে পালনকর্তারূপে বিশ্বাস করে ও তা স্বীকারও করে (এটা হল মূল ঈমান) অতঃপর তাতে অবিচলও থাকে (এটা হল সৎকর্ম।)। এভাবে তারা ঈমান ও সৎকর্ম উভয় গুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। استقامت শব্দের অর্থ ঈমান ও তওহীদে কায়েম থাকা, তারা তা পরিত্যাগ করে না। এ তফসীর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ওসমান (রাঃ) থেকেও প্রায় তাই বর্ণিত রয়েছে। তিনি استقامت -এর অর্থ করেছেন, খাঁটি আমল করা। হযরত

ওমর (রাঃ) বলেন- আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় বিধি তথা আদেশ ও নিষেধের উপর অবিচলিত থাকা এবং তা থেকে শৃগালের ন্যায় এদিক-ওদিক পলায়নের পথ বের না করার নাম استقامت —(মাযহারী)

তাই আলেমগণ বলেন, استقامت সংক্ষিপ্ত হলেও এতে শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন এবং হারাম ও মকরূহ বিষয়াদি থেকে সার্বক্ষণিক বেঁচে থাকা শামিল রয়েছে। তফসীরে-কাশশাফে আছে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ — একথাটি বলা তখনই শুদ্ধ হতে পারে, যখন অন্তরে বিশ্বাস করা হয় যে, আমি প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক পদক্ষেপেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রশিক্ষণাধীন, তাঁর রহমত ব্যতিরেকে আমি একটি শ্বাসও ছাড়তে পারি না। এর দাবী এই যে, মানুষ এবাদতে অটল-অবিচল থাকবে এবং তার আত্মা ও দেহ কেশাগ্র পরিমাণও আল্লাহ্র দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ ছাকাফী (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ), আমাকে এমন এক পূর্ণাঙ্গ বিষয় বলে দিন যা শোনার পর অন্য কারও কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন থাকবে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, قل آمنت بالله ثم استقم অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের স্বীকারোক্তি কর; অতঃপর তাতে অবিচল থাক।— (মুসলিম) এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, ঈমান ও তার দাবী অনুযায়ী সৎকর্মেও অবিচলিত থাক।

এ কারণেই হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) استقامت-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ ফরয কর্মসমূহ আদায় করা। হযরত হাসান বসরী বলেন, استقامت এই যে, যাবতীয় কাজে আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাক। এ থেকে জানা গেল যে, استقامت-এর পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা তাই, যা উপরে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। জাসসাস ও ইবনে-জরীর এই তফসীর আবুল আলিয়া থেকে উদ্ধৃত করে তাই গ্রহণ করেছেন।

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ — ফেরেশতাগণের এই অবতরণ ও সম্বোধন হযরত ইবনে-আব্বাসের উক্তি অনুযায়ী মৃত্যুর সময় হবে। কাতাদাহ বলেন — হাশরে কবর থেকে বের হওয়ার সময় হবে এবং ওকী' ইবনে জাররাহ্ বলেন, তিন সময়ে হবে — প্রথম মৃত্যুর সময়, অতঃপর কবরের অভ্যন্তরে, অতঃপর হাশরে কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়। বাহরে-মুহীতে আবু হাইয়্যান বলেন — আমি তো বলি যে, মুমিনদের কাছে ফেরেশতাগণের অবতরণ প্রত্যহ হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া ও বরকত তাদের কাজকর্মে পাওয়া যায়। তবে চাক্ষুষ দেখা ও তাদের শোনা উপরোক্ত সময়েই হবে।

হযরত সাবেত বেনানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সূরা হা-মীম সেজদা তেলাওয়াত করতঃ আলোচ্য আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, আমি এই হাদীস প্রাপ্ত হয়েছি যে, মুমিন যখন কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন দুনিয়াতে যেসব ফেরেশতা তার সাথে থাকত, তারা এসে বলবে, তুমি ভীত ও চিন্তিত হয়ো না; বরং প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। তাদের কথা শুনে মুমিন ব্যক্তি আশ্বস্ত হয়ে যাবে।— (মাযহারী)

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

ফেরেশতাগণ মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা জান্নাতে মনে যা চাইবে তাই পাবে এবং যা দাবী করবে তাই সরবরাহ করা হবে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ করা হবে — তোমরা চাও বা না চাও। অতঃপর نُزُلًا তথা আপ্যায়নের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নেয়ামতও পাবে, যার আকাঙ্ক্ষাও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না। যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক বস্তুও আসে যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষতঃ যখন কোন বড় লোকের মেহমান হয়।— (মাযহারী)

হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, জান্নাতে কোন পাখী উড়তে দেখে তোমাদের মনে তার মাংস খাওয়ার বাসনা সৃষ্টি হবে। তৎক্ষণাৎ তা ভাজা করা অবস্থায় সামনে আনীত হবে। কতক রেওয়ায়েতে আছে, তাকে আগুন ও ধোঁয়া কোন কিছুই স্পর্শ করবে না। আপনা-আপনি রান্না হয়ে সামনে এসে যাবে।— (মাযহারী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যদি জান্নাতী ব্যক্তি নিজ গৃহে সন্তান জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব, শিশুর দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পণ সব এক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে। — (মাযহারী)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللَّهِ — এটা মুমিনদের দ্বিতীয় অবস্থা। অর্থাৎ তারা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না; বরং অপরকেও দাওয়াত দেয়। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকে, তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এ থেকে বোঝা গেল যে, মানুষের সেই কথাই সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট যাতে অপরকে সত্যের দাওয়াত দেয়া হয়। এতে মুখে, কলমে, অন্য কোনভাবে ইত্যাদি সর্বপ্রকার দাওয়াতই শামিল রয়েছে। আযানদাতাও এতে দাখিল আছে। কেননা, সে মানুষকে নামাযের দিকে আহবান করে। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আলোচ্য আয়াত মুয়াযযিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং دَعَآ إِلَى اللَّهِ বাক্যের পর وَعَمِلَ صَالِحًا বলে আযান-একামতের মধ্যস্থলে দু'রাকআত নামায বোঝানো হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আযান ও একামতের মাঝখানে যে দোয়া করা হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না।— (মাযহারী)

হাদীসে আযান ও আযানের জওয়াব দেয়ার অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত রয়েছে। যদি বেতন ও পারিশ্রমিকের দিকে লক্ষ্য না করে খাঁটিভাবে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আযান দেয়া হয়।— (মাযহারী)

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ এখান থেকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াতকারীদেরকে বিশেষ পথনির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তারা মন্দের জওয়াবে ভাল ব্যবহার করবে এবং সবর ও অনুগ্রহ করবে। اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ —অর্থাৎ, দাওয়াতকারীরা অতি উত্তম পন্থায় মন্দকে প্রতিহত করবে। এটাই তাদের অভ্যস্ত গুণ হওয়া উচিত যে, মন্দের জওয়াবে মন্দ না করে বরং ক্ষমা করা উত্তম কাজ। অতি উত্তম কাজ এই যে, যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তাকে ক্ষমাও করবে, অধিকন্তু তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন — এই আয়াতের নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, তার মোকাবেলায় তুমি সবর কর, যে তোমার প্রতি মূর্খতা প্রকাশ করে, তুমি তার প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন কর এবং যে তোমাকে জ্বালাতন করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর।— (মাযহারী)

রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি গালি দিল অথবা মন্দ বলল। তিনি জওয়াবে বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও এবং আমি অপরাধী ও মন্দ হই, তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। পক্ষান্তরে যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে ক্ষমা করেন।— (কুরতুবী)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۭ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۭ اِنَّهٗ عَلٰي كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۭ
اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِعْمَلُوْا مَا
شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا
جَاۗءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ۝ لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ۭ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ۝ مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا
قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ
اَلِيْمٍ ۝ وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ۭ
ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ۭ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاۗءٌ ۭ وَ
الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۭ اُولٰۗىِٕكَ
يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ۝ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ
فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاۗءَ فَعَلَيْهَا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

(৩৯) তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন সে শস্যশ্যামল ও স্ফীত হয়। নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। নিশ্চয় তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (৪০) নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে, তারা আমার কাছে গোপন নয়। যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, না যে কেয়ামতের দিন নিরাপদে আসবে? তোমরা যা ইচ্ছা কর, নিশ্চয় তিনি দেখেন যা তোমরা কর। (৪১) নিশ্চয় যারা কোরআন আসার পর তা অস্বীকার করে, তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে। এটা অবশ্যই এক সম্মানিত গ্রন্থ। (৪২) এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিকে থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৪৩) আপনাকে তো তাই বলা হয়, যা বলা হত পূর্ববর্তী রসূলগণকে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার কাছে রয়েছে ক্ষমা এবং রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৪৪) আমি যদি একে অনারব ভাষায় কোরআন করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, কিতাব অনারব ভাষার আর রসূল আরবীভাষী! বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার। যারা মুমিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কোরআন তাদের জন্যে অন্ধত্ব। তাদেরকে যেন দূরবর্তী স্থান থেকে আহবান করা হয়। (৪৫) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতে মতভেদ সৃষ্টি হয়। আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত। তারা কোরআন সম্বন্ধে এক অস্বস্তিকর সন্দেহে লিপ্ত। (৪৬) যে সৎকর্ম করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তা তার উপরই বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বন্দাদের প্রতি মোটেই যুলুম করেন না।

আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে সেজদা করা জায়েয নয় : لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ — এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেজদা একমাত্র জগৎস্রষ্টা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। তিনি ব্যতীত কোন নক্ষত্র অথবা মানব ইত্যাদিকে সেজদা করা হারাম। এই সেজদা এবাদতের নিয়তে হোক অথবা নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে হোক, সর্বাবস্থায় উম্মতের ইজমাবলে এটি হারাম। পার্থক্য এই যে, কেউ এবাদতের নিয়তে সেজদা করলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং কেউ নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে সেজদা করলে তাকে কাফের বলা হবে না, কিন্তু হারামকারী ও ফাসেক বলা হবে।

এবাদতের উদ্দেশে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সেজদা করা কোন উম্মত ও শরীয়তে হালাল ছিল না। কেননা, এটা শিরক এবং প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তেই শিরক ছিল হারাম। তবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে সেজদা করা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে বৈধ ছিল। পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে হযরত আদমকে সেজদা করার আদেশ সমস্ত ফেরেশতাকে দেয়া হয়েছিল। ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর পিতা ও ভ্রাতাগণ সেজদা করেছিল। কোরআনে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু ফেকাহ্‌বিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইসলামে এই আদেশ রহিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সেজদা করা সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়েছে।

وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ এ বিষয়ে ফেকাহ্‌বিদগণ একমত যে, এ সূরাতে তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব, কিন্তু কোন্ আয়াতে ওয়াজিব এতে মতভেদ রয়েছে। কাযী আবু বকর আহ্‌কামুল কোরআনে লিখেন, হযরত আলী ও ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রথম আয়াত অর্থাৎ, اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ এর শেষে সেজদা করতেন। ইমাম মালেক তাই অবলম্বন করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ, لَا يَسْئَمُوْنَ -এর শেষে সেজদা করতেন। হযরত ইবনে ওমরও তাই বলেছেন। এ কারণে মসরূক, আবু আবদুর রহমান, ইবরাহীম নখয়ী, ইবনে সিরীন, কাতাদাহ প্রমুখ ফেকাহ্‌বিদগণ দ্বিতীয় আয়াত শেষেই সেজদা করতেন। আহ্‌কামুল কোরআনে আরও বলা হয়েছে, হানাফী মযহাবের আলেমগণও তাই বলেন। এ মতভেদের কারণে দ্বিতীয় আয়াত শেষে সেজদা করাই সাবধানতার প্রতীক। কেননা, আসলে প্রথম আয়াতে সেজদা ওয়াজিব হলে তখন তাও আদায় হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়টিতে ওয়াজিব হলেও আদায় হয়ে যাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কুফরের বিশেষ প্রকার 'এলহাদ'-এর সংজ্ঞা ও বিধান : اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا — এর পূর্বের আয়াতে যারা রেসালত ও তওহীদকে খোলাখুলি অস্বীকার করত, তাদেরকে শাসানো হয়েছিল এবং তাদের আযাব বর্ণনা করা হয়েছিল। এখান থেকে অস্বীকারের এক বিশেষ প্রকার এলহাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। لحد ও الحاد -এর আভিধানিক অর্থ একদিকে ঝুঁকে পড়া। এক পার্শ্বে খনন করা, কবরকেও এ কারণেই لحد বলা হয়। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় কোরআনী আয়াত থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াকে এলহাদ বলা হয়। খোলাখুলি পাস কাটিয়ে যাওয়া, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে উভয়টিকে এলহাদ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে এলহাদ হচ্ছে কোরআন ও তার আয়াতসমূহের প্রতি বাহ্যতঃ ঈমান দাবী করা, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোরআন, সুন্নাহ্ ও অধিকাংশ উম্মতের বিপরীত অর্থ বর্ণনা করা, যদ্দ্বারা

কোরআনের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এলহাদের অর্থ তাই বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, الالحاد هو وضع الكلام على غير موضعه , আয়াতের لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا বাক্যটিও এ অর্থের ইঙ্গিত বহন করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এলহাদ এমন একটি কুফর, যাকে তারা গোপন করতে চাইত। তাই আল্লাহ্ বলেছেন যে, তারা আমার কাছে তাদের কুফর গোপন করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াত স্পষ্ট ব্যক্ত করছে যে, কোরআনের আয়াতকে প্রকাশ্য ভাষায় অস্বীকার করা অথবা অসত্য অর্থ বর্ণনা করে কোরআনের বিধানাবলীকে বিকৃত করার চেষ্টা করা সবই কুফর ও গোমরাহী।

সারকথা এই যে, এলহাদ এক প্রকার কপটতামূলক কুফর। অর্থাৎ, মুখে কোরআন ও কোরআনের আয়াতসমূহ মেনে নেয়ার দাবী ও স্বীকারোক্তি করা, কিন্তু আয়াতসমূহের এমন মনগড়া অর্থ বর্ণনা করা, যা কোরআন ও সুন্নাহ্র অন্যান্য বর্ণনা ও ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) কিতাবুল খেরাজে বলেন, كذلك الزنادقة الذين يلحدون وقد كانوا يظهرون الاسلام সে যিন্দিকরাও তেমনি, যারা এলহাদ করে এবং মুখে মুসলমানিত্বের দাবী করে।

এ থেকে জানা যায় যে, মুলহিদ ও যিন্দীক সম-অর্থে এমন কাফেরকে বলা হয়, যে মুখে ইসলাম দাবী করলেও প্রকৃতপক্ষে আয়াতসমূহের কোরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা বিরোধী মনগড়া অর্থ বর্ণনা করার অজুহাতে ইসলামের বিধানাবলীকে পাশ কাটিয়ে চলে।

একটি বিভ্রান্তির অবসান ঃ আকায়েদের কিতাবসমূহে এ নিয়ম বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুফরী বাক্য অবলম্বন করে, সে কাফের নয়। এখন এ নীতিটি যদি ব্যাপক অর্থে নেয়া হয় যে, যে কোন অকাট্য ও নিশ্চিত বিধানে অর্থ উদ্ভাবন করলেও এবং যে কোন ধরনের অসত্য অর্থ উদ্ভাবন করলেও কাফের হবে না, তবে দুনিয়াতে মুশরিক, প্রতিমা-পূজারী ও ইহুদী-খ্রীষ্টানদের মধ্যে কাউকেই কাফের বলা যায় না। কেননা, প্রতিমা-পূজারী মুশরিকদের অর্থ উদ্ভাবন তো কোরআনে উল্লেখিত আছে যে, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى অর্থাৎ, আমরা প্রকৃতপক্ষে প্রতিমাদের পূজা এজন্যে করি যাতে তারা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যশীল করে দেয়। অতএব, প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহ্রই এবাদত করি। কিন্তু কোরআন তাদের উদ্ভাবিত এ অর্থ বর্ণনা সত্ত্বেও তাদেরকে কাফেরই বলেছে। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের অর্থ বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত, কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহ্র বর্ণনায় এতদসত্ত্বেও তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল যে, অর্থ উদ্ভাবনকারীকে কাফের না বলার ভাবার্থ ব্যাপক নয়।

এ কারণেই আলেম ও ফেকাহ্বিদগণ বলেন যে, অর্থ উদ্ভাবনের কারণে কাউকে কাফের বলা যায় না, তার জন্যে শর্ত এই যে, তা ধর্মের জরুরী বিষয়াদিতে অকাট্য অর্থের বিপরীতে না হওয়া চাই। ধর্মের জরুরী বিষয়াদির শানে ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বিষয়াদি, যেগুলো সম্পর্কে অশিক্ষিত মূর্খ মহলও ওয়াকিফহাল, যেমন পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়া, ফজরের দু'রাকআত ও যোহরের চার রাকআত ফরয হওয়া, রমযানের রোযা ফরয হওয়া; সুদ, মদ ও শূকর হারাম হওয়া ইত্যাদি। যদি কোন ব্যক্তি এসব বিষয় সম্পর্কে কোরআনের আয়াতে এমন কোন অর্থ উদ্ভাবন করে, যদ্দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ পাল্টে যায়, তবে সে নিশ্চিতরূপেও সর্বসম্মতভাবে কাফের হয়ে যাবে। কেননা, এটা প্রকৃত-প্রস্তাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষাকে অস্বীকার করার নামান্তর। অধিকাংশ আলেমের মতে ঈমানের সংজ্ঞাই এই যে, تصديق النبى صلى الله عليه وسلم فيما علم مجيئه من الدين بالضرورة অর্থাৎ, এমন সব বিষয়ে নবী করীম (সাঃ)- এর সত্যায়ন করা, যেগুলোর বর্ণনা ও আদেশ জাজ্জ্বল্যমানরূপে তাঁর কাছ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। অর্থাৎ, আলেমগণ তো জানেনই — সর্বসাধারণও জানে।

কাজেই এর বিপরীতে কুফরের সংজ্ঞা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিশ্চিত ও জাজ্জ্বল্যমানরূপে যেসব বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটিকে অস্বীকার করা।

অতএব, যে ব্যক্তি ধর্মের জরুরী বিষয়াদিতে অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিধান পরিবর্তন করে, সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আনীত শিক্ষাকেই অস্বীকার করে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ - অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন, এ আয়াতে ذكر বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। ব্যাকরণের দিক দিয়ে اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا বাক্যটি পূর্ববর্তী اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ বাক্য থেকে بدل হয়েছে। কাজেই উভয় বাক্যের একই বিধান হবে এবং সারমর্ম হবে এই যে, তারা আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না বিধায় আযাব থেকেও বাঁচতে পারবে না।

لَا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ এতে বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সংরক্ষিত। কাতাদাহ্ ও সুদ্দী বলেন, আয়াতে باطل বলে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে এবং সম্মুখ দিক ও পশ্চাদ্দিক বলে সমস্ত দিক বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান কোনদিক থেকেই এ কিতাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং এতে কোনরূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না।

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, জিন অথবা মানব কোন প্রকার শয়তানই কোরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে সক্ষম নয়। রাফেযী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ কোরআনে দশটি পারা এবং কেউ কেউ বিশেষ আয়াত সংযোজন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আবু-হাইয়্যান বলেন, বাতিল শব্দটি কেবলমাত্র শয়তানের জন্যেই প্রযোজ্য নয়; বরং শয়তানের পক্ষ থেকে হোক অথবা অন্য কারও পক্ষ থেকে হোক, যে কোন বাতিল কোরআনে প্রবিষ্ট হতে পারে না। অতঃপর তিনি তাবারীর বরাত দিয়ে আয়াতের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, কোন বাতিলপন্থীর সাধ্য নেই যে, সামনে এসে এ কিতাবে কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে। এমনিভাবে পেছন দিক থেকে গোপনে এসে এর অর্থ বিকৃত করার ও এলহাদ করার সাধ্যও কারও নেই।

তাবারীর তফসীর এ স্থানের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, কোরআনে এলহাদ ও পরিবর্তনের পথ দু'টিই – এক খোলাখুলিভাবে কোরআনে কোন পরিবর্তন করার চেষ্টা করা। একে مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই বাহ্যতঃ ঈমান দাবী করা, কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে অসত্য অর্থ সংযোজনের মাধ্যমে কোরআনের অর্থে পরিবর্তন সাধন করা। একে وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সারকথা এই যে, এ কিতাব আল্লাহ্র কাছে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত। এর ভাষায় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন

করার শক্তি যেমন কারও নেই, তেমনি এরঅর্থ সম্ভার বিকৃত করে বিধানাবলীর পরিবর্তন করার সাধ্যও কারও নেই। যখনই কোন হতভাগা এরূপ করার ইচ্ছা করেছে, তখনই সে লাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং কোরআন তার নাপাক কৌশল থেকে পাক-পবিত্র রয়েছে। কোরআনের ভাষায় যে পরিবর্তন করার উপায় নেই, তা প্রত্যেকে দেখে এবং বোঝে। কোরআন চৌদ্দশ' বছর অবধি সারা বিশ্বে পঠিত হচ্ছে এবং লাখো মানুষের বুকে সংরক্ষিত আছে। কেউ একটি যের ও যবরে ভুল করলেও বৃদ্ধ থেকে নিয়ে বালক পর্যন্ত এবং আলেম থেকে নিয়ে জাহেল পর্যন্ত লাখো মুসলমান তার ভুল ধরার জন্যে দাঁড়িয়ে যায়। مِنْ خَلْفِهٖ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ বলে আল্লাহ্ তা'আলা কেবল কোরআনের ভাষা সংরক্ষণের দায়িত্বই নেননি ; বরং এর অর্থ-সম্ভারের হেফাযত করাও আল্লাহ্ তা'আলারই দায়িত্ব। তিনি আপন রসূল ও তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরেদ অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে কোরআনের অর্থ-সম্ভার এমন সংরক্ষিত করে দিয়েছেন যে, কোন বেদ্বীন-মুলহেদ অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে এতে পরিবর্তন সাধন করতে চাইলে সর্বত্র সর্বযুগে হাজারো আলেম তা খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়ে যান। ফলে সে ব্যর্থ ও অপমানিত হয়। সত্য বলতে কি, وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ বাক্যে لَهٗ-এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হয়েছে এবং কোরআন কেবল ভাষার নাম নয়; বরং ভাষা ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমষ্টিকে কোরআন বলা হয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, যারা বাহ্যতঃ মুসলমান তারা খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু আয়াতসমূহে অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অকাট্য বর্ণনার বিপরীত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। তাদের এ ধরনের পরিবর্তন থেকেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবের হেফাযত করেছেন। ফলে কারও মনগড়া অর্থ প্রসার লাভ করতে পারে না। কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা এবং আলেমগণ তার মুখোশ উন্মোচিত করে দেন। সহীহ্ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে এমন দল থাকবে, যারা পরিবর্তনকারীদের পরিবর্তনের মুখোশ উন্মোচিত করে কোরআনের সঠিক অর্থ জনসমক্ষে ফুটিয়ে তুলবে। তারা মানুষের কাছে নিজেদের কুফর যতই গোপন করুক, আল্লাহ্র কাছে গোপন করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক, তখন তাদের এ অপকর্মের শাস্তি ভোগ করাও অপরিহার্য।

ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ — আরব ব্যতীত দুনিয়ার অপর জাতিসমূহকে 'আজম' বলা হয়। যদি শব্দটির প্রথমে আলিফ যোগ করে اعجم বলা হয়, তবে এর অর্থ হয় অপ্রাঞ্জল বাক্য। তাই যে ব্যক্তি আরবী নয়, তাকে আজমী বলা হবে, যদিও সে প্রাঞ্জল ভাষা বলে। বস্তুতঃ اعجم বলা হবে তাকেই, যে ব্যক্তি প্রাঞ্জল ভাষা বলতে পারে না। — (কুরতুবী)

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি যদি আরবী ভাষা ব্যতীত অপর কোন ভাষায় কোরআন নাযিল করতাম, তবে কোরায়শরা অভিযোগ করত যে, এ কিতাব আমরা বুঝি না। তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, রসূল তো আরবী আর কিতাব হল কিনা অনারব, অপ্রাঞ্জল ভাষায়।

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ —এখানে কোরআনের দু'টি গুণ ব্যক্ত হয়েছে — (এক) কোরআন হেদায়েত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। (দুই) কোরআন আরোগ্যদানকারী। কুফর, শিরক, অহংকার, হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি আত্মিক রোগ যে কোরআনের মাধ্যমে নিরাময় হয়, তা বলাই বাহুল্য। কোরআন বাহ্যিক ও দৈহিক রোগেরও প্রতিকার। অনেক দৈহিক রোগের চিকিৎসা কোরআনী দোয়া দ্বারা হয় এবং সফলও হয়।

اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ এটা একটা দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তি কথা বোঝে, অনারবরা তাকে বলে انت تسمع من قريب অর্থাৎ, তুমি নিকটবর্তী স্থান থেকে শুনছ। আর যে কথা বোঝে না, তাকে বলে انت تنادى من بعيد অর্থাৎ, তোমাকে দূর থেকে ডাকা হচ্ছে। — (কুরতুবী)

উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কোরআনের নির্দেশাবলী শোনার ও বোঝার ইচ্ছা রাখে না, তাই তাদের কান যেন বধির এবং চক্ষু অন্ধ। তাদেরকে হেদায়েত করা এমন, যেমন কাউকে অনেক দূর থেকে ডাক দেয়া, ফলে তার কানে আওয়াজ পৌছে না এবং সে সাড়া দিতে পারে না।

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ
أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ
يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾
وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن
مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ
فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ
مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن
رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾ وَإِذَا
أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ
فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ
ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ
أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ أَلَا
إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٤﴾

(৪৭) কেয়ামতের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই জানা। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না এবং কোন নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, আমার শরীকরা কোথায়? সেদিন তারা বলবে, আমরা আপনাকে বলে দিয়েছি যে, আমাদের কেউ এটা স্বীকার করে না। (৪৮) পূর্বে তারা যাদের পূজা করত, তারা উধাও হয়ে যাবে এবং তারা বুঝে নেবে যে, তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই। (৪৯) মানুষ উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় না; যদি তাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে; (৫০) বিপদাপদ স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে বলতে থাকে, এটা যে আমার যোগ্য প্রাপ্য; আমি মনে করি না যে, কেয়ামত সংঘটিত হবে। আমি যদি আমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাই, তবে অবশ্যই তার কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতএব, আমি কাফেরদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই আস্বাদন করাব কঠিন শাস্তি। (৫১) আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে। (৫২) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়, অতঃপর তোমরা একে অমান্য কর, তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? (৫৩) এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়? (৫৪) শুনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। শুনে রাখ, তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ অর্থাৎ, কাফের লোকদের অভ্যাস এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কোন নেয়ামত, ধন-সম্পদ, ইজ্জত ও নিরাপত্তা দিলে সে তাতে মগ্ন ও বিভোর হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে আরও দূরে চলে যায় এবং তার অহংকার ও উদাসীনতা আরও বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে সে কোন বিপদের সম্মুখীন হলে আল্লাহ্র কাছে সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে। সুদীর্ঘ দোয়াকে এস্থলে عَرِيضٍ অর্থাৎ, প্রশস্ত দোয়া বলা হয়েছে। এতে আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, যে বস্তু প্রশস্ত ও বড়, তা যে দৈর্ঘ্যেও বড় হবে, তা আপনা-আপনিই বোঝা যায়। এ কারণেই জান্নাতের বিস্তৃতি বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'আলা عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ বলেছেন। অর্থাৎ, জান্নাত এত বিস্তৃত যে, তার প্রস্থের মধ্যে সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীর সংকুলান হয়ে যায়।

সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, দোয়ার মধ্যে কাকুতি-মিনতি, কান্নাকাটি ও বার বার বলা উত্তম। — (বোখারী, মুসলিম) সেমতে দীর্ঘ দোয়া করা প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু এস্থলে কাফেরদের নিন্দা দীর্ঘ দোয়ার কারণে করা হয়নি; বরং তার এ সামগ্রিক অভ্যাসের কারণে করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নেয়ামত পেলেই সে অহংকারে মেতে উঠে এবং বিপদের সম্মুখীন হলেই দুঃখ বর্ণনা করে ফিরে। এতে তার উদ্দেশ্য দোয়া নয়; বরং হা-হুতাশ করা ও মানুষের কাছে তা গেয়ে ফেরা।

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ অর্থাৎ, আমি আমার কুদরত ও তওহীদের নিদর্শনাবলী তাদেরকে দেখাই বিশ্বজগতেও এবং তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেও। آفاق শব্দটি افق -এর বহুবচন, অর্থ দিগন্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বজগতের ছোট-বড় সৃষ্টি তথা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা আল্লাহ্র অস্তিত্ব, তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরত এবং তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দেয়। এর চাইতে আরও নিকটবর্তী বস্তু স্বয়ং মানুষের প্রাণ ও দেহ। তার এক একটি অঙ্গ এবং তাতে কর্মরত সূক্ষ্ম ও নাজুক যন্ত্রপাতির মধ্যে তার আরাম ও সুখের বিস্ময়কর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতিকে এমন মজবুত করা হয়েছে যে, সত্তর-আশি বছর পর্যন্তও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মানুষের গ্রন্থিসমূহে যে স্প্রিং লাগানো হয়েছে, তা মানুষের তৈরী হলে ইস্পাত নির্মিত স্প্রিংও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খতম হয়ে যেত। মানুষের হাতের চামড়া এবং তাতে অঙ্কিত রেখাও সারা জীবনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এসব ব্যাপারে যদি সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে এ বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, তার অবশ্যই একজন স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা আছেন, যাঁর জ্ঞান ও কুদরত অসীম এবং যাঁর কোন সমকক্ষ হতে পারে না। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

সূরা হা-মীম সেজদাহ্ সমাপ্ত

سُوْرَةُ الشُّوْرٰى مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

حٰمٓ ۚ ① عٓسٓقٓ ② كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ③ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ④ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰۗىِٕكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ۭ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⑤ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۗءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ڮ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ⑥ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ⑦ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاۗءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۭ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ⑧ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۗءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُـحْيِ الْمَوْتٰى ۡ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑨ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ڰ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ⑩

সূরা আশ-শূরা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৫৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হা-মীম, (২) আইন, সীন, ক্বা-ফ। (৩) এমনিভাবে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। (৪) নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর। তিনি সমুন্নত, মহান। (৫) আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয় আর তখন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। শুনে রাখ, আল্লাহ্‌ই ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (৬) যারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। আপনার উপর নয় তাদের দায়-দায়িত্ব। (৭) এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৮) আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে সমস্ত লোককে এক দলে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। আর যালেমদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। (৯) তারা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক স্থির করেছে? পরন্তু আল্লাহ্‌ই তো একমাত্র অভিভাবক। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। (১০) তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ। ইনিই আল্লাহ্‌—আমার পালনকর্তা। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তাঁরই অভিমুখী হই।

সূরা আশ-শূরা

يَتَفَطَّرْنَ –এতে হাদীসের বরাত দিয়ে উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাদের বোঝার চাপে আকাশে এমন আওয়াজ সৃষ্টি হয়, যেমন কোন বস্তুর উপর ভারী বোঝা পতিত হলে সৃষ্টি হয়। এতে বোঝা গেল যে, ফেরেশতাদের ওজন আছে এবং তা ভারী। এটা অবান্তরও নয়। কেননা, এটা স্বীকৃত যে, ফেরেশতাগণও দেহবিশিষ্ট যদিও তা খুব সূক্ষ্ম। বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম দেহও একত্রিত হলে ভারী হওয়া অসম্ভব নয়।—(বয়ানুল -কোরআন)।

لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى . اُمَّ الْقُرٰى এর অর্থ সকল জনপদ ও শহরের মূল ও ভিত্তি। এখানে মক্কা মোকাররমা বোঝানো হয়েছে। এই নামকরণের হেতু এই যে, এ শহরটি সমগ্র বিশ্বের শহর-জনপদ এমনকি ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে অধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে আদী ইবনে হামরা যুহরী বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করছিলেন এবং হাযুরা নামক স্থানে ছিলেন তখন আমি শুনেছি তিনি মক্কাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى ولولا انى اخرجت منك ماخرجت —তুমি আমার কাছে আল্লাহ্‌ তাআলার সমগ্র পৃথিবী থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি আমাকে তোমার থেকে বহিষ্কার করা না হত, তবে আমি কখনও স্বেচ্ছায় তোমাকে ত্যাগ করতাম না।

وَمَنْ حَوْلَهَا —অর্থাৎ, মক্কা মোকাররমার আশপাশ। এর অর্থ আশপাশের আরব দেশসমূহও হতে পারে এবং পূর্ব-পশ্চিম বিশ্বও হতে পারে।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ — অর্থাৎ, যে ব্যাপারে ও যে কাজে তোমাদের পারস্পরিক মতভেদ হয়, তার ফয়সালা আল্লাহ্‌র কাছেই সমর্পিত রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্‌র ফয়সালাই আসল ফয়সালা। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ — অন্যান্য অধিকাংশ আয়াতে রসূলের এবং কোন কোন আয়াতে শাসকবর্গের আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেসব আয়াত এর পরিপন্থী নয়। কেননা, রসূল ও শাসকবর্গের ফয়সালা একদিক দিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলারই ফয়সালা হয়ে থাকে। তাঁরা ওহীর মাধ্যমে অথবা কিতাব ও সুন্নাহ্‌ অনুযায়ী ফয়সালা করলে তা আল্লাহ্‌র ফয়সালা হওয়া সুস্পষ্ট। আর যদি তাঁরা ইজতিহাদ দ্বারা ফয়সালা করেন, তবে ইজতিহাদের ভিত্তিও কোরআন ও সুন্নাহ্‌ হয়ে থাকে। তাই এ ফয়সালাও প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌ তাআলারই ফয়সালা। মুজতাহিদগণের ইজতিহাদও এদিক দিয়ে খোদায়ী বিধানাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই আলেমগণ বলেন, কোরআন ও সুন্নাহ্‌ বোঝার যোগ্যতা রাখে না, এমন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে মুফতীর ফতোয়াই শরীয়তের বিধান।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ
مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ۭ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ
السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٢﴾ شَرَعَ لَكُمْ
مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ
لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۭ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۭ اَللّٰهُ
يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾ وَمَا
تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ وَلَوْلَا
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَ
اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١٤﴾
فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَهُمْ ۚ
وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ
بَيْنَكُمْ ۭ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۭ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۭ لَا
حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۭ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾

(১১) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। (১২) আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁর কাছে। তিনি যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী। (১৩) তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরেকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন। (১৪) তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই তারা পারস্পরিক বিভেদের কারণে মতভেদ করেছে। যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত রয়েছে। (১৫) সুতরাং আপনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং হুকুম অনুযায়ী অবিচল থাকুন ; আপনি তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবেন না। বলুন, আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্ আমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। আমাদের জন্যে আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্ম। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই। আল্লাহ্ আমাদেরকে সমবেত করবেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার প্রদত্ত বাহ্যিক ও দৈহিক নেয়ামত উল্লেখিত হয়েছিল। এখান থেকে আধ্যাত্মিক নেয়ামতসমূহের বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে এক মজবুত ও সুদৃঢ় ধর্ম দান করেছেন, যা সমস্ত পয়গম্বরেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত ধর্ম। আয়াতে পাঁচ জন পয়গম্বরের উল্লেখ রয়েছে। সর্বপ্রথম নূহ (আঃ) ও সর্বশেষ আমাদের রসূল (সাঃ) এবং মাঝখানে পয়গম্বরগণের পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর নাম উল্লেখ রয়েছে। কুফর ও শিরক সত্ত্বেও আরবের লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর নবুওয়ত স্বীকার করত। কোরআন অবতরণের সময় হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)–এর ভক্ত ইহুদী ও খ্রীস্টান সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর পরে এ দু'জন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আযহাবেও পয়গম্বরগণের অঙ্গীকার গ্রহণ প্রসঙ্গে এ পাঁচ জন পয়গম্বরেরই নাম উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ —পার্থক্য এই যে, সূরা আহযাবে শেষ নবী (সাঃ)–এর নাম প্রথমে এবং নূহ (আঃ)–এর নাম শেষে রয়েছে। এতে সম্ভবত ঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, খাতামুল আম্বিয়া (সাঃ) যদিও আবির্ভাবের দিক দিয়ে সবার শেষে এসেছেন কিন্তু নবুওয়ত বন্টনে সবার অগ্রে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি সৃষ্টি ক্ষেত্রে সকল পয়গম্বরের অগ্রবর্তী এবং আবির্ভাবে শেষে।—(ইবনে মাজা, দারেমী)

এখন প্রশ্ন হয় যে, হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম পয়গম্বর। তাঁর নামের উল্লেখের দ্বারা পয়গম্বরগণের আলোচনা শুরু করা হল না কেন? জওয়াব এই যে, দুনিয়াতে আগমনকারী সর্বপ্রথম পয়গম্বর ছিলেন আদম (আঃ)। মৌলিক বিশ্বাস ও ধর্মের প্রধান প্রধান বিষয়াদিতে তিনিও অভিন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁর আমলে মানুষের মধ্যে কুফর ও শিরক ছিল না। কুফর ও শিরকের সাথে দ্বন্দ্ব হযরত নূহ (আঃ)–এর আমল থেকে শুরু হয়েছে। কাজেই এ ধরনের গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার দিক দিয়ে নূহ (আঃ)–ই প্রথম পয়গম্বর। তাই তাঁর মাধ্যমেই পয়গম্বরগণের আলোচনা শুরু করা হয়েছে।

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ —এটা পূর্ববর্তী বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ, যে দ্বীন বা ধর্মমতে পয়গম্বরগণ সকলেই অভিন্ন ও এক, সে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, তাতে বিভেদ ও অনৈক্য বৈধ নয় ; বরং ধ্বংসের কারণ।

ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখা ফরয এবং বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ঃ এ আয়াতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টির নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। ধর্ম বলে সকল পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মৌলিক বিশ্বাস–যেমন তওহীদ, রেসালত, পরকালে বিশ্বাস এবং মৌলিক এবাদত।—যেমন, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের বিধান মেনে চলা। এ ছাড়া চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা অপরকে বিনা কারণে নিপীড়ন করা, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার মত অনাচারসমূহের নিষিদ্ধতা। এগুলো সমস্ত ঐশী ধর্মেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত বিষয়। শাখা বিধানসমূহে পয়গম্বরগণের শরীয়তে আংশিক বিভিন্নতাও রয়েছে। কোরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا – অতএব

পয়গম্বরগণের অভিন্ন বিধানাবলীতে বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম এবং ধ্বংসের কারণ।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের সামনে একটি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর এর ডানে ও বাঁয়ে আরও কয়েকটি রেখা টেনে বললেন, ডান-বামের এসব রেখা শয়তানের আবিষ্কৃত পথ। এর প্রত্যেকটিতে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সে পথেই চলার উপদেশ দেয়। অতঃপর তিনি মধ্যবর্তী সরল রেখার দিকে ইশারা করে বললেন : وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ -এটা আমার সরল পথ। তোমরা এরই অনুসরণ কর।—(মাযহারী)

এ দৃষ্টান্তে সরল পথ বলে পয়গম্বরগণের অভিন্ন ধর্মের পথই বোঝানো হয়েছে। এতে শাখা-প্রশাখা বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ও শয়তানের কাজ। এ সম্পর্কে হাদীসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন :

من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه-অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে অর্ধ হাত পরিমাণও দূরে সরে পড়ে, সে-ই ইসলামের বন্ধনই তার কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল। তিনি আরও বলেন, يد الله على الجماعة —অর্থাৎ, জামাতের উপর আল্লাহ্র রহমতের হাত রয়েছে। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, শয়তান মানুষের জন্য ব্যাঘ্রস্বরূপ। বাঘ ছাগলের পেছনে লাগে অতঃপর যে ছাগল পালের পেছনে অথবা এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে সেটির উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের সঙ্গে থাকা—পৃথক না থাকা।—(মাযহারী)

সারকথা এই যে, এ আয়াতে সকল পয়গম্বর কর্তৃক অনুসৃত অভিন্ন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখার আদেশ রয়েছে। এতে মতভেদকে تفرق শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসে এ মতভেদকেই ঈমানের জন্যে বিপদজ্জনক ও ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে।

মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতভেদ এতে দাখিল নয় : শাখাগত মাসআলার ব্যাপারে যে ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসে কোন স্পষ্ট বিধান নেই, অথবা কোন বাহ্যিক বৈপরীত্য আছে, সেখানে মুজতাহিদ ইমামগণ নিজ নিজ ইজতিহাদ দ্বারা বিধান বর্ণনা করেছেন এবং এতে মতাদর্শের বিভিন্নতার কারণে পরস্পরের মধ্যে মতভেদও হয়েছে। আয়াতে নিষিদ্ধ মতভেদের সাথে এই মতভেদের কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের মতভেদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমল থেকে সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যে হয়ে আসছে এবং এটা যে উম্মতের জন্যে রহমতস্বরূপ, এ বিষয়ে ফেকাহ্বিদগণ একমত।

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ -অর্থাৎ, তওহীদ সত্য প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তওহীদের দাওয়াত মুশরিকদের কাছে কঠিন ঠেকে। এর কারণ, খেয়ালখুশী ও শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ এবং সরলপথ বর্জন। এরপর বলা হয়েছে—

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ — অর্থাৎ, সরলপথ প্রাপ্তির দু'টিই উপায়। (এক) আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং কাউকে সরলপথের জন্যে মনোনীত করে তার স্বভাব ও মজ্জাকে তার উপযোগী করে দিলেন। যেমন, পয়গম্বর ও ওলীগণকে দেয়া হয়েছিল। তাদের সম্পর্কে কোরআন বলে :

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ — অর্থাৎ, আমি তাদেরকে বিশেষ কাজের জন্যে খাঁটিভাবে তৈরী করে নিয়েছি। বিশেষ বিশেষ পয়গম্বর সম্পর্কে কোরআনে مخلص (অর্থাৎ, মনোনীত) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের অর্থও তাই। এ ধরনের হেদায়েত খুবই সীমিত। সরলপথ প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে—যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অভিমুখী হয় এবং তাঁর দ্বীন মেনে চলার ইচ্ছা করে, আল্লাহ্ তাকে সত্য ধর্মের হেদায়েত দান করেন। وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ -বাক্যের অর্থ তাই। এ উপায়ের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। অতএব, মুশরেকদের কাছে তওহীদের দাওয়াত কঠিন ঠেকার কারণ এই যে, তারা ধর্মকে বোঝার এবং তা মেনে চলার ইচ্ছাও করে না।

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ — হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে কোরাইশ কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, সত্যধর্ম ও সরলপথের প্রতি তাদের বিমুখতা এমনিতেও নির্বুদ্ধিতা প্রসূত ছিল, তদুপরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা এরূপ করেছে। জ্ঞান এসে যাওয়ার অর্থ হযরত ইবনে আব্বাসের মতে, যাবতীয় জ্ঞান-গরিমার উৎস রসূলে করীম (সাঃ)-এর আগমন। কেউ কেউ এই অর্থ বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতরা নিজেদের পয়গম্বরগণের ধর্ম থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন রয়েছে, অথচ তাদের কাছে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে সরলপথের সঠিক জ্ঞান এসে গিয়েছিল। পূর্ববর্তী উম্মতদের কথা বলা হোক অথবা কোরাইশ কাফেরদের কথা বলা হোক—উভয় অবস্থায় তারা নিজেরা তো পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলই, রসূলগণকেও তাদের পথে চালানোর প্রয়াসী ছিল। তাই অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে :

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

হাফেয ইবনে-কাসীর বলেন, দশটি বাক্য সম্বলিত এই আয়াতের প্রত্যেকটি বাক্যে বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কোরআনে আয়াতুল কুরসীই এর একমাত্র নযীর। তাতেও দশটি বিধান বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রথম বিধান হচ্ছে فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ -অর্থাৎ, যদিও মুশরেকদের কাছে আপনার তওহীদী দাওয়াত কঠিন মনে হয়, তথাপি আপনি এ দাওয়াত ত্যাগ করবেন না এবং উপর্যুপরি দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখুন। দ্বিতীয় বিধান وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ অর্থাৎ, আপনি এ ধর্মে নিজে অবিচল থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যাবতীয় বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, অভ্যাস ও সামাজিকতার যথাযথ সমতা ও ভারসাম্য কায়েম রাখুন। কোন দিকেই যেন কোনরূপ বাড়াবাড়ি না হয়। বলাবাহুল্য, এরূপ দৃঢ়তা সহজসাধ্য নয়। এ কারণেই কোন কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে তাদের চুলে পাক ধরে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : شيبتنى هود অর্থাৎ, সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। সূরা হূদেও এই আদেশ এ ভাষায়ই ব্যক্ত হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় বিধান— وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ -অর্থাৎ, প্রচারের দায়িত্ব পালনে আপনি কারও বিরোধিতার পরওয়া করবেন না। চতুর্থ বিধান— وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

وَالَّذِيْنَ يُحَاۤجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ
دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿١٦﴾
اَللّٰهُ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ
لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ
اَلَاۤ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ﴿١٨﴾
اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿١٩﴾
مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ
كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ
مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾ اَمْ لَهُمْ شُرَكٰۤؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ
مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ
وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ
مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ؕ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا
يَشَاۤءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾

(১৬) আল্লাহ্‌র দ্বীন মেনে নেয়ার পর যারা সে সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে বাতিল, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব। (১৭) আল্লাহ্‌ই সত্যসহ কিতাব ও ইনসাফের মানদণ্ড নাযিল করেছেন। আপনি কি জানেন, সম্ভবতঃ কেয়ামত নিকটবর্তী। (১৮) যারা তাতে বিশ্বাস করে না তারা তাকে তড়িৎ কামনা করে। আর যারা বিশ্বাস করে, তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে, তা সত্য। জেনে রাখ, যারা কেয়ামত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা দূরবর্তী পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে। (১৯) আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা, রিযিক দান করেন। তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী (২০) যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্যে সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না। (২১) তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (২২) আপনি কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে ভীতসন্ত্রস্ত দেখবেন। তাদের কর্মের শাস্তি অবশ্যই তাদের উপর পতিত হবে। আর যারা মুমিন ও সৎকর্মী, তারা জান্নাতের উদ্যানে থাকবে। তারা যা চাইবে, তাই তাদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। এটাই বড় পুরস্কার।

مِنْ كِتٰبٍ – অর্থাৎ, আপনি ঘোষণা করুন ঃ আল্লাহ্ তাআলা যত কিতাব নাযিল করেছেন, সবগুলোর প্রতি আমি বিশ্বাসী। পঞ্চম বিধান— وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ -এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের কোন মোকদ্দমা আমার কাছে আসলে তাতে ন্যায় বিচার করার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ এখানে **عدل** এর অর্থ করেছেন সাম্য। তারা এ আয়াতের অর্থ করেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধান তোমাদের মধ্যে সমান সমান রাখি, প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সব বিধান পালন করি—এরূপ নয় যে, কোন বিধান মানবো আর কোনটি অমান্য করব। অথবা কোনটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব ও কোনটির প্রতি করব না। ষষ্ঠ বিধান— اَللّٰهُ رَبُّنَا অর্থাৎ, আল্লাহ্ আমাদের সকলের পালনকর্তা। সপ্তম বিধান لَنَاۤ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ — অর্থাৎ, আমাদের কর্ম আমাদের কাজে আসবে। তোমাদের তাতে কোন লাভ-লোকসান হবে না এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের কাজে আসবে। আমার তাতে কোন লাভ ও ক্ষতি নেই। কেউ কেউ বলেন, মক্কায় যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার আদেশ অবতীর্ণ হয়নি, তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। পরে জেহাদের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ায় এই বিধান রহিত হয়ে যায়। কেননা, জেহাদের সারমর্ম এই যে, যারা উপদেশ ও অনুরোধে প্রভাবিত হয় না, যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পরাভূত করতে হবে। তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি রহিত হয়নি এবং উদ্দেশ্য এই যে, দলীলের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তোমাদের না মানা কেবল শত্রুতা ও হঠকারিতা বশতঃই হতে পারে। শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এখন প্রমাণাদির আলোচনা অর্থহীন। তোমাদের কর্ম তোমাদের সামনে এবং আমার কর্ম আমার সামনে থাকবে। —(কুরতুবী)

অষ্টম বিধান— لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ অর্থাৎ, সত্য স্পষ্ট ও প্রমাণিত হওয়ার পরও যদি তোমরা শত্রুতাকেই কাজে লাগাও, তবে তর্ক-বিতর্কের কোন অর্থ নেই। কাজেই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এমন কোন বিতর্ক নেই। নবম বিধান— اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا —অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যেকের কর্মের প্রতিদান দেবেন। দশম বিধান— وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ, আমরা সকলেই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বের আয়াতসমূহে পয়গম্বরগণের সর্বসম্মত ধর্মের প্রতি বিশ্বাসীকে দাওয়াত এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত থাকার উপদেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যেসব কাফের শুনতে ও মানতেই রাযী নয়, তারা এরপরেও মুসলমানদের সাথে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দেয়। রেওয়ায়েতে আছে যে, কিছুসংখ্যক ইহুদী ও খ্রীস্টান এ বিতর্ক উপস্থিত করল যে, আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে এসেছেন এবং আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্ম অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কোন কোন রেওয়ায়েতে এই বিষয়টি কোরাইশ কাফেরদের উত্থাপিত বলে বর্ণিত রয়েছে। কেননা, তারা নিজেদেরকে প্রাচীন ধর্মের অনুসারী বলে আখ্যায়িত করত।

কোরআন পাক উল্লেখিত আয়াতসমূহে বর্ণনা করেছে যে, ইসলাম ও কোরআনের আবেদন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে এবং স্বয়ং তোমাদের জ্ঞানী-গুণী ও ন্যায়পন্থী ব্যক্তিবর্গও মুসলমান হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তোমাদের বাকবিতণ্ডা অসার ও পথভ্রষ্টতা বৈ নয়। তোমরা না মানলে গযব তোমাদের উপরই পড়বে। অতঃপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং এতে আল্লাহ্‌র হক ও বন্দার হকের জন্যে পূর্ণাঙ্গ আইন-কানুন রয়েছে। أَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ এখানে 'কিতাব' বলে কোরআনসহ সমস্ত ঐশীগ্রন্থকে বোঝানো হয়েছে এবং 'হক' বলে পূর্বোক্ত সত্যধর্মকে বোঝানো হয়েছে। ميزان -এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়ি-পাল্লা। এটা যেহেতু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং অধিকার পূর্ণ মাত্রায় দেয়ার একটি মানদণ্ড তাই হযরত ইবনে আব্বাস এর তফসীর করেছেন ন্যায় বিচার। মুজাহিদ বলেন, মানুষ যে দাঁড়ি-পাল্লা ব্যবহার করে এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং হক শব্দের মধ্যে আল্লাহ্‌র যাবতীয় হক এবং ميزان শব্দের মধ্যে বন্দার যাবতীয় হকের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

'মুমিনরা কেয়ামতকে ভয় করে'—এর অর্থ কেয়ামতের ভয়াবহতাজনিত বিশ্বাসগত ভয়। পরন্তু নিজেদের কর্মগত ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য করলে এ ভয় অপরিহার্যরূপে দেখা দেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে কোন মুমিনের মধ্যে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রবল হয়ে তা এ ভয়কে ছাপিয়ে যায়—তা আয়াতের পরিপন্থী নয়। যেমন, মৃত্যুর পর কবরে কোন কোন মৃতের যথাশীঘ্র কেয়ামতের আগমন কামনার বিষয় প্রমাণিত রয়েছে। কারণ, কবরে ফেরেশতাদের কাছ থেকে রহমত ও মাগফেরাতের সুসংবাদ শুনে কেয়ামতের ভয় স্তিমিত হয়ে যাবে।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ — অভিধানে لَطِيْفٌ শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস-এর অনুবাদ করেছেন 'দয়ালু' এবং মুকাতিল করেছেন 'অনুগ্রহকারী।'

হযরত মুকাতিল বলেন, আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত বন্দার প্রতিই দয়ালু। এমনকি কাফের এবং পাপাচারীর উপরও দুনিয়াতে তাঁর নেয়ামত বর্ষিত হয়। বন্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপা অসংখ্য প্রকার। তাই তফসীরে কুরতুবী لَطِيْفٌ শব্দের অনেক অর্থ বর্ণনা করেছেন। সবগুলোর সারমর্মই দয়ালু ও অনুগ্রহকারী।

আল্লাহ্ তাআলা রিযিক সমগ্র সৃষ্টির জন্যে ব্যাপক। স্থলে ও জলে বসবাসকারী যেসব জন্তু সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না, আল্লাহ্‌র রিযিক তাদের কাছেও পৌঁছে। আয়াতে যাকে ইচ্ছা রিযিক দেন, বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার রিযিক অসংখ্য প্রকার। জীবনধারণের উপযোগী রিযিক সবাই পায়। এরপর বিশেষ প্রকারে রিযিক বণ্টনে তিনি বিভিন্ন স্তর ও মাপ রেখেছেন। কাউকে ধন-সম্পদের রিযিক অধিক দান করেছেন। কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তির, কাউকে জ্ঞান ও মারেফতের এবং কাউকে অন্যান্য প্রকার রিযিক দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক মানুষ অপরের মুখাপেক্ষীও থাকে এবং এই মুখাপেক্ষিতাই তাদেরকে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে, যার উপর মানব সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

হযরত জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, রিযিকের ব্যাপারে বন্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও অনুকম্পা দু'রকম। (এক)—তিনি কাউকে তার সারা জীবনের রিযিক এক যোগে দান করেন না। এরূপ করলে তার হেফাযত দুরূহ হয়ে পড়ত এবং শত হেফাযতের পরেও তা পচা-গলা থেকে নিরাপদ থাকত না।—(মাযহারী)

একটি পরীক্ষিত আমল : মাওলানা শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (রহঃ) বলেন, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় সত্তর বার اَللّٰهُ لَطِيْفٌ আয়াতটি الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ -পর্যন্ত নিয়মিত পাঠ করবে, সে রিযিকের অভাব-অনটন থেকে মুক্ত থাকবে। তিনি আরও বলেন, এটি বহুল পরীক্ষিত আমল।

قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى -সার-সংক্ষেপে বর্ণিত এ আয়াতের তফসীর অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকেই বর্ণিত রয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের সবার কাছে আমার আসল হক এই যে, তোমরা আমার রেসালতকে স্বীকৃতি দাও এবং নিজেদের সৌভাগ্য ও সাফল্যের জন্যে আমার আনুগত্য কর। তোমরা এটা না করলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আমার একটি মানবিক ও পারিবারিক হকও রয়েছে, যা তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমাদের অধিকাংশ গোত্রে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। আত্মীয়তার অধিকার ও আত্মীয় বাৎসল্যের প্রয়োজন তোমরা অস্বীকার কর না। অতএব, আমি তোমাদের শিক্ষা, প্রচার ও কর্ম সংশোধনের যে দায়িত্ব পালন করি, এর কোন পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে চাই না। তবে এতটুকু চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু শত্রুতা প্রদর্শনে তো কমপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত।

বলাবাহুল্য, আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বয়ং তাদেরই কর্তব্য ছিল। একে কোন শিক্ষা ও প্রচারকার্যের পারিশ্রমিক বলে অভিহিত করা যায় না। আয়াতে একে রূপক অর্থে পারিশ্রমিক বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি তোমাদের কাছে এটাই চাই। এটা প্রকৃতপক্ষে কোন পারিশ্রমিক নয়। তোমরা একে পারিশ্রমিক মনে করলে ভুল হবে। এ বাক্যের নযীর দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষাতেই বিদ্যমান রয়েছে। কবি মুতানাব্বী বলেন ঃ

ولا عيب فيهم غيران سيوفهم .. بهن فلول من قراع الكتائب

অর্থাৎ, কোন এক গোত্রের বীরত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে এছাড়া কোন দোষ নেই যে, অহরহ যুদ্ধ ও মারামারির কারণে তাদের তরবারিতে দাঁত সৃষ্টি হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, বীরের জন্যে এটা কোন দোষ নয় বরং নৈপুণ্য। জনৈক উর্দু কবি

তার বিশ্বস্ততার গুণকে দোষরূপে ব্যক্ত করে নিজের নির্দোষতাকে বড় করে দেখিয়েছেন।

সরাকথা এই যে, আত্মীয় বাৎসল্য বাস্তবে পারিশ্রমিক নয়। কাজেই আমি এছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই চাই না।

বোখারী ও মুসলিমে আলোচ্য আয়াতের এ তফসীরই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে। যুগে যুগে পয়গম্বরগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়কে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তার কোন বিনিময় তোমাদের কাছে চাই না। আমার প্রাপ্য আল্লাহ্ তাআলাই দেবেন। অতএব, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সকলের সেরা পয়গম্বর হয়ে স্বজাতির কাছে কেমন করে বিনিময় চাইবেন?

ইমাম শা'বী বলেন, আমি এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখলে তিনি জওয়াবে লিখে পাঠালেন ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وسط الناس فى قريش

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোরাইশদের যে গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তার প্রত্যেকটি শাখা-পরিবারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার জন্মগত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাই আল্লাহ্ বলেছেন, আপনি মুশরেকদেরকে বলুন, দাওয়াতের জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। আমি চাই, তোমরা আত্মীয়তার খাতিরে আমাকে তোমাদের মধ্যে অবাধে থাকতে দাও এবং আমার হেফাযত কর।—(রূহুল—মা'আনী)

ইবনে জরীর প্রমুখ আরও বর্ণনা করেন—

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আমার অনুসরণে অস্বীকৃতিও জ্ঞাপন কর, তবুও তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে অন্তত তার প্রতি তো লক্ষ্য রাখবে। আরবের অন্যান্য লোক আমার হেফাযত ও সাহায্যে অগ্রণী হলে তোমাদের জন্যে তা গৌরবের বিষয় হবে না।—(রূহুল-মা'আনী)

হযরত ইবনে আব্বাস থেকেই আরও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি নাযিল হলে কেউ কেউ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে জিজ্ঞেস করল, আপনার আত্মীয় কারা? তিনি বললেন, আলী, ফাতেমা ও তাদের সন্তান–সন্ততি। এ রেওয়ায়েতের সনদ খুব দুর্বল। তাই সুয়ূতী ও হাফেয ইবনে হাজার প্রমুখ একে অগ্রাহ্য বলেছেন। এছাড়া এ রেওয়ায়েতের অর্থ এই যে, আমি আমার কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে এতটুকু চাই যে, তোমরা আমার সন্তান–সন্ততির প্রতি লক্ষ্য রাখ। এটা পয়গম্বরগণ বিশেষতঃ সেরা ও শ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের উপযুক্ত কথা হতে পারে না। সুতরাং সঠিক তফসীর তাই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। রাফেযী সম্প্রদায় এ রেওয়ায়েত কেবল পছন্দই করেনি, এর উপর বিরাট বিরাট আশার দুর্গও রচনা করেছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

নবী পরিবারের সম্মান ও মহব্বত ঃ উপরে এতটুকুই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের কাজের বিনিময়ে জাতির কাছে স্বীয় সন্তানদের প্রতি মহব্বত প্রদর্শনের আবেদন করেননি। এর অর্থ এই নয় যে, রসূল পরিবারের মাহাত্ম্য ও মহব্বত কোন গুরুত্বের অধিকারী নয়। যে কোন হতভাগা পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই এরূপ ধারণা করতে পারে। সত্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্মান ও মহব্বত সবকিছুর চাইতে বেশী হওয়া আমাদের ঈমানের অঙ্গ ও ভিত্তি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে যার যত নিকট সম্পর্ক আছে, তার সম্মান ও মহব্বত এবং সে অনুপাতে জরুরী হওয়া অপরিহার্য। ঔরসজাত সন্তান সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয়। তাই তাদের মহব্বত নিশ্চিতরূপে ঈমানের অঙ্গ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বিবিগণ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হবে, অথচ তাঁদেরও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর নৈকট্য ও আত্মীয়তার বিভিন্নরূপে সম্পর্ক রয়েছে।

সারকথা এই যে, নবী পরিবার ও নবী বংশের মহব্বত নিয়ে কোন সময় মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়নি। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁদের মহব্বত অপরিহার্য। তবে বিরোধ সেখানে দেখা দেয়, যেখানে অন্যদের সম্মানে আঘাত হানা হয়। নতুবা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর বংশধর হিসেবে যত দূর সম্পর্কের সৈয়দই হোক না কেন, তাদের মহব্বত ও সম্মান সৌভাগ্য ও সওয়াবের কারণ। অনেকেই এ ব্যাপারে শৈথিল্যের পরিচয় দিতে শুরু করলে হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কয়েক লাইন কবিতায় তাদের তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁর কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হল। এতে প্রকৃতপক্ষে তিনি অধিকাংশ আলেমের মতাদর্শই তুলে ধরেছেন—

ঃ হে আশ্বারোহী, তুমি মুহাস্সাব উপত্যকার অদূরে থাম। প্রত্যূষে যখন হাজীদের স্রোত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় মীনার দিকে রওয়ানা হবে, তখন সেখানকার প্রত্যেক বাসিন্দা ও পথচারীকে ডেকে তুমি ঘোষণা কর, যদি কেবল মুহাম্মদ (সাঃ)–এর বংশধরের প্রতি মহব্বত রাখলেই মানুষ রাফেযী হয়ে যায়, তবে বিশ্বজগতের সমস্ত জিন ও মানব সাক্ষী থাকুক, আমিও রাফেযী।

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ
حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٢٣﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ
افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ
اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٤﴾
وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ
وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۗ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ
بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ
مَّا يَشَاۤءُ ۗ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌ ۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ
مِنْ ۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ۗ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٨﴾ وَ
مِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَاۤبَّةٍ ۗ
وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاۤءُ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾ وَمَاۤ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا
كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ
فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٣١﴾

(২৩) এরই সুসংবাদ দেন আল্লাহ্ তার সেসব বান্দাকে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে। বলুন, আমি আমার দাওয়াতের জন্যে তোমাদের কাছে কেবল আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ চাই। যে কেউ উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্যে তাতে পুণ্য বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, গুণগ্রাহী। (২৪) নাকি তারা একথা বলে যে, তিনি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করেছেন? আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনার অন্তরে মোহর এঁটে দিতেন। বস্তুতঃ তিনি মিথ্যাকে মিটিয়ে দেন এবং নিজ বাক্য দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরনিহিত বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত। (২৫) তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। (২৬) তিনি মুমিন ও সৎকর্মীদের দোয়া শোনেন এবং তাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। (২৭) যদি আল্লাহ্ তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর রিযিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ নাযিল করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন। (২৮) মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই কার্যনির্বাহী, প্রশংসিত। (২৯) তাঁর এক নিদর্শন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা, এগুলোকে একত্রিত করতে সক্ষম। (৩০) তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন। (৩১) তোমরা পৃথিবীতে পলায়ন করে আল্লাহ্কে অক্ষম করতে পার না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন কার্যনির্বাহী নেই, সাহায্যকারীও নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত, রেসালত ও কোরআনকে ভ্রান্ত ও আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অপপ্রচার আখ্যাদানকারীদেরকে একটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করে জওয়াব দিয়েছেন। নীতিটি এই যে, পয়গম্বরের মো'জেযা ও যাদুকরের যাদু—এ দুই এর মধ্যে কোনটিই আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছু করতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলাই স্বীয় অনুগ্রহে পয়গম্বরগণের নবুওয়ত সপ্রমাণ করার উদ্দেশে তাদেরকে মো'জেযা দান করেন। এতে পয়গম্বরের কোন এখতিয়ার থাকে না।

এমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলা যাদুকরদের যাদুকেও পরীক্ষার ভিত্তিতে চালু হতে দেন। কিন্তু যাদু ও মো'জেযার মধ্যে এবং যাদুকর ও পয়গম্বরের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে তিনি এই নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি মিছামিছি নবুওয়ত দাবী করে, তার হাতে কোন যাদুও সফল হতে দেন না; নবুওয়ত দাবী করার পূর্ব পর্যন্তই তার যাদু কার্যকর হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যাকে নবুওয়ত দান করেন, তাঁকে মো'জেযাও দেন এবং সমুজ্জ্বল করেন। এভাবে স্বাভাবিক গতিতেই তাঁর নবুওয়ত সপ্রমাণ করে দেন। এছাড়া স্বীয় কালামের আয়াতের সত্যায়নও নাযিল করেন।

কোরআন পাকও এক মো'জেযা। সারা বিশ্বের জিন ও মানব এর এক আয়াতের নমুনাও রচনা করতে অক্ষম। তাদের এই অক্ষমতা নবী (সাঃ)-এর আমলেই সপ্রমাণ হয়ে গেছে এবং আজ পর্যন্ত সপ্রমাণ আছে। এমন সুস্পষ্ট মো'জেযা উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী কোন মিথ্যা নবীর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। অতএব, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওহী ও রেসালত সম্পর্কিত দাবী সম্পূর্ণ সত্য ও বিশুদ্ধ। যারা একে ভ্রান্ত ও অপপ্রচার বলে, তারা নিজেরাই বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারে লিপ্ত।

দ্বিতীয় আয়াতে কাফেরদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, এখনও কুফর থেকে বিরত হও এবং তওবা কর। আল্লাহ্ তাআলা পরম দয়ালু। তিনি তওবাকারীদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের পাপ মার্জনা করেন।

তওবার স্বরূপ ঃ তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। শরীয়তের পরিভাষায় কোন গোনাহ্ থেকে ফিরে আসাকে তওবা বলা হয়। তওবা বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

(এক)—বর্তমানে যে গোনাহে লিপ্ত রয়েছে, তা অবিলম্বে বর্জন করতে হবে, (দুই)—অতীতের গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হতে হবে এবং (তিন)—ভবিষ্যতে সে গোনাহ্ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং কোন ফরয কাজ ছেড়ে থাকলে তা আদায় অথবা কাযা করতে হবে। গোনাহ্ যদি বন্দার বৈষয়িক হক সম্পর্কিত হয়, তবে শর্ত এই যে, প্রাপক জীবিত থাকলে তাকে সে ধন-সম্পদ ফেরত দেবে অথবা মাফ করিয়ে নেবে। প্রাপক জীবিত না থাকলে তার ওয়ারিসদেরকে ফেরৎ দেবে। কোন ওয়ারিস না থাকলে বায়তুল মালে জমা দেবে। যদি বায়তুলমালও না থাকে অথবা তার ব্যবস্থাপনা সঠিক না হয় তবে প্রাপকের পক্ষ থেকে সদকা করে দেবে। বৈষয়িক নয়, এমন কোন হক হলে—যেমন, কাউকে অন্যায়ভাবে জ্বালাতন করলে, গালি দিলে, অথবা কারও গীবত করলে যেভাবেই সম্ভবপর হয় তাকে সন্তুষ্ট করে ক্ষমা নিতে হবে।

সকল তওবার জন্যেই আল্লাহ্র ওয়াস্তে গোনাহ্ বর্জন করতে হবে,

শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে গোনাহ্ বর্জন করলে তওবা হবে না। যাবতীয় গোনাহ্ থেকে তওবা করাই শরীয়তের কাম্য। কিন্তু কোন বিশেষ গোনাহ্ থেকে তওবা করলেও আহ্‌লে সুন্নতের মতানুযায়ী সে গোনাহ্ মাফ হবে, কিন্তু অন্যান্য গোনাহ্ বহাল থাকবে।

পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে-নুযূল ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা তওহীদ সপ্রমাণ করার জন্যে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞার উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি বিশ্বজগতকে এক মজবুত ও অটল ব্যবস্থাপনার সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বজগতের এই অটল ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ের দলিল যে, একজন প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ সত্তা একে পরিচালনা করছেন।

পৃথিবীতে জারিকৃত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তাআলা এই বিষয়বস্তুর সূচনা করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এই বিষয়টির সম্পর্ক এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছিল, আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের এবাদত ও দোয়া কবুল করেন। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, মুসলমানরা অনেক সময় পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে দোয়া করে, কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। এরূপ ঘটনা বিরল নয় ; বরং প্রায়ই সংঘটিত হতে দেখা যায়। এ খটকার জওয়াব উল্লেখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে দেয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, মানুষের প্রত্যেকটি বাসনা পূর্ণ হওয়া মাঝে মাঝে স্বয়ং মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উপযোগিতার পরিপন্থী হয়ে থাকে। কাজেই কোন সময় কোন মানুষের দোয়া বাহ্যতঃ কবুল না হলে এর পশ্চাতে বিশ্বজগতের এমন কিছু স্বার্থ নিহিত থাকে, যা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষকেই সব রকম রিযিক ও নেয়ামত দান করা হলে দুনিয়ার প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অচল হয়ে যেতে বাধ্য। –(তফসীরে-কবীর)

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েতে আছে যে, আলোচ্য আয়াত সেসব মুসলমান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় ; যারা কাফেরদের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখে নিজেরাও সেরূপ প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করত। ইমাম বগভীর রেওয়ায়েতে সাহাবী খাব্বাব ইবনে আরত (রাঃ) বলেন, আমরা যখন বনূ-কুরায়যা, বনূ-নুযায়ের ও বনূ-কায়নুকার অগাধ ধন-সম্পদ দেখলাম, তখন আমাদের মনেও ধনাঢ্য হওয়ার বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত ওমর ইবনে হুরায়স (রাঃ) বলেন, সুফফায় অবস্থানকারীদের মধ্যে কেউ কেউ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এরূপ আকাংখা প্রকাশ করেছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেও বিত্তশালী করে দিন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।—(রূহুল-মা'আনী)

দুনিয়াতে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য বিপর্যয়ের কারণ ঃ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব মানুষকে সবরকম রিযিক ও নেয়ামত প্রচুর পরিমাণে দেয়া হলে তাদের পারস্পরিক হানাহানি সীমা ছাড়িয়ে যেত। কারণ, ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে কেউ কারও মুখাপেক্ষী থাকত না এবং কেউ কারও কাছে নতি স্বীকার করত না। অপরদিকে ধনাঢ্যতার এক বৈশিষ্ট্য এই যে, ধন যতই বাড়ে, লোভ-লালসাও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এর অপরিহার্য পরিণতি দাঁড়াত এই যে, একে অপরের সম্পত্তি করায়ত্ত করার জন্যে জোরজবরদস্তির প্রয়োগ ব্যাপক হয়ে যেত। মারামারি-কাটাকাটি ও অন্যান্য কুকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তাআলা সব মানুষকে সব রকম নেয়ামত না দিয়ে এভাবে বন্টন করেছেন যে, কাউকে, ধন-সম্পদ বেশী দিয়েছেন, কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তি অধিক পরিমাণে যুগিয়েছেন, কাউকে রূপ ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং কাউকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরের তুলনায় বেশী সরবরাহ করেছেন। ফলে প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে অপরের মুখাপেক্ষী এবং এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপরই সভ্যতার ভীত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاۤءُ বাক্যের অর্থও তাই যে, আল্লাহ্ তাঁর নেয়ামতসমূহ বিশেষ পরিমাণে মানুষকে দান করেছেন। এরপর اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা সম্যক জানেন কার জন্য কোন নেয়ামত উপযুক্ত এবং কোন নেয়ামত ক্ষতিকর। তাই তিনি প্রত্যেককে তার উপযোগী নেয়ামত দান করেছেন। তিনি যদি কারও কাছ থেকে কোন নেয়ামত ছিনিয়ে নেন, তবে সমগ্র বিশ্বের উপযোগিতার ভিত্তিতেই ছিনিয়ে নেন। এটা মোটেই জরুরী নয় যে, আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপযোগিতা বুঝতে সক্ষম হব। কারণ, এখানে প্রত্যেকেই তার জ্ঞানের এক সীমিত পরিধির মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করে। আর আল্লাহ্ তাআলার সামনে রয়েছে সমগ্র বিশ্বজগতের অন্তহীন উপযোগিতার ক্ষেত্র। কাজেই তাঁর সমস্ত রহস্য অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এর একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টান্ত এই যে, একজন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান মাঝে মাঝে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের পরিপন্থী নির্দেশও জারি করেন। ফলে তারা বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। বিপদে পতিত ব্যক্তি যেহেতু নিজ স্বার্থের সীমিত গণ্ডিতে থেকে চিন্তা করে, তাই রাষ্ট্রপ্রধানের এই পদক্ষেপ তার দৃষ্টিতে অযৌক্তিক ও অসমীচীন প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যার দৃষ্টি গোটা দেশ ও জাতির প্রতি নিবদ্ধ এবং যে মনে করে যে, ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে গোটা দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া যায় না, সে এই পদক্ষেপকে মন্দ বলতে পারে না। অতএব, যে সত্তা সমগ্র বিশ্বজগত পরিচালনা করছেন, তাঁর প্রজ্ঞা ও রহস্য মানুষ কিরূপে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে? এই দৃষ্টিকোণে চিন্তা করলে কোন ব্যক্তিকে বিপদাপদে পতিত দেখে মনে যেসব কুধারণা ও জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি হয়, সেগুলো আপনা-আপনিই উবে যেতে পারে।

এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, বিশ্বের সব মানুষই সমান ধন-সম্পদের অধিকারী হোক এটা সম্ভবপর নয়, কাম্যও নয় এবং বিশ্ব ব্যবস্থাপনার সৃষ্টিগত উপযোগিতাও এর পক্ষে নয়। সূরা যুখরুফের نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ আয়াতের তফসীরে ইনশাআল্লাহ্ এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুরোপুরি আলোচনা করা হবে।

জান্নাত ও দুনিয়ার পার্থক্যঃ এখানে খটকা দেখা দিতে পারে যে, জান্নাতে তো সমস্ত মানুষকেই সর্বপ্রকার নেয়ামত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হবে। সেখানে তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে না কেন? জওয়াব এই যে, দুনিয়াতে বিপর্যয়ের কারণ ধন-সম্পদের প্রাচুর্যসহ লোভ-লালসার প্রেরণা, যা ধনাঢ্যতার সাথে সাথে সাধারণতঃ বৃদ্ধিই পেতে থাকে। এর বিপরীতে জান্নাতে তো নেয়ামতসমূহের ব্যাপক বৃষ্টি বর্ষিত হবে, কিন্তু লোভ-লালসা ও অবাধ্যতার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। ফলে কোনরূপ বিপর্যয় দেখা দেবে না। তাফসীরের সার-সংক্ষেপে মওলানা থানভী (রহঃ) 'বর্তমান অবস্থায়' কথাটি সংযুক্ত করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন—(বয়ানুল-কোরআন)

দুনিয়াতে ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের মাধ্যমে লোভ-লালসার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হল না কেন? এখন এই আপত্তি উত্থাপন করা

নিশ্চিতই অর্থহীন। কেননা, দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ভাল ও মন্দের সমন্বিত একটি বিশ্ব রচনা করা। এটা ব্যতীত জগৎ সৃষ্টির মূল রহস্য-মানুষকে পরীক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং দুনিয়াতে মানুষের এসব প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলে দুনিয়া সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই অর্জিত হত না। পক্ষান্তরে জান্নাতে কেবল কল্যাণই থাকবে—মন্দের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। তাই সেখানে এসব প্রেরণা খতম করে দেয়া হবে।

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا (মানুষ নিরাশ হয়ে গেলে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন।) ভূ-পৃষ্ঠে পানির তীব্র প্রয়োজন দেখা দিলে বৃষ্টি বর্ষণ করাই আল্লাহ্র সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এখানে "নিরাশ হওয়ার পর" বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাঝে মাঝে আল্লাহ্ তাআলা সাধারণ নিয়মের বিপরীতে বৃষ্টি বর্ষণে বিলম্বও করেন। ফলে মানুষ নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হতে থাকে। এতে পরীক্ষা ছাড়া এ বিষয় হুঁশিয়ার করারও উদ্দেশ্য থাকে যে, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি সবই আল্লাহ্ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা মানুষের পাপাচারের কারণে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, যাতে মানুষ তাঁর রহমতের প্রতি মনোনিবেশ করে তাঁর সামনে কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করে। নতুবা বৃষ্টির জন্য এমন ধরাবাঁধা সময় নির্ধারিত থাকলে যার চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম হয় না, তবে মানুষ একে বাহ্যিক কারণের অনুগামী মনে করে আল্লাহ্র কুদরতের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ত। এখানে 'নিরাশ' বলে নিজেদের তদ্বির থেকে নিরাশ হওয়া বোঝানো হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্র রহমত থেকে নৈরাশ্য কুফর।

وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ —অভিধানে নিজ ক্ষমতা বলে চলাফেরা ও নড়াচড়া করতে সক্ষম প্রত্যেক বস্তুকে دَابَّةٌ বলা হয়। পরে শব্দটি কেবল জীব-জন্তু অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক চলমান বস্তু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে চলমান সৃষ্টবস্তু সম্পর্কে সবাই অবগত। আকাশে চলমান সৃষ্টবস্তুর অর্থ ফেরেশতাও হতে পারে এবং এমন জীবজন্তুও হতে পারে, যা এখনও মানুষের কাছে আবিষ্কৃত হয়নি।

উদ্দেশ্য এই যে, যদিও বিশ্বব্যবস্থার উপযোগিতাবশতঃ আল্লাহ্ তাআলা সব মানুষকে ধনাঢ্যতা দান করেননি ; কিন্তু বিশ্বজগতের ব্যাপক উপকারী বস্তু দ্বারা সব মানুষকেই উপকৃত করেছেন। বৃষ্টি, মেঘ, ভূ-পৃষ্ঠ আকাশ এবং এগুলোর যাবতীয় সৃষ্টবস্তু মানুষের উপকারার্থে সৃজিত হয়েছে। এগুলো সবাই আল্লাহ্র তওহীদ ব্যক্ত করে। এরপর কারও কোন কষ্ট হলে তা তার কৃতকর্মের ফলেই হয়। সুতরাং কষ্টে পতিত হয়ে আল্লাহ্ তাআলাকে ভর্ৎসনা করার পরিবর্তে তার উচিত নিজের দোষত্রুটি দেখা।

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

বাক্যের অর্থ তাই। হযরত হাসান থেকে বর্ণিত আছে— এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, সে সত্তার কসম, যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তির গায়ে কোন কাঠের আঁচড় লাগে, অথবা কোন শিরা ধড়ফড় করে অথবা পা পিছলে যায়, তা সবই তার গোনাহ্র কারণে হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক গোনাহ্র শাস্তি দেন না, বরং যেসব গোনাহ্র শাস্তি দেন না সেগুলোর সংখ্যাই বেশী। হযরত আশরাফুল-মাশায়েখ বলেন, দৈহিক পীড়া ও কষ্ট যেমন গোনাহ্র কারণে হয়, তেমনি আত্মিক ব্যাধিও কোন গোনাহের ফলশ্রুতিতে হয়ে থাকে। এক গোনাহ্ হয়ে গেলে তা অন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম 'দাওয়ায়ে-শফী' গ্রন্থে লিখেন,—গোনাহ্র এক নগদ শাস্তি এই যে, এর পরেই মানুষ অন্য গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এমনিভাবে সৎকর্মের এক নগদ প্রতিদান এই যে, এক সৎকর্ম অন্য সৎকর্মের দিকে আকর্ষণ করে।

বায়যাভী প্রমুখ বলেন, এ আয়াত বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের দ্বারা গোনাহ্ সংঘটিত হতে পারে। পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা ও উন্মাদ ব্যক্তি দ্বারা কোন গোনাহ্ হতে পারে না। তারা যদি কোন কষ্ট ও বিপদে পড়ে, তবে তারা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কষ্টের অন্যান্য কারণ ও রহস্য থাকতে পারে। যেমন মর্যাদা উন্নীত করা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এসব রহস্যও মানুষ পূর্ণরূপে জানতে পারে না।

কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, যেসব গোনাহের শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে যায়, মুমিন ব্যক্তি সেগুলো থেকে পরকালে অব্যাহতি লাভ করবে। হাকেম ও বগভী হযরত আলীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।—(মাযহারী)

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ
فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُوْرٍ ﴿٣٣﴾ اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٤﴾ وَّيَعْلَمَ
الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٥﴾ فَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ
مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى
لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ
كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾
وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى
بَيْنَهُمْ ۪ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَهُمُ
الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾ وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ
فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾
وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ
سَبِيْلٍ ﴿٤١﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ
يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٤٣﴾

(৩২) সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম জাহাজসমূহ তাঁর অন্যতম নিদর্শন। (৩৩) তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দেন। তখন জাহাজসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে যেন পাহাড়। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সবরকারী, কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৩৪) অথবা তাদের কৃতকর্মের জন্যে সেগুলোকে ধ্বংস করে দেন এবং অনেককে ক্ষমাও করে দেন (৩৫) এবং যারা আমার ক্ষমতা সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা যেন জানে যে, তাদের কোন পলায়নের জায়গা নেই। (৩৬) অতএব, তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ মাত্র। আর আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে, তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে, (৩৭) যারা বড় গোনাহ্ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে, (৩৮) যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে, (৩৯) যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (৪০) আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে ; নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন নাই। (৪১) নিশ্চয় যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই। (৪২) অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৪৩) অবশ্যই যে সবর করে ও ক্ষমা করে নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল এবং পরকালের নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ ও চিরন্তন। পরকালের নেয়ামতসমূহ অর্জনের সর্বপ্রধান শর্ত ঈমান। ঈমান ব্যতিরেকে সেখানে এসব নেয়ামত কেউ লাভ করতে পারবে না। কিন্তু ঈমানের সাথে যদি সৎকর্ম ও পুরোপুরি সম্পাদন করা হয়, তবে পরকালের নেয়ামত শুরুতেই অর্জিত হয়ে যাবে। নতুবা গোনাহ্ ও ত্রুটির শাস্তি ভোগ করার পর অর্জিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম শর্ত لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বর্ণিত হয়েছে। এরপর বিশেষ বিশেষ কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো ব্যতীত আইন অনুযায়ী পরকালের নেয়ামতসমূহ শুরুতেই পাওয়া যাবে না, বরং গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর পাওয়া যাবে। 'আইন অনুযায়ী' বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে শুরুতেই পরকালের নেয়ামতসমূহ মহাপাপীকেও দিতে পারেন। তিনি কোন আইনের অধীন নন। এখন এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখিত কর্ম ও গুণাবলী লক্ষ্য করুন ঃ

প্রথম গুণ — وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ —অর্থাৎ, সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। তিনি ব্যতীত অপরকে সত্যিকার কার্যনির্বাহী মনে করে না। দ্বিতীয় গুণ — وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ অর্থাৎ, যারা মহাপাপ বিশেষতঃ অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে। মহাপাপ তথা কবীরা গোনাহ্ কি, তার বিশদ বিবরণ সূরা নেসায় বর্ণিত হয়েছে।

কবীরা গোনাহ্‌সমূহের মধ্যে সমস্ত গোনাহ্‌ই অন্তর্ভুক্ত। তবে অশ্লীল গোনাহ্‌কে আলাদা করে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, অশ্লীল গোনাহ্ সাধারণ কবীরা গোনাহ্ অপেক্ষা তীব্রতর ও সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় হয়ে থাকে। এর দ্বারা অন্যরাও প্রভাবিত হয়। নির্লজ্জ কাজকর্ম বোঝানের জন্যে **فواحش** শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, ব্যভিচার ও তার ভূমিকাসমূহ। এছাড়া যেসব কুকর্ম ধৃষ্টতা সহকারে প্রকাশ্যে করা হয়, সেগুলোকেও **فواحش** তথা অশ্লীল বলা হয়। কেননা, এগুলোর কু প্রভাবও যথেষ্ট তীব্র এবং গোটা মানব সমাজকে কলুষিত করে।

তৃতীয় গুণ– وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ –অর্থাৎ, তারা রাগান্বিত হয়েও ক্ষমা করে। এটা সচ্চরিত্রতার উত্তম নমুনা। কেননা, কারও ভালবাসা অথবা কারও প্রতি ক্রোধ যখন প্রবল আকার ধারণ করে, তখন সুস্থ, বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মানুষকেও অন্ধ ও বধির করে দেয়। সে বৈধ–অবৈধ, সত্য–মিথ্যা ও আপন কর্মের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে। কারও প্রতি ক্রোধ হলে সে সাধ্যমত ঝাল মেটানোর চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তাআলা মুমিন ও সৎকর্মীদের এগুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা ক্রোধের সময় কেবল বৈধ –অবৈধের সীমায় অবস্থান করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং অধিকার থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা প্রদর্শন করে।

চতুর্থ গুণ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ – এর অর্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন আদেশ পাওয়া মাত্রই বিনা দ্বিধায় তা কবুল করতে ও পালন করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। যে আদেশ মনের অনুকূলে হোক অথবা প্রতিকূল। এতে ইসলামের সকল ফরয কর্ম পালন এবং হারাম ও মাকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা দাখিল রয়েছে। ফরয কর্মসমূহের মধ্যে নামায

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর বৈশিষ্ট্যও এই যে, এটা পালন করলে অন্যান্য ফরয কর্ম পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকারও তওফীক হয়ে যায়। তাই এর উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ অর্থাৎ তারা সকল ওয়াজিব ও আদবসহ বিশুদ্ধরূপে নামায পড়ে।

পঞ্চম গুণ وَأَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْ — অর্থাৎ, তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে স্থিরীকৃত হয়। অর্থাৎ, যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শরীয়ত কোন বিশেষ বিধান নির্দিষ্ট করেনি, সেগুলো মীমাংসার কাজে তারা পরস্পর পরামর্শ করে। এখানে امر শব্দের অনুবাদ 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়' করা হয়েছে। কেননা, সাধারণের পরিভাষায় امر শব্দ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূরা আলে ইমরানের وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ আয়াতের তফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং একথাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি এবং সাধারণ লেন-দেনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সবই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে-কাসীর বলেন, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদীতে পরামর্শ গ্রহণ করা ওয়াজীব।

ইমাম জাসসাস আহকামুল-কোরআনে বলেন, এ আয়াত থেকে পরামর্শের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। এতে আমাদের প্রতি পরামর্শসাপেক্ষ কাজে তাড়াহুড়া না করার, নিজস্ব মতকেই প্রাধান্য দিয়ে কাজ না করার এবং জ্ঞানী ও সুধীবর্গের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে।

পরামর্শের গুরুত্ব ও পন্থা ঃ খতীব বাগদাদী হযরত আলী মুর্তজা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অবর্তমানে আমরা যদি এমন কোন ব্যাপারের সম্মুখীন হই, যাতে কোরআনের কোন ফয়সালা নেই এবং আপনার পক্ষ থেকেও কোন ফয়সালা না পাই, তবে আমরা সে ব্যাপারে কি করব? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জওয়াবে বললেন- এর জন্যে আমার উম্মতের এবাদতকারীদেরকে একত্রিত করবে এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কর্তব্য স্থির করবে; কারও একক মতে ফয়সালা করো না।

রূহুল -মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন, যে পরামর্শ এভাবে না নিয়ে বে-এলম ও বে-দ্বীন লোকদের কাছ থেকে নেয়া হয়, তার সুফলের চেয়ে কুফলই বেশী হবে।

বায়হাকী বর্ণিত হযরত ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন কাজের ইচ্ছা করে তাতে পরামর্শ গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে সঠিক বিষয়ের দিকে হেদায়েত করবেন। অর্থাৎ, যে কাজের পরিণতি তার জন্যে মঙ্গলজনক ও উত্তম, সে কাজের দিকে তার মনের গতি ফিরিয়ে দেবেন। এমনি ধরনের এক হাদীসে ইমাম বোখারী আল-আদাবুল মুফরাদে হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি উল্লেখিত আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন ঃ

ماتشاور قوم قط الا هدوا لارشد امرهم -যখন কোন সম্প্রদায় পরামর্শক্রমে কাজ করে, তখন তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথনির্দেশ দান করা হয়।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা দানশীল হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হবে, ততদিন ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের বসবাস করা অর্থাৎ, জীবিত থাকা ভাল। পক্ষান্তরে যখন তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মন্দ ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম নারীদের হাতে ন্যস্ত হবে—তারা যেভাবে ইচ্ছা কাজ করবে, তখন তোমাদের বসবাসের জন্যে ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূগর্ভই শ্রেয়ঃ হবে। অর্থাৎ, বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম হবে।—(রূহুল-মা'আনী)

ষষ্ঠ গুণ— وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُونَ -অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক থেকে সৎকাজে ব্যয় করে। ফরয যাকাত, নফল দান-খয়রাত সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কোরআনের সাধারণ বর্ণনাপদ্ধতি অনুযায়ী নামাযের সাথে যাকাত ও সদকার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। এখানে নামাযের আলোচনার পরে পরামর্শের বিষয় বর্ণনা করে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযের জন্যে মসজিদসমূহে দৈনিক পাঁচ বার লোকজন সমবেত হয়। পরামর্শসাপেক্ষ বিষয়াদিতে পরামর্শ নেয়ার কাজেও এ সমাবেশকে ব্যবহার করা যায়।—(রূহুল-মা'আনী)

সপ্তম গুণ— وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ — অর্থাৎ, তারা অত্যাচারিত হয়ে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং এতে সীমালঙ্ঘন করে না। এটা প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় গুণের ব্যাখ্যা ও বিবরণ। তৃতীয় গুণ ছিল এই যে, তারা শত্রুকে ক্ষমা করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমা করলে অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। তখন প্রতিশোধ গ্রহণই উত্তম বিবেচিত হয়। আয়াতে এরই বিধান বর্ণিত হয়েছে যে, কোথাও প্রতিশোধ গ্রহণ শ্রেয়ঃ বিবেচিত হলে সেখানে সাম্যের সীমা লঙ্ঘন না করার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। সীমা লংঘিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণও অত্যাচারে পর্যবসিত হবে। এ কারণেই পরে বলা হয়েছে — وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا —অর্থাৎ, মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে। তোমার যতটুকু আর্থিক অথবা শারিরীক ক্ষতি কেউ করে, তুমি ঠিক ততটুকু ক্ষতিই তার কর। তবে শর্ত এই যে, তোমার মন্দ কাজটি যেন পাপকর্ম না হয়। উদাহরণতঃ কেউ তোমাকে বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দিলে তোমার জন্যে তাকেও বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দেয়া জায়েয হবে না।

আয়াতে যদিও সমান সমান প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু পরে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ —অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপোষ-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহ্র দায়িত্বে রয়েছে। এতে নির্দেশ রয়েছে যে, ক্ষমা করাই

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ
لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿۴۴﴾ وَتَرٰىهُمْ
يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ
وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿۴۵﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ
مِنْ سَبِيْلٍ ﴿۴۶﴾ اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ
مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿۴۷﴾ فَاِنْ اَعْرَضُوْا
فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّاۤ اِذَاۤ اَذَقْنَا
الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ
اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿۴۸﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿۴۹﴾
اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ
قَدِيْرٌ ﴿۵۰﴾ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ
حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿۵۱﴾

(৪৪) আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্যে তিনি ব্যতীত কোন কার্যনির্বাহী নেই। পাপাচারীরা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা বলছে আমাদের ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি? (৪৫) জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করার সময় আপনি তাদেরকে দেখবেন, অপমানে অবনত এবং অর্ধ নির্মীলিত দৃষ্টিতে তাকায়। মুমিনরা বলবে, কেয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা নিজেদের ও তাদের পরিবার–পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে। শুনে রাখ, পাপাচারীরা স্থায়ী আযাবে থাকবে। (৪৬) আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না, যে তাদেরকে সাহায্য করবে। আল্লাহ্ তাআলা যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন গতি নেই। (৪৭) আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অবশ্যম্ভাবী দিবস আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য কর। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তা নিরোধকারী কেউ থাকবে না। (৪৮) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কর্তব্য কেবল প্রচার করা। আমি যখন মানুষকে আমার রহমত আস্বাদন করাই, তখন সে উল্লসিত হয়, আর যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের কোন অনিষ্ট ঘটে, তখন মানুষ খুব অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (৪৯) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্ তাআলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা–সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র–সন্তান দান করেন, (৫০) অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল। (৫১) কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন ; কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন দূত প্রেরণ করবেন, অতঃপর আল্লাহ্ যা চান, সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌছে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়।

উত্তম। পরবর্তী দু'আয়াতে এরই আরও বিবরণ দেয়া হয়েছে।

ক্ষমা ও প্রতিশোধ গ্রহণে সুষম ফয়সালা ঃ হযরত ইবরাহীম নখয়ী (রহঃ) বলেন, পূর্ববর্তী মনীষীগণ এটা পছন্দ করতেন না যে, মুমিনগণ পাপাচারী লোকদের সামনে নিজেদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবেন। ফলে তাদের ধৃষ্টতা আরও বেড়ে যাবে। তাই যেক্ষেত্রে ক্ষমা করার ফলে পাপাচারীদের ধৃষ্টতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেয়াই উত্তম। ক্ষমা করা তখন উত্তম, যখন অত্যাচারী ব্যক্তি অনুতপ্ত হয় এবং তার পক্ষ থেকে অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে। কাযী আবুবকর ইবনে আরাবী ও কুরতুবী এ নীতিই পছন্দ করেছেন। তারা বলেন, ক্ষমা ও প্রতিশোধ দু'টিই অবস্থা ভেদে উত্তম। যে ব্যক্তি অনাচার করার পর লজ্জিত হয়, তাকে ক্ষমা করা উত্তম এবং যে ব্যক্তি স্বীয় জেদে ও অত্যাচারে অটল থাকে, তার ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেয়াই উত্তম।

বয়ানুল–কোরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য দু'আয়াতে খাঁটি মুমিন ও সৎকর্মীদের দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। هُمْ يَغْفِرُوْنَ –এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, তারা ক্রোধের সময় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে না ; বরং তখনও ক্ষমা ও অনুকম্পা তাদের মধ্যে প্রবল থাকে। ফলে ক্ষমা করে দেয়। পক্ষান্তরে هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ —বাক্যে বলা হয়েছে যে, কোন সময় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগ্রত হলেও তারা তাতে ন্যায়ের সীমা লংঘন করে না, যদিও ক্ষমা করে দেয়া উত্তম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রাথমিক আয়াতসমূহে তাদের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে, যারা মুমিন সৎকর্মীদের বিপরীতে কেবল দুনিয়ার আরাম–আয়েশ ও সুখ–শান্তি কামনা করে। এরপর اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ —বাক্যে তাদেরকে কেয়ামতের আযাব আসার পূর্বে তওবা করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেয়া হয়েছে যে, আপনার বারংবার প্রচার ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি তাদের চৈতন্য ফিরে না আসে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا —বাক্যের মর্ম তাই।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ ...... —থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার সর্বময় ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা বর্ণনা করে তওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির আলোচনার পর يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ বলে কুদরতের একটি বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি প্রত্যেক ছোট বড় বস্তু সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির উল্লেখ করে বলা হয়েছে।

يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا
وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ, মানব সৃষ্টিতে কারও ইচ্ছা, ক্ষমতা এমনকি, জ্ঞানেরও কোন দখল নেই। পিতা–মাতা মানবসৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হয়ে থাকে মাত্র। সন্তান প্রজননে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতারও কোন দখল নেই। দখল থাকা তো দূরের কথা, সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্বে মাতাও জানে না যে, তার গর্ভে কি আছে এবং কিভাবে গঠিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলাই কাউকে কন্যা–সন্তান,

কাউকে পুত্র সন্তান, কাউকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং কাউকে সম্পূর্ণ বন্ধ্যা করে রাখেন—তার কোন সন্তানই হয় না।

এসব আয়াতে সন্তানের প্রকার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম কন্যা-সন্তানের উল্লেখ করেছেন, আর পুত্র-সন্তানের উল্লেখ করেছেন পরে। এ ইঙ্গিতদৃষ্টে হযরত ওয়াছেলা ইবনে আসকা বলেন, যে নারীর গর্ভ থেকে প্রথমে কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে পুণ্যময়ী।—(কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াত ইহুদীদের এক হঠকারিতামূলক দাবীর জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে। বগভী ও কুরতুবী প্রমুখ লিখেছেন, ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলল, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। কেননা, আপনি মূসা (আঃ)-এর ন্যায় আল্লাহ্ তাআলাকে দেখেন না এবং তাঁর সাথে সামনা-সামনি কথাবার্তাও বলেন না।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, একথা সত্য নয় যে, মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলাকে দেখেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর সারমর্ম এই যে, এ দুনিয়াতে আল্লাহ্ তাআলার সাথে সরাসরি ও সামনা-সামনি কথা বলা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। স্বয়ং হযরত মূসা (আঃ)-ও সামনা-সামনি কথা শুনেন নি, বরং যবনিকার অন্তরাল থেকে আওয়ায শুনেছেন মাত্র।

এ আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, কোন মানুষের সাথে আল্লাহ্ তাআলার কথা বলার তিনটি মাত্র উপায় রয়েছে। (এক) وَحْيًا অর্থাৎ, কোন বিষয় অন্তরে জাগ্রত করে দেয়া। এটা জাগ্রত অবস্থায়ও হতে পারে এবং নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নের আকারে হতে পারে। অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) القى فى روعى বলতেন। অর্থাৎ, এ বিষয়টি আমার অন্তরে জাগ্রত করা হয়েছে। পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। এতে শয়তানের কারসাজি থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় সাধারণতঃ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে শব্দ অবতীর্ণ হয় না; কেবল বিষয়বস্তু অন্তরে জাগ্রত হয়, যা পয়গম্বর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন।

দ্বিতীয় উপায় أَوْ مِن وَرَائِ حِجَابٍ অর্থাৎ, জাগ্রত অবস্থায় যবনিকার অন্তরাল থেকে কোন কথা শোনা। মূসা (আঃ) তূর পর্বতে এভাবেই আল্লাহ্ তাআলার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাত লাভ করেননি। তাই رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ বলে সাক্ষাতের আবেদন জানান, যার নেতিবাচক জওয়াব لَن تَرَانِي বলে দেয়া হয়।

দুনিয়াতে আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাতের অন্তরায় যবনিকাটি এমন কোন বস্তু নয়, যা আল্লাহ্ তাআলাকে ঢেকে রাখতে পারে। কেননা, তাঁর সর্বব্যাপী নূরকে কোন বস্তুই ঢাকতে পারে না। বরং মানুষের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাই এ সাক্ষাতের পথে অন্তরায় হয়ে থাকে। জান্নাতে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দেয়া হবে। ফলে সেখানে প্রত্যেক জান্নাতী আল্লাহ্ তাআলার দর্শন লাভে ধন্য হবে। সহীহ্ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জমাআতের মাযহাবও তাই।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এ নীতি দুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুনিয়াতে কোন মানুষ আল্লাহ্ তাআলার সাথে সামনা-সামনি কথা বলতে পারে না। আলোচনা যেহেতু মানুষ সম্পর্কে, তাই আয়াতে বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা বাহ্যতঃ ফেরেশতাগণের সাথেও আল্লাহ্ তাআলার সামনা-সামনি কথা হয় না। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে জিবরাঈল (আঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, আমি অনেক কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম, তবুও আমার এবং আল্লাহ্ তাআলার মধ্যে সত্তর হাজার পর্দা রয়ে গিয়েছিল। কোন কোন আলেমের উক্তি অনুযায়ী যদি মে'রাজ-রজনীতে আল্লাহ্ তাআলার সাথে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখোমুখি কথাবার্তা প্রমাণিত হয়, তবে তা উপরোক্ত নীতির পরিপন্থী নয়। কেননা, সে কথাবার্তা এ জগতের নয়—আরশে হয়েছিল।

তৃতীয় উপায়— أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا — অর্থাৎ, জিবরাঈল প্রমুখ কোন ফেরেশতাকে কালাম দিয়ে প্রেরণ করা এবং পয়গম্বরকে তার পাঠ করে শুনানো। এটাই ছিল সাধারণ পন্থা। কোরআন পাক সম্পূর্ণ এ উপায়ে ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। উপরোক্ত বিবরণে وحى শব্দটিকে অন্তরে নিক্ষেপ করার অর্থে নেয়া হয়েছে। কিন্তু শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ তাআলার সব ধরনের কালামের অর্থে ব্যবহৃত হয়। বোখারীর একদীর্ঘ হাদীসে ফেরেশতার মাধ্যমে কথাবার্তাকেও ওহীর একটি প্রকার গণ্য করা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, ফেরেশতার মাধ্যমে আগত ওহীও দু'রকম। কখনও ফেরেশতা আসল আকৃতিতে আসেন এবং কখনও মানুষের আকৃতিতে।

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

سُورَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ وَثَمَانُونَ آيَةً وَسَبْعُ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمٓ ﴿١﴾ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ وَإِنَّهُۥ فِىٓ أُمِّ ٱلْكِتَٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيمٌ ﴿٤﴾ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴿٥﴾ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِىٍّ فِى ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِىٍّ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٧﴾ فَأَهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٩﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾ وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١١﴾

(৫২) এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি। কিন্তু আমি একে করেছি নূর, যাদ্দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি সরল পথপ্রদর্শন করেন— (৫৩) আল্লাহ্‌র পথ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। শুনে রাখ, আল্লাহ্ তাআলার কাছেই সব বিষয়ে পৌঁছে।

সূরা যুখরুফ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৮৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হা-মীম, (২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, (৩) আমি একে করেছি কোরআন, আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ। (৪) নিশ্চয় এ কোরআন আমার কাছে সমুন্নত অটল রয়েছে লওহে-মাহ্‌ফুযে। (৫) তোমরা সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায়—এ কারণে কি আমি তোমাদের কাছ থেকে কোরআন প্রত্যাহার করে নেব? (৬) পূর্ববর্তী লোকদের কাছে আমি অনেক রসূলই প্রেরণ করেছি। (৭) যখনই তাদের কাছে কোন রসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। (৮) সুতরাং আমি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিসম্পন্নদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তীদের এ ঘটনা অতীত হয়ে গেছে। (৯) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ (১০) যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্যে করেছেন পথ, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার। (১১) এবং যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন পরিমিত। অতঃপর তদ্দ্বারা আমি মৃত ভূ-ভাগকে পুনরুজ্জীবিত করেছি। তোমরা এমনিভাবে উত্থিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ —এ আয়াতটি প্রথম আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুরই পরিশিষ্ট এর সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে মুখোমুখি কথাবার্তা তো কারও সাথে হয়নি—হতে পারেও না। তবে আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ করে বন্দাদের প্রতি যে ওহী প্রেরণ করেন, তার তিনটি উপায় প্রথম আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এই নিয়ম অনুযায়ী আপনার প্রতিও ওহী প্রেরণ করা হয়। আপনি আল্লাহ্ তাআলার সাথে সামনা-সামনি কথা বলুন—ইহুদীদের এ দাবী মূর্খতাপ্রসূত ও হঠকারিতামূলক। তাই বলা হয়েছে, কোন মানুষ এমনকি কোন রসূল যে জ্ঞান লাভ করেন, তা আল্লাহ্ তাআলারই দান। যতক্ষণ আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তা ব্যক্ত না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত রসূলগণ কোন কিতাব সম্পর্কেও জানতে পারেন না এবং ঈমানের বিশদ বিবরণ সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হতে পারেন না। কিতাব সম্পর্কে না জানার বিষয়টি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। ঈমান সম্পর্কে সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে ওহীর পূর্বে জ্ঞান থাকে না। নতুবা এ বিষয়ে আলেমগণের ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা যাকে রসূল ও নবী করেন, তাকে শুরু থেকেই ঈমানের উপর পয়দা করেন। তাঁর মনমানসিকতা ঈমানের উপর ভিত্তিশীল থাকে। নবুওয়ত দান ও ওহী অবতরণের পূর্বেও তিনি পাকাপোক্ত মুমিন হয়ে থাকেন। ঈমান তাঁর মজ্জা ও চরিত্রে পরিণত হয়। এ কারণেই যুগে যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় পয়গম্বরকে বিরোধিতা করে তাদের প্রতি নানা রকম দোষারোপ করেছে, কিন্তু কোন পয়গম্বরগণের বিরোধীরা এই দোষ দেয়নি যে, আপনিও তো নবুওয়ত দাবীর পূর্বে আমাদের মতই প্রতিমা পূজা করতেন। কুরতুবী তাঁর তফসীরে এবং কাযী আয়ায "শেফা" গ্রন্থে এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন।

সূরা আয যুখরুফ

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। তবে হযরত মুকাতিল (রহঃ) বলেন, وَسْـَٔلْ مَنْ أَرْسَلْنَا আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। কেউ কেউ বলেন, সূরাটি মে'রাজের সময় আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে।— (রুহুল-মা'আনী)

وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ এতে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা যে বস্তুর কসম করেন, তা সাধারণতঃ পরবর্তী দাবীর দলীল হয়ে থাকে। এখানে কোরআনের কসম করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন স্বয়ং তার অলৌকিকতার কারণে নিজের সত্যতার দলীল। কোরআনকে সুস্পষ্ট বলার অর্থ এই যে, এর উপদেশপূর্ণ বিষয়বস্তু সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান চয়ন করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ কাজ। ইজতিহাদের পূর্ণ যোগ্যতা ব্যতিরেকে একাজ করা যায় না। সেমতে অন্যত্র একথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ (নিঃসন্দেহে আমি কোরআনকে উপদেশ হাসিলের জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?) এতে বলা হয়েছে যে, কোরআন উপদেশ গ্রহণের জন্যে সহজ। এ থেকে ইজতিহাদ ও বিধান চয়ন সহজ হওয়া জরুরী হয় না, বরং অন্যভাবে প্রমাণিত রয়েছে যে, এ কাজের জন্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করা শর্ত।

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ
مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا
اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا
لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤﴾ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ
عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ
بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ
لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾ أَوَمَن يُنَشَّأُ
فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ
الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ
شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُم
مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ آتَيْنَاهُمْ
كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا
آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ وَكَذَٰلِكَ مَا
أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

(১২) এবং যিনি সবকিছুর যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের জন্যে যানবাহনে পরিণত করেছেন, (১৩) যাতে তোমরা তাদের পিঠের উপর আরোহণ কর। অতঃপর তোমাদের পালনকর্তার নেয়ামত স্মরণ কর এবং বল পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। (১৪) আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব। (১৫) তারা আল্লাহ্র বন্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্র অংশ স্থির করেছে। বাস্তবিক মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ। (১৬) তিনি কি তাঁর সৃষ্টি থেকে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন পুত্র-সন্তান? (১৭) তারা রহমান আল্লাহর জন্যে যে কন্যা-সন্তান বর্ণনা করে, যখন তাদের কাউকে তার সংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং ভীষণ মনস্তাপ ভোগ করে। (১৮) তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্র জন্যে বর্ণনা করে, যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম? (১৯) তারা নারী স্থির করে ফেরেশতাগণকে, যারা আল্লাহ্র বন্দা। তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে। এখন তাদের দাবী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। (২০) তারা বলে, রহমান আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে আমরা ওদের পূজা করতাম না। এ বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। (২১) আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি, অতঃপর তারা তাকে আঁকড়ে রেখেছে? (২২) বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত। (২৩) এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংকে অনসূরণ করে চলছি।

প্রচারকের পক্ষে নিরাশ হয়ে বসে থাকা উচিত নয় ঃ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ (আমি কি **তোমাদের কাছ** থেকে এ উপদেশ গ্রন্থ প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায়) উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা অবাধ্যতায় যতই সীমা অতিক্রম কর না কেন, আমি তোমাদেরকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান পরিত্যাগ করব না। এ থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত ও তবলীগের কাজ করে, তার উচিত প্রত্যেকের কাছে পয়গাম নিয়ে যাওয়া এবং কোন দলের কাছে তবলীগ শুধু এ কারণে পরিত্যাগ করা উচিত নয় যে, তারা চরম পর্যায়ের মুলহিদ, বে-দ্বীন অথবা পাপাচারী।

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا (তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বিছানা করেছেন।) উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীর বাহ্যিক আকার বিছানার মত এবং এতে বিছানার অনুরূপ আরাম পাওয়া যায়। সুতরাং এটা গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (তোমাদের জন্যে নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ কর।) মানুষের যানবাহন দু'প্রকার। (এক) যা মানুষ নিজের শিল্পকৌশল দ্বারা নিজেই তৈরী করে। (দুই) যার সৃষ্টিতে মানুষের শিল্পকৌশলের কোন দখল নেই। 'নৌকা' বলে প্রথম প্রকার যানবাহন এবং চতুষ্পদ জন্তু বলে দ্বিতীয় প্রকার যানবাহন বোঝানো হয়েছে। সর্বাবস্থায় উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের ব্যবহারের যাবতীয় যানবাহন আল্লাহ্ তাআলার মহা অবদান। চতুষ্পদ জন্তু যে অবদান, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এগুলো মানুষের চেয়ে কয়েক গুণ বেশী শক্তিশালী হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এগুলোকে মানুষের এমন বশীভূত করে দিয়েছেন যে, একজন বালকও ওদের মুখে লাগাম অথবা নাকে রশি লাগিয়ে যথা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এমনিভাবে যেসব যানবাহন তৈরীতে মানুষের শিল্পকৌশলের দখল আছে, সেগুলোও আল্লাহ্ তা'আলারই অবদান। উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে মামুলী সাইকেল পর্যন্ত যদিও বাহ্যতঃ মানুষ নির্মাণ করে, কিন্তু এগুলো নির্মাণের কৌশল আল্লাহ্ ব্যতীত কে শিক্ষা দিয়েছে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষের মস্তিষ্কে এমন শক্তি দান করেছেন যে, লোহাকেও মোমে পরিণত করে ছাড়ে। এছাড়া এগুলোর নির্মাণে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়, তা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সরাসরি আল্লাহ্র সৃষ্টি।

ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ (এবং যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অবদান স্মরণ কর)। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষের কর্তব্য হল সত্যিকার দাতা আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতসমূহ ব্যবহার করার সময় অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করার পরিবর্তে এ বিষয়ের ধ্যান করা যে, এগুলো আমার প্রতি আল্লাহর দান। কাজেই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তাঁর উদ্দেশে বিনয় ও অসহায়ত্ব ব্যক্ত করা আমার উপর ওয়াজিব। সৃষ্ট জগতের নেয়ামতসমূহ মুমিন ও কাফের উভয়েই ব্যবহার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাফের চরম উদাসিনতা ও বেপরওয়া মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করে আর মুমিন আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহকে চিন্তায়

উপস্থিত রেখে তাঁর সামনে বিনয়াবনত হয়। এ লক্ষ্যেই কোরআন ও হাদীসে বিভিন্ন কাজ আনজাম দেয়ার সময় সবর ও শোকরের বিষয়বস্তুসম্বলিত বিভিন্ন দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মানুষ যদি দৈনন্দিন জীবনে উঠাবসা ও চলা-ফেরায় এসব দোয়া নিয়মিত পাঠ করে তবে তার প্রত্যেক বৈধ কাজই এবাদত হয়ে যেতে পারে। এসব দোয়া আল্লামা জযরীর কিতাব 'হিসনে হাসীনে' এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর কিতাব 'মোনাজাতেমকবুলে' দ্রষ্টব্য।

সফরের দোয়া ঃ سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا (পবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন)। এটা যানবাহনে বসে পাঠ করার দোয়া। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সওয়ারীর জন্তুর উপর বসার সময় এই দোয়া পাঠ করতেন। আরোহণ করার মোস্তাহাব পদ্ধতি হযরত আলী (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, সওয়ারীতে পা রাখার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলবে, অতঃপর সওয়ার হওয়ার পরে 'আলহামদুলিল্লাহ্' পাঠ করে سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ থেকে শুরু করে لَمُنْقَلِبُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করবে।— (কুরতুবী)

وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ (আমরা এমন ছিলাম না যে, একে বশীভূত করব)। এটা যান্ত্রিক যানবাহনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা মৌল উপাদান সৃষ্টি না করলে অথবা তাতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া না রাখলে অথবা মানুষের মস্তিষ্কে সেসব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের শক্তিদান না করলে সমগ্র সৃষ্টি একত্রিত হয়েও এমন যানবাহন সৃষ্টি করতে সক্ষম হত না।

وَاِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ (নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকেই ফিরে যাব)। এ বাক্যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, মানুষের উচিত পার্থিব সফরের সময় পরকালের কঠিন সফরের কথা স্মরণ করা, যা সর্বাবস্থায় সংঘটিত হবে। সে সফর সহজে অতিক্রম করার জন্যে সৎকর্ম ব্যতীত কোন সওয়ারী কাজে আসবে না।

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا (তারা আল্লাহ্র বন্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্র অংশ স্থির করেছে)। এখানে অংশ বলে সন্তান বোঝানো হয়েছে। মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহ্র কন্যা-সন্তান' আখ্যা দিত। 'সন্তান' না বলে 'অংশ' বলে মুশরেকদের এই বাতিল দাবীর যুক্তিভিত্তিক খণ্ডনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা এভাবে যে, আল্লাহ্ তাআলার কোন সন্তান থাকলে সে আল্লাহ্ তাআলার অংশ হবে। কেননা, পুত্র পিতার অংশ হয়ে থাকে। যুক্তিসংগত নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বস্তু স্বীয় অস্তিত্বের জন্যে তার অংশসমূহের প্রতি মুখাপেক্ষী। এ থেকে জরুরী হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ্ তাআলাও তাঁর সন্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন। বলাবাহুল্য যে কোন প্রকার মুখাপেক্ষিতা আল্লাহ্র মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ (যে অলংকার ও সাজ – সজ্জায় লালিত – পালিত হয়)-এ থেকে জানা গেল যে, নারীর জন্যে অলংকার ব্যবহার এবং শরীয়তসম্মত সাজ-সজ্জা অবলম্বন করা জায়েয। এ বিষয়ের ইজমাও আছে। কিন্তু বর্ণনাপদ্ধতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সারা দিনমান সাজ-সজ্জা ও প্রসাধনে ডুবে থাকা সমীচীন নয়। এটা বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতার লক্ষণ ও কারণ।

وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ (এবং সে বিতর্কে কথা বলতেও অক্ষম)। উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশ নারী মনের ভাব জোরেশোরে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পুরুষদের সমান সক্ষম নয়। এ কারণেই বিতর্কে নিজেদের দাবী সপ্রমাণ করা ও প্রতিপক্ষের দাবী প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কাজেই কোন কোন নারী যদি বাকপটুতায় পুরুষদেরকেও হারিয়ে দেয়, তবে সেটা এ আয়াতের পরিপন্থী হবে না। কেননা, অধিকাংশের লক্ষ্যেই সাধারণতঃ নীতি বর্ণনা করা হয়। নারীদের অধিকাংশ এরূপই বটে।

قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ۚ قَالُوْٓا اِنَّا
بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٤﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٥﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ
بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٦﴾ اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ﴿٢٧﴾ وَ
جَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَتَّعْتُ
هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا
جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَقَالُوْا لَوْلَا
نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾ اَهُمْ
يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَلَوْلَآ اَنْ
يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ
لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوْتِهِمْ
اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا ۗ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا
مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٥﴾

(২৪) সে বলত, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছ, আমি যদি তদপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি তোমরা তাই বলবে? তারা বলত তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না। (২৫) অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে। (২৬) যখন ইবরাহীম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (২৭) তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তিনিই আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন। (২৮) এ কথাটিকে সে অক্ষয় বাণীরূপে তার সন্তানদের মধ্যে রেখে গেছে, যাতে তারা আল্লাহ্‌র দিকেই আকৃষ্ট থাকে। (২৯) পরন্তু আমিই এদেরকে ও এদের পূর্বপুরুষদেরকে জীবনোপভোগ করতে দিয়েছি, অবশেষে তাদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল আগমন করেছে। (৩০) যখন সত্য তাদের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা যাদু, আমরা একে মানি না। (৩১) তারা বলে, কোরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হল না? (৩২) তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বন্টন করে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় করে, আপনার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা উত্তম। (৩৩) যদি সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের জন্যে রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার উপর তারা চড়ত (৩৪) এবং তাদের গৃহের জন্যে দরজা দিতাম এবং পালংক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। (৩৫) এবং স্বর্ণনির্মিতও দিতাম। এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী মাত্র। আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাঁদের জন্যেই যারা ভয় করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে বলা হয়েছিল, মুশরেকদের কাছে তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণ ব্যতীত শিরকের কোন দলীল নেই। বলাবাহুল্য, সুস্পষ্ট যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা খুবই অযৌক্তিক ও গর্হিত কাজ। এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি পূর্বপুরুষদেরই অনুকরণ করতে চাও, তবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসরণ কর না কেন, যিনি তোমাদের সম্ভ্রান্ততম পূর্বপুরুষ এবং যাঁর সাথে সম্পর্ক রাখাকে তোমরা গর্বের বিষয় মনে কর? তিনি কেবল তওহীদেই বিশ্বাসী ছিলেন না, বরং তাঁর কর্মপন্থা পরিষ্কার ব্যক্ত করে যে, যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদির উপস্থিতিতে কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা বৈধ নয়। তিনি যখন দুনিয়াতে প্রেরিত হন, তখন তাঁরা গোটা সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণে শিরকে লিপ্ত ছিল। কিন্তু তিনি পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে সুস্পষ্ট প্রমাণাদির অনুসরণ করে সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে বলেন, اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি কুকর্মী ও অবিশ্বাসী দলের মধ্যে বসবাস করে এবং তাদের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে নীরব থাকে, তাকেও তাদের সমমনা মনে করার আশংকা থাকে, তাহলে কেবল তার বিশ্বাস ও কর্ম ঠিক করে নেয়াই যথেষ্ট হবে না, বরং সেই দলের বিশ্বাস ও কর্মের সাথে তার সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করাও জরুরী হবে। সেমতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কেবল নিজের বিশ্বাস ও কর্মকে মুশরেকদের থেকে স্বতন্ত্র করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং মুখে ও সর্বসমক্ষে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছেন।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ (তিনি একে তাঁর সন্তানদের মধ্যে একটি চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গেছেন।) উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তাঁর তওহীদী বিশ্বাসকে নিজের সত্তা পর্যন্তই সীমিত রাখেননি, বরং তাঁর বংশধরকেও এ বিশ্বাসে অটল থাকার ওসিয়ত করেছেন। সেমতে তাঁর বংশধরদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক তওহীদপন্থী ছিল। স্বয়ং মক্কা মোকাররমা ও তার আশপাশে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত অনেক সুস্থমনা ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরেও ইবরাহীম (আঃ)-এর মূল ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, নিজেকে ছাড়াও সন্তান-সন্ততিকে বিশুদ্ধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করাও মানুষের অন্যতম কর্তব্য। পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত ইয়াকুব (আঃ) সম্পর্কেও কোরআন বর্ণনা করেছে যে, তিনি ওফাতের সময় পুত্রদেরকে বিশুদ্ধধর্মে কায়েম থাকার ওসিয়ত করেছিলেন। সুতরাং যে কোন সম্ভাব্য উপায়ে সন্তান-সন্ততির কর্ম ও চরিত্র সংশোধনে পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা যেমন জরুরী, তেমনি পয়গম্বরগণের সুন্নত বটে। সন্তানদের সংশোধনের অনেক পদ্ধতি রয়েছে যা স্থান বিশেষ অবলম্বন করা যায়। কিন্তু শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (রহঃ) 'লাতায়েফুল মিনান' গ্রন্থে একটি কার্যকরী পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, পিতা-মাতা সন্তানদের সংশোধনের জন্যে সযত্নে দোয়া করবেন। পরিতাপের বিষয়, এই সহজ পদ্ধতির প্রতি আজকাল

ব্যাপক উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। অবশ্য স্বয়ং পিতা-মাতারই এর অশুভ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা মুশরেকদের একটি আপত্তির জওয়াব দিয়েছেন। তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর রেসালতের ব্যাপারে এ আপত্তি করত। প্রকৃতপক্ষে তারা শুরুতে একথা বিশ্বাস করতেই সম্মত ছিল না যে, রসূল কোন মানুষ হতে পারে। কোরআন পাক তাদের এ মনোভাব কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছে যে, আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কিরূপে রসূল মানতে পারি, যখন সে সাধারণ মানুষের মতই পানাহার করে এবং বাজারে চলাফেরা করে? কিন্তু যখন কোরআনের একাধিক আয়াতে ব্যক্ত করা হল যে, কেবল মুহাম্মদ (সাঃ)-ই নন দুনিয়াতে এ যাবৎ যত পয়গম্বর আগমন করেছেন, তারা সবাই মানুষ ছিলেন, তখন তারা পাঁয়তারা পরিবর্তন করে বলতে শুরু করল যে, যদি কোন মানুষকেই নবুওয়ত সমর্পণ করার ইচ্ছা ছিল, তবে মক্কা ও তায়েফের কোন বিত্তবান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে সমর্পণ করা হল না কেন? মুহাম্মদ (সাঃ) তো কোন প্রভাবশালী, ধনী ব্যক্তি নন। কাজেই তিনি নবুওয়ত লাভের যোগ্য নন। রেওয়ায়েতে আছে যে, এ ব্যাপারে তারা মক্কার ওলীদ ইবনে মুগীরা ও ওতবা ইবনে রবীয়া এবং তায়েফের ওরওয়া ইবনে মাসউদ সকফী, হাবীব ইবনে আমরা সকফী অথবা কেনেনা ইবনে আবদে ইয়া'লীলের নাম পেশ করেছিল।— (রূহুল-মা'আনী)

মুশরেকদের এ আপত্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা দু'টি উত্তর দিয়েছেন। প্রথম জওয়াব উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়াতে এবং দ্বিতীয় জওয়াব এর পরবর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছে। যথাস্থানেই এর ব্যাখ্যাও করা হবে। প্রথম জওয়াবের সারমর্ম এই যে, এব্যাপারে তোমাদের নাক গলানোর কোন অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ কাকে নবুওয়ত দিচ্ছেন এবং কাকে দিচ্ছন না। নবুওয়তের বন্টন তোমাদের হাতে নয় যে, কাউকে নবী করার পূর্বে তোমাদের মত নিতে হবে। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হাতে। তিনিই মহান। উপযোগিতা অনুযায়ী একাজ সমাধা করেন। তোমাদের অস্তিত্ব, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা নবুওয়ত বন্টনের দায়িত্ব লাভের যোগ্যই নয়। নবুওয়ত বন্টন তো অনেক উচ্চস্তরের কাজ, তোমাদের মর্যাদা, অস্তিত্ব ও স্বয়ং তোমাদের জীবিকা ও জীবিকার আসবাবপত্র বন্টনের দায়িত্ব পালনেরও উপযুক্ত নয়। কারণ, আমি জানি তোমাদেরকে এ দায়িত্ব দেয়া হলে তোমরা একদিনও জগতের কাজ-কারবার পরিচালানা করতে সক্ষম হবে না এবং গোটা বাবস্থাপনা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ্ তাআলা পার্থিব জীবনে তোমাদের জীবিকা বন্টনের দায়িত্বও তোমাদের হাতে সোপর্দ করেননি, বরং একাজ নিজের হাতেই রেখেছেন। অতএব, যখন নিম্নস্তরের একাজ তোমাদেরকে সোপর্দ করা যায় না, তখন নবুওয়ত বন্টনের মত মহান কাজ কিরূপে তোমাদের হাতে সোপর্দ করা যাবে। আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য তো এতটুকুই, কিন্তু মুশরেকদেরকে জওয়াব দান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেগুলো থেকে কতিপয় অর্থনৈতিক মূলনীতি চয়ন করা যায়। এখানে এগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা জরুরী।

জীবিকা বন্টনের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ঃ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ
আমি তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি আমার অপার প্রজ্ঞার সাহায্যে বিশ্বের জীবনব্যবস্থা এমন করেছি যে, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজনাদি মিটানোর ক্ষেত্রে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং সকল মানুষ এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার সূত্র গ্রথিত হয়ে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনাদি মিটিয়ে যাচ্ছে। আলোচ্য আয়াতটি খোলাখুলি ব্যক্ত করেছে যে, আল্লাহ্ তাআলা জীবিকা বন্টনের কাজ (সোশ্যালিজমের ন্যায়) কোন ক্ষমতাশালী মানবিক প্রতিষ্ঠানের হাতে সোপর্দ করেননি, যে পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থির করবে যে, সমাজের প্রয়োজনাদি কি কি, সেগুলো কিভাবে মিটানো হবে, উৎপাদিত সম্পদকে কি হারে কি কি কাজে লাগানো হবে এবং এগুলোর মধ্যে আয়ের বন্টন কিসের ভিত্তিতে করা হবে? এর পরিবর্তে এ সমস্ত কাজ আল্লাহ্ তাআলা নিজের হাতে রেখেছেন। নিজের হাতে রাখার অর্থ এটাই যে, তিনি প্রত্যেককে অপরের মুখাপেক্ষী করে বিশ্বব্যবস্থা এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, এতে অস্বাভাবিক ইজারাদারী ইত্যাদির মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি না করা হলে এ ব্যবস্থাটি আপনা-আপনি এসব সমস্যার সমাধান করে দেয়। পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার এই ব্যবস্থাকে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিভাষায় 'আমদানি-রফতানির' ব্যবস্থা বলা হয়। আমদানি-রফতানির স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে বস্তুর আমদানি কম অথচ চাহিদা বেশী, তার মূল্য বৃদ্ধি পায়। কাজেই উৎপাদন যন্ত্রগুলোর সেই বস্তু উৎপাদনে অধিক মুনাফা দেখে সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে। অতঃপর যখন আমদানি রফতানির তুলনায় বেড়ে যায়, তখন মূল্য হ্রাস পায়। ফলে সে বস্তুর অধিক উৎপাদন লাভজনক থাকে না এবং উৎপাদন যন্ত্রগুলো এর পরিবর্তে অন্য কাজে ব্যাপৃত হয়ে যায়, যার প্রয়োজন বেশী। ইসলাম আমদানি ও রফতানির এসব শক্তির মাধ্যমেই সম্পদ উৎপাদন ও বন্টনের কাজ নিয়েছে এবং সাধারণ অবস্থায় জীবিকা বন্টনের কাজ কোন মানবিক প্রতিষ্ঠানের হাতে সোপর্দ করেনি। এর কারণ এই যে, পরিকল্পনা প্রণয়নের যত উন্নত পদ্ধতিই আবিষ্কৃত হোক না কেন, এর মাধ্যমে বিষয়াদি সাধারণতঃ স্বাভাবিক ব্যবস্থার অধীনেই পরিচালিত হয়। জীবনের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যা এমনিভাবে স্বাভাবিক পন্থায় আপনা-আপনি সমাধান প্রাপ্ত হয়। এগুলোকে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রণয়নের সোপর্দ করা জীবনে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা ছাড়া কিছু নয়। উদাহরণতঃ দিন কাজের জন্যে এবং রাত্রি নিদ্রার জন্যে। এ বিষয়টি কোন চুক্তি অথবা মানবিক পরিকল্পনা প্রণয়নের অধীনে স্থিরীকৃত হয়নি, বরং প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আপনা-আপনি এ ফয়সালা করে দিয়েছে। এমনিভাবে কে কাকে বিয়ে করবে এ বিষয়টি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত ব্যবস্থার অধীনে আপনা থেকেই সম্পন্ন হয় এবং একে পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সমাধান করার কল্পনা কারও মধ্যে জাগ্রত হয়নি। উদাহরণতঃ কে জ্ঞান ও কারিগরির কোন বিভাগকে নিজের কার্যক্ষেত্র রূপে বেছে নিবে, এ বিষয়টি মানসিক আগ্রহ ও অনুরাগের পরিবর্তে সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর সোপর্দ করা একটা অযথা জবরদস্তি মাত্র। এতে প্রাকৃতিক নিয়মে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এমনিভাবে জীবিকা ব্যবস্থাও আল্লাহ্ তাআলা নিজের হাতে রেখে প্রত্যেকের মনে সেই কাজের প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তার জন্যে অধিক উপযুক্ত এবং যা সে সুষ্ঠুভাবে আনজাম দিতে পারে। সেমতে প্রত্যেক ব্যক্তি এমনকি একজন ঝাড়ুদারও নিজের কাজ নিয়ে আনন্দিত ও গর্বিত থাকে— كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যায় ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সম্পদ একত্রিত করে অপরের জন্যে রিযিকের দ্বারা বন্ধ করে দেয়ার স্বাধীনতা দেয়নি ; বরং আমদানির উপায়সমূহের মধ্যে হালাল ও হারামের পার্থক্য করে সুদ, ফটকা বাজী, জুয়া, মজুদদারী ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এরপর বৈধ আমদানিতেও যাকাত, ওশর ইত্যাদি কর আরোপ করে সেসব অনিষ্টের মূলোৎপাটন করেছে, যা বর্তমান পুঁজিবাদীব্যবস্থায় পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও কখনও ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তা ভেঙ্গে দেয়ারজন্যে সরকারের হস্তক্ষেপ বৈধ রেখেছে।

সামাজিক সাম্যের তাৎপর্য ঃ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ আমি এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি। এ থেকে জানা গেল যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের আয় সম্পূর্ণভাবে সমান হোক—এ অর্থে সামাজিক সাম্য কাম্যও নয় এবং সম্ভবপরও নয়। আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক মানুষের দায়িত্বে কিছু কর্তব্য আরোপ করেছেন এবং কিছু অধিকার দিয়েছেন আর এতদুভয়ের মধ্যে স্বীয় প্রজ্ঞার ভিত্তিতে এ গড় নির্বাচন করে দিয়েছেন যে, যার কর্তব্য যত বেশী, তার অধিকারও তত বেশী। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্ট জীবের দায়িত্বে-কর্তব্য খুব কম আরোপ করা হয়েছে। তারা হালাল ও হারাম, জায়েয ও নাজায়েযের আওতাধীন নয়। তাই তাদের অধিকার সবচেয়ে কম। সেমতে তাদের ব্যাপারে মানুষকে প্রশস্ত স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। মানুষ নামে মাত্র কিছু বিধি-নিষেধ পালন করে যেভাবে ইচ্ছা, তাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সেমতে কোন কোন জীবকে মানুষ কেটে ভক্ষণ করে, কোন কোনটি পিঠে সওয়ার হয় এবং কোনটিকে পদতলে পিষ্ট করে, কিন্তু একে এসব জীবের অধিকার হরণ বলে গণ্য করা হয় না। কারণ, তাদের কর্তব্য কম বিধায় তাদের অধিকারও কম। সৃষ্টজগতের মধ্যে সর্বাধিক কর্তব্য মানুষ ও জিনের দায়িত্বে আরোপ করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকটি কথা ও কর্ম এবং উঠা ও বসার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। তারা তাদের দায়িত্ব পালন না করলে পরকালে কঠোর শাস্তির যোগ্য হবে। তাই আল্লাহ্ তাআলা মানুষ ও জিনকে অধিকারও সবচেয়ে বেশী দিয়েছেন। পরস্পরভাবে মানুষের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, যার দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরের তুলনায় বেশী, তার অধিকারও বেশী। মনুষ্যকুলের মধ্যে সর্বাধিক দায়িত্ব যেহেতু পয়গম্বরগণের উপর আরোপিত হয়েছে তাই তাঁদেরকে অধিকারও অন্যদের তুলনায় বেশী দেয়া হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়ও আল্লাহ্ তাআলা এই মাপকাঠির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি যতটুকু দায়িত্ব বহন করে, তাকে ততটুকু অসুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বলাবাহুল্য, মানুষের কর্তব্যে সমতা আনয়ন করা একেবারে অসম্ভব এবং তাতে তফাৎ হওয়া অপরিহার্য। এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পূর্ণ অপরের সমান হবে। কেননা, আর্থ-সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষের সৃষ্টিগত যোগ্যতা ও প্রতিভার উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে দৈহিক শক্তি, স্বাস্থ্য, বিবেক, বয়স, মেধা, দক্ষতা, কর্মতৎপরতা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকেই খোলা চোখে অবলোকন করতে পারে যে, এসব গুণের দিক দিয়ে সকল মানুষের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করার সাধ্য সর্বাধিক উন্নত সমাজতান্ত্রিক সরকারেরও নেই। মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভার মধ্যে যখন পার্থক্য অপরিহার্য, তখন তাদের কর্তব্যেও পার্থক্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী হবে। অর্থনৈতিক অধিকার ও কর্তব্যের উপরই নির্ভরশীল বিধায় আমদানিতেও পার্থক্য হওয়া অপরিহার্য। কেননা, কর্তব্যে পার্থক্য রেখে যদি সকলের আমদানি সমান করে দেয়া হয়, তবে এর মাধ্যমে কখনও ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কিছু লোকের আমদানি তাদের কর্তব্যের তুলনায় বেশী এবং কিছু লোকের কম হবে, যা সুস্পষ্ট অবিচার। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আমদানিতে পূর্ণ সাম্য কোন যুগেই ইনসাফভিত্তিক হতে পারে না। সুতরাং সমাজতন্ত্র তার চরম উন্নতির যুগে (পূর্ণ মাত্রায় সাম্যবাদের যুগে) যে সাম্যের দাবী করে, তা কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় ও ইনসাফভিত্তিক নয়। (১) তবে কার কর্তব্য বেশী, কার কম এবং এ হারে কার কতটুকু অধিকার হওয়া উচিত, এটা নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন কাজ। এটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্যে মানুষের কাছে কোন মাপকাঠি নেই। মাঝে মাঝে দেখা যায় একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এক ঘন্টায় এত টাকা আয় করে, যা একজন অদক্ষ শ্রমিক সারাদিন অনেক মণ মাটি বয়েও আয় করতে পারে না। কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখতে একে তো শ্রমিকের সারাদিনের স্বাধীন পরিশ্রম ইঞ্জিনিয়ারকে প্রদত্ত গুরু দায়িত্বের সমান হতে পারে না, এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারের আমদানি কেবল এক ঘন্টার পরিশ্রমের প্রতিদান নয়; বরং এতে বছরের পর বছর মস্তিষ্ক ক্ষয় ও অধ্যবসায়ের প্রতিদানেরও অংশ আছে, যা সে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা অর্জনের ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং তাতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে সহ্য করেছে। সমাজতন্ত্র তার প্রাথমিক স্তরে আয়ের এই পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েছে। সেমতে সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বেতনের বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেই তাদের পদস্খলন ঘটেছে যে, উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের তহবিলে দিয়ে জনগণের কর্তব্য নির্ধারণ ও তদনুযায়ী আমদানি বন্টনের কাজও সরকারের কাছে ন্যস্ত করেছে। অথচ উপরে বর্ণিত রয়েছে যে, কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে অনুপাত কায়েম রাখার জন্যে মানুষের কাছে কোন মাপকাঠি নেই। সমাজতন্ত্রের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সারা দেশের মানুষের জীবিকা নির্ধারণের কাজ সরকারের কতিপয় কর্মীর হাতে এসে গেছে। তারা যাকে যতটুকু ইচ্ছা, দেয়ার এবং যতটুকু ইচ্ছা, না দেয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে। প্রথমতঃ এতে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির জন্যে প্রশস্ত ময়দান খোলা রয়েছে, যার সিঁড়ি বেয়ে আমলাতন্ত্র ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ যদি সরকারের সকল কর্মীকে ফেরেশতাও ধরে নেয়া হয় এবং তারা বাস্তবিকই ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে দেশে আমদানি বন্টন করতে আগ্রহী হয়, তবে তাদের কাছে এমন কোন মাপকাঠি আছে কি যদ্দ্বারা তারা একজন ইঞ্জিনিয়ার ও একজন শ্রমিকের কর্তব্যের পার্থক্য এবং তদনুপাতে তাদের আমদানির ইনসাফভিত্তিক পার্থক্য সম্পর্কে ফয়সালা দিতে পারে?

বাস্তব ঘটনা এই যে, এ বিষয়ের ফয়সালা মানব বুদ্ধির অনুভূতির উর্ধ্বে। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ একে নিজের হাতে রেখেছেন। আলোচ্য وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন যে, এই পার্থক্য নির্ধারণের কাজ আমি মানুষকে সোপর্দ করার পরিবর্তে নিজের হাতে রেখেছি। এর অর্থ এখানে তাই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেকের প্রয়োজন অপরের সাথে জড়িত করে দেয়া হয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে অপরকে ততটুকু দিতে বাধ্য, যতটুকুর সে যোগ্য। এখানেও পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপর ভিত্তিশীল আমদানি ও রফতানির ব্যবস্থা প্রত্যেকের আমদানী নির্ধারণ করে। অর্থাৎ, প্রত্যেকেই নিজে ফয়সালা করে যে, যতটুকু কর্তব্য সে নিজ দায়িত্বে নিয়েছে, তার কতটুকু বিনিময় তার জন্য যথেষ্ট। এর কম পাওয়া গেলে সে সেই কাজ করতে সম্মত হয় না এবং বেশী চাইলে প্রতিপক্ষ তাকে কাজে নিয়োজিত করে না। لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا বাক্যের অর্থ তাই যে, আমি আমদানিতে পার্থক্য একারণে রেখেছি, যাতে একজন অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়। নতুবা সকলের আমদানি সমান হলে কেউ কারও কোন কাজে আসত না।

তবে কতক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই বড় বড় পুঁজিপতিরা আমদানি ও রফতানির এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থেকে অবৈধ ফায়দা লুটতে পারে, তারা গরীবদেরকে তাদের প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা কম মজুরীতে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে। ইসলাম প্রথমতঃ হালাল-হারাম ও

জায়েয-নাজায়েযের সুদূরপ্রসারী বিধি-বিধানের সাহায্যে এবং দ্বিতীয়তঃ নৈতিক আচরণাবলী ও পরকাল চিন্তার মাধ্যমে এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পথে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলেছে। যদি কখনও কোন স্থানে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে যায়, তবে ইসলাম রাষ্ট্রকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সীমা পর্যন্ত মজুরী নির্ধারণের ক্ষমতা দান করেছে। বলাবাহুল্য, এটা কেবল অস্বাভাবিক পরিস্থিতি পর্যন্ত সীমিত বিধায় এর জন্যে উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের হাতে সমর্পণ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, এর ক্ষতি উপকারের তুলনায় অনেক বেশী।

ইসলামী সাম্যের অর্থ ঃ উল্লেখিত ইঙ্গিতসমূহ থেকে একথা স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে যে, আমদানিতে পুরোপুরি সাম্য ও ন্যায় সুবিচারের দাবী নয়। এ সাম্য কার্যতঃ কোথাও কায়েম হয়নি এবং হতে পারে না। এটা ইসলামেওর কাম্য নয়। তবে ইসলাম আইন, সামাজিকতা ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এর অর্থ এই যে, উল্লেখিত প্রাকৃতিক কর্মপদ্ধতি অনুসারে যার যতটুকু অধিকার নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তা অর্জন করার আইনগত ও সমাজগত অধিকারে সকলেই সমান এ বিষয়ের কোন অর্থ হয় না যে, একজন ধনী, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও পদাধিকারী ব্যক্তি তার অধিকার সসম্মানে ও সহজে অর্জন করবে, আর গরীব বেচারী তার অধিকার অর্জনের জন্যে দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খেয়ে ফিরবে এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে, আইন ধনীর অধিকার সংরক্ষণ করবে আর গরীবদের বেলায় আইনের বাণী নিভৃতে কাঁদবে। এ বিষয়টি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)
খলীফা হওয়ার পর এক ভাষণে তুলে ধরেছিলেনঃ আমি যে পর্যন্ত দুর্বলের অধিকার আদায় করে না দেই, সে পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বল অপেক্ষা শক্তিশালী কেউ নেই এবং আমি যে পর্যন্ত সবলের কাছ থেকে অধিকার আদায় না করি, সে পর্যন্ত সবল অপেক্ষা দুর্বল আমার কাছে কেউ নেই।

এমনিভাবে নির্ভেজাল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে ইসলামী সাম্যের অর্থ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই উপার্জনের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। ইসলাম এটা পছন্দ করে না যে, কয়েকজন বড় বড় ধনপতি ধন-সম্পদের উৎসমুখ দখল করে নিজেদের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত করে নেবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্যে বাজারে বসাও দুরূহ করে তুলবে। সেমতে সুদ, ফটকাবাজী, জুয়া, মজুদদারী এবং ইজারাদারী ভিত্তিক বাণিজ্যিক চুক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া যাকাত, ওশর, খেরাজ, ভরণ-পোষণের ব্যয়, দান-খয়রাত ও অন্যান্য কর আরোপ করে এমন পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা, শ্রম ও পুঁজি অনুপাতে উপার্জনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে একটি সুখী সমাজ গড়ে উঠতে পারে। এত সবের পরেও আমদানিতে যে পার্থক্য থেকে যাবে, তা প্রকৃতপক্ষে অপরিহার্য। মনুষ্যকুলের মধ্যে যেমন রূপ, সৌন্দর্য, শক্তি, স্বাস্থ্য, জ্ঞানবুদ্ধি, মেধা, সন্তান-সন্ততির বিদ্যমান পার্থক্য মেটানো সম্ভবপর নয়, তেমনি এ পার্থক্যও বিলোপ হওয়ার নয়।

ধনদৌলতে প্রাচুর্য শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় ঃ কাফেররা বলেছিল, মক্কা ও তায়েফের কোন বড় ধনাঢ্য ব্যক্তিকে পয়গম্বর করা হল না কেন? আলোচ্য আয়াতসমূহে এর দ্বিতীয় জওয়াব দেয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে নবুওয়তের জন্যে কিছু যোগ্যতা ও শর্ত থাকা জরুরী। কিন্তু ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে কাউকে নবুওয়ত দেয়া যায় না। কেননা, ধন-দৌলত আমার দৃষ্টিতে এত নিকৃষ্ট ও হেয় যে, সব মানুষের কাফের হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি সব কাফেরের উপর স্বর্ণ-রৌপ্যের বৃষ্টি বর্ষণ করতাম। তিরমিযীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسقى كافـرا منها شربة مـاء অর্থাৎ, দুনিয়া যদি আল্লাহ্র কাছে মশার এক পাখার সমানও মর্যাদা রাখত, তবে আল্লাহ্ তাআলা কোন কাফেরকে দুনিয়া থেকে এক ঢোক পানিও দিতেন না। এ থেকে জানা গেল যে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্যও কোন শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় এবং এর অভাবও মানুষের মর্যাদাহীন হওয়ার আলামত নয়। তবে নবুওয়তের জন্যে কতিপয় উচ্চস্তরের গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। সেগুলো মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই কাফেরদের আপত্তি সম্পূর্ণ অসার ও বাতিল।

আয়াতে "সব মানুষ কাফের হয়ে যেত" এর অর্থ বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কাফের হয়ে যেত। নতুবা আল্লাহ্র কিছু বান্দাহ্ আজও আছে, যারা বিশ্বাস করে যে, কুফরী অবলম্বন করে তারা ধন-দৌলতে স্নাত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারা ধন-দৌলতের খাতিরে কুফরী অবলম্বন করে না। এরূপ কিছু লোক সম্ভবতঃ তখনও ঈমানকে আঁকড়ে থাকত। কিন্তু তাদের সংখ্যা হত আটার মধ্যে লবণের তুল্য।

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾
وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾
حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ
فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾ وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ
مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٩﴾ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ
فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٠﴾ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤١﴾
اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِيْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿٤٢﴾ فَاسْتَمْسِكْ
بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٣﴾ وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ
لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً
يُّعْبَدُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ
فَقَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ
مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ۫ وَ
اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَ
السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾

(৩৬) যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। (৩৭) শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে। (৩৮) অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব থাকত। কত হীন সঙ্গী সে! (৩৯) তোমরা যখন কুফর করছিলে, তখন তোমাদের আজকের আযাবে শরীক হওয়া কোন কাজে আসবে না। (৪০) আপনি কি বধিরকে শোনাতে পারবেন? অথবা যে অন্ধ ও যে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত, তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারবেন? (৪১) অতঃপর আমি যদি আপনাকে নিয়ে যাই, তবু আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব। (৪২) অথবা যদি আমি তাদেরকে যে আযাবের ওয়াদা দিয়েছি, তা আপনাকে দেখিয়ে দেই, তবু তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। (৪৩) অতএব, আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়, তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে রয়েছেন। (৪৪) এটা আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্যে উল্লেখিত থাকবে এবং শীঘ্রই আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন। (৪৫) আপনার পূর্বে আমি যেসব রসূল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত আমি কি কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম এবাদতের জন্যে? (৪৬) আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, অতঃপর সে বলেছিল, আমি বিশ্ব পালনকর্তার রসূল। (৪৭) অতঃপর সে যখন তাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী উপস্থাপন করল, তখন তারা হাস্যবিদ্রূপ করতে লাগল। (৪৮) আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম, তাই হত পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ এবং আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, যাতে তারা ফিরে আসে। (৪৯) তারা বলল, হে যাদুকর, তুমি আমাদের জন্যে তোমার পালনকর্তার কাছে সে বিষয় প্রার্থনা কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন; আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখতা কুসংসর্গের কারণ ঃ وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপদেশ অর্থাৎ কোরআন ও ওহী থেকে জেনেশুনে বিমুখ হয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই। সে দুনিয়াতেও তার সহচর হয়ে থাকে এবং তাকে সৎকর্ম থেকে নিবৃত্ত করে, কুকর্মে উৎসাহিত করে এবং পরকালেও যখন সে কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন তার সঙ্গে থাকবে। অবশেষে উভয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (কুরতুবী) এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখতার এতটুকু শাস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া যায় যে, তার সংসর্গ খারাপ হয়ে যায় এবং মানুষ-শয়তান অথবা জিন-শয়তান তাকে সৎকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে অসৎকর্মের নিকটবর্তী করে দেয়। সে পথভ্রষ্টতার যাবতীয় কাজ করে, অথচ মনে করে যে, খুব ভাল কাজ করছে। (কুরতুবী) এখানে যে শয়তানকে নিয়োজিত করার কথা বলা হয়েছে, সে সেই শয়তান থেকে ভিন্ন, যে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরের সাথে নিয়োজিত রয়েছে। কেননা, সেই শয়তান মুমিনের নিকট থেকে বিশেষ বিশেষ সময়ে সরেও যায়, কিন্তু এ শয়তান সদাসর্বদা জোঁকের মত লেগেই থাকে।—(বয়ানুল-কোরআন)

وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ .... —এ আয়াতের দু'রকম তফসীর হতে পারে (এক) যখন তোমাদের কুফর ও শিরক প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন পরকালে তোমাদের এ পরিতাপ কোন কাজে আসবে না যে, হায়, এই শয়তান যদি আমা থেকে দূরে থাকত। কেননা, তখন তোমরা সবাই আযাবে শরীক থাকবে।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য তফসীর এই যে, সেখানে পৌঁছার পর তোমাদের ও শয়তানদের আযাবে শরীক হওয়া তোমাদের জন্যে মোটেই উপকারী হবে না। দুনিয়াতে অবশ্য এরূপ হয় যে, একই বিপদে কয়েকজন শরীক হলে প্রত্যেকের দুঃখ কিছুটা হালকা হয় বলে, কিন্তু পরকালে যেহেতু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকবে এবং কেউ কারও দুঃখ হটাতে পারবে না, তাই আযাবে শরীক হওয়া কোন উপকার দিবে না। এমতাবস্থায় اَنَّكُمْ হবে ينفع ক্রিয়ার কর্তা।

সুখ্যাতি ধর্মে পছন্দনীয় وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ (এ কোরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য খুবই সম্মানের বস্তু।) ذكر এর অর্থ এখানের সুখ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআর পাক আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য মহাসম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। ইমাম রাযী বলেন, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুখ্যাতি একটি কাম্য বিষয়। তাই আল্লাহ্ তা' আলা এখানে একে অনুগ্রহস্বরূপ উল্লেখ করেছেন এবং এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই দোয়া করেছিলেন — وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ (তফসীর কবীর) কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সুখ্যাতি তখনই উত্তম, যখন তা জীবনের লক্ষ্য না হয়ে সৎকর্মের দৌলতে আপনা-আপনি অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ যদি সুখ্যাতির লক্ষ্যেই সৎকর্ম করে, তবে এটা রিয়া, যা সৎকর্মের যাবতীয় উপকারিতা বিনষ্ট করে দেয় এবং পাপের বোঝা বড় হয়। আয়াতে "আপনার সম্প্রদায়" বলে কারও কারও মতে কোরাইশ গোত্রকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আল্লামা কুরতুবী বলেন, এতে সমগ্র উম্মতকে বোঝানো হয়েছে। কোরআন পাক সকলের জন্যেই সম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ (আপনার পূর্বে আমি যেসব পয়গম্বর প্রেরণ করেছি,

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾ وَنَادَى فِرْعَوْنُ
فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ
مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ
أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ
ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ
أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ
إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ
نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ
لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾
وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَ
لَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ
لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٦٣﴾

(৫০) অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে লাগলো। (৫১) ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, হে আমার কওম, আমি কি মিসরের অধিপতি নই? এই নদীগুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়, তোমরা কি দেখ না? (৫২) আমি যে শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে, যে নীচ এবং কথা বলতেও সক্ষম নয়। (৫৩) তাকে কেন স্বর্ণবলয় পরিধান করানো হল না, অথবা কেন আসল না তার সঙ্গে ফেরেশতাগণ দল বেঁধে? (৫৪) অতঃপর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। (৫৫) অতঃপর যখন আমাকে রাগান্বিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম। তাদের সবাইকে। (৫৬) অতঃপর আমি তাদেরকে করে দিলাম অতীত লোক ও দৃষ্টান্ত পরবর্তীদের জন্যে। (৫৭) যখনই মরিয়ম-তনয়ের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল, তখনই আপনার সম্প্রদায় হট্টগোল শুরু করে দিল (৫৮) এবং বলল, আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ, না সে? তারা আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যেই করে। বস্তুতঃ তারা হল এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়। (৫৯) সে তো এক বান্দাই বটে, আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বনী-ইসরাঈলের জন্যে আদর্শ। (৬০) আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম, যারা পৃথিবীতে একের পর এক বসবাস করত। (৬১) সুতরাং তা হল কেয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কেয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ। (৬২) শয়তান যেন তোমাদেরকে নিবৃত্ত না করে। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (৬৩) ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আগমন করল, তখন বলল, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং তোমরা যে, কোন কোন বিষয়ে মতভেদ করছ তা ব্যক্ত করার জন্যে এসেছি। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার কথা মান।

আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন) এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ তো ওফাত পেয়ে গেছেন। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করার আদেশ কিরূপে দেয়া হল? কোন কোন তফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তাআলা যদি মো'জেযাস্বরূপ পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকে আপনার সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেন, তবে তাদেরকে একথা জিজ্ঞেস করুন। সেমতে মে'রাজ রজনীতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সকল পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাত ঘটেছিল। কুরতুবী বর্ণিত কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পয়গম্বরগণের ইমামত শেষে তাঁদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের সনদ জানা যায়নি। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও সহীফায় খুঁজে দেখুন এবং তাদের উম্মতের আলেমগণকে জিজ্ঞেস করুন। সেমতে বনী-ইসরাঈলের পয়গম্বরগণের সহীফাসমূহে বিকৃতি সত্ত্বেও তওহীদের শিক্ষা ও শিরকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের শিক্ষা আজ পর্যন্তও বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণতঃ বর্তমান বাইবেলের কিছু বাক্য উদ্ধৃত করা হল।

বর্তমান তওরাতে আছে ঃ যাতে তুমি জান যে, খোদাওয়ান্দই খোদা, তিনি ব্যতীত কেউই নেই।—(এস্তেছনা—৩৫—৪)

শুন হে ইসরাঈল, খোদাওয়ান্দ আমাদেরই এক খোদা।—(এস্তেছনা (৪—৬) হযরত আশিইয়া (আঃ)-এর ছহীফায় আছে ঃ

আমিই খোদাওয়ান্দ, অন্য কেউ নয়। আমাকে ছাড়া কোন খোদা নেই, যাতে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত লোকেরা জানে যে, আমাকে ছাড়া কেউ নেই, আমিই খোদাওয়ান্দ, আমাকে ছাড়া অন্য কেউ নেই। (ইয়াহিয়া ৬-৫ ঃ ৪৫)

হযরত ঈসা (আঃ)-এর এ উক্তিও বর্তমান বাইবেলে রয়েছে ঃ

'হে ইসরাঈল, শুন, খোদাওয়ান্দ আমাদের খোদা একই খোদাওয়ান্দ। তুমি খোদাওয়ান্দ তোমার খোদাকে সমস্ত মনে সমস্ত প্রাণে এবং প্রিয় বিবেক ও সমগ্র শক্তি দ্বারা ভালবাস। (মরকাস ১২-২৯ মাত্তা ২২-৩৬)

বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার মোনাজাতে বলেছিলেন ঃ

এবং চিরন্তন জীবন এই যে, তারা তুমি একক ও সত্য আল্লাহ্‌কে এবং ঈসা মসীহ্‌কে—যাকে তুমি প্রেরণ করেছ—চিনবে (ইউহান্না ৩-১৭)

হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা পূর্বে বার বার উল্লেখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আরাফে বিবৃত হয়েছে। এখানে তাঁর ঘটনা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ধনাঢ্য ছিলেন না বলে কাফেররা তাঁর নবুওয়তে যে সন্দেহ করত, তা কোন নতুন নয়, বরং ফেরাউন ও তার সভাসদরা এমন সন্দেহ মূসা (আঃ)-এর নবুওয়তেও করেছিল। ফেরাউনের বক্তব্য ছিল এই যে, আমি মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি, আমার প্রাসাদসমূহের পাদদেশে নদ-নদী প্রবাহিত, ফলে আমি মূসা (আঃ) থেকে শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমাকে বাদ দিয়ে সে কিরূপে নবুওয়ত লাভ করতে পারে? কিন্তু তার এই সন্দেহ যেমন তার কোন কাজে আসল না, সে সম্প্রদায়সহ নিমজ্জিত হল, তেমনি মক্কার কাফেরদের আপত্তিও তাদেরকে ইহকাল ও পরকালের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَا يَكَادُ يُبِينُ –(এবং সে কথারও শক্তি রাখে না) যদিও মূসা (আঃ)-এর দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মুখের তোতলামী দূর করে

দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর পূর্বঅবস্থাই ফেরাউনের মনে ছিল। তাই সে মূসা (আঃ)-এর প্রতি এই দোষ আরোপ করল। এখানে 'কথা বলার শক্তি' বলে প্রমাণাদির সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতাও বোঝানো যেতে পারে। ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমাকে সন্তুষ্ট করার মত পর্যাপ্ত-প্রমাণ মূসা (আঃ)-এর কাছে নেই। অথচ এটা ছিল ফেরাউনের নিছক অপবাদ। নতুবা মূসা (আঃ) দলীল-প্রমাণের সাহায্যে ফেরাউনকে চূড়ান্তরূপে লা জওয়াব করে দিয়েছেন। —(তফসীরে কবীর, রূহুল মা'আনী)

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ -এর দু'রকম অনুবাদ হতে পারে। (এক) ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে সহজেই তার অনুগত করে নিল— طلب منهم الخفة (দুই) সে তার সম্প্রদায়কে বেওকুফ পেল وجدهم خفيفة فى مطاوعته احلامهم—(রূহুল-মা'আনী)

فَلَمَّا آسَفُونَا -এটা اسف থেকে উদ্ভূত। আভিধানিক অর্থ অনুতাপ। কাজেই বাক্যের শাব্দিক অর্থ, 'অতঃপর যখন তারা আমাকে অনুতপ্ত করল। অনুতাপ ক্রোধের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই এর পারিভাষিক অনুবাদ সাধারণতঃ এভাবে করা হয়—যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল। আল্লাহ্ তাআলা অনুতাপ ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়ামূলক অবস্থা থেকে পবিত্র। তাই এর অর্থ হবে, তারা এমন কাজ করল যদ্দরুন আমি তাদেরকে শাস্তিদানের সংকল্প গ্রহণ করলাম। —(রূহুল মা'আনী)

এসব - وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ আয়াতের শানে নুযূলে তফসীরবিদগণ তিন প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। প্রথম এই যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোরাইশদেরকে সম্বোধন করে বললেন, يا معشر قريش لا خير فى احد يعبد من دون الله -অর্থাৎ, হে কোরাইশগণ , আল্লাহ্ ব্যতীত যারই এবাদত করা হয়, তার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। কোরাইশরা বলল, খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর এবাদত করে ; কিন্তু আপনি নিজেই বলেন যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সৎকর্ম পরায়ণ বান্দা ও নবী ছিলেন। তাদের এই আপত্তির জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।—(কুরতুবী)

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, কোরআন পাকের আয়াত — إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ —(তোমরা নিজেরা এবং তোমরা যেসব প্রতিমার পূজা কর, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে)। আয়াতটি অবতীর্ণ হলে, আবদুল্লাহ্ ইবনুয যিবা'রা (যে তখনও কাফের ছিল) বলল, আমার কাছে এ আয়াতের চমৎকার জওয়াব রয়েছে। তা এই যে, খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর এবাদত করে এবং ইহুদীরা হযরত ওযায়ের (আঃ)-এর পূজা করে। অতএব, তারা উভয়েই কি জাহান্নামের ইন্ধন হবে? একথা শুনে মুশরেক কোরাইশরা খুবই আনন্দিত হল। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তাআলা إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ আয়াত এবং সূরা যুখরুফের আলোচ্য আয়াত নাযিল করলেন। —(ইবনে-কাসীর)

তৃতীয় রেওয়ায়েত এই যে, একবার মক্কার মুশরেকরা মিছা-মিছিই প্রচার করতে লাগল যে, মুহাম্মদ (সাঃ) খোদায়ী দাবী করার ইচ্ছা রাখেন। তাঁর বাসনা এই যে, খ্রীষ্টানরা যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-এর পূজা করে, এমনিভাবে আমরাও তাঁর পূজা করি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে রেওয়ায়েত তিনটির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কাফেররা সবগুলো কথাই বলে থাকবে, যার জওয়াবে আল্লাহ্ তাআলা এমন আয়াত নাযিল করেন, যাতে তিন আপত্তির জওয়াব হয়ে যায়। আয়াতসমূহে সর্বশেষ আপত্তির জওয়াব সুস্পষ্ট। কেননা, যারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর এবাদত শুরু করেছে, তারা তা আল্লাহ্র কোন আদেশ বলে মনে করেনি এবং ঈসা (আঃ)-এরও এরূপ বাসনা ছিল না, কোরআনও তাদের সমর্থন করে না। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণের কারণে তারা ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। কোরআন এ বিভ্রান্তি প্রবলভাবে খণ্ড করে। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে সম্ভবপর যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খ্রীষ্টানদের দেখাদেখি নিজেও খোদায়ী দাবী করে বসলেন?

প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে কাফেরদের আপত্তির সারমর্ম প্রায় এক। আলোচ্য আয়াত থেকে এর জওয়াব এভাবে বের হয়, যারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে এবং যাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, তারা হয় নিষ্প্রাণ উপাস্য, যেমন, পাথরের মূর্তি, না হয় প্রাণী ; কিন্তু নিজেই নিজের এবাদতের আদেশ দেয় কিংবা তা পছন্দ করে, যেমন, শয়তান, ফেরাউন, নমরূদ প্রভৃতি। হযরত ঈসা (আঃ) তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা, তিনি কোন পর্যায়ে নিজের এবাদত পছন্দ করতেন না। খ্রীষ্টানরা তাঁর কোন নির্দেশের কারণে তাঁর এবাদত করে না, বরং তাঁকে আমি আমার কুদরতের এক নিদর্শন করে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছিলাম, যাতে মানুষ জানে যে, আল্লাহ্ তাআলা কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু খ্রীষ্টানরা এর ভুল অর্থ নিয়ে তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। অথচ এটা স্বয়ং ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতের পরিপন্থী ছিল। তিনি সর্বদা তওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন। মোটকথায়, এবাদতে তাঁর অসন্তুষ্টির কারণে তাঁকে অন্যান্য উপাস্যের কাতারে শামিল করা যায় না।

এতে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত কাফেরদের আরও একটি আপত্তির জওয়াব হয়ে গেছে। তা এই যে, আপনি নিজে যাকে শ্রেষ্ঠ বলেন (অর্থাৎ, ঈসা (আঃ) তাঁরও তো এবাদত হয়েছে।) সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের এবাদত মন্দ নয়। আয়াতে এর জওয়াব সুস্পষ্ট যে, ঈসা (আঃ)-এর এবাদত আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছারও বিরুদ্ধে ছিল এবং স্বয়ং ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতেরও পরিপন্থী ছিল। কাজেই এর মাধ্যমে শিরকের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা যায় না।

এটা - وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ খ্রীষ্টানদের সে বিভ্রান্তির জওয়াব, যার ভিত্তিতে তারা ঈসা (আঃ)-কে উপাস্য স্থির করেছিল। পিতা ব্যতীত জন্ম গ্রহণের বিষয়টিকে তারা তাঁর খোদায়ীর প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছিল। আল্লাহ্ তাআলা এর খণ্ডনে বলেন, এটা তো নিছক আমার কুদরতের এক প্রদর্শনী ছিল। আমি স্বভাবাতীত কাজ করারও ক্ষমতা রাখি। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা খুব বেশী স্বভাবাতীত কাজ নয়। কেননা, হযরত আদমকে পিতা-মাতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে এমন কাজও করতে পারি, যার নযীর এপর্যন্ত কায়েম হয়নি। অর্থাৎ, মানুষের ঔরসে ফেরেশতাও সৃষ্টি করতে পারি।

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ (এবং নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা [আঃ] কেয়ামতে বিশ্বাস স্থাপন করার একটি উপায়।) এর দু'রকম তফসীর করা হয়েছে। তফসীরে সার-সংক্ষেপে উল্লেখিত প্রথম তফসীর এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) অভ্যাসের বিপরীতে পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন, এটা এ বিষয়ের দলীল যে, আল্লাহ্ তাআলা বাহ্যিক কারণ ব্যতিরেকেও মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবন দান করা তাঁর জন্যে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরায় আকাশ থেকে

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾
فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ
بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ
تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ اُدْخُلُوا
الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ
مِّنْ ذَهَبٍ وَّأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ
الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا
تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُونَ ﴿٧٤﴾
لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَ
لٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظّٰلِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا
رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مّٰكِثُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ
أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾

(৬৪) নিশ্চয় আল্লাহ্ই আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তাঁর এবাদত কর। এটা হল সরল পথ। (৬৫) অতঃপর তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দল মতভেদ সৃষ্টি করল। সুতরাং যালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের দুর্ভোগ। (৬৬) তারা কেবল কেয়ামতেরই অপেক্ষা করছে যে, আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে যাবে এবং তারা খবরও রাখবে না। (৬৭) বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে খোদাভীরুরা নয়। (৬৮) হে আমার বন্দাগণ, তোমাদের আজ কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। (৬৯) তোমরা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা আজ্ঞাবহ ছিলে। (৭০) জান্নাতে প্রবেশ কর তোমরা এবং তোমাদের বিবিগণ সানন্দে। (৭১) তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে। (৭২) এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা তোমাদের কর্মের ফল। (৭৩) তথায় তোমাদের জন্যে আছে প্রচুর ফল-মূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে। (৭৪) নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকবে। (৭৫) তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতেই থাকবে হতাশ হয়ে। (৭৬) আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি; কিন্তু তারাই ছিল জালেম। (৭৭) তারা ডেকে বলবে, হে মালেক, পালনকর্তা আমাদের কিস্সাই শেষ করে দিন। সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা চিরকাল থাকবে। (৭৮) আমি তোমাদের কাছে সত্যধর্ম পৌঁছিয়েছি; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যধর্মে নিস্পৃহ। (৭৯) তারা কি কোন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছে? তাহলে আমিও এক ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছি।

অবতরণ কেয়ামতের আলামত। সেমতে শেষ যুগে তাঁর পুনরাগমন ও দাজ্জাল হত্যা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। সূরা মায়েদায় এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ – (এবং যাতে আমি তোমাদের কোন কোন বিরোধপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করে দেই।) বনী ইসরাঈলের মধ্যে হঠকারিতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তাই তারা কোন কোন বিধি-বিধান বিকৃত করে দিয়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ) সেগুলোর স্বরূপ তুলে ধরেন। 'কোন কোন বলার কারণ এই যে, কোন কোন বিষয় একান্তই পার্থিব ছিল। তাই তিনি সেগুলোর মতভেদ দূর করার প্রয়োজন মনে করেননি।—(বয়ানুল-কোরআন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রকৃত বন্ধুত্ব তাই, যা আল্লাহ্র ওয়াস্তে হয় ঃ اَلْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ – (খোদাভীরুদের ছাড়া সকল বন্ধুবর্গই সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে।) এ আয়াত পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে যে, মানুষ যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে দুনিয়াতে গর্ব করে এবং যার জন্যে হালাল ও হারাম এক করে দেয়, কেয়ামতের দিন সে সম্পর্ক কেবল নিষ্ফলই হবে না, বরং শত্রুতায় পর্যবসিত হবে। হাফেয ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীরে হযরত আলী (রাঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, দুই মুমিন বন্ধু ছিল এবং দুই কাফের বন্ধু। মুমিন বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজনের ইন্তেকাল হলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হল। তখন তার আজীবন বন্ধুর কথা মনে পড়লে সে দোয়া করল,—ইয়া আল্লাহ্, আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রসূলের আনুগত্য করার আদেশ দিত, সৎকাজে উৎসাহ দিত, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের বিষয় স্মরণ করিয়ে দিত। কাজেই হে আল্লাহ্, আমার পরে তাকে পথভ্রষ্ট করবেন না, যাতে সেও জান্নাতের দৃশ্য দেখতে পারে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন সন্তুষ্ট, তার প্রতিও তেমনি সন্তুষ্ট হোন। এই দোয়ার জওয়াবে তাকে বলা হবে, যাও, তোমার বন্ধুর জন্যে আমি যে পুরস্কার ও সওয়াব রেখেছি, তা যদি তুমি জানতে পার, তবে কাঁদবে কম, হাসবে বেশী। এরপর অপর বন্ধুর ইন্তেকাল হয়ে গেলে উভয়ের রূহ্ একত্রিত হবে। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা একে অপরের প্রশংসা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই অপরের সম্পর্কে বলবে, সে শ্রেষ্ঠ ভাই, শ্রেষ্ঠ সঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

এর বিপরীতে কাফের বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজন মারা গেলে তাকে জাহান্নামের ঠিকানা জানানো হবে। তখন তার বন্ধুর কথা মনে পড়বে এবং সে দোয়া করবে, ইয়া আল্লাহ্, আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রসূলের অবাধ্যতা করার আদেশ দিত, মন্দ কাজে উৎসাহ দিত এবং ভাল কাজে বাধা দিত। সে আমাকে বলত যে, আমি কখনও আপনার কাছে হাযির হব না। কাজেই হে আল্লাহ্, আমার পরে তাকে হেদায়াত দেবেন না, যাতে সেও জাহান্নামের দৃশ্য দেখে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন অসন্তুষ্ট, তেমনি তার প্রতিও অসন্তুষ্ট থাকুন। এরপর অপর বন্ধুরও মৃত্যু হয়ে যাবে এবং উভয়ের রূহ্ একত্রিত হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা একে অপরের সংজ্ঞা বর্ণনা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই পরস্পরের সম্পর্কে বলবে, সে নিকৃষ্ট ভাই, নিকৃষ্ট সঙ্গী এবং নিকৃষ্ট বন্ধু। এ কারণেই ইহকাল ও পরকাল—এ

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴿٨١﴾ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

سورة الدخان مكية وهي تسع وخمسون آية وثلاث ركوعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

حم ﴿١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴿٣﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾

(৮০) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ শুনি না? হ্যাঁ, শুনি। আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকটে থেকে লিপিবদ্ধ করে। (৮১) বলুন, দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকলে আমি সর্ব প্রথম তার এবাদত করব। (৮২) তারা যা বর্ণনা করে, তা থেকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা, আরশের পালনকর্তা পবিত্র। (৮৩) অতএব, তাদেরকে বাকচাতুরী ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দিন সেই দিবসের সাক্ষাত পর্যন্ত, যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়। (৮৪) তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে । তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (৮৫) বরকতময় তিনিই, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যার। তাঁরই কাছে আছে কেয়ামতের জ্ঞান এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৮৬) তিনি ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে, তারা সুপারিশের অধিকারী হবে না, তবে যারা সত্য স্বীকার করত ও বিশ্বাস করত। (৮৭) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্। অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (৮৮) রসূলের এই উক্তির কসম, হে আমার পালনকর্তা, এ সম্প্রদায় তো বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৮৯) অতএব ,আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং বলুন, 'সালাম' । তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

সূরা আদ দোখান

মক্কায় অবতীর্ণ, ঃ আয়াত ৫৯

(১) হা-মীম (২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের (৩) আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। (৪) এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।

উভয় দিক বিচারে উৎকৃষ্ট বন্ধুত্ব তাই, যা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হয়। যে দু'জন মুসলমানের মধ্যে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বন্ধুত্ব হয়, তাদের ফযীলত ও মহত্ত্ব অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হাশরের ময়দানে তারা আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে থাকবে। 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে' বন্ধুত্বের অর্থ অপরের সাথে কেবল সত্যিকার ধর্মপরায়ণতার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা। সেমতে ধর্মীয় শিক্ষার ওস্তাদ, শায়েখ, মুর্শিদ, আলেম ও আল্লাহ্‌ভক্তদের প্রতি এবং সারা মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি নিঃস্বার্থ মহব্বত পোষণ করা এর অন্তর্ভুক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ –(যদি রহমান আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকত, তবে আমিই সর্বপ্রথম তার এবাদত করতাম)। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্‌র সন্তান হওয়া কোন পর্যায়ে সম্ভব। বরং উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আমি কোন শত্রুতা ও হঠকারিতাবশতঃ তোমাদের বিশ্বাস অস্বীকার করছি না ; বরং প্রমাণাদির আলোকেই করছি। বিশুদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তান থাকা প্রমাণিত হলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিতাম। কিন্তু সর্বপ্রকার দলীল এর বিপক্ষে। কাজেই মেনে নেয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ থেকে জানা গেল যে, মিথ্যাপন্থীদের সাথে বিতর্কের সময় নিজের সত্যপ্রিয়তা ফুটানোর উদ্দেশ্যেএকথা বলা জায়েয ও সমীচীন যে, তোমার দাবী সত্য প্রমাণিত হলে আমি মেনে নিতাম। কেননা, মাঝে মাঝে এধরনের কথায় প্রতিপক্ষের মনে নম্রতা সৃষ্টি হয়, যা তাকে সত্য গ্রহণে উৎসাহিত করে।

وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ – এ বাক্যটি অবতারণার উদ্দেশ্য কাফেরদের উপর গযব নাযিল হওয়ার যে বহুবিধ গুরুতর, অপরদিকে 'রহমতুল্লিল-আলামীন' ও শফীউল মুযনিবীন' রূপে প্রেরিত রসূল (সাঃ) স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং বলছেন যে, তারা বার বার বলা সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করে না। এখন অনুমান করা যায় যে, তারা রসূল (সাঃ)-এর উপর কি পরিমাণ নির্যাতন চালিয়েছে। মামুলী কষ্ট পেয়ে রহমতুল্লিল আলামীন (সাঃ) আল্লাহ্ তাআলার কাছে এমন বেদনা মিশ্রিত অভিযোগ করতেন না। এ তফসীর অনুযায়ী وَقِيلِهِ এর এক আয়াত পূর্বে السَّاعَةِ শব্দের উপর معطوف হয়েছে। এ আয়াতের আরও কয়েকটি তফসীর করা হয়েছে। উদাহরণতঃ واو অক্ষরটি কসমের অর্থ বোঝায় এবং إِنَّ هَٰؤُلَاءِ কসমের জওয়াব। এসব তফসীর রুহুল মা'আনীতে দ্রষ্টব্য।

وَقُلْ سَلَامٌ –পরিশেষে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, বিরোধীদের দলীল ও আপত্তির জওয়াব দিন, কিন্তু তারা অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রদর্শনে কিংবা দুর্নাম রটনায় প্রবৃত্ত হলে তার জওয়াব তাদের ভাষায় না দিয়ে নিশ্চুপ থাকুন। 'সালাম বলুন'-এর অর্থ আসসালামু আলাইকুম বলা নয়। কেননা, কোন অমুসলিমকে এই ভাষায় সালাম করা বৈধ নয়। বরং এটা এক বাকপদ্ধতি। কারও সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হলে বলা হয়, 'আমার পক্ষ থেকে সালাম' অথবা 'তোমাকে সালাম করি।' এতে সত্যিকারভাবে সালাম উদ্দেশ্য থাকে না, বরং উদ্দেশ-এই যে, আমি সুন্দরভাবে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই। কাজেই এ আয়াত দ্বারা কাফেরদেরকে السلام عليكم বলা অথবা سلام বলা বৈধ প্রতিপন্ন করা অসঙ্গত। —(রুহুল মা'আনী)

সূরা যুখরুফ সমাপ্ত

সূরা আদ দোখান

সূরার ফযীলত ঃ হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জুমআর রাত্রিতে সূরা দোখান পাঠ করে, সকাল হওয়ার আগেই তার গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। হযরত আবু উমামার রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি জুমআর রাত্রিতে অথবা দিনে সূরা দোখান পাঠ করবে আল্লাহ্ তাআলা তার জন্যে জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করবেন। —(কুরতুবী)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে কোরআনের মাহাত্ম্য ও কতিপয় বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (সুস্পষ্ট কিতাব) বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কসম করে বলেছেন, আমি একে এক মোবারক রাত্রিতে নাযিল করেছি এবং এর উদ্দেশ্য গাফেল মানুষকে সতর্ক করা।

لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ –অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে শবে–কদর বোঝানো হয়েছে, যা রমযান মাসের শেষ দশকে হয়। এ রাত্রিকে 'মোবারক' বলার কারণ এই যে, এ রাত্রিতে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত নাযিল হয়। সূরা কদরে إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ –আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন পাক শবে–কদরে নাযিল হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখানেও বরকতের রাত্রি বলে শবে–কদরই বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেন, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা পয়গম্বরগণের প্রতি যত কিতাব নাযিল করেছেন, তা সবই রমযান মাসেরই বিভিন্ন তারিখে নাযিল হয়েছে। হযরত কাতাদাহ বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর সহীফাসমূহ রমযানের প্রথম তারিখে, তওরাত ছয় তারিখে, যবুর বার তারিখে, ইঞ্জীল আঠার তারিখে এবং কোরআন পাক চব্বিশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর পঁচিশের রাত্রিতে অবতীর্ণ হয়েছে।—(কুরতুবী)

কোরআন শবে–কদরে নাযিল হয়েছে, এর অর্থ এই যে, লওহে–মাহফুয থেকে সমগ্র কোরআন দুনিয়ার আকাশে এ রাত্রিতেই নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর তেইশ বছরে অল্প অল্প করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর প্রতি নাযিল হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রতি বছর যতটুকু কোরআনের অবতরণ অবধারিত ছিল, ততটুকুই শবে–কদরে দুনিয়ার আকাশে নাযিল করা হত।– (কুরতুবী)

ইকরিমাহ প্রমুখ কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াতে বরকতের রাত্রি বলে শবে–বরাত অর্থাৎ, শা'বান মাসের পনের তারিখের রাত্রি বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এ রাত্রিতে কোরআন অবতরণ কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থী।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ –এবং إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ এর ন্যায় সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও বলা যায় না যে, কোরআন শবে–বরাতে নাযিল হয়েছে। তবে কোন কোন রেওয়ায়েতে শা'বানের পনের তারিখকে শবে–বরাত অথবা 'লায়লাতুস্সফ' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর বরকতময় হওয়া ও এতে রহমত নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে কোন কোন রেওয়ায়েতে রহমত নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا এ রাত্রিতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা আমার পক্ষ থেকে করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ কোরআন অবতরণের রাত্রি অর্থাৎ, শবে–কদরে সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা স্থির করা হয়, যা পরবর্তী শবে–কদর পর্যন্ত এক বছরে সংঘটিত হবে। অর্থাৎ, এ বছর কারা কারা জন্মগ্রহণ করবে, কে কে মারা যাবে এবং এ বছর কি পরিমাণ রিযিক দেয়া হবে। মাহ্দভী বলেন, এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে পূর্বাহ্ণে স্থিরীকৃত সকল ফয়সালা এ রাত্রিতে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ করা হয়। কেননা, কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তাআলা এসব ফয়সালা মানুষের জন্মের পূর্বেই সৃষ্টিলগ্নে লিখে দিয়েছেন। অতএব, এ রাত্রিতে এগুলোর স্থির করার অর্থ এই যে, যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ফয়সালা ও তকদীর প্রয়োগ করা হয়, এ রাত্রিতে সারা বছরের বিধানাবলী তাদের কাছে অর্পণ করা হয়।—(কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে শবে–বরাত সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, এতে জন্ম–মৃত্যুর সময় ও রিযিকের ফয়সালা লেখা হয়। এ থেকেই কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতে 'বরকতের রাত্রি'র অর্থ নিয়েছেন শবে–বরাত। কিন্তু এটা শুদ্ধ নয়। কেননা, এখানে সর্বাগ্রে কোরআন অবতরণের উল্লেখ রয়েছে এবং কোরআন অবতরণ যে রমযান মাসে হয়েছে, তা কোরআনের বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত। শবে–বরাত সম্পর্কিত উল্লেখিত কোন কোন রেওয়ায়েতকে ইবনে–কাসীর অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং কাযী আবুবকর ইবনে আরাবী সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলোর 'নির্ভরযোগ্য নয়' বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনে আরবী শবে–বরাতের ফযীলত স্বীকার করেন না। তবে কোন কোন মাশায়েখ দুর্বল হলেও হাদীসগুলোকে কবুল করেছেন। কেননা, ফযীলত সম্পর্কিত দুর্বল রেওয়ায়েত কবুল করার অবকাশ রয়েছে।

أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦﴾ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٧﴾ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٩﴾ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ ۖ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾

(৫) আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, আমিই প্রেরণকারী, (৬) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৭) যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে দেখতে পাবে ; তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা। (৮) তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষদেরও পালনকর্তা (৯) এতদসত্ত্বেও এরা সন্দেহে পতিত হয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করছে। (১০) অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধূয়ায় ছেয়ে যাবে, (১১) যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১২) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করুন, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করছি। (১৩) তারা কি করে বুঝবে, অথচ তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল (১৪) অতঃপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বলে, সে তো উন্মাদ—শিখানো কথা বলে। (১৫) আমি তোমাদের উপর থেকে আযাব কিছুটা প্রত্যাহার করব, কিন্তু তোমরা পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। (১৬) যেদিন আমি প্রবলভাবে ধৃত করব, সেদিন পুরোপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করবই। (১৭) তাদের পূর্বে আমি ফেরাউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের কাছে আগমন করেছেন একজন সম্মানিত রসূল, (১৮) এই মর্মে যে, আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে অর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য প্রেরীত বিশ্বস্ত রসূল (১৯) আর তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না। আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করছি। (২০) তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরবর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্যে আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হয়েছি। (২১) তোমরা যদি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে আমার কাছ থেকে দূরে থাক। (২২) অতঃপর সে তার পালনকর্তার কাছে দোয়া করল যে, এরা অপরাধী সম্প্রদায় (২৩) তাহলে তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিবেলায় বের হয়ে পড়। নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (২৪) এবং সমুদ্রকে অচল থাকতে দাও। নিশ্চয় ওরা নিমজ্জিত বাহিনী। (২৫) তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবন, (২৬) কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য স্থান,

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লেখিত ধূঁয়া সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। প্রথম উক্তি এই যে, এটা কেয়ামতের অন্যতম আলামত বা কেয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। এই উক্তি হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আবু হুরায়রা, (রাঃ) হাসান বসরী (রহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী অতীতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এতে মক্কার সে দুর্ভিক্ষ বোঝানো হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর বদ–দোয়ার ফলে মক্কাবাসীদের উপর অর্পিত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল এবং মৃত জন্তু পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। আকাশে বৃষ্টি ও মেঘের পরিবর্তে ধুম্র দৃষ্টিগোচর হত। এ উক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ (রাঃ) প্রমুখের। তৃতীয় উক্তি এই যে, এখানে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার আকাশে উত্থিত ধূলিকণাকে ধুম্র বলা হয়েছে। এ উক্তি আবদুর রহমান আরাজ প্রমুখের।—(কুরতুবী) প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। তৃতীয় উক্তি ইবনে-কাসীরের মতে অগ্রাহ্য। সহীহ্ হাদীসসমূহে দ্বিতীয় উক্তিই অবলম্বিত হয়েছে। প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ের রেওয়ায়েত নিম্নরূপ ঃ

সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হুযায়ফা ইবনে উসায়েদ বলেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উপর তলার কক্ষ থেকে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। আমরা তখন পরস্পর কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, যত দিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ, ততদিন কেয়ামত হবে না—(১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (২) দোখান তথা ধুম্র, (৩) দাব্বা, (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আর্বিভাব, (৫) ঈসা (আঃ)–এর অবতরণ, (৬) দাজ্জালের অবির্ভাব, (৭) পূর্বে ভূমিধস, (৮) পশ্চিমে ভূমিধস (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধস, (১০) আদন থেকে এক অগ্নি বের হবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ যেখানে রাত্রিযাপন করতে আসবে, অগ্নিও থেমে যাবে, যেখানে দুপুরে বিশ্রামের জন্যে আসবে, সেখানে অগ্নিও থেমে যাবে।—(ইবনে-কাসীর)

আবু মালেক আশ'আরী বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে তিন বিষয়ে সতর্ক করছি— (এক) ধুম্র, যা মুমিনকে কেবল এক প্রকার সর্দিতে আক্রান্ত করে দেবে এবং কাফেরের দেহে প্রবেশ করে প্রতিটি রন্ধ্রপথে বের হতে থাকবে। (দুই) দাব্বা (ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত জানোয়ার) এবং (তিন) দাজ্জাল। ইবনে-কাসীর এমনি ধরনের আরও কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেন ঃ কোরআনের তফসীরকার হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত এই সনদ বিশুদ্ধ। অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তিও তাই, তারা ইবনে –আব্বাসের সঙ্গে একমত হয়েছেন। এছাড়া কিছু সহীহ্ ও হাসান হাদীসও একথা প্রমাণ করে যে, 'দোখান' ধুম্র কেমামতের ভবিষ্যৎ আলামতসমূহের অন্যতম। কোরআনের বাহ্যিক ভাষাও এর সাক্ষ্য দেয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদের তফসীরে উল্লেখিত ধুম্র একটি কাল্পনিক ধুম্র ছিল, যা ক্ষুধার তীব্রতার কারণে তাদের চোখে প্রতিভাত হয়েছিল। এর জন্যে 'মানুষকে ঘিরে নেবে' কথাটি অবান্তর মনে হয়। কেননা, এই কাল্পনিক ধুম্র মক্কাবাসীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। অথচ يَغْشَى النَّاسَ থেকে বোঝা যায় যে, এটা সব মানুষকে ব্যাপকভাবে ঘিরে ফেলবে।' (ইবনে কাসীর)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসঊদের উক্তির রেওয়ায়েত বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে হযরত মসরূকের বাচনিক বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন আমরা আবওয়াবে কেন্দার নিকটবর্তী কূফার মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, জনৈক ওয়ায়েয ওয়াজ করছেন।

তিনি يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ – আয়াত সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করলেন, এই দোখানের কি অর্থ, আপনারা জানেন? অতঃপর নিজেই বললেন, এটা এক ধূম্র, যা কেয়ামতের দিন নির্গত হবে এবং মুনাফিকদের কর্ণ ও চক্ষু নষ্ট করে দেবে। পক্ষান্তরে মুমিনদের মধ্যে এর কারণে কেবলমাত্র সর্দির উপসর্গ সৃষ্টি হবে।

মসরূক বলেন, ওয়ায়েযের একথা শুনে আমরা আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের কাছে গেলাম। তিনি শায়িত ছিলেন—ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের নবীকে (সাঃ)-এই পথনির্দেশ দিয়েছেন — مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ –অর্থাৎ, আমি তোমাদের কাছে আমার সেবা কর্মের 'কোন বিনিময় চাই না এবং আমি কোন কথা বানিয়ে বলি না। কাজেই যে আলেম হবে, সে যা জানে না, তা পরিষ্কার বলে দেবে, আমি জানি না ; আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। নিজে কোন কথা বানিয়ে বলা উচিত নয়। অতঃপর তিনি বললেন, এখন আমি তোমাদেরকে এ আয়াতের তফসীর সম্পর্কিত ঘটনা শুনাই। কাফেররা যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাওয়াতে কবুল করতে অস্বীকার করল এবং কুফ্রীকেই আঁকড়ে রইল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের জন্যে বদদোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ্ এদের উপর ইউসুফ (আঃ)-এর আমলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন। ফলে কাফেররা ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে পতিত হল। এমনকি, তারা অস্থি এবং মৃত জন্তুও ভক্ষণ করতে লাগল। তারা আকাশের দিকে তাকালে ধূম্র ব্যতীত কিছুই দৃষ্টিগোচর হত না। এক রেওয়ায়েতে আছে, তাদের কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তীব্রতায় সে কেবল ধূম্রের মত দেখত। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ –আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আবেদন করল, আপনি আপনার মুযার গোত্রের জন্য আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টি দোয়া করুন! নতুবা আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দোয়া করলে, বৃষ্টি হল। তখন إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ আয়াত নাযিল হল। অর্থাৎ, আমি কিছু দিনের জন্যে তোমাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কিন্তু তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবার কুফরের দিকে ফিরে যাবে। বাস্তবে তাই হল, তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। তখন আল্লাহ্ তাআলা يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ –আয়াত নাযিল করলেন। অর্থাৎ যেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিনের ভয় কর। অতঃপর ইবনে-মসউদ বললেন, এই প্রবল পাকড়াও বদরযুদ্ধে হয়ে গেছে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আরও বললেন, পাঁচটি বিষয় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, দোখান তথা ধূম্র, রোম, চাঁদ, পাকড়াও ও লেযাম।— (ইবনে-কাসীর) দোখান অর্থ মক্কার দুর্ভিক্ষ। রোম অর্থ সেই ভবিষ্যদ্বাণী যা সূরা রূমে রোমকদের বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত আছে وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ –চন্দ্র অর্থ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, যা اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। পাকড়াও অর্থ বদরযুদ্ধে কোরাইশ কাফেরদের পরিণতি। লেযাম অর্থে فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাওয়া যায়—(১) আকাশে ধূম্র দেখা দেবে এবং সবাইকে আচ্ছন্ন করবে, (২) মুশরেকরা আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমানের ওয়াদা করতঃ আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবে, (৩) তাদের ওয়াদা মিথ্যা প্রমাণীত হবে এবং পরে তারা বে-ঈমানী করবে, (৪) তাদের মিথ্যা ওয়াদা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে জব্দ করার উদ্দেশে কিছু দিনের জন্যে আযাব প্রত্যাহার করবেন এবং বলে দেবেন, তোমরা ওয়াদায় কায়েম থাকবে না এবং (৫) আল্লাহ্ তাআলা পুনরায় তাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের তফসীর অনুযায়ী সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথমোক্ত চারিটি মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হওয়া এবং তা দূর হওয়ার অন্তর্বর্তী সময়েই পূর্ণ হয়েছে এবং পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণীটি বদর যুদ্ধে পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এই তফসীর কোরআনের বাহ্যিক ভাষার সাথে সঙ্গতি রাখে না। কোরআনের ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, আকাশ প্রকাশ্য ধূঁয়া দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং সমস্ত মানুষ এই ধূম্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে। কিন্তু তফসীর থেকে এগুলো কিছুই প্রমাণিত হয় না। বরং জানা যায় যে, এই ধূম্র তাদের বিপদের তীব্রতার ফলশ্রুতি। এ কারণেই ইবনে-কাসীর কোরআনের বাহ্যিক ভাষা দৃষ্টে এ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এ ধূম্র কেয়ামতের অন্যতম আলামত। একে অগ্রাধিকার দেয়ার আরও কারণ এই যে, এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণীত। পক্ষান্তরে ইবনে মসউদের তফসীর তাঁর নিজস্ব ধারণাপ্রসূত। কিন্তু ইবনে-কাসীরের অগ্রাধিকার দেয়া তফসীরে বাহ্যতঃ খটকা আছে। তা এই যে, আয়াতে আছে إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ –অথচ কেয়ামতে কাফেরদের থেকে কোন সময় আযাব প্রত্যাহার করা হবে না। সুতরাং কিছু দিনের জন্যে আযাব প্রত্যাহারের বিষয়টি কিরূপে শুদ্ধ হবে? ইবনে-কাসীর বলেন, এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে (এক) উদ্দেশ্য এই যে, আমি যদি তোমাদের কথা অনুযায়ী আযাব প্রত্যাহার করি এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেই, তবে তোমরা পূর্ববৎ কুফরীই করতে থাকবে।

কোরআনের অন্য আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে—
وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

–অন্য এক আয়াতে আছে وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ
দ্বিতীয় অর্থ এই যে, كشف عذاب –এর মানে যদিও আযাবের কারণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আযাব তোমাদের নিকটে এসে গেছে; কিন্তু কিছু দিন আমি তা পিছিয়ে দেব। ইউসুফ (আঃ)-এর কওমের ব্যাপারেও এমনিভাবে انا كشفنا عنهم العذاب বলা হয়েছে। অথচ তাদের উপর আযাবের লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়েছিল মাত্র। আযাব আসার তখনও বিলম্ব ছিল। একেই كشف عذاب বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সারকথা এই যে, ধূম্রের ভবিষ্যদ্বাণীকে কেয়ামতের আলামত গণ্য করা হলে كَاشِفُوا الْعَذَابِ আয়াত দ্বারা কোন খটকা দেখা দেয় না এবং এ তফসীর অনুযায়ী نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ –এর অর্থ হবে কেয়ামত দিবসের পাকড়াও। আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের তফসীরকে বদর যুদ্ধের পাকড়াও বলা হয়েছে। এটাও স্বস্থানে শুদ্ধ। কারণ এটাও প্রবল পাকড়াও ছিল। কিন্তু এতে জরুরী হয় না যে, কেয়ামতে আরও প্রবল পাকড়াও হবে না। এটাও অবান্তর মনে হয় না যে, কোরআন পাক কাফেরদেরকে আলোচ্য আয়াতসমূহে এক ভাবী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছে। এরপর তাদের উপর যে কোন আযাব এসেছে, তাকেই তাঁরা এ আয়াতের প্রতীক মনে করে আয়তসমূহ উল্লেখ করেছেন। ফলে এটা যে কেয়ামতের আলামত, তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন স্বয়ং ইবনে-মসউদ থেকে বর্ণিত আছে—

وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿٢٧﴾ كَذٰلِكَ ۫ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿٢٨﴾
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ
نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿٣٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ ؕ اِنَّهٗ
كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿٣٣﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ
لَيَقُوْلُوْنَ ﴿٣٤﴾ اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ﴿٣٥﴾
فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٦﴾ اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ اَهْلَكْنٰهُمْ ۫ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٣٧﴾ وَمَا
خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا
بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ
مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا
هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٢﴾
اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ
فِي الْبُطُوْنِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ
الْجَحِيْمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٨﴾

(২৭) কত সুখের উপকরণ, যাতে তারা খোশগল্প করত। (২৮) এমনিই হয়েছিল এবং আমি এগুলোর মালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। (২৯) তাদের জন্যে ক্রন্দন করেনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তারা অবকাশও পায়নি। (৩০) আমি বনী-ইসরাঈলকে অপমানজনক শাস্তি থেকে উদ্ধার করেছি। (৩১) ফেরাউন সে ছিল সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। (৩২) আমি জেনেশুনে তাদেরকে বিশ্ববাসীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম (৩৩) এবং আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম যাতে ছিল স্পষ্ট সাহায্য। (৩৪) কাফেররা বলেই থাকে, (৩৫) প্রথম মৃত্যুর মাধ্যমেই আমাদের সবকিছুর অবসান হবে এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না। (৩৬) তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে এস। (৩৭) ওরা শ্রেষ্ঠ, না তুব্বার সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি ওদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। ওরা ছিল অপরাধী। (৩৮) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি; (৩৯) আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশে সৃষ্টি করেছি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না। (৪০) নিশ্চয় ফয়সালার দিন তাদের সবারই নির্ধারিত সময়, (৪১) যেদিন কোন বন্ধুই কোন বন্ধুর উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (৪২) তবে আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করেন, তার কথা ভিন্ন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী দয়াময়। (৪৩) নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ (৪৪) পাপীর খাদ্য হবে; (৪৫) গলিত তাম্রের মত পেটে ফুটতে থাকবে। (৪৬) যেমন ফুটে পানি। (৪৭) একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, (৪৮) অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও,

ধূম্র দু'টি। একটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। (অর্থাৎ, মক্কার দুর্ভিক্ষের সময়।) আর যেটি বাকী আছে, সেটি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে দেবে। এতে মুমিনের মধ্যে কেবল সর্দির অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং কাফেরের দেহের সমস্ত রন্ধ্র ছিন্ন করে দেবে। তখন আল্লাহ্ তাআলা ইয়ামনের দিক থেকে দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা প্রত্যেক মুমিনের প্রাণ হরণ করবে এবং কেবল দুষ্ট প্রকৃতির কাফেরকুল অবশিষ্ট থাকবে।—(রুহুল-মা'আনী)

রুহুল মাআনীর গ্রন্থকার এই রেওয়ায়েতের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এটা প্রমাণিত হলেও কোরআন ও হাদীসের সাথে তাঁর অবলম্বিত তফসীরের কোন বৈপরীত্য থাকে না।

وَاِنِّیْ عُذْتُ بِرَبِّیْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ - (তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্যে আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হচ্ছি।) رجم শব্দের অর্থ প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। এর অপর অর্থ কাউকে গালি দেয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থই হতে পারে, কিন্তু প্রথম অর্থ নেয়াই অধিক সঙ্গত। কেননা, ফেরাউনের সম্প্রদায় মূসা [আঃ]-কে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا -(সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও।) মূসা (আঃ) সঙ্গীগণসহ সমুদ্র পার হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে কামনা করবেন যে, সমুদ্র পুনরায় আসল অবস্থায় ফিরে যাক, যাতে ফেরাউনের বাহিনী পার হতে না পারে। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বলে দিলেন, তোমরা পার হওয়ার পর সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও এবং পুনরায় পানি চলমান হওয়ার চিন্তা করো না—যাতে ফেরাউন শুষ্ক ও তৈরী পথ দেখে সমুদ্রের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। তখন আমি সমুদ্রকে চলমান করে দেব এবং তারা তাতে নিমজ্জিত হবে।—(ইবনে-কাসীর)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ —(আমি এক ভিন্ন জাতিকে সেসবের উত্তরাধিকারী করে দিলাম।) সূরা শোয়ারায় বলা হয়েছে যে, এই 'ভিন্ন জাতি' হচ্ছে বনী ইসরাঈল। অবশ্য বনী ইসরাঈল পুনরায় মিসরে আগমন করেছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সূরা শোয়ারার তফসীরে এর জওয়াবও দেয়া হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন ঃ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ

(অতঃপর তাদের জন্যে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করেনি।) উদ্দেশ্য এই যে, তারা পৃথিবীতে কোন সৎকর্ম করেনি যে, তাদের মৃত্যুতে পৃথিবী ক্রন্দন করবে এবং তাদের কোন সৎকর্ম আকাশেও পৌঁছায়নি যে, তাদের জন্য আকাশ অশ্রুপাত করবে। একাধিক রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, কোন সৎকর্মপরায়ণ বান্দার মৃত্যু হলে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। এরপর তিনি প্রমাণস্বরূপ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ আয়াতখানি তেলাওয়াত করেন। ইবনে-আব্বাস থেকেও এমনি ধরনের হাদীস বর্ণিত রয়েছে। — (ইবনে-কাসীর) শোরায়হ্ ইবনে ওবায়দ (রাঃ)-এর অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, প্রবাসে মৃত্যুবরণ করার দরুন, যে মুমিন ব্যক্তির জন্যে কোন ক্রন্দনকারী থাকে না, তার জন্যে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। এর সাথেও তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং বলেন, পৃথিবী ও আকাশ কোন কাফেরের জন্যে ক্রন্দন করে না। —(ইবনে-জরীর) হযরত আলী (রাঃ)-ও সৎলোকের

মৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দনের কথা উল্লেখ করেছেন। —(ইবনে-কাসীর)

কেউ কেউ এ আয়াতকে রূপক অর্থে ধরে নিয়ে বলেন, এতে আকাশ ও পৃথিবীর প্রকৃত ক্রন্দন বোঝানো হয়নি ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অস্তিত্ব এমন অনুল্লেখযোগ্য দৃষ্টে এটাই অধিক সঙ্গত মনে হয় যে, আয়াতে আক্ষরিক অর্থেই ক্রন্দন বোঝানো হয়েছে। কেননা, এটা সম্ভবপর এবং রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত। কাজেই অহেতুক রূপক অর্থ নেয়ার প্রয়োজন নেই। এখন প্রশ্ন এই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে চেতনা কোথায়? তারা ক্রন্দন করবে কেমন করে? জওয়াব এই যে, জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্টবস্তুতেই কিছু না কিছু চেতনা অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ -আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমানুয়ে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হচ্ছে। তবে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন মানুষের ক্রন্দনের অনুরূপ হওয়া জরুরী নয়। তারা অবশ্যই অন্যভাবে ক্রন্দন করে, যার স্বরূপ আমাদের জানা নেই।

وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ -(আমি বনী-ইসরাঈলকে জেনে-শুনে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।) এতে উম্মতে-মোহাম্মদী অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্ব জরুরী হয় না। কেননা, এখানে তৎকালীন বিশ্ববাসী বোঝানো হয়েছে। তখন তারা নিশ্চিতই জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতি ছিল। এরই অনুরূপ কোরআনে হযরত মরিয়মকে বিশ্বের নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের কথা বলা হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, বিশেষ কোন বিষয়ে বনী-ইসরাঈলকে সর্বকালের সর্বলোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে উম্মতে-মোহাম্মদীই শ্রেষ্ঠ। عَلٰى عِلْمٍ (জেনেশুনে)-এর উদ্দেশ্য এই যে, আমার প্রত্যেক কাজ প্রজ্ঞাভিত্তিক হয়ে থাকে। কাজেই প্রজ্ঞার দাবী অনুযায়ীই আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ -(আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলী দিয়েছি, যাতে প্রকৃষ্ট পুরস্কার ছিল।) এখানে লাঠি, দীপ্তিময় শুভ্র হাত ইত্যাদি মো'জেযা বোঝানো হয়েছে। عَلٰى عِلْمٍ শব্দের দু'অর্থ—পুরস্কার ও পরীক্ষা। এখানে উভয় অর্থ অনায়াসে সম্ভবপর।—(কুরতুবী)

فَأْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -(তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর)। এই আপত্তির জওয়াব সুস্পষ্ট বিধায় কোরআন পাক এর কোন জওয়াব দেয়নি। পরকালে মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে বলে দাবী করা হয়েছে। দুনিয়াতে জন্ম-মৃত্যু আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ আইন ও উপযোগিতার অধীন। কাজেই আল্লাহ্ তাআলা কাউকে দুনিয়াতে পুনরুজ্জীবন দান না করলে পরকালেও দান করতে পারবেন না, এটা কেমন করে বোঝা যায়?—(বয়ানুল-কোরআন)

তুব্বার সম্প্রদায়ের ঘটনা ঃ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ - (তারা শৌর্য-বীর্যে শ্রেষ্ঠ, না তুব্বার সম্প্রদায়?) কোরআনে দুজায়গায় তুব্বার উল্লেখ রয়েছে—এখানে এবং সূরা ক্বাফে। কিন্তু উভয় জায়গায় কেবল নামই উল্লেখ করা হয়েছে—কোন বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত হয়নি। তাই এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে, এরা কোন জনগোষ্ঠী? বাস্তবে তুব্বা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়, বরং এটা ইয়ামনের হিমইয়ারী সম্রাটদের উপাধিবিশেষ। তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়ামনের পশ্চিমাংশকে রাজধানী করে আরব, শাম, ইরাক ও আফ্রিকার কিছু অংশ শাসন করেছে। تبع শব্দের বহুচন تبابعة ব্যবহৃত হয় এবং এই সম্রাটগণকে 'তাবাবয়ায়ে-ইয়ামন' বলা হয়। এখানে কোন সম্রাট বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে-কাসীরের বক্তব্য অধিক সঙ্গত মনে হয়। তিনি বলেন, এখানে মধ্যবর্তী সম্রাট বোঝানো হয়েছে, যার নাম 'আস'আদ আবু কুরায়েব ইবনে মালফিকারেব।' যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের কমপক্ষে সাতশ' বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। হিমইয়ারী সম্রাটদের মধ্যে তার রাজত্বকাল সর্বাধিক ছিল। সে তার শাসনামলে অনেক দেশ জয় করে সমরকন্দ পর্যন্ত পৌছে যায়। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, এই দিগ্বিজয়কালে একবার সে মদীনা মুনাওয়ারার জনপদ অতিক্রম করে এবং তা করায়ত্ত করার ইচ্ছা করে। মদীনাবাসীরা দিনের বেলায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং রাত্রিতে তার আতিথেয়তা করত। ফলে সে লজ্জিত হয়ে মদীনা জয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। এ সময়েই মদীনার দু'জন ইহুদী আলেম তাকে হুঁশিয়ার করে দেয় যে, এই শহর সে করায়ত্ত করতে পারবে না ; কারণ, এটা শেষ পয়গম্বরের হিজরতভূমি। সম্রাট ইহুদী আলেমদ্বয়কে সাথে নিয়ে ইয়ামন প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের শিক্ষা ও প্রচারে মুগ্ধ হয়ে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য, তখন ইহুদী ধর্মই সত্য ধর্ম ছিল। অতঃপর তার সম্প্রদায়ও সত্য ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারা আবার মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজা শুরু করে দেয়। ফলে তাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হয়। সূরা সাবায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। (ইবনে-কাসীর) এ থেকে জানা যায় যে, তুব্বার সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরে পথভ্রষ্ট হয়ে আল্লাহ্র গযবে পতিত হয়েছিল। এ কারণেই কোরআনের উভয় জায়গায় 'তুব্বার সম্প্রদায়' উল্লেখ করা হয়েছে ; শুধু তুব্বা উল্লেখিত হয়নি। হযরত সহল ইবনে সা'দ ও ইবনে আব্বাসের রেওয়েতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন لاتسبوا تبعا فانه قد اسلم তোমারা তুব্বাকে মন্দ বলো না ; কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

مَا خَلَقْنٰهُمَآ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ -(আমি আকাশ ও পৃথিবী যথাযথ উদ্দেশেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।) উদ্দেশ এই যে, বোধশক্তি ও চিন্তাশক্তি থাকলে আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টিসমূহ অনেক সত্য উদ্ঘাটন করে। উদাহরণতঃ এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলায় অপার কুদরত ও পরকালের সম্ভাব্যতা বোঝা যায়। কারণ, যে সত্তা এসব মহাসৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন, তিনি নিশ্চিতই এগুলোকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। তৃতীয়তঃ এগুলোর মাধ্যমে শাস্তি ও প্রতিদানের প্রয়োজনীয়তাও বোঝা যায়। কারণ, পরকালের প্রতিদান ও শাস্তি না থাকলে সৃষ্টির সমগ্র কাণ্ডকারখানাই ভণ্ডুল হয়ে যায়। পৃথিবী সৃষ্টির রহস্যই তো একে পরীক্ষাগার করা এবং এর পর পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান দেয়া। নতুবা সৎ ও অসৎ উভয়ের পরিণতি এক হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। এটা আল্লাহ্র মাহাত্ম্যের পরিপন্থী। চতুর্থতঃ সৃষ্টিজগত চিন্তাশীলদেরকে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যে উদ্বুদ্ধও করে। কেননা, সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর বিরাট অবদান। কাজেই এ অবদানের কৃতজ্ঞতা স্রষ্টার আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা বান্দার অবশ্য কর্তব্য।

আলোচ্য আয়াতসমূহে পরকালের কতিপয় অবস্থা বিধৃত হয়েছে এবং নিয়ম অনুযায়ী কোরআন পাক জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের অবস্থা একের পর এক বর্ণনা করেছে।

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ -যাক্কুমের স্বরূপ সম্পর্কে সূরা ছাফফাতে কিছু জরুরী বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কোরআনের আয়াত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায়, যাক্কুম কাফেরদেরকে

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعٌ وَثَلٰثُونَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

حم ﴿١﴾ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

(৪৯) স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। (৫০) এ সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে। (৫১) নিশ্চয় খোদাভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে—(৫২) উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে। (৫৩) তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমীবস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে। (৫৪) এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে আনতলোচনা স্ত্রী দেব। (৫৫) তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল আনতে বলবে। (৫৬) তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার পালনকর্তা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। (৫৭) আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহা সাফল্য। (৫৮) আমি আপনার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা স্মরণ রাখে। (৫৯) অতএব, আপনি অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে।

সূরা আল জাসিয়া
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৩৭

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হা-মীম, (২) পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ কিতাব। (৩) নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে মুমিনদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৪) আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং চারদিকে ছড়িয়ে রাখা জীব জন্তুর সৃজনের মধ্যেও নিদর্শনাবলী রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য। (৫) দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে রিযিক (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন অতঃপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৬) এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমি আপনার কাছে আবৃত্তি করি যথাযথরূপে। অতএব, আল্লাহ্ ও তাঁর আয়াতের পর তারা কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে?

জাহান্নামে প্রবেশ করার আগেই খাওয়ানো হবে। কেননা, এখানে যাক্কুম খাওয়ানোর পর জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সূরা ওয়াকেয়ার আয়াত هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ থেকেও কেউ কেউ তাই বুঝেছেন। কেননা, দাওয়াতের পূর্বে মেহমানদেরকে যে আদর-আপ্যায়ন করা হয়, তাদের মতে তাকেই نزل বলা হয়। পরবর্তী খাদ্যকে ضيافة অথবা مادبة বলা হয়। কোরআনের ভাষায় জাহান্নামে প্রবেশের পরে যাক্কুম খাওয়ানোরও সম্ভাবনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে পরে জাহান্নামে টেনে নেয়ার আদেশের অর্থ এই হবে যে, তারা পূর্বেই জাহান্নামে ছিল; কিন্তু যাক্কুম খাওয়ানোর পর তাদেরকে আরও লাঞ্ছিত ও কষ্টদানের জন্যে জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাওয়া হবে।—(বয়ানুল-কোরআন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ — এসব আয়াতে জান্নাতের চিরন্তন নেয়ামতসমূহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং প্রায় সকল প্রকার নেয়ামতই এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কেননা, মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু সাধারণতঃ ছয়টি (১) উত্তম বাসগৃহ (২) উত্তম পোষাক, (৩) আকর্ষণীয় জীবনসঙ্গিনী (৪) সুস্বাদু খাদ্য (৫) এসব নেয়ামতের স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা এবং (৬) দুঃখ-কষ্ট থেকে পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকার আশ্বাস। এখন এ ছয়টি বস্তুই জান্নাতীদের জন্যে প্রমাণিত করে দেয়া হয়েছে। এখানে বাসস্থানকে 'নিরাপদ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিপদমুক্ত হওয়াই বাসস্থানের প্রধান গুণ।

سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ —এর অর্থ যথাক্রমে চিকন ও মোটা রেশমীবস্ত্র।

وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ تزويج —এর অর্থ এক কে অন্যের যুগল করে দেয়া। পরে শব্দটি বিবাহ করানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থের প্রেক্ষিতে এখানে উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতী পুরুষদের বিয়ে সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদের সাথে যথা নিয়মে সম্পন্ন করা হবে। জান্নাতে পার্থিব বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না কিন্তু সম্মানার্থ এসব বিয়ে সম্পন্ন হবে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদেরকে জান্নাতী পুরুষদের যুগল করে দেয়া হবে এবং দান হিসেবে দেয়া হবে। এর জন্যে দুনিয়ার ন্যায় বিবাহ বন্ধনের প্রয়োজন নেই। لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ —অর্থাৎ, একবার মৃত্যুর পর আর কোন মৃত্যু হবে না। এ নিয়ম জাহান্নামীদের জন্যেও। কিন্তু সেটা তাদের জন্যে অধিক কঠোর এবং জান্নাতীদের জন্যে অধিক আনন্দ ও সুখের বিষয় হবে। কারণ, যত বড় নেয়ামতই হোক, তা বিলুপ্ত হওয়ার কল্পনা নিশ্চিতরূপেই মনে বিপদের রেখাপাত করে। জান্নাতীরা যখন কল্পনা করবে যে, এসব নেয়ামত তাদের কাছ থেকে কখনও ছিনিয়ে নেয়া হবে না, তখন এটা তাদের আনন্দকে আরও বৃদ্ধি করে দেবে।

(সূরা দোখান সমাপ্ত)

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٧﴾ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا
كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٨﴾ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا
اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩﴾ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ
وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ
عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ
فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ
آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا
إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ
يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾

(৭) প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপাচারীর দুর্ভোগ। (৮) সে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শুনে, অতঃপর অহংকারী হয়ে জেদ ধরে, যেন সে আয়াত শুনেনি। অতএব, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (৯) যখন সে আমার কোন আয়াত অবগত হয়, তখন তাকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করে। এদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (১০) তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম। তারা যা উপার্জন করেছে, তা তাদের কোন কাজে আসবে না, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে তারাও নয়। তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি। (১১) এটা সৎপথ প্রদর্শন, আর যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১২) তিনি আল্লাহ্‌ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (১৩) এবং আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমণ্ডলে ও যা আছে ভূমণ্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১৪) মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ্‌র সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না যাতে তিনি কোন সম্প্রদায়কে কৃতকর্মের প্রতিফল দেন। (১৫) যে সৎকাজ করছে, সে নিজের কল্যাণার্থেই তা করছে, আর যে অসৎকাজ করছে, তা তার উপরই বর্তাবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (১৬) আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, রাজত্ব ও নবুওয়ত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন রিযিক দিয়েছিলাম এবং বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। (১৭) আরও দিয়েছিলাম তাদেরকে ধর্মের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি। অতঃপর তারা জ্ঞান লাভ করার পর শুধু পারস্পরিক জেদের বশবর্তী হয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, আপনার পালনকর্তা কেয়ামতের দিন তার ফয়সালা করে দেবেন।

সূরা আল জাসিয়া

সমগ্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এক উক্তি এই যে, قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ আয়াতখানি শুধু মদীনায় অবতীর্ণ। মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য সূরাসমূহের ন্যায় এর মৌলিক বিষয়বস্তু হল বিশ্বাস সংশোধন। সেমতে এতে তওহীদ, রেসালত ও পরকাল সম্পর্কিত বিশ্বাসসমূহকেই বিভিন্নভাবে সপ্রমাণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে পরকাল প্রমাণের দলীলাদি, কাফেরদের সন্দেহ ও বেদ্বীনদের খণ্ডন এতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ এসব আয়াতের উদ্দেশ্য তওহীদ সপ্রমাণ করা। অনুরূপ আয়াত দ্বিতীয় পারায় বর্ণিত হয়েছে। উভয় জায়গায় শব্দ ও ভাষার সামান্য পার্থক্য সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা বিদ্বান, পাঠকবর্গ ইমাম রাযীর 'তফসীরে-কবীরে' দেখতে পারেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা করে এক জায়গায় বলা হয়েছে, এতে মুমিনদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে, দ্বিতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তৃতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিবেকবানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। এতে বর্ণনা পদ্ধতির রকমফের ছাড়াও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব নিদর্শন দ্বারা পূর্ণ উপকার তারাই লাভ করতে পারে, যারা ঈমান আনে, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের জন্যে উপকারী, যারা তৎক্ষণাৎ ঈমান না আনলেও অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এগুলো তওহীদের দলীল। এই বিশ্বাস কোন না কোন দিন ঈমানের কারণ হতে পারে। তৃতীয় পর্যায়ে তাদের জন্যে উপকারী, যারা বর্তমানে মুমিন ও বিশ্বাসী না হলেও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী। কারণ, সুস্থ বুদ্ধিসহকারে এসব নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অবশেষে ঈমান ও বিশ্বাস অবশ্যই পয়দা হবে। তবে যারা সুস্থ বিবেক রাখে না অথবা এসব ব্যাপারে বিবেক খাটানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না, তাদের সামনে হাজারো দলীল পেশ করলেও যথেষ্ট হবে না।

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ – (প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীর জন্যে ভীষণ দুর্ভোগ) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই আয়াত নসর ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কোন রেওয়ায়েত থেকে হারেছ ইবনে কালদাহ্‌ সম্পর্কে এবং কোন রেওয়ায়েত থেকে আবুজাহ্‌ল ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানা যায়।—(কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্যে প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। كل শব্দ ব্যক্ত করছে যে, যে কেউ এসব বিশেষণে বিশেষিত, তার জন্যেই দুর্ভোগ—একজন হোক অথবা তিন জন।

مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ শব্দটি আরবীতে 'পশ্চাৎ' অর্থে বেশী এবং 'সামনে' অর্থে কম ব্যবহৃত হয়। অনেকেই এখানে 'সামনে' অর্থ নিয়েছেন। যারা 'পেছনে' অর্থ নিয়েছেন, তাদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে তারা যেভাবে অহংকারী হয়ে জীবন যাপন করছে, এর পেছনে অর্থাৎ, পরে জাহান্নাম আসছে।—(কুরতুবী)

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ ...... وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ কোরআন পাকে অনুগ্রহ তালাশ করার অর্থ সাধারণতঃ জীবিকা উপার্জনের

চেষ্টা-প্রচেষ্টা হয়ে থাকে। এখানে এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তোমাদেরকে সমুদ্রে জাহাজ চালনার শক্তি দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পার। এরূপ অর্থও সম্ভবপর যে, সমুদ্রে আমি অনেক উপকারী বস্তু সৃষ্টি করে সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা সেগুলো খুঁজ করে উপকৃত হও। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে জানা গেছে যে, সমুদ্রে এত অধিক খনিজ-সম্পদ এবং ধন-দৌলত লুক্কায়িত আছে, যা স্থলেও নেই।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ (আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ্‌র সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না।) এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতের শানে নুযূল এই যে, মক্কায় জনৈক মুশরেক হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনা করেছিল। হযরত ওমর এর বিনিময়ে তাকে শাস্তি দেয়ার সংকল্প করেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী বনী মুস্তালিক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীগণসহ মুরাইসী নামক এক কূপের ধারে শিবির স্থাপন করেন। মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইও মুসলিম বাহিনীতে শামিল ছিল। সে তার গোলামকে কূপ থেকে পানি উঠানোর জন্য প্রেরণ করলে তার ফিরে আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। আবদুল্লাহ্ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, হযরত ওমরের এক গোলাম কূপের কিনারায় বসা ছিল। সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও হযরত আবু বকরের মশক ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত কাউকে পানি উঠানোর অনুমতি দিল না। আবদুল্লাহ্ বলল, আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে এই প্রবাদবাক্যই চমৎকার খাটে যে, কুকুরকে মোটা-তাজা করলে সে তোমাকেই খেয়ে ফেলবে। হযরত ওমর (রাঃ) এ বিষয় অবগত হয়ে তরবারি হস্তে আবদুল্লাহ্‌র দিকে রওয়ানা হলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ।—(কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী) সনদ খোঁজাখুঁজির পর যদি উভয় রেওয়ায়েত সহীহ্ প্রমাণিত হয়,তবে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, আয়াতটি আসলে মক্কায় নাযিল হয়েছিল, অতঃপর বনি মুস্তালিক যুদ্ধে একই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আয়াতটি সেখানেও তেলাওয়াত করে ঘটনার সাথে খাপ খাইয়ে দেন। শানে নুযূল সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে প্রায়ই এ ধরনের ব্যাপার ঘটেছে। এটাও সম্ভবপর যে, জিবরাঈল (আঃ) স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য পুনরায় একই আয়াত বিন মুস্তালিক যুদ্ধের সময় নিয়ে আগমন করেন। উসূলে তফসীরের পরিভাষায় একে শানে নুযূলে মুকাররার (বার বার অবতরণ) বলা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে اَيَّامَ اللّٰهِ শব্দের অর্থ পরকালে প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কিত আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারাদি। اَيَّامٌ শব্দটি ঘটনাবলী ও ব্যাপারাদির অর্থে আরবীতে বহুল প্রচলিত।

এখানে দ্বিতীয় অনুধাবনযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে 'মুশরেকদেরকে বলে দিন' না বলে 'যারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারাদিতে বিশ্বাস রাখে না, তাদেরকে বলে দিন' বলা হয়েছে। এতে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে যে, তাদেরকে আসল শাস্তি পরকালে দেয়া হবে। যেহেতু তারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তাই এ শাস্তি তাদের জন্যে অপ্রত্যাশিত হবে। অপ্রত্যাশিত কষ্ট অনেক বেশী হয়ে থাকে। ফলে তাদের ভবিষ্যৎ আযাব খুব কঠোর হবে এবং এর মাধ্যমে তাদের সকল কুকর্মের পুরোপুরি প্রতিশোধ নেয়া হবে। কাজেই দুনিয়াতে ছোটখাট ধর-পাকড় করার চিন্তা আপনি করবেন না।

কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতের আদেশ জেহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশের বক্তব্য এই যে, জেহাদের বিধানের সাথে এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। এতে সাধারণ সামাজিক কাজ-কারবারে ছোটখাট বিষয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করার শিক্ষা রয়েছে, যা প্রতি যুগে প্রযোজ্য। আজও এ শিক্ষা কার্যকর রয়েছে। অতএব, একে রহিত বলা ঠিক নয়। বিশেষতঃ এর শানে-নুযূল যদি বিন মুস্তালিকের যুদ্ধকালীন ঘটনা হয়, তবে জেহাদের আয়াত একে রহিত করতে পারে না। কারণ, জেহাদের আয়াত এর অনেক আগেই অবতীর্ণ হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেসালত সপ্রমাণ করা। এ প্রসঙ্গে কাফেরদের উৎপীড়নের মুখে তাঁকে সান্ত্বনাও দেয়া হয়েছে। اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ এ পর্যন্ত আয়াতসমূহ থেকে দু'টি বিষয় জানা যায় -(এক)—বনী ইসরাঈলকে কিতাব ও নবুওয়ত দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সমর্থন এবং (দুই) তাঁকে সান্ত্বনা দেয়া যে, বনী ইসরাঈল যে কারণে মতভেদ করেছিল, আপনার সম্প্রদায়ও সে কারণেই মতভেদ করছে, অর্থাৎ দুনিয়া-প্রীতি ও পারস্পরিক বিদ্বেষ। কারণ, এটা নয় যে, আপনার প্রমাণাদিতে কোন ত্রুটি আছে। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না।—(বয়ানুল-কোরআন)

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ
الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾ اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ وَ
اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩﴾
هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمْ
حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٢١﴾ وَ
خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ ۢبِمَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾ اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ
عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ۗ فَمَنْ
يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ۗ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا
الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ
مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ
مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

(১৮) এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞানদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। (১৯) আল্লাহ্‌র সামনে তারা আপনার কোন উপকারে আসবে না। যালেমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ্ পরহেযগারদের বন্ধু। (২০) এটা মানুষের জন্যে জ্ঞানের কথা এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। (২১) যারা দুষ্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মত করে দেব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে—এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের দাবী কত মন্দ! (২২) আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের ফল পায়। তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (২৩) আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ্ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহ্‌র পর কে তাকে পথপ্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা কর না? (২৪) তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে। (২৫) তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন একথা বলা ছাড়া তাদের কোন যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে এস। (২৬) আপনি বলুন, আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, অতঃপর মৃত্যু দেন, অতঃপর তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ (এরপর আমি আপনাকে ধর্মের এক বিশেষ তরীকার উপর রেখেছি।) এখানে স্মর্তব্য যে, ইসলাম-ধর্মের কিছু মৌলিক বিশ্বাস রয়েছে, যেমন তওহীদ, পরকাল ইত্যাদি এবং কিছু কর্মজীবন সম্পর্কিত বিধি-বিধান রয়েছে। মৌলিক বিশ্বাস প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্যই এক ও অভিন্ন। এতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন সম্ভবপর নয়। কিন্তু কর্মগত বিধান বিভিন্ন পয়গম্বরের শরীয়তে যুগের চাহিদা অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে এসব কর্মগত বিধানকেই 'ধর্মের এক বিশেষ তরীকা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ কারণেই ফেকাহ্‌বিদগণ এ আয়াত থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, উম্মতে-মুহাম্মদীর জন্যে কেবল শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধানাবলীই অবশ্য পালনীয়। পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রাপ্ত বিধানাবলী কোরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জন্যে অবশ্য পালনীয় নয়। সমর্থনের এক প্রকার এই যে, কোরআন অথবা হাদীসে স্পষ্ট বলা হবে যে, অমুক নবীর উম্মতের এ বিধান তোমাদের জন্যেও অবশ্য পালনীয় ; আর দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কোরআন পাক অথবা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পূর্ববর্তী কোন উম্মতের কোন বিধান প্রশংসাচ্ছলে বর্ণনা করবেন এবং বিধানটি আমাদের যুগে রহিত হয়ে গেছে, এরূপ বলা থেকে বিরত থাকবেন। এতেও বোঝা যায় যে, বিধানটি আমাদের শরীয়তে অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় এই বিধান শরীয়তে মুহাম্মদীর অংশ হিসেবেই অবশ্য পালনীয় হবে।

পরজগৎ এবং তাতে প্রতিদান ও শাস্তি যুক্তির আলোকেই অপরিহার্য ঃ উল্লেখিত ২১-২২ নং আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে প্রতিদান ও শাস্তি অপরিহার্য হওয়ার একটি যুক্তি বর্ণিত হয়েছে। যুক্তিটি এই যে, এটা প্রত্যক্ষ ও অনস্বীকার্য সত্য যে, দুনিয়াতে ভাল বা মন্দ কাজের পূর্ণ প্রতিফল পাওয়া যায় না, বরং সাধারণভাবে কাফের ও পাপাচারীরা অঢেল ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যশীল বান্দা উপবাস, দারিদ্র্য ও বিপদাপদে জড়িত থাকে। প্রথমতঃ দুনিয়াতে দুশ্চরিত্র অপরাধীদের অপরাধ অধিকাংশ সময়ই জানা যায় না, জানা গেলেও অধিকাংশ সময় তারা ধরা পড়ে না। আবার ধরা পড়লেও হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার পরওয়া না করে তারা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে নেয়। শত শত অপরাধীর মধ্যে কেউ যদি শাস্তি পায়ও তবে তাও তার অপরাধের পূর্ণ শাস্তি হয় না। এভাবে খোদাদ্রোহী ও খেয়াল-খুশীর অনুসারীরা ইহজীবনে সদম্ভে প্রকাশ্য ঘুরে বেড়ায়। আর ঈমানদারগণ শরীয়তের অনুসরণ করে অনেক টাকা-পয়সা ও ভোগ-বিলাসকে হারাম মনে করে ত্যাগ করে এবং বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও কেবল বৈধপন্থা অবলম্বন করে। অতএব, যদি ইহজগতের পর পরজগৎ ও পুনরুজ্জীবন এবং প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে, তবে ইহজগতে কোন চুরি-ডাকাতি,ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদিকে অপরাধ বলা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। এ ধরনের অপরাধীরা দুনিয়াতে প্রায়ই সফল জীবন-যাপন করে। চোর ও ডাকাত, এক রাত্রিতে এত ধন-সম্পদ উপার্জন করে নেয়, যা একজন গ্রাজুয়েট সারা বছর চাকরী ও পরিশ্রম করে উপার্জন করতে পারে না। এখন পরকাল ও হিসাব-নিকাশ না থাকলে এই চোর-ডাকাতকে এই ভদ্র-গ্রাজুয়েট অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলতে হবে। অথচ এটা কোন বিবেকবান ব্যক্তি বলতে পারে না। তবে ইহজগতে এদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক

রাষ্ট্রেই কঠোর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র সেই অপরাধীই ধরা পড়ে, যে নির্বোধ। চালাক, চতুর ও পেশাদার অপরাধীদের জন্যে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ উন্মুক্ত রয়েছে। এক ঘুষের চোরা দরজাই তাদের সাজা এড়ানোর জন্যে যথেষ্ট। মোটকথা স্বীকার করে নিন যে, দুনিয়াতে ভাল, মন্দ, সাধুতা ও অসাধুতা বলতে কিছু নেই—যেভাবে পার উদ্দেশ্য হাসিল করে নাও ; কিন্তু দুনিয়াতে এর কোন প্রবক্তা নেই। কেউ এটা স্বীকার করে না। অতএব, সাধুতা ও অসাধুতার পার্থক্য স্বীকার করার পর একথাও স্বীকার করতে হবে যে, উভয়ের পরিণাম একরকম হতে পারে না। উভয়ের পরিণাম একরকম হলে এর চেয়ে বড় যুলুম আর কিছুই হবে না। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, তোমরা কি চাও, অপরাধী ও নির্দোষ ব্যক্তিকে ইহকালে ও পরকালে সমান করে দেয়া হোক? এটা খুবই নির্বোধ ফয়সালা। দুনিয়াতে যখন ভাল ও মন্দের প্রতিদান ও শাস্তি পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না, তখন এর জন্যে পরকালের জীবন অপরিহার্য। দ্বিতীয় আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই পূর্ণতা দানের উদ্দেশে বলা হয়েছে,

وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াকে কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষা ক্ষেত্র করেছেন—প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। তাই প্রত্যেক কর্মের ভাল ও মন্দের প্রতিদান এ দুনিয়াতেই দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি।

مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ —(অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করে-) বলাবাহুল্য, কোন কাফেরও তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় খোদা অথবা উপাস্য বলে না, কিন্তু কোরআন পাকের এ আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, এবাদত ও উপাসনা প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যেরই নাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যের মোকাবেলায় অন্য কারও আনুগত্য অবলম্বন করে, তাকেই তার উপাস্য বলা হবে। অতএব, যে ব্যক্তি হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের পরওয়া করে না, আল্লাহ্ যে কাজকে হারাম বলেছেন, সে তাতে আল্লাহ্র আদেশের পরিবর্তে নিজের খেয়াল-খুশীর অনুকরণ করে, সে মুখে খেয়াল-খুশীকে উপাস্য না বললেও প্রকৃতপক্ষে খেয়াল-খুশীই তার উপাস্য।

হযরত আবু উমামা বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আকাশের নীচে দুনিয়াতে যত উপাস্যের উপাসনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক গর্হিত উপাস্য হচ্ছে খেয়াল-খুশী। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে তার খেয়াল-খুশীকে বশে রেখে পরকালের জন্যে কাজ করে। আর সে ব্যক্তিই পাপাচারী, যে তার মনকে খেয়াল-খুশীর পেছনে ছেড়ে দেয় এবং তারপরেও আল্লাহ্র কাছে পরকালের মঙ্গল কামনা করে। হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ তস্তরী (রহঃ) বলেন, খেয়াল-খুশীই তোমাদের রোগ। তবে যদি খেয়াল-খুশীর বিরোধিতা কর, তবে এ রোগই তোমাদের প্রতিষেধক।—(কুরতুবী)

وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ — دهر শব্দের অর্থ আসলে মহাকাল, অর্থাৎ, জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সমষ্টি। কখনও দীর্ঘ সময়কালকে دهر বলা হয়। কাফেররা দলীলস্বরূপ বলেছে যে, আল্লাহ্র আদেশ ও ইচ্ছার সাথে জীবন ও মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই, বরং এগুলো প্রাকৃতিক কারণের অধীন। মৃত্যু সম্পর্কে তো সকলেই প্রত্যক্ষ করে যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যবহারের কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এরই নাম মৃত্যু। জীবনও তদ্রূপ, কোন খোদায়ী আদেশে নয়, বরং উপকরণের প্রাকৃতিক গতিশীলতার মাধ্যমেই তা অর্জিত হয়।

দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলা ঠিক নয় ঃ কাফের ও মুশরিকরা মহাকালের চক্রকেই সৃষ্টিজগত ও তার সমস্ত অবস্থার কারণ সাব্যস্ত করত এবং সবকিছুকে তারই কারকতা বলে অভিহিত করত। অথচ এগুলো সব প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কুদরত ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই সহীহ্ হাদীসসমূহে দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, কাফেররা যে শক্তিকে দহর শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে, প্রকৃতপক্ষে সেই কুদরত ও শক্তি আল্লাহ্ তাআলারই। তাই দহরকে মন্দ বলার ফল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, মহাকালকে গালি দিও না, কেননা, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই মহাকাল। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খরা যে কাজকে মহাকালের কাজ বলে, সেটা আসলে আল্লাহ্র শক্তি ও কুদরতেরই কাজ। মহাকাল কোন কিছু নয়। এতে জরুরী হয় না যে, দহর আল্লাহ্ তাআলার কোন নাম হবে। কেননা, হাদীসে রূপক অর্থে আল্লাহ্ তাআলাকে দহর বলা হয়েছে।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ
الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾ وَتَرٰى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعٰى إِلٰى كِتٰبِهَا
الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ
بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْمُبِينُ ﴿٣٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ۟ أَفَلَمْ تَكُنْ آيٰتِي تُتْلٰى عَلَيْكُمْ
فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ
اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ
إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٢﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا
عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ
نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَأْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ
مِنْ نٰصِرِينَ ﴿٣٤﴾ ذٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيٰتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ
الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٣٦﴾
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

(২৭) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (২৮) আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে। তোমরা যা করতে, অদ্য তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। (২৯) আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম। (৩০) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তাদের পালনকর্তা স্বীয় রহমতে দাখিল করবেন। এটাই প্রকাশ্য সাফল্য। (৩১) আর যারা কুফর করেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের কাছে কি আয়াতসমূহ পঠিত হত না? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়। (৩২) যখন বলা হত, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে আমরা জানি না কেয়ামত কি? আমরা কেবল ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। (৩৩) তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে গ্রাস করবে। (৩৪) বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের সাহায্যকারী নেই। (৩৫) এটা এজন্যে যে তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না এবং তাদের কাছে তওবা চাওয়া হবে না। (৩৬) অতএব, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, ভূ-মণ্ডলের পালনকর্তা ও নভোমণ্ডলের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র-ই প্রশংসা। (৩৭) নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে তাঁরই গৌরব। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَتَرٰى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً – جثو এর অর্থ নতজানু হয়ে বসা। ভয়ের কারণে এভাবে বসবে। كُلَّ أُمَّةٍ (প্রত্যেক দল) শব্দ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, মুমিন, কাফের, সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সকলেই হাশরের ময়দানে ভয়ে নতজানু হয়ে বসবে। কোন কোন আয়াত ও রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হাশরের ময়দানে পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভীত হবেন না। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয় ; কেননা, অল্পকিছুক্ষণের জন্যে এই ভয় ও ত্রাস পয়গম্বর ও সৎলোকদের মধ্যেও দেখা দেয়া সম্ভবপর। কিন্তু যেহেতু খুব অল্প সময়ের জন্যে এই ভয় দেখা দেবে, তাই একে না হওয়ার পর্যায়ে রেখে দেয়া হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, 'প্রত্যেক দল' বলে অধিকাংশ হাশরবাসী বোঝানো হয়েছে। كُلّ শব্দটি মাঝে মাঝে অধিকাংশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ جَاثِيَةً এর অর্থ করেছেন নামাযে বসার ন্যায় বসা। এমতাবস্থায় কোন খট্‌কা থাকে না। কেননা, এটা আদবের বসা—ভয়ের নয়।

كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعٰى إِلٰى كِتٰبِهَا অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে কিতাব অর্থ দুনিয়াতে ফেরেশতাগণের লিখিত আমলনামা। হাশরের ময়দানে এসব আমলনামা উড়িয়ে দেয়া হবে এবং প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে পৌঁছে যাবে। তাকে বলা হবে, اِقْرَأْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا অর্থাৎ, তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর এবং নিজেই হিসাব কর কি প্রতিফল তোমার পাওয়া উচিত। আমলনামার দিকে আহ্বান করার অর্থ আমলের হিসাবের দিকে আহ্বান করা।

সূরা আল-জাসিয়া সমাপ্ত

سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسٌ وَّثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

حٰمٓ ① تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②
مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ
مُّسَمًّى ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّاۤ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ③ قُلْ اَرَءَيْتُمْ
مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ
اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۗ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَاۤ اَوْ
اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ④ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ
دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ⑤ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّ
كَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ⑥ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ
قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ⑦
اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۗ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ
لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۗ كَفٰى بِهٖ
شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۗ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⑧

সূরা আল-আহ্ক্বাফ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৩৫

পরম করুণাময় ও অসীমদাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) হা-মীম, (২) এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৩) নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমি যথাযথভাবেই এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। আর কাফেররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪) বলুন, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের পূজা কর, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? দেখাও আমাকে তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে? অথবা নভোমণ্ডল সৃজনে তাদের কি কোন অংশ আছে? এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান আমার কাছে উপস্থিত কর—যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন বস্তুর পূজা করে, যে কেয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? তারা তো তাদের পূজা সম্পর্কেও বেখবর। (৬) যখন মানুষকে হাশরে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের এবাদত অস্বীকার করবে। (৭) যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো হয়, তখন সত্য আগমন করার পর কাফেররা বলে, এ তো প্রকাশ্য জাদু। (৮) তারা কি বলে যে, রসূল একে রচনা করেছে? বলুন, যদি আমি রচনা করে থাকি, তবে তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করার অধিকারী নও। তোমরা এ সম্পর্কে যা আলোচনা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। আমার ও তোমাদের মধ্যে তিনি সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

সূরা আল-আহ্ক্বাফ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এসব আয়াতে মুশরেকদের দাবী বাতিল করার জন্যে তাদের দাবীর স্বপক্ষে দলীল চাওয়া হয়েছে। কেননা, সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত কোন দাবী গ্রহণীয় হয় না। দলীলের যত প্রকার রয়েছে, সবগুলো আয়াতে উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মুশরেকদের দাবীর পক্ষে কোন প্রকার দলীল নেই। তাই এহেন দলীলবিহীন দাবীতে অটল থাকা নিরেট পথভ্রষ্টতা। আয়াতে দলীলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (এক) যুক্তিভিত্তিক দলীল। এর খণ্ডনে বলা হয়েছে اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ দ্বিতীয় প্রকার ইতিহাস ভিত্তিক দলীল। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কেবল সেই ইতিহাসভিত্তিক দলীলই গ্রহণীয় হতে পারে, যা স্বয়ং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে। যেমন, তওরাত, ইঞ্জীল, কোরআন ইত্যাদি ঐশী কিতাব অথবা আল্লাহ্‌র মনোনীত নবী ও রসূলগণের উক্তি। এই দুই প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারের খণ্ডনে বলা হয়েছে اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَاۤ অর্থাৎ, তোমাদের মূর্তি পূজার কোন দলীল থাকলে কোন ঐশী কিতাব পেশ কর, যাতে মূর্তি পূজার অনুমতি দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, রসূলগণের উক্তি খণ্ডন করতে বলা হয়েছে, اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ অর্থাৎ, কিতাব আনতে না পারলে কমপক্ষে রসূলগণের পরম্পরাগত কোন উক্তি পেশ কর। তাও পেশ করতে না পারলে তোমাদের কথা ও কাজ পথভ্রষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

اثارة শব্দটি سماحة-شجاعة এর ওজনে একটি ধাতু। অর্থ নকল, রেওয়ায়েত। এ কারণে ইকরিমা ও মুকাতিল-এর তফসীরে 'পয়গম্বরগণ থেকে রেওয়ায়েত' বলেছেন। (কুরতুবী) সারকথা এই যে, দু'রকম ইতিহাসভিত্তিক দলীল গ্রহণযোগ্য – কোন পয়গম্বরের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং লোক পরম্পরায় প্রমাণিত পয়গম্বরের উক্তি। আয়াতে اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ বলে তাই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ অন্যান্য আরও কিছু তফসীর করেছেন, যা কোরআনের ভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ
إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحٰٓى إِلَىَّ وَمَآ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ
إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِىْٓ
إِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا
سَبَقُوْنَآ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ إِفْكٌ قَدِيْمٌ ﴿١١﴾
وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى إِمَامًا وَّرَحْمَةً ۚ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ
لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢﴾ إِنَّ
الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ﴿١٣﴾ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسٰنَ بِوٰلِدَيْهِ إِحْسٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهٗ
كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۚ حَتّٰٓى إِذَا بَلَغَ
أَشُدَّهٗ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىْٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِىْٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ
وَأَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ۚ إِنِّىْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٥﴾

(৯) বলুন, আমি তো কোন নতুন রসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ককারী বৈ নই। (১০) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় এবং তোমরা একে অমান্য কর এবং বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করে; আর তোমরা অহংকার কর, তবে তোমাদের চেয়ে অবিবেচক আর কে হবে? নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অবিবেচকদেরকে পথ দেখান না। (১১) আর কাফেররা মুমিনদের বলতে লাগল যে, যদি এ দ্বীন ভাল হত, তবে এরা আমাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারত না। তারা যখন এর মাধ্যমে সুপথ পায়নি, তখন শীঘ্রই বলবে, এ তো এক পুরাতন মিথ্যা। (১২) এর আগে মূসার কিতাব ছিল পথপ্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ। আর এই কিতাব তার সমর্থক আরবী ভাষায়, যাতে যালেমদেরকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে সুসংবাদ দেয়। (১৩) নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌ অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। (১৪) তারাই জান্নাতের অধিকারী। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। তারা যে কর্ম করত, এটা তারই প্রতিফল। (১৫) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ – وَمَآ أَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحٰٓى إِلَىَّ আয়াতে إِنْ أَتَّبِعُ বাক্যটি ব্যতিক্রম নির্দেশ করে। অর্থ এই যে, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, তা ব্যতীত আমি জানি না। এর ভিত্তিতে তফসীরবিদ যাহ্‌হাক এ আয়াতের যে তফসীর করেছেন, তার সারমর্ম এই যে, আমি একমাত্র ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান লাভ করতে পারি। ওহীর মাধ্যমে আমাকে যে বিষয় জানানো হয় না, তা আমার ব্যক্তিগত বিষয় হোক অথবা উম্মতের মুমিন ও কাফেরের বিষয় হোক অথবা ইহকালের বিষয় হোক কিংবা পরকালের বিষয় হোক—তা আমি জানি না। অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে আমি যা কিছু বলি, তা সবই ওহীর আলোকে বলে থাকি। কোরআন পাকে উল্লেখিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে অনেক অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন। এক আয়াতে আছে تِلْكَ مِنْ أَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ إِلَيْكَ জাহান্নাম, জান্নাত, হিসাব, নিকাশ, শাস্তি, প্রতিদান ইত্যাদি পারলৌকিক বিষয়ের বিবরণ তো স্বয়ং কোরআন পাকে অনেক রয়েছে। ইহকালের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর অনেক বিবরণও পরম্পরাগত সহীহ্‌ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, উল্লেখিত আয়াতের সারমর্ম এতটুকু যে, আমি অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞানে আল্লাহ্‌ তাআলার মত নই এবং জ্ঞানে স্বেচ্ছাধীনও নই; বরং ওহীর মাধ্যমে আমাকে যতটুকু বলে দেয়া হয়, আমি ততটুকুই বর্ণনা করি।

তফসীরে রুহুল মা'আনীতে এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, আমার বিশ্বাস, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় নেননি, যতদিন আল্লাহ্‌র সত্তা, গুণাবলী এবং পরকালের ও ইহকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করা হয়নি। তবে যায়েদ আগামীকাল কি করবে, তার পরিণাম কি হবে ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষের খুঁটিনাটি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকা কোন উৎকর্ষের বিষয় নয় এবং এগুলো না জানলেও নবুওয়তের উৎকর্ষ হ্রাস পায় না।

রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত আদব ঃ এ ব্যাপারে আদব এই যে, তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন না, এরূপ বলা সঙ্গত নয়। বরং এভাবে বলা দরকার যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁকে অদৃশ্য বিষয়াদির অনেক জ্ঞান দান করেছিলেন যা অন্য কোন পয়গম্বরকে দেননি। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে পার্থিব অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে 'আমি জানি না' বলা হয়েছে—পারলৌকিক অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে নয়। কেননা, পারলৌকিক বিষয়ে তিনি খোলাখুলি বলে দিয়েছেন যে, মুমিন জান্নাতে যাবে এবং কাফের জাহান্নামে যাবে।—(কুরতুবী)

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِىْٓ إِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ

أَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً أَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِىْٓ إِسْرَآءِيْلَ – এ আয়াতের এবং সূরা শোয়ারার আয়াতের অর্থ একই রকম। সারমর্ম এই যে, যেসব ইহুদী ও খ্রীষ্টান রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর রেসালত ও কোরআন অমান্য করে, তারা স্বয়ং তাদের কিতাব সম্পর্কেও অজ্ঞ। কেননা, বনী ইসরাঈলের অনেক আলেম তাদের কিতাবে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। সে আলেমগণের সাক্ষ্যও কি এই মূর্খদের জন্যে যথেষ্ট নয়? এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার

নবুওয়ত দাবীকে ভ্রান্ত এবং কোরআনকে আমার রচনা বল। এর এক জওয়াব পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ বাস্তবে নবী না হয়ে নিজেকে নবী বলে মিথ্যা দাবী করলে তার দুনিয়াতেই নিপাত হয়ে যাওয়া জরুরী, যাতে জনসাধারণ প্রতারিত না হয়। এ জওয়াবই যথেষ্ট, কিন্তু তোমরা যদি না মান তবে এ সম্ভাবনার প্রতিও লক্ষ্য কর যে, আমার দাবী যদি সত্য হয় এবং কোরআন আল্লাহ্‌র কিতাব হয় আর তোমরা একে অমান্য করেই যাও, তবে তোমাদের পরিণতি কি হবে, বিশেষতঃ যখন তোমাদের বনী-ইসরাঈলেরই কোন মান্যবর ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা আল্লাহ্‌র কিতাব, অতঃপর সে নিজেও মুসলমান হয়ে যায়? এ জ্ঞান লাভের পরও যদি তোমরা জেদ ও অহংকারে অটল থাক, তবে তোমরা গুরুতর শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে।

আয়াতে বনী ইসরাঈলের কোন বিশেষ আলেমের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং এটাও নির্দিষ্ট করা হয়নি যে, এ সাক্ষ্য আয়াত অবতরণের পূর্বেই জনসমক্ষে এসে গেছে, না ভবিষ্যতে আসবে। তাই বনী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করার উপর আয়াতের অর্থ নির্ভরশীল নয়। খ্যাতনামা ইহুদী আলেম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামসহ যত ইহুদী ও খ্রীষ্টান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন, তারা সবাই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যদিও আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এ আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছিল।

হযরত সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, যাহ্হাক প্রমুখ তফসীরবিদগণ তাই বলেছেন। এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিপন্থী নয়। এমতাবস্থায় আয়াতটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গণ্য হবে।—(ইবনে কাসীর)

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ অহংকার ও গর্ব মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকেও বিকৃত করে দেয়। অহংকারী ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিকেই ভালমন্দের মাপকাঠি বলে মনে করতে থাকে। সে যা পছন্দ করে না, অন্যেরা তা পছন্দ করলে সে সবাইকে বোকা মনে করে, অথচ বাস্তবে নিজেই বোকা। কাফেরদের এ ধরনের অহংকার ও গর্বই আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে। ইসলাম ও ঈমান তাদের পছন্দনীয় ছিল না। তাই অন্যান্য ঈমান-প্রেমিকদের সম্পর্কে তারা বলত, ঈমান যদি ভালই হত, তবে সর্বাগ্রে তা আমাদের পছন্দনীয় হত। এই হতচ্ছাড়াদের পছন্দের কি মূল্য।

ইবনে মুনযির প্রমুখ এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) যখন মুসলমান ছিলেন না, তখন তাঁর রানীন নাম্নী এক বাঁদী ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই অপরাধে তিনি বাঁদীকে প্রচুর মারধর করতেন, যাতে সে ইসলাম ত্যাগ করে। তখন কোরাইশ কাফেররা বলত, ইসলাম ভাল হলে রানীনের মত নীচ বাঁদী আমাদেরকে পেছনে ফেলে যেতে পারত না। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(মাযহারী)

وَمِن قَبْلِهِ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً এ আয়াত থেকে প্রথমতঃ প্রমাণ পাওয়া গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন অভিনব রসূল এবং কোরআন কোন অভিনব কিতাব নয় যে, এতে বিশ্বাস স্থাপনে আপত্তি হবে। বরং এর আগে মূসা (আঃ) রসূলরূপে আগমন করেছেন এবং তাঁর প্রতি তওরাত নাযিল হয়েছিল। ইহুদী ও খ্রীষ্টান কাফেররাও তা স্বীকার করে। দ্বিতীয়তঃ এতে وَشَهِدَ شَاهِدٌ বাক্যেরও সমর্থন আছে। কেননা, মূসা (আঃ) ও তওরাত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও কোরআনের সত্যতার সাক্ষ্যদাতা।

পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে জালেমদের জন্যে শাস্তিবাণী এবং মুমিনদের জন্যে সাফল্যের সুসংবাদ ছিল। আলোচ্য ১৩ ও ১৪ নং আয়াত তারই পরিশিষ্ট। প্রথম অর্থাৎ, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا আয়াতে অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ ভঙ্গিতে সমগ্র ইসলাম, ঈমান ও সৎকর্মসমূহকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। رَبُّنَا اللَّهُ বাক্যে সমগ্র ঈমান এবং استقامة শব্দের মধ্যে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের অবিচল থাকা ও তদনুযায়ী পূর্ণমাত্রায় আমল করা দাখিল রয়েছে। استقامة এর গুরুত্বের ব্যাখ্যা সূরা হা-মীম সেজদায় বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ঈমান ও ঈমানে অবিচল থাকার কারণে ওয়াদা করা হয়েছে যে, তাদের ভবিষ্যতে কোন দুঃখ কষ্টের ভয় নেই এবং অতীত কষ্টের কারণেও তারা পরিতাপ করবে না। পরের আয়াতে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তাদের এই সুখ চিরন্তন ও স্থায়ী হবে। পরবর্তী ১৫-১৮ নং আয়াতে মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এর বিপরীত কর্মের নিন্দা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মানুষের প্রতি পিতা-মাতার অনুগ্রহ সন্তানের জন্যে শ্রম ও কষ্ট স্বীকার এবং পরিণত বয়সে পৌঁছার পর মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করার বিশেষ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। ইবনে কাসীরের ভাষায় পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক ও যোগসূত্র এই যে, কোরআন পাক সাধারণভাবে যেখানে মানুষকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও এবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়, সেখানে সাথে সাথে পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার, তাদের সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের নির্দেশও দান করে। বিভিন্ন সূরার অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী এখানেও আল্লাহ্‌র তওহীদের প্রতি দাওয়াতের সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কুরতুবীতে বর্ণিত যোগসূত্র এই যে, এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এক প্রকার সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, আপনি ঈমান ও তওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখুন। কেউ কবুল করবে এবং কেউ করবে না। এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, মানুষ তাদের পিতা-মাতার ক্ষেত্রেও সবাই সমান নয়। কেউ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কের এবং কেউ সদ্ব্যবহার করে না।

মোটকথা, এ আয়াত চতুষ্টয়ের আসল বিষয়বস্তু হল পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেয়া। অবশ্য এতে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য শিক্ষাও এসে গেছে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এসব আয়াত হযরত আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এর ভিত্তিতেই তফসীরে মাযহারীতে وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ বাক্যে انسان এর অর্থ নেয়া হয়েছে, হযরত আবু বকর (রাঃ)। বলাবাহুল কোরআনের কোন আয়াত অবতরণের কারণ কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা ঘটনা হলেও আয়াতের নির্দেশ সবার জন্যেই ব্যাপক হয়ে থাকে। এখানেও যদি আয়াতটির অবতরণের কারণ হযরত আবু বকর হয়ে থাকেন এবং আয়াতে উল্লেখিত বিশেষ গুণাবলী তাঁরই গুণাবলী হয়ে থাকে, তবুও আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে সবাইকে শিক্ষা দান করা। আসল আয়াতকে ব্যাপক রাখা হলে হযরত আবু বকর (রাঃ) আয়াতে বর্ণিত শিক্ষার প্রথম প্রতীক হবেন এবং যৌবনে পদার্পন ও চল্লিশ বছসর বয়সে উপনীত হওয়া সম্পর্কিত বিশেষ গুণাবলী হবে দৃষ্টান্তস্বরূপ। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা দেখুনঃ

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا — وصية শব্দের অর্থ তাকীদপূর্ণ নির্দেশ এবং احسان এর অর্থ সদ্ব্যবহার। এতে সেবা-যত্ন, আনুগত্য,

সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনও অন্তর্ভুক্ত।

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا — كره শব্দের অর্থ সে কষ্ট, যা মানুষ কোন কারণবশতঃ সহ্য করে থাকে এবং كره এর অর্থ সে কষ্ট, যা সহ্য করতে অন্য কেউ বাধ্য করে। এ থেকেই اكراه শব্দের উৎপত্তি। এ বাক্যটি প্রথম বাক্যেরই তাকীদ। অর্থাৎ, পিতা–মাতার সেবা–যত্ন ও আনুগত্য জরুরী হওয়ার এক কারণ এই যে, তারা তোমাদের জন্যে অনেক কষ্টই সহ্য করেন। বিশেষতঃ মাতার কষ্ট অনেক বেশী হয়ে থাকে। তাই এখানে কেবল মাতার কষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মাতা দীর্ঘ নয় মাস তোমাদেরকে গর্ভে ধারণ করে। এ ছাড়াও এসময়ে তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। এরপর প্রসবকালে অসহনীয় প্রসব বেদনার পর তোমরা ভূমিষ্ঠ হও।

মাতার হক পিতা অপেক্ষা বেশী : আয়াতের শুরুতে পিতা–মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও জরুরী। গর্ভধারণের সময়ে কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট সর্বাবস্থায় ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাতাকেই সহ্য করতে হয়। পিতার জন্যে লালন–পালনের কষ্ট সহ্য করা সর্ববস্থায় জরুরী হয় না। পিতা ধনাঢ্য হলে এবং তার চাকর–বাকর থাকলে অপরের মাধ্যমে সন্তানের দেখাশুনা করতে পারে, কিংবা বিদেশে অবস্থান করে ভরণ–পোষণের অর্থ প্রেরণ করতে পারে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সন্তানের উপর মাতার হক বেশী রেখেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন– صل امك ثم امك ثم اباك ثم ادناك فادناك অর্থাৎ, মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর পিতার সাথে, অতঃপর নিকট আত্মীয়ের সাথে।

وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا এ বাক্যেও মাতার কষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, সন্তানকে গর্বে ধারণ ও প্রসবের কষ্টের পরও মাতা রেহাই পায় না। এর পরে সন্তানের খাদ্যও আল্লাহ্ তাআলা মাতার স্তনে রেখে দিয়েছেন। মাতা তাকে স্তন্যদান করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য ছাড়ানো ত্রিশ মাসে হয়। হযরত আলী (রাঃ) এই আয়াতদৃষ্টে বলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। কেননা, وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ আয়াতে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল পূর্ণ দু'বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এখানে গর্ভধারণ ও স্তন্যদান উভয়ের সমকাল বর্ণিত হয়েছে ত্রিশ মাস। অতএব, স্তন্যদানের দু'বছর অর্থাৎ, চব্বিশ মাস বাদ দিলে গর্ভধারণের জন্যে ছয় মাসই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং এটাই হবে গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল। রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান গনী (রাঃ)–এর খেলাফতকালে জনৈক মহিলার গর্ভ থেকে ছয় মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে গেলে তিনি একে অবৈধ গর্ভ সাব্যস্ত করে শাস্তির আদেশ জারী করেন। কেননা, সাধারণ নিয়ম ছিল নয় এবং সর্বনিম্ন সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া। হযরত আলী (রাঃ) এই সংবাদ অবগত হয়ে খলীফাকে শাস্তি কার্যকর করতে বারণ করলেন এবং আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। খলীফা তার যুক্তিপ্রমাণ কবুল করে শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করে নেন।–(কুরতুবী)

এ কারণেই সমস্ত আলেমগণ একমত যে,গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস হওয়া সম্ভবপর। এখন সর্বোচ্চ সময়কাল কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। তাব কোরআন এ সম্পর্কে কোন ফয়সালা দেয়নি।

আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস নির্ধারিত। এর কম সময়ে সন্তান সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। তবে সর্বোচ্চ কতদিন সন্তান গর্ভে থাকতে পারে, এ সম্পর্কে অভ্যাস বিভিন্নরূপ। এমনিভাবে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর নির্ধারিত। বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে আরও ছয়মাস সময় বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু সর্বনিম্ন সময়কাল নির্দিষ্ট নেই। কোন কোন নারীর দুধই হয় না এবং কারও কারও দুধ কয়েক মাসেই শুকিয়ে যায়। কতক শিশু মায়ের দুধ পান করে না অথবা মায়ের দুধ শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়। ফলে অন্য দুধ পান করাতে হয়।

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً – اشد –এর শাব্দিক অর্থ শক্তি সামর্থ্য। সূরা আনআমে এর তফসীর করা হয়েছে' প্রাপ্তবয়স' বলে। এ আয়াতেও কেউ কেউ এ অর্থ নিয়েছেন। অতঃপর وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً কে বয়সের অপর একটি স্তর সাব্যস্ত করেছেন। হাসান বসরীর মতে بَلَغَ اَشُدَّهٗ ও وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً উভয়টি সমার্থবোধক। আয়াতে প্রথমে সন্তানের গর্ভধারণ, অতঃপর স্তন্যপানের সময়কাল বর্ণনা করার পর حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ বলার অর্থ এই যে, এরপর সে প্রাপ্তবয়স্ক ও শক্তিশালী হল এবং জ্ঞানবুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করল। এ সময় সে স্রষ্টা ও পালনকর্তার অভিমুখী হওয়ার তওফীক লাভ করল। ফলে এই বলে দোয়া করতে লাগল رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে শক্তি দিন, যাতে আমি আপনার নেয়ামতের শোকর আদায় করি,যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা–মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করি, আমার পিতা–মাতাকেও সৎকর্ম পরায়ণ করুন। অমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আমি আপনার একজন আজ্ঞাবহ। এখানে সবগুলো ক্রিয়ার অতীত পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে ব্যহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এটা কোন বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ ব্যক্তির বর্ণনা, যা আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়ে থাকবে। একারণেই তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, এগুলো সব হযরত আবু বকর (রাঃ) –এর অবস্থা। এগুলোই ব্যাপক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে অন্য মুসলমানগণও এতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং এরূপ করে। কুরতুবীতে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের দলীল। সে রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন বিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজার অর্থকড়ি দিয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশে সিরিয়া সফরে যান, তখন হযরত আবুবকর সে সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর। এ বয়সকেই بَلَغَ اَشُدَّهٗ বলা হয়েছে। এ সফরে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর অসাধারণ অবস্থা অবলোকন করে তার একান্ত ভক্ত হয়ে যান। সফর থেকে ফিরে এসে তিনি অধিকাংশ সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) –এর সাহচর্যে অতিবাহিত করতেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নবুওয়ত দান করলেন। তখন আবু বকর (রাঃ)–এর বয়স ছিল আটত্রিশ বছর। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই

أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ
فِىٓ أَصْحَٰبِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِى
قَالَ لِوَٰلِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِىٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ
مِن قَبْلِى وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
فَيَقُولُ مَا هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ
الْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ
كَانُوا خَٰسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَٰلَهُمْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ
أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ
تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِى
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾ وَاذْكُرْ أَخَا
عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُۥ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنۢ
بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦٓ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللَّهَ إِنِّىٓ أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا
عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ ﴿٢٢﴾

(১৬) আমি এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি এবং মন্দকর্মগুলো মার্জনা করি। তারা জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত সেই সত্য ওয়াদার কারণে যা তাদেরকে দেওয়া হত। (১৭) আর যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বলে, ধিক তোমাদেরকে, তোমরা কি আমাকে খবর দাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব, অথচ আমার পূর্বে বহু লোক গত হয়ে গেছে? আর পিতা-মাতা আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোমার তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। তখন সে বলে, এটা তো পূর্বর্তীদের উপকথা বৈ নয়। (১৮) তাদের পূর্বে যে সব জিন ও মানুষ গত হয়েছে, তাদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের প্রতিও শাস্তিবাণী অবধারিত হয়ে গেছে। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্থ। (১৯) প্রত্যেকের জন্যে তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর রয়েছে, যাতে আল্লাহ্ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন। বস্তুতঃ তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (২০) যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানকর আযাবের শাস্তি দেয়া হবে ; কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে। (২১) আ’দ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা স্মরণ করুন, তার পূর্বে ও পরে অনেক সতর্ককারী গত হয়েছিল, সে তার সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় এ মর্মে সতর্ক করেছিল যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও এবাদত করো না। আমি তোমাদের জন্যে এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি। (২২) তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য দেব-দেবী থেকে নিবৃত্ত করতে আগমন করেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দাও, তা নিয়ে আস।

ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর হয়ে গেল, তখন তিনি উল্লেখিত দোয়া করলেন। আয়াতে وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً বলে তাই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ দোয়াও কবুল করেন এবং নয় জন মুসলমান ও কাফেরদের হাতে নির্যাতিত গোলাম ক্রয় করে, মুক্ত করার তওফীক দান করেন। এমনিভাবে তাঁর দোয়া وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي কবুল হয়। বস্তুত : তাঁর সন্তানদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে ইসলাম গ্রহণ করেননি। আল্লাহ্ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবু বকরকেই এই বৈশিষ্ট্য দান করেন যে, তিনি নিজেও মুসলমান হন এবং পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তাঁরা সবাই রসূলে করীম (সাঃ)-এর পবিত্র সংসর্গও লাভ করেন। তফসীরে রুহুল মা'আনীতেও একথা বর্ণিত রয়েছে। এখন প্রশ্ন হয় যে, তাঁর পিতা আবু কুহাফা মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়েছিলেন, আর এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই তখন পিতা-মাতার প্রতি নেয়ামত দেয়ার কথা কেমন করে উল্লেখ করা হল? জওয়াব এই যে, কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। এরূপ হলে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না। আর যদি মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তবে অর্থ হবে ইসলামের নেয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত হওয়ার দোয়া। (রুহুল মাআনী) এই তফসীর দৃষ্টে যদিও সবগুলো অবস্থা হযরত আবু বকরের বর্ণিত হয়েছে ; কিন্তু আয়াতের বিধান সবার জন্যেই প্রযোজ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য সমস্ত মুসলমানকে নির্দেশ দেয়া যে, মানুষের বয়স চল্লিশ বছরের নিকটবর্তী হয়ে গেলে তার মধ্যে পরকাল চিন্তা প্রবল হওয়া উচিত। অতীত গোনাহ্ থেকে তওবা করে ভবিষ্যতে সেগুলো থেকে আত্মরক্ষায় পুরোপুরি যত্নবান হওয়া দরকার। কেননা, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, চল্লিশ বছর বয়সে যে অভ্যাস ও চরিত্র গড়ে উঠে, তা পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে থাকে।

হযরত ওসমান (রাঃ)-বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্-(সাঃ) বলেন, মুমিন বান্দা যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ্ তাআলা হিসাব সহজ করে দেন, ষাট বছর বয়সে পৌছালে সে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হওয়ার তওফীক লাভ করে, সত্তর বছর বয়সে পৌছালে আকাশের অধিবাসীরা তাকে ভালবাসতে শুরু করে, আশি বছর বয়সে পৌছালে আল্লাহ্ তাআলা তার সৎকর্মসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং মন্দ কর্মগুলোকে মিটিয়ে দেন এবং যখন সে নব্বই বছর বয়সে পৌছে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তার সমস্ত অতীত গোনাহ্ মাফ করে দেন, তাকে তার পরিবারের লোকজনের জন্যে সুপারিশ করার অধিকার দেন এবং আকাশে তার নামের সাথে اسير الله فى الارض লিখে দেন। অর্থাৎ, সে পৃথিবীতে আল্লাহ্ কয়েদী।—(ইবনে কাসীর) বলাবাহুল্য, হাদীসে সে মুমিন বন্দাকে বোঝানো হয়েছে, যে শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুসারী হয়ে খোদাভীতি সহকারে জীবন অতিবাহিত করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ

অর্থাৎ, উপরোক্ত গোনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এটাও ব্যাপক বিধান। তবে হযরত আবু বকরের ক্ষেত্রে এটা সর্বপ্রথম প্রযোজ্য। হযরত আলী (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত উক্তি থেকেও আয়াতের ব্যাপকতা বোঝা যায়। মুহাম্মদ ইবনে হাতেম বর্ণনা করেন, একবার আমি আমীরুল মুমেনীন

হযরত আলীর (রাঃ) নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে আরও কিছু লোক উপস্থিত ছিল। তারা হযরত ওসমান (রাঃ)–এর চরিত্রে কিছু দোষ আরোপ করলে তিনি বললেন ঃ

كان عثمان رضى الله عنه من الذين قال الله تعالى فيهم :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

قال والله عثمان واصحاب عثمان رضى الله عنهم قالها ثلاثا .

অর্থাৎ, হযরত ওসমান (রাঃ) সে লোকদের অন্যতম ছিলেন, যাঁদের কথা আল্লাহ্ তাআলা أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ আয়াতে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্র কসম ! ওসমান ও তাঁর সঙ্গীদের ক্ষেত্রেই এই আয়াত প্রযোজ্য। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন।—(ইবনে কাসীর)

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا পূর্বের আয়াতসমূহে মাতা–পিতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য সম্পর্কিত নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছিল। এ আয়াতে সে ব্যক্তির আযাব ও শাস্তি উল্লেখিত হয়েছে, যে পিতা–মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার ও কটূক্তি করে। বিশেষতঃ পিতা–মাতা যখন তাকে ইসলাম ও সৎকর্মের দিকে দাওয়াত দেয়, তখন তাদের কথা অমান্য করা দ্বিগুণ পাপ। ইবনে কাসীর বলেন, যে কোন লোক পিতা–মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করবে, তার ক্ষেত্রেই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে।

মারওয়ান এক ভাষণে বলেছিল, এ আয়াত হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) মারওয়ানের এই দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। কোন সহীহ্ রেওয়ায়েতে আয়াতটি কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে বর্ণিত নেই।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا অর্থাৎ, কাফেরদেরকে বলা হবে, তোমরা কিছু ভাল কাজ দুনিয়াতে করে থাকলে তার প্রতিদানও তোমাদেরকে পার্থিব আরাম–আয়েশ ও ভোগ–বিলাসের আকারে দেয়া হয়েছে। এখন পরকালে তোমাদের কোন প্রাপ্য নেই। এ থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের যেসব সৎকাজ ঈমানের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় নয়; পরকালে সেগুলো মূল্যহীন; কিন্তু দুনিয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সেগুলোর প্রতিদান দিয়ে দেন। কাজেই কাফেররা দুনিয়াতে যেসব বিষয়–বৈভব, ধন–দৌলত, মান–সম্ভ্রম, প্রভাব–প্রতিপত্তি ইত্যাদি লাভ করে, সেগুলো তাদের দানশীলতা, সহানুভূতি, সততা ইত্যাদি সৎকর্মের প্রতিফল হয়ে থাকে। মুমিনদের জন্যে এরূপ নয়। তারা দুনিয়াতে ধন–সম্পদ, মান–সম্মান, প্রভাব–প্রতিপত্তি ইত্যাদি নেয়ামত লাভ করলেও পরকালের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে না।

দুনিয়ার সুখ–সামগ্রী ভোগ–বিলাস থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা ঃ আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার ভোগ–বিলাসে মগ্ন থাকার কারণে কাফেরদের উদ্দেশে শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ দুনিয়ার ভোগ–বিলাস বর্জন করার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের জীবনালেখ্য এর সাক্ষ্য দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)–কে ইয়ামন প্রেরণ করার সময় এ উপদেশ দেন ঃ দুনিয়ার ভোগ–বিলাস থেকে বেঁচে থেকো। হযরত আলীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছ থেকে অল্প রিযিক নিতে সম্মত হয়ে যায়, আল্লাহ্ তাআলাও তার অল্প আমলে সন্তুষ্ট হয়ে যান।—(মাযহারী)

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَأُبَلِّغُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْ
أَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ
قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۖ رِيْحٌ
فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا
فَأَصْبَحُوْا لَا يُرٰى إِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَا إِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّأَبْصَارًا وَّأَفْئِدَةً ۖ فَمَا أَغْنٰى عَنْهُمْ
سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ
كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى
وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ
الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ۖ بَلْ ضَلُّوْا
عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَإِذْ صَرَفْنَا
إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ
قَالُوْا أَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

(২৩) সে বলল, এ জ্ঞান তো আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। আমি যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পৌঁছাই। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়। (২৪) (অতঃপর) তারা যখন শাস্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল, তখন বলল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। বরং এটা সেই বস্তু, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা বায়ু এতে রয়েছে মর্মন্তদ শাস্তি। (২৫) তার পালনকর্তার আদেশে সেসব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে। অতঃপর তারা ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শাস্তি দিয়ে থাকি। (২৬) আমি তাদেরকে এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দেইনি। আমি তাদের দিয়েছিলাম, কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়, কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসল না, যখন তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল এবং তাদেরকে সেই শাস্তি গ্রাস করে নিল, যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করত। (২৭) আমি তোমাদের আশপাশের জনপদসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছি এবং বার বার আয়াতসমূহ শুনিয়েছি, যাতে তারা ফিরে আসে। (২৮) অতঃপর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা যাদেরকে সান্নিধ্য লাভের জন্যে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়। (২৯) যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিল। তারা যখন কোরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতসমূহের যোগসূত্র ঃ (উপরে 'আদ সম্প্রদায়ের কাহিনী বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন তাদেরই মত অন্যান্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যাদেরকে কুফর ও পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে বিভিন্ন আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছিল। **তাদের জনপদের ধ্বংসাবশেষ মক্কাবাসীদের সফরের পথে অবস্থিত ছিল। এসব ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে সংক্ষেপে তাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।)**

আমি তোমাদের আশপাশের আরও জনপদ (কুফর ও শিরকের কারণে) ধ্বংস করে দিয়েছি। (যেমন, সামূদ ও লূতের সম্প্রদায়। মক্কাবাসীরা সিরিয়া সফরে এসব জনপদ অতিক্রম করত। মক্কার এক দিকে ইয়ামন ও অপরদিকে সিরিয়া অবস্থিত ছিল। তাই مَا حَوْلَكُمْ বলা হয়েছে।) এবং আমি (ধ্বংস করার পূর্বে তাদের উপদেশের জন্যে) বার বার নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছি, যাতে তারা (কুফর ও শিরক থেকে) বিরত হয়। (কিন্তু তারা বিরত হল না এবং ধ্বংস হয়ে গেল।) অতঃপর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা যাদেরকে নৈকট্য লাভের জন্যে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল (ধ্বংস ও আযাবের সময়) তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা (অর্থাৎ, তাদেরকে উপাস্য ও সুপারিশকারী মনে করা) ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়। (বাস্তবে তারা উপাস্য ছিল না।)

মক্কার কাফেরদেরকে শোনানোর জন্যে পূর্বেকার আয়াতসমূহে কুফর ও অহংকারের নিন্দা ও ধ্বংসকারিতা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে লজ্জা দেয়ার উদ্দেশে জিনদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, জিনরা অহংকার ও গর্বে তোমাদের চেয়েও বেশী, কিন্তু কোরআন শুনে তাদের অন্তরও বিগলিত হয়ে গেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা জিনদের চেয়ে বেশী জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন; কিন্তু তোমরা ইসলাম গ্রহণ করছ না! (জিনদের কোরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সহীহ্ হাদীসসমূহে এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পর থেকে জিন জাতিকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহ থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়। সেমতে তাদের কেউ সংবাদ শোনার মানসে উপরে গেলে তাকে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে বিতাড়িত করা হত। জিনরা এই নতুন পরিস্থিতির কারণ উদঘাটনে সচেষ্ট হল এবং তাদের বিভিন্ন দল কারণ অনুসন্ধানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল। একদল হেজাযেও পৌঁছল। সেদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কয়েকজন সাহাবীসহ 'বাতনে নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর 'ওকায' বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আরবরা আমাদের যুগের প্রদর্শনীর মত বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ বিশেষ দিনে মেলার আয়োজন করত। এসব মেলায় বহুলোক উপস্থিত থাকত, দোকান খোলা হত এবং সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হত। ওকায নামক স্থানে প্রতি বছর এমনি ধরনের এক মেলা বসত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্ভবতঃ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে সেখানে গমন করছিলেন। নাখলা নামক স্থানে তিনি যখন ফজরের নামাযের কোরআন পাঠ করছিলেন, তখন জিনদের অনুসন্ধানী দলটি সেখানে গিয়ে পৌঁছল। তারা কোরআন পাঠ শুনে বলতে লাগল, এই সে নতুন ঘটনা, যার কারণে আমাদেরকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহে নিবৃত্ত করা হয়েছে।—(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, জিনরা সেখানে পৌঁছে পরস্পর

قَالُوا يٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا أُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيٓ إِلَى الْحَقِّ وَإِلٰى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِٓ أَوْلِيَآءُ ۚ أُولٰٓئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يُّحْـِۧيَ الْمَوْتٰى ۚ بَلٰٓى إِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۖ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلٰى وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۚ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٣٥﴾

سُورَةُ مُحَمَّدٍ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ أَضَلَّ أَعْمٰلَهُمْ ﴿١﴾

(৩০) তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে। (৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহবানকারীর কথা মান্য কর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ্ মার্জনা করবেন। (৩২) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে আহবানকারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহ্কে অপারক করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। (৩৩) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩৪) যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে, সেদিন বলা হবে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, হাঁ আমাদের পালনকর্তার শপথ। আল্লাহ্ বলবেন, আযাব আস্বাদন কর। কারণ, তোমরা কুফরী করতে। (৩৫) অতএব, আপনি সবর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবেন না। ওদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হত, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা সুস্পষ্ট অবগতি। এখন তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যারা পাপাচারী সম্প্রদায়।

সূরা মুহাম্মদ

মদিনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৩৮

(১) যারা কুফরী করে এবং আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ্ তাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করে দেন।

বলতে লাগল, চুপ করে কোরআন শুন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নামায শেষ করলে জিনরা ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তদন্তকার্যের রিপোর্ট পেশ করে একথাও বলল, আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। তোমাদেরও ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সূরা জিন অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই জিনদের গমনাগমন এবং তাদের কোরআন পাঠ শুনে ইসলাম গ্রহণের বিষয় কিছুই জানতেন না। সূরা জিনে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেন।—(ইবনুল মুনযির)

আরও এক রেওয়ায়েতে আছে, নসীবাঈন নামক স্থানের অধিবাসী এই জিনদের সংখ্যা ছিল নয় অথবা সাত। তাদের প্রচারের ফলে পরবর্তীকালে আরও তিন শত জিন ইসলাম গ্রহণের জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়।—(রূহুল-মা'আনী) অন্যান্য হাদীসে জিনদের আগমনের ঘটনা অন্যভাবেও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে একাধিক ঘটনা বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে এসব বর্ণনায় কোন বৈপরীত্য নেই। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, জিনরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে বার বার আগমন করেছে।

খাফফাযী বলেন, সবগুলো হাদীস একত্রিত করলে দেখা যায় যে, জিনদের আগমনের ঘটনা ছয় বার সংঘটিত হয়েছে।—(বয়ানুল-কোরআন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জিনদের আগমনের ঘটনাই উপরোক্ত আয়াতসমূহে বিধৃত হয়েছে।

كِتٰبًا أُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوسٰى 'মূসার পরে' বলার কারণে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আগন্তুক জিনরা ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিল। কেননা, মূসা (আঃ)-এর পর ঈসা (আঃ)-এর প্রতি যে ইঞ্জীল অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের উক্তিতে তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ইঞ্জীলের উল্লেখ না করাই তাদের ইহুদী হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ নয়। কেননা ইঞ্জীলের উল্লেখ না করার এক কারণ এও হতে পারে যে, ইঞ্জীল অধিকাংশ বিধি-বিধানে তওরাতেরই অনুসারী। কিন্তু কোরআন তওরাতের মত একটি স্বতন্ত্র কিতাব। এর বিধি-বিধান ও শরীয়ত তওরাত থেকে অনেক ভিন্নতর। তাই একথা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য হতে পারে যে, কোরআনই তওরাতের অনুরূপ স্বতন্ত্র কিতাব।

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ - مِن অব্যয়টি আসলে 'কোন কোন'-এর অর্থ নির্দেশ করে। এখানে এই অর্থ নেয়া হলে বাক্যের ফায়দা এই হবে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে কোন কোন গোনাহ্ মাফ হবে, অর্থাৎ, আল্লাহ্র হক মাফ হবে-বান্দার হক মাফ হবে না। কেউ কেউ مِن অব্যয়টিকে অতিরিক্ত সাব্যস্ত করেছেন। এমতাবস্থায় এ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

সূরা মুহাম্মদ

সূরা মুহাম্মদের অপর নাম সূরা কিতাল। কেননা, এতে "কিতাল" তথা জেহাদের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এমনকি, এর একটি আয়াত وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ
وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾
ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴿٣﴾
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ
فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ
أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ
بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ
أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴿١٠﴾ ذَٰلِكَ
بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿١١﴾

(২) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন। (৩) এটা এ কারণে যে, যারা কাফের, তারা বাতিলের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী, তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে। এমনিভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্যে তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন। (৪) অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রু পক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে! একথা শুনলে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়, আল্লাহ্ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। (৫) তিনি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। (৬) অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। (৭) হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন। (৮) আর যারা কাফের, তাদের জন্যে আছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন। (৯) এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব, আল্লাহ্ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। (১০) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি অতঃপর দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং কাফেরদের অবস্থা এরূপই হবে। (১১) এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ মুমিনদের হিতৈষী বন্ধু এবং কাফেরদের কোন হিতৈষী বন্ধু নাই।

যে, এটি মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত। কেননা, এই আয়াতটি তখন নাযিল হয়েছিল, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন এবং মক্কার জনবসতি ও বায়তুল্লাহ্র দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেন ঃ হে মক্কা নগরী! জগতের সমস্ত নগরের মধ্যে তুমিই আমার কাছে প্রিয়। যদি মক্কার অধিবাসীরা আমাকে এখান থেকে বহিস্কার না করত, তবে আমি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কখনও তোমাকে ত্যাগ করতাম না। তফসীরবিদগণের পরিভাষায় যে আয়াত হিজরতের সফরে অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত বলে অভিহিত করা হয়। মোটকথা এই যে, এই সূরা মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং মদীনায় পৌঁছেই কাফেরদের সাথে জেহাদ ও যুদ্ধের বিধানাবলী নাযিল হয়েছে।

وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ এখানে سَبِيلِ اللَّهِ (আল্লাহ্র পথ) বলে ইসলামকে বোঝানো হয়েছে। أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ বলে কাফেরদের ঐ সকল কর্ম বোঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম। যেমন ফকীর-মিসকীনকে সাহায্য ও সহায়তা করা, প্রতিবেশীর সমর্থন ও হেফাযত করা, উদারতা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এসব কর্ম যদিও প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম, কিন্তু ঈমানসহ হলেই পরকালে এগুলো দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। কাফেরদের এধরনের সৎকর্ম পরকালে তাদের জন্যে মোটেই উপকারী হবে না। তবে তাদের সৎকর্মের বিনিময়ে ইহকালেই তাদেরকে আরাম ও সুখ দান করা হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ যদিও পূর্ববর্তী বাক্যেও ঈমান ও সৎকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেসালত ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীও শামিল রয়েছে, কিন্তু এই দ্বিতীয় বাক্যে একথা স্পষ্টভাবে পুনরুল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই সত্য ব্যক্ত করা যে, শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সমস্ত শিক্ষা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার উপরই ঈমানের আসল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ — بال শব্দটি কখনও অবস্থার অর্থে এবং কখনও অন্তরের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থ নেয়া যায়। প্রথম অর্থে আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের অবস্থাকে অর্থাৎ, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কর্মকে ভাল করে দেন। দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের অন্তরকে ঠিক করে দেন। এর সারমর্মও সমস্ত কাজকর্ম ঠিক করে দেয়া। কেননা, কাজকর্ম ঠিক করে দেয়া অন্তর ঠিক করে দেয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আলোচ্য আয়াত থেকে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়। (এক) যুদ্ধের মাধ্যমে কাফেরদের শৌর্য-বীর্য নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদেরকে হত্যার পরিবর্তে বন্দী করতে হবে। (দুই) অতঃপর এই যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলমানদের দু'রকম ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ কৃপাবশতঃ তাদেরকে কোন রকম মুক্তিপণ ও বিনিময় ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেয়া। দ্বিতীয়তঃ মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া। মুক্তিপণ এরূপও হতে পারে যে, আমাদের কিছুসংখ্যক মুসলমান তাদের হাতে বন্দী থাকলে তাদের বিনিময়ে কাফের বন্দীদেরকে মুক্ত করা এবং এরূপও হতে পারে যে, কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেয়া। এই বিধান পূর্ববর্ণিত সূরা আনফালের বিধানের বাহ্যতঃ খেলাফ। সূরা আনফালে বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে

ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সতর্কবাণী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ আমাদের এই সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ্ তাআলার আযাব নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। যদি এই আযাব আসত, তবে ওমর ইবনে খাত্তাব ও সা'দ ইবনে মুয়ায (রাঃ) ব্যতীত কেউ তা থেকে রক্ষা পেত না। কেননা, তাঁরা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার বিপক্ষে ছিলেন। এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআনের চতুর্থ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সারকথা এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদরের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়াও নিষিদ্ধ ছিল। সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত এই উভয় বিষয়কে সিদ্ধ সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই অধিকাংশ সাহাবী ও ফেকাহ্‌বিদ বলেন যে, সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। তফসীরে মাযহারীতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ), হাসান, আতা (রহঃ), প্রমুখ অধিকাংশ সাহাবী ও ফেকাহ্‌বিদের উক্তি তাই। সওরী, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক (রহঃ) প্রমুখ ফেকাহ্‌বিদ ইমামগণের মাযহাবও তাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। তখন কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেয়া নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য ও সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন সূরা মুহাম্মদে কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেয়ার অনুমতি দান করা হয়। তফসীরে মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ্ একথাটি উদ্ধৃত করার পর বলেন, এ উক্তিই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয়। কেননা, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একে কার্যে পরিণত করেছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনও একে কার্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। তাই এই আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। কারণ এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদর যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। বদর যুদ্ধ হিজরতের দ্বিতীয় সালে সংঘটিত হয়েছিল। আর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী বন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মক্কার আশি জন কাফের রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অতর্কিতে হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তানয়ীম পাহাড় থেকে নীচে অবতরণ করে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে জীবিত গ্রেফতার করেন এবং মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতহের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ
أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) -এর সিদ্ধান্ত এই যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেয়া জায়েয নয়। এ কারণেই হানাফী আলেমগণ সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াতকে ইমাম আযমের মতে রহিত ও সূরা আনফালের আয়াতকে রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তফসীরে মাযহারী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, সূরা আনফালের আয়াত পূর্বে এবং সূরা মুহাম্মদের আয়াত পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই সূরা মুহাম্মদের আয়াতই রহিতকারী এবং সূরা আনফালের আয়াত রহিত। ইমাম আযমের গৃহীত মত এবং অধিকাংশ সাহাবী ও ফেকাহ্‌বিদের অনুরূপ অর্থাৎ, মুক্ত করা জায়েয বলে তফসীরে মাযহারীতে বর্ণনা করেছে। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, যদি এতেই মুসলমানদের উপকারিতা নিহিত থাকে। তফসীরে মাযহারীর মতে এটাই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয়। হানাফী আলেমগণের মধ্যে আল্লামা ইবনে হুমাম (রহঃ) ফতহুল কাদীর গ্রন্থে এই অভিমতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি লিখেন ঃ কুদূরী ও হেদায়ার বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আযমের মতে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করা যায় না। এটা ইমাম আযমের এক রেওয়ায়েত। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেই অপর এক রেওয়ায়েত 'সিয়ারে-কবীরে' জমহুরের উক্তির অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, মুক্ত করা জায়েয। উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যে শেষোক্ত রেওয়ায়েতই অধিক স্পষ্ট। ইমাম তাহাভী (রহঃ) ''মা'আনিউল-আসারে'' একেই ইমাম আযমের মাযহাব সাব্যস্ত করেছেন।

সারকথা এই যে, সূরা মুহাম্মদ ও সূরা আনফালের উভয় আয়াত অধিকাংশ সাহাবী ও ফেকাহ্‌বিদের মতে রহিত নয়। মুসলমানদের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মুসলমানদের শাসনকর্তা এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একটিকে উপযুক্ত মনে করবে, সেটিই প্রয়োগ করতে পারবে। কুরতুবী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে কখনও হত্যা করা হয়েছে, কখনও গোলাম করা হয়েছে, কখনও মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং কখনও মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ে মুসলমান বন্দীদেরকে মুক্ত করানো এবং কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেয়া এই উভয় ব্যবস্থাই মুক্তিপণ নেয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা উভয় ব্যবস্থাই প্রমাণিত আছে। এই বক্তব্য পেশ করার পর ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এ থেকে জানা যায় যে, এ ব্যাপারে যেসব আয়াতকে রহিতকারী ও রহিত বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো তদ্রূপ নয়; বরং সবগুলো অকাট্য আয়াত। কেননা, কাফেররা যখন বন্দী হয়ে আমাদের হাতে আসবে, তখন মুসলিম শাসনকর্তা চারটি ধারার মধ্য থেকে যে কোনটি প্রয়োগ করতে পারবেন। তিনি উপযুক্ত মনে করলে বন্দীদেরকে হত্যা করবেন, উপযুক্ত বিবেচনা করলে তাদেরকে গোলাম ও বাঁদী করে নেবেন, মুক্তিপণ নেয়া উপযুক্ত মনে করলে অর্থকড়ি নিয়ে অথবা মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে ছেড়ে দেবেন। অথবা কোনরূপ মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেবেন। এরপর কুরতুবী লিখেন ঃ

ঃ মদীনার আলেমগণ তাই বলেন এবং এটাই ইমাম শাফেয়ী ও আবু ওবায়েদ (রহঃ)-এর উক্তি। ইমাম তাহ্‌ভী, ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মত সেটিই যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলিম শাসনকর্তার চারটি ক্ষমতা ঃ উপরোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মুসলিম শাসনকর্তা যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করতে পারবেন এবং তাদেরকেও গোলাম বানাতে পারবেন। এই প্রশ্নে উম্মতের সবাই একমত। মুক্তিপণ নিয়ে অথবা মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে যদিও কিছু মতভেদ আছে, কিন্তু অধিকাংশের মতে এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ।

ইসলামে দাসত্বের আলোচনা ঃ এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দেয়ার ব্যাপারে তো ফেকাহ্‌বিদগণের মধ্যে কিছু না কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু হত্যা করা ও গোলাম বানানোর বৈধতার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। এ ক্ষেত্রে সবাই একমত যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করা উভয় ব্যবস্থাই জায়েয। এমতাবস্থায় কোরআন পাকে এই ব্যবস্থাদ্বয়ের উল্লেখ করা হয়নি কেন? শুধু মুক্ত করে দেয়ার দুই ব্যবস্থাই কেন উল্লেখ করা হল? ইমাম রাযী (রহঃ) তফসীরে কবীরে এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এখানে কেবল এমন দুইটি ব্যবস্থার কথা আলোচনা

করা হয়েছে যা সর্বত্র ও সর্বদা বৈধ। দাসে পরিণত করার কথা উল্লেখ না করার কারণ এই যে, আরবের যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি নেই এবং পঙ্গু ইত্যাদি লোকের হত্যাও জায়েয নয়। এতদ্ব্যতীত হত্যার কথা পূর্বে উল্লেখও করা হয়েছে। — (তফসীরে-কবীর, ৭ম খণ্ড, ৫০৮ পৃঃ)

দ্বিতীয় কথা এই যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করার বৈধতা সুবিদিত ও সুপরিজ্ঞাত ছিল। সবাই জানত যে, এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ। এর বিপরীতে মুক্ত করে দেয়ার বিষয়টি বদর যুদ্ধের সময় রহিত করে দেয়া হয়েছিল। এখন এস্থলে মুক্ত ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দান করাই উদ্দেশ্য ছিল। তাই এরই দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুক্তিপণ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেয়া এবং মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া। যেসব ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই বৈধ ছিল সেগুলোকে এস্থলে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কাজেই এসব আয়াতদৃষ্টে একথা বলা কিছুতেই ঠিক নয় যে, এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হত্যা অথবা দাসে পরিণত করার বিধান রহিত হয়ে গেছে। যদি দাসে পরিণত করার বিধান রহিতই হয়ে যেত, তবে কোরআন ও হাদীসের এক না এক জায়গায় এর নিষেধাজ্ঞা উল্লেখিত হত। যদি আলোচ্য আয়াতই নিষেধাজ্ঞার স্থলাভিষিক্ত হত তবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর পর কোরআন ও হাদীসের অকৃত্রিম অনুসারী সাহাবায়ে কেরাম অসংখ্য যুদ্ধবন্দীদের কেন দাসে পরিণত করেছেন? হাদীস ও ইতিহাসে দাসে পরিণত করার কথা এত অধিক পরিমাণে ও পরম্পরায় সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, তা অস্বীকার করা ধৃষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইসলাম মানবাধিকারের সর্ববৃহৎ হয়ে দাসত্বের অনুমতি কিরূপে দিল? প্রকৃতপক্ষ ইসলামের বৈধকৃত দাসত্বকে জগতে অন্যান্য ধর্ম ও জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করে নেয়ার কারণেই এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অথচ ইসলাম দাসদেরকে যেসব অধিকার দান করেছে এবং সমাজে তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে এরপর তারা কেবল নামেই দাস রয়ে গেছে। নতুবা তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলে দেখা যায় যে, অনেক অবস্থায় যুদ্ধবন্দীদের সাথে এর চাইতে উত্তম ব্যবহার সম্ভবপর নয়। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ মসিও গোস্তাও লিবান তদীয় "আরবের তমদ্দুন" গ্রন্থে লিখেন ঃ

"বিগত ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে লিখিত আমেরিকার বই-পুস্তক পাঠে অভ্যস্ত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির সামনে যদি 'দাস' শব্দটি উচ্চারণ করা হয় তবে তার মানসপটে এমন অসহায় একদল মানুষের চিত্র ভেসে উঠে যাদেরকে শিকল দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে, গলায় বেড়ি পরানো হয়েছে এবং বেত মেরে মেরে হাঁকানো হচ্ছে। তাদের খোরাক প্রাণটা কোনরূপে দেহে আটকে রাখার জন্যেও যথেষ্ট নয়। বসবাসের জন্য অন্ধকারময় কক্ষ ছাড়া তারা আর কিছুই পায় না। আমি এখানে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না যে, এই চিত্র কতটুকু সঠিক এবং ইংরেজরা বিগত বছরগুলোতে আমেরিকায় যা কিছু করেছে তা এই চিত্রের অনুরূপ কি না। --- কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য যে, মুসলমানদের কাছে দাসের যে চিত্র তা খৃষ্টানদের চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। (ফরীদ ওয়াজদী প্রণীত দায়েরাতুল-মা'আরেফ থেকে উদ্ধৃত। ৪র্থ খণ্ড, ১৭৯ পৃঃ)

প্রকৃত সত্য এই যে, অনেক অবস্থায় বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার চাইতে উত্তম কোন পথ থাকে না। কেননা দাসে পরিণত না করা হলে যৌক্তিক দিক দিয়ে তিন অবস্থাই সম্ভবপর – হয় হত্যা করা হবে, না হয় মুক্ত ছেড়ে দেয়া হবে, না হয় যাবজ্জীবন বন্দী করে রাখা হবে। প্রায়ই এই তিন অবস্থা উপযোগিতার পরিপন্থী হয়। কোন কোন বন্দী উন্নত প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে, এ কারণে হত্যা করা সমীচীন হয় না। মুক্ত ছেড়ে দিলে অনেক ক্ষেত্রেই এমন আশংকা থাকে যে, স্বদেশে পৌঁছে সে মুসলমানদের জন্য পুনরায় বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। এখন এই দুই অবস্থাই অবশিষ্ট থাকে – হয় তাকে যাবজ্জীবন বন্দী রেখে আজকালকার মত কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আটক রাখা, না হয় তাকে দাসে পরিণত করে তার প্রতিভাকে কাজে লাগানো এবং তার মানবিক অধিকারগুলোরও পুরোপুরি প্রদান করা। চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, এতদুভয়ের মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা কোনটি? বিশেষতঃ দাসদের সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বোঝা আরও সহজ। দাসদের সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি রসূলে করীম (সাঃ) নিম্নরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

তোমাদের দাসেরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব, যার ভাই তার অধীনস্থ হয়, সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে এবং তাকে যেন এমন কাজের ভার না দেয় যা তার জন্য অসহনীয় হয়। যদি এমন কাজের ভার দিতেই হয়, তবে যেন সে নিজেও তাকে সাহায্য করে। — (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিক দিয়ে ইসলাম দাসদেরকে যে মর্যাদা দান করেছে তা স্বাধীন ও মুক্ত মানুষের মর্যাদার প্রায় কাছাকাছি। সেমতে অন্যান্য জাতির বিপরীতে ইসলাম দাসদেরকে শুধু বিবাহ করার অনুমতিই দেয়নি; বরং মালিকদেরকে وَأَنْكِحُوا الْأَيَامٰى مِنْكُمْ আয়াতের মাধ্যমে জোর তাকীদও করেছে। এমনকি তারা স্বাধীন মুক্ত নারীদেরকেও বিবাহ করতে পারে। তারা জেহাদেও অংশগ্রহণ করতে পারে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাদের অংশ স্বাধীন মুজাহিদের সমান। শত্রুকে যে কোন ধরনের নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে তাদের উক্তিও তেমনি ধর্তব্য যেমন স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের উক্তি। কোরআন ও হাদীসে তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশাবলী এত অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলোকে একত্রে সন্নিবেশিত করলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়ে যেতে পারে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, দু'জাহানের সরদার হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর পবিত্র মুখে যে কথাগুলো জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উচ্চারিত হচ্ছিল এবং যারপর তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান তা ছিল এই ঃ الصلوٰة الصلوٰة اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم অর্থাৎ, নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখ, নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তোমাদের অধীনস্থ দাসদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর।— (আবু দাউদ)

ইসলাম দাসদেরকে শিক্ষাদীক্ষা অর্জনেরও যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আমলে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশেই জ্ঞান-গরিমায় যারা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন দাসদের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রথাটি ক্রমে বিলীন করা অথবা হ্রাস করার জন্যে দাসদেরকে মুক্ত করার ফযীলত কোরআন ও হাদীসে ভূরি ভূরি বর্ণিত হয়েছে, যাতে মনে হয় যেন অন্য কোন সৎকর্ম এর সমকক্ষ হতে পারেনা। ফেকাহ্র বিভিন্ন বিধি-বিধানে দাসদেরকে মুক্ত করার জন্যে বাহানা তালাশ করা হয়েছে। রোযার কাফ্ফারা, হত্যার কাফ্ফারা, যেহারের কাফ্ফারা ও কসমের কাফ্ফারার মধ্যে দাস মুক্ত করাকে সর্বপ্রথম বিধান রাখা হয়েছে। এমনকি হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, কেউ যদি দাসকে অন্যায়ভাবে চপেটাঘাত করে,তবে এর কাফ্ফারা হচ্ছে দাসকে মুক্ত করে দেয়া। — (মুসলিম) সাহাবায়ে

কেরামের অভ্যাস ছিল তাঁরা অকাতরে প্রচুর সংখ্যক দাস মুক্ত করতেন। "আন্নাজমুল ওয়াহ্হাজ" – এর গ্রন্থকার কোন কোন সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) – ৬৯, হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) – ১০০, হযরত ওসমান গণী (রাঃ) – ২০, হযরত আব্বাস (রাঃ) – ৭০, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) – ১০০০, হযরত যূল কা'লা হিমইয়ারী (রাঃ)– ৮০০০ (মাত্র একদিনে), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) – ৩০,০০০ – (ফতহুল আল্লাম, টীকা বুলুগুল মারাম নবাব সিদ্দীক হাসান খান প্রণীত, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃঃ) এ থেকে জানা যায় যে, মাত্র সাত জন সাহাবী, ৩৯,২৫৯ জন দাসকে মুক্ত করেছেন। বলাবাহুল্য, অন্য আরও হাজারো সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা এর চাইতে অনেক বেশী হবে। মোটকথা, ইসলাম দাসত্বের ব্যবস্থায় সর্বব্যাপী সংস্কার সাধন করেছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখবে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, ইসলামের দাসত্বকে অন্যান্য জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এসব সংস্কার সাধনের পর যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি তাদের প্রতি একটি বিরাট অনুগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এখানে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার বিধান কেবল বৈধতা পর্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ, ইসলামী রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত বিবেচনা করে, তবে তাদেরকে দাসে পরিণত করতে পারে। এরূপ করা মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব নয়। বরং কোরআন ও হাদীসের সমষ্টিগত বাণী থেকে মুক্ত করাই উত্তম বোঝা যায়। দাসে পরিণত করার এই অনুমতিও ততক্ষণ, যতক্ষণ শত্রুপক্ষের সাথে এর বিপরীত কোন চুক্তি না থাকে। যদি শত্রুপক্ষের সাথে চুক্তি হয়ে যায় যে, তারা আমাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করবে না এবং আমরাও তাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করব না, তবে এই চুক্তি মেনে চলা অপরিহার্য হবে। বর্তমান যুগে বিশ্বের অনেক দেশ এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ আছে। কাজেই যেসব মুসলিম দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তাদের জন্যে চুক্তি বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত কোন বন্দীকে দাসে পরিণত করা বৈধ হবে না।

জেহাদ সিদ্ধ হওয়ার একটি রহস্য ঃ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জেহাদের সিদ্ধতা প্রকৃতপক্ষে একটি রহমত। কেননা, জেহাদকে আসমানী আযাবের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ, কুফর, শিরক ও খোদাদ্রোহিতার শাস্তি পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে আসমান ও যমীনের আযাব দ্বারা দেয়া হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেও এরূপ হতে পারত, কিন্তু রাহমাতুল্লিল-আলামীনের কল্যাণে এই উম্মতকে এ ধরনের আযাব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এর স্থলে জেহাদ সিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এতে ব্যাপক আযাবের তুলনায় অনেক নমনীয়তা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। প্রথম এই যে, ব্যাপক আযাবে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সমগ্র জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে জেহাদে নারী ও শিশুরা তো নিরাপদ থাকেই, পরন্তু পুরুষও তারাই আক্রান্ত হয়, যারা আল্লাহ্র দ্বীনের হেফাযতকারীদের মোকাবেলায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে। তাদের মধ্যেও সবাই নিহত হয় না ; বরং অনেকের ইসলাম গ্রহণ করার তওফীক হয়ে যায়। জেহাদের দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে উভয়পক্ষের অর্থাৎ, মুসলমান ও কাফেরদের পরীক্ষা হয়ে যায় যে, কে আল্লাহ্র নির্দেশে নিজের জান ও মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয় এবং কে অবাধ্যতা ও কুফরে অটল থাকে কিংবা ইসলামের উজ্জ্বল প্রমাণাদি দেখে ইসলাম কবূল করে।

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ সূরার প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, যারা কুফরী ও শিরক করে এবং অপরকেও ইসলাম থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দিবেন ; অর্থাৎ, তারা যেসব সদকা-খয়রাত ও জনহিতকর কাজ করে, শিরক ও কুফরের কারণে সেগুলোর কোন সওয়াব তারা পাবে না। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয় তাদের কর্ম বিনষ্ট হয় না ; অর্থাৎ, তারা কিছু গোনাহ্ করলেও সেই গোনাহের কারণে তাদের সৎকর্ম হ্রাস পায় না। বরং অনেক সময় তাদের সৎকর্ম তাদের গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়।

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ এতে শহীদের জন্য দু'টি নেয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। (এক) আল্লাহ্ তাকে হেদায়েত করবেন, (দুই) তার সমস্ত অবস্থা ভাল করে দেবেন। অবস্থা বলে দুনিয়া ও আখেরাত – উভয় জাহানের অবস্থা বোঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে এই যে, যে ব্যক্তি জেহাদে যোগদান করে, সে শহীদ না হলেও শহীদের সওয়াবের অধিকারী হবে। আখেরাতে এই যে, সে কবরের আযাব থেকে এবং হাশরের পেরেশানী থেকে মুক্তি পাবে। কিছু লোকের হক তার যিম্মায় থেকে গেলে আল্লাহ্ তাআলা হকদারদেরকে তার প্রতি রাযী করিয়ে তাকে মুক্ত করে দেবেন। — (মাযহারী) শহীদ হওয়ার পর হেদায়েত করার অর্থ এই যে, তাদেরকে 'মনযিলে-মকসূদ' অর্থাৎ, জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবেন ; যেমন কোরআনে জান্নাতীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতে পৌঁছে একথা বলবে ঃ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا অর্থাৎ, আল্লাহ্রই সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাদিগকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ এ হচ্ছে একটি তৃতীয় নেয়ামত। অর্থাৎ, তাদেরকে কেবল জান্নাতেই পৌঁছানো হবে না ; বরং তাদের অন্তরে আপনা-আপনি জান্নাতে নিজ নিজ স্থান ও জান্নাতের নেয়ামত তথা হূর ও গেলমানের এমন পরিচয় সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেমন তারা চিরকাল তাদের মধ্যে বসবাস করত এবং তাদের সাথে পরিচিত ছিল। এরূপ না হলে অসুবিধা ছিল। কারণ, জান্নাত ছিল একটি নতুন জগৎ। সেখানে নিজ নিজ স্থান খুঁজে নেয়ার মধ্যে ও সেখানকার বস্তুসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার মধ্যে সময় লাগত এবং বেশ কিছুকাল পর্যন্ত অপরিচিতির অনুভূতির কারণে মন অশান্ত থাকত।

হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) বর্ণনা ; রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি আমাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, তোমরা দুনিয়াতে যেমন তোমাদের স্ত্রী ও গৃহকে চিন, তার চাইতেও বেশী জান্নাতে তোমাদের স্থান ও স্ত্রীদেরকে চিনবে এবং তাদের সাথে অন্তরঙ্গ হবে। — (মাযহারী) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রত্যেক জান্নাতীর জন্যে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। সে জান্নাতে তার স্থান বলে দেবে এবং সেখানকার সঙ্গিনীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا এখানে মক্কার কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর যেমন আযাব এসেছে, তেমনি তোমাদের উপরও আসতে পারে। কাজেই তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো না।

محمد ٤٧ ٥٠٩ حم ٢٦

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ﴿١٤﴾ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴿١٨﴾

(১২) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আর যারা কাফের, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। (১৩) যে জনপদ আপনাকে বহিষ্কার করেছে, তদপেক্ষা কত শক্তিশালী জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। (১৪) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত নিদর্শন অনুসরণ করে, সে কি তার সমান, যার কাছে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করা হয়েছে এবং যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। (১৫) পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার ***অবস্থা নিম্নরূপ ঃ*** *তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহেযগাররা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন বিছিন্ন করে দেবে? (১৬) তাদের মধ্যে কতক আপনার দিকে কান পাতে, অতঃপর যখন আপনার কাছ থেকে বাইরে যায়, তখন যারা শিক্ষিত, তাদেরকে বলে ঃ এইমাত্র তিনি কি বললেন? এদের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। (১৭) যারা সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের সৎপথপ্রাপ্তি আরও বেড়ে যায় এবং আল্লাহ্ তাদেরকে তাকওয়া দান করেন। (১৮) তারা শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, কেয়ামত অকস্মাৎ তাদের কাছে এসে পড়ুক। বস্তুতঃ কেয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। সুতরাং কেয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?*

وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ - مَوْلَى শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অভিভাবক। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর আরেক অর্থ মালিক। কোরআনের অন্যত্র কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ — এতে আল্লাহ্ তাআলাকে কাফেরদেরও মাওলা বলা হয়েছে। কারণ, এখানে মাওলা শব্দের অর্থ মালিক। আল্লাহ্ তাআলা সবারই মালিক। মুমিন-কাফের কেউ এই মালিকানার বাইরে নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুনিয়ার পানির রঙ, গন্ধ ও স্বাদ কোন কোন সময় পরিবর্তিত হয়ে যায়। দুনিয়ার দুধও তেমনি বাসি হয়ে যায়। দুনিয়ার শরাব বিস্বাদ ও তিক্ত হয়ে থাকে। তবে সাময়িক নেশার কারণে তা পান করা হয় ; যেমন তামাক কড়া হওয়া সত্ত্বেও সেবন করা হয় এবং খেতে অভ্যাস হয়ে যায়। জান্নাতের পানি, দুধ ও শরাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সবই পরিবর্তন ও বিস্বাদ থেকে মুক্ত। জান্নাত অন্যান্য অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু থেকেও মুক্ত, একথা সূরা সাফফাতের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ এমনিভাবে দুনিয়ার মধুর মধ্যে মোম ও আবর্জনা মিশ্রিত থাকে। এর বিপরীতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের মধু পরিশোধিত হবে। বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, জান্নাতে আক্ষরিক অর্থেই পানি, দুধ, শরাব ও মধুর চারি প্রকার নহর রয়েছে। এখানে রূপক অর্থ নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবে এটা পরিষ্কার যে, জান্নাতের বস্তুসমূহকে দুনিয়ার বস্তুসমূহের অনুরূপ মনে করা যায় না। সেখানকার প্রত্যেক বস্তুর স্বাদ ও আনন্দ ভিন্নরূপ হবে, যার নযীর পৃথিবীতে নেই।

اشراط শব্দের অর্থ আলামত বা লক্ষণ। খাতামুন্নাবীয়্যিন (সাঃ) -এর আবির্ভাবই কেয়ামতের প্রাথমিক একটি আলামত। কেননা, খতমে-নবুওয়তও কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণ। এমনিভাবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযাকে কোরআনে اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটাও কেয়ামতের অন্যতম লক্ষণ। এসব প্রাথমিক আলামত কোরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যান্য আলামত সহীহ্ হাদীসসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীস হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে শুনেছেন - নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কেয়ামতের সুস্পষ্ট আলামত ঃ জ্ঞানচর্চা উঠে যাবে। অজ্ঞানতা বেড়ে যাবে। ব্যভিচারের প্রসার হবে। মদ্যপান বেড়ে যাবে। পুরুষেরা সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে ; এমন কি, পঞ্চাশ জন নারীর ভরণ-পোষণ একজন পুরুষে করবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, এলেম হ্রাস পাবে এবং মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে।— (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) বর্ণনা ; রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যখন যুদ্ধলব্ধ মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে এবং আমানতকে যুদ্ধলব্ধ মাল সাব্যস্ত করা হবে (অর্থাৎ, হালাল মনে করে খেয়ে ফেলবে।) যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে (অর্থাৎ, আদায় করতে কুণ্ঠিত হবে।) এলমে-দ্বীন পার্থিব স্বার্থের জন্যে অর্জন করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য ও জননীর অবাধ্যতা করতে শুরু করবে এবং বন্ধুকে নিকটে রাখবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদসমূহে হট্টগোল শুরু হবে, পাপাচারী ব্যক্তি কওমের নেতা হয়ে যাবে ; হীনতম ব্যক্তি জাতির

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ
اٰمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيهَا
الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ
الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلٰى لَهُمْ ﴿٢٠﴾ طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ
فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾ فَهَلْ
عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾
أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمٰى أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا
يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَ أَمْ عَلٰى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا
عَلٰى أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ
وَأَمْلٰى لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيعُكُمْ
فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ
الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا
مَا أَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾ أَمْ حَسِبَ
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾

(১৯) জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত। (২০) যারা মুমিন, তারা বলে ঃ একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জেহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্যে। (২১) তাদের আনুগত্য ও মিষ্ট বাক্য জানা আছে। অতএব, জেহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি প্রদত্ত অংগীকার পূর্ণ করে, তবে তাদের জন্যে তা মঙ্গলজনক হবে। (২২) ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (২৩) এদের প্রতিই আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। (২৪) তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (২৫) নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্যে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। (২৬) এটা এজন্যে যে, তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করে ঃ আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ্ তাদের গোপন পরামর্শ অবগত আছেন। (২৭) ফেরেশতা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে? (২৮) এটা এজন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন। (২৯) যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না?

প্রতিনিধিত্ব করবে, অত্যাচারের ভয়ে দুষ্ট লোকদের সম্মান করা হবে, গায়িকা নারীদের গান-বাদ্য ব্যাপক হয়ে যাবে, বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে, মদ্যপান করা হবে এবং উম্মতের সর্বশেষ লোকেরা তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে, তখন তোমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অপেক্ষা করো ঃ একটি রক্তিম ঝড়ের, ভূমিকম্পের, মানুষের মাটিতে প্রোথিত হয়ে যাওয়ার, আকার-আকৃতি বিকৃতি হয়ে যাওয়ার, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণের এবং কেয়ামতের অন্যান্য আলামতের, যেগুলো একের পর এক এভাবে প্রকাশ পাবে, যেমন মোতির মালা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একটি একটি করে মাটিতে খসে পড়ে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এবাদতের যোগ্য নয়। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানও একথা জানে, পয়গম্বরকুল শিরোমণি একথা জানবেন না কেন? এমতাবস্থায় এই জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দানের অর্থ হয় এর উপর দৃঢ় ও অটল থাকা, না হয় তদনুযায়ী আমল করা। কুরতুবী বর্ণনা করেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে এলমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন ঃ তুমি কি কোরআনের এই বাণী শ্রবণ করনি – فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ এতে এলমের পর আমলের নির্দেশ রয়েছে। অন্যত্র আছে اِعْلَمُوْٓا أَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ আরও বলা হয়েছে ঃ سَابِقُوْٓا إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ وَاعْلَمُوْٓا أَنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ এরপর বলা হয়েছে فَاحْذَرُوْهُمْ এসব জায়গায় প্রথমে এলম অতঃপর তদনুযায়ী আমল করার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যদিও পূর্ব থেকে একথা জানতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য তদনুযায়ী আমল করা। এ কারণেই এরপর وَاسْتَغْفِرْ অর্থাৎ, এস্তেগফারের আদেশ দান করা হয়েছে। পয়গম্বরসুলভ পবিত্রতার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে যদিও এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু পয়গম্বরগণ গোনাহ্ থেকে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও স্থলবিশেষে ইজতিহাদী ভুল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। শরীয়তের আইনে ইজতিহাদী ভুল গোনাহ্ নয়; বরং এই ভুলেরও সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু পয়গম্বরগণকে এই ভুল সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করে দেয়া হয় এবং তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভুলকে, ذنب তথা গোনাহ্ শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়; যেমন সূরা আবাছায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ কঠোর সতর্কবাণী এই ইজতিহাদী ভুলেরই একটি দৃষ্টান্ত। সূরা আবাছায় এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে যে, সেই ইজতিহাদী ভুল যদিও গোনাহ্ ছিল না; বরং এরও এক সওয়াব পাওয়ার ওয়াদা ছিল; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে সেই ভুলকে পছন্দ করা হয়নি। আলোচ্য আয়াতে এমনি ধরনের গোনাহ্ বোঝা যেতে পারে।

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা বেশী পরিমাণে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ কর এবং এস্তেগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনা কর। ইবলীস বলে ঃ আমি মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করে ধ্বংস করেছি, প্রত্যুত্তরে তারা আমাকে কালেমা ''লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' পাঠ করে ধ্বংস করেছে। এই অবস্থা দেখে আমি তাদেরকে এমন অসার কল্পনার অনুসারী করে দিয়েছি, যা তারা

সৎকাজ মনে করে সম্পন্ন করে (যেমন সাধারণ বেদআতসমূহের অবস্থা তদ্রূপই।) এতে করে তাদের তওবা করারও তওফীক হয় না।

مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ – متقلب এর শাব্দিক অর্থ ওলট-পালট হওয়া এবং مثوى শব্দের অর্থ অবস্থানস্থল। তফসীরবিদগণ এই শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সবগুলোর অর্থই এখানে উদ্দিষ্ট। কেননা, প্রত্যেক মানুষের উপর দ্বিবিধ অবস্থা আসে। (এক) যে অবস্থার সাথে সে সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে জড়িত হয় এবং (দুই) যে অবস্থাকে সে স্থায়ী বৃত্তি মনে করে। এমনিভাবে কোন কোন গৃহে মানুষ অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং কোন কোন গৃহে স্থায়ীভাবে। আয়াতে অস্থায়ীকে متقلب শব্দ দ্বারা এবং স্থায়ীকে مثوى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবে আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ মানুষের যাবতীয় অবস্থার খবর রাখেন।

سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ – مُّحْكَمَةٌ এর শাব্দিক অর্থ মজবুত ও অনড়। এই আভিধানিক অর্থে কোরআনের প্রত্যেক সূরাই مُّحْكَمَةٌ কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় محكم শব্দটি منسوخ তথা রহিতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এখানে সূরার সাথে "f মাহকামাহ" সংযুক্ত করার তাৎপর্য এই যে, সূরা মনসূখ ও রহিত না হলেই আমলের সাধ পূর্ণ হতে পারে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ যেসব সূরায় যুদ্ধ ও জেহাদের বিধানাবলী বিধৃত হয়েছে, সেগুলো সব "`মাহকামাহ্" তথা অরহিত। এখানে আসল উদ্দেশ্য জেহাদের নির্দেশ ও তা বাস্তবায়ন। তাই সূরার সাথে মোহ্কামাহ্ শব্দ যুক্ত করে জেহাদের আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আসছে।— (কুরতুবী)

فَأَوْلٰى لَهُمْ আসমায়ীর উক্তি অনুযায়ী এর অর্থ قاربه مايهلكه অর্থাৎ, তার ধ্বংসের কারণসমূহ আসন্ন।— (কুরতুবী)

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

আভিধানিক দিক দিয়ে تولى শব্দের দুই অর্থ সম্ভবপর। (এক) মুখ ফিরিয়ে নেয়া ও (দুই) কোন দলের উপর শাসনক্ষমতা লাভ করা। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ প্রথম অর্থ নিয়েছেন, যা উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে লিখিত হয়েছে। আবু হাইয়ান (রহঃ) বাহ্‌রে-মুহীতে এই অর্থকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা শরীয়তের বিধানাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও-(জেহাদের বিধানও এর অন্তর্ভুক্ত), তবে এর প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, তোমরা মূর্খতা যুগের প্রাচীন পদ্ধতির অনুসারী হয়ে যাবে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। মূর্খতা যুগের প্রত্যেকটি কাজে এই পরিণতি প্রত্যক্ষ করা হত। এক গোত্র অন্য গোত্রের উপর হানা দিত এবং হত্যা ও লুটতরাজ করত। সন্তানদেরকে স্বহস্তে জীবন্ত কবরস্থ করত। ইসলাম মূর্খতা যুগের এসব কুপ্রথা মেটানোর জন্যে জেহাদের নির্দেশ জারি করেছে। এটা যদিও বাহ্যতঃ রক্তপাত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সারমর্ম হচ্ছে পচা, গলিত অঙ্গকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, যাতে অবশিষ্ট দেহ নিরাময় ও সুস্থ থাকে। জেহাদের মাধ্যমে ন্যায়, সুবিচার এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্মানিত ও সুসংহত হয়। রুহুল মা'আনী, কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে تَوَلّٰى শব্দের অর্থনেয়া হয়েছে "রাজত্ব ও শাসনক্ষমতা লাভ করা।" এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে অর্থাৎ, দেশ ও জাতির শাসনক্ষমতা লাভ করলে এর পরিণতি এ ছাড়া কিছুই হবে না যে, তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

আত্মীয়তা বজায় রাখার কঠোর তাকীদ ঃ ارحام শব্দটি رحم এর বহুবচন। এর অর্থ জননীর গর্ভাশয়। সাধারণ সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ভিত্তি সেখান থেকেই সূচিত হয়, তাই বাকপদ্ধতিতে رحم শব্দটি আত্মীয়তা ও সম্পর্কের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এস্থলে তফসীরে রুহুল মা'আনীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, ارحام ও ذوى الارحام শব্দ কোন্ কোন্ আত্মীয়তাতে পরিব্যাপ্ত। ইসলাম আত্মীয়তার হক আদায় করার জন্যে খুবই তাকীদ করেছে। বোখারীতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও অন্য দু'জন সাহাবী থেকে এই বিষয়বস্তুর হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে নৈকট্য দান করবেন এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে ছিন্ন করবেন। এ থেকে জানা গেল যে, আত্মীয় ও সম্পর্কশীলদের সাথে কথায়, কর্মে ও অর্থ ব্যয়ে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর নির্দেশ আছে। উপরোক্ত হাদীসে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের বরাত দিয়েছেন যে, ইচ্ছা করলে কোরআনের এই আয়াতটি দেখে নাও। অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তাআলা যেসব গোনাহের শাস্তি ইহকালেও দেন এবং পরকালেও দেন, সেগুলোর মধ্যে নিপীড়ন ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার সমান কোন গোনাহ্ নেই।— (আবু দাউদ, তিরমিযী) হযরত সওবানের বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আয়ুবৃদ্ধি ও রুযী-রোযগারে বরকত কামনা করে সে যেন আত্মীয়তার সাথে সহৃদয় ব্যবহার করে। সহীহ্ হাদীসসমূহে আরও বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে অপরপক্ষ থেকে সদ্ব্যবহার আশা করা উচিত নয়। যদি অপরপক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহারও করে, তবুও তার সাথে তোমার সদ্ব্যবহার করা উচিত। সহীহ্ বোখারীতে আছে ঃ

ليس الواصل بالمكافى ولكن الواصل الذى اذا قطعت رحمه وصلها অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহারকারী নয়, যে কেবল প্রতিদানের সমান সদ্ব্যবহার করে ; বরং সেই সদ্ব্যবহারকারী, যে অপরপক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখে।— (ইবনে কাসীর)

أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ, যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন। অর্থাৎ, তাদেরকে রহমত থেকে দূরে রাখেন। হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) এই আয়াত দৃষ্টেই উম্মুল ওলাদের বিক্রয় অবৈধ সাব্যস্ত করেন। অর্থাৎ, যে মালিকানাধীন বাঁদীর গর্ভ থেকে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে বিক্রয় করলে সন্তানের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে,যা অভিসম্পাতের কারণ। তাই এরূপ বাঁদী বিক্রয় করা হারাম।— (হাকেম)

أَمْ عَلٰى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا অন্তরে তালা লেগে যাওয়ার অর্থ তাই, যা অন্যান্য আয়াতে طَبَعَ ও خَتَمَ অর্থাৎ, মোহর লেগে যাওয়া বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য অন্তর এমন কঠোর ও চেতনাহীন হয়ে যাওয়া যে, ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করতে থাকে। এর কারণেই মানুষ সাধারণতঃ বিরামহীনভাবে গোনাহে লিপ্ত থাকে। (নাউযুবিল্লাহ্ মিনহু)

الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلٰى لَهُمْ এতে শয়তানকে দু'টি কাজের কর্তা বলা হয়েছে। (এক) تسويل এর সুশোভিত করা ; অর্থাৎ, মন্দ বিষয়

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ
الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ
مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا
أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ
مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى
السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾
إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ
أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا
وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾ هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ
وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا
غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

(৩০) আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের সাথে পরিচিত করে দিতাম। তখন আপনি তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন এবং আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন। আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহের খবর রাখেন। (৩১) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জেহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি। (৩২) নিশ্চয় যারা কাফের এবং আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্যে সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর রসূলের (সাঃ) বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ্র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এবং তিনি ব্যর্থ করে দিবেন তাদের কর্মসমূহকে। (৩৩) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রসূলের (সাঃ) আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। (৩৪) নিশ্চয় যারা কাফের এবং আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে অতঃপর কাফের অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ্ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (৩৫) অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহ্বান জানিও না, তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহ্ই তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না। (৩৬) পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না। (৩৭) তিনি তোমাদের কাছে ধন-সম্পদ চাইলে অতঃপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দেবেন। (৩৮) শুন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।

অথবা মন্দ কর্মকে কারও দৃষ্টিতে সুন্দর ও সুশোভিত করে দেয়া। (দুই) املاء এর অর্থ অবকাশ দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান প্রথমে তো তাদের মন্দকর্মসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে ভাল ও শোভন করে দেখিয়েছে, এরপর তাদেরকে এমন দীর্ঘ আশায় জড়িত করে দিয়েছে, যা পূর্ণ হওয়ার নয়।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ

اضغان শব্দটি ضغن এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন শত্রুতা ও বিদ্বেষ। মুনাফিকরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করত এবং বাহ্যতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর প্রতি মহব্বত প্রকাশ করত, কিন্তু অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করত। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে আলেমুল গায়েব জানা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে এমন নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের অন্তরের গোপন ভেদ ও বিদ্বেষকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন? ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ্ তাআলা সূরা বারাআতে তাদের ক্রিয়াকর্মের পরিচয় বলে দিয়েছেন, যদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, কারা মুনাফিক। এ কারণেই সূরা বারাআতকে সূরা ফাযেহা অর্থাৎ, অপমানকারী সূরাও বলা হয়। কেননা, এই সূরা মুনাফিকদের বিশেষ বিশেষ আলামত প্রকাশ করে দিয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ অর্থাৎ, আমি ইচ্ছা করলে আপন্যকে নির্দিষ্ট করে মুনাফিকদের দেখিয়ে দিতে পারি এবং তাদের এমন আকার-আকৃতি বলে দিতে পারি, যদ্দ্বারা আপনি প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারতেন। এখানে لو অব্যয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। এতে ব্যাকরণিক নিয়ম অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিহ্নিত করে আপনাকে বলে দিতাম ঃ কিন্তু রহস্য ও উপযোগিতাবশতঃ আমার সহনশীলতা গুণের কারণে তাদেরকে এভাবে লাঞ্ছিত করা পছন্দ করিনি, যাতে এই বিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, প্রত্যেক বিষয়কে বাহ্যিক অর্থে বুঝতে হবে এবং অন্তরগত অবস্থা ও গোপন বিষয়াদিকে আল্লাহ্ তাআলার নিকট সোপর্দ করতে হবে। তবে আমি আপনাকে এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছি যে, আপনি মুনাফিকদেরকে তাদের কথাবার্তার ভঙ্গি দ্বারা চিনে নিতে পারবেন। — (ইবনে কাসীর)

হযরত ওসমান গনী (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিষয় অন্তরে গোপন করে, আল্লাহ্ তাআলা তার চেহারা ও অনিচ্ছাপ্রসূত কথা দ্বারা তা প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ, কথাবার্তার সময় তার মুখ থেকে এমন বাক্য বের হয়ে যায়, যার ফলে তার মনের ভেদ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এমনি এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্তরে কোন বিষয় গোপন করে,আল্লাহ্ তাআলা তার সত্তার উপর সেই বিষয়ের চাদর ফেলে দেন। বিষয়টি ভাল হলে তা প্রকাশ না হয়ে পারে না এবং মন্দ হলেও প্রকাশ না হয়ে পারে না। কোন কোন হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, একদল মুনাফিকের ব্যক্তিগত পরিচয়ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেয়া হয়েছিল। মসনদে -আহমদে ওকবা ইবনে আমরের হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার এক খোতবায় ছয়ত্রিশ জন মুনাফিকের নাম বলে তাদেরকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দেন। হাদীসে তাদের নাম গণনা করা হয়েছে। — (ইবনে কাসীর)

حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ আল্লাহ্ তাআলা তো সৃষ্টির আদিকাল

থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সর্বব্যাপী জ্ঞান রাখেন। এখানে জানার অর্থ প্রকাশ হওয়া। অর্থাৎ, যে বিষয়টি আল্লাহ্‌র জ্ঞানে পূর্ব থেকেই ছিল, তার বাস্তবভিত্তিক ও ঘটনাভিত্তিক জ্ঞান হয়ে যাওয়া। — (ইবনে কাসীর)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ আলোচ্য আয়াতও মুনাফিক এবং ইহুদী বনী-কোরায়যা ও বনী-নুযায়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এই আয়াত সেসব মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধের সময় কোরাইশ কাফেরদেরকে সাহায্য করেছে এবং তাদের বার জন লোক সমগ্র কোরাইশ বাহিনীর পানাহারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। প্রত্যহ একজন লোক গোটা কাফের বাহিনীর পানাহারের ব্যবস্থা করত।

وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ এখানে "কর্ম বিনষ্ট" করার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেবেন না ; বরং ব্যর্থ করে দেবেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই লিখিত হয়েছে। এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কুফর ও নিফাকের কারণে তাদের সৎকর্মসমূহ যেমন সদকা, খয়রাত ইত্যাদি সব নিষ্ফল হয়ে যাবে – গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ কোরআন পাক এ স্থলে حبط এর পরিবর্তে ابطال উল্লেখ করেছে। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা বাতিল করা এক প্রকার কুফরের কারণে প্রকাশ পায়, যা উপরের আয়াতে حبط শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আসল কাফেরের কোন আমল কুফরের কারণে গ্রহণযোগ্যই হয় না। ইসলাম গ্রহণ করার পর যে ব্যক্তি ইসলামকে ত্যাগ করে মুরতাদ তথা কাফের হয়ে যায়, তার ইসলামকালীন সৎকর্ম যদিও গ্রহণযোগ্য ছিল ; কিন্তু তার কুফর ও ধর্মত্যাগ সেসব কর্মকেও নিষ্ফল করে দেয়।

আমল বাতিল করার দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কোন কোন সৎকর্মের জন্যে অন্য সৎকর্ম করা শর্ত। যে ব্যক্তি এই শর্ত পূরণ করে না, সে তার সৎকর্মও বিনষ্ট করে দেয়। উদাহরণতঃ প্রত্যেক সৎকর্ম কবূল হওয়ার শর্ত এই যে, তা খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্যে হতে হবে, তাতে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব এবং নাম যশের উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ — অতএব, যে সৎকর্ম রিয়া ও নাম যশের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা আল্লাহ্‌র কাছে বাতিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে সদকা-খয়রাত সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ অর্থাৎ, অনুগ্রহের বড়াই করে অথবা গরীবকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের সদকা খয়রাতকে বাতিল করো না। এতে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহের বড়াই করলে অথবা গরীবকে কষ্ট দিলে সদকা বাতিল হয়ে যায়। হযরত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ তাই হতে পারে, যা তিনি এই আয়াতের তফসীরে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের সৎকর্মসমূহকে গোনাহের মাধ্যমে বাতিল করো না। যেমন ইবনে জুরায়েজ বলেন ঃ بالرياء والسمعة মুকাতিল প্রমুখ বলেন ঃ بِالْمَنِّ কেননা, আহলে সুন্নত দলের ঐক্যমতে, কুফর ও শিরক ছাড়া কোন কবীরা গোনাহ্ও এমন নাই, যা মুমিনদের সৎকর্ম বাতিল করে দেয়। উদাহরণতঃ কেউ চুরি করল এবং সে নিয়মিত নামাযী ও রোযাদার। এমতাবস্থায় তাকে বলা হবে না যে, তোমার নামায-রোযা বাতিল হয়ে গেছে— এগুলোর কাযা কর। অতএব, সেসব গোনাহ্ দ্বারাই সৎকর্ম বাতিল হয়, যেগুলো না করা সৎকর্ম কবূল হওয়ার জন্যে শর্ত ; যেমন রিয়া ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে করা। এরূপ উদ্দেশ্যে না করা প্রত্যেক সৎকর্ম কবূল হওয়ার জন্যে শর্ত। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ সৎকর্মের বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া হবে এবং স্বয়ং সৎকর্ম বিনষ্ট হওয়া হবে না। এমতাবস্থায় এটা সকল গোনাহ্‌র ক্ষেত্রেই শর্ত হবে। যার আমলে গোনাহের প্রাধান্য থাকবে, তার অল্প সৎকর্মে ও আযাব থেকে রক্ষা করার মত বরকত থাকবে না ; বরং সে নিয়মানুযায়ী গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে ; কিন্তু পরিণামে ঈমানের বরকতে শাস্তি ভোগার পর মুক্তি পাবে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ

এমন শব্দের মাধ্যমেই একটি নির্দেশ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পুনরুল্লেখের এক কারণ এই যে, প্রথম আয়াতে কাফেরদের পার্থিব ক্ষতি বর্ণিত হয়েছে এবং এই আয়াতে পারলৌকিক ক্ষতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই উদ্ধৃত করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও হতে পারে যে, প্রথম আয়াতে সাধারণ কাফেরদের বর্ণনা ছিল, যাদের মধ্যে তারাও শামিল ছিল, যারা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা কাফের অবস্থায় যেমন সৎকর্ম করেছিল, তা সবই নিষ্ফল হয়েছে। মুসলমান হওয়ার পরও সেগুলোর সওয়াব পাবে না। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে এমন কাফেরদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফর ও শিরককে আঁকড়ে রেখেছিল। তাদের বিধান এই যে, পরকালে কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ এ আয়াতে কাফেরদেরকে সন্ধির আহ্বান জানাতে নিষেধ করা হয়েছে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا অর্থাৎ, কাফেররা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তোমরাও ঝুঁকে পড়। এ থেকে সন্ধি করার অনুমতি বোঝা যায়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন যে, অনুমতির আয়াতের অর্থ এই যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব হলে তোমরা সন্ধি করতে পার। পক্ষান্তরে এই আয়াতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু খাঁটি কথা এই যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করাও জায়েয, যদি এতে মুসলমানদের উপযোগিতা দেখা যায় এবং কাপুরুষতা ও বিলাসপ্রিয়তা এর কারণ না হয়। এ আয়াতের শুরুতে فَلَا تَهِنُوا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাপুরুষতা ও জেহাদ থেকে পলায়নের মনোভাব নিয়ে যে সন্ধি করা হয়, তা নিষিদ্ধ। কাজেই এতেও কোন বিরোধ নেই। কারণ, وَإِن جَنَحُوا আয়াতের বিধানও তখনই হবে, যখন অলসতা ও কাপুরুষতার কারণে সন্ধি করা না হয়, বরং মুসলমানদের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়।

وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কর্মসমূহের প্রতিদান হ্রাস করবেন না। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে কোন কষ্ট ভোগ কর, তার বিরাট প্রতিদান পরকালে পাবে। অতএব, কষ্ট করলেও মুমিন অকৃতকার্য নয়।

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا সংসারাসক্তিই মানুষের জন্যে জেহাদে বাধাদান-কারী হতে পারে। এতে নিজের জীবনের প্রতি আসক্তি, পরিবার-পরিজনের আসক্তি এবং টাকা-কড়ির আসক্তি সবই দাখিল। এই আয়াতে

বলা হয়েছে যে, এসব বস্তু সর্বাবস্থায় নিঃশেষ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এগুলোকে আপাততঃ বাঁচিয়ে রাখলেও অন্য সময় এগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই এসব ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী বস্তুর মহব্বতকে পরকালের স্থায়ী অক্ষয় নেয়ামতের মহব্বতের উপর প্রাধান্য দিও না।

وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। কিন্তু সমগ্র কোরআনেই যাকাত ও সদকার বিধান এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। স্বয়ং এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার তাকীদ বর্ণিত হচ্ছে। তাই বাহ্যতঃ উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে বলে মনে হয়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন ঃ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের কাছ থেকে নিজের কোন উপকারের জন্যে চান না ; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্যে চান। এই আয়াতেও يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ শব্দ দ্বারা এই উপকারের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমাদেরকে আল্লাহ্ পথে ব্যয় করার জন্যে বলার কারণ এই যে, পরকালে তোমরা সওয়াবের প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে। তখন এই ব্যয় তোমাদেরই কাজে লাগবে এবং সেখানে তোমাদেরকে এর প্রতিদান দেয়া হবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই বক্তব্যই পেশ করা হয়েছে। এর নজীর হচ্ছে এই আয়াত ঃ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ অর্থাৎ, আল্লাহ্ বলেনঃ আমি তোমাদের কাছে নিজের জন্যে কোন জীবনোপকরণ চাই না। আমার এর প্রয়োজনও নেই। কারও কারও মতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ বলে সমস্ত ধনসম্পদ চাওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা ইবনে উয়ায়নার উক্তি। — (কুরতুবী) পরবর্তী আয়াত এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে, যাতে বলা হয়েছে — إِن يَسْـَٔلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ - يحف - احفاء শব্দটি থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাড়াবাড়ি করা এবং কোন কাজে শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। এই আয়াতের মর্ম সবার মতে এই যে, আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তোমরা কার্পণ্য করতে এবং এই আদেশ পালন তোমাদের কাছে অপ্রিয় মনে হত। এমনকি, আদায় করার সময় মনের এই অপ্রিয় ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ত। সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ বলে তাই বোঝানো হয়েছে, যা দ্বিতীয় আয়াতে فَيُحْفِكُمْ সংযুক্ত করে বোঝানো হয়েছে। উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের প্রতি যাকাত, ওশর ইত্যাদি যেসব আর্থিক ফরয কাজ আরোপ করেছেন, প্রথমতঃ সেগুলো স্বয়ং তোমাদেরই উপকারার্থে করেছেন— আল্লাহ্ তাআলার কোন উপকার নাই। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ তাআলা এসব ফরয কাজের ক্ষেত্রে করুণাবশতঃ অল্প পরিমাণ অংশই ফরয করেছেন। ফলে একে বোঝা মনে করা উচিত নয়। যাকাতে মজুদ অর্থের ৪০ ভাগের এক ভাগ, উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের এক অথবা ২০ ভাগের এক, ১০০ ছাগলের মধ্যে একটি ছাগল মাত্র। অতএব, বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সমস্ত ধন-সম্পদ চাননি। সমস্ত ধন-সম্পদ চাইলে তা স্বভাবতঃই অপ্রিয় ও বোঝা মনে হতে পারত। তাই এই অল্প পরিমাণ অংশ সন্তুষ্টচিত্তে আদায় করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।

وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ - اضغان শব্দটি ضغن এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন বিদ্বেষ ও গোপন অপ্রিয়তা। এস্থলেও গোপন অপ্রিয়তা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করে দেয়া মানুষের কাছে স্বভাবতঃই অপ্রিয় ঠেকে, যা সে প্রকাশ করতে না চাইলেও আদায় করার সময় টালবাহানা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ হয়েই পড়ে। আয়াতের সারমর্ম এই যে, যদি আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কাছে সমস্ত ধন-সম্পদ চাইতেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করতে। কৃপণতার কারণে যে অপ্রিয়ভাব তোমাদের অন্তরে থাকত, তা অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়ত। তাই তিনি তোমাদের ধন-সম্পদের মধ্য থেকে সামান্য একটি অংশ তোমাদের উপর ফরয করেছেন। কিন্তু তোমরা তাতেও কৃপণতা শুরু করেছ। শেষ আয়াতে একথাই এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ অর্থাৎ, তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদের কিছু অংশ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার দাওয়াত দেয়া হলে তোমাদের কেউ কেউ এতে কৃপণতা করে। এরপর বলা হয়েছেঃ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এতেও কৃপণতা করে, সে আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করে না ; বরং এর মাধ্যমে সে নিজেরই ক্ষতি করে। কারণ, এতে করে সে পরকালের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয় এবং ফরয তরক করার শাস্তির যোগ্য হয়। অতঃপর এই কথাটিই আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা মানে স্বয়ং তোমাদের অভাব দূর করা। وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা নিজের অভাবমুক্ততাকে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, তোমাদের ধন-সম্পদে আল্লাহ্ তাআলার কি প্রয়োজন থাকতে পারে, তিনি তো স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেরও মুখাপেক্ষী নন। যদি তোমরা সবাই আমার বিধানাবলী পরিত্যাগ করে বস, তবে যতদিন আমি পৃথিবীকে এবং ইসলামকে বাকী রাখতে চাইব, ততদিন সত্যধর্মের হেফাযত এবং বিধানাবলী পালন করার জন্যে অন্য জাতি সৃষ্টি করব। তারা তোমাদের মত বিধানাবলীর প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না; বরং আমার পুরোপুরি আনুগত্য করবে। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ 'অন্য জাতি বলে অনারব জাতি বোঝানো হয়েছে।' হযরত ইকরামা বলেন ঃ এখানে পারসিক ও রোমক জাতি বোঝানো হয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন সাহাবায়ে কেরামের সামনে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তখন তাঁরা আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! (সাঃ), তারা কোন জাতি, যাদেরকে আমাদের স্থলে আনা হবে, অতঃপর তারা আমাদের মত শরীয়তের বিধানাবলীর প্রতি বিমুখ হবে না? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মজলিসে উপস্থিত হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর উরুতে হাত মেরে বললেন ঃ সে এবং তাঁর জাতি। যদি সত্য ধর্ম সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্রেও থাকত, (যেখানে মানুষ পৌঁছতে পারে না,) তবে পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক সেখানেও পৌঁছে সত্যধর্ম হাসিল করতো এবং তা মেনে চলত। — (তিরমিযী, হাকেম, মাযহারী)

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী ইমাম আবু হানীফার প্রশংসায় লিখিত গ্রন্থে বলেন, আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহচরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য সন্তান। কোন দলই জ্ঞানের সেই স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে আবু হানীফা ও তাঁর সহচরগণ পৌঁছেছেন। — (তফসীরে-মাযহারীর প্রান্ত-টীকা)

।। সূরা মুহাম্মদ সমাপ্ত ।।

سُورَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَأَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝١ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَ
مَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝٢ وَ
يَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۝٣ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي
قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝٤ لِّيُدْخِلَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا
عَظِيمًا ۝٥ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَ
الْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۖ وَ
غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝٦
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝٧
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝٨ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٩

সূরা আল-ফাতহ্
মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ২৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে।

(১) নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট (২) যাতে আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (৩) এবং আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য। (৪) তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫) ঈমান এজন্যে বেড়ে যায়, যাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে এবং যাতে তিনি তাদের পাপ মোচন করেন। এটাই আল্লাহ্‌র কাছে মহাসাফল্য। (৬) এবং যাতে তিনি কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারী এবং অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদিনী নারীদেরকে শাস্তি দেন, যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে। তাদের জন্য মন্দ পরিণাম। আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন। এবং তাহাদের জন্যে জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল অত্যন্ত মন্দ। (৭) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৮) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি অবস্থা ব্যক্তকারীরূপে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে, (৯) যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা কর।

সূরা আল-ফাতহ্

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে সূরা ফাত্‌হ্ ষষ্ঠ হিজরীতে অবতীর্ণ হয়, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে মক্কা মোকাররমা তশরীফ নিয়ে যান এবং হেরেমের সন্নিকটে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন। মক্কার কাফেররা তাঁকে মক্কা প্রবেশে বাধা দান করে। অতঃপর তারা এই শর্তে সন্ধি করতে সম্মত হয় যে, এ বছর তিনি মদীনায় ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর এই ওমরার কাযা করবেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই বিশেষতঃ হযরত ওমর (রাঃ) এ ধরনের সন্ধি করতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খোদায়ী ইঙ্গিতে এই সন্ধিকে পরিণামে মুসলমানদের জন্যে সাফল্যের উপায় মনে করে গ্রহণ করে নেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন ওমরার এহরাম খুলে হুদায়বিয়া থেকে ফেরত রওয়ানা হলেন, তখন পথিমধ্যে এই পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) —এর স্বপ্ন সত্য এবং অবশ্যই বাস্তবরূপ লাভ করবে। কিন্তু তার সময় এখনও হয়নি। পরে মক্কা বিজয়ের সময় এই স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করে। এই সন্ধি প্রকৃতপক্ষে মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছিল। তাই একে "প্রকাশ্য বিজয়" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ ও অপর কয়েকজন সাহাবী বলেনঃ তোমরা মক্কা বিজয়কে বিজয় বলে থাক; কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বিজয় মনে করি। হযরত জাবের বলেন ঃ আমি হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বিজয় মনে করি। হযরত বারা ইবনে আযেব বলেন ঃ তোমরা মক্কা বিজয়কেই বিজয় মনে কর এবং নিঃসন্দেহে তা বিজয় ; কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার ঘটনায় 'বয়াতে-রিযওয়ান'কেই আসল বিজয় মনে করি। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি বৃক্ষের নীচে উপস্থিত চৌদ্দশত সাহাবীর কাছ থেকে জেহাদের শপথ নিয়েছিলেন। এ সূরায় বরাতের আলোচনাও করা হয়েছে। (ইবনে কাসীর)

হুদায়বিয়া ঃ হুদায়বিয়া মক্কার বাইরে হেরেমের সীমানার সন্নিকটে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। আজকাল এই স্থানটিকে "শমীসী" বলা হয়। ঘটনাটি এই স্থানেই ঘটে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর স্বপ্ন ঃ আবদ ইবনে হুমায়দ, ইবনে জরীর, বায়হাকী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনার এক অংশ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় স্বপ্ন দেখলেন তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ মক্কায় নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে প্রবেশ করছেন এবং এহ্‌রামের কাজ সমাপ্ত করে কেউ কেউ নিয়মানুযায়ী মাথা মুণ্ডন করেছেন, কেউ কেউ চুল কাটিয়েছেন এবং তিনি বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছেন ও বায়তুল্লাহ্‌র চাবি তাঁর হস্তগত হয়েছে। এটা সূরায় বর্ণিত ঘটনার একটা অংশ। পয়গম্বরগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। তাই স্বপ্নটি যে বাস্তবরূপ লাভ করবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এই ঘটনার কোন সন, তারিখ বা মাস নির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নটি মক্কা বিজয়ের সময় প্রতিফলিত হওয়ার ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন সাহাবায়ে কেরামকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনালেন, তখন তাঁরা সবাই পরম আগ্রহের সাথে মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরামের প্রস্তুতি দেখে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও ইচ্ছা করে ফেললেন। কেননা, স্বপ্নে কোন বিশেষ সাল অথবা মাস নির্দিষ্ট ছিল না। কাজেই এই মুহূর্তেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। — (বয়ানুল কোরআন)

সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ও আনুগত্যের আরও একটি পরীক্ষা ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে, সন্ধির শর্তাবলী এবং ওমরা ব্যতিরেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে দুঃসহ ছিল। অনন্য সাধারণ ঈমানের বলেই তাঁরা এসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে রসূলের (সাঃ) আনুগত্যে অটল ও অনড় থাকতে পেরেছিলেন। হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–'কুরা গামীম' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন আলোচ্য 'সূরা ফাত্হ' অবতীর্ণ হয়। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সূরাটি পাঠ করে শুনালেন। তাদের অন্তর পূর্বেই আহত ছিল। এমতাবস্থায় সূরায় একে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দেয়ায় হযরত ওমর (রাঃ) আবার প্রশ্ন করে বসলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! এটা কি বিজয়? তিনি বললেন ঃ যার হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার কসম, এটা প্রকাশ্য বিজয়। এই ভাষ্যের সামনেও সাহাবায়ে কেরাম মাথা নত করে নিলেন এবং গোটা পরিস্থিতিকে প্রকাশ্য বিজয় মেনে নিলেন।

হুদায়বিয়া সন্ধির ফলাফল ও কল্যাণের বিকাশ ঃ এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া এই প্রকাশ পায় যে, কোরাইশ ও তাদের অনেক অনুসারীদের সামনে তাদের অন্যায় জেদ ও হঠকারিতা ফুটে উঠে এবং তাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকা এবং ওরওয়া ইবনে মসউদ আপন আপন দল নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ সাহাবায়ে কেরামের নজীরবিহীন আত্মনিবেদন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর প্রতি তাদের অনুপম অনুরাগ, সম্ভ্রম ও আনুগত্য দেখে কোরাইশরা ভীত হয়ে যায় এবং সন্ধি করতে সম্মত হয়। অথচ তাদের জন্যে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার এই চাইতে উত্তম সুযোগ আর ছিল না। কেননা, তারা নিজেদের বাড়ী–ঘরে ছিল এবং মুসলমানগণ ছিলেন প্রবাসী। পানির জায়গাগুলো তাদের অধিকারে ছিল। মুসলমানগণ ছিলেন ঘাস পানিবিহীন প্রান্তরে। তাদের পূর্ণ রণশক্তি ছিল। মুসলমানদের কাছে তেমন অস্ত্র–শস্ত্রও ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। তাদের দলের অনেক লোক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সাথে সাক্ষাত ও মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে অনেকের অন্তরে ইসলাম ও ঈমান আসন করে নেয় এবং তারা মুসলমান হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ সন্ধি ও শান্তি স্থাপনের কারণে পথঘাট নিরাপদ হয়ে যায় এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সকল বাধা অপসারিত হয়। আরব গোত্রসমূহের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম আরবের কোণে কোণে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেন। বিভিন্ন রাজা–বাদশাহ্র নামে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন বড় বড় বাদশাহ্ ইসলাম গ্রহণ করেন। এসব কার্যক্রমের ফল এই দাঁড়ায় যে, হুদায়বিয়ার ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর ব্যাপক দাওয়াত ও ওমরার জন্যে বের হওয়ার তাকীদ সত্ত্বেও যেখানে দেড় হাজারের বেশী মুসলমান সঙ্গে ছিল না, সেখানে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এই সময়েই সপ্তম হিজরীতে খায়বর বিজিত হয়, যার ফলে বিপুল পরিমাণে সমরোপকরণ হস্তগত হয় এবং মুসলমানদের সমরশক্তি সুসংহত হয়। সন্ধির পর দুই বছর অতিক্রান্ত না হতেই মুসলমানদের সংখ্যা এত বেড়ে যায়, যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এরই ফলস্বরূপ কোরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তিভঙ্গের দরুন যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গোপনে মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু করেন, তখণ সন্ধির মাত্র বিশ একুশ মাস পরে তাঁর সাথে মক্কাগমনকারী আত্মনিবেদিত মুসলমান সিপাহীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সংবাদ পেয়ে কোরাইশরা উদ্বিগ্ন হয়ে চুক্তি নবায়নের জন্যে তড়িঘড়ি আবু সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) চুক্তি নবায়ন করলেন না এবং অবশেষে দশ হাজারের খোদায়ী লশকর সাথে নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। কোরাইশরা এত ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, মক্কায় তেমন কোন যুদ্ধের প্রয়োজনই হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)– এর দূরদর্শী রাজনীতিও কিছুটা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে সহায়তা করেছিল। তিনি মক্কায় ঘোষণা করে দেন যে, যে ব্যক্তি গৃহের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। এভাবে সব মানুষ নিজ নিজ চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধের তেমন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। এ কারণেই মক্কা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, না যুদ্ধের মাধ্যমে – এ বিষয়ে ফেকাহ্শাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মোটকথা, অতি সহজেই মক্কা বিজিত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর স্বপ্ন বাস্তব ঘটনা হয়ে দেখা দেয়। সাহাবায়ে কেরাম নিশ্চিন্তে বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ, মাথা মুণ্ডানো ও চুল কাটেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীদেরকে নিয়ে বায়তুল্লায় প্রবেশ করেন। বায়তুল্লাহ্র চাবি তাঁর হস্তগত হয়। এ সময় তিনি বিশেষভাবে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে এবং সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ এই ঘটনাই আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম। এরপর বিদায় হজ্বের সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত ওমরকে (রাঃ) বলেন ঃ এই ঘটনাই আমি তোমাকে বলেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ নিঃসন্দেহে কোন বিজয় হুদায়বিয়ার সন্ধির চাইতে উত্তম ও মহান নয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তো পূর্ব থেকেই একথা বলতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহ্ ও রসূলের (সাঃ) মধ্যকার এই মীমাংসিত সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তারা স্বপ্নের দ্রুত বাস্তবায়ন কামনা করত। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের দ্রুততা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে দ্রুততা অবলম্বন করেন না, বরং তাঁর প্রত্যেক কাজ যথার্থ সময়েই সম্পন্ন হয়। তাই 'সূরা ফাত্হে' আল্লাহ্ তাআলা হুদায়বিয়ার ঘটনাকে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির এসব গুরুত্বপূর্ণ অংশ জানার পর পরবর্তী আয়াতসমূহ বোঝা সহজ হবে। এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ এখানে প্রথমোক্ত لام কে কারণ বর্ণনার জন্যে ধরা হলে এর সারমর্ম এই হবে যে, আয়াতে বর্ণিত তিনটি অবস্থা অর্জিত হওয়ার জন্যে আপনাকে প্রকাশ্য বিজয়দান করা হয়েছে। তিনটি অবস্থা এই ঃ (এক) আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ গোনাহ্ মাফ করা। সূরা মুহাম্মদে প্রথমে বর্ণিত হয়েছে যে, পয়গম্বরগণ গোনাহ্ থেকে পবিত্র। তাঁদের বেলায় কোরআনে যেখানে সেখানে ذنب অথবা عصيان (গোনাহ্) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তা তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তমের বিপরীত কাজ করার জন্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। নবুওয়তের উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে অনুত্তম কাজ করাও একটি ত্রুটি যাকে কোরআনে শাসানোর ভঙ্গিতে ذنب তথা গোনাহ্ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। ماتقدم বলে নবুওয়তের পূর্ববর্তী ত্রুটি এবং ماتاخر বলে নবুওয়ত লাভের পরবর্তী ত্রুটি বোঝানো হয়েছে, – (মাযহারী)। প্রকাশ্য বিজয় এই ক্ষমার কারণ এজন্যে যে, এক প্রকাশ্য বিজয়ের ফলে দলে দলে লোক ইসলামে দাখিল হবে। ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপক আকার লাভ করা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)– এর জীবনের মহান লক্ষ্যকে সমুন্নত করবে এবং তাঁর সওয়াব ও প্রতিদানকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, সওয়াব ও প্রতিদান বেড়ে যাওয়া ত্রুটি মার্জনার কারণ হয়ে থাকে। — (বয়ানুল–কোরআন)

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا এটা প্রকাশ্য বিজয়ের দ্বিতীয় কল্যাণ। এখানে প্রশ্ন হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তো পূর্ব থেকেই 'সিরাতে–মুস্তাকীম' তথা সরল পথে ছিলেন এবং শুধু তিনিই নন বরং বিশ্ববাসীকে এই সরল পথের দাওয়াত দেয়াই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। অতএব, হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে প্রকাশ্য বিজয়ের মাধ্যমে সরল পথ পরিচালনা করার মানে কি? এই প্রশ্নের জওয়াব সূরা ফাতেহার তফসীরে হেদায়াত শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, হেদায়েত একটি ব্যাপক শব্দ। এর অসংখ্য স্তর আছে। কারণ, হেদায়েতের অর্থ অভীষ্ট মনযিলের পথ দেখানো অথবা সেখানে পৌঁছানো। প্রত্যেক মানুষের আসল অভীষ্ট মনযিল হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টির অসংখ্য ও অগণিত স্তর আছে। এক স্তর অর্জিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অর্জনের আবশ্যকতা বাকী থাকে। কোন বৃহত্তম ওলী এমনকি নবী–রসূলও এই আবশ্যকতা থেকে মুক্ত হতে পারেন না। এ কারণেই নামাযের প্রত্যেক রাকআতে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ বলে দোয়া করার শিক্ষা যেমন উম্মতকে দেয়া হয়েছে, তেমনি স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কেও দেয়া হয়েছে। এর সারমর্ম হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়েত তথা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টির স্তরসমূহে উন্নতি লাভ করা। এই প্রকাশ্য বিজয়ের কারণে আল্লাহ্ তাআলা এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টিরই একটি অত্যুচ্চ স্তর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)– কে দান করেছেন, যাকে يَهْدِيَكَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا এটা প্রকাশ্য বিজয়ের তৃতীয় নেয়ামত। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার যে সাহায্য ও সমর্থন আপনি চিরকাল লাভ করে এসেছেন, এই প্রকাশ্য বিজয়ের ফলস্বরূপ তা একটি মহান স্তর আপনাকে দান করা হয়েছে।

সূরার প্রথম তিন আয়াতে এই প্রকাশ্য বিজয়ের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে প্রদত্ত বিশেষ নেয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। হুদায়বিয়ার সফর সঙ্গী কয়েকজন সাহাবী আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! এসব নেয়ামত তো আপনার জন্যে। এগুলো আপনার জন্যে মোবারক হক; কিন্তু আমাদের জন্যে কি? এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে সরাসরি হুদায়বিয়ায় উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নেয়ামত যেহেতু ঈমান ও রসূলের (সাঃ) আনুগত্যের কারণ হয়েছে, তাই এগুলোতে সব মুমিনও শামিল। কারণ, যে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের পূর্ণতা লাভ করবে, সে–ই এসব নেয়ামতের যোগ্য পাত্র হবে।

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতকে বিশেষ করে বয়াতে রিযওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদেরকে প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এসব নেয়ামত দানকারী ছিলেন আল্লাহ্ এবং দানের মাধ্যম ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)। তাই এর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ ও রসূলের হক এবং তাঁদের প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনের কথা বলা হচ্ছে। প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে সম্বোধন করে তাঁর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে — شاهد ، مبشر و نذير

شاهد শব্দের অর্থ সাক্ষী। এর উদ্দেশ্য তাই যা সূরা নেসার فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا আয়াতের তফসীরে দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি আল্লাহ্র পয়গাম তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর কেউ আনুগত্য করেছে এবং কেউ নাফরমানী করেছে। এমনিভাবে নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন। সূরা নেসার আয়াতের তফসীরে কুরতুবী লিখেন ঃ পয়গম্বরগণের এই সাক্ষ্য নিজ নিজ যমানার লোকদের সম্পর্কে হবে যে, তাঁদের দাওয়াত কে কবূল করেছে এবং কে বিরোধিতা করেছে। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)– এর সাক্ষ্য তাঁর আমলের লোকদের সম্পর্কে হবে। কেউ কেউ বলেন, এই সাক্ষ্য সমস্ত উম্মতের পুণ্য ও পাপকাজ সম্পর্কে হবে। কেননা, কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, উম্মতের ক্রিয়াকর্ম সকাল–সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সামনে পেশ করা হয়। কাজেই তিনি সমস্ত উম্মতের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে অবহিত হবেন। — (কুরতুবী)

بشير শব্দের অর্থ সুসংবাদদাতা এবং نذير শব্দের অর্থ সতর্ককারী। উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উম্মতের আনুগত্যশীল মুমিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন এবং কাফের পাপাচারীদেরকে আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করবেন। অতঃপর রসূল প্রেরণের লক্ষ্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। ঈমানের সাথে আরও তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা ঈমানদারদের মধ্যে থাকা বিধেয় — تُعَزِّرُوهُ – تُوَقِّرُوهُ এবং تُسَبِّحُوهُ

تُعَزِّرُوهُ শব্দটি تعزير ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাহায্য করা। দণ্ডকেও এ কারণে تعزير বলা হয় যে, অপরাধীকে দণ্ড দিলে প্রকৃতপক্ষে তাকে সাহায্য করা হয়। — (মুফরাদাতুল–কোরআন)

تُوَقِّرُوهُ শব্দটি توقير ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সম্মান করা। تُسَبِّحُوهُ শব্দটি تسبيح ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পবিত্রতা বর্ণনা করা। সর্বশেষ শব্দটি নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্র জন্যেই হতে পারে। তাই এর সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বোঝানোর সম্ভাবনা নেই। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারাও আল্লাহ্কেই বুঝিয়েছেন। অর্থ এই যে, বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহ্কে অর্থাৎ, তাঁর দ্বীনকে ও রসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর। কেউ কেউ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারা রসূলকে বুঝিয়ে এরূপ অর্থ করেন যে, রসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর। কিন্তু কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, এতে সর্বনামসমূহের বিভিন্নতা জরুরী হয়ে পড়ে, যা অলংকার শাস্ত্রের নীতি বিরুদ্ধ। এরপর হুদায়বিয়ার ঘটনার দশম অংশে বর্ণিত বয়আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর হাতে বয়আত করেছে, তারা যেন স্বয়ং আল্লাহ্র হাতে বয়আত করেছে। কারণ, এই বয়আতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্র আদেশ পালন করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। কাজেই তারা যখন রসূলের হাতে হাত রেখে বয়আত করল, তখন যেন আল্লাহ্র হাতেই বয়আত করল। আল্লাহ্র হাতের স্বরূপ কারও জানা নেই এবং জানার চেষ্টা করাও দুরস্ত নয়।

বয়আতের আসল অর্থ কোন বিশেষ কাজের জন্যে শপথ গ্রহণ করা। একজন অপরজনের হাতের উপর হাত রেখে শপথবাণী উচ্চারণ করা বয়আতের প্রাচীন ও মছনুন তরিকা। তবে হাতের উপর হাত রাখা শর্ত বা জরুরী নয়। যে কাজের অঙ্গীকার করা হয়, তা পূর্ণ করা আইনতঃ ওয়াজেব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তাই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বয়আতের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। এতে আল্লাহ্ ও রসূলের কোন ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, আল্লাহ্ তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।

الفتح ٤٨ ৫১৩ حم ٢٦

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ
اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ
الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ
بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ
اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ
إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ
وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا
أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ
يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٤﴾
سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا
ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُل لَّن
تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ
بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾

(১০) যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহ্‌র কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে; অতি অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং যে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; আল্লাহ্ সত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন। (১১) মরুবাসীদের মধ্যে যারা গৃহে বসে রয়েছে, তারা আপনাকে বলবে ঃ আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব, আমাদের পাপ মার্জনা করান। তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই। বলুন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে বিরত রাখতে পারে? বরং তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয় পরিপূর্ণ জ্ঞাত। (১২) বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রসূল ও মুমিনগণ তাদের বাড়ী-ঘরে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের জন্যে খুবই সুখকর ছিল। তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলে। তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়। (১৩) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে না, আমি সেসব কাফেরের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি। (১৪) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। (১৫) তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্যে যাবে, তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে ঃ আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহ্‌র কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলুন ঃ তোমরা কখনও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ্ পূর্ব থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন। তারা বলবে ঃ বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। পরন্তু তারা সামান্যই বোঝে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লেখিত বিষয়বস্তু সেসব মরুবাসীর সাথে সম্পৃক্ত, যাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হোদায়বিয়ার সফরে সঙ্গে চলার আদেশ দিয়েছিলেন ; কিন্তু তারা নানা তাল-বাহানার আশ্রয় নেয়। হোদায়বিয়ার ঘটনার প্রথম অংশ একথা বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে তওবা করে এবং খাঁটি ঈমানদার হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতসমূহে হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এসময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন খয়বর যুদ্ধে গমন করার ইচ্ছা করলেন, তখন শুধু তাদেরকে সঙ্গে নিলেন, যারা হুদায়বিয়ার সফর ও বয়আতে-রিযওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূল (সাঃ)-কে খয়বর বিজয় ও সেখানে প্রভূত গনীমতের মাল লাভের ওয়াদা দিয়েছিলেন। তখন যেসব মরুবাসী ইতিপূর্বে হুদায়বিয়ার সফরে আহূত হওয়া সত্ত্বেও ওযর পেশ করে অংশগ্রহণে বিরত ছিল, তারাও খয়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করল; হয় এ কারণে যে, তারা লক্ষণাদি দৃষ্টে জানতে পেরেছিল যে, খয়বর বিজিত হবে এবং অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে। না হয় এ কারণে যে, মুসলমানদের সাথে আল্লাহ্‌র ব্যবহার ও হুদায়বিয়ার সন্ধির বিভিন্ন কল্যাণ দেখে জেহাদের অংশ গ্রহণ না করার কারণে তারা অনুতপ্ত হয়েছিল এবং এখন জেহাদে শরীক হওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল। মোটকথা, তাদের জওয়াবে কোরআন বলেছে يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ তারা আল্লাহ্‌র কালাম অর্থাৎ, তাঁর আদেশ পরিবর্তন করতে চায়। এই আদেশের অর্থ ঃ খয়বর যুদ্ধ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিশেষ করে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্য। এরপর كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ বাক্যেও হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের এই বিশেষত্বের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাকের কোথাও এই বিশেষত্বের উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় এই বিশেষত্বের ওয়াদাকে 'আল্লাহ্‌র কালাম' ও ''আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন'' বলা কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে?

ওহী শুধু কোরআনে সীমাবদ্ধ নয়, কোরআন ছাড়াও ওহীর মাধ্যমে আদেশ এসেছে এবং রসূলের হাদীসও আল্লাহ্‌র কালামের হুকুম রাখে ঃ আলেমগণ বলেন ঃ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীর বিশেষত্ব সম্পর্কিত উল্লেখিত ওয়াদা কোরআন পাকের কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি; বরং এই বিশেষত্বের ওয়াদা আল্লাহ্ তাআলা ''ওহী গায়র-মতলু'' অর্থাৎ, অপঠিত ওহীর মাধ্যমে হুদায়বিয়ার সফরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দিয়েছিলেন। এ স্থলে একেই 'আল্লাহ্‌র কালাম' ও 'আল্লাহ্ ইতিপূর্বে বলে দিয়েছেন' বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, কোরআনের বিধানাবলী ছাড়া যেসব বিধান সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও এই আয়াত অনুযায়ী 'আল্লাহ্‌র কালাম'' ও আল্লাহ্‌র উক্তির মধ্যে দাখিল। যেসব ধর্মভ্রষ্ট লোক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীসকে দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রমাণ বলেই স্বীকার করে না, এসব আয়াত তাদের ধর্মভ্রষ্টতা ফাঁস করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। এখানে আরও একটি আলোচনাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, হুদায়বিয়া সফরের শুরুতে অবতীর্ণ এই সূরার অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا তফসীর-বিদগণের ঐকমত্যে এখানে ''নিকটবর্তী বিজয়'' বলে খয়বর বিজয়

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦﴾ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾ وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢٠﴾ وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢١﴾ وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾

(১৬) গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন ঃ আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহূত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। আর যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। (১৭) অন্ধের জন্যে, খঞ্জের জন্যে ও রুগ্নের জন্যে কোন অপরাধ নাই এবং যে কেউ আল্লাহ্ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তাকে তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, তাকে যন্ত্রণদায়ক শাস্তি দিবেন। (১৮) আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ্ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (১৯) এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২০) আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্ধ করে দিয়েছেন — যাতে এটা মুমিনদের জন্যে এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (২১) আরও একটি বিজয় রয়েছে যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ্ তা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। (২২) যদি কাফেররা তোমাদের মোকাবিলা করত, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। (২৩) এটাই আল্লাহ্র রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি আল্লাহ্র রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।

বোঝানো হয়েছে। এভাবে কোরআনে খয়বর বিজয় ও তার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের পাওয়ার কথা এসে গেছে। এটাই ''আল্লাহ্র কালাম'' ও ''আল্লাহ্র উক্তির'' অর্থ হতে পারে। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, এই আয়াতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা তো আছে ; কিন্তু একথা কোথাও বলা হয়নি যে, এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হোদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীরাই বিশেষভাবে পাবে, অন্যেরা পাবে না। এই বৈশিষ্ট্যের কথা নিঃসন্দেহে হাদীস দ্বারাই জানা গেছে। অতএব, ''আল্লাহ্র কালাম'' ও আল্লাহ্র উক্তি বলে এখানে হাদীসই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, ''আল্লাহ্র কালাম'' বলে সূরা তওবার এই আয়াতকে বোঝানো হয়েছেঃ

فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ

তাদের এই উক্তি শুদ্ধ নয়। কারণ, এই আয়াতগুলো তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যার সময়কাল খয়বর যুদ্ধের পর নবম হিজরী।—(কুরতুবী)

قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا – এতে হুদায়বিয়া থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের–কে তাকীদ সহকারে বলা হয়েছে ঃ তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। এই উক্তি বিশেষভাবে খয়বর যুদ্ধের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। ভবিষ্যতে অন্য কোন জেহাদেও শরীক হতে পারবে না— আয়াত থেকে এটা মনে করা জরুরী নয়। এ কারণেই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্য থেকে মুযায়না ও জোহায়না গোত্রদ্বয় পরবর্তীকালে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। — (রূহুল–মা'আনী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হুদায়বিয়ার সফর থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের কেউ কেউ পরে তওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল ঃ হুদায়বিয়ার সফর থেকে যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল, তাদের সবাইকে খয়বরের জেহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল অথচ তাদের মধ্যে সবাই মুনাফিক ছিল না। কেউ কেউ মুসলমানও ছিল। কেউ কেউ যদিও তখন মুনাফিক ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা সাচ্চা ঈমানদার হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। তাই এ ধরণের লোকদের সন্তুষ্টির জন্যে পরবর্তী আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র ওয়াদা অনুযায়ী খয়বর যুদ্ধ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যারা খাঁটি মুসলমান এবং মনে–প্রাণে জেহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যেও ভবিষ্যতে আরও সুযোগ–সুবিধা আসবে। এসব সুযোগের কথা কোরআন পাক একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে বর্ণনা করেছে, যা রসূল করীম (সাঃ)–এর ইন্তেকালের পর প্রকাশ পেয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ অর্থাৎ, এক সময় আসবে, যখন তোমাদের–কে জেহাদের দাওয়াত দেয়া হবে। এই জেহাদ একটি শক্তিশালী যোদ্ধাজাতির সাথে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই জেহাদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়নি। কেননা, প্রথমতঃ এরপর তিনি কোন যুদ্ধে মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন বলে প্রমাণ নেই; দ্বিতীয়তঃ এরপর এমন কোন বীর যোদ্ধা জাতির সাথে মোকাবেলাও হয়নি, যাদের

বীরত্বের উল্লেখ কোরআন পাক করেছে। তাবুক যুদ্ধে যদিও যোদ্ধাজাতির সাথে মোকাবেলা ছিল ; কিন্তু এই যুদ্ধে মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দেয়ার প্রমাণ নেই এবং এতে কোন যুদ্ধও সংঘটিত হয়নি। আল্লাহ্‌ তাআলা প্রতিপক্ষের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। ফলে তারা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণই হয়নি। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম বিনা যুদ্ধে তাবুক থেকে ফিরে আসেন। হুনায়ন যুদ্ধেও মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দেয়ার প্রমাণ নেই এবং তখন কোন সশস্ত্র ও বীর যোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে মোকাবেলাও ছিল না। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আয়াতে পারস্য ও রোম অর্থাৎ, কেসরা ও কায়সরের জাতিসমূহ বোঝানো হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)– এর আমলে জেহাদ হয়েছে। — (কুরতুবী)

হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলেন ঃ আমরা কোরআনের এই আয়াত পাঠ করতাম ঃ কিন্তু আমাদের জানা ছিল না যে, এখানে কোন্‌ জাতিকে বোঝানো হয়েছে। অবশেষে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)–এর ইন্তেকালের পর হযরত আবুবকর সিদ্দীকের (রাঃ) খেলাফতকালে তিনি আমাদেরকে বনী–হুনায়ফা ও মোসায়লামা কাযযাবের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করার দাওয়াত দেন। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, উক্ত আয়াতে এই জাতিকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এই দু'টি উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ ও বৈপরিত্য নেই। পরবর্তীকালের শক্তিশালী সকল প্রতিপক্ষই এর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ হযরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযমের (রাঃ) খেলাফত যে সত্যের অনুকূলে ছিল, এ আয়াত তার প্রমাণ। আলোচ্য আয়াতে স্বয়ং কোরআন তাঁদের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করেছে।

تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ হযরত উবাই এর কেরাআতে حتّٰى يسلموا বলা হয়েছে। তদনুযায়ী কুরতুবী او অব্যয়কে حتى এর অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ, সেই জাতির সাথে যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা আনুগত্যশীল হয়ে যায়, ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, উপরের আয়াতে যখন জেহাদে অংশগ্রহণে পশ্চাৎপদদের জন্যে শাস্তির কথা উচ্চারিত হয়েছে, তখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কতক বিকলাঙ্গ লোক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, তাঁরা জেহাদে অংশগ্রহণ করার যোগ্য নন। ফলে তারাও নাকি এই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্নকে জেহাদের আদেশের আওতাবহির্ভূত করে দেয়া হয়েছে। —(কুরতুবী)

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ এখানে হুদায়বিয়ার শপথ বোঝানো হয়েছে। ইতিপূর্বেও اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ আয়াতে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতও তারই তাকিদ। এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই একে ''বাইয়াতে–রিযওয়ান'' তথা সন্তুষ্টির শপথও বলা হয়। এর উদ্দেশ্য শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসা করা এবং তাদেরকে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি জোর তাকীদ করা। বোখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়ার দিনে আমাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশত। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন — انتم خير اهل الارض অর্থাৎ, তোমরা ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সহীহ্‌ মুসলিমে উম্মে বাশার থেকে বর্ণিত আছে, من بايع تحت الشجرة لايدخل النار অর্থাৎ, যারা এই বৃক্ষের নীচে শপথ করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। — (মাযহারী) তাই এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অনুরূপ হয়ে গেছে। তাঁদের সম্পর্কে যেমন কোরআন ও হাদীসে খোদায়ী সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ বর্ণিত রয়েছে, তেমনি হুদায়বিয়ার শপথে অংশগ্রহণকারীদের জন্যেও এরূপ সুসংবাদ উল্লেখিত আছে।

এসব সুসংবাদ সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁদের সবার খাতেমা অর্থাৎ, জীবনাবসান ঈমান ও পছন্দনীয় সৎকর্মের উপরে হবে। কেননা, খোদায়ী সন্তুষ্টির এই ঘোষণা এ বিষয়েরই নিশ্চয়তা দেয়।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি দোষারোপ এবং তাঁদের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করা এই আয়াতের পরিপন্থী ঃ তফসীরে–মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা যেসব সম্মানিত ব্যক্তি সম্পর্কে ক্ষমা ও মাগফিরাতের ঘোষণা দিয়েছেন, যদি তাঁদের তরফ থেকে কোন ভুল–ত্রুটি অথবা গোনাহ্‌ হয়েও যায়, তবে এই আয়াত তাঁদের ক্ষমা ঘোষণা করছে। এমতাবস্থায় তাঁদের যেসব কর্মকাণ্ড প্রশংসনীয় ও উত্তম নয়, সেগুলোকে আলোচনা ও বিতর্কের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা দুর্ভাগ্যজনক এবং এই আয়াতের পরিপন্থী। রাফেযী সম্প্রদায় হযরত আবুবকর, ওমর ও অন্যান্য সাহাবীর প্রতি কুফর–নিফাকের দোষ আরোপ করে। আলোচ্য আয়াত ওদের সেসব ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করে।

রিযওয়ান বৃক্ষ ঃ আয়াতে যে বৃক্ষের উল্লেখ আছে, সেটা ছিল একটা বাবলা বৃক্ষ। কথিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)–এর ওফাতের পর কিছু লোক সেখানে গমন করত এবং এই বৃক্ষের নীচে নামায আদায় করত। হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) দেখলেন যে, ভবিষ্যতে অজ্ঞ লোকেরা পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় এই বৃক্ষের পূজা শুরু করে দিতে পারে। এই আশংকায় তিনি বৃক্ষটি কেটে ফেলেন। কিন্তু বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত তারেক ইবনে আবদুর রহমান বলেন ঃ আমি একবার হজ্বে যাওয়ার পথে এক জায়গায় কিছু সংখ্যক লোককে একত্রিত হয়ে নামায পড়তে দেখলাম। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এটা কোন্‌ মসজিদ? তারা বলল ঃ এটা সেই বৃক্ষ, যার নীচে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) রিযওয়ানের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। আমি অতঃপর সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিবের কাছে উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা বিবৃত করলাম। তিনি বললেন ঃ আমার পিতা বয়াতে–রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন ঃ আমরা যখন পরবর্তী বছর মক্কায় উপস্থিত হই, তখন অনেক খোঁজাখুজির পরও বৃক্ষটির সন্ধান পাইনি। অতঃপর সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব বললেন ঃ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) —এর যেসব সাহাবী এই বয়াতে শরীক ছিলেন, তাঁরা তো এই বৃক্ষের সন্ধান পাননি, আর তুমি জেনে ফেলেছ। আশ্চর্যের বিষয় বটে। তুমি কি তাঁদের চাইতে অধিক জ্ঞাত? – (রূহুল-মা'আনী)

এ থেকে জানা গেল যে, পরবর্তীকালে লোকেরা নিছক অনুমানের মাধ্যমে কোন একটি বৃক্ষ নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল এবং তার নীচে জড়ো হয়ে নামায পড়া শুরু করেছিল। হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) একথাও জানতেন যে, এটা সেই বৃক্ষ নয়। তাই অবান্তর নয় যে, তিনি শিরকের আশংকাবোধ করে সেই বৃক্ষটিও কর্তন করে ফেলেন।

খয়বর বিজয় ঃ খয়বর প্রকৃতপক্ষে বহু জনপদ দুর্গ ও বাগ-বাগিচা সমন্বিত একটি বিশেষ এলাকার নাম। — (মাযহারী)

وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا এই আসন্ন বিজয়ের অর্থ সর্বসম্মতভাবে খয়বর বিজয়। হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এই বিজয় বাস্তবরূপ লাভ করে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় দশ দিন এবং অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী বিশ দিন অবস্থান করেন। এরপর খয়বরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি যিলহজ্জ মাসে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে খয়বর গমন করেন। সফর মাসে খয়বর বিজিত হয়। ওয়াকেদীর মাগাযী অধ্যায়ে তাই বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজারের মতে এ অভিমতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। — (মাযহারী)

মোটকথা, প্রমাণিত হল যে, খয়বর বিজয়ের ঘটনা হুদায়বিয়ার সফরের বেশ কিছুদিন পরে সংঘটিত হয়। সূরা ফাত্হ যে হুদায়বিয়ার সফরকালে অবতীর্ণ হয়েছে এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। হাঁ, এ বিষয়ের মতভেদ রয়েছে যে, সম্পূর্ণ সূরা তখনই নাযিল হয়েছিল, না কিছুসংখ্যক আয়াত পরে নাযিল হয়েছে। প্রথমোক্ত অবস্থা সাব্যস্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহে খয়বরের আলোচনা ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে হয়েছে এবং ঘটনাটি যে আকাট্য ও নিশ্চিত – একথা প্রকাশ করার উদ্দেশেই অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে শেষোক্ত অবস্থা সাব্যস্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহ পরে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا এতে খয়বরের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বোঝানো হয়েছে, যদ্দ্বারা মুসলমানদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হয়।

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ —এখানে কেয়ামত পর্যন্ত যেসব ইসলামী বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে, সেগুলো বোঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত সম্পদ আল্লাহ্র নির্দেশে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যে দেয়া হয়েছিল এবং এই আয়াতে বর্ণিত সম্পদ সবার জন্যে ব্যাপক। এ থেকেই জানা যায় যে, বিশেষত্বের আদেশ এসব আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি ; বরং তা পৃথক ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলে দেয়া হয়েছিল। তিনি তা কর্মে পরিণত করেন এবং সাহাবায়ে কেরামের কাছে ব্যক্ত করেন।

وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ আয়াতে খয়বরবাসী কাফের সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে এই জেহাদে অধিক শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দেননি। ইমাম বগভী বলেন ঃ গাতফান গোত্র খয়বরের ইহুদীদের মিত্র ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক খয়বর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তারা ইহুদীদের সাহায্যার্থে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা চিন্তা করতে লাগল, যদি আমরা খয়বরে চলে যাই, তবে মুসলমানদের কোন লশকর আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের বাড়ী-ঘরে চড়াও হতে পারে। এই ভেবে তাদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। — (মাযহারী)

وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا সরল পথের আমল এবং হেদায়েত তো তাঁদের পূর্বে থেকেই অর্জিত ছিল। কিন্তু পূর্বেও বলা হয়েছে যে, হেদায়েতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এখানে সেই স্তর বোঝানো হয়েছে, যা অর্জিত ছিল না। অর্থাৎ, আল্লাহ্র উপর একান্ত নির্ভরশীলতা এবং ঈমানী শক্তির বৃদ্ধি।

وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে আরও অনেক বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা এখনও তাদের ক্ষমতাসীন নয়। এসব বিজয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কা বিজয় রয়েছে দেখে কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতে মক্কা বিজয়কেই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাষা ব্যাপক হেতু কেয়ামত পর্যন্ত আগত সব বিজয়ই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾ لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

(২৪) তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (২৫) তারাই তো কুফরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে এবং অবস্থানরত কোরবানীর জন্তুদেরকে যথাস্থানে পৌঁছতে। যদি মক্কায় কিছুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না। অর্থাৎ, তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তবে সব কিছু চুকিয়ে দেয়া হত ; কিন্তু এ কারণে চুকানো হয়নি, যাতে আল্লাহ্ তাআলা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করে নেন। যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম। (২৬) কেননা, কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের জেদ পোষণ করত। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর রসূল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের জন্যে সংযমের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিলেন। বস্তুতঃ তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (২৭) আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয় (২৮) তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

بِبَطْنِ مَكَّةَ এর আসল অর্থ মক্কা শহরই; কিন্তু এখানে হুদায়বিয়ার স্থান বোঝানো হয়েছে। মক্কার সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ার কারণে হুদায়বিয়াকেই "বাতনে মক্কা" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ হুদায়বিয়ার কিছু অংশকে হরমের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই আয়াত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ এ থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি এহরাম বাঁধার পর মক্কা প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, কোরবানী করে এহ্রাম থেকে হালাল হওয়া তার পক্ষে অপরিহার্য। এতে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, এই কোরবানী বাধাপ্রাপ্তির স্থানেই হতে পারে, না অন্যান্য কোরবানীর ন্যায় এর জন্যেও হরমের অভ্যন্তরে হওয়া শর্ত? হানাফীদের মতে এর জন্যে হরমের সীমানা শর্ত। আলোচ্য আয়াত তাদের প্রমাণ। এখানে এই কোরবানীর জন্যে কোরআন একটি বিশেষ স্থান সাব্যস্ত করেছে, যেখানে পৌঁছতে কাফেররা মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছিল। এখানে কথা থাকে যে, খোদ হানাফী আলেমগণ একথাও বলেন যে, হুদায়বিয়ার কতক অংশ হরমের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় হরমে প্রবেশে বাধাদান কিরূপে প্রমাণিত হয়? জওয়াব এই যে, যদিও এই কোরবানী হরমের যে কোন অংশে করে দেয়া যথেষ্ট; কিন্তু মীনার অভ্যন্তরে "মানহার" (কোরবানগাহ্) নামে যে বিশেষ স্থান রয়েছে, সেখানে কোরবানী করা উত্তম। কাফেররা তখন মুসলমানদেরকে এই উত্তম স্থানে জন্তু নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল।

فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ – مَّعَرَّةٌ শব্দের অর্থ কেউ কেউ গোনাহ্ বর্ণনা করেছেন, কেউ সাধারণ ক্ষতি এবং কেউ দোষ বর্ণনা করেছেন। এ স্থলে শেষোক্ত অর্থই বাহ্যতঃ সঙ্গত। কারণ, যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত এবং অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের হাতে মক্কায় আটক মুসলমানগণ নিহত হত, তবে এটা একটা দোষ ও লজ্জাকর ব্যাপার হত। কাফেররা মুসলমানদেরকে লজ্জা দিত যে, তোমরা তোমাদের দ্বীনী ভাইদেরকে হত্যা করেছ। এছাড়া এটা ক্ষতিকর ব্যাপারও ছিল। নিহত মুসলমানদের ক্ষতি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। হত্যাকারী মুসলমানগণও অনুতাপ ও আক্ষেপের অনলে দগ্ধ হত।

সাহাবায়ে কেরামকে দোষত্রুটি থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা : ইমাম কুরতুবী বলেন : অজ্ঞাতসারে এক মুসলমানের হাতে অন্য মুসলমান মারা যাওয়া গোনাহ্ তো নয় ; কিন্তু দোষ, লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপের কারণ অবশ্যই; ভুলবশতঃ হত্যার কারণে রক্তপণ ইত্যাদি দেয়ারও বিধান আছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূলের (সাঃ) সাহাবীদেরকে এ থেকেও নিরাপদ রেখেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম যদিও পয়গম্বরগণের ন্যায় নিষ্পাপ নন, কিন্তু সাধারণভাবে তাঁদেরকে ভুলভ্রান্তি ও দোষ থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হয়ে যায়। এটাই তাঁদের সাথে আল্লাহ্র ব্যবহার।

لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের অন্তরে সংযম সৃষ্টি করে যুদ্ধ না হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ, আল্লাহ্ জানতেন যে, ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। তাদের প্রতি এবং মক্কায় আটক মুসলমানদের প্রতি রহমত করার জন্যে এসব আয়োজন করা হয়েছে।

لَوْ تَزَيَّلُوْا - تزيل শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মক্কায় আটক মুসলমানগণ যদি কাফেরদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হত এবং মুসলমানগণ তাদেরকে চিনে বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিতে পারত, তবে এই মুহূর্তেই কাফেরদেরকে মুসলমানদের হাতে শাস্তি প্রদান করা হত। কিন্তু মুশকিল এই যে, আটক দুর্বল মুসলমান পুরুষ ও নারী কাফেরদের মধ্যেই মিশ্রিত ছিল। যুদ্ধ হলে তাদেরকে বাঁচানোর উপায় ছিল না। তাই আল্লাহ্ তাআলা যুদ্ধই মওকুফ করে দিলেন।

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا "কলেমায়ে-তাকওয়া" বলে তাকওয়া অবলম্বনকারী কলেমা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তওহীদ ও রেসালতের কলেমা। এই কলেমাই তাকওয়ার ভিত্তি। তাই একে কলেমায়ে-তাকওয়া বলা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামকে এই কলেমার অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত আখ্যা দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা সেসব লোকের লাঞ্ছনা প্রকাশ করে দিয়েছেন, যারা তাঁদের প্রতি কুফর ও নিফাকের দোষ আরোপ করে। আল্লাহ্ তো তাঁদেরকে কলেমায়ে ইসলামের অধিক যোগ্য বলেন, আর এই হতভাগারা তাঁদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি চূড়ান্ত হয়ে গেলে একথা স্থির হয়ে যায় যে, এখন মক্কায় প্রবেশ এবং ওমরা পালন ব্যতিরেকেই মদীনায় ফিরে যেতে হবে। বলাবাহুল্য, সাহাবায়ে কেরাম ওমরা পালনের সংকল্প রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে করেছিলেন, যা এক প্রকার ওহী ছিল। এখন বাহ্যতঃ এর বিপরীত হতে দেখে কারও কারও অন্তরে এই সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল যে, (নাউযুবিল্লাহ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) - এর স্বপ্ন সত্য হল না। অপরদিকে কাফের-মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে বিদ্রূপ করল যে, তোমাদের রসূলের স্বপ্ন সত্য নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। — (বায়হাকী)

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ - صَدَقَ শব্দটি كذب এর বিপরীতে কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়। যে কথা বাস্তবের অনুরূপ, তাকে صدق এবং যে কথা অনুরূপ নয়, তাকে كذب বলা হয়। মাঝে মাঝে কাজকর্মের জন্যেও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। তখন এর অর্থ হয় কোন কাজকে বাস্তবায়িত করা; যেমন কোরআনে আছে— رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ অর্থাৎ, তারা তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে। এ সময় صدق শব্দের দু'টি مفعول থাকে; যেমন আলোচ্য আয়াতে প্রথম مفعول হচ্ছে رسوله এবং দ্বিতীয় مفعول হচ্ছে رؤيا আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে স্বপ্নের ব্যাপারে সাচ্চা দেখিয়েছেন। — (বায়যাভী) যদিও এই সাচ্চা দেখানোর ঘটনা ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার ছিল ; কিন্তু একে অতীত পদ বাচ্য ব্যক্ত করে এর নিশ্চিত ও অকাট্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেমতে পরবর্তী বাক্যে ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে- لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ অর্থাৎ, মসজিদে-হারামে প্রবেশ সংক্রান্ত আপনার স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু এ বছর নয়— এ বছরের পরে। স্বপ্নে মসজিদে-হারামে প্রবেশের সময় নির্দিষ্ট ছিল না। পরম ঔৎসুক্যবশতঃ সাহাবায়ে কেরাম এ বছরই সফরের সংকল্প করে ফেললেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। এতে আল্লাহ্ তাআলার বিরাট রহস্য নিহিত ছিল , যা হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। সেমতে ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ) প্রথমেই হযরত ওমর (রাঃ)-এর জওয়াবে বলেছিলেন ঃ আপনার সন্দেহ করা উচিত নয়, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্বপ্ন কোন সময় ও বছর নির্দিষ্ট ছিল না। এখন না হলে পরে হবে। — (কুরতুবী)

ভবিষ্যৎ কাজের জন্য "ইনশাআল্লাহ্" বলার তাকীদ ঃ এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মসজিদে-হারামে প্রবেশের সাথে যা ভবিষ্যতে হওয়ার ছিল— 'ইনশাআল্লাহ্' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ আল্লাহ্ নিজের চাওয়া সম্পর্কে নিজেই জ্ঞাত। তাঁর এরূপ বলার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু স্বীয় রসূল ও বন্দাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে এস্থানে আল্লাহ্ তাআলাও 'ইনশাআল্লাহ্' শব্দ ব্যবহার করেছেন। — (কুরতুবী)

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ সহীহ্ বোখারীতে আছে, পরবর্তী বছর কাযা ওমরায় হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর পবিত্র কেশ কাঁচি দ্বারা কর্তন করেছিলেন। এটা কাযা ওমরারই ঘটনা। কেননা, বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মস্তক মুণ্ডিত করেছিলেন। — (কুরতুবী)

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا অর্থাৎ, এ বছরই তোমাদেরকে মসজিদে-হারামে প্রবেশ এবং ওমরাহ্ করিয়ে দিতে আল্লাহ্ তাআলা সক্ষম ছিলেন। পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করার মধ্যে বড় বড় রহস্য নিহিত ছিল, যা আল্লাহ্ জানতেন— তোমরা জানতে না। তন্মধ্যে এক রহস্য এটাও ছিল যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছিল খয়বর বিজিত হয়ে মুসলমানদের শক্তি ও সাজ-সরঞ্জাম বর্ধিত হোক এবং তারা পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি সহকারে ওমরা পালন করুক। এ কারণেই বলা হয়েছে ঃ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا অর্থাৎ, স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করার আগে খয়বরের আসন্ন বিজয় মুসলমানগণ লাভ করুক। কেউ কেউ বলেন এই আসন্ন বিজয় বলে খোদ হুদায়বিয়ার সন্ধি বোঝানো হয়েছে। কারণ, এটা মক্কা বিজয় ও অন্যান্য সব বিজয়ের ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে সকল সাহাবীই একে বৃহত্তম বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ বছর তোমাদের সফরের সংকল্প করার পর ওমরা পালনে ব্যর্থতা ও সন্ধি সম্পাদনের মধ্যে যেসব রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা তোমাদের জানা ছিল না কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা সব জানতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, এই স্বপ্নের ঘটনার আগে হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তোমাদেরকে একটা আসন্ন বিজয় দান করবেন। এই আসন্ন বিজয়ের ফলাফল সবাই প্রত্যক্ষ করেছে যে, হুদায়বিয়ার সফরে মুসলমানদের সংখ্যা দেড় হাজারের বেশী ছিল না। সন্ধির পর তাদের সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত হয়ে গেল। — (কুরতুবী)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিজয়, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা এবং বিশেষভাবে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবী ও সাধারণভাবে সকল সাহাবীর গুণাবলী ও সুসংবাদ উল্লেখিত হয়েছে। এখন সূরার উপসংহারে সেসব বিষয়বস্তুর সারমর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে। এসব নেয়ামত ও সুসংবাদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আনুগত্য ও সত্যায়নের কারণেই প্রদত্ত হয়েছে। তাই এই সত্যায়ন ও আনুগত্যের উপর জোর দেয়ার জন্যে, রেসালত অস্বীকারকারীদের যুক্তি খণ্ডন করার লক্ষ্যে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের অন্তরে যেসব সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, সেগুলো দূরীকরণের জন্যে আলোচ্য আয়াতসমূহে রেসালত সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং জগতের সব ধর্মের উপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) - এর দ্বীনকে জয়যুক্ত করার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ
تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيْمَاهُمْ فِيْ
وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى
عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

سُوْرَةُ الْحُجُرٰتِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَ
اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا
اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٢﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٣﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤﴾

(২৯) মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে— চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে— যাতে আল্লাহ্ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।

সূরা আল-হুজুরাত

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ১৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে—

(১) মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন ও জানেন। (২) মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। (৩) যারা আল্লাহ্‌র রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্যে শোধিত করেছেন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (৪) যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উঁচুস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ সমগ্র কোরআনে শেষনবী (সাঃ) -এর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে সাধারণতঃ গুণাবলী ও পদবীর মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছেঃ বিশেষতঃ আহ্বানের স্থলে - يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ - يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ ইত্যাদি বলা হয়েছে। এর বিপরীতে অপরাপর পয়গম্বরকে নাম সহকারে আহ্বান করা হয়েছে, যেমন— يٰۤاِبْرٰهِيْمُ - يٰمُوْسٰى - يٰعِيْسٰى সমগ্র কোরআনে মাত্র চার জায়গায় তাঁর নাম 'মুহাম্মদ' উল্লেখ করা হয়েছে। এসব স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করার মধ্যে উপযোগিতা এই যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে হযরত আলী (রাঃ) যখন তাঁর নাম ''মুহাম্মদুর-রসূলুল্লাহ্'' লিপিবদ্ধ করেন, তখন কাফেররা এটা মিটিয়ে ''মুহাম্মদ ইবনে-আবদুল্লাহ্'' লিপিবদ্ধ করতে পীড়াপীড়ি করে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্‌র আদেশে তাই মেনে নেন। পরিবর্তে আল্লাহ্ তাআলা এ স্থলে বিশেষভাবে তাঁর নামের সাথে ''রসূলুল্লাহ্'' শব্দ কোরআনে উল্লেখ করে একে চিরস্থায়ী করে দিলেন, যা কেয়ামত পর্যন্ত লিখিত ও পঠিত হবে।

وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ এখান থেকে সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে। যদিও এতে সর্বপ্রথম হুদায়বিয়া ও বয়াতে-রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে ; কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার দরুন সকল সাহাবীই এতে দাখিল আছেন। কেননা, সবাই তাঁর সহচর ও সঙ্গী ছিলেন।

সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদিঃ-এস্থলে আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর রেসালত ও তাঁর দ্বীনকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার কথা বর্ণনা করে সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এতে একদিকে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় গৃহিত তাঁদের কঠোর পরীক্ষার পুরস্কার আছে। কেননা, অন্তরগত বিশ্বাস ও প্রেরণার বিরুদ্ধে সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার ফলে ওমরা পালনে ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁদের এতটুকু পদস্খলন হয়নি বরং তাঁরা নজিরবিহীন আনুগত্য ও ঈমানী শক্তির পরিচয় দেন। এছাড়া সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বিস্তারিত বর্ণনা করার মধ্যে এ রহস্য নিহিত থাকাও বিচিত্র নয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পর দুনিয়াতে আর কোন নবী-রসূল প্রেরিত হবেন না। তিনি উম্মতের জন্যে কোরআনের সাথে সাহাবীদেরকে নমুনা হিসেবে ছেড়ে যাবেন এবং তাঁদের অনুসরণ করার আদেশ দেবেন। তাই কোরআনও তাঁদের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে তাঁদের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ স্থলে সাহাবায়ে কেরামের সর্বপ্রথম যে গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, তাঁরা কাফেরদের মোকবেলায় তাঁদের কঠোরতা সর্বক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা ইসলামের জন্যে বংশগত সম্পর্ক বিসর্জন দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার ঘটনায় বিশেষভাবে এর বিকাশ ঘটেছে। সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক সহানুভূতি ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তখন প্রকাশ পেয়েছে, যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আনসাররা তাঁদের সবকিছুতে মুহাজিরদেরকে অংশীদার করার আহ্বান জানায়। কোরআন সাহাবায়ে কেরামের এই গুণটি সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছে। কেননা, এর সারমর্ম এই যে, তাঁদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, ভালবাসা

অথবা হিংসোপরায়ণতা কোন কিছুই নিজের জন্যে নয়; বরং সব আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলের জন্যে হয়ে থাকে। এটাই পূর্ণ ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আছে, من احب لله وابغض لله فقد استكمل ايمانه অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার ভালবাসা ও শত্রুতা উভয়কে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুগামী করে দেয়, সে তার ঈমানকে পূর্ণতা দান করে। এ থেকেই আরও প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের মোকাবেলায় কঠোর ছিলেন— একথার অর্থ এরূপ নয় যে, তাঁরা কোন সময় কোন কাফেরের প্রতি দয়া করেন না ; বরং অর্থ এই যে, যে স্থলে আল্লাহ্ ও রসূলের পক্ষ থেকে কাফেরদের প্রতি কঠোরতা করার আদেশ হয়, সেই স্থলে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি সম্পর্ক একাজে অন্তরায় হয় না। পক্ষান্তরে দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপারে তো স্বয়ং কোরআনের ফয়সালা এই যে,

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ .... اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ অর্থাৎ, যেসব কাফের মুসলমানদের বিপক্ষে কার্যতঃ যুদ্ধরত নয়, তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করতে আল্লাহ্ তাআলা নিষেধ করেন না। রসূলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামের অসংখ্য ঘটনা এমন পাওয়া যায়, সেগুলোতে দুর্বল, অক্ষম অথবা অভাবগ্রস্ত কাফেরদের সাথে দয়া-দাক্ষিণ্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারের মানদণ্ডও প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপক আদেশ রয়েছে। এমনকি, রণাঙ্গনেও ন্যায় ও ইনসাফের পরিপন্থী কোন কার্যক্রম ইসলামে বৈধ নয়।

সাহাবায়ে কেরামের দ্বিতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা সাধারণতঃ রুকূ-সেজদা ও নামাযে মশগুল থাকেন। তাঁদেরকে অধিকাংশ সময় এ কাজেই লিপ্ত পাওয়া যায়। প্রথম গুণটি পূর্ণ ঈমানের আলামত এবং দ্বিতীয় গুণটি পূর্ণ আমলের পরিচায়ক। কারণ, আমলসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে নামায। سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ অর্থাৎ, নামায তাঁদের জীবনের এমন ব্রত হয়ে গেছে যে, নামাযে ও সেজদার বিশেষ চিহ্ন তাঁদের মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়। এখানে "সেজদার চিহ্ন" বলে সেই নূরের আভা বোঝানো হয়েছে, যা দাসত্ব এবং বিনয় ও নম্রতার প্রভাবে প্রত্যেক এবাদতকারীর মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষ করা হয়। কপালে সেজদার কাল দাগ বোঝানো হয়নি। বিশেষতঃ তাহাজ্জুদ নামাযের ফলে উপরোক্ত চিহ্ন খুব বেশী ফুটে উঠে। ইবনে মাজার এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ من كثر صلوته بالليل حسن وجهه بالنهار অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাত্রে বেশী নামায পড়ে, দিনের বেলায় তার চেহারা সুন্দর আলোকোজ্জ্বল হয়। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ নামাযীদের মুখমণ্ডলের সেই নূর, যা কেয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে।

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ ۖ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ

উপরে সাহাবায়ে কেরামের সেজদা ও নামাযের যে আলামত বর্ণনা করা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁদের এই দৃষ্টান্তও তওরাতে বর্ণনা করা হয়েছে, এরপর বলা হয়েছে যে, ইঞ্জিলে তাঁদের আরও একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখিত হয়েছে। তা এই যে, তাঁরা এমন, যেমন কোন কৃষক মাটিতে বীজ বপন করে। প্রথমে এই বীজ একটি ক্ষুদ্র সূঁচের আকারে নির্গত হয়। এরপর তা থেকে ডালপালা অঙ্কুরিত হয়। অতঃপর তা আরও মজবুত ও শক্ত হয় এবং অবশেষে শক্ত কাণ্ড হয়ে যায়। এমনিভাবে নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণ শুরুতে খুবই নগণ্যসংখ্যক ছিলেন। এক সময়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ব্যতীত মাত্র তিন জন মুসলমান ছিলেন— পুরুষদের মধ্যে হযরত আবুবকর(রাঃ), নারীদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রাঃ) ও বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ)। এরপর আস্তে আস্তে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এমনকি, বিদায় হজ্বের সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে হজ্বে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের সংখ্যা দেড় লক্ষের কাছাকাছি বর্ণনা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে ঃ (এক) فِى التَّوْرٰىةِ এ পাঠ-বিরতি করা এবং মুখমণ্ডলের নূরের দৃষ্টান্ত তওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা। এরপর وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ এ পাঠবিরতি না করা। তখন অর্থ এই হবে যে, সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত সেই চারা গাছের ন্যায়, যা শুরুতে খুবই দুর্বল হয়। এরপর আস্তে আস্তে শক্তকাণ্ড বিশিষ্ট হয়ে যায়।

(দুই) فِى التَّوْرٰىةِ এ পাঠবিরতি না করা বরং فِى الْاِنْجِيْلِ এ পাঠবিরতি করা। অর্থ এই হবে যে, মুখমণ্ডলের নূরের দৃষ্টান্ত তওরাতেও রয়েছে, ইঞ্জীলেও রয়েছে। অতঃপর كَزَرْعٍ কে একটি আলাদা দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা। (তিন) فِى التَّوْرٰىةِ এ বাক্য না করা এবং فِى الْاِنْجِيْلِ এও শেষ না করা। অতঃপর ذٰلِكَ কে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের দিকে ইঙ্গিত সাব্যস্ত করা। এর অর্থ এই যে, তওরাত ও ইঞ্জীল আসল আকারে বিদ্যমান থাকলে সেগুলো দেখলেই কোরআনের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এগুলোতে বহু বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তাই কোন নিশ্চিত ফয়সালা সম্ভবপর নয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথম সম্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন, যা থেকে জানা যায় যে, প্রথম দৃষ্টান্ত তওরাতে এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলে আছে। ইমাম বগভী (রহঃ) বলেন ঃ ইঞ্জীলে সাহাবায়ে কেরামের এই দৃষ্টান্ত আছে যে, তাঁরা শুরুতে নগণ্য সংখ্যক হবেন, এরপর তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শক্তি অর্জিত হবে। হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের এই দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলে লিখিত আছে যে, এমন একটি জাতির অভ্যুদয় হবে, যারা চারা গাছের অনুরূপ বেড়ে যাবে। তারা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান করবে। (মাযহারী) বর্তমান যুগের তওরাত ও ইঞ্জীলেও অসংখ্য পরিবর্তন সত্ত্বেও নিম্নরূপ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে ঃ

খোদাওন্দ সিনা থেকে আগমন করলেন এবং শায়ীর থেকে তাদের কাছে যাহির হলেন। তিনি ফারান পর্বত থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং দশ হাজার পবিত্র লোক তাঁর সাথে আসলেন। তাঁর হাতে তাদের জন্যে একটি অগ্নিদীপ্ত শরীয়ত ছিল তিনি নিজের লোকদেরকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর সব পবিত্র লোক তোমার হাতে আছে এবং তোমার চরণের কাছে উপবিষ্ট আছে। তারা তোমার কথা মানবে। "— (তওরাত ঃ বাবে এস্তেস্না)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের সময় সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তাঁরা ফারান থেকে উদিত দীপ্তিময় মহাপুরুষের সাথে 'খলীলুল্লাহ্' শহরে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর হাতে অগ্নিদীপ্ত শরীয়ত থাকবে বলে اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ এর প্রতি ইঙ্গিত বোঝা যায়। তিনি নিজের লোকদেরকে ভালবাসবেন — কথা থেকে رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ এর বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। এযহারুল-হক, তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়ে এর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই গ্রন্থটি মওলানা রহমতুল্লাহ্ কিরানভী (রহঃ) খ্রীষ্টান মতবাদের স্বরূপ উদঘাটন করার জন্যে ফিন্ডার নামক পাদ্রীর জওয়াবে লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে ইঞ্জীলে বর্ণিত দৃষ্টান্ত এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ সে তাদের সামনে আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে

বলল, আকাশের রাজত্ব সরিষার দানার মত, যাকে কেউ ক্ষেতে বপন করে। এটা ক্ষুদ্রতম বীজ হলেও যখন বেড়ে যায়, তখন সব সব্জীর চাইতে বড় এমন এক বৃক্ষ হয়ে যায়, যার ডালে পাখী বসে বাসা বাঁধে। (ইঞ্জীল ঃ মাত্তা) ইঞ্জীল মরকাসের ভাষা কোরআনের ভাষার অধিক নিকটবর্তী। তাতে আছে ঃ সে বলল, খোদার রাজত্ব এমন, যেমন কোন ব্যক্তি মাটিতে বীজ বপন করে এবং রাত্রিতে নিদ্রা যায় ও দিনে জাগ্রত থাকে। বীজটি এমনভাবে অংকুরিত হয় ও বেড়ে যায় যে, মনে হয় মাটি নিজেই বুঝি ফলদান করে। প্রথমে পাতা, এরপর শীষ, এরপর শীষে তৈরী দানা। অবশেষে যখন শস্য পেকে যায়, তখন সে অনতিবিলম্বে কাঁচি লাগায়। কেননা, কাটার সময় এসে গেছে। — (এযহারুল-হক, ৩য় খণ্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা) আকাশের রাজত্ব বলে যে শেষ নবীর অভ্যুদয় বোঝানো হয়েছে, তা তওরাতের একাধিক জায়গা থেকে বোঝা যায়।

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁদেরকে দুর্বলতার পর শক্তি এবং সংখ্যাল্পতার পর সংখ্যাধিক্য দান করেছেন, যাতে এগুলো দেখে কাফেরদের অন্তর্জ্বালা হয় এবং তারা হিংসার অনলে দগ্ধ হয়। হযরত আবু ওরওয়া যুবায়রী (রহঃ) বলেন ঃ একবার আমরা ইমাম মালেক (রহঃ)- এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি কোন একজন সাহাবীকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ কিছু বক্তব্য রাখল। তখন ইমাম মালেক (রহঃ) উপরোক্ত আয়াতটি পূর্ণ তেলাওয়াত করতঃ যখন لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন বললেন ঃ যার অন্তরে কোন একজন সাহাবীর প্রতি ক্রোধ আছে, সে এই আয়াতের শাস্তি লাভ করবে। — (কুরতুবী) ইমাম মালেক (রহঃ) একথা বলেননি যে, সে কাফের হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন যে, সে-ও এই শাস্তি লাভ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, তার কাজটি কাফেরদের কাজের অনুরূপ হবে।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

مِنْهُمْ এর من অব্যয়টি এখানে সবার মতে বর্ণনামূলক। অর্থ এই যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। এ থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, সব সাহাবায়ে কেরামই বিশ্বাস স্থাপন করতেন ও সৎকর্ম করতেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের সবাইকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। এই বর্ণনামূলক من এর ব্যবহার কোরআনে প্রচুর; যেমন فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ এখানে مِنَ الْاَوْثَانِ বলে رجس এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে مِنْهُمْ বলে الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাফেযী সম্প্রদায় এস্থলে من কে "কতক" - এর অর্থে ধরেছে এবং আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছে যে, সাহাবীগণের মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী যাঁরা ঈমানদার ও সৎকর্মী, তাঁদেরকে এই ওয়াদা দেয়া হয়েছে। এটা পূর্বাপর বর্ণনা এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের পরিষ্কার পরিপন্থী। কেননা, যেসব সাহাবী হুদায়বিয়ার সফর ও বয়াতে-রিযওয়ানে শরীক ছিলেন, তাঁরা তো নিঃসন্দেহে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং আয়াতের প্রথম উদ্দিষ্ট বলে তাঁদের সবার সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় সন্তুষ্টির এই ঘোষণা করেছেন ঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ সন্তুষ্টির এই ঘোষণা নিশ্চয়তা দেয় যে, তাঁরা সবাই মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান ও সৎকর্মের উপর কায়েম থাকবেন। কারণ, আল্লাহ্ আলীম ও খবীর তথা সর্বজ্ঞ। যদি কারও সম্পর্কে তাঁর জানা থাকে যে, সে ঈমান থেকে কোন না কোন সময় মুখ ফিরিয়ে নেবে, তবে তার প্রতি আল্লাহ্ স্বীয় সন্তুষ্টি ঘোষণা করতে পারেন না। ইবনে আবদুল বার (রহঃ) এস্তিয়াবের ভূমিকায় এই আয়াত উদ্ধৃত করে লিখেন ঃ من رضى الله عنه لم يسخط عليه ابدا অর্থাৎ, আল্লাহ্ যার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তার প্রতি এরপর কখনও অসন্তুষ্ট হন না। এই আয়াতের ভিত্তিতেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ বয়াতে-রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ জাহান্নামে যাবে না। অতএব, তাঁদের জন্যেই যখন মুখ্যতঃ এই ওয়াদা করা হয়েছে, তখন তাদের মধ্যে কারও কারও বেলায় ব্যতিক্রম হওয়া নিশ্চিতই বাতিল। এ কারণেই সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবায়ে কেরাম সবাই আদেল ও সিকাহ্।

সাহাবায়ে কেরাম সবাই জান্নাতী, তাঁদের পাপ মার্জনীয় এবং তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা গোনাহ্ ঃ কোরআন পাকের অনেক আয়াত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তন্মধ্যে কতিপয় আয়াত এই সূরাতেই উল্লেখিত হয়েছে ঃ

وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا এবং

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

এছাড়া আরও অনেক আয়াতে এই বিষয়বস্তু রয়েছে —

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ —

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ

بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ

সূরা হাদীদে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى অর্থাৎ, তাঁদের সবাইকে আল্লাহ্ "হুসনা" তথা উত্তম পরিণতির ওয়াদা দিয়েছেন। এরপর সূরা আম্বিয়ায় হুসনা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ অর্থাৎ, যাদের জন্যে আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই হুসনার ফয়সালা হয়ে গেছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم অর্থাৎ, সমগ্র সময়কালের মধ্যে আমার সময়কাল উত্তম। এরপর সেই সময়কালের লোক উত্তম, যাদের সময়কাল আমার সময়কালের সংলগ্ন, এরপর তারা যারা তাদের সংলগ্ন। আরও এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমার সাহাবীগণকে মন্দ বলো না। কেননা, (ঈমানী শক্তির কারণে তাঁদের অবস্থা এই যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ ব্যয় করে,তবে তা তাঁদের ব্যয় করা এক মুদের সমানও হতে পারে না, এমনকি অর্ধ মুদেরও না। মুদ আরবের একটি ওজনের নাম যা আমাদের অর্ধ সেরের কাছাকাছি। — (বোখারী) হযরত জাবের (রাঃ)-এর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা সারা জাহানের মধ্য থেকে আমার সাহাবীগণকে পছন্দ করেছেন। এরপর আমার সাহাবীগণের মধ্য থেকে চার জনকে আমার জন্যে পছন্দ করেছেন— আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রাঃ)।— (বাযযার) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ-

আমার সাহাবীগণের সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় কর, আল্লাহ্কে ভয় কর। আমার পর তাঁদেরকে নিন্দা ও দোষারোপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না। কেননা, যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসে, সে আমার ভালবাসার কারণে তাঁদেরকে ভালবাসে এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, সে আমার

প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে। যে তাঁদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয় এবং যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহ্কে কষ্ট দেয়। যে আল্লাহ্কে কষ্ট দেয়, তাকে অচিরেই আল্লাহ্ আযাবে গ্রেফতার করবেন।—(তিরমিযী)

সূরা আল-হুজরাত

সূরার যোগসূত্র ও শানে নুযূল ঃ পূর্ববর্তী দুই সূরায় জেহাদের বিধান ছিল, যদ্দ্বারা বিশ্বজগতের সংশোধন উদ্দেশ্য। আলোচ্য সূরায় আত্মসংশোধনের বিধান ও শিষ্টাচার নীতি ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষতঃ সামাজিকতা সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লেখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতরণের ঘটনা এই যে, একবার বনী তামীম গোত্রের কিছু লোক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। এই গোত্রের শাসনকর্তা কাকে নিযুক্ত করা হবে তখন এ বিষয়েই আলোচনা চলছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) কা' কা' ইবনে হাকিমের নাম প্রস্তাব করলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) আকরা' ইবনে হাবসের নাম প্রস্তাব করলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে মজলিসেই কথাবার্তা হল এবং ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটিতে উন্নীত হয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর উচু হয়ে গেল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।—(বোখারী)

আলোচ্য আয়াতসমূহের অবতরণ সম্পর্কে কুরতুবীর ভাষ্য অনুযায়ী ছয়টি ঘটনা বর্ণিত আছে। কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন ঃ সব ঘটনা নির্ভুল। কেননা, সবগুলোই আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে একটি ঘটনা বোখারীর বর্ণনামতে প্রথমেই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

بين اليدين -এর আসল অর্থ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

দুই হাতের মধ্যস্থল। এর উদ্দেশ্য সামনের দিক। অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না। কি বিষয়ে অগ্রণী হতে নিষেধ করা হয়েছে কোরআন পাক তা উল্লেখ করেনি। এতে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ, যে কোন কথায় অথবা কাজে রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে অগ্রণী হয়ো না। বরং তাঁর জওয়াবের অপেক্ষা কর। তবে তিনি যদি কাউকে জওয়াবদানের আদেশ করেন, তবে সে জওয়াব দিতে পারে। এমনিভাবে যদি তিনি পথ চলেন তবে কেউ যেন তাঁর অগ্রে না চলে। খাওয়ার মজলিসে কেউ যেন তাঁর আগে খাওয়া শুরু না করে। তবে তাঁর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বর্ণনা অথবা শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি কাউকে অগ্রে প্রেরণ করতে চান তবে তা ভিন্ন কথা; যেমন সফর ও যুদ্ধের বেলায় কিছুসংখ্যক লোককে অগ্রে যেতে আদেশ করা হত।

আলেম ও ধর্মীয় নেতাদের সাথেও এই আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত ঃ কেউ কেউ বলেন, ধর্মের আলেম ও মাশায়েখের বেলায়ও এই বিধান কার্যকর। কেননা, তাঁরা পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী। নিম্নোক্ত ঘটনা এর প্রমাণ। একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-কে আবু বকর (রাঃ)-এর অগ্রে অগ্রে চলতে দেখে সতর্ক করলেন এবং বললেন ঃ তুমি কি এমন ব্যক্তির অগ্রে চল, যিনি ইহকাল ও পরকালে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? তিনি আরও বললেন ঃ দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তির উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়নি যে পয়গম্বরগণের পর হযরত আবু বকর থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।—(রূহুল-বয়ান) তাই আলেমগণ বলেন যে, ওস্তাদ ও পীরের সাথে একই ধরনের আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ নবী করীম (সাঃ)-এর মজলিসের এটা দ্বিতীয় আদব। অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে কণ্ঠস্বরকে তাঁর কণ্ঠস্বরের চাইতে অধিক উঁচু করা অথবা তাঁর সাথে উচ্চস্বরে কথা বলা—যেমন, পরস্পরে বিনা দ্বিধায় করা হয়, এক প্রকার বে-আদবী ও ধৃষ্টতা। সেমতে এই আয়াত অবতরণের পর সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা পাল্টে যায়। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরয করেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ), আল্লাহ্র কসম ! এখন মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে কানাকানির অনুরূপ কথাবার্তা বলব।—(বায়হাকী) হযরত ওমর (রাঃ) এরপর থেকে এত আস্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে হত।—(সেহাহ্) হযরত সাবেত ইবনে কায়সের কণ্ঠস্বর স্বভাবগতভাবেই উঁচু ছিল। এই আয়াত শুনে তিনি ভয়ে সংযত হলেন এবং কণ্ঠস্বর নীচু করলেন।—(দুররে-মনসূর)

রওযা মোবারকের সামনেও বেশী উঁচুস্বরে সালাম ও কালাম করা নিষিদ্ধ ঃ কাযী আবু বকর ইবনে-আরাবী (রহঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্মান ও আদব তাঁর ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব। তাই কোন কোন আলেম বলেন ঃ তাঁর পবিত্র কবরের সামনেও বেশী উচুস্বরে সালাম ও কালাম করা আদবের খেলাফ। অনুরূপ যে মজলিসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীস পাঠ অথবা বর্ণনা করা হয়, তাতেও হট্টগোল করা বে-আদবী। কেননা, তাঁর কথা যখন তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হত তখন সবার জন্যে চুপ করে শোনা ওয়াজিব ও জরুরী ছিল। এমনিভাবে ওফাতের পর যে মজলিসে সেসব বাক্যাবলী শুনানো হয়, সেখানে হট্টগোল করাও বে-আদবী।

মাসআলা ঃ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে পয়গম্বরের আগে হাঁটা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার আওতায় যেমন আলেমগণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, তেমনিভাবে আওয়াজ উঁচু করারও বিধান তাই। আলেমগণের মজলিসে এত উঁচুস্বরে কথা বলবে না, যাতে তাঁদের আওয়াজ চাপা পড়ে যায়।—(কুরতুবী)

أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ অর্থাৎ, তোমাদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বর থেকে উঁচু করো না এই আশংকার কারণে যে, কোথাও তোমাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যায় এবং তোমরা টেরও পাও না। এস্থলে শরীয়তের স্বীকৃত মূলনীতির দিক দিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয় ঃ (এক) আহলে সুন্নত ওয়াল জমাআতের ঐকমত্যে একমাত্র কুফরীই সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। কোন গোনাহের কারণে কোন সৎকর্ম বিনষ্ট হয় না। এখানে মুমিন তথা সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا শব্দযোগে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, কাজটি কুফরী নয়। অতএব, আমলসমূহ বিনষ্ট হবে কিরূপে? (দুই) ঈমান একটি ইচ্ছাধীন কাজ। যে পর্যন্ত কেউ স্বেচ্ছায় ঈমান গ্রহণ না করে, মুমিন হয় না। এমনিভাবে কুফরও একটি ইচ্ছাধীন কাজ। স্বেচ্ছায় কুফরী অবলম্বন না করা পর্যন্ত কেউ কাফের হতে পারে না। এখানে আয়াতের শেষাংশে স্পষ্টতঃ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা টেরও পাবে না। অতএব, এখানে খাঁটি কুফরীর শাস্তি সমস্ত

নেক-আমল নিষ্ফল হওয়া কিরূপে প্রযোজ্য হতে পারে।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বয়ানুল-কোরআনে এর এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যদ্দ্বারা সব প্রশ্ন দূর হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, আয়াতের অর্থ এই যে, মুসলমানগণ! তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কণ্ঠস্বর থেকে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করা এবং উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা থেকে বিরত থেকো। কারণ, এতে তোমাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। আশংকার কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে অগ্রণী হওয়া অথবা তাঁর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করার মধ্যে তাঁর শানে ধৃষ্টতা ও বে-আদবী হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, যা রসূলকে কষ্টদানের কারণ। রসূলের কষ্টের কারণ হয়, এরূপ কোন কাজ সাহাবায়ে কেরাম ইচ্ছাকৃতভাবে করবেন, যদিও এরূপ কল্পনা করা যায় না, কিন্তু অগ্রণী হওয়া ও কণ্ঠস্বর উঁচু করার মত কাজ কষ্টদানের ইচ্ছায় না হলেও তদ্দ্বারা কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই এই জাতীয় কাজ সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও গোনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোন গোনাহর বৈশিষ্ট্য এই যে, যারা এই গোনাহে অহর্নিশি মগ্ন হয়ে পরিণামে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যা সমস্ত নেক আমল নিষ্ফল হওয়ার কারণ। ধর্মীয় নেতা, ওস্তাদ অথবা পীরকে কষ্ট দেয়া এমনি গোনাহ্ যদ্দ্বারা তওফীক ছিনিয়ে নেয়ার আশংকা আছে। এভাবে নবীর সামনে অগ্রণী হওয়া এবং কণ্ঠস্বর উঁচু করা দ্বারাও তওফীক ছিনিয়ে নেয়ার এবং অবশেষে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার আশংকা থাকে। ফলে সমস্ত সৎকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে। যারা এহেন কাজ করে, তারা যেহেতু কষ্ট দেয়ার ইচ্ছায় করে না, তাই সে টেরও পাবে না যে, এই কুফর ও সৎকর্ম নিষ্ফল হওয়ার আসল কারণ কি ছিল। কোন কোন আলেম বলেন ঃ বুযুর্গ পীরের সাথে ধৃষ্টতা ও বে-আদবীও মাঝে মাঝে তওফীক ছিনিয়ে নেয়ার কারণ হয়ে যায়, যা পরিণামে ঈমানের সম্পদও বিনষ্ট করে দেয়।

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

– এই আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি তৃতীয় আদব শেখানো হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি যখন নিজ বাসগৃহে তশরীফ রাখেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকা, বিশেষতঃ গোয়ার্তুমি সহকারে নাম নিয়ে আহবান করা বে-আদবী। এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। حجرات শব্দটি حجرة এর বহুবচন। অভিধানে প্রাচীর চতুষ্টয় দ্বারা বেষ্টিত স্থানকে حجرة বলা হয়, যাতে কিছু বারান্দা ও ছাদ থাকে। নবী করীম (সাঃ)-এর নয় জন বিবি ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে পৃথক পৃথক হুজরা তথা কক্ষ ছিল। তিনি পালাক্রমে এসব হুজরায় তশরীফ রাখতেন।

ইবনে সা'দ আতা খোরাসানীর রেওয়ায়েতক্রমে লিখেন ঃ এসব হুজরা খর্জুর শাখা দ্বারা নির্মিত ছিল এবং দরজায় মোটা কাল পশমী পর্দা ঝুলানো থাকত। ইমাম বোখারী (রহঃ) 'আদাবুল-মুফরাদ' গ্রন্থে এবং বায়হাকী দাউদ ইবনে কায়সের উক্তি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি এসব হুজরার যিয়ারত করেছি। আমার ধারণা এই যে, হুজরার দরজা থেকে ছাদবিশিষ্ট কক্ষ পর্যন্ত ছয় সাত হাতের ব্যবধান ছিল। কক্ষ দশ হাত এবং ছাদের উচ্চতা সাত-আট হাত ছিল। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের রাজত্বকালে তাঁরই নির্দেশে এসব হুজরা মসজিদে নব্বীর অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়। মদীনার লোকগণ সেদিন অশ্রু রোধ করতে পারেননি।

শানে নুযূল ঃ ইমাম বগভী (রহঃ) কাতাদাহ্ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন, বনূ-তামীমের লোকগণ দুপুরের সময় মদীনায় উপস্থিত হয়েছিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন এক হুজরায় বিশ্রামরত ছিলেন। তারা ছিল বেদুঈন এবং সামাজিকতার রীতি-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ। কাজেই তারা হুজরার বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু করল ঃ يا محمد اخرج الينا এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এভাবে ডাকাডাকি করতে নিষেধ করা হয় এবং অপেক্ষা করার আদেশ দেয়া হয়। মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ইত্যাদি গ্রন্থে এ রেওয়ায়েত বিভিন্ন শব্দযোগে বর্ণিত হয়েছে।—(মাযহারী)

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাঁদের আলেম ও মাশায়েখের সাথেও এই আদব ব্যবহার করেছেন। সহীহ্ বোখারী ও অন্যান্য কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—আমি যখন কোন আলেম সাহাবীর কাছ থেকে কোন হাদীস লাভ করতে চাইতাম, তখন তাঁর গৃহে পৌঁছে ডাকাডাকি অথবা দরজার কড়া নাড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আগমন করতেন, তখন আমি তাঁর কাছে হাদীস জিজ্ঞেস করতাম। তিনি আমাকে দেখে বলতেন ঃ হে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চাচাত ভাই! আপনি দরজার কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) উত্তরে বলতেন ঃ আলেম কোন জাতির জন্যে পয়গম্বর সদৃশ। আল্লাহ্ তাআলা পয়গম্বর সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁর বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

হযরত আবু ওবায়দা (রহঃ) বলেন ঃ আমি কোন দিন কোন আলেমের দরজায় যেয়ে কড়া নাড়া দেইনি; বরং অপেক্ষা করেছি যে, তিনি নিজেই বাইরে আসলে সাক্ষাত করব।—(রূহুল-মা'আনী)

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾ وَاعْلَمُوا
أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ
لَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ
الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن
يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا
مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

(৫) যদি তারা আপনার বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত সবর করত, তবে তা-ই তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) মুমিনগণ। যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও। (৭) তোমরা জেনে রাখ তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রসূল রয়েছেন। তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবদার মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। (৮) এটা আল্লাহ্র কৃপা ও নেয়ামত ঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৯) যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনছাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনছাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। (১০) মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহ্কে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। (১১) মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ্। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালেম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল ঃ মুসনাদে-আহমদের বরাত দিয়ে ইবনে-কাসীর এই আয়াত অবতরণের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, বনিল-মুস্তালিক গোত্রের সরদার, উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ)-এর পিতা হারেস ইবনে মেরার বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং যাকাত প্রদানের আদেশ দিলেন। আমি ইসলামের দাওয়াত কবুল করতঃ যাকাত প্রদানে স্বীকৃত হলাম এবং বললাম ঃ এখন আমি স্বগোত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও ইসলাম ও যাকাত প্রদানের দাওয়াত দেব। যারা আমার কথা মানবে এবং যাকাত দেবে ; আমি তাদের যাকাত একত্রিত করে আমার কাছে জমা রাখব। আপনি অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্যন্ত কোন দূত আমার কাছে প্রেরণ করবেন, যাতে আমি যাকাতের জমা অর্থ তার হাতে সোপর্দ করতে পারি। এরপর হারেস যখন ওয়াদা অনুযায়ী যাকাতের অর্থ জমা করলেন এবং দূত আগমনের নির্ধারিত মাস ও তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোন দূত আগমন করল না, তখন হারেস আশংকা করলেন যে, সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। নতুবা ওয়াদা অনুযায়ী দূত না পাঠানোর কোন কারণ থাকতে পারে না। হারেস এই আশংকার কথা ইসলাম গ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছেও প্রকাশ করলেন এবং সবাই মিলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করলেন। এদিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নির্ধারিত তারিখে ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ)-কে যাকাত গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পথিমধ্যে ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ)-এর মনে এই ধারণা জাগ্রত হয় যে, এই গোত্রের লোকদের সাথে তাঁর পুরাতন শত্রুতা আছে। কোথাও তাঁরা তাকে পেয়ে হত্যা না করে ফেলে। এই ভয়ের কথা চিন্তা করে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে যেয়ে বলেন যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করারও ইচ্ছা করেছে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রাগান্বিত হয়ে খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্রেরণ করলেন। এদিকে মুজাহিদ বাহিনী রওয়ানা হল এবং ওদিকে হারেস জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনারা কোন গোত্রের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন? উত্তর হল ঃ আমরা তোমাদের প্রতিই প্রেরিত হয়েছি। হারেস কারণ জিজ্ঞেস করলে তাঁকে ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ)-কে প্রেরণ ও তাঁর প্রত্যাবর্তনের কাহিনী শুনানো হল এবং ওলীদের এই বিবৃতিও শুনানো হল যে, বনিল-মুস্তালিক গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। একথা শুনে হারেস বললেন ঃ সে আল্লাহ্র কসম, যিনি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সত্য রসূল করে প্রেরণ করেছেন, আমি ওলীদ ইবনে ওকবাকে দেখিওনি। সে আমার কাছে যায়নি। অতঃপর হারেস রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি যাকাত দিতে অস্বীকার করেছ এবং আমার দূতকে হত্যা করতে চেয়েছ? হারেস বললেন ঃ কখনই নয়; সে আল্লাহ্র কসম, যিনি আপনাকে সত্য পয়গামসহ প্রেরণ করেছেন, সে আমার কাছে যায়নি এবং আমি তাকে দেখিওনি। নির্ধারিত সময়ে আপনার দূত যায়নি দেখে আমার আশংকা হয় যে, বোধ হয়, আপনি কোন ত্রুটির কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই আমরা খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। হারেস বলেন, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা হুজুরাতের আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে-কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ) নির্দেশ

অনুযায়ী বনিল-মুস্তালিক গোত্রে পৌছেন। গোত্রের লোকেরা পূর্বেই জানত যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দূত অমুক তারিখে আগমন করবে। তাই তারা অভ্যর্থনার উদ্দেশে বস্তি থেকে বের হয়ে আসে। ওলীদ সন্দেহ করলেন যে, তারা বোধ হয় পুরাতন শত্রুতার কারণে তাঁকে হত্যা করতে এগিয়ে আসছে। সেমতে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে নিজ ধারণা অনুযায়ী আরয করলেন যে, তারা যাকাত দিতে সম্মত নয়; বরং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)-কে প্রেরণ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) রাত্রি বেলায় বস্তির নিকটে পৌছে গোপনে কয়েকজন গুপ্তচর পাঠিয়ে দিলেন। তারা ফিরে এসে সংবাদ দিল যে, তারা সবাই ইসলাম ও ঈমানের উপর কায়েম রয়েছে এবং যাকাত দিতে প্রস্তুত আছে। তাদের মধ্যে ইসলামের বিপরীত কোন কিছু নেই। খালেদ (রাঃ) ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন দুষ্ট ও পাপাচারী ব্যক্তি যদি কোন লোক কিংবা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে, তবে যথোপযুক্ত তদন্ত ব্যতিরেকে তার সংবাদ অথবা সাক্ষ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়।

আয়াত সম্পর্কিত বিধান ও মাসআলা : ইমাম জাসসাস আহকামুল-কোরআনে বলেন : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ফাসেক ও পাপাচারীর খবর কবূল করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়, যে পর্যন্ত না অন্যান্য উপায়ে তদন্ত করে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা, এই আয়াতে এক কেরাআত হচ্ছে فتثبتوا অর্থাৎ, তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তড়িঘড়ি করোনা; বরং অন্য উপায়ে এর সত্যতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত দৃঢ়পদ থাক। ফাসেকের খবর কবূল করা যখন না জায়েয তখন সাক্ষ্য কবূল করা আরও উত্তমরূপে নাজায়েয হবে। কেননা, সাক্ষ্য এমন একটি খবর, যাকে শপথ ও কসম দ্বারা জোরালো করা হয়। একারণেই অধিকাংশ আলেমের মতে ফাসেকের খবর অথবা সাক্ষ্য শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোন কোন ব্যাপারে ফাসেকের খবর ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সেটা এই বিধানের ব্যতিক্রম। কেননা, আয়াতে এই বিধানের একটি বিশেষ কারণ أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ বর্ণনা করা রয়েছে। অতএব, যেসব ব্যাপারে এই কারণ অনুপস্থিত, সেগুলো আয়াতের বিধানে দাখিল নয়. অথবা এর ব্যতিক্রম। উদাহরণতঃ কোন ফাসেক বরং কাফেরও যদি কোন বস্তু এনে বলে যে, অমুক ব্যক্তি আপনাকে এটা হাদিয়া দিয়েছে, তবে তার এই খবর সত্য বলে মেনে নেয়া জায়েয। ফেকাহ্ গ্রন্থে এর আরও বিবরণ পাওয়া যাবে।

সাহাবীদের আদালত সম্পর্কে একটি গুরুত্ব পূর্ন প্রশ্ন ও জওয়াবঃ বিভিন্ন সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, এই আয়াতটি ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আয়াতে তাকে ফাসেক বলা হয়েছে। এ থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, সাহাবীগণের মধ্যে কেউ ফাসেকও হতে পারে। এটা الصحابة كلهم عدول এই স্বীকৃত ও সর্বসম্মত মূলনীতির পরিপন্থী। অর্থাৎ, সকল সাহাবীই সিকাহ্ তথা নির্ভরযোগ্য। তাদের কোন খবর ও সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা আলুসী (রহঃ) রুহুল মা'আনীতে বলেন : অধিকাংশ আলেম এ সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করেন তাই সত্য ও নির্ভুল। তাঁরা বলেন : সাহাবায়ে কেরাম নিষ্পাপ নন, তাঁদের দ্বারা কবীরা গোনাহ্ও সংঘটিত হতে পারে, যা ফিসক তথা পাপাচার। এরূপ গোনাহ্ হলে তাঁদের বেলায় শরীয়তসম্মত শাস্তি প্রযোজ্য হবে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত হলে তাঁদের খবর এবং সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যান করা হবে। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর বর্ণনাদৃষ্টে আহলে-সুন্নাত ওয়াল-জমাতের আকীদা এই যে, সাহাবী গোনাহ্ করতে পারেন, কিন্তু এমন কোন সাহাবী নেই, যিনি গোনাহ্ থেকে তওবা করে পবিত্র হননি। কোরআন পাক رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ বলে সর্বাবস্থায় তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছে। গোনাহ্ ক্ষমা করা ব্যতীত আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি হয় না। কাযী আবু ইয়ালা (রহঃ) বলেনঃ সন্তুষ্টি আল্লাহ্ তাআলার একটি চিরাগত গুণ। তিনি সেসব লোকের জন্যেই সন্তুষ্টি ঘোষণা করেন, যাদের সম্পর্কে জানেন যে, সন্তুষ্টির কারণাদির উপরই তাদের ওফাত হবে।

সারকথা এই যে, সাহাবায়ে কেরামের বিরাট দলের মধ্য থেকে গুণাগুণতি কয়েকজন দ্বারা কখনও কোন গোনাহ্ হয়ে থাকলেও তাঁরা তাৎক্ষণিক তওবা করার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। রসূলে করীম (সাঃ)-এর সংসর্গের বরকতে শরীয়ত তাঁদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ অথবা গোনাহ্ তাঁদের পক্ষ থেকে খুবই দুর্লভ ছিল। তাঁদের অসংখ্য সৎকর্ম ছিল। নবী করীম (সাঃ) ও ইসলামের জন্যে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূলের অনুসরণকে তাঁরা জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ জন্যে এমন সাধনা করেছিলেন, যার নজীর অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এসব গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বের মোকালায় সারাজীবনে কোন গোনাহ্ হয়ে গেলেও তা স্বভাবতঃই ধর্তব্য নয়। এছাড়া আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর মাহাত্ম্য ও মহব্বতে তাঁদের অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। সামান্য গোনাহ্ হয়ে গেলেও তাঁরা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন এবং তাৎক্ষণিক তওবা করতেন; বরং নিজেকে শাস্তির জন্যে নিজেই পেশ করে দিতেন। কোথাও নিজেই নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন। এসব ঘটনা হাদীসে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি গোনাহ থেকে তওবা করে, সে এমন হয়ে যায় যেন গোনাহ্ করেন। তৃতীয়তঃ কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী পুণ্যকাজ নিজেও গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। বলা হয়েছেঃ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ বিশেষতঃ সাহাবায়ে কেরামের পুণ্যকাজ গোনাহ্রে কাফফারা হবেই। কারণ, তাঁদের পুণ্যকাজ সাধারণ লোকদের মত ছিল না। তাঁদের অবস্থা আবু দাউদ ও তিরমিযী হযরত সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন–

والله لمشهد رجل منهم مع النبى صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل احدكم

– "আল্লাহ্র কসম তাঁদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে জেহাদে শরীক হওয়া—যাতে তাঁর মুখমণ্ডল ধূলি ধুসরিত হয়ে যায়-তোমাদের সারা জীবনের এবাদত থেকে উত্তম, যদিও তোমাদেরকে নূহ (আঃ)-এর আয়ুষ্কাল দান করা হয়।" অতএব, গোনাহ্ হয়ে গেলে যদিও তাঁদেরকে নির্ধারিত শাস্তিই দেয়া হয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোন পরবর্তী ব্যক্তির জন্যে তাঁদের কাউকে ফাসেক সাব্যস্ত করা জায়েয নয়। তাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর যুগে কোন সাহাবী দ্বারা ফিসক হওয়ার কারণে তাঁকে ফাসেক বলা হলেও এর কারণে তাঁকে (নাউযুবিল্লাহ্) পরবর্তীকালেও সর্বদা ফাসেক বলা বৈধ নয়।—(রূহুল-মা'আনী)

আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ)-এর

ঘটনা হলেও আয়াতে তাঁকে ফাসেক বলা হয়েছে—একথা অকাট্যরূপে জরুরী নয়। কারণ, এই ঘটনার পূর্বে ফাসেক বলার মত কোন কাজ তিনি করেননি। এই ঘটনাও নিজ ধারণা অনুযায়ী সত্য মনে করেই তিনি মোস্তালিক গোত্র সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত সংবাদ দিয়েছিলেন। এই আয়াত ফাসেকের খবর অগ্রহণীয় হওয়া সম্পর্কে একটি সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করেছে এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ আয়াত অবতরণের ফলে বিষয়টি এভাবে আরও জোরদার হয়েছে যে, ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ) ফাসেক না হলেও তাঁর খবর শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা অগ্রহণীয় মনে হয়েছে। তাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কেবল তাঁর খবরের ভিত্তেতেই ব্যবস্থা গ্রহণ না করে খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)-কে তদন্তের আদেশ দেন। সুতরাং একজন সৎ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির খবরের ইঙ্গিতের ভিত্তিতে সন্দেহ হওয়ার কারণে যখন তদন্ত না করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না, তখন ফাসেকের খবর কবুল না করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা আরও সুস্পষ্ট। সাহাবীগণের 'আদালত' সম্পর্কিত আলোচনার কিছু অংশ পরবর্তী وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ আয়াতেও বর্ণিত হবে।

এর আগের আয়াতে ওলীদ ইবনে ওকবা মুস্তালিক গোত্র সম্পর্কে খবর দিয়েছিল যে, তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। এতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও উত্তেজনা দেখা দেয়। তাঁদের মত ছিল যে, মুস্তালিক গোত্রের বিপক্ষে যুদ্ধাভিযান করা হোক। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওলীদ ইবনে ওকবার খবরকে শক্তিশালী ইঙ্গিতের খেলাফ মনে করে কবুল করেননি এবং তদন্তের জন্যে খালেদ ইবনে ওলীদকে আদেশ করেন। আগের আয়াতে কোরআন এ বিষয়কে আইনের রূপ দান করেছে যে, যে ব্যক্তির খবরে শক্তিশালী ইঙ্গিতের মাধ্যমে সন্দেহ দেখা দেয়, তদন্তের পূর্বে তার খবর অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াতে সাহাবায়ে কেরামকে আরও একটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যদিও বনী-মুস্তালিক সম্পর্কিত খবর শুনে তোমাদের উত্তেজনা ধর্মীয় মর্যাদাবোধের কারণে ছিল; কিন্তু তোমাদের মতামত নির্ভুল ছিল না। রসূলের অবলম্বিত পন্থাই উত্তম ছিল।—(মাযহারী) উদ্দেশ্য এই যে, পরামর্শ সাপেক্ষ ব্যাপারাদিতে কোন মত পেশ করা তো দুরস্ত; কিন্তু এরূপ চেষ্টা করা যে, রসূল (সাঃ) এই মত অনুযায়ীই কাজ করুন, এটা দুরস্ত নয়। কেননা, সাংসারিক ব্যাপারাদিতে যদিও খুব কমই রসূলের মতামত উপযোগিতার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা নবুওয়তের পরিপন্থী নয়, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূলকে যে দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন, তা তোমাদের নেই। তাই রসূল যদি তোমাদের মতামত মেনে চলেন, তবে অনেক ব্যাপারে তোমাদের কষ্ট ও বিপদ হবে। যদি কুত্রাপি কোথাও তোমাদের মতামতের মধ্যেই উপযোগিতা নিহিত থাকে এবং তোমরা রসূলের আনুগত্যের খাতিরে নিজেদের মতামত পরিত্যাগ কর, যাতে তোমাদের সাংসারিক ক্ষতিও হয়ে যায়, তবে তাতে ততটুকু ক্ষতি নেই, যতটুকু তোমাদের মতামত মেনে চলার মধ্যে আছে। কেননা, এমতাবস্থায় কিছু সাংসারিক ক্ষতি হয়ে গেলেও রসূলের আনুগত্যের পুরস্কার ও সওয়াব এর চমৎকার বিকল্প বিদ্যমান আছে। عَنِتُّم শব্দটি عَنَت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ গোনাহ্ও হয় এবং কোন বিপদে পতিত হওয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে।—(কুরতুবী)

শানে-নুযূল ঃ এসব আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে তফসীরবিদগণ একাধিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনায় খোদ মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়বস্তু আছে। এখন সকল ঘটনার সমষ্টি আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে অথবা কোন একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্য ঘটনাগুলোকে অনুরূপ দেখে সেগুলোকেও অবতরণের কারণের মধ্যে শরীক করে দেয়া হয়েছে। এই আয়াতে আসলে যুদ্ধ ও জেহাদের সরঞ্জাম ও উপকরণের অধিকারী রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করা হয়েছে।—(বাহ্র, রুহুল মা'আনী) পরোক্ষভাবে সকল মুসলমানকেও সম্বোধন করা হয়েছে যে, তারা এ ব্যাপারে রাজন্যবর্গের সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানে কোন ইমাম, আমীর, সরদার, অথবা বাদশাহ্ নেই, সেখানে যতদূর সম্ভব বিবদমান উভয়পক্ষকে উপদেশ দিয়ে যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত করতে হবে। যদি উভয়ই সম্মত না হয়, তবে তাদের থেকে পৃথক থাকতে হবে। কারও বিরোধিতা এবং কারও পক্ষ অবলম্বন করা যাবে না।—(বয়ানুল-কোরআন)

মাসায়েল ঃ মুসলমানদের দুই দলের যুদ্ধ কয়েক প্রকার হতে পারে। বিবদমান উভয় দল ইমামের শাসনাধীন হবে কিংবা উভয়দল শাসনাধীন হবে না কিংবা একদল শাসনাধীন হবে এবং অন্যদল শাসন বহির্ভূত হবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে উপদেশের মাধ্যমে উভয়দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। যদি উপদেশে বিরত না হয়, তবে ইমামের পক্ষ থেকে মীমাংসা করা ওয়াজেব। যদি ইসলামী সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে উভয়পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করে, তবে কেসাস ও রক্তবিনিময়ের বিধান প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় উভয়পক্ষের সাথে বিদ্রোহীর ব্যবহার করা হবে। এক পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত হলে এবং অপর পক্ষ জুলুম ও নির্যাতন অব্যাহত রাখলে দ্বিতীয় পক্ষকে বিদ্রোহী মনে করা হবে এবং প্রথম পক্ষকে আদেল বলা হবে। বিদ্রোহীদের প্রতি প্রযোজ্য বিস্তারিত বিধান ফেকাহ্ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সংক্ষেপে বিধান এই যে, যুদ্ধের আগে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা হবে। যুদ্ধরত অবস্থায় কিংবা যুদ্ধের পর তাদের সন্তান-সন্ততিকে গোলাম অথবা বাঁদী করা হবে না এবং তাদের ধন-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ বলে গণ্য হবে না। তবে তওবা না করা পর্যন্ত ধন-সম্পদ আটক রাখা হবে। তওবার পর প্রত্যার্পন করা হবে। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا অর্থাৎ, যদি বিদ্রোহী দল বিদ্রোহ ও যুদ্ধ থেকে বিরত হয় তবে শুধু যুদ্ধ বিরতিই যথেষ্ট হবে না; বরং যুদ্ধের কারণ ও পারস্পরিক অভিযোগ দূর করার চেষ্টা কর, যাতে কোন পক্ষের মনে বিদ্বেষ ও শত্রুতা অবশিষ্ট না থাকে এবং স্থায়ী ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তারা যেহেতু ইমামের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে, তাই তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি ইনছাফ না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই কোরআন পাক উভয় পক্ষের অধিকারের ব্যাপারে ইনছাফের তাকীদ করেছে।—(বয়ানুল-কোরআন)

মাসআলা ঃ যদি মুসলমানদের কোন শক্তিশালী দল ইমামের বশ্যতা অস্বীকার করে, তবে ইমামের কর্তব্য হবে সর্বপ্রথম তাদের অভিযোগ শ্রবণ করা, তাদের কোন সন্দেহ কিংবা ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা দূর করা। তারা যদি তাদের বিরোধিতার শরীয়তসম্মত বৈধ কারণ উপস্থিত করে, যদ্দ্বারা খোদ ইমামের অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রমাণিত হয়, তবে সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে এই দলের সাহায্য ও সমর্থন করা, যাতে ইমাম যুলুম থেকে বিরত হয়। এক্ষেত্রে ইমামের যুলুম নিশ্চিত ও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হওয়া শর্ত।—(মাযহারী)

পক্ষান্তরে যদি তারা তাদের বিদ্রোহ ও আনুগত্য বর্জনের পক্ষে কোন সুস্পষ্ট ও সঙ্গত কারণ পেশ করতে না পারে এবং ইমামের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের যুদ্ধে লিপ্ত

হওয়া হালাল। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, তারা যুদ্ধ শুরু না করা পর্যন্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করা জায়েয হবে না।—(মাযহারী)

এই বিধান তখন, যখন এই দেশের বিদ্রোহী ও অত্যাচারী হওয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায়। যদি উভয় পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণ রাখে এবং কে বিদ্রোহী ও কে আদেল, তা নির্দিষ্ট করা কঠিন হয়, তবে প্রত্যেক মুসলমানই নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী যে পক্ষকে আদেল মনে করবে সেই পক্ষকে সাহায্য ও সমর্থন করতে পারে। যার এরূপ কোন প্রবল ধারণা নেই, সে নিরপেক্ষ থাকবে, যেমন জমল ও ছিফফীন যুদ্ধে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ ঃ ইমাম আবুবকর ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন ঃ এই আয়াত মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের যাবতীয় প্রকারের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে। সেসব দ্বন্দ্ব-কলহও এই আয়াতের মধ্যে দাখিল, যাতে উভয় পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণের ভিত্তিতে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরামের বাদানুবাদ এই প্রকারের মধ্যে পড়ে। কুরতুবী ইবনে আরাবীর এই উক্তি উদ্ধৃত করে এ স্থলে সাহাবায়ে-কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ তথা জঙ্গে-জমল ও সিফফীনের আসল স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে পরবর্তী যুগের মুসলমানদের কর্মপন্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এখানে কুরতুবীর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

কোন সাহাবীকে অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে ভ্রান্ত বলা জায়েয নয়। কারণ, তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমেই নিজ নিজ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিলেন। সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ। তাঁরা সবাই আমাদের নেতা। আমাদের প্রতি নির্দেশ এই যে, আমরা যেন তাঁদের পারস্পরিক বিরোধ সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকি এবং সর্বদা উত্তম পন্থায় তাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করি। কেননা, সাহাবী হওয়া বড়ই সম্মানের বিষয়। নবী করীম (সাঃ) তাঁদেরকে মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। এছাড়া বিভিন্ন সনদে এই হাদীস প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত তালহা (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন ঃ ان طلحة شهيد يمشى على وجه الارض - অর্থাৎ, তালহা ভূপৃষ্ঠে চলাফেরাকারী শহীদ।

এখন হযরত আলীর বিরুদ্ধে হযরত তালহার যুদ্ধের জন্যে বের হওয়া প্রকাশ্য গোনাহ্ ও নাফরমানী হলে এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে তিনি কিছুতেই শাহাদতের মর্যাদা লাভ করতে পারতেন না। এমনিভাবে হযরত তালহার এই কাজকে ভ্রান্ত এবং কর্তব্য পালনে ত্রুটি সাব্যস্ত করা সম্ভব হলেও তাঁর জন্যে শাহাদতের মর্তবা অর্জিত হত না। কারণ, শাহাদত একমাত্র তখনই অর্জিত হয়, যখন কেউ আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়। কাজেই তাঁদের ব্যাপারে পূর্ববর্ণিত বিশ্বাস পোষণ করাই জরুরী।

এ ব্যাপারে খোদ হযরত আলী থেকে বর্ণিত সহীহ্ ও মশহুর হাদীস দ্বিতীয় প্রমাণ। তাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ যুবায়রের হত্যাকারী জাহান্নামে আছে।

হযরত আলী বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে একথা বলতে শুনেছি, সফিয়্যা-তনয়ের হত্যাকারীকে জাহান্নামের খবর দিয়ে দাও। অতএব, প্রমাণিত হল যে, হযরত তালহা ও হযরত যুবায়র এই যুদ্ধের কারণে পাপী ও গোনাহ্গার ছিলেন না। এরূপ হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত তালহাকে শহীদ বলতেন না এবং যুবায়রের হত্যাকারী সম্পর্কে জাহান্নামের ভবিষ্যদ্বাণী করতেন না। এছাড়া তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জন সাহাবীর অন্যতম। তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য প্রায় সর্ববাদিসম্মত।

এমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা এসব যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিলেন, তাঁদেরকেও ভ্রান্ত বলা যায় না। আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে ইজতিহাদের মাধ্যমে এ মতের উপরই কায়েম রেখেছেন—এদিক দিয়ে তাঁদের কর্মপন্থাও সঠিক ছিল। সুতরাং এ কারণে তাঁদেরকে ভর্ৎসনা করা, তাঁদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তাঁদেরকে ফাসেক সাব্যস্ত করা এবং তাদের ফযীলত, সাধনা ও মহান ধর্মীয় মর্যাদা অস্বীকার করা কিছুতেই দুরস্ত নয়। জনৈক আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ সাহাবায়ে-কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদের ফলস্বরূপ যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি জওয়াবে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ, সেই উম্মত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাদের কাজকর্ম তাদের জন্যে এবং তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্যে। তারা কি করত না করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

একই প্রশ্নের জওয়াবে অন্য একজন বুযুর্গ বলেন ঃ এটা এমন রক্ত যে, আল্লাহ্ এর দ্বারা আমার হাতকে রঞ্জিত করেননি। এখন আমি আমার জিহ্বাকে এর সাথে জড়িত করতে চাই না। উদ্দেশ্য এই যে, আমি কোন এক পক্ষকে কোন ব্যাপারে নিশ্চিত ভ্রান্ত সাব্যস্ত করার ভুলে লিপ্ত হতে চাই না।

আল্লামা ইবনে ফওর বলেন ঃ আমাদের একজন সহযোগী বলেছেন যে, সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যবর্তী বাদানুবাদ ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর অনুরূপ। তাঁরা পারস্পরিক বিরোধ সত্ত্বেও বেলায়েত ও নবুওয়তের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যাননি। সাহাবায়ে-কেরামের পারস্পরিক ঘটনাবলীর ব্যাপারটিও হুবহু তাই।

হযরত মুহাসেবী বলেন ঃ সাহাবায়ে-কেরামের পারস্পরিক রক্তপাতের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কিছু মন্তব্য করা সুকঠিন। কেননা, এ ব্যাপারে খোদ সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। হযরত হাসান বছরী সাহাবীদের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন ঃ এসব যুদ্ধে সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা অনুপস্থিত। তাঁরা সম্পূর্ণ অবস্থা জানতেন। আমরা জানি না। যে ব্যাপারে সব সাহাবী একমত আমরা তাতে তাঁদের অনুসরণ করব এবং যে ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে, সেই ব্যাপারে আমরা নিশ্চুপ থাকব।

হযরত মুহাসেবী (রহঃ) বলেন ঃ আমিও তাই বলি, যা হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন। আমি জানি তাঁরা যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন, সে ব্যাপারে তাঁরা আমাদের চাইতে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাই তাঁদের সর্বসম্মত বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ করা এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকাই আমাদের কাজ। আমাদের তরফ থেকে নতুন কোন পথ আবিষ্কার করা অনুচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমে কাজ করেছিলেন এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করেছিলেন। তাই ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা সবাই সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে।

সূরা হুজুরাতের শুরুতে নবী করীম (সাঃ)-এর হক ও আদব, অতঃপর সাধারণ মুসলমানদের পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতি-নীতি বর্ণিত

হয়েছে। এর পূর্ববর্তী দুই আয়াতে মুসলমানদের দলগত সংশোধনের বিধান উল্লেখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক হক, আদব ও সামাজিক রীতি-নীতি বিবৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (এক) কোন মুসলমানকে ঠাট্টা ও উপহাস করা, (দুই) কাউকে দোষারোপ করা এবং (তিন) কাউকে অপমানকর অথবা পীড়াদায়ক নামে ডাকা।

কুরতুবী বলেন ঃ কোন ব্যক্তিকে হেয় ও অপমান করার জন্যে তার কোন দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা, যাতে শ্রোতারা হাসতে থাকে, তাকে استهزاء ও تمسخر - سخرية বলা হয়। এটা যেমন মুখে সম্পন্ন হয়, তেমনি হস্তপদ ইত্যাদি দ্বারা ব্যঙ্গ অথবা ইঙ্গিতের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে থাকে। কারও কথা শুনে অপমানের ভঙ্গিতে বিদ্রূপ করার মাধ্যমেও হতে পারে। কেউ কেউ বলেন ঃ শ্রোতাদের হাসির উদ্রেক করে, এমনভাবে কারও সম্পর্কে আলোচনা করাকে تمسخر ও سخرية বলা হয়। কোরআনের বর্ণনা মতে এগুলো সব হারাম।

কোরআন পাক এত গুরুত্ব সহকারে سخرية তথা উপহাস নিষিদ্ধ করেছে যে, এক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী জাতীকে পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। পুরুষদের জন্যে কওম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, অভিধানে এ শব্দটি পুরুষদের জন্যেই বির্ধারিত, যদিও রূপকভঙ্গিতে নারীদেরকেও শামিল করা হয়ে থাকে। কোরআন পাক সাধারণতঃ পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যে কওম শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু কোরআন এখানে কওম শব্দটি বিশেষভাবে পুরুষদের জন্যে ব্যবহার করেছে এবং এর বিপরীতে نِسَآءٌ শব্দের মাধ্যমে নারীদের কথা উল্লেখ করেছে। উভয়কে বলা হয়েছে যে, যে পুরুষ অপর পুরুষকে উপহাস করে, সে আল্লাহ্র কাছে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। কোরআনে পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে উপহাস করা ও তা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ; অথচ কোন পুরুষ নারীকে এবং কোন নারী পুরুষকে উপহাস করলে তা-ও হারাম। কিন্তু একথা উল্লেখ না করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নারী ও পুরুষের মেলামেশাই শরীয়তে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। মেলামেশা না হলে উপহাসের প্রশ্নই উঠে না। আয়াতের সারমর্ম এই যে, কোন ব্যক্তির দেহে, আকার-আকৃতিতে অথবা গঠনপ্রকৃতিতে কোন দোষ দৃষ্টিগোচর হলে তা নিয়ে কারও হাসাহাসি অথবা উপহাস করা উচিত নয়। কেননা, তার জানা নেই যে, সম্ভবতঃ এই ব্যক্তি সততা, আন্তরিকতা ইত্যাদির কারণে আল্লাহ্র কাছে তার চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। এ আয়াতে পূর্ববর্তী বুযুর্গ ও মনীষীদের অন্তরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমর ইবনে শোরাহ্বিল (রাঃ) বলেন ঃ কোন ব্যক্তিকে বকরীর স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করতে দেখে যদি আমার হাসির উদ্রেক হয়, তবে আমি আশংকা করতে থাকি যে, কোথাও আমিও এরূপই না হয়ে যাই। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ কোন কুকুরকেও উপহাস করতে আমার ভয় লাগে, আমিও নাকি কুকুর হয়ে যাই।—(কুরতুবী)

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)- এর রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের আকার-আকৃতি ও ধন-দৌলতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। কুরতুবী বলেন ঃ এই হাদীস থেকে এই বিধি ও মূলনীতি জানা যায় যে, কোন ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে নিশ্চিতরূপে ভাল অথবা মন্দ বলে দেয়া জায়েয নয়। কারণ, যে ব্যক্তির বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মকে আমরা খুব ভাল মনে করছি, সে আল্লাহ্র কাছে নিন্দনীয় হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তরগত গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা ও ক্রিয়াকর্ম মন্দ, তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তরগত গুণাগুণ তার কুকর্মের কাফফারা হয়ে যেতে পারে। তাই যে ব্যক্তিকে মন্দ অবস্থা ও কুকর্মে লিপ্ত দেখ, তার এই অবস্থাকে মন্দ মনে কর, কিন্তু তাকে হেয় ও লাঞ্ছিত মনে করার অনুমতি নেই। আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে لمز -এর অর্থ কারও দোষ বের করা, দোষ প্রকাশ করা এবং দোষের কারণে ভর্ৎসনা করা, এরশাদ হয়েছে- وَلَا تَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ অর্থাৎ, তোমারা নিজেদের দোষ বের করো না। এই বাক্যটি وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ -এর মতই, যার অর্থ তোমরা পরস্পরে একে অন্যকে হত্যা করো না এবং নিজেদের দোষ বের করার অর্থ এই যে, একে অন্যের দোষ বের করো না। এরূপ ভঙ্গিতে দোষ ব্যক্ত করার রহস্য একথা বলা যে, অপরকে হত্যা করা একদিক দিয়ে নিজেকেই হত্যা করার শামিল। কেননা, প্রায়ই তো এরূপ হয়েই যায় যে, একজন অন্যজনকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির সমর্থকরা তাকেও হত্যা করে। এটা না হলেও প্রকৃত সত্য এই যে, মুসলমান সব ভাই ভাই। ভাইকে হত্যা করা যেন নিজেকে হত্যা করা এবং হস্তপদ বিহীন করে দেয়া।- وَلَا تَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ -এর অর্থ তা-ই। অর্থাৎ, তোমরা অন্যের দোষ বের করলে, সেও তোমাদের দোষ বের করবে। কারণ, দোষ থেকে কোন মানুষ মুক্ত নয়। জনৈক আলেম বলেন ঃ وفيك عيوب وللناس اعين অর্থাৎ, তোমার মধ্যেও দোষ আছে এবং মানুষের চক্ষু আছে। তারা দোষ দেখে। তুমি কারও দোষ বের করলে সেও তোমার দোষ বের করবে। যদি সে সবর করে, তবে সে কথাই বলতে হবে যে, মুসলমান ভাইয়ের দুর্নাম নিজেরই দুর্নাম।

আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, অপরকে মন্দ নামে ডাকা, যদ্দরুন সে অসন্তুষ্ট হয়। উদাহরণতঃ কাউকে খঞ্জ, খোঁড়া অথবা অন্ধ বলে ডাকা অথবা অপমানজনক নামে সম্বোধন করা। হযরত আবু জুবায়ের আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ এই আয়াত আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আমাদের অধিকাংশ লোকের দুই তিনটি করে নাম খ্যাত ছিল। তন্মধ্যে কোন কোন নাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লজ্জা দেয়া ও লাঞ্ছিত করার জন্য লোকেরা খ্যাত করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা জানতেন না। তাই মাঝে মাঝে সেই মন্দ নাম ধরে তিনিও সম্বোধন করতেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম বলতেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, সে এই নাম শুনলে অসন্তুষ্ট হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ এর অর্থ হচ্ছে কেউ কোন গোনাহ্ অথবা মন্দকাজ করে তওবা করার পরও তাকে সেই মন্দকাজের নামে ডাকা। উদাহরণতঃ চোর, ব্যভিচারী অথবা শরাবী বলে সম্বোধন করা। যে ব্যক্তি চুরি, যেনা, শরাব ইত্যাদি থেকে তওবা করে নেয়, তাকে অতীত কুকর্ম দ্বারা লজ্জা দেয়া ও হেয় করা হারাম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন গোনাহ্ দ্বারা লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তওবা করেছে, তাকে সেই গোনাহে লিপ্ত করে ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছিত করার দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা গ্রহণ করেন।-(কুরতুবী)

কোন কোন নামের ব্যতিক্রমঃ কোন কোন লোকের এমন নাম খ্যাত হয়ে যায়, যা আসলে মন্দ, কিন্তু এই নাম ব্যতীত কেউ তাকে চেনে না। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হেয় লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা না থাকলে তাকে এই নামে ডাকা জায়েয। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। যেমন, কোন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۳﴾ قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴﴾ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿۱۵﴾ قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۶﴾ يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ؕ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۷﴾ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾

(১২) মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ্। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (১৩) হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন। (১৪) মরুবাসীরা বলে ঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুন ঃ তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি; বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল করা হবে না। নিশ্চয়, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। (১৫) তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্‌র পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ। (১৬) বলুন ঃ তোমরা কি তোমাদের ধর্ম পরায়ণতা সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে এবং যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (১৭) তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না। বরং আল্লাহ্ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক। (১৮) আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয় জানেন, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।

কোন মুহাদ্দেসের নামের সাথে اعرج . احدب ইত্যাদি খ্যাত আছে। খোদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জনৈক অপেক্ষাকৃত লম্বা হাতবিশিষ্ট সাহাবীকে ذو اليدين নামে পরিচিত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ হাদীসের সনদে কতক নামের সাথে কিছু পদবী যুক্ত হয়; যেমন مروان الاخضر . سليمان الاعمش ـ حميد الطويل ইত্যাদি। এসব পদবী সহকারে নাম উল্লেখ করা জায়েয কি না? তিনি বললেন ঃ দোষ বর্ণনা করার ইচ্ছা না থাকলে এবং পরিচয় পূর্ণ করার ইচ্ছা থাকলে জায়েয।—(কুরতুবী)

ভাল নামে ডাকা সুন্নত ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ মুমিনের হক অপর মুমিনের উপর এই যে, তাকে অধিক পছন্দনীয় নাম ও পদবী সহকারে ডাকবে। একারণেই আরবে ডাকনামের প্রচলন ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)ও তা পছন্দ করেছিলেন। তিনি বিশেষ বিশেষ সাহাবীকে কিছু পদবী দিয়েছিলেন-হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে আতীক, হযরত ওমর (রাঃ)-কে ফারূক, হযরত হামযা (রাঃ)-কে আসাদুল্লাহ্ এবং খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)-কে সাইফুল্লাহ্ পদবী দান করেছিলেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই আয়াতেও পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি ব্যক্ত হয়েছে এবং এতেও তিনটি বিষয় হারাম করা হয়েছে। (এক) ظن তথা ধারণা, (দুই) تجسس অর্থাৎ, কোন গোপন দোষ সন্ধান করা এবং (তিন) গীবত অর্থাৎ, কোন অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে শুনলেও অসহনীয় মনে করত। প্রথম বিষয় ظن এর অর্থ প্রবল ধারণা। এ সম্পর্কে কোরআন প্রথমতঃ বলেছে যে, অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। এরপর কারণস্বরূপ বলা হয়েছে, কতক ধারণা পাপ। এ থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক ধারণাই পাপ নয়। অতএব, কোন্ ধারণা পাপ, তা জেনে নেয়া ওয়াজিব হবে, যাতে তা থেকে আত্মরক্ষা করা যায় এবং জায়েয না জানা পর্যন্ত তার কাছেও না যায়। আলেম ও ফেকাহ্‌বিদগণ এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কুরতুবী বলেন ঃ ধারণা বলে এস্থলে অপবাদ বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, কোন ব্যক্তির প্রতি শক্তিশালী প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন দোষ অথবা গোনাহ্ আরোপ করা। ইমাম আবু বকর জাসসাস আহকামুল কোরআন গ্রন্থে এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ধারণা চার প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার হারাম, দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজিব, তৃতীয় প্রকার মুস্তাহাব এবং চতুর্থ প্রকার জায়েয। হারাম ধারণা এই যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কুধারণা রাখা যে, তিনি আমাকে শাস্তিই দেবেন অথবা বিপদেই রাখবেন। এটা যেন আল্লাহ্‌র মাগফেরাত ও রহমত থেকে নৈরাশ্য। হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ لايموتن احدكم الاوهو يحسن الظن بالله তোমাদের কারও আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়। অন্য এক হাদীসে আছে انا عند ظن عبدى بى -অর্থাৎ, আমি আমার বঞ্চন্দার সাথে তেমনি ব্যবহার করি, যেমন সে আমার সম্বন্ধে ধারণা রাখে। এখন সে আমার প্রতি যা ইচ্ছা ধারণা রাখুক। এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা ফরয এবং কুধারণা পোষণ করা হারাম। এমনিভাবে যেসব মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্মপরায়ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের সম্পর্কে প্রমাণ ব্যতিরেকে কুধারণা পোষণ করা হারাম। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث অর্থাৎ, ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর। এখানে সবার মতেই ধারণা বলে প্রমাণ ব্যতিরেকে মুসলমানের

প্রতি কুধারণা বোঝানো হয়েছে। যেসব কাজের কোন এক দিককে আমলে আনা আইনতঃ জরুরী এবং সে সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই; সেখানে প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব; যেমন পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ ও মোকদ্দমার ফয়সালায় নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফয়সালা দেয়া। কারণ, যে বিচারকের আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়, তার জন্যে ফয়সালা দেয়া জরুরী ও ওয়াজিব এবং এই বিশেষ ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে কোন বর্ণনা নেই। এমতাবস্থায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করা বিচারকের জন্যে জরুরী। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরও মিথ্যা বলার সম্ভাবনা থাকে। তার সত্যবাদিতা নিছক একটা প্রবল ধারণা মাত্র। সেমতে এই ধারণা অনুযায়ী আমল করাই ওয়াজিব। এমনিভাবে যে জায়গায় কেবলার দিক অজ্ঞাত থাকে এবং জেনে নেয়ার মত কোন লোকও না থাকে, সেখানে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তির উপর কোন বস্তুর ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব হলে সেই বস্তুর মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারেও প্রবল ধারণা অনুযায়ীই আমল করা ওয়াজিব। জায়েয ধারণা এমন, যেমন নামাযের রাকআত সম্পর্কে সন্দেহ হল যে, তিন রাকআত পড়া হয়েছে, না চার রাকআত। এমতাবস্থায় প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা জায়েয। যদি সে প্রবল ধারণা বাদ দিয়ে নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ, তিন রাকআত সাব্যস্ত করে চতুর্থ রাকআত পড়ে নেয়, তবে তাও জায়েয। প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব। এর জন্যে সওয়াবও পাওয়া যায়।—(জাসসাস)

কুরতুবী বলেনঃ কোরআনে বলা হয়েছেঃ

لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا –এতে মুমিনদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার তাগিদ আছে। অপর পক্ষে একটি সুবিদিত বাক্য আছে অর্থাৎ, প্রত্যেকের প্রতি কুধারণা পোষণ করাই সাবধানতা। এর উদ্দেশ্য এই যে, কুধারণার বশবর্তী হয়ে যেরূপ ব্যবহার করা হয়, প্রত্যেকের সাথে সেইরূপ ব্যবহার করবে। অর্থাৎ, আস্থা ব্যতিরেকে নিজের জিনিস কাউকে সোপর্দ করবে না। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অপরকে চোর মনে করে লাঞ্ছিত করবে। মোটকথা, কোন ব্যক্তিকে চোর অথবা বিশ্বাসঘাতক মনে না করে নিজের ব্যাপারে সতর্ক হবে।

আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে تجسس অর্থাৎ, কারও দোষ সন্ধান করা। এই শব্দে দু'টি কেরাআত আছে। (এক) لَا تَجَسَّسُوا জীম সহকারে এবং (দুই) لاتحسسوا হা সহকারে। আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে এই দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে لاتجسسوا ولاتحسسوا উভয় শব্দের অর্থ কাছাকাছি। আখফাশ উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, জীম সহকারে تجسس এর অর্থ কোন গোপন বিষয় সন্ধান করা এবং হা-সহকারে تحسس এর অর্থ সাধারণ সন্ধান করা। সূরা ইউসুফে فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ আয়াতে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে দোষ তোমার সামনে আছে, তা ধরতে পার, কিন্তু কোন মুসলমানের যে দোষ প্রকাশ্য নয়, তা সন্ধান করা জায়েয নয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

لاتغتابوا المسلمين ولاتتبعوا عوراتهم فان من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بيته

মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ্ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ্‌র যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্বগৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন।–(কুরতুবী)

বয়ানুল-কোরআনে আছে, গোপনে অথবা নিদ্রার ভান করে কারও কথাবার্তা শোনাও নিষিদ্ধ, تجسس এর অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে কিংবা নিজের অথবা অন্য মুসলমানের হেফাযতের উদ্দেশ্য থাকে, তবে ক্ষতিকারীর গোপন ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি অনুসন্ধান জায়েয। আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে গীবত। অর্থাৎ, কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কষ্টকর কথাবার্তা বলা, যদিও তা সত্যকথা হয়। কেননা, মিথ্যা হলে সেটা অপবাদ, যা কোরআনের অন্য আয়াত দ্বারা হারাম। এখানে ''অনুপস্থিতিতে'' কথা থেকে এরূপ বোঝা সঙ্গত নয় যে, উপস্থিতিতে কষ্টকর কথা বলা জায়েয হবে। কেননা, এটা গীবত নয়, কিন্তু لمز তথা দোষ বের করার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী আয়াতে এর নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে।

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا – এই আয়াত কোন মুসলমানের বেইজ্জতী ও অপমানকে তার গোশত খাওয়ার সমতুল্য সাব্যস্ত করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত থাকলে এই বেইজ্জতী জীবিত মানুষের গোশত টেনে ভক্ষণ করার সমতুল্য হবে। لمز শব্দের মাধ্যমে কোরআন একে হারাম সাব্যস্ত করেছে ; যেমন বলা হয়েছে, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ এবং আরও পরে এক আয়াত আসবে وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ – সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত না থাকলে তার পশ্চাতে কষ্টদায়ক কথাবার্তা বলা মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য। মৃত মানুষের গোশত ভক্ষণ করলে যেমন তার কোন কষ্ট হয় না, তেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তি যে পর্যন্ত গীবতের কথা না জানে, তারও কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু কোন মৃত মুসলমানের গোশত খাওয়া যেমন হারাম ও চূড়ান্ত নীচতা, তেমনি গীবত করাও হারাম এবং নীচতা। কারণ, অসাক্ষাতে কাউকে মন্দ বলা কোন বীরত্বের কাজ নয়।

এই আয়াতে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করতে গিয়ে গীবতের নিষিদ্ধতাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং একে মৃত মুসলমানের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য প্রকাশ করে এর নিষিদ্ধতা ও নীচতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, কারও উপস্থিতিতে তার দোষ প্রকাশ করা পীড়াদানের কারণে হারাম, কিন্তু তার প্রতিরোধ সে নিজেও করতে পারে। প্রতিরোধের আশংকায় প্রত্যেকেরই এরূপ দোষ প্রকাশ করার সাহসও হয় না এবং এটা স্বভাবতঃই বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে গীবতের মধ্যে কোন প্রতিরোধকারী থাকে না। নীচ থেকে নীচতর ব্যক্তি কোন উচ্চতর ব্যক্তির গীবত অনায়াসে করতে পারে। প্রতিরোধ না থাকার কারণে এর ধারা সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়ে থাকে এবং এতে মানুষ লিপ্তও হয় বেশী। এসব কারণে গীবতের নিষিদ্ধতার উপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য করা হয়েছে যে, কেউ গীবত শুনলে তার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ করবে। প্রতিরোধের শক্তি না থাকলে কমপক্ষে তা শ্রবণ থেকে বিরত থাকবে। কেননা, ইচ্ছাকৃতভাবে গীবত শোনাও নিজে গীবত করার মতই।

হযরত মায়মুন (রাঃ) বলেনঃ একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, জনৈক সঙ্গী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং একব্যক্তি আমাকে বলছে একে ভক্ষণ কর। আমি বললাম আমি একে কেন ভক্ষণ করব? সে বললঃ

কারণ, তুমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গী গোলামের গীবত করেছ। আমি বললাম ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি তো তার সম্পর্কে কখনও কোন ভালমন্দ কথা বলিনি। সে বলল ঃ হাঁ, একথা ঠিক, কিন্তু তুমি তার গীবত শুনেছ এবং এতে সম্মত রয়েছ। এই ঘটনার পর হযরত মায়মুন (রাঃ) নিজে কখনও কারও গীবত করেননি এবং তাঁর মজলিসে কারও গীবত করতে দেননি।

হযরত হাসান ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত শবে মে'রাজের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে নিয়ে যাওয়া হলে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম যাদের নখ ছিল তামার। তারা তাদের মুখমণ্ডল ও দেহের মাংস আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা? তিনি বললেন ঃ এরা তাদের ভাইয়ের গীবত করত এবং তাদের ইজ্জতহানি করত।-(মাযহারী)

হযরত আবু সায়ীদ (রাঃ) ও জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, الغيبة اشد من الزنا অর্থাৎ, গীবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক গোনাহ্। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, এটা কিরূপে? তিনি বললেন, একব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তওবা করলে তার গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু যে গীবত করে, তার গোনাহ্ প্রতিপক্ষের মাফ না করা পর্যন্ত মাফ হয় না।—(মাযহারী)

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গীবতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক উভয়ই নষ্ট করা হয়। তাই যার গীবত করা হয়, তার কাছ থেকে মাফ নেয়া জরুরী। কোন কোন আলেম বলেন ঃ যার গীবত করা হয়, গীবতের সংবাদ তার কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত বান্দার হক হয় না। তাই তার কাছ থেকে ক্ষমা নেয়া জরুরী নয়।—(রুহুল-মা'আনী) কিন্তু বয়ানুল-কোরআনে একথা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে ঃ এমতাবস্থায় যদিও তার কাছে ক্ষমা চাওয়া জরুরী নয়, কিন্তু যার সামনে গীবত করা হয়, তার সামনে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলা এবং নিজ গোনাহ্ স্বীকার করা জরুরী। যদি সেই ব্যক্তি মারা যায়, কিংবা লাপাত্তা হয়ে যায়, তবে তার কাফ্ফারা এই যে, যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে মাগফেরাতের দোয়া করবে এবং এরূপ বলবে ঃ হে আল্লাহ্, আমার ও তার গোনাহ মাফ কর। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাই বলেছেন।

মাসআলা ঃ শিশু, উন্মাদ এবং কাফের যিম্মীর গীবতও হারাম। কেননা, তাদেরকে পীড়া দেয়াও হারাম। হরবী কাফেরকে পীড়া দেয়া হারাম না হলেও নিজের সময় নষ্ট করার কারণে তার গীবতও মাকরূহ্।

মাসআলা ঃ গীবত যেমন কথা দ্বারা হয়, তেমনি কর্ম ও ইশারা দ্বারাও হয়। উদাহরণতঃ খঞ্জকে হেয় করার উদ্দেশে তারমত হেঁটে দেখানো।

মাসআলাঃ কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে সব গীবতকেই হারাম করা হয়নি এবং কতক গীবতের অনুমতি আছে। উদাহরণতঃ কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে কারও দোষ বর্ণনা করা জরুরী হলে তা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, তবে প্রয়োজন ও উপকারিতাটি শরীয়তসম্মত হতে হবে। উদাহরণতঃ কোন অত্যাচারীর অত্যাচার কাহিনী এমন ব্যক্তির সামনে বর্ণনা করা, যে তার অত্যাচার দূর করতে সক্ষম। কারও সন্তান ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার পিতা ও স্বামীর কাছে অভিযোগ করা, কোন ঘটনা সম্পর্কে ফতওয়া গ্রহণ করার জন্যে ঘটনার বিবরণ দান করা, মুসলমানদেরকে কোন ব্যক্তির সাংসারিক অথবা পারলৌকিক অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে তার অবস্থা বর্ণনা করা, কোন ব্যাপারে পরামর্শ নেয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গোনাহ করে এবং নিজের পাপাচারকে নিজেই প্রকাশ করে, তার কুকর্ম আলোচনা করাও গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে নিজের সময় নষ্ট করার কারণে মাকরূহ্।-(বয়ানুল-কোরআন, রুহুল মা'আনী) এসব মাসআলায় অভিন্ন বিষয় এই যে,কারও দোষ আলোচনা করার উদ্দেশ্য তাকে হেয় করা না হওয়া চাই; বরং প্রয়োজনবশতঃই আলোচনা হওয়া চাই।

উপরের আয়াতসমূহে মানবিক ও ইসলামী অধিকার এবং সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে ছয়টি বিষয়কে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণ হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে মানবিক সাম্যের একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা রয়েছে যে, কোন মানুষ অপর মানুষকে যেন নীচ ও ঘৃণ্য মনে না করে বরং নিজের বংশগত মর্যাদা, পরিবার, অথবা ধন-সম্পদ ইত্যাদির ভিত্তিতে গর্ব না করে। কেননা, এগুলো প্রকৃতপক্ষে গর্বের বিষয় নয়। এই গর্বের কারণে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাই বলা হয়েছে ঃ সব মানুষ একই পিতা-মাতার সন্তান হওয়ার দিক দিয়ে ভাই ভাই এবং পরিবার, গোত্র, অথবা ধন-দৌলতের দিক দিয়ে যে প্রভেদ আল্লাহ্ তাআলা রেখেছেন, তা গর্বের জন্যে নয়, পারস্পরিক পরিচয়ের জন্যে।

শানে নুযূল ঃ এই আয়াত মক্কা বিজয়ের সময় তখন নাযিল হয়, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত বেলাল হাবশী (রাঃ)-কে মুয়াযযিন নিযুক্ত করেন। এতে মক্কার অমুসলমান কোরাইশদের একজন বলল ঃ আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ যে, আমার পিতা পূর্বেই মারা গেছেন। তাকে এই কুদিন দেখতে হয়নি। হারেস ইবনে হেশাম বলল ঃ মুহাম্মদ (সাঃ) মসজিদে হারামে আযান দেয়ার জন্যে এক কাল কাক ব্যতীত অন্য কোন মানুষ পেলেন না? আবু সুফিয়ান বলল ঃ আমি কিছুই বলব না; কারণ, আমার আশংকা হয় যে, আমি কিছু বললেই আকাশের মালিক তার (মুহাম্মদের) কাছে তা পৌঁছিয়ে দেবেন। এসব কথাবার্তার পর জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তাদের সব কথাবার্তা বলে দিলেন। তিনি তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি বলেছিলে? অগত্যা তাদেরকে স্বীকার করতে হল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, গর্ব ও ইজ্জতের বিষয় প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও তাকওয়া, যা তোমাদের মধ্যে নেই এবং হযরত বেলাল (রাঃ)-এর মধ্যে আছে। তাই তিনি তোমাদের চাইতে উত্তম ও সম্ভ্রান্ত।-(মাযহারী) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বীয় উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে তওয়াফ করেন। (যাতে সবাই তাঁকে দেখতে পারে।) তওয়াফ শেষে তিনি এই ভাষণ দেন ঃ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি অন্ধকার যুগের গর্ব ও অহংকার তোমাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন। এখন সব মানুষ মাত্র দুই ভাগে বিভক্ত ঃ (এক) সৎ, পরহেযগার ও আল্লাহ্‌র কাছে সম্ভ্রান্ত, (দুই) পাপাচারী, হতভাগা ও আল্লাহ্‌র কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।—(তিরমিযী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ দুনিয়ার মানুষের কাছে ইজ্জত হচ্ছে ধনসম্পদের নাম এবং আল্লাহ্‌র কাছে ইজ্জত পরহেযগারীর নাম।

شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ - শব্দটি شعب এর বহুবচন شعوب। এর অর্থ এক মূল থেকে উদ্ভূত বিরাট দল, যার মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ও পরিবার থাকে। বড়

পরিবার এবং তার বিভিন্ন অংশের জন্যেও আলাদা আলাদা নাম আছে। সর্ববৃহৎ অংশকে شعب এবং ক্ষুদ্রতম অংশকে عشيرة বলা হয়। আবু রওয়াফ বলেন ঃ অনারব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত নেই। তাদেরকে شعب বলা হয় এবং আরব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত আছে, তাদেরকে قبائل বলা হয়। اسباط শব্দটি বনী ইসরাঈলের জন্যে ব্যবহৃত হয়।

বংশগত, দেশগত, অথবা ভাষাগত পার্থক্যের তাৎপর্য পারস্পরিক পরিচয় ঃ কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে ফুটিয়ে তুলেছে যে, যদিও আল্লাহ্ তাআলা সব মানুষকে একই পিতা-মাতা থেকে সৃষ্টি করে ভাই ভাই করে দিয়েছেন, কিন্তু তিনিই তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন, যাতে মানুষের পরিচিতি ও সনাক্তকরণ সহজ হয়। উদাহরণতঃ একনামের দুই ব্যক্তি থাকলে পরিবারের পার্থক্য দ্বারা তাদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। মোটকথা, বংশগত পার্থক্যকে পরিচিতির জন্যে ব্যবহার করা—গর্ব নয়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে সম্মান ও আভিজাত্যের মাপকাঠি হচ্ছে পরহেযগারী। এই পরহেযগারী একটি অপ্রকাশ্য বিষয় যা আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। কোন ব্যক্তির পক্ষেই নিজের পবিত্রতার দাবী করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, ঈমানের আসল ভিত্তি হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে শুধু মুখে নিজেকে মুমিন বলা ঠিক নয়। সমগ্র সূরার প্রথমে নবী করীম (সাঃ)-এর হক, অতঃপর পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। উপসংহারে বলা হচ্ছে যে, আন্তরিক বিশ্বাস এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের উপরই পরকালে সৎকর্ম গ্রহণীয় হওয়ার ভিত্তি স্থাপিত।

শানে-নুযূল ঃ ইমাম বগভীর (রহঃ)-বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতটি অবতরণের ঘটনা এই যে, বনী-আসাদের কতিপয় ব্যক্তি নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সময় মদীনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তারা অন্তরগতভাবে মুমিন ছিল না। শুধু সদকা-খয়রাত লাভের জন্যে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করছিল। বাস্তবে মুমিন না হওয়ার কারণে ইসলামী বিধি-বিধান ও রীতিনীতি সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ও বেখবর ছিল। মদীনার পথে-ঘাটে তারা মলমূত্র ও আবর্জনা ছড়িয়ে দিল এবং বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়ে দিল। তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে একে তো ঈমানের মিথ্যা দাবী করল, দ্বিতীয়ত ঃ তাঁকে ধোঁকা দিতে চাইল এবং তৃতীয়ত ঃ মুসলমান হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ধন্য করেছে বলে প্রকাশ করল। তারা বলল ঃ অনান্য লোক দীর্ঘকাল পর্যন্ত আপনার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে, অনেক যুদ্ধ করেছে, এরপর মুসলমান হয়েছে। কিন্তু আমরা কোনরূপ যুদ্ধ ছাড়াই আপনার কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়েছি। কাজেই আমাদের সদিচ্ছাকে মূল্য দেয়া দরকার। এটা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শানে এক প্রকার ধৃষ্টতা। কারণ, এই মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করার পেছনে মুসলমানের সদকা-খয়রাত আকর্ষণ করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যদি তারা বাস্তবিকই খাঁটি মুসলমান হয়ে যেত, তবে এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নয়—স্বয়ং তাদেরই উপকার ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হয় এবং তাদের মিথ্যা দাবী ও অনুগ্রহ প্রকাশের মুখোশ উন্মোচন করা হয়।

وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا – তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না, শুধু বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে তারা মিথ্যা দাবী করছিল। তাই কোরআন তাদের ঈমান না থাকা এবং ঈমানের দাবী মিথ্যা হওয়ার কথা বর্ণনা করে বলেছে ঃ তোমাদের "ঈমান এনেছি" বলা মিথ্যা। তোমরা বড় জোর اَسْلَمْنَا "ইসলাম কবুল করেছি" বলতে পার। কেননা, ইসলামের শাব্দিক অর্থ বাহ্যিক কাজকর্মে আনুগত্য করা। তারা তাদের ঈমানের দাবী সত্য প্রতিপন্ন করার জন্যে কিছু কাজকর্ম মুসলমানদের মত করতে শুরু করেছিল। তাই আক্ষরিক দিক দিয়ে এক প্রকার আনুগত্য হয়ে গিয়েছিল। অতএব, আভিধানিক অর্থে اَسْلَمْنَا বলা শুদ্ধ ছিল।

ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে সম্পর্ক ঃ উপরের বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ইসলামের আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে—পারিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। তাই আয়াতে এ বিষয়ের প্রমাণ হতে পারে না যে, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পরিভাষাগত পার্থক্য আছে। পারিভাষিক ঈমান ও পারিভাষিক ইসলাম অর্থের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। শরীয়তের পরিভাষায় অন্তরগত বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, অর্থাৎ, অন্তর দ্বারা আল্লাহ্র একত্ব ও রসূলের রেসালাতকে সত্য জানা। পক্ষান্তরে বাহ্যিক কাজকর্ম আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যকে ইসলাম বলা হয়। কিন্তু শরীয়তে অন্তরগত বিশ্বাস ততক্ষণ ধর্তব্য নয়, যতক্ষণ তার প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজকর্মে প্রতিফলিত না হয়। এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে মুখে কালেমার স্বীকারোক্তি করা। এমনিভাবে ইসলাম বাহ্যিক কাজ-কর্মের নাম হলেও শরীয়তে ততক্ষণ ধর্তব্য নয়, যতক্ষণ অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি না হয়। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে সেটা হবে 'নেফাক' তথা মুনাফেকী। এভাবে ইসলাম ও ঈমান সূচনা ও শেষ প্রান্তের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। ঈমান অন্তর থেকে শুরু হয়ে বাহ্যিক কাজকর্ম পর্যন্ত পৌছে এবং ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্ম থেকে শুরু হয়ে অন্তরের বিশ্বাস পর্যন্ত পৌছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ইসলাম ও ঈমান একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঈমান ইসলাম ব্যতীত ধর্তব্য নয় এবং ইসলামও ঈমান ব্যতি শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তে এটা অসম্ভব যে, এক ব্যক্তি মুসলিম হবে মুমিন হবে না এবং মুমিন হবে—মুসলিম হবে না। এটা পারিভাষিক ইসলামের ও ঈমানের বেলায়ই প্রযোজ্য। আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে এটা সম্ভব যে, এক ব্যক্তি মুসলিম হবে—মুমিন হবে না; যেমন মুনাফিকদের অবস্থা তাই ছিল। বাহ্যিক আনুগত্যের কারণে তাদেরকে মুসলিম বলা হত, কিন্তু অন্তরে ঈমান না থাকার কারণে তারা মুমিন ছিল না।

সূরা আল-হুজুরাত সমাপ্ত

سُوْرَةُ قٓ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسٌ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ١ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ
فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ٢ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ
ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ٣ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا
كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ٤ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ٥
اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا
مِنْ فُرُوْجٍ ٦ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا
فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ٧ تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ٨
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ٩
وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ١٠ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ
بَلْدَةً مَّيْتًا ۗ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ
الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ١٢ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ١٣ وَّاَصْحٰبُ
الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۗ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ١٤
اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ۗ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ١٥

সূরা ক্বাফ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৪৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে—

(১) ক্বাফ। সম্মানিত কোরআনের শপথ; (২) বরং তারা তাদের মধ্য থেকেই একজন ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেছে দেখে বিস্ময় বোধ করে। অতঃপর কাফেররা বলে ঃ এটা আশ্চর্যের ব্যাপার! (৩) আমরা মরে গেলে এবং মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলেও কি পুনরুত্থিত হব? এ প্রত্যাবর্তন সুদূরপরাহত। (৪) মৃত্তিকা তাদের কতটুকু গ্রাস করবে, তা আমার জানা আছে এবং আমার কাছে আছে সংরক্ষিত কিতাব। (৫) বরং তাদের কাছে সত্য আগমন করার পর তারা তাকে মিথ্যা বলছে। ফলে তারা সংশয়ে পতিত রয়েছে। (৬) তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না – আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্রও নেই। (৭) আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদ্গত করেছি, (৮) এটা জ্ঞান আহরণ ও স্মরণ করার মত ব্যাপার প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্যে। (৯) আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্দ্বারা বাগান ও শস্য উদ্গত করি, যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয় (১০) এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর, (১১) বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি। এমনিভাবে পুনরুত্থান ঘটবে। (১২) তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে নূহের সম্প্রদায়, কূপবাসীরা এবং সামূদ সম্প্রদায়, (১৩) আদ, ফেরাউন ও লূতের সম্প্রদায়, (১৪) বনবাসীরা এবং তোব্বা সম্প্রদায়। প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যা বলেছে, অতঃপর আমার শাস্তির যোগ্য হয়েছে। (১৫) আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে।

সূরা ক্বাফ

সূরা ক্বাফের বৈশিষ্ট্য ঃ সূরা ক্বাফে অধিকাংশ বিষয়বস্তু পরকাল, কেয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা হুজুরাতের উপসংহারেও এমনি বিষয়বস্তুর উল্লেখ ছিল। এটাই সূরাদ্বয়ের যোগসূত্র।

একটি হাদীস থেকে সূরা ক্বাফের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। হাদীসে উম্মে হিশাম বিনতে হারেসা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গৃহের সন্নিকটেই আমার গৃহ ছিল। প্রায় দু'বছর পর্যন্ত আমাদের ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রুটি পাকানোর চুল্লিও ছিল অভিন্ন। তিনি প্রতি শুক্রবারে জুমআর খোতবায় সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করতেন। এতেই সূরাটি আমার মুখস্থ হয়ে যায়।—(মুসলিম-কুরতুবী)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আবু ওয়াকেদ লাইসী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দুই ঈদের নামাযে কোন্ সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন ঃ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ এবং اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফজরের নামাযে অধিকাংশ সময় সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করতেন।—(সূরাটি বেশ বড়,) কিন্তু এতদসত্ত্বেও নামায হাল্কা মনে হত।—(কুরতুবী) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর তেলাওয়াতের বিশেষ প্রভাবেই বৃহত্তম এবং দীর্ঘতম নামাযও মুসুল্লীদের কাছে হাল্কা মনে হত।

আকাশ দৃষ্টিগোচর হয় কি? اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, আকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু একথাই সুবিদিত যে, উপরে যে নীলাভ রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তা শূন্যমণ্ডলের রঙ। কিন্তু আকাশের রঙও যে তাই হবে—একথা অস্বীকার করার কোন প্রমাণ নেই।

এ ছাড়া আয়াতে نظر শব্দের অর্থ চর্মচক্ষে দেখা না হয়ে অন্তশ্চক্ষে দেখা অর্থাৎ, চিন্তা-ভাবনা করাও হতে পারে।—(বয়ানুল-কোরআন)

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কিত একটি বহুল উত্থাপিত প্রশ্নের জওয়াব ঃ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ কাফের ও মুশরিকরা কেয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন অস্বীকার করে। তাদের সর্ববৃহৎ প্রমাণ এই বিস্ময় যে, মৃত্যুর পর মানুষের দেহের অধিকাংশ অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে দিকবিদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পানি ও বায়ু মানবদেহের প্রতিটি কণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়। কেয়ামতে পুনরুজ্জীবন দান করার জন্যে এই বিক্ষিপ্ত কণাসমূহের অবস্থানস্থল জানা এবং প্রত্যেকটি কণাকে আলাদাভাবে একত্রিত করার সাধ্য কার আছে? কোরআন পাকের ভাষায় এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, মানুষ তার সসীম জ্ঞানের মাপকাঠিতে আল্লাহ্ তাআলার অসীম জ্ঞানকে পরিমাপ করার কারণেই এই পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞান এতই বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী যে, মৃত্যুর পর মানব দেহের প্রতিটি অংশ তাঁর দৃষ্টিতে উপস্থিত থাকে। তিনি জানেন মৃতের কোন্ কোন্ অংশ মৃত্তিকা গ্রাস করেছে। মানবদেহের কিছু অস্থি আল্লাহ্ তাআলা এমন তৈরী করেছেন যে, এগুলোকে মৃত্তিকা গ্রাস করতে পারে না। অবশিষ্ট যেসব অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে যায়, সেগুলো সবই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে থাকে। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, সবগুলোকে এক জায়গায় একত্রিত করবেন। সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, এখন প্রত্যেক মানুষের দেহ যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত, তাতেও সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের উপাদান

সন্নিবেশিত রয়েছে; কোনটি খাদ্যের আকারে এবং কোনটি ওষধের আকারে সন্নিবেশিত হয়ে বর্তমান মানবদেহ গঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় পুনর্বার এসব উপাদানকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার পর আবার এক জায়গায় একত্রিত করা আল্লাহ্র পক্ষে কঠিন হবে কি? মৃত্যুর পর এবং মৃত্তিকায় পরিণত হওয়ার পর আল্লাহ্ তাআলা মানবদেহের এসব উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন, শুধু তাই নয়, বরং মানব-সৃষ্টির পূর্বেই তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পরিবর্তন এবং মৃত্যু-পরবর্তী প্রতিটি অবস্থা আল্লাহ্ তাআলার কাছে 'লওহে-মাহফুযে' লিখিত আকারে বিদ্যমান আছে।

অতএব, এমন সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সম্পর্কে উপরোক্ত বিস্ময় প্রকাশ করা স্বয়ং বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ আয়াতের এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।—(বাহ্রে-মুহীত)

فِيْ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ অভিধানে مَّرِيْجٍ শব্দের অর্থ মিশ্র, যাতে বিভিন্ন প্রকার বস্তুর মিশ্রণ থাকে এবং যার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। এরূপ বস্তু সাধারণতঃ ফাসেদ ও দূষিত হয়ে থাকে। এ কারণেই হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) مَّرِيْجٍ শব্দের অনুবাদ করেছে ফাসেদ ও দুষ্ট। যাহ্হাক, কাতাদাহ, হাসান বসরী (রহঃ) প্রমুখ এর অনুবাদ করেছে মিশ্র ও জটিল। উদ্দেশ্য এই যে, কাফেররা নবুওয়ত অস্বীকার করার ব্যাপারেও এক কথার উপর অটল থাকে না। রসূলকে কখনও যাদুকর, কখনও কবি, কখনও অতীন্দ্রিয়বাদী এবং কখনও জ্যোতিষী বলে। তাদের কথাবার্তা স্বয়ং মিশ্র ও দুষ্ট। অতএব, কোন্ কথার জওয়াব দেয়া যায়।

এরপর নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বিশালকায় বস্তুসমূহ সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সর্বসময় শক্তি বিধৃত করা হয়েছে। নভোমণ্ডল সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ - فُرُوْجٍ শব্দটি فرج এর বহুবচন। এর অর্থ ফাটল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আকাশের এই বিশালকায় গোলক সৃষ্টি করেছেন। এটি মানুষের হাতে নির্মিত হলে এতে হাজারো জোড়াতালি ও ফাটলের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হত। কিন্তু তোমরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, এতে না কোন তালি আছে এবং না কোথাও ভগ্নাংশ বা সেলাইয়ের চিহ্ন আছে। আকাশগাত্রে নির্মিত দরজা এর পরিপন্থী নয়। কারণ, দরজাকে ফাটল বলা হয় না।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের রেসালত ও পরকাল প্রত্যাখ্যানের বিষয় বর্ণিত হয়েছিল। এটা যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে মর্মপীড়ার কারণ ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সান্ত্বনার জন্যে অতীত যুগের পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন ঃ প্রত্যেক পয়গম্বরের সাথেই কাফেররা পীড়াদায়ক আচরণ করেছে। এটা পয়গম্বরগণের চিরন্তন প্রাপ্য। এতে আপনি মনক্ষুন্ন হবেন না। নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কাহিনী কোরআনে বার বার বর্ণিত হয়েছে। তিনি সাড়ে নয়'শ বছর পর্যন্ত তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রচেষ্টা চালাল। কিন্তু তারা শুধু তাঁকে প্রত্যাখ্যানই করেনি; বরং নানাভাবে উৎপীড়নও করেছে।

وَاَصْحٰبُ الرَّسِّ কারা? ঃ رس শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থে ইট, পাথর ইত্যাদি দ্বারা পাকা করা হয় না এরূপ কাঁচা কূপকে رس বলা হয়। وَاَصْحٰبُ الرَّسِّ বলে আযাবের পর সামূদ গোত্রের অবশিষ্ট লোকদেরকে বোঝানো হয়। যাহ্হাক (রহঃ) প্রমুখ তফসীরকারকের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের কাহিনী এই যে, সালেহ্ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্য থেকে চার হাজার ঈমানদার ব্যক্তি এই আযাব থেকে নিরাপদ থাকে। আযাবের পর তারা এই স্থান ত্যাগ করে হাযরা মাউতে বসতি স্থাপন করে। হযরত সালেহ্ (আঃ)- ও তাদের সাথে ছিলেন। তারা একটি কূপের আশেপাশে বসবাস করতে থাকে। অতঃপর হযরত সালেহ্ (আঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ কারণেই এই স্থানের নাম حضرموت (হাযারা-মাউত অর্থাৎ, মৃত্যু হাযির হল) হয়ে যায়। তারা এখানেই থেকে যায় এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশধরদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্ তাআলা একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। তারা তাঁকে হত্যা করে। ফলে আযাবে পতিত হয় এবং তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন কূপটি অকেজো হয়ে যায় ও দালান-কোঠা শ্মশানে পরিণত হয়। কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই উল্লেখিত হয়েছে ঃ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ অর্থাৎ, তাদের অকেজো কূয়া এবং মজবুত জনশূন্য দালান-কোঠা শিক্ষা গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট।

ثَمُوْدُ হযরত সালেহ (আঃ)-এর উম্মত। তাদের কাহিনী কোরআনে বার বার উল্লেখিত হয়েছে।

عَادٌ —বিশালবপু এবং শক্তি ও বীরত্বে আদ জাতি প্রবাদ বাক্যের ন্যায় খ্যাত ছিল। হযরত হূদ (আঃ) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। তারা নাফরমানী করে এবং তাঁর উপর নির্যাতন চালায়। অবশেষে ঝঞ্ঝার আযাবে সব ফানা হয়ে যায়।

وَاِخْوَانُ لُوْطٍ —হযরত লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়। তাদের কাহিনী পূর্বে কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে।

وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ — ঘন জঙ্গল ও বনকে ايكة বলা হয়। তারা এরূপ জায়গাতেই বসবাস করত। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা অবাধ্যতা করে এবং আযাবে পতিত হয়ে নিস্তনাবুদ হয়ে যায়।

وَقَوْمُ تُبَّعٍ ইয়ামনের জনৈক সম্রাটের উপাধি ছিল তোব্বা। সপ্তম খণ্ডের সূরা দোখানে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে।

যারা হাশর ও নশর অস্বীকার করত এবং মৃতদের জীবিত হওয়াকে অবিশ্বাস্য যুক্তিবহির্ভূত বলত, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের সন্দেহ এভাবে নিরসন করা হয়েছিল যে, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানকে নিজেদের জ্ঞানের মাপকাঠিতে পরিমাপ করে রেখেছ। তাই এই খটকা দেখা দিয়েছে যে, মৃতের দেহ-উপাদান মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার পর এগুলোকে কিভাবে একত্রিত করা সম্ভব হবে? কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু আমার জ্ঞানের আওতায় রয়েছে। এগুলোকে যখন ইচ্ছা একত্রিত করে দেয়া আমার জন্যে মোটেই কঠিন নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহেও খোদায়ী জ্ঞানের বিস্তৃতি ও সর্বব্যাপকতা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ মানুষের বিক্ষিপ্ত দেহ-উপাদান সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়ার চাইতে বড় বিষয় এই যে, আমি প্রত্যেক মানুষের মনের নিভৃতে জাগরিত কল্পনাসমূহকেও সর্বদা ও সর্বাবস্থা জানি। দ্বিতীয় আয়াতে এর কারণ বর্ণনা হয়েছে যে, আমি গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও মানুষের অধিক নিকটবর্তী। যে ধমনীর উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল, তাও তার এতটুকু নিকটবর্তী নয়, যতটুকু আমি নিকটবর্তী। তাই তার হাল-অবস্থা স্বয়ং তার চাইতে আমি বেশী জানি।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ
الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ وَ
جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ
فِي الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ
وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾
أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾
الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾
قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ
لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ
لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ
وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾
هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ
وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾

(১৬) আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। (১৭) যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। (১৮) সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (১৯) মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে। (২০) এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। এটা হবে ভয় প্রদর্শনের দিন। (২১) প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে। তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী। (২২) তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ম। (২৩) তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে ঃ আমার কাছে যে আমলনামা ছিল, তা এই। (২৪) তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ বিরুদ্ধবাদীকে, (২৫) যে বাধা দিত মঙ্গলজনক কাজে, সীমালঙ্ঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারীকে। (২৬) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত, তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। (২৭) তার সঙ্গী শয়তান বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি। বস্তুতঃ সে নিজেই ছিল সুদূর পথভ্রান্তিতে লিপ্ত। (২৮) আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেছিলাম।(২৯)আমার কাছে কথা রদবদল হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই। (৩০) যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব ; তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবে ঃ আরও আছে কি? (৩১) জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে খোদাভীরুদের অদূরে। (৩২) তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও স্মরণকারীকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল ; (৩৩) যে না দেখে দয়াময় আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হত। (৩৪) তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটাই অনন্তকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্ গ্রীবাস্থিত ধমনীর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী–একথার তাৎপর্য ঃ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ – অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এই আয়াতে জ্ঞানগত নৈকট্য বোঝানো হয়েছে, স্থানগত নৈকট্য উদ্দেশ্য নয়।

আরবী ভাষায় وريد শব্দের অর্থ প্রত্যেক প্রাণীর সেই সমস্ত শিরা–উপশিরা যেগুলো দিয়ে সারাদেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এ জাতীয় শিরা–উপশিরাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। (এক) যা কলিজা থেকে উদ্ভূত হয়ে সারা দেহে খাঁটি রক্ত পৌছে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই প্রকার শিরাকেই وريد বলা হয়। (দুই) যা হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত হয়ে রক্তের সূক্ষ্ম বাষ্প সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে রক্তের এই সূক্ষ্ম বাষ্পকে রূহ্ বলা হয়। প্রথম প্রকার শিরা মোটা এবং দ্বিতীয় প্রকার শিরা চিকন হয়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষা অনুযায়ী وريد শব্দটি কলিজা থেকে উদ্ভূত শিরার অর্থে নেয়াই জরুরী নয়। বরং হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত ধমনীকেও আভিধানিক দিক দিয়ে وريد বলা যায়। কেননা, এতেও এক প্রকার রক্তই সঞ্চালিত হয়। এস্থলে আয়াতের উদ্দেশ্য মানুষের হৃদয়গত অবস্থা ও চিন্তাধারা অবগত হওয়া। তাই এ অর্থই অধিক উপযুক্ত। মোটকথা, উল্লেখিত দুই অর্থের মধ্যে যে কোন অর্থই নেয়া হোক সর্বাবস্থায় প্রাণীর জীবন এর উপর নির্ভরশীল। এসব শিরা কেটে দিলে প্রাণীর আত্মা বের হয়ে যায়। অতএব, সারকথা এই দাঁড়াল যে, যে ধমনীর উপর মানবজীবন নির্ভরশীল, আমি সে ধমনীর চাইতেও অধিক তার নিকটবর্তী। অর্থাৎ, তার সবকিছুই আমি জানি।

সূফী বুযুর্গগণের মতে, আয়াতে কেবল জ্ঞানগত নৈকট্যই উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে বিশেষ এক ধরনের সংলগ্নতা বোঝানো হয়েছে, যার স্বরূপ ও গুণাগুণ তো কারও জানা নেই, কিন্তু এই সংলগ্নতার অস্তিত্ব অবশ্যই বিদ্যমান আছে। কোরআন পাকের একাধিক আয়াত এবং অনেক সহীহ্ হাদীস এ তথ্যের সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ অর্থাৎ, সেজদা কর এবং আমার নৈকট্যশীল হয়ে যাও। হিজরতের ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)–কে বলেছিলেন ঃ الله معنا অর্থাৎ, আল্লাহ্ আমাদের সংগে আছেন। হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে বলেছিলেন ঃ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي অর্থাৎ, আমার পালনকর্তা আমার সঙ্গে আছেন। হাদীসে আছে, মানুষ আল্লাহ্ তাআলার সর্বাধিক নিকটবর্তী তখন হয়, যখন সে সেজদায় থাকে। হাদীসে আরও আছে, আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দা নফল এবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে।

এবাদতের মাধ্যমে এবং মানুষের নিজের কর্মফলস্বরূপ অর্জিত এই নৈকট্য বিশেষভাবে মুমিনের জন্যে নির্দিষ্ট। এরূপ মুমিন ''আল্লাহ্‌র ওলী'' বলে অভিহিত হন। এই নৈকট্য সেই নৈকট্য নয়, যা প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরের প্রাণের সাথে আল্লাহ্ তাআলার সমভাবে রয়েছে। মোটকথা, উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্ তাআলার সাথে মানুষের এক বিশেষ প্রকার সংলগ্নতা আছে, যদিও আমরা এর স্বরূপ ও গুণাগুণ উপলব্ধি করতে সক্ষম নই।

এই নৈকট্য ও সংলগ্নতা চোখে দেখা যায় না; বরং ঈমানী দূরদর্শিতা দ্বারা জানা যায়। তফসীরে মাযহারীতে এই নৈকট্য ও সংলগ্নতাকেই আয়াতের মর্ম সাব্যস্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে জ্ঞানগত সংলগ্নতা বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর এই দুই অর্থ থেকে আলাদা এক তৃতীয় তফসীর এই বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতে نَحْنُ শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার সত্তা বোঝানো হয়নি। বরং তাঁর ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে। ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা মানুষের সাথে সাথে থাকে। তারা মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে এতটুকু ওয়াকিফহাল, যতটুকু খোদ মানুষ তার প্রাণ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নয়।

প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন ফেরেশতা আছে ঃ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ – **تلقى** শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা, নেয়া এবং অর্জন করে নেয়া। فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ অর্থাৎ, নিয়ে নিলেন আদম তাঁর পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য। আলোচ্য আয়াতে **متلقيان** বলে দুই জন ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা প্রত্যেক মানুষের সাথে সদাসর্বদা থাকে এবং তার ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করে। عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ অর্থাৎ, তাদের একজন ডান দিকে থাকে এবং সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করে। অপরজন বাম দিকে থাকে এবং অসৎকর্ম লিপিবদ্ধ করে। قَعِيدٌ শব্দটি **قاعد** (উপবিষ্ট) অর্থে একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। قَعِيدٌ এর অর্থ **قاعد** হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, **قاعد** শুধু উপবিষ্ট অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু قَعِيدٌ শব্দটি ব্যাপক। যে ব্যক্তি কারও সংগে থাকে, তাকে قَعِيدٌ বলা হয় – উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক অথবা চলাফেরা রত হোক। উপরোক্ত ফেরাশতাদ্বয়ের অবস্থাও তাই। তারা সর্বদা–সর্বাবস্থায় মানুষের সংগে থাকে – সে উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক, চলাফেরা রত হোক অথবা নিদ্রিত হোক। কেবল প্রস্রাব–পায়খানা অথবা স্ত্রী সহবাসের প্রয়োজনে যখন সে গুপ্তাঙ্গ খোলে তখন ফেরেশতাদ্বয় সরে যায়। কিন্তু তদবস্থায়ও সে কোন গোনাহ্ করলে আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি বলে তারা তা জানতে পারে।

ইবনে কাসীর আহ্নাফ ইবনে কায়সের (রহঃ) বর্ণনা উদ্ধৃত করে লিখেছেন ঃ এই ফেরেশতাদ্বয়ের মধ্যে ডানদিকের ফেরেশতা নেক আমল লিপিবদ্ধ করে এবং বাম দিকের ফেরেশতারও দেখা–শুনা করে। মানুষ যদি কোন গোনাহ্ করে, তবে ডানদিকের ফেরেশতা বামদিকের ফেরেশতাকে বলে ঃ এখনি এটা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করো না। তাকে সময় দাও। যদি সে তওবা করে তবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় আমলনামায় লিপিবদ্ধ কর।–(ইবনে–আবী হাতেম)

মানুষের প্রত্যেকটি কথা লিপিবদ্ধ করা হয় ঃ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই পরিদর্শক ফেরেশতা রেকর্ড করে নেয়। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) ও কাতাদাহ বলেন ঃ এই ফেরেশতা মানুষের প্রতিটি বাক্য রেকর্ড করে। তাতে কোন গোনাহ্ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কেবল সেসব বাক্য লিখিত হয়, যেগুলো সওয়াব অথবা শাস্তিযোগ্য। ইবনে কাসীর উভয় উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে প্রথমোক্ত উক্তি অগ্রগণ্য মনে হয়। এরপর তিনি হযরত ইবনে–আব্বাস (রাঃ) থেকেই আলী-ইবনে আবী তালহার (রাঃ) এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, যদ্দ্বারা উভয় উক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। এই রেওয়াতে আছে, প্রথমে তো প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়, তাতে কোন গোনাহ্ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দিনে ফেরেশতা লিখিত বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করে এবং যেসব উক্তি সওয়াব অথবা শাস্তিযোগ্য এবং ভাল অথবা মন্দ সেগুলো রেখে বাকীগুলো মিটিয়ে দেয়।

মৃত্যু যন্ত্রণা ঃ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ – سَكْرَةُ الْمَوْتِ এর অর্থ মৃত্যু–যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর সময় মূর্ছা যাওয়া। আবু বকর ইবনে আম্বারী (রহঃ) হযরত মসরুক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)–এর মধ্যে যখন মৃত্যুর ক্রিয়া শুরু হয়, তখন তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)–কে কাছে ডাকলেন। পিতার অবস্থা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে এই কবিতাংশ উচ্চারিত হয়ে যায় ঃ **اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر** অর্থাৎ, আত্মা একদিন অস্থির হবে এবং বক্ষ সংকুচিত হয়ে যাবে। হযরত আবুবকর (রাঃ) শুনে বললেনঃ তুমি বৃথাই এই কবিতা পাঠ করেছ। এর পরিবর্তে এই আয়াত পাঠ করলে না কেন? وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ

ওফাতের সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর মধ্যে এই অবস্থা দেখা দিলে তিনি হাত ভিজিয়ে মুখমণ্ডলে মালিশ করতেন এবং বলতেন ঃ **لا اله الا الله ان للموت سكرات** অর্থাৎ, কালেমা তাইয়েবা পাঠ করে বলতেন ঃ মৃত্যুযন্ত্রণা বড় সাংঘাতিক।

بِالْحَقِّ – এখানে ب অব্যয়টি **تعديه** অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই যে, মৃত্যুযন্ত্রণা সত্য বিষয়কে নিয়ে এল। অর্থাৎ, মৃত্যুযন্ত্রণা এমন বিষয়কে সামনে উপস্থিত করেছে, যা সত্য ও প্রতিষ্ঠিত এবং যা থেকে পলায়নের অবকাশ নেই।–(মাযহারী)।

ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ – تَحِيدُ শব্দটি **حيد** থেকে উদ্ভূত। অর্থ সরে যাওয়া, পলায়ন করা। আয়াতের অর্থ এই যে, এই মৃত্যু থেকেই তুমি পলায়ন করতে।

বাহ্যতঃ সাধারণ মানুষকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। মৃত্যু থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি স্বভাবগতভাবে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই জীবনকে কাম্য এবং মৃত্যুকে আপদ মনে করে এ থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে গোনাহ্ নয়। কিন্তু আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের এই স্বভাব ও প্রকৃতিগত বাসনা পুরোপুরিভাবে কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। একদিন না একদিন মৃত্যু আসবেই; তুমি যতই পলায়ন কর না কেন।

মানুষকে হাশরের ময়দানে উপস্থিতকারী ফেরেশতাদ্বয় ঃ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ —এই আয়াতের পূর্বে কেয়ামত কায়েম হওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে হাশরের ময়দানে মানুষের হাযির হওয়ার একটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হাশরের ময়দানে প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন سَائِقٌ থাকবে। سَائِقٌ সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জন্তুদের অথবা কোন দলের পেছনে থেকে তাকে কোন বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দেয়। شَهِيدٌ এর অর্থ সাক্ষী। سَائِقٌ যে ফেরেশতা হবে এব্যাপারে সব রেওয়ায়েতই একমত। شَهِيدٌ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কারও কারও মতে সে-ও একজন ফেরেশতাই হবে। এভাবে প্রত্যেকের সাথে দুই জন ফেরেশতা থাকবে। একজন তাকে হাশরের ময়দানে পৌঁছাবে এবং অপরজন তার কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। এই ফেরেশতাদ্বয় ডান ও বামে বসে আমল লিপিবদ্ধকারী কেরামুন–কাতেবীন

ফেরেশতাও হতে পারে এবং অন্য দুই ফেরেশতাও হতে পারে।

وَّشَهِيْدٌ সম্পর্কে কেউ বলেন ঃ সে হবে মানুষের আমল এবং কেউ খোদ মানুষ কেউ وَّشَهِيْدٌ বলেছেন। ইবনে কাসীর বলেন ঃ ফেরেশতা হওয়াই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বোঝা যায়। হযরত ওসমান গনী (রাঃ) খোতবায় এই আয়াত তেলাওয়াত করে এই তফসীরই করেছেন। হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ্ ও ইবনে-যায়েদ (রাঃ) থেকেও তাই- বর্ণিত আছে।

মৃত্যুর পর মানুষ এমন সবকিছু দেখবে, যা জীবিতাবস্থায় দেখতে পেত না ঃ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ অর্থাৎ, আমি তোমাদের সামনে থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমাদের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। এখানে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে, এ সম্পর্কেও তফসীরবিদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে জরীর (রহঃ) ইবনে-কাসীর প্রমুখের মতে মুমিন, কাফের, মুত্তাকী ও ফাসেক নির্বিশেষে সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া স্বপ্নজগত সদৃশ এবং পরকাল জাগরণ সদৃশ। স্বপ্নে যেমন মানুষের চক্ষুদ্বয় বন্ধ থাকে এবং কিছুই দেখে না, এমনিভাবে পরগত সম্পর্কিত বিষয়াবলী দুনিয়াতে চর্মচক্ষে দেখে না। কিন্তু এই চর্মচক্ষু বন্ধ হওয়া মাত্রই স্বপ্নজগত খতম হয়ে জাগরণের জগত শুরু হয়ে যায়। এ জগতে পরকাল সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সামনে এসে যায়। এ কারণেই কোন কোন আলেম বলেন ঃ الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا অর্থাৎ, আজিকার পার্থিব জীবনে সব মানুষ নিদ্রিত। যখন তারা মরে যাবে, তখন জাগ্রত হবে।

وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ — এখানে সংগী অর্থ সেই ফেরেশতা, যে ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্যে মানুষের সাথে থাকত। পূর্বেই জানা গেছে যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা দুইজন। কিন্তু কেয়ামতে উপস্থিত হওয়ার সময় একজনকে চালক ও অপরজনকে সাক্ষী। এর আগের আয়াতে বলা হয়েছে। তাই পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্বয়কে হাশরের ময়দানে উপস্থিতির সময় দু'টি কাজ সোপর্দ করা হয়েছে। একজনকে পশ্চাতে থেকে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে পৌছানার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আয়াতে তাকেই سَآئِقٌ তথা চালক বলা হয়েছে। অপরজনের দায়িত্বে তার আমলনামা দেয়া হয়েছে। তাকে شَهِيْدٌ তথা সাক্ষী নামে ব্যক্ত করা হয়েছে। হাশরের ময়দানে পৌছার পর আমলনামার ফেরেশতা আরয করবে ঃ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ — অর্থাৎ, তাঁর লিখিত আমলনামা আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। ইবনে জরীর বলেন ঃ এখানে قَرِيْنٌ শব্দটি দ্বারা উভয় ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে।

اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ - اَلْقِيَا শব্দটি দ্বিবাচক পদ। আয়াতে কোন্ ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে? বাহ্যতঃ পূর্বোক্ত চালক ও সাক্ষী ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ অন্য কথাও বলেছেন।—(ইবনে কাসীর)।

قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ - قَرِيْنٌ - শব্দের দ্বারা আসলে সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যে অন্তরঙ্গভাবে সংগে থাকে। এই অর্থের দিক দিয়ে আগের আয়াতে এর দ্বারা আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা বোঝানো হয়েছিল। উপরোক্ত ফেরেশতাদ্বয় যেমন মানুষের সংগী হয়ে থাকে, তেমনি শয়তানও মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে অবস্থান করে এবং মানুষকে পথভ্রষ্টতা ও পাপের দিকে প্ররোচিত করে। আলোচ্য আয়াতে قَرِيْنٌ বলে এই শয়তানই বোঝানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ হয়ে যাবে ; তখন এই শয়তান বলবে ঃ পরওয়ারদেগার, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি ; বরং সে নিজেই পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করত এবং সদুপদেশে কর্ণপাত করত না। বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এর আগে জাহান্নামী ব্যক্তি নিজেই এই অজুহাত পেশ করবে যে, আমাকে এই শয়তান বিভ্রান্ত করেছিল। নতুবা আমি সৎকাজ করতাম। এর জওয়াবে শয়তান পূর্বোক্ত কথা বলবে। উভয়ের বাকবিতণ্ডার জওয়াবে আল্লাহ্ তাআলা বলবেন ঃ

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ — অর্থাৎ, আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তোমাদের অসার ওযরের জওয়াব দিয়েছি এবং ঐশীগ্রন্থের মাধ্যমে প্রমাণাদি সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। আজ এই অনর্থক তর্কবিতর্ক কোন উপকারে আসবে না।

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ —আমার কথা রদবদল হয় না। যা ফয়সালা করেছি, তা কার্যকর হবেই। আমি কারও প্রতি জুলুম করিনি। ইনসাফের ফয়সালা করেছি।

اَوَّابٍ কারা ঃ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ — অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক اَوَّابٍ ও حَفِيْظٍ এর জন্যে রয়েছে। اَوَّابٍ এর অর্থ অনুরাগী। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে সরে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি অনুরক্ত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, শা'বী ও মুজাহিদ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নির্জনতায় গোনাহ্ স্মরণ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, সেই اَوَّابٍ হযরত ওবায়দ ইবনে ওমর বলেন ঃ اَوَّابٍ এমন ব্যক্তি, যে প্রত্যেক উঠাবসায় আল্লাহ্ তাআলার কাছে গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি আরও বলেন ঃ আমাকে বলা হয়েছে যে, اَوَّابٍ ও حَفِيْظٍ এমন ব্যক্তি, যে প্রত্যেক মজলিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া পাঠ করে ঃ

سبحان الله وبحمده اللّٰهم انى استغفرك مما اصبت من مجلسى هٰذا

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র ও তাঁরই প্রশংসা। হে আল্লাহ্, আমি, এই মজলিসে যেসব গোনাহ্ আমার উপর এসে আপতিত হয়েছে, সেগুলো থেকে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া পাঠ করে, আল্লাহ্ তাআলা তার এই মজলিসে কৃত সব গোনাহ্ মাফ করে দেন। দোয়া এই ঃ

سبحانك اللّٰهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র এবং প্রশংসা তোমারই। তোমা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ حَفِيْظٍ এমন ব্যক্তি, যে নিজ গোনাহ্সমূহ স্মরণ রাখে, যাতে সেগুলো মোচন করিয়ে নেয়। ইবনে আব্বাসের অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে حَفِيْظٍ এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ তাআলার বিবিধ-বিধান স্মরণ রাখে। হযরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদীসের রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে (এশরাকের) চার রাকআত নামায পড়ে, সে اَوَّابٍ ও حَفِيْظٍ —(কুরতুবী)।

وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ —আবু বকর ওয়াররাক বলেন ঃ مُّنِيْبٍ (বিনীত) এর আলামত এই যে, সে আল্লাহ্ তাআলার আদবকে সর্বদা চিন্তায়

لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿٣٨﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾

سُورَةُ الذَّارِيَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ﴿١﴾ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ﴿٣﴾ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴿٤﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾

(৩৫) তারা তথায় যা চাইবে, তাই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক। (৩৬) আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, তারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত। তাদের কোন পলায়ন স্থান ছিল না। (৩৭) এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। (৩৮) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। (৩৯) অতএব, তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্যে আপনি ছবর করুন এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন, (৪০) রাত্রির কিছু অংশে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং নামাযের পশ্চাতেও। (৪১) শুন, যে দিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে, (৪২) যেদিন মানুষ নিশ্চিত সেই ভয়াবহ আওয়াজ শুনতে পাবে, সেদিনই পুনরুত্থান দিবস। (৪৩) আমি জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। (৪৪) যেদিন ভূমণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে মানুষ ছুটাছুটি করে বের হয়ে আসবে। এটা এমন সমবেত করা, যা আমার জন্যে অতি সহজ। (৪৫) তারা যা বলে, তা আমি সম্যক অবগত আছি। আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন। অতএব, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন।

সূরা আয-যারিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৬০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে—

(১) কসম ঝঞ্ঝাবায়ুর, (২) অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের, (৩) অতঃপর মৃদু চলমান জলযানের, (৪) অতঃপর কর্ম বণ্টনকারী ফেরেশতাগণের, (৫) তোমাদের প্রদত্ত ওয়াদা অবশ্যই সত্য। (৬) ইনসাফ অবশ্যম্ভাবী।

উপস্থিত রাখবে, তাঁর সামনে বিনীত ও নম্র হয়ে থাকবে এবং মনের কুবাসনা পরিত্যাগ করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا —অর্থাৎ, জান্নাতীরা জান্নাতে যা চাইবে, তাই পাবে। অর্থাৎ, চাওয়া মাত্রই তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। বিলম্ব ও অপেক্ষার বিড়ম্বনা সইতে হবে না। হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ জান্নাতে কারও সন্তানের বাসনা হলে গর্ভধারণ, প্রসব ও সন্তানের কায়িক বৃদ্ধি এগুলো সব এক মুহূর্তের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়ে যাবে।—(ইবনে-কাসীর)।

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ —অর্থাৎ, আমার কাছে এমন নেয়ামতও আছে, যার কল্পনাও মানুষ করতে পারে না। ফলে তারা এগুলোর আকাঙ্ক্ষাও করতে পারবে না। হযরত আনাস ও জাবের (রাঃ) বলেনঃ এই বাড়তি নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার দীদার তথা সাক্ষাত, যা জান্নাতীরা লাভ করবে। لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ আয়াতের তফসীরে এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জান্নাতীরা প্রতি শুক্রবার আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাত লাভ করবে।—(কুরতুবী)।

فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ - فَنَقَّبُوا শব্দটি تنقيب থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ ছিদ্র করা, বিদীর্ণ করা। বাক-পদ্ধতিতে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

مَّحِيصٍ এর অর্থ আশ্রয়স্থল। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা তোমাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল এবং যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত। কিন্তু দেখ পরিণামে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। কোন ভূখণ্ড অথবা গৃহ তাদেরকে ধ্বংসের কবল থেকে আশ্রয় দিতে পারল না।

জ্ঞানার্জনের দুই পন্থাঃ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ —হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ এখানে 'কলব' বলে বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। বোধশক্তির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে কলব তথা অন্তঃকরণ। তাই একে কলব বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ এখানে কলব বলে হায়াত তথা জীবন বোঝানো হয়েছে। কারণ, কলবের উপরই হায়াত ভিত্তিশীল। আয়াতের অর্থ এই যে, এই সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু দ্বারা সেই ব্যক্তিই উপদেশ ও শিক্ষার উপকার লাভ করতে পারে, যার বোধশক্তি অথবা হায়াত আছে। বোধশক্তিহীন অথবা মৃত ব্যক্তি এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ - القاء سمع এর অর্থ কোন কথা কান লাগিয়ে শোনা এবং شَهِيدٌ এর অর্থ উপস্থিত। উদ্দেশ্য এই যে, দুই ব্যক্তি উল্লেখিত আয়াতসমূহের দ্বারা উপকার লাভ করে। (এক) যে স্বীয় বোধশক্তি দ্বারা সব বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে (দুই) অথবা সে আয়াতসমূহকে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে ; অন্তরকে অনুপস্থিত রেখে শুধু কানে শুনে না। তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছেঃ কামেল বুযুর্গগণ প্রথমোক্ত প্রকারের মধ্যে এবং তাঁদের অনুসারী ও মুরিদগণ দ্বিতীয়

প্রকারের মধ্যে দাখিল।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ – سَبِّحْ শব্দটি تسبيح থেকে উদ্ভূত। অর্থ আল্লাহ্ তাআলার তসবীহ্ (পবিত্রতা বর্ণনা) করা। মুখে হোক কিংবা নামাযের মাধ্যমে হোক। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন ঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে তসবীহ্ করার অর্থ ফজরের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তসবীহ্ করার মানে আছরের নামায। হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ্‌র বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

চেষ্টা কর, যাতে তোমার সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযগুলো ফওত না হয়ে যায়, অর্থাৎ, ফজর ও আছরের নামায। এর প্রমাণ হিসেবে জরীর উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন।—(কুরতুবী)।

সেসব তসবীহ্ও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সকাল-বিকাল পাঠ করার প্রতি সহীহ্ হাদীসসমূহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশত বার করে 'সোবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী' পাঠ করে, তার গোনাহ্ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের তরঙ্গ অপেক্ষাও বেশী হয়।—(মাযহারী)।

وَأَدْبَارَ السُّجُودِ —হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ سجود বলে ফরয নামায বোঝানো হয়েছে এবং পশ্চাতে বলে সেইসব তসবীহ্ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর ফযীলত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েত ; রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার সোবহানাল্লাহ্ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং এক বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' পাঠ করবে, তার গোনাহ্ মাফ করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ঢেউয়ের সমান হয়।-(বোখারী-মুসলিম) ফরয নামাযের পরে যেসব সুন্নত নামায পড়ার কথা সহীহ্ হাদীসমূহে বর্ণিত আছে, وَأَدْبَارَ السُّجُودِ বলে সেগুলোও বোঝানো যেতে পারে।—(মাযহারী)।

يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ —অর্থাৎ, যেদিন আহ্বানকারী ফেরেশতা নিকট থেকেই আহ্বান করবে। ইবনে-আসাকির জায়েদ ইবনে-জাবের থেকে বর্ণনা করেন, এই ফেরেশতা আর কেউ নয়—স্বয়ং ইসরাফীল। তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসের সখরায় দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বের মৃতদেরকে এই বলে সম্বোধন করবেন ঃ হে পচাগলা চামড়াসমূহ, চূর্ণ-বিচূর্ণ অস্থিসমূহ এবং বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ! শুন, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে হিসাবের জন্যে সমবেত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন।—(মাযহারী)।

আয়াতে কেয়ামতের দ্বিতীয় ফুঁৎকার বর্ণিত হয়েছে, যাদ্বারা বিশ্বজগতকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। নিকটবর্তী স্থানের অর্থ এই যে, তখন এই আওয়াযটি নিকটের ও দূরের সবাই এমনভাবে শুনবে, যেন কানের কাছ থেকেই বলা হচ্ছে। হযরত ইকরিমা (রাঃ) বলেন ঃ আওয়াযটি এমনভাবে শোনা যাবে, যেন কেউ আমাদের কানেই বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেন ঃ নিকটবর্তী স্থানের অর্থ বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরা। এটাই পৃথিবীর মধ্যস্থল। চতুর্দিক থেকে এর দূরত্ব সমান।—(কুরতুবী)।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا —অর্থাৎ, যখন পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে সব মৃত বের হয়ে আসবে এবং ছুটাছুটি করবে। হাদীস থেকে জানা যায়, সবাই শাম দেশের দিকে দৌড়তে থাকবে। সেখানে বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরায় ইসরাফীল (আঃ) সবাইকে আহ্বান করবেন।

তিরমিযীতে মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শাম দেশের দিকে ইশারা করে বলেন ঃ

من ههنا الى ههنا تحشرون ركبانا ومشاة وتجرون على وجوهكم يوم القيامة

এখান থেকে সেই পর্যন্ত তোমরা উত্থিত হবে। কেউ সওয়ার হয়ে, কেউ পদব্রজে এবং কেউ উপুড় হয়ে কেয়ামতের ময়দানে নীত হবে।

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ —অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে আপনি কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দিন।" উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রচারকার্য ব্যাপক হলেও একমাত্র তারাই এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে, যারা আমার শাস্তিকে ভয় করে।

হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) এই আয়াত পাঠ করে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন ঃ

اللّٰهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يابر يارحيم

হে আল্লাহ্, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার শাস্তিকে ভয় করে এবং আপনার ওয়াদার আশা করে। হে ওয়াদাপূরণকারী, হে দয়াময়।

সূরা আয-যারিয়াত

সূরা যারিয়াতেও পূর্বেকার সূরা ক্বাফ-এর ন্যায় বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু পরকাল, কেয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং সওয়াব ও আযাব সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কতিপয় বস্তুর কসম খেয়ে বলেছেন যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত কেয়ামত সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি সত্য। মোট চারটি বস্তুর কসম খাওয়া হয়েছে। (এক) وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (দুই) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (তিন) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا এবং (চার) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا

ইবনে-কাসীরের মতে অগ্রাহ্য একটি হাদীস এবং হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) ও আলী মোর্তাযা (রাঃ)-এর উক্তিতে এই বস্তু চতুষ্টয়ের তফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

ذاريات বলে ধূলিকণা বিশিষ্ট ঝঞ্ঝাবায়ু বোঝানো হয়েছে। حاملات وقرا-এর শাব্দিক অর্থ বোঝাবাহী ; অর্থাৎ, যে মেঘমালা বৃষ্টির বোঝা বহন করে। جاريات يسرا বলে পানিতে স্বচ্ছন্দগতিতে চলমান জলযান বোঝানো হয়েছে। مقسمات امرا এর অর্থ সেইসব ফেরেশতা, যারা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সৃষ্টজীবের মধ্যে বিধিলিপি অনুযায়ী রিযিক, বৃষ্টির পানি এবং কষ্ট ও সুখ বন্টন করে।—(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, দুররে-মনসূর)।

وَالسَّمَاۗءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۟ اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۟ يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ۟ قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۟ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۟ يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ۟ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ۟ ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ۭ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۟ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۟ اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۟ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۟ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۟ وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاۗىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۟ وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ۟ وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۭ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۟ وَفِي السَّمَاۗءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ۟ فَوَرَبِّ السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ۟ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ۟ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ۭ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۟ فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَاۗءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ۟ فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ۟ فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۭ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۭ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۟ فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ۟ قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۟

(৭) পথবিশিষ্ট আকাশের কসম, (৮) তোমরা তো বিরোধপূর্ণ কথা বলছ। (৯) যে ভ্রষ্ট, সেই এ থেকে মুখ ফিরায়, (১০) অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক, (১১) যারা উদাসীন, ভ্রান্ত। (১২) তারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে হবে? (১৩) যে দিন তারা অগ্নিতে পতিত হবে, (১৪) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা একেই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। (১৫) খোদাভীরুরা জান্নাতে ও প্রস্রবণে থাকবে। (১৬) এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন। নিশ্চয় ইতিপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, (১৭) তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, (১৮) রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত, (১৯) এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল। (২০) বিশ্বাসকারীদের জন্যে পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২১) এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (২২) আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত সবকিছু। (২৩) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার কসম, তোমাদের কথাবার্তার মতই এটা সত্য। (২৪) আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? (২৫) যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ সালাম, তখন সে বলল ঃ সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক। (২৬) অতঃপর সে গৃহে গেল এবং একটি ঘৃতেপক্ক মোটা গোবৎস নিয়ে হাযির হল। (২৭) সে গোবৎসটি তাদের সামনে রেখে বলল ঃ তোমরা আহার করছ না কেন? (২৮) অতঃপর তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত হল ঃ তারা বলল ঃ ভীত হবেন না। তারা তাঁকে একটি জ্ঞানীগুণী পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিল। (২৯) অতঃপর তাঁর স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এল এবং মুখ চাপড়িয়ে বলল ঃ আমি তো বৃদ্ধা, বন্ধ্যা। (৩০) তারা বলল ঃ তোমার পালনকর্তা এরূপই বলেছেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالسَّمَاۗءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ — حبك শব্দটি حبكة এর বহুবচন। এর অর্থ কাপড় বয়নে উদ্ভূত পাড়। এটা পথসদৃশ হয় বলে পথকেও حبك বলা হয়। অনেক তফসীরবিদের মতে এস্থলে এই অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, পথবিশিষ্ট আকাশের কসম। পথ বলে এখানে ফেরেশতাদের যাতায়াতের পথ এবং তারকা ও নক্ষত্রের কক্ষপথ উভয়ই বোঝানো যেতে পারে।

বয়নে উদ্ভূত পাড় কাপড়ের শোভা ও সৌন্দর্যও হয়ে থাকে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে حبك এর অর্থ নিয়েছেন শোভা ও সৌন্দর্য। আয়াতের অর্থ এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশের কসম। যে বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্যে এখানে কসম খাওয়া হয়েছে, তা এই ঃ اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ —বাহ্যতঃ এতে মুশরিকদের-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ব্যাপারে বিভিন্নরূপ উক্তি করত এবং কখনও উন্মাদ, কখনও যাদুকর, কখনও কবি ইত্যাদি বাজে পদবী সংযুক্ত করত। মুসলিম ও কাফের নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে এখানে সম্বোধন করার সম্ভাবনাও আছে; তখন "বিভিন্ন রূপ উক্তির" অর্থ হবে এই যে, তাদের মধ্যে কেউ তো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকে সত্যবাদী মনে করে এবং কেউ অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে।—(মাযহারী)।

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ — اُفِكَ-এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো। عَنْهُ এর সর্বনামে দু'টি আলাদা আলাদা সম্ভাবনা আছে। (এক) এই সর্বনাম দ্বারা কোরআন ও রসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কোরআন ও রসূল থেকে সেই হতভাগাই মুখ ফেরায়, যার জন্যে বঞ্চনা অবধারিত হয়ে গেছে।

(দুই) এই সর্বনাম দ্বারা قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ (বিভিন্ন উক্তি) বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তোমাদের বিভিন্নরূপ ও পরস্পর বিরোধী উক্তির কারণে সেই ব্যক্তিই কোরআন ও রসূল থেকে মুখ ফেরায়, যে কেবল হতভাগ্য ও বঞ্চিত।

قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ — خراص-এর অর্থ অনুমানকারী, যে ব্যক্তি অনুমানের উপর ভিত্তি করে কথা বলে। এখানে সেই কাফের ও অবিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা কোন প্রমাণ ও কারণ ব্যতিরেকেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী উক্তি করত। কাজেই এর অনুবাদে "মিথ্যাবাদীর দল" বললেও অযৌক্তিক হবে না। এই বাক্যে তাদের জন্যে অভিশাপের অর্থে বদদোয়া রয়েছে।—(মাযহারী) কাফেরদের আলোচনার পর কয়েক আয়াতেই মুমিন ও পরহেযগারদের আলোচনা করা হয়েছে।

এবাদতে রাত্রি জাগরণ ও তার বিবরণ ঃ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ — يَهْجَعُوْنَ-শব্দটি هجوع থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া। এখানে মুমিন পরহেযগারদের এই গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তাআলার এবাদতে রাত্রি অতিবাহিত করে, কম নিদ্রা যায় এবং অধিক জাগ্রত থাকে। ইবনে জরীর এই তফসীর করেছেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে তাই বর্ণিত আছে যে, পরহেযগারগণ রাত্রিতে জাগরণ ও এবাদতের ক্লেশ স্বীকার করে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। হযরত

ইবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ, মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে ما শব্দটি 'না' বোধক অর্থ দেয় এবং আয়াতের অর্থ এই যে, তারা রাত্রির অল্প অংশে নিদ্রা যায় না এবং সেই অল্প অংশে নামায ইত্যাদি এবাদতে অতিবাহিত করে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি রাত্রির শুরুতে অথবা শেষে অথবা মধ্যস্থলে যে কোন অংশে এবাদত করে নেয় সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়ে, হযরত আনাস ও আবুল আলিয়া (রাঃ)–এর মতে সে-ও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবু জাফর বাকের (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এশার নামাযের পূর্বে নিদ্রা যায় না, আয়াতে তাকেও বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে কাসীর)।

রাত্রির শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার বরকত ও ফযীলত ঃ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ —অর্থাৎ, মুমিন পরহেযগারগণ রাত্রির শেষপ্রহরে গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। اسحار শব্দটি سحر এর বহুবচন। এর অর্থ রাত্রির ষষ্ঠপ্রহর। এই প্রহরে ক্ষমাপ্রার্থনা করার ফযীলত অন্য এক আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে ঃ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ —সহীহ্ হাদীসের সব কয়টি কিতাবেই এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে বিরাজমান হন। (কিভাবে বিরাজমান হন, তার স্বরূপ কেউ জানে না।) তিনি ঘোষণা করেন ঃ কোন তওবাকারী আছে কি, যার তওবা আমি কবূল করব? কোন ক্ষমাপ্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করব?—(ইবনে-কাসীর)।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শেষপ্রহরে ক্ষমাপ্রার্থনার আয়াতে সেইসব পরহেযগারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা পূর্ববর্তী আয়াতে বিবৃত করা হয়েছে যে, তারা রাত্রিতে আল্লাহ্ তাআলার এবাদতে মশগুল থাকে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। এমতাবস্থায় ক্ষমাপ্রার্থনা করার বাহ্যতঃ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করা হয়। যারা সমগ্র রাত্রি এবাদতে অতিবাহিত করে, তারা শেষ রাত্রে কোন্ গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করে?

জওয়াব এই যে, তাঁরা আল্লাহ্ তাআলার আধ্যাত্মজ্ঞানে জ্ঞানী এবং আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁরা তাঁদের এবাদতকে আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্যের পক্ষে যথোপযুক্ত মনে করেন না। তাই এই ত্রুটি ও অবহেলার কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।—(মাযহারী)।

সদকা-খয়রাতকারীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ ঃ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ বলে এমন দরিদ্র অভাবগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার্থে নিজের অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না। ফলে মানুষের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে। আয়াতে মুমিন-মুত্তাকীদের এই গুণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তাআলার পথে ব্যয় করার সময় কেবল ভিক্ষুক অর্থাৎ, স্বীয় অভাব প্রকাশকারীদেরকেই দান করে না ; বরং যারা স্বীয় অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না, তাদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে এবং তাদের খোঁজ-খবর নেয়।

বলাবাহুল্য, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন-মুত্তাকিগণ কেবল দৈহিক এবাদত তথা নামায ও রাত্রি জাগরণ করেই ক্ষান্ত হয় না ; বরং আর্থিক এবাদতেও অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ভিক্ষুকদের ছাড়া তারা এমন লোকদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে, যারা ভদ্রতা রক্ষার্থে নিজেদের অভাব কাউকে জানায় না। কিন্তু কোরআন পাক এই আর্থিক এবাদত وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ, তারা যেসব ফকীর ও মিসকীনকে দান করে, তাদের কাছে নিজেদের অনুগ্রহ প্রকাশ করে বেড়ায় না ; বরং এরূপ মনে করে দান করে যে, তাদের ধন-সম্পদে এই ফকীরদেরও অংশ ও হক আছে এবং হকদারকে তার হক দেয়া কোন অনুগ্রহ হতে পারে না ; বরং এতে স্বীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করার সুখ রয়েছে।

বিশ্বচরাচর ও ব্যক্তিসত্তা উভয়ের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলী রয়েছে ঃ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ —অর্থাৎ, বিশ্বাসকারীদের জন্যে পৃথিবীতে কুদরতের অনেক নিদর্শন আছে। (পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে কাফেরদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর মুমিন পরহেযগারদের অবস্থা, গুণাবলী ও উচ্চ মর্তবা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আবার কাফের ও কেয়ামত অবিশ্বাসকারীদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার এবং আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের দৃষ্টিতে উপস্থিত করে অস্বীকারে বিরত হওয়ার নির্দেশ দান করা হচ্ছে। অতএব, এই বাক্যের সম্পর্ক পূর্বোল্লেখিত إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ বাক্যের সাথে রয়েছে, যাতে কোরআন ও রসূলকে অস্বীকার করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

তফসীর-মাযহারীতে একেও মুমিন-মুত্তাকীদেরই গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে এবং موقنين -এর অর্থ আগের متقين-ই করা হয়েছে। এতে তাদের এই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা পৃথিবী ও আকাশের দিগন্তে বিস্তৃত আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে। ফলে তাদের ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় ; যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

পৃথিবীতে কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগ-বাগিচাই দেখুন, এদের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও গন্ধ, এক একটি পত্রের নিখুঁত সৌন্দর্য এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়ার হাজারো বৈচিত্র্য রয়েছে। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠে নদীনালা কূপ ও অন্যান্য জলাশয় রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে সুউচ্চ পাহাড় ও গিরিগুহা রয়েছে। মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণকারী অসংখ্য প্রকার জীবজন্তু ও তাদের বিভিন্ন উপকারীতা রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন গোত্র, জাতি এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে বর্ণ ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য, চরিত্র ও অভ্যাসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করলে প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার কুদরত ও হিকমতের এত বিকাশ দৃষ্টিগোচর হবে, যা গণনা করাও সুকঠিন।

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ —এস্থলে নিদর্শনাবলীর বর্ণনায় আকাশ ও শূন্য জগতের সৃষ্টবস্তুর কথা বাদ দিয়ে কেবল ভূপৃষ্ঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মানুষের খুব নিকটবর্তী এবং মানুষ এর উপর বসবাস ও চলাফেরা করে। আলোচ্য আয়াতে এর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী খোদ মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূপৃষ্ঠের সৃষ্টবস্তুও বাদ দাও, খোদ তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই চিন্তা-ভাবনা করলে এক একটি অঙ্গকে আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের এক একটি পুস্তক দেখতে পাবে। তোমরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে যে, সমগ্র বিশ্বে কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেসবই যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে সংকুচিত হয়ে বিদ্যমান হয়েছে। একারণেই মানুষের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে আল্লাহ্ তাআলাকে যেন সে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।

কিভাবে এককোঁটা বীর্য বিভিন্ন ভূখণ্ডের খাদ্য ও বিশ্বময় ছড়ানো সূক্ষ্ম উপাদানের নির্যাস হয়ে গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল হয়? অতঃপর কিভাবে বীর্য থেকে একটি জমাট রক্ত তৈরী হয় এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড প্রস্তুত হয়? এরপর কিভাবে তাতে অস্থি তৈরী করা হয় এবং অস্থিকে মাংস পরানো হয়? অতঃপর কিভাবে এই নিষ্প্রাণ পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয় এবং পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করে তাকে দুনিয়ার আলো বাতাসে আনয়ন করা হয়? এরপর কিভাবে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে এই জ্ঞানহীন ও চেতনাহীন শিশুকে একজন সুধী ও কর্মঠ মানুষে পরিণত করা হয় এবং কিভাবে মানুষের আকার-আকৃতিকে বিভিন্নরূপ দান করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনের চেহারা অন্যজনের চেহারা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিগোচর হয়? এই কয়েক ইঞ্চির পরিধির মধ্যে এমন এমন স্বাতন্ত্র্য রাখার সাধ্য আর কার আছে? এরপর মানুষের মন ও মেজাযের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের একত্ব সেই আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের লীলা, যিনি অদ্বিতীয় ও অনুপম। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

এসব বিষয় প্রত্যেক মানুষ বাইরে ও দূরে নয়—স্বয়ং তার অস্তিত্বের মধ্যেই দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে। এরপরও যদি সে আল্লাহ্ তাআলাকে সর্বশক্তিমান স্বীকার না করে তবে, তাকে অন্ধ ও অজ্ঞান বলা ছাড়া উপায় নেই। একারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ, তোমরা কি দেখ না? এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ব্যাপারে তেমন বেশী জ্ঞানবুদ্ধি দরকার হয় না, দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ অর্থাৎ, আকাশে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত বিষয় রয়েছে। এর নির্মল ও সরাসরি তফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, আকাশে থাকার অর্থ "লওহে-মাহফুযে" লিপিবদ্ধ থাকা। বলাবাহুল্য প্রত্যেক মানুষের রিযিক, প্রতিশ্রুত বিষয় এবং পরিণাম সবই লওহে-মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে।

اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ অর্থাৎ, তোমরা যেমন নিজেদের কথাবার্তা বলার মাধ্যমে কোন সন্দেহ কর না, কেয়ামতের আগমনও তেমনি সুস্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। দেখাশোনা, আস্বাদন করা, স্পর্শ করা ও ঘ্রাণ লওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে এখানে বিশেষভাবে কথা বলাকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, উপরোক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণে ধোঁকা হয়ে যায়। দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য হওয়া সুবিদিত। অসুস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে মিষ্ট বস্তুও তিক্ত লাগে, কিন্তু বাকশক্তিতে কখনও কোন ধোঁকা ও ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই।—(কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াত থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) —এর সান্ত্বনার জন্যে অতীত যুগের কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

فَقَالُوْا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ ফেরেশতাগণ বলেছিল سَلٰمًا ইবরাহীম (আঃ) জওয়াবে বললেন سَلٰمٌ কেননা, এতে সার্বক্ষণিক শান্তির অর্থ নিহিত রয়েছে। কোরআন পাকে নির্দেশ আছে, সালামের জওয়াব সালামকারী ভাষা অপেক্ষা উত্তম ভাষায় দাও। ইবরাহীম (আঃ) এভাবে সেই নির্দেশ পালন করলেন।

قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ - منكر শব্দের অর্থ অপরিচিত। ইসলামে গোনাহের কাজও অপরিচিত হয়ে থাকে। তাই গোনাহ্‌কেও منكر বলা হয়। বাক্যের অর্থ এই যে, ফেরেশতাগণ মানব আকৃতিতে আগমন করেছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদেরকে চিনতে পারেননি। তাই মনে মনে বললেন ঃ এরা তো অপরিচিত লোক। এটাও সম্ভবপর যে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে মেহমানদেরকে শুনিয়েই একথা বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা।

فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ - راغ শব্দটি روغ থেকে উদ্ভূত। অর্থ গোপনে চলে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আঃ) মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা করার জন্যে এভাবে গৃহে থেকে চলে গেলেন যে, মেহমানরা তা টের পায়নি। নতুবা তারা একাজে বাধা দিত।

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ অর্থাৎ, ইবরাহীম (আঃ) তাদের না খাওয়ার কারণে তাদের ব্যাপারে শংকাবোধ করতে লাগলেন। কেননা, তখন ভদ্র সমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, আহার্য পেশ করলে মেহমান কিছু না, কিছু আহার্য গ্রহণ করত। কোন মেহমান এরূপ না করলে তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশে আগমনকারী শত্রু বলে আশংকা করা হত। সেই যুগের চোর-ডাকাতদেরও এতটুকু ভদ্রতা জ্ঞান ছিল যে, তারা যার বাড়ীতে কিছু খানা খেত, তার ক্ষতিসাধন করত না। তাই না খাওয়া বিপদাশংকার কারণ ছিল।

فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِىْ صَرَّةٍ এর অর্থ অসাধারণ আওয়াজ। কলসের শব্দকে صرير বলা হয়। হযরত সারা যখন শুনলেন যে, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে পুত্র-সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিতেছে, আর একথা বলাই বাহুল্য যে, সন্তান স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে; তখন তিনি বুঝলেন যে, এই সুসংবাদ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যে। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর মুখ থেকে কিছু আশ্চর্য ও বিস্ময়ের বাক্য উচ্চারিত হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ অর্থাৎ, প্রথমতঃ আমি বৃদ্ধা, এরপর বন্ধ্যা। যৌবনেও আমি সন্তান ধারণের যোগ্য ছিলাম না। এখন বার্ধক্যে এটা কিরূপে সম্ভব হবে? জওয়াবে ফেরেশতাগণ বলল ঃ كَذٰلِكِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সবকিছু করতে পারেন। এ কাজও এমনিভাবেই হবে। এই সুসংবাদ অনুযায়ী যখন হযরত ইসহাক (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন, তখন হযরত সারার বয়স নিরানব্বই বছর এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বয়স একশত বছর ছিল।—(কুরতুবী)

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا
أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُسَوَّمَةً
عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً
لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ
فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي عَادٍ
إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ
عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا
حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ وَ
هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾
وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾ وَ
السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا
فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾

(৩১) ইবরাহীম বলল ঃ হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? (৩২) তারা বলল ঃ আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, (৩৩) যাতে তাদের উপর মাটির ঢিলা নিক্ষেপ করি। (৩৪) যা সীমাতিক্রমকারীদের জন্যে আপনার পালনকর্তার কাছে চিহ্নিত আছে। (৩৫) অতঃপর সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম। (৩৬) এবং সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোন মুসলমান আমি পাইনি। (৩৭) যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্যে সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি। (৩৮) এবং নিদর্শন রয়েছে মূসার বৃত্তান্তে; যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। (৩৯) অতঃপর সে শক্তিবলে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল ঃ সে হয় যাদুকর, না হয় পাগল। (৪০) অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সে ছিল অভিযুক্ত। (৪১) এবং নিদর্শন রয়েছে তাদের কাহিনীতে, যখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অশুভ বায়ু। (৪২) এই বায়ু যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল ঃ তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। (৪৩) আরও নিদর্শন রয়েছে সামূদের ঘটনায়; যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, কিছুকাল মজা লুটে নাও। (৪৪) অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল এবং তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এমতাবস্থায় যে, তারা তা দেখছিল। (৪৫) অতঃপর তারা দাঁড়াতে সক্ষম হল না এবং কোন প্রতিকারও করতে পারল না। (৪৬) আমি ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। নিশ্চিতই তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। (৪৭) আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী। (৪৮) আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম। (৪৯) আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর। (৫০) অতএব, আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই কথোপকথনের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) জানতে পারলেন যে, আগন্তুক মেহমানগণ আল্লাহ্‌র ফেরেশতা। অতএব, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি অভিযানে আগমন করেছেন? তারা লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণের আযাব নাযিল করার কথা বলল। এই প্রস্তর বর্ষণ বড় বড় পাথর দ্বারা নয়—মাটি নির্মিত কংকর দ্বারা হবে। مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ অর্থাৎ, কংকরগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ চিহ্নযুক্ত হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, প্রত্যেক কংকরের গায়ে সেই ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে ধ্বংস করার জন্যে কংকরটি প্রেরিত হয়েছিল। সে যেদিকে পলায়ন করেছে, কংকরও তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে। অন্যান্য আয়াতে কওমে-লূতের উপর আপতিত আযাবের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, জিবরাঈল (আঃ) গোটা জনপদকে উপরে তুলে উল্টিয়ে দেন। অর্থাৎ, প্রথমে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং পরে সমগ্র ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিল।

কওমে-লূতের পর মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়, ফেরাউন এবং তার অনুসারীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। ফেরাউনকে যখন মূসা (আঃ) সত্যের পয়গাম দেন, তখন বলা হয়েছে ঃ فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ অর্থাৎ, ফেরাউন মূসা (আঃ) –এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বীয় শক্তি, সেনাবাহিনী ও পারিষদবর্গের উপর ভরসা করে। رُكْن এর শাব্দিক অর্থ শক্তি। হযরত লূত (আঃ)-এর বাক্যে اَوْ اٰوِىْۤ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কেয়ামত ও পরকালের বর্ণনা এবং অস্বীকারকারীদের শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার সর্বময় শক্তি বর্ণিত হয়েছে। এতে করে কেয়ামত ও কেয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে যে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়, তার নিরসন হয়ে যায়। এছাড়া আয়াতসমূহে তওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং রেসালতে বিশ্বাস স্থাপনের তাকীদ হয়েছে।

بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ – ايد শব্দের অর্থ শক্তি ও সামর্থ্য। এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ তফসীরই করেছেন।

فَفِرُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ উদ্দেশ্য এই যে, তওবা করে গোনাহ্ থেকে ছুটে পালাও। আবুবকর ওয়াররাক ও জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ প্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষকে গোনাহের দিকে দাওয়াত ও প্ররোচনা দেয়। তোমরা এগুলো থেকে ছুটে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদেরকে এদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। — (কুরতুবী)

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ؕ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿٥١﴾ كَذٰلِكَ مَاۤ اَتَى الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾ اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَاۤ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٤﴾ وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾ مَاۤ اُرِیْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَاۤ اُرِیْدُ اَنْ یُّطْعِمُوْنِ ﴿٥٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِیْنُ ﴿٥٨﴾ فَاِنَّ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا یَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٥٩﴾ فَوَیْلٌ لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ یَّوْمِهِمُ الَّذِیْ یُوْعَدُوْنَ ﴿٦٠﴾

سُوْرَةُ الطُّوْرِ [illegible]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالطُّوْرِ ﴿١﴾ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ﴿٢﴾ فِیْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ﴿٣﴾ وَّالْبَیْتِ الْمَعْمُوْرِ ﴿٤﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ﴿٥﴾ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ﴿٦﴾ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾ یَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ﴿٩﴾ وَّتَسِیْرُ الْجِبَالُ سَیْرًا ﴿١٠﴾ فَوَیْلٌ یَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِیْنَ ﴿١١﴾ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ خَوْضٍ یَّلْعَبُوْنَ ﴿١٢﴾ یَوْمَ یُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِیْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٤﴾

(৫১) তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোন উপাস্য সাব্যস্ত করো না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (৫২) এমনিভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছে, তারা বলেছে : যাদুকর, না হয় উম্মাদ। (৫৩) তারা কি একে অপরকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে? বস্তুতঃ ওরা দুষ্ট সম্প্রদায়। (৫৪) অতএব, আপনি ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। এতে আপনি অপরাধী হবেন না। (৫৫) এবং বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো মুমিনদের উপকারে আসবে। (৫৬) আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। (৫৭) আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। (৫৮) আল্লাহ্ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত। (৫৯) অতএব, এই যালেমদের প্রাপ্য তাই, যা ওদের অতীত সহচরদের প্রাপ্য ছিল। কাজেই ওরা যেন আমার কাছে তা তাড়াতাড়ি না চায়। (৬০) অতএব, কাফেরদের জন্যে দুর্ভোগ সেই দিনের, যেদিনের প্রতিশ্রুতি ওদেরকে দেয়া হয়েছে।

সূরা আত্ব তূর

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৪৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(১) কসম তূরপর্বতের, (২) এবং লিখিত কিতাবের, (৩) প্রশস্ত পত্রে, (৪) কসম বায়তুল-মামুর তথা আবাদ গৃহের, (৫) এবং সমুন্নত ছাদের, (৬) এবং উত্তাল সমুদ্রের, (৭) আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, (৮) তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। (৯) সেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে (১০) এবং পর্বতমালা হবে চলমান, (১১) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে, (১২) যারা ক্রীড়াচ্ছলে মিছেমিছি কথা বানায়। (১৩) যেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। (১৪) এবং বলা হবে : এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে,

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে এবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এখানে বাহ্যদৃষ্টিতে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। (এক) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তার জন্যে সেই কাজ থেকে বিরত থাকা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব, অপ্রকৃত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিপরীতে কোন কাজ করা অসম্ভব। (দুই) আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব সৃষ্টিকে কেবল এবাদতে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। অথচ তাদের সৃষ্টিতে এবাদত ব্যতীত আরও অনেক উপকারিতা ও রহস্য বিদ্যমান আছে।

প্রথম প্রশ্নের জওয়াবে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এই বিষয়বস্তু শুধু মুমিনদের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, আমি মুমিন জিন ও মুমিন মানবকে এবাদত ব্যতীত অন্য কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি। বলাবাহুল্য, যারা মুমিন, তারা কমবেশী এবাদত করে থাকে। যাহ্হাক, সুফিয়ান প্রমুখ তফসীরবিদ এই উক্তি করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত এই আয়াতের এক কেরাতে مُؤْمِنِيْنَ শব্দও উল্লেখ করা হয়েছে এবং আয়াত এভাবে পাঠ করা হয়েছে وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ — اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ এই কেরাত থেকে উপরোক্ত তফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। এই প্রশ্নের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, আয়াতে জবরদস্তিমূলক ইচ্ছা বোঝানো হয়নি, যার বিপরীত হওয়া অসম্ভব বরং আইনগত ইচ্ছা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আমি তাদেরকে কেবল এজন্যে সৃষ্টি করেছি, যাতে তাদেরকে এবাদত করার আদেশ দেই। আল্লাহ্‌র আদেশকে মানুষের ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত রাখা হয়েছে। তাই আদেশের বিপরীত হওয়া অসম্ভব নয়। অর্থাৎ, আল্লাহ্ সবাইকে এবাদত করার আদেশ দিয়েছেন; কিন্তু সাথে সাথে ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্ষমতাও দিয়েছেন। তাই কোন কোন লোক খোদাপ্রদত্ত ইচ্ছা যথার্থ ব্যয় করে এবাদতে আত্মনিয়োগ করেছে এবং কেউ এই ইচ্ছার অসদ্ব্যবহার করে এবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই উক্তি ইমাম বগভী (রহঃ) হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তফসীরে-মাযহারীতে এর সরল তফসীর এই বর্ণিত হয়েছে যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার সময় তাদের মধ্যে এবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। সেমতে প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে এই প্রতিভা প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান থাকে। এরপর কেউ এই প্রতিভাকে সঠিক পথে ব্যয় করে কৃতকার্য হয় এবং কেউ একে গোনাহ্ ও কুপ্রবৃত্তিতে বিনষ্ট করে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه অর্থাৎ, প্রত্যেক সন্তান প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতা-মাতা তাকে প্রকৃতি থেকে সরিয়ে নিয়ে ইহুদী অথবা অগ্নিপূজারীতে পরিণত করে। "প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ" করার অর্থ অধিকাংশ আলেমের মতে ইসলাম ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করা। অতএব এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ও সৃষ্টিগতভাবে ইসলাম ও ঈমানের যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। এরপর তার পিতা-মাতা এই প্রতিভাকে বিনষ্ট করে কুফরের পথে পরিচালিত করে। এই হাদীসের অনুরূপ আলোচ্য আয়াতেরও এরূপ অর্থ হতে পারে যে, প্রত্যেক জিন ও

মানবের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা এবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা রেখেছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াব এই যে, এবাদতের জন্যে কাউকে সৃষ্টি করা তার কাছ থেকে অন্যান্য উপকারিতা অর্জিত হওয়ার পরিপন্থী নয়।

مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী কোন উপকার চাই না যে, তারা রিযিক সৃষ্টি করবে আমার জন্যে অথবা নিজেদের জন্যে অথবা আমার অন্যান্য সৃষ্টজীবের জন্যে। আমি এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই কথাগুলো বলা হয়েছে। কেননা, যত বড়লোকই হোক না কেন – কেউ যদি কোন গোলাম ক্রয় করে এবং তার পিছনে অর্থ-কড়ি ব্যয় করে, তবে তার উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, গোলাম তার কাজকর্মের প্রয়োজন মেটাবে এবং রুযী-রোযগার করে মালিকের হাতে সমর্পন করবে। আল্লাহ্ তাআলা এসব উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। তাই বলেছেন যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার পশ্চাতে আমার কোন উপকার উদ্দেশ্য নয়।

ذَنُوبًا শব্দের আসল অর্থ কূয়া থেকে পানি তোলার বড় বালতি। জনগণের সুবিধার্থে জনপদের সাধারণ কূয়াগুলোতে পানি তোলার পালা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালা অনুযায়ী পানি তোলে। তাই এখানে ذَنُوب শব্দের অর্থ করা হয়েছে পালা ও প্রাপ্য অংশ। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে নিজ নিজ সময়ে আমল করার সুযোগ ও পালা দেয়া হয়েছে। যারা নিজেদের পালায় কাজ করেনি, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনিভাবে বর্তমান মুশরিকদের জন্যেও পালা ও সময় নির্ধারিত আছে। যদি তারা এ সময়ের মধ্যে কুফর থেকে বিরত না হয়, তবে আল্লাহ্র আযাব তাদেরকে দুনিয়াতে না হয় পরকালে অবশ্যই পাকড়াও করবে। তাই তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন ত্বরিত আযাব চাওয়া থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ, কাফেররা অস্বীকারের ভঙ্গিতে বলে থাকে যে, আমরা বাস্তবিক অপরাধী হলে আপনার কথা অনুযায়ী আমাদের উপর আযাব আসে না কেন? এর জওয়াব এই যে, আযাব নির্দিষ্ট সময় ও পালা অনুযায়ী আগমন করবে। তোমাদের পালাও এল বলে। কাজেই তাড়াহুড়া করো না।

সূরা আত্ব-তূর

وَالطُّورِ —হিব্রু ভাষায় এর অর্থ পাহাড়, যাতে লতাপাতা ও বৃক্ষ উদগত হয়। এখানে তূর বলে মাদইয়ানে অবস্থিত তূরেসিনীন বোঝানো হয়েছে। এই পাহাড়ের উপর হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, দুনিয়াতে জান্নাতের চারটি পাহাড় আছে। তন্মধ্যে তূর একটি—(কুরতুবী) তূরের কসম খাওয়ার মধ্যে উপরোক্ত বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্যে কিছু কালাম ও আহকাম আগমন করেছে। এগুলো মেনে চলা ফরয।

وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ — رَقّ - শব্দের আসল অর্থ লেখার জন্যে কাগজের স্থলে ব্যবহৃত পাতলা চামড়া। তাই এর অনুবাদ করা হয় পত্র। লিখিত কিতাব বলে মানুষের আমলনামা বোঝানো হয়েছে, না হয় কোন কোন তফসীরবিদের মতে কোরআন পাক বোঝানো হয়েছে।

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ —আকাশস্থিত ফেরেশতাদের কা'বাকে বায়তুল মামুর বলা হয়। এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের প্রমাণিত আছে যে, মেরাজের রাত্রিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বায়তুল মামুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা এবাদতের জন্যে প্রবেশ করে। এরপর তাদের পুনরায় এতে প্রবেশ করার পালা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফেরেশতাদের নম্বর আসে।—(ইবনে কাসীর)

সপ্তম আকাশে বসবাসকারী ফেরেশতাদের কা'বা হচ্ছে বায়তুল মামুর। এ কারণেই মেরাজের রাত্রিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এখানে পৌঁছে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বায়তুল মামুরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। তিনি ছিলেন দুনিয়ার কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহ্ তাআলা এর প্রতিদানে আকাশের কা'বার সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।—(ইবনে-কাসীর)

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ — مسجور শব্দটি سجر থেকে উদ্ভূত। এটা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই ঃ সমুদ্রের কসম, যাকে অগ্নিতে পরিণত করা হবে। এথেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের দিন সকল সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ —অর্থাৎ, চতুর্দিকের সমুদ্র অগ্নি হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত মানুষকে ঘিরে রাখবে। এই তফসীরই হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আলী, ইবনে-আব্বাস, মুজাহিদ ও ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে-উমায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।—(ইবনে কাসীর)

হযরত আলী (রাঃ)-কে জনৈক ইহুদী প্রশ্ন করল ঃ জাহান্নাম কোথায়? তিনি বললেন ঃ সমুদ্রই জাহান্নাম। পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থে অভিজ্ঞ ইহুদী এই উত্তর সমর্থন করল। —(কুরতুবী) হযরত কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ مسجور – এর অর্থ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ। ইবনে জরীর (রহঃ) এই অর্থই পছন্দ করেছেন। —(ইবনে কাসীর)

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ — আপনার পালনকর্তার আযাব অবশ্যম্ভাবী। একে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এটা পূর্বোল্লেখিত কসমসমূহের জওয়াব।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) সূরা তূর পাঠ করে যখন এই আয়াতে পৌঁছেন, তখন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ দিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। তাঁর রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতা কারও ছিল না।—(ইবনে কাসীর)

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতএম বলেন ঃ মুসলমান হওয়ার পূর্বে আমি একবার বদরের যুদ্ধে বন্দীদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশে মদীনা পৌঁছেছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পাঠ করছিলেন। মসজিদের বাইরে থেকে আওয়ায শোনা যাচ্ছিল। তিনি যখন إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ পাঠ করলেন, তখন হঠাৎ আমার মনে হল যেন অন্তর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন এই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই আমি আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাব।—(কুরতুবী)

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا —অভিধানে অস্থির নড়াচড়াকে مور বলা হয়। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন আকাশ অস্থিরভাবে নড়াচড়া করবে।

أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾

(১৫) এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখছ না? (১৬) এতে প্রবেশ কর অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে। (১৭) নিশ্চয়ই খোদাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নেয়ামতে (১৮) তারা উপভোগ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদের দেবেন এবং তিনি জাহান্নামের আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন। (১৯) তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। (২০) তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। (২১) যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী। (২২) আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে। (২৩) সেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দেবে; যাতে অসার বকাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। (২৪) সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। (২৫) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (২৬) তারা বলবে ঃ আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। (২৭) অতঃপর আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। (২৮) আমরা পূর্বেও আল্লাহ্‌কে ডাকতাম। তিনি সৌজন্যশীল, পরম দয়ালু। (২৯) অতএব, আপনি উপদেশ দান করুন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং উন্মাদও নন। (৩০) তারা কি বলতে চায় ঃ সে একজন কবি আমরা তার মৃত্যু-দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছি। (৩১) বলুন ঃ তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত আছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ঈমান থাকলে বুযুর্গদের সাথে বংশগত সম্পর্ক পরকালেও উপকারে আসবে ঃ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ —অর্থাৎ, যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানগণও ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদের সন্তানদেরকে জান্নাতে তাদের সাথে মিলিত করে দেব। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকেও তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেবেন, যদিও তারা কর্মের দিক দিয়ে সেই মর্তবার যোগ্য না হয়—যাতে বুযুর্গদের চক্ষু শীতল হয়।—(মাযহারী)

সায়ীদ ইবনে-জুবায়ের (রহঃ) বলেন ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যে, তারা কোথায় আছে? জওয়াবে বলা হবে যে, তারা তোমার মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তাই তারা জান্নাতে আলাদা জায়গায় আছে। এই ব্যক্তি আরয করবে ঃ পরওয়ারদেগার, দুনিয়াতে নিজের জন্যে ও তাদের সবার জন্যে আমল করেছিলাম। তখন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আদেশ হবে ঃ তাদেরকেও জান্নাতের এই স্তরে একসাথে রাখা হোক।—(ইবনে-কাসীর)

ইবনে-কাসীর এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন ঃ এসব রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে সৎকর্মপরায়ণ পিতৃপুরুষ দ্বারা তাদের সন্তানরা উপকৃত হবে এবং আমলে তাদের মর্তবা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরককে পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। অপরদিকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদের পিতা-মাতার উপকৃত হওয়াও হাদীসে প্রমাণিত আছে। মসনদে-আহমদে বর্ণিত হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা কোন কোন নেকবান্দার মর্তবা তার আমলের তুলনায় অনেক উচ্চ করে দেবেন। সে প্রশ্ন করবে ঃ পরওয়ারদেগার, আমাকে এই মর্তবা কিরূপে দেয়া হল? আমার আমল তো এই পর্যায়ের ছিল না। উত্তর হবে ঃ তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা ও দোয়া করেছে। এটা তারই ফল।

وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ — ايلات ও الت এর শাব্দিক অর্থ হ্রাস করা।—(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই ঃ সন্তান-সন্ততিকে তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করার জন্যে এই পন্থা অবলম্বন করা হবে না যে, বুযুর্গদের আমল কিছু হ্রাস করে সন্তানদের আমল পূর্ণ করা হবে। বরং আল্লাহ্ তাআলা নিজ কৃপায় তাদেরকে সমান করে দেবেন।

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ — অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের জন্যে দায়ী হবে। অপরের গোনাহের বোঝা তার মাথায় চাপানো হবে না। অর্থাৎ, পূর্ববর্তী আয়াতে নেককর্মের বেলায় সৎকর্মশীল পিতৃপুরুষদের খাতিরে সন্তান-সন্ততির আমল বাড়িয়ে দেয়ার কথা আছে। কিন্তু গোনাহের বেলায় এরূপ করা হবে না। একের গোনাহের প্রতিক্রিয়া অপরের উপর প্রতিফলিত হবে না।—(ইবনে-কাসীর)

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَٰذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ
تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا
صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ
أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ
مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ
تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ
فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ
الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾
وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾
فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ
لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ
لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

(৩২) তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করে, না তারা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? (৩৩) না তারা বলে ঃ এই কোরআন সে নিজে রচনা করেছে? বরং তারা অবিশ্বাসী। (৩৪) যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক। (৩৫) তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? (৩৬) না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না। (৩৭) তাদের কাছে কি আপনার পালনকর্তার ভাণ্ডার রয়েছে, না তারাই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক? (৩৮) না তাদের কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা শ্রবণ করে? থাকলে তাদের শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক। (৩৯) না তার কন্যা-সন্তান আছে আর তোমাদের আছে পুত্রসন্তান? (৪০) না আপনি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান যে, তাদের উপর জরিমানার বোঝা চেপে বসে? (৪১) না তাদের কাছে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিপিবদ্ধ করে? (৪২) না তারা চক্রান্ত করতে চায়? অতএব যারা কাফের, তারাই চক্রান্তের শিকার হবে। (৪৩) না তাদের আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত কোন উপাস্য আছে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তাআলা তা থেকে পবিত্র। (৪৪) তারা যদি আকাশের কোন খণ্ডকে পতিত হতে দেখে, তবে বলে ঃ এটা তো পুঞ্জীভূত মেঘ। (৪৫) তাদেরকে ছেড়ে দিন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের উপর বজ্রাঘাত পতিত হবে। (৪৬) সেদিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (৪৭) গোনাহগারদের জন্যে এছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (৪৮) আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন এবং আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি গাত্রোত্থান করেন। (৪৯) এবং রাত্রির কিছু অংশে এবং তারকা অস্তমিত হওয়ার সময় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا — শত্রুদের শত্রুতা-বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে সূরার উপসংহারে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আপনি আমার দৃষ্টিতে আছেন। অর্থাৎ, আমার হেফাযতে আছেন। আমি আপনাকে তাদের প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখব। আপনি তাদের পরওয়া করবেন না। অন্য এক আয়াতে আছে وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা মানুষের অনিষ্ট থেকে আপনার হেফাযত করবেন।

এরপর আল্লাহ্ তাআলার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণায় আত্মনিয়োগ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যা মানবজীবনের আসল লক্ষ্য এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে বেঁচে থাকার প্রতিকারও। বলা হয়েছে ঃ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার সপ্রশংসে পতিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন। এর এক অর্থ নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থান করা। ইবনে-জরীর (রহঃ) তাই বলেন। এক হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রে জাগ্রত হয়ে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, সে যে দোয়াই করে, তাই কবুল হয়। বাক্যগুলো এই ঃ

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علىٰ كل شئ قدير . سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولاحول ولا قوة الا بالله

এরপর যদি সে ওযু করে নামায পড়ে, তবে তার নামায কবুল করা হবে।—(ইবনে-কাসীর)

মজলিসের কাফ্ফারা ঃ মুজাহিদ ও আবুল আহওয়াস (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, ''যখন দণ্ডায়মান হন''—এর অর্থ এই যে, যখন কেউ মজলিস থেকে উঠে, তখন এই বাক্য পাঠ করবে— سبحانك اللهم وبحمدك — এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) বলেন ঃ তুমি যখন মজলিস থেকে উঠ, তখন তসবীহ্ ও তাহ্মীদ কর। তুমি এই মজলিসে কোন সৎকাজ করে থাকলে তার পুণ্য অনেক বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোন পাপ কাজ করে থাকলে এই বাক্য তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে ভাল-মন্দ কথা-বার্তা হয়, সে যদি মসলিস ত্যাগ করার পূর্বে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, তবে আল্লাহ্ তাআলা এই মজলিসের যেসব গোনাহ্ হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করেন। বাক্যগুলো এই ঃ

سبحانك اللّٰهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك (তিরমিযী—ইবনে-কাসীর)।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ —অর্থাৎ, রাত্রে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। মাগরেব ও এশার নামায এবং সাধারণ তসবীহ্ পাঠ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। وَإِدْبَارَ النُّجُومِ অর্থাৎ, তারকা অস্তমিত হওয়ার পর। এখানে ফজরের নামায ও তখনকার তসবীহ্ পাঠ বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে-কাসীর)।

সূরা আত্ব-তূর সমাপ্ত

سُورَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى ① مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ② وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
الْهَوٰى ③ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ④ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ⑤ ذُوْ
مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى ⑥ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلٰى ⑦ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ⑧
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى ⑨ فَأَوْحٰى إِلٰى عَبْدِهٖ مَا أَوْحٰى ⑩ مَا
كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰى ⑪ أَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ⑫ وَلَقَدْ رَاٰهُ
نَزْلَةً أُخْرٰى ⑬ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ⑭ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى ⑮
إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ⑯ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ⑰
لَقَدْ رَأٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ⑱ أَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ⑲
وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى ⑳ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثٰى ㉑
تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ㉒ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا أَنْتُمْ
وَاٰبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ
إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ
الْهُدٰى ㉓ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ㉔ فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْأُوْلٰى ㉕

সূরাআন্‌-নাজ্‌ম

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৬২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(১) নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। (২) তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। (৩) এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। (৪) কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। (৫) তাঁকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা, (৬) সহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল (৭) ঊর্ধ্ব দিগন্তে, (৮) অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল। (৯) তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম। (১০) তখন আল্লাহ্‌ তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করলেন। (১১) রসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। (১২) তোমরা কি বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে? (১৩) নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, (১৪) সিদরাতুলমুন্তাহার নিকটে, (১৫) যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত। (১৬) যখন বৃক্ষটি দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার, তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। (১৭) তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি। (১৮) নিশ্চয় সে তার পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে। (১৯) তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা সম্পর্কে (২০) এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? (২১) পুত্র-সন্তান কি তোমাদের জন্যে এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহ্‌র জন্য? (২২) এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বন্টন। (২৩)এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের রেখেছ। এর সমর্থনে আল্লাহ্‌ কোন দলীল নাযিল করেননি। তারা অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথনির্দেশ এসেছে। (২৪) মানুষ যা চায়, তাই কি পায়? (২৫) অতএব, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব মঙ্গলই আল্লাহ্‌র হাতে।

সূরা আন্‌-নাজ্‌ম

সূরা নজমের বৈশিষ্ট্য ঃ সূরা নজম প্রথম সূরা, যা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মক্কায় ঘোষণা করেন।—(কুরতুবী) এই সূরাতেই সর্বপ্রথম সেজদার আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তেলাওয়াতের সেজদা করেন। মুসলমান ও কাফের সবাই এই সেজদায় শরীক হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় মজলিসে যত কাফের ও মুশরিক উপস্থিত ছিল, সবাই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সাথে সেজদায় আভূমি নত হয়ে যায়। কেবল এক অহংকারী ব্যক্তি যার নাম সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে, সে সেজদা করেনি। কিন্তু সে এক মুষ্টি মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বলল ঃ ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি সেই ব্যক্তিকে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি।—(ইবনে-কাসীর)।

এই সূরার শুরুতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সত্য নবী হওয়া এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে।

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى —নক্ষত্রমাত্রকেই نجم বলা হয় এবং বহুবচন نجوم কখনও এই শব্দটি কয়েকটি নক্ষত্রের সমষ্টি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতেও কেউ কেউ নজমের তফসীর "সুরাইয়া" অর্থাৎ, সপ্তর্ষিমণ্ডল দ্বারা করেছেন। কাররা ও হযরত হাসান বসরী (রহঃ) প্রথম তফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।—(কুরতুবী)। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তা-ই অবলম্বন করা হয়েছে। هَوٰى শব্দটি পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। নক্ষত্রের পতিত হওয়ার মানে অস্তমিত হওয়া। এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা নক্ষত্রের কসম খেয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর ওহী সত্য, বিশুদ্ধ ও সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। সূরা সাফফাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, বিশেষ উপযোগিতা ও তাৎপর্যের কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর বিশেষ বিশেষ সৃষ্টবস্তুর কসম খেতে পারেন। কিন্তু অন্য কারও জন্যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর কসম খাওয়ার অনুমতি নেই। এখানে নক্ষত্রের কসম খাওয়ার এক তাৎপর্য এই যে, অন্ধকার রাত্রে দিক ও রাস্তা নির্ণয়ের কাজে নক্ষত্র ব্যবহৃত হয়, তেমনি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর মাধ্যমেও আল্লাহ্‌র পথের দিকে হেদায়েত অর্জিত হয়।

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى — এই বিষয়বস্তুর কারণেই কসম খাওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যে পথের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেন ; তাই আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টিলাভের বিশুদ্ধ পথ। তিনি পথ ভুলে যাননি এবং বিপথগামীও হননি।

রসূলের পরিবর্তে সংগী বলার রহস্য ঃ এ স্থলে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নাম অথবা নবী শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে 'তোমাদের সংগী' বলে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) বাইরে থেকে আগত কোন অপরিচিত ব্যক্তি নন, যার সত্যবাদিকতায় তোমরা সন্দিগ্ধ হবে। বরং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সংগী। তোমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানেই শৈশব অতিবাহিত করে যৌবনে-পদার্পণ করেছেন। তাঁর জীবনের কোন দিক তোমাদের কাছে গোপন নয়। তোমরা পরীক্ষা করে দেখেছ যে, তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না। তোমরা তাঁকে শৈশবেও কোন মন্দকাজে লিপ্ত দেখনি। তাঁর চরিত্র, অভ্যাস, সততা ও বিশ্বস্ততার

প্রতি তোমাদের এতটুকু আস্থা ছিল যে, সমগ্র মক্কাবাসী তাঁকে 'আল-আমীন' বলে সম্বোধন করত। এখন নবুওয়ত দাবী করায় তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করেছ। সর্বনাশের কথা এই যে, যিনি মানুষের ব্যাপারে কখনও মিথ্যা বলেননি, তিনি আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারে মিথ্যা বলছেন বলে তোমরা তাঁকে অভিযুক্ত করছ। তাই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى — অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কথা তৈরী করে আল্লাহ্ তাআলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন না। এর কোন সম্ভাবনাই নেই। বরং তিনি যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে প্রত্যাদেশ হয়। বোখারীর বিভিন্ন হাদীসে ওহীর অনেক প্রকার বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে (এক) যার অর্থ ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, এর নাম কোরআন। (দুই) যার কেবল অর্থ আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই অর্থ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন, এর নাম হাদীস ও সুন্নাহ্। এরপর হাদীসে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যে বিষয়বস্তু বিধৃত হয়, কখনও তা কোন ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা তথা বিধান হয়ে থাকে এবং কখনও কেবল সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়। এই নীতির মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইজতিহাদ করে বিধানাবলী বের করেন। এই ইজতিহাদে ভ্রান্তি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তথা পয়গম্বরকুলের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান বর্ণনা করেন, সেগুলোতে ভুল হয়ে গেলে তা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীর সাহায্যে শুধরিয়ে দেয়া হয়। তাঁরা ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য মুজতাহিদ আলেম ইজতিহাদে ভুল করলে তারা তার উপর কায়েম থাকতে পারেন। তাদের এই ভুলও আল্লাহ্ তাআলার কাছে কেবল ক্ষমাই নয় ; বরং ধর্মীয় বিধান হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে তাঁরা যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, তজ্জন্যে তাঁরা কিঞ্চিৎ সওয়াবেরও অধিকারী হন।

এই বক্তব্য দ্বারা আলোচ্য আয়াত সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জওয়াবও হয়ে গেছে। প্রশ্ন এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সব কথাই যখন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী হয়ে থাকে, তখন জরুরী হয়ে পড়ে যে, তিনি নিজ মতামত ও ইজতিহাদ দ্বারা কোন কিছু বলেন না। অথচ সহীহ্ হাদীসসমূহে একাধিক ঘটনা এমন বর্ণিত আছে যে, প্রথমে তিনি এক নির্দেশ দেন, অতঃপর ওহীর আলোকে সেই নির্দেশ পরিবর্তন করেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রথম নির্দেশটি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ছিল না'; বরং তিনি স্বীয় মতামত ও ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন। এর জওয়াব পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওহী কখনও সামগ্রিক নীতির আকারে হয়, যদ্দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইজতিহাদ করে বিধানাবলী বের করেন। এই ইজতিহাদে ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوٰى — এখান থেকে অষ্টাদশতম আয়াত لَقَدْ رَأٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى পর্যন্ত সব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওহীতে কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। আল্লাহ্র কালাম তাঁকে এভাবে দান করা হয়েছে যে, এতে কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকতে পারে না।

এই আয়াতসমূহের তফসীরে তফসীরবিদদের মতভেদ ঃ এসব আয়াতের ব্যাপারে দু'প্রকার তফসীর বর্ণিত রয়েছে। (এক) আনাস ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তফসীরের সারমর্ম এই যে, এসব আয়াতে মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভ ও আল্লাহ্র দর্শন ও নৈকট্যলাভের কথা আলোচিত হয়েছে। মহাশক্তিশালী, সহজাত শক্তিসম্পন্ন, فَاسْتَوٰى এবং دَنَا فَتَدَلّٰى এগুলো সব আল্লাহ্ তাআলার বিশেষণ ও কর্ম। তফসীরে মযহারীতে এই তফসীর অবলম্বিত হয়েছে। (দুই) অন্যান্য অনেক সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে এসব আয়াতে জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে এবং মহাশক্তিশালী ইত্যাদি শব্দ জিবরাঈলের বিশেষণ। এই তফসীরের পক্ষে অনেক সঙ্গত কারণ রয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও সূরা নজম সম্পূর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কায় সর্বপ্রথম যে সূরা প্রকাশ্যে পাঠ করেন তা সূরা নজম। বাহ্যতঃ মে'রাজের ঘটনা এরপরে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি তর্কাতীত নয়। আসল কারণ এই যে, হাদীসে বরং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এসব আয়াতের যে তফসীর করেছেন, তাতে জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখিত আছে। মুসনাদে-আহমদে বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য এরূপ ঃ

শা'বী হযরত মসরূক থেকে বর্ণনা করেন—তিনি একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে ছিলেন এবং আল্লাহ্ তাআলাকে দেখা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। মসরূক বলেন ঃ আমি বললাম, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى - وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন ঃ আয়াতে যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে, সে জিবরাঈল (আঃ)। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে মাত্র দু'বার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। আয়াতে বর্ণিত দেখার অর্থ এই যে, তিনি জিবরাঈলকে আকাশ থেকে ভূমির দিকে অবতরণ করতে দেখেছেন। তার দেহাকৃতি আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল।—(ইবনে-কাসীর)।

সহীহ্ মুসলিমেও এই রেওয়ায়েত প্রায় একই ভাষায় বর্ণিত আছে। হাফেয ইবনে হাজার ফতহুলবারী গ্রন্থে ইবনে মরদুওয়াইহ্ (রহঃ) থেকে এই রেওয়ায়েত একই সনদে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত আয়েশার (রাঃ) বক্তব্য এরূপ ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ এই আয়াত সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি আপনার পালনকর্তাকে দেখেছেন কি ? তিনি বললেনঃ না, বরং আমি জিবরাঈলকে নীচে অবতরণ করতে দেখেছি।—(ফতহুল-বারী ৮ম খণ্ড ৪৯৩ পৃঃ)।

সহীহ্ বোরখারীতে শায়বানী বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত যরকে এই আয়ারেত অর্থ জিজ্ঞাসা করেন ঃ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى إِلٰى عَبْدِهِ مَا اَوْحٰى তিনি জওয়াবে বলেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জিবরাঈলকে ছয়শত বাহুবিশিষ্ট দেখেছেন। ইবনে জরীর (রহঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে-মসউদ (রাঃ) থেকে مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জিবরাঈলকে রফরফের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর অস্তিত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে রেখেছিল।

ইবনে কাসীরের বক্তব্য ঃ ইবনে-কাসীর স্বীয় তফসীরে এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ সূরা নজমের উল্লেখিত আয়াতসমূহ

দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বলে জিবরাঈলকে দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বোঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা, আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ, আবুযর গেফারী, আবু হোরায়রা প্রমুখ সাহাবীর এই উক্তি। তাই ইবনে-কাসীর আয়াতসমূহের তফসীরে বলেনঃ

ঃআয়াতসমূহে উল্লেখিত দেখা ও নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ জিবরাঈলকে দেখা ও জিবরাঈলের নিকটতবর্তী হওয়া। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার মে'রাজের রাত্রিতে সিদরাতুল-মুন্তাহার নিকটে দেখেছিলেন। প্রথমবারে দেখা নবুওয়তের সম্পূর্ণ প্রাথমিক যমানায় হয়েছিল। তখন জিবরাঈল সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতসমূহের প্রত্যাদেশ নিয়ে প্রথমবার আগমন করেছিলেন। এরপর ওহীতে বিরতি ঘটে, যদ্দরুন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন। পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করার ধারণা বারবার তাঁর মনে জাগ্রত হতে থাকে। কিন্তু যখনই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হত, তখনই জিবরাঈল (আঃ) দৃষ্টির অন্তরালে থেকে আওয়াজ দিতেনঃ হে মুহাম্মদ, (সাঃ) আপনি আল্লাহ্ তাআলার সত্য নবী, আর আমি জিবরাঈল। এই আওয়াজ শুনে তাঁর মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যেত। যখনই মনে বিরূপ কল্পনা দেখা দিত, তখনই জিবরাঈল (আঃ) অদৃশ্যে থেকে এই আওয়াজের মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। অবশেষে একদিন জিবরাঈল (আঃ) মক্কার উন্মুক্ত ময়দানে তাঁর আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর ছয়শত বাহু ছিল এবং তিনি গোটা দিগন্তকে ঘিরে রেখেছিলেন। এরপর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর নিকট আসেন এবং তাঁকে ওহী পৌঁছান। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে জিবরাঈলের মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্ তাআলার দরবারে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার স্বরূপ ফুটে উঠে।—(ইবনে-কাসীর)

সারকথা এই যে, ইমাম ইবনে কাসীরের মতে উল্লেখিত আয়াতসমূহের তফসীর তাই যা উপরে বর্ণনা করা হল। এই প্রথম দেখা এ জগতেই মক্কার দিগন্তে হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, জিবরাঈলকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অতঃপর জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাঁর নিকটে আসেন এবং খুবই নিকটে আসেন।

দ্বিতীয়বার দেখার কথা وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى —আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। মে'রাজের রাত্রিতে এই দেখা হয়। উল্লেখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ তফসীরবিদ এই তফসীরকেই গ্রহণ করেছেন। ইবনে-কাসীর, কুরতুবী, আবু হাইয়ান, ইমাম রাযী প্রমুখ এই তফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)ও এই তফসীরই অবলম্বন করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, সূরা নজমের শুরুভাগের আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলাকে দেখার কথা আলোচিত হয়নি; বরং জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নবভী মুসলিম শরীফের টীকায় এবং হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল-বারী গ্রন্থেও এই তফসীর অবলম্বন করেছেন।

ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى — مرة শব্দের অর্থ শক্তি। জিবরাঈলের অধিক শক্তি বর্ণনা করার জন্যে এটাও তাঁরই বিশেষণ। এতেকরে এই ধারণার অবকাশ থাকে না, ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাজে কোন শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কারণ, জিবরাঈল এতই শক্তিশালী যে, শয়তান তাঁর কাছেও ঘেঁষতে পারে না।

فَاسْتَوٰى এর অর্থ সোজা হয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য এই যে, জিবরাঈলকে যখন প্রথম দেখেন, তখন তিনি আকাশ থেকে নীচে অবতরণ করছিলেন। অবতরণের পর তিনি উর্ধ্ব দিগন্তে সোজা হয়ে বসে যান। দিগন্তের সাথে উর্ধ্ব সংযুক্ত করার রহস্য এই যে, ভূমির সাথে মিলিত যে দিগন্ত তা সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই জিবরাঈলকে উর্ধ্ব দিগন্তে দেখানো হয়েছে।

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى — دنا শব্দের অর্থ নিকটবর্তী হল এবং تدلّى শব্দের অর্থ ঝুলে গেল। অর্থাৎ, ঝুঁকে পড়ে নিকটবর্তী হল। فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ধনুকের কাঠ এবং এর বিপরীতে ধনুকের সূতার মধ্যবর্তী ব্যবধানকে قَابَ বলা হয়। এই ব্যবধান আনুমানিক একহাত হয়ে থাকে। قَابَ قَوْسَيْنِ দুই ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধান বলার কারণ আরবদের একটি বিশেষ অভ্যাস। দুই ব্যক্তি পরস্পরে শান্তিচুক্তি ও সখ্যতা স্থাপন করতে চাইলে এর এক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত আলামত ছিল হাতের উপর হাত মারা। অপর একটি আলামত ছিল এই যে, উভয়েই আপন আপন ধনুকের কাঠ নিজের দিকে এবং ধনুকের সূতা অপরের দিকে রাখত। এভাবে উভয় ধনুকের সূতা পরস্পরে মিলিত হয়ে যাওয়াকে সম্প্রীতি ও সখ্যতার ঘোষণা মনে করা হত। এসময় উভয় ব্যক্তির মাঝখানে দুই ধনুকের 'কাবের' ব্যবধান থেকে যেত অর্থাৎ, প্রায় দুই হাত বা একগজ। এরপর اَوْ اَدْنٰى বলে আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই মিলন সাধরণত প্রথাগত মিলনের অনুরূপ ছিল ; বরং এর চাইতেও গভীর ছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আঃ)-এর অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, তিনি যে ওহী পৌঁছিয়েছেন তা শ্রবণে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। এই নৈকট্য ও মিলনের কারণে জিবরাঈল (আঃ)-কে না চেনা এবং শয়তানের হস্তক্ষেপ করার সম্ভাবনাও বাতিল হয়ে যায়।

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى — এখানে اَوْحٰى ক্রিয়াপদের কর্তা স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা এবং عَبْدِهٖ-এর সর্বনাম দ্বারা তাঁকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, জিবরাঈল (আঃ)-কে শিক্ষক হিসেবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সন্নিকটে প্রেরণ করে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করলেন।

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى — فؤاد শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ। উদ্দেশ্য এই যে, চক্ষু যা কিছু দেখেছে, অন্তঃকরণও তা যথাযথ উপলব্দি করতে কোন ভুল করেনি। এই ভুল ও ত্রুটিকেই আয়াতে كَذَبَ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ, দেখা বস্তু উপলব্ধি করার ব্যাপারে অন্তঃকরণ মিথ্যা বলেনি। مَا رَاٰى শব্দের অর্থ যা কিছু দেখেছে। কি দেখেছে, কোরআনে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এ ব্যাপারে সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদগণের উক্তি দ্বিবিধ। কারও কারও মতে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাকে দেখেছে এবং কারও কারও মতে জিবরাঈল (আঃ)-কে আসল আকৃতিতে দেখেছে। এই তফসীর অনুযায়ী رَاٰى শব্দটি আক্ষরিক অর্থে (চর্মচক্ষে দেখার অর্থে) ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে অন্তশ্চক্ষু দ্বারা দেখার অর্থ নেয়ার প্রয়োজন নেই।

আয়াতে অন্তঃকরণকে উপলব্দি করার কর্তা করা হয়েছে। অথচ খ্যাতনামা দার্শনিকদের মতে উপলব্দি করা বোধশক্তি কাজ। এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, উপলব্ধির আসল কেন্দ্র অন্তঃকরণ। তাই কখনও বোধশক্তিকেও 'কল্ব' (অন্তঃকরণ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে দেয়া হয় ; যেমন لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ আয়াতে কল্ব বলে বিবেক ও বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। কোরআন

পাকের لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ — نَزْلَةً أُخْرَىٰ এর অর্থ দ্বিতীয়বারের অবতরণ। এই অবতরণও জিবরাঈল (আঃ)-কে প্রথম দেখার স্থান যেমন মক্কার উর্ধ্ব দিগন্ত বলা হয়েছিল, তেমনি দ্বিতীয়বার দেখার স্থান সপ্তম আকাশের 'সিদরাতুল-মুন্তাহা' বলা হয়েছে। বলাবাহুল্য, মে'রাজের রাত্রিতেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন। এতে করে দ্বিতীয়বার দেখার সময়ও মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অভিধানে 'সিদরাহ' শব্দের অর্থ বদরিকা বৃক্ষ। মুন্তাহা শব্দের অর্থ শেষপ্রান্ত। সপ্তম আকাশে আরশের নীচে এই বদরিকা বৃক্ষ অবস্থিত। মুসলিমের রেওয়ায়েতে একে ষষ্ঠ আকাশে বলা হয়েছে। উভয় রেওয়ায়েতের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, এই বৃক্ষের মূল শিকড় ষষ্ঠ আকাশে এবং শাখা প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।—(কুরতুবী) সাধারণ ফেরেশতাগণের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। তাই একে মুন্তাহা বলা হয়। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্ তাআলার বিধানাবলী প্রথমে 'সিদরাতুল-মুন্তাহায়' নাযিল হয় এবং এখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়। পৃথিবী থেকে আকাশগামী আমলনামা ইত্যাদিও ফেরেশতাগণ এখানে পৌঁছায় এবং এখান থেকে অন্য কোন পন্থায় আল্লাহ্ তাআলার দরবারে পেশ করা হয়। মসনদে-আহমদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে একথা বর্ণিত আছে।—(ইবনে-কাসীর)।

عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ — ماوى শব্দের অর্থ ঠিকানা, বিশ্রামস্থল। জান্নাতকে ماوى বলার কারণ এই যে, এটাই মানুষের আসল ঠিকানা। আদম (আঃ) এখানেই সৃজিত হন, এখান থেকেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয় এবং এখানেই জান্নাতীরা বসবাস করবে।

জান্নাত ও জাহান্নামের বর্তমান অবস্থান ঃ এই আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, জান্নাত এখনও বিদ্যমান রয়েছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস তাই যে, জান্নাত ও জাহান্নাম কেয়ামতের পর সৃজিত হবে না। এখনও এগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এই আয়াত থেকে একথাও জানা গেল যে, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপর আরশের নীচে অবস্থিত। সপ্তম আকাশ যেন জান্নাতের ভূমি এবং আরশ তার ছাদ। কোরআনের কোন আয়াতে অথবা হাদীসের কোন রেওয়ায়েতে জাহান্নামের অবস্থানস্থল পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়নি। সূরা তূরের আয়াত وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ থেকে কোন কোন তফসীরবিদ এই তথ্য উদ্ধার করেছেন যে, জাহান্নাম সমুদ্রের নিম্নদেশে পৃথিবীর অতল গভীরে অবস্থিত। বর্তমানে তার উপর কোন ভারী ও শক্ত আচ্ছাদন রেখে দেয়া হয়েছে। কেয়ামতের দিন এই আচ্ছাদন বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের অগ্নি বিস্তৃত হয়ে সমুদ্রকে অগ্নিতে রূপান্তরিত করে দেবে।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের অনেক বিশেষজ্ঞ মৃত্তিকা খনন করে ভূগর্ভের অপর প্রান্তে যাওয়ার প্রচেষ্টা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত রেখেছে। তারা বিপুলায়তন যন্ত্রপাতি এ কাজের জন্যে আবিষ্কার করেছে। যে দল একাজে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছে, তারা মেশিনের সাহায্যে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে ছয় মাইল গভীর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। এরপর শক্ত পাথরের এমন একটা স্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যার কারণে তাদের খননকার্য এগুতে পারেনি। তারা অন্য জায়গায় খনন আরম্ভ করেছে, কিন্তু এখানেও ছয় মাইলের পর তারা শক্ত পাথরের সম্মুখীন হয়েছে। এভাবে একাধিক জায়গায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ছয় মাইলের পর সমগ্র ভূগর্ভের উপর এমন একটি কঠিন শীলার আবরণ রয়েছে, যাতে কোন মেশিন কাজ করতে সক্ষম নয়। বলাবাহুল্য, পৃথিবীর ব্যাস হাজার হাজার মাইল। তন্মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে বিজ্ঞান মাত্র ছয় মাইল পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এরপর প্রস্তরাবরণের অস্তিত্ব স্বীকার করে প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে হয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে ; সমগ্র ভূগর্ভকে কোন প্রস্তরাবরণ দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। যদি কোন সহীহ্ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নাম এই প্রস্তরাবরণের নীচে অবস্থিত, তবে তা মোটেই অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে না।

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ - অর্থাৎ, যখন বদরিকা বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আচ্ছন্নকারী বস্তু। মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তখন বদরিকা বৃক্ষের উপর স্বর্ণ নির্মিত প্রজাপতি চতুর্দিক থেকে এসে পতিত হচ্ছিল। মনে হয়, আগন্তক মেহমান রসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্মানার্থে সেদিন বদরিকা বৃক্ষকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ — زَاغَ শব্দটি زيغ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বক্র হওয়া, বিপদগামী হওয়া। طغى শব্দটি طغيان থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমালংঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যা কিছু দেখেছেন, তাতে দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি। এতে সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, মাঝে মাঝে মানুষেরও দৃষ্টিতে বিভ্রম করে; বিশেষ করে যখন সে কোন বিস্ময়কর অসাধারণ বস্তু দেখে। এর জওয়াবে কোরআন দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা, দুই কারণে দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে—(এক) দৃষ্টি দেখার বস্তু থেকে সরে গিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেলে। مَا زَاغَ বলে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, রসূলের দৃষ্টি অন্য বস্তুর উপর নয়; বরং যা তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, তার উপরই পতিত হয়েছে। (দুই) দৃষ্টি উদ্দিষ্ট বস্তুর উপর পতিত হয়, কিন্তু সাথে সাথে এদিক-সেদিক অন্য বস্তুও দেখতে থাকে। এতেও মাঝে মাঝে বিভ্রম হওয়ার আশংকা থাকে। এ ধরনের দৃষ্টিবিভ্রমের জওয়াবে وَمَا طَغَىٰ বলা হয়েছে।

যারা উল্লেখিত আয়াতসমূহের তফসীরে জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখার কথা বলেন, তাদের মতে এই আয়াতেরও অর্থ এই যে, জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখার ব্যাপারে দৃষ্টি ভুল করেনি। এই বর্ণনার প্রয়োজন এজন্যে দেখা দিয়েছে যে, জিবরাঈল (আঃ) হলেন ওহীর মাধ্যমে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যদি তাঁকে উত্তমরূপে না দেখেন এবং না চেনেন, তবে ওহী সন্দেহমুক্ত থাকে না।

পক্ষান্তরে যারা উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীরে আল্লাহ্ তাআলাকে দেখার কথা বলেন, তারা এখানেও বলেন যে, আল্লাহ্র দীদারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দৃষ্টি কোন ভুল করেনি; বরং ঠিক ঠিক দেখেছে। তবে এই আয়াত চর্মচক্ষে দেখার বিষয়টিকে আরও অধিক ফুটিয়ে তুলেছে।

আল্লাহ্র দীদার ঃ সকল সাহাবী, তাবেয়ী এবং অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, পরকালে জান্নাতীগণ তথা সর্বশ্রেণীর মুমিনগণ আল্লাহ্ তাআলার দীদার লাভ করবেন। সহীহ্ হাদীসসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র দীদার কোন অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার নয়। তবে দুনিয়াতে এই দীদারকে সহ্য করার মত শক্তি মানুষের দৃষ্টিতে নেই। তাই দুনিয়াতে কেউ এই দীদার লাভ করতে পারে না। পরকালের ব্যাপারে খোদ কোরআন বলে ঃ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ অর্থাৎ, পরকালে মানুষের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ম ও

শক্তিশালী করে দেয়া হবে এবং যবনিকা সরিয়ে নেয়া হবে। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন ঃ দুনিয়াতে কোন মানুষ আল্লাহ্‌কে দেখতে পারে না। কেননা, মানুষের দৃষ্টি ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ্ তাআলা অক্ষয়। পরকালে যখন মানুষকে অক্ষয় দৃষ্টি দান করা হবে, তখন আল্লাহ্‌র দীদারে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। কাযী আয়ায (রহঃ) থেকেও প্রায় এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে এবং সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে একথা প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে। হাদীসের ভাষা এরূপ ঃ واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا এ থেকে এ বিষয়ের সম্ভাবনাও বোঝা যায় যে, দুনিয়াতেও কোন সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে বিশেষভাবে সেই শক্তি দান করা যেতে পারে, যদ্দ্বারা তিনি আল্লাহ্ তাআলার দীদার লাভ করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু মে'রাজের রাত্রিতে যখন সপ্ত আকাশ, জান্নাত, জাহান্নাম ও আল্লাহ্‌র বিশেষ নিদর্শনাবলী অবলোকন করার জন্যেই তিনি স্বতন্ত্রভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন আল্লাহ্ তাআলার দীদারের ব্যাপারটি দুনিয়ার সাধারণ বিধি থেকেও ব্যতিক্রম ছিল। কারণ, তখন তিনি দুনিয়াতে ছিলেন না। সম্ভাবনা প্রমাণিত হওয়ার পর প্রশ্ন থেকে যায় যে, দীদার বাস্তবে হয়েছে কি না? এ ব্যাপারে হাদীসের রেওয়ায়েত বিভিন্নরূপ এবং কোরআনের আয়াত সম্ভাবনা ও অবকাশ যুক্ত। এ কারণেই এ বিষয়ে সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণের পূর্বাপর মতভেদ চলে আসছে। ইবনে কাসীর এসব আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-আব্বাস (রাঃ)-এর মতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্ তাআলার দীদার লাভ করেছেন। কিন্তু সাহাবী ও তাবেয়ীগণের একটি বিরাট দল এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইবনে-কাসীর অতঃপর উভয় দলের প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন।

হাফেয ইবনে-হাজার আসকালানী (রহঃ) ফতহুল-বারী গ্রন্থে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এই মতবিরোধ উল্লেখ করার পর কিছু উক্তি এমনও উদ্ধৃত করেছেন, যদ্দ্বারা উপরোক্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। তিনি আরও বলেছেন ঃ কুরতুবীর মতে এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা না করা এবং নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয়ঃ। কেননা, এ বিষয়টির সঙ্গে কোন 'আমল' জড়িত নয়; বরং এটা বিশ্বাসগত প্রশ্ন। এতে অকাট্য প্রমাণাদির অনুপস্থিতিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভবপর নয়। কোন বিষয় অকাট্যরূপে না জানা পর্যন্ত সে সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকাই বিধান। আমার মতে এটাই নিরাপদ ও সাবধানতার পথ। তাই এ প্রশ্নের দ্বি-পাক্ষিক যুক্তি-প্রমাণ উল্লেখ করা হলো না।

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর নবুওয়ত, রেসালত ও তাঁর ওহী সংরক্ষিত হওয়ার প্রমাণাদি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা কোন দলীল ব্যতিরেকেই বিভিন্ন প্রতিমাকে উপাস্য ও কার্যনির্বাহী সাব্যস্ত করে রয়েছে এবং ফেরেশতাকুলকে আল্লাহ্‌র কন্যা আখ্যায়িত করেছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা প্রতিমাদেরকেও আল্লাহ্‌র কন্যা বলত।

আরবের মুশরিকরা অসংখ্য প্রতিমার পূজা করত। তন্মধ্যে তিনটি প্রতিমা ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। আরবের বড় বড় গোত্র এগুলোর এবাদতে আত্মনিয়োগ করেছিল। প্রতিমাত্রয়ের নাম ছিল লাত, ওযযা ও মানাত। লাত তায়েফের অধিবাসী সকীফ গোত্রের, ওযযা কোরাইশ গোত্রের এবং মানাত বনী-হেলালের প্রতিমা ছিল। এসব প্রতিমার অবস্থানস্থলে মুশরিকরা বড় বড় জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ নির্মাণ করে রেখেছিল। এসব গৃহকে কা'বার অনুরূপ মর্যাদা দান করা হত। মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এসব গৃহ ভূমিসাৎ করে দেন।—(কুরতুবী)

قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ — ضِيزَىٰ শব্দটি ضوز থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জুলুম করা, অধিকার খর্ব করা। এ কারণেই হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ এর অর্থ করেছেন নিপীড়নমূলক বন্টন।

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ
بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلٰئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثٰى ﴿٢٧﴾ وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ
عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ
شَيْئًا ﴿٢٨﴾ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهٖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ﴿٣٠﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنٰى ﴿٣١﴾ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰئِرَ الْإِثْمِ
وَالْفَوٰحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ
أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهٰتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا
أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿٣٢﴾ أَفَرَءَيْتَ الَّذِي تَوَلّٰى ﴿٣٣﴾ وَأَعْطٰى
قَلِيلًا وَأَكْدٰى ﴿٣٤﴾ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ
بِمَا فِي صُحُفِ مُوسٰى ﴿٣٦﴾ وَإِبْرٰهِيمَ الَّذِي وَفّٰى ﴿٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى ﴿٣٨﴾ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰنِ إِلَّا مَا سَعٰى ﴿٣٩﴾

(২৬) আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন। (২৭) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেশতাকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। (২৮) অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসূ নয়। (২৯) অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে তার তরফ থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। (৩০) তাদের জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্তই। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ভাল জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে। (৩১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র, যাতে তিনি মন্দকর্মীদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেন এবং সৎকর্মীদেরকে দেন ভাল ফল, (৩২) যারা বড় বড় গোনাহ্ ও অশ্লীলকার্য থেকে বেঁচে থাকে ছোটখাট অপরাধ করলেও নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত। তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভাল জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে কচি শিশু ছিলে। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনি ভাল জানেন কে সংযমী? (৩৩) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (৩৪) এবং দেয় সামান্যই ও পাষাণ হয়ে যায়। (৩৫) তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে দেখে? (৩৬) তাকে কি জানানো হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে, (৩৭) এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে তার দায়িত্ব পালন করেছিল? (৩৮) কিতাবে এই আছে যে, কোন ব্যক্তি কারও গোনাহ্ নিজে বহন করবে না, (৩৯) এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে,

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধারণার বিভিন্ন প্রকার ও বিধান : وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا আরবী ভাষায় ظن শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। আয়াতে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এটাই মুশরিকদের প্রতিমাপূজার কারণ ছিল। (দুই) এমন ধারণা যা দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীতে আসে। "একীন" তথা দৃঢ়বিশ্বাস সেই বাস্তবসম্মত অকাট্য জ্ঞানকে বলা হয়, যাতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই; যেমন কোরআন পাক অথবা হাদীসে-মুতাওয়াতির থেকে অর্জিত জ্ঞান। এর বিপরীতে "যন" তথা ধারণা সেই জ্ঞানকে বলা হয়, যা ভিত্তিহীন কল্পনা তো নয়, বরং দলীলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে এই দলীল অকাট্য নয়, যাতে অন্য কোন সম্ভাবনাই না থাকে; যেমন সাধারণ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিধি-বিধান। প্রথম প্রকারকে "একিনিয়্যাত" তথা দৃঢ়বিশ্বাসপ্রসূত বিধানাবলী এবং দ্বিতীয় প্রকারকে 'যন্নীয়্যাত' তথা ধারণাপ্রসূত বিধানাবলী বলা হয়ে থাকে। এই প্রকার ধারণা শরীয়তে ধর্তব্য। এর পক্ষে কোরআন ও হাদীসে সাক্ষ্য – প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এই ধারণাপ্রসূত বিধান অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব – এ বিষয়ে সবাই একমত। আলোচ্য আয়াতে যে ধারণাকে নাকচ করা হয়েছে, তার অর্থ অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। তাই কোন খট্‌কা নেই।

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ..... مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ অর্থাৎ, যারা আমার স্মরণে বিমুখ এবং একমাত্র পার্থিব জীবনই কামনা করে, আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের জ্ঞানের দৌড় পার্থিব জীবন পর্যন্তই।

কোরআন পাক পরকালে ও কেয়ামতে অবিশ্বাসীদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছে। পরিতাপের বিষয়, ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীন শিক্ষা এবং পার্থিব লোভ-লালসা আজকাল মুসলমানদের অবস্থা তাই করে দিয়েছে। আজকাল আমাদের সকল জ্ঞান-গরিমা ও শিক্ষাগত উন্নতির প্রচেষ্টা কেবল অর্থনীতিকেই কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে। ভুলেও আমরা পরকালীন বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করি না। আমরা রসূলে পাক (সাঃ) – এর নাম উচ্চারণ করি এবং তাঁর সুপারিশ আশা করি; কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূলকে এহেন অবস্থাসম্পন্নদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ দেন। নাউযুবিল্লাহে মিনহা।

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ পালনকারী সৎকর্মীদের প্রশংসাসূচক আলোচনা করে তাদের পরিচয় এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সাধারণভাবে কবীরা তথা বড় বড় গোনাহ্ থেকে এবং বিশেষভাবে নির্লজ্জ কাজকর্ম থেকে দূরে থাকে। এতে لمم শব্দের মাধ্যমে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রমের সারমর্ম উপরে তফসীরের সারসংক্ষেপে লিখিত হয়েছে যে, ছোটখাট গোনাহে লিপ্ত হওয়া তাদেরকে সৎকর্মীর উপাধি থেকে বঞ্চিত করে না।

لمم শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে দু'রকম উক্তি বর্ণিত আছে। (এক) এর অর্থ সগীরা অর্থাৎ, ছোটখাট গোনাহ্। সূরা নেসার আয়াতে একে سيئات বলা হয়েছে। اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰٓئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ এই উক্তি হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হোরায়রা (রাঃ) থেকে ইবনে-কাসীর বর্ণনা করেছেন। (দুই) এর অর্থ সেসব গোনাহ্, যা কদাচিৎ সংঘটিত হয়, অতঃপর তা

থেকে তওবা করতঃ চিরতরে বর্জন করা হয়। এই উক্তিও ইবনে-কাসীর প্রথমে হযরত মুজাহিদ থেকে এবং পরে হযরত ইবনে আব্বাস ও আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এর সারমর্মও এই যে, কোন সৎলোক দ্বারা ঘটনাচক্রে কবীরা গোনাহ্ হয়ে গেলে যদি সে তওবা করে, তবে সে-ও সৎকর্মী ও মুত্তাকীদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে না।

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ

اَجِنَّةٌ শব্দটি جَنِيْن এর বহুবচন। এর অর্থ গর্ভস্থিত ভ্রূণ। আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, মানুষ তার নিজের সম্পর্কে ততটুকু জ্ঞান রাখে না, যতটুকু তার স্রষ্টা রাখেন। কেননা, মাতৃগর্ভে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার সময় তার কোন জ্ঞান ও চেতনা থাকে না, কিন্তু তার স্রষ্টা বিজ্ঞসুলভ সৃষ্টিকুশলতায় তাকে গড়ে তোলেন। আয়াতে মানুষের অক্ষমতা ও অজ্ঞানতা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে, মানুষ যে কোন ভাল ও সৎকাজ করে, সেটা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয় ; বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত অনুগ্রহ। কারণ, কাজ করার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনি তৈরী করেছেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তিনি গতিশীল করেছেন। অন্তরে সৎকাজের প্রেরণা ও সংকল্প তাঁরই তওফীক দ্বারা হয়। অতএব, মানুষ যতবড় সৎকর্মী, মুত্তাকী ও পরহেযগারই হোক না কেন, নিজ কর্মের জন্যে গর্ব করার অধিকার তার নেই। এছাড়া ভাল-মন্দ সব সমাপ্তি ও পরিণামের উপর নির্ভরশীল। সমাপ্তি ভাল হবে কি মন্দ হবে, তা এখনও জানা নেই। অতএব, গর্ব ও অহংকার কিসের উপর? পরবর্তী আয়াতে একথাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى — অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের পবিত্রতা দাবী করো না। কারণ, আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানেন কে কতটুকু পানির মাছ। শ্রেষ্ঠত্ব খোদাভীতির উপর নির্ভরশীল—বাহ্যিক কাজ-কর্মের উপর নয়। খোদাভীতিও তা-ই ধর্তব্য, যা মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম থাকে।

হযরত যয়নব বিনতে আবু সালমা (রাঃ)-এর পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'বাররা' যার অর্থ সৎকর্মপরায়ণ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আলোচ্য فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ আয়াত তেলাওয়াত করতঃ এই নাম রাখতে নিষেধ করেন। কারণ, এতে সৎ হওয়ার দাবী রয়েছে। অতঃপর তাঁর নাম পরিবর্তন করে যয়নব রাখা হয়।—(ইবনে-কাসীর)

ইমাম আহমদ (রাঃ) আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি নিষেধ করে বললেন ঃ তুমি যদি কারও প্রশংসা করতেই চাও, তবে একথা বলে কর ঃ আমার জানা মতে এই ব্যক্তি সৎ, খোদাভীরু। সে আল্লাহ্র কাছেও পাক পবিত্র কিনা আমি জানি না।

শানে নুযূল ঃ দুররে-মনসূরে ইবনে-জরীর (রহঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তার বন্ধু এই বলে তাকে তিরস্কার করল যে, তুমি পৈতৃক ধর্ম কেন ছেড়ে দিলে? সে বলল ঃ আমি আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় করি। বন্ধু বলল ঃ তুমি আমাকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমি তোমার শাস্তি নিজের কাঁধে নিয়ে নেব। ফলে তুমি বেঁচে যাবে। সেমতে সে বন্ধুকে কিছু অর্থকড়ি দিল। বন্ধু আরও চাইলে সে সামান্য ইতস্ততঃ করার পর আরও দিল এবং অবশিষ্ট অর্থের একটি দলিল লিখে দিল। রূহুল মা'আনীতে এই ব্যক্তির নাম ওলীদ ইবনে-মুগীরা লিখিত আছে। সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তার বন্ধু তাকে তিরস্কার করে শাস্তির দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছিল।

اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى — এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো। উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য থেকে মুখ ফেরানো।

اَكْدٰى — শব্দটি كديـة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সেই প্রস্তরখণ্ড, যা কূপ অথবা ভিত্তি খনন করার সময় মৃত্তিকা গর্ভ থেকে বের হয় এবং খননকার্যে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এখানে اَكْدٰى এর অর্থ এই যে, প্রথমে কিছু দিল, এরপর হাত গুটিয়ে নিল। উপরে আয়াতের শানে-নুযূলে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে কিছু ব্যয় করে অতঃপর তা পরিত্যাগ করে অথবা শুরুতে আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে কিছু আকৃষ্ট হয়, অতঃপর আনুগত্য বর্জন করে বসে। এই তফসীর হযরত মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, কাতাদাহ্ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।—(ইবনে-কাসীর)

اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى —— শানে নুযূলের ঘটনা অনুযায়ী আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি কোন এক বন্ধুর এই কথায় ইসলাম ত্যাগ করল যে, তোমার পরকালীন আযাব আমি মাথা পেতে নেব, সেই নির্বোধ লোকটি বন্ধুর এই কথায় কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করল? তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যদ্দ্বারা সে দেখতে পাচ্ছে যে, এই বন্ধু তার শাস্তি মাথা পেতে নেবে এবং তাকে বাঁচিয়ে দেবে? বলাবাহুল্য, এটা নিরেট প্রতারণা। তার কাছে কোন অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং অন্য কেউ তার পরকালীন শাস্তি নিজে ভোগ করে তাকে বাঁচাতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি শানে নুযূলের ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে যে, দানকার্য শুরু করে তা বন্ধ করে দেয়ার কারণ এই ধারণা হতে পারে যে, উপস্থিত সম্পদ ব্যয় করে দিলে আবার কোথা থেকে আসবে? এই ধারণা খণ্ডন করার জন্যে বলা হয়েছে, তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যাদ্দ্বরা সে যেমন দেখতে পাচ্ছে যে, এই সম্পদ খতম হয়ে যাবে এবং তদস্থলে অন্য সম্পদ সে লাভ করতে পারবে না? এটা ভুল। তার কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং তার এই ধারণাও সঠিক নয়।

اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى — এই আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর একটি বিশেষগুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে وَفّٰى বলা হয়েছে। وفاء শব্দের অর্থ ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা।

ইবরাহীম (আঃ) এর বিশেষগুণ, অঙ্গীকার পূরণের কিঞ্চিৎ বিবরণ ঃ উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্র আনুগত্য করবেন এবং মানুষের কাছে তাঁর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবেন। তিনি এই অঙ্গীকার সকল দিক দিয়েই পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। এতে তাঁকে অনেক অগ্নিপরীক্ষায়ও অবতীর্ণ হতে হয়েছে। وَفّٰى শব্দের এই তফসীর ইবনে-কাসীর, ইবনে-জরীর প্রমুখের মতে।

কোন কোন হাদীসে ইবরাহীম (আঃ)-এর বিশেষ বিশেষ কর্মকাণ্ড বোঝানোর জন্য وَفّٰى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা উপরোক্ত তফসীরের পরিপন্থী নয়। কেননা, অঙ্গীকার পালন শব্দটি আসলে ব্যাপক। এতে নিজস্ব কর্মকাণ্ডসহ খোদায়ী বিধানাবলী প্রতিপালন এবং আল্লাহ্র আনুগত্যও দাখিল আছে। এছাড়া রেসালতের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সংশোধনও এর পর্যায়ভুক্ত। হাদীসে বর্ণিত কর্মকাণ্ডও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণতঃ আবু ওসামা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ আয়াত তেলাওয়াত করে তাঁকে বললেনঃ তুমি জান এর মতলব কি? আবু ওসামা (রাঃ) আরয করলেনঃ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-ই ভাল জানেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেনঃ অর্থ এই যে, وفى عمل يومه باربع ركعات فى اول النهار অর্থাৎ, তিনি দিনের কাজ এভাবে পূর্ণ করে দেন, দিনের শুরুতে (এশরাকের) চার রাকআত নামায পড়ে নেন।—(ইবনে-কাসীর)

তিরমিযীতে আবু যর (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেনঃ

ابن ادم اركع لى اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره .

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ বলেনঃ হে বনী আদম, দিনের শুরুতে আমার জন্যে চার রাকআত নামায পড়, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার সব কাজের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাব।

মুয়ায ইবনে আনাস (রাঃ) এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেনঃ আমি তোমাদেরকে বলছি, আল্লাহ্‌ তাআলা ইবরাহীম (আঃ)-কে الَّذِي وَفَّىٰ খেতাব কেন দিলেন। কারণ এই যে, তিনি প্রত্যহ সকাল-বিকাল এই আয়াত পাঠ করতেনঃ

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ – (ইবনে-কাসীর)

মূসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফার বিশেষ নির্দেশ ও শিক্ষাঃ কোরআন পাক পূর্ববর্তী কোন পয়গম্বরের উক্তি অথবা শিক্ষা উদ্ধৃত করার মানে এই যে, এই উম্মতের জন্যেও সেটা অবশ্য পালনীয়। তবে এর বিপক্ষে কোন আয়াত অথবা হাদীস থাকলে সেটা ভিন্নকথা। পরবর্তী আঠার আয়াতে সেইসব বিশেষ শিক্ষা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো মূসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফায় ছিল। তন্মধ্যে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মগত বিধান মাত্র দুটি। অবশিষ্ট শিক্ষা, উপদেশ ও আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত। কর্মগত বিধানদ্বয় এইঃ

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ এবং وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

وزر — শব্দের আসল অর্থ বোঝা। প্রথম আয়াতের অর্থ এই যে, কোন বোঝা বহনকারী নিজের ছাড়া অপরের বোঝা বহন করবে না। এখানে বোঝা অর্থ পাপ ও শাস্তির বোঝা। উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তির শাস্তি অপরের ঘাড়ে চাপানো হবে না এবং অপরের শাস্তি নিজে বরণ করার ক্ষমতাও কারও হবে না।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ অর্থাৎ, কোন শক্তি যদি পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে অপরকে অনুরোধ করে যে, আমার কিছু বোঝা তুমি বহন কর, তবে তার বোঝার কিয়দংশও বহন করার সাধ্য কারও হবে না।

একের গোনাহে অপরকে ধৃত করা হবে নাঃ এই আয়াতের শানে নুযূলে বর্ণিত ব্যক্তির ধারণাও অসার প্রমাণিত হয়েছে। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল অথবা ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল। তার বন্ধু তাকে তিরস্কার করল এবং নিশ্চয়তা দিল যে, কেয়ামতে কোন আযাব হলে সে নিজে তা গ্রহণ করে তাকে বাঁচিয়ে দেবে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র দরবারে গোনাহে অপরকে ধৃত করার কোন সম্ভাবনা নেই।

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ এর সারমর্ম এই যে, অপরের আযাব যেমন কেউ নিজে গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি অপরের কাজ নিজে করার অধিকারও কারও নেই। এতে করে সে অপরকে কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে না। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ফরয নামায আদায় করতে পারে না এবং ফরয রোযা রাখতে পারে না। এভাবে যে, অপর ব্যক্তি এই ফরয নামায ও রোযা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অথবা এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ঈমান কবুল করতে পারে না, যার ফলে অপরকে মুমিন সাব্যস্ত করা যায়।

উপরে মূসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফার বরাত দিয়ে যে দু'টি বিধান বর্ণিত হল, এগুলো অন্যান্য পয়গম্বরের শরীয়তেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বিশেষভাবে হযরত মূসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাঁদের আমলে এই মূর্খতাসুলভ প্রথা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল যে, পিতার পরিবর্তে পুত্রকে এবং পুত্রের পরিবর্তে পিতাকে অথবা ভ্রাতা-ভগ্নীকে হত্যা করা হত। তাঁদের শরীয়ত এই কুপ্রথা বিলীন করেছিল।

وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ۝٤٠ ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ۝٤١ وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ۝٤٢ وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ۝٤٣ وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ۝٤٤ وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝٤٥ مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ۝٤٦ وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ۝٤٧ وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ۝٤٨ وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ۝٤٩ وَاَنَّهٗ اَهْلَكَ عَادَا ࣙ الْاُوْلٰى ۝٥٠ وَثَمُوْدَاۡ فَمَاۤ اَبْقٰى ۝٥١ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى ۝٥٢ وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى ۝٥٣ فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰى ۝٥٤ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ۝٥٥ هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى ۝٥٦ اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ۝٥٧ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ۝٥٨ اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ۝٥٩ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ۝٦٠ وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ۝٦١ فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ۝٦٢

سُوْرَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَّخَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝١ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝٢ وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ۝٣

(৪০) তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে। (৪১) অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। (৪২) তোমার পালনকর্তার কাছে সবকিছুর সমাপ্তি, (৪৩) এবং তিনিই হাসান ও কাঁদান (৪৪) এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান, (৪৫) এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী। (৪৬) একবিন্দু বীর্য থেকে যখন স্খলিত করা হয়। (৪৭) পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই, (৪৮) এবং তিনিই ধনবান করেন ও সম্পদ দান করেন। (৪৯) এবং তিনিই শি'রা নক্ষত্রের মালিক। (৫০) তিনিই প্রথম আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, (৫১) এবং সামূদকেও; অতঃপর কাউকে অব্যাহতি দেননি। (৫২) এবং তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, তারা ছিল আরও জালেম ও অবাধ্য। (৫৩) তিনিই জনপদকে শূন্যে উত্তোলন করে নিক্ষেপ করেছেন। (৫৪) অতঃপর তাকে আচ্ছন্ন করে নেয় যা আচ্ছন্ন করার। (৫৫) অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে মিথ্যা বলবে? (৫৬) অতীতের সতর্ককারীদের মধ্যে সে-ও একজন সতর্ককারী। (৫৭) কেয়ামত নিকটে এসে গেছে। (৫৮) আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ একে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। (৫৯) তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? (৬০) এবং হাসছ-ক্রন্দন করছ না? (৬১) তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছ, (৬২) অতএব আল্লাহ্কে সেজদা কর এবং তাঁর এবাদত কর।

সূরা আল-ক্বামার

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৫৫

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(১) কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। (২) তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু। (৩) তারা মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে স্থিরীকৃত হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى — অর্থাৎ, কেবল বাহ্যিক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। আল্লাহ্ তাআলার দরবারে প্রত্যেকের প্রচেষ্টার আসল স্বরূপও দেখা হবে যে, তা একান্তভাবে আল্লাহ্র জন্যে করা হয়েছে, না অন্যান্য জাগতিক স্বার্থও এতে শামিল আছে? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ **انما الاعمال بالنيات** অর্থাৎ, কেবল দৃশ্যতঃ কর্মই যথেষ্ট নয়। কর্মে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ও আদেশ পালনের খাঁটি নিয়ত থাকা জরুরী।

وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى — উদ্দেশ্য এই যে, অবশেষে সবাইকে আল্লাহ্ তাআলার দিকেই ফিরে যেতে হবে এবং কর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে।

কোন কোন তফসীরবিদ এই বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, মানুষের চিন্তা-ভাবনার গতিধারা আল্লাহ্ তাআলার সত্তায় পৌছে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ চিন্তাভাবনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না এবং এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনায় অনুমতিও নেই ; যেমন কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্ তাআলার অবদান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর ; তাঁর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো না। এটা তোমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। কাজেই বিষয়টিকে আল্লাহ্র জ্ঞানে সোপর্দ কর।

وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى – অর্থাৎ, মানবজাতির মধ্যে আনন্দ ও শোক এবং এর পরিণতিতে হাসি ও কান্না প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করে এবং এতদুভয়কে তাদের বাহ্যিক কারণাদির সাথে সম্পৃক্ত করে ব্যাপার শেষ করে দেয়। অথচ ব্যাপারটি চিন্তা-ভাবনা সাপেক্ষ। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে, কারও আনন্দ অথবা শোক এবং হাসি ও কান্না স্বয়ং তার কিংবা অন্য কারও করায়ত্ত নয়। এগুলো আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আসে। তিনিই কারণ সৃষ্টি করেন এবং তিনিই কারণাদিকে ক্রিয়াশক্তি দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে ক্রন্দনকারীদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন এবং হাস্যরতদেরকে এক মিনিটের মধ্যে কাঁদিয়ে দিতে পারেন।

وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى — **غناء** শব্দের অর্থ ধনাঢ্যতা এবং **اغناء** শব্দের অর্থ অপরকে ধনাঢ্য করা। اَقْنٰى শব্দটি **قنية** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংরক্ষিত ও রিজার্ভ সম্পদ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলাই মানুষকে ধনবান ও অভাবমুক্ত করেন এবং তিনিই যাকে ইচ্ছা সম্পদ দান করেন যাতে সে তা সংরক্ষিত করে।

وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى – **شعرى** একটি নক্ষত্রের নাম। আরবের কোন কোন সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পূজা করত। তাই বিশেষভাবে এর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এই নক্ষত্রের মালিক ও পালনকর্তা আল্লাহ্ তাআলাই ; যদিও সমস্ত নক্ষত্র, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, মালিক ও পালনকর্তা তিনি।

وَاَنَّهٗ اَهْلَكَ عَادَا ࣙ الْاُوْلٰى وَثَمُوْدَاۡ فَمَاۤ اَبْقٰى — 'আদ জাতি ছিল পৃথিবীর শক্তিশালী দুর্ধর্ষতম জাতি। তাদের দু'টি শাখা পর পর প্রথম ও দ্বিতীয় নামে পরিচিত। তাদের প্রতি হযরত হুদ (আঃ)-কে রসূলরূপে প্রেরণ করা হয়। অবাধ্যতার কারণে ঝঞ্ঝা বায়ুর আযাব আসে। ফলে সমগ্র জাতি নিস্তানাবুদ হয়ে যায়। কওমে-নূহের পর তারাই সর্বপ্রথম আযাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।—(মাযহারী) সামূদ সম্প্রদায়ও তাদের অপর

শাখা। তাদের প্রতি হযরত সালেহ্ (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়। যারা অবাধ্যতা করে, তাদের প্রতি বজ্রনিনাদের আযাব আসে। ফলে তারা হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوٰى – مؤتفكة এর শাব্দিক অর্থ সংলগ্ন। এখানে কয়েকটি জনপদ ও শহর একত্রে সংলগ্ন ছিল। হযরত লূত (আঃ) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। অবাধ্যতা ও নির্লজ্জতার শাস্তিস্বরূপ জিবরাঈল (আঃ) তাদের জনপদসমূহ উল্টে দেন।

فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى – অর্থাৎ, আচ্ছন্ন করে নিল জনপদগুলোকে উল্টে দেয়ার পর। তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। এ পর্যন্ত মূসা (আঃ) ও ইবরাহীম (আঃ)–এর কিতাবের বরাত দিয়ে বর্ণিত শিক্ষা সমাপ্ত হল।

فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى — تمر শব্দের অর্থ বিবাদ ও বিরোধিতা করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এখানে প্রত্যেক মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াত এবং মূসা ও ইবরাহীম (আঃ)–এর সহীফায় বর্ণিত আয়াত সম্পর্কে সামান্য চিন্তা–ভাবনা করলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর শিক্ষার সত্যতায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকে না এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও আযাবের ঘটনাবলী শুনে বিরোধিতা বর্জন করার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যায়। এটা আল্লাহ্ তাআলার একটা নেয়ামত। এতদসত্বেও তোমরা আল্লাহ্ তাআলার কোন্ কোন্ নেয়ামত সম্পর্কে বিবাদ ও বিরোধিতা করতে থাকবে।

هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى – هٰذَا শব্দ দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অথবা কোরআনের প্রতি ইশারা হয়েছে। অর্থাৎ, ইনি অথবা এই কোরআনও পূর্ববর্তী পয়গম্বর অথবা কিতাবসমূহের ন্যায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সতর্ককারীরূপে প্রেরিত। ইনি সরল পথ এবং দ্বীন ও দুনিয়ার সাফল্য সম্বলিত নির্দেশাবলী নিয়ে আগমন করেছেন এবং বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখান।

أَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ অর্থাৎ, নিকটে আগমনকারী বস্তু নিকটে এসে গেছে। আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ এর গতিরোধ করতে পারবে না। এখানে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের বয়সের দিক দিয়ে কেয়ামত নিকটে এসে গেছে। কারণ, উম্মতে মুহাম্মদী বিশ্বের সর্বশেষ কেয়ামতের নিকটবর্তী উম্মত।

أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ

هٰذَا الْحَدِيْثِ বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কোরআন স্বয়ং একটি মোজেযা। এটা তোমাদের সামনে এসে গেছে। এ জন্যেও কি তোমরা আশ্চর্যবোধ করছ, উপহাসের ছলে হাস্য করছ এবং গোনাহ্ ও ত্রুটির কারণে ক্রন্দন করছ না?

وَأَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ — سمود এর আভিধানিক অর্থ গাফিলতি ও নিশ্চিন্তা। এর অপর অর্থ গান-বাজনা করা। এস্থলে এই অর্থও হতে পারে।

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا — অর্থাৎ, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ চিন্তাশীল মানুষকে শিক্ষা ও উপদেশের সবক দেয়। এসব আয়াতের দাবী এই যে, তোমরা সবাই আল্লাহ্র সামনে বিনয় ও নম্রতা সহকারে নত হও এবং সেজদা কর ও একমাত্র তাঁরই এবাদত কর।

সহীহ্ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নজমের এই আয়াত পাঠ করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেজদা করলেন এবং তাঁর সাথে সব মুসলমান, মুশরিক, জিন ও মানব সেজদা করল। বোখারী ও মুসলিমের অপর এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সূরা নজম পাঠ করতঃ তেলাওয়াতের সেজদা আদায় করলে তাঁর সাথে উপস্থিত সকল মুমিন ও মুশরিক সেজদা করল, একজন কোরাইশী বৃদ্ধ ব্যতীত। সে একমুষ্টি মাটি তুলে নিয়ে কপালে স্পর্শ করে বলল ঃ আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ্ ইবনে-মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এই ঘটনার পর আমি বৃদ্ধকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, তখন যেসব মুশরিক মজলিসে উপস্থিত ছিল, আল্লাহ্ তাআলার অদৃশ্য ইঙ্গিতে তারাও সেজদা করতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য কুফরের কারণে তখন এই সেজদার কোন সওয়াব ছিল না। কিন্তু এই সেজদার প্রভাবে পরবর্তীকালে তাদের সবারই ইসলাম ও ঈমান গ্রহণ করার তওফীক হয়ে যায়। যে বৃদ্ধ সেজদা থেকে ছিল বিরত, একমাত্র সে-ই কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল।

সূরা আল-ক্বামার

পূর্ববর্তী সূরা নাজম أَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ বলে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য সূরাকে এই বিষয়বস্তু দ্বারাই অর্থাৎ, اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ বলে শুরু করা হয়েছে। এরপর কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি দলীল চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযায় আলোচিত হয়েছে। কেননা, কেয়ামতের বিপুলসংখ্যক আলামতের মধ্যে সর্ববৃহৎ আলামত হচ্ছে খোদ শেষনবী মুহাম্মদ (সাঃ)–এর নবুওয়ত। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ আমার আগমন কেয়ামত হাতের দুই অঙ্গুলির ন্যায় অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আরও কতিপয় হাদীসে এই নৈকট্যের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)– এর মো'জেযা হিসাবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়াও কেয়ামতের একটি বড় আলামত। এছাড়া এই মো'জেযাটি আরও এক দিক দিয়ে কেয়ামতের আলামত। তা এই যে, চন্দ্র যেমন আল্লাহ্র কুদরতে দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তেমনিভাবে কেয়ামতে সমগ্র গ্রহ–উপগ্রহের খণ্ড–বিখণ্ড হয়ে যাওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযা ঃ মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর কাছে তাঁর রেসালতের স্বপক্ষে কোন নিদর্শন চাইলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযা প্রকাশ করেন। এই মো'জেযার প্রমাণ কোরআন পাকের وَانْشَقَّ الْقَمَرُ আয়াতে আছে এবং অনেক সহীহ্ হাদীসেও আছে। এসব হাদীস সাহাবায়ে কেরামের একটি বিরাট দলের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, জুবায়ের ইবনে মুতইম, ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) প্রমুখ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ একথাও বর্ণনা করেন যে, তিনি তখন অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং মো'জেযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইমাম তাহাভী (রহঃ) ও ইবনে কাসীর এই মো'জেযা সম্পর্কিত সকল রেওয়ায়েতকে 'মুতাওয়াতির' বলেছেন। তাই এই মো'জেযার বাস্তবতা অকাট্য রূপে প্রমাণিত।

ঘটনার সার–সংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কার মিনা নামক

স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তখন মুশরিকরা তাঁর কাছে নবুওয়তের নিদর্শন চাইল। তখন ছিল চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রি। আল্লাহ্ তাআলা এই সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে একখণ্ড পূর্বদিকে ও অপরখণ্ড পশ্চিমদিকে চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উপস্থিত সবাইকে বললেন ঃ দেখ এবং সাক্ষ্য দাও। সবাই যখন পরিষ্কাররূপে এই মো'জেযা দেখে নিল, তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় একত্রিত হয়ে গেল। কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির পক্ষে এই সুস্পষ্ট মো'জেযা অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু মুশরিকরা বলতে লাগল ঃ মুহাম্মদ সারা বিশ্বের মানুষকে জাদু করতে পারবে না। অতএব, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের অপেক্ষা কর। তারা কি বলে শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগন্তুক মুশরিকদেরকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করল।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, মক্কায় এই মো'জেযা দুইবার সংঘটিত হয়। কিন্তু সহীহ্ রেওয়ায়েতসমূহে একবারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।—(বয়ানুল-কোরআন) এ সম্পর্কিত কয়েকটি রেওয়ায়েত ইবনে-কাসীর থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ

ঃ মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে নবুওয়তের কোন নিদর্শন দেখতে চাইলে আল্লাহ্ তাআলা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখিয়ে দিলেন। তারা হেরা পর্বতকে উভয় খণ্ডের মাঝখানে দেখতে পেল।—(বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে গেল। সবাই এই ঘটনা অবলোকন করল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা সাক্ষ্য দাও।

ইবনে-জরীর (রহঃ)ও নিজ সনদে এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আরও উল্লেখিত আছে ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি মিনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং একখণ্ড পাহাড়ের পশ্চাতে চলে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ সাক্ষ্য দাও, সাক্ষ্য দাও।

আবু দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ মক্কায় (অবস্থানকালে) চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে যায়। কোরাইশ কাফেররা বলতে থাকে, এটা জাদু, মুহাম্মদ তোমাদেরকে জাদু করেছে। অতএব, তোমরা বহির্দেশ থেকে আগমনকারী মুসাফিরদের অপেক্ষা কর। যদি তারাও চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখে থাকে, তবে মুহাম্মদের দাবী সত্য। পক্ষান্তরে তারা এরূপ দেখে না থাকলে এটা জাদু ব্যতীত কিছু নয়। এরপর বহির্দেশ থেকে আগত মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করে।—(ইবনে-কাসীর)

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও জওয়াব ঃ গ্রীক দর্শনের নীতি এই যে, আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের পক্ষে বিদীর্ণ হওয়া ও সংযুক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই নীতির ভিত্তিতে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব। জওয়াব এই যে, দার্শনিকদের এই নীতি নিছক একটি দাবী মাত্র। এর পক্ষে যত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, সবগুলো অসার ও ভিত্তিহীন। আজ পর্যন্ত কোন যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব বলে প্রমাণ করা যায়নি। তবে অজ্ঞ জনসাধারণ প্রত্যেক সুকঠিন বিষয়কে অসম্ভব বলে ধারণা করে থাকে। বলাবাহুল্য, মো'জেযা বলাই হয় এমন কাজকে, যা সাধারণ অভ্যাস বিরুদ্ধ ও সাধারণের সাধ্যাতীত এবং বিস্ময়কর হয়ে থাকে। সচরাচর ঘটে এরূপ মামুলী ঘটনাকে কেউ মো'জেযা বলবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এরূপ বিরাট ঘটনা ঘটে থাকলে বিশ্বের ইতিহাসে তা স্থান পেত। কিন্তু এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, ঘটনাটি মক্কায় রাত্রিকালে ঘটেছিল। তখন বিশ্বের অনেক দেশে দিন ছিল। সুতরাং সেসব দেশে এই ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। কোন কোন দেশে অর্ধ রাত্রি এবং কোন কোন দেশে শেষরাত্রি ছিল। তখন সাধারণতঃ সবাই নিদ্রামগ্ন থাকে। যারা জাগ্রত থাকে, তারাও তো সর্বক্ষণ চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে না। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলে তার আলোকরশ্মিতে তেমন কোন প্রভেদ হয় না যে, এই প্রভেদ দেখে মানুষ চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হবে। এছাড়া এটা ছিল স্বল্পক্ষণের ঘটনা। আজকাল দেখা যায় যে, কোন দেশে চন্দ্রগ্রহণ হলে পূর্বেই পত্র-পত্রিকা ও বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করে দেয়া হয়। এতদসত্ত্বেও হাজারো লাখো মানুষ চন্দ্রগ্রহণের কোন খবর রাখে না। তারা টেরই পায় না। জিজ্ঞাসা করি, এটা চন্দ্রগ্রহণ আদৌ না হওয়ার প্রমাণ হতে পারে? অতএব, পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাসে উল্লেখিত না হওয়ার কারণে এই ঘটনাকে মিথ্যা বলা যায় না।

এতদ্ব্যতীত ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য "তারীখে-ফেরেশতা" গ্রন্থে এই ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। মালাবারের জনৈক মহারাজা এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁর রোজ-নামচায় তা লিপিবদ্ধও করেছিলেন। এই ঘটনাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিল। উপরে আবু দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা বহিরাগত লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারাও ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কথা স্বীকার করে।

وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ — مُّسْتَمِرٌّ শব্দের প্রচলিত অর্থ দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু আরবী ভাষায় কোন সময়ে استمر ও مر চলে যাওয়া ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অর্থেও আসে। তফসীরবিদ মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রহঃ) এস্থলে এই অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা স্বল্পক্ষণস্থায়ী জাদুর প্রতিক্রিয়া, যা আপনা আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবে। مُّسْتَمِرٌّ *শব্দের এক অর্থ শক্ত ও কঠোর হয়।* আবুল আলীয়া ও যাহহাক (রাঃ) এই তফসীরই করেছেন। অর্থাৎ, এটা বড় শক্ত জাদু।

মক্কাবাসীরা যখন চাক্ষুষ দেখাকে মিথ্যা বলতে পারল না, তখন জাদু ও শক্ত জাদু বলে নিজেদেরকে প্রবোধ দিল।

وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ - استقرار এর শাব্দিক অর্থ স্থির হওয়া। অর্থ এই যে, প্রত্যেক কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সত্যের উপর যে জালিয়াতির পর্দা ফেলে রাখা হয়, তা পরিণামে উন্মুক্ত হয়েই যায় এবং সত্য সত্যরূপে এবং মিথ্যা মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়ে যায়।

وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا
تُغْنِ النُّذُرُ ﴿٥﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ﴿٦﴾
خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿٧﴾
مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾ كَذَّبَتْ
قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾
فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ
مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾
وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ
كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي
وَنُذُرِ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾ كَذَّبَتْ
عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا
فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ
مُّنقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾
فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

(৪) তাদের কাছে এমন সংবাদ এসে গেছে, যাতে সাবধানবাণী রয়েছে। (৫) এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে সতর্ককারীগণ তাদের কোন উপকারে আসে না। (৬) অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে, (৭) তারা তখন অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পংগপাল সদৃশ। (৮) তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়াতে থাকবে। কাফেররা বলবে ঃ এটা কঠিন দিন। (৯) তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল। তারা মিথ্যারোপ করেছিল আমার বান্দা নূহের প্রতি এবং বলেছিল ঃ এ তো উন্মাদ। তারা তাঁকে হুমকি প্রদর্শন করেছিল। (১০) অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বলল ঃ আমি অক্ষম, অতএব, তুমি প্রতিবিধান কর। (১১) তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। (১২) এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে। (১৩) আমি নূহকে আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে। (১৪) যা চলত আমার দৃষ্টির সামনে। এটা তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। (১৫) আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (১৬) কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! (১৭) আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (১৮) আদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (১৯) আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এক চিরাচরিত অশুভ দিনে। (২০) তা মানুষকে উৎখাত করছিল, যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড। (২১) অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (২২) আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (২৩) সামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (২৪) তারা বলেছিল ঃ আমরা কি আমাদেরই একজনের অনুসরণ করব? তবে তো আমরা বিপথগামী ও বিকারগ্রস্তরূপে গণ্য হব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ এর শাব্দিক অর্থ মাথা তোলা, আয়াতের অর্থ এই যে, আহ্বানকারীর প্রতি তাকিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটতে থাকবে। আগের আয়াতে দৃষ্টি অবনমিত থাকার কথা বলা হয়েছে। উভয় বক্তব্যে মিল এভাবে যে, হাশরে বিভিন্ন স্থান হবে। কোন কোন স্থানে মস্তক অবনমিতও থাকবে।

مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ — এর শাব্দিক অর্থ হুমকি প্রদর্শন করা হল। উদ্দেশ্য এই যে, তারা নূহ (আঃ)-কে পাগলও বলল এবং তাঁকে হুমকি প্রদর্শন করে রেসালতের কর্তব্য পালন থেকে বিরতও রাখতে চাইল। অন্য এক আয়াতে আছে যে, তারা নূহ (আঃ)-কে হুমকি প্রদর্শন করে বলল ঃ যদি আপনি প্রচার ও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত না হন, তবে আমরা আপনাকে প্রস্তর বর্ষণ করে মেরে ফেলব।

আবদ ইবনে হুমায়েদ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত করেন, নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কিছু লোক তাঁকে পথে-ঘাটে কোথাও পেলে গলা টিপে ধরত। ফলে তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন এরপর হুঁশ ফিরে এলে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করতেন ঃ আল্লাহ্, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। তারা অজ্ঞ। সাড়ে নয়শ' বছর পর্যন্ত সম্প্রদায়ের এহেন নির্যাতনের জওয়াব দোয়ার মাধ্যম দিয়ে অবশেষে নিরূপায় হয়ে তিনি বদদোয়া করেন, যার ফলে সমগ্র জাতি মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়।

فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ — অর্থাৎ, ভূমি থেকে স্ফীত পানি এবং আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এভাবে পরস্পরে মিলিত হয়ে গেল যে, সমগ্র জাতিকে ডুবিয়ে মারার যে পরিকল্পনা আল্লাহ্ তাআলা করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়ে গেল। ফলে পাহাড়ের চূড়ায়ও কেউ আশ্রয় পেল না।

ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ — أَلْوَاحٍ শব্দটি لوح এর বহুবচন। অর্থ কাঠের তক্তা دسر শব্দটি دسار এর বহুবচন। অর্থ পেরেক, কীলক, যার সাহায্যে তক্তাকে সংযুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্য নৌকা।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ — ذكر এর অর্থ দ্বিবিধ (এক) মুখস্থ করা এবং (দুই) উপদেশ ও শিক্ষা অর্জন করা। এখানে উভয় অর্থ বোঝানো যেতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা কোরআনকে মুখস্থ করার জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অন্য কোন ঐশীগ্রন্থ এরূপ ছিল না। তওরাত, ইঞ্জীল ও যবুর মানুষের মুখস্থ ছিল না। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সহজকরণের ফলশ্রুতিতেই কচি কচি বালক বালিকারাও সমগ্র কোরআন মুখস্থ করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাতে একটি যের-যবরের পার্থক্যও হয় না। চৌদ্দশ' বছর ধরে প্রতি স্তরে প্রতি ভূখণ্ডে হাজারো লাখো হাফেযের বুকে আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআন সংরক্ষিত আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এছাড়া কোরআন পাক তার উপদেশ ও শিক্ষার বিষয়বস্তুকে খুবই সহজ করে বর্ণনা করেছে। ফলে বড় বড় আলেম, বিশেষজ্ঞ ও দার্শনিক যেমন এর দ্বারা উপকৃত হয়, তেমনি গণ্ডমূর্খ ব্যক্তিরাও এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

ইজতিহাদ তথা বিধানাবলী চয়ন করার জন্যে কোরআনকে সহজ করা হয়নি ঃ আলোচ্য আয়াতে يسرنا এর সাথে للذكر সংযুক্ত করে আরও বলা হয়েছে যে, মুখস্থ করা ও উপদেশ গ্রহণ করার সীমা

ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُوْنَ
غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٦﴾ اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ
فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾ وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ
كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً
وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا
كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا
بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا
عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوْقُوْا
عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ
مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا
فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾ اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ
اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾

(২৫) আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি উপদেশ নাযিল করা হয়েছে? বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (২৬) এখন আগামীকল্যই তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (২৭) আমি তাদের পরীক্ষার জন্য এক উষ্ট্রী প্রেরণ করব, অতএব, তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবর কর (২৮) এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানির পালা নির্ধারিত হয়েছে এবং পালাক্রমে উপস্থিত হতে হবে। (২৯) অতঃপর তারা তাদের সঙ্গীকে ডাকল। সে তাকে ধরল এবং বধ করল। (৩০) অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! (৩১) আমি তাদের প্রতি একটিমাত্র নিনাদ প্রেরণ করেছিলাম। এতেই তারা হয়ে গেল শুষ্ক শাখাপল্লব নির্মিত দলিত খোয়াড়ের ন্যায়। (৩২) আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৩৩) লূত-সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (৩৪) আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষণকারী প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু; কিন্তু লূত-পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে রাতের শেষপ্রহরে উদ্ধার করেছিলাম। (৩৫) আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ। যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, আমি তাদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। (৩৬) লূত তাদেরকে আমার প্রচণ্ড পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। অতঃপর তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করেছিল। (৩৭) তারা লূতের (আঃ) কাছে তার মেহমানদেরকে দাবী করেছিল। তখন আমি তাদের চক্ষু লোপ করে দিলাম। অতএব, আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (৩৮) তাদেরকে প্রত্যুষে নির্ধারিত শাস্তি আঘাত হেনেছিল। (৩৯) অতএব, আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী আস্বাদন কর। (৪০) আমি কোরআনকে বোঝবার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৪১) ফেরাউন সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারীগণ আগমন করেছিল। (৪২) তারা আমার সকল নিদর্শনের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর আমি পরাভূতকারী, পরাক্রমশালীর ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম। (৪৩) তোমাদের মধ্যকার কাফেররা কি তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ? না তোমাদের মুক্তির সনদপত্র রয়েছে কিতাবসমূহে? (৪৪) না তারা বলে যে, আমরা এক অপরাজেয় দল?

পর্যন্ত কোরআনকে সহজ করা হয়েছে। ফলে প্রত্যেক আলেম ও জাহেল, ছোট ও বড় সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এতে জরুরী হয় না যে, কোরআন পাক থেকে বিধানাবলী চয়ন করাও তেমনি সহজ হবে। বলাবাহুল্য, এটা একটা স্বতন্ত্র ও কঠিন শাস্ত্র। যেসব প্রগাঢ় জ্ঞানী আলেম এই শাস্ত্রের গবেষণায় জীবনপাত করেন, কেবল তারাই এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন। এটা প্রত্যেকের বিচরণক্ষেত্র নয়।

কোন কোন মুসলমান উপরোক্ত আয়াতকে সম্বল করে কোরআনের মূলনীতি ও ধারাসমূহ পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করেই মুজতাহিদ হতে চায় এবং বিধানাবলী চয়ন করতে চায়। উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে। বলাবাহুল্য, এটা পরিষ্কার পথভ্রষ্টতা।

কতক শব্দার্থের ব্যাখ্যা : وَّسُعُرٍ শব্দটি দুই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে সামূদ গোত্রের আলোচনায় তাদেরই উক্তিতে। এখানে এর অর্থ পাগলামি। দ্বিতীয় لَفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ বাক্যাংশে। এখানে وَّسُعُرٍ এর অর্থ জাহান্নামের অগ্নি। অভিধানে এই শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ — مراودة শব্দের অর্থ কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে কাউকে ফুসলানো। কওমে লূত বালকদের সাথে অপকর্মে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাদের পরীক্ষার জন্যেই কয়েকজন ফেরেশতাকে সুশ্রী বালকের বেশে প্রেরণ করেন। দুর্বৃত্তরা তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্যে লূত (আঃ)-এর গৃহে উপস্থিত হয়। লূত (আঃ) দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে অথবা প্রাচীর টপকিয়ে ভিতরে আসতে থাকে। লূত (আঃ) বিব্রতবোধ করলে ফেরেশতাগণ তাদের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন : আপনি চিন্তিত হবেন না। এরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমরা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যেই আগমন করেছি।

সূরা ক্বামার কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, যাতে দুনিয়ার লোভ-লালসায় পতিত এবং পরকাল বিমুখ কাফেরদের চৈতন্য ফিরে আসে। প্রথমে কেয়ামতের আযাব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর তাদের পার্থিব মন্দ পরিণাম ব্যক্ত করার জন্যে পাঁচটি বিশ্ববিশ্রুত সম্প্রদায়ের অবস্থা, পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে তাদের অশুভ পরিণতি ও ইহকালেও নানা আযাবে পতিত হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

সর্বপ্রথম নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, তারাই বিশ্বের সর্বপ্রথম জাতি, যাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব ধ্বংস করে দেয়। এই কাহিনী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে 'আদ, সামূদ, কওমে-লূত ও কওমে ফেরাউন এই চার সম্প্রদায়ের আলোচনা রয়েছে। তাদের ঘটনাবলী কোরআন পাকের কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পাঁচটি জাতি ছিল বিশ্বের শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত জনগোষ্ঠী। কোন শক্তির কাছে তারা মাথা নত করত না। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আগমনের চিত্র অংকন করা হয়েছে। প্রত্যেক জাতির বর্ণনা শেষে কোরআন পাক এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করেছে :

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ অর্থাৎ, এত শক্তিশালী ও জনবহুল জাতির

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ
أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ
فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ
بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا
أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَ
كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾
فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

سُورَةُ الرَّحْمَٰنِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ○
الرَّحْمَٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾ وَالسَّمَاءَ
رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا
الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا
لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَالْحَبُّ
ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

(৪৫) এ দল তো সত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। (৪৬) বরং কেয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কেয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর। (৪৭) নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত। (৪৮) যেদিন তাদেরকে মুখ হিঁচড়ে টেনে নেয়া হবে জাহান্নামে, বলা হবে ঃ অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর। (৪৯) আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। (৫০) আমার কাজ তো এক মুহূর্তে চোখের পলকের মত। (৫১) আমি তোমাদের সমমনা লোকদেরকে ধ্বংস করেছি, অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৫২) তারা যা কিছু করেছে, সবই আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে। (৫৩) ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ। (৫৪) খোদাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে। (৫৫) যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।

সূরা আর রহমান

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৭৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) করুণাময় আল্লাহ্ (২) শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, (৩) সৃষ্টি করেছেন মানুষ (৪) তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। (৫) সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে (৬) এবং তৃণলতা ও বৃক্ষাদি সেজদারত আছে। (৭) তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদণ্ড, (৮) যাতে তোমরা সীমালংঘন না কর তুলাদণ্ডে। (৯) তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিয়ো না। (১০) তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টজীবের জন্যে। (১১) এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ। (১২) আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। (১৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

উপর যখন আল্লাহ্‌র আযাব নেমে এল, তখন দেখ, তারা কিতাবে মশা-মাছির ন্যায় নিপাত হয়ে গেল। এতদসঙ্গে মুমিন ও কাফেরদের উপদেশের জন্যে এই বাক্যটিও বার বার উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ — অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র এই মহা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হচ্ছে কোরআন। উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের সীমা পর্যন্ত আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি। কাজেই সেই ব্যক্তি চরম হতভাগা ও বঞ্চিত, যে কোরআন দ্বারা উপকৃত হয় না। পরে উল্লেখিত আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে বিদ্যমান লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যুগের কাফেররা ধন-সম্পদ, জনসংখ্যা এবং শক্তি সাহসে 'আদ, সামূদ ও ফেরাউন সম্প্রদায়ের চাইতে বেশী নয়। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে নিশ্চিন্তে বসে রয়েছে।

কয়েকটি শব্দার্থের ব্যাখ্যা ঃ زبر শব্দটি زبور এর বহুবচন। অভিধানে প্রত্যেক লিখিত কিতাবকে زبور বলা হয়। হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের নামও যবুর। أَدْهَىٰ এর অর্থ অত্যধিক ভয়াবহ এবং وَأَمَرُّ শব্দের অর্থ তিক্ততর। এটা مر থেকে উদ্ভূত। কঠোর ও কষ্টকর বিষয়কেও امر ও امر বলা হয়। وَسُعُرٍ শব্দের অর্থ এখানে জাহান্নামের অগ্নি। اشياع শব্দটি شيعة এর বহুবচন। এর অর্থ অনুসারী ; অর্থাৎ যারা তাদের অনুসারী ও সমমনা مَقْعَدِ এ অর্থ মজলিস, বসার জায়গা এবং صِدْقٍ এ অর্থ সত্য। উদ্দেশ্য এই যে, এই মসলিসে মহতী হবে। এতে কোন অসার ও বাজে কথাবার্তা হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ — قدر শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিমাপ করা, কোন বস্তু উপযোগিতা অনুসারে পরিমিতরূপে তৈরী করা। আয়াতে এ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা বিশ্ব জাহানের সকল শ্রেণীর বস্তু বিজ্ঞসুলভ পরিমাপ সহকারে ছোট বড় ও বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে তৈরী করেছেন। অঙ্গুলিসমূহ একইরূপ তৈরী করেননি —দৈর্ঘ্য পার্থক্য রেখেছেন। হাত পায়ে দৈর্ঘ্য প্রস্থ রেখেছেন, খোলা বন্ধ হওয়া এবং সংকোচন ও সম্প্রসারণের জন্য স্প্রিং সংযোজিত করেছেন। এক এক অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ্‌র কুদরত ও হিকমতের বিস্ময়কর দ্বার উন্মোচিত হতে দেখা যাবে।

শরীয়তের পরিভাষায় 'কদর' শব্দটি খোদায়ী তকদীর তথা বিধিলিপির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ কোন কোন হাদীসের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতে এই অর্থই নিয়েছেন।

মুসনাদে আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, কোরাইশ কাফেররা একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে তকদীর সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু তকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ, আদিকালে সৃজিত বস্তু, তার পরিমাণ, সময়কাল, হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপ বিশ্ব অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই লিখে দেয়া হয়েছিল। এখন বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি লাভ করে, তা এই আদিকালীন তকদীর অনুযায়ীই সৃষ্টি লাভ করে।

তকদীর ইসলামের একটি অকাট্য ধর্মবিশ্বাস। যে একে সরাসরি অস্বীকার করে, সে কাফের। আর যারা দ্ব্যর্থতার আশ্রয় নিয়ে অস্বীকার

করে, তারা ফাসেক। আহমদ, আবু-দাউদ ও তিবরানী বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের (রাঃ) বর্ণনাঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ প্রত্যেক উম্মতে কিছুলোক মজুসী (অগ্নিপূজারী কাফের) থাকে। আমার উম্মতের মজুসী তারা, যারা তকদীর মানে না। এরা অসুস্থ হলে এদের খবর নিও না এবং মরে গেলে কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করো না। (রূহুল-মা'আনী)

সূরা আররাহমান

সূরার যোগসূত্র এবং فَبِأَيِّ آلَاءِ **বাক্যটি বার বার উল্লেখ করার তাৎপর্য ঃ** পূর্ববর্তী সূরা ক্বামারের অধিকাংশ বিষয়বস্তু অবাধ্য জাতিসমূহের শাস্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছিল। তাই প্রত্যেক শাস্তির পর মানুষকে হুশিয়ার করার জন্য فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ বাক্যটি বার বার ব্যবহার করা হয়েছে। এর সাথে ঈমান ও আনুগত্যে উৎসাহিত করার জন্য দ্বিতীয় বাক্য وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ কে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

এর বিপরীতে সূরা রহমানের বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু আল্লাহ্ তাআলার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অনুগ্রহ দানসমূহের বর্ণনা সম্পর্কিত। তাই যখন কোন বিশেষ অবদান উল্লেখ করা হয়েছে, তখনই মানুষকে সতর্ক ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারে উৎসাহিত করার জন্যে فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا বাক্যটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র সূরায় এ বাক্য একত্রিশ বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক বার বাক্যটি নতুন নতুন বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এটা অলংকার শাস্ত্রের পরিপন্থী নয়। আল্লামা সুয়ূতী এ ধরনের পুনরুল্লেখের নাম রেখেছেন তরদীদ। এটা বিশুদ্ধভাষী আরবদের গদ্য ও পদ্য রচনায় বহুল ব্যবহৃত ও প্রশংসিত। শুধু আরবী ভাষাই নয়, ফারসী, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় সর্বজন স্বীকৃত কবিদের কাব্যের এর নযীর পাওয়া যায়। এসব নযীর উদ্ধৃত করার স্থান এটা নয়। তফসীর রূহুল-মা'আনীতে এস্থলে কয়েকটি নযীর উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা আর রাহমান মক্কায় অবতীর্ণ, না মদীনায় অবতীর্ণ এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কুরতুবী কতিপয় হাদীসের ভিত্তিতে মক্কায় অবতীর্ণ হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিরমিযীতে হযরত জাবের বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কয়েকজন লোকের সামনে সমগ্র সূরা আর রহমান তেলাওয়াত করেন। তাঁরা শুনে নিশ্চুপ থাকলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ আমি 'লায়লাতুল জিনে' (জিন-রজনীতে) জিনদের সামনে এই সূরা তেলাওয়াত করেছিলাম। প্রভাবান্বিত হওয়ার দিক দিয়ে তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম ছিল। কারণ, আমি যখনই সূরার فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا আয়াতটি তেলাওয়াত করতাম তখনই তারা সমস্বরে বলে উঠতঃ ربنا لا نكذب بشئ من نعمك فلك الحمد অর্থাৎ, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার কোন অবদানকেই অস্বীকার করব না। আপনার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা। এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। কেননা, 'জিন-রজনীর' ঘটনা মক্কায় সংঘটিত হয়েছিল। এই রজনীতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জিনদের কাছে ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দান করেছিলেন।

কুরতুবী এ ধরনের আরও কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সব হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরাটিকে 'রহমান' শব্দ দ্বারা শুরু করার তৎপর্য এই যে, মক্কার কাফেররা আল্লাহ্ তাআলার এই নাম সম্পর্কে অবগত ছিল না। তাই মুসলমানদের মুখে রহমান নাম শুনে ওরা বলাবলি করতঃ وَمَا الرَّحْمٰنُ রহমান আবার কি? তাদেরকে অবহিত করার জন্য এখানে এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, পরের আয়াতে কোরআন শিক্ষা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই রহমান শব্দটি ব্যবহার করে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই কোরআন শিক্ষা দেয়ার কার্যকরী কারণ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার রহমত ও করুণা। নতুবা তাঁর দায়িত্বে কোন কাজ ওয়াজিব বা জরুরী নয় এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

এরপর সমগ্র সূরায় আল্লাহ্ তাআলার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবদানসমূহের অব্যাহত বর্ণনা হয়েছে। عَلَّمَ الْقُرْآنَ বলে সর্ববৃহৎ অবদান দ্বারা শুরু করা হয়েছে। কোরআন সর্ববৃহৎ অবদান। কেননা, এতে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার কল্যাণ রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম কোরআনকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে পরকালীন উচ্চ মর্যাদা ও নেয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন এবং দুনিয়াতেও এমন উচ্চ আসন দান করেছেন, যা রাজা-বাদশাহ্রাও হাসিল করতে পারে না।

ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী عَلَّمَ ক্রিয়াপদের দু'টি কর্ম থাকে- 'এক' যা শিক্ষা দেয়া হয় এবং 'দুই' যাকে শিক্ষা দেয়া হয়। আয়াতে প্রথম কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ কোরআন। কিন্তু দ্বিতীয় কর্ম অর্থাৎ, কাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তার উল্লেখ নেই। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ এখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উদ্দেশ্য। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যক্ষভাবে তাঁকেই শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র সৃষ্টজীব এতে দাখিল রয়েছে। এরূপও হতে পারে যে, কোআন নাযিল করার লক্ষ্য সমগ্র সৃষ্টজগতকে পথপ্রদর্শন করা ও তাদেরকে নৈতিক চরিত্র ও সৎকর্ম শিক্ষা দেয়া। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যেই আয়াতে বিশেষ কোন কর্ম উল্লেখ করা হয়নি।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ মানবসৃষ্টি আল্লাহ্ তাআলার একটি বড়- অবদান। স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে এটাই সর্বাগ্রে। কোরআন শিক্ষা দেয়ার অবদানটি মানব সৃষ্টির পরেই হতে পারে। কিন্তু কোরআন পাক এই অবদান অগ্রে এবং মানব সৃষ্টির কথা পরে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানব সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই হচ্ছে কোরআন শিক্ষা এবং কোরআন নির্দেশিত পথে চলা। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে শুধু আমার এবাদত করার জন্যে সৃষ্টি করেছি। বলাবাহুল্য, খোদায়ী শিক্ষা ব্যতীত এবাদত হতে পারে না। কোরআন এই শিক্ষার উপায়। অতএব, এই দিক দিয়ে কোরআন শিক্ষা মানব সৃষ্টির অগ্রে স্থান লাভ করেছেন।

মানবসৃষ্টির পর অসংখ্য অবদান মানবকে দান করা হয়েছে। তন্মধ্যে এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের ক্রমবিকাশ, অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের সাথে যেসব অবদান সম্পর্কযুক্ত, যেমন পানাহার, শীত ও গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার উপকরণ, বসবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদিতে বিশেষভাবে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর মধ্যে প্রথমে কোরআন শিক্ষা ও পরে বর্ণনা শিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, কোরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া বর্ণনাশক্তির উপরই নির্ভরশীল।

এখানে বর্ণনার অর্থ ব্যাপক। মৌখিক বর্ণনা,লেখা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে বর্ণনা এবং অপরকে বোঝানোর যত উপায় আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ও বাকপদ্ধতি সবই এই বর্ণনা শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গ এবং এটা কার্যতঃ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا আয়াতের তফসীরও।

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ আল্লাহ্ তাআলা মানুষের জন্যে ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে অসংখ্য অবদান সৃষ্টি করেছেন। এই আয়াতে নভোমণ্ডলীয় অবদানসমূহের মধ্য থেকে বিশেষভাবে সূর্য ও চন্দ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, বিশ্ব-জগতের গোটা ব্যবস্থাপনা এই দু'টি গ্রহের গতি ও কিরণ-রশ্মির সাথে গভীরভাবে জড়িত রয়েছে। حسبان শব্দটি কারও কারও মতে ধাতু। এর অর্থ হিসাব। কেউ কেউ বলেন যে, এটা حساب শব্দের বহুবচন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সূর্য ও চন্দ্রের গতি এবং কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা একটি বিশেষ হিসাব ও পরিমাপ অনুযায়ী চালু রয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রের গতির উপরই মানব জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার নির্ভর করে। এর মাধ্যমেই দিবারাত্রির পার্থক্য, ঋতু পরিবর্তন এবং মাস ও বছর নির্ধারিত হয়। حسبان শব্দটিকে حساب এর বহুবচন ধরা হলে অর্থ এই হবে যে, সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকের পরিক্রমণের আলাদা আলাদা হিসাব আছে। বিভিন্ন ধরনের হিসাবে উপর সৌর ও চন্দ্র ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এসব হিসাবও এমন অটল ও অনড় যে, লাখো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এতে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয়নি।

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ — কাণ্ডবিহীন লতানো গাছকে نجم এবং কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষকে شجر বলা হয়। অর্থাৎ, সর্বপ্রকার লতা-পাতা ও বৃক্ষ, আল্লাহ্ তাআলার সামনে সেজদা করে। সেজদা চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্যের লক্ষণ। তাই এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বৃক্ষ, লতা-পাতা, ফল ও ফুলকে যে যে বিশেষ কাজ ও মানুষের উপকারের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তারা অনবরত সে কাজ করে যাচ্ছে এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে মানুষের উপকার সাধন করে যাচ্ছে। এই সৃষ্টিজগত ও বাধ্যতামূলক আনুগত্যকেই আয়াতে সেজদা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।— (রুহুল-মা'আনী, মাযহারী)।

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ — رفع ও وضع দু'টি বিপরীত শব্দ। رفع শব্দের অর্থ সমুন্নত করা এবং وضع শব্দের নীচে রাখা। আয়াতে প্রথমে আকাশকে সমুন্নত করার কথা বলা হয়েছে। স্থানগত উচ্চতা ও মর্যাদাগত উচ্চতা উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আকাশের মর্যাদা পৃথিবীর তুলনায় উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী আকাশের বিপরীত গণ্য হয়। সমগ্র কোরআনে এই বৈপরীত্য সহকারেই আকাশ ও পৃথিবীর উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আকাশকে সমুন্নত করার কথা বলার পর মীযান স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে, যা আকাশের বিপরীতে আসে না। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এখানেও প্রকৃতপক্ষে আকাশের বিপরীতে পৃথিবীকে আনা হয়েছে। তিন আয়াতের পর বলা হয়েছে وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ কাজেই আসলে আকাশ ও পৃথিবীর বৈপরীত্যই ফুটানো হয়েছে। কিন্তু বিশেষ রহস্যের কারণে উভয়ের মাঝখানে তৃতীয় একটি বিষয় অর্থাৎ, মীযান স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। মনে হয় এতে রহস্য এই যে, মীযান স্থাপন এবং পরবর্তী তিন আয়াতে বর্ণিত মীযানকে যথাযথ ব্যবহার করার নির্দেশ, এতদুভয়ের সারমর্ম হচ্ছে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং আত্মসাৎ ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করা। এখানে আকাশকে সমুন্নতকরণ ও পৃথিবী স্থাপনের মাঝখানে মীযানের কথা উল্লেখ করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবী শান্তি ও ন্যায় এবং ইনসাফের মাধ্যমেই কায়েম থাকতে পারে। নতুবা অনর্থই হবে।

হযরত কাতাদাহ্ মুজাহিদ, সুদ্দী প্রমুখ 'মীযান' শব্দের তফসীর করেছেন ন্যায় বিচার। কেননা, মীযান তথা দাঁড়িপাল্লার আসল লক্ষ্য ন্যায় বিচারই। তবে মীযানের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে দাঁড়িপাল্লা। কোন কোন তফসীরবিদ মীযানকে এই অর্থেই নিয়েছেন। এর সারমর্মও পারস্পরিক লেন-দেনে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা। এখানে মীযানের অর্থে এমন যন্ত্র দাখিল আছে, যদ্দ্বারা কোন বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়; তা দুই পাল্লাবিশিষ্ট হোক কিংবা কোন আধুনিক পরিমাপযন্ত্র হোক।

اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ এই আয়াতে দাঁড়িপল্লা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করেছেন, যাতে তোমরা ওজনে কম-বেশী করে জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত না হও।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ, ইনসাফ সহকারে ন্যায্য ওজন কায়েম কর। قسط এর শাব্দিক অর্থ ইনসাফ।

وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ বাক্যে যে বিষয়টি ধনাত্মক ভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়েছে, এই বাক্যে তাই ঋণাত্মক ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, ওজনে কম দেয়া হারাম।

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক প্রাণীকে انام বলা হয়।— (কামূস)

বায়যাভী বলেন ঃ যার আত্মা আছে, সেই انام আয়াতে انام বলে বাহ্যতঃ মানব ও জিনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, যাদের আত্মা আছে, তাদের মধ্যে এই দুই শ্রেণীই শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতাভুক্ত। এই সূরায় فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا বলে তাদেরকে বার বার সম্বোধনও করা হয়েছে।

فِيْهَا فَاكِهَةٌ - فَاكِهَةٌ এমন ফলমূলকে বলা হয়, যা আহারের পর স্বভাবতঃ মুখের স্বাদ পরিবর্তনের উদ্দেশে খাওয়া।

وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ - اكمام শব্দটি كم এর বহুবচন। এর অর্থ সেই বহিরাবরণ, যা খর্জুর ইত্যাদি ফলগুচ্ছের উপরে থাকে।

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ - حب এর অর্থ শস্য; যেমন গম, বুট, ধান, মাষ, মসুর ইত্যাদি। عصف সেই খোসাকে বলে, যার ভিরতে আল্লাহ্‌র কুদরতে মোড়কবিশিষ্ট অবস্থায় শস্যের দানা সৃষ্টি করা ময়। এই খোসার আবরণে মোড়কবিশিষ্ট হওয়ার কারণে শস্যের দানা দূষিত আবহাওয়া ও পোকামাকড় ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। শস্যের দানার সাথে 'খোসাবিশিষ্ট' কথাটি যোগ করে বুদ্ধিমান মানুষের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, তোমরা যে রুটি, ডাল ইত্যাদি প্রত্যহ কয়েকবার আহার কর, এর এক একটি দানাকে সৃষ্টিকর্তা কিরূপ সুকৌশলে মৃত্তিকা ও পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এরপর কিভাবে একে কীট-পতঙ্গ থেকে নিরাপদ রাখার জন্যে আবরণ দ্বারা আবৃত করেছেন এত কিছুর পরই সেই দানা তোমাদের মুখের গ্রাসে পরিণত হয়েছে। এর সাথে সম্ভবতঃ আরও একটি অবদানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই খোসা তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর খোরাক হয়, যাদের দুধ তোমরা পান কর এবং যাদেরকে বোঝা বহনের কাজে নিয়োজিত কর।

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ﴿٣١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾

(১৪) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে (১৫) এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে (১৬) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (১৭) তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। (১৮) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (১৯) তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। (২০) উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না। (২১) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (২২) উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মোতি ও প্রবাল। (২৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৪) দরিয়ায় বিচরণশীল পর্বতদৃশ্য জাহাজসমূহ তাঁরই (নিয়ন্ত্রণাধীন)। (২৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৬) ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। (২৭) একমাত্র আপনার মহিমায় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া। (২৮) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৯) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী। তিনি সর্বদাই কোননা কোন কাজে রত আছেন। (৩০) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে। (৩১) হে জিন ও মানব। আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্যে কর্মমুক্ত হয়ে যাব। (৩২) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে। (৩৩) হে জিন ও মানবকুল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। (৩৪) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩৫) ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না। (৩৬) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে। (৩৭) যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে তখন সেটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত চামড়ার মত হয়ে যাবে। (৩৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?

وَالرَّيْحَانُ এর প্রসিদ্ধ অর্থ সুগন্ধি। ইবনে যায়েদ (রহঃ) আয়াতের এই অর্থই বুঝিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন বৃক্ষ থেকে নানা রকমের ও সুগন্ধি এবং সুগন্ধযুক্ত ফুল সৃষ্টি করেছেন। ريحان শব্দটি কোন কোন সময় নির্যাস ও রিযিকের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বলা হয় خرجت لاطلب ريحان الله অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্র রিযিক অন্বেষণে বের হলাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আয়াতে ريحان এর এ তফসীরই করেছেন।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - آلَاءِ শব্দটি বহুবচন। এর অর্থ অবদান। আয়াতে জিন ও মানবকে সম্বোধন করা হয়েছে। সূরা আর-রহমানের একাধিক আয়াতে জিনদের আলোচনা থেকে একথা বোঝা যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ এখানে انسان বলে সরাসরি মৃত্তিকা থেকে সৃষ্ট আদম (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। صَلْصَالٍ এর অর্থ পানি মিশ্রিত শুষ্ক মাটি। فخار এর অর্থ পোড়ামাটি। অর্থাৎ মানুষকে পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন।

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ - جان এর অর্থ জিন জাতি। مَّارِجٍ এর অর্থ অগ্নিশিখা। জিন সৃষ্টির প্রধান উপাদান অগ্নিশিখা, যেমন মানব সৃষ্টির প্রধান উপাদান মৃত্তিকা।

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচল পারিবর্তীত হয়। গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে مشرق অর্থাৎ উদয়াচল এবং مغرب অর্থাৎ অস্তাচল ভিন্ন ভিন্ন জায়গা হয়। আয়াতে সম্বসরের এই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলকে مغربين ও مشرقين বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ - مرج এর আভিধানিক অর্থ স্বাধীন ও মুক্ত ছেড়ে দেয়া بحرين বলে মিঠা ও লোনা দুই দরিয়া বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীতে উভয় প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন স্থানে উভয় দরিয়া একত্রে মিলিত হয়ে যায়, যার নযীর পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু যে স্থানে মিঠা ও লোনা উভয় প্রকার দরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, সেখানে বেশ দূর পর্যন্ত উভয়ের পানি আলাদা ও স্বতন্ত্র থাকে। একদিকে থাকে মিঠা পানি এবং অপরদিকে লোনা পানি। কোথাও কোথাও এই মিঠা ও লোনা পানি উপরে-নীচেও প্রবাহিত হয়। পানি তরল ও সূক্ষ্ম পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে মিশ্রিত হয় না। আল্লাহ্ তাআলার এই অপার শক্তি প্রকাশ করার জন্যেই বলা হয়েছে ঃ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ অর্থাৎ, উভয় দরিয়া পরস্পরে মিলিত হয়; কিন্তু উভয়ের মাঝখানে আল্লাহ্র কুদরতের একটি অন্তরাল থাকে, যা দূর পর্যন্ত তাদেরক মিশ্রিত হতে দেয় না।

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ - لؤلؤ শব্দের অর্থ মোতি এবং مرجان এর অর্থ প্রবাল। এটাও মূল্যবান মনিমুক্তা। এতে বৃক্ষের ন্যায় শাখা ময়। এই মোতি ও প্রবাল সমুদ্র থেকে বের হয় কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে জাতি ও মনিমুক্তা লোনা সমুদ্র থেকে বের হয়-মিঠা পানি থেকে নয়। আয়াতে উভয় প্রকার পানি থেকে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর জওয়াব এই যে, মোতি উভয় প্রকার সমুদ্রেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু মিঠা পানির স্রোতধারা

প্রবাহমান হওয়ার কারণে তা থেকে মোতি বের করা সহজসাধ্য নয়। মিঠা পানির স্রোত প্রবাহিত হয়ে লোনা সমুদ্রে পতিত হয় এবং সেখানে থেকেই মোতি বের করা হয়। এ কারণেই লোনা সমুদ্রকে মোতির উৎস বলা হয়ে থাকে।

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۔ جوارى শব্দটি جارية এর বহুবচন। এর এক অর্থ নৌকা বা জাহাজ। এখানে তাই বুঝানো হয়েছে। منشئات শব্দটি نشا থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ভেসে উঠা, উঁচু হওয়া অর্থে এখানে নৌকার পাল বুঝানো হয়েছে, যা পতাকার ন্যায় উচুঁ হয়। আয়াতে নৌকার নির্মাণ-কৌশল এবং সেটি পানির উপর বিচরণ করার রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ — এর অর্থ এই যে, ভূপৃষ্ঠে যত জিন ও মানব আছে, তারা সবাই ধ্বংসশীল। এই সুরায় জিন ও মানবকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের প্রসঙ্গই উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, আকাশ ও আকাশস্থিত সৃষ্ট বস্তু ধ্বংসশীল নয়। কেননা অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় সমগ্র সৃষ্টিজগতের ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয়টিও ব্যক্ত করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

وَجْهُ رَبِّكَ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে وجه আল্লাহ তাআলা সত্তা এবং শব্দের رَبِّكَ সম্বোধন সর্বনাশ দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। এটা সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি বিশেষ সম্মান। প্রশংসার স্থলে কোথাও তাঁকে عبده এবং কোথাও رَبِّكَ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, জ্বিন ও মানবসহ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। অক্ষয় হয়ে থাকবে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সত্তা।

ধ্বংসশীল হওয়ার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, এসব বস্তু এখনও সত্তাগতভাবে ধ্বংসশীল। এগুলোর মধ্যে চিরস্থায়ী হওয়ার যোগ্যতাই নেই। আরেক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।

কোন তফসীরবিদ وَجْهُ رَبِّكَ এর তফসীর এরূপ করেছেন যে, সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্যে একমাত্র সেই বস্তুই স্থায়ী যা আল্লহ তাআলার দিকে আছে। এতে শামিল আছে আল্লাহ তাআলার সত্তা এবং মানুষের সেই সব কর্ম ও অবস্থা, যা আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর সারমর্ম এই যে, মানব জিন ও ফেরেশতা যে কাজ আল্লাহ্‌র জন্যে করে, সেই কাজও চিরস্থায়ী, অক্ষয়। তা কোন সময় ধ্বংস হবে না।—(মাযহারী, কুরতুবী, রুহুল মা'আনী)

কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায় ঃ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ — অর্থাৎ, তোমাদের কাছে যা কিছু অর্থ সম্পদ শক্তি-সামর্থ্য, সুখ-কষ্ট অথবা ভালবাসা ও শত্রুতা আছে, সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র কাছে যা কিছু আছে, তা অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের যেসব কর্ম ও অবস্থা আছে, সেগুলো ধ্বংস হবে না।

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ অর্থাৎ, সেই পালকর্তা মহিমামণ্ডিত এবং মহানুভবও। মহানুভব হওয়ার এক অর্থ যে, প্রকৃতপক্ষে সম্মান বলতে যা কিছু আছে, এ সবেরই যোগ্য একমাত্র তিনিই। আরেক অর্থ এই যে, তিনি মহিমাময় হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মত নন যে, অন্যের বিশেষতঃ দরিদ্রের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না ; বরং তিনি অকল্পনীয় সম্মান ও শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবেরও সম্মান বর্ধন করেন। তাদেরকে অস্তিত্ব দানের পর নানাবিধ অবদান দ্বারা ভূষিত করেন এবং তাদের প্রার্থনা ও দোয়া শুনেন। পরবর্তী আয়াত এই দ্বিতীয় অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ —বাক্যটি আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণাবলীর অন্যতম। এই শব্দগুলো উল্লেখ করে যে দোয়াই করা হয়, কবুল হয় তিরমিযী, নাসায়ী ও মসনদে-আহমদের রেওয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

তোমরা 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলে দোয়া করো। (কারণ, এটা কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক।)—মাযহারী।

يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ —অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টবস্তু আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী এবং তাঁর কাছেই প্রয়োজনাদি যাঞ্চা করে। পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের রিযিক, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা সুখ-শান্তি, পরকালে ক্ষমা, রহমত ও জান্নাত প্রার্থনা করে এবং আকাশের অধিবাসীরা যদিও পানাহার করে না ; কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপার তারাও মুখাপেক্ষী। كُلَّ يَوْمٍ শব্দটি يسئل বাক্যর ظرف অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে তাদের এই যাঞ্চা ও প্রার্থনা প্রতিনিয়তই অব্যাহত থাকে। এর সারমর্ম এই যে, সমগ্র সৃষ্টবস্তু বিভিন্ন ভূখণ্ডে ও বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কাছে নিজেদের অভাব-অনটন সর্বক্ষণ পেশ করতে থাকে। বলাবাহুল্য, পৃথিবীস্থ ও আকাশস্থ সমগ্র সৃষ্টজীব ও তাদের প্রত্যেকের অসংখ্য অভাব-অনটন আছে। তাও আবার প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি পলে পেশ করা হচ্ছে। এগুলো এই মহিমাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কে শুনতে পারে এবং পূর্ণ করতে পারে? তাই كُلَّ يَوْمٍ এর সাথে هُوَ فِي شَأْنٍ ও বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সর্বদা ও সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তাআলার একটি বিশেষ শান ও অবস্থা থাকে। কাউকে জীবনদান করেন, কারও মৃত্যু ঘটান, কাউকে সম্মানিত করেন। কাউকে লাঞ্ছিত করেন, কোন সুস্থকে অসুস্থ, কোন অসুস্থকে সুস্থ করেন। কোন বিপদগ্রস্তকে বিপদ থেকে মুক্তি দেন, কোন ব্যথিত ও ক্রন্দনকারীর মুখে হাসি ফুটান, কোন প্রার্থনাকারীকে প্রার্থিত বস্তু দান করেন। কারও পাপ মার্জনা করে তাকে জান্নাতের যোগ্য করে দেন। কোন জাতিকে সমুন্নত ও ক্ষমতায় আসীন করে দেন এবং কোন জাতিকে অধঃপতিত ও লাঞ্ছিত করেন দেন। মোটকথা, প্রতিমুহূর্তে, প্রতি পলে আল্লাহ্ তাআলার একটি বিশেষ শান থাকে।

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ — ثقلان শব্দটি ثقل এর দ্বি-বচন। যে বস্তুর ওজন ও মূল্যমান সুবিদিত, আরবী ভাষায় তাকে বলা হয়। এখানে মানব ও জিন জাতিদ্বয় বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ انى تارك فيكم الثقلين অর্থাৎ, আমি দু'টি ওজনবিশিষ্ট ও সম্মানার্হ বিষয় ছেড়ে যাচ্ছি। এগুলো তোমাদের জন্যে সৎপথের দিশারী হয়ে থাকবে। কোন কোন রেওয়াতে كتاب الله وعترتى বলে এবং কোন কোন রেওয়াতে كتاب الله وسنتى বলে উল্লেখিত বিষয় দু'টি বর্ণিত হচ্ছে। উভয়ের সারমর্ম এক। কেননা, عترتى বলে রসূল্লাহ্ (সাঃ)-এর বংশগত ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার সন্তান-সন্ততি বুঝানো হয়েছে। কাজেই সাহাবায়ে কেরামও এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসের অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পর দু'টি বিষয় মুসলমানদের হেদায়াত ও

সংশোধনের উপায় হবে—একটি আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআন ও অপরটি সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের কর্মপতি। যে হাদীসে সুন্নত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার সারমর্ম হচ্ছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষা, যা সাহাবায়ে-কেরামের মাধ্যমে মুসলমানদের কাছে পৌছেছে।

মোটকথা ; এই হাদীসে ثقلين বলে দু'টি ওজন বিশিষ্ট ও সম্মানার্হ বিষয় বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব জাতিকে এই অর্থের দিকে দিয়েই ثقلان বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে যত প্রাণী বসবাস করে, তাদের মধ্যে জিন ও মানব সর্বাধিক ওজন বিশিষ্ট ও সম্মানার্হ। سَنَفْرُغُ শব্দটি فراغ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কর্মমুক্ত হওয়া। অভিধানে فراغ বিপরীত শব্দ হচ্ছে شغل অর্থাৎ, কর্মব্যস্ততা। فراغ শব্দ থেকে দু'টি বিষয় বুঝা যায়—(এক) পূর্বে কোন কাজে ব্যস্ত থাকা এবং (দুই) এখন সেই কাজ সমাপ্ত করে কর্মমুক্ত হওয়া। উভয় বিষয় সৃষ্টজীবের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। মানুষ কোন সময় এক কাজে ব্যস্ত থাকে এরপর তা থেকে মুক্ত হয়ে অবসর লাভ করে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা উভয় বিষয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তাঁর এক কাজ অন্য কাজের জন্যে বাধা হয় না এবং তিনি মানুষের ন্যায় কাজ থেকে অবসর লাভ করেন না।

তাই আয়াতে سَنَفْرُغُ শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী একথা বলা হয়েছে। কোন কাজের গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্যে বলা হয় ঃ আমি এই কাজের জন্যে অবসর লাভ করেছি ; অর্থাৎ, এখন একাজেই পুরাপুরি মনোনিবেশ করব। কোন কাজে পূর্ণ মনোযোগ ব্যয় করাকে বাক পদ্ধতিতে এভাবে প্রকাশ করা হয় ঃ তার তো এছাড়া কোন কাজ নেই।

এর আগের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি সৃষ্টজীব আল্লাহ্‌র কাছে তাদের অভাব-অনটন পেশ করে এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করার ব্যাপারে সর্বদাই এক বিশেষ শানে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আবেদন ও আবেদন মঞ্জুর করা সম্পর্কিত সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন কাজ কেবল একটি থাকবে এবং শানও একটি হবে ; অর্থাৎ, হিসাব-নিকাশ ও ইনছাফ সহকারে ফয়সালা প্রদান।—(রূহুল-মা'আনী)

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ

পূর্ববর্তী আয়াতে জিন ও মানবকে ثقلين শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে বলা হয়েছিল যে, কিয়ামতের দিন একটিই কাজ হবে ; অর্থাৎ, সকল জিন ও মানবের কাজকর্ম পরীক্ষা হবে এবং প্রতিটি কাজের প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, প্রতিদান দিবসের উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ থেকে পলায়ন করতে পারবে না। মৃত্যুর কবল থেকে অথবা কিয়ামতের হিসাব থেকে গা বাঁচিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সাধ্য কারও নেই। এই আয়াতে ثقلان এর পরিবর্তে জিন ও মানবের প্রকাশ্য নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং জিনকে অগ্রে রাখা হয়েছে। এতে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করতে হলে বিরাট শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন জাতিকে আল্লাহ্ তাআলা এ ধরনের কাজের শক্তি মানুষের চাইতে বেশী দিয়েছেন। তাই জিনকে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই ঃ হে জিন ও মানবকুল, তোমরা যদি মনে কর যে, তোমরা কোথাও পালিয়ে গিয়ে মালাকুল-মওতের কবল থেকে গা বাঁচিয়ে যাবে অথবা হাশরের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে হিসাব-নিকাশের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তবে এস, শক্তি পরীক্ষা করে দেখ। যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করার সামর্থ্য তোমাদের থাকে, তবে অতিক্রম করে দেখাও। এটা সহজ কাজ নয়। এর জন্যে অসাধারণ শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন ও মানব কারও এরূপ শক্তি নেই। এখানে আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করার সম্ভাব্যতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় ; বরং অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেয়ার পর্যায়ে তাদের অক্ষমতা ব্যক্ত করা লক্ষ্য।

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ —হযরত ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন ঃ ধূম্রবিহীন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে شواظ এবং অগ্নিবিহীন ধূম্রকুঞ্জকে نحاس বলা হয় এই আয়াতেও জিন ও মানবকে সম্বোধন করে তাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ ছাড়ার কথা বর্ণনা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, হিসাব-নিকাশের পর জাহান্নামের অপরাধীদেরকে দুই প্রকার আযাব দেয়া হবে। কোথাও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে এবং কোথাও অগ্নিবিহীন ধূম্রকুঞ্জ হবে। কোন কোন তফসীরবিদ ধূম্রবিহীন এই আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের পরিশিষ্ট ধরে নিয়ে এরূপ অর্থ করেছেন যে, হে জিন ও মানব। আকাশের সীমানা অতিক্রম করার সাধ্য তোমাদের নেই। তোমরা যদি এরূপ করতেও চাও, তবে যেদিকেই পালাতে চাইবে, সেদিকেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে।—(ইবনে-কাসীর)।।

فَلَا تَنْتَصِرٰنِ — এটা انصار থেকে উদ্ভূত। অর্থ কাউকে সাহায্য করে বিপদ থেকে উদ্ধার করা। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যে জিন ও মানবের মধ্যে থেকে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَ
الْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ
بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ﴿٤٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٥﴾ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴿٤٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٩﴾ فِيهِمَا
عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥١﴾ فِيهِمَا مِن كُلِّ
فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ
بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا
جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا
الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾ وَمِن دُونِهِمَا
جَنَّتَانِ ﴿٦٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَامَّتَانِ ﴿٦٤﴾
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٦﴾

(৩৯) সেদিন মানুষ না তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, না জিন। (৪০) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪১) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে; অতঃপর তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে। (৪২) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৩) এটাই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলত। (৪৪) তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে। (৪৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পলনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৬) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু' টি উদ্যান। (৪৭) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৮) উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট। (৪৯) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫০) উভয় উদ্যানে আছে বহমান দুই প্রস্রবন। (৫১) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫২) উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে। (৫৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৪) তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকটে ঝুলবে। (৫৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৬) তথায় থাকবে আনতনয়না রমনীগণ, কোন জিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে ব্যবহার করেনি। (৫৭) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৮) প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ। (৫৯) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬০) সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? (৬১) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬২) এই দু' টি ছাড়া আরও দু' টি উদ্যান রয়েছে। (৬৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৪) কালোমত ঘন সবুজ। (৬৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৬) তথায় আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ —অর্থাৎ, সেদিন কোন মানব অথবা জিনকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। এর এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে কিয়ামতে এই প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অমুক গোনাহ্ করেছ কি না? এ কথা তো ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামায় এবং আল্লাহ্ তাআলার আদি জ্ঞানে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। বরং প্রশ্ন এই হবে যে, তোমরা অমুক গোনাহ্ কেন করবে? হযরত ইবনে আব্বাস এই তফসীর করেছেন মুজাহিদ বলেন ঃ অপরাধীদের শাস্তিদানে আদিষ্ট ফেরেশতাগণ অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে না যে, তোমরা এই গোনাহ্ করেছ কিনা? এর প্রয়োজনই হবে না কেননা, প্রত্যেক গোনাহের একটি বিশেষ চিহ্ন অপরাধীদের চেহারায় ফুটে উঠবে। ফেরেশতাগণ এই চিহ্ন দেখে তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দেবে। পরবর্তী يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ আয়াতে এই বিষয়বস্তু বিধৃত হয়েছে উপরোক্ত উভয় তফসীরের সারমর্ম এই যে, হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের পর অপরাধীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ফয়সালার পর এই ঘটনা ঘটবে। সুতরাং তখন তাদের গোনাহ্ সম্পর্কে কোন আলোচনা হবে না। তারা তালামত দ্বারা চিহ্নিত হয়েই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

হযরত কাতাদাহ্ বলেন ঃ এটা তখনকার অবস্থা যখন একবার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে যাবে এবং অপরাধীরা অস্বীকার করবে ও কসম খাবে। তখন তাদের মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য নেয়া হবে। ইবনে কাসীর বর্ণিত এই তিনটি তফসীর কাছাকাছি। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ — سيما শব্দের অর্থ আলামত চিহ্ন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ সেদিন অপরাধীদের আলামত হবে এই যে, তাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষু নীলাভ হবে। দুঃখ ও কষ্টের কারণে চেহারা বিষণ্ন হবে। এই আলামতের সাহায্যে ফেরেশতারা তাদেরকে পাকড়াও করবে।

نواصى শব্দটি ناصية এর বহুবচন। অর্থ কপালের চুল। কেশাগ্র ও পা ধরার এক অর্থ এই যে, কারও কেশাগ্র ধরে এবং কারও পা ধরে টানা হবে অথবা এক সময় এভাবে এবং অন্য সময় অন্যভাবে টানা হবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, কেশাগ্র ও পা এক সাথে বেঁধে দেয়া হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহে সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের উত্তম প্রতিদান ও অবদান বর্ণনা করা হচ্ছে। তন্মধ্যে জান্নাতীদের প্রথমোক্ত দুই উদ্যান ও তার অবদানসমূহ এবং শেষোক্ত দুই উদ্যান ও তাতে সরবরাহকৃত অবদানসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত দুই উদ্যান কাদের জন্যে, একথা وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তারা এই দুই উদ্যানের অধিকারী হবে, যারা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলার সামনে উপস্থিত হওয়ার ও হিসাব-নিকাশ দেয়ার ভয়ে ভীত থাকে। ফলে তারা কোন পাপকর্মের কাছেও যায় না। বলাবাহুল্য, এ ধরনের লোক বিশেষ নৈকট্যশীলগণই হতে পারে।

শেষোক্ত দুই উদ্যানের অধিকারী কারা হবে, এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, এই দুই উদ্যান প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের হবে।

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ অর্থাৎ, পূর্বোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এই উদ্যানদ্বয়ের অধিকারী হবে সাধারণ মুমিনগণ, যারা মর্যাদায় নৈকট্যশীলদের চেয়ে কম।

প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণ আরও অনেক উক্তি করেছেন। কিন্তু হাদীসের আলোকে উপরোক্ত তফসীরই অগ্রগণ্য মনে হয়। কেননা, দুররে -মনসূরের বরাত দিয়ে বয়ানুল-কোরআনে এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ এবং وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

অর্থাৎ, স্বর্ণনির্মিত দুই উদ্যান নৈকট্যশীলদের জন্যে এবং রৌপ্য নির্মিত দুই উদ্যান সাধারণ সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের জন্যে। এছাড়া 'দুররে-মনসূরে' হযরত বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত আছে — অর্থাৎ, প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের দুই প্রস্রবণ, যাদের সম্পর্কে تَجْرِيٰنِ তথা বহমান বলা হয়েছে, শেষোক্ত দুই উদ্যানের প্রস্রবণ থেকে উত্তম, যাদের সম্পর্কে نَضَّاخَتٰنِ তথা উত্তাল বলা হয়েছে। কেননা, প্রস্রবণ মাত্রই উত্তাল হয়ে থাকে। কিন্তু যে প্রস্রবণ সম্পর্কে বহমান বলা হয়েছে, তার মধ্যে উত্তাল হওয়া ছাড়াও দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার গুণটি অতিরিক্ত।

এ হচ্ছে প্রস্রবণ চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, যেগুলো জান্নাতীগণ লাভ করবে। এখন আয়াতের ভাষা ও অর্থ দেখুন ঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ — অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে مقام رب বলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলার সামনে হিসাবের জন্যে উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। এই উপস্থিতির ভয় রাখার অর্থ এই যে, জনসমক্ষে ও নির্জনে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় এই ধ্যান থাকা যে, আমাকে একদিন আল্লাহ্ তাআলার সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং ক্রিয়াকর্মের হিসাব দিতে হবে। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তির সদাসর্বদা এরূপ ধ্যান থাকবে, সে পাপকর্মের কাছে যাবে না।

কুরতুবী প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ مقام رب এর এরূপ তফসীরও করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক কথা, কাজ এবং গোপন ও প্রকাশ্য কর্ম দেখাশুনা করেন। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁর দৃষ্টির সামনে। আল্লাহ্ তাআলার এই ধ্যানও মানুষকে পাপকর্ম থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ -এটা প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের বিশেষণ। অর্থাৎ, উদ্যানদ্বয় ঘন শাখাপল্লববিশিষ্ট হবে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, এগুলোর ছায়াও ঘন ও সুনিবিড় হবে এবং ফলও বেশী হবে। পরবর্তীতে উল্লেখিত উদ্যানদ্বয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়ের অভাব বোঝা যায়।

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ —প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের বিশেষণে مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এগুলোতে সর্বপ্রকার ফল থাকবে। এর বিপরীতে শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের বর্ণনায় শুধু فَاكِهَةٌ বলা হয়েছে। زَوْجٰنِ - এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক ফলের দুটি করে প্রকার হবে - শুস্ক ও আর্দ্র। অথবা সাধারণ স্বাদযুক্ত ও অসাধারণ স্বাদযুক্ত। — (মাযাহারী)

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ - طمث শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ হায়েযের রক্ত। যে নারীর হায়েয হয়, তাকে طامث বলা হয়। কুমারী বালিকার সাথে সহবাসকেও طمث বলা হয়। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। (এক) যেসব রমণী মানুষের জন্যে নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ এবং যেসব রমণী জিনদের জন্যে নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন জিন স্পর্শ করেনি। (দুই) দুনিয়াতে যেমন মাঝে মাঝে মানব নারীদের উপর জিন ভর করে বসে, জান্নাতে এরূপ কোন সম্ভাবনা নেই।

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ —নৈকট্যশীলদের উদ্যানদ্বয়ের কিছু বিবরণ পেশ করার পর এরশাদ হয়েছে যে, সৎকর্মের প্রতিদান উত্তম পুরস্কারই হতে পারে, এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনা নেই। তারা সর্বদা সৎকর্ম পালন করেছে, কাজেই আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকেও তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেয়া উচিত ছিল যা দেয়া হয়েছে।

مُدْهَآمَّتٰنِ —ঘন সবুজের কারণে যে কাল রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তাকে ادهام বলা হয়। অর্থাৎ, এই উদ্যানদ্বয়ের ঘন সবুজতা এদের কালোমত হওয়ার কারণ হবে। প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি বটে, কিন্তু ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ — বিশেষণে এই বিশেষণও শামিল আছে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ
آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ
رَافِعَةٌ ﴿٣﴾ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾
فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ﴿٦﴾ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٩﴾
وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّاتِ
النَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾
عَلَىٰ سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴿١٦﴾

(৬৭) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৮) তথায় আছে ফল-মূল, খর্জুর ও আনার। (৬৯) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭০) সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ। (৭১) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭২) তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ। (৭৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৪) কোন জিন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি। (৭৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৬) তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। (৭৭) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৮) কত পূণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।

সূরা আল-ওয়াক্বিয়া

মদিনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৯৬

(১) যখন কেয়ামতের ঘটনা ঘটবে, (২) যার বাস্তবতায় কোন সংশয় নেই। (৩) এটা নীচু করে দেবে, সমুন্নত করে দেবে। (৪) যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী (৫) এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে (৬) অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা (৭) এবং তোমরা তিনভাবে বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৮) যারা ডান দিকে, কত ভাগ্যবান তারা। (৯) এবং যারা বামদিকে, কত হতভাগা তারা। (১০) অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। (১১) তারাই নৈকট্যশীল, (১২) অবদানের উদ্যানসমূহে, (১৩) তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে (১৪) এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্যে থেকে, (১৫) স্বর্ণ খচিত সিংহাসনে। (১৬) তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ - خَيْرَاتٌ এর অর্থ চারিত্রিক দিক দিয়ে সুশীলা এবং حِسَانٌ এর অর্থ দেহাবয়বের দিক দিয়ে সুন্দরী। উভয় উদ্যানের রমণীগণ সমভাবে এই বিশেষণে বিশেষিতা হবে।

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ - رَفْرَفٍ এর অর্থ সবুজ রঙের রেশমী বস্ত্র। – (কামূস) এর দ্বারা বিছানা, বালিশ ও অন্যান্য বিলাস সামগ্রী তৈরী করা হয়। সিহাহ্ গ্রন্থে আছে, এর উপর বৃক্ষ ও ফুলের কারুকার্য করা হয়। عَبْقَرِيٍّ অর্থ সুশ্রী ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র।

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ — সূরা আর-রহমানে বেশীর ভাগ আল্লাহ্ তাআলার অবদান ও মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে। উপসংহারে সার-সংক্ষেপ হিসেবে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা অনন্য। তাঁর নামও খুব পুণ্যময়। তাঁর নামের সাথেই এসব অবদান কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত আছে।

সূরা ওয়াক্বিয়ার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ঃ অন্তিম রোগশয্যায় আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) -এর শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন ঃ ইবনে-কাসীর ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-মাসউদ যখন অন্তিম রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন আমিরুল মুমেনীন হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁকে দেখতে যান। তখন তাঁদের মধ্যে শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন হয়, তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

হযরত ওসমান — ما تشتكى আপনার অসুখটা কি?

হযরত ইবনে মাসউদ — ذنوبى আমার পাপসমূহই আমার অসুখ।

ওসমান গনী — ما تشتهى আপনার বাসনা কি?

ইবনে মাসউদ — رحمة ربى আমার পালনকর্তার রহমত কামনা করি।

ওসমান গনী — আমি আপনার জন্যে কোন চিকিৎসক ডাকব কি?

ইবনে মাসউদ - الطبيب امرضنى চিকিৎসকই আমাকে রোগাক্রান্ত করেছেন।

ওসমান গনী — আমি আপনার জন্যে সরকারী বায়তুল মাল থেকে কোন উপঢৌকন পাঠিয়ে দেব কি?

ইবনে মাসউদ — لاحاجة لى فيها এর কোন প্রয়োজন নেই।

ওসমান গণী - উপঢৌকন গ্রহণ করুন। তা আপনার পর আপনার কন্যাদের উপকারে আসবে।

ইবনে মাসউদ — আপনি চিন্তা করছেন যে, আমার কন্যারা দারিদ্র্য ও উপবাসে পতিত হবে। কিন্তু আমি এরূপ চিন্তা করি না। কারণ, আমি কন্যাদেরকে জোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছি যে, তারা যেন প্রতিরাত্রে সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠ করে। আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠ করবে, সে কখনও উপবাস

করবে না। ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর অন্যান্য সনদ ও কিতাব থেকেও এর সমর্থন পেশ করেছেন।

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ — ইবনে কাসীর বলেন ঃ ওয়াক্বিয়া কেয়ামতের অন্যতম নাম। কেননা, এর বাস্তবতায় কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ - كَاذِبَةٌ শব্দটি عاقبة -এর ন্যায় একটি ধাতু। অর্থ এই যে, কেয়ামতের বাস্তবতা মিথ্যা হতে পারে না।

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে এই বাক্যের তফসীর এই যে, কেয়ামতের ঘটনা অনেক উচ্চ মর্যদাশীল জাতি ও ব্যক্তিকে নীচ করে দেবে এবং অনেক নীচ ও হেয় জাতি ও ব্যক্তিকে উচ্চ মর্যদায় আসীন করে দেবে। উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামত ভয়াবহ হবে এবং এতে অভিনব বিপ্লব সংঘটিত হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বিপ্লব সাধিত হলে দেখা যায় যে, উপরের লোক নীচে এবং নীচের লোক উপরে উঠে যায় এবং নিঃস্ব ধনবান আর ধনবান নিঃস্ব হয়ে যায়।— (রুহুল-মা'আনী)।।

হাশরের ময়দানে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবেঃ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ইবনে-কাসীর বলেন ঃ কেয়ামতের দিন সব মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এক দল আরশের ডানপার্শ্বে থাকবে। তারা আদম (আঃ)-এর ডানপার্শ্ব থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে। তারা সবাই জান্নাতী।

দ্বিতীয় দল আরশের বামদিকে একত্রিত হবে। তারা আদম (আঃ)-এর বামপার্শ্ব থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেয়া হবে। তারা সবাই জাহান্নামী।

তৃতীয় দল হবে অগ্রবর্তীদের দল। তারা আশাধিপতির সামনে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও নৈকট্যের আসনে থাকবে। তারা হবেন নবী, রসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও ওলীগণ। তাঁদের সংখ্যা প্রথমোক্ত দলের তুলনায় কম হবে।

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ —ইমাম আহমদ (রহঃ) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবারে কেরামকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা জান কি, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র ছায়ার দিকে কারা অগ্রবর্তী হবে? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ তারাই অগ্রবর্তী হবে, যাদেরকে সত্যের দাওয়াত দিলে কবুল করে, যারা প্রাপ্য চাইলে পরিশোধ করে এবং অন্যের ব্যাপারে তাই ফয়সালা করে যা নিজের ব্যাপারে করে।

মুজাহিদ বলেন ঃ سابقين তথা অগ্রবর্তীগণ বলেন পয়গম্বরগণকে বোঝানো হয়েছে। ইবনে-সিরীন (রহঃ) - এর মতে যারা বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ্ উভয় কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছে, তারা অগ্রবর্তীগণ। হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (রাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী।

এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর ইবনে-কাসীর বলেন ঃ এসব উক্ত স্ব স্ব স্থানে সঠিক ও বিশুদ্ধ। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, দুনিয়াতে যারা সৎকাজে অন্যের চাইতে অগ্রে, পরকালেও তারা অগ্রবর্তীরূপে গণ্য হবে। কেননা, পরকালের প্রতিদান দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতে দেয়া হবে।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ - ثُلَّةٌ শব্দের অর্থ দল। যমখশরীর মতে বড় দল।— রুহুল-মা'আনী)।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কারা ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে দু'জায়গায় পূর্ববর্তীও পরবর্তীর বিভাগ উল্লেখিত হয়েছে—নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায়। নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় জায়গায় ثلة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সাধারণ মুমিনদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং একটি বড় দল পরবর্তীদের মধ্য থেকেও হবে।

এখন চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণ দুরকম উক্তি করেছেন। (এক) হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) - এর পূর্ব পর্যন্ত সব মানুষ পূর্ববর্তী এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত সব মানুষ পরবর্তী মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনে জরীর (রহঃ) প্রমুখ এই তফসীর করেছেন। তফসীরের সার সংক্ষেপেও তাই নেয়া হয়েছে। হযরত জাবের এর বর্ণিত একটি হাদীস এই তফসীরের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ যখন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সম্পর্কে প্রথম আয়াত ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ নাযিল হল, তখন হযরত ওমর (রাঃ) বিস্ময় সহকারে আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ) পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা বেশী এবং আমাদের মধ্যে কম হবে কি? অতঃপর এক বছর পর্যন্ত পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়নি। এক বছর পরে যখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ নাযিল হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ

اسمع ياعمر ماقد انزل الله ثلة من الاولين وثلة من الاخرين الا وان من ادم الى ثلة وامتى ثلة .

শোন হে ওমর, আল্লাহ্ নাযিল করেছেন — পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল হবে। মনে রেখ, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আমা পর্যন্ত এক বড় দল এবং আমার উম্মত অপর বড় দল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীস থেকেও এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ আয়াতখানি যখন নাযিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম ব্যথিত হন যে আমরা পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় কমসংখ্যক হব। তখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ আয়াতখানি নাযিল হয়। *তখন রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ আমি আশা করি যে, তোমরা (অর্থাৎ,* উম্মতে মুহাম্মদী) জান্নাতে সমগ্র উম্মতের মোকাবেলায় এক চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ বরং অর্ধেক হবে। বাকী অর্ধেকের মধ্যেও তোমাদের কিছু অংশ থাকবে — (ইবনে-কাসীর)। এর ফলশ্রুতি এই যে, সমষ্টিগতভাবে জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী হবে সংখ্যাগরিষ্ট। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসদ্বয়কে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা নির্ভেজাল নয়। কেননা, প্রথম আয়াত وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং দ্বিতীয় আয়াত وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ তাদের বর্ণনায় নয়; বরং সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এর জওয়াবে রুহুল-মা'আনী গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ প্রথম আয়াত শুনে সাহাবায়ে কেরাম ও হযরত ওমর (রাঃ) দুঃখিত হওয়ার কারণ এরূপ হতে পারে যে, তাঁরা মনে করেছেন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের মধ্যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের যে হার সাধারণ মুমিনদের মধ্যেও সেই হার অব্যাহত থাকবে। ফলে সমগ্র জান্নাতবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম হবে। কিন্তু পরের আয়াতে সাধারণ মুমিনদের বর্ণনা যখন ثلة (বড়দল) শব্দটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হল, তখন তাঁদের সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং তাঁরা বুঝলেন যে, সমষ্টিগতভাবে জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। তবে অগ্রবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা কম হবে। এর বিশেষ কারণ এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে পয়গম্বরই রয়েছেন বিপুলসংখ্যক। কাজেই তাঁদের মোকাবেলায় উম্মতে মুহাম্মদী কম হলেও সেটা দুঃখের বিষয় নয়।

(দুই) তফসীরবিদগণের দ্বিতীয় উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে এই উম্মতেরই দু'টি স্তর বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী বলে কুরুনে-উলা তথা সাহাবী, তাবেয়ী প্রমুখদের যুগকে এবং পরবর্তী বলে তাঁদের পরবর্তী কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমান সমপ্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। ইবনে-কাসীর, আবু হাইয়ান, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদি তফসীরগ্রন্থে এই দ্বিতীয় উক্তিকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

প্রথম উক্তির সমর্থনে হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন যে, এর সনদ অগ্রাহ্য। দ্বিতীয় উক্তির প্রমাণ হিসেবে তিনি কোরআন পাকের সেসব আয়াত পেশ করেছেন, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মদী শ্রেষ্ঠতম উম্মত; যেমন كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ইত্যাদি আয়াত। তিনি আরও বলেছেন যে, অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই শ্রেষ্ঠতম উম্মতে কম হবে — একথা মেনে নেয়া যায় না। তাই একথাই অধিক সঙ্গত যে, পূর্ববর্তীগণের অর্থ এই উম্মতের প্রথম যুগের মনীষীগণ এবং পরবর্তীগণের অর্থ তাঁদের পরবর্তী লোকগণ। তাদের মধ্যে নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে।

এর সমর্থনে ইবনে-কাসীর হাসান বসরী (রহঃ)- এ উক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন ঃ পূর্ববর্তীগণ তো আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ইয়া আল্লাহ্, আমাদেরকে সাধারণ মুমিন তথা আসহাবুল-ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি পূর্ববর্তীগণের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ من مضى من هذه الامة অর্থাৎ, পূর্ববর্তীগণ হচ্ছেন এই উম্মতেরই পূর্ববর্তী লোকগণ।

এমনিভাবে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহঃ) বলেন ঃ আলেমগণ বলেন এবং আশা রাখেন যে, এই উম্মতের মধ্য থেকেই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ হোক। (ইবনে-কাসীর)

রূহুল-মা'আনীতে দ্বিতীয় তফসীরের সমর্থনে হযরত আবু বাকরা (রাঃ) -এর রেওয়াতেক্রমে নিম্নোক্ত হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

ঃ একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তাআলার এই উক্তির তফসীর প্রসংগে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ তারা সবাই এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে।

এই তফসীর অনুযায়ী শুরুতে وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً এই আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকেই সম্বোধন করা হয়েছে এবং প্রকারত্রয় উম্মতে মোহাম্মদী হবে। — (রুহুল-মা'আনী)

তফসীরে মাযহারীতে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, কোরআন পাক থেকে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়, উম্মতে মুহাম্মদী পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বলাবাহুল্য, কোন উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব তার ভিতরকার উচ্চস্তরের লোকদের সংখ্যাধিক্য দ্বারাই হয়ে থাকে। তাই শ্রেষ্ঠতম উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে — এটা সুদূর পরাহত। যেসব আয়াত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানিত হয়, সেগুলো এই ঃ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ এবং

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

انتم تتمون سبعين امة انتم اخيرها واكرمها على الله تعالى

— তোমরা সত্তরটি উম্মতের পরিশিষ্ট হবে। তোমরা সর্বশেষে এবং আল্লাহ্ তাআলার কাছে সর্বাধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ হবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) - এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে — এতে তোমরা সন্তুষ্ট আছ কি? আমরা বললাম ঃ নিশ্চয় আমরা এতে সন্তুষ্ট। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ والذى نفسى بيده انى لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنة — যে সত্তার করায়ত্ত আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে। — (বোখারী-মাযহারী)

জান্নাতীগণ মোট একশ বিশ' কাতারে থাকবে তন্মধ্যে আশি কাতার এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে এবং অবিশিষ্ট চল্লিশ কাতারে সমগ্র উম্মত শরীক হবে।

উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই উম্মতের জান্নাতীদের পরিমাণ কোথাও এক চতুর্থাংশ, কোথাও অর্ধেক এবং শেষ রেওয়ায়েতে দুই তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। এতে কোন বৈপরিত্য নেই। কারণ, এগুলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুমান মাত্র। অনুমান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ হয়েই থাকে।

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ — ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম, বায়হাকী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, مَّوْضُونَةٍ-এর অর্থ স্বর্ণখচিত বস্ত্র।

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ ۙ وَكَأْسٍ
مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا
يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَالِ
اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا
لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۙ مَا أَصْحَابُ
الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَ
مَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَ
فُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾
عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ
مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۙ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ
وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ
ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوا
يَقُولُونَ ۙ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوَآبَاؤُنَا
الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ ۙ إِلَىٰ
مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾

(১৭) তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা (১৮) পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে, (১৯) যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না। (২০) আর তাদের পছন্দমত ফল-মূল নিয়ে (২১) এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়ে। (২২) তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ, (২৩) আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়, (২৪) তারা যা কিছু করত, তার পুরস্কারস্বরূপ। (২৫) তারা তথায় অবান্তর ও কোন খারাপ কথা শুনবে না (২৬) কিন্তু শুনবে সালাম আর সালাম। (২৭) যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান। (২৮) তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে (২৯) এবং কাঁদি কাঁদি কলায়, (৩০) এবং দীর্ঘ ছায়ায় (৩১) এবং প্রবাহিত পানিতে, (৩২) ও প্রচুর ফল-মূলে, (৩৩) যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়, (৩৪) আর থাকবে সমুন্নত শয্যায়। (৩৫) আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। (৩৬) অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, (৩৭) কামিনী, সমবয়স্কা (৩৮) ডান দিকের লোকদের জন্যে। (৩৯) তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে (৪০) এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে। (৪১) বামপার্শ্বস্থ লোক, কত না হতভাগা তারা। (৪২) তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে এবং উত্তপ্ত পানিতে, (৪৩) এবং ধূম্রকুঞ্জের ছায়ায় (৪৪) যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। (৪৫) তারা ইতিপূর্বে স্বাচ্ছন্দ্যশীল ছিল। (৪৬) তারা সদাসর্বদা ঘোরতর পাপকর্মে ডুবে থাকত। (৪৭) তারা বলত ঃ আমরা যখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুত্থিত হব। (৪৮) এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও। (৪৯) বলুন ঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, (৫০) সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। (৫১) অতঃপর হে পথভ্রষ্ট, মিথ্যারোপকারীগণ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ —অর্থাৎ, এই কিশোররা সর্বদা কিশোরই থাকবে। তাদের মধ্যে বয়সের কোন তারতম্য দেখা দেবে না। হুরদের ন্যায় এই কিশোরগণও জান্নাতেই পয়দা হবে এবং তারা জান্নাতীদের খেদমতগার হবে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একজন জান্নাতীর কাছে হাজারো খাদেম থাকবে।—(মাযহারী)

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ ۙ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ - اكواب শব্দটি كوب এর বহুবচন। অর্থ গ্লাসের ন্যায় পানপাত্র। اباريق শব্দটি ابريق এর বহুবচন। এর অর্থ কুজা। كاس এর অর্থ সূরা পানের পেয়ালা। معين -এর উদ্দেশ্য এই যে, এই পানীয় একটি ঝরণা থেকে আনা হবে।

لَّا يُصَدَّعُونَ — এটা صدع থেকে উদ্ভূত। অর্থ মাথা ব্যাথা। দুনিয়ার সূরা অধিক মাত্রায় পান করলে মাথাব্যথা ও মাথাঘোরা দেখা দেয়। জান্নাতের সূরা এই সূরা-উপসর্গ থেকে পবিত্র হবে।

وَلَا يُنزِفُونَ - نزف এর আসল অর্থ কূপের সম্পূর্ণ পানি উত্তোলন করা। এখানে অর্থ জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলা।

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ -অর্থাৎ, রুচিসম্মত পাখির মাংস। হাদীসে আছে, জান্নাতীগণ যখন যেভাবে পাখীর মাংস খেতে চাইবে, তখন সেভাবে প্রস্তুত হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে।—(মাযহারী)

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۙ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ —মুমিন, মুত্তাকী ও ওলীগণই প্রকৃতপক্ষে 'আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা ডানপার্শ্বস্থ লোক। পাপী মুসলমানগণও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে—কেউ তো নিছক আল্লাহ্ তাআলার কৃপায়, কেউ কোন নবী ও ওলীর সুপারিশের পর এবং কেউ আযাব ভোগ করবে, কিন্তু পাপ পরিমাণে আযাব ভোগ করার পর পবিত্র হয়ে 'আসহাবুল-ইয়ামীনের' অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কারণ, পাপী মুমিনের জন্যে জাহান্নামের অগ্নি প্রকৃতপক্ষে আযাব নয়, বরং আবর্জনা থেকে পবিত্র হওয়ার একটি কৌশল মাত্র।—(মাযহারী)

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ —জান্নাতের অবদানসমূহ অসংখ্য, অদ্বিতীয় ও কল্পনাতীত। তন্মধ্যে কোরআন পাক মানুষের বোধগম্য, ও পছন্দসই বস্তুসমূহ উল্লেখ করেছে। আরবরা যেসব চিত্তবিনোদন ও যেসব ফল-মূলকে পছন্দ করত, এখানে তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হয়েছে। سِدْرٍ এর অর্থ বদরিকা বৃক্ষ مَّخْضُودٍ -এর অর্থ যার কাঁটা কেটে ফেলা হয়েছে এবং ফলভারে বৃক্ষ নুয়ে পড়েছে। জান্নাতের বদরিকা দুনিয়ার বদরিকার ন্যায় হবে না; এগুলো আকৃতিতে অনেক বড় এবং স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় হবে। وَطَلْحٍ এর অর্থ কলা مَّنضُودٍ -কাঁদি وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ এর অর্থ দীর্ঘ ছায়া। হাদীসে আছে, অশ্বে আরোহণ করে শত শত বছরেও তা অতিক্রম করা যাবে না। وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ -এর অর্থ মাটির উপর প্রবাহিত পানি।

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ — প্রচুর ফল ; অর্থাৎ, ফলের সংখ্যাও বেশী হবে এবং প্রকারও অনেক হবে। لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ — দুনিয়ার সাধারণ ফলের অবস্থা এই যে, মওসুম শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায়। কোন ফল

গ্রীষ্মকালে হয় এবং মওসুম শেষ হয়ে গেলে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার কোন ফল শীতকালে হয় এবং শীতকাল শেষ হয়ে গেলে ফলের নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু জান্নাতের প্রত্যেক ফল চিরস্থায়ী হবে—কোন মওসুমের মধ্যে সীমিত থাকবে না। এমনিভাবে দুনিয়াতে বাগানের পাহারাদাররা ফল ছিঁড়তে নিষেধ করে কিন্তু জান্নাতের ফল ছিঁড়তে কোন বাধা থাকবে না।

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ - فرش শব্দটি فراش -এর বহুবচন। অর্থ বিছানা, ফরাশ। উচ্চস্থানে বিছানো থাকবে বিধায় জান্নাতের শয্যা সমুন্নত হবে। দ্বিতীয়তঃ এই বিছানা মাটিতে নয়, পালঙ্কের উপর থাকবে। তৃতীয়তঃ স্বয়ং বিছানাও খুব পুরু হবে। কারও কারও মতে এখানে বিছানা বলে শয্যাশায়িনী নারী বোঝানো হয়েছে। কেননা, নারীকেও বিছানা বলে ব্যক্ত করা হয়। হাদীসে আছে الولد للفراش —পরবর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী নারীদের আলোচনাও এরই ইঙ্গিত—(মাযহারী) এই অর্থ অনুযায়ী مَّرْفُوعَةٍ এর অর্থ হবে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত।

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। هن সর্বনাম দ্বারা জান্নাতের নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে فراش এর অর্থ জান্নাতে নারী হলে তার স্থলেই এই সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া শয্যা, বিছানা ইত্যাদি ভোগবিলাসের বস্তু উল্লেখ করায় নারীও তার অন্তর্ভুক্ত আছে বলা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি জান্নাতের নারীদেরকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। জান্নাতী হুরদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া এই যে, তাদেরকে জান্নাতেই প্রজননক্রিয়া ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ার যেসব নারী জান্নাতে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষভঙ্গি এই যে, যারা দুনিয়াতে কুশ্রী, কৃষ্ণাঙ্গী অথবা বৃদ্ধা ছিল ; জান্নাতে তাদেরকে সুশ্রী যুবতী ও লাবণ্যময়ী করে দেয়া হবে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত রেওয়েতে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যেসব নারী দুনিয়াতে বৃদ্ধা, শ্বেতকেশিনী ও কদাকার ছিল, এই নতুন সৃষ্টি তাদেরকে সুন্দর, ষোড়শী যুবতী করে দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন ঃ একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গৃহে আগমন করলেন। তখন এক বৃদ্ধা আমার কাছে বসা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ কে? আমি আরয করলাম ঃ সে সম্পর্কে আমার খালা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রসচ্ছলে বললেনঃ لا يدخل الجنة عجوز -অর্থাৎ, জান্নাতে কোন বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। একথা শুনে বৃদ্ধা বিষণ্ণ হয়ে গেল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে কাঁদতে লাগল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং স্বীয় উক্তির অর্থ এই বর্ণনা করলেন যে, বৃদ্ধারা যখন জান্নাতে যাবে, তখন বৃদ্ধা থাকবে না ; বরং যুবতী হয়ে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে শোনালেন।—(মাযহারী)

أَبْكَارًا — এটা بكر এর বহুবচন। অর্থ কুমারী বালিকা। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের নারীদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, প্রত্যেক সঙ্গম-সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে।

عُرُبًا — এটা عروبة — এর বহুবচন। অর্থ স্বামী সোহাগিনী ও প্রেমিকা নারী।

أَتْرَابًا — এটা ترب — এর বহুবচন। অর্থ সমবয়স্ক। জান্নাতে পুরুষ ও নারী সব এক বয়সের হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, প্রত্যেকের বয়স তেত্রিশ বছর হবে।—(মাযহারী)

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ শব্দের অর্থ এবং اولين ও اخرين -এর তফসীর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদি اولين তথা পূর্ববর্তীগণ বলে হযরত আদম (আঃ) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পূর্ব পর্যন্ত লোকগণ এবং اخرين তথা পরবর্তীগণ বলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত লোকগণ বোঝানো হয়, তবে এই আয়াতের সারমর্ম এই হবে যে, 'আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা মুমিন-মুত্তাকীগণ পূর্ববর্তী সমগ্র উম্মতের মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে এবং একা উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে। এমতাবস্থায় এটা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে কম গৌরবের বিষয় নয় যে, তারা পূর্ববর্তী লক্ষ লক্ষ পয়গাম্বরের উম্মতের সমান হয়ে যাবে ; অথচ তাদের সময়কাল খুবই সংক্ষিপ্ত। এছাড়া ثُلَّةٌ শব্দের মধ্যে এরূপ অবকাশও আছে যে, পরবর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যা পূর্ববর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী হবে।

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾
فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾
هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾
اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾
نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾ عَلٰۤى اَنْ
نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ
النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾ ءَاَنْتُمْ
تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا
فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾
اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ
الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا
تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾ ءَاَنْتُمْ
اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَاۤ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً
وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾ فَلَاۤ
اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾

(৫২) তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে, (৫৩) অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে, (৫৪) অতঃপর তার উপর পান করবে উত্তপ্ত পানি। (৫৫) পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়। (৫৬) কেয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন। (৫৭) আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে। অতঃপর কেন তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস কর না? (৫৮) তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে (৫৯) তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (৬০) আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই। (৬১) এ ব্যাপারে যে, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মত লোককে নিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন করে দেই, যা তোমরা জান না। (৬২) তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? (৬৩) তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৬৪) তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? (৬৫) আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি, অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট। (৬৬) বলবেঃ আমরা তো ঋণের চাপে পড়ে গেলাম; (৬৭) বরং আমরা হৃত-সর্বস্ব হয়ে পড়লাম। (৬৮) তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৬৯) তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি? (৭০) আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? (৭১) তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৭২) তোমরা কি এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি? (৭৩) আমিই সেই বৃক্ষকে করেছি স্মরণিকা এবং মরুবাসীদের জন্যে সামগ্রী। (৭৪) অতএব, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। (৭৫) অতএব, আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি, (৭৬) নিশ্চয় এটা এক মহা-শপথ— যদি তোমরা জানতে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরায় শুরু থেকে এ পর্যন্ত হাশরে মানুষের তিন প্রকার এবং তাদের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পথভ্রষ্ট মানুষকে হুশিয়ার করা হচ্ছে, যারা মূলতঃ কেয়ামত সংঘটিত হওয়ায় এবং পুনরুজ্জীবনেই বিশ্বাসী নয়। অথবা আল্লাহ্ তাআলার এবাদতে অপরকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। উদ্দেশ্য মানুষের সেই উদাসীনতা ও মূর্খতার মুখোস উন্মোচন করা, যে তাকে ভ্রান্তিতে লিপ্ত করে রেখেছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, এই বিশ্বচরাচরে যা কিছু বিদ্যমান আছে অথবা হচ্ছে, অথবা ভবিষ্যতে হবে, এগুলোকে সৃষ্টি করা, স্থায়ী রাখা এবং মানুষের বিভিন্ন উপকারে নিয়োজিত করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার শক্তি ও রহস্যের লীলা। যদি কারণাদির যবনিকা মাঝখানে না থাকে এবং মানুষ এসব বস্তুর সৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করে তবে সে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এ জগৎকে পরীক্ষাগার করেছেন। তাই এখানে যাকিছু অস্তিত্ব ও বিকাশ লাভ করে সব কারণাদির অন্তরালে বিকাশ লাভ করে।

আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অপার শক্তি ও রহস্যের বলে কারণাদি ও ঘটনাবলীর মধ্যে এমন এক অটুট যোগসূত্র স্থাপন করে রেখেছেন যে, কারণ অস্তিত্ব লাভ করার সাথে সাথে ঘটনা অস্তিত্ব লাভ করে। কারণ ও ঘটনা যেন একটি অপরটির সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। বাহ্যদর্শী মানুষ কারণাদির এই বেড়াজালে আটকে যায় এবং সৃষ্টকর্মকে কারণাদির সাথেই সম্বন্ধযুক্ত মনে করতে থাকে। যবনিকার অন্তরাল থেকে যে আসল শক্তি কারণ ও ঘটনাবলীকে সক্রিয় করে, তার দিকে বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টি যায় না।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে খোদ মানবসৃষ্টির স্বরূপ উদঘাটন করেছেন, এরপর মানবীয় প্রয়োজনাদি সৃষ্টির মুখোস উন্মোচিত করেছেন। মানুষকে সম্বোধন করে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন এবং এসব প্রশ্নের মাধ্যমে সঠিক উত্তরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কেননা, প্রশ্নের মধ্যেই কারণাদির দুর্বলতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রথম আয়াত نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ একটি দাবী এবং পরবর্তী আয়াতগুলো এর স্বপক্ষে প্রমাণ। সর্বপ্রথম স্বয়ং মানবসৃষ্টি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। কারণ, গাফেল মানুষ প্রত্যহ দেখে যে, পুরুষ ও নারীর যৌনমিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হয়। এরপর তা জননীর গর্ভাশয়ে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নয় মাস পর একটি পরিপূর্ণ মানবরূপে ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়। এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কারণে বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টি এতেই নিবদ্ধ থেকে যায় যে, পুরুষও নারীর পারস্পরিক মিলনই মানব সৃষ্টির প্রকৃত কারণ। তাই প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ –অর্থাৎ, হে মানব, একটু ভেবে দেখ, সন্তান জন্মলাভ করার মধ্যে তোমার হাত এতটুকুই তো যে, তুমি এক ফোঁটা বীর্য বিশেষ স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছ। এরপর তোমার জানা আছে কি যে, বীর্যের উপর স্তরে স্তরে কি কি পরিবর্তন আসে? কি কি ভাবে এতে অস্থি ও রক্ত মাংস সৃষ্টি হয়? এই ক্ষুদ্র জগতের অস্তিত্বের মধ্যে খাদ্য আহরণ করার, রক্ত তৈরী করার ও জীবাত্মা সৃষ্টি করার কেমন যন্ত্রপাতি কি কি ভাবে স্থাপন করা হয় এবং শ্রবণ, দর্শন, কথন, আস্বাদন ও অনুধাবন শক্তি নিহিত করা হয়, যার ফলে একটি মানুষের অস্তিত্ব একটি চলমান কারখানাতে পরিণত হয়? পিতাও কোন খবর রাখে না এবং যে জননীর উদরে এসব হচ্ছে, সেও কিছু জানে না। জ্ঞান-বুদ্ধি বলে কোনবস্তু

দুনিয়াতে থেকে থাকলে সে কেন বোঝে না যে, কোন স্রষ্টা ব্যতীত মানুষের অত্যাশ্চর্য ও অভাবনীয় সত্তা আপনা-আপনি তৈরী হয়ে যায়নি। কে সেই স্রষ্টা? পিতা-মাতা তো জানেও না যে, কি তৈরী হল, কিভাবে হল? প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত তারা অনুমানও করতে পারে না যে, গর্ভ, ভ্রূণ ছেলে না মেয়ে? তবে কে সেই শক্তি, যেন উদর, গর্ভাশয় ও ভ্রূণের উপরস্থ ঝিল্লি—এই তিন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এমন সুন্দর-সুশ্রী শ্রবণকারী, দর্শনকারী ও অনুধাবনকারী সত্তা তৈরী করে দিয়েছেন? এরূপ স্থলে যে ব্যক্তি فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ —(সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ্ মহান) বলে উঠে না, সে জ্ঞান-বুদ্ধির শত্রু।

এরপরের আয়াতসমূহে একথাও বলা হয়েছে যে, হে মানব, তোমাদের জন্মগ্রহণ ও বিচরণশীল কর্মঠ মানুষ হয়ে যাওয়ার পরও অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও সকল কাজকারবারে তোমরা আমারই মুখাপেক্ষী। আমি তোমাদের মৃত্যুরও একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি। এই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তোমাদের যে আয়ুষ্কাল রয়েছে, তাতে তোমরা নিজেদেরকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বীরূপে পেয়ে থাকে। এটাও তোমাদের বিভ্রান্তি বৈ নয়। আমি এই মুহূর্তেই তোমাদেরকে নাস্ত-নাবুদ করে তোমাদের, স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করতে সক্ষম। অথবা তোমাদেরকে ধ্বংস না করে অন্যকোন জীবের কিংবা জড় পদার্থের আকারে পরিবর্তিত করে দিতেও সক্ষম। নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের স্থায়িত্বের ব্যাপারে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী নও; বরং তোমাদের স্থায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে এক বিশেষ শক্তি, সামর্থ্য ও জ্ঞান-বুদ্ধির বাহক করেছেন। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে তোমরা অনেক কিছু করতে পার وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ এর সারমর্ম এই যে, কেউ আমার ইচ্ছাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। আমি এই মুহূর্তেও যা চাই, তাই করতে পারি, عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের স্থলে তোমাদেরই মত অন্য কোন জাতি নিয়ে আসতে পারে। وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ এবং তোমাদের এমন আকৃতি করে দিতে পারি, যা তোমরা জান না। অর্থাৎ, মৃত্যুর পর মাটি হয়ে যেতে পার অথবা অন্য কোন জন্তুর আকারেও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পার ; যেমন বিগত উম্মতের মধ্যে আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে বানর ও শূকরে পরিণত হওয়ার আযাব এসে গেছে। তোমাদেরকে প্রস্তর ও জড়পদার্থের আকারেও পরিণত করে দেয়া যেতে পারে।

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ খাদ্য মানুষের জীবন ধারণের প্রধান ভিত্তি। মানব সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব উদঘাটিত করার পর এখন এই খাদ্যে স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা হয়েছে ঃ তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? এই বীজ থেকে অংকুর বের করার ব্যাপারে তোমাদের কাজের কতটুকু দখল আছে? চিন্তা করলে এছাড়া জওয়াব নেই, কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল চালিয়ে, সার দিয়ে মাটি নরম করেছে মাত্র, যাতে দুর্বল অংকুর মাটি ভেদ করে সহজেই গজিয়ে উঠতে পারে। বীজ বপনকারী কৃষকের সমগ্র প্রচেষ্টা এই এক বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ। চারা গজিয়ে উঠার পর সে তার হেফাযতে লেগে যায়। কিন্তু একটি বীজের মধ্য থেকে চারা বের করে আনার সাধ্য তার নেই। সে চারাটি তৈরী করেছে বলে দাবীও করতে পারে না। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সুবিশাল মাটির স্তূপে পতিত বীজের মধ্য থেকে এই সুন্দর ও মহোপকারী বৃক্ষ কে তৈরী করল? জওয়াব এটাই যে, সেই পরম প্রভু অপার শক্তিধর আল্লাহ্ তাআলার অত্যাশ্চর্য কারিগরিই এর প্রস্তুতকারক।

এরপর যে পানির অপর নাম জীবন এবং যে অগ্নি দ্বারা মানুষ রান্না-বান্না করে ও শিল্পকারখানা পরিচালনা করে, সেগুলোর সৃষ্টি সম্পর্কে একই ধরনের প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। উপসংহারে সবগুলোর সার-সংক্ষেপ এরূপ বর্ণিত হয়েছে—

نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ – مقوين শব্দটি اقواء থেকে এবং اقواء শব্দটিকে قواء থেকে লওয়া হয়েছে। এর অর্থ মরু। কাজেই قوى শব্দের অর্থ হবে মরুবাসী। এখানে মুসাফির বোঝানো হয়েছে যে, প্রান্তরে অবস্থান করে খানাপিনার ব্যবস্থাপনায় রত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সৃষ্টি আমার শক্তি-সামর্থ্যের ফসল।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ -এর অবশ্যম্ভাবী ও যুক্তিভিত্তিক পরিণতি এই যে, মানুষ আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তি ও তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করবে। এটাই তাঁর অবদানসমূহের কৃতজ্ঞতা।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তি ও পার্থিব সৃষ্টির মাধ্যমে কেয়ামতে পুনরুজ্জীবনের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে শপথ সহকারে পেশ করা হচ্ছে।

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ – قسم -এর শুরুতে অতিরিক্ত لا পদের ব্যবহার একটি সাধারণ বাকপদ্ধতি। যেমন বলা হয় لا والله মুর্খতাযুগের কসমে لا وابى সুবিদিত। কেউ কেউ বলেন যে, এরূপ স্থলে لا সমোধিত ব্যক্তির ধারণা খণ্ডনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, তোমার ধারণা ঠিক নয় ; বরং এরপর শপথ করে যা বলা হচ্ছে তাই সত্য। مواقع শব্দটি موقع এর বহুবচন। এর অর্থ নক্ষত্রের অস্তাচল অথবা অস্তের সময়। এ আয়াতে নক্ষত্রের অস্ত যাওয়ার সময়ের শপথ করা হয়েছে ; যেমন সূরা নজমেও وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى বলে তাই করা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, অস্ত প্রত্যক্ষ করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, নক্ষত্র চিরন্তন নয় ; বরং আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের মুখাপেক্ষী।

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾
تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿٨١﴾
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾
وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا
تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِن
كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَ
رَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾
فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ
الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ
هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

سُورَةُ الْحَدِيدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

(৭৭) নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, (৭৮) যা আছে এক গোপন কিতাবে, (৭৯) যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না। (৮০) এটা বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৮১) তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে? (৮২) এবং একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে? (৮৩) অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয় (৮৪) এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, (৮৫) তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি ; কিন্তু তোমরা দেখ না। (৮৬) যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, (৮৭) তবে তোমরা এই আত্মাকে ফিরাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৮৮) যদি সে নৈকট্যশীলদের একজন হয় ; (৮৯) তবে তার জন্যে আছে সুখ, উত্তম রিযিক এবং নেয়ামতে ভরা উদ্যান। (৯০) আর যদি সে ডানপার্শ্বস্থদের একজন হয়, (৯১) তবে তাকে বলা হবে ঃ তোমার জন্যে ডানপার্শ্বস্থদের পক্ষ থেকে সালাম। (৯২) আর যদি সে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের একজন হয়, (৯৩) তবে তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা। (৯৪) এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিতে। (৯৫) এটা ধ্রুব সত্য। (৯৬) অতএব, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

সূরা আল-হাদীদ

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ২৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু।

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিধর ; প্রজ্ঞাময়। (২) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (৩) তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ —যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করার উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী আয়াতে শপথ করা হয়েছিল, এখান থেকে তাই বর্ণিত হচ্ছে। এর সারমর্ম এই যে, কোরআন পাক সম্মানিত ও সংরক্ষিত কিতাব এবং মুশরিকদের এই ধারণা মিথ্যা যে, কোরআন কারও রচিত অথবা শয়তানকর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট কালাম। নাউযুবিল্লাহ !

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ —অর্থাৎ, গোপন কিতাব। একথা বলে লওহে-মাহ্ফুয বোঝানো হয়েছে। لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। তফসীরবিদগণ এসব বিষয়ে মতভেদ করেছেন। (এক) ব্যাকরণিক দিক দিয়ে এই বাক্যের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। প্রথম এই যে, এটা কিতাব অর্থাৎ, 'লওহে-মাহ্ফূযের'ই দ্বিতীয় বিশেষণ এবং لَّا يَمَسُّهُ এর সর্বনাম দ্বারা লওহে-মাহ্ফূযই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, গোপন কিতাব অর্থাৎ, লওহে-মাহ্ফূযকে পাক-পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেউ স্পর্শ করতে পারে না। এমতাবস্থায় مطهرون অর্থাৎ, 'পাক-পবিত্র লোকগণ'— এর অর্থ ফেরেশতাগণই হতে পারে, যারা 'লওহে-মাহ্ফূয' পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম। এ ছাড়া مس শব্দটিকে তার আসল অর্থে নেয়া যায় না; বরং مس তথা স্পর্শ করার রূপক অর্থ নিতে হবে, অর্থাৎ লওহে-মাহ্ফূযে লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। কেননা, লওহে-মাহ্ফূযকে হাতে স্পর্শ করা ফেরেশতা প্রমুখ সৃষ্টজীবের কাজ নয়। (কুরতুবী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থ ধরেই তফসীর করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য অর্থ এই যে, এ বাক্যটি إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ বাক্যে অবস্থিত সম্মানিত শব্দটি কোরআনের বিশেষণ। এমতাবস্থায় لَّا يَمَسُّهُ এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হবে। কোরআনের অর্থ হবে সেই কপি যাতে কোরআন লিখিত আছে এবং مس শব্দটি হাতে স্পর্শ করার আসল অর্থে থাকবে। কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদগণ এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন ঃ আমি এই আয়াতের যত তফসীর শুনেছি, তন্মধ্যে এই তফসীরই উত্তম। এর মর্মও তাই, যা সূরা আবাসের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহেরমর্ম— فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ (কুরতুবী রুহুল-মা'আনী)

এর সারমর্ম এই যে, আলোচ্য বাক্যটি كِتَابٍ مَّكْنُونٍ এর বিশেষণ নয়; বরং কোরআনের বিশেষণ।

(দুই) দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, مطهرون অর্থাৎ, 'পাক-পবিত্র' কারা? বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদগণের মতে এখানে ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে, যাঁরা পাপ ও হীন কাজকর্ম থেকে পবিত্র। হযরত আনাস, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই উক্তি করেছেন। (কুরতুবী, ইবনে-কাসীর) ইমাম মালেক (রহঃ) ও এই উক্তিই পছন্দ করেছেন। — (কুরতুবী)।

কিছুসংখ্যক তফসীরবিদ বলেন ঃ কোরআনের অর্থ কোরআনের লিখিত কপি এবং مطهرون এর অর্থ এমন লোক, যারা 'হদসে-আসগর' ও 'হদসে-আকবর' থেকে পবিত্র। বে-ওযু অবস্থাকে 'হদসে-আসগর' বলা হয়। ওযু করলে এই অবস্থা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বীর্যস্খলনের

পরবর্তী অবস্থা এবং হায়েয ও নেফাসের অবস্থাকে 'হদসে-আকবর' বলা হয়। এই হদস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্যে গোসল করা জরুরী। এই তফসীর হযরত আতা, তাউস, সালেম ও বাকের (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে।—(রুহুল-মা'আনী)।

এমতাবস্থায় لَا يَمَسُّهُ এই সংবাদসূচক বাক্যটির অর্থ হবে নিষেধসূচক। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পবিত্রতা ব্যতীত কোরআনের কপি স্পর্শ করা জায়েয নয়। পবিত্রতার অর্থ হবে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হওয়া, বেওযু না হওয়া এবং বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থা না হওয়া। কুরতুবী এই তফসীরকেই অধিক স্পষ্ট বলেছেন এবং তফসীরে-মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি ভগ্নি ফাতেমাকে কোরআন পাঠরতা অবস্থায় পেয়ে কোরআনের পাতা দেখতে চান। ভগ্নি আলোচ্য আয়াত পাঠ করে কোরআনের পাতা তাঁর হাতে দিতে অস্বীকার করেন। অগত্যা তিনি গোসল করতঃ পাতাগুলো হাতে নিয়ে পাঠ করেন। এই ঘটনা থেকেও শেষোক্ত তফসীরের অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। যেসব হাদীসে অপবিত্র অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোকেও কেউ কেউ এই তফসীরের সমর্থনে পেশ করেছেন।

যেহেতু এই প্রশ্নে হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী মতভেদ করেছেন ; তাই অনেক তফসীরবিদ অপবিত্র অবস্থায় কোরআন পাক স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞা সপ্রমাণ করার জন্যে এই আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন না। তাঁরা এর প্রমাণ হিসেবে কয়েকটি হাদীস পেশ করেন মাত্র। হাদীসগুলো এই ঃ

হযরত আমর ইবনে হযমের নামে লিখিত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর একখানি পত্র ইমাম মালেক (রহঃ) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে একটি বাক্য এরূপও আছে لا يمس القران الا طاهر অর্থাৎ, অপবিত্র ব্যক্তি যেন কোরআনকে স্পর্শ না করে।—(ইবনে-কাসীর)

রুহুল-মা'আনীতে এই রেওয়ায়েত মুসনাদে আবদুর রাযযাক, ইবনে আবী দাউদ ও ইবনুল মুনযির থেকেও বর্ণিত আছে। তিবরানী ও ইবনে-মরদুওয়াইহি বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ لا يمس القران الا طاهر —(রুহুল-মা'আনী)

মাসআলা ঃ উল্লেখিত রেওয়ায়েতসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ উম্মত এবং ইমাম চতুষ্টয় এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাক স্পর্শ করার জন্যে পবিত্রতা শর্ত। এর খেলাফ করা গোনাহ্। পূর্ববর্ণিত সকল পবিত্রতাই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আলী, ইবনে মসউদ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, সায়ীদ ইবনে যায়দ, আতা, যুহরী, নাখয়ী, হাকাম, হাম্মাদ, ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আবু হানীফা প্রমুখ সবাই এই ব্যাপারে একমত। উপরে যে মতভেদ বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল মাসআলার দলীলে, আসল মাসআলায় নয়। কেউ কেউ কোরআনের আয়াত এবং উল্লেখিত হাদীসের সমষ্টি দ্বারা এই মাসআলাটি সপ্রমাণ করেছেন এবং কেউ কেউ শুধু হাদীসকেই দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। সাহাবীদের মতভেদের কারণে তাঁরা আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করা থেকে বিরত রয়েছেন।

মাসআলা ঃ কোরআন পাকের যে গিলাফ মলাটের সাথে সেলাই করা, তাও ওযু ব্যতীত স্পর্শ করা সর্বসম্মতভাবে না-জায়েয। তবে আলাদা কাপড়ের গিলাফে কোরআন পাক বন্ধ থাকলে ওযু ব্যতীত তাতে হাত লাগানো ইমাম আবু 'হানীফার মতে জায়েয। ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (রহঃ)-এর মতে তাও না-জায়েয।—(মাযহারী)

মাসআলা ঃ বে-ওযু অবস্থায় পরিধেয় কাপড়ের আস্তিন অথবা আঁচল দ্বারা কোরআন পাক স্পর্শ করাও জায়েয নয়, রুমাল দ্বারা স্পর্শ করা যায়।

মাসআলা ঃ আলেমগণ বলেন ঃ এই আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থায় এবং হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় কোরআন পাক তেলাওয়াত করাও জায়েয নয়। গোসল করার পর জায়েয হবে। কারণ, কপিতে লিখিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব হলে মুখে উচ্চারিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আরও বেশী ওয়াজিব হওয়া দরকার। কাজেই বে-ওযু অবস্থায়ও তেলাওয়াত নাজায়েয হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে-আব্বাসের হাদীস এবং মুসনাদে আহ্‌মদে বর্ণিত হযরত আলীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বে-ওযু অবস্থায় তেলাওয়াত করেছেন। এ কারণে ফেকাহ্‌বিদগণ এর অনুমতি দিয়েছেন।—(মাযহারী)

أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ – مدهنون শব্দটি ادهان থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ তেল মালিশ করা। তেল মালিশ করলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নরম ও শিথিল হয়। তাই এই শব্দটি অবৈধ ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করা ও কপটতা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এই শব্দটি কোরআনী আয়াতের ব্যাপারে কপটতা ও মিথ্যারোপ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি দ্বারা ও পরে নক্ষত্ররাজির কসম করে দু'টি বিষয় সপ্রমাণ করা হয়েছে। (এক) কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম। এতে কোন শয়তান বা জিনের প্রভাব থাকতে পারে না। এর বিষয়বস্তু সত্য। (দুই) কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে আল্লাহ্‌র সামনে নীত হবে। পরিশেষে এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের অস্বীকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

কেয়ামত ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকৃতি কাফেরদের পক্ষ থেকে যেন এ বিষয়ের দাবী যে, তাদের প্রাণ ও আত্মা তাদেরই করায়ত্ত। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্যে আলোচ্য আয়াতসমূহে একজন মরনোম্মুখ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, যখন তার আত্মা কণ্ঠাগত হয় আর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অসহায়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তারা কামনা করে যে, তার আত্মা বের না হোক, তখন আমি জ্ঞান ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি। নিকটে থাকার অর্থ এই যে, তার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ও সক্ষম থাকি। কিন্তু তোমরা আমার নৈকট্য ও মরনোম্মুখ ব্যক্তি যে আমার করায়ত্ত এ বিষয়টি চর্মচক্ষে দেখ না। সারকথা এই যে, তোমরা সবাই মিলে তার জীবন ও আত্মার হেফাযত করতে চাও, কিন্তু তোমাদের সাধ্যে কুলায় না। তার আত্মার নির্গমন কেউ রোধ করতে পারে

না। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে বলা হয়েছে ঃ যদি তোমরা মনে কর যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জীবিত করা যাবে না এবং তোমরা এমন শক্তিশালী ও বীরপুরুষ যে আল্লাহ্‌র নাগালের বাইরে চলে গেছ, তবে এখানেই স্বীয় শক্তিমত্তা ও বীরত্ব পরীক্ষা করে দেখ এবং এই মরনোন্মুখ ব্যক্তির আত্মার নির্গমন রোধ কর কিংবা নির্গমনের পর তাকে পুনরায় দেহে ফিরিয়ে আন। তোমরা যখন এতটুকুও করতে পার না, তখন নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র নাগালের বাইরে মনে করা এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার করা কতটুকু নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক!

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ –পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হয় কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে এবং হিসাবের পর প্রতিদান ও শাস্তি সুনিশ্চিত। সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, প্রতিদান ও শাস্তির পর সবাই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেকের প্রতিদান আলাদা আলাদা হবে। আলোচ্য আয়াতে তাই আবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর এই ব্যক্তি নৈকট্যশীলদের একজন হলে সুখই সুখ এবং আরামই আরাম ভোগ করবে। আর যদি 'আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা সাধারণ মুমিনদের একজন হয়, তবে সেও জান্নাতের অবদান লাভ করবে। পক্ষান্তরে যদি আসহাবে শিমাল' তথা কাফের ও মুশরিকদের একজন হয়, তবে জাহান্নামের অগ্নি ও উত্তপ্ত পানি দ্বারা তাকে আপ্যায়ন করা হবে। পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ — অর্থাৎ উল্লেখিত প্রতিদান ও শাস্তি ধ্রুব সত্য। এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ সূরার উপসংহারে রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। এতে নামাযের ভিতরে ও বাইরের সব তসবীহ্ দাখিল রয়েছে। খোদ নামাযকেও মাঝে মাঝে তসবীহ্ বলে ব্যক্ত করা হয়। এমতাবস্থায় এটা নামাযের প্রতি গুরুত্বদানেরও আদেশ হয়ে যাবে।

সূরা আল-হাদীদ

সূরা হাদীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ যে পাঁচটি সূরার শুরুতে سَبَّحَ অথবা يُسَبِّحُ আছে, সেগুলোকে হাদীসে مسبحات তথা তসবীহ্‌যুক্ত সূরা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সূরা হাদীদ তন্মধ্যে প্রথম। দ্বিতীয় হাশর, তৃতীয় ছফ, চতুর্থ জুমুআ এবং পঞ্চম তাগাবুন। আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর রেওয়ায়েতে হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এসব সূরা পাঠ করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে, এসব সূরায় একটি আয়াত এমন আছে, যা হাজার আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবনে-কাসীর বলেন ঃ সেই শ্রেষ্ঠ আয়াতটি হচ্ছে সূরা হাদীদের এই আয়াত ঃ

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

এই পাঁচটি সূরার মধ্য থেকে তিনটিতে অর্থাৎ, হাদীদ, হাশর ও ছফে سَبَّحَ অতীত পদবাচ্য সহকারে এবং জুমুআ ও তাগাবুনে يُسَبِّحُ ভবিষ্যত পদবাচ্য সহকারে বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলার তসবীহ্ ও যিকর অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সর্বকালেই অব্যাহত থাকা বিধেয়।—(মাযহারী)

শয়তানী কুমন্ত্রণার প্রতিকার ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কোন সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ্ তাআলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানী কুমন্ত্রণা দেখা দিলে هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ আয়াতখানি আস্তে পাঠ করে নাও। —(ইবনে-কাসীর)

এই আয়াতের তফসীর এবং আউয়াল, আখের, যাহের ও বাতেনের অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দশটিরও অধিক উক্তি বর্ণিত আছে। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই — সবগুলোরই অবকাশ আছে। আউয়াল শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট ; অর্থাৎ, অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্টজগতের অগ্রে ও আদি। কারণ, তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁরই সৃজিত। তাই তিনি সবার আদি। কারও কারও মতে আখেরের অর্থ এই যে, সবকিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। যেমন, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ আয়াতে এর পরিষ্কার উল্লেখ আছে। বিলীনতা দুই প্রকার। (এক) যা কার্যতঃ বিলীন হয়ে যায় ; যেমন, কেয়ামতের দিন সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে। (দুই) যা কার্যতঃ বিলীন হয় না, কিন্তু সত্তাগতভাবে বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত নয়। এরূপ বস্তুকে বিদ্যমান অবস্থায়ও ধ্বংসশীল বলা যায়। এর উদাহরণ জান্নাত ও দোযখ এবং এগুলোতে প্রবেশকারী ভাল-মন্দ মানুষ। তাদের অস্তিত্ব বিলীন হবে না; কিন্তু বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্তও হবে না। একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তাই এমন যে, পূর্বেও বিলীন ছিল না এবং ভবিষতেও কখনও বিলীন হবে না। তাই তিনি সবার অন্ত।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার মারেফত সবার শেষে হয়। এই দিক দিয়ে তিনি আখের তথা অন্ত। মানুষ জ্ঞান ও মারেফতে ক্রমোন্নতি লাভ করতে থাকে। কিন্তু মানুষের অর্জিত এসব স্তর আল্লাহ্‌র পথের বিভিন্ন মনযিল বৈ নয়। এর চূড়ান্ত ও শেষ সীমা হচ্ছে আল্লাহ্‌র মারেফত।—(রুহুল-মা'আনী)

'যাহের' বলে সেই সত্তা বোঝানো হয়েছে, যেসব বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক প্রকাশমান। প্রকাশমান হওয়া অস্তিত্বের একটি শাখা। অতএব, আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব যখন সবার উপরে ও অগ্রে, তখন তাঁর আত্মপ্রকাশও সবার উপরে হবে। জগতে তাঁর চাইতে অধিক কোন বস্তু প্রকাশমান নয়। তাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তিসামর্থ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন বিশ্বের প্রতিটি কণায় কণায় দেদীপ্যমান।

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ ﴿٥﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾ آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا
جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ
لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾
هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٩﴾ وَ
مَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ
أُولٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا
وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَىٰ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

(৪) তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (৫) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (৬) তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাত্রিতে। তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত। (৭) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার। (৮) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছ না, অথচ রসূল তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত দিচ্ছেন? আল্লাহ্ তো পূর্বেই তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছেন—যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৯) তিনিই তাঁর দাসের প্রতি প্রকাশ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন, যাতে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনয়ন করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (১০) তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহ্ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন। এই 'সঙ্গের' স্বরূপ ও প্রকৃত অবস্থা মানুষের জ্ঞানসীমার অতীত। কিন্তু এর অস্তিত্ব সুনিশ্চিত। এটা না হলে মানুষের টিকে থাকা এবং তার দ্বারা কোন কাজ হওয়া সম্ভবপর নয়। আল্লাহ্র ইচ্ছা ও শক্তি বলেই সবকিছু হয়। তিনি সর্বাবস্থায় ও সর্বত্র মানুষের সঙ্গে আছেন।

وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ — এর অর্থ আদিকালীন অঙ্গীকারও হতে পারে, যখন আল্লাহ্ তাআলা মখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই ভবিষ্যতে আগমনকারী সব আত্মাকে একত্রিত করে তাদের কাছ থেকে তিনিই যে তাদের একমাত্র পালনকর্তা একথার স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কোরআন পাকে أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ বলে এই অঙ্গীকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই অঙ্গীকারও হতে পারে, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও তাঁদের উম্মতের কাছ থেকে শেষ নবী (সাঃ)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁকে সাহায্য করা সম্পর্কে নিয়েছিলেন।

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ — অর্থাৎ, যদি তোমরা মুমিন হও। এখানে প্রশ্ন হয় যে, একথাটি সেই কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, যাদেরকে মুমিন না হওয়ার কারণে ইতিপূর্বে وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ বলে সতর্ক করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে 'তোমরা যদি মুমিন হও' বলা কিরূপে সঙ্গত হতে পারে?

জওয়াব এই যে, কাফের ও মুশরিকরাও আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের দাবী করত। প্রতিমাদের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ছিল এইযে, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفَىٰ –অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের দাবী যদি সত্য হয়, তবে তার বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য পথ অবলম্বন কর। এটা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে রসূলের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে হতে পারে।

وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ - مِيرَاثُ অভিধানে উত্তরাধিকার–সূত্রে প্রাপ্তমালিকানাকে বলা হয়ে থাকে। এই মালিকানা বাধ্যতামূলক—মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ ব্যক্তি আপনা–আপনি মালিক হয়ে যায়। এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপর আল্লাহ্ তাআলার সার্বভৌম মালিকানাকে مِيرَاثُ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার রহস্য এই যে, তোমরা ইচ্ছা কর বা না কর, তোমরা আজ যে যে জিনিসের মালিক বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশেষে আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ মালিকানায় চলে যাবে। সবকিছুর প্রকৃত মালিক পূর্বেও আল্লাহ্ তা'আলাই ছিলেন, কিন্তু তিনি কৃপাবশতঃ কিছু বস্তুর মালিকানা তোমাদের নামে করে দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের সেই বাহ্যিক মালিকানাও অবশিষ্ট থাকবে না। সর্বতোভাবে আল্লাহ্রই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাই এই মুহূর্তে যখন বাহ্যিক মালিকানা তোমাদের হাতে আছে, তখন এ থেকে আল্লাহ্র নামে যা ব্যয় করবে, তা পরকালে পেয়ে যাবে। এভাবে যেন আল্লাহ্র পথে ব্যয়কৃত বস্তুর মালিকানা তোমাদের জন্যে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একদিন

আমরা একটি ছাগল যবাই করে তার অধিকাংশ গোশত বন্টন করে দিলাম, শুধু একটি হাত নিজেদের জন্যে রাখলাম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বন্টনের পর এই ছাগলের গোশত কতটুকু রয়ে গেছে? আমি আরয করলাম ঃ শুধু একটি হাত রয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ গোটা ছাগলই রয়ে গেছে। তোমার ধারণা অনুযায়ী কেবল হাতই রয়ে যায়নি। কেননা, গোটা ছাগলই আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় হয়েছে। এটা আল্লাহ্‌র কাছে তোমার জন্যে থেকে যাবে। যে হাতটি নিজের খাওয়ার জন্যে রেখেছ, পরকালে এর কোন প্রতিদান পাবে না। কেননা, এটা এখানেই বিলীন হয়ে যাবে।—(মাযহারী)

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার প্রতি জোর দেয়ার পর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র পথে যা কিছু যে কোন সময় ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যাবে ; কিন্তু ঈমান, আন্তরিকতা ও অগ্রগামিতার পার্থক্যবশতঃ সওয়াবেও পার্থক্য হবে। বলা হয়েছে ঃ لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ –অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্‌র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (এক) যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছে।

(দুই) যারা মক্কাবিজয়ের পর মুমিন হয়ে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছ। এই দুই শ্রেণীর লোক আল্লাহ্‌র কাছে সমান নয়; বরং মর্যাদায় একশ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে শ্রেষ্ঠ। মক্কাবিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, জেহাদকারী ও ব্যয়কারীর মর্যাদা অপর শ্রেণী অপেক্ষা বেশী।

মক্কা বিজয়কে সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদাভেদের মাপকাঠি করার রহস্যঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা সাহাবায়ে-কেরামকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। (এক) যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়ে ইসলামী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং (দুই) যারা মক্কাবিজয়ের পর একাজে শরীক হয়েছেন। আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রথমোক্ত সাহাবীগণের মর্যাদা আল্লাহ্ তাআলার কাছে শেষোক্ত সাহাবীগণের তুলনায় বেশী।

সকল সাহাবীর জন্যে মাগফেরাত ও রহমতের সুসংবাদ এবং অবিশিষ্ট উম্মত থেকে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদার পারস্পরিক তারতম্য উল্লেখ করে শেষে বলা হয়েছে ঃ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى — অর্থাৎ, পারস্পরিক তারতম্য সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা কল্যাণ অর্থাৎ, জান্নাত ও মাগফেরাতের ওয়াদা সবার জন্যেই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে-কেরামের সেই শ্রেণীদ্বয়ের জন্যে, যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে-কেরামের প্রায় সমগ্র দলই শামিল আছে। কেননা, তাঁদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি খুবই দুর্লভ, যিনি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র পথে কিছুই ব্যয় করেননি এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় অংশগ্রহণ করেননি। তাই মাগফেরাত ও রহমতের এই কোরআনী ঘোষণা প্রত্যেক সাহাবীকে শামিল করেছে।

সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদা কোরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায় ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা নয় ঃ সারকথা এই যে, সাহাবায়ে-কেরাম সাধারণ উম্মতের ন্যায় নন। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও উম্মতের মাঝখানে আল্লাহ্‌র তৈরী সেতু। তাঁদের মাধ্যম ব্যতীত উম্মতের কাছে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষা পৌঁছার কোন পথ নেই। তাই ইসলামে তাঁদের বিশেষ একটি মর্যাদা রয়েছে। তাঁদের এই মর্যাদা ইতিহাস গ্রন্থের সত্যমিথ্যা বর্ণনা দ্বারা নয় ; বরং কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়।

তাঁদের দ্বারা কোন পদস্খলন বা ভ্রান্তিমূলক কোন কিছু হয়ে থাকলে তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইজতিহাদী ভুল। যে কারণে সেগুলোকে গোনাহের মধ্যে গণ্য করা যায় না। বরং সহীহ্ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তদ্দ্বারা তাঁরা একটি সওয়াব পাওয়ার অধিকারী। যদি বাস্তবে কোন গোনাহ্ হয়েই যায়, তবে প্রথমতঃ তা তাঁদের সারা জীবনের সৎকর্ম এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও ইসলামের সাহায্য ও সেবার মোকাবেলায় শূন্যের কোঠায় থাকে। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ছিলেন অসাধারণ খোদাভীরু। সামান্য গোনাহের কারণেও তাঁদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে তওবা করতেন এবং নিজের উপর গোনাহের শাস্তি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হতেন। কেউ নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন এবং তওবা কবুল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তদবস্থায়ই দণ্ডায়মান থাকতেন। এছাড়া তাঁদের প্রত্যেকের পুণ্য এত অধিক ছিল যে, সেগুলো দ্বারা গোনাহের কাফ্ফরা হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের মাগফেরাতের ব্যাপক ঘোষণা আলোচ্য আয়াতে এবং অন্য আয়াতেও করে দিয়েছেন। শুধু মাগফেরাতই নয় ; رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ বলে তাঁর সন্তুষ্টিরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাঁদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে কাউকে মন্দ বলা অথবা দোষারোপ করা নিশ্চিতরূপে হারাম, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী অভিশপ্ত হওয়ার কারণ এবং নিজের ঈমানকে বিপন্ন করার শামিল।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ وَلَهُ
أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُورُهُمْ
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ
الْمُنٰفِقُونَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ
نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ
بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾
يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ
تَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتّٰى جَاءَ أَمْرُ اللّٰهِ وَ
غَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوٰىكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلٰىكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾
أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ
مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ
عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فٰسِقُونَ ﴿١٦﴾ اِعْلَمُوا أَنَّ
اللّٰهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

(১১) কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ধার দিবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার। (১২) যেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে, তাদের সম্মুখ ভাগে ও ডানপার্শ্বে তাদের জ্যোতি ছুটোছুটি করবে। বলা হবে ঃ আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ জান্নাতের, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য। (১৩) যেদিন কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারীরা মুমিনদেরকে বলবে ঃ তোমরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর, আমরাও কিছু আলো নিব তোমাদের জ্যোতি থেকে। বলা হবে ঃ তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও আলোর খোঁজ কর। অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব। (১৪) তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবে ঃ আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে ঃ হাঁ কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে আল্লাহ্‌র আদেশ পৌঁছেছে। এই সবই তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে। (১৫) অতএব, আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং কাফেরদের কাছ থেকেও নয়। তোমাদের সবার আবাসস্থল জাহান্নাম। সেটাই তোমাদের সঙ্গী। কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল। (১৬) যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (১৭) তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ই ভূ-ভাগকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। আমি পরিষ্কারভাবে তোমাদের জন্যে আয়াতগুলো ব্যক্ত করেছি, যাতে তোমরা বোঝ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

অর্থাৎ, সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের অগ্রে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে।

'সেদিন' বলে কেয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। নূর দেয়ার ব্যাপারটি পুলসিরাতে চলার কিছু পূর্বে ঘটবে। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে। হাদীসটি কিছু দীর্ঘ। এতে আছে যে, আবু উমামা (রাঃ) একদিন দামেশ্‌কে এক জানাযায় শরীক হন। জানাযা শেষে উপস্থিত লোকদেরকে মৃত্যু ও পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে তিনি মৃত্যু, কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিম্নে তাঁর কয়েকটি বাক্যের অনুবাদ দেয়া হল ঃ

অতঃপর তোমরা কবর থেকে হাশরের ময়দানে স্থানান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মনযিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মনযিলে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে কিছু মুখমণ্ডলকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেয়া হবে এবং কিছু মুখমণ্ডলকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করে দেয়া হবে। অপর এক মনযিলে সমবেত সব মুমিন ও কাফেরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বণ্টন করা হবে। প্রত্যেক মুমিনকে নূর দেয়া হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মুমিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেয়া হবে। ফলে কারও নূর পর্বতসম, কারও খর্জুর বৃক্ষসম এবং কারও মানবদেহসম হবে। সর্বাপেক্ষা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে, যার কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নূর থাকবে; তাও আবার কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে। —(ইবনে-কাসীর)

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

—অর্থাৎ, মুমিনদের জন্যে কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র যিকর এবং যে সত্য নাযিল করা হয়েছে তৎপ্রতি নম্র ও বিগলিত হবে?

خشوع قلب — এর অর্থ অন্তর নরম হওয়া, উপদেশ কবুল করা ও আনুগত্য করা। —(ইবনে-কাসীর) কোরআনের প্রতি অন্তর বিগলিত হওয়ার অর্থ এর বিধান তথা আদেশ ও নিষেধ পুরোপুরি পালনকরার জন্যে প্রস্তুত হওয়া এবং এ ব্যাপারে কোন অলসতা বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দেয়া।—(রুহুল-মা'আনী)

এটা মুমিনদের জন্যে হুশিয়ারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তাআলা কোন কোন মুমিনদের অন্তরে আমলের প্রতি অলসতা ও অনাসক্তি আঁচ করে এই আয়াত নাযিল করেন। (ইবনে-কাসীর) ইমাম আ'মাশ বলেন ঃ মদীনায় পৌঁছার পর কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হওয়ায় কোন কোন সাহাবীর কর্মোদ্দীপনায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। —(রুহুল-মা'আনী)।

হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) উপরোক্ত রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে, এই হুশিয়ারী সংকেত কোরআন অবতরণ শুরু হওয়ার তের বছর পরে নাযিল হয়। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মসউদ

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ
لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ اعْلَمُوا أَنَّمَا
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ
فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝
سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ
الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ
ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا
آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

(১৮) নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহ্‌কে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। (১৯) আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে সিদ্দীক ও শহীদ বলে বিবেচিত। তাদের জন্যে রয়েছে পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কাফের ও আমার নিদর্শন অস্বীকারকারী তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। (২০) তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়। (২১) তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদের জন্যে। এটা আল্লাহ্‌র কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আল্লাহ্ মহান কৃপার অধিকারী। (২২) পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না ; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। (২৩) এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে উল্লসিত না হও। আল্লাহ্ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না, (২৪) যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

(রাঃ) বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে হুশিয়ার করা হয়।

মোটকথা, এই হুশিয়ারীর সারমর্ম হচ্ছে মুসলমানদেরকে পুরোপুরি নম্রতা ও সৎ কর্মের জন্যে তৎপর থাকার শিক্ষা দেয়া এবং একথা ব্যক্ত যে, আন্তরিক নম্রতাই সৎকর্মের ভিত্তি।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষের অন্তর থেকে সর্বপ্রথম নম্রতা উঠিয়ে নেয়া হবে। —(ইবনে-কাসীর)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রত্যেক মুমিনই কি সিদ্দীক ও শহীদ? وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায়। এই আয়াতের ভিত্তিতে হযরত কাতাদাহ্ ও আমর ইবনে মায়মুন (রাঃ) বলেন, যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই সিদ্দিক ও শহীদ।

হযরত বারা ইবনে আযেবের বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ مؤمنوا امتى شهداء অর্থাৎ আমার উম্মতের সব মুমিন শহীদ। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। —(ইবনে-জরীর)

একদিন হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) কাছে কিছুসংখ্যক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন ঃ كلكم صديق وشهيد অর্থাৎ, আপনারা প্রত্যেকেই সিদ্দীক ও শহীদ। সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন ঃ আবু হুরায়রা, আপনি এ কি বলছেন? তিনি জওয়াবে বললেনঃ আমার কথা বিশ্বাস না করলে কোরআনের এই আয়াত পাঠ করুন

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ

কিন্তু কোরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মুমিন সিদ্দীক ও শহীদ নয় ; বরং মুমিনদের একটি উচ্চ শ্রেণীকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা হয়। আয়াতটি এই ঃ

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

এই আয়াতে পয়গম্বরগণের সাথে মুমিনদের তিনটি শ্রেণী বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে যথা, সিদ্দীক, শহীদ ও ছালেহ্। বাহ্যতঃ এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। নতুবা ভিন্ন ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন ঃ সিদ্দীক ও শহীদ প্রকৃতপক্ষে মুমিনদের বিশেষ উচ্চশ্রেণীর লোকগণকে বলা হয়, যারা মহান গুণগরিমার অধিকারী। তবে আলোচ্য আয়াতে সব মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মুমিনকেও কোন না কোন দিক দিয়ে সিদ্দীক ও শহীদ বলে গণ্য এবং তাঁদের কাতারভুক্ত মনে করা হবে।

রুহুল-মা'আনীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে কামেল ও এবাদতকারী মুমিন অর্থ নেওয়া সঙ্গত। নতুবা যেসব মুমিন অসাবধান ও খেয়ালখুশীতে মগ্ন তাদেরকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায় না। এক হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ؛ اللعانون لايكونون شهداء অর্থাৎ, যারা মানুষের প্রতি অভিসম্পাত করে তারা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) একবার উপস্থিত জনতাকে বললেন ঃ

তোমাদের কি হল যে, তোমরা কাউকে অপরের ইয্যতের উপর হামলা করতে দেখেও তাকে বাধা দাও না এবং একে খারাপ মনে কর না? জনতা আরয করল ঃ আমরা কিছু বললে সে আমাদের ইযযতের উপরও হামলা চালাবে এই ভয়ে আমরা কিছু বলি না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ যারা এমন শিথিল, তারা সেই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যারা কেয়ামতের দিন পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উম্মতদের মোকাবেলায় সাক্ষ্য দিবে। —(রুহুল-মা'আনী)

তফসীরে-মাযহারীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে যারা ঈমানদার হয়েছে এবং তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছে, তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। আয়াতে هُمُ الصِّدِّيقُونَ বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, একমাত্র সাহাবায়ে-কেরামই সিদ্দীক, অন্য কোন মুমিন নয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) বলেন ঃ সাহাবায়ে-কেরাম সকলেই পয়গম্বরসুলভ গুণগরিমার বাহক ছিলেন। যে ব্যক্তি একবার মুমিন অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেখেছে, সেই পয়গম্বরসুলভ গুণগরিমায় আপ্লুত হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পরকালীন চিরস্থায়ী অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। মানুষের পরকালের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং আযাবে ধৃত হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সুখ ও তাতে নিমগ্ন হয়ে পরকাল থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া। তাই আলোচ্য আয়তসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়।

পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এই ঃ প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজ-সজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ।

لَعِبٌ শব্দের অর্থ এমন খেলা, যাতে মোটেই উপকার লক্ষ্য থাকে না ; যেমন কচি শিশুদের অঙ্গ চালনা। لَهْوٌ এমন খেলাধুলা, যার আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন ও সময়ক্ষেপণ হলেও প্রসঙ্গক্রমে ব্যায়াম অথবা অন্য কোন উপকারও অর্জিত হয়ে যায়। যেমন—বড় বালকদের ফুটবল, লক্ষ্যভেদ অর্জন ইত্যাদি খেলা। হাদীসে লক্ষ্যভেদ অর্জন ও সাঁতার অনুশীলনকে উত্তম খেলা বলা হয়েছে। অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজন বিদিত। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ لَعِبٌ এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর لَهْوٌ শুরু হয়। এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপৃত হয় এবং শেষ বয়সে সমসাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

উল্লেখিত ধারাবাহিকতার প্রতিটি স্তরেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং একেই সর্বোত্তম জ্ঞান করে। কিন্তু যখন এক স্তর ডিঙিয়ে অন্য স্তরে গমন করে, তখন বিগত স্তরের দুর্বলতা ও অসারতা তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। বালক-বালিকারা খেলা-ধুলাকে জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ ও সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ধন মনে করে। কেউ কেউ তাদের খেলার সামগ্রী ছিনিয়ে নিলে তারা এত ব্যথা পায়, যেমন বয়স্কদের ধন-সম্পদ, বাড়ীঘর ছিনিয়ে নিলে তারা ব্যথা পায়। কিন্তু এই স্তর অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলে পর তারা বুঝতে পারে যে, যেসব বস্তুকে তারা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, সেগুলো ছিল অসার ও অর্থহীন বস্তু। যৌবনে সাজ-সজ্জা ও পারস্পরিক অহমিকাই থাকে জীবনের লক্ষ্য। বার্ধক্যে ধনে ও জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কিন্তু যৌবনে যেমন শৈশবের কার্যকলাপ অসার মনে হয়েছিল, বার্ধক্যে পৌঁছেও তেমনি যৌবনের কার্যকলাপ অনর্থক মনে হতে থাকে। বার্ধক্য হচ্ছে জীবনের সর্বশেষ মনযিল। এ মনযিলে ধন ও জনের প্রাচুর্য এবং জাঁক-জমক ও পদের জন্যে গর্ব জীবনের মহান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কোরআন পাক বলে যে, এই অবস্থাও সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। এর পরবর্তী দুটি স্তর বরযখ ও কেয়ামতের চিন্তা কর। এগুলোই আসল। অতঃপর কোরআন পাক বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে ঃ

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا

غَيْث শব্দের অর্থ বৃষ্টি। كفار শব্দটি মুমিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টি দ্বারা ফসল ও নানা রকম উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোন কোন তফসীরবিদ كفار শব্দটিকে প্রচলিত অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফেররা আনন্দিত হয়। এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবুজ, শ্যামল ফসল দেখে কাফেররাই কেবল আনন্দিত হয় না, মুসলমানরাও হয়। জওয়াব এই যে, মুমিনের আনন্দ ও কাফেরের আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। মুমিন আনন্দিত হলে তার চিন্তাধারা আল্লাহ্ তাআলার দিকে থাকে। সে বিশ্বাস করে যে, এই সুন্দর ফসল আল্লাহ্র কুদরত ও রহমতের ফল। সে একেই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে না। তার আনন্দের সাথে পরকালের চিন্তাও সদাসর্বদা বিদ্যমান থাকে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধনরত্ন পেয়েও মুমিন কাফেরের ন্যায় আনন্দিত ও মত্ত হয় না। তাই আয়াতে 'কাফের আনন্দিত হয়' বলা হয়েছে।

এরপর এই দৃষ্টান্তের সারসংক্ষেপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সবুজ শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ করে কাফেররা খুবই আনন্দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা শুষ্ক হতে থাকে। প্রথমে পীতবর্ণ হয়, এরপরে সম্পূর্ণ খড়-কুটায় পরিণত হয়। মানুষও তেমনি প্রথমে তরুতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরূপই কাটে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য—পরকালের চিন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে পরকালের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ অর্থাৎ, পরকালে মানুষ এ দু'টি অবস্থার মধ্যে যে-কোন একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফেরদের অবস্থা অর্থাৎ, তাদের জন্যে কঠোর আযাব রয়েছে। অপরটি মুমিনদের অবস্থা ; অর্থাৎ, তাদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে।

এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ — অর্থাৎ, এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে

যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার সম্পদ-প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমুহূর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর পরকালের আযাব ও সওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এরূপ হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে পরকালের চিন্তা বেশী করবে। পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

—অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর প্রস্থের সমান।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার এক অর্থ এই যে, জীবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্যের কোন ভরসা নেই ; অতএব, সৎকাজে শৈথিল্য ও টালবাহানা করো না। এরূপ করলে কোন রোগ অথবা ওযর তোমার সৎকাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে কিংবা তোমার মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে। অতএব এর সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি সৎকাজের পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে জান্নাতে পৌঁছতে পার।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সৎকাজে অপরের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর উপদেশাবলীতে বলেন ঃ তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম গমণকারী এবং সর্বশেষ নির্গমনকারী হও। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বলেন ঃ জেহাদে সর্বপ্রথম কাতারে থাকার জন্যে অগ্রসর হও। হযরত আনাস বলেন ঃ জামাতের নামাযের প্রথম তকবীরে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কর। —(রুহুল-মা'আনী)

জান্নাতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সূরা আল-এমরানে এই বিষয়বস্তুর আয়াতে سموات বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি একত্রিত করলে জান্নাতের প্রস্থ হবে। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বেশী হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের বিস্তৃতি সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতে বেশী عرض শব্দটি কোন সময় কেবল বিস্তৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় অবস্থাতেই জান্নাতের বিশাল বিস্তৃতিই বোঝা যায়।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ পূর্বের আয়াতে জান্নাত ও তার নেয়ামতসমূহের দিকে অগ্রণী হওয়ার আদেশ ছিল। এতে কেউ ধারণা করতে পারত যে, জান্নাত ও তার অক্ষয় নেয়ামতরাজি মানুষের কর্মের ফল এবং মানুষের কর্মই এর জন্যে যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেছেন যে, তোমাদের ক্রিয়াকর্ম জান্নাত লাভের পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয় যে, ক্রিয়াকর্মের ফলেই জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব নেয়ামত লাভ করেছে, তার সারাজীবনের সৎকর্ম এগুলোর বিনিময়ও হতে পারে না, জান্নাতের অক্ষয় নেয়ামতরাজির মূল্য তো হওয়া দূরের কথা। অতএব আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপার বদৌলতেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম ও বোখারী বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেন ঃ আপনিও কি তদ্রূপ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমিও আমার আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করতে পারি না— আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও অনুকম্পা হলেই লাভ করতে পারি। — (মাযহারী)

দু'টি পার্থিব বিষয় মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ ও পরকালের চিন্তা থেকে গাফেল করে দেয়। (এক) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, যাতে লিপ্ত হয়ে মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে যায়। এ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। (দুই) বিপদাপদ, এতে জড়িত হয়েও মানুষ মাঝে মাঝে নিরাশ ও আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ

كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا —অর্থাৎ, পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ, লওহে-মাহ্ফুযে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। পৃথিবীর বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ —আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ্ তাআলা লওহে-মাহ্ফুযে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এজন্যে দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভাল-মন্দ অবস্থা নিয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা না কর। দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থসম্পদ তেমন উল্লাসিত ও মত্ত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহ্র স্মরণ ও পরকাল সম্পর্কে গাফেল হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোন কোন বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোন কোন বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করে পরকালের পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও সওয়াব হাসিল করতে হবে। (রূহুল-মা'আনী)

পরবর্তী আয়াতে সুখ ও ধন-সম্পদের কারণে উদ্ধত্য ও অহংকারীদের নিন্দা করা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ -অর্থাৎ, আল্লাহ্র উদ্ধত্য অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নেয়ামত পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহ্র কাছে ঘৃণার্হ। কিন্তু পছন্দ করেন না, বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, বুদ্ধিমান ও পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হল প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্র পছন্দ ও অপছন্দের চিন্তা। তাই এখানে অপছন্দ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ
بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ
رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ
إِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ
وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا
بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْإِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً ۗ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا
عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ
فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾
يٰۤأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ
كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَلَّا يَقْدِرُوْنَ
عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ
يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

(২৫) আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২৬) আমি নূহ ও ইবরাহীমকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং তাদের বংশধরের মধ্যে নবুওয়ত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি। অতঃপর তাদের কতক সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে এবং অধিকাংশই হয়েছে পাপাচারী। (২৭) অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছি আমার রসূলগণকে এবং তাদের অনুগামী করেছি মরিয়ম তনয় ঈসাকে ও তাকে দিয়েছি ইঞ্জীল। আমি তার অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর ফরয করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এটা অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা যথাযথভাবে তা পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দিয়েছি। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (২৮) মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি নিজ অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দিবেন, তোমাদেরকে দিবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (২৯) যাতে কিতাবধারীরা জানে যে, আল্লাহ্র সামান্য অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন ক্ষমতা নেই, দয়া আল্লাহ্রই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ঐশী কিতাব ও পয়গম্বর প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা ঃ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ

بـيـنـات শব্দের আভিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট বিষয়। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বিধানাবলীও হতে পারে; যেমন তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এর উদ্দেশ্য মোজেযা এবং রেসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও হতে পারে। —(ইবনে-কাসীর) পরবর্তী বাক্যে কিতাব নাযিলের আলাদা উল্লেখ বাহ্যতঃ শেষোক্ত তফসীরের সমর্থক। অর্থাৎ, بينات বলে মোজেযা ও প্রমাণাদি বোঝানো হয়েছে এবং বিধানাবলীর জন্যে কিতাব নাযিল করার কথা বলা হয়েছে।

কিতাবের সাথে 'মীযান' নাযিল করারও উল্লেখ আছে। মীযানের আসল অর্থ পরিমাপযন্ত্র। প্রচলিত দাঁড়িপাল্লা ছাড়া বিভিন্ন বস্তু ওজন করার জন্যে নবাবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও 'মীযান'-এর অর্থে শামিল আছে; যেমন আজকাল আলো, উত্তাপ ইত্যাদির পরিমাপযন্ত্র প্রচলিত আছে।

আয়াতে কিতাবের ন্যায় মীযানের বেলায়ও নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। কিতাব নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতার মাধ্যমে পয়গম্বরগণ পর্যন্ত পৌঁছা সুবিদিত। কিন্তু মীযান নাযিল করার অর্থ কি? এ সম্পর্কে তফসীরে রূহুল-মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদিতে বলা হয়েছে যে, মীযান নাযিল করার মানে দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলী নাযিল করা। কুরতুবী বলেন ঃ প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন ও আবিষ্কারকে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আরবদের বাকপদ্ধতিতে এর নজীর বিদ্যমান আছে। কাজেই আয়াতের অর্থ যেন এরূপ انزلنا الكتاب ووضعنا الميزان অর্থাৎ, আমি কিতাব নাযিল করেছি ও দাঁড়িপাল্লা উদ্ভাবন করেছি। সূরা আর-রহমানের وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে ميزان শব্দের সাথে وضع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, নূহ (আঃ)-এর প্রতি আক্ষরিক অর্থে আকাশ থেকে দাঁড়িপাল্লা নাযিল করা হয়েছিল এবং আদেশ করা হয়েছিল যে, এর সাহায্যেও ওজন করে দায়-দেনা পূর্ণ করতে হবে।

কিতাব ও মীযানের পর লৌহ নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাযিল করার মানে সৃষ্টি করা। কোরআন পাকের এক আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও নাযিল করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ চতুষ্পদ জন্তু আসমান থেকে নাযিল হয় না —পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাযিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহুপূর্বেই লওহে-মাহ্ফূযে লিখিত ছিল—এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ। —(রূহুল-মা'আনী)

আয়াতে লৌহ নাযিল করার দু'টি রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) এর ফলে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধ্যদেরকে

খোদায়ী বিধান ও ন্যায়নীতি পালনে বাধ্য করা যায়। (দুই) এতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের জন্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকব্জা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোন শিল্প চলতে পারে না।

এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ এবং ন্যায়নীতির দাঁড়িপাল্লা আবিষ্কার ও ব্যবহারের আসল লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ, মানুষ যাতে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর লৌহ সৃষ্টি করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্যও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, পয়গম্বরগণও আসমানী কিতাবসমূহ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেন এবং যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে না, তাদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় দেখান। মীযান ইনসাফের সীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু যারা অবাধ্য ও হঠকারী, তারা কোন প্রমাণ মানে না এবং ন্যায়নীতি অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হয় না। তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হলে দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা সুদূরপরাহত। তাদেরকে বশে আনা লৌহ ও তরবারির কাজ, যা শাসকবর্গ অবশেষে বেগতিক হয়ে ব্যবহার করে।

এখানে আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক ইনসাফ ও সুবিচার দেনা-পাওনা পরিশোধ ও তাতে হ্রাসবৃদ্ধির নিষেধাজ্ঞা জানা যায় এবং মীযান দ্বারা অপরের দেনা-পাওনায় অংশ নির্ধারিত হয়। এই বস্তুদ্বয় নাযিল করার লক্ষ্যই হচ্ছে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এরপর শেষের দিকে লৌহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকল্পে লৌহের ব্যবহার বেগতিক অবস্থায় করতে হবে। এটা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার আসল উপায় নয়।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রকৃতপক্ষে চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। রাষ্ট্রের তরফ থেকে জোর-জবরদস্তি প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্যে নয়; বরং পথের বাধা দূর করার জন্যে বেগতিক অবস্থায় হয়ে থাকে। চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষা-দীক্ষাই আসল বিষয়।

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ রূহুল-মা'আনীতে আছে এখানে واو অব্যয়টি এই বাক্যকে একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংযুক্ত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ لينفعهم -আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, যাতে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয়, মানুষ এর দ্বারা শিল্পকাজে উপকৃত হয় এবং আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে আল্লাহ্ জেনে নেন কে লৌহের সমরাস্ত্র দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে ও ধর্মের জন্যে জিহাদ করে। আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু পূর্বেই জানেন। কিন্তু মানুষ কাজ করার পর তা আমলনামায় লিখিত হয়। এর মাধ্যমেই কাজটি আইনগত প্রকাশ লাভ করে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পার্থিব হেদায়েত ও পৃথিবীতে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে পয়গম্বর প্রেরণ এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও মীযান অবতারণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাঁদের মধ্যথেকে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ (আঃ)-এর এবং পরে পয়গম্বরগণের শ্রদ্ধাভাজন ও মানবমণ্ডলীর ইমাম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যত পয়গম্বর ও ঐশী কিতাব দুনিয়াতে আগমন করবে, তাঁরা সব এঁদেরই বংশধরের মধ্য থেকে হবে। অর্থাৎ, নূহ (আঃ)-এর সেই শাখাকে এই গৌরব অর্জনের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যাতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে যত পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন এবং যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা সব ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর।

এই বিশেষ আলোচনার পর পয়গম্বরগণের সমগ্র পরম্পরাকে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا অর্থাৎ, এরপর তাঁদের পশ্চাতে একের পর এক আমি আমার পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে বনী-ইসরাঈলের সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আঃ)-এর উল্লেখ করে শেষনবী মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর শরীয়ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হাওয়ারীগণের বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً —অর্থাৎ, যারা হযরত ঈসা (আঃ) অথবা ইঞ্জীলের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের অন্তরে স্নেহ ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা একে অপরের প্রতি দয়া ও করুণাশীল কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি তারা অনুগ্রহশীল। رحمت ও رافت শব্দদ্বয়কে সমঅর্থবোধক মনে করা হয়। এখানে ভিন্নমুখী করে উল্লেখ করায় কেউ কেউ বলেন ঃ رافة এর অর্থ অতি দয়া। সাধারণ দয়ার চাইতে এতে যেন আতিশয্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ কারও প্রতি দয়া করার দু'টি অভ্যাসগত কারণ থাকে। এক, সে কষ্টে পতিত থাকলে তার কষ্ট দূর করে দেয়া। একে رافة বলা হয়। দুই, কোন বস্তুর প্রয়োজন থাকলে তাকে দান করা। একে رحمت বলা হয়। মোটকথা رافة এর সম্পর্ক ক্ষতি দূর করার সাথে এবং رحمت এর সম্পর্ক উপকার অর্জনের সাথে। ক্ষতি দূর করাকে সবদিক দিয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তাই এই শব্দদ্বয় একত্রে ব্যবহৃত হলে رافت কে অগ্রে আনা হয়।

এখানে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাহাবী তথা হাওয়ারীগণের দু'টি বিশেষ গুণ رافت ও رحمت উল্লেখ করা হয়েছে ; যেমন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহাবায়ে-কেরামের কয়েকটি বিশেষ গুণ সূরা ফাত্‌হ-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ কিন্তু এর আগে সাহবায়ে-কেরামের আরও একটি বিশেষ গুণ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ও বর্ণিত হয়েছে ; অর্থাৎ, তাঁরা কাফেরদের প্রতি বজ্রকঠোর। পার্থক্যের কারণ এই যে, ঈসা (আঃ)-এর শরীয়তে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের বিধান ছিল না। তাই কাফেরদের বিপক্ষে কঠোরতা প্রকাশ করার কোন স্থানই সেখানে ছিল না।

সন্ন্যাসবাদের অর্থঃ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا - رهبانية শব্দটি رهبان - এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। رهبان ও راهب - এর অর্থ যে ভয় করে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর বনী-ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে বিশেষতঃ রাজন্যবর্গ ও শাসকশ্রেণী ইঞ্জীলের বিধানাবলীর প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। বনী-ইসরাঈলের মধ্যে কিছুসংখ্যক খাঁটি আলেম ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা এই ধর্মবিমুখতাকে রুখে দাঁড়ালে তাঁদেরকে হত্যা করা হয়। যে কয়েকজন প্রাণে বেঁচে গেলেন তারা দেখলেন যে, মোকাবেলার শক্তি তাঁদের নেই ;

কিন্তু এদের সাথে মিলে-মিশে থাকলে তাঁদের দ্বীন-ঈমান বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের জন্যে জরুরী করে নিলেন যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দিবেন, বিবাহ করবেন না, খাওয়া-পরা এবং ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করার চিন্তা করবেন না, বসবাসের জন্যে গৃহ নির্মাণে যত্নবান হবেন না, লোকালয় থেকে দূরে কোন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন অথবা যাযাবরদের ন্যায় ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দিবেন যাতে ধর্মের বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে পালন করা যায়। তারা আল্লাহ্র ভয়ে এই কর্ম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন; তাই তাঁরা راهب অথবা رهبان তথা সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হল এবং তাঁদের উদ্ভাবিত মতবাদ رهبانيت তথা সন্ন্যাসবাদ নামে খ্যাতি লাভ করেন।

তাদের এই মতবাদ পরিস্থিতির চাপে অপারক হয়ে নিজেদের ধর্মের হেফাযতের জন্যে ছিল। তাই এটা মূলতঃ নিন্দনীয় ছিল না। তবে কোন বিষয়কে আল্লাহ্র জন্যে নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নেয়ার পর তাতে ত্রুটি ও বিরুদ্ধাচরণ করা গুরুতর পাপ। উদাহরণতঃ মানত আসলে কারও উপর ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কোন ব্যক্তি নিজে কোন বস্তুকে মানত করতঃ নিজের উপর হারাম অথবা ওয়াজিব করে নিলে শরীয়তের আইনে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা গোনাহ্ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কতক লোক সন্ন্যাসবাদের নামের আড়ালে দুনিয়া উপার্জন ও ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। কেননা, জনসাধারণ তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং হাদিয়া ও নযর-নিয়ায আগমন করতে থাকে। তাদের চারপাশে নারী-পুরুষের ভিড় জমতে থাকে। ফলে বেহায়াপনাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাক এ বিষয়েই তাদের সমালোচনা করেছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ভোগ বিলাস বিসর্জন দেয়া অপরিহার্য করে নিয়েছিল—আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফরয করা হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের উচিত ছিল এটা পালন করা, কিন্তু তারা তাও ঠিকমত পালন করতে পারেনি।

তাদের এই কর্মপন্থা মূলতঃ নিন্দনীয় ছিল না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)- এর হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে-কাসীর বর্ণিত এই হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ বনী-ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি দল আযাব থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রথম দলটি হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর অত্যাচারী রাজন্যবর্গ ও ঐশ্বর্যশালী পাপাচারীদেরকে পূর্ণ শক্তি সহকারে রুখে দাঁড়ায়, সত্যের বাণী সর্বোচ্চে তুলে ধরে এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়। কিন্তু অশুভ শক্তির মোকাবেলায় পরাজিত হয়ে তারা নিহত হয়। তাদের স্থলে অপর একদল দণ্ডায়মান হয়। তাদের মোকাবেলা করার এতটুকুও শক্তি ছিল না, কিন্তু তারা জীবনপণ করে মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেয়। পরিণামে তাদেরকেও হত্যা করা হয়। কতককে করাত দ্বারা চিরা হয় এবং কতককে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় বিপদাপদে সবর করে। এই দলটিও মুক্তি পেয়েছে, এরপর তৃতীয় দল তাদের জায়গায় আসে। তাদের মধ্যে মোকাবেলারও শক্তি ছিল না এবং পাপাচারীদের সাথে থেকে নিজেদের ধর্ম বরবাদ করারও তারা পক্ষপাতী ছিল না। তাই তারা জঙ্গল ও পাহাড়ের পথ বেছে নেয় এবং সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ আয়াতে তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যারা সন্যাসবাদ অবলম্বন করে তা যথাযথভাবে পালন করেছে এবং বিপদাপদে সবর করেছে, তারাও মুক্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতের এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, যে ধরনের সন্যাসবাদ প্রথমে তারা অবলম্বন করেছিল, তা নিন্দনীয় ও মন্দ ছিল না। তবে সেটা শরীয়তের বিধানও ছিল না। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের উপর তা জরুরী করে নিয়েছিল। কিন্তু জরুরী করার পর কেউ কেউ একে যথাযথভাবে পালন করেনি। এখান থেকেই এর নিন্দনীয় ও মন্দ দিক শুরু হয়। যারা পালন করেনি, তাদের সংখ্যাই বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাই অধিকাংশের কাজকে সবার কাজ ধরে নিয়ে কোরআন গোটা বনী-ইসরাঈল সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, তারা যে সন্যাসবাদকে নিজেদের উপর জরুরী করে নিয়েছিল, তা যথাযথ পালন করেনি

فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

এ থেকে আরও জানা গেল যে, ابتدعوا শব্দটি بدعتথেকে উদ্ভূত হলেও এস্থলে এর আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, উদ্ভাবন করা। এখানে পারিভাষিক বিদআত বোঝানো হয়নি, যে সম্পর্কে হাদীসে আছে كل بدعة ضلالة অর্থাৎ, প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা।

কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত ব্যাখ্যার সত্যতা ফুটে উঠে। সর্বপ্রথম এই বাক্যের প্রতিই লক্ষ্য করুন ঃ

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً

এখানে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় নেয়ামত প্রকাশ করার জায়গায় বলেছেনঃ আমি তাদের অন্তরে স্নেহ, দয়া ও সন্ন্যাসবাদ সৃষ্টি করেছি। এ থেকে বোঝা যায় যে, স্নেহ ও দয়া যেমন নিন্দনীয় নয়, তেমনি তাদের অবলম্বিত সন্ন্যাসবাদও সত্তাগতভাবে নিন্দনীয় ছিল না। নতুবা এ স্থলে একে স্নেহ ও দয়ার সাথে উল্লেখ করার কোন কারণ ছিল না। এ কারণেই যারা সন্ন্যাসবাদকে সর্বাবস্থায় দূষণীয় মনে করেন, তাদেরকে এ স্থলে বাক্যের সাথে رهبانية শব্দটির সংযুক্তির ব্যাপারে অনাবশ্যক ব্যাকরণিক হেরফেরের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তারা বলেন যে, এখানে رهبانية শব্দের আগে ابتدعوا বাক্যটি উহ্য আছে। ইমাম কুরতুবী তাই বলেছেন। কিন্তু উপরোক্ত তফসীর অনুযায়ী এই হেরফেরের কোন প্রয়োজন থাকে না। এরপরও কোরআন পাক তাদের এই উদ্ভাবনের কোনরূপ বিরূপ সমালোচনা করেনি; বরং সমালোচনা এ বিষয়ের কারণে করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের উদ্ভাবিত এই সন্যাসবাদ যথাযথ পালন করেনি। এটাও ابتداع শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে নিলেই সম্ভবপর। পারিভাষিক অর্থে হলে কোরআন স্বয়ং এর বিরূপে সমালোচনা করত। কেননা, পারিভাষিক বিদআতও একটি পথভ্রষ্টতা।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর পূর্বোক্ত হাদীসেও সন্ন্যাসবাদ অবলম্বনকারী দলকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল গণ্য করা হয়েছে। তারা যদি পারিভাষিক বিদআতের অপরাধে অপরাধী হত, তবে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে নয়—পথভ্রষ্টদের মধ্যে গণ্য হত।

সন্ন্যাসবাদ সর্বাবস্থায়ই কি নিন্দনীয় ও অবৈধ ঃ বিশুদ্ধ কথা এই যে, رهبانية শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে, ভোগ-বিলাস বিসর্জন ও অবৈধ কাজ-কর্ম বর্জন। এর কয়েকটি স্তর আছে। (এক) কোন অনুমোদিত ও হালাল বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যতঃ হারাম সাব্যস্ত করা। এই অর্থে সন্ন্যাসবাদ নিশ্চিত হারাম। কারণ, এটা ধর্মের পরিবর্তন ও বিকৃতি।

কোরআন পাকের يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়েই নিষেধাজ্ঞা ও অবৈধতা বিধৃত হয়েছে। এই আয়াতে لَا تُحَرِّمُوا শব্দটিই ব্যক্ত করছে যে, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে আল্লাহ্র হালালকৃত বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যতঃ হারাম সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহ্র বিধানাবলী পরিবর্তন ও বিকৃত করার নামান্তর।

(দুই) অনুমোদিত কাজকর্মকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত ঃ হারাম সাব্যস্ত করে না, কিন্তু কোন কোন পার্থিব কিংবা ধর্মীয় প্রয়োজনের খাতিরে অনুমোদিত কাজ বর্জন করে। পার্থিব প্রয়োজন যেমন কোন রোগব্যাধির আশংকা করে কোন অনুমোদিত বস্তু ভক্ষণে বিরত থাকা এবং ধর্মীয় প্রয়োজন—যেমন, পরিণামে কোন গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকায় কোন বৈধ কাজ বর্জন করা। উদাহরণতঃ মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ মানুষের সাথে মেলামেশাই বর্জন করে ; কিংবা কোন কুস্বভাবের প্রতিকারার্থে কিছুদিন পর্যন্ত কোন কোন বৈধ কাজ বর্জন করতঃ তা ততদিন অব্যাহত রাখা, যতদিন কুস্বভাব সম্পূর্ণ দূর না হয়ে যায়। সূফী বুযুর্গগণ মুরীদকে কম আহার, কম নিদ্রা ও কম মেলামেশার জোর আদেশ দেন। কারণ, এটা প্রবৃত্তি বশীভূত হয়ে গেলে এবং অবৈধতায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা দূর হয়ে গেলে এই সাধনা ত্যাগ করা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে সন্যাসবাদ নয় ; বরং তাক্ওয়া, যা ধর্মপরায়ণদের কাম্য এবং সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে প্রমাণিত।

(তিন) কোন অবৈধ বিষয়কে যেভাবে ব্যবহার করা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত আছে সেইরূপ ব্যবহার বর্জন করা এবং একেই সওয়াব ও উত্তম মনে করা। এটা এক প্রকার বাড়াবাড়ি, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর অনেক হাদীসে নিষিদ্ধ। এক হাদীসে আছে لا رهبانية فى الاسلام অর্থাৎ, ইসলামে সন্ন্যাসবাদ নেই। এতে এই তৃতীয় স্তরের বর্জনই বোঝানো হয়েছে। বনী–ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে যে সন্যাসবাদের গোড়াপত্তন হয়, তা ধর্মের হেফাযতের প্রয়োজনে হলে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ, তাকওয়ার মধ্যে দাখিল। কিন্তু কিতাবধারীদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি ছিল। এই বাড়াবাড়ির ফলে তারা প্রথম স্তর অর্থাৎ, হালালকে হারাম করা পর্যন্ত পৌঁছে থাকলে তারা হারাম কাজ করেছে। আর তৃতীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছে থাকলেও এক নিন্দনীয় কাজের অপরাধী হয়েছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ — এই আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)- এর প্রতি বিশ্বাসী কিতাবধারী মুমিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে কেবল মুসলমানগণকে সম্বোধন করাই কোরআন পাকের সাধারণ রীতি। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বেলায় 'আহ্লে কিতাব' শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (আঃ)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)- এর প্রতি তাদের বিশ্বাস যথেষ্ট ও ধর্তব্য নয়। কাজেই তারা الَّذِينَ آمَنُوا কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এই সাধারণ রীতির বিপরীতে খ্রীষ্টানদের জন্য الَّذِينَ آمَنُوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবত ঃ এর রহস্য এই যে, পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (আঃ)- এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, এটাই হযরত ঈসা (আঃ)–এর প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসের দাবী। তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরোক্ত সম্বোধনের যোগ্য হয়ে যাবে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার ও সওয়াব দানের ওয়াদা করা হয়েছে। এক সওয়াব হযরত মূসা (আঃ) অথবা ঈসা (আঃ)- এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ও তাঁদের শরীয়ত পালন করার এবং দ্বিতীয় সওয়াব শেষনবী (সাঃ)–এর প্রতি ঈমান ও তাঁর শরীয়ত পালন করার এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত আছে যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কাফের ছিল এবং কাফেরদের কোন এবাদত গ্রহণীয় নয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছিল যে, বিগত শরীয়তানুযায়ী তাদের সব কাজকর্ম নিষ্ফল হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, কাফের মুসলমান হয়ে গেলে তার কাফের অবস্থায় কৃত সব সৎকর্ম বহাল করে দেয়া হয়। ফলে সে দুই সওয়াবের অধিকারী হয়।

لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ এখানে لا অতিরিক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উল্লেখিত বিধানাবলী এজন্যে বর্ণনা করা হল, যাতে কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে কেবল ঈসা (আঃ)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেই আল্লাহ্ তাআলার কৃপা লাভের যোগ্য নয়। যদি তারা নিজেদের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে, তবেই তারা আল্লাহ্র কৃপালাভে সমর্থ হবে।

সূরা হাদীদ সমাপ্ত।

بسم الله الرحمن الرحيم
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و
تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ①
الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهتهم إن أمهتهم
إلا الئي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا و
إن الله لعفو غفور ② والذين يظهرون من نسائهم ثم
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم
توعظون به والله بما تعملون خبير ③ فمن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام
ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله
وللكفرين عذاب أليم ④ إن الذين يحادون الله ورسوله
كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا ءايت بينت و
للكفرين عذاب مهين ⑤ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم
بما عملوا أحصىه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ⑥

সূরা আল-মুজাদালাহ্
মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ২২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহ্র দরবারে, আল্লাহ্ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ্ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (২) তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (৩) যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফ্ফারা এই ঃ একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্যে উপদেশ হবে। আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর। (৪) যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাট জন মিসকীনকে আহার করাবে। এটা এজন্যে, যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব (৫) যারা আল্লাহ্র তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা অপদস্থ হয়েছে, যেমন অপদস্থ হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীরা। আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (৬) সেদিন স্মরণীয় ; যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তারা করত। আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত আছে সব বস্তুই।

সূরা আল-মুজাদালাহ্

শানে-নুযূল ঃ একটি বিশেষ ঘটনা এই সূরার প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত অবতরণের হেতু। হযরত আওস ইবনে সামেত (রাঃ) একবার তাঁর স্ত্রী খাওলাকে বলে দিলেন ঃ انت على كظهر امى অর্থাৎ, তুমি আমার পক্ষে আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের ন্যায়; মানে হারাম। ইসলাম-পূর্বকালে এই বাক্যটি স্ত্রীকে চিরতরে হারাম করার জন্যে বলা হত, যা ছিল চূড়ান্ত তালাক অপেক্ষাও কঠোরতর। এই ঘটনার পর হযরত খাওলা (রাঃ)-এর শরীয়তসম্মত বিধান জানার জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন পর্যন্ত এই বিষয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তাই তিনি পূর্ব থেকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী খাওলাকে বলে দিলেন ঃ ما اراك الاقدحرمت عليه অর্থাৎ, আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে গেছ। খাওলা একথা শুনে বিলাপ শুরু করে দিলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার যৌবন তার কাছে নিঃশেষ করেছি। এখন বার্ধক্যে সে আমার সাথে এই ব্যবহার করল। আমি কোথায় যাব। আমার ও আমার বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ কিরূপে হবে। এক রেওয়ায়েতে খাওলার এ উক্তিও বর্ণিত আছে ঃ ماذكر طلاقا অর্থাৎ, আমার স্বামী তো তালাক উচ্চারণ করেনি। এমতাবস্থায় তালাক কিরূপে হয়ে গেল? অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, খাওলা আল্লাহ্ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করলেন ঃ اللهم انى اشكو اليك অর্থাৎ, আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে অভিযোগ করছি। এক রেওয়ায়েতে আছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খাওলাকে একথা বললেন ঃ ما امرت فى شانك بشئ حتى الان অর্থাৎ, তোমার মাসআলা সম্পর্কে আমার প্রতি এখন পর্যন্ত কোন বিধান অবতীর্ণ হয়নি (এসব রেওয়ায়েতে কোন বৈপরীত্য নেই। সবগুলোই সঠিক হতে পারে।) এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।—(দুররে-মনসূর, ইবনে-কাসীর)

ফেকাহ্র পরিভাষায় এই বিশেষ মাসালাটিকে 'যিহার' বলা হয়। এই সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহে যিহারের শরীয়তসম্মত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আল্লাহ্ তাআলা হযরত খাওলার (রাঃ) ফরিয়াদ শুনে তার জন্যে তার সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন। তার খাতিরে আল্লাহ্ তাআলা কোরআন পাকে এসব আয়াত নাযিল করেছেন। তাই সাহাবায়ে কেরাম এই মহিলার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। একদিন খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) একদল লোকের সাথে গমনরত ছিলেন। পতিমধ্যে এই মহিলা সামনে এসে দণ্ডায়মান হলে তিনি দাঁড়িয়ে তার কথাবার্তা শুনলেন। কেউ কেউ বলল ঃ আপনি এই বৃদ্ধার খাতিরে এতবড় দলকে পথে আটকিয়ে রাখলেন। খলীফা বললেন ঃ জান ইনি কে? এ সেই মহিলা, যার কথা আল্লাহ্ তাআলা সপ্ত আকাশের উপরে শুনেছেন। অতএব, আমি কি তাঁর কথা এড়িয়ে যেতে পারি? আল্লাহ্র কসম, তিনি যদি স্বেচ্ছায় প্রস্থান না করতেন, তবে আমি রাত্রি পর্যন্ত তার সাথে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতাম।—(ইবনে-কাসীর)

قد سمع الله –পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এসব আয়াতে উল্লেখিত নারী হলেন হযরত আওস ইবনে সামেত (রাঃ)-এর স্ত্রী খাওলা বিনতে সা'লাবা। তাঁর স্বামী তাঁর সাথে যিহার করেছিলেন। তিনি এই অভিযোগ নিয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সম্মান দান করে জওয়াবে এসব আয়াত

নাযিল করলেন। আল্লাহ্ তাআলা এসব আয়াতে কেবল যিহারের শরীয়তসম্মত বিধান বর্ণনা এবং তাঁর কষ্ট দূর করার ব্যবস্থাই করেননি ; বরং তাঁর মনোরঞ্জনের জন্যে শুরুতেই বলে দিলেন ঃ যে নারী তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল, আমি তার কথা শুনেছি। একবার জওয়াব দেয়া সত্ত্বেও মহিলা বার বার নিজের কষ্ট বর্ণনা করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আয়াতে একেই مجادلة বলা হয়েছে। কতক রেওয়েতে আরও আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জওয়াবে খাওলাকে বললেন ঃ তোমার ব্যাপারে আমার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার কোন বিধান নাযিল হয়নি। তখন দুঃখিনীর মুখে একথা উচ্চারিত হল ঃ আপনার প্রতি তো প্রত্যেক ব্যাপারে বিধান নাযিল হয়। আমার ব্যাপারে কি হল যে, ওহীও বন্ধ হয়ে গেল।—(কুরতুবী) এরপর খাওলা আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলেন। এর প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাযিল হয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন ঃ সেই সত্তা পবিত্র, যিনি সব আওয়ায ও প্রত্যেকের ফরিয়াদ শুনেন; খাওলা বিনতে সালাবা যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমি তার কোন কোন কথা শুনতে পারিনি। অথচ আল্লাহ্ তাআলা সব শুনেছেন এবং বলেছেন ঃ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ (বোখারী, ইবনে-কাসীর)

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ - يُظٰهِرُوْنَ শব্দটি ظهار থেকে উদ্ভূত। স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার বিশেষ একটি পদ্ধতিকে ظهار বলা হয়। এটা ইসলাম-পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। পদ্ধতিটি এই ঃ স্বামী স্ত্রীকে বলে দিবে— انت على كظهر امى অর্থাৎ, তুমি আমার উপর আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের মত হারাম। এখানে পেটই আসল উদ্দেশ্য, কিন্তু রূপকভঙ্গিতে পৃষ্ঠদেশের উল্লেখ করা হয়েছে।—(কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত এই প্রথার দ্বিবিধ সংস্কার সাধন করেছে। প্রথমতঃ স্বয়ং যিহারের প্রথাকেই অবৈধ ও গোনাহ্ সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ কাম্য হলে তার বৈধ পন্থা হচ্ছে তালাক। সেটা অবলম্বন করা দরকার। যিহারকে একাজের জন্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা স্ত্রীকে মাতা বলে দেয়া একটা অসার ও মিথ্যা বাক্য। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ مَّا هُنَّ أُمَّهٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهٰتُهُمْ إِلَّا الّٰٓـِٔىْ وَلَدْنَهُمْ অর্থাৎ, তাদের এই অসার উক্তির কারণে স্ত্রী মাতা হয়ে যায় না। মাতা তো সে-ই যার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে ঃ এরপর বলেছে ঃ وَإِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا অর্থাৎ, তাদের এই উক্তি মিথ্যা এবং পাপও। কারণ, বাস্তব ঘটনার বিপরীতে স্ত্রীকে মাতা বলছে।

দ্বিতীয় সংস্কার এই করেছে যে, যদি কোন মূর্খ অর্বাচীন ব্যক্তি এরূপ করেই বসে, তবে এই বাক্যের কারণে ইসলামী শরীয়তে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। কিন্তু এই বাক্য বলার পর স্ত্রীকে পূর্ববৎ ভোগ করার অধিকারও তাকে দেয়া হবে না। বরং তাকে জরিমানাস্বরূপ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। সে যদি এই উক্তি প্রত্যাহার করতে চায় এবং পূর্বের ন্যায় স্ত্রীকে ব্যবহার করতে চায়, তবে কাফ্ফারা আদায় করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কাফ্ফারা আদায় না করলে স্ত্রী হালাল হবে না।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا আয়াতের অর্থ তাই। এখানে لِمَا قَالُوْا শব্দটি عما قالوا শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তারা আপন উক্তি প্রত্যাহার করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) يَعُوْدُوْنَ শব্দের অর্থ করেন يندمون অর্থাৎ একথা বলার পর তারা অনুতপ্ত হয় এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চায়। —(মাযহারী)

এই আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যেই কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে। খোদ যিহার কাফ্ফারার কারণ নয়। বরং যিহার করা এমন গোনাহ্, যার কাফ্ফারা হচ্ছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আয়াত শেষে وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই কোন ব্যক্তি যদি যিহার করার পর স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে না চায়, তবে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করা না জায়েয। স্ত্রী দাবী করলে কাফ্ফারা আদায় করে মেলামেশা করা অথবা তালাক দিয়ে মুক্ত করা ওয়াজিব। স্বামী স্বেচ্ছায় এরূপ না করলে স্ত্রী আদালতে রুজু হয়ে স্বামীকে এরূপ করতে বাধ্য করতে পারে।

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ -অর্থাৎ, যিহারের কাফ্ফারা এই যে, একজন দাস অথবা দাসীকে মুক্ত করবে। এরূপ করতে সক্ষম না হলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। রোগ-ব্যাধি কিংবা দুর্বলতাবশতঃ এতগুলো রোযা রাখতেও সক্ষম না হলে ষাট জন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে আহার করাবে। আহার করানোর পরিবর্তে ষাট জন মিসকীনকে জনপ্রতি একজনের ফেৎরা পরিমাণ গম কিংবা তার মূল্য দিলেও চলবে। আমাদের প্রচলিত ওজনে একজনের ফেৎরার পরিমাণ হচ্ছে পৌনে দু'সের গম।

ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ -এই আয়াতে ঈমান বলে শরীয়ত ও বিধানাবলী পালন বোঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ কাফ্ফারা ইত্যাদির বিধান আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। এই সীমা ডিঙানো হারাম। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইসলাম বিবাহ, তালাক, যিহার ও অন্যান্য সব ব্যাপারে মূর্খতা যুগের প্রথা-পদ্ধতি বিলোপ করে সুষম ও বিশুদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা এগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। যারা এসব সীমা মানে না তথা কাফের, তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ -পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্র সীমা ও ইসলামের বিধানাবলী পালন করার তাকীদ ছিল। এই আয়াতে বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রতি শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এতে পার্থিব লাঞ্ছনা ও উদ্দেশ্যে ব্যর্থতা এবং পরকালে কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

أَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ -এতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, মানুষ দুনিয়াতে পাপাচার করে যায় এবং তা তার স্মরণও থাকে না। স্মরণ না থাকার কারণ হচ্ছে একে মোটেই গুরুত্ব না দেয়া। কিন্তু তার সব পাপাচার আল্লাহ্র কাছে লিখিত আছে। আল্লাহ্ তাআলার সব স্মরণ আছে। এজন্যে আযাব হবে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑦ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ⑨ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑩ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑪

(৭) আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ্ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন, তারা যা করে, তিনি কেয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (৮) আপনি কি ভেবে দেখেননি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, সীমালংঘন এবং রসূলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাঘুষা করে। তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে, যদ্দ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে সালাম করেননি। তারা মনে মনে বলে ঃ আমরা যা বলি, তজ্জন্যে আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের জন্যে যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। কতই না নিকৃষ্ট সেই জায়গা! (৯) মুমিনগণ, তোমরা যখন কানাকানি কর, তখন পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না বরং অনুগ্রহ ও খোদাভীতির ব্যাপারে কানাকানি করো। আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর কাছে তোমরা একত্রিত হবে। (১০) এই কানাঘুষা তো শয়তানের কাজ ; মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্যে। তবে আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মুমিনদের উচিত আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। (১১) মুমিনগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয় ঃ মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে প্রশস্ত করে দিবেন। যখন বলা হয় ঃ উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ্ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ কয়েকটি ঘটনা। (এক) ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তিচুক্তি ছিল। কিন্তু ইহুদীরা যখন কোন মুসলমানকে দেখত, তখন তার চিন্তাধারাকে বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশে পরস্পরে কানাকানি শুরু করে দিত। মুসলমান ব্যক্তি মনে করত যে, তার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করা হচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইহুদীদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা বিরত হল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ...... আয়াতে অবতীর্ণ হয়।

(দুই) মুনাফিকরাও এমনিভাবে পরস্পরে কানাকানি করত। এর পরিপ্রেক্ষিতে إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا আয়াত নাযিল হল। (তিন) ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলে দুষ্টুমির ছলে السلام عليكم বলার পরিবর্তে السام عليكم বলত। سام শব্দের অর্থ মৃত্যু। (চার) মুনাফিকরাও এমনিভাবে বলত। উভয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ .... আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইবনে-কাসীর ইমাম আহমদ (রহঃ) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, ইহুদীরা এভাবে সালাম করে চুপিসারে বলত ঃ

لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ –অর্থাৎ, আমাদের এই গোনাহের কারণে আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? (পাঁচ) একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মসজিদে সুফ্‌ফায় অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদে অনেক লোক সমাগম ছিল। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থান পেলেন না। মজলিসের লোকজনও চেপে চেপে বসে স্থান করে দিল না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই নির্বিকার দৃশ্য দেখে কয়েকজন লোককে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ দিলেন। মুনাফিকরা 'এটা কেমন ইনসাফ' বলে আপত্তি জানাল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বললেন ঃ আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন, যে আপন ভাইয়ের জন্যে জায়গা খালি করে দেয়। এরপর লোকেরা জায়গা খালি করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ ... আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে-কাসীর)

রেওয়ায়েতের সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রথমে জায়গা খালি করে দেয়ার কথা বলে থাকবেন। কেউ কেউ খালি করে দিল, যা পর্যাপ্ত ছিল না এবং কেউ কেউ খালি করল না। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে উঠে যেতে বলেছেন, যা মুনাফিকদের মনঃপূত হয়নি। (ছয়) কোন কোন বিত্তশালী লোক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কানকথা বলত। ফলে নিঃস্ব মুসলমানগণ কথাবার্তা বলে উপকৃত হওয়ার সময় কম পেত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছেও ধনীদের দীর্ঘক্ষণ বসে কানকথা অপছন্দনীয় ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ ... আয়াত অবতীর্ণ হয়। ফতহুল বয়ানে বর্ণিত আছে—ইহুদী ও মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অনবশ্যক কানকথা বলত। মুসলমানগণ কোন ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে কানকথা হচ্ছে ধারণা করে তা পছন্দ করত না। ফলে তাদেরকে নিষেধ করা হয়, যা نُهُوا عَنْهُ বাক্যে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু যখন তারা বিরত হল না, তখন إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ আয়াত অবতীর্ণ হল। এর ফলশ্রুতিতে বাতিলপন্থীরা কানাকানি করা

থেকে বিরত হয়। কারণ, অর্থ প্রীতির কারণে সদকা প্রদান করা তাদের জন্যে কষ্টকর ছিল।

(সাত) যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করার আদেশ হল, তখন অনেকে জরুরী কথাও বন্ধ করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে .... ءَأَشْفَقْتُمْ আয়াত নাযিল হল। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন ঃ সদকা প্রদান করার আদেশে পূর্ব থেকেও فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا আয়াতে অসমর্থ লোকদের বেলায় আদেশ শিথিল করা হয়েছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক সম্পূর্ণ অসমর্থও ছিল না এবং পুরোপুরি বিত্তশালীও ছিল না। কম সামর্থ্য এবং অক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহের কারণে সম্ভবতঃ তাদের জন্যেই সদকা প্রদান করা কষ্টকর হয়েছিল। তাই তারা সদকা প্রদান করতে পারেনি এবং নিজেদেরকে আদেশের আওতা বহির্ভূতও মনে করেনি। আর কানকথা বলা এবাদতও ছিল না যে, এটা ত্যাগ করলে নিন্দার পাত্র হয়ে যাবে। তাই তার কানকথা বলা বন্ধ করেছিল। —(সবগুলো রেওয়ায়েতই দুররে-মনসূরে বর্ণিত আছে।) অবতরণের এসব হেতু জানার ফলে আয়াতসমূহের তফসীর বোঝা সহজ হবে।—(বয়ানুল-কোরআন)

• আলোচ্য আয়াতসমূহ শানে-নুযূলে বর্ণিত বিশেষ ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও কোরআনী নির্দেশসমূহ ব্যাপক হয়ে থাকে। এগুলোতে আকায়েদ, এবাদত, পারস্পরিক লেন-দেন ও সামাজিকতার যাবতীয় বিধি-বিধান বিদ্যমান থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও পারস্পরিক কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে এমনি ধরনের কতিপয় বিধান আছে।

গোপন পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ ঃ গোপন পরামর্শ সাধারণতঃ বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে হয়ে থাকে, যাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা এই গোপন রহস্য কারও কাছে প্রকাশ করবে না। তাই এরূপ ক্ষেত্রে কারও প্রতি জুলুম করা, কাউকে হত্যা করা, কারও বিষয়-সম্পত্তি অধিকার করা ইত্যাদি বিষয়েরও পরিকল্পনা করা হয়। আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলেছেন যে, আল্লাহ্র জ্ঞান সমগ্র বিশ্বজগতকে পরিবেষ্টিত। তোমরা যেখানে যত আত্মগোপন করেই পরামর্শ কর, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জ্ঞান, শ্রবণ ও দৃষ্টির দিক দিয়ে তোমাদের কাছে থাকেন এবং তোমাদের প্রত্যেক কথা শুনেন, দেখেন ও জানেন। যদি তাতে কোন পাপ কাজ কর, তবে শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। এতে বলা উদ্দেশ্য তো এই যে, তোমরা যতই কম বা বেশী মানুষে পরামর্শ ও কানাকানি কর না কেন, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন। উদারহরণস্বরূপ তিন ও পাঁচের সংখ্যা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তিন জনে পরামর্শ কর, তবে বোঝে নাও যে, চতুর্থজন আল্লাহ্ তাআলা সেখানে বিদ্যমান আছেন। আর যদি পাঁচ জনে পরামর্শ কর, তবে ষষ্ঠ জন আল্লাহ্ তাআলা বিদ্যমান আছেন। তিন ও পাঁচের সংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে যে, দলের জন্যে আল্লাহ্র কাছে বেজোড় সংখ্যা পছন্দনীয়। مَا يَكُونُ مِن نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ আয়াতের সারমর্ম তাই।

কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ ঃ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوٰى -শানে নুযূলের ঘটনায় বলা হয়েছে, ইহুদী ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা চালাতে পারত না। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্তর্নিহিত জিঘাংসা চরিতার্থ করার এক পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করেছিল। তা এই যে, তারা যখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে কাউকে কাছে আসতে দেখত, তখন পারস্পরিক কানাকানি ও গোপন পরামর্শের আকারে জটলা সৃষ্টি করত এবং আগন্তুক মুসলমানের দিকে কিছু ইশারা-ইঙ্গিত করত। ফলে আগন্তুক ধারণা করত যে, তার বিরুদ্ধেই কোন ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এতে সে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারত না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইহুদীদেরকে এরূপ কানাকানি করতে নিষেধ করে দেন। نُهُوا عَنِ النَّجْوٰى। বাক্যে এই নিষেধাজ্ঞাই বর্ণিত হয়েছে।

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে মুসলমানদের জন্যেও আইন হয়ে যায় যে, তারাও পরস্পরে এমনভাবে কানা-কানি ও পরামর্শ করবে না, যদ্দ্বারা অন্য মুসলমান মানসিক কষ্ট পেতে পারে।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইবনে-মসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

অর্থাৎ, যেখানে তোমরা তিন জন একত্রিত সেখানে দুই জন তৃতীয় জনকে ছেড়ে পরস্পরে কানাকানি ও গোপন কথাবার্তা বলবে না, যে পর্যন্ত আরও লোক না এসে যায়। কারণ, এতে সে মনক্ষুণ্ণ হবে, সে নিজেকে পর বলে ভাববে এবং তার বিরুদ্ধেই কথাবার্তা হচ্ছে বলে সে সন্দেহ করবে।—(মাযহারী)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদেরকে অবৈধ কানাকানির কারণে হুসিয়ার করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা সব অবস্থা ও কথাবার্তা জানেন, তারা যেন তাদের কানাকানি ও পরামর্শের মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এই লক্ষ্য রাখার সাথে তারা যেন চেষ্টা করে যাতে তাদের পরামর্শ ও কানকথার মধ্যে পাপাচার, জুলুম অথবা শরীয়ত বিরুদ্ধ কোন প্রসঙ্গ না থাকে ; বরং সৎকাজের জন্যেই যেন তারা পরস্পরে পরামর্শ করে।

মজলিসের কতিপয় শিষ্টাচার ঃ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوا মুসলমানদের সাধারণ মজলিসসমূহের বিধান এই যে, কিছু লোক পরে আগমন করলে উপবিষ্টরা তাদের বসার জায়গা করে দিবে এবং চেপে চেপে বসবে। এরূপ করলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্যে প্রশস্ততা সৃষ্টি করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এই প্রশস্ততা পরকালে তো প্রকাশ্যই, সাংসারিক জীবিকায় এই প্রশস্ততা হলেও তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এই আয়াতে মজলিসের শিষ্টাচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় নির্দেশ এই ঃ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا -অর্থাৎ, যখন তোমাদের কাউকে মজলিস থেকে উঠে যেতে বলা হয়, তখন ওঠে যাও। আয়াতে কে বলবে, তার উল্লেখ নেই। তবে সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং আগন্তুক ব্যক্তি নিজের জন্যে জায়গা করার উদ্দেশে কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিলে তা জায়েয হবে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىْ
نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ
صَدَقَٰتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا۟ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَ
ءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾
أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا
مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا
شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً
فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٦﴾ لَّن تُغْنِىَ عَنْهُمْ
أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ
هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ
كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ
ٱلْكَٰذِبُونَ ﴿١٨﴾ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَأَنسَىٰهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ۚ
أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٩﴾
إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ٱلْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾

(১২) মুমিনগণ, তোমরা রসূলের কাছে কানকথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদকা প্রদান করবে। এটা তোমাদের জন্যে শ্রেয়ঃ ও পবিত্র হওয়ার ভাল উপায়। যদি তাতে সক্ষম না হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৩) তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে? অতঃপর তোমরা যখন সদকা দিতে পারলে না এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন তখন তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর। (১৪) আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা আল্লাহ্র গযবে নিপতিত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয়। তারা জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। (১৫) আল্লাহ্ তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করে, খুবই মন্দ। (১৬) তারা তাদের শপথকে ঢাল করে রেখেছেন, অতঃপর তারা আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করে। অতএব, তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (১৭) আল্লাহ্র কবল থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (১৮) যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তারা আল্লাহ্র সামনে শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে। তারা মনে করবে যে, তারা কিছু সৎপথে আছে। সাবধান, তারাই তো আসল মিথ্যাবাদী। (১৯) শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। (২০) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত।

(সাঃ) বলেন ঃ

অর্থাৎ, একজন অপরজনকে দাঁড় করিয়ে তার জায়গায় বসবে না। বরং তোমরা চেপে বসে আগন্তুকের জন্যে জায়গা করে দাও।—(বোখারী, মুসলিম, মুসনাদে-আহমদ, ইবনে-কাসীর)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ –রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জনশিক্ষা ও জন-সংস্কারের কাজে দিবারাত্র মশগুল থাকতেন। সাধারণ মজলিসসমূহে উপস্থিত লোকজন তাঁর অমিয়বাণী শুনে উপকৃত হত। এই সুবাদে কিছু লোক তাঁর সাথে আলাদাভাবে গোপন কথাবার্তা বলতে চাইলে তিনি সময় দিতেন। বলাবাহুল্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা সময় দেয়া যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি কষ্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের কিছু দুষ্টামিও শামিল হয়ে গিয়েছিল। তারা খাঁটি মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে একান্তে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইত এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। কিছু অজ্ঞ মুসলমানও স্বভাবগত কারণে কথা লম্বা করে মজলিসকে দীর্ঘায়ীত করত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই বোঝা হালকা করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, যারা রসূলের সাথে একান্তে কানকথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদকা প্রদান করবে। কোরআনে এই সদকার পরিমাণ বর্ণিত হয়নি। কিন্তু আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম একে বাস্তবায়িত করেন। তিনি এক দীনার সদকা প্রদান করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছ থেকে একান্তে কথা বলার সময় নেন।

একমাত্র হযরত আলীই আদেশটি বাস্তবায়িত করেন, এরপর তা রহিত হয়ে যায় এবং আর কেউ বাস্তবায়নের সুযোগ পাননি ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আদেশটি জারি করার পর খুব শীঘ্রই রহিত করে দেয়া হয়। কারণ, এর ফলে সাহাবয়ে-কেরামের মধ্যে অনেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হন। হযরত আলী প্রায়ই বলতেন ঃ কোরআনে একটি আয়াত এমন আছে, যা আমাকে ছাড়া কেউ বাস্তবায়ন করেনি—আমার পূর্বেও না এবং আমার পরেও কেউ করবে না। পূর্বে বাস্তবায়ন না করার কারণ তো জানা। পরে বাস্তবায়ন না করার কারণ এই যে, আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, আগে সদকা প্রদান করার আলোচ্য আয়াতই সেই আয়াত।—(ইবনে-কাসীর)

আদেশটি রহিত হয়ে গেছে ঠিক ; কিন্তু এর ইপ্সিত লক্ষ্য এভাবে অর্জিত হয়েছে যে, মুসলমানগণ তো আন্তরিক মহব্বতের তাগিদেই এরূপ মজলিস দীর্ঘায়িত করা থেকে বিরত হয়ে গেল এবং মুনাফিকরা যখন দেখল যে, সাধারণ মুসলমানদের কর্মপন্থার বিপরীতে এরূপ করলে তারা চিহ্নিত হয়ে যাবে এবং মুনাফেকী ধরা পড়বে, তখন তারা এ থেকে বিরত হয়ে গেল।

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم এসব আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সেসব লোকের দুরবস্থা ও পরিণামে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহ্র শত্রু কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। মুশরিক, ইহুদী, খ্রীষ্টান অথবা অন্য যে কোন প্রকার কাফেরের সাথে কোন মুসলমানের বন্ধুত্ব রাখা জায়েয নয়। এটা যুক্তিগতভাবে সম্ভবপরও নয়। কেননা, মুমিনের আসল সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ্র মহব্বত। কাফের আল্লাহ্র

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢١﴾ لَا تَجِدُ قَوْمًا
يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
وَلَوْ كَانُوْۤا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ
كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا
عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٢٢﴾

سورة الحشر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١﴾
هُوَ الَّذِيْۤ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ
لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؔؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ
مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِيْ
قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ
فَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿٢﴾ وَلَوْلَاۤ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ
الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ؕ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٣﴾

(২১) আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন ঃ আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২২) যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে।

সূরা আল-হাশর

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ২৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু।

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী। (২) তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে প্রথমবার একত্রিত করে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্র কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ্র শাস্তি তাদের উপর এমনদিক থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৩) আল্লাহ্ যদি তাদের জন্যে নির্বাসন অবধারিত না করতেন, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব।

দুশমন। যার অন্তরে কারও প্রতি সত্যিকার মহব্বত ও বন্ধুত্ব আছে, তার শত্রুর প্রতিও মহব্বত ও বন্ধুত্ব রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এ কারণেই কোরআন পাকের অনেক আয়াতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে এবং যে মুসলমান কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখে, তাকে কাফেরদেরই দলভুক্ত মনে করার শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এসব বিধি-বিধান আন্তরিক বন্ধুত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

কাফেরদের সাথে সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, অনুগ্রহ, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান করা বন্ধুত্বের অর্থের মধ্যে দাখিল নয়। এগুলো কাফেরদের সাথেও করা জায়েয। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের প্রকাশ্য কাজ-কারবার এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে এসব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা জরুরী যে, এগুলো যেন নিজ ধর্মের জন্যে ক্ষতিকর না হয়, ঈমান ও আমলে শৈথিল্য সৃষ্টি না করে এবং অন্যান্য মুসলমানদের জন্যেও ক্ষতিকর না হয়।

وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ -কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এই আয়াত আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবতাল মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের সাথে বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি বললেন ঃ এখন তোমাদের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করবে। তার অন্তর নিষ্ঠুর এবং সে শয়তানের চোখে দেখে। এর কিছুক্ষণ পরই আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবতাল আগমন করল। তার চক্ষু ছিল নীলাভ ; দেহবয়ব বেঁটে গোধূম বর্ণ এবং সে ছিল হালকা শ্মশ্রুমণ্ডিত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দেয় কেন? সে শপথ করে বলল ঃ আমি এরূপ করিনি। এরপর সে তার সঙ্গীদেরকেও ডেকে আনল এবং তারাও মিছেমিছি শপথ করল। আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে দিয়েছেন।-(কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমানের আন্তরিক বন্ধুত্ব কাফেরের সাথে হতে পারে না ঃ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْۤا اٰبَآءَهُمْ .... প্রথম আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বকারীদের প্রতি আল্লাহ্র গযব ও কঠোর শাস্তির বর্ণনা ছিল। এই আয়াতে তাদের বিপরীতে খাঁটি মুসলমানদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র শত্রু অর্থাৎ, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক রাখে না, যদিও সেই কাফের তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা নিকটাত্মীয়ও হয়।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সবারই এই অবস্থা ছিল। এস্থলে তফসীরবিদগণ অনেক সাহাবীর এমন ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রমুখের মুখ থেকে ইসলাম অথবা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর বিরুদ্ধে কোন কথা শুনে সব সম্পর্ক ছেদ করে দিয়েছেন, তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন এবং কতককে হত্যাও করেছেন।

মাসআলা ঃ পাপাসক্ত ফাসেক-ফাজের ও কার্যতঃ ধর্মবিমুখ মুসলমানদের বেলায়ও অনেক ফেকাহ্‌বিদ এই বিধান রেখেছেন যে, তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয হতে পারে না। কাজকর্মের প্রয়োজনে সহযোগিতা অথবা প্রয়োজন মাফিক সাহচর্য ভিন্ন কথা, যার মধ্যে ফিস্‌ক তথা পাপাসক্তির বীজানু বিদ্যমান

আছে, একমাত্র তার অন্তরেই কোন ফাসেক ও পাপাসক্তের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকতে পারে। তাই রসূলে খোদা (সাঃ) তাঁর দোয়ায় বলতেন ঃ لا تجعل لفاجر على يدا অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ আমাকে কোন পাপাসক্ত ব্যক্তির কাছে ঋণী করো না। অর্থাৎ, তার কোন অনুগ্রহ যেন আমার উপর না থাকে। কেননা, সম্ভ্রান্ত মানুষ স্বভাবগত গুণের কারণে অনুগ্রহকারীর প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখতে বাধ্য হয়। কাজেই ফাসেকদের অনুগ্রহ কবূল করা তাদের প্রতি মহব্বতের সেতু। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই সেতু নির্মাণ থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।—(কুরতুবী)

وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ –এখানে কেউ কেউ রূহ–এর তফসীর করেছেন নূর, যা মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়। এই নূরই তার সৎকর্ম ও আন্তরিক প্রশান্তির উপায় হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এই প্রশান্তি একটি বিরাট শক্তি। আবার কেউ কেউ রূহ–এর তফসীর করেছেন কোরআন ও কোরআনের প্রমাণাদি। কারণ, এটাই মুমিনের আসল শক্তি।—(কুরতুবী)

সূরা আল-হাশ্‌র

যোগসূত্র ও শানে নুযূল ঃ পূর্ববর্তী সূরায় মুনাফিক ও ইহুদীদের বন্ধুত্বের নিন্দা করা হয়েছিল। এই সূরায় ইহুদীদের দুনিয়াতে নির্বাসনদণ্ড ও পরকালে জাহান্নামের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদীদের বৃত্তান্ত এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় আগমন করার পর ইহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে এক গোত্র ছিল বনূ-নুযায়ের। তারাও শান্তিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মদীনা থেকে দু'মাইল দূরে বসবাস করত। একবার আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এর রক্ত বিনিময় আদায় করা মুসলমান–ইহুদী সকলেরই কর্তব্য ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর জন্যে মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুললেন। অতঃপর চুক্তি অনুযায়ী ইহুদীদের কাছ থেকেও রক্ত বিনিময়ের অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। সেমতে তিনি বনূ–নুযায়ের গোত্রের কাছে গমন করলেন। তারা দেখল যে, পয়গম্বরকে হত্যা করার এটাই প্রকৃষ্ট সুযোগ। তাই তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল ঃ আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমরা রক্ত বিনিময়ের অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করছি। এরপর তারা গোপনে পরামর্শ করে স্থির করল যে, তিনি যে প্রাচীরের নীচে উপবিষ্ট আছেন, এক ব্যক্তি সেই প্রাচীরের উপরে উঠে একটি বিরাট ও ভারী পাথর তাঁর উপর ছেড়ে দিবে, যাতে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তৎক্ষণাৎ ওহীর মাধ্যমে এই চক্রান্তের বিষয় অবগত হয়ে গেলেন। তিনি সেস্থান ত্যাগ করে চলে এলেন এবং ইহুদীদেরকে বলে পাঠালেন ঃ তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তি লংঘন করেছ। অতএব, তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেয়া হল। এই সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। এই সময়ের পর কেউ এস্থানে দৃষ্টিগোচর হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। বনূ–নুযায়ের মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে সম্মত হলে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক তাদেরকে বাধা দিয়ে বলল ঃ তোমরা এখানেই থাক। অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার অধীনে দুই হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী আছে। তারা প্রাণ দিবে, কিন্তু তোমাদের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দিবে না। রূহুল–মা'আনীতে আছে, এ ব্যাপারে ওদিয়া ইবনে–মালেক, মুয়ায়েদ এবং রায়েসও আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই–এর সাথে শরীক ছিল। বনূ–নুযায়ের তাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে সদর্পে বলে পাঠাল ঃ আমরা কোথাও যাব না। আপনি যা করতে পারেন, করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে বনূ–নুযায়ের গোত্রকে আক্রমণ করলেন। বনূ–নুযায়ের দুর্গের ফটক বন্ধ করে বসে রইল এবং মুনাফিকরাও আত্মগোপন করল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করলেন এবং তাদের খর্জুর বৃক্ষে আগুন ধরিয়ে দিলেন এবং কিছু কর্তন করিয়ে দিলেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা নির্বাসনদণ্ড মেনে নিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই অবস্থায়ও তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করে আদেশ দিলেন, আসবাবপত্র যে পরিমাণ সঙ্গে নিয়ে যেতে পার, নিয়ে যাও। তবে কোন অস্ত্র–শস্ত্র সঙ্গে নিতে পারবেনা। এগুলো বাজেয়াপ্ত করা হবে। সে মতে বনূ–নুযায়রের কিছু লোক সিরিয়ায় এবং কিছু লোক খয়বরে চলে গেল। সংসারের প্রতি অসাধারণ মোহের কারণে তারা গৃহের কড়ি–কাঠ, তক্তা ও কপাট পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। ওহুদ যুদ্ধের পর চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে তাদেরকে পুনরায় অন্যান্য ইহুদীর সাথে খয়বর থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এই নির্বাসনদ্বয়ই 'প্রথম সমাবেশ' ও 'দ্বিতীয়সমবেশ' নামে অভিহিত।—(যাদুল মা'আদ)

সূরা হাশরের বৈশিষ্ট্য ও বনূ–নুযায়ের গোত্রের ইতিহাস ঃ সমগ্র সূরা হাশর ইহুদী বনূ–নুযায়ের গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।—(ইবনে–ইসহাক) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই সূরার নামই 'সূরা বনূ–নুযায়ের' বলতেন।—(ইবনে কাসীর) বনূ–নুযায়ের হযরত হারূন (আঃ) –এর সন্তান–সন্ততিদের মধ্যে একটি ইহুদী গোত্র। তাদের পিতৃপুরুষগণ তওরাতের পণ্ডিত ছিলেন। তওরাতে খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সাঃ)–এর সংবাদ, আকার–অবয়ব ও আলামত বর্ণিত আছে এবং তাঁর মদীনায় হিজরতের কথাও উল্লেখিত আছে। এই পরিবার শেষনবী (সাঃ)–এর সাহচর্যে থাকার আশায় সিরিয়া থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাদের বর্তমান লোকদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক তওরাতের পণ্ডিত ছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর মদীনায় আগমনের পর তাঁকে আলামত দেখে চিনেও নিয়েছিল যে, ইনিই শেষনবী (সাঃ) কিন্তু তাদের ধারণা ছিল যে, শেষনবী হযরত হারূন (আঃ)–এর বংশধরদের মধ্যে তাদের পরিবার থেকে আবির্ভূত হবেন। তা না হয়ে শেষনবী প্রেরিত হয়েছেন বনী–ইসরাঈলের পরিবর্তে বনী–ইসমাঈলের বংশে। এই প্রতিহিংসা তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা দিল। এতদসত্ত্বেও তাদের অধিকাংশ লোক মনে মনে জানত এবং চিনত যে, ইনিই শেষনবী। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিস্ময়কর বিজয় এবং মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় দেখে তাদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর স্বীকারোক্তি তাদের মুখে শোনাও গিয়েছিল, কিন্তু এই বাহ্যিক জয়–পরাজয়কে সত্য ও মিথ্যা চিনার মাপকাঠি করাটাই ছিল অসার ও দুর্বলভিত্তি। ফলে ওহুদ যুদ্ধের প্রথমদিকে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় দেখা দিল এবং কিছু সাহাবী শহীদ হলেন, তখন তাদের বিশ্বাস টলটলায়মান হয়ে গেল। এরপরই তারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব শুরু করে দিল।

এর আগে ঘটনা এই হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনা পৌঁছে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে সর্বপ্রথম মদীনায় ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইহুদী গোত্রসমূহের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না এবং কোন আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না। তারা

আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে সাহায্য করবে। শান্তিচুক্তিতে আরও অনেক ধারা ছিল। 'সীরত ইবনে-হেশামে' এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এমনিভাবে বনূ-নুযায়েরসহ ইহুদীদের সকল গোত্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে বনূ-নুযায়েরের বসতি, দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং বাগ-বাগিচা ছিল।

ওহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত তাদেরকে বাহ্যতঃ এই শান্তিচুক্তির অনুসারী দেখা যায়। কিন্তু ওহুদ যুদ্ধের পর তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন দূরভিসন্ধি শুরু করে দেয়। এই বিশ্বাসঘাতকতার সূচনা এভাবে হয় যে, বনূ-নুযায়রের জনৈক সর্দার কা'ব ইবনে-আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর আরও চল্লিশ জন ইহুদীকে সাথে নিয়ে মক্কা পৌঁছে এবং ওহুদ যুদ্ধ ফেরত কোরায়শী কাফেরদের সাথে সাক্ষাত করে। দীর্ঘ আলোচনার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চুক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত হয়। চুক্তিটি পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ চল্লিশ জন ইহুদীসহ এবং প্রতিপক্ষের আবু সুফিয়ান চল্লিশ জন কোরায়শী নেতাসহ কাবা গৃহে প্রবেশ করে এবং বায়তুল্লাহ্র গেলাফ স্পর্শকরতঃ পারস্পরিক সহযোগিতা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করে।

চুক্তি সম্পাদনের পর কা'ব ইবনে-আশরাফ মদীনায় ফিরে এলে জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং চুক্তির বিবরণ বলে দেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যার আদেশ জারি করেন এবং মুহাম্মদ ইবনে-মাসলামা (রাঃ) সাহাবী তাকে হত্যা করেন।

এরপর বনূ-নুযায়রের আরও অনেক চক্রান্ত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অবহিত হতে থাকেন। তন্মধ্যে একটি উপরে শানে-নুযূলে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-কে হত্যার চক্রান্ত করে। যদি ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাৎক্ষণিকভাবে এই চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত না হতেন, তবে তারা হত্যার এই ষড়যন্ত্রে সফলকাম হয়ে যেত। কেননা, যে গৃহের নীচে তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বসিয়েছিল, তার ছাদে চড়ে একটি প্রকাণ্ড ভারী পাথর তাঁর মাথায় ছেড়ে দেয়ার পরিকল্পনা প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে ব্যক্তি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছিল, তার নাম ওমর ইবনে-জাহ্হাশ, আল্লাহ্ তাআলার হেফাযতের কারণে এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর ঘটনা ঃ শানে-নুযুলের ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই হত্যাকাণ্ডের রক্ত বিনিময় সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। এ ব্যাপারেই বনূ-নুযায়রের চাঁদা লাভ করার জন্যে তিনি তাদের জনপদে গমন করেছিলেন। এর পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে-কাসীর লিখেন ঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের ষড়যন্ত্র ও উৎপীড়নের কাহিনী অতিদীর্ঘ। তন্মধ্যে বীরে-মাউনার ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে সুবিদিত। একবার কিছু সংখ্যক মুনাফিক ও কাফের তাদের জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে একদল সাহাবী প্রেরণ করার আবেদন করে। তিনি সত্তর জন সাহাবীর একটি দল তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পরে জানা যায় যে, এটা নিছক একটা চক্রান্ত ছিল। কাফেরেরা মুসলমানগণকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং এতে তারা সফলও হয়ে যায়। সাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র আমর ইবনে যমীর কোনরূপে পলায়ন করতে সক্ষম হন। যিনি এইমাত্র কাফেরদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর উনসত্তর জন সঙ্গীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন, কাফেরদের মোকাবেলায় তাঁর মনোবৃত্তি কি হবে, তা অনুমান করা কারও পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়। ঘটনাক্রমে মদীনায় ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে তিনি দুইজন কাফেরের মুখোমুখী হন। তিনি কালবিলম্ব না করে উভয়কে হত্যাকরেন। পরে জানা যায় যে, তারা ছিল বনী-আমের গোত্রের লোক, যাদের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর শান্তিচুক্তি ছিল।

لِأَوَّلِ الْحَشْرِ -বনূ-নুযায়রের এই নির্বাসনকে কোরআন পাক 'আউয়ালে হাশর' তথা প্রথম সমাবেশ আখ্যা দিয়েছে। এর এক কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাচীনকাল থেকে তারা একজায়গায় বসবাস করত। স্থানান্তর ও নির্বাসনের ঘটনা তাদের জীবনে এই প্রথমবার সংঘটিত হয়েছিল। এর আরও একটি কারণ এই যে, ইসলামের ভবিষ্যৎ প্রকৃত নির্দেশ ছিল আরব উপদ্বীপকে অমুসলিমদের থেকে মুক্ত করতে হবে, যাতে এটা ইসলামের এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়। এর ফলে নির্বাসনের আকারে দ্বিতীয় সমাবেশ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। এটা হযরত ফারূকে আযম (রাঃ)-এর খেলাফতকালে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে এবং নির্বাসিত হয়ে যারা খয়বরে বসতি স্থাপন করেছিল তাদেরকে আরব উপদ্বীপ ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এদিক দিয়ে বনূ-নুযায়রের এই নির্বাসন, প্রথম সমাবেশ এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে সংঘটিত নির্বাসন, দ্বিতীয় সমবেশ নামে অভিহিত হয়।

فَأَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا -এর শাব্দিক অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের কাছে এমনভাবে আগমন করলেন, যা তারা কল্পনাও করেনি। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্র আগমন করার অর্থ তাঁর নির্দেশ ও নির্দেশবাহক ফেরেশতা আগমন করা।

يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِأَيْدِيْهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ -গৃহের দরজা, কপাট ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের গৃহ ধ্বংস করছিল। পক্ষান্তরে তারা যখন দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল, তখন তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্যে মুসলমানগণ তাদের গৃহ ও গাছপালা ধ্বংস করছিল।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِّ اللّٰهَ فَإِنَّ اللّٰهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤﴾ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ
أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَىٰ
رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلٰكِنَّ
اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾
مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ
مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ۚ
أُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ
قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

(৪) এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। (৫) তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্রই আদেশে এবং যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন। (৬) আল্লাহ্ বনু-বনুযায়রের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ্ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৭) আল্লাহ্ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহ্র, রসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। (৮) এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ্ তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। (৯) যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ

وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ – لِينَةٍ শব্দের অর্থ খর্জুর বৃক্ষ। বনু-নুযায়রের খর্জুর বাগান ছিল। তারা যখন দুর্গের ভিতরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন কিছু কিছু মুসলমান তাদেরকে উত্তেজিত ও ভীত করার জন্যে তাদের কিছু খর্জুর বৃক্ষ কর্তন করে অথবা অগ্নিসংযোগ করে খতম করে দিলেন। অপর কিছু সংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআল্লাহ্ বিজয় তাদের হবে এবং পনিণামে এসব বাগ-বাগিচা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবে। এই মনে করে তাঁরা বৃক্ষ কর্তনে বিরত রইলেন। এটা ছিল মতের গরমিল। পরে যখন তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হল, তখন বৃক্ষ কর্তনকারীরা এই মনে করে চিন্তিত হলেন যে, যে বৃক্ষ পরিণামে মুসলমানদের হবে, তা কর্তন করে তারা অন্যায় করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হল। এতে উভয়দলের কার্যক্রমকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে।

وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ – أَفَاءَ শব্দটি فيء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। দুপুরের পরবর্তী পূর্বদিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছায়াকেও فيء বলা হয়। কাফেরদের কাছ থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের স্বরূপ এই যে, কাফেররা বিদ্রোহী হওয়ার কারণে তাদের ধন-সম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের মালিকানা থেকে বের হয়ে প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তাআলার দিকে ফিরে যায়। তাই এগুলো অর্জনকে শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ তো এই ছিল যে, কাফেরদের কাছ থেকে অর্জিত সকল প্রকার ধন-সম্পর্কেই فيء বলা হত। কিন্তু যুদ্ধ ও জেহাদের মাধ্যমে যে ধন-সম্পদ অর্জিত হয়, তাতে মানুষের কর্ম ও অধ্যবসায়েরও এক প্রকার দখল থাকে। তাই এই প্রকার ধন-সম্পদকে 'গনীমত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ –কিন্তু যে ধন-সম্পদ অর্জনে যুদ্ধ ও জেহাদের প্রয়োজন পড়ে না, তাকে فيء শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, যে ধন-সম্পদ যুদ্ধ ও জেহাদ ব্যতিরেকে অর্জিত হয়েছে, তা মুজাহিদ ও যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের আইনানুযায়ী বণ্টন করা হবে না। বরং তা পুরোপুরিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এখতিয়ারে থাকবে। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা করবেন দেবেন, অথবা নিজের জন্যে রাখবেন। তবে যে কয়েক প্রকার হকদার নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যেই এই সম্পদের বণ্টন সীমিত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছেঃ

مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ এখানে أَهْلِ الْقُرَىٰ বলে বনু- নুযায়ের এবং তাদের মত বনু-কোরায়যা ইত্যাদি গোত্র বোঝানো হয়েছে, যাদের ধন-সম্পদ যুদ্ধ ব্যতিরেকেই অর্জিত হয়েছিল। এরপর পাঁচ প্রকার হকদারদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব আয়াতে উপরোক্ত প্রকার ধন-সম্পদের বিধান, হকদার ও হকদারদের মধ্যে বণ্টন করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আনফালের শুরুতে গনীমতের মাল ও ফায়-এর মালের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জেহাদের ফলশ্রুতিতে যে ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাই গনীমতের মাল

এবং যুদ্ধ ও জেহাদ ব্যতিরেকে যা অর্জিত হয়, তা ফায়-এর মাল। কাফেররা যে ধন-সম্পদ রেখে পলায়ন করে কিংবা যা সম্মতিক্রমে জিযিয়া, খারাজ কিংবা বাণিজ্যিক ট্যাক্সের আকারে প্রদান করে, সবই ফায়-এর অন্তর্ভুক্ত।

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ —যে সম্পদ পরস্পরে আদান-প্রদান হয়, তাকে دُوْلَةً বলা হয়।—(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই যে, উপরোক্ত ধন-সম্পদের হকদার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যাতে এই সম্পদ কেবল তোমাদের ধনী ও বিত্তশালীদের মধ্যকার পুঞ্জীভূত সম্পদ না হয়ে যায়। এতে মূর্খতাযুগের একটি কুপ্রথার মূলোৎপাটনের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কু-প্রথা ছিল এই যে, এ ধরনের সকল ধন-সম্পদ কেবল বিত্তশালীরাই কুক্ষিগত করে নিত এবং এতে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের কোন অংশ থাকত না।

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللهَ

-এই আয়াত ফায়-এর মাল বণ্টন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর উপযুক্ত অর্থ এই যে, ফায় এর মাল সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা হকদারদের শ্রেণী বর্ণনা করেছেন ঠিক, কিন্তু তাদের মধ্যে কাকে কতটুকু দেয়া হবে, তা নির্ধারণ করা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুবিবেচনার উপর রেখে দিয়েছেন। তাই এই আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যাকে যে পরিমাণ দেন, তা সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ কর এবং যা দেন না, তা পেতে চেষ্টা করো না। অতঃপর وَاتَّقُوا اللهَ বলে এই নির্দেশকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ ব্যাপারে ভ্রান্ত ছলচাতুরীর মাধ্যমে অতিরিক্ত আদায় করে নিলেও আল্লাহ্ তাআলা সব খবর রাখেন। তিনি এজন্যে শাস্তি দেবেন।

রসূলের নির্দেশ কোরআনের নির্দেশের ন্যায় অবশ্য পালনীয় ঃ কিন্তু আয়াতের ভাষা ধন-সম্পদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং শরীয়তের বিধি-বিধানও এতে দাখিল আছে। তাই ব্যাপকভঙ্গিতে আয়াতের এই যে, যে কোন নির্দেশ অথবা ধন-সম্পদ অথবা অন্য কোন বস্তু তিনি কাউকে দেন, তা তার গ্রহণ করা উচিত এবং তদনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে তিনি যে বিষয় নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকা দরকার।

অনেক সাহাবায়ে কেরাম আয়াতের এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রত্যেক নির্দেশকে কোরআনের নির্দেশের অনুরূপ অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করেছেন। কুরতুবী বলেন ঃ আয়াতে اٰتٰى শব্দে বিপরীতে نهى শব্দ ব্যবহার করায় বোঝা যায় যে, এখানে اٰتٰى শব্দের অর্থ اَمَرَ অর্থাৎ, যা আদেশ করেন। কারণ এটাই نهى এর বিশুদ্ধ বিপরীত শব্দ। তবে কোরআন পাক এর পরিবর্তে اٰتٰى শব্দ এজন্যে ব্যবহার করেছে যাতে 'ফায়' এর মাল বণ্টন সম্পর্কিত বিষয়বস্তুও এতে শামিল থাকে। কারণ, এ প্রসঙ্গে আয়াতটি আনা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে এহরাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে দেখে তা খুলে ফেলতে আদেশ করেন। লোকটি বলল ঃ অপনি এ সম্পর্কে কোরআনের কোন আয়াত বলতে পারেন কি যাতে সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, এ সম্পর্কে আয়াত আছে অতঃপর তিনি وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ আয়াতটি পাঠ করে দিলেন। ইমাম শাফেয়ী একবার উপস্থিত লোকজনকে বললেন ঃ আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জওয়াব কোরআন থেকে দিতে পারি। জিজ্ঞাসা কর, যা জিজ্ঞাসা করতে চাও। এক ব্যক্তি আরয করল ঃ এক ব্যক্তি এহ্‌রাম অবস্থায় প্রজাপতি মেরে ফেলল, এর বিধান কি? ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করে হাদীস থেকে এর বিধান বর্ণনা করে দিলেন।—(কুরতুবী)।

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ —রুকূর শেষ পর্যন্ত এই কয়েকটি আয়াতে দরিদ্র মুহাজির, আনসার ও তাঁদের পরবর্তী সাধারণ উম্মত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাকরণিক দিক দিয়ে لِلْفُقَرَاءِ শব্দটি وَلِذِي الْقُرْبٰى থেকে بدل হয়েছে, যা পূর্বের আয়াতে আছে।—(মাযহারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের আয়াতে সাধারণতঃ এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরগণকে অভাবগ্রস্ততার কারণে ফায়-এর মালের হকদার গণ্য করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যদিও সকল দরিদ্র ও মিসকীন এই মালের হকদার, কিন্তু তাদের মধ্যে দরিদ্র মুহাজির ও আনসারগণ অগ্রগণ্য। কারণ, তাঁদের ধর্মীয় খেদমত এবং ব্যক্তিগত গুণ-গরিমা সুবিদিত।

মুহাজিরদের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ এতে মুহাজিরগণের প্রথম গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁরা স্বদেশ ও সহায়সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তাঁরা মুসলমান এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সমর্থক ও সাহায্যকারী শুধু এই অপরাধে মক্কার কাফেররা তাঁদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাতৃভূমি, ধন-সম্পদ ও বাস্তু-ভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। তাঁদের কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটে পাথর বেঁধে নিতেন এবং কেউ কেউ শীত বস্ত্রের অভাবে গর্ত খনন করে তাতে শীতের দাপট থেকে আত্মরক্ষা করতেন।—(মাযহারী, কুরতুবী)।

মুহাজিরগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا অর্থাৎ, তাঁরা কোন জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং হিজরত করে মাতৃভূমি ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করেননি ; কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিই তাঁদের কাম্য ছিল। এ থেকে তাঁদের পূর্ণ আন্তরিকতা বোঝা যায়। فَضْل শব্দটি প্রায়শঃ পার্থিব নেয়ামতের জন্যে এবং وَرِضْوَانٌ শব্দটি পারলৌকিক নেয়ামতের জন্যে ব্যবহৃত হয়। কাজেই অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁরা তাঁদের সাবেক ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে এখন ইসলামের ছায়াতলে সাংসারিক প্রয়োজন এবং পরকালের নেয়ামত কামনা করছেন।

মুহাজিরগণের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে ঃ وَيَنْصُرُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ, আল্লাহ্ ও রসূলকে সাহায্য করার জন্যে তাঁর উপরোক্ত সবকিছু করেছেন। আল্লাহ্ তাআলাকে সাহায্য করার অর্থ তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করা। এ ক্ষেত্রে তাঁদের ত্যাগ ও তিতীক্ষা বিস্ময়কর।

তাঁদের চতুর্থ গুণ হচ্ছে ঃ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ —অর্থাৎ, তাঁরাই কথা ও কাজে সত্যবাদী। ইসলামের কলেমা পাঠ করে তাঁরা আল্লাহ্ তাআলা ও রসূলের সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এই আয়াত সকল মুহাজির সাহাবী সত্যবাদী বলে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে। অতএব যে ব্যক্তি তাঁদের কাউকে মিথ্যাবাদী বলে, সে এই আয়াত অস্বীকার করার কারণে মুসলমান হতে

পারে না। নাউযুবিল্লাহ্! রাফেযী সম্প্রদায় তাঁদেরকে মুনাফিক আখ্যা দেয়। এটা এই আয়াতের সুস্পষ্ট লংঘন। রসূলে করীম (সাঃ) এই ফকীর মুহাজিরগণের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করতেন। এতেই বোঝা যায় যে, হুযুরের কাছে তাঁদের কি মর্যাদা ছিল।—(মাযহারী)।

আনসারগণের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ – تَبَوَّءُو শব্দের অর্থ অবস্থান গ্রহণ করা। دار বলে হিজরতের স্থান তথা মদীনা তাইয়েবা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) মদীনাকে দুনিয়ার সকল শহর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, দুনিয়ার যেসব শহরে ইসলাম পৌছেছে ও প্রসার লাভ করেছে, সেগুলো জেহাদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে; এমনকি, মক্কা মোকাররমাও। একমাত্র মদীনা শহরই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঈমান ও ইসলামকে বুকে ধারণ করেছে।—(কুরতুবী)।

আয়াতে تَبَوَّءُو ক্রিয়াপদের পর دار এর সাথে ঈমানও উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অবস্থান গ্রহণ কোন স্থান বা জায়গাতেই শুধু হতে পারে। ঈমান কোন জায়গা নয় যে, এতে অবস্থান গ্রহণ করা হবে। তাই কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে خَلَصُوا অথবা تمكنوا ক্রিয়াপদ উহ্য আছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন, ঈমানে খাঁটি ও পাকাপোক্ত হয়েছেন। এখানে এরূপও হতে পারে যে, ঈমানকে রূপক ভঙ্গিতে জায়গা ধরে নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। مِنْ قَبْلِهِمْ অর্থাৎ মুহাজিরগণের পূর্বে। এতে আনসারগণের একটি শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তা এই যে, যে শহর আল্লাহ্ তাআলার কাছে 'দারুল-হিজরত' ও দারুল ঈমান' হওয়ার ছিল, তাতে তাঁদের অবস্থান ও বসতি মুহাজিরগণের পূর্বেই ছিল। মহাজিরগণের এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তাঁরা ঈমান কবুল করে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আনসারগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ অর্থাৎ, তাঁরা তাদেরকে ভালবাসে, যারা হিজরত করে তাদের শহরে আগমন করেছেন। এটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের রুচির পরিপন্থী। সাধারণতঃ লোকেরা এহেন ভিটা-মাটিহীন দুর্গত মানুষকে স্থান দেয়া পছন্দ করে না। সর্বত্রই দেশী ও ভিনদেশীর প্রশ্ন উঠে। কিন্তু আনসারগণ কেবল তাঁদেরকে স্থানই দেননি, বরং নিজ নিজ গৃহে আবাদ করেছেন, নিজেদের ধন-সম্পদে অংশীদার করেছেন এবং অভাবনীয় ইযযত ও সম্ভ্রমের সাথে তাঁদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক একজন মুহাজিরকে জায়গা দেয়ার জন্যে এক সাথে কয়েকজন আনসারী আবেদন করেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লটারীর মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি করতে হয়েছে।—(মাযহারী)।

তাঁদের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে ঃ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا এই বাক্যের সম্পর্ক একটি বিশেষ ঘটনার সাথে, যা বনূ-নুযায়েরের নির্বাসন এবং তাদের বাগান ও গৃহের উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সংঘটিত হয়েছিল।

উল্লেখিত আয়াতে حَاجَةً বলে প্রয়োজনের বস্তু এবং مِّمَّا أُوتُوا -এর সর্বনাম দ্বারা মুহাজিরগণকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, এই বণ্টনে যা কিছু মুহাজিরগণকে দেয়া হল, মদীনার আনসারগণ সানন্দে তা গ্রহণ করে নিলেন ; যেন তাঁদের এসব জিনিসের কোন প্রয়োজন ছিল না। মুহাজিরগণকে দেয়াকে খারাপ মনে করা অথবা অভিযোগ করার তো সামান্যতম কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এর মোকবেলায় যখন বাহরাইন বিজিত হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রাপ্ত ধন-সম্পদ সম্পূর্ণই আনসারগণের মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দিতে চাইলেন ; কিন্তু তাঁরা তাতে রাযী হলেন না, বরং বললেন ঃ আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুহাজির ভাইগণকেও এই ধন-সম্পদ থেকে অংশ না দেয়া হয়।—(বোখারী, ইবনে-কাসীর)।

আনসারগণের চতুর্থ গুণ এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ — خَصَاصَةٌ শব্দের অর্থ দারিদ্র্য ও উপবাস। ايثار এর অর্থ অপরের বাসনা ও প্রয়োজনকে নিজের বাসনা ও প্রয়োজনের অগ্রে রাখা। আয়াতের অর্থ এই যে, আনসারগণ নিজেদের উপর মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দিতেন। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাঁদের প্রয়োজন মেটাতেন ; যদিও নিজেরাও অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ছিলেন।

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ আনসারগণের আত্মত্যাগ ও আল্লাহ্ তাআলার পথে সবকিছু বিসর্জন দেয়ার কথা বর্ণনা করার পর সাধারণ বিধি হিসেবে বলা হয়েছে যে, যারা মনের কার্পণ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তারাই আল্লাহ্ তাআলার কাছে সফলকাম। بخل ও شُحّ শব্দদ্বয় প্রায় সমঅর্থবোধক। তবে شُحّ শব্দের মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয্য আছে। ফলে এর অর্থ অতিশয় কৃপণতা। যাকাত, ফিতরা, ওশর, কোরবানী ইত্যাদি আল্লাহ্ তাআলার ওয়াজেব হক আদায়ের অথবা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ অভাবগ্রস্ত পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বান্দার ওয়াজিব হক আদায়ের কৃপণতা করা হলে তা নিশ্চিতরূপে হারাম। যে কৃপণতা মুস্তাহাব বিষয় ও দান খয়রাতের ফযীলত অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়, তা মকরূহ ও নিন্দনীয় এবং যা প্রথাগত কাজে প্রতিবন্ধক হয়, তা শরীয়তের আইনে কৃপণতা নয়।

কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা খুবই নিন্দনীয় অভ্যাস। কোরআন ও হাদীসে জোরালো ভাষায় এসবের নিন্দা করা হয়েছে এবং যারা এসব বিষয় থেকে মুক্ত, তাদের জন্যে সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে। উপরে আনসারগণের যে গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তাঁরা কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত ছিলেন।

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا
الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا
يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ
اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ
قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١١﴾ لَئِنْ اُخْرِجُوْا
لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ
لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۟ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢﴾ لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً
فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٣﴾
لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ
جُدُرٍ ؕ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ؕ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ
شَتّٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ
قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾

(১০) আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। (১১) আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফের ভাইদেরকে বলে ঃ তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চিয়ই মিথ্যাবাদী। (১২) যদি তারা বহিস্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফেররা কোন সাহায্য পাবে না। (১৩) নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। (১৪) তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচণ্ড হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন ; কিন্তু তাদের অন্তর শতধাবিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কাণ্ডজ্ঞানহীন সম্প্রদায়। (১৫) তারা সেই লোকদের মত, যারা তাদের নিকট অতীতে নিজেদের কর্মের শাস্তিভোগ করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৬) তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে ঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুহাজির ও আনসারগণের পর উম্মতের সাধারণ মুসলমান ঃ وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ —এই আয়াতের بعد অর্থে সাহাবায়ে কেরাম মুহাজির ও আনসারগণের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান শামিল আছে এবং এই আয়াত তাদের সবাইকে 'ফায়'-এর মালে হকদার সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) ইরাক, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি বড় বড় শহর অধিকার করার পর এদের সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করেননি ; বরং এগুলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সাধারণ ওয়াকফ হিসেবে রেখে দিয়েছেন, যাতে এসব সম্পত্তির আমদানি ইসলামী বায়তুল-মালে জমা হয় এবং তা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানগণ উপকৃত হয়। কোন কোন সাহাবী তাঁর কাছে বিজিত সম্পত্তি বণ্টন করে দেয়ার আবেদন করলে তিনি এই আয়াতের বরাত দিয়ে জওয়াব দেন যে, আমার সামনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রশ্ন না থাকলে আমি যে দেশই অধিকার করতাম, তার সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম, যেমন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খয়বরের সম্পত্তি বণ্টন করে দিয়েছিলেন। এসব সম্পত্তি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ মুসলমানদের জন্যে কি অবশিষ্টথাকবে?—(মালেক-কুরতুবী)।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালবাসা ও মাহাত্ম্য অন্তরে পোষণ করা মুসলমানদের সত্যপন্থী হওয়ার পরিচায়ক ঃ এস্থলে আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—মুহাজির, আনসার ও অবশিষ্ট সাধারণ মুসলমান। মুহাজির ও আনসারগণের বিশেষ গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বও এস্থলে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলীর মধ্য থেকে মাত্র একটি বিষয় এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সাহাবায়ে কেরামের ঈমানে অগ্রগামিতা এবং তাদের কাছে ঈমান পৌঁছানোর মাধ্যম হওয়ার গুণটিকে সম্যক বুঝে এবং সবার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে। এছাড়া নিজেদের জন্যেও এরূপ দোয়া করে ঃ আল্লাহ্ তাআলা আমাদের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না।

এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলমানদের ঈমান ও ইসলাম কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্ম্য ও ভালবাসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাঁদের জন্যে দোয়া করা। যার মধ্যে এই শর্ত অনুপস্থিত, সে মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। এ কারণেই হযরত মুসাব ইবনে সা'দ (রাঃ) বললেন ঃ উম্মতের সকল মুসলমান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে দুই শ্রেণী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ; অর্থাৎ, মুহাজির ও আনসার। এখন সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত পোষণকারী এক শ্রেণী বাকী রয়ে গেছে। তোমরা যদি উম্মতের মধ্যে কোন আসন কামনা কর, তবে এই তৃতীয় শ্রেণীতে দাখিল হয়ে যাও।

হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে (তাঁর শাহাদতের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর) প্রশ্ন করেছিল। তিনি পাল্টা প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত? সে নেতিবাচক উত্তর দিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তবে কি আনসারগণের একজন? সে বলল ঃ না। হযরত হুসাইন (রাঃ) বললেন ঃ এখন তৃতীয় আয়াত وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ বাকী রয়ে গেছে। তুমি যদি হযরত ওসমান গনী (রাঃ) সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও

সংশয় সৃষ্টি করতে চাও, তবে এই তৃতীয় শ্রেণী থেকেও খারিজ হয়ে যাবে।

কুরতুবী বলেন ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালবাসা রাখা আমাদের জন্যে ওয়াজেব। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে মন্দ বলে অথবা তাঁর সম্পর্কে মন্দ বিশ্বাস রাখে, মুসলমানদের 'ফায়'–এর মালে তার কোন অংশ নেই। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। যেহেতু ফায়–এর মালে প্রত্যেক মুসলমানের অংশ আছে, তাই যার অংশ বাদ পড়বে তার ইসলাম ও ঈমানই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা সকল মুসলমানকে সাহাবায়ে–কেরামের জন্যে এস্তেগফার ও দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ্ তাআলা জানতেন যে, তাঁদের পরস্পরে যুদ্ধ–বিগ্রহও হবে। তাই তাঁদের পারস্পরিক বাদানুবাদের কারণে তাঁদের মধ্য থেকে কারও প্রতি কুধারণা পোষণ করা কোন মুসলমানের জন্যে জায়েয নয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদের নবী (সাঃ)–এর মুখে শুনেছি ঃ এই উম্মত ততদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, যতদিন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে অভিশাপ ও ভর্ৎসনা না করে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ তুমি যদি কাউকে দেখ যে, কেউ কোন সাহাবীকে মন্দ বলছে, তবে তাকে বল ঃ যে তোমাদের মধ্য থেকে অধিক মন্দ, তার উপর আল্লাহ্ তাআলার লানত হোক। বলাবাহুল্য, অধিক মন্দ সাহাবী হতে পারেন না—যে তাঁকে মন্দ বলে সে–ই হবে। সারকথা এই যে, সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে মন্দ বলা লানতের কারণ।

আওয়াম ইবনে হাওশব বলেন ঃ এই উম্মতের পূর্ববর্তীগণ মানুষকে সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী বর্ণনা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন, যাতে মানুষের অন্তরে তাঁদের ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আমি এ ব্যাপারে তাঁদেরকে একনিষ্ঠভাবে ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে দেখেছি। তাঁরা আরও বলতেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে মতবিরোধ ও বাদানুবাদ সংঘটিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করো না ; করলে মানুষের ধৃষ্টতা বেড়ে যাবে—(কুরতুবী)।

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا.... —এটা বনূ–নুযায়রের দৃষ্টান্ত الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ কারা? এ সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এরা হচ্ছে বদরের কাফের যোদ্ধা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এরা ইহুদী বনূ–কায়নুকা। উভয়েরই অশুভ পরিণতি তথা নিহত, পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা তখন জন সমক্ষে ফুটে উঠেছিল। কেননা, বনূ–নুযায়রের নির্বাসনের ঘটনা বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় এবং বনূ–কায়নুকার ঘটনাও বদরের পরে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। বদরে মুশরিকদের সত্তর জন নেতা নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা চরম লাঞ্ছিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। অতএব, হযরত মুজাহিদ (রহঃ)–এর উক্তি অনুযায়ী ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ —বাক্যের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে। এটা পরকালের আগে দুনিয়াতেই তারা ভোগ করেছে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাসে (রাঃ)–এর উক্তি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ ইহুদী বনূ–কায়নুকা হলে তাদের ঘটনাও তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

বনূ কায়নুকার নির্বাসন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) মদীনায় আগমন করার পর মদীনার পার্শ্ববর্তী সবগুলো ইহুদী গোত্রের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এর এক শর্ত ছিল এই যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুসলমানদের কোন শত্রুকে সাহায্য করবে না। বনূ–কায়নুকাও এই শান্তিচুক্তির অধীনে ছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তারা চুক্তির বিপরীত কাজকর্ম শুরু করে দেয়। বদর যুদ্ধের সময় মক্কার কাফেরদের সাথে তাদের গোপন যোগসাজশ ও সাহায্যের কিছু ঘটনাও সামনে আসে। তখন কোরআন পাকের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ অর্থাৎ, চুক্তি সম্পাদনের পর যদি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা দেখা দেয়, তবে আপনি তাদের শান্তিচুক্তি ভণ্ডুল করে দিতে পারেন। বনূ–কায়নুকা নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে এই চুক্তি ভঙ্গ করে দিয়েছিল। তাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন এবং হযরত হামযা (রাঃ)–এর হাতে পতাকা দিলেন। মদীনা শহরে হযরত আবুল লুবাবা (রাঃ)–কে স্থলাভিষিক্ত করে তিনি নিজেও জেহাদে রওয়ানা হলেন। মুসলমান সৈন্যবাহিনী দেখে বনূ–কায়নুকা দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দুর্গ অবরোধ করে নিলেন। পনর দিন অবরুদ্ধ থাকার পর আল্লাহ্ তাআলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, তাদের বুঝতে বাকী রইল না যে, মোকাবেলা ফলপ্রসূ হবে না। অগত্যা তারা দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে বলল ঃ আমাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে সিদ্ধান্ত নিবেন, আমরা তাতেই সম্মত আছি।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের পুরুষকুলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেন ; কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক বাধ সাধল। সে চূড়ান্ত কাকুতি–মিনতি সহকারে তাদের প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাল। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঘোষণা করলেন ঃ তারা বসতি ত্যাগ করে চলে যাবে এবং তাদের ধন–সম্পত্তি যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে পরিগণিত হবে। এই মীমাংসা অনুযায়ী বনূ–কায়নুকা মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ার আমরুয়াত এলাকায় চলে গেল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অধ্যাদেশ অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের ধন–সম্পত্তি বন্টনকরতঃ একভাগ বায়তুলমালে এবং অবশিষ্ট চার ভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে বিলি করে দিলেন।

বদর যুদ্ধের পর এই প্রথম বায়তুলমালে গনীমতের পাঁচ ভাগের একভাগ জমা হল। এই ঘটনা হিজরতের বিশ মাস পর ১৫ই শাওয়াল তারিখে সংঘটিত হয়।

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ —এটা মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত, যারা বনূ–নুযায়রকে নির্বাসনের আদেশ অমান্য করতে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ যখন তাদেরকে অবরোধ করে নেয়, তখন কোন মুনাফিক সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়নি। কোরআন পাক শয়তানের একটি ঘটনা দ্বারা তাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছে। শয়তান মানুষকে কুফর করতে প্ররোচিত করেছিল এবং তার সাথে নানারকম ওয়াদা–অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু মানুষ যখন কুফরে লিপ্ত হল, তখন সে ওয়াদা ভঙ্গ করল।

আল্লাহ্ তাআলা জানেন শয়তানের এ ধরনের ঘটনা কত হয়ে থাকবে। তন্মধ্যে একটি ঘটনা তো স্বয়ং কোরআনে সূরা আনফালের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে ঃ

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

(১৭) অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই জালেমদের শাস্তি। (১৮) মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (১৯) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য। (২০) জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম। (২১) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (২২) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। (২৩) তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। (২৪) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ

এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। এতে শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণার মাধ্যমে অথবা মানবাকৃতিতে সামনে এসে মুশরিকদের মুসলমানদেরকে মোকাবেলায় উৎসাহিত করে এবং সাহায্যের আশ্বাস দেয়। কিন্তু যখন বাস্তবিকই মোকাবেলা শুরু হয়, তখন সাহায্য করতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানায়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে যদি এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে, তখন আপত্তি দেখা দেয় যে, এই ঘটনায় শয়তান বাহ্যতঃ কুফর করার আদেশ দেয়নি। তারা তো পূর্ব থেকেই কাফের ছিল। শয়তান কেবল তাদেরকে মোকাবেলায় একত্রিত হতে বলেছিল। এই আপত্তির জওয়াব এই যে, কুফরে অটল থাকতে বলা এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলাও কুফর করতে বলারই অনুরূপ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হাশরে শুরু থেকে কিতাবী, কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের অবস্থা, কাজ-কারবার ও তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তি বর্ণনা করার পর, সূরার শেষ পর্যন্ত মুমিনদেরকে হুঁশিয়ারী ও সৎকর্ম পরায়ণতার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উল্লেখিত প্রথম আয়াতে বলিষ্ঠভঙ্গিতে পরকালের চিন্তা ও তজ্জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ আছে। বলা হয়েছে ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ অর্থাৎ, মুমিনগণ, আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত পরকালের জন্যে কি প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এ আয়াতে কেয়ামত বোঝাতে গিয়ে لِغَدٍ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। এতে তিনটি ইঙ্গিত রয়েছে। প্রথম, সমগ্র ইহকাল পরকালে মোকাবেলায় স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ, এক দিনের সমান। হিসাব করলে একদিনের সমান হওয়াও কঠিন। কেননা, পরকাল চিরন্তন, যার কোন শেষ ও অন্ত নেই। মানব বিশ্বের বয়স তো কয়েক হাজার বছরই বলা হয়। যদি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি থেকে হিসাব করা হয়, তবে কয়েক লাখ বছর হয়ে যাবে। তবুও এটা সীমিত সময়কাল। অসীম ও অশেষ সময়কালের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না।

এক হাদীসে আছে —সারা দুনিয়া একদিন এবং এই দিনে আমাদের রোযা আছে। মানব সৃষ্টি থেকে শুরু করা হোক কিংবা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি থেকে, চিন্তা করলে উভয়টিই মানুষের জন্য গুরুত্ববহ নয় ; বরং প্রত্যেক ব্যক্তির দুনিয়া তার বয়সের বছর ও দিনগুলোই। এই বছর ও দিনগুলো পরকালের তুলনায় কত যে তুচ্ছ ও নগণ্য, তা প্রত্যেকেই অনুমান করতে পারে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত সুনিশ্চিত ; যেমন আজকের পর আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। কেউ এতে সন্দেহ করতে পারে না। এমনিভাবে দুনিয়ার পরে কিয়ামত ও পরকালের আগমনে কোন সন্দেহ নেই।

তৃতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। আজকের পর আগামীকাল যেমন দূরে নয়—খুব নিকটবর্তী, তেমনি দুনিয়ার পর কিয়ামতও খুব নিকটবর্তী।

কিয়ামত দুই প্রকার—সমগ্র বিশ্বের কিয়ামত ও ব্যক্তি বিশেষের কিয়ামত। প্রথমোক্ত কিয়ামতের অর্থ, আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধ্বংসপ্রাপ্তি। এটা লাখো বছর পরে হলেও পারলৌকিক সময়কালের তুলনায় নিকটবর্তীই। শেষোক্ত কিয়ামত, ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর সাথে সাথে সংঘটিত হয়। তাই বলা হয়েছে ঃ من مات فقد قامت قيامته অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মারা যায়, তার কিয়ামত তখনই কায়েম হয়ে যায়। কারণ, কবর থেকেই পরজগতের ক্রিয়াকর্ম শুরু হয়ে যায় এবং আযাব ও সওয়াবের নমুনা সামনে এসে যায়। কবরজগৎ যার অপর নাম বরযখ, এটা দুনিয়ার "ওয়েটিং রুম" (বিশ্রামাগার) সদৃশ। "ওয়েটিং রুম" ফার্স্ট ক্লাস থেকে নিয়ে থার্ড ক্লাসের যাত্রীদের জন্যে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। অপরাধীদের ওয়েটিং রুম হচ্ছে হাজত ও জেলখানা। এই বিশ্রামাগার থেকেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্তর ও মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারে। তাই মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের নিজস্ব কিয়ামত এসে যায়। আল্লাহ্ তাআলা মানুষের মৃত্যুকে একটি ধাঁ-ধার রূপ দিয়ে রেখেছেন। ফলে বড় বড় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণও এর নিশ্চিত সময় নিরূপণ করতে পারে না, বরং প্রতিটি মুহূর্তেই মানুষ আশংকা করতে থাকে যে, পরের ঘন্টাটি তার জীবদ্দশায় অতিবাহিত নাও হতে পারে, বিশেষতঃ বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাবলী একে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত করে দিয়েছে।

সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতকে আগামীকাল বলে উদাসীন মানুষকে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামতকে বেশী দূরে মনে করো না। কিয়ামত আগামীকালের মত নিকটবর্তী ; এমনকি আগামীকালের পূর্বেও এসে যাওয়া সম্ভবপর।

مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ —বলে সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার কর্ম বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি সৎকর্ম প্রেরণ করে, সে সওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে অসৎকর্ম প্রেরণ করে, সে সেখানে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হবে। এরপর وَاتَّقُوا اللّٰهَ বাক্যটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর এক কারণ তাকীদ করা এবং অপর সম্ভাব্য কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, প্রথম وَاتَّقُوا اللّٰهَ বলে খোদায়ী নির্দেশাবলী পালন করে পরকালের জন্যে সম্বল প্রেরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার وَاتَّقُوا اللّٰهَ বলে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যে সম্বল প্রেরণ কর, তা কৃত্রিম ও পরকালে অচল কি না, তা দেখে নাও। পরকালে অচল সম্বল তাই, যা দৃশ্যতঃ সৎকর্ম, কিন্তু তা খাঁটিভাবে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে করা হয় না ; বরং নাম-যশ অথবা কোন মানসিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে করা হয় অথবা সেই আমল, যা দৃশ্যতঃ এবাদত হলেও ধর্মে তার কোন প্রমাণ না থাকার কারণে বেদআত ও পথভ্রষ্টতা। অতএব, দ্বিতীয় وَاتَّقُوا اللّٰهَ বাক্যের সারমর্ম এই যে, পরকালের জন্যে কেবল দৃশ্যতঃ সম্বল যথেষ্ট নয় ; বরং তা অচল কিনা তা দেখে প্রেরণ কর।

فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ —অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্ তাআলাকে ভুলে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই আত্মভোলা হয়ে গেছে। ফলে ভাল-মন্দের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ —এটা একটা দৃষ্টান্ত ; অর্থাৎ, যদি কোরআন পাহাড়ের ন্যায় কঠিন ও ভারী জিনিসের উপর অবতীর্ণ করা হত এবং পাহাড়কে মানুষের ন্যায় জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দেয়া হত, তবে পাহাড়ও কোরআনের মাহাত্ম্যের সামনে নত—বরং ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ খেয়াল-খুশী ও স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে তার স্বভাবজাত চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। সে কোরআন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। অতএব, এটা যেন এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। কারণ, বাস্তবে পাহাড়ের মধ্যে চেতনা নেই। কেউ কেউ বলেন ঃ পাহাড়, বৃক্ষ ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি বিদ্যমান আছে। কাজেই এটা কাল্পনিক নয়—বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টান্ত।—(মাযহারী)।

পরকালের চিন্তা ও কোরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর উপসংহারে আল্লাহ্ তাআলার কতিপয় পূর্ণত্ববোধক গুণ উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক দৃশ্য-অদৃশ্য ও উপস্থিত-অনুপস্থিত বিষয় পুরোপুরি জানেন। اَلْقُدُّوْسُ —এমনি সত্তা, যিনি প্রত্যেক দোষ থেকে মুক্ত এবং অশালীন বিষয়াদি থেকে পবিত্র। اَلْمُؤْمِنُ —এই শব্দটি মানুষের জন্যে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় আল্লাহ্ ও রসূলে বিশ্বাসী। আল্লাহ্ তাআলার জন্যে ব্যবহার করলে অর্থ হয় নিরাপত্তা বিধায়ক অর্থাৎ, তিনি ঈমানদারগণকে সর্বপ্রকার আযাব ও বিপদ থেকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দান করেন।

اَلْمُهَيْمِنُ —এর অর্থ দেখাশোনাকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ (রহঃ) তাই বলেছেন।—(মাযহারী, কামূস)।

اَلْجَبَّارُ —প্রতাপশালী মহান। এই শব্দটি جبر থেকেও উদ্ভূত হতে পারে, যার অর্থ ভাঙ্গা হাড় ইত্যাদি সংযোগ করা। এ কারণেই ভাঙ্গা হাড় জোড়া দেয়ার পর যে পট্টি বাঁধা হয়, তাকে جبيرة বলা হয়। অতএব, অর্থ এই যে, তিনি প্রত্যেক ভাঙ্গা ও অকেজো বস্তুর সংস্কারক।—(মাযহারী)।

اَلْمُتَكَبِّرُ —এটা كبرياء ও تكبر থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বড়ত্ব, প্রত্যেক বড়ত্ব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার জন্যে নির্দিষ্ট। তিনি কোন বিষয়ে কারও মুখাপেক্ষী নন। যে মুখাপেক্ষী, সে বড় হতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অন্যের জন্যে এই শব্দটি দোষ ও গোনাহ্। কারণ, সত্যিকার বড় না হয়ে বড়ত্ব দাবী করা মিথ্যা এবং আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণে শরীক হওয়ার দাবী। তাই এটা আল্লাহ্ তাআলার জন্যে পূর্ণত্বের গুণ এবং অন্যের জন্যে মিথ্যা দাবী।

اَلْمُصَوِّرُ —অর্থাৎ, রূপদানকারী। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র সৃষ্টবস্তুকে আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ বিশেষ আকার ও আকৃতি দান করেছেন, যদ্দরুন এক বস্তু অপর বস্তু থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়েছে। আকাশস্থ ও পৃথিবীস্থ সকল সৃষ্টবস্তু বিশেষ আকারের মাধ্যমেই পরিচিত হয়। সৃষ্টবস্তুর অসংখ্য প্রকারের আলাদা আলাদা আকার-আকৃতি, মানুষের একই শ্রেণীর মধ্যে পুরুষ ও নারীর আকার-আকৃতিতে পার্থক্য, কোটি কোটি নারী ও পুরুষের চেহারায় এমন স্বতন্ত্র যে, একজনের মুখাবয়ব অন্যজনের সাথে মিলে না—এটা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই অপার শক্তির কারসাজি। এতে অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়। বড়ত্ব যেমন আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের

سُورَةُ الْمُمْتَحِنَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ
اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ
وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ
ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ
اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ① اِنْ
يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ
بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ② لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ③ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ
اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا
بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا
قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ
مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ④

সূরা আল-মুমতাহিনা

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১৩

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টিলাভের জন্যে এবং আমার পথে জেহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (২) তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফের হয়ে যাও। (৩) তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (৪) তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সংঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেন ঃ আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।

জন্যে বৈধ নয় এবং এটা একমাত্র তাঁরই গুণ, তেমনি চিত্র ও আকার-আকৃতি নির্মাণ অন্যের জন্যে বৈধ নয়। এটাও আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণে তাঁর সাথে অংশীদারিত্ব দাবী করার নামান্তর।

لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার উত্তম উত্তম নাম আছে। কোরআন পাকে এসব নামের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। সহীহ্ হাদীসসমূহে ৯৯টি নাম বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক হাদীসে সবগুলোই উল্লেখিত হয়েছে।

يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ —এই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা অবস্থার মাধ্যমে হলে তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়; কেননা, সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও করা অন্তর্নিহিত কারিগরি এবং আকার-আকৃতি নিজ নিজ অবস্থার মাধ্যমে অহর্নিশ স্রষ্টার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনে মশগুল আছে। সত্যিকার উক্তির মাধ্যমে তসবীহ্ পাঠও হতে পারে। কেননা, সুচিন্তিত অভিমত এই যে, প্রত্যেক বস্তুই নিজ নিজ সীমায় চেতনা ও অনুভূতি সম্পন্ন। জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার সর্বপ্রথম দাবী হচ্ছে স্রষ্টাকে চেনা ও তাঁর কৃতজ্ঞ হওয়া। অতএব, প্রত্যেক বস্তুর সত্যিকার তসবীহ্ পাঠ করা অসম্ভব নয়। তবে আমরা নিজ কানে তা শুনি না। একারণেই কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ —অর্থাৎ, তোমরা তাদের তসবীহ্ শোন না, বুঝ না।

সূরা হাশরের সর্বশেষ আয়াতসমূহের উপকারিতা ও কল্যাণ ঃ তিরমিযীতে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে তিন বার اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم পাঠ করার পর সুরা হাশরের هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ থেকে শেষপর্যন্ত সর্বশেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্যে সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্যে রহমতের দোয়া করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু হাসিল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সে-ও এই মর্তবা লাভ করবে।—(মাযহারী)।

সূরা আল-মুমতাহিনা

এই সূরার শুরুভাগে কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অংশ অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল ঃ তফসীর কুরতুবীতে কুশায়রী ও সা'লাবীর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধের পর মক্কাবিজয়ের পূর্বে মক্কার সারা নাম্নী একজন গায়িকা নারী প্রথমে মদীনায় আগমন করে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে বলল ঃ না। আবার জিজ্ঞাসা করা হল ঃ তবে কি তুমি মুসলমান হয়ে এসেছ? সে এরও নেতিবাচক উত্তর দিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তা হলে কি উদ্দেশে আগমন করেছ? সে বলল ঃ আপনারা মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে।

আমি ঘোর বিপদে পড়ে ও অভাবগ্রস্ত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশে এখানে আগমন করেছি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি মক্কার পেশাদার গায়িকা। মক্কার সেই যুবকরা কোথায় গেল, যারা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে টাকা-পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করত? সে বলল ঃ বদর যুদ্ধের পর তাদের উৎসবপর্ব ও গান-বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকগণকে তাকে সাহায্য করার জন্যে উৎসাহ দিলেন। তারা তাকে নগদ টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল।

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কার কাফেররা হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এই গোপন তথ্য পূর্বাহ্নে মক্কাবাসীদের কাছে ফাঁস না হোক। এদিকে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হাতেব ইবনে আবী বালতায়া (রাঃ)। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশোদ্ভূত এবং মক্কায় এসে বসবাস অবলম্বন করেছিলেন। মক্কায় তাঁর স্বগোত্র বলতে কেউ ছিল না। মক্কায় বসবাসকালেই মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানগণ তখনও মক্কায় ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও অনেক সাহাবীর হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কাফেররা নির্যাতন চালাত এবং তাদেরকে উত্যক্ত করত। যেসব মুহাজিরের আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা কোনরূপে নিরাপদে ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তাঁর সন্তান-সন্ততিকে শত্রুর নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, মক্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তাঁর সন্তানদের উপর জুলুম করবে না। তাই গায়িকার মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন।

হাতেব স্বস্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাঁস করে দিলে তাঁর কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাফেরদেরকে জানিয়ে দেই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলে-পেলেদের হেফাযত হয়ে যাবে। সুতরাং হাতেব এই ভুলটি করে ফেললেন এবং মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে গায়িকা সারার হাতে সোপর্দ করলেন।—(কুরতুবী, মাযহারী)

এদিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, মহিলাটি এসময়ে রওযায়ে খাক নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

বোখারী ও মুসলিমে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে, আবু মুরসাদকে ও যুবায়র ইবনে আওয়ামকে আদেশ দিলেন, অশ্বে আরোহণ করে সেই মহিলার পশ্চাদ্ধাবন কর। তোমরা তাকে রওযায়ে খাকে পাবে। তার সাথে মক্কাবাসীদের নামে হাতেব ইবনে আবী বালতায়ার পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পত্রটি ফিরিয়ে নিয়ে আস। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমরা নির্দেশমত দ্রুতগতিতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেস্থানের কথা বলেছিলেন, ঠিক সেস্থানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম পত্রটি বের কর। সে বলল ঃ আমার কাছে কারও কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর তালাশ করে কোন চিঠি পেলাম না। আমরা মনে মনে বললাম ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সংবাদ ভ্রান্ত হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে পত্রটি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা তাকে বললাম ঃ হয় পত্র বের কর, না হয় আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে দিব।

অগত্যা সে নিরূপায় হয়ে পায়জামার ভিতর থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা পত্র নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে চলে এলাম। হযরত ওমর (রাঃ) ঘটনা শুনা মাত্রই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন ঃ এই ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও সকল মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য কাফেরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে। অতএব, অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাকে এই কাণ্ড করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? হাতের আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমার ঈমানে এখনও কোন তফাৎ হয়নি। ব্যাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মক্কাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার বাচ্চা-কাচ্চাদের কোন ক্ষতি করবে না। আমি ব্যতীত অন্য কোন মুহাজির এরূপ নেই, যার স্বগোত্রের লোক মক্কায় বিদ্যমান নেই। তাদের স্বগোত্রীয়রা তাদের পরিবার-পরিজনের হেফাযত করে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাতেবের জবানবন্দী শুনে বললেন ঃ সে সত্য বলেছে। অতএব, তার ব্যাপারে তোমরা ভাল ছাড়া মন্দ বলো না। হযরত ওমর (রাঃ) ঈমানের জোশে নিজ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাঁকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ্ তাআলা বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমা করার ও তাদের জন্যে জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। একথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আরয করলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলই আসল সত্য জানেন।—(ইবনে-কাসীর) কোন কোন রেওয়ায়েতে হাতেবের এই উক্তিও বর্ণিত আছে যে ; আমি একাজ ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্যে করিনি। কেননা, আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ই বিজয়ী হবেন। মক্কাবাসীরা জেনে গেলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুমতাহিনার শুরুভাগের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াত উপরোক্ত ঘটনার জন্যে হুশিয়ার করা হয় এবং কাফেরদের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হারাম সাব্যস্ত করা হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে, তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করবে। এতে উল্লেখিত ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ, এ ধরনের পত্র কাফেরদেরকে লিখা বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করারই নামান্তর। আয়াতে কাফের শব্দ বাদ দিয়ে 'আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রু বলে প্রথমতঃ এই নির্দেশের কারণ ও দলীল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের ও আল্লাহ্র শত্রুর কাছে বন্ধুত্ব আশা করা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ নয়। অতএব, এ থেকে বিরত থাক। দ্বিতীয়তঃ এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাফের যে পর্যন্ত কাফের থাকবে, সে কোন মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। সে আল্লাহ্র দুশমন। অতএব, যে মুসলমান আল্লাহ্ মহব্বত দাবী করে, তার সাথে কাফেরের বন্ধুত্ব কিরূপে সম্ভবপর?

وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ

এখানে حق বলে কোরআন অথবা ইসলাম বোঝানো হয়েছে। এই আয়াতে তাদের শত্রুতার আসল কারণ কুফর বর্ণনা করার পর তাদের বাহ্যিক শত্রুতাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা তোমাদেরকে এবং তোমাদের রসূলকে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছেন। এই বহিষ্কারের কারণ কোন পার্থিব বিষয় নয়। বরং একমাত্র তোমাদের ঈমানই এর কারণ ছিল। অতএব, একথা আর গোপন রইল না যে, তোমরা যে পর্যন্ত মুমিন থাকবে তারা তোমাদের বন্ধু হতে পারে না। হাতেব মনে করেছিল যে, তাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করলে তারা তা পরিবার-পরিজনের হেফাযত করবে। তার এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, ঈমানের কারণে তারা তোমাদের শত্রু। খোদা না করুন, তোমাদের ঈমান বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বন্ধুত্বের আশা করা ধোঁকা বৈ নয়।

إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের হিজরত যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র জন্যে ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে ছিল, তবে আল্লাহ্‌র শত্রু কাফেরদের কাছে এই আশা কিরূপে রাখা যায় যে, তারা তোমাদের খাতির করবে।

تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ

এতেও আরও বলা হয়েছে যে, যারা কাফেরদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব রাখে তারা যেন মনে না করে যে, তাদের এই কার্যকলাপ গোপন থেকে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কাজকর্মের খবর রাখেন; যেমন উল্লেখিত ঘটনায় তিনি তাঁর রসূলকে ওহীর মাধ্যমে অবগত করে চক্রান্ত ধরিয়ে দিয়েছেন।

إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ অর্থাৎ, সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তারা তোমাদের সাথে উদার ব্যবহার করবে, তাদের কাছে এরূপ প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। তারা যখনই তোমাদের উপর প্রাধান্য হাসিল করবে, তখনই তাদের বাহু ও রসনা তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া কোন দিকে প্রসারিত হবে না।

وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ এতে ইঙ্গিত আছে যে, যখন তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে, তখন তাদের বন্ধুত্ব কেবল তোমাদের ঈমানের বিনিময়ে লাভ করতে পারবে। তোমরা কুফরে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়তা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপকারে আসবে না। আল্লাহ্ তাআলা সেদিন এসব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবেন। সন্তানরা পিতা-মাতার কাছ থেকে ও পিতা-মাতারা সন্তানদের কাছ থেকে পলায়ন করবে। এতে হযরত হাতেবের ওযর খণ্ডন করা হয়েছে যে, যে সন্তানদের মহব্বতে তুমি একাজ করেছিলে, মনে রেখ, কিয়ামতের দিন তারা তোমার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছু গোপন নয়।

পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর সমস্ত জ্ঞাতিগোষ্ঠী মুশরিক ছিল। তিনি সবার সাথে শুধু সম্পর্কচ্ছেদই নয়—শত্রুতাও ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যে পর্যন্ত তোমরা বিশ্বাস স্থাপন না করবে এবং শিরক থেকে বিরত না হবে, সেই পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতার প্রাচীর অন্তরায় হয়ে থাকবে।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ থেকে حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

একটি সন্দেহের জওয়াব ঃ উপরের আয়াতে মুসলমানদেরকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উত্তম আদর্শ ও সুন্নত অনুসরণ করার জোর আদেশ দেয়া হয়েছে। ইবরাহীম (আঃ) তার মুশরিক পিতার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন বলেও প্রমাণিত আছে। সূরা তওবায় এর উল্লেখ আছে। অতএব, সন্দেহ হতে পারত যে, মুশরিক পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও মাগফেরাতের দোয়া করা ইবরাহিমী আদর্শের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা জায়েয হওয়া উচিত। তাই ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ থেকে একে ব্যতিক্রম প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, অন্যসব বিষয়ে ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ জরুরী, কিন্তু তাঁর এই কাজটির অনুসরণ মুসলমানদের জন্যে জায়েয নয়। إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ আয়াতের মর্ম তাই। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ওযর সূরা তওবায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পিতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া নিষেধাজ্ঞার পূর্বে করেছিলেন, অথবা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে করেছিলেন যে, তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান আছে, কিন্তু পরে যখন জানলেন যে, সে আল্লাহ্‌র দুশমন, তখন এবিষয় থেকেও নিজের বিমুখতা ঘোষণা করলেন। فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ আয়াতের উদ্দেশ্য তা-ই।

কোন কোন তফসীরবিদ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ কে বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, ইবরাহীম (আঃ) যে, পিতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করেছিলেন, এটা তাঁর আদর্শের পরিপন্থী নয়। কেননা, তিনি পিতা মুসলমান হয়ে গেছে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে দোয়া করেছিলেন। এরপর যখন তিনি আসল সত্য জানতে পারেন, তখন দোয়া ছেড়ে দেন এবং সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন। এরূপ করা এখনও জায়েয। কোন কাফের সম্পর্কে যদি কারও প্রবল ধারণা থাকে যে, সে মুসলমান, তবে তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করায় কোন দোষ নেই।—(কুরতুবী)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾
عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ
وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ
يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَ
تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ
الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ
إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ
إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا
أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا
أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

(৫) হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৬) তোমরা যারা আল্লাহ্ ও পরকাল প্রত্যাশা কর, তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ বেপরওয়া, প্রশংসার মালিক। (৭) যারা তোমাদের শত্রু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবতঃ বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ্ সবই করতে পারেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৮) ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। (৯) আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং বহিষ্কারকার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই যালেম। (১০) মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফেরদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্যে হালাল নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা, এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহ্র বিধান ; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, যদিও সেই কাফের আত্মীয়তায় খুবই নিকটবর্তী হয়। সাহাবায়ে-কেরাম আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলী পালনের ব্যাপারে নিজেদের খাহেশ ও আত্মীয় স্বজনের পরওয়া করতেন না। তাঁরা এই নিষেধাজ্ঞাও বাস্তবায়িত করলেন। ফলে দেখা গেল যে, ঘরে ঘরে পিতা-পুত্রের সাথে এবং পুত্র-পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। বলাবাহুল্য, মানবপ্রকৃতি ও স্বভাবের জন্যে এ কাজ সহজ ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা এই সংকটকে অতিসত্বর দূর করার আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন যে, আজ যারা কাফের, ফলে তারা তোমাদের শত্রু ও তোমরা তাদের শত্রু, সত্বরই হয়তো আল্লাহ্ তাআলা এই শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পর্যবসিত করে দিবেন। অর্থাৎ, তাদেরকে ঈমানের তওফীক দিয়ে তোমাদের পারস্পরিক সুসম্পর্ককে নতুন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী মক্কাবিজয়ের সময় বাস্তবরূপ লাভ করে। ফলে নিহতদের বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল কাফের মুসলমান হয়ে যায়।— (মাযহারী) কোরআন পাকের এক আয়াতে এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا অর্থাৎ, তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করবে ; বাস্তবেও তাই হয়েছে।

বোখারী ও মুসনাদে আহ্মদের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আসমা (রাঃ)-এর জননী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর স্ত্রী কবীলা হোদায়বিয়া সন্ধির পর কাফের অবস্থায় মক্কা থেকে মদীনায় পৌছেন। তিনি কন্যা আসমার জন্যে কিছু উপঢৌকনও সাথে নিয়ে যান। কিন্তু হযরত আসমা (রাঃ) সেই উপঢৌকন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমার জননী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, কিন্তু তিনি কাফের। আমি তাঁর সাথে কিরূপ ব্যবহার করব ? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ জননীর সাথে সদ্ব্যবহার কর।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আসমা (রাঃ)-এর জননী কবীলাকে হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম পূর্বকালেই তালাক দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অপর স্ত্রী উম্মে রোমানের গর্ভজাত ছিলেন। উম্মে রোমান মুসলমান হয়ে যান।— (ইবনে-কাসীর, মাযহারী)।

যেসব কাফের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কারেও অংশগ্রহণ করেনি, আলোচ্য আয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার তো প্রত্যেক কাফেরের সাথেও জরুরী। এতে যিম্মি কাফের, চুক্তিতে আবদ্ধ কাফের এবং শত্রু কাফের সবই সমান ; বরং ইসলামে জন্তু-জানোয়ারের সাথেও সুবিচার করা ওয়াজিব ; অর্থাৎ, তাদের পৃষ্ঠে সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপানো যাবে না এবং ঘাস, পানি ও বিশ্রামের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ এই আয়াতে সেই সব কাফেরের বর্ণনা আছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকে এবং

মুসলমানদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কারে অংশগ্রহণ করে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন। এতে অনুগ্রহমূলক কাজ কারবার করতে নিষেধ করা হয়নি ; বরং শুধু আন্তরিক বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ কেবল যুদ্ধরত শত্রুদের সাথেই নয় ; বরং যিম্মী ও চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের সাথেও জায়েয নয়। এ থেকে তফসীরে-মাযহারীতে মাসআলা বের করা হয়েছে যে, যুদ্ধরত কাফেরদের সাথে ন্যায় ও সুবিচার করা তো জরুরীই ; নিষিদ্ধ নয়। এথেকে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার যুদ্ধরত শত্রুদের সাথেও জায়েয। তবে অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে এর জন্যে শর্ত এই যে, তাদের সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহারের কারণে মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষতি হওয়ার আশংকা যেন না থাকে। আশংকা থাকলে জায়েয নয়। তবে ন্যায় ও সুবিচার প্রত্যেকের সাথে সর্বাবস্থায় জরুরী ও ওয়াজিব।

শানে-নুযূলের ঘটনা ঃ আলোচ্য আয়াতগুলোও একটি বিশেষ ঘটনা অর্থাৎ, হোদায়বিয়ার সন্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সূরা ফাত্হের শুরুতেই এই সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সন্ধির যেসব শর্ত ছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি কাফেরদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দেয়া হবে না, পরন্তু কাফেরদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দিতে হবে। সেমতে কিছু মুসলমান পুরুষ কাফেরদের মধ্য থেকে আগমন করে এবং তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়। এরপর কয়েকজন নারী মুসলমান হয়ে আগমন করে। তাদের কাফের আত্মীয়রা তাদেরকে প্রত্যর্পণের আবেদন জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলো হোদায়বিয়ায় অবতীর্ণ হয়। এতে নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সন্ধিপত্রের ব্যাপকতা সংকুচিত ও রহিত হয়ে গেছে। এ ধরনের নারীদের ব্যাপারে কিছু বিশেষ বিধানও নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর সাথে এমন নারীদের ব্যাপারেও কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে, যারা প্রথমে মুসলমানদের বিবাহিতা ছিল ; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং মক্কাতেই থেকে যায়। মুসলমান হওয়াই এই নারীদের বেলায় আসল ভিত্তি বিধায় তাদের ঈমান পরীক্ষা করার পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মক্কাবাসীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়ার বিখ্যাত শান্তিচুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, মক্কা থেকে কোন ব্যক্তি মদিনায় চলে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিবেন যদিও সে মুসলমান হয়। কিন্তু মদীনা থেকে কেউ মক্কায় চলে গেলে কোরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই বাহ্যতঃ অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ, কোন মুসলমান পুরুষ অথবা নারী মক্কা থেকে মদীনায় চলে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে ফেরত পাঠাবেন।

এই চুক্তি সম্পাদন শেষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন হোদায়বিয়াতেই অবস্থানরত ছিলেন তখন মুসলমানদের জন্যে অগ্নি পরীক্ষাতুল্য একাধিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হযরত আবু জন্দল (রাঃ)-এর। কোরাইশরা তাকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল। তিনি কোন রকমে সেখান থেকে পালিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ভীষণ উদ্বেগ দেখা দিল যে, চুক্তির শর্তানুযায়ী তাঁকে ফেরত পাঠানো উচিত কিন্তু আমরা আমাদের একজন নির্যাতিত ভাইকে যালেমদের হাতে পুনরায় তুলে দিব এটা কিরূপে সম্ভব?

কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি শরীয়তের নীতিমালার হেফাযত ও তৎপ্রতি দৃঢ়তা এক ব্যক্তির কারণে বিসর্জন দিতে পারতেন না। এর সাথে সাথে তাঁর দূরদর্শী অন্তর্দৃষ্টি সত্বরই এই নির্যাতিতদের বিজয়ীসুলভ মুক্তিও যেন প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিল। স্বভাবগত কারণেই তিনিও আবু জন্দল (রাঃ)-কে ফেরত প্রত্যর্পণে দুঃখিত হয়ে থাকবেন, কিন্তু চুক্তি পালনের খাতিরে তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বিদায় করে দিলেন।

এর সাথে সাথেই দ্বিতীয় একটি ঘটনা সংঘটিত হল। মুসলমান সাঈদা বিনতে হারেস (রাঃ) কাফের সায়ফী ইবনে আনসারের পত্নী ছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে সায়ফীর নাম মুসাফির মখযুমী বলা হয়েছে। তখন পর্যন্ত মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ছিল না। এই মুসলমান মহিলা মক্কা থেকে পালিয়ে হোদায়বিয়ায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। সাথে সাথে স্বামীও হাযির। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে দাবী জানাল যে, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে প্রত্যর্পণ করা হোক। কেননা, আপনি এই শর্ত মেনে নিয়েছেন এবং চুক্তিপত্রের কালি এখনও শুকায়নি।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। এর পরিণতিতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান নারী হিজরত করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছে গেলে তাকে কাফেরদের হাতে ফেরত দেয়া হবে না—সে পূর্ব থেকেই মুসলমান হোক ; যেমন উল্লেখিত সাঈদা অথবা হিজরতের পর তার মুসলমানত্ব প্রমাণিত হোক। তাকে ফেরত না দেয়ার কারণ এই যে, সে তার কাফের স্বামীর জন্যে হালাল নয়। তফসীরে কুরতুবীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এই ঘটনা বর্ণিত রয়েছে।

মোটকথা উল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতরণের ফলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, চুক্তিপত্রের উপরোক্ত শর্তটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয় যে, পুরুষ অথবা নারী যে কোন মুসলমান আগমন করুক, তাকে ফেরত দিতে হবে। বরং এই শর্তটির ব্যাপকতা কেবল পুরুষদের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়—নারীদের ক্ষেত্রে নয়। নারীদের ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, যে নারী মুসলমান হয়ে হিজরত করে, তার কাফের স্বামী মোহরানার আকারে যা কিছু তার পিছনে ব্যয় করেছে, তা তাকে ফেরত দেয়া হবে। এসব আয়াতের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) চুক্তিপত্রের উল্লেখিত এই শর্তের সঠিক মর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং তদনুযায়ী সাঈদা (রাঃ)-কে কাফেরদের কাছে ফেরত প্রেরণে বিরত থাকেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম বিনতে-ওতবা মক্কা থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তার পরিবারের লোকেরা শর্তের ভিত্তিতে তাকে ফেরৎ দানের দাবী জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ নাযিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম আমর ইবনে-আস (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। স্বামী তখনও মুলসমান ছিল না। উম্মে-কুলসুম ও তাঁর দুই ভাই মক্কা থেকে পলায়ন করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে চলে যান। সাথে সাথেই তাঁদেরকে ফেরত পাঠানোর দাবী উঠে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শর্ত অনুযায়ী আম্মারা ও ওলীদ ভ্রাতৃদ্বয়কে ফেরত পাঠিয়ে দেন ; কিন্তু উম্মে কুলসুমকে ফেরত দেননি। তিনি বললেন ঃ এই

শর্ত পুরুষদের জন্যে, নারীদের জন্যে নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সত্যায়নে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

এমনি ধরনের আরও কয়েকজন নারীর ঘটনা রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। বলাবাহুল্য এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। সবগুলা ঘটনাই সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কুরতুবীর উল্লেখিত রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, চুক্তির উপরোক্ত ধারার ভাষা যদিও ব্যাপক ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মতে তাতে নারীরা শামিল ছিল না। তাই তিনি হোদায়বিয়াতেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দেন এবং এরই সত্যায়নে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

সারকথা এই যে, এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক। নারীরা এর অন্তর্ভুক্ত না থাকার বিষয়টি পূর্ব থেকেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে ছিল ; কিংবা আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি নারীদেরকে শর্ত থেকে খারিজ করে দেন। উভয় অবস্থাতেই কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে এই চুক্তি এরপরও পূর্ণাঙ্গরূপে বলবৎ ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা পালিত হয়। কাজেই এক ব্যাখ্যাকে চুক্তিভঙ্গকরণ অথবা খতমকরণ রূপে গণ্য করা যায় না। অতঃপর ভাষাদৃষ্টে আয়াতসমূহের অর্থ অনুধাবন করুন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ

أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নারীদের মুসলমান ও মুমিন হওয়াই সন্ধির শর্ত থেকে তাদের ব্যতিক্রমভুক্ত হওয়ার কারণ। মক্কা থেকে মদীনায় আগমনকারিণী নারীদের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনাও ছিল যে, তাদের কেউ ইসলাম ও ঈমানের খাতিরে নয়, বরং স্বামীর সাথে ঝগড়া করে অথবা মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে বা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে হিজরত করেছে। এরূপ নারী আল্লাহ্‌র কাছে এই শর্তের ব্যতিক্রমভুক্ত নয় ; বরং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাকে ফেরত পাঠানো জরুরী। তাই মুসলমানগণকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেসব নারী হিজরত করে মদীনায় আসে, তাদের ঈমান পরীক্ষা করে নাও। এর সাথেই বলা হয়েছেঃ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যিকার ও আসল ঈমানের সম্পর্ক তো অন্তরের সাথে, যার খবর আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। তবে মৌখিক স্বীকারোক্তি ও লক্ষণাদিদৃষ্টে ঈমান সম্পর্কে অনুমান করা যায়। সুতরাং মুলমানগণকে এ বিষয়েরই আদেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন ঃ মুহাজির নারীকে শপথ করানো হত যে, সে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণে আগমন করেনি, মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে আসেনি এবং অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের বশবর্তী হয়ে হিজরত করেনি ; বরং একান্তভাবে আল্লাহ্ ও তার রসূলের ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আগমন করেছে। যে নারী এই শপথ করত, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে মদীনায় বসবাসের অনুমতি দিতেন এবং সে তার স্বামীর কাছ থেকে যে মোহরানা ইত্যাদি আদায় করেছিল, তা তার স্বামীকে ফেরত দিয়ে দিতেন।—(কুরতুবী)

তিরমিযীতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বলা হয়েছে ঃ নারীদের পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল সেই আনুগত্যের শপথ, যা পরবর্তী আয়াতসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ, إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ মুহাজির নারীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাতে আয়াতে বর্ণিত বিষয়সমূহের শপথ করত। এটাও অসম্ভব নয় যে, প্রথমে তাদেরকে সেসব বাক্যও উচ্চারণ করানো হত, যেগুলো হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে। এরপর আয়াতে বর্ণিত শপথ দ্বারা তা পূর্ণ করা হত।

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ অর্থাৎ, পরীক্ষার পর যদি তারা মুমিন প্রতিপন্ন হয়, তবে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠানো বৈধ নয়।

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ অর্থাৎ, এই নারীরা কাফের পুরুষদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফের পুরুষরাও তাদের জন্যে হালাল নয় যে, তাদেরকে পুনর্বিবাহ করবে।

এই আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, যে নারী কোন কাফেরের বিবাহাধীনে ছিল, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেছে, তার বিবাহ কাফেরের সাথে আপনা-আপনি ভঙ্গ হয়ে গেছে, তারা একে অপরের জন্যে হারাম। নারীদেরকে সন্ধির শর্ত থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত রাখার কারণ এটাই।

وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا অর্থাৎ, মুহাজির মুসলমান নারীর কাফের স্বামী বিবাহের মোহরানা ইত্যাদি বাবত যা ব্যয় করেছে, তা সবই তার স্বামীকে ফেরত দাও। কেননা, নারীকে ফেরত দেয়াই কেবল সন্ধি-শর্তের ব্যতিক্রমভুক্ত ছিল, যা হারাম হওয়ার কারণে সম্ভবপর নয়, কিন্তু স্বামীর প্রদত্ত ধন-সম্পদ শর্ত অনুযায়ী ফেরত দেয়া উচিত। মুহাজির নারীকে সরাসরি এই ধন-সম্পদ ফেরত দিতে বলা হয়নি ; বরং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা ফেরত দাও। কারণ, স্বামী প্রদত্ত ধন-সম্পদ খতম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ফলে নারীদের কাছ থেকে ফেরত দেয়ানো সম্ভবপর নয় বিধায় বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্বে দেয়া হয়েছে। যদি বায়তুলমাল থেকে দেয়া সম্ভবপর হয়, তবে সেখান থেকে, নতুবা মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে দেয়া হবে।—(কুরতুবী)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ পূর্বের আয়াত থেকে বোঝা গেছে যে, মুহাজির মুসলমান নারীর বিবাহ তার কাফের স্বামীর সাথে ভঙ্গ হয়ে গেছে। এই আয়াতে তারই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে, এখন মুসলমান পুরুষের সাথে তার বিবাহ হতে পারে ; যদিও প্রাক্তন কাফের স্বামী জীবিত থাকে এবং তালাকও না দেয়।

আলোচ্য আয়াতে إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ বাক্যটি শর্তরূপে উল্লেখিত হয়েছে ; অর্থাৎ, তোমরা এই নারীদেরকে মোহরানা দিয়ে দেয়ার শর্তে বিবাহ করতে পার। এটা প্রকৃতপক্ষে বিবাহের শর্ত নয়। কেননা, সবার মতেই বিবাহ মোহরানা আদায় করার উপর নির্ভরশীল নয়, তবে বিবাহের কারণে মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব অবশ্যই। এখানে একে শর্তরূপে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এই মাত্র এক মোহরানা কাফের স্বামীকে ফেরত দেয়ানো হয়েছে। কাজেই বিবাহকারী মুসলমান মনে করতে পারে যে, নতুন মোহরানা দেয়ার আর আবশ্যকতা নেই। এই ভ্রান্তি দূর করার জন্যে বলা হয়েছে যে, বিগত মোহরানার সম্পর্ক বিগত বিবাহের সাথে ছিল। এটা নতুন বিবাহ ; কাজেই এর জন্যে নতুন মোহরানা অপরিহার্য।

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ - عصم শব্দটি عصمة এর বহুবচন। এর

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ⑪ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑫ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ⑬

سورة الصف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ② كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ③ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ④

(১১) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে থেকে যায়, অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও, তখন যাদের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। (১২) হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (১৩) মুমিনগণ, আল্লাহ্ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে যেমন কবরস্থ কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে।

সূরা আছ-ছফ

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ১৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাবান। (২) মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? (৩) তোমরা যা করনা, তা বলা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অসন্তোষজনক। (৪) আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর।

আসল অর্থ সংরক্ষণ ও সংহতি। এখানে বিবাহবন্ধন ইত্যাদি সংরক্ষণযোগ্য বিষয় বোঝানো হয়েছে।

كوافر শব্দটি كَافِرَةٌ এর বহুবচন। এখানে মুশরিক রমণী বোঝানো হয়েছে। কেননা, কিতাবী কাফের রমণীকে বিবাহ্ করা কোরআনে সিদ্ধ রাখা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ পর্যন্ত মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ ছিল, তা খতম করে দেয়া হল। এখন কোন মুসলমানের বিবাহ মুশরিক নারীর সাথে বৈধ নয়। পূর্বে যে বিবাহ হয়েছে, তাও খতম হয়ে গেছে। এখনও কোন-মুশরিক নারীকে বিবাহে আবদ্ধ রাখা হালাল নয়।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময় যে সাহাবীর কোন মুশরিক স্ত্রী ছিল, তিনি তাকে ছেড়ে দেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর বিবাহে দুইজন মুশরিক নারী ছিল। হিজরতের সময় তারা মক্কায় রয়ে গিয়েছিল। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি তাদেরকে তালাক দিয়ে দেন।—(মাযহারী) এখানে তালাকের অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ করা। পারিভাষিক তালাকের এখানে প্রয়োজনই নেই। কেননা, আয়াত বলেই তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়।

وَسْـَٔلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا مَا أَنفَقُوا অর্থাৎ, যখন মুসলমান নারীকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হবে না এবং তার মোহরানা স্বামীকে ফেরত দেয়া হবে, এমনিভাবে যদি কোন মুসলমান নারী ধর্মত্যাগী হয়ে মক্কায় চলে যায় অথবা পূর্ব থেকেই কাফের থাকার কারণে মুসলমান স্বামীর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মুসলমান স্বামীকে তার মোহরানা ফেরত দেয়া কাফেরদের দায়িত্ব হয়, তখন পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে এসব লেন-দেনের মীমাংসা করে নেয়া কর্তব্য। উভয়পক্ষ যে মোহরানা ইত্যাদি দিয়েছে তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে তদনুযায়ী লেন-দেন করে নেয়া উচিত।

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ ......

عَاقَبْتُمْ শব্দটি معاقبة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রতিশোধ নেয়াও হয়ে থাকে। এখানে এই অর্থও হতে পারে। (কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদের কিছুসংখ্যক স্ত্রীলোক যদি কাফেরদের হাতে থেকে যায়, তবে তাদের মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ইত্যাদি ফেরত দেয়া কাফেরদের জন্যে জরুরী ছিল, যেমন মুসলমানদের পক্ষ থেকে মুহাজির নারীদের কাফের স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দেয়া হয়েছে। কিন্তু কাফেররা এরূপ করল না এবং মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দিল না। এখন তোমরা যদি এর প্রতিশোধ নাও এবং কাফেরদের প্রাপ্য মোহরানা তোমাদের প্রাপ্য পরিমাণে আটক কর, তবে এর বিধান এই যে,

فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا অর্থাৎ, তোমরা মুহাজির নারীদের দেয়া আটককৃত মোহরানা থেকে সেই মুসলমান স্বামীদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণে দিয়ে দাও, যাদের স্ত্রী কাফেরদের হাতে রয়ে গেছে।

عَاقَبْتُمْ এর অপর অর্থ যুদ্ধে সম্পদ হাসিল করাও হয়ে থাকে। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যেসব মুসলমানের স্ত্রী কাফেরদের হাতে চলে গেছে এবং শর্ত অনুযায়ী কাফেররা মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা দেয়নি, এরপর মুসলমানেরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেছে, এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকেই মুসলমান স্বামীদের প্রাপ্য দিতে হবে।—(কুরতুবী)

নারীদের আনুগত্যের শপথ ঃ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ এ আয়াতে মুসলমান নারীদের কাছ থেকে একটি বিস্তারিত আনুগত্যের শপথ নেয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ঈমান ও আকায়েদসহ শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করারও অঙ্গীকার রয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতদৃষ্টে যদিও এই শপথ মুহাজির নারীদের ঈমান পরীক্ষার পরিশিষ্ট হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার কারণে এটা শুধু তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়। বরং সব মুসলমান নারীর জন্যে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বাস্তব ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে শুধু মুহাজির নারীরাই নয়, অন্যান্য নারীরাও শপথ করেছে। সহীহ্ বোখারীর রেওয়ায়েতে হযরত ওমায়মা বর্ণনা করেন ঃ আমি আরও কয়েকজন মহিলাসহ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে শপথ করেছি। তিনি আমাদের কাছ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নেন এবং সাথে সাথে এই বাক্যও উচ্চারণ করান فيما استطعتن واطقتن অর্থাৎ, আমরা এসব বিষয় পালনে অঙ্গীকার করি যে পর্যন্ত আমাদের সাধ্যে কুলায়। ওমায়মা এরপর বলেন ঃ এথেকে জানা গেল যে, আমাদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর স্নেহ-মমতা আমাদের নিজেদের চাইতেও বেশী ছিল। আমরা তো নিঃশর্ত অঙ্গীকারই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে শর্তযুক্ত অঙ্গীকার শিক্ষা দিলেন। ফলে অপারগ অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল হবে না—(মাযহারী)

সহীহ্ বোখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) এই শপথ সম্পর্কে বলেন ঃ মহিলাদের এই শপথ কেবল কথাবার্তার মাধ্যমে হয়েছে—হাতের উপর হাত রেখে শপথ হয়নি, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে হত। বস্তুতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাত কখনও কোন গায়র মাহ্রাম নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি।—(মাযহারী)

হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, এই শপথ কেবল হোদায়বিয়ার ঘটনার পরেই নয় ; বরং বারবার হয়েছে। এমনকি, মক্কাবিজয়ের দিনও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পুরুষদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করে সাফা পর্বতের উপর নারীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে হযরত ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাক্যাবলী নীচে সমবেত মহিলাদের কাছে পৌছিয়ে দিতেন।

তখন যারা আনুগত্যের শপথ করেছিল, তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও ছিল। সে প্রথমে লজ্জাবশতঃ নিজেকে গোপন রাখতে চেয়েছিল, এরপর শপথের কিছু বিবরণ জিজ্ঞাসা করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।—(মাযহারী)

يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ মহিলাদের জন্য শপথের প্রথম বিষয় ছিল ঈমান অবলম্বন করা এবং শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সাধারণ পুরুষদের শপথেও ছিল। দ্বিতীয় বিষয় চুরি না করা। অনেক নারীই স্বামীর ধন-সম্পদ চুরি করতে অভ্যস্ত ছিল। তাই এটা উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বিষয় ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা। এতে নারীরা পাকাপোক্ত হলে পুরুষদের জন্যেও আত্মরক্ষা করা সহজ হয়ে যায়। চতুর্থ বিষয় নিজ সন্তানকে হত্যা না করা।

মূর্খতাযুগে কন্যাসন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করার প্রচলন ছিল। আয়াতে একে রোধ করা হয়েছে। পঞ্চম বিষয় মিথ্যা অপবাদ ও কলংক আরোপ না করা। এই নিষেধাজ্ঞার সাথে একথাও আছে যে, بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ অর্থাৎ, নিজের হাত ও পায়ের মাঝখানে যেন অপবাদ আরোপ না করে। এর কারণ এই যে, কেয়ামতের দিন মানুষের হস্ত-পা-ই তার ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের পাপকর্ম করার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যে, আমি চারজন সাক্ষীর মাঝখানে এই কাজ করছি। এরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে একটি সাধারণ বিধি। তা এই যে, وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ অর্থাৎ, তারা ভাল কাজে আপনার আদেশ অমান্য করবে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে কোন কাজের আদেশ দিবেন, তা ভাল না হয়ে পারে না। এর ব্যতিক্রম নিশ্চিত অসম্ভব। এমতাবস্থায় 'ভালকাজে' কথাটি যুক্ত করার কারণ কি? এর এক কারণ তো এই যে, মুলমানরা যেন ভাল করে বোঝে নেয় যে, আল্লাহ্র আদেশের বিপরীতে কোন মানুষের আনুগত্য করা জায়েয নয় ; এমনকি, সেই মানুষটি যদি রসূলও হন, তবুও নয়। তাই রসূলের আনুগত্যের সাথেও এই শর্তটি যুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, এখানে ব্যাপার নারীদের। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোন আদেশেরই খেলাফ করবে না, এরূপ ব্যাপক আনুগত্যের কারণে শয়তান কারও মনে পথভ্রষ্টতার কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারত। এই পথ বন্ধ করার জন্যে শর্তটি যুক্ত করা হয়েছে।

সূরা আছ-ছফ্

শানে-নুযূল ঃ তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একদল সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্‌টি আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তবে তা বাস্তবায়িত করতাম। বগভী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেউ কেউ একথাও বললেন যে, আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি জানতে পারলে আমরা তজ্জন্যে জান ও মাল সব বিসর্জন করতাম।—(মাযহারী)

ইবনে-কাসীর মুসনাদে আহমদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা একত্রিত হয়ে পরস্পরে এই আলোচনা করার পর একজনকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্যে প্রেরণ করতে চাইলেন, কিন্তু কারও সাহস হল না। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। (ফলে বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।) তাঁরা দরবারে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁদেরকে সমগ্র সূরা ছফ্ পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন, যা তখনই নাযিল হয়েছিল।

এই সূরা থেকে জানা গেল যে, তাঁরা সর্বাধিক প্রিয় যে আমলটির সন্ধানে ছিলেন, সেটি হচ্ছে আল্লাহ্র পথে জেহাদ। তাঁরা এ সম্পর্কে যেসব বড় বড় বুলি আওড়িয়েছিলেন এবং জীবনপণ করার দাবী উচ্চারণ করেছিলেন, সে সম্পর্কেও সূরায় সাথে সাথে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোন মুমিনের জন্যে এ ধরনের বুলি আওড়ানো দুরস্ত নয়। কারণ, যথাসময়ে সে তার সংকল্প পূর্ণ করতে পারবে কি না, তা তার জানা নেই। সংকল্প পূর্ণ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া এবং বাধা অপসারিত হওয়া তার ক্ষমতাধীন নয়। এছাড়া স্বয়ং তার হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি আন্তরিক সংকল্পও তার কব্জায় নয়। এ কারণেই কোরআন পাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কেও শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে,

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي
رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى
ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى
رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا
بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟
هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ
يُدْعَىٰٓ إِلَى ٱلْإِسْلَٰمِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٧﴾ يُرِيدُونَ
لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨﴾
هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ
كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ
تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ
فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا
ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾
وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

(৫) স্মরণ কর, যখন মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রসূল। অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৬) স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আঃ) বলল ঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল ঃ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু। (৭) যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে ; তার চাইতে অধিক যালেম আর কে? আল্লাহ্ যালেম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৮) তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্‌র আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (৯) তিনিই তাঁর রসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (১০) মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? (১১) তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম ; যদি তোমরা বোঝ। (১২) তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। (১৩) এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।

আগামীকালের করণীয় কাজ বর্ণনা করতে হলে ইনশাআল্লাহ্ অর্থাৎ, যদি আল্লাহ্ চান বলে বর্ণনা করবেন। বলা হয়েছেঃ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ সাহাবা কেরামের নিয়ত ও ইচ্ছা বুলি আওড়ানো না হলেও দৃশ্যতঃ তাই বোঝা যাচ্ছিল। আল্লাহ্‌র কাছে এটা পছন্দনীয় নয় যে, কেউ কোন কাজ করার বড় গলায় দাবী করবে, ইনশাআল্লাহ্ বলা ব্যতীত। মোটকথা, তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্যে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ
أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে কাজ তোমরা করবে না, তা করার দাবী কর কেন? এতে এ ধরনের কাজের দাবী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বোঝা গেল, যা করার ইচ্ছাই মানুষের অন্তরে নেই। কারণ, এটা একটা মিথ্যা দাবী বৈ নয়, যা নাম ও যশ অর্জনের খাতিরে হতে পারে। বলাবাহুল্য, উপরোক্ত ঘটনায় সাহাবায়ে কেরাম যে দাবী করেছিলেন, তা না করার ইচ্ছায় ছিল না। কাজেই এটাও আয়াতের অর্থে অন্তর্ভুক্ত যে, অন্তরে ইচ্ছা ও সংকল্প থাকলেও নিজের উপর ভরসা করে কোন কাজ করার দাবী করা দাসত্বের পরিপন্থী। প্রথমতঃ তা বলারই প্রয়োজন নেই। কাজ করার সুযোগ পেলে কাজ করা উচিত। কোন উপযোগিতাবশতঃ বলার দরকার হলেও ইন্‌শাআল্লাহ্ সহ বলতে হবে। তাহলে এটা আর দাবী থাকবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পরের আয়াতে এই সূরা অবতরণের আসল কারণ বিবৃত হয়েছে ; অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ অর্থাৎ, যুদ্ধের সেই কাতার আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়, যা আল্লাহ্‌র শত্রুদের মোকাবেলায় তাঁর বাণী সমুন্নত করার জন্যে কায়েম করা হয় এবং মুজাহিদদের অসাধারণ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার কারণে তা একটি সীসা লাগানো দুর্ভেদ্য প্রাচীরের রূপ পরিগ্রহ করে।

এরপর হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ এবং শত্রুদের নির্যাতন সহ্য করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর পুনরায় মুসলমানদেরকে জেহাদ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এখানে বর্ণিত হযরত মূসা ও ঈসার (আঃ) ঘটনাবলীতেও অনেক শিক্ষাগত ও কর্মগত উপকারিতা এবং দিক নির্দেশ রয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাহিনীতে আছে যে, তিনি যখন বনী-ইসরাঈলকে তাঁর নবুওয়ত মেনে নেয়ার ও আনুগত্য করার দাওয়াত দেন, তখন বিশেষভাবে দু'টি বিষয় উল্লেখ করেন। (এক) তিনি কোন অভিনব রসূল নন এবং অভিনব বিষয় নিয়ে আগমন করেননি বরং এমনসব বিষয় নিয়ে এসেছেন, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ এ পর্যন্ত বলে এসেছেন এবং পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবে উল্লেখিত আছে। পরে যে সর্বশেষ পয়গম্বর আগমন করবেন, তিনিও এ ধরনের দিকনির্দেশ নিয়ে আসবেন।

এখানে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে তওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বনী-ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ নিকটতম কিতাব একটিই ছিল। নতুবা পয়গম্বরগণ পূর্ববর্তী সব কিতাবেরই সত্যায়ন করেছেন। এ ছাড়া এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈসা (আঃ)-এর শরীয়ত যদিও

স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু তার অধিকাংশ বিধি-বিধান মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত ও তওরাতের অনুরূপ। স্বল্পসংখ্যক বিধানই পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র।

হযরত ঈসা (আঃ) দ্বিতীয় বিষয় এই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর পরে আগমণকারী রসূলের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁর দিক নির্দেশও তদনুরূপ হবে। তাই তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও বুদ্ধি এবং সততার দাবী।

সাথে সাথে তিনি বনী ইসরাঈলকে পরে আগমনকারী রসূলের নাম-ঠিকানাও ইঞ্জীলে বলে দিয়েছেন। এভাবে বনী-ইসরাঈলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যখন আগমন করবেন, তখন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে। وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ বাক্যে তাই বর্ণিত হয়েছে। এতে সেই রসূলের নাম বলা হয়েছে আহ্‌মদ। আমাদের প্রিয় শেষনবী (সাঃ)-এর মুহাম্মদ, আহমদ এবং আরও কয়েকটি নাম ছিল। কিন্তু ইঞ্জীলে তাঁর নাম আহমদ উল্লেখ করার উপযোগিতা সম্ভবতঃ এই যে, আরবে প্রাচীনকাল থেকেই মুহাম্মদ নাম রাখার প্রচলন ছিল। ফলে এই নামের আরও লোক আরবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আহমদ নাম আরবে প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল না। এটা একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরই বিশেষ নাম ছিল।

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

এই আয়াতে ঈমান এবং ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করাকে বাণিজ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে। কারণ, বাণিজ্যে যেমন কিছু ধন-সম্পদ ও শ্রম ব্যয় করার বিনিময়ে মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ঈমান সহকারে আল্লাহ্‌র পথে জান ও মাল ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী নেয়ামত অর্জিত হয়। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, যে এই বাণিজ্য অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার গোনাহ্ মাফ করবেন এবং জান্নাতে উৎকৃষ্ট বাসগৃহ দান করবেন। এসব বাসগৃহে সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস-ব্যসনের সরঞ্জাম থাকবে। অতঃপর পরকালীন নেয়ামতের সাথে কিছু ইহকালীন নেয়ামতেরও ওয়াদা করা হয়েছে ঃ

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - وَأُخْرَىٰ শব্দটি نِعْمَتَ এর বিশেষণ। অর্থ এই যে, পরকালীন নেয়ামত ও বাসগৃহ তো পাওয়া যাবেই ; ইহকালেও একটি নগদ নেয়ামত পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অর্থাৎ, শত্রুদের বিজিত হওয়া। এখানে قَرِيبٌ শব্দটি পরকালের বিপরীতে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যদি প্রচলিত قَرِيبٌ ধরা হয়, তবে এর প্রথম অর্থ হবে খয়বর বিজয় এবং এরপর মক্কা বিজয়। تُحِبُّونَهَا অর্থাৎ, তোমরা এই নগদ নেয়ামত খুব পছন্দ কর। কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবে নগদকে পছন্দ করে। কোরআনে বলা হয়েছে। وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا অর্থাৎ, মানুষ তড়িঘড়ি পছন্দ করে। এর অর্থ এই নয় যে, পরকালীন নেয়ামত তাদের কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, পরকালের নেয়ামত তো তাদের প্রিয় কাম্যই, কিন্তু স্বভাবগতভাবে কিছু নগদ নেয়ামতও তারা দুনিয়াতে চায়। তাও দেয়া হবে।

كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ

حواريين শব্দটি حوارى এর বহুবচন। এর অর্থ আন্তরিক বন্ধু। যারা ঈসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে حوارى বলা হত। সূরা আল-ইমরানে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল বার জন। এই আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর আমলের একটি ঘটনা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে দ্বীনের সাহায্যের জন্যে তৈরী হতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) শত্রুদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিলেন ঃ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচারে কে আমার সাহায্যকারী হবে? প্রত্যুত্তরে বার জন লোক আনুগত্যের শপথ করে এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অতএব মুসলমানদেরকেও আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচারে সাহায্যকারী হওয়া উচিত।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ
لِلْحَوَارِيِّۦنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ
ٱللَّهِ ۖ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ ۖ
فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَٰهِرِينَ ﴿١٤﴾

سورة الجمعة مدنية وهي احدى عشرة آية وفيها ركوعان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ
ٱلْحَكِيمِ ﴿١﴾ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّۦنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ
مُّبِينٍ ﴿٢﴾ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣﴾ ذَٰلِكَ
فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٤﴾ مَثَلُ
ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًۢا ۚ
بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ
ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥﴾ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا۟ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ
مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٦﴾

(১৪) মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে-মরিয়ম তার শিষ্যবর্গকে বলেছিল, আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? শিষ্যবর্গ বলেছিল ঃ আমরা আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনী-ইসরাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল কাফের হয়ে গেল। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের মোকাবেলায় শক্তি যোগালাম, ফলে তারা বিজয়ী হল।

সূরা আল-জুমুআহ

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) রাজাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে, যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে। (২) তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। (৩) এই রসূল প্রেরিত হয়েছেন অন্য আরও লোকদের জন্যে, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪) এটা আল্লাহ্‌র কৃপা, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ্ মহাকৃপাশীল। (৫) যাদেরকে তওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে। যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট! আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (৬) বলুন হে ইহুদীগণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু—অন্য কোন মানব নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَٰهِرِينَ

খ্রীষ্টানদের তিন দল ঃ বগভী (রহঃ) এই আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা (আঃ) আসমানে উত্থিত হওয়ার পর খ্রীষ্টান জাতি তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল বলল ঃ তিনি খোদা ছিলেন এবং আসমানে চলে গেছেন। দ্বিতীয় দল বলল ঃ তিনি খোদা ছিলেন না বরং খোদার পুত্র ছিলেন। এখন আল্লাহ্ তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং শত্রুদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তৃতীয় দল বিশুদ্ধ ও সত্যকথা বলল। তারা বলল ঃ তিনি খোদাও ছিলেন না, খোদার পুত্রও ছিলেন না; বরং আল্লাহ্‌র দাস ও রসূল ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে শত্রুদের কবল থেকে হেফাযত ও উচ্চ মর্তবা দান করার জন্যে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। তারাই ছিল সতিকার ঈমানদার। প্রত্যেক দলের সাথে কিছু কিছু জনসাধারণও যোগদান করে এবং পারস্পরিক কলহ বাড়তে বাড়তে যুদ্ধের উপক্রম হয়। ঘটনাচক্রে উভয় কাফের দল মুমিনদের মোকাবেলায় প্রবল হয়ে উঠে। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা সর্বশেষ পয়গম্বর (সাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি মুমিন দলকে সমর্থন দেন। এভাবে পরিণামে মুমিন দল যুক্তি প্রমাণের নিরীখে বিজয়ী হয়ে যায়।—(মাযহারী)

এই তফসীর অনুযায়ী ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ বলে ঈসা (আঃ)-এর উম্মতের মুমিনগণকেই বোঝানো হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহায্য ও সমর্থনে বিজয়গৌরব অর্জন করবে।—(মাযহারী) কেউ কেউ বলেন ঃ ঈসা (আঃ)-এর আসমানে উত্থিত হওয়ার পর খ্রীষ্টানদের মধ্যে দুইদল হয়ে যায়। একদল ঈসা (আঃ)-কে খোদা অথবা খোদার পুত্র আখ্যায়িত করে মুশরিক হয়ে যায় এবং অপরদল বিশুদ্ধও খাঁটি দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র দাস ও রসূল মান্য করে। এরপর মুশরিক ও মুমিন দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদেরকে কাফের দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। কিন্তু একথাই প্রসিদ্ধ যে, ঈসা (আঃ)-এর ধর্মে জেহাদ ও যুদ্ধের বিধান ছিল না। তাই মুমিন দলের যুদ্ধ করার কথা অবান্তর মনে হয়।—(রূহুল-মা'আনী) উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর জওয়াবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্ভবতঃ যুদ্ধের সূচনা কাফের খ্রীষ্টানদলের পক্ষ থেকে হয়েছিল এবং মুমিনরা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা প্রকৃতপক্ষে জেহাদ ও যুদ্ধের মধ্যে পড়ে না।

সূরা আল-জুমুআহ

কোরআন পাকের يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ যেসব সূরা سَبَّحَ ও يُسَبِّحُ শব্দ দ্বারা হয়, সেগুলোকে 'মুসাব্বাহাত' বলা হয়। এসব সূরায় নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর জন্যে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা পাঠ সপ্রমাণ করা হয়েছে। অবস্থার মাধ্যমে এই পবিত্রতা পাঠ সবারই বোধগম্য। কারণ, সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তার প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার প্রজ্ঞা ও অপার শক্তি-সামর্থ্যের সাক্ষ্যদাতা। এটাই

তার পবিত্রতা পাঠ। নির্ভুল সত্য এই যে, প্রত্যেক বস্তু তার নিজস্ব ভঙ্গিতে আক্ষরিক অর্থেও পবিত্রতা পাঠ করে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক জড় ও অজড় পদার্থের মধ্যে তার সাধ্যানুযায়ী চেতনা ও অনুভূতি রেখেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতির অপরিহার্য দাবী হচ্ছে পবিত্রতা পাঠ। কিন্তু এসব বস্তুর পবিত্রতা পাঠ মানুষ শ্রবণ করে না। তাই কোরআনে বলা হয়েছে وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ অধিকাংশ সূরার শুরুতে অতীত পদবাচ্যে سَبَّحَ বলা হয়েছে। কেবল সূরা জুমআ ও সূরা তাগাবুনে ভবিষ্যৎ পদবাচ্যে يُسَبِّحُ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ভাষাগত অলংকার এই যে, অতীত পদবাচ্য নিশ্চয়তা বোঝায়। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই ব্যবহৃত হয়েছে। ভবিষ্যৎ পদবাচ্য সদাসর্বদা হওয়া বোঝায়। এই অর্থ বোঝাবার জন্যে দুই জায়গায় এই পদ ব্যবহার করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا - اميين শব্দটি امى এর বহুবচন। এর অর্থ নিরক্ষর। আরবরা এই পদবীতে সুবিদিত। কারণ, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। লেখাপড়া জানা লোক খুব কম ছিল। এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার মহাশক্তি প্রকাশ করার জন্যে বিশেষভাবে আরবদের জন্যে এই পদবী অবলম্বন করা হয়েছে এবং একথাও বলা হয়েছে যে, প্রেরিত রসূলও তাদেরই একজন অর্থাৎ, নিরক্ষর। কাজেই এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, গোটা জাতি নিরক্ষর এবং তাদের কাছে যে রসূল প্রেরিত হয়েছেন, তিনিও নিরক্ষর। অথচ যেসব কর্তব্য এই রসূলকে সোপর্দ করা হয়েছে, সেগুলো সবই এমন শিক্ষামূলক ও সংস্কারমূলক যে, কোন নিরক্ষর ব্যক্তি এগুলো শিক্ষা দিতে পারে না এবং কোন নিরক্ষর জাতি এগুলো শিখার যোগ্য নয়।

একে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তিবলে রসূলে করীম (সাঃ)-এর অলৌকিক ক্ষমতাই আখ্যা দেয়া যায় যে, তিনি যখন শিক্ষা ও সংস্কারের কাজ শুরু করেন, তখন এই নিরক্ষরদের মধ্যেই এমন সুপণ্ডিত ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটল, যাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ও কুশলতা এবং উৎকৃষ্ট কর্মপ্রতিভা সারাবিশ্বের স্বীকৃতি ও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

পয়গম্বর প্রেরণের তিন উদ্দেশ্য ঃ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ (এক) কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত, (দুই) উম্মতকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা, (তিন) কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়া।

এই তিনটি বিষয়ই উম্মতের জন্যে যেমন আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত, তেমনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যেরও অন্তর্ভুক্ত।

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ - تلاوت এর আসল অর্থ অনুসরণ করা। পরিভাষায় শব্দটি আল্লাহ্র কালাম পাট করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ايات বলে কোরআনের আয়াত বোঝানো হয়েছে। عَلَيْهِمْ শব্দে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রেরণ করার এক উদ্দেশ্য এই যে, তিনি মানুষকে কোরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য يُزَكِّيْهِمْ এটা تزكية থেকে উদ্ভূত। অর্থ পবিত্র করা। আভ্যন্তরীণ দোষ থেকে পবিত্র করার অর্থে অধিকতর ব্যবহৃত হয় ; অর্থাৎ, কুফর, শিরক ও কুচরিত্রতা থেকে পবিত্র করা। কোন সময় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার পবিত্রতার জন্যেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এই ব্যাপক অর্থই উদ্দেশ্য।

তৃতীয় উদ্দেশ্য وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ 'কিতাব' বলে কোরআন পাক এবং 'হিকমত' বলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণিত উক্তিগত ও কর্মগত শিক্ষাসমূহ বোঝানো হয়েছে। তাই অনেক তফসীরকারক এখানে হিকমতের তফসীর করেছেন সুন্নাহ্।

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - وَّاٰخَرِيْنَ এর শাব্দিক অন্য লোক। لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ এর অর্থ যারা এখন পর্যন্ত তাদের অর্থাৎ, নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে বোঝানো হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে প্রথম কাতারের মুমিন অর্থাৎ, সাহাবায়ে-কেরামের সাথে সংযুক্ত মনে করা হবে। এটা নিঃসন্দেহে পরবর্তী মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।—(রূহুল-মা'আনী)

কেউ কেউ وَّاٰخَرِيْنَ শব্দটিকে اميين এর উপর عطف করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূলকে নিরক্ষরদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন, যারা এখনও নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করার বিষয়টি বোধগম্য, কিন্তু যারা এখনও দুনিয়াতে আগমনই করেনি, তাদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করার মানে কি? বয়ানুল কোরআনে বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রেরণ করার অর্থ তাদের জন্যে প্রেরণ করা, فى শব্দটি আরবী ভাষায় এই অর্থেও আসে।

কেউ কেউ وَّاٰخَرِيْنَ শব্দের عطف মেনেছেন وَيُعَلِّمُهُمْ এর সর্বনামের উপর। এর অর্থ এই হবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শিক্ষা দেন নিরক্ষরদেরকে এবং তাদেরকে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।—(মাযহারী)

সহীহ বোখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় সূরা জুমুআ অবতীর্ণ হয়। তিনি আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনান। তিনি وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ পাঠ করলে আমরা আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, এরা কারা? তিনি নিরুত্তর রইলেন। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার প্রশ্ন করার পর তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর গায়ে হাত রাখলেন এবং বললেন ঃ যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের সমান উচ্চতায়ও থাকে, তবে তার সম্প্রদায়ের কিছুলোক সেখান থেকেও ঈমানকে নিয়ে আসবে।—(মাযহারী)

এই রেওয়ায়েতেও পারস্যবাসীদের কোন বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না ; বরং এতটুকু বোঝা যায় যে, তারাও اٰخرين অর্থাৎ, অন্য লোকদের সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীসে অনারবদের যথেষ্ট ফযীলত ব্যক্ত হয়েছে।—(মাযহারী)

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا

اسفار শব্দটি سفر এর বহুবচন। এর অর্থ বড় পুস্তক। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নিরক্ষর লোকদের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাব ও নবুওয়ত এবং তাঁকে প্রেরণ করার তিনটি উদ্দেশ্য যে ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, তওরাতেও তা প্রায় একই ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেখামাত্রই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইহুদীদের

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ إِحْدَى عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾

(৭) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্ জালেমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (৮) বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখামুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে। (৯) মুমিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (১০) অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (১১) তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়। বলুন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

সূরা মুনাফিকুন

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রসূল। আল্লাহ্ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (২) তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। (৩) এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। এতএব তারা বুঝে না।

উচিত ছিল। কিন্তু পার্থিব জাঁকজমক ও ধনৈশ্বর্য তাদেরকে তওরাত থেকে বিমুখ করে রেখেছে। ফলে তারা তওরাতের পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তওরাতের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ মূর্খ ও অনভিজ্ঞের পর্যায়ে চলে এসেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, যাদেরকে তওরাতের বাহক করা হয়েছিল, অর্থাৎ, অযাচিতভাবে আল্লাহ্‌র এই নেয়ামত দান করা হয়েছিল, তারা যথাযথভাবে একত্রে বহন করেনি ; অর্থাৎ, তারা তওরাতের নির্দেশাবলীর পরওয়া করেনি। ফলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গর্দভ, যার পিঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃহদাকার গ্রন্থ চাপিয়ে দেয়া হয়। এই গর্দভ সেই বোঝা বহন তো করে, কিন্তু তার বিষয়বস্তুর কোন খবর রাখে না এবং তাতে তার কোন উপকার হয় না। ইহুদীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্যে তওরাতকে বহন করে এবং এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জাকজমক ও প্রতিপত্তি লাভ করতে চায়, কিন্তু এর দিকনির্দেশ দ্বারা কোন উপকার লাভ করে না।

তফসীরবিদগণ বলেন ঃ যে আলেম তার এলম অনুযায়ী আমল করে না, তার দৃষ্টান্তও ইহুদীদের অনুরূপ।

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا ... إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ইহুদীরা তাদের কুফর, শিরক ও চরিত্রহীনতা সত্ত্বেও দাবী করত যে, نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ অর্থাৎ, আমরা তো আল্লাহ্‌র সন্তান সন্ততি ও প্রিয়জন। তারা নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে জান্নাতের যোগ্য অধিকারী মনে করত না ; বরং তাদের বক্তব্য ছিল ঃ

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا অর্থাৎ, ইহুদী না হয়ে কেউ জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না। তারা যেন নিজেদেরকে পরকালের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করত এবং জান্নাতের নেয়ামতসমূহকে তাদের ব্যক্তিগত জায়গীর মনে করত। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, পরকালের নেয়ামতসমূহ ইহকালের নেয়ামত অপেক্ষা হাজারো গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সে আরও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পরই সে এসব মহান ও চিরন্তন নেয়ামত অবশ্যই লাভ করবে, তার মধ্যে সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধি থাকলে সে অবশ্যই মনে-প্রাণে মৃত্যু কামনা করবে। তার আন্তরিক বাসনা হবে যে, মৃত্যু শীঘ্রই আসুক, যাতে সে দুনিয়ার মলিন ও দুঃখ-বিষাদের পূর্ণ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে অকৃত্রিম সুখ ও শান্তির চিরকালীন জীবনে প্রবেশ করতে পারে।

তাই আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ আপনি ইহুদীদের বলুন, যদি তোমরা দাবী কর যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একমাত্র তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু ও প্রিয়পাত্র এবং পরকালের আযাব সম্পর্কে তোমরা মোটেই কোন আশংকা না কর, তবে জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী এই যে, তোমরা মৃত্যু কামনা কর এবং মৃত্যুর জন্যে আগ্রহান্বিত থাক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এরপর কোরআন নিজেই বলে ঃ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ অর্থাৎ, তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ, তারা পরকালের জন্যে কুফর, শিরক ও কুকর্ম ব্যতীত আর কিছুই পায়নি। অতএব তারা ভালরূপে জানে যে, পরকালে তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিই অবধারিত রয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র প্রিয়জন হওয়ার যে দাবী করে, তা

সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা স্বয়ং তাদের অজানা নেই। তবে দুনিয়ার উপকারিতা লাভ করার জন্যে তারা এ ধরনের দাবী করে। তারা আরও জানে যে, যদি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথায় তারা মৃত্যু কামনা করে তবে তা অবশ্যই কবূল হবে এবং তারা মরে যাবে। তাই বলা হয়েছে, ইহুদীরা মৃত্যু কামনা করতেই পারে না।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যদি সে সময় তাদের কেউ মৃত্যু কামনা করত, তবে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হত।—(রূহুল-মা'আনী)

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ অর্থাৎ, ইহুদীরা উপরোক্ত দাবী সত্ত্বেও মৃত্যু কামনা থেকে বিরত থাকত। এর সারমর্ম মৃত্যু থেকে পলায়ন করা বৈ নয়। অতএব আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর, তা অবশ্যই আসবে। আজ নয় তো কিছুদিন পর। সুতরাং মৃত্যু থেকে পলায়ন সম্পূর্ণতঃ কারও সাধ্যে নেই।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ

ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ - يَوْمِ الْجُمُعَةِ এই দিনটি মুসলমানদের সমাবেশের দিন। তাই এই দিনকে 'ইয়াওমুল জুমআ' বলা হয়। আল্লাহ্ তাআলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও সমস্ত জগতকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। এই ছয়দিনের শেষদিন ছিল জুমআর দিন। এই দিনেই আদম (আঃ) সৃজিত হন, এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করা হয় এবং এই দিনেই জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামানো হয়। কেয়ামত এই দিনেই সংঘটিত হবে। এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে, যাতে মানুষ যে দোয়াই করে, তাই কবুল হয়। এসব বিষয় সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে।—(ইবনে-কাসীর)

আল্লাহ্ তাআলা প্রতি সপ্তাহে মানবজাতির সমাবেশ ও ঈদের জন্যে এই দিন রেখেছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতরা তা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ইহুদীরা 'ইয়াওমুস সাব্ত' তথা শনিবারকে নিজেদের সমাবেশের দিন নির্ধারিত করে নেয় এবং খ্রীষ্টানরা রবিবারকে। আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতকেই তওফীক দিয়েছেন যে, তারা শুক্রবারকে মনোনীত করেছে।—(ইবনে-কাসীর) মূর্খতাযুগে শুক্রবারকে 'ইয়াওমে আরূবা' বলা হত। আরবে কা'ব ইবনে লুয়াই সর্বপ্রথম এর নাম 'ইয়াওমুল জুমআ' রাখেন। এই দিনে কোরাইশদের সমাবেশ হত এবং কাব ইবনে লুয়াই ভাষণ দিতেন। এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পাঁচশত ষাট বছর পূর্বের ঘটনা।

কা'ব ইবনে লুয়াই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পূর্বপুরুষদের অন্যতম। আল্লাহ্ তাআলা মূর্খতাযুগেও তাকে প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষা করেন এবং একত্ববাদের বিশ্বাস রাখার তওফীক দান করেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদও মানুষকে শুনিয়েছিলেন। কোরাইশ গোত্র তাঁকে একজন মহান ব্যক্তি হিসেবে সম্মান করত। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নবুওয়ত লাভের পাঁচশত ষাট বছর পূর্বে যেদিন তাঁর মৃত্যু হয়, সেদিন থেকেই কোরাইশরা তাদের বছর গণনা শুরু করে। শুরুতে কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন থেকে আরবদের বছর গণনা আরম্ভ করা হত। কা'ব ইবনে লুয়াই - এর মৃত্যুর পর তাঁর মৃত্যুদিবস থেকেই বছর গণনা প্রচলিত হয়ে যায়। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্মের বছর যখন হস্তিবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন এদিন থেকেই তারিখ গণনা আরম্ভ হয়। সারকথা এই যে, ইসলাম পূর্বকালেও কা'ব ইবনে লুয়াই -এর আমলে শুক্রবার দিনকে গুরুত্ব দান করা হত। তিনিই এই দিনের নাম জুমআর দিন রেখেছিলেন।—(মাযহারী)

نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ - نداء صلوة বলে আযান বোঝানো হয়েছে। سعى শব্দের এক অর্থ দৌড়া এবং অপর অর্থ কোন কাজ গুরুত্ব সহকারে করা। এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য। কারণ, নামাযের জন্যে দৌড়ে আসতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ শান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে নামাযের জন্যে গমন কর। আয়াতের অর্থ এই যে, জুমআর দিনে জুমআর আযান দেয়া হলে আল্লাহ্র যিকেরের দিকে ত্বরা কর। অর্থাৎ নামায ও খোতবার জন্যে মসজিদে যেতে যত্নবান হও। যে ব্যক্তি দৌড় দেয়, সে অন্য কোন কাজের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তোমরাও তেমনি আযানের পর নামায ও খোতবা ব্যতীত অন্য কাজের দিকে মনোযোগ দিও না।—(ইবনে-কাসীর) ذِكْرِ اللَّهِ বলে জুমআর নামায এবং এই নামাযের অন্যতম শর্ত খোতবাও বোঝানো হয়েছে।—(মাযহারী)

وَذَرُوا الْبَيْعَ অর্থাৎ, বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এতে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, জুমুআর আযানের পর বেচাকেনা হারাম করা হয়েছে। এই আদেশ পালন করা বিক্রেতা ও ক্রেতা সবার উপর ফরয। বলাবাহুল্য, দোকানপাট বন্ধ করে দিলেই ক্রয়-বিক্রয় আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

পূর্বের আয়াতসমূহে জুমআর আযানের পর বেচাকেনা ইত্যাদি পার্থিব কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই আয়াতে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, জুমআর নামায সমাপ্ত হলে ব্যবসায়িক কাজকর্ম এবং রিযিক হাসিলের চেষ্টা সবাই করতে পারে।

وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ এই আয়াতে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে, যারা জুমআর খোতবা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়িক কাজ-কারবারে মনোযোগ দিয়েছিল। ইবনে-কাসীর বলেন ঃ এই ঘটনা তখনকার, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জুমআর নামাযের পর জুমআর খোতবা পাঠ করতেন। দুই ঈদের নামাযে অদ্যাবধি এই নিয়ম প্রচলিত আছে। এক জুমআর দিনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নামাযান্তে খোতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মদীনার বাজারে উপস্থিত হয় এবং ঢোল ইত্যাদি পিটিয়ে তা ঘোষণা করা হয়। ফলে অনেক মুসল্লী খোতবা ছেড়ে বাজারে চলে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বল্পসংখ্যক সাহাবীসহ মসজিদে থেকে যান। তাদের সংখ্যা বার জন বর্ণিত আছে।—(আবু দাউদ) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বললেন ঃ যদি তোমরা সবাই চলে যেতে, তবে মদীনার উপত্যকা আযাবের অগ্নিতে পূর্ণ হয়ে যেত।—(ইবনে-কাসীর)

তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন, এই বাণিজ্যিক কাফেলাটি ছিল দেহ্ইয়া ইবনে খলফ কলবীর। সে সিরিয়া থেকে মাল-সম্ভার নিয়ে এসেছিল। তার কাফেলায় সাধারণতঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছু থাকত। তার আগমনের সংবাদ পেলে মদীনার নারী-পুরুষ সবাই দৌড়ে কাফেলার কাছে যেত। দেহ্ইয়া ইবনে খলফ তখন পর্যন্ত মুসলমান ছিল না ; পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হাসান বসরী ও আবু মালেক (রহঃ) বলেন ঃ এই কাফেলার আগমনের

সময় মদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল।—(মাযহারী) এসব কারণেই বিপুলসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম বাণিজ্যিক কাফেলার আওয়ায শুনে মসজিদ থেকে বের হয়ে যান। ফরয নামায শেষ হয়ে গিয়েছিল। জানা ছিল না যে, এটা শ্রবণ করা অপরিহার্য। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য এবং তৃতীয়তঃ বাণিজ্যিক কাফেলার উপর সবার ঝাঁপিয়ে পড়া—এসব কারণে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, দেরীতে গেলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়া যাবে না।

এসব কারণেই সাহাবায়ে কেরামের পদস্খলন হয় এবং উল্লেখিত হাদীসে তাঁদের প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়। এ ব্যাপারে তাদেরকে লজ্জা দেয়া ও হুশিয়ার করার জন্যে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিয়ম পরিবর্তন করে জুমআর নামাযের পূর্বে খোতবা দেয়া শুরু করেন। বর্তমান তাই সুন্নত।—(ইবনে-কাসীর)

আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে একথা বলে দিতে আদেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র কাছে যে সওয়াব আছে, তা এই বাণিজ্য থেকে উত্তম। এটাও অবান্তর নয় যে, যারা নামায ও খোতবার খাতিরে বাবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেয়, তাদের জন্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দুনিয়াতেও বিশেষ বরকত নাযিল হবে।

সূরা আল-মুনাফিকূন

সূরা মুনাফিকূন অবতরণের বিস্তারিত ঘটনা ঃ এই ঘটনা মুহাম্মদ ইবনে-ইসহাক (রহঃ)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ষষ্ঠ হিজরীতে এবং কাতাদাহ ও ওরওয়া (রহঃ)-এর রেওয়ায়েত অনুযারী পঞ্চম হিজরীতে 'বনিল-মুস্তালিক' যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়।—(মাযহারী) ঘটনা এই ঃ রসূললুল্লাহ্ (সাঃ) সংবাদ পান যে, 'মুস্তালিক' গোত্রের সরদার হারেস ইবনে যেরার তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই হারেস ইবনে যেরার হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ)-এর পিতা, যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিবিদের অন্তর্ভুক্ত হন। হারেস ইবনে যেরারও পরে মুসলমান হয়ে যায়।

সংবাদ পেয়ে রসূলে করীম (রাঃ) একদল মুজাহিদসহ তাদের মোকাবেলা করার জন্যে বের হন। এই জেহাদে গমনকারী মুসলমানদের সঙ্গে অনেক মুনাফিকও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার হওয়ার লোভে রওয়ানা হয়। কারণ, তারা অন্তরে কাফের হলেও বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ্র সাহায্যে তিনি এই যুদ্ধে বিজয়ী হবেন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মুস্তালিক গোত্রে পৌছলেন, তখন 'মুরাইসী' নামে খ্যাত একটি কূপের কাছে হারেস ইবনে যেরারের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। এ কারণেই এই যুদ্ধকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়। উভয়পক্ষ সারিবদ্ধ হয়ে তীর বর্ষণের মাধ্যমে মোকাবেলা হল। মুস্তালিক গোত্রের বহুলোক হতাহত হল এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করতে লাগল। আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বিজয় দান করলেন। প্রতিপক্ষের কিছু ধন-সম্পদ এবং কয়েকজন পুরুষ ও নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। এভাবে এই জেহাদের সমাপ্তি ঘটল।

এরপর যখন মুসলমান মুজাহিদ বাহিনী মুরাইসী কূপের কাছেই সমবেত ছিল, তখন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। একজন মুহাজির ও একজন আনসারীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম করে পারস্পরিক সংঘর্ষের পর্যায়ে পৌছে গেল। মুহাজির ব্যক্তি সাহায্যের জন্যে মুহাজিরগণকে এবং আনসারী ব্যক্তি আনসার সম্প্রদায়কে ডাক দিল। উভয়ের সাহায্যার্থে কিছু লোক তৎপরও হয়ে উঠল। এভাবে ব্যাপারটি মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌছে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সংবাদ পেয়ে অনতিবিলম্বে অকুস্থলে পৌছে গেলেন এবং ভীষণ রুষ্ট হয়ে বললেন ঃ ما بال دعوى الجاهلية অর্থাৎ, এ কি মূর্খতাযুগের আহবান। দেশ ও বংশগত জাতীয়তাকে ভিত্তি করে সাহায্য ও সহযোগিতার আয়োজন হচ্ছে কেন? তিনি আরও বললেন ঃ دعوها فانها منتنة এই শ্লোগান বন্ধ কর। এটা দুর্গন্ধময় শ্লোগান। তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানের সাহায্য করা—সে যালেম হোক অথবা মযলুম। মযলুমকে সাহায্য করার অর্থ তো জানাই যে, তাকে যুলুম থেকে রক্ষা করা। জালেমকে সাহয্য করার অর্থ তাকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করা। এটাই তার প্রকৃত সাহায্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যাপারে দেখা উচিত কে যালেম ও কে মযলুম। এরপর মুহাজির, আনসারী, গোত্র ও বংশ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য মজলুমকে জুলুম থেকে রক্ষা করা এবং জালেমের হাত চেপে ধরা—সে আপন সহোদর ভাই হোক অথবা পিতা হোক। এই দেশ ও বংশগত জাতীয়তা একটা মূর্খতাসুলভ দুর্গন্ধময় শ্লোগান। এর ফল জঞ্জাল বাড়ানো ছাড়া কিছুই হয় না।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই উপদেশবাণী শোনামাত্রই ঝগড়া মিটে গেল। এ ব্যাপারে মুহাজির জাহ্জাহের বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হল। তার হাতে সিনান ইবনে ওবরা আনসারী (রাঃ) আহত হয়েছিলেন। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে ঝগড়াকারী জালেম ও মজলুম উভয়ই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেল।

মুনাফিকদের যে দলটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লালসায় মুসলমানদের সাথে আগমন করেছিল। তাদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর পারস্পরিক সংঘর্ষের খবর পেল, তখন সে একে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিল। সে মুনাফিকদের এক মজলিসে, যাতে মুমিনদের মধ্যে কেবল যায়েদ ইবনে আরকাম উপস্থিত ছিলেন, আনসারকে মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশে বলল ঃ তোমরা মুহাজিরদেরকে দেশে ডেকে এনে মাথায় চড়িয়েছ, নিজেদের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাড় মটকাচ্ছে। যদি তোমাদের এখনও জ্ঞান ফিরে না আসে, তবে পরিণামে এরা তোমাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে টাকা-পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো না। এতে তারা আপনা-আপনি ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্মানীরা বহিরাগত এসব বাজে লোকদের বহিষ্কার করে দিবে।

সম্মানী বলে তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দল ও আনসার এবং বাজে লোক বলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) একথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, তুই-ই বাজেলোক লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তিবলে এবং মুসলমানদের ভালবাসার জোরে মহাসম্মানী।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে, বিপদ দেখলে সে, তার কপটতার উপর পর্দা ফেলে দিবে। তাই সে স্পষ্টভাষা ব্যবহার করেনি। কিন্তু যায়েদ ইবনে আকরামের ক্রোধ দেখে তার সম্বিৎ ফিরে এল। পাছে তার কুফর প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই আশংকায় সে হযরত যায়েদের কাছে

ওযর পেশ করে বলল ঃ আমি তো একথাটি হাসির ছলে বলেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কিছু করা ছিল না।

যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) মজলিস থেকে উঠে সোজা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে গেলেন এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা তাঁকে বলে শোনালেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে সংবাদটি খুবই গুরুতর মনে হল। মুখমণ্ডলে পরিবর্তনের রেখা ফুটে উঠল। যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) অল্পবয়স্ক সাহাবী ছিলেন রসূল (সাঃ) তাকে বললেন ঃ বৎস দেখ, তুমি মিথ্যা বলছ না তো? যায়েদ কসম খেয়ে বললেন ঃ না, আমি নিজ কানে এসব কথা শুনেছি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবার বললেন ঃ তোমার কোনরূপ বিভ্রান্তি হয়নি তো? যায়েদ উত্তরে পূর্বের কথাই বললেন। এরপর মুনাফিক সরদারের এই কথা গোটা মুসলমান বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে এছাড়া আর কোন আলোচনাই রইল না। এদিকে সব আনসার যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-কে তিরস্কার করতে লাগলেন যে, তুমি সম্প্রদায়ের নেতার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছ। যায়েদ (রাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, সমগ্র খাযরাজ গোত্রের মধ্যে আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় কেউ নেই। কিন্তু যখন সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার পিতাও এমন কথা বলত তবে আমি তাও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গোচরীভূত করতাম।

অপরদিকে হযরত ওমর (রাঃ) এসে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে হযরত ওমর (রাঃ) এ কথা বলেছিলেন ঃ আপনি ওব্বাদ ইবনে বিশরকে আদেশ করুন, সে তার মস্তক কেটে আপনার সামনে উপস্থিত করুক।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ ওমর, এর কি প্রতিকার যে, মানুষের মধ্যে খ্যাত হয়ে যাবে আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। অতঃপর তিনি ইবনে উবাইকে হত্যা করতে বারণ করে দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর এই কথা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এর পুত্র জানতে পারলেন। তাঁর নামও আবদুল্লাহ্ ছিল। তিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ যদি আপনি আমার পিতাকে এসব কথাবার্তার কারণে হত্যা করবার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমাকে আদেশ করুন, আমি তার মস্তক কেটে আপনার কাছে এই মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে হাযির করব। তিনি আরও আরয করলেন ঃ সমগ্র খাযরাজ গোত্র সাক্ষী, তাদের মধ্যে কেউ আমা অপেক্ষা অধিক পিতামাতার সেবা ও আনুগত্যকারী নেই। কিন্তু আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধে তাদেরও কোন বিষয় সহ্য করতে পারব না। আমার আশংকা যে, আপনি যদি অন্য কাউকে আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দান এবং সে তাকে হত্যা করে, তবে আমি আমার পিতৃহন্তাকে চোখের সামনে চলা-ফেরা করতে দেখে হয়ত আত্মসম্বরন করতে পারবনা। এটা আমার জন্য আযাবের কারণ হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং আমি কাউকে এ বিষয়ে আদেশও করিনি।

এই ঘটনার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাধারন অভ্যাসের বিপরীতে অসময়ের সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং নিজে 'কসওয়া' উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সাহাবায়ে কেরাম রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে ডেকে এনে বললেন ঃ তুমি কি বাস্তবিকই এরূপ কথা বলেছ? সে অনেক কসম খেয়ে বলল ঃ আমি কখনও এরূপ কথা বলিনি। এই বালক (যায়েদ ইবনে আরকাম) মিথ্যাবাদী। স্বগোত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তারা সবাই স্থির করল যে, সম্ভবত ঃ যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) ভুল বুঝেছে। আসলে ইবনে উবাই একথা বলেনি।

মোটকথা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইবনে উবাইয়ের কসম ও ওযর কবুল করে নিলেন। এদিকে জনগণের মধ্যে যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও তিরস্কার আরও তীব্র হয়ে গেল। তিনি এই অপমানের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সমগ্র মুজাহিদ বাহিনীসহ সারাদিন ও সারারাত সফর করলেন এবং পরের দিন সকালেও সফর অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে যখন সূর্যকিরণ প্রখর হতে লাগল, তখন তিনি কাফেলাকে একজায়গায় থামিয়ে দিলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফরের ফলে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত সাহাবায়ে কেরাম মনযিলে অবস্থানের সাথে সাথে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন ঃ সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাৎক্ষণিক ও অসময়ে সফর করা এবং সুদীর্ঘকাল সফর অব্যাহত রাখার পিছনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা থেকে উদ্ভূত জল্পনা-কল্পনা হতে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয়া, যাতে এ সম্পর্কিত চর্চার অবসান ঘটে।

এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পুনরায় সফর শুরু করলেন। ইতিমধ্যে ওবাদা ইবেন সামেত (রাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে উপদেশচ্ছলে বললেন ঃ তুমি এক কাজ কর। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নাও। তিনি তোমার জন্যে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। এতে তোমরা মুক্তি হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ শুনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। হযতর ওবাদা (রাঃ) তখনই বললেন ঃ আমার মনে হয়, তোমর এই বিমুখতা সম্পর্কে অবশ্যই কোরআনের আয়াত নাযিল হবে।

এদিকে সফর চলাকালে যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বার বার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আসতেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। অতএব আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কোরআন নাযিল হবে। হঠাৎ যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) দেখলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মধ্যে ওহী অবতরণকালীন লক্ষণাদি ফুটে উঠছে। তাঁর শ্বাস ফুলে উঠছে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর উষ্ট্রী বোঝার বারে নুয়ে পড়ছে। যায়েদ (রাঃ) আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হবে। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এই অবস্থা দুর হয়ে গেল। যায়েদ (রাঃ) বলেন ঃ আমার সওয়ারী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছ ঘেঁষে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকেই আমার কান ধরলেন এবং বললেন ঃ

ياغلام صدق الله حديثك ونزلت سورة المنافقين فى ابن ابى من اولها الى اخرها ـ

অর্থাৎ, হে বালক, আল্লাহ্ তাআলা তোমরা কথার সত্যায়ন করেছেন এবং সম্পূর্ণ সূরা মুনাফিকূন ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, সূরা মুনাফিকূন সফরের মধ্যেতই নাযিল হয়েছে। কিন্তু বগভী (রহঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মদীনায় পৌঁছে যান এবং যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) অপমানের ভয়ে গৃহে আত্মগোপন করেন, তখন এই সূরা নাযিল

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ
خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ
قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ
اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ سَوَاءٌ
عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا
عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا
إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن
يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ
قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ
نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

(৪) আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শুনেন। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ্য। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ্ তাদেরকে। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? (৫) যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমরা এস, আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) আপনি তাদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৭) তারাই বলে ঃ আল্লাহ্‌র রসূলের সাহচর্যে যারা আছে তাদের জন্যে ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনা-আপনি সরে যাবে। ভূ ও নভোমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্‌রই কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না। (৮) তারা বলে ঃ আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। শক্তি তো আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মুমিনদের'ই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না। (৯) মুমিনগণ। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (১০) আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (১১) প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

হয়েছে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মদীনার নিকটবর্তী আকীক উপত্যকায় পৌঁছেন, তখন ইবনে উবাইয়ের মুমিন পুত্র আবদুল্লাহ্ (রাঃ) সম্মুখে অগ্রসর হন এবং খুঁজতে খুঁজতে পিতা ইবনে উবাইয়ের কাছে পৌঁছে তার উষ্ট্রীকে বসিয়ে দেন। তিনি উষ্ট্রীর হাঁটুতে পা রেখে পিতাকে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত সম্মানী বাজে লোককে বহিষ্কৃত করবে'—এ কথার ব্যাখ্যা না কর। এই বাক্যে সম্মানী কে?– রসূলুল্লাহ্ (সাঃ), না তুমি? পুত্র পিতার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল এবং যারা এ পথ অতিক্রম করছিল তারা পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে তিরস্কার করছিল যে, পিতার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করছ কেন? অবশেষে যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উষ্ট্রী তাদের কাছে আসল, তখন তিনি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল ঃ আবদুল্লাহ্ এই বলে তার পিতার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দেখলেন যে, মুনাফিক ইবনে উবাই বেগতিক হয়ে পুত্রের কাছে বলে যাচ্ছে ঃ আমি তো ছেলেপিলে ও নারীদের চাইতেও অধিক লাঞ্ছিত। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পুত্রকে বললেন ঃ তার পথ ছেড়ে দাও, তাকে মদীনায় যেতে দাও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মুনাফিকুন অবতরণের পটভূমি এতটুকুই। এই কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে একথাও বলা হয়েছে যে, বনিল-মুস্তালিক যুদ্ধের জন্যে আসলে উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ)-এর পিতা হারেস ইবনে যেরার দায়ী ছিলেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তাআলা হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ)-কে ইসলাম গ্রহণ এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্নী হওয়ার গৌরব দান করেন। তাঁর পিতা হারেসও পরে মুসলমান হয়ে যান।

এ ঘটনা মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ ইত্যাদি কিতাবে এভাবে বর্ণিত আছে যে, মুস্তালিক গোত্র পরাজিত হলে তাদের কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দীও মুসলমানদের করতলগত হয়। ইসলামী আইন অনুযায়ী সব কয়েদী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। কয়েদীদের মধ্যে হারেস ইবনে যেরারের কন্যা জুয়ায়রিয়াও ছিলেন। তিনি সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ)-এর ভাগে পড়েন। সাবেত (রাঃ) জুয়ায়রিয়াকে কিতাবতের প্রথায় মুক্ত করে দিতে চাইলেন। এর অর্থ এই যে, দাস অথবা দাসী মেহনত-মজুরী করে অথবা ব্যবসায়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে মালিককে দিলে সে মুক্ত হয়ে যেত।

জুয়ায়রিয়ার যিম্মায় মোটা অংকের অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা পরিশোধ করা সহজসাধ্য ছিল না। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন ঃ আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ এক তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আপনি আল্লাহ্‌র রসূল। অতঃপর নিজের ঘটনা শুনালেন যে, সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ) আমার সাথে কিতাবতের চুক্তি করেছে। কিন্তু কিতাবতের অর্থ পরিশোধ করার সাধ্য আমার নেই। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু সাহায্য করুন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং সাথে সাথে তাঁকে মুক্ত করে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জুয়ায়রিয়ার জন্যে এর চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারত! তিনি সানন্দে প্রস্তাব মেনে নিলেন।

এইভাবে তিনি পুণ্যময়ী বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। উম্মুল-মুমিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বনিল-মুস্তালিক যুদ্ধে গমনের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, ইয়াসরিবের (মদীনার) দিক থেকে চাঁদ রওয়ানা হয়ে আমার কোলে এসে লুটিয়ে পড়েছেন। তখন আমি এই স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করিনি। কিন্তু এখন তার ব্যাখ্যা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

তিনি ছিলেন গোত্রপতির কন্যা। তিনি যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পুণ্যময়ী বিবিদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন, তখন এর শুভ প্রতিক্রিয়া তাঁর গোত্রের উপরও প্রতিফলিত হয়। তাঁর সাথে বন্দিনী অন্যান্য নারীরাও এই শুভবিবাহের উপকারিতা লাভ করল। কেননা এই বিবাহের কথা জানাজানি হওয়ার পর যে যে মুসলমানের কাছে তাঁর আত্মীয় কোন বন্দিনী ছিল, তারা সবাই তাদেরকে মুক্ত করে দিল। এভাবে একশ' বন্দিনী তাঁর সাথে মুক্ত হয়ে গেল। এপর তাঁর পিতাও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি মোজেযা দেখে মুসলমান হয়ে গেলেন।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে সূরা মুনাফিকূন নাযিল হয়েছে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার কসম সবই মিথ্যা। এই মুনাফিক সরদারের হিতাকাঙ্খায় কেউ কেউ তাকে বলল ঃ তুই জানিস কোরআনে তোর সম্পর্কে কি নাযিল হয়েছে? এখনও সময় আছে, তুই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে হাযির হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তোর জন্যে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। সে উত্তরে বলল ঃ তোমরা আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছিলে, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এরপর তোমরা আমাকে অর্থ-সম্পদের যাকাত দিতে বলেছিলে, আমি তাও দিতেছি। এখন আর কি বাকী রইল? আমি কি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সেজদা করব? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যখন তার অন্তরে ঈমানই নেই, তখন তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা উপকারী হতে পারে না।

এই ঘটনার পর ইবনে উবাই মদীনায় পৌঁছে বেশীদিন জীবিত থাকেনি—শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।—(মাযহারী)

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا

জাহ্জাহ্ মুহাজির ও সিনান আনসারীর ঝগড়ার সময় ইবনে উবাই-ই একথা বলেছিল। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, নির্বোধরা মনে করে মুহাজিরগণ তাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী এবং ওরাই তাদের অন্ন যোগায়। অথচ সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্র হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে মুহাজিরগণকে তোমাদের কোন সাহায্য ছাড়াই সবকিছু দিতে পারেন। ইবনে উবাইয়ের এরূপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীর পরিচায়ক। তাই কোরআন পাক এস্থলে لَا يَفْقَهُونَ বলে ব্যক্ত করেছে যে, যে এরূপ মনে করে, সে বেওকুফ ও নির্বোধ।

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

এটাও ইবনে উবাইয়ের উক্তি। এই উক্তির ভাষা অস্পষ্ট হলেও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ছিল না যে, সে নিজেকে এবং মদীনার আনসারগণকে শক্তিশালী ও ইযযতদার এবং এর বিপরীতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুহাজির সাহাবায়ে-কেরামকে দুর্বল ও হেয় বলে প্রকাশ করেছিল। সে মদীনার আনসারগণকে উত্তেজিত করেছিল, যাতে তারা এই দুর্বল ও 'হেয়' লোকদেরকে মদীনা থকে বহিষ্কৃত করে দেয়। আল্লাহ্ তাআলা এর জওয়াবে তার কথা তারই দিকে উল্টে দিয়েছেন যে, যদি ইযযতওয়ালারা 'হেয়' লোকদেরকে বের করেই দেয়, তবে এর কুফল তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কেননা, ইযযত তো আল্লাহ্র, তাঁর রসূলের এবং মুমিনদের প্রাপ্য। কিন্তু মূর্খতার কারণে তোমরা এ সম্পর্কে বে-খবর। এখানে কোরআন لَا يَعْلَمُونَ এবং এর আগে لَا يَفْقَهُونَ শব্দ ব্যবহার করেছে। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, কোন মানুষ নিজেকে অন্যের রিযিকদাতা মনে করলে এটা নিরেট জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপন্থী এবং নির্বুদ্ধিতার আলামত। পক্ষান্তরে ইযযত ও অপমান দুনিয়াতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনে লাভ করে। তাই এতে বিভ্রান্তি হলে সেটা বোখবর ও অনভিজ্ঞ হওয়ার প্রমাণ। তাই এখানে لَا يَعْلَمُونَ বলা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ এই সূরার প্রথম রুকূতে মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছিল। দুনিয়ার মহব্বতে পরাভূত হওয়াই ছিল এসব কিছুর সারমর্ম। এ কারণেই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ভাগ বসাবার উদ্দেশে বাহ্যতঃ নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত। মুহাজির সাহাবীদের পিছনে ব্যয় করার ধারা বন্ধ করার যে চক্রান্ত তারা করেছিল, এর পশ্চাতেও এ কারণই নিহিত ছিল। এই দ্বিতীয় রুকূতে খাঁটি মুমিনদেরকে সম্বোধন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে যেয়ো না। যেসব বিষয় মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে, তন্মধ্যে দু'টি সর্ববৃহৎ-ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই এই দু'টির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সম্ভারই উদ্দেশ্য। আয়াতের সারমর্ম এই যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েযই নয়—ওয়াজিবও হয়ে যায়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। এখানে 'আল্লাহ্র স্মরণের' অর্থ কোন কোন তফসীরবিদের মতে পাঞ্জেগানা নামায, কারও মতে হজ্ব ও যাকাত এবং কারও মতে কোরআন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ স্মরণের অর্থ এখানে যাবতীয় আনুগত্য ও এবাদত। এই অর্থ সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত।—(কুরতুবী)

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ এই আয়াতে মৃত্যু আসার অর্থ মৃত্যুর লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর লক্ষণাদি সামনে আসার আগেই স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট থাকা অবস্থায় তোমাদের ধনসম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে পরকালের পুঁজি করে নাও। নতুবা মৃতুর পর এই ধন-সম্পদ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আল্লাহ্র স্মরনের' অর্থ যাবতীয় এবাদত ও শরীয়তের আদেশ-নিষেধ পালন করা। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর এখানে অর্থ ব্যয় করাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার দু'টি কারণ হতে পারে। (এক) আল্লাহ্ ও তাঁর আদেশ নিষেধ পালনে মানুষকে গাফেলকারী সর্ববৃহৎ বস্তু হচ্ছে ধন-সম্পদ। তাই যাকাত, ওশর, হজ্ব ইত্যাদি আর্থিক এবাদত স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। (দুই) মৃত্যুর লক্ষণাদি দৃষ্টির সামনে আসার সময় কারও সাধ্য নেই এবং কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, কাযা নামাযগুলো পড়ে নেবে, কাযা হজ্ব

سُورَةُ التَّغَابُنِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ① هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ② خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ③ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢبِذَاتِ الصُّدُوْرِ ④ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۫ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑤ ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۫ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ⑥ زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ⑦ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ⑧

সূরাআত্-তাগাবুন

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ১৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (৩) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন। (৪) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তিনি তা জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর। আল্লাহ্ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (৫) তোমাদের পূর্বে যারা কাফের ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬) এটা এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলে তারা বলত ঃ মানুষই কি আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা কাফের হয়ে গেল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। এতে আল্লাহ্‌র কিছু আসে যায় না। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী প্রশংসার্হ। (৭) কাফেররা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। (৮) অতএব তোমরা আল্লাহ্ তাঁর রসূল এবং অবতীর্ণ নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

আদায় করবে অথবা কাযা রোযা রাখবে, কিন্তু ধন-সম্পদ সামনে থাকে এবং এ বিশ্বাস হয়েই যায় যে, এখন এই ধন তার হাত থেকে চলে যাবে। তখনও তাড়াতাড়ি ধন-সম্পদ ব্যয় করে আর্থিক এবাদতের ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া দান-খয়রাত যাবতীয় আপদ-বিপদ দূর করার ব্যাপারেও কার্যকর।

সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল ঃ কোন্ সদকায় সর্বাধিক সওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেন ঃ যে সদকা সুস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে—অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকা অবস্থায় করা হয়। তিনি আরও বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করো না যখন আত্মা তোমার কণ্ঠনালীতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাক আর বল ঃ এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় কর।

فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, যে ব্যক্তির যিম্মায় যাকাত ফরয ছিল; কিন্তু আদায় করেনি অথবা হজ্ব ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি, সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আল্লাহ্ তাআলার কাছে বাসনা প্রকাশ করে বলবে ঃ আমি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই; অর্থাৎ, মৃত্যু আরও কিছু বিলম্বে আসুক, যাতে আমি সদকা-খয়রাত করে নেই এবং ফরয কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাই। وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ অর্থাৎ, কিছু অবকাশ পেলে এমন সৎকর্ম করে নেব, যদ্দ্বারা সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। যেসব ফরয বাদ পড়েছে, সেগুলো পূর্ণ করে নেব এবং যেসব হারাম ও মকরূহ্ কাজ করেছি, সেগুলো থেকে তওবা করে নেব। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা বলে দিয়েছেন যে, মৃত্যু আসার পর কাউকে অবকাশ দেয়া হয় না। সুতরাং এই বাসনা নিরর্থক।

সূরা আত্-তাগাবুন

خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ — অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন হয়ে গেছে। এখানে فَمِنْكُمْ এর ف অব্যয়টি এই অর্থ জ্ঞাপন করে যে, প্রথমে সৃষ্টি করার সময় কোন কাফের ছিল না। এই কাফের ও মুমিনের বিভেদ পরে সেই ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীনে হয়েছে, যা আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে দান করেছেন। এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার কারণেই মানুষের উপর গোনাহ্ ও সওয়াব আরোপিত হয়। এক হাদীসেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه — অর্থাৎ, প্রত্যেক সন্তান নির্মল স্বভাবধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। (যার ফলে তার মুমিন হওয়া স্বাভাবিক ছিল।) কিন্তু এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রীষ্টান ইত্যাদিতে পরিণত করে।—(কুরতুবী)

وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ - তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে সুশ্রী করেছেন। আকৃতি তৈরী করা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বস্রষ্টার বিশেষ গুণ। এজন্যেই আল্লাহ্‌র নামসমূহের

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٩﴾ وَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٠﴾ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَمَنْ
يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ
اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٢﴾
اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ
وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾ اِنَّمَآ
اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا
اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ
وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٦﴾ اِنْ
تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ
شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٧﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

(৯) সেদিন অর্থাৎ, সমাবেশের দিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এ দিন হার-জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে, তারা তথায় চিরকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাফল্য। (১০) আর যারা কাফের এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল এটা। (১১) আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (১২) তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রসূলুল্লাহ্‌র আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌঁছে দেয়া। (১৩) আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। অতএব মুমিনগণ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুক। (১৪) হে মুমিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর, এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১৫) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। (১৬) অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্‌কে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (১৭) যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সহনশীল। (১৮) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

মধ্যে مصور অর্থাৎ, আকৃতিদাতা বর্ণিত আছে। চিন্তা করুন, সৃষ্টজগতে কত বিভিন্ন জাতি রয়েছে, প্রত্যেক জাতিতে কত বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে লাখো বিভিন্ন ব্যক্তি রয়েছে। তাদের একজনের আকৃতি অপরজনের আকৃতির সাথে খাপ খায় না। একই মানব শ্রেণীর মধ্যে দেশ ও ভূখণ্ডের বিভিন্নতার কারণে এবং বংশ ও জাতির বিভিন্নতার কারণে আকৃতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তদুপরি তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির মুখাবয়ব অন্য সবার থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এই বিস্ময়কর কারিগরি ও ভাস্কর্য দেখে জ্ঞানবুদ্ধি দিশেহারা হয়ে পড়ে। মানুষের চেহারা ছয়-সাত বর্গ ইঞ্চির অধিক নয়। কোটি কোটি মানুষের একই ধরনের চেহারা সত্ত্বেও একজনের আকার অন্যজনের সাথে পুরোপুরি মিলে না যে, চেনা কঠিন হয়। আলোচ্য আয়াতে আকার নির্মাণের নেয়ামত উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ অর্থাৎ, তিনি মানবাকৃতিকে সমগ্র সৃষ্টজগত ও সৃষ্টজীবের আকৃতি অপেক্ষা অধিক সুন্দর ও সুষম করেছেন। কোন মানুষ তার দলের মধ্যে যতই কুৎসিত ও কদাকার হোক না কেন, অবশিষ্ট সকল জীবজন্তুর আকৃতির তুলনায় সে-ও সুশ্রী।

فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا — بشر শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনের অর্থ দেয়। তাই يهدون বহুবচন ক্রিয়াপদ তার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। মানবত্বকে নবুওয়ত ও রেসালতের পরিপন্থী মনে করাও কাফেরদের একটি অলীক ধারণা ছিল। কোরআনে স্থানে স্থানে এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, এখন মুসলমানদের মধ্যেও কেউ কেউ এমন দেখা যায়, যারা নবী করীম (সাঃ)-এর মানবত্ব অস্বীকার করে। তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা কোন্‌পথে অগ্রসর হচ্ছে? মানব হওয়া নবুওয়তেরও পরিপন্থী নয় এবং রেসালতের উচ্চমর্যাদারও প্রতিকূল নয়। রসূল (সাঃ) নূর হলেও মানব হতে পারেন। তিনি নূরও এবং মানবও। তাঁর নূরকে প্রদীপ, সূর্য ও চন্দ্রের নূরের নিরীখে বিচার করা ভুল।

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا — (বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি, যা আমি নাযিল করেছি।) এখানে নূর বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। কারণ, নূরের স্বরূপ এই যে, সে নিজেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল এবং অপরকেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল করে। কোরআন স্বকীয় অলৌকিকতার কারণে নিজে যে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কারণাদি, বিধি-বিধান, শরীয়ত এবং পরজগতের সঠিক তথ্যাবলী উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এগুলো জানা মানুষের জন্যে জরুরী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কেয়ামতকে লোকসানের দিন বলার কারণ ঃ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ যেদিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন একত্রিত করার দিবসে। এই দিনটি হবে লোকসানের। لِيَوْمِ الْجَمْعِ একত্রিত হওয়ার দিবস ও يَوْمُ التَّغَابُنِ লোকসানের দিবস—এই উভয়টি কেয়ামতের নাম। একত্রিত হওয়ার দিন একারণে যে, সেদিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জিন এবং মানবকে হিসাব-নিকাশের জন্যে একত্রিত করা হবে। পক্ষান্তরে تغابن শব্দটি غَبْنٌ থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ লোকসান। আর্থিক লোকসান এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান উভয়কে غَبْنٌ বলা হয়।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল কোরআনে বলেনঃ আর্থিক লোকসান জ্ঞাপন করার জন্যে এই শব্দটি صيغة مجهول এ ব্যবহৃত হয় এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান জ্ঞাপন করার জন্যে باب سمع থেকে ব্যবহৃত হয়। تغابن শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে দুই তরফা কাজের জন্যে বলা হয়, অর্থাৎ, একজন অন্যজনের এবং অন্যজন তার লোকসান করবে, অথবা তার লোকসান প্রকাশ করবে।

বোখারীর এক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তির কাছে কারও কোন পাওনা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করে অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। নতুবা কেয়ামতের দিন দিরহাম ও দীনার থাকবে না। কারও কোন দাবী থাকলে তা সে ব্যক্তির সৎকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সৎকর্ম শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারের গোনাহ্ প্রাপ্য পরিমাণে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।—(মাযহারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য তফসীরবিদ কেয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার উপরোক্ত কারণই বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকের মতে সেদিন কেবল কাফের, পাপাচারী ও হতভাগাই লোকসান অনুভব করবে না ; বরং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও এভাবে লোকসান অনুভব করবে যে, হায়! আমরা যদি আরও বেশী সৎকর্ম করতাম, তবে জান্নাতের সুউচ্চ মর্তবা লাভ করতাম। সেদিন প্রত্যেকেই জীবনের সেই সময়ের জন্যে পরিতাপ করবে, যা অযথা ব্যয় করেছে। হাদীসে আছে ঃ

من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه كان عليه حسرة يوم القيامة

যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে এবং সমগ্র মজলিসে আল্লাহ্‌কে স্মরণ না করে, কেয়ামতের দিন সেই মজলিস তার জন্য পরিতাপের কারণ হবে।

কুরতুবীতে আছে, প্রত্যেক মুমিনও সেদিন সৎকর্ম ত্রুটির কারণে স্বীয় লোকসান অনুভব করবে। সূরা মরিয়ম কেয়ামতের নাম يَوْمَ الْحَسْرَةِ পরিতাপ দিবস বলে বর্ণিত হয়েছে। তারই অনুরূপ এখানে লোকসান দিবস নাম রাখা হয়েছে।

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

— অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কারও উপর কোন বিপদ আসে না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ্ তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, আল্লাহ্ তাআলার অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোথাও সামান্যতম বস্তু নড়াচড়া করতে পারে না। আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কারও কোন ক্ষতি এবং উপকার করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তকদীরে বিশ্বাসী নয়, বিপদ মুহূর্তে তার জন্যে কোন স্থিরতা ও শান্তির উপকরণ থাকে না। সে বিপদ দূরীকরণের উদ্দেশে হা-হুতাশ ও ছটফট করতে থাকে। এর বিপরীতে তকদীরে বিশ্বাসী মুমিনের অন্তরকে আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাসী করে দেন যে, যা কিছু হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার অনুমতি ও ইচ্ছাক্রমে হয়েছে। যে বিপদ তাকে স্পর্শ করেছে, তা অবধারিত ছিল, কেউ একে টলাতে পারত না এবং যে বিপদ থেকে সে মুক্ত রয়েছে, তা থেকে মুক্ত থাকাই অবধারিত ছিল। তাকে এই বিপদে জড়িত থাকার সাধ্য কারও ছিল না। এই ঈমান ও বিশ্বাসের ফলে পরকালের সওয়াবের ওয়াদাও তার সামনে থাকে, যদ্দ্বারা দুনিয়ার বিপদও সহজ হয়ে যায়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

— অর্থাৎ, মুসলমানগণ, তোমাদের কতক স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু। তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা কর। তিরমিযী, হাকেম প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত সেই মুসলমানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হিজরতের পর মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে হিজরত করে চলে যেতে মনস্থ করে, কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনরা তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দেয়।—(রূহুল-মা'আনী)

وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ — পূর্ববর্তী আয়াতে যাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শত্রু আখ্যা দেয়া হয়েছে, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ভবিষ্যতে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে কঠোর ব্যবহার করার ইচ্ছা করল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের এই অংশে বলা হয়েছে ঃ যদিও এই স্ত্রী ও সন্তানরা তোমাদের জন্যে শত্রুর ন্যায় কাজ করেছে এবং তোমাদেরকে ফরয পালনে বাধা দিয়েছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের সাথে কঠোর ও নির্দয় ব্যবহার করো না ; বরং মার্জনা, উপেক্ষা ও ক্ষমার ব্যবহার কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার অভ্যাসও ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করা।

গোনাহ্‌গার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও বিদ্বেষ রাখা অনুচিত ঃ আলেমগণ আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে বলেছেন যে, পরিবার-পরিজনের কেউ কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ করে ফেললেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা ও তার জন্যে বদদোয়া করা উচিত নয়।—(রূহুল-মা'আনী)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ — فِتْنَةٌ শব্দের অর্থ পরীক্ষা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের পরীক্ষা নেন যে, এসবের মহব্বতে লিপ্ত হয়ে সে আল্লাহ্‌র বিধানাবলীকে উপেক্ষা করে, না মহব্বতকে যথাসীমায় রেখে স্বীয় কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়।

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ — অর্থাৎ, যথাসাধ্য তাকওয়া ও খোদাভীতি অবলম্বন কর। এর আগে কোরআন পাকে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌কে এমন ভয় কর, যেমন ভয় করা তাঁর প্রাপ্য। এই আয়াত সাহাবায়ে-কেরামের কাছে খুবই দুঃসাধ্য ও কঠিন মনে হয়। কারণ, আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অনুযায়ী আল্লাহ্‌কে ভয় করার সাধ্য কার আছে? এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে কোনকিছু করার আদেশ করেন না। কাজেই তাকওয়াও সাধ্যানুযায়ী ওয়াজিব বোঝতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাকওয়া অর্জনে কেউ তার পূর্ণ শক্তি ও চেষ্টা নিয়োজিত করলেই আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আদায় হয়ে যাবে।—(রূহুল-মা'আনী-সংক্ষেপিত)

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً وَفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ① فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۬ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ② وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ③ وَالّٰٓئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓئِيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ④ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ⑤

সূরা আত্-ত্বালাক্ব

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ্ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দেবেন। (২) অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে। এতদ্দ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। (৩) এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (৪) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তানপ্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দেন। (৫) এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন।

সূরা আত্-ত্বালাক্ব

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ — বাক্যের দাবী ছিল এই যে, এরপরেও একবচনে বিধান বর্ণনা করা হত। কিন্তু এখানে বহুবচন ব্যবহার করে اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ বলা হয়েছে। এতে প্রত্যক্ষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু বহুবচনে সম্বোধন করার মধ্যে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আছে এবং এদিকে ইঙ্গিতও রয়েছে যে, এই বিধান বিশেষভাবে আপনার জন্যে নয়—সমগ্র উম্মতের জন্যে।

কেউ কেউ এস্থলে বাক্য উহ্য সাব্যস্ত করে এরূপ তফসীর করেছেন যে, হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন যে, তারা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়, তখন যেন পরে বর্ণিত আইন পালন করে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হয়েছে। অতঃপর তালাকের কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বিধান, فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ — عدت এর শাব্দিক অর্থ গণনা করা। শরীয়তের পরিভাষায় সেই সময়কালকে ইদ্দত বলা হয়, যাতে স্ত্রী এক স্বামীর বিবাহ বের হওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাধীন থাকে। কোন স্বামীর বিবাহ থেকে বের হওয়ার উপায় দু'টি। (এক) স্বামীর ইন্তেকাল হয়ে গেলে। এই ইদ্দতকে "ইদ্দতে-ওফাত" বলা হয়। গর্ভবতী নয়—এমন মহিলাদের জন্যে এই ইদ্দত চার মাস দশদিন। (দুই) বিবাহ থেকে বের হওয়ার দ্বিতীয় উপায় তালাক। গর্ভবতী নয়—এমন মহিলাদের জন্যে তালাকের ইদ্দত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে পূর্ণ তিন হায়েয। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে তালাকের ইদ্দত তিন তোহ্‌র (পবিত্রতাকাল)। সারকথা, এর জন্যে কোন দিন ও মাস নির্ধারিত নেই; বরং যত মাসে তিন হায়েয অথবা তিন তোহ্‌র পূর্ণ হয়, তাই তালাকের ইদ্দত। যেসব নারীর বয়সের স্বল্পতা হেতু এখনও হায়েয হয় না অথবা বেশী বয়স হওয়ার কারণে হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের বিধান পরে আলাদাভাবে বর্ণিত হচ্ছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দতও পরে বর্ণিত হচ্ছে। এতে ওফাতের ইদ্দত ও তালাকের ইদ্দত একইরূপ। সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আয়াতকে فطلقوهن لقبل عدتهن পাঠ করেছেন। হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে لقبل عدتهن ও এক রেওয়ায়েতে فى قبل عدتهن বর্ণিত আছে।—(রূহুল-মা'আনী)

বোখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) একথা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গোচরীভূত করলে তিনি খুব নারায হয়ে বললেন ঃ

ঃ তার উচিত হায়েয অবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করে নেয়া এবং স্ত্রীকে বিবাহে রেখে দেয়া। এই হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর আবার যখন স্ত্রীর হায়েয হবে এবং তা থেকে পবিত্র হবে, তখন যদি তালাক দিতেই চায়, তবে সহবাসের পূর্বে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে। এই ইদ্দতের আদেশই আল্লাহ্ তাআলা (আলোচ্য) আয়াতে দিয়েছেন।

এই হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয় — (এক) হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম। (দুই) কেউ এমতাবস্থায় তালাক দিলে সেই

তালাক প্রত্যাহার করে নেয়া ওয়াজিব (যদি প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হয়। ইবনে ওমর (রাঃ)-এর ঘটনায় তদ্রূপই ছিল।) (তিন) যে তোহ্‌রে তালাক দিবে, সেই তোহ্‌রে স্ত্রীর সাথে সহবাস না হওয়াই চাই। (চার) فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আয়াতের তফসীর তাই।

উপরোক্ত কেরাতদ্বয় এবং হাদীসদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, কোন স্ত্রীকে তালাক দিতে হলে ইদ্দত শুরু হওয়ার পূর্বে তালাক দিতে হবে। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে হায়েয থেকে, ইদ্দত শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে তোহ্‌রে তালাক দেয়ার ইচ্ছা থাকে সেই তোহ্‌রে সহবাস করবে না এবং তোহ্‌রের শেষ ভাগে হায়েয আসার পূর্বে তালাক দিবে। ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের মতে ইদ্দত তোহ্‌র থেকে শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোহ্‌রের শুরুতেই তালাক দিবে।

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে ঃ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ - احصاء শব্দের অর্থ গণনা করা। আয়াতের অর্থ এই যে, ইদ্দতের দিনগুলো সযত্নে স্মরণ রেখো এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই শেষ মনে করে নেয়ার মত ভুল করো না। ইদ্দতের দিনগুলো স্মরণে রাখার এই দায়িত্ব পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের। কিন্তু আয়াতে পুরুষবাচক পদ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, সাধারণভাবে সেসব বিধান পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে অভিন্ন, সেগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পুরুষবাচক পদই ব্যবহার করা হয়; স্ত্রীরা প্রসঙ্গতঃ তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই বিশেষক্ষেত্রে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত বিশেষ রহস্যও থাকতে পারে যে, স্ত্রীরা অধিক আনমনা, তাই সরাসরি পুরুষদেরকেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় বিধান হচ্ছে ঃ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ অর্থাৎ, স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এখানে তাদের গৃহ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত তাদের বসবাসের হক পুরুষের দায়িত্বে থাকে, সেই পর্যন্ত গৃহে তাদের অধিকার আছে। তাতে তাদের বসবাস বহাল রাখা কোন কৃপা নয়; বরং প্রাপ্য আদায়। বসবাসের হকও স্ত্রীর অন্যতম হক। আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, এই হক কেবল তালাক দিলেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। বরং ইদ্দতের দিনগুলোতে এই গৃহে বসবাস করার অধিকার স্ত্রীর আছে। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জুলুম ও হারাম। এমনিভাবে স্ত্রীর স্বেচ্ছায় বের হয়ে যাওয়াও হারাম; যদিও স্বামী এর অনুমতি দেয়। কেননা, এই গৃহেই ইদ্দত অতিবাহিত করা স্বামীরই হক নয় আল্লাহ্‌রও হক, যা ইদ্দত পালনকারিণীর উপর ওয়াজিব। হানাফী মাযহাব তাই।

চতুর্থ বিধান হচ্ছেঃ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ অর্থাৎ, ইদ্দত পালনকারিণী স্ত্রী কোন প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হারাম নয়। এটা তৃতীয় বিধানের ব্যতিক্রম। প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজ বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে।

(এক) নির্লজ্জ কাজ বলে খোদ গৃহ থেকে বের হয়ে যাওয়াই বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা দৃশ্যতঃ ব্যতিক্রম, যার উদ্দেশ্য গৃহ থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া নয়; বরং নিষেধাজ্ঞাকে আরও জোরদার করা। উদাহরণতঃ এরূপ বলা যে, এই কাজ করা কারও উচিত নয় সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে মনুষত্বই বিসর্জন দেয় অথবা তুমি তোমার জননীকে গালি দিও না এটা ব্যতীত যে, তুমি জননীর সম্পূর্ণই অবাধ্য হয়ে যাও। বলাবাহুল্য, প্রথম দৃষ্টান্তে ব্যতিক্রম দ্বারা সেই কাজের বৈধতা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য নয় এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে জননীর অবাধ্যতার বৈধতা প্রমাণ করা লক্ষ্য নয়; বরং বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তার আরও বেশী অবৈধতা ও মন্দ হওয়া বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতএব, আয়াতের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ এই হল যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা তাদের স্বামীর গৃহ থেকে বের হবে না, কিন্তু যদি তারা অশ্লীলতায়ই মেতে উঠে ও বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এর অর্থ বের হয়ে যাওয়ার বৈধতা নয়; বরং আরও বেশী নিন্দা ও নিষিদ্ধতা প্রমাণ করা। নির্লজ্জ কাজের এই তফসীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) সুদ্দী, ইবনে সায়েব, নাখয়ী (রহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) এই তফসীরই গ্রহণ করেছেন।— (রুহুল-মা'আনী)

(দুই) নির্লজ্জ কাজ বলে ব্যভিচার বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যতিক্রম যথার্থ অর্থেই বুঝতে হবে। অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ব্যভিচার করলে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার প্রতি শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করার জন্যে অবশ্যই তাকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বের করা হবে। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ্, হাসান বসরী, শা'বী যায়েদ ইবনে আসলাম, যাহ্‌হাক, ইকরিমা (রহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইউসুফ এই তফসীরই গ্রহণ করেছেন।

(তিন) নির্লজ্জ কাজ বলে কটু কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি তারা কটুভাষিণী ও ঝগড়াটে হয় এবং স্বামীর আপনজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তবে তাদেরকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা যাবে। এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। আলোচ্য আয়াতে হযরত উবাই ইবনে কা'ব ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর কেরাত এরূপঃ الا ان يفحشن এই শব্দের বাহ্যিক অর্থ অশ্লীল কথাবার্তা বলা। এই কেরাত থেকেও সর্বশেষ তফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়।—(রূহুল-মা'আনী) এই অবস্থায়ও ব্যতিক্রম আক্ষরিক অর্থে থাকবে।

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا — حُدُودُ اللَّهِ শরীয়তের নির্ধারিত আইনকানুন বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো লংঘন করে অর্থাৎ, আইন-কানুনের বিরোধিতা করে, সে নিজের উপর জুলুম করে; অর্থাৎ, আল্লাহ্ অথবা শরীয়তের কোন ক্ষতি করে না, নিজেরই ক্ষতিসাধন করে। এই ক্ষতি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়ই হতে পারে। পারলৌকিক ক্ষতি তো শরীয়ত বিরোধী কাজের গোনাহ্ ও পরকালের শাস্তি এবং ইহলৌকিক ক্ষতি এই যে, যে ব্যক্তি শরীয়তের নির্দেশাবলীর তোয়াক্কা না করে স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে অধিকাংশ সময় তিন তালাক পর্যন্ত পৌঁছে ক্ষান্ত হয়, যার পর পারস্পরিক প্রত্যাহার অথবা পুনর্বিবাহও হতে পারে না। মানুষ প্রায়ই তালাক দিয়ে অনুতাপ করে এবং বিপদের সম্মুখীন হয়; বিশেষ করে সন্তান-সন্ততি থাকলে। অতএব, তালাকের বিপদ দুনিয়াতেই তার ঘাড়ে চেপে বসে। অনেকেই স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার নিয়তে অন্যায়ভাবে তালাক দেয়। এরূপ তালাকের কষ্ট স্ত্রীও ভোগ করে। কিন্তু পুরুষের জন্যে এটা জুলুমের উপর জুলুম এবং দ্বিগুণ শাস্তির কারণ হয়ে যায়। (এক) আল্লাহ্‌র নির্ধারিত আইন-কানুন লংঘন করার শাস্তি এবং (দুই) স্ত্রীর উপর জুলুম করার শাস্তি।

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا — অর্থাৎ, তুমি জান না সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাআলা এই রাগ-গোস্বার পর অন্য কোন অবস্থা সৃষ্টি

করে দিবেন। অর্থাৎ, স্ত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত আরাম, সন্তানের লালন-পালন এবং গৃহের সহজ ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করে তুমি তাকে পুনরায় বিবাহে রাখার ইচ্ছা করতে পার। এমতাবস্থায় আবার বিবাহে থাকা তখন সম্ভবপর হবে, যখন তুমি তালাক দেয়ার সময় শরীয়তের আইন-কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং অহেতুক বাইন তালাক না দিয়ে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দাও। এরূপ তালাক দেয়ার পর প্রত্যাহার করে নিলে পূর্ববিবাহ যথারীতি বহাল থাকে। তুমি তিন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে তালাক দিও না, যার প্রত্যাহারের অধিকার থাকে না এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি সত্ত্বেও পরস্পরে পুনর্বিবাহও হালাল হয় না।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

— এখানে اجل শব্দের অর্থ ইদ্দত এবং اجل পর্যন্ত পৌঁছার অর্থ ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হওয়া।

তালাক সম্পর্কে পঞ্চম বিধান ঃ এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হয়, তখন স্থির মস্তিষ্কে পুনরায় চিন্তা করে দেখ যে, বিবাহ বহাল রাখা উত্তম না সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করে দেয়া ভাল। এ চিন্তার জন্যে এ সময়টি উত্তম। কারণ, ততদিনে পুরুষের সাময়িক রাগ-গোস্বা দমিত হয়ে যায়। যদি স্ত্রীকে বিবাহে রাখা স্থির হয়, তবে রেখে দাও। পরবর্তী আয়াতের ইঙ্গিত এবং হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী এর সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, মুখে বলে দাও আমি তালাক প্রত্যাহার করলাম। অতঃপর এর জন্যে দু'জন সাক্ষী রাখ।

পক্ষান্তরে যদি বিবাহ ভেঙ্গে দেয়াই সিদ্ধান্ত হয়, তবে স্ত্রীকে সুন্দর পন্থায় মুক্ত করে দাও। অর্থাৎ, ইদ্দত শেষ হতে দাও। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলেই স্ত্রী মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যায়।

ষষ্ঠ বিধান ঃ ইদ্দত সমাপ্ত হলে স্ত্রীকে রাখার সিদ্ধান্ত হোক অথবা মুক্ত করে দেয়ার, উভয় অবস্থাতে কোরআন পাক তা মারূফ অর্থাৎ, যথোপযুক্ত পন্থায় সম্পন্ন করতে বলেছে। 'মারূফ' শব্দের অর্থ পরিচিত পন্থা। উদ্দেশ্য এই যে, যে পন্থা শরীয়ত ও সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত এবং মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে খ্যাত, সেই পন্থা অবলম্বন কর। তা এই যে, বিবাহে রাখা এবং তালাক প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত হলে স্ত্রীকে মুখে অথবা কাজে কর্মে কষ্ট দিও না, তার উপর অনুগ্রহ রেখো না এবং তার যে কর্মগত ও চরিত্রগত দুর্বলতা তালাকের কারণ হচ্ছিল, অতঃপর নিজেও তজ্জন্যে সবর করার সংকল্প কর, যাতে পুনরায় সেই তিক্ততা সৃষ্টি না হয়। পক্ষান্তরে মুক্ত করা সিদ্ধান্ত হলে তার বিদিত ও সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে অথবা গালমন্দ দিয়ে গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না; বরং সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় কর। কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, তাকে কোন বস্ত্রজোড়া দিয়ে বিদায় করা কমপক্ষে মোস্তাহাব এবং কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিবও। ফেকাহ্র কিতাবাদিতে এর বিবরণ পাওয়া যাবে।

সপ্তম বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতে বিবাহে রাখা অথবা মুক্ত করে দেয়ার দ্বিবিধ ক্ষমতা দেয়া থাকে এবং পূর্ববর্তী لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا আয়াত থেকে প্রসঙ্গক্রমে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তালাক যদি দিতেই হয়, তবে এমন তালাক দিবে, যাতে প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে। এর সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, পরিষ্কার ভাষায় কেবল এক তালাক দিবে এবং সাথে সাথে রাগ-গোস্বা প্রকাশার্থে এমন কোন বাক্য বলবে না, যা বিবাহকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করার অর্থ জ্ঞাপন করে।

وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ — অর্থাৎ, মুসলমানদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী করে নাও এবং তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশে সঠিক সাক্ষ্য কায়েম কর।

অষ্টম বিধান ঃ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার সময় প্রত্যাহার করা সিদ্ধান্ত হোক কিংবা মুক্ত করা, উভয় অবস্থাতে এই কাজের জন্যে দু'জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রাখতে হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে এই বিধানটি মোস্তাহাব, এর উপর প্রত্যাহার নির্ভরশীল নয়। প্রত্যাহারের অবস্থায় সাক্ষী করার তাৎপর্য এই যে, পরবর্তীকালে স্ত্রী যাতে প্রত্যাহার অস্বীকার করে বিবাহ চূড়ান্তরূপে ভঙ্গ হওয়ার দাবী না করে বসে। মুক্ত করার অবস্থায় এ জন্যে সাক্ষী করতে হবে, যাতে পরবর্তীকালে স্বয়ং স্বামীই দুষ্টুমিচ্ছলে অথবা স্ত্রীর ভালবাসায় পরাভূত হয়ে দাবী না করে বসে যে, সে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই প্রত্যাহার করেছিল। সাক্ষীদ্বয়ের জন্যে ذَوَىْ عَدْلٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, শরীয়তের পরিভাষা অনুযায়ী সাক্ষীদ্বয়ের নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরী। অন্যথায় তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী কোন বিচারক ফয়সালা দিবে না।

وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ বাক্যে সাধারণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা কোন প্রত্যাহার কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনায় সাক্ষী হও এবং বিচারকের এজলাসে সাক্ষ্য দেয়ার প্রয়োজন হয় তবে কারও মুখ চেয়ে অথবা বিরোধিতা ও শত্রুতার কারণে সত্য সাক্ষ্য দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয়ো না।

ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ — অর্থাৎ, উপরোক্ত বিষয়বস্তু দ্বারা সে ব্যক্তিকে উপদেশ দান করা হচ্ছে, যে আল্লাহ্ ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এতে বিশেষভাবে পরকালে উল্লেখ করার কারণ এই যে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার আদায় খোদাভীতি ও পরকাল চিন্তা ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

— অর্থাৎ, যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্যে প্রত্যেক সংকট ও বিপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত রিযিক দান করেন।

تَقْوٰى শব্দের আসল অর্থ আত্মরক্ষা করা। শরীয়তের পরিভাষায় গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করার অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্র সাথে সম্বন্ধযুক্ত হলে এর অনুবাদ করা হয় আল্লাহ্কে ভয় করা। উদ্দেশ্য আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা ও ভয় করা।

আলোচ্য আয়াতে تَقْوٰى তথা খোদাভীতির দু'টি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে — (এক) খোদাভীতি অবলম্বনকারীর জন্যে আল্লাহ্ তাআলা নিষ্কৃতির পথ করে দেন। কি থেকে নিষ্কৃতি? এ সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, দুনিয়ার যাবতীয় সংকট ও বিপদ থেকে এবং পরকালের সব বিপদাপদ থেকে নিষ্কৃতি। (দুই) তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন, যা কল্পনায়ও থাকে না। এখানে রিযিকের অর্থও ইহকাল এবং পরকালের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু। এই আয়াতে মুমিন-মুত্তাকীর জন্যে আল্লাহ্ তাআলার এই ওয়াদা ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি তার প্রত্যেক সমস্যাও সহজসাধ্য করেন এবং তার অভাব-অনটন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে এমন পথে তার প্রয়োজনাদি সরবরাহ করেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না।—(রূহুল-মা'আনী)

স্থানের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে কোন কোন তফসীরবিদ এই

আয়াতের তফসীরে বলেছেন ঃ তালাকদাতা স্বামী ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী উভয়ই অথবা তাদের মধ্যে যে কেউ খোদাভীতি অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী সকল সংকট ও কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দান করবেন। পুরুষকে তার যোগ্যা স্ত্রী এবং স্ত্রীকে তার উপযুক্ত স্বামী দান করবেন। বলাবাহুল্য, আয়াতের যে আসল অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই অর্থও তাতে শামিল আছে।—(রূহুল-মা'আনী)

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, আল্লাহ্ তার মুশকিল কাজের জন্যে যথেষ্ট। কেননা, আল্লাহ্ তার কাজ যেভাবে ইচ্ছা পূর্ণ করে ছাড়েন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। তদনুয়ায়ী সব কাজ সম্পন্ন হয়। তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হযরত ওমর (রাঃ) – এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدواخماصا وتروح بطانا

যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর যথাযথ ভরসা করতে, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে পশু-পক্ষীর ন্যায় রিযিক দান করতেন। পশু-পক্ষী সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) –এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক বিনাহিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের অন্যতম গুণ এই যে, তারা আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে।— (মাযহারী)

وَالّٰئِي يَئِسْنَ ..... أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ এই আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দতের আরও বিবরণ আছে। এতে ইদ্দতের সাধারণ বিধি থেকে ভিন্ন তিন প্রকার স্ত্রীদের ইদ্দতের বিধান বর্ণিত হয়েছে।

তালাকের ইদ্দত সম্পর্কিত নবম বিধান ঃ সাধারণ অবস্থায় তালাকের ইদ্দত পূর্ণ তিন হায়েয। কিন্তু যেসব মহিলার বয়ঃবৃদ্ধি অথবা কোন রোগ ইত্যাদির কারণে হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, এমনিভাবে যেসব মহিলার বয়স না হওয়ার কারণে এখনও হায়েয আসা শুরু হয়নি তাদের ইদ্দত আলোচ্য আয়াতে তিন হায়েযের পরিবর্তে তিন মাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দত সন্তানপ্রসব সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা যতদিনেই হোক।

إِنِ ارْتَبْتُمْ – অর্থাৎ, যদি তোমাদের সন্দেহ হয়। সাধারণ ইদ্দত হায়েয দ্বারা গণনা করা হয়, কিন্তু এসব মহিলার হায়েয বন্ধ ; অতএব, তাদের ইদ্দত কিভাবে গণনা করা হবে—এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাকেই আয়াতে সন্দেহ বলা হয়েছে।

অতঃপর আবার খোদাভীতির ফযীলত ও বরকত বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا অর্থাৎ, যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া ও পরকালের কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এরপর আবার তালাক ও ইদ্দতের বর্ণিত বিধানাবলী পালন করার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ — এটা আল্লাহ্র বিধান, যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। এরপর তাকওয়ার আরও একটি ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا — অর্থাৎ, যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করেন এবং তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন।

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ
قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ
رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ﴿٨﴾
فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ
أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ
لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ
يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ
سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

(৬) তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্যে সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তানপ্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পর জেদ কর, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে। (৭) বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ্ কষ্টের পর সুখ দেবেন। (৮) অনেক জনপদ তাদের পালনকর্তা ও তাঁর রসূলগণের আদেশ অমান্য করেছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে কঠোর হিসাবে ধৃত করেছিলাম এবং তাদেরকে ভীষণ শাস্তি দিয়েছিলাম। (৯) অতঃপর তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করল এবং তাদের কর্মের পরিণাম ক্ষতিই ছিল। (১০) আল্লাহ্ তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি উপদেশ নাযিল করেছেন, (১১) একজন রসূল, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করেন, যাতে বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদের অন্ধকার থেকে আলোতে আনয়ন করেন। যে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাকে উত্তম রিযিক দেবেন। (১২) আল্লাহ্ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

খোদাভীতির পাঁচটি কল্যাণ ঃ পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে খোদাভীতির পাঁচটি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে—(১) আল্লাহ্ তাআলা খোদাভীরুদের জন্যে ইহকাল ও পরকালের বিপদাপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন। (২) তার জন্যে রিযিকের এমন দ্বার খুলে দেন যা কল্পনায়ও থাকে না। (৩) তার সব কাজ সহজ করে দেন। (৪) তার পাপসমূহ মোচন করে দেন। (৫) তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন। অন্য এক জায়গায় খোদভীতির এই কল্যাণও বর্ণিত হয়েছে যে, এর কারণে খোদাভীরুর পক্ষে সত্য ও মিথ্যার পরিচয় সহজ হয়ে যায়। إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর আবার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দত, তাদের ভরণ-পোষণ এবং সাধারণ স্ত্রীদের অধিকার আদায়ের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

— এই আয়াত উপরে বর্ণিত প্রথম বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এই আয়াতে তার ইতিবাচক দিক উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাসের জায়গা দাও। তোমরা যে গৃহে থাক, সেই গৃহের কোন অংশে তাদেরকে রাখ। প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে থাকলে কোন প্রকার পর্দা করারও প্রয়োজন নেই। 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে অবশ্য বিবাহ ছিন্ন হওয়ার কারণে তালাকদাতা স্বামীর কাছে পর্দা সহকারে সেই গৃহে বাস করতে হবে।

দশম বিধান ঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে ইদ্দতকালে উত্যক্ত করো না ঃ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ এর অর্থ এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা যখন ইদ্দতকালে তোমাদের সাথে থাকবে, তখন তিরস্কার করে অথবা তার অভাবপূরণে কৃপণতা করে তাকে উত্যক্ত করো না, যাতে সে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব তাদের ব্যয়ভার বহন করবে।

একাদশ বিধান ঃ তালাকপ্রাপ্তাদের ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ ঃ এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী হলে তার ভরণ-পোষণ সন্তান প্রসব পর্যন্ত স্বামীর উপর ওয়াজিব। এ কারণেই এ ব্যাপারে সমগ্র উম্মত একমত। তবে যে স্ত্রী গর্ভবতী নয়, তাকে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে থাকলে তার ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণ ও উম্মতের ইজমা দ্বারা স্বামীর উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে তাকে 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে, অথবা সে খোলা ইত্যাদির মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ করিয়ে থাকলে, তার ভরণ-পোষণ ইমাম শাফেয়ী, আহমদ (রহঃ) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম আযম (রহঃ)-এর মতে তার ভরণ-পোষণ তখনও স্বামীর উপর ওয়াজিব। তিনি বলেন ঃ বসবাসের অধিকার যেমন সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রাপ্য, তেমনি ভরণ-পোষণ ও সর্বপ্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রাপ্য, যা তালাকদাতা স্বামী আদায় করবে। তাঁর দলীল পূর্বোক্ত এই আয়াত ঃ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ কেননা, এই আয়াতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) –এর কেরাত এরূপ ঃ

— اسكنوهن من حيث سكنتم وانفقوا عليهن من وجدكم

সাধারণতঃ এ কেরাত অন্য কেরাতের তফসীর করে। অতএব, প্রসিদ্ধ কেরাতে যদিও انفقوا শব্দটি উল্লেখিত নেই, কিন্তু তা উহ্য আছে। প্রসিদ্ধ কেরাত যেভাবে বসবাসের অধিকার স্বামীদের উপর ওয়াজিব করেছে, তেমনি ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণও স্বামীদের যিম্মায় অপরিহার্য করে দিয়েছে। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ও অন্য কয়েকজন সাহাবীর এক উক্তি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ)-কে তার স্বামী তিন তালাক দিয়েছিল। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে বলেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার ভরণ-পোষণ তার স্বামীর উপর ওয়াজিব করেননি। হযরত ওমর (রাঃ) ও কয়েকজন সাহাবী ফাতেমার এই কথা খণ্ডন করে বলেছিলেন ঃ আমরা এই বর্ণনার ভিত্তিতে আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নতকে বর্জন করতে পারি না। এতে আল্লাহ্র কিতাব বলে বাহ্যতঃ এই আয়াতকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, হযরত ওমর (রাঃ)-এর মতে ভরণ-পোষণ ও আয়াতের মধ্যে দাখিল। রসূলের সুন্নত বলে তাহাভী, দারে-কুতনী ও তিবরানী বর্ণিত সেই হাদীসকে বোঝানো হয়েছে, যাতে স্বয়ং হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে শুনেছি, তিনি তিন তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যেও ভরণ-পোষণ এবং বসবাসের অধিকার স্বামীর উপর ওয়াজিব করেছেন।

সারকথা এই যে, গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণ এই আয়াত পরিষ্কারভাবে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে উম্মতের ইজমা আছে। এমনিভাবে প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তার বিবাহ ভঙ্গ না হওয়ার কারণে তার ভরণ-পোষণও সবার মতে ওয়াজিব। 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাকপ্রাপ্তাদের ব্যাপারে ফেকাহ্‌বিদগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আযম (রহঃ)-এর মতে তাদের ভরণ-পোষণও ওয়াজিব। এর পূর্ণ বিবরণ তফসীরে মাযহারীতে দেখুন।

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ — অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী হলে এবং সন্তানপ্রসব হয়ে গেলে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। তাই তার ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব থাকে না। কিন্তু প্রসূত সন্তানকে যদি তালাকপ্রাপ্তা মা স্তন্যদান করে, তবে স্তন্যদানের বিনিময় নেয়া জায়েয।

দ্বাদশ বিধানঃ স্তন্যদানের পারিশ্রমিক ঃ যে পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর বিবাহাধীন থাকে, সে পর্যন্ত সন্তানদেরকে স্তন্যদান করা স্বয়ং জননীর যিম্মায় কোরআনের আদেশ বলে ওয়াজিব। বলা হয়েছে وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ - যে কাজ কারও দায়িত্বে এমনিতেই ওয়াজিব, সেই কাজের জন্যে পারিশ্রমিক নেয়া ঘুষের শামিল, যা নেয়া উভয়ই নাজায়েয। এ ব্যাপারে ইদ্দতকালও বিবাহের মধ্যে গণ্য। কেননা, বিবাহ অবস্থায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণ যেমন স্বামীর উপর ওয়াজিব, ইদ্দতকালেও তেমনি ওয়াজিব। তবে সন্তান প্রসবের পর যখন ইদ্দত খতম হয়ে যায়, তখন তার ভরণ-পোষণও স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে না। এখন যদি সে প্রসূত সন্তানকে স্তন্যদান করে, তবে আলোচ্য আয়াত এর পারিশ্রমিক নেয়া ও দেয়া জায়েয সাব্যস্ত করেছে।

ত্রয়োদশ বিধান ঃ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ - ائتمار এর শাব্দিক অর্থ পরামর্শ করা এবং একজন অন্যজনের কথা মেনে নেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, স্তন্যদানের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীকে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যেন সাধারণ পারিশ্রমিক অপেক্ষা বেশী না চায় এবং স্বামী সাধারণ পারিশ্রমিক দিতে যেন অসম্মত না হয় এবং এ ব্যাপারে তারা যেন একে অপরের সাথে উদার ব্যবহার করে।

চতুর্দশ বিধানঃ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ অর্থাৎ, স্তন্যদান করার ব্যাপারটি যদি পারস্পরিক পরামর্শক্রমে মীমাংসা না হয়, অথবা স্ত্রী যদি তার সন্তানকে পারিশ্রমিক নিয়েও স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে আইনতঃ তাকে বাধ্য করা যাবে না, বরং মনে করতে হবে যে, সন্তানের প্রতি জননীর সর্বাধিক মায়ামমতা সত্ত্বেও যখন অস্বীকার করছে, তখন কোন বাস্তব ওযর আছে। কিন্তু যদি বাস্তবে ওযর না থাকে, কেবল রাগ-গোস্বার কারণে অস্বীকার করে, তবে আল্লাহ্র কাছে সে গোনাহ্‌গার হবে। তবে বিচারক তাকে স্তন্যদান করতে বাধ্য করবে না।

পঞ্চদশ বিধান ঃ স্ত্রীর ভরণ-পোষণের পরিমাণ নির্ধারণে স্বামীর আর্থিক সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

— অর্থাৎ, বিত্তশালী ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার রিযিক সীমিত, সে আমদানি ব্যয় করবে। এ থেকে জানা গেল যে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যাপারে স্ত্রীর অবস্থা ধর্তব্য হবে না; বরং স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী ভরণ-পোষণ দেয়া ওয়াজিব হবে। স্বামী বিত্তবান হলে বিত্তবানসুলভ ভরণ-পোষণ দেয়া ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিত্তশালী না হয়; বরং দরিদ্র ও ফকীর হয়। স্বামী দরিদ্র হলে দরিদ্রসুলভ ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিত্তশালীনী হয়। ইমাম আযম (রাঃ)-এর মাযহাব তাই। কোন কোন ফেকাহ্‌বিদের উক্তি এর বিপরীত।-(মাযহারী)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

— এটা আগের বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কাজের দায়িত্ব দেন না। তাই দরিদ্র ও নিঃস্ব স্বামীর উপর তারই অবস্থা অনুযায়ী ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে। এরপর স্ত্রীকে দরিদ্রসুলভ ভরণ-পোষণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার ও সবর করার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে ঃ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا অর্থাৎ, কারও এরূপ মনে করা উচিত নয়, বর্তমান দারিদ্র-চিরকাল বজায় থাকবে; বরং দারিদ্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহ্র হাতে। তিনি দারিদ্র্যের পর স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন।

জ্ঞাতব্য ঃ এই আয়াতে সেই স্বামীরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে বলে ইঙ্গিত আছে, যারা যথাসাধ্য স্ত্রীদের ওয়াজিব ভরণ-পোষণ আদায় করতে সচেষ্ট থাকে এবং স্ত্রীকে কষ্টে রাখার মনোবৃত্তি পোষণ না করে।-রূহুল মা'আনী)

فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا — আয়াতে উল্লেখিত এসব জাতির হিসাব ও আযাব পরকালে হবে, কিন্তু এখানে একে অতীত পদবাচ্যে ব্যক্ত করার কারণ এর নিশ্চিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা, যেন হয়েই গেছে।-(রূহুল-মা'আনী) আর এরূপ হতে পারে যে, এখানে হিসাবের অর্থ জিজ্ঞাসাবাদ নয় ; বরং শাস্তি নির্ধারণ করা। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থই নেয়া হয়েছে। এটাও হতে পারে যে, কঠোর হিসাব যদিও পরকালে হবে, কিন্তু আমলনামায় তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং হচ্ছে। একেই হিসাব করা হয়েছে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আযাবের অর্থ ইহকালীন আযাব, যা অনেক পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের উপর নাযিল হয়েছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا বাক্যে বর্ণিত

আযাব কেবল পরকালে হবে।

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا এই আয়াতের সহজ ব্যাখ্যা এই যে, ارسل শব্দ উহ্য মেনে এই অর্থ করা যে, নাযিল করেছেন কোরআন এবং প্রেরণ করেছেন রসূল (সাঃ)। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই করা হয়েছে। অন্যরা অন্য ব্যাখ্যাও লিখেছেন। উদাহরণতঃ 'যিকর' এর অর্থ স্বয়ং রসূল (সাঃ) এবং অধিক যিকরের কারণে তিনি নিজেই যেন যিকর হয়ে গেছেন।— (রূহুল-মা'আনী)

সপ্ত পৃথিবী কোথায় কোথায় কিভাবে আছে ঃ اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ এই আয়াত থেকে এতটুকু বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, আকাশ যেমন সাতটি পৃথিবীও তেমনি সাতটি। এখন এই সপ্ত পৃথিবী কোথায় ও কি আকারে আছে, উপরে নীচে স্তরে স্তরে আছে, না প্রত্যেক পৃথিবীর স্থান ভিন্ন ভিন্ন? যদি উপরে নীচে স্তরে স্তরে থাকে, তবে সপ্ত আকাশের মধ্যে আলাদা আলাদা ফেরেশতা আছে, তেমনি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মাঝখানেও ব্যবধান, বায়ুমণ্ডল, শূন্যমণ্ডল ইত্যাদি আছে কি না, তাতে কোন সৃষ্টজীব আছে কি না অথবা সপ্ত পৃথিবী পরস্পরে গ্রথিত কি না? এসব প্রশ্নের ব্যাপারে কোরআন পাক নীরব। এ সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত রয়েছে, সেসব হাদীসের অধিকাংশ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ এগুলোকে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং কেউ জাল এবং মনগড়া পর্যন্ত বলে দিয়েছেন। উপরে যেসব সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তির নিরীখে সবগুলোই সম্ভবপর। বলতে কি, এসব তথ্যানুসন্ধানের উপর আমাদের কোন ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। কবরে অথবা হাশরে আমাদেরকে এ সম্পর্কে প্রশ্নও করা হবে না। তাই নিরাপদ পন্থা এই যে, আমরা ঈমান আনব এবং বিশ্বাস করব আকাশের ন্যায় পৃথিবীও সাতটিই। সবগুলোকে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অপার শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। কোরআনের বর্ণনা এতটুকুই যে বিষয় বর্ণনা করা কোরআন জরুরী মনে করেনি, আমরাও তার পেছনে পড়ব না। এ জাতীয় বিষয়াদিতে পূর্ববর্তী মনীষীগণের কর্মপন্থা তাই ছিল। তাঁরা বলেছেন ঃ ابهموا ما ابهمه الله অর্থাৎ, যে বিষয়কে আল্লাহ্ তাআলা অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও। বিশেষতঃ বহমান তফসীর সর্বসাধারণের জন্য লিখিত হয়েছে। জনসাধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় নয়—এমন বিরোধপূর্ণ আলোচনা এতে সন্নিবেশিত করা হয়নি।

يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার আদেশ সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবীর মাঝখানে অবতীর্ণ হতে থাকে। আল্লাহ্র আদেশ দ্বিবিধ।— (আইনগত, যা আল্লাহ্র আদিষ্ট বান্দাদের জন্যে ওহী ও পয়গম্বরগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীতে মানব ও জিনের জন্যে আকাশ থেকে ফেরেশতাগণ এই আইনগত আদেশ পয়গম্বরগণের কাছে নিয়ে আসে। এতে আকায়েদ, এবাদত, চরিত্র, পারস্পরিক লেন-দেন, সামাজিক বিধি ইত্যাদি থাকে এগুলো মেনে চললে সওয়াব এবং অমান্য করলে আযাব হয়। (২) দ্বিতীয় প্রকার আদেশ সৃষ্টিগত। অর্থাৎ, আল্লাহ্র তকদীর প্রয়োগ সম্পর্কিত বিধি-বিধান। এতে জগত সৃষ্টি, জগতের ক্রমোন্নতি, হ্রাসবৃদ্ধি এবং জীবন ও মরণ দাখিল আছে। এসব বিধি -বিধান সমগ্র সৃষ্ট বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। তাই যদি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মধ্যস্থলে শূন্যমণ্ডল, ব্যবধান এবং তাতে কোন সৃষ্টজীবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে সেই সৃষ্টজীব শরীয়তের বিধি-বিধানের অধীন না হলেও তার প্রতি আল্লাহ্র আদেশ অবতীর্ণ হতে পারে। কারণ, আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টিগত আদেশ তাতেও ব্যাপ্ত।

সূরা তালাক সমাপ্ত

سُورَةُ التَّحْرِيمِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ○

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ① قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ② وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ③ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ④ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ⑤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ⑥

সূরা আত্-তাহরীম

মদীনায় অবতীর্ণ।ঃ আয়াত ১২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হে নবী, আল্লাহ্ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করছেন কেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (২) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৩) যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ্ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেন ঃ কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন ঃ যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন। (৪) তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ্, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী। (৫) যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবতঃ তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী তওবাকারিণী, এবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী। (৬) মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ্ তাআলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।

সূরা আত্‌তাহ্‌রীম

শানে নুযূল ঃ সহীহ্ বোখারী ইত্যাদি কিতাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসরের পর দাঁড়ানো অবস্থায়ই সকল বিবির কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্যে গমন করতেন। একদিন হযরত যয়নব (রাঃ)-এর কাছে একটু বেশী সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার মনে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং আমি হযরত হাফসা (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছে আসবেন, সেই বলবে ঃ আপনি "মাগাফীর" পান করেছেন। (মাগাফীর এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়।) সেমতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ না, আমি তো মধু-পান করেছি। সেই বিবি বললেন ঃ সম্ভবত ঃ কোন মৌমাছি 'মাগাফীর' বৃক্ষে বসে তার রস চুষেছিল। এ কারণেই মধু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে সযত্নে বেঁচে থাকতেন। তাই অতঃপর মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন। হযরত যয়নব (রাঃ) মনঃক্ষুন্ন হবেন চিন্তা করে তিনি বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যেও বলে দিলেন। কিন্তু সেই বিবি বিষয়টি অন্য বিবির গোচরীভূত করে দিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত হাফসা (রাঃ) মধু পান করেছিলেন এবং হযরত আয়েশা, সওদা ও সফিয়্যা (রাঃ) পরামর্শ করেছিলেন। কতক রেওয়ায়েতে ঘটনাটি অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। অতএব এটা অমূলক নয় যে, একাধিক ঘটনার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।— (বয়ানুল-কোরআন)

আয়াতসমূহের সার -সংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি হালাল বস্তু অর্থাৎ, মধুকে কসমের মাধ্যমে নিজের জন্যে হারাম করে নিয়েছিলেন। এ কাজ কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে হলে জায়েয; গোনাহ্ নয়, কিন্তু আলোচ্য ঘটনায় এমন কোন প্রয়োজন ছিল না যে, এর কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কষ্ট স্বীকার করে নিবেন এবং একটি হালাল বস্তু বর্জন করবেন। কেননা, একাজ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কেবল বিবিগণকে খুশী করার জন্যে করেছিলেন। এরূপ ব্যাপারে বিবিগণকে খুশী করা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে অপরিহার্য ছিল না। তাই আল্লাহ্ তাআলা সহানুভূতিস্থলে বলেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ — এই আয়াতেও কোরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাম নিয়ে সম্বোধন না করে 'হে নবী' বলা হয়েছে। এটা তাঁর বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রম। এরপর বলা হয়েছে যে, স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আপনি নিজের জন্যে একটি হালাল বস্তুকে হারাম করেছেন কেন? বাক্যটি যদিও সহানুভূতিচ্ছলে বলা হয়েছে, কিন্তু দৃশ্যতঃ এতে জওয়াব তলব করা হয়েছে। এ থেকে ধারণা হতে পারত যে, সম্ভবতঃ তিনি খুব বড় ভুল করে ফেলেছেন। তাই সাথে সাথে বলা হয়েছে وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ অর্থাৎ, গোনাহ্ হলেও আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

উল্লেখিত ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কসম খেয়েছিলেন। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এই কসম ভঙ্গ করেন এবং কাফফারা আদায় করেন। দুররে-মনসূরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি কাফফারা হিসাবে

একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দেন। — (বয়ানুল – কোরআন)

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ অর্থাৎ, যে ক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ করা জরুরী অথবা উত্তম বিবেচিত হয়, আল্লাহ্ তাআলা সেক্ষেত্রে তোমাদের কসম ভঙ্গ করে কাফফারা আদায় করার পথ করে দিয়েছেন। অন্যান্য আয়াতে এর বিশদ বর্ণনা আছে।

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا - অর্থাৎ, নবী যখন তাঁর কোন এক বিবির কাছে গোপন কথা বললেন। সহীহ্ ও অধিকাংশ রেওয়ায়েতদৃষ্টে এই গোপন কথা ছিল এই যে, হযরত যয়নব (রাঃ)-এর কাছে মধু পান করার কারণে অন্য বিবিগণ যখন মনঃক্ষুন্ন হলেন, তখন তাদেরকে খুশী করার জন্য তিনি মধু পান না করার কসম খেলেন এবং বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যে বলে দিলেন, যাতে যয়নব (রাঃ) মনে মনে কষ্ট না পান। কিন্তু সেই বিবি এই গোপন কথা ফাঁস করে দিলেন। এই গোপন কথা প্রসঙ্গে অন্যান্য রেওয়ায়েতে আরও কতিপয় বিষয় বর্ণিত আছে। কিন্তু অধিকাংশ ও সহীহ্ রেওয়ায়েতসমূহে তাই আছে, যা লিখিত হল।

فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ অর্থাৎ, সেই বিবি যখন গোপন কথাটি অন্য বিবির গোচরীভূত করে দিলেন এবং আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন, তখন তিনি সেই বিবির কাছে গোপনে কথা ফাঁস করে দেয়ার অভিযোগ তো করলেন, কিন্তু পূর্ণ কথা বললেন, না। এটা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভদ্রতা। তিনি দেখলেন সম্পূর্ণ কথা বললে সে অধিক লজ্জিত হবে। কোন বিবির কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল এবং কার কাছে ফাঁস করা হয়েছিল, কোরআন পাক তা বর্ণনা করেনি। অধিকাংশ রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) -এর কাছে তা ফাঁস করে দেন। এ সম্পর্কে সহীহ্ বোখারীর হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা পরে উল্লেখ করা হবে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে গোপন কথা ফাঁস করে দেয়ার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাফসা (রাঃ)-কে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করেন; কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈল (আঃ)-কে প্রেরণ করে তাঁকে তালাক থেকে বিরত রাখেন এবং বলে দেন যে, হাফসা (রাঃ) অনেক নামায পড়ে অনেক রোযা রাখে। তার নাম জান্নাতে আপনাার বিবিগণের তালিকায় লিখিত আছে।—(মাযহারী)।

اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا —— উপরোক্ত ঘটনার পশ্চাতে যে দু'জন বিবি সক্রিয় ছিলেন, তাঁরা কে, এসম্পর্কে সহীহ্ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এতে তিনি বলেন ঃ যে দু'জন নারী সম্পর্কে কোরআন পাকে اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ বলা হয়েছে, তাঁদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)-কে প্রশ্ন করার ইচ্ছা বেশ কিছুকাল আমার মনে ছিল। অবশেষে একবার তিনি হজ্বের উদ্দেশে রওয়ানা হলে সুযোগ বোঝে আমিও সফরসঙ্গী হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে একদিন যখন তিনি ওযু করছিলেন এবং আমি পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম, তখন প্রশ্ন করলাম ঃ কোরআনে যে দু'জন নারী সম্পর্কে اِنْ تَتُوْبَا বলা হয়েছে, তাঁরা কে? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আপনি জানেন না, এঁরা দু'জন হলেন হাফসা ও আয়েশা (রাঃ)। অতঃপর এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজের একটি দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত করলেন। এতে এই ঘটনার পূর্ববর্তী কিছু অবস্থাও বর্ণনা করলেন। তফসীরে-মাযহারীতে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ —এতে বলা হয়েছে ঃ যদি তোমরা তওবা করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে খুশী না কর, তবে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈল ও সমস্ত নেক মুসলমান তাঁর সহায়। সকল ফেরেশতা তাঁর সেবায় নিয়োজিত। অতএব, তাঁর ক্ষতি করার সাধ্য কার? ক্ষতি যা হবার, তোমাদেরই হবে। অতঃপর তাঁদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ — এতে বিবিগণের এই ধারণার জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তালাক দিয়ে দিলে তাদের মত স্ত্রী সম্ভবতঃ তিনি পাবেন না। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলার সামর্থ্যের বাইরে কোন কিছু নেই। তিনি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দিলে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের মতই নয়; বরং তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নারী তাঁকে দান করবেন। এতে জরুরী হয় না যে, তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট নারী তখন বিদ্যমান ছিল। হতে পারে যে, তখন ছিল না, কিন্তু প্রয়োজনে আল্লাহ্ তাআলা অন্য নারীদেরকে তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট করে দিতে পারেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিবিগণের কর্ম ও চরিত্রের সংশোধন এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষার বর্ণনা আছে। অতঃপর সাধারণ মুমিনগণকেও এ ব্যাপারে আদেশ করা হচ্ছে।

قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ —এই আয়াতে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে ঃ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নির ভয়াবহতা উল্লেখ করে অবশেষে একথাও বলা হয়েছে যে, যারা জাহান্নামের যোগ্য পাত্র হবে, তারা কোন শক্তি, দলবল, খোশামোদ অথবা ঘুষের মাধ্যমে জাহান্নামে নিয়োজিত কঠোরপ্রাণ ফেরেশতাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। এই ফেরেশতাদের নাম 'যবানিয়া'।

اَهْلِيْكُمْ শব্দের মধ্যে পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, চাকর-নওকর সবই দাখিল আছে। এক রেওয়ায়েতে আছে , এই আয়াত নাযিল হলে পর হযরত ওমর (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটি তো বোঝে আসে (যে, আমরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকব এবং খোদায়ী বিধি-বিধান পালন করব,) কিন্তু পরিবার-পরিজনকে আমরা কিভাবে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করব? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এর উপায় এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমার তাদেরকে সেসব কাজ করতে নিষেধ কর এবং যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার-পরিজনকেও সেগুলো করতে আদেশ কর। এই কর্মপন্থা তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করতে পারবে।—(রূহুল-মা'আনী)।

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য ঃ ফেকাহ্‌বিদগণ বলেন ঃ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ফরয কর্মসমূহ এবং হালাল ও হারামের বিধানাবলী শিক্ষা দেয়া এবং তা পালন করানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। একথা আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তাআলা সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে বলে ঃ হে আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা, তোমাদের যাকাত,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَعْتَذِرُوا۟ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٩﴾ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَٰنِتِينَ ﴿١٢﴾

(৭) হে কাফের সম্প্রদায়, তোমরা আজ ওযর পেশ করো না। তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোম'রা করতে। (৮) মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহ্ তাআলার কাছে তওবা কর—আন্তরিক তওবা। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ্ নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৯) হে নবী। কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। (১০) আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের জন্যে নূহ-পত্নী ও লূত-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা ছিল আমার দুই ধর্মপরায়ণ বান্দার গৃহে। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল ঃ জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও। (১১) আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের জন্যে ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা ! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন। (১২) আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এমরান-তনয়া মরিয়মের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিল। সে ছিল বিনয়প্রকাশকারীনীদের একজন।

তোমাদের এতীম, তোমাদের মিসকীন, তোমাদের প্রতিবেশী, আশা করা যায় আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে তোমাদের সাথে জান্নাতে সমবেত করবেন। "তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা" ইত্যাদি বলার উদ্দেশ্য এই যে, এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখ, এতে শৈথিল্য না হওয়া উচিত। "তোমাদের মিসকীন, তোমাদের এতীম" ইত্যাদি বলার অর্থ এই যে, তোমাদের প্রাপ্য খুশী মনে আদায় কর। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সেই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাবে থাকবে, যার পরিবার-পরিজন ধর্ম সম্পর্কে মূর্খ ও উদাসীনহবে।—(রূহুল-মা'আনী)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুমিনদেরকে উপদেশ দানের পর يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ আয়াতে কাফেরদেরকে বলা হয়েছে ঃ এখন তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের সামনে আসছে। এখন তোমাদের কোন ওযর কবূল করা হবে না।

تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا —তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। উদ্দেশ্য গোনাহ্ থেকে ফিরে আসা। কোরআন ও সুন্নাহ্র পরিভাষায় তওবার অর্থ বিগত গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার ধারে-কাছে না যাওয়ার দৃঢ়সংকল্প করা। نصوح শব্দটিকে যদি نصحة থেকে উদ্ভূত ধরা হয়, তবে এর অর্থ খাঁটি করা। আর যদি نصاحة থেকে ব্যুৎপন্ন ধরা হয়, তবে এর অর্থ বস্ত্র সেলাই করা ও তালি দেয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে تَوْبَةً نَّصُوحًا -এর অর্থ এমন তওবা, যা রিয়া ও নাম-যশ থেকে খাঁটি—কেবল আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ও আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে এবং গোনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে গোনাহ্ পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে نصوح শব্দটি এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার জন্যে হবে যে, তওবা গোনাহের কারণে সৎকর্মের ছিন্নবস্ত্রে তালি সংযুক্ত করে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ বিগত কর্মের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি না করার পাকাপোক্ত ইচ্ছা করাই توبة نصوح —কলবী (রহঃ) বলেন ঃ توبة نصوح হল মুখে ক্ষমাপ্রার্থনা করা, অন্তরে অনুশোচনা করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভবিষ্যতে সেই গোনাহ্ থেকে দূরে রাখা।

হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল ; তওবা কি ? তিনি বললেন ঃ ছয়টি বিষয়ের একত্র সমাবেশ হলে তওবা হবে—(১) অতীত মন্দকর্মের জন্যে অনুতাপ (২) যেসব ফরয ও ওয়াজিব কর্ম তরক করা হয়েছে, সেগুলোর কাযা করা, (৩) কারও ধন-সম্পদ ইত্যাদি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে থাকলে তা প্রত্যার্পণ করা, (৪) কাউকে হাতে অথবা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে তজ্জন্যে ক্ষমা নেয়া, (৫) ভবিষ্যতে সেই গোনাহের কাছে না যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হওয়া এবং (৬) নিজেকে যেমন আল্লাহ্ তাআলার নাফরমানী করতে দেখেছিল, তেমনি এখন আনুগত্য করতে দেখা।—(মাযহারী)।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত তওবার উপরোক্ত শর্তসমূহ সবার কাছে স্বীকৃত। তবে কেউ সংক্ষেপে এবং কেউ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ . عَسَىٰ —শব্দের অর্থ আশা আছে, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য ওয়াদা। ওয়াদাকে আশা বলে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের তওবা অথবা অন্য কোন সৎকর্ম হোক, কোনটিই জান্নাত ও মাগফেরাতের মূল্য হতে পারে না। নতুবা ইনসাফের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তাআলার জন্যে জরুরী হয়ে পড়ে যে, যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, তাকে অবশ্যই জান্নাতে দাখিল করতে হবে। সৎকর্মের এক প্রতিদান তো

প্রত্যেক মানুষ পার্থিব জীবনে প্রাপ্ত নেয়ামতের আকারে পেয়ে যায়। এর বিনিময় আইনের দৃষ্টিতে জান্নাত পাওয়া জরুরী নয়। এটা কেবল আল্লাহ্ তাআলার কৃপা ও অনুগ্রহের উপরই নির্ভরশীল। বোখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কাউকে শুধু তার সৎকর্ম মুক্তি দিতে পারে না যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা কৃপা ও রহমতের ব্যবহার না করেন। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আপনাকেও মুক্তি দিতে পারে না? তিনি বললেন ঃ হাঁ আমাকেও।—(মাযহারী)।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ — সূরার শেষভাগে আল্লাহ্ তাআলা চার জন নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। প্রথম দুই নারী দুই জন পয়গম্বরের পত্নী। তারা ধর্মের ব্যাপারে আপন আপন স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং গোপনে কাফের ও মুশরেকদেরকে সাহায্য করেছিল। ফলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় পয়গম্বরগণের বৈবাহিক সাহচর্যও তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাদের একজন হযরত নূহ (আঃ)—এর পত্নী, তার নাম 'ওয়ায়েলা' বর্ণিত আছে। অপরজন লূত (আঃ) পত্নী, তার নাম 'ওয়ালেহা' কথিত আছে।—(কুরতুবী) তৃতীয়জন সর্ববৃহৎ কাফের, খোদায়ী দাবীদার ফেরাউনের পত্নী ছিলেন, কিন্তু হযরত মূসা (আঃ)—এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে মহান মর্যাদা দান করেছেন এবং দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের আসন দেখিয়ে দিয়েছেন। স্বামীর ফেরাউনী আচরণ তাঁর পথে মোটেই প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। চতুর্থ জন হযরত মরিয়ম। তিনি কারও পত্নী নন, কিন্তু ঈমান ও সৎকর্মের বদৌলতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নবুওয়তের গুণাবলী দান করেছেন, যদিও অধিকাংশ আলমের মতে তিনি নবী নন।

এসব দৃষ্টান্ত দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, একজন মুমিনের ঈমান তার কোন কাফের স্বজন ও আত্মীয়ের উপকারে আসতে পারে না। তাই নবী ও ওলীগণের পত্নীরা যেন নিশ্চিন্ত না হয় যে, তারা তাদের স্বামীদের কারণে মুক্তি পেয়েই যাবে এবং কোন কাফের পাপাচারীর পত্নী যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয় যে, স্বামীর কুফরী ও পাপাচার তার জন্যে ক্ষতিকর হবে ; বরং প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে নিজেই নিজের ঈমান ও সৎকর্মের চিন্তা করা উচিত।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ

ابْنِ لِیْ عِنْدَكَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ —এটা ফেরাউন-পত্নী হযরত আসিয়া বিনতে মুযাহিমের দৃষ্টান্ত। মূসা (আঃ) যখন যাদুকরদের মোকাবেলায় সফল হন এবং যাদুকররা মুসলমান হয়ে যায়, তখন বিবি আসিয়া তাঁর ঈমান প্রকাশ করেন। ফেরাউন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ভীষণ শাস্তি দিতে চাইল। কতক রেওয়ায়েতে আছে, ফেরাউন তাঁর চার হাত পায়ে পেরেক মেরে বুকের উপর ভারী পাথর রেখে দিল, যাতে তিনি নড়াচড়া পর্যন্ত করতে না পারেন। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহ্ তাআলার কাছে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দোয়া করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ফেরাউন উপর থেকে একটি ভারী পাথর তাঁর মাথার উপর ফেলে দিতে মনস্থ করলে তিনি এই দোয়া করেন। ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর আত্মা কবজ করে নেন এবং পাথরটি নিষ্প্রাণ দেহের উপর পতিত হয়। তিনি দোয়ায় বলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি নিজের সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের গৃহ দেখিয়ে দেন।—(মাযহারী)।

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ — كلمات ربها বলে পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্ তাআলার সহীফা বোঝানো হয়েছে এবং كتب বলে প্রসিদ্ধ ঐশীগ্রন্থ ইঞ্জীল, যবুর ও তওরাত বোঝানো হয়েছে।

وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِیْنَ - قانتين শব্দটি قانت -এর বহুবচন। এর অর্থ নিয়মিত এবাদতকারী, এটা হযরত মরিয়মের পরিচিতি। হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামেল ও সিদ্ধপুরুষ হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল ফেরাউন-পত্নী আসিয়া, এমরান তনয়া মরিয়ম সিদ্ধিলাভ করেছেন।—(মাযহারী) বাহ্যতঃ এখানে নবুওয়তের গুণাবলী বোঝানো হয়েছে, যা নারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অর্জন করেছেন।—(মাযহারী)।

সূরা তাহ্রীম সমাপ্ত

سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرُ ۝ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ
عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۗ
مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ
تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ
الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا
بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۗ
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ
تَفُوْرُ ۝ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۗ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ
خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا
وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝
وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝

সূরা আল-মুলক

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৩০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) পুণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। (৩) তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিফিরাও ; কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (৪) অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ—তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (৫) আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি ; সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপণাস্ত্রবৎ করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্যে জলন্ত অগ্নির শাস্তি। (৬) যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। (৭) যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। (৮) ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে। তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? (৯) তারা বলবে ঃ হাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ্ তাআলা কোন কিছু নাজিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। (১০) তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।

সূরা আল-মুলক

সূরা মুলকের ফযীলত ঃ এই সূরাকে হাদীসে ওয়াকিয়া ও মুনজিয়া বলা হয়েছে। ওয়াকিয়া শব্দের অর্থ রক্ষাকারী এবং মুনজিয়া শব্দের অর্থ মুক্তিদানকারী। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ هى المانعة المنجية تنجيه من عذاب القبر অর্থাৎ, এই সূরা আযাব রোধ করে এবং আযাব থেকে মুক্তি দেয়। যে এ সূরা পাঠ করে, তাকে এ সূরা কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবে।—(কুরতুবী)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত ; রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, সূরা মুলক প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে গ্রথিত থাকুক। হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েত ; রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার কিতাবে একটি সূরা আছে, যার আয়াত তো মাত্র ত্রিশটি কিন্তু কেয়ামতের দিন এই সূরা এক এক ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করবে ; সেটা সূরা মুলক।—(কুরতবী)।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - تَبٰرَكَ — بركت —থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ বেশী হওয়া। এই শব্দটি আল্লাহ্ তাআলার শানে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সর্বোচ্চ ও মহান। بِيَدِهِ الْمُلْكُ —আল্লাহ্ তাআলার হাতে রয়েছে রাজত্ব। কোরআন পাকের স্থানে স্থানে আল্লাহ্ তাআলার জন্যে হাত অর্থে يد শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বহু উর্ধ্বে। তাই এটা একটা متشابه শব্দ। একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। কিন্তু এর অবস্থা ও স্বরূপ কারও জানার বিষয় নয়। এর রহস্য উদঘাটনে ব্রতী হওয়া অবৈধ। রাজত্ব বলে আকাশ ও পৃথিবী এবং ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কর্তৃত্ব বোঝানো হয়েছে। আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার জন্যে চারিটি গুণ দাবী করা হয়েছে। (এক) তিনি বিদ্যমান আছেন। (দুই) তিনি চরম পূর্ণত্ব গুণের অধিকারী এবং সবার উর্ধ্বে। (তিন) তাঁর রাজত্ব আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত এবং (চার) তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। পরবর্তী আয়াতসমূহে এ দাবীর যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে, যা আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টজীবের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করলেই ফুটে উঠে। তাই পরে আয়াতসমূহে সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও সৃষ্টবস্তুর বিভিন্ন প্রকার দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব, তওহীদ এবং তাঁর জ্ঞান ও শক্তিমত্তা সপ্রমাণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সৃষ্টির সেরা মানুষের অস্তিত্বে খোদায়ী কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি করে বলা হয়েছে ঃ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ —এরপর কয়েক আয়াতে আকাশ সৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে প্রমাণ এনে বলা হয়েছে, الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ —এরপর هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا থেকে দুই আয়াতে পৃথিবী সৃজন ও তার উপকারিতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে শূন্যমণ্ডলে বসবাসরকারী সৃষ্টজীব পক্ষীদের উল্লেখ করে اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ বলা হয়েছে। মোটকথা, সমগ্র সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব, জ্ঞান-গরিমা ও শক্তি-সামর্থ্যের পক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা। প্রসঙ্গক্রমে কাফেরদের শাস্তি, মুমিনদের প্রতিদান ইত্যাদি বিষয়বস্তুও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণ জ্ঞান ও শক্তির যেসব প্রমাণ মানুষের মধ্যে রয়েছে দু'টি শব্দের মাধ্যমে সেগুলো নির্দেশ করা হয়েছে।

মরণ ও জীবনের স্বরূপ ঃ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ অর্থাৎ, তিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। মানুষের অবস্থাসমূহের মধ্যে এখানে কেবল মরণ ও জীবন এই দু'টি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, এই দু'টি অবস্থাই মানব জীবনের যাবতীয় হাল ও ক্রিয়াকর্মে পরিব্যাপ্ত। জীবন একটি অস্তিবাচক বিষয় বিধায় এর জন্যে সৃষ্টি শব্দ যথার্থই প্রযোজ্য। কিন্তু মৃত্যু বাহ্যতঃ নাস্তিবাচক বিষয়। অতএব, একে সৃষ্টি করার মানে কি? এই প্রশ্নের জওয়াবে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক স্পষ্ট উক্তি এই যে, মৃত্যু নিরেট নাস্তিকে বলা হয় না; বরং মৃত্যুর সংজ্ঞা হচ্ছে আত্মা ও দেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা। এটা অস্তিবাচক বিষয়। মোটকথা, জীবন যেমন দেহের একটি অবস্থার নাম, মৃত্যুও তেমনি একটি অবস্থা। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্য কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, মরণ ও জীবন দু'টি শরীরী সৃষ্টি। মরণ একটি ভেড়ার আকারে এবং জীবন একটি ঘোটকীর আকারে বিদ্যমান। বাহ্যতঃ একটি সহীহ্ হাদীসের সাথে সুর মিলিয়ে এই উক্তি করা হয়েছে। হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে দাখিল হয়ে যাবে, তখন মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকারে উপস্থিত করা হবে এবং পুলসিরাতের সন্নিকটে যবাই করে ঘোষণা করা হবে ঃ এখন যে যে অবস্থায় আছে অনন্তকাল সেই অবস্থায়ই থাকবে। এখন থেকে কারও মৃত্যু হবে না। কিন্তু এই হাদীস থেকে দুনিয়াতে মৃত্যুর শরীরী হওয়া জরুরী হয় না ; বরং এর অর্থ এই যে, দুনিয়ার অনেক অবস্থা ও কর্ম যেমন কেয়ামতের দিন শরীরী ও সাকার হয়ে যাবে, যা অনেক সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি মানুষের মৃত্যুরূপী অবস্থাও কেয়ামতে শরীরী হয়ে ভেড়ার আকার ধারণ করবে এবং তাকে যবাই করা হবে।—(কুরতুবী)।

তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে, মৃত্যু নাস্তি হলেও নিছক নাস্তি নয় ; বরং এমন বস্তুর নাস্তি, যা কোন সময় অস্তিত্ব লাভ করবে। এ ধরনের সকল নাস্তিবাচক বিষয়ের আকার জড়-অস্তিত্ব লাভের পূর্বে 'আলমে-মিছালে' (সাদৃশ জগতে) বিদ্যমান থাকে। এগুলোকে 'আ'য়ানে-সাবেতা' তথা প্রতিষ্ঠিত বস্তুনিচয় বলা হয়। এসব আকারের কারণে এগুলোর অস্তিলাভের পূর্বেও এক প্রকার অস্তিত্ব আছে। এরপর তফসীরে-মাযহারীতে 'আলমে-মিছাল' প্রমাণ করার উদ্দেশে অনেক হাদীস থেকে প্রমাণাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

মরণ ও জীবনের বিভিন্ন স্তর ঃ তফসীরে-মাযহারীতে আছে, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অপার শক্তি ও প্রজ্ঞা দ্বারা সৃষ্টিকে বিভিন্নভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেককে এক প্রকার জীবন দান করেছেন। সর্বাধিক পরিপূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন মানবকে দান করা হয়েছে। এতে একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় লাভ করার যোগ্যতাও নিহিত রেখেছেন। এই পরিচয়ই মানুষকে খোদায়ী আদেশ-নিষেধের অধীন করার ভিত্তি এবং এই পরিচয়ই সেই আমানতের গুরুভার, যা বহন করতে আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা অক্ষমতা প্রকাশ করে কিন্তু মানুষ খোদা প্রদত্ত যোগ্যতার কারণে তা বহন করতে সক্ষম হয়। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে রয়েছে ঃ

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنٰهُ —অর্থাৎ, কাফেরকে মৃত এবং মুমিনকে জীবিত আখ্যা দেয়া হয়েছে। কারণ, কাফের তার উপরোক্ত পরিচয় বিনষ্ট করে দিয়েছে। সৃষ্টির কোন কোন প্রকারের মধ্যে জীবনের এই স্তর নেই, কিন্তু চেতনা ও গতিশীলতা বিদ্যমান আছে। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ নিম্নোক্ত আয়াতে আছে,

وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ —এখানে জীবনের অর্থ অনুভূতি ও গতিশীলতা এবং মৃত্যুর অর্থ তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। কোন কোন সৃষ্টির মধ্যে এই অনুভূতি ও গতিশীলতাও নেই, কেবল বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা আছে; যেমন সাধারণ বৃক্ষ ও উদ্ভিদ এ ধরনের জীবনের অধিকারী। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا আয়াতে আছে। এই তিন প্রকার জীবন মানব, জন্তু-জানোয়ার ও উদ্ভিদের মধ্যে সীমিত। এগুলো ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর মধ্যে এই ধরনের জীবন নেই। তাই আল্লাহ্ তাআলা প্রস্তর নির্মিত প্রতিমা সম্পর্কে বলেছেন ঃ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ —কিন্তু এতদসত্ত্বেও জড়পদার্থের মধ্যেও অস্তির জন্যে অপরিহার্য বিশেষ এক প্রকার জীবন বিদ্যমান আছে। এই জীবনের প্রভাবই কোরআন পাকে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ —অর্থাৎ, এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা-কীর্তন করে না। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আয়াতে মৃত্যুকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণও ফুটে উঠেছে। মূলতঃ মৃত্যুই অগ্রে। অস্তিত্বলাভ করে—এমন প্রত্যেক বস্তুই পূর্বে মৃত্যুজগতে থাকে। পরে তাকে জীবন দান করা হয়। একথাও বলা যায় যে, পরবর্তী لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا আয়াতে মরণ ও জীবন সৃষ্টি করার কারণ মানুষের পরীক্ষা নির্ণয় করা হয়েছে। এই পরীক্ষা জীবনের তুলনায় মৃত্যুর মধ্যে অধিক। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের মৃত্যুকে উপস্থিত জ্ঞান করবে, সে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদনে অধিকতর সচেষ্ট হবে। জীবনের মধ্যেও এই পরীক্ষা আছে। কারণ, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষ এই অভিজ্ঞজ্ঞতা লাভ করতে থাকে যে, সে নিজে অক্ষম এবং আল্লাহ্ তাআলা সর্বশক্তিমান। এ অভিজ্ঞতা মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু মৃত্যুচিন্তা কর্ম সংশোধন ও সৎকর্ম সম্পাদনের সর্বাধিক কার্যকর।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ كفى بالموت واعظا وكفى باليقين غنى অর্থাৎ, মৃত্যু উপদেশের জন্যে এবং বিশ্বাসই ধনাঢ্যতার জন্যে যথেষ্ট।—(তিবরানী) উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনদের মৃত্যু প্রত্যক্ষকরণ সবচাইতে বড় উপদেশদাতা। যারা এই দৃশ্য দেখে প্রভাবান্বিত হয় না, অন্য কোন কিছু দ্বারা তাদের হওয়া সুদূর পরাহত। আল্লাহ্ তাআলা যাকে ঈমান ও বিশ্বাসরূপী ধন দান করেছেন, তার সমতুল্য কোন ধনাঢ্য ও অমুখাপেক্ষী নেই। রবী ইবনে আস (রহঃ) বলেন ঃ মৃত্যু মানুষকে সংসারের সাথে সম্পর্কহীন করা ও পরকালের প্রতি আগ্রহান্বিত করার জন্যে যথেষ্ট।

أَحْسَنُ عَمَلًا এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, মরণ ও জীবনের সাথে জড়িত মানুষের পরীক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আমি দেখতে চাই, তোমাদের মধ্যে কার কর্ম ভাল। একথা বলেননি যে, কার কর্ম বেশী। এ থেকে বোঝা যায় যে, কারও কর্মের পরিমাণ বেশী হওয়া আল্লাহ্ তাআলার কাছে আকর্ষণীয় ব্যাপার নয় ; বরং কর্মটি ভাল, নির্ভুল ও মকবুল হওয়াই ধর্তব্য। এ কারণেই কেয়ামতের দিন মানুষের কর্ম গণনা করা হবে না ; বরং ওজন করা হবে। এতে কোন কোন একটি কর্মের ওজনই হাজারো কর্ম অপেক্ষা বেশী হবে।

ভাল কর্ম কি ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই আয়াতে তেলাওয়াত করতঃ أَحْسَنُ عَمَلًا পর্যন্ত পৌছে বললেন ঃ সেই ব্যক্তি ভাল কর্মী, যে আল্লাহ্ তাআলার হারামকৃত বিষয়াদি থেকে

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١٢﴾ وَاَسِرُّوْا
قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٣﴾ اَلَا يَعْلَمُ
مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٤﴾ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ
الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ
النُّشُوْرُ ﴿١٥﴾ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ
الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ﴿١٦﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ
يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ
كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا
اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؔؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ
اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ
يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ﴿٢٠﴾
اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا
فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ﴿٢١﴾ اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖۤ
اَهْدٰۤى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾

(১১) অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক। (১২) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (১৩) তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (১৪) যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত। (১৫) তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। (১৬) তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন, অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে। (১৭) না তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী। (১৮) তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কত কঠোর হয়েছিল আমার অস্বীকৃতি। (১৯) তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি—পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ্-ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব-বিষয় দেখেন। (২০) রহমান আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত তোমাদের কোন সৈন্য আছে কি, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফেররা বিভ্রান্তিতেই পতিত আছে। (২১) তিনি যদি রিযিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দিবে বরং তারা অবাধ্যতা ও বিমুখতায় ডুবে রয়েছে।। (২২) যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি সৎ পথে চলে, না সে ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরলপথে চলে?

সর্বাধিক বেঁচে থাকে এবং আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য করার জন্যে সদাসর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে।—(কুরতুবী)।

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ — এই আয়াত থেকে বাহ্যত: জানা যায় যে, দুনিয়ার মানুষ আকাশকে চোখে দেখতে পারে এবং উপরে যে নীলাভ শূন্যমণ্ডল পরিদৃষ্ট হয়, তাই আকাশ হবে, এটা জরুরী নয়। বরং এটা সম্ভবপর যে, আকাশ আরও অনেক অনেক উপরে অবস্থিত হবে। উপরে যে নীলাভ রঙ দেখা যায়, এটা বায়ু ও শূন্যমণ্ডলের রঙ। দার্শনিকগণ তাই বলে থাকেন। কিন্তু এ থেকে এটা ও জরুরী হয় না যে, আকাশ মানুষের দৃষ্টিগোচরই হবে না। এটা সম্ভবপর যে, এই নীলাভ শূন্যমণ্ডল কাঁচের মত স্বচ্ছ হওয়ার কারণে বহু উপরে অবস্থিত আকাশ দেখার পথে অন্তরায় নয়। যদি একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় আকাশকে চোখে দেখা যেতে পারে না, তবে এই আয়াতে দেখার অর্থ হবে চিন্তা-ভাবনা করা।—(বয়ানুল-কোরআন)।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ

مصابيح—বলে নক্ষত্ররাজি বোঝানো হয়েছে। নিম্নতম আকাশকে নক্ষত্ররাজির দ্বারা সুশোভিত করার জন্যে এটা জরুরী নয় যে, নক্ষত্ররাজি আকাশের গায়ে অথবা তার উপরে সংযুক্ত থাকবে ; বরং নক্ষত্ররাজি আকাশের বহু নিম্নে মহাশূন্যে থাকা অবস্থায়ও এই আলোকসজ্জা হতে পারে। আধুনিক গবেষণায় এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। নক্ষত্ররাজিকে শয়তান বিতাড়িত করার জন্যে অঙ্গার করে দেয়ার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, নক্ষত্ররাজি থেকে কোন অগ্নেয় উপাদান শয়তানদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং নক্ষত্ররাজি স্বস্থানেই থেকে যায়। সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নক্ষত্রের ন্যায় গতিশীল দেখা যায়। তাই একে তারকা খসে যাওয়া এবং আরবীতে انقضاض الكوكب বলে দেয়া হয়।—(কুরতুবী)।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, ঐশী সংবাদাদি চুরি করার জন্যে শয়তানরা যখন উর্ধ্বগগণে আরোহণ করে, তখন তাদেরকে নক্ষত্ররাজি পর্যন্ত পৌঁছার আগেই বিতাড়িত করে দেয়া হয়।—(কুরতুবী) এ পর্যন্ত বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ শক্তির প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ থেকে সাত আয়াত পর্যন্ত কাফেরদের শাস্তি ও অনুগত মুমিনদের সওয়াব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর পুনরায় জ্ঞান ও শক্তির বর্ণনা রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا — ذَلُوْلًا এর শাব্দিক অর্থ বাধ্য ও অনুগত। যে জন্তু আরোহণের সময় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে না, তাকে ذلول বলা হয়। مناكب শব্দটি منكب-এর বহুবচন। এর অর্থ কাঁধ। যে কোন জন্তুর কাঁধ আরোহণের স্থান নয় ; বরং কোমড় অথবা ঘাড় আরোহণের জায়গা হয়ে থাকে। যে জন্তু আরোহীর জন্যে নিজের কাঁধও পেশ করে দেয়, সে খুবই বাধ্য, অনুগত ও বশীভূত হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে, আমি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্যে এমন বশীভূত করে দিয়েছি যে, তোমরা তার কাঁধে চরে অবাদে বিচরণ করতে পার। আল্লাহ্ তাআলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, এটা পানির ন্যায় তরলও নয় এবং রুটি ও কর্দমের ন্যায় চাপ সহযোগে নীচেও নেমে যায় না। ভূপৃষ্ঠ এরূপ হলে

তার উপর মানুষের বসবাস সম্ভবপর হত না। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠকে লৌহ ও প্রস্তরের ন্যায় শক্তও করা হয়নি। এরূপ হলে তাতে বৃক্ষ ও শস্য বপন করা যেত না, কূপ ও খাল খনন করা যেত না এবং খনন করে সুউচ্চ অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা যেত না। এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা ভূপৃষ্ঠকে স্থিরতা দান করেছেন, যাতে এর উপর দালান-কোঠা স্থির থাকে এবং চলাচলকারীরা হোঁচট না খায়।

وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ —আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে ভূপৃষ্ঠের আনাচে-কানাচে বিবরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, এরপর বলেছেন আল্লাহ্ তাআলা প্রদত্ত রিযিক আহার কর। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ভ্রমণ এবং পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রফতানি আল্লাহ্ তাআলা প্রদত্ত রিযিক হাসিল করার দরজা। وَإِلَيْهِ النُّشُورُ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে পানাহার ও বসবাসের উপকারিতা লাভ করার অনুমতি আছে, কিন্তু মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো না, পরিণামে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। ভূপৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় পরকালের প্রস্তুতিতে লেগে থাকে। পরবর্তী আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে বসবাসরত অবস্থায়ও আল্লাহ্ তাআলার আযাব আসতে পারে। এরশাদ হয়েছে ঃ

ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

তোমরা কি এ বিষয়ে ভাবনামুক্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং ভূগর্ভ তোমাদেরকে গিলে ফেলবে? অর্থাৎ, যদিও আল্লাহ্ তাআলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, খনন ব্যতীত কেউ এর অভ্যন্তরে যেতে পারে না, কিন্তু তিনি একে এরূপও করে দিতে সক্ষম যে, এই ভূপৃষ্ঠই তার উপরে বসবাসকারীদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। পরের আয়াতে অন্য এক প্রকার আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ

كَيْفَ نَذِيرِ —অর্থাৎ, তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন? তখন তোমরা এই সতর্কবাণীর পরিণতি জানতে পারবে। কিন্তু তখন জানা নিষ্ফল হবে। আজ সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় এ বিষয়ে চিন্তা কর। এরপর দুনিয়াতে আযাবপ্রাপ্ত জাতীসমূহের ঘটনাবলীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ আয়াতের মর্মার্থ তাই। অতঃপর সূরার মূল বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে সৃষ্টির হাল-অবস্থা থেকে আল্লাহ্ তাআলার তওহীদ, জ্ঞান ও শক্তির পক্ষে প্রমাণ আনা হয়েছে। স্বয়ং মানবসত্তা, আকাশ, নক্ষত্র, পৃথিবী ইত্যাদির অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর শূন্য পরিমণ্ডলে উড়ন্ত পক্ষীকূলের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ —অর্থাৎ, তারা কি পক্ষীকূলকে মাথার উপর উড়তে দেখে না, যারা কখনও পাখা বিস্তার করে এবং কখনও সংকুচিত করে। এদের ব্যাপারে চিন্তা কর, এরা ভারী দেহবিশিষ্ট। সাধারণ নিয়মদৃষ্টে ভারীবস্তু উপরে ছাড়া হলে তা মাটিতে পড়ে যাওয়া উচিত। বায়ু সাধারণভাবে তা আটকাতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা পক্ষীকূলকে বায়ুমণ্ডলে স্থির থাকার মত করে সৃষ্টি করেছেন। বাতাসে ভর দেয়া এবং তাতে সন্তরণ করে বিচরণ করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে পাখা বিস্তার ও সংকোচনের মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করা নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, বায়ুর মধ্যে এই যোগ্যতা সৃষ্টি করা যেরূপ পাখা তৈরী করা এবং পাখার মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দেয়া—এগুলো সব আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তিরই ফলশ্রুতি।

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ

الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ —এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং ভূমি থেকে শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্ তাআলার যে রিযিক পাচ্ছ, এটা তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয় ; বরং আল্লাহ্ তাআলার দান ও বখশিস। তিনি তা বন্ধও করে দিতে পারেন। أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর কাফেরদের জন্যে পরিতাপ করা হয়েছে, যারা নিজেরাও আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশাবলী সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং বর্ণনাকারীর বর্ণনাও শুনে না। بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ —অর্থাৎ, তারা অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় বেড়েই চলেছে। অতঃপর কেয়ামতের মাঠে কাফের ও মুমিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের মাঠে কাফেররা উপুড় হয়ে মস্তকের উপর ভর দিয়ে চলবে। বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, কাফেররা মুখে ভর দিয়ে কিরূপে চলবে? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ যে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে পায়ে ভর দিয়ে চালনা করেছেন, তিনি কি মুখমণ্ডল ও মস্তকের উপর ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম নন? নিম্নোক্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ —অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুখমণ্ডলে ভর দিয়ে চলে, সে বেশী হেদায়েতপ্রাপ্ত, না যে সোজা চলে? শেষোক্ত ব্যক্তিই মুমিন। সে-ই হেদায়েত পেতে পারে।

قُلْ هُوَ الَّذِيٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝ قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۠ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْۗـــَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ۝ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاۗؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاۗءٍ مَّعِيْنٍ ۝

سورة القلم مكية وهي اثنتان وخمسون آية وفيها ركوعان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نۗ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۝ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۝ بِاَيِّىكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۝

(২৩) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (২৪) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা সমবেত হবে? (২৫) কাফেররা বলে ঃ এই প্রতিশ্রুতি কবে হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (২৬) বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলার কাছেই আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী। (২৭) যখন তারা সেই প্রতিশ্রুতিকে আসন্ন দেখবে তখন কাফেরদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে পড়বে এবং বলা হবে ঃ এটাই তো তোমরা চাইতে। (২৮) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ—যদি আল্লাহ্ তাআলা আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে কাফেরদেরকে কে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (২৯) বলুন, তিনি পরম করুণাময়, আমরা তাতে বিশ্বাস রাখি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। সত্বরই তোমরা জানতে পারবে, কে প্রকাশ্য পথ-ভ্রষ্টতায় আছে। (৩০) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা।

সূরা আল-কলম

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৫২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(১) নূন—শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা লিপিবদ্ধ করে, (২) আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উম্মাদ নন। (৩) আপনার জন্যে অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (৪) আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (৫) সত্বরই আপনি দেখে নিবেন এবং তারাও দেখে নিবে। (৬) কে তোমাদের মধ্যে বিকারগ্রস্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অতঃপর আবার মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ্ তাআলার শক্তি ও জ্ঞানের কতিপয় বিকাশ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ قُلْ هُوَ الَّذِيٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ — **অর্থাৎ, আপনি বলুন, আল্লাহ্ তাআলাই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর বানিয়েছেন, কিন্তু তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।**

কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরের বৈশিষ্ট্য ঃ আয়াতে মানুষের অঙ্গসমূহের মধ্যে তিন অঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর উপর জ্ঞান, অনুভূতি ও চেতনা নির্ভরশীল। দার্শনিকগণ জ্ঞান ও অনুভূতির পাঁচটি উপায় বর্ণনা করেছেন। এগুলোকে পঞ্চইন্দ্রিয় বলা হয়। এগুলো হচ্ছে শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ। ঘ্রাণের জন্যে নাক আস্বাদনের জন্যে জিহ্বা তৈরী করা হয়েছে এবং স্পর্শশক্তি সমস্ত দেহে নিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা শ্রবণ করার জন্যে কর্ণ এবং দেখার জন্যে চক্ষু সৃষ্টি করেছেন। এখানে আল্লাহ্ তাআলা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করেছেন—কর্ণ ও চক্ষু। কারণ এই যে, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শের মাধ্যমে খুব কম বিষয়ের জ্ঞান মানুষ অর্জন করতে পারে। মানুষের জানা বিষয়সমূহের বিরাট অংশ শ্রবণ ও দর্শনের মধ্যে সীমিত। এতদুভয়ের মধ্যেও শ্রবণকে অগ্রে জানা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, মানুষ সারাজীবনে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তন্মধ্যে শোনা বিষয়সমূহের সংখ্যা দেখা বিষয়সমূহের তুলনায় বহুগুণ বেশী। অতএব, মানুষের অধিকাংশ জানা বিষয় এই দুই পথে অর্জিত হয় বিধায় এখানে পঞ্চইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বস্তু অন্তর হচ্ছে আসল ভিত্তি ও জ্ঞানের কেন্দ্রে। কানে শোনা ও চোখে দেখা বিষয়সমূহের জ্ঞানও অন্তরের উপর নির্ভরশীল। অন্তর যে জ্ঞানের কেন্দ্রে এর পক্ষে কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয়। এর বিপরীতে দার্শনিকগণ মস্তিষ্ককে জ্ঞানের কেন্দ্র মনে করেন।

এরপর আবার কাফেরদের প্রতি হুশিয়ারী ও শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে। সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে ঃ তোমরা যারা পৃথিবীতে বসবাস কর, ভূপৃষ্ঠকে খনন করে কূপ তৈরী কর এবং সেই পানি দ্বারা নিজেদের পান ও শস্য উৎপাদনের কাজ কর,. তোমরা ভুলে যেয়ো না যে, এগুলো তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয়, আল্লাহ্ তাআলার দান। তিনিই পানি বর্ষণ করেছেন এবং সেই পানিকে বরফের সাগরে পরিণত করে পচন রোধ করার জন্যে পর্বতশৃঙ্গে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর এই বরফকে আস্তে আস্তে গলিয়ে পর্বতের শিরা উপশিরার পথে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে নামিয়ে দিয়েছেন। এরপর কোন পাইপলাইনের সাহায্য ব্যতিরেকে সেই পানিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা যেথা ইচ্ছা মাটি খনন করে পানি বের করতে পার। তিনি এই পানি মৃত্তিকার উপরের স্তরেই রেখে দিয়েছেন যা কয়েক ফুট মাটি খনন করেই বের করা যায়। এটা স্রষ্টার দান। তিনি ইচ্ছা করলে একে নিম্নের স্তরে তোমাদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاۗؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاۗءٍ مَّعِيْنٍ

অর্থাৎ, তারা ভেবে দেখুক, তারা যে পানি কূপের মাধ্যমে অনায়াসে বের করে পান করছে, তা যদি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কোন্ শক্তি পানির এই স্রোতধারাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে? হাদীসে আছে,

এই আয়াত তেলাওয়াত করার পর বলা উচিত .... অর্থাৎ, বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহ্ তাআলাই পুনরায় এই পানি আনতে পারেন—আমাদের শক্তি নেই।

সূরা আল কলম

সূরা মুলকে সৃষ্টজগতের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব, তওহীদ, জ্ঞান ও শক্তির প্রমাণাদি বিবৃত হয়েছে। সূরা কলমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি কাফেরদের দোষারোপের জওয়াব দেয়া হয়েছে। তাদের সর্বপ্রথম দোষারোপ ছিল এই যে, তারা আল্লাহ্ প্রেরিত পূর্ণ বুদ্ধিমান, পূর্ণজ্ঞানী ও সর্বগুণে গুণান্বিত রসূলকে (নাউযুবিল্লাহ্) উন্মাদ ও পাগল বলত। এর কারণ হয় এই ছিল যে, ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ ওহীর সময় তার প্রতিক্রিয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র অঙ্গে ফুটে উঠত। এরপর তিনি ওহী থেকে প্রাপ্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাতেন। এই গোটা ব্যাপারটি কাফেরদের জ্ঞান ও অনুভূতির উর্ধ্বে ছিল। তাই তারা একে পাগলামী আখ্যা দিত। না হয় এর কারণ ছিল এই যে, তিনি স্বজাতি ও সারা বিশ্বে বিদ্যমান ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপরীতে এই দাবী করেন যে, আরাধনার যোগ্য আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ নেই। তারা যেসব স্বহস্ত নির্মিত প্রতিমাকে খোদা মনে করত, সেগুলো যে জ্ঞান ও চেতনা থেকে মুক্ত এবং কারও উপকার বা ক্ষতি করতে অক্ষম, একথা তিনি প্রকাশ্যে বর্ণনা করেন। এই নতুন ধর্মবিশ্বাসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কোন সাথী ছিল না। তিনি একাই এই দাবী নিয়ে আত্মরক্ষার বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই সারা বিশ্বের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যান। বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিতে এই উদ্দেশ সাফল্য লাভ করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই এরূপ দাবী নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়াকে পাগলামী মনে করা হয়েছে। এছাড়া দোষারোপের উদ্দেশেও তো দোষারোপ হতে পারে। এমতাবস্থায় কোন কারণ ছাড়াই কাফেররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে পাগল বলত। সূরার প্রথম আয়াতসমূহে তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা শপথ সহকারে খণ্ডন করা হয়েছে।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ নূন অক্ষরটি একটি খণ্ডবর্ণ। কোরআন পাকের অনেক সূরার প্রারম্ভে এ ধরনের খণ্ডবর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ ও রসূল ব্যতীত এগুলোর অর্থ কারও জানা নেই। এ সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করতে উম্মতকে নিষেধ করা হয়েছে।

কলমের অর্থ এবং কলমের ফযীলত : এখানে কলমের অর্থ সাধারণ কলমও হতে পারে। এতে ভাগ্যলিপির কলম এবং ফেরেশতা ও মানবের লেখার কলম অন্তর্ভুক্ত। এখানে বিশেষতঃ ভাগ্যলিপির কলমও বোঝানো যেতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি তাই। এই বিশেষ কলম সম্পর্কে হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাআলা কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার আদেশ করেন। কলম আরয করল : কি লিখব? তখন খোদায়ী তকদীর লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করা হল। কলম আদেশ অনুযায়ী অনন্তকাল পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল ঘটনা ও অবস্থা লিখে দিল। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র সৃষ্টির তকদীর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিখে দিয়েছিলেন।

হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন : কলম আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি বড় নেয়ামত। কেউ কেউ বলেছেন : আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম তকদীরের কলম সৃষ্টি করেছেন। এই কলম সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও সৃষ্টির তকদীর লিপিবদ্ধ করেছে। এরপর দ্বিতীয় কলম সৃষ্টি করেছেন। এই কলম দ্বারা পৃথিবীর অধিবাসীরা লিখে এবং লিখবে। সূরা ইকরার عَلَّمَ بِالْقَلَمِ আয়াতেও এই কলমের উল্লেখ আছে।

সারকথা, আয়াতে কলম এবং কলম দ্বারা যা কিছু লেখা হয়, তার শপথ করে আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের দোষারোপ খণ্ডন করে বলেছেন : مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ অর্থাৎ, আপনি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ ও কৃপায় কখনও পাগল নন। এখানে بِنِعْمَةِ رَبِّكَ যোগ করে দাবীর স্বপক্ষে দলীলও দেয়া হয়েছে যে, যার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, সে কিরূপে পাগল হতে পারে? তাকে যে পাগল বলে, সে নিজেই পাগল।

আলেমগণ বলেন : কোরআন পাকে আল্লাহ্ তাআলা যে বস্তুর শপথ করেন, তা শপথের বিষয়বস্তুর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হয়ে থাকে। এখানে وَمَا يَسْطُرُونَ বলে বিশ্ব-ইতিহাসের যা কিছু লিখা হয়েছে এবং লিখা হচ্ছে, তাকে সাক্ষ্য-প্রমাণরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিশ্ব-ইতিহাসের পাতা খুলে দেখ, এমন মহান চরিত্র ও কর্মের অধিকারী ব্যক্তি পাগল হতে পারে কি? এরূপ ব্যক্তি তো অপরের জ্ঞান-বুদ্ধির সংস্কারক হয়ে থাকে। অতঃপর উপরোক্ত বিষয়বস্তুর সমর্থনে বলা হয়েছে :

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ অর্থাৎ, আপনার জন্যে অশেষ পুরস্কার রয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার যে কাজকে তারা পাগলামী বলছে, সেটা আল্লাহ্ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় কাজ। এর জন্যে আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারও এমন, যা কখনও নিঃশেষ হবে না —চিরন্তন। জিজ্ঞাসা করি, কোন পাগলকে তার কর্মের জন্যে পুরস্কৃত করা হয় কি? অতঃপর আরেকটি বাক্য দ্বারা এই বিষয়বস্তুর আরও সমর্থন করা হয়েছে :

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ এতে রসূলে করীম (সাঃ)- এর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে : জ্ঞানপাপীরা, তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ, দুনিয়াতে যারা পাগল ও উন্মাদ, তাদের চরিত্র ও কর্ম কি এরূপ হয়ে থাকে?

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মহৎ চরিত্র : হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : মহৎ চরিত্রের অর্থ মহৎ ধর্ম। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার কাছে ইসলাম ধর্ম অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন ধর্ম নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন : স্বয়ং কোরআন রসূলে করীম (সাঃ)-এর মহৎ চরিত্র। অর্থাৎ, কোরআন পাক যেসব উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি সেসবের বাস্তব নমুনা। হযরত আলী (রাঃ) বলেন : মহৎ চরিত্র বলে কোরআনের শিষ্টাচার বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, যেসব শিষ্টাচার কোরআন শিক্ষা দিয়েছে। সব উক্তির সারমর্ম প্রায় এক। রসূলে করীম (সাঃ)-এর সত্তায় আল্লাহ্ তাআলা যাবতীয় উত্তম চরিত্র পূর্ণমাত্রায় সন্নিবেশিত করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেন : بعثت لاتمم مكارم الاخلاق অর্থাৎ, আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্যেই প্রেরিত হয়েছি। — (আবু হাইয়ান)

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ শীঘ্রই আপনিও দেখে নিবেন

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ۞٧ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ۞٨ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ
فَيُدْهِنُونَ ۞٩ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ۞١٠ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ
بِنَمِيمٍ ۞١١ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞١٢ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ۞١٣
أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۞١٤ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۞١٥ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ۞١٦ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا
بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۞١٧ وَلَا
يَسْتَثْنُونَ ۞١٨ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۞١٩
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۞٢٠ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ۞٢١ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ
حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ۞٢٢ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ۞٢٣
أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ۞٢٤ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ
قَادِرِينَ ۞٢٥ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ۞٢٦ بَلْ نَحْنُ
مَحْرُومُونَ ۞٢٧ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ۞٢٨
قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۞٢٩ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ۞٣٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ۞٣١

(৭) আপনার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন যারা সৎপথপ্রাপ্ত। (৮) অতএব, আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না। (৯) তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে। (১০) যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না, (১১) যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে, (১২) যে ভাল কাজে বাধা দেয়, সে সীমালংঘন করে, সে পাপিষ্ঠ, (১৩) কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত ; (১৪) এ কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। (১৫) তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হলে সে বলে : সেকালের উপকথা। (১৬) আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। (১৭) আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছি উদ্যানওয়ালাদের, যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে, (১৮) 'ইনশাআল্লাহ্' না বলে (১৯) অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলো। যখন তারা নিদ্রিত ছিল। (২০) ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্নবিচ্ছিন্ন তৃণসম। (২১) সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল, (২২) তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। (২৩) অতঃপর তারা চলল ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে, (২৪) অদ্য যেন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। (২৫) তারা সকালে লাফিয়ে লাফিয়ে সজোরে রওয়ানা হল। (২৬) অতঃপর যখন তারা বাগান দেখল, তখন বলল : আমরা তো পথ ভুলে গেছি। (২৭) বরং আমরা তো কপালপোড়া, (২৮) তাদের উত্তম ব্যক্তি বলল : আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ্ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেন? (২৯) তারা বলল : আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম। (৩০) অতঃপর তারা একে অপরকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। (৩১) তারা বলল : হায়! দুর্ভোগ আমাদের আমরা ছিলাম সীমাতিক্রমকারী।

এবং কাফেররাও দেখে নিবে যে, কে বিকারগ্রস্ত। مفتون শব্দের অর্থ এস্থলে বিকারগ্রস্ত পাগল। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি পাগল বলে দোষারোপকারীদের উক্তি প্রমাণাদি দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছিল। এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতেই এ তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পাগল ছিলেন, না যারা তাঁকে পাগল বলত, তারাই পাগল ছিল। সেমতে অল্পদিনের মধ্যেই বিষয়টি বাস্তব সত্য হয়ে বিশ্ববাসীর চোখের সামনে এসে যায় এবং পাগল আখ্যাদানকারীদের মধ্য থেকেই হাজার হাজার লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর অনুসরণ ও মহব্বতকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতে থাকে। অপরদিকে তওফীক থেকে বঞ্চিত অনেক হতভাগা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ অর্থাৎ, আপনি মিথ্যারোপকারীদের কথা মানবেন না। তারা তো চায় যে, আপনি প্রচারকার্যে কিছুটা নমনীয় হলে এবং শিরক ও প্রতিমা পূজায় তাদেরকে বাধা না দিলে তারাও নমনীয় হয়ে যাবে এবং আপনার প্রতি বিদ্রূপ, দোষারোপ ও নির্যাতন ত্যাগ করবে। — (কুরতুবী)

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ — আপনি আনুগত্য করবেন না এমন ব্যক্তির, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে দোষারোপ করে, যে পশ্চাতে নিন্দা করে, যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়, যে সৎকাজে বাধাদান করে, যে সীমালংঘন করে, যে অত্যধিক পাপাচার করে, যে কঠোর স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। زنيم শব্দের অর্থ পিতৃ পরিচয়হীন জারজ। আয়াতে যে ব্যক্তির এসব বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে, সে জারজই ছিল।

পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ কাফেরদের আনুগত্য না করার এবং ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ নমনীয়তা অবলম্বন না করার ব্যাপক আদেশ ছিল। এই আয়াতে বিশেষ করে দুষ্টমতি কাফের ওলীদ ইবনে-মুগীরার কুস্বভাব বর্ণনা করে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ও তার আনুগত্য না করার বিশেষ আদেশ দেয়া হয়েছে। এরপরও কয়েক আয়াতে এই ব্যক্তির মন্দ চরিত্র ও অবাধ্যতা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছেঃ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ অর্থাৎ, আমি কেয়ামতের দিন তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। ফলে পূর্ববর্তী সব লোকের সামনে তার লাঞ্ছনা ফুটে উঠবে। خرطوم শব্দটি বিশেষভাবে হাতী অথবা শূকরের শুঁড়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে ওলীদের নাসিকাকে ঘৃণা প্রকাশার্থে خرطوم শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ, আমি মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন উদ্যানের মালিকদের পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। পূর্বের আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর প্রতি মক্কাবাসী কাফেরদের দোষারোপের জওয়াব ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা বিগত যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করেছেন। মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, বর্ণিতব্য কাহিনীতে উদ্যানের মালিকদেরকে যেমন আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় নেয়ামতরাজি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন, তারা কৃতঘ্নতা করেছিল। ফলে

তাদের উপর আযাব পতিত হয়েছিল এবং নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল, তেমনি আল্লাহ্ তাআলা মক্কাবাসীদেরকেও নেয়ামতরাজি দান করেছেন। তাদের সর্ববৃহৎ নেয়ামত তো এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তাদের মধ্যেই পয়দা করেছেন। এছাড়া তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দান করেছেন এবং তাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছেন। এসব নেয়ামত মক্কাবাসীদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ্ দেখতে চান যে, তারা এসব নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কি না এবং আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কি না। যদি তারা কুফর ও অবাধ্যতায় অটল থাকে, তবে উদ্যানের মালিকদের কাহিনী থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

উদ্যানের মালিকদের কাহিনী ঃ হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখের ভাষ্য অনুযায়ী এই উদ্যান এয়ামনে অবস্থিত ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে জুবায়ের-এর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এয়ামনের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ শহর "সান আ" থেকে ছয় মাইল দূরে এই উদ্যান অবস্থিত ছিল। কারও কারও মতে এটা আবিসিনিয়ায় ছিল। — (ইবনে-কাসীর) উদ্যানের মালিকরা ছিল আহলে – কিতাব। ঈসা (আঃ)-এর আকাশে উত্থিত হওয়ার কিছুকাল পরে এই ঘটনা ঘটে। — (কুরতুবী)

একজন সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তি এই উদ্যানটি তৈরী করেছিলেন। তিনি ফসল কাটার সময় কিছু ফসল ফকীর-মিসকীনদের জন্যে রেখে দিতেন। তারা সেখান থেকে খাদ্য-শস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এমনিভাবে ফসল মাড়ানোর সময় যেসব দানা ভূষির মধ্যে থেকে যেত, সেগুলোও ফকীর- মিসকীনদের জন্যে রেখে দিতেন। এই নিয়ম অনুযায়ী উদ্যানের বৃক্ষ থেকে ফল আহরণ করার সময় যেসব ফল নীচে পড়ে যেত;সেগুলোও ফকীর-মিসকীনদের জন্যে রেখে দিতেন এ কারণেই ফসল কাটা ও ফল আহরণের সময় বিপুল সংখ্যক ফকীর-মিসকীন সেখানে সমবেত হত। এই সাধু ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র উদ্যান ও ক্ষেতের উত্তরাধিকারী হল। তারা পরস্পরে বলাবলি করল ঃ আমাদের পারিবারিক-পরিজন বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় ফসলের উৎপাদন কম। তাই এখন ফকীর -মিসকীনদের জন্য এত শস্য ও ফল রেখে দেয়ার সাধ্য আমাদের নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, পুত্রত্রয় উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের ন্যায় বলল ঃ আমাদের পিতা বেওকুফ ছিল তাই বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য ও ফল মিসকীনদের জন্যে রেখে দিত। অতএব, আমাদের কর্তব্য এই প্রথা বন্ধ করে দেয়া। অতঃপর তাদের কাহিনী স্বয়ং কোরআনের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ অর্থাৎ, তারা পরস্পরে শপথ করে বলল ঃ এবার আমরা সকাল-সকালেই যেয়ে ক্ষেতের ফসল কেটে আনব, যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের না পায় এবং পিছনে পিছনে না চলে। এই পরিকল্পনার প্রতি তাদের এতটুকু দৃঢ় আস্থা ছিল যে, ইনশাআল্লাহ্ বলারও প্রয়োজন মনে করল না। আগামীকালের কোন কাজ করার কথা বলার সময় "ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল একাজ করব" বলা সুন্নত। তারা এই সুন্নতের পরওয়া করল না। কোন কোন তফসীরবিদ وَلَا يَسْتَثْنُونَ এর এরূপ অর্থ করেছেন যে, আমরা সম্পূর্ণ খাদ্যশস্য ও ফল নিয়ে আসব এবং ফকীর-মিসকীনদের অংশ বাদ দিব না। —(মাযহারী)

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এই ক্ষেতে ও উদ্যানে একটি বিপদ হানা দিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, একটি অগ্নি এসে সমস্ত তৈরী ফসলকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। وَهُمْ نَائِمُونَ অর্থাৎ, এই আযাব রাত্রিবেলায় তখন অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন তারা সবাই নিদ্রামগ্ন। فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ - صرم শব্দের অর্থ ফল ইত্যাদি কর্তন করা। صريم এর অর্থ কর্তিত। উদ্দেশ্য এই যে, ফসল কেটে নেয়ার পর ক্ষেত যেমন সাফ ময়দান হয়ে যায়, অগ্নি এসে ক্ষেতকে সেইরূপ করে দিল। صريم এর অর্থ কালো রাত্রিও হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, ফসলও কালো রাত্রির ন্যায় কালো ভস্ম হয়ে গেল। — (মাযহারী)

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ অর্থাৎ, যারা অতি প্রত্যুষেই একে অপরকে ডেকে বলতে লাগল ঃ যদি ফসল কাটতে চাও, তবে সকাল-সকালই ক্ষেতে চল। وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ অর্থাৎ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় তারা চুপিসারে কথাবার্তা বলতেছিল, যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের পেয়ে সাথে না চলে।

وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ - حرد শব্দের অর্থ নিষেধ করা ও রাগা, গোস্বা দেখানো। উদ্দেশ্য এই যে, তারা ফকীর-মিসকীনকে কিছু না দিতে সক্ষম, এরূপ ধারণা নিয়ে রওয়ানা হল। যদি কোন ফকীর এসেও যায়, তবে তাকে হটিয়ে দিবে।

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ যখন গন্তব্যস্থলে পৌছে ক্ষেত-বাগান কিছুই দেখতে পেল না, তখন প্রথমে বলল ঃ আমরা পথ ভুলে অন্যত্র এসে গেছি। কিন্তু পরে নিকটবর্তী স্থান ও আলামত দেখে বুঝতে পারল যে, গন্তব্যস্থলেই এসেছি; কিন্তু ক্ষেত পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তখন তারা বলল ঃ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ — আমরা এই ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি।

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ তাদের মধ্যে যে মাঝারী ব্যক্তি ছিল, অর্থাৎ, পিতার ন্যায় সৎকর্মপরায়ন এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে আনন্দ লাভকারী ছিল, সে বলল ঃ আমি কি পূর্বেই তোমাদেরকে বলিনি যে, আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর না কেন? অর্থাৎ, তোমরা মনে কর যে, ফকীর-মিসকীনকে ধন-সম্পদ দিয়ে দিলে আল্লাহ্ তাআলা এর পরিবর্তে ধন-সম্পদ দিবেন না, অথচ আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয় থেকে পবিত্র। যারা তাঁর পথে ব্যয় করে, তিনি নিজের কাছ থেকে তাদেরকে আরও বেশী দিয়ে দেন। — (মাযহারী)

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ তখন এই ব্যক্তির কথা কেউ না শুনলেও এখন সবাই স্বীকার করল যে,আল্লাহ্ তাআলা সকল ত্রুটি ও অভাব থেকে পবিত্র এবং তারা নিজেরাই জালেম। কারণ, তারা ফকীর-মিসকীনের অংশও হজম করতে চেয়েছিল।

এই মধ্যপন্থী ব্যক্তি সত্য কথা বলেছিল এবং সে অন্যদের চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দুষ্টদের সঙ্গী হয়ে তাদেরই মতানুসারে কাজ করতে সম্মত হয়ে গিয়েছিল। তাই তার দশাও তাদের মতই হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে পাপকাজে নিষেধ করে, অতঃপর তাদেরকে বিরত না হতে দেখে নিজেও তাদের সাথে শরীক হয়ে যায়, সে-ও তাদের অনুরূপ। তার উচিত নিজেকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ অর্থাৎ, তারা নিজেদের

عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ۝٣٢
كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۭ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ۝٣٣ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝٣٤
اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۝٣٥ مَا لَكُمْ ۣ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝٣٦
اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ۝٣٧ اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ۝٣٨
اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ
لَمَا تَحْكُمُوْنَ ۝٣٩ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ۝٤٠ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاۗءُ ۚ
فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَاۗىِٕهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۝٤١ يَوْمَ يُكْشَفُ
عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝٤٢
خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۭ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ
اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ۝٤٣ فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا
الْحَدِيْثِ ۭ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٤٤ وَاُمْلِيْ
لَهُمْ ۭ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ۝٤٥ اَمْ تَسْـَٔـلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ
مُّثْقَلُوْنَ ۝٤٦ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝٤٧ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ
رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ۝٤٨

(৩২) সম্ভবতঃ আমাদের পালনকর্তা পরিবর্তে এর চাইতে উত্তম বাগান আমাদেরকে দিবেন। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে আশাবাদী। (৩৩) শাস্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি আরও গুরুতর; যদি তারা জানত! (৩৪) মোত্তাকীদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নেয়ামতের জান্নাত। (৩৫) আমি কি আজ্ঞাবহদেরকে অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করব? (৩৬) তোমাদের কি হল? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? (৩৭) তোমাদের কি কোন কিতাব আছে, যা তোমরা পাঠ কর (৩৮) তাতে তোমরা যা পছন্দ কর, তাই পাও? (৩৯) না তোমরা আমার কাছ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ কোন শপথ নিয়েছ যে, তোমরা তাই পাবে যা তোমরা সিদ্ধান্ত করবে? (৪০) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তাদের কে এ বিষয়ে দায়িত্বশীল? (৪১) না তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে? থাকলে তাদের শরীক উপাস্যদেরকে উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয়। (৪২) গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ কর, সেদিন তাদেরকে সেজদা করতে আহ্বান জানানো হবে, অতঃপর তারা সক্ষম হবে না। (৪৩) তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে; তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে সেজদা করতে আহ্বান জানানো হত। (৪৪) অতএব, যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন ধীরে ধীরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে পারবে না। (৪৫) আমি তাদেরকে সময় দেই। নিশ্চয় আমার কৌশল মজবুত। (৪৬) আপনি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান? ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা পড়েছে? (৪৭) না তাদের কাছে গায়বের খবর আছে? অতঃপর তারা তা লিপিবদ্ধ করে। (৪৮) আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং মাছওয়ালা ইউনুসের মত হবেন না, যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করেছিল।

অপরাধ স্বীকার করার পরও একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল যে, তুই-ই প্রথমে ভ্রান্ত পথ দেখিয়েছিলি, যদ্দরুন এই আযাব এসেছে। অথচ তাদের কেউ একা অপরাধী ছিল না; বরং সবাই অথবা অধিকাংশ অপরাধে শরীক ছিল।

আজকাল এই বিপদটি ব্যাপকাকারে দেখা যায়। অনেকগুলো দলের সমষ্টিগত কর্মের ফলে কোন ব্যর্থতা অথবা বিপদ আসলে একে অপরকে দোষী করে সময় নষ্ট করাও একটি বিপদ হয়ে দেখা দেয়।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ অর্থাৎ, প্রথমে একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করার পর যখন তারা চিন্তা করল, তখন সবাই একবাক্যে স্বীকার করল যে, আমরা সবাই অবাধ্য ও গোনাহগার। তাদের এই অনুতপ্ত স্বীকোরোক্তি তওবার স্থলাভিষিক্ত ছিল। এ কারণেই তারা আশাবাদী হতে পেরেছিল যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে আরও উত্তম উদ্যান দান করবেন।

ইমাম বগভীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন : আমি খবর পেয়েছি যে, তাদের খাঁটি তওবার বদৌলতে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে আরও উত্তম বাগান দান করেছিলেন। সেই বাগানের এক একটি আঙ্গুর-গুচ্ছ এক খচ্চরের বোঝা হয়ে যেত। —(মাযহারী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষরূপী আযাবের সংক্ষিপ্ত এবং উদ্যান মালিকদের ক্ষেত জ্বলে যাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনার পর সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্র আযাব আসে, তখন এমনিভাবেই আসে। দুনিয়ায় এই আযাব আসার পরও তাদের পরকালের আযাব দূর হয়ে যায় না; বরং পরকালের আযাব ভিন্ন এবং তদপেক্ষা কঠোর হয়ে থাকে।

فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ অর্থাৎ, যারা কেয়ামতের কথা অবিশ্বাস করে, আপনি তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। এরপর দেখুন আমি কি করি। এখানে "ছেড়ে দিন" কথাটি একটি বাকপদ্ধতির অনুসরণে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। এর সারমর্ম এই যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে বার বার এই দাবীও পেশ করা হত, যদি আমরা বাস্তবিকই আল্লাহ্র কাছে অপরাধী হয়ে থাকি এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে আযাব দিতে সক্ষম হন, তবে এই মুহূর্তেই আমাদেরকে আযাব দেন না কেন? তাদের এসব কষ্টদায়ক দাবীর কারণে কখনও কখনও স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মনেও এই ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকবে এবং সম্ভবতঃ তিনি কোন সময় দোয়াও করে থাকবেন যে, এদের উপর এই মুহূর্তেই আযাব এসে গেলে অবশিষ্ট লোকদের সংশোধনের পথ হয়ত সুগম হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে : আমার রহস্য আমিই ভাল জানি। আমি তাদেরকে একটি সীমা পর্যন্ত সময় দেই; তাৎক্ষণিক আযাব প্রেরণ করি না। এতে করে তাদের পরীক্ষাও হয় এবং ঈমান আনার জন্যে অবকাশও হয়। পরিশেষে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, ইউনুস (আঃ) কাফেরদের দাবীতে অতিষ্ঠ হয়ে আযাবের দোয়া করেছিলেন।

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ এখানে হযরত ইউনুস (আঃ)- কে 'صاحب حوت' মাছওয়ালা, বলা হয়েছে। কেননা, তিনি কিছুকাল মাছের পেটে ছিলেন।

لَوْلَآ أَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ﴿٤٩﴾
فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٥٠﴾ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ
لَمَجْنُوْنٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٢﴾

سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَآقَّةُ ﴿١﴾ مَا الْحَآقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ﴿٣﴾
كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا
بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾ وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾
سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا
فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾
فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ
وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ
فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾ اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ
فِى الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ﴿١٢﴾

(৪৯) যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তবে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হত। (৫০) অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। (৫১) কাফেররা যখন কোরআন শুনে, তখন তারা তাদের দৃষ্টি দ্বারা যেন আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিবে এবং তারা বলে ঃ সে তো একজন পাগল। (৫২) অথচ এই কোরআন তো বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ বৈ নয়।

সূরা আল-হাক্কাহ্

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৫২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) সুনিশ্চিত বিষয়। (২) সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৩) আপনি কি কিছু জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৪) 'আদ ও সামূদ গোত্র মহাপ্রলয়কে মিথ্যা বলেছিল। (৫) অতঃপর সামূদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা (৬) এবং আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু, (৭) যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। আপনি তাদেরকে দেখতেন যে, তারা অসার খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে। (৮) আপনি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পান কি? (৯) ফেরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে যাওয়া বস্তিবাসীরা গুরুতর পাপ করেছিল। (১০) তারা তাদের পালনকর্তার রসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোরহস্তে পাকড়াও করলেন। (১১) যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম, (১২) যাতে এ ঘটনা তোমাদের জন্যে স্মৃতির বিষয় এবং কান এটাকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগী রূপে গ্রহণ করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ازلاق يزلقون শব্দটি – وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হুঁচট দেয়া, ভূপাতিত করা। — (রাগিব)

উদ্দেশ্য এই যে, কাফেররা আপনাকে ক্রুদ্ধ ও তির্যক দৃষ্টিতে দেখে এবং আপনাকে স্বস্থান থেকে সরিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্‌র কালাম শ্রবণ করার সময় তাদের এই অবস্থা হয়। তারা বলে ঃ এতো পাগল। وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ অথচ এই কালাম বিশ্বাসীদের জন্যে উপদেশ এবং তাদের সংশোধন ও সাফল্য প্রতিশ্রুত। এরূপ কালামের অধিকারী ব্যক্তি কখনও পাগল হতে পারে কি? সূরার শুরুতে কাফেরদের যে দোষারোপের জওয়াব দেয়া হয়েছিল, উপসংহারে অন্য ভঙ্গিতে তারই জওয়াব দেয়া হয়েছে।

ইমাম বগভী প্রমুখ তফসীরবিদ এসব আয়াতের সাথে সম্পর্কিত একটি বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মক্কায় জনৈক ব্যক্তি নযর লাগানোর কাজে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। সে উট ইত্যাদি জন্তু-জানোয়ারকে নযর লাগালে তৎক্ষণাৎ সেটি মরে যেত। মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে হত্যা করার জন্যে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করত। তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নযর লাগানোর উদ্দেশ্যে সে ব্যক্তিকে ডেকে আনল। সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নযর লাগানোর চেষ্টা করল; কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় পয়গম্বরের হেফাযত করলেন। ফলে তাঁর কোন ক্ষতি হল না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ আয়াতে এই নযর লাগার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য, নযর লাগা একটি বাস্তব সত্য। ছহীহ্ হাদীসসমূহে এর সত্যতা সমর্থিত হয়েছে। আরবেও এটা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ নযর লাগা ব্যক্তির গায়ে وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফুঁ দিলে নযর লাগার অশুভ প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়। — (মাযহারী)

সূরা আল-হাক্কাহ্

এই সূরায় কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী ও পাপাচারীদের শাস্তি এবং মুমিন খোদাভীরুদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। কোরআন পাকে কেয়ামতকে হাক্কা কারেয়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

حاقة শব্দের এক অর্থ সত্য এবং দ্বিতীয় অর্থ অপরাপর বিষয়কে সত্য প্রতিপন্নকারী। কেয়ামতের জন্যে এই শব্দটি উভয় অর্থে খাটে। কেননা, কেয়ামত নিজেও সত্য, এর বাস্তবতা প্রমাণিত ও নিশ্চত এবং কেয়ামত মুমিনদের জন্যে জান্নাত এবং কাফেরদের জন্যে জাহান্নাম প্রতিপন্ন করে। এখানে কেয়ামতের এই নাম উল্লেখ করে বার বার প্রশ্ন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেয়ামত সকল প্রকার অনুমানের উর্ধ্বে এবং বিস্ময়কররূপে ভয়াবহ।

قارعة শব্দের অর্থ খট খট শব্দকারী। কেয়ামত যেহেতু সব মানুষকে অস্থির ও ব্যাকুল করে দিবে এবং সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীকে ছিন্নবিছিন্ন করে দিবে তাই একে قارعة বলা হয়েছে।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ
الْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾
وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ
تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ
كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّي
ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢١﴾
فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا
هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا مَنْ
أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ﴿٢٥﴾
وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَا
أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ﴿٢٩﴾ خُذُوهُ
فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا
سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾

(১৩) যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে—একটি মাত্র ফুৎকার (১৪) এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, (১৫) সেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে। (১৬) সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে (১৭) এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আট জন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের ঊর্ধ্বে বহন করবে। (১৮) সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। (১৯) অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। (২০) আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। (২১) অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে, (২২) সুউচ্চ জান্নাতে। (২৩) তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। (২৪) বিগতদিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে। (২৫) যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ হায় আমায় যদি আমার আমলনামা না দেয়া হতো ! (২৬) আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! (২৭) হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত। (২৮) আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। (২৯) আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। (৩০) ফেরেশতাদেরকে বলা হবে ঃ ধর একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, (৩১) অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। (৩২) অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। (৩৩) নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিল না। (৩৪) এবং মিসকীনকে আহার্য দিতে উৎসাহিত করত না।

طاغية শব্দটি طغيان থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমালংঘন করা। উদ্দেশ্য এমন কঠোর শব্দ, যা সারা দুনিয়ার শব্দসমূহের সীমার বাইরে ও বেশী। মানুষের মন ও মস্তিষ্ক এই শব্দ বরদাশত করতে পারে না। সামুদ গোত্রের অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাদের উপর এই শব্দের আকারেই আযাব এসেছিল। এতে সারা বিশ্বের **বজ্রনিনাদ ও সারা বিশ্বের** শব্দসমূহের **সমষ্টি সন্নিবেশিত ছিল। ফলে তাদের হৃদপিণ্ড ফেটে গিয়েছিল।**

ريح صرصر —**এর অর্থ অত্যধিক শৈত্যসম্পন্ন প্রচণ্ড বাতাস।**

سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ —এক রেওয়ায়েতে **বর্ণিত আছে, বুধবারের** সকাল থেকে এই ঝঞ্ঝাবায়ুর আযাব শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত **অব্যাহত ছিল। এভাবে দিন আটটি ও রাত্রি সাতটি হয়ে ছিল।**

حُسُوْمًا —**শব্দটি حاسم এর বহুবচন। এর অর্থ মূলোৎপাটন করে** দেয়া।

مؤتفكات এর অর্থ পরস্পরের মিশ্রিত ও মিলিত। **হযরত লূত** (আঃ)-এর **সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহকে مؤتفكات বলা হয়েছে। এর এক** কারণ এই যে, তাদের বস্তিগুলো পরস্পরে মিলিত ছিল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আযাব আসার পর তাদের বস্তিগুলো তছনছ হয়ে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ —**তিরমিযীতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে আছে صور শিং-এর আকারে কোন বস্তুকে বলা হয়। কেয়ামতের দিন এতে ফুৎকার দেয়া হবে।** نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ **এর অর্থ হঠাৎ একযোগে এই শিংগার আওয়াজ শুরু হবে এবং সবার মৃত্যু পর্যন্ত একটানা আওয়াজ অব্যাহত থাকবে। কোরআন ও হাদীস দ্বারা কেয়ামতে শিংগার দুইটি ফুৎকার প্রমাণিত আছে। প্রথম ফুৎকারকে** نفخة صعق বলা হয়। এসম্পর্কে কোরআনে আছে, فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ —**অর্থাৎ এই ফুৎকারের ফলে আকাশের** অধিবাসী ফেরেশতা এবং পৃথিবীতে **বসবাসকারী মানব, জিন ও সমস্ত জীব-জন্তু অজ্ঞান হয়ে যাবে।** (অতঃপর এই অজ্ঞান অবস্থায় সবার মৃত্যু ঘটবে।) দ্বিতীয় ফুৎকারকে **نفخة بعث** বলা হয়। শব্দের **بعث অর্থ** উঠা। এই ফুৎকারের মাধ্যমে সকল মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এ সম্পর্কে কোরআনে আছে, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ —**অর্থাৎ,** পুনরায় শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। ফলে অকস্মাৎ সব মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং দেখতে থাকবে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে এই দুই ফুৎকারের পূর্বে তৃতীয় একটি ফুৎকারের উল্লেখ আছে। এর নাম **نفخة فزع** কিন্তু রেওয়ায়েতের সমষ্টিতে চিন্তা করলে জানা যায় যে, এটা প্রথম ফুৎকারই। শুরুতে একে **نفخة فزع** বলা হয়েছে এবং পরিণামে এটাই **نفخة صعق** হয়ে যাবে।—(মাযহারী)।

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ —অর্থাৎ, কেয়ামতেরদিন আট জন ফেরেশতা আল্লাহ্ তাআলার আরশকে বহন করবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কেয়ামতের পূর্বে চার জন ফেরেশতা এই দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। কেয়ামতের দিন তাদের সাথে আরও চার জন মিলিত হবে।

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ
غِسْلِينٍ ﴿٣٦﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخٰطِئُونَ ﴿٣٧﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا
تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ
كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾
وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنْزِيلٌ مِنْ
رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا
مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾
وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٥٠﴾
وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

سُورَةُ الْمَعَارِجِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكٰفِرِينَ لَيْسَ
لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَ
الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾

(৩৫) অতএব, আজকের দিন এখানে তার কোন সুহৃদ নাই। (৩৬) এবং কোন খাদ্য নাই, ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত। (৩৭) গোনাহ্গার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না। (৩৮) তোমরা যা দেখ, আমি তার শপথ করছি (৩৯) এবং যা তোমরা দেখ না, তার—(৪০) নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের আনীত। (৪১) এবং এটা কোন কবির কালাম নয় ; তোমরা কমই বিশ্বাস কর। (৪২) এবং এটা কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা নয় ; তোমরা কমই অনুধাবন কর। (৪৩) এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ। (৪৪) সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত, (৪৫) তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, (৪৬) অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা। (৪৭) তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না। (৪৮) এটা খোদাভীরুদের জন্যে অবশ্যই একটি উপদেশ। (৪৯) আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যারোপ করবে। (৫০) নিশ্চয় এটা কাফেরদের জন্যে অনুতাপের কারণ। (৫১) নিশ্চয় এটা নিশ্চিত সত্য। (৫২) অতএব, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

সূরা আল-মা'আরিজ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৪৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) একব্যক্তি চাইল, সেই আযাব সংঘটিত হোক যা অবধারিত—(২) কাফেরদের জন্যে, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই। (৩) তা আসবে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে, যিনি সমুন্নত মর্তবার অধিকারী। (৪) ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ্ তাআলার দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।

আল্লাহ্ তাআলার আরশ কি? এর স্বরূপ ও প্রকৃত আকার-আকৃতি কি? ফেরেশতারা কিভাবে একে বহন করছে? এসব প্রশ্নের সমাধান মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি দিতে পারে না এবং এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন করার অনুমতি নেই। এ ধরনের যাবতীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, এসব বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্য সত্য এবং স্বরূপ অজ্ঞাত বলে বিশ্বাস করতে হবে।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ —অর্থাৎ, সেদিন সবাই পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হবে। কোন আত্মগোপনকারী আত্মগোপন করতে পারবে না। আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে আজ দুনিয়াতেও কেউ আত্মগোপন করতে পারে না। সেই দিনের বিশেষত্ব সম্ভবতঃ এই যে, হাশরের ময়দানে সমস্ত ভূপৃষ্ঠ সবটি সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হবে। গর্ত, পাহাড়, ঘর-বাড়ী, বৃক্ষ ইত্যাদি আড়াল বলতে কিছুই থাকবে না। দুনিয়াতে এসব বস্তুর পশ্চাতে আত্মগোপনকারীরা আত্মগোপন করে। কিন্তু সেখানে কিছুই থাকবে না। ফলে কেউ আত্মগোপন করার জায়গা পাবে না।

هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتٰبِيَهْ - هَاؤُمُ-শব্দের অর্থ না। উদ্দেশ্য এই যে, যার আমলনামা ডানহাতে আসবে, সে আহলাদে আটখানা হয়ে আশেপাশের লোকজনকে বলবে ঃ নাও, আমার আমলানামা পাঠ করে দেখ।

هَلَكَ عَنِّي سُلْطٰنِيَهْ - سلطان — শব্দের অর্থ ক্ষমতা ও আধিপত্য। তাই রাষ্ট্রকে সুলতানাত এবং রাষ্ট্রনায়ককে সুলতান বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে অন্যদের উপর আমার ক্ষমতা ও আধিপত্য ছিল। আমি সবার বড় একজন। আজ সেই রাজত্ব ও প্রাধান্য কোন কাজে আসল না। سلطان -এর অপর অর্থ প্রমাণ, সনদও হতে পারে। তখন অর্থ হবে, হায়! আজ আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমার হাতে কোন সনদ নেই।

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ —অর্থাৎ, ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে ঃ এই অপরাধীকে ধর এবং তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এই আদেশ উচ্চারিত হলে সব প্রাচীর ইত্যাদি সব বস্তু তাকে ধরার জন্যে দৌড় দিবে।

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ —অতঃপর তাকে সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে গ্রথিত করে দাও। শৃঙ্খলিত করার অর্থও রূপকভাবে নেয়া যায়। কিন্তু এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে মোতি অথবা তসবীহর দানা গ্রথিত করার ন্যায় শিকল দেহে বিদ্ধ করে অপর দিক থেকে বের করে দেয়া। কোন কোন হাদীসে এই আক্ষরিক অর্থেরও সমর্থন আছে।—(মাযহারী)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ - حميم এর অর্থ সুহৃদ। غِسْلِينٍ সেই পানি, যদ্দ্বারা জাহান্নামীদের ক্ষতের পুঁজ ইত্যাদি ধৌত করা হবে। আয়াতের অর্থ এই যে, আজ তার কোন সুহৃদ তাকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারবে না এবং আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তার খাদ্য জাহান্নামীদের ক্ষতধৌত নোংরা পানি ব্যতীত কিছু

হবে না। "কিছু হবে না" এর অর্থ তফসীরের সারসংক্ষেপে এই বলা হয়েছে যে, কোন সুখাদ্য হবে না। ক্ষতধৌত পানির অনরূপ অন্য কোন নোংরা খাদ্য হতে পারবে; যেমন অন্য আয়াতে জাহান্নামীদের খাদ্য যাক্কুম উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতে কোন বৈপরিত্য নেই।

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ –অর্থাৎ, সেইসব বস্তুর শপথ, যা তোমরা দেখ অথবা দেখতে পার এবং যা তোমরা দেখনা ও দেখতে পার না। এতে সমগ্র সৃষ্টি এসে গেছে। কেউ কেউ বলেন ঃ 'যা দেখনা' বলে আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ যা দেখ বলে দুনিয়ার বস্তুসমূহ এবং 'যা দেখ না' বলে পরকালের বিষয়সমূহ বোঝানো হয়েছে।—(মাযহারী)।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا — تَقَوَّلَ শব্দের অর্থ কথা রচনা করা। وتين হৃদয় থেকে নির্গত সেই শিরাকে বলা হয়, যার মাধ্যমে আত্মা মানবদেহে বিস্তার লাভ করে। এই শিরা কেটে দিলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়ে যায়।

কাফেরদের কেউ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কবি এবং তাঁর কালামকে কবিতা, কেউ

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ —এর আগে আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু বলেন না। তিনি আল্লাহ্র কালামই বলেন। এই কালাম খোদাভীরুদের জন্যে উপদেশ। কিন্তু আমি একথাও জানি যে, এসব অকাট্য ও নিশ্চিত বিষয়াদি জানা সত্ত্বেও অনেক লোক মিথ্যারোপ করতে থাকবে। এর পরিণাম হবে পরকালে তাদের অনুশোচনা ও সার্বক্ষণিক আযাব। অবশেষে বলা হয়েছেঃ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ —অর্থাৎ, এটা পুরোপুরি সত্য ও নিশ্চিত। এতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ —এতে ঈঙ্গিত আছে যে, আপনি এই হঠকারী কাফেরদের কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না এবং দুঃখিতও হবেন না; বরং আপনার মহান পালনকর্তার পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণায় নিজেকে নিয়োজিত করুন। এটাই সব দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়। অন্য এক আয়াতে এর অনুরূপ বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ —অর্থাৎ, আমি জানি আপনি কাফেরদের অর্থহীন কথাবার্তায় মনঃক্ষুণ্ণ হন। এর প্রতিকার এই যে, আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসায় মশগুল হয়ে যান এবং সেজদাকারীদের দলভুক্ত হয়ে যান। কাফেরদের কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না।

আবু দাউদ হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহানী বর্ণনা করেন, যখন فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এতে তোমাদের রুকূতে রাখ। অতঃপর যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন তিনি বললেন ঃ একে তোমাদের সেজদায় রাখ। এ কারণেই সর্বসম্মতভাবে রুকূ ও সেজদায় এই দু'টি তসবীহ্ পাঠ করা হয়। অধিকাংশ ইমামের মতে এগুলো তিন বার পাঠ করা সুন্নত। কেউ কেউ ওয়াজেবও বলেছেন।

সূরা হাক্কাহ্ সমাপ্ত

সূরা আল-মাআরিজ

سَأَلَ سَائِلٌ – سؤال শব্দটি কখনও তথ্যানুসন্ধানের অর্থে আসে। তখন আরবী ভাষায় এর সাথে عن অব্যয় ব্যবহৃত হয় এবং কখনও আবেদন ও কোন কিছু চাওয়ার অর্থে আসে। আয়াতে এই অর্থে আসার কারণে এর সাথে باء অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, এক ব্যক্তি আযাব চাইল। নাসায়ীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নযর ইবনে হারেছ এই আযাব চেয়েছিল। সে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করতে যেয়ে ধৃষ্টতাসহকারে বলেছিল وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ হে আল্লাহ্! যদি এই কোরআনই আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রেরণ করুন।—(মাযহারী) আল্লাহ্ তাআলা তাকে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে শাস্তি দেন।—(মাযহারী) সে আল্লাহ্ তাআলার কাছে যে আযাব চেয়েছিল, অতঃপর তার কিছু স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এই আযাব কাফেরদের জন্যে দুনিয়াতে কিংবা পরকালে কিংবা উভয় জাহানে অবধারিত। একে প্রতিহত করার সাধ্য কারও নেই। এটা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে, যিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই শেষ বাক্যটি প্রথম বাক্যের প্রমাণ। কারণ, যে আযাব মহান আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আসে, তাকে প্রতিহত করা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।'

معارج শব্দটি معراج -এর বহুবচন। এটা عروج থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ উর্ধ্বারোহণ করা। معرج ও معراج সেই সিঁড়িকে বলা হয়, যাতে নীচে থেকে উপরে আরোহণ করার জন্যে অনেকগুলো স্তর থাকে। আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার বিশেষণ ذِي الْمَعَارِجِ এই অর্থে আনা হয়েছে যে, তিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই সুউচ্চ মর্তবা হচ্ছে উপরে-নীচে সপ্ত আকাশ। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) ذِي الْمَعَارِجِ এর অর্থ করেছেন আকাশসমূহের মালিক।

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ –অর্থাৎ, উপরে নীচে স্তরে স্তরে সাজানো এই মর্তবাসমূহের মধ্যে ফেরেশতাগণ ও 'রুহুল-আমীন' অর্থাৎ, জিবরাঈল আরোহণ করেন। জিবরাঈল ফেরেশতাগণেরই একজন। কিন্তু তার বিশেষ সম্মানের কারণে তাঁর পৃথক নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ —অর্থাৎ, উল্লেখিত আযাব সেই দিন সংঘটিত হবে, যে দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। হযরত আবু ছাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এই দিনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আমার প্রাণ যে সত্তার করায়ত্ত, তাঁর শপথ করে বলছি—এই দিনটি মুমিনের জন্যে একটি ফরয নামায পড়ার সময়ের চেয়েও কম হবে।—(মাযহারী)।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে, يكون على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر والعصر —অর্থাৎ, এই দিনটি মুমিনদের জন্যে যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ের মত হবে।—(মাযহারী)।

এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, পঞ্চাশ হাজার বছর হওয়া একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। অর্থাৎ, কাফেরদের জন্যে এতটুকু দীর্ঘ এবং

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿٨﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

(৫) অতএব, আপনি উত্তম সবর করুন। (৬) তারা এই আযাবকে সুদূরপরাহত মনে করে, (৭) আর আমি একে আসন্ন দেখছি। (৮) সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মত। (৯) এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গিন পশমের মত (১০) বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না। (১১) যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহ্গার ব্যক্তি পণস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান–সন্ততিকে, (১২) তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে, (১৩) তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত (১৪) এবং পৃথিবীর সবকিছুকে, অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। (১৫) কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি, (১৬) যা চামড়া তুলে দিবে। (১৭) সে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল, (১৮) সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, অতঃপর আগলিয়ে রেখেছিল। (১৯) মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে। (২০) যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা–হুতাশ করে। (২১) আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। (২২) তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আদায়কারী। (২৩) যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে। (২৪) এবং যাদের ধন–সম্পদে নির্ধারিত হক আছে (২৫) যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের (২৬) এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। (২৭) এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তির সম্পর্কে ভীত–কম্পিত। (২৮) নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না। (২৯) এবং যারা তাদের যৌন–অঙ্গকে সংযত রাখে, (৩০) কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না, (৩১) অতএব, যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই সীমালংঘনকারী।

মু'মিনদের জন্যে এতটুকু খাট হবে।

কেয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য এক হাজার বছর, না পঞ্চাশ হাজার বছর ? আলোচ্য আয়াতে কেয়ামত দিবসের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর এবং সূরা তানযীলের আয়াতে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। আয়াতটি এই ঃ

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ —আল্লাহ্ তাআলার কাজ কর্ম পরিচালনা করে আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত, অতঃপর তাঁর দিকে উর্ধ্বগমন করেন এমন এক দিনে যা তোমাদের হিসাব অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান। বাহ্যতঃ উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরিত্য আছে। উপরোক্ত হাদীস দৃষ্টে এর জওয়াব হয়ে গেছে যে, সেই দিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন দলের দিক দিয়ে বিভিন্ন রূপ হবে। কাফেরদের জন্যে পঞ্চাশ হাজার বছর এবং মুমিনদের জন্যে এক নামাযের ওয়াক্তের সমান হবে। তাদের মাঝখানে কাফেরদের বিভিন্ন দল থাকবে। সম্ভবতঃ কোন কোন দলের জন্যে এক হাজার বছরের সমান থাকবে। অস্থিরতা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে সময় দীর্ঘ ও খাট হওয়া প্রসিদ্ধ ও সুবিধিত। অস্থিরতা ও কষ্টের এক ঘন্টা মাঝে মাঝে মানুষের কাছে এক দিন বরং এক সপ্তাহের চেয়েও বেশী মনে হয় এবং সুখ ও আরামের দীর্ঘতর সময়ও সংক্ষিপ্ত অনুভূত হয়।

যে আয়াতে এক হাজার বছরের কথা আছে, সেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরে–মাযহারীতে বলা হয়েছে, এই আয়াতে পার্থিব একদিন বোঝানো হয়েছে। এই দিনে জিবরাঈল ও ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী থেকে আকাশে যাতায়াত করে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন, যা মানুষে অতিক্রম করলে এক হাজার বছর লাগত। কেননা, সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত পাঁচশত বছরের ব্যবধান আছে। অতএব, পাঁচশত বছর নীচে আসার এবং পাঁচশত বছর উর্ধ্ব গমনের ফলে মোট এক হাজার বছর মানুষের গতির দিক দিয়ে হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ এই দূরত্ব খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে অতিক্রম করেন। সুতরাং সূরা তানযীলের আয়াতে পার্থিব হিসাবেই 'একদিন' বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা–মা'আরিজে কেয়ামতের দিন বিধৃত হয়েছে, যা পার্থিব দিন অপেক্ষা অনেক বড়। এর দৈর্ঘ্য ও সংক্ষিপ্ততা বিভিন্ন লোকের জন্যে তাদের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্নরূপ অনুভূত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا —এখানে স্থান ও কালের দিক দিয়ে দূর ও নিকট বোঝানো হয়নি ; বরং সম্ভাব্যতার ও বাস্তবতার দূরবর্তীতা বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা কেয়ামতের বাস্তবতা—বরং সম্ভাব্যতাকেও সুদূর পরাহত মনে করে আর আমি দেখছি যে, এটা নিশ্চিত।

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ — حميم শব্দের অর্থ ঘনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম বন্ধু। কেয়ামতের দিন কোন বন্ধু বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে না—সাহায্য করা দূরের কথা। জিজ্ঞাসা না করার কারণ সামনে না থাকা নয় ; বরং আল্লাহ্ তাআলার কুদরতে তাদের সবাইকে একে অপরের সামনেও করে দিবে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকবে

যে, কেউ অপরের কষ্ট ও সুখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতে পারবে না।

كَلَّآ إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ — لَظَىٰ শব্দের অর্থ অগ্নির লেলিহান শিখা। شَوَىٰ শব্দটি شواة এর বহুবচন। অর্থ মাথা ও হাত-পায়ের চামড়া। অর্থাৎ, জাহান্নামের অগ্নি একটি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা হবে, মস্তিষ্ক অথবা হাত-পায়ের চামড়া খুলে ফেলবে।

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ এই অগ্নি নিজে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ; বিমুখ হয় এবং ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে তা আগলিয়ে রাখে। পুঞ্জিভূত করার অর্থ অবৈধ পন্থায় পুঞ্জিভূত করা এবং আগলিয়ে রাখার অর্থ ফরয ও ওয়াজেব হক আদায় না করা। সহীহ্ হাদীসে তাই অর্থ করা হয়েছে।

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا - هلوع -এর শাব্দিক অর্থ লোভী, অধৈর্য ভীরু ব্যক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এখানে অর্থ সেই ব্যক্তি, যে হারাম ধন-সম্পদের লোভ করে। সাইদ ইবনে জুবায়র (রাঃ) বলেন ঃ এর অর্থ কৃপণ এবং মুকাতিল বলেন ঃ এর অর্থ সংকীর্ণমনা ধৈর্যহীন ব্যক্তি। এসব অর্থ কাছাকাছি। স্বয়ং কোরআনের ভাষায় هلوع শব্দের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে দোষযুক্ত অবস্থায়, তখন তাকে অপরাধী কেন সাব্যস্ত করা হয়? জওয়াব এই যে, এখানে মানব-স্বভাবে নিহিত প্রতিভা ও উপকরণ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা মানব-স্বভাবে সৎকাজের প্রতিভাও নিহিত রেখেছেন, তাকে জ্ঞান-গরিমাও দান করেছেন। কিতাব এবং রসূলের মাধ্যমে প্রত্যেক ভাল-মন্দ কাজের পরিণতিও বলে দিয়েছেন। মানুষ স্বেচ্ছায় জন্মলগ্নে গচ্ছিত মন্দ উপকরণের কারণে অপরাধী হয় না। هلوع শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোরআন পাক স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়াকর্মই উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছেঃ

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا অর্থাৎ, মানুষ এত ভীরু ও বে-সবর যে, যখন সে কোন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন হা-হুতাশ শুরু করে দেয়। পক্ষান্তরে যখন কোন সুখ-শান্তি ও আরাম লাভ করে, তখন কৃপণ হয়ে যায়। এখানে শরীয়তের সীমার বাইরে হা-হুতাশ বোঝানো হয়েছে। এমনিভাবে কৃপণতা বলে ফরয ও ওয়াজেব কর্তব্য পালনে ত্রুটি বোঝানো হয়েছে। অতঃপর সাধারণ মানুষের এই বদ-অভ্যাস থেকে সৎকর্মী মুমিনদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করে তাদের সৎ ক্রিয়াকর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রম إِلَّا الْمُصَلِّينَ থেকে শুরু করে عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এখানে مصلين শব্দ বলে مؤمنين বুঝিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামায মুমিনের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ আলামত। যারা নামাযী, তারাই মুমিন বলার যোগ্য হতে পারে। অতঃপর তাদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ—অর্থাৎ, যে নামাযী তার সমগ্র নামাযের নামাযে দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে ; এদিক সেদিক তাকায় না। ইমাম বগভী (রহঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে আবুল খায়র বলেন ঃ আমি সাহাবী হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াতের অর্থ কি এই যে, যারা সর্বক্ষণ নামায পড়ে? তিনি বললেন ঃ না, এই অর্থ নয় ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাযের দিকেই নিবিষ্ট থাকে এবং ডানে-বামে ও আগে-পিছে তাকায় না। অতঃপর وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ বাক্যে নামায ও নামাযের আদবসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই বিষয়বস্তুতে পুনরুক্তি নেই। এর পরে উল্লেখিত মুমিনদের গুণাবলী প্রায় তাই, যা সূরা মুমিনুনে বর্ণিত হয়েছে।

যাকাতের পরিমাণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত, তা হ্রাসবৃদ্ধি করার ক্ষমতা কারও নেই ঃ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ—এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, যাকাতের পরিমাণ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছ থেকে সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে। তাই যাকাতর নেসাব ও পরিমাণ উভয়টি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে স্থিরীকৃত। কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে এগুলো পরিবর্তিত হতে পারে না।

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ — এর পূর্বের আয়াতে যৌনকামনা চরিতার্থ করার বৈধ পাত্র বিবাহিতা স্ত্রী ও মালিকানাধীন বাঁদী উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতে এগুলো ছাড়া যৌনকামনা চরিতার্থ করার প্রত্যেক প্রকারকে নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾

سُورَةُ نُوحٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾

(৩২) এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে (৩৩) এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল-নিষ্ঠাবান (৩৪) এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান, (৩৫) তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে। (৩৬) অতএব, কাফেরদের কি হল যে, তারা আপনার দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। (৩৭) ডান ও বামদিক থেকে দলে দলে। (৩৮) তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, তাকে নেয়ামতের জান্নাতে দাখিল করা হবে? (৩৯) কখনই নয়, আমি তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি, যা তারা জানে। (৪০) আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার! নিশ্চয়ই আমি সক্ষম। (৪১) তাদের পরিবর্তে উৎকৃষ্টতর মানুষ সৃষ্টি করতে এবং এটা আমার সাধ্যের অতীত নয়। (৪২) অতএব, আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বাকবিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করুক সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হচ্ছে। (৪৩) সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে—যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। (৪৪) তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত; তারা হবে হীনতাগ্রস্ত। এটাই সেইদিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হত।

সূরা নূহ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ২৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) আমি নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি একথা বলে ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, তাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসার আগে। (২) সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহর হক ও সব বান্দার হক আমানতের অন্তর্ভুক্ত ঃ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ —এই আয়াতে আমানত শব্দটি বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য এক আয়াতেও তদ্রূপ করা হয়েছে। আয়াতটি এই ঃ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا —উভয় আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমানত কেবল সে অর্থকেই বলে না, যা কেউ আপনার হাতে সোপর্দ করে ; বরং যেসব ওয়াজেব হক আদায় করা আপনার দায়িত্বে ফরয, সেগুলো সবই আমানত। এগুলোতে ক্রটি করা খিয়ানত। এতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আল্লাহ্ তা'আলার হকও দাখিল আছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার যেসব হক আপনার উপর ওয়াজেব করা হয়েছে অথবা কোন লেনদেন ও চুক্তির মাধ্যমে আপনি যেসব হক নিজের উপর ওয়াজেব করে নিয়েছেন, সেগুলোও দাখিল আছে। এগুলো আদায় করা ফরয এবং এতে ক্রটি করা খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত।—(মাযহারী)।

وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ -এখানেও শাহাদত শব্দটিকে বহুবচন আনার কারণে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 'শাহাদত' তথা সাক্ষ্যের অনেক প্রকার আছে এবং প্রত্যেক প্রকার সাক্ষ্য কায়েম রাখা ওয়াজেব। এতে ঈমান, তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যও দাখিল এবং রমযানের চাঁদ, শরীয়তের বিচার-আচার ও পারস্পরিক লেনদেনের সাক্ষ্যও দাখিল আছে। এসব সাক্ষ্য গোপন করা ও এতে কম বেশী করা হারাম। বিশুদ্ধভাবে এগুলোকে কায়েম করা আয়াত দৃষ্টে ফরয।—(মাযহারী)

সূরা মা'আরিজ সমাপ্ত

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿٣﴾ يَغْفِرْ لَكُم مِّن
ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ
إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي
دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا
فِرَارًا ﴿٦﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ
فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا
اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ
لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾
وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ
وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾
وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا
وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ
الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

(৩) এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার এবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (৪) আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলার নির্দিষ্টকাল যখন হবে, তখন অবকাশ দেয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে। (৫) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা। আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি ; (৬) কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। (৭) আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। (৮) অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, (৯) অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। (১০) অতঃপর বলেছি ঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (১১) তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন, (১২) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন। (১৩) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব আশা করছ না ! (১৪) অথচ তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন রকমে সৃষ্টি করেছেন। (১৫) তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন (১৬) এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে। (১৭) আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উদ্গত করেছেন। (১৮) অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং আবার পুনরুত্থিত করবেন।

সূরা নূহ্

يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ - مِن —অব্যয়টি প্রায়শঃ কতক অর্থ জ্ঞাপন করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের কতক গোনাহ্ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার হক সম্পর্কিত গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। কেননা, বান্দার হক মাফ হওয়ার জন্যে ঈমান আনার পরও একটি শর্ত আছে। তা এই যে, হকটি আদায়যোগ্য হলে তা আদায় করতে হবে ; যেমন আর্থিক দায়-দেনা এবং আদায়যোগ্য না হলে তা মাফ নিতে হবে ; যেমন মুখে কিংবা হাতে কাউকে কষ্ট দেয়া।

হাদীসে বলা হয়েছে, ঈমান আনলে পূর্ববর্তী সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। এতেও বান্দার হক আদায় করা, অথবা মাফ নেয়া শর্ত। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আয়াতে من অব্যয়টি অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ দৃষ্টে শর্তটি অপরিহার্য।

وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى - أَجَلٍ مُّسَمًّى-এর অর্থ নির্দিষ্ট মেয়াদ। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। অর্থাৎ, বয়সের নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে তোমাদেরকে কোন পার্থিব আযাবে ধ্বংস করবেন না। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় এই যে, ঈমান না আনলে নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বেই তোমাদেরকে আযাবে ধ্বংস করে দেয়ারও সম্ভাবনা আছে। বয়সের নির্দিষ্ট মেয়াদের মাঝে মাঝে এরূপ শর্ত থাকে যে, সে অমুক কাজ করলে উদাহরণতঃ তার বয়স আশি বছর হবে এবং না করলে ষাট বছর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এমনিভাবে অকৃতজ্ঞতার কাজে বয়স হ্রাস পাওয়া এবং কৃতজ্ঞতার কাজে বয়স বেড়ে যাওয়াও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

মানুষের বয়স হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত আলোচনা ঃ তফসীরে-মাযহারীতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ তকদীর দুই প্রকার—(১) চূড়ান্ত অকাট্য এবং (২) শর্তযুক্ত। অর্থাৎ, লওহে-মাহ্ফূযে এভাবে লিখা হয় যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য করলে তার বয়স উদাহরণতঃ ষাট বছর হবে এবং আনুগত্য না করলে পঞ্চাশ বছর বয়সে খতম করে দেয়া হবে। দ্বিতীয় প্রকার তকদীরে শর্তের অনুপস্থিতিতে পরিবর্তন হতে পারে। উভয় প্রকার তকদীর কোরআন পাকের এই আয়াতে উল্লেখিত আছে। يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা লওহে-মাহ্ফূযে —পরিবর্তন পরিবর্ধন করে থাকেন এবং তাঁর কাছে রয়েছে আসল কিতাব। "আসল কিতাব" বলে সেই কিতাব বোঝানো হয়েছে, যাতে অকাট্য তকদীর আছে। কেননা, শর্তযুক্ত তকদীরে লিখিত শর্ত সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ ব্যক্তি শর্তপূর্ণ করবে কি করবে না। তাই চূড়ান্ত তকদীরে অকাট্য ফায়সালা লিখা হয়।

হযরত সালমান ফারেসীর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন—

لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد فى العمر الا البر অর্থাৎ, দোয়া ব্যতীত কোন কিছু আল্লাহ্ তাআলার ফয়সালা রোধ করতে পারে না এবং পিতা-মাতার বাধ্যতা ব্যতীত কোন কিছু বয়স বৃদ্ধি করতে পারে না। এই হাদীসের মতলব এটাই যে, শর্তযুক্ত তকদীরে এসব কর্মের কারণে পরিবর্তন হতে পারে। সারকথা, আয়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ

দেয়াকে তাদের ঈমান আনার উপর নির্ভরশীল করে তাদের বয়স সম্পর্কে শর্তযুক্ত তকদীর বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা হযরত নূহ্ (আঃ)-কে এ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে থাকবেন। এ কারণে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলে দিলেন, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্যে যে আসল বয়স নির্ধারণ করেছেন, সেই পর্যন্ত তোমরা অবকাশ পাবে এবং কোন পার্থিব আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা ঈমান না আন, তবে এই আসল বয়সের পূর্বেই আল্লাহ্ তাআলার আযাব তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। এমতাবস্থায় পরকালের আযাবে ভিন্ন হবে। অতঃপর আরও বলে দিলেন যে, ঈমান আনলেও চিরতরে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে না। বরং অকাট্য তকদীরে তোমাদের যে বয়স লিখিত আছে, সেই বয়সে মৃত্যু আসা অপরিহার্য। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় রহস্য বলে এই বিশ্ব-চরাচরকে চিরস্থায়ী করেননি। এখানকার প্রত্যেক বস্তু অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এতে ঈমান ও আনুগত্য এবং কুফর ও গোনাহের কারণে কোন পার্থক্য হয় না। إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে। অতঃপর স্বজাতির সংশোধন ও ঈমানের জন্যে নূহ্ (আঃ)-এর বিভিন্ন প্রচেষ্টায় বিরামহীনভাবে নিয়োজিত থাকা এবং সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধিতা করার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পরিশেষে নিরাশ হয়ে বদদোয়া করা এবং সমগ্র জাতির নিমজ্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ নূহ্ (আঃ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়ত লাভ করেন এবং কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কখনও চেষ্টায় ক্ষান্ত হননি এবং কোন দিন নিরাশও হননি। সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি সবর করেন।

যাহ্হাক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ তাঁর সম্প্রদায়ের প্রহারের চোটে তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। এরপর তারা তাঁকে একটি কম্বলে জড়িয়ে গৃহে রেখে যেত। তারা মনে করত, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু পরবর্তী দিন যখন চৈতন্য ফিরে আসত, তখন আবার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তাআলার দিকে দাওয়াত দিতেন এবং প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করতেন। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক ওবায়দ ইবনে আসরেশী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁর গলা টিপে দিত। ফলে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলতেন ঃ পুনরায় চেতনা ফিরে এলে তিনি এই দোয়া করতেন ঃ رب اغفر لقومى انهم لايعلمون অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন ; কারণ, ওরা অবুঝ। তাদের এক পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তিনি দ্বিতীয় পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে আশাবাদী হতেন। দ্বিতীয় পুরুষের পর তৃতীয় পুরুষের ব্যাপারেও এমনি আশাবাদী হয়ে তিনি কর্তব্যপালনে লিপ্ত থাকতেন। কারণ, তাদের পুরুষানুক্রমিক বয়স হযরত নূহ্ (আঃ)-এর বয়সের ন্যায় দীর্ঘ ছিল না। তিনি মু'জেযা হিসাবে দীর্ঘ বয়স প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যখন সম্প্রদায়ের একের পর এক পুরুষ অতিক্রান্ত হতে থাকে এবং প্রত্যেক ভবিষ্যৎ পুরুষ বিগত পুরুষ অপেক্ষা অধিক দুষ্টমতি প্রমাণিত হতে থাকে, তখন হযরত নূহ্ (আঃ) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার দরবারে অভিযোগ পেশ করলেন এবং বললেন ঃ আমি ওদেরকে দিবারাত্রি, দলবদ্ধভাবে ও পৃথক পৃথকভাবে, প্রকাশ্যে ও সংগোপনে—সারকথা, সর্বতোভাবে পথে আনার চেষ্টা করেছি। কখনও আযাবের ভয় প্রদর্শন করেছি, কখনও জান্নাতের নেয়ামতরাজির লোভ দেখিয়েছি। আরও বলেছি—ঈমান ও সৎকর্মের বরকতে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে দুনিয়াতেও সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন এবং কখনও আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের নিদর্শনাবলী পেশ করে বুঝিয়েছি, কিন্তু তারা কিছুতেই কর্ণপাত করল না। অপরদিকে আল্লাহ্ তাআলা হযরত নূহ্ (আঃ)-কে বলে দিলেন ঃ আপনার সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ছাড়া নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ আয়াতের মতলব তাই। এমনি নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌছে হযরত নূহ্ (আঃ)-এর মুখে বদদোয়া উচ্চারিত হল। ফলে সমগ্র সম্প্রদায় নিমজ্জিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। তবে মু'মিনগণ রক্ষা পেল। তাদেরকে একটি জলযানে তুলে নেয়া হয়েছিল।

সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে যেয়ে নূহ্ (আঃ) তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার কাছে এস্তেগফার অর্থাৎ, ঈমান এনে বিগত গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার দাওয়াত দেন এবং এর পার্থিব উপকার এই বর্ণনা করেন যে,

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ —এ থেকে অধিকাংশ আলেম বলেন যে, গোনাহ্ থেকে তওবা ও এস্তেগফার করলে আল্লাহ্ তাআলা যথাস্থানে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, দুর্ভিক্ষ হতে দেন না এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত হয়। কোথাও কোন রহস্যের কারণে খেলাফও হয় ; কিন্তু তওবা এস্তেগফারের ফলে পার্থিব বিপদাপদ দূর হয়ে যাওয়াই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলার প্রচলিত রীতি। হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا —এই আয়াতে তওহীদ ও কুদরতের প্রমাণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সাজানোর কথা এবং তাতে চন্দ্রের আলোকোজ্জ্বল হওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে فِيهِنَّ বলায় বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, চন্দ্র আকাশগাত্রে অবস্থিত। কিন্তু আধুনিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের অনেক নীচে মহাশূন্যে অবস্থিত। এ সম্পর্কে সূরা ফোরকানের جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا আয়াতের তফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

سُورَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾

(১৯) আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছানা (২০) যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে। (২১) নূহ্ বলল : হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ করছে এমন লোককে, যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে। (২২) আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছে। (২৩) তারা বলছে : তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে। (২৪) অথচ তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব, আপনি জালেমদের পথভ্রষ্টতাই বাড়িয়ে দিন। (২৫) তাদের গোনাহসমূহের দরুন তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর দাখিল করা হয়েছে জাহান্নামে। অতঃপর তারা আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি। (২৬) নূহ্ আরও বলল : হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। (২৭) যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফের। (২৮) হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে—তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং জালেমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।

সূরা আল-জিন

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ২৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) বলুন ঃ আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে ঃ আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি;

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে নূহ্ (আঃ) আরও বললেনঃ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا —অর্থাৎ, তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে। তারা নিজেরাতো উৎপীড়ন করতই, উপরন্তু জনপদের গুণ্ডা ও দুষ্ট লোকদেরকেও নূহ্ (আঃ)-এর পিছনে লেলিয়ে দিত। তারা পরস্পরে এই চুক্তিতেও উপনীত হয়েছিল যে, وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا —অর্থাৎ, আমরা আমাদের দেব-দেবী বিশেষতঃ এই পাঁচ জনের উপাসনা পরিত্যাগ করব না। আয়াতে উল্লেখিত শব্দগুলো পাঁচটি প্রতিমার নাম।

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, এই পাঁচ জন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল হযরত আদম ও নূহ্ (আঃ)-এর আমলের মাঝামাঝি। তাঁদেরও নেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাঁদের ওফাতের পর ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্ তাআলার এবাদত ও বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত করল ঃ তোমরা যেসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা কর, যদি তাদের মূর্তি তৈরী করে সামনে রেখে লও, তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা বোঝতে না পেরে মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং তাদের স্মৃতি জাগরিত করে এবাদতে বিশেষ পুলক অনুভব করতে লাগল। এমতাবস্থায়ই তাদের সবাই একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বোঝাল ঃ তোমাদের পূর্বপুরুষদের খোদা ও উপাস্য মূর্তিই ছিল। তারা এই মূর্তিগুলোরই উপাসনা করত। এখান থেকে প্রতিমাপূজার সূচনা হয়ে গেল। উপরোক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য তাদের অন্তরে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় পারস্পরিক চুক্তিতে তাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا —অর্থাৎ, এই জালেমদের পথভ্রষ্টতা আরও বাড়িয়ে দিন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাতিকে সৎপথ প্রদর্শন করা পয়গম্বরগণের কর্তব্য। নূহ্ (আঃ) তাদের পথভ্রষ্টতার দোয়া করলেন কিভাবে? জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে নূহ্ (আঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখন তাদের মধ্যে কেউ মুসলমান হবে না। সেমতে পথভ্রষ্টতা ও কুফরের উপর তাদের মৃত্যুবরণ নিশ্চিত ছিল। নূহ্ (আঃ) তাদের পথভ্রষ্টতা বাড়িয়ে দেয়ার দোয়া করলেন, যাতে সত্বরই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا —অর্থাৎ, তারা তাদের গোনাহ অর্থাৎ, কুফর ও শিরকের কারণে পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে এবং অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়েছে। পানিতে ডুবা ও অগ্নিতে প্রবেশ করা বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী আযাব হলেও আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের পক্ষে অবাস্তব নয়। বলাবাহুল্য, এখানে জাহান্নামের অগ্নি বোঝানো হয়নি। কেননা, তাতে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর প্রবেশ করবে ; বরং এটা বরযখী অগ্নি। কোরআন পাক এই বরযখী অগ্নিতে প্রবেশ করার খবর দিয়েছে।

সূরা নূহ্ সমাপ্ত

সূরা আল-জিন

نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ – نَفَرٌ **শব্দটি** তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা জ্ঞাপন করে। বর্ণিত আছে যে, আয়াতে আলোচিত জিনদের সংখ্যা নয় ছিল। তারা ছিল নছীবাইনের অধিবাসী।

জিনদের স্বরূপ ঃ জিন আল্লাহ্ তাআলার এক প্রকার শরীরী, আত্মাধারী ও মানুষের ন্যায় জ্ঞান এবং চেতনাশীল সৃষ্টজীব। তারা মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়। এ কারণেই তাদেরকে জিন বলা হয়। জিন এর শাব্দিক অর্থ গুপ্ত। মানবসৃষ্টির প্রধান উপকরণ যেমন মৃত্তিকা, তেমনি জিন সৃষ্টির প্রধান উপকরণ অগ্নি। এই জাতির মধ্যেও মানুষের ন্যায় নর ও নারী আছে এবং সন্তান প্রজননের ধারা বিদ্যমান আছে। কোরআন পাকে যাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে, বাহ্যতঃ তারাও জিনদের দুষ্ট শ্রেণীর নাম। জিন ও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব কোরআন ও সুন্নাহর অকাট্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এটা অস্বীকার করা কুফর।—(মাযহারী)

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ –থেকে জানা গেল যে, এখানে বর্ণিত ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জিনদেরকে স্বচক্ষে দেখেননি। আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে অবহিত করেছেন।

সূরা জিন অবতরণের ঘটনা ঃ সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এই ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জিনদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোরআন শোনাননি এবং তিনি তাদেরকে দর্শনও করেননি। এই ঘটনা তখনকার, যখন শয়তানদেরকে আকাশের খবর শোনা থেকে উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহত করা হয়েছিল। এ সময়ে জিনরা পরস্পরে পরামর্শ করল যে, আকাশের খবরাদি শোনার ব্যাপারে বাধাদানের এই ব্যাপারটি কোন আকস্মিক ঘটনা মনে হয় না। পৃথিবীতে অবশ্যই কোন নতুন ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর তারা স্থির করল যে, পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ও আনাচে-কানাচে জিনদের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে হবে। যথাযথ খোঁজাখুঁজি করে এই নতুন ব্যাপারটি কি, তা জেনে আসবে। হেজাযে প্রেরিত তাদের প্রতিনিধিদল যখন 'নাখাল' নামক স্থানে উপস্থিত হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন।

জিনদের এই প্রতিনিধিদল নামাযে কোরআন পাঠ শুনে পরস্পরে শপথ করে বলতে লাগল ঃ এই কালামই আমাদের ও আকাশের খবরাদির মধ্যে অন্তরায় হয়েছে। তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বজাতির কাছে ঘটনা বিবৃত করল এবং বলল ঃ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا আল্লাহ্ তাআলা এসব আয়াতে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তাঁর রসূলকে অবহিত করেছেন।

হযরত আবু তালেবের ইন্তেকালের পর আল্লাহ্র রসূল তায়েফবাসীদের নিকট দ্বীন প্রচারের উদ্দেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওরা তাঁর কথা শোনার পরিবর্তে তাঁকে নির্মমভাবে অত্যাচার করেছিল ফলে নিরাশ হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ফেরার পথে তিনি 'নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করে শেষরাত্রে তাহাজ্জুদের নামায শুরু করেন। ইয়ামনের নছীবাইন শহরের জিনদের এক প্রতিনিধি দলও তখন সেখানে অবস্থানরত ছিল। তারা কোরআন পাঠ শুনল এবং শুনে বিশ্বাসস্থাপন করল। অতঃপর তারা স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা তারই আলোচনা করেছেন।—(মাযহারী)

জনৈক সাহাবী জিনের ঘটনা ঃ ইবনে জওযী (রহঃ) "আছ-ছফওয়া" গ্রন্থে হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এক জায়গায় জনৈক বৃদ্ধ জিনকে বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখেন। সে পশমের জোব্বা পরিহিত ছিল। হযরত সহল (রাঃ) বলেন ঃ নামায সমাপনান্তে আমি তাকে সালাম করলে সে জওয়াব দিল ও বলল ঃ তুমি এই জোব্বার চাকচিক্য দেখে বিস্মিত হচ্ছ? জোব্বাটি সাতশ' বছর ধরে আমার গায়ে আছে। এই জোব্বা পরিধান করেই আমি ঈসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করেছি। অতঃপর এই জোব্বা গায়েই আমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দর্শন লাভ করেছি। যেসব জিন সম্পর্কে 'সূরা জিন' অবতীর্ণ হয়েছে, আমি তাদেরই একজন।—(মাযহারী)

হাদীসে বর্ণিত লায়লাতুল-জিনের ঘটনায় আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইচ্ছাকৃতভাবে জিনদের কাছে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে মক্কার অদূরে জঙ্গলে যাওয়া এবং কোরআন শোনানো উল্লেখিত আছে। এটা বাহ্যতঃ সূরায় বর্ণিত কাহিনীর পরবর্তী ঘটনা। আল্লামা খাফফাযী বর্ণনা করেন, নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, জিনদের প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে একবার দু'বার নয়—ছয় বার আগমন করেছিল। অতএব, সূরার বর্ণনা ও হাদীসের বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই।

يَهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ
وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ وَّ
اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ
اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ وَّاَنَّهٗ كَانَ
رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ
رَهَقًا ۙ وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ
وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا
وَّشُهُبًا ۙ وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ
يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ
اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ
رَشَدًا ۙ وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا
طَرَآئِقَ قِدَدًا ۙ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ
وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۙ وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ
فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۙ وَّاَنَّا مِنَّا
الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا

(২) যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না (৩) এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। (৪) আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত। (৫) অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন কখনও আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না। (৬) অনেক মানুষ অনেক জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। (৭) তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা মানবেরা ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তাআলা কখনও কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। (৮) আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। (৯) আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে। (১০) আমরা জানি না পৃথিবীবাসীদের অমঙ্গল সাধন করা অভীষ্ট, না তাদের পালনকর্তা তাদের মঙ্গল সাধন করার ইচ্ছা রাখেন। (১১) আমাদের কেউ কেউ সৎকর্মপরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয়। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। (১২) আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাআলাকে পরাস্ত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাঁকে অপারক করতে পারব না। (১৩) আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম, তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব, যে তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস করে, সে লোকসান ও জোর-জবরের আশংকা করে না। (১৪) আমাদের কিছুসংখ্যক আজ্ঞাবহ এবং কিছুসংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আজ্ঞাবহ হয়, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا – جَدٌّ শব্দের অর্থ শান, অবস্থা। আল্লাহ্ তাআলার জন্যে বলা হয় تَعٰلٰى جَدُّهٗ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার শান উর্ধ্বে। এখানে সর্বনামের পরিবর্তে رب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। এতে শান উর্ধ্বে হওয়ার প্রমাণও এসে গেছে। কেননা, যিনি সৃষ্টির পালনকর্তা, তাঁর শানে যে উর্ধ্বে, তা বলাই বাহুল্য।

وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا – شطط —শব্দের অর্থ অবান্তর কথা, অন্যায় ও জুলুম। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন জিনরা এ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার অজুহাত বর্ণনা করে বলেছে : আমাদের সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা আল্লাহ্ তাআলার শানে অবান্তর কথাবার্তা বলত। অথচ আমরা মনে করতাম না যে, কোন মানব অথবা জিন আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে পারে। তাই বোকাদের কথায় আমরা আজ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিলাম। এখন কোরআন শুনে আমাদের চক্ষু খুলেছে।

وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا —এই আয়াতে মুমিন জিনরা বলেছে : মূর্খতাযুগে মানুষ যখন কোন বিজন প্রান্তরে অবস্থান করত, তখন প্রান্তরের জিনদের আশ্রয়গ্রহণ করত। এতে জিনরা মনে করে বসল আমরা মানবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মানবও আমাদের আশ্রয়গ্রহণ করে। এতে জিনদের পথভ্রষ্টতা আরও বেড়ে যায়।

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا –আরবী অভিধানে سماء শব্দের অর্থ যেমন আকাশ, তেমনি মেঘমালা অর্থেও এর ব্যবহার ব্যাপক ও সুবিদিত। এখানে বাহ্যতঃ এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

জিনরা আকাশের সংবাদ শোনার জন্যে মেঘমালা পর্যন্ত গমন করতো—আকাশ পর্যন্ত নয় : জিন ও শয়তানরা আকাশের সংবাদ শোনার জন্যে আকাশ পর্যন্ত যাওয়ার অর্থ মেঘমালা পর্যন্ত যাওয়া। এর প্রমাণ বোখারীতে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এই হাদীস :

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন : আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি—ফেরেশতারা 'ইনান' অর্থাৎ, মেঘমালা পর্যন্ত অবতরণ করে। সেখানে আল্লাহ্ তাআলার জারিকৃত সিদ্ধান্তসমূহ পরস্পরে আলোচনা করে। শয়তানরা এখান থেকে এগুলো চুরি করে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌছিয়ে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে শত শত মিথ্যা বিষয় সংযোজন করে দেয়।—(মাযহারী)

বোখারীতেই আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর এবং মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই ঘটনা আসল আকাশে সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা যখন আকাশে কোন হুকুম জারি করেন, তখন সব ফেরেশতা আনুগত্যসূচক পাখা নাড়া দেয়। এরপর তারা পরস্পরে সে বিষয়ে আলোচনা করে। খবরচোর শয়তানরা এই আলোচনা শুনে নেয় এবং তাতে অনেক মিথ্যা সংযোজন করে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌছিয়ে দেয়।

এই বিষয়বস্তু হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা, এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, শয়তানরা আসল আকাশে পৌছে খবর চুরি করে। বরং এটা সম্ভবপর যে, এসব খবর পর্যায়ক্রমে আকাশের

وَأَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَّأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا
عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَأَسْقَيْنٰهُمْ مَّاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۚ
وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾
وَّأَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ وَّأَنَّهٗ
لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾
قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَا أُشْرِكُ بِهٖ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّيْ لَا
أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ
اللّٰهِ أَحَدٌ ۙ وَّلَنْ أَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلٰغًا
مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ۚ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَإِنَّ
لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتّٰى إِذَا رَأَوْا مَا
يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَّأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾
قُلْ إِنْ أَدْرِيْ أَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ أَمْ يَجْعَلُ
لَهٗ رَبِّيْ أَمَدًا ﴿٢٥﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ
أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَإِنَّهٗ
يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

(১৫) আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন। (১৬) আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম (১৭) যাতে এ ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে উদীয়মান আযাবে পরিচালিত করবেন। (১৮) এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার সাথে কাউকে ডেকো না। (১৯) আর যখন আল্লাহ্ তাআলার বান্দা তাঁকে ডাকার জন্যে দণ্ডায়মান হল, তখন অনেক জিন তার কাছে ভিড় জমাল। (২০) বলুন ঃ আমি তো আমার পালনকর্তাকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। (২১) বলুন ঃ আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। (২২) বলুন ঃ আল্লাহ্ তাআলার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। (২৩) কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার বাণী পৌঁছানো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (২৪) এমনকি যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার সংখ্যা কম। (২৫) বলুন ঃ আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় আসন্ন না আমার পালনকর্তা এর জন্যে কোন মেয়াদ স্থির করে রেখেছেন। (২৬) তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না। (২৭) তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন,

ফেরেশতাগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ফেরেশতাগণ মেঘমালা পর্যন্ত এসে সে সম্পর্কে আলোচনা করে। এখান থেকে শয়তানরা তা চুরি করে। পূর্বোক্ত হাদীসে তাই বলা হয়েছে।—(মাযহারী)

সারকথা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পূর্বে আকাশের খবর চুরি ধারা বিনা বাধায় অব্যাহত ছিল। শয়তানরা নির্বিঘ্নে মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছে ফেরেশতাগণের কাছে শুনে নিত। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের সময় তাঁর ওহীর হেফাযতের উদ্দেশে চুরির সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হল এবং কোন শয়তান খবর চুরির নিয়তে উপরে গেলে তাকে লক্ষ্য করে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। চোর বিতাড়নের এই নতুন উদ্যোগ দেখেই শয়তান ও জিনরা চিন্তিত হয়ে পড়ে, কারণ অনুসন্ধানের জন্যে পৃথিবীর কোণে কোণে সন্ধানকারী দল প্রেরণ করেছিল। অতঃপর 'নাখলা' নামক স্থানে একদল জিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে কোরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

উলকাপিণ্ড পূর্বেও ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমল থেকে একে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার হচ্ছে ঃ প্রচলিত ভাষায় شهاب ثاقب বলা হয় তারকা বিচ্যুতিকে। আরবীতে এর জন্যে انقضاض الكوكب শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই তারকা-বিচ্যুতির ধারা প্রাচীনকাল থেকেই অব্যাহত আছে। অথচ আয়াত থেকে জানা যায় যে, এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলের বৈশিষ্ট্য। এর জওয়াব এই যে, উল্কাপিণ্ডের অস্তিত্ব পূর্ব থেকেই ছিল। এর স্বরূপ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের ভাষ্য এই যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে কিছু আগ্নেয় পদার্থ শূন্যমণ্ডলে পৌঁছে এবং এক সময়ে তা প্রজ্বলিত হয়ে যায়। এটাও সম্ভবপর যে, কোন তারকা অথবা গ্রহ থেকে এই আগ্নেয় পদার্থ নির্গত হয়। যাই হোক না কেন, জগতের আদিকাল থেকেই এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবে এই আগ্নেয় পদার্থকে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নুবওয়ত লাভের সময় থেকে শুরু হয়েছে। দৃষ্ট সব উল্কাপিণ্ডকে একাজে ব্যবহার করাও জরুরী নয়। সূরা হিজরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

وَّأَنَّا لَا نَدْرِيْ أَشَرٌّ أُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

—অর্থাৎ, খবর চুরি বন্ধ করার কারণ দ্বিবিধ হতে পারে—(১) পৃথিবীবাসীকে শাস্তি দেয়া, যাতে তারা আকাশের খবরাদি না পায়, (২) তাদের হেদায়েতের ব্যবস্থা করা, যাতে জিন ও শয়তান খোদায়ী ওহীতে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে।

فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا — بخس শব্দের অর্থ প্রাপ্য অপেক্ষা কম দেয়া এবং رهق শব্দের অর্থ লাঞ্ছনা ও অপমান। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিনের প্রতিদান কম দেয়া হবে না এবং পরকালে তার কোন লাঞ্ছনা হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَّأَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا — مساجد শব্দটি مسجد এর বহুবচন। এর এক অর্থ উপাসনালয় হতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, মসজিদসমূহ কেবল আল্লাহ্ তাআলার এবাদতের জন্যে নির্মিত হয়েছে। অতএব, তোমরা মসজিদে যেয়ে আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যের জন্যে ডেকো না; যেমন ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা তাদের

উপাসনালয়সমূহে এ ধরনের শেরেকী করে থাকে। সুতরাং আয়াতের সারমর্ম এই যে, মসজিদসমূহকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মিথ্যা কর্মকাণ্ড থেকে পবিত্র রাখতে হবে।

এছাড়া مسجد শব্দটি এখানে مصدر ميمى হয়ে সেজদার অর্থেও হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সকল সেজদা আল্লাহ্ তাআলার জন্যেই নির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অপরকে সাহায্যের জন্যে ডাকে, সে যেন তাকে সেজদা করে। অতএব অপরকে সেজদা করা থেকে বিরত থাক।

উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্যে আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অপরকে সেজদা করা হারাম এবং কোন কোন আলেমের মতে কুফর।

قُلْ إِنْ أَدْرِيٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُۥ رَبِّيٓ أَمَدًا — এখানে প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা রসূলকে আদেশ করেছেন, যেসব অবিশ্বাসী আপনাকে কেয়ামতের নির্দিষ্ট দিন-তারিখ বলে দেয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করে, তাদেরকে বলে দিন ঃ কেয়ামতের আগমন ও হিসাব-নিকাশ নিশ্চিত ; কিন্তু তার নির্দিষ্ট দিন-তারিখ আল্লাহ্ তাআলা কাউকে বলেননি। তাই আমি জানি না কেয়ামতের দিন আসন্ন না আমার পালনকর্তা এর জন্য দীর্ঘ মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিবেন। দ্বিতীয় আয়াতে এর দলীল বর্ণনা করা হয়েছে যে, عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا —অর্থাৎ আমার না জানার কারণ এই যে, আমি 'আলেমুল-গায়ব' নই ; বরং আলেমুল গায়ব বিশেষণটি একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণ। আর তিনি এ ব্যাপারে কাউকে অবহিত করেন না।

এখানে কোন নির্বোধ ব্যক্তির মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কোন গায়ব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন না, তখন তিনি রসূল হলেন কিরূপে? কেননা, রসূলের কাছে আল্লাহ্ তাআলা হাজারো গায়বের বিষয় ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। যার কাছে ওহী আসে না, সে নবী ও রসূল হতে পারে না। এই প্রশ্নের জওয়াবের দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে পরবর্তী আয়াতে ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে।

গায়ব ও গায়বের খবরের মধ্যে পার্থক্য ঃ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا — উপরোক্ত বোকাসুলভ প্রশ্নের জওয়াব এই ব্যতিক্রমের إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن সারমর্ম। অর্থাৎ, রসূল গায়ব জানেন না—এ কথার অর্থ যে কোন গায়ব জানেন না নয়। বরং রেসালতের জন্যে যে পরিমাণ গায়বের ও খবর অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান কোন রসূলকে দেয়া অপরিহার্য, সেই পরিমাণ গায়বের খবর ওহীর মাধ্যমে রসূলকে দান করা হয়েছে এবং তার খুবই সংরক্ষিত পথে দান করা হয়েছে। যখন রসূলের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তার চতুর্দিকে ফেরেশতাগণের প্রহরা থাকে, যাতে শয়তান কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম না হয়। এখানে রসূল শব্দ দ্বারা প্রথমে রসূল ও নবীকে প্রদত্ত গায়বের প্রকার নির্ধারণ করা হয়েছে যে, তা হচ্ছে শরীয়ত ও বিধি-বিধানের জ্ঞান এবং সময়োপযোগী গায়বের খবর। এরপর পরবর্তী বাক্যে আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, এসব খবর ফেরেশতাগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার চুতস্পার্শ্বে অন্যান্য ফেরেশতাগণের প্রহরা নিয়োগ করা হয়। এথেকে বোঝা গেল যে, এই ব্যতিক্রমের মাধ্যমে নবী ও রসূলের রেসালতের জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রকারের গায়ব সপ্রমাণ করা হয়েছে।

অতএব, পরিভাষায় এই ব্যতিক্রমকে استثناء منقطع বলা হয়। অর্থাৎ, যে গায়ব সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত কেউ জানে না, ব্যতিক্রমের মাধ্যমে সেই গায়ব প্রমাণ করা হয়নি ; বরং বিশেষ ধরনের 'এলমে-গায়ব' প্রমাণ করা হয়েছে। কোরআনের স্থানে স্থানে একে أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ শব্দের অভিহিত করা হয়েছে। এক আয়াতে আছে— تِلْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ

কোন কোন অজ্ঞ লোক গায়ব ও গায়েবর খবরের মধ্যে পার্থক্য বোঝে না। তারা পয়গম্বরগণের জন্যে বিশেষতঃ শেষ নবী (সাঃ)-এর জন্যে সর্বপ্রকার এলমে-গায়ব সপ্রমাণ করার প্রয়াস পায় এবং তাঁকে আল্লাহ্ তাআলার অনুরূপ আলেমুল-গায়ব তথা সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞানবান মনে করে। এটা পরিষ্কার শিরক এবং রসূলকে আল্লাহ্ তাআলার আসনে আসীন করার অপপ্রয়াস বৈ নয়।—(নাউযুবিল্লাহ্) যদি কোন ব্যক্তি তার ভেদ তার বন্ধুকে বলে দেয়, এতে দুনিয়ার কেউ বন্ধুকে আলেমুল-গায়ব আখ্যা দিতে পারে না। এমনিভাবে পয়গম্বরগণকে ওহীর মাধ্যমে হাজারো গায়বের বিষয় বলে দেয়ার কারণ তাঁর আলেমুল-গায়ব হয়ে যাবেন না। এতএব, বিষয়টি উত্তমরূপে বোঝে নেয়া দরকার।

এক শ্রেণীর সাধারণ মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না। ফলে তাদের কাছে যখন বলা হয় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) 'আলেমুল-গায়ব' নন, তখন তারা এই অর্থ বোঝে যে, নাউযুবিল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন গায়বের খবর রাখেন না। অথচ দুনিয়াতে কেউ এর প্রবক্তা নয় এবং হতে পারে না। কেননা, এরূপ হলে খোদ নবুওয়ত ও রেসালতই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। তাই কোন মুমিনের পক্ষেই এরূপ বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয়।

لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

سورة المزمل مكية وهي عشرون آية وفيها ركوعان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٧﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾ رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿١٤﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

(২৮) যাতে আল্লাহ্ তাআলা জেনে নেন যে, রসূলগণ তাঁদের পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছিয়েছেন কি না। রসূলগণের কাছে যা আছে, তা তাঁর জ্ঞান-গোচর। তিনি সবকিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন।

সূরা মুযযাম্মিল

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ২০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) হে বস্ত্রাবৃত, (২) রাত্রিতে দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে; (৩) অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম (৪) অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে। (৫) আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। (৬) নিশ্চয় এবাদতের জন্যে রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। (৭) নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। (৮) আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন। (৯) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকেই গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে। (১০) কাফেররা যা বলে, তজ্জন্যে আপনি সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। (১১) বিত্ত-বৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দিন। (১২) নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড। (১৩) গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৪) যেদিন পৃথিবী পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তূপ। (১৫) আমি তোমাদের কাছে একজন রসূলকে তোমাদের জন্যে সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউনের কাছে একজন রসূল।

আনষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে— وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا —অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তুর পরিসংখ্যান আল্লাহ্ তাআলারই গোচরীভূত। পাহাড়ের অভ্যন্তরে কি পরিমাণ অণু-পরমাণু রয়েছে, সারা বিশ্বের জলধিসমূহের মধ্যে কি পরিমাণ জলবিন্দু আছে, প্রত্যেক বৃষ্টিতে কতসংখ্যক ফোঁটা বর্ষিত হয় এবং সারা জাহানের বৃক্ষসমূহের পাত্রের সঠিক পরিসংখ্যান তাঁর জানা আছে। সমস্ত এলমে গায়ব যে আল্লাহ্ তাআলারই বিশেষ গুণ, আয়াতে একথা আবার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যাতে উপরোক্ত ব্যতিক্রম দেখে ভুল বোঝাবুঝিতে পতিত না হয়।

এলমে-গায়বের অর্থ ও তার বিস্তারিত বিধি-বিধান সূরা নমলের قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ আয়াতের তফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা জিন সমাপ্ত

সূরা মুয্যাম্মিল

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ – مزمل এবং পরবর্তী সূরায় ব্যবহৃত مدثر শব্দদ্বয়ের অর্থ প্রায় এক; অর্থাৎ, বস্ত্রাবৃত। উভয় সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে একটি সাময়িক অবস্থা ও বিশেষ গুণ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ভীষণ ভয় ও উদ্বেগের কারণে তীব্র শীত অনুভব করছিলেন এবং বস্ত্রাবৃত হয়েছিলেন। সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে, সর্ব প্রথম হেরা গিরি গুহায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে ফেরেশতা জিবরাঈল আগমন করে ইক্‌রা সূরায় প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। ফেরেশতার এই অবতরণ ও ওহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর নিকট গমন করলেন এবং তীব্র শীত অনুভব করার কারণে বললেন, زملونى زملونى অর্থাৎ, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও।' এরপর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে "ফতরাতুল ওহী" বলা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেন ঃ একদিন আমি পথ চলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিগুহার সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একজায়গায় একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভয়ে ও আতংকে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি গৃহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললাম ঃ আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ আয়াত নাযিল হল। এই হাদীসে কেবল এই আয়াতের কথাই বলা হয়েছে। এটা সম্ভবপর যে, একই অবস্থা বর্ণনা করার জন্যে يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপের বর্ণনানুযায়ী এই আয়াতের ঘটনা পৃথকও হতে পারে। এভাবে সম্বোধন করার মধ্যে বিশেষ এক করুণা ও

অনুগ্রহ আছে। নিছক করুণা প্রকাশার্থে স্নেহ ও ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে সাময়িক অবস্থার দ্বারাও কাউকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে।— (রূহুল-মা'আনী) এই বিশেষভঙ্গিতে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তাহাজ্জুদের আদেশ করা হয়েছে এবং এর কিছু বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

তাহাজ্জুদ নামাযের বিধানাবলী ঃ مدثر ও مزمل শব্দদ্বয় থেকেই বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ ইসলামের শুরুতে এবং কোরআন অবতরণের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পর্যন্ত পাঞ্জেগানা নামায ফরয ছিল না। পাঞ্জেগানা নামায মে'রাজের রাত্রিতে ফরয হয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখের হাদীসদৃষ্টে বগভী (রহঃ) বলেন ঃ এই আয়াতের আলোকে তাহাজ্জুদ অর্থাৎ, রাত্রির নামায রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সমগ্র উম্মতের উপর ফরয ছিল। এটা পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার পূর্বের কথা।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের নামায কেবল ফরযই করা হয়নি; বরং তাতে রাত্রির কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ মশগুল থাকাও ফরয করা হয়েছে। কারণ, আয়াতের মূল আদেশ হচ্ছে কিছু অংশ বাদে সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকা। কিছু অংশ বাদ দেয়ার বিবরণ পরে উল্লেখ করা হবে।

ইমাম বগভী (রহঃ) বলেন, এই আদেশ পালনার্থে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ রাত্রি তাহাজ্জুদের নামাযে ব্যয় করতেন। ফলে তাঁদের পদদ্বয় ফুলে যায় এবং আদেশটি বেশ কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ এক বছর পর এই সূরার শেষাংশ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ অবতীর্ণ হলে দীর্ঘক্ষণ নামাযে দণ্ডায়মান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে দেয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে ব্যক্ত করা হয় যে, যতক্ষণ নামায পড়া সহজ মনে হয়, ততক্ষণ নামায পড়াই তাহাজ্জুদের জন্যে যথেষ্ট। এই বিষয়বস্তু আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মে'রাজের রাত্রিতে পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হলে তাহাজ্জুদের আদেশ রহিত হয়ে যায়। তবে এরপরও তাহাজ্জুদ সুন্নত থেকে যায়। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন।— (মাযহারী)

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا - الَّيْلَ শব্দে সাথে আলিফ ও লাম সংযুক্ত হওয়ায় অর্থ হয়েছে সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকুন। অর্থাৎ, আপনি সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকুন কিছু অংশ বাদ দিয়ে। অতঃপর এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ঃ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ অর্থাৎ এখন আপনি অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা কিছু বেশী নামাযে মশগুল হোন। এটা اِلَّا قَلِيْلًا ব্যতিক্রমের বর্ণনা। তাই প্রশ্ন হয় যে, অর্ধেক রাত্রি তো কিছুঅংশ হতে পারে না। জওয়াব এই যে, রাত্রির প্রাথমিক অংশ তো মাগরিব ও এশার নামায ইত্যাদিতে অতিবাহিতই হয়ে যায়। এখন অর্ধেকের অর্থ হবে অবশিষ্ট রাত্রির অর্ধেক। সেটা সারা রাত্রির তুলনায় কিছু অংশ। আয়াতে অর্ধরাত্রির কমেরও অনুমতি আছে, বেশীরও আছে। তাই সমষ্টিগতভাবে এর সারমর্ম এই যে, কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ রাত্রির চেয়ে কিছু বেশী নামাযে মশগুল থাকা ফরয।

ترتيل قران এর অর্থ ঃ ترتيل এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও সঠিকভাবে বাক্য উচ্চারণ করা।— (মুফরাদাত) আয়াতের উদ্দেশ্যে এই যে, দ্রুত কোরআন তেলাওয়াত করবেন না; বরং সহজভাবে এবং অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে উচ্চারণ করবেন।—(কুরতুবী) وَرَتِّلِ বলে রাত্রির নামাযে করণীয় কি, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, তাহাজ্জুদের নামায কেরাআত, তসবীহ্, রুকূ, সেজদা ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত হলেও তাতে আসল উদ্দেশ্য কোরআন পাঠ। একারণেই সহীহ্ হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামায অনেক লম্বা করে আদায় করতেন। সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও এই অভ্যাস ছিল।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কেবল কোরআন পাঠই কাম্য নয় বরং তরতীল তথা সহজ ও সঠিকভাবে পাঠ কাম্য। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এভাবেই পাঠ করতেন। রাত্রির নামাযে তিনি কিরূপে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, এই প্রশ্নের জওয়াবে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কেরাআত অনুকরণ করে শোনান তাতে প্রত্যেকটি হরফ স্পষ্ট ছিল।—(মাযহারী)

যথাসম্ভব সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করাও তরতীলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে, নবী সশব্দে সুললিত স্বরে তেলাওয়াত করেন, তাঁর কেরাআতের মত অন্য কারও কেরাআত আল্লাহ্ তাআলা শুনেন না।—(মাযহারী)

হযরত আলকামা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে সুমধুর স্বরে তেলাওয়াত করতে দেখে বললেন ঃ لقد رتل القران فداه ابى وامى অর্থাৎ, সে কোরআনে তরতীল করেছে; আমার পিতামাতা তার জন্য উৎসর্গ হোন।— (কুরতুবী)

তবে পরিস্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ্ শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ চিন্তা করে তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়াই আসল তরতীল। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করে ক্রন্দন করতে দেখে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا আয়াতের যে তরতীলের আদেশ করেছেন, এটাই সেই তরতীল।—(কুরতুবী)

اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا - قول ثقيل (ভারী কালাম) বলে কোরআন পাক বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআনে বর্ণিত হালাল, হারাম, জায়েয ও নাজায়েযের সীমা স্থায়ীভাবে মেনে চলা স্বভাবতঃ ভারী ও কঠিন। তবে যার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা সহজ করে দেন, তার কথা স্বতন্ত্র। কোরআনকে ভারী বলার আরেক কারণ এই যে, কোরআন নাযিল হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিশেষ ওজন ও তীব্রতা অনুভব করতেন। ফলে প্রচণ্ড শীতেও তাঁর মস্তক ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। তিনি তখন কোন উটের উপর সওয়ার থাকলে বোঝার কারণে উট নুয়ে পড়ত।—(বুখারী)

এই আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষকে কষ্টে অভ্যস্ত করার জন্যে তাহাজ্জুদের আদেশ দেয়া হয়েছে। রাত্রিকালে নিদ্রার প্রাবল্য এবং মানসিক সুখের বিরুদ্ধে এটা একটা জেহাদ। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে কোরআনে অবতীর্ণ কষ্টসাধ্য ও ভারী বিধি-বিধান সহ্য করা সহজ হয়ে যাবে।

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ - ناشئة শব্দটি ধাতু। এর অর্থ রাত্রির নামাযের জন্যে দণ্ডায়মান হওয়া। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রার পর নামাযের জন্যে গাত্রোত্থান করা। তাই এর অর্থ হয়ে গেছে তাহাজ্জুদ। কারণ, এর শাব্দিক অর্থও রাত্রিতে নিদ্রার পর উঠে নামায পড়া। ইবনে কায়সান (রহঃ) বলেন ঃ শেষরাত্রে গাত্রোত্থান করাকে نَاشِئَةَ الَّيْلِ বলা হয়। ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন ঃ রাত্রির যে অংশতে কোন নামায পড়া হয়, তা نَاشِئَةَ الَّيْلِ এর অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আবী মুলায়কা (রহঃ) এক

প্রশ্নের জওয়াবে হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়র (রহঃ)ও তাই বলেছেন।—(মাযহারী)

এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে রাত্রির যে কোন অংশে যে নামায পড়া হয়, বিশেষতঃ এশার পর যে নামায পড়া হয়, তাই نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ও قيام الليل এর মধ্যে দাখিল, যেমন হাসান বসরী (রহঃ)বলেছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও বুযুর্গগণ সর্বদাই এই নামায নিদ্রার পর শেষরাত্রে জাগ্রত হয়ে পড়তেন। তাই এটা উত্তম, ও অধিক বরকতের কারণ। তবে এশার নামাযের পর যে কোন নফল নামায পড়া যায়, তাতে তাহাজ্জুদের সুন্নত আদায় হয়ে যায়।

هِيَ أَشَدُّ وَطْأً — وَطْأً শব্দে দু'রকম কেরাআত আছে। প্রসিদ্ধ কেরাআতে ওয়াও এর উপর যবর এবং ত্বোয়া সাকিন করে অর্থ দলন করা, পিষ্ট করা। আয়াতের অর্থ এই যে রাত্রির নামায প্রবৃত্তিদলনে খুবই সহায়ক; অর্থাৎ, এতে করে প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং অবৈধ বাসনা থেকে বিরত রাখার কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই কেরাআত অবলম্বন করা হয়েছে। দ্বিতীয় কেরাআত হচ্ছে كتاب এর ওজনে وطاء। এমতাবস্থায় এটা অনুকূল হওয়ার অর্থে ধাতু। لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ আয়াতেও শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে এই অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন ঃ উদ্দেশ্য এই যে, রাত্রিতে নামাযের জন্যে গাত্রোত্থান করা অন্তর, দৃষ্টি, কর্ণ ও জিহবার মধ্যে পারস্পরিক একাত্মতা সৃষ্টিতে খুবই কার্যকর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ أَشَدُّ وَطْأً এর অর্থ এই যে, কর্ণ ও অন্তরের মধ্যে তখন অধিকতর একাত্মতা থাকে। কারণ, রাত্রিবেলায় সাধারণতঃ কাজকর্ম ও হট্টগোল থাকে না। তখন মুখ থেকে যে বাক্য উচ্চারিত হয়, কর্ণও তা শুনে ও অন্তরও উপস্থিত থাকে।

وَأَقْوَمُ শব্দের অর্থ অধিক সঠিক। অর্থাৎ, রাত্রিবেলায় কোরআন তেলাওয়াত অধিক শুদ্ধতা ও স্থিরতা সহকারে হতে পারে। কারণ, তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি ও হট্টগোল দ্বারা অন্তর ও মস্তিস্ক ব্যাকুল হয় না।

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এই আয়াতেও তাহাজ্জুদের রহস্য ও বর্ণিত হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا আয়াতে বর্ণিত রহস্যটি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিজ সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং এই আয়াতে বর্ণিত রহস্যটি সমস্ত উম্মতের জন্যে ব্যাপক।

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا — سبح শব্দের অর্থ প্রবাহিত হওয়া ও ঘোরাফেরা করা। এ কারণেই সাঁতার কাটাকেও سبح ও سباحة বলা হয়। এখানে এর অর্থ দিনমানের কর্মব্যস্ততা, শিক্ষা দেয়া, প্রচার করা, মানবজাতির সংশোধনের নিমিত্ত অথবা নিজের জীবিকার অন্বেষণে ঘোরাফেরা করা ইত্যাদি সবই এতে দাখিল।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের তৃতীয় রহস্য ও উপযোগিতা বর্ণিত হয়েছে। এটাও সবার জন্যে ব্যাপক। রহস্য এই যে, দিবাভাগে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও অন্যান্য সবাইকে অনেক কর্মব্যস্ততায় থাকতে হয়। ফলে একাগ্রচিত্তে এবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাত্রি একাজের জন্যে থাকা উচিত যে, প্রয়োজন মাফিক নিদ্রা ও আরাম এবং তাহাজ্জুদের এবাদতও হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্য ঃ ফেকাহ্‌বিদগণ বলেন ঃ যেসব আলেম ও মাশায়েখ জনগণের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন, এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাদেরও এ কাজ দিবাভাগে সীমিত রেখে রাত্রিতে আল্লাহ্ তাআলার সামনে উপস্থিতি ও এবাদতে মশগুল হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলেমগণের কর্মপদ্ধতি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে যদি কোন সময় রাত্রিবেলায়ও উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তা ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে প্রয়োজনমাফিক ব্যতিক্রম হতে পারে। এর সাক্ষ্যও অনেক আলেম ও ফেকাহ্‌বিদের কর্ম থেকে পাওয়া যায়।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا — تبتل এর শাব্দিক অর্থ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তাআলার এবাদতে মগ্ন হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতে তাহাজ্জুদের নামাযের আদেশ দেয়ার পর এই আয়াতে এমন এক এবাদতের আদেশ দেয়া হয়েছে, যা রাত্রি অথবা দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়; বরং সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা। এখানে সদাসর্বদা অব্যাহত রাখার অর্থে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার আদেশ করা হয়েছে। কেননা, একথা কল্পনাও করা যায় না যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন সময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন না, তাই এ আদেশ করা হয়েছে।—(মাযহারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দিবারাত্রি সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে; এতে কোন সময় অবহেলা ও অনবধানতাকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়। এটা তখনই হতে পারে, যখন স্মরণ করার অর্থ ব্যাপক নেয়া হয়; অর্থাৎ, মুখে, অন্তরে অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে ব্যাপৃত রেখে ইত্যাদি যে কোন প্রকারে স্মরণ করা। এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ كان يذكر الله على كل حين অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন। এটাও উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে শুদ্ধ হতে পারে। কেননা, প্রস্রাব-পায়খানার সময় তিনি যে মুখে আল্লাহ্‌কে স্মরন করতেন না, একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তবে আন্তরিক স্মরণ সর্বাবস্থায় হতে পারে। আন্তরিক স্মরণ দুই প্রকার। - (১) শব্দ কল্পনা করে স্মরণ করা এবং (২) আল্লাহ্‌র গুণাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।—(মাওলানা থানভী)

আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় আদেশ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا অর্থাৎ, আপনি সমগ্র সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিবিধানে ও এবাদতে মগ্ন হোন। এর সাধারণ অর্থে এবাদতে শিরক না করাও দাখিল এবং নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তথা উঠাবসায়, চলাফেরায় দৃষ্টি ও ভরসা আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ রাখা এবং অপরকে লাভ-লোকসান ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে না করাও দাখিল। হযরত ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন ঃ تبتل এর অর্থ দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করা।—(মাযহারী) কিন্তু এই تبتل তথা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সেই رهبانية তথা বৈরাগ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে এবং হাদীসে لا رهبانية فى الاسلام বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা, শরীয়তের পরিভাষায় رهبانية এর অর্থ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং ভোগ সামগ্রী ও হালাল বস্তুসমূহকে এবাদতের নিয়তে পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ, এরূপ বিশ্বাস থাকা যে, এসব হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা ব্যতীত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জিত হতে পারে না, অথবা ওয়াজিব হকে ত্রুটি করে কার্যতঃ সম্পর্কচ্ছেদ করা। আর এখানে যে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে, তা এই যে, বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যগতভাবে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের উপর

কোন সৃষ্টির সম্পর্ককে প্রবল হতে না দেয়া। এ ধরণের সম্পর্কচ্ছেদ বিবাহ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক কাজ-কারবারের পরিপন্থী নয়; বরং এগুলোর সাথে জড়িত থেকেও এটা সম্ভবপর। পয়গম্বরগণের সুন্নত; বিশেষতঃ পয়গম্বরকুল শিরোমণি মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর সমগ্র জীবন ও আচারাদি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আয়াতে تبتل শব্দ দ্বারা যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে, পূর্ববর্তী বুযুর্গানে-দ্বীনের ভাষায় এরই অপর নাম 'ইখলাস' ।-(মাযহারী)

জ্ঞাতব্য ঃ অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এবং সাংসারিক সম্পর্ক ত্যাগ করার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সুফী বুযুর্গগণ সবার অগ্রণী ছিলেন। তাঁরা বলেন ঃ আমরা যে দূরত্ব অতিক্রম করার কাজে দিবারাত্রি মশগুল আছি, প্রকৃতপক্ষে তার দু' টি স্তর আছে – প্রথম স্তর সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় স্তর আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছা। উভয় স্তর পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আলোচ্য আয়াতে এ দু' টি স্তরই পর পর দুই বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। (১) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ এবং (২) وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

এখানে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার অর্থ সার্বক্ষণিকভাবে স্মরণ করা, যাতে কখনও ত্রুটি ও শৈথিল্য দেখা না দেয়। এই স্তরকেই সুফী-বুযুর্গগণের পরিভাষায় وصول الى الله আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছা বলা হয়। এভাবে প্রথম বাক্যে শেষ স্তর এবং শেষ বাক্যে প্রথম স্তর উল্লেখিত হয়েছে। এই ক্রম পরিবর্তনের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, দ্বিতীয় স্তরই আল্লাহ্‌র পথের পথিকের আসল উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য। তাই এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত করার জন্যে স্বাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে। শেখ সাদী (রহঃ) উপরোক্ত দু' টি স্তর চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ-

ইসমে যাতের যিকর অর্থাৎ, বার বার 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' বলাও এবাদত ঃ আয়াতে ইসম শব্দ উল্লেখ করে وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ বলা হয়েছে এবং وَاذْكُرْ رَبَّكَ বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইসমে যাত অর্থাৎ, আল্লাহ্ বার বার উচ্চারণ করাও আদিষ্ট বিষয় ও কাম্য। — (মাযহারী) কোন কোন আলেম একে বিদআত বলেছেন। আয়াত থেকে জানা গেল যে, তাদের এই উক্তি ঠিক নয়।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا যাকে কোন কাজ সোপর্দ করা হয়, অভিধানে তাকে وكيل বলা হয়। কাজেই فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا বাক্যের অর্থ এই যে, নিজের সব কাজ-কারবার ও অবস্থা আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ কর। পরিভাষায় একেই তাওয়াক্কুল বলা হয়। এই সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রদত্ত নির্দেশাবলীর মধ্যে এটা পঞ্চম নির্দেশ। ইমাম ইয়াকুব কারখী (রহঃ) বলেন ঃ সূরার শুরু থেকে এই আয়াত পর্যন্ত সুলুক তথা আল্লাহ্‌র পথে চলার পাঁচটি স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে (১) রাত্রিবেলায় আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্যে নির্জনে গমন, (২) কোরআন পাকে মশগুল হওয়া, (৩) সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণ (৪) সৃষ্টির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং (৫) তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুলের সর্বশেষ নির্দেশ দেয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তাআলার গুণ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা জাহানের পালনকর্তা এবং সারা জাহানের প্রয়োজনাদি আগা গোড়া পূর্ণ করার যিম্মাদার, একমাত্র তিনিই তাওয়াক্কুল ও ভরসা করার যোগ্য হতে পারেন এবং তাঁর যে ব্যক্তি ভরসা করবে, সে কখনও বঞ্চিত হবে না।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ ইমাম কারখী (রহঃ)-এর উক্তিমতে এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রদত্ত ষষ্ঠ নির্দেশ। অর্থাৎ, মানুষের উৎপীড়ন ও গালিগালাজে সবর করা। এটা আল্লাহ্‌র পথের পথিকের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। উদ্দেশ্য এই যে, যাদের শুভেচ্ছায় ও সহানুভূতিতে সাধক তার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ও জীবন নিয়োজিত করে,প্রতিদানে তাদের পক্ষ থেকেই নির্যাতন ও গালি-গালাজ শুনে উত্তম সবর করবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের কল্পনাও করবে না। সূফীগণের পরিভাষায় এই সর্বোচ্চ স্তর নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে বিলীন করা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا এর শাব্দিক অর্থ বিষণ্ণ ও দুঃখিত মনে কোনকিছুকে ত্যাগ করা। অর্থাৎ, মিথ্যারোপকারী কাফেররা আপনাকে যেসব পীড়াদায়ক কথাবার্তা বলে, আপনি সেসবের প্রতিশোধ নিবেন না ঠিক, কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্কও রাখবেন না। সম্পর্ক ত্যাগ করার সময় মানুষের অভ্যাস এই যে, যার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা হয়, তাকে গালমন্দ দেয়। তাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্পর্ক ত্যাগের আদেশ দিতে যেয়ে هَجْرًا جَمِيْلًا শব্দ যোগ করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, আপনার উচ্চ পদমর্যাদার খাতিরে আপনি কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন এবং মুখেও তাদেরকে মন্দ বলবেন না।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ পরবর্তীতে অবতীর্ণ জেহাদের আদেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা এই আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু চিন্তা করলে এরূপ বলার প্রয়োজন নেই। কেননা, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের উৎপীড়নের কারণে সবর ও সম্পর্ক ত্যাগ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এটা হুমকি, শাস্তি ও জেহাদের পরিপন্থী নয়। এই আয়াতের নির্দেশ সর্বদা ও সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য এবং জেহাদে যে শাস্তির হুমকি আছে তার আদেশ বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রযোজ্য। এছাড়া ইসলামী জেহাদ কোন প্রতিশোধ স্পৃহা ও ক্রোধবশতঃ করা হয় না, যা সবর ও উত্তম সম্পর্ক ত্যাগের পরিপন্থী হবে। বরং জেহাদ বিশেষ খোদায়ী আদেশ প্রতিপালন মাত্র। সাধারণ অবস্থায় সবর ও সম্পর্ক ত্যাগও তেমনি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সান্ত্বনার জন্যে কাফেরদের পরকালীন আযাব বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী অত্যাচার-অবিচারের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন। তবে বিশেষ রহস্যের তাগিদে তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। পরবর্তী আয়াত وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا এর মর্ম তাই।

এতে কাফেরদেরকে أُولِي النَّعْمَةِ বলা হয়েছে। نعمة শব্দের অর্থ ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে যাওয়া পরকাল অবিশ্বাসীরই কাজ হতে পারে। মুমিনও মাঝে মাঝে এগুলো প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে তাতে মত্ত হয়ে পড়ে না। দুনিয়ার আরাম-আয়েশের মধ্যে থেকেও তার অন্তর পরকাল চিন্তা থেকে মুক্ত হয় না।

অতঃপর পরকালের কঠিনতম শাস্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে انكال শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ আটকাবস্থা ও শিকল। এরপর জাহান্নামের উল্লেখ করে জাহান্নামীদের ভয়াবহ খাদ্যের কথা আছে وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ এর অর্থ গলগ্রহ খাদ্য। অর্থাৎ, যে খাদ্য গলায় এমনভাবে আটকে যায় যে, গলধঃকরণও করা যায় না এবং উদগীরণও করা যায় না। জাহান্নামীদের খাদ্য যরী ও যাক্কুমের অবস্থা তাই হবে।

فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٦﴾
فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ
شِيْبًا ﴿١٧﴾ السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ۚ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿١٨﴾ اِنَّ
هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿١٩﴾
اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَ
نِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ
يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ
سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ
يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا
لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا
وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

(১৬) অতঃপর ফেরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। (১৭) অতএব, তোমরা কিরূপে আত্মরক্ষা করবে যদি তোমরা সেদিনকে অস্বীকার কর, যেদিন বালককে করে দিবে বৃদ্ধ? (১৮) সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (১৯) এটা উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার দিকে পথ অবলম্বন করুক। (২০) আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি এবাদতের জন্যে দণ্ডায়মান হন রাত্রির প্রায় দু' তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ্ দিবা ও রাত্রি পরিমাপ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে জেহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্যে যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহ্র কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তাতে আগুনের কাঁটা থাকবে; যা গলায় আটকে যাবে। – (নাউযুবিল্লাহ্ মিনহু) শেষে বলা হয়েছে ঃ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا নির্দিষ্ট আযাব উল্লেখ করার পর একথা বলে এর আরও অধিক কঠোরতা ও অকল্পনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অতঃপর কেয়ামতের কিছু ভয়াবহ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ঃ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ এরপর কাফেরদের ফেরাউন ও হযরত মূসার কাহিনী শুনিয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, ফেরাউন পয়গম্বর মূসা (আঃ)-কে মিথ্যারোপ করে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে, তোমরাও মিথ্যারোপ অব্যাহত রাখলে তোমাদের উপরও দুনিয়াতে এমনি ধরনের আযাব আসতে পারে। শেষে বলা হয়েছে, দুনিয়াতে এরূপ আযাব না আসলেও কেয়ামতের সেই দিনের আযাবকে ঠেকাতে পারবে না, যেদিন ভয়াবহ ও দীর্ঘ হওয়ার কারণে বালককে বৃদ্ধে পরিণত করে দিবে। বাহ্যতঃ এতে কেয়ামতের ভয়াবহতা ও কঠোরতা বিবৃত হয়েছে। সেদিন এমন ভীতি ও ত্রাস দেখা দিবে যে, বালকও বৃদ্ধ হয়ে যাবে। কেউ কেউ একে উপমা বলেছেন এবং কারও মতে এটা বাস্তব সত্য। দিনটি এত দীর্ঘ হবে যে, বালক ও বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যাবে।—(কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী)

আনষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তাহাজ্জুদ আর ফরয নয় ঃ সূরার শুরুতে قُمِ الَّيْلَ বলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সকল মুসলমানের উপর তাহাজ্জুদ ফরয করা হয়েছিল এবং এই নামায অর্ধরাত্রির কিছু কম অথবা কিছু বেশী এবং কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়াও ফরয ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর একদল সাহাবী প্রায়ই রাত্রির অধিকাংশ সময় নামাযে অতিবাহিত করে এই ফরয আদায় করতেন। প্রতি রাত্রিতেই এই এবাদত এবং দিনের বেলায় দ্বীনের দাওয়াত ও প্রচারকার্য, তদুপরি ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি নির্বাহ করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। এছাড়া সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশই মেহনত মজুরী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। নিয়মিতভাবে এই দীর্ঘ নামায আদায় করতে করতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের পদযুগল ফুলে যায়। তাঁদের এই কষ্ট ও শ্রম আল্লাহ্ তাআলার অগোচরে ছিল না। কিন্তু তাঁর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল যে, এই পরিশ্রম ও মেহনতের এবাদত ক্ষণস্থায়ী হবে, যাতে তাঁরা পরিশ্রম ও সাধনায় অভ্যস্ত হয়ে যান। এর প্রতি اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا আয়াতেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এর চেয়ে ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ বাণী কোরআনের দায়িত্ব আপনাকে সোপর্দ করা হবে, তাই আপনাকে এই কষ্ট ও পরিশ্রমে নিয়োজিত করা হয়েছে। সারকথা, আল্লাহ্র জ্ঞান অনুযায়ী যখন এই সাধনা ও পরিশ্রমে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তাহাজ্জুদের ফরয রহিত করে দেয়া হল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এটাও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কেবল দীর্ঘ নামায রহিত হয়েছে এবং আসল তাহাজ্জুদের নামায পূর্ববৎ ফরয রয়ে গেছে। অতঃপর মে'রাজের রাত্রিতে যখন পাঞ্জেগানা নামায ফরয করা হল, তখন তাহাজ্জুদের নামায আর ফরয রইল না।

عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ – احصاء শব্দের অর্থ গণনা করা। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা জানেন যে, তোমরা এর গণনা কররত পারবে না। কোন কোন তফসীরবিদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদের নামাযে আল্লাহ্ তাআলা

রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এই নামাযে মশগুল থাকা অবস্থায় রাত্র কতটুকু হয়েছে, তা জানা কঠিন ছিল। কেননা, তখনকার দিনে সময় জানার যন্ত্র ঘড়ি ইত্যাদি ছিল না। থাকলেও নামাযে মশগুল হয়ে বার বার ঘড়ির দিকে তাকানো তাঁদের অবস্থা ও খুশু-খুযুর পরিপ্রেক্ষিতে সহজ ছিল না। আবার কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে • احصا শব্দের অর্থ দীর্ঘ সময় এবং নিদ্রার সময়ে প্রত্যহ যথারীতি নামায পড়তে সক্ষম না হওয়া। শব্দটি এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন হাদীসে আল্লাহ্র সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, من احصاها دخل الجنة অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামসমূহকে কর্মের ভিতর দিয়ে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলে সে জান্নাতে দাখিল হবে। সূরা ইবরাহীমের তফসীরেও এ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

فَتَابَ عَلَيْكُمْ - توبة শব্দের আসল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গোনাহের তওবাকেও এ কারণে তওবা বলা হয় যে, মানুষ এতে পূর্বের গোনাহ্ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। এখানে কেবল প্রত্যাহার বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ফরয তাহাজ্জুদের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অবশেষে বলা হয়েছে ঃ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের নামায, যা এখন ফরযের পরিবর্তে মোস্তাহাব অথবা সুন্নত রয়ে গেছে, তাতে যে যতটুকু কোরআন সহজে পাঠ করতে পারে, পাঠ করুক। এর জন্যে নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এখানে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ফরয নামায বোঝানো হয়েছে। বলাবাহুল্য, ফরয নামায পাঁচটি যা মে'রাজের রাত্রিতে ফরয হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায এক বছর পর্যন্ত ফরয থাকা কালেই মে'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর পূর্বোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ফরয তাহাজ্জুদ রহিত হয়েছে। সুতরাং সূরার শেষের وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আয়াতে পাঞ্জেগানা ফরয নামায বোঝানো যেতে পারে।—(ইবনে-কাসীর, কুরতুবী, বাহরে-মুহীত)

এমনিভাবে وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ বাক্যে ফরয যাকাত বোঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে, যাকাত হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে ফরয হয়েছে এবং এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে কোন কোন তফসীরবিদ বিশেষভাবে এই আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কিন্তু ইবনে-কাসীর বলেন ঃ যাকাত মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ফরয হয়েছিল, কিন্তু তার নেসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও ফরয যাকাত বোঝানো যেতে পারে। — রূহুল-মা'আনীও তাই বলেছে।

وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا আল্লাহ্র পথে ব্যয় করাকে এমনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহ্কে ঋণ দিচ্ছে। এতে তার অবস্থার প্রতি কৃপা প্রদর্শনের দিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা ধনীদের সেরা ধনী; তাঁকে দেয়া ঋণ কখনও মারা যাবে না—অবশ্যই পরিশোধিত হবে। ফরয যাকাতের আদেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এখানে নফল দান-খয়রাত ও কার্যাদি বোঝানো হয়েছে; যেমন আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনেক কিছু দেয়া, মেহমানদের জন্যে ব্যয় করা, আলেম ও সাধু-পুরুষদের সেবাযত্ন করা ইত্যাদি। কেউ কেউ এর অর্থ এই নিয়েছেন যে, যাকাত ছাড়াও অনেক আর্থিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে; যেমন পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। কাজেই وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ বাক্যে এসব ওয়াজিব পাওনা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ অর্থাৎ, তোমরা জীবদ্দশায় যে যে কাজ সম্পাদন কর, তা মৃত্যুর সময় সেই কাজের ওসীয়্যত করে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। কারণ, মৃত্যুর পর ওয়ারিশরা স্বাধীন ; তারা ওসীয়্যত পূর্ণ করতেও পারে, না-ও করতে পারে। এতে আর্থিক এবাদত, সদকা-খয়রাতসহ নামায-রোযা ইত্যাদিও দাখিল।

সূরা মুযযাম্মিল সমাপ্ত

سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتٌّ وَخَمْسُونَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ○

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৫৬ ।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) হে চাদরাবৃত, (২) উঠুন, সতর্ক করুন, (৩) আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন, (৪) আপন পোশাক পবিত্র করুন (৫) এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (৬) অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দিবেন না। (৭) এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশে সবর করুন। (৮) যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে ; (৯) সেদিন হবে কঠিন দিন, (১০) কাফেরদের জন্যে এটা সহজ নয়। (১১) যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি, তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। (১২) আমি তাকে বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছি। (১৩) এবং সদা সংগী পুত্রবর্গ দিয়েছি, (১৪) এবং তাকে খুব সচ্ছলতা দিয়েছি। (১৫) এরপরও সে আশা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী দেই (১৬) কখনই নয়। সে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। (১৭) আমি সত্বরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ করাব। (১৮) সে চিন্তা করেছে এবং মনঃস্থির করেছে, (১৯) ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনঃস্থির করেছে, (২০) আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনঃস্থির করেছে! (২১) সে আবার দৃষ্টিপাত করেছে, (২২) অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে, (২৩) অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ও অহংকার করেছে। (২৪) এরপর বলেছে ঃ এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু বৈ নয়, (২৫) এতো মানুষের উক্তি বৈ নয়। (২৬) আমি তাকে দাখিল করব অগ্নিতে। (২৭) আপনি কি বোঝলেন অগ্নি কি? (২৮) এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না (২৯) মানুষকে দগ্ধ করবে। (৩০) এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশ জন ফেরেশতা।

সূরা আল-মুদ্দাসসির

সূরা মুদ্দাস্‌সির সম্পূর্ণ প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এ কারণেই কেউ কেউ একে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরাও বলেছেন। সহীহ্‌ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সর্বপ্রথম সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এরপর কোরআন অবতরণ বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। এই বিরতির শেষভাগে একদিন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মক্কায় পথ চলাকালে উপর দিক থেকে কিছু আওয়াজ শুনতে পান। তিনি উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পান যে, সেই হেরা গিরিগুহায় আগমনকারী ফেরেশতা শূন্য মণ্ডলে একটি ঝুলন্ত আসনে উপবিষ্ট আছেন। ফেরেশতাকে এমতাবস্থায় দেখে হেরা গিরিগুহার অনুরূপ তিনি আবার ভীত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কনকনে শীত ও কম্পন অনুভব করে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন এবং বললেন ঃ زملونى زملونى আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। অতঃপর তিনি বস্ত্রাবৃত হয়ে শুয়ে পড়লেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হয়। তাই আয়াতে তাঁকে يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ 'হে বস্ত্রাবৃত' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই শব্দটি دثار থেকে উদ্ভূত। অর্থ শীত ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সাধারণ পোশাকের উপর ব্যবহৃত অতিরিক্ত বস্ত্র। مزمل শব্দের অর্থ এর কাছাকাছি। রূহুল-মা'আনীতে জাবের ইবনে যায়েদ তাবেয়ীর উক্তি বর্ণিত আছে যে, সূরা মুদ্দাস্‌সির সূরা মুযযাম্মিলের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, কিন্তু উপরে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্‌সির অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, ওহী বিরতির পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

সূরা মুদ্দাস্‌সিরে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে প্রদত্ত সর্বপ্রথম নির্দেশ এই ঃ قُمْ فَأَنذِرْ অর্থাৎ, উঠুন। এর আক্ষরিক অর্থ 'দাঁড়ান'ও হতে পারে। অর্থাৎ, আপনি বস্ত্রাচ্ছাদন পরিত্যাগ করে দণ্ডায়মান হোন। এখানে কাজের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার অর্থ নেয়াও অবান্তর নয়। উদ্দেশ্য এই যে এখন আপনি সাহস করে জনশুদ্ধির দায়িত্ব পালনে ব্রতী হোন। فَأَنذِرْ শব্দটি انذار থেকে উদ্ভূত। অর্থ সতর্ক করা, কিন্তু এমন সতর্ক করা, যা স্নেহ ও ভালবাসার উপর ভিত্তিশীল, যেমন পিতা তার সন্তানকে সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি থেকে সতর্ক করে। পয়গম্বরগণ এরূপই করে থাকেন। তাই তাঁরা بشير ও نذير উপাধিতে ভূষিত হন। نذير -এর অর্থ স্নেহ ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে সতর্ককারী এবং بشير -এর অর্থ সুসংবাদদাতা। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এরও এই উভয় উপাধি কোরআনের স্থানে স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এস্থলে শুধু সতর্ক করার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তখন পর্যন্ত মুমিন-মুসলমান গুণাগুণতি কয়েকজনই ছিল। অবশিষ্ট সবাই ছিল অবিশ্বাসী কাফের, যারা সুসংবাদের নয়—সতর্ক করারই যোগ্য পাত্র ছিল।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই ঃ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ অর্থাৎ, শুধু আপন পালনকর্তার মহত্ত্ব বর্ণনা করুন কথায় ও কাজে। এখানে رب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, এটাই এই নির্দেশের মূল কারণ। যিনি সারাজাহানের পালনকর্তা, একমাত্র তিনিই সর্বপ্রকার মহত্ত্ব বর্ণনার যোগ্য। তকবীরের শাব্দিক অর্থ আল্লাহু আকবার বলা হয়ে থাকে। এতে নামাযের তকবীরে তাহ্‌রীমাসহ অন্যান্য তকবীরও দাখিল আছে। এই নির্দেশকে নামাযের তকবীরে

তাহ্রীমার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত কারার ব্যাপারে কোরআনের ভাষায় কোন ইঙ্গিত নেই।

তৃতীয় নির্দেশ এই ঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - ثياب শব্দটি ...এর বহুবচন। এর আসল ও আক্ষরিক অর্থ কাপড়। রূপক অর্থে কর্মকেও لباس ও ثوب বলা হয় ; এমনিভাবে অন্তর, মন, চরিত্র ও ধর্মকেও বলা হয়। মানব দেহকেও لباس বলে ব্যক্ত করা হয়, যার সাক্ষ্য কোরআন ও আরবী বাক-পদ্ধতিতে প্রচুর পাওয়া যায়। আলোচ্য আয়াতে তফসীরবিদগণ থেকে উপরোক্ত সকল অর্থই বর্ণিত আছে। বাহ্যতঃ এতে কোন বৈপরীত্য নেই। এমতাবস্থায় নির্দেশের অর্থ হবে এই যে, আপন পোশাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন এবং অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে এবং কুচরিত্রতা থেকে মুক্ত রাখুন।—(মাযহারী)

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্রতা পছন্দ করেন। এক আয়াতে আছে, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ হাদীসে পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ বলা হয়েছে। তাই মুসলমানকে সর্বাবস্থায় শরীর, স্থান ও পোশাককে বাহ্যিক নাপাকী থেকে এবং অন্তরকে আভ্যন্তরীণ অশুচি থেকে পবিত্র রাখার প্রতি সচেষ্ট হতে হবে।

চতুর্থ নির্দেশ এই ঃ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ তফসীরবিদ মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা, যুহরী, ইবনে যায়েদ প্রমুখ এস্থলে رجز -এর অর্থ নিয়েছেন প্রতিমা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক রেওয়ায়েতে এর অর্থ নিয়েছেন গোনাহ্। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রতিমা পূজা অথবা গোনাহ্ পরিত্যাগ করুন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তো পূর্ব থেকেই এ সবের ধারে-কাছে ছিলেন না। এমতাবস্থায় তাঁকে এই আদেশ করার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতেও এসব বিষয় থেকে দূরে থাকুন। প্রকৃতপক্ষে উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে অতিশয় গুরুত্বদানের উদ্দেশে রসূলকেই সম্বোধন করে আদেশটি দেয়া হয়েছে। এতে উম্মত বুঝতে পারবে যে, আদেশটি খুবই গুরুত্ববহ। তাই নিষ্পাপ রসূলকেও এ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি।

পঞ্চম নির্দেশ ঃ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ অর্থাৎ, বেশী পাওয়ার অভিপ্রায়ে কারও প্রতি অনুগ্রহ করো না। এ থেকে জানা যায় যে, প্রতিদানে বেশী দিবে, এই আশায় কাউকে উপঢৌকন দেয়া নিন্দনীয় ও মকরূহ। কোরআনের অন্য আয়াত দ্বারা সাধারণ লোকের জন্যে এর বৈধতা জানা গেলেও এটা সাধারণ ভদ্রতার পরিপন্থী। বিশেষতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে এটা হারাম।

ষষ্ঠ নির্দেশ ঃ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ — صبر-এর শাব্দিক অর্থ প্রবৃত্তিকে বাধা দেয়া ও বশে রাখা। তাই আল্লাহ্ তাআলার বিধি-বিধান প্রতিপালনে প্রবৃত্তিকে কায়েম রাখা, আল্লাহ্র হারামকৃত বস্তুসমূহ থেকে প্রবৃত্তিকে বিরত রাখা এবং বিপদাপদে যথাসাধ্য হা-হুতাশ করা থেকে বেঁচে থাকাও সবরের মধ্যে দাখিল। সুতরাং এটা একটা ব্যাপক অর্থবোধক নির্দেশ, যা গোটা দ্বীনকে পরিব্যাপ্ত করে। এস্থলে বিশেষভাবে এই নির্দেশ দানের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত এবং শেরক ও কুফরকে বাধা দানের আদেশ দেয়া হয়েছিল। বলাবাহুল্য, এর ফলশ্রুতি এই ছিল যে, অনেক মানুষ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরোধিতা ও শত্রুতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর অনিষ্টসাধনে উদ্যত হবে। তাই সবর ও সহনশীলতার অভ্যাস গড়ে তোলা তাঁর জন্যে সমীচীন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এই কয়েকটি নির্দেশ দেয়ার পর কেয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। نَاقُورْ শব্দের অর্থ শিংগা এবং نقر বলে শিংগায় ফুঁ দিয়ে আওয়াজ বের করা বোঝানো হয়েছে। কেয়ামত দিবস সকল কাফেরের জন্যেই কঠিন হবে—একথা বর্ণনা করার পর জনৈক দুষ্টমতি কাফেরের অবস্থা ও তার কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

ওলীদ ইবনে মুগীরার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি গিনি ঃ এই কাফেরের নাম ওলীদ ইবনে মুগীরা। আল্লাহ্ তাআলা তাকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ভাষায়, তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ-বাগিচা মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সওরী বলেন ঃ তার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি দীনার। কেউ কেউ আরও কম বলেছেন। তবে এতটুকু সবার কাছেই স্বীকৃত যে, তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আমদানী সারা বছর তথা শীত ও গ্রীষ্ম সব ঋতুতে অব্যাহত থাকত। তাই কোরআন পাকে বলা হয়েছে, وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا তাকে আরবের সরদার গণ্য করা হত। জনসাধারণ্যের মধ্যে তার উপাধি 'রায়হানা কোরায়শ' খ্যাত ছিল। সে গর্ব ও অহংকারবশতঃ নিজেকে ওহীদ ইবনুল-ওহীদ অর্থাৎ, এককের পুত্র একক বলত। তার দাবী ছিল এই যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে সেও তার পিতা মুগীরা অদ্বিতীয়।—(কুরতুবী) কিন্তু এই পাপিষ্ঠ আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করেনি এবং কোরআনকে খোদায়ী কালাম মেনে নেয়া সত্ত্বেও মিথ্যা রচনা বলে বকতে থাকে। সে কোরআনকে জাদু এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জাদুকর বলে প্রচার করে। তফসীরে-কুরতুবীতে তার ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে—

রসূলে করীম (সাঃ) একদিন حٰمٓ تَنْزِيلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ থেকে إِلَيْهِ الْمَصِيرُ পর্যন্ত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছিলেন। ওলীদ ইবনে মুগীরা এই তেলাওয়াত শুনে একে খোদায়ী কালাম মেনে নিতে এবং একথা বলতে বাধ্য হয় যে—"আল্লাহ্র শপথ, আমি তাঁর মুখে এমন কালাম শুনেছি, যা কোন মানুষের কালাম হতে পারে না এবং কোন জিনেরও হতে পারে না। এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর বিন্যাসে রয়েছে বিশেষ ধরনের এক বর্ণাঢ্যতা। এর বাহ্যিক আবরণ হৃদয়গ্রাহী এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবাহিত রয়েছে এক স্নিগ্ধ ফল্গুধারা। এটা নিশ্চিতই সবার উর্ধ্বে থাকবে এবং এর উপর কেউ প্রবল হতে পারবে না। এটা মানুষের কালাম নয়।"

কিন্তু দুঃখজনক হলো যে, ওসব কথা স্বীকার করার পরও শুধুমাত্র অহংকার এবং বিদ্বেষবশতঃই রসূলুল্লাহ্র নবুওয়তে স্বীকৃতি না দিয়ে বিরুদ্ধাচরণের পথ বেছে নিল। ওলীদের এই ঘটনা কোরআন পাক নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ব্যক্ত করেছে ঃ

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ
وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ
هٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

এখানে قدر শব্দটি تقدير থেকে উদ্ভূত। অর্থ প্রস্তাব করা। উদ্দেশ্য এই যে, এই হতভাগা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়তের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করারই সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু অপমানের ভয়ে পরিষ্কার মিথ্যা বলা থেকে বিরত রইল। তাই অনেক চিন্তা-ভাবনার পর প্রস্তাব করল, তাঁকে উপরোক্ত যুক্তির ভিত্তিতে জাদুকর বলা হোক। এই ঘৃণ্য প্রস্তাবের কারণেই আল্লাহ্ তাআলা কোরআনে فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ বলে ওর প্রতি পুনঃ পুনঃ অভিসম্পাত করেছেন।

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ
إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ
اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ
رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾ كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾
وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى
الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ
أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ
الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا
سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ
نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَ
كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ
شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤٨﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾

(৩১) আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যেই তার এই সংখ্যা করেছি—যাতে কিতাবীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মুমিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কাফেররা বলে যে, আল্লাহ্ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে চালান। আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটা তো মানুষের জন্যে উপদেশ বৈ নয়। (৩২) কখনই নয়। চন্দ্রের শপথ, (৩৩) শপথ রাত্রির যখন তার অবসান হয়, (৩৪) শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়, (৩৫) নিশ্চয় জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের অন্যতম, (৩৬) মানুষের জন্যে সতর্ককারী (৩৭) তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে। (৩৮) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী; (৩৯) কিন্তু ডানদিকস্থরা, (৪০) তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে (৪১) অপরাধীদের সম্পর্কে (৪২) বলবে : তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? (৪৩) তারা বলবে : আমরা নামায পড়তাম না, (৪৪) অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না, (৪৫) আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম (৪৬) এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম (৪৭) আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত। (৪৮) অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। (৪৯) তাদের কি হল যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা একটি নেয়ামত : ওলীদ ইবনে মুগীরাকে আল্লাহ্ তাআলা যেসব নেয়ামত দান করেছিলেন তন্মধ্যে একটি ছিল وَبَنِينَ شُهُودًا অর্থাৎ, সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা। এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করা ও জীবিত থাকা যেমন নেয়ামত, তেমনিভাবে সন্তান-সন্ততি কাছে উপস্থিত থাকাও আল্লাহ্ তাআলার একটি বড় নেয়ামত।

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ তফসীরবিদ মুকাতিল বলেন : এটা আবু জাহ্‌লের উক্তির জওয়াব। সে যখন কোরআনের এই বক্তব্য শুনল যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক উনিশ জন ফেরেশতা, তখন কোরায়শ যুবকদেরকে সম্বোধন করে বলল : মুহাম্মদের সহচর তো মাত্র উনিশ জন। অতএব, তার সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। সুদ্দী বলেন : উপরোক্ত মর্মে আয়াত নাযিল হলে পর জনৈক নগণ্য কোরায়শ কাফের বলে উঠল : হে কোরায়শ গোত্র, কোন চিন্তা নেই। এই উনিশ জনের জন্যে আমি একাই যথেষ্ট, আমি ডান বাহু দ্বারা দশ জনকে এবং বাম বাহু দ্বারা নয় জনকে দূর করে দিয়ে উনিশের কিস্‌সা চুকিয়ে দেব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় : আহাম্মকের স্বর্গে বসবাসকারীরা জেনে রাখ, প্রথমতঃ ফেরেশতা একজনও তোমাদের সবার জন্যে যথেষ্ট। এখানে যে উনিশ জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই প্রধান ও দায়িত্বশীল ফেরেশতা। তাদের প্রত্যেকের অধীনে কর্তব্য পালন ও কাফেরদেরকে আযাব দেয়ার জন্যে অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছে, যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। অতঃপর কেয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে : إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ - كبر শব্দটি كبرى -এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে জাহান্নামে দাখিল করা হবে, সেটি অবশ্যই গুরুতর বিপদ। এ ছাড়া তাতে রয়েছে আরো নানারকম আযাব।

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ এখানে অগ্রে যাওয়ার অর্থ ঈমান ও আনুগত্যের দিকে অগ্রণী হওয়া এবং পশ্চাতে থাকার অর্থ ঈমান ও আনুগত্য থেকে পশ্চাতে থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে সতর্ক করা সব মানুষের জন্যে ব্যাপক। অতঃপর এই সতর্কবাণী শুনে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি অগ্রণী হয় এবং কোন কোন হতভাগা এরপরও পশ্চাতে থেকে যায়।

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ - رهينة -এর অর্থ এখানে প্রত্যেকের আটক ও বন্দী হওয়া। ঋণের পরিবর্তে বন্ধকী দ্রব্য যেমন মহাজনের হাতে আটক থাকে—মালিক তাকে কোন কাজে লাগাতে পারে না, তেমনি কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার গোনাহের বিনিময়ে আটক ও বন্দী থাকবে। কিন্তু, আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা ডানদিকের সৎলোকগণ এ থেকে মুক্ত থাকবে।

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ এখানে هم সর্বনাম দ্বারা সেসব অপরাধীকে বোঝানো হয়েছে, পূর্বের আয়াতে যারা তাদের চারটি অপরাধ স্বীকার করেছে—(১) তারা নামায পড়ত না, (২) তারা কোন অভাবগ্রস্ত ফকীরকে আহার্য দিত না ; অর্থাৎ, দরিদ্রদের প্রয়োজনে ব্যয় করত না, (৩) ভ্রান্ত লোকেরা ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলত

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيدُ
كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا بَل لَّا
يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَن شَاءَ
ذَكَرَهُ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ
التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

سُورَةُ الْقِيٰمَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿١﴾ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾
أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَادِرِينَ
عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴿٤﴾ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ
أَمَامَهُ ﴿٥﴾ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿٦﴾ فَإِذَا بَرِقَ
الْبَصَرُ ﴿٧﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾
يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾ إِلَىٰ
رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ
بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾

(৫০) যেন তারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গর্দভ (৫১) হট্টগোলের কারণে পলায়নপর। (৫২) বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় তাদের প্রত্যেককে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক। (৫৩) কখনও না, বরং তারা পরকালকে ভয় করে না। (৫৪) কখনও না, এটা তো উপদেশমাত্র। (৫৫) অতএব, যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক। (৫৬) তারা স্মরণ করবে না, কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।

সূরা আল-ক্বেয়ামাহ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৪০ ।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) আমি শপথ করি কেয়ামত দিবসের, (২) আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়—(৩) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না? (৪) পরন্তু আমি তার অংগুলিগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। (৫) বরং মানুষ তার ভবিষ্যত জীবনেও ধৃষ্টতা করতে চায়; (৬) সে প্রশ্ন করে—কেয়ামত দিবস কবে? (৭) যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, (৮) চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। (৯) এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে—(১০) সে দিন মানুষ বলবেঃ পলায়নের জায়গা কোথায়? (১১) না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। (১২) আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে। (১৩) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে যা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে। (১৪) বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান,

অথবা গোনাহ্ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হত, তারাও তাদের সাথে তাতে লিপ্ত হত এবং সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করত না, (৪) তারা কেয়ামত অস্বীকার করত।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যেসব অপরাধী এসব গোনাহ্ করে এবং কেয়ামত অস্বীকার করার মত কুফরী করে, তাদের জন্যে কারও সুপারিশ উপকারী হবে না। কেননা, তারা কাফের। কাফেরের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেয়া হবে না। কেউ করলে গ্রহণীয় হবে না। যদি সব সুপারিশকারী একত্রিত হয়ে জোরেসোরে সুপারিশ করে, তাতেও উপকারী হবে না। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যেই شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ বলা হয়েছে।

কাফেরের জন্য কারও সুপারিশ উপকারী হবে না ঃ এই আয়াত থেকে আরও বোঝা যায় যে, মুসলমান গোনাহ্গার হলেও তার জন্যে সুপারিশ উপকারী হবে। অনেক সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবীগণ, ওলীগণ, সৎকর্মপরায়ণগণ—এমন কি সাধারণ মুমিনগণও অপরের জন্যে সুপারিশ করবেন এবং তা কবূল হবে। তবে কাফেরের জন্য কারও কোন সুপারিশ কাজে আসবে না।

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ —এখানে تذكرة তথা উপদেশ বলে কোরআন মজীদ বোঝানো হয়েছে। কেননা, এর শাব্দিক অর্থ স্মারক। কোরআন পাক আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী, রহমত, গযব সওয়াব ও আযাবের অদ্বিতীয় স্মারক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শেষে বলা হয়েছে كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ অর্থাৎ, নিশ্চিতই কোরআন উপদেশ, যা তোমরা বর্জন করে রেখেছ। قسورة —এর অর্থ সিংহ এবং তীরন্দাজ শিকারী। এ স্থলে সাহাবায়ে-কেরাম থেকে উভয় অর্থ বর্ণিত আছে।

هُوَ أَهْلُ التَّقْوٰى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ আল্লাহ্ তাআলা **اهل تقوى** এই অর্থে যে, একমাত্র তিনিই ভয় করার ও তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার যোগ্য। **اهل مغفرت** হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তিনিই বড় অপরাধী গোনাহ্গারের অপরাধ ও গোনাহ্ যখন ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। অন্য কেউ এরূপ উচ্চমনা হতে পারে না।

সূরা আল-ক্বেয়ামাহ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ এখানে لا অব্যয়টি অতিরিক্ত। কারও বিরোধী মনোভাব খণ্ডন করার জন্যে শপথ করা হলে শপথের পূর্বে অতিরিক্ত لا ব্যবহৃত হয়। আরবী বাক-পদ্ধতিতে এই ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আমাদের ভাষায়ও মাঝে মাঝে তাকীদযোগ্য বিষয়বস্তু বর্ণনা করার পূর্বে বলা হয় 'না', এরপর স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়। এ সূরায় কেয়ামত ও পরকাল অবিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার ও তাদের সন্দেহ-সংশয়ের জওয়াব দান করা হয়েছে। প্রথমে কেয়ামত দিবস পরে 'নফসে-লাওয়ামা' তথা ধিক্কারকারী মনের শপথ করে সূরা শুরু করা

হয়েছে। শপথের জওয়াব স্থানের ইঙ্গিতে উহ্য আছে। অর্থাৎ, কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী। কেয়ামতের শপথ যে স্থানোপযোগী হয়েছে, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। এমনিভাবে নফসে-লাওয়ামার শপথেও তার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্‌র কাছে মকবুল হওয়ার বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। নফস শব্দের অর্থ প্রাণ ও আত্মা সুবিদিত। لوامة শব্দটি لوم থেকে উদ্ভূত। অর্থ তিরস্কার ও ধিক্কার দেয়া। 'নফসে লাওয়ামা' বলে এমন নফস বোঝানো হয়েছে, যে নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। অর্থাৎ, কৃত গোনাহ্ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে নিজেকে ভর্ৎসনা করে যে, তুই এমন করলি কেন? সৎকর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তিরস্কার করে যে, আরও বেশী সৎকাজ সম্পাদন করে উচ্চমর্যাদা লাভ করলে না কেন? সারকথা, কামেল মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই তার প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কাজের জন্যে নিজেকে তিরস্কারই করে। গোনাহ্ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে তিরস্কার করার হেতু বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। সৎকাজে তিরস্কার করার কারণ এই যে, নফস ইচ্ছা করলে আরও বেশী সৎকাজ করতে পারত। সে বেশী সৎকাজ করল না কেন? এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।— (ইবনে-কাসীর) এই অর্থের ভিত্তিতেই হযরত হাসান বসরী (রহঃ) নফসে-লাওয়ামার তফসীর করেছেন 'নফসে-মুমিনা।' তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র কসম, মুমিন তো সর্বদা সর্বাবস্থায় নিজেকে ধিক্কারই দেয়। সৎকর্মসমূহেও সে আল্লাহ্‌র শানের মোকাবেলায় আপন কর্মে অভাব ও ত্রুটি অনুভব করে। কেননা, আল্লাহ্‌র হক পুরোপুরি আদায় করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। ফলে তার দৃষ্টিতে ত্রুটি থাকে এবং তজ্জন্যে নিজেকে ধিক্কার দেয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাসান বসরী (রহঃ) প্রমুখের এই তফসীর অনুযায়ী নফসে-লাওয়ামার শপথ করার উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে মুমিন ব্যক্তিদের সম্মান ও সম্ভ্রম প্রকাশ করা, যারা নিজেদের কাজকর্ম হিসাব করে ত্রুটির জন্যে অনুতপ্ত হয় ও নিজেদেরকে তিরস্কার করে।

নফসে-লাওয়ামার এই তফসীরে 'নফসে-মুতমায়িন্নাও' দাখিল আছে। এগুলো 'নফসে-মুত্তাকীরই' উপাধি।

নফসে আম্মারা, লাওয়ামা ও মুতমায়িন্না ঃ সূফী বুর্যুর্গগণ বলেনঃ নফস মজ্জাগত ও স্বভাবগতভাবে لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে জোরদার আদেশ করে। কিন্তু ঈমান, সৎকর্ম ও সাধনার বলে সে নফসে-লাওয়ামা হয়ে যায় এবং মন্দ কাজ ও ত্রুটির কারণে অনুতপ্ত হতে শুরু করে। কিন্তু মন্দ কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। অতঃপর সৎকর্মে উন্নতি ও খোদায়ী নৈকট্যলাভে চেষ্টা করতে করতে যখন শরীয়তের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায় এবং শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে, তখন এই নফসই মুতমায়িন্না উপাধিপ্রাপ্ত হয়।

অতঃপর কেয়ামত অবিশ্বাসীদের একটি সাধারণ প্রশ্নের জওয়াব আছে। প্রশ্ন এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে পরিণত হবে। তার অস্থিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সেগুলোকে পুনরায় একত্রিত করে কিরূপে জীবিত করা হবে? জওয়াবে বলা হয়েছেঃ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ -এর সারমর্ম এই যে, চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত অস্থিসমূহকে একত্রিত করে পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে তোমরা বিস্মিত হচ্ছ ঃ অথচ এ বিষয়টি পূর্বে একবার প্রত্যক্ষ করেছ যে, দুনিয়াতে পালিত ও বর্ধিত প্রত্যেক মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশ ও কণা নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। অতএব, যে ক্ষমতাশালী সত্তা প্রথমবার সারাবিশ্বে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একজন মানুষের অস্তিত্বে একত্রিত করেছেন, এখন পুনরায় সেগুলোকে একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কিরূপে কঠিন হবে? তিনি পূর্বে যেমন তার কাঠামোতে আত্মা রেখে তাকে জীবিত করেছেন, পুনরায় এরূপ করলে তা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে কেন?

لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ - امام শব্দের অর্থ সম্মুখ ও ভবিষ্যত। আয়াতের অর্থ এই যে, কাফের ও গাফেল মানুষ আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের এসব চাক্ষুষ বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, যাতে অতীতের অস্বীকারের দরুন অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যত ঠিক করে নিতে পারে ; বরং ভবিষ্যতেও সে কুফর, শেরক, অস্বীকার ও মিথ্যারোপে অটল থাকতে চায়।

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ এখানে কেয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। برق অর্থ চক্ষুতে ধাঁধা লেগে গেল এবং দেখতে পারল না। কেয়ামতের দিন সবার দৃষ্টিতে ধাঁধা লেগে যাবে। ফলে চক্ষু স্থির কোন বস্তু দেখতে পারবে না। خسف শব্দটি خسوف থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ, চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ এতে বলা হয়েছে যে, শুধু চন্দ্রই জ্যোতিহীন হবে না ; বরং সূর্যের দশাও তাই হবে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, আসল আলো সূর্যের মধ্যে নিহিত। চন্দ্রও সূর্যের কিরণ থেকে আলো লাভ করে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ কেয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে একই অবস্থায় একত্রিত করা হবে এবং উভয়ের জ্যোতি হারিয়ে ফেলবে। কেউ কেউ বলেন, চন্দ্র ও সূর্যকে একত্রিত করার অর্থ এই যে, সেদিন উভয়েই একই উদয়াচল থেকে উদিত হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে তাই বর্ণিত আছে।

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ -অর্থাৎ, মানুষকে সেদিন অবহিত করা হবে যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ মানুষ মৃত্যুর পূর্বে যে সৎকাজ করে নেয়, তা সে অগ্রে প্রেরণ করে এবং যে সৎ অথবা অসৎ, উপকারী অথবা অপকারী কাজ ও প্রথা এমন ছেড়ে যায়, যা তার মৃত্যুর পর মানুষ বাস্তবায়িত করে, তা সে পশ্চাতে রেখে আসে। (এর সওয়াব অথবা শাস্তি সে পেতে থাকবে।) হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেনঃ ما قدم বলে এমন সৎকাজ বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ জীবদ্দশায় করে নেয় এবং ما اخر বলে এমন সৎকাজ বোঝানো হয়েছে, যা সে করতে পারত, কিন্তু করেনি এবং সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে।

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ - بصير ও بَصِيْرَةٌ -এর অর্থ চক্ষুষ্মান। এর অপর অর্থ প্রমাণও হয়ে থাকে। কোরআনে আছে- قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ এখানে بصائر শব্দটি بَصِيْرَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ প্রমাণ। معاذير শব্দটি ওযর অর্থে معذار এর বহুবচন। আয়াতের অর্থ এই যে, যদিও ন্যায়বিচারের বিধি অনুযায়ী মানুষকে তার প্রত্যেকটি কর্ম সম্পর্কে হাশরের মাঠে অবহিত করা হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রয়োজন নেই। কেননা, মানুষ তার কর্ম সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। সে কি করেছে, তা সে নিজেই জানে। এছাড়া হাশরের মাঠে প্রত্যেকে তার সৎ অসৎ কর্ম স্বচক্ষে দেখতেও পাবে। অন্য আয়াতে আছে وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا অর্থাৎ, দুনিয়াতে মানুষ যা করেছে, হাশরের

وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٥﴾ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ
بِهِ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ
قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ
الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾
إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ
أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾
وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالْتَفَّتِ
السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾
فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾
ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿٣٣﴾ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٤﴾
ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٥﴾ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ
يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ
الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ
يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

(১৫) যদিও সে তার অজুহাত পেশ করতে চাইবে। (১৬) তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্যে আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না। (১৭) এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। (১৮) অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। (১৯) এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব। (২০) কখনও না, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস (২১) এবং পরকালকে উপেক্ষা কর। (২২) সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। (২৩) তারা তার পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। (২৪) আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উদাস হয়ে পড়বে। (২৫) তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর-ভাঙ্গা আচরণ করা হবে। (২৬) কখনও না, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। (২৭) এবং বলা হবে, কে ঝাড়বে (২৮) এবং সে মনে করবে যে, বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে (২৯) এবং গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যাবে। (৩০) সেদিন, আপনার পালনকর্তার নিকট সবকিছু নীত হবে। (৩১) সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি ; (৩২) পরন্তু মিথ্যারোপ করেছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। (৩৩) অতঃপর সে দম্ভভরে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে। (৩৪) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ! (৩৫) অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (৩৬) মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? (৩৭) সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না? (৩৮) অতঃপর সে ছিল রক্তপিণ্ড, অতঃপর আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। (৩৯) অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল—নর ও নারী। (৪০) তবুও কি সেই আল্লাহ্ মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?

মাঠে তাকে উপস্থিত পাবে এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। এখানে মানুষকে নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান বলার অর্থ তাই।

পক্ষান্তরে بَصِيْرَةٌ -এর অর্থ প্রমাণ হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মানুষ নিজেই নিজের সম্পর্কে প্রমাণস্বরূপ হবে। সে অস্বীকার করলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে। কিন্তু মানুষ তার অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি জানা সত্ত্বেও বাহানাবাজি ত্যাগ করবে না। সে তার কৃতকর্মের অজুহাত পেশ করতেই থাকবে। وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ বাক্যের অর্থ তাই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ পর্যন্ত কেয়ামতের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা আলোচিত হল। পরেও এই আলোচনা আসবে। মাঝখানে চার আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা ওহী নাযিল হওয়ার সময় অবতীর্ণ আয়াতগুলো সম্পর্কিত। নির্দেশ এই যে, যখন জিবরাঈল (আঃ) কোরআনের কিছু আয়াত নিয়ে আগমন করতেন, তখন তা পাঠ করার সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দ্বিবিধ চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়তেন। (এক) কোথাও এর শ্রবণ ও তদনুযায়ী পাঠে কোন পার্থক্য না হয়ে যায়। (দুই) কোথাও এর কোন অংশ, কোন বাক্য স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এই চিন্তার কারণে যখন জিবরাঈল (আঃ) কোন আয়াত শোনাতেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহবা নেড়ে দ্রুত আবৃত্তি করতেন, যাতে বার বার পড়ে তা মুখস্থ করে নেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই পরিশ্রম ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশে আলোচ্য চার আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কোরআন বিশুদ্ধ পাঠ করানো, মুখস্থ করানো ও মুসলমানদের কাছে হুবহু পেশ করানোর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলে দিয়েছেন যে, আপনি এই উদ্দেশে জিহবাকে দ্রুত নাড়া দেয়ার কষ্ট করবেন না। لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ বাক্যের অর্থ তাই। এরপর বলেছেন, إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ অর্থাৎ, আয়াতসমূহকে আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং হুবহু আপনার দ্বারা পাঠ করিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি এ চিন্তা পরিত্যাগ করুন। এরপর বলা হয়েছে, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ এখানে কোরআনের অর্থ পাঠ। অর্থ এই যে, যখন আমি অর্থাৎ, আমার পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আঃ) কোরআন পাঠ করে, তখন আপনি সাথে সাথে পাঠ করবেন না ; বরং চুপ করে শুনবেন এবং আমার পাঠের পর পাঠ করবেন। এখানে কোরআন অনুসরণ করার মানে চুপ করে জিবরাঈলের পাঠ শ্রবণ করা। সকল তফসীরবিদই এতে একমত।

অবশেষে বলা হয়েছে إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ অর্থাৎ, আপনি এ চিন্তাও করবেন না যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? এটা বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। আমি কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও তার উদ্দেশ্য আপনার কাছে ফুটিয়ে তুলব।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ অর্থাৎ, সেদিন কিছু মুখমণ্ডল হাসি-খুশী ও সজীব হবে এবং তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে জান্নাতীগণ চর্মচক্ষে আল্লাহ্

তাআলার দীদার (দর্শন) লাভ করবে। আহলে সুন্নত-ওয়াল-জামাআতের সকল আলেম ও ফেকাহ্‌বিদ এ বিষয়ে একমত। বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয়বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে। তবে এই দীদার ও সাক্ষাতে জান্নাতীগণের বিভিন্ন স্তর থাকবে। কেউ সপ্তাহে একবার অর্থাৎ, শুক্রবারে এই সাক্ষাৎ লাভ করবে, কেউ দৈনিক সকাল-বিকাল লাভ করবে এবং কেউ সারাক্ষণ সাক্ষাতেই থাকবে।— (মাযহারী)

كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيْلَ مَنْ سَكْرَاقٍ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ পূর্ববর্তী আয়াসমূহে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই আয়াতে মৃত্যুর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যাতে সে মৃত্যুর পূর্বেই পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ঈমান ও সৎকর্মের দিকে ধাবিত হয়। আয়াতে মৃত্যুর চিত্র অংকন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, গাফেল মানুষ যখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে থাকে, তখন তার মাথার উপর মৃত্যু এসে দণ্ডায়মান হয় এবং আত্মা কণ্ঠনালীতে এসে ঠেকে। পায়ের গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে যায়। এটাই আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার সময়। এ সময়ে কোন তওবা কবুল হয় না এবং কোন আমলও করা যায় না। কাজেই বুদ্ধিমানের উচিত এর আগেই সংশোধনের চেষ্টা করা। وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ - ساق-এর প্রসিদ্ধ অর্থ পায়ের গোছা। গোছার সাথে জড়িয়ে পড়ার এক অর্থ এই যে, তখন অস্থিরতার কারণে এক গোছা দ্বারা অন্য গোছার উপর আঘাত করবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দুর্বলতার আতিশয্যে এক পা অপর পায়ের উপর থাকলে তা সরাতে চাইলেও সক্ষম হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এখানে দুই গোছা বলে দুই জগৎ—ইহকাল ও পরকাল বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তখন হবে ইহকালের শেষ দিন এবং পরকালের প্রথম দিনের সম্মিলন। তাই মানুষ ইহকালের বিরহ-বেদনা এবং পরকালে কি হবে না হবে তার চিন্তায় গ্রেফতার থাকবে।

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى - اَوْلٰى শব্দটি ويل এর অপভ্রংশ। অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। যে ব্যক্তি কুফর ও মিথ্যারোপকেই আঁকড়ে থাকে এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদে মত্ত থাকে ও তদবস্থায় মারা যায়, তার জন্যে এখানে চারবার ويل তথা দুর্ভোগ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, মৃত্যুর সময়, মৃত্যুর পর কবরে, হাশরে সমবেত হওয়ার সময় এবং অবশেষে জাহান্নামে প্রবেশের সময় বিপর্যয় ও দুর্ভোগই তোমার প্রাপ্য।

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى অর্থাৎ, জীবন-মৃত্যু ও সারা বিশ্ব যে সত্তার করতলগত, তিনি কি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কেয়ামার এই আয়াত পাঠ করে, তার বলা উচিত بلٰى وانا علٰى ذٰلك من الشاهدين অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে তিনি সক্ষম এবং আমিও এর একজন সাক্ষী। সূরা ত্বীনের শেষ আয়াত اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ পাঠ করার সময়ও একথা বলার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এই হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি সূরা মুরসালাতের فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ আয়াত পাঠ করে তার বলা উচিত اٰمنا بالله

সূরা আল-কেয়ামাহ্ সমাপ্ত

سورة الدهر مدنية وهي احدى وثلثون اية وفيها ركوعان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا (١) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا (٢) إِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوْرًا (٣) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا وَأَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا (٤) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا (٥) عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا (٦) يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا (٧) وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّأَسِيْرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَا شُكُوْرًا (٩) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا (١٠) فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا (١١) وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا (١٢) مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا (١٣) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا (١٤)

সূরা আদ-দাহ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ৩১।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (২) আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে-এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব। অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। (৩) আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়। (৪) আমি অবিশ্বাসীদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত অগ্নি। (৫) নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে কাফূর মিশ্রিত পানপাত্র। (৬) এটা একটা ঝরণা, যা থেকে আল্লাহ্‌র বন্দাগণ পান করবে—তারা একে প্রবাহিত করবে। (৭) তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী। (৮) তারা আল্লাহ্‌র প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। (৯) তারা বলেঃ কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (১০) আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি। (১১) অতঃপর আল্লাহ্‌ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। (১২) এবং তাদের সবরের প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। (১৩) তারা সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না। (১৪) তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে।

সূরা আদ-দাহ্‌র

সূরা দাহরের অপর নাম সূরা 'ইনসান' ও সূরা 'আবরার'।—(রূহুল-মা'আনী)

এতে মানব সৃষ্টির আদি-অন্ত, কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি, কেয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর বিশুদ্ধ ও সাবলীল ভঙ্গিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

هَلْ أَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا

هل অব্যয়টি আসলে প্রশ্নবোধকরূপে ব্যবহৃত হয়। মাঝে মাঝে কোন **জাজ্বল্যমান ও প্রকাশ্য বিষয়কে প্রশ্নের আকারে ব্যক্ত করা যায়,** যাতে তার প্রকাশ্যতা আরও জোরদার হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, যাকেই জিজ্ঞাসা করবে, সে এ উত্তরই দিবে, অপর কোন সম্ভাবনাই নেই। উদাহরণতঃ কেউ দুপুরের সময় কাউকে জিজ্ঞাসা করে—**এখন কি দিন নয়?** এটা দৃশ্যতঃ প্রশ্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি যে একেবারে চরম জাজ্বল্যমান, তারই বর্ণনা। তাই এ ধরনের স্থানে কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, **هل** অব্যয়টি এখানে **قد** (বাস্তবিক নিশ্চয়তার) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাহোক, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের উপর এমন দীর্ঘ এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন পৃথিবীতে তার নাম-নিশানা এমন কি, আলোচনা পর্যন্ত ছিল না। **حين** শব্দটিকে **تنوين** -সহ উল্লেখ করে সময়ের দীর্ঘতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত যে দীর্ঘ সময় মানুষের উপর অতিবাহিত হয়েছে, তাতে তার কোন না কোন পর্যায়ে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। নতুবা মানুষের উপর অতিবাহিত হয়েছে—একথা বলা দুরস্ত হয় না। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এই দীর্ঘ সময়ের অর্থ মায়ের পেটে গর্ভ সঞ্চারের পর থেকে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়, যা সাধারণতঃ নয় মাসে হয়ে থাকে। এতে মানব সৃষ্টির যত স্তর অতিবাহিত হয়—বীর্য থেকে দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রাণ সঞ্চার ইত্যাদি সব দাখিল আছে। এই সম্পূর্ণ সময়ে এক পর্যায়ে তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সে ছেলে, না মেয়ে তা কেউ জানে না। এ সময়ে তার কোন নাম থাকে না এবং কোন আকার-আকৃতিও কেউ জানে না। ফলে কোথাও তার কোন আলোচনা পর্যন্ত হয় না। আয়াতে বর্ণিত দীর্ঘ সময়কে আরও বিস্তৃত অর্থ দেয়া যেতে পারে। যে বীর্য থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা, সেই বীর্যও খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয়। সেই খাদ্য এবং খাদ্যের পূর্ববর্তী উপকরণ কোন না কোন আকারে দুনিয়াতে ছিল। এই সময়কেও শামিল করলে আয়াতে বর্ণিত দীর্ঘ সময় হাজারো বছর হতে পারে। সারকথা, এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষের দৃষ্টি এক নিগূঢ়তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। মানুষ যদি সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিরও অধিকারী হয় এবং এই তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করে, তবে একদিকে তার নিজের স্বরূপ তার কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে এবং অপরদিকে স্রষ্টার অস্তিত্ব, জ্ঞান ও অপার শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তার গত্যন্তর থাকবে না।

এরপর মানব সৃষ্টির সূচনা এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ অর্থাৎ, আমি মানুষকে মিশ্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। أَمْشَاجٍ শব্দটি مشج অথবা مشيج -এর বহুবচন। অর্থ মিশ্র। বলাবাহুল্য এখানে নর ও নারীর মিশ্র বীর্য বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদ তাই বলেছেন। কেউ কেউ বলেনঃ এখানে أَمْشَاجٍ বলে রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল,

পিত্ত—এই শারীরিক উপাদান চতুষ্টয় বোঝানো হয়েছে। এগুলো দিয়ে বীর্য গঠিত হয়।

প্রত্যেক মানুষের সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের উপাদান ও কণা শামিল আছেঃ চিন্তা করলে দেখা যায়, উপরোক্ত শারীরিক উপাদান চতুষ্টয়ও বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে অর্জিত হয়। প্রত্যেক মানুষের খাদ্য সম্পর্কে চিন্তা করলেও দেখা যায়, এতে দূর-দূরান্ত দেশ ও ভূখণ্ডের উপাদান পানি, বায়ু ইত্যাদির মাধ্যমে শামিল হয়। এভাবে একজন মানুষের বর্তমান শরীর বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে যে, এটা এমন উপাদান ও কণাসমূহের সমষ্টি, যা বিশ্বের আনাচে-কানাচে বিক্ষিপ্ত ছিল। সর্বশক্তিমানের অভাবনীয় ব্যবস্থা সেগুলোকে বিস্ময়করভাবে তার শরীরে একত্রিত করেছে।

نَّبْتَلِيْهِ —এটা ابتلاء থেকে উদ্ভূত। অর্থ পরীক্ষা করা। এই বাক্যে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও রহস্য বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য তাকে পরীক্ষা করা, পরের আয়াতে তা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমি পয়গম্বর ও ঐশী গ্রন্থের মাধ্যমে তাকে পথ বলে দিয়েছি যে, এই পথ জান্নাতের দিকে এবং এই পথ জাহান্নামের দিকে যায়। এরপর তাকে ক্ষমতা দিয়েছি যে কোন পথ অবলম্বন করার। সেমতে তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوْرًا অর্থাৎ, একদল তো তাদের স্রষ্টা ও নেয়ামতদাতাকে চিনে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, কিন্তু অপরদল অকৃতজ্ঞ হয়ে কাফের হয়ে গেছে। অতঃপর উভয়দলের প্রতিফল ও পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেরদের জন্যে রয়েছে শিকল, বেড়ি ও জাহান্নাম। আর ঈমান ও এবাদত পালনকারীদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত নেয়ামত। সর্বপ্রথম পানীয় বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে এমন শরাবের পাত্র দেয়া হবে, যাতে কাফূরের মিশ্রণ থাকবে। কোন কোন তফসীরকারক বলেনঃ কাফূর জান্নাতের একটি ঝরণার নাম। এই শরাবের স্বাদ ও গুণ বৃদ্ধি করার জন্যে তাতে এই ঝরণার পানি মিলানো হবে। যদি কাফূরের প্রসিদ্ধ অর্থ নেয়া হয়, তবে জরুরী নয় যে, জান্নাতের কাফূর দুনিয়ার কাফূরের ন্যায় অখাদ্য হবে। বরং সেই কাফূরের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হবে।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ — عَيْنًا শব্দটি كافورا -এর بدل ও হতে পারে। এমতাবস্থায় এটা নির্দিষ্ট যে, আয়াতে কাফূর বলে জান্নাতের ঝরণাই বোঝানো হয়েছে। عِبَادُ اللّٰهِ বলে আল্লাহ্‌র সেসব নেক বন্দাকেই বোঝানো হয়েছে, ইতিপূর্বে যাদেরকে ابرار বলা হয়েছিল। পক্ষান্তরে যদি عَيْنًا শব্দটি من كاس -এর بدل হয়, তবে এটা অন্য কোন ঝরণা ও পানির বর্ণনা হবে। এমতাবস্থায় عِبَادُ اللّٰهِ -এর অর্থ হবে ابرار থেকে নিম্নস্তরের অন্য কোন দল।

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ এতে বিধৃত হয়েছে যে, সৎকর্মশীল বন্দাগণকে এসব নেয়ামত কিসের ভিত্তিতে দেয়া হবে। অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যে কাজের মানত করে, তা পূর্ণ করে। نذر -এর শাব্দিক অর্থ নিজের জন্যে এমন কোন কাজ ওয়াজিব করে নেয়া, যা শরীয়তের তরফ থেকে তার দায়িত্বে ওয়াজিব নয়। এরূপ মানত পূর্ণ করা শরীয়তের আইনে ওয়াজিব। এখানে মানত পূর্ণ করাকে জান্নাতীদের মহান প্রতিদান ও অফুরন্ত নেয়ামত লাভের কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّأَسِيْرًا অর্থাৎ, জান্নাতীদের এসব নেয়ামত এ কারণেও যে, তারা দুনিয়াতে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীদেরকে আহার্য দান করত। عَلٰى حُبِّهٖ -এর মর্মার্থ এই যে, তারা শুধু নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার্যই দরিদ্রদেরকে দান করে না; বরং নিজেদের প্রয়োজন সত্ত্বেও দান করে। দরিদ্র ও এতীমদেরকে আহার্য দেয়া যে এবাদত, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। বন্দী বলে এমন বন্দী বোঝানো হয়েছে, যাকে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী বন্দী করা হয়েছে—সে কাফের হোক অথবা মুসলমান অপরাধী।

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ﴿١٥﴾ قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾

(১৫) তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত পানপাত্রে (১৬) রূপালী স্ফটিক পাত্রে—পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। (১৭) তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে 'যানজাবীল' মিশ্রিত পানপাত্র। (১৮) এটা জান্নাতস্থিত 'সালসাবীল' নামক একটি ঝরণা। (১৯) তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা। (২০) আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন নেয়ামতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। (২১) তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকণ এবং তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন 'শরাবান-তহুরা'। (২২) এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে। (২৩) আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কোরআন নাযিল করেছি। (২৪) অতএব, আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের জন্যে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন এবং ওদের মধ্যকার কোন পাপিষ্ঠ ও কাফেরের আনুগত্য করবেন না। (২৫) এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। (২৬) রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশে সেজদা করুন এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (২৭) নিশ্চয় এরা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে। (২৮) আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব। (২৯) এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয় সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (৩০) আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ দুনিয়ার রৌপ্য-পাত্র গাঢ় ও **মোটা হয়ে থাকে**—আয়নার মত স্বচ্ছ হয় না। পক্ষান্তরে কাঁচ নির্মিত পাত্র রৌপ্যের মত শুভ্র হয় না। উভয়ের মধ্যে **বৈপরীত্য আছে, কিন্তু জান্নাতের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানকার রৌপ্য আয়নার মত স্বচ্ছ হবে।** হযরত **ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ জান্নাতের সব বস্তুর নজীর দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। তবে দুনিয়ার রৌপ্য নির্মিত গ্লাস ও পাত্র জান্নাতের পাত্রের ন্যায় স্বচ্ছ নয়।**

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا — **زنجبيل —এর প্রসিদ্ধ** অর্থ শুকনা আদা। আরবরা শরাবে এর মিশ্রণ পছন্দ করত। তাই **জান্নাতেও একে পছন্দ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ জান্নাতের বস্তু ও দুনিয়ার বস্তু নামেই কেবল অভিন্ন। বৈশিষ্ট্যে উভয়ের মধ্যে অনেক** ব্যবধান। তাই দুনিয়ার আদার আলোকে জান্নাতের আদাকে বোঝার উপায় নেই।

وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ — أَسَاوِرَ শব্দটি سوار —এর **বহুবচন।** অর্থ কংকণ যা হাতে পরিধান করার অলংকারবিশেষ। এই আয়াতে রূপার কংকণ এবং অন্য এক আয়াতে **স্বর্ণের কংকণ উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ নেই। কেননা, কোন সময় রূপার এবং কোন সময়** স্বর্ণের কংকণ ব্যবহৃত হতে পারে, অথবা কেউ রূপার এবং কেউ স্বর্ণের ব্যবহার করতে পারে।

إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا অর্থাৎ, **জান্নাতীরা** যখন জান্নাতে পৌছে যাবে, তখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বলা হবে ঃ জান্নাতের এসব বিস্ময়কর **অবদানসমূহ তোমাদের দুনিয়াতে** কৃতকর্মসমূহের প্রতিদান এবং তোমাদের প্রচেষ্টা আল্লাহ্‌র কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে।

পরিশেষে কাফেরদের হঠকারিতার এই কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই মূর্খরা পার্থিব ধ্বংসশীল ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে **পরিণাম অর্থাৎ,** পরকাল বিস্মৃত হয়ে বসেছে। **অথচ আমি দুনিয়াতেও খোদ তাদের অস্তিত্বে এমন উপকরণ রেখেছিলাম,** যে সম্পর্কে চিন্তা করলে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে চিনতে পারত। বলা হয়েছে, نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ অর্থাৎ, আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন প্রকৃতি মজবুত ও সুদৃঢ় করেছি।

يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ
عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣١﴾

سُوْرَةُ الْمُرْسَلٰتِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ﴿١﴾ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ﴿٢﴾ وَّالنّٰشِرٰتِ
نَشْرًا ﴿٣﴾ فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ﴿٥﴾ عُذْرًا اَوْ
نُذْرًا ﴿٦﴾ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾ فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾ وَ
اِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾ وَاِذَا الرُّسُلُ
اُقِّتَتْ ﴿١١﴾ لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ
مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٥﴾ اَلَمْ
نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٧﴾ كَذٰلِكَ
نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٨﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٩﴾ اَلَمْ
نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿٢١﴾
اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ
يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٤﴾ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾

(৩১) তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতে দাখিল করেন। আর যালেমদের জন্যে তো প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

সূরা আল-মুরসালাত

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৫০।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু—

(১) কল্যাণের জন্যে প্রেরিত বায়ুর শপথ, (২) সজোরে প্রবাহিত ঝটিকার শপথ, (৩) মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ, (৪) মেঘপুঞ্জ বিতরণকারী বায়ুর শপথ এবং (৫) ওহী নিয়ে অবতরণকারী ফেরেশতাগণের শপথ—(৬) ওযর-আপত্তির অবকাশ না রাখার জন্যে অথবা সতর্ক করার জন্যে (৭) নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে। (৮) অতঃপর যখন নক্ষত্রসমূহ নির্বাপিত হবে, (৯) যখন আকাশ ছিদ্রযুক্ত হবে, (১০) যখন পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেয়া হবে এবং (১১) যখন রসূলগণের একত্রিত হওয়ার সময় নিরূপিত হবে, (১২) এসব বিষয় কোন্ দিবসের জন্যে স্থগিত রাখা হয়েছে? (১৩) বিচার দিবসের জন্যে। (১৪) আপনি জানেন বিচার দিবস কি? (১৫) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (১৬) আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি? (১৭) অতঃপর তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করব পরবর্তীদেরকে। (১৮) অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি। (১৯) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (২০) আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? (২১) অতঃপর আমি তা রেখেছি এক সংরক্ষিত আধারে, (২২) এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, (২৩) অতঃপর আমি পরিমিত আকারে সৃষ্টি করেছি, আমি কত সক্ষম স্রষ্টা? (২৪) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (২৫) আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারিণীরূপে,

সূরা আল-মুরসালাত

সহীহ্ বোখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমরা মিনার এক গুহায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে সূরা মুরসালাত অবতীর্ণ হল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সূরাটি আবৃত্তি করতেন আর আমি তা শুনে মুখস্থ করতাম। সূরার মিষ্টতায় তাঁর মুখমণ্ডল সতেজ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ একটি সর্প আমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। আমরা সর্পের দিকে অগ্রসর হলাম, কিন্তু সেটি পালিয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা যেমন তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রয়েছ, তেমনি সেও তোমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে।—(ইবনে-কাসীর)

এই সূরায় আল্লাহ্ তাআলা কয়েকটি বস্তুর শপথ করে কেয়ামতের নিশ্চিত আগমনের কথা ব্যক্ত করেছেন। এই বস্তুগুলোর নাম কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি। তবে সেগুলোর স্থলে এ পাঁচটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে عاصفات - مرسلات - ملقيات الذكر- فارقات . ناشرات কিন্তু এগুলো কার বিশেষণ, কোন হাদীসে তা পুরোপুরি নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই এ সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে বিভিন্নরূপ তফসীর বর্ণিত আছে।

কারও কারও মতে এগুলো সব ফেরেশতাগণের বিশেষণ। সম্ভবতঃ ফেরেশতাগণের বিভিন্ন দল এসব বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত। কেউ কেউ এগুলোকে বায়ুর বিশেষণ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, বায়ু বিভিন্ন প্রকার ও গুণের হয়ে থাকে। ফলে বায়ুরও এসব বিভিন্ন বিশেষণ হতে পারে। কেউ কেউ স্বয়ং পয়গম্বরগণকে এসব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। এ কারণেই ইবনে-জরীর এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকাকে অধিকতর নিরাপদ ঘোষণা করে বলেছেন ঃ সবই হতে পারে, কিন্তু আমরা কোনকিছু নির্দিষ্ট করি না।

عُذْرًا اَوْ نُذْرًا -এই আয়াত ذكرا শব্দটি ملقيات -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ ذكر তথা ওহী পয়গম্বরগণের কাছে নাযিল করা হয়, যাতে তা মুমিনদের জন্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে ওযরখাহীর কারণ হয় এবং কাফেরদের জন্যে সতর্ককারী হয়ে যায়।

বায়ু, ফেরেশতা অথবা উভয়ের শপথ করে আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ অর্থাৎ, তোমাদেরকে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে কেয়ামত, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ও শাস্তির যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। অতঃপর বাস্তবায়ন মুহূর্তের কতিপয় অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমে সব নক্ষত্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে অথবা জ্যোতিহীন অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। ফলে সমগ্র বিশ্ব গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তৃতীয় অবস্থা এই যে, পর্বতসমূহ তুষারের ন্যায় উড়তে থাকবে। চতুর্থ অবস্থা এই ঃ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ - اُقِّتَتْ শব্দটি توقيت থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ সময় নির্ধারণ করা। আল্লামা যমখশরী বলেন ঃ এর অর্থ কোন সময় নির্দিষ্ট সময়ে পৌছাও হয়ে থাকে। এখানে এই অর্থই উপযুক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গম্বরগণের জন্যে উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হওয়ার যে সময় নিরূপিত হয়েছিল, তাঁরা যখন সে সময়ে পৌছে যাবেন এবং তাঁদের উপস্থিতির মেয়াদ এসে যাবে। তাই তফসীরে এর অর্থ করা হয়েছে যখন

أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَ
أَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾
انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾ انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ
ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾
إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ
يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا
يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾
هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾ إِنَّ
الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كُلُوا
وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ
يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

(২৬) জীবিত ও মৃতদেরকে? (২৭) আমি তাতে স্থাপন করেছি মজবুত সুউচ্চ পর্বতমালা এবং পান করিয়েছি তোমাদেরকে তৃষ্ণা নিবারণকারী সুপেয় পানি। (২৮) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (২৯) চল তোমরা তারই দিকে, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (৩০) চল তোমরা তিন কুণ্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, (৩১) যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না। (৩২) এটা অট্টালিকা সদৃশ বৃহৎ স্ফুলিংগ নিক্ষেপ করবে। (৩৩) যেন সে পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী। (৩৪) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৩৫) এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না। (৩৬) এবং কাউকে তওবা করার অনুমতি দেয়া হবে না। (৩৭) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৩৮) এটা বিচার দিবস, আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একত্রিত করেছি। (৩৯) অতএব, তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার কাছে। (৪০) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৪১) নিশ্চয় খোদাভীরুরা থাকবে ছায়ায় এবং প্রস্রবণসমূহে-(৪২) এবং তাদের বাঞ্ছিত ফল-মূলের মধ্যে। (৪৩) বলা হবে ঃ তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। (৪৪) এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (৪৫) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৪৬) কাফেরগণ, তোমরা কিছুদিন খেয়ে নাও এবং ভোগ করে নাও। তোমরা তো অপরাধী। (৪৭) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৪৮) যখন তাদেরকে বলা হয়, নত হও, তখন তারা নত হয় না। (৪৯) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৫০) এখন কোন্ কথায় তারা এরপর বিশ্বাস স্থাপন করবে?

পয়গম্বরগণকে একত্রিত করা হবে। অতঃপর وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন খুবই ভয়াবহ হবে। কারণ, এটা বিচার দিবস। এতে কাফের ও মিথ্যারোপকারীদের জন্যে ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া কিছু হবে না। ويل শব্দের অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। হাদীসে আছে **ويل** জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এতে জাহান্নামীদের ক্ষতস্থানের পুঁজ একত্রিত হবে এবং এটাই হবে মিথ্যারোপকারীদের বাসস্থান। অতঃপর বর্তমান লোকদেরকে অতীত লোকদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে- اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ, আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে তাদের কুফরের কারণে ধ্বংস করিনি? এখানে আদ, সামুদ, কওমে-লূত, কওমে-ফেরাউন ইত্যাদির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ এক কেরাআত অনুযায়ী অর্থ এই যে, আমি কি পূর্ববর্তীদের পর পরবর্তীদেরকেও তাদের পশ্চাতে ধ্বংস করিনি? এমতাবস্থায় পরবর্তী মানে পূর্ববর্তীদেরই পরবর্তী লোকেরা, যারা কোরআন অবতরণের পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অপর কেরাআত অনুযায়ী এটা আলাদা বাক্য এবং পরবর্তী মানে উম্মতে মুহাম্মদীর কাফের। উদ্দেশ্য পরবর্তী লোকদের ধ্বংসের খবর দিয়ে বর্তমান কাফেরদেরকে ভবিষ্যত আযাবের খবর দেয়া। এই আযাব বদর, ওহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে তাদের উপর পতিত হয়েছে।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ـ اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا অর্থাৎ, আমি কি ভূমিকে জীবিত ও মৃত মানুষদের জন্যে **كفات** করিনি? **كفات** শব্দটি **كفت** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ মিলানো। **كفات** সেই বস্তু, যে অনেক কিছুকে নিজের মধ্যে ধারণ করে। ভূমিও জীবিত মানুষকে তার পৃষ্ঠে এবং সকল মৃতকে তার পেটে ধারণ করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ - قصر -এর অর্থ অট্টালিকা। جِمٰلَتٌ উটকে বলা হয় এবং صُفْرٌ শব্দটি **اصفر** এর বহুবচন, অর্থ পীতবর্ণ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের অগ্নি বিশালকায় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে, যা বিরাট অট্টালিকার ন্যায় মনে হবে। অতঃপর তা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হবে এবং খণ্ডগুলো পীতবর্ণ উষ্ট্র শ্রেণীর সমান মনে হবে। কেউ কেউ এখানে صُفْرٌ -এর অনুবাদ করেছেন কৃষ্ণবর্ণ। কেননা, পীতবর্ণ কৃষ্ণাভ হয়ে থাকে।—(রূহুল-মা'আনী)

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ অর্থাৎ, সেদিন কেউ কথা বলতে পারবে না এবং কাউকে কৃতকর্মের ওযর পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না। অন্যান্য আয়াতে কাফেরদের কথা বলা এবং ওযর পেশ করার কথা রয়েছে। সেটা এর পরিপন্থী নয়। কেননা, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থান আসবে। কোন স্থানে ওযর পেশ করা নিষিদ্ধ থাকবে এবং কোন স্থানে অনুমতি দেয়া হবে।—(রূহুল-মা'আনী)

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ অর্থাৎ, কিছুদিন খেয়ে-দেয়ে নাও এবং আরাম করে নাও। তোমরা তো অপরাধী ; অবশেষে কঠোর আযাব ভোগ করতে হবে। পয়গম্বরগণের মাধ্যমে একথা দুনিয়াতে মিথ্যারোপকারীদেরকে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী

سُوْرَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۝ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝ وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝ وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۝ وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝ وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۝ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۝ وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝ وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝ لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ۝ لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۝ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۝ اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۝ جَزَآءً وِّفَاقًا ۝ اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۝

সূরা আন্‌-নাবা

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৪০।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? (২) মহা সংবাদ সম্পর্কে, (৩) যে সম্পর্কে তারা মতানৈক্য করে। (৪) না, সত্বরই তারা জানতে পারবে, (৫) অতঃপর না, সত্বর তারা জানতে পারবে। (৬) আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা (৭) এবং পর্বতমালাকে পেরেক? (৮) আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি, (৯) তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী, (১০) রাত্রিকে করেছি আবরণ (১১) দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়, (১২) নির্মাণ করেছি তোমাদের মাথার উপর মজবুত সপ্ত-আকাশ (১৩) এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। (১৪) আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি, (১৫) যাতে তদ্দ্বারা উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ। (১৬) ও পাতাঘন উদ্যান। (১৭) নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে। (১৮) যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে, (১৯) আকাশ বিদীর্ণ হয়ে; তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে (২০) এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে। (২১) নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে, (২২) সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে। (২৩) তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। (২৪) তথায় তারা কোন শীতল এবং পানীয় আস্বাদন করবে না; (২৫) কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে। (২৬) পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসেবে। (২৭) নিশ্চয় তারা হিসাব-নিকাশ আশা করত না।

আরাম-আয়েশের পর তোমাদের কপালে আযাবই আযাব রয়েছে।—(আবু হাইয়্যান)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ —এখানে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে রুকূর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে যখন তাদেরকে খোদায়ী বিধানাবলী মেনে চলতে বলা হত, তখন তারা মেনে চলত না। কেউ কেউ রুকূর পারিভাষিক অর্থও নিয়েছেন। আয়াতে উদ্দেশ্য এই যে, যখন তাদেরকে নামাযের দিকে আহ্বান করা হত, তখন তারা নামায পড়ত না। কাজেই আয়াতে রুকূ বলে পুরো নামায বোঝানো হয়েছে।—(রূহুল-মা'আনী)

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ, তারা যখন কোরআনের মত অপূর্ব, অলংকারপূর্ণ, তত্ত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিমণ্ডিত কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করল না, তখন এরপর আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? এখানে উদ্দেশ্য তাদের ঈমানের ব্যাপারে নৈরাশ্য ব্যক্ত করা। হাদীসে আছে, যখন এই সূরা তেলাওয়াতকারী এই আয়ত পাঠ করে তখন তার اٰمَنَّا بِاللّٰهِ বলা উচিত। অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নামাযের বাইরে ও নফল নামাযের মধ্যে এই বাক্য বলা উচিত। ফরয ও সুন্নত নামাযে এ থেকে বিরত থাকা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

সূরা আন্‌-নাবা

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ অর্থাৎ, তারা কি বিষয়ে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? অতঃপর আল্লাহ্ নিজেই উত্তর দিয়েছেন عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ - نبا শব্দের অর্থ মহাখবর। এখানে মহাখবর বলে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মক্কাবাসী কাফেররা কেয়ামত সম্পর্কে সওয়াল-জওয়াব করছে, যে সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কোরআনের অবতরণ শুরু হলে মক্কার কাফেররা তাদের বৈঠকে বসে এ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করত। কোরআনে কেয়ামতের আলোচনাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে; অথচ এটা তাদের মতে একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাই এ সম্পর্কে অধিক পরিমাণ আলোচনা চলত। কেউ একে সত্য মনে করত এবং কেউ অস্বীকার করত। তাই আলোচ্য সূরার শুরুতে কাফেরদের অবস্থা উল্লেখ করে কেয়ামতের সম্ভাব্যতা আলোচনা করা হয়েছে। কেয়ামত সম্পর্কে কাফেররা যেসব খটকা ও আপত্তি উত্থাপন করত, সেগুলোর জওয়াব দেয়া হয়েছে। কোন কোন তফসীরকারক বলেন যে, কাফেরদের এই সওয়াল ও জওয়াব তথ্যানুসন্ধ্যানের উদ্দেশে নয়, বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার উদ্দেশে ছিল। কোরআন পাক এর জওয়াবে একই বাক্যকে তাকীদের জন্যে দু'বার উল্লেখ করেছে كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, কেয়ামতের বিষয়টি সওয়াল-জওয়াব, আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম হবে না; বরং এটা যখন সামনে উপস্থিত হবে, তখনই এর স্বরূপ জানা যাবে। এ নিশ্চিত বিষয়ে বিতর্ক, প্রশ্ন ও অস্বীকারের অবকাশ নেই। অতি সত্বর অর্থাৎ, মৃত্যুর পর পরজগতের বস্তুসমূহ দৃষ্টিতে ভেসে উঠবে এবং সেখানকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলী দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। তখন কেয়ামতের স্বরূপ খুলে যাবে। এরপর আল্লাহ্

তাআলার স্বীয় অপার শক্তি, প্রজ্ঞা ও কারিগরীর কয়েকটি দৃশ্য উল্লেখ করেছেন, যদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি সমগ্র বিশ্বকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় তদ্রূপই সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ সম্পর্কে ভূমি ও পর্বতমালা সৃষ্টি এবং নর ও নারীর যুগলের আকারে মানব সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর মানুষের সুখ, স্বাস্থ্য ও কাজ-কারবারের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে একটি বাক্য এই যে, وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا - سبات শব্দটি سبت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কমানো, কর্তন করা। নিদ্রা মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে কর্তন করে তার অন্তর ও মস্তিষ্ককে এমন স্বস্তি ও শান্তি দান করে, যার বিকল্প দুনিয়ার কোন শান্তি হতে পারে না। এ কারণেই কেউ কেউ سبات -এর অর্থ করেছেন সুখ, আরাম।

وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا অর্থাৎ, আমি রাত্রিকে করেছি আবরণ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বভাবতঃ মানুষের নিদ্রা তখন আসে, যখন আলো অধিক না থাকে, চতুর্দিকে নীরবতা বিরাজ করে এবং হট্টগোল না থাকে। আল্লাহ্ তাআলা রাত্রিকে আবরণ বলে ইশারা করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে কেবল নিদ্রাই দেননি ; বরং সারা বিশ্বে নিদ্রার উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করেছেন।

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا -মানুষের সুখ ও শান্তির জন্যে প্রয়োজনীয় আহার্য দ্রব্যাদির সরবরাহও নিতান্ত জরুরী। নতুবা নিদ্রা সাক্ষাত মৃত্যু হয়ে যাবে। যদি সারাক্ষণ রাত্রিই থাকত এবং মানুষ কেবল নিদ্রাই যেত, তবে এসব দ্রব্য কিরূপে অর্জিত হত। এর জন্যে চেষ্টা, পরিশ্রম ও দৌড়াদৌড়ি জরুরী, যা আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে সম্ভবপর। তাই বলা হয়েছে ঃ তোমাদের সুখকে পূর্ণতা দান করার জন্যে আমি কেবল রাত্রি ও তার অন্ধকার সৃষ্টি করিনি ; বরং একটি আলোকোজ্জ্বল দিনও দিয়েছি, যাতে তোমরা কাজ-কারবার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পার। অতঃপর মানুষের সুখের সেই উপকরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা আকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ উপকারী বস্তু হচ্ছে সূর্যের আলো। বলা হয়েছে ঃ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا অর্থাৎ, আমি একটি প্রোজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। এরপর মানুষের সুখের প্রয়োজনে আকাশের নীচে সৃজিত বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু মেঘমালার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

وَّأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا - معصرات শব্দটি معصرة -এর বহুবচন। এর অর্থ জলে পরিপূর্ণ মেঘমালা। এ থেকে জানা গেল যে, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। কোন কোন আয়াতে আকাশ থেকে বর্ষিত হওয়ার কথা আছে। তাতে আকাশের অর্থ আকাশের শূন্যমণ্ডল। এই অর্থে سماء শব্দের ব্যবহার কোরআনে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এছাড়া এ কথাও বলা যায় যে, কোন সময় সরাসরি আকাশ থেকেও বৃষ্টি বর্ষিত হতে পারে। এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। এসব কারিগরি ও নেয়ামত উল্লেখ করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু কেয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا অর্থাৎ, বিচারের দিন মানে কেয়ামত নির্দিষ্ট সময়ে আসবে। তখন এই বিশ্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, দু'বার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকারের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সাথে পুনরায় জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এ সময় বিশ্বের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ দলে দলে আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত হবে।

وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا অর্থাৎ, যে পাহাড়কে আজ অটল ও অনড় হওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা হয়, সেই পাহাড় স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে। سراب -এর শাব্দিক অর্থ চলে যাওয়া। মরুভূমির যে বালুকাস্তূপ দূর থেকে পানির ন্যায় ঝলমল করতে থাকে, তাকেও سراب এ কারণে বলা হয় যে, কাছে গেলেই তা অদৃশ্য হয়ে যায়। —(সেহাহ্, রাগিব)

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا -যে স্থানে বসে কারও দেখাশোনা অথবা অপেক্ষা করা হয়, তাকে مرصاد বলা হয়। এখানে জাহান্নামের অর্থ জাহান্নামের পুল তথা পুলসেরাত। সওয়াবদাতা ও শাস্তিদাতা উভয় প্রকার ফেরেশতা এখানে অপেক্ষা করবে। জাহান্নামীদেরকে শাস্তিদাতা ফেরেশতারা পাকড়াও করবে এবং জান্নাতীদেরকে সওয়াবদাতা ফেরেশতা তাদের গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাবে। —(মাযহারী)

لِّلطَّاغِينَ مَآبًا এটা إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا -এর দ্বিতীয় خبر উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক সৎ ও অসৎকে জাহান্নামের পুলের উপর দিয়ে যেতে হবে এবং জাহান্নাম সীমালংঘনকারীদের আবাসস্থল। طاغين শব্দটি طاغى -এর বহুবচন এবং طغيان থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ, অবাধ্যতা করা। طاغى এমন লোককে বলা হয়, যে অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে যায়। ঈমান না থাকলেও এটা হতে পারে। তাই এখানে طاغى অর্থ কাফের। কুবিশ্বাসী, পথভ্রষ্ট মুসলমানদের সেই দলও অর্থ হতে পারে, যারা কোরআন ও সুন্নাহ্র সীমা ডিঙ্গিয়ে যায়। যদিও প্রকাশ্যভাবে কুফর অবলম্বন করে না, যেমন রাফেযী, খারেজী ও মুতাযেলা সম্প্রদায়। —(মাযহারী)

لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا - لَّابِثِينَ শব্দটি لابث -এর বহুবচন। অর্থ অবস্থানকারী। احقاب শব্দটি حقبة -এর বহুবচন। অর্থ সুদীর্ঘ সময়। ইবনে-জরীর হযরত আলী (রাঃ) থেকে এর পরিমাণ আশি বছর বর্ণনা করেছেন, যার প্রত্যেক বছর বার মাসের, প্রত্যেক মাস ত্রিশ দিনের এবং প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের। এভাবে প্রায় দুই কোটি আটাশি বছরে এক حقبة হয়। অপর কয়েকজন সাহাবী এর পরিমাণ আশির পরিবর্তে সত্তর বছর বলেছেন। অবশিষ্ট হিসাব পূর্বের ন্যায়। —(ইবনে- কাসীর) কিন্তু মুসনাদে বাযযারে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের যাকে গোনাহের সাজায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তাকে কয়েক হুক্বা জাহান্নামে অবস্থান না করা পর্যন্ত বের করা হবে না। এক হুক্বা আশি বছরের কিছু বেশী এবং এক বছর তোমাদের বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ৩৬০ দিনের হবে। —(মাযহারী)

جَزَاءً وِّفَاقًا অর্থাৎ, জাহান্নামে তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে, তা ন্যায় ও ইনসাফের দৃষ্টিতে তাদের বাতিল বিশ্বাস ও কুকর্মের অনুরূপ হবে। এতে কোন বাড়াবাড়ি হবে না।

وَكَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾
فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾
حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَّكَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾
لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً
حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ
لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾
ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾ اِنَّآ
اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ
وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

سُوْرَةُ النّٰزِعٰتِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ﴿٢﴾ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ﴿٣﴾
فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ﴿٥﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ
الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ﴿٨﴾

(২৮) এবং আমার আয়াতসমূহে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত। (২৯) আমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি। (৩০) অতএব, তোমরা আস্বাদন কর, আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করব। (৩১) পরহেযগারদের জন্যে রয়েছে সাফল্য (৩২) উদ্যান, আঙ্গুর (৩৩) সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী। (৩৪) এবং পূর্ণ পানপাত্র। (৩৫) তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না। (৩৬) এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে যথোচিত দান, (৩৭) যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, দয়াময়, কেউ তাঁর সাথে কথার অধিকারী হবে না। (৩৮) যেদিন রূহ্ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে। (৩৯) এই দিবস সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক। (৪০) আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফের বলবেঃ হায়, আফসোস—আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।

সূরা আন্-নযিআ'ত

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৪৬ ।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে, (২) শপথ তাদের, যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে; (৩) শপথ তাদের, যারা সন্তরণ করে দ্রুতগতিতে, (৪) শপথ তাদের, যারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং (৫) শপথ তাদের যারা সকল কর্মনির্বাহ করে—কেয়ামত অবশ্যই হবে। (৬) যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী, (৭) অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাদগামী; (৮) সেদিন অনেক হৃদয় ভীত-বিহ্বল হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا অর্থাৎ, তোমরা দুনিয়াতে যেমন কুফর ও অস্বীকারে কেবল বেড়েই চলেছ—বাধ্যতামূলক মৃত্যুর সম্মুখীন না হলে আরও বেড়েই চলতে, তেমনিভাবে আজ আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের আযাব কেবল বৃদ্ধিই করবেন। অতঃপর কাফেরদের বিপরীতে মুমিন, মুত্তাকীদের সওয়াব ও জান্নাতের নেয়ামত বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নেয়ামত বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ

جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا অর্থাৎ, জাহান্নাতের এসব নেয়ামত মুমিনদের প্রতিদান এবং আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত দান। এখানে জান্নাতের নেয়ামতসমূহকে প্রথমে কর্মের প্রতিদান ও পরে খোদায়ী দান বলা হয়েছে।

لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا —এই বাক্য পূর্বের جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ বাক্যের সাথেও সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ্ তাআলা যাকে যেরূপ সওয়াব দান করবেন, তাতে কারও কথা বলার সাধ্য হবে না যে, অমুককে কম এবং অমুককে বেশী কেন দেয়া হল? যদি একে আলাদা বাক্য সাব্যস্ত করা হয়; তবে উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কারও ভাষণ দেয়ার ক্ষমতা হবে না। এই অনুমতি কোন কোন স্থানে হবে এবং কোন কোন স্থানে হবে না।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا কোন কোন তফসীরকারকের মতে রূহ্ বলে এখানে জিবরাঈল (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ করার সাধারণ উদ্দেশে ফেরেশতাগণের পূর্বে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রূহ্ আল্লাহ্ তাআলার এক বিরাট বাহিনী, যারা ফেরেশতা নয়। তাদের মাথা ও হস্তপদ আছে। এই তফসীর অনুযায়ী দুটি সারি হবে—একটি রূহের ও অপরটি ফেরেশতাগণের।

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ —বাহ্যতঃ এই দিন হচ্ছে কেয়ামতের দিন। হাশরে প্রত্যেকেই তার কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখতে পাবে—হয় আমলনামা হাতে আসার ফলে দেখবে, না হয় কাজকর্ম সব সশরীরী হয়ে সামনে এসে যাবে। কোন কোন হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত আছে। এদিন মৃত্যুর দিনও হতে পারে। এমতাবস্থায় স্বীয় কাজকর্ম দেখা কবরে ও বরযখে হতে পারে।—(মাযহারী)

وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا —হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন সমগ্র ভূপৃষ্ঠ এক সমতল ভূমি হয়ে যাবে। এতে মানব, জ্বিন, গৃহপালিত জন্তু ও বন্য জন্তু সবাইকে একত্রিত করা হবে। জন্তুদের মধ্যে কেউ দুনিয়াতে অন্য জন্তুর উপর জুলুম করে থাকলে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। এমন কি কোন শিংবিশিষ্ট ছাগল কোন শিংবিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে সেদিন তারও প্রতিশোধ নেয়া হবে। এই কর্ম সমাপ্ত হলে সব জন্তুকে আদেশ করা হবেঃ মাটি হয়ে যাও। তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এই দৃশ্য দেখে কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে—হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম! এরূপ হলে আমরা হিসাব-নিকাশ ও জাহান্নামের আযাব থেকে বেঁচে যেতাম।

সূরা আন-নাবা সমাপ্ত

সূরা আন্-নাযিআ'ত

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا - نازعات শব্দটি نزع থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোন কিছুকে উৎপাটন করা। اغراق ও غرق -এর অর্থ কোন কাজ নির্মমভাবে করা। বাকপদ্ধতিতে বলা হয়- اغرق النازع فى القوس অর্থাৎ, তীর নিক্ষেপকারী ধনুকে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছে। সূরার শুরুতে ফেরেশতাগণের কতিপয় গুণ ও অবস্থা বর্ণনা করে তাদের শপথ করা হয়েছে। শপথের জওয়াব উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, কেয়ামত ও হাশর-নশর অবশ্যই হবে। ফেরেশতাগণ এখনও সারা বিশ্বের কাজকর্ম ও শৃংখলা বিধানে নিয়োজিত রয়েছে, কিন্তু কেয়ামতের দিন যখন বস্তুনিষ্ঠ কারণাদি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং অসাধারণ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তখন ফেরেশতাগণই যাবতীয় কর্মনির্বাহ করবে। এ সম্পর্কের কারণে সূরায় তাদের শপথ করা হয়েছে।

এস্থলে ফেরেশতাগণের পাঁচটি বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে। এগুলো মানুষের মৃত্যু ও আত্মা বের করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদ্দেশ্য কেয়ামতের সত্যতা বর্ণনা করা। মানুষের মৃত্যু দ্বারা এই বর্ণনা শুরু করা হয়েছে। কেননা, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু তার জন্যে আংশিক কেয়ামত হয়ে থাকে। কেয়ামতের বিশ্বাসে এর প্রভাব অসাধারণ। প্রথম বিশেষণ- وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا অর্থাৎ, নির্মমভাবে টেনে আত্মা নির্গতকারী। এখানে আযাবের, সেসব ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা কাফেরের আত্মা নির্মমভাবে বের করে। যেহেতু এই নির্মমতা আত্মিক হয়ে থাকে, তাই দর্শকদেরও এটা অনুভব করা জরুরী নয়। এ কারণেই কাফেরদের আত্মা প্রায়ই সহজে বের হতে দেখা যায়, কিন্তু এটা কেবল আমাদের দেখার মধ্যেই। তার আত্মার উপর যে নির্মম কাণ্ড সংঘটিত হয়, তা কে দেখতে পারে। এটা তো আল্লাহ্র উক্তি থেকেই জানা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে খবর দেয়া হয়েছে যে, কাফেরদের আত্মা টেনে টেনে নির্মমভাবে বের করা হয়।

দ্বিতীয় বিশেষণ— وَالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا - ناشطات শব্দটি نشط থেকে উদ্ভূত। অর্থ, বাঁধন খুলে দেয়া। কোন কিছুতে পানি অথবা বাতাস ভর্তি থাকলে যদি তার বাঁধন খুলে দেয়া হয়, তবে সেই পানি বা বাতাস সহজে বের হয়ে যায়। এতে মুমিনের আত্মা বের করাকে এর সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, যে ফেরেশতা মুমিনের রূহ কবজ করার কাজে নিয়োজিত আছে, সে অনায়াসে রূহ্ কবজ করে—কঠোরতা করে না। এখানেও বিষয়টি আত্মিক বিধায় কোন মুসলমান বরং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় আত্মা বের হতে বিলম্ব হলে একথা বলা যায় না যে, তার প্রতি নির্মমতা করা হচ্ছে—যদিও শারীরিকভাবে নির্মমতা পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃত কারণ এই যে, কাফেরের আত্মা বের করার সময় থেকেই বরযখের আযাব সামনে এসে যায়। এতে তার আত্মা অস্থির হয়ে দেহে আত্মগোপন করতে চায়। ফেরেশতা জোরে-জবরে টানা—হেঁচড়া করে তাকে বের করে। পক্ষান্তরে মুমিনের রূহের সামনে বরযখের সওয়াব, নেয়ামত ও সুসংবাদ ভেসে উঠে। ফলে সে দ্রুতবেগে সেদিকে যেতে চায়।

তৃতীয় বিশেষণ— وَالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا - سبح -এর আভিধানিক অর্থ সন্তরণ করা। এখানে উদ্দেশ্য দ্রুতবেগে চলা। নদীপথে কোন বাধাবিঘ্ন থাকে না। সন্তরণকারী ব্যক্তি অথবা নৌকারোহী সোজা গন্তব্য স্থানের দিকে ধাবিত হয়। এই সন্তরণকারী বিশেষণটিও মৃত্যুর ফেরেশতাগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের রূহ্ কবজ করার পর তারা দ্রুতগতিতে আকাশের দিকে নিয়ে যায়।

চতুর্থ বিশেষণ— فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا উদ্দেশ্য এই যে, যে আত্মা ফেরেশতাগণের হস্তগত হয়, তাকে ভাল অথবা মন্দ ঠিকানায় পৌছানোর কাজে তারা দ্রুততায় একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যায়। তারা মুমিনের আত্মাকে জান্নাতের আবহাওয়ায় ও নেয়ামতের জায়গায় এবং কাফেরের আত্মাকে জাহান্নামের আবহাওয়ায় ও আযাবের জায়গায় পৌছিয়ে দেয়।

পঞ্চম বিশেষণ— فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا মৃত্যুর ফেরেশতাদের সর্বশেষ কাজ এই যে, যে আত্মাকে সওয়াব ও আরাম দেয়ার আদেশ হয়, তারা তার জন্যে সওয়াব ও আরামের ব্যবস্থা করে এবং যাকে আযাব ও কষ্টে রাখার আদেশ হয়, তারা তার জন্যে আযাব ও কষ্টের ব্যবস্থা করে।

أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿٩﴾ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً ﴿١١﴾ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾
فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾ هَلْ أَتَاكَ
حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾
اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ
تَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿١٩﴾ فَأَرَاهُ الْآيَةَ
الْكُبْرَىٰ ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ
فَنَادَىٰ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ
الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ ﴿٢٦﴾ أَأَنْتُمْ
أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿٢٨﴾ وَ
أَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ
دَحَاهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣٢﴾
مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾
يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ
لِمَنْ يَرَىٰ ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾

(৯) তাদের দৃষ্টি নত হবে। (১০) তারা বলে ঃ আমরা কি উলটো পায়ে প্রত্যাবর্তিত হবই—(১১) গলিত অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও? (১২) তবে তো এ প্রত্যাবর্তন সর্বনাশা হবে। (১৩) অতএব, এটা তো কেবল এক মহা-নাদ, (১৪) তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে। (১৫) মূসার বৃত্তান্ত আপনার কাছে পৌঁছেছে কি? (১৬) যখন তার পালনকর্তা তাকে পবিত্র তুয়া উপ্যকায় আহ্বান করেছিলেন, (১৭) ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে। (১৮) অতঃপর বল ঃ তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি? (১৯) আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাকে ভয় কর। (২০) অতঃপর সে তাকে মহা-নিদর্শন দেখাল। (২১) কিন্তু সে মিথ্যারোপ করল এবং অমান্য করল। (২২) অতঃপর সে প্রতিকার চেষ্টায় প্রস্থান করল। (২৩) সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহ্বান করল, (২৪) এবং বলল ঃ আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা। (২৫) অতঃপর আল্লাহ্ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দিলেন। (২৬) যে ভয় করে তার জন্যে অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে। (২৭) তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন? (২৮) তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। (২৯) তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন। (৩০) পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন। (৩১) তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাম নির্গত করেছেন (৩২) পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, (৩৩) তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (৩৪) অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে। (৩৫) অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে (৩৬) এবং দর্শকদের জন্যে জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে, (৩৭) তখন যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে; (৩৮) এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে,

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ - ساهرة অর্থ সমতল ময়দান। কেয়ামতে পুনরায় যে ভূপৃষ্ঠ সৃষ্টি করা হবে, তা সমতল হবে, এতে উঁচু-নীচু, পাহাড়-পর্বত, টিলা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। একেই ساهرة বলা হয়েছে। অতঃপর কেয়ামত অবিশ্বাসীদের হঠকারিতা ও শত্রুতার ফলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে মর্মপীড়া অনুভব করতেন, তা দূর করার উদ্দেশে হযরত মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুরা কেবল আপনাকেই কষ্ট দেয়নি, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও শত্রুদের পক্ষ থেকে দারুণ মর্মপীড়া অনুভব করেছেন। তাঁরা সবর করেছেন। অতএব, আপনারও সবর করা উচিত।

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ - نَكَالَ শব্দের অর্থ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, যা দেখে অন্যরাও আতঙ্কিত হয়ে যায়। نَكَالَ الْآخِرَةِ হল ফেরাউনের পরকালীন আযাব এবং نكال الاولى দরিয়ায় নিমজ্জিত হওয়ার আযাব। অতঃপর মরে মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর পুনর্জীবন কিরূপে হবে, কাফেরদের এই বিস্ময়ের জওয়াব দেয়া হয়েছে। এতে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃজিত বস্তুসমূহের উল্লেখ করে অসতর্ক মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে মহান সত্তা কোনরূপ উপকরণ ও হাতিয়ার ব্যতিরেকেই এসব মহাসৃষ্টিকে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি যদি এগুলোর ধ্বংসপ্রাপ্তির পর পুনরায় সৃষ্টি করে দেন, তবে এতে বিস্ময়ের কি আছে?

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا —(এক) আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করা। (দুই) পার্থিব জীবনকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার দেয়া অর্থাৎ, যে কাজ অবলম্বন করলে দুনিয়াতে সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু পরকালে তার জন্যে আযাব নির্দিষ্ট আছে, সে ক্ষেত্রে পরকালের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে দুনিয়ার সুখ ও আনন্দকেই অগ্রাধিকার দেয়া। দুনিয়াতে যে ব্যক্তির মধ্যে এই দু'টি আলামত পাওয়া যায়, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে— فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ অর্থাৎ, জাহান্নামই তার ঠিকানা।

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ
نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا ﴿٤٣﴾
إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا ﴿٤٥﴾ كَأَنَّهُمْ
يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾

سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١﴾ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ
يَزَّكَّىٰ ﴿٣﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿٤﴾ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ﴿٥﴾
فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَن
جَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشَىٰ ﴿٩﴾ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ﴿١٠﴾ كَلَّا
إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿١٢﴾ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾
مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾
قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾
مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿١٩﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿٢٠﴾

(৩৯) তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (৪০) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, (৪১) তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (৪২) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কখন হবে? (৪৩) এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? (৪৪) এর চরম জ্ঞান আপনার পালনকর্তার কাছে। (৪৫) যে একে ভয় করে, আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবেন। (৪৬) যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।

সূরা আবাসা

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৪২।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। (২) কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল। (৩) আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত, (৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশ তার উপকার হত। (৫) পরন্তু যে বেপরোয়া, (৬) আপনি তার চিন্তায় মশগুল। (৭) সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। (৮) যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো (৯) এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে, (১০) আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। (১১) কখনও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশবাণী। (১২) অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ করবে। (১৩—১৪) এটা লিখিত আছে সম্মানিত, উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে, (১৫) লিপিকারের হস্তে, (১৬) যারা মহৎ, পূত চরিত্র। (১৭) মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ! (১৮) তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? (১৯) শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে সুপরিমিত করেছেন। (২০) অতঃপর তার পথ সহজ করেছেন,

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এরপর জান্নাতীদেরও দু'টি বিশেষ আলামত বর্ণনা করা হয়েছে, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ —(এক) দুনিয়াতে প্রত্যেক কাজের সময় এরূপ ভয় করা যে, একদিন আল্লাহ্ তাআলার সামনে উপস্থিত হয়ে এ কাজের হিসাব দিতে হবে। (দুই) অবৈধ খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এই দু'টি গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়, কোরআন পাক তাকে সুসংবাদ দেয় فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ অর্থাৎ, জান্নাতই তার ঠিকানা।

সূরা আবাসা

শানে নুযূলে বর্ণিত অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে-মকতুম (রাঃ)-এর ঘটনায় ইমাম বগভী (রহঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) অন্ধ হওয়ার কারণে একথা জানতে পারেননি যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অন্যের সাথে আলোচনারত আছেন। তিনি মজলিসে প্রবেশ করেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আওয়াজ দিতে শুরু করেন এবং বার বার আওয়াজ দেন।—(মাযহারী) ইবনে-কাসীরের এক রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কোরআনের একটি আয়াতের পাঠ জিজ্ঞেস করেন এবং সাথে সাথে জওয়াব দিতে পীড়াপীড়ি করেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন মক্কার কাফের নেতৃবর্গকে উপদেশদানে মশগুল ছিলেন। এই নেতৃবর্গ ছিলেন ওতবা ইবনে রবীয়া, আবু জাহ্ল ইবনে-হেশাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পিতৃব্য আব্বাস। তিনি তখনও মুসলমান হননি। এরূপ ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে-উম্মে মকতুম (রাঃ)-এর এভাবে কথা বলা এবং আয়াতের ভাষা ঠিক করার মামুলী প্রশ্ন রেখে তাৎক্ষণিক জওয়াবের জন্য পীড়াপীড়ি করা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, আবদুল্লাহ্ (রাঃ) পাক্কা মুসলমান ছিলেন এবং সদাসর্বদা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই প্রশ্ন অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তাঁর জওয়াব বিলম্বিত করার মধ্যে কোন ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা ছিল না।

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ প্রথম শব্দের অর্থ রুষ্টতা অবলম্বন করা এবং চোখে-মুখে বিরক্তি প্রকাশ করা। দ্বিতীয় শব্দের অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেয়া। এটা মুখোমুখি সম্বোধন করে উপস্থিত পদবাচ্য দ্বারা এসব কথা বলার স্থান ছিল। কিন্তু তা না করে কোরআন পাক অনুপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করেছে। এতে ভর্ৎসনার স্থলেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং ধারণা দেয়া হয়েছে যে, কাজটি যেন অন্য কেউ করেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এরূপ করা আপনার পক্ষে সমীচীন হয়নি। পরবর্তী وَمَا يُدْرِيكَ (আপনি কি জানেন?) বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওযরের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, আপনার মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ হয়নি যে, সাহাবীর জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উপকারিতা নিশ্চিত এবং কাফেরদের সাথে আলোচনার উপকারিতা অনিশ্চিত। এ বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্যের পরিবর্তে উপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করার মধ্যেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে। কেননা, যদি কোথাও উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা না হত, তবে সন্দেহ হতে পারত যে, এই

কর্মপদ্ধতি অপছন্দ করার কারণেই মুখোমুখি সম্বোধন বর্জন করা হয়েছে। এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে অসহনীয় কষ্টের কারণ হত। সুতরাং প্রথম বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা এবং দ্বিতীয় বাক্যে উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা—উভয়টির মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে।

لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ - أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ —অর্থাৎ আপনি কি জানেন, এই সাহাবী যা জিজ্ঞেস করছিল, তা তাকে শিক্ষা দিলে সে তদ্দ্বারা পরিশুদ্ধ হতে পারত, কিংবা কমপক্ষে আল্লাহ্কে স্মরণ করে প্রাথমিক উপকার লাভ করতে পারত। ذكرى শব্দের অর্থ আল্লাহ্কে বহুল পরিমাণে স্মরণ করা।—(সেহাহ্)

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আপনার ও আপনার ধর্মের প্রতি বেপরওয়া ভাব প্রদর্শন করছে, আপনি তার চিন্তায় মশগুল আছেন যে, সে কোনরূপে মুসলমান হোক। অথচ এটা আপনার দায়িত্ব নয়। সে মুসলমান না হলে আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধর্মের জ্ঞান অন্বেষণে দৌড়ে আপনার কাছে আসে এবং সে আল্লাহ্কে ভয়ও করে, আপনি তার দিকে মনোযোগ দেন না। এতে সুস্পষ্টভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, শিক্ষা, সংশোধন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুলমানদেরকে পাকাপোক্ত মুসলমান করা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী। এর চিন্তা অধিক করা উচিত। অতঃপর কোরআন যে উপদেশবাণী এবং উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ – صحف বলে লওহে-মাহ্ফূয বোঝানো হয়েছে। এটা যদিও এক বস্তু, কিন্তু সমস্ত ঐশী সহীফা এতে লিখিত আছে বলে একে বহুবচনে প্রকাশ করা হয়েছে। مرفوعة বলে এর উচ্চমর্যাদা বোঝানো হয়েছে এবং مطهرة বলে বোঝানো হয়েছে যে, নাপাক মানুষ, হায়েয ও নেফাসওয়ালী নারী এবং ওযূহীন ব্যক্তি একে স্পর্শ করতে পারে না।

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ – سفرة শব্দটি سافر -এর বহুবচন হতে পারে। অর্থ হবে লিপিকার। এমতাবস্থায় এই শব্দ দ্বারা ফেরেশতা কেরামুন-কাতেবীন অথবা পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের ওহী লেখকগণকে বোঝানো হবে। এটা হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) ও মুজাহিদ (রহঃ)-এর তফসীর।

سفرة শব্দটি سفير -এর বহুবচনও হতে পারে। অর্থ দূত। এমতাবস্থায় এর দ্বারা দূত ফেরেশতা, পয়গম্বরগণ এবং ওহী লেখক সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হয়েছে। আলেমগণও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কেননা, তাঁরাও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও উম্মতের মধ্যবর্তী দূত। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেরাআতে বিশেষজ্ঞ কোরআন পাঠকও এই আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। আর যে ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ নয় ; কিন্তু কষ্টে-সৃষ্টে কেরাআত শুদ্ধ করে নেয়, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে, কেরাআতের সওয়াব ও কষ্ট করার সওয়াব। এ থেকে জানা গেল যে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অনেক সওয়াব পাবে।—(মাযহারী)

অতঃপর মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব নেয়ামত ভোগ করে, সেসব নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো বস্তুনিষ্ঠ ও অনুভূত বিষয়। সামান্য চেতনাশীল ব্যক্তিও এগুলো বুঝতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রথমে مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ বলে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, হে মানুষ, চিন্তা কর, আল্লাহ্ তোমাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? এই প্রশ্নের জওয়াব নির্দিষ্ট—অন্য কোন জওয়াব হতেই পারে না। তাই নিজেই জওয়াব দিয়েছেন- مِن نُّطْفَةٍ অর্থাৎ, মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ অর্থাৎ,কেবল বীর্য থেকে মানুষকে সৃষ্টিই করেননি ; বরং তাকে সুপরিমিতও করেছেন। তার গঠন প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, গ্রন্থি, চক্ষু, নাক, কান ইত্যাদি এমন সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, একটু এদিক-সেদিক হলে মানুষের আকৃতিই বিগড়ে যেত এবং কাজকর্ম দুরূহ হয়ে যেত।

قدره - শব্দের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, মানুষ যখন মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হতে থাকে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তার চারটি বিষয়ের পরিমাণ লিখে দেন—(১) সে কি কাজ করবে এবং কিরূপে করবে, (২) তার বয়স কত হবে, (৩) কি পরিমাণ রিযিক পাবে এবং (৪) পরিণামে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা হবে।—(বোখারী-মুসলিম,)

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় রহস্য-বলে মাতৃগর্ভের তিন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এবং সংরক্ষিত জায়গায় মানুষকে সৃষ্টি করেন। যার গর্ভে এই সৃষ্টিকর্ম চলে, সে নিজেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানে না। এরপর আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তিই এই জীবিত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষের মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে আসার পথ সহজ করে দেয়। চার পাঁচ পাউণ্ড ওজনের দেহটি সহীহ-সালামতে বাইরে চলে আসে এবং মায়েরও এতে তেমন কোন দৈহিক ক্ষতি হয় না।

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴿٢١﴾ ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ﴿٢٤﴾ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَّ عِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ﴿٣١﴾ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾ فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿٣٤﴾ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

سورة التكوير مكية

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾

(২১) অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন তাকে। (২২) এরপর যখন ইচ্ছা করবেন তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (২৩) সে কখনও কৃতজ্ঞ হয়নি, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি। (২৪) মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, (২৫) আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি, (২৬) এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি। (২৭) অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, (২৮) আঙ্গুর, শাক-সব্জী (২৯) যয়তুন, খর্জুর, (৩০) ঘন উদ্যান, (৩১) ফল এবং ঘাস (৩২) তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (৩৩) অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে, (৩৪) সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে (৩৫) তার মাতা, তার পিতা, (৩৬) তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। (৩৭) সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। (৩৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, (৩৯) সহাস্য ও প্রফুল্ল। (৪০) এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি ধূসরিত। (৪১) তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। (৪২) তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল।

সূরা আত্-তাকভীর

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ২৯।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, (২) যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, (৩) যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে, (৪) যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে; (৫) যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, (৬) যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (৭) যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে,

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ —নেয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে মানবসৃষ্টির সূচনা বর্ণনা করার পর পরিণতি অর্থাৎ, মৃত্যু ও কবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে কোন বিপদ নয়—নেয়ামত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ **تحفة المؤمن الموت** -মৃত্যু মুমিনের জন্য উপঢৌকন-স্বরূপ। এর মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। **فَاَقْبَرَهٗ** অর্থাৎ, অতঃপর তাকে কবরস্থ করেছেন। বলাবাহুল্য, এটাও এক নেয়ামত। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় যেখানে মরে সেখানেই পচে-গলে যেতে দেননি; বরং তাকে গোসল দিয়ে পাক-সাফ কাপড় পরিয়ে সম্মান সহকারে কবরে দাফন করে দেয়া হয়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, মৃত মানুষকে দাফন করা ওয়াজিব।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ —এতে অবিশ্বাসী মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, উপরোক্ত খোদায়ী নিদর্শনাবলী ও নেয়ামতরাজির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ছিল এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর বিধানাবলী পালন করা। কিন্তু হতভাগ্য মানুষ তা করেনি। অতঃপর মানবসৃষ্টির সূচনা ও পরিসমাপ্তির মাঝখানে যেসব নেয়ামত মানুষ ভোগ করে, সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষের রিযিক কিভাবে সৃষ্টি করা হয়? কিভাবে আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়ে মাটির নীচে চাপাপড়া বীজকে সজীব ও সতেজ করে তোলে। ফলে একটি সরু ও ক্ষীণকায় অঙ্কুর মাটি ভেদ করে উপরে উঠে। অতঃপর তা থেকে হরেক রকমের শস্য, ফল-মূল ও বাগ-বাগিচা সৃষ্টি হয়। এসব নেয়ামত সম্পর্কে মানুষকে বার বার অবহিত করার পর পরিশেষে আবার কেয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ - **صاخة** এমন কঠোর নাদ; যার ফলে মানুষ শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলে। এখানে কেয়ামতের হট্টগোল তথা শিংগার ফুঁক বোঝানো হয়েছে।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ এখানে হাশরের ময়দানে সকলের সমাবেশের দিন বোঝানো হয়েছে। সেদিন প্রত্যেক মানুষ আপন চিন্তায় বিভোর হবে। দুনিয়াতে যেসব আত্মীয়তা ও সম্পর্কের কারণে মানুষ একে অপরের জন্যে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না, হাশরে তারাই নিজ নিজ চিন্তায় এমন নিমগ্ন হবে যে, কেউ কারও খবর নিতে পারবে না; বরং সামনে দেখলেও মুখ লুকাবে। প্রত্যেক মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে এবং পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে ফিরবে। দুনিয়াতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ভ্রাতাদের মধ্যে হয়। এর চেয়ে বেশী পিতা-মাতাকে সাহায্য করার চিন্তা করা হয় এবং স্বভাবগত কারণে এর চেয়েও বেশী স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আয়াতে নীচ থেকে উপরের সম্পর্ক যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর হাশরের ময়দানে মুমিন ও কাফেরের পরিণতি বর্ণনা করে সূরার ইতি টানা হয়েছে।

সূরা আত্-তাকভীর

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ — **تكوير** —এর এক অর্থ জ্যোতিহীন হওয়া। হাসান বসরী (রহঃ) এই তফসীরই করেছেন। এর অপর অর্থ নিক্ষেপ

করাও হয়ে থাকে। রবী ইবনে খায়সাম (রহঃ) এই তফসীর করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, সূর্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে এবং সূর্যের উত্তাপে সারা সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। এই দুই তফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, এটা সম্ভবপর যে, প্রথমে সূর্যকে জ্যোতিহীন করে দেয়া হবে, অতঃপর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। সহীহ্ বোখারীতে আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন চন্দ্র-সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। মুসনাদে আহমদে আছে, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এই আয়াত প্রসঙ্গে আরও কয়েকজন তফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা সূর্য, চন্দ্র ও সমস্ত নক্ষত্রকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন, অতঃপর এর উপর প্রবল বাতাস প্রবাহিত হবে। ফলে সারা সমুদ্র অগ্নি হয়ে যাবে। এভাবে চন্দ্র, সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে—এ উভয় কথাই ঠিক হয়ে যায়। কেননা, সারা সমুদ্র তখন জাহান্নাম হয়ে যাবে। — (মাযহারী, কুরতুবী)

وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ - انكدار -এর অর্থ পতিত হওয়া। পূর্ববর্তীগণ থেকে এই তফসীর বর্ণিত রয়েছে। আকাশের সব নক্ষত্র সমুদ্রে পতিত হবে। পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতসমূহে এর বিবরণ রয়েছে।

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ — আরবের রীতি অনুযায়ী দৃষ্টান্তস্বরূপ একথা বলা হয়েছে। কেননা, কোরআনে আরবদেরকেই প্রথমে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের কাছে দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী বিরাট ধনরূপে গণ্য হত। তারা এর দুগ্ধ ও বাচ্চার অপেক্ষা করত। ফলে একে দৃষ্টির আড়াল হতে দিত না এবং কখনও স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত না।

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ — تسجير —এর অর্থ অগ্নিসংযোগ করা ও প্রজ্বলিত করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই অর্থই নিয়েছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন মিশ্রিত করা। এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রথমে লোনা সমুদ্র ও মিঠা সমুদ্র একাকার করা হবে। মাঝখানের অন্তরায় শেষ করে দেয়া হবে। ফলে উভয় প্রকার সমুদ্রের পানি মিশ্রিত হয়ে যাবে। অতঃপর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এতে নিক্ষেপ করে সমস্ত পানিকে অগ্নি তথা জাহান্নামে পরিণত করা হবে। — (মাযহারী)

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ — অর্থাৎ, যখন হাশরে সমবেত লোকদেরকে বিভিন্ন দলে দলবদ্ধ করে দেয়া হবে। এই দলবদ্ধকরণ ঈমান ও কর্মের দিক দিয়ে করা হবে। কাফের এক জায়গায় ও মুমিন এক জায়গায়। কাফের এবং মুমিনের মধ্যেও কর্ম এবং অভ্যাসের পার্থক্য থাকে। এদিক দিয়ে কাফেরদেরও বিভিন্ন প্রকার দল হবে আর মুমিনদেরও বিশ্বাস এবং কর্মের ভিত্তিতে দল হবে। বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন, যারা ভাল হোক মন্দ হোক একই প্রকার কর্ম করবে, তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। উদাহরণতঃ আলেমগণ এক জায়গায়, এবাদতকারী সংসারবিমুখগণ এক জায়গায়, জেহাদকারী গাযীগণ এক জায়গায় এবং সদ্কা-খয়রাতে বৈশিষ্ট্যের অধিকারীগণ এক জায়গায় সমবেত হবে। এমনিভাবে মন্দ লোকদের মধ্যে চোর-ডাকাতকে এক জায়গায়, ব্যভিচারীকে এক জায়গায় এবং অন্যান্য বিশেষ গোনাহে অংশগ্রহণকারীদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ হাশরে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বজাতির সাথে থাকবে (কিন্তু এই জাতীয়তা বংশ অথবা দেশভিত্তিক হবে না; বরং কর্ম ও বিশ্বাসভিত্তিক হবে।) তিনি এর প্রমাণস্বরূপ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً আয়াতখানি পেশ করেন। অর্থাৎ, হাশরে লোকদের তিনটি প্রধান দল হবে — (১) পূর্ববর্তী সৎকর্মী লোকদের, (২) আসহাবুল ইয়ামীনের এবং (৩) আসহাবুশ-শিমালের দল। প্রথমোক্ত দুই দল মুক্তি পাবে এবং তৃতীয় দলটি হবে কাফের পাপাচারীদের। তারা মুক্তি পাবে না।

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ۝٨ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝٩ وَإِذَا الصُّحُفُ
نُشِرَتْ ۝١٠ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝١١ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝١٢
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝١٣ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝١٤ فَلَا
أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝١٥ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝١٦ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝١٧
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝١٨ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝١٩ ذِي
قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝٢٠ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝٢١ وَ
مَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ۝٢٢ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۝٢٣
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝٢٤ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ
رَّجِيمٍ ۝٢٥ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۝٢٦ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝٢٧
لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۝٢٨ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝٢٩

سورة الانفطار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ۝١ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْبِحَارُ
فُجِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝٤ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝٥

(৮) যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, (৯) কি অপরাধে তাকে হত্যা করা করা হল? (১০) যখন আমলনামা খোলা হবে, (১১) যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, (১২) যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে (১৩) এবং যখন জান্নাত সন্নিকটবর্তী হবে, (১৪) তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে। (১৫) আমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে যায়, (১৬) চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়, (১৭) শপথ নিশাবসান ও (১৮) প্রভাত আগমন কালের, (১৯) নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী, (২০) যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী, (২১) সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন। (২২) এবং তোমাদের সাথী পাগল নন। (২৩) তিনি সেই ফেরেশতাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। (২৪) তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপণতা করেন না। (২৫) এটা বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়। (২৬) অতএব, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? (২৭) এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্যে উপদেশ, (২৮) তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়। (২৯) তোমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।

সূরা আল-ইনফিতার

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ১৯।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে, (৩) যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (৪) এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে, (৫) তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ — موءودة -এর অর্থ জীবন্ত প্রোথিত কন্যা। জাহেলিয়াত যুগের আরবরা কন্যা-সন্তানকে লজ্জাকর মনে করত এবং জীবন্তই মাটিতে প্রোথিত করে দিত। ইসলাম এই কুপ্রথার মূলোৎপাটন করে।

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ - كشط —এর আভিধানিক অর্থ জন্তুর চামড়া খসানো। বাহ্যতঃ এটা প্রথম ফুঁকের সময়কার অবস্থা, যা এই দুনিয়াতেই ঘটবে। আকাশের সৌন্দর্য সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ জ্যোতিহীন হয়ে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। আকাশের বর্তমান আকার-আকৃতি বদলে যাবে। এই অবস্থাকে كشط শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ লিখেছেন গুছিয়ে নেয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, মাথার উপর ছাদের ন্যায় বিস্তৃত এই আকাশকে গুছিয়ে নেয়া হবে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ অর্থাৎ, কেয়ামতের উপরোক্ত পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ, সৎকর্ম কিংবা অসৎকর্ম — সব তার দৃষ্টির সামনে এসে যাবে — আমলনামায় লিখিত অবস্থায় অথবা অন্য কোন বিশেষ পন্থায়। হাদীস থেকে এরূপই জানা যায়।

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ অর্থাৎ, এই কোরআন একজন সম্মানিত দূতের আনীত কালাম। তিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাশীল, ফেরেশতাগণের মান্যবর এবং আল্লাহ্‌র বিশ্বাসভাজন। পয়গাম আনা-নেয়ার কাজে তার তরফ থেকে বিশ্বাসভঙ্গ ও কম-বেশী করার সম্ভাবনা নেই। এখানে رَسُولٍ كَرِيمٍ বলে বাহ্যতঃ জিবরাঈল (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। পয়গম্বরগণের ন্যায় ফেরেশতাগণের বেলায়ও রসূল শব্দ ব্যবহৃত হয়। উল্লেখিত সবগুলো বিশেষণ জিবরাঈল (আঃ)-এর জন্যে বিনা দ্বিধায় প্রযোজ্য। তিনি যে শক্তিশালী, সূরা নজমে তার পরিষ্কার উল্লেখ আছে عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ তিনি যে, আরশ ও আকাশবাসী ফেরেশতাগণের মান্যবর, তা মেরাজের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সাথে নিয়ে আকাশে পৌঁছলে তাঁর আদেশে ফেরেশতারা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়। তিনি যে أمين — তথা বিশ্বাসভাজন, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কোন কোন তফসীরবিদ رسول أمين —এর অর্থ নিয়েছেন মুহাম্মদ (সাঃ)। তাঁরা উল্লেখিত বিশেষণগুলোকে কিছু কিছু সদর্থ করে তাঁর জন্যে প্রযোজ্য করেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাহাত্ম্য এবং কাফেরদের অলীক অভিযোগের জওয়াব দেয়া হয়েছে। وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ —যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে উম্মাদ বলত, এতে তাদেরকে জওয়াব দেয়া হয়েছে।

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ — অর্থাৎ, তিনি জিবরাঈল (আঃ)-কে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। সূরা নজমে আছে فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ এই দেখার কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে পরিচিত ছিলেন, তাঁকে আসল আকার-আকৃতিতেও দেখেছিলেন। তাই এই ওহীতে কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

সূরা তাকভীর সমাপ্ত

يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ الَّذِي خَلَقَكَ
فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝ كَلَّا بَلْ
تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ وَإِنَّ
الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝ وَمَا هُمْ
عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝ ثُمَّ مَا
أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ
شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْعُوثُونَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ۝ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ
مَا سِجِّينٌ ۝ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

(৬) হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। (৮) তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। (৯) কখনও বিভ্রান্ত হয়ো না; বরং তোমরা দান-প্রতিদানকে মিথ্যা মনে কর। (১০) অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। (১১) সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। (১২) তারা জানে যা তোমরা কর। (১৩) সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে। (১৪) এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে ; (১৫) তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে। (১৬) তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না। (১৭) আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? (১৮) অতঃপর আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? (১৯) যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্র।

সূরা আত্-তাত্ফীফ
মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ৩৬।।
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু—

(১) যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ, (২) যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় (৩) এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। (৪) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। (৫) সেই মহাদিবসে, (৬) যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে। (৭) এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। (৮) আপনি জানেন, সিজ্জীন কি? (৯) এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (১০) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের,

সূরা আল-ইনফিতার

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ অর্থাৎ, আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, নক্ষত্র-সমূহ ঝরে পড়া, মিঠা ও লোনা সমুদ্র একাকার হয়ে যাওয়া, কবর থেকে মৃতদের বের হয়ে আসা ইত্যাকার কেয়ামতের ঘটনা যখন ঘটে যাবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়েছে। অগ্রে প্রেরণ করার এক অর্থ কাজ করা এবং পশ্চাতে ছাড়ার অর্থ কাজ না করা। সুতরাং কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে সৎ অসৎ কি কর্ম করেছে এবং সৎ অসৎ কি কর্ম করেনি। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, অগ্রে প্রেরণ করেছে মানে যে কর্ম সে নিজে করেছে এবং পশ্চাতে ছেড়েছে মানে যে কর্ম সে নিজে তো করেনি, কিন্তু তার ভিত্তি ও প্রথা স্থাপন করে এসেছে। কাজটি সৎ হলে তার সওয়াব সে পেতে থাকবে এবং অসৎ হলে তার গোনাহ্ আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম সুন্নত ও নিয়ম চালু করে, সে তার সওয়াব সব সময় পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কুপ্রথা অথবা পাপ কাজ চালু করে, যতদিন মানুষ এই পাপ কাজ করবে, ততদিন তার আমলনামায় এর গোনাহ্ লিখিত হতে থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কেয়ামতের ভয়াবহ কাজ-কারবার উল্লেখিত হয়েছে। এই আয়াতে মানুষের সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো নিয়ে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ আল্লাহ্ ও রসুল (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত এবং তাঁদের নির্দেশাবলীর চুল পরিমাণও বিরুদ্ধাচরণ করত না। কিন্তু মানুষ ভুল-ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। তাই সাবধান করার উদ্দেশে প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ হে মানুষ, তোমার সূচনা ও পরিণামের এসব অবস্থা সামনে থাকা সত্ত্বেও তোমাকে কিসে বিভ্রান্ত করল যে, আল্লাহ্র নাফরমানী শুরু করেছ?

এখানে মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তদুপরি তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুবিন্যস্ত করেছেন। এরপর বলা হয়েছে— فَعَدَلَكَ অর্থাৎ, তোমার অস্তিত্বকে বিশেষ সমতা দান করেছেন, যা অন্য প্রাণীর মধ্যে নেই। মানব সৃষ্টিতে যদিও রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল, পিত্ত ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী উপকরণ শামিল রয়েছে, কিন্তু খোদায়ী রহস্য এগুলোর সমন্বয়ে একটি সুষম মেজায তৈরী করে দিয়েছে। এরপর তৃতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে —

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সব মানুষকে একই আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেননি। এরূপ করলে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য থাকত না। বরং তিনি কোটি কোটি মানুষের আকার-আকৃতি এমনভাবে গঠন করেছেন যে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

সৃষ্টির এসব প্রারম্ভিক পর্যায় বর্ণনার পর বলা হয়েছে يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ হে অনবধান মানব, যে পালনকর্তা তোমার মধ্যে এতসব গুণ গচ্ছিত রেখেছেন, তাঁর ব্যাপারে তুমি কিরূপে ধোঁকা খেলে

যে, তাঁকে ভুলে গেছ এবং তাঁর নির্দেশাবলী অমান্য করছ? তোমার দেহের প্রতিটি গ্রন্থিই তো তোমাকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় এই বিভ্রান্তি কিরূপে হল? এখানে كريم শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের ধোঁকায় পড়ার কারণ এই যে, আল্লাহ্ মহানুভব। তিনি দয়া ও কৃপার কারণে মানুষের গোনাহের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না, এমন কি তার রিযিক, স্বাস্থ্য ও পার্থিব সুখ-শান্তিতেও কোন বিঘ্ন ঘটান না। এতেই মানুষ ধোঁকা খেয়ে গেছে। অথচ সামান্য বুদ্ধি খাটালে এই দয়া ও কৃপা বিভ্রান্তির কারণ হওয়ার পরিবর্তে পালনকর্তার অনুগ্রহের কাছে ঋণী হয়ে আরও বেশী আনুগত্যের কারণ হওয়া উচিত ছিল।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন: كم من مغرور تحت الستروهو لا يشعر অর্থাৎ, অনেক মানুষের দোষ-ত্রুটি ও গোনাহের উপর আল্লাহ্ তাআলা পর্দা ফেলে রেখেছেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করেননি। ফলে তারা আরও বেশী ধোঁকায় পড়ে গেছে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ পূর্ববর্তী إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

مَّا قَدَّمَتْ আয়াতে যে কর্ম সামনে আসার কথা বলা হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতে তারই শাস্তি ও প্রতিদান উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যারা সৎকর্ম করত, তারা নেয়ামতে তথা জান্নাতে থাকবে এবং অবাধ্য ও নাফরমানরা জাহান্নামে থাকবে।

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ অর্থাৎ, জাহান্নামীরা কোন সময় জাহান্নাম থেকে পৃথক হবে না। কারণ, তাদের জন্যে চিরকালীন আযাবের নির্দেশ আছে। لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় অন্যের কোন উপকার করতে পারবে না এবং কারও কষ্ট লাঘবও করতে পারবে না। এতে সুপারিশ করবে না, এরূপ বোঝা যায় না। কেননা, কারও সুপারিশ করা নিজ ইচ্ছায় হবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ কাউকে কারও সুপারিশ করার অনুমতি না দেন। তাই আল্লাহ্ তাআলাই আসল আদেশের মালিক। তিনি স্বীয় কৃপায় কাউকে সুপারিশের অনুমতি দিলে এবং তা কবুল করলে তাও তাঁরই আদেশ হবে।

সূরা আত্-তাতফীক

সূরা তাত্ফীফ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর মতে মক্কায় অবতীর্ণ এবং হযরত ইবনে-আব্বাস, কাতাদাহ (রাঃ), মুকাতিল ও যাহ্হাক (রহঃ)-এর মতে মদীনায় অবতীর্ণ, কিন্তু মাত্র আটটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। ইমাম নাসাঈ (রহঃ) হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মদীনায় তশরীফ আনেন, তখন মদীনাবাসীদের সাধারণ কাজ-কারবার 'কায়ল' তথা মাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হত। তারা এ ব্যাপারে চুরি করা ও কম মাপায় খুবই অভ্যস্ত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা তাত্ফীফ অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) আরও বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় পৌঁছার পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়। কারণ, মদীনাবাসীদের মধ্যে তখন এ বিষয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল যে, তারা নিজেরা কারও কাছ থেকে সওদা নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করত এবং অন্যের কাছে বিক্রি করার সময় মাপে কম দিত। এই সূরা নাযিল হওয়ার পর তারা এই বদ-অভ্যাস থেকে বিরত হয় এবং এমন বিরত হয় যে, আজ পর্যন্ত তাদের সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত। —(মাযহারী)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ — تطفيف এর অর্থ মাপে কম করা। যে এরূপ করে, তাকে বলা হয় مطفف কোরআনের এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাপে কম দেয়া হারাম।

تطفيف কেবল মাপে কম করার মধ্যেই সীমিত নয়; বরং যে কোন ব্যাপারে প্রাপককে প্রাপ্য থেকে কম দেয়াও تطفيف এর অন্তর্ভুক্ত: কোরআন ও হাদীসে মাপ ও ওজনে কম করাকে হারাম করা হয়েছে। সাধারণভাবে কাজ-কারবারে লেন-দেন এরই দুই উপায়েই সম্পন্ন হয় এবং প্রাপকের প্রাপ্য আদায় হল কি না, তা এই দুই উপায়েই নির্ণীত হয়। প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় দেয়াই যে এর উদ্দেশ্য, একথা বলাই বাহুল্য। অতএব বোঝা গেল যে, এটা শুধু মাপ ও ওজনের মধ্যেই সীমিত থাকবে না; বরং মাপ ও ওজনের মাধ্যমে হোক, গণনার মাধ্যমে হোক অথবা অন্য যে কোন পন্থায় প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে তা تطفيف এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

মুয়াত্তা ইমাম মালেকে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাযের রুকু-সেজদা ইত্যাদি ঠিকমত করে না এবং দ্রুত নামায শেষ করে দেয়। তিনি তাকে বললেন: لقد طففت অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ্র প্রাপ্য আদায়ে تطفيف করেছ। এই উক্তি উদ্ধৃত করে হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন: لكل شئ وفاء وتطفيف অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় দেয়া ও কম করা আছে, এমনকি, নামায ও ওযূর মধ্যেও। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অন্যান্য হক ও এবাদতে এবং বান্দার নির্দিষ্ট হকে ত্রুটি ও কম করে, সেও تطفيف এর অপরাধে অপরাধী। মজুর, কর্মচারী ও যতটুকু সময় কাজ করার চুক্তি করে, তাতে কম করাও অন্যায় এবং প্রচলিত নিয়মের বরখেলাফ, কাজে অলসতা করাও নাজায়েয।

সিজ্জীন ও ইল্লিয়্যীন: كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ - سجن -এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় বন্দী করা। কামূসে আছে— سِجِّينٍ -এর অর্থ চিরস্থায়ী কয়েদ। হাদীস ও রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, سِجِّينٍ একটি বিশেষ স্থানের নাম। এখানে কাফেরদের রূহ অবস্থান করে এবং এখানেই তাদের আমলনামা থাকে। এখানে এটাও সম্ভবপর যে, এস্থানে এমন কোন খাতা আছে, যাতে সারা বিশ্বের কাফেরদের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ -এস্থলে- مرقوم -এর অর্থ مختوم (মোহরকৃত)। ইমাম বগভী ও ইবনে-কাসীর (রহঃ) বলেন: এটা সিজ্জীনের তফসীর নয়; বরং পূর্ববর্তী كِتَابَ الْفُجَّارِ -এর বর্ণনা। অর্থ এই যে, কাফের ও পাপাচারীদের আমলনামা মোহর লাগিয়ে সংরক্ষিত করা হবে। ফলে এতে হ্রাস-বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকবে না। এই সংরক্ষণের স্থান হবে সিজ্জীন। এখানেই কাফেরদের রূহ জমা করা হবে।

الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۞ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۞ كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۞ كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۞ ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ۞ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۞ كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ۞ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۞ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۞ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۞ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۞ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۞ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۞ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۞ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ۜ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۞ وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۞ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ۞ وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۞ وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۞ وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ۞ وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۞

(১১) যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যারোপ করে। (১২) প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠই কেবল একে মিথ্যারোপ করে। (১৩) তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে ঃ পুরাকালের উপকথা। (১৪) কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। (১৫) কখনও না, তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। (১৬) অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৭) এরপর বলা হবে ঃ একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে। (১৮) কখনও না, নিশ্চয় সৎলোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যীনে। (১৯) আপনি জানেন ইল্লিয়্যীন কি? (২০) এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (২১) আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ একে প্রত্যক্ষ করে। (২২) নিশ্চয় সৎলোকগণ থাকবে পরম আরামে, (২৩) সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে। (২৪) আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন। (২৫) তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। (২৬) তার মোহর হবে কস্তুরী। এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। (২৭) তার মিশ্রণ হবে তসনীমের পানি। (২৮) এটা একটা ঝরণা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ। (২৯) যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করত। (৩০) এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। (৩১) তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। (৩২) আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলত ঃ নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত। (৩৩) অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয়নি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ — رين শব্দটি ران থেকে উদ্ভূত। অর্থ মরিচা ও ময়লা। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অন্তরে পাপের মরিচা পড়ে গেছে। মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের অন্তরের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে তারা ভাল ও মন্দের পার্থক্য বোঝে না।

اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ — অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন এই কাফেররা তাদের পালনকর্তার যেয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, সেদিন মুমিন ও ওলীগণ আল্লাহ্ তাআলার যেয়ারত লাভ করবে। নতুবা কাফেরদেরকে পর্দার অন্তরালে রাখার কোন উপকারিতা নেই।

اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ - কারও কারও মতে **علين** শব্দটি **علو** -এর বহুবচন। উদ্দেশ্য উচ্চতা। ফাররা (রহঃ)-এর মতে এটা এক জায়গার নাম— বহুবচন নয়। পূর্বোল্লেখিত বারা ইবনে আযেব (রাঃ)-এর হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইল্লিয়্যীন সপ্তম আকাশে আরশের নীচে এক স্থানের নাম। এতে মুমিনদের রূহ ও আমলনামা রাখা হয়। পরবর্তী **كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ** বাক্যটিও ইল্লিয়্যীনের তফসীর নয়— সৎলোকদের আমলনামার বর্ণনা। উপরে **اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ** বাক্যে এই আমলনামার উল্লেখ আছে।

يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ — يشهد শব্দটি **شهود** থেকে উদ্ভূত। অর্থ উপস্থিত হওয়া, প্রত্যক্ষ করা। কোন কোন তফসীরকারকের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সৎকর্মশীলদের আমলনামা নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ দেখবে অর্থাৎ, তত্ত্বাবধান ও হেফাযত করবে। — (কুরতুবী) **شهود** -এর অর্থ উপস্থিত হওয়া নেয়া হলে **يشهده** -এর সর্বনাম দ্বারা ইল্লিয়্যীন বোঝানো হবে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, নৈকট্যশীলগণের রূহ্ এই ইল্লিয়্যীন নামক স্থানে উপস্থিত হবে। কারণ, এটাই তাদের আবাসস্থল ; যেমন সিজ্জীন কাফেরদের রূহের আবাসস্থল। সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর বর্ণিত একটি হাদীস এর প্রমাণ। এই হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ শহীদগণের রূহ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে সবুজ পাখীদের মধ্যে থাকবে এবং জান্নাতের বাগ-বাগিচা ও নহরসমূহে ভ্রমণ করবে। তাদের বাসস্থানে আরশের নীচে ঝুলন্ত প্রদীপ থাকবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, শহীদগণের রূহ আরশের নীচে থাকবে এবং জান্নাতে ভ্রমণ করতে পারবে।

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى — এ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে। সিদরাতুল মুনতাহা যে সপ্তম আকাশে, একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই আত্মার স্থান ইল্লিয়্যীন জান্নাতের সংলগ্ন এবং আত্মাসমূহ জান্নাতের বাগিচায় ভ্রমণ করে। অতএব, আত্মার স্থান জান্নাতও বলা যায়।

وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ - تنافس -এর অর্থ কোন বিশেষ পছন্দনীয় জিনিস অর্জন করার জন্যে কয়েকজনের ধাবিত হওয়া ও দৌড়া, যাতে অপরের আগে সে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এখানে জান্নাতের নেয়ামতরাজি উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তাআলা গাফেল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন ঃ আজ তোমরা যেসব বস্তুকে প্রিয় ও

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى
الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

سُورَةُ الْانْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا
الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَأَذِنَتْ
لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ
كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٧﴾
فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ
مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ
يَدْعُو ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ
مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ
كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا
وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا
لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾

(৩৪) আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফেরদেরকে উপহাস করছে। (৩৫) সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে, (৩৬) কাফেররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো?

সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ২৫।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত (৩) এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে (৪) এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে (৫) এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং পৃথিবী এরই উপযুক্ত। (৬) হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে। (৭) যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, (৮) তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে (৯) এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে (১০) এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হবে, (১১) সে মৃত্যুকে আহবান করবে, (১২) এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৩) সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। (১৪) সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না। (১৫) কেন যাবে না, তার পালনকর্তা তো তাকে দেখতেন। (১৬) আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার (১৭) এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে (১৮) এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে, (১৯) নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে। (২০) অতএব, তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না? (২১) যখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন সেজদা করে না।

কাম্য মনে কর সেগুলো অর্জন করার জন্যে অগ্রে চলে যাওয়ার চেষ্টায় রত আছ, সেগুলো অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নেয়ামত। এসব নেয়ামত প্রতিযোগিতার যোগ্য নয়। এসব ক্ষণস্থায়ী সুখের সামগ্রী হাতছাড়া হয়ে গেলেও তেমন দুঃখের কারণ নয়। হাঁ, জান্নাতের নেয়ামতরাজির জন্যই প্রতিযোগিতা করা উচিত। এগুলো সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ চিরস্থায়ী।

সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব

এ সূরায় কেয়ামতের অবস্থা, হিসাব-নিকাশ এবং সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা আছে। অতঃপর গাফেল মানুষকে তার সত্তা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং তদ্দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছার নির্দেশ আছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে যে, তার গর্ভে যেসব গুপ্ত ভাণ্ডার অথবা মানুষের মৃতদেহ আছে, সব সেদিন বাইরে উদগিরণ করে দেবে এবং হাশরের জন্যে এক নতুন পৃথিবী তৈরী হবে। তাতে না থাকবে কোন পাহাড়-পর্বত এবং না থাকবে কোন দালান-কোঠা ও বৃক্ষলতা—পরিষ্কার একটি সমতল ভূমি হবে। একে আরও সম্প্রসারিত করা হবে, যাতেকরে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ তাতে সমবেত হতে পারে। অন্যান্য সূরায়ও এই বর্ণনা বিভিন্ন ভঙ্গিতে এসেছে। এখানে নতুন সংযোজন এই যে, কেয়ামতের দিন আকাশ ও পৃথিবীর উপর আল্লাহ্ তাআলার কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে— وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ - اذنت-এর অর্থ শুনেছে অর্থাৎ, আদেশ পালন করেছে। حقت —এর অর্থ حق لها الانقياد অর্থাৎ, আদেশ পালন করাই তার ওয়াজিব কর্তব্য ছিল।

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ -- مد - এর অর্থ টেনে লম্বা করা। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন পৃথিবীকে চামড়ার (অথবা রবারের) ন্যায় টেনে সম্প্রসারিত করা হবে। এতদসত্ত্বেও পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ একত্রিত হওয়ার ফলে এক একজনের ভাগে কেবল পা রাখার স্থান পড়বে। — (মাযহারী)

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ — অর্থাৎ, পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু উদগিরণ করে একেবারে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে। পৃথিবীর গর্ভে গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার, খনি এবং সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মৃত মানুষের দেহকণা ইত্যাদি রয়েছে। প্রবল ভূকম্পনের মাধ্যমে পৃথিবী এসব বস্তু গর্ভ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করবে।

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ - كدح -এর অর্থ কোন কাজে পূর্ণ চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা। إِلَىٰ رَبِّكَ অর্থাৎ, মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা ও অধ্যবসায় আল্লাহ্‌র দিকে চূড়ান্ত হবে।

فَمُلَاقِيهِ -এর সর্বনাম দ্বারা كدح ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ হবে এই যে, মানুষ এখানে যে চেষ্টা-চরিত্র করছে, পরিশেষে তার পালনকর্তার কাছে পৌঁছে এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে এবং এর শুভ অথবা অশুভ পরিণতি সামনে এসে যাবে। এই সর্বনাম দ্বারা رب ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষ পরকালে তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং হিসাবের জন্যে তার সামনে উপস্থিত হবে।

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِیَمِیْنِهٖ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیْرًا

وَّیَنْقَلِبُ اِلٰۤی اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا — এতে মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের আমলনামা ডান হাতে আসবে এবং তাদের সহজ হিসাব নিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হবে। তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ من حوسب يوم القيامة عذب অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, সে আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রশ্ন করলেন ঃ কোরআনে কি یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیْرًا বলা হয়নি? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এই আয়াতে যাকে সহজ হিসাব বলা হয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ হিসাব নয়; বরং কেবল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সামনে উপস্থিতি। যে ব্যক্তির কাছ থেকে তার কাজকর্মের পুরোপুরি হিসাব নেয়া হবে, সে আযাব থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। — (বোখারী)

اِنَّهٗ كَانَ فِیْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا — অর্থাৎ, যার আমলনামা তার পিঠের দিক থেকে বাম হাতে আসবে, সে মরে মাটি হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, যাতে আযাব থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু সেখানে তা সম্ভবপর হবে না। তাকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে। এর এক কারণ এই বলা হয়েছে যে, সে দুনিয়াতে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে আনন্দ-উল্লাসে দিন যাপন করত।

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ —এখানে আল্লাহ্ তাআলা চারটি বস্তুর শপথ করে মানুষকে আবার اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰی رَبِّكَ আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করেছেন। শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, মানুষ এক অবস্থার উপর স্থিতিশীল থাকে না এবং তার অবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে।

وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ —এটাও وسق থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ একত্রিত করা। চন্দ্রের একত্রিত করার অর্থ তার আলোকে একত্রিত করা। এটা চৌদ্দ তারিখের রাত্রিতে হয়, যখন চন্দ্র ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। চন্দ্র প্রথমে খুবই সরু ধনুকের মত দেখা যায়। এরপর প্রত্যহ এর আলো বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে যায়। অবিরাম ও উপর্যুপরি পরিবর্তনের সাক্ষ্যদাতা চারটি বস্তুর শপথ করে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ উপরে নীচে স্তরে স্তরে সাজানো জিনিসপত্রের এক একটি স্তরকে طبق বলা হয়। ركوب -এর অর্থ আরোহণ করা। অর্থ এই যে, হে মানুষ, তোমরা সর্বদাই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কোন সময় এক অবস্থায় স্থির থাকে না, বরং তার উপর পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আসতে থাকে।

وَاِذَا قُرِئَ عَلَیْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا یَسْجُدُوْنَ — অর্থাৎ, যখন তাদের সামনে সুস্পষ্ট হেদায়েত পরিপূর্ণ কোরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা আল্লাহ্‌র দিকে নত হয় না।

سجدہ ও سجود -এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। এর মাধ্যমে আনুগত্য ও ফরমাবরদারী বোঝানো হয়। বলাবাহুল্য, এখানে পারিভাষিক সেজদা উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহ্‌র সামনে আনুগত্য সহকারে নত হওয়া তথা বিনীত হওয়া উদ্দেশ্য।

সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব সমাপ্ত

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ
وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ
الْوَقُودِ ﴿٥﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ
بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَ
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ
الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾ إِنَّ
بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾

(২২) বরং কাফেররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে। (২৩) তারা যা সংরক্ষণ করে, আল্লাহ্ তা জানেন। (২৪) অতএব, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (২৫) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

সূরা আল-বুরূজ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ২২।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের, (২) এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, (৩) এবং সেই দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয় (৪-৫) অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা অর্থাৎ, অনেক ইন্ধনের অগ্নিসংযোগকারীরা; (৬) যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল (৭) এবং তারা বিশ্বাসীদের সাথে যা করেছিল, তা নিরীক্ষণ করছিল। (৮) তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, (৯) যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহ্‌র সামনে রয়েছে সবকিছু। (১০) যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা। (১১) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরিণীসমূহ। এটাই মহাসাফল্য। (১২) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। (১৩) তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন।

সূরা আল-বুরূজ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ — **بروج শব্দটি برج -এর বহুবচন। অর্থ বড়** প্রাসাদ ও দুর্গ। অন্য আয়াতে আছে, وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ এখানে এই **অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর মূলধাতু برج -এর আভিধানিক অর্থ যাহির** হওয়া। تبرج **-এর অর্থ বেপর্দা খোলাখুলি চলাফেরা করা। এক আয়াতে** আছে وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতে برج -এর অর্থ বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্র। কয়েকজন তফসীরবিদ এস্থলে অর্থ নিয়েছেন প্রাসাদ। অর্থাৎ, সেসব গৃহ, যা আকাশে **প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্যে নির্ধারিত। পরবর্তী কোন কোন** তফসীরবিদ দার্শনিকদের পরিভাষায় বলেছেন যে, সমগ্র আকাশমণ্ডলী বার ভাগে বিভক্ত। এর প্রত্যেক ভাগকে برج বলা হয়। তাদের ধারণা এই যে, স্থিতিশীল নক্ষত্রসমূহ এসব برج -এর মধ্যেই অবস্থান করে। গ্রহসমূহ আকাশের গতিতে গতিশীল হয়ে এসব برج -এর মধ্যে অবতরণ করে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। কোরআন পাক গ্রহসমূহকে আকাশে প্রোথিত বলে না যে, এগুলো আকাশের গতিতে গতিশীল হবে ; বরং কোরআনের মতে প্রত্যেক গ্রহ নিজস্ব গতিতে গতিশীল। সূরা ইয়াসীনে আছে وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ এখানে فلك -এর অর্থ আকাশ নয়; বরং গ্রহের কক্ষপথ, যেখানে সে বিচরণ করে।

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ —তিরমিযীর হাদীসের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত দিনের অর্থ কেয়ামতের দিন। شاهد -এর অর্থ শুক্রবার দিন এবং مشهود -এর অর্থ আরাফার দিন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা চারটি বস্তুর শপথ করেছেন। (এক) বুরূজবিশিষ্ট আকাশের; (দুই) কেয়ামত দিবসের; (তিন) শুক্রবারের এবং (চার) আরাফার দিনের। এসব শপথের সম্পর্ক এই যে, এগুলো আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তি, কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানের দলীল। শুক্রবার ও আরাফার দিন মুসলমানদের জন্যে পরকালের পুঁজি সংগ্রহের পবিত্র দিন। অতঃপর শপথের জওয়াবে সেই কাফেরদেরকে অভিশাপ করা হয়েছে, যারা মুসলমানদেরকে ঈমানের কারণে অগ্নিতে পুড়িয়ে মেরেছে। এরপর মুমিনদের পরকালীন মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ — এখানে অত্যাচারী কাফেরদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা মুমিনদেরকে কেবল ঈমানের কারণে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। শাস্তি প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে— (এক) فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ, তাদের জন্যে পরকালে জাহান্নামের আযাব রয়েছে, (দুই) وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ অর্থাৎ, তাদের জন্যে দহন যন্ত্রণা রয়েছে। এখানে দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই বর্ণনা ও তাকীদ হতে পারে। অর্থাৎ, জাহান্নামে যেয়ে তারা চিরকাল দহন যন্ত্রণা ভোগ করবে। এটাও সম্ভবপর যে, দ্বিতীয় বাক্যে দুনিয়ার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, মুমিনদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পর অগ্নি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের রূহ্ কবজ করে নেন। এভাবে তিনি তাদেরকে দহন যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। ফলে তাদের মৃতদেহই কেবল

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعَ عَشْرَةَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

(১৪) তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়; (১৫) মহান আরশের অধিকারী। (১৬) তিনি যা চান, তাই করেন। (১৭) আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত পৌঁছেছে কি? (১৮) ফেরাউনের এবং সামূদের? (১৯) বরং যারা কাফের, তারা মিথ্যারোপে রত আছে। (২০) আল্লাহ্ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (২১) বরং এটা মহান কোরআন, (২২) লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ।

সূরা আত্ব-তারেক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ১৭।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর। (২) আপনি জানেন, যে রাত্রিতে আসে, সেটা কি? (৩) সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। (৪) প্রত্যেকের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে। (৫) অতএব, মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে। (৬) সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। (৭) এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে। (৮) নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম। (৯) যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে, (১০) সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না। (১১) শপথ চক্রশীল আকাশের (১২) এবং বিদারনশীল পৃথিবীর। (১৩) নিশ্চয় কোরআন সত্য-মিথ্যার ফয়সালা (১৪) এবং এটা উপহাস নয়। (১৫) তারা ভীষণ চক্রান্ত করে, (১৬) আর আমিও কৌশল করি। (১৭) অতএব, কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন—কিছু দিনের জন্যে।

অগ্নিতে দগ্ধ হয়। অতঃপর এই অগ্নি আরও বেশী প্রজ্বলিত হয়ে তার লেলিহান শিখা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যারা মুসলমানদের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার তামাশা দেখছিল, তারাও এই আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। কেবল বাদশাহ 'ইউসুফ যুনওয়াস' পালিয়ে যায়। সে অগ্নি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেখানেই সলিল সমাধি লাভ করে।— (মাযহারী)

কাফেরদের জাহান্নামের আযাব ও দহন যন্ত্রণার খবর দেয়ার সাথে সাথে কোরআন বলেছে,- ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا অর্থাৎ, এই আযাব তাদের উপর পতিত হবে, যারা এই দুষ্কর্মের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেনি। এতে তাদেরকে তওবার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপার কোন পারাপার নেই। তারা তো আল্লাহ্‌র ওলীগণকে জীবিত দগ্ধ করে তামাশা দেখেছে, আল্লাহ্ তাআলা এরপরও তাদেরকে তওবা ও মাগফেরাতের দাওয়াত দিচ্ছেন।— (ইবনে-কাসীর)

সূরা আত্ব-তারেক্ব

এই সূরায় আল্লাহ্ তাআলা আকাশ ও নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন ঃ প্রত্যেক মানুষের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। সে তার সমস্ত কাজ কর্ম ও নড়াচড়া দেখে, জানে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে দুনিয়াতে যাকিছু করছে, তা সবই কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই কোন সময় পরকাল ও কেয়ামতের চিন্তা থেকে গাফেল হওয়া অনুচিত। এরপর পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে শয়তান মানুষের মনে যে অসম্ভাব্যতার সন্দেহ সৃষ্টি করে, তার জওয়াব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ মানুষ লক্ষ্য করুক যে, সে কিভাবে বিভিন্ন অণু-কণা ও বিভিন্ন উপকরণ থেকে সৃজিত হয়েছে। যিনি প্রথম সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের কণাসমূহ একত্রিত করে একজন জীবিত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি তাকে মৃত্যুর পর পুনরায় তদ্রূপ সৃষ্টি করতেও সক্ষম। এরপর কেয়ামতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করে আবার আকাশ ও পৃথিবীর শপথ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষকে পরকাল চিন্তার যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সে যেন তাকে হাসি-তামাশা মনে না করে। এটা এক বাস্তব সত্য, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। অবশেষে দুনিয়াতেই কেন আযাব আসে না — কাফেরদের এই প্রশ্নের জওয়াবের মাধ্যমে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

প্রথম শপথে আকাশের সাথে طارق শব্দ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ রাত্রিতে আগমনকারী। নক্ষত্র দিনের বেলায় লুক্কায়িত থাকে এবং রাতে প্রকাশ পায়, এজন্যে নক্ষত্রকে طارق বলা হয়েছে। কোরআন এ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখে নিজেই জওয়াব দিয়েছে النَّجْمُ الثَّاقِبُ — অর্থাৎ, উজ্জ্বল নক্ষত্র। আয়াতে কোন নক্ষত্রকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই যে কোন নক্ষত্রকে বোঝানো যায়। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন বিশেষ করে নক্ষত্র 'সুরাইয়া' যা সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ একটি নক্ষত্র কিংবা 'শনি গ্রহ' অর্থ নিয়েছেন। আরবী ভাষায় সুরাইয়া ও শনি গ্রহকে نجم বলা হয়ে থাকে।

إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ — এটা শপথের জওয়াব। অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষের উপর তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ, আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। এখানে حافظ শব্দ একবচনে উল্লেখ করা হলেও

তারা যে একাধিক তা অন্য আয়াত থেকে জানা যায়। অন্য আয়াতে আছে وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ

حافظ -এর অপর অর্থ আপদ-বিপদ থেকে হেফাযতকারীও হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মানুষের হেফাযতের জন্যে ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তারা দিন-রাত মানুষের হেফাযতে নিয়োজিত থাকে। তবে আল্লাহ্ তাআলা যার জন্যে যে বিপদ অবধারিত করে দিয়েছেন, তারা সে বিপদ থেকে হেফাযত করে না। অন্য এক আয়াতে একথা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ অর্থাৎ, মানুষের জন্যে পালাক্রমে আগমনকারী পাহারাদার ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা আল্লাহ্র আদেশে সামনে ও পেছনে থেকে তার হেফাযত করে।

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ অর্থাৎ, মানুষ সৃজিত হয়েছে এক সবেগে স্খলিত পানি থেকে, যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অস্থিপিঞ্জরের মধ্য থেকে নির্গত হয়। সাধারণভাবে তফসীরবিদগণ এর এই অর্থ করেছেন যে, বীর্য পুরুষের পৃষ্ঠদেশ এবং নারীর বক্ষদেশ থেকে নির্গত হয়। কিন্তু মানবদেহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের সুচিন্তিত অভিমত ও অভিজ্ঞতা এই যে, বীর্য প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রত্যেক অঙ্গ থেকে নির্গত হয় এবং সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গ নারী ও পুরুষের সেই অঙ্গ থেকে নির্গত বীর্য দ্বারা গঠিত হয়। তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী প্রভাব থাকে মস্তিষ্কের। এ কারণেই সাধারণতঃ দেখা যায়, যারা অতিরিক্ত স্ত্রীমৈথুন করে, তারা প্রায়ই মস্তিষ্কের দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়। তাদের আরও সুচিন্তিত অভিমত এই যে, বীর্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে স্খলিত হয়ে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে অণ্ডকোষে জমা হয় এবং সেখান থেকে নির্গত হয়।

إِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ - رجع -এর অর্থ ফিরিয়ে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, যে বিশ্বস্রষ্টা প্রথমবার মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে অর্থাৎ, মৃত্যুর পর জীবিত করতে আরও ভালরূপে সক্ষম।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ - تُبْلَى -এর শাব্দিক অর্থ পরীক্ষা করা, যাচাই করা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের যেসব বিশ্বাস, চিন্তাধারা, মনন ও সংকল্প অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, দুনিয়াতে কেউ জানত না এবং যেসব কাজকর্ম সে গোপনে করেছিল, কেয়ামতের দিন সে সবগুলোই পরীক্ষিত হবে। অর্থাৎ, প্রকাশ করে দেয়া হবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন মানুষের সব গোপন ভেদ খুলে যাবে। প্রত্যেক ভাল-মন্দ বিশ্বাস ও কর্মের আলামত হয় মানুষের মুখমণ্ডলে শোভা পাবে, না হয় অন্ধকার ও কাল রঙের আকারে প্রকাশ করে দেয়া হবে। — (কুরতুবী)

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ - الرَّجْعِ -এর অর্থ পর পর বর্ষিত বৃষ্টি। একবার বৃষ্টি হয়ে শেষ হয়ে যায়, আবার হয়।

إِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ অর্থাৎ, কোরআন সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা করে; এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কোরআন সম্পর্কে বলতে শুনেছি—

অর্থাৎ, এই কিতাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের সংবাদ এবং তোমাদের পরে আগমনকারীদের জন্যে বিধি-বিধান রয়েছে। এটা চূড়ান্ত উক্তি; আমার মুখের কথা নয়।

সূরা আত্ব-তারেক্ব সমাপ্ত

سُوْرَةُ الْاَعْلٰى مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعَ عَشْرَةَ اٰيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ① الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ② وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ③ وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ④ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ⑤ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ⑥ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ⑦ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ⑧ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ⑨ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ⑩ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ⑪ الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ⑫ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ⑬ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ⑭ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ⑮ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ⑯ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ⑰ اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ⑱ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ⑲

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتٌّ وَعِشْرُوْنَ اٰيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ① وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ② عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ③ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ④ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ⑤ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ⑥ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ⑦

সূরা আল-আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ১৯।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন, (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। (৩) এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন (৪) এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেছেন, (৫) অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা। (৬) আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না — (৭) আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়। (৮) আমি আপনার জন্যে সহজ শরীয়ত সহজতর করে দেবো। (৯) উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন, (১০) যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে, (১১) আর যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে, (১২) সে মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (১৩) অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। (১৪) নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় (১৫) এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে। (১৬) বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, (১৭) অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। (১৮) এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে; (১৯) ইবরাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে।

সূরা আল-গাশিয়াহ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ২৬।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? (২) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত, (৩) ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। (৪) তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। (৫) তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। (৬) কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই। (৭) এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধায়ও উপকার করবে না।

সূরা আল-আ'লা

মাসআলা ঃ আলেমগণ বলেন ঃ নামাযের বাইরে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى তেলাওয়াত করলে سبحان ربى الاعلى বলা মুস্তাহাব। সাহাবায়ে কেরাম এই সূরা তেলাওয়াত শুরু করলে এরূপ বলতেন। — (কুরতুবী)

○ ওকবা ইবনে-আমের জোহানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন সূরা আলা নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ اجعلوها فى سجودكم — অর্থাৎ, তোমরা سبحان ربى الاعلى কালেমাটি সেজদায় পাঠ কর। تسبيح শব্দের অর্থ পবিত্র রাখা, পবিত্রতা বর্ণনা করা। سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ -এর অর্থ এই যে, আপন পালনকর্তার নাম পবিত্র রাখুন। অর্থাৎ, পালনকর্তার নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করার সময় বিনয়, নম্রতা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। তাঁর উপযুক্ত নয় — এমন যাবতীয় বিষয় থেকে তাঁর নামকে পবিত্র রাখুন। এর এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ্ স্বয়ং নিজের যেসব নাম বর্ণনা করেছেন, তাঁকে কেবল সেসব নামের মাধ্যমেই ডাকুন। অন্য কোন নামে তাঁকে ডাকা জায়েয নয়।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে কালেমাটি নামাযের সেজদায় পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন, সেটি سبحان اسم ربك الْاَعْلَى নয়; বরং سبحان ربى الاعلى — এ থেকেও জানা যায় যে, এ ক্ষেত্রে নাম উদ্দেশ্য নয়; বরং স্বয়ং সত্তা উদ্দেশ্য। — (কুরতুবী)

বিশ্ব সৃষ্টির নিগূঢ় তাৎপর্য ঃ الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى — এগুলো সব জগত সৃষ্টিতে আল্লাহ্র অপার রহস্য ও শক্তি সম্পর্কিত গুণাবলী। **প্রথম গুণ** خلق -এর অর্থ কেবল সৃষ্টি করাই নয়; বরং কোন পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোন কিছুকে নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করে। কোন সৃষ্টির একাজ করার সাধ্য নেই; একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার অপার কুদরতই কোন পূর্ব-নমুনা ব্যতিরেকে যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করে। **দ্বিতীয় গুণ** فَسَوّٰى — এটা تسوية থেকে উদ্ভূত। অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বিশেষ মিল রেখে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। মানুষ ও প্রত্যেক জীব-জানোয়ারকে তার প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। হস্তপদ ও অংগসমূহের মধ্যে এমন জোড়া ও প্রাকৃতিক স্প্রিং সংযুক্ত করেছেন, যার ফলে এগুলোকে চতুর্দিকে ঘোরানো-মোড়ানো যায়। এই বিস্ময়কর মিল স্রষ্টার রহস্য ও শক্তি-সামর্থ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যে যথেষ্ট।

তৃতীয় গুণ قَدَّرَ - تقدير -এর অর্থ কোন বস্তুকে বিশেষ পরিমাণ সহকারে সৃষ্টি করা। শব্দটি ফয়সালা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ্র ফয়সালা। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ার বস্তুসমূহকে সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি; প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ কাজের জন্যে সৃষ্টি করে সে কাজের উপযুক্ত সম্পদ দিয়ে তাকে সে কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এটা কোন বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টির মধ্যে সীমিত নয়— সমগ্র সৃষ্ট জগত ও সৃষ্টিকেই আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে

সৃষ্টি করেছেন এবং সে কাজেই নিয়োজিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তু তার পালনকর্তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

চতুর্থ গুণ ঃ فَهَدٰى অর্থাৎ, স্রষ্টা যে কাজের জন্যে যাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সে কাজের পথনির্দেশও দিয়েছেন। সত্যিকারভাবে এ পথনির্দেশে আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত আছে। কেননা, এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধি ও চেতনা আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে দিয়েছেন, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা থেকে নিম্নস্তরের। অন্য আয়াতে আছে أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করে এক অস্তিত্ব দিয়েছেন, অতঃপর তার সংশ্লিষ্ট কাজের পথনির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ এ পথনির্দেশের প্রভাবে আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী সৃষ্টির আদি থেকে যে কাজের জন্যে আদিষ্ট হয়েছে, সে কাজ হুবহু তেমনিভাবে কোনরূপ ত্রুটি ও অলসতা ব্যতিরেকে সম্পাদন করে চলেছে।

وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى - مرعى শব্দের অর্থ পশু- চারণ ভূমি এবং غثاء শব্দের অর্থ আবর্জনা, যা বন্যার পানির উপর ভাসমান থাকে। احوى শব্দের অর্থ কৃষ্ণাভ গাঢ় সবুজ রং। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা উদ্ভিদ সম্পর্কিত স্বীয় কুদরত ও হেকমত বর্ণনা করেছেন। তিনি ভূমি থেকে সবুজ-শ্যামল ঘাস উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর একে শুকিয়ে কাল রং-এ পরিণত করেছেন এবং সবুজতা বিলীন করে দিয়েছেন। এতে মানুষের পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, দেহের এ সজীবতা, সৌন্দর্য, স্ফূর্তি ও চাতুর্য আল্লাহ্ তাআলারই দান। কিন্তু পরিশেষে এসবই নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ -পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কুদরত ও হেকমতের কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর এস্থলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নবুওয়তের কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দানের পূর্বে তাঁর কাজ সহজ করে দেয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রথমদিকে যখন জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কোরআনের কোন আয়াত শোনাতেন, তখন তিনি আয়াতের শব্দাবলী বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার আশংকায় জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে সাথে তা পাঠ করতেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কোরআন মুখস্থ করানোর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন যে, জিবরাঈল (আঃ)-এর চলে যাওয়ার পর কোরআনের আয়াতসমূহ বিশুদ্ধরূপে পাঠ করানো এবং স্মৃতিতে সংরক্ষিত করা আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না। এর ফলে فَلَا تَنْسٰٓى اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ অর্থাৎ, আপনি কোন বিষয় বিস্মৃত হবেন না সে অংশ ব্যতীত, যা কোন উপযোগিতার কারণে আল্লাহ্ তাআলা স্মৃতি থেকে মুছে দিতে চাইবেন। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনের কিছু আয়াত রহিত করার এক সুবিদিত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম আদেশের বিপরীতে পরিষ্কার দ্বিতীয় আদেশ নাযিল করা। এর আর একটি পদ্ধতি হলো সংশ্লিষ্ট আয়াতটিই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সকল মুসলমানের স্মৃতি থেকে মুছে দেয়া। এ সম্পর্কে এক আয়াতে আছে مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا অর্থাৎ, আমি কোন আয়াত রহিত করি অথবা আপনার স্মৃতি থেকে উধাও করে দেই। কেউ কেউ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ -এর অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা কোন উপযোগিতাবশতঃ কোন আয়াত সাময়িকভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর স্মৃতি থেকে মুছে দিয়ে পরবর্তীকালে তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন, এটা সম্ভবপর। হাদীসে আছে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন একটি সূরা তেলাওয়াত করলেন এবং মাঝখান থেকে একটি আয়াত বাদ পড়ল। ওহী লেখক উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) মনে করলেন যে, আয়াতটি বোধ হয় মনসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসার জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ মনসূখ হয়নি, আমিই ভুলক্রমে পাঠ করিনি।—(কুরতুবী) অতএব, উল্লেখিত ব্যতিক্রমের সারমর্ম এই যে, সাময়িকভাবে কোন আয়াত ভুলে যাওয়া অতঃপর তা স্মরণে আসা বর্ণিত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী নয়।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى -এর আক্ষরিক তরজমা এই যে, আমি আপনাকে সহজ করে দেব সহজ পদ্ধতির জন্যে। সহজ পদ্ধতি বলে ইসলামী শরীয়ত বোঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, এ পদ্ধতি ও শরীয়তকে আপনার জন্যে সহজ করে দেব। কিন্তু এর পরিবর্তে কোরআন বলেছে, আপনাকে এই শরীয়তের জন্যে সহজ করে দেব। এর তাৎপর্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে এরূপ করে দেবেন যে, শরীয়ত আপনার মজ্জা ও স্বভাবে পরিণত হবে এবং আপনি তার ছাঁচে গঠিত হয়ে যাবেন।

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নবুওয়তের কর্তব্য পালনে খোদা প্রদত্ত সুবিধাদির বর্ণনা ছিল।

এই আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কর্তব্য পালনের আদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, উপদেশ ফলপ্রসূ হলে আপনি মানুষকে উপদেশ দিন। এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয়; বরং আদেশকে জোরদার করাই উদ্দেশ্য। আমাদের পরিভাষায় এর দৃষ্টান্ত কাউকে এরূপ বলা যে, যদি তুমি মানুষ হও তবে তোমাকে কাজ করতে হবে। অথবা তুমি যদি অমুকের ছেলে হও তবে একাজ করা উচিত। বলাবাহুল্য, এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয়; বরং কাজটি যে অপরিহার্য, তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উপদেশ ও প্রচার যে ফলপ্রসূ, একথা নিশ্চিত, তাই এই উপকারী উপদেশ আপনি কোন সময় পরিত্যাগ করবেন না।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى - زكوة — এর আসল অর্থ শুদ্ধ করা। ধন-সম্পদের যাকাতকেও এ কারণে যাকাত বলা হয় যে, তা ধন-সম্পদকে শুদ্ধ করে। এখানে تَزَكّٰى শব্দের অর্থ ব্যাপক। এতে ঈমানগত ও চরিত্রগত শুদ্ধি এবং আর্থিক যাকাত প্রদান সবই অন্তর্ভুক্ত।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى অর্থাৎ, তারা পালনকর্তার নাম স্মরণ করে এবং নামায আদায় করে। বাহ্যতঃ এতে ফরয ও নফল সবরকম নামায অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ ঈদের নামায দ্বারা এর তফসীর করেছেন। তাও এতে শামিল। بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا —হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ এই যে, ইহকালের নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত এবং পরকালের নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দৃষ্টি দৃষ্টি থেকে উধাও ও অনুপস্থিত। তাই অপরিণামদর্শী লোকেরা উপস্থিতকে অনুপস্থিতের উপর প্রাধান্য দিয়ে বসে, যা তাদের জন্যে চিরস্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। এ ক্ষতির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যেই আল্লাহ্ তাআলা খোদায়ী কিতাব ও রসূলগণের মাধ্যমে পরকালের নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেন সেগুলো উপস্থিত ও বিদ্যমান। একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে নগদ মনে করে অবলম্বন কর, তা আসলে কৃত্রিম, অসম্পূর্ণ ও দ্রুত ধ্বংসশীল। এরূপ

বস্তুতে মজে যাওয়া ও তার জন্যে স্বীয় শক্তি ব্যয় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ সত্যকেই ফুটিয়ে তোলার জন্যে অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى অর্থাৎ,তোমরা যারা দুনিয়াকে পরকালের উপর প্রাধান্য দাও, একটু চিন্তা কর যে, তোমরা কি বস্তু ছেড়ে কি বস্তু অবলম্বন করছ। যে দুনিয়ার জন্যে তোমরা পাগলপারা, প্রথমতঃ তার বৃহত্তম সুখ ও আনন্দ, দুঃখ, কষ্ট ও পরিশ্রমের মিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়, দ্বিতীয়তঃ তার কোন স্থিরতা ও স্থায়িত্ব নেই। আজ যে বাদশাহ, কাল সে পথের ভিখারী। আজকের যুবক ও বীর্যবান, আগামী কাল দুর্বল ও অক্ষম। এটা দিবারাত্রি চোখের সামনে ঘটছে। এর বিপরীতে পরকাল এসব দোষ থেকে মুক্ত। পরকালের প্রত্যেক নেয়ামত ও সুখ উৎকৃষ্টই উৎকৃষ্ট — দুনিয়ার কোন নেয়ামত ও সুখের সাথে তার কোন তুলনা হয় না। তদুপরি তা اَبْقٰى অর্থাৎ, চিরস্থায়ী। মানুষ চিন্তা করুক, যদি তাকে বলা হয় — তোমার সামনে দুটি গৃহ আছে। একটি সুউচ্চ প্রাসাদ, যা যাবতীয় বিলাসসামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত এবং অপরটি মামুলী কুঁড়েঘর, যাতে কোন সাজ-সরঞ্জামও নেই। এখন হয় তুমি এই প্রাসাদোপম বাংলো গ্রহণ কর; কিন্তু কেবল এক দু'মাসের জন্যে, এরপর একে খালি করে দিতে হবে; না হয় এই কুঁড়েঘর গ্রহণ কর, যা তোমার চিরস্থায়ী মালিকানায় থাকবে। এখন প্রশ্ন এই যে, বুদ্ধিমান মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে পরকালের নেয়ামত যদি অসম্পূর্ণ ও নিম্নস্তরেরও হত, তবুও চিরস্থায়ী হওয়ার কারণে তাই অগ্রাধিকারের যোগ্য ছিল। অথচ বাস্তবে যখন এই নেয়ামত দুনিয়ার নেয়ামতের মোকাবেলায় উৎকৃষ্ট, উত্তম ও চিরস্থায়ীও, তখন কোন বোকারাম হতভাগাই এ নেয়ামত পরিত্যাগ করে দুনিয়ার নেয়ামতকে প্রাধান্য দিতে পারে!

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى - অর্থাৎ, এই সূরার সব বিষয়বস্তু অথবা সর্বশেষ বিষয়বস্তু (অর্থাৎ, পরকাল উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী হওয়া) পূর্ববর্তী সহীফাসমূহেও লিখিত আছে। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম ও মূসা (আঃ)- এর সহীফাসমূহে। হযরত মূসা (আঃ)-কে তওরাতের পূর্বে কিছু সহীফাও দেয়া হয়েছিল। এখানে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে, অথবা তওরাতও বোঝানো যেতে পারে।

ইবরাহীমী সহীফার বিষয়বস্তু ঃ হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, ইবরাহীম (সাঃ)-এর সহীফা কিরূপ ছিল? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এসব সহীফায় শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছিল। তন্মধ্যে এক দৃষ্টান্তে অত্যাচারী বাদশাহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ হে ভুঁইফোড় গর্বিত বাদশাহ, আমি তোমাকে ধনৈশ্বর্য স্তূপীকৃত করার জন্যে রাজত্ব দান করিনি ; বরং আমি তোমাকে এজন্যে শাসনক্ষমতা অর্পণ করেছি, যাতে তুমি উৎপীড়িতের বদদোয়া আমা পর্যন্ত পৌঁছতে না দাও। কেননা, আমার আইন এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া প্রত্যাখ্যান করি না, যদিও তা কাফেরের মুখ থেকে হয়।

অপর এক দৃষ্টান্তে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ বুদ্ধিমানের কাজ হল, নিজের সময়কে তিন ভাগে বিভক্ত করা। এক ভাগ তার পালনকর্তার এবাদত ও তাঁর সাথে মোনাজাতের, এক ভাগ আত্মসমালোচনার ও আল্লাহ্‌র মহাশক্তি এবং কারিগরি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং এক ভাগ জীবিকা উপার্জনের ও স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি মেটানোর।

আরও বলা হয়েছে ঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্যে অপরিহার্য এই যে, সে সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবে, উদ্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকবে এবং জিহ্বার হেফাযত করবে। যে ব্যক্তি নিজের কথাকেও নিজের কর্ম বলে মনে করবে, তার কথা খুবই কম হবে এবং কেবল জরুরী বিষয়ে সীমিত থাকবে।

মূসা (আঃ)-এর সহীফার বিষয়বস্তু ঃ হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর আমি মূসা (আঃ)- এর সহীফা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এসব সহীফায় কেবল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুই ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ ঃ

আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করি, যে মৃত্যুর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, অতঃপর সে কিরূপে আনন্দিত থাকে! আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে বিধিলিপি বিশ্বাস করে, অতঃপর সে কিরূপে অপারক, হতোদ্যম ও চিন্তাযুক্ত হয়! আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে দুনিয়া, দুনিয়ার পরিবর্তনাদি ও মানুষের উত্থান-পতন দেখে, সে কিরূপে দুনিয়া নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী। অতঃপর সে কিরূপে কর্ম পরিত্যাগ করে বসে থাকে? হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর আমি প্রশ্ন করলাম ঃ এসব সহীফার কোন বিষয়বস্তু আপনার কাছে আগত ওহীর মধ্যেও আছে কি? তিনি বললেন ঃ হে আবু যর, এ আয়াতগুলো সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ কর — قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى — (কুরতুবী)

সূরা আল-গাশিয়াহ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ কেয়ামতে মুমিন ও কাফের আলাদা আলাদা বিভক্ত দু'দল হবে এবং মুখমণ্ডল দ্বারা পৃথকভাবে পরিচিত হবে। এই আয়াতে কাফেরদের মুখমণ্ডলের এক অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তা خَاشِعَةٌ অর্থাৎ, হেয় হবে। خشوع শব্দের অর্থ নত হওয়া ও লাঞ্ছিত হওয়া। নামাযে খুশুর অর্থ আল্লাহ্‌র সামনে নত হওয়া, হেয় হওয়া। যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র সামনে খুশু অবলম্বন করেনি, কেয়ামতে এর শাস্তিস্বরূপ তাদের মুখমণ্ডল লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা হবে عَامِلَةٌ - نَّاصِبَةٌ - বাকপদ্ধতিতে অবিরাম কর্মের কারণে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে عَامِلَةٌ এবং ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় نَّاصِبَةٌ বলাবাহুল্য, কাফেরদের এ দুরবস্থা দুনিয়াতেই হবে। কেননা, পরকালে কোন কর্ম ও মেহনত নেই। তাই কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ প্রথম অবস্থা অর্থাৎ, মুখমণ্ডল লাঞ্ছিত হওয়া তো পরকালে হবে এবং পরবর্তী দুরবস্থা কাফেরদের দুনিয়াতেই হয়। কেননা, অনেক কাফের দুনিয়াতে মুশরিকসুলভ এবাদত এবং বাতিল পন্থায় অধ্যবসায় ও সাধনা করে থাকে। হিন্দু যোগী ও খ্রীষ্টান পাদ্রী অনেক এমন আছে, যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ্ তাআলারই সন্তুষ্টির জন্যে দুনিয়াতে এবাদত ও সাধনা করে থাকে এবং এতে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করে। কিন্তু এসব এবাদত মুশরিকসুলভ ও বাতিল পন্থায় হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র কাছে সওয়াব ও পুরস্কার লাভের যোগ্য হয় না। অতএব, তাদের মুখমণ্ডল দুনিয়াতেও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত রইল এবং পরকালে তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অপমানের অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রাখবে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বর্ণনা করেন, খলীফা হযরত ওমর ফারূক

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ۝ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۝ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۝ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۝ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۝ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۝

سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ۝ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝

(৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে সজীব, (৯) তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট। (১০) তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। (১১) তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা। (১২) তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরণা। (১৩) তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন। (১৪) এবং সংরক্ষিত পানপাত্র (১৫) এবং সারি সারি গালিচা (১৬) এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (১৭) তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা (১৮) এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে? (১৯) এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? (২০) এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে? (২১) অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, (২২) আপনি তাদের শাসক নন, (২৩) কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফের হয়ে যায়, (২৪) আল্লাহ্ তাকে মহা আযাব দেবেন। (২৫) নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট, (২৬) অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্ব।

সূরা আল-ফজর

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৩০।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) শপথ ফজরের, (২) শপথ দশ রাত্রির, শপথ তার, (৩) যা জোড় ও যা বিজোড় (৪) এবং শপথ রাত্রির যখন তা গত হতে থাকে (৫) এর মধ্যে আছে শপথ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে। (৬) আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন, (৭) যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং (৮) যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি (৯) এবং সামূদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল।

(রাঃ) যখন শাম দেশের সফরে গমন করেন, তখন জনৈক খ্রীষ্টান বৃদ্ধ পাদ্রী তাঁর কাছে আগমন করে। সে তার ধর্মীয় এবাদত, সাধনা ও মোজাহাদায় এত বেশী আত্মনিয়োগ করেছিল যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে চেহারা বিকৃত এবং দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার পোশাকের মধ্যেও কোন শ্রী ছিল না। খলীফা তাকে দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেনঃ এই বৃদ্ধের করুণ অবস্থা দেখে আমি ক্রন্দন করতে বাধ্য হয়েছি। বেচারী স্বীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্যে জীবনপণ পরিশ্রম ও সাধনা করেছে, কিন্তু সে তার লক্ষ অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনি। অতঃপর খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। — (কুরতুবী)

نَارًا حَامِيَةً - حَامِيَةً শব্দের অর্থ গরম, উত্তপ্ত। অগ্নি স্বভাবতঃই উত্তপ্ত। এর সাথে উত্তপ্ত বিশেষণ যুক্ত করা একথা বলার জন্যে যে, এই অগ্নির উত্তাপ দুনিয়ার অগ্নির ন্যায় কোন সময় কম অথবা নিঃশেষ হয় না; বরং এটা চিরন্তন উত্তপ্ত।

لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ — অর্থাৎ, যরী ব্যতীত জাহান্নামীরা কোন খাদ্য পাবে না। যরী পৃথিবীর এক প্রকার কন্টকবিশিষ্ট ঘাস, যা মাটিতেই ছড়ায়। দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত কাঁটার কারণে জন্তু-জানোয়ার এর ধারের কাছেও যায় না।

لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ —জাহান্নামীদের খাদ্য হবে যরী—একথা শুনে কোন কোন কাফের বলতে থাকে যে, আমাদের উট তো যরী খেয়ে খুব মোটা-তাজা হয়ে যায়। এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার যরী দ্বারা জাহান্নামের যরীকে বোঝার চেষ্টা করো না। জাহান্নামের যরী খেয়ে কেউ মোটা তাজা হবে না এবং এতে ক্ষুধা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً অর্থাৎ, জান্নাতে জান্নাতীরা কোন অসার ও মর্মন্তুদ কথাবার্তা শুনতে পাবে না। মিথ্যা, কুফরী কথাবার্তা, গালি-গালাজ, অপবাদ ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا অর্থাৎ, তারা জান্নাতে কোন অনর্থক ও দোষারোপের কথা শুনবে না। আরও কতিপয় আয়াতে এ বিষয়বস্তু উল্লেখিত হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, দোষারোপ ও অশালীন কথাবার্তা খুবই পীড়াদায়ক। তাই জান্নাতীদের অবস্থায় একে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

কতিপয় সামাজিক রীতি-নীতিঃ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ - أَكْوَابٌ শব্দটি كوب -এর বহুবচন। অর্থ পানপাত্র, যথা গ্লাস ইত্যাদি। مَّوْضُوعَةٌ অর্থাৎ, নির্দিষ্ট জায়গায় পানির সন্নিকটে রক্ষিত থাকবে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ,পানপাত্র পানির কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা উচিত। যদি এদিক সেদিক থাকে এবং পানি পান করার সময় তালাশ করতে হয়, তবে এটা কষ্টকর ব্যাপার। তাই সব ব্যবহারের

وَفِرْعَوْنَ ذِى الْأَوْتَادِ ۝ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ ۝ فَأَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَأَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ ۝ وَأَمَّآ إِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىٓ أَهَانَنِ ۝ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۝ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۝ وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝ كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝ وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝ وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۝ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ ۝ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ أَحَدٌ ۝ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ أَحَدٌ ۝ يٰٓأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِىٓ إِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ۝ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ۝

(১০) এবং বহু কীলকের অধিপতি ফেরাউনের সাথে (১১) যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল। (১২) অতঃপর সেখানে বিস্তর অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। (১৩) অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কশাঘাত করলেন। (১৪) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (১৫) মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে ঃ আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন। (১৬) এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলে ঃ আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। (১৭) এটা অমূলক, বরং তোমরা এতীমকে সম্মান কর না। (১৮) এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। (১৯) এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল (২০) এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাস। (২১) এটা অনুচিত। যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে (২২) এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন, (২৩) এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে? (২৪) সে বলবে ঃ হায়, এ জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম। (২৫) সেদিন তার শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিবে না। (২৬) এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দিবে না। (২৭) হে প্রশান্ত মন, (২৮) তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। (২৯) অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও (৩০) এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

বস্তু — যেমন, বদনা, গ্লাস, তোয়ালে ইত্যাদি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা এবং ব্যবহারের পর সেখানেই রেখে দেয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই যত্নবান হওয়া উচিত, যাতে অন্যদের কষ্ট না হয়। জান্নাতীদের পানপাত্র পানির কাছে রক্ষিত থাকবে — একথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তাআলা উপরোক্ত নীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ —কেয়ামতের অবস্থা এবং মুমিন ও কাফেরের প্রতিদান এবং শাস্তি বর্ণনা করার পর কেয়ামতে অবিশ্বাসী হঠকারীদের পথ প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কুদরতের কয়েকটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার কথা বলেছেন। আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীতে অসংখ্য। এখানে মরুচারী আরবদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল চারটি নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে। আরবরা উটে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তের সফর করে। তখন তাদের সর্বাধিক নিকটে থাকে উট, উপরে আকাশ, নীচে ভূপৃষ্ঠ এবং অগ্র-পশ্চাতে সারি সারি পর্বতমালা। এই চারটি বস্তু সম্পর্কেই তাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, অন্যান্য নিদর্শন বাদ দিয়ে যদি এ চারটি বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হয়, তবে আল্লাহ্র অপার কুদরত চাক্ষুষ দেখা যাবে।

সূরার উপসংহারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর সান্ত্বনার জন্যে বলা হয়েছে ঃ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ অর্থাৎ, আপনি তাদের শাসক নন যে, তাদেরকে মুমিন করতেই হবে। আপনার কাজ শুধু প্রচার করা ও উপদেশ দেয়া। এতটুকু করেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাদের হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও প্রতিদান আমার কাজ।

সূরা আল-ফজর

এ সূরায় পাঁচটি বস্তুর শপথ করে إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ দুনিয়াতে তোমরা যাকিছু করছ, তার শাস্তি ও প্রতিদান অপরিহার্য ও নিশ্চিত। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

শপথের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে ফজর অর্থাৎ, সোবহে-সাদেকের সময়। এখানে প্রত্যেক দিনের প্রভাতকালও উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ, প্রভাতকাল বিশ্বে এক মহাবিপ্লব আনয়ন করে এবং আল্লাহ্ তাআলার অপার কুদরতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। এখানে বিশেষ দিনের প্রভাতকালও বোঝানো যেতে পারে। তফসীরবিদ সাহাবী হযরত আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়র (রাঃ) থেকে প্রথম অর্থ এবং ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে ও হযরত কাতাদা (রাঃ) থেকে দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ, মহররম মাসের প্রথম তারিখের প্রভাতকাল বর্ণিত হয়েছে। এ দিনটি ইসলামী চান্দ্র বছরের সূচনা।

কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন, যিলহজ্জ মাসের দশম তারিখের প্রভাতকাল। মুজাহিদ (রহঃ) ও ইকরিমা (রাঃ)-এর উক্তি তাই। বিশেষ করে এদিনের শপথ করার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক দিনের সাথে একটি রাত্রি সংযুক্ত করে দিয়েছেন, যা ইসলামী নিয়মানুযায়ী দিনের পূর্বে থাকে। একমাত্র 'ইয়াওমুন্নহর, তথা যিলহজ্জের দশম তারিখ এমন একটি দিন, যার সাথে কোন রাত্রি নেই। কারণ, এর পূর্বের রাত্রি এ দিনের রাত্রি নয় ; বরং আইনতঃ তা আরাফারই রাত্রি। এ কারণেই কোন হাজী যদি 'ইয়াওমে-আরাফা' তথা নবম তারিখে দিনের বেলায় আরাফার

ময়দানে পৌছতে না পারে এবং রাত্রিতে সোবহে সাদেকের পূর্বে কোন সময় পৌছে যায়, তবে তার আরাফাতে অবস্থান সিদ্ধ ও হজ্ব শুদ্ধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, আরাফা দিবসের রাত্রি দু'টি—একটি পূর্বে ও একটি পরে এবং 'ইয়াওমুন্নহর' তথা দশম তারিখের কোন রাত্রি নেই। এদিক দিয়ে এ দিনটি সব দিনের তুলনায় বিশেষ শানের অধিকারী।—(কুরতুবী)

শপথের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দশ রাত্রি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদা ও মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদদের মতে এতে যিলহজ্বের দশ দিন সর্বোত্তম দিন। এর প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান এবং এতে প্রত্যেক রাত্রির এবাদত শবে কদরের এবাদতের সমতুল্য।—(মাযহারী) হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ -এর তফসীর করেছেন। যিলহজ্বের দশ দিন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর কাহিনীতে وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ বলে এই দশ রাত্রিকেই বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী বলেন, হযরত জাবের (রাঃ)-এর হাদীস থেকে জানা গেল যে, যিলহজ্বের দশ দিন সর্বোত্তম দিন এবং এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, মূসা (আঃ)-এর জন্যেও এ দশ দিনই নির্ধারিত করা হয়েছিল।

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ -এ দু'টি শব্দের আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে 'জোড়' ও 'বিজোড়'। এই জোড় ও বিজোড় বলে আসলে কি বোঝানো হয়েছে, আয়াত থেকে নির্দিষ্টভাবে তা জানা যায় না। তাই এ ব্যাপারে তফসীরকারগণের উক্তি অসংখ্য। কিন্তু হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

الوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر -অর্থাৎ, وتر -এর অর্থ আরাফা দিবস, (যিলহজ্বের নবম তারিখ) এবং এর ইয়াওমুন্নহর (যিলহজ্বের দশম তারিখ)।

কুরতুবী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন ঃ এটা সনদের দিক দিয়ে এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক সহীহ্, যাতে জোড় ও বিজোড় নামাযের কথা আছে। তাই হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরিমা (রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত তফসীরই অবলম্বন করেছেন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ জোড় বলে সমগ্র সৃষ্টজগত বোঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন ঃ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ -অর্থাৎ, আমি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। যথা কুফর ও ঈমান, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, আলো ও অন্ধকার, রাত্রি ও দিন, শীত-গ্রীষ্ম, আকাশ ও পৃথিবী, জিন ও মানব এবং নর ও নারী। এগুলোর বিপরীতে বিজোড় একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সত্তা هو الله الاحد الصمد

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ - يسرى অর্থ রাত্রিতে চলা। অর্থাৎ, রাত্রির শপথ, যখন সে চলতে থাকে তথা খতম হতে থাকে। এ পাঁচটি শপথ উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তাআলা গাফেল মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে বলেছেন ঃ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ - حجر -এর শাব্দিক অর্থ বাধা দেয়া। মানুষের বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বাধাদান করে। তাই حِجْرٍ -এর অর্থ বিবেকও হয়ে থাকে। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, বিবেকবানের জন্যে এসব শপথও যথেষ্ট কিনা? এই প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে মানুষকে গাফলত থেকে জাগ্রত করার একটি কৌশল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে, তাঁর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করা সম্পর্কে এবং শপথের বিষয়সমূহের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে যে বিষয়ের জন্যে শপথ করা হয়, তার নিশ্চয়তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। এখানে যে বিষয়ের জন্যে শপথ করা হয়েছে, তা এই যে, মানুষের প্রত্যেক কর্মের পরকালে হিসাব হওয়া এবং তার শাস্তি ও প্রতিদান হওয়া সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। শপথের এই জওয়াব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু পূর্বপর বর্ণনা থেকে তা বোঝা যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের উপর আযাব আসার কথা বর্ণনা করেও একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহের শাস্তি পরকালে হওয়া তো স্বীকৃত বিষয়ই। মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও তাদের প্রতি আযাব প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি জাতির আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—(এক) আ'দ বংশ, (দুই) সামূদ গোত্র এবং (তিন) ফেরাউন সম্প্রদায়। আ'দ ও সামূদ জাতিদ্বয়ের বংশতালিকা উপরের দিকে ইরামে গিয়ে এক হয়ে যায়। এভাবে ইরাম শব্দটি আ'দ ও সামূদ উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য।

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ -এখানে ইরাম শব্দ ব্যবহার করে আ'দ-গোত্রের পূর্ববর্তী বংশধর তথা প্রথম আ'দকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারা দ্বিতীয় আ'দের তুলনায় আ'দের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে আ'দে-ইরাম শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদেরকেই এখানে عاد ارم শব্দ দ্বারা এবং সূরা নজমে عَادًا الْأُولَىٰ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তাদের বিশেষণে বলা হয়েছে ذَاتِ الْعِمَادِ - عماد ও عمود শব্দের অর্থ স্তম্ভ। তারা অত্যন্ত দীর্ঘকায় জাতি ছিল বিধায় তাদের ذَاتِ الْعِمَادِ বলা হয়েছে। এই আ'দ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কোরআন পাক তাদের স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছে ঃ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ -অর্থাৎ, এমন দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী জাতি ইতিপূর্বে পৃথিবীতে সৃজিত হয়নি। এতদসত্ত্বেও কোরআন তাদের দেহের মাপ অনাবশ্যক বিবেচনা করে উল্লেখ করেনি। ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহে তাদের দৈহিক গঠন ও শক্তি সম্পর্কে অদ্ভুত ধরনের কথাবার্তা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও মুকাতিল (রহঃ) থেকে তাদের উচ্চতা বার হাত তথা ১৮ ফুট বর্ণিত আছে।

বলাবাহুল্য, তাঁরা ইসরাঈলী রেওয়ায়েত দৃষ্টেই একথা বলেছেন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ ইরাম আ'দ তনয় শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের নাম। এরই বিশেষণ ذَاتِ الْعِمَادِ কেননা, এই অনুপম প্রাসাদটি বহু স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান এবং স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণিমুক্তা দ্বারা নির্মিত ছিল, যাতে মানুষ পরকালের বেহেশতের পরিবর্তে এ নগদ বেহেশতকে পছন্দ করে নেয়। কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর যখন শাদ্দাদ সভাসদ সমভিব্যাহারে এ বেহেশতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করল, তখনই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আযাব নাযিল হল। ফলে সবাই ধ্বংস এবং কৃত্রিম বেহেশতও ধূলিসাৎ হয়ে গেল। —(কুরতুবী) এ তফসীরের দিক দিয়ে আয়াতে আ'দ গোত্রের একটি বিশেষ আযাব বর্ণিত হয়েছে, যা শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের উপর নাযিল হয়েছে। প্রথম তফসীর অনুযায়ী এতে আ'দ গোত্রের সমস্ত আযাবের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ – اوتاد শব্দটি وتد –এর বহুবচন। এর অর্থ কীলক। ফেরাউনকে কীলকওয়ালা বলার বিভিন্ন কারণ তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেছেন। অন্য এক তফসীরের বর্ণিত রয়েছে যে, এই শব্দের মধ্যে তার জুলুম-নিপীড়ন ও শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ কারণই প্রসিদ্ধ। ফেরাউন যার প্রতি কুপিত হত, তার হস্তপদ চারটি কীলকে বেঁধে অথবা চার হাত-পায়ে কীলক মেরে রৌদ্রে শুইয়ে দিত এবং তার দেহে সর্প বিচ্ছু ছেড়ে দিত। কোন কোন তফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়ার ঈমান প্রকাশ করা এবং ফেরাউন কর্তৃক তাঁকে এ ধরনের শাস্তি দেয়ার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।—(মাযহারী)

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ –আ'দ, সামুদ ও ফেরাউন গোত্রের অপকীর্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের আযাবকে কশাঘাতের শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কশাঘাত যেমন দেহের বিভিন্ন অংশে হয়, তেমনি তাদের উপরও বিভিন্ন প্রকার আযাব নাযিল করা হয়।

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ – مرصد ও مرصاد শব্দের অর্থ সতর্ক দৃষ্টি রাখার ঘাঁটি, যা কোন উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়ে থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখছেন এবং সবাইকে প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। কোন কোন তফসীরবিদ এ বাক্যটিকে পূর্বোক্ত শপথ বাক্যসমূহের জওয়াব সাব্যস্ত করেছেন।

দুনিয়াতে জীবনোপকরণের বাহুল্য ও স্বল্পতা আল্লাহ্র কাছে প্রিয়পাত্র ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আলামত নয়ঃ فَأَمَّا الْإِنسَانُ –আয়াতে আসলে কাফের ইনসান বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সেসব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা নিম্নরূপ ধারণায় লিপ্ত থাকে।

আল্লাহ্ তাআলা যখন কাউকে জীবনোপকরণে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য, ধন-সম্পদ ও সুস্বাস্থ্য দান করেন, তখন শয়তান তাকে দু'টি ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত করে দেয়—(এক) সে মনে করতে থাকে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, গুণ-গরিমা ও কর্ম প্রচেষ্টারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি, যা আমার লাভ করাই সঙ্গত। আমি এর যোগ্য পাত্র। (দুই) আমি আল্লাহ্র কাছেও প্রিয় পাত্র। যদি প্রত্যাখ্যাত হতাম, তবে তিনি আমাকে এসব নেয়ামত দান করতেন না। এমনিভাবে কেউ অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হলে একে আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলীল মনে করে এবং তাঁর প্রতি এ কারণে ক্রুদ্ধ হয় যে, সে অনুগ্রহ ও সম্মানের পাত্র ছিল, কিন্তু তাকে অহেতুক লাঞ্ছিত ও হেয় করা হয়েছে। কাফের ও মুশরেকদের মধ্যে এ ধরনের ধারণা বিদ্যমান ছিল এবং কোরআন পাক কয়েক জায়গায় তা উল্লেখও করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল মুসলমানও এ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের অবস্থাই উল্লেখ করেছেনঃ كلا –অর্থাৎ, তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। দুনিয়াতে জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ্য সৎ ও আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়, তেমনি অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্ছিত হওয়ার দলীল নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে থাকে। খোদায়ী দাবী করা সত্ত্বেও ফেরাউনের কোনদিন মাথা ব্যথাও হয়নি, অপরপক্ষে কোন কোন পয়গম্বরকে শত্রুরা করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, মুহাজিরগণের মধ্যে যারা দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিল, তারা ধনী মুহাজিরগণ অপেক্ষা চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে যাবে।—(মাযহারী) অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তাআলা যে বান্দাকে ভালবাসেন, তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমরা রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখ।—মাযহারী)

এতীমের জন্যে ব্যয় করাই যথেষ্ট নয়, তাকে সম্মান করাও জরুরী ঃ এরপর কাফেরদের কয়েকটি মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ —অর্থাৎ, তোমরা এতীমকে সম্মান কর না। এখানে আসলে বলার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা এতীমদের প্রাপ্য আদায় কর না এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন কর না। কিন্তু 'সম্মান কর না' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এতীমদের প্রাপ্য আদায় এবং তাদের ব্যয়ভার বহন করলেই তোমাদের যৌক্তিক, মানবিক ও আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পদের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালিত হয়ে যায় না, বরং তাদেরকে সম্মানও করতে হবে; নিজেদের সন্তানদের মোকাবেলায় তাদেরকে হেয় মনে করা যাবে না। কাফেররা যে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সম্মান এবং অভাব-অনটনকে অপমান মনে করত, এটা বাহ্যতঃ তারই জওয়াব। এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা কোন সময় অভাব-অনটনের সম্মুখীন হলে তা এ কারণে হয় যে, তোমরা এতীমের ন্যায় দয়ার যোগ্য বালক-বালিকাদের প্রাপ্যও আদায় কর না। তাদের দ্বিতীয় মন্দ অভ্যাস হল— وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা তো গরীব-মিসকীনকে অন্নদান করই না, পরন্তু অপরকেও এ কাজে উৎসাহিত কর না। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনী ও বিত্তশালীদের উপর যেমন গরীব-মিসকীনের হক আছে, তেমনি যারা দান করার সামর্থ্য রাখে না, তাদের উপরও হক আছে যে, তারা অপরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করবে।

তৃতীয় মন্দ অভ্যাস এই যে, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا অর্থাৎ, তোমরা হালাল ও সব রকম ওয়ারিসী সম্পত্তি একত্রিত করে খেয়ে ফেল এবং নিজের অংশের সাথে অপরের অংশও ছিনিয়ে নাও। সব রকম হালাল ও হারাম ধন-সম্পদ একত্রিত করা নাজায়েয, কিন্তু এখানে বিশেষভাবে ওয়ারিসী সম্পত্তির কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ওয়ারিসী সম্পত্তির দিকে বেশী দৃষ্টি রাখা ও তার পেছনে লেগে থাকা, ভীরুতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ। এ ধরনের লোক মৃতভোজী জন্তুদের মতই তাকিয়ে থাকে, কবে মালিক মরবে এবং তারা সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার সুযোগ পাবে। যারা কৃতী পুরুষ, তারা নিজেদের উপার্জনেই সন্তুষ্ট থাকে এবং মৃতদের সম্পত্তির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না।

চতুর্থ মন্দ অভ্যাস হচ্ছে, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا –অর্থাৎ, তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবাস। অত্যধিক বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধন-সম্পদের ভালবাসা এক পর্যায়ে নিন্দনীয় নয়, বরং মানুষের জন্মগত তাগিদ। তবে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এবং তাতে মজে যাওয়া নিন্দনীয়। কাফেরদের এসব মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে কেয়ামত আগমনের কথা বলা হয়েছে।

إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا – دك –এর শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুকে আঘাত করে ভেঙ্গে দেয়া। এখানে কেয়ামতের ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, যা পর্বতমালাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। دَكًّا دَكًّا বার বার বলায় ইঙ্গিত হয়েছে যে, কেয়ামতের ভূকম্পন একের পর এক অব্যাহত থাকবে।

وَّجَاۤءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا —অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে হাশরের ময়দানে আগমন করবেন। আল্লাহ্ তাআলা কিভাবে আগমন করবেন, তা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। وَجِايْۤءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ—অর্থাৎ, সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে অর্থাৎ, সামনে উপস্থিত করা হবে। এর উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে জাহান্নামকে হাশরের ময়দানে আনা হবে, তার স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। তবে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, সপ্তম পৃথিবীর গভীরে অবস্থিত জাহান্নাম তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে এবং সব সমুদ্র অগ্নিময় হয়ে তাতে শামিল হয়ে যাবে। এভাবে জাহান্নাম হাশরের আঙিনায় সবার সামনে এসে যাবে।

يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى - تذكر —এর অর্থ এখানে বুঝে আসা। অর্থাৎ, কাফের মানুষ সেদিন বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে তার কি করা উচিত ছিল আর সে কি করেছে। কিন্তু তখন এই বুঝে আসা নিষ্ফল হবে। কেননা, পরকাল কর্মজগত নয়—প্রতিদান জগত। অতঃপর সে يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ বলে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে যে, হায়! আমি যদি দুনিয়াতে কিছু সৎকর্ম করতাম! কিন্তু কুফর ও শিরকের শাস্তি সামনে এসে যাওয়ার পর এ আকাঙ্ক্ষায় কোন লাভ নেই। এখন আযাব ও পাকড়াওয়ের সময়। আল্লাহ্ তাআলার পাকড়াওয়ের মত কঠিন পাকড়াও কারও হতে পারে না। অতঃপর মুমিনদের সওয়াব ও জান্নাতে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে।

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ —এখানে মুমিনদের রূহকে نفس مطمئنة (প্রশান্ত আত্মা) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ, সে আত্মা, যে আল্লাহ্র স্মরণ ও আনুগত্যের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে এবং তা না করলে অশান্তি ভোগ করে। সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মন্দ স্বভাব ও হীনমন্যতা দূর করেই এই স্তর অর্জন করা যায়। আল্লাহ্র আনুগত্য, যিকর ও শরীয়ত এরূপ ব্যক্তির মজ্জার সাথে একাকার হয়ে যায়। সম্বোধন করে বলা হয়েছে — اِرْجِعِىْۤ اِلٰى رَبِّكِ-অর্থাৎ, নিজের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাও। ফিরে যাওয়া বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, তার প্রথম বাসস্থানও পালনকর্তার কাছে ছিল। সেখানেই ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। এতে সে হাদীসের সমর্থন রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, মুমিনগণের আত্মা তাদের আমলনামাসহ সপ্তম আকাশে আরশের ছায়াতলে অবস্থিত ইল্লিয়্যীনে থাকবে। সমস্ত আত্মার আসল বাসস্থান সেখানেই। সেখান থেকে এনে মানব দেহে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং মৃত্যুর পর সেখানেই ফিরে যায়।

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً -অর্থাৎ, এ আত্মা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ তাআলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা, বন্দার সন্তুষ্টির দ্বারাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ বন্দার প্রতি সন্তুষ্ট না হলে বন্দা আল্লাহ্র ফয়সালায় সন্তুষ্ট হওয়ার তওফীকই পায় না। এমনি আত্মা মৃত্যুকালে মৃত্যুতেও সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়।

فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ -প্রশান্ত আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হবে, আমার বিশেষ বন্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। এ আদেশ হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করা ধর্মপরায়ণ সৎ বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাদের সাথেই জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। এ থেকে জানা যায় যে, যারা দুনিয়াতে ধার্মিক ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সঙ্গ ও সংসর্গ অবলম্বন করে, তারা যে তাদের সাথে জান্নাতে যাবে, এটা তারই আলামত। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আঃ) দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন : وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ এবং ইউসুফ (আঃ) দোয়া করতে গিয়ে বলেছিলেন : وَاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ –এতে বোঝা গেল, সৎসংসর্গ একটি মহানেয়ামত, যা পয়গম্বরগণও উপেক্ষা করতে পারেন না।

وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ —এতে আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ 'আমার জান্নাত' বলেছেন। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাত কেবল চিরন্তন সুখ-শান্তির আবাসস্থলই নয়, বরং সর্বোপরি এটা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির স্থান।

সূরা আল-ফজর সমাপ্ত

سُوْرَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ عِشْرُوْنَ اٰيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝١ وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝٢ وَوَالِدٍ وَّمَا
وَلَدَ ۝٣ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝٤ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ
عَلَيْهِ اَحَدٌ ۝٥ يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۝٦ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ
اَحَدٌ ۝٧ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۝٨ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۝٩ وَهَدَيْنٰهُ
النَّجْدَيْنِ ۝١٠ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝١١ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝١٢ فَكُّ
رَقَبَةٍ ۝١٣ اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۝١٤ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝١٥
اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝١٦ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝١٧ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝١٨
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝١٩ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ۝٢٠

سُوْرَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسَ عَشْرَةَ اٰيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالشَّمْسِ وَضُحٰىهَا ۝١ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ۝٢ وَالنَّهَارِ اِذَا
جَلّٰىهَا ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ۝٤ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ۝٥

সূরা আল–বালাদ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ২০।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) আমি এই নগরীর শপথ করি (২) এবং এই নগরীতে আপনার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। (৩) শপথ জনকের ও যা জন্ম দেয়। (৪) নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি। (৫) সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না? (৬) সে বলে ঃ আমি প্রচুর ধন–সম্পদ ব্যয় করেছি ! (৭) সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? (৮) আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়, (৯) জিহবা ও ওষ্ঠদ্বয়? (১০) বস্তুতঃ আমি তাকে দু' টি পথ প্রদর্শন করেছি। (১১) অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। (১২) আপনি জানেন, সে ঘাঁটি কি? (১৩) তা হচ্ছে দাসমুক্তি (১৪) অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান (১৫) এতীম আত্মীয়কে (১৬) অথবা ধুলি-ধুসরিত মিসকীনকে (১৭) অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার। (১৮) তারাই সৌভাগ্যশালী। (১৯) আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হতভাগা। (২০) তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে।

সূরা আশ্‌–শাম্‌স

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ১৫।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, (২) শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে, (৩) শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে, (৪) শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে, (৫) শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর।

সূরা আল-বালাদ

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ —এখানে لا অক্ষরটি অতিরিক্ত এবং আরবী বাকপদ্ধতিতে এর অতিরিক্ত ব্যবহার সুবিদিত। অধিক বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্যে এই لا শপথ বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, এটা কেবল তোমার ধারণা নয় ; বরং আমি শপথ সহকারে যা বলছি, তাই বাস্তব সত্য। البلد (নগরী) বলে এখানে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। সূরা ত্বীনেও এমনিভাবে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছে এবং তদসঙ্গে امين বিশেষণও উল্লেখ করা হয়েছে।

وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ - حل শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে—(এক) এটা حلول থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোন কিছুতে অবস্থান নেয়া, থাকা ও অবতরণ করা। অতএব, حل এর অর্থ হবে অবস্থানকারী, বসবাসকারী। আয়াতের মর্মার্থ এই যে, মক্কা নগরী নিজেও সম্মানিত ও পবিত্র, বিশেষতঃ আপনিও এ নগরীতে বসবাস করেন। বসবাসকারীর শ্রেষ্ঠত্বের দরুনও বাসস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে যায়। কাজেই আপনার বসবাসের কারণে এ নগরীর মাহাত্ম্য ও সম্মান দ্বিগুণ হয়ে গেছে। (দুই) এটা حلت থেকে উদ্ভূত। অর্থ হালাল হওয়া। এদিক দিয়ে এক অর্থ এই যে, আপনাকে মক্কার কাফেররা হালাল মনে করে রেখেছে এবং আপনাকে হত্যা করার ফিকিরে রয়েছে ; অথচ তারা নিজেরাও মক্কা নগরীতে কোন শিকারকেই হালাল মনে করে না। এমতাবস্থায় তাদের জুলুম ও অবাধ্যতা কতটুকু যে, তারা আল্লাহ্‌র রসূলের হত্যাকে হালাল মনে করে নিয়েছে। অপর অর্থ এই যে, আপনার জন্যে মক্কার হরমে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল করে দেওয়া হবে। বস্তুতঃ মক্কা বিজয়ের সময় একদিনের জন্যেই তাই করা হয়েছিল। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থ অবলম্বনেই তফসীর করা হয়েছে। মাযহারীতে সম্ভাব্য তিনটি অর্থই উল্লেখ করা হয়েছে।

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ –এখানে والد বলে মানব পিতা হযরত আদম (আঃ), আর ماولد বলে বনী-আদমকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে এতে হযরত আদম ও দুনিয়ার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব বনী-আদমের শপথ করা হয়েছে। অতঃপর শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ - كبد –এর শাব্দিক অর্থ শ্রম ও কষ্ট। অর্থাৎ, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আজীবন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ গর্ভাশয়ে আবদ্ধ থাকে, জন্মলগ্নে শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে, এরপর আসে জননীর দুগ্ধ পান করার ও তা ছাড়ানোর শ্রম। অতঃপর জীবিকা ও জীবনোপকরণ সংগ্রহের কষ্ট, বার্ধক্যের কষ্ট, মৃত্যু, কবর ও হাশর এবং তাতে আল্লাহ্‌র সামনে জবাবদিহি, প্রতিদান ও শাস্তি—এ সমুদয় শ্রমের বিভিন্ন পর্যায়, যা মানুষের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়। এ শ্রম ও কষ্ট শুধু মানুষেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়, অন্যান্য জীব-জানোয়ারও এতে শরীক রয়েছে। কিন্তু এখানে মানুষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, প্রথমতঃ সব মানুষ জীব-জানোয়ার অপেক্ষা অধিক চেতনা ও উপলব্ধির অধিকারী। পরিশ্রমের কষ্ট চেতনাভেদে কম-বেশী হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ শ্রম হচ্ছে হাশরের মাঠে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সারা জীবনের

কাজকর্মের হিসাব দেয়া। এটা অন্য জীব-জানোয়ারের বেলায় নেই।

أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ -অর্থাৎ, এই বোকা কি মনে করে যে, তার দুষ্কর্মসমূহ কেউ দেখেনি? তার জানা উচিত যে, তার স্রষ্টা সবকিছুই দেখছেন।

চক্ষু ও জিহ্বা সৃষ্টির কয়েকটি রহস্য ঃ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ - نجدين - نجد শব্দটি -এর দ্বিবচন। এর শাব্দিক অর্থ উর্ধ্বগামী পথ। এখানে প্রকাশ্য পথ বোঝানো হয়েছে। এপথ দু'টির একটি হচ্ছে সৌভাগ্য ও সাফল্যের পথ এবং অপরটি হচ্ছে অনিষ্ট ও ধ্বংসের পথ।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ - عقبة বলা হয় পাহাড়ের বিরাট প্রস্তর খণ্ডকে এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ তথা মাটিকে। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কাজে এ মাটি মানুষকে সহায়তা করে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরোহণ করে আত্মরক্ষা করা যায় অথবা মাটিতে প্রবেশ করে অন্যত্র চলে যাওয়া যায়। এস্থলে আল্লাহ্‌র এবাদতকে একটি মাটি রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। মাটি যেমন শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়, সৎকর্মও তেমনি পরকালের আযাব থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এসব সৎকর্মের মধ্যে প্রথমে فك رقبة অর্থাৎ, দাস মুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এটা খুব বড় এবাদত এবং একজন মানুষের জীবন সুসংহত করার নামান্তর। দ্বিতীয় সৎকর্ম হচ্ছে ক্ষুধার্তকে অন্নদান। যে কাউকে অন্নদান করা সওয়াবমুক্ত নয়, কিন্তু কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর লোককে অন্ন দান করলে তা আরও বিরাট সওয়াবের কাজ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে ঃ

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ অর্থাৎ, বিশেষভাবে যদি আত্মীয় এতীমকে অন্নদান করা হয়, তবে তাতে দ্বিগুণ সওয়াব হয়।—(এক) ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করার সওয়াব এবং (দুই) আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার সওয়াব। فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ -অর্থাৎ, বিশেষভাবে ক্ষুধার দিনে তাকে অন্ন দান করা অধিক সওয়াবের কারণ হয়ে যায়। এমনিভাবে ধুলায় লুণ্ঠিত মিস্‌কীন অর্থাৎ, নিরতিশয় নিঃস্ব ব্যক্তিকে অন্নদান করাও অধিক সওয়াবের কাজ। এরূপ ব্যক্তি যত বেশী অভাবী হবে, অন্নদাতার সওয়াবও ততই বৃদ্ধি পাবে।

অপরকেও সৎকাজের নির্দেশ দেয়া ঈমানের দাবী ঃ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ এ আয়াতে ঈমানের পর মুমিনের এই কর্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সে অপরাপর মুসলমান ভাইকে সবর ও অনুকম্পার উপদেশ দেবে। সবরের অর্থ নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা ও সৎকর্ম সম্পাদন করা। مرحمة -এর অর্থ অপরের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া। অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে তাকে কষ্টদান ও জুলুম করা থেকে বিরত হওয়া। এতে দ্বীনের প্রায় সব নির্দেশই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সূরা আশ-শামস

এই সূরার শুরুতে সাতটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির সাথে তার পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর উদ্দেশে কিছু বিশেষণ যোগ করা হয়েছে। প্রথম শপথ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا এখানে ضحى শব্দটি অর্থগতভাবে شمس -এর বিশেষণ। অর্থাৎ, শপথ সূর্যের যখন তা উর্ধ্বগগনে থাকে। সূর্য উদয়ের পর যখন কিছু উর্ধ্বে উঠে যায় এবং পৃথিবীতে তার কিরণ ছড়িয়ে পড়ে, সে সময়কে ضحى বলা হয়। তখন সূর্য কাছেই দৃষ্টিগোচর হয় এবং তেমন প্রখরতা না থাকার কারণে তা পূর্ণরূপে দেখাও যায়।

দ্বিতীয় শপথ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا -অর্থাৎ, চন্দ্রের শপথ যখন তা সূর্যের পেছনে আসে এবং এর এক অর্থ এই যে, যখন চন্দ্র সূর্যাস্তের পরেই উদিত হয়। মাসের মধ্যভাগে এরূপ হয়। তখন চন্দ্র প্রায় পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। পেছনে আসার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কিছুটা উর্ধ্বগগনে থাকার সময় সূর্য যেমন পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি পরিপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে চন্দ্র সূর্যের অনুগামী হয়। তৃতীয় শপথ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا -এখানে جَلَّاهَا -এর সর্বনাম দ্বারা পৃথিবী অথবা দুনিয়াও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ, শপথ দিবসের দুনিয়া অথবা পৃথিবীর—যাকে দিন আলোকিত করে। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণরূপে আলোকিত দিবসের শপথ করা হয়েছে। কিন্তু বাক্যের বাহ্যিক অবস্থা এই যে, এখানে সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, শপথ দিবসের, যখন সে সূর্যকে আলোকিত করে। অর্থাৎ, যখন দিন শুরু হওয়ার কারণে সূর্য উজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়।

চতুর্থ শপথ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا -অর্থাৎ, শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। মানে সূর্যের কিরণকে ঢেকে দেয়।

পঞ্চম শপথ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا -অর্থাৎ ما অব্যয়কে مصدرية ধরে এই এই অর্থ নেয়া সুস্পষ্ট যে, সে শপথ আকাশের ও তা নির্মাণের। কোরআনের অন্য এক আয়াতে এর নজির আছে بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي এমনিভাবে ষষ্ঠ শপথ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا বাক্যের অর্থ এরূপ হবে যে শপথ পৃথিবীর ও তাকে বিস্তৃত করার। এখানে আকাশের সাথে নির্মাণের এবং পৃথিবীর সাথে বিস্তৃত করার উল্লেখও এতদুভয়ের পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর জন্যে। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। কাশশাফ, বায়যাবী ও কুরতুবী একেই পছন্দ করেছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এস্থলে ما অব্যয়কে من এর অর্থে ধরে এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার সত্তা বুঝিয়েছেন। কাজেই উপরোক্ত বাক্যদ্বয়ের অর্থ হবে শপথ আকাশের ও তাঁর, যিনি একে নির্মাণ করেছেন। শপথ পৃথিবীর ও তাঁর, যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু এখানে সবগুলো শপথই সৃষ্ট বস্তুর শপথ। মাঝখানে স্রষ্টার শপথ এসে যাওয়া ধারাবাহিকতার খেলাফ মনে হয়। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ী এ আপত্তিও দেখা দেয় না যে, সৃষ্টবস্তুর শপথ স্রষ্টার শপথের অগ্রে বর্ণিত হল কেন?

সপ্তম শপথ ঃ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا -এখানেও দু'রকম অর্থ হতে পারে—(এক) শপথ মানুষের প্রাণের এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার এবং (দুই) শপথ নফসের এবং তাঁর, যিনি সেটাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا
وَتَقْوٰىهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝
كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ۝ إِذِ انْۢبَعَثَ أَشْقٰىهَا ۝ فَقَالَ لَهُمْ
رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۝ فَدَمْدَمَ
عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۝ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝

سُوْرَةُ اللَّيْلِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلّٰى ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ
وَالْأُنْثٰىٓ ۝ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝ فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝ وَأَمَّا مَنْۢ
بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۝ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۝ فَسَنُيَسِّرُهٗ
لِلْعُسْرٰى ۝ وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ إِذَا تَرَدّٰى ۝ إِنَّ عَلَيْنَا
لَلْهُدٰى ۝ وَإِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْأُوْلٰى ۝ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا
تَلَظّٰى ۝ لَا يَصْلٰىهَآ إِلَّا الْأَشْقَى ۝ الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۝

(৬) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তাঁর, (৭) শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর (৮) অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, (৯) যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। (১০) এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (১১) সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশতঃ মিথ্যারোপ করেছিল (১২) যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল, (১৩) অতঃপর আল্লাহ্‌র রসূল তাদেরকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক। (১৪) অতঃপর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং উষ্ট্রীর পা কর্তন করেছিল। তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে একাকার করে দিলেন। (১৫) আল্লাহ্ তাআলা এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না।

সূরা আল-লায়ল

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ২১।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে, (২) শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয় (৩) এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন, (৪) নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। (৫) অতএব, যে দান করে এবং খোদাভীরু হয়, (৬) এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, (৭) আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (৮) আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় (৯) এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, (১০) আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (১১) যখন সে অধঃপতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না। (১২) আমার দায়িত্ব পথপ্রদর্শন করা। (১৩) আর আমি মালিক ইহকালের ও পরকালের। (১৪) অতএব, আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। (১৫) এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, (১৬) যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৭) এ থেকে দূরে রাখা হবে খোদাভীরু ব্যক্তিকে, (১৮) যে আত্মশুদ্ধির জন্যে তার ধন-সম্পদ দান করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا — **الهام**-এর অর্থ নিক্ষেপ করা এবং **فجور** শব্দের অর্থ প্রকাশ্য গোনাহ্। এই বাক্য সপ্তম শপথের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা মানুষের নফস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর অন্তরে অসৎকর্ম ও সৎকর্ম উভয়ের প্রেরণা জাগ্রত করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ্ তাআলা গোনাহ্ ও এবাদত উভয় কর্মের যোগ্যতা রেখেছেন, অতঃপর তাকে বিশেষ এক প্রকার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে সে স্বেচ্ছায় গোনাহের পথ অবলম্বন করে অথবা এবাদতের পথ। যখন সে নিজ ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন এক পথ অবলম্বন করে, তখন এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার ভিত্তিতেই সে সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হয়। এই তফসীর অনুযায়ী এরূপ প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই যে, মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই যখন পাপ ও এবাদত নিহিত আছে, তখন সে তা করতে বাধ্য। এর জন্যে সে কোন সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হবে না। একটি হাদীস থেকে এই তফসীর গৃহীত হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, তকদীর সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষের মধ্যে গোনাহ্ ও এবাদতের যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন, কিন্তু তাকে কোন একটি করতে বাধ্য করেননি ; বরং তাকে উভয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি করার ক্ষমতা দান করেছেন।

হযরত আবু হোরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন—

اللّٰهم آت نفسى تقواها انت وليها ومولاها وانت خير من زكاها

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ আমাকে তাকওয়ার তওফীক দান কর, তুমিই আমার মুরুব্বী ও পৃষ্ঠপোষক।

সপ্তম শপথের পর জওয়াবে বলা হয়েছে قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا — অর্থাৎ, সে ব্যক্তি সফলকাম, যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করে। **تزكية** শব্দের প্রকৃত অর্থ আভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করে, সে সফলকাম। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি ব্যর্থ যে নিজের নফসকে পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত করে দেয়। **دس**-এর অর্থ মাটিতে প্রোথিত করা ; যেমন এক আয়াতে আছে أَمْ يَدُسُّهٗ فِي التُّرَابِ -কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতের অর্থ করেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম হয় ; যাকে আল্লাহ্ শুদ্ধ করেন এবং সে ব্যক্তি ব্যর্থ, যাকে আল্লাহ্ তাআলা গোনাহে ডুবিয়ে দেন। এ আয়াত সমগ্র মানবকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে, সফলকাম ও ব্যর্থ। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার মানুষের একটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করে তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সামূদ গোত্রের ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে তাদের এই শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا — **دمدم** শব্দ এমন কঠোর শাস্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা বার বার কোন ব্যক্তি অথবা জাতির উপর পতিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে দেয়। سَوّٰىهَا-এর উদ্দেশ্য এই যে, এ আযাব জাতির আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবাইকে বেষ্টন করে নেয়। وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا -অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার শাস্তিদান ও কোন জাতিকে

নির্মূল করে দেয়ার ব্যাপারকে দুনিয়ার ব্যাপারের মত মনে করো না। দুনিয়াতে কোন রাজাধিরাজ ও প্রবল পরাক্রান্ত শাসকও কোন জাতির বিরুদ্ধে ধ্বংসাভিযান পরিচালনা করলে সে জাতির অবশিষ্ট লোক অথবা তাদের সমর্থকদের প্রতিশোধমূলক কার্যক্রম ও গণবিদ্রোহের আশংকা করতে থাকে। এখানে যারা অপরকে হত্যা করে, তারা নিজেরাও হত্যার আশংকা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যারা অপরকে আক্রমণ করে তারা নিজেরাও আক্রান্ত হওয়ার ভয় রাখে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এরূপ নন। কারও পক্ষ থেকে কোন সময় তাঁর কোন বিপদাশঙ্কা নেই।

সূরা আল-লায়ল

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ –এ বাক্যটি সূরা ইনশিকাকের إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا বাক্যের অনুরূপ, যার তফসীর সে সূরায় বর্ণিত হয়ে গেছে। মর্মার্থ এই যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে কোন না কোন কাজের জন্যে প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ে অভ্যস্ত, কিন্তু কোন কোন লোক তার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা চিরস্থায়ী সুখের ব্যবস্থা করে নেয়, আর কেউ কেউ এই পরিশ্রম দ্বারাই অনন্ত আযাব ক্রয় করে। হাদীসে আছে, প্রত্যেক মানুষ সকাল বেলায় গাত্রোত্থান করে নিজেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এই ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করে এবং নিজেকে পরকালের আযাব থেকে মুক্ত করে। পক্ষান্তরে কারও শ্রম ও প্রচেষ্টাই তার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হল প্রথমে নিজের প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিণতি চিন্তা করা এবং যে কর্মের পরিণতি সাময়িক সুখ ও আনন্দ হয়, তার কাছেও না যাওয়া।

কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে মানুষের দু'দল ঃ অতঃপর কোরআন পাক কর্ম প্রচেষ্টার ভিত্তিতে মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে এবং প্রত্যেকের তিনটি করে বিশেষণ বর্ণনা করেছে—প্রথমে সফলকাম দলের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ –অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহ্কে ভয় করে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তাঁর অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকে এবং সে উত্তম কলেমাকে সত্য মনে করে। এখানে 'উত্তম কলেমা' বলে কলেমায়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে-আব্বাস, যাহ্হাক)

দ্বিতীয় দলেরও তিনটি কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ –অর্থাৎ, যে আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা করে তথা যাকাত ও ওয়াজিব সদকাও দেয় না, আল্লাহ্কে ভয় করার পরিবর্তে তাঁর প্রতি বিমুখ হয় এবং উত্তম কলেমা তথা ঈমানের কলেমাকে মিথ্যা মনে করে। এতদুভয়ের প্রথম দল সম্পর্কে বলা হয়েছে فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ – يسرى এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও আরামদায়ক বিষয়, যাতে কোন কষ্ট নেই। এখানে জান্নাত বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ – عسر এর শাব্দিক অর্থ কঠিন ও কষ্টদায়ক বিষয়। এখানে জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রম প্রথমোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, (অর্থাৎ, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা, আল্লাহ্কে ভয় করা এবং ঈমানকে সত্য মনে করা) তাদেরকে আমি জান্নাতের কাজের জন্যে সহজ করে দেই। পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রমকে শেষোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, আমি তাদেরকে জাহান্নামের কাজের জন্য সহজ করে দেই। এখানে বাহ্যতঃ এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, আমি তাদের জন্যে জান্নাতের অথবা জাহান্নামের কাজ সহজ করে দেই। কেননা, কাজকর্মই সহজ অথবা কঠিন হয়ে থাকে—ব্যক্তি সহজ অথবা কঠিন হয় না। কিন্তু কোরআন পাক এভাবে ব্যক্ত করেছে যে, স্বয়ং তাদের সত্তাকে এসব কাজের জন্যে সহজ করে দেয়া হবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রথম দলের জন্যে জান্নাতের কাজকর্ম তাদের মজ্জায় পরিণত হবে। আর এর বিপরীত কাজ করতে তারা কষ্ট অনুভব করবে। এমনিভাবে দ্বিতীয় দলের জন্যে জাহান্নামের কাজকর্ম মজ্জায় পরিণত করে দেয়া হবে। ফলে তারা এ জাতীয় কাজই পছন্দ করবে এবং এতেই শান্তি পাবে। উভয় দলের মজ্জায় এ অবস্থা সৃষ্টি করে দেয়াকেই একথা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদেরকে এসব কাজের জন্যে সহজ করে দেয়া হবে।

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ –অর্থাৎ, যে ধন-সম্পদের খাতিরে এ হতভাগ্য ওয়াজিব হক দিতেও কৃপণতা করত, সে ধন-সম্পদ আযাব আসার সময় তার কোন কাজে আসবে না। تردى –এর শাব্দিক অর্থ গর্তে পতিত হওয়া ও ধ্বংস হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পরে কবরে অতঃপর কেয়ামতে যখন সে জহান্নামের গর্তে পতিত হবে, তখন এই ধন-সম্পদ কোন উপকারে আসবে না।

لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ —অর্থাৎ, এই জাহান্নামে নিতান্ত হতভাগা ব্যক্তিই দাখিল হবে, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাঁদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলাবাহুল্য, এরূপ মিথ্যা আরোপকারী কাফেরই হতে পারে। এ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, পাপী মুমিন যে মিথ্যারোপের অপরাধে অপরাধী নয়, সে জাহান্নামে দাখিল হবে না। অথচ কোরআনের অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, মুমিন ব্যক্তি গোনাহ্ করার পর যদি তওবা না করে অথবা কারও সুপারিশের বলে কিংবা বিশেষ রহমতে যদি তাকে ক্ষমা করা না হয়, তবে সেও জাহান্নামে যাবে এবং গোনাহের শাস্তি ভোগ করা পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে। অবশ্য শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে ঈমানের কল্যাণে তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে।

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ —এতে সৌভাগ্যশালী খোদাভীরুদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্যে অভ্যস্ত এবং একমাত্র গোনাহ্ থেকে শুদ্ধ হওয়ার উদ্দেশে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে।

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

سُورَةُ الضُّحَىٰ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

سُورَةُ الشَّرْحِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانُ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

(১৯) এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না। (২০) তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত। (২১) সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে।

সূরা আদ্ব-দ্বোহা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ১১।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) শপথ পূর্বাহ্নের, (২) শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, (৩) আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। (৪) আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। (৫) আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (৬) তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। (৭) তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। (৮) তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। (৯) সুতরাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না ; (১০) সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না (১১) এবং আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।

সূরা আল- ইন্‌শিরাহ্‌

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ৮।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি? (২) আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, (৩) যা ছিল আপনার জন্যে অতিশয় দুঃসহ। (৪) আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি। (৫) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৬) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৭) অতএব, যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন। (৮) এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর সাথেই সম্পর্কশীল আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ —অর্থাৎ, যেসব গোলামকে হযরত আবুবকর (রাঃ) প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোন সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরূপ করা যেত ; বরং إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ -তাঁর লক্ষ্য মহান আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না।

মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোন মুসলমানকে কাফের মালিকের হাতে বন্দী দেখলে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন। এ ধরনের মুসলমান সাধারণঃ দুর্বল ও শক্তিহীন হত। একদিন তাঁর পিতা হযরত আবু কোহাফা বললেন ঃ তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তই করে দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহসী গোলাম দেখে মুক্ত করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে সে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে হেফাযত করতে পারে। হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন ঃ কোন মুক্ত করা মুসলমান দ্বারা উপকার লাভ করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি তো কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই তাদেরকে মুক্ত করি।— (মাযহারী)

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ -অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই তার ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং পার্থিব উপকার চায়নি, আল্লাহ্‌ তাআলাও পরকালে তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং জান্নাতের মহা নেয়ামত তাকে দান করবেন। এই শেষ বাক্যটি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর জন্যে একটি বিরাট সুসংবাদ। আল্লাহ্‌ তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন—এ সংবাদ দুনিয়াতেই তাঁকে শোনানো হয়েছে।

সূরা আদ্ব-দোহা

এই সূরা অবতরণের কারণ সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর একটি অংগুলীতে আঘাত লেগে রক্ত বের হয়ে পড়লে বললেন ঃ

অর্থাৎ, তুমি তো একটি অংগুলীই ; যা রক্তাক্ত হয়ে গেছ। তুমি যে কষ্ট পেয়েছ, তা আল্লাহ্‌র পথেই পেয়েছ। (কাজেই দুঃখ কিসের।) এ ঘটনার পর কিছু দিন জিবরাঈল ওহী নিয়ে আগমন করলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ্‌ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে সূরা আদ্ব-দ্বোহা অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে বর্ণিত জুনদুব (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে দু'এক রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্যে না উঠার কথা আছে—ওহী বিলম্বিত হওয়ার কথা নেই। তিরমিযীতে তাহাজ্জুদের জন্যে না উঠার উল্লেখ নেই, শুধু ওহী বিলম্বিত হওয়ার উল্লেখ আছে। বলাবাহুল্য, উভয় ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে বিধায় উভয় রেওয়ায়েতে কোন বিরোধ নেই। বর্ণনাকারী হয়তো এক সময়ে এক ঘটনা এবং অন্য সময়ে অন্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রেওয়ায়েতে আছে যে, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালিয়েছিল। ওহী বিলম্বিত হওয়ার

ঘটনা কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল। একবার কোরআন অবতরণের প্রথমভাগে যাকে 'ফাতরাতে-ওহী'র কাল বলা হয়। এটাই ছিল বেশী দিনের বিলম্ব। দ্বিতীয়বার তখন বিলম্বিত হয়েছিল, যখন মুশরিকরা অথবা ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে রূহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখেছিল এবং তিনি পরে জওয়াব দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন 'ইনশাআল্লাহ্' না বলার কারণে ওহীর আগমন বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল যে, মুহাম্মদের আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছেন। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা দ্বোহা অবতীর্ণ হয়, সেটাও এমনি ধরনের। সবগুলো ঘটনা একই সময়ে সংঘটিত হওয়া জরুরী নয়; বরং আগে-পিছেও হতে পারে।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى -এখানে اخرة ও اولى শব্দদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অর্থ পরকাল ও ইহকাল নেয়া হলে এর ব্যাখ্যা হবে যে, মুশরিকরা আপনার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, এর অসারতা তো তারা ইহকালে দেখে নেবেই, অধিকন্তু আমি আপনাকে পরকালে নেয়ামত দান করারও ওয়াদা দিচ্ছি। সেখানে আপনাকে ইহকাল অপেক্ষা অনেক বেশী নেয়ামত দান করা হবে। এখানে اخرة -কে শাব্দিক অর্থে নেয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, এর অর্থ পরবর্তী অবস্থা; যেমন اولى শব্দের অর্থ প্রথম অবস্থা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামত দিন দিন বেড়েই যাবে এবং প্রত্যেক প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উত্তম ও শ্রেয় হবে। এতে জ্ঞানগরিমা ও খোদায়ী নৈকট্যে উন্নতিলাভসহ জীবিকা এবং পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব অবস্থাই অন্তর্ভুক্ত।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى —অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা আপনাকে এত প্রাচুর্য দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এতে কি দিবেন, তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কাম্যবস্তুই প্রচুর পরিমাণে দেবেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাম্যবস্তুসমূহের মধ্যে ছিল ইসলামের উন্নতি, সারা বিশ্বে ইসলামের প্রসার, উম্মতের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়লাভ, শত্রুদেশে ইসলামের কলেমা সমুন্নত করা ইত্যাদি। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাযিল হলে পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তাহলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার উম্মতের একটি লোকও জাহান্নামে থাকবে।—(কুরতুবী) হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা আমার উম্মত সম্পর্কে আমার সুপারিশ কবূল করবেন এবং অবশেষে তিনি বলবেন, رضيت يامحمد হে মুহাম্মদ, এখন আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কি? আমি আরয করব? يارب رضيت হে আমার পরওয়ারদেগার, আমি সন্তুষ্ট। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কিত এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ —অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)- এর উক্তি সম্বলিত অপর একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন— اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ —এরপর তিনি দুহাত তুলে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বারবার বলতে লাগলেন اللهم امتى امتى আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করতে প্রেরণ করলেন ঃ (এবং বললেন, অবশ্য আমি সব জানি।) জিবরাঈলের জওয়াবে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) বললেন ঃ আমি আমার উম্মতের মাগফেরাত চাই। আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলকে বললেন ঃ যাও, গিয়ে বল যে, আল্লাহ্ তাআলা উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং আপনাকে দুঃখিত করবেন না।

উপরে কাফেরদের বলাবলির জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি ইহকালে ও পরকালে খোদায়ী নেয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল। অতঃপর তিনটি বিশেষ নেয়ামত উল্লেখ করে এর কিঞ্চিত বিবরণ দেয়া হয়েছে—

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى -এটা প্রথম নেয়ামত। অর্থাৎ, আমি আপনাকে পিতৃহীন পেয়েছি। আপনার জন্মের পূর্বেই পিতা ইন্তেকাল করেছিল। পিতা কোন বিষয়-আশয়ও ছেড়ে যাননি, যদ্দ্বারা আপনার লালন-পালন হতে পারত। অতঃপর আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। অর্থাৎ, প্রথমে পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের ও পরে পিতৃব্য আবু তালেবের অন্তরে আপনার প্রতি অগাধ স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। ফলে তাঁরা ঔরসজাত সন্তান অপেক্ষা অধিক যত্নসহকারে আপনাকে লালন-পালন করতেন।

দ্বিতীয় নেয়ামত ঃ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى - ضال শব্দের অর্থ পথভ্রষ্টও হয় এবং অনভিজ্ঞ, বেখবরও হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। নবুওয়ত লাভের পূর্বে তিনি খোদায়ী বিধি-বিধান সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। অতঃপর নবুওয়তের পদ দান করে তাঁকে পথনির্দেশ দেয়া হয়।

তৃতীয় নেয়ামত ঃ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى -অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত পেয়েছেন। অতঃপর আপনাকে ধনশালী করেছেন। হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ধন-সম্পদ দ্বারা অংশীদারী কারবার করার মাধ্যমে এর সূচনা হয়, অতঃপর খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহ করার ফলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি রসূলুল্লাহ্ (রাঃ)-এর জন্য উৎসর্গিত হয়ে যায়।

এ তিনটি নেয়ামত উল্লেখ করার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ - قهر শব্দের অর্থ জবরদস্তিমূলকভাবে অধিকারভুক্ত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কোন পিতৃহীনকে অসহায় ও বেওয়ারিশ মনে করে তার ধন-সম্পদ জবরদস্তিমূলকভাবে নিজ অধিকারভুক্ত করে নেবেন না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এতীমের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর আদেশ দিয়েছেন এবং বেদনাদায়ক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মুসলমানদের সে গৃহই সর্বোত্তম যাতে কোন এতীম রয়েছে এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করা হয়। আর সে গৃহ সর্বাধিক মন্দ, যাতে কোন এতীম রয়েছে, কিন্তু তার সাথে অসদ্ব্যবহার করা হয়।—(মাযহারী)

দ্বিতীয় নির্দেশ ঃ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ - نهر শব্দের অর্থ ধমক দেয়া এবং سائل -এর অর্থ সাহায্যপ্রার্থী। অর্থগত ও জ্ঞানগত উভয় প্রকার সাহায্যপ্রার্থী এর অন্তর্ভুক্ত। উভয়কে ধমক দিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নিষেধ করা হয়েছে। সাহায্য প্রার্থীকে কিছু দিয়ে বিদায় করা এবং দিতে না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উত্তম। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন শিক্ষণীয় বিষয় জানতে চায় তার জওয়াবেও কঠোরতা ও দুর্ব্যবহার করা নিষেধ। তবে যদি কোন সাহায্যপ্রার্থী নাছোড়বান্দা হয়ে যায় তবে প্রয়োজনে তাকে ধমক দেয়াও জায়েয।

তৃতীয় নির্দেশ ঃ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ - تحديث শব্দের অর্থ কথা বলা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের সামনে আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করুন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটাও এক পন্থা। এমনকি একজন অন্যজনের প্রতি যে অনুগ্রহ করে, তারও শোকর আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের শোকর আদায় করে না, সে

আল্লাহ্‌ তাআলারও শোকর আদায় করে না।—(মাযহারী)

সূরা দ্বোহা থেকে কোরআনের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার সাথে তকবীর বলা সুন্নত। শায়েখ সালেহ্‌ মিসরীর মতে, এই তকবীর হল لا اله الا الله والله اكبر —(মাযহারী)

ইবনে কাসীর প্রত্যেক সূরা শেষে এবং বগভী (রহঃ) প্রত্যেক সূরার শুরুতে তকবীর বলা সুন্নত বলেছেন।—(মাযহারী) উভয়ের মধ্যে যাই করা হবে, তাতে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

সূরা দ্বোহা থেকে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সূরায় রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ নেয়ামত ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং কয়েকটি সূরায় কেয়ামত ও তার অবস্থাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন মহান এবং যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। এই বিষয়বস্তু দ্বারাই কোরআন পাক শুরু করা হয়েছে এবং সেই সত্তার মাহাত্ম্য বর্ণনা দ্বারা শেষ করা হয়েছে, যাঁর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরা আল-ইন্‌শিরাহ

সূরা যোহার শেষে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা যোহা থেকে শেষ পর্যন্ত বাইশটি সূরায় বেশীর ভাগ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর প্রতি নেয়ামত ও তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মাত্র কয়েকটি সূরায় কেয়ামতের অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য সূরা ইনশিরাহেও রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে এবং এ বর্ণনায়ও সূরা যোহার ন্যায় জিজ্ঞাসাবোধক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে।

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ - شرح শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা। জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্যে বক্ষকে প্রশস্ত করে দেয়ার অর্থে বক্ষ উন্মুক্ত করা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্য এক আয়াতে আছে فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পবিত্র বক্ষকে আল্লাহ্‌ তাআলা জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্যে এমন বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন যে, বিশ্ববিখ্যাত কোন পণ্ডিত-দার্শনিকও তাঁর জ্ঞান-গরিমার ধারে কাছে পৌঁছতে পারেনি। এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টির প্রতি তাঁর মনোনিবেশ আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি মনোনিবেশে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করত না। কোন কোন সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র আদেশে বাহ্যতঃ ও তাঁর বক্ষ বিদারণ করে পরিষ্কার করেছিল। কোন কোন তফসীরবিদ এস্থলে বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ সে বক্ষ বিদারণই নিয়েছেন।—(ইবনে-কাসীর)

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ - وزر - এর শাব্দিক অর্থ বোঝা আর نقض ظهر -এর শাব্দিক অর্থ কোমর ভেঙ্গে দেয়া। অর্থাৎ, কোমরকে নুইয়ে দেয়া। কোন বড় বোঝা কারও মাথায় তুলে দিলে যেমন তার কোমর নুয়ে পড়ে, তেমনি আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে বোঝা আপনার কোমরকে নুইয়ে দিয়েছিল, আমি তাকে আপনার উপর থেকে অপসারিত করে দিয়েছি। সে বোঝা কি ছিল, তার ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, নবুওয়তের প্রথমদিকে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর উপর ওহীর প্রতিক্রিয়াও গুরুতররূপে দেখা দিত। তদুপরি সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার করা এবং কুফর ও শিরকের বিলোপ সাধন করে সমগ্র মানব জাতিকে তওহীদে একত্রিত করার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল।

এসব ব্যাপারে আদেশ ছিল فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ —অর্থাৎ, আপনি আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ী সরল পথে অটল থাকুন। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এই গুরুভার তিলে তিলে অনুভব করতেন। এক হাদীসে আছে, তাঁর দাঁড়ির কতক চুল সাদা হয়ে গেলে তিনি বললেন ঃ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ -এই আয়াত আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।

এই বোঝাকেই তাঁর অন্তর থেকে সরিয়ে দেয়ার সুসংবাদ এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। একে সরানোর পন্থা পরের আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আপনার প্রত্যেক কষ্টের পর স্বস্তি আসবে। আল্লাহ্‌ তাআলা বক্ষ উন্মুক্ত করার মাধ্যমে তাঁর মনোবল আকাশচুম্বী করে দেন। ফলে প্রত্যেক কঠিন কাজই তাঁর কাছে সহজ মনে হতে থাকে এবং কোন বোঝাই আর বোঝা থাকেনি।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ -রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর আলোচনা উন্নত করা এই যে, ইসলামের বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মসমূহে আল্লাহ্‌র নামের সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়। সারা বিশ্বের মসজিদসমূহের মিনারে ও মিম্বরে আশহাদু আল্‌ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'র সাথে সাথে 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ' বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশ্বের কোন জ্ঞানী মানুষ তাঁর নাম সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত উচ্চারণ করে না, যদিও সে অমুসলমান হয়।

এখানে তিনটি নেয়ামত উলেখ করা হয়েছে— شرح صدر (বক্ষ উন্মোচন) وضع وزر (বোঝা লাঘবকরণ) ও رفع ذكر (আলোচনা উন্নতকরণ)। এগুলোকে তিনটি বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বাক্যে কর্তা ও কর্মের মাঝখানে لك অথবা عنك ব্যবহার করা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব কাজ আপনার খাতিরেই করা হয়েছে।

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -আরবী ভাষার একটি নীতি এই যে, আলিফ ও লামযুক্ত শব্দকে যদি পুনরায় আলিফ ও লাম সহকারে উল্লেখ করা হয়, তবে উভয় জায়গায় একই বস্তুসত্তা অর্থ হয়ে থাকে এবং আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে পুনরায় উল্লেখ করা হলে উভয় জায়গায় পৃথক পৃথক বস্তুসত্তা বোঝানো হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে الْعُسْرِ শব্দটি যখন পুনরায় الْعُسْرِ উল্লেখিত হয়েছে, তখন বোঝা গেল যে, উভয় জায়গায় একই عسر অর্থাৎ, কষ্ট বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে يُسْرًا শব্দটি উভয় জায়গায় আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে উল্লেখিত হয়েছে এতে নিয়মানুযায়ী বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় يسر তথা স্বস্তি প্রথম يسر তথা স্বস্তি থেকে ভিন্ন। এতএব আয়াতে إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -এর পুনরুল্লেখ থেকে জানা গেল যে, একই কষ্টের জন্যে দু'টি স্বস্তির ওয়াদা করা হয়েছে। দু'এর উদ্দেশ্যও এখানে বিশেষ দু'এর সংখ্যা নয়; বরং উদ্দেশ্য অনেক। অতএব সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর একটি কষ্টের সাথে তাঁকে অনেক স্বস্তি দান করা হবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে এই আয়াত থেকে দু'টি সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং বলেছেন, لن يغلب عسر يسرين অর্থাৎ, এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর প্রবল হতে পারে না। সেমতে মুসলমান অমুসলমানদের লিখিত সব ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, যে কাজ কঠিন থেকে কঠিনতর বরং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হত, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর জন্যে সে কাজ সহজতর হয়ে গিয়েছিল।

سُورَةُ التِّينِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانُ آيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ① وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ② وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ③ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ④ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ⑤ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ⑥ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ⑦ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ⑧

سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعَ عَشْرَةَ آيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ① خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ② اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ③ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤ كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ⑥ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ⑦ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ⑧ اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى ⑨ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ⑩ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ⑪ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ⑫ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ⑬ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ⑭ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ڏ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ⑮ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ⑯ فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ⑰

সূরা ত্বীন

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের, (২) এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বতের, (৩) এবং এই নিরাপদ নগরীর। (৪) আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে (৫) অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে (৬) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (৭) অতঃপর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ কেয়ামতকে? (৮) আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?

সূরা আলাক

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ১৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। (৩) পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, (৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (৬) সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, (৭) এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। (৮) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে। (৯) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে (১০) এক বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে? (১১) আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎপথে থাকে (১২) অথবা খোদাভীতি শিক্ষা দেয়। (১৩) আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৪) সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন? (১৫) কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই—(১৬) মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ। (১৭) অতএব, সে তার সভাসদদেরকে আহবান করুক।

শিক্ষা ও প্রচারকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্যে একান্তে যিকর ও আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করা জরুরী ঃ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ —অর্থাৎ, আপনি যখন দাওয়াত ও তবলীগের কাজ থেকে অবসর পান, তখন অন্য কাজের জন্যে তৈরী হয়ে যান। আর তা হল এই যে, আল্লাহ্‌র যিকর, দোয়া ও এস্তেগফারে আত্মনিয়োগ করুন। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ তফসীরই করেছেন। কেউ কেউ অন্য তফসীরও করেছেন, কিন্তু এটাই অধিকতর বোধগম্য তফসীর। এর সারমর্ম এই যে, দাওয়াত, তবলীগ, মানুষকে পথপ্রদর্শন করা এবং তাদের সংশোধনের চিন্তা করা—এসবই ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সর্ববৃহৎ এবাদত। কিন্তু এটা সৃষ্টজীবের মধ্যস্থতায় এবাদত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কেবল এ জাতীয় পরোক্ষ এবাদত করে ক্ষান্ত হবেন না বরং যখনই এ এবাদত থেকে অবসর পাবেন, তখন একান্তে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করুন। তাঁর কাছেই প্রত্যেক কাজে সাফল্য লাভের দোয়া করুন। আল্লাহ্‌র যিকর ও প্রত্যক্ষ এবাদতই তো আসল উদ্দেশ্য। এর জন্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এ কারণেই পরোক্ষ এবাদত থেকে অবসর পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা এক প্রয়োজনের এবাদত। এ থেকে অবসর পাওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রত্যক্ষ এবাদত তথা আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করা এমন বিষয়, যা থেকে মুমিন ব্যক্তি কখনও অবসর পেতে পারে না, বরং তার জীবন ও সর্বশক্তি এতে ব্যয় করতে হবে।

এ থেকে জানা গেল যে, আলেম সমাজ, যারা শিক্ষা,প্রচার ও জনসংশোধনের কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদের কিছু সময় আল্লাহ্‌র যিকর ও আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশে ব্যয়িত হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলেমগণ এরূপই ছিলেন। এছাড়া শিক্ষা এবং প্রচারকার্যও কার্যকর হয় না এবং তাতে বরকতও হয় না। فَانْصَبْ শব্দটি نصب থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ পরিশ্রম ও ক্লান্তি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এবাদত ও যিকর এতটুকু করা উচিত যে, তাতে কিছু কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভূত হয়— আরাম পর্যন্তই সীমিত রাখা উচিত নয়। কোন ওযিফা কিংবা নিয়ম মেনে চলাও এক প্রকার কষ্ট ও ক্লান্তি, যদিও কাজ সামান্যই হয়।

সূরা ত্বীন

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ -এ সূরায় চারটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। (এক) তীন অর্থাৎ, আঞ্জীর তথা ডুমুর বৃক্ষ। (দুই) যয়তুন বৃক্ষ। (তিন) সিনাই প্রান্তররস্থ তূর পর্বত। (চার) মক্কা মোকাররমা। এই বিশেষ শপথের কারণ এই হতে পারে যে, তূর পর্বত ও মক্কা নগরীর ন্যায় ডুমুর ও যয়তুন বৃক্ষও বিপুল উপকারী বস্তু। এটাও সম্ভবপর যে, এখানে তীন ও যয়তুন উল্লেখ করে সে স্থানকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে এ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আর সে স্থান হচ্ছে শাম দেশ, যা অগণিত পয়গম্বরগণের আবাসভূমি। হযরত ইবরাহীম (আঃ) সে দেশে অবস্থান করতেন। তাঁকে সেখান থেকে হিজরত করিয়ে মক্কা মোকারমায় আনা হয়েছিল। এভাবে উপরোক্ত শপথসমূহে সেসব ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেখানে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরগণ জন্মগ্রহণ করেছেন ও প্রেরিত হয়েছেন। শাম দেশ অধিকাংশ পয়গম্বরের আবাসভূমি। তূর পর্বত মূসা (আঃ)-এর আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপের স্থান। সিনীন অথবা সীনা তূর পর্বতের অবস্থানস্থলের নাম। নিরাপদ শহর শেষনবী (সাঃ)-এর জন্মস্থান ও বাসস্থান।

শপথের পর বলা হয়েছে ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ –এর শাব্দিক অর্থ কোন কিছুর অবয়ব ও ভিত্তিকে ঠিক করা।

أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ –এর উদ্দেশ্য এই যে, তার মজ্জা ও স্বভাবকেও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের তুলনায় উত্তম করা হয়েছে এবং তার দৈহিক অবয়ব এবং আকার-আকৃতিকেও দুনিয়ার সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করা হয়েছে।

সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর ঃ মানুষকে আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করেছেন। ইবনে আরাবী বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ অপেক্ষা সুন্দর কেউ নেই। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা তাকে জ্ঞানী, শক্তিবান, বক্তা, শ্রোতা, দ্রষ্টা, কুশলী এবং প্রজ্ঞাবান করেছেন। এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী। সেমতে বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে ان الله خلق ادم على صورته—অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা আদম (আঃ)-কে নিজের আকারে সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ এটাই হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলার কতিপয় গুণাবলী কোন কোন পর্যায়ে তাকেও দেয়া হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্ তাআলার কোন আকার নেই।—(কুরতুবী)

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ –পূর্বের আয়াতে মানুষকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সুন্দরতম সৃষ্টি করার বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে তার বিপরীতে বলা হয়েছে যে, সে যৌবনের প্রারম্ভে যেমন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ছিল, তেমনি পরিশেষে সে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর এবং মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এই উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা তার বাহ্যিক ও শারীরিক অবস্থার দিক দিয়ে বলা হয়েছে। যৌবন অস্তমিত হয়ে গেলে তার আকার-আকৃতি বদলে যায়। বার্ধক্য এসে তাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। সে কুশ্রী দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং কর্মক্ষমতা হারিয়ে অপরের উপর বোঝা হয়ে যায়। কারও কোন উপকারে আসে না। অন্যান্য জীব জন্তু এর বিপরীত। সেগুলি শেষ পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকে। মানুষ ওসবের কাছ থেকে দুগ্ধ, বোঝা বহন এবং অন্যান্য বহু রকম কাজ নেয়। জবাই করা হলে অথবা মারা গেলেও সেগুলির চামড়া, পশম অস্থি মানুষের কাজে আসে। কিন্তু মানুষ যখন বার্ধক্যে অক্ষম হয়ে যায়, তখন সে সাংসারিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। মৃত্যুর পরও তার কোন অংশ দ্বারা কোন মানুষ অথবা জন্তুর উপকার হয় না। সারকথা, মানুষ যে নিকৃষ্টদের মধ্যে নিকৃষ্টতম, এর অর্থ তার বৈষয়িক ও শারীরিক অবস্থা। হযরত যাহ্‌হাক প্রমুখ থেকে এ তফসীরই বর্ণিত রয়েছে—(কুরতুবী)

এ তফসীর অনুযায়ী পরের আয়াতে মুমিন সৎকর্মশীলগণ এর ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মুমিন সৎকর্মী বার্ধক্যে অক্ষম ও অপারগ হয় না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের দৈহিক বেকারত্ব ও বৈষয়িক অকর্মন্যতার ক্ষতি তাদের হয় না, বরং ক্ষতি কেবল তাদের হয় যারা নিজেদের সমগ্র চিন্তা ও যোগ্যতা বৈষয়িক উন্নতিতেই ব্যয় করেছিল। এখন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিন্তু মুমিন সৎকর্মীর পুরস্কার ও সওয়াব কোন সময়ই নিঃশেষ হয় না। দুনিয়াতে বার্ধক্যের বেকারত্ব ও অপরাগতার সম্মুখীন হলেও পরকালে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও সুখ বিদ্যমান থাকে। বার্ধক্যজনিত বেকারত্ব ও কর্ম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তাদের আমলানামায় সেসব কর্ম লিখিত হয়, যা তারা শক্তিমান অবস্থায় করত। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কোন মুসলমান অসুস্থ হয়ে পড়লে আল্লাহ্ তাআলা আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন, সুস্থ অবস্থায় সে যেসব সৎকর্ম করত, সেগুলো তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করতে থাক। (বোখারী) এছাড়া এস্থলে মুমিন সৎকর্মীর প্রতিদান জান্নাত ও তার নেয়ামত বর্ণনা করার পরিবর্তে বলা হয়েছে فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ –অর্থাৎ, তাদের পুরস্কার কখনও বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত হবে না। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তাদের এই পুরস্কার দুনিয়ার বৈষয়িক জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা তার প্রিয় বান্দাদের জন্যে বার্ধক্যে এমন খাঁটি সহচর জুটিয়ে দেন, যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের কাছ থেকে আত্মিক উপকারিতা লাভ করতে থাকেন এবং তাদের সর্বপ্রকার সেবাযত্ন করেন। এভাবে বার্ধক্যের যে স্তরে মানুষ বৈষয়িক ও দৈহিক দিক দিয়ে অকেজো, বেকার ও অপরের উপর বোঝারূপে গণ্য হয়, সে স্তরেও আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ বেকার থাকেন না। কোন কোন তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের এরূপ তফসীর করেছেন যে,

رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ সাধারণ মানুষের জন্যে নয়; বরং কাফের ও পাপাচারীদের জন্যে বলা হয়েছে, যারা খোদা প্রদত্ত সুন্দর অবয়ব, গুণগত উৎকর্ষ ও বিবেককে বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনে বরবাদ করে দেয়। এই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হিসেবে তাদেরকে হীনতম পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া হবে। এমতাবস্থায় إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا বাক্যের ব্যতিক্রম বাহ্যিক অর্থেই বহাল থাকে। অর্থাৎ, যারা মুমিন ও সৎকর্মী, তাদেরকে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌঁছানো হবে না। কেননা, তাদের পুরস্কার সব সময়ই অব্যাহত থাকবে।—(মাযহারী)

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ –এতে কেয়ামতে অবিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, খোদায়ী কুদরতের উপরোক্ত দৃশ্য ও পরিবর্তন দেখার পরও তোমাদের জন্যে পরকাল ও কেয়ামতকে মিথ্যা মনে করার কি অবকাশ থাকতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা কি সব বিচারকের মহাবিচারক নন?

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা তীনের أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ পর্যন্ত পাঠ করে, তার উচিত وانا على ذلك من الشاهدين বলা। ফোকাহ্‌বিদগণের মতে এই বাক্যটি পাঠ করা মোস্তাহাব।

সূরা আলাক

ওহীর সূচনা ও সর্বপ্রথম ওহী ঃ বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, সূরা আলাক থেকেই ওহীর সূচনা হয় এবং এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত (مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত) সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ সূরা মুদ্দাস্‌সিরকে প্রথম সূরা এবং কেউ সূরা ফাতেহাকে সর্বপ্রথম সূরা বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম বগভী অধিকাংশ আলেমের মতকেই বিশুদ্ধ বলেছেন। সূরা মুদ্দাস্‌সিরকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, সূরা আলাকের পাঁচ আয়াত নাযিল হওয়ার পর দীর্ঘকাল কোরআন অবতরণ বন্ধ থাকে, যাকে ওহীর বিরতিকাল বলা হয়ে থাকে—এই বিরতির কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ভীষণ মর্মবেদনা ও মানসিক অশান্তির সম্মুখীন হন। এরপর একদিন হঠাৎ জিবরাঈল (আঃ) সামনে আসেন এবং সূরা মুদ্দাস্‌সির অবতীর্ণ হয়। এ সময়ও ওহী অবতরণ এবং জিবরাঈলের সাথে সাক্ষাতের দরুন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মধ্যে সে পূর্বের

মতই ভাবান্তর দেখা দেয়, যা সূরা আলাক অবতীর্ণ হওয়ার সময় দেখা দিয়েছিল। এভাবে বিরতিকালের পর সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রাথমিক আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। ফলে একেও প্রথম সূরা আখ্যা দেয়া যায়। সূরা ফাতেহাকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, পূর্ণ সূরা হিসাবে একত্রে সূরা ফাতেহাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এর আগে কয়েকটি সূরার আংশবিশেষই অবতীর্ণহয়েছিল।—(মাযহারী)

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ –এখানে اسم শব্দ যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখনই কোরআন পড়বেন, আল্লাহ্‌র নাম অর্থাৎ, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা শুরু করবেন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর পেশকৃত ওযরের জওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনি যদিও বর্তমান অবস্থায় উম্মী ; লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু আপনার পালনকর্তা উম্মী ব্যক্তিকে উচ্চতর শিক্ষা, বাক্‌-নৈপুণ্য, বিশুদ্ধ ভাষাজ্ঞান ও প্রাঞ্জলতার এমন পরাকাষ্ঠা দান করতে পারেন, যার সামনে বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ পেয়েছিল।—(মাযহারী) এস্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র 'রব' নামটি উল্লেখ করায় এ বিষয়বস্তু আরও জোরদার হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলাই আপনার পালনকর্তা। তিনি সর্বতোভাবে আপনাকে পালন করেন। তিনি উম্মী হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে পাঠ করাতে সক্ষম। আল্লাহ্‌র গুণাবলীর মধ্য থেকে এস্থলে বিশেষভাবে সৃষ্টিগুণ উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবতঃ রহস্য এই যে, সৃষ্টি তথা অস্তিত্ব দান করাই সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ তাআলার সর্বপ্রথম অনুগ্রহ। এস্থলে ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে خلق ক্রিয়াপদের কর্ম উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ, সমগ্র বিশ্বজগতই এই সৃষ্টি কর্মের ফল।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ —পূর্বের আয়াতে সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টির বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সেরা সৃষ্টি মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, সমগ্র বিশ্বজগতের সার-নির্যাস হচ্ছে মানুষ। জগতে যা কিছু আছে তার প্রত্যেকটির নযীর মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। তাই মানুষকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করার এক কারণ এরূপ হতে পারে যে, নবুওয়ত রেসালত ও কোরআন নাযিল করার লক্ষ্য খোদায়ী আদেশ-নিষেধ পালন করানো। এটা বিশেষভাবে মানুষেরই কাজ ; علق শব্দের অর্থ জমাট রক্ত। মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রান্ত হয়। মৃত্তিকা ও উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা এর সূচনা হয়, এরপর বীর্য ও এরপর জমাট রক্তের পালা আসে। অতঃপর মাংসপিণ্ড ও অস্থি ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এসবের মধ্যে জমাট রক্ত হচ্ছে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। এর উল্লেখ করায় এর পূর্বাপর অবস্থাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে।

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ –এখানে اِقْرَأْ আদেশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ এরূপও হতে পারে যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর পাঠ করার জন্যে প্রথম اِقْرَأْ বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় اِقْرَأْ তবলীগ, দাওয়াত ও অপরকে পাঠ করানোর জন্যে বলা হয়েছে। اكرم বিশেষণে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জগৎ সৃষ্টি ও মানব সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার নিজের কোন স্বার্থ ও লাভ নেই ; বরং এগুলো সব দানশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। ফলে তিনি অযাচিতভাবে সৃষ্টজগৎকে অস্তিত্বের মহান নেয়ামত দান করেছেন।

اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ —মানব সৃষ্টির পর মানুষের শিক্ষার প্রসঙ্গটি উল্লেখিত হয়েছে। কারণ, শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে স্বতন্ত্র এবং সৃষ্টির সেরা রূপে চিহ্নিত করে। শিক্ষার পদ্ধতি সাধারণতঃ দ্বিবিধ। (এক)—মৌখিক শিক্ষা এবং (দুই) কলম ও লেখার মাধ্যমে শিক্ষা। সূরার শুরুতে اِقْرَأْ শব্দের মধ্যে মৌখিক শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু এ আয়াতে শিক্ষাদান সম্পর্কিত বর্ণনায় কলমের সাহায্যে শিক্ষাকেই অগ্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিক্ষার সর্ব প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় কলম ও লিখন ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) –এর রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা যখন আদিকালে সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সেমতে কলম কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে। এ কিতাব আল্লাহ্‌র কাছে আরশে রক্ষিত আছে।—(কুরতুবী)

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ –পূর্বের আয়াতে ছিল কলমের সাহায্যে শিক্ষা দানের বর্ণনা। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ্ তাআলা। তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে অসংখ্য, অগণিত—শুধু কলমের মধ্যেই সীমিত নয়। তাই বলা হয়েছে ; আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে পূর্বে জানত না। এতে কলম অথবা অন্য কোন উপায় উল্লেখ না করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার এ শিক্ষা মানুষের জন্মলগ্ন থেকে অব্যাহত রয়েছে

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবু জাহ্‌লকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, ততদিন সোজা হয়ে চলে। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং অপরের উপর জুলুম ও নির্যাতনের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সাধারণতঃ বিত্তশালী, শাসনক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গ এবং ধনজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সমর্থনপুষ্ট এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই প্রবণতা বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা ধনাঢ্যতা ও দলবলের শক্তিতে মদমত্ত হয়ে অপরকে পরওয়াই করে না। আবু জাহ্‌লের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। সে ছিল মক্কার বিত্তশালীদের অন্যতম। তার গোত্র এমনকি সমগ্র শহরের লোক তাকে সহীহ করত। সে এমনি অহংকারে মত্ত হয়ে পয়গম্বরকুল শিরোমণি ও সৃষ্টির সেরা মানব রসূলে করীম (সাঃ)–এর শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বসল। পরের আয়াতে এমনি ধরনের অবাধ্য লোকদের অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى অর্থাৎ, সবাইকে তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এবং ভাল-মন্দ কর্মের হিসাব নেবে। অবাধ্যতার কুপরিণাম স্বচক্ষে দেখে নেবে।

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى عَبْدًا اِذَا صَلّٰى এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নামাযের আদেশ লাভ করার পর যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নামায পড়া শুরু করেন, তখন আবু জাহ্‌ল তাঁকে নামায পড়তে বারণ করে এবং হুমকি দেয় যে, ভবিষ্যতে নামায পড়লে ও

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ⑱ كَلَّا ۚ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩ ⑲

سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ① وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ② لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ③ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ④ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ⑤

سُورَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ① رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ② فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ③ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ④ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ⑤ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ⑥

(১৮) আমিও আহবান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে (১৯) কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সেজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জনকরুন।

সূরাকদর

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু—

(১) আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে। (২) শবে-কদর সমন্ধে আপনি কি জানেন? (৩) শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৪) এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। (৫) এটা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহতথাকে।

সূরাবাইয়্যিনাহ্

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু—

(১) আহ্‌লে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা প্রত্যাবর্তন করত না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। (২) অর্থাৎ, আল্লাহ্র একজন রসূল, যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা, (৩) যাতে আছে, সঠিক বিষয়বস্তু। (৪) অপর কিতাব প্রাপ্তরা যে বিভ্রান্ত হয়েছে তা হয়েছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। (৫) তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র এবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (৬) আহ্‌লে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।

সেজদা করলে সে তাঁর ঘাড় পদতলে পিষ্ট করে দেবে। এর জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ অর্থাৎ, সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখছেন? কি দেখছেন, এখানে তার উল্লেখ নেই। অতএব ব্যাপক অর্থে তিনি নামায প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষকেও দেখছেন এবং বাধাদানকারী হতভাগাকেও দেখছেন। দেখার পর কি হবে, তা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ভয়াবহ পরিণতি কল্পনাও করা যায় না।

لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ – سفع এর অর্থ কঠোরভাবে হেঁচড়ানো। نَاصِيَةٍ শব্দের অর্থ কপালের উপরিভাগের কেশগুচ্ছ। যার এই কেশগুচ্ছ অন্যের মুঠোর ভেতরে চলে যায়, সে তার করতলগত হয়ে পড়ে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ এতে নবী করীম (সাঃ)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আবু জাহ্‌লের কথায় কর্ণপাত করবেন না এবং সেজদা ও নামাযে মশগুল থাকুন। কারণ, এটাই আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জনের উপায়।

সেজদায় দোয়া কবুল হয় ঃ আবু দাউদে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ বন্দা যখন সেজদায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সেজদায় বেশী পরিমাণে দোয়া কর। অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে—সেজদার অবস্থায় কৃত দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য।

নফল নামাযের সেজদায় দোয়া করার প্রমাণ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এর বিশেষ দোয়াও বর্ণিত আছে। বর্ণিত সে দোয়া পাঠ করাই উত্তম। ফরয নামাযসমূহে এ ধরনের দোয়া পাঠ করার প্রমাণ নেই। কারণ, ফরয নামায সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য আয়াত যে পাঠ করে এবং যে শুনে, সবার উপর সেজদা করা ওয়াজিব। সহীহ্ মুসলিমে আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করে সেজদা করেছেন।

সূরা কদর

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবী হাতেম (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার বনী-ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জেহাদে মশগুল থাকে এবং কখনও অস্ত্র সংবরণ করেনি। মুসলমানগণ একথা শুনে বিস্মিত হলে এ সূরা কদর অবতীর্ণ হয়। এতে এ উম্মতের জন্যে শুধু এক রাত্রির ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের এবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইবনে জরীর (রহঃ) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী-ইসরাঈলের জনৈক এবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি এবাদতের মশগুল থাকত ও সকাল হতেই জেহাদের জন্যে বের হয়ে যেত এবং সারাদিন জেহাদে লিপ্ত থাকত। সে এক হাজার মাস

এভাবে কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তাআলা সূরা–কদর নাযিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, শবে–কদর উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য।—(মাযহারী)

লায়লাতুল কদরের অর্থ ঃ কদরের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। কেউ কেউ এস্থলে এ অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে একে 'লায়লাতুল–কদর' তথা মহিমান্বিত রাত বলা হয়। আবু বকর ওয়াররাক বলেন ঃ এ রাত্রিকে লায়লাতুল–কদর বলার কারণ এই যে, আমল না করার কারণে এর পূর্বে যার কোন সম্মান ও মূল্য মহিমান্বিত থাকে না, সে এ রাত্রিতে তওবা–এস্তেগফার ও এবাদতের মাধ্যমে সম্মানিতও হয়ে যায়।

কদরের আরেক অর্থ তকদীর এবং আদেশও হয়ে থাকে। এ রাত্রিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে লিখে দেয়া হয়, এমনকি, এ বছর কে হজ্ব করবে, তাও লিখে দেয়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর উক্তি অনুযায়ী চার জন ফেরেশতাকে এসব কাজ সোপর্দ করা হয়। তারা হলেন ইসরাফীল, মীকাঈল, আযরাঈল ও জিবরাঈল (আঃ)।—(কুরতুবী)

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَآ

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, পবিত্র রাত্রে তকদীর সংক্রান্ত সব ফয়সালা লিপিবদ্ধ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ এর অর্থ শবে–কদরই। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন মধ্য শাবানের রাত্রি অর্থাৎ, শবে–বরাত। তাঁরা বলেন যে, তকদীরসংক্রান্ত বিষয়াদির প্রাথমিক ও সংরক্ষিত ফয়সালা শবেবরাতেই হয়ে যায়। অতঃপর তার বিশদ বিবরণ শবে–কদরে লিপিবদ্ধ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর উক্তিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। বগভীর রেওয়ায়েতে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা সারা বছরের তকদীরসংক্রান্ত বিষয়াদির ফয়সালা শবে–বরাতে সম্পন্ন করেন; অতঃপর শবে–কদরে এসব ফয়সালা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়।—(মাযহারী) পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই রাত্রিতে তকদীরসংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পন্ন হওয়ার অর্থ এ বছর যেসব বিষয় প্রয়োগ করা হবে, সেগুলো লওহে মাহফূয থেকে নকল করে ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা। নতুবা আসল বিধি–লিপি আদিকালেই লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

শবে–কদর কোন্ রাত্রি ঃ কোরআন পাকের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শবে–কদর রমযান মাসে। কিন্তু সঠিক তারিখ সম্পর্কে আলেমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে যা সংখ্যায় চল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছে। তফসীরে মাযহারীতে আছে, এসব উক্তির নির্ভুল তথ্য এই যে, শবে–কদর রমযান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে আসে; কিন্তু এরও কোন তারিখ নির্দিষ্ট নেই; বরং যে কোন রাত্রিতে হতে পারে। প্রত্যেক রমযানে তা পরিবর্তিতও হয়। সহীহ্ হাদীসদৃষ্টে এই দশ দিনের বেজোড় রাত্রিগুলোতে শবে–কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যদি শবে–কদরকে রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে ঘূর্ণায়মান এবং প্রতি রমযানে পরিবর্তনশীল মেনে নেয়া যায়, তবে শবে–কদরের দিন–তারিখ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাই অধিকাংশ ইমাম এ মতই পোষণ করেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)–এর এক উক্তি এই যে, শবে–কদর নির্দিষ্ট দিনেই হয়ে থাকে।—(ইবনে–কাসীর)

সহীহ্ বোখারীর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ **تحروا ليلة القدر فى العشر الاواخر من رمضان** অর্থাৎ, রমযানের শেষ দশকে শবে–কদর অন্বেষণ কর। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে – **فاطلبوها فى الوتر منها** অর্থাৎ, শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে তালাশ কর।—(মাযহারী)

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, কোরআন পাক শবে–কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক অর্থ এও হতে পারে যে, সমগ্র কোরআন লওহে মাহফূয থেকে শবে–কদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর জিবরাঈল একে ধীরে ধীরে তেইশ বছর ধরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর কাছে পৌঁছাতে থাকেন। দ্বিতীয় এই হতে পারে যে, এ রাতে কয়েকটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে কোরআন অবতরণের ধারাবাহিকতা সূচনা হয়ে যায়। এরপর অবশিষ্ট কোরআন পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়।

সমস্ত ঐশী কিতাব রমযানেই অবতীর্ণ হয়েছে ঃ হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ ইবরাহীম (আঃ)–এর সহীফাসমূহ ৩রা রমযানে, তওরাত ৬ই রমযানে, ইনজীল ১৩ই রমযানে এবং যবুর ১৮ই রমযানে অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআন পাক ২০শে রমযানুল–মোবারকে নাযিল হয়েছে।—(মাযহারী)

تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ – روح বলে জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। হাদীসে আছে, শবে–কদরে জিবরাঈল ফেরেশতাদের বিরাট এক দল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং যত নারী–পুরুষ নামায অথবা যিকরে মশগুল থাকে, তাদের জন্যে রহমতের দোয়া করেন।—(মাযহারী)

مِّن كُلِّ أَمْرٍ —অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ শবে–কদরে সারা বছরের অবধারিত ঘটনাবলী নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। কোন কোন তফসীরবিদ একে سَلَٰمٌ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এ অর্থ করেছেন যে, এ রাত্রিটি যাবতীয় অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে শান্তিস্বরূপ।—(ইবনে–কাসীর)

سَلَٰمٌ অর্থাৎ, এ রাত্রি শান্তিই শান্তি, মঙ্গলই মঙ্গল। এতে অনিষ্টের নামও নেই।—(কুরতুবী) কেউ কেউ একে مِّن كُلِّ أَمْرٍ এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন—ফেরেশতাগণ প্রত্যেক শান্তি ও কল্যাণকর বিষয় নিয়ে আগমন করে।—(মাযহারী)

هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ অর্থাৎ, শবে–কদরের এই বরকত রাত্রির কোন বিশেষ অংশে সীমিত নয়; বরং ফজরের উদয় পর্যন্ত বিস্তৃত।

সূরা বাইয়্যিনাহ

প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়াতে কুফর, শিরক ও মূর্খতার ঘোর অন্ধকারের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এহেন সর্বগ্রাসী অন্ধকার দূর করার জন্যে একজন পারদর্শী সংস্কারক প্রেরণ করা ছিল অপরিহার্য। রোগ যেমন জটিল ও বিশ্বব্যাপী, তার প্রতিকারের জন্যে চিকিৎসকও তেমনি সুনিপুণ ও বিচক্ষণ হওয়া

দরকার। অন্যথায় রোগ নিরাময়ের আশা সুদূর পরাহত হতে বাধ্য। অতঃপর সেই বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকের গুণাগুণ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁর অস্তিত্ব একটি 'বাইয়্যিনাহ' অর্থাৎ, কুফর ও শেরককে অসার প্রতিপন্ন করার জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরপর বলা হয়েছে যে, এই চিকিৎসক হলেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত একজন রসূল, যিনি কোরআনের সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে আগমন করেছেন। এ পর্যন্ত আয়াত থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল—(এক) পয়গম্বর প্রেরণের পূর্বে দুনিয়াতে বিরাট অনর্থ এবং মূর্খতার অন্ধকার বিরাজমান ছিল এবং (দুই) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মহান মর্যাদার অধিকারী। অতঃপর কোরআনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ - يَتْلُوا শব্দটি تلاوت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পাঠ করা। তবে যে কোন পাঠকেই তেলাওয়াত বলা যায় না, বরং যে পাঠ পাঠদানকারীর প্রদত্ত অনুশীলনের সম্পূর্ণ অনুরূপ হবে তাকেই 'তেলাওয়াত' বলা হয়। তাই পরিভাষায় সাধারণতঃ কোরআন পাঠ করার ক্ষেত্রে তেলাওয়াত শব্দ ব্যবহৃত হয়। صحف শব্দটি صحيفة এর বহুবচন। যেসব কাগজে কোন বিষয়বস্তু লিখিত থাকে সেগুলোকেই বলা হয় সহীফা। كُتُبٌ শব্দটি كتاب এর বহুবচন। এর অর্থ লিখিত বস্তু। এদিক দিয়ে কিতাব ও সহীফা সমার্থবোধক। কিতাব অর্থ কোন সময় আদেশও হয়ে থাকে। যেমন, এক আয়াতে আছে لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ এখানেও এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অন্যথায় فيها বলার কোন মানে থাকে না।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুশরিক ও আহলে-কিতাবদের পথভ্রষ্টতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে সরে আসা সম্ভবপর ছিল না। যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আল্লাহ্‌র কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাদের কাছে রসূলকে সুস্পষ্ট প্রমাণরূপে প্রেরণ করেন। তাঁর কর্তব্য ছিল তাদেরকে পবিত্র সহীফা তেলাওয়াত করে শুনানো। অর্থাৎ, তিনি সেসব বিধান শুনাতেন, যা পরে সহীফার মাধ্যমে সংরক্ষিত করা হয়। কেননা, প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন সহীফা থেকে নয় স্মৃতি থেকে পাঠ করে শুনাতেন। এসব সহীফায় ন্যায় ও ইনসাফ সহকারে প্রদত্ত ও চিরন্তন-বিবিবিধান লিখিত ছিল।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ

تَفَرَّقَ -এর অর্থ এখানে বিরোধী ও অস্বীকার করা। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্ম ও আবির্ভাবের পূর্বে আহলে-কিতাবরা তাঁর নবুওয়তের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করত। কেননা, তাদের ঐশীগ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জীলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত, তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণাবলী ও তাঁর প্রতি কোরআন অবতরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা ছিল। তাই ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন বিরোধ ছিল না যে, শেষ যমানায় মোহাম্মদী মোস্তফা (সাঃ) আগমন করবেন, তাঁর প্রতি কোরআন নাযিল হবে এবং তাঁর অনুসরণ সবার জন্যে অপরিহার্য হবে। কোরআন পাকেও তাদের এই ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا অর্থাৎ, আহলে কিতাবরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং যখন মুশরেকদের সাথে তাদের মোকাবেলা হত, তখনই তাঁর মধ্যস্থতায় আল্লাহ্ তাআলার কাছে বিজয় কামনা করে দোয়া করত যে, শেষ নবীর বরকতে আমাদেরকে সাফল্য দান করা হোক। অথবা তারা মুশরেকদেরকে বলত ঃ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষা করছ বটে, কিন্তু সত্বরই একজন রসূল আসবেন, যিনি তোমাদেরকে পদানত করবেন। আমরা তাঁর সাথে থাকব, ফলে আমাদেরই বিজয় হবে।

সারকথা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে আহলে-কিতাবরা সবাই তাঁর নবুওয়ত সম্পর্কে অভিন্ন মত পোষণ করত, কিন্তু যখন তিনি আগমন করলেন, তখন তারা অস্বীকার করতে লাগল। কোরআনেরও অন্য এক আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ অর্থাৎ, তাদের কাছে যখন পরিচিত রসূল, সত্যধর্ম অথবা কোরআন আগমন করল, তখন তারা কুফর করতে লাগল। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আশ্চর্যের বিষয়, রসূলের আগমন ও তাঁকে দেখার পূর্বে তো তাদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে কোন মতবিরোধ ছিল না; সবাই তাঁর নবুওয়ত সম্পর্কে একমত ছিল, কিন্তু যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ, শেষনবী আগমন করলেন, তখন তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। কেউ তো বিশ্বাস স্থাপন করে মুমিন হল এবং অনেকেই কাফের হয়ে গেল।

এ ব্যাপারটি কেবল আহলে-কিতাবদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে—মুশরেকদের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু প্রথম ব্যাপারে উভয় দলই শরীক ছিল, তাই প্রথম আয়াতে উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ বলা হয়েছে।

وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ অর্থাৎ, আহলে-কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল খাঁটি মনে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র এবাদত করতে, নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে। এরপর বলা হয়েছে, এটা কেবল তাদেরই বৈশিষ্ট্য নয়, প্রত্যেক সঠিক মিল্লাতের অথবা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের তরীকাও তাই। বলাবাহুল্য قيمة শব্দটি كتب -এর বিশেষণ হলে এর উদ্দেশ্য কোরআনী বিধি-বিধান হবে এবং আয়াতের মতলব হবে এই যে, মোহাম্মদী শরীয়ত প্রদত্ত বিধি-বিধানও হুবহু তাই, যা তাদের কিতাব তাদেরকে পূর্বে দিয়েছিল। ভিন্ন বিধি-বিধান হলে অবশ্য তারা বিরোধিতার বাহানা পেত। কিন্তু এখন সে সুযোগ নেই।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾
جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾

سورة الزلزال مدنية وهي ثمان آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾
وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِأَنَّ
رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا
أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَن
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

سورة العديت مكية وهي احدى عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴿١﴾ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ﴿٢﴾ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴿٣﴾
فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ﴿٤﴾ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿٥﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ
لَكَنُودٌ ﴿٦﴾ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾

(৭) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। (৮) তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।

সূরা যিলযাল

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, (২) যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে (৩) এবং মানুষ বলবে, এর কি হল ? (৪) সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, (৫) কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। (৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে (৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতেপাবে।

সূরা আদিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের, (২) অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক অশ্বসমূহের (৩) অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্বসমূহের (৪) ও যারা সে সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে (৫) অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে—(৬) নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ (৭) এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত (৮) এবং সে নিশ্চিতই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মত্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ এ আয়াতে জান্নাতীদের প্রতি সর্ববৃহৎ নেয়ামত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতীদেরকে উদ্দেশ করে বলবেন ঃ يا اهل الجنة (হে জান্নাতীগণ) তখন তারা জওয়াব দেবে لبيك ربنا وسعديك والخير كله فى يديك হে আমাদের পালনকর্তা। আমরা উপস্থিত এবং আপনার আনুগত্যের জন্যে প্রস্তুত। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন, هل رضيتم তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা জওয়াব দেবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার ! এখনও সন্তুষ্ট না হওয়ার কি সম্ভাবনা ? আপনি তো আমাদেরকে এত সব দিয়েছেন, যা অন্য কোন সৃষ্টি পায়নি। আল্লাহ্ বলবেন, আমি তোমাদেরকে আরও উত্তম নেয়ামত দিচ্ছি। আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি নাযিল করছি। অতঃপর কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।—(বোখারী, মুসলিম)

আলোচ্য আয়াতেও খবর দেয়া হয়েছে যে, জান্নাতীরাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর প্রতিটি আদেশ ও কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতেই পারে না। এমতাবস্থায় এখানে জান্নাতীদের সন্তুষ্টি উল্লেখ করার তাৎপর্য কি? জওয়াব এই যে, সন্তুষ্টির এক স্তর হল প্রত্যেক আশা ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া এবং কোন কামনা অপূর্ণ না থাকা। এখানো সন্তুষ্টি বলে এই স্তরই বোঝানো হয়েছে। উদাহরণতঃ সূরা যোহায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে ঃ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ অর্থাৎ, সত্বরই আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে এমন বস্তু দান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এখানে অর্থ চূড়ান্ত বাসনা পূর্ণ করা। এ কারণেই এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তা হলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার একটি উম্মতও জাহান্নামে থাকবে।—(মাযহারী)

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ সূরার উপসংহারে আল্লাহ্‌র ভয়কে সমস্ত ধর্মীয় উৎকর্ষ এবং পারলৌকিক নেয়ামতের ভিত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোন শত্রু, হিংস্র জন্তু অথবা ইতর প্রাণী দেখে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাকে خشية বলা হয় না; বরং কারও অসাধারণ মাহাত্ম্য ও প্রতাপ থেকে যে ভয়-ভীতির উৎপত্তি, তাকেই خشية বলা হয়। এই ভয়ের প্রেক্ষিতে সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সত্তার সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা হয় এবং অসন্তুষ্টির সন্দেহ থেকেও আত্মরক্ষা করা হয়। এই ভীতিই মানুষকে কামেল ও প্রিয় বন্দায় পরিণত করে।

সূরা যিলযাল

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا — আয়াতে প্রথম শিংগা ফুঁকার পূর্বেকার ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। প্রথম ফুঁৎকারের পরবর্তী ভূকম্পনের পর মৃতরা জীবিত হয়ে কবর থেকে উত্থিত হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও তফসীরবিদগণের উক্তি এ ব্যাপারে বিভিন্নরূপ যে, আলোচ্য আয়াতে কোন্ ভূকম্পন ব্যক্ত হয়েছে। তবে এস্থলে দ্বিতীয় ভূকম্পন বোঝানোর সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ, এরপর কেয়ামতের অবস্থা

তথা হিসাব-নিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।— (মাযহারী)

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا — এই ভূকম্পন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিশালাকার স্বর্ণ খণ্ডের আকারে উদ্গীরণ করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের জন্যে কাউকে হত্যা করেছিল, সে তা দেখে বলবে, এর জন্যেই কি আমি এতবড় অপরাধ করেছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল, সে বলবে, এর জন্যেই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম? চুরির কারণে যার হাত কাটা হয়েছিল, সে বলবে, এর জন্যেই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম? অতঃপর কেউ এসব স্বর্ণখণ্ডের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না।—(মুসলিম?)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ আয়াতে خير বলে শরীয়তসম্মত সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে ; যা ঈমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা, ঈমান ব্যতীত কোন সৎকর্মই আল্লাহ্র কাছে সৎকর্ম নয়। কুফর অবস্থায় কৃত সৎকর্ম পরকালে ধর্তব্য হবে না যদিও দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেয়া হয়। তাই এ আয়াতকে এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় যে, যার মধ্যে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে অবশেষে জাহান্নাম থেকে বের করে নেয়া হবে। কেননা, এ আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী প্রত্যেকের সৎকর্মের ফল পরকালে পাওয়া জরুরী। কোন সৎকর্ম না থাকলেও স্বয়ং ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে মুমিন ব্যক্তি যতবড় গোনাহ্গারই হোক, চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিন্তু কাফের ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন সৎকর্ম করে থাকলে ঈমানের অভাবে তা পন্ডশ্রম মাত্র। তাই পরকালে তার কোন সৎকাজই থাকবে না।

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ — জীবদ্দশায় তওবা করেনি, এখানে এমন অসৎকর্ম বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন ও হাদীসের অকাট্য প্রমাণ আছে যে, তওবা করলে গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে যে গোনাহ্ থেকে তওবা করেনি, তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক— পরকালে অবশ্যই সামনে আসবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, দেখ, এমন গোনাহ থেকেও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও, যাকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা হয়। কেননা, এর জন্যেও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হবে।— (নাসায়ী,ইবনে-মাজা)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ কোরআনের এ আয়াতটি সর্বাধিক অটল ও ব্যাপক অর্থবোধক। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ আয়াতকে ঃ একক, অনন্য ও সর্বব্যাপক বলে অভিহিত করেছেন।

হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সূরা যিলযালকে কোরআনের অর্ধেক, সূরা এখলাসকে কোরআনের এক তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরূনকে কোরআনের এক চতুর্থাংশ বলেছেন।— (মাযহারী)

সূরা আদিয়াত

০ হযরত ইবনে মাসউদ, জাবের, হাসান বসরী, ইকরিমা ও আতা (রাঃ) প্রমুখের মতে 'সূরা আদিয়াত' মক্কায় অবতীর্ণ এবং ইবনে আব্বাস, আনাস (রাঃ), ইমাম মালেক ও কাতাদাহ্ (রহঃ) প্রমুখের মতে মদীনায় অবতীর্ণ।— (কুরতুবী)

এ সূরায় আল্লাহ্ তাআলা সামরিক অশ্বের কতিপয় বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শপথ করে বলেছেন যে, মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। একথা বার বার বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তার সৃষ্টির মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর শপথ করে বিশেষ ঘটনাবলী ও বিধানাবলী বর্ণনা করেন। এটা আল্লাহ্ তাআলারই বৈশিষ্ট্য। মানুষের জন্যে কোন সৃষ্টবস্তুর শপথ করা বৈধ নয়। শপথ করার লক্ষ্য নিজের বক্তব্যকে বাস্তবসম্মত ও নিশ্চিত প্রকাশ করা। কোরআন পাক যে বস্তুর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করে, বর্ণিত বিষয় সপ্রমাণে সে বস্তুর গভীর প্রভাব থাকে। এমনকি, সে বস্তু যেন সে বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্যদান করে। এখানে সামরিক অশ্বের কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার উল্লেখ যেন মানুষের অকৃতজ্ঞতার সাক্ষ্যস্বরূপ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, অশ্ব বিশেষতঃ সামরিক অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের আদেশ ও ইঙ্গিতের অনুসারী হয়ে কত কঠোর খেদমতই না আনজাম দিয়ে থাকে। অথচ এসব অশ্ব মানুষ সৃষ্টি করেনি। তাদেরকে যে ঘাস-পানি মানুষ দেয়, তাও তার সৃজিত নয়। আল্লাহ্র সৃষ্টি করা জীবনোপকরণকে মানুষ তাদের কাছে পৌছে দেয় মাত্র। এখন অশ্বকে দেখুন, সে মানুষের এতটুকু অনুগ্রহকে কিভাবে চিনে এবং স্বীকার করে। তার সামান্য ইশারায় সে তার জীবনকে সাক্ষাৎ বিপদের মুখে ঠেলে দেয়, কঠোরতর কষ্ট সহ্য করে। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি লক্ষ্য করুন,আল্লাহ্ তাআলা তাকে এক ফোঁটা তুচ্ছ বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন কাজের শক্তি দিয়েছেন, বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন, তার পানাহারের সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য করে তার কাছে পৌছে দিয়েছেন। কিন্তু সে এতসব উচ্চস্তরের অনুগ্রহেরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। এবার শব্দার্থের প্রতি লক্ষ্য করুন — عاديات শব্দটি عدو থেকে উদ্ভূত। অর্থ দৌড়ানো। ضَبْحًا ঘোড়ার দৌড় দেয়ার সময় তার বক্ষ থেকে নির্গত আওয়াজকে বলা হয়। موريات শব্দটি ايراء থেকে উদ্ভূত। অর্থ অগ্নি নির্গত করা। যেমন চকমকি পাথর ঘষে অথবা দিয়াশলাই ঘষা দিয়ে অগ্নি নির্গত করা হয়। قدح এর অর্থ ক্ষুরাঘাত করা। লৌহনাল পরিহিত অবস্থায় ঘোড়া যখন প্রস্তরময় মাটিতে ক্ষুরাঘাত করে দৌড় দেয় তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। مغيرات শব্দটি اغارة থেকে উদ্ভূত। অর্থ হামলা করা, হানা দেয়া। صُبْحًا আরবদের অভ্যাস হিসেবে প্রভাতকালের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বীরত্ববশতঃ রাত্রির অন্ধকারে হানা দেয়া দোষণীয় মনে করত। তাই তারা ভোর হওয়ার পর একাজ করত। اثرن শব্দটি اثارة থেকে উৎপন্ন। অর্থ ধূলি উড়ানো। نقع ধূলিকে বলা হয়। অর্থাৎ, অশ্বসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে এত দ্রুত ধাবমান হয় যে, তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়ে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিশেষতঃ প্রভাতকালে ধূলি উড়া অধিক দ্রুতগামিতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, স্বভাবতঃ এটা ধূলি উত্থিত হওয়ার সময় নয়। ভীষণ দৌড় দ্বারাই ধূলি উড়তে পারে।

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا অর্থাৎ, এসব অশ্ব শত্রুদলের অভ্যন্তরে নির্ভয়ে ঢুকে পড়ে। لَكَنُودٌ হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ সে ব্যক্তি, যে বিপদ স্মরণ রাখে এবং নেয়ামত ভুলে যায়।

আবু বকর ওয়াসেতী (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি, আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহকে গোনাহের কাজে ব্যয় করে, তাকে لَكَنُودٌ বলা হয়। তিরমিযীর মতে এর অর্থ যে নেয়ামত দেখে, কিন্তু নেয়ামতদাতাকে দেখে না। এসব উক্তির সারমর্ম নেয়ামতের নাশোকরী করা।

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ خير এর শাব্দিক অর্থ মঙ্গল। আরবে ধন- সম্পদকেও خير বলে ব্যক্ত করা হয়; যেন ধন-সম্পদ মঙ্গলই মঙ্গল এবং উপকারই উপকার। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ধন-সম্পদ মানুষকে হাজারো বিপদেও জড়িত করে দেয়। পরকালে তো হারাম ধন-সম্পদের পরিণতি তাই হবে; দুনিয়াতেও তা মানুষের জন্যে বিপদ হয়ে যায়। কিন্তু আরবের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী এ আয়াতে ধন-সম্পদকে خير বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আছে إِنْ تَرَكَ خَيْرًا —

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝

سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ۝ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ۝ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

سُورَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

(৯) সে কি জানেনা, যখন কবরে যা আছে, তা উত্থিত হবে (১০) এবং অন্তরে যা আছে, তা অর্জন করা হবে? (১১) সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ জ্ঞাত।

সূরা কারেয়া
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) করাঘাতকারী, (২) করাঘাতকারী কি? (৩) করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন? (৪) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত (৫) এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙীন পশমের মত। (৬) অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, (৭) সে সুখীজীবন যাপন করবে (৮) আর যার পাল্লা হালকা হবে, (৯) তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। (১০) আপনি জানেন তা কি? (১১) প্রজ্জ্বলিতঅগ্নি।

সূরা তাকাসুর
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, (২) এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও। (৩) এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্ত্বরই জেনে নেবে, (৪) অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্ত্বরই জেনে নেবে। (৫) কখনই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে। (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, (৭) অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে, (৮) এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিতহবে।

উপরোক্ত আয়াতে অশ্বের শপথ করে মানুষ সম্পর্কে দুটি কথা ব্যক্ত করা হয়েছে — (এক) মানুষ অকৃতজ্ঞ, সে বিপদাপদ ও কষ্ট স্মরণ রাখে এবং নেয়ামত ও অনুগ্রহ ভুলে যায়। 'দুই' সে ধনসম্পদের লালসায় মত্ত। উভয় বিষয় শরীয়ত ও যুক্তির নিরীখে নিন্দনীয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ — **অর্থাৎ, মানুষ কি জানে না যে,** কেয়ামতের দিন সব মৃতকে কবর থেকে জীবিত উত্থিত করা হবে এবং অন্তরের সকল ভেদ ফাঁস হয়ে যাবে? এটাও সবার জানা যে, আল্লাহ্ তাআলা সব অবস্থা সম্পর্কেই অবহিত। অতএব তদনুযায়ী শাস্তি ও প্রতিদান দেবেন। কাজেই বুদ্ধিমানের কর্তব্য হল অকৃতজ্ঞতা না করা এবং ধন সম্পদের লালসায় মত্ত না হওয়া।

সূরা কারেয়া

এ সূরায় আমলের ওজন ও তার হালকা এবং ভারী হওয়ার প্রেক্ষিতে জাহান্নাম অথবা জান্নাত লাভের বিষয় আলোচিত হয়েছে। আমলের ওজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আ'রাফের শুরুতে করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া দরকার। সেখানে একথাও লিখিত হয়েছে যে, বিভিন্ন হাদীস ও আয়াতের মধ্যে সমন্বয়সাধণ করে জানা যায়, আমলের ওজন সম্ভবতঃ দুবার হবে। একবার ওজন করে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হবে। মুমিনের পাল্লা ভারী ও কাফেরের পাল্লা হালকা হবে। এরপর মুমিনদের মধ্যে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের পার্থক্য বিধানের জন্যে হবে দ্বিতীয় ওজন। এ সূরায় বাহ্যতঃ প্রথম ওজন বোঝানো হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মুমিনের পাল্লা ঈমানের অভাবে হালকা হবে, সে যদিও কিছু সৎকর্ম করে থাকে। তফসীরে মাযহারীতে আছে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে কাফের ও সৎকর্মপরায়ণ মুমিনের শাস্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে। মুমিনদের মধ্যে যারা সৎ ও অসৎ মিশ্র কর্ম করে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে তাদের দান-প্রতিদানের কোন উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে একথা স্মর্তব্য যে, কেয়ামতে মানুষের আমল ওজন করা হবে — গণনা হবে না। আমলের ওজন এখলাস তথা আন্তরিকতা ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বেড়ে যায়। যার আমল আন্তরিকতাপূর্ণ ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংখ্যায় কম হলেও তার আমলের ওজন বেশী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংখ্যায় তো নামায, রোযা,সদকা-খয়রাত, হজ্ব-ওমরা অনেক করে,কিন্তু আন্তরিকতা ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্য কম, তার আমলের ওজন কম হবে।

সূরা তাকাসুর

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ — تكاثر শব্দটি كثرة থেকে উদ্ভূত। অর্থ প্রচুর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হাসান বসরী (রহঃ) এ তফসীরই করেছেন। এ শব্দটি প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাতাদাহ্ (রহঃ) এ অর্থই করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার এ আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন ঃ এর অর্থ

অবৈধ পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করা। — (কুরতুবী)

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ — এখানে কবরস্থান যেয়ারত করার অর্থ মরে কবরে পৌছা। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, حتى ياتيكم الموت — (ইবনে-কাসীর) অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশ-গোত্রের বড়াই তোমাদেরকে গাফেল ও উদাসীন করে রাখে, নিজেদের পরিণতি ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কোন চিন্তা তোমরা কর না এবং এমনি অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যায় আর মৃত্যুর পর তোমরা আযাবে গ্রেফতার হও। একথা বাহ্যতঃ সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে, যারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসার অথবা অপরের সাথে বড়াই করায় এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, পরিণাম চিন্তা করার ফুরসতই পায় না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শিখখীর (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট পৌছে দেখলাম, তিনি اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ তেলাওয়াত করে বলছিলেনঃ

"মানুষ বলে, আমার ধন, আমার ধন, অথচ তোমার অংশ তো ততটুকুই যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করে ফেল অথবা পরিধান করে ছিন্ন করে দাও অথবা সদকা করে সম্মুখে পাঠিয়ে দাও। এছাড়া যা আছে, তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে — তুমি অপরের জন্যে তা ছেড়ে যাবে— (ইবনে-কাসীর, তিরমিযী, আহমদ)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

"আদম সন্তানের যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে, তবে সে (তাতেই সন্তুষ্ট হবে না; বরং) দুটি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ তো (কবরের) মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা সম্ভব নয়। যে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করে, আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন। — (বোখারী)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেনঃ আমরা সূরা তাকাছুর নাযিল হওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত হাদীসকে কোরআন মনে করতাম। মনে হয়, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করে তার ব্যাখ্যায় উপরোক্ত উক্তিটি করেছিলেন। এতে কোন কোন সাহাবী তাঁর উক্তিকেও কোরআনের ভাষা মনে করলেন। পরে যখন সম্পূর্ণ সূরা সামনে আসে, তখন তাতে এসব বাক্য ছিল না। ফলে প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠে যে, এগুলো ছিল তফসীরের বাক্য।

لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ - لو এর জওয়াব এস্থলে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, لما الهاكم التكاثر — উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যদি কেয়ামতের হিসাব-নিকাশে নিশ্চিত বিশ্বাসী হতে, তবে কখনও প্রাচুর্যের বড়াই করতে না এবং উদাসীন হতে না।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ — উপরে বলা হয়েছে عَيْنَ الْيَقِيْنِ এর অর্থ সে প্রত্যয়, যা চাক্ষুষ দর্শন থেকে অর্জিত হয়। এটা বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তর। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ মূসা (আঃ) যখন তূর পর্বতে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্প্রদায় গোবৎসের পূজা করতে শুরু করেছিল, তখন আল্লাহ্ তাআলা তূর পর্বতেই তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, বনী ইসরাঈলরা গোবৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু মূসা (আঃ) এর মধ্যে এর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, যেমন ফিরে আসার পর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার ফলে দেখা দিয়েছিল। তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তওরাতের তক্তিগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। — (মাযহারী)

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ অর্থাৎ, তোমরা সবাই কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে, সেগুলোর শোকর আদায় করেছ কি না এবং পাপকাজে ব্যয় করেছ কি না? তন্মধ্যে কিছুসংখ্যক নেয়ামতের সুস্পষ্ট উল্লেখ কোরআনের অন্য আয়াতে এভাবে করা হয়েছে اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا এতে মানুষের শ্রবণশক্তি দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় সম্পর্কিত লাখো নেয়ামত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেগুলো সে প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করে।

সূরা তাকাছুরের বিশেষ ফযীলত ঃ রসূলে করীম (সাঃ) একবার সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন তোমাদের মধ্যে কারও এমন ক্ষমতা নেই যে, এক হাজার আয়াত পাঠ করবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেনঃ হাঁ, এক হাজার আয়াত পাঠ করার শক্তি কয়জনের আছে! তিনি বললেনঃ তোমাদের কেউ কি সূরা তাকাছুর পাঠ করতে পারবে না? উল্লেখ্য এই যে, দৈনিক এই সূরা পাঠ করা এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান। — (মাযহারী)

সূরা তাকাসুর সমাপ্ত

سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلٰثُ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالْعَصْرِ ۙ﴿١﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ﴿٢﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعُ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ﴿١﴾ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ﴿٢﴾ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۖ﴿٤﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ؕ﴿٥﴾ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ﴿٦﴾ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ؕ﴿٧﴾ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ﴿٨﴾ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

سُورَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ؕ﴿١﴾ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۙ﴿٢﴾ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۙ﴿٣﴾ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۪ۙ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ﴿٥﴾

সূরা আছর

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) কসম যুগের, (২) নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; (৩) কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।

সূরা হুমাযাহ্

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, (২) যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে (৩) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে! (৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। (৫) আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি? (৬) এটা আল্লাহ্‌র প্রজ্বালিত অগ্নি, (৭) যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে। (৮) এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে, (৯) লম্বালম্বা খুঁটিতে।

সূরা ফীল

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? (৩) তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী, (৪) যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। (৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।

সূরা আছর

সূরা আছরের বিশেষ ফযীলত ঃ হযরত ওবায়দুল্লাহ্ **ইবনে হিসন** (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সাহাবীগণের **মধ্যে দু'ব্যক্তি ছিল, তারা** পরস্পর মিলে একজন অন্যজনকে সূরা আছর পাঠ করে না শুনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না। — (তিবরানী) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) **বলেন ঃ যদি** মানুষ কেবল এ সূরাটি চিন্তা করত, তবে এটাই তাদের **জন্যে যথেষ্ট ছিল।** — (ইবনে-কাসীর)

সূরা আছর কোরআন পাকের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, **কিন্তু এমন** অর্থপূর্ণ সূরা যে, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর ভাষায় **মানুষ এ সূরাটিকেই** চিন্তা ভাবনা সহকারে পাঠ করলে তাদের ইহকাল ও পরকাল **সংশোধনের** জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়। এ সূরায় **আল্লাহ্ তাআলা যুগের কসম করে** বলেছেন যে, **মানবজাতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই ক্ষতির কবল থেকে** কেবল তারাই মুক্ত, যারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে পালন করে—**ঈমান,** সৎকর্ম, অপরকে সত্যের উপদেশ এবং সবরের **উপদেশদান। দ্বীন ও** দুনিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার **এবং মহা উপকার লাভ করার চার** বিষয় সম্বলিত এ ব্যবস্থাপত্রের প্রথম দুটি বিষয় **আত্মসংশোধন সম্পর্কিত** এবং দ্বিতীয় দু'টি বিষয় মুসলমানদের হেদায়েত ও **সংশোধন সম্পর্কিত।**

প্রথম প্রতিধানযোগ্য বিষয় এই যে, **বিষয়বস্তুর সাথে যুগের কি** সম্পর্ক, যার কসম করা হয়েছে? কসম ও কসমের জওয়াবের **মধ্যে** পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ **তফসীরবিদ বলেন ঃ** মানুষের সব কর্ম, গতিবিধি, উঠাবসা ইত্যাদি সব **যুগের মধ্যেই সংঘটিত** হয়। সূরায় যেসব কর্মের নির্দেশ দেয়া হয়েছে **সেগুলোও এই** যুগ-কালেরই দিবা-রাত্রিতে সংঘটিত হবে। এরই প্রেক্ষিতে **যুগের শপথ** করা হয়েছে।

মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ততায় যুগ ও কালের প্রভাব কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, আয়ুষ্কালের সাল, মাস, সপ্তাহ **দিবারাত্র বরং ঘন্টা ও** মিনিটই মানুষের একমাত্র পুঁজি, যার সাহায্যে সে **ইহকাল ও পরকালের** বিরাট এবং বিস্ময়কর মুনাফাও অর্জন করতে পারে এবং **ভ্রান্তপথে চললে** এটাই তার জন্যে বিপজ্জনকও হয়ে যেতে পারে।

অতঃপর এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা লক্ষ্য **করুন। ঈমান ও** সৎকর্ম—আত্ম-সংশোধন সম্পর্কিত এ **দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যা** নিষ্প্রয়োজন। তবে সত্যের উপদেশ ও সবরের উপদেশ **এ দু'টি বিষয়ের** উদ্দেশ্য কি, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। تواصى **শব্দটি** وصيت **থেকে** উদ্ভূত। কাউকে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে উপদেশ দেয়া ও **সৎকাজের জোর তাকীদ** করার নাম ওসীয়্যত। এ কারণেই মরণোন্মুখ ব্যক্তি **পরবর্তীকালের জন্যে** যেসব নির্দেশ দেয়, তাকেও ওসীয়্যত বলা হয়।

উপরোক্ত দু'রকম উপদেশ প্রকৃতপক্ষে **এই ওসীয়্যতেরই দু'টি** অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় সত্যের উপদেশ এবং **দ্বিতীয় অধ্যায় সবরের** উপদেশ। এখন এ দু'টি শব্দের কয়েক রকম **অর্থ হতে পারে—(এক)** সত্যের অর্থ বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎকর্মের **সমষ্টি।** আর **সবরের অর্থ** যাবতীয় গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। অতএব **প্রথম শব্দের সারমর্ম** হল 'আমর বিন মারূফ তথা সৎকাজের আদেশ করা **এবং দ্বিতীয় শব্দের** সারমর্ম হল 'নাহী আনিল মুনকার' তথা মন্দ কাজে **নিষেধ করা। এখন** সমষ্টির সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, নিজে যে ঈমান **ও সৎকর্ম অবলম্বন** করেছে, অপরকেও তার উপদেশ দেয়া। (দুই) সত্যের **অর্থ বিশুদ্ধ**

বিশ্বাস এবং সবরের অর্থ সৎকাজ করা এবং মন্দকাজ থেকে বেঁচে থাকা। কেননা, সবরের আক্ষরিক অর্থ নিজেকে বাধা দেয়া ও অনুবর্তী করা। এ অনুবর্তী করার মধ্যে সৎকর্ম সম্পাদন এবং গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা উভয়ই শামিল।

মুক্তির জন্যে নিজের কর্ম সংশোধিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, অপরের চিন্তাও জরুরী ঃ এ সূরায় মুসলমানদের প্রতি একটি বড় নির্দেশ এই যে, নিজেদের ধর্মকে কোরআন ও সুন্নাহর অনুসারী করে নেয়া যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী, ততটুকুই জরুরী অন্য মুসলামনদেরকেও ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান করার সাধ্যমত চেষ্টা করা। নতুবা কেবল নিজেদের আমল মুক্তির জন্যে যথেষ্ট হবে না, বিশেষতঃ আপন পরিবার–পরিজন, বন্ধু–বান্ধব ও আত্মীয়–স্বজনের কুকর্ম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা আপন মুক্তির পথ বন্ধ করার নামান্তর, যদিও নিজে পুরোপুরি সৎকর্মপরায়ণ হয়। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সাধ্যমত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ফরয করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণ মুসলমান এমনকি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত উদাসীনতায় লিপ্ত রয়েছে। তারা নিজেদের আমলকেই যথেষ্ট মনে করে বসে আছে, সন্তান–সন্ততি কি করছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে এ আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন।

সূরা হুমাযাহ্

এ সূরায় তিনটি জঘন্য গোনাহে শাস্তি ও তার তীব্রতা বর্ণিত হয়েছে। গোনাহ্ তিনটি হচ্ছে همز – لمز ও جمع مال প্রথমোক্ত শব্দদ্বয় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তফসীরকারের মতে همز –এর অর্থ গীবত অর্থাৎ, পশ্চাতে পরনিন্দা করা এবং لمز –এর অর্থ সামনাসামনি দোষারোপ করা ও মন্দ বলা। এ দু'টি কাজই জঘন্য গোনাহ্। পশ্চাতে পরনিন্দার শাস্তির কথা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এরূপ হতে পারে যে, এ গোনাহে মশগুল হওয়ার পথে সামনে কোন বাধা থাকে না। যে এতে মশগুল হয়, সে কেবল এগিয়েই চলে। ফলে গোনাহ্ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ও অধিকতর হতে থাকে। সম্মুখের নিন্দা এরূপ নয়। এতে প্রতিপক্ষও বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে গোনাহ্ দীর্ঘ হয় না। এছাড়া কারও পশ্চাতে নিন্দা করা এ কারণেও বড় অন্যায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানতেও পারে না যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। ফলে সে সাফাই পেশ করার সুযোগ পায় না।

একদিক দিয়ে لمز তথা সম্মুখের নিন্দা গুরুতর। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয়, তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়। এর কষ্টও বেশী, ফলে শাস্তিও গুরুতর। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

شرار عباد الله تعالى المشاءون بالنميمة المفرقون بين الاحبة الباغون للبرآء العنت .

অর্থাৎ, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষ নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।

যেসব বদভ্যাসের কারণে আয়াতে শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে অর্থলিপ্সা। আয়াতে একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে—অর্থলিপ্সার কারণে সে তা বার বার গণনা করে। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থ সঞ্চয় করা সর্বাবস্থায় হারাম ও গোনাহ্ নয়। তাই এখানেও উদ্দেশ্য সেই সঞ্চয় হবে, যাতে জরুরী হক আদায় করা হয় না, কিংবা গর্ব ও অহমিকা লক্ষ্য হয় কিংবা লালসার কারণে দ্বীনের জরুরী কাজ বিঘ্নিত হয়।

الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ অর্থাৎ, জাহান্নামের এই অগ্নি হৃদয়কে পর্যন্ত গ্রাস করবে। প্রত্যেক অগ্নির এটাই বৈশিষ্ট্য। যা কিছু তাতে পতিত হয়, তার সকল অংশ জ্বলে–পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। মানুষ তাতে নিক্ষিপ্ত হলে তার অঙ্গ–প্রত্যঙ্গসহ হৃদয়ও জ্বলে যাবে। এখানে জাহান্নামের অগ্নির এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার কারণ এই যে, দুনিয়ার অগ্নি মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার আগেই মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যন্ত অগ্নি পৌঁছবে এবং হৃদয়–দহনের তীব্র যন্ত্রণা জীবদ্দশাতেই মানুষ অনুভব করবে।

সূরা ফীল

এ সূরায় হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারা কা'বা গৃহকে ভূমিসাৎ করার উদ্দেশে হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেছিল। আল্লাহ্ তাআলা নগণ্য পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলবকে ধুলায় মিশিয়ে করে দেন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্মের বছর এ ঘটনা ঘটেছিল ঃ মক্কা মোকাররমায় খাতামুল–আম্বিয়া (সাঃ)–এর জন্মের বছর হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কতক রেওয়ায়েত দ্বারাও এটা সমর্থিত এবং এটাই প্রসিদ্ধ উক্তি।—(ইবনে–কাসীর) হাদীসবিদগণ এ ঘটনাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর এক প্রকার মো'জেযারূপে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু মো'জেযায় নুবওয়ত দাবীর সাথে নবীর সমর্থনের প্রকাশ করা হয়। নবুওয়ত দাবীর পূর্বে বরং নবীর জন্মেরও পূর্বে আল্লাহ্ তাআলা মাঝে মাঝে দুনিয়াতে এমন ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশ করেন, যা অলৌকিকতায় মো'জেযার অনুরূপ হয়ে থাকে। এ ধরনের নিদর্শনাবলীকে হাদীসবিদগণের পরিভাষায় 'আরহাসাত' বলা হয়। 'রাহ্স' এর অর্থ ভিত্তি ও ভূমিকা। এসব নিদর্শন নবীর নবুওয়ত প্রমাণের ভিত্তি ও ভূমিকা হয় বিধায় এগলোকে 'আরহাসাত' বলা হয়ে থাকে। নবী করীম (সাঃ)–এর নবুওয়ত এমনকি জন্মেরও পূর্বে এ ধরনের কয়েক প্রকার 'আরহাসাত' প্রকাশ পেয়েছে। হস্তী–বাহিনীকে আসমানী আযাব দ্বারা প্রতিহত করাও এসবের অন্যতম।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ — এখানে اَلَمْ تَرَ 'আপনি কি দেখেননি' বলা হয়েছে ; অথচ এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর জন্মের কিছুদিন পূর্বেকার ঘটনা। কাজেই দেখার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যে ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সে ঘটনার জ্ঞানকেও 'দেখা' বলে ব্যক্ত করা হয়; যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা। এক পর্যায়ে দেখাও প্রমাণিত আছে ; যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আয়েশা ও আসমা (রাঃ) দু'জন হস্তীচালককে অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও ভিক্ষুকরূপে দেখেছিলেন।

سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعُ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ○

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ① إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ② فَلْيَعْبُدُوا

رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ③ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ④

سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعُ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ○

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ① فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ② وَ

لَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ③ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ④ الَّذِينَ هُمْ عَنْ

صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ⑤ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ⑥ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ⑦

سُورَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ○

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ① فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ② إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ③

سُورَةُ الْكَافِرُونَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ○

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ① لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ②

সূরা কোরাইশ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) কোরায়েশের আসক্তির কারণে, (২) আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। (৩) অতএব তারা যেন এবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

সূরা মাউন

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৭

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে? (২) সে সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয় (৩) এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। (৪) অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, (৫) যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর; (৬) যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে (৭) এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।

সূরা কাওসার

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। (২) অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। (৩) যে আপনার শত্রু, সে-ই তো লেজকাটা, নির্বংশ।

সূরা কাফিরূন

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) বলুন, হে কাফেরকূল, (২) আমি এবাদত করিনা তোমরা যার এবাদত কর।

طَيْرًا أَبَابِيلَ - أَبَابِيلَ শব্দটি বহুবচন। অর্থ পাখীর ঝাঁক—কোন বিশেষ প্রাণীর নাম নয়। এই পাখী আকারে কবুতর অপেক্ষা সামান্য ছোট ছিল কিন্তু এ জাতীয় পাখী পূর্বে কখনও দেখা যায়নি।—(কুরতুবী)

بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ — ভেজা মাটি আগুনে পুড়ে যে কংকর তৈরী হয়, সে কংকরকে سِجِّيلٍ বলা হয়ে থাকে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই কংকরেরও নিজস্ব কোন শক্তি ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার কুদরতে ঐগুলি বন্দুকের গুলী অপেক্ষা বেশী কাজ করেছিল।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ — عصف -এর অর্থ ভূষি। ভূষি নিজেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তৃণ। তদুপরি যদি কোন জন্তু সেটিকে চর্বন করে, তবে এই তৃণও আর তৃণ থাকে না। কংকর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহার সেনাবাহিনীর অবস্থা তদ্রূপই হয়েছিল।

হস্তী বাহিনীর এই অভূতপূর্ব ঘটনা সমগ্র আরবের অন্তরে কোরাইশদের মাহাত্ম্য আরও বাড়িয়ে দিল। এখন সবাই স্বীকার করতে লাগল যে, তারা বাস্তবিকই আল্লাহ্‌ ভক্ত। তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং তাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।—(কুরতুবী)

সূরা কোরাইশ

এ ব্যাপারে সব তফসীরকারকই একমত যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরা সূরা-ফীলের সাথেই সম্পৃক্ত। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোন কোন মাসহাফে এ দু'টিকে একই সূরারূপে লেখা হয়েছিল। উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ্‌ লিখিত ছিল না। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) যখন তাঁর খেলাফতকালে কোরআনের সব মাসহাফ একত্রিত করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সাহাবায়ে-কেরামের তাতে ইজমা হয়, তখন তাতে এ দু'টি সূরাকে স্বতন্ত্র দু'টি সূরারূপে সন্নিবেশিত করা হয় এবং উভয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহ্‌ লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর তৈরী এ কপিকে 'ইমাম' বলা হয়।

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ —আরবী ব্যাকরণিক গঠনপ্রণালী অনুযায়ী حرف لام -এর সম্পর্ক কোন পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে হওয়া বিধেয়। আয়াতে উল্লেখিত لام — এর সম্পর্ক কিসের সাথে, এ সম্পর্কে একাধিক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সূরা ফীলের সাথে অর্থগত সম্পর্কের কারণে কেউ কেউ বলেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে انا اهلكنا اصحاب الفيل অর্থাৎ, আমি হস্তীবাহিনীকে এজন্যে ধ্বংস করেছি, যাতে কোরাইশদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন দুই সফরের পথে কোন বাধাবিপত্তি না থাকে এবং সবার অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে اعجبوا অর্থাৎ, তোমরা কোরাইশদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ কর, তারা কিভাবে শীত ও গ্রীষ্মের সফর নিরাপদে নির্বিবাদে করে! কেউ কেউ বলেন ঃ এই لام -এর সম্পর্ক পরবর্তী বাক্য فَلْيَعْبُدُوا -এর সাথে। অর্থাৎ, এই নেয়ামতের ফলশ্রুতিতে কোরাইশদের কৃতজ্ঞ হওয়া ও আল্লাহ্‌ তাআলার এবাদতে আত্মনিয়োগ করা উচিত। সারকথা, এই সূরার বক্তব্য এই যে, কোরাইশরা যেহেতু শীতকালে ইয়ামনের ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার সফরে অভ্যস্ত ছিল এবং এ দু'টি সফরের উপরই তাদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল এবং তারা ঐশ্বর্যশালীরূপে পরিচিত ছিল,

তাই আল্লাহ্ তাআলা তাদের শত্রু হস্তীবাহিনীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মানুষের অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তারা যে কোন দেশে গমন করে, সকলেই তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ —একথা সুবিদিত যে, মক্কা শহর যে স্থলে অবস্থিত, সেখানে কোন চাষাবাদ হয় না, বাগবাগিচাও নেই; যা থেকে ফল মূল পাওয়া যেতে পারে। এ জন্যেই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীলুল্লাহ্ (আঃ) দোয়া করেছিলেন وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ – অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, এতে বসবাস–কারীদেরকে ফলমূলের রিযিক দান করুন। আরও বলেছিলেন يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ —অর্থাৎ, বাইরে থেকেও যেন এখানে ফলমূল আনার ব্যবস্থা হয়। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশে সফর ও বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ করার উপরই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মক্কাবাসীরা খুব দারিদ্র্য ও কষ্টে দিনাতিপাত করত। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর প্রপিতামহ হাশেম কোরায়েশকে ভিন্‌দেশে যেয়ে ব্যবসা–বাণিজ্য করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সিরিয়া ছিল ঠাণ্ডা দেশ। তাই গ্রীষ্মকালে তারা সিরিয়া সফর করত। পক্ষান্তরে ইয়ামেন গরম দেশ ছিল বিধায় তারা শীতকালে সেখানে বাণিজ্যিক সফর করত এবং মুনাফা অর্জন করত। বায়তুল্লাহর্ খাদেম হওয়ার কারণে সমগ্র আরবে তারা ছিল সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। ফলে পথের বিপদাপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মক্কাবাসীদের প্রতি এসব অনুগ্রহ ও নেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ — নেয়ামত উল্লেখ করার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে কোরায়েশকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা এই গৃহের মালিকের এবাদত কর। এই গৃহই যেহেতু তাদের সব শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণের উৎস ছিল, তাই বিশেষভাবে এই গৃহের মৌলিক গুনটি উল্লেখ করা হয়েছে।

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ — সুখী জীবনের জন্যে যা যা দরকার তা সমস্তই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা কোরায়েশকে এগুলো দান করেছিলেন। أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ বলে পানাহারের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম বোঝানো হয়েছে এবং وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ বাক্যে দস্যু ও শত্রুদের থেকে নিরাপত্তা এবং পরকালীন আযাব থেকে নিষ্কৃতি এ উভয় মর্মই বোঝানো হয়েছে।

আবুল হাসান কাযবিনী (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি শত্রু অথবা বিপদের আশংকা করে তার জন্যে সূরা কোরায়েশের তেলাওয়াত নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। একথা উদ্ধৃত করে ইমাম জযরী (রহঃ) বলেন—এটা পরীক্ষিত আমল। কাযী সানাউল্লাহ্ তফসীরে–মাযহারীতে বলেন ঃ আমাকে আমার মুর্শিদ 'মির্যা মাযহার জান্ জানান' বিপদাপদের সময় এই সূরা তেলাওয়াত করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ সব ধরনের বালামুসিবত দূর করার জন্যে এটা পরীক্ষিত ও অব্যর্থ। কাযী সানাউল্লাহ্ (রহঃ) আরও বলেন ঃ আমি বারবার এটা পরীক্ষা করেছি।

সূরা কোরাইশ সমাপ্ত

সূরা মাউন

এ সূরায় কাফের ও মুনাফেকদের কপিয় দুষ্কর্ম উল্লেখ করে তজ্জন্য জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। মুমিন ব্যক্তি বিচার দিবস অস্বীকার করে না। সুতরাং কোন মুমিন যদি এসব দুষ্কর্ম করে, তবে তা শরীয়ত মতে কঠোর গোনাহ্ ও নিন্দনীয় অপরাধ হলেও বর্ণিত শাস্তির বিধান তার জন্যে প্রযোজ্য নয়। এ কারণেই প্রথমে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে বিচারদিবস তথা কেয়ামত অস্বীকার করে। এতে অবশ্যই ইঙ্গিত আছে যে, বর্ণিত দুষ্কর্ম কোন মুমিন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে এসব কোন অবিশ্বাসী কাফেরই করতে পারে। বর্ণিত দুষ্কর্ম এই ঃ এতীমের সাথে দুর্ব্যবহার, শক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীনকে খাদ্য না দেয়া এবং অপরকেও দিতে উৎসাহ না দেয়া, লোক দেখানো নামায পড়া এবং যাকত না দেয়া। এসব কর্ম এমনিতেও নিন্দনীয় এবং কঠোর গোনাহ্। আর যদি কুফর বশতঃ কেউ এসব কর্ম করে, তবে তার শাস্তি চিরকাল দোযখবাস। সূরায় ويل (দুর্ভোগ) শব্দের মাধ্যমে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

এটা মুনাফিকদের অবস্থা। তারা লোক দেখানোর জন্যে এবং মুসলমানিত্বের দাবী সপ্রমাণ করার জন্য নামায পড়ে। কিন্তু নামায যে ফরয, এ বিষয়ে তারা বিশ্বাসী নয়। ফলে সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না এবং আসল নামাযেরও খেয়াল রাখে না। লোক দেখানোর জায়গা হলে পড়ে, নতুবা ছেড়ে দেয়। আসল নামাযের প্রতিই ভ্রূক্ষেপ না করা মুনাফিকদের অভ্যাস এবং عَن صَلَاتِهِمْ শব্দের আসল অর্থ তাই। নামাযের মধ্যে কিছু ভুল–ভ্রান্তি হয়ে যাওয়ার কথা এখানে বোঝানো হয়নি। কেননা, এজন্যে জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে না। এটা উদ্দেশ্য হলে عَن صَلَاتِهِمْ –এর পরিবর্তে فِي صَلَاتِهِمْ বলা হত। সহীহ্ হাদীসমূহে প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর জীবনেও একাধিকবার নামাযের মধ্যে ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল।

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ – ماعون শব্দের আসল অর্থ যৎকিঞ্চিৎ ও তুচ্ছ বস্তু। এমন ব্যবহার্য বস্তুসমূহকেও ماعون বলা হয়, যা স্বভাবতঃ একে অপরকে ধার দেয় এবং যেগুলোর পারস্পরিক লেন–দেন সাধারণ মানবতারূপে গণ্য হয় ; যথা কুড়াল, কোদাল অথবা রান্না–বান্নার পাত্র। প্রয়োজনে এসব জিনিসি প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে নেয়া দোষনীয় মনে করা হয় না। কেউ এগুলো দিতে অস্বীকৃত হলে তাকে বড় কৃপণ ও নীচ মনে করা হয়। কারও কারও মতে আলোচ্য আয়াতে ماعون বলে যাকাত বোঝানো হয়েছে। যাকাতকে ماعون বলার কারণ এই যে, যাকত পরিমাণে আসল অর্থের তুলনায় খুবই কম—অর্থাৎ, চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে। হযরত আলী ও ইবনে ওমর (রাঃ) এবং হাসান বসরী, কাতাদাহ্ ও যাহ্হাক (রহঃ) প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ এখানে এ তফসীরই করেছেন।—(মাযহারী) বলাবাহুল্য, বর্ণিত শাস্তি জাহান্নাম ফরয কাজ তরক করার কারণেই হতে পারে। ব্যবহার্য জিনিসপত্র অপরকে দেয়া খুব সওয়াবের কাজ এবং মানবতার দিক দিয়ে জরুরী, কিন্তু ফরয বা ওয়াজিব নয়, যা না দিলে জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে। কোন কোন হাদীসে ماعون –এর তফসীর ব্যবহার্য জিনিস করা হয়েছে। এর মর্মার্থ তাদের চরম নীচতাকে ফুটিয়ে তোলা যে, তারা যাকাত কি দেবে, ব্যবহার্য জিনিস দেয়ার মধ্যে কোন খরচ নেই — এতেও তারা কৃপণতা করে।

অতএব শাস্তির বিধান কেবল ব্যবহার্য জিনিস না দেয়ার কারণেই নয় ; বরং ফরয যাকাত না দেয়াসহ চরম কৃপণতার কারণে।

সূরা কাওসার

শানে নুযূল ঃ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির পুত্রসন্তান মারা যায়, আরবে তাকে ابتر নির্বংশ বলা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পুত্র কাসেম অথবা ইবরাহীম যখন শৈশবেই মারা গেলেন, তখন কাফেররা তাঁকে নির্বংশ বলে উপহাস করতে লাগল। ওদের মধ্যে 'আস ইবনে ওয়ায়েলের' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সামনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কোন আলোচনা হলে সে বলতঃ আরে তার কথা বাদ দাও, সে তো কোন চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ, সে নির্বংশ। তার মৃত্যু হয়ে গেলে তার নাম উচ্চাচরণ করারও কেউ থাকবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে-কাসীর, মাযহারী)

সরাকথা, পুত্রসন্তান না থাকার কারণে কাফেররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর প্রতি দোষারোপ করত অথবা অন্যান্য কারণে তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত। এরই প্রেক্ষাপটে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়। এতে দোষারোপের জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, শুধু পুত্রসন্তান না থাকার কারণে যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্বংশ বলে, তারা তাঁর প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে বে-খবর। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যদিও তা কন্যা-সন্তানের তরফ থেকে হয়। অনন্তর নবীর আধ্যাত্মিক সন্তান অর্থাৎ, উম্মত তো এত অধিকসংখ্যক হবে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতের সমষ্টি অপেক্ষাও বেশী হবে। এছাড়া এ সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রিয় ও সম্মানিত তাও তৃতীয় আয়াতে বিবৃত হয়েছে।

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ —— হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'কাউসার' সেই অজস্র কল্যাণ যা আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দান করেছেন। কাউসার জান্নাতের একটি প্রস্রবনের নাম—কারও কারও এই উক্তি সম্পর্কে সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ একথা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তির পরিপন্থী নয়। কাউসার নামক প্রস্রবণটিও এই অজস্র কল্যাণের একটি। তাই মুজাহিদ কাউসারের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ এটা উভয় জাহানের অফুরন্ত কল্যাণ। এতে জান্নাতের বিশেষ কাউসার প্রস্রবণও অন্তর্ভুক্ত।

হাউযে কাউসার ঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে তন্দ্রা অথবা এক প্রকার অচেনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি হাসিমুখে মস্তক উত্তোলন করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রসুলাল্লাহ্, আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন ঃ এই মুহূর্তে আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ্সহ সূরা কাউসার পাঠ করলেন এবং বললেন ঃ তোমরা জান, কাউসার কি? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার পালনকর্তা আমাকে এটা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউযে কেয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যা আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফেরেশতাগণ হাউয থেকে হটিয়ে দেবে। আমি বলব ঃ পরওয়ারদেগার, সে তো আমার উম্মত। আল্লাহ্ তাআলা বলবেন ঃ আপনি জানেন না, আপনার পরে সে কি নতুন মত ও পথ অবলম্বন করেছিল।—(বোখারী, মুসলিম, আবু-দাউদ, নাসায়ী)

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ - نحر শব্দের অর্থ উট কোরবানী করা। এর প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে হাত-পা বেঁধে কণ্ঠনালীতে বর্শা অথবা ছুরি দিয়ে আঘাত করা এবং রক্ত বের করে দেয়া। গরু-ছাগল ইত্যাদির কোরবানীর পদ্ধতি যবাই করা। অর্থাৎ, জন্তুকে শুইয়ে কণ্ঠনালীতে ছুরিকাঘাত করা। আরবে সাধারণতঃ উট কোরবানী করা হত। তাই কোরবানী বোঝাবার জন্যে এখানে نحر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝে মাঝে এ শব্দটি যে কোন কোরবানীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সূরার প্রথম আয়াতে কাফেরদের মিথ্যা ধারণার বিপরীতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ক কাউসার (অর্থাৎ, ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কল্যাণ, তাও অজস্র পরিমাণে দেয়ার সুসংবাদ শুনানোর পর এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁকে দু'টি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে — নামায ও কোরবানী। নামায শারীরিক এবাদতসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ এবাদত এবং কোরবানী আর্থিক এবাদতসমূহের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বের অধিকারী। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার নামে কোরবানী করা প্রতিমা পূজারীদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে একটি জেহাদ বটে। তারা প্রতিমাদের নামে কোরবানী করত। এ কারণেই অন্য এক আয়াতেও নামাযের সাথে কোরবানীর উল্লেখ আছে— إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ —আলোচ্য আয়াতে وَانْحَرْ — এর অর্থ যে কোরবানী, একথা হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ), আতা, মুজাহিদ, হাসান বসরী (রাহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ এর অর্থ শত্রুতাপোষণকারী, দোষারোপকারী। যেসব কাফের রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্বংশ বলে দোষারোপ করত, এ আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে অধিকাংশ রেওয়ায়েত মতে 'আস ইবনে ওয়ায়েল, কোন কোন রেওয়ায়েত মতে ওকবা এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে কা'ব ইবনে আশরাফকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কাউসার অর্থাৎ, অজস্র কল্যাণ দান করেছেন। এর মধ্যে সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যও অন্তর্ভুক্ত। তাঁর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কম নয়। এছাড়া পয়গম্বর উম্মতের পিতা এবং উম্মত তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তান। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উম্মত পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বরের উম্মত অপেক্ষা অধিক হবে। সুতরাং একদিকে শত্রুদের উক্তি নস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে এবং অপরদিকে আরও বলা হয়েছে যে, যারা আপনাকে নির্বংশ বলে প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বংশ।

সূরা কাফিরূন

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ)- এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ ফজরের সুন্নত নামাযে পাঠ করার জন্যে দু'টি সূরা উত্তম —সূরা কাফিরূন ও এখলাস।—(মাযহারী) তফসীর

ইবনে–কাসীরে কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে ফজরের সুন্নতে এবং মাগরিব পরবর্তী সুন্নতে এ দু'টি সূরা অধিক পরিমাণে পাঠ করতে শুনেছেন। জনৈক সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর কাছে আরয করলেন ঃ আমাকে নিদ্রার পূর্বে পাঠ করার জন্যে কোন দোয়া বলে দিন। তিনি সূরা কফিরূন পাঠ করতে আদেশ দিলেন এবং বললেন এটা শিরক থেকে মুক্তিপত্র। জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রাঃ) বলেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ তুমি কি চাও যে, সফরে গেলে সঙ্গীদের চেয়ে অধিক সুখে–স্বাচ্ছন্দ্যে থাক এবং তোমার আসবাবপত্র বেশী হোক? আমি জওয়াব দিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি অবশ্যই এরূপ চাই। তিনি বললেন ঃ কোরআনের শেষ দিককার পাঁচটি সূরা— সূরা কাফিরূন, নছর, এখলাস, ফালাক, ও নাস পাঠ কর এবং প্রত্যেক সূরা বিস্মিল্লাহ্ বলে শুরু কর ও বিস্মিল্লাহ্ বলে শেষ কর। হযরত জুবায়ের (রাঃ) বলেন, ইতিপূর্বে আমার অবস্থা ছিল এই যে, সফরে আমার পাথেয় কম এবং সঙ্গীদের তুলনায় আমি দুর্দশাগ্রস্ত হতাম। কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)– এর এই শিক্ষা অনুসরণ করলাম, তখন থেকে আমি সফরে সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল হয়ে থাকি। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে বিচ্ছু দংশন করলে তিনি পানির সাথে লবণ মিশ্রিত করলেন এবং সূরা কাফিরূন, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করতে করতে ক্ষতস্থানে পানি লাগালেন।—(মাযহারী)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মোত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খলফ প্রমুখ মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কয়েকজন একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর কাছে এসে বলল ঃ আসুন, আমরা পরস্পরের মধ্যে এই শান্তিচুক্তি করি যে, একবছর আপনি আমাদের উপাস্যদের এবাদত করবেন এবং একবছর আমরা আপনার উপাস্যের এবাদত করব।—(কুরতুবী) তিবরানীর রেওয়ায়েতে ইবনে–আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, কাফেররা প্রথমে পারস্পরিক শান্তির স্বার্থে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সামনে এই প্রস্তাব রাখল যে, আমরা আপনাকে বিপুল পরিমাণে ধনৈশ্বর্য দেব, ফলে আপনি মক্কার সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিময়ে আপনি শুধু আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না। যদি আপনি এটাও মেনে না নেন, তবে একবছর আমরা আপনার উপাস্যের এবাদত করব এবং একবছর আপনি আমাদের উপাস্যদের এবাদত করবেন।—(মাযহারী)

আবু সালেহ্–এর রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মক্কার কাফেররা পারস্পরিক শান্তির লক্ষ্যে এই প্রস্তাব দিল যে, আপনি আমাদের কোন প্রতিমার গায়ে কেবল হাত লাগিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সত্য বলব। এর পরিপ্রেক্ষিতে জিবরাঈল সূরা কাফিরূন নিয়ে আগমন করলেন। এতে কাফেরদের ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং আল্লাহ্ তাআলার অকৃত্রিম এবাদতের আদেশ আছে।

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ — এ সূরায় কয়েকটি বাক্য পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হওয়ায় স্বভাবতঃ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ ধরনের আপত্তি দূর করার জন্যে বোখারী অনেক তফসীরবিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একই বাক্য একবার বর্তমানকালের জন্যে এবং একবার ভবিষ্যৎকালের জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি এক্ষণে কার্যতঃ তোমাদের উপাস্যদের এবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের এবাদত কর না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ হতে পারে না।

النصر ١١٠ - تبت - الاخلاص ٢١٢   ٦١٠   عمّ ٣٠

وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ۝٤ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ۝٦

سُورَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُ آيَاتٍ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۝١ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا ۝٣

سُورَةُ تَبَّتْ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ آيَاتٍ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ۝٤ فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍۭ ۝٥

سُورَةُ الْإِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعُ آيَاتٍ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۝٤

(৩) এবং তোমরাও এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি (৪) এবং আমি এবাদতকারী নই যার এবাদত তোমরা কর। (৫) তোমরা এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি। (৬) তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।

সূরা নছর

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় (২) এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, (৩) তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

সূরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, (২) কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। (৩) সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে (৪) এবং তার স্ত্রীও—যে ইন্ধন বহন করে, (৫) তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।

সূরা এখলাছ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক, (২) আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দিয়েনি (৪) এবং তার সমতূল্য কেউ নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইবনে কাসীর এখানে অন্য একটি তফসীর অবলম্বন করেছেন। তিনি এক জায়গায় ما - কে موصول ধরেছেন এবং অন্য জায়গায় مصدرية ধরেছেন। ফলে প্রথম জায়গায় لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা যেসব উপাস্যের এবাদত কর, আমি তাদের এবাদত করি না এবং আমি যে উপাস্যের এবাদত করি তোমরা তার এবাদত কর না। দ্বিতীয় জায়গায় وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ -আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও তোমাদের এবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। আমি তোমাদের মত এবাদত করতে পারি না এবং বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরাও আমার মত এবাদত করতে পার না। এভাবে প্রথম জায়গায় উপাস্যদের বিভিন্নতা এবং দ্বিতীয় জায়গায় এবাদত পদ্ধতির বিভিন্নতা বিধৃত হয়েছে। সারকথা এই যে, তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে উপাস্যের ক্ষেত্রেও অভিন্নতা নেই এবং এবাদত-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নেই। এভাবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখের আপত্তি দূর হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুসলমানদের এবাদতপদ্ধতি তাই, যা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে। আর মুশরিকদের এবাদত-পদ্ধতি স্বকপোলকল্পিত।

ইবনে-কাসীর এই তফসীরের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন ঃ 'লা-ইলাহ্ ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' কলেমার অর্থও তাই হয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। এবাদত-পদ্ধতি তাই গ্রহণযোগ্য, যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছেছে।

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ — এর তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে-কাসীর বলেন ঃ এ বাক্যটি তেমনি যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ — আরও এক আয়াতে لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ — এর সারমর্ম এই যে, ইবনে-কাসীর دين শব্দকে ধর্মের ক্রিয়াকর্মের অর্থে নিয়েছেন যার অর্থ প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কাফেরদের সাথে শান্তিচুক্তির বৈধ ও অবৈধ প্রকার ঃ আলোচ্য সূরায় কাফেরদের প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তির কতক প্রকার সম্পূর্ণ খণ্ডন করে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং কোরআন পাকে একথাও আছে যে, وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا -অর্থাৎ, কাফেররা সন্ধি করতে চাইলে তোমরাও সন্ধি কর। মদীনায় হিজরত করার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও ইহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাই কোন কোন তফসীরবিদ সূরা কাফিরূনকে মনসুখ ও রহিত সাব্যস্ত করেছেন এবং এর বড় কারণ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ আয়াতখানি। কেননা, এটা বাহ্যতঃ জেহাদের আদেশের। কিন্তু শুদ্ধ কথা এই যে, لَكُمْ دِينُكُمْ -এর অর্থ এরূপ নয় যে, কুফর করার অনুমতি অথবা কুফরে বহাল থাকার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, বরং এর সারমর্ম হল 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। অতএব অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে সূরাটি রহিত নয়। যে ধরনের শান্তিচুক্তি নিষিদ্ধ রয়েছে وَإِن جَنَحُوا۟ আয়াত দ্বারা এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চুক্তি দ্বারা সে শান্তিচুক্তির অনুমতি বা বৈধতা জানা যায়, তা

সে সময় যেমন বৈধ ছিল, আজও তেমনি বৈধ আছে। বৈধতা ও অবৈধতার আসল কারণ হচ্ছে স্থান-কাল-পাত্র এবং সন্ধির শর্তাবলী। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ফয়সালা দিতে গিয়ে বলেছেন— الاصلحا احل حراما اوحرم حلالا —অর্থাৎ, সে সন্ধি অবৈধ, যা কোন হারামকে হালাল কিংবা হালালকে হারাম করে। এখন চিন্তা করুন, কাফেরদের প্রস্তাবিত চুক্তি মেনে নিলে শিরক করা জরুরী হয়ে পড়ে। কাজেই সূরা কাফিরূন এ ধরনের সন্ধি নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে ইসলামের মূলনীতিবিরুদ্ধ কোন বিষয় ছিল না। উদারতা, সদ্ব্যবহার ও শান্তি অন্বেষায় ইসলামের সাথে কোন ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্তু শান্তিচুক্তি মানবিক অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে—আল্লাহ্ তাআলার আইন ও ধর্মের মূলনীতিতে কোন প্রকার দরকষাকষির অবকাশ নেই।

সূরা নছর

এ সূরা সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় অবতীর্ণ এবং এর অপর নাম সূরা 'তাওদী'। 'তাওদী' শব্দের অর্থ বিদায় করা। এ সূরায় রসূলে করীম (সাঃ)-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত আছে বিধায় এর নাম 'তাওদী' হয়েছে।

কোরআন পাকের সর্বশেষ সূরা ও সর্বশেষ আয়াত ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নছর কোরআনের সর্বশেষ সূরা। অর্থাৎ, এরপর কোন সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কতক রেওয়ায়েতে কোন কোন আয়াত নাযিল হওয়ার যে কথা আছে, তা এর পরিপন্থী নয়। সূরা ফাতেহাকে এই অর্থেই কোরআনের সর্বপ্রথম সূরা বলা হয়। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ সূরারূপে সূরা ফাতেহাই সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে। সুতরাং সূরা আলাক, মুদ্দাসসির ইত্যাদির কোন কোন আয়াত পূর্বে নাযিল হলে তা এর পরিপন্থী নয়।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ সূরা নছর বিদায় হজ্জে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাত্র আশি দিন জীবিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর জীবনের যখন মাত্র পঞ্চাশ দিন বাকী ছিল, তখন কালালার আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর পঁয়ত্রিশ দিন বাকী থাকার সময় لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ .. আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একুশ দিন বাকী থাকার সময় ... وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ আয়াত অবতীর্ণ হয়। —(কুরতুবী)

এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, প্রথম আয়াতে বিজয় বলে মক্কাবিজয় বোঝানো হয়েছে। তবে সূরাটি মক্কাবিজয়ের পূর্বে নাযিল হয়েছে, না পরে, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। اذا جاء ভাষাদৃষ্টে পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে বলে বাহ্যতঃ মনে হয়। রূহুল-মা'আনীতে এর অনুকূলে একটি রেওয়ায়েতও বর্ণিত আছে, যাতে বলা হয়েছে যে, খয়বর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। খয়বর বিজয় যে মক্কাবিজয়ের পূর্বে হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। রূহুল-মা'আনীতে হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দু'বছর জীবিত ছিলেন। যেসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মক্কা বিজয়ের দিন অথবা বিদায় হজ্জে নাযিল হয়েছে, সেগুলোর মর্মার্থ এরূপ হতে পারে যে, এস্থলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সূরাটি পাঠ করে থাকবেন। ফলে সবাই ধারণা করেছে যে, এটা এক্ষুণি নাযিল হয়েছে।

একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উক্তিতে আছে যে, এ সূরায় রসূলে করীম (সাঃ)- এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে যে, আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তসবীহ্ ও এস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। মুকাতিল (রহঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের এক সমাবেশে সূরাটি তেলাওয়াত করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে, এতে মক্কাবিজয়ের সুসংবাদ আছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সূরাটি শুনে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এতে আপনার ওফাতের সংবাদ লুক্কায়িত আছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও এর সত্যতা স্বীকার করলেন। বোখারী হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে তাই রেওয়ায়েত করেছেন। তাতে আরও আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) একথা শুনে বললেন ঃ এ সূরার মর্ম থেকে আমিও তাই বুঝি। — (কুরতুবী)

وَرَاَيْتَ النَّاسَ — মক্কাবিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেসালত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কোরাইশদের ভয়ে অথবা অন্য কোন কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। মক্কাবিজয় তাদের সেই বাধা দূর করে দেয়। সেমতে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। ইয়ামেন থেকে সাত শ' ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে পথিমধ্যে আযান দিতে দিতে ও কোরআন পাঠ করতে করতে মদীনায় উপস্থিত হয়। সাধারণ আরবরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়।

মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে বেশী পরিমাণে তসবীহ ও এস্তেগফার করা উচিত ঃ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ —হযরত আয়েশা বলেন ঃ এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রত্যেক নামাযের পর এই দোয়া পাঠ করতেন سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفرلى — (বোখারী)

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন ঃ এই সূরা নাযিল হওয়ার পর তিনি উঠা-বসা, চলাফেরা তথা সর্বাবস্থায় এই দোয়া পাঠ করতেন سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه তিনি বলতেন ঃ আমাকে এর আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর প্রমাণস্বরূপ সূরাটি তেলাওয়াত করতেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে এবাদতে মনোনিবেশ করেন। ফলে তাঁর পদযুগল ফুলে যায়। — (কুরতুবী)

সূরা লাহাব

আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল ওয্‌যা। সে ছিল আবদুল মোত্তালিবের অন্যতম সন্তান। গৌরবর্ণের কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় আবু লাহাব। কোরআন পাক তার আসল নাম বর্জন করেছে। কারণ,

সেটা মুশরিকসুলভ। এছাড়া আবু লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহান্নামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কট্টর শত্রু ও ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল। সে নানাভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কষ্ট দেয়ার প্রয়াস পেত। তিনি যখন মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিতেন, তখন সে সাথে সাথে যেয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত। — (ইবনে-কাসীর)

শানে-নুযূল ঃ বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাফা পর্বতে আরোহণ করে কোরাইশ গোত্রের উদ্দেশে ياصباحاه বলে অথবা আবদে মানাফ ও আবদুল মোত্তালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। (এভাবে ডাক দেয়া তখন আরবে বিপদাশংকার লক্ষণরূপে বিবেচিত হত।) ডাক শুনে কোরাইশ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ যদি আমি বলি যে, একটি শত্রুদল ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে এবং সকাল বিকাল যে কোন সময় তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? সবাই একবাক্যে বলে উঠল ঃ হাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি (শিরক ও কুফরের কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভীষণ আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। একথা শুনে আবু লাহাব বলল ঃ تبالك الهذا جمعتنا ধ্বংস হও তুমি, এজন্যেই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? অতঃপর সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে পাথর মারতে উদ্যত হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়।

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ শব্দের অর্থ হাত। মানুষের সব কাজে হাতের প্রভাবই বেশী, তাই কোন ব্যক্তির সত্তাকে হাত বলেই ব্যক্ত করে দেয়া হয়; যেমন কোরআনে بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আবু লাহাব একদিন বলতে লাগল ঃ মুহাম্মদ বলে যে, মৃত্যুর পর এটা হবে, সেটা হবে। পরপর সে তার হাতের দিকে ইশারা করে বলল ঃ এই হাতে সেগুলোর মধ্য থেকে একটিও আসেনি। অতঃপর সে তার হাতকে লক্ষ্য করে বলল ঃ تبالكما مارى فيكما شيئا مما قال محمد — অর্থাৎ, তোমরা ধ্বংস হও, মুহাম্মদ যেসব বিষয় সংঘটিত হওয়ার কথা বলে আমি সেগুলোর মধ্যে একটিও তোমাদের মধ্যে দেখিনি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক বলেছে।

تبت এর অর্থ ধ্বংস ও বরবাদ হওয়া। আয়াতে বদদোয়ার অর্থে تبات বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আবু লাহাব ধ্বংস হোক। দ্বিতীয় বাক্যে وتب এ বদদোয়া কবুল হওয়ার খবর দেয়া হয়েছে যে, আবু লাহাব ধ্বংস হয়ে গেছে। মুসলমানদের ক্রোধ দমনের উদ্দেশে বদদোয়ার বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, আবু লাহাব যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে تبا বলেছিল, তখন মুসলমানদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তাঁরাও ওর জন্যে বদদোয়া করবেন। আল্লাহ্ তাআলা যেন তাঁদের মনের কথা নিজেই বলে দিলেন। সাথে সাথে এ খবরও দিয়ে দিলেন যে, এ বদদোয়ার ফলে সে ধ্বংসও হয়ে গেছে। আবু লাহাবের ধ্বংসপ্রাপ্তির এই পূর্ব সংবাদের প্রভাবে বদর যুদ্ধের সাত দিন পর তার গলায় প্লেগের ফোঁড়া দেখা দেয়। সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে বিজন জায়গায় ছেড়ে আসে। শেষ পর্যন্ত এই অসহায় অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। তিন দিন পর্যন্ত তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করেনি। পঁচতে শুরু করলে চাকর-বাকরদের দ্বারা মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। — (বয়ানুল-কোরআন)

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ - ماكسب এর অর্থ ধন-সম্পদ দ্বারা অর্জিত মুনাফা ইত্যাদি। এর অর্থ সন্তান-সন্ততিও হতে পারে। কেননা, সন্তান-সন্ততিকেও মানুষের উপার্জন বলা হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه অর্থাৎ, মানুষ যা খায়, তন্মধ্যে তার উপার্জিত বস্তুই সর্বাধিক হালাল ও পবিত্র এবং তার সন্তান সন্ততিও তার উপার্জিত বস্তুর মধ্যে দাখিল। অর্থাৎ, সন্তানের উপার্জন খাওয়াও নিজের উপার্জন খাওয়ারই নামান্তর। — (কুরতুবী) এ কারণে কয়েকজন তফসীরবিদ এস্থলে وَمَا كَسَبَ এর অর্থ করেছেন সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ্ তাআলা আবু লাহাবকে যেমন দিয়েছিলেন অগাধ ধন-সম্পদ, তেমনি দিয়েছিলেন অনেক সন্তান-সন্ততি। অকৃতজ্ঞতার কারণে এ'দুটি বস্তুই তার গর্ব, অহমিকা ও শাস্তির কারণ হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন স্বগোত্রকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেন, তখন আবু লাহাব একথাও বলেছিল, আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা যদি সত্যই হয়ে যায়, তবে আমার কাছে ঢের অর্থবল ও লোকবল আছে। আমি এগুলোর বিনিময়ে আত্মরক্ষা করব। এর প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, আল্লাহ্র আযাব যখন তাকে পাকড়াও করল, তখন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কোন কাজে আসল না। অতঃপর পরকালের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ অর্থাৎ, কেয়ামতে অথবা মৃত্যুর পর কবরেই সে এক লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে। তার নামের সাথে মিল রেখে অগ্নির বিশেষণ ذَاتَ لَهَبٍ বলার মধ্যে বিশেষ অলংকার রয়েছে।

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ আবু লাহাবের ন্যায় তার স্ত্রীও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। সে এ ব্যাপারে তার স্বামীকে সাহায্য করত। সে ছিল আবু সুফিয়ানের ভগিনী ও হরব ইবনে উমাইয়্যার কন্যা। তাকে উম্মে জামীল বলা হত। আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই হতভাগিনীও তার স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ শুষ্ককাঠ বহনকারিণী। আরবের বাকপদ্ধতিতে পশ্চাতে নিন্দাকারীকে حَمَّالَةَ (খড়িবাহক) বলা হত। শুষ্ককাঠ একত্রিত করে যেমন কেউ অগ্নি সংযোগের ব্যবস্থা করে, পরোক্ষে নিন্দাকার্যটিও তেমনি। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আবু লাহাব পত্নী পরোক্ষে নিন্দাকার্যের সাথেও জড়িত ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইকরিমা ও মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ -এর এ তফসীরই করেছেন। অপরপক্ষে ইবনে যায়েদ ও যাহ্হাক (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণ একে আক্ষরিক অর্থেই রেখেছেন এবং কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, এই নারী বন থেকে কন্টকযুক্ত লাকড়ি চয়ন করে আনত এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কষ্ট দেয়ার জন্যে তাঁর পথে বিছিয়ে রাখত। তার এই নীচ ও হীন কাণ্ডকে কোরআন حَمَّالَةَ الْحَطَبِ বলে ব্যক্ত করেছে। — (কুরতুবী, ইবনে-কাসীর) কেউ কেউ বলেন যে, তার এই অবস্থাটি হবে জাহান্নামে। সে জাহান্নামে যাক্কুম ইত্যাদি বৃক্ষ থেকে লাকড়ি এনে জাহান্নামে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে অগ্নি আরও প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, যেমন দুনিয়াতেও সে স্বামীকে সাহায্য করে তার কুফর ও

জুলুম বাড়িয়ে দিত। — (ইবনে-কাসীর)

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ – مَسَدٍ শব্দটি সীন-এর উপর সাকিনযোগে ধাতু। অর্থ রশি পাকানো, রশি মজবুত করা এবং সীন-এর উপর যবরযোগে সর্বপ্রকার মজবুত রশিকে বলা হয়। — (কামূস) কেউ কেউ আরবের রীতি অনুযায়ী এর অনুবাদ করেছেন খর্জুরের রশি। কিন্তু ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) অনুবাদ করেছেন লোহার তার পাকানো মোটা দড়ি। জাহান্নামে তার গলায় লোহার তার পাকানো বেড়ী পরানো হবে। হযরত মুজাহিদ (রহঃ)ও তাই তফসীর করেছেন। — (মাযহারী)

সূরা এখলাস

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নুযূল ঃ তিরমিযী ও হাকেম প্রমুখের রেওয়ায়েতে আছে, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলার বংশপরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, যার জওয়াবে এই সূরা নাযিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, মদীনার ইহুদীরা এ প্রশ্ন করেছিল। এ কারণে যাহ্হাক (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদের মতে সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ।— (কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, মুশরিকরা আরও প্রশ্ন করেছিল—আল্লাহ্ তাআলা কিসের তৈরী, স্বর্ণরৌপ্য অথবা অন্য কিছুর? এর জওয়াবে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরার ফযীলত ঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর কাছে এসে আরয করল ঃ আমি এই সূরাটি খুব ভালবাসি। তিনি বললেন ঃ এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে দাখিল করবে।—(ইবনে-কাসীর)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে কোরআনের এক তৃতীয়াংশ শুনাব। অতঃপর যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, তারা একত্রিত হয়ে গেলে তিনি আগমন করলেন এবং সূরা এখলাস পাঠ করে শুনালেন। তিনি আরও বললেন ঃ এই সূরাটি কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। — (মুসলিম, তিরমিযী) আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে তা তাকে বালা-মুসীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট হয়।—(ইবনে-কাসীর)

ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে এমন তিনটি সূরা বলছি, যা তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ও কোরআনসহ সব কিতাবেই রয়েছে। রাত্রিতে তোমরা ততক্ষণ নিদ্রা যেয়োনা, যতক্ষণ সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস না পাঠ কর। ওকবা (রাঃ) বলেন ঃ সেদিন থেকে আমি কখনও এই আমল ছাড়িনি।—(ইবনে কাসরী)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ 'বলুন' কথার মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেসালতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষকে পথ প্রদর্শনের আদেশ রয়েছে। আল্লাহ্ শব্দটি এমন এক সত্তার নাম, যিনি চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সর্বগুণের আধার ও সর্বদোষ থেকে পবিত্র। احد ও واحد উভয়ের অর্থ এক। কিন্তু احد শব্দের অর্থে এটাও শামিল যে, তিনি কোন এক অথবা একাধিক উপাদান দ্বারা তৈরী নন, তাঁর মধ্যে একাধিকত্বের কোন সম্ভাবনা নেই এবং তিনি কারও তুল্য নন। এটা তাদের সেই প্রশ্নের জওয়াব, যাতে বলা হয়েছিল, আল্লাহ্ কিসের তৈরী? এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত সকল আলোচনা এসে গেছে এবং قل শব্দের মধ্যে নবুওয়তের কথা এসে গেছে। অথচ এসব আলোচনা বিরাটকায় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ – صمد শব্দের অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের অনেক উক্তি আছে। তিবরানী এসব উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন ঃ এগুলো সবই নির্ভুল। এতে আমাদের পালনকর্তার গুণাবলীই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু صمد এর আসল অর্থ সেই সত্তা, যাঁর কাছে মানুষ আপন অভাব ও প্রয়োজন পেশ করে এবং যাঁর সমান মহান কেউ নয়। সারকথা এই যে, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। — (ইবনে-কাসীর)

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ — যারা আল্লাহ্র বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, এটা তাদের জওয়াব। সন্তান প্রজনন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য — স্রষ্টার নয়। অতএব, তিনি কারও সন্তান নন এবং তাঁর কোন সন্তান নেই।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ — অর্থাৎ, কেউ তাঁর সমতুল্য নয় এবং আকার-আকৃতিতে কেউ তাঁর সাথে সামঞ্জস্য রাখে না।

সূরা এখলাস সমাপ্ত

سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ② وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ⑤

سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② اِلٰهِ النَّاسِ ③ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

সূরা ফালাক্ব

মদিনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, (৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, (৪) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাস

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার (২) মানুষের অধিপতির, (৩) মানুষের মা' বুদের (৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, (৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (৬) জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ফালাক ও পরবর্তী সূরা নাস একই সাথে একই ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম (রহঃ) উভয় সূরার তফসীর একত্রে লিখেছেন। তাতে বলেছেন যে, এ সূরাদ্বয়ের উপকারিতা ও কল্যাণ অপরিসীম এবং মানুষের জন্যে এ দু'টি সূরার প্রয়োজন অত্যধিক। বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করায় এ সূরাদ্বয়ের কার্যকারিতা অনেক। বলতে গেলে মানুষের জন্যে শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ যতটুকু প্রয়োজনীয়, এ সূরাদ্বয় তার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, জনৈক ইহুদী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর উপর জাদু করেছিল। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিবরাঈল আগমন করে সংবাদ দিলেন যে, জনৈক ইহুদী জাদু করেছে এবং যে জিনিসে জাদু করা হয়েছে, তা অমুক কূপের মধ্যে আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লোক পাঠিয়ে সেই জিনিস কূপ থেকে উদ্ধার করে আনলেন। তাতে কয়েকটি গ্রন্থি ছিল। তিনি গ্রন্থিগুলো খুলে দেয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শয্যা ত্যাগ করেন। জিবরাঈল ইহুদীর নাম বলে দিয়েছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে চিনতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার অভ্যাস তাঁর কোন দিনই ছিল না। তাই আজীবন এই ইহুদীকে কিছু বলেননি এবং তার উপস্থিতিতে মুখমণ্ডলে কোনরূপ অভিযোগের চিহ্নও প্রকাশ করেননি। কপটবিশ্বাসী হওয়ার কারণে ইহুদী রীতিমত দরবারে হাযির হত।

সহীহ্ বোখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) –এর উপর জনৈক ইহুদী জাদু করলে তার প্রভাবে তিনি মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং যে কাজটি করেননি, তাও করেছেন বলে অনুভব করতেন। একদিন তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)–কে বললেনঃ আমার রোগটা কি, আল্লাহ্ তাআলা তা আমাকে বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে) দুব্যক্তি আমার কাছে আসল এবং একজন শিয়রের কাছে ও অন্যজন পায়ের কাছে বসে গেল। শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্য জনকে বলল, তাঁর অসুখটা কি? অন্যজন বলল ঃ ইনি জাদুগ্রস্ত। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ কে জাদু করল? উত্তর হল, ইহুদীদের মিত্র মুনাফিক লবীদ ইবনে আ'সাম জাদু করেছে। আবার প্রশ্ন হল ঃ কি বস্তুতে জাদু করেছে? উত্তর হল, একটি চিরুনীতে। আবার প্রশ্ন হল, চিরুনীটি কোথায়? উত্তর হল, খেজুর ফলের আবরণীতে 'বির যরওয়ান' কূপে একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সে কূপে গেলেন এবং বললেন ঃ স্বপ্নে আমাকে এই কূপই দেখানো হয়েছে। অতঃপর চিরুনীটি সেখান থেকে বের করে আনলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ আপনি ঘোষণা করলেন না কেন (যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জাদু করেছে)? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। আমি কারও জন্যে কষ্টের কারণ হতে চাই না। (উদ্দেশ্য, একথা ঘোষণা করলে মুসলমানরা তাকে হত্যা করত অথবা কষ্ট দিত।)

মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর এই অসুখ ছয় মাস স্থায়ী হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও আছে যে,

কতক সাহাবায়ে কেরাম জানতে পেরেছিলেন যে, এ দুষ্কর্মের হোতা লাবীদ ইবনে আ'সাম। তাঁরা একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর কাছে এসে আরয করলেন ঃ আমরা এই পাপিষ্ঠকে হত্যা করব না কেন? তিনি তাঁদেরকে সে উত্তরই দিলেন, যা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে দিয়েছিলেন। ইমাম সা'লাবী (রহঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, জনৈক বালক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর কাজকর্ম করত। ইহুদী তার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চিরুনী হস্তগত করতে সক্ষম হয়। অতঃপর একটি তাঁতের সূতায় এগারটি গ্রন্থি লাগিয়ে প্রত্যেক গ্রন্থিতে একটি করে সুঁই সংযুক্ত করে। চিরুনীসহ সেই তার খেজুর ফলের আবরণীতে রেখে অতঃপর একটি কূপে প্রস্তরখণ্ডের নীচে রেখে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলা এগার আয়াতবিশিষ্ট এ দুটি সূরা নাযিল করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রত্যেক গ্রন্থিতে এক আয়াত পাঠ করে তা খুলতে লাগলেন। গ্রন্থি খোলা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তিনি অনুভব করলেন যেন একটি বোঝা নিজের উপর থেকে সরে গেছে। —(ইবনে-কাসীর)

জাদুগ্রস্ত হওয়া নবুওয়তের পরিপন্থী নয় ঃ যারা জাদুর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, তারা বিস্মিত হয় যে, আল্লাহ্‌র রসূলের উপর জাদু কিরূপে ক্রিয়াশীল হতে পারে। জাদুর স্বরূপ ও তার বিশদ বিবরণ সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে এতটুকু জানা জরুরী যে, জাদুর ক্রিয়াও অগ্নি, পানি ইত্যাদি স্বাভাবিক কারণাদির ক্রিয়ার ন্যায়। অগ্নি দহন করে অথবা উত্তপ্ত করে, পানি ঠাণ্ডা করে এবং কোন কোন কারণের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বর আনে। এগুলো সবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পয়গম্বরগণ এগুলোর উর্ধ্বে নন।জাদুর প্রতিক্রিয়াও এমনি ধরনের একটি ব্যাপার। কাজেই তাঁদের জাদুগ্রস্ত হওয়া অবাস্তব নয়।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর ফযীলতঃ প্রত্যেক মুমিনের বিশ্বাস এই যে, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত লাভ-লোকসান আল্লাহ্ তাআলার করায়ত্ত। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কারও অণু পরিমাণ লাভ অথবা লোকসান করতে পারে না। অতএব, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে দিয়ে দেয়া এবং কাজে কর্মে নিজেকে তাঁর আশ্রয়ে যাওয়ার যোগ্য করতে সচেষ্ট হওয়া। সূরা ফালাকে ইহলৌকিক বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে উভয় সূরার অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত আছে। সহীহ্ মুসলিমে ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)- এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা লক্ষ্য করেছ কি, অদ্য রাত্রিতে আল্লাহ্ তাআলা আমার প্রতি এমন আয়াত নাযিল করেছেন, যার সমতুল্য আয়াত দেখা যায় না; অর্থাৎ, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ আয়াতসমূহ। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর এবং কোরআনেও অনুরূপ অন্য কোন সূরা নেই। এক সফরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)-কে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করালেন, অতঃপর মাগরিবের নামাযে এ সূরাদ্বয়ই তেলাওয়াত করে বললেন ঃ এই সূরাদ্বয় নিদ্রা যাওয়ার সময় এবং নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থানের সময়ও পাঠ করো। অন্য হাদীসে তিনি প্রত্যেক নামাযের পর সূরাদ্বয় পাঠ করার আদেশ করেছেন।—(আবু দাউদ, নাসায়ী)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন রোগে আক্রান্ত হলে এই সূরাদ্বয় পাঠ করে হাতে ফুঁদিয়ে সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। ইন্তেকালের পূর্বে যখন তাঁর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, তখন আমি এই সূরাদ্বয় পাঠ করে তাঁর হাতে ফুঁক দিতাম। অতঃপর তিনি নিজে তা সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিতেন। আমার হাত তাঁর পবিত্র হাতের বিকল্প হতে পারত না। তাই আমি এরূপ করতাম। — (ইবনে-কাসীর) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হাবীব (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক রাত্রিতে বৃষ্টি ও ভীষণ অন্ধকার ছিল। আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে খুঁজতে বের হলাম। যখন তাঁকে পেলাম, তখন প্রথমেই তিনি বললেন ঃ বল। আমি আরয করলাম, কি বলব? তিনি বললেন ঃ সূরা এখলাস ও কূল আউযু সূরা দ্বয়। সকাল-সন্ধ্যায় এগুলো তিন বার পাঠ করলে তুমি প্রত্যেক কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।—(মাযহারী)

সারকথা এই যে, যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম এই সূরাদ্বয়ের আমল করতেন। অতঃপর আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন—

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ — فلق -এর শাব্দিক অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। এখানে উদ্দেশ্য নিশি শেষে ভোর হওয়া। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌র গুণ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ্‌র সমস্ত গুণের মধ্য থেকে একে অবলম্বন করার রহস্য এই হতে পারে যে, রাত্রির অন্ধকার প্রায়ই অনিষ্ট ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে এবং ভোরের আলো সেই বিপদাপদের আশংকা দূর করে দেয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইবে, তিনি তার সকল মুসীবত দূর করে দেবেন। —(মাযহারী)

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ — আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম (রহঃ) লিখেন ঃ شر শব্দটি দু'প্রকার বিষয়বস্তুকে শামিল করে — (এক) প্রত্যক্ষ অনিষ্ট ও বিপদ, যদ্দ্বারা মানুষ সরাসরি কষ্ট পায়, (দুই) যা মুসীবত ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে; যেমন কুফর, ও শিরক। কোরআন ও হাদীসে যেসব বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা আছে, সেগুলো এই প্রকারদ্বয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেগুলো হয় নিজেই বিপদ, না হয় কোন বিপদের কারণ।

আয়াতের ভাষায় সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্টই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজেই আশ্রয় গ্রহণের জন্যে এ বাক্যটিই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এস্থলে আরও তিনটি বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রায়ই বিপদ ও মুসীবতের কারণ হয়ে থাকে। প্রথমে বলা হয়েছে, وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ - غسق শব্দের অর্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান ও মুজাহিদ (রহঃ) غَاسِقٍ এর অর্থ নিয়েছেন রাত্রি। وقوب -এর অর্থ অন্ধকার পূর্নরূপে বৃদ্ধি পাওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই রাত্রি থেকে যখন তার অন্ধকার গভীর হয়। রাত্রিবেলায় জিন, শয়তান, ইতরপ্রাণী কীট-পতঙ্গ ও চোর-ডাকাত বিচরণ করে এবং শত্রুরা আক্রমণ করে। যাদুর ক্রিয়াও রাত্রিতে বেশী হয়। তাই বিশেষভাবে রাত্রি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় এই ঃ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ - نفث এর অর্থ ফুঁ দেয়া। عقد শব্দটি عقدة এর বহুবচন। অর্থ গ্রন্থি। যারা জাদু করে, তারা ডোর ইত্যাদিতে গিরা লাগিয়ে তাতে জাদুর মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয়। এখানে نفاثات স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা نفوث এরও বিশেষণ হতে পারে, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই দাখিল আছে। বাহ্যতঃ

এটা নারীর বিশেষণ। জাদুর কাজ সাধারণতঃ নারীরাই করে এবং জন্মগতভাবে এর সাথে তাদের সম্পর্কই বেশী। এছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) –এর উপর জাদুর ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরাদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে। সেই ঘটনায় ওলীদের কন্যারাই পিতার আদেশে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)– এর উপর জাদু করেছিল। জাদু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে, এর অনিষ্ট সর্বাধিক। কারণ, মানুষ জাদুর কথা জানতে পারে না। অজ্ঞতার কারণে তা দূর করতে সচেষ্ট হয় না। রোগ মনে করে চিকিৎসা করতে থাকে। ফলে কষ্ট বেড়ে যায়।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ — অর্থাৎ, হিংসুক ও হিংসা। হিংসার কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর উপর জাদু করা হয়েছিল। ইহুদী ও মুনাফিকরা মুসলমানদের উন্নতি দেখে হিংসার অনলে দগ্ধ হত। তারা সম্মুখযুদ্ধে জয়লাভ করতে না পেরে জাদুর মাধ্যমে হিংসার দাবানল নির্বাপিত করার প্রয়াস পায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর প্রতি হিংসা পোষণকারীর সংখ্যা জগতে অনেক। এ কারণেও বিশেভাবে হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

حَسَدَ শব্দের অর্থ কারও নেয়ামত ও সুখ দেখে দগ্ধ হওয়া ও তার অবসান কামনা করা। এই হিংসা হারাম ও মহাপাপ। এটাই আকাশে কৃত সর্বপ্রথম গোনাহ্ এবং এটাই পৃথিবীতে কৃত সর্বপ্রথম গোনাহ্। আকাশে ইবলীস আদম (আঃ)–এর প্রতি এবং পৃথিবীতে আদমপুত্র কাবীল তদীয় ভ্রাতা হাবীলের প্রতি হিংসা করেছে — (কুরতুবী) حَسَدَ তথা হিংসার কাছাকাছি হচ্ছে غبط তথা ঈর্ষা। এর সারমর্ম হচ্ছে কারও নেয়ামত ও সুখ দেখে নিজের জন্যেও তদ্রূপ নেয়ামত ও সুখ কামনা করা। এটা জায়েয; বরং উত্তম।

এখানে তিনটি বিষয় থেকে বিশেষ আশ্রয় প্রার্থনার কথা আছে। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথা যুক্ত করা হয়েছে — غَاسِقٍ এর সাথে إِذَا وَقَبَ এবং حَاسِدٍ–এর সাথে إِذَا حَسَدَ সংযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় نفاثات এর সাথে কোন কিছু সংযুক্ত করা হয়নি। কারণ এই যে, জাদুর ক্ষতি ব্যাপক। কিন্তু রাত্রিতে ক্ষতি ব্যাপক নয়; বরং রাত্রি যখন গভীর হয়, তখনই ক্ষতির আশংকা দেখা দেয়। এমনিভাবে হিংসুক ব্যক্তি যে পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে প্রবৃত্ত না হয়, সেই পর্যন্ত হিংসার ক্ষতি তার নিজের মধ্যেই সীমিত থাকে। তবে সে যদি হিংসায় উত্তেজিত হয়ে প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধনে সচেষ্ট হয়, তবেই প্রতিপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে।

সূরা নাস

০ সূরা ফালাকে জাগতিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য সূরা নাসে পারলৌকিক আপদ ও মুসীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। যেহেতু পরকালীন ক্ষতি গুরুতর, তাই এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে কোরআন পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ — এখানে ناس–এর দিকে এবং পূর্ববর্তী সূরায় فلق–এর দিকে رب–এর সম্বন্ধ করা হয়েছে। কারণ এই যে, পূর্ববর্তী সূরায় বাহ্যিক ও দৈহিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য এবং সেটা মানুষের মধ্যে সীমিত নয়। জন্তু–জানোয়ারও দৈহিক বিপদাপদ এবং মুসীবতে পতিত হয়। কিন্তু সূরায় শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। এটা মানুষের মধ্যে সীমিত এবং জিন জাতিও প্রসঙ্গতঃ শামিল আছে। তাই এখানে رَبّ শব্দের সম্বন্ধ ناس –এর দিকে করা হয়েছে। — (বায়যাভী)

مَلِكِ النَّاسِ — মানুষের অধিপতি إِلَٰهِ النَّاسِ — মানুষের মাবুদ। এ দুটি গুণ সংযুক্ত করার কারণ এই যে, رب শব্দটি কোন বিশেষ বস্তুর দিকে সম্বন্ধ হলে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের জন্যেও ব্যবহৃত হয়; যথা رب الدار গৃহের মালিক। প্রত্যেক মালিকই অধিপতি হয় না। তাই إِلَٰهِ النَّاسِ বলা হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক অধিপতিই মাবুদ হয় না। তাই مَلِكِ النَّاسِ বলতে হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ মালিক, অধিপতি, মাবুদ সবই। এই তিনটি গুণ একত্রিত করার রহস্য এই যে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি গুণ হেফাযত ও সংরক্ষণ দাবী করে। কেননা, প্রত্যেক মালিক তার মালিকানাধীন বস্তুর, প্রত্যেক রাজা তার প্রজার এবং প্রত্যেক উপাস্য তার উপাসকদের হেফাযত করে। এই গুণত্রয় একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার মধ্যে একত্রিত আছে। তিনি ব্যতীত কেউ এই গুণত্রয়ের সমষ্টি নন। তাই আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয় সর্বাধিক বড় আশ্রয়। হে আল্লাহ্,আপনিই এসব গুণের আধার এবং আমরা কেবল আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি — এভাবে দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার নিকটবর্তী হবে। এখানে প্রথমে بِرَبِّ النَّاسِ বলার পর ব্যাকরণিক নীতি অনুযায়ী সর্বনাম ব্যবহার করে الهہم ও ملکہم বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু দোয়া ও প্রশংসার স্থল হওয়ার কারণে এই শব্দকে বার বার উল্লেখ করাই উত্তম বিবেচিত হয়েছে। কেউ কেউ ناس শব্দটি বার বার উল্লেখ করার ব্যাপারে একটি রসালো তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেনঃ এ সূরায় ناس শব্দ পাঁচ বার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ناس বলে অল্পবয়স্ক বালক–বালিকা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই এর আগে رب অর্থাৎ, পালনকর্তা শব্দ আনা হয়েছে। কেননা, অল্পবয়স্ক বালক–বালিকারাই প্রতিপালনের অধিক মুখাপেক্ষী। দ্বিতীয় ناس দ্বারা যুবকশ্রেণী বোঝানো হয়েছে। مَلِكِ (রাজা, শাসক) শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শাসন যুবকদের জন্যে উপযুক্ত। তৃতীয় ناس বলে সংসারত্যাগী, এবাদতে মশগুল বুড়োশ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে। এবাদতের অর্থবাহী ইলাহ্ শব্দ তাদের জন্যে উপযুক্ত। চতুর্থ ناس বলে আল্লাহ্‌র সৎকর্মপরায়ণ বান্দা বোঝানো হয়েছে। وسوسة শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শয়তান সৎকর্মপরায়ণদের শত্রু। তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করাই তার কাজ। পঞ্চম ناس বলে দুষ্কৃতকারী লোক বোঝানো হয়েছে। কেননা, তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ — যে বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য অত্র আয়াতে সেই বিষয় বর্ণিত হয়েছে। وسواس শব্দটি ধাতু। এর অর্থ কুমন্ত্রণা। এখানে অতিরঞ্জনের নিয়মে শয়তানকে কুমন্ত্রণা বলে দেয়া হয়েছে; সে যেন আপাদমস্তক কুমন্ত্রণা। আওয়াজহীন গোপন বাক্যের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে তার আনুগত্যের আহবান করে। মানুষ এই বাক্যের অর্থ অনুভব করে, কিন্তু কোন আওয়াজ শুনে না। শয়তানের এরূপ আহবানকে কুমন্ত্রণা বলা হয়। — (কুরতুবী) خناس শব্দটি خنس থেকে উৎপন্ন। অর্থ পশ্চাতে সরে যাওয়া। মানুষ আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করলে পেছনে সরে যাওয়াই শয়তানের অভ্যাস। মানুষ গাফেল হলে

শয়তান আবার অগ্রসর হয়। অতঃপর হুশিয়ার হয়ে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করলে শয়তান আবার পশ্চাতে সরে যায়। এ কার্যধারাই অবিরাম অব্যাহত থাকে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দু'টি গৃহ আছে। একটিতে ফেরেশতা ও অপরটিতে শয়তান বাস করে। (ফেরেশতা সৎকাজে এবং শয়তান অসৎকাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।) মানুষ যখন আল্লাহ্‌র যিকর করে, তখন শয়তান পেছনে সরে যায় এবং যখন যিকিরে থাকে না, তখন তার চঞ্চু মানুষের অন্তরে স্থাপন করে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।— (মাযহারী)

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ — অর্থাৎ, কুমন্ত্রণাদাতা জিনের মধ্য থেকেও হয় এবং মানুষের মধ্য থেকেও হয়। অতএব সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ্ তাআলা রসূলকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন জিন-শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং মানুষ-শয়তানের অনিষ্ট থেকে। এখন জিন-শয়তানের কুমন্ত্রণা বুঝতে অসুবিধা হয় না; কারণ তারা অলক্ষ্যে থেকে মানুষের অন্তরে কোন কথা রাখতে পারে। কিন্তু মানুষ-শয়তান প্রকাশ্যে সামনে এসে কথা বলে। এটা কুমন্ত্রণা কিরূপে হল? জওয়াব এই যে, মানুষ-শয়তানও কারও সামনে এমন কথা বলে, যা থেকে সেই ব্যক্তির মনে কোন ব্যাপার সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এই সন্দেহ ও সংশয়ের বিষয় সে পরিষ্কার বলে না। শায়খ ইযযুদ্দীন (রহঃ) তদীয় গ্রন্থে বলেন ঃ মানুষ-শয়তানের অনিষ্ট বলে নফসের (মনের) কুমন্ত্রণা বোঝানো হয়েছে। কেননা, জিন-শয়তান যেমন মানুষের অন্তরে কুকাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে তেমনি স্বয়ং মানুষের নফসও মন্দ কাজেরই আদেশ করে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আপন নফসের অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে আছে اللهم انى اعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه۔ অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ আমি আপনার আশ্রয় চাই, আমার নফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং শিরক থেকেও।

কোরআনের সূচনা ও সমাপ্তির মিল ঃ আল্লাহ্ তাআলা সূরা ফাতেহার মাধ্যমে কোরআন পাক শুরু করেছেন, যার সারমর্ম আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর তাঁর সাহায্য ও সরলপথে চলার তওফীক প্রার্থনা করা। আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ও সরলপথের মধ্যেই মানুষের যাবতীয় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কামিয়াবী নিহিত । কিন্তু এ দুটি বিষয় অর্জনে এবং অর্জনের পর তা ব্যবহারে প্রতি পদক্ষেপে অভিশপ্ত শয়তানের চক্রান্ত ও কুমন্ত্রণার জাল বিছানো থাকে। তাই এ জাল ছিন্ন করার কার্যকর পন্থা আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা কোরআন পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

সমাপ্ত